সূচীপত্র—কার্ত্তিক, ১৩৭০



শরতের শিশিরভেজা সকাল।
আকাশের সাদা মেঘে
হাল্কা হাসির ঢেউ, শিউলিফুলের
গন্ধে খুসির আমেজ।
সোনারঙ দিনের
হাসিখুসির মেলায়
উৎসবের আনন্দ সার্থক হোক।
পূর্ব রেলওয়ে

সূচীপত্র—কার্ত্তিক, ১৩৭০

প্রবাসী প্রেস কলিকাতা

আরতি

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৩শ ভাগ
২য় খণ্ড

১ম সংখ্যা
কার্ত্তিক, ১৩৭০

বিবিধ প্রসঙ্গ

কলিকাতার বড়বাজার অঞ্চল

কলিকাতার অন্তঃস্থলের উপর দিয়া যে প্রশস্ত রাজপথ গিয়াছে তাহার বর্তমান নাম মহাত্মা গান্ধী রোড ঐ অঞ্চলের পশ্চিমাংশ কলিকাতার যত চোরাকারবার, কালোবাজার ও প্রবঞ্চনা-প্রতারণার কেন্দ্রস্থল বলিলেও চলে। সেই হিসাবে ঐ রাজপথ বা জনপথের নাম অন্ততঃ কলেজ ষ্টীটের পশ্চিমে—দুরাত্মা গণ্ডেরিরাম রোড হওয়া উচিত।

সম্প্রতি একজন পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্মচারী "হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ড" দৈনিকের রিপোর্টারকে এক বিবৃতি দিয়াছেন, যাহার সারাংশ ঐ দৈনিকের ৯ই অক্টোবরের সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। সে বিবরণে "চমকপ্রদ" কিছু না থাকিলেও এদেশ কোন মুখে চলিয়াছে তাহার একটা নির্দেশ আছে। সেই কারণে তাহার কিছু মর্মার্থ এখানে দেওয়া গেল।

চুরি-ডাকাতি, খুন-খারাপি, মারপিট, দাঙ্গা, সাধারণ লোকে দুষ্কৃতি বা অপরাধ বলিতে এই রকম মনে "তাক্ লাগানো" ঘটনার কথাই ভাবে। কিন্তু আর এক প্রকার দুষ্কৃতি আছে যাহার বাহ্যিক প্রকাশে কোন কিছু চমকপ্রদ অসাধারণ লক্ষণ দেখা যায় না। চোরা-চালানী কারবার ঠিক ঐ প্রকার ব্যাপার। উহার মধ্যে সাধারণ হিসাবে কোনও হিংস্র ফৌজদারী অপরাধের পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু উহার ফলাফল রাষ্ট্র ও সমাজের পক্ষে আরও সাংঘাতিক ভাবে ক্ষতিকর কেননা উহাতে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামোই ধ্বংস করিতে পারে।

ঐ পুলিশ মুখপাত্র বলেন যে কলিকাতার বড় বাজার একটি বৃহৎ ব্যবসায় কেন্দ্র। এখানে দৈনিক পঞ্চাশ লক্ষ টাকার মত কারবার চলে। এবং ঐ প্রকাশ্য ব্যবসায় ছাড়াও পনের ষোল লক্ষ টাকার চোরাচালানের মাল দৈনিক কেনা-বেচা হয়। স্থানীয় পুলিশ অধ্যক্ষের আন্দাজে শুধু পূর্বপাকিস্তান হইতেই দৈনিক দশ লক্ষ টাকার মাল এখানে আমদানি হয়। বাংলার দুই অংশের মধ্যে সীমানা অনেক স্থলেই প্রহরাহীন হওয়ায় ইহা সম্ভব হইতেছে। পুলিশ মুখপাত্র বলেন যে এ বিষয়ে খোঁজ করার জন্য দুই একটি নিম্নতর পুলিশ কর্মচারীকে নিয়োগ করায় জানুয়ারী হইতে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে এই বৎসরে ১৭০ খানি প্রাইভেট মোটর ধরা পড়ে যাহাতে সীমান্ত হইতে চোরাচালানী মাল বড়বাজারে আনা হইতেছিল। ঐ মোটরগুলি মাল সমেত ধরিয়া কাষ্টমস বিভাগের হাতে দেওয়া হয়। এবং দেখা গেল যে আরও বেশী কর্মচারী এই কাজে দিলে পরে আরও অনেক বেশী গাড়ী ধরা পড়িত।

মোটর ধরার পর তদন্তে কতকগুলি আশ্চর্যজনক বিষয় দেখা গেল। ঐ মোটরগুলির অধিকাংশই স্থানীয় ধনী ব্যবসায়ীদের দরওয়ানদের নামে রেজেষ্ট্রি করা। অল্প কয়টি ঐ অঞ্চলের ছোটখাটো দোকানীদের নামে রেজেষ্ট্রি করা ছিল। অধিকাংশ মোটরই সেকেণ্ডহাণ্ড গাড়ীর কারবারীদের কাছ হইতে কিস্তিবন্দি টাকা শোধের ব্যবস্থায় লওয়া। এবং সব কটিই প্রাইভেট ট্যাক্সি হিসাবে ভাড়া খাটে।

ধরা পড়িলে দারোয়ানজীরা বলেন গাড়ীর চালক তাঁদের

অজানিতে ঐরূপ ভাড়া খাটিয়াছে—অর্থাৎ তাঁদের হাতে গাঁজা খাইয়াছে। আদালতে সামান্য জরিমানা দিয়া পুনবার মহানন্দে ঐ কাজেই গাড়ী খাটে। এমনই দেশের আইন আদালতের ব্যবস্থা!

একদিকে এই চোরা-চালানের খোলা হাট অন্যদিকে ট্যাক্স ফাঁকি, শুল্ক ফাঁকি, জনসাধারণের খাদ্যে ভেজাল ও সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের কালোবাজার—অর্থাৎ জাতীয় সরকার ও দেশের জনসাধারণ উভয়েরই প্রবঞ্চনা ও প্রতারণা। এই তো বড় বাজার, আমড়াতলা ইত্যাদি কলিকাতার ব্যবসায় ও বাণিজ্য কেন্দ্রের অধিকাংশ অধিকারি ও অধিপতির স্বরূপ। এবং ইহাদেরই শোষণে ও পেষণে বাঙ্গালী অসহায় ভাবে সর্বস্বান্ত, গৃহ-আশ্রয়হারা ও সম্বিৎহীন হইয়া ধ্বংসের পথে চলিতেছে। অন্যদিকে ঐ প্রবঞ্চক ও প্রতারকের দল নির্ব্বিবাদে তাহাদের অসৎ উপায়ে অর্জিত অতুল ঐশ্বর্যের পরিচয় দিতেছে সারা শহরের শ্রেষ্ঠ বাসস্থানগুলি দখল করিয়া, বিরাট বিরাট বিদেশী মোটর চালাইয়া। কিবা দেশের অবস্থা ও ব্যবস্থা, কিবা দেশের শাসনতন্ত্রে অধিকারি বর্গের কেরামতি!

উপায় কি? পুলিশ মুখপাত্রে বলেন যে এদেশের ন্যায়-বিচার ও দণ্ডনীতির মধ্যে কিছু বিশেষ গলদ আছে, নহিলে একটা সাধারণ চোর দশ পঁচিশ টাকা চুরি করিয়া ধরা পড়িলে তাহার কয়েক মাসের জেল হয় আর এই ভাবে যাহারা দেশের ও দশের সর্বনাশ করিয়া ঐরূপে বিরাট ভাবে দুষ্কৃতি চালাইতেছে তাহাদের কোনও সাজা হয় না। আইন-কানুন বদল হইলে শাসনতন্ত্রের সংলগ্ন কর্মচারীবর্গ অনেক কিছুই করিতে পারেন।

আইন-কানুন বদলাইতে হইলে সংবিধান হইতে আরম্ভ করা প্রয়োজন। সংবিধান যাঁহারা গড়িয়াছিলেন এবং সেই সংবিধান লইয়া যাঁহারা কেন্দ্রীয় সংসদে আলোচনা ও বিতর্ক করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই মহানুভব ব্যক্তি। তাঁহাদের রচিত, আলোচিত ও গঠিত সংবিধানে দুষ্কৃতকারিদের পলায়নের সহস্রাধিক রন্ধ্রপথ তাঁহাদেরই অনুকম্পায় রহিয়াছে। বলিতে কি দেশের সকল দুর্নীতি ও দুষ্কৃতির আকর ঐ সংবিধান। ঐ সংবিধান অনুযায়ী ন্যায় ও দণ্ড-নীতির প্রসাদে দেশের দুষ্কৃতকারি তস্কর ও প্রবঞ্চক বাঁচিয়া আছে। এবং পাছে ঐরূপ আইন-কানুন বদল হয় সেই জন্য সেই লুটতরাজের অংশ যথাস্থানে সিঞ্চিত হয়। উহারই কারণে আজ কংগ্রেসের এই অধঃপতন।

কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচন ও কামরাজ প্রস্তাবের প্রসঙ্গ

বিগত ৯ই অক্টোবর সন্ধ্যায় নয়াদিল্লিতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এক বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষ প্রস্তাব করেন যে পরবর্তী কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ নাদারের হওয়া উচিত। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রী কে. কে. শাহ সাংবাদিকগণকে বলেন যে, কমিটির সকল সদস্য ও অধিবেশনে আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ সকলেই একমত হইয়া এই প্রস্তাব সমর্থন করেন।

অবশ্য, প্রচলিত রীতি অনুসারে আগামী ১০ই নভেম্বর পর্যন্ত সভাপতি মনোনয়ন পত্র দাখিলের সময় দেওয়া হইয়াছে এবং যদি প্রয়োজন হয় তবে আগামী ৯ই ডিসেম্বর ভোট গ্রহণ এবং ১৫ই ফলাফল ঘোষিত হইবে বলা হইয়াছে।

ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনের পূর্বেই অতুল্য বাবু প্রকাশ্য ভাবে বলেন যে, তাঁহার মতে যে সকল মন্ত্রী কামরাজ প্রস্তাব অনুযায়ী পদত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্য হইতেই কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হওয়া উচিত। তাঁহার এই মত কংগ্রেসদলে ও চিন্তাশীল জনসাধারণের কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হয়। এবং সেই যুক্তি অনুসারে শ্রীকামরাজই সভাপতি পদলাভের জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি।

তাহারও পূর্বে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় খাদ্য মন্ত্রী শ্রী এস. কে. পাতিল বলেন যে, তাঁহার মতে শ্রীঅতুল্য ঘোষকে কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত করা উচিত। বাংলা ও বাঙালীর কথা দীর্ঘ দিন ঐ পদের জন্য বিবেচিত হয় নাই এই কথাও তিনি উল্লেখ করিয়া বলেন যে এ বিষয়ে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের বিবেচনা করা প্রয়োজন। এই উক্তি ও কামরাজ প্রস্তাবের সম্পর্কিত নানা ব্যাপার সম্পর্কে খোলাখুলি মত প্রকাশের জন্য কংগ্রেসের মহারথিবৃন্দ পাতিলের প্রতি ভ্রূকুটি নিক্ষেপ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঐ বক্রদৃষ্টি পর্যন্তই তাঁহাদের বিরূপ মতের নির্দেশ রহিয়া গেল।

অবশ্য কংগ্রেস পার্লামেন্টারি বোর্ডের এক বৈঠকে শ্রী এস. কে. পাতিল এক ৩১টি শব্দবিশিষ্ট কৈফিয়ৎ দিয়াছিলেন। এবং বলা বাহুল্য সেই কৈফিয়ৎ বিনা বাক্যব্যয়ে এবং অত্যন্ত হৃদ্যতার পরিবেশে গৃহীত হয়। "কেঁচো খুঁড়িতে সাপ বার করা" সম্পর্কিত প্রবাদ বাক্য বোধহয় কংগ্রেসী মহারথীগণের হৃদয়ঙ্গম হয়। পণ্ডিত নেহরুও পাতিলের মন্তব্যকে এক প্রকার সমর্থন দিয়াছিলেন নয়া দিল্লীতে ৯ই অক্টোবরের সাংবাদিক্ সম্মেলনে। তিনি বলেন, যদিও কামরাজ প্রস্তাব মুখ্যতঃ অতি উত্তম, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে উহা চালু করায় অতি সুফল পাওয়া গিয়াছে, তবুও কয়েকটি রাজ্যে উহার জের হিসাবে যেভাবে মুখ্যমন্ত্রীর আসন লইয়া যেভাবে রেষারেষি হইয়াছে তাহা তাঁহার মনঃপূত হয় নাই। শ্রী এস. কে. পাতিলের [illegible]তা

লইয়া যে বিতর্ক চলিতেছে সে সম্বন্ধে পণ্ডিতজী কোন মন্তব্য করিতে সোজা অস্বীকার করেন এবং বলেন আগে পাতিলের সহিত আলোচনা হইলে পরে এবিষয়ে বাহিরে আলোচনা চলিতে পারে।

শ্রীপাতিলের বক্তৃতায় বিতর্কমূলক কথার মধ্যে একটি প্রধান বিষয়ের সমাধান হইল কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনে শ্রীঅতুল্য ঘোষের এই প্রস্তাবে একদিকে শ্রীকামরাজকে সভাপতিত্বে মনোনীত করায় এবং অন্যদিকে—পরোক্ষভাবে—শ্রীঅতুল্য ঘোষের স্বয়ং সরিয়া দাঁড়ানোয়।

যে ভাবে গুজরাটে শ্রীজীবরাজ মেহতাকে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়, সে সম্পর্কে পণ্ডিত নেহরু উক্ত সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, উহা "দুর্ভাগ্যজনক ভাবে পরিচালিত হইয়াছে" এবং উহাতে যে সকল চাল চালিত হয় সেগুলি সন্দেহের অতীত নয়। উত্তর প্রদেশে শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী অভিযোগ করেন যে, কংগ্রেস হাইকমাণ্ড তাঁহার মন্ত্রী মনোনয়ন ব্যাপারে অযথা হস্তক্ষেপ করিতেছেন, এই সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তরে পণ্ডিত নেহরু বলেন যে, ঐ বিষয়ে শেষ কথা বলার অধিকার কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের "আলবৎ" আছে। নহিলে উহার অস্তিত্বই নিরর্থক। বিহারে ও উত্তর প্রদেশে উপদলীয় প্রতিনিধিদের প্রসঙ্গে শ্রীনেহরুকে প্রশ্ন করা হয় যে, তিনি কি উপদলীয়তাকে প্রশ্রয় দিতেছেন না? জবাবে তিনি বলেন যে, সমস্ত উপদলীয় বা "সংখ্যালঘু সংঘের" প্রতিনিধি লইয়াই দল পূর্ণ করিতে হইবে।

কার্যতঃ উত্তর প্রদেশে সুচেতা কৃপালনীর মতামত অগ্রাহ্য করিয়া নূতন মন্ত্রীদল গড়িয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তাহা লইয়াই ঐ প্রদেশের মন্ত্রিসভা চালাইতে হইবে। বিহারে মোটামুটি একটা ব্যবস্থা হইয়াছে—তাহাও হাইকমাণ্ডের নির্দেশে—এবং সম্প্রতি কোন গোলমাল নাই।

ঐ সাংবাদিক সম্মেলনে ভাবী কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে তিনি কাহাকে "পসন্দ" করেন এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন "যিনি সর্বাপেক্ষা সেরা"। সে কে এই প্রশ্নের উত্তরে বুঝা যায় যে পণ্ডিত নেহরু, ঐ নির্বাচন খুব সোজা নয়, এই কথা অনুভব করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কেননা তিনি কংগ্রেসের আদর্শ যে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ, সে কথা বলিয়া ভারতীয় রাজনীতিতে ফ্যাশিস্ত প্রবণতা দেখা দিয়াছে ইত্যাদি অনেক কথাই বলেন। যা হোক তাঁহার ভয় যাহা ছিল তাহার নিরশন বোধ হয় অতুল্যবাবু করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

অর্থমন্ত্রীর বেতার ভাষণ

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী টি. টি. কৃষ্ণমাচারি বিগত ১১ই অক্টোবর নয়া দিল্লী হইতে এক বেতার ভাষণে ভারতের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। এই পনেরো মিনিট ব্যাপী বক্তৃতায় দেশের লোককে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে বেশ কিছু, আদর্শবাদ সম্পর্কে উচ্চারিত হইয়াছে বুকনি একাধিকবার, বলা হয় নাই শুধু এমন কোনও কথা যাহাতে দেশের লোক বুঝিতে পারে যে তাহাদের অর্থনৈতিক দুর্গতি নিরসনে দেশের উচ্চতম অধিকারিবর্গ কৃতসংকল্প হইয়াছেন। যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে একথাই বুঝা যায় যে "দেশের অর্থ নৈতিক পরিপুষ্টি"—অর্থাৎ দেশের শিল্পজাত, খনিজাত, কৃষিজাত ইত্যাদি পণ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি—লোক সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সমান হারে হইতেছে না বলিয়া সরকারের মাথাব্যথা আরম্ভ হইয়াছে। এবং সেই কারণে সরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্কে পণ্য উৎপাদন সম্পর্কিত বিষয়ে ধারের চাহিদা মিটাইতে বলিয়াছেন। অন্যদিকে এই ব্যবস্থার অপব্যবহার যে কি ভাবে হইতে পারে, তাহা জানা সত্ত্বেও সেদিকে সাবধানী হইবার কোনও নির্দেশ যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে দেওয়া হইবে সে বিষয়ে কোনও ইঙ্গিত পাওয়া গেল না।

মিলজাত, কৃষিজাত, বা খনিজাত, দ্রব্যাদি গুদামজাত করিয়া ব্যাঙ্ককে বন্ধক দিলে যদি পাইকারি মূল্যের বড় অংশ ধার পাওয়া যায় তবে কেনা-বেচা ও আদায়জনিত দেরীর কারণে টাকা টান পড়ায় যেভাবে উৎপাদন ব্যাহত হয়, তাহার অনেকটা সুরাহা হয় একথা সত্য। অন্যদিকে বর্তমানে ঐ সকল উৎপাদন কেন্দ্র ও শিল্পজাত পণ্যাদি যে একজাতীয় লোকের হস্তগত হইয়াছে বা দ্রুত গতিতে হইতেছে, যাহাদের বিবেকবুদ্ধি, সততা বা ন্যায় অন্যায় জ্ঞান একেবারেই নাই, যাহাদের জীবনের এক মাত্র লক্ষ্য বিপুল পরিমাণে অর্থোপার্জন সেই অর্থোপার্জন জন্য এহেন নীচ কাজ নাই যাহা করিতে ইহাদের ঠেকে বা এরূপ দুর্নীতি নাই যাহার প্রশ্রয় দিতে ইহাদের বাধে। জনসাধারণের রক্ত শোষণে ও ট্যাক্স শুল্ক ইত্যাদি ফাঁকি দিয়া বিরাট পুঁজি গড়িতে ইহারা সদা-সর্বদাই চেষ্টিত। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের টাকা সুলভ্য হইলে ইহারা পণ্য মূল্য বৃদ্ধি ও কালোবাজার, ভেজাল ও চোরাকারবার ইত্যাদির প্রসারে উৎসাহিত হইবেই।

অবশ্য সকল শিল্পপতিই এরূপ ট্যাক্স ফাঁকি, কালোবাজার চালান ইত্যাদি ফেরেববাজির প্রশ্রয় দেন না। কিন্তু শিল্প প্রতিষ্ঠান, খনি ইত্যাদি অধিকার যাঁহারা করিয়াছেন তাঁহাদের শতকরা ৯০ জন বোধহয় ঐ কুটিল কুপথের পথিক। শ্রীকৃষ্ণমাচারি ১০ জন সৎলোকের সুবিধা হয়ত কিছুটা করিবেন কিন্তু সেই সঙ্গে ৯০টি রক্তশোষকের শক্তি বৃদ্ধিও করিবেন। একথা কি তিনি জানেন না? ঐ রকম এক ব্যক্তির পাকে পড়িয়া তো এর আগে তাঁহাকে গদী ছাড়িতেই হইয়াছিল।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের টাকার অপব্যবহারের সম্পর্কে তিনি অবশ্য বলিয়াছেন যে, ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষ সে বিষয়ে খরদৃষ্টি রাখিবেন কিন্তু যাহাতে ঐ টাকায় ফটকা বা ঐরূপ বিকারগ্রস্ত কারবার না চলে। কিন্তু কালোবাজার ও চোরাবাজার ইত্যাদি কাঁচা টাকার ব্যাপারে ঘুষ ও ঘুষের অনুপান যে ভাবে ব্যবহৃত হয় তাহাতে কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষে সবদিক সামলানো বা চতুর্দ্দিকে খরদৃষ্টি রাখা কতটা সম্ভবপর হইবে সে বিষয়ে আমাদের ঘোর সন্দেহ আছে।

অল্প কথায় বলা যায় যে শ্রীকৃষ্ণমাচারির ব্যবস্থায় দেশের লোকের অবস্থা অবনতির পথেই চলিবে—যেমন চলিতেছে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি যদিইবা হয় তবে তাহাতে দেশের ৪২ কোটি লোকের মধ্যে বড়জোর ছুইচার হাজার লোকের কাজে—বা কুকাজে লাগিবে। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের শিল্প-বিপ্লবের প্রথমপাদে জনসাধারণের দুর্দ্দশা যেভাবে বৃদ্ধি পায়—যাহা দেখিয়া কার্লমার্কস তাঁহার প্রসিদ্ধ পুস্তক লেখেন—এদেশেও তাহারই পুনরাবৃত্তি হইবে।

শ্রীকৃষ্ণমাচারি সমাজতন্ত্র-সোসিয়ালিজম—সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছেন। সেই আলোচনায় ইহাই বুঝা যায় যে শ্রীকৃষ্ণমাচারি সমাজতন্ত্রবাদে আদৌ বিশ্বাস করেন না যদিও নেহরু মন্ত্রিসভার জাতিকুল বজায় রাখিবার বৃথা চেষ্টায় তিনি বড় বড় কথা অনেকগুলি বলিয়া নিজের ও শ্রোতাদের সময় নষ্ট করিয়াছেন। কথাগুলি যেরূপ অন্তঃসারশূন্য তেমনই পরস্পরের সহিত সঙ্গতি বিরোধী।

সাধারণজন, অর্থাৎ মধ্যবিত্ত ও অল্পবিত্ত গৃহস্থ এবং দরিদ্র ও দুঃস্থ সাধারণজন, বর্ত্তমানে মূল্য বৃদ্ধির ফলে যে কি নিদারুণ দুর্দ্দশায় পড়িয়াছে সে বিষয়ে মন্ত্রীপ্রবরের যে বিশেষ মাথা ব্যথা আছে তাহা মনে হয় না। নহিলে যে ভাবে বলা হইয়াছে যে ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির ফলে কয়েক সহস্র পরিবার তাহাদের জীবিকার একাংশ হইতে বঞ্চিত হইতেছে, ইহাতে সংশয় নাই এবং এই অবস্থা সমাজতান্ত্রিক ধারণার অনুকূল নয় তাহা বলা সম্ভব ছিল না।

মূল্য বৃদ্ধির ফলে এক পশ্চিম বাংলাতেই অন্ততঃ বিশ লক্ষ পরিবারের জীবিকানির্ব্বাহ প্রায় অসম্ভব হইয়াছে। সারা ভারতে কম পক্ষে লক্ষ লক্ষ পরিবার, জনসংখ্যার শতকরা ২৫ ভাগ আংশিক ভাবে বা পূর্ণরূপে প্রবঞ্চিত হইতেছে সে বিষয়ে কি সন্দেহের অবকাশ আছে? আর সেখানে শ্রীকৃষ্ণমাচারি বলেন কয়েক সহস্র!

আমরা কোনও উচ্চ অধিকারীর মুখে এতটা আসার বক্তৃতা খুব অল্পই শুনিয়াছি। এরূপ বক্তৃতার সার্থকতা কি তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম।

অথচ এই বক্তৃতায় সংবাদপত্র মহলে কেহবা পুলকিত হইয়াছেন এতদিনে "বৈষয়িক উন্নতি'। অর্থাৎ উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে সরকার মনোনিবেশ করিয়াছেন বলিয়া আবার কেহবা সরকারি তরফ হইতে মূল্য বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করা হইয়াছে দেখিয়াই উল্লাস অনুভব করিতেছেন, যদিও মূল্য-বৃদ্ধি জনিত অপকারের প্রতিকার সম্পর্কে একটি কথাও শ্রীকৃষ্ণমাচারি বলেন নাই!

একটি মাত্র ইংরেজী দৈনিক পত্র (কলিকাতার) সহজ ও স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন যে "কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর এই নূতন-তম বিবৃতিতে এমন কিছু পাওয়া গেল না যাহাতে মনে হয় যে এই মূল্যবৃদ্ধির ফলে সাধারণ নাগরিকের (অর্থাৎ দেশের সাধারণ জনের) যে কি সর্বনাশ হইতেছে সে সম্বন্ধে ভারত সরকারের চৈতন্যের উদয় হইয়াছে। তিনি (কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী) অবশ্য দ্রব্যমূল্যের এই ক্রমবৃদ্ধিশীল গতির ফলে কয়েক সহস্র লোকের জীবিকা নির্বাহের একটা অংশ ব্যাহত হইতেছে এবং ঐ পরিণতি সামাজতন্ত্রবাদের আদর্শ অনুযায়ী অসঙ্গত একথা বলিয়াছেন। কিন্তু বলার ধরণ ছিল নীতিগত স্তোক-বাক্যের খেলো পুনরাবৃত্তির মত। ইহাতে দুর্দশা গত জনসাধারণের কষ্টের লাঘবের কোন প্রতিশ্রুতি নাই।"

আমরাও এই কথাই বলি এবং সেই সঙ্গে বলি যে, ঐ স্তোক বাক্যের সঙ্গে যে জনসাধারণের মনে বিভ্রান্তি আনার জন্য মন্ত্রী বলিয়াছেন, "এই মূল্য বৃদ্ধির ব্যাপার গত বিশ বৎসর উত্তরোত্তর চলিতেছে তাহার নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন ভবিষ্যতের অনেক বৎসর থাকিবে" এবং মূল্য নিয়ন্ত্রণ যে কিরূপ দুরূহ ব্যাপার তাহা বুঝাইতে পণ্য উৎপাদকের স্বার্থ ও ক্রেতার স্বার্থ সমপর্যায়ে ফেলিয়া মুনফাবাজী কালোবাজার ইত্যাদির কথা চাপিয়া দিতে চেষ্টিত হইয়াছেন উহা দুর্লক্ষণ—জন-সাধারণের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে এবং কংগ্রেসী সরকারের পক্ষে পরোক্ষ ভাবে।

কংগ্রেসী সরকার তো ইংরেজীনবীশদের সংগঠন। তাঁহাদের একটি ইংরেজী প্রবাদ বাক্য মনে করাইয়া দিই—Though the mills of God grind slowly, yet they grind exceeding small. এতদিন জনসাধারণের দুঃখ দুর্দ্দশা নিরসনের জন্য কোন কিছু চেষ্টা না করিয়াও কংগ্রেস দেশের শাসনতন্ত্র অধিকার করিতে পারিয়াছে শুধু স্বাধীনতাপূর্ব যুগের কংগ্রেসের দেশাত্মবোধ ও দেশবাসীর দুঃখ কষ্টের দিনে সক্রিয় সহায়তা ও সহানুভূতির মহিমায়। ক্ষমতাপ্রাপ্তির পর কংগ্রেসের অধিকারী যাঁহারা হইয়াছেন তাঁহাদের অধিকাংশের—অর্থাৎ শতকরা ৯৫ জনের—দেশসেবা বা দেশপ্রেমের সম্পর্কে কোনও ইতিহাস বা জ্ঞান নাই। দেশের লোক ক্রমেই বুঝিতেছে শাসনতন্ত্রের অধিকারিবর্গের যোগ্যতা বিচার কিসের নিরিখে কাঁচে

হয়। এবং যে ভাবে বিগত ৮।১০ বৎসর কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার অর্থ ও খাদ্যমন্ত্রীগণ দেশবাসীর দুঃখ কষ্টের প্রতি ঔদাসীন্য দেখাইয়াছেন তাহাতে কংগ্রেসের দুর্দ্দিন ঘনাইয়া আসিতেছে মনে হয়।

চাউল প্রসঙ্গ

পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বার বার বলিয়াছেন যে বর্তমান অবস্থায় পশ্চিম বাংলায় চাউলের অভাব দূর করা অসম্ভব এবং সেই জন্যেই বলিয়াছেন যে এখানে খাদ্যের অভাব নাই। তিনি যদি একথাও বলিতে পারিতেন যে যেটুকু চাউল জনসাধারণের জন্য দেওয়া সম্ভব তাহার বিক্রয়ের ন্যায্য মূল্যের সমতা যাহাতে থাকে সেদিকে সরকার চেষ্টিত এবং চাউলের চোরাচালান ও ফাটকা এবং মুনফাবাজী সরকার কঠোর হস্তে দমন করিবেন তবে কোনও বিবেচক লোকের পক্ষে কিছু বলার থাকিত না।

বাজারে মাল না থাকিলে দাম চড়িবে একথা প্রমাণ করার জন্য অর্থ মন্ত্রী বা মৎস্য মন্ত্রী বা খাদ্য মন্ত্রীর দপ্তরের মোটা মাহিনার লোকের মাথা ঘামানোর প্রয়োজন হয় না বা মন্ত্রিসভার উচ্চ অধিকারিবর্গের তারস্বরে চীৎকারও প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যেটুকু মাল আছে তাহার অধিকাংশ লুকাইয়া বা সরাইয়া, একদিকে মালের ঘাটতি অন্যদিকে কালোবাজারের প্রসার—যাহা এখন পশ্চিমবঙ্গে বিরাট অঙ্কে চলিতেছে—যাহারা করিতে ব্যস্ত বাজারের সেই ঘৃণ্য শ্বাপদগুলিকে শায়েস্তা করার জন্য মন্ত্রিসভার মহাশয় ব্যক্তিগণ কি করিবেন তাহাই এখন দেশের লোকে জানিতে চায়।

দৈনিক পত্রে এইরূপ চোরাচালানের কথা এখন প্রায়ই প্রকাশিত হইতেছে। ১৪ই অক্টোবরে "যুগান্তর" ঐরূপ এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন :—

দমদমের নাগরিকবৃন্দের উদ্যোগে আজ সকালে স্থানীয় লীলা সিনেমার সম্মুখে খাদ্য মূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধের জন্য একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এই সভায় বিভিন্ন বামপন্থীদলের নেতাদের বক্তৃতার পর এক বিরাট জনতার মিছিল অঞ্জনগড় কলোনীতে প্রবেশ করে। উক্ত বামপন্থীদলের নেতৃবৃন্দের অনুরোধে দমদম থানা-অফিসার শ্রীপ্রণব মিত্র এই জনতার সহিত কলোনীর মধ্যে কিছু পুলিশ লইয়া প্রবেশ করেন। অঞ্জনগড় কলোনীর দুইটি গুদাম হইতে নব্বই বস্তা, ৩২নং বস্তীর তিনটি গুদাম হইতে দুইশত একটি বস্তা এবং শেঠ কলোনী ও অন্যান্য অঞ্চলে অভিযান চালাইয়া আরও দুইশত বস্তা চাউলের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রত্যেক গুদামে চাউলের সন্ধান পাইয়াই দমদমের থানা-অফিসার ঐ স্থানগুলিতে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশী প্রহরার ব্যবস্থা করেন।

প্রকাশ যে এই সকল গুদামজাত চাউল ইতিপূর্বে যে সব গুদামে রাখা হইয়াছিল সেই সকল গুদাম হইতে গতকাল রাত্রি বারোটা হইতে তিনটা পর্যন্ত বিভিন্ন উদ্বাস্তু কলোনীর নানা গৃহে ও গুদামে ব্যবসায়ীরা প্রায় এক হাজার মণ চাউল স্থানান্তরিত করেন। কিন্তু বিক্ষুব্ধ জনতা যাঁহারা গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ রেশনের দোকানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইন দিয়াও সামান্য আটা পর্যন্ত পান নাই, তাঁহারা গতকাল প্রায় সারা রাত্রিব্যাপী এই গুদামগুলিতে চাউল রাখিতে দেখিয়া বিশেষ ভাবে বিক্ষুব্ধ হইয়া পড়েন। ভোর হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন পথের ধারে ধারে এই চাউল সরাইয়া ফেলিবার খবর জনতার মুখে মুখে ছড়াইয়া পড়ে। তাই বিভিন্ন উদ্বাস্তু কলোনীগুলির মধ্যে যখন বামপন্থী নেতাগণ ও পুলিশ অভিযান সুরু করেন, তখন বৃদ্ধ, যুবক ও শিশুরা পর্যন্ত কোন্ কোন্ ঘরে চাউল গুদামজাত করিয়া রাখা হইয়াছে তাহা দেখাইয়া দিতে থাকেন। বাহিরে অব্যবহার্য নোনাধরা ঘর কিন্তু ভিতরে বস্তা বস্তা চাউল থরে থরে সাজানো। অবিশ্বাস্য মনে হইলেও এদৃশ্য আজ দমদমের বিভিন্ন উদ্বাস্তু কলোনীর মধ্যে দেখা গিয়াছে।

এই ব্যাপারের পরিণতি হিসাবে বলা হইয়াছে যে ঐ ব্যবসায়ীগণ ঐ হাজার মণ চালের মধ্যে দুইশত মণ চাউল, মাথাপিছু ৫ কিলো করিয়া ৩৫৲ টাকা মণ দরে যাহাদের আয় মাসিক ১০০৲ টাকার অনূর্দ্ধ সেইরূপ সাধারণ জনকে বিক্রয় করিতে স্বীকৃত হইয়াছে। বলাবাহুল্য ইহা দয়া-দাক্ষিণ্য নহে।

"আনন্দবাজারে"ও ঐদিন ঐরূপ সংবাদ প্রকাশিত হয়। আমরা জানিতে চাহি সরকার এবিষয়ে কি ব্যবস্থা করিতে চাহেন? ইহারা তো ছোটখাট বড় মহাজন ও ফাটকা বাজা বণিক সম্প্রদায়ের এইরূপ সমাজবিরোধী আচরণ কি শেষ পর্যন্ত অবাধে চলিতে দেওয়া হইবে।

কংগ্রেসী সরকার কি করিয়া এই অবস্থায় সামাল দিবেন, তাইতো একপ্রকার অনিশ্চিতের পর্যায়েই পড়িয়া আছে। অন্যদিকে কংগ্রেস বিরোধী দলগুলি করিবেন কি? দমদমায় যাহা ঘটিয়াছে তাহার সহিত এক সূত্রেই যদি তাঁহাদের কার্যক্রম নির্দ্ধারিত হয় তবে তো অনেকখানি কাজ হইবে। তাহার মধ্যে সর্বপ্রথম কাজ হইবে কংগ্রেস সরকারের চৈতন্যের উদয়—কেননা ঐভাবে যদি বিরোধী পক্ষ কোনও অঞ্চলের সাধারণ জনের উপর অন্যায় অত্যাচারের প্রতিকার করিতে সমর্থ হয় তবে নির্বাচনের সময় সেখানে কংগ্রেস মার খাইবেই এটুকু জ্ঞান কংগ্রেসের এতদিনে হইয়াছে মনে হয়।

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীকরুণাকুমার নন্দী

বর্তমান বৎসরের প্রথমাবধি হইতেই দেশের খাদ্যসংস্থানের বিষয় লইয়া নানাবিধ আশঙ্কাজনক আলোচনা চলিতেছিল। তদানীন্তন কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ও শ্রমমন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ তৃতীয় পরিকল্পনার রূপায়ণের সুরু হইতেই এ বিষয়ে গভীর আশঙ্কার কথা বলিতেছিলেন। গত বৎসরের মাঝামাঝি তিনি একটি বিবৃতিতে বলেন যে কৃষিজ উৎপাদনের, বিশেষ করিয়া খাদ্যশস্যের উৎপাদনের, পরিকল্পনানুযায়ী অগ্রগতি সাধিত না হওয়ার কারণে মূল্যবৃদ্ধির ধারা সংযত করিয়া রাখিতে পারা যায় নাই। এই কারণে দ্বিতীয় পরিকল্পনার সুফলের বেশ খানিকটা অংশ মূল্যবৃদ্ধিতে খাইয়া গিয়াছে। তিনি আশঙ্কা করেন যে, এই মূল্যবৃদ্ধির ধারা সংযত করিতে না পারিলে তৃতীয় পরিকল্পনার সার্থকতাও আনুপাতিক পরিমাণে ব্যাহত হইতে বাধ্য।

শ্রীনন্দের এই বিবৃতি প্রকাশিত হয় গত বৎসর ভারতের উপরে চীনা জঙ্গী আক্রমণ সুরু হইবার কয়েক সপ্তাহ পূর্বে। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কিত শ্রীনন্দের আশঙ্কা কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রণালয়ে তাঁহার সহযোগী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলিতে কোন বিশেষ উত্তেজনার সঞ্চার করিয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। তদানীন্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজি দেশাই এ বিষয়ে একপ্রকার নীরবই ছিলেন। কিন্তু খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী শ্রী এস, কে, পাতিল চুপ করিয়া থাকেন নাই। কৃষিজ উৎপাদন-প্রগতির আশানুরূপ সার্থকতার অভাব সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, ইহার জন্য বিশেষভাবে দায়ী অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলির ঔদাসীন্য ও ব্যর্থতা। তিনি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে সেচ ব্যবস্থার অকিঞ্চিৎকরতার ও সার-উৎপাদন বৃদ্ধির অভাবের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে এই দুইটি অবশ্যপ্রয়োজনীয় আয়োজনে সার্থক প্রগতি সাধিত না হওয়ায় কৃষিক্ষেত্রে, বিশেষ করিয়া খাদ্য উৎপাদনে প্রগতির ধারা ব্যাহত হইয়াছে এবং ইহার কোনটির জন্যই তাঁহার নিজস্ব মন্ত্রণালয়টি সরাসরি দায়ী নহে। ইহা ছাড়াও তিনি বলেন যে এ দেশে কৃষিজ উৎপাদন চিরকালই দৈবের উপর অর্থাৎ জলবায়ুর আনুকূল্যের উপর নির্ভরশীল ছিল, এখনও তাহাই আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। জলবায়ুর প্রতিকূলতা খাদ্যোৎপাদনে বিঘ্ন ঘটাইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও ইহা হইতে পারে, ইহা মানিয়া লওয়া ছাড়া উপায় নাই। কৃষিজ পণ্যের, বিশেষ করিয়া খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি সম্বন্ধে তিনি বড় অদ্ভুত কথা বলেন। তিনি বলেন যে চাষী চিরকাল বঞ্চিত হইয়াই থাকিবে এমনটা আশা করা অন্যায়। চাষী ক্রমে তাহার নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন হইতে সুরু করিয়াছে এবং তাহারই কারণে খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি হইতে সুরু করিয়াছে। দেশে খাদ্যশস্যের আংশিক (marginal) ঘাটতি তাহাকে তাহার পণ্যের উচিৎ মূল্য সংগ্রহ করিতে সহায়তা করিয়াছে, এবং তাহাতে উত্তেজিত হইলে চলিবে না। দেশের আর্থিক প্রগতির অনুপাতে চাষীর অবস্থারও উন্নতি হওয়া আবশ্যক এবং বর্তমানে খাদ্যশস্যের যে মূল্যবৃদ্ধির ধারা সুরু হইয়াছে তাহা চাষীর ন্যায্য স্বার্থসাধনের ধারার সূচনা বলিয়াই মানিয়া লইতে হইবে।

এ সকল আলোচনা হয় গত বৎসর অক্টোবর মাসের শেষ ভাগে—এ দেশের উপরে চীনা আক্রমণ সুরু হইবার পূর্বে। চীনা হামলার কারণে দেশে যে জরুরী দেশরক্ষা অবস্থার উদ্ভব হয়, তাহাতে খাদ্যমূল্য সম্বন্ধে আশঙ্কা আরও ঘনীভূত হইয়া উঠে। এ রকম পরিস্থিতিতে যে কালোবাজারী ও মুনাফা-খোরগোষ্ঠী আবার তৎপর হইয়া উঠিবে এবং দেশবাসীর খাদ্য ও অন্যান্য অবশ্যভোগ্য পণ্যাদি লইয়া ফাট্‌কা খেলিবার সুযোগ খুঁজিবে এমন আশঙ্কা অমূলক ছিল না। এই আশঙ্কা নিবারণের উদ্দেশ্যে শ্রীনন্দর প্রচেষ্টায় ভোগসমবায় (Consumers Cooperatives), ন্যায্যমূল্য পণ্যশালা (Fair Price Shops), মূল্য-নির্দ্ধারক কমিটি (Price Vigillance Committees) ইত্যাদি গঠনের দ্বারা, অবশ্যভোগ্য পণ্যাদির এবং বিশেষ করিয়া খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রকোপ নিয়ন্ত্রণ করিবার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু অচিরেই দেখা যায় যে, এ সকল প্রচেষ্টা সার্থকভাবে মূল্যবৃদ্ধির প্রকোপ নিয়ন্ত্রণ করিতে একান্তই অসমর্থ হইয়াছে। অনুরূপ অবস্থায় যাহা স্বতঃই অবশ্যম্ভাবীরূপে ঘটিয়া থাকে, মূল্যবৃদ্ধির প্রাথমিক প্রকোপ পড়ে খাদ্যশস্যের উপরে এবং ক্রমে তাহা অন্যান্য খাদ্যপণ্য এবং অন্তিমে অন্যান্য অবশ্যভোগ্য পণ্যাদির উপরও ছড়াইয়া পড়িতে থাকে।

কিভাবে অব্যাহত গতিতে খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি পাইতে থাকে তাহা বিচার করিলে ইহার প্রচণ্ড প্রকোপের একটা সঠিক নির্দ্দেশ পাওয়া যাইবে। সম্প্রতি প্রকাশিত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়ার ১৯৬২-৬৩ সনের বার্ষিক রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, "১৯৬২ সনে সাধারণ প্রাকৃতিক (Seasonal) মূল্যবৃদ্ধির ধারা মার্চ্চ মাসের শেষ ভাগে সুরু হইয়া আগষ্ট পর্য্যন্ত চলিতে থাকে এবং এই সময়ের মধ্যে সাধারণ মূল্যমান (General index) ৭.১ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। পূর্ব্ব-বৎসরের আনুপাতিক সময়ের মধ্যে যে মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াছিল তাহার তুলনায় ইহা প্রভূত পরিমাণে বেশী ছিল। আগষ্ট হইতে সুরু করিয়া ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সাধারণতঃ যে মূল্যক্ষতি (decline) ঘটিয়া থাকে তাহাও পূর্ব্ব-বৎসরের অনুরূপ সময়ের তুলনায় অনেক কম, অর্থাৎ মাত্র ৪.৭ শতাংশ পরিমাণ কমিয়াছিল। সমগ্র বৎসরে গড়পড়তা সাধারণ মূল্যমান বৃদ্ধির পরিমাণ এই বৎসরে ছিল ৪.৮ শতাংশ, পূর্ব্ব-বৎসরে ইহার পরিমাণ ছিল মাত্র ১.৫ শতাংশ এবং ১৯৬০-৬১ সনে ইহা ছিল ২.৪ শতাংশ।...... সকল পণ্যের মূল্যই এই বৎসর কিঞ্চিদধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম পরিমাণ মূল্যবৃদ্ধি ঘটে খাদ্যপণ্যে। সকল খাদ্যপণ্যাদি মিশাইয়া গড়পড়তা বৃদ্ধির পরিমাণ এই সময় দাঁড়ায় ৭.৩ শতাংশ। চাউলের মূল্যবৃদ্ধি পায় ১৪.১ শতাংশ পরিমাণ, ডাইল ৫.৭ শতাংশ, চিনি ৪.৮ শতাংশ এবং গুড় ৩৮ শতাংশ।" বস্তুতঃ এই মূল্যবৃদ্ধির ধারা কি প্রচণ্ড বেগে অগ্রসর হইতেছিল তাহা দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রারম্ভিক বৎসর ১৯৫৫-৫৬ সনের মূল্যমানের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিলে আরও প্রকট হইয়া উঠিবে। চাউলের পাইকারী মূল্য ১৯৫৫-৫৬ সনের গড়পড়তা মানের তুলনায় বর্ত্তমান বৎসরের এপ্রিল মাসে ছিল প্রায় ৪২.৯ শতাংশ বেশী, গমের মূল্য প্রায় ২৫ শতাংশ বেশী, চিনির মূল্য ৩৮.৪ শতাংশ বেশী ও গুড়ের মূল্য ১৪৭.৭ শতাংশ বেশী। (এ সংখ্যাসকল পাইকারী মূল্য পরিসংখ্যান হইতে সঙ্কলিত)। চাউলের মূল্য ইতিমধ্যে আরও মণপ্রতি ৫।৬ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে (অর্থাৎ আরো প্রায় ১৩½ হইতে ১৬ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে) এবং আরও বাড়িতেছে।

এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, দেশের শিক্ষিত জনমতের একটি বিশেষ অংশ হইতে গত বৎসর হইতেই খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ ও বণ্টনের দাবি জানান হইতেছিল। তদানীন্তন খাদ্য-মন্ত্রী শ্রীপাতিল এই দাবি স্বীকার করিয়া লইতে সরাসরি অস্বীকার করেন। তাঁহার মতে সরকারী নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা চাষী ও ব্যবসায়ী মহলে উৎপাদন প্রগতি অবশ্যম্ভাবীরূপে ব্যাহত করিতে বাধ্য এবং তাহার ফলে খাদ্য-উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা সাধনের পথে বিশেষ বিঘ্নের সৃষ্টি হইবে। অন্য পক্ষে, তিনি বলেন, ব্যবসায়ী মহল হইতে তাঁহাকে নিশ্চিত ভরসা দেওয়া হইয়াছে যে, খাদ্য-পণ্যের ব্যবসায়ের স্বাধীন ধারা নিয়ন্ত্রণের দ্বারা বিঘ্নিত না হইলে ব্যবসায়ীগোষ্ঠী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যাহাতে খাদ্যশস্যের মূল্য অন্যায়ভাবে বৃদ্ধি না পায় তাহার দায়িত্ব তাঁহারাই গ্রহণ করিবেন। কিভাবে তাঁহারা এই দায়িত্ব পালন করিয়াছেন তাহা বর্ত্তমান মূল্য পরিস্থিতি হইতেই সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হইবে। খাদ্যমূল্য ও বণ্টন নিয়ন্ত্রণ দাবির অন্যতম প্রধান মুখপাত্র ছিলেন বর্ত্তমান অর্থমন্ত্রী কৃষ্ণমাচারী মহাশয় স্বয়ং। গত বৎসর মান্দ্রাজের বিভিন্ন এলাকায় তাঁহার প্রদত্ত ভাষণে নিয়ন্ত্রণের স্বপক্ষে তাঁহার অভিমত ছিল স্পষ্ট ও দ্বিধাহীন। অবশ্য তখন এই বিষয়ে তাঁহার কোন সরকারী দায়িত্ব ছিল না। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় অর্থ-মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণের পর রাজ্য-সভায় তিনি এই বিষয়টি সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহা হইতে দেখা যাইবে যে, ইতিমধ্যে তাঁহার পূর্ব্ব অভিমতে সম্পূর্ণ ও বিপরীত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তিনি বলেন যে, তত্ত্বের বিচারে যাহা গ্রাহ্য ও উচিত বলিয়া বিবেচিত হয় সকল সময়ে তাহা বাস্তব-পক্ষে প্রয়োগযোগ্য হইয়া উঠে না। মূল্যস্থিরতা (Price stabilization) সাধনের জরুরী প্রয়োজন বিনা দ্বিধায় স্বীকার করেন, কিন্তু বণ্টন নিয়ন্ত্রণের দ্বারা এই প্রয়োজন সাধন করিতে হইলে যে ব্যবস্থা ও অবস্থা স্বীকার করিয়া লইতেই হইবে, সে সকল আজ দেশবাসী গ্রহণ করিতে আদৌ প্রস্তুত আছেন কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। ইহা প্রবর্ত্তন করিতে হইলে সরকারকে যে-সকল দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার সুষ্ঠু পালনের জন্য যে সকল অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রয়োগের প্রয়োজন হইবে তাহা এক্ষণে সরকারের অধিকারের অন্তর্গত নহে এবং এ সকল অতিরিক্ত ক্ষমতা গ্রহণে সরকার দেশবাসীর অনুমোদন ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিবেন এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হইতে পারেন নাই। কৃষ্ণমাচারী মহাশয় এভাবে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ চতুরতার সহিত মূল্যনিয়ন্ত্রণ ও মূল্যসমতা সাধনের বিষয়ে সরকারী দায়িত্ব এড়াইয়া গিয়াছেন সত্য, কিন্তু আসলে নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগের বিরুদ্ধে তাঁহার কোন কোন বিশিষ্ট দলীয় সহযোগীদিগের দৃঢ় প্রতিকূলতা এবং যে সরকারী আয়োজনের দ্বারা এরূপ নিয়ন্ত্রণ বিধি প্রয়োগ করা প্রয়োজন হইবে তাহার প্রকট অসামর্থ্য ও সততার অভাবও যে বিশেষ ভাবে তাঁহার মনে ক্রিয়া করিতেছিল তাহাই যে তাঁহার নিজের পূর্ব্বমতের বৈপরীত্য ঘটাইয়াছে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ দেখি না।

খাদ্য-পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রসঙ্গে যে সকল সরকারী অভিমত সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে একটা বিষয়েই বার বার বিশেষভাবে জোর দেওয়া হইতেছে দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে খাদ্যশস্য উৎপাদনের

অসামান্যতা এবং তাহার ফলে অবশ্যম্ভাবী মূল্যবৃদ্ধি। পরিকল্পনা কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী পরিকল্পনাকালের প্রথম দশ বৎসরে খাদ্যশস্যের উৎপাদনের ধারা নিম্নলিখিত রূপ ছিল দেখিতে পাওয়া যায় :— প্রয়োজনের তুলনায় উৎপাদনের ঘটতি আনুমানিক লক্ষ টন মাত্র, অর্থাৎ চাহিদার তুলনায় ১ শতাংশেরও কম। অবশ্য মোট ঘাটতি ইহার চেয়ে খানিকটা বেশীই হইবে। কেননা,

(লক্ষ টন)

শস্য	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬	১৯৫৬-৫৭	১৯৫৭-৫৮	১৯৫৮-৫৯	১৯৬০	১৯৬০-৬১
চাউল	২০৯	২৭১	২৮৬	২৪৯	৩০৪	২৯৩	৩২০
গম	৬৬	৮৬	৩	৭৭	৯৮	৯৭	১০০
অন্যান্য খাদ্য-শস্য	১৬২	১৯২	১৯৫	২০৪	২২৪	২১৫	২২০
নানাবিধ ডাইল	৮৫	১০৯	১১৪	৯৫	১২৯	১১২	১২০
মোট কৃষিজ খাদ্য-পণ্য	৫২২	৬৫৮	৬৮৮	৬২৫	৭৫৫	৭১৭	৭৬০

(Towards A Self Reliant Economy, December, 1961)

দেশের লোকের উদর-পূর্ত্তির জন্য এখন কতটা ন্যূনতম খাদ্যশস্যের আমাদিগের প্রয়োজন তাহার একটা বাস্তব হিসাব নির্দ্ধারণ করিতে পারিলে, দেশে খাদ্য-শস্যের ঘাটতির একটা নির্ভরযোগ্য হিসাব পাওয়া যাইতে পারে। ১৯৬১ সনে অনুষ্ঠিত লোক-গণনার হিসাব হইতে দেখা যাইতেছে যে ঐ বৎসর আমাদের সকল বয়স ও স্ত্রী পুরুষ মিলাইয়া মোট লোকসংখ্যা ছিল কিঞ্চিদধিক ৪৩ কোটি ৯০ লক্ষ। দেশের জনসংখ্যা বার্ষিক নীট দুই শতাংশ হিসাবে বৃদ্ধি পাইতেছে বলা হইয়াছে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে দেশের মোট লোক-সংখ্যা কিঞ্চিদধিক ৪৫ কোটি ৬৬ লক্ষ হইবে। ইহার মধ্যে ০ হইতে ৪ বৎসর পর্যন্ত বয়স্কদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ১৩·৫ শতাংশের সামান্য বেশী; ৫ হইতে ১৪ বৎসর পর্যন্ত বয়স্কদের সংখ্যা মোটের ২৪·৮ শতাংশের বেশী এবং ৬৫ এবং তদূর্দ্ধ বয়স্কদের সংখ্যা মোটের ৩·২ শতাংশের অধিক। অর্থাৎ পূর্ণ বয়স্কদের (বৃদ্ধদিগকে বাদ দিয়া) সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৫৮·৫ শতাংশের সামান্য কম। অর্থাৎ ইহাদের সংখ্যা কিঞ্চিদধিক ২৬ কোটি ৯৪ লক্ষ, কিম্বা মোটামুটি ২৭ কোটি; ০ হইতে ৪ বৎসর পর্যন্ত বয়স্কদের সংখ্যা মোটামুটি ৫ কোটি ৯০ লক্ষ এবং ৫ হইতে ১৪ এবং ৬৫ ও তদূর্দ্ধ বয়স্কদের সংখ্যা মোটামুটি ১২ কোটি ৬৩ লক্ষ। সরকারী হিসাবে চাউল, গম বা অন্যান্য খাদ্যশস্যের পূর্ণ বয়স্কদের ন্যূনতম দৈনিক প্রয়োজন ১৬½ আউন্স বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে। ০ হইতে ৪ বৎসর বয়স্কদের প্রয়োজন যদি পূর্ণবয়স্কদের ১০ শতাংশ এবং ৫-১৪ এবং ৬৫ ও তদূর্দ্ধ বয়স্কদের প্রয়োজন পূর্ণবয়স্কদের ৭৫ শতাংশ বলিয়া ধরা হয়, তবে দেশবাসীর আহার্য্যের ন্যূনতম প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ৬৪৬·৬ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের প্রয়োজন। সরকারী হিসাব মতে দেখা যাইতেছে যে আমাদের দেশে বর্তমানে মোট খাদ্যশস্যের উৎপাদনের পরিমাণ, সকল খাদ্য-শস্য মিলাইয়া মোট ৬৪০ লক্ষ টন। অর্থাৎ ন্যূনতম ইহার সঙ্গে বীজের প্রয়োজন ও অনিবার্য্য অপচয়ের হিসাবও ধরিয়া লইতে হইবে।—কিন্তু খাদ্যশস্যের ন্যূনতম প্রয়োজন যদি কেবল মাত্র চাউল ও গম দিয়াই পূরণ করিতে হয় তবে ঘাটতির পরিমাণ সমধিক অর্থাৎ ২২৬ লক্ষ টন + বীজ ও অনিবার্য্য অপচয়ের পরিমাণ অথবা ৩৫ শতাংশেরও বেশী বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতেই হইবে।

অবশ্য কেবলমাত্র চাউল ও গমই খাদ্যশস্যরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে, বাজরা, ভুট্টা, যব ও অন্যান্য শস্যাদি মানুষের খাদ্যরূপে ব্যবহারের অনুপযোগী এমন মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। বরং স্থান বিশেষে এ সকল বিভিন্ন শস্যের যে একটা স্বাভাবিক চাহিদা বহুকাল হইতেই চালু ছিল একথা অজানা নাই। পাঞ্জাব রাজ্যবাসীরা বহুকাল হইতেই গমের আটার রুটি ব্যতীতও বাজরার আটার রুটি পছন্দ করিতেন ও আহার করিতে অভ্যস্ত ছিলেন। উত্তর প্রদেশের পশ্চিম প্রান্তে ও রাজস্থানেও বহুকাল হইতেই বাজরার আটার রুটির ব্যবহার প্রচলিত ছিল। দেশের কোন কোন অংশে যবের গম ও ছাতু সাধারণ লোকের খাদ্যবস্তুর অন্যতম প্রধান অংশরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল। মধ্যপ্রদেশের বিস্তৃত অংশে ভুট্টার আটা ও খই খাদ্যশস্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা ছাড়াও ডাইলের মধ্যে ছোলা বা বুটের ছাতু প্রধান খাদ্যরূপে উত্তর বিহার ও পূর্ব-উত্তর প্রদেশের বিস্তীর্ণ অংশে দরিদ্র জনসাধারণ, বিশেষ করিয়া যাহারা কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকেন, ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহার একটা বিশেষ কারণও আছে, ছোলার ছাতু অন্যান্য খাদ্যবস্তুর তুলনায় হজম হইতে কিছু অধিক সময় লাগে এবং সেই কারণে ইহার ব্যবহারে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ভরাপেটের অনুভূতি বজায় থাকে। এ সকল বিভিন্ন খাদ্যশস্যের বিস্তৃততর ব্যবহার সামান্য আয়ুর্বে

ও প্রচারের দ্বারা যে আরো বেশী সম্ভব হইতে পারে এ বিষয়ে কোন সন্দেহের কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। অতএব এ সকল শস্যের চাউল গমের মতনই পূর্ণতর ব্যবহার প্রচলিত করিতে পারিলে সরকারী বরাদ্দ মতন, উৎপাদনের বর্ত্তমান আপেক্ষিক অকিঞ্চিৎকরতা সত্ত্বেও যে দেশের খাদ্যে মোট ঘাটতির পরিমাণ অতি সামান্য মাত্র তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

তাহা ছাড়া দেশের মধ্যে উৎপাদিত খাদ্যশস্য ছাড়াও সরকারী আয়োজনে আমেরিকা হইতে এবং কিছু কিছু অন্যান্য দেশ হইতেও মোটা পরিমাণ খাদ্যশস্য এদেশে আমদানী করা হইতেছে। বর্ত্তমান বৎসরেও কেন্দ্রীয় সরকার আমেরিকান সরকারের সঙ্গে এই সাপক্ষে আরো নতুন চাউল ও গম আমদানী করিবার চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছেন। বাহির হইতে আমদানীকৃত চাউল ও গম দেশের উৎপাদিত পরিমাণের সঙ্গে যোগ করিলে বর্ত্তমাণ ঘাটতির সম্পূর্ণ পুর্ত্তি হইবার কথা। কিন্তু দুঃখের বিষয় গত কয়েক বৎসরের মধ্যে সকল প্রকার খাদ্যশস্যের মূল্য প্রচণ্ড ভাবে এবং গত ১২ মাসের মধ্যে চাউলের মূল্য অসম্ভব রকম বাড়িয়াছে এবং এখনো বাড়িয়া চলিয়াছে। খাদ্যশস্য লইয়া অবাধ মুনাফাবাজী ও ফাট্‌কা খেলিবার যে সুযোগ ও বাধাহীন স্বাধীনতা সকল জনমত উপেক্ষা করিয়া শ্রীপাতিল দেশের বিবেকহীন ব্যবসায়ীগোষ্ঠীর হাতে তুলিয়া দিয়াছিলেন, তাহারই বিষময় ফল যে বর্ত্তমান মূল্যমানে প্রতিফলিত হইতেছে ইহা লইয়া দ্বিমত হইবার কি কোন অবকাশ আছে? আমরা উপরে দেখাইয়াছি যে সরকারী উৎপাদানের হিসাব ও সরকারী বরাদ্দমতেই চাহিদার বিশ্লেষণের দ্বারা এই সিদ্ধান্ত খণ্ডিত হইতে পারে না, যে বিদেশী খাদ্য আমদানী না হইলেও আমাদের বর্ত্তমান খাদ্য ঘাটতি নিতান্তই সামান্য মাত্র। চাহিদার তুলনায় মোট সরবরাহের যে সামান্যতম ঘাটতি আছে তাহার দ্বারা বর্তমান মূল্যবৃদ্ধির পরিমাপ ও ধারার কোনই ব্যাখ্যা হইতে পারে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় সরকারের তরফ হইতে এবিষয়ে যে আশু এবং কার্য্যকরী কিছু করিবার প্রয়োজন একান্তই অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছে সে সম্বন্ধে কোনও সত্যকার অনুভূতি বা কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা প্রয়োগের লক্ষণ আজিও দেখা যাইতেছে না। কিছু যে করিতে হইবে এ কথা তাঁহারা অস্বীকার করেন নাই, কিন্তু কি করা যাইতে পারে সে সম্বন্ধে হয় ইঁহাদের কোনই ধারণা নাই, না হয়তো যাহা হইলে কার্য্যকরী সুফল ফলিতে পারিত তাহা হইলে স্পষ্টতঃই সরকারের বিশেষ অনুগ্রহপুষ্ট কোন কোন বিশিষ্ট স্বার্থে আঘাত লাগিতে পারে এই আশঙ্কায় তাঁহারা সাহস করিয়া কিছু করিতে পারিতেছেন না।

এই ত হইল দেশের বর্ত্তমান খাদ্য সঙ্কট ও মূল্য-পরিস্থিতির একটা মোটামুটি সামগ্রিক চিত্র। এখন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের অবস্থার দিকে চাহিয়া দেখা যাউক। এখানে অবস্থা অধিকতর ভয়াবহ, অন্যায় মুনাফাবাজী আরো সম্পূর্ণ নিরঙ্কুশ ও সরকারী ব্যর্থতা শুধু নহে, সরকার পক্ষ হইতে জনকল্যাণে কোন প্রকার কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার সদিচ্ছারও অভাব অতি সুস্পষ্ট ও প্রকট।

গত আগষ্ট মাসে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় খাদ্যবিতর্ক প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন এই রাজ্যে খাদ্য-পরিস্থিতি এবং তৎসম্পর্কে রাজ্যসরকারের নীতিসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা আমরা পূর্ব্বেই করিয়াছি। এই প্রসঙ্গে মনে থাকিতে পারে যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে বর্ত্তমান বৎসরে চাউলের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল মোটামুটি ৪০ লক্ষ টন। ইহার মধ্যে আন্দাজ ৩৪ লক্ষ টন গ্রামে ব্যবহার হয় এবং আন্দাজ ৪ লক্ষ টন মাত্র কলিকাতায় পৌঁছে। রাজ্যসরকার ইহার উপরে আরও ৫ লক্ষ টন চাউল সংগ্রহ করিয়াছেন। এই অবস্থায় খাদ্যশস্যের পূর্ণ বণ্টন নিয়ন্ত্রনের দ্বারা রাজ্যের সকল অধিবাসীর আহার্য্যের দাবি পূরণ করা অসম্ভব। বর্ত্তমান বৎসরের প্রথমে আংশিক বণ্টন নিয়ন্ত্রণের দ্বারা (Modified rationing) ৫৬ লক্ষ লোকের চাহিদা মেটানো হইতেছিল। ইহা বাড়িয়া ঐ বিতর্কের সময়ে ৬৩ লক্ষ লোকের চাহিদা মেটানো হইতেছিল। মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে প্রয়োজন হইলে এভাবে ১ কোটি লোকের, এমন কি নিতান্ত প্রয়োজনে, ১ কোটি ২০ লক্ষ লোকের চাহিদা পর্য্যন্ত এভাবে মেটানো সম্ভব হইতে পারে; ১৯৫৯ সনের বন্যার সময় তাহা করা হইয়াও ছিল। রাজ্যের চাউলের উৎপাদন ৪০ লক্ষ টন মাত্র; পূর্ণ চাহিদা মিটাইতে হইলে ৬২ লক্ষ টনের প্রয়োজন; অর্থাৎ ঘাটতির পরিমাণ ২২ লক্ষ টন অথবা মোট পরিমাণের ৩৭ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে চাষী ও তৎপরিবারভুক্ত লোকের সংখ্যা এক কোটি নব্বই লক্ষ। ইহার মধ্যে ৮০ লক্ষ চাষী যাহা উৎপাদন করেন, তাহার দ্বারা তাঁহাদিগের আপন আপন চাহিদা মিটাইয়াও কিছু পরিমাণ উদ্‌বৃত্ত থাকে। বাকী এক কোটি দশ লক্ষ চাষী যাহা উৎপাদন করেন তাহার দ্বারা তাঁহাদিগের দুই হইতে দশ মাস পর্যন্ত আপন চাহিদা মেটানো সম্ভব হয়, অর্থাৎ ইঁহাদিগের গড়পড়তা মোটামুটি ছয়মাস পর্য্যন্ত চাহিদা মাত্র মিটিতে পারে। রাজ্যে চাষোপযোগী অব্যবহৃত উদ্‌বৃত্ত জমি নাই বলিলেও চলে। ফলে চাউলের উৎপাদন বিশেষ পরিমাণে বাড়াইতে পারিবার অবকাশও অনুরূপ সঙ্কীর্ণ।

আরেকটি সরকারী হিসাবে দেখা যাইতেছে যে বর্ত্তমান বৎসরে বীজ ধান ও অনিবার্য্য অপচয়ের জন্য মোট উৎপাদনের

১০ শতাংশ বাদ দিয়া এই বৎসরে ৩৯, ৬২, ২০০ লক্ষ টন চাউল আহার্য্যের প্রয়োজনে পাওয়া গিয়াছে। মাথাপিছু দৈনিক সাড়ে ষোল আউন্স হিসাবে ৫৪, ৪৫, ৭০০ টন চাউল হইলে এই রাজ্যের পূর্ণ চাহিদা মিটিতে পারে (মুখ্যমন্ত্রীর হিসাবে উহার পরিমাণ ৬২ লক্ষ টন)। ১৯৬০ এবং ১৯৬১ সনে ঘাটতির পরিমাণ ছিল মোটামুটি বার্ষিক ১১ লক্ষ টন। ১৯৬২ সনে এই ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১০ লক্ষ টন এবং বর্ত্তমান বৎসরের হিসাব মতন ইহার পরিমাণ হইবে মোটামুটি ১৫ লক্ষ টন (মুখ্যমন্ত্রীর হিসাবে ইহার পরিমাণ ২২ লক্ষ টন)। ১৯৬১ সনের আদমসুমারীর হিসাব মতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মোট অধিবাসীর সংখ্যা তিন কোটি ৪৯ লক্ষ। কেন্দ্রীয় সরকারের হিসাব মতে দেশের লোকসংখ্যা বার্ষিক নীট ২ শতাংশ হিসাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহা হইলে বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যা মোটামুটি প্রায় ৩ কোটি ৬৩ লক্ষ। ইহার মধ্যে সর্ব্বভারতীয় হিসাবের ভিত্তিতে মোট সংখ্যার ১৩'৫ শতাংশের হিসাবে ০-৪ বয়স্কদের সংখ্যা হইবে ৪৯ লক্ষ। ৫-১৪ এবং ৬৫ ও তদূর্দ্ধ বয়স্কদের সংখ্যা ২৮ শতাংশ হিসাবে হইবে মোট প্রায় ৯৮ লক্ষ। তাহা হইলে ১৫-৬৪ পর্য্যন্ত বয়স্কদের সংখ্যা হইবে ২ কোটি ২ লক্ষ। ০-৪ বৎসর পর্য্যন্ত বয়স্কদের চাউলের চাহিদা বিশেষ কিছু হইবার কারণ নাই; ইহাদের জন্য পূর্ণ বয়স্কদের ১০ শতাংশ বরাদ্দ যথেষ্টই হইবার কথা। তাহা হইলে ইহাদের জন্য বৎসরে ৮২,৪০০ টন চাউল হইলেও যথেষ্ট হওয়া উচিৎ। ৫-১৪ এবং ৬৫ ও তদূর্দ্ধ বয়স্কদের আহার্য্যের প্রয়োজন পূর্ণ বয়স্কদের, অর্থাৎ ১৫—৬৪ বয়স্কদের সমপরিমাণ হইবার কথা নহে। ইহাদের জন্য পূর্ণ-বয়স্কদের তুলনায় ৭৫ শতাংশ বরাদ্দই সমীচীন বিবেচিত হওয়া উচিৎ তাহা হইলে ইহাদের জন্য লাগিবে বার্ষিক ১২ লক্ষ ৭ হাজার টন। পূর্ণবয়স্ক অর্থাৎ ১৫ হইতে ৬৪ বৎসর বয়স্ক ২ কোটি ২ লক্ষ লোকের জন্য দৈনিক সাড়ে ষোল আউন্স হিসাবে বার্ষিক প্রয়োজনের পরিমাণ হইবে ৩৪ লক্ষ টনের কিঞ্চিৎ কম। এই হিসাব মতে দেখা যাইতেছে যে মোট ৪৬ লক্ষ ৯০ হাজার টন চাউল হইলে রাজ্যের সকল অধিবাসীর আহার্য্যের ন্যূনতম চাহিদা সম্পূর্ণভাবে মিটিতে পারে। ইহার সঙ্গে অনিবার্য্য অপচয় ও বীজ ধানের জন্য ১০ শতাংশ যোগ করিলে বর্ত্তমান লোকসংখ্যার হিসাবে ৫১ লক্ষ ৫৯ হাজার টন পরিমাণ চাউল হইলেই রাজ্যের সম্পূর্ণ চাহিদা মিটিতে পারে। পূর্ব্ববর্ণিত সরকারী হিসাবে (রাজ্য খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের হিসাবে) মোটামুটি অনুরূপ চাহিদার পরিমাণই ধরা হইয়াছে দেখা যাইতেছে।

এই প্রসঙ্গে একটা বিষয় স্পষ্ট করিয়া লওয়া প্রয়োজন। উপরে বর্ণিত হিসাবে কেবলমাত্র চাউলের হিসাব ধরা হইয়াছে। ইহা খানিকটা বিভ্রান্তিকর। কেননা এই চাহিদার পরিমাপ কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা বিভাগের নীতি অনুযায়ী সকল প্রকার খাদ্যশস্য মিলাইয়াই ধার্য্য করা হইয়াছে; পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যেও সকলেই কেবলমাত্র চাউল খাইয়াই বাঁচিয়া থাকেন না। কিছুসংখ্যক লোক চাউল একেবারেই খান না। এবং শহরবাসী সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে চাউলের সহিত গম মিলাইয়া তাহাদের আহার্য্যের প্রয়োজন মিটাইয়া থাকেন। গত এপ্রিল মাস হইতে চাউলের দর অসম্ভব পরিমাণে ও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকায় দরিদ্র, নিম্ন ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রায় সকলেই অন্ততঃ আধাআধি পরিমাণ গম দিয়া তাঁহাদিগের আহার্য্যের প্রয়োজন মিটাইতেছেন বলিয়া আমরা জানি। সম্প্রতি প্রকাশিত মুখ্যমন্ত্রীর বিভিন্ন বিবৃতির ও সংবাদপত্রের বিভিন্ন রিপোর্ট হইতে দেখিতে পাইতেছি যে কেবলমাত্র শহরাঞ্চলেই নহে, সম্প্রতি গ্রামাঞ্চলেও গমের ব্যবহার দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহা ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গে অবস্থানরত উত্তর-বিহার ও পূর্ব-উত্তর প্রদেশবাসী অনেকেই তাঁহাদিগের দৈনিক আহার্য্যের প্রয়োজন অন্ততঃ অংশতঃ বুটের ছাতু দিয়া মিটাইয়া থাকেন। ইহা কাহারও অজানা নাই। অতএব কেবল চাউল দিয়া যদি রাজ্যবাসীর খাদ্যের প্রয়োজন ও সরবরাহে ঘাটতির পরিমাণ নিরূপন করা হয়, তাহা হইলে ইহা যে নিতান্তই বিভ্রান্তিকর প্রমানিত হইবে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। পশ্চিমবঙ্গরাজ্যে গত ৩ বৎসরে কি পরিমাণ গম আমদানী হইয়াছে তাহা নিম্নলিখিত সরকারী হিসাব হইতে জানা যাইবে :—

সন	সরকারী আমদানী (Govt. A/c.)		ব্যবসায়ীদের আমদানী (rade A/c)		মোট আমদানী	
১৯৬১	৮০, ৯০০	টন	৪৫৯, ৮০০	টন	৫৪০, ৭০০	টন
১৯৬২	১২৮, ৮০০	,,	৪৯৬,০০০	,,	৬২৪, ৮০০	,,
১৯৬৩ (১লা জানুয়ারী হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত)	১৯৮,০০০	,,	৪৪৭, ৮০০	,,	৬৪৬, ৮০০	,,

ইহা ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে এবং অন্যান্য স্থান হইতে কিছু পরিমাণ চাউলও পশ্চিমবঙ্গে আমদানী হইয়াছে। কিন্তু তাহার সঠিক পরিমাণের হিসাব পাওয়া যায় নাই।

উপরে বর্ণিত হিসাবমত পশ্চিমবঙ্গরাজ্যের বীজধান ও অনিবার্য অপচয় সমেত মোট খাদ্যশস্যের প্রয়োজন বর্তমান বৎসরে যদি ৫২ লক্ষ ৫৯ হাজার টন অথবা মোটামুটি ৫২ লক্ষ টন বাস্তব বলিয়া গ্রহণযোগ্য হয়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে এই বৎসর বাহির হইতে চাউলের আমদানী ছাড়িয়া দিলেও কেবলমাত্র গম দিয়া যে পরিমাণে ঘাটতি পূরণ করা হইয়াছে তাহাতে উদ্বৃত্ত ঘাটতির পরিমাণ বাকি থাকে মাত্র ১১.৫ শতাংশ।

গত বৎসর মার্চ মাসে পশ্চিমবঙ্গে চাউলের গড়পড়তা মূল্য (Indian Produce Association) পাইকারী হিসাবে ছিল মণপ্রতি ২২.২৩ টাকা মার্চের শেষ ভাগ হইতে সাধারণতঃ যে প্রাকৃতিক (seasonal) মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে তাহার ফলে ইহা ২৪.৫০ টাকায় বৃদ্ধি পায়। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি হইতে নূতন ফসল উঠিবার পর এই দর সামান্যমাত্র কমিয়া ২৪ টাকা ২৫ নয়া পয়সায় ঠেকে। কিন্তু মাত্র এক মাস পরেই দর আবার বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এপ্রিলের প্রথম ভাগ পর্যন্ত এই বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল সামান্য মোটামুটি মণপ্রতি প্রায় একটাকা মাত্র। কিন্তু এপ্রিল হইতে চাউলের দর দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ২রশে জুলাই তারিখে স্টেটসম্যান পত্রিকার একটি রিপোর্টে দেখা যায় যে ঐ দিন মোটামুটি (average) মানের চাউলের মণপ্রতি পাইকারী দাম ছিল ৩৩.৭৫ টাকা এবং অত্যন্ত মোটা চালের দাম ছিল মণপ্রতি ৩১ টাকা। প্রায় একমাস পরে Indian Produce Association-এর ২০শে আগষ্ট তারিখের দর হিসাবে দেখা যাইতেছে যে মোটামুটি মানের এবং খুব মোটাচালের ঐ দিন মিলের মণপ্রতি দাম ছিল যথাক্রমে ৩৫.৮৯ টাকা ও ৩১.৬০ টাকা। এই প্রসঙ্গে ইহাও প্রণিধানযোগ্য যে এই মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খুচরা বিক্রীর দর অনুপাতে অনেক বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ৯ই জুলাই তারিখের স্টেটসম্যানের রিপোর্ট হইতে দেখিতে পাই যে ঐ দিন কলিকাতার বাজারে সবচেয়ে মোটা চাউলের খুচরা দর ছিল মণপ্রতি ৩৭, টাকা এবং মধ্যমানের চাউল ৩৮.৫০ টাকায় বিক্রী হইতেছিল। অর্থাৎ একবৎসরের পূর্বের দরের তুলনায় চাউলের দর পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৬১ শতাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু ইহাতেই চাউলের উপর মুনাফাবাজী শেষ হয় নাই। গতমাসের শেষ ভাগ হইতে চাউলের দর আবারও দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং গত দুই সপ্তাহে এই বৃদ্ধির পরিমাণ আরও প্রায় মণপ্রতি ৭ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। অর্থাৎ দুই সপ্তাহ পূর্বের তুলনায় এই বৃদ্ধির পরিমাণ আরও ১৭.২৮ শতাংশে দাঁড়াইয়াছে; এবং দর এখনও বাড়িয়া চলিয়াছে। এই প্রসঙ্গে আরেকটা কথা ভাবিয়া দেখিবার আছে। সরকারী হিসাবমতে পূর্বেই বলা হইয়াছে ১৯৬০ এবং ৬১ সনে এই রাজ্যে চাহিদার তুলনায় চাউলের উৎপাদনের ঘাটতির পরিমাণ ছিল বার্ষিক ১১ লক্ষ টন করিয়া। ১৯৬২ সনে এই ঘাটতির পরিমাণ সামান্য মাত্র কমিয়া ১০ লক্ষ টনে দাঁড়ায়। আমাদের পূর্ববর্ণিত বাস্তব হিসাব যদি ঠিক বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয় তবে বর্তমান বৎসরের মোট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১২ লক্ষ টন। তাহার মধ্যে প্রায় ৬½ লক্ষ টনের ঘাটতি ইতিমধ্যেই গম আমদানী করিয়া পূরণ করা হইয়াছে। ঘাটতি গতবৎসরেও ছিল, তাহার পূর্ব্ব দুই বৎসরে আরও বেশী ছিল। কিন্তু ও পূর্ব পূর্ব বৎসরে চাউলের দর এভাবে বাড়ে নাই। অথচ একবৎসরের পূর্বের দরের তুলনায় আজ পশ্চিমবঙ্গে চাউলের দর মোটামুটি প্রায় ৯০ শতাংশ বাড়িয়াছে।

ব্যাপারটা আরও অদ্ভুত এই কারণে যে সম্প্রতি প্রকাশিত মুখ্যমন্ত্রীর নিজের বিবৃতি অনুযায়ীই আগামী আমন ফসল, তাঁহার কৃষিবিশেষজ্ঞদের হিসাব অনুসারে, আশাতীত ভালো, অর্থাৎ মোট ৫০ লক্ষ টনেরও অধিক হইবে বলিয়া হিসাব করা গিয়াছে। ইহা ছাড়াও আউসের ফসল উঠিয়াছে আরও ৪ লক্ষ টনের উপর। ঐ সকল তথ্য প্রকাশিত হইবার পরও চাউলের বাজার দর কিছুমাত্র কমে নাই-ই, বরং আরও বাড়িয়াছে এবং এখনও বাড়িতেছে। বর্তমান বৎসরের ঘাটতির পরিমাণ সরকারী হিসাব অনুযায়ীই পূর্ব বৎসরের তুলনায় এমন কিছু নহে। আগামী ফসলের প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রী বলিয়াছেন যে এ রাজ্যে আরও প্রায় ১৩ লক্ষ টন ঘাটতি থাকিবে। আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি যে এই হিসাব অবাস্তব; আগামী বারো মাসে আরও দুই শতাংশ লোকবৃদ্ধি ধরিয়া লইয়াও এবং বীজ ধান ও অনিবার্য্য অপচয়ের জন্য ১০ শতাংশ বরাদ্দ ধরিয়া লইয়াও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ ৫২ লক্ষ ৮০ হাজার টন কিংবা মোটামুটি ৫৩ লক্ষ টনের বেশী হইবে না। সরকারী হিসাবে ৫৪ লক্ষ টন ফসল পাওয়া যাইবে বলিয়া বলা হইয়াছে, অতএব সামান্য পরিমান উদ্বৃত্ত থাকিবে ঘাটতি হইবে না।

তাহা সত্ত্বেও দর দ্রুত গতিতে ও অসম্ভব পরিমাণে বাড়িয়াছে ও বাড়িতেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলিয়াছেন যে এই বিষয়ে কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করার ক্ষমতা তাঁহার সরকারের নাই। এই স্বীকৃতি যে ব্যর্থতা ও জনগনের প্রতি তাঁহাদের ন্যূনতম দায়িত্ব পালনে যে ঔদাসিন্য সূচীত করে,

তাহা সত্ত্বেও গণভোটের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি তথাকথিত গণতান্ত্রিক সরকার কি করিয়া টিঁকিয়া থাকে তাহা ভাবিতে বিস্ময় বোধ হয়। তবে কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে দায়ী করিয়া লাভ নাই। রাজ্যসরকার অনিবার্য্য কারণেই এসকল বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সর্ব্বভারতীয় নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতে বাধ্য হইবেন ইহা স্বতঃসিদ্ধ। আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি কেন্দ্রীয় সরকারে সম্প্রতি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত অর্থমন্ত্রী কৃষ্ণমাচারী মহাশয় কিভাবে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ চতুরতার সহিত খাদ্যশস্য ও অন্যান্য অবশ্যভোগ্য পণ্যাদির মূল্যনিয়ন্ত্রন ও মূল্য স্থিরিকরণ সম্বন্ধে অনস্বীকরণীয় সরকারী দায়িত্ব এড়াইয়া গিয়াছেন। ইতিমধ্যে কৃষ্ণমাচারী মহাশয় আরও একটি মূল্যবৃদ্ধিকর নীতির প্রবর্ত্তনের স্পষ্ট আভাস তাঁহার সম্প্রতি প্রচারিত বেতার বর্ত্তার মারফত প্রকাশ করিয়াছেন। পরিকল্পনানুযায়ী ঐশ্বর্য্যপ্রজননের গতি দ্রুততর করিতে হইবে এই অজুহাতে রিজার্ভ ব্যঙ্ক কর্ত্তৃক গত দুই বৎসর ধরিয়া অনুসৃত ঋণ সঙ্কোচ (credit control) ঢিলা করিয়া দিয়া আগামী কালে অধিকতর পরিমাণ অর্থ বাজারে ছাড়িবার যে সিদ্ধান্ত তিনি গ্রহণ করিয়াছেন তাহারা ফলে যে অনিবার্যভাবে মূল্যবৃদ্ধির চাপ, বিশেষ করিয়া খাদ্যশস্য ও অবশ্যভোগ্য পণ্যসমূহের উপর আরও সমধিক বৃদ্ধি পাইবে, ইহা অর্থশাস্ত্রে নিতান্ত শিশুও বুঝিতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে চাউলের দরবৃদ্ধি যে কেবলমাত্র প্রাকৃতিক কারণে বা সরবরাহের ঘাটতির জন্যই ঘটে নাই, ইহাতে সরকারী সরাসরি অনুগ্রহ না হইলেও অন্ততঃ ঔদাসীন্য পুষ্ট কালোবাজারী ও মুনাফাবাজীর একটা বিশেষ ও প্রধান ভূমিকা আছে, ইহাতে কোনই সন্দেহের কারণ নাই।

মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি বলিয়াছেন যে বর্ত্তমান উচ্চমূল্য মানের সুযোগ লইয়া চাষীরা ধানের দাম অসম্ভব বাড়াইয়া দেওয়ায় চাউলের দর এতটা বাড়িয়াছে। তাঁহারই নিজের হিসাবমত এ রাজ্যের এক কোটি ৯০ লক্ষ চাষীর মধ্যে মাত্র ৮০ লক্ষ চাষী যা উৎপাদন করেন তাহা হইতে তাঁহাদিগের নিজেদের প্রয়োজন মিটাইয়া বাজারের জন্য কিছু উৎবৃত্ত থাকিয়া যায়। বাকী ১ কোটি ১০ লক্ষ চাষী যাহা উৎপাদন করেন তাহাতে তাঁহাদের নিজেদের বৎসরের ছয়মাসের প্রয়োজন মাত্র পূরণ হয়। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলিয়াছেন যে বর্ত্তমান বৎসরে মোট চল্লিশ লক্ষ টন ফসলের মধ্যে গ্রামের চাষীদের প্রয়োজন মিটাইয়া ৪ লক্ষ টন চাউল মাত্র উদ্বৃত্ত পাওয়া গিয়াছে। ঐ অবস্থায় চাষীরা হঠাৎ এমনই স্বচ্ছল হইয়া উঠিলেন যে তাঁহারা উৎপন্ন ধানের বেশ একটা অংশ মোটা দর পাইবার আশায় এতদিন ধরিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারিলেন, ইহা যেমনই অসম্ভব তেমনই হাস্যকর। তাহা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ চাষী চাউলের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে নিস্ফল প্রতিবাদ জানাইতে জানাইতে হয়রাণ হইয়া গিয়াছেন তাহা কাহারও অজানা নয়। বাংলা দেশের চাষীর অধিকাংশের এই বৎসরে অনাহারে অর্দ্ধাহারে কি শোচনীয় পরিণতি ঘটিতেছে তাহা সকলেই দেখিতে পাইতেছে। মিথ্যা ও সম্পূর্ণ স্বকপোলকল্পিত কারণ দেখাইয়া তাঁহার নিজস্ব দপ্তর ও সমগ্রভাবে রাজ্যসরকারের ব্যর্থতা ও কালোবাজারী ও মুনাফাবাজের স্বার্থে সরকারী দায়িত্ব পালনে শ্রীপ্রফুল্ল সেন অব্যাহতি পাইতে পারেন না, একথা তাঁহার মত প্রবীণ রাজনৈতিকের জানা থাকা উচিৎ। তিনি বলিতেছেন চাউলের দর বাড়িয়াছে, কি করিব আমি নিরুপায়। চাউল খাইও না, গম ও আলু খাও গমের কোন অপ্রতুল নাই, গম খাইলে উচ্চমূল্যে চাউল কিনিতে হইবে না। তিনি আরও বলিয়াছেন যে বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ৮৫ লক্ষ unit র‍্যাশন কার্ড ইস্যু করা হইয়াছে। তাঁহারা সকলেই unit প্রতি সপ্তাহে এককিলো গম ও এককিলো চাউল পাইতেছেন। প্রয়োজন হইলে গমের বরাদ্দ আরও বাড়ানো যাইবে। কিন্তু তিনি ইহা বলেন নাই যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কলিকাতা শহরের মধ্যে অনেকেই বরাদ্দ চাউল পাইতেছেন না এবং শহরতলীতে ও গ্রামাঞ্চলে অবস্থা আরও শোচনীয়। আমরা কলিকাতা শহরে একটি fair price দোকানের অবস্থা অনুসন্ধান করিয়াছি। দোকনেটিতে ৪ হাজার ৭২ Unit রেজিষ্ট্রি হইয়াছে। দুই সপ্তাহ পূর্বে এই দোকানটিতে সরকারী গুদাম হইতে ২১০০ কিলোর সামান্য বেশী চাউল সরবরাহ করা হয়; গত সপ্তাহে যে চাউল আসে তাহার পরিমাণ ছিল মাত্র ১৪০০ কিলোর উপর; বর্ত্তমানে সপ্তাহে ১৫০১ কিলো বরাদ্দ হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে সরকারী অঙ্গীকারকৃত মাথাপিছু সপ্তাহে এককিলো চাউল ration card ধারী ৮৫ লক্ষ লোকের মধ্যে মোটামুটি দুই তৃতীয়াংশই পাইতেছেন না। এখন দেখা যাউক মুখ্যমন্ত্রীর উপদেশ ক্রমে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যবাসী সকলেই যদি চাউলের পরিবর্ত্তে গম খাইতে শুরু করেন তাহা হইলে কি অবস্থা দাঁড়ায়। এ রাজ্যে গত মাসের শেষ দিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান বৎসরে সাড়ে ৬ লক্ষ টন গম আমদানী হইয়াছে। ইহার দ্বারা সম্পূর্ণ গমের নির্ভর করিতে হইলে রাজ্যের এক চতুর্থাংশ লোকেরও আহার্য্যের সম্পূর্ণ সংস্থান হইবে না। অবশ্য মুখ্যমন্ত্রী বলিয়াছেন আলুও খাও। তাঁহার জানা আছে কিনা জানি না, কিন্তু খাদ্য রসায়ন সম্বন্ধে যাঁহাদের প্রাথমিক জ্ঞান মাত্রও আছে তাঁহারা জানেন যে আলুর ওজনের ৮০ শতাংশই জল এবং মাত্র ২০ শতাংশ সারবস্তু। অর্থাৎ গম কিংবা চাউলের পরিবর্ত্তে আলু খাইয়া থাকিতে হইলে প্রতি টন চাউল কিংবা

গমের পরিবর্ত্তে ৫ টন করিয়া আলুর প্রয়োজন হইবে। পশ্চিমবঙ্গে আলুর ফসল বা আমদানীর পরিমাণ আমাদের জানা নাই তবে কেবলমাত্র আলু খাওয়াইয়া রাখিতে হইলে যে ২ কোটি ৫০ লক্ষ টন আলুর প্রয়োজন হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। পশ্চিমবঙ্গের সকলে যদি ভাত খাওয়া একেবারেই ছাড়িয়া দিয়া কেবলমাত্র গম ও আলু খাইয়া থাকিতে চায় তাহা হইলে মুখ্যমন্ত্রী তাহা সরবরাহের সমগ্র দায় স্বীকার করিয়া লইতে পারিবেন কি ? –না আবারও তাঁহার অসামর্থ্য জানাইয়াই দায়িত্ব শেষ করিবেন ?

মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন অবশ্য বলিয়াছেন যে চাউলের ঘাট্‌তি সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে খাদ্যের কোন ঘাট্‌তি নাই। চাউলের সঙ্গে গম ও আলু মিলাইয়া খাদ্যের প্রয়োজন মিটাইলে খাদ্যাভাব ঘটিবে না। এই আশ্বাসবাণী কি পশ্চিমবঙ্গবাসীকে আশ্বস্ত করিতে পারিবে ? চাউলের দর হু হু করিয়া বাড়িতেছে। গত ১৪ই অক্টোবর তারিখের একটি সংবাদে দেখা যায় যে কলিকাতার উপকণ্ঠে চাউল ৪৫৲ টাকা হইতে ৫০৲ টাকায় বিক্রয় হইতেছে। এই প্রচণ্ড মূল্যবৃদ্ধি প্রশমিত করিবার সামর্থ্য তাঁহার বা তাঁহার রাজ্য সরকারের নাই একথা তিনি স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া দিয়াছেন। নূতন ফসল উঠিলেই, কেহ কেহ বলিতেছেন, চাউলের দর আবার পড়িয়া যাইবে। ফসল উঠিতে আর মাত্র মাসাবধি কাল বাকী আছে, তবুও দর এখনো বাড়িতেছে, ফসল উঠিলেই ইহা কমিবে তাহা ভরসা করিবার বাস্তব হেতু কোথায় ? একদিকে অবাধ মুনাফাবাজী চলিতেছে—সরকার এ বিষয়ে কিছু করিবেন না তাহা স্পষ্টই বলিয়াছেন—অন্যদিকে কেবল শূন্য বাক্‌ভরসা। যাঁহাদের তেতাল্লিশের মন্বন্তরের গতি ও প্রকৃতির কথা স্মরণ আছে তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন যে আবারও পশ্চিমবঙ্গ মুনাফাবাজদের দ্বারা ইচ্ছাসৃষ্ট মন্বন্তরের পথে অনিবার্য্যভাবে অগ্রসর হইতেছে। মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁহার প্রভু অতুল্য ঘোষের ছেঁদো ভরসার কথায় ভুলিবার অবকাশ কোথায় ?- চাউলেরও কোন ঘাট্‌তি সত্যই নাই, কেন না দাম দিতে পারিলে যতটা খুশী চাউল পাওয়া যাইতেছে। তেতাল্লিশেও তাহাই ঘটিয়াছিল। অতএব খাদ্য-প্রাচুর্য্য (অন্ততঃ ন্যূনতম প্রয়োজনানুরূপ খাদ্য যে মজুদ আছে তাহাতে সন্দেহের কারণ দেখি না) সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গবাসী বিরাট দরিদ্র, নিম্ন ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত জনসাধারণ অনিবার্য্যভাবে উপবাসের সম্মুখীন হইতে চলিয়াছে ; এখনই বহু লোক নিরুপায় হইয়া অর্দ্ধাশনে থাকিতে বাধ্য হইতেছেন। কেবলমাত্র তাঁহাদের অনুগ্রহপুষ্ট কতিপয় মুনাফাবাজদিগের স্বার্থে সরকার ইহা বন্ধ করিবার কোনই চেষ্টা করিবেন না। হয়তো তাঁহাদের দুরভিসন্ধি এই যে এইভাবে উপবাসে মারিয়া রাজ্যের লোকসংখ্যার চাপ কিছুটা কমাইবেন !

খাদ্যের অভাব নাই বটে। কিন্তু তবুও লোকে উপবাসে বাধ্য হইয়া প্রাণ দিবে। দেশের দরিদ্রতম ৬০ শতাংশ লোকের আয়ের মান লইয়া কয়েকদিন পূর্ব্বেই কেন্দ্রে প্রচণ্ড বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। রামমনোহর লোহিয়া বলিয়াছিলেন ইহা কিঞ্চিদধিক মাথা পিছু ৩ আনা মাত্র ; মন্ত্রী গুলজারীলাল নন্দ ভোগব্যয়ের তালিকা দাখিল করিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন ইহা ৩ আনা নহে ৭½ আনা এবং দেশের দরিদ্রতম জনসাধারণও এখন পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী এবং ভাল খাইতে পরিতে পাইতেছেন। সম্প্রতি প্রকাশিত সংবাদ পত্রের একটি রিপোর্টে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে প্রশান্ত মহলানবীশ কমিটি জাতীয় আয় বণ্টনের আধুনিকতম ধারার আর একটি প্রাথমিক হিসাবে দেশের দরিদ্রতম ৪০ শতাংশ জনসংখ্যার মাথাপিছু দৈনিক আয় বর্ত্তমানে ৫ আনা বলিয়া ধার্য্য করিয়াছেন। পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গে গমের সরবরাহ মোটামুটির চাউলের এক-ষষ্ঠমাংশ মাত্র। বর্ত্তমানে চাউলের ন্যূনতম খুচরা বাজার দর ৪৫৲ টাকা মণ। গমের সরকারী দর ১৫৲ মণ, আটার দর ২০৲ টাকা মণ, বাজার দর ইতিমধ্যে অবশ্য ২৫৲ টাকায় উঠিয়াছে। এই অবস্থায় মানুষকে যদি তাহার দৈনিক ১৬½ আউন্স বরাদ্দের মধ্যে ১২ আউন্স চাউল ও ৪½ আউন্স আটা দিয়া পূরণ করিতে হয় তবে খরচ পড়ে মোট দৈনিক ৫৭ নয়া পয়সার সামান্য বেশী, অর্থাৎ ৯ আনার উপর। ইহার সঙ্গে অবশ্য অন্যান্য সামান্য কিছু অবশ্য প্রয়োজনীয় আহার্য্য এমনকি সামান্য লবণমাত্র যোগ করিতে হইলেও খরচ আরো বাড়িবে। মাথাপিছু দৈনিক আয় ৩ আনা, কিম্বা ৫ আনা, এমন কি নন্দ বর্ণিত ৭½ আনা হইলেও এইটুকু সামান্যতম আহার্য্যের সংস্থান হয় না। মন্বন্তর আর কাহাকে বলে ?

ইতিমধ্যে আরো একটি সংবাদে কিছু আশার সঞ্চার হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। দেরী হইলেও বিদেশ হইতে কিছু চাউল — ব্রহ্মদেশ হইতে ১০,০০ হাজার টন এবং ভিয়েৎ নাম হইতে ১০,০০ টন—এবং অন্ধ্রদেশ হইতে কিছু চাউল কেন্দ্রীয় সরকারের আয়োজনে শীঘ্রই বাংলা দেশের দিকে রওয়ানা হইবে। তাহা ছাড়া ইতিমধ্যে কিছু আমনের ফসলও মাঠ হইতে উঠিয়াছে। ফলে নাকি চাউলের পাইকারী দর গত কয়েকদিনে আর বাড়ে ত নাই-ই, মণ

প্রতি নাকি ১৲ টাকা হইতে ৪৲ টাকা পর্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। অবশ্য ইহার প্রতিফলন যে খুচরা দরের উপরে একেবারেই হয় নাই সে কথা বলা বাহুল্য। দমদম এলাকায় অবশ্য গত ১৪ই অক্টোবর তারিখে কিছু চাউল বাজার দর হইতে কিছু কমে বিক্রয় হইয়াছে; কিন্তু তাহার কারণ একমাত্র সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী মহলে জনমত হইতে সাময়িক ভাবে আত্ম-রক্ষা করিবার প্রয়াস। ইহার ফলে যে সাধারণ ভাবে সমগ্র খুচরা বাজার কমিবে এমন আশা সুদূরপরাহত। বরং প্রফুল্ল সেন আবারও বলিয়াছেন যে তাঁহার সরকার চাউলের বাজার দর কমাইবার কোন প্রয়াস করিবেন না,—কারণ দর্শাইয়াছেন যে চাউলের দর যদি বাঁধিয়া দেওয়া হয় তবে অতিরিক্ত চাউল খরিদ করিবার জন্য খুচরা ক্রেতাদের মধ্যে হুড়াহুড়ি পড়িয়া যাইবে এবং এভাবে আবার কৃত্রিম ঘাট্তির সৃষ্টি হইবে। যে দেশের লোক মাথাপিছু ৫ আনা দৈনিক আয়ে জীবানধারণ করিয়া আছে, সে দেশের লোকে দৈনিক প্রয়োজনাতিরিক্ত চাউল খরিদ করিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারে, এমন অসম্ভাব্য ও হাস্যোদ্বেগজনক কথা দিয়া ছেলে ভোলানোর চেষ্টা করা এক কংগ্রেসী শাসনকর্তাদেরই সাজে! দেশের লোকে কি এই ছেঁদো কথায় ভুলিবে?

মোট কথা দেশের লোককে অন্ততঃ দুইবেলা দু'মুঠো খাইতে ও পরিতে দিবার দায়ীত্ব পালন করিবার মতন ছোট কাজে মন দিবার অবসর আমাদের কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের কর্তাদের নাই। দেশের সার্বভৌম আর্থিক উন্নয়ন, নিজেদের দলের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই, ইত্যাদি বৃহৎ বৃহৎ ব্যাপার লইয়া ইহারা এমন জড়াইয়া আছেন যে এ সকল ছোট কাজে নজর দিবার তাঁহাদের অবকাশ কোথায়? দেশের লোককে অনাহারে মারিয়া হইলেও দেশের উন্নতি ইহারা করিবেনই। এমন ব্যর্থতা ও দেশবাসীর প্রতি ন্যূনতম দায়ীত্বের প্রতি এমন গভীরতম ঔদাসীন্যের গত ১৬ বৎসরের এই উদাহরণ দুনিয়ার ইতিহাসে কোনখানে ও কোন কালে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না! ভারতবাসী স্বভাবতঃই নীরবে ও বিনাপ্রতিবাদে সকল দুঃখ, সকল অত্যাচার সহ্য করিয়া লইতে বহু শতাব্দী হইতেই অভ্যস্ত; সে মরিবে কিন্তু কখনো প্রত্যাভিঘাত করিবে না। ইহারই সুযোগ লইয়া আমাদের বাকসর্বস্ব কংগ্রেসী শাসনকর্তারা দেশের বুকের উপর দিয়া সীমাহীন দুর্নীতি ও অবাধ অত্যাচারের বন্যা বহাইয়া চলিয়াছেন। অন্য কোন দেশে এমন অবস্থা হইলে যাহা অনিবার্য্যভাবে ঘটিত তাহার ভূরি ভূরি সাক্ষ্য ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠায় দেখিতে পাওয়া যাইবে। কিন্তু ইংরাজীতে একটি প্রাচীন প্রবাদ বাক্য আছে—"The wheels of destiny grind slow but grind exceedingly small"—অর্থাৎ ইতিহাসের চাকা অত্যন্তই মন্দ গতিতে চলে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার গতি পথের সকল বাধা একেবারেই দলিত পিষ্ট করিয়া অগ্রসর হয়। এই প্রাচীন প্রবাদবাক্যটির তাৎপর্য আমাদের কংগ্রেসী শাসনকর্তাদের ভাল করিয়া স্মরণ করিতে অনুরোধ করি!

সঙ্গীতের আসরে

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

গান্ধীজীর অপূর্ব অভিজ্ঞতা।

মহাত্মা গান্ধী যে সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন, একথা সাধারণভাবে প্রায় সকলেরই জানা আছে। তাঁর প্রার্থনা সভার অনুষ্ঠানে ভজন গান যে নিয়মিত অঙ্গ ছিল, তা শুধু গানের বিষয়বস্তুর জন্যে নয়, সাঙ্গীতিক আবেদনও তরে কারণ।

তিনি অন্তরে কেমন সঙ্গীতভক্ত ছিলেন, তার একটি দৃষ্টান্ত এখানে বর্ণনা করা হবে। তার ভূমিকা স্বরূপ গান্ধী সকাশে শ্রীদিলীপকুমার রায় মহাশয়ের সঙ্গীত প্রসঙ্গ তাঁর "ভ্রাম্যমাণের দিন পঞ্জিকা" গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করে দেওয়া হ'ল, কারণ মহাত্মাজীর সঙ্গীতপ্রিয়তার এক মনোজ্ঞ ও অন্তরঙ্গ পরিচয় এই বিবরণে পাওয়া যায়ঃ

"আমি সঙ্গীতের ছাত্র শুনে মহাত্মাজী সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করলেন। মীরাবাঈয়ের সুন্দর গানগুলির সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে কি না জিজ্ঞাসা করাতে, মহাত্মাজী বললেন, খুব আছে। আমি মীরার অনেক গানই শুনেছি ও তার অনেক গানেরই আমি ভক্ত। ···আমি সঙ্গীত বড় ভালবাসি যদিও সঙ্গীতের সমঝদার নই।···

" আমি মীরাবাঈয়ের 'চাকর রাখোজী' ব'লে একটি ভজন ও বৃন্দাবন সম্বন্ধীয় 'দীন দয়াল গোপাল হরি' বলে একটি পূরবী গাইলাম।

"গান শুনতে শুনতে মহাত্মাজীর প্রশান্ত উজ্জ্বল চোখ দু'টি যেন অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠল, কারণ সেই স্তিমিত আলোতেও তাঁর চোখ দু'টি চক্ চক্ করতে লাগল।

"আমি বললাম,···আমার বরাবরই একটা ধারণা ছিল যে, আপনি সঙ্গীত বা অন্যান্য সুকুমার কলার বিরোধী।

"মহাত্মাজী সবিস্ময়ে বলে উঠলেনঃ আমি সঙ্গীতের বিরোধী! আমি? বলেই খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর প্রশান্ত ভাবে একটু হেসে বললেন, বুঝেছি, বুঝেছি। আমার সম্বন্ধে নানা লোকের মনে এত রকম ভুল আছে যে, এখন সেসব ধারণার মুলোৎপাটন করা কঠিন হয়ে পড়েছে। ······আমি সঙ্গীতের মতন সুকুমার কলার বিরোধী! আমি ত সঙ্গীতকে বাদ দিয়ে ভারতের আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশের কথা ভাবতেই পারি না। আমি যে সঙ্গীতাদি ললিতকলার ভক্ত, একথা আমি খুব জোর করেই বলতে চাই।······"

মহাত্মা গান্ধী সঙ্গীত কত গভীরভাবে ভালবাসতেন, তা তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলে অজানা ছিল না। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনও জানতেন। তাই সেবার যখন গান্ধীজীর দেশবন্ধুর ভবানীপুরের বাড়ীতে আসবার কথা হ'ল, তখন তিনি অতিথিকে একদিন সঙ্গীত শোনাবার ব্যবস্থা করলেন—তবে কণ্ঠসঙ্গীত নয়, যন্ত্রসঙ্গীত।

গান্ধীজীর জন্যে যে সঙ্গীতজ্ঞকে চিত্তরঞ্জন আমন্ত্রণ জানালেন, তাঁর কথা বিশেষ করে জানবার আছে। বহু গায়ক, বাদক, কীর্তনীয়ার সঙ্গে দেশবন্ধু পরিচিত থাকলেও, নিয়ে এলেন রাগ সঙ্গীতের এক অনন্যসাধারণ গুণীকে—বাঙ্গালী, কিন্তু সর্বভারতীয় সঙ্গীত ক্ষেত্রে এক দিক্‌পাল। বীণকার ও ধ্রুপদী শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সাধারণত রুদ্রবীণা বা সুর-শৃঙ্গারবাদক রূপে সঙ্গীতাসরে সুপরিচিত ছিলেন বটে, কিন্তু সারস্বত বীণাতেও তিনি রীতিমত শিক্ষা পান পুণার বীণ্‌কার ও দারবঙ্গরাজের সভাবাদক আন্না ঘোড়পুরের কাছে। স্বনামধন্য উজীর খাঁর কাছে প্রমথনাথ সুরশৃঙ্গার যন্ত্রে তালিম পেয়েছিলেন। শুধু ওই দুই মহাগুণী ন'ন, আরো কয়েকজনের কাছেও শিক্ষার সুযোগ পান তিনি। বলা যায়, তাঁর উত্তরকালের সঙ্গীতজীবন যেমন গৌরবের তেমনি ছিল তাঁর সঙ্গীতশিক্ষার পর্বও।

প্রথম জীবনে তিনি কণ্ঠসঙ্গীতের সাধনাও রীতিমত করেছিলেন, বিশেষ ধ্রুপদ। প্রায় ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি ছিলেন প্রধানতঃ ধ্রুপদী। পরে যন্ত্রসঙ্গীতশিল্পী রূপেই আসরে আত্মপ্রকাশ করেন। বিখ্যাত ধ্রুপদী মুরাদ আলী খাঁ এবং আলী বক্শ দুজনের কাছেই তিনি পেয়েছিলেন

শিক্ষার সুযোগ। তা ছাড়া, (নবাব ওয়াজেদ আলীর মেটেবুরুজ দরবারের গায়ক) আন্‌সাদ্ দৌলার কাছে খেয়াল, সুপ্রসিদ্ধা শ্রীজোন বাঈয়ের কাছে খেয়াল ও টপ্পা, গুরু বিনায়কের কাছে ধ্রুপদ, (মেটেবুরুজের শানাইবাদক প্যারে খাঁর শিষ্য) শ্যামলাল গোস্বামীর কাছে এস্রাজ ইত্যাদি বহু বিচিত্র শিক্ষা লাভ তাঁর ঘটে। সেই সঙ্গে ছিল নিজের একনিষ্ঠ সাধনা। তার ফলে সমগ্র ভারতবর্ষে তিনি একজন প্রথমশ্রেণীর কলাবন্তরূপে স্বীকৃত হন। এই শতকে পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গীত সম্মেলনে বাংলা থেকে যাঁরা আমন্ত্রিত হন, তিনি তাঁদের মধ্যে একজন অগ্রণী। আমেদাবাদ ও লক্ষ্ণৌ সঙ্গীত সম্মেলনে (দুটিই ১৯২৪ খ্রীঃ), তা ছাড়া লাহোর, পুণা, নাগপুর, বাঙ্গালোর, শিমলা, কাশ্মীর, কাশী, গিধোড়, পাটনা, দ্বারবঙ্গ প্রভৃতি স্থানের আসরে ও দরবারে যোগ দিয়ে তিনি গুণপণা দেখিয়েছিলেন। যে সব বিদেশী সঙ্গীতবিদ্ তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেন, তাঁদেরমধ্যে বিশ্ববিখ্যাত রুশ পিয়ানো-বাদক মিরোভিচ হলেন একজন। জীবনের শেষ ৫ বছর (সুদীর্ঘ ৯৩ বছর ছিল তাঁর আয়ু) তিনি দিল্লীর সঙ্গীত নাটক এ্যাকাডেমীর কার্যকরী বোর্ডের সদস্য ছিলেন।

প্রমথনাথের প্রতিভা সব চেয়ে স্ফূর্তি পেত বিলম্বিত আলাপচারীতে। এমন ঢিমা চা'লের আলাপে মুন্সিয়ানা খুব কম গুণীই দেখাতে পেরেছেন। তাঁর এই আলাপচারীর পদ্ধতি ওস্তাদ উজীর খাঁর অনুবর্তী ছিল না, ছিল অনেক-খানি আম্না ঘোড়পুরের রীতির অনুসারী। প্রমথনাথের অন্যতম কৃতী শিষ্য মোহিনীমোহন মিশ্রের মতে, ধ্রুপদী মুরাদ আলী ঢিমা আলাপের ঢঙও তাঁর বাজনায় ফুটে উঠত। আসরে প্রমথনাথ অনেক সময় সুরশৃঙ্গার রাগালাপ করে গৎ বাজাতেন তাঁর নিজের তৈরী একটি যন্ত্রে হার্পের অনুকরণে কাঠের ফ্রেমে আঁটা ২২ তারের এই যন্ত্রটির তিনি নাম দেন 'সুর আয়না'।

প্রমথনাথের সঙ্গীতজীবনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল। তিনি প্রমথনাথকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা তদ্‌গত মনে শুনতেন তাঁর যন্ত্রসঙ্গীত।

তাঁরই অনুরোধে প্রমথনাথ সঙ্গীতকে জীবনের বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেন। তাঁর আগ্রহে দুই কন্যার (শ্রীমতী অপর্ণা ও শ্রীমতী কল্যাণী) সঙ্গীতশিক্ষক হন প্রমথনাথ মাসিক ১৫০ টাকা দক্ষিণায়। সে বোধহয় ১৯১৩ খ্রীঃ কিংবা তার কাছাকাছি সময়ের কথা।

চিত্তরঞ্জন তখনও দেশবন্ধু হন নি। কিন্তু মানিকতলা বোমা মামলা পরিচালনা করে ও শ্রীঅরবিন্দের মুক্তিলাভ ঘটিয়ে তার অনেক আগেই লব্ধকীর্তি এবং বিপুল পসারী ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জনের মহাপ্রাণতা ও গুণগ্রাহিতার খ্যাতি সে সময় অনেকের কাছেই সুবিদিত। উপরন্তু তিনি তখন কবি এবং কাব্য সাহিত্য সঙ্গীত ইত্যাদি জাতীয় মানস সম্পদের একান্ত অনুরাগী এবং সে-সবের সেবকদের সহৃদয় পৃষ্ঠপোষক।

অবশেষে তিনি যখন হলেন দেশবন্ধু, দেশের হিতার্থে যথাসর্বস্ব ত্যাগী—তখনো কিন্তু ত্যাগ করতে পারলেন না সঙ্গীত ইত্যাদির প্রতি প্রীতি। প্রমথনাথকে তিনি আগে কর্পোরেশনের চাকুরি থেকে অসময়ে অবসর গ্রহণ করান সঙ্গীতচর্চায় পরিপূর্ণ ভাবে আত্মনিয়োগ করার জন্যে এবং তাই তাঁর মাসিক নির্দিষ্ট আয়ের ব্যবস্থা করিয়েছিলেন নিজের বাড়ীতে। এখন কংগ্রেসের কাজে আইন ব্যবসা ত্যাগ করেও কিন্তু প্রমথনাথের প্রতি দায়িত্ব বিস্মৃত না হয়ে তাঁকে পাটনায় থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। তাঁর নির্দেশে ভ্রাতা পি আর দাশ মহোদয়ের গৃহে এবং ডুমরাওনের রাণীর ভবনেও সঙ্গীতশিক্ষক নিযুক্ত হলেন প্রমথনাথ।

শুধু তাই নয়, আমেদাবাদ সঙ্গীত সম্মেলনে প্রমথনাথের যোগ দেবার বন্দোবস্ত করলেন তার সংগঠক বিষ্ণুদিগম্বর পালুসকরকে চিঠি দিয়ে। সেই সম্মেলনেই (ফেব্রুয়ারী, ১৯২৪ খ্রীঃ) বিখ্যাত ধ্রুপদী আল্লাবন্দে খাঁর (যাঁর পুত্র নাসিরুদ্দিন) সঙ্গে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কিছু অম্লমধুর পরিচয় ঘটেছিল। আল্লাবন্দে খাঁর মধ্যে ওস্তাদ-সুলভ রীতিমত দাপট প্রকাশ পেত—গানে এবং ব্যবহারেও। তিনি পশ্চিম ভারতের সঙ্গীত সম্মেলনে সম্ভবত এই প্রথম বাঙ্গালী দেখে—প্রমথনাথের গুণপণার বিষয়ে তাঁর কোনই ধারণা ছিল না—একটি স্থূল শ্লেষ প্রয়োগ করে তাঁর প্রতি কটাক্ষ করলেন (অবশ্যই উর্দুতে), 'ওঃ বাংলা দেশ থেকে এসেছেন দেখছি! থিয়েটারের গান বাজাবেন ত?'

সেটা সম্মেলন আরম্ভ হবার আগেকার কথা। প্রমথনাথ সংযত হয়ে রইলেন, খাঁ সাহেবের এই অকারণ আক্রমণেও বিবাদের মধ্যে গেলেন না। মনে মনে দৃঢ় সঙ্কল্প করলেন, বাংলার গুণের পরিচয় দেবেন যথাস্থানে, যথাসময়ে।

তারপর যখন সম্মেলনের আসরে তাঁর পালা এল, তিনি সুর-শৃঙ্গারে বাজালেন ভীমপলশ্রী। তাঁর বিশিষ্ট রীতিতে এবং পূর্ণ আত্মবিশ্বাসে, বিশেষ করে আল্লাবন্দে খাঁর বিদ্রূপ মনে রেখে তিনি ভীমপলশ্রীর রাগরূপ অতিশয় নৈপুণ্যে রূপায়িত করলেন। বাজনা শেষ হ'তে সমবেত গুণীদের সাধুবাদ পেলেন তিনি। এবং ওস্তাদ আল্লাবন্দে খাঁ প্রথমে হতবাক্ থেকে পরে যোগ দিলেন সেই প্রশংসার উচ্ছ্বাসে। বাংলায় এমন গুণী থাকতে পারেন, এ নাকি তাঁর ধারণার অতীত ছিল!............

সেই প্রমথনাথকে দেশবন্ধু আনলেন গান্ধীজীকে যথার্থ সঙ্গীত আস্বাদন করাবার জন্যে। দেশবন্ধুর তখন শেষ জীবন। কিন্তু তখনও মৃত্যুর এক-দেড় বছর আগেও তিনি মাঝে মাঝে প্রমথনাথকে বাড়ীতে আমন্ত্রণ করে এনে তাঁর যন্ত্রসঙ্গীতে পরিতৃপ্ত হতেন।

এই অনুষ্ঠানটিও সেই সময়ে কোন এক দিনের ঘটনা। সন তারিখ সঠিক জানা নেই।

মহাত্মাজী তখন দেশবন্ধুর গৃহে অতিথি, সঙ্গে আছেন একান্ত সচিব মহাদেব দেশাই।

সেদিন সকালবেলা দেশবন্ধু তাঁকে সঙ্গীত শোনাবার ব্যবস্থা করেছেন। সেই রসা রোডের বাসভবনের দোতলায় —যা লুপ্ত হয়ে এখন গড়ে ওঠেছে তাঁরই নামাঙ্কিত সেবাসদন—সেদিনের আসর বসেছে। অবশ্য সাধারণ আসর নয়, বাইরের বিশেষ কাউকে দেশবন্ধু আমন্ত্রণ জানান নি সেখানে।

তাঁর সেই ভবনের দোতলায় পশ্চিমের অর্থাৎ ট্রাম রাস্তার দিকে বারান্দায় বাদক ও শ্রোতারা উপস্থিত। গান্ধীজী এক ধারে বসে আস্তে আস্তে চরকায় সুতো কাটছেন, পাশে আছেন মহাদেব দেশাই। সামনে বসেছেন চিত্তরঞ্জন, তাঁর পাশে বসে প্রমথনাথ সুরশৃঙ্গারের তার ক'টি সুরে বেঁধে নিচ্ছেন।

দিনটি সোমবার। গান্ধীজীর মৌনদিবস। তিনি মুখ ঈষৎ নীচু করে দক্ষিণ হাতে চরকার হাতল ঘোরাচ্ছেন, বাঁ-হাতের টানে তুলো থেকে সুতোর আবির্ভাব ঘটছে। তাঁর পকেট-ঘড়িটি সামনে রয়েছে সময় অনুধাবনের জন্যে।

যন্ত্র বেঁধে প্রমথনাথ সেটি হাতে নিয়ে সুরের গুঞ্জন ধ্বনিত করলেন। আরম্ভ হ'ল তাঁর সকালবেলার প্রিয় রাগ দরবারী তোড়ির আলাপ।

গান্ধীজী বাহ্যত নিবিষ্ট মনে চরকায় সুতো কাটতে লাগলেন এবং তন্ময় প্রমথনাথ সুর সৃষ্টি করে চললেন নিপুণ অঙ্গুলি-চালনায়। আসরে তিনি যত বিলম্বিত লয়ে বাজান এখানে তা' বাজালেন না। ২০ মিনিটের মধ্যে দরবারী তোড়ির রাগালাপ শেষ করলেন বিশিষ্ট শ্রোতার ধৈর্যের কথা বিবেচনা করে। তারপর ধরলেন একটি অপ্রচলিত রাগ—মঙ্গল। মঙ্গলের সুরের আলাপও সংক্ষেপে শেষ করে তিনি সুরশৃঙ্গার নামিয়ে রাখলেন এবং ঝঙ্কার তুললেন তাঁর নিজস্ব যন্ত্র সুর আয়নায়। এবার ভৈরবী সুরের নক্সা ফোটাতে লাগলেন। সেই শান্ত সকালবেলায়, গান্ধীজীর উপস্থিতির প্রশান্ত পরিবেশে প্রমথনাথ সৃষ্টি করলেন ভৈরবীর উদাসকরা আবহ।

তারপর একসময় তাঁর বাজনা শেষ হ'ল। দেশবন্ধু মাঝে মাঝে গান্ধীজীর মুখের দিকে লক্ষ্য করছিলেন বাজনা তাঁর কেমন লাগছে বোঝবার জন্যে। প্রমথনাথ থামতে গান্ধীজীও চরকা বন্ধ করলেন এবং একটুকরো কাগজে কি লিখে মহাদেব দেশাইকে দিলেন। মহাদেববাবু কাগজটির ওপর চোখ বুলিয়ে সেটি হস্তান্তরিত করলেন দেশবন্ধুকে।

দেশবন্ধু হাতে নিয়ে পড়লেন মহাত্মাজীর লেখা মন্তব্য: "আধ ঘণ্টার মধ্যে আজ আমার সাতবার সুতো ছিঁড়ে গেছে। এমন আর আগে কোনদিন হয় নি।"

দেশবন্ধু স্মিতমুখে কাগজখানি প্রমথনাথকে দেখালেন। তাঁর সুরসৃষ্টিই গান্ধীজীর এতবার ছিন্নসূত্রের অঘটনের জন্যে দায়ী। শ্রোতাকে পরিতৃপ্ত করবার শিল্পীজনোচিত তৃপ্তি লাভ করলেন বাদ্যকর।

মেটেবুরুজ দরবারে বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আজ থেকে প্রায় ৮০ বছর আগেকার কথা। কলকাতার দক্ষিণ উপকণ্ঠ মেটিয়াবুরুজ তখন এমন শ্রীভ্রষ্ট ছিল না। কারণ লক্ষ্ণৌর শেষ ও নির্বাসিত নবাব ওয়াজেদ আলী শা তখনো মেটিয়াবুরুজে বিদ্যমান। তাঁর পরিকল্পনায় গড়া নতুন নতুন প্রাসাদ আর বাগবাগিচায় তখন মেটেবুরুজ ছিল লক্ষ্ণৌর এক ক্ষুদ্র সংস্করণ। আর সে মেটেবুরুজের কোহিনুর ছিল সেখানকার দরবার, সঙ্গীতের দরবার।

মেটেবুরুজ দরবারের মতন অর্থাৎ নবাব ওয়াজিদ আলীর

সঙ্গীত সভার মতন এমন দরবার সারা ভারতবর্ষে তখন অন্ততঃ আর ছিল কি না সন্দেহ। একত্র এত প্রথম শ্রেণীর সঙ্গীত-শিল্পীর সমাবেশ, একসঙ্গে এমন ধ্রুপদ খেয়াল ঠুংরী রীতির গায়ক ও গায়িকা এবং সেতার স্বরদ সুরবাহার শানাই পাখোয়াজ তবলার এত গুণীর একত্র সমাবেশ সেকালে আর কোথাও ছিল বলে জানা যায় না। প্রায় ১৫০ জন গায়ক গায়িকা যন্ত্রী ইত্যাদি নবাব দরবারের সঙ্গে যুক্ত থাকতেন। আর তাঁদের প্রায় সকলেরই বাস ছিল মেটেবুরুজে। তাই সেখানকার সঙ্গীতচর্চ্চার মান ছিল অতি উচ্চ গ্রামে বাঁধা এবং দরবার ও তার বাইরেকার সঙ্গীত সমাজ নিয়ে মেটেবুরুজ সেকালের এক সুবিখ্যাত সঙ্গীতকেন্দ্র।

সঙ্গীতক্ষেত্রে বাংলার যে সব স্মরণীয় সন্তান মেটেবুরুজে সঙ্গীতশিক্ষা করেন, গুণী খেয়াল গায়ক বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট একজন। প্রথম যৌবনে সঙ্গীতশিক্ষার প্রবল আগ্রহে সহায়হীন সম্বলহীন তিনি সাহসে ভর ক'রে সেই সুরতীর্থে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং বহু বাধা-বিপত্তির মধ্যে দিয়ে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে সেখান থেকে সঙ্গীত-বিদ্যা অর্জন করেন। সেই বামাচরণবাবুরই একটি আসরের ঘটনা পরে বলা হবে এখানে।

তাঁর পিতা ভারত সরকারের সমর বিভাগে চাকুরি সূত্রে পশ্চিমাঞ্চলে থাকার জন্যে বামাচরণের বাল্যজীবনও সেখানে কাটে। তাঁর জন্মও হয় পশ্চিম পাঞ্জাবের রাওয়ালপিণ্ডিতে। ফলে তাঁর বেশভূষা চালচলন উচ্চারণ আর কথাবর্তার ধরণ হয়ে যায় পশ্চিমাদের মতন। তাই ১৬।১৭ বছর বয়সে যখন তিনি নিজেদের বেহালার বাড়ীতে এসে বাস করতে লাগলেন, তখনও তাঁর সেই পশ্চিমী ধরণ-ধারণ রয়ে গেল।

পরণে ঢিলে পাজামা পাঞ্জাবী, দীর্ঘ কেশ আর বলিষ্ঠ শরীরে তাঁকে হঠাৎ চেনা যেত না বাঙ্গালী বলে। সেজন্যে কলকাতায় এসে রীতিমত সঙ্গীতশিক্ষার আকুল ইচ্ছায়—যে ইচ্ছা তাঁর কম বয়স থেকেই ছিল—যখন তিনি প্রথম গেলেন লক্ষ্মীনারায়ণ বাবাজীর কাছে, তাঁর কেমন বিরক্তি আসে বামাচরণের ওই পশ্চিমী পোশাক-আশাক আর হিন্দুস্থানী-সুলভ উচ্চারণ শুনে। লক্ষ্মীনারায়ণ বাবাজী হলেন সে যুগের বাংলার এক বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ। বাবাজী একাধারে কুশলী ধ্রুপদী ও পাখোয়াজী, এস্রাজবাদক ও তবলিয়া, বীণকার ও সেতারী। তাঁর নাম থেকেই যেমন বোঝা যায়—তিনি ছিলেন প্রায় সন্ন্যাসীর মত ধর্ম এবং আচারনিষ্ঠ ও সাত্ত্বিক প্রকৃতির মানুষ। সঙ্গীতশিক্ষার্থী বামাচরণ তাঁর সঙ্গীত-খ্যাতি শুনে যখন শিষ্য হবার জন্যে তাঁর কাছে গেলেন, লক্ষ্মীনারায়ণ তাঁর বেশভূষা আর চাল-চলন দেখে বিরূপ হলেন। বামাচরণকে বিদ্রূপ করে বলে উঠলেন, "তা তুমি আমার কাছে এসেছ কেন? তোমার জায়গা মেটেবুরুজে।"

মর্ম্মাহত বামাচরণ তাঁর সেই ঠাট্টাকেই সত্যি ক'রে নিয়ে একদিন খোঁজখবর নিতে হাজির হলেন মেটেবুরুজে। অপরিচিত জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে সেখানকার ওস্তাদ-দের সন্ধান করতে লাগলেন। কে কে আছেন সেখানে, কে কেমন দরের ওস্তাদ ইত্যাদি। খোঁজ নিতে নিতে শুনলেন, সেখানকার ওস্তাদদের মধ্যে তখন আলী বক্সের খুব নাম-ডাক, ধ্রুপদ গায়ক মুরাদ আলী খাঁ নবাবের দরবার ছেড়ে যাবার পর থেকে। গোয়ালিয়রের ধ্রুপদ ও খেয়াল গায়ক, মেটেবুরুজ দরবারে নিযুক্ত আলী বক্সের ডেরার খোঁজ-খবর নিয়ে বুক ঠুকে তাঁর সঙ্গে বামাচরণ দেখা করতে গেলেন। আলী বক্সের কাছ থেকে তাঁকে ফিরে আসতেই হ'ত ব্যর্থ মন নিয়ে, কিন্তু ঘটনাচক্রে বামাচরণের ভাগ্য প্রসন্ন হ'ল ওস্তাদের এক বিশেষ আলাপী বাঙ্গালী ভদ্র-লোকের সহায়তায়। সেসব কথা সবিস্তারে বলবার দরকার নেই। তবে ভদ্রলোকের কথায় আলী বক্স বামাচরণকে শিক্ষা দিতে রাজী হলেন শেষ পর্যন্ত।

কিন্তু সে যে শুধু মৌখিক সম্মতি, তা' বামাচরণ দিন-কয়েকের মধ্যেই বুঝতে পারলেন। দেখলেন, শেখাবার চেয়ে না শেখাবার ইচ্ছাটাই ওস্তাদজীর বেশি। স্পষ্ট 'না' বলা ছাড়া আর সব রকম কায়দাই দেখা যেত তাঁর। শেখাবার দিনে নানা ওজর-অজুহাত আর বায়নার অভাব হ'ত না। বামাচরণ কিন্তু অটল ধৈর্যে বেহালা থেকে মেটে-বুরুজে যাতায়াত করতে লাগলেন (হেঁটেই তখন যেতেন সেখানে), নাছোড়বন্দ হয়ে ওস্তাদকে আঁকড়ে ধ'রে রইলেন। কোন কষ্টকেই মেনে নিলেন না কষ্ট বলে। একবার বেহাগ শেখাবার প্রার্থনা জানালেন আলী বক্সের কাছে। তিনি কাটাবার জন্যে হুকুম জারি করলেন, "বেহাগ নিতে গেলে রাত বারোটায় এখানে আসতে হবে। তার আগে এলে

পাবে না।" শিষ্য তাইতেই রাজী। বেহালা থেকে শীতের রাতে হাঁটতে হাঁটতে মেটেবুরুজে পৌঁছলেন বারোটা নাগাদ, তারপর তালিম নিয়ে বাড়ী ফিরেছেন শেষ রাতে। এমনি সব অসুবিধার মধ্যে দিয়ে শিখতে হয়েছে তাঁকে। আর সেই সঙ্গে ওস্তাদের ঘন ঘন তামাক সাজা ইত্যাদি ব্যাপার ত ছিলই। দক্ষিণার কথা এখানে উল্লেখ না করে উহ্য রাখা হ'ল। অনেক দিন এইরকম চলবার পর তবে প্রসন্ন হয়েছিল ওস্তাদের মন। উত্তরকালে বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় তাই বলতেন, "বড় কষ্ট করে আমরা সে যুগে গান শিখেছিলুম।"

সঙ্গীতের জন্যে এই দুরূহ সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ অবশ্যই করেছিলেন, খেয়াল গানের এক অসামান্য গুণী হয়ে। তবে সে পরবর্তীকালের কথা।

মেটেবুরুজে তিনি আলী বক্‌স্ ভিন্ন আর এক বড় ওস্তাদের তালিমও পান। তাঁর নাম হ'ল (লক্ষ্ণৌর) আহম্মদ খাঁ। আহম্মদ খাঁও ছিলেন খেয়ালের কলাবন্ত।

যে ঘটনাটির উল্লেখ এখানে করা হবে, তার সঙ্গে অবশ্য আহম্মদ খাঁর কোন সম্পর্ক নেই। আলী বক্‌সের কাছে বামাচরণ যখন বছর তিনেক তালিম পেয়েছেন, এটি সে সময়ের ঘটনা।

বামাচরণ তখন নবীন যুবক। ওস্তাদের উপেক্ষা সত্ত্বেও অদম্য অধ্যবসায়ে কণ্ঠসাধনা করছেন, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আদায় করে নিচ্ছেন যতটুকু সার সংগ্রহ করা যায়, ওস্তাদের কণ্ঠে গান শোনবার সুযোগের সদ্ব্যবহার করে নিচ্ছেন নিজের মনোবীণার তারগুলি তেমনি সুরে বেঁধে নিয়ে। সেবায় আর নিষ্ঠায় আলী বক্‌সের মন ঈষৎ আকর্ষণ করতে পেরেছেন। ওস্তাদের সঙ্গে আসরে যেতে আরম্ভ করেছেন তাঁর অনুচর হয়ে।

এমন সময়কার বিবরণ এটি। ঘটনাস্থল—নবাব ওয়াজিদ আলীর মেটেবুরুজ দরবার। সেদিন দরবারে নবাব একটি বিশেষ জলসার আয়োজন করেছেন তাঁর এক নতুন বেগমের গান অবশ্যই পর্দানশীনা হয়ে শোনাবার উপলক্ষ্যে।

নবাবের সেই ডিম্বাকৃতি এবং নিয়ত সুরগুঞ্জনে মুখরিত দরবারে আসর বসেছে। বৃদ্ধ ওয়াজিদ আলীর সামনে রয়েছেন দরবারের ওস্তাদবর্গ—ধামারী তাজ খাঁ, খেয়াল-গায়ক আহম্মদ খাঁ, ধ্রুপদী খেয়ালী আলী বক্‌স এবং আরো অনেকে। তরুণ বামাচরণও সেখানে ওস্তাদের সঙ্গে উপস্থিত হয়ে বসেছেন তাঁর পেছনে।

যথাসময়ে নবাবের হুকুমে জলসা আরম্ভ হ'ল। দরবারের একদিকে চিকের অন্তরালে বসে আরম্ভ করলেন বেগম সাহেবা। তিনি গাইলেন একটি ভারি রাগ—হিন্দোল। একটি গান হিন্দোলে গেয়েই বেগম সাহেবা তাঁর অনুষ্ঠান শেষ করলেন।

তাঁর গান কিন্তু আদৌ ভাল হ'ল না। সম্ভবত বেশিদিন বা ভালভাবে তিনি তালিম পাননি। তার ওপর নবীনা নারীর কণ্ঠে যথাযথ হ'ল না গাম্ভীর্যপূর্ণ হিন্দোলের রূপ প্রকাশ ও বিস্তার। অন্তত সে গানে ওস্তাদরা কেউই সন্তুষ্ট হ'তে পারলেন না। বামাচরণের মনোভাবও তাই। সে গান শেষ হ'তে দরবার নিস্তব্ধ হয়ে রইল অনেকক্ষণ। সুরের আসর জমাট না হয়ে, হিন্দোলের সুরে ভরপুর না হয়ে, বরং যেন তরল হয়ে রইল।

এমন সময় নবাব হঠাৎ ওস্তাদ আলী বক্‌স খাঁকে গানের ফরমায়েস করলেন! একেই ত আসরটি অর্বাচীনা বেগমের, তার ওপর প্রতিকূল আবহাওয়ায় আলী বক্‌সের মেজাজ তখন একেবারে নষ্ট। সুতরাং এ আসরে গাইতে তাঁর একান্তই অনিচ্ছা হ'ল। অথচ স্বয়ং নবাবের ফরমায়েস হয়েছে। দ্বিধাগ্রস্ত ওস্তাদ ইতস্তত করতে লাগলেন, হঠাৎ স্থির করতে পারলেন না রুচি ও রুজির মধ্যে তিনি বেছে নেবেন কোন্‌টি!

নবাবের ফরমায়েস হওয়া থেকেই শিষ্য ওস্তাদের দিকে লক্ষ্য করছিলেন। ওস্তাদকে তিনি তিন বছর ধ'রে দেখছেন। তাঁর মনের অনেক খবর, বিশেষ গানের বা মেজাজ বিষয়ে, তাঁর অজানা নয়। তিনি ওস্তাদের মানসিক দ্বন্দ্বটি অনুভব করে স্থির করলেন একটি উপায়।

আলী বক্‌সকে তিনি বললেন, "ওস্তাদজী, নবাব বাহাদুরকে ব'লে আমায় আসরে গাইবার অনুমতি করিয়ে দিন, আমি গাইব।"

বামাচরণ এমনভাবে কথা ক'টি বলেছিলেন যাতে তা' নবাবের কানে যায়। নবাব আলী বক্‌সকে প্রশ্ন করে জেনে নিলেন বামাচরণের অভিপ্রায় কি, কারণ সব কথা স্পষ্টভাবে শুনতে পান নি।

আলী বক্‌স তখন অকূলে কূল দেখতে পেয়েছেন, বামাচরণের প্রস্তাবে। তিনি নবাবের কাছে সাগরেদের হয়ে আর্জি পেশ করলেন, যদি হুজুর মেহেরবানি করে এই ছেলেটিকে গাইতে অনুমতি দেন তা হলে বেচারি ধন্য বোধ করবে।

খেয়ালী নবাব নিজের আগেকার ফরমায়েসের কথা ভুলে গিয়ে হৃষ্টচিত্তে এই গৌরবর্ণ দীর্ঘকায় নবীন গায়ককে গাইবার সম্মতি জানালেন।

বামাচরণ অবশ্যই দরবারে গাইবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আসেন নি। এখানে গাইবার কথা তাঁর মনেও কখনো ছিল না তার আগে। শুধু ওস্তাদকে সেই অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে নিস্তার দেবার জন্যেই এত বড় দরবারে গাইতে হঠাৎ স্থির ক'রে ফেলেন। কিন্তু তিনি ভয় পেলেন না। সাহসের সঙ্গে এগিয়ে এসে বসলেন গানের জায়গায়। তারপর তানপুরা নতুন করে বেঁধে নিয়ে, তবলচির সঙ্গে সুর ঠিকঠাক করে তিনি গান আরম্ভ করে দিলেন—তৈরী গলায় এবং গলা ছেড়ে। তিনি ধরলেন আলী বক্‌সেরই কাছে পাওয়া একটি ভূপালী :

সুঘর বনায়ে গায়ে বাজায়ে
রিঝয়ে সবন কো
মত গত সোঁ।

বেশ খানিকক্ষণ ধরে যথারীতি কর্তবের সঙ্গে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে তিনি গানখানি গাইলেন।

গান শেষ হ'তে নবাব থেকে আরম্ভ করে সব শ্রোতাই বামাচরণের গানের তারিফ করলেন। বিশেষ আলী বক্‌স্। কারণ সাগরেদ্ তাঁর মান রক্ষা করেছে, মুখ রক্ষা করেছে। তার জন্যেই তিনি এক বিসদৃশ পরিস্থিতি থেকে পেয়েছেন পরিত্রাণ—তাঁকে গান ফরমায়েস করবার কথা আর নবাবের মনে নেই!

বিখ্যাত গায়ক তাজ খাঁ বামাচরণের গানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে তাঁর পরিচয় জানতে চাইলেন—"এ কে ?"

এই তরুণ খেয়ালী বাঙ্গালী শুনে তাজ খাঁ আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তিনি সাবাস দিলেন বামাচরণের পিঠ চাপড়ে।

আর এক অদ্ভুত পুরস্কার বামাচরণ লাভ করলেন অপরিচিত একজন শ্রোতার কাছ থেকে। তিনি বামাচরণের অজস্র সুখ্যাতি করবার পর নিজের কুর্তার পকেট উজাড় ক'রে তাঁর গানের মুজরো স্বরূপ সানন্দে এবং সাদরে দান করলেন—"নাও বেটা নাও, আমি তোমায় বড় খুশী হয়ে দিচ্ছি।"

বামাচরণ হাত পেতে নিয়ে দেখেন—কয়েকটা তামার পয়সা। তিনি বিস্মিত, লজ্জিত হয়ে একটু পরে তাঁর ওস্তাদকে পুরস্কারের বহরটা দেখালেন। মন তাঁর বাস্তবিক বড় ছোট হয়ে গিয়েছিল এই ব্যাপারে।

কিন্তু আলী বক্‌স্ তাঁকে চুপি চুপি বুঝিয়ে বললেন, "যে তোমায় এই পয়সা ক'টা দিয়েছে, এক কালে সে একজন ওমরাহ ছিল। কিন্তু আজ ও ফকীর। এই ক'টি পয়সাই ওর আজকের সম্বল জানবে। তোমাকে মুজরো দেওয়ার ফলে ওকে হয়ত আজ অনাহারে থাকতে হবে, তবুও তোমার গানের জন্যে ওর শেষ সম্বল দিয়ে দিলে। এই পয়সার দাম লাখ টাকা!"

বামাচরণ ওস্তাদের কথার তাৎপর্য বুঝে সত্যই নিজেকে পুরস্কৃত বোধ করলেন!

———

রায়বাড়ী

শ্রীগিরিবালা দেবী

২৮

মহা অষ্টমীর শুভারম্ভ সেই সপ্তমীর পুনরাবৃত্তি। সেই ভোর বাজানো। নিদ্রায় অচৈতন্য বিনুর সর্ব্বাঙ্গে পাথার খোঁচা, ব্যায়ামপুষ্ট শক্ত হাতের প্রচণ্ড ধাক্কা। সেই প্রাতঃস্নান। প্রভেদ শুধু ভোগের ঘরের পরিবর্ত্তে নিয়মের গৃহে কাজ।

ঠাকুমার স্থান সেই মণ্ডপের সিঁড়ি। ঢাকঢোলের সহিত গলা ফাটাইয়া সেই উলু উলু। কেহ তাঁহাকে মণ্ডপে প্রবেশ করিতে ডাকে-না। তাঁহার আচারবিচার নাই, এঁটো-কাঁটার জ্ঞান নাই। শুচিশুদ্ধা সরস্বতীর ব্যবস্থায় তাঁহাকে অস্পৃশ্য-অপাংক্তেয় করিয়া রাখা হইয়াছে। ইহাতে তাঁহার ক্ষোভ-দুঃখের লেশও নাই। পায়ের জন্য সমতল স্থলে বসা তাঁহার কষ্টকর, তাই তিনি সোপানের সিংহাসন বাছিয়া লইয়াছেন। কর্ম্মহীন জীবনের অবলম্বন হইয়াছে গ্রাম্য ছড়া।

পুরোহিতেরা পূজায় বসিলে মনোরমা গতদিনের ন্যায় পূজার উপকরণ নিখুঁত রূপে সাজাইয়া ভোগশালায় আসিলেন। ছোট ঠাকুমা ও বিনুকে লইয়া ভানুমতী কর্ম্মশালায় দশভুজা রূপ ধারণ করিল। সন্ধিপূজার আয়োজন করিয়া নবমীর পূজার অনেক কাজ সারিয়া রাখা হইল।

আজ ভানুমতীর নির্দ্দেশে কাজ করতে বিনুর ভালই লাগিতেছিল। সরস্বতীর উপস্থিতিতে বিনু যেন কেমন থ হইয়া যায়। তাহার দৃষ্টিভঙ্গি, বাচনভঙ্গি তাহার ভাল লাগে না।

এবার সন্ধ্যায় সন্ধিপূজা। পুরোহিত উপবাসী। বিধবাদের এমনিতেই বলি না হওয়া পর্য্যন্ত জলগ্রহণ করিতে নাই। পূজায় তাঁহাদের অন্ন গ্রহণ বারণ। সন্ধিপূজা সমাপ্ত হইলে পুরোহিতের আহারের পরে বিধবাদের আহার। ভানুমতী ছোট ভোগশালায় তাহাদের জন্য লুচি-তরকারি, পিঠে-পুলির যোগাড় করিয়া রাখিয়াছে। এদিকের ভোগ সরিয়া গেলে সন্ধ্যায় সন্ধিপূজার গোলমালের পূর্ব্বেই সে উহাদের রান্না রাঁধিয়া রাখিবে।

পূজান্তে পূর্ব্বদিনের মত প্রসাদ বিতরণ হইতেছিল। হঠাৎ তরু কাঁঠালতলার এঁটো কলার পাতায় পা দিয়া এক বিপর্য্যয় কাণ্ড করিয়া ফেলিল।

ভোগ রাঁধিতে রাঁধিতে অগ্নির উত্তাপে উত্তপ্ত হইয়া সরস্বতী ভোগশালার বারান্দায় বাতাসে একটু দাঁড়াইয়াছিল, এমন সময় তাহার চোখে পড়িল তরুর অনাচার।

সরস্বতী শশব্যস্তে ডাকিল, "মা, দেখে যাও, তরু এঁটো পাতা মাড়িয়ে ফেলেছে। এক্ষুণি মণ্ডপে ঢুকে সৃষ্টি রসাতলে দেবে। ওকে চান ক'রে শুদ্ধ হতে বল।"

মা দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া হুকুম দিলেন, "তরু, চান ক'রে এসোগে।"

ঠাকুমা মুখ খুলিলেন, "তুই ওদিকে প্রসাদ বাঁটছিলি, নাফিয়ে এদিকে এসেছিলি কেনে? এখন ডুব দিয়ে খুন হ'গে। 'যার মরণ যেখানে, নাও ভাড়া করে যায় সেখানে।' দিবারাত্তির একবুলি, 'ঠাকুমা, এঁটো মাড়ালো, মাছের গামলা ছুঁয়ে দিল।' এখন কেমন? 'অসৎকর্ম্মের বিপরীত ফল, মশা মারতে গালে চ'ড়'।"

তরু রাগ করিল না, সে জলে থাকিতে ভালবাসিত। হাসিয়া বলিল, "আমার ভালই হ'ল, গা ঘেমে গিয়েছিল, জলে ঠাণ্ডা করে আসি। আমি কি তোমার মতন জল-চোরা, ঠাকুমা? সেই শেষ রাতে চান ক'রে সারা দিনে জল ছোঁও না?"

ভানুমতী কহিল, "ওখানটায় যে রোদ এসে পড়েছে। উপোসের দিন রোদে থাকতে নেই। তুমি যাও ছায়ায় যেয়ে বসো গে। উলু দেবার দরকার হ'লে আমিই দিয়ে দেব। যাও তুমি।"

ঠাকুমা উঠিলেন না। তেমনি বসিয়াই আপনার মনে বলিলেন, "আমি যাব ব্রজের পথে, আমার কপাল যাবে সাথে সাথে।"

মধ্যাহ্নে পূর্ব্ববৎ নিয়মনিষ্ঠার সহিত মহামায়ার ভোগ নিবেদিত হইল। সেই অন্ন যজ্ঞে একই রব—'আন, দাও।'

আনিতে এবং দিতেই সন্ধ্যা সমাগত হইল। সন্ধি-পূজার শুভলগ্ন আগাইয়া আসিল। একশো আট প্রদীপ জ্বলিল, উচ্চ নিনাদে বাজনা বাজিতে লাগিল। মায়ের নামে আর একটি ছাগশিশু জীবন দান করিয়া ধন্য হইয়া গেল।

আজ গানের আসর বসিল রাত্রি দশটার পরে। পালা শ্রীকৃষ্ণের পারিজাত হরণ। কিন্তু রায়-রঙ্গিণীদের নিকটে হরণ বা বরণের মূল্য নাই। কর্ম্মশালাকে যতই দান কর না কেন, তাহার কর্ম্মভাণ্ডার যেন পূর্ণ হইতে চাহে না। দানে দানে আরও বাড়িরাই যায়।

সেই তরকারির পাহাড়, বাটি বাটি চন্দন ঘষা। পিঠের গোলা, জিলাপীর রস। ধামায় ধামায় ভোগের চাল ডাল মাপিয়া রাখা। ভোগশালার শুচিতা পর্য্যবেক্ষণ। ইহার ভিতরে পারিজাত হরণের সময় দিবার অবকাশ কোথায়?

তবুও ভানুমতী মধুমতীকে কহিল, "কাল তোর যাত্রাগান শোনবার ইচ্ছে হয়েছিল, শুনতে পাস নি। যা না, আজ পারিজাত হরণ শুনে আয়। এদিকের প্রায় সারা হয়েছে, যা বাকি আছে আমরাই বরং ক'রে রাখছি। বৌকেও নিয়ে যা।"

"রক্ষে কর বড়দি, পারিজাত আমার মাথায় থাকুক, এখন বিছানা নিতে পারলে বাঁচি, হাড় চূর্ণ হয়ে গেছে।" বলিয়া মধুমতী সেইখানেই আঁচল বিছাইল।

আহারাদির পরেই সরস্বতী শয্যা লইয়াছে। ছোট ঠাকুমাকেও উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ঠাকুমা প্রতি-দিনের মতন তাঁহার সেই হাতীর মাথায় অবিচল অচল হইয়া বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার ক্লান্তি নাই, শ্রান্তি নাই, অবসাদ নাই। তিনি মধুমতীর কথার উত্তরস্বরূপ আওড়াইতে লাগিলেন—

"হাড় মুড়-মুড় কালো জিরে, রোমুন কুসুম পানের বিড়ে!"

ভানুমতী ও মধুমতী খিলখিল্ শব্দে হাসিয়া অস্থির, "বাবা, কি কান! আমরা এখান থেকে যা বলছি, ওখান থেকে তা শোনা হচ্ছে। ঠাকুমার ক্ষমতার তারিফ করতে হয়. এবার যেন ঠাকুমা বেশি বেশি ঘোরাফেরা করছে। পিসীমা আসতে পারে নি ব'লে মন ভাল নেই।"

ঠাকুমা তৎক্ষণাৎ সাড়া দিলেন, "আলুতি ঝিঙে, জালুতি ঝিঙে, ফুটলো ঝিঙের জালি। মা বলিয়া দিল ডাক, উঠলো মনের কালি।"

আবার সবগুলি ক্লিষ্ট মুখে হাসির বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। বধূ ও মেয়েরা আর পারিতেছে না। রাত্রি দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। অগত্যা অনিচ্ছার সঙ্গে মনোরমা দরজায় তালা দিতে লাগিলেন। এবার ঠাকুমারও উঠিবার পালা। নিশীথ রাত্রে হাতীর সিংহাসনে একাকী বসিয়া থাকা চলে না। তিনি আকাশের পানে চোখ তুলিয়া রজনীর গভীরতা পরীক্ষা করিয়া বিড় বিড় করিতে লাগিলেন, "কা-কা-কা! চন্দ্রমণি লেখন দিচে, মাথা তুলে চা।"

২৯

অষ্টমীর নিশি ভাল করিয়া না পোহাইতেই ঠাকুমার কলকণ্ঠে নবমীর উদ্বোধন হইল। "ওলো, ভানি্য, মাল্যি, আজ না তোদের ঢিলে ঢিলে ভাব দেখছি? 'নবমীতে গা গদ্‌গদ্, বাসনে এঁটো, তরকারি সুঁটো'। লক্ষ্মীরা আয়' কোমর বেঁধে আমার মহেশের মহোচ্ছব পাড়ি দিয়ে দে। আজকের ঠ্যালা শক্ত ঠ্যালা। লোক খাবে অঢেল। রান্না-বাড়াও হবে বেশি বেশি। বিজয়ার নাল পান্তা রেঁধে রাখতে হবে, চাকরদের নাল তুলে আনতে বলেছিস ত? আগেভাগে কিন্তু একটা ভোগ দিয়ে ভরা তুলতে হবে। নইলে বারবেলা প'ড়ে যাবে। মাল্যি, তুই আগে ভরার দ্রব্যজাত ঠিক ক'রে দে। বড় পুষ্পপাত্রে ধান, টাকা, সিঁদুরের কৌটো, ভরার বাতির হাঁড়ি, তার ওপরে বলির খড়্গ রেখে সোনা-রূপো দিতে হয়। বলি হলে তবে না খড়্গ পাবি। বলির পরে কুমড়ো আর আখ বলি দিতে হবে। এক্ষুণি সব নিয়ে মণ্ডপে রেখে দিয়ে আয়। শেষ-মেশ গোরগোল প'ড়ে যাবে। আর একটা কথা, ভরা ওঠার পরে রায়বাড়ীদের আজকে অন্য কোথাও কিছু খাবার নিয়ম নাই।"

তরু স্নানান্তে বারান্দায় কাপড় ছাড়িতেছিল। ঠাকুমার কলকলিতে অতিষ্ঠ হইয়া বলিল, "তুমি এত কথাও বলতে পার ঠাকুমা, তোমার মুখে ব্যথা হয় না? এখন যাও,

মণ্ডপের সিঁড়ি জুড়ে গলা ফাটাও গে। আমাদের ঢের কাজ আছে, তোমার মতন আমরা 'মুখসর্ব্বস্বী' নই বাপু।"

পুজাবাড়ীতে তরু মস্ত কাজের লোক হইয়াছে। কাজের খোঁটা দিয়া ঠাকুমাকে কথা শোনাইতে সে পশ্চাদ্‌পদ হইল না। কিন্তু ইহাতে তাঁহার কিছুই আসে-যায় না। ইহা তাঁহার গা-সহা হইয়াছে।

তিনি মণ্ডপের দিকে অগ্রসর হইয়া নাতনীর প্রতি একটা বক্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "ছোট মুখে বড় কথা, ছাগলের মুখে সরার পাতা।"

তরু এক লাফে বারান্দা হইতে নামিয়া ঠাকুমার মুখোমুখি হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "চুপে চুপে আমাকে কি গাল দিচ্ছ, ঠাকুমা? কি বলছিলে, আবার বলো।"

ঠাকুমা থামিলেন না, গমনোদ্যতা হইয়া অনুচ্চস্বরে বলিলেন, "ওরে আমার তুমি, তোমার লেগে পা ছড়িয়ে বসে কাঁদি আমি।"

তরুর অনেক কাজ। সে ঠাকুমাকে লইয়া সময় নষ্ট না করিয়া মণ্ডপে চলিয়া গেল।

প্রথম দিনের ন্যায় আজও সেই ভোগরাঁধুনী তিনজনা। রান্না নয়, স্থানে স্থানে যেন ছোটখাটো পাহাড়ের স্তূপ। আজ শেষ পুজা, শেষ প্রসাদ বিতরণ, আয়োজন বিপুল।

বেলা একটার পরে বারবেলা পড়িবে। তাহার পূর্ব্বে বলি ও একটা ভোগ সরাইয়া ভরা তুলিতে হইবে। পরে যথা নিয়মে পুনরায় ভোগ হইবে। ভরা উঠিবে অন্তঃপুরের বড় ঘরের লোহার সিন্দুকের মাথায়। গোবর জল দিয়া ঘর মুছিয়া-ধুইয়া তক্‌তকে করা হইয়াছে। সিন্দুরে চন্দনে রঞ্জিত লোহার সিন্দুকের সামনে রাখা হইয়াছে আম্র পল্লবে ভূষিত পূর্ণ কুম্ভ। মেঝেয় পাতা শীতল পাটি, রূপার রেকাবীতে ধান দূর্ব্বা। জলশূন্য ঘটি-কলসী, ঝাঁটা ন্যাতা গোলা হাঁড়ি সরাইয়া ফেলা হইয়াছে অন্তরালে।

বলির কোলাহল থামিবার পরে মায়ের সংক্ষিপ্ত ভোগ দেওয়া হইল। পরে বাজিতে লাগিল ভরার বাজনা। শুধু ঠাকুমা নহেন, সমবেত স্ত্রীলোকদের উচ্চ উলুধ্বনিতে চারিদিক কম্পিত হইতে লাগিল।

অগ্রে পুরোহিত ও মহেশবাবু, তাঁহাদের পশ্চাতে বিরাট্‌ পুষ্পপাত্র মস্তকে প্রসাদ। তাহার সহিত আত্মীয়-স্বজন, বালক-বালিকারা।

ঠাকুমাকে আগেই ধরিয়া আনিয়া পাটির উপরে বসাইয়া রাখা হইয়াছিল। তিনি সেখানে বসিয়াই গলা ফাটাইয়া উলুধ্বনি দিতে লাগিলেন, তাহার প্রতিধ্বনি তুলিল বাড়ীর দাসীরা ও আগত রমণীগণ।

ভরা নামাইয়া রাখার পরে প্রণাম ও আশীর্ব্বাদের ধুম পড়িয়া গেল। গৃহের তুচ্ছ দাসদাসী হইতে বাদ্যকরেরা পর্য্যন্ত গৃহকর্ত্রীর মঙ্গল হস্তের ধানদূর্ব্বার আশীর্ব্বাদ পাইয়া ধন্য হইয়া গেল।

ভরা তোলার সময় রাঁধুনীরা হাঁড়ি কড়া নামাইয়া একত্রিত হইয়াছিল। এখন দে ছুট ভোগশালায়। রাশি রাশি মাছ, গামলা গামলা মাংস। একমুণী দেড়মুণী পিতলের কড়ায় কলসী কলসী পায়েসের দুধ। লুচির পাহাড়, জিলাপির টিলা, অন্নের বালিয়াড়ি রন্ধনকারিণীদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।

অবশেষে মনোরমাও আসিয়া যোগ দিলেন রন্ধনে। দশটা চুল্লী দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে, প্রকাণ্ড ঘর বোঝাই হইয়া গেল রন্ধন সামগ্রীতে।

বেলা গড়াইয়া গেল ভোগ সরিতে। তাহার পরে লোকের ভিড়। ঘর বারান্দা, আঙ্গিনা, আনাচে-কানাচে লোকের মাথা, তাহাদের সামনে কলার পাতা। আজকেই দুর্গাপুজার প্রসাদ দেওয়া ও পাওয়া শেষ। দশমীতে অনুগত-অভ্যাগত, কামার কুমোর, নাপিত ধোপা, মিস্ত্রী ভূমিমালি ও বাদ্যকরেরা খাইবে। আর খাইবে গঙ্গাপুত্রের দল যাহারা মৃন্ময়ী জননীকে দুর্গাদহের অতল সলিলে বিসর্জ্জন দিবে।

নাল পান্তার ভোগ সযত্নে রক্ষিত হইল কর্ম্মশালার এক কোণে। থালা থালা ভাজা, মাছ ভাজা, শুক্‌তো, ডাল ও তরকারি। পিঠে পায়েস, লুচি জিলিপি। যাহা বাসি হইলে নষ্ট হইবে না তেমনি দ্রব্য। দুই গামলা গরম ভাতে কলসী কলসী জল ঢালিয়া পান্তা করিয়া রাখা হইল।

সন্ধ্যা হইতেই পুজার প্রাঙ্গণে গ্রামোফোন বিচিত্র রাগ-রাগিণীর আলাপন করিতেছিল। গোল বারান্দার আঙ্গিনায় শ্রীকৃষ্ণযাত্রার আয়োজন হইতেছিল। পুজার প্রাঙ্গণে ধূপভাঙ্গার।

অনেক রাত্রে নবমীর আরতি সম্পন্ন হইল। কারণ ভোজনপর্ব্ব মিটাইয়া আসিতে রায়লক্ষ্মীদের বিলম্ব

হইয়াছিল। আজ সকলের অমানুষিক খাটুনি গেলেও আগামী দিনের জন্য বিশেষ কিছু যোগাড় করিয়া রাখিতে হইবে না। তাই সকলের একটু হাল্‌কা চিত্ত। নবমীতে নববস্ত্র পরিধান করিয়া গ্রামের ভদ্রমহিলারা নব-প্রতিমা দর্শনে বাহির হইয়াছেন।

মধুমতী আরতি দেখিতে দেখিতে ভানুমতীর কাছে প্রস্তাব করিল, "চলো না বড়দি, আমরাও আজ নব প্রতিমা দর্শন ক'রে আসি ওদের সাথে।"

ভানুমতী অনুচ্চস্বরে ধমক দিল, "ওদের বাড়ীতে ত পুজোআচ্চা নেই, নেমন্তন খেয়ে পাড়া বেড়িয়ে বেড়ায় রাতদিন। তোর প্রতিমা দেখবার যদি এতই সখ হয় তা হ'লে নয়বার মণ্ডপ প্রদক্ষিণ করে নিজেদের ঘরের ঠাকুর দেখ্। তা হ'লেই নব-প্রতিমা দেখা হবে। তোর পরণে ত নতুন শাড়ী রয়েছেই।"

দিদির যুক্তিতে মধুমতী প্রতিবাদ করিতে পারিল না। মন একবার আগাইয়া গিয়া পিছাইয়া আসিয়াছে যাত্রাদলের ঢোলকের বাজনায়। এ কয়েক দিন তাহার যাত্রা দেখা, গান শোনার আগ্রহ মাঠে মারা গিয়াছে। আজ রাত্রি-ভোর বসিয়া দেখিলেও কেহ তাড়না করিতে আসবে না। পূজার দিনে তাহার তরুণ বিরহকাতর হৃদয় একটা উপলক্ষ্য লইয়া তন্ময় হইয়া থাকিতে চায়।

এদিকে ধূপভাঙ্গা, ওদিকে যাত্রার আসর, এই সন্ধিক্ষেত্রে ঢোলক-করতাল-বেহালা ও হারমোনিয়ামেরই জয় হইল। লোক ছুটিয়া গেল যাত্রার আসরে।

মধুমতী বিনুকে লইয়া গোলবারান্দায় থামের পাশে চিকের আড়ালে গান শুনিতে বসিল। শ্রান্ত বিনু আর বসিয়া থাকিতে পারিতেছিল না। দুই চোখ ঘুমে বুঁজিয়া আসিয়াছিল। ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া থামের গায়ে হেলিয়া ঘুমাইতে তাহার অসুবিধা হইল না।

যাত্রার পালা ছিল, "বৃন্দাবন লীলা।" রাত্রি-শেষের দিকে গানও শেষ হইয়া আসিল। মধুমতী এতক্ষণ যাত্রা-গানে মন সংযোগ করিয়া বধূর প্রতি লক্ষ্য রাখে নাই। বৌ ত দিব্য থামে হেলিয়া গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইয়া রহিয়াছে।

মধুমতী বিনুকে ঠেলা দিয়া কহিল, "বৌ, আর কত ঘুমাবে? গান যে শেষ হয়ে গেল।"

ঠেলা-খাওয়া বিনুর অভ্যাস আছে। সে সোজা হইয়া বসিল, চোখ মুছিয়া আসরে তাকাইয়া রহিল। তখন যুগলমিলন হইয়াছে। বালকবেশী শ্রীকৃষ্ণ বালিকাবেশ-ধারিণী শ্রীরাধা কদমতলায় বঙ্কিমভঙ্গিমায় দাঁড়াইয়া—এক সুকণ্ঠ যুবক গোঁফদাড়ি কামাইয়া শ্রীকৃষ্ণ-সখা সুবলের পাঠ লইয়াছিল। সেই সুবল যুগলমূর্ত্তির সামনে বাহু ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া গাহিতে লাগিল,

"তমাল পাশে কনকলতা হেরিয়া নয়ন জুড়াল রে,
কিম্বা নব-নীল নীরদ এসে দামিনী পাশে দাঁড়াল রে!
শ্রীচরণ সরোজে কত ভ্রমিতেছে মধুব্রত;
শশধর শশঙ্কিত, শমন ভয় ফুরাল রে।"—

৩০

নবমীর শেষযামে ভোর বাজিতে লাগিল। কিন্তু আজ ঢাকের কাঠিতে যেন তেমন জোর নাই। ঢিমেতেতালা।

আজই দুর্গাপূজার ভোর বাজানো শেষ। বিজয়ার পরের দিন বাজনাদারেরা বিদায় লইবে। তাহাদের প্রাপ্য ধুতি-চাদর, রচনা, কলা আখ নারিকেল, টাকাকড়ি বাহির মহল হইতে বুঝিয়া লইয়া অন্দরে আসিবে বিদায় লইতে। বাড়ীর প্রত্যেককে দিতে হইবে শাড়ী, ধুতি, গায়ের চাদর, জামা সেমিজ। ইহারা স্থানীয় লোক, ইহাদের উপজীবিকা বাজনা।

দশমীর ভোরে বিনুকে বিশেষ ধাক্কাধাক্কি করিয়া ঘুম ভাঙাইবার প্রয়োজন হইল না। সে গোলবারান্দার থামে হেলান দিয়া প্রাণ ভরিয়া ঘুমাইয়া লইয়াছিল।

আজ মায়ের সংক্ষিপ্ত পূজাভোগান্তে দর্পণ-বিসর্জ্জন। পাচকদ্বয় বড় ভোগের ঘরে রান্না চড়াইয়াছে, ঝিয়েরা যোগান দিতেছে।

সকলেই স্নানান্তে মণ্ডপে সমাগত হইল। পূজার পরে নাল পান্তা ভোগ দেওয়া হইল।

প্রকাণ্ড মহা স্নানের হাঁড়ির উপরে দর্পণ রাখিয়া পুরোহিত এক এক করিয়া দর্পণে প্রতিমার প্রতিচ্ছবি দর্শন করিতে নির্দ্দেশ দিলেন। মেয়েরা পূর্ব্বেই যে যাহার সিঁদুরের রূপার বা কাঠের কৌটা আনিয়া রাখিয়াছিল। মনোরমা আনিয়াছিলেন লক্ষ্মীর ঝাঁপি। পুরোহিত সেগুলি মায়ের চরণ স্পর্শ করাইলেন।

সাধারণ মানুষের ধারণা, দর্পণে যে মূর্ত্তি দৃষ্টিপথে পড়ে,

ারা বছরের ফলাফল তাহারই উপরে নির্ভর করিয়া াকে।

চঞ্চলা তরু সর্ব্বাগ্রে দর্পণে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া আনন্দে নৃত্য রিতে লাগিল। সে গণেশ দেখিয়াছে। সুমন্তকে দেখান ইল, সে ভাল করিয়া কথাই কহিতে পারে না। জিজ্ঞাসা রায় কহিল, "আমি ঠাকুল দেখেছি।"

এবার ক্ষিতির পালা, ক্ষিতি দর্পণে ঝুঁকিয়াই মুখ বিরস রিয়া সরিয়া গেল।

প্রশ্নের পর প্রশ্ন, "কি দেখলি ক্ষিতি? মেজদা নিশ্চয় চ্ছু ভাল দেখে নি, তাই কথা বলছে না।"

তরুকে থামাইয়া দিয়া প্রসাদ সস্নেহে ছোট ভাই-এর ত মুঠোয় চাপিয়া কহিল, "তোমাদের কাছে সব দেবতাই সমান, কেউ ফেলনা নয়। যা হোক্ কিছু দেখলেই ল। তার ভালমন্দ কি?"

এবার ক্ষিতি মুখ খুলিল, "আমি অসুর দেখেছি দাদা।"

"তাতে কি হয়েছে? অসুর শক্তির দেবতা। দেখিস অসুরের পুজো হয়, ভোগ হয়। তুই অসুরের মতন ক্তিমান্ হবি।" বলিয়া প্রসাদ তাহার পিঠ চাপড়াইয়া ল। ক্ষিতির মলিন মুখে হাসি ফুটিল।

মনোরমার চোখে পড়িল প্রতিমার চালির ঊর্দ্ধে বৃষবাহন বমূর্ত্তি। ভানুমতী সিংহের মুখ, সরস্বতী অসুরের স্কন্ধে পিত ফণাধারী সর্প, মধুমতী কার্ত্তিকের ময়ূর, ছোট ঠাকুমা স্বতীর হাঁস দেখিলেন। ঠাকুমাকে কেহ ডাকে না, নিও মণ্ডপে ঢোকেন না। তিনি যে অনাচারের অবতার, চিতার বিঘ্নস্বরূপা। সকলের শেষে বিনু ভয়ে দুরু দুরু ক্ষ তাকাইল দর্পণে—তাহার নয়নে প্রতিভাত হইল ম্নাসনা লক্ষ্মীর যুগলচরণ।

বিনুর পাশে তরু সরিয়া গিয়া সকৌতুকে সাগ্রহে জ্ঞাসা করিল, "তুমি কি দেখলে বৌদি?"

"লক্ষ্মীর পা।"

তরু আনন্দে করতালি দিল, "ওমা শোন, তোমার বৌমা ল লক্ষ্মীমন্ত। লক্ষ্মীর পা দেখেছে।"

প্রসাদ যে কি দর্শন করিয়াছে তাহা অব্যক্ত রহিয়া গেল।

বিসর্জ্জনের বাজনা বাজিতেছিল, ঠাকুমা ভাঙা-গলায় লু উলু করিতেছিলেন। পুরোহিত দর্পণ বিসর্জ্জন দিলেন। স্নানের জল সকলের মাথায় ছিটাইয়া ঘট নাড়িয়া দিলেন। প্রতিমাকে নাড়া দিয়া স্বস্থানে পরমেশ্বরীকে 'গচ্ছ-গচ্ছ' করিয়া বিদায় দিলেন। কান্না পড়িয়া রহিলেন মাটির ধরণীতে, ছায়া উজ্জ্বল করিতে গেলেন অন্ধকার কৈলাসপুরী।

ইহাদের কুলপ্রথা অপরাজিতা-বন্ধন। পুরুষরা দক্ষিণ-হস্তে অপরাজিতার বলয় ধারণ করিল। মেয়েরা বাম-হস্তে। নিরঞ্জন না হওয়া পর্য্যন্ত ইহা ধারণের বিধি।

মনোরমা ছোট ভোগের ঘরে আজ নারায়ণের ভোগ রাঁধিতেছেন। যাঁহাদের উৎসবে আনন্দে অধিকার নাই, নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণে যোগাযোগ নাই, সেই দুর্ভাগিণী পাড়ার বিধবাদিগকে মনোরমা প্রতি বিজয়াদশমীতে নিমন্ত্রণ করিয়া থাকেন। যতরকম নিরামিষ তরকারি নিজের হাতে রান্না করিয়াছেন। পিঠে, পুলি, লুচি, জিলিপি', পায়েস কোনটা বাদ যায় না। মেয়ের অকাল বৈধব্যে সমগ্র বিধবার প্রতি মার করুণার সঞ্চার হইয়াছিল।

বাহির মহল হইতে তাগিদ আসিয়াছে তাড়াতাড়ি রান্না-খাওয়া মিটাইয়া দিতে। এবার আশ্বিনের প্রথমে পূজা হওয়াতে গলির বা জোলার বর্ষার জল শুকাইয়া যায় নাই। এখনও হীরাসাগর নদী অবধি নৌকা চলাচল করিতেছে। সেই কারণে প্রতিমা নৌকায় তুলিয়া নদীতে বাইচ দিতে লওয়া হইবে। নিজেদের এলাকা ভিন্ন রায়বংশেরা অন্য কাহারও মাটিতে প্রতিমা বিসর্জ্জন দেন না। এমনি তাঁহাদের আভিজাত্য ও বংশগরিমা। নদীতে রায়দের নৌকা নাই। নদীবিহীন গ্রামের প্রান্তে চলন বিল নদী-সংলগ্ন। সেই বিলের উপকণ্ঠে অনেকটা ডাঙ্গা জায়গায় রায়গোষ্ঠীর শ্মশানভূমি। মৃত্যুর কাছেও ইহাদের গর্ব্ব পরাজিত হয় নাই। এমনিই গর্ব্বিত বংশের ধারা।

বাহিরের ফুলবাগানের অদূরে যে গভীর দহ আছে, সেইখানেই ইঁহাদের প্রতিমা বিসর্জ্জন দেওয়া হয়। দহের নাম দুর্গাদহ।

ভোগের নাল পান্তা খাইবার উদ্দেশে তরু কলার পাতা বাছিতে বাছিতে উল্লাসে চীৎকার করিতে লাগিল, "ওমা, বড়দি, মেজদি, তোমরা শীগ্‌গির বেরিয়ে দেখে যাও, যোড়া ধরে খঞ্জন পাখী চ'রে বেড়াচ্ছে।"

পূজান্তে পল্লীগ্রামে খঞ্জন পাখী দর্শন হিন্দুদের অতি আকাঙ্ক্ষিত। এই পাখী দেখা দর্পণে দশভুজার প্রতিকৃতি

দর্শনের ন্যায় সংস্কারযুক্ত। খঞ্জন' কোন্ মুখে প্রথম দৃষ্ট হয় তাহারও একটা ফলাফল-বিচার আছে। খঞ্জন-বিশেষজ্ঞেরা তাহা নির্ণয় করিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই পাখীগুলি পূজার পূর্ব্বে কোথায় থাকে কেহ তাহা জানে না। পূজার পরে লক্ষ্মী পূর্ণিমা অবধি ইহারা গৃহস্থের অঙ্গনে নামিয়া চরিয়া বেড়ায়। তাহার পরে কোথায় চলিয়া যায়। কোথায় যায়, কোথায় থাকে, তাহার ঠিকানা নাই। ইহারা বাংলার মাটিতে ক্ষণিকের অতিথি।

পাখীগুলি আকৃতিতে শালিক পাখীর কৃশ সংস্করণ। পালকে সাদা-কালোর ডোরা, কিন্তু বক্ষ শুভ্র সুন্দর। সাদা গলা হইতে সূক্ষ্ম রেখা সুতার মতন, সেই সুতার গায়ে হারের ধুক্‌ধুকির মত একটি কৃষ্ণবর্ণের বড় গোল তিলক। সাধারণের ধারণা ওই তিলকটা নারায়ণশিলা। প্রকৃতির সহিত পাখীদের কিসের সংযোগ সেটা পক্ষীতত্ত্ববিদেরা জানেন। খঞ্জনের লম্বা আকৃতির জন্যই বোধ হয় কবিরা 'খঞ্জন-গঞ্জন আঁখির' উপমা দিয়াছেন।

তরুর তারস্বরে যে যেখানে ছিল ছুটিয়া আসিয়া যুক্তকরে খঞ্জনকে প্রণাম করিতে লাগিল। তরু বার বার হাত ললাটে স্থাপন করিয়া খঞ্জন-বন্দনা করিল, "খঞ্জন পাখী নমস্কার, কাল দেব দুধ-ভাত, আজ দিলাম শুধু হাত।"

পাখী দুইটি অঙ্গনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া শস্যকণা খুঁটিয়া খুঁটিয়া খাইতেছিল। হঠাৎ চতুষ্পার্শ্বে জনসমাগমের সাড়া পাইয়া ফুড়ুৎ করিয়া উড়িয়া গেল।

তরুর আর তখনকার মত খাওয়া হইল না। সে গেল বৃদ্ধ হর ঠাকুরদাদার কাছে খঞ্জনের পূর্ব্ব ও পশ্চিম মুখের লক্ষণ বিচার করিতে।

প্রভাতে দর্পণ বিসর্জ্জনের উলুধ্বনি দিবার পর ঠাকুমা নিস্তেজ হইয়া বসিয়াছিলেন, তাঁহার কায়েমী আসনে। উত্তরমুখী বারান্দায় রৌদ্রের প্রখরতা নাই। সকালের দিকে বাঁকা ভাঙ্গতে এক ঝলক রৌদ্র-স্নানের উপরে ছড়াইয়া পড়িতে না পড়িতে তখনই সরিয়া যায়। ঠাকুমার অবস্থানের পথে বাধা সৃষ্টি করে না। আজ তাঁহার ঘোমটা-ঢাকা মুখখানি বড় বিষণ্ণ। তেলহীন মাটির প্রদীপের মত সলতে যেন মিট্‌ মিট্‌ করিতেছে। কণ্ঠস্বর ভাঙ্গাভাঙ্গা, ঝিমানো, জোর নাই।

খঞ্জন পাখীকে প্রণাম করিবার পর তাঁহার স্তিমিত ভাব অনেকখানি কমিয়া গেল। তিনি বার কত কাশিয়া ঘোমটা তুলিয়া ভাঙ্গা গলায় ডাক দিলেন, "তোরা সব কোথায় গেলি লো ছুঁড়িরা? ক'দিনের খাটা-খাটাতে যে 'ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যায়' হলি? বরণের দ্রব্যজাত ঠিকঠাক ক'রে রেখে দে। খই, ইন্দুরের মাটি; বাতাস দেবার ফুলকাটা পাখা, তোমার বড় গাড়ুটা মেজে ঘষে এক গাড়ু জল। জলের ধারা দিয়ে বরণ করতে হয়। কুড়ি দুই আস্ত পান বোঁটা সমেতে চিরে জোড়া জোড়া খিলি করে দে। কপালে সিঁন্দুর দিয়ে পায়ে ধান-দুর্ব্বো দিয়ে প্রণাম করে পানের বোঁটায় পান ঝুলিয়ে দিবি হাতে হাতে। কাঠামোর সকল ঠাকুরের মুখে চিনি দিয়ে মিঠে মুখ করে দিতে হয়। বরণের ডালায় প্রদীপে তেল-সলতে ঠিক আছে কি না দেখে রাখ। ভরার কাছের যাত্রা কলসী নিয়ে যেতে হবে বরণের সময়। আজ ধান-দুর্ব্বো কিন্তু লাগবে গাদা গাদা। যারা প্রণাম করতে আসবে সকলের মাথায় ধান-দুর্ব্বো দিয়ে আশীর্ব্বাদ করতে হবে। আমি কয়ে না দিলে ভুলচুক হতে পারে, 'তখন যত দোষ নন্দ ঘোষ।' তন্নিটা 'আপন হাত জগন্নাথ' ক'রে পান্তা প্রসাদ খেতে যেয়ে ফর্‌ফর্ করে উড়ে গেল কোন্ দিকে? যাদের নাল পান্তা খাওয়া তারা সাত তাড়াতাড়ি খেয়ে নিক। তপ্ত ভাতের সাথে ত পান্তা খাওয়া চলবে না।"

ঠাকুমায়ের হিতোপদেশে কোথাও সাড়াশব্দ মিলিল না। এ তাঁহার অরণ্যে রোদন। কিন্তু রোদন তিনি চিরকাল করিয়া আসিতেছেন। অন্যান্য দিন তাঁহার অরণ্যে কর্ম্মব্যস্ত পথিকের পদধ্বনি শ্রুত হইয়া থাকে। যাতায়াতের সময় কেহ রোষ ভরে তিরস্কার করিয়া যায়, কেহবা অনুকম্পার নেত্রে ক্ষণেক দাঁড়াইয়া হাস্য করে। আজ বাড়ীটাই যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া ঝিমাইতেছে। অতিরিক্ত পরিশ্রমের পরে রায়বাড়ীতে অবসাদ আসিয়াছে। তবু পূজা এখনও ফুরায় নাই। অদ্যকার নিমন্ত্রিতের সংখ্যাও কম নয়।

আপনার মনে কিছুক্ষণ বকিয়া অবশেষে ঠাকুমা বিন্নুর ঘরের ঘেরা বারান্দায় উঠিয়া গেলেন। স্থানটি নিভৃত, এখন ঢেঁকির কাজ বন্ধ। পুকুর অনতিদূরে, জলের সুশীতল বাতাস ঝির্ ঝির্ করিয়া বহিয়া যাইতেছে। ঠাকুমার

সুস্থান কুস্থানের বিচারবোধ নাই। তিনি সেইখানে আঁচল পাতিয়া শয়ন করিলেন।

কামিনীর মা নিরালায় একটু গড়াইয়া লইতে বারান্দায় আসা মাত্র ঠাকুমা যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন, "রাজেশ্বরী, আয়, এখানে একটু হাত-পা টান্ করে নে! খেটে খেটে তোর সোনার অঙ্গ কালি হয়ে গেছে। রাঁধা নামলেই ফের সোরগোল প'ড়ে যাবে। আঁচল পেতে জুড়িয়ে নে! পূজো ত গেল। দিন যায়, মাস আসে, বছর ঘোরে। পূজো আসে, পূজো যায়। কিন্তু মানুষ আর ফেরে না। সেই যে কর্ত্তা গেলেন, আর ফিরলেন না। 'যে যার যমুনা পার, ফিরে ত আসে না আর'।"

"তা যা কইচেন, মা ঠান, যে যায় ফেরে না। তবু পরাণ বাঁচানোর তরে কর্ম্ম করতে হয়।" বলিয়া কামিনীর মা ঠাকুমার পদতলে ধপ্ করিয়া শুইয়া পড়িল। শুধু শোয়া নয়, অল্প সময়ের মধ্যে সে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইল। কে ঘুমাইল, কে জাগিয়া রহিল তাহাতে ঠাকুমার কিছু আসে-যায় না। নিকটে লোক থাকিলেই তিনি পুলকিত। তাঁহার মন আজ উদাস হইয়াছে, তাই কণ্ঠেও উদাস স্বর ঝরিয়া পড়িতে লাগিল,

"দিন গেল বৃথা কাজে রাত গেল নিদ্রে—
না ভজিলাম রাধা কৃষ্ণের চরণার বিন্দে।"

আহারাদি অর্দ্ধেক মিটাইয়া অর্দ্ধেক ফেলিয়া রাখিয়া রায়লক্ষ্মীরা সাজ-সজ্জায় মন দিলেন, সাবান দিয়া গা ধুইয়া সকলে আলতা সিন্দুর পরিল। মধুমতী সোনার চিরুণী-কাঁটা, ফুল ও প্রজাপতি দিয়া বিনুর চুল বাঁধিয়া দিল পরিপাটি করিয়া। সকলে সর্ব্বাঙ্গে গহনা পরিয়া, নূতন শাড়ী পরিয়া ঝল্‌মল্ করিতে লাগিল।

মেয়েদের আগ্রহে মনোরমাকেও আটপৌরে গহনার সঙ্গে সঙ্গে পরিতে হইল চুড় তাবিজ, দশ লহর মালা, কোমরে চন্দ্রহার, নূতন বেনারসী শাড়ী।

বরণ হইয়া গেলে তুমুল বাদ্যভাণ্ড সঙ্গে লইয়া প্রতিমা চড়িলেন বড় মহাজনী নৌকায়। এক নৌকায় বাজনাদার, আর এক নৌকায় লেঠেল, প্রতিমার নৌকার আগে পিছে চলিল। তাহার পরে বাবুদের পান্‌সী, বাবুনীদের পান্‌সী সারি সারি চলিতে লাগিল।

গ্রামের নিম্নভূমি দিয়া গলি বা জোলা বরাবর চলিয়া গিয়াছে নদী অবধি। বিল, ঝিল, দীঘি, মজা জলাশয় বর্ষার জলে গলির সহিত এক হইয়া গিয়াছে। গলির দুই পাশে বাঁশ ঝাড়, শেওড়া গাছের ঝোপ, আম-কাঁঠালের বাগান, ঘনবন; তাহার ফাঁকে ফাঁকে বসতি। দুই পারে জনতা দাঁড়াইয়া প্রতিমা দর্শন করিতেছিল। স্ত্রীলোকে হাত জোড় করিয়া উলু দিতে লাগিল, পুরুষেরা "দুর্গা মা কী জয়" বলিয়া জয়ধ্বনি দিল। কেহ শঙ্খ বাজাইতেছিল, কেহ ঘণ্টা-কাঁসর বাজাইতেছিল। চারিদিকে ধ্বনির প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল।

হীরাসাগর নদীর মোহনার নাম মোহনগঞ্জ। মোহনগঞ্জ এক খণ্ড গ্রাম, রায়দের অধিকারভুক্ত। হীরাসাগর অন্য জমিদারের জলকর সম্পত্তি।

নদীর মোহনায় পৌঁছিয়াই নৌকার সারি থামিয়া গেল। নৌকায় নৌকায় হীরাসাগরের বক্ষ আন্দোলিত হইতেছিল। নাকালিয়া বন্দরের যত প্রতিমা, পাথরকুচি গ্রামের যত প্রতিমার নৌকা একত্রিত হইয়া মোহনগঞ্জ ও বন্দর অবধি বাচ্ খেলিতেছে। প্রতি নৌকার সহিত বাজনার নৌকা, আকাশ বিদীর্ণ করিয়া বাজনা বাজিতেছে। তীর নীর অন্তরীক্ষ চঞ্চল, মুখর হইয়া উঠিয়াছে।

মোহনগঞ্জ ও পাথরকুচি গ্রামের গায়ে গায়ে মেলামেশা। বিনু নৌকার ছইয়ের ভিতরে বসিয়া নৌকার বাতায়ন-পথে তৃষাতুর দৃষ্টিতে তাকাইয়া দেখিতে লাগিল। এপারে অগণিত জনসমুদ্র বিসর্জ্জন দেখিতে আসিয়াছে। পর পারে ধূ-ধূ বালির চড়ার গা ঘেঁষিয়া সীমাহীন অনন্ত শস্য-ক্ষেত্র বিস্তার লাভ করিয়া শরতের নীলাকাশের সঙ্গে যেন মিশিয়া গিয়াছে। অপরাহ্নের শ্যামল স্নিগ্ধছায়া স্থলে জলে নামিয়া আসিয়াছেন। সূর্য্যদেব যাই যাই করিয়াও যেন যাইতে পারিতেছেন না, তরুশিরে সোনার আভা বিকীর্ণ করিতেছেন। অগণিত ঢাক-ঢোলের সুউচ্চ-নিনাদে পাখীরা নীড় পরিত্যাগ করিয়া ভীত চঞ্চল হইয়া ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া পলাইতেছে।

ডাইনে মোহনগঞ্জের জেলেপাড়ার ঘাট, তাহার পরেই কি ভীষণ শান্তিপূর্ণ শ্মশানভূমি। চারিদিকে প্রাচীন বৃক্ষ-বল্লরী প্রাচীর রচনা করিয়া নিভৃত স্থানটিকে বহির্জ্জগৎ হইতে গোপনে লুকাইয়া রাখিয়াছে। ইহার পর গোয়ালাপাড়ার ঘাট, তাহার পরেই বিনুদের।

নৌকা আর একটু, আর অল্প একটু আগাইয়া গেলেই বিন্নুর চোখে পড়িত তাহাদের ঘাটটিকে। তাহাদের গ্রামে বাড়ীর মেয়েরা প্রতিমার নৌকার সহিত নৌকায় যায় না। তীরে সমবেত হইয়া নিরঞ্জন দর্শন করিয়া থাকে। বিন্নুর ঠাকুমারা সকলে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরেও আসিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে মাও আছেন। বিন্নুর সোনার প্রতিমার মতন মা—স্রোতের প্রবল টানে নৌকা আর একটু সরিয়া গেলেই বিন্নু মাকে দেখিতে পাইত। জনতার মধ্য হইতে মাকে চিনিয়া লইত।

সন্ধ্যার বিলম্ব নাই, ধীরে ধীরে দিনের আলো নিবিয়া আসিতেছে, গলি-খুজিতে লগি ঠেলিয়া নৌকা ফিরাইয়া লইতে হইবে। কাজেই ইহারা আর বিলম্ব করিতে পারিল না। যে পথে আসিয়াছিল সেই পথেই ফিরিয়া চলিল নৌকার সারি। সেই হর্ষধ্বনি, সেই ঢাক-ঢোলে ঘনঘন কাঠি!

প্রতিমার নৌকা চলিল দুর্গাদহের দিকে, তাহার পশ্চাতে অনুচর-পার্শ্বচরদের নৌকা।

মেয়েদের নৌকা ভিড়িল পুকুরের পাড়ে, অন্তঃপুরের ঘাটে। সকলে নামিয়া ত্বরিতপদে ছুটিয়া গেল, ছাদে। বাড়ীর ছাদ হইতে স্পষ্ট-পরিষ্কার বিসর্জ্জন দেখা যায়।

দুর্গাদহের অনতিদূরে ছোটখাটো একটা মেলা বসিয়াছে। স্থানীয় মাটির পুতুল, ঝুরিভাজা, ফেনিবাতাসা, সাঁচ, এলাচ-দানা আর রাশি রাশি তেলেভাজা জিলেপি। জিলেপি-গুলি রায়বাড়ীরই বরাদ্দ। যাহারা প্রতিমা বিসর্জ্জন দিবে, সেই গঙ্গাপুত্রদের জন্য।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঝোপে-ঝাড়ে গাঢ় হইতেছিল, জোনাকি জ্বলিতে লাগিল পাতায় লতায়। দূর হইতে শৃগালেরা সান্ধ্য ঘোষণা করিল। দশমীর শুভ্র জ্যোৎস্নাকে সহচর করিয়া চন্দ্রদেব উদিত হইলেন। দুর্গামার জয়ধ্বনি দিতে দিতে মাকে নিমজ্জিত করা হইল দুর্গাদহের গভীর সলিলে।

প্রতিমাকে জলে নিক্ষেপ করিয়া তাহার উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িল জেলেরা। প্রতিমা ভাসিয়া ওঠা অমঙ্গল। তাই তাহারা দহের কর্দ্দমে মৃন্ময়ী মায়ের শেষ পূর্ণ পরিণতি সারিয়া তীরে আসিয়া উঠিল। উঠিয়াই ভিজা কাপড়ে, ভিজা গায়ে জিলাপির পাতা লইয়া বসিয়া গেল।

বাদ্যকরেরা বাজনা বাজাইতে লাগিল শূন্য মণ্ডপের সম্মুখে। এ বাজনার ভিতরে সে আনন্দগীতির আভাস নাই। করুণ বিলাপ তান ঝরিয়া পড়িতেছে।

ভরার প্রদীপকে প্রণাম করিয়া সকলে যোগ দিল কোলাকুলি, প্রণাম ও আশীর্ব্বাদে। পাড়ায় যাহারা কাছা-কাছি থাকে, তাহারা রাত্রেই সারিয়া গেল প্রণাম-পর্ব্ব। দূরের যাহারা, তাহারা প্রভাতে আসিবে।

সাজপোশাক ছাড়িয়া গৃহলক্ষ্মীরা ফের সংসারের কাজে হাত দিলেন। বিজয়ার রাত্রে রায় পরিবারে ভাত মাছ অচল। সকলের লুচি পুরীর ব্যবস্থা হইল।

পরের দিন একাদশী, বিধবাদের নিরম্বু উপবাস। ঠাকুমা এমনি রাত্রে কিছু খান না, দশমীতে সামান্য কিছু গ্রহণ করিয়া থাকেন। সকলের প্রণাম শেষ হইলে প্রত্যেকের মাথায় ধানদূর্ব্বা দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া তিনি চলিয়া গিয়াছেন নিজের ঘরে। অন্ধকারে ঠাকুমা বিছানায় শুইয়া আছেন।

ভানুমতী খাদ্যপূর্ণ থালা ও জলের ঘটি লইয়া ডাকিল, "ঠাকুমা, উঠে জল খেয়ে নাও। আমি আলো আনি?"

আলো আসিল, তবু ঠাকুমার সাড়া নাই।

মধুমতী কহিল "ঘুমিয়ে পড়েছ, ঠাকুমা? উঠে জল খেয়ে নিয়ে প্রাণ ভরে ঘুমাও। কাল ভোরেও বাজবে না, ভোরেও উঠতে হবে না।"

ঠাকুমা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

ভানুমতী বলিল, "এ আবার কি ঢং, বছরকার দিনে কাঁদছো কেন? তোমার কি শরীর খারাপ হয়েছে, পেট ব্যথা করছে? না, কেউ কিছু বলেছে?"

কেউ কিছু বলিবার ধার তিনি যেন ধারিয়া থাকেন চিরকাল!

ঠাকুমা নীরব, কিন্তু কান্না চলিতেছে সমানে। প্রসাদ তাঁহার প্রথম নাতি, অতিশয় স্নেহের পাত্র। অবশেষে তাহাকে ডাকা হইল।

প্রসাদ ঠাকুমার কোলের কাছে বসিয়া গা জড়াইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি হয়েছে, ঠাকুমা? ও, বুঝেছি, পিসীমার জন্যে মন খারাপ হয়েছে? তুমি উঠে জল খাও, আমি কাল সকালবেলা নৌকো নিয়ে পিসীমাকে আনবো।"

ঠাকুমা মুখ খুলিলেন, "না।"

"না, কেন ?"

"সে তার নিজের ঘরে রইচে, সুখে স্বচ্ছন্দে থাকুক। আমি কেনে তার জন্যে কাঁদতে যাব ?"

"তা হ'লে কাঁদো কেন ? আমাকে কি বলতে পার না ?"

"কাঁদি কেনে ? কাঁদি আমার মা দুর্গার বিহনে। আমি যে ভরা এক বছর মা'র মুখখানি দেখতে পাব না। যদি মরে যাই, আর দেখা হবে না।" ঠাকুমা চোখে অঞ্চল চাপিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

তাঁহার অসঙ্গত কথায় ঘরের সকলে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে লাগিল। এমনি হাসির মধ্যে আমার দেশের পুরাতন স্মৃতিকথা শেষ হইল।

শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর "আত্মচরিত" ছাড়া অন্য উচ্চাঙ্গের গ্রন্থও লিখেছেন। তিনি সুকবি ছিলেন :—"পুষ্পমালা", পুষ্পাঞ্জলি", "নির্ব্বাসিতের বিলাপ", হিমাদ্রি-কুসুম", এবং আধ্যাত্মিক রূপক কাব্য "ছায়াময়ী পরিণয়" তাঁর কবিপ্রতিভার, মানবিকতার ও সবল মনুষ্যত্বের সাক্ষ্য দেয়। তাঁর "মেজবউ" দীর্ঘকাল হিন্দুসমাজেও গার্হস্থ্য সামাজিক উপন্যাস ব'লে আদৃত হ'ত—এখনও এর চলন আছে। তাঁর উপন্যাস "যুগান্তর" সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ সমালোচনা সূত্রে "সাধনা"য় লিখেছিলেন,"শাস্ত্রী মহাশয় বিরলবসতি বাংলা সাহিত্যে একটি গ্রাম বসিয়েছেন" ইত্যাদি। ঠিক কথাগুলি স্মৃতি থেকে উদ্ধৃত করতে পারলাম না)। "রামতনু লাহিড়ী ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত" গ্রন্থে তিনি বাংলা সাহিত্যে জীবনচরিত রচনার একটি উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ, প্রাজ্ঞ ও মননশীল সন্দর্ভলেখক (essayist)। তাঁর কথাবার্তা যেমন, তেমনি তাঁর অনেক লেখা তাঁর রসিকতায় সমুজ্জ্বল। বালক-বালিকাদের জন্যে লেখা তাঁর,

"হবু গবু অশ্ব দুটি করতেছিলেন জলপান,
এমন সময় এলেন তথায় বন্ধু একজন লম্বাকান,"

প্রভৃতি কবিতায় তাঁর অন্যবিধ পরিহাস রসিকতা প্রকাশ পেয়েছে।

—১৫.১০.১৯৪: তারিখে ঘাটশিলা থেকে শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়কে লেখা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পত্রাংশ।

যা হারিয়ে যায়

শ্রীশান্তা দেবী

পনের দিন ধরে চিঠির আশায় দিন গুনছিলেন অনিন্দিতা। চাকরটা দিনে তিনবার করে চিঠির বাক্স খোলে আর ফিরে আসে। শুধু হাতে? না, মাঝে মাঝে ইলেক্ট্রিকের বিল কিম্বা টেলিফোনের বিল হাতে করে। মনি অর্ডারের রসিদও একটা একদিন এসেছিল। কিন্তু চিঠি একটাও আসেনি তাঁর নামে। ভৃত্য গদাধরের নামে বড় বড় বাঁকা অক্ষরে লেখা যে খানদুই পোস্টকার্ড এসেছিল, ইচ্ছা করত সেগুলো তার হাত থেকে টেনে নিয়ে কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলে দেন। কিন্তু তাতে লাভ কি?

অবশেষে বড় একটা চৌকো খাম এল তাঁর নামে। অনিন্দিতা বারান্দায় চিঠিখানা হাতে করে বেতের চেয়ারে বসলেন। খুলবেন কি এখনই? না। উপরে তার হাতের অক্ষরে নিজের নামটা বানান করে পড়তে বেশ লাগছে। ঠিকানাটার উপর জল পড়ে ধেবড়ে গিয়েছে; কিন্তু তাতেও ত ঠিকই এসেছে। টিকিটের উপর ডাকের ছাপটা পড়ে নি। ইচ্ছে করলে কেউ খুলে ব্যবহার করতে পারে। যাক্, অনিন্দিতা ত আর টিকিট খুলছেন না! চিঠিটা খোলাই আসল দরকার। খুললেই পড়া, পড়লেই ফুরিয়ে গেল। আবার কবে আর একখানা চিঠি আসবে সেই আশায় বসে থাকতে হবে।

"আজ ৬।৭ দিন হ'ল শ্রীনগরে এসে পৌছেছি। কি আশ্চর্য্য দেশ! একদিকে যেমন স্বর্গের মত সুন্দর, অন্যদিকে তেমনি নরকের মত নোংরা। তবে পৃথিবীতে আর কোথাও এত ফুল আর এমন জলের ঐশ্বর্য্য আছে কি না কে জানে? ভোর থেকে রাত পর্য্যন্ত ঝুর ঝুর করে কুচো ফুল বড় বড় গাছ থেকে ঝরছে। বাগানের প্যান্‌জিতে কি রঙের খেলা, আর কি বড় বড় এক-একটা ফুল। চিঠির মধ্যে দুটো দিলাম। এরকম ফুল কখনও দেখেছ? এমনি ফুলের মত মুখও মাঝে মাঝে দেখা যায়। ঝিলম্ নদীতে হাউস বোটে দিন কয়েক থাকব। জলস্রোতের সঙ্গে ভেসে ভেসে দিন কাটবে। পহলগাম শুনেছি অপূর্ব্ব সুন্দর। সেটা পরে যাব। আর ত্রাগবাল পাসে ঘোড়ায় চড়ে যেতে হবে। পাহাড়ে কখনও ত ঘোড়ায় চড়িনি, নূতন একটা অভিজ্ঞতা হবে। শুনেছি গায়ে ভীষণ ব্যথা হয়। গুলমার্গে লোকে স্কেট করে বরফের উপর। সে সখটাও আছে। তুমি যদি আসতে পারতে তোমারও ভাল লাগত। বাড়ীতে বসে বসে কড়িকাঠ গোনার সঙ্গে এর তুলনা হয় না। সকালে উঠে থোড় বড়ি খাড়া রান্নার ব্যবস্থা, দুপুরে ঘুম আর রাত্রে আবার ডাল রুটির চিন্তা, এসব মনে থাকে না এমন জায়গায় এলে। মনে হয় যেন আর একটা পৃথিবীতে এসেছি। এখানে খালি ফুল আর পাখী আর জল আর রঙের খেলা, পরীর রাজ্য আর কি! ধুলো-মাখা পৃথিবী মায়ার মত মন থেকে হারিয়ে যায়।"

কতক্ষণ ধরে অনিন্দিতা পড়লেন। তাঁর কথা কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না। সত্যিই পরীর রাজ্যে গিয়েছে। মর্ত্ত্যের মানুষদের কোনো ছায়া সেখানে পড়েনি। অনিন্দিতা চিঠিখানা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন। কতদিন আশা করে বসেছিলেন এই চিঠির জন্যে! কি পেলেন? ভাল আছে, আনন্দে আছে। না হলে অন্য রকম চিঠি হ'ত। না হলে এই মর্ত্ত্যের কথা মনে পড়ত। তাঁর চারধারে এই যে কঠিন মর্ত্ত্য সমস্তক্ষণ আপনার পরিচয় নানাভাবে দিচ্ছে। এখানে চোখের অবাধ দৃষ্টিকে বাধা দিচ্ছে ওই যে চারপাশে চারতলা বাড়ীগুলো। সন্ধ্যার ছায়ায় ছোট ছোট জানালা দিয়ে একটুখানি আলো বাইরে ছড়িয়ে পড়ছে, বাকি সব শুধু অন্ধকার ইটের স্তূপ। কিন্তু কানে আসছে নানা ধ্বনি। কড়ায় ছ্যাক্ ছ্যাক্ করে ঘরে ঘরে ভাজা চলছে মাছ তরকারি, কলতলায় ঘস্ ঘস্ করে বাসন মাজা চলেছে, ছেলেরা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে সুর করে পরীক্ষার পড়া পড়ছে, রেডিও খুলে দুই-একজন বাতাসে গানের তরঙ্গ তুলে দিয়েছেন, তার মধ্যেই কারা যেন তুমুল কলহ জুড়ে দিয়েছে, স্বার্থের সংঘাত বেধেছে। সব ধ্বনিকে ডুবিয়ে একটা এরোপ্লেন আকাশ কাঁপিয়ে ছুটে চলে গেল।

উপরতলা থেকে বাজারের থলি হাতে কাকাবাবু নেমে

এসে অনিন্দিতার অন্যমনস্কতা ঘুচিয়ে দিলেন। শুধু চার-পাশের বাড়ী নয়, এবাড়ীতেও মর্ত্ত্যের মানুষ সংসার-সচেতন হয়ে ঘুরছে। কাকাবাবু বললেন, "কি মা, চিঠি এল? কি লিখেছে? কবে আসছে?"

অনিন্দিতার উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই তিনি আবার বললেন, "উপর তলার ঘরটা মন্দ কি? সন্ধ্যের বাজারে তরিতরকারিগুলো কেনবার পর ভালো পর্দ্দার সস্তা কাপড়ের একটু খোঁজ করব। বেড কভার আর পর্দা সব নূতন করে দিতে হবে, ভালই দেখাবে।" কাকাবাবু শীর্ণহাতে থলিটা ঝুলিয়ে নীচের দিকে নেমে চললেন। মাথার শুভ্র চুলগুলি বিরল হয়ে এসে কাঁধের দিকে ঝালরের মত একটু নেমেছে। চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ নয়, সিঁড়ির রেলিঙের উপর বাঁহাতটা রেখে সাবধানে পা ফেলছেন, যেন পা পিছলে পড়ে না যান। উপর থেকে পিসীমা ডেকে বললেন, "মাধব, সন্ধ্যা না হলে কি বাজারে বেরোনো যায় না? চোখের ত ওই অবস্থা, দিনের আলো একটু থাকতে থাকতে যাও না কেন বাজারে?"

মাধব রেগে বললেন, "তোমার জন্যে দিনের আলোয় কে সস্তার বাজার বসাচ্ছে? দু পয়সা বাঁচাতে হলে এই চোখ নিয়েই সন্ধ্যায় বেরোতে হবে।"

পিসীমা রাগ করে উপর থেকেই হেঁকে বললেন, "এই বয়সে দু পয়সা বাঁচিয়ে আখেরে কি লাভটা হবে শুনি? রাস্তায় পড়ে হাত-পাগুলো শেষ না করে দুটো পয়সা বেশী খরচ করলে ক্ষতিটা কিছু হত না।"

মাধবকাকা আর জবাব দিলেন না, ছেঁড়া কটকী চটি-জোড়ায় পা গলিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে গেলেন। তিন-তলার ঘরের বিছানা ছেড়ে উঠে পিসীমা ধীরে ধীরে দোতলায় নামলেন। অশীতিপর বৃদ্ধা, একটুখানি হেঁট হয়েই চলেন, মাথার সাদা চুলগুলি ঘাড়ের কাছে ছাঁটা, কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে আছে, কিন্তু তার উপর এক ছড়া সোনার সরু হার চক্ চক্ করছে। হাতে একটা খাতা, সেমিজে একটা কলম গোঁজা। মনটা দু নৌকায় পা দিয়ে চলে। কখনও হিসাব করেন, দিন শেষ হয়ে আসার আগে দুনিয়ায় কি কি কাজ, কি কি পরহিত, ভবিষ্যৎবংশীয়ের জন্যে কি কি দান ধ্যান করে যাবেন; কখনও হিসাব করেন, আজও কোথায় কি পাওনা আছে, কোথা থেকে কি আসতে পারে। সেইগুলি জমা হলেই ত দান-ধ্যান বাড়বে। পিসীমা বললেন, "আমার সিন্ধুকের রূপার বাসন ক'টা তোমার ঘরে এনে রাখ, অনি। ওর উপর আর মায়া করব না। আমার নাম যারা করবে তাদের একটা একটা দিও। আর সোনার গুঁড়ো যে ক'টা আছে সে ত আর দশ ভাগ হবে না। কাশ্মীর হয়ে আসুক, ওরই হাতে তুলে দেব।"

অনিন্দিতা বললেন, "ঘরটা সারাতে হবে আগে। ওসব ত পরের কথা। ছাদে একটু চীনামাটির টব সাজিয়ে বাগান করতে হবে। এত ফুল ভালবাসে, বাড়ীতে ত এক চিলতে জমি নেই। টবের বাগান ভালোই দেখাবে।"

পিসীমা হেসে বললেন, "বাগান সাজাও ভাল কথা। কিন্তু সংসারটা আগে সাজাবে, তবে ত বাগান। চার পাশের এই বুড়ো মুখগুলো, এ আর কত দিন? ফুল টবের পাশে পাশে কচি কচি মুখ কচি কচি হাত পা নেড়ে বেড়াবে, তবে না?"

অনিন্দিতা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আঁচল দিয়ে দেয়ালে টাঙানো ছবির কাচগুলো মুছতে লাগলেন! কয়েকটা কচি মুখের ছবি, তার উপর ধুলো জমে সাদা হয়ে গিয়েছে। দেয়ালে একই মুখের নানা বয়সের আরও কয়েকটি ছবি ধূলিমলিন হয়ে আছে। অনিন্দিতা সেদিকে তাকালেন না, গিয়ে ভাঁড়ারের তরকারির ঝুড়িটা একবার নাড়াচাড়া করলেন। করবার কিছু নেই। আলমারি খুলে দেখলেন, ভাঙানো টাকা রয়েছে, আজ কিছু কেনবার নেই। চিঠিটার একটা জবাব লিখবেন নাকি? কিন্তু কি লিখবেন? জবাব দেবার মত কোন প্রশ্ন ত নেই। এখানকার কিছু ত সে জানতে চায় নি। জানবার মত কিছু নেইও এখানে। একই খবর, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের দিন গড়িয়ে গড়িয়ে চলে যাচ্ছে। তার মধ্যে লেখবার কি আছে? কোনও উচ্ছল আনন্দের বন্যা নেই, কোন মর্ম্মান্তিক বেদনা নেই, কোন অপরিসীম চাঞ্চল্য নেই, কোন গভীর ঔৎসুক্য নেই। একটা অধীর প্রতীক্ষা একটা আশার ঝলক মাঝে মাঝে চমক দিয়ে ওঠে, আবার নিভে আসে ধীরে ধীরে। এ কথা বারে বারে লেখা হয়ে গিয়েছে। আরও কি সেই একই কথা লেখা যায়?

পাশের বাড়ীর জানালা খুলে একটি মেয়ে বাইরের

দিকে তাকাল, অনিন্দিতাকে অস্পষ্ট আলোয় এদিক্ ওদিক্ ঘুরতে দেখে ডেকে বললে, "ও মাসীমা, অন্ধকারে একা একা ঘুরঘুর করছেন কেন ?"

অনিন্দিতা বললেন, "কি করব মা ? তোমার মত একটি দোকা থাকলে তার সঙ্গেই ঘুরে বেড়াতাম। এখন একা ছাড়া উপায় কি ?"

মেয়েটি হেসে বললে, "যাবেন আমার সঙ্গে ? সিনেমা দেখবেন ? সত্যজিৎ রায়ের ছবি—তিন কন্যা ?"

অনিন্দিতা বললেন, "রবীন্দ্রনাথের গল্প ত ? বইয়ে পড়তে অনেক ভাল লাগে। মনের মধ্যে যা দেখি, সিনেমার ছবিতে তা দেখা যায় না। 'সীমাহীন দিশাহীন শুভ্রতা ও শূন্যতা' ছবিতে কি দেখানো যায় ? ঝম্ ঝম্ ঝম্ করে গহনা বাজিয়ে সিঁড়ি দিয়ে মণিমালা উঠছে, কে দেখাতে পারে আমার মনে যা ছবি আছে তার মত ?"

মেয়েটি হেসে বললে, "বাবা, আপনি বড় কবি মাসীমা, আপনার কাব্য ধূলিসাৎ করে কাজ নেই। তার চেয়ে চলুন একেবারে আধুনিক বাস্তব রাজ্যে! কোয়ালিটির ঠাণ্ডা ঘরে আইসক্রীম খাবেন ? দেখবেন এখন চুলছাঁটা মেয়ে, জোড়া-বিনুনী মেয়ে, টোপর-খোঁপা মেয়ে, শালোয়ার-শোভিতা-বপু সবাই মুখোমুখি দোসর বসিয়ে কাঁটা চামচ চালাচ্ছে তার মধ্যে থেকে থেকে কদম-ছাঁট আমেরিকান টুরিষ্ট বাঙালী মহিলা গাইড সঙ্গে করে নিয়ে চা খেতে বসে পড়ছে। বাড়ী ফিরেই বই লিখবে এ দেশের বিষয়। গাইড ওকে যা দেখিয়েছে, তার চেয়ে বেশী লিখবে যা দেখায় নি সে বিষয়ে। ঘুঁটে দেওয়া দেয়াল, ফুটপাথে গরু-মহিষ, পথেঘাটে ভিখিরী, গঙ্গার ঘাটে চান আরও কত কি !"

অনিন্দিতা বললেন, "তুমি মা, আমার ঘরের মেয়ে হলে আমি সব দেখে বেড়াতাম। শুধু কলকাতায় নয়, আরও অনেক অনেক দূরে নানা দেশে। কিন্তু এখন তোমায় টেনে নিয়ে বেড়াতে চাইলে তোমার মা দেবে কেন ? এখন আমায় এই ঝিমিয়ে পড়া রংচটা সংসারে এঘর ওঘর ঘুরঘুর করেই কাটাতে হবে।"

মেয়েটি বললে, "যত আপনার নিরানন্দ ডেকে আনা স্বভাব। বয়স ত সব মানুষেরই হবে। তাই বলে কি তারা পাঁচটা জিনিষ দেখবে না, পাঁচ জায়গায় যাবে না ? পাঁচ জনের সঙ্গে পাঁচ রকম কথা বলতে, পথে ঘাটে নূতন নূতন সামান্য জিনিষও দেখতে মানুষের কত ভাল লাগে। শুধু বাড়ীর মধ্যে বসে সেই রোজকার দেখা দেয়াল চারটে আর চালডাল তরকারির হাঁড়ি ঝুড়ি দেখে কি কোন রস পাওয়া যায় ? তার চেয়ে আজগুবি সিনেমাও মনকে বেশী জাগিয়ে তোলে।"

অনিন্দিতা বললেন, "ভাগ্যে থাকলে তাই যাব মা, তাই যাব। এখানে বসে কিই বা করছি আর কিই শুনছি ? পিসীমার কোন্ বাসনটা কোন্ উত্তরাধিকারীকে দিয়ে যাবেন, কোন সোনাটা কোন অজাত বংশধরের কি কাজে লাগবে, তিনি চলে গেলে কে তাঁকে কি কারণে স্মরণ করতে পারে, এ ছাড়া কিছু সুখকর বা মনোহর আলোচনা আমার ঘরে করবার কেউ নেই। মাধব কাকা চোখে প্রায় কিছুই দেখেন না, কিন্তু সস্তায় ভাল বাজার করবেনই, এই তাঁর একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। এই প্রতিজ্ঞার মধ্যে অল্প একটু হাসির খোরাক আছে বটে। কিন্তু তা নিয়ে হাসব কার সঙ্গে ? বাড়ীতে আর যে দুটো বুড়ো আছে, চাকর আর বামুন, তাদের একমাত্র চিন্তা হচ্ছে একপোর জায়গায় কি করে আধ সের করে চালের ভাত প্রতি বেলায় খাওয়া যায়। এ বিষয়ে রাঁধুনীকে কিছু বললে সে বলে, 'আমি ত এতটুকু খাই, উয়ার পেট ভরে না, তাই বেশী নিতে হয়।' ভৃত্যকে অতিরিক্ত আহারের কুফল বিষয়ে উপদেশ দিলে সে বলে, 'খাবার লেগেই ত কাজ করতে আসা। উ যদি খায়, আমি কম খাব কেনে ?' এ শুনে শুনে আর পারি না। ইচ্ছে করে পৃথিবীর অন্য যে রূপটা, যেখানে রং আলো গান গল্প ছড়িয়ে আছে, তার ভিতর ডুবে থাকি, কিন্তু ঘরের এই নানা স্তরের বার্দ্ধক্যের জগৎ এড়িয়ে সেখানে যাব কি করে ?"

মেয়েটি বললে, "রাত হয়ে এল মাসীমা, কাল আবার আপনার সঙ্গে বেড়াবার পরামর্শ করব। আজ আসি।"

জোড়া বিনুনী দুলিয়ে মেয়েটি তরতর করে নিজেদের সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে গেল। অনিন্দিতা সেই দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। মনে পড়ল, একদিন এই রকম হরিণের মত দ্রুত পদক্ষেপ তাঁরও ছিল। ওই মেয়েটিকে দেখলেই সেই সব দিনের কথা মনে পড়ে। নিজের চার-পাশে ত কেবল জরার নানা রূপ। দেয়ালের ছবিগুলিতে

যার নানা বয়সের তরুণ মুখ নানাভাবে ফুটে আছে, সে আজ কতদিন কত দূরে চলে গিয়েছে। ফিরে যখন আসবে, ঠিক যেখানটা ভেঙে বেরিয়ে গিয়েছিল সেইখানটায় কি জোড়া লাগবে? ঠিক তেমনি করে নাই লাগুক তবু আসুক। বুকের মধ্যে আবার একটা খুশির তুফান ক'দিনের মত ও ত নেচে উঠবে? অন্যভাবে চলবে ফিরবে, অন্যরকম কথা কইবে, অন্য একটা বন্ধুজগৎ গড়ে নিয়েছে তারি সন্ধানে থাকবে, তবু সে ত সে। আমি হয়ত তাকে তেমনি করেই মনের মধ্যে পাব। সেই যে ছোটটি আমার কোলের কাছে ঘুমোত, খেলতে খেলতে দৌড়ে এসে এক-একবার আমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ত, বকুনি খেলে চোখ দিয়ে বড় বড় জলের ফোঁটা পড়ত, কিন্তু জোরে কাঁদত না, ভাতের থালায় শক্ত করে দলা পাকিয়ে তার উপরে একটু করে মাছ বসিয়ে দিলে টপ্ টপ্ করে সব দলাগুলি খেয়ে নিত, সেই সে এখন কত বড় হয়েছে, কত বিদ্যা হয়েছে, দেশ-বিদেশ ঘুরেছে, সে কি তেমনি করে আমার মনকে এখনও নাড়া দিতে পারবে না?

সে রাত্রে ঘুমিয়ে অনিন্দিতা সেই পুরাণো দিনগুলির মধ্যে যেন ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। তাকে ইস্কুলের পড়া বলে দিচ্ছেন, দরজি ডেকে তার মাপ দিয়ে ভাল ভাল রঙের জামা করাচ্ছেন, সে লাফিয়ে এসে পিঠের দিক থেকে ধাক্কা দিয়ে সব তছনছ করে কোল থেকে ফেলে দিচ্ছে। জোরে ধমক দিতে গিয়ে ঘুম ভেঙে গেল। কোলের কাছে কোথায় সেই সুন্দর পোশাকগুলি? মলিন বিছানায় একলা শুয়ে আছেন। জানালা দিয়ে রাস্তার আলো দেয়ালে পড়ে নানারকম ডোরা কেটে ঘরটাকে কেমন যেন অচেনা দেখাচ্ছে।

সারা সকাল ধরে অনিন্দিতা ভাবলেন, এ রকম ঘরকুনো হয়ে তিনি থাকবেন না। বেরোতে হবে। জীবনটাকে এই বয়সেও অন্যরকম করে দেখতে হবে। তবে একেবারেই নিরুদ্দেশ যাত্রা করা যাবে না। একটা উদ্দেশ্য নিয়েই বেরোবেন, যদি 'রথ দেখা আর কলা বেচা' দুই ভাগ্যে থাকে হবে।

মাধব কাকা শুনে চোখ কপালে তুলে বললেন, "সে কি কথা মা! তোমার এত বড় ঘর-সংসার ফেলে তুমি কোথায় যাবে? তিল তিল করে গড়েছ, কত হিসাব, কত দেখাশুনা, কত দিকে দিকে সন্ধান করে এতখানি হয়েছে। তুমি যদি ছেড়ে চলে যাও, সাত ভূতে ত সব খেয়ে ফেলবে।"

অনিন্দিতা বললেন, "বেঁচে যদি থাকি ত ফিরেই আসব। ইতিমধ্যে সাত ভূতরা যা পায় সেটা তাদের লাভ। আমি আগলে থাকলে শুধু ত যক্ষের ধন হচ্ছে। নিজেও ভোগ করতে জানি না, পরেও নিতে পারে না।"

পিসীমা কেঁদে ফেললেন, বললেন, "আমাদের না হয় শেষ দিনে জলগণ্ডুষ নাই দিলি কিন্তু যার জন্যে এতদিন ধরে সব সাজালি, সব গড়ে তুললি, তার হাতে তার জিনিষ তুলে দিবি না? এতদিন যদি ধৈর্য্য ধরেছিস, এই ক'টা দিন আর পারবি না?"

অনিন্দিতা বললেন, "চাকর-বাকর ঘর-দুয়ার সবই ত রইল পিসীমা, আপনাদের অযত্ন হবে না। আমার মনটা বড় উতলা হয়েছে। পাশের বাড়ীর উষা মেয়েটি বেড়াতে বেরোতে রাজী হয়েছে, তার মাও যাবেন। এই আমার পরম সুযোগ, আমি একটু ঘুরে আসি। খুব বেশী সময় লাগবে না। আশে পাশে সবাইকে বলে যাব আপনাকে দেখবে এসে এসে।"

পাশের বাড়ীর উষা বিরাট্ আয়োজন করছে বেড়াতে যাবার জন্য। মনটা খুবই খুশী তার। শুধু বেড়াবার জন্য নয়। আরও বড় একটা কিছু যেন ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে এসে পড়ছে। অনিন্দিতার সঙ্গেই বেড়াবার বাজার করে। আধুনিক রকম শাড়ী জামা হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ে ওঠার স্ল্যাক্‌স্ আর শার্ট। কত রকম জুতো, পথে হাঁটার, পাহাড়ে ওঠার, পার্টিতে যাবার। টিফিনের বাক্স, হোল্ডঅল, ফ্লাস্ক্, তাও কেনা হল। বন্ধুদের কাছে ধার করে একটা ক্যামেরা জোগাড় করা গেল। মা বললেন, "বাপ রে, আর কত জোটাবি? দিগ্বিজয়ে যাওয়া হচ্ছে নাকি?"

মেয়েটি বললে, "না, ট্রেণমেধ যজ্ঞ। আজকাল ত ঘোড়া ছুটিয়ে যাওয়া যায় না? কিন্তু প্রত্যহই খবরের কাগজে ট্রেণ-মেধ যজ্ঞের খবর বেরোয়, পড় না?"

মা বললেন, "চুপ কর্ বোকা মেয়ে! যতসব অলুক্ষুণে কথা বলিস্ নে। অমন করলে আমি যাব না তোর সঙ্গে।"

উষা বললে, "বাবাঃ, ঠাট্টাও বোঝ না? আজকে গল্প শুনছিলাম, আমেরিকায় মানুষ প্লেনে এত মারা যায় যে,

স্বামী-স্ত্রী কোথাও যেতে হলে দুজনে দুটো আলাদা প্লেনে চড়ে, বিপদ্ হ'লে যাতে একজন অন্তত বাঁচে। আমরা সেই রকম তিনজন তিনটে আলাদা কামারায় অন্তত উঠলে মন্দ হয় না।"

মা বললেন, "ফের সেই এক কথা! কাজকর্ম্ম বন্ধ করে দিতে হবে দেখছি।"

ঊষা বললে, "না, না, আর বলব না। তুমি যাওয়া বন্ধ করলে মাসীমার যাওয়া হবে না।"

মাধব কাকা ও পিসীমার ভীত ও চিন্তিত দৃষ্টির সামনে দিয়ে অনিন্দিতা সঙ্গিনীদের নিয়ে একদিন যাত্রা করলেন। তীর্থ দর্শন করতে প্রয়াগ মথুরা বৃন্দাবন ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেলেন। সর্ব্বত্র চেনা লোক নেই, থাকবার অসুবিধা। তাই ষ্টেশনেই একবেলা বাস করে যতটা চোখের তৃপ্তি এবং পুণ্যের খোরাক জোটে তাতেই খুশী থাকতে হল। পুরি আর কচোরি ছাড়া ভাত-ডাল সহজে জুটত না। বড় জোর পেঁড়া কি মিঠাই।

বাহির থেকে নানা তীর্থের নানা রূপ, কিন্তু এক জায়গায় সবাই সমান। সবাই বলে, "জুতো খোল, পয়সা দাও।"

ঊষা বিরক্ত হয়ে বলে, "মাসীমা, এত সখ করে সাহেবী জুতো আনলাম, তা সারাক্ষণই দরজায় গোড়ায় ফেলে তেল পিছলোনো মেঝেয় খালি পায়ে ছুটতে হবে।"

অনিন্দিতা বললেন, "তা কি হবে বাপু? কষ্ট না করলে কি আর কেষ্ট মেলে? ম্লেচ্ছের দেশে গিয়ে জুতো মোজা পরে মেমসাহেবি করো এখন।"

ঊষা বললে, "মুসলমান ম্লেচ্ছরাও ত জুতো খুলতে বলছে। তবে পয়সা চাইবে না এই একটা লাভ।"

অনিন্দিতা বললেন, "এমন ম্লেচ্ছের দেশও দেখবে যেখানে মন্দির সমাধি কিছুই নেই। ভগবান্ যা গড়েছেন তাই শুধু দ্রষ্টব্য। সেই দেশটাই ত আসল, পথে যা দেখে যাচ্ছি তা ত শুধু ফাউ।"

ঊষা বললে, "মথুরা বৃন্দাবনে ভগবানের সৃষ্ট যা বাঁদর দেখলাম এমন কোথাও দেখিনি, দেখবও না।"

অনিন্দিতা বললেন, "কেন, প্রয়াগে ভগবানেরই সৃষ্ট গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম কি তোমার মনে ধরল না? এমন দুরঙা জলের মিলন কোথাও দেখেছ? মানুষের সৃষ্টিও অনেক দেখবে যার তুলনা নেই পৃথিবীতে। তবে তা ম্লেচ্ছদেরই সৃষ্ট। যদি আর কখনও পার, অজন্তা ইলোরা দেখো, ম্লেচ্ছরা করেনি সেগুলি। তবে আমার ভাগ্যে তা হবে না আর এ জীবনে। ঐ তাজ আর মতি মসজিদ দেখেই খুশী থাকতে হবে।"

ঊষা বললে, "আপনি ত কাব্য ভালবাসেন। ঐ তাজের উপরেই ত রবীন্দ্রনাথের অমর কবিতা আছে। শুধু ঐটুকু দেখতে পাওয়াও কিছু কম ভাগ্য নয়।"

অনিন্দিতা বললেন, "ঠিকই বলেছ মা। তবে যা-ই দেখি না কেন, তার চেয়ে অনেক সামান্য জিনিষের উপরই আমার ভাগ্যের পরীক্ষা নির্ভর করছে। আপাতদৃষ্টিতে লোকের সে কথা সামান্যই মনে হবে। কিন্তু আমার কাছে আজ সেইটেই বড় হয়ে আছে।"

অবশেষে আগ্রা দিল্লীও দেখা মন্দ হ'ল না। সঙ্গে অন্য যে দলটি ছিল, তাদের পুরুষ অভিভাবকও ছিল, কাজেই তাদের নির্দ্দেশমতই এঁরা চললেন। পথের ধুলোয় গরমে একদিকে প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি করছে, আর একদিকে নিত্য নূতন নূতন দৃশ্যপট মনকে উৎফুল্ল করে তুলছে। ছোটখাট কেনাকাটাও হচ্ছে। বেশী কিছু নিলে ফেরবার পথে বোঝা বড় ভারী হয়ে যাবে, তাই যে জিনিষ ওজনে হাল্কা এবং মাপে ছোট এমন ছাড়া কিছু নেওয়া হবে না স্থির হয়েছে। অনিন্দিতা বলেন, "কার জন্যেই বা নেব?"

শেষ গন্তব্যস্থল শ্রীনগর। ঝিলম নদীর প্রকাণ্ড নৃত্যরত স্রোতের নানা খেলা দেখতে দেখতে পাহাড়ে ওঠা। মাঝে মাঝে পথপ্রান্ত থেকে সে অনেক দূরে সরে গিয়েছে। আবা যেন লুকোচুরি খেলা খেলতে নূতন রূপে নূতন বাঁকে দেখা দিচ্ছে। কে বলবে সেই একই ঝিলম। কখনও পুঞ্জীভূত শুভ্র ফেনা তুলে উল্লম্ফন করছে, কখনও গভীর বিস্তৃত জলরাশির শহরের কাছে এসে সেই সৌন্দর্য্যময়ী, মানুষের অত্যাচারেই ক্লেদাক্ত শ্লথগতি, কখনো বা অদৃশ্য। রাস্তার দুই পাশে সফেদ ও মধ্যে মধ্যে বিরাট চেনার গাছের রাজ্যের ভিতর দিয়ে শ্রীনগর এসে পড়ল। অনিন্দিতা ব্যস্ত হয়ে গাড়ীর চালককে বললেন, 'তাঁদের সেনানিবাসের ডাক্তারের বাসায় নিয়ে যেতে। সেই তাঁর পুত্র অনিরুদ্ধ। গাড়ী থেকে নামলেন। সেলাম করে একজন সিপাহি এসে দাঁড়াল। বললে, "ডাক্তার সাহেব তিন মাসের ছুটি নিয়েছেন। কয়েকদিন আগে শ্রীনগর ছেড়ে গেছেন।"

কোথায় গেলেন?—একজন মেমসাহেবের সঙ্গে সাদি হয়েছে। তাঁকে নিয়ে বেড়াতে গেছেন। দেশে তাঁর মা আছেন. হয়ত ফিরবার সময় তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করে আসবেন। তারপর আবার বদলি হয়ে কোথায় যাবেন ঠিক নেই।

—

ছায়াপথ

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

॥ তেরো ॥

বাবুদের বাড়ী এসে রামকিঙ্কর পরম মুক্তির আনন্দে অভিভূত হয়ে গেল। এরকম মুক্তি প্রথমে বাল্যকালে যদি পেয়ে থাকে সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু কর্মজীবনে পায় নি তাতে আর ভুল নেই। আর কাজেও কি সে আজ ঢুকেছে? মনে পড়ে না, কতদিন হল ঢুকেছে। মনে হয়, জন্ম থেকে সে তেলের পিপে গড়াচ্ছে, গ্রীষ্মে-বর্ষায় তাগাদায় বেরুচ্ছে আর হরেকৃষ্ণের কাছে দাতুনী খাচ্ছে।

এখানে কাজ নেই, হরেকৃষ্ণের তিরস্কার নেই। শুধু অবারিত ছুটি, সকাল থেকে তার পরদিন সকাল পর্যন্ত।

ঠাকুরবাড়ীর সামনে, একই উঠানের উপর এই মহলটা হ'ল কাছারী মহল। নিচে সেরেস্তা, উপরের ঘরগুলিতে আমলারা থাকে। তারা ঠাকুরবাড়ী প্রসাদ খায়।

নিরামিষ। মাঝে মাঝে নিজেরাই বাজার থেকে মাছ আনিয়ে স্টোভে রান্না করে খায়। মাংস রান্না নিষিদ্ধ। কিন্তু প্রসাদ অতি উপাদেয়। মুখ বদলাবার প্রয়োজন কালে-ভদ্রে হয়।

দু'বেলাই প্রসাদ। দিনে ভাত, রাত্রে রুটি তার সঙ্গে সামান্য ফল-মিষ্টিও থাকে। দোকানের মেসের অখাদ্যের তুলনায় অমৃত ভোগ বললেই চলে।

সকাল-বিকেলে জলখাবার কি চা আসে না। সেটা নিজে পয়সা খরচ করে খেতে হয়। কিন্তু সে আর কতই বা!

মাঝে মাঝে নানা উপলক্ষ্যে অন্দর থেকে খাবারও আসে। কখনও গিন্নিমার ভাঁড়ার থেকে, কখনও বা বৌরাণীর ভাঁড়ার থেকে। অন্দরে দুটি ভাঁড়ার: একটি গিন্নিমার, সেটি সম্পূর্ণ নিরামিষ, আর একটি বৌরাণীর। দুজনেই দয়াবতী।

আমলা-মহল যদিচ বাড়ীর বাইরে, সদরে, কিন্তু অন্দরের সঙ্গে সংযোগরহিত নয়। গিন্নিমার ত কথাই নেই, তাঁর দেখাদেখি বৌরাণীও এদের কথা ভাবেন, খাবার-দাবার কিছু হলে এই বেচারাদের জন্যেও পাঠিয়ে দেন।

দোকান থেকে বেরিয়ে এসে রামকিঙ্করের ঘুম দেরিতে ভাঙছে। হরেকৃষ্ণ নেই, তাগাদাও নেই। অন্যেরা বাইরে চা খেতে যায়, ওর সে-পাঠ নেই। পাড়াগাঁয়ের ছেলে, চায়ের ভক্ত নয়। পেলে খায়, না পেলেও ক্ষতি নেই।

সকালেই কাছারী বসে। আমলারা নিচে নেমে যায়। রামকিঙ্কর মুখ হাত ধুয়ে এসে পড়তে বসে। উপরতলা একেবারে নিরিবিলি। কেউ বিরক্ত করার নেই। তবু পড়ায় মন বসতে বিলম্ব হচ্ছে। দোকানের অভ্যাস সহজে যেতে চায় না।

বেলা হলে মাঝে মাঝে গিন্নিমা ডেকে পাঠান। রামকিঙ্কর ঠাকুরদালানে তাঁর কাছে গিয়ে বসে। দোকানের কোন আলোচনা হয় না। তার দেশের বাড়ির কথা, পড়াশোনার কথা, সুবিধা-অসুবিধার কথা। কিছু প্রসাদী ফলমিষ্টি দেন। তার পর চলে আসে।

দুপুরে স্নান এবং প্রসাদ ভক্ষণ। একটুখানি বিশ্রাম করেই বই খুলে বসে। পড়বার চেষ্টা করে।

একদিন সুবল এল।

ওর থাকার ব্যবস্থা দেখে তার চক্ষু ছানাবড়া।

—কি রে, এ যে দিব্যি আরামে রয়েছিস।

—তা আছি ভাই, কিন্তু একটু অসুবিধাও আছে। বহুদিন দোকানের খাঁচার মধ্যে বসে বুলি কপচেছি, এখানে এই খোলামেলার মধ্যে মনটাকে ঠিক পড়ার কাছে গুটিয়ে আনতে পারছি না। তার পরে দোকানের খবর বল।

—খবর ভাল নয়।

—কেন?

—হরেকেষ্ট গুম। কারও সঙ্গে কথা বলে না। বকাবকি একদম বন্ধ।

—আমি নেই। আর কাকে বকবে।

চিন্তিত ভাবে সুবল বললে, শুধু তাই নয়। ভেতরে

আরও কিছু আছে বোধ হয়, আমরা ধরতে পারছি না। জানিস, সারারাত ঘুমোয় না। বুঝতে পারি, ওর হুঁকোর শব্দে।

সুবল হেসে বললে, কিছু একটা হয়েছে। ভাবলাম, তুই হয়ত জানতে পারিস।

—আমি কি করে জানব?

—গিন্নিমার সঙ্গে দেখা হয় না?

—প্রায় প্রত্যহই দেখা হয়।

—তিনি কিছু বলেন না?

—না। অনেক কথা বলেন। অনেক গল্প করেন। কিন্তু দোকান নিয়ে কোন কথা না।

তবে আর কি!

রামকিঙ্কর চলে আসায় তাগাদার ভার পড়েছে সুবলের উপর। তাগাদা ফাঁকি দিয়ে এই কথাটা জানবার জন্যেই তার রামকিঙ্করের কাছে আসা।

হরেকৃষ্ণ গুম হয়ে যাওয়ায় দোকানের সকলেই খুব চিন্তিত। ব্যাপারটা জানবার জন্যে সকলেই খুব কৌতূহলী। কে জানাতে পারে রামকিঙ্কর ছাড়া? সে কেন্দ্রস্থলে বসে আছে। হয়ত বা সেই নাটের গুরু। গিন্নিমাকে পরামর্শ দিচ্ছে। সে যদি না জানে, অথবা জেনেও না জানে, তাদের কৌতূহল আর কে চরিতার্থ করতে পারে?

সুবল জিজ্ঞাসা করলে, দোকানে যাবি না একদিন? সবাই তোর কথা জিগ্যেস করে।

রামকিঙ্কর ম্লান হাস্যে বললে, এখন আর কি করে যাই? দেখছিস ত।

বলে বইগুলির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে।

কিন্তু সেটি আসল কথা নয়। আসল কথা হচ্ছে ভয়। যখন সে দোকানে হরেকৃষ্ণের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল, তখন ওর সম্বন্ধে তার ভয় ছিল না। ছিল ক্রোধ এবং আক্রোশ। সেই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে এসে পিছনের দিকে চেয়ে এখন সে হরেকৃষ্ণের কুটিল হিংস্র মুখ কল্পনা করতে ভয় পায়।

রাত্রে এর মধ্যে কতদিন সে হরেকৃষ্ণকে স্বপ্ন দেখেছে। স্বপ্নে ওর মুখখানা বৃদ্ধ রাক্ষসের মত আরও কুটিল এবং আরও হিংস্র দেখিয়েছে। বড় বড় ধারালো দাঁত যেন তার দেহ থেকে মাংস খুবলে নিতে আসছে!

ঘুমের ঘোরে সে অব্যক্ত শব্দ করেছে। ঘামে বিছানা ভিজে গেছে।

দোকানে থাকতে দিনের বেলায় পড়বার সময় পেত না। রাত্রেও বেশি রাত্রি পর্যন্ত আলো জ্বালা চলত না। কিন্তু যেটুকু পড়ত, রাত্রেই পড়ত।

এখানে এসে দিনের পড়ায় এখনও সে মন বসাতে পারে নি। বই খুলে বসে। কিছুটা পড়ে। কিন্তু বই খুলে এলোমেলো চিন্তাটাই বেশি আসে। রাত্রেই পড়ায় মন বসে।

অনেক রাত্রি পর্যন্ত পড়বার চেষ্টা করে।

পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে তার বুকের ভিতরটা হাহাকার করে উঠত তার বাবা ও মায়ের জন্যে। মনে হ'ত বুকের ভিতরটা একেবারে শূন্য। কিছু নেই ওর মধ্যে।

এমন এর আগে কখনও হয় নি। বোধ হয় এমন একলা কখনও থাকে নি বলে।

সে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়।

বাবুদের বাড়ীটা যেন স্বপ্নপুরীর মত মনে হয়। কোন দিক থেকে যেন আধখানায় আলো এসে পড়েছে। বাকি অর্ধেক অন্ধকার। মনে হয় আধখানা বাড়ী হাসছে। আর আধখানা অন্ধকার।

এদিকে আমলা মহল সুখসুপ্ত। কিন্তু অন্দরে বোধ হয় আলো জ্বলে। এবং পুরনারীদেরও সকলে নিদ্রিত নয়। ফিসফাস শব্দ শোনা যায়।

হয়ত দাসীদের কাজ তখনও মেটে নি।

রামকিঙ্করের কিরকম যেন রহস্যজনক মনে হয়। অত বড় একটা বাড়ী, তার অর্ধেক আলো, অর্ধেক অন্ধকার। তার অন্তরালে কাদের যেন ফিসফাস সমস্ত মিলে বাড়ীটাকে যেন একটা রহস্যপুরীর স্তরে এনে ফেলেছে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে রামকিঙ্কর যেন বর্তমান এবং বাস্তবের সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে ফেলে।

এমনি হ'ত তার ছেলেবেলায়। দেশে।

কোনদিন গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙে গেলে খোলা জানালা দিয়ে দূরের বাইরেটাকে এমনি রহস্যময় মনে হ'ত। আলো-ছায়ার উপর দাঁড়িয়ে-থাকা দূরের আম বাগানটা যেন একটা

অন্যতা পেয়ে গেছে। দিনের দেখা সেই স্পষ্ট আম বাগান নয়।

ওর যেন ওজন নেই। যেন ঝুলছে।

দোকানের কাজে ঢুকে সে যেন বুড়িয়ে যাচ্ছিল। তার চেয়ে বড়দের সঙ্গে গল্প, আড্ডা, ইয়ার্কি। প্রতিদিন সেই একঘেয়ে কাজ এবং একঘেয়ে ঝগড়া-ঝাঁটি। এখানে এসে ক'দিনের মধ্যেই আবার সে নিজের বয়সে ফিরে এল। তার মধ্যে আবার ফিরে আসছে রস, রোমান্স এবং সজীবতা, যা এই বয়সের ছাত্রজীবনের ধর্ম।

ইট-পাথর-সিমেণ্টে বাঁধাই কলকাতা তার বরাবরই নীরস ঠেকে। রাত্রে সেই কলকাতাই যে আশ্চর্য রহস্যময় হতে পারে, এখানে আসার আগে সে ধারণা তার ছিল না।

এখন সে কল্পনা করে, কলকাতা যেন দিনমজুর। সমস্ত দিন সে ইস্পাতের মত শক্ত পেশী আর পাথরের মত কঠিন পা দিয়ে খাটে। লোভে, ক্ষোভে ও নিষ্ফলতায় তার চোখ রক্তবর্ণ। প্রকাণ্ড একটা দৈত্য যেন।

রাত্রে সে চোখে নেমে আসে রোমান্স। শান্ত, স্নিগ্ধ ও আলো-ছায়ায় রহস্যময়।

এখানে চাঁদ দুর্লভ।

কিন্তু গভীর রাত্রে বারান্দায় গেলে মাঝে মাঝে চাঁদ দেখা যায়। নৌকার মত বাঁকা চাঁদ যেন আকাশ-পারাবারে খেয়া দিচ্ছে।

তখনই বসে বসে সে একটা কবিতা লিখে ফেললে। এবং পরদিন সেটা পড়ে ভাবলে, এ কাজ সে করলে কি করে আর কেনই বা করলে। এখানে আছে সে ক'টা দিনের জন্যেই বা! পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলেই 'স্বর্গ হইতে বিদায়'! আবার সেই তেলের দোকান: তেল বেচা আর খদ্দেরদের কাছে টাকার তাগাদা করা!

তার হঠাৎ কবিতা লেখার শখ হ'ল কেন? ছোঁয়াচটা কোথা থেকে পেলে?

এই আমলা-মহলে যারা থাকে তারা কেউ কবিতা লেখে বলে শোনে নি। বাড়ীর যিনি মালিক তাঁরও এ বাতিক আছে বলে বোধ হয় না। দিলদরিয়া মেজাজ বটে, কিন্তু কবি নন।

সন্ধ্যাবেলায় মোসাহেব নিয়ে বাগানবাড়ী যান, পরদিন সকালে ফেরেন। সমস্ত দিন ঘুমিয়ে কাটিয়ে আবার সন্ধ্যাবেলায় বার হন। কবিতা লেখার সময়ও নেই, সম্ভবত শখও নেই।

তবে এ ছোঁয়াচ সে পেলে কোথা থেকে?

আমলাদের সঙ্গে দেখা হওয়ার সময় দুপুর বেলা। সবাই এক সঙ্গে খেতে বসে সেই সময়। সবাই ছা-পোষা গৃহস্থ। না বেশভূষার পারিপাট্য, না কিছু। কাউকে কোনদিন গুণ গুণ করে গানের সুর ভাঁজতেও শোনে নি।

ওরই মধ্যে যা একটু পারিপাট্য দেখা যায় দুর্যোধনের। বেশের নয়, কেশের। ঢেউ-খেলানো চুল সব সময় পরিপাটি বিন্যস্ত। আর পরিপাটি বিছানাটি। বলে, অপরিচ্ছন্ন বিছানায় তার ঘুম হয় না। সমস্ত দিন খাটাখুটির পরেও না।

এই ক'দিনের মধ্যে আমলাদের কারও সঙ্গে রামকিঙ্করের বিশেষ পরিচয় হয় নি। মুখচেনা মাত্র। কি খাবার সময় দু'চারটে কথা। দু'দণ্ড বসে গল্প করার সুযোগ হয় নি।

সেদিন গভীর রাত্রে বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রামকিঙ্কর বাড়ীর রহস্য উপভোগ করছে, পাশে কে যেন এসে দাঁড়াল। চমকে চেয়ে দেখে, দুর্যোধন।

—ঘুম আসছে না?

রামকিঙ্কর হাসলে: না। ঠিক তার উলটো। ঘুম আসছিল বলেই ঘুমটা ছাড়াবার জন্যে এখানে এসে দাঁড়ালাম।

—পরীক্ষার পড়া? না?

—হ্যাঁ।

রামকিঙ্কর বললে, রাত্রে বাড়ীটাকে দেখে আশ্চর্য লাগে! না?

—হ্যাঁ। কিন্তু রাত্রে এখানে এসে দাঁড়াবেন না।

—কেন?

—কারও চোখে পড়ে গেলে খারাপ হবে।

—চোখে পড়ব কি করে?

—ঝিলমিলির ওদিক্ থেকে দেখা যায়।

—কিন্তু সবাই ত ঘুমুচ্ছে।

—না। এরা দিনে ঘুমোয়, রাত্রে জাগে। শব্দ পাচ্ছেন না?

—ঝিরা কাজ করছে বোধ হয়। না?

দুর্যোধন হাসলেঃ অন্যেরাও হতে পারে। কিছু বলা যায় না। ভিতরে গিয়ে পড়াশুনো করুন গে।

দুর্যোধন তার নিজের ঘরে চলে গেল। ভয়ে এবং বিস্ময়ে রামকিঙ্করও নিজের ঘরে চলে এল। কিন্তু আর পড়ায় মন দিতে পারলে না। একটা অজ্ঞাত, ঘনীভূত রহস্য তার মনকে সবলে নাড়া দিতে লাগল!

আলো নিভিয়ে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়েও সে যেন শুনতে পাচ্ছিল ওদিকের ফিসফাস শব্দ, সন্তর্পণে চলাফেরা এবং বোধ করি একটু চাপা হাসিও।

বিশ্বনাথ এসেছিল সকালে।

সে জানত না রামকিঙ্কর এখানে এসেছে। প্রথমে গিয়েছিল দোকানে। গদীতে বসে হরেকৃষ্ণ। তাকে বিশ্বনাথ ভয় করে। লোকটা অত্যন্ত দুর্মুখ এবং রূঢ়ভাষী। সহজে তার সঙ্গে কথা বলতে সে চায় না! কিন্তু আর কাউকে সামনে না পেয়ে তাকেই জিজ্ঞাসা করতে হয়।

—রাম আছে?

পর পর দুবার জিজ্ঞাসা করতে হল। হরেকৃষ্ণ তার কথা শুনতেই পেলে না।

তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করতে হরেকৃষ্ণ খ্যাঁক করে উঠলঃ তা আমি কি করে জানব? আমি কি তার খাস পেয়াদা?

নিরাশ হয়ে বিশ্বনাথ ফিরে আসছিল। পথে সুবলের সঙ্গে দেখা। সে-ই রামকিঙ্করের ঠিকানা দিলে।

—কি আশ্চর্য রাম!—বিশ্বনাথ ক্রুদ্ধ ভাবে বললে, দশ-বারো দিন হ'ল এখানে এসেছ, আমাদের একটা খবর দিতে নেই? মা যে কত ভাবছেন!

কুণ্ঠিতভাবে রামকিঙ্কর বললে, ভুল হয়ে গিয়েছিল ভাই। এখানে এসে পর্যন্ত—

বাধা দিয়ে বিশ্বনাথ বললে, ভুল হয়ে গিয়েছিল! এর মধ্যেই ভুল হতে আরম্ভ হ'ল!

বিশ্বনাথ তিক্ত ভাবে হেসে উঠল।

লজ্জিত ভাবে রামকিঙ্কর বললে, তোমাকে আমি বোঝাতে পারব না ভাই, এখানে এসে পর্যন্ত সব কি রকম এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে! যা মনে রাখবার তা মনে থাকছে না। যা ভোলবার তাই মনের মধ্যে সব সময় পাক খাচ্ছে।

—সে আবার কি?

—তাই। কি যে ব্যাপার, তোমাকে বোঝাতে পারব না। কি রকম যেন বাড়ীটা।

বিশ্বনাথ সভয়ে জিজ্ঞাসা করলে, ভূতুড়ে নয় ত?

...কি জানি ভূতুড়ে কি না। কিন্তু আর সবাই ত বেশ আছে। শুধু আমারই এই রকম হচ্ছে।

—রাত্রে ভয় টয় পাও না ত?

—না, ভয় নয় কি রকম যেন অনুভূতি। বিশেষ করে রাত্রে। মনে হয় প্রতিদিনের যে পৃথিবী তার থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি।

ফিক করে হেসে বললে, জান, একটা কবিতা লিখে ফেলেছি।

এবারে বিশ্বনাথ সত্যই ভয় পেয়ে গেল।

বললে, বল কি হে? পরীক্ষার পড়া কি রকম হচ্ছে?

—ভাল নয়।

চিন্তিত ভাবে বিশ্বনাথ বললে, তা বুঝতে পারছি। দিনে খাও কখন?

—বারোটা একটা হয়।

—রাত্রে?

—ন'টা দশটা।

বিশ্বনাথ বললে, শোন। দুপুরে খেয়েদেয়ে তুমি আমাদের বাড়ী আসবে। দু'জনে রাত ন'টা পর্যন্ত একসঙ্গে পড়া যাবে। তার পর ফিরে আসবে।

উৎসাহে রামকিঙ্কর লাফিয়ে উঠলঃ খুব ভাল! এখানে আমার পড়া হবে না। অথচ পাস আমাকে করতেই হবে। নইলে জীবনটাই নষ্ট হয়ে যাবে।

বিশ্বনাথ চলে যাবার পর এই একটা কথাই রামকিঙ্কর ভাবতে লাগলঃ পাস তাকে করতেই হবে। পাস তাকে করতেই হবে।

কিন্তু এখানে তার এমন হচ্ছে কেন?

নিরিবিলি ঘর পেয়েছে। অঢেল সময়। তাকে বিরক্ত করবার কেউ নেই। গিন্নিমা সকল সময় তার খোঁজ নিচ্ছেন। তার সুখ-সুবিধা দেখছেন। তবু এমন হচ্ছে কেন?

রামকিঙ্কর তার কারণ খুঁজে পায় না।

শুধু মনে হয়, বাড়ীটা কেমন অস্বাভাবিক। জীবন-যাত্রার যে স্বাভাবিক ছন্দের সঙ্গে তার পরিচয়, এখানকার

ছন্দ যেন তার থেকে স্বতন্ত্র। এবং এই ছন্দের আবর্তে পড়ে সেও যেন কি রকম অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে।

বৌরাণীকে সে এখনও দেখে নি, কিন্তু গিন্নিমাকে অনেক দিন থেকে দেখে আসছে। শান্ত, সৌম্য, প্রসন্ন মূর্তি। বুকের মধ্যে যেমন উদার স্নেহ, মস্তিষ্কের মধ্যে তেমনি প্রখর বুদ্ধি। ওই ঠাকুরদালানে বসেই তিনি বিরাট জমিদারী এবং সুবিস্তৃত ব্যবসা চালাচ্ছেন। আর সেই সঙ্গে যারা এখানে খেটে অন্নসংস্থা করছে তাদেরও সুখ-সুবিধা দেখে আসছেন।

আশ্চর্য একটি মহিলা!

বৌরাণীকে ত দেখেইনি, বাবুকে যা দেখেছে, সেও না-দেখারই সামিল। সুতরাং তাঁরা কেমন কিছুই জানে না। কিন্তু এখানে এসে মনে হচ্ছে, গিন্নিমাকে বাইরে থেকে যেমনই মনে হোক, ভিতরে তিনিও বোধ হয় সম্পূর্ণ স্বাভাবিক নন।

এ বাড়ীতে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বোধ হয় থাকাই যায় না। এর হাওয়াই সে রকম নয়।

এ বাড়ীতে, যতদূর সে টের পেয়েছে, সামাজিক এবং মানসিক মহল বোধ হয় তিনটি:

একটি, এবং সেইটিই কার্যতঃ সর্বপ্রধান, ঠাকুরদালানকে কেন্দ্র করে এবং সদর ও অন্দরের অনেকখানি জুড়ে গিন্নিমার মহল। তার মধ্যে আছেন রাধামাধব, আমলা-কর্মচারী, দাস-দাসী এবং পোষ্য-পরিজন।

দ্বিতীয়টি বাবুর মহল। দিনে নিদ্রাচ্ছন্ন আর রাত্রে সঙ্গীত ও সুরায় এবং বিজলী আলোর ঔজ্জ্বল্যে জম-জমাট। বলতে গেলে অন্দর ও সদর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। আমলা-কর্মচারী, পোষ্য-পরিজন এবং দাস-দাসী থেকেও!

তৃতীয়টি বৌরাণীর মহল। কে জানে সে মহলের সত্যকার রূপ কি? তার কল্পনায় বাস্তব-জগতের বাইরে আলস্যমন্থর যোগনিদ্রাভিভূত একটি মহল। সেখানে সূর্য ওঠে না, চন্দ্র-তারকাও না। কিন্তু বোধ হয় অন্ধকার নয়, অরোরা বোরিয়ালিসের আলোয় চিহ্নহীন দিনরাত্রি আলোকিত। সেই আলোয় একা-একা বৌরাণীর কি ভাবে সময় কাটে রামকিঙ্কর ভেবে পায় না।

চৌদ্দ

দুপুরে খেয়ে-দেয়ে রামকিঙ্কর বিশ্বনাথের বাড়ী পড়তে গিয়েছিল। রাত্রি আটটায় যখন ফিরছে, একটি ঝি তার দিকে চেয়ে ফিক করে হাসলে।

বললে, আপনাকে বৌরাণী একবার ডাকছেন। আমার সঙ্গে আসুন।

হাতের বইগুলির দিকে বিব্রতভাবে চেয়ে রামকিঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, এখনি?

ওর অসুবিধার কথা বোধ হয় ঝি বুঝলে। বললে, আপনি বই রেখে আসুন। আমি অপেক্ষা করছি।

চিন্তিতমুখে রামকিঙ্কর তার ঘরে বইগুলি রাখতে গেল। বৌরাণী হঠাৎ তাকে ডাকলেন কেন? এ পর্যন্ত তাঁকে সে চোখেই দেখে নি, কথা বলা দূরে থাক। এত লোক থাকতে হঠাৎ তাকে তিনি ডাকবেন কেন?

যাই হোক, যখন ডেকেছেন তখন যেতেই হবে। কিন্তু তার কি রকম ভয়-ভয় করতে লাগল।

বই রেখে ফিরে এসে শুষ্ক মুখে ঝিকে বললে, চল।

আগে ঝি, পিছনে সে। এ-দরজা, ও-দরজা, অনেক গলি বারান্দা পার হয়ে অন্দরে পৌঁছল। প্রশস্ত সিঁড়ি উপরে উঠে গেছে।

ঝি হন্ হন্ করে চলে আর মাঝে মাঝে পিছনে চেয়ে দেখে আর ফিক্ করে হাসে।

কি দেখে সে-ই জানে। বোধ হয় রামকিঙ্কর হারিয়ে গেল কি না। কি হয়ত দেখে, সে পালাল কি না। যে কারণেই দেখুক, ওর হাসিতে সে ভয় পায়। ভয়ে সমস্ত শরীর শিউরে ওঠে।

শুষ্ক মুখে, দুরু দুরু বুকে সে পিছু পিছু চলে।

সিঁড়ির মাথায় এসে ঝি দাঁড়াল।

ফিক্ করে হেসে বললে, এইখানে একটু দাঁড়ান। আমি খবর দিই।

রামকিঙ্কর নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল।

প্রকাণ্ড চওড়া বারান্দা। মোটা মোটা থাম। সাদা-কালো মার্বেলে মোড়া মেঝে আলোয় ঝকঝক করছে। ময়লা জুতো পরে ওই ঝকঝকে মেঝের উপর হাঁটা যায়

কি না। যায় না বোধ হয়। সে সিঁড়িতে জুতো খুলে ঝিয়ের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

ঝি ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ঠোঁটে সেই বাঁকা হাসি। চোখের ইসারায় ডাকলে। তার কাছে যেতেই পর্দা সরিয়ে ভিতরে যেতে ইঙ্গিত করলে।

নিস্তব্ধ ঘর।

ঘরের মধ্যে স্তিমিত আলোয় খাটে কে যেন নিঃসাড় শুয়ে। পাশে একখানি চেয়ারে গিন্নিমা বসে।

ফিস্ ফিস্ করে বললেন, এস।

গিন্নিমাকে দেখে রামকিঙ্করের সাহস হ'ল। অপরিচয়ের কুণ্ঠা কাটল।

তিনিই ডেকেছেন তাহলে। বৌরাণী নয়।

খাটে শুয়ে উনিই বোধ হয় বৌরাণী। স্থূল দেহ কাঁচা সোনার মত রং। চোখ বন্ধ। ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস পড়ছে। সর্বাঙ্গ একখানি চাদরে আবৃত। শুধু ডান হাতখানি বাইরে রয়েছে। মাংসল বাহু। মণিবন্ধে এক গোছা সোনার চুড়ি, গায়ের রঙের সঙ্গে মিশে গেছে।

কি ব্যাপার?

গিন্নিমা বললেন, বৌমা হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

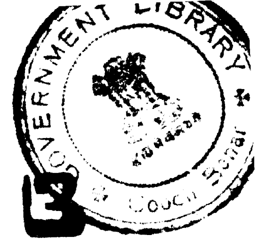
—কিন্তু এখনই ত উনি আমাকে ডাকতে পাঠালেন।

—উনি নয়, আমিই। ডাক্তারকে খবর দেবার জন্যে ডাকতে পাঠিয়েছিলাম।

অসম্ভব নয়। কিন্তু ঝি অমন হাসে কেন? যেন ভিতরে কি একটা রহস্য রয়েছে।

ক্রমশঃ





কচ ও দেবযানী

(নব পর্য্যায়)

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

সুকোমল এদিক্‌কার লেখাপড়ায় পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিল।

আরও পড়ত। জীবনভোর জ্ঞানচর্চা ক'রে যাওয়ারই ...চ্ছা; সুযোগের অভাব নেই, বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারও ...লা। সাহিত্যের পর দর্শনশাস্ত্রে এম-এ পাস ক'রে কিন্তু ...খল এই একটা বিদ্যাই এত অনন্ত অপার যে, একটা ...বনে কুলিয়ে ওঠা দুষ্কর।

...বে বিশ্ববিদ্যালয়ের আর বিশেষ কিছু দেওয়ার নেই। ...ম এর প্রস্তুতির সময় ভারতীয় দর্শনের যে খণ্ডিত রূপের ...ঙ্গে পরিচয় হ'ল, তাতে দেখল, আর্য-মুনি-ঋষিরাই এ-...ষয়ে চিন্তা-গবেষণার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গেছেন, এবং ...দের দ্বারস্থ হওয়া ভিন্ন উপায় নেই।

ব্যাপারটি কিন্তু দুরূহ।

এমনি অবশ্য পুস্তক-পুঁথি সংগ্রহ ক'রে ভালো একজন ...ণ্ডিত নিযুক্ত ক'রে কিছু কিছু যে না আয়ত্ত করা যায় তা ...য়; করছেও অনেকে। কিন্তু জ্ঞানকে যখন ব্রতই ক'রে ...য়েছে, তখন এই তপঃলব্ধ সম্পদকে যাঁরা তপস্যার দ্বারাই ...ক্ষা ক'রে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে গিয়ে, সম্পূর্ণ তাঁদের ...রিবেশে না কাটাতে পারলে উপায় নেই। এ-ধারণাটাও ...ত আর্যদর্শন আলোচনারই প্রতিক্রিয়া মনের ওপর, ...বে সরানো গেল না, বরং যতই দিন যেতে লাগল ততই ...মূল হয়ে উঠতে লাগল মনে। একটা অশান্তি লেগে ...ইল এবং কি ভাবে, কোথায় গেলে এটা সম্ভব হতে পারে ...না প্রকারে তার অনুসন্ধান করতে লাগল সুকোমল।

অবশেষে পেলেও সন্ধান। সে সময় কৃষ্ণদাস বাচস্পতি বঙ্গদেশে ষড়্‌দর্শনের একজন দিক্‌পাল। নবদ্বীপ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে কিছুদিন যাবৎ কলকাতাতে এসেই ছিলেন। শেষে এখানকার বাতাবরণ অনুকূল না মনে হওয়ায় চলে যান এ-স্থান ত্যাগ করে। নবদ্বীপের মানুষ নবদ্বীপেই ফিরে যাওয়ার কথা। কিন্তু যান নি। আরও খোঁজ নিয়ে সুকোমল জানতে পারল তিনি নবদ্বীপের বাস উঠিয়ে দিয়েই নবদ্বীপ-অম্বিকা কালনার মাঝামাঝি গঙ্গার ধারে নিতান্তই এক অখ্যাত-পল্লীর কাছে টোল ক'রে অল্প কিছু শিষ্য নিয়ে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত আছেন।

আনন্দে নৃত্য ক'রে উঠল সুকোমলের মন; ঠিক যা চেয়েছে এতদিন ধ'রে!

লোক পাঠিয়ে ভালো ক'রে খবর সংগ্রহ ক'রে কিন্তু অনেকটা দমেই গেল।

অজ পাড়াগাঁ গ্রামটা। তার থেকেও পো'টাক দূরে বাচস্পতি মহাশয়ের টোল। নিতান্তই বুনো জায়গা, শুধু সামনে গঙ্গা থাকায় একটু হয়ত বা বাস করবার মত। ভিটের সঙ্গে বাগান, পুকুর আর বিঘে কয়েক ধান-জমি নিয়ে জায়গাটা বর্ধমান মহারাজার দেওয়া একটা দেবোত্তর সম্পত্তি। শেষ বয়সে বাচস্পতি মহাশয়ের ওখানে উঠে যাওয়ার এও একটা কারণ।

বাচস্পতি মহাশয় নিতান্তই সাবেক কালের পণ্ডিত। একেবারে বৃদ্ধ না হলেও বয়স হয়েছে, পঠন-পাঠন নিয়েই



"কিন্তু এই কৃচ্ছ্রসাধনে সমর্থ হবে কি ?

থাকেন। তবে বেশি ভ্যাজালের পক্ষপাতী নন; মাত্র জন ছয় শিষ্য নিয়ে টোলখানি; প্রাচীন প্রথামত গুরুগৃহ থেকেই আহারের ব্যবস্থা। চাল-ডাল-তরকারি লবণাদির সিধা, জ্বালানী কাঠ, সবই পাওয়া যায় দুবেলা; বাইরে থেকে কিছু ব'য়ে আনবার স্বাধীনতা নেই কারুর। জোট বেঁধে অথবা নিজে নিজেও রন্ধন ক'রে নেয় ছাত্ররা। পরিবারটিও ছোট। বাচস্পতি মহাশয়ের পুত্র-সন্তান নেই; গৃহিণী আর দু'টি কন্যা।

যতদিন সন্ধান পাওয়া যায় নি, আদর্শ হিসাবে বিষয়টা কল্পনার মধ্যে ছিল, ততদিন একটা অন্য ভাব ছিল। কল্পনাটা বাস্তবের রূপ নিতে, বর্তমানের সঙ্গে ভবিষ্যতের চিত্রটা মিলিয়ে দেখে বেশ পিছিয়েই গেল সুকোমলের মনটা। আজন্ম কলিকাতার অভিজাত পল্লীতে মানুষ, বিলাস সম্পদের মধ্যেই। তাকে একটা জঙ্গলের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে হবে, অন্য সব কিছুর কথা দূরে থাক, কলের জল বা বিদ্যুতের অনায়াসলভ্য আলোটুকু পর্যন্ত নেই, মনটা তুলনা-প্রবণ হয়ে যতই অভাবের দিকটা স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল, চিত্রটা ততই যেন ভয়াবহ হয়ে উঠল। স্বপাক রান্নায়—অথবা ঠিকভাবে বলতে গেলে, রান্নার চিন্তায় একটা ছেলেমানুষী আনন্দ আছে, কিন্তু সেখানে ত ষ্টোভ বা কুকারের প্রবেশ নিষেধ।

তবু কিন্তু গেল সুকোমল। সদ্যসদ্য হ'ল না অবশ্য। মনের সঙ্গে একটা প্রবল দ্বন্দ্ব চলল, তবে জ্ঞান-তৃষ্ণাটা অকৃত্রিম, শেষ পর্যন্ত জয়ী হ'ল। কচ কি ক'রে স্বর্গসুখ ছেড়ে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের আশ্রমে কাটিয়ে এল অত দিন মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা অর্জন করার উদ্দেশ্যে ?

বাচস্পতি মহাশয় ছাত্রজীবনে ওর কৃতিত্বের পরিচয় পেয়ে গ্রহণ করতে স্বীকৃত হলেন, শুধু অল্প একটু হেসে প্রশ্ন করলেন—"কিন্তু এই কৃচ্ছ্রসাধনে সমর্থ হবে কি? দেখতেই পাচ্ছ আমার টোলের বটুদের।"

"আপনার আশীর্বাদ যখন পেয়েছি তখন ওটা এমন কিছু অন্তরায় হবে না," হাত জোড় ক'রে বিনয়ের সঙ্গে উত্তর করল সুকোমল।

ছোট মেয়েটিকে দিয়ে একজন ছাত্রকে ডেকে আনালেন, বললেন—"এটি তোমাদের নূতন সতীর্থ হ'ল কামদেব, স্নানাদির ব্যবস্থা ক'রে দাও।"

একটু পরিচয়ও দিলেন। পরিচয় পাওয়ার পর আর একবার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল পরিচিতের ওপর। দেখে নিয়ে কামদেব বলল—"খুব আনন্দের কথা। কিন্তু···"

থেমে গিয়ে একটা যেন প্রশ্ন নিয়ে চেয়ে রইল ওঁর মুখের পানে। উনি অল্প একটু হেসে উত্তর করলেন—"সে বিষয়ে চিন্তা করেছি আমি। চতুষ্পাঠী-সংলগ্ন যে ছোট ঘরটি তুলেছি সম্প্রতি, তাইতে ব্যবস্থা ক'রে দাও; তোমাদের ওখানে হবে না সুবিধা।"

"আপনি বিশেষ কোনও উদ্দেশ্যে নিশ্চয়ই তুলেছেন ঘরটা"—

একটু আপত্তি করল মৃদুভাবে সুকোমল; বলল—"ওঁদের সঙ্গে আমার কোন অসুবিধা হবে না।"

"আপাততঃ এই থাক। পরে আবার চিন্তা করা যাবে।··· রন্ধনটাও আপাতত আমার আশ্রমেই হোক।"

"আপনি কৃচ্ছ্রসাধনের কথা তুলে আপনিই কিন্তু বাধা দিচ্ছেন আমায়।" হেসে বলল সুকোমল।

চতুষ্পাঠীর মুক্ত হাসি হেসে উঠলেন বাচস্পতি মহাশয়। বললেন—"সাধু, সাধু! তা হ'লে তুমি ওদের সহকারী হয়ে একটু আয়ত্ত ক'রে নাও ও-বিদ্যাটা।"

কামদেবের দিকে চেয়ে বললেন—"তাই ক'রো তা হ'লে। গৃহিণী একটু অসুস্থও রয়েছেন, দু'টো ব্যঞ্জন অধিক করবার ঝোঁকেও প'ড়ে যাবেন। স্মিতাও নেই এখানে। সে এলে বরং এর সুবিধা হবে।"

ডানদিকে চতুষ্পাঠী, একটি মাঝারি গোছের আটচালা ঘর; তার পাশেই আর একটি ছোট নূতন ঘর। মাঝখানে, প্রায় হাত-পঞ্চাশেক ছেড়ে দেয়াল দিয়ে ঘেরা পাঁচখানি ছোটবড় ঘর নিয়ে ভদ্রাসন। অপর দিকে আরও খানিকটা তফাতে টানা দোচালার মধ্যে পাশাপাশি তিনখানি ঘর, সামনে দাওয়া। নেমে, কয়েক হাত দূরে রন্ধনশালা। এইটি ছাত্রাবাস। ভদ্রাসনের দুখানি ঘর ছাড়া বাকি সব-গুলিরই মাটির দেয়াল, ওপরে গোলপাতার চাল।

যতখানি ভয় নিয়ে এসেছিল তার অনেকখানি প্রথম দিনেই গেল কেটে। পরিবেশটা খুব খারাপ নয়। জায়গাটা বুনো নিশ্চয়, আগাছার জঙ্গল, কিন্তু তার সমস্তটাই পেছন দিকে। সামনেটা গঙ্গা থাকার জন্য পরিষ্কারই। কামদেবের সহায়তায় খানিকটা গোছগাছ ক'রে নিয়ে গঙ্গার চড়ার ওপর একটু বেড়াতে গিয়েছিল, সন্ধ্যার সময় ফিরে এসে দেখে বাচস্পতি মহাশয়ের ছোট কন্যা একটা পরিষ্কার ক'রে মাজা পিতলের পিলসুজের ওপর প্রদীপ জ্বালছে। বছর দশেকের মেয়ে, রাঙা পাড়ের একখানি শাড়ি পরা, মুখে প্রদীপের আলোটা এসে পড়েছে। ঠিক এই সময় বাড়ীতে সন্ধ্যা-শঙ্খ বেজে ওঠায় সমস্তটুকু কল্পিত আশ্রম-জীবনের সঙ্গে এত মিলে গেল যে একটু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সুকোমল। মেয়েটির সঙ্গে পরিচয় করল কাছে ডেকে নিয়ে। নাম সুজাতা, গাঁয়ের মিডল্ স্কুলে পড়ে, এদিকে বাবার কাছে সংস্কৃত।···হ্যাঁ, ব্রত-পূজাও আছে বৈকি; পুণ্যিপুকুর, শিবপুজো। সঙ্গী-সাথী এখানে কেউ নেই, তবে ইস্কুলে আছে।···একলা-একলা বোধ হয় একটু; তবে দিদি থাকলে হয় না। দিদি এখন নৈহাটীতে মামার বাড়ীতে। ওরা চারজনেই গিয়েছিল, কেতুদাদার বিয়েতে। বাবা সুজাতা আর মাকে নিয়ে চলে এসেছেন, দিদি থেকে গেছে, শীগ্‌গির একদিন আসবে।···বাবা আর মা দুই বোনকেই সমান ভালবাসেন, তবে মা বেশি ভালবাসেন সুজাতাকে, বাবা বেশি ভালবাসেন দিদিকে।···দিদির নাম সুস্মিতা···

রাত্রিটাও বেশ লাগছে। দাওয়ায় গঙ্গার দিকে মুখ ক'রে একটা মোড়ার ওপর ব'সে অপেক্ষা করছিল, কখন রন্ধনে সহকারিতা করবার জন্য ডাকতে আসবে, ছাত্রাবাস থেকে অন্য একটি ছাত্র একেবারে আহার করবার জন্য ডেকে নিয়ে গেল। ব্যাগের মধ্যে হাত-ঘড়িটায় দেখল মাত্র সাড়ে সাতটা হয়েছে। এখানে তা হ'লে এই পদ্ধতি।

অভ্যাস নেই, আহার সেরে এসে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ব'সেই রইল দাওয়ায়। বেশ লাগছে, চারিদিক নিস্তব্ধ, নিঝুম; আশ্রম সুষুপ্ত। আশ্বিন মাস প'ড়ে গেছে। কলকাতার তুলনায় গা একটু বেশি সির্‌সির্ করে; এক সময় মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত প্রফুল্লতা নিয়ে সুকোমল উঠে শয্যা গ্রহণ করল।

দার্শনিক মন, একদিনেই নিজের অনেকখানি সামঞ্জস্য ক'রে নিতে পারল জায়গাটার সঙ্গে। আর এই জন্যই পরদিন সকালেই নিজের মধ্যেকার কতকগুলি অসামঞ্জস্য ওর কাছে বড় বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠল।

সকালে চিরাচরিত অভ্যাসমত ক্ষৌরকার্য শেষ ক'রে নেওয়ার জন্য বসেছে শেভিং সেট ইত্যাদি নিয়ে, ঠিকঠাক ক'রে মুখে সাবান দিতে গিয়ে আর্শিতে নজর পড়ায় নিজেকে যেন নূতন ক'রে দেখল সুকোমল। পরিষ্কার ক'রে সেলুনে ছাঁটানো চুল, কয়েকদিন হয়ে গেছে, তবু এখনও কানের ওপর অনেকটা সাদাই, ঘাড়ের দিকেও নিশ্চয় এইরকমই হবে। পরিষ্কার ক'রে কামানো মুখমণ্ডল, চব্বিশ ঘণ্টার অন্তরালে যা অল্প একটু নীলাভা দেখা দিয়েছে। ফিনফিনে, গলা-খোলা কট্টাম্ গেঞ্জি। সব মিলিয়ে হঠাৎ এত নূতন দেখাচ্ছে নিজেকে, আর এত অদ্ভুত যে, কিছুক্ষণ ধ'রে আর চোখ ফেরাতেই পারল না আর্শি থেকে। তারপর সেই অবস্থাতেই আর্শির প্রতিচ্ছায়াটা

ধীরে ধীরে রাঙা হয়ে উঠল। কালকের কথাগুলো মনে প'ড়ে গেছে সুকোমলের।

বাচস্পতি মহাশয় কেন ওর সর্বাঙ্গে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বলেছেন—"কিন্তু এই কৃচ্ছ্রসাধনে সমর্থ হবে কি? দেখতেই পাচ্ছ আমার টোলের বটুদের।" পরে, থাকবার ব্যবস্থা করতে বলায় কামদেবের যে কুণ্ঠার ভাব সেও নিশ্চয় এই জন্যই, অর্থাৎ এ-মানুষকে ছাত্রাবাসের সর্ববিধ দীনতার মধ্যে নিয়ে যাওয়া যায় কি ক'রে? সেখানেও বাচস্পতি মহাশয় বললেন, তিনি পূর্বেই চিন্তা ক'রে দেখেছেন—অর্থাৎ প্রসাধন-বেশভূষার সঙ্গে সেটা সুসমঞ্জস হবে না।

আস্তে আস্তে শেভিং সেটটি গুছিয়ে নিয়ে তুলে রাখল। এর পর অস্বস্তি বোধ করায় বার-দুই বের ক'রে পরিষ্কার ক'রে নিল মুখটা, পাঁচ-সাত দিন পরে পরে, তারপর তুলেই রাখল সেট। চুলের পাট একেবারেই দিল বন্ধ ক'রে। আরও সব একে একে গেল, যা একসময় নিত্য প্রয়োজনে অপরিহার্যই ব'লে মনে হ'ত।

কলকাতা থেকে একজন নূতন শিক্ষার্থী আশ্রমে বাবার কাছে অধ্যয়নের জন্য এসেছে, এ-সংবাদটা সুস্মিতা ভগ্নীর চিঠিতে পেয়েছিল আগে। ওর ফিরতে কয়েকটা কারণে একটু বিলম্ব হয়ে গেল। মাস দেড়েক পরে যখন ফিরল, কলকাতার জীব ব'লে যে সসঙ্কোচ কৌতূহল ছিল, দেখল সে-ধরনের কিছু নয়। আর সব শিক্ষার্থীর মতই নগ্নপদ, ক্বচিৎ পায়ে খড়ম; নগ্ন গাত্র, ক্বচিৎ গায়ে একটা উত্তরীয়, অতি সাধারণ। অন্যদিক্ দিয়ে নিজের প্রতি অবহেলার ভাবটা বরং আরও অধিকই। মাথায় বড় বড় চুল, অবিন্যস্তই; ক্ষৌরকার্য কখনও হয়েছে কি না বলা যায় না। মুখমণ্ডল দাড়ি-গোঁফে সমাচ্ছন্ন। অন্য সঙ্গিনীর অভাবে দশমবর্ষীয়া ভগ্নীই সঙ্গিনী, সুস্মিতা ওর অভিমতটা তাকেই জানাল; বলল—"ভালই হ'ল রে! আমি ভেবেছিলাম কলকাতার ডবল এম-এ ছাত্র, না জানি কত তার ঠাটবাট হবে। এ একেবারেই ত কামদেব-শঙ্কর-নিশানাথ দাদাদের মতন। অত সমীহ ক'রে চলতে হবে না।"

সুজাতাও জানাল তার নিজের মনের প্রতিক্রিয়াটা, যা দিদির অভাবে মনে চাপা থেকে এতদিন একটা অস্বস্তিই সৃষ্টি ক'রে রেখেছিল। চোখ বড় বড় ক'রে বলল—"তুমি দেখ নি তাই বলছ দিদি! কি সুন্দর চেহারা যে ছিল সুকোমল দাদার! কি রং! কি চুলের বাহার! মামার বাড়ীতে দাদাদের মতন! এত দাড়ি-গোঁফ দেখছ ত—একটুও ছিল না কোথাও!"

খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠল সুস্মিতা, বলল—"কাউকে বলিস নি আর এত ঘটা ক'রে—মনে করবে, সোজাসুজি না ব'লে বলছে, বুনো জায়গায় এসে তোর সুকোমল দাদাও বুনো হয়ে গেছে!"

মেয়েটি একটু রঙ্গপ্রিয়। তা ছাড়া ওর চরিত্রগঠনে আরও একটি জিনিষ কার্যকরী হয়েছে। ওদের মাতুল বংশ পণ্ডিত বংশ। মাতামহ ভট্টপল্লীর একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন সেকালে। তবে বৃহৎ পরিবার, সংস্কৃতর সঙ্গে ইংরেজী শিক্ষা মিলে, অধ্যাপনার সঙ্গে চাকরি মিলে প্রাচীন-আধুনিক দুটো ধারাই গেছে মিলে পরিবারটির মধ্যে। ফলে সুস্মিতার মধ্যেও এই দুটি ধারার প্রভাব সুস্পষ্ট। তার আর একটা কারণ, মাতুলদের আগ্রহে ওর ওদিকটা মাতুলালয়েই কাটে, মেয়েদের স্কুলে লেখাপড়া করার জন্য। বাচস্পতি মহাশয় যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে কলকাতায় অধ্যাপনা করছেন, সুস্মিতা তখন ইস্কুলে ওপরের ক্লাসের ছাত্রী। উনি থাকতে থাকতেই ইস্কুলের পরীক্ষা শেষ ক'রে কলেজে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত হ'চ্ছিল, এই সময় বাচস্পতি মহাশয় অকস্মাৎ কাজ ছেড়ে দিয়ে এখানে চ'লে এলেন; প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় কলকাতা অঞ্চলের বাতাবরণ সহ্য করতে না পেরে, সুস্মিতাকে আর কলেজে প্রবেশ করতে না দিয়ে সঙ্গে নিয়ে এলেন। কৌলিক বিদ্যা সংস্কৃত, পুত্রের অভাবে কন্যার মধ্যে তার কিছু রেখে যাওয়ার উদ্দেশ্যও ছিল মনে মনে।

সুস্মিতার সঙ্গে সুকোমলের প্রথম পরিচয়টা হ'ল একটু অদ্ভুতভাবেই। বাচস্পতি মহাশয় প্রাতঃকালে স্নান-পূজাদি সেরে ঘণ্টা তিন-চার চতুষ্পাঠীতে ছাত্রদের শিক্ষা দেন। তারপর আহার বিশ্রাম সেরে বৈকালে ওদের দুই বোনকে নিয়ে বসেন। এই সময় ছাত্রদের কিছু জিজ্ঞাস্য থাকলে তারাও এসে সংশয় নিরসন ক'রে নিয়ে যায়। তাই এসেছিল সুকোমল সেদিন।

দিদি এসেছে শুনেছিল সুজাতার কাছে, দেখে নি. ঘরে প্রবেশ করতে গিয়ে ফিরে আসছিল ঘুরে, বাচস্পতি মহাশয় ডাকলেন। উনি একটা মাদুরে তাকিয়ার হেলান দিয়ে

বসেন, ছাত্রদের জন্ম একটা আলাদা মাদুর থাকে, সুকোমল গিয়ে তাইতে উপবেশন করলে বললেন—"এটি আমার প্রথমা কন্যা, নাম সুস্মিতা, কাল সকালে এল মাতুলালয় থেকে।"

"শুনেছি সুজাতার মুখে।" ঘুরে চেয়ে নমস্কার করল সুকোমল, সুস্মিতাও প্রতিনমস্কার করল। সুকোমল ঘুরে বাচস্পতি মহাশয়ের কাছে নিজের প্রশ্নটা উপস্থাপিত করল, উনি বোঝাতে আরম্ভ ক'রে দিয়ে হঠাৎ থেমে ব'লে উঠলেন—"ওহে, ভাল হ'ল তুমি এলে। তোমায় বলব বলব ক'রে ভুলে যাচ্ছি কাল থেকে। প্রথম দিন তোমায় বলি—মিতা এলে তোমার সুবিধা হবে—অর্থটা নিশ্চয় তুমি ধরতে পার নি?"

পণ্ডিতী সরলতা, সুকোমল বেশ একটু বিব্রত হয়েই বলল—"আজ্ঞে না।"

"মিতা-মা হচ্ছে রন্ধনে দ্রৌপদী। কামদেবাদির কাছে শিক্ষানবিশী না ক'রে তুমি যদি ওর কাছে কর—বাপের কাছে ষড়্‌দর্শন, কন্যার কাছে দশব্যঞ্জন..."

নিজের রসিকতায় উচ্চরবে উঠলেন হেসে। সুস্মিতাকে বললেন—"হয়েছে মা মিতা। ন্যায়শাস্ত্র বলে, প্রত্যক্ষ সর্বাপেক্ষা বড় প্রমাণ। তুমি কালকে রন্ধন ক'রে খাইয়ে দাও সুকোমলকে—অবশ্য ওদেরও সবাইকে—অনেকদিন হয়ও নি ত ওদের, তুমি ছিলে না, তোমার গর্ভধারিণীরও শরীরটাও অপটু ছিল। কেমন, আমার কথাটা সপ্রমাণ করতে পারবে ত?"

বাবা সঙ্গে থাকার জন্যই বেশ একটা সহজ সাবলীল ভাব রয়েছে সুস্মিতার, একটু হেসে বলল, "অত প্রশংসা না করলে বোধ হয় পারতাম বাবা। প্রশংসা শুনলে যে অনেকের আবার নিন্দা করবার ঝোঁক হয়; ভয় সেইখানে।"

আবার একটু হাসি উঠল। এবার একটু লজ্জিতভাবে সুকোমলও যোগ দিল।

হাসির মধ্যে দিয়ে যে পরিচয়, প্রথম ঝোঁকেই সঙ্কোচটা কেটে গিয়ে তার গতিটা বেশ মসৃণ হয়ে ওঠে। যেটুকু বা ছিল সঙ্কোচ, পরদিন সকলের সঙ্গে আহারের সময় হাস্য-পরিহাসে গেল কেটে, সমষ্টির মধ্যে ব্যক্তি আড়ালেই প'ড়ে যায় ত! ভালই রাঁধে সুস্মিতা, আর সবার সঙ্গে, নিজের প্রশংসা জুড়ে দিতে বিশেষ অসুবিধাও হ'ল না সুকোমলের। শিক্ষানবিশীর কথাটা অবশ্য রহস্যের আকারেই ছেড়ে দিল। বলল—"সৌভাগ্যই, তবে প্রথম শিক্ষার্থীকে উনি ত বাটনা বাটা, কুটনা কোটার ভারই দেবেন।"

একটু হাসি উঠল আবার। অল্প পরিচয় হ'লেও পরিহাসটুকু বিসদৃশ হ'তে পেল না।

শুধু একসঙ্গে অবস্থানের জন্য যে পরিচয়টা ছিল ভাসা ভাসা, প্রয়োজন-অপ্রয়োজনে কচিৎ কখনো এক-আধটা কথার মধ্যে দিয়ে, সেটা একটা ব্যাপারে এসে প'ড়ে একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়বার সুযোগ পেল। একেবারে অনভিজ্ঞ নূতন শিক্ষার্থী নয়, পড়াশুনা ক'রে প্রচুর সময় থাকে, সুকোমল সুজাতার ইস্কুলের পড়ার দিক্‌টা আসার কয়েকদিন পর থেকেই দেখেশুনে ঠিক ক'রে দিতে আরম্ভ করেছিল। দিদি আসার পর সুজাতার সঙ্গে আরও একটা নিত্যকার যোগসূত্র গ'ড়ে উঠল সুকোমলের।

কতকটা অন্যান্য শিক্ষার্থীর মত আশ্রমের প্রথাটা রক্ষা ক'রে যাওয়ার জন্যই সুকোমল নিজের ঘরেই স্বপাকের ব্যবস্থাটা রেখে গিয়েছিল, যত সংক্ষিপ্ত হয়। বাচস্পতি মহাশয় কথাটা বলবার পর, একটু দ্বিধা কাটিয়ে সুস্মিতা সুরুই ক'রে দিল শিক্ষকতা। তবে সোজাসুজি নয় অবশ্য। সুকোমল আহারে বসলে সুজাতা একটি রেকাবি ক'রে কয়েকটি ব্যঞ্জন নিয়ে উপস্থিত হ'ত, এবং পরিবেশন ক'রে দিদির মুখে-শোনা তার রন্ধন-প্রণালী বুঝিয়ে দিত সুকোমলকে। এ শিক্ষায় অবশ্য ষড়্‌দর্শন শিক্ষার আগ্রহ বা ঔৎসুক্য লেগে থাকত না, তবে ব্যঞ্জন-প্রসঙ্গ থেকে শাখা-উপশাখা বেরিয়ে গল্পের আসর বেশ জমে উঠত। জমে ওঠবার একটা কারণ এই ছিল যে, পাঠের সময় যেসব কথা তোলা যেত না, খাওয়া আর খাওয়ানোর লঘুতর অবসরের মধ্যে সেসব অনায়াসে এনে ফেলতে পারত সুজাতা। বিশেষ ক'রে সুকোমল কোন ব্যঞ্জনের প্রশংসা করলে।

রোজ খেতে হ'লে প্রশংসার সুযোগটা কমে আসে। একদিন এইরকম একটা সুযোগ পেয়ে, কোন মানা না শুনে সুজাতা ছুটে চ'লে গেল বাড়ীতে এবং প্রশংসিত ব্যঞ্জন আরও খানিকটা এনে পাতে দিতে দিতেই আরম্ভ ক'রে দিল—"জানেন সুকোমলদা, দিদি একটা কথা বলছিল।...বলছিল, তোর সুকোমলদাকে জিজ্ঞেস করিস, আমাকেও একটু ক'রে

পড়িয়ে দেবেন? বাড়ীতে ব'সেই পরীক্ষা দোব ভেবেছিলাম, কিন্তু সব ভুলে যাচ্ছি।"

সুকোমল একটু চুপ ক'রে থেকে বলল—"তরকারির প্রশংসা শুনে বললেন দিদি তোমার?"

"না, অনেকদিন আগে বলেছে। ভুলেই যাচ্ছিলাম বলতে।"

কথাটা যে অনেকদিন আগের, এইরকম একটা সুযোগ খুঁজছিল সুজাতা, সেটা জেনেই প্রশ্নটা করা সুকোমলের; ঠাট্টা ক'রে ভাববার সময় নেওয়ার জন্য। কাজটা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারছে না। একটু হেসেই বলল—"বলব'খন। আবার যেদিন এইরকম ভাল তরকারি হবে।"

পরিহাস ক'রে কথাটা আপাততঃ চাপাই দিয়ে দিল।

তারপর নিজেই একদিন তুলল। এবার সুজাতার মত দ্বিধার সঙ্গে নিজেই কয়েকদিন সংগ্রাম করে।

সুজাতা অসুস্থ হয়ে পড়ায় সুস্মিতাকেই ব্যঞ্জনগুলো নিয়ে আসতে হ'ল। প্রথম দু'দিন আহারের পূর্বে এসে ঢেকেই রেখে গেল। তবে মাত্র দু'দিনই। নিঃসঙ্গ আহার ক'রে যাচ্ছে, কিছু প্রয়োজন হবে কি না জিজ্ঞেস করবার কেউ নেই—এটা নিজের কাছেই খারাপ লাগছিল, তার পর তৃতীয় দিনে সুজাতা টুকে দিল—"চ'লে এলে দিদি, সুকোমলদা যদি কিছু চান?"

একটু জড়িতভাবেই সুস্মিতা উত্তর করল…"বসলেই যাচ্ছি। বসেন নি এখনও।"

একটু লক্ষ্য রেখে, সুকোমল বসলে, গিয়ে উপস্থিত হ'ল এবং একটু জড়িত ভাবেই দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ঘরের ভেতর। প্রায় চুপচাপই গেল। কিছু দরকার আছে কি না একবার প্রশ্ন করল সুস্মিতা। যেগুলি রয়েছে পাতে সেগুলি গলাধঃকরণই দুষ্কর হয়ে উঠেছে সুকোমলের, সংক্ষেপেই উত্তর করল "চাই না কিছু।"

প্রথম দিনটাই। তার পর আস্তে আস্তে সব জড়তা কেটে গিয়ে বেশ সহজই হয়ে এল দাঁড়ান, বসা, প্রশ্ন করা, উত্তর দেওয়া। এবং মাত্র আহারের সময়টিতে নিবদ্ধ রইল না। গোছাবার বিশেষ কিছু নেই, তবু ঘর গোছানো ব'লে যে একটা কথা আছে তার সমস্তটুকু আস্তে আস্তে সুজাতা তুলে নিয়েছিল ওর হাতে—জামাকাপড় ঝেড়ে-ঝুড়ে রাখা, শয্যাপ্রস্তুত, বইগুলো ঠিক ক'রে রাখা, সবই। সুজাতা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় সেগুলো খুব সহজভাবেই গিয়ে পড়ল সুস্মিতার হাতে। নীরবেও নয়, প্রথম দিনের সেই দরজা ধ'রে দাঁড়িয়ে থাকার মত। নীরবতা ভাঙছেও ত চারিদিক্ দিয়ে। সুজাতার অসুখ, সেখানে নিত্য হচ্ছে দেখা, পড়ার সময়, তারপর এইখানে। সম্বন্ধটা নিতান্তই সহজ হয়ে উঠল। সুজাতা যে দিন সাতেক ভুগল তার মাঝেই, এবং তার মাঝেই একদিন আহার করার সময় সুকোমলের হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল কথাটা, দিন চারেক ধ'রে চেষ্টা করার পর বলল—"হ্যাঁ একটা কথা—সুজাতা একদিন বলেছিল আপনি প্রাইভেটে'ল কলেজ কোর্স আরম্ভ করতে চান… আমি বলি, মন্দ কি, সময়েরও অভাব নেই…"

"হ্যাঁ…তা…একদিন যেন বলেছিলাম…তা…"

যে জড়তাটুকু অত পরিষ্কার হয়ে কেটে গিয়েছিল সেটা আবার ভুল পথে কি ক'রে যে এসে উপস্থিত হ'ল বলা যায় না। সেদিন ঘর গোছানোর ব্যাপারটাও খুব সংক্ষেপে সেরে তাড়াতাড়ি চ'লে গেল সুস্মিতা—যেন পাছে ও কথাটা আবার ওঠে।

তবে এই একটি দিনই।

পরদিন যেন নিজেকে শাসিয়েই সুস্মিতা নিজে হ'তে কথাটা তুলল বাবার কাছে, এবং যখন সুকোমল রয়েছে। হয়ত আশঙ্কা ছিল, সুকোমল তুললে সেটা আরও সঙ্কোচের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

সুজাতার কাছেই বসেছিল সবাই। অসুখের সময় নূতন ক'রে ভাল ছেলে ভাল মেয়ে হয়ে ওঠবার ঝোঁক আসে বালো, বোধ হয় সেই ঝোঁকেই গল্পসল্পের মধ্যে সুজাতা ব'লে উঠল—"আর, এই পড়ার ক্ষতি হয়ে গেল আমার! এবার আরও বেশি ক'রে পড়াতে হবে সুকোমল দাদা!"

"বাঃ, আর আমি ভাবছি…"

সতর্কই ছিল যেন সুস্মিতা, ওকে ঐটুকু ব'লেই বাচস্পতি মহাশয়ের দিকে চেয়ে বলল—"হ্যাঁ বাবা—বলব বলব ক'রে ভুলে যাচ্ছিলাম। আমি যদি বাড়ী থেকে আই-এ পড়াটা করি—সুকোমলদা রয়েছেন…"

হো হো ক'রে হেসে উঠলেন বাচস্পতি মহাশয়, একটুও অসঙ্গতি কানে ঠেকলেই যেমন ওঠেন উনি, বললেন—"রয়েছেন তো সুকোমলদা তোমাদের, কিন্তু অতিষ্ঠ হয়ে উঠবেন না?"

"কেন ?"—বুঝেও অপ্রতিভ হয়ে গিয়ে প্রশ্নটা করল সুস্মিতা।

"বেচারা পড়তে এল ঘরবাড়ী ছেড়ে—উল্‌টে দুই বোনে স্কন্ধে চেপে…"

হাসতে হাসতেই সুকোমলের দিকে চেয়ে সাহস দেওয়ার মত ক'রে বললেন—"না গো, ভয় নেই, আমি আছি…"

হাসিটাই হয়ে রইল অনুমতি ; যেমন হয় ওঁর।

সুজাতা ভালো হয়ে এদিক্‌কার চার্জ নিজে নিয়ে নিতে লাগল আস্তে আস্তে। বেশ সহজে হ'ল না অবশ্য। শিক্ষার্থিনী হিসাবে সুস্মিতার একটা অধিকার দাঁড়িয়েছে দেখাশোনা বা সেবা করবার—যাই নাম দেওয়া হোক। বইগুলো রইল সুস্মিতার এলাকায়। অনেকগুলি বই—তুলনামূলক অধ্যয়নের জন্য ইংরেজীগুলোও রয়েছে—একটা বেশ বড় যোগসূত্রই রয়ে গেল সুস্মিতার হাতে। তা ছাড়া পড়ানোর মত বড় সূত্র ত আর হয়ও না। কচ আর দেবযানীর মধ্যে এটা না থেকেও যখন জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল, তখন এতগুলি সূত্রবদ্ধ দু'টি উন্মুখ হৃদয়ের মধ্যে যে হবেই, এটা বেশ সহজেই ধ'রে নেওয়া যায়।

ক্রমে এটাও বেশ সহজ হয়ে এল। একবার মন জানাজানি হয়ে গেলে ত থাকেও না অন্যভাব। পরস্পরকে নিকট থেকে নিকটতর ক'রে দিতে দিতে বছর গেল ঘুরে। সুকোমলের আশ্রম-প্রবাসের দিন শেষ হয়ে আসছে, এই সময় একদিন একটি ব্যাপার হয়ে প'ড়ে ওদের জীবনের একটানা স্রোতে একটা আবর্ত সৃষ্টি ক'রে তুলল।

বৈকাল বেলা। সুস্মিতা বাচস্পতি মহাশয়ের কাছে ড়ছিল, সুকোমল এসে উপস্থিত হ'ল। সুস্মিতার প্রায় য়েই এসেছিল, কিছু বাদ রেখেই উঠে পড়ল। আজকাল হয়েছে, রোজ না হলেও, এক-একদিন ও এসে হলে একটু যেন জড়োসড়োই হয়ে পড়ে বাপের সামনে, ছু একটা ছুতো ক'রে তাড়াতাড়ি উঠে যায়। আবার ক একদিন সেই সহজ, সরল সংলাপ ; তিন জনে মিলে স, সাধারণ পরিহাসও।

উঠে সুকোমলের ঘরেই চ'লে গেল বইগুলো গুছিয়ে তে। যেদিন সুকোমল থাকে, এর সঙ্গে অন্যসব কথা-ও হ'তে থাকে, আজ বইগুলো নিয়েই পড়ল। কোনটা ড় রেখে দিচ্ছে, কোনটার মলাট পরিয়ে দিচ্ছে ঠিক ক'রে, মাঝে মাঝে কোনটা খুলে পড়বারও চেষ্টা করছে। দুর্বোধ্যতায় সুকোমলের বিস্তার গভীরতা আবিষ্কার ক'রে মনটা শ্রদ্ধায় প্রশংসায় উঠছে ভ'রে।

এই করতে করতেই একটা মোটা ইংরেজী বই ওলটাতে ওলটাতে মাঝামাঝি এক জায়গায় এসে দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল। বুকটা ধক্ ধক্ করছে, নিঃশ্বাস ঘন হয়ে উঠেছে। একটা বিমূঢ় ভাবের মধ্যে হঠাৎ প'ড়ে গিয়ে কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না, এই সময় সুকোমলের পায়ের শব্দ হওয়ায় মুড়ে ফেলল বইটা।

"কি, ওরকম ক'রে দাঁড়িয়ে যে ?"—একটু বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল সুকোমল।

"কি ক'রে আবার দাঁড়িয়ে থাকব ?…আপনার এই বইটা দেখছিলাম। উঃ, কি শক্ত !…আমি নিয়ে যাচ্ছি একটু…" বইটা দু'হাতে চেপে ধরল বুকে।

"শক্ত……নিয়ে যাচ্ছ !" বিস্ময়ের যেন সীমা খুঁজে পাচ্ছে না সুকোমল। বলল—"ক্যান্টের ও বই—তুমি তো এক বর্ণও বুঝতে পারবে না !"

ততক্ষণে দরজার বাইরে চ'লে গেছে সুস্মিতা, না ঘুরেই বলল—"না পারি ফিরিয়ে দোব।"

আশ্চর্য উত্তর !…কি যে হয় আজকাল মাঝে মাঝে সুস্মিতার ! মুখে একটু হাসি নিয়ে অন্যমনস্কভাবে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সুকোমল, তারপর গঙ্গার চড়ায় বেড়াতে চ'লে গেল। অনেকদিন থেকে কয়েকটা বড় দার্শনিক সমস্যা নিয়ে প'ড়ে আছে, হয়নি বেড়াতে যাওয়া।

ভালই লেগেছিল সুকোমলের ; যাকে ভালবাসা যায় তার সব কিছুই মোহনীয় হয়ে ওঠে। কিন্তু এর পর থেকেই ওর আচরণে হঠাৎ একটা পরিবর্তন লক্ষ্য ক'রে বিস্মিত হয়ে পড়ল। পরে একটু ক্ষুব্ধও। বইটা তার পরদিন সুজাতা নিয়ে এল এবং সেই বইগুলোও গোছাচ্ছে দেখে সুকোমল একটু সতর্কভাবে প্রশ্ন করল—"তোমার দিদি এল না ?"

"না।"—উত্তর করল সুজাতা।

"শরীর ভাল আছে ত ?"

"হ্যাঁ। আমায় বললে—তুই-ই বইগুলো গুছিয়ে দিয়ে আসিস। আর জানেন সুকোমলদা…"

"কি ?"

"এটাও আমার হাতেই দিয়ে দিল আজ থেকে দিদি।" —বেশ প্রফুল্ল দৃষ্টিতেই চেয়ে জানাল সুজাতা। বলল— "দিদি বললে—ভারী লাগবে তোর ?…মস্ত বড় কাজ! ভারী লাগবে! বলুন ?"

হঠাৎ কি হ'ল ভেবে পায় না সুকোমল। একবার মনে হ'ল জিজ্ঞেস করে। কিন্তু কিছুমাত্র না ব'লে একটা উৎকট ঔৎসুক্য রেখে আস্তে আস্তে নিজেকে আলাদা ক'রে নিচ্ছে সুস্মিতা, অত যে কাছে এসে পড়েছিল, নিদারুণ ক্ষোভে অভিমানে পূর্ণ হয়ে উঠতে লাগল সুকোমলের মনটা। করবে না কিছু প্রশ্ন। আসা-যাওয়া কথা-বার্তা সবই রইল—এমনও হতে লাগল, সুজাতা কোন কাজে আটকে গেছে, ওই এল খাওয়ার সময়, রইল দাঁড়িয়ে, একেবারে নিবাক্ও নয়, কিন্তু বাক্য যেন নিতান্ত শুষ্ক বাক্যই। যতটুকু না হ'লে ভদ্রতা রক্ষা হয় না। যে মুহূর্তগুলি অমৃতময় হয়ে উঠে পুষ্ট করছিল জীবনকে, অবশ্য জীবনকে শুধু সহনীয়ই নয়, কমনীয় ক'রে তুলছিল—বিরস শিষ্টাচার রক্ষার প্রয়াসে দুঃসহ হয়ে উঠতে লাগল সুকোমলের কাছে।

আরও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল এই জন্য যে, এখানে অবস্থানের একেবারে দিন যখন শেষ হয়ে এসেছে, সুস্মিতা বিনা কারণেই তাকে এই আঘাতটা দিল।…একদিন জীবন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু ওর দার্শনিক মন এই বেদনা থেকে একটা তথ্যও আবিষ্কার ক'রে বসল। যা ছিল মাত্র বেদনা, ক্ষোভ, অভিমান, তা একেবারে কঠোর বৈরাগ্যের মুখে এসে পড়ল।

সুকোমলের মনে হ'ল—এই স্বাভাবিক। লঘুচিত্ত রমণী—তার হৃদয় হয়ত অন্য কোথাও দেওয়া, নিবিড় সান্নিধ্যে দু'দিনের প্রণয়—কাকলি তুলে বিচ্ছেদের মুখে স্তব্ধ হয়ে গেল আবার।…এ ত নিত্যই হচ্ছে।

এই কথাটাই একদিন সুস্মিতাও স্বীকার ক'রে নিল। তবে নিজের অর্থে।

আশ্রম থেকে বিদায় নেওয়ার দিনটা আরও দিন দশেক এগিয়ে নিয়ে এসেছে সুকোমল। একটা বাহ্য কারণ এই হ'ল যে, বারাণসী থেকে একটি বড় পণ্ডিত-সম্মেলনীতে বাচস্পতি মহাশয়ের হঠাৎ নিমন্ত্রণ আসায় তাঁকে কিছুদিনের জন্যে চ'লে যেতে হচ্ছে। এমন কিছু নূতন নয়। সুকোমলের আশ্রম প্রবাসকালের এই কিঞ্চিদধিক এক বৎসরের মধ্যে আরও হয়েছে এ ধরনের ব্যাপার, কিন্তু এবার ওঁর অনুপস্থিতিতে জীবন যে আরও কি দুর্বিষহ হয়ে উঠবে সেটা অনুমান ক'রে নিজের সংকল্পটা জানিয়ে দিল ওঁকে—উনি যাওয়ার একদিন আগে সেও চ'লে যাবে বাড়ী। যেমন কথা হয়েছে, আবার প্রয়োজন হ'লে তাঁর চরণতলে এসে বসবে।

সেদিন দুপুরবেলা জানিয়ে দিল ওঁকে সেদিন বৈকালে সুস্মিতাই এল ওর ঘরটা গোছগাছ ক'রে দিতে। শুধু ওর নিজের এলাকাটুকুই নয়; সব কিছুই। সুকোমলের মনে হ'ল, কোন একটা ছুতো করেই যেন সুজাতাকে আটকে রেখেছে বাড়ীতে। বিস্মিতই হ'ল, বিশেষ ক'রে ভাব গতিটা লক্ষ্য ক'রে। একটা যে আড়ষ্ট ভাব থেকে যাচ্ছিল এই প্রায় মাসখানেক ধ'রে, সেটার অনেকখানিই নেই। জামা উড়ানি ঝাড়তে ঝাড়তে নিজেই আরম্ভ করল কথা, বলল—"সুজাতা আসতে পারল না……ভালই হ'ল, সুকোমলদা'র রাগ জমে উঠেছে আমার উপর—কেন তা জানি না—যতটা দোষ কাটিয়ে নিতে পারি।"

জামা ঝাড়তে ঝাড়তে উল্টো দিকে মুখ ক'রে ছিল, তারপর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে ওর মুখের দিকে চেয়ে বলল— "আপনি ত চ'লে যাচ্ছেন এবার। বাবার মুখে শুনলাম।"

একটু হতভম্বই হয়ে গেছে সুকোমল, জড়িত কণ্ঠে উত্তর করল—"কেন, ঠিক ত ছিলই।"

"এতদিন আগে চ'লে যাওয়ার কথা বলছি।"—আগের মতই চোখ দু'টি কৌতুকে ভ'রে বলল সুস্মিতা। তারপর ব'লেই চলল—জামা উড়ানির দিক্ থেকে ওইদের দিকে চ'লে গিয়ে—"আশ্চর্য হচ্ছি না—কোথায় কলকাতার বালিগঞ্জ—দেখি নি, তবে শুনেছি সে নাকি ভূস্বর্গই—ভাল লাগবে কেন এই বন জঙ্গল—তার উপর কষ্টও ত পেলেন—ব্যবহার জানে না এখানকার মানুষে—অপরাধের উপর অপরাধ……"

এইখানেই কথাটা আটকে গেল সেদিন, উল্টো দিকে ঘুরে ছিল। সুকোমলের মনে হ'ল যেন গলাটা অশ্রুরুদ্ধ হয়ে গেছে হঠাৎ।

ওটা সাময়িক। এই ন' দিনে যে না দেখা দিল আরও ক'বার এমন নয়, কিন্তু এই ন' দিনে সেই আগেকার মুক্ত

যেন আবার সম্পূর্ণরূপে ফিরে এসেছে —হাসিতে পরিহাসে সেই আগেকারই গোয়গাটিং৬ প্রায় এসে দাঁড়িয়েছে।

তবে একাই। সুকোমলের সতর্ক দার্শনিক মন যেন আর এক পাও এগুতে সাহস পাচ্ছে না। লঘুচিত্ত রমণী। এ সাময়িক চপলতা কেটে যাবে অদর্শনে। যা এতই লঘু—তাকে প্রশ্রয় দিয়ে, তার স্মৃতি বাড়িয়ে সুকোমলেরই বা লাভ কি? একটা অপরাধই ত গুরুত্বহে। তবে শেষ রক্ষা করতে পারল না।



কেন? তোমার অপরাধ কিসে?

যাওয়ার আগের দিন; বৈকালে ঐ ঘর গোছাবার সময়।

সুকোমল বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে একটা বই পড়ছিল, সুস্মিতা প্রবেশ ক'রে একটা কাপড় পেড়ে নিয়ে কোঁচাতে আরম্ভ ক'রে দিল। সুকোমল যেন একটু সময় দিল ওকেই কথা আরম্ভ করতে, যেমন করছে রোজ এই ক'টা দিন। তারপর নীরব দেখে বলল—"বিদায় নিয়ে রাখছি সুস্মিতা দেবী, কাল সকালেই আমি যাব চ'লে।"

বইয়ের আড়াল থেকেই। "এটা আজকের বিকেল। তবে বিদেয় নেওয়ার জন্যে আপনি ব্যস্ত আছেন বটে।"—রহস্য ক'রেই বলল সুস্মিতা, তবে যেমন ছিল সেই ভাবেই কাপড় কোঁচাতে কোঁচাতে।

একটু চুপ-চাপ গেল। বুক নিংড়ে যে কথাটা বলতে হবে সেটা মুখে আনতে দেরি হয়ে যাচ্ছে সুকোমলের। তারপর এবারেও বইয়ের আড়াল থেকেই বলল—"আপনি ঐ কথা বলছেন, আমি ভাবছি আরও কত আগেই যাওয়া উচিত ছিল। একটা ভুল আশায় কি অপরাধটা যে হয়ে যাচ্ছিল…"

"অপরাধটা যে আমারই…"

"কেন? তোমার অপরাধ কিসে?"—এবার প্রশ্ন করল বই থেকে মুখটা সরিয়ে নিয়েই। সুস্মিতা আল্‌না থেকে বইয়ের কাছে স'রে গেছে, আছে কিন্তু পিছন ফিরেই। উত্তরটাও সেই ভাবেই দিল; বলল—"আমারই জানিয়ে দেওয়া উচিত ছিল কত নিরুপায় আমি এ-বিষয়ে…"

"কেন, বাচস্পতি মশাইয়ের কি এ-বিষয়ে অমত ছিল? আমার ত মনে হ'ত—তিনি, সব আভাসে বুঝেছিলেনই, আর…"

"কিন্তু আমি যে আগে থাকতেই অন্যের কাছে…"

অসীম বিস্ময়ে সুকোমলের মাথাটা উপাধান থেকে আপনিই উঠে গেল খানিকটা; সুস্মিতার কণ্ঠস্বরে কি কৌতুকের আভাস, শরীরটা কি চাপা হাসিতেই কেঁপে কেঁপে উঠছে?

হ্যাঁ, তাই। ঘুরেও দাঁড়িয়েছে সুস্মিতা। বুকের কাছ থেকে একটা ফটো বের করে বলতে বলতে এগিয়েও এসেছে—"এই দেখুন না—কিছুদিনের জন্যে বনবাস নিয়ে তিনি এখন…"

হাসি নিয়েই, ওর পরিহাস-তরল কণ্ঠেই।

কিন্তু আর পারল না। লঘু রহস্যের বশে আত্মবিস্মৃত হয়ে দয়িতের বুকে যে ব্যথা সঞ্চিত ক'রে গেছে এতদিন ধ'রে, সমস্তটুকু যেন কি ক'রে ওর বুকেই সঞ্চারিত হয়ে ওকে অভিভূত ক'রে ফেলল, আর নিজেকে সামলাতে না পেরে সুস্মিতা মাটিতেই এলিয়ে প'ড়ে সুকোমলের শয্যাপ্রান্তে মাথা চেপে হু হু ক'রে উঠল কেঁদে।

পরিহাস-তরল কণ্ঠস্বর দারুণ অনুতাপে রুদ্ধ হয়ে আসছে —"আমায় মার্জনা করুন—আমার মার্জনা নেই—আমারও ক'টা দিন যে কি ক'রে কেটেছে!…"

পরিবর্ত্তন

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়



মিছিলটা সম্পূর্ণ সরে যায় নি রাজপথ থেকে—বিক্ষোভের আওয়াজ এখনও জোরদার রয়েছে। চারিদিক্ বন্ধ-করা খুপরি ঘরের মধ্যে বসেও বুঝতে পারলেন ভূষণ মাস্টার।

নিশ্চিন্তে বসেছিলেন না মাস্টার—মনোযোগ সহকারে প্রুফ দেখছিলেন। এটা অর্ডার প্রুফ, এর জন্য অপেক্ষা করে আছে মেশিনম্যান। এখন মেশিন চালু না রাখতে পারলে সমূহ ক্ষতি। মাসের শেষ হয় হয়—অথচ এখনও দুটি ফর্ম্মা ছাপা না হলে যথাসময়ে পত্রিকা বা'র হবে না। পরের ফর্ম্মার বিষয়বস্তুরও কিছু অনটন পড়তে পারে। একটু আগে প্রিণ্টার জানিয়ে গেছে—অন্তত একটি পৃষ্ঠা ভর্ত্তি হওয়ার মত ছোট একটি লেখা চাই। অর্ডার প্রুফটা সংশোধন করার সঙ্গে সঙ্গে পরের ফর্মাটারও গ্যালি প্রুফ যাতে ওঠে সেই ব্যবস্থা করতে হবে। তা সেজন্য চিন্তার কিছু ছিল না। টেবিলের উপরে অনেক লেখাই ছড়ানো আছে। ডান ধারের ট্রে ভর্ত্তি নূতন লেখা—যা থেকে অনায়াসে বাছাই ক'রে নেওয়া যাবে এক পৃষ্ঠার উপযোগী একটি লেখা। বাঁ ধারের ট্রে ভর্ত্তি লেখাগুলোর ব্যবস্থা করতে হবে পত্রিকা বা'র হয়ে গেলে। ওগুলো বাতিল লেখা। টিকেট দেওয়া থাকলে ফেরত পাঠানোর হাঙ্গামা আছে, অন্যথায় টেবিলের নীচেয় জমা হবে। যাই হোক—এখন ডান দিক্ থেকে যে লেখাটি মনোনীত করবেন—সেটা প্রবন্ধ হবে, না রম্যরচনার মত কিছু, কিংবা কবিতা? পৃষ্ঠা পূরণ হিসাবে কোনটাই বেমানান হবে না—যদি তার সাহিত্য-মূল্য কিঞ্চিৎ থাকে। সাহিত্য-মূল্য সম্বন্ধে ভূষণ মাস্টার আবার অত্যন্ত সচেতন। পল্লীগ্রামের ক্ষীণ-কলেবর কাগজ হলে কি হবে···যেদিন থেকে সম্পাদনার ভার নিয়েছেন—দু'টি বিষয়ে লক্ষ্য রেখেছেন প্রখর ভাবে। এক—যথাকালে এর প্রকাশ, দুই—বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সতর্কতা। সাহিত্য-মূল্য নির্ণয়ে উনি কিঞ্চিৎ শুচিবাইগ্রস্তও বটে। ফলে বহু লেখকের মনোকষ্টের হেতুও হয়েছেন। এই জন্য উনি আত্মপ্রসাদ ভোগ ক'রে থাকেন।

প্রুফ দেখা শেষ হ'ল—তখনও মিছিলের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে প্রিণ্টার কালোবরণ। তার দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন, কিসের মিছিল?

কালোবরণ বলল, স্বর্ণ-নিয়ন্ত্রণ আইনের বিরুদ্ধে ওরা সভা করবে ইস্কুলের মাঠে।

আবার জিজ্ঞাসা করলেন, মিছিলটা বেশ বড় ব'লে মনে হচ্ছে। অন্য গ্রামের কর্ম্মীরাও রয়েছে বুঝি?

আজ্ঞে এ দিগড়ে যত গ্রাম আছে—সব মিলিয়ে—

বুঝেছি। সব দোকানই বুঝি বন্ধ?

আজ্ঞে সমস্ত।

হুঁ। গম্ভীর হয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। পরে প্রুফটায় অর্ডার দিয়ে প্রিন্টারের হাতে তুলে দিলেন।

কালোবরণ বলল, এই সঙ্গে এক পৃষ্ঠার মত একটা ম্যাটার দেবেন বলেছিলেন—

ও, হ্যাঁ। অন্যমনস্ক ভাবে টেবিলের বাঁ ধারের ফাইল-গুলোয় হাত দিলেন ভূষণ মাস্টার। কয়েকটি লেখা উল্টে-পাল্টে—একটি ছোট মত লেখা বেছে নিলেন। সেটা পড়লেন। তার পর কাগজখানা এগিয়ে দিয়ে বললেন, এই নাও—এটা নিশ্চয় এক পৃষ্ঠায় কুলিয়ে যাবে।

কালোবরণ লেখাটি তুলে নিয়ে এক বার চোখ বুলিয়েই বলে উঠল, স্যার এটাতে যে 'অ' মার্কা রয়েছে! নিশ্চয় অমনোনীত।

ভূষণ মাস্টার কাগজখানা হাত বাড়িয়ে নিলেন। লেখাটা আর একবার পড়লেন। একটুকাল কি যেন চিন্তা করলেন। একবার যেন অল্প একটু মাথা নাড়লেন—পরে বললেন, এটাই কম্পোজ করতে দিয়ে দাও। চলে যাবে।

কালোবরণ তবু ইতস্ততঃ করতে লাগল। এই পত্রিকার জন্মকাল থেকে ও কাজ করছে। মঞ্জুর বাতিলের মাপকাঠিটা ওরও অজানা নয়—সাহিত্য-রুচিবোধও জন্মেছিল এইসব নেড়েচেড়ে। লেখাটিতে আর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে ও আস্তে আস্তে বলল, লেখাটা স্যার বড্ড কাঁচা নয় কি?

ভূষণ মাস্টার মাথা নেড়ে বললেন, জানি। তবে বিষয়বস্তুটায় নূতনত্ব আছে। ওটাই নিয়ে যাও।

কালোবরণ আর প্রতিবাদ করল না। বেশ অবাক্ হয়েই লেখাটা নিয়ে বেরিয়ে গেল।

* *

অবাক্ ভূষণও কম হন নি। যেহেতু এই দণ্ডে আর একটি বৃত্তির প্রবল পীড়ন উনি অনুভব করছিলেন। মিছিলের ধ্বনিটা ততক্ষণে মিলিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু আর-একটি মিলিয়ে যাওয়া বস্তু অতিশয় স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। এই পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়ার আদিপর্ব্বটিতে এসে পৌঁছেছিলেন।

হাঁ—কাগজখানা তখন টায়ে-টোয়ে জীবন ধারণ করছিল। নামে মাসিক হয়েও—প্রকাশ ছিল অনিয়মিত।



বিষয়বস্তুটায় নূতনত্ব আছে। ওটাই নিয়ে যাও।

নীলাম ইস্তাহার আর দু'-একটি চলতি বিজ্ঞাপনের দৌলতে তার আয়ু নিবু-নিবু দীপশিখার মত জ্বলছিল।

ভূষণ মাস্টার তখন শহরের কাগজে লিখে কবিখ্যাতি পেয়েছেন। একদিন কাগজের মালিক এসে বললেন, মাস্টারমশায়, আর চলে না। এতদিন গাঁটের কড়ি খরচ ক'রে এটাকে বাঁচিয়ে রেখেছি, এখন আপনারা এর ভার নিন। শুধু নীলাম ইস্তাহারের সাগু বালি গিলিয়ে মা সরস্বতীকে আর কতকাল জীইয়ে রাখব… আপনারা এবার পুষ্টিকর খাদ্য দিন। বাইরে নাম করেছেন—দেশেরটির দিকেও দৃষ্টি দিন—

কাগজখানার ভার নিয়েছিলেন ভূষণ মাস্টার। সেই সময়ে ক্ষুদিরামের সঙ্গে তাঁর আলাপ।

ক্ষুদিরামকে ভোলা যায় না—অন্ততঃ এই দণ্ডে তার চেহারাটা চোখের সামনে জ্বল্ জ্বল্ করতে লাগল। পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ, বয়সের নাগাল পাওয়া মুশকিল। বেঁটে-খাটো গোলগাল মানুষ। নেয়াপাতি গোছ ভুঁড়ি আছে—

কোমরে ঘুনসি আছে, সেই ঘুনসিতে ঝুলছে চাবির গোছা। হাতে সোনার কবচ…অনামিকায় একটা পলার আংটি। সর্ব্বদাই পান চিবিয়ে দাঁতগুলিকে করেছে তরমুজের বীচি, কিন্তু মুখের হাসিটি সব সময়েই অম্লান। অম্লান হবারই কথা…চাকরি সে করত না, তার ছিল স্বাধীন ব্যবসা। মা-লক্ষ্মীর অঙ্গ সেবা করে তাঁর কৃপাকণা আদায় করেছিল বইকি!

এহেন ক্ষুদিরাম একদিন অতিশয় বিনীত ভাবে ওঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। অতিশয় সঙ্কোচে ফতুয়ার পকেটে হাত চালিয়ে এক চিল্‌তে কাগজ টেনে বার ক'রে লজ্জিত হাস্যে বলেছিল, মাস্টারমশায়—এটা একবার দেখবেন ত কেমন হয়েছে।

কাগজের ভাজ খুলে ভূষণ মাস্টারের চোখ ত কপালে উঠবার জো! আট লাইনের একটি কবিতা—অতি সাবধানে অক্ষর গুণে গুণে লাইন, আর মিল ঠিক করা। কবিতা পড়ে—অনেকক্ষণ বাঙ্‌নিষ্পত্তি হয় নি। বলেছিলেন, তাই ত ক্ষুদিরাম, এত কাণ্ড তুমি করলে কখন? দিনরাত ত ঠুকঠাকই কর জানি। পান মরতা বাদ দিয়ে কষ্টি-পাথরে ফেলে খাঁটি মালের হিসেব কষ—তোমার আবার এ খেয়াল কেন?

হাত কচলাতে কচলাতে জবাব দিয়েছিল ক্ষুদিরাম, আজ্ঞে ছেলেবেলা থেকে একটু-আধটু অব্যেস ছিল। তা জানতেন ত বাবাকে—মহা বদরাগী মানুষ—এসব দেখলেই তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠতেন—কত যে বেত ভেঙ্গেছেন এই পিঠে…তা অব্যেসটা ত গেল না। এখন স্বাধীন হয়েছি, ব্যবসাবৃত্তি নিয়ে আছি। আপনার কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেবার কথা মনে হতেই ভাবলাম, বাঃ রে, শুধু শুধু বিজ্ঞাপনই বা দেব কেন—আমিও ত এই রকম আথ্‌ছাড় লিখতে পারি—এতে মাস্টারমশাইরও কিছু উপকার হবে। যাঁহাতক মনে হওয়া, বসে গেলাম কাগজ-কলম নিয়ে। আর আশ্চর্য্যি, বললে বিশ্বাস করবেন না মাস্টারমশায়—নদীতে যেমন বন্যে আসে না—তেমনি হু হু করে জল বাড়ার মত—

ওর উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়ে ভূষণ মাস্টার বলেছিলেন, বন্যার জলটা কিন্তু ময়লা—পানের উপযুক্ত নয়। এ লেখা ত চলবে না।

এতটুকু ম্লান না হয়ে ক্ষুদিরাম বলেছিল, তাহলে আর একটা কবিতা লিখে ফেলব আজ রাত্তিরেই। আচ্ছা বলুন ত কি কি দোষ হয়েছে এটার?

ওটা বুঝিয়ে বলা যাবে না। ডাক পুরুষের কথায় আছে —সর্ব্বাঙ্গে ঘা ওষুদ লাগাব কোথায়! এক কাজ করগে, আরও পাঁচটা কবিতা পড়গে—তাদের মিলিয়ে এটাও পড়বে—তাহলেই ধরতে পারবে কি দোষ হয়েছে।

সোৎসাহে বলেছিল ক্ষুদিরাম, ঠিক বলেছেন মাস্টার-মশায়, আজ রাত্তিরেই পড়ব। একটু ভেবে মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলেছিল, আচ্ছা বলুন ত কি কি কাগজে কবিতা বা'র হয়? মানে—

জবাব দিয়েছিলেন ভূষণমাস্টার, ও হরি, তাও জান না! সব মাসিক পত্রিকাতেই ত কবিতা থাকে। ভাল মন্দ সব রকম কবিতা, সরেস, সরেস মাঝারি, নীরেস—

তবু দুই একটার নাম করুন ত।

ভূষণ মাস্টার বুঝেছিলেন—ক্ষুদিরাম স্বভাব কবি—সাহিত্য-পত্রিকার ধার বড় একটা ধারে না। কোন জন্মে হয়ত চোখেই দেখে নি। তবু কয়েকখানা পত্রিকার নাম করেছিলেন। বলেছিলেন, আগে ওগুলো পড়ে ফেল—তাড়াতাড়ি করবে না—ধীরে সুস্থে লিখবে।

ক্ষুদিরাম আবার ফতুয়ার পকেটে হাত ঢুকিয়েছিল। উনি আতঙ্কে শিউরে উঠেছিলেন। আবারও কি একটা কবিতা বার করছে? না—সে রকম মারাত্মক কাগজ নয়—এ অন্য ধরনের ব্যাপার। একখানা পাঁচ টাকার নোট টেবিলের উপর রেখে ক্ষুদিরাম বলেছিল, আপনার উপদেশ শিরোধার্য্য মাস্টারমশায়—এখন এটা রাখুন।

টাকা কিসের? মাস্টারের বিস্ময় বেড়েছিল। বলে-ছিলেন, টাকা কেন?

আজ্ঞে, আমার দোকানের বিজ্ঞাপনের টাকা।

ওঃ, বিজ্ঞাপনটা দিয়ে যেও কাল।

আজ্ঞে, আপনিই ওটা গুছিয়ে-গাছিয়ে লিখে দেবেন—আমার আবার গদ্য-টদ্য আসে না। যেন পদ্যতেই হাত দুরস্ত এমনি ভাবে হেসে জবাব দিয়েছিল ক্ষুদিরাম।

পরের মাসে কবিতা হাতে করে আবার এসেছিল ও। সেটিও বাতিল করে দিয়েছিলেন ভূষণ মাস্টার। এবার কবিতার কাগজটা পকেটে পুরে একটি কাগজের ঠোঙা টেবিলের উপর রেখেছিল ক্ষুদিরাম।

ওটা কি? শুধিয়েছিলেন ভূষণ মাস্টার।

এই গোটাকতক নারকেল নাড়ু—বাড়ীতে তৈরি করেছিল। ভাবলাম—মাস্টারের দৃষ্টি ক্রমশঃ কঠিন হয়ে উঠছে দেখে তাড়াতাড়ি চলে গিয়েছিল।

তার পরের বার কবিতার সঙ্গে এনেছিল একটি সুপক্ক আনারস। ধমক দিয়ে দু'টিই ফেরৎ দিতে চেয়েছিলেন ভূষণ মাস্টার। কবিতাটি পকেটে পুরে, আনারস নিতে পারব না বলে কেঁদে ফেলেছিল ক্ষুদিরাম। অগত্যা আনারসটি নিতে হয়েছিল।

ভূষণ মাস্টার বুঝতে পেরেছিলেন—কবিতা প্রকাশে দৃঢ়-সঙ্কল্প হয়েছে ক্ষুদিরাম। ওঁরও কেমন জিদ চেপে গিয়েছিল, কেমন আদর্শ-ঘেঁষা জিদ—যে ওটা কিছুতেই ঘটতে দেবেন না।

ঘটতে দেনও নি। ক্ষুদিরাম কিন্তু হাল ছাড়ে নি—। সেটা বুঝলেন আরও কয়েকদিন পরে।

একদিন স্বত্বাধিকারী বললেন, আপনি বড় কঠিন মাস্টারমশায়। ও বেচারা হেঁটে হেঁটে পায়ের সুতো ছিঁড়ে ফেলল—দিলেনই বা ছাপিয়ে একটা লেখা।

ছাপবার উপযুক্ত হ'লে অবশ্যই ছাপব।

তা যদি বলেন ত বলি—এই সব নীলাম ইস্তাহার, চায়ের দোকানের, মিষ্টির দোকানের বিজ্ঞাপনগুলোই কি ছাপার যোগ্য! ক্ষুদের লেখাটাও তেমনি ক্ষেমাঘেন্না করে দিন ছাপিয়ে। দেখুন না কেন—নেমন্তন্নর ভোজে সন্দেশ রসগোল্লার সঙ্গে ছ্যাচড়া শাকও ত থাকে।

গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন ভূষণ মাস্টার, ক্ষুদিরাম কত টাকা দিয়েছে?

তা দিয়েছে বইকি বিজ্ঞাপনের দরুণ—ক'মাস পাঁচ টাকা করে।

তা হ'লে কাগজটা আপনিই দেখুন—আমাকে ছুটি দিন।

আরে না—না, সে কি হয়?

অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর রয়ে গিয়েছিলেন ভূষণ মাস্টার।

এর পর ক্ষুদিরাম আর আসে নি, কিন্তু আরও কবিতা এসেছিল ডাকে।·· সেগুলো পড়েছিলেন ভূষণ মাস্টার।



কবিতাটি পকেটে পুরে, অনারস নিতে পারব না বলে কেঁদে ফেলেছিল ক্ষুদিরাম।

ওর অদম্য অধ্যবসায়ের প্রশংসা করেছিলেন মনে মনে। এই অনুপাতে ওর কল্পনায় যদি সাহিত্য-সৃষ্টির শক্তি থাকত—ভেবেছিলেন কতবার! কিন্তু হায়—ক্ষুদিরাম যে যথা পূর্ব্বম্ তথা পরম্। লেখাগুলি 'অ' চিহ্নিত হয়ে বাঁ ধারের ট্রেতে জমা হচ্ছিল।

আজ হঠাৎ কি হ'ল কে বলবে—বড় অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন ভূষণ মাস্টার।

মিছিল এতক্ষণ গ্রাম ছাড়িয়ে ইস্কুলের মাঠে পড়েছে। কোন ধ্বনিই আসছে না। ধ্বনি না-ই আসুক, সমস্যা ত ঠিকই রয়েছে। কর্তৃপক্ষ বলেছেন—নতুন পৃথিবীতে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলতে হবে—পুরাতন মূল্যমানের মোহ ত্যাগ করতে হবে। স্বর্ণমানের পরিবর্ত্তন চাই—পরিবর্ত্তন চাই সবকিছুর। সময়ের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়াই

ত আসল কাজ। কঠিন কাজ। সাধনা। সেই সাধনা সমাজের সর্ব্বস্তরের কৌলীন্যকে বিসর্জ্জন দিয়ে সুরু করতে হবে।

কিন্তু সাধনার সেই পথটি সংক্ষিপ্ত নয়, সুগমও নয়। কত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে, দুঃসহ দুঃখ-ক্লেশের পাথার পার হয়ে কবে সেই নিরাপদ্ তীরভূমিতে এসে পৌছবে মানুষ? সে কতকাল পরে—কত জীবন ক্ষয় হয়ে যাবার পরে?

আজ চলার পথে স্বর্ণমানের অবসান যদি ঘটল—সাহিত্যের মান বজায় রেখে মানুষকে কি সুস্থ রাখা যাবে?

মিছিলের আওয়াজ তখন মিলিয়ে গিয়েছিল—ভূষণ মাস্টার তবু ভাবছিলেন। ভাবতে ভাবতেই হাতটা বাড়িয়ে দিলেন বাঁ-ধারে। অন্যমনস্কে ক্ষুদিরামের কবিতাটাই তুলে নিলেন। স্থির করলেন এই কবিতাটাই ছাপতে দেবেন। আর এটা ছাপিয়ে যৎসামান্য সম্মানমূল্য যদি দিতে পারেন···

কবিতার মধ্যে দিয়ে নিশ্চয় বাঁচবে না ক্ষুদিরাম—কিন্তু বৃত্তিহারা একটি মানুষের অধিকার নিয়েই বা কেন বাঁচতে পারবে না!



"ব্রাহ্মণ তারে করো জীবন্ত"

(ঋগ্বেদ)

পতিত যেজন তুলে নাও তারে
পুনরায় ব্রাহ্মণ!
পাপে অভিরত যেজন সতত
মরে গেছে যার মন,
ব্রাহ্মণ তারে করো জীবন্ত!
করো পুন সচেতন!

সাম্য

(ঋগ্বেদ)

জন্ম হতে পবিত্র সবে
নহে ছোটবড় কেহ!
সন্তান সব দেবী ধরণীর
দিব্য তাদের দেহ!
ভেদ করি' বাধা তোলে তারা শির
ঠেলিয়া বিঘ্ন শত,
আসুক সহজে মোর কাছে সবে
মানুষ যেখানে যত!

অনুবাদ—শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়



প্রতিবিম্ব

হরিনারাণ চট্টোপাধ্যায়

লম্বায় সাড়ে ছ' ফিট, অনুপাতে প্রস্থও কম নয়। এই দৈত্যাকৃতি লোকটার হাতে শৃঙ্খল যেন খেলনা।

আগে থেকেই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া ছিল। জাহাজ কূলে ভিড়তে পুলিস সতর্ক হয়ে উঠল। সাধারণ লোককে জেটির ধারে-কাছে যেতে দিল না। নিজেরা দু'পাশে লাইন বেঁধে দাঁড়াল।

পুলিস-সুপার বসাক রসিক লোক। সহকারীর দিকে ফিরে বললেন, নাগ, এরকম রাজকীয় সম্মান আমাদের বরাতেও জোটে না।

এর আগে গোটা দুয়েক জেলের পাচিল টপকেছে। কি ক'রে ঈশ্বর জানেন। মুখে একটি কথা নেই। হাজার নির্যাতনে একটি শব্দ বের হয় নি দাঁতের ফাঁক দিয়ে। জজের প্রশ্ন আর উকিলের জেরায় শুধু মুখ খুলেছে।

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। রায় বের হ'তে সারা কলকাতার পুলিস মহল যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল। রাজবন্দীদের বেলাতেও সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতে হ'ত বটে, কিন্তু তাদের সব কিছুর পিছনে একটা যুক্তি ছিল, নীতি ছিল। তা মানুষকে মারবার বেলাতেও, মানুষকে বাঁচাবার বেলাতেও।

এই লোকটার কিন্তু এ সবের বালাই নেই। বেল্টের সঙ্গে আঁটা ভোজালি। মেজাজ বিগড়ালে, কিংবা মতে না মিললেই, সে ভোজালি রঙীন হয়ে উঠত। সামান্য কারণে।

চুরি, ডাকাতি, নিষিদ্ধ জিনিষের কারবার, এসব ত ছিলই। তা ছাড়া এমন একটা হিংস্র মানুষের ভয়ে সবাই যেন তটস্থ। কখন কোথায় কি ক'রে বসে তার ঠিক নেই। প্রত্যেক থানা অফিসার ভোরে উঠে, আর শুতে যাবার মুখে লোকটার বাপান্ত করত। সেই সঙ্গে মৃত্যু কামনাও।

পুলিস কমিশনার অ্যালফ্রেড ফিলিপ কোর্টের রায় বেরোতে সহকর্মীদের বাড়ীতে ডেকে ছোটখাটো একটা ভোজের ব্যবস্থাই ক'রে ফেললেন। সেই ভোজসভাতেই আক্ষেপ করলেন, অন্য দ্বীপে চালান না ক'রে, ব্যাটাকে একেবারে অন্য জগতে চালানের বন্দোবস্ত করলেই হ'ত। মোম-লাগানো দড়িটা জল্লাদের বদলে তিনি নিজেই তার গলায় পরিয়ে দিতেন।

চার দিনের পথ। এই চারদিন কলকাতার পুলিস ভয়ে ভয়ে রইল। কিছু বিশ্বাস নেই লোকটাকে। রেলিং ডিঙিয়ে কালাপানির বুকে ঝাঁপিয়ে পড়াও তার পক্ষে কিছু বিচিত্র নয়। ঢেউয়ের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে তীরে ফিরে যাওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। সব পারে লোকটা।

হুগলীর সেই ব্যাপারটার কথা মনে প'ড়ে গেল। একেবারে গঙ্গার কূল ঘেঁষে বাড়ী। পুলিস তিনটে দিক্ ঘেরাও করল। জিপ গাড়িতে ব'সে অনবরত ভয় দেখাল, যদি ধরা না দেয় ত বোমাসুদ্ধ বাড়ী উড়িয়ে দেওয়া হবে।

হঠাৎ ঝুপ্ ক'রে শব্দ। প্রহরারত দু-একজন পুলিস ছুটে জলের ধারে গেল। ছাদের পাশেই এক হেলানো নারকেল গাছ। সেখান থেকে নারকেল ছিঁড়ে তিনতলার ছাদ থেকে কে জলে ফেলেছে, পুলিসকে ধোঁকা দেবার জন্য। উদ্দেশ্য, পুলিশ গঙ্গার দিকে চ'লে এলে, সেই ফাঁকে অন্যদিক্ দিয়ে পালাবার চেষ্টা করবে।

কিন্তু পুলিশ অত কাঁচা নয়। প্রথম কয়েকবার ছুটে গেল। তারপর আর গেলই না। ভোর হবার অপেক্ষায় তিনদিক ঘিরে দাঁড়িয়ে রইল।

একটু আলো দেখা দিতেই অর্ডার হ'ল। চার্জ।

বন্দুক বাগিয়ে পুলিস ভিতরে ঢুকল। পিছনে কর্তাব্যক্তিরা।

তন্ন তন্ন ক'রে প্রত্যেকটি ঘর খোঁজা হ'ল। কেউ কোথাও নেই। পাখী উড়েছে।

একেবারে ছাদের ওপর গিয়েই পুলিস থমকে দাঁড়াল। সঙ্গে কর্তারা থাকলেও ছোকরা পুলিসের দল মুখ টিপে টিপে হাসল।

ছাদের মাঝখানে একটা কাঁসার পাত্রে নধর একটি ডাব।

ব্যাপারটা বোঝা গেল। সারা রাত ডাব জলে ফেলার সময় কোন ফাঁকে মানুষটাও ঝাঁপিয়ে পড়েছে জলে। তারপর হয় সাঁতরে ওপার চ'লে গেছে, কিংবা কাছেপিঠে নৌকার ব্যবস্থা ছিল।

মোট কথা, পুলিসকে একেবারে বোকা বানিয়েছে।

যে লোকটার জন্য এত ভয়, এত সতর্কতা, সে কিন্তু একবারের জন্যও কেবিনের বাইরে আসে নি। বালিশে হেলান দিয়ে চুপচাপ ব'সে আছে, চোখ বন্ধ ক'রে। নতুন কোন ফন্দিফিকিরের সন্ধানে কি না কে জানে।

নাম শের খাঁন। জাতে পাঠান। এই নামটা এবারে পুলিসের খাতায় লেখা আছে। অবশ্য নাম তার অনেক। শ্রীকৃষ্ণের মতন শ'খানেকের ওপর। এক-এক লীলার সময়. এক-এক নাম। আদি বাড়ী পেশোয়ার। ব্যবসা করতে এদেশে আসে, দলের সঙ্গে। দল ফিরে গেছে কিন্তু শের খাঁন যায় নি। বাংলা মুলুকের প্রেমে প'ড়ে এদেশেই আস্তানা বেঁধেছে। ফিরে যাবে এমন মনে হয় না।

লোকের মুখে মুখে বিচিত্র একটা কাহিনী চালু আছে। শের খাঁন বাংলা দেশের প্রেমে ত বটেই, বাঙালিনীর প্রেমেও পড়েছে।

দু' একজন বলে, সিদ্ধির নেশার মুখে শের খাঁন নাকি বলেছে, ইয়ে মুলুক হামারা শ্বশুরাল হায়।

ভাল কথা। কিন্তু এমন ঘরজামাই-এর সংখ্যা আরও গাটা কয়েক হ'লে বাংলা দেশের পুলিসদের পাততাড়ি গুটোতে হবে।

অনেকবার শের খাঁন-এর খোঁজে পুলিস তার আস্তানায় হানা দিয়েছে, কিন্তু সেখানে গৃহস্থালীর কোন চিহ্নই দেখতে পায় নি। মেয়েছেলে ত দূরের কথা।

একবার সামান্য একটু সন্দেহ, কিন্তু ওই সন্দেহই, তার বেশী কিছু নয়। তার বেশী কিছু জানবার আর সুযোগ হয় নি।

পুলিসের কাছে জোর খবর ছিল। এক জার্মান জাহাজ জেটিতে ভিড়েছিল। সে জাহাজে কিছু অটোমেটিক বিলি করার জন্য এসেছিল। সেই সময় স্বদেশী যুগ। কিছু কিছু সন্ত্রাসবাদের স্ফুলিঙ্গ এদিকে-ওদিকে ছিল। পুলিস তৎপর হ'ল।

স্পাইরা কিন্তু অন্য খবর আনল। অটোমেটিক সোজাসুজি স্বদেশী বাবুদের হাতে যাবে না। সব যাবে শের খাঁনের কাছে। সেখান থেকে এদিক-ওদিক ছড়াবে।

ডেপুটি কমিশনার বাছা বাছা পুলিস নিয়ে শের খাঁনের আস্তানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কেউ নেই। একজন লোক ব'সে ব'সে বিড়ি পাকাচ্ছিল, পুলিস তাকে টেনে নিয়ে গেল নিজের দপ্তরে।

প্রথমে অনুনয়, বিনয়। রেকাবি রেকাবি মণ্ডা, মিঠাই এল। নেশার 'জিনিষ'। লোকটার মুখে এক কথা। তার নাম ইয়াকুব। বাড়ী মেদিনীপুর। বিড়ি পাকানোর কাজ করছে আজ মাস ছয়েক। ওই জায়গায় একটা লোক সকালে বসিয়ে দিয়ে গেছে, সন্ধ্যার দিকে বিড়ির হিসাব ক'রে পয়সা মিটিয়ে দিয়ে যাবে।

না, শের খাঁনকে সে চেনে না। জীবনে সে পাঠান দেখে নি। ছেলেবেলায় একবার যাত্রা দেখেছিল, মোগল পাঠান।

পুলিস তখন বাঁকা পথ ধরল। পা দুটো বেঁধে কড়িকাঠে ঝোলাল। মাথা নীচের দিকে। তার পর সপাসপ চাবুক। নখের মধ্যে আলপিন। কচুয়া-ধোলাই কিছু বাদ গেল না।

সন্ধ্যার দিকে লোকটা কবুল করল।

বলছি হুজুর. বলছি, বলছি। অত্যাচার থামান।

প্রহার-পর্ব শেষ হ'ল।

লোকটা ধুঁকতে ধুঁকতে বলল, আজ্ঞে, আর কোন খবর

জানি না। শের খাঁনের খবর বলতে পারি। তার গোপন আস্তানার খবর।

পুলিস খাতা-পেন্সিল নিয়ে তৈরি।

লোকটা জানবাজারে একটা রাস্তা আর বাড়ীর নম্বর বলল। সেখানে শের খাঁন বৌ নিয়ে থাকে।

বৌ? পুলিস চমকাল।

হ্যাঁ হুজুর। এক বাঙালী আওরতের সঙ্গে থাকে।

পুলিস তখনই দৌড়াল। আস্তানার খোঁজ মিলল। মানুষজন উধাও। তবে একটা সংসারের ছাপ আস্তানার সর্বত্র। আলনায় কিছু শাড়ী রয়েছে। টেবিলের ওপর মেয়েলী প্রসাধনের টুকিটাকি।

জার্মান জাহাজ সার্চ করা হ'ল, কিছু পাওয়া গেল না।

কিছুদিন আটকে রেখে লোকটাকেও ছেড়ে দেওয়া হ'ল।

ঠিক তার দিন-তুয়েক পরে। পুলিস কমিশনারের নামে এক পার্শেল এল। একটা পার্শেল অবশ্য আসবার কথা ছিল ছেলের কাছ থেকে। ছেলে কানপুর থাকে। বলেছিল, বাপের জন্য অর্ডার দেওয়া ভাল জুতো পাঠিয়ে দেবে।

পার্শেলটা কানপুর থেকেই এসেছে। ছেলের কাছ থেকে। কমিশনার সাহেব নিজের হাতে পার্শেলটা খুললেন গৃহিণী আর মেয়েদের সামনে।

কাপড় আর কাগজের মোড়ক খুলেই কমিশনার সাহেব আতকে উঠলেন। পার্শেলটা গড়িয়ে মেঝের ওপর প'ড়ে গেল।

সেই লোকটির কর্তিত মুণ্ড। তুটি চোখ খোলা। দৃষ্টিতে আতঙ্ক আর ত্রাস। তলায় একটি আইভরি ফিনিশ কার্ড। কয়েকটি লাইন ইংরেজীতে টাইপ করা। জুতোর জন্য বিশ্বাসঘাতকদের চামড়াই প্রশস্ত। ব্যবহার ক'রে দেখতে পারেন।

কার কাজ জানতে পুলিসের একটুও দেরি হ'ল না। সঙ্গে সঙ্গে বেতার-বার্তা গেল কানপুর। পুলিস শহর তোলপাড় ক'রে ফেলল। পোষ্টাফিসে খোঁজ। কোন সন্ধান মিলল না।

কাজেই এ হেন শের খাঁনকে বহাল তবিয়তে আন্দামানে না পৌছাতে পারা পর্যন্ত পুলিস অফিসারদের স্বস্তি নেই।

সঙ্গে জাঁদরেল ডাক্তার চলেছে। সকাল বিকাল শরীরের তাপ, রক্তের চাপ পরীক্ষা চলেছে। শের খাঁন নির্বিকার।

আন্দামানের উপকূল দেখা যেতে সবাই যেন একটু আশ্বস্ত হ'ল। এই দুর্বৃত্তকে নতুন দ্বীপের মাটি ছোঁয়াতে পারলেই তাদের দায়িত্ব শেষ।

একটি ছোকরা পুলিস অফিসার শের খাঁনের কেবিনের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলল, এসে গেছি খাঁনসায়েব। জলের শেষ। মাটির সুরু। নামবার সময় হ'লে আপনাকে খবর দিয়ে যাব।

উত্তরে শের খাঁন শুধু একবার মুখ তুলে দেখল। সারা মুখে চাপ চাপ গোঁফ দাড়ি। সুগৌর বর্ণ। দীর্ঘ আয়ত তু'টি চোখ। দৃঢ়তাব্যঞ্জক কাঠামো। অনায়াসেই একজা-দিল্লীশ্বরের বংশধর ব'লে চালানো যায়। নৃশংসতার বিন্দুমাত্র চিহ্নও কোথাও নেই। শান্ত, নিরুত্তেজ চেহারা।

বিছানার নীচে প্লেটে চাপাটি প'ড়ে আছে। আর একটা বাটিতে ডাল। তার মানে, আগের রাত্রে দেওয়া আহার্য শের খাঁন ছোঁয় নি।

তবিয়ত খারাপ। শরীর দেখে ত তা মনে হচ্ছে না।

মর্জি। ইচ্ছা হয় নি, তাই খায় নি। কর্মকেন্দ্র থেকে ক্রমেই দূরে স'রে যাচ্ছে, সেইজন্য বুকে একটা ক্ষোভ জমা খুব স্বাভাবিক। নতুন দ্বীপে কিছু করার কোন স্বাধীনতা নেই। চারপাশে লবণাক্ত বাধা। তা ছাড়া যখন-তখন যেখানে-সেখানে যাওয়ার স্বাধীনতাও নেই।

অনেকগুলো বছর এই নির্জনে কাটাতে হবে। কর্মহীন, নিরুত্তাপ দিনের সমষ্টি।

শের খাঁন আড়চোখে একবার কেবিনের হুকে টাঙানো হাতকড়ার দিকে দেখল আর একবার দেখল বাইরে দরজায় প্রহরারত বন্দুকধারী সিপাইয়ের দিকে।

জাহাজ জেটিতে লাগলে এক ডজনের ওপর পুলিস এসে দাঁড়াল শের খাঁনের কামরার সামনে। জন চারেক ভিতরে ঢুকল। বন্দুকধারী সিপাইরা বন্দুক উঁচিয়ে প্রস্তুত।

এই মুহূর্তে যেন শের খাঁন বীরবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়বে তাদের ওপর। একটা অসম যুদ্ধই বেধে যাবে।

কিন্তু সে সব কিছুই হ'ল না। শের খাঁন আস্তে আস্তে



শিকল পরাবার সময়ও মুখের রেখার সামান্য কুঞ্চন নয়।

উঠে দাঁড়িয়ে দুটো হাত প্রসারিত করে দিল। শিকল পরাবার সময়ও মুখের রেখার সামান্য কুঞ্চন নয়।

সম্ভবতঃ আন্দামানের পুলিসের কর্তারা মুখ টিপে টিপে হাসল। দুর্দান্ত প্রকৃতির হিংস্র নরপশুর এ কি শান্ত ব্যবহার; শের কই, এ ত নিছক বকরি।

ধীর পায়ে শের খাঁন সিঁড়ি দিয়ে নামল।

পুলিস ধারে কাছে কাউকে আসতে দেয় নি, কিন্তু দূরে জমাট জনতা। উৎসাহী দু-একজন নারকেল গাছের মাথাতেও চড়েছে।

অবশ্য এ দ্বীপে এমন লোক আসা এই প্রথম নয়। সারা ভারতবর্ষ ঝেঁটিয়ে এই ধরণেরই লোক আসে, তবু বাসিন্দাদের উৎসাহের কমতি নেই।

শের খাঁন মাটিতে পা দিয়ে একবার দূর চক্রবালের দিকে চোখ ফেরাল। তরঙ্গের পর তরঙ্গ। নীলের অশান্ত বিস্তার। কোন দিকে তটরেখা দেখা যায় না।

শের খাঁন ভ্রূ কুঁচকে কিন্তু তটরেখারই খোঁজ করতে লাগল। চারদিন আগে পিছনে ফেলে-আসা পরিচিত ভূখণ্ড। মনে মনে বুঝি একবার হিসাব করল। কতদিন, কত বছর সে মাটির সঙ্গে কোন সংযোগ থাকবে না।

ঠিক সেই সময়টা মানুষটা একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। হাতে হাতে লেগে ঝনঝন ক'রে শৃঙ্খল বেজে উঠেছিল।

সঙ্গে সঙ্গে প্রহরীরা সতর্ক, তৎপর হয়ে উঠেছিল।

জেটিতে একটু দেরি হ'ল। কতকগুলো কাগজপত্রে সই সাবুদ। তারপর লোহার তার দিয়ে ঘেরা গাড়িতে ওঠানো হ'ল শের খাঁনকে।

এইবার এতদিন পরে কলকাতার পুলিস নিশ্চিন্ত নিশ্বাস ফেলল। দিন দুয়েক অপেক্ষা ক'রে তারা ফিরে যাবে। এখন থেকে সব দায়-দায়িত্ব আন্দামানের পুলিসের।

লোহার খাঁচায় মুখ রেখে শের খাঁন বাইরে চোখ রাখল। সবুজের এমন সমাবেশ এর আগে ওর চোখে পড়ে নি। তাল, নারিকেলের মেলা। গাছ লতাপাতায় সতেজ আভা। রুক্ষ, বুভুক্ষু দু'টি চোখ শান্ত হয়ে গেল। ঠোঁটের দুটো পাশ আবেগে থর থর ক'রে কেঁপে উঠল।

দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটা চেপে শের খাঁন চুপচাপ ব'সে রইল।

পাশে বসা সিপাইটা আলাপ জমাবার চেষ্টা করল। ক'টা বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে ভাই। ঠিকমত থাকলে বেশ কয়েক মাস মাপও হয়ে যায়।

ঠিক ছুটো ভ্রূর মাঝখানে কয়েকটা আঁচড়, বিরক্তির চিহ্ন। শের খাঁন উত্তর দেওয়া দূরে থাক, একবার ফিরেও দেখল না।

সিপাইটা আর দু-একবার চেষ্টা ক'রে থেমে গেল।

গাড়ি জেলের গেটে এসে পৌঁছল।

একেবারে আলাদা সেল। সমুদ্রের দিকে ছোট একটা গোল জানলা। রোদ, বাতাস বাইরের যা-কিছু সেখান দিয়েই আসে। আর কোথাও কোন ফাটলও নেই দেওয়ালের গায়ে কয়লা দিয়ে অনেকগুলো নাম লেখা। হিন্দি, উর্দু, বাংলায়। সম্ভবত এখানকার বাসিন্দাদের। কাজের অবসরে নিজেকে অমর করার প্রয়াস।

শের খাঁন পা ফেলে ফেলে সব সেলটা দেখল। কয়েক পা হাঁটলেই ফুরিয়ে যায়। অনেক বছর ধ'রে এইটুকু পরিসরে নিজেকে মানিয়ে নিতে হবে। সমস্ত পৃথিবীটা গুটিয়ে এই সেলে এসে ঠেকবে।

এতক্ষণ পরে শের খাঁনকে একটু যেন চিন্তিত মনে হ'ল।

দরজার শব্দ হতেই শের খাঁন চমকে ঘুরে দাঁড়াল।

জেলার, সঙ্গে একজন সিপাই।

জেলারকে দেখলে কপালে হাত ঠেকিয়ে একটা সেলাম করার রেওয়াজ আছে বন্দীদের। যেখানে, যতবার দেখা হোক। শেরখান কিন্তু চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

জেলার গম্ভীর গলায় সিপাইকে বলল, এই বেতমিজকে সহবত শিখিয়ে দাও। একেবারে জানোয়ার।

জানোয়ার কথাটা কানে যেতেই পলকের জন্য শের খাঁনের দু চোখে আগুন জ্ব'লে উঠল। দুটি হাত মুষ্টিবদ্ধ।

সিপাই বন্দুকটা চেপে ধ'রে দাঁড়াল।

কিন্তু আস্তে আস্তে রুদ্রভাব অপসৃত হ'ল। শ্লথ হ'ল মুষ্টি। সিপাইয়ের নির্দেশে শের খাঁন নিজের প্রশস্ত কপালে হাত ঠেকাল। সেলাম, সাব।

জেলার একেবারে বাঁধা গৎ আউড়ে গেল।

জেলের নিয়ম-কানুন মেনে যদি চল ত সরকারের কাছে সুপারিশ ক'রে তোমার মেয়াদ মকুব করার জন্য লিখব। মকুব করা মানে, মেয়াদ শেষ হবার আগেই ছুটি পেয়ে যাবে। ভালভাবে চলবে। মেটের কথা শুনবে। ঝগড়াঝাঁটি কেজিয়া করবে না কারও সঙ্গে।

প্রায় আধ ঘণ্টার কাছাকাছি সময় নিয়ে জেলার ব'লে গেল আর সারাটা সময় শের খাঁন গোল জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইল। জেলারের দিকে পিছন ফিরে।

শুধু অগাধ সমুদ্র নয়, জমির কিছুটা দেখা যায়। গোটা তিনেক নারকেল গাছ। একটা ঝাঁকড়া নাম-না-জানা গাছ। তার একটা ডাল হেলে জানলার কাছ-বরাবর এসেছে। গাছটাকে জড়িয়ে এক লতা উঠেছে, সর্বাঙ্গে বেগুনীফুলের পসরা নিয়ে।

জেলার চ'লে যাবার পর অনেকক্ষণ সেই দিকে চেয়ে শের খাঁন দাঁড়িয়ে রইল। শুধু সেলের মধ্যের নীরস পাথর আর বাইরের লবণাক্ত জলই নয়, মাটিও আছে। নরম, কালো মাটি। সেই মাটির বুক ফুঁড়ে গাছপালা উঠেছে। শুধু নীলের বিস্তার নয়, সবুজেরও সমারোহ।

পরের দিন সান্ত্রী মেটের কাছে রিপোর্ট করল। নতুন কয়েদী সারা রাত ঘুমোয় নি। যখনই সান্ত্রী পায়চারি করতে করতে তার সেলের সামনে গেছে দেখেছে শের খাঁন দুটো হাত পিছনে রেখে এদিক থেকে ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সান্ত্রী দু'-একবার ডেকে ঘুমোবার উপদেশ দিয়েছে, কিন্তু কয়েদী শোনে নি।

মেট বলেছে, নতুন জায়গায় অমন হয়। চট্ ক'রে ঘুম আসে না। তা ছাড়া কাল প্রথম দিন ব'লে খাটান হয় নি। সারাটা দিন পাথর ভাঙলে, রাত্রে ঠিক ঘুম এসে যাবে। ভাববার কিছু হয় নি।

ভাববার কিছু হয় নি বলল বটে, কিন্তু জেলার আসতেই তাকে খবরটা জানিয়ে দিল। পাঠান কয়েদী সারারাত ছটফট করেছে। এক তিল ঘুমোয় নি।

জেলার গোঁফে তা দিতে দিতে হাসল।

আরে বাবা, এ দুনিয়া বড় মজার জায়গা। কারও রেহাই নেই। যাদের খুন ক'রে এসেছে, তারা সব পিছু নেয়। ঘুমোতে দেয় না। এ ত একটা রাত, আমি দেখেছি রাতের পর রাত কয়েদী জেগে ব'সে থাকে। চীৎকার করে। ইয়া জোয়ান চেহারা, দু'দিনে শুকিয়ে একেবারে আমসি হয়ে যায়। জীবনে খুন কি কম করেছে নাকি এই পাঠানটা? একটা খুনের জন্য কালাপানি পার হয়ে এখানে এসেছে, তার আগে কত খুন করেছে। পুলিস তার কিনারা করতে পারে নি।

কথাগুলো বলতে বলতে জেলার এগিয়ে শের খাঁনের সেলের দিকে গেল।

শের খাঁনের চেহারা দেখলে মনেই হয় না, এই লোকটা সারাটা রাত ঘুমোয় নি। এখন দুটো হাত আড়াআড়ি ভাবে বুকের ওপর রেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। বোধ হয় সেলের দরজা খোলার অপেক্ষায়।

কি, নমাজ পড়া হয়েছে? জেলার প্রশ্ন করল।

চোখ দুটো কুঁচকে শের খাঁন বলল, ওসব করি না। একটু বাইরে যাব।

সিপাই হাতকড়া লাগিয়ে শের খাঁনকে বাইরে নিয়ে গেল।

সারাটা দিন একটানা পরিশ্রম। শের খাঁনের সারা দেহ আরক্ত হয়ে উঠল। হাতুড়ির ঘায়ে পাথরের স্তূপ ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল। ঝুড়ি ক'রে পাথরের টুকরো নিয়ে একটু দূরে গিয়ে ঢালতে হ'ল।

ওর মধ্যেই প্রহরীর চোখ এড়িয়ে, কান বাঁচিয়ে, দু'একজন জিজ্ঞাসা করল, কোন্ শহরের আমদানী?

হাতুড়ি মাথার ওপর তুলতে তুলতে শের খাঁন বলল, কলকাতা।

ক' বছর?

খোদা মালুম!

তারপর ছোটখাট প্রশ্নের খোঁচা নানাদিক্ থেকে।

অপরাধটা কি?

ফাঁসাল কে? দলের কেউ? সে নেমকহারামকে খতম করতে পারে নি শের খাঁন?

আর কোন প্রশ্নের উত্তর শের খাঁন দিল না। একমনে পাথর ভাঙতে লাগল।

আশপাশ থেকে দু'-একজন বলল, করুক, কাজ করুক। প্রথম ক'দিন কাজ না করলে মেটের মন পাবে কি ক'রে? দিন গেলে ঠিক হয়ে যাবে। নোনা বাতাসে শরীরের তেজ কমবে। কলিজা কমজোর হবে। তখন দোস্তের মতন সব কথা বলবে। জিজ্ঞাসা না করতেই।

শের খাঁনকে আর বলতে হ'ল না। মেটই বলল। কাজ-কর্মের অবসরে দু'একজন পুরোনো কয়েদীর কাছে গল্প করল।

চলতি ট্রেণে ডাকাতি। ফার্স্ট ক্লাশ কামরায় যাচ্ছিলেন মোতিরাম আগরওয়ালা আর তাঁর স্ত্রী। ছোট এক স্টেশনে গাড়ি থামল। থামবার কথা নয়। সম্ভবতঃ সিগনাল আপ রাত তখন প্রায় একটা। সেইজন্য কৌতূহলী জনতা নেমে আর খোঁজ করার উৎসাহ বোধ করে নি।

গাড়ি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাথরুমের দরজা খুলে গেল। ঘুমন্ত মোতিরাম গাড়ির ঝাঁকুনিতে চোখ খুলেই দেখে কামরায় দু'টি লোক। একজনের হাতে পিস্তল, আর একজনের হাতে ভোজালি।

ভোজালি হাতে শের খাঁন। গম্ভীর কণ্ঠে বলল, সঙ্গে টাকাকড়ি যা আছে সব বের কর। দশ মিনিট সময় দিলাম।

মোতিরাম তখন ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছে। কাঁপতে কাঁপতেই বলল, সঙ্গে টাকাকড়ি বিশেষ কিছু নেই। দরকারী কাগজপত্র নিয়ে দিল্লী যাচ্ছি। একটা কোল্ড ষ্টোরেজ খুলব আর একটা ইম্পোর্টের কারবার। তারই লাইসেন্স।

কথা আর শেষ হ'ল না। শের খাঁনের প্রচণ্ড লাথিতে মোতিরাম মেঝেয় গড়িয়ে পড়ল।

এবার আর তিলমাত্র দেরী নয়। কোমরে বাঁধা চাবি বের ক'রে স্যুটকেস খুলে নোটের তাড়া বের ক'রে দিল। ঠিক এই ধরনের খবরই শের খাঁনের ছিল। মোতিরাম আগরওয়ালা দিল্লী যাচ্ছে, সঙ্গে প্রচুর নগদ টাকা।

টাকাগুলো গুছিয়ে শের খাঁন ভিতরের পকেটে রাখছে এমন সময় পিস্তলের শব্দ। একমুঠো আগুন, একটু ধোঁয়া, একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ।

মোতিরামের স্ত্রীর দেহ ওপরের বাঙ্ক থেকে নীচে লুটিয়ে পড়ল।

শের খাঁন সাগরেদের দিকে চাইতেই সে বলল, ওস্তাদ, হারামীটা গুটি গুটি চেনের দিকে এগোচ্ছিল, দিলাম শেষ ক'রে।

ঠিক আছে। গা থেকে গয়নাগুলো খুলে নে।

ভাগ্য ভাল শের খাঁনের। একে গভীর রাত, তার ওপর ট্রেণটা সেই সময় পুলের ওপর দিয়ে যাচ্ছিল। যন্ত্রদানবের চাকায় চাকায় ছন্দোবদ্ধ ঝঙ্কার। সেই আওয়াজে পিস্তলের শব্দ ডুবে গেল।

পরের স্টেশনে ট্রেণের গতি মৃদু হতেই দুজনে নেমে পড়ল। নামবার সময় শের খাঁনের ভোজালিটা মৃদু

আলোয় একবার ঝিকমিকিয়ে উঠল! আবার একটা আর্তনাদ। তারপর সব নিস্তব্ধ, তারপর কাঁটা তার পার হয়ে ঝোপ এড়িয়ে মাঠ ধ'রে কোনাকুনি পাড়ি দিল।



মোতিরামের স্ত্রীর দেহ ওপরের বাঙ্ক থেকে নীচে লুটিয়ে পড়ল।

ব্যাপারটা জানাজানি হ'ল পরের দিন ভোরে।

দু-একটা কামরা পরেই মোতিরামের চাকর যাচ্ছিল। সে মোতিরামের খবর নিতে এসে দেখে এদিকের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। অনেক ঠেলাঠেলিতে দরজা খুলল না। হৈ চৈ চীৎকারে লোকজন জড়ো হয়ে গেল। কয়েকজন লোক বুদ্ধি ক'রে স্টেশনের উল্টোদিকে গিয়ে দরজা ঠেলতেই দরজা খুলে গেল।

দু'-একজন ভিতরে ঢুকেই চেঁচিয়ে উঠল।

তারপর গার্ড এল, পুলিস এল, একজোড়া লাস সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হ'ল। পুলিসের নির্দেশে সেই কামরা কেটে সাইডিংএ রেখে দেওয়া হ'ল। উদ্দেশ্য, যদি পায়ের বা হাতের ছাপ পাওয়া যায়।

কিছু পাওয়া গেল না। কিন্তু সুন্দর সিং ধরা পড়ে গেল। শের খাঁনের সাগরেদ সুন্দর সিং।

ফতেপুর থেকে সত্তর মাইল ভিতরে এক জুয়ার আড্ডায় সুন্দর সিং মারপিটের অভিযোগে গ্রেপ্তার হ'ল।

থানার দারোগা অবশ্য তখনও কিছুই জানে না। দশেরার দিন সিদ্ধি খেয়ে জুয়া খেলা, মারপিট করা সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু থানায় সুন্দর সিং নিজেকে নিজে ধরা দিল।

বাইরে বেঞ্চের ওপর তাকে শুইয়ে রেখেছিল। হঠাৎ বোধ হয় ঠাণ্ডা হাওয়া লেগে নেশাটা ছুটে যাবার দাখিল হয়েছিল। সে হঠাৎ উঠে ব'সে ব'লে উঠল, এই, আমায় আর এক লোটা সরবত দাও, নয়ত মোতিরামের পরিবারকে যেমন খতম করেছি, সেই রকম সব ক'টাকে শেষ ক'রে ফেলব।

দু পাশের পুলিসগুলো সশব্দে হেসে উঠল, কিন্তু ছোট দারোগা হাসল না। এ থানায় বদলি হয়েছে মাস ছয়েক। লেখাপড়া-জানা ছেলে। ইতিমধ্যেই লাইনে বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে। পুলিস জার্নালে যখন ট্রেণ-রাহাজানির খবরটা বেরোয়, খুব মনোযোগ দিয়ে পড়েছিল। সুন্দর সিংয়ের কথাটা কানে যেতেই তার সামনে এসে দাঁড়াল।

হয়ত কথাগুলো একেবারে অর্থহীন। নেশাখোরের প্রমত্ত উক্তি। তবু এ লাইনে তিলও মাঝে মাঝে তাল হয়ে দেখা দেয়। কাউকে উপেক্ষা করা উচিত নয়।

ছোট দারোগা একটা পুলিসকে ডেকে সুন্দর সিংকে পাঁজাকোলা ক'রে নিজের ঘরে নিয়ে যেতে বলল।

ছোট দারোগা কামরায় ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দিল। একটা চেয়ার নিয়ে সুন্দর সিংয়ের সামনে ব'সে বলল, এসব আজেবাজে কথা বললে চাবুক পেটা করব তোমায়। মোতিরাম আগরওয়ালাদের যারা মেরেছিল, তারা ধরা পড়েছে। তাদের সাজাও হয়ে গেছে।

সুন্দর সিং নেশায় বেহুঁস। বহুকষ্টে একটা চোখ খুলে ছোট দারোগাকে জরিপ করিল, তারপর বলল, সাজাও হয়ে গেছে! বহুত আচ্ছা।

অনেক রাত অবধি ছোট দারোগা অনেক ভাবে চেষ্টা করল, কিন্তু সুন্দর সিংয়ের মুখ থেকে আর একটি কথাও বের করতে পারল না। তখন পুলিসকে ডেকে সুন্দর সিংকে ফাটকে আটকাবার হুকুম দিয়ে উঠে পড়ল।

পরের দিন বেশ বেলা হ'তে ছোট দারোগা আবার এসে দাঁড়াল সুন্দর সিংয়ের সামনে।

ট্রেণ-ডাকাতির সময়ে সঙ্গে আর কে কে ছিল তোমার? সুন্দর সিং দেয়ালে হেলান দিয়ে চুপচাপ বসেছিল, প্রশ্ন

শুনে অবাক্। হুঁশ ফিরে এসেছে। প্রত্যেকটি কথার তাৎপর্য এখন বেশ বুঝতে পারছে।

অনেকক্ষণ পরে সে বলল, কি বলছেন হুজুর ?

চোপরও। হুজুর একেবারে অগ্নিমূর্তি, সঙ্গে সঙ্গে ছপাৎ ক'রে চাবুক এসে পড়ল সুন্দর সিংয়ের মুখের ওপর।

এমনই একটানা তিন দিন তিন রাত। প্রথম দিকে ছোট দারোগা বলল, নেশার ঝোঁকে সব কথা সুন্দর সিং ব'লে দিয়েছে। সব খাতায় রেকর্ড করা হয়ে গিয়েছে। এখন অন্য সঙ্গীদের নাম দরকার।

কথাগুলো সুন্দর সিং ঠিক বিশ্বাস করে নি. কিন্তু মনের কোণে একটু সন্দেহ ছিল। সামান্য অস্বস্তি। কিছুই যদি সে বলে নি, তবে ছোট হুজুর সেই ট্রেন-ডাকাতির সঙ্গে ওর নাম জড়াচ্ছেই বা কেন।

তিন দিনের দিন আর পারল না সুন্দর সিং। সারা পিঠ ফেটে রক্ত জমে কাল হয়ে গিয়েছে। মুখ-চোখ ফোলা। একটা চোখ ত প্রায় বন্ধই হয়ে গেছে। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। রাত্রে শুতে পারে না। প্রাণান্তকর যন্ত্রণা।

সন্ধ্যার দিকে চীৎকার ক'রে উঠল, চাবুক থামান হুজুর, আর পারছি না। সব বলছি।

সেই রাত্রেই সুন্দর সিং সব বলল। সমস্ত ঘটনা, কেবল শের খাঁনের নাম বাদ দিয়ে।

কিন্তু চাবুক তুলতেই নামটাও বেরিয়ে পড়ল। রাত্রেই ঘোড়ায় চেপে পুলিস সদরে ছুটল। ভোরবেলা হোমরা-চোমরা পুলিস অফিসার এসে হাজির।

শের খাঁনের নাম শুনেই সবাই ভ্রূ কোঁচকাল।

সে ইবলিসের বাচ্চার সন্ধান পাওয়াই দায়।

সন্ধানও সুন্দর সিং দিল, অবশ্য আরও ঘা-কয়েক খাবার পর।

শের খাঁন যেখানেই থাক্, শনিবার সন্ধ্যায় কলকাতায় ফিরে আসবেই।

কলকাতার কোথায় ?

ফকির নন্দী লেনে। ছ' নম্বর ফকির নন্দী লেন।

কেন ?

ওই ঠিকানায় ওর পেয়ারের লোক আছে হুজুর।

বিস্মিত হবার কিছু নেই। এসব লোকের এ ধরণের মেয়েছেলে একটা ক'রে থাকে, তবে তাদের প্রতি এমন একনিষ্ঠ ভাব সচরাচর দেখা যায় না। সকলে কিন্তু অবাক্ হ'ল সুন্দর সিংয়ের পরের কথায়।

বাঙালী মেয়েছেলে হুজুর। সাদী-করা পরিবার। শের খাঁন তাকে নিজের কলিজার চেয়েও ভালবাসে।

মেটের বলার কায়দায় কাহিনীটা রহস্যঘন হয়ে উঠল। কয়েদীরা আরও ঘন হয়ে বসল। দু'চোখে কৌতূহলের রোশনাই জ্বেলে।

তখনই কলকাতায় খবর গেল। শাদা পোশাকে পুলিসের লোক ফকির নন্দী লেনে ব'সে রইল।

সন্ধ্যা পার হয়ে গেল. কেউ নেই। প্রায় আটটা, পুলিসের লোক উঠব-উঠব করছে, এমন সময় বাড়ীর সামনে এক রিক্‌শা এসে দাঁড়াল। আপাদমস্তক চাদর জড়িয়ে এক দীর্ঘ চেহারা নামল।

পুলিসের লোক তৈরী ছিল। বাড়ী ঘেরাও করল। প্রায় নিঃশব্দে। জনদুয়েক লোক সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল। রিভলভারের ট্রিগারে হাত রেখে।

একবার, দুবার, তিনবার। দরজার ওপার থেকে প্রশ্ন, কে ?

দোস্ত্।

দরজা খুলে গেল।

পুলিসের লোক অবাক্। কুড়ি-বাইশ বছরের এক তরুণী। কাঁচা সোনার বর্ণ। মমতাউচ্ছল দু'টি চোখ। পানের রসে রাঙা ওষ্ঠাধর। টিয়াপাখী রঙ শাড়ী দেহে জড়ানো।

তার পিছন দিয়ে দেখা গেল শের খাঁনকে।

আসন পেতে খেতে বসেছে। একেবারে বাঙালী ধরণের খাওয়া। ভাত, মাছের ঝোল, দই, মিষ্টি।

এঁটো হাতেই শের খাঁন আলমারির মাথায় রাখা পিস্তল পাড়বার আগেই পুলিসের লোক ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তার ওপরে। নিরস্ত্র লোকটাকে কাবু করতে কম বেগ পেতে হয় নি।

শের খাঁনকে নিয়ে যাবার সময় মেয়েটার সে কি কান্না। এঁটো থালার পাশে আছড়ে প'ড়ে অঝোর ধারায়।

মেট এমনভাবে বর্ণনা দিল. এসব যেন তার চোখে দেখা ঘটনা। বলার মুন্সিয়ানায় সমুদ্রের ওপারের কানাগলির

এক বিষণ্ণ কাহিনী শ্রোতাদের চোখের সামনে রংএ-রেখায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

একজন কয়েদী ব'লেই ফেলল।

তুমি এত সব কথা জানলে কি ক'রে?

মেট হাসল, মন্তর জানি, মন্তর। নইলে আর তোদের মতন দুশমন চরাতে পারি?

বলই না, জানলে কোথা থেকে?

আ রে, এই তেইশ নম্বরের কয়েদীর কেসের রেকর্ড থেকে। সাক্ষীসাবুদদের এজাহার, উকিলদের জেরা, এসব থেকে জানলাম। জেলার সেদিন বলছিল ডাক্তার সায়েবকে, ব'সে ব'সে শুনলাম।

কয়েদীরাও ব'সে ব'সে শুনল। এ ধরণের দুর্বৃত্ত প্রবৃত্তির লোক, কিংবা তার হিংস্র প্রকৃতির কথায় তারা খুব আকৃষ্ট হ'ল না। এ রকম তারা অনেক দেখেছে, অনেক শুনেছে। তারা নিজেদের জীবনেই একাধিক খুনখারাপই করেছে। একটা মানুষকে খতম করা তাদের কাছে খুব বেশী কিছু নয়।

তারা আশ্চর্য হ'ল অন্য কারণে।

একটা রুদ্র প্রকৃতির পাঠানের কোমল, সুন্দরী এক বাঙালী তরুণীর ওপর এই আকর্ষণ, এই একনিষ্ঠতা, এটাতেই তারা নতুন খোরাক পেল।

সমুদ্রের ওপারে তাদেরও মেয়েছেলে আছে। তারা এই জঙ্গলের লতার মতন, কাছাকাছি যে গাছ পায়, তাকেই জড়িয়ে ওঠে। এই মুহূর্তে তারা এদেরই কোন সহকর্মীদের সঙ্গে ঘর বেঁধেছে। বিয়ে করা বৌও দু-একজনের আছে। কিন্তু এমন অসামান্য সুন্দরী!

শের খাঁনেরকাছে সুবিধা হয় নি। দু'-একজন হৃদ্যতা করতে গিয়েছিল। এদিক্-সেদিক্ কথাবার্তা। কিন্তু ফকির নন্দী লেনের বাঙালী মেয়ের কথা বলতেই শের খাঁন হুঙ্কার দিয়ে উঠেছিল। তার মুংচোখের চেহারা দেখে তার কাছে বেশীক্ষণ ব'সে থাকতে কারও সাহস হয় নি।

সুন্দর সিং রাজসাক্ষী হয়েছিল। প্রথম দিকে শের খাঁন অপরাধ কবুল করেছিল। পুলিসের কাছে জবানবন্দীও দিয়েছিল, কিন্তু কেস আরম্ভ হতে উল্টো গাইতে সুরু করল! সে এ ব্যাপারের কিছু জানে না। পুলিস জোর-জবরদস্তি ক'রে তার জবানবন্দী নিয়েছে। ফকির নন্দীলেন আঁচড়ে ফেলেও মেয়েটির সন্ধান পাওয়া গেল না। পুলিসের অসতর্কতার সুযোগে তাকে কে সরিয়ে ফেলেছে।

বড় নামকরা ব্যারিষ্টার এল শের খাঁনের পক্ষে। ঘটনার সময়ে আসামী সেখান থেকে দুশো মাইল দূরে নিজের মেওয়া ফলের কারবারে ব্যস্ত ছিল, এমন একটা প্রমাণ করার চেষ্টা চলল। কিন্তু ধোপে টি`কল না। জেরার দমকা বাতাসে সাজানো তাসের ঘর ভেঙে পড়ল।

রায় বেরোবার দিন শের খাঁন একবার গর্জন ক'রে উঠেছিল। গুলী খাওয়া বাঘ যেমন আকাশের দিকে মুখ তুলে অন্তিম হাহাকার করে, ঠিক তেমনি ক'রে। তারপরই সামলে নিয়েছিল। সুন্দর সিংয়ের দিকে চেয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বলেছিল, বেইমান, কুত্তা কাঁহাকা। তোমকো হাম নেহি ছোড়েঙ্গে।

এসব কথা কেউ পুলিসের রেকর্ডে পায় নি। রেকর্ডে এ সব থাকে না। জেলারও বলে নি। এসব শুনেছে কলকাতা থেকে শের খাঁনের সঙ্গে আসা পুলিস অফিসারদের কাছ থেকে। যারা দিনের পর দিন কোর্ট ঘরে হাজির ছিল।

দুর্ধর্ষ একটা দানব প্রকৃতির মানুষ, কিন্তু দেখে কিছু বোঝবার উপায় নেই। সারাটা দিন অসুরের মতন খাটে। পাথর ভাঙে, ম্যানিলা রোপ পাকায়, কাঠ চেরাই করে। ক্লান্ত দেহে নিজের সেলে ফিরে আসে।

মাঝে মাঝে উৎসবের আয়োজন হয়। জেলার জেনকিন্স নিজে ব্যবস্থা করেন। নানা দেশের গান-বাজনা। প্রায় রাতভোর চলে। শের খাঁন যোগ দেয় না। চুপচাপ নিজের সেলে প'ড়ে থাকে।

যারা ডাকতে গেছে, তাদের সোজা উত্তর দিয়েছে, ভবিষ্যৎ খারাপ। বিরক্ত ক'রো না।

সময় পেলেই শের খাঁন গোল জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সাধারণ মানুষের চোখ এ ঘুলঘুলির নাগাল পাবে না। অস্বাভাবিক দীর্ঘ শের খাঁন। তার কোন অসুবিধা হয় না।

মাঝে মাঝে চঞ্চল ঢেউয়ের বুকে জেলেরা ডিঙি নিয়ে বের হয়। জাল ছড়িয়ে দেয় সমুদ্রের ওপর। টেনে টেনে তোলে রুপোর চাকতির মত একরাশ মাছ। কোনদিন ডুবুরিরা রত্নের সন্ধানে হেলানো নারকেল গাছ থেকে লাফিয়ে

পড়ে জলের নীচে। নীল সাগরের মাঝখানে কালো কালো মাথাগুলো দেখা যায়।

শের খাঁনের নজর কিন্তু এ সবের ওপর নয়। সমুদ্র পার হয়ে আরও দূরে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। সমুদ্রের ওপারে অনেক দূরে এক পরিচিত মাটি। সেই মাটির সন্ধানে শের খাঁন নিজের দৃষ্টিকে দিগন্তপ্রসারী করতে চায়।

হঠাৎই একদিন চোখে প'ড়ে গেল। শের খাঁন জানলার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। দুটি চোখে অতৃপ্ত তৃষ্ণা, সারা মুখে অশান্তির আঁচড়।

ঠিক জানলার পাশেই নামহীন এক গাছ। বড় বড় চওড়া পাতা। তার ডালে ঘন-সবুজ রংএর এক পাখী। গাছের পাতার আড়ালে চেনবার উপায় নেই, লাল টুকটুকে ঠোঁট দেখে শের খাঁন পাখীর অস্তিত্ব টের পেল।

সবুজ ঝুঁটি, কাচের মার্বেলের মতন সাদা দুটি চোখ, দু'টি পায়ে নৃত্যের ছন্দ। টিয়ার রং, কিন্তু বুলবুলির দেহ গঠন।

শের খাঁন অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

একটু পরেই পাতার ঝোপের পাশে শিসের শব্দ। ঘাড় কাত ক'রে নীচু হয়ে শের খাঁন দেখল। আর একটা, আর একটা পাখী এসে বসেছে ওদিকের ডালে।

এই প্রথম শের খাঁনের কঠিন, কঠোর মুখে হাসির ঝিলিক দেখা গেল। এদের দুজনের সম্পর্কটা আর অজানা নয়। একটু লক্ষ্য করতেই দেখতে পেল, প্রথম পাখীটার মুখে খড়কুটো।

শের খাঁন একটু স'রে এল। তাকে দেখে ভয় না পায়। বাসা বাঁধতে কোন রকম অসুবিধা না হয়। কারও ঘর বাঁধবার সময় বাধা দিলে, অনন্তকাল দোজখে পচতে হয়।

পরের দিন ভোরে উঠেই শের খাঁন জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

পাখী দুটো তার চেয়েও আগে উঠেছে। শুধু ওঠা নয়, ইতিমধ্যেই দুটো পাতা অদ্ভুত কায়দায় সেলাই ক'রে ভিতরে খড়কুটো ভরতে সুরু করেছে।

বেশীক্ষণ দাঁড়াবার সময় নেই। এখনই ডাক আসবে। প্রথমে সরকার সেলাম, তারপর নাস্তা, তারপরই কাজে লেগে যেতে হবে।

সেদিন কাজ করতে করতে শের খাঁন বার বার অন্যমনস্ক হয়ে যেতে লাগল। হাতুড়ি পাথরের ওপর রেখে চুপচাপ ব'সে রইল।

মেট চীৎকার ক'রে উঠল, এই, কি রে, দিনদুপুরে খোয়াব দেখছিস? কাজ কর্, কাজ কর্।

চমকে শের খাঁন মুখ তুলল। সবেগে হাতুড়ি তুলে পাথরের স্তূপের ওপর ঘা মারতে লাগল।

কথাটা মনে হতে নিজেই লজ্জা পেল। এ কথা যাকে বলবে সেই হাসবে। দুটো সবুজ রংএর পাখী খড়কুটো বয়ে এনে বাসা বাঁধছে, তাদের কথা ভেবে তেইশ নম্বরের কয়েদী হাতের কাজ ফেলে তন্ময় হয়ে ব'সে আছে।

মাথাটা ঝেঁকে নিয়ে শের খাঁন সোজা হয়ে বসল। দ্রুততালে হাতের হাতুড়ি চালাতে লাগল একটানা।

সেদিন সেলে ফিরেই শের খাঁন জানলায় গিয়ে দাঁড়াল। বাসা প্রায় শেষ। মাদী পাখীটা ছোট্ট শরীরটা বাসার মধ্যে ঢুকিয়ে শুধু লাল ঠোঁটটা বের ক'রে রয়েছে। আর অন্য পাখীটা কাছের এক ডালে ব'সে অনর্গল কিচির-মিচির করছে।

শের খাঁন আবার হাসল। সব জায়গায় এক খেলা। কি মানুষের সমাজে, কি পাখীদের জগতে। একজন বাসায় কায়েমী হয়ে বসে, আর একজন অর্থহীন কাকলীতে দিগন্ত ভরিয়ে তোলে।

আরও কয়েকটা দিন গেল। আরও কয়েকটা রাত।

কাজে বেরোবার মুখে জানলা দিয়ে উঁকি দিয়েই শের খাঁন থমকে দাঁড়াল।

ঘাস-পাতার ফাঁকে একজোড়া নীলাভ সাদা রঙের ডিম। মাদী পাখাটা একটু দূরে ব'সে ঠোঁট দিয়ে ডানার পালক খুঁটছে। পুরুষ পাখীটাকে ধারে-কাছে কোথাও দেখা গেল না।

আকাশে মেঘের ছায়ামাত্র নেই। ঝক্‌ঝকে নীল। উজ্জ্বল রোদে অপূর্ব দেখাল ডিম দুটো। দু হাতে দেয়াল চেপে শের খাঁন একদৃষ্টে চেয়ে রইল।

এই জন্যই বাসা তৈরির জন্য এত ব্যাকুলতা। নতুন সৃষ্টির জন্য নবনীড়ের প্রয়োজন।

সেদিন অনেকবার ডেকে সিপাই তবে শের খাঁনের সাড়া পেল।

শের খাঁন বাইরে আসতেই সিপাই সবেগে তার গালে

এক চড় লাগাল, দশ বার ডাকছি, ব্যাটার খেয়াল নেই। হাঁ ক'রে সমুদ্র দেখছে। এই সমুদ্রে চোবালে তবে নবাবের ব্যাটা জব্দ হয়।

শের খাঁনের সুগৌর গাল আরক্ত হয়ে উঠল। পাশাপাশি পাঁচটি আঙুলের দাগ ফুটে উঠল। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে শের খাঁন একটু দম নিল, তারপর জোর পায়ে সিপাইয়ের পিছন পিছন চলতে সুরু করল।

সেদিন বেশ কয়েকবার শের খান অন্যমনস্ক হয়ে গেল। মেট ধমকাতে বলল, তবিয়ত খারাপ।

তাকে টানতে টানতে মেট ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়ে হাজির করল।

চোখ টেনে জিভ দেখে ডাক্তার কি বুঝল কে জানে। বলল, ঠিক আছে। আজ বিশ্রাম।

প্রায় ছুটতে ছুটতে শের খাঁন নিজের সেলে ফিরে এল।

মাদী পাখীটা ডিমের ওপর। পুরুষ পাখীটা মুখে ক'রে কয়েকটা পোকা-মাকড় এনে মাদী পাখীটার ঠোঁটের কাছে ধরেছে।

দৃশ্যটা ঝাপ্‌সা হয়ে যেতেই শের খাঁন বুঝল, তার দুটো চোখ জলে ভ'রে এসেছে। কোর্তার হাতা দিয়ে জল মুছে ফেলল। আশ্চর্য, এ ধারার যেন আর শেষ নেই। শরীরের সব খুন বুঝি জল হয়ে চোখ দিয়ে ঝরতে সুরু করেছে।

দু' হাতে বুকটা চেপে শের খাঁন স'রে এল। যখন ডাক্তার দেখেছিল, তখন তার শরীর ঠিক ছিল, কিন্তু এই মুহূর্তে তবিয়ত খুব খারাপ বোধ হচ্ছে। দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে। মাথার মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা। মনে হচ্ছে, কে যেন কঠিন মুষ্টিতে হৃদ্‌পিণ্ডটা চেপে ধরেছে। নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে।

দেয়ালে মাথা দিয়ে শের খাঁন অনেকক্ষণ আচ্ছন্নের মতন প'ড়ে রইল।

সানকিতে রুটিগুলো প'ড়ে। লোটায় জল। শের খাঁন ছুঁলও না। এই প্রথম তার মনে হ'ল, এই নরক থেকে মুক্তি পেতে এখনও অনেক দেরি। লবণাক্ত জলের রাশি পার হয়ে আবার কি কোনদিন ফিরে যেতে পারবে দূরের সেই জনবহুল শহরে? তার রক্ত-ছিটানো সেই শহরের গলিতে-উপগলিতে? তার পঞ্জরের রাশ সেখানেই জমা করা। পাপে, তাপে, লোভে, ক্ষোভে বীভৎস জীবনের আস্বাদ পাওয়া কুৎসিত শহরে।

কিন্তু শুধু কি তাই? এই আবর্জনাময় জীবনের ঊর্ধ্বে, সে শহর আর কিছু দেয় নি শের খাঁনকে? তার আবর্ত-সঙ্কুল রক্তের তরঙ্গে শ্যামল বনানীর ছায়া ফেলে নি?

শের খাঁন আহত বন্য পশুর মতন আর্তনাদ ক'রে উঠল।

দিন তিনেক পরেই।

শের খাঁন দেয়ালে হেলান দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে-ছিল, হঠাৎ পাখী দুটোর করুণ চীৎকারে চমকে উঠল।

দুটো পাখীই বাসা ছেড়ে উড়তে সুরু করেছে। বেশী দূর যায় নি। বাসা ঘিরে চক্রাকারে উড়ছে।

কি হ'ল? দুটো পায়ে ভর দিয়ে শের খাঁন উঁচু হয়ে দেখতে গিয়েই ভ্রূ কুঞ্চিত করল। সেলের ভিতর এদিক্-ওদিক্ দৃষ্টি ফেরাল। একেবারে কোণের দিকে বড় রকমের একটা ফাটল। দু' একটা পাথরের টুকরো ফেটে চৌচির হয়ে আছে।

শের খাঁন প্রাণপণ শক্তিতে টানতেই কতকগুলো পাথরের টুকরো আলগা হয়ে গেল। পাথরের টুকরোগুলো হাতে ক'রে আবার সে জানলার কাছে ফিরে এল।

একবার, দু'বার, তিনবার। গাছের গুঁড়ি লক্ষ্য ক'রে শের খাঁন পাথরের টুকরোগুলো ছুঁড়ল। একটার পর একটা।

কাজ হ'ল। সাপটা নক্ষত্র বেগে গাছ থেকে পিছলে ঘাসের মধ্যে ঢুকে পড়ল, তারপর এঁকে-বেঁকে গভীর জঙ্গলের দিকে চ'লে গেল।

পাখীগুলো কিন্তু অনেকক্ষণ ধ'রে চেঁচামেচি করল। প্রায় আধঘণ্টা পর একটু একটু ক'রে বাসার কাছে ফিরে এল। আরও কিছুক্ষণ বাদে, মাদী পাখীটা এদিক্-ওদিক্ চেয়ে সন্ত্রস্ত পায়ে ডিমের ওপর গিয়ে বসল। পুরুষ পাখীটা রোদে ডানা মেলে ডালের ওপর ব'সে রইল।

নিশ্চিন্ত হয়ে শের খাঁন জানলা থেকে স'রে এসে দেয়ালের কাছে দাঁড়াল।

এদিকের দেয়াল জুড়ে কালো কালো রেখা। দেয়ালের ওপর শামুকের আঁচড়। শের খাঁন অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রেখাগুলো দেখল, তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে পিছু হটে সেলের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল।

মেটের কাছে নালিশ গেল। সিপাই অভিযোগ করল। ডেকে ডেকে সাড়া পাওয়া যায় না শের খাঁনের। দিনের পর দিন তন্ময় হয়ে কি যে দেখে সমুদ্রের দিকে চেয়ে। আজকাল ভাল ক'রে খায়ও না। অর্ধেক দিন রুটি-তরকারি প'ড়ে থাকে। আগে যাও বা দু'-একটা কথা বলত কয়েদী-দের সঙ্গে, মেটের সঙ্গে, আজকাল একেবারে চুপচাপ।

চোখের কোণে কালির রেখা। উদাস দৃষ্টি। অত বড় বিরাট্ দেহটা কুঁকড়ে যেন ছোট হয়ে আসছে।

পালাবার মতলব করছে না ত?

মেট হাসল। জেলার জেনকিন্স পাইপের ছাই মেঝের ওপর ঝাড়তে ঝাড়তে অবহেলায় বলল, পালাবে? কোথায় পালাবে? বে অফ বেঙ্গল সাঁতরে? ফুঃ। তা নয়, বোধ হয় অনুতাপ হচ্ছে মনে। এ রকম হয়। আ রে, ক্রিমিনাল হলেও মানুষ ত!

অনেক ভেবে-চিন্তে মেট একটা মতলব ঠিক করল। এই সেল থেকে শের খাঁনকে সরাতে হবে। একেবারে পশ্চিম দিকের কোন একটা সেলে পাঠিয়ে দিতে হবে। যে সেলের জানলা দিয়ে সমুদ্রের টুকরো নজরে আসবে না। ঘন জঙ্গলে দৃষ্টি আটকে যাবে। তা হ'লে আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কয়েদী সমুদ্রের দৃশ্য দেখবে না। সমুদ্রের ওপারের ফেলে-আসা কোন ভূখণ্ডের কথাও মনে পড়বে না।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শের খাঁন হিসাব করল। আর বোধ হয় দুটো দিন। তারপরই ডিমের খোলা ভেঙে বাচ্চারা মুখ বের করবে। মাদী পাখীটার ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই। ঘন্টার পর ঘণ্টা নিজের বুকের উত্তাপে ডিম দুটোকে চেপে রয়েছে। ঠোঁটে তার গান নেই, কোন শব্দ নয়। মাঝে মাঝে বাসা থেকে বেরিয়ে ঠিক গাছের তলায় গিয়ে নামে। খুঁটে খুঁটে মাটি থেকে কিসের দানা তুলে নেয়, তারপর আবার উড়ে এসে বসে ডিম দুটো চেপে। এই সময় পুরুষ পাখীটা ডিম দুটো পাহারা দেয়।

ভাবতে শের খানের খুব ভাল লাগে। আর দিন দুয়েক পরেই নিস্তব্ধতা ভেঙে যাবে কচি কণ্ঠের অর্থহীন কাকলীতে। এদিকটা মুখর হয়ে উঠবে।

এসব কথা ম'নে হলেই বুকের সেই প্রাণান্তকর যন্ত্রণাটা মোচড় দিয়ে ওঠে। দু' হাতে বুক চেপে শের খাঁন দেয়ালের দিকে স'রে যায়। তৃষিত চোখ মেলে রেখাঙ্কিত দেয়ালের দিকে নিষ্পলক চোখে চেয়ে থাকে।

এই তেইশ নম্বর।

সিপাইয়ের রূঢ়, কর্কশ কণ্ঠে শের খাঁনের দিবাস্বপ্ন ভেঙে গেল। বিরক্ত মুখে চোখ তুলে দেখল।

অর্ডার হয়ে গেছে। এ সেল ছাড়তে হবে। সাত নম্বর সেলে যেতে হবে। আর কালাপানি দেখতে হবে না। দিন নেই, রাত নেই কেবল জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে থাকা। দশ ডাকে তবে সাড়া মেলে। চল, চল।

কথাগুলো বুঝতে শের খাঁন বেশ একটু সময় নিল। সিপাইয়ের কথাগুলো মনে মনে আবার সে আওড়াল। একটা একটা ক'রে। থেমে থেমে। অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার দুর্বার চেষ্টায়। অর্থ যখন বুঝল, তখন তার সারা মুখ লাল টক্‌টকে হয়ে উঠেছে।

দুটো হাত বুকের ওপর রেখে বলল, নেহি।

কি নেহি।

এই সেল ছেড়ে যাব না।

আবদার নাকি? হুকুম না মানলে বিশ কোড়া, টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাব এখান থেকে।

শের খাঁন দ্রুতপায়ে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, তার পর বলল, আর দু'-তিন দিন, তারপর আমি যাব। যেখানে বলবে।

ও, লাটসাহেব। ওঁর হুকুম মত কাজ হবে। চল, চল।

সিপাই এগিয়ে এসে শের খাঁনের একটা কাঁধ ধ'রে সবলে ঝাঁকুনি দিল।

সঙ্গে সঙ্গে শের খাঁন ঘুরে দাঁড়াল। দু'টি চোখে হিংস্র বহ্নি। দাঁতে দাঁতে ঘ'ষে একটা শব্দ বের হ'ল। বজ্রকঠিন দু'টি হাত দিয়ে সিপাইয়ের গলাটা টিপে ধরল। মিনিট কয়েক, তারপরই সিপাইয়ের অচেতন দেহটা সেলের মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়ল। শের খাঁন পা দিয়ে দেহটা একপাশে ঠেলে দিয়ে ছুটে দেয়ালের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বিড় বিড় ক'রে হিসাব করল, তারপর কোণে রাখা শামুকটা দিয়ে একটা দাগ কেটে দিল।

আর বোধ হয় তিন-চার দিন। তারপর অনেক দূরের শহরের এক ঘিঞ্জি গলির ছোট্ট ঘরে একটি সন্তান জন্ম নেবে। বাঙালী মেয়ে, যার নাম শের খাঁন ভাল ক'রে উচ্চারণ করতে পারে না, কিন্তু সমস্ত দিল দিয়ে যাকে ভাল-বাসে, তার কোলে। শের খাঁনের দেওয়া নাম গুলবাহার কোলে।

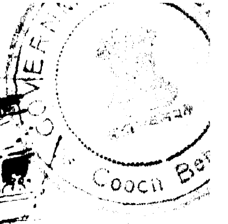
ততদিন এই সেল থেকে জীবন্ত শের খাঁনকে কেউ সরাতে পারবে না। কারণ এই সেলের বাইরে মাতার পরিচর্যা আর পিতার প্রহরায় আরও দু'টি নতুন প্রাণ পৃথিবীর আলো দেখবে। তাদের মধ্যে দিয়েই বুঝি শের খাঁনের তৃষিত পিতৃহৃদয় কিছুটা সান্ত্বনা পাবে, কিছুটা তৃপ্তি।



সাঁঝ সকালে

শ্রীসীতা দেবী





দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখনও প্রবল বেগে চলেছে। জাপানও এসে জুটেছেন। কাজেই কলকাতার অবস্থা সঙ্গীন, জাপানী বোমার ভয়ে সবাই থরহরি কম্পমান। ক্রমাগত লোক পালাচ্ছে শহর ছেড়ে, আবার বাইরে থাকার হরেক রকম কষ্ট সহ্য করতে না পেরে ফিরেও আসছে অনেকে। পুরুষদের পালাবার জো নেই, জাপানী বোমার ভয়ে পালালে চাকরি থকেবে না এবং অনাহারে মরাটা বোমার ঘায়ে মরার চেয়ে কিছু বেশী আরামদায়ক হবে না। স্ত্রী পুত্র কন্যা অনেকেই অন্য জায়গায় পাঠাচ্ছেন। তাঁরা অনেকেই কিন্তু আবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে কলকাতায় এসে বসছেন।

কলকাতার তখন হাঙ্গাম অনেক। ঝি-চাকর বেশীর ভাগ বাড়ী থেকেই পালিয়েছে। জিনিষপত্রের দাম হু হু ক'রে চড়ছে। সন্ধ্যা হ'তে না হ'তে শহর ঘুট্ ঘুট্ করছে অন্ধকারে। রাস্তায় ঘাটে আলো নেই, দোকানপাটে আলো নেই। গৃহস্থের বাড়ীর ভিতর মিট্‌মিটে আলো, টুপি পরান। দরজা-জানলা সব বন্ধ, পাছে বাইরের থেকে আলোর রেখাটুকুও দেখা যায়। সবার উপর মন সর্বদা সন্ত্রস্ত, কখন সাইরেণের বাঁশী বাজে, আর সিঁড়ির তলায় গিয়ে আশ্রয় নিতে হয়।

এ হেন সময়েও হাওড়া স্টেশনে ট্রেন যাওয়া-আসা করছে। কলকাতায় থেকে যে ট্রেণগুলি ছাড়ছে সেগুলিতে অসম্ভব ভিড়, যাত্রীরা শুয়ে-বসে বাদুড়-ঝোলা হয়ে চলেছে। যেগুলি কলকাতায় আসছে অন্য জায়গা থেকে সেগুলি অনেকটাই হাল্‌কা। সন্ধ্যার পর স্টেশন ঝিমিয়ে পড়ে, লোকজন থাকে অতি সামান্য।

এ হেন সময়ে একদিন বিকেলে একটা ট্রেণ এসে থামল প্ল্যাটফর্মে। যাত্রী নামল কিছু কিছু, কুলীরা এগিয়ে এল মোট বইবার জন্যে। যাত্রীদের আগ বাড়িয়ে নিতে দু-চারজন মানুষ এসেছিল, তারা এগিয়ে এল গাড়ির দিকে।

মেয়েদের একটা কামরা থেকে কয়েকজন মানুষ নেমে দাঁড়াল। মনে হ'ল দুটো পরিবারের লোক। একটিতে একজন প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলা, থান কাপড় পরা, মাথার চুল ছোট ক'রে ছাঁটা, পা খালি। সঙ্গে একটি অতি সুদর্শনা তরুণী এবং একটি ছোট ছেলে। আর-এক দলে একজন সধবা ভদ্রমহিলা, কপালে মস্ত বড় সিঁদুরের টিপ, খুব চওড়া লাল-পেড়ে শাড়ী পরা। এঁরও বেশ বয়স হয়েছে, চুলে পাক ধরেছে, দাঁতও প'ড়ে গেছে দু'একটা। সঙ্গে একটি বারো-তরো বছরের মেয়ে এবং প্রায় সেই বয়সেরই একটি ছেলে।

বিধবা মহিলা ট্রেন থেকে নেমেই ব্যস্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন সঙ্গিনী মেয়েটিকে, "হাঁ মা, জিতেনদের বাড়ীর কাউকে দেখতে পাচ্ছিস্? আমি ত সন্ধ্যের পর ভাল করে চোখেও দেখি না।"

মেয়েটি চারদিকে তাকিয়ে দেখে ম্লানভাবে বলল, "কই, কাউকে ত দেখছি না।"

মা ভীতকণ্ঠে বললেন, "কি হবে রে তা হ'লে মন্দা? আমরা কি ক'রে বাড়ী পৌছব? আর তাও কি কাছে বাড়ী? সেই যার নাম শ্যামবাজার!"

অন্য দলটিকে অভ্যর্থনা করতে এসে দাঁড়াল একটি

সাতাশ-আটাশ বছরের যুবক। চেহারাটা সুশ্রী, হাসিখুশী। সঙ্গে গোটা দুই-তিন চাকরের মত লোক।

সধবা মহিলাকে প্রণাম ক'রে ছেলেটি বলল, "ভাল দিন দেখে এসে পৌঁছেছ মা। একে ত কলকাতার এই অবস্থা, ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই চারদিক্ অন্ধকারে ডুবে যাবে। তার উপর পুলিশের সঙ্গে মারপিট ক'রে ট্যাক্সিওয়ালা গাড়ীওয়ালারা সব strike করেছে। হাঁটা ছাড়া উপায় নেই।"

মা বললেন, "তা না হয় তাই যাব! বেশী দূর ত আর নয়? তাই বুঝি এতগুলো চাকর-বাকর নিয়ে এসেছিস্? এই না লিখেছিলি, রসিক বাদে আর সবাই পালিয়েছে? আবার নূতন লোক রেখেছিস্ বুঝি?"

ছেলে বলল, "কোথায় পাব? এই দুজন উপর-তলার চাকর। বখ্‌শিসের লোভ দেখিয়ে নিয়ে এসেছি।"

হঠাৎ কান্নার শব্দে চমকে উঠে সবাই অন্য যাত্রিণীদের দিকে ফিরে তাকালেন। তরুণী মেয়েটি বিব্রত মুখে দাঁড়িয়ে আছে, বিধবা মহিলা ছেলেটিকে কোলে জড়িয়ে ধ'রে ডাক ছেড়ে কাঁদছেন।

সধবা গৃহিণীটি ব্যস্ত হয়ে বললেন, "কি হ'ল দিদি, কি হ'ল? অমন করে কাঁদছেন কেন?

তরুণীটি একটু ধমকের সুরে বলল, "মা, তুমি চুপ কর দেখি, এই রকম করে কেউ রাস্তা-ঘাটে? যা হয় একটা কিছু উপায় নিশ্চয় হবে। আমরা ত বাঘ-ভালুকের মধ্যে আসি নি, মানুষের মধ্যে এসেছি। কোথাও সাহায্য নিশ্চয় পাব।"

যুবকটি একটু নীচু গলায় বলল মাকে, "কোথায় যেতে হবে এঁদের?"

তরুণীটি সঙ্কোচ ত্যাগ ক'রে বলল, "শ্যামবাজারে। আমার মামার স্টেশনে এসে আমাদের নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু ট্যাক্সির অভাবে বোধহয় এসে পৌঁছতে পারেন নি।"

যুবকের মা বললেন, "তা দেখ বাবা বিকাশ, এদের এ অবস্থায় ফেলেও আমরা চ'লে যেতে পারি না। ছেলেমেয়ে নিয়ে কোথায় যাবে বেচারী?"

মন্দা জিজ্ঞাসা করল, "আমাদের waiting room-এ কি থাকতে দিতে পারে?"

বিকাশ বলল, "সম্ভব নয়। ট্রেন চলাচল বন্ধ হলেই সব waiting room-এ তালা প'ড়ে যাবে। নিতান্ত দু'চারটে পাহারাওয়ালা ছাড়া কেউ থাকে না। স্টেশন একটা প্রধান target যুদ্ধের সময়। কুলী-মজুর সব পালিয়ে যায়।"

বিকাশের মা বললেন, "এমন অবস্থায় এদের ফেলে যাই কি ক'রে? সেটা কি মানুষের কাজ হবে?

বিকাশ বলল, "হবেই ত না। চল, ওদের নিয়েই চল। বাড়ীতে জায়গা ঢের আছে। চট্‌পট্ কর কিন্তু, অন্ধকার হয়ে এল ব'লে।"

মন্দার মা এবার উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, "তুমি ধনে-পুত্রে লক্ষ্মী লাভ কর বাবা। ভগবান্ তোমার একশ বছর পরমায়ু করুন। কি বিপদ্ থেকে তুমি আমাদের রক্ষা করলে।"

মন্দা মুখে কিছু বলল না, তবে তার চোখের দৃষ্টির ভিতর দিয়ে তার মনের অনেকখানি দেখা গেল।

জিনিষপত্র খুব বেশী ছিল না। চাকর তিনজন ও বিকাশ বেশীর ভাগটাই নিতে পারল। মহিলারা এবং ছোট ছেলেমেয়েরাও যতটা পারল তুলে নিল। সবাই মিলে প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে বাইরে এসে পড়ল।

সত্যিই বাড়ীটা বেশী দূর নয়। দশ মিনিট হাঁটতে না হাঁটতেই তারা পৌঁছে গেল। মাঝারি গোছের তিনতলা বাড়ী। চাকরেরা জিনিষপত্র নামিয়ে রাখল সামনের বারান্দায়। দরজায় ধাক্কা দিতেই সামনের ঘরের একটা জানলা খুলে গেল। তার ভিতর দিয়ে একটা বারো-তেরো বছরের ছেলে মুখ বাড়িয়ে তাদের ভাল ক'রে দেখে নিয়ে দরজাটা খুলে দিল।

চারিদিক্ তখন অন্ধকার হয়ে আসছে। আগন্তুকরা সবাই জিনিষপত্র নিয়ে ভিতরে ঢুকবামাত্র দরজা-জানলা আবার সব ভাল ক'রে বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'ল। ঠোঙা পরানো আলো এধারে-ওধারে জ্বলছে বটে, তবে আলো হচ্ছে খুবই কম। তারই সাহায্যে কাজকর্ম চলছে এক রকম করে।

একটা বড় শোবার ঘরে ঢুকে বিকাশের মা বললেন, এইটা আমার শোবার ঘর ভাই। দুটো বড় খাট রয়েছে দেখছই ত? একটাতে আমি আমার মেয়েকে নিয়ে শোব, আর একটায় তোমরা তিনজন শুতে পারবে না? তোমার ছেলে ত ছোট্ট?"

মন্দা বলল, বেশ পারব, কোন অসুবিধা হবে না। আপনার ছোট ছেলে কোথায় শোবে ?"

"ও বিকাশের সঙ্গে তার ঘরে শোবে এখন। আচ্ছা বাছা, এবার হাত-মুখ ধোও দেখি তোমরা, আমি দেখি ওদিকে রান্নাঘরে কি ব্যবস্থা করেছে ওরা। দুটো ভাতে ভাত ত অন্ততঃ ফুটিয়ে নিতে হবে।"

মন্দা ব্যস্ত হয়ে বলল, "আবার রান্না-বান্নার কি দরকার মাসীমা ? আমাদের সঙ্গে যা খাবার আছে, তাতেই রাত্তিরের মতো হয়ে যাবে।"

বিকাশের মা তার কথা উড়িয়েই দিলেন, বললেন, "ওমা, তাই আবার হয় নাকি ? আমরা সব মাছ-ভাত খেতে বসব আর তোমরা ভাইবোনে জল খেয়ে থাকবে, তা হয় না। যা আছে সবাই ভাগ করে খাব।"

অতিথিদের বাথরুম দেখিয়ে দিয়ে তিনি রান্নাঘরে চলে গেলেন। তাঁর ছোট ছেলেমেয়ে দুজন বিকাশের পিছন পিছন তার ঘরে গিয়ে হৈ-চৈ আরম্ভ করল।

মন্দা দেখল ছোট ভাই প্রায় ঘুমিয়ে পড়বার জোগাড় করছে। সে তাড়াতাড়ি বিছানা খুলে খাটে পেতে তাকে শুইয়ে দিল। মাকে বলল, "তুমি হাত-পা ধুয়ে কাপড় ছেড়ে ফেল মা। একটা যা হোক কিছু মুখে দিয়ে জল খেয়ে নাও।"

মন্দার মা অত্যন্ত অবসন্নের মত বসেছিলেন এতক্ষণ। মেয়ের কথায় উঠে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে এলেন। ছেলের পাশে বসে তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, "আমি আজ আর কিছু গিলতে পারব না বাবা, একটু বাতাসা ভিজিয়ে সরবৎ করে দে, তা হ'লেই হবে। হাত-পা আমার পেটের ভিতর সেঁধিয়ে গিয়েছিল বাছা, পায়ের তলায় যেন মাটি ছিল না। ভগবান্ রক্ষে করলেন তাই, নইলে ছেলেমেয়ে নিয়ে কোথায় যেতাম আমি ?"

মন্দা ট্রাঙ্ক থেকে নিজের শাড়ী জামা ইত্যাদি বার করে স্নানের ঘরে ঢুকে গেল। মা অত্যন্ত ভয় পেয়েছেন, তাঁকে আরো বেশী ভড়কে দিয়ে লাভ নেই। নইলে মন্দা ত জানে যে দুর্ভোগের এখনও কিছু অবসান হয় নি। একটা রাতের মত সেটাকে একটু ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে মাত্র। কাদের সঙ্গে, কাদের বাড়ীতে এসে উঠেছে তারা, কিছুই জানা নেই। বিকাশের মুখটা মানসনেত্রে ভেসে উঠল। না, এমন মুখ যার, সে কখনও মন্দ হতে পারে না, প্রতারক হতে পারে না। তার মাও মানুষ খুব সরল আর ভাল, সারা পথ কত গল্প করেছেন, কত রকমে তাদের সাহায্য করেছেন। সবচেয়ে বড় কথা যে তারা এখন নিরুপায়, এঁদের বিশ্বাস করা ছাড়া কিছু করবার নেই।

স্নানের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মন্দা মায়ের জন্যে সরবত করে দিল। তারপর জিনিষপত্র যথাসাধ্য গুছিয়ে রেখে মায়ের পাশে গিয়ে বসে রইল।

হঠাৎ অতিথি এসে পড়ায়, জোগাড়-জাগাড় করে রান্না-বান্না শেষ করতে একটু দেরিই হ'ল। তবে বহুকালের পাতা সংসার, খুব একটা অসুবিধায় পড়তে হ'ল না। দিন-কাল ভাল নয় বলে গিন্নীর নির্দেশ ছিল, বাড়ীতে চাল ডাল, ঘি, তেল, অল্পস্বল্প তরিতরকারি সর্বদাই মজুত থাকবে, কাজেই হয়ে গেল একরকম করে।

সারাদিনের প্রায় উপবাসের পরে গরম গরম ভাত-তরকারি পেয়ে মন্দা এবং তার ছোট ভাই যেন বেঁচে গেল। মা সেই উপবাসীই রইলেন ব'লে মন্দা দুঃখবোধ করতে লাগল। যা হোক্, তিনি ত আর চাকরের রান্না খাবেন না ? রাত্রে ভাতও খাবেন না, কি আর করা ?

সবাই অতঃপর যে যার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। দারুণ দুশ্চিন্তায় মন্দার ঘুম একেবারেই এল না, যদিও সে খুবই ক্লান্ত ছিল। ছোটখোকা অকাতরে ঘুমোতে লাগল। মন্দার মা শুয়ে-ব'সে, খানিক জেগে, খানিক ঘুমিয়ে রাতটা কাটিয়ে দিলেন।

ভোর হতেই সবাই উঠে পড়ল। এ বাড়ীর লোকেরা উঠে কাজকর্ম আরম্ভ করল। চায়ের ব্যবস্থা এদের সকাল সকালই হয়, সুতরাং একটু পরেই ডাক পড়ল। এরা কিছু আধুনিক ভাবে চলে, টেবিলে ব'সে খায়, এবং স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে একসঙ্গেই খায়। মন্দার মা অবশ্য আলাদা চা ক'রে রান্না-ঘরে বসে খেলেন, তবে খাওয়া হতেই উঠে এসে ছেলেমেয়ে-দের পাশে দাঁড়ালেন। বিকাশকে দেখেই বললেন, "এরপর আমাদের একটা গতি করে দাও বাবা। কাউকে দিয়ে আমাদের শ্যামবাজারে পাঠিয়ে দাও।"

বিকাশ বলল, "নিশ্চয়, আমি এখনই ব্যবস্থা করছি। আমার যে আবার অফিস, নইলে আমি নিজেই যেতে পারতাম। তবে আমাদের পুরোণো চাকর রসিক যাবে আপনাদের সঙ্গে, ও কলকাতা, বিশেষ ক'রে পুরণো কলকাতা, আমাদের সকলের চেয়ে বেশী চেনে"।



আপনি একটুও সঙ্কোচ বোধ করবেন না।

মন্দার মুখটা একেবারে শাদা হয়ে গেল। আস্তে আস্তে বলল, "আরো যে সমস্যা রয়েছে সামনে।"

বিকাশের মা বললেন, "বল, আর কি সমস্যা? তারও ব্যবস্থা করতে হবে ত?"

মন্দা বলল, "ও ঘরে চলুন, বলছি।" চাকর-বাকর ছেলে-পিলেদের মধ্যে কথাটা আর ভাঙল না।

বিকাশ আর তার মা, মন্দা এবং তার মা শোবার ঘরে এসে দাঁড়ালেন। মন্দা মাথা নীচু করে বলল, "আমরা একেবারে কপর্দকশূন্য অবস্থায় এসে পড়েছি। কথা ছিল মামা স্টেশনে এসে নিয়ে যাবেন আমাদের, তারপর সম্প্রতির মত ব্যবস্থা যেমন হয় তিনিই করবেন। এ ভাবে কেউ পথে বেরোয় না, কিন্তু পাটনায় আর থাকা আমাদের সম্ভব ছিল না, তাই কোনরকমে আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে এসে পড়বার চেষ্টায় খালি হাতেই চলে এসেছি। আমরা একেবারে সহায়-সম্বলহীন।

মন্দার মা আবার চোখ মুছতে আরম্ভ করলেন। মন্দারও চোখ জলে ভরে উঠেছিল, সে প্রাণপণ চেষ্টায় সেটা গড়িয়ে পড়তে দিল না।

বিকাশ তার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে বলল, "তার আর কি, সম্প্রতি যা দরকার তা এখান থেকে নিয়ে যান। ক'টা টাকা দরকার বলুন, আমি দিয়ে দিচ্ছি। আপনি ঠিকানা নিয়ে যান, পরে পাঠিয়ে দেবেন এখন, এতে আর কি অসুবিধা? আপনি একটুও সঙ্কোচ বোধ করবেন না।"

মন্দার মাথাটা আর ওঠেই না। তেমনি মুখ নীচু করে বলল, "গোটা পনেরো লাগবে বোধহয়। অতদূরে যাওয়ার ট্যাক্সিভাড়া আছে, তারপর মামার বাড়ী গিয়ে কি অবস্থা দেখব জানি না। কাল তাঁরা কোন খোঁজ না নেওয়ায় ভয় করছে।"

মন্দার মা বললেন, "কি জানি এ কি গ্রহের ফের। সেখানেও যদি কিছু অঘটন ঘটে থাকে ত কোথায় দাঁড়াব আমি? হে মধুসূদন, এ কি অগাধ জলে ফেললে!"

মন্দা বলল, "কেঁদে কি হবে মা? মামার বাড়ীটা ত নিজের? সেটা চার-পাঁচ দিন আগেও যখন তাঁদের ছিল, এরি মধ্যে উবে যেতে পারে না? উঠি ত আগে সেখানে গিয়ে, তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে। আরো দু'-চারজন আত্মীয়-স্বজন আছেন ত? আপনি আপনার চাকরকে বলে দিন মাসীমা, আর একটা ট্যাক্সি ডাকিয়ে দিন। আমি বিছানাটা বেঁধে নিই।"

বিকাশ বলল, "আপনাকে বাঁধতে হবে না, আমি ঠিক করে দিচ্ছি। আর এই টাকাটা রাখুন।" সে দু'খানা দশ টাকার নোট বাড়িয়ে ধরল।

মন্দা ম্লানমুখে টাকাটা নিয়ে নিজের হাণ্ডব্যাগে রাখল। বলল, "আমার সকালে স্নান করা অভ্যাস, ট্যাক্সি আসতে আসতে আমি ঝট্ করে স্নানটা করে নিই," বলে প্রায় ছুটে স্নানের ঘরে চলে গেল। বিকাশের সামনে থেকে স'রে যাওয়া তার একান্ত দরকার হয়েছিল।

বিকাশ একটা চাকর ডেকে মন্দাদের বিছানাটা বাঁধিয়ে দিল। তারপর সে চেয়ে দেখল ঘরে সে নিজে ছাড়া আর কেউ নেই। পকেট থেকে নিজের wallet-টা বার করে একখানা ১০০৲ টাকার নোট মন্দার ব্যাগের সব নীচে গুঁজে রেখে দিল। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অতঃপর ট্যাক্সি এল, জিনিষপত্র উঠল, যাত্রী তিনজনও এসে বাইরে দাঁড়াল। বিকাশের মা মন্দার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "কিছু ভেবো না মা, সাহস করে চলে যাও। ঠিকানাটা লিখে নিয়েছ ত? গিয়ে একখানা পোষ্টকার্ড লিখে দিও। কিছু দরকার হলেই জানিও, মনে ক'রো আমি নিজেরই মাসীমা।"

"আর-জন্মে মায়ের পেটের বোনই ছিলে ভাই" ব'লে মন্দার মা কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে ট্যাক্সিতে উঠলেন। মন্দা বিকাশকে নমস্কার করল, তার মাকে নমস্কার করল, তারপর মায়ের পাশে গিয়ে বসল। রসিক বসল ড্রাইভারের পাশে গিয়ে।

যতক্ষণ ট্যাক্সিটা দেখা গেল, বিকাশ ততক্ষণ ফুটপাথে দাঁড়িয়ে রইল। মন্দাও মুখ বার করে পথের দিকে চেয়ে রইল। একটা মোড় ঘুরে ট্যাক্সিটা আর এক রাস্তা ধরল। মন্দা তখন আবার সোজা হয়ে ব'সে গাড়ির ভিতরের আরোহীদের দিকে তাকাল। একটি দীর্ঘশ্বাস যেন বুকের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছিল, কিন্তু জোর করে সেটাকে সে চেপে ফেলল।

রসিক শ্যামবাজার চেনে বটে। কিছু ঘোরাঘুরি করতে হ'ল না, একরকম সোজা গিয়েই তারা গন্তব্যস্থানে পৌছল। মন্দা বলল, "তুমি ত রাস্তা-ঘাট খুব চেন দেখি।"

রসিক বলল, "তা আর চিনব না দিদিমণি? এ পাড়ায় কতদিন কাজ করেছি।"

সবাই নেমে পড়ল, জিনিষপত্র নামান হতে লাগল। মন্দা সদর দরজায় ঠক্‌ঠক্ ক'রে ঘা দিল। প্রথমবারে কোন সাড়া মিলল না, দ্বিতীয়বার আরো জোরে ধাক্কা দিতে, ভিতরে পায়ের শব্দ শোনা গেল, এবং কে একজন কাশতে কাশতে এসে দরজাটা হড়াৎ করে খুলে দিল।

মন্দার মা সামনের কম্বল-জড়ান মূর্তিকে লক্ষ্য করে বললেন, "কিরে যদু, সাত-সকালে কম্বল মুড়ি দিয়েছিস্ কেন? আর বাড়ীতে কেউ নেই নাকি? সব খাঁ-খাঁ করছে।"

এঁদের কথার মধ্যে বাধা দিয়ে রসিক বলল, "আমি তা হ'লে চলি দিদিমণি। আমার একটু তাড়া আছে" বলে অবনত হয়ে একটা নমস্কার জানিয়ে সে হন্ হন্ করে চলে গেল।

জিনিষপত্র ট্যাক্সিচালক ও যদুর সাহায্যে ভিতরে ঢুকিয়ে মন্দা ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে দিল। তারপর মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, "ব্যাপারটা কি বুঝতে পারছি না ত? কেউ নেই কেন?"

যদু আর একপালা কাশতে ব্যস্ত ছিল। কোনোমতে দম নিয়ে বলল, "কি বলব বল দিদি। চারদিকে যে কি বিপদ, কোথা দিয়ে কি করি? কেউ কি আছে বাড়ীতে? এই যেদিন তোমরা তার পাঠালে আসছ বলে, তার পরদিনই খবর এল বিষ্ণুপুর থেকে, মায়ের বাবা যায় যায়। আর থাকে তেনারা? সেই রাত্তিরের গাড়িতেই চলে গেল। আমায় শুধু ব'লে গেল তোমরা সোমবার এসে পৌছচ্ছ, যেন ইষ্টিশানে গিয়ে নিয়ে আসি।"

মন্দা বলল, "তা তুমিই বা গেলে না কেন? ট্রামে-বাসে ত যেতে পারতে?"

"যাব কি দিদিমণি? পরশু থেকে সে কি ধুম জ্বর!

আমার ম্যালেরিয়া আছে জান ত? একেবারে বেহুঁস হয়ে গিয়েছিলাম। পাশের বাড়ীর শশী এসে মুখে-মাথায় জল দেয়, তবে আমি চোখ তাকাই। আজ ত সবে উঠে দাঁড়িয়েছি। তা তোমরা আজ এলে ভালই হ'ল। বাড়ী ত চিনেছ ঠিক। আমি বলে ভেবে মরি যে অবলা মানুষ, একলা একলা কি করে জায়গা চিনে আসবে।"

মন্দার মা বললেন, "ভেবে ত সব করলে বাছা! এতদিন এ পাড়ায় রয়েছ, সকলের সঙ্গে চেনা-শোনা, একটা কাউকে বলে-কয়ে পাঠাতে পারলে না ইষ্টিশানে? আজ আসব কেন, কালই এসেছি আমরা, কাউকে না দেখে ভয়ে আমার নাড়ি ছেড়ে যায় আর কি? ভগবান্ রক্ষে করলেন তাই।"

যদু মাথায় হাত দিয়ে বলল, "হেই মা, কি বিপদ্ দেখ ত? তখন কি করলে?"

মন্দা অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল, বলল, "এখন ও সব বক্তৃতা রাখ বাপু। যা হয়ে গেছে, তা ত হয়েই গেছে। এখন জিনিষপত্রগুলো ধরাধরি করে ঘরে তোল দেখি। গুছিয়ে একটু বসি। আমি ত স্নান করেই এসেছি, তোমরা এরপর সেরে নাও। আর খাওয়া-দাওয়ার কি হবে? বাড়ীতে আছে কিছু? যদু ত নিশ্চয়ই জ্বরের মধ্যে রান্নাবাড়া করে নি।"

যদু বলল, "আমার যা হাল হয়েছিল, তা যদি দেখতে গো। ও বাড়ীর থেকে দু' দিন দু'বাটি সাবু দিয়েছে, তাই খেয়ে জীবন ধারণ করেছি। ভাঁড়ারে চাল, ডাল, আটা, তেল, ঘি সব আছে, দুটো যদি ফুটিয়ে নাও কোনমতে।"

মন্দার মা ঘরের মধ্যে জিনিষপত্র সব সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখতে রাখতে বললেন, "তা না হয় ফুটোলাম। তা শুধু চাল-ডালেই হবে? তরকারি-পাতি একেবারে কিছু নেই? দুটো আলুও নেই?"

যদু বলল, "কিছুটি নেই মা। সেই কবে বাজার করেছি, এতদিন কি থাকে? আর আমাদের মা ঠাকরুণকে ত জান, কখনও ছ' আনার বেশী আট আনা দিবে নি। তা পয়সা দাও যদি তা হ'লে মোড়ের দোকান থেকে আলু পেঁয়াজ কুমড়ো এনে দিতে পারি। আজ পেটে দুটো ভাত পড়লে, কাল বাজার যেতে পারব।"

মন্দা বলল, "তাই আন বাপু, ভাতে-ভাত যা হয় কিছু ত খেতে হবে? মায়ের এই দু'দিন উপোস চলছে! মা, তুমি যাও স্নানটা সেরে এস, আমি দেখি গোটা কয়েক পয়সা বোধহয় হ্যাণ্ডব্যাগে আছে, তাই দিয়ে যদুকে দোকানে পাঠাই।"

মন্দার মা স্নান করতে গেলেন, তাঁর ছোট ছেলে বাড়ীঘর তদারক করে বেড়াতে লাগল। পয়সা বার করবার ইচ্ছায় মন্দা হ্যাণ্ডব্যাগটা একটা টেবিলের উপর উপুড় করতেই ঠক্ ক'রে একটা ভাঁজকরা নোট পড়ে গেল। অবাক্ হয়ে সেটা তুলে ধরল মন্দা, একশ টাকার নোট!

অনেকক্ষণ সেটা হাতে নিয়ে চুপ করে বসে রইল। দুই চোখ তখন জলে ভরা। ফিরিয়েই দেওয়া উচিত হয়ত। কিন্তু ভবিষ্যৎ যে বড় অনিশ্চিত। কিছুদিন অপেক্ষা করতেই হবে। কয়েক আনা পয়সা খুঁজে পেতে বার করে সে যদুকে দোকানে পাঠিয়ে দিল।

মন্দার মা স্নান সেরে এসে তাড়াতাড়ি উনুন ধরালেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই যদু কিছু তরি-তরকারি নিয়ে এল। সাদাসিধে রান্না শেষ হতে বেশী দেরি হ'ল না। ভাঁড়ারে কয়েক শিশি আচার ছিল, সেগুলো কাজে লাগল।

মন্দার বিষণ্ণ ম্লান মুখের দিকে তাকিয়ে তার মা একবার বললেন, "অত ভাবছিস্ কেন বাছা? দেখলি ত কাল কেমন ডুবতে ডুবতে ত্রাণ পেলাম? ভগবান্ কি আর আমাদের একেবারে ভুলে গেছেন?"

মন্দা বলল "নিজের পায়ের উপর যে মানুষ দাঁড়াতে না পারে মা, ভগবান্ কি চিরদিন তাকে রক্ষা করেন? তা হ'লে কি আর দেশে এত দুঃখী মানুষ থাকত?"

তার মা বললেন, "তা ঠিক বাছা। দেখি, জিতেন ফিরুক, তখন একটা কিছু উপায় হবেই। কয়েকটা দিন চালাতে পারবি না?"

মন্দা বলল, "চালাতেই হবে।"

নূতন জায়গায় আস্তানা গাড়লে কাজকর্ম্ম কিছু থাকেই। কাজেই দিনটা তাদের এক রকম ক'রে কেটেই গেল।

পরদিন তার মামা জিতেনের একটা চিঠি এসে পৌঁছল, যদুর নামে। তাতে জানা গেল যে তাঁর শ্বশুর মারা গেছেন, দুদিন আগে। চতুর্থীর শ্রাদ্ধ ক'রে, শাশুড়ীকে সঙ্গে নিয়ে তাঁরা যথাসম্ভব শীঘ্র ফিরছেন। মন্দারা নিরাপদে এসে পৌঁছেছে কি না সে বিষয়েও একটু উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

মন্দার মা বললেন, "এই নাও এখন। বারো উপোসীর ঘরে তেরো উপোসীর নেমন্তন্ন! জিতেনের ত এই দশা, না চাকরি, না বাকরি। তবু শুধু দুজন ব'লে বাড়ীভাড়ার টাকায় চালিয়ে নিচ্ছিল। এখন শাশুড়ী বিধবা হলেন, তাঁকে কিছু ফেলতে পারবে না। তার উপর আমি এসে জুটলাম, মায়ের পেটের বোন, ছেলেমেয়ে নিয়ে, আমাকেই বা কোথায় ফেলে?"

মন্দা বলল, "কারও ঘাড়ে ব'সে খাব কেন আমরা? খোকা না হয় ছোট, আমি ত বড় হয়েছি, লেখাপড়া শিখেছি, আমি খেটে খাব। মানুষে ঘরে বসেও কত রকমে রোজগার করে, তুমিও কিছু পারবে। মামা এসে খালি উপায়গুলো যদি ব'লে দেন তা হ'লেই ঢের হয়।"

মা বললেন, "তিনচার দিনের মধ্যেই আসছে ত? দেখি কি বলে? বাড়ী ত বেশ বড়, থাকার জায়গাটা ত পাব? আবার শাশুড়ী আসছেন, তিনি কেমনধারা মানুষ কে জানে?"

যদু এসে বলল, "একখানা পুষ্টকার্ড থাকে ত দাও দিদিমণি। বাবুকে একখান পত্তর দিয়ে দি।"

মন্দা পোষ্টকার্ড বার করে দিল। মনটা তার সারাক্ষণই ভার হয়ে আছে। বিকাশের মা পৌছে চিঠি দিতে বলেছিলেন তা সে পারে নি। ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে কি লিখবে সে? বিকাশের মুখ মনে হলেই তার যেন মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছা করে।

২

কলকাতার শহরের চেহারা কিছু বদলায় না বিশেষ, যদিও শেষের ঘটনাগুলোর পর বাইশ-তেইশটা বছর কেটে গেছে। আরও লোক বেড়েছে, পথে-ঘাটে খানাখন্দ বেড়েছে, নোংরা আবর্জ্জনাও বেড়ে থাকবে। মানুষ বাড়লেই জঞ্জাল বাড়ে। মানুষের আর্থিক দুর্গতি অনেক বেড়েছে, কিন্তু বেহিসাবী খরচ কমে নি। বিয়ে বৌভাত, পূজা-পার্ব্বণে তারা সমানে পয়সা ওড়াচ্ছে, তারপর বৎসরের বাকি দিনগুলো ঋণ ক'রে, কান্নাকাটি ক'রে কাটিয়ে দিচ্ছে।

উত্তর কলকাতার একটা বড় রাস্তার উপরে মাঝারি-গোছের বাড়ী। ডেকোরেটরের লোক এসে গেট সাজাচ্ছে। ঠেলাগাড়ি করে চেয়ার একরাশ এনে ফুটপাথে নামান হ'ল। দুটো রিক্‌শায় চড়ে দুজন পাচক বামুন অতিকায় কতগুলি হাঁড়ি কড়া, পিতলের গামলা প্রভৃতি নিয়ে দেখা দিল। বোঝাই যাচ্ছে, বাড়ীতে একটা শুভ উৎসব আসন্ন।

বাড়ীর ভিতরেও সোরগোল চলেছে। বালকবালিকা আর নারীকণ্ঠের কলরবে চারদিক মুখর। ঘর-দোরগুলি দেখে বোঝা যাচ্ছে যে বাড়ীটা শুভকর্ম্ম উপলক্ষ্যে ভাড়া করা হয়েছে, বারমাস থাকার জায়গা নয় এটা। একখানি ঘর অতি সুসজ্জিত, নূতন ঝক্‌ঝকে আসবাবপত্রে ঘর ভরা, খাটের উপর একটি সুন্দরী তরুণী বসে আছে, সে যে নববধূ তা তার সাজপোশাক, নম্রসলজ্জ মুখচ্ছবি সকলকেই জানিয়ে দিচ্ছে। এই ঘরে রাজ্যের বালিকা আর তরুণীর দল ভিড় করে আছে। গিন্নীবান্নির দল ভঁাড়ার ঘর থেকে ক্রমাগত ডাকাডাকি করছেন, কিন্তু কাউকে নড়াতে পারছেন না।

একজন মহিলা এবার ঘরের ভিতর ঢুকে বললেন, "এইবার নড়া ধ'রে সব ক'টাকে টেনে নিয়ে যাব, খালি বকর বকর করছে, কাজের সঙ্গে নাম নেই। বলি পানগুলো যে সাজতে বললাম তার কি হ'ল! সব কাজ কি আমরা বুড়ীরাই করব?"

একটি পনেরো-ষোল বছরের মেয়ে বলল, "মাসীমার ঐ এক কথা। বুড়ী ত কত! আসলে আমাদের দলে যোগ দেবার জন্যেই একটা ছুতো করে এসেছ।"

আর একটি মেয়ে বলল, "আচ্ছা মন্দামাসী, তুমি কি ছোট থেকেই এ রকম নিদারুণ কাজের মেয়ে? কখনও স্ফূর্ত্তি করার জন্যে ফাঁকি দাও নি?"

মন্দাকিনী বললেন, "সে সুযোগ আমার হ'ল কই? ছোট থেকেই ত আমি বাড়ীর গিন্নী? মা শুদ্ধ আমার মুখ চেয়ে বসে থাকতেন। ফাঁকি আর কাকে দেব? নিজেকে ত আর নিজে ফাঁকি দেওয়া যায় না?"

প্রথমা মেয়েটি বলল, "মাসীমার মত আদর্শ নারীর পাল্লায় পড়লে বড় বিপদ্ হয়। কোথাও কোন খুঁৎ নেই। এমন কি অল্প বয়সেও নাকি উনি ছেলেমানুষী করতেন না, সাজগোজ করতেন না।"

মন্দাকিনী বললেন, "অবসর কোথায় পেলাম বল্? অল্প-বয়সে বাবা পথে বসিয়ে দিয়ে মারা গেলেন, তখন থেকে সংসার মাথায় ক'রে চলতে চলতে বুড়িয়ে গেলাম। অত ভাবন করবার সুযোগ আর কই হ'ল?"

ভাঁড়ার ঘর থেকে আবার তাড়া এল। মন্দাকিনী এবার দু'তিনজন মেয়েকে ধরে নিয়ে প্রস্থান করলেন। ভাঁড়ার ঘরের কাজ আরো প্রখর বেগে চলতে লাগল।

চটি ফটফট্ করতে করতে এক মোটা-সোটা প্রৌঢ় ভদ্রলোক ভাঁড়ার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। নিজের গৃহিণীকে ডেকে বললেন, "একটু চা আর জলখাবার বাইরের ঘরে পাঠিয়ে দাও ত।"

গৃহিণী বললেন, "কে আবার এল দুপুরবেলা চা খেতে? আমার বলে এখন মরবার সময় নেই।"

কর্ত্তা বললেন, "আরে নূতন বেয়াই এসেছেন, তাঁকে একটু খাতির করতেই হয়।"

মন্দাকিনী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমি দিচ্ছি সব ঠিক করে মুখুজ্জে মশায়। আমিই নিয়ে যাচ্ছি। তোমার নূতন বেয়াইকে দেখবার সখ আমার ভয়ানক, নামটা শুনে অবধি।"

"নামের মধ্যে আবার কি মহিমা পেলে? তা যাই পেয়ে থাক, চা নিয়ে চল তাড়াতাড়ি। তুমিও তাঁকে দেখবে, তিনিও তোমায় দেখবেন, দুজনেই তুষ্ট হবে বোধ হয়। আমিও এমন রূপসী শ্যালিকাকে দেখিয়ে গর্ব্ব অনুভব করব।"

গৃহিণী তাড়া দিয়ে বললেন, "ভদ্রলোককে একলা বসিয়ে রেখে এখন শালীর সঙ্গে রসিকতা করতে হবে না, তুমি যাও দেখি এখান থেকে, মন্দা যাচ্ছে পাঁচ মিনিটের মধ্যে।"

কর্ত্তা আবার চটির শব্দ করতে করতে ফিরে গেলেন বাইরের ঘরে। আগন্তুক ভদ্রলোকের চিন্তিত মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "মেয়েটিকে পরের ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে বড় মুষড়ে পড়েছেন দেখছি। চিন্তা কি? কলকাতাতেই রইল, ইচ্ছা করলে দুবেলা দেখে যেতে পারবেন। আর আমার এখানে কোন অযত্ন হবার সম্ভাবনা নেই। আমার ঘরের লক্ষ্মী, প্রথম বৌ।"

মেয়ের বাবা একটু ক্লিষ্ট হাসি হেসে বললেন, "সে কি আমি জানি না? আমার এখন যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে কোন অচেনা বাড়ীতে মেয়ের বিয়ে দিতে আমি সাহসই করতাম না। আমাদের দেশ এখন শিক্ষায় সংস্কৃতিতে যতই অগ্রসর হয়ে থাক্, মেয়ের বাবা হওয়া এখনও একটা অপরাধ বলেই গণ্য হয়। আর আমি ত আরও নানাদিক্ দিয়ে অপরাধী ব'লে প্রমাণিত হব। তাই আমি ছেলে যত না দেখেছি, ছেলের বাবা তার চেয়ে বেশী করে দেখেছি। জানি, আপনি আমায় ক্ষমা করবেন, ত্রুটি আমার যতই হোক্।"

ছেলের বাবা বললেন, "ভয় ধরিয়ে দিলেন যে মশায়, কিছু একটা বিভ্রাট ঘটেছে বলে মনে হচ্ছে যেন।"

বিকাশবাবু পকেট থেকে একতাড়া নোট বার করলেন। বললেন, "আজ আপনাকে আমার হাজার টাকা চুকিয়ে দেবার কথা ছিল। কিন্তু আজও আমি সব টাকা জোগাড় করতে পারি নি, পাঁচশ টাকা এনেছি। বাকিটার জন্যে আমাকে আরও এক সপ্তাহ সময় দিতে হবে।"

গৃহস্বামী হাত বাড়িয়ে নোটগুলো নিলেন বটে, তবে তাঁর মুখটা খানিকটা চিন্তান্বিত হয়ে পড়ল। বললেন, "তাই ত, এ ত ফ্যাশাদে পড়া গেল দেখছি। আমি বেশী ত চাই নি, সে ত আপনি জানেনই? নিতান্ত এই বৌভাতের খরচের কিছুটা। কাল যে আবার নানা জায়গায় আমি কথা দিয়ে রেখেছি টাকা দেব ব'লে। বাড়ীর ভিতর ওঁরা আবার ঘাবড়ে না যান। টাকাকড়ির গোলমালকে উনি আবার বড় অপছন্দ করেন।"

বিকাশ বললেন, "আমার প্রাণপণ চেষ্টা আমি করছি, দু'তিন দিনের মধ্যে হয়েও যেতে পারে। কোনমতে একটা দিন আপনি কাটিয়ে দিন। আপনার বাড়ীতে মেয়ে দিয়ে আমি ধন্য হয়েছি, এই সুন্দর সম্পর্কের মধ্যে কোথাও যেন বেসুর না বাজে।"

দরজার বাইরে একটি মানুষ এতক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হাতে ছোট্ট ট্রেতে সাজান জলখাবার আর চা। ভিতরের কথাগুলো তাঁর কানে এসে যেন তাঁর পা দুটো আড়ষ্ট করে দিয়েছিল। এরকম লুকিয়ে কারো কথা শোনা ভদ্রসমাজের নিয়ম নয়, কিন্তু কিছুক্ষণের মত তিনি যেন পাথর হয়ে গিয়েছিলেন।

বিকাশ থামতেই তাঁর যেন সম্বিৎ ফিরে এল। অল্প একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে মন্দাকিনী বললেন, "মুখুজ্জে মশাই, চা এনেছি আমি।"

কর্ত্তা উঠে পড়ে বললেন, "এস, এস, ভিতরে এস।"

মন্দাকিনী ভিতরে ঢুকলেন। সামনে তাকিয়ে দেখলেন ভাল করে। সেই মানুষ সন্দেহ নেই, শুধু কিছু ক্লিষ্ট, কিছু চিন্তাজীর্ণ। আস্তে ট্রেটা নামিয়ে টেবিলের উপর রাখলেন।

কর্ত্তা বললেন, "এই যে আমার শ্যালিকা শ্রীমতী মন্দাকিনী দেবী। আর মন্দা, ইনি আমার বেয়াই বিকাশ মৈত্র।"

মন্দাকিনী বিকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমাকে চিনতে পেরেছেন ত?"

বিকাশ একটা নমস্কার করে বললেন, "না, চেনার কোন সম্ভাবনা নেই।"

গৃহকর্ত্তা বললেন, "ও কি, তোমাদের আগে পরিচয় ছিল নাকি? কই, একথা আগে ত কিছু শুনি নি?"

বিকাশ বললেন, "পরিচয় খুবই ছিল, যদিও মাঝে বহু বৎসর কোন খোঁজই রাখতে পারি নি। সেটা আমারই দুর্ভাগ্যের জন্য ঘটেছিল।"

মন্দাকিনী বললেন, "আমার দিকে শুধু দুর্ভাগ্য নয়, অপরাধও থেকে গেছে।"

কর্ত্তা বললেন, "নিন মশাই, চা-টা ত খান। আপনাদের হেঁয়ালী আমি কিছু বুঝতে পারছি না। পরে না হয় শুনব, যদি দয়া করে বলেন।"

মন্দাকিনী বললেন, "সে না হয় বলা যাবে সময় মত। এখন অত সাতকাণ্ড রামায়ণ শুনতে গেলে আপনার ধৈর্য্য থাকবে না। তা ছাড়া বিকাশবাবুর সঙ্গে আমার একটু কাজের কথাও আছে।"

বিকাশ মন্দাকিনীর দিকে একবার তাকিয়ে বললেন, "বলুন।"

মন্দাকিনী বললেন, "আমি অভদ্রের মত বাইরে দাঁড়িয়ে আপনাদের অনেকগুলো কথা শুনে ফেলেছি। সেটা মার্জনা করবেন। কিন্তু আপনার যে একটা বড় ভুল হয়ে গেছে, বিকাশবাবু? ৫০০৲ টাকার জন্যে কেন ঠেকে পড়েছেন আপনি? কত টাকা রয়েছে আপনার আমার কাছে।"

বিকাশের চোখের দৃষ্টিটাও কেমন যেন হয়ে গেল। বললেন, "সে ত অতি সামান্য। ওটার কথা আর দয়া করে তুলবেন না।"

মন্দাকিনী বললেন, "সামান্য কেন হ'তে যাবে? সুদে-আসলে নিশ্চয় ৫০০৲র বেশীই হয়েছে। আপনি নিন টাকাটা অনুগ্রহ করে। আমার একটুখানি ঋণ শোধ হোক্। কৃতজ্ঞতার ঋণটা অবশ্য কোনদিনই শোধ হবে না।"

কর্ত্তা এই সময় কার যেন ডাকে বেরিয়ে গেলেন। বিকাশ বললেন, "টাকা এখন আমি নিচ্ছি, কারণ আমার অত্যন্ত প্রয়োজন। একমাত্র মেয়ে আমার ওটি, সামান্য ক'টা টাকার জন্যে তার নূতন সংসারের কেউ তার প্রতি বিরূপ হয় এটা আমি চাই না। কিন্তু আপনিও আমায় কথা দিন যে সাত-আট দিনের মধ্যে আমি যখন টাকাটা আবার ফেরৎ দিতে আসব, তখন দয়া করে আপনি নেবেন।"

মন্দাকিনী বললেন, "আপনার উপযুক্ত কথাই আপনি বলেছেন, কিন্তু আমি ঋণীই থেকে যাব যে?"

বিকাশ বললেন, "ঐ টাকাটা সুদ পাবার জন্য ধার দিই নি ত আপনাকে? অন্ততঃ এই সান্ত্বনাটুকু থাক না আমার? ভাগ্য আমাকে সার্থকতা বিশেষ কিছু দেয় নি, বুঝতেই পারছেন। যে পথে চলব আমি ভেবেছিলাম, তা পারি নি একেবারেই।"

মন্দাকিনী বললেন, "অন্ততঃ যে টাকাটা আপনি দিয়েছিলেন, সেটা রাখুন আপনি, আমারও ত একটু সান্ত্বনা দরকার? বাকীটা ফিরিয়েই দেবেন। আমি সেটা দিয়ে আমাদের নতুন বৌ-এর একটা ভাল গহনা গড়িয়ে দেব। তার ত ডবল পাওনা আমার কাছে। আমার বোন-পো বৌ হিসাবে আবার আপনার মেয়ে হিসাবে।"

বিকাশ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "আচ্ছা তাই হবে।" খানিক পরে জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় থাকা হয় এখন?"

মন্দাকিনী বললেন, "পশ্চিমে থাকি, কালেভদ্রে কলকাতায় আসি।"

বিকাশ জিজ্ঞাসা করলেন, "মা আছেন এখনও?"

মন্দাকিনী বললেন, "না, তিনি অনেক কাল হ'ল চ'লে গেছেন। ভাইটি বড় হয়েছে চাকরি-বাকরি করছে। মাসীমা, আপনার ভাই-বোনেরা কোথায়?"



বাইরে দাঁড়িয়ে আপনাদের অনেকগুলো কথা শুনে ফেলেছি। সেটা মার্জ্জনা করবেন।

বিকাশ বললেন, "সব নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। মা কাশীতে, তাঁকে লিখব আপনার কথা। অনেক দিন পর্য্যন্ত তিনি আপনাদের কথা বলতেন।"

মন্দাকিনী বললেন, "আমার মাও। দু'দিকেই এত আগ্রহ ছিল, অথচ দেখা হ'ল বাইশ বছর পরে।"

বিকাশ বললেন, "ভগবান্ নিতান্ত সাধারণ ভাবে দেখা করাতে চান নি বোধহয়। তাই এমন সব ঘটনা পর পর ঘটল যে, দু'জনে যেন দু'লোকে থেকে গেলাম। একটা বিপদের ক্ষণে প্রথম দেখা হ'ল, আর একটা বিপদের ক্ষণে দ্বিতীয়বার।"

মন্দাকিনী বললেন, "আর কিন্তু ভেসে গেলে চলবে না। এই মেয়েই আমাদের সেতু হ'ল। এর ভিতর দিয়েই আমাদের সম্বন্ধটা চিরকালের হয়ে থাকবে।"

—*—

নাগ

শ্রীকালিদাস রায়

সাহিত্যে নগণ্য নয় তব দান আজো,
উপমায় সমাদর আছে তব নাগ,
নামে উপনামে তুমি আজিও বিরাজো,
বাড়াইল বিষ তব জন্মেজয়-যাগ।
সাহিত্যের নাগলোক সে ত অবাস্তব,
এ বঙ্গই বাস্তবিক 'বড়-নাগ-পুর',
বিজ্ঞান রুধিতে নারে তব উপদ্রব,
আজো মোরা ডাক ছাড়ি 'গরুড়, গরুড়'।
পরশি প্রিয়ার বেণী ভয়ে চমকাই,
প্রেমের গতিটি আজো তোমার মতন।
ছবিতে তোমারে দেখি নয়ন জুড়াই
—বেণু করে ফণা 'পরে কাহ্নর নাচন।
আজো নাগ পঞ্চমীতে বিষহরী-পূজি।
রজ্জু-খণ্ডে তুমি ভাবি লাফিয়ে পালাই;
দুধ কলা দিয়া পোষে বেদে কেন বুঝি,
দেখাও যে খেলা তাই ভাবি না বালাই।
পরীক্ষিৎ মৃত সর্প ঋষির গলায়
জড়ায়ে হারালো প্রাণ আপনারি দোষে।
অর্পিল জীবন্ত সর্প যারা দেবতায়,
তারা কেন মরে হায় দেবতারই রোষে?

আমার শ্রাবণ

শ্রীকৃষ্ণধন দে

আমার শ্রাবণ শুধু আমারি যে একান্ত আপন,
সে মোর কুটীরে বন্দী,—রুদ্ধ দ্বার রুদ্ধ বাতায়ন,
আমার শ্রাবণ শুধু নেমে আসে দীপ-নেভা ঘরে,
বাহিরে আকাশ কাঁদে,—নেচে যায় বাউল পবন।

আমার শ্রাবণ চায় প্রিয়ারে আপন করে নিতে
বর্ষণমুখর রাতে বনানীর মর্মর-সঙ্গীতে;
ছোট ঘর, ছোট শয্যা, ঘুমন্ত শিথিল দেহখানি
লতাক্ আমারি বুকে তন্দ্রাহারা স্বপ্ন-রজনীতে!

আমার শ্রাবণ আনে প্রেমগূঢ় নিভৃত সাধনা,
আমার শ্রাবণ আনে বেদনার্ত অস্পর্শ কামনা,
নেমে আসে অন্ধকার বুকভরা যুথী-গন্ধ নিয়ে,—
রাত্রির তৃষ্ণায় জাগে উর্বশীর সূর্য-আরাধনা!

বাদল ত থামবেই, উঠবেও চাঁদ শেষরাতে,
সে গান কি ফিরে পাব গেয়েছি যা' তোমাতে-আমাতে!

মহুয়া

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

বৃষ্টি আর বৃষ্টি আর বৃষ্টি
দৈত্যের মতো মেঘ জমে ওঠে
স্বর্গ অন্ধকার
পিচ-ঢালা পথগুলো নদী হয়ে গেছে।

"মহুয়া মহুয়া দাও॥"

পূবের জানালায় বসে ভাবি
সে চলে গেলো
আর দেখি দৈত্যের মতো মেঘ।
লোকে বলে চাঁদ-সূর্য ঘোরে
থাকবার জায়গা নেই বলে
কিন্তু তোমার ছিলো তো জায়গা!
তাকে ভালোবেসেছিলাম
কিন্তু যত তাকে বোঝাতে চাই
সে বুঝতে পারে না এই শোক।

"মহুয়া মহুয়া দাও॥"

ডাইনী বুড়ী

সুনীলকুমার নন্দী

'চোখের আলোর সবুজ ছায়া নীলচে পাখির ঝাঁক
ভাসতে ভাসতে বিরুদ্ধতার রাত্রি এলো, যা—
অন্ধকারের আড়াল থেকে করল কে যে ডাক,
চোখের আলো বিদ্ধ হলো উড়লো পাখির ঝাঁক
অন্য কোথাও ভাসছে পাখি আর তো আসে না—
বুকের তলে একলা জাগে নিঃস্ব নীলিমা…'

বলতে বলতে উধাও হলো পাশের বাড়ীর সেই
ডাইনী বুড়ী… হাঁকাহাঁকি ঘুম ভেঙ্গে যায় যেই
স্বপ্ন আরে… রোল আসে, হায় ডাইনীবুড়ী নেই।

খুঁজতো বুড়ী অন্ধকারে নীলচে পাখির ঝাঁক—
জানলো না কেউ; বলবো কি তা থাক সে কথা, থাক
একটি মেয়ের মুখলুকানো রঙীন বাসনা।

শব্দে তুফান যে যাই তুলুক নাগাল পাবে না—
বুকের গোপন ইচ্ছে পাগল নানা কথার বাঁক
পেরিয়ে চলে খুঁজতে সুদূর নীলচে পাখির ঝাঁক।

ঘুম-ডোবানো মাঝ প্রহরে ডাইনী বুড়ী আর
নাড়বে না ঘর, যে যার মতো গোছা গে সংসার—
মা-ই বা তোরা জানলি ও যে ডাইনী বুড়ী না…

স্বপ্নে দেখা ধাঁধার কেন মিথ্যে দিবি পা।

সাধারণ মেয়ে

বাণী রায়

অনেক প্রতিভা দেখে বৃদ্ধ হলাম ত।
অনেক শাণিত শব্দপ্রয়োগের বাক্য কানে এল।
চশমিত নয়নে বুদ্ধির ঝলক দেখলাম,
মুগ্ধ হলাম,
গুণীকে পূজলাম।
কিন্তু আমার পূজা পেলাম কই?
তাই অবশেষে—
বিদেশী বন্দরে আমি-প্রবীণ নাবিক
ভিড়াই পুরাণো তরী নবীন তমালে,
নন্দসুতছায়া-আঁকা নয় সে তমাল,
শ্যামল-গভীর আর বসন্তে উদাস;
সে তরুণ তালশীর্ষে নূতন ভাস্কর,
ঝলমলো কান্তি তার যৌবনসুন্দর;
সমুদ্র ইঙ্গিত নেই তার—দুইচোখে,
সে চোখে বাঁচার আশা ইস্পাত-ঝিলিক।
এ-কথা অতীব সত্য, বাঁকা তার ঠোঁট,
কিন্তু পুষ্পধনু নয়, সিগার-বাহন;
সেই সীমান্বিত এক অন্তরীপে আমি
ডুবলাম শেষে কি না প্রবীণ নাবিক!
সে ত গাইল না গান অপার্থিব স্বরে,
ভাঙা ছন্দে অবশ্যই লিখল কবিতা
হাসি আর খেলা দিয়ে;
আনলো দুহাতে সাধারণ কোন পূজা
উপোসী দেউলে।
তাই—
এখন ভেবে দেখি
এ মন বাঁধবার কোন যন্ত্র তার হাতে ছিল কি?
সে অত্যন্ত সাধারণ।
সাধারণ নারীর মতই আমাকে চেয়েছে
বিবাহবন্ধনে,
বিবাহের চেয়ে বড় প্রেম সে বোঝে না।
অস্বীকার করলে বিস্মিত হয়।
আমাকে শিল্পী-কবি বলে ক্ষমা করে না,
বোঝে না আমার সুদূর পিয়াসা।
ভাবে: আমি অদ্ভুত কোন জীব,
তাই মিলন চাই না,
প্রেমের যা পূর্ণ পরিণতি।
দিনরাত্রি তার কাজে বাঁধা,
সেখানে খেলা কোথায়?
সাধারণ মেয়ের মত সে দেখে আমাকে;
সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষার উপদেশ দেয়;
ভালবাসার কথা বলে,
আবার তিরস্কারও করে।
আমার মনোরঞ্জনের জন্য কবিতা লেখে,
যে কবি নয়—কর্মী।
তাই কি: আমি মুগ্ধ হ'লাম?
মুগ্ধ হ'ল হৃদয় আমার সহজ কথা শুনে।
অসাধারণের পাল্লায় হারিয়ে গিয়েছিলাম,
সাধারণ প্রেম আমাকে বুঝিয়ে দিল,—
কি?

পোলাউ রোজ খেতে ভাল লাগে কি?
মাছ ভাত বাঙালীর দৈনন্দিন খাদ্য।
বিচিত্রকে চাও, ওগো বিচিত্রা;
কিন্তু জীবন যে বড়ই সাধারণ,
বড়ই সহজ।
সকাল থেকে সন্ধ্যা তুমি যা করো,
কোন্‌টা তার অসাধারণ,
একমাত্র কবিতালেখা ছাড়া?
ভগ্নাংশের জন্য
সমগ্রকে অস্বীকার করেনা কেউ।

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

শিশু-অপরাধী

ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মত পশ্চিমবঙ্গেও শিশু অপরাধীর সংখ্যা গত চার-পাঁচ বৎসরে সবিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ৭ হইতে ২০ বৎসর পর্য্যন্ত অপ্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যেই অপরাধীর সংখ্যা-বৃদ্ধি সবিশেষ দেখা যাইতেছে। বাঙ্গলার শহর অঞ্চলেই ইহার আধিক্য অধিক পরিলক্ষিত। কিছুদিন পূর্ব্বে প্রকাশিত একটি সরকারী হিসাব হইতে দেখা যাইতেছে যে, সমগ্র ভারতে :

১৬ হইতে ২০ বৎসর বয়স্কদের মধ্যেই অপরাধীর সংখ্যা সর্ব্বাধিক। ১৯৫৮ সালে এই সংখ্যা ছিল ২৫ হাজার, ১৯৬১ সালে উহা হইয়াছে ৩৩ হাজার। সাত হইতে ১২ বৎসরের মধ্যে অপরাধীর সংখ্যা অল্প, ১২ হইতে ১৬ বৎসরে উহা অপেক্ষা বেশী এবং ১৬ হইতে বিশ পর্যন্ত সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। ১৯৬১ সালে অপ্রাপ্তবয়স্ক মোট অপরাধীর সংখ্যা ছিল ৫৩,৭৭৬। সেণ্ট্রাল ব্যুরো অব্ কারেকশনাল্ সার্ভিসেস্ এই সংখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন। বিভিন্ন রকমের অপরাধীর শ্রেণী-বিন্যাস হইতে দেখা যায়, দণ্ডনীয় অপরাধ শতকরা ২০ ভাগ, ঘরে ঢুকিয়া চুরি শতকরা পাঁচভাগ, হিংসাত্মক গুরুতর আঘাত ৪ ভাগ, খুন ১ ভাগ, অস্বাভাবিক অপরাধ ৩ ভাগ ও আত্মহত্যার চেষ্টা তিন ভাগ।

১৬ হইতে ২০ বৎসর বয়স্ক বালকদের মধ্যে অপরাধ-প্রবণতা ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে—বিশেষভাবে কলিকাতা (বৃহত্তর কলিকাতা সমেত) এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য কয়েকটি শহর এবং শিল্পাঞ্চলগুলিতে। ১৯৫৮-৫৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে ছিল এইপ্রকার অপরাধীর সংখ্যা প্রায় ৬।৭ হাজার, এই সংখ্যা ১৯৬১-৬২ সালে প্রায় ২২ হাজারের কোঠায় আসিয়াছে!

শহরাঞ্চলে অপরাধের তালিকায়—চুরি, লোকের ঘরের দরজার তালা ভাঙ্গা, গুণ্ডামি, পকেট মারা, খুনখারাবি, আত্মহত্যার প্রচেষ্টাও স্থান পাইয়াছে। গ্রামাঞ্চলের বালক-দের মধ্যে উক্তপ্রকার অপরাধ একেবারে বিরল না হইলেও খুবই কম বলা যায়। গ্রামাঞ্চলে বালকেরা পরের বাগান হইতে আম-কাঁঠাল-আমড়া-পেয়ারা এবং পুকুর হইতে মাছ চুরি করা ছাড়া কোন গুরুতর অপরাধ করে না, কিংবা করিবার শক্তি বা অবকাশ পায় না।

কলিকাতার মত বড় বড় শহরে শিশু অপরাধীদের ভয়াবহ সংখ্যাধিক্য দেখিয়া ইহাই প্রমাণিত হয় যে :

ক্রমবর্দ্ধমান নাগরিক জীবন শিশুদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধি করিয়া থাকে। শিল্পোন্নয়ন ও নাগরিক জীবনের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পারিবারিক বন্ধনও শিথিল হইয়া পড়িতেছে। গ্রামের পারিবারিক বন্ধনও এখন আর আগের মত অটুট নাই। কিন্তু পরিবার-প্রথায় ভাঙন ধরিলেও গ্রামে এখনও পরিবারনির্ব্বিশেষে শিশুদের উপর বয়স্ক ও বৃদ্ধ ব্যক্তিদের অভিভাবকত্ব নষ্ট হয় নাই। কিন্তু শহরের ধরন একেবারেই আলাদা। রুজি-রোজগারের জন্য বাপ-মাকে বেশীর ভাগ সময়েই বাড়ীর বাহিরে থাকিতে হয়। বাড়ীতে দেখাশুনা করিবারও বড়-একটা কেউ থাকে না। প্রতিবেশীকেও শিশুরা মান্য করিতে শেখে না। এ অবস্থায় শিশু যদি বিপথে যায়, তাহা হইলে শিশুকে খুব বেশী দায়ী করা সম্ভব নয়।

কলিকাতার মত শহরে সিনেমা, হোটেল, রেষ্টুরেণ্ট এবং অন্যান্য নানাবিধ বস্তুর প্রলোভন 'কম নয়' বলিলে কম বলা হয়—এই প্রকার প্রলোভন গত কয়েক বৎসরে সাংঘাতিক আকার পরিগ্রহ করিয়াছে। স্কুলের পরিচালন-ব্যবস্থা শিথিল। ছেলে স্কুল পালাইলে অভিভাবক তাহা জানিতে পারেন না। শহরের সিনেমার কিউ-এ ছোট ছোট ছেলেদের দেখিয়া কোন সন্দেহ থাকে না যে, উহারা সঙ্গ-দোষে বাপ-মায়ের অজ্ঞাতে স্কুল পলাইয়া সিনেমার লাইনে ভিড় জমাইতেছে। শহরের অস্বাস্থ্যকর এবং বিকৃত জীবনও ছোটদের অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধি করিতেছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে, সিনেমা দেখিবার পয়সা সংগ্রহের জন্য কয়েকটি বালককে পিতার হাঁত-বাক্স ভাঙ্গিয়া টাকা চুরির অপরাধে ধরা হয়! দুঃখের সঙ্গে বলিতে হয়—শহরের সিনেমার ম্যাটিনী শো-গুলি বিশেষভাবে বালক-বালিকা এবং ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ জীবনের সর্ব্বনাশ করিতেছে।

একথা সত্য যে, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ভাবিয়া-চিন্তিয়া অর্থাৎ প্ল্যান করিয়া অপরাধমূলক কার্য্য করে না। সাময়িক উত্তেজনা কিংবা 'দলে পড়িয়াই' ইহারা অপরাধীর খাতায় নাম লিখায়। একদিকে যেমন পিতামাতার যথাযথ মনোযোগ এবং সতর্ক দৃষ্টির অভাবেই ছোট ছোট ছেলেরা 'বিগড়াইয়া' যায়, তেমনি আবার মাতার অত্যধিক স্নেহও

বহু স্থলে শিশুর ভবিষ্যতের পক্ষে একান্ত ক্ষতিকর হয়। সমবয়স্ক অন্যান্যদের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় ছেলেরা বহু সময় বাবার পকেট কাটে ও মায়ের ভাঁড়ারে হাত চালায়। পিতামাতা, বহুক্ষেত্রে অত্যধিক স্নেহের জন্য, ছেলেমেয়েদের পিছনে সামর্থ্য অপেক্ষাও বেশী খরচ করিয়া থাকেন। পরবর্তী জীবনে ওইসব ছেলেমেয়েদের বায়না মিটানো খুব কম অভিভাবকের পক্ষেই সম্ভব হয়। এমন অবস্থায় এই ছেলেদের অনেকেই চুরি করিতে আরম্ভ করে।

অদূর ভবিষ্যতে শহর-জীবন ক্রমপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শিশু অপরাধীর সংখ্যা আরও ভয়াবহরূপে বৃদ্ধি পাইতে বাধ্য। নাগরিক জীবনে শিশুর (সঙ্গে সঙ্গে বয়স্কদেরও) মনে অপরাধপ্রবণতা প্রতিরোধ, এমন কি সীমাবদ্ধ করিবার প্রয়োজনীয় অবকাশ এবং 'আবহাওয়া' নাই, গ্রাম্যজীবনে এখনও যাহা কমিয়া গেলেও কিছু অবশিষ্ট আছে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার এবং সেই সঙ্গে কলিকাতা কর্পোরেশনের বিষম কর্তব্যবোধের ফলে এবং প্রজাকুলকে পালনের নিখুঁত ব্যবস্থার কল্যাণে, কলিকাতা শহর এবং এ-রাজ্যের অন্যত্র—আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় আছে অতি কম সংখ্যক স্কুল এবং স্থানাভাবের জন্য স্কুলে বাড়ীর বিকল্প পরিবেশ সৃষ্টিও সম্ভব নয়, শিশু অপরাধীর সংখ্যা কম রাখিবার জন্য যাহা একান্ত প্রয়োজন। ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ছেলেমেয়েদের জীবন যথাযথ ভাবে গঠন করিতে হইলে সেদিকে প্রথম হইতেই নজর দেওয়া দরকার। মহিলা ও সমাজসেবা প্রতিষ্ঠানগুলি এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু এ-কাজে কষ্টও যেমন, 'নাম' পাইবার আশাও তেমন নাই, কাজেই সৌখীন এবং নাম-কা-ওয়াস্তে মহিলা ও সমাজসেবা প্রতিষ্ঠানগুলি দেশের শিশুজীবন গঠন কার্য্যে অগ্রসর হইবেন বলিয়া মনে হয় না। পশ্চিমবঙ্গের শতকরা ৯০টি সমাজসেবা প্রতিষ্ঠান—নাচের স্কুল, গানের ক্লাশ এবং বহুবিধ 'কৃষ্টি' সেবাতেই নিয়োজিত রহিয়াছে।

শিশু অপরাধীরা যাহাতে স্বাভাবিক জীবনযাপনের সুযোগ পায়, তাহার জন্য জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গিও বদল হওয়া দরকার। পরবর্তী জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সরকারকেও সংশোধনী আবাসে আরও অধিক সংখ্যক যোগ্য শিক্ষক নিযুক্ত করিতে হইবে।

কিন্তু মাত্র এইটুকুতেই জাতীয় জীবনের এ বিষম সমস্যার সহজ সমাধান হইবে না। শিশুদের সুস্থ এবং সৎ নাগরিকে পরিণত করিতে হইলে আরও গভীরে যাইতে হইবে।

বর্তমান বাঙ্গলার সমগ্র অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন সর্ব্বাগ্রে দরকার। যাহাতে, সাধারণ মানুষ দু-মুঠো ভাত, একখানা বস্ত্র, মাথা গুঁজিবার একটা চালা, অসুখে এক কৌটা ঔষধ এবং ছেলেমেয়েদের সামান্যতম শিক্ষার নিম্নতম আর্থিক দাবি মিটাইতে পারে। ক্ষুধার্ত্ত মানুষকে বড় বড় ইস্পাত কারখানা এবং আরও বড় বড় নদীর বাঁধ উপহার দিয়া সরকার জাতীয় জীবনে মহাপ্লাবন রোধ করিতে পারিবেন কি?

এই প্রসঙ্গে মহামতি লেনিনের একটি কথা বলিলে অন্যায় হইবে না। এক ভাষণে লেনিন বলেন—

". . young people particularly need the joy and force of life. Healthy sport, many-sided intellectual interest, learning, studying, inquiry . . . that will give young people more than eternal theories and discussions . . . . and the so-called living to the full: **Healthy bodies, healthy minds.**"

দেশের কর্তারা সর্ব্বাগ্রে যদি শিশু এবং বালকদের healthy body—অর্থাৎ সুস্থ দেহ দিতে পারেন—তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে healthy mind অর্থাৎ সুস্থ মনের অধিকারী হওয়া সহজ এবং স্বতঃসিদ্ধ হইবে।

শিশু এবং বালকদের, তথা সমস্ত দেশবাসীকে সুস্থ দেহের অধিকারী করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম তাহাদের জন্য উপযুক্ত 'সার' অর্থাৎ খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে, "কৃচ্ছ্রতা সাধনের এবং আরও ত্যাগের" বাণী প্রচারে যাহা কখনই ঘটিতে পারে না। ক্ষুধার্ত্ত অসুস্থ মানুষকে নীতি উপদেশ দান—ভস্মে ঘি ঢালার সামিল!

পশ্চিমবঙ্গের নাসিকান্ত প্রাপ্ত জীবন

আড়তদার, ব্যবসায়ী এবং মজুতদারদের প্রতি সরকারী হুকুম নির্দেশ এবং রক্তচক্ষু প্রদর্শনের একমাত্র ফললাভ (জনগণের পক্ষে) হইয়াছে—অপক্ব রম্ভা, অবশ্য এই অপক্ব রম্ভা অর্থাৎ কদলীর জোড়া-প্রতি মূল্যও আজ প্রায় আকাশ-ছোঁয়া! আমাদের রাজ্য সরকারের কেরামতি এবং দক্ষতা

অসীম, বৈষ্ণব কবির কথায় 'প্রভুর (প্রভুদের) গুণের কথা অকথ্য কথন' !

চাউল, ডাইল, চিনি, মৎস্য তথা যে-কোন অত্যাবশ্যকীয় যে-সকল খাদ্য-সামগ্রীর মূল্য সেন-ব্যানার্জ্জি অ্যাণ্ড কোং নিয়ন্ত্রিত করিতে গিয়াছেন, কিংবা স্থিতিশীল করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, সেই সব সামগ্রীর মূল্য হু-হু করিয়া বৃদ্ধিমুখে গিয়া আজ সাধারণ জনের আয়ত্তের বাহিরে গিয়াছে। মূল্য স্থিতিশীল হওয়া দূরে থাক্—আজ পর্য্যন্ত ইহা ক্রমাগত উর্দ্ধমুখেই রকেটের মত ছুটিয়াছে।

যথা, মাছের বাজার। মৎস্য-নিয়ন্ত্রণ আদেশ জারির পর প্রায় চার মাস হইতে চলিল, অথচ আজও মাছ না দিল জালে ধরা, না ব্যাপারী-বিক্রেতারা হুকুমের জালে। হয় জালেই বড় বড় ফাঁক আছে, নয় জাল যাহাদের হাতে তাহাদের জাল টানিবার সাধ-সাধ্য কিছুই নাই! বাজারে মাছের নাম আর গন্ধটুকুই আছে। বিধানমণ্ডলীতে মাঝে মাঝে কথার ঝড় ওঠে, কর্ত্তারা কাটা-মাছের বদলে কাটা-কথায় জবাব দেন। একবার যদি কর্ত্তারা দয়া করিয়া বলেন, মৎস্যকুলেও মন্ত্রিকুলের মতই পরিবার-পরিকল্পনার হিড়িক পড়িয়াছে বলিয়াই আকাল, তবে গোল চুকিয়া যায়! লোকে বুঝিয়া লইত, 'মাছ খাইব না'—এই নিস্ক্রিয় নিরুপদ্রব সংকল্প ছাড়া তাহাদের অন্য গতি নাই।

চিনি যোগাইবার ভার যাঁহাদের হাতে সেই চিন্তামণি-গোঁসাইরা চিনির বদলে বাজে চালাকি এবং কথার মারপ্যাঁচ চালাইতেই ব্যস্ত! অন্যদিকে বাঙ্গালীর কাছে চাউল অত্যাবশ্যক কি না—তাহা লইয়া বিধানসভায় 'গুমো'-সেন-মন্ত্রীর বৃথা বাক্যব্যয় সবেগে চলিতেছে। মুখ্যমন্ত্রী চালের পরিবর্ত্তে প্রভুত বাচালতাই প্রকাশ করিতেছেন। রাজ্যের অর্থমন্ত্রীর 'নিষ্ঠুর'-বাচালতা অসহ্য হইয়াছে। এই সহসা দেশপ্রেমিক এবং জনকল্যাণে নিবেদিত-প্রাণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়—মানুষের দুঃখ-দুর্দ্দশা এবং অভাবের নিপীড়ন, পশ্চিমবঙ্গে কোথাও দেখিতে পান নাই! এই মহাশয়-ব্যক্তির ধারণা এই যে, সরকারের বিবিধপ্রকার প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ করভার জনগণকে এমন কিছু 'আঘাত' করে নাই। এই জনপ্রেমিক মহাব্যক্তি বিধানসভায় এমন ঘোষণাও করিয়াছেন যে, জনকল্যাণের জন্য সরকার হয়ত আরো নূতন নূতন করের ব্যবস্থা করিবেন! মোক্তারী করিয়া অগাধ বিত্তের অধিকারী এই মহাশয় ব্যক্তি হঠাৎ অর্থ-নীতি বিষয়ে এত বিদ্যা এবং পাণ্ডিত্য কবে এবং কি ভাবে অর্জ্জন করিলেন—আমাদের পক্ষে তাহা বুঝা অসম্ভব। কিন্তু সে-কথা থাক্। এ রাজ্যের জনগণের আর্থিক দুর্দ্দশা আজ অসহনীয় হইয়াছে যাহার ফলে মানুষ এবার সত্যই মহাপ্রস্থান করিতে বাধ্য হইবে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে হয়ত একটা অঘটন কিছু ঘটিবে, যে ঘটনাতে যাঁহারা আজ শাসনকর্ত্তা হইয়া বসিয়া আছেন, তাঁহাদের অবস্থাও বিশেষ প্রীতিকর হইবে না। এ সম্ভাবনার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, আবার বলিতে বাধ্য হইতেছি।

অর্থমন্ত্রী শঙ্করদাস বিধান সভায় স্পষ্ট নির্লজ্জ ঘোষণা করিয়াছেন যে পশ্চিমবঙ্গে অদূর ভবিষ্যতে চাল-ডাল-চিনি-মাছ এবং অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী-সম্ভারের মূল্য কমিবার কোন সম্ভাবনা তিনি তাঁহার দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পান না। সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু তাঁহার দিব্যদৃষ্টিতে ইহা স্পষ্ট উদ্ভাসিত হইয়াছে যে, সরকারের (অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে তাঁহার) করনীতি নির্ভুল এবং যথাযথ। এই ঘোষণা প্রসঙ্গে এ রাজ্যের সহৃদয় অর্থমন্ত্রী বাঙ্গলার জনগণের ভবিষ্যতে আরও কল্যাণ এবং আরও ভাল করিবার জন্য আরও কর প্রবর্ত্তনের শুভ-বার্ত্তাও প্রকাশ করিতেও দ্বিধা করেন নাই।

অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী-টিমের কাপ্তান এবং সেণ্টার ফরোয়ার্ড—শ্রীপ্রফুল্ল সেন দৃপ্তকণ্ঠে এবং উন্নত শিরে বিধান সভায় বলেন : পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য-সঙ্কট আদৌ ঘটে নাই, ঘটিয়াছে মাত্র কিছু চাউলের ঘাটতি মাত্র ২২ লক্ষ টনের! এ-সমস্যা কিছুই নহে এবং (সেই বহু-ঘোষিত) 'গম ও আলুতেই' ইহা পূরণ করা অতি সহজ-সম্ভব! 'গুমো' মন্ত্রীর শ্রীমুখ হইতে গমের প্রশংসাবাণী বাঙ্গালীর চাউলহীন জীবনে নিশ্চয় প্রভুত আনন্দসঞ্চার করিবে। শ্রীসেন বলেন—গম চাল অপেক্ষা অধিকতর পুষ্টিকর, গমে প্রোটিনও বেশী আছে (মুখ্যমন্ত্রী এইখানে মৎস্য সমস্যারও কিছু সমাধান করিয়া দিলেন!)

এ-রাজ্যের গুণী মন্ত্রীমহাশয়দের কথাবার্ত্তায় এবং দৃপ্ত ঘোষণায় আজ স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে—ব্যবসায়ীদের স্বাধীনতায় তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিবেন না, সে সাহস তাঁহাদের দেহে-মনে নাই : অতএব বাঙ্গলার শতকরা ৯৮ জনের জীবন

লইয়া এই নিষ্ঠুর পরিহাস (পূর্ণ উদর মন্ত্রীদের পক্ষে যাহা পরিহাস ছাড়া আর কিছুই নয়) বাধাহীন ভাবেই চলিতে থাকিবে।

যে সব দেশের উদার ধনতান্ত্রিক তথা অর্থনৈতিক পদ্ধতি 'স্বাধীন' ভারত আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে—সে সব দেশেই নিম্ন ও মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষের নিয়মিত আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সমতা অটুট রাখার নীতি বলবৎ করিয়াছে। পাল্লার একদিকে অপরিহার্য্য ব্যয়ের বোঝা ভারী হইলে সঙ্গে সঙ্গে আয় বৃদ্ধির স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা সক্রিয় হইয়া উঠে এবং অনতিবিলম্বে আবার আয়-ব্যয়ের মধ্যে সমতা আনে। সামাজিক ন্যায় বিচারের এই নিরঙ্কুশ ব্যবস্থাই সে সব দেশে সার্ব্বজনীন স্বচ্ছলতার, তথা জাতীয় সমৃদ্ধির বনিয়াদ। সরকার দলীয় স্বার্থের চাপে পড়িয়া কিংবা নির্বুদ্ধিতার কারণে ইহার অন্যথা করিলে সেই দেশের সর্ব্বত্র ঝড় বহিয়া যায় এবং সর্ব্ব-সাধারণের সমবেত সক্রিয় চেষ্টায় দেশের মন্ত্রী-সভার পতন ও 'মৃত্যু' ঘটে। আমাদের এ হতভাগ্য দেশে সবই বিপরীত! সবই কপালের লিখন বলিয়া ভাগ্যের হাতে ছাড়িয়া দি। মজুতদার এবং মুনাফা-শিকারীদের দমন করা দূরে থাক্—পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাহাদের জন্য চলতি বাজার-দর অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ, এমন কি সুদ পরিশোধের বাধ্যবাধকতাও নতমস্তকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন!

সরকারী কোন মহল হইতেই যখন কোন প্রতিকারের আশা নাই, যে দেশের শাসন-ব্যবস্থায় এবং কাঠামোতে সরকার অপেক্ষা 'পার্টি' প্রাধান্য লাভ করে—যে দেশে পার্টি বলিতে বুঝায় মাত্র একজন পুরুষকে: নবীন এবং স্বাধীন ভারতের 'বাক্য'-সিংহকেই, যিনি দেশ এবং সাধারণ মানুষকে অবহেলা অগ্রাহ্য করিয়া, একমাত্র পার্টির (অর্থাৎ নিজের) অসীম আধিপত্য এবং চির-স্থায়িত্ব কামনা করেন সেই দেশের জনগণের কর্ত্তব্য কি, তাহা জনগণকেই স্থির করিতে হইবে। ১৬ বৎসর একাদিক্রমে "রাজত্ব" করিয়া সম্রাট 'বাক্‌বর' নূতন দিল্লীর মসনদে বসিয়া স্তাবকদের সাহায্যে দেশ এবং জাতিকে ক্রমাগত নিচে পাতালের দিকেই ঠেলিয়া দিতেছে, সর্ব্ববিষয়ে! সর্ব্বকাজে যাহারা আত্ম এবং আত্মীয়-কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই করিতে পারে নাই, সেই কংগ্রেসীদের অনতিবিলম্বে ক্ষমতাচ্যুত না করিতে পারিলে দেশ এবং দেশবাসীর ভবিষ্যৎ চিরতরে বিলুপ্ত হইবে!

আকাশবাণী: কলিকাতা

কলিকাতা তথা ভারতের অন্যান্য বেতার ষ্টেশনগুলি ঠিক কি কারণে এবং কাহার বা কাহাদের কল্যাণার্থে কর-দাতাদের অর্থে চলিতেছে, তাহা এখনও যথাযথ বুঝিতে পারি নাই। শ্রোতারা বেতার লাইসেন্স বাবদ যে মূল্য দেয়—সেই অর্থ ব্যয় হয় কোন্ জনকল্যাণে বা জনস্বার্থে তাহা যদি কেন্দ্রীয় সরকার দয়া করিয়া ঘোষণা করেন—পরম বাধিত বোধ করিবে উৎপীড়িত-শ্রোতা সমাজ।

বেতারের প্রধানতম কাজ যতদূর দেখা যাইতেছে তাহা হইল:

১। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, বিশেষ করিয়া প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য রাম-শাম-যদু-মধু এবং হরি শ্রেণীর কেন্দ্রীয় এবং মাঝে মাঝে রাজ্যমন্ত্রীদের প্রশংসাবাদ এবং তাঁহাদের সহস্রবার-ঘোষিত অমূল্য বাণীগুলি ধোলাই করিয়া পুনঃ পুনঃ এবং 'আবার পুনরায়' পুনঃপ্রচার।

২। বেতারের আর একটি প্রধান কর্ম্ম: সরকারী সকল প্রকার সংকল্প, প্রকল্প, বিকল্প, অকল্প, কাজ-অকাজের নির্জ্জলা, এবং প্রায়শই অসত্য, প্রশংসা-ঢাক পিটানো।

৩। বেতারে সরকারী মহা মহা কর্ম্মকীর্ত্তির প্রশংসা প্রচার-দ্বারা এই চেষ্টাই করা হইয়া থাকে যে, দেশে দুঃখ-দারিদ্র্য অভাব অনটন অশিক্ষা অর্থাৎ সাধারণ মানুষের কষ্টের বা দুঃখের কোন প্রকৃত কারণ আর নাই। নেহরু ভারতের শাসন-সিংহাসনে বসিয়া দেশকে প্রায় গান্ধী-ইচ্ছিত রাম-রাজ্যে পরিণত করিয়াছেন! অতএব দেশবাসীর কর্ত্তব্য নীরবে বেতারবাণী শ্রবণ এবং সরবে রামভক্ত নেহরু-নাম কীর্ত্তন!

বেতার সম্পর্কে একটা প্রশ্ন করিব—অবশ্য এই প্রশ্নের জবাব যাঁহার দিবার কথা তিনি জবাব দিবেন না জানি। প্রশ্নটা হইল: ভারতীয় বেতার কি সরকার এবং সরকারী মন্ত্রী, বড় বড় কর্ম্মচারী প্রভৃতির একচেটিয়া অর্থাৎ 'মোনোপলি' কারবার? যদি তাহাই হয়, তবে গরীব করদাতারা এই প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ভার কেন বহন করিবে? আর যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে বেসরকারী এবং সরকার-বিরোধী অতি

শ্রদ্ধেয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের আকাশবাণী মারফৎ তাঁহাদের বক্তব্য প্রচার করিতে কেন দেওয়া হয় না? এমন কোন কথা নাই যে, বিরোধী পক্ষের নেতা মাত্রেই দেশদ্রোহী এবং রেডিও ব্যবহার করিতে পাইলেই সে-সুযোগের অপব্যবহার তাঁহারা করিবেন।

কথাটা কর্ত্তাদের কাছে তিক্ত হইলেও সত্য যে, বিরোধী দলে এমন সকল পণ্ডিত এবং দেশভক্ত ব্যক্তি আছেন যাঁহারা দেশের জনসাধারণের নিকট হইতে যে-কোন মন্ত্রী, (প্রধানমন্ত্রী সমেত) এবং কংগ্রেসী নেতা অপেক্ষা অনেক বেশী শ্রদ্ধা পান, এবং যাঁহাদের কথা জনগণের নিকট কংগ্রেসী নেতা এবং কপালগুণে মন্ত্রীদের অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান্ বিবেচিত হয়। সত্য হইলেও ইহা বলিব না যে আজ কংগ্রেসী সকল মন্ত্রী এবং নেতা দেশের সকল শ্রদ্ধা নিজেদের গুণে হারাইয়াছেন।

আর একটা দিক্‌ও আছে—রেডিও মারফৎ যে-সকল মন্ত্রী এবং সরকারী সুউচ্চ পদস্থ ব্যক্তিদের ভাষণ শুনিবার সৌভাগ্য দীন শ্রোতাদের ঘটে, তাঁহাদের শতকরা ৯৯ জনেরই জিহ্বার জড়তা কাটে নাই এবং ভাষাজ্ঞানের অভাবও অতি প্রকট। এই শ্রেণীর অধিকাংশ বক্তারই রেডিও-ভাষণ দিবার নিম্নতম যোগ্যতাও নাই, কিন্তু তবুও ইঁহারাই এই কার্য্যের যোগ্যতম অধিকারী বিবেচিত হইতেছেন এবং কংগ্রেসী শাসনে চিরকালই হয়ত ইহাই হইতে থাকিবেন। জানি, অন্যান্য সকল অভিযোগের মত আমাদের এ অভিযোগেরও কোন বিচার-তদন্ত হইবে না।

এবার কলিকাতার বেতার প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে দু-চার কথা বলিব। 'পল্লীমঙ্গল' এবং 'মজদুর মণ্ডলীর' আসর সম্পর্কে পূর্ব্বে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু কোন ফল হয় নাই।

পল্লীমঙ্গল নামক ভাঁড়ামির আসর হইতে 'মঙ্গলময়' নামক ব্যক্তিটিকে বিতাড়িত করা হইয়াছে, কারণ আসরে এই ভদ্রলোককেই তবু সহ্য করা যাইত। এই একজনের বদলে আসরে নূতন আমদানী হইয়াছে 'মুখুজ্জে মশায়' এবং 'হরি-লাল' নামক দুইজন ভাঁড়ের—একজন ন্যাকা, অন্যজন দড়কচা মারা। মোট দাঁড়াইল চারজন ভাঁড় এবং তাহাদের উপর ভাঁড়কুলপতি মহামতি মোড়ল। আসরের কাজ একই সুরে বাঁধা। সরকারের সকল কাজের সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান ভারতের বাক্যসিংহ নেহরু-গুণগান এবং কংগ্রেস সরকার কেমন করিয়া কত কষ্টে কত নিস্বার্থ ভাবে দেশের লোকের সর্ব্বসুখবিধান করিয়াছে—তাহারই বস্তা-পচা ফিরিস্তি প্রচার বিবিধ কণ্ঠে। ইহার উপর আছে 'চাষের' কথা (বলা বাহুল্য ইহা চাষীদের জন্য নহে—কারণ দেশের প্রকৃত অর্থাৎ bona fide চাষী একজনও ইহা শ্রবণ করে না)। পল্লীমঙ্গল আসরের চাষাদের নিকট হইতে চাষ সম্পর্কে মূল্যবান্ বহু তথ্যই শোনা যায় এবং যাহা শুনিয়া কলিকাতার বহু নাগরিক ছাদে এবং বারান্দায় টবে বহুপ্রকার চাষ-আবাদ (বিশেষ করিয়া গমের) করিতে সমর্থ হইবেন! সর্ব্বপ্রকার চাষের কথাই সর্ব্ববিদ্যাধর চাষা-পণ্ডিত শ্রী মোড়ল বলেন, এখন গাঁজা-চাষের বিষয় কিছু বলিলেই ষোলকলা পূর্ণ হইবে!

চাষের বিষয় মূল্যবান্ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে "সদা সত্য কথা বলিবে, চুরি করা মহাপাপ" ইত্যাদি নীতিবিদ্যালয়ের বাণী দান এই মোড়ল পরম নিষ্ঠার সঙ্গে নিয়মিত করিয়া যাইতেছেন এবং যাহার ফলে কলিকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের পল্লী অঞ্চলে মিথ্যাবাদী এবং চোরের সংখ্যা শতকরা প্রায় ৯৯ শতাংশ হ্রাস পাইয়াছে এবং এ-ক্ষেত্রেও যাহার ফলে পুলিস টুলে বসিয়া ঝিমাইয়া দিবারাত্র যাপন করিতেছে!

কলিকাতা বেতারে "সবিনয় নিবেদন" নামে একটি সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। এই অনুষ্ঠান বা প্রোগ্রামের পরিচালক অতি রসিক এবং পরম ব্যঙ্গপ্রিয় মহাশয় ব্যক্তি। শ্রোতাদের চিঠিপত্রের জবাব দেওয়াই ইঁহার কর্ত্তব্য, কিন্তু শ্রোতাদের সমালোচনামূলক পত্রাদির যে-জবাব যে-ভাবে এই অতি-বিনীত ভদ্রলোক দিয়া থাকেন, তাহাতেও মনে হয় সকল শ্রোতাই গাধা নামক বিশেষ জীবের সগোত্র! এবং পশ্চিমবঙ্গে একমাত্র বুদ্ধিমান, বিবেচক ব্যক্তি রেডিওর এই সবিনয় নিবেদক!

কলিকাতা আকাশবাণীর প্রোগ্রাম যে কত ভাল এবং শ্রোতাদের পক্ষে কী ভীষণ হিতকর এবং গভীর আনন্দদায়ক হতভাগ্য বাঙালী শ্রোতার দল বিন্দুমাত্র বুঝিতে চেষ্টা করে না, কিংবা পারে না! 'সবিনয় নিবেদকে'র পত্রোত্তর শুনিয়া মনে হয়, শ্রোতারা রেডিও লাইসেন্সের (মূল্য দিয়া) অধিকারী হইয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন! অর্থাৎ ১৫ এবং ১০ টাকা মূল্য দিয়া গালে চড় খাওয়ার বেশী আর কি (পত্রপ্রেরক) শ্রোতারা আশা করিতে পারেন? বিনীত সবিনয় নিবেদক

মহাশয় কিন্তু সত্যই অতি বিনয়ী! কিছুদিন পূর্ব্বে জনৈক শ্রোতার একটি পত্র তিনি বিনীত কণ্ঠে পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে পত্রপ্রেরক লেখেন: "আপনার কণ্ঠস্বর অতি মধুর এবং বাচনভঙ্গিও অপূর্ব্ব সুন্দর···" ইত্যাদি। বিনয়ের পরাকাষ্ঠা!

বারান্তরে কলিকাতার বেতার প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে অন্য কতকগুলি বিষয়ের সবিস্তার আলোচনা করিবার 'প্রকল্প' রহিল। এবারের মত এই যথেষ্ট বলিয়া মনে করি।

"অবশ্য-সঞ্চয়"—আংশিক ভাবে প্রত্যাহার

শাক্যসিংহের নির্ব্বাণলাভের বহুকাল গত হইবার পর, বর্ত্তমান ভারতের 'বাক্যসিংহ' নেহরুর ভীষণ ঘোষণা সত্ত্বেও (নেহরু বলেন C. D. S.—fully legal and justified) —অবশেষে কেন্দ্রীয় সরকারকে 'জবরদস্তি সঞ্চয়' পরিকল্পনা বহু অংশে প্রত্যাহার করিতে হইল।

অবশ্য সঞ্চয় পরিকল্পনার মাথা ও ধড় দুই কাটা গিয়াছে—বাকী আছে শুধু লেজটুকু। সেটা যে কেন কাটিয়া দেওয়া হইল না তা বুঝিতে পারিতেছি না। এ পরিকল্পনার মূল কথা ছিল যে, দেশের হিতের জন্য ধনী দরিদ্র মধ্যবিত্ত সকলেই কিছু কিছু স্বার্থত্যাগ করিবে। তাই যাহাদের আয়কর দিতে হয় না, যাহারা ক্ষুদ্র চাষী অথবা যাহাদের সামান্য জমিজমা আছে কিংবা যাহারা ছোটখাট ব্যবসা করে তাহাদের নিকট হইতে কিছু কিছু অর্থ সংগ্রহের জন্যই অবশ্য সঞ্চয় পরিকল্পনা প্রবর্ত্তন করা হইয়াছিল। এ ধরনের লোকেদের পক্ষে মাসে মাসে দুই-পাঁচ টাকা জমা দেওয়াও যে দুঃসাধ্য, সেটা শ্রীদেশাই বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। প্রাণ রাখিতে যাহারা সদাই প্রাণান্ত তাহারা আবার সঞ্চয় করিবে কোথা হইতে? সরকারের হুমকিতে নিরুপায় হইয়া খাতাপত্রে টাকাটা তাহারা হয়ত জমা দিত—কিন্তু সেটা ধার করিয়া। তাহাদের কাছে অবশ্য সঞ্চয় ছিল তাই এক নিদারুণ পরিহাস। আশীর্ব্বাদ নয়, অভিশাপ। সেটা যে গিয়াছে তাহাতে তাহাদের এক বিভীষিকা দূর হইয়াছে, তাহারা প্রাণে বাঁচিয়া গিয়াছে। কিন্তু যাহাদের জন্য এই অবশ্য সঞ্চয় পরিকল্পনা তাহারাই যদি গেল তবে তাহার সামান্য একটু জের কেন রহিয়া গেল? শ্রীকৃষ্ণমাচারীর উচিত অবশ্য সঞ্চয় পরিকল্পনাটা ষোলো আনাই বাতিল করা। তাহাতে সরকারের অর্থের সাশ্রয় হইবে, লোকেও অনেক হয়রানির হাত হইতে বাঁচিবে। তবে সেটা করিতে গেলে আয়করের উপর ধার্য্য অতিরিক্ত সারচার্জ্জের হারটা সঙ্গে সঙ্গে কমাইতে হয়। সেটা আর এমন কি দুঃসাধ্য ব্যাপার?

আয়কর যাঁহারা দেন, তাঁহাদের মধ্যে শতকরা ৯৫ জনই মধ্যবিত্ত। ইঁহাদের আয় বছরে ৩৬০০৲ টাকা হইতে ৭৫০০৲ টাকার মধ্যে সীমীত এবং এই সীমীত আয় হইতে সর্ব্বপ্রকার কর, খাজনা এবং অন্যান্য অবশ্য-দেয় শোধ করিয়া —পরিবারের ৭।৮ জন লোককে প্রতিপালন করিতে হয়। এমন অনেক মধ্যবিত্ত পরিবার আছে, যাহাদের লোকসংখ্যা ১০।১২ জনেরও বেশী। এই সকল পরিবারের মাসিক খরচ ৫০০।৭০০৲ টাকাতে কূল পায় না। ইহার উপর যদি স্কুল-কলেজে পাঠরত পুত্র-কন্যা থাকে, তাহা হইলে ত কথাই নাই। মাসিক সামান্য ৫০০।৭০০৲ টাকা হইতে অন্ততঃ পক্ষে ১৫০৲ টাকা স্কুল-কলেজের বেতন, বাস-ট্রাম ভাড়া, টিফিন খরচা ইত্যাদিতে চলিয়া যায়—অনেক ক্ষেত্রে আরো বেশী ব্যয় করিতে হয়। আয়ের অর্দ্ধেক যায় বাড়ী ভাড়াতে।

কাজেই সীমিত আয় মধ্যবিত্ত পরিবারের উপার্জ্জনকারী কর্ত্তাকে যদি মাসে অন্ততঃ ২০৲ হইতে ২৫৲ কিংবা আরো বেশী সি ডি এস-এ জমা দিতে হয়, তাহা হইলে অবস্থাটা কি রকম দাঁড়ায়, তাহা সহজ অনুমেয়।

বাধ্যতামূলক সঞ্চয়রূপী অত্যাচার যদি, জেদের কারণে বজায় রাখিতেই কর্ত্তারা বদ্ধপরিকর হইয়া থাকেন, তাহা হইলে—৭০০৲ টাকা পর্য্যন্ত মাসিক আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ছাড় দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য এবং শেষ পর্য্যন্ত দিতেও হইবে। পুনঃ-অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারীর নিকট কাতর আবেদন পেশ করিলাম—পৌঁছাইবে কি না জানি না।

সাধারণ মানুষ ও পণ্যমূল্য

কিছুদিন পূর্ব্বের তুলনায় বর্ত্তমানে দেশে পণ্যদ্রব্যের মূল্য চার গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার ফলে পূর্ব্বে নিয়োগ কর্ত্তা যে ব্যক্তিকে মাসে ৩ শত টাকা বেতন দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হইয়া চাকুরিতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন সেই ব্যক্তি বর্ত্তমানে দ্রব্যমূল্যের বিচারে এবং তুলনায় ৭৫৲ টাকা বেতন পাইতেছেন। চাকুরিতে নিযুক্ত হওয়ার সময় যে ব্যক্তি তিন শত টাকা দিয়া যে পরিমাণ ভোগ্যপণ্য সংগ্রহ করিতে পারিতেন এক্ষণে তিন শত টাকা দিয়া তিনি মাত্র তাহার এক-চতুর্থাংশ কিংবা তাহারও কম পরিমাণ পণ্য পাইতেছেন। পণ্যমূল্য বৃদ্ধি—অর্থাৎ টাকার মূল্য হ্রাসের ফলে টাকার হিসাবে প্রাপ্ত চাকুরিয়া ব্যক্তিই যে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন তাহা নহে—উহার ফলে দেশের সমগ্র অর্থ নৈতিক কাঠামো সমূহ বিপর্যস্ত হইতেছে।

বিলাসদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির জন্য কেহই চিন্তিত নহেন, কিন্তু যে খাদ্য খাইয়া মানুষকে প্রাণে বাঁচিতে এবং দেহকে কর্ম্মক্ষম রাখিতে হয়, সেই সব অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যসামগ্রী—অর্থাৎ চাউল, ডাইল, তেল, চিনি, মাছ-মাংস, তরি-তরকারির

মূল্য বর্ত্তমানে সাধারণ জনের আয়ত্তের বাহিরে! এই মূল্য দিয়া কয়জন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পরিবারবর্গের একান্ত যতটুকু না হইলেই নয়, সেই পরিমাণ আহারও দিতে পারেন জানি না। তবে একান্ত প্রয়োজনীয় সামান্য পুষ্টির অভাবের বিষময় ফল কলিকাতায় চোখের সামনেই অহরহ দেখা যাইতেছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য বোর্ড কর্ত্তৃক—কলিকাতায় ছাত্র সমাজের স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত বাৎসরিক সমীক্ষায় দেখা যাইতেছে যে, কলিকাতার যুবকগণ লম্বায় বাড়িতেছেন কিন্তু প্রস্থে বা ওজনে কোনপ্রকার বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে না। এই স্বাস্থ্য সমীক্ষায় প্রকাশ যে—১৯৩৮-৪০ সালে:

বিশ বছরের একজন ছাত্র ছিল দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৬৪'২ সেণ্টিমিটার, ১৯৬০ সালে এইরূপই এক যুবকের দৈর্ঘ্য দাঁড়াইয়াছে ১৬৬'১ সেণ্টিমিটার। এদিকে ওজন কমিয়াছে প্রায় চার কিলো—৫৪'৩ কিলো হইতে কমিতে কমিতে বর্ত্তমানে দাঁড়াইয়াছে ৫০'৯ কিলোয়। বুকের মাপও ৮৫'৩ সেণ্টিমিটার হইতে হ্রাস পাইয়া হইয়াছে ৮৩'২ সেণ্টিমিটার। প্রাক্-যুদ্ধ এবং যুদ্ধ-পরবর্ত্তী যুগের এই হিসাব সমস্ত বয়সশ্রেণীর পক্ষেই প্রযোজ্য বলিয়া সমীক্ষায় মন্তব্য করা হইয়াছে। অর্থাৎ সমস্ত বয়সের ছাত্রই দীর্ঘতর হইলেও প্রস্থে এবং ওজনে কিছু হারাইয়াছেন। অবশ্য ওজন কমিবার কারণ হিসাবে যুদ্ধোত্তর যুগের কৃচ্ছ্রতা এবং বেসামাল অবস্থাকে দায়ী করা যায়। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে নানা রকম রোগ সকলের শরীরকেই আশ্রয় করিয়াছে। সুতরাং মোটা হইবার এবং ওজনে বাড়িবার সম্ভাবনা খুবই অল্প। কিন্তু সহসা মাথার দিকে বাড়িবার কারণ কি? সমস্ত ছাত্র সমাজকেই কি কোন বিশেষ গ্ল্যাণ্ডের ব্যাধিতে পাইয়া বসিয়াছে? স্বাস্থ্য বোর্ড ইহার কোন সন্তোষজনক জবাব দিতে পারেন নাই।

ভুষা-মাল, তাও আধপেটা খাইবার ফলে বাঙ্গালী শিক্ষিত যুবক সর্ব্বপ্রকার প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ক্রমশঃ পিছাইয়া পড়িতেছে—এবং এই অবস্থার প্রতিকার যদি অবিলম্বে না হয়, তাহা হইলে আর ৫। ১০ বৎসরের মধ্যে সর্ব্বভারতীয় সকল কর্ম্মক্ষেত্র হইতে বাঙ্গালী একেবারে লোপ পাইবে—এবং ইহাই বোধহয় কেন্দ্রীয় কর্ত্তাদের অবচেতন মনের 'সচেতন' বাসনা!

কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমরা কি ইহাও মনে করিব যে, পশ্চিমবঙ্গের মহাশয় মন্ত্রীগণও ভারতের ঐক্য রক্ষার জন্য কেন্দ্রের কর্ত্তাদের সহিত এ-বিষয়ে এক মত, এক প্রাণ হইয়াছেন? গুমো-মন্ত্রীবর কি বলেন?

দিল্লী তথা পশ্চিমবঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্য আজ একান্ত ভাবে দিল্লীর সহিত এবং মোগল সম্রাট্ আকবর শাহের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত বর্ত্তমান বাক্‌বর শাহের মর্জ্জি এবং চালচলনের উপর নির্ভর করে (আমাদের দুর্ভাগ্য!) সম্রাট 'বাক্‌বর শাহ' কামরাজ জোলাপ প্রয়োগে নিজের ইচ্ছামত কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য মন্ত্রীসভা হইতে তাঁহার পক্ষে অসুবিধাজনক, তথা কাঁটাস্বরূপ, মন্ত্রী অপসারণ প্ল্যান সার্থক করিয়াছেন। এক কথায় নেহরু এবার কামরাজের কল্যাণে ভারতে স্পষ্ট "হাম রাজ" প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

নেহরুর সততার প্রতি বিশ্বাস লোকের বহুদিন পূর্ব্বেই লোপ পাইয়াছে—এবার তাঁহার আন্তরিকতার প্রতি যা সামান্য কিছু বিশ্বাস ছিল তাহাও কাদায় লুটাইল। এখন ক্রমশঃ লোকে বলিতেছে যে, নেহরু গান্ধীজীর ভারতে সর্ব্ববিধ দুর্নীতি এবং অনাচারের যে চরম আশ্রয় কেবল তাহাই নহে, নিজের কন্যাকে উত্তরাধিকারসূত্রে দিল্লীর প্রধানমন্ত্রীর মসনদে বসাইবার জন্য তিনি ভারতের শত্রুদের নিকট হইতেও সকল প্রকার সাহায্য সহযোগিতা লইতে পিছ-পা হইবেন না। অর্থাৎ দিল্লীর সিংহাসনে এইবার নব-'রীজিয়ার' আবির্ভাব হইবে। সোভিয়েত-সমর্থিত কৃষ্ণ মেনন নেহরুর এই পুণ্য পরিকল্পনার চীফ্ টেক্‌নিসিয়ান্।

ইন্দিরাকে গদীতে বসাইতে হইলে দুইটি পার্টিকে নিউট্রালাইজ করিতে অর্থাৎ হাতে রাখিতে হইবে—কমুনিষ্ট পার্টি এবং স্বতন্ত্র পার্টি। কৃষ্ণ মেনন মারফৎ কমুনিষ্ট পার্টিকে বেশ সহজেই পদানত রাখা সম্ভব হইবে। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে এমন একটি সংবাদ পাইয়াছি যাহাতে বিশ্বাস করিবার কারণ ঘটিতেছে যে, নেহরু পাকিস্থান এবং স্বতন্ত্র পার্টি উভয়ের বন্ধুত্ব একসঙ্গে অর্জ্জন করিতে চাহিতেছেন। স্বতন্ত্র পার্টির প্রতিষ্ঠাতা এবং নেতা রাজাগোপালাচারীর পাকিস্থান প্রেম সুবিদিত। বাঙ্গলা এবং পাঞ্জাব পাকিস্থানকে খয়রাৎ করিয়াই তিনি ভারতের ক্ষমতা অধিকারে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি স্বতন্ত্র পার্টিকে দিয়া একটি প্রস্তাব পাশ করাইয়াছেন যে, কাশ্মীর সম্বন্ধে প্রধানমন্ত্রী যাহা করিবেন তাহাই মানিয়া নিতে হইবে। এইবার রাজাজী কাশ্মীর পাকিস্থানকে দিয়া দেওয়ার ওকালতি শুরু করিলেন। তবে মুন্সীজী ইহা মানিতে পারেন নাই, তিনি প্রতিবাদ করিয়াছেন। বক্সী গোলাম মহম্মদের পদত্যাগ বিনাবাক্যব্যয়ে গ্রহণের দ্বারা কাশ্মীরে বিশৃঙ্খলার দ্বার উদ্ঘাটন এবং বিশৃঙ্খলার দোহাই দিয়া কাশ্মীর পাকিস্থানকে অর্পণ এখন আর কেবলমাত্র সন্দেহের বিষয় নহে উহা বাস্তবের খুব কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে।

দিল্লীর এই পাপ-পরিকল্পনার কথা বিদেশেও ছড়াইয়ছে—

তাহার প্রতিক্রিয়া শুধু দেশে নহে, বিদেশেও খুব ভালভাবেই ঘটিতেছে এবং তাহার ফল ভারতের অর্থনীতি, রাজনীতি এবং সামরিক প্রস্তুতি সব কিছুর উপরেই আসিয়া পড়িতেছে। কৃষ্ণ মেননের পরামর্শে ইন্দিরা গান্ধী ভারত সরকার চালাইবেন এই সম্ভাবনা মাত্রে আমেরিকা হাত গুটাইয়াছে এবং রাশিয়া হস্ত প্রসারিত করিতেছে। আমেরিকা অর্থসাহায্য কমাইয়াছে., রাশিয়া মস্কো প্রদর্শনীতে প্রেরিত সমস্ত ভারতীয় পণ্য কিনিয়া নিয়াছে। একজন ৫০০ কোটি টাকা দিতে উদ্যত হইয়া দিল না, অপরজন ৪ লক্ষ টাকার মাল কিনিয়া নিল, উহাই শুধু তফাৎ। দিল্লীর কূটনৈতিক মহলের সংবাদ, আমেরিকা যে সমস্ত মূল্যবান্ অস্ত্র-শস্ত্র ভারতকে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল তাহা আসিবার সম্ভাবনা কমিয়া গিয়াছে; আমেরিকানরা বলিতেছে যে কমুনিষ্ট কৃষ্ণ মেননের হাতে ঐ সব দুষ্প্রাপ্য অস্ত্র পড়িবার আশঙ্কা তাহারা মানিয়া নিতে পারিবে না।

সংবাদপত্রে "কেচ্ছা" প্রকাশ

নিউজিল্যাণ্ডের ওয়েলিংটন শহরে কিছুদিন পূর্ব্বে ষ্টিফেন ওয়ার্ডের মামলার অশ্লীল বিবরণ প্রকাশ করার জন্য একজন পাঠক একটি সংবাদপত্রের মালিকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিয়াছেন। মামলা দায়েরকারী হাওয়ার্ড টমাস রুক একজন ইঞ্জিনিয়ার। অভিযোগে তিনি বলিতেছেন যে, ডেলি নিউজ পত্রিকায় গত ২৫শে জুলাই সংখ্যায় ওয়ার্ডের মামলার যে বিবরণ প্রকাশিত হয় তাহার কিছু অংশ অশ্লীল। অভিযোগকারীর উকিল বলেন যে, ইহা সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের চেষ্টা নহে, যে-সব ছেলেমেয়েরা সংবাদপত্র পাঠ করে তাহাদের মাতাপিতার পক্ষ হইতে ইহা প্রতিবাদ মাত্র। মামলা সম্পর্কে হাকিম বলিয়াছেন যে, "বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আমার সিদ্ধান্ত জ্ঞাপনের পূর্ব্বে আমি কিছু সময় লইব।"

পৃথিবীতে এখনও অন্ততঃ এমন একজন ভদ্রলোক আছেন যিনি সংবাদপত্রে কদর্য্য বিষয় পরিবেশনের বিরুদ্ধে আদালতে প্রতিবাদ করিবার সৎসাহস রাখেন দেখিয়া মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ক্ষীণ একটু আশার আলো দেখিতে পাইলাম।

অন্য দেশের কথা জানি না, কিন্তু এই 'কৃষ্টি'-গর্ব্বিত কলিকাতা শহরের অভিজাত এবং সর্ব্বাধিক প্রচারিত ইংরেজী এবং বাঙ্গলা সংবাদপত্রগুলিতে ডাঃ ওয়ার্ড তথা "বিমোহিনী" কীলার কাহিনী যে ভাবে এবং যে রসাল ভাষায় পাঠকমহলে পরিবেশন করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া নিজেদের শালীনতা, বিবেক, শিক্ষা এবং সর্ব্বোপরি ভদ্রতাবোধ সম্পর্কে সন্দেহাকুল হইয়াছি। অপ্রাপ্তবয়স্কদের মস্তক চর্ব্বণের পক্ষে এই প্রকার মামলার রিপোর্ট প্রকাশ প্রশস্ত অস্ত্র—পর্ণোগ্রাফী ইহার কাছে লজ্জায় মাথা নিচু করিবে! একশ্রেণীর ইতর লোক পয়সার লোভেই 'পর্ণোগ্রাফী' বিক্রয় করে, এই পয়সাতেই হয়ত ইহাদের সংসার চলে, কিন্তু কোটি টাকার মালিকদের সংবাদপত্রে সংবাদের নামে কাঁচা পর্ণোগ্রাফীর প্রচার কেন? এই পুণ্য প্রচারকার্য্যে সংবাদপত্রগুলির মধ্যে সময় বিশেষে বিষম প্রতিযোগিতাও লাগিয়া যায়।

প্রায়ই দেখা যায়, আমাদের বাঙ্গলা এবং ইংরেজী সংবাদপত্রে ডিভোর্স এবং নারী-ঘটিত ব্যাপারের অতি রসাল রিপোর্ট 'সংবাদ' বলিয়া প্রকাশিত হয়। এই প্রকার সমাজ, বিশেষ করিয়া ছেলেমেয়েদের পক্ষে অতীব ক্ষতিকর রিপোর্ট প্রকাশ না করিলেই কি নয়? অন্যদিকে, সমাজ-হিতৈষী কোন ব্যক্তি কিংবা সমাজ-সেবা-কর্ম্মে নিয়োজিত মহিলা সমিতির পক্ষ হইতে সংবাদপত্রের এই অনাচারের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ উঠে না। কেন?

উপরি-উক্ত বিষয়ের রিপোর্ট সংবাদ হিসাবে যতটুকু প্রয়োজনীয় সেইটুকু মাত্র অবশ্যই প্রকাশ করিতে হইবে। আমাদের আপত্তি—কুৎসিত-কদর্য্য ঘটনার বিস্তারিত রসাল বিবরণ প্রকাশ লইয়া। সংবাদপত্রের মালিক এবং সম্পাদক নিজেদের বাড়ীর অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েদের কথা মনে করিয়া, তাহাদের কল্যাণ চিন্তা করিয়াও ত এই বিকৃত সাংবাদিকতা হইতে বিরত থাকিতে পারেন, অন্ততঃ থাকা উচিত বলিয়া মনে করি।

বাঙ্গালা শিক্ষিত যুবকদের বেকারীর চিত্র

প্রায় দুই মাস পূর্ব্বে কর্ম্মসংস্থান কেন্দ্র হইতে প্রকাশিত একটি হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত বেকার কর্ম্মপ্রার্থী এবং তাহাদের কত সংখ্যক চাকুরি পাইয়াছে—তাহার একটি নির্ম্মম চিত্র পাওয়া যাইবে—

শিক্ষিত বেকারের চিত্র

সন		মোট শিক্ষিত কর্ম্মপ্রার্থী		মোট চাকুরি প্রাপ্ত
১৯৬০	—	৬৮৭৩১	—	২৭০২
১৯৬১	—	৭৯৮৭৫	—	৪২৫৭
১৯৬২	—	১১০২৮৭	—	৫০৪৬
১৯৬৩ (জুন পর্য্যন্ত)	—	১১৭৮৮৯	—	৩৪১৯

	মোট তালিকাভুক্ত	চাকুরিপ্রাপ্ত
ম্যাট্রি কুলেট		
১৯৬০	৪৬৪৫৩	১৩৩৩
১৯৬১	৫৩০১৮	২৫২৯
১৯৬২	৭৬৪৯৬	২৬৬১
১৯৬৩	৭৬২৭০	১৮৩৪
(জুন পর্য্যন্ত)		
ইন্টারমিডিয়েট		
১৯৬০	১৪৬০৩	৭৩২
১৯৬১	১৬৮৩৬	১০২৪
১৯৬২	২৩০৬২	১৩৬১
১৯৬৩	২৮৪২৪	৯৬৮
(জুন পর্য্যন্ত)		
গ্রাজুয়েট		
১৯৬০	৭৬৭৫	৬৩৭
১৯৬১	১০০২১	৭০৪
১৯৬২	১০৭২৯	১০২৪
১৯৬৩	১৩২৯৬	৬১৭
(জুন পর্য্যন্ত)		

বলা বাহুল্য—কর্ম্মসংস্থান কেন্দ্রে কর্ম্মপ্রার্থী হিসাবে নাম লিখায় নাই এমন আরও কয়েক লক্ষ বেকার পশ্চিমবঙ্গে আছে এবং তাহাদের সংখ্যাও প্রতি দিন বৃদ্ধিমুখে। আমাদের যতটুকু জানা আছে, তাহাতে মনে হয় বাঙ্গালী শিক্ষিত বেকারদের শতকরা ৭০ জনই আর কর্ম্মসংস্থান কেন্দ্রের দ্বারস্থ হয় না, তাহার প্রধান কারণ—পশ্চিমবঙ্গে-স্থিত অবাঙ্গালী মালিকানা এবং বাণিজ্য সংস্থায়—বাঙ্গালী কর্ম্মপ্রার্থী কর্ম্মসংস্থান হইতে প্রেরিত হইলেও—চাকুরি পায় না। কর্ত্তৃপক্ষ কেবলমাত্র নিয়ম রক্ষা করিবার -জন্যই Employment Exchangeএ তাঁহাদের কর্ম্মখালীর সংবাদ তথ্য ও হিসাব পাঠান। এমনও হয় যে ভেকান্সি, মালিকের ইচ্ছিতপ্রার্থীর দ্বারা পূরণ করিয়া, তাহার পর কর্ম্মসংস্থান কেন্দ্রে সংবাদ পাঠানো হয়। প্রায় সর্ব্বত্রই এক্সচেঞ্জ প্রার্থীর দাবি অগ্রাহ্য হইতেছে! বর্ত্তমানে—

"শিক্ষিত বেকারদের সম্বন্ধে কর্ম্মসংস্থান কেন্দ্রে যে তথ্য আছে তা থেকেই বলা যায় যে, বাঙ্গালী শিক্ষিত যুবকরা এখন শুধু কেরাণীর কাজেই নহে, দক্ষ শ্রমিক ও কারিগরি কাজে খুব ঝুঁকে পড়েছেন। কিন্তু বেসরকারী ক্ষেত্রে শিক্ষিত বেকারদের এডমিনিষ্ট্রেটিভ, সুপারভাইজারি, কারিগরি, কেরাণী, দক্ষ শ্রমিকের কাজ পাওয়ার যে সুযোগ আছে তাহার হার হ'ল ৩৯ শতাংশ। কিন্তু সেখানে বাঙ্গালীর চাকুরির হার কি? বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিক কর্ম্মচারীর প্রায় ৬২ শতাংশ এই রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দা বা স্থানীয় নন। শিল্পসংস্থায় যেখানে ১০০ জন বাঙ্গালী কাজ করেন সেখানে ১৫৭ জন অন্য রাজ্যের লোক কাজ করেন। আজ বাঙ্গালী যুবক পরিশ্রমের কাজেও নিযুক্ত হ'তে আগ্রহী, কিন্তু কাজ কোথায়? এবং কে তাঁদের সেই কাজ দিচ্ছেন? কলকারখানায় ডিগ্রীধারী, ডিপ্লোমাধারী ইঞ্জিনীয়ারিং ও কারিগরি বিদ্যায় ট্রেনিংপ্রাপ্ত বাঙ্গালী কর্ম্মীরা পর্য্যন্ত কাজ জুটাতে পারছেন না তার বহু অভিযোগ সরকারের শ্রম কর্ম্মসংস্থান দপ্তরের আছে। কর্ম্মসংস্থান কেন্দ্রের প্রেরিত প্রার্থীদের প্রতি বেসরকারী শিল্পবাণিজ্য সংস্থা, বিশেষ করে যাদের অংশীদারদের অনেকেই এই রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দা নন, তাদের এক বিরাট অংশ একটা বিরূপ মনোভাব নেওয়ায় শিক্ষিত বেকারের পক্ষে চাকুরী লাভ কঠিন হয়ে পড়েছে। সরকারী হিসাবে দেখা গিয়েছে এই রাজ্যের সম্ভাবনা শূন্য পদ পূরণের ক্ষেত্রে মোটেই সুযোগ পাচ্ছেন না। এক্সচেঞ্জ প্রেরিত প্রার্থীদের দিয়ে গড়ে ১১টি শূন্য পদের মধ্যে ৪টি পূরণ করা হয়েছে—সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা সকল হিসাব ধরে। কিন্তু বেসরকারী ক্ষেত্রে প্রতি ১০টি শূন্য পদের মধ্যে এক্সচেঞ্জ প্রেরিত একজনের বেশী লোক চাকুরি পায় না। আরও বহু সংস্থা এক্সচেঞ্জের কাছে লোক চান না এবং লোক পাঠালে তাঁদের ইণ্টারভিউ পর্য্যন্ত করেন না। ফলে, এক্সচেঞ্জের প্রয়াস অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হচ্ছে।"

উপরি উক্ত অভিযোগ সম্পর্কে আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কিছু আছে।

পশ্চিমবঙ্গের ব্যবসা-বাণিজ্যের শতকরা অন্ততঃ ৯০ ভাগ আজ অবাঙ্গালীর করতলগত। এবং এই অবাঙ্গালী মালিকের দল সাধ্যমত চেষ্টা করেন তাঁহাদের নিজ নিজ প্রদেশের জ্ঞাতি-ভাইদের কর্ম্মে নিয়োগ করিতে, বলা বাহুল্য শতকরা ৯০টি চাকরিও পায় তাহারা। যোগ্যতর বাঙ্গালী কর্ম্মপ্রার্থীর প্রতিও চরম অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে বেশীর ভাগ অবাঙ্গালী মালিক কোন প্রকার সঙ্কোচ বা দ্বিধা কিংবা ভয় করেন না। কারণ এই অবাঙ্গালী মালিকগোষ্ঠী বেশ ভাল করিয়াই জানেন যে, ক্লীব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এমন ভরসা বা সাহস নাই যে—তাঁহারা বাঙ্গালী স্বার্থবিরোধী কোন কাজে কোন প্রকার সক্রিয় প্রতিবাদ করিবেন।

অবাঙ্গালী মালিকদের দোষ দিয়া লাভ কি, যে ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারও তাঁহাদের পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত কল-কারখানা এবং সংস্থাগুলিতে একটি পাকা পরিকল্পনা করিয়া ক্রমশঃ বাঙ্গালীর সংখ্যা কমাইয়া যাইতেছেন। কল-কারখানা এবং সংস্থাগুলির উচ্চপদে বাঙ্গালী আজ কমিতে কমিতে প্রায় 'নাই'-এর সংখ্যায় ঠেকিবার উপক্রম হইয়াছে। দুর্গাপুর শিল্প-নগরীর প্রতি একটু নজর দিলেই ইহার কিছু বাস্তব প্রমাণ

পাওয়া যাইবে। পশ্চিমবঙ্গের চিত্তরঞ্জন ইঞ্জিন নির্মাণ কারখানায় উচ্চ-নীচ সব লইয়া আজ বাঙ্গালীর সংখ্যা কোথায় নামিয়াছে তাহাও একবার দেখিলে ভাল হইত!

বর্ত্তমান সঙ্কটে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত বেকার কি এই রাজ্যে কর্ম্ম পাইবে না? বাঙ্গালী এম-এ,বি-টি, ইণ্টার, ম্যাট্রিক পাশ কয়েক লক্ষ শিক্ষিত কর্ম্মপ্রার্থী কর্ম্মসংস্থান কেন্দ্রে নাম রেজিষ্টারী করিয়া বছরের পর বছর কি কেবল বৃথা আশা লইয়া দিন গুণিতে থাকিবে? পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ-বিষয় কি কিছুই করিবেন না, এ-বিষয়ে কি তাঁহাদের কোন কর্তব্য, কোন দায়িত্বই নাই? বাঙ্গালীর জন্য এই রাজ্যে কিছু করিতে গেলেই যদি কেন্দ্রের ভয় করিতে হয়, তবে হে-বর্ত্তমান বাঙ্গালী-প্রধান! আপনি আরামবাগে গিয়া আরাম বিশ্রাম করুন—মন্ত্রিত্বে ইস্তফা দিয়া। রাজ্য শাসনকার্য্য চালনা আপনার কাজ নয়।

বিজয়নগরে বিজয়-বাণী

কিছুদিন পূর্ব্বে কৃষ্ণনগরের—বিজয়নগর নামক এক পল্লীতে কংগ্রেসীদের এক সভায় শ্রমমন্ত্রী শ্রীবিজয় সিং নাহার মহাশয় এই বাণী-দান করিয়াছেন যে, এ রাজ্যে (পশ্চিমবঙ্গে) সকল ব্যক্তির চাকুরি হওয়া সম্ভব নহে (নিশ্চয়ই সম্ভব নহে, যে হেতু শতকরা অন্তত ৭৫টি চাকরি বহিরাগত অতিথিদের জন্য অবশ্যই রিজার্ভ রাখিতে হইবে!), কাজেই চাকুরির মোহ (এবং আশা) ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালী যুবকদের বিভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্যে নামিতে হইবে এবং ছোটখাট ব্যবসা (কারণ বড় ব্যবসা-বাণিজ্য আজ সবই অবাঙ্গালীদের দখলে!) করিবার জন্য অগ্রণী হইতে হইবে, নতুবা সমস্যার সমাধান হইবে না!—এ-রাজ্যের ভয়াবহ বেকার সমস্যার সমাধান এক কথায় শ্রমিককুলমণি বিজয় সিং নাহার করিয়া ফেলিয়াছেন। ধন্যবাদ! বহুত ধন্যবাদ!

কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব—যে বাঙ্গালী সমাজের শতকরা ৯৫ জনেরই আজ একমুঠা চাউল, একখানা বস্ত্র, এক ফোঁটা ঔষধ কিনিবার মত অতি সামান্য অর্থও নাই, সেই সমাজের বেকার যুবকেরা 'ছোট খাট' ব্যবসা করিবার মত অন্তত হাজার-দুই হাজার টাকার সংস্থান করিবে কোন্, এবং কাহার সঞ্চিত কোষাগার হইতে?

প্রকৃত এবং তথাকথিত বহু 'উদ্বাস্তু' যুবক এবং অন্যান্য ওপার-আগত ব্যক্তি ব্যবসা এবং বসতবাটী নির্ম্মাণের জন্য লোন্ হিসাবে বহু অর্থ পাইয়াছেন জানি—এবং ইহাও জানি যে এই 'লোন্' চিরতরে অপরিশোধ্যই থাকিয়া যাইবে—কিন্তু এ-পারের দুর্গত এবং নবউদ্বাস্তুদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার কতটুকু কি করিয়াছেন,তাহার একটা হিসাব পাইলে খুশী হইবে।

বিজয়বাবু বলিতেছেন, এ রাজ্যে সকলের চাকুরি পাইবার আশা নাই. কিন্তু কেন? অন্য প্রদেশের লক্ষ লক্ষ লোক এ-রাজ্যে অনুপ্রবেশ করিয়া শতকরা ৬০ হইতে ৭৫টি চাকুরি কেমন করিয়া কি ভাবে পাইতেছে—অথচ লক্ষ লক্ষ পশ্চিমবঙ্গবাসী শিক্ষিত-অশিক্ষিত কর্ম্মক্ষম যুবক পথে পথে ভিখারীর মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে?

পাশাপাশি রাজ্যগুলিতে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার হইতে দাবি করা হইয়াছে—ঐ সব রাজ্যে যে সব কেন্দ্রীয় কলকারখানা এবং সংস্থা আছে তাহাতে শতকরা ৭৫ জন রাজ্যবাসীকেই কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে হইবে। এ-দাবী মিটাইতে কেন্দ্রীয় সরকার বিলম্বও করিবেন না। কিন্তু আমাদের ক্লীব রাজ্য সরকার এ বিষয় একেবারে নীরব কেন? বিহার, ওড়িষ্যা এবং অন্য রাজ্যের প্রায় সকল কলকারখানা এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে শতকরা ৭৫টি চাকুরিতে এবং কাজে স্থানীয় কর্ম্মপ্রার্থীদের নিযুক্ত করা হইতেছে। এ-কাজ সহজে হয় নাই—রাজ্য সরকারের জোরেই ইহা সম্ভব হইয়াছে। এ-বিষয় পশ্চিমবঙ্গে এমন জলন্ত ব্যতিক্রম কেন? স্বর্গত বিধান রায়ও এ-বিষয়ে বিষম অপরাধী ছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত কর্ম্মপ্রার্থী বেকারেরা বর্ত্তমানে যে "নিজ বাসভূমে পরবাসী" হইয়া আছে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের উপেক্ষাই সে-জন্য দায়ী। চাকুরি লইয়া প্রত্যেক রাজ্যেই প্রাদেশিক ভেদবুদ্ধির উদ্ভব হইয়েছে দেখিয়া দুই বৎসর পূর্ব্বে কেন্দ্রীয় সরকার স্থির করিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক রাজ্যের কলকারখানা ইত্যাদিতে নিম্ন বেতনের চাকুরির মধ্যে অধিকাংশ চাকুরি রাজ্যের অধিবাসীদের দেওয়া বাধ্যতামূলক হইবে এবং অধিক বেতনের চাকুরিতে লোকনিয়োগের ব্যাপারে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার আশ্রয় গ্রহণ করা হইবে। ভারত সরকার কর্ত্তৃক এই প্রস্তাবটি কার্য্যকর হইলে পশ্চিমবঙ্গের কলকারখানায় বাঙালী বেকারদের চাকুরি পাওয়ার সুবিধা হইত। কিন্তু কি নিগূঢ় কারণে জানি না, এই প্রস্তাবটি ধামাচাপা পড়িয়াছে। এই সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মতিগতিও দুর্ব্বোধ্য। আসাম, বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি রাজ্যের কলকারখানায় যাহাতে স্থানীয় লোকেরা চাকুরি পায় সেজন্য ওই সব

রাজ্যের গভর্ণমেণ্ট সম্ভবপর সব রকম চেষ্টা করিতেছেন এবং এই ব্যাপারে নিয়োগকর্ত্তাদের উপর ক্রমাগত চাপ দিতেছেন। ফলে এই সব রাজ্যে বর্ত্তমানে বহিরাগতদের পক্ষে কলকারখানায় চাকুরি পাওয়া খুবই কঠিন হইয়াছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে দারুণ বেকার-সমস্যা থাকা সত্ত্বেও এই রাজ্যের কলকারখানাতে বহিরাগতদের অবারিত দ্বার। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রত্যেক সংস্থাকে চাকুরি খালির বিষয়ে রাজ্যের এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জগুলিতে সংবাদ দিতে হইবে বলিয়া একটি আইন বলবৎ করিয়াছিলেন। কিন্তু অনেক শিল্প-সংস্থাই এই আইন নানাভাবে এড়াইয়া চলিতেছে। যেসব সংস্থা এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জগুলির নিকট সংবাদ দিতেছে, সেইসব সংস্থাও এক্সচেঞ্জের সুপারিশ গ্রহণ না করিয়া চাকুরিতে নিজেদের মনোমত লোক নিযুক্ত করিতেছে। কেবল নিয়োগের ব্যাপারেই নয়—এই রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্য সংস্থাগুলিতে প্রমোশনের ব্যাপারেও রাজ্যের সন্তানদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতদুষ্ট নীতি প্রযুক্ত হইতেছে। পরিকল্পনা-কমিশনের জনৈক উপদেষ্টা এ কথা স্বীকার করিয়াছেন যে, হাওড়া, হুগলী, ২৪ পরগণা—এমন কি দুর্গাপুরের শিল্পাঞ্চলে নূতন কোন কলকারখানা চালু হইলে তাহাতে স্থানীয় অধিবাসীরা খুব কমই কাজের সুযোগ পায়। তিনি বলেন যে, নূতনভাবে স্থাপিত কারখানার আশপাশে ইতিমধ্যেই যে বহিরাগত শ্রমিক ছিল তাহাদের মধ্য হইতেই নূতন কারখানায় লোক নিযুক্ত হয়।

একবার দুর্গাপুরের দিকে দৃষ্টি দিলে কি দেখিতে পাইবেন?

দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার বর্ত্তমান জেনারেল ম্যানেজার বাঙালী। পূর্ববর্ত্তী জেনারেল ম্যানেজারও বাঙালী ছিলেন। এইরূপ এক গুজব শোনা যাইতেছে যে, বর্ত্তমান জেনারেল ম্যানেজারের কার্যকাল শেষ হইলে ইস্পাত কারখানায় জেনারেল ম্যানেজারের পদে একজন অবাঙালীকে নিযুক্ত করা হইবে।

৬ জন ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজারের মধ্যে একজন বাঙালী। তাঁহার কার্যকালও শীঘ্রই শেষ হওয়ার কথা।

বর্ত্তমানে কয়েকটি উচ্চপদে বাঙালী নিযুক্ত আছেন। ঠিক তাঁহাদের নীচের পদগুলিতে অবাঙালীরা কাজ করিতেছেন। অধিকাংশ বাঙালী অফিসারের বয়স হইয়াছে। তাঁহারা অবসর গ্রহণ করিলেই অবাঙালীরা ঐ সব পদে উন্নীত হইবেন।

সম্প্রতি এইরূপ একটি ঘটনা ঘটিয়াছে। ট্রাফিক ম্যানেজার বাঙালী ছিলেন। তিনি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে নূতন ট্রাফিক ম্যানেজার এবং তাঁহার সহকারী অবাঙালী. ব্লাষ্ট ফার্নেসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের প্রমোশন হইয়াছে। এ ক্ষেত্রেও নূতন পদাধিকারী তাঁহার সহকারী অবাঙালী। রোলিং মিলসের চীফ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং চীফ মেটালারজিষ্ট বাঙালী। তাঁহাদের ঠিক নীচের পদেই অবাঙালী নিযুক্ত আছেন।

বর্ত্তমান ধারা যদি চলিতে থাকে তাহা হইলে দুই-তিন বছর পরে মেল্টিং শপ, কোকওভেন এবং চীফ ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনীয়ারের অফিস ভিন্ন অন্য সব বিভাগে অবাঙালীরা অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত হইবেন। জুনিয়ার ইঞ্জিনীয়াররা একসময়ে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইবেন। ২২৮ জন জুনিয়ার ইঞ্জিনীয়ারের মধ্যে বাঙালীর সংখ্যা মাত্র ৫৭ জন। এই সব ব্যাপার দেখিয়া সিনিয়ার বাঙালী অফিসাররা বেশ দুঃখ বোধ করিতেছেন।

এই ব্যাপার যে ইচ্ছাকৃতভাবে করা হইতেছে না, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই তাহা স্বীকার করেন না।

বর্ত্তমানে দুর্গাপুরে কারিগরিকুশল ব্রিটিশ কর্ম্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া প্রায় ৭০ এ দাঁড়াইয়াছে। অন্য কর্ম্মচারীদের ডিঙাইয়া তাঁহাদের উচ্চপদে নিযুক্ত করা হইতেছে।

অভিযোগ এই যে, একজন ব্রিটিশ কর্ম্মচারী একজন ভারতীয় কর্ম্মচারী অপেক্ষা ৫ গুণ অধিক বেতন পান। তিনি যে কাজ করেন, ভারতীয় কর্ম্মচারীরা তাহা ভালভাবেই করিতে পারেন।

ব্রিটিশ কর্ম্মচারীদের বেতনের অর্ধাংশ ষ্টার্লিংয়ে দিতে হয়। ইহাতে মূল্যবান্ বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করিতে হয়।

গোপন পরিকল্পনা বা প্রকল্প মতই যে দুর্গাপুরে উচ্চ পদগুলিতে অবাঙালী নিযুক্ত করা হইতেছে—যোগ্যতার ভিত্তিতে নহে—এ বিষয় সন্দেহের অবকাশ বিশেষ নাই বলিয়াই মনে হয়।

বেকারীর পরিণতি কি?

কর্ম্মক্ষম শিক্ষিত যুবকগণ বেকার থাকিতে বাধ্য হইতেছেন, তাঁহারা কর্ম্মের অভাবে বাধ্য হইয়াই নানা অকর্ম্মে লিপ্ত হইতেছেন। রাজ্য সরকার এবং সমাজের প্রতি এই সব বেকারদের কোন কৃতজ্ঞতা বা দায়িত্ব থাকিতে পারে না। বঞ্চিত এবং অভাবগ্রস্ত এই সব বেকারদের মনে সরকার এবং সমাজের প্রতি একটা প্রতিশোধ স্পৃহা জাগ্রত হইতে বাধ্য, যাহার ফলে সমাজ-জীবন নানাভাবে বিপদগ্রস্ত হইবে।

"পশ্চিমবঙ্গে যে সমস্ত মারাত্মক সমস্যা রহিয়াছে তাহার মধ্যে বেকার-সমস্যা ভীষণতম। এই সমস্যার কারণে পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় জীবন বিপর্য্যস্ত, কলুষিত হইয়া পড়িতেছে। কারণ শিক্ষিত লোকদের মধ্যে যে-সব লোক কর্ম্মক্ষম থাকা সত্ত্বেও কর্ম্মের সুযোগ পাইতেছেন না তাঁহারা নানা অবাঞ্ছিত আন্দোলনে যোগদান করিয়া পশ্চিমবঙ্গবাসীকে ভ্রান্ত পথে পরিচালনা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। প্রচলিত রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁহাদের বিদ্বেষই উহার কারণ। এই রাজ্যের যে-সব বেকার শিক্ষিত নহেন, তাঁহাদের কার্য্যকলাপ আরও মারাত্মক। কারণ এই শ্রেণীর লোকেরা নানা সমাজবিরোধী কার্য্যে লিপ্ত হইতেছেন। ফলে পশ্চিমবঙ্গের সর্ব্বত্র নাগরিকদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা আজ ক্ষুণ্ণ। পশ্চিমবঙ্গে এই যে বেকার-সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিজেদের নীতির পরিবর্ত্তনের দ্বারা ওউহার বহুলাংশে সমাধান অবশ্যই করিতে পারেন।"

মন্ত্রীমহাশয়গণ কেবলমাত্র বাণী-বিনোদ হইয়া থাকিলে কোন সমস্যার কোন সুরাহাই হইবে না। এ রাজ্যের বেকার-সমস্যার আশু সমাধান না হইলে—অল্পকাল মধ্যে যে বিষম 'সমাজ-বিপ্লবকর অবস্থার উদ্ভব হইবে, তাহা চিন্তা করিতেও আমরা ভয় পাইতেছি। জীবনে আশাহীন বেপরোয়া লোকের পক্ষে সর্ব্বপ্রকার অনর্থ সৃষ্টি দ্বারা সব কিছু তছনছ করা অসম্ভব নহে।

গত কিছুকাল হইতে এ রাজ্যে কার্য্যক্ষম কিন্তু বেকার যুবকদের মধ্যে রাজ্য সরকার এবং সমাজের বিরুদ্ধে বিষম একটা ক্রোধ এবং প্রতিহিংসার ভাব স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। রাজ্যের বাহির হইতে আগত ভিন্ন রাজ্যের লোক এখানে জমিজমা কিনিয়া, ব্যবসা-বাণিজ্য হইতে রাজ্যবাসীকে বেদখল করিয়া নবাবী করিতেছে, বাঙ্গালীকে সর্ব্বপ্রকারে বঞ্চিত করিয়া, তাহার বুকের উপর দিয়া ২৫।৩০ হাজার টাকার গাড়ি চালাইতেছে।

নিরুপায় বাঙ্গালী সন্তান এ-দৃশ্য ফ্যাল্ ফ্যাল্ নেত্রে অবলোকন করিতেছে। কিন্তু ইহা আর অধিককাল চলিবে না—চলিতে পারে না। বাঙ্গালী যুবকদের এ-অবস্থার সুযোগ পূর্ণমাত্রায় লইতেছে দেশদ্রোহী কম্যু-পার্টি। কম্যুদের 'চাষ'-এর অতি উর্ব্বর ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া দিতেছেন কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার, উভয়েই। 'বীজ' বপন সুরু হইয়া গিয়াছে—এই বিষবৃক্ষের ফসল দেশের এবং দশের সরকারের পক্ষে সমান অকল্যাণকর হইবে—বিশেষ ভাবে উপরতলার বাসিন্দাদের পক্ষে!

কবির জীবনকে আপনি "Comparatively screne life of eighty years" বলেছেন। বাইরে থেকে দেখলে এইরকম মনে হতে পারে। কিন্তু খুব কম লোকই তাঁর মত শোকের আঘাত, বন্ধুবিয়োগ ও বিচ্ছেদ, এবং নানাবিধ মানসিক ঝঞ্ঝা ও তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ ও তীব্র নিন্দা সহ্য করেছেন এবং অসাধারণ ধৈর্য্য, সংযম ও দৃঢ়তার সহিত সহ্য করেছেন।

—১৫.১০.১৯৪১ তারিখে শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়ের লেখা
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পত্রাংশ

"প্রমথবাবু যে কথ্য" বাংলার champio ছিলেন ইহা খুব সত্য। আপনি যে তাঁকে বাংলা পুস্তকে "কথ্য" বাংলার প্রবর্ত্তক বলেননি (যা অনেকে অজ্ঞতা বা অন্য কোন কারণে ব'লে থাকেন), ঐতিহাসিক তথ্য তার সমর্থন করে। কারণ, পুস্তকে "কথ্য" বাংলার ব্যবহার তাঁর আগে একাধিক লেখক করেছিলেন।

—১৫.১০.১৯৪১ তারিখে শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়কে লেখা
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পত্রাংশ।



হে বন্ধু বিদায়!

অজিত চট্টোপাধ্যায়

এক

শহর নয়, গ্রাম নয়—মাঝামাঝি জায়গা। লোকে বলে বাজার—মানিকবাজার নাম দিয়েছে। একপাশ দিয়ে নদী গিয়েছে বয়ে। ছোট নদী, গতি আঁকাবাঁকা। বর্ষায় ভরা, আবার গ্রীষ্মে হাঁটুজলও থাকে না। নদীর পাশে ঠিক বসতি গ'ড়ে ওঠে নি। বসতি হয়েছে বেশ খানিকটা গিয়ে। খড়ে ছাওয়া চাল, মাটির ঘর, নিকোনো-পোঁছানো মেজে···ইঁটের বাড়ী ত্ন'চারটে চোখে পড়ে। তবে সে অল্প-স্বল্প। মাটির ঘরই বেশী। অনেকগুলি পাড়া জুড়ে বসতি··· বোষ্টম পাড়া, কুমোর পাড়া, বামুন পাড়া, কায়েত পাড়া। পাড়ার মধ্যে লালমাটির পথ। এ অঞ্চলে পথ বা রাস্তা কথাটি বেশী ব্যবহার করে না কেউ। এরা বলে কুলি। বর্ষায় জল হ'লে রাস্তা দিয়ে জলের স্রোত বয়ে যায়। খল খল ক'রে হেসে চলে জল। এরা বলবে, বোষ্টম কুলি দিয়ে কি জলের তোড়। যেন ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায়। পাড়াগুলি ছাড়িয়ে বাজার মত জায়গা। ছোটখাটো ব্যবসার স্থান। আশেপাশের গ্রাম-অঞ্চলের লোকেরা বাজার করতে আসে। গোলদারী দোকান আছে, অর্থাৎ তেল-মুনের দোকান। ইঁট বা বালির কারবার করে কেউ। কেউ বা ষ্টেশনারী দোকান খুলে বসেছে। আজকাল কয়লার আড়ত হয়েছে ত্ন-চারটে। গ্রাম-অঞ্চলে কয়লার প্রচলন বেড়েছে। বাজারের উপরই থানা। আর রয়েছে ডাক্তারখানা। একজন কবরেজও দোকান খুলে বসেছে। একটা সিনেমা হলও আছে বাজার ছাড়িয়ে। তবে বারোমাস চলে না। শীতের সময় থেকেই সুরু হয় ছবি। তখন গ্রাম-অঞ্চলে ধানকাটা শেষ হয়। ঝাড়াই-মাড়াই হয়ে ধান ওঠে খামারে। চাষীর হাতে পয়সা আসে। মহাজনে ধান কেনে, খড় কেনে। সে সময় ছবি সুরু হ'লে দর্শকের জন্য চিন্তা করতে হয় না।

মানিকবাজারে স্কুল আছে ত্নটো। একটা ছেলেদের, অন্যটা মেয়েদের। ছেলেদের হাই স্কুল—সেটা মোটরবাস যাবার পথে আমবাগানের পাশে। বাজার থেকে বেশ খানিকটা দূরে। মেয়েদের জুনিয়র হাইস্কুল। সেটি বাজার যাবার পথে বাঁ-দিকে পড়বে। খড়ে-ছাওয়া স্কুলবাড়ী। সামনে ছোট বাগান মত খানিকটা। পিছনে দিদিমণিদের থাকবার বাড়ী। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন তক্‌তকে স্কুলটি দেখলে লোকজনের নজর ফেরে না।

এ ছাড়াও আছে সরকারী হাসপাতাল। পাকা বাড়ী। অনেকখানি জায়গা জুড়ে সাদা সাদা ঘরগুলি। এজ্‌বেসটসের ছাউনি। এখানে-সেখানে ছড়িয়ে আছে ঘরগুলি। কোনটা রোগীদের থাকবার, কোনটা আউটডোরে পেশেন্ট দেখা হয়···কোনটা নার্সদের কোয়ার্টার, কোনটা বা ডাক্তারবাবুর বাসা। ত্ন'জন রোগী থাকবার ব্যবস্থা আছে হাসসাতালে। তবে ইনডোরে অনেক সময়ই পেশেন্ট পাওয়া যায় না। আউটডোরে অবিশ্যি জায়গা হয় না রোগীদের দাঁড়াবার। এত ভিড় যে ডাক্তারবাবু কম্পাউণ্ডাররা হিম্‌সিম খেয়ে যান। কানে পুঁজ, দাঁতে রক্ত, পেটে ব্যথা, সর্দিজ্বর এমনি রোগীর সংখ্যাই বেশী। আসলে হাসপাতালকে বিশ্বাস করতে পারে নি পুরোপুরি। তাই খুব দায়ে না পড়লে ইনডোরে পেশেণ্ট হয়ে আসতে চায় না কেউ। হাসপাতালের ইনডোর ওয়ার্ডে তাই সীট প্রায় খালিই থাকে।

দুই

নটবর সাউ এ অঞ্চলের মস্ত ধনী মহাজন। মানিক-বাজারে কোঠাবাড়ী আছে। সিনেমা হলটা তারই। ধানের আড়তও আছে একটা। সেটা কর্মচারীতেই চালায়। পেটমোটা নটবর যত্র-তত্র ছুটাছুটি করতে পারেন না। তাই কর্মচারীদের উপর নির্ভর করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। এদিকে ঘরে তিন সংসার। অবশ্য প্রথম দু'জন আগেই গত হয়েছেন। তাই সংসার বজায় রাখতে তৃতীয়াকে ঘরে আনতে হয়েছে। সেজন্য নটবরের আর খেদের অন্ত নেই। গদীতে ব'সে ক্যাশবাক্সটার উপর হাত রেখে খদ্দেরজনকে বলে নটবর—সতীলক্ষ্মী তারা। তাই সংসার ছেড়ে আগেভাগেই চ'লে গেল। আমায় রইতে হচ্ছে একা। কিন্তু সংসার বজায় রাখি কি ক'রে? তাই অনিচ্ছায় আবার দার পরিগ্রহ করতে হ'ল।

খদ্দেররা অনেকেই ধারে জিনিষপাতি কেনে। তাই নটবরকে সন্তুষ্ট না ক'রে তাদের উপায় নেই। তারা সমবেদনা জানিয়ে বলে—তা দুঃখ ক'রে আর কি করবেন সাউমশায়। সংসারে কেউ চিরদিনের নয়। একজন যায় আর একজনকে আনতে হয়, নইলে সংসার যে বজায় থাকে না। ছোট বেলায় ইংরেজী পড়েছিল নটবর। পিয়ারী-চরণ সরকারের ফার্ষ্টবুকের ঘোড়ার পাতা পর্যন্ত দৌড়। খদ্দেরের কথা শুনে সে মাথা নাড়িয়ে বলে—ইংরিজীতেও ঐ কথাই যে বলেছে গো। ওয়ান মর্ণ আই মেট এ লেম ম্যান। মানে এ সংসারে কেউ কারো নয়। ইন এ লেন, অর্থাৎ যদিও হয়। ক্লোজ টু মাই ফার্ম—দু'দশ দিনের জন্য।

দাঁত বের ক'রে হাসতে থাকে নটবর সাউ। খদ্দেররা ইংরেজী শুনে স্তব্ধ, তাদের দৌড় বিদ্যাসাগর মশায়ের বইয়ের জল পড়ে পাতা নড়ে অবধি! এ দাঁতভাঙা ইংরেজীর ব্যাখ্যা করে শোনাচ্ছেন সাউমশাই! তারা কৃতার্থ হয়ে ব'সে থাকে।

তিন

চায়ের দোকানী নিবারণ সাণ্ডেলের মনে সুখ নেই। পঞ্চাশটি টাকা কর্জ ক'রে হাসপাতালের কাছে চায়ের দোকান দিয়েছে নিবারণ। কর্জ নিয়েছে সাউমশাইয়ের কাছ থেকে। আজকাল গ্রাম-অঞ্চলেও চায়ের দোকানের বেশ চলন হয়েছে। বিক্রীপাতি মন্দ হয় না। বুদ্ধিটা দিয়েছে নটবর সাউ নিজেই। এক রকম ব'সেই ছিল নিবারণ। কাজকর্মের অভাবে প্রায় বাউণ্ডুলে হ'তে যাচ্ছিল। নটবর সাউ ওকে ডাকিয়ে নিয়ে এসে বলল,—উদ্‌মাটার মত টো টো ক'রে ঘুরে মরছিস্ কেন? একটা কাজকর্ম কিছু কর্—

নিবারণ বলল—কাজকর্ম একটা কিছু জুটিয়ে দাও না সাউমশাই।

কাজকর্ম কোথায় পাব রে? তবে হ্যাঁ একটা বুদ্ধি দিতে পারি বাতলে—

—কি বুদ্ধি?

—একটা কাজ কর্ না। হাসপাতালে সকালে-বিকালে ত ভিড় কম হয় না? তা ছাড়া নার্সরা, কম্পাউণ্ডার আর দুচারজন লোকও রয়েছে। ওখানে একটা দোকান পাত্ না—

—কিসের দোকান?

—এই চায়ের দোকান। সঙ্গে পান, সিগারেট দেশলাই মোমবাতি রাখবি।

—কিন্তু পুঁজি যে নাই গো? সেদিকে ভাঁড়ে মা ভবানী।

—পুঁজি নেই ত, কর্জ কর—নটবর সাউ হেসে বলল।

—দিবে তুমি কর্জ? নিবারণ পাল্টা প্রশ্ন ক'রে বসল।

নিজের কথাতে নিজেই বাঁধা পড়ে গেল নটবর সাউ। পঞ্চাশটি টাকা কর্জ দিতেই হ'ল। অবিশ্যি শুধু হাতে। তবে সুদের হারও তেমনি চড়া। শেয়ালের মত খ্যাঁস্‌খ্যাঁসে গলায় হাসি হেসে কথাটা বলল নটবর—আসলটা না দিতে পারিস্ ত দরকার নেই। তবে হ্যাঁ সুদটা, মাস মাস ওটা দিতে যেন ভুলিস্ নে বাবা।

সেই থেকে দোকান দিয়েছে নিবারণ সাণ্ডেল। তবে দোকান সুরু হতেই জোর চলেছে। হাসপাতালের আউট-ডোর রোগীর সংখ্যা কম নয়। দূর গ্রাম হতেও লোক আসে অনেক। বিনা পয়সায় চিকিৎসা হয়। ওষুধপত্তর পাওয়া যায়। অধিকাংশই সাধারণ রোগী। শুধু বিনা পয়সায় চিকিৎসা হবে ব'লেই এসে জোটে। এদের অনেকেই চা খায় নিবারণের দোকানে ব'সে। সেই সঙ্গে সুরু হয় বিড়ি সিগারেট বিক্রী। মাস দুই-এর মধ্যেই গুছিয়ে বসেছে নিবারণ। নটবর সাউয়ের টাকা শোধ ক'রে দিয়েছে। সাউ অবাক্ হয়েছিল টাকা ফেরৎ পেয়ে। হেসে বলেছিল, টাকা ত ফেরৎ দিলি? কিন্তু যে বুদ্ধিটা বাত্‌লে দিলাম সেজন্য কি দিবি?

নিদারুণ সত্য। অস্বীকার করার ক্ষমতা নিবারণ

সাণ্ডেলের ছিল না। সে সাউমশায়কে বিনিপয়সায় এক পেয়ালা চা খাওয়াতে প্রতিশ্রুত হয়ে এসেছে।

একা সামলাতে না পেরে একজন লোকও রেখেছে নিবারণ। ঠিক লোক নয়, একটা বাচ্চা ছেলে। মোটাসোটা কালো কুচকুচে বর্ণের ছেলেটা। একটা নীল রঙের প্যান্ট প'রে চট্‌পট্ কাজকর্ম করে সে। চা দেয় খদ্দেরজনকে। নিবারণ ক্যাশবাক্স আঁকড়ে ব'সে থাকে। মাঝে মাঝে পান-সিগারেট বেচে।

সেদিক্ দিয়ে শান্তিতেই আছে নিবারণ। অর্থের স্বাচ্ছল্য তার একটু-আধটু এসেছে। অশান্তিটা তার মনের। শুধু মনেরও নয়, অশান্তিটা তার একান্তই নিজস্ব। অশান্তির কারণ হাসপাতালের কচি নার্সটি। জন চার নার্স আছে হাসপাতালে। প্রথম দোকান খুলে ওদেরই খদ্দের পেয়েছে নিবারণ। সকালে উঠে দোকান খুলে প্রথম চা-টা ওদেরই পৌঁছে দিতে হয়। এক পট্ চা নেয় ওরা। তার সঙ্গে পাউরুটি, বিস্কুটও কিছু কিছু যায়। সব দিন পৌঁছে দিতে হয় না এসব। হাসপাতালের ঝিটাই এক-একদিন আগেভাগে দোকানে এসে ব'সে থাকে চা নেবার জন্যে।

নিবারণ বলে—কি রে? এত সকালেই চা খাবে তোর দিদিমণিরা?

ঝি'টা এদেশী মেয়ে। এদেশেরই টানের সুরে কথা বলে। সে জবাব দেয়—চা খাবেক নাই? বেলা কি কম হয়েছে গা?

চা নিয়ে ঝি'টা চ'লে যায়। চারজন নার্সকেই চেনে নিবারণ। তিনজনের বয়স বেশী। পঁয়ত্রিশ-চল্লিশের কম নয় তারা। শুধু একজনই কচি। খুব অল্প বয়সেই নার্স-ট্রেনিং নিয়ে এ লাইনে ঢুকে পড়েছে। মেয়েটির নাম প্রমীলা। নিবারণ হাসপাতালের মুদ্দফরাসের কাছে খবরটা নিয়েছে। নার্সকোয়ার্টার্সের বারান্দায় কতদিন চেয়ার পেতে মেয়েটিকে ব'সে থাকতে দেখেছে সে। অল্পবয়সী কালো মেয়েটি। চুলগুলি বিনুনী ক'রে পিঠে ঝোলান। বারান্দার এক কোণে ব'সে দূরের আকাশটার দিকে চেয়ে কি যেন ভাবে মেয়েটি। নিবারণ কতদিন দোকানে ব'সে চেয়ে থেকেছে সেদিকে।

মাঝে দু'একদিন মেয়েটি দোকানে এসেছিল। নার্সের পোশাক প'রেই এল সে একদিন। অন্য কিছু নয়। একটা জিনিষ আনিয়ে দেওয়ার কথা বলতে। কি একটা বিশেষ তেল একশিশি। মানিকবাজারে ওসব পাওয়া যায় না। নিবারণ জিনিষপাতি কিনতে হামেশাই যায় বারো মাইল দূরের জেলাশহরে। তাই নিবারণকেই বলতে এসেছিল জিনিষটা আনিয়ে দেওয়ার কথা। নিবারণ হেসে বলল—টাকাটা আপনি রাখুন এখন। আমি সময়মত জিনিষটা পৌঁছে দিয়ে আসব আপনার।

মেয়েটি স্মিত হেসে উত্তর দিল—তাতে কি হয়েছে? টাকাটা থাকই না আপনার কাছে।

চায়ের দোকানী নিবারণ সাণ্ডেল কচি ছেলে নয়। সে জানে, জীবনে চান্স্ কখনও দুবার আসে না। তেল এনে দেওয়ার নাম ক'রে এক শিশি সুগন্ধী তেল যদি সে উপহার দিতে পারে তা হ'লে অল্পবয়সের এই হাসি-হাসি মেয়েটি তার দিকে চেয়ে একবার ফিক্ ক'রে হেসে ফেলতেও পারে। তাই কথা না বাড়িয়ে সে বলল—নোটখানা আপনার কাছেই রাখুন। তেল যদি পাওয়া যায় তখন দাম ত আপনার কাছ থেকে চেয়েই নেব।

এতে আর উত্তর করতে পারে নি প্রমীলা। দোকানী যদি জিনিষ এনে দিয়ে দাম নিতে চায় তাতে বলার কি আছে? সে টাকাটা হাতে নিয়ে ফিরে গেল কোয়ার্টার্সের দিকে।

ওর গমনপথের দিকে কতক্ষণ চেয়ে রইল নিবারণ। যদি এক কাপ চা খেতে বলত, তা হ'লে প্রমীলা কি অনুগৃহীত করত না ওকে? নিবারণ আনমনা হয়ে ব'সে রইল কতক্ষণ।

চার

প্রমীলা বসু মানিকবাজার হাসপাতালের জুনিয়র নার্স। চারজন নার্সের মধ্যে বয়সেও ও সবচেয়ে ছোট। বাইশের বেশী নয়। ছিপ্‌ছিপে কালো রঙের মেয়েটি। হাসি-হাসি মুখখানি। মাথার চুল বিনুনী ক'রে পিঠের উপর ঝোলান। রোগীরা ওকে পছন্দও করে খুব। শাদা পোশাকে ও যখন রোগীর কাছে এসে দাঁড়ায়, মিষ্টি হেসে কুশলবার্তা জানতে চায়, তখন রোগীর যেন অর্ধেক রোগ যায় কমে। হাসপাতালের ঝি-চাকররা ছোট দিদিমণি বলতে অজ্ঞান। অন্য তিনজন নার্স বয়সের সঙ্গে সঙ্গে চাকরির একঘেঁয়েমিতে মনেপ্রাণে খিট্‌খিটে হয়ে গেছে। কিন্তু প্রমীলা তা হয় নি। বৎসরখানেকের চাকরি-জীবনে-নার্সের কাজে বিরক্তি কখনও আসে নি তার।

রাতের ডিউটি পেলে অন্য নার্সরা ফোঁস্ ক'রে ওঠে বলে—কাজ নেই, কর্ম নেই আবার বাত্তির বহর দেখ না?

প্রমীলা হেসে উত্তর দেয়—কি হ'ল হেনাদি?

—হবে আবার কি? দেখ না ডিউটি খাতাটা। নাইট ডিউটি দিয়েছে আমাকে—

—নাইট ডিউটি ব'লে রাগছ এত? তা আমি যাই না তোমার বদলে—প্রমীলা হাসিমুখে জানায়।

হেনা জানে প্রমীলা এমনিধারা মেয়ে। কাজ করতে

পেলে যেন বর্তে যায় মেয়েটা। অন্যের কাজ টেনে নিয়ে করতে চাইবে নিজে।

হেনা হেসে বলে—আমার নাইট ডিউটি তুই নিতে যাবি কেন? পরে ডিউটি খাতাটায় সই ক'রে দিয়ে সে প্রমীলাকে বলে—বরং ঝিকে দিয়ে ব'লে পাঠা দু' কাপ চায়ের জন্য। আর দু'বাটি মুড়ি তেল মেখে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে নিয়ে আয়।

অন্য দু জনের নাম মলিনা আর নীরদা। বিকেল হতেই তারা বেরিয়েছে বাজারের দিকে। কাপড়ের দোকানে দু'চার গজ ছিট কিনবে, দু'একটা শাড়ীও পছন্দ ক'রে দেখবে। তারপর কেনাকাটা শেষ ক'রে হয়ত চওড়া পীচঢালা পথ দিয়ে চ'লে যাবে গ্রামের বাইরের দিকে। এ সময়টা চারপাশ বড় নিস্তব্ধ আর শান্ত। পাখপাখালীর রব শোনা যাবে। তেঁতুলগাছের ডালে ব'সে বসন্তগৈরী পাখী ডাকবে। সারাদিন খাটাখাটুনীর পর মলিনা আর নীরদা তাই একটু পায়ে হাঁটতে বেরিয়ে পড়ে।

চায়ের কাপ দিয়ে গেল দোকানের চাকরটা। নার্সদের জন্য স্পেশাল চা তৈরী ক'রে দেয় নিবারণ। কচি কলাপাতার রঙের শাড়ী প'রে প্রমীলা আজ নিজে গিয়ে ব'লে এসেছিল চায়ের কথা। দু'বাটি মুড়ি তেল-নুন লঙ্কা মাখিয়ে এনে টুলের উপর রাখল সে। তারপর একটু হেসে হেনাকে বলল—নাও, এবার সুরু ক'রে দাও হেনাদি।

হাত বাড়িয়ে মুড়ির বাটিটা নেয় হেনা। বলে—তুই আছিস্ ব'লে মানিকবাজারে টিঁকে আছি প্রমীলা। এত যত্ন, এসব আর কে করত বল্?

প্রমীলা বাধা দেয়। বলে—আহা, কত যেন করছি আমি হেনাদি?

এ কথার জবাব দেয় না হেনা। মুড়ি খেতে খেতে বলে—দেখ্ না মজা। একটা মাত্র রুগী ইনডোরে—তার জন্যে আবার নাইট ডিউটি। ডাঃ মিত্রের সব ব্যাপারে বড় বাড়াবাড়ি।

প্রমীলা চুপ ক'রে থাকে। কোন প্রতিবাদ করে না।

হেনা বলে—অথচ রোগীর বাড়ী থেকে একজন লোক সব সময় ব'সে আছে পাশে। নার্সের আর কি প্রয়োজন বল্?

ডাঃ মিত্র হাসপাতালের রেসিডেন্ট মেডিক্যাল অফিসার। অল্পবয়স্ক ছোকরা ডাক্তারটি। অল্পদিন পাশ ক'রে গ্রাম-অঞ্চলের ডাক্তার হয়ে এসেছে। ইনডোরে রোগী কম। একমাত্র লেবার কেস্ ছাড়া রোগী হয় না বললেই চলে। তবু মাঝে মাঝে দু-একটা বিদ্ঘুটে রুগী এসে জোটে হাসপাতালে। ইনডোরে তারাই বেশ কিছু দিন ধ'রে থাকে। তখন নাইট ডিউটি পড়ে নার্সের। আর তাই নিয়ে বিরক্তি আর গজগজানির অন্ত নেই।

একটু পরেই রাত হ'ল। মলিনা আর নীরদা ফিরল সন্ধ্যার একটু পরে। দোকানে সওদা শেষ করেছে অনেক আগে। পছন্দমত ছিট কাপড় নটবর সাউয়ের দোকানেই পেয়েছে। ছিটগুলি দেখতে দেখতে হেনা বলল—কত ক'রে নিল বল্ দিকি?

মলিনা দাম বলল। কিন্তু সেকথা চাপা দিয়ে নীরদা ব'লে বসল—গলা-কাটা দাম, বুঝলি হেনা? কলকাতা হ'লে এর অর্ধেক দামে পেতাম ছিটগুলো।

প্রমীলা সদ্য-কেনা সবুজ শাড়ীটার জমিটা পরীক্ষা করছিল। সে হেসে উত্তর দিল—কলকাতায় ত সস্তা হবেই হেনাদি। কলকাতা থেকে কিনে আনতেও ত কম খরচা হয় না?

নীরদা গালে হাত দিয়ে বলল—তুই অবাক্ করলি প্রমীলা। তাই ব'লে ডবল দাম আদায় করবে?

প্রসঙ্গটা পাল্টে গেল। হেনা বলল—ওসব তর্ক রাখ্। আমার রাতে ডিউটি পড়েছে আজও।

নীরদা আর মলিনা সমস্বরে বলল—সে কি রে? ইনডোরে রুগী কই?

—কেন, ঐ ত রুগী রয়েছে একজন।

—তার কাছে ত নিজের লোক দুজন সব সময় মোতায়েন—তুই কি করবি?

হেনা হেসে বলল—কিছু না করতে পারি, সারারাত চেয়ারে ব'সে কাটাতে ত পারব?

প্রমীলা বলল—তার চেয়ে আমিই যাই না হেনাদি?

ওকে ধমক দিয়ে হেনা থামিয়ে দিল। তারপর একটু হেসে বলল—কাজ পেলে আর কিছু চাস্ না তুই, তাই না?

প্রমীলা মাথা নীচু ক'রে রইল লজ্জায়।

হেনা বলল—তার চেয়ে দেখি একখানা ভাল গল্পের বই। নিয়ে আয় দেখি আগে। তবে হ্যাঁ, ন্যাকা প্রেমের গল্প যেন না হয়।

বেশ মোটামতন একখানা বই নিয়ে এল প্রমীলা। সেটা হাতে নিয়ে হেনাকে খুশী খুশী দেখাল খুব।

মলিনা বলল—বই শেষ করতেই তোর রাত কেটে যাবে হেনা। দেখবি, বই শেষ হয়ে এলে ঐ বট গাছটার মাথায় শুকতারাটা দপ্ দপ্ ক'রে জ্বলছে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে হেনা বেরিয়ে গেল। বারান্দায় চেয়ার পেতে তার পরও কতক্ষণ ব'সে রইল প্রমীলা। এখানে তার ছ'মাস প্রায় কেটে

গেল। আকাশের এক রাশ তারার দিকে চেয়ে পুরাণো দিনগুলির কথাই সে ভাবছিল। এই ছ'মাসে কি বদ্‌লে গেল প্রমীলা? না, প্রমীলা সেই এক রকমই আছে। মাঠের এককোণে দাঁড়ান বিরাট্ বটগাছটার দিকে চেয়ে সে ভাবছিল, কখন শুক উঠবে, রাত শেষ হয়ে ভোরের হিমেল হাওয়া বইবে।

পাঁচ

দিন দুই পর। বিকেল হ'তে তখনও একটু বাকী। নিবারণ সাণ্ডেল সাইকেলে পা দিয়ে নার্স-কোয়ার্টারে এসে হাজির। গলা শুনে ঝি বেরিয়ে এসে বলল—কি খবর দোকানীবাবু? কাকে খুঁজছ?

চ'টে গিয়ে নিবারণ বলল—দোকানীবাবু কি রে? সাণ্ডেলবাবু বলতে পারিস্ নে?

ঝি বোকাহাবার মত চেয়ে রইল কতক্ষণ।

নিবারণ বলল—তোর প্রমীলা দিদিমণিকে ডেকে আন্।

সাইকেল থেকে নেমে দাঁড়াল নিবারণ। পকেট থেকে সিগারেট বের ক'রে ধরাল একটা। পরিষ্কার ধবধবে পাঞ্জাবী পরণে। পাতলা ধুতির কোঁচাটা পায়ের কাছে লুটোচ্ছে। রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে নিল সে।

প্রমীলা বেরিয়ে এসে বলল—কি ব্যাপার? আপনি হঠাৎ? অসুখবিসুখ নাকি কারো?

শুকনো গলাটা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে নিবারণ বলল—ইয়ে, আজ্ঞে, অসুখ নয়। আপনার সেই তেলটা এনেছি। আজই শহর থেকে এলাম যে।

হাত বাড়িয়ে তেলের শিশিটা নিল প্রমীলা। সেই সুগন্ধী তেলের শিশি। প্রমীলার পছন্দ-করা জিনিষ। এসব অঞ্চলে এত দামী তেল ব্যবহার করে না কেউ। প্রমীলার একটা বাতিক আছে। মাথায় ঐ তেলটা না মাখলে কেমন তৃপ্তি হয় না ওর।

নিবারণ বলল—এই তেলটাই ত? দেখুন, না হলে বদ্‌লে আনিয়ে দিতে পারব।

তাড়াতাড়ি উত্তর দিল প্রমীলা—না, না। এই তেলটাই চাই আমি।

নিবারণ প্রমীলার দিকে চেয়ে হাসতে লাগল।

—কত দিতে হবে আপনাকে? প্রমীলা জিজ্ঞেস করল।

—সে দেবেন'খন। তাড়াতাড়ির কি আছে?

—না, না, তাই কি হয় নাকি? আপনি দাঁড়ান একটু, আমি টাকাটা নিয়ে আসি।

ভেতরে ঢুকে গেল প্রমীলা। বাইরে দাঁড়িয়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল নিবারণ। সামান্য একশিশি তেল। প্রমীলাকে যদি এটুকু উপহারও না গ্রহণ করাতে পারে সে, তা হ'লে একবারও কি হাসবে তার দিকে চেয়ে ঐ অল্পবয়সী মেয়েটি? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের মনেই সাতপাঁচ ভাবতে লাগল সে।

টাকা নিয়ে কোয়ার্টার্স থেকে বেরিয়ে এল প্রমীলা। ততক্ষণে উধাও হয়ে গেছে নিবারণ। কোনদিকে টিকিটিও দেখা নেই সাণ্ডেলের। প্রমীলা হাসপাতাল কম্পাউণ্ডের চারপাশে চেয়ে চেয়ে দেখল। সে ভাবল, আচ্ছা কাণ্ড ত! টাকাটা না নিয়ে কোথায় চ'লে গেল ভদ্রলোক।

চিন্তিত মুখে কোয়ার্টার্সে ঢুকল প্রমীলা। টাকাটা আবার দোকানে গিয়ে দিয়ে আসতে হবে। কিংবা ঝি-কে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেও চলবে। তেলের শিশিটার দিকে সে একদৃষ্টে চেয়ে রইল।

সামনের খাটে শুয়েছিল হেনা। পাশ ফিরে সে বলল—কি ব্যাপার রে প্রমীলা? টাকা হাতে ক'রে বেরুলি, আবার টাকা নিয়ে ফিরে এলি।

—তেলের দামটা দিতে গেছলাম। কিন্তু নিবারণ-বাবুকে দেখতে পেলাম না কোথাও। শিশিটা দিয়ে কোথায় যে চ'লে গেলেন ভদ্রলোক—

এবার হেসে ফেলল হেনা। বলল—ওর জন্য ভাবিস্ না প্রমীলা। তেলের দাম বোধহয় ভদ্রলোক নেবেন না তোর কাছ থেকে।

—সে কি? এ আবার কি কথা তোমার হেনাদি?

হেনা বলল—তুই ঘাবড়ে যাচ্ছিস্ কেন? তোকে যদি একশিশি তেল ও উপহার দেয় তাতে চটবার কি আছে? তা ছাড়া এটা ত তেল দেওয়ারই যুগ রে!

—তা ব'লে আমাকে তেল দিতে চাইবে কেন?—প্রমীলা হেসে বলল।

—শোন কথা মেয়ের। কোয়ার্টার্সের দিকে নিবারণ-বাবুকে কখনও হাঁ ক'রে চেয়ে থাকতে দেখিস্ নি? হাসপাতালের দিকে বা আউটডোরের কাছে নিবারণবাবুকে ব'সে থাকতে দেখিস্ নি কোনদিন? এ সবের মানেও তোকে আমায় ব'লে দিতে হবে প্রমীলা?

এতক্ষণে খুব করুণ দেখাল প্রমীলাকে। সে মুখখানা কালো ক'রে হেনাকে বলল—তা হ'লে কি হবে হেনাদি?

—কি আবার হবে? তুই খটমট্ ক'রে হাসপাতালে যাবি, চাকরি করবি, আর নিবারণের মত লোকগুলোর মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিবি!—হেনা জোরে হেসে উঠল।

প্রমীলা কিন্তু হাসতে পারল না। সে ভাবছিল অন্য কথা। এই বিদেশ-বিভুঁই স্থানে এরকম একটা কাণ্ড ঘটলে সে



সে দেবেন'খন। তাড়াতাড়ির কি আছে? বলল নিবারণ।

সামলাবে কি ক'রে? নিজের সুনাম বজায় রাখবে কি উপায়ে?

হেনা বলল—দুর বোকা মেয়ে। এইটুকুতেই অত ঘাবড়ে যাস্ কেন? এখানে আমরা আছি কি করতে?

এবার মিষ্টি ক'রে হাসল প্রমীলা। লজ্জা-মেশান খুশী-খুশী হাসি। ওকে কাছে টেনে নিয়ে আদর ক'রে গাল দুটো টিপে দিল হেনা। তারপর মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল—নিবারণের আর দোষ কি বল্? মুখ দেখলে আমাদেরই মাথা ঘোরে তা নিবারণ ত পুরুষমানুষ।

নিজেকে ছাড়িয়ে নিল প্রমীলা। সে জানে, হেনাদির মুখকে বিশ্বাস নেই। কথা বলতে বলতে সময় আর পাত্র-পাত্রী ভুলে যেতে পারে হেনাদি। তাই সুরুতেই বাধা না দিলে হয়ত প্রমীলাকেই লজ্জায় ছুটে পালাতে হবে ঘর ছেড়ে।

ছয়

সাইকেল চালিয়ে নিবারণ সাণ্ডেল বাজারে এসে উঠল। সামনেই নটবর সাউয়ের দোকান। আজ হাটবার নয়। তাই দোকানে ভিড় নেই তেমন। নটবর সাউ ক্যাশবাক্সটার উপর হাত রেখে ঘুমোচ্ছিল। নিবারণ দোকানে এসে ঢুকল।

তন্দ্রাজড়িত চোখ মেলে সাউ বলল—কি রে নিবারণ, এমন ভরদুপুরে সাইকেল চালিয়ে হঠাৎ?

বড় শুকনো দেখাচ্ছিল নিবারণকে। কিন্তু সাজের বড়

বাহার। গন্ধতেল মাখা কেশদাম সযত্নবিন্যস্ত। ধবধবে পাঞ্জাবিটার পকেট থেকে একটা সুদৃশ্য রুমাল উঁকি দিচ্ছে। ধুতিখানা একটা বিখ্যাত মিলের প্রস্তুত। নটবর সাউ ভাল ক'রে ওকে চোখ মেলে দেখল।

নিবারণ বলল—এলাম এমনি বেড়াতে। অনেকদিন ত দেখা হয় নাই গো।

নটবর বলল—তা এত সাজের বাহার কিসের? এখানে আসতে সাজ লাগে নাকি?

চুপ ক'রে রইল নিবারণ।

—কি রে, জবাব দিলি না যে বড়?—নটবর ওকে জিজ্ঞেস করল।

এবার মুখ খুলল নিবারণ। হেসে বলল—একটা কাজে যেতে হয়েছিল যে।

—কি কাজ?

—একশিশি ভাল তেলের অর্ডার ছিল নার্সদের। সেটাই পৌঁছতে গেছলাম।

—কোন্ নার্সের? ঐ কচি মেয়েটার বোধহয়?—তির্যক চোখে তাকাল নটবর।

নিবারণ হেসে বলল—তা গন্ধতেলের অর্ডার কি ওই ঘাটের মড়া বুড়ী নার্সগুলোর হবে? যে বয়সের যা, তাই হওয়া চাই ত?

—সে আমি বুঝেছি নিবারণ। নইলে এই ভরদুপুরে তুই এমন সেজেগুজে বেরিয়ে পড়বি কেন?

—এ আবার কি কথা তোমার? খদ্দের জিনিষের অর্ডার দিল। সেটা তার বাড়ী গিয়ে পৌঁছে দিতে হবে না?

—তা ত পৌঁছে দিলি? কিন্তু লাভ হ'ল কি-টা? হেসে কথা বলল দুটো?—নটবর পানখাওয়া দাঁত বের ক'রে হি হি ক'রে হাসতে লাগল।

এরপর আর দোকানে বসতে সাহস 'পেল না নিবারণ। সাউমশাই রসিয়ে রসিয়ে কথা বলতে সুরু করেছে। কালকেই পাড়াময় চাউর ক'রে দেবে তার কথা। এই ছোট্ট জায়গায় অমন রসালো খবরটা ছড়িয়ে যেতে এতটুকু সময় লাগবে না।

নিবারণ উঠে পড়ল। একবার দোকানের দিকে যেতে হয়। অশ্বত্থগাছের মাথায় রোদ হলদে হয়ে এল। বিকেল নেমে এসেছে। দূর দূর গাঁ থেকে যারা এসেছিল কেনাবেচা করতে, তারা মাঠের পথে রওনা দিয়েছে। নিবারণ একবার সেদিকে চাইল। মানিক বাজারের চার পাশে বড় বড় মাঠ। মাঠের মধ্যে কোথাও পুকুর রয়েছে। তালগাছে ঘেরা ছোট-বড় পুকুর। এ অঞ্চলে তালবৃক্ষের প্রাচুর্য আছে। নিবারণ পুকুর-পাড়ের উপর দিয়ে হেঁটে-যাওয়া চাষী মানুষগুলোর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল।

হাট-ফেরৎ লোকগুলো মাথায় ঝুড়ি নিয়ে নিজের নিজের গাঁয়ের দিকে চলেছে। মাঝে মাঝে চা খেতে ওরা নিবারণের দোকান পর্যন্ত চ'লে আসে। চায়ের আজকাল বড় প্রচলন। দোকানী, চাষী, হাটুরে, মজুর, সকলেই খাটাখাটনির পর চা একটু খাবে। সাইকেলে উঠে পড়ল নিবারণ। রাস্তাটা বাজারের শেষে একটা বাঁক নিয়েছে। পীচঢালা খোলা পথ। দিনেরাতে বাস ছাড়ে, মোটর চলে অসংখ্য। লরীর ত কথাই নেই। নিবারণ এসে হাসপাতালের কাছে নামল। ছোকরাটা ইতিমধ্যে ঘুম থেকে উঠে দোকান খুলে বসেছে। বিরাট্ কেৎলিটা উনুনে বসিয়ে দিয়েছে এক ফাঁকে। কেনাবেচা সুরু হয়েছে পান-সিগারেট আর দু'চার রকম জিনিষপত্রের। চায়ের দোকান হলেও অনেক কিছুই পাওয়া যায় নিবারণের দোকানে। এক হিসেবে মানিকবাজারের সব ষ্টলই ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোর। ছিট কাপড় থেকে আরম্ভ ক'রে উপহার দেবার মত দুচারখানা বই শুদ্ধ পাওয়া যাবে। দোকানে ঢুকে সাজগোজ ছাড়ল নিবারণ। দোকানী সেজে বসল আবার। ইচ্ছে হ'ল ছেলেটাকে একবার জিজ্ঞেস করে তেলের দাম দিতে কেউ এসেছিল কি না। কি ভেবে কথাটা তুলল না নিবারণ। পরিবর্তে লাল খেরো খাতাটা খুলে সারাদিনের হিসেব লিখতে সুরু করে দিল।

সাত

এর পর অনেকদিন কেটে গেছে। পৃথিবীর সব স্থানের মতই মানিকবাজারের দিনগুলি অবসাদে উত্তেজনায় কেটেছে। হয়ত বৈচিত্র্য ছিল কিছু। কিন্তু তেমন দিনকেও একরঙা ছাড়া আর বেশী কি বলা যায়? সব উত্তেজনাই থিতিয়ে যায় শেষে। সব উৎসাহই নিভে যায় ক্লান্তির চাপে।

কিন্তু ইতিমধ্যে একদিন শাদা মেঘের ভেলা ভাসিয়ে শরৎ হাজির হ'ল। এ বছর বর্ষা তেমন হয় নি। মাঠে-ঘাটে জল বড় কম। চাষের কাজও ব্যাহত হয়েছে খুব। কথায় বলেছে ধারাশ্রাবণ। কিন্তু এবারের মত রুখোশুকো শ্রাবণ আর কখনো যেন দেখা যায় নি।

চেয়ারে ব'সে প্রমীলা বলছিল—দেখেছ মলিনাদি, এবার কেমন ভাদ্রের প্রথমেই আকাশ ঝকঝকে হয়ে গেল? বর্ষা প্রায় হ'লই না যে!

মলিনা আরাম-চেয়ারে ঠেস দিয়ে কি একটা বুনছিল। অবসর সময় কাটাতে মেয়েরা যে কোন একটা সেলাইয়ের

আশ্রয় নেবে। মলিনাও বুনে যাচ্ছিল নিজের মনে। প্রমীলার কথা শুনে সে মুখ না তুলে জবাব দিল—তা যা বলেছিস্। এবার জল কম হওয়াতে চাষটা একদমই হ'ল না।

নীরদা কি একটা পত্রিকার পাতায় চোখ বুলোচ্ছিল। সে হেসে বলল—জল যদি হয় ত কলকাতায়। বর্ষার যেন আর শেষ নেই। দিনরাত শুধু ঝম্ ঝম্ আর ঝম্ ঝম্। অবিশ্যি মাঝে মাঝে ঝির ঝির করেও পাতলা বৃষ্টি হয়—

প্রমীলা জানে নীরদির ঐ একটা দোষ, কলকাতার প্রসঙ্গ না উঠিয়ে পারে না। যে কোন কথা উঠলেই তুলনামূলক ভাবে কলকাতাকে সে টেনে আনবেই। অবশ্য বর্ষণমুখর দিনে কলকাতাকে যে প্রমীলার মনে পড়ে না তা নয়। ছায়াবৃত আষাঢ় প্রহরে অনেকদিনই প্রমীলার মন উধাও হয়ে ফেরে। এখানে মানিকবাজারে যখন ঘন মেঘাবৃত আকাশে প্রচণ্ড বর্ষণের সুরু হয়, প্রমীলা তখন জানলার কাছ ঘেঁষে কতদিন ব'সে থেকেছে। একটা সাদা চাদরে ঢাকা সমস্ত আকাশটা বর্ষণমুখর হয়ে উঠেছে। দূরে দিগন্তটা অস্পষ্ট ধোঁয়া-ধোঁয়া মনে হয়। ওপাশে খামারবেড়ে গ্রামের খোড়ো ঘরগুলি স্পষ্ট দেখা যায় না। বৃষ্টি, বৃষ্টি,···কি প্রবল বৃষ্টি—

এমনি বৃষ্টির দিনে কলকাতায় সে কত ঘুরেছে। অবিশ্যি একা নয়, সুরঞ্জন সব সময়ই তার সঙ্গে থাকত। ট্রামে-বাসে এসপ্ল্যানেডে গিয়ে নামত। তার পর হাঁটতে হাঁটতে কোনদিন আউটরাম ঘাট, কোনদিন বা ইডেন গার্ডেনে গিয়ে বসত।

সুরঞ্জন বলত—এভাবে ঘুরে ঘুরে সমস্ত কলকাতাটাই চ'ষে ফেলা হবে। কিন্তু এতে লাভ কি মিলি?

প্রমীলা বুঝতে পারত সুরঞ্জনের চোখে কিসের বেদনা। কিন্তু সে গায়ে মাখত না সে কথা। হেসে বলত—লাভ-লোকসানের কথা এখন থাক সুরঞ্জন। আগে তোমার একটা চাকরি হোক্ তার পর দেখবে কলকাতাকে চ'ষে বেড়াতে হবে না। আমরা ছোট্ট এককোণে ঠাঁই পেয়ে গেছি দুজনে।

চাকরির কথা উঠলেই ম্রিয়মাণ দেখাত সুরঞ্জনকে। অনেক চেষ্টা ক'রেও একটা চাকরি জোটাতে পারে নি বেচারা। সে লজ্জাটা সুরঞ্জনের নিজস্ব। প্রমীলাকে কিছুতেই তার ভাগ দিতে চায় না। অথচ প্রমীলা চেয়েছে ওর সব লজ্জা নিজের ক'রে নিতে। সুরঞ্জনের কি চেষ্টার ক্রটি আছে? সে কথা কি জানে না প্রমীলা? আজকাল দু'তিনটে টিউশনি করে সুরঞ্জন। সে কথাও অজানা নয় নয় প্রমীলার। সুরঞ্জন কিন্তু কিছুতেই জানতে দিতে চায় না এসব কথা। প্রমীলা জানতে চাইলেও এড়িয়ে যায় সব কথা। যেন একটা রঙীন প্রজাপতি হয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে প্রমীলা। সংসারের খরেরৌদ্রের এতটুকু তাপে ঝল্‌সে যেতে পারে ওর ঝলমলে পাখা দু'টি।

এক-একদিন বৃষ্টি নামত হুড়মুড় ক'রে। ইডেন গার্ডেনে একটা মালীর ঘরে আশ্রয় নিত ওরা। মালীটাও প্রায় চিনে গিয়েছিল ওদের। উড়ে মালী। দেখা হ'লেই হেসে বলত—'ভিজি গলা দিদিমণি। আস, আস, জলদি আস।'

এতদিন পরে মানিকবাজারে বৃষ্টি দেখলে ওর সেই উড়ে মালীর কথাও কতবার মনে পড়ে।

মলিনা বলল—মাঝে মাঝে তুই এত ভাবিস্ কি বল্ দিকি প্রমীলা? মন যে তোর কোথায় ভেসে যায়।

কথা শুনে হেসে ফেলে প্রমীলা। মুখ ফিরিয়ে জবাব দেয়,—মলিনাদি যেন কি! মন আবার কোথায় যাবে? কি বলবে, কই বল না?

এই সময় হেনা এসে ঢুকল ঘরে। তার আজ সকাল থেকেই ডিউটি ছিল। সে এসে একটা চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বসল। নার্সের এপ্রণটা টান মেরে ছুঁড়ে দিল ঝিকে। তারপর প্রমীলাকে বলল—চটপট্ এক কাপ চা খাওয়া প্রমীলা, নইলে কিন্তু ভীষণ রেগে যাব।

হেসে বলল প্রমীলা—এক কাপ নয় হেনাদি। চার কাপ চা আনাচ্ছি। কি, সবাই খুশী ত?

ওর রকম-সকম দেখে হাসছিল মলিনা আর নীরদা। কি প্রাণচঞ্চল মেয়েটা। এই অল্পবয়সেই নার্সিং শিখে হাসপাতালে এসে পৌচেছে। এখনও ওর জীবনের সবটাই যে বাকী।

ঝিকে চায়ের পয়সা আর টি-পট দিয়ে পাঠিয়ে দিল প্রমীলা। তারপর হেনাকে বলল—আজ বিকেলে কার ডিউটি পড়ল হেনাদি?

—কার বল্ দিকি? হেনা মিটিমিটি হাসছিল।

—বা রে, আমি কেমন ক'রে বলব? আমার, না মলিনাদির? পরক্ষণেই নিরুৎসাহ হয়ে সে বলল—তবে কার ডিউটি পড়ল?

হেনা জবাব দিল এবার। বিকেলে ডিউটি নেই কারও। মানে ডাঃ মিত্র দেন নি কাউকে। তবে রাত্তিরে ডিউটি আছে তোর, বুঝলি প্রমীলা?

কথা শুনে হেসে ফেলে প্রমীলা। বলে—তবু ভাল হেনাদি। মলিনাদির ডিউটি পড়লে এতক্ষণ ঘরের হাওয়া গুমোট হয়ে উঠত।

বাইরে ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি পড়ছে। এ অঞ্চলের লোকে

বলে বৃন্দাবনী বিষ্টি। ঠিক ইলশে গুঁড়ি নয়—তবে অমনি গোছেরই বৃষ্টি। মানুষকে ভেজায় না ঠিক—কেমন স্যাঁতসেঁতে ক'রে তোলে।

জানলার ফাঁকে মলিনা একবার বাইরে তাকাল। মাঠে সবুজ ঘাসের নরম আস্তরণ। হাসপাতালের কাছে শিউলি-গাছে এবার ফুল আসবে। কি পত্রভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে গাছগুলো! ডাক্তারবাবুর বাড়ীর কাছে একটা গোলাপগাছে গোটা তিন গোলাপ ফুটে রয়েছে। এখান থেকে পাতাঢাকা গোলাপগুলো বড় সুন্দর দেখায়। তাদের বাড়ীর কাছে পাতাবাহার গাছগুলোর কোন কোন পাতায় জল টলমল করছে দু'এক ফোঁটা। বাইরের রোগীরা সব যে যার ঘরে ফিরছে। মলিনা দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে আবার সূচীকার্যে মন দিল।

বাইরে কড়া ন'ড়ে উঠল। নিশ্চয় কেউ ডাকছে—প্রমীলা গিয়ে দরজা খুলে এল সবার আগে। অন্য কেউ নয়—নিবারণ সাণ্ডেল। চা নিয়ে নিজে এসেছে। প্রমীলা বলল—আপনি? নিজেই চা এনেছেন যে?

নিবারণ যেন এতেই গদগদ। জোয়ারের মুখে ভরা নৌকার মত খুশীতে ডগমগ। সে একগাল হেসে বলল—কি করি বলুন? চাকরটা নানা কাজে রয়েছে। দেরি হ'ত চা পেতে।

—তাতে কি হয়েছে? প্রমীলার সুরে কিসের ছোঁয়া যেন।

নিবারণ সাণ্ডেল নিজেকে বুঝি হারিয়ে ফেলবে। চা আনতে যে তার কষ্ট হয়েছে একথা কচি নার্সটিরও মনে হয়। চায়ের পট বয়ে আনা বুঝি তার সার্থক হয়ে উঠল। সে বলল—চায়ের পট্‌টা ধরুন এবার। দোকানে চাকরটা একা আছে। নিবারণ মোলায়েম ক'রে হাসল।

চা নিয়ে ঘরে এল প্রমীলা। কাপ-ডিশ বের ক'রে টেবিলের উপর সাজিয়ে রাখল। চা ঢেলে দিল প্রত্যেকের কাপে।

হেনা বলল—চায়ের দোকানী বুঝি নিজে চা বয়ে নিয়ে এসেছিল প্রমীলা?

প্রমীলা হেসে ঘাড় নাড়ল। মলিনা আর নীরদা মুখ টিপে হাসছে। অবাক্ হ'ল প্রমীলা। সে বলল—কি ব্যাপার? হাসছ যে তোমরা?

হেনা বলল—প্রমীলাটা একেবারে ছেলেমানুষ। হাসপাতাল শুদ্ধ সবাই হাসাহাসি করে আর ওই জানে না কিছু।

এবার যেন খানিকটা আঁচ করতে পারছে প্রমীলা। নিবারণ সাণ্ডেলকে নিয়ে মাঝে মাঝে কথা উঠেছে ঠিকই। হাসপাতালের একটা গুঞ্জন মাঝে মাঝে তার কানেও ভেসে এসেছে। কিন্তু সে কথা নিয়ে একবারও তেমন ক'রে ভাবে নি প্রমীলা।

মলিনা বলল—প্রমীলার কাজ পেলে নিবারণ সাণ্ডেলের আর জ্ঞান থাকে না। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে।

হেনা বলল—কিন্তু তাতে কি? প্রমীলা যে কিছুই জানে না বা জানতে চায় না। এ যে ওয়ান-ওয়ে রাস্তা। নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠল হেনা।

নীরদা বলল—ঠিক বলেছ ভাই। আসলে পুরুষজাতটাই হ্যাংলা। কলকাতায় থাকতে কত যে শুনেছি—

তরল পরিহাসের স্রোত এবার মিলিয়ে গেল। হেনা ভাবল, নীরদাকে আর ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। একবার যখন কলকাতা এসেছে তখন আর শেষ নেই। মলিনা মুখ টিপে হাসতে লাগল।

গতিক দেখে এগিয়ে গেল প্রমীলাই। সে বলল—কলকাতার কথা এখন তুলে রাখ নীরদি। বরং আজকের একটা প্রোগ্রাম কর। ম্যাটিনিতে সিনেমা দেখে আসি চল। কি যেন বই এসেছে—

নীরদা বলল—বই আর কি দেখবি? হয়ত গেলে জানতে পারবি যে তিন বছর আগে কলকাতায় রিলিজ করেছিল। পুরনো ফিল্ম, তার উপর বাদসাদ দিয়ে কি বা আছে?

—যাই থাক্ না। দুপুরবেলায় চল না দেখে আসি সবাই মিলে?

হেনা, মলিনা দু'জনেই রাজী। যাওয়াই ঠিক হ'ল। দুপুরের পর বেরিয়ে পড়ল ওরা। আকাশে পেঁজা পেঁজা ছেঁড়া মেঘের আনাগোনা। রোদ হাসছে কোথাও। কোথাও মেঘে ঢাকা পড়েছে সূর্যকিরণ। ছায়াবৃত প্রান্তরে গরু চ'রে বেড়াচ্ছে। কাঠের বোঝা মাথায় সাঁওতাল মেয়ে চলেছে পথ বেয়ে। সিনেমা হাউসটা বাজার ছাড়িয়ে বেশ খানিকটা গেলে। দুপুরের দিকে পথ প্রায় জনহীন। সিনেমায় পৌঁছে চারখানা টিকিট কিনে ঢুকল ওরা। পর্দায় একটি স্নিগ্ধ ঘরোয়া ছবি দেখান হচ্ছে।

পাস ক'রে চাকরি-বাকরি জোটাতে পারে নি এক যুবক। চেষ্টার ত্রুটি রাখে নি কোন। কলকাতার বড় বড় রাস্তা চ'ষে, নামী নামী অফিসগুলোর দরজায় মাথা ঠুকেও কাজ জোগাড় হ'ল না। বাড়ীতে বিধবা মা ঠাকুর-দেবতার কাছে প্রার্থনা জানিয়ে চলেন—তার খোকনের একটা কাজ যেন হয়। কিন্তু এ যুগে ঠাকুরও বুঝি বধির।

কাজ কিন্তু ছেলেটির চাই। তার কাজ পাবার আশাপথ চেয়ে আর একজন ব'সে আছে। একটি মিষ্টিমধুর মনের

মেয়ে। তার ডাগর দুটি চোখে ব্যাকুল প্রতীক্ষা। কাজ কি ছেলেটি পাবে না?

অবিশ্যি কাজ পেল ছেলেটি। কিন্তু তার আগেই মেয়েটির প্রতীক্ষার অবসান ঘটেছে। অন্য একজনের গৃহে ঘরণী হয়ে উঠেছে মেয়েটি। বড় দেরী ক'রে যে কাজ পেল ছেলেটি। মেয়েটির অভিভাবকরা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারলেন না যে একদিন ছেলেটি কাজ খুঁজে পাবে।

নতুন কাজে যোগ দিতে গেল সে। অকেজো মন নিয়ে—

শো দেখে বাড়ী ফিরে আসতে আসতে নিজের কথাই ভাবছিল প্রমীলা। এখনও কাজ পায় নি সুরঞ্জন। কত চেষ্টাই না ক'রে চলেছে বেচারা। প্রমীলার প্রতীক্ষার কিন্তু অবসান ঘটে নি। ঘটবেও না। ঘটবে সেইদিন যেদিন কাজ পাবে সুরঞ্জন। প্রমীলা যে ব্যাকুল আগ্রহে সেই দিনটিরই প্রতীক্ষা করেছে—

আকাশে বেলা আর অবশিষ্ট নেই। সন্ধ্যে নেমে আসছে দূরে দিগন্তের কোলে। পাখীর দল উড়ে চলেছে নীড়ের দিকে। অমনি ক'রে কবে এখান ছেড়ে যেতে পারবে প্রমীলা? সুরঞ্জনের আহ্বান কবে এসে পৌছবে?

আট

দিনকতক পর। দুপুরে বিছানায় শুয়ে কি একটা বইয়ের পাতা উল্টোচ্ছিল প্রমীলা। পাশের ঘরে মলিনা ঘুমোচ্ছে। আজ সারা দুপুর নীরদা আর হেনা দু'জনেরই ডিউটি। সেই সন্ধ্যে পর্যন্ত থাকবে ওরা। বিছানায় শুয়ে ভাবছিল প্রমীলা। আজ বিকেলটা আর কোথাও বেড়াতে যাওয়া হয় না। অবিশ্যি একা একা বেরিয়ে পড়তে পারে সে। কিন্তু তাও সাহস পায় না তেমন। চায়ের দোকানী নিবারণ সাণ্ডেল হয়ত পথের মধ্যে দেখা হ'লে হাত ঝুঁকিয়ে নমস্কার ক'রে বসবে।

চটির শব্দ ভেসে এল বারান্দা দিয়ে।

প্রমীলা অবাক্ হ'ল। কে আবার এল এমন সময়? হাল্কা চটির শব্দ। বুঝে নিতে ভুল হয় না যে হেনাদি এগিয়ে আসছে। প্রমীলা উৎসুক হয়ে তাকাল।

চটির শব্দ দোর পর্যন্ত এগিয়ে এল। হ্যাঁ, হেনাদিই। প্রমীলা অবাক্ হয়ে বলল—কি ব্যাপার হেনাদি? ডিউটি ছেড়ে হঠাৎ?

—এক ভদ্রলোক তোর সঙ্গে দেখা করতে চান। কলকাতা থেকে এসেছেন বললেন। আয় চট ক'রে, ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন বাইরে।

আরও অবাক্ হ'ল প্রমীলা। কলকাতা থেকে কে তার সঙ্গে দেখা করতে আসবে এই ধাপধাড়া গোবিন্দপুরে? দুপুর গড়িয়ে বিকেল আসছে। এখন কোন্ ট্রেনে নেমে বাস ধরল জেলাশহরে?

বাইরে বেরিয়ে এসে দেখা হ'ল। সুরঞ্জন দাঁড়িয়ে আছে। হাতে একটা ছোট ব্যাগজাতীয় জিনিষ। হয়ত জামা-কাপড় ভরা আছে ওতে। মুখে একটা ক্লান্ত হাসি। যেন বড় পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে বেচারী।

হেনা বলল—তুই তা হ'লে কথাবার্তা বল্ প্রমীলা। আমি ডিউটিতে যাই। হেনা দু'হাত তুলে নমস্কার করল সুরঞ্জনকে।

হেনা চ'লে গেল। হাসপাতালের ইনডোর এখন জম-জমাট। শ্রাবণ ভাদ্রে ভাত নেই চাষীর ঘরে। তাই রোগ অসুখে হাসপাতালই বা মন্দ কি? চিকিৎসা হবে, দু'বেলা দু'মুঠো খেতে জুটবে। দিনকতক শুয়ে ব'সে গতরটাকে সারিয়ে তুলতে আপত্তি হবে কেন? তাছাড়া শেষবর্ষায় পল্লীগ্রামে জ্বরজাড়ি একটু বেশীই হয়। কাজেই হাসপাতালের ইনডোরে আজ ঠাঁই নেই, ঠাঁই নেই অবস্থা।

সুরঞ্জন বলল—হঠাৎ আমাকে দেখে খুব অবাক্ হয়ে গেছ প্রমীলা, তাই না?

প্রমীলা অবাক হয়েছিল। কিন্তু সে ভাব চেপে গিয়ে সে উত্তর দিল—বা রে, অবাক্ হব কেন? কিন্তু তুমি দাঁড়িয়ে রইলে যে, ভেতরে এস।

বাইরের ঘরে একটা চেয়ার টেনে বসল সুরঞ্জন। প্রমীলা ওর হাত থেকে ব্যাগটা কেড়ে নিয়ে তুলে রাখল।

চান করবে তুমি? জল দিতে বলি ঝিকে বাথরুমে, কেমন? প্রমীলা হেসে বলল।

সুরঞ্জন ক্লান্ত হয়ে চেয়ারে এলিয়ে দিয়েছিল নিজেকে। প্রমীলার কথা শুনে সে চোখ তুলে তাকাল ভাল করে। —তোমাকে অনর্থক বিব্রত করছি, তাই না প্রমীলা? এক আশ্চর্য বিষাদের সুরে বলল কথা ক'টি।

ওমা, তা হবে কেন? তুমি ক্লান্ত হয়েছ, চানটান না ক'রে নিলে সুস্থ বোধ করবে কেন?

স্নান ক'রে সামান্য কিছু খেয়ে নিল সুরঞ্জন। এখন বেশ সুস্থ বোধ করছে সে। মুখখানায় আর আগের ক্লান্তির ছাপ নেই। এখন বেশ উজ্জ্বল আর প্রাণবন্ত মনে হচ্ছে মুখটা। অন্তত প্রমীলার চেয়ে চেয়ে তাই মনে হ'ল।

সুরঞ্জন বলল—কই, এসেছি কেন জিজ্ঞাসা করলে না ত?

প্রমীলা উত্তর দিল—সে কথা ত তুমিই বলবে সুরঞ্জন।

সুরঞ্জন হাসল। বলল—তা বটে। কথাটা আমারই বলা উচিত।

প্রমীলা বাধা দিয়ে বলল—থাক না, বরং পরেই ব'ল—

—পরে কেন। এমন কিছু কথা নয়। এসেছিলাম ইন্টারভ্যু দিতে, এখান থেকে ষোল মাইল দূরে।

প্রমীলা উৎসুক হয়ে বলল—ঐ যেখানে ষ্টীলের কারখানা তৈরি হচ্ছে?

—হ্যাঁ, ঠিক ধরেছ। এতদূর এসে সামান্য পথটুকু না এসে থাকতে পারলাম না প্রমীলা।

প্রমীলা হেসে বলল—কিন্তু আমাদের কি কথা ছিল বল ত? চাকরি পেয়ে তুমি আমাকে চিঠি লিখবে। তার আগে আর কিছু নয়, কিছু নয়।

সুরঞ্জনের মুখখানা এক মুহূর্তে করুণ দেখাল। ম্লান হেসে সে বলল—কথাটা আমি বেমালুম ভুলে গেছি ভাবছ? তা ঠিক নয় প্রমীলা। আসলে কি জান, চাকরি বোধ-হয় আমি আর পাব না। কত ত খুঁজে বেড়ালাম, কত ফিরলাম হাতড়ে হাতড়ে। কিন্তু চাকরি কোথাও পেলাম না।

প্রমীলার মনে হ'ল, স্বরে যেন হাহাকার ফুটে উঠছে। এতখানি ভেঙ্গে পড়ছে সুরঞ্জন। প্রমীলার সমস্ত মন জুড়ে ওর জন্যে ভীষণ মায়া। সান্ত্বনা দিয়ে সে বলল, বা রে, এখনও খুঁজে পাও নি ব'লে আর কি কখনই পাবে না? এই ত ইণ্টারভ্যু দিয়ে এল। হয়ত এই চাকরিটাই লেগে যাবে তোমার।

সুরঞ্জন হাসল। সে হাসি কূলহারা নাবিকের বিষাদ-মলিন মুখের মত নির্জ্জীব নিষ্প্রাণ। তবু সে ভাব কাটিয়ে সে বলল, চল একটু ঘুরে আসি প্রমীলা। এখানে বেড়াতে যেতে কোন বাধানিষেধ নেই ত?

ঘাড় দুলিয়ে প্রমীলা জবাব দিল, কিছু না। আমি এখন স্বাধীনা জেনানা। দাঁড়াও, তৈরী হয়ে আসি।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই প্রমীলা তৈরী। কতদিন পরে সুরঞ্জনের সঙ্গে আবার দেখা। একদিন কলকাতার পথে-ঘাটে কতই না ঘুরে বেড়িয়েছে দু'জনে। পথে নামতে নামতে প্রমীলার সেই কথাই মনে পড়তে লাগল বার বার।

হাসপাতাল ছাড়িয়ে পীচ-ঢালা পথটা বাঁ দিকে বেঁকে গেছে জেলা শহরের দিকে। খানিকটা গেলেই ধানের মিল একটা। পথের দুপাশে ইলেকট্রিক পোষ্টের সারি। দামোদর নদের বিদ্যুৎকে টেনে এনেছে মানুষের প্রয়াস অগুণতি মাইলের দূরত্ব অবধি।

সুরঞ্জন বলল, তোমাদের এ জায়গাটা বেশ সুন্দর, তাই না প্রমীলা? কলকাতা থেকে দু-চার দিনের জন্যে এলে বেশ ভাল লাগে।

প্রমীলা উত্তরে বলল, তোমার বুঝি জায়গাটা খুব সুন্দর লাগছে? কি জান সুরঞ্জন, এখানে সকালগুলো ভগবানের আশীর্বাদ, বিকেলগুলো তাঁর করুণা ধারা, কিন্তু রাতগুলো ভীষণ, ভয়ংকর। এক-একদিন নাইট ডিউটি পড়লে কি বিশ্রী যে লাগে তা তোমাকে কি বলব।

—তাই বুঝি? কিন্তু রাতের কথা থাক এখন। এই বিকেলটাকেই ভাল ক'রে দেখি। সুরঞ্জন ভাল ক'রে চারপাশে তাকাতে লাগল।

সত্যই মনোরম অপরাহ্ণ। রোদ হাসছে দূরের টিলায়, গাছের উঁচু ডালে আর দিগন্তের বুকে। বহুদূরে দিগন্তলীন শুশুনিয়া পাহাড়। কাছাকাছি আরও কি একটা ছোটমত পাহাড়। সবুজ প্রান্তর ছড়িয়ে আছে চারপাশে। পীচ-ঢালা পথটা চলে গেছে সর্পিল গতিতে। বহুদূর অবধি তার বাঁকা চেহারাটা অল্পস্বল্প চোখে পড়ে।

প্রমীলা বলল, সুরঞ্জন, এখনও কলকাতায় আগের মত বেড়াতে যাও?

—তোমার কি মনে হয় প্রমীলা?

—বা রে, আমি তো জানতে চাইছি শুধু।

একটু সময় চুপ ক'রে রইল সুরঞ্জন। তারপর বলল, আমার আর কলকাতা ভাল লাগছে না প্রমীলা। কেবল মনে হয়, কি যেন অভাব সমস্ত জীবনটায়। নেহাৎ ক'টা টিউশনী আছে। তাই সময়টা কোনমতে কেটে যায়। কথার কোন উত্তর দিতে পারল না প্রমীলা। সে দিগন্তলীন পাহাড়টার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল।

সেদিন সন্ধ্যার কিছু পরেই রওনা হ'ল সুরঞ্জন। রাতেই জেলাশহরে গিয়ে কলকাতার ট্রেন ধরবে। বাসে ক'রে পৌঁছতে ঘণ্টাখানেকের বেশী সময় লাগবে না। প্রমীলা বাস পর্যন্ত পৌঁছে দিতে এসেছিল ওকে। হাসপাতালের গেটেই বাস দাঁড়ায়। যাবার সময় প্রমীলা বলল, সুরঞ্জন, এত অল্পতেই ভেঙে প'ড়ো না কিন্তু। চাকরি একদিন হবেই। তুমি তো জান আমি, শুধু একটি দিনের অপেক্ষায় রয়েছি। শেষ দিকে তার গলাটা ধরা ধরা শোনাল।

কথার কোন উত্তর যোগাল না সুরঞ্জনের মুখে। তার বাস ছাড়ার সময় হয়ে এসেছে। সে বলল শুধু—এখন তাহলে আসি প্রমীলা?—হ্যাঁ। কিন্তু একটা কথা শোনো, কলিকাতা পৌঁছে আমাকে একটা চিঠি লিখো কেমন? ওর দিকে চেয়ে সুরঞ্জন একটু ম্লান হাসল।

বাস ছাড়ল। প্রমীলা চেয়ে রইল কতক্ষণ। আকাশে ফুলের মত একরাশ তারা ফুটছে। চঞ্চল মনটা আজ যেন

অবসন্ন প্রমীলার। কোয়ার্টার্সের দিকে ফিরতে ফিরতে ভাবল এসে, সুরঞ্জন তাকে ভোলেনি। একটি দিনের জন্যও নয়। সেও সুরঞ্জনকে কখনও ভুলতে পারবে না।

নয়

কলকাতায় ফিরে দিন দুই শুয়ে ব'সে কাটিয়ে দিল সুরঞ্জন। আজকাল কেমন যেন অবসাদ এসেছে কাজে। কোন কিছুতেই আর প্রেরণা নেই যেন। সব সময়ই যেন মনে হয়, কি হবে কাজ ক'রে। অথচ কাজ না ক'রেও উপায় নেই। গোটা তিন-চার টিউশনী নিয়ে ব'সে আছে। খরচ চালানোর আর কোন উপায় খুঁজে পায় না সে।

তিনদিনের দিন সকালে জামাটা গলিয়ে নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ল সুরঞ্জন। কাছেই অক্রুর দত্ত লেনে একটা টিউশনী আছে তার। এটি ছাত্রী এ বছর স্কুল-ফাইন্যাল দেবে। সুরঞ্জনের যে ক'টি ছাত্রছাত্রী, তার মধ্যে এটিই একটু মনযোগী। লেখাপড়া শিখবার বিশেষ চেষ্টা আছে। অন্য দুটির লেখাপড়া জ্ঞানলাভের জন্য বোধ হয় না। ওটা বোধহয় পড়া পড়া খেলা। ধনীর বাড়ীতে ঠাকুর চাকরের মত প্রাইভেট মাষ্টারও একটা অত্যাবশ্যকীয় বস্তু। সন্ধ্যায় ইত্যাদির দুটি স্বর্ণ-গর্দভকে পড়াতে পড়াতে সুরঞ্জনের সেই কথাটাই খুব বেশী মনে হয়।

অক্রুর দত্ত লেনের বাড়ীতে এসে সুরঞ্জন কড়া নাড়ল। মিনতি সকালেই পড়াশুনা নিয়ে বসেছে। সুরঞ্জন ভারী খুশী হল।

মিনতি বলল—মাষ্টার মশাই, দু-তিন দিন যে এলেন না? অসুখ-বিসুখ হয়নি তো?

সুরঞ্জন হেসে বলল—না না, অসুখ হ'তে যাবে কেন? এমনিই আসা হয়নি।

পড়তে পড়তে সুরঞ্জন এক সময় থামল। ওকে বলল—এবার তুমি নিজে চেষ্টা কর কিন্তু। আমি আসি।

মিনতি ঘাড় নেড়ে ওর দিকে চাইল।

সুরঞ্জন বেরিয়ে এল পথে। দশটা বাজতে তখনও বেশ কিছু দেরী। তবু উর্ধ্বমুখী জনতার স্রোত বইতে শুরু হয়েছে। অফিসমুখো কেরাণীর দল। পায়ে হেঁটে, ট্রামে-বাসে, উজিয়ে চলা কইমাছের মত দল বেঁধে চলেছে সব। সুরঞ্জন রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে রইল কতক্ষণ। চাকরি পাওয়া লোকগুলোকে দেখে ওর মনে কেমন একটা বিচিত্র অনুভূতি জাগল। দশটা থেকে পাঁচটা কাজ আর তাঁতির মাকুর মত দু'বেলা নিত্য যাতায়াত কেমন অসহ্য মনে হ'ল তার। পরক্ষণেই প্রমীলার কথা মনে হ'ল।

এই কলকাতার পথে ঘাটে চলতে চলতে প্রমীলাকেই খুব বেশী মনে পড়ে। একদিন কতই না ঘুরেছে ওরা। পায়ে হেঁটে বউবাজার ষ্ট্রীট, সেন্ট্রাল এ্যাভিনিউ, এসপ্ল্যানেড, রেড রোড, আউটরাম ঘাট, ইডেন গার্ডেন—কিছুই বাদ দেয়নি। আজ প্রমীলাকে কলকাতা ছেড়ে কতদূর চ'লে যেতে হয়েছে। যেতে হ'ত না প্রমীলাকে, যদি সে একটা চাকরি জোগাড় করতে পারত। তবে পরশ পাথর খোঁজা তার শেষ হয়নি। আজও হাতড়ে হাতড়ে চাকরিই খুঁজে চলেছে সে।

কলকাতায় প্রমীলার সঙ্গে সুরঞ্জনের অনেকদিনের জানাশোনা। ওদের রজনী গুপ্ত রোয়ের গলির একপ্রান্তে প্রমীলার মামাবাড়ী। মা বাবা নেই প্রমীলার। মামার বাড়ীতেই মানুষ সে। সুরঞ্জন যখন থার্ড ইয়ারে উঠেছে, সে বছরেই প্রমীলা স্কুল-ফাইন্যাল দেবে। প্রমীলাকে পড়ানোর কাজ জুটেছিল সুরঞ্জনের। মাসে পনেরো টাকা পারিশ্রমিকে। জীবনে সেই প্রথম কাজ। মাসান্তে পনেরোটা টাকা। টিউশনি পেয়ে বুকখানা ভ'রে উঠেছিল সুরঞ্জনের।

গুরু-শিষ্যের সম্পর্কেও প্রেমের দেবতার দৃষ্টি পড়ে। বিশেষ ক'রে গুরু-শিষ্যা যদি তরুণ তরুণী হয় যে ভালো লাগার বয়েসটায় মানুষের চোখে সব কিছুই সুন্দর মনে হয়। সেদিন সুরঞ্জনের চোখেও জগৎটা সুন্দর মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল, এই নীলাকাশ বেষ্টিত শ্যামলা পৃথিবীটা কি মনোহর!

প্রমীলার সঙ্গে সেই থেকেই পরিচয়ের শুরু। সে পরিচয় প্রগাঢ় প্রেমে পরিণত হ'তে সময় লাগেনি বেশী। প্রমীলা স্কুল-ফাইন্যাল পাশ করবার পরও কতদিন তাকে পড়িয়েছে সুরঞ্জন। ওকে প্রাইভেটে আই. এ. পরীক্ষা দেওয়াতে চেয়েছিল সে। কিন্তু সে সাধ তার মেটেনি।

কারণটা স্কুল-ফাইন্যাল পাশের পর প্রমীলার বিয়ের তোড়জোড় করেছিলেন ওর মামা-মামী। একটি ভালো ছেলেও পাওয়া গিয়েছিল। সওদাগরী অফিসে কি যেন কাজ করে। লেখাপড়াও কম নয় কিছু। বি. এ. পাশ করেছে। বিয়ের প্রায় সব ঠিক। এমন সময় মেয়েই বেঁকে বসল, সে নাকি কিছুতেই বিয়ে করবে না।

বিয়ে না করার কারণটা অবিশ্যি কিছুদিনের মধ্যেই জানাজানি হ'ল। হয়ত প্রমীলাই বলে থাকবে কাউকে, কিংবা অভিভাবকেরাই আন্দাজ করেছিলেন। তাছাড়া পার্কে, রেস্তোরাঁয়, জনবহুল রাজপথে কিংবা জনবিরল



প্রমীলা, তুমি কি পাংচুয়াল, ঘড়ির কাটা যে এখনও সাড়ে চারটে পার হয়নি।

গলিতে তাদের দু'জনকে একসঙ্গে ঘুরে বেড়াতে অনেকেই লক্ষ্য ক'রে থাকবে।

কিন্তু বিয়ে না দিয়ে ভাগ্নীকে বসিয়ে রাখবেন ঘরে, প্রমীলার মামা এমন নিবিরোধী লোক নন। অবস্থা তখন চরমে উঠেছে। বাড়ীতে, বাইরে মামামামী কিংবা আত্মীয়-স্বজনদের কাছে নানা কথা শুনতে শুনতে প্রমীলার প্রায় মাথা খারাপ হবার যোগাড়, দুজনেই তখন বেপরোয়া। প্রমীলাই বলেছিল ওকে—তোমার কাজ না জুটুক, আমার একটা ব্যবস্থা হয় না? মামার বাড়ীর ভাত আর যে গলা দিয়ে নামতে চায় না।

সুরঞ্জনের এক বন্ধুই ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিল নার্সিং শেখার। তখন হেলথ্ সার্ভিসে শিক্ষিত ট্রেইণ্ড নার্সের প্রচুর প্রয়োজন। বেশী বেগ পেতে হয়নি প্রমীলাকে। অল্প আয়াসেই নার্সিং ট্রেনিং-এর জন্য মনোনীতা হ'ল সে।

সে সময় দুজনেই দুজনের খুব কাছাকাছি আসতে পেরেছিল। প্রমীলার হস্টেলে ছিল না তেমন বিধিনিষেধের গণ্ডী। সুরঞ্জনেরও টিউশনির ফাঁকে ফাঁকে ছিল পর্যাপ্ত অবসর।

অনেকদিনই বিকেলের রোদ বাদামী হ'য়ে এলে গোলদীঘির মধ্যে একটা দেবদারু গাছের নীচে মিলিত হ'ত ওরা। বিকেলে চারটের পর নার্সদের ছুটি মিলত। প্রমীলা আর দেরী করত না। মূর্তিমতী সেবাদাসীর শুভ্র বসনটা খুলে ফেলে আকাশী রঙের নীল শাড়ীটা গায়ে জড়িয়ে নিত সে। আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে চুলটা গুছিয়ে নিত একটু। মুখের উপর পাউডার-পাফটা বুলোত দু' একবার। তারপর চটিটা পায়ে গলিয়ে মেডিক্যাল কলেজের শান্ত ওয়ার্ডগুলোর পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বেরিয়ে পড়ত।

সুরঞ্জন বলত—প্রমীলা, তুমি কি পাংচুয়্যাল! ঘড়ির কাঁটা যে এখনও সাড়ে চারটে পার হয়নি।

তাই বুঝি? তোমার কিন্তু মাঝে মাঝে বড্ড দেরী হয় আসতে। একা একা দাঁড়িয়ে থাকতে কি বিশ্রী যে লাগে!

সুরঞ্জন কথা ফিরিয়ে নেয়। বলে—চলো বেরিয়ে পড়ি দু'জনে। মিছিমিছি গোলদীঘিতে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করি কেন?

ট্রামে কিংবা বাসে এসপ্ল্যানেড। হাঁটতে হাঁটতে ওরা দু'জনে আউটরাম ঘাট অবধি পৌঁছে যায়। বিকেলটা যে

কলকাতা এত সুন্দর তা রজনী গুপ্ত রোয়ের বাড়ীতে ব'সে অনুভবও করা যায় না। গঙ্গার বুকে বড় বড় জাহাজ ভাসছে। ধোঁয়া উঠছে কোন চলমান ষ্টীমারের গহ্বর হ'তে। পাখ-পাখালীর দল ঘরে ফিরছে। বহুদূর পশ্চিম আকাশে অস্তমান রক্তসূর্য্য।

সুরঞ্জন বলল—কি বড় বড় জাহাজগুলো দেখছ প্রমীলা। ওগুলো বোধহয় মহাসমুদ্রে যায়।

তার মানে?—প্রমীলা বিস্মিত হয়ে চাইল।—তুমি বলছ ওগুলো ইউরোপ, আমেরিকা ঘুরে আসে?

তাই তো মনে হয়।—সুরঞ্জন হাসল।

এদিক্‌টায় যে কি সুন্দর লাগে! আমাদের গলিতে হয়ত এতক্ষণ ধোঁয়া দিয়েছে। গেলেই চোখজ্বালা করবে। —প্রমীলা বলল।

সুরঞ্জন জবাব দিল—তাতে কি প্রমীলা? তুমি তো আর গলির বাসিন্দা নও এখন? সুন্দর সাজানো সরকারী হষ্টেলে বাস করছ।

প্রমীলা বলল—তাতে কি? হিংসে হচ্ছে বুঝি?

—তা কেন হ'তে যাবে? ও এমনি কথার কথা। তারপর তোমার নার্সিং লাগছে কেমন?

—খুব ভালো।—প্রমীলা ঘাড় দুলিয়ে বলল।—জানো, যন্ত্রণায় কষ্ট পেতে পেতে রুগীগুলো যখন একটু সেবা চায়, দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে, তখন আমাদের মনও ভ'রে যায়। সে তুমি ঠিক বুঝবে না।

সুরঞ্জন হাসতে থাকে। বলে—পেশা-বৃত্তির কথা থাক বরং। কিন্তু তোমার কথা শুনে আমারই তো রুগী হ'তে ইচ্ছে হচ্ছে।

—তাই নাকি?—প্রমীলা চোখ পাকিয়ে বলল।

—নিশ্চয়ই।

—তোমার মত রুগী আমাদের হাসপাতালে নেবে না।

কথা শুনে সুরঞ্জন হাসতে লাগল। অনেকক্ষণ সন্ধ্যে হয়েছে। দূরে তেরতলা সরকারী বাড়ীটা দুগ্ধশাদা নিওন বাতিতে শুভ্র সমুজ্জ্বল। হাওড়ার পোলের মাথায় আকাশ-ভ্রমণ আইন অনুযায়ী লালবাতি জ্বলছে। সুরঞ্জন চেয়ে চেয়ে দেখল।

রজনী উতলা হ'য়ে উঠেছে এবার। বিকেলের সে শান্ত মাধুর্য্য কোথায় হারিয়ে গেছে। মহানগরীর ন'টার বেশ এখন। অভিনয়ের প্রশস্ত অবসর।

সুরঞ্জন বলল—চলো, ফির এবার। প্রমীলারও আটটার মধ্যে ফেরার কথা। দেরী হ'লে আবার কৈফিয়ৎ দিতে হবে।

ওরা ফিরে চলল।

দিন সাত পরে একটা খামের চিঠি পেল প্রমীলা,—সুরঞ্জন লিখেছে। প্রায় তিন পাতা জোড়া চিঠি। দুপুরে হেনা বেরিয়ে গেছে ডিউটি দিতে হাসপাতালে। ঘরে কেউ নেই। দরজাটা ভেজিয়ে দিল প্রমীলা। তারপর খাটে শুয়ে চিঠির উপর চোখ মেলল সে।—

প্রিয় মিলি,

আমার এই চিঠি পেয়ে নিশ্চয় খানিকটা অবাক্ হয়ে যাবে। কলকাতা ছেড়ে যাবার আগের দিন আউটরাম ঘাটে তুমি যা প্রতিজ্ঞা করিয়েছিলে তা হয়ত রাখতে পারলাম না। সেটা যদি দোষ মনে ক'র তাই। আর তা যদি না মনে হয় তবে বুঝব, তুমি আমার মনটাকে বুঝতে চেষ্টা করছি। আজ প্রায় এক বছর, তুমি কলকাতা ছেড়ে গেছ। হয়ত আশা করেছিলে এই একটা বছর অনেকদিন। এর মধ্যে নিশ্চয় আমার ভদ্রগোছের একটা কিছু হয়ে যাবে। কিন্তু তুমি চাইলেও ভগবান্ বোধহয় তো চান না। তাই চাকরি জোগাড় ক'রে তোমায় সুখবরটা জানানোর মত বরাত আমার নেই।

জানো মিলি, একটা কথা ভেবে আজকাল বড় দুঃখ হয়। মনে হয়, তোমার এ অবস্থার জন্য আমিই দায়ী। তোমাকে ঘরছাড়া করেছি আমি, কিন্তু নতুন কোন আশ্রয় দেবার মত যোগ্যতা আমার আজও হ'ল না। তোমার মামার কথা শুনলে হয়ত এ অবস্থায় তোমাকে পড়তে হ'ত না। মামা-বাড়ীর আশ্রয়ও হয়ত তোমার ঘুচত না। কিন্তু মনে হয়, সে ভুল তুমি নিজে কর নি। আমি ত তোমায় করতে বাধ্য করেছি। বেশ বুঝতে পারছি, কি পরিমাণ দুঃখবাদী হয়ে পড়েছি আমি।

সামনের কাছাকাছি কোন দিনে যে চাকরি জুটবে, মনে হয় না। আমার মত গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা ত এদেশে কম নয়? তাদের কারও কারও হয়ত দাদা কাকা মামার জোর আছে। আমার সে সুবিধেটুকুও নেই। কাজেই চাকুরিলাভ আমার পক্ষে একটা আকাশ কুসুমের সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদি কোন প্রভাতে চাকরি পাওয়ার খামটা হাতে এসে পড়ে, তবে সেটা একটা ছলনা-ভরা দৈবদুর্বিপাক ছাড়া আর কিছু আমার মনে নবে না। অন্ততঃ আজকাল আমার এই ধারণাই হয়ে যাচ্ছে—।

এখনও কলকাতায় টিউশনিগুলোই আমার সম্বল। কিন্তু টিউশনি করা যেন একটা আপত্তিকর পুনরাবৃত্তি মনে হয়। সেই একঘেয়ে ছেলে পড়ান, নিত্য রুটিনমাফিক বকে যাওয়া, অত্যন্ত বিশ্রী ঠেকে। আগে এ সবের মধ্যেও

একটা মুক্তির স্বাদ ছিল। বিকেলের রোদ প'ড়ে এলে গোলদীঘির কাছে দেবদারু গাছটার নীচে এসে দাঁড়াতে তুমি। পরণে তোমার বেশীদিনই সেই সবুজ রঙের শাড়ীটা থাকত। ঐ শাড়ীটায় তোমাকে বড় ভাল লাগত আমার। আসলে সবুজ আমার প্রিয় রং। কচি কলাপাতার বুকে যে সবুজ থাকে, কচি কিশলয়ের গায়ে যে সবুজ হাসে, নতুন গজানো ঘাসের শীষে যে সবুজের ছোঁয়া, সেই সবুজ তারুণ্যের রং। তাকে ভালো না লেগে পারে না।

এখন বিকেলগুলো নীরস বিবর্ণ। কলকাতার ফুটপাথকেও যেন নির্জন মনে হয়। অসংখ্য কোলাহলের মধ্যেও নিজেকে বড় একা একা লাগে। আউটরাম ঘাটে তার পরেও দু-একদিন গেছি। ঘাট যেন দুই পাটি দাঁত মেলে আমায় গিলতে এসেছে। কিছুতেই ভাল লাগে নি। অথচ ওখানে তেমনি শান্ত নিস্তরঙ্গ বিকেলটি। জাহাজের চিমনি থেকে ধোঁয়া উঠছে। কাছেই খিদিরপুর ডকে সারবন্দী জাহাজগুলো দাঁড়িয়ে। সন্ধ্যা হবার আগে গাংচিলগুলো পাক খেয়ে উড়ছে গঙ্গার জলে। যেমনটি তুমি দেখে গিয়েছিলে ঠিক তাই।

মনে আছে মিলি, এই আউটরাম ঘাটেই এক বছর আগে তোমায় কথা দিয়েছিলাম। মেনেছিলাম তোমার অনুরোধ যে, এক বছর মন দিয়ে শুধু চাকরি খুঁজব। চাকরি পাবার আগে তোমায় চিঠিও লিখব না, তোমার সঙ্গে দেখাও করব না। কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা আমি রাখতে পারি নি।

কলকাতায় শরৎ এসেছে। পুজোর আর কদিনই বা বাকী? তুমি নিশ্চয়ই আসছ না? আসবেই বা কোথায়? মামাবাড়ী তোমার আমার কারও পক্ষেই নিরাপদ নয়। অগত্যা মানিকবাজারেই পুজোটা দেখে নাও।

একটা কথা সত্যি কিন্তু। মানিকবাজার জায়গাটা আমার বড় সুন্দর লেগেছে। দূরে কাছে কত পাহাড়, মাঝে মাঝে নাবাল জমি……ধানের জমি সমস্ত মাঠময় বিস্তৃত ছড়ান নয়…খাঁজ কেটে ধাপে ধাপে নীচে নেমে গেছে।

মানিকবাজারের সেই আশ্চর্য সুন্দর বিকেলটি মনে পড়ে। সেদিন মনে হয়েছিল, অনেকদিন বাদে বুঝি বা আউটরাম ঘাটের হারানো বিকেলটাই হাতের মুঠোয় এসে পৌঁছেছে।

চিঠির উত্তর দিও। প্রতিজ্ঞা ত আমিই ভেঙেছি। তোমার আর আর দায় রইল কিসের? ইতি।

সুরঞ্জন।

চিঠিটা দু'তিন বার পড়ল প্রমীলা। সত্যি, ভেঙ্গে পড়েছে সুরঞ্জন। নিজের উপর যেন আর কোন আস্থা নেই ওর। কপাল ব'লে বস্তুটি ওর উপর যেন বড় বেশী নির্দয়। নইলে গ্র্যাজুয়েট হবার পর প্রায় তিন বৎসর কেটে যেতে চলল। তবু একটা চাকরি কেন হয় না সুরঞ্জনের? প্রমীলার মনের প্রতিটি কোঠায় এই একটা প্রশ্নই ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

আজ নাইট ডিউটি প্রমীলার। নীরদা ছুটি নিয়ে কলকাতা বেড়াতে গেছে। বিছানায় শুয়ে হঠাৎ ওকেই হিংসা করতে চাইল প্রমীলার মন। কি আনন্দে কলকাতার পথেঘাটে আজ বেড়াচ্ছে নীরদি। প্রমীলা যদি যেতে পারত আজ। অন্য কিছু না। অবসন্ন সুরঞ্জনের মনে খানিকটা উৎসাহও যোগাতে পারত। কিন্তু প্রমীলা গিয়ে উঠবে কোথায়? মামাবাড়ীর দরজা ওর জন্যে বন্ধ হয়ে গিয়েছে অনেকদিন। নাসিংএ যাবার সময়ই সেকথা জানিয়ে দিয়েছিলেন মামা। প্রমীলা তা কোনদিনই ভুলবে না। এক অবিশ্যি কোন হোটেলে গিয়ে উঠতে পারে। কিন্তু কেমন হোটেল হবে ইত্যাদি কিছুই জানে না প্রমীলা। এ সব ব্যাপারে সে শিশুর মতই অনভিজ্ঞ। কাজেই কলকাতা যাওয়া তার নাগালের বাইরে। লেখার প্যাডটা নিয়ে অগত্যা বসল প্রমীলা। কলম ছাড়া আর কোন সাথী নেই। কিন্তু চিঠিতে কতটুকু সান্ত্বনা আশা প্রেরণা পাঠাতে পারবে প্রমীলা?

বাইরে শরতের আকাশ এখনও মেঘেরোদে মেশা। কিন্তু আর বেশী দিন না। মেঘ সরে যাবে এবার। পরিপূর্ণ উজ্জ্বল দিন নেমে আসছে পৃথিবীতে। পরিষ্কার মেঘহীন নীলাকাশ হাসবে চেয়ে চেয়ে—

প্রমীলা কলম নিয়ে চিঠি লিখতে শুরু করল।

এগারো

হাসপাতালে সেদিন বড় হৈ চৈ।

লেবার কেসের পেশেন্ট। কিছুতেই প্রসব হয় না। সাতদিনের উপর ওর হাসপাতালে থাকা হ'ল। মাইল ছয় দূরের কি একটি গ্রাম থেকে এসেছে মেয়েটি। বেশ সুশ্রী কমনীয় চেহারা। কতই বা বয়স? হয়ত প্রমীলারই বয়সী। এর মধ্যেই কিন্তু তিন ছেলের মা হতে চলেছে। আগের দুটির বেলায় কোন গণ্ডগোল হয় নি। মুশকিল হয়েছে তৃতীয়টির আবির্ভাব নিয়ে—।

মেয়েটির নাম মিনতি। শ্যামলা শ্যামলা গায়ের রং। চোখগুলি বেশ বড়। কোমল আর বেদনাতুর মনে

হয়। স্বামী গ্রামে ব'সেই কৃষিবিভাগের কি একটা ছোট-খাটো সরকারী চাকরি করে। প্রমীলার সঙ্গে ওর আলাপ হয়েছে। বেশ ভাব ক'রে নিয়েছে প্রমীলা। ওর বাড়ীর কথা, ঘরসংসারের কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জেনে নিয়েছে। এসব কথা হেনা নীরদারা কখনও জিজ্ঞাসাও করে না। ওরা কাজ করে সরকারী নিয়মমাফিক। সময়ে ওষুধ দেয়, দরকার হ'লে টেম্পারেচার নেয়। নানাবিধ উপদেশ দেয়—তারপর চুপ ক'রে ব'সে পড়ে নার্সের টেবিলে। সেখানে এসে রেজিস্টার লেখে, মাঝে মাঝে রোগীদের উপর দৃষ্টিক্ষেপ করে। আলাপ আলোচনার সময় ওদের হাতে নেই।

প্রমীলা ঠিক উল্টো। বেড়াতে বেড়াতে সমবয়সী মেয়েদের বেডের পাশে ছোট একটা টুল পেতে ব'সে পড়ে সে। পেশেণ্টের শীর্ণ মুখের দিকে চেয়ে অল্প হাসে। নিজের সুডৌল আঙুলগুলি দিয়ে চুলের মধ্যে বিলি কেটে দেয়। বলে, কি, হাসপাতাল কেমন লাগছে?

গ্রাম্য মেয়েটি প্রথমেই কোন উত্তর দেয় না।

প্রমীলা আবার বলে, আমাদের হাসপাতাল ভাল লাগছে না বুঝি?

—তা লাগবে না কেন? হাসপাতাল কি খারাপ? এবার মেয়েটি মুখ খোলে।

প্রমীলা গল্প শুরু ক'রে দেয়। ঘরকন্নার গল্প, স্বামীর গল্প, পোষা পাখী, আদরের হালবলদ, আনাই থানাই সাত-সতেরো কত কি কথা। মেয়েটি হাসে।

বলে, গাম আমাদের ডাঙ্গাডহরের দেশ গো। আপনার কলকাতার মত কি লাইট জ্বলে সাঁজবেলাতে?

ওর কাছ থেকে অনেক খবরই পেয়েছে প্রমীলা। বিয়ের পর শাশুড়ী ওকে বড় কম হেনস্থা করে নি। মারধোর করেছে কতদিন। স্বামীও তাতে যোগ দিয়েছে। হুগলী জেলায় বাপের ঘর। বাপ ধানফলানো চাষী গেরস্থ। বিয়ের পর তত্ত্বতালাস করতে পারে নি তত। তাইতেই ত এত গঞ্জনা—

প্রমীলা শুধিয়েছে, এখনও কি করে নাকি সেসব কিছু?

—এখন? একগাল হেসে মেয়েটি ঘাড় নেড়েছে। বলেছে, সেই যে বছরকে গোপাল কোলে এল সেই থেকে সব নিবিত্তি

নবগোপাল ওর বড়ো ছেলের নাম। একদিন মাকে দেখতে বাপের সঙ্গে এসেছিল ছেলেটি। বছর চার বয়স হবে। তামাটে গায়ের রং। মায়ের মতই ডাগর ডাগর চোখ দুটি। হাসিতে উজ্জ্বল, বিস্ময়ে স্থির। প্রমীলা ওকে আদর করেছে

নিবারণ সাণ্ডেলের দোকান থেকে টফি দিয়েছে কিনে। ছেলেটি লাজুক দুটি চোখে বিস্ময়ের দৃষ্টি মেলেছে ওর দিকে।

মিনতিকে নিয়ে বড় মুশকিলে পড়েছেন ডাঃ মিত্র। এখানকারই রেসিডেন্ট মেডিক্যাল অফিসার। সাত দিনের উপর থাকা হ'ল ওর। কিছুতেই প্রসব হয় না মেয়েটির। প্রত্যাশিত দিনটি কেটে গেছে তিন-চার দিন আগে। ডাঃ মিত্র বড় বিব্রত বোধ করেছেন নিজের বিবেকের কাছে।

মিনতির স্বামী বহুবার অনুরোধ করেছে, এর চেয়ে ওকে সদর হাসপাতালে পাঠিয়ে দিন ডাক্তারবাবু। সেখানে কলেজের বড় ডাক্তারকে দেখাতে পারতাম।

ডাঃ মিত্র সে কথা জানেন। কিন্তু সদর হাসপাতালে রোগী পাঠানো অত সহজ নয়। সাধারণ লেবার কেসের পেশেণ্টকে সেখানে পাঠালে সদর হাসপাতালে আর জায়গা কুলোবে না। তাছাড়া চীফ্ মেডিক্যাল অফিসার? খুব শক্ত কেস না হলে সেখানে রোগী পাঠানো নিষেধ বললেই চলে। তাহলে হেল্থ্ সেণ্টারের লোক হয় কে। সেখানকার ডাক্তার কি তবে ঘাস খেয়ে বেড়ায়?

আশা দিয়ে ডাঃ মিত্র বল্লেন, অত ভয় পাচ্ছেন কেন? এ ত সামান্য লেবার কেস। তাছাড়া তেমন বাড়াবাড়ি কিছু দেখলে আমরা ফোন ক'রে এ্যাম্বুলেন্স আনাতে পারব।

মিনতির স্বামীকে চুপ ক'রে যেতে হয়। ডাক্তারী-শাস্ত্র নিয়ে ডাক্তারের সঙ্গে তর্ক করা চলে না। ওটা এক্তিয়ার বহির্ভূত কাজ। তাতে ডাক্তারও চ'টে যান। পেশেণ্টেরও ভাল হয় না।

সেদিনই অনেক রাতে অস্থির হয়ে উঠল মিনতি। একটা তীব্র প্রচণ্ড ব্যথা, কেউ যেন বর্শা দিয়ে খুঁচিয়ে দিচ্ছে নরম কোমল মৃত্তিকার আবরণ। প্রমীলা একা সামলাতে পারছিল না। খবর দিয়ে হেনাদিকে আনিয়েছিল। অনেক দিনের অভিজ্ঞতা হেনাদির। সাধারণ লেবার কেসে সে একাই যথেষ্ট। আড়ালে বারান্দায় গিয়ে সে প্রমীলাকে বলল, কেস ভাল নয় রে। ডাঃ মিত্রকে একটা খবর দিই। ওর বাড়ীতেও একটা মেসেঞ্জার যাক।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ছুটতে ছুটতে এসে পড়লেন ডাঃ মিত্র। সত্যিই জটিল লেবার কেস। অপারেশন ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিন্তু হেল্থ্ সেণ্টারের ছোট হাসপাতালে এ ধরণের বড় অপারেশনের কোন ব্যবস্থাই নেই—। জেলা শহরের সদর হাসপাতালে খবর দেওয়া হ'ল। অবিলম্বে এ্যাম্বুলেন্স আসুক, পেশেণ্টের অবস্থা মোটেই আশাপ্রদ নয়।

রাত গভীর হ'ল। কি একটা পাখী ডানা ঝটপট ক'রে উড়ে গেল তার বাসা থেকে। আকাশে মেঘ আজ বড় কম। নীলাভ প্রশান্তির ভাবটাই বেশী। সব নিথর নিঃস্পন্দ। মহামৌনতায় আবৃত হয়ে রয়েছে সমস্ত পৃথিবী।

ডাঃ মিত্র চেষ্টার ত্রুটি রাখলেন না। হেল্‌থ্‌ সেণ্টারের হাসপাতালে যা করা সম্ভব সবই করা হ'ল। কিন্তু মিনতি নির্জীব হয়ে পড়তে লাগল। প্রমীলাকে বললেন ডাঃ মিত্র —যদি কালকেও সদরে পাঠাতে পারতাম।

প্রমীলা চুপ ক'রে ছিল। ডাঃ মিত্র স্বগতোক্তির মতই বললেন—পাঠাই কি ক'রে? চীফ মেডিক্যাল অফিসার ত না হ'লে আস্ত রাখবে না। সেও এক মুশকিল।

সদরের এ্যাম্বুলেন্স হয়ত বাইরে গিয়েছিল। তাই শেষরাতে মিনতিকে আর রাখা গেল না। এ্যাম্বুলেন্স এসে পৌঁচেছিল অনেক ভোরে। তার খানিক আগেই মিনতি হাসপাতাল ছেড়ে চ'লে গেছে। শাদা চাদরে ওর বাগানান শরীরটাকে ঢেকে দিতে দিতে প্রমীলা বলেছে নিজের মনে —তোমাকে আমরা বাঁচাতে পারি নি মিনতি, এ আমাদের দোষ। আমাদের ব্যবস্থার, আমাদের নিয়মকানুনের।—সে চোখের জল সংবরণ করতে পারে নি।

পরদিন সকালে বাপের সঙ্গে চার বছরের নবগোপালও এসেছিল। লাজুক, নম্র ছেলেটি। চোখজোড়া চিন্তায় ভয়ে যেন দিশাহারা। প্রমীলা ওকে আদর ক'রে কাছে টেনে নিয়ে চুলে, মুখে হাত বুলিয়ে দিয়েছে। শাদা চাদরে ঢাকা ওর মায়ের মূর্তিটাকে দেখে নবগোপাল ফুঁকরিয়ে কেঁদে উঠল। প্রমীলা সান্ত্বনার ভাষা খুঁজে পায় নি।

ডেথ সার্টিফিকেট নিয়ে ওরা চ'লে গেল। পথের বাঁকে ওদের গরুর গাড়ির অপসৃয়মান শেষাংশ দেখছিল মিনতি। মায়ের শবের পায়ের কাছে ব'সে কাঁদছে নবগোপাল। চার বৎসরের অবোধ শিশু। ও কি বুঝতে পেরেছে, পৃথিবীতে কি ক্ষতি ওর হয়ে গেল এই চার বৎসরের শিশুজীবনে?

প্রমীলা ভাবছিল। এই পথ দিয়েই বছরকয়েক আগে বধূজীবনে প্রবেশ করতে গিয়েছিল মিনতি। হুগলী জেলা থেকে সিঁথিমোর প'রে স্বামীর পিছনে পিছনে হাটছিল সে। নতুন নারীজীবন। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই সব শেষ হয়ে গেল। আজ আর সেই ব্যথাকোমল বড় বড় চোখের মেয়েটিকে এই পৃথিবীতে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। বায়ুভূতো নিরাশ্রয় হয়ে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোথায় তাই বা কে জানে।

বারো

কার্তিকের শেষ।

বেশ হিম পড়তে সুরু হয়েছে। সকালের রোদ বড় নরম আর নিরুত্তাপ। অনেকটা খোলস-খসা সাপের মত—নিস্তেজ আর নির্জীব।

ভোর সকালেই চায়ের দোকান খুলে বসেছে নিবারণ। সর্বাঙ্গে একটা গরম চাদর জড়ানো, শুধু মুখটি বের ক'রে রেখেছে। ছোকরা চাকরটা ছুটোছুটি ক'রে কাজ করছে। খদ্দেরপাতি বিদেয় করছে। হাত বের ক'রে পয়সা নিচ্ছে নিবারণ। ক্যাশবাক্সে গুনে গুনে ফেলছে।

দোকানে একটি বাবুগোছের খদ্দের এসে দাঁড়াল।

অপরিচিত লোক। এখানকার কেউ নয় নিশ্চয়ই। তা হ'লে নিবারণ ঠিক চিনতে পারত। হয়ত কোন সরকারী কর্মচারী। আজকাল মানিকবাজারে নানা সরকারী অফিস হয়েছে। ব্লক হয়েছে, তার অফিস রয়েছে। কৃষিবিভাগের অফিস, ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের অফিস, সেটেলমেণ্ট অফিস, থানা, পোষ্টাফিস, আরও কি সব যেন। সরকারের এত বিভাগ রয়েছে ইংরেজ আমলে তাই জানত না কেউ। তখন মানিকবাজারে জীবন ছিল নিস্তরঙ্গ, শান্তি আর প্রাচুর্যের দিন। উত্তর স্বাধীনতা যুগে গ্রামজীবনে স্পন্দন বেড়েছে—ঢেউ জেগেছে। লোকের হাতে দু'পয়সা আসছে ঠিকই। জোয়ান ছেলেরা ছোটখাট কাজও পাচ্ছে। কিন্তু যা পাচ্ছে হাতে, তার দ্বিগুণ বেরিয়ে যেতে চাইছে।

লোকটি এক কাপ চা খেতে চাইল।

শশব্যস্ত হয়ে নিবারণ বলল—কই রে, একটা চেয়ার পেতে দে বাবুকে বসতে।

লোকটি চেয়ারে বসল।

নিবারণ বলল—শুধু চা দেবে? না কেক-বিস্কুট—

—কেক দিক একটা।—লোকটি নির্লিপ্তস্বরে বলল।

—এখানে কি নতুন এলেন?—নিবারণ জানতে চাইল।

—না, কালকের শেষ বাসে এসেছি—অনেক রাত্তিরে।

—কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

লোকটি জেলাশহরের নাম করল। তারপর চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলল—ডাকবাংলোর খাটে যা ছারপোকা। সারারাত ঘুমই হ'ল না।

—ডাকবাংলোয় ছিলেন বুঝি?

লোকটি মাথা নাড়ল। নিবারণ ভাল ক'রে চাইল এবার। পরণে ফ্লানেলের স্যুট, ঊর্দ্ধাঙ্গে সোয়েটার আর কোট দুই-ই আছে। লোকটা চায়ে চুমুক দিতে দিতে মাঝে মাঝে কেকটাতে কামড় দিতে লাগল।

—এখানে কোন কাজে এসেছেন নিশ্চয়?—নিবারণ জানতে চাইল।

—লোকটি মাথা নাড়ল। প'রিদার কোন উত্তর দিল না। একটু পরে চা খাওয়া শেষ হ'ল। একটা সিগারেট

ধরাল লোকটি। তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে চ'লে গেল—হয়ত ডাকবাংলোর দিকেই।

নিবারণ অন্য কাজে মন দিল। এমন লোক মানিক-বাজারে হামেশাই আসছে। কোন এন্‌কোয়ারী কিংবা কিছু দেখাশোনা করতে সরকারী কর্মচারীদের আনাগোনা লেগেই আছে। নিবারণ তাই ভুলে গেল ওর কথা। ক্যাশবাক্সে পয়সা ফেলতে ফেলতে আড়চোখে একবার হাসপাতালের আউটডোরের দিকে চাইল সে। না, আজ প্রমীলা নেই। আঁটোসাঁটো ক'রে কাপড় জড়িয়ে মলিনা আর নীরদা ঘোরাঘুরি করছে। ও বেচারার বোধহয় নাইট ডিউটি। নিবারণের মনে হ'ল, ডাক্তারটা নিতান্তই অবিবেচক। কচি মেয়েটাকে সারা রাতের ডিউটি দিয়ে ব'সে আছে। মনে মনে রেসিডেণ্ট মেডিক্যাল অফিসারের সে মুণ্ডপাত করতে লাগল।

বেশ কিছুটা সময় কেটে গেল। দোকানের সামনের খুঁটিটার পায়ের কাছে রোদ এসে পৌঁছেছে। বেলা দশটার কম নয়। শীতের বেলা ব'লে মনে হয় না তেমন। রোদের আঁচ বড় কম। নিবারণ ক্যাশবাক্সে চাবি লাগাল। একবার যেতে হবে বাজারের দিকে। ছোটখাট দু'চারটে জিনিষ কিনতে হবে। নিবারণ চটিতে পা গলিয়ে নিল।

নটবর সাউয়ের দোকানের সামনে অসম্ভব ভিড়। দুজন পুলিস মোতায়েন রয়েছে সামনে। ভিতরে কি হচ্ছে ব্যাপারটা ঠাহর করতে পারল না নিবারণ। খুব কৌতূহল হ'ল তার। ভিড়ের ফাঁকে ফাঁকে একবার ভিতরে দৃষ্টিক্ষেপ করল সে। সেই অপরিচিত লোকটি···দোকানের ভিতর নটবর সাউকে কি সব জেরা করছে। সমস্ত দোকানময় খাতাপত্তর ছড়ান। দোকানের খাতাপত্তর সব। নিবারণ অবাক্ হ'ল।

—কি ব্যাপার বল দিকি? পাশের একজন লোককে জিজ্ঞেস করল সে।

—সদর থেকে আইছে, ট্যাক্স-অফিসার। নটবর সাউকে বিষম প্যাঁচে ফেলাইছে। লোকটা হি হি ক'রে হাসতে লাগল।

—খাতাপত্তর দেখছে কেন এত?

—বেবাক তুলে লিয়ে যাবেক। তারপর সদরকে গিয়ে তুমার বিচার।

নিবারণ ভিড় থেকে বেরিয়ে এল। সমস্ত বাজারময় কথাটা চাউর হয়ে গেছে। ধনী ব্যবসায়ী নটবর সাউয়ের দোকানের খাতাপত্তর সদরে চালান যাচ্ছে। নিবারণ বিভিন্ন জায়গায় কথাটা শুনল নানাভাবে।

বাজারে আর ভাল লাগল না। কি একটা অকারণ ভীতি সমস্ত মনকে অবশ আর পীড়িত ক'রে তুলেছে। নিবারণ ক্ষিপ্রপদে নিজের দোকানে ফিরে এল। হাস-পাতালে এখন আর ভিড় নেই। রোগীরা সব বিদেয় নিয়েছে। নার্সরা কোয়াটার্সে। নিবারণ সেদিকে একবার সতৃষ্ণনয়নে তাকাল। মাঠের ওপার থেকে শনশনে উত্তরে হাওয়া দিচ্ছে। শীত এবার প্রচণ্ড হবে। নিবারণ মাঠের ওপারের একটা প্রকাণ্ড অশ্বত্থগাছের দিকে অকারণেই চেয়ে রইল।

বিকেলের প্রায় শেষ। নিবারণ সন্ধ্যা দেবার জোগাড় করছে দোকানে। ডাকবাংলোর চৌকিদার এসে ওকে খবর দিল, সাহেব ডাকছেন একবার।

সন্ধ্যা দেওয়া ফেলে রেখে নিবারণ ত্রস্তপদে অগ্রসর হ'ল।

সেই অপরিচিত লোকটি। ডাকবাংলোর ইজিচেয়ারে বিশ্রাম করছিল। নিবারণ নমস্কার ক'রে দাঁড়াল।

—তোমার দোকানে মাংস-ভাত রান্না করাতে পারবে?

—কেন পারব না স্যর? তবে মাংস এখন—

—সে ব্যবস্থা আমি করছি—ব'লেই লোকটি চৌকিদারকে কি যেন ইঙ্গিত করল।

চৌকিদার একটা ছোট মুরগী বের ক'রে আনল। এক-জনের পক্ষে যথেষ্ট।

নিবারণ মুরগীটা হাতে করে বেরিয়ে এল। ছোঁড়াটাকে দিয়ে তাড়াতাড়ি রান্না করাতে হবে। যা বিষম অফিসার। হয়ত কখন তার দোকানেরই খাতাপত্তর চেয়ে বসবে।

খবরটা কেমন ক'রে জানি নটবর সাউয়ের কানে পৌঁছেছিল। সন্ধ্যার পরই সর্বাঙ্গ মোটা চাদরে আবৃত ক'রে নিবারণের দোকানে এসেছিল সে। শীতের রাত। সন্ধ্যার পর পথ প্রায় জনহীন। বিশেষ ক'রে এদিকটায়। নটবর নীরবে এসে দোকানে ঢুকল।

নিবারণ সমাদর করে বলল, কি খুড়ো? কি ব্যাপার বল দিকি?

নটবর শান্তকণ্ঠে বলল, সব ত শুনেছিস।

নিবারণ চুপ ক'রে রইল।

নটবর আবার বলল, বড় বদ্ অফিসার বাবু। জানতে দিলেক নাই আমাকে। সঙ্গে চাপরাশী পিওন কিছু আনে নি। নইলে ওর আসার খবর কি আমি না পাই?

নিবারণ বলল, তা এখন কি হবেক?

—কি আর? মোটা টাকা ধার্য ক'রে দিবেক, একেবারে আসল খাতাটাই পেয়েছে কিনা? নটবর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

নিবারণ বলল, এখানেই আজ সাহেবের রান্না হচ্ছে যে।

—তাই শুনেই ত এলাম। একবার বল দিকি সাহেবকে, হেই বাপ! আমার খুড়ামশায়কে একটু দেখুন। মুরগীর মাংস কেন, রাত্তিরে সাহেবের ঘরে আমি জ্যান্ত মাংস পাঠিয়ে দেব।

—আমি পারব না খুড়ো।

নিবারণ মাথা নেড়ে বলল, পারতেই হবে, হেই বাপ আমার। নটবর ওর হাত দুটো জড়িয়ে ধরল।

রাত ন'টার পর। কনকনে ঠাণ্ডা এখন। খাবার নিয়ে নিবারণ চলেছে। পিছনে নটবর সাউ। সে ডাক-বাংলো থেকে খানিকটা দূরে অপেক্ষা করবে। নিবারণই বলবে তার কথা।

লোকটি খেতে বসল। নিবারণ দাঁড়িয়ে রইল সামনে। যুক্তকরে সে বলল, একটা নিবেদন ছিল স্যর।

—বল না, কি বলবে।

—নটবর সাউ আমার খুড়ামশায়। একটুকু দেখবেন হুজুর।

লোকটা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাল, তোমার কাছে এসেছিল বুঝি?

নিবারণ সভয়ে বলল, আজ্ঞে না স্যর।

লোকটা নীরবে খাওয়া সেরে উঠল।

নিবারণ বলল, আর কিছু লাগবে না স্যর?

—আবার কি? খাওয়া-দাওয়া ত চুকল।

—না, মানে। খাওয়ার পর যদি আর কিছু

—তুমি কি বলতে চাও?

—না ইয়ে, এ ত রাঁধা মাংস হুজুর। এরপর যদি অন্য মাংস—

কথা শুনেই লোকটা চীৎকারে ফেটে পড়ল—বেরিয়ে যাও। বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

নিবারণ আর এক মুহূর্ত দেরী করল না। সোজা পিছনে। নটবর সাউ ধারে কাছে কোথাও নেই, হয়ত চীৎকার শুনে আগেই চম্পট দিয়েছে।

নিবারণ কনকনে ঠাণ্ডার মধ্যে প্রায় দৌড়ুতে লাগল।

তের

সেদিন দুপুরে নীরদাই কথাটা প্রকাশ করল।

হাসপাতালের আউটডোর পেসেন্টেদের বিদেয় ক'রে ঘণ্টা দুই তিন ছুটি সকলেই পায়। এ সময়টা ইনডোরে হাসপাতালের চাকর ঝিয়েরাই কাজ চালিয়ে দেয়। ডাক্তার তাঁর কোয়ার্টার্সে ফিরে যান। নার্সরাও নাওয়া খাওয়া সেরে নিতে কোয়ার্টার্সে এসে পড়ে।

খাওয়ার টেবিলে গোল হয়ে বসেছিল ওরা চারজনে। দুপুরে আর রাতে ওদের একত্রে খাওয়ারই ব্যবস্থা। একান্ত যদি কেউ কোন বিশেষ কাজে অন্যত্র যায় তবে সেটা অন্য কথা। না হলে খাওয়ার সময় ওরা গোল হয়ে ব'সে গল্প ক'রে খাওয়া দাওয়া সারতে অনেকখানি সময় টেনে নেয়।

প্রমীলা বলল—কি যে রান্না করে, রোজ একঘেয়ে। মাছের ঝোল আর ভাতে কিংবা ভাজাভুজি একটা। এমনি ক'রে কি খাওয়া যায়?

হেনা হেসে জবাব দেয়—তা, তুই ত এক-আধটা ভালমন্দ রান্না করলে পারিস। আমরা না হয় প্রশংসা করতাম একঝুড়ি।

মাথা নামিয়ে প্রমীলা বলল—হেনাদি যেন কি? প্রশংসা পাবার জন্যে আবার রান্না কি রকম! তাছাড়া সকালে সময় কোথায় বল?

এ কথার জবাব হেনা দিল না।

মলিনা বলল—আমি ভেবেছিলাম এখানে থাকতে থাকতে এই খাওয়া-দাওয়ায় তুই অভ্যস্ত হয়ে গেছিস। কিন্তু সে আশা বৃথা। তুই যেমন ঘরগেরস্থালির মেয়ে ছিলি তেমনিই আছিস। এতদিন নার্সের কাজ করে এখনও মেজাজটা খিটখিটে করতে পারলি নে?

এতক্ষণে নীরদা মুখ খুলল। তোমরা দেখছি নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত। আমার কিন্তু একটা বলার কথা ছিল। খুব সিরিয়াস—

—সিরিয়াস? কি ব্যাপার? বিয়ে থা করছ নাকি?

হেনা উৎসুক হয়ে রইল।

—বা রে, বিয়ে থা ছাড়া আর কোন সিরিয়াস ব্যাপার নেই বুঝি? তোমরা যেন কি হচ্ছ দিন দিন।

—ও, বিয়ে থা নয়। তবে আর কি এমন সিরিয়াস ব্যাপার? তুমি মিথ্যে রাগছ নীরদা। আমাদের এই জীবনে কারওর যদি একটা বিয়ের গেরো লেগে যায় তবে সেটা নিঃসন্দেহে একটা ভূমিকম্পের মত সিরিয়াস ব্যাপার। কিন্তু এমনি কপাল সব। বিয়ে দূরে থাকুক, একটা নীলখামের প্রেমপত্রও কারও আসে না। আমরা ত বুড়ী হতে যাচ্ছি। কিন্তু এই অল্পবয়সী প্রমীলা, ওকেও কেউ একটা প্রেমপত্র-টত্র কই দেয় না ত! কেবল ওই নিবারণটা দূর থেকে আড়চোখে দেখে। কিন্তু ওটা বোগাস।

মলিনা বলল—প্রেমপত্রের কথা থাক হেনা! এখন নীরদা কি সিরিয়াস কথা বলছে শোন না। নীরদার কথা এই। গত ছুটিতে সে কলকাতায় শুধু বেড়াতেই যায় নি। নানাভাবে একটা ভাল জায়গায় চাকরিরও চেষ্টা করেছে।

এখানে তার একদম ভাল লাগে না। অন্তত কলকাতার কাছাকাছি কোন হাসপাতালেও যদি চান্স পেত তা হলেও থাকতে অসুবিধা হ'ত না।

কলকাতায় ডাক্তার সেনের সঙ্গে দেখা। এক সময় ওর চেম্বারে সে প্রাইভেট নার্সের কাজ করেছে।

উনি বলেছেন—কি নীরদা, এখন কোথায় কাজ করছ। কলকাতায় ত দেখি না?

—কলকাতা থেকে অনেক দূরে স্যর। পাণ্ডববর্জিত দেশে।

—সে কি? সে কোন্ জায়গায়?

—একটা ইউনিয়ন হেল্‌থ্ সেণ্টারে। ভেবেছিলাম পাকা চাকরি, সরকারী ব্যাপার—

—আর এখন?—ডাঃ সেন সহাস্যে তাকিয়েছেন।

—এখন দেখছি সবই বুজরুকী স্যর। সরকারী চাকরি কিছু নয়। ও জায়গাটাও ভাল নয় তেমন। কলকাতা থেকে বড্ড দূরে।

—তা কি ঠিক করেছ মনে?

কলকাতায় কিংবা ধারে কাছে কোন কাজ জুটত যদি তা হলে বেঁচে যেতাম স্যর।

ডাঃ সেন নিজের মনে কি ভাবছিলেন।

নীরদা আবার বলল—সরকারী হাসপাতালে ওই দোষ স্যর। বিশেষ কিছুই ওষুধ নেই। একটা বিশেষ ইনজেকশন যদি দেবার দরকার পড়ে, রোগীর লোকেদের বলতে হবে। তারা যদি কিনে দেয় ভাল, না হ'লে রোগীর আর ওষুধ পাওয়া হ'ল না। তা ছাড়া গাঁয়ের লোক দামী দামী ওষুধ কিনতে পয়সাই বা পায় কোথায়?

ডাঃ সেন বললেন—আচ্ছা, তোমার কথা আমি মনে রাখব নীরদা। ঠিকানাটা বরং দিয়ে যাও।

ঠিকানা রেখে চ'লে এসেছিল নীরদা। সেও প্রায় বেশ কয়েকদিন হ'ল।

আজই সকালে ডাঃ সেনের চিঠি পেয়েছে নীরদা। অন্য কিছু নয়। মাত্র কয়েক ছত্রে তার চাকরির সংবাদটুকু। কলকাতার বেশ কাছেই একটা হাসপাতালে নীরদার চাকরি হ'তে পারে। মাইনে কোয়ার্টার এখানকারই অনুরূপ। যদি নিতে চায় নীরদা যেন জয়েন করবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আসে।

খাওয়ার টেবিলে ব'সে নীরদা ওর মনের কথাই জানাল।

কথা শুনে প্রমীলার মুখটা একটু করুণ হয়ে উঠছিল। সে বলল—তুমি তা হ'লে চললে নীরদি। আমাদের বাসার একজন মেম্বার কমল। আবার কে আসবে কে জানে?

হেনা হেসে জবাব দিল—বাসার মেম্বার কি বলছিস। বল্ মৌচাকে ঢিল পড়ল। একটি দিল চম্পট। আবার কার পালা আসবে কে জানে?

—কবে তোকে জয়েন করতে হচ্ছে?—মলিনা প্রশ্ন করল।

—যত শীঘ্র পারি, সেইরকমই ত লিখেছে।

—তা হ'লে এখানে রেজিগ্‌নেশান দিচ্ছিস ত?

—নিশ্চয়ই। আজ বিকেলেই সাব্‌মিট্ করব ভেবেছি।

প্রমীলা তেমনি স্বরে বলল—বেশ ছিলাম সকলে, তাই না নীরদি? তুমি চ'লে যাচ্ছ। থেকে থেকে ব'সে আমাদের কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগবে। মনে হবে, এই ত সেদিনও তুমি ছিলে। একসঙ্গে ব'সে গল্প করতাম, একসঙ্গে খেতাম। কত তাড়াতাড়ি সব কেমন বদলে যেতে চায়।

নীরদার মনটাও কেমন আর্দ্র হয়ে উঠেছিল। এই মানিকবাজারে অনেকদিন কাটল। প্রায় চার বৎসর হবে। তখন এত বড় ছিল না হাসপাতাল। অল্প কয়েকজন কর্মচারী মাত্র। রোগীও কম হ'ত খুব। তখন একা একা নার্স কোয়ার্টার্সে কতদিন কাটিয়েছে সে। এখন ত জম জমাট হাসপাতাল। এখনকার দিনই আলাদা।

প্রমীলাকে সে বলল—চাকরি ক'রে বেড়ান সারা জীবন মেয়েদের পোষায় না রে। যদি সুখের পোষাপাখীর মত রাখতে পারিস তবে চলে। তাই তোকে ব'লে যাচ্ছি, যত তাড়াতাড়ি পারিস ছেড়ে দিবি। অল্প বয়স তোর—তাই বলছি এত কথা—

দিন দুই পরে নীরদা চ'লে গেল। হাসপাতালে সকলে মিলে ছোটখাট একটা ফেয়ারওয়েল দিল ওকে। এসব ব্যাপারে প্রমীলা ভয়ানক উৎসাহী। পছন্দসই একটা বই কিনে আনা হ'ল। তাতে বিদায়স্মৃতিসূচক দু'লাইন কবিতাও লিখল সকলে মিলে। বাগানের ফুল তুলে এনে মালা গাঁথা হ'ল। রেসিডেণ্ট মেডিক্যাল অফিসার সভাপতি। ফুলের মালা প'রে উঠে কিছু বলতে গিয়ে হঠাৎ কেমন নির্বাক্ হয়ে গেল নীরদা। মুখ দিয়ে ওর কোন কথাই সরল না। মলিনা হেনা এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। তেমনি নির্বাক্ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে একটি ছোট্ট নমস্কার ক'রে ব'সে পড়ল নীরদা। মুখটা করুণ বেগুনী হয়ে গেছে। যেন কি এক তীক্ষ্ণ দুঃখে অভিভূত হয়ে গেছে বেচারী।

সন্ধ্যের পর সকলে মিলে ওকে বাসে তুলে দিতে গেল। রাত ন'টায় জেলাশহরে ট্রেন ধরতে হবে। বাসটা প্রায় খালিই। ওকে তুলে দিয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল ওরা।

হেনা বলল—গিয়ে একটা চিঠি দিস নীরদা। সম্পর্কটা রাখিস। ভুলে দিস না।

নীরদা মাথা নাড়ল।

মলিনা বাধা দিয়ে বলল—মাথা নাড়া নয়—গিয়ে কিন্তু ভুলে যাসনে পোড়ারমুখী—

প্রমীলা কথা বলে নি। ওর মনটা পাথরের মত ভারী হয়ে উঠেছে। সেখানে যেন আর সাড় নেই। স্পর্শকাতর মনটি অকস্মাৎ যেন বোবা হয়ে গেছে—

নীরদাকে নিয়ে রাতের বাস ছাড়ল। শীত হলেও জ্যোৎস্নাপক্ষ। একাদশী কিংবা দ্বাদশী তিথি হবে। আকাশে বিরাট চাঁদ। ঠাণ্ডা জ্যোৎস্নায় পৃথিবী ছেয়ে আছে। পীচঢালা পথটা একটা টিলার পাশ দিয়ে বহুদূরে কোথায় যেন চ'লে গেছে। পথটা একটা বিশালকায় সরীসৃপের মতই আকাবাঁকা।

বহুদূরে বাসটার পিছনের ছোট লাল বাতিটা এখনও চোখে পড়ে।

হেনা বলল—এবার ফিরি চল্ প্রমীলা। ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে, বল্?

মন্থর ক্লান্তগতিতে ওরা সকলে বাড়ী ফিরতে লাগল।

চৌদ্দ

নীরদা চ'লে যাবার পর মাস দুই কেটেছে। এখন মানিকবাজারে ভরা গ্রীষ্ম। রোদের তাপ প্রচণ্ড। মাঠ ঘাট সব কিছু খাঁ খাঁ করছে। পুকুর শুকিয়ে যাবার জোগাড়। দূরে দিগন্তে মধ্যাহ্নের রৌদ্রে বনপাহাড় কেমন ঝিলমিলি করে।

বনানী মিত্র নতুন এসেছে হাসপাতালে। নীরদার বদলে কাজ করবে। অল্প বয়সী মেয়েটি। স্বামী উত্তর-বঙ্গের কোন এক সরকারী অফিসে কাজ করে। এতদূরে ঘরসংসার ফেলে নার্সের চাকরি নিয়ে এসেছে শুনে প্রমীলাও অবাক্ হয়েছিল।

প্রথম আলাপের পরই তাই সে সরাসরি জিজ্ঞেস করেছিল—কিন্তু ভাই। তোমার কর্তা রইলেন সেই কোনখানে আর তুমি চাকরী করবে এই ধাপধাড়া গোবিন্দপুরে।

ম্লান হেসে বনানী জবাব দিয়েছে—উপায় কি বল? আমার একটা চাকরি না করলে সংসার চালান দায়। প্রথমে ভাবতাম ওঁর কাছেই কোন না কোন হাসপাতালে কাজ জুটে যাবে। সেই মত দরখাস্তও করলাম। চাইলাম উত্তরবঙ্গের কোন হাসপাতাল আর পাঠিয়ে দিল এইখানে।

প্রমীলা বলল—তুমি এ্যাসিষ্টাণ্ট ডাইরেক্টরের সঙ্গে দেখা করলে না কেন?

—দেখা? করেছিলাম একদিন। উনি আমার কথাটাও বুঝেছিলেন। তারপর সেই এক কথা বললেন—একবার যখন অর্ডার বেরিয়েছে তখন সেটা মানতেই হবে। পরে না হয় উনি আবার সুবিধামত জায়গায় বদলী ক'রে দেবেন। সেই আশাতেই আসা। নইলে আমার স্বামী বলেছিলেন চাকরিটা ছেড়ে দিতে। এতদূরে আসায় বাড়ীশুদ্ধ কারও মত ছিল না।

প্রমীলা দুঃখপ্রকাশ ক'রে বলল—আমাদের উপরওয়ালা-দের এমনিই ব্যাপার। এ আর নতুন কি এমন? হেনাদির কোন আত্মীয় নাকি বদলী হয়েছিলেন গত বছর। তাঁর স্ত্রীর তখন ছেলে হবার সময়। উপরওয়ালা সাহেব দরবার শুনে রায় দিলেন—আমি কি করব? তাছাড়া আমি তোমাকে বদলী করেছি। তোমার স্ত্রীকে করি নি—

এত দুঃখেও বনানী হেসে ফেলল। বলল—যা বলেছ ভাই। কিন্তু এরা একটা জিনিষ বোঝে না যে ভাঙ্গা মন নিয়ে কোন ভাল কাজ হয় না। পাবলিক সার্ভিস ত অনেক দূরের কথা।

বনানীকে সব কথা বলেছে প্রমীলা। দুজনেই সমবয়সী। অল্প কিছুতেই যে বয়সে মেয়েরা উচ্ছলতায় ছলছল হয়ে ওঠে, দুজনেরই সেই বয়স। তাই বনানী মিত্রের সঙ্গে প্রমীলা বসুর অন্তরঙ্গতা হতে দেরী হয় নি একটুও।

বনানীর স্বামীচিঠির দু'জনে মিলে পড়েছে। চিঠি প'ড়ে গানের কলি এসেছে প্রমীলার মুখে। ঠোঁট নেড়ে হাত ঘুরিয়ে সে গেয়েছে—

—রাতি কৈনু দিবস আমি
দিবস কৈনু রাতি
তবু তো বুঝিতে নারি,
বন্ধু তোমার পিরীতি।

বনানী ওকে ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দিতে চেয়েছে। কৃত্রিম কোপে চোখ পাকিয়ে বলেছে—কি ফাজলামী হচ্ছে এসব? মুখের যে আগল থাকছে না—

সুরঞ্জনের চিঠি দেখাতে চায় নি প্রমীলা। সেই আশাহীন নিরাশাভরা কালো কালো অক্ষরগুলি। সেই চিঠিতে উচ্ছ্বাস বা উত্তাপের একান্ত অভাব। বড় নিস্তরঙ্গ, বড় নিথর প্রাণহীন শুকনো রচনা। ও শুধু প্রমীলাই বোঝে। সুরঞ্জনের ব্যথা একমাত্র সেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। বনানীকে দেখান যায় না সে চিঠি। অন্যে কি তেমন ক'রে গ্রহণ করতে পারবে সুরঞ্জনের

লেখাগুলি। হয়তো ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসবে। কিংবা অনুকম্পা প্রকাশ করবে। বলবে আহা বেচারী! প্রাণ গেলেও অন্যের কাছ থেকে তা শুনতে পারবে না প্রমীলা।

তবু বনানী মিত্র একদিন সব জানতে পারল। মেয়েদের অনুসন্ধিৎসু মন। লুকোনো প্রায় মুশকিল। নিজের বাক্সের চাবি লাগাতে ভুলে গিয়েছিল প্রমীলা। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গিয়েছিল ডিউটিতে। বনানী খুঁজে পেয়েছিল চিঠিগুলো। সুরঞ্জনের লেখা অল্প কয়েখানি চিঠি। কখনও পত্রাদি বেশী দেয় নি সুরঞ্জন। কলকাতায় থাকতে তু'জনেরই দেখা হ'ত। এখানে আসার পরই যা দু'একটা চিঠি এসেছে সুরঞ্জনের।

ডিউটি থেকে ফিরতেই বনানীর প্রশ্নের মুখোমুখী হ'ল প্রমীলা—

—এই যে ভাই। তা ডুবে ডুবে জল খাও, আমাদের একটু জানাবে তো—

প্রমীলা প্রশ্ন শুনে অবাক্ হ'ল। সে ঘাড় বেঁকিয়ে বলল—কি আবার অপরাধ করলাম ?

বনানী আর রেখে ঢেকে কথা বলল না। একমুখ হাসি দিয়ে সুরঞ্জনের কথাটাই প্রকাশ করল সে।

কি ব্যাপার? সুরঞ্জনবাবুর আধুনিক পত্রগুলো কোথায়? এগুলো যে বড্ড পুরোণো—

ম্লান হেসে জবাব দিল প্রমীলা—এত পত্র আসে না ভাই। আগেভাগেই যা এসেছে তাই। আর চিঠি তো দেখলে। দুঃখই বল নিরাশাই বল সব কিছুই জুড়ে ব'সে আছে।

বনানী অবাক্ চোখে তাকাল। যেন বিষণ্ণতার প্রতিমূর্তি হয়ে গেছে প্রমীলা। কূলহারা নাবিকের মত দিশেহারা চোখের ভাষা—

কোন কথা জোগাল না তার মুখে। প্রমীলা ধীর পদে বেরিয়ে গেল বারান্দা দিয়ে অন্য কোনো কাজের অছিলায়।

সন্ধ্যেবেলায় গা ধুয়ে দু'জনেই সামনের মাঠে এসে দাঁড়াল। হেনা আর মলিনা ডিউটিতে গেছে। আকাশে জ্যোৎস্নায় মাখামাখি। এমন রাতে কেউ নাকি ঘরে থাকে না। মাতাল হওয়ায় গা ভাসিয়ে বনের দেশে বেড়াতে যায়। মাঠের এক কোণে করবীগাছের ঝোপ একটি। হাসপাতাল বাড়ীটা থেকে বেশ খানিকটা দূরে। আলো জ্বলছে ইনডোর ওয়ার্ডের ঘরে। টেবিলে ব'সে হেনাদি কি একটা বই পড়ছে। প্রমীলা চেয়ে চেয়ে দেখল।

বনানী মিত্র সেই প্রসঙ্গটা আবার তুলল। বলল,—তোমার সবকথা তো শোনালে না প্রমীলা?

প্রমীলা মুখ ফিরিয়ে বলল—কি আবার কথা? চিঠি পড়ে তো সব কিছুই জানলে।

—সব কিছু কই আর পেলাম? আর তোমার মুখ থেকে শুনব ব'লেই তো আশা করে আছি।

কি হবে? বরকে সবকিছু চিঠিতে লিখে জানাবে তো?

হাসল বনানী।—নিশ্চিয়ই তোর বর হ'লে দেখবি সব কথা তাকে না জানালে তোর যেন ভালই লাগবে না।

অগত্যা প্রমীলাকে শুরু ক'রতে হ'ল। সেই কথা সব। সুরঞ্জনের টিউশনী, তাদের প্রথম আলাপ, বিয়ের কথা তার, মামাবাড়ীর গঞ্জনা কোন কিছুই গোপন ক'রল না প্রমীলা। এতদিনেও একটা চাকরি জোটাতে পারেনি বেচারী। কত বছর তো কাটল। হয়ত আর কোন চাকরি পাবেই না খুঁজে।

আকাশের কোণে অল্প একটু ক্ষয়ে যাওয়া গোলাকৃতি চাঁদ। করবী গাছের পাতায় চিক্‌চিকে জ্যোৎস্না। পুরণো দিনের কথা ভাবতে ভাবতে অকস্মাৎই এলোমেলো ছবি ভেসে এ'ল তার মনে।

এখন ভরা বৈশাখ। মেডিক্যাল কলেজের নার্স কোয়ার্টার্সের কাছে সারিবদ্ধ কৃষ্ণচূড়ার গাছের স্তবকে স্তবকে কত বিচিত্রবর্ণ ফুলের সমারোহ। দুপুরের রোদে গাছের পাতা ঝিলমিল করে। ডিউটিক্লান্ত শরীরে কতদিন দুপুরে জানালা দিয়ে উঁকি দিয়েছে প্রমীলা। কৃষ্ণচূড়া গাছের তলা দিয়ে ধীর শান্ত গতিতে কতক্ষণ পরে আসবে সুরঞ্জন। দেওয়ালের বড় ঘড়িটার কাঁটায় কখন ভিজিটিং আওয়ার্সের সঙ্কেত ঘোষণা হবে ?

প্রমীলার চোখের সামনে পুরণো দিনের নানা ছবি এক এক ক'রে ভেসে এল।

পনের

বৈশাখ মাসে সুরঞ্জনের একটু সুরাহা হ'ল। একটা চাকরি হ'ল ওর। কি একটা সদাগরী অফিসে কেরানীগিরি, মাইনে এমনিতে সামান্য। কিন্তু যুদ্ধোত্তর ভারতবর্ষে ও পরিকল্পনার দৌলতে সদাগরী অফিসের মাগগী ভাতার হার বৃদ্ধি পেয়েছে চিতাবাঘের লাফের মতই দ্রুতগতিতে। মাইনের অঙ্কের সমান কিংবা দেড়গুণ পর্য্যন্ত মাগগীভাতা, মাসান্তে মাইনেটা তাই মোটামুটি ভালো। শ আড়াইয়ের কাছাকাছি।

চাকরী পাওয়ার ব্যাপারে সুরঞ্জনের কোন কৃতিত্ব নেই। এর জন্য সব প্রচেষ্টাই সুরঞ্জনের মা'র। আসল ব্যাপারটা সুরঞ্জনও জানে না। ইচ্ছে ক'রেই জানান নি সুনয়নী দেবী।

মিথ্যে ক'রে একটা গল্প বলেছেন ওকে। কল্পিত এক সইয়ের দৌলতেই নাকি কাজ হয়েছে সুরঞ্জনের। সুরঞ্জন চাকরি পাওয়ার আনন্দেই খুশী। কার্য্যকারণ নিয়ে অত মাথা ঘামাতে চায় না।

আসল ব্যাপারটা অন্যরূপ। এক ঘটকীমেয়ের কাছে সুরঞ্জনের কথা বলেছিলেন সুনয়নী দেবী। বলেছিলেন, ছেলে তাঁর সুঠাম সুপুরুষ। বি,.এ. পাশ করেছে ভালোভাবে। শুধু চাকরি নেই। কেউ যদি একটা চাকরি ক'রে দেন ওকে তবে তাঁর মেয়েকে ঘরের বৌ ক'রে আনবেন উনি।

সেই ঘটকীমেয়েই সুরঞ্জনের চাকরি ক'রে দেওয়ার উপলক্ষ্য।

ঘটকী বলেছিল—কিন্তু মা, আগে মেয়ে দেখে নাও। ছেলেকে মেয়ে দেখাও, যদি পছন্দ হয় তবে চাকরি তোমার ছেলের আগেই ক'রে দেওয়া হবে।

সুনয়নী দেবীর মনটা একটু দোলা দিয়ে উঠেছিল। প্রমীলার ব্যাপারটা এখানের সবাই প্রায় জানত। সেও কত দিন হয়ে গেল। এতদিন পরে সে ব্যাপারটাকে আর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন মনে করলেন না উনি। মানুষের মন সমুদ্রতীরের বেলাভূমি। নতুন ঢেউ এসে পুরানো পায়ের ছাপ মুছে দিয়ে যায়। তবু সুরঞ্জনকে আগেভাগে এতসব কথা জানানোর প্রয়োজন কি? ঘটকীমেয়েকে সেই কথাই বললেন সুনয়নী দেবী।

ছেলেকে কিন্তু বিয়ের কথা আগে জানাবে না মেয়ে। আমি পাত্রী দেখে আসব। পছন্দ হলে সুরঞ্জনের চাকরি ক'রে দিতে হবে আগে। আর দেনাপাওনার কোন কথা নেই। সে উনি যা দেবেন মেয়ে জামাইকে।

ঘটকী একবার বলেছিল—শেষে ছেলে যদি বেঁকে বসে মা?

একগাল হেসে সুনয়নী দেবী উত্তর দেন—সে ভাবনা তোমার নয় মেয়ে। ওটা আমাকেই ভাবতে দাও। ছেলে আমার কথা কোনদিন ঠেলতে পারে নি। আজও পারবে না ব'লেই বিশ্বাস রাখি।

মেয়ে দেখে এলেন সুনয়নী দেবী। একটু কালো অবিশ্যি। কিন্তু অত বিচার করলে চলে না। আইবুড়ো মেয়ের বিয়ে না হওয়ায় যে জ্বালা, সুস্থ সবল ছেলের চাকরি না পাওয়াও সেই একই দুঃখ। সুরঞ্জনের ম্লান মুখখানা ভেসে এল তাঁর মনে। মা হয়ে সন্তানের দুঃখমলিন মুখ নিত্য দেখতে পারবেন না তিনি।

ঘটকীকে মত জানানো হ'ল। চাকরি ক'রে দেওয়ার মাস দুই পরে বিয়ের দিন ঠিক করা হবে।

চাকরি হ'তে কিন্তু দুদিনের বেশী সময় লাগল না। মেয়ের বাবার এক বড়লোক বন্ধু একটা পত্র লিখে দিলেন মাত্র। সেই চিঠিটা হাতে নিয়ে এক সদাগরী অফিসের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে হবে। সুনয়নী দেবী আগেই ব'লে রেখেছিলেন সুরঞ্জনকে। তার ছোটবেলাকার এক সইয়ের সঙ্গে গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে দেখা। সই এখন মস্ত বড়লোকের ঘরণী। ছেলের কথা সইকে বলেছিলেন তিনি। ছোটবেলার বন্ধু। সইকে ভোলেনি, লোক দিয়ে চিঠিখানা পাঠিয়ে দিয়েছে। বলেছে, সুরঞ্জন যেন অবিলম্বে দেখা করে চিঠিতে দেওয়া ঠিকানায়। চাকরি নিশ্চয়ই হবে।

চিঠিটা হাতে নিয়ে সুরঞ্জনের মনটা এক অনাবিল আনন্দে ভ'রে গেল। সুনয়নী দেবী জননীর স্নিগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন ছেলের মুখে। কতদিন ছেলের এমন হাসিমুখ দেখেন নি তিনি। সেই ছোটবেলাকার সুরঞ্জন যেন। উজ্জ্বল হাস্যময় মুখখানি। ছেলেটার উপর অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত মমতায় তাঁর সমস্ত অন্তরটা ভ'রে উঠল।

চিঠিটা হাতে নিয়ে সুরঞ্জন বলল—এই সইটিকে এতদিন কেন খুঁজে পাও নি মা। কি দুঃখেই বল ত জীবনটা কাটল এতদিন। এত খুঁজে খুঁজে চাকরি পেলাম না কোথাও। এমন ক'রে তোমার সইটি লুকিয়েছিলেন কেন বল ত?

চিঠিটা শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে আবার লুফে নিল সে। বলল, মা, এটা তোমার চিঠি নয়। এটা হ'ল পরশমণি—এর ছোঁয়ায় পাথর সোনা হবে। আর তোমার বেকার অচল ছেলেটার এবার বোধহয় একটা গতি হবে।

সুনয়নী দেবী হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

বিছানায় শুয়ে সুরঞ্জন বাইরে তাকাল। বেলা প'ড়ে এসেছে। গ্রীষ্মের রোদ বাইরের পার্কের উপর ছড়ানো। হঠাৎ সমস্ত পৃথিবীটাই কি অপূর্ব মোহময় মনে হ'ল তার। এতদিন বাদে আলীবাবার গল্পের সেই চিচিংফাঁক মন্ত্রের সন্ধান পেয়েছে সে। পাহাড়ের মত নো ভেকেন্সির দরজাটা এবার যেন মায়ামন্ত্রবলেই খুলে যাবে তার সামনে।

পরদিনই সেই সদাগরী অফিসের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করল সে।

অল্প কয়েকটি কথা। অধিকাংশই শিক্ষাসংক্রান্ত—তার কোয়ালিফিকেশনের ফিরিস্তি।

দিন দুই পরেই ডাকযোগে নিয়োগপত্র এল তার নামে।

রেজেষ্ট্রী-করা চিঠিটা পিওনের হাত থেকে নিয়ে প্রথমেই একজনের কথা মনে হ'ল তার। আয়ত কালো দুটি চোখের বিষণ্ণ দৃষ্টি। সে দৃষ্টিতে এবার হাসি ফুটবে। মুখখানি প্রমীলার।

ষোলো

নিবারণ সাণ্ডেলের দোকানে গ্রীষ্মকালে খদ্দেরপাতি

কম। গ্রাম অঞ্চলে গ্রীষ্মপ্রচণ্ড। খর বৈশাখে সব কিছু জ্বলছে। আকাশে মেঘ নেই। রোদের তেজে গাছের পাতাগুলো যেন ঝিমোয়। গাঁয়ের লোকে খড়ের ঘরে ঘুমোয়। হাসপাতালেও ভিড় কম। এই দারুণ রোদে রোগ দেখাতে কেই বা আসছে এত দূরে?

দোকানে বসে নিরারণ চেয়ে থাকে। দুপুরে মাঠঘাট যেন জ্বলতে চায়। মাঠের শেষে দিগন্তটা যেন ঝাপসা ধোঁয়া ধোঁয়া। অগ্নিবর্ষী আকাশের ধোঁয়াটে রূপে পৃথিবীটা কেমন ধূসর লাগে চোখে।

নিবারণ হাসপাতালের দিকে চাইল। এতদিনেও কিছু করতে পারল না বেচারা। কচি নার্সটি একদিনও হেসে কথা বলে নি তার সঙ্গে। অথচ ওকে নিয়ে প্রথম প্রথম কত স্বপ্নই না রচনা করেছিল সে। একদিন সাহস ক'রে নিবারণ কিছু বলতেও চেয়েছিল। কিন্তু ভরসা পায় নি শেষ পর্যন্ত। প্রমীলাকে যত সমীহ করে সে, তার চেয়ে অনেক বেশী ভয় হয় তার হেনাকে দেখে। নার্স হলে কি হবে, চোখে যেন দারোগার ক্রূরদৃষ্টি। নিবারণের বড় ভয় হয়। মাঝে মাঝে পথ দিয়ে যেতে কটমট ক'রে এমন তাকিয়েছে নিবারণের দিকে যে তার অন্তরাত্মা ভয়ে শুকিয়ে যাওয়ার যোগাড়।

আজ সকালেই হেনা ডেকে পাঠিয়েছিল ওকে। অন্য কিছু নয়, কয়েকটা জিনিষের অর্ডার। কয়েকটা সাবান, একটা তেলের শিশি, স্নো, পাউডার ইত্যাদি—অর্ডার নিতে নিতে সাহস ক'রে শুধিয়েছিল নিবারণ, ওনার কিছু লাগবে না? আনতে হবে না কি কিছু ওঁর জন্যে—

হেনা বিরক্তির স্বরে উত্তর দিয়েছিল, ওনার জিনিষের দরকার হলে উনিই বলবেন সেকথা। আপনাকে নিজে থেকে বলতে হবে কেন?

আমতা আমতা ক'রে নিবারণ বলেছিল, না, না, ঠিক তা নয়। তবে পাঁচজনের কাছ থেকে অর্ডার নিয়েই ত আমাদের কারবার। তাই জিজ্ঞেস না ক'রে পারি না।

কথাটা শুধু এইটুকু নয়। সেটা প্রমীলা ভাল ক'রেই জানে। মাসের প্রথম সপ্তাহে নিবারণ ঠিক একবার নার্স-কোয়ার্টার্সে চ'লে আসবে। সঙ্গে নিয়ে আসবে তেল, স্নো, সাবান ইত্যাদি। ঠিক এমনি সময় আসবে যখন নার্স-কোয়ার্টার্সে প্রমীলা শুধু একা। এক গাল নিস্পৃহ অমায়িক হাসি উপহার দিয়ে নমস্কার জানাবে নিবারণ।

তারপর বলবে, শহর থেকে আপনার জিনিষগুলো নিয়ে এসেছি। সে দাম আপনি যখন খুশি দেবেন, তার জন্যে কিছু নয়। তবে এগুলো ত ফি মাসেই দরকার আপনার?

প্রমীলা অবাক্ হয়ে দেখেছিল, সব কিছু জিনিষই বেশী বেশী। তার প্রয়োজনের চেয়ে দু-একখানা বেশীই। এমন কি সুগন্ধী সেন্টখানা পর্যন্ত। সে বলেছিল, এত জিনিষের ত আমার প্রয়োজন নেই। আর দাম কত? এখনই নিয়ে যান।

দাম নিয়ে চ'লে গিয়েছিল নিবারণ। কিন্তু জিনিষটার ইতি এখানেই হয় নি। বেশ কিছুদিন পরে হঠাৎ কথায় কথায় আবিষ্কার করেছিল প্রমীলা যে, তার জিনিষের দাম অন্যদের তুলনায় অনেকখানি কম। লজ্জায় মরমে মরে গিয়েছিল সে। পরদিনই প্রতিবাদ করেছিল নিবারণকে ডাকিয়ে। কিন্তু যার লজ্জা কম, কথায় তার কিই বা আসে যায়! নিবারণ বলেছিল, আপনার কাছে শহরের দামটাই নিয়েছি শুধু। তাই একটু আধটু কম মনে হয়েছে। ও নিয়ে মন খারাপ করবেন না আপনি।

প্রমীলা সেই থেকে পারতপক্ষে নিবারণকে আর জিনিষ আনতে দেয় নি।

বিকেলের ডাকে দুখানি চিঠি এল প্রমীলার। খোলা বারান্দায় চেয়ারে ব'সে সে খবরের কাগজে চোখ বুলোচ্ছিল। চিঠি দুটি ঝি হাতে এনে দিল। কাগজ সরিয়ে চিঠি দুটির দিকে তাকাল প্রমীলা। একখানি সুরঞ্জনের। হাতের লেখা দেখেই ব'লে দিতে পারে প্রমীলা। অন্যটি কোন এক কোলিয়ারীর মনে হ'ল। ইচ্ছে ক'রেই শেষের চিঠিখানা প্রথমে খুলল সে। অন্য কিছু নয়, একখানা নিয়োগপত্র। তার নামে। মাসখানেক আগে কি খেয়ালে একদিন দরখাস্ত করেছিল প্রমীলা। সেদিন প্রমীলার মনটা ভালো ছিল না। ইচ্ছে হয়েছিল, এই বাংলা দেশে ছেড়ে অন্য কোথায় অনেক দূরে চ'লে যেতে। এখানকার প্রাত্যহিক জীবনের ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তিতে বিরক্ত হয়ে পড়েছিল সে। সেদিনকার কাগজে মধ্যপ্রদেশের এক কোলিয়ারীর হাসপাতালের জন্য নার্স চাই বিজ্ঞপ্তি ছিল। খেয়ালবশেই একখানা দরখাস্ত করেছিল প্রমীলা। আজ সোজাসুজি নিয়োগপত্র। একবার সুরঞ্জনের কথা মনে হ'ল তার! এমনি একটা চাকরির জন্য কি অক্লান্ত পরিশ্রমই না ক'রে চলেছে সে।

খানিক পরে সুরঞ্জনের চিঠিখানা খুলল সে। বেলা প্রায় শেষ। দূরের আকাশে পাখীরা উড়ে চলেছে। হয়ত নীড়-অভিমুখী বিহঙ্গকুল। সমস্ত দিনের শেষে ক্লান্তি নেমেছে ডানা দুটিতে। এখন নীড়ে ফেরার সময়।

প্রমীলা একবার দৃষ্টি মেলে সেদিকে চাইল।

সুরঞ্জনের চিঠিতে নতুন সুর। সে লিখেছে,—

মিলি,

এমন ভালো মন নিয়ে কোনদিন তোমার চিঠি লিখি নি। সূর্য্যকরোজ্জ্বল এই পুলকিত পৃথিবীটা এতদিন আমার কাছে মেঘেঢাকা বিষাদ-মলিন হয়ে ছিল। আজ কি এক যাদুমন্ত্রে মেঘ গিয়েছে স'রে। রোদের আলোয় সমস্ত পৃথিবীটা যেন হাসছে। আমার রক্তে তার স্পন্দন শুনছি।

ব্যাপারটা অন্যকিছু নয়। এখন আমি সশব্দে 'ইউরেকা' বলে চীৎকার করতে পারি। জগতে বাঁচবার জন্যে যে পাসপোর্ট চাই তা আমার হাতে এসে গেছে। অর্থাৎ চাকরি পেয়ে গেছি। মাসান্তে প্রায় শ'আড়াই টাকা হাতে আসবে।

তোমাকে আর প্রতীক্ষায় ফেলে রাখতে আমার মন চাইছে না। এমনিতেই অনেকদিন আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে কাটালাম। এখন লগ্ন সমাগত। তাকে পরিহার ক'রে দূরে সরিয়ে রাখার কোন প্রয়োজন দেখছি না।

আমার চিঠি পেয়ে ওখানকার চাকুরিতে তুমি ইস্তফা দিও। যতশীঘ্র পার চ'লে এসো কলকাতায়। ভয় নেই, এখানে এসে মামাবাড়ীতে উঠতে হবে না তোমায়। তবু শ্বশুরবাড়ীতেও আগে থেকে আসতে বলতে পারি না বোকে, তাই তোমার জন্যে থাকার আস্তানা আমি ঠিক ক'রেই রেখেছি। সুন্দর পরিচ্ছন্ন একটি মেয়ে হোস্টেলের একখানি রুম।

তুমি এখানে এলেই আমাদের সামাজিক সম্পর্কটাকে একটা লৌকিক অনুষ্ঠানের মর্য্যাদা দিতে হবে। তার জন্যেও সবকিছু আমি ভেবে রেখেছি। মাকেও ২।১ দিনের মধ্যেই সব বলব। তিনি কখনই অরাজী হবেন না। আর হলেও অন্য কোন উপায় নেই।

মোটকথা আমার চিত্ত এখন অশান্ত দেবী। সমুদ্রে কত ঢেউ আমি জানি না। কিন্তু আমার হৃদয়ে যে ঢেউয়ের উথালপাথাল চলেছে তার বর্ণনা তোমাকেও দিতে পারছি না অতএব অবধান কর, দেবী প্রমীলা। তোমার কান্তসন্দর্শনে যদি চিত্ত উন্মুখ হয়ে থাকে, তবে হে দেবী আর বিলম্ব কেন। যতশীঘ্র পার বাষ্পীয় শকটে আরোহণপূর্বক মহানগরীতে চ'লে এস। তোমার চিঠির উত্তর পেলেই, কবে কখন স্টেশনে যাব তার হদিশ মিলবে মনে হয়।

ইতি—

চিঠিটা প'ড়ে কতক্ষণ স্থির হয়ে বসে রইল প্রমীলা-দূরের আকাশটা কালো হয়ে এসেছে। সন্ধ্যা সমাগত। দূরে দূরে সাঁঝের প্রদীপ দেখাচ্ছে গৃহবধূরা। শাঁথের আওয়াজ এখানেও কানে ভেসে আসে। কি মিষ্টি সন্ধ্যা। কোথায় দূরে যেন বৃষ্টি হয়েছে। ঠাণ্ডা বাতাস ব'য়ে আসছে সেদিক্ থেকে।

কি মনে হ'তে ঘরে উঠে এল প্রমীলা। আলো জ্বালিয়ে সুরঞ্জনের চিঠিখানা শুরু থেকে আবার পড়তে আরম্ভ করল। এমন ভাল চিঠি সুরঞ্জন যেন কখনো লেখেনি।

সতেরো

কাজে ইস্তফা দিল প্রমীলা।

হেনা, মলিনা আর বনানী তিনজনেই খুশী হয়েছে খুব! সুরঞ্জনের কথা সকলেই কাছেই বলেছে প্রমীলা। আজ আর লজ্জা নেই কোন। হেনা, মলিনা, দুজনেই জিজ্ঞেস করেছে—কি রে, বিয়ে থা ক'রে আমাদের ভুলে যাবি তো?

সলজ্জ হাসল প্রমীলা। কতদিন ধ'রে স্বপ্ন দেখেছে বেচারী, দুপুর রাতে রোগীদের চোখেও যখন ঘুম নেমেছে তখন হাসপাতালের ওয়ার্ড ছেড়ে মাঠের উপর কতদিন দাঁড়িয়েছে এসে প্রমীলা। মাথার উপর তারা-জ্বলা আকাশের চাঁদোয়া। জোনাকী জ্বলছে গাছে,…নানা জ্যামিতিক রেখার আকৃতিতে পরীরাজ্যের সৃষ্টি করছে তার বিমুগ্ধদৃষ্টির সামনে। তখন কতবার সুরঞ্জনের কথা মনে হয়েছে প্রমীলার। নার্সের এই হাড়ভাঙ্গা খাটুনি ছেড়ে কবে সে সুরঞ্জনের কাছে আবার ফিরে যাবে।

তবু এক গাল হেসে বলল প্রমীলা—তোমাদের ভুলে যাব কি আবার? কেমনধারা সব কথা দেখ।

মলিনা বলল—ভুলে যাবি রে যাবি। তবে কি আর এক দিনে? আস্তে আস্তে একটু একটু ক'রে ভুলে যাবি। হঠাৎ একদিন দেখবি, মানিকবাজারের দিনগুলো আর তেমন ক'রে মনে আসছে না—সব কিছু কেমন ঝাপসা আর ধোঁয়া ধোঁয়া।

হেনা বলল—গিয়ে চিঠি দিবি। কি সপ্তাহে একখানা। আর একদিন দুজনে মিলে আসবি না, একখানা ঘরই ছেড়ে দেব তোদের—ও মা অত লজ্জার কি আছে?

প্রমীলা চুপ ক'রে রইল।

রাতে বিছানায় শুয়ে বনানী বলল—প্রমীলা, তুমি চলে গেলে আমার কিন্তু ভারী খারাপ লাগবে। এই ত জায়গা, মাঠ, গ্রাম, পাহাড় আর বন। মিশবার মত লোকজন কই তেমন? হেনাদি আর মলিনাদি অনেক বড়। ওঁদের সঙ্গে ঠিক প্রাণ খুলে মিশতে পারি না। তুমি ছিলে—একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল তার।

প্রমীলা বলল—কি করবে বল আর? প্রথমটা কষ্ট হবেই। কিন্তু আবার ত একজন আসবে আমার মত—দেখবে ভাবসাব হতে একটু দেরী লাগবে না।

—তোমার মত কেন বলছ? হয়ত হেনাদিদের মত

কেউ আসবে। কিংবা আরও বেশী বয়স। তাহলেই গেছি আর কি—

দুজনে চুপ করে রইল কতক্ষণ। বনানীই কথা বলল আবার—প্রমীলা ঘুমোলে নাকি?

—না। ঘুম আসছে কই?

—সুরঞ্জনবাবুর কি রকম চাকরি বাকরি হ'ল, তা ত কিছু বললে না!

—সে সব কথা লিখেছে কই, খালি চাকারতে ইস্তফা দিয়ে যেতে বলেছে—

—নিশ্চয়ই খুব ভাল চাকরি। নইলে তোমাকে এমন জোর তলব! বনানী একটু হাসল।

প্রমীলা বলল, কি জানি। গেলেই ত সব জানতে পারব। তখন না-হয় লিখে জানাব তোমাদের।

সকলে মিলে খুব একটা ভাল ফেয়ারওয়েল দিল প্রমীলাকে। হাসপাতালের সব কর্মচারী, রোগীদেরও অনেকে উপস্থিত ছিল সভায়। সভাপতির আসনে ডাক্তার মিত্র। এমন কি নিবারণ সাণ্ডেলও এসেছিল সভাতে। পিছনের একটা বেঞ্চিতে চুপ ক'রে বসেছিল বেচারী। শহর থেকে খুব সুন্দর একটা মালা আনা হয়েছিল। এনেছিল নিবারণ সাণ্ডেল। কিছুতেই দাম নিতে চায় নি। ওর ঝোঁক বুঝে হেনাও আর পীড়াপিড়ি করে নি তেমন।

মালা প'রে স্তব্ধ হয়ে বসেছিল প্রমীলা। যেন বিসর্জনের প্রতিমা। ঠেলা দিয়ে হেনা বলল—অমন মনমরা কেন তুই বল্ দিকি? ফেয়ারওয়েল নিতে এসে কেউ অমন ভার ভার মুখে ব'সে থাকে?

—কি করব তবে?

—কি আবার? একটু হাসিখুশী হয়ে বস্। কথা বল্ সকলের সঙ্গে।

কোন পরিবর্তন হল না প্রমীলার। বরং আরও মলিন দেখাতে লাগল তাকে। যেন ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছে বেচারী। এতটুকু কৌতুকের চিহ্ন নেই ওর চোখে।

রাতের বাসেই মানিকবাজার ছেড়ে চলল প্রমীলা। শেষরাতের একটা ট্রেন ধরবে শহরে। কাল দুপুরের আগেই কলকাতা পৌঁছে যাবে।

বাসস্ট্যাণ্ডে সকলে এসেছিল। হেনাদি, মলিনাদি, বনানী। আর এসেছিল নিবারণ সাণ্ডেল। ওকে কেউ ডাকে নি, তবু কখন যেন সকলের অলক্ষ্যে বাসস্ট্যাণ্ডে এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে বেচারী।

হেনাদি ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বললেন—ওখানে দাঁড়িয়ে কেন আপনি? এখানে এসে কথাবার্তা বলুন।

এগিয়ে এল নিবারণ। কিন্তু ওই পর্যন্তই। একটা কথাও বলতে পারল না সে। যে কথা বলার এত সুযোগ খুঁজত আজ সেই সুযোগ পেয়েও মৌন হয়ে রয়ে গেল নিবারণ সাণ্ডেল। তবু প্রমীলা বলল—আপনার দোকানের কথা আমার বহুদিন মনে থাকবে। কত কষ্ট ক'রে খুঁজে পেতে শহর থেকে জিনিষ এনে দিতেন আপনি, তা আমি কোনদিন ভুলব না।

বাস এল। বিশেষ ভিড় নেই রাতের বাসে। একপাশের একটা সীটে বসল প্রমীলা। বাক্স আর বিছানা পাশের ছাদে তুলে দিল কুলিরা। হাত নাড়লেন হেনাদি, মলিনাদি।

বনানী বলল, গিয়েই চিঠি দিও। দূরে রাস্তার একপাশে নিবারণ সাণ্ডেল দাঁড়িয়ে। ওকে দেখে হঠাৎ ভারী ভাল লাগল প্রমীলার। এমন ভালো যেন কোনদিন লাগেনি।

বাস ছুটে চলল। পিছন ফিরে চেয়ে দেখল প্রমীলা, অনেক দূরে আমবনের আড়ালে হাসপাতাল বাড়ীর শাদা শাদা ঘরগুলো এখনও পরিষ্কার নজরে আসে। আর কোনদিন হয়ত মানিকবাজারে আসবে না প্রমীলা। কোনদিন আর কাজ করতে ঢুকবে না হাসপাতালের আউট ডোর ওয়ার্ডে, মলিনাদি, হেনাদি, বনানী, নিবারণ সাণ্ডেল, হাসপাতালের সেই পুরাণো বুড়ী ঝিটা, এদের সকলের কথা, ওর মনে ভিড় ক'রে এল। পিছন ফিরে আর একবার চাইল প্রমীলা, এখন আর দেখা যায় না কিছু। শুধু টিম টিম ক'রে আলো জ্বলছে কয়েকটা। তাই নজরে আসে। মানিকবাজারের জীবনের এইখানেই শেষ। প্রমীলা চোখ ফিরিয়ে নিয়ে সামনের দিকে তাকাল।

আঠারো

স্টেশনে এসেছিল সুরঞ্জন।

কামরা থেকে মুখ বাড়াতেই প্রমীলা দেখতে পেল এক মাথা উস্কো খুস্কো চুল নিয়ে মানুষটা এগিয়ে আসছে। আগের চেয়ে আর একটু যেন রোগা হয়ে গেছে। যেন একটু শীর্ণ আর মলিন দেখাচ্ছে।

কাছে এসে সুরঞ্জন বলল, নেমে এস চটপট॥ কই, কি মালপত্র আছে দেখি?

হাওড়া স্টেশনে একবার ভালো ক'রে চোখ মেলে চাইল প্রমীলা! উঃ, কি জমজমাট চারপাশটা। কতদিন যেন এতগুলো মানুষ একসঙ্গে দেখেনি প্রমীলা। এত কর্মব্যস্ততা, এত চাঞ্চল্য মানিকবাজারে বসে কল্পনাও করা যায় না।

সুরঞ্জন বলল, আমি তো ভেবেছিলাম আরো তাড়াতাড়ি

এসে পড়বে তুমি, একটা চাকরি ছেড়ে আসতে এতদিন দেরী !

হেসে ফেলল প্রমীলা। বলল, বা রে, একটা চাকরি জোগাড় করতে হিমসিম খেয়ে গেলে তুমি, আর ছেড়ে আসতে সামান্য কয়েকটা দিনও লাগবে না ?

সুরঞ্জন বলল, বেশ বলেছ কিন্তু। সত্যি, চাকরি জোগাড় করতে নাকাল হলাম কত।

ট্যাক্সিতে চেপে রওনা হল দুজনে, একটা হোটেল ঠিক ক'রে এসেছে সুরঞ্জন। সেখানেই দিন সাত থাকবে প্রমীলা। তারপর রেজিষ্ট্রারকে খবর দেবে সুরঞ্জন। সাক্ষী সাবুদ একরকম জোগাড় করাই আছে। তারপর পরের মেয়েকে ঘরের মেয়ে ক'রে নিতে একটুও অসুবিধা হবে না আর।

হঠাৎ ফিস ফিস ক'রে বলল প্রমীলা, মাকে বলেছ সব ?

সুরঞ্জনের কানে মা কথাটা বড় সুন্দর লাগল। আগে সুরঞ্জনের মাকে মাসীমা বলত প্রমীলা। আজ মা বলতে শুনে সে হঠাৎ যেন সচেতন হয়ে উঠল।

সুরঞ্জন বলল, মাকে কাল বলেছি সব, তোমাকে কোথায় এনে রাখব তাও বলেছি।

—শুনে মা কি বললেন ?

—কিছু না। খানিকটা চুপ ক'রে রইলেন। তারপর বললেন, প্রমীলা এলে আমাকে একদিন নিয়ে যাস তো ওর কাছে।

—মায়ের আপত্তি নেই তো কোন ?

—আপত্তি কিসের ? ওসব কিছু নয়।

প্রমীলাকে হোটেলে রেখে সুরঞ্জন চলে গেল, অবার কাল আসবে সকালে। অফিসে কাজ আছে কয়েকটা। একবার রেজিষ্ট্রা অফিসেও যাবে। বন্ধুদের সাহায্য নিতে হবে। তাদেরও সঙ্গে দেখা করা দরকার। আর প্রমীলা যদি বলে তাহলে একবার ওর মামার সঙ্গেও দেখা করবে সুরঞ্জন !

সুরঞ্জন চলে গেলে চান-টান সেরে নিল প্রমীলা ! ভাত খেয়ে নিল তাড়াতাড়ি। বেলা বেশ হয়েছে। অন্তত দুটোর কম নয়। কাল জেগে এসেছে সারারাত। বিছানায় শুয়ে পড়ল প্রমীলা। ঘুম এসেছে চোখের পাতায়। নিবিড় নিশ্ছিদ্র নিদ্রা।

দরজাতে কড়া নাড়ার শব্দে ঘুম ভাঙল প্রমীলার। কে যেন ডাকছে ওকে। শব্দ হচ্ছে কপাটে, ঠক্ ঠক্।

দরজা খুলে প্রমীলা অবাক্। সুরঞ্জনের মা সুনয়না এসেছেন।

পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল প্রমীলা। বলল, ভাল আছেন ?

উনি হাসলেন। প্রমীলার যেন মনে হ'ল, হাসিটা ভারী মলিন, বিষাদভরা।

ভিতরে এসে বসলেন উনি। প্রমীলাকে বসতে বললেন।

—তুমি কি চাকরি ছেড়ে দিয়ে এসেছ মা ?

প্রমীলা ঘাড় নাড়ল।

—তোমাকে একটা কথা বলতে এসেছিলাম মা।

—কি ? প্রমীলা অবাক্ হয়ে চাইল।

—একথা সুরঞ্জনও জানে না। জানলে হয়ত চাকরি নিত না।

—কি কথা ?

—তোমাদের বিয়ে হলে সুরঞ্জনের চাকরি থাকবে না। এ চাকরি যিনি দিয়েছেন, তাঁর একটা সর্ত আছে।

—সর্ত ?

—একটি মেয়েকে বিয়ে করতে হবে সুরঞ্জনকে। সব জেনেও আমি রাজী হয়েছিলাম। শুধু ছেলেটার মুখ চেয়ে। একটা চাকরি না পেয়েও বয়সের ছেলে যেন শুকিয়ে যাচ্ছিল। একটু থামলেন উনি। আবার বললেন, তোমার সে চাকরিটা আবার পাবে না মা ?

একটু হাসল প্রমীলা। বলল, আমরা ট্রেইণ্ড নার্স। কত চাকরি প'ড়ে আছে আমাদের। আজ ছাড়লে কাল পাব। ওর জন্যে কোন চিন্তা নেই।

সুনয়না উঠলেন। যাবার সময় বলে গেলেন শুধু, দুজনে মিলে যা হয় একটা ঠিক ক'রো। তুমি বুদ্ধিমতী, আমি সব ব্যাপারটা জানিয়ে গেলাম।ওকে তুমিই ব'লো।

স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইল প্রমীলা। কতক্ষণ সেও জানে না। হঠাৎ চেয়ে দেখে সন্ধ্যা নেমেছে বাইরে। আলো জ্বলে উঠছে পথে। বাক্স খুলে কোলিয়ারীর সেই নিয়োগ-পত্রটা বের করল প্রমীলা। টাইম টেবিলটা টেনে নিল হাতে। রাত ন'টাতে গাড়ী আছে একটা। আবার গোছগাছ শুরু করল প্রমীলা। তবে এবার সংক্ষিপ্ত সব-কিছু। অল্প সময়েই শেষ হ'ল সব।

আটটার পরই গাড়ী ডাকিয়ে বেরিয়ে পড়ল প্রমীলা। সেই হওড়া স্টেশন, আলো-জ্বলা জমজমাট পথঘাট···কুলুকুলু প্রবাহিনী গঙ্গা।

গাড়ীতে উঠে নির্জীবের মত শুয়ে পড়ল প্রমীলা। একটু পরেই ঘুম নেমে এল ওর চোখে।

কিছুদিন পরে বনানী প্রমীলার একটা চিঠি পেয়েছিল। প্রমীলা লিখেছে—

ভাই বনানী,

যেখান থেকে চিঠি লিখছি সেটা বাংলা দেশ থেকে অনেক দূরে। এখানকার একটা হাসপাতালে চাকরি নিয়ে এসেছি, এর চারপাশে শুধু পাহাড়, বন আর জঙ্গল। এত পাহাড় যে, মনে হয় ছোট ছোট ভাইবোনের মত ওরা যেন হাত ধরাধরি করে দাড়িয়ে আছে। এখানে কেন চলে এলাম তা জানতে তোমার নিশ্চয় খুব কৌতূহল হচ্ছে। সুরঞ্জনকে একথা বলিনি। কিন্তু তোমাকে বলতে নিশ্চয় আপত্তি নেই।

সুরঞ্জন চাকরি পেয়েছিল ঠিক। কিন্তু শুধু রাজত্ব নয়, ওর সঙ্গে রাজকন্যা পাবারও একটা কথা ছিল। বেচারা সুরঞ্জন জানত না সেটা। কিন্তু ওর মা আমাকে সব বলেছেন। রাজকন্যাকে না নিলে রাজত্বটাও থাকবে না। সেটাই ছিল সমস্যা।

সুরঞ্জনকে ছেড়ে এসেছি তাই। অনেকদিন চাকরি ছিল না ওর। এখন যা পেয়েছে আমার জন্যেই সেটা যদি হারাতে হয় তবে লজ্জা রাখবার জায়গা থাকবে না আমার। তাই সুরঞ্জনকেও কিছু না জানিয়ে চ'লে এসেছি একান্ত সংগোপনে। ওকে সব কথা বললে দু'হাত মেলে বাধা দিত সুরঞ্জন। আমার আর পালিয়ে আসা হ'ত না।

এখানকার ঠিকানা তোমায় দিলাম না। দিলে হয়ত কোনদিন সুরঞ্জন তা জানতে পারবে। সেটাই আমার ভয়। ও যদি এখান পর্যন্ত চ'লে আসে, ওকে ফেরাতে পারি এমন শক্তি আমার কই? তাই তো ভয়। তাই তো নিজেকে এমন ক'রে লুকিয়ে রাখছি। কিন্তু এ যুগের পৃথিবীটা এতই ছোট জায়গা, জানি না শেষ পর্যন্ত সেটা সম্ভব হবে কি না! তবে যদি কোনদিন জানতে পারি, সুরঞ্জন সেই মেয়েটিকে বিয়ে করেছে, সংসারী হয়েছে, তখন আর একবার কলকাতা যাব। দেখে আসব ওকে। ওর বড়ো বড়ো চোখে আমি শুধু চাকরি না পাওয়ার দুঃখই দেখেছি। সুখী সংসারীর উজ্জ্বল মুখটি দেখার আমার অনেকদিনের সাধ। কিন্তু সেটা ভাগ্যে আছে কি না ঠিক বুঝতে পারছি না।

বাংলাদেশ থেকে অনেকদূরের এই জায়গাটার বন্যরূপের মধ্যে একটা অদ্ভুত নিঃস্বতা আছে। হয়ত সেই কারণেই ভাল লাগছে এটা। এর চার পাশে পাহাড় আর বন-জঙ্গল, পুরাণো দিনগুলোকে একটু একটু ক'রে ভুলিয়ে দিচ্ছে। হাসপাতালেও চাপ। সেই কাজের মধ্যে প্রাণপণ শক্তিতে ডুবে আছি।

এতকথা সুরঞ্জনকে লিখতে পারি সে শক্তি আমার নেই, তাই তোমাকে এতকটা জানিয়ে একটু হাল্কা হবার চেষ্টা করলাম। বিদায়—

প্রমীলা।

—*—

কাঠের গন্ধ

শ্রীসমীর সেনগুপ্ত

সন্ধ্যার পরই অতিথিরা আসতে আরম্ভ করল। প্রথমে এল নিশাকর আর হিমাংশু। ছোট বারান্দা পার হয়ে ঘরে ঢুকে নিশাকর উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল; বলল, 'এ কি? সারা বাড়ীটার চেহারাই যে বদলে ফেলেছিস? করেছিস্ কি রে?'

হিমাংশু বলল, 'সত্যি। দরজার সামনে নম্বরটা মিলিয়ে নিয়েছি তাই, নইলে অন্য কোন বাড়ীতে ঢুকে পড়েছি ভেবে এতক্ষণে গৃহস্বামীর কাছে ক্ষমা চাইতাম ঠিক। ভারি সুন্দর সাজিয়েছেন সত্যি।'

মনে মনে খুশী হ'ল সিদ্ধার্থ। মুখে বলল, 'অল্ কমপ্লিমেন্ট্স্ টু মিসেস মিত্র।'

'তা ত বটেই, সে ত ওব্ভিয়াস। তোর দিকে তাকিয়ে বললেও হিমাংশু মীন করেছে সুপ্রভাকেই। সত্যি, আপনার রুচির—কি বলব? আমার আবার বাংলা বললেই বিদ্ঘুটে সব বড় বড় শব্দ বেরোয় মুখ দিয়ে। খবরের কাগজে কাজ ক'রে ক'রে এই দশা।'

মুখ নিচু ক'রে হাসল সুপ্রভা। বেশি কথা বলে না মেয়েটি, শুধু নিঃশব্দে হাসে। আজ সে পরেছে একটি শাদা বেনারসী, পাড়ে আর আঁচলে সোনালী জরির কাজ করা। রঙ মিলিয়ে পরা ব্লাউজ, চটি, চুলের ফিতে। বলল, 'চলুন, বাগানে গিয়ে বসা যাক্।'

—'বাগানে? সে কি? এই শীতে বাগানে কেন?'

—'ওখানেই সব আয়োজন করা হয়েছে। ঘরে ত এত লোক ধরবে না, কাজেই। আগুন পোয়াবার ব্যবস্থা আছে অবশ্যি।'

—'আগুন? সত্যি সত্যি? ব্রিলিয়ান্ট, মিসেস মিত্র। কলকাতা শহরে ব'সে আগুন পোয়ান—তুলনা হয় না। এটাও আপনার প্ল্যান নিশ্চয়ই?'

সুপ্রভার হয়ে সিদ্ধার্থই জবাব দিল। 'আজকের সমস্ত পরিকল্পনাই ওর। আমি শুধু হুকুম তামিল করেছি মাত্র।'

—'বাঃ। আদর্শ দাম্পত্য। সর্তহীন আনুগত্য একেবারে। ওই দেখুন, আমি আবার ডিক্‌শনারী হয়ে উঠলাম। এই রোগটা আমার আর গেল না। কি করি বলুন ত?'

ওর ভঙ্গিতে হেসে উঠল সকলেই। সুপ্রভা বলল, 'খবরের কাগজের চাকরি ছেড়ে দিন।'

—'ওরে বাবা! আমি চাকরি ছাড়লেও চাকরি আমাকে ছাড়বে না যে! রিপোর্ট লিখে লিখে কি অবস্থা জানেন না ত? আমার বিয়ের দিন হ'ল কি, রাত্তির আড়াইটে নাগাদ রমা ত ঘুমিয়ে পড়ল। আমার আর ঘুম আসে না, সারাদিন খাওয়া নেই, তার ওপর বিয়ের দিন পুরুষরা কিরকম নার্ভাস হয়ে যায় জানেনই ত। শেষে দুত্তোর ব'লে বিছানা ছেড়ে উঠে সদ্য-উপহার পাওয়া প্যাডের কাগজে চার পৃষ্ঠা ধ'রে নিজের বিয়ের রিপোর্ট লিখলাম, তবে ঘুম এল।'

সুপ্রভা হেসে উঠল মুখে রুমাল চাপা দিয়ে, অন্য দু'জন শ্রোতা খোলা গলায়। সিদ্ধার্থ বলল, 'সত্যি, রমা ঠিক এই সময়েই নেই কলকাতায়। এলে কি ভাল হ'ত বল ত?'

আরও চার-পাচ জন অতিথি এসে পৌছল, তাদের মধ্যে একটি নবদম্পতি। ওরা সবাই একসঙ্গে ট্যাক্সিতে এসেছে। সুপ্রভা এগিয়ে গিয়ে সকলকে একসঙ্গে নমস্কার জানাল, মেয়েটির হাত ধ'রে বলল, 'আসুন ভাই।' তারপর তার আপাদমস্তক একবার দেখে বলল, 'কি সুন্দর দেখাচ্ছে আপনাকে আজ, সত্যি।'

মেয়েটি—অনু—একটু হেসে বলল, 'আপনার চেয়েও?'

—'ধ্যেৎ, কি যে বলেন। আপনার কাছে আমি?'

আগত পুরুষদের মধ্যে একজন মোটা গলায় বলল, 'নিশাকর কখন এসেছিস্ রে?'

—'বেশিক্ষণ নয়, মিনিটকয়েক। ভেবেছিলাম একটু আগে এসে একা একা মিসেস মিত্রর আপ্যায়ন উপভোগ করব, তা তোরাও যে সেই একই উদ্দেশ্যে আসবি তা কি জানি? তোর কি ছুটি ছিল আজকে?'

—'না, সন্ধ্যের দু'টো ক্লাস ফাঁকি দিলাম। ছেলেদের ডেকে বললাম, এমন চমৎকার সন্ধ্যেটা ফ্রেঞ্চ রিভোল্যুশনের

ওপর এনসাইক্লোপিডিস্টদের প্রভাব বিষয়ে বক্তৃতা শুনে মাটি করবে? তার চেয়ে যাও, যারা প্রেম-টেম করেছ তারা সিনেমায় যাও, আর যারা তা করতে পার নি তারা করবার চেষ্টা কর গিয়ে। তারপর প্রিন্সিপ্যালকে গিয়ে বললাম, স্যর, আমার শালার এ্যাক্সিডেণ্ট হয়েছে, বোঝেনই ত ডোমেস্টিক ব্যাপার,—আজকের ক্লাস ছুটো বরং থাক্। প্রিন্সিপ্যাল বিচক্ষণ লোক,—পারিবারিক গোলযোগের দায়িত্ব নিতে চাইলেন না, ছুটি দিয়ে দিলেন।'

হিমাংশু চেঁচিয়ে উঠল, 'কিন্তু তোর আবার শালা কোথায় রে?'

—'ওইখানে একটা কাঁচা কাজ ক'রে ফেলেছি। ওটা বলেছিলাম ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দেবার জন্যে, শালা থাকতে গেলে যে একজন স্ত্রী থাকা এসেন্শিয়ল সে কথাটা মাথায় আসে নি। যা হোক্, ওটা পরে সামলে নিতে হবে।'

সুপ্রভা মৃদু গলায় বলল, 'এবার গিয়ে বসলে হ'ত না? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর কতক্ষণ কথা বলবেন?' স্বামীর দিকে ফিরে বলল, 'তুমি ওদের নিয়ে বসাও, আমি অন্যদের রিসীভ করছি।'

ইংরেজী 'এল্' অক্ষরের আকারে বাড়ী, তার পিছন দিকে ছোট বাগান। চারপাশে ফুলের বেড, মাঝখানে সবুজ লন। এখন সেই লন জুড়ে বড় শামিয়ানা খাটান হয়েছে। তার নিচে ছোট ছোট টেবিল ইতস্তত: ছড়ান, প্রত্যেকটাকে ঘিরে কয়েকটা ক'রে চেয়ার। প্রত্যেকটি টেবিলের উপর একটি বড় ঝিনুকের খোলা, তার ভিতরে একটি ক'রে মোমবাতি। শামিয়ানার বাইরে চারকোনায় চারটে বড় বড় বাল্ব জ্বলছে, কিন্তু খোলা আকাশের তলায় সমস্ত ব্যাপারটা হচ্ছে ব'লে অন্ধকার খুব দূর হয় নি। সে আলোতে পরস্পরের মুখ চিনতে কোন অসুবিধে হয় না, কিন্তু অক্ষর চিনতে কষ্ট হয়। শামিয়ানার বাইরে, একটু নিরাপদ্ দূরত্ব বজায় রেখে ইঁট দিয়ে গোটা তিনেক বড় বড় চুল্লি করা হয়েছে, কাঠের গুঁড়ি জ্বলছে তাতে। প্রত্যেকটি চুল্লি ঘিরে কয়েকটি ক'রে চেয়ার। একপাশে একটি নিচু টেবিল, তার উপরে কয়েকটি কন্যাক ও বিলিতি জিন্, দু'টি ভার্মুথ ও একটি ক্রেম-দ্য-মেন্থে সাজান। শামিয়ানার দূরতম প্রান্তে বড় একটি টেবিলের উপর নিঃশব্দ পরিচারক খাবারের আয়োজন সাজাচ্ছে। উজ্জ্বল আলো পড়েছে টেবিলে, কিন্তু আলোগুলো এমনভাবে বসান যে টেবিলের বাইরে একটি রেখাও পড়ছে না। একপাশে একটি ছোট টিপয়ের উপর স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাপনায় নিচু স্বরে একটির পর একটি রেকর্ড বেজে যাচ্ছে। বিভিন্ন স্বরগ্রামে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে করতে অতিথিরা আসন গ্রহণ করল, কেউ আগুনের ধারে, কেউ টেবিলের পাশে। সিদ্ধার্থ নিজে কন্যাক খুলে গেলাশে সোডা মিশিয়ে এগিয়ে দিল। মিনিট দশেকের মধ্যে আরও জনা দশ-বার মেয়ে-পুরুষ এসে পৌঁছল, কলরব ক্রমে বেড়ে উঠছে, রেকর্ডের বাজনা আর শোনা যায় না। পুরোদমে পার্টি আরম্ভ হয়ে গেল। সুপ্রভা প্রত্যেক টেবিলে ঘুরছে, হেসে নরম গলায় কথা বলছে প্রত্যেকের সঙ্গে, কিন্তু কোথাও বেশিক্ষণ দাঁড়াচ্ছে না, ব'সে পড়ছে না কোথাও, যেন এক জায়গায় আটকে গিয়ে অন্যদের প্রতি শৈথিল্য প্রকাশ করা না হয়। প্রথমে সবাই একসঙ্গে বসেছিল, আস্তে আস্তে কয়েকটা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গেল সবাই। মেয়েরা স্বভাবতই আলাদা দল হ'ল একটা, একটা আগুনের কুণ্ডকে তারাই পুরোপুরি দখল ক'রে নিল। লক্ষ্য করলে তাদের মধ্যেও একটা সূক্ষ্মভাগ চোখে পড়ে: যাদের বিয়ে হয় নি তারা একদিকে, আর বিবাহিতারা আরেকদিকে বসেছে। বিবাহিতাদের গলার আওয়াজ একটু নিচু, মাঝে মাঝে হঠাৎ সমস্ত পার্টিকে উচ্চকিত ক'রে দিয়ে হেসে ওঠা ছাড়া তাদের গলার আওয়াজ শোনাই যাচ্ছে না প্রায়। কয়েক বার তারা সুপ্রভাকে টেনে বসাল কাছে; সুপ্রভা বসল যোগও দিল দু'একটা রসিকতায়, কিন্তু দু'চার মিনিট পরেই উঠে পড়ল। শুধু যে বিবাহিত মেয়েদের ঈষৎ অশ্লীল সরস আলোচনা তার সহ্য হয় না তা নয়, অন্য অতিথিদের প্রতিও তার দায়িত্ব আছে। পুরুষদের মধ্যে যাদের বয়স একটু বেশি, পঁয়ত্রিশ ধরেছে কিম্বা ছাড়িয়েছে, তারা বসেছে এক টেবিলে। তাদের আলোচনায় মাঝে মাঝে এসে পড়ছে শেয়ার প্রসঙ্গ, কেউ জমি কিনেছে কিন্তু বাড়ীর প্ল্যান মঞ্জুর করছে না কর্পোরেশন, কারও উপন্যাসের প্রকাশক এগারোশোর হিসেব দেখিয়ে আসলে ছেপেছে বাইশশো'র কম ত নয়ই, যে মাদ্রাজীটা বীরেনকে ছাড়িয়ে সিনিয়র এক্জিকিউটিভের পোস্টটা বাগাল সে ব্যাটা ওর থেকে অন্তত তিন বছরের জুনিয়র, কাজ কিছুই জানে না কিন্তু জেনারেল ম্যানেজারের ভাইপো হ'লে—আর ভাই, শেদটা

করাপ্‌শনে ছেয়ে গেল। একটা টেবিলে চারজন 'পোকার' খেলছে। অন্য একটাতে ব্যাচেলররা প্রায় সবাই, বাইশ আউন্সের একটা কন্যাক সেখানে ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে এল। সবচেয়ে বেশি গোলমাল উঠছে সেই টেবিলটা থেকে। তাদের থেকে ত্ব'একজন মাঝে মাঝে উঠে এসে তরুণীদের সঙ্গে ব'সে যাচ্ছে। দূরতম কোণের টেবিলে ব'সে কয়েকটি বাচ্চা, তাদের মায়েরা মাঝে মাঝে তাদের উদ্দেশে সতর্কবাণী ছুঁড়ে দিয়ে আবার নিজেদের আলোচনায় ফিরে যাচ্ছে। 'তারপর বুঝলি অমিতা, আমি ত এমন ভাব করলাম যেন কিছুই জানি না। কিন্তু এদিকে ত পেট ফেটে হাসি আসছে। তারপর—'

অবিবাহিত মেয়েদের টেবিলে সুতপা নিচু গলায় তার বিশেষ বান্ধবী কেতকীকে ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে বলল, 'এই, সুপ্রভাকে দেখছিস্‌?'

—'দেখছি সেই থেকে। রাজহাঁসের মত ভেসে বেড়াচ্ছে। খুশিতে ফেটে পড়ছে একেবারে।'

—'একটু মোটা হয়েছে আগের চাইতে, না রে?'

—'হবেই; বিয়ের এক বছর পরে তুইও হবি।'

—'যা তা বলিস না। আচ্ছা সত্যি, বিয়ে হ'লেই মেয়েগুলো সব মোটা হয়ে যায় কেন রে?'

—'আহা, যেন বোঝে না কিছু। প্রাণটা হাঁশফাঁশ করছে, না? উপোসী ছারপোকা হয়ে আছিস একেবারে। তোর সেই ইঞ্জিনীয়ারের কি হ'ল? সেই যে দেখে গেল তোকে বাইশ তারিখে?'

—'আমি তার কি জানি?' চোখ নামাল সুতপা। 'আমি কি জিজ্ঞেস করতে গেছি নাকি?'

—'আহা, জিজ্ঞেস করতে যাবি কেন? বাড়ীতে ত চোখকান খোলা রাখিস, সারাদিনই ত আর ডিকেন্সের কমিক এলিমেণ্ট মুখস্ত করিস্‌ না? বল্‌ না। আমাকে বলতেও লজ্জা?'

আরও নুয়ে পড়ল সুতপা, আঙুলে রুমাল জড়াতে জড়াতে, ঠোঁট টিপে হেসে ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে বলল, 'ওদের—বোধ হয় পছন্দ হয়েছে। তারিখ ঠিক করা হচ্ছে এখন।'

—'সত্যি?' কেতকী ওকে জড়িয়ে ধরল প্রায়, 'এমন খবরটা চেপে রেখেছিলি এখনও? কালই আমি য়ুনিভার্সিটিতে—'

—'এই, খবরদার কেতকী, ভাল হবে না বলছি। তুমি যদি য়ুনিভার্সিটিতে এ সব বলতে যাও তা হ'লে তোমার সঙ্গে—তোকে বিশ্বাস ক'রে বললাম ব'লে তুই—?'

—"এই, কি কথা হচ্ছে রে তোদের?' পাশ থেকে অরুন্ধতী প্রশ্ন করল। ওর বছর তিনেক হ'ল বিয়ে হয়েছে।

—'আমরা সুপ্রভার কথা বলছিলাম, 'সুতপা তাড়াতাড়ি জুড়ে দিল, 'ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে, না রে?'

—'তা দেখাচ্ছে; ত্ব' হাজার টাকা মাইনেওলা স্বামী যদি জোটাতে পারিস্‌, তোকেও দেখাবে।' অরুন্ধতীর স্বামী একটা প্রাইভেট কলেজে পড়ায়, শ'তুই টাকা মাইনে, ছাত্র পড়িয়ে আরও শ'দেড়েক জোটে। 'হ'ত আমাদের মত অবস্থা, যা রোজগার তার অর্ধেক টাকা দিয়ে বই কিনে বাবু বিদ্যে ফলাতেন, তা হ'লে বুঝতাম কি ক'রে সুন্দর দেখায়।'

—'যাঃ, অমন ক'রে বলছিস কেন রে?' সুতপার এখনও বিয়ে হয় নি, একটি বিবাহিত মেয়ের প্রতি অন্য একটি বিবাহিত মেয়ের যে ঈর্ষা, তা'র স্বাদ ওর অজ্ঞাত। 'সুপ্রভাকে সত্যিই সুন্দর দেখতে।'

—'তাও যদি রঙটা আরেক পোঁচ ফরসা হ'ত। ইশ, হাঁটছে দ্যাখ না, যেন নৌকো চলেছে পাল তুলে। আর সিদ্ধার্থটাও কি বৌয়ের ধামাধরা রে, সেদিন আমাদের বাড়ীর সামনে দিয়ে যাচ্ছে, উনি দেখতে পেয়ে ডাকলেন। তখন বিকেলবেলা, আমরা চা খেতে বসেছিলাম। উনি বললেন, আমিও কত ক'রে বললাম এক পেয়ালা চা খেয়ে যেতে। কিছুতেই কি খেল? বলল, না, অফিস যাবার সময় সুপ্রভার জ্বর দেখে এসেছি, কেমন আছে না জানি। এখন আর বসব না।—জ্বর না ছাই, কয়েকটা ঘণ্টা চোখের আড়ালে রয়েছে আর অমনি বিশ্ব অন্ধকার।'

—'ধ্যাৎ, তুই ভাই বড্ড বাড়িয়ে বলিস্‌। আয় যা-ই বল, সত্যি সুন্দর দেখতে, কালো হ'লে কি হবে। আর কি রুচি, সত্যি। এই পার্টির এ্যারেঞ্জমেণ্ট সব ও-ই-ত করেছে। এত সুন্দর ক'রে সব ব্যবস্থা করতে, আমি ত ভাই, লাখ টাকা রোজগার থাকলেও পারতাম না। যা-ই

বলিস, গুণ আছে মেয়েটার।' মুগ্ধচোখে সুপ্রভার দিকে তাকিয়ে রইল সুতপা। সে তখন বাচ্চাদের টেবিলে ঝুঁকে প'ড়ে বোতল-সবুজ ফ্রকপরা একটি মেয়েকে আদর করছিল। এই টেবিল থেকে একটি মেয়ের মা, চেঁচিয়ে বলল, 'সুপ্রভা, ওদের টেবিলের মোমটা নিভিয়ে দে না ভাই, কে কখন জামাটায় আগুন লাগিয়ে বসবে।' সুপ্রভা ফুঁ দিয়ে মোমটা নিভিয়ে দিতেই বাচ্চারা প্রতিবাদে কলরব ক'রে উঠল, একজনের বাবা ধমক দিতে সুপ্রভা পিছন ফিরে মিষ্টি হেসে বারণ করল তাকে, তারপর গালে আঙুল ঠেকিয়ে দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট কামড়ে ধ'রে (এটা তার চিন্তা করবার বিশেষ ভঙ্গি) আধ মিনিট ভাবল। তারপর নিঃশব্দ পরিচালকটিকে ডেকে নির্দেশ দিল নীচু গলায়। লোকটি বাচ্চাদের টেবিলটা ধ'রে শামিয়ানা টাঙাবার একটা খুঁটির গোড়ায় নিয়ে এল, তারপর ভিতর থেকে হাতুড়ি আর পেরেক নিয়ে খুঁটির গায়ে বাচ্চাদের নাগালের বাইরে ছুটি পেরেক এনে পুঁতে দিল। তার উপর একটি প্লেট বসিয়ে তাতে একটির জায়গায় ছুটি মোম জেলে দিল সুপ্রভা, বাচ্চারা কলরব ক'রে হেসে উঠল, সেই পিতা ধমক দিল আবার, সুপ্রভা আবার পিছন ফিরে হেসে মানা করল তাকে, আর মুগ্ধগলায় সুপ্রভা বলল, 'দেখলি? কি চমৎকারভাবে ম্যানেজ করল ব্যাপারটা? এটা কিন্তু, তোমরা যাই বল ভাই, সকলের পক্ষে সম্ভব না।' বিবাহিত মেয়েটি কোন উত্তর না দিয়ে ফিরে বসল। কেতকী হেসে বলল, 'তুই যে প্রেমে পড়ে গেলি সুপ্রভার। যা না, ওর কাছে কাছে ঘুরে বেড়া গিয়ে, শিখেটিখে নে সব। কি ক'রে সুগৃহিণী হ'তে হয়। বেশি তা আর বাকি নেই তোর এখন?'

এক সময় ঢং ক'রে একটা ঘণ্টা বাজল। সিদ্ধার্থ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'এস সবাই, খেয়ে নাও এখন। খাওয়ার ব্যাপারটা বুফে করা হয়েছে, কারণ সবাই ব'সে একসঙ্গে খাওয়ার জায়গার অভাব।' মেয়েদের দিকে চেয়ে বলল, 'আসুন আপনারা। সুপ্রভা, ওদের নিয়ে এস। এখানে প্লেট আর কাঁটা চামচে ন্যাপকিন রয়েছে, সবাই নিজে নিজে খাবার তুলে নাও। কি অমিতা, অসুবিধে হবে নাকি?'

—'না-না, অসুবিধে কেন? তবে বাচ্চারা কি নিজে নিয়ে খেতে পারবে? আমি বরং ওদের দিই একটা আলাদা টেবিলে বসিয়ে।'

অমিতার স্বামী নিরঞ্জন প্রতিবাদ করল তক্ষুণি। 'আরে না, পারবে না কেন? শেখালেই পারবে। তুমি ওদের ছেড়ে দাও ত। নিজেরটা নিজেকে করতে দাও।'

—'হ্যাঁঃ, শেষে জামায়-টামায় ফেলে, প্লেট-টেট ভেঙে একাকার করুক আর কি। তুমি নিজেরটা দেখ ত বাপু, আমি কি করি তোমাকে দেখতে হবে না।' একটা দাম্পত্য কলহ প্রায় বেধে উঠছিল, সুপ্রভা তাড়াতাড়ি এসে থামিয়ে দিল। বলল, 'না না, অমিতা ঠিকই বলেছে। বাচ্চারা কি নিজে নিয়ে খেতে পারে? তবে অমিতা, তুই খেয়ে নে, বাচ্চাদের আমি খাইয়ে দিচ্ছি।'

—'তুই খাবি না?'

—'পাকামি করিস না। আমি অতিথিদের না খাইয়ে খেতে পারি?'

—'ও, এদিকে খুব সাহেবিপনা, ওদিকে অতিথিদের না খাইয়ে খেতে পার না বুঝি? বাঙালিত্ব যাবে কোথায়?' হেসে খোঁচা দিল অমিতা।

—'আচ্ছা, আচ্ছা। তোর বাড়ীতে যেদিন যাব সেদিন তুই আগেভাগে খেয়ে নিস্ ত, দেখব কেমন পারিস্।'

পুডিং সমেত প্রায় গোটা সাতেক পদ, টেবিলের চার পাশে ঘুরে-ঘুরে ইটালিয়ান কাচের পাত্র থেকে চামচে দিয়ে নিজের নিজের প্লেটে তুলে নিল সবাই, 'এটা খাও, ওটা খাও ব'লে কেউ সাধাসাধি করল না ব'লে পরিমাণের চেয়ে বেশিই নিল সকলে। গ'ড়ে-ওঠা দলগুলো খেতে ওঠার জন্য ভেঙে গেল, কেউ বসল, অভ্যস্তরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই খেতে লাগল। নিশাকর বলল, 'সত্যি, সিদ্ধার্থটার স্ত্রীভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হওয়া ছাড়া উপায় নেই। এমন চমৎকার রান্না বহুকাল খাই নি।'

মুখ ভর্তি ভেনি ফাউল চিবোতে চিবোতে অনুপম বলল, 'যা বলেছিস। আমাদের ভাগ্যে,' পাশে দাঁড়ান নিজের স্ত্রীকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, ''কোনদিন মাছটা বেড়ালে খেয়ে যায়, কোনদিন দুধটা পুড়ে যায়—'

ওর স্ত্রী রমা ভ্রূভঙ্গি করল। 'ইশ্, বললেই হ'ল? একটা কথাও বিশ্বাস করবেন না, নিশাকরবাবু। কোন্‌দিন তোমার মাছ বেড়ালে খেয়ে গেছে, শুনি? আর সেদিন দুধ পুড়ে গিয়েছিল, সে ত তোমারই সোয়েটারের প্যাটার্ন অঞ্জলিদির কাছ থেকে তুলে আনতে গিয়ে। যা-তা আমার নামে বললেই হ'ল, না?'

—'আরে ওই হ'ল। সোয়েটার না হয় আমি পরব, কিন্তু সেজন্যে প্রশংসাটা হবে কার? লোকে বলবে, বাঃ, ভারি চমৎকার সোয়েটারটা? কার করা মশাই? আর আমি সগর্বে বলব, আমার স্ত্রীর। সুতরাং আমার সোয়েটার বুনছিলে তাতে কি এসে-যায়?'

—'শুনলেন নিশাকরবাবু, শুনলেন? আমার নামে বলতে পেলে উনি—'

—'আর কিছু চান না, না?' একটি অবিবাহিত মেয়ে ফোড়ন কাটল। 'সবাই একরকম। দেখুন ত সিদ্ধার্থকে? আপনাদের সবারই ওর কাছে শিক্ষা নেওয়া উচিত, কি ক'রে ওব্লাইজিং হাজ্ব্যাণ্ড হ'তে হয়। কখনও প্রশংসা ছাড়া অন্য কথা নেই মুখে।'

—'হবে গো সুন্দরী, তোমারও হবে। বিমলেন্দু যা দেখাচ্ছে এখনই, বিয়ের পর তোমার পা রাখার জন্যে বুক পেতে দেবে। আমার বাবা ঢাকঢাক গুড়গুড় নেই। ব'লে দেব নাকি পরশু দিন সন্ধ্যার সময় যা দেখে ফেলেছিলাম?'

—'এই, কি হচ্ছে? আপনি ভারি অসভ্য কিন্তু। ভাল হবে না বলছি।'

—'কি হয়েছিল, হয়েছিল কি? আমরা একটু শুনতে পাই না?' কয়েকটি মুখ এগিয়ে এল।

—'এই, এই, ভাল হবে না বলছি,—খুব খারাপ হবে—আপনার সঙ্গে আর কখনও—প্লিজ, অনুপম—'

—'আরে রাখ তোমার প্লিজ। পরশু দিন, বুঝলি ভাস্কর, আমি ত রাত্রিবেলা রেডিও স্টেশন থেকে ফিরছি, জানিসই ত ইডেন গার্ডেন রাত্রিবেলা কি রকম নির্জন? হঠাৎ দেখি কি—'

সুপ্রভা একটু দূরে দাঁড়িয়ে সমস্ত পার্টিটা দেখছিল। যারা এসেছে তারা তার ও সিদ্ধার্থের বন্ধু, বন্ধুদের বন্ধু। তার সমস্ত মুখে একটি তৃপ্তি ছড়িয়ে আছে, জলের ভিতরে আলো পড়ার মত। আজ চার বছর বিয়ে হয়েছে তাদের, আর প্রতিবছর এইরকম একটা পার্টির আয়োজন করেছে তারা। এই পার্টি তার জীবনের সুখের প্রতীক। সুখকর পরিশ্রমে এই শীতেও তার কপাল একটু একটু ঘেমেছে। সে বিষয়ে সচেতন হয়ে সে শাড়ির আঁচল দিয়ে কপালটা মুছে নিল। এক সময় সিদ্ধার্থ তার কাছে দাঁড়াল এসে। নিচু গলায় বলল, 'সুন্দর জমেছে পার্টিটা, তাই না?'

তার দিকে একবার পূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকাল সুপ্রভা, কিছু বলল না। নরম ক'রে হেসে চোখ নামিয়ে নিল। সিদ্ধার্থ জানে, এটাই তার আনন্দ প্রকাশ করবার রীতি। নিচু গলায় বলল, 'তুমি খুশী হয়েছ, সুপ্রভা?'

আবার চোখ তুলে তাকাল সুপ্রভা। বলল, 'খুব ভাল লাগছে।'

—'সত্যি, না? আর খাবারগুলোও ভাল উৎরেছে আজ। তোমার আস্গর রাঁধে ভাল।'

তির্যকভাবে তাকিয়ে সুপ্রভা ভ্রূভঙ্গি ক'রে বলল,'আমার আস্গর বুঝি?'

—'তোমার—সবই তোমার। তোমার জন্যে।' ফিস্‌-ফিস্‌ ক'রে, প্রায় স্বগতোক্তির মত ক'রে বলল সিদ্ধার্থ। তারপর ওর কানের কাছে মুখ নামিয়ে বলল, 'শুধু তুমি খুশী থেক। আমি আর কিছু চাই না।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল সুপ্রভা। যেন সমস্ত শরীর দিয়ে গ্রহণ করল, আলো, আকাশ, ভালবাসা। তারপর বলল, 'যাও ওদিকে, দেখ গিয়ে কার কি লাগবে—"

পার্টি ভাঙল প্রায় রাত্রি এগারোটায়। কেউ কেউ আগেই চ'লে গিয়েছিল, কিন্তু প্রায় সমস্ত দলটাই ছিল শেষ অবধি। সিদ্ধার্থ আপিস থেকে দুটো বড় গাড়ি আনিয়ে রেখেছিল, তাছাড়া তিন-চার জন মোটর নিয়ে এসেছে। ফলে বাস বন্ধ হয়ে গেলেও কোন অসুবিধে হবে না। কলরব করতে করতে সবাই বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

'মিসেস মিত্রর এই পার্টির জন্যে সারা বছর অপেক্ষা ক'রে থাকি। বছরে দুটো ক'রে পার্টি করুন না, মিসেস মিত্র?'

—'তা হ'লে আদরযত্নও কিন্তু দুভাগ হয়ে যাবে।' প্রসাদ মন্তব্য করল।

—'আরে, মিসেস মিত্রর আদরযত্ন দু'ভাগ কেন দশভাগ হলেও যা থাকে তাতে আমার মত দশটা অভাগা ব্যাচেলর হেসেখেলে দশ বছর কাটিয়ে দিতে পারে। কি বল হে নিশাকর?'

—'তা আর বলতে? কিন্তু আমি ভাবছিলাম, কালকের কাগজে এই পার্টির একটা রিপোর্ট না-বার করলেই নয়। অন্ততঃ তিন কলাম ধরে—কি ক্যাপ্শন দেওয়া যায়

বল ত? জান ত, আমি আবার রিপোর্টের লাইনে ছাড়া কিছু ভাবতেই পারি না।'

সবাই হেসে উঠল। দলের মধ্যে সবচেয়ে বয়স্ক—ভাস্কর—দশ বছর হ'ল বিয়ে করেছে, চারটি সন্তানের পিতা—এগিয়ে এসে বলল, 'কিন্তু মিসেস মিত্র, এবার যেটুকু বাকি আছে সেটুকুও সেরে ফেলুন। একটি-দু'টি বেবি না থাকলে কি বাড়ীর শোভা হয়?'

দারুণ লাল হয়ে সুপ্রভা বারান্দার অপর প্রান্তে চলে গেল। কিন্তু ভাস্করের কথাটা সবাই শুনতে পেয়েছিল। একটি মেয়ে তাকে ধরে ফেলে চাপাগলায় বলল, 'এই, সত্যি বল্ না। যা হবার ইচ্ছে-টিচ্ছে কি নেই নাকি? এমনি প্রজাপতির মত ঘুরে বেড়াবি আর কদ্দিন? তিন-চার বছর ত হয়ে গেল, এখনও হনিমুন কাটল না?'

লজ্জায় বেগুনী হয়ে সুপ্রভা বলল, 'কি যে ফাজলামি করিস্ সতী, ভাস্করদা না হয় সাত পেগ জিন টেনেছে, তুই ত আর খাস নি?'

—'না না, বল্ না। ব্যাপারটা কি?'

—'কিছু না। এখন ওঠ্ ত গাড়িতে।'

কলরব করতে করতে সমস্ত দলটি নানা গাড়িতে ভাগ হয়ে উঠে পড়ল। স্টার্ট দিতে দিতে মুখ ফিরিয়ে হিমাংশু বলল, 'চলি মিসেস মিত্র। এই দিনটি আমাদের জীবনে বার বার ফিরে আসুক। একে একে স্টার্ট দিল গাড়িগুলো, সরু পথ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে বড় রাস্তায় পড়ে ডাইনে-বাঁয়ে বাঁক নিয়ে মিলিয়ে গেল।

এতক্ষণে স্পষ্ট হ'ল, রাত গভীর হয়েছে। আশেপাশে কোন বাড়ীর জানালায় আলো দেখা যাচ্ছে না, বড় রাস্তা থেকে শব্দ আসছে না গাড়ি চলাচলের। এতক্ষণ সন্ধ্যে আটটার আবহাওয়া ছিল বাড়ীতে, অতিথিরা চলে যেতেই যেন রাত দুটো ঘনিয়ে এল। একটুক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল দু'জনে। তারপর হাত বাড়িয়ে বাতি নিভিয়ে দিয়ে সিদ্ধার্থ কাছে টেনে নিল সুপ্রভাকে। ওর চুলে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, 'ভালই হ'ল শেষ পর্যন্ত, না মণি? কেমন লাগছে তোমার?'

একটু চুপ ক'রে রইল সুপ্রভা, নিঃশ্বাসের সঙ্গে সিদ্ধার্থকে টেনে নিল যেন। তারপর বলল, 'বড্ড টায়ার্ড লাগছে—'

—'টায়ার্ড লাগছে? তা ত লাগবেই। আজ সমস্ত দিনে তোমার ওপর দিয়ে কম যায় নি ত?'

আবার একটু নিস্তব্ধতা। তারপর সিদ্ধার্থ জিগ্যেস করল, 'মাথা ধরেছে?'

—'হ্যাঁ—'

—'গাড়িটা বার করব? খোলা হাওয়ায় ঘুরে আসবে একটু? তা হ'লে ভাল লাগবে হয়ত।'

—'তাই চল। ঘুরেই আসি একটু।'

—'তুমি তা হ'লে বাতিগুলো নিভিয়ে এস, গাড়িটা বার করি আমি।'

পাঁচ মিনিট পরে সুপ্রভা যখন ফিরে এল, সিদ্ধার্থ দেখল শাড়িটাও বদলে এসেছে সে। একটা তাঁতের শাড়ি বাড়ীতে পরবার ধরনে ঘুরিয়ে পরে এসেছে।

—'ঠাণ্ডা লাগবে না ত? গরম কিছু নিলে পারতে একটা—'

—'থাক্, লাগবে না; চল।'

সিদ্ধার্থ আর কিছু বলল না। তার নিজের তখন বেড়াতে ইচ্ছে করছিল; একটা সিগারেট ধরিয়ে সুইচ ঘোরাল সে, বড় রাস্তায় বেরিয়ে এসে ডায়মণ্ডহারবার রোডে পড়ল। শুক্লপক্ষের একাদশী কি দ্বাদশী হবে, জ্যোৎস্নায় ভরে আছে মাঠ, জল, ধান কেটে-নেওয়া ক্ষেত। আস্তে আস্তে স্পীড বাড়াল সে।

জানলার কাচ নামিয়ে দিয়ে তার উপর মাথা রেখে ব'সে আছে সুপ্রভা, শীত করছে কিন্তু কাচটা তুলে দিতে ইচ্ছে করছে না। আধবোজা চোখে পথের দিকে তাকিয়ে আছে সে। দু'পাশে সরে সরে যাচ্ছে মাঠ, জলা, ছোট ছোট ঘুমন্ত গ্রাম, মাঝরাতের জ্যোৎস্নায় সমস্ত কিছু গলে গিয়ে একাকার হয়ে গেছে যেন। মাথা ধরা কমে আসছে ধীরে ধীরে, শীতরাত্রির হাওয়ায় ঘুম আসছে। সুখ—সুখ—ঘুম আসছে।

পথের ধারে একটা মস্ত অশথগাছ কেটে ফেলছে ওরা। টুকরো টুকরো ডালপালা ছড়িয়ে আছে অনেকটা জায়গা জুড়ে, অনেকটা বাতাস কাঁচা কাঠের গন্ধে মন্থর। পলকে জায়গাটা পার হয়ে গেল গাড়ি, আর যেন জন্মান্তরের ওপার থেকে কাঁচা কাঠের গন্ধ নাকে এল সুপ্রভার, তার আধঘুমন্ত শিথিল চেতনার উপর ছড়িয়ে পড়ল। আবছাভাবে মনে

পড়ল, অনেক, অনেক বছর আগে, সিদ্ধার্থ তার কেউ ছিল না যখন, সেই সময় এমনি কুয়াশাময় শীতের রাত্রে, এমনি কাঁচা কাঠের গন্ধে-ভরা একটা রাস্তা দিয়ে সে হেঁটে যেত। কতটুকুন তখন সে। তার পাশে পাশে পা ফেলে ঝুঁকে ঝুঁকে হাঁটত যে, তার নাম ভুলে গেছে—তার উশকোখুশকো চুল কপালের উপর পড়ত এসে—সেই রাত্রি, সেই কুয়াশা, সেই কাঁচা কাঠের মদির গন্ধ—সে বলেছিল, সে সুপ্রভার জন্যে অপেক্ষা করবে—সে আজ বেঁচে আছে কি না, তাও জানে না। হঠাৎ দু'হাতে মুখ ঢাকল সুপ্রভা, হাতের উপর গাল রেখে বলল, 'মাগো!' তারপর অস্ফুট গলায় ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

হেডলাইটের তীব্র আলোর উপর সিদ্ধার্থের চোখ নিবদ্ধ হয়ে আছে, সে সুপ্রভার কান্না শুনতে পেল না।

আপনি "কল্লোল". "কালীকলম", "কবিতা", "প্রগতি", "শনিবারের চিঠি" প্রভৃতি কাগজের উল্লেখ করেছেন। বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে এরা যা করেছে, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বঙ্গদর্শন, ভারতী, আর্য্যদর্শন, সাধনা, সাহিত্য ও প্রবাসীর তুলনায় তা বেশী কিছু নয়—সামান্য। অথচ আপনি "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"র নাম পর্য্যন্ত করেন নাই, "সাহিত্যে"র নাম করেননি, "সাধনা"র ও "আর্য্যদর্শনে"র নাম করেননি, বঙ্গদর্শন, ভারতী ও প্রবাসীর casual উল্লেখ মাত্র করেছেন। আমাদের মাসিকগুলি অবশ্য এক-একটি সূর্য্য নয়। কিন্তু আমার বক্তব্যটা বিশদ করবার জন্যে বলছি, সূর্য্যালোকের সাতটা রংকে বিশ্লিষ্ট ও আলাদা ক'রে দেখালে তাতে অনেকেই আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হয়, কিন্তু সকল রঙের সমাবেশ যে সূর্য্যালোক তার সেরূপ প্রশংসা করে না। তেমনি যেসব মাসিক একপেশে, যে-সব মাসিক সাহিত্যিক দলবিশেষের, সেগুলি উল্লেখযোগ্য মনে হ'তে পারে; কিন্তু যেগুলিতে সব বিষয়ের লেখা, নানা শ্রেণীর ও দলের লেখকদের লেখা বেরয়, সেগুলি তেমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মনে না হতে পারে।

আতসবাজার নানা রঙ চমকপ্রদ, সূর্য্যালোক ও জ্যোৎস্না তেমন চমকপ্রদ নয়।

—১৫.১০.১৯৪১ তারিখে শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়কে লেখা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পত্রাংশ।

লক্ষ্মী



– মানসী দাশগুপ্ত

শহরতলীর কাঁচা গলির মোড়ে বেঁকে মোটর সাইকেলের গতি কমিয়ে এনে বাড়ীর সামনে এসে থামল বীরেশ্বর অন্য দিনের মতই। শহরের সারাদিনের কাজ আর শহরতলীতে দিনান্তের বিশ্রামের মাঝখানের যোগরেখা এই মোটর সাইকেলখানাকে অতি যত্নে খোলা দরজার চৌকাঠ ডিঙিয়ে উঠোনের ভিতরে এনে নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড় করিয়েও দিলে অন্য অন্য দিনের মত। কিন্তু অন্যান্য দিনের মত মাঝের ঘরে কি দোতলার ঘরে আলো চোখে পড়ল না একটাও। শুধু বারান্দায় টেমির আলোয় কানাই মশলা পিষতে পিষতে তার দিকে তাকাল।

হতচ্ছাড়ী লক্ষ্মীটা বুঝি আবার ঝগড়া বাধিয়েছে মায়ের সঙ্গে। এই ক'দিন কি যে ভূত চেপেছে ওর ঘাড়ে! বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দিন দিন যেন তেজ বাড়ছে ওর। বুদ্ধি বাড়ার নামটি নেই। নিত্যি একটা না একটা ঝক্কি, আর সারাদিনের পরে তেতেপুড়ে এসে তা সামাল দিতে হবে বীরেশ্বরকেই। এত বড় মেয়ে, তবু সেই ঠোঁট ফুলিয়ে কাঁদবে, মামা এসে সাধবে, তবে খাওয়া দাওয়া, শান্তি। তাই বলে সাঁঝনা আলোটা পর্যন্ত জ্বালবে না? কাণ্ডটা দেখ! ওপরে উঠে যেতে গিয়ে কানাইকে চেয়ে থাকতে দেখে বীরেশ্বর থামল। বলল, "এরা সব গেল কোথায় রে কানাই?"

কানাই ফের মশলা পিষতে পিষতে বললে, "চলে গেছেন, আজ্ঞে!"

বীরেশ্বর সিঁড়ির মুখ ছেড়ে এসে কানাইয়ের সামনে দাঁড়িয়ে কথাটা বুঝতে চেষ্টা পেল। চলে গেছে। বেরিয়ে গেছে এমন নয়। বাইরে গেছে—তাও নয়। চলে গেছে!

"চলে গেছে কি রে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু, তাই ত গেল। বাক্স পেটরা নিয়ে বেঁধে-ছেঁদে। আপনিও ভট্ ভট্ করে গেলেন, ওনারাও ওমনি"—হাত দিয়ে কানাই বাকি বক্তব্য প্রকাশ করে শিলনোড়া ধুতে লাগল। বীরেশ্বর অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে গেল ওপরে। কানাই পিছনে ডাক দিয়ে বলল, "লণ্ঠন জ্বেলে দিচ্ছি বাবু।"

বীরেশ্বর বলল, "এখন লাগবে না, তুই ব্যস্ত হ'সনে।"

"স্নানের জল?" কানাই কর্তামি করবার চালাও সুযোগ পেয়েছে, ছাড়তে কি চায়?

বীরেশ্বর বলল, "পরে। পরে। হাঁকাহাঁকি করিস নে কানাই, নিজের কাজ কর্।"

এর উত্তরে কানাই বিড়বিড় করে কি বলল, বোঝা গেল না। বীরেশ্বর ওপরে এসে খোলা ছাদে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গায়ের জামাটা খুলে হাতে রাখলে। বর্ষা কেটে অসহ্য গুমোট দেখা দিয়েছে। অন্ধকার রাত্রি। রাস্তার মোড়ের গ্যাসের আলোটা এসে বেঁকে এখানে পড়ে কি না পড়ে! আকাশে তারা মিট্‌মিট্ করে। কালও এখানে মাদুরে বীরেশ্বরের পাশে চিত হয়ে শুয়ে শুয়ে তারা গুনেছে লক্ষ্মী। তাও কি সোজা ঝামেলার পরে? প্রথমে ত



আজ্ঞে হ্যাঁ, বাবু। তাই ত গেল

বাড়ী আসতেই মেয়ের এই কান্না ত সেই কান্নাঃ "মামা, মা আমাকে মেরেছে!"

সাত্তনাকে তাও কিছু বলতে যায় নি বীরেশ্বর। বলে লাভ নেই জানত। মাঝখান থেকে কিছু উল্টো দোষ দেবে তাকেই। মামার আদরেই ত লক্ষ্মী নষ্ট হচ্ছে। বীরেশ্বরই সান্ত্বনার ছেলেমেয়েদের সব মাথা খাচ্ছে। সান্ত্বনার নিজের মাথাটা খেয়েছে কে, বীরেশ্বর মাঝে মাঝেই ভাবে। তাদের ভাইবোনের ত আর মামা ছিল না! মাথার ঠিক থাকলে এগার-বার বছরের মেয়ের গায়ে হাত তোলে কেউ? লক্ষ্মীই বা কেন মাকে জ্বালাতে যায়, সে লক্ষ্মীই জানে।

"রাগালি কেন মাকে?"

লক্ষ্মী ত এই প্রশ্নের অপেক্ষাতেই ছিল। কান্না ভুলে তৎক্ষণাৎ বলতে আরম্ভ করল, "আমি রাগাব মাকে? আমার বড়ো দায় পড়েছে। আমি কি বলেছি, জিগ্যেস কর তুমি মাকে? কাল কনকদি এসেছিল, বলি নি তোমায়? বলেছিলাম না? আজও আবার তুমি যেতে না যেতেই এসে উপস্থিত। বলে, 'চলে গেল বেরিয়ে বীরু-দা? আহা, দেখাই হ'ল না।' আজই কিনা দুপুরের খাওয়া সেরেই চলে যাবেন উনি, তাই সারা সকাল সব্বাইকে বসে থাকতে হবে ওনার অপেক্ষায়, বুঝলে মামা? আমার এত রাগ হয়েছিল। মা আবার ওর হয়ে কত কথা বলতে লাগল। চলে গেল দেখে বলে, 'আহা, বীরুটা ত শুনেওছিল ও এসেছে, নিজেই না হয় একবার যেত দেখা করতে, এই ত এ বাড়ী ও বাড়ী।' আমি তাইতে, বুঝলে মামা, বলেছি, 'বেশ করেছে মামা বেরিয়ে গেছে। যাবে ছাড়া কি! লজ্জা করে না কনকদির অন্য জায়গায় বিয়ে টিয়ে করে আবার গয়না বাজিয়ে ঝমঝম করে মামাকে দেখাতে আসতে?' এতে না, মা রেগে কত কথা বলতে লাগল জান? বলল, 'করবেই ত বিয়ে অন্য জায়গায়! যা-না তোমার মামার ছিরি আর যে-বুদ্ধির বেরস্পতি। ওরই খেয়ে-পরে ওরই মুখে জুতো দিয়ে কত মেয়ে যায় দেখ না।' এত কথা সহ্য হয় মামা? আমি সোজা বলে দিলাম মা-কে যে, 'তুমিই ত মামার শনি। ঘাড়ের ওপর ছেলে-মেয়ে গোষ্ঠী নিয়ে বসে আছ, সেই ভয়েই ত মেয়েরা এগোতে চায় না। যাও না বড়মামার কাছে? সে কিনা তাড়িয়ে

দেবে!' এই শুনেই না, মা আমায় মেরেছে, চড় মেরেছে। ঠাস্-ঠাস্ করে ঠিক এইখানে—", লক্ষ্মী আবার কাঁদতে লাগল অঝোরঝোরে।

সমস্ত বর্ণনাটা শুনতে শুনতে বীরেশ্বরের বুকের ভিতরটা যদিও জ্বালা করছিল, লক্ষ্মীকে তাই বলে এ ব্যাপারে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। বীরেশ্বর বলল, "চুপ কর লক্ষ্মী, হাউ হাউ করে কাঁদিস এত বড় মেয়ে, লজ্জা করে না? অত কথা তুই মা-কে বলতে যাসই বা কেন? যত পাকা পাকা কথায় তোমার থাকাই চাই, না?"

লক্ষ্মী কান্না থামিয়ে সতেজে বলল, "অন্যায় সইতে পারি না মামা।"

আর বাক্যব্যয় না করে বীরেশ্বর ওপরে উঠে গিয়েছিল। সমস্ত মেঝেটা জুড়ে বড় আর মেজ ভাগ্নে দুটোর দৌরাত্ম্যের চিহ্ন ছড়ানো। লক্ষ্মী পিছু পিছু উঠে এসেছিল। লণ্ঠনের সলতেটা সামান্য বাড়িয়ে দিয়ে ঘরটা গুছোতে গুছোতে বলল, "দিনমানভর আমি যেই দেখি নি, ছেলে দুটো কি করে রেখেছে তোমার ঘর! স্নানের জল দিতে বলেছি মামা, ভাতও গোছাতে বলি?"

খেতে ব'সে অন্যদিনের মতই লক্ষ্মী অনেক কথা বলে যাচ্ছিল। সারাদিনের দুঃখের কথা সে তখন ভুলে গেছে। ওদের গলার সাড়া পেয়ে কোলের ছেলেটাকে বুকে করে নিয়ে ঘুম ঘুম চোখে সান্ত্বনা এসে বসেছিল মেঝেয় এক কোণে। বলেছিল, "বীরু, কখন ফিরলি?" মেয়েকে বলেছিল, "লক্ষ্মী, তুই ত সজাগ আছিস্, বাপ এলে দরজাটা খুলে দিস। আমি তোদের খাওয়া দেখে শুয়ে পড়ব গিয়ে বাবা!"

বীরেশ্বর জিজ্ঞেস করেছিল, "তোর খাওয়া হয়েছে দিদি?"

সান্ত্বনা বলেছিল, "ওই বসেছিলাম মেজুটার পাতে। এত ভাত ফেলে! নষ্ট করতে ইচ্ছে করে না। বসে পড়ি!"

রোজই যা করে সান্ত্বনা, তার জন্য রোজই যেন তার কিছু না কিছু ছুতো, কিছু ব্যাখ্যা দেওয়া চাই। কানাই নিঃশব্দে পরিবেশন করে যায়। সান্ত্বনা এ ঘরে ছেলে কোলে নিয়ে না বসে থাকলেও ওদের খাওয়া-দাওয়ার কোন ত্রুটি হ'ত এমন নয়। কিন্তু ঐ রকম বসে থাকাই সান্ত্বনার রপ্ত হয়ে গেছে। খেয়ে উঠে আঁচাতে আঁচাতে লক্ষ্মী বলে, "ছাতে মাদুর বিছিয়ে দেব ত মামা?"

বীরেশ্বর বলে, "তুই আর রাত্তির জাগিস্ নে লক্ষ্মী। কাল ইস্কুল নেই তোর?

লক্ষ্মী সাড়া দেয় না এবারে। বীরেশ্বর মুখহাত মুছে ওপরে যাওয়ার আগে মাঝের ঘরে ঢোকে। ভাগ্নে দুটো ঘুমোচ্ছে। বড়কু চিরকালের অভ্যাসমত পা চালিয়ে দিয়েছে মেজুর পেটের ওপরে। মেজু মুখ হাঁ ক'রে তাও ঘুমিয়েই যাচ্ছে। এদের দুজনকে পৃথক্ ক'রে শুইয়ে মাঝখানে পাশবালিশটা রেখে দিল বীরেশ্বর। ওদের বাপ হতভাগা এসে যদি পাশবালিশটা তুলে নিয়ে সরে না পড়ে, তা হ'লে বাকি রাতটা হয়ত ওরা ভালই ঘুমোবে, কে জানে। বীরেশ্বরের কাজ কেবল চেষ্টা করে যাওয়া। খাওয়ার ঘরে সান্ত্বনা কোলে ছেলে নিয়ে বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছে। কোলের ছেলেটার হাত ঠাণ্ডা মেঝেয় গিয়ে পড়ছে। বীরেশ্বর সাবধানে ছেলেটাকে আস্তে আস্তে তুলে নিল। তাতেও সান্ত্বনার ঘুম ভাঙল না। শুধু বড় একটা নিশ্বাস ফেলে কোণের দেয়ালে মাথাটা হেলিয়ে দিল সে। বীরেশ্বর বাচ্চাটাকে এনে সন্তর্পণে বিছানায় শুইয়ে কাঁথাটা ঠিক করে দিল। না, ভেজায় নি এখনও। নিশ্চিন্ত হয়ে ওপরে উঠে যেতে লক্ষ্মী বলল, "তুমি এসে শুলেই পারতে মামা, আমি ওদের ঠিকঠাক করে শোয়াতাম।"

বীরেশ্বর টানটান হয়ে ছাতের মাদুরে শুয়ে বলল, "বাজে বকিস্ নে। মাথার পাকা চুল কতদিন তুলিস্ নি বল্ দেখি?"

লক্ষ্মী মামার বিশাল রোমশ পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, "ঈস, তোমার পাকা চুল নেই-ই মোটে!"

বীরেশ্বর হেসে উঠে বলল, "অন্ধকারে সব চুলই কাঁচা। কি বলিস্ লক্ষ্মী?" উঠে ব'সে বালিশের তলাটা হাতড়ে বিড়ি আর দেশলাই বার করে বিড়ি ধরাল বীরেশ্বর। লক্ষ্মী শুয়ে পড়ে বলল, "শুয়ে শুয়ে একটা গল্প বল না মামা।"

বীরেশ্বর বলল, "নাঃ। স্যাঁতসেঁতে ছাতটায় আর শোব না রে। এমনিতেই বাত ধরেছে। একেবারে অথর্ব হয়ে যাব শেষে। তুইও ওঠ্, ঘরে গিয়ে শোগে যা।"

লক্ষ্মী তারা গুণছিল। সাড়া দিল না।

দুই টানে বিড়িটাকে প্রায় শেষ করে এনে বীরেশ্বর আলতো ভাবে জিজ্ঞাসা করল, "তোর কনকদি বুঝি আজই ফিরে গেল শ্বশুরবাড়ী ?"

লক্ষ্মী তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, "যাক্ গে।"

বীরেশ্বর নিঃশব্দে বিড়িটা শেষ করল। তার পর আস্তে আস্তে বলল, "তুই কিন্তু তোর মা-র সঙ্গে আর ঝগড়া করবি নে, বুঝলি ?"

লক্ষ্মী বলল, "করি না ত ? তাই বলে তোমারই কাছ থেকে সব নেবে আর তোমারই নিন্দে করবে কেন ?"

নিচে লক্ষ্মীর বাপের কড়া নাড়ার শব্দে লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি নেমে গেল। ছাত থেকে উঠে বীরেশ্বরও ঘরে গিয়ে শুল। লণ্ঠনটা কমিয়ে রাখা আছে এক কোণে। নিবিয়ে দিলেই হয়। কিন্তু লণ্ঠনের এইরকম ছোট্ট আলো দেখতে বীরেশ্বরের ভাল লাগে। ওর ছোটবেলার কথা মনে পড়ে। শুধু সেই মায়াতেই বুঝি এত অসুবিধা সয়েও শহরতলীর এই নিবিদ্যুৎ অঞ্চলে মাথা গুঁজবার ঠাই করেছে বীরেশ্বর। ওর দাদা সুরেশ্বরের বাড়ীতে ঝক্‌ঝকে আলো, তক্‌তকে সব ঘর-দুয়োর। সুরেশ্বর ছিল ওদের মায়ের চক্ষের মণি, দুঃখের সংসারে আশার আলো। বীরেশ্বরকে নিয়ে মায়ের দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না, গরীব হোন, দুঃখী হোন, ভদ্রঘরের মেয়ে হয়ে এরকম কালো, বেঢপ, কুচ্ছিত সন্তানের জন্ম দিয়ে তাঁর বোধ করি সঙ্কোচ হয়ে থাকবে। উঠতে-বসতে তাঁর কথায় তাই আক্ষেপ বাজত। 'যেমন কালো মোষের মত চেহারা, তেমনি স্বভাব, কি যে হবে ছেলেটার! দশজনের মধ্যে দাঁড়াবে কি ক'রে ? সে যোগ্যতাও নেই, ইচ্ছেও নেই।'

যোগ্যতা ছিল কি না ছিল, কে জানে। কিন্তু ইচ্ছেটা সত্যিই চলে গিয়েছিল বীরেশ্বরের। কারু দলে গিয়ে কোথাও মেশবার, কি দুদণ্ড বসবার দরকার হলে বাইরে বাইরেই ঘুরেছে। একজন মুখ বেঁকালে সেখানে অন্যজন ক্ষমাঘেন্না করে ডেকে নেয়। 'আপনার চেয়ে পর ভাল।' আত্মীয়স্বজনের ধার দিয়েও ঘেঁষে নি বীরেশ্বর। অনেক ঠেকে, অনেক ঠকে দু' মুঠো যখন করে খেতে সুরু করেছে, তখনও দেখাতে যায় নি কাউকে, বলে নি, 'দেখ আমিও পারি কি না।' অথচ বড় বোনটা ঠেকায় পড়ামাত্র কই সুরেশ্বরের কাছে ত গেল না? এল সেই পাতে-ঠেলা বীরেশ্বরের কাছেই। বীরেশ্বর না থাকলে চাকরি খুইয়ে ব'সে-থাকা জুয়াড়ী ঐ স্বামী আর ছোট ছোট বাচ্চা ক'টাকে নিয়ে কোথায় ভেসে যেত দিদিটা, সে কথা মা কখনো ভেবেছিলেন নাকি ? বীরেশ্বর যে কখনো কারুর ভরসা বা আশ্রয় হতে পারে, এ বোধ হয় তিনি কোনমতেই বিশ্বাস করতেন না! তবু, না-ই বুঝুক কনক তার দাম, না-হয় আরও অনেকেই সত্যি অমন ঠেলাধাক্কা দিয়ে যাবে তাকে, এ কথা কারো অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, বীরু আছে বলেই মা-র সাধের বড়ো মেয়ের স্বামী-পুত্র সংসার টিঁকে আছে। এই ছোট লণ্ঠনের আলোয় সে কথা বলে যেন মনে মনে প্রায় মাকে ডেকে কথাটা শুনিয়ে দেবার মত আরাম পায় বীরেশ্বর।

আজ সকালে উঠতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল বীরেশ্বরের। তাড়াতাড়ি যখন দাড়ি কামানোটা সেরে নিতে ব্যস্ত, সান্ত্বনা এসে দাঁড়াল কাছে। বলল, "ও বীরু, কনক এসে ঘুরে গেল দু'দিন। রাত করে আসিস্, কি ঘুম যে পায় তখন, কথা সব ভুলেও যাই।"

বীরেশ্বর উত্তরে বলল, "ঘুম তোমার কখন পায় না ?"

সান্ত্বনা বলল, "তুমি ত তা বলবেই। কোলে, কাঁখে, কাঁধে সামলে ঘরসংসার ত কর নি, করলে দেখতে ঘুম পায় কি না। সারাদিন এই বকল সয়ে সয়ে কি হাড়ীর হাল হয়েছে দিদির, চোখ মেলে তা দেখ ?"

বীরেশ্বর ব্লেড থেকে সাবানের ফেনাসমেত ময়লা পরিষ্কার করতে করতে বলল, "ব্যাজর ব্যাজর ক'রো না দিদি। ছেলেপুলে সামলাও ত সবই নিজের। পথ থেকে ত আর ডেকে এনে ঘাড়ে বোঝা চাপিয়ে দেয় নি তোমার ? আর তাও যদি ঝঞ্ঝাট সবই আমাকে না পোয়াতে হয়!"

সান্ত্বনা কেটে কেটে বলল, "ও! আমি নিজের ঝক্কি নিজে ডেকে এনেছি, আর, তোমার ঘাড়ে এসে পরের ঝক্কি চেপেছে বলে তোমার ঘাড়-গতর কন্‌কন্ করছে ? তা এতই যখন আপদ্‌ বালাই বোঝা, যার বোঝা তাকে বুঝিয়ে দাও।"

এ রকম ঝগড়া ওদের ভাইবোনে নতুন নয়। বীরেশ্বর নির্বিকার ভাবে গালে আর এক পোচ সাবান দিতে দিতে বলল, "তাই ত দিচ্ছি।"

সান্ত্বনা বলল, "তাই দিচ্ছ ? সাহস থাকলে ত দেবে ? ডাক না তোমার ঐ বড় ভগ্নীপতিকে, সোজা কথা তাকে ব'ল। আমার ঠাসা কেন ?"

বীরেশ্বর বলল, "বেছে বেছে যেমনটি সংগ্রহ করেছ! মানুষ হলে ত তাকে ডেকে কথাই বলা যেত!"

সান্ত্বনা একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। ভাইয়ের বাড়ীতে এসে ওঠার পরে যত কথা কথান্তর ওদের হয়ে থাক্, এত বড় কথাটা মুখের ওপরে বীরু কখনও বলেছে বলে মনে করতে পারল না সান্ত্বনা! বাকস্ফূর্তি হওয়া মাত্র বলে উঠল, "আমার ত তবু জন্তু হোক, জানোয়ার হোক, কিছু একটা জুটেছে। তোমার ঐ ময়ূর-চড়া কার্তিকপনা ঘুচোতে কোনও পেত্নীও এ মুখো হ'ল না জীবনে, তাই বুঝি কথা কয়ে ঝাল মিটিয়ে নিচ্ছ?"

এ কথাটা মর্মান্তিক রকম সত্যি বলেই হোক, কিংবা, বড় রকম একটা কটু কথা বড় বোনকে সোজাসুজি বলে ফেলার সঙ্কোচেই হোক, বীরেশ্বর এর পরে আর প্রত্যুত্তর করল না। সান্ত্বনাও দাঁড়াল না সে অপেক্ষায়। তাকে চলে যেতে দেখে তখন বীরুর মনে পড়ল, কাল অফিস ফেরতা দিদির জন্যে আড়াই গজ মার্কিন আর গজ পাঁচেক লংক্লথ এনেছিল দিদিরই ফরমাসে। দিতে ভুলে গিয়েছিল। এখন এই বিসদৃশ বাদবিসংবাদের পরে আবার ও সব দিতে যাওয়া ঠিক হবে কি না ভাবতে ভাবতে সে ভাগ্নেকে ডাক দিয়ে বলল, "বড়কু, আমার পকেটে, ঐ কালকের ছাড়া পাঞ্জাবির পকেটটা দেখবি,—তোর ইরেজারটা আছে। রঙের বাক্সটা মেজুকে দিয়ে দিবি, ওটা তোর না কিন্তু।"

অফিসে বেরিয়ে আসার আগে সেমিজ-টেমিজের জন্য ঐ থানগুলো লক্ষ্মীর কাছে জিম্মা দিয়ে যাবে ভেবেছিল বীরেশ্বর, কিন্তু ঠিক সেই সময়ে লক্ষ্মীটার সাড়া পেল না, তাই ওগুলো নিজের ঘরে রেখেই চলে গিয়েছিল। ছাদ থেকে অন্যমনস্ক ভাবে ঘরে এসে ও অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে দেখল, সে প্যাকেট দুটো তেমনি আছে। হাঁক দিল, "কানাই, আলো দিয়ে যা।"

কানাই সম্ভবতঃ এই ডাকেরই অপেক্ষায় ছিল। শোনামাত্রই হারিকেন হাতে উপস্থিত হ'ল। বীরেশ্বর বলল, "খাবার এখানেই দিয়ে যা আমার। চান আজ আর করব না।"

কানাই বহুদিনের পুরণো লোক। সান্ত্বনারা যখন আসে নি, তখনও সেই ভাড়াটে বাড়ীর ঝুলি-মলিন ইলেকট্রিক আলোয় বসে ছোটবেলা থেকে কানাই বীরেশ্বরের জন্যে রান্না করে আসছে। সান্ত্বনা এসে রান্নাঘরের কাজে কোনও রদবদল করেছিল এমনও নয়। খাবার-দাবার কানাই যথাযথ এনে হাজির করল, বরং দুচার পদ বেশিই এনে দিলে। কিন্তু খেতে বসে খাওয়ায় আজ ওর মন লাগল না কিছুতেই। এমনি করে কোথায় ভেসে গেল ছেলেমেয়ে-গুলোকে নিয়ে কে জানে? হয়ত লক্ষ্মীটা সারাদিন মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে না খেয়েই ঘুমিয়ে থাকবে। ছেলে দুটোর কোনটা কোথায় ঘুরছে হিসেব নেই। ওদের গাঁজাখোর বাপটার কি আক্কেল-বুদ্ধি ব'লে পদার্থ আছে, না কোনও দায়িত্বজ্ঞান আছে? মেজাজ দেখিয়ে গেলেই হ'ল?

কোনমতে খাওয়া সেরে ফের ছাড়া জামাটা গায়ে তুলল বীরেশ্বর। চটিটা পায়ে গলিয়ে নীচে নামতে নামতে শুধোল, "হ্যাঁরে কানাই, কোথা গেল দিদিমণি, ঠিকানা দিয়ে গেছে?"

কানাই সবেগে মাথা নেড়ে বললে, "না বাবু।"

"লক্ষ্মীও কিছু বলল না?"

"তানারে ত হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল। ও ত যাবে না, এই কান্না!"

বীরেশ্বর বলল, "হুঁ। যাকগে, যে চুলোয় ইচ্ছে যাক্।" বলে রাগ করে ফিরে ওপরেই উঠে এল ও।

হঠাৎ কথা নেই, বার্তা নেই, সান্ত্বনা এ রকম হুট বলতে গিয়ে গোটা সংসার নিয়ে কোথায় উঠতে পারে, বীরেশ্বর ভেবে বার করতে চেষ্টা করল। নেই, কেউ অন্ততঃ বীরেশ্বরের জানা নেই। এ অবস্থায় পথে পথে ঘুরে কাউকে খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। চেষ্টা করাই মিথ্যে। এত বড় কলকাতা শহর আর শহরতলীর পথে ইচ্ছে করলে হারিয়ে যাওয়া একটুও শক্ত নয়। কিন্তু সান্ত্বনা ঐ রকম ইচ্ছে করবে, এ ভাবাই যায় না। তা ছাড়া সত্যি ত আর পাগল হয়ে যায় নি ওরা স্বামী-স্ত্রীতে যে, ছেলেমেয়ের হাত ধ'রে মোটঘাট নিয়ে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াবে? বীরেশ্বর ফের হাঁক দিল, "কানাই, হ্যাঁরে, জামাইবাবু ওদের যেতে দেখেছে?'

কানাই সাড়া দিয়ে বলল, "তিনিই ত গাড়ি ডেকে আনল মোট তুলতে। আমায় কত কি বলল।"

বীরেশ্বর কথা বাড়াল না। কানাইটা হয়ত মজা পাচ্ছে মনে মনে। কে জানে। আর, সত্যি, গেছে ওরা

গোটা সংসার একত্রে, এতে কি এসে-যায় বীরেশ্বরের। ঘরটা আজ ঝরঝরে নিরিবিলি। ছেলেপিলের ছুটোপাটিতে ছত্রখান হয়ে নেই। কানাই বুদ্ধি করে বেলা থাকতেই বিছানা বিছিয়ে রেখে গেছে। শুয়ে পড়লেই নির্বিঘ্ন নিদ্রায় কোনও বাধা নেই, সারা মেঝেয় এ পাশ থেকে ও পাশে গড়িয়ে ঘুমোক না বীরেশ্বর? সমস্ত বাড়ী নিস্তব্ধ। কচি ছেলের কান্নায় ব্যস্ত হতে হবে না কাউকে। নির্বিরোধী মানুষ বীরেশ্বর। তার নিজের নেই সংসার। তার দরকারটা কি এত দুর্ভাবনার? ছিল ছেলেমেয়ে ক'টা, ছিল। গেছে, যেখানে তাদের মা-বাপ নিয়ে যেতে চায়, যাক্। সে কোঠা বাড়ীই হোক্, কি খড়োঘরই হোক্। ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ সন্দেহটা ঝিলিক্ দিল বীরেশ্বরের মনে: সুরেশ্বরের ওখানে গিয়ে ওঠে নি ত ওরা? চিন্তাটাকে দুবার নাড়াচাড়া করতেই সন্দেহ থেকে নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাল বীরেশ্বর: এতে ভুল নেই। তাই গেছে দিদি। আত্মসম্মান জ্ঞান বলে পদার্থ ত ওদের নেই? কি দিদি কি জামাইবাবু, দুটিই সমান। ছেলেমেয়েগুলোকে দু'বেলা বাঁকা কথা দিয়ে হেনস্থা করবে দাদা-বৌদি। আর, সেই মামা-মামীর পাতেই ওদের ভাত খাওয়াবে ওদের বাপ-মা। অপমানে যেন বীরেশ্বরেরই কান দুটো জ্বালা করতে লাগল। সে দুটো কথা নিজের বোনকে ভাল ভেবে বলতে গেলে বোন-ভগ্নীপতির গায়ে ফোস্কা পড়ে যায়, আর, এ কিনা সুরেশ্বর আর তার বউ, তাদের পায়ে পায়ে ফিরতেও ওদের লজ্জা নেই। ঘর ছেড়ে ছাদে আবার এসে দাঁড়াল বীরেশ্বর। রাত এমন অসম্ভব কিছু বেশি হয় নি। ইচ্ছে করলে এখন যে সুরেশ্বরের বাড়ী যাওয়া যায় না, তা নয়। অনেকটা দূর, তাতে কি! তার ত মোটর সাইকেলই রয়েছে। কিন্তু লাভ কি গিয়ে? গিয়েছে যখন, তার পরামর্শ নিয়ে ত যায় নি যে, সে বলামাত্র ফিরে আসবে! মাঝখান থেকে সুরেশ্বর কিছু বোলচাল দেবে। কোনও দরকার নেই বীরেশ্বরের। অনেক হয়েছে। কে জানে, হয়ত যা হ'ল, ভালই হ'ল।

খাওয়ার এতক্ষণ পরে বিড়ির কথা মনে হ'ল বীরেশ্বরের। আজ আর লক্ষ্মী ত নেই যে গুছিয়ে রেখে দেবে? কে এখন লণ্ঠন নিয়ে খোঁজে কোথায় বিড়ি, কোথায় দেশলাই। তার চেয়ে মোড়ের দোকান থেকে কিনে আনা ঢের সোজা। রাস্তায় একটু ঘুরে এলে ওর ভালই লাগবে। আরেকবার চটি পায়ে দিয়ে বীরেশ্বর নিচে নামল কানাই সমস্ত ঘরদুয়োর বন্ধ ক'রে নিজে শোয়ার উদ্যোগ করছিল। বীরেশ্বর দোর খুলে বেরুতে বেরুতে বলল, "কানাই, দরজাটায় একটু চোখ রাখ। আমি এই মোড় থেকে আসছি।"

পথে বেরিয়ে অন্যমনস্কের মত গলির মুখের দিকে হাঁটছিল ও, হঠাৎ কি একটা জিনিষকে এগিয়ে আসতে দেখে চমকে সরে দাঁড়াল, আর তখনি চলন্ত সেই জিনিষটা ছুটে এসে ওর সামনেই দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল। জিনিষ নয়, মানুষ, কাপড়ে সর্বাঙ্গ জড়িয়ে কি অদ্ভুত দেখাচ্ছিল লক্ষ্মীকে!

লক্ষ্মী হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "মামা! উঃ, ঠিক বাড়িটা খুঁজে পেইছি।"

বীরেশ্বর উত্তেজনায় বিড়ির কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে বার বার কেবল জিজ্ঞেস করতে লাগল, "লক্ষ্মী, তুই কেমন ক'রে এলি লক্ষ্মী? একা একা? এতখানি রাস্তা! ওরা কই?"

উত্তর শোনার যেন তার ইচ্ছেও নেই। লক্ষ্মীকেও কথা বলবার জন্য অবশ্য অবসর দিতে হয় না। ও নিজের মনেই ব'লে যাচ্ছে। সকাল থেকে কি কি হয়েছিল—সব। বাড়ীতে ঢুকে ওকে সোজা ছাদে নিয়ে গেল বীরেশ্বর। বলল, "গায়ের চাদরটা খুলে ফেল্ লক্ষ্মী। গলা, কপাল মোছ, সব তোর, কি ঘেমেছিস! চাদর মুড়ি দিয়ে আসছিলি কেন?"

লক্ষ্মী একগাল হেসে বলল, "লুকিয়ে আসতে হবে না, বাঃ? আর, যতই আসছি না মামা, ততই ভয় করছে, যদি হারিয়ে ফেলি রাস্তা?"

এই পঞ্চমবার সমস্ত কাহিনীটা যখন বলল লক্ষ্মী, মন দিয়ে শুনল বীরেশ্বর। না, লক্ষ্মী সুরেশ্বরের সেই দূর মুলুকের বাড়ী থেকে একা পাড়ি দেয় নি। সে বাড়ীতে ত যায়ই নি মোটে ওরা। ওরা এখান থেকে গিয়েছে এই মোটে গোটা ছয়েক রাস্তা ওদিকে যে পাড়াগাঁ মত—সেইখানে। না, রাস্তাটার নাম লক্ষ্মী ঠিক বলতে পারে না, ওটা হচ্ছে ওদের গগনজ্যাঠার বাড়ী। জ্যেঠিমা, বৌদি, আরও কারা সব থাকে। দৈবাৎ দু'একদিন মা'র সঙ্গে লক্ষ্মী বেড়াতেও গিয়েছিল ওখানে। ভাগ্যে গিয়েছিল, তাই ত রাস্তা চিনে পালিয়ে আসতে পারল। ওখানে কে থাকবে, বাবাঃ!

জ্যেঠি সারাদিনই গোবরগঙ্গাজল ছিটোচ্ছেন, আর বৌদির মুখ অন্ধকার। আর সবাই ত স্পষ্টই জিজ্ঞেস করছে, কতদিন থাকবে ওরা ওখানে !

"বাবা যেতে চায়ও নি, জান মামা ? এই সন্ধ্যেবেলাই ত দেখলাম, বাবাতে মা'তে কি সব বকাবকি ! যা ইচ্ছে করুক গে বাবা, আমি ত চলে এসেছি !"

"খেয়ে এসেছিস, লক্ষ্মী ?"

"কি সব রেঁধেছিল ! খেয়েছি যা পেরেছি। তোমার নিশ্চয় খাওয়া হয় নি মামা ? খুব ভাবছিলে আমরা কোথায় গেছি ?"

"এখন যে তুই চলে এলি, তোর মা-বাবা ভাববে ত ?"

"হুঁ ! বাবা-মা ভাববে না আরও কিছু। বাবা ত খেয়ে উঠে ঝগড়াঝাঁটি ক'রে বেরিয়ে গেছে, আর মা সেই তেমনি ঝিমুচ্ছে ?"

"আর বড়কু মেজু ?"

"ঘুমিয়েই ত পড়েছিল। যদি না আবার অন্যদের চেঁচামেচিতে জেগে গিয়ে থাকে। কি গোলমালের বাড়ী না মামা ? সকলে যে যার শুয়ে পড়েছে, শুয়ে শুয়েই তবু চেঁচাচ্ছে। কথা বলছে ! আচ্ছা, না-ই যদি ঘুমোবে, তবে আলো নিবিয়ে শোয়া কেন ? বৌদি বলে, 'শুধু শুধু আলো জ্বলবে ?' এই সব কাণ্ড ! আমি কিন্তু মামা, এখানেই থাকব।"

বীরেশ্বর বলল, "শুধু তুই কেন, ওরা সবাই থাকবে। বড়কু, মেজু সবাই ওখানে কষ্ট পাক, তাই বুঝি তুই চাস ?"

লক্ষ্মী বলল, "বেশ ত, তবে ওদের দু'জনকে নিয়ে আসি। মা ত ভারী দেখে ওদের, আমরাই ওদের দেখা-শুনো করতে পারব। সে বেশ হবে, কেমন মামা ?"

লক্ষ্মীর উৎসাহে সায় না দিয়ে বীরেশ্বর বলল, "দূর পাগলী। বড়কু, মেজু থাকবে এখানে, ছোটু আর তোদের বাবা-মা ওখানে, এ কি হয় ? কাল সকাল হোক। সবাইকে নিয়ে আসব গিয়ে।"

লক্ষ্মী বিমর্ষ হয়ে বলল, "সবাইকে আনবে কেন মামা ? অমন ক'রে চলে গেল, তোমায় ব'লে পর্যন্ত গেল না ! তোমার কি দরকার তাদের সেধে আনার !"

বীরেশ্বর রাগ ক'রে বলল, "তোর পাকামি বন্ধ কর দিকি লক্ষ্মী ? যত বুড়ো বুড়ো কথা তোর মুখে। কাল থেকে নিয়মমত ইস্কুল যাবি, বুঝলি ? বাড়ী বসে বসে পাকামি শেখা আমি বার করছি তোর !"

লক্ষ্মী সায় দিয়ে বলল, "যাব।"

বীরেশ্বর বলল, "আর এখন রাগ ক'রে গোঁজ হয়ে না থেকে আমাকে আমার বিড়ি আর দেশলাই দিয়ে ঘুমোগে যা। কানাইকে বল্ নিচে থেকে তোর বিছানা এনে ওপরের এ ঘরেই পেতে দিক।—তবু রাগ ক'রে থাকে ?"

লক্ষ্মী বলল, "রাগ করি নি মামা।"

"করি নি মামা ত মুখ গুঁজে কি ভাবছ কি !"

লক্ষ্মী মুখ তুলে বলল, "বললেই তুমি রাগ করবে ! কিন্তু সবাই বলে মামা। বলে, আমাদের সকলকে পুষতে হয় বলে তুমি বিয়ে করতে পার না, কিছু করতে পার না। সত্যি ? বলে এই সব লোকে।"

বীরেশ্বর হাসল। বলল, "দূর পাগলী ! তুই একেবারে বোকা। তোরা আছিস বলে আমার বিয়ে হচ্ছে না, লোকে বলল, তুইও বিশ্বাস করলি ? তোরা যতদিন ছিলি না, ততদিন হয় নি কেন ? তখন বরং বয়েস ছিল।"

লক্ষ্মী একটুক্ষণ ভাবল। ভেবে শেষে বলল, "বিয়ে না হোক গে। নিজের মনে থাকতে পার। অত হাঙ্গামায় যেতে হয় না। ঝগড়াঝাঁটি। তাই ত লোকে বলে, তোমার কি দরকার এত বোঝা বওয়ার ?"

বীরেশ্বর ভাগ্নীর চুলে হাত বুলিয়ে বলল, "যা ইচ্ছে বলুক গে লোকে। লোকের কথায় কান দিসনে লক্ষ্মী। লোকেরা যা মুখে আসে তাই বলে, ওরা কিছু বোঝে না। এত বড় একটা কাঁধ তোর মামার। বোঝা একটা জুতমত বইতে না পারলে কি ভাল লাগবে লক্ষ্মী ? এমনিই ত কাঁধের জোর যাচ্ছে !"

লক্ষ্মী কি বুঝল কে জানে। মামার কাঁধের ওপর নিজের চিবুক রেখে বসে রইল খানিকক্ষণ। তার পর কি ভেবে হি হি করে হেসে বলল, "তোমায় আর যেতে হবে না ভাবতে, দেখো এখন, ওরা নিজেরাই এসে উপস্থিত হবে একে একে। জিনিষপত্তর সব গাড়ি ভাড়া দিয়ে নিয়ে গেছে বলে যদি দুটো দিন দেরি হয়। বিছানাগুলো কেন সব নেওয়া হয় নি জান মামা ? বাবা একটার বেশি বিছানা বাঁধতে রাজিই হ'ল না। হাঁপিয়ে অস্থির। বাবা দেখো এসে ঠিক হাজির হবে রাত্তিরেই !"

বীরেশ্বও হাসল। লক্ষ্মীর পিঠে হাত দিয়ে বলল, "হয়ত হবে। তুই এখন যা, ঘুমিয়ে পড়্গে লক্ষ্মী। বিড়িটা কিন্তু দিয়ে যাস মনে করে। গলাটা শুকিয়ে গেছে রে।"

লক্ষ্মী লাফাতে লাফাতে উঠে গিয়ে মুহূর্তের মধ্যে এনে দিল বিড়ি আর দেশলাই। বলল, "আজ কিন্তু গল্প শুনে তবে ঘুমোতে যাব মামা। কালকের মত না ব'লো না?"

বীরেশ্বর বলল, "আচ্ছা, গল্প বলব, তুই বোস্ লক্ষ্মী!" বলে খানিকক্ষণ সে চুপ করেই রইল। তার পরে আস্তে আস্তে বলল, "যদি ওখানে গল্পটল্প শুনতে পেতিস, সব রকম সুবিধে পেতিস, তাহলে তুই ওখানেই থেকে যেতিস লক্ষ্মী? ফিরে আসতে চাইতিস না ত এখানে?"

লক্ষ্মী মাথা নেড়ে বলল, "তা বই কি? কি যে তুমি বল মামা? সুবিধে অসুবিধে আবার কি? তোমার কাছে ছাড়া গল্প শুনতে ভালই লাগে না আমার!"

পঞ্চশস্য

যুগান্তকারী অস্ত্রোপচার

১৩৬৯ মাঘের প্রবাসীতে এই শিরোনামায় পঞ্চশস্য বিভাগে আমরা একটি সংবাদ পরিবেশন করেছিলাম। প্রবাসীর সেই সংখ্যাটি যাঁরা



জোড়া-লাগা কাটা হাত

পড়েন নি কিংবা ঐ সংবাদটি যাঁদের চোখ এড়িয়ে গেছে তাঁদের জন্যে সেটার খানিকটা পুনরুক্তি এখানে করছি।

গতবৎসর মে মাসে আমেরিকার বোষ্টন শহরে এভেরেট নোল্‌স্ নামক ছেলের ডান হাতটা একটা দুর্ঘটনার ফলে কাঁধের কাছ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সেখানকার হাসপাতালের ডাক্তাররা কাটা হাতটাকে নিয়ে, হাড়ের সঙ্গে হাড়, পেশীর সঙ্গে পেশী, শিরার সঙ্গে শিরা, উপশিরার সঙ্গে উপশিরা জুড়ে এবং কোন কোন স্নায়ুর সঙ্গে স্নায়ুগুলিকে মিলিয়ে সেলাই ক'রে আবার যথাস্থানে বসিয়ে দেন। কিছুদিনের মধ্যেই দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হাতটাতে রক্ত-চলাচল শুরু হয়, কিন্তু তখন পর্যন্ত ছেলেটির সেই জোড়া-দেওয়া হাতটাতে কোন সাড় ছিল না।

কাটা হাতের স্নায়ুগুলোর সঙ্গে দেহস্থ স্নায়ুগুলো ঠিকমত মিলেছে কি না, বা মিলবে কি না, ডাক্তাররা তখন বলতে পারছিলেন না, কিন্তু তাঁরা আশা করছিলেন যে মিলবে। নোল্‌সের সেলাই-করা জোড়া হাতটাতে আবার সাড় ফিরে আসবে।

সঙ্গের ছবিটি সম্প্রতি যখন নেওয়া হয় তখন এভেরেট নোল্‌স্ মহা খুশী হয়ে দেখাচ্ছিল যে, সে এখন (দুর্ঘটনার দেড় বৎসর পরে) কাটা হাতটা'র পাঁচটা আঙুলই নাড়তে পারছে। কেবল তাই নয়, কব্জির নীচে হাতটাকে একদিকে ঘোরাতেও পারছে।

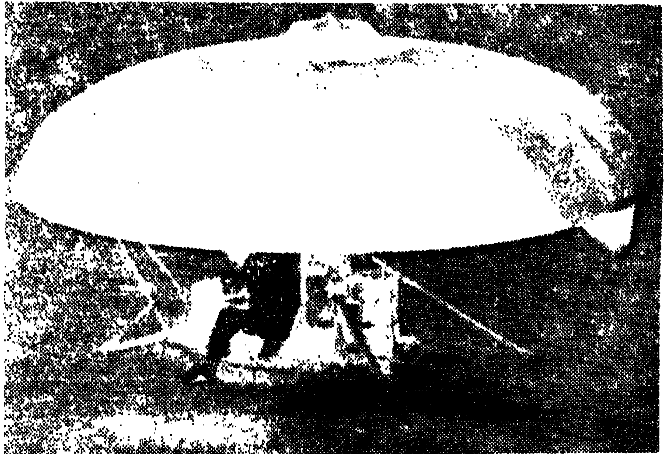
এই অস্ত্রোপচারটির সম্বন্ধে বোষ্টন হাসপাতালের ডাক্তাররা খুব আশাবাদী হয়ে উঠেছেন, তবে তাঁরা এও বলছেন, যে অস্ত্রোপচারটি সম্পূর্ণ সার্থক হ'ল কি হ'ল না তা অনেকটাই নির্ভর করবে, ছেলেটির কাটা হাতের সব স্নায়ুগুলো আবার আস্তে আস্তে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে কি না তার ওপর। এজন্যে ছেলেটিকে আরও অনেক মাস তাঁদের পর্যবেক্ষণ এবং চিকিৎসার অধীন হয়ে থাকতে হবে। ছেলেটি অবশ্যই তা থাকবে।

মদ না কাঁচের গুঁড়ো?

একজন বিজ্ঞানী বলছেন, তেজস্ক্রিয় রশ্মি ইত্যাদির সংস্পর্শে এলে মনুষ্যদেহের যে ক্ষতি হয়, মদ্যপান তার একটি প্রতিষেধক। সেইসঙ্গে তিনি এও বলছেন যে, কাঁচের গুঁড়ো খেলেও সেই একই ফল হয়। এ দুটোর মধ্যে কোন্‌টা আপনার পছন্দ, ভেবে দেখবেন।

ফ্লাইং সসার

এতকাল এরা মঙ্গলগ্রহ, কিংবা শুক্রগ্রহ, কিংবা অন্য কোন সৌর-মণ্ডলের অজানা কোন গ্রহ থেকে আসছিল। এতদিনে মানুষও একটি ফ্লাইং সসার বা উড়ন্ত পিরীচ তৈরি করেছে তবে এটি পৃথিবীর বায়ু-মণ্ডলের পরিবেশের মধ্যেই উড়বে।



ওল্টানো পিরীচের আকারের হেলিকপ্টার।

উল্টানো পিরীচের মত ঢাকনাটার মাঝখান থেকে এই হেলিকপ্টারটি হাওয়া পাম্প ক'রে শূন্যে ছুঁড়তে থাকে। তার ফলে উপরকার এবং নীচেকার হাওয়ার চাপের মধ্যে এমন বিষম একটি তারতম্য ঘটে যাতে হেলিকপ্টারটি সোজা শূন্যে উঠে যায় এবং হাল্কা হাওয়ার টানেই ভেসে থাকে। পাখা ঘোরে না বলে এর ওঠানামা, শূন্যে ঘোরাফেরা কোন কিছুতেই অসুবিধা কিছু হয় না।

প্রাণান্তকর আলস্য

মানুষ বলে, খেটে খেটে ম'রে গেলাম। আসলে কিন্তু যাদের কাজকর্ম নেই, যারা আলস্যে দিন কাটায় তারাই মরে বেশী।

আমেরিকার শেয়াটল্ শহরের লোকসংখ্যা দশ লক্ষ। এই শহরে এক বৎসরে ১৩৩ জন লোক হৃদ্‌যন্ত্র-ঘটিত গোলযোগে মারা যায়। এই ১৩৩ জনের মধ্যে ১২২ জন পুরুষ, ১১ জন নারী।

ডাক্তারদের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, এই ১২২ জন পুরুষই ছিল যেন আলস্যের প্রতিমূর্তি। এদের মধ্যে ৮০ জনের কাজ বলতে ছিল, টেলিভিশন দেখা, বই পড়া আর বাকী সময়টা লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরে গল্পগুজব করা।

পরিসংখ্যানমূলক এই গবেষণার ফলে আর একটা কথা জানা গেছে। অনেক ডাক্তারদের ধারণা যে, মদ্যপরা হৃদ্‌যন্ত্রের গোলযোগে ভোগে কম। কিন্তু উপরিউক্ত ১২২ জন পুরুষের মধ্যে ১০ জন এবং ১১জন স্ত্রীলোকের মধ্যে ৩ জন ছিল মদ্যপানাসক্ত। আরও ২৩ জন প্রত্যহ সাড়ে চার পেগের মত হুইস্কি খেত।

বাচ্চা গাড়ি

সাধারণ আয়তনের গাড়িটির পাশে ছোট গাড়িটাকে তার বাচ্চার মতই দেখাচ্ছে। এই বাচ্চা গাড়িটি দৈর্ঘ্যে চার ফুট, ওজনে দেড় মণের একটু বেশী, আর সামনের বাম্পারটা ধরে টেনে একে পিছনটার উপর দাঁড় করিয়ে দিলে একটা বড় বাক্সের আকারের গারাজে একে বন্ধ ক'রে রাখা যায়। তিন চাকার প্ল্যাষ্টিকে তৈরী গাড়িটির ডানদিকে আছে একটি চার অশ্বশক্তি-বিশিষ্ট ইঞ্জিন, আর এর বাঁদিকে আছে একটিমাত্র দরজা। ভিতরে অবশ্য একজন মানুষই কেবল বসতে পারে। গাড়িটির গতিবেগ ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল পর্যন্ত ওঠে, আর এক গ্যালন তেলে স্বচ্ছন্দে ১০০ মাইল চ'লে যাওয়া যায়।

রেড ইণ্ডিয়ানরা কি ধ্বংসোন্মুখ ?

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত শ্বেতাঙ্গ-অধ্যুষিত কানাডার আদিবাসী রেড ইণ্ডিয়ানদের ধ্বংসোন্মুখ জাতি ব'লে মনে করা হ'ত। শ্বেতাঙ্গদের দ্বারা বিজিত হবার পর তাদের সংখ্যা দ্রুতগতিতে কমে যাচ্ছিল। ১৯০০ সালে তাদের সংখ্যা ছিল একলক্ষ। বর্তমানে সেই সংখ্যা দুই লক্ষে দাঁড়িয়েছে। কেবল তাই নয়, কানাডার অধিবাসী নানাজাতীয় মানুষের মধ্যে তাদেরই বৃদ্ধির হার এখন সর্বোচ্চ।

লাল চীনের যুদ্ধপ্রস্তুতি

লাল চীনের প্রতিটি বালককে তার আঠারো বছর বয়স পূর্ণ হবার দিনে সৈন্যদলে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়। প্রতিবৎসর ৭,৫০,০০০ বালক এইভাবে সৈনিক-জীবন যাপন করতে আসে এবং তিনবৎসর ধ'রে সামরিক শিক্ষা লাভ করে। শিক্ষা সমাপ্ত ক'রে ফিরে যাবার পর চল্লিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত যে-কোন সময়, প্রয়োজন হলেই তারা আবার সৈন্যদলে যোগ দিতে আসবে এই চুক্তিসর্তে তারা আবদ্ধ থাকে। চীনের লোকসংখ্যা ৬৭ কোটি ২০ লক্ষ। উপরি-উক্ত উপায়ে যুদ্ধক্ষম বয়সের ১২ কোটি ৫০ লক্ষ সৈনিক নিয়ে যে-কোন যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারবে ব'লে লাল চীন আশা করে।

কিন্তু কেবল সৈন্যবল থাকলেই ত হ'ল না? তারা কিরকমের সৈন্য সেটাও দেখতে হবে। এই ১২ কোটি ৫০ লক্ষ সৈন্য যাতে দুর্দ্ধর্ষ হয়, নির্ভীক হয়, তার জন্যে লাল চীন রেডিও-বক্তৃতা, দেশাত্মবোধক কবিতা, বা যুদ্ধের প্রেরণা এনে দেয় এমন সমস্ত সঙ্গীতের উপর নির্ভর ক'রে নেই। সেদেশের বিজ্ঞানীরা অক্লান্ত ভাবে এখন গবেষণা করে চলেছেন, কোনও বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই ১২ কোটি ৫০ লক্ষ সৈনিকের চিত্তবৃত্তিকে এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যায় কি না দেখতে, যাতে তাদের মন থেকে এ্যাটম বোমার ভয়, রাইফেলের গুলীর ভয়, এক কথায় মৃত্যুভয় একেবারে বিদূরিত হয়ে যায়।

শোনা যাচ্ছে, লাল চীনের বিজ্ঞানীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা তাঁদের এইদিকে কতকটা সাফল্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে।



সংক্ষিপ্ত সংস্করণের মোটরগাড়ী

গির্জ্জার সমুদ্রযাত্রা

লণ্ডনের যুদ্ধবিধ্বস্ত এই গির্জার প্রত্যেকটি পাথর সাবধানে খুলে ফেলা হচ্ছে, কোনকিছু ভেঙে গিয়ে নষ্ট না হয়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে। ভিত্তি থেকে সুরু ক'রে ছাদ পর্যন্ত এর প্রতিটি উপকরণকে আটলান্টিক পার ক'রে নিয়ে গিয়ে আমেরিকার ফুল্টন শহরে ওএষ্টমিনিষ্টার কলেজ-প্রাঙ্গণে নূতন করে গেঁথে তোলা হবে।



সমুদ্রযাত্রী গির্জ্জা

১৯৪৬ সালে স্যর উইন্‌ষ্টন চার্চিল এই ওএষ্টমিনিষ্টার কলেজেই তাঁর "Iron Curtain" বা লৌহযবনিকা বিষয়ক বিশ্ববিখ্যাত বক্তৃতাটি করেন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনের জন্যেই লণ্ডনের এই গির্জাটিকে এইভাবে সেই কলেজে পুনঃস্থাপিত করা হবে।

পঞ্চদশ শতাব্দীর ভিত্তির উপর ক্রিষ্টোফার রেণ ১৬৭০-১৬৮৩ সালের মধ্যে এই গির্জাটি নির্মাণ করেন। এটিকে আটলান্টিক পার ক'রে নিয়ে যেতে খরচ পড়বে দশ লক্ষ টাকা।

স্ফিঙ্কসের বয়স

বিষয়টি নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মতভেদ থাকলেও আমেরিকার ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটির মতে স্ফিঙ্ক্‌সের বয়স ন্যূনাধিক ৪৫০০ বৎসর। সোসাইটি অনুমান করেন খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২৬ শতাব্দীতে মিশরের গিজা-তে এই সিংহের দেহে মানুষের মুখ জোড়া অতিকায় মূর্তিটি নির্মিত হয়। মিশরের রাজা খাফ্‌রে নিকটস্থ 'দ্বিতীয়' পিরামিডটি তৈরি করেছিলেন, হয়ত এই স্ফিঙ্ক্‌স্ তাঁরই রূপক প্রতিমূর্ত্ত। কিন্তু স্ফিঙ্ক্‌সে স্ত্রীত্ব আরোপ ক'রে তার সম্পর্কিত সমস্ত সর্বনাম ও বিশেষণ সেইভাবে ব্যবহার করা হয়। কেন করা হয়, প্রত্নতাত্ত্বিকরা বহু গবেষণা ক'রেও তার কোন সদুত্তর দিতে পারেন নি।

এ্যাটম বোমা বিস্ফোরণের ফলাফল

হিরোশিমায় এ্যাটম বোমা বিস্ফোরণের ফলাফল দুই বৎসর ধ'রে পর্যবেক্ষণ ক'রে এসে ইয়েলের ডাঃ ষ্টুয়ার্ট সি ফিঞ্চ তাঁর রিপোর্টে বলছেন যে, যেরকম আশঙ্কা করা গিয়েছিল ঠিক সেই রকম ভাবেই লিউকেমিয়া এবং থাইরয়েডের ক্যান্সারের প্রাদুর্ভাব সেখানে খুব বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু পিতামাতা তেজস্ক্রিয়তার সংস্পর্শে আসা সত্ত্বেও ৭০,০০০টি প্রসবের ব্যাপার পর্যবেক্ষণ ক'রেও এমন একটি শিশু দেখা যায় নি যে বিকলাঙ্গ বা জেনে (gene)-সংক্রান্ত অন্যবিধ কোনও গোলযোগ নিয়ে জন্মেছে। তবে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা গেছে, পিতা তেজস্ক্রিয়তার সংস্পর্শে এসে থাকলে সন্তানটি হয়েছে ছেলে, আর মা যদি সে-সংস্পর্শে এসে থাকেন ত সন্তানটি হয়েছে মেয়ে।

কচুরিপানাকে কচু-কাটা করা

আমেরিকার ফ্লোরিডাতে এক হ্রদমধ্যস্থ দ্বীপে এক ভদ্রলোক সখ ক'রে বাড়ী তৈরি করেছিলেন। হ্রদটি কচুরিপানায় ভ'রে যায়। ফলে দ্বীপটিতে আসা-যাওয়া করা কঠিন হয়ে পড়ে। বর্তমানে হ্রদটি কচুরিপানার উৎপাত থেকে একেবারে মুক্ত। ভদ্রলোক তাঁর মোটর-বোটটির পিছনে জলের চার ইঞ্চি নীচে লনমোয়ারের ধরণে ৫০টি ধারাল ছুরীওয়ালা একটি ঘূর্ণায়মান চাকা বসিয়ে কচুরিপানাগুলিকে টুকরো টুকরো ক'রে কেটে দিয়েছেন। এতেই তারা নির্মূল হয়ে গিয়েছে।

স. চ.



কচুরি-পানা কাটার নৌকো

চাঁদ—বিজ্ঞানের চোখে

একটি বিজ্ঞাপন মাত্র। আমেরিকার বেল টেলিফোন কোম্পানী 'ফিজিক্স টু-ডে' পত্রিকায় একটা অদ্ভুত বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। নানা রকম আঁককষা একটি 'ফটোলিপি' (ফেটোপ্লাট), তলায় লেখা রয়েছে—দেখ, আমাদের চোখে চাঁদ কেমন দেখায়। 'বেলকম্' (বেল টেলিফোন কোম্পানীর সংক্ষিপ্ত নাম) চাঁদে রকেট অভিযানের ব্যাপারে বিশেষ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে গবেষণা করছেন। চাঁদ তাঁদের কাছে তাই অনেকগুলি জটিল সমস্যার আকর হয়ে রয়েছে। কোম্পানীর গবেষকমণ্ডলী এ সমস্ত সমস্যার বিরুদ্ধেই কাজ ক'রে যাচ্ছেন। বেল টেলিফোন কোম্পানীর বিজ্ঞানীদের কথা যে কোন পাতায় চাঁদ সম্বন্ধে তাঁদের সেই ধারণা ছড়ানো রয়েছে। আমরা তারই একটা প্রতিরূপ এখানে তুলে ধরলাম। আজকের বিজ্ঞানীদের চোখে এটাই হলো চাঁদের একমাত্র রূপ—এই রূপ একদিকে যেমন জটিল, অন্যদিকে তেমনি রহস্যময়। আমাদের এতদিনের পরিচিত চাঁদের এই নূতন রূপটা তুলে ধরতেই পৃথিবীর নানা গবেষণাকেন্দ্রে হাজার হাজার বিজ্ঞানী কর্মব্যস্ত রয়েছেন।

প্রবাসীর বিগত এক সংখ্যায় আমরা একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিকের কথা উল্লেখ করেছিলাম যিনি বিজ্ঞানের নিত্যনূতন ধারণার ফলে সাহিত্যের জগতে তার অভিঘাতের কথা উল্লেখ করেছিলেন। চাঁদের সম্বন্ধে সেই অনাদি কাল থেকে কবি-সাহিত্যিকরা যে স্বপ্ন ও কল্পনা গ'ড়ে তুলেছেন, রকেটে ভ্রাম্যমাণ ক্যামেরার দৌলতে তা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। চাঁদের কোন অন্ধকার কোণে ব'সে চরকা বুড়ী আলোর জাল তৈরি করছে—এ যুগের শিশুদের মনে পর্যন্ত তা অবিশ্বাসের কৌতুক সৃষ্টি করে। বিজ্ঞানের প্রখর আলোকে সাহিত্য তার ধারণা ও ভবিষ্যৎ নূতন করে তৈরি করে নেবে। আর বিজ্ঞান পৃথিবীর বিষয় ও প্রকৃতি সম্বন্ধে কি ভাবে চিন্তা করছে তার পরিচয় যন্ত্র ও সঙ্কেতের মধ্যে ধরা পড়ছে। সাধারণ মানুষকেও সে সম্বন্ধে যথাসম্ভব ওয়াকিবহাল হ'তে হবে। চাঁদের সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের মনোজগতের যে ছবি, তার "পাণ্ডুলিপি" তাই এখানে পাঠকদের সামনে হাজির করলাম।

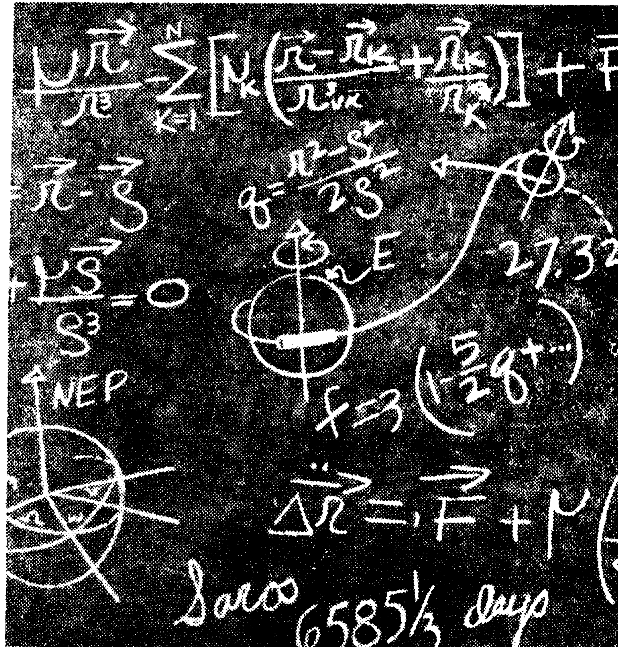
জলজ আগুন

অর্থাৎ জলে জাত আগুন। যে আগুনের জল থেকে জন্ম। জলে গাছ হয় তার ফুলও ফোটে, কিন্তু তাই বলে জল থেকে আগুন!

জলে রয়েছে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন। অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন রাসায়নিক বাঁধনে যৌগিক হয়ে জলে পরিণত হয়। অক্সিজেনের ধর্ম তো দহন কাজে সাহায্য করে অথচ নিজে জ্বলে না, আর হাইড্রোজেন দহনের কাজে না লাগলেও নিজে জ্বলে পুড়ে যায়। অক্সিজেনের আবহাওয়ায় তাই হাইড্রোজেনকে সহজেই জ্বালানো সম্ভব।

এই হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন জল থেকে নেওয়া হ'ল।

বিদ্যুতের প্রভাবে জলের অণুগুলি ভেঙ্গে গিয়ে অক্সিজেন আর



বেল্‌কম্‌-এর চোখে চাঁদ

হাইড্রোজেন আলাদা হয়ে পড়ে। এই গ্যাস দু'টি আলাদাভাবে ধ'রে রাখা হ'ল। একটা নলপথে তা যখন ছাড়া হয় তখন আগুন ধরলে ওয়েল্ডিং রডের জ্বলন্ত মুখের মতই তা জ্বলে ওঠে।

জলজ আগুন ওয়েল্ডিং-এর কাজেই ব্যবহার করা যাচ্ছে। দরকার-মত নলের মুখে সূচের মত সূক্ষ্ম ক'রে অত্যন্ত ছোট জায়গাতে লাগানো চলবে। বিশেষ করে এ কারণেই "জলজ" আগুন সাধারণ ওয়েল্ডিং-এর আগুনকেও কোন কোন ক্ষেত্রে ছাড়িয়ে গেছে।

১৫৬ নম্বর

রাষ্ট্রসংঘের নিরস্ত্রীকরণ সমিতির ১৫৬তম মিটিং আগষ্টের ২৯ তারিখে জেনেভায় সম্পন্ন হ'ল। একটিমাত্র বিষয়ের উপর এতগুলি মিটিং-এর এই অভাবনীয় সংখ্যা খবর কাগজের শিরোনাম পাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। নিরস্ত্রীকরণ এ যুগের প্রধান সমস্যা। রাজনৈতিক কূট বিচার এবং স্নায়ু-যুদ্ধের টানে সহজ বুদ্ধি বিবেচনার সূত্রগুলি হারিয়ে যাচ্ছে। সমস্ত বিষয়টিকে ঘিরে এক দুর্ভেদ্য অচলায়তন সৃষ্টি হয়েছে, মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ভবিষ্যৎ মাথা খুঁড়ে মরছে। এরই মধ্যে সম্প্রতি একটা ফাটল যেন দেখা দিয়েছে,—মাটি এবং আকাশে পরমাণুর বিস্ফোরণ বন্ধ থাকবে, মস্কোতে তিন শক্তিতে মিলে এই অঙ্গীকারে স্বাক্ষর দিয়েছে।

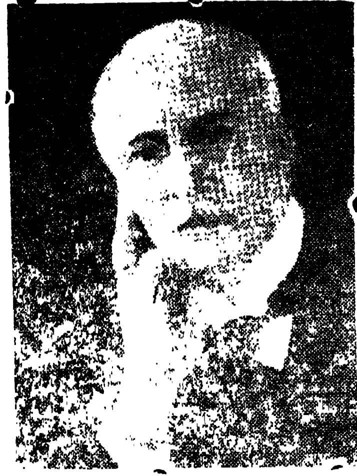
আশা হচ্ছে মানুষের অনন্ত মঙ্গল-শক্তি এ পথেই অগ্রসর হয়ে বিস্ফোরণের সমস্যাটি অতীতের গর্ভে নিক্ষেপ করবে।

ডিজেল একটি লোকের নাম

সত্যই তাই। ডিজেল একজন লোকের নাম। রুডল্ফ্ ডিজেল একজন বিশ্ববিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার। ডিজেল তেল, ডিজেল ইঞ্জিন তাঁরই নামবাহী। অথচ এ সমস্ত নামের আড়ালে আসল মানুষটির পরিচয় সাধারণ লোকের কাছে একেবারেই হারিয়ে গেছে।

ডিজেলের জীবনের শেষ ঘটনাটিও এমনি এক রহস্যে ঢাকা। ১৯১৩ সালের ১০ই অক্টোবর, হঠাৎ দূরে ডাচ নাবিকদের চোখে পড়ল উত্তর সাগরের তীরে কি যেন একটা জলের তোড়ে ওলট-পালট খাচ্ছে। ছোট্ট ডিঙ্গি নিয়ে তারা ছুটে গেল, মৃত লোকই বটে—অজ্ঞাত-পরিচয়, তবে তাঁর বুকপকেট হাতড়িয়ে পাওয়া গেল কয়েকটা চিঠি আর হাতে একটা আংটি, কিন্তু নামগোত্র কিছুই জানা গেল না। ডাচ নাবিকেরা সেই কাগজ আর আংটি খুলে রেখে নামপরিচয়হীন লোকটির দেহ আবার সমুদ্রের জলেই ভাসিয়ে দিল। পরে যখন তারা বন্দরে ফিরে এল, লোকটির পরিচয় আর অজ্ঞাত রইল না। কিন্তু অকুল সমুদ্রের মধ্যে মৃতদেহের খোঁজ পাওয়া তখন আর সম্ভব নয়। ডিজেল ইঞ্জিনের আবিষ্কর্তা ইনিই সেই রুডল্ফ্ ডিজেল—বিশ্ববিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার, এণ্টওয়ার্প্ থেকে তিনি ইংলণ্ডে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর জাহাজ ড্রেস্‌ডেন যখন তীরে এসে ভিড়ল, কেবিনের ঘর একেবারেই শূন্য। এরপর জীবিত অবস্থায় তাঁর আর কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি।

রুডল্ফের জন্ম প্যারিসে ১৮৫৮ সালে। দেশত্যাগী এক জার্মাণ পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। ফ্রান্স জার্মাণী ও ইংলণ্ডের নানা জায়গায় ঘুরে ডিজেল একসময় বিখ্যাত বিজ্ঞানী লিণ্ডের কাছে পাঠ গ্রহণের সুযোগ পান। ষ্টীম ইঞ্জিন তখন চালু হয়েছে। কিন্তু তাতে মোট আহরিত শক্তির ৬ কি ৮ শতমিক (শতাংশ) মাত্র কাজে লাগানো চলত।



রুডল্ফ্ ডিজেল
ডিজেল ইঞ্জিনের প্রবর্তক

ডিজেল খাতায় নোট লিখেছিলেন—এত অপচয় কেন, ইঞ্জিনকে আরো কার্যকরী উপায়ে গড়ে তোলা চাই। কিন্তু ল্যাবরেটরির নিরিবিলিতে গবেষণার অবসর বা সুযোগ তাঁর ছিল না। ডিজেলের সমস্ত জীবনটাই আশ্চর্য সংগ্রামময়। কিন্তু গবেষণার সরাসরি সুযোগ না পেলেও তাঁর কর্মজীবন ইঞ্জিনিয়ারিং কর্মশালার মধ্যেই সুরু হয়েছিল। লিণ্ডে প্রবর্তিত অ্যামোনিয়া রেফ্রিজারেটিং মেশিনের প্যারিসের কারখানায় তিনি প্রধান হলেন। কিন্তু উচ্চাভিলাষী ডিজেল এতে মোটেই সন্তুষ্ট ছিলেন না, ডায়েরির পাতায় তিনি এ নিয়ে বহু আক্ষেপ করেছেন। তাঁর মনের এই অতৃপ্তিই তাঁকে নূতন আবিষ্কারের পথে ঠেলে নিয়ে চলল। ডিজেল ইঞ্জিন আবিষ্কার করলেন। তথাকথিত ডিজেল তেলও তিনি খনিজ তেলের মধ্যে খুঁজে বার করেন। কিন্তু এ সমস্ত সাফল্যের পিছনে তাঁর বহুদিনকার নিষ্ঠা, ত্যাগ ও নৈরাশ্যের ইতিহাস লেখা আছে। রুডল্ফ্ ডিজেল পৃথিবীজোড়া খ্যাতি ও অগাধ সম্পত্তির অধিকারী হলেন। কিন্তু তাঁর জীবন এ সময়ই আবার নানা সমস্যায় জর্জরিত হয়ে উঠল। আবিষ্কারের অধিকার ইত্যাদি নিয়ে তিনি নানা কূট মামলা-মকদ্দমায় জড়িয়ে পড়লেন; ডিজেল প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে পড়লেন। ঠিক এ সময়েই এক নূতন দার্শনিক বোধ তাঁকে অস্থির করে তুলল। জাগতিক চিন্তায় তিনি আর দিশা রাখতে পারলেন না। ভিতর-বাহিরের এ সমস্ত সমস্যা শেষ পর্যন্ত তাঁকে উত্তর সাগরের জলে সমাধির মুক্তি এনে দিল।

ক্ষুধা বনাম অস্ত্রসজ্জা

ক্ষুধা এবং অস্ত্রসজ্জা বিশ্বরাজনীতির এক জটিল সূত্রে বাঁধা। রাষ্ট্র-সংঘের খাদ্য ও কৃষি দপ্তরের ডাইরেক্টার জেনরেল ডঃ বি. আর. সেনের আহ্বানে সম্প্রতি (১৪ই মার্চ) রোমে পৃথিবীর জ্ঞানীগুণীমনীষীরা যে বিবৃতি দিয়েছেন তা থেকে বিষয়টির গুরুত্ব ও বিস্তৃতি উপলব্ধি করা যাবে। কোনরূপ মন্তব্য না ক'রে আমরা এখানে তা তুলে দিলাম।

"পৃথিবীর অর্ধে'ক লোকই আজ অপুষ্টি বা অপুষ্টিজনিত রোগে ভুগছে। অথচ উন্নয়নের কাজে যেখানে পর্যাপ্ত অর্থের সংস্থান হয় না তখন এই ১৯৬২ সালেই অস্ত্রসজ্জার উদ্দেশ্যে প্রায় ১২০ বিলিয়ন ডলার খরচ করা হয়েছে (এক বিলিয়ন=১,০০০,০০০,০০০,০০০)। যখন আমরা দেখি যে, বিংশ শতাব্দীর শিশু—প্রতি তিনজনের মধ্যে একজন, স্বাভাবিক ভাবে বাঁচবার কোন আশা না নিয়েই জন্মগ্রহণ করে, তখন আমাদের এই সভ্যতা একটি বিরাট্ অপচয় এবং প্রগতি-বিরোধী, এ ছাড়া অন্য কোন ভাবে সিদ্ধান্ত টানা যায় না। অবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছে, কারণ, একদিকে যেমন জনসংখ্যা বাড়ছে, সে অনুপাতে চাষের ফসল বাড়ছে না। এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার মত উপকরণ অবশ্য মানুষের হাতেই রয়েছে, যদি তা ঠিক ভাবে ব্যবহার করা যায়, ক্ষুধার বিভীষিকার হাত থেকে মানুষ মুক্তি পেতে পারে। মানুষ কি সে সম্বন্ধে কোনদিন সচেতন হবে এবং নিজেকে সে ভাবে প্রস্তুত করে তুলবে?

"এটি সত্যসত্যই একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার যে, মানুষের হাতে অপর্যাপ্ত সম্পদ এবং তা কাজে লাগাবার মত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও মানুষ এভাবে দুঃখযন্ত্রণা সহ্য করবে। খাদ্যের অভাবটাই—প্রধান সমস্যা। ক্ষুধা এবং অপুষ্টি জাতির প্রগতিকে পরোক্ষভাবে পিছিয়ে দিতে পারে।

"জাতীয় অবস্থার উপর দাঁড় না করালে কোন উন্নতিই শেষ পর্যন্ত টিঁকে থাকতে পারে না। বাহিরের সাহায্য দরকার একমাত্র তার পরিপূরক ও পথপ্রদর্শক হিসাবে। বাধাগুলি প্রধানতঃ সামাজিক ও অর্থনৈতিক। বৈজ্ঞানিক বাধাগুলির থেকেও তা জরুরী। শিক্ষা, উপযুক্ত মূলধন এবং কারিগরি কৌশল হ'ল মূল উপকরণ। সমস্যাগুলি অবশ্যই জটিল এবং বিস্তৃত, তবে আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় নিশ্চয়ই তা সমাধান করা চলবে। এ প্রসঙ্গে, বাণিজ্য-চুক্তিগুলি এমন ভাবে তৈরী হওয়া উচিত যাতে অনুন্নত দেশগুলির মর্যাদা ও স্বাধীন সত্তা কোনপ্রকারে ক্ষুণ্ণ না হয়, তাঁদের তৈরি বাণিজ্যদ্রব্যগুলি যাতে পৃথিবীর বাজারে বিক্রী হওয়ার সমান সুযোগ পায়। ধনতন্ত্র ও কমুনিষ্ট দু' ধরণেরই উন্নত দেশগুলির সহযোগিতায় মানুষ সাধারণ শত্রু ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামজয়ী হতে পারে, এবং এভাবে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা ফিরে এলে মানুষের আর একটি মুক্তি-যুদ্ধের ভয় থেকে মুক্তি সম্ভব হবে। ......এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, ক্ষুধার বিরুদ্ধে মানুষের আন্তর্জাতিক প্রয়াস আন্তর্জাতিক সম্পর্কগুলি সহজ করে তুলতে পারে।"

বিশ্বশান্তি লাভের পথে প্রথম ধাপ ক্ষুধার থেকে মুক্তি।

রামেন্দ্রসুন্দর শতবার্ষিকী

রামেন্দ্রসুন্দর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রশস্তি সর্বজনবিদিত। বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ ধারা তাঁর সাধনায় পুষ্ট ও বেগবান্ হয়ে উঠেছিল। মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের আলোচনা তিনি যে শুধু সহজ ক'রে তুলেছিলেন তা নয়, সে সঙ্গে তা সুন্দরও করেছিলেন—সাহিত্যের প্রাণরসে বিজ্ঞানের মত বিষয়ও তাঁর হাতে উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল। রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনের তারে যে সঙ্গীত বাজত তার সুরটি ছিল বড়ো গভীর। এই গভীরতা তাঁর বৈজ্ঞানিক রচনাগুলিকেও স্পর্শ করত। বিজ্ঞানের স্বাভাবিক সীমানাকে প্রায় অতিক্রম ক'রে এক আলো-আঁধারময় রহস্যের জগতে তাঁর রচনার বিষয়গুলি সঞ্চারিত হ'ত। বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলির মধ্যে সে কোন্ "পুতুল পূজা", এই পৃথিবী কি মায়াময় দৃষ্টিবিভ্রম, নাকি সত্যসত্যই কোন গভীর তাৎপর্য তার রয়েছে, নিয়মের রাজত্ব যাকে বলি—তার বাঁধাধরা পথ ছাড়িয়ে কি সেই রহস্যের হাতছানি—অসীম অনন্ত সব জিজ্ঞাসা খণ্ডবিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁর রচনার মধ্যে ইতস্ততঃ ছড়ানো বিক্ষিপ্ত থাকত। একটি বৃহৎ অনুভূতি তাঁর বৈজ্ঞানিক চিন্তা-ভাবনাকে দার্শনিক ধূসরতায় আবিষ্ট ক'রে তুলত, তাঁর এই জিজ্ঞাসা-কাতর উন্মুখ আন্তরিকতায় পাঠকের মনপ্রাণ নূতন এক ভাবনার জগতে ইঙ্গিত বিস্তার করত।

রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে বাংলা ও বাঙালীর ঋণ অশেষ পরিমাণ। আর কয়েক মাস পরে তাঁর শতবার্ষিকী। আশা করি দেশের সুধীজনের প্রেরণায় তা উপযুক্ত ভাবেই প্রতিপালিত হবে।

"পকেট ঘর"

পকেট ঘড়ি নয়, পকেট ঘর। এখনো অবশ্য তৈরি হয় নি। তবে তা প্রস্তুতির মুখে।

পৃথিবীর সীমানা ছাড়িয়ে যে মানুষ মহাকাশের পথে দুঃসাহসিক পা বাড়াবে তার বাধা পদে পদে। অপরিচিত অবস্থা, যান্ত্রিক নির্ভরতা ইত্যাদির কথা বাদ দিলেও সূর্য্যের এই একান্ত অনুকূল রশ্মি সেখানে জীবনের পক্ষে মস্ত প্রতিকূল। চাঁদ বা মঙ্গল কি শুক্র (?) গ্রহে গিয়ে মহাকাশচারী যদি সাময়িক আশ্রয় চায়, তার কি ব্যবস্থা করা যেতে পারে? মহাকাশযাত্রীর পোশাক-পরিচ্ছদ অবশ্য সূর্য্যের তেজস্ক্রিয় রশ্মিগুলি থেকে নিরাপদ, কিন্তু কোন বিপজ্জনক অভিযানে একমাত্র পোশাককেই ভরসা মানা উচিত হবে না। উপায় উদ্ভাবনের নানা চেষ্টা-চরিত্র তাই অব্যাহত ভাবে চলছে।



মহাকাশ-যাত্রীর পকেট ঘর

এক রকম পলিয়ুরেথিনের ফেনা আছে যা ইনফ্রা-রেড আলোর সংস্পর্শে এসে জমে কঠিন হয়। তখন এই কঠিন জিনিষটি ভেদ করে সূর্য্যের ক্ষতিকর আলোগুলি আর অগ্রসর হতে পারে না। ল্যাবরেটরির পরীক্ষায় এই বিচিত্র ফেনা দিয়ে একটা বেলুন এবং একটা চেয়ার তৈরি

ক'রে দেখা হয়েছে। ইনফ্রা-রেড আলো ফেলায়, এরা এখন জমে কঠিন (ছবি দেখুন)। বিজ্ঞানীরা চেষ্টায় আছেন, কাপড়ে বা রাবার শীটের গায়ে এই ফেনা ধরানো যায় কি না। ফেনা মাখানো কাপড় তখন ছোট তাঁবুর মত বাক্সে গুটিয়ে রাখা যাবে। বায়ুমণ্ডলের বাহিরে মহাকাশে ইনফ্রা-রেড আলোর অভাব নেই। দরকারের সময় বাক্সটা খুলে মেলে ধরলেই হলো—পলিয়ুরেথিনের ফেনা জমে কঠিন আকার ধারণ করবে। পৃথিবীর বাহিরে গিয়েও এভাবে মহাকাশযাত্রী মাথা গোঁজার মত একটা "ঘর" খুঁজে পাবে। এই ঘর রুমালের মতই সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো চলবে।

শব্দের "ছাপ"

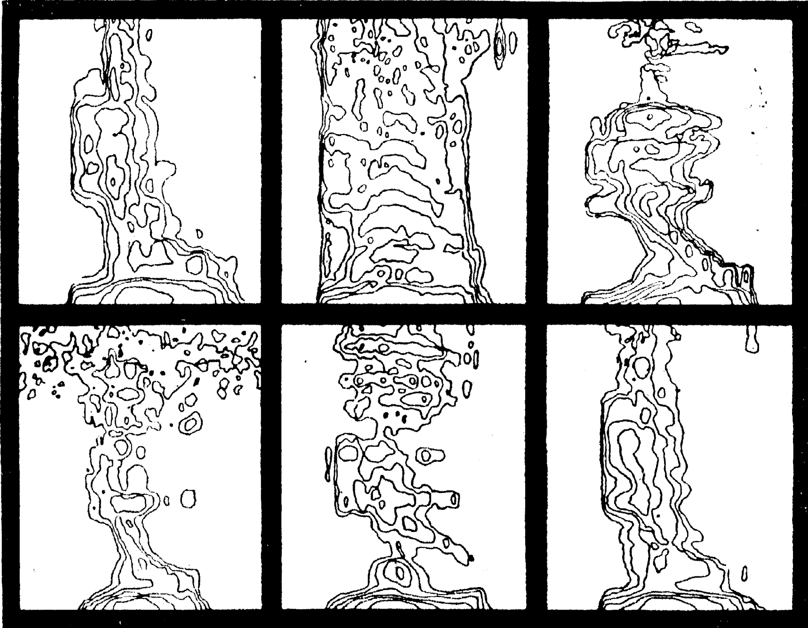
ব্রজবাবু একজন ভয়ঙ্কর ডিটেকটিভ। সবাই যখন খুনের কিনারা করতে না পেরে হাল ছেড়ে দিয়েছেন, ব্রজবাবু তখন জলের গ্লাসে খুনীর হাতের ছাপ খুঁজে পেলেন। এরপর কাহিনীর গতি অতি দ্রুত। খুনীর হাতে হাতকড়া পরানোর পর ছোটখাট একটা বক্তৃতার মধ্য দিয়ে গল্পের মধুরেণ সমাপয়েৎ।

হাতের ছাপ বা পায়ের ছাপের কথা আমরা জানি। লোকবিশেষের জন্য পুলিশের খাতায় তা যত্ন করে তুলে রাখাও হয়। অনেকের মতে কপালেও এক ধরণের ছাপ থাকে, এই ছাপ নাকি গুপ্ত, তবে এই ছাপ যার অনুকূলে, পৃথিবীতে ধন মান প্রতিপত্তি কিছুরই তার অভাব হয় না। এ সমস্ত ছাপের কথা আমরা শুনি বা মেনে থাকি। কিন্তু শব্দের যে আবার একটা ছাপ থাকতে পারে তা কখনো শোনা যায় নি, অথচ এই ছাপ নাকি রয়েছে। যন্ত্রের কলাকৌশলে তা তোলাও হয়েছে।



স্পেক্টোগ্রাফ যন্ত্রে বিজ্ঞানী তাঁর গলার স্বর ধরে রাখছেন

মোটামুটি আমরা যা জানি—প্রত্যেকেরই গলার স্বর ভিন্নরকম। একজনের সঙ্গে আর-একজনের গলার স্বর মেলে না। কণ্ঠস্বরের এই ধরণ-ধারণ ব্যক্তি বিশেষের মুখ, ঠোঁট, গলা, নাকের পরিধি ইত্যাদির উপর



বিভিন্ন গলায় ইংরেজী "You" কথাটির উচ্চারণের ছাপ। প্রথম এবং শেষ ছাপটি একই গলার উচ্চারণের।

নির্ভর করে। গলার বড় একটা পরিবর্তন হয় না। এমন কি দাঁত পড়ে গেলে, গলায় টনসিল হলে কিংবা মুখে সুপুরি রাখলেও তার মৌলিক কোন পরিবর্তন হয় না। এ হিসাবে একজন আর একজনের গলার স্বর নকল করতে পারে না। অপারেশন করে বরং হাতের ছাপ বদ্‌লানো যায় (আজকাল তাও সম্ভব), কিন্তু একজন প্রাপ্তবয়স্ক তার গলার স্বরের প্রকৃতি বদল করতে পারে না।

বেল টেলিফোন ল্যাবরেটারির এল. জি. কারস্টা একটা উপায় আবিষ্কার করেছেন যাতে করে কণ্ঠস্বরের এই বৈচিত্র্য ছবির আকারে আমাদের সামনে তুলে ধরা যায়। সঙ্গের ছবিতে বিজ্ঞানী কথা বলছেন, স্পেক্ট্রোগ্রাফ মেসিনের সাহায্যে, তা কাগজের গায়ে ছবি হয়ে ফুটে উঠছে। এই সঙ্গে মোট ছ'টি ছবি দেখানো হয়েছে,—'you' শব্দটি বিভিন্ন লোকের গলায় কি ভাবে ফোটে তা এখানে দেখানো হচ্ছে। প্রথম এবং শেষ ছবি দুটি একই লোকের "উচ্চারণ", গলার স্বর বিকৃত করার ফলে শব্দের "ছাপ" দুভাবে ফুটে উঠেছে। আমাদের কাছে তা যতই তফাৎ বলে মনে হোক, বিশেষজ্ঞের চোখে তা ধরা পড়ে। বেল ল্যাবরেটরির বিজ্ঞানীরা ২৫ হাজার লোকের কথা পরীক্ষা করে দেখেছেন, শতকরা ৯৭ জনের ক্ষেত্রেই তাঁদের বিচার নির্ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

বলা যায় না, শব্দের ছাপ একদিন হাতের ছাপ নেওয়ার মতই প্রমাণের বিষয় হয়ে উঠবে।

৺বিজয়ার অভিনন্দন

৺বিজয়ার অভিনন্দনলিপি—গ্রিটিং কার্ড, তার সঙ্গে নূতন একটা উদ্দেশ্য এসে যোগ দিক না? পূজার আনন্দে যখন আমরা পরস্পরের প্রতি প্রীতি শুভেচ্ছা জানাই, তখন শিশুদের প্রতি একটা কর্তব্য, উৎসবের মধ্যেই সম্পন্ন করে নিতে পারি।

শিশুদের দিকে বিশেষ ভাবে নজর দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রসংঘের বিশেষ একটি কাণ্ড রয়েছে। প্রতি বছরই অভিনন্দন লিপি বিক্রি ক'রে কাণ্ড টাকা তোলার ব্যবস্থা করেন। গত বছর ২৭০ লক্ষ কার্ড বিক্রি ক'রে দেড় কোটিরও বেশি ডলার সংগ্রহ হয়েছিল। এ বছরেও এ ভাবে টাকা



বিজয়ার অভিনন্দন—হাতীর সাজ

তোলার চেষ্টা চলছে। মোট ১৮ রকমের কার্ড, ১০টি পাঁচ টাকা। শহরের বড় বড় ষ্টেশনারী দোকানগুলিতে মিলবে, অথবা ১১নং জোড় বাগ, নয়া দিল্লী।

আপনার অভিনন্দন পত্রের মধ্যে শিশুদের মঙ্গল মূর্ত হয়ে উঠুক।

এ. কে. ডি.

— * —

প্রতিরক্ষা তহবিলের জন্য শ্রীদিলীপকুমার রায়ের অর্থসংগ্রহ প্রচেষ্টায় সন্তোষ জ্ঞাপন করে রাষ্ট্রপতি শ্রীরাধাকৃষ্ণন তাঁকে যে পত্র লেখেন তাতে এই উদ্ধৃতিটি ছিল:

পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয়ান্ উপসেবমানো
ধীরো ন মুঞ্চতি মুকুন্দ-পদারবিন্দম্।
সঙ্গীত-বাদ্য-লয়-তালবশঙ্গতাপি
মৌলিস্থ কুম্ভ পরিরক্ষণধীর্নটীব।

বঙ্গানুবাদ: নানা সুরতালের সঙ্গে নৃত্যরতা নটী যেমন তার শিরস্থ জলপাত্রের সম্বন্ধে সচেতন থাকে, তেমনি ধর্মাত্মা ব্যক্তি যেরূপ কাজেই লিপ্ত থাকুন না কেন, মুকুন্দের পদারবিন্দ থেকে মনকে কখনো সরিয়ে নেন না।

সলিটেয়ার

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

খেলা, শুধু খেলা আর খেলা।
খেলা যেন খেলা নয়, খেলা যেটা নয় তাও খেলা,
কে হারে কে জেতে এই খেলা
আমরণ খেলে এরা,
খেলা ছাড়া বাঁচতে পারে না।

বেলোয়ারী ঝাড় দিয়ে আসর সাজায়,
দাবার পাশার ছক পাতে,
খেলার যে হারজিত তাতে আরো হারজিত জোড়ে,
নিঃস্ব হয়, নিঃস্ব করে, তবে খেলা জমে।

কাজের মানুষ কাজে নেমে
ফাটকা-বাজারে খেলা করে।
লেন-দেন বেচাকেনা নিয়ে,
বাদী-প্রতিবাদী নিয়ে
ডান পথ, বাম পথ নিয়ে
রাজপথে জনপথে প্রসেশন ক'রে খেলা করে,
কে হারে কে জেতে এই খেলা,
খেলা ছাড়া বাঁচতে পারে না।

শুধু কিছু খেলা আছে
যে খেলাতে তুমি এসে জোট।
তোমাকে ডাকে না কেউ, তবু এসে জোট।
কেন এস?
কেন এসে জোট?
ওদের খেলতে দিতে কি হয় তোমার?

ভালবাসাবাসি খেলা এরা সুরু করে।
দু'টি দেহ-মন
একটুকু কাছাকাছি হতেই কেমন
মধুময় হয়ে যায়।
কে দেবে কতটা মধু, সে-হারজিতের খেলা হয়।
মধু যে মধুর কেন, এরা ত বোঝে না?
এরা ত জানে না,
এ মধু তোমার মধু?

তুমি এসে জোট।
এদের কাঁদিয়ে ছাড়।
কত মধু বিষ হয়, কত বিষ হয়ে যায় মধু,
সব খেলা হয়ে যায় একলা তোমারই শুধু খেলা।

এরা যুদ্ধ করে।
রক্তে আছে ব্যাধবৃত্ত বহু পুরুষের
রক্তলোলুপতা ব্যাধি,
আজও তাই এত মাতামাতি
অকারণ প্রাণঘাতী
নিষ্ঠুর মৃগয়া নিয়ে খেলাছলে।
যুদ্ধও এদের খেলা,
মৃত্যু নিয়ে খেলা,
খেলা ছাড়া বাঁচতে পারে না।
তুমি এসে জোট।
তখন কে জেতে, কে যে হারে,
তা নিয়ে বিষম গোল বাধে বারে বারে।
সে-খেলাও হয়ে যায় একলা তোমার শুধু খেলা,
হারজিত একলা তোমার।

তোমারই মতন এক একলার খেলা খেলে ও যে,
তোমার এ খেলা তাই বোঝে।
এস তুমি তার, এ খেলাতে।
ভালবাসাবাসি খেলে, তাও একা একা।
বীরধর্ম্ম কাকে বলে কিছুই জানে না।
তবু অস্ত্র হাতে নেবে যদি যুদ্ধ চলে,
আততায়ী-প্রতিরোধ জীবধর্ম্ম ব'লে।
কিন্তু শত্রু যারা
তারাও যে আত্মজন তার
এ ভাব কিছুতে তার ঘুচবে না।
ভুলবে না মৃত্যু যে মৃত্যুই,
সে-আঁধার সমান আঁধার
নিবুক প্রাণের যারই বাতি।

ভুলবে না, সব শব এক মহাজাতি,
বিচারে-আচারে ভেদ, ভাষাভেদ নেই।
তার যে যুদ্ধের খেলা, হবে তাও একথা জেনেই,
হারজিত নেই এ খেলাতে।
লাল তিরি কালো দুরি, লাল ছক্কা কালো পাঞ্জা
মিলিয়ে মিলিয়ে খেলা করে।
যদিই না মেলে তাস,
সকল ভণ্ডুল হয়,
সব তছনছ হয়,
ফিরে তাস ভেঁজে হয় খেলা।

তোমার খেলার রীতি ওরা ত বোঝে না?
যেও না ওদের দিকে তুমি।
ওদের খেলতে দাও কে হারে কে জেতে এই খেলা।
না হয় ভণ্ডুল হবে সব,
সব তছনছ হবে, জীব-ইতিহাস
আবার নূতন ক'রে লেখা হবে।
কতবার হয়েছে ত আগে?

এস, বস, দেখ, ও যে খেলে
তোমারই মতন এক একলার খেলা।

—*—

বাতায়ন খুলে রাখো

হেনা হালদার

বাতায়ন খুলে রাখো। ফ্লুরেসেণ্ট মায়াবী আলো-কে
এবার নেভাও। চাঁদ-ময়ূরীর রূপোলী পালকে
বিছানা ঢাকুক।

যদি নাছোড়বান্দা লাইলাক
জনশ্রুতির মত সুগন্ধ ছড়ায়, নাই থাক
স্পর্শের বিদ্যুৎ তাতে, তবু তার অসম্বদ্ধ কথা
প্রথম বৃষ্টির মত বর্ষণের সব প্রগল্‌ভতা
ঘনাবে হৃদয়ে।

আর সংক্রামিত রক্তকোষে পাবো
জ্যোৎস্নার সাহস: অণুপরমাণু গ'লে রজতাভ
ঝর্ণার প্রপাত হবে: আলো-ঝলা হ্রদের মতন
পৃথিবীর বুকে শুয়ে কেড়ে নেবে আকাশের মন।

বাতায়ন খুলে দাও—বাসনাকে কর উন্মোচিত
প্রত্যাশার বরাভয়ে। আদিগন্ত যন্ত্রণা-খচিত
আদিঅন্তহীন সুখে ছিঁড়ে পারিপার্শ্বিকের মালা
নদীর মতন ফের সুরু কর কীর্তনের পালা…
আখরে দোহারে পূর্ণ ক'রে দাও সমুদ্রের দাবী।
প্রেমের কর্পূর যদি উড়ে গিয়ে থাকে, মৃগনাভি
স্মৃতির সৌরভ আছে। দেখ, কাটা-বিশ্বাসের বুক
ভাঙা আয়নায় মত: ধরে আছে অনাহত মুখ।

সৌম্য-অশান্ত

নিখিলকুমার নন্দী

বন্ধু, সুখ চাও? সুখের জন্যে কি ধুসর পুঁথিখোঁড়া,
অথবা, পথে-পথে পথিকবনিতার পায়ের ধুলো ওড়া,
যদি তা জানতে সে কেমন ব্যাকুলতা রক্তে-প্রেমে-গড়া।

পথের কবিতা যে পথের এ-মাথায় দিনের প্রত্যয়ে
রঙের কোলাহল, পথের ও-মাথায় রাত্রিরসময়ে
স্বল্প বর্ণনা, তবু তা স্পন্দিত দীর্ণ শিখা ছুঁয়ে।

তুমি যে ভালোবাস, তাই ত সুখ এই দুঃখে নড়ে-ওঠা
সময় দীর্ঘ তা প্রায়ই পার হয়ে স্নিগ্ধ প্রান্তে যে ব্যর্থ
হয় ছোটা,
বৃষ্টিপ্রান্তরে সার তো অবরোধ রৌদ্র-পায় লোটা।

তাই কি পথময় পথিকবনিতার লোধ্ররেণুসাজ মর্মে
হানা দেয়
আর্দ্র কজ্জল-সিক্ত চোখে-চোখে রিক্ত মেঘে বাজে বজ্র,
মেঘোদয়
নবীন অম্বরে, সেই তো পথিকের চিত্ত পথময়।

সুখ ও দুঃখের এ-মাথা ও-মাথায় পথের ধুলো-ওড়া।
যদি তা জেনেছোই, মিথ্যে পুঁথি, তার প্রাচীরে
মাথা খোঁড়া,
সটান পথটাকে স্নিগ্ধতায় দাও পথিকবনিতার রক্তে-
প্রেমে-গড়া।

সৌম্যকে

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

সৌম্য তুমি যাও, উঠে গিয়ে জানলা খুলে দেখ কেউ
অন্যায় আঁধারে একা বৃক্ষের সমান একা—তুমি জানলা খুলে দেখ
বসন্তের প্রান্তে ক্লান্ত যে সব বছর বৃদ্ধ হলুদ বিবর্ণ হয়ে আছে
তাদের শরীরে তীব্র পাতা ঝরানোর মতো ঝড়
সূর্যবিরুদ্ধতা, দিতে পারো কিনা—তুমি যাও, জানলা খুলে দেখ।
পৃথিবীর দৃশ্যে কেন সমস্ত নিসর্গ আজ অর্থহীন ম্লান!
সৌম্য তুমি উঠ, উঠে জানলার নিরুত্তর ঋণ
নীলে বেঁচে থাকা তবু জেগে থাকা কেন নয়? উত্তরে অন্তিম
শরীর, শোচনা, শব-সাধনার ভিক্ষাগুলি নিয়ে
ঝংকারের মতো নাড়ো, পঞ্চমে বাজাও।

প্রকৃতিতে বহুদিন জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, দাহ নেই অতিথি বজ্রের।

ব্যবধান

শ্রীইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়

তোমার প্রতীক্ষার ছায়া
আমাকে পোড়ায় আমি
কিছুতেই পারি না পৌঁছাতে
যেখানে শ্বেতপাথর চাপা
তোমার চিঠি রয়েছে। আমি
নিজের হাতে কিছুতে পারি না
প্ররোচনা এবং সিদ্ধান্ত মেলাতে;
জ্যোৎস্না তবে থান কাপড়
মাঝখানে পথ রাখতো না
ধাঁধিয়ে; কারণ ভয়াবহ স্বার্থে
জড়িয়ে থাকে দু'টি গোখরো,
স্বপ্নে থুথু ছিটিয়ে; একা
বৃষ্টি ভিজে পাগল পথে পথে।
তোমার প্রতীক্ষার ছায়া
আমাকে পোড়ায়; কথা মতো
একটা দিনও পারি না পৌঁছাতে
যেখানে শ্বেতপাথর চাপা
তোমার চিঠি চিরসজাগ
অপূরণীয় প্রতীক্ষাপরায়ণ।

অসামান্যা

নরেন সরকার

ও তার চাতকের নিয়ত মেঘ-চাওয়া করুণ দুই চোখ
কেবলই আকাশের করুণা খুঁজছে,
কিংবা তাও নয়, হয়ত দিনমান
যেন সে প্রাণপণ ভাঙছে নির্মোক,
আর সে আকুলতা উদার আলোকের সীমানা খান্‌খান্‌
চাইছে উচ্চে।

কত ত পড়ে জল, বৃষ্টিধোয়া জল, সব সে নিত যদি
তা হ'লে এতদিনে বহতো তারও নদী
ভাঙ্‌তো সব পাড়
বুকের কাছে যেন গোপন কালীদহে মাতাল কত ঢেউ
উঠত বারবার।

ও মেয়ে চিরকাল রজনীগন্ধার স্নিগ্ধ ঋজুতায়
সরল বিস্তৃতি হৃদয় জুড়ে চায়,
তাই ত গলিপথ যেখানে সূর্যও আসে নি কোনদিন
সেখানে বেড়ে উঠে বদ্ধ আলোহীন
যদিও সেও এক প্রতিমা আঁধারের,
তবু কি প্রত্যাশে ফিরিয়ে দিয়ে যায়
ক্ষুদ্র প্রলোভন ছদ্ম আলোকের।

ও মেয়ে একা একা দাঁড়িয়ে আছে ঠায়॥

নায়ে উঠলাম

পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য

নিজের ছায়াকে আমি দূর পথ মাড়িয়ে মাড়িয়ে
একটা খুশির নদী দেখতে পেলাম।
ডাঙাটা বাঁ পায়ে ঠেলে ডান পায়ে নায়ে উঠলাম।

এখানে মাথায় ছই, বসার জন্য পাটাতন,
নির্ভর করার হাল, হাতের নাগালে বৈঠা,
আকাশে মেলার মতো পাল
সব আছে।

এক বুক নিঃশ্বাস পায়রার ঝাঁক হয়ে
আকাশ পেয়েছে।



কালি আর কয়লার অজস্র ছোপ-মারা তেলচিটে ট্রাউজার আর হাফশার্ট পরে ডিউটিতে রওনা হবার জন্য প্রস্তুত হ'ল রেলইঞ্জিনের ড্রাইভার জয়ন্ত চৌধুরী। চামড়ার ভারি জুতোজোড়ার ফিতে বাঁধা শেষ হতেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল—গৃহিণী প্রতিমা খাবার ভর্তি টিফিন কেরিয়ার হাতে সামনেই দাঁড়িয়ে—

দেরি হ'ল বোধ হয়—জয়ন্ত ত্রস্তভাবে হাতের ঘড়িটার দিকে এক নজর দৃষ্টি বুলিয়েই বলল—"চলি, এ্যা—"

নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে প্রতিমা টিফিন কেরিয়ারটা তুলে দিল স্বামীর হাতে, তারপর পিছু পিছু চ'লে গেল তার লক্ষণের সীমাগণ্ডি সদর দরজা পর্যন্ত—জয়ন্ত দরজাটা খুলে ঘট্‌ঘট্ করে পেরিয়ে গেল টালি দিয়ে ছাওয়ান নিজেদের সিমেণ্ট বারান্দা—পিচের সদর রাস্তা থেকে অভ্যাসমত একবার পিছু ফিরে তাকাল—ঠায় দাঁড়িয়ে আছে প্রতিমা।

পরক্ষণেই সদর দরজাটা বন্ধ হওয়ার বিশেষ শব্দ কানে ভেসে এল জয়ন্তর। আগামী আটচল্লিশ ঘণ্টার মত সম্পর্ক চুকে গেল স্বামী-স্ত্রীর—নাইন আপ তুন এক্সপ্রেসটা উল্কার মত ছুটিয়ে চলবে জয়ন্ত, তারপর ছুটি সেই মধ্যরাত্রির পরে, গয়া জংশনে।

ছোট থেকেই কলকব্জার দিকে বিশেষ ঝোঁক ছিল জয়ন্তর। মামা-মামীর সংসারে মানুষ—ওদের দেওয়া ভাত আর গঞ্জনা অনেক খেয়েছে বাল্যকালে, কিন্তু বেপরোয়া জয়ন্ত গ্রাহ্যই করে নি কোনদিন, তারপর কোন রকমে আই. এস-সি. টা পাস করেছিল। মামা নিজে রেলের চাকর, ভাগ্নে জয়ন্তকে প্রথম ঢুকিয়ে দেয় ইঞ্জিনের ফায়ারম্যান ক'রে—তার পর জয়ন্ত নিজের ঐকান্তিকতার পুরস্কারে অল্পদিনেই হ'ল মালগাড়ির ড্রাইভার।

জয়ন্ত স্টেশনের দিকে চলেছে, বাঁ-হাতে ঝুলছে প্রতিমার দেওয়া টিফিন কেরিয়ার, ডান-হাতে জলন্ত সিগারেট—মনের মধ্য থেকে তখনও মুছে যায় নি সুন্দরী স্ত্রী প্রতিমার প্রতিবিম্বটা। এদিক্ দিয়ে সত্যি ভাগ্যবান্ জয়ন্ত। প্রতিমা যেরকম রূপসী তাতে ও যে-কোন রাষ্ট্রদূতের গৃহিণী হতে পারত—অদৃষ্ট! তা না হ'লে প্রতিমা কি ক'রে হয় জয়ন্ত ড্রাইভারের স্ত্রী!

"—ড্রাইভার—!"

সহকর্মী বন্ধু দেবু একদিন দীর্ঘশ্বাস ফেলে জয়ন্তকে সখেদে বলেছিল, "ভাই রে, আর যা-ই করিস না কেন, খবরদার বিয়ে-টিয়ে যেন করিস্ না। গাড়োয়ানের আবার বউ-এর সখ কি বাবা! তোর মনে পড়ে ড্রাইভার ইমদাদ মিঞার কথা?"

ইমদাদ মিঞার কথা ভাল করেই মনে পড়ে জয়ন্তর—চাকরির প্রথমে জয়ন্ত আর দেবু ছিল ওস্তাদ ড্রাইভার ইমদাদ মিঞার অধীনে ফায়ারম্যান—ওরা দুজনেই গুরুর মত ভক্তি করত ইমদাদকে, প্রতিদানে ইমদাদ মিঞাও ওদের শিক্ষা দিয়েছিল পরম যত্নে, ভালবেসেছিল ছোট ভাইয়ের মত—ড্রাইভারের জীবনের কত অভিজ্ঞতা আর জ্ঞান অর্জন করেছিল ওর কাছে। সেই ইমদাদ মিঞা পরে একদিন মারা গেল রেল দুর্ঘটনায়—ইমদাদের

রূপসী বিবি রাবেয়া প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে এসে দাঁড়াত রেল-ফটকের ধারে—লোকো শেডে ইঞ্জিনখানা জমা দিয়ে হয়ত কোনদিন ইমদাদ আবার হাসিমুখে এসে দাঁড়াবে আদরিণী রাবেয়া বিবির সামনে!

"কোন বউ," দেবু তির্যক্ হেসে বলেছিল,—"বলতে পারিস জয়ন্ত আজকের দুনিয়ায় ক'টা বউ রাবেয়া বিবির মত রেলফটকের ধারে এসে প্রতীক্ষা করে, বিশেষ করে সে বউ যদি সুন্দরী হয়? তাই ত বলি বিয়ে-টিয়ে করিস্ না! এই দেখ্ না, এখন রাত্রি ৯টা, সুন্দরী বউটাকে বুড়ী পিসীর জিম্মায় ফেলে চলে এসেছি স্টেশনে—রাত্রি দশটায় ডিউটি সুরু—সেভেন আপ জনতা এক্সপ্রেসটাকে ছুটিয়ে নিয়ে যাব কোন্ দিকে! অন্তত পঞ্চাশ ঘণ্টার মত স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্ক চুকে গেল—গিন্নীর এটা একরকম সাময়িক বৈধব্য; আবার সাময়িক বৈধব্য পাকা হতেই বা কতক্ষণ? তাই বলছি জয়ন্ত—ওপথে শ্যাম যেও না যেও না! তাছাড়া—" দেবু কেমন যেন ইতস্তত করে।

"তা ছাড়া কি?"

"তা ছাড়া সত্যি বলতে কি—আমি ত এদিকে বহুদূরে কোন তেপান্তরের মাঠে ইঞ্জিনে বাঁশী বাজাচ্ছি, ওদিকে কোন কালো শশী বাজায় বাঁশী—" ইঙ্গিতটা যে কতদূর স্থূল, দেবুর আর বলা হ'ল না, প্ল্যাটফর্ম কাঁপিয়ে হুড়হুড় ক'রে ঢুকে পড়ল পাঞ্জাব মেল ট্রেনখানা। দেবুর সময় অতিরিক্ত হয়েছে সেভেন আপ জনতা এক্সপ্রেসের ইঞ্জিনখানা নিয়ে সাইডি'এ রেডি হয়ে থাকার।

স্টেশনে পৌঁছে গেল জয়ন্ত—প্রথম ফায়ারম্যান ভূপতি আর দ্বিতীয় ফায়ারম্যান সুধীর ইতিমধ্যে হাজির হয়ে গিয়েছে। সুধীরের হাতে টিফিন-কেরিয়ারটা দিয়ে জয়ন্ত ওদের পাঠিয়ে দিল শেডের দিকে, তারপর খাতাপত্রে সই করে নিজেও রওনা হ'ল—ইঞ্জিনটা সাইডিংএ এনে প্রস্তুত করে রাখতে হবে; ইলেক্ট্রিক ইঞ্জিনের সীমা এইখানে শেষ—তারপর তুন এক্সপ্রেসখানা টানবার পালা জয়ন্তর ষ্টীম ইঞ্জিনের।

কালো মিশ্‌মিশে বিরাট্ ইঞ্জিনখানা জয়ন্ত মসৃণ গতিতে চালিয়ে এনে দাঁড় করিয়ে রাখল সাইডিং-এর একধারে। ফায়ারম্যান মিনিটে মিনিটে কয়লা খাওয়াচ্ছে ইঞ্জিনের চুল্লীর মুখে। নাইন আপ তুন এক্সপ্রেস ১৭ মিনিট লেট আসছে। তা আসুক! ইলেক্ট্রিক ইঞ্জিনখানা খুলে বেরিয়ে যেতে যা দেরি। জয়ন্ত নিঃশব্দে পাকা হাতে জুড়ে দেবে তার বিরাট্ ইঞ্জিনখানা। যে যা-ই বলুক, ইলেক্ট্রিক ইঞ্জিনের চাইতে, জয়ন্তর মনে হয়, বিরাট্ দেহ ষ্টীম ইঞ্জিনের নিজস্ব একটা গাম্ভীর্য আছে, দম্ভ আছে গতিতে। ওস্তাদ ইমদাদ মিঞা বলত—নিজের বিবির মত ভালবাসতে হয়, তোয়াজ করতে হয় ইঞ্জিনকে—ছিমছাম রাখতে আর দানাপানি দিতে কসুর করবে না ভুলেও! লেকিন ভাইয়া, বিবিই বোল আর ইঞ্জিনই বোল, বিবেকটা নজরে রাখবে হরবখ্‌ত্!

জয়ন্ত দশফুট পিছনে চালিয়ে দিল ইঞ্জিনটা, পরমুহূর্তে কষে দিল ভ্যাকুয়াম ব্রেক—থেমে গেল ইঞ্জিনটা। ইঞ্জিনের ব্রেক তো ঠিক আছে কিন্তু.........

এসে গেল তুন এক্সপ্রেস—জয়ন্ত হাতের সিগারেটটা ফেলে দিল। কাছেই বসে-থাকা একপাল খাঁই খাঁই সন্দিগ্ধচিত্ত কাকের ভিড়ের মধ্যে। সতের মিনিট লেট এসেছে তুন এক্সপ্রেস—জয়ন্ত নিজের ঘড়িটা দেখল, সতের নয় ত, ঊনিশ মিনিট লেট। ওটা এমন কিছু নয় জয়ন্তর কাছে—জয়ন্ত পাবে একটানা দেড় ঘণ্টা ১০৫ কিলো মিটারের দৌড়। ঊনিশ কেন, তিরিশ মিনিট লেট পুষিয়ে নিতে পারে জয়ন্ত। যদিও নিষেধের বেড়ী আছে রেলকর্তাদের, কিন্তু গতির উপর একটা নেশা আছে বেপরোয়া জয়ন্তর—কাজেই—

ইলেক্ট্রিক্ ইঞ্জিনখানা খুলে বেরিয়ে যেতেই জয়ন্ত সন্তর্পণে ইঞ্জিনখানা নিয়ে গিয়ে জুড়ে দিল তুন এক্সপ্রেসের কামরায়—একবিন্দুও ঝাঁকানি নেই, একটুকুও টের পেল না যাত্রীরা—পাকা হাতের কাপ্‌লিং।

খালাসীরা সেলাম দিয়ে জানিয়ে দিল—ঠিক হ্যায়। গার্ড এসে দেখা করল জয়ন্তর সঙ্গে—আবার সেই "ঠিক হ্যায়—"। ফিরে গেল গার্ড সাহেব গাড়ির শেষ সীমান্তে নিজের কামরার দিকে।

হোম আর ডিস্‌ট্যান্ট্ সিগনালের পাখা পড়ল—

যাত্রার জন্য জয়ন্ত উন্মুখ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ইঞ্জিনের রড ধরে—গার্ড সাহেবের বাঁশী আর সবুজ নিশানের জন্য পিছনে তাকিয়ে আছে গার্ডের গাড়ির দিকে। অসংখ্য যাত্রী মৌমাছির মত ভিড় করে জমেছে প্রতিটি দরজার সামনে, ঠেলাঠেলি চলছে ওঠা-নামার, তারপর কোলাহল ছাপিয়ে শোনা গেল গার্ডের তীক্ষ্ণ সিটি, হাতে দুলছে সবুজ নিশানা।

সঙ্গে সঙ্গে গুরুগম্ভীর ভাবে বেজে উঠল ইঞ্জিনের বাঁশী—জয়ন্ত ঠেলে দিল ষ্টীম খুলে দেবার রড্‌টা—প্রচণ্ড ষ্টীমের চাপে ইঞ্জিনের চাকাগুলো বারকয়েক ঘুরপাক খেল

পিছল লাইনের ওপরে—যাত্রা শুরু হ'ল মসৃণ অথচ নিশ্চিত গতিতে। স্টেশন-প্রাঙ্গণের অসংখ্য লাইনের জট ছাড়িয়ে ওভার-ব্রিজের তলা দিয়ে এঁকে-বেঁকে এগিয়ে চলল নাইন আপ তুন এক্সপ্রেস—আধ মিনিটেই পেরিয়ে গেল ডিস্‌ট্যান্ট সিগ্‌ন্যাল—এখন ফাঁকা উন্মুক্ত মাঠ, সামনের সাতষট্টি মাইলের মধ্যে থামতে হবে না। জয়ন্ত দেখে নিল নানারকম মিটার, ষ্টীমের চাপ, জলের চাপ—তারপর ডানদিকে ভ্যাকুয়াম ব্রেকের ধারে ছোট্ট আসনে বসে তাকিয়ে থাকল সামনের লাইনের বিস্তৃতির দিকে। ফেলে এল বর্দ্ধমান, ফেলে এল প্রতিমার কোয়ার্টার, উল্কা গতিতে এখন এগিয়ে চলেছে ইঞ্জিন—হু-হু ক'রে বাতাস ঢুকছে সামনের ছোট্ট গবাক্ষ দিয়ে—জয়ন্ত আঁটসাট করে মাথায় বেঁধে নিল রুমালটা।

ইঞ্জিনের নানারকম মিটার আছে, কিন্তু স্পীড-মিটার নেই—ঘড়ি আর টেলিগ্রাফের খুঁটি গুনে হিসাব রাখতে হয় গাড়ির গতির। ইঞ্জিন এখন যে গতিবেগ সঞ্চয় করেছে তাতে আর প্রাথমিক যাত্রার মত বাড়তি ষ্টীমের প্রয়োজন নেই—চাকার ঘর্ষণটুকু শুধু এড়িয়ে যাওয়া, তা নাহ'লে ইঞ্জিনের গতিবেগ সীমাহীন ভাবে বেড়েই চলবে।

ফায়ারম্যান ভূপতি জয়ন্তর চোখের নির্দেশ বুঝতে পারে—বুঝতে পারে যে, এখন ষ্টীমের খরচটা কমিয়ে দেওয়া প্রয়োজন—দিলও তাই।

আসানসোল ছেড়ে এল, সূর্য বসতে যাচ্ছে পশ্চিমে—কয়লার খনি-অঞ্চল এটা, জমিতে মাটিতে কয়লার সামান্য কালো আভা, এখানে-ওখানে কয়লা তোলার ডেরিকগুলো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। সীতারামপুর এসে গেল। ইঞ্জিনটা দুলে উঠল সামান্য—মেন লাইন ছেড়ে দিল জয়ন্তর ইঞ্জিন—এখন পথ বাঁয়ে, গ্র্যাণ্ড কর্ড লাইন ধরে।

সূর্য ডুবল দিগন্তের কোলে, অল্প অল্প মেঘ জমছে আকাশে, গোটা আকাশ জুড়ে কে যেন ছড়িয়ে দিল লাল আবীর। রক্তিম আভায় ভ'রে উঠল পৃথিবীটা। এই সময়ে বড্ড মনে পড়ে প্রতিমার কথা - কি করছে প্রতিমা? তুলসী-তলায় হয়ত প্রদীপ দেখাচ্ছে—ঘোমটা বেড়ে হয়ত আছে গলবস্ত্র—নয়ত? ভাবছে কি জয়ন্তর কথা? কে জানে! জয়ন্তর বিয়ে হয়েছে কতদিন? বছর দুই হবে,—দেবুর বিয়ের এক বছর পরে। বৌভাতের রাত্রে দেবু জয়ন্তর কানে কানে বলেছিল, "সর্বনাশ করেছিস্ জয়ন্ত!"

"কেন বল্ ত?"

"কেন কি রে! বৌ নয় চাঁপার কলি! সৌখিন ফুলদানিতে যে ফুল সাজিয়ে রাখার কথা—শেষটা তুই সেই ফুল নিয়ে তুলবি লোকো-শেডের খোপে—" তারপরই দেবু ঠাট্টা করে ছড়া কেটে ছিল—"বউ দেখে যাও, বউ দেখে যাও, কনকচাঁপার ফুল! বর দেখে যাও, বর দেখে যাও,"রান্নাঘরের ঝুল!"

বেপরোয়া জয়ন্ত সেদিন কাঁধ ঝাঁকিয়ে হো হো ক'রে হেসেছিল, কিন্তু এখন যেন মনে হয় দেবুর কথাটা নেহাতই হেসে উড়িয়ে দেবার নয়—ফুলদানির সৌখিন ফুল জয়ন্ত তুলে এনে সাজিয়েছে রান্নাঘরের ঝুলের মধ্যে। রেল কোয়ার্টারের আর পাঁচজনে প্রতিমার রূপের অকুণ্ঠ প্রশংসাই করেছিল—সেদিক্ দিয়ে জয়ন্তর স্ত্রীভাগ্যটা সত্যি ভাল। কিন্তু প্রতিমার নিজের স্বামী-ভাগ্যটা কেমন? উত্তর ত দেবু দিয়েই রেখেছে—"বর দেখে যা, বর দেখে যা—রান্নাঘরের ঝুল!" সত্যি—দু'বছর হ'ল বিয়ে হয়েছে, কিন্তু প্রতিমার কাছে জয়ন্ত কি পেয়েছে? না—না—পেয়েছে হয়ত সবই. শুধু পায় নি হয়ত তাই যা কেউ কোনদিন চেয়ে পায় না, পায় না জোর করে আর অর্থের বিনিময়ে, অথচ যে পাবার সে পায় এমনিতেই! জয়ন্তর প্রতিমা মাটির প্রতিমাই থেকে গেল, মানুষের প্রতিমা হ'ল কই?

সমান গতিতে ছুটে চলেছে তুন এক্সপ্রেস—অন্ধকারে ভ'রে গিয়েছে পৃথিবীটা। জয়ন্ত খেয়াল করে নি কখন যে ভূপতি সুইচ টিপে জ্বেলে দিয়েছে কামরা আর ইঞ্জিনের বাতি—ঐ ত এসে গেল লাইনের তীক্ষ্ণ বাঁকটা! ষ্টীমটা বন্ধ করে জয়ন্ত ভ্যাকুয়াম ব্রেকের বারটা কিছুটা নামিয়ে দিল—অভ্যস্ত কানে শুনতে পেল ইঞ্জিনের চাকায় চাকায় ব্রেকের কঠিন আলিঙ্গন, শ্লথ হয়ে এল এক্সপ্রেসের গতি—এসে গেল দক্ষিণমুখো বাঁকটা, ইঞ্জিন আর কামরাগুলো ঈষৎ হেলে গেল ডান দিকে, তারপর দেখতে দেখতে আবার সোজা হ'ল লাইন—জয়ন্ত আবার খুলে দিল ষ্টীম, ধীরে ধীরে বেড়ে চলল ইঞ্জিনের গতি। পুঁ-উ-উ—ছোট্ট স্টেশনটাকে সামান্য দোলা দিয়ে পেরিয়ে গেল তুন এক্সপ্রেস—

ওদিকে ভূপতি ফায়ারম্যান স্টেশনের পর স্টেশন থেকে নির্ভুলভাবে ছোঁ মেরে তুলে চলেছে তারের চাকতি ট্যাবলেট ছাড়পত্র, বিনিময়ে নিজেরটা ফেলে দিচ্ছে অন্ধকারে মশাল জ্বেলে দাঁড়িয়ে-থাকা পয়েন্ট্‌স্-ম্যানের পায়ের কাছে—

জয়ন্ত আকাশের দিকে চেয়ে দেখল—একটাও তারা দেখা যাচ্ছে না—গোটা আকাশটা ঢেকে গিয়েছে মেঘে।

রাত্রি বারটা একুশ মিনিটে গয়া ষ্টেশন—জয়ন্তদের ডিউটি শেষ। ছুটি হবে ইঞ্জিন সমেত জয়ন্তর, গার্ডের। ইঞ্জিনের তাতে ঝলসান শরীরটা তখন চায় শীতল অবগাহন—নীরব স্নিগ্ধ শান্ত পরিবেশ। দেবুর ভাষায়, "বউ হবে স্নিগ্ধ শীতল। টগবগে তেজী বউ আমাদের মত আগুনে ঝলসান মানুষের জন্য নয়!" প্রতিমা কিন্তু উষ্ণ ত নয়ই, বরং শীতল—হিম—

দূর ছাই! এসব আজে-বাজে কি চিন্তা করছে জয়ন্ত! ইমদাদ মিঞা বারংবার বলেছিল, "ইঞ্জিনের মত হিংসুটে সতীন আর নেই,—ভুলেও মনে করবে না ঘরে ফেলে-আসা বিবির কথা,—ও ঠিক ধ'রে ফেলবে তোমার চুরি করা চিন্তার কথা,—অভিমানে হয়ত গাড়িসমেত ঝাঁপ দেবে বাঁধের নীচে খাদে! ইয়াদ রাখবে ভেইয়া—হাজার হাজার আদমির জানের ইজারাদার তুমিই—"

ঠিক-ঠিক! প্রতিমার কথা আর একটুও নয়। জয়ন্ত ঝট্ ক'রে উঠে পড়ল নিজের সিট থেকে,—দ্বিতীয় ফায়ারম্যান সুধীরের হাত থেকে কয়লা-তোলা বেলচাটা নিয়ে নিল, তার কোন আপত্তিই শুনল না জয়ন্ত, খুলে ফেলল চুল্লীর ঢাকনি—সুপটু আর সবল হাতে দিয়ে দিল কয়েক খোন্তা কয়লা—

ভুপতি পিছনে কয়লা রাখার টেণ্ডারে ঠুকে ঠুকে কয়লা ভাঙছিল ঠাণ্ডা বাতাসে বসে—হঠাৎ হাতের কাজ বন্ধ করে তাদের ওপরওয়ালার খেয়ালিপনা লক্ষ্য করছিল—

"কি দেখছ ভুপতি?"

ভুপতি ভাবতেই পারে নি যে জয়ন্ত ওর দিকে তাকাবে—লজ্জিতভাবে আবার লেগে গেল কয়লা ঠুকতে।

জয়ন্ত উঠে গেল কয়লার গাদার ওপর, ভুপতির হাত থেকে হাতুড়িটা কেড়ে নিয়ে নিজেই ঠুকতে সুরু করে দিল কয়লা। কিন্তু—কিন্তু—

জয়ন্ত হাতুড়ি ঠোকা বন্ধ ক'রে কুকুরের মত কান খাড়া করল—ইঞ্জিনের কোথা থেকে যেন আসছে একটা মৃদু শব্দ—কুঁই-কুঁই-কুঁই—

"আসানসোলে তেল দিয়েছ?"

দেয় নি। লজ্জিত ভাবে জিভ কাটল ভুপতি।

"কেন দাও নি?" ধমকে উঠল জয়ন্ত, সুধীর সামনে থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে ভুপতির অপ্রস্তুত মুখের দিকে তাকিয়ে বেশ মজা উপভোগ করছিল—

"এও—সুধীর!" অর্থাৎ সুধীরের কাজ এখন শুধু সামনের লাইনের দিকে সজাগ আর সতর্ক দৃষ্টি রাখা—মজা দেখার সময় এটা তার নয়।

সুধীর পুনরায় ইঞ্জিনের গবাক্ষ দিয়ে চেয়ে রইল। ইঞ্জিনের সার্চলাইটের আলোয় দুপাটি লাইন ঝক্ ঝক্ করছে দুখানা তরওয়ালের মত। ঝম ঝম করে বৃষ্টি এসে গেল—ধোঁয়া আর কয়লা পোড়ার গন্ধ ছাড়িয়েও পাওয়া গেল ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ। এইটুকু ভিজে মাটিতে কিছু আসে-যায় না, তবু সাবধানের মার নাই—জয়ন্ত ইঞ্জিনের গতি একটু কমিয়ে দিল, কিন্তু সেই কুঁই কুঁই শব্দ—

"ভুপতি, অয়েল-ক্যানটা কই?" ইঙ্গিতটা ভুপতি বুঝতে পারল অর্থাৎ এক্ষুণি তেল দিতেই হবে। কোথায়? না ইঞ্জিনের পাশ দিয়ে যে ইঞ্চিকয়েক স্থান আছে ইঞ্জিনের আগুমাথায় যাবার জন্য, সেইখান দিয়ে এগিয়ে গিয়ে তেল দিতে হবে ঘর্ষণরত ইঞ্জিনের অংশে। বৃষ্টিটা অবশ্য ধরে এসেছে এখন।

ভুপতি অয়েল-ক্যান্ নিয়ে পা বাড়াল।

"কই, আমাকে দাও," জয়ন্ত ভুপতির হাত থেকে অয়েল-ক্যানটা জোর করেই কেড়ে নিল।—"ক'দিন আগে তোমার না ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছিল?"

"হ'লই বা। তাই বলে আপনি যাবেন নাকি তেল দিতে?"

"খুব বাহাদুর দেখছি!"

বৃষ্টি নেই কিন্তু শন্‌শন্ করে বাতাস বইছে,—বাইরে কুচকুচে অন্ধকার। জয়ন্ত অয়েলক্যান হাতে ইঞ্জিনের বাঁ-পাশ দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল ইঞ্জিনের সামনের দিকে। যে কর্তব্য করতে ভুল করেছে ভুপতি, সেটা শুধরে নিতে হচ্ছে ড্রাইভার জয়ন্তকে—ড্রাইভারের জীবনের সঙ্গে গ্রন্থি দেওয়া আছে শতশত যাত্রীর নিরাপত্তা!

হু হু ক'রে ছুটে চলেছে দুন এক্সপ্রেস নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ফুঁড়ে।—লাইনের পাশে ছোট ছোট বস্তিতে মাটির খাপরার চালের নীচে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে বিহার দেশের দেহাতি মানুষ।

ইঞ্জিনটা প্রদক্ষিণ করে ফিরে এল জয়ন্ত,—হাঁফ ছেড়ে বাঁচল ভুপতি আর সুধীর,—এতটা দুঃসাহসের কাজ না না করলে কি ভাগবত অশুদ্ধ হ'ত? যদি কিছু হ'ত, কোন্ মুখে ওরা গিয়ে দাঁড়াত ভগবতীর মত প্রতিমা দেবীর সামনে,—কি কৈফিয়ত দিত?

ভুপতি ষ্টীম বন্ধ করে দিল, তারপর টান দিল ভ্যাকুয়াম ব্রেকে—"বরাকর সিগ্‌ন্যাল দেয়নি স্যার্।"

জয়ন্ত হাতঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল,—লেট মেকআপ হয়ে বরং তিন মিনিট আগেই এসেছে বরাকরে, কিন্তু উপায় নেই। লাট সাহেবের গাড়িও উপেক্ষা করতে পারে

না সিগ্‌ন্যালের নির্দেশ। তুন এক্সপ্রেস স্রুড়স্রুড় করে দাঁড়িয়ে গেল আকাশচুম্বী ডিসট্যাণ্ট সিগন্যালের পায়ের কাছে—গোটা কয়েক হুইসেল্‌ও দিল ভূপতি।

রাত্রির আহার টিফিন কেরিয়ার খুলে সেরে নিল জয়ন্ত।—এখন ব'সে ব'সে সিগারেট টানছে। সুধীর নিয়মিতভাবে কয়লা দিয়ে যাচ্ছে চুল্লীতে। ইঞ্জিনের সেফটি ভাল্‌ভ দিয়ে তীব্র বেগে আর কান ঝালাপালা শব্দে বেরিয়ে যাচ্ছে ফালতু সাদা ষ্টীম—তারপর এক সময়ে ফট্‌ করে বন্ধ হয়ে গেল শব্দ, এখন শুধু ঝিঁঝিঁ পোকার মত শব্দ বেরুচ্ছে ইঞ্জিনের কোন গুপ্ত অঞ্চল হতে।

কোথায় যেন কোন রসিক-যাত্রী গলা ছেড়ে গান গাইছে,—কোথায় কোন কামরায় বাচ্চা ছেলে একটানা কেঁদে চলেছে মায়ের আদর নাকচ করে,—এসব জয়ন্ত রাত্রির নিস্তব্ধতায় চোখ বুজে শুনছে।

প্রতিমা—? এতক্ষণ হয়ত সে ঘুমে অচেতন। আবার প্রতিমার কথা! জয়ন্ত নিজের মনকে চোখ রাঙ্গাল, তারপর নিজেই উঠে ইঞ্জিনের বাঁশীটা বাজিয়ে দিল,—প্রয়োজনের তাগিদে নয়, শুধু মনের ভিতর থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে প্রতিমার চিন্তাটা। কিন্তু মন ত ফাঁকা থাকবার নয়, তক্ষুণি মনে পড়ে গেল বন্ধু দেবুর কথা, "আমি ত এদিকে কোন্ তেপান্তরে ইঞ্জিনের বাঁশী বাজাচ্ছি, ওদিকে কোন্ কালো শশী—" মুখের কোন আগল নেই দেবুটার—নিজের মনেই হেসে ফেলল জয়ন্ত।

সিগ্‌ন্যাল পড়ল। ১৩ মিনিট সময় গেল বৃথা। গয়া জংশনের আগেই ওটা আবার পুষিয়ে নিতে হবে জয়ন্তকে।

৫৩ ঘণ্টা পরে জয়ন্ত ডাউন কাল্কা-হাওড়া মেল চালিয়ে নিজের স্টেশন বর্দ্ধমানে ফিরল, রাত্রি তখন ন'টা বেজে পাঁচ মিনিট। লোকো শেডে যথারীতি ইঞ্জিনখানা জমা দিয়ে যখন স্টেশনের বাইরে এল তখন ঝম্‌ঝম্ করে বৃষ্টি হচ্ছে। ভারি আরাম লাগছে জয়ন্তর—আঃ! তাতাপোড়া শরীরটা জুড়িয়ে যাচ্ছে বৃষ্টির ধারায়। বাংলা দেশের বৃষ্টি, এর ধরণই আলাদা—এমন স্নেহবর্ষণ আর কোথায় আছে? একটা মাত্র গান জয়ন্তর পুরোপুরি জানা আছে,—"মা আমায় ঘোরাবি কত।" সত্যি, রামপ্রসাদ যেন জয়ন্তদের কথা চিন্তা করেই লিখে গিয়েছেন "মা আমায় ঘোরাবি কত।"—তা নয়ত কি? সেই ৫৩ ঘণ্টা আগে ঘরসংসার ফেলে রেখে ঘুরতে গিয়েছিল।

আর চিন্তা করা হ'ল না, জয়ন্ত নিজের কোয়ার্টারের বারান্দায় উঠে পড়ল—কড়াটা নাড়ল, খট্—খট—খট্—জয়ন্ত কড়াটা নেড়েই যাচ্ছে কিন্তু কোন সাড়া নেই প্রতিমার।—বৃষ্টির শব্দে ডুবে যাচ্ছে নাকি কড়া নাড়ার শব্দ? না, না, কোথায় যেন কোন মেয়েছেলে গান গাইছে—সে শব্দ ত জয়ন্ত দিব্যি শুনতে পাচ্ছে! তা হ'লে বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে সকাল সকাল।

দরজায় তালা ঝুলছে।

মানে? কপাল ভুরু কুঁচকে উঠল জয়ন্তর। এমন ত কোনদিন হয় নি,—ব্যাপার কি? সম্ভব থেকে অসম্ভব, অসম্ভব থেকে অবাঞ্ছিত নানা চিন্তা কিল্‌বিল্ করে উঠল জয়ন্তর মাথার মধ্যে—তবে কি—

"জয়ন্তদা?"

"কে?"

"আমি প্রবীর, আমি আরও দু'বার এসে ফিরে গিয়েছি,—প্রতিমা বৌদি পাঠিয়েছিলেন।

"প্রবীর? কি ব্যাপার বল ত?"

"বৌদি যে আমাদের বাড়ীতে।—অত সুন্দর রবীন্দ্র সংগীত গাইতে পারেন—কই, বলেন নি ত কোনদিন? কি সাংঘাতিক চাপা মানুষ আপনি!" প্রবীর ক্লাস সেভেনের ছাত্র, বয়সের অনুপাতে একটু বেশী জ্যাঠা! কারণ, একে বড় রেলস্টেশনের ওপরওয়ালার ছেলে, তার উপর সনাতনবাবুর সংসার প্রগতি-পন্থী।

প্রবীর আবার আরম্ভ করল, "জানেন, প্রতিমা বৌদির গান শুনে সকলে যা প্রশংসা করছিলেন—মা, দিদি, শম্পা বৌদি, ছোট মামা, ছোট মামার বন্ধুরা। জানেন ত, ছোট মামার স্বভাবই হ'ল সব তাতেই নাক সিঁটকানো—ডিভিশনাল কমিশনারের ভাইঝি—খু-উ-ব সুন্দরী, তাকেই পছন্দ হ'ল না ছোট মামার! সেই ছোট মামা যা প্রশংসা করলেন প্রতিমা বৌদির—"

একটি চড় কষে দিতে ইচ্ছে হ'ল জয়ন্তর, কিন্তু সামলে নিয়ে শুধু বলল, "হুঁ"।

—"চলুন না জয়ন্তদা আমাদের বাড়ী—রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসবের ব্যবস্থা করেছেন মা। বেশী না, একটু শুনেই চ'লে আসবেন।

কি যেন চিন্তা করল জয়ন্ত, তারপর বলল—"চল।"

সনাতনবাবুর সদর ঘর। গোটা-দুয়েক ফ্লুওরেসেণ্ট আলোয় ভ'রে আছে ঘরখানা। একদিকে রবিঠাকুরের ছবি—মালা পরান; একগুচ্ছ ধূপশলাকা জলছে কাছেই। চেনা-অচেনা পাঁচ-ছ'জন পুরুষ আর জনকয়েক মহিলা,—রঙীন ভয়েল নাইলন আর সূক্ষ্ম আদ্দি-



কে সে? কি চায়?

বেনারসীর ঝকমকে পরিবেশ দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে এই চাঁদের হাট—গান গাইছে প্রতিমা—

ঘরের চৌকাট পেরিয়েই জয়ন্ত থমকে দাঁড়িয়ে গেল,—এ কোথায় এল জয়ন্ত? তেল-কালি মাখা হাফ শার্ট, ট্রাউজার, অবিন্যস্ত চুল, কাদায় ভর্তি ভারি জুতোজোড়া—বৃষ্টির জল গা বেয়ে পড়ছে মেঝেয়—এমন যে কদাকার মানুষ জয়ন্ত, সে গিয়ে দাঁড়াল চাঁদের হাটে!

"কাকে চাই?" এক অপরিচিত রুক্ষভাবেই প্রশ্ন করল জয়ন্তকে।

কাকে চাই? তেতেপুড়ে ক্লান্ত দেহে বাড়ী ফিরেছে জয়ন্ত,—সে চাইছিল প্রতিমার মিষ্টি-মধুর সান্নিধ্য, আকাঙ্ক্ষা করছিল তার সুষমিত দেহবল্লরীতে সংবর্দ্ধনার সলজ্জ ইঙ্গিত। সেই প্রতিমা আজ এই চাঁদের হাটের একজন, জয়ন্তর যেন কেউ নয়। এখানে এরা, ভ্রূকুটি করে প্রশ্ন করে জয়ন্তর পরিচয় সম্বন্ধে—কে সে? কি চায়?

দপ্ করে জ্বলে উঠল জয়ন্তর টানাটানা চোখ দুটো—কুঁচকে উঠল কপালের রেখা—না, থাক্।

ঠোঁট কামড়ে নিরুত্তর ভাবে গটগট করে জয়ন্ত নেমে গেল বাইরে, অন্ধকারে।

একমুহূর্ত দ্বিধা করল না প্রতিমা,—ছুটে বেরিয়ে এল জয়ন্তর পিছু পিছু। জয়ন্তর মধ্যে এতদিন প্রতিমা শুধু

দেখেছে একজন শান্ত, সদাতুষ্ট, অহুদ্ধত শিব-ভোলানাথকে,—সেই শিবম্ সুন্দরমের চোখে আজ যেন ফুটে উঠেছে ক্রোধান্ধ ধূর্জটির সংহার-সংকল্প।

ভয়ে থুরথুর করে শিউরে উঠল, কেঁপে উঠল প্রতিমার বুকটা, কিন্তু সেই সঙ্গে এক অবর্ণনীয় আনন্দে ভ'রে উঠল তার অন্তর। যে পুরুষের পৌরুষ নেই, দর্প নেই অধিকার করবার, সে পুরুষ স্ত্রী হয়ত পায়, কিন্তু নারীকে পায় না কোন দিন!

জয়ন্ত গিয়ে বসল নিজের বারান্দায়—মাথার চুলগুলো নির্মমভাবে টানতে লাগল মুঠি মুঠি করে—প্রতিমা জয়ন্তর হাত ধরে টেনে বলল, "উঠে এসো লক্ষ্মাটি—আচ্ছা মানুষ! ওঠ—লোকে দেখে ত কি বলবে বল ত?"

উঠে ঘরে ঢুকল জয়ন্ত। ভালমন্দ আর কিছুই বলল না। গায়ের তেলচিটে জামাটা বারান্দার একদিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গামছা আর সাবান নিয়ে চলে গেল বাথরুমে। প্রতিমা ব্যস্তসমস্ত হয়ে চায়ের কেটলিটা চড়িয়ে দিল স্টোভে।

প্রতিমার দেওয়া চায়ের কাপটা টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিল উঠানে। অভুক্ত রইল প্রতিমার বাড়া ভাত।

ঘুম নেই জয়ন্তর। জীবনে যে আর শান্তির ঘুম আসবে বলে মনে হয় না। দেহ না মন, কোন্‌টা ঘুমোয়? শরীরের তাগিদে দেহটা হয়ত ঘুমোবে কিন্তু জয়ন্তর মন আর ঘুমোবে না! কিন্তু সত্যি বলতে কি, ভুল জয়ন্তও করেছে। দেবুটা ঠিকই বলেছিল, কঠিন সংসারকে সেই চিনেছ ঠিক—ফুলদানির সৌখিন ফুল লোকো শেডের আস্তাবলে মানায় না। প্রতিমার কি দোষ? পায়রা পায়রার ঝাঁকের মধ্যেই গিয়ে বসে—শালিকের ঝাঁকে নয়! প্রতিমার আর কি দোষ!

জয়ন্তর অপ্রকাশিত মানসিক রায়ে অবশ্য প্রতিমা নির্দোষী ব'লে সাব্যস্ত হ'ল, কিন্তু এ রায় অভিমান আর রাগের ভুয়ো রায়, কারণ, বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেল,—জয়ন্ত আর প্রতিমার মধ্যে ব্যাক্যালাপ বন্ধ হ'ল সম্পূর্ণ ভাবে। প্রতিমা মুখ বুজে ভাত বেড়ে দেয়,—জয়ন্ত নাম মাত্র খেতে বসেই উঠে যায়। কলের পুতুল যেন এগিয়ে দেয় চা,—জয়ন্ত দু'এক চুমুক হয়ত খায়! ওরা আছে সত্যি, কিন্তু নেই যেন ওদের অস্তিত্ব।

দিন পনের চ'লে গেল।

জয়ন্ত নাইন আপ তুন এক্সপ্রেস আর ডাউন কান্‌কা-হাওড়া মেল চালায়। এর মধ্যে বেশ কয়েক পা দেওয়া হয়েছে নিজের স্টেশন আর গয়ার মধ্যে ফায়ারম্যান ভূপতি আর সুধীর লক্ষ্য করেছে, ড্রাইভার জয়ন্ত কেমন যেন হয়ে গিয়েছে আজকাল। গতি নেশায় ওকে যেন পেয়ে বসেছে, হুঁশ থাকে না নিরাপত্তা বিষয়ে। "সার, ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল ইঞ্জিন যাচ্ছে—"

"তাই নাকি—আচ্ছা—আচ্ছা।" ষ্টীমটা বন্ধ ক'রে টেনে দেয় ব্রেক।

স্টেশনে গাড়ি থামলেই জয়ন্ত নেমে যায় ইঞ্জিন থেকে—অস্থির ভাবে পায়চারি করে ইঞ্জিনের পাশে প্লাটফরমে—সিটি পড়েছে গার্ডের, কোন খেয়াল নেই ড্রাইভার সাহেবের। ভূপতি ইঞ্জিনের বাঁশীটা বাজিয়ে দিতেই চমক ভাঙ্গে জয়ন্তর, ধীরেসুস্থে উঠে আসে ইঞ্জিনের ভেতরে, দিয়ে দেয় ষ্টার্ট, তারপর এক-আধ মাইল যেতে না যেতেই গাড়ির গতিবেগ বেড়েই চলে—৩৫—৪০—৪৩—৪৭—!

"সার্, সামনেই যে বাঁক!"

"বাঁক তা হয়েছে কি?

খেঁকিয়ে উঠে জয়ন্ত, কিন্তু পরক্ষণেই হাত দেয় ব্রেকে—ইমদাদ মিঞা সত্যি সত্যদ্রষ্টা—বিবিই হোক্ আর ইঞ্জিনই হোক্, বিরেকটা নজরে রাখবে হরবখ্‌ত্।

জয়ন্তর অসাক্ষাতে ভূপতি সুধীরের কানে কানে বলল, "ড্রাইভার সাহেবের সঙ্গে মেম সাহেবের বোধহয় ঝগড়া-টগড়া হয়ে গেছে—দেখছিস্ না সাহেবের হালচাল। তা ছাড়া বাড়ী থেকে টিফিন কেরিয়ারে আর খাবার আসে না আজকাল।"

ভূপতি প্ল্যাটফরমে নেমে জয়ন্তকে বলল, "স্যার্, রাত্রি ১০টা হ'ল, খাবেন না কিছু?"

জয়ন্ত পায়চারি বন্ধ করে বলল, "তা খেলে হয়।" প্যাণ্টের পকেট থেকে একটা নোট ভূপতির হাতে দিয়ে বলল, "নিয়ে এস কিছু খাবার—ঐ দেখ খাবার ওয়ালা।" ভূপতি পা বাড়াল।

গার্ডের সিটি বেজে উঠল ঠিক এই সময়ে। সবুজ আলোটা দুলছে গার্ডের হাতে। ভূপতি ইঞ্জিনের হাতল ধরে উঠতে যাচ্ছিল, ধমকে উঠল জয়ন্ত, "গার্ডের চাকর আমি নই ভূপতি, মাইনেও ওর চেয়ে কম পাই না।—যাও, খাবার কিনে আন, তারপর গাড়ি ছাড়ব। সুধীর, কুঁজোর জলটা বদ্‌লে আন।"

ভূপতি আর সুধীর বাক্যব্যয় না করে চলে গেল খাবার আর জল আনতে।

গার্ডের বাঁশী বেজেই চলেছে, দুলেই চলেছে সবুজ আলো,—ব্যাপার কি, বিগড়াল নাকি ইঞ্জিন ?

ভূপতি আর সুধীর ফিরে এলে জয়ন্ত গাড়ি ছাড়ল।

উদ্দাম গতিতে ছুটে চলেছে তুন এক্‌সপ্রেস—জয়ন্তর মনটা এক সময়ে চুরি করে ফিরে গেল নিজের কোয়ার্টারে।—আজ ১৫ দিন ওদের মনান্তর হয়েছে, কেমন যেন শুকিয়ে যাচ্ছে প্রতিমা, নিশ্চয় ভাল করে খায় না, ঘরদুয়োর হয়ে উঠেছে অগোছাল, প্রসাধনের ধার দিয়েও যায় না! আপনা থেকেই জয়ন্তর মনটা নরম হয়ে এল, কিন্তু পরক্ষণেই ঘনিয়ে এল একটা কালো ছায়া,—জয়ন্ত, হুঁশিয়ার! ওদের চোখের জল, অসহযোগিতা, আর উপোস এই তিনটে হ'ল পুরুষ কাত করা ধারাল হাতিয়ার! কঠিন হয়ে উঠল জয়ন্তর মুখের চেহারা।—

ডাউন কাল্কা-হাওড়া মেল আসানসোল ছাড়ল, পরবর্তী থামবার ষ্টেশন বর্দ্ধমান ১০৫ কিলোমিটার দূরে —তখন হবে জয়ন্তর ছুটি। কাল্কা মেল কিন্তু ঢিমিয়ে ঢিমিয়ে চলেছে—কালীপাহাড়ী পার হ'ল, রাণীগঞ্জ পার হ'ল কিন্তু কে বলবে যে জয়ন্তর এটা মেল্ ট্রেন। ঘণ্টায় পনের মাইলের বেশী মোটেই যাচ্ছে না—ঘরমুখো বাঙালী ঘরবিমুখ হ'লে এমনিই হয়।

ভূপতি আর সুধীর পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল অর্থপূর্ণ ভাবে, অর্থাৎ ওদের ত গৃহদ্বন্দ্ব নেই! যে রকম ভাবে যাচ্ছে তাতে গাড়ি অন্তত দেড় ঘণ্টা লেট যাবেই—

"স্পীডটা বাড়িয়ে দোব সার্? বড্ড কম যাচ্ছে।"

"না।" জয়ন্তর নির্বিকার উত্তর।

"মানে, দেরির জন্যে আবার কৈফিয়ৎ—"

"কৈফিয়ৎ দিতে হয় আমি দোব, তোমরা নিজের ডিউটি ক'রে যাও।" জয়ন্তর গম্ভীর হুকুম।

ভূপতি সুধীরের আর করবার কি আছে? আপের বেলায় ঘণ্টায় পঞ্চাশ, ডাউনের বেলায় ঘণ্টায় পনের মাইল—ঘর থেকে দূরে যেতে চান উল্কা বেগে আর ঘরে ফেরার বেলায় হাঁটি হাঁটি পা পা।

কি জানি কি হ'ল—জয়ন্ত ইঞ্জিনের স্পীডটা বাড়িয়ে দিল, মিনিটে মিনিটে সুধীর কয়লা দিয়ে যাচ্ছে চুল্লীতে, ভূপতি খুশী মনে শুনে যাচ্ছে টেলিগ্রাফের খুঁটি — ৩৫-৩৭-৪০-৫০-৫২—!! দুর্বার গতিতে ছুটে চলেছে কাল্কা মেল। ইঞ্জিনটা রেলের ভাষায় হার্স্টিং সুরু করেছে ভীষণ, অর্থাৎ ডাইনে আর বাঁয়ের পিষ্টনের ধাক্কায় ইঞ্জিনটা বাঁয়ে আর ডাইনে দুলছে ভীষণ ভাবে, মারাত্মক ভাবে,—ইঞ্জিনটার প্রচণ্ড শব্দ কানে তালা ধরিয়ে দিচ্ছে ওদের!

উৎকট বেগে গলসী পার হ'ল, খানা জংশন পার হ'ল, মাঝখানে শুধু তালিত স্টেশন—সে আর কতদূর! ভূপতি আর সুধীরের মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠেছে ভয়ে।

"জান ভূপতি? বর্দ্ধমানে গাড়ি থামাচ্ছি না—মানব না, গ্রাহ্য করব না তোমাদের পয়েণ্টস্‌ম্যান আর সিগন্যাল! উল্কা বেগে উড়িয়ে নিয়ে যাব বর্দ্ধমান স্টেশনের ভিতর দিয়ে।"

ভূপতি আর সুধীরের কপাল ঘেমে উঠল—আর নিস্তার নেই নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে। দুরদুর করে কাঁপছে ভূপতি আর সুধীরের বুক।

বর্দ্ধমানের ডিস্‌ট্যাণ্ট্ সিগ্‌ন্যাল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে—সিগ্‌ন্যাল ডাউন!

"না থাকলেও ক্ষতি ছিল না!" জয়ন্ত নিজের মনেই বিড়বিড় করে বলল, তারপর জয়ন্ত ও ভূপতির মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল, "ভূপতি, তুমি বিয়ে করেছ?"

"হ্যাঁ সার্! সুধীরও করেছে—ওর আবার একটা বাচ্চা হয়েছে মাস দুয়েক হ'ল—" করুণভাবে ভূপতি বলল।

"বাচ্চা?—বাচ্চা?" একটু কি ভাবল জয়ন্ত তার পরই ষ্টীমটা বন্ধ করে দিল টান দিয়ে—শাঁ ক'রে বেরিয়ে গেল ডিস্‌ট্যাণ্ট্ সিগ্‌ন্যাল। জয়ন্ত হাত দিয়েছে ভাকুয়াম ব্রেকে—নবজীবনের নিশ্বাস ফেলে বাঁচল ভূপতি আর সুধীর। কাল্কা মেলের যাত্রীরা সেদিন ভাবতেও পারল না যে, কতবড় বিপদের করাল ছায়া সরে গেল তাদের ভাগ্য হতে। ইঞ্জিন আর গাড়ির চাকায় শোনা যাচ্ছে ভাকুয়াম ব্রেকের কঠিন আলিঙ্গন! এক সময়ে কাল্কা মেল থেমে গেল বর্দ্ধমান স্টেশনে—তখন বেলা ন'টা বেজে সাত মিনিট।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে ভূপতি ফায়ারম্যান সুধীরকে বলল, "বুঝলি সুধরে? ব্যাপার খুব কঠিন! এ আমার তোর বউ-এর সঙ্গে ঝগড়া নয়— এ ঝগড়া সাহেব আর মেমের! কিছু বুঝলি?"

সুধীর মুখে অবশ্য কিছু বলল না কিন্তু ঘাড়টা কাত করল অত্যন্ত বেশী, অর্থাৎ বুঝেছে ত নিশ্চয়ই বরং তারও বেশী এবং হাড়ে হাড়ে!

কড়া নাড়তেই দরজা খুলে দিল প্রতিমা।—সকালেই স্নান করেছে, এলান চুলগুলো, পরেছে বেগুনফুল রঙের একখানা শাড়ি, কপালে একটা টিপ। সুগন্ধি সাবানের মিষ্টি গন্ধে ভ'রে আছে প্রতিমার সান্নিধ্য। মনটাও খুশী খুশী—প্রতিমার দাদার আজ আসবার কথা আছে এখানে।



না, না, ছোঁব না। শুধু জোড় মিলিয়ে দেখে নিচ্ছি

জয়ন্ত ঘরে ঢুকেই একবার নিজের দিকে চেয়ে দেখল পা থেকে মাথা পর্যন্ত। হাফ শার্টটার আদি রং যে কি ছিল কেউ বলতে পারে না, ট্রাউজারের পা দুখানা হয়ে গিয়েছে গোল চোঙা, হাতের কনুই পর্যন্ত আর কপালে গালে কয়লার কালি, মাথার চুলের রঙ কটা আর তেলচিটে। বিশ্বাস না হয়, ঐ ত বড় আয়না রয়েছে সামনে।

প্রতিমা নিঃশব্দে চ'লে যাচ্ছিল ভিতরের দিকে, জয়ন্ত বলল, "দাঁড়াও!"

প্রতিমা দাঁড়িয়ে গেল থমকে।

জয়ন্ত ভারি জুতো দিয়ে শব্দ করতে করতে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল একেবারে প্রতিমার কাছ ঘেঁষে।

"বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেরে এসে ছুঁয়ে দেবে নাকি?" প্রতিমা একটু সরে দাঁড়াল সন্ত্রস্তভাবে।

"না—না, ছোঁব না, শুধু জোড় মিলিয়ে দেখে নিচ্ছি তোমার পাশে আমাকে কেমন মানায়! আচ্ছা, তুমিই বল প্রতিমা—এই কি কখন মানায়? আমি তোমাকে ঠকিয়েছি কিন্তু তুমি ঠকে চলবে কেন? কেন ঠকতে যাবে? কক্ষণো না—তুমি আপোষে চাও, আইনের বলে চাও, আমি তোমাকে মুক্তি দিতে প্রস্তুত! আমি একটুকুও অনুযোগ করব না, আমি—" ভারি হয়ে এল জয়ন্তর গলার স্বর—

নিমেষে প্রতিমা হাত দিয়ে চেপে ধরল জয়ন্তর মুখটা,—ওসব কথা প্রতিমা জয়ন্তর মুখ থেকে শুনতে চায় না।—"ছি—ছি,—তুমি কেমনধারা মানুষ? যা মুখে আনতে নেই তাই বলে যাবে? কেন—কেন—কেন—" জয়ন্তর বুকে মাথা রেখে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল প্রতিমা।

জয়ন্তর হাত দুটো সেই মুহূর্তে বেষ্টন করে বেঁধে ফেলল প্রতিমার কুসুম-কোমল সৌগন্ধস্নাত দেহখানা—চিবুকটা নত হয়ে স্পর্শ করল প্রতিমার কেশদাম।

নিয়মমতই নাইন আপ ডুন একস্‌প্রেস আজ তার গন্তব্য পথে ছুটে চলেছে উল্কা বেগে। অনেকদিন পরে জয়ন্ত পরেছে ধোপদুরস্ত ট্রাউজার আর হাফশার্ট,—প্রাণ খুলে কথা বলে চলেছে ফায়ারম্যান ভূপতি আর সুধীরের সঙ্গে।

"ভূপতি,—ফিরে এসে একবার কলকাতা যেতে পারবে? একটা ভাল হারমোনিয়াম কিনতে হবে—।"

"হারমোনিয়াম?" আঁতকে উঠল ভূপতি,—সাহেবের হেঁড়ে গলায় গানের নমুনা ওরা ভাল করেই জানে।—এর উপরে হারমোনিয়াম! ভূপতি তবু আগ্রহের সঙ্গেই বলল—"যাব সার্।"

জয়ন্ত আসানসোলে পেট ভরে মিষ্টি খাওয়াল ভূপতি আর সুধীরকে।—সীতারামপুর পার হয়ে জয়ন্ত হাই তুলে বলল, "চোখদুটো বাপু বন্ধ হয়ে আসছে, ভূপতি তোমরাই একটু দেখ।"

"হ্যাঁ সার্, আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমোন।"

জয়ন্ত পরম নিশ্চিন্তে ইঞ্জিনের ছোট শাটারের গায়ে হেলান দিয়ে চোখ বুজল, তারপর ঘুমিয়ে পড়ল এক মিনিটেই।

ইঞ্জিন ছুটে চলেছে সমান গতিতে। এক সময়ে জয়ন্তর দিকে আঙুল দেখিয়ে সুধীরের কানে কানে ভূপতি বলল, "বোধ হয় মিটমাট! কি বললাম, বুঝলি সুধরে?"

সুধীর ঘাড় একটু বেশী রকম কাত করে জানিয়ে দিল যে সে দিব্যি বুঝেছে, তারপর অনেক দিন পরে আনা জয়ন্তর ঝকঝকে টিফিন কেরিয়ারটার দিকে অর্থপূর্ণ ভাবে আঙুল দেখিয়ে বলল—"বাবাঃ বাঁচলাম!"

একটি সন্ধ্যা সোনার কাঠিতে ছোঁয়া

হেনা হালদার

দুই বিপরীত-মুখী গ্রহের কোন্ আকর্ষণে দেখা হয় আমাদের জানা নেই, কিন্তু লোলিটা পলিট আর উপমন্যু মিত্রের দেখা হয়েছিল সুলতানা ক্লাবের ডান্স ফ্লোরে। উপমন্যু শান্তিনিকেতন থেকে স্বল্পমেয়াদের চুক্তিতে এসেছে এ শহরের নবনির্মিত কলাভবনের জন্য কয়েকটা প্রাচীর-চিত্র আঁকতে। আর লোলিটা হ'ল জস্টিস পলিটের একমাত্র দুহিতা। অক্সফোর্ড থেকে ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে বি.এ. পাস ক'রে মাত্র ক' মাস হ'ল ফিরেছে। বনের পাখীর সঙ্গে খাঁচার পাখীর দেখাটা আচম্বিতে ঘটিয়ে দিয়ে বিধাতা হাসলেন। ওঁর মনে কি ছিল কে জানে।

প্রথম যেদিন 'সুলতানা' ক্লাবে নিমন্ত্রিত উপমন্যু পদার্পণ করল, লোলিটা পলিট একজন আমেরিকান যুবকের বাহুপাশে 'টুইস্ট' করছিল ফ্লোরে। চারপাশে ছড়ানো সিন্ধি পাঞ্জাবী পার্শী আর মারাঠী মেয়েদের চড়া ফর্সা রঙের পাশে টুকটুকে লালরঙা ঠোঁটের এই কালো মেয়েটিকে অদ্ভুত লেগেছিল উপমন্যুর। কারণ লোলিটা ঠোঁট রাঙালেও মুখে চুণকাম করে নি। হীরে-মুক্তো-পোখরাজ বৈদূর্যের শো-কেসের মধ্যে রক্তমুখী নীলার মতন একক ওর উপস্থিতি, যদিও একাকী নয়।

ডান্সের পর ব্যাঙ্কোয়েটের টেবিলে ওরই পাশে স্থান ক'রে নিয়েছিল উপমন্যু কৌতূহলী হয়ে। ওর দেহবর্ণের সঙ্গে ঘাড়ছাঁটা কেশপাশ ও বেশবাস থাপ খায় নি। ডিনার জ্যাকেটের বোতাম-ঘরে অপরাজিতার মত বেমানান মনে হয়েছিল ওকে উপমন্যুর। তির্যক সমালোচনায় লোলিটার ব্যক্তিত্বকে জরীপ করেছিল উপমন্যু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিভঙ্গিতে। ওর চুড়িহীন হাত, হাতাহীন জামা, পাড়হীন শাড়ী, তেলহীন চুল, সিঁথিহীন মাথা দেখে মনে মনে বলেছিল, 'যদিও বুদ্ধিহীন মস্তিষ্ক নয়, হয়ত বা বিবেকহীন হৃদয়।' চারপাশে আবর্তিত চিন্তাহীন ভাষা আর প্রাণহীন সৌজন্যে হাবুডুবু খেতে খেতে বিরূপ হয়ে উঠেছিল ওর চিত্ত।

তারপর আলাপ যখন হ'ল, উপমন্যু সোজাসুজি ওকে ব'লে বসল: 'আপনাদের এই ভোজসভা এক কথায় রবীন্দ্রনাথের ভারততীর্থ। বেশে এবং পরিবেশে।'

মানে? পাখীর নীড়ের মতন চোখ তুলেই প্রশ্ন করেছিল লোলিটা। যদিও তাতে শাণ ছিল শ্যেনদৃষ্টির।

—'মানে খুব সহজ,' হেসে ফেলেছিল উপমন্যু ;'শকহুণ দল পাঠান মোগল এক দেহে হ'ল লীন।' সকৌতুকে ওর চোখে চোখে রেখেছিল উপমন্যু।

'তন্দুরী চিকেনের সঙ্গে টিক্কা কাবাব, দইবড়ার সঙ্গে ছানার পায়েস। মহামিলন ছাড়া কি?'

'কিন্তু বেশের মধ্যে আপত্তির কি পেলেন আপনি? আমরা তো শাড়ীই পরেছি। ইভনিং গাউন কিংবা কাউবয় প্যাণ্টস পরে আসিনি ত। তা হলে?' নিজের পরিচ্ছদের ওপর ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে দৃষ্টি বুলিয়ে দীপ্ত কটাক্ষে হেসে উঠল লোলিটা। 'হ্যাঁ, শাড়ীটা এখনো আপনারা কেউ কেউ দয়া ক'রে পরছেন বটে, যদিও তাতে স্কার্টের স্বল্পতা আর গাউনের স্বচ্ছতাকে প্রশ্রয় দিতে ছাড়েননি কিন্তু জামাগুলো একেবারে বিশুদ্ধ আন্তর্জাতিক। কখনো স্লিভলেস ব্লাউজ কখনো বা ব্লাউজলেস স্লিভ।

রাগ করতে গিয়ে হেসে ফেলেছিল লোলিটা। নিজের অজান্তেই সাপের খোলসের মত স্বচ্ছ আঁচলটা গায়ে জড়িয়ে নিয়েছিল। বলেছিল, 'মেয়েদের ড্রেস নিয়ে খুব গবেষণা করছেন বুঝি?'

'ড্রেস কোথায়?' নিরীহ মুখে উত্তর দিয়েছিল উপমন্যু, 'সবই ত' কস্ট্যুম্। কখনো হাইকিংএর, কখনো নাচের, কখনো সাঁতারের, কখনো বা সার্কাসের। ওগুলো সুস্থ স্বাভাবিক পোশাক কি?' হাসতে হাসতে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল উপমন্যু। গভীর দৃষ্টিতে লোলিটাকে বিদ্ধ ক'রে বলেছিল, 'সত্যিই মুখোশের সঙ্গে মুখশ্রীর পার্থক্য গুলিয়ে ফেলেছেন আপনারা।'

লোলিটা চুপ ক'রে গিয়েছিল। কিন্তু উপমন্যু চুপ

করে নি, বলেছিল, 'শেষের কবিতা পড়েছেন কিনা জানি না কিন্তু লাবণ্যের রূপ নিয়ে কেটী মিটারের রূপ-সজ্জার এক্সপেরিমেণ্ট করতে মায়া হয় নি আপনার। যদিও বন্যার মত অনন্যা হওয়াটাই ছিল আপনার চেহারা ও চরিত্রের দাবী।'

ওর সব কথা ভালো ক'রে বুঝতে পারে নি লোলিটা। শৈশব থেকেই অনন্যসাধারণ মেধার অধিকারিণী লোলিটা পলিট।

কথার মোড় ফেরাবার জন্যে ও উপমন্যুকে বলেছিল 'আসুন না আমার বান্ধবীদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই আপনার।'

সভয়ে শিউরে ওঠার ভঙ্গি করেছিল উপমন্যু, 'ওরে বাবা ঐ সব প্রলাপরূপিণীদের সঙ্গে আলাপ?' হাত জোড় করে বলেছিল মাফ করবেন মিস্ পালিত। একদিনে অসংখ্য মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করা আর দশখানা ম্যাগাজিনের বিশখানা ধারাবাহিক গল্পকে একসঙ্গে মনে রাখা সমান ভয়াবহ। তার চেয়ে একটি কবিতার একটি লাইন নিয়ে মনে মনে ফাল্গুনী রচনা করাটাই আমার পছন্দ।' বলে সুন্দর করে তাকিয়েছিল ওর মুখের দিকে।

আর লোলিটা রক্তিম হয়েছিল ওর দৃষ্টির সংরাগে। স্বদেশে বিদেশে স্তব স্তুতি কম শোনেনি ও, কিন্তু রক্তের সেতারে এমন ঝংকার কি উঠেছে এর আগে?

সংলাপের মোড় ফেরাতে হয়েছিল আবার দক্ষ মোটর চালকের মতন। হঠাৎ হেসে উঠল লোলিটা। বলেছিল, 'ভারততীর্থ বলে ঠাট্টা করলে কি হবে, ভারতবর্ষের সংহতির জন্যে এমনি সব জাতের মহামিলনের মূল্য কি কম মনে হয় আপনার?'

'সব জিনিসের মূল্যই আপেক্ষিক। প্রয়োজনের ওজনেই ওর বাজার দরের ওঠা-নামা। অর্থাৎ অবস্থা আর পরিবেশ-নির্ভর। ধরুন দুজন অসমপদস্থ বাঙালীর মধ্য হনলুলু কিংবা কামস্কাটকায় গেলে আটকায় না অথচ কলকাতার বুকে সেটা হবে অসম্ভবের পায়ে মাথা কোটা। কাজেই এই ফ্যাশানেবল সমাজের কাঁধ ঘসাঘসির মূল্য কতটুকু বলুন। এঁদের জাত কই? এঁরা তো সকলেই অভিজাত। পোশাক-আশাক, খানা-পিনা, বোল-চাল, ভাবনা-চিন্তা সবই সরকারী লেবেল আঁটা, সুতরাং বিভেদ নেই। এঁদের সংহতি আত্মিক নয়, আর্থিক বৈষম্যের। সেই গাছতলার সঙ্গে পাঁচতলার ফারাক। টাকাটাই এখানে লিফট-এর কাজ করছে।'

—'দেখুন, এ-তর্কের এক কথায় মীমাংসা হবে না।' ওকে থামিয়ে দিয়ে বলেছিল লোলিটা। 'তার চেয়ে আমার বাড়ীতে আসুন না একদিন। ড্যাডিউড্ লভ্ টু মিট ইউ।' বলার সময় গলার স্বর ভিজে ভিজে শোনাল লোলিটার। চোখের পাতা ফুলের পাপ্ড়ির মত কাঁপল।

'সন্ধ্যেবেলা অনেকেই আসেন আমাদের আড্ডায়। গান গল্প গুজবে চমৎকার সময় কেটে যায়। অবশ্য শুধু মেয়েরাই নয়, ছেলেরাও থাকেন।' উৎসুক চোখে অনুরোধ জানায় সে। 'আপনি তো কবি ব'লে শুনেছি। আমরাও না হয় শুনলাম আপনার কবিতা, যদিও বুঝব না হয়ত।'

—'কিন্তু আমি তো ওখানে পুরোপুরি বেমানান হব।' চোখের হাসিকে ঠোঁটে নামিয়ে আনল উপমন্যু। 'যেখানে সকাল-বিকেল মোটর আর স্কুটর চড়ে স্যুটররা আসেন দলে দলে, সেখানে সাইকেল চড়ে যান যিনি, তিনি কবি মাইকেল হলেও পাত্তা পাবেন না।' এবার উচ্চস্বরেই হাসিটাকে ছড়িয়ে দিল উপমন্যু। হাওয়ায় উড়িয়ে দিল ওর প্রস্তাবটাকে।

ওর একান্ত সহজ অনাড়ষ্ট ব্যবহারে বিমূঢ় হ'ল লোলিটা। কী বলবে ভেবে না পেয়ে হাসল। আর তক্ষুণি হৈ হৈ করতে করতে এগিয়ে এল লোলিটার সঙ্গিনীরা। তাদের অঙ্গবাসের বৈচিত্র্যে সর্বভারতীয় সংহতির বিজ্ঞাপন প্রকট। শাড়ী-স্কার্ট-সালোয়ার-গরারার নমুনায়। ওদের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিল উপমন্যুকে, লোলিটা। অনেক-গুলি প্রসারিত হাতকে লক্ষ্য না ক'রে নিজের দু'হাত জোড় করল উপমন্যু নমস্কারের মুদ্রায়।

'সো ইউ আর এ্যান আর্টিষ্ট!' অনেকগুলি সুঅঙ্কিত ভ্রু বিস্ময়ে উৎক্ষিপ্ত হ'ল কপালে। ডালিয়া রং ঠোঁট ফাঁক হল সসম্ভ্রমে। 'আই হ্যাভ সীন ওয়ান অফ ইওর পেণ্টিং, ইট ইজ টেরেফিক্।' বলল নীলম নারং তার শ্যাওলা রঙ কুর্তার ওপর মাত্র চার ইঞ্চি চওড়া ওড়নিটাকে এ কাঁধ থেকে ও কাঁধে মালার মতন দুলিয়ে দিতে দিতে।

'ওঃ আই এ্যাম ডাইয়িং টু হ্যাভ্ এ গ্লিম্স্···উর্মিলা জাভেরী তার কাঁধ পর্য্যন্ত লম্বা জড়োয়া ঝাড় লণ্ঠন নাচিয়ে বটুয়াস্থিত ছোট্ট দর্পণে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই বলল, কিছুই দেখবার আগ্রহ বা প্রয়োজন আপাততঃ যদিও তার দেখা গেল না। আর সেই মুহূর্ত্তে উপমন্যুর চোখের সঙ্গে চোখ মিলল লোলিটার, আর ওর মনে হ'ল, উপমন্যু যেন উঁচু গ্যালারি থেকে কোনো সার্কাসের তাঁবুর দিকে চেয়ে হাসছে। ওর চোখে মুখে কৌতুক ও কৌতুহল বিচ্ছুরিত।

ডিনারের পর একটা ছোটখাটো সঙ্গীতানুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল। ভায়োলীন, মাউথ অর্গান আর গীটার সোলোর পর ওরা ধরল লোলিটাকে গান করবার জন্য। অর্গানের পর্দ্দায় সূক্ষ্মাগ্র আঙুলগুলোকে নাচাতে নাচাতে উপমন্যুকে জিজ্ঞেস করল লোলিটা: 'বলুন কী গাইব।'

'রবীন্দ্র সঙ্গীত।' তৎক্ষণাৎ উত্তর এল ওর।

'আমি রবীন্দ্র সঙ্গীত জানি না।' বলল লোলিটা, 'তাছাড়া এসব জায়গায় কি রবীন্দ্রনাথের গান জমে?'

'একমাত্র রবীন্দ্র সঙ্গীত-ই জমে।' জোর দিয়ে বলল উপমন্যু, 'রবীন্দ্র-সঙ্গীতেরই আছে সেই আশ্চর্য পরশমণি যা নাকি যে কোন পানোচ্ছল ড্রইংরুমকেও মন্দিরে পরিণত করতে পারে মুহূর্ত্তে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর এক সেঞ্চুরি পরেও আমরা ওঁর স্যাংচুয়ারিতেই রেফিউজ খুঁজব।' শেষ কথাগুলো প্রায় মন্ত্রোচ্চারণের মত ক'রে বলল উপমন্যু।

'আপনি গেয়ে প্রমাণ ক'রে দিন।' মিউজিক টুল ছেড়ে সুন্দর ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়াল লোলিটা।

কী যেন ভেবে ওর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করল উপমন্যু। অর্গানের চাবিতে লম্বা আর ফর্সা আঙুলগুলো চালাতে চালাতে গান ধরল:

'তোমার আমার এই বিরহের অন্তরালে
কত আর সেতু বাঁধি সুরে সুরে তালে তালে।'

আর তক্ষুণি কী যেন একটা ঘ'টে গেল। ওর কণ্ঠের সুরে আর কথায়, বেদনায় আর বোধনায় জড়াজড়ি হয়ে যেন সঞ্চারিত হল লোলিটার সত্তায়। লোলিটা পলিট যেন যা' ছিল তা আর হতে পারবে না কোনদিন। বুকের মধ্যে অব্যক্ত যন্ত্রণা অভূতপূর্ব্ব আনন্দে সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হ'ল ওর, চোখে জল ভ'রে এল।

'সুখ দুঃখ আপনারি, সে বোঝা হয়েছে ভারী,
যেন সে সঁপিতে পারি চরম পূজার থালে।'

গানের শেষ কলিটা বার বার ক'রে গেয়ে শেষ করল উপমন্যু। ঘরের শ্রোতারা পর্য্যন্ত তাদের চটুলতা ভুলে চিত্রার্পিতের মতন ব'সে রইল। কফি-পেয়ালা ঠাণ্ডা হ'ল, সিগারেট অজ্ঞান্তেই পুড়ে শেষ হ'ল। উপমন্যু উঠে ধীরে ধীরে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল।

ঘরে কত লোক ঢুকল আর বেরুল। হলঘরে আবার নাচের বাজনা শুরু হয়েছে। ট্রের ওপর টলটলে পানীয়ের সোনালী গ্লাস সাজিয়ে বেয়ারারা ছুটোছুটি করছে ব্যস্ত হয়ে।

সেই আমেরিকান যুবকটি কোথা থেকে এসে লোলিটাকে হাত ধ'রে আসন থেকে টেনে তুলল, 'এ্যানাদার ডান্স প্লিজ মিস্ পলিট্, মে আই হ্যাভ্ দ্য প্লেজার·········'

কিন্তু চেতনা হারিয়ে ফেলেছে কি লোলিটা? রক্তে মধ্যে কে যেন অদৃশ্য বীণায় বিলম্বিত রাগিণীতে একটানা বাজিয়ে চলেছে তোমার আমার এই বিরহের অন্তরালে······ তোমার আমার এই বিরহের······।' নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল সে। লোলিটা পলিট নয়, বুঝি বৈষ্ণব কবিতার ললিতা। হয়ত এঘরে আর কোনদিন ফিরতে পারবে না এই ললিতা। কোথায় উপমন্যু? ঘরে, বারান্দায়, লাউঞ্জে, বাগানে কোথাও নেই।

পাতালপুরীর ঘুমন্ত কন্যার মনে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে দূরদেশী সেই রাখাল ছেলে।

আজ থেকে হয়ত তাকে খুঁজতেই পথে বেরুতে হবে ললিতাকে।

২রা অক্টোবর

শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী

কিছুদিন থেকে দেশপ্রেম নিয়ে খুব তর্ক বিতর্ক চলেছে। মাঝে মাঝে তো দাঙ্গা হবার উপক্রম। সকলেই প্রেমিক, শুধু প্রেম প্রকাশের তারতম্য নিয়েই ও পন্থা নিয়েই যত উপদ্রব। শুনেছি এক হিন্দী কবি নাকি গণতন্ত্রের প্রবহমান দরিয়ার তীরে বসে কোনও উচ্চপদস্থ ব্যক্তির কল্পনাকে কবিতায় রূপ দিয়েছেন। ভি আই পি বলছেন,—আমি দশটা ব্রীজ বানিয়েছি, চৌদ্দটা রাস্তা বানিয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য আমার দুখানা বাড়ি বানিয়েছি, তাই নিয়ে এত নিন্দা কেন? এই পুণ্যময় ভারতের মাটির তৈরী ইট ও ও সিমেন্ট ভারতেই আছে, কাঁহা উঠা তো নেই লে গয়া!

সম্প্রতি সীমান্তে আক্রমণের ফলে শত্রুর বিরুদ্ধে আসমুদ্র হিমাচলের সমস্ত মানুষ নাকি দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ও জাতীয় ঐক্য অনুভব করেছিল। বার বার নানা স্থানে জ্ঞানীর গুণীর বক্তৃতায় এ কথা শুনেছিলাম। এমনকি একটি উচ্চতম বিদ্যায়তনে চিন্তাবিদদের আলোচনার মধ্যে একজন উপাচার্য তাঁর বক্তৃতায় বলেন—চীনের হামলার আরম্ভে ছাত্র-সমাজের মধ্যে যে জাতীয় উদ্দীপনা ও দেশপ্রেম লক্ষ্য করা গিয়েছিল, ওরা হঠাৎ চলে যাওয়াতে ক্রমেই সে উৎসাহ কমে আসছে—এ স্থলে কি কর্তব্য?

এ্যাংরি ইয়ংম্যান জাতীয় সেখানে কেউ বোধহয় উপস্থিত ছিল না, তাহলে মাননীয় অধ্যাপককে পরামর্শ দিত, যে করে হোক বুঝিয়ে সুঝিয়ে শত্রুকে ফিরিয়ে আনতে। উপস্থিত ছিল আমাদের মত শীতল-রক্ত পোষমানা ভদ্র জীবগুলি, যারা অনায়াসে এমন গভীর চিন্তাশীল উক্তি হজম ক'রে নিল।

একজন মন্ত্রীও সে সভায় বক্তৃতা করলেন—তাঁর নারী-কণ্ঠের সঙ্গে মাইকের স্বর মিলে, একটি সুউচ্চ কলহের ভাব সভাগৃহে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হল। কলহের প্রতিপক্ষ তাঁরা যাঁরা বিদেশে গিয়ে, সে দেশের প্রশংসা করেন, দেশে ফিরে এসে বিদেশের নিন্দা করেন না, তাঁদের সে কুকীর্তি এই চিন্তাশীলার মতে দেশদ্রোহিতা। এ যুক্তি অনুসারে অবশ্য এযুগে মিস মেয়োর মত দেশ-প্রেমিকা আর নেই। না, আর একজন আছে—সেই যে জার্মাণ রূঢ়কেল্লা থেকে বেরিয়ে গিয়ে দেশে একখানি বইতে ভারতের স্মৃতি লিখেছে, তার মতে, "ভারতীয়দের জন্য কি দুঃখে আমরা ব্লাষ্ট ফার্নেশ বানাতে গেছি, ওরা এমনি অপদার্থ যে চল্লিশ মিলিয়ন ভারতীয় গ্যাস চেম্বারে ঢোকবার উপযুক্ত!" এরকম ধরণের কথা কোনো জার্মানের কলম থেকে বেরুলে বিস্মিত হবার কিছুই নেই। কারণ, দুটো মহাযুদ্ধের রক্ত তাদের হাতে মাখা। কিন্তু আমাদের দেশেও বিরোধের উপর ভিত্তি করে দেশপ্রেমকে উদ্বুদ্ধ করতে যারা চায়, তাদের সঙ্গে তর্ক করা নিরর্থক। কারণ, শিক্ষার যে দুটি প্রধান পথ—অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞের মত (অথরিটি), দুটোই তাঁরা উড়িয়ে দিচ্ছেন। বিরোধের উপর স্থাপিত জাতীয়তাবোধের কতটা মূল্য, ইতিহাস তার প্রমাণ দিচ্ছে—সহস্র সহস্র ইহুদী পুড়িয়ে মেরেও হিট্লার জার্মাণ জাতির ঐক্য ও দেশপ্রেম রক্ষা করতে বা বাড়াতে পারেন নি। আজ পাকিস্তানেও নিজেদের সমস্যাগুলির থেকে জনসাধারণের দৃষ্টি সরিয়ে হিন্দুদের উৎপীড়নের মজায় দেশের মূর্খ লোকদের লাগিয়ে দিয়ে বেশিদিন চলবে না। জাতির তাতে কোনো মঙ্গলই হচ্ছে না। আজ চীনও যদি সেই একই উদ্দেশ্যে নিজের সমস্যা থেকে চোখ ফিরিয়ে দিতে প্রতিবেশীর সীমান্তে এসে হাঙ্গামা বাধাতেই থাকে, তাতেও তার কোনো উপকারই হবে না এবং হচ্ছে না। এগুলো আমরা দেখতে পেয়েছি—এবং আমাদের চেয়ে যাঁরা অনেক বেশি দেখতে পারেন, বুঝতে পারেন, জানতে পারেন, সেই পরম-জ্ঞান-সম্পন্ন দুজন মহাপুরুষ এই সেদিন পর্যন্ত এ বিষয়ে আমাদের তাঁদের জীবন ও বাণী দিয়ে, কত রকম করেই বোঝাবার চেষ্টা করলেন। সেই অভিজ্ঞ সৎপরামর্শকে আমরা বর্তমান জাতীয় জীবনে কতটুকু স্থান দিচ্ছি? বেশ মনে পড়ে, চীনা আক্রমণের নৃশংসতা যখন দেশ সুদ্ধ লোকের মনকে আতঙ্কিত করে তুলেছে, প্রত্যেক দিনই কি হবে কি হবে

এই দুশ্চিন্তায় রেডিওতে কান পেতে আছি, তখন একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা, জীবনে তিনি কতটা দেশের কথা চিন্তা করেছেন জানি না। কিন্তু অন্তত এটুকু জানি যে তাঁর 'জীবনই তাঁর বাণী নয়'। তিনি মুখবিকৃতি করে বললেন, হবে না, যাও এখন সীমান্তে সারি সারি চরকা দিয়ে বসিয়ে দাও গে; যান না, নেতারা চরকা ঘোরান গে না, নয়তো উপোস করে ধন্না দিয়ে পড়ুন।—ক্রোধে তাঁর চক্ষু ঘূর্ণিত হল, মুখের মধ্যে পানের ডেলাটা ওলট পালট করল, আমি স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলুম। জানি না সত্যিই এর উত্তর কি! জানি না যে সেইটাই আসলে দুর্গতির কারণ। শুনেছি অনেকবার, বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তিরাই বলে গেছেন, কিন্তু বিপদের মুখে বা স্বার্থের সামনে জাতের বড় সত্যগুলোর উপর বিশ্বাস না রাখতে পারাই সমস্ত অজ্ঞতার ও ভ্রান্তির মূল।

আজ নানা দিক্ থেকে জাতীয় জীবন রাহুগ্রস্ত, চোরা-বাজার কালোবাজার ও দুর্নীতির খবর খবরের কাগজে উপচে পড়ছে। অন্যদিকে মানুষের নানা দুর্দশা, অনাহার, আত্মহত্যা, দুর্গতির পঙ্ককুণ্ড শহরে গলিতে নালায় নর্দমায় দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। নানা দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের মন হাহাকার করছে। দেশপ্রেম শুধু স্বার্থান্বেষী মানুষের স্বার্থ সাধনের জিগির হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এরকম একটা অবস্থায় পড়ে অনেক সময় আমরা বুঝতেই পারি না, 'দেশ' অর্থ কি? সে কি আমি বা আমার নিজের দল? বা তার চেয়ে ব্যাপক কিছু? দেশকে ভালবাসা মানে তো কোনো বিশেষ মত বা দলকে ভালবাসা নয়? দেশের মানুষকে, তার চরিত্রকে, তার ব্যবস্থাকে ও তার কতগুলি বিশেষ আদর্শকে ভালবাসা। বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে আমরা চীৎকার করতে পারি কিন্তু প্রেম উদ্বুদ্ধ করতে পারি না।

মহাত্মা একবার বলেছিলেন—অপরিচ্ছন্ন দেশে দেশপ্রেম জাগতে পারে না। কথাটার সত্যতা প্রতিদিন নূতন করে বুঝছি। কলকাতার রাস্তার জঞ্জালের পাশে দাঁড়িয়ে বস্তির পরিবেশে মানব-শিশুকে কুকুর-বেড়ালের মত ঘুরে বেড়াতে দেখলে মনে যে ভাবেরই সঞ্চার হোক তা প্রেম নয়।

এক-এক সময় মনে হয় যেন আমাদের মনে থেকে সত্যিই সেই আশ্চর্য বস্তুটি হারিয়ে যাচ্ছে, যাকে বলে দেশাত্মবোধ। এর চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কিছু হতে পারে না। আমি অনুমান করতে পারি, এই রকম পরিতপ্ত আরো অনেকেই আছেন যাঁদের কাছে ১৮ই আগষ্ট ওয়াশিংটনের রাজপথের দুই লক্ষ নিগ্রো নরনারীর শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রা এবং ভিয়েৎনামের বৌদ্ধ ভিক্ষুর অনলে আত্মাহুতি, বর্তমান সময়ে, এই মারণাস্ত্রের যুগে, ভারতবর্ষের অস্তিত্বের এক গভীর সার্থকতায় সে পরিতাপ ধুয়ে দেবে।

মার্টিন লুথার কিং নিগ্রো-আন্দোলনের এই বর্তমান রূপটিকে মহাত্মার সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সঙ্গে তুলনা করেন, আমরা তুলনা করি না। আমরা নিশ্চিত জানি, এ তাঁরই চিন্তার ফসল।

১৯১৬ সালে যুদ্ধ-বিক্ষুব্ধ ইউরোপ ও আমেরিকায় শান্তির বাণী নিয়ে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ—তাঁর সেই বাণী শুনে যুদ্ধোন্মত্ত দেশের অনেক লোক, বিশেষতঃ শক্তিশালী খবরের কাগজগুলি তাঁর সেই আন্তর্জাতিক মৈত্রী-ভাবনাকে ঘুমপাড়ানীর গান ও যুবকদের পক্ষে বিষের মত ক্ষতিকর মনে করেন, আবার অন্যদিকে যুদ্ধরত সৈনিকদের মধ্যেও সেই নিষিদ্ধ গ্রন্থ 'ন্যাশনালিজম্' বিবেকের বাণী জাগিয়ে তোলে।

সে বাণী ভারতবর্ষের বহু পুরাতন কথা। 'সদয়হৃদয় দর্শিত-পশুঘাতম্', দশম অবতার বুদ্ধের জীবন থেকে যা একভাবে উত্থিত হয়েছিল, বর্তমানকালে সেই চির সত্যকেই নূতন যুগের জীবনে পরীক্ষা করতে চাইলেন রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধী। কখনো মনে হয়েছে, হয়ত তাঁদের সেই আজীবনের প্রাণপণ প্রয়াস বিফল হয়েছে; কিন্তু আজ প্রমাণ হচ্ছে যে, তা সুদূরপ্রসারী গভীর মূল বিস্তার করে বিশ্বজীবনে এক নূতন পথ দেখাচ্ছে।

যখন কেউ রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধীর কর্ম ও দর্শন তুলনা করেন, তখন সচরাচর সমসাময়িক হলেও এঁদের মধ্যে যে অনেক পার্থক্য ছিল সে কথা স্মরণ করেন। আকৃতি প্রকৃতি ও জীবনবিন্যাসে এঁদের প্রভেদ অনেক। এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ কর্মেও এঁদের মত-বিরোধিতা ঘটেছে বারবার। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'চরকা' প্রবন্ধটিতে সেই মত-দ্বন্দ্বের কারণগুলি নিজেই বিস্তারিত করে বলেছেন। চরকাকে একটি পূজ্য প্রতীক করে তোলায় ছিল তাঁর আপত্তি। রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় মনে যুক্তিবাদের বিকাশ চেয়েছিলেন। যে দেশ নানা কুসংস্কারে মোহগ্রস্ত, কার্য-

কারণের সংযোগে বিশ্বনিয়মের নিয়ন্ত্রণকে অস্বীকার ক'রে মনগড়া শত শত নিরর্থক আচারে জড়িত হয়ে আছে, তাকে সে পথ থেকে ফিরিয়ে আনবার জন্য যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রয়োজন। সেই কারণেই, বিহারে ভূমিকম্পের পরে যখন মহাত্মা বলেছিলেন যে, জাতিভেদের পাপেই বিহার এ শাস্তি পেয়েছে, তখন রবীন্দ্রনাথ কঠোর স্বরে তার প্রতিবাদ করেছিলেন। অযৌক্তিক চিন্তার নূতন আবাদ করবার তাঁর অভিপ্রায় ছিল না। এই রকম ছোট বড় নানা ভাবের পার্থক্য সত্ত্বেও দুজনেই দুজনের প্রতি কি গভীর শ্রদ্ধা বহন করেছেন চিরদিন তা উভয়েরই বহু রচনায় চিরস্থায়ী প্রমাণ রেখে গেছে। মহাত্মা কবিকে সম্বোধন করতেন গুরুদেব বলে আর কবি লিখলেন—আমরা মহাত্মা গান্ধীর শিষ্য, কেউবা ধনী কেউবা নিঃস্ব—একজায়গায় আছে মোদের মিল—সেই মিলের অর্থ এই যে দুজনেই ভারতীয় ইতিহাসের বিশেষ আদর্শকে নব যুগের মানুষের জীবনে রূপ দিচ্ছিলেন। দুজনেই তাই—বিশ্বের মধ্যে ভারতের প্রতিষ্ঠা করছিলেন। এই প্রতিষ্ঠা শুধুমাত্র তাঁদের ব্যক্তিগত প্রতিভার বিষয় নয়—ভারতীয় আদর্শ ও ভাবধারাকে আধুনিক জগতের সতত কর্মচঞ্চল উগ্র বিশ্ব ব্যাপারের মধ্যে সঞ্চারিত ক'রে দেশের আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করা। এ আদর্শ কোনো কাল্পনিক ভাবপ্রবণতার ধোঁয়ায় তৈরী বা কবিত্বের খেয়ালে গড়া নয়। অতি প্র্যাকটিক্যাল কার্যকরী বুদ্ধিপ্রণোদিত ও বর্ত্তমান কালের যান্ত্রিক সভ্যতার ও বৈজ্ঞানিক অস্ত্রের যুগে মানুষের বাঁচবার একমাত্র উপায়।

আজ নিউক্লিয়ার যুদ্ধের ভয়াবহ সম্ভাবনার সামনে দাঁড়িয়ে যুদ্ধোন্মাদ শক্তি-গর্বিত দেশের নেতারা অনেকেই সেই কথায় ফিরে আসছেন, যে কথা ১৯১৬ সালে তাঁদের দেশে বিষবৎ বোধ হয়েছিল।

১৯২৮ সালে ক্যানাডাতে কবি বলেছিলেন, "আমি দেখতে চাই, দ্রষ্টা মানুষের সঙ্গে আবিষ্কারকের সামঞ্জস্য। আমরা বহুদিন থেকে বলে এসেছি, 'আকাশকে জয় করব'—তোমরা ত জয় করলে, এখন তেমনি করে নৈতিক সমস্যাগুলিকে জয়কর।"

একদা বহু ক্লেশ স্বীকার করে পরাধীন দেশের একজন কবি বারবার সারা পৃথিবীতে মৈত্রী-যাত্রা করেছিলেন, আজকের দিনে প্রতাপান্বিত নেতৃবৃন্দ সেই পথই বেছে নিয়েছেন। বহু বৎসর পূর্বে তিনি বলেছিলেন, "ব্যক্তিগত মানুষই সর্বদা মানুষের উদ্ধার করেছে—মানব সভ্যতা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ মহৎ ব্যক্তির দান। জগতের পরিবর্ত্তন ঘটবে অজ্ঞাতসারে—কেমন করে ঘটবে আমরা হয়ত তা জানতেও পারব না। হয়ত সেই মুক্তির শক্তি এখনই কাজ করছে এবং আমাদের হয়ত জানাই নেই কত উর্দ্ধমুখী মানবচিত্ত নীরবে সেই মুক্তিপথের সাধনা করে চলেছে……… আদর্শের সত্যতায় বিশ্বাস স্থির রেখ। যখন সে আদর্শ প্রচার হবে তখন বহু মানুষ সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে—তাদের প্রভাবে বিপুল পরিবর্ত্তন ঘটবে, জগৎ আশ্চর্য হয়ে ভাববে, এ কি করে ঘটতে পারল?"

আজ দ্রষ্টার এই ভবিষ্যদ্‌বাণীকে বিশ্লেষণ করে বিস্মিত মনে লক্ষ্য করি, জগতে সবচেয়ে যুদ্ধাশ্রয়ী শক্তিশালী জাতির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধীর চিন্তার আবেগ কী বিপুল পরিবর্ত্তন ঘটিয়েছে। Organisation-এর মধ্যে Personality আপন কর্ত্তব্যে রত হয়েছে। মৈত্রী-যাত্রায় চলেছেন ক্রুরকম্মা, নেতারাও। চলেছেন ক্রুশ্চেভ আইসেনহাওয়ার,কেনেডি, সঙ্গে সঙ্গে কত মিশন, কত দল, কত গায়ক বাদক লেখক মানুষে মানুষে দেশে দেশে মানুষের সম্বন্ধকে সত্য করতে চলেছে।—আর চলেছে আলডারমাষ্টন মার্চ, চলেছে নিগ্রোদের বিপুল মুক্তি-যাত্রা। মহামানবদের জীবনের মাল্য থেকে খসা চিন্তার বীজ ছড়িয়ে যায় আকাশে, তারপরে যথাসময়ে মানুষের মনের ভূমিতে অনুকূল অবসরে তার থেকে উদ্‌ভিন্ন হয় অঙ্কুর। কেউ জানতেও পারে না, কি করে এ অমৃত-তরু জন্মাল। এই সেদিন মহাত্মার একজন শিষ্য, সীমান্তে শিশুরাও যেতে পারে, এই জাতীয় কোন কথা বলায় বহুজনের দ্বারা নিন্দিত হয়েছেন। এ কথার ক্যারিকেচার হয়েছে প্রচুর। যে-সমস্ত পত্র-পত্রিকায় পূরো ভাষণটি প্রকাশিত হয়নি তারাই ক্যারিকেচার ছেপেছে। কথাটি হাস্যকর অবশ্যই,—কারণ, হত্যাই যুদ্ধের কাম্য, আত্মহত্যা নয়। এ যেন সেই সীমান্তে চরকা নিয়ে বসে যাওয়ার মতন। কিন্তু এ কথাও ভুললে চলবে না যে, বর্তমান যুগে যুদ্ধের এক নূতন রীতি প্রবর্তন করে গিয়েছেন এ যুগের একজন শ্রেষ্ঠ বীর মহাত্মা গান্ধী। এই রীতি কিন্তু কেবল সত্যাগ্রহীই গ্রহণ করতে পারে, যে যুদ্ধে সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা চায়। লোভের তাড়নায় অপরকে হনন করার জন্য

যে যুদ্ধ, এ রীতি সে যুদ্ধের নয়। অর্থাৎ আক্রমণকারী যুদ্ধ-ক্ষেত্রে শিশু বা নিরস্ত্রকে পাঠাতে পারে না, কিন্তু সত্যাগ্রহী পারে। কামানের মুখে, বন্দুকেয় মুখে যখন নিরস্ত্র সত্যাগ্রহী দাঁড়ায় তখন সে শিশু ছাড়া কি? তার বয়স তখন তার কি কাজে লাগবে? রবীন্দ্রনাথ গান করেছিলেন—শাসনে যতই ঘেরো, আছে বল দুর্বলেরও—সেই দুর্বলের গায়ের শক্তির কাছে পরাজিত হয়ে ভাঙ্গা দেশ জোড়া লেগেছিল। এই দুর্বলের বলকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক ও বাস্তব ভাবে প্রয়োগ করলেন গান্ধীজী। শত বিপত্তি সত্বেও তিনি আদর্শে ছিলেন স্থির এবং তার অমোঘ ফল ফলল। সে ফল যে কত সুদূরপ্রসারী তা আজ যেমন বোঝা যাচ্ছে, এমন তখন যায়নি।

দাণ্ডি মার্চের সময় শুধু ইংরেজী কাগজই তাঁকে Lunatic বলেনি, দেশের লোকও বলেছে। অসহায় নরনারীকে পুলিশের ডাণ্ডার সামনে নিয়ে চলে এই উন্মাদ—অস্ত্রের সঙ্গে শুধু হাতে লড়াই, পাগলামি ছাড়া আর কি? কিন্তু আজ? আজ নিউক্লিয়ার অস্ত্রের সামনে জগতের সমস্ত সৈনিকই শুধু-হাত হয়ে গেছে। তাই আজ নিরস্ত্র চিত্তশক্তিকেই যুদ্ধের অস্ত্র করা ছাড়া উপায় নেই। সেই কারণেই কিউবা থেকে বিপুল রণসজ্জা ফিরে এল। শুধু তফাৎ এই যে, পাশ্চাত্য জগতে এগুলো আজও বাহিক কারণে নিয়ন্ত্রিত, সুবিধার খাতিরে গৃহীত। কিন্তু সত্যাগ্রহীর আগ্রহের কারণ আরো অনেক গূঢ়মূল। কিন্তু আশার সঞ্চার হয়েছে, 'মরা মরা' বলতে বলতে ওরাও রাম নাম বলবে।

যে বৌদ্ধ ভিক্ষু সরকারী অবিচারের প্রতিবাদে নিজেকে আহুতি দিলেন, তিনি কি সীমান্তে শিশু পাঠাবার মতই কাজ করেননি? শত্রুপক্ষ শুষ্কমুখে হাসি এনে বললে, ভালই হ'ল, এ রকম করে আরো মরুক। কিন্তু সে বলা কি সত্য? ভয় কি ঢোকে নি? জগতের মধ্যে এই আত্মাহুতি যে আন্দোলন তুলেছে তাতে পাষাণে বাঁধানো শাসনের ভিত্তি কি নড়ে যায়নি? ঐ ভিক্ষু যদি তার বদলে দুটো গুপ্ত হত্যা করতেন তাহলেই কি তাঁর যুদ্ধ আরো কার্য্যকরী বা বাস্তব হত? মধ্য এশিয়ার নানা রাজ্যে ও আরো নানা জায়গায় কত রাজনৈতিক হত্যা, তার কোন্‌টা মানুষের মনকে এমন গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে? অষ্টমার্গের নীতি, পঞ্চশীলের অভ্যাস, ঐ ভিক্ষুদের আত্মত্যাগের শিক্ষা দিয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু আধুনিক যুগে রাজনীতির ক্ষেত্রে উপবাসে প্রাণত্যাগ, সত্যাগ্রহ, শান্তিপূর্ণ অসহযোগকে যুদ্ধের অস্ত্ররূপে ব্যবহার করবার পথ নির্দেশ করল কে? এ আবিষ্কার কার? নিঃসংশয়ে মহাত্মা গান্ধীর। তাঁর এ অস্ত্র নবযুগের অস্ত্র এবং নিউক্লিয়ার অস্ত্রের একমাত্র প্রতিষেধক। বৈজ্ঞানিকের তৈরী মারণাস্ত্রের চেয়ে এ বেশী কার্যকরী হবে, তার আভাস দেখা যাচ্ছে, কারণ, সমগ্র জগতে বিভিন্ন দেশে এই অহিংস নীতিতে ন্যায় বিচারের দাবী জানাচ্ছে অত্যাচারিত মানব।

পৃথিবীর একটি বাস্তববাদী দেশ, যাদের হাতে এটম বোমা, যে বোমা দু'বার জনাকীর্ণ নগরীর উপর পরীক্ষা করেও নিয়েছে, সেই দেশের রাজপথে দুই লক্ষ নরনারীর মুক্তির দাবীতে অস্ত্রের ঝনঝনা শোনা গেল না, তারা শুধু উদাত্ত সঙ্গীতে বিশ্বের বিবেককে জাগ্রত করে দুটি মাইল পদযাত্রা করল, এই সংবাদ পড়তে পড়তে মনে হয়েছে, একদা মহাত্মার অতি প্রিয় গান ছিল, 'একলা চলরে,' কিন্তু আজ আর তিনি একলা নন, বিশ্বের নানা দেশে নানা প্রসঙ্গে অত্যাচারিত মানুষ সত্যের সন্ধানে তাঁরই পথে তাঁকেই পুরোভাগে নিয়ে চলেছে, সেকথা তারা জানুক বা না জানুক।

বিশ্বের জীবনে মহৎ ব্যক্তিত্বের ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষের এই যে দান, এ কারু চেয়ে কম নয়, এমন কি এটম বোমা বানান বা মহাকাশে ওড়ার চেয়েও কম নয়।

বহু নিরর্থক জঞ্জালের মধ্যে বেঁচে থাকায় এই আমাদের পরম সার্থকতা।

আর্থিক

শ্রীচিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

ভারতবাসীর গড় আয়

আমাদের দেশের অধিকাংশ বাসিন্দার গড় দৈনিক আয় তিন আনার কোঠায় না সাত আনার কোঠায় এই সূক্ষ্ম হিসাব নিয়ে সম্প্রতি লোকসভায় তুমুল বিতর্ক হয়ে গেছে : সরকার পক্ষ তাদের অকাট্য যুক্তিজালে বিপক্ষের পরিসংখ্যানের অসারতা প্রমাণ করে আত্মশ্লাঘা বোধ করেছেন ; আমরাও এই ভেবে সান্ত্বনা পেয়েছি যে আংশিক তথ্যের উপর নির্ভর করে এবং অন্যান্য সমস্ত সমস্যার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে এই তুচ্ছ অঙ্কের হিসাবটুকু নিয়েই বিরোধীপক্ষ যে সব উক্তি করেছিলেন সে সব কথা বিশ্বাস যোগ্য নয় —তিন আনা ও সাত আনায় বহু পার্থক্য সন্দেহ নেই। কিন্তু একদল লোকের মনে এই আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে যে, অন্যান্য সমস্যাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি আলোচিত না হবার ফলে এই অতিসূক্ষ্ম হিসাবের স্রোতে, বহু-আলোচিত বিষয়েরই পুনরাবৃত্তি হলেও, মূল বক্তব্য চাপা পড়ে গেছে।

ধরে নেওয়া যাক সরকার পক্ষের যুক্তিই অভ্রান্ত ; কিন্তু তার দ্বারা কি প্রমাণিত হচ্ছে ? যে দেশের গড় মাথাপিছু বাৎসরিক আয় এখনো ২৯৩ টাকা ৪০ নয়া পয়সা (১৯৪৮-৪৯এর মূল্যমান অনুযায়ী) অর্থাৎ দৈনিক মাত্র ৮০ নয়া পয়সা, যে দেশে কৃষি ও আনুষঙ্গিক কাজে (Primary Sector) লিপ্ত কর্মীরা (মোট কর্মরত লোকের ৭২·২৮ ভাগ লোক) জাতীয় আয়ের মাত্র ৪৮·২৯ ভাগ রোজগার করছে অর্থাৎ বছরে ১৯৬ টাকা বা দৈনিক ৫৩ নয়া পয়সা আয় করছে[1] এবং যে দেশের গ্রামাঞ্চলের মোট সাড়ে ছয় কোটি পরিবারের মধ্যে মাত্র এক অষ্টমাংশ পরিবার মোট জমির দুই তৃতীয়াংশের মালিক[2] সে দেশে একদল লোককে এই ক্রমবর্ধমান মূল্যের বাজারে দৈনিক তিন আনায় কাটাতেই হোক বা সাত আনাতেই কাটাতে হোক, কোন ক্ষেত্রেই আমরা বলতে পারব না যে সেইসব লোক স্বচ্ছন্দে দিন কাটাচ্ছে।

দীর্ঘকালের সঞ্চিত সমস্যার আমূল সমাধান মাত্র ষোল বছরে সম্পন্ন হবে এ কথা অতিবড় আশাবাদী সরকার পক্ষও অবশ্য কোনদিনই বলেন নি। সমস্যা-জর্জরিত অন্যান্য সব "অনুন্নত" দেশের মতই আমাদের দেশের সমস্যাও বহুমুখী ও গভীর[3]। স্বর্ণযুগের কথা ভেবে আমরা যতই বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থাকে ধিক্কার দিই না কেন, অতীতের ধন বণ্টন ব্যবস্থার পুনঃপ্রচলন এ যুগের বেশীরভাগ লোকেই চাইবেন না। জনসংখ্যার চাপে বিব্রত, মূলধন সঞ্চয়ে অক্ষম, গ্রামীন ও নাগরিক অর্থনৈতিক কাঠামোর দ্বিধাবিভক্ত, "চাষা" ও "বাবু" "ছোটলোক" ও "ভদ্রলোক" শ্রেণীতে বিচ্ছিন্ন আমাদের এই দরিদ্র দেশের মূল সমস্যা একাধারে জাতীয় আয় বৃদ্ধির পথ প্রশস্ততর করা, আর তারই সঙ্গে সেই বর্দ্ধিত আয় ন্যায্যভাবে বণ্টনের ব্যবস্থা করা, এই দুঃসাধ্য কাজ কোন বছরে সম্পন্ন হতে পারে না। দীর্ঘকাল ধরে সকলকেই যেমন ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে। (তারই সঙ্গে এর জন্য যথোচিত মূল্যও সবাইকে দিতে হবে।)

---

(১) Primary Sector-এ ১৯০১এ যেখানে মোট কর্মরত লোকের ৭১'৭৬ ভাগ লোক লিপ্ত ছিল, ১৯৬১তে সেখানে ৭২·২৮ ভাগ লোক লিপ্ত আছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পর্বে কৃষিকার্য থেকে উদ্ভূত জাতীয় আয়ের ভাগ ছিল ৪৮·১৩ ভাগ, দ্বিতীয় পরিকল্পনা পর্বে ৪৮·২৯ ভাগ। ১৯৬১-৬২তে গড় মাথাপিছু আয় ছিল ২৯৩ টাকা ৪০ নঃ পয়সা ; এই হিসাবে দেখা যায় দেশের শতকরা ৭২·২৮ ভাগ লোকের গড় আয় ১৯৬ টাকা আর বাকী ২৭'৭২ ভাগ লোকের গড় আয় ৫৪৭ টাকা ৩২ নঃ পয়সা অর্থাৎ Primary Sector-এর লোকেদের আয়ের প্রায় তিনগুণ।

(২) দ্রঃ ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভের রিপোর্ট। "India 1963" পৃ ১৫১। এই সূত্রে দ্রষ্টব্য Distribution of income in the Indian Economy, 1953-54 to 1956-57. রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বুলেটিন সেপ্টেম্বর '৬২। (পৃঃ ১৩৪৮-১৩৬৩) অন্যান্য দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের আয়ের তুলনামূলক হিসাবের জন্য দ্রষ্টব্য ধীরেন ভট্টাচার্য প্রণীত, Understanding India's Economy। পৃ ১৭ ও E. W. Zimmermann, World Resources and Industries, পৃ ১২৮।

(৩) এই সূত্রে দ্রষ্টব্য 'A Century and a Half of Economic Stagnation' by V. V. Bhatt ; Economic Weekly Special number, July 1963, পৃ ১২২৯-১২৩৬।

যাবতীয় সমস্যাকে বিভিন্ন দিক্ থেকে আক্রমণ করে, ইদানীং কালে বহুপ্রচলিত মত অনুযায়ী "take off stage" পার হতে যতটুকু সময় দিতে হয়৪ তার সবটুকু এখনো দেওয়া হয়নি। 'অনুন্নত' দেশ বলতে যদি কোন সংজ্ঞা দেওয়া যায় তার প্রায় সবই আমাদের দেশে এখনো স্পষ্টতই বিদ্যমান। জমিদারী লোপ হওয়া সত্ত্বেও জমির দখল মুষ্টিমেয় লোকের হাতে, মাথাপিছু 'গড়' আয় যাই হোক না কেন, অল্প কয়েকজনের হাতে যাবতীয় মূলধনের সঞ্চয়, লোকসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি, জাতীয় আয়ের তুলনায় সঞ্চয়ের স্বল্পতা ৫, বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সামান্য কয়টি কৃষিজ পণ্যের উপর নির্ভর, সরকারী আয়ের স্বল্পতা৬ শিল্প প্রচেষ্টার তুলনায় ব্যবসায় ও আনুষঙ্গিক (Tertiary Sector) কাজে লোকের ভীড় ইত্যাদি ইত্যাদি। গত দশ বারো বছরে যত কোটি কোটি টাকা দেশে ব্যয় হয়েছে তার অনেকখানিই, সরকারের নতুন নতুন ট্যাক্সনীতি সত্ত্বেও, কয়েকজন কর্মোদ্যোগী লোকের হাতেই বেশী পরিমাণে জমেছে, আর কিছুটা মাত্র সমাজের নিচের স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে।

(৪) বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ W. W. Rostow-র মতে ইংল্যাণ্ড তার "take off stage"এ ছিল ১৭৮৩ থেকে ১৮০২ পর্যন্ত; সেই সময়ে, তার পূর্বে ও পরে, একাধারে নতুন নতুন যন্ত্র আবিষ্কার, নতুন দেশ জয় ও উপনিবেশ স্থাপন এবং তারই সঙ্গে ক্রীতদাস ব্যবসায়, শ্রমিক অন্দোলন রোধ করার নিয়মাবলী, কারখানায় শিশু-শ্রমিক ও স্ত্রীলোক শ্রমিকদের পরিশ্রম ও রোজগারের ইতিহাস এবং ব্যবসায়ে জোয়ার ভাঁটার বিচিত্র ধারার কথা একত্রে পাঠ করলে আমাদের দেশের বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে সাদৃশ্য ও পার্থক্য কতটা আছে, বা আদৌ আছে কিনা তা বিচার করা যেতে পারে।

(৫) পঞ্চম পরিকল্পনার শেষ নাগাদ আমাদের জাতীয় আয়ের থেকে মোট ১৯-২০% ভাগ সঞ্চয় মূলধন হিসাবে কাজে লাগানো যাবে আশা করা যাচ্ছে; আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ও মোট মূলধনের যেটুকু পার্থক্য এমনকি বিদেশী ঋণের সাহায্যে পূরণ করা হচ্ছে, সেই পার্থক্য ক্রমেই কমে আসবে আশা করা হচ্ছে। (Third Five Years Plan, Pages 28 and 91)। বর্তমানে আমাদের জাতীয় আয়ের তুলনায় সঞ্চয়ের হার ৭% থেকে ৮% এর বেশি হারে (দ্রঃ India 1963, Page 148)।

(৬) ১৯৬৩-৬৪তে যে বাড়তি ট্যাক্স ধার্য করা হয়েছে তাতে আশা করা হচ্ছে, জাতীয় আয়ের তুলনায় সরকারী আয়ের যে হার তা' ৯'৬% থেকে অচিরে ১৩%-এ উঠবে (Report of the Central Board of Directors, Reserve Bank of India; 1962-63, Page 7)। ১৯৫৭তে এই হার ভারতে ছিল ৮%, সিংহলে ১৯%, জাপানে ২২%, যুক্তরাষ্ট্রে ২৬%, যুক্তরাজ্যে ৩৫% (দ্রঃ Samuelson, Economics, Page 113)

তবু একথা বলতে হয় যে আমরা অতীতের গতি-হীনতার দিন কাটিয়ে, এগিয়ে এসেছি; ভালয় মন্দয় মিশিয়ে দিন অবশ্যই বদলেছে। বিদেশী শাসকের কঠোর শাসনের ফলে দেশবাসীর যে মনের মুক্তি ঘটেছে তার প্রতিফলন আমরা সর্বত্রই লক্ষ্য করছি; জমিদারী প্রথা লোপ হবার ফলে পল্লীবাসীর বুকের উপর থেকে জগদ্দল পাথর গেছে নেমে; যাতায়াতের ব্যবস্থা সুগম হবার ফলে গ্রামের চিরন্তন নিঃসঙ্গতা ও কূপমণ্ডূকতা গেছে ঘুচে; তাদের পরোক্ষ লাভ যেটুকু হয়েছে, তা হচ্ছে মনে আশার সঞ্চার, বা অন্তত পক্ষে নৈরাশ্যের অবসান। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার তুলনায় যদিও কর্মসংস্থান সমান তালে চলতে পারছে না, তা সত্ত্বেও গ্রামের সঙ্গে শহরের যোগাযোগ বৃদ্ধি পাওয়াতে এবং দীর্ঘ মেয়াদী কাজ-গুলিতে সরকারী প্রচেষ্টার ফল কিছু কিছু দেখা যাবার সূত্রপাত ঘটাতে অন্তত একদল লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ বেড়েছে। মোটামুটি ভাবে একথা বলা যায় যে, যে পথ দিয়েই আমরা চলি না কেন, আমাদের সমাজে ভাল মন্দর সংমিশ্রণে কিছু বদল ঘটেছে এবং ঘটছে।

আমাদের লক্ষ্যস্থলের থেকে এখনো আমরা বহুদূরে আছি; ঠিক এই মুহূর্তে আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকের গড় আয় কত হচ্ছে, তাই নিয়ে তর্কবিতর্ক যাই হোক না কেন, মূল প্রশ্নটি হচ্ছে, ভবিষ্যৎটা। আমরা যত-দূর দেখতে পাচ্ছি তার মধ্যে আমাদের বাঞ্ছিত উদ্বৃত্ত ধনের বণ্টনের ধারা কোন্ দিকে যাবে? ভবিষ্যৎ অর্থ-নৈতিক কাঠামোর যতটুকু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, তার সমস্তটাই অপরিবর্তনীয় ছকের মধ্যে ফেলা সম্ভব নয়; খানিক সম্ভব হত, আমরা ত স্বেচ্ছায়ই সেই পথ গ্রহণ করিনি। এই বিরাট্ দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর অনেকখানিই এখনো মধ্যযুগীয় স্তরে রয়ে গেছে, তাকে অকস্মাৎ এ-যুগের ধাঁচে ফেলতে হলে সরকারকে যে সর্বাঙ্গীন বা সর্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ করতে হয় এবং তারই সঙ্গে যে পরিমাণে জনসাধারণের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য খর্ব করতে হয়, সেই অধিকার ত আমরা সরকারকে দিতে চাই না। গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে, 'মিশ্র' অর্থনীতির সাহায্যে আমরা কালক্রমে সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টি করব। এর মধ্যে, যেহেতু রাষ্ট্রের হাতে সর্বময় কর্তৃত্বের ভার তুলে দিচ্ছেন, তাই পরিকল্পনার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এক-এক দিকে স্বার্থান্বেষীরা বিবিধ সমস্যা সৃষ্টি করবে এ সম্ভাবনার কথা ত স্বয়ং পরিকল্পনা বিশারদরাও স্বীকার করেন।

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিকল্পনার কাজে অগ্রসর হবার কালে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু তার বণ্টন

সর্বক্ষেত্রে বাঞ্ছিত পথে হয়নি এ কথা ইদানীং বহু দফেই আলোচিত হয়েছে। এ যাবৎ যত অনুসন্ধান হয়েছে সবক্ষেত্রেই প্রায় দেখা গেছে, গ্রাম ও শহরবাসীর আয়ের পার্থক্য হয় পূর্বের মতই আছে নয়ত বেড়েছে, শিল্পপতি-দের আয় ও কৃষিজীবীদের আয়ের ব্যবধান বেড়েছে, জমির মালিক ও ভূমিহীন লোকের আয়ের ব্যবধান বেড়েছে বা চাকুরে ও ব্যবসায়ীর আয়ের বৈষম্য বেড়ে চলেছে, ইত্যাদি।

প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা যে পথ বেছে নিয়ে অগ্রসর হচ্ছি সে পথে গেলে অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতে নিম্ন আয়ের লোকেদের আয় বৃদ্ধি এবং উচ্চ আয়ের লোকেদের প্রয়োজনাতিরিক্ত আয় কিছু পরিমাণে হ্রাস কি সম্ভব হবে? লোকের হাত থেকে ইদানীং কালে সৃষ্ট উদ্বৃত্ত আয় যথাসম্ভব টেনে নেবার জন্য সরকার বিবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন ও করছেন, তা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে সরকার যে অর্থ ব্যয় করছেন তার অনেকাংশ, কিছুটা সৎপথেই,—আর কিছুটা হয়ত অসৎপথে,—একদল উদ্যোগী লোকের হাতে জমছে, সেই উদ্বৃত্তর কিছুটা যাচ্ছে মূলধনের পুনর্নিয়োগে, আর কিছুটা অবশ্যই যাচ্ছে বিলাসিতা এবং বাহুল্যে।

প্রশ্নটি দুটি দিক থেকে দেখা যেতে পারে। স্বাধীন ব্যবসা ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের সমন্বয় ঘটিয়ে যে 'মিশ্রনীতি' আমরা অনুসরণ করছি সেই পথে আদৌ আমরা আমা-দের বাঞ্ছিত পথে এগোতে পারব কি না, আর অপরটি হচ্ছে (যেটি হয়ত অনেকাংশে প্রথম প্রশ্ন থেকেই উদ্ভূত হচ্ছে), পদ্ধতি হিসাবে এই 'মিশ্রনীতি' উৎকৃষ্ট হলেও আমাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থার ঔদাসীন্য ও শৈথিল্যের ফলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর মধ্যে যে দুর্নীতি প্রশ্রয় পাচ্ছে, তারই দরুণ আমরা আমাদের লক্ষ্যস্থল থেকে ক্রমে দূরে সরে যাব কি না?

সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে থেকে স্বাধীন ব্যবসার মারফৎ অর্থনৈতিক কাঠামোকে চালু রাখার 'মিশ্রনীতি' অল্প বিস্তর সব দেশেই আজ গৃহীত হয়েছে, সর্বাঙ্গীন বা সামগ্রিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ এবং ভোগ্য সামগ্রীর ব্যবহার ও মূল্য নির্ধারণের পথ যে সব দেশ গ্রহণ করেন নি সে সব দেশই আজ Laissez faire মতবাদ থেকে অনেকখানি সরে এসেছেন। আমরা মধ্যপথ বেছে নিয়ে সরকারী নিয়ন্ত্রণের মাত্রা ক্রমশ বাড়িয়ে আখেরে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা আনবার চেষ্টা করছি। ব্যক্তিগত বা দলগত লাভের চেষ্টার সঙ্গে সমাজচেতনার নিজস্ব 'মুনাফার' সঙ্গে সমবেত প্রচেষ্টার বা 'সমবায়'-এর, যান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে কুটীর শিল্পের সামঞ্জস্য ঘটিয়ে আমরা চেষ্টা করছি, উদ্যোগীর লভ্যাংশ, শ্রমিকের মজুরী এবং ক্রেতার স্বার্থ সমানভাবে রক্ষা করবার। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এগোতে হলে দেশবিদেশের বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ্‌দের দ্বারা অনুমোদিত এই 'মিশ্রনীতি' ছাড়া আমরা সকলের পক্ষে কল্যাণকর কোন পদ্ধতির কথা ভাবতে পারি না। সময় কিছু বেশি লাগলেও, আশা করা যায় যে, কালক্রমে জাতীয় আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আয় বণ্টন ব্যবস্থারও আমূল পরিবর্তন হবে। এখনো আমরা যে ধন-বৈষম্য দেখছি এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় না যে, নীতির দিক্ দিয়ে আমাদের গৃহীত পদ্ধতি ব্যর্থ হয়েছে; এই প্রশ্নের বিচারের সময় এখনো আসে নি। অতএব 'এখনো আমাদের দেশের শতকরা সাটজন গ্রামবাসীর দৈনিক আয় তিন আনা অথবা সাত আনা' কি না তাই নিয়ে বাক্‌যুদ্ধ করার সার্থকতা দেখি না। যে কথা বিচার্য তা হচ্ছে, নির্ধারিত পক্ষে অগ্রসর হয়ে কবে নাগাদ আমরা বর্ধিত জাতীয় আয়ের উপযুক্ত বণ্টন ব্যবস্থা দেখতে পাব। একদল বলবেন যে, আমরা যে কয়টি দেশের নজীরকে প্রধানত সামনে রেখে অগ্রসর হচ্ছি তারা বহুকাল আগেই "take off stage" পার হয়ে[৭] High mass Consumption" স্তরে পৌঁছেও বেকার সমস্যা

(৭) ইংলণ্ডের স্বর্ণযুগের আলো এবং আঁধারের দিক্ সম্বন্ধে বহু আলোচনা হয়ে গেছে; পূর্বেই আমরা তার কিছু উল্লেখ করেছি! আজ সাম্রাজ্য হারিয়ে সে দেশের যে দুরবস্থা যাচ্ছে তা আমরা প্রত্যহই জানতে পারছি। অপর ধনীদেশ, যুক্তরাষ্ট্র, যেখান থেকে আমরা অর্থ সাহায্য ও উদ্দীপনা অনেকাংশে সংগ্রহ করছি সেদেশে মোট আয়ব্যয়ের হার আমাদের দেশের তুলনায় অনেক বেশি হলেও, ধনবৈষম্য এখনো খুবই উগ্রভাবে রয়েছে: এইসূত্রে আমেরিকার এক বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদের বক্তব্যটি লক্ষণীয়।

". . . it is understandable that one should form an impression of the American standard of living from the full-page magazine advertisements portraying a jolly American family in an air-conditioned home with a Buick and a station wagon and all the other good things that go to make up comfortable living. Actually, of course, this sort of life is still beyond the grasp of 95 per cent of the American public and even beyond most families from which the selected group of college students comes." **(Paul A. Samuelson, Economics, pp. 60-61).**

ও ধনবৈষম্যের উগ্রতা থেকে যে ভাবে ভুগছে, তাতে সে সব দেশের পন্থা অনুসরণ করলে আমরাও একই স্থানে উপস্থিত হব। কিন্তু আমরা ধরে নিচ্ছি, আমরা আমাদের পরিকল্পনাকে রূপদান কালে ঐসব দেশকে অন্ধভাবে অনুকরণ করব না, অতএব আমরা বাঞ্ছিত লক্ষ্যস্থলেই পৌঁছাতে পারব।

এরই সূত্রে অপর যে প্রশ্নটি আসে তা হচ্ছে আমাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থার শৈথিল্য, উদাসীনতা বা ইচ্ছাকৃত অবহেলার ফলে যে ধনবৈষম্য ঘটছে তার পরিমাণ কতটা, এবং যদি সরকার সম্পূর্ণভাবে 'চাপ-নিরপেক্ষ' পথে, স্বচ্ছ, নির্ভীক শাসন ব্যবস্থা অনুসরণ করেন তাহলে আমরা ধনবৈষম্য দূর করার পথে কতটা সুফল পাব।— মূল্য বৃদ্ধির গতিরোধ করার অসামর্থ্য ইদানীং প্রকট হয়ে উঠেছে ; এই মূল্য বৃদ্ধির কতখানি চাহিদা ও সরবরাহের 'স্বাভাবিক' নিয়মানুযায়ী নির্ধারিত হচ্ছে এবং কতখানি ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর সঙ্ঘবদ্ধ চাপের ফলে সৃষ্টি হচ্ছে এই প্রশ্নের সদুত্তর আজও জনসাধারণ পায়নি। ব্যবসায় গোষ্ঠী যদি নূতন নূতন পথে অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির গতি অব্যাহত রাখতে পারেন এবং সরকার যদি সেক্ষেত্রে যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অক্ষম হন তাহলে আমরা সেটি কিসের ব্যর্থতার নিদর্শন বলে ধরব, 'মিশ্রনীতি'র মূল মতবাদের অথবা প্রশাসনিক ব্যবস্থার গলদের, অথবা উভয়ই? আয়কর কত অনাদায়ী পড়ে থাকছে তাই নিয়ে দেশের লোকে ক্রমাগতই সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে কিন্তু কোন প্রতিবিধান লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। ৮ অপর দিকে, বিভিন্ন খাতে যত অপচয় ও অপ্রয়োজনীয় ব্যয় হচ্ছে তারও অনেকখানি পরিহার করা সম্ভব হলে, অযথা মুষ্টিমেয় লোকের হাতে অর্থসঞ্চয়ের পথ কিছুটা সঙ্কীর্ণ করা যেত। ট্যাক্স আদায়েও শৈথিল্য থাকলে এবং সেই সঙ্গে অপব্যয় সম্বন্ধে সজাগ না হ'লে সরকারী তহবিলে সঞ্চিত টাকা সকলের মঙ্গলের জন্য ব্যয়িত হবে না, তহবিলের চাহিদাও কোনদিন আয়ত্তাধীনে আসবে না। 'শ্রেণীবিহীন' সমাজ তৈরীর ঝোঁকে আমরা রেলগাড়ির ইণ্টার ক্লাশ তুলে দিলাম, পরিবর্ত্তে করলাম 'এয়ার কণ্ডিশনড' গাড়ী; পদস্থ কর্মচারীরা আজকাল ঐ রকম গাড়ীতে চড়ে ভ্রমণ না করলে নিজেদের 'কর্মদক্ষতা' বজায় রাখতে পারেন না। বড় বড় শহরে "Load Shedding" যখন নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে, পয়সাওয়ালা লোকের ঘরে ঘরে 'ঠাণ্ডা ঘরে'র যন্ত্র বসছে। এইভাবে তিল তিল করে চারিদিকে কত অপচয় বিলাস বৈভবের নতুন মানদণ্ড তৈরী হচ্ছে তার সম্মিলিত ফল কখনও ভেবে দেখা হচ্ছে না। চালের ঘাটতি শুধু আমাদের দেশে কেন, সারা পৃথিবী জুড়ে দেখা গেছে, কিন্তু সেই যুক্তিতে 'এমার্জেন্সি'র ভারে আমাদের দেশে চালের যত দাম বেড়েছে তার সমর্থন কি খুঁজে পাওয়া যায়? যখন নিত্য ব্যবহার্য জিনিষের দাম বাড়বার মুখে, তখনি সরকারী মুখপত্র, প্রথমে সকল ব্যবসায়ীর ধর্মবোধের প্রতি আবেদন জানাচ্ছেন, পরে বলছেন, এই মূল্যবৃদ্ধি অনিবার্য্য। যেখানে টাকার মূল্য স্থির রাখা সম্বন্ধে সরকারের এত অক্ষমতা সেখানে গরীব গ্রামবাসীর দৈনিক ব্যয় তিন আনার স্থলে সাত আনা হলেও কি যথেষ্ট আনন্দিত

(পূর্বে এক রচনায় আমরা আমেরিকার বেকার সমস্যার কথা আলোচনা করেছি।) আমাদের দেশের গ্রামের ও শহরের কত ভাগ লোক জাতীয় 'গড়' আয়ের তুলনায় আরো কম রোজগার করছে বা কতভাগ লোক অত্যন্ত দুরবস্থার মধ্যে আছে ("below the poverty line") সেই তথ্য ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভের বিভিন্ন হিসাবের থেকে যতটুকু পাওয়া যায় তাই যথেষ্ট নিরুৎসাহজনক (এই সূত্রে দ্রষ্টব্য "*Some Aspects of Indian Economic Development*, Volume I, : S. K. Bose. Page 148.) আমেরিকার ধনবণ্টন ব্যবস্থা আমাদের দেশের থেকে সম্পূর্ণ অন্যস্তরের হলেও আদৌ অনুকরণযোগ্য নয়; মোট জনসংখ্যার শতকরা ২৮ ভাগ পরিবার মোট জাতীয় আয়ের মাত্র ৯ ভাগ রোজগার করে; অপর দিকে সর্বোচ্চ আয়ের মোট ৮ ভাগ পরিবার মোট আয়ের ২৭ ভাগ রোজগার করে।

(৮) ১৯৫০-৫১তে আয়কর বাবদ সরকারী তহবিলে এসেছিল ১৩২·৭৩ কোটি টাকা আর ১৯৬৩-৬৪ বাজেটে আয়কর বাবদ ধরা হয়েছে ২১৮ কোটি টাকা (৬৪·২ ভাগ বৃদ্ধি)। অপর দিকে বিভিন্ন সামগ্রীর উপর কর (Taxes on Commodities and service) ২২৭·৪৯ কোটিতে থেকে ৮৮৫·৩৯ কোটি (২৮৯·৩ ভাগ বৃদ্ধি) দাঁড়িয়েছে। (দ্রঃ রিজার্ভব্যাঙ্ক বুলেটিন মার্চ ৬৩)। বুলেটিনের অক্টোবর ১৯৬১ সংখ্যায় দেখা যায় যে ২৫,০০০ টাকা ও তদুর্দ্ধ আয়ের মোট আয়কর দাতার সংখ্যা ১৯৫৮-৫৯এ ছিল ৬৩২১৪ জন, তাদের আয় ছিল ৫০৮·৪২ কোটি টাকা এবং আয়কর ধার্য হয়েছিল ২২৪·১২ কোটি টাকা; ১৯৫৯-৬০এ এই অঙ্ক যথাক্রমে ৬৭৭১৪ জন ৫৬৪·৭৫ কোটি টাকা এবং ১৯৭·৯১ কোটি টাকা। বুলেটিনের জুন ১৯৬৭ সংখ্যা এবং সেপ্টেম্বর '৬২ সংখ্যা (পৃ ১৩৬০) দেখে অনুমান হয় উচ্চ আয়ের সবশ্রেণীর আয়করদাতার কাছ থেকে দেশের চাহিদা অনুযায়ী, এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধি, ও ব্যবসায়ে পথ প্রশস্ততর হবার সঙ্গে সামঞ্জস্য দেখে আয়কর আদায় করা হয়ত হচ্ছে না, অথবা বলা যেতে পারে, আদায় করার সব পথ যথেষ্ট উদ্যোগের সঙ্গে ব্যবহার করা হচ্ছে না।

হবার কারণ আছে? প্রতি বছরই বাজেটের সময় দেখা যায়, কোন বিশেষ দ্রব্যের উপর যে পরিমাণ ট্যাক্স চাপানো হল, মূল্যবৃদ্ধি হ'ল তার থেকে বেশি; আর যদি সেই বর্দ্ধিত দাম কমাবার জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন, অবিলম্বে সেই জিনিষ 'সাদা বাজার' থেকে অদৃশ্য হল, আর সরকার নীরব দর্শক হিসাবে সেই কাজ হজম করলেন।

একদলের মতে মিশ্র অর্থনীতির প্রাথমিক অধ্যায়ে এই সব প্রশাসনিক শৈথিল্য অনিবার্য; তাছাড়া শাসন কার্যে আমাদের অভিজ্ঞতা কম আর অন্যান্য দেশে ত এইসব গলদ আরো প্রকটভাবেই দেখা দিয়েছে, সে তুলনায় আমাদের শাসন ব্যবস্থা অনেক ভাল।—সবই না-হয় মেনে নেওয়া গেল, কিন্তু তার মোট ফলটা কি দাঁড়াল? পদ্ধতির দিক্ দিয়ে বর্তমানে অনুসৃত নীতিকে আমরা সবচেয়ে ভাল বলে গ্রহণ করেছি কিন্তু তাকেই রূপদান করার কাজে যে প্রশাসনিক শৈথিল্য দেখা দিয়েছে তাকেও কি অবশ্যম্ভাবী বলে মেনে নিতে হবে?

গরীবের দিন কি ভাবে কাটছে তাই নিয়ে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল তারই উল্লেখ করে বলতে হয়, আমাদের গৃহীত নীতি যতই ত্রুটিশূন্য হোক না কেন, তার প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে ধরনের ঢিলেমি দেখা দিয়েছে অনেকটা তারই ফলে আমরা যে পথে এগোতে চাইছি সে পথ থেকে সরে আসছি। 'মিশ্রনীতি' অভ্রান্ত এবং শ্রেষ্ঠ কি না সেই বিতর্কে আমরা প্রবেশ করছি না, তবে কাগজে কলমে যে নীতিকে আমরা গ্রহণ করেছি তাকে রূপদান করার ক্ষেত্রে আমাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থার যে সব ত্রুটি ক্রমে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে তার আমূল পরিবর্তন ঘটাতে না পারলে সুফল পাওয়া দুষ্কর।—চাহিদা ও সরবরাহের অবাধনীতির দ্বারাই মূল্য নির্ধারিত হবে এই কথা 'মিশ্রঅর্থনীতি'তেও সবক্ষেত্রে বেদবাক্য বলে মেনে নেওয়া যখন হচ্ছে না তখন যেমন দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি ঘটছে, সেসব ক্ষেত্রে আইনের কঠোর প্রয়োগের দ্বারা কেন মূল্য নির্ধারণ এবং তারই সঙ্গে সহজলভ্যতা আনা যাবে না সে প্রশ্ন স্বভাবতঃই দৈনিক সাত আনা আয়ের লোকদের মনেও আসে। খাদ্যে, ওষুধে ভেজাল দিলেও শাস্তি পেতে হবে না, অথবা শাস্তিকে এড়ানো যাবে, একথাও ঠিক মিশ্রনীতির আওতায় বোধহয় পড়ে না; ধার করা টাকা দিয়ে বিমানঘাটী থেকে শহরপর্যন্ত হেলিকপ্টারে চড়ে আসার ব্যবস্থাও কোন বিশেষ অর্থনৈতিক মতবাদের অন্তর্ভুক্ত কথা নয়।

দৈনিক সাত আনা আয়ের যেসব লোকের সুখ সুবিধার কথা নিয়ে এত চিন্তা করা হয়েছে, তারা সম্ভবত বলবে, নিদেন পক্ষে যতটুকু ব্যবস্থার কথা আমাদের ঘোষিত নীতির মধ্যে বলা আছে ততটুকুই সুষ্ঠুভাবে, সৎভাবে, নির্ভীক ভাবে প্রয়োগ করা হোক, আপাতত তাতেই তারা নিশ্চিন্ত বোধ করবে।

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
মুদ্রাকর ও প্রকাশক— শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ১২০।২ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা।

NOTICE

We have the pleasure to announce the appointment

of

Messrs PATRIKA SYNDICATE PRIVATE LTD.

12/1, Lindsay Street, Calcutta-16,

as



Sole Distributors through newsvenders in India

of

THE MODERN REVIEW

(from Dec. 1962)

PRABASI

(from Paus 1369 B.S.)

All newsvenders in India are requested to contact the aforesaid Syndicate for their requirements of The Modern Review and Prabasi henceforward.

Manager,

THE MODERN REVIEW & PRABASI

Phone : 24-3229 Cable : Patrisynd

PATRIKA SYNDICATE PRIVATE LTD.

12/1, Lindsay Street, Calcutta-16.

Delhi Office : Gole Market, New Delhi. Phone : 46235

Bombay Office : 23, Hamam Street, Fort, Bombay-1.

Madras Office : 16, Chandrabhanu Street, Madras-2.

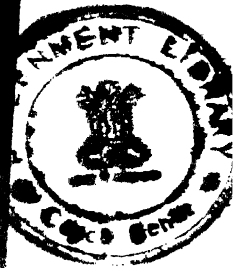


সূচীপত্র—অগ্রহায়ণ, ১৩৭০

— রঙীন চিত্র —

— হলায়ুধ —

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়



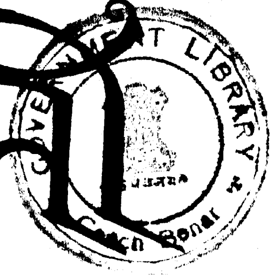
প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

হলায়ুধ

শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

প্রবাসী



"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৩শ ভাগ
২য় খণ্ড

২য় সংখ্যা
অগ্রহায়ণ, ১৩৭০

বিবিধ প্রসঙ্গ

পশ্চিম বাংলার মধ্যবিত্ত

সম্প্রতি কলিকাতার এক ইংরাজী দৈনিক সংবাদ দিয়াছেন যে, নূতন আমন ধান কাটা ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পুরাদস্তুর চলিবে। এবং সেই নূতন ধান বাজারে আসিলেই নাকি এই রাজ্যে চালের দরে একেবারে ওলট-পালট আরম্ভ হইবে। কলিকাতায় বাজারের খবর এই মত যে, পশ্চিম বাংলায় অঢেল ফসল না হইলেও যাহা হইয়াছে তাহা ভালই। প্রতিবেশী উড়িষ্যা রাজ্যের ফসল এবার সত্য-সত্যই প্রচুর। এবং এই খবরে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে চাউলের একেবারে জলের দর হওয়ার সম্ভাবনার কথা আলোচনা হওয়া সুরু হইয়াছে। এই ধরণের কথার পিছনে যে বস্তু আছে তাহার প্রমাণস্বরূপে উক্ত দৈনিক বলেন যে, সম্প্রতি উড়িষ্যার নেতৃবর্গের কয়েকজনই ঘোষণা করিয়াছেন যে, চাউলের দর অসম্ভব নামিয়া উড়িষ্যার চাষী তাহার ন্যায্য দাম হইতে বঞ্চিত হয়, ইহা তাঁহারা চাহেন না এবং সে কারণে তাঁহারা সতর্কবাণী দিতেছেন।

ঐ দৈনিক বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারও নাকি উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবীরেন মিত্রের চাউল বিক্রয় প্রস্তাবে খুবই আগ্রহ দেখাইতেছেন। শ্রীমিত্র সরকারী হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ৩ লক্ষ টন চাউল সস্তা দরে দিতে রাজী আছেন। বাংলায় একদল উচ্চশ্রেণীর বিশেষজ্ঞ বলেন যে, বাংলা সরকারের এই প্রস্তাব গ্রহণে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করা উচিত নহে। যদি উড়িষ্যার চাউল ১৬।১৭ টাকা মণ দরে পাওয়া যায় তবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচিত এখনই এমন কড়া ব্যবস্থা করা যে বেসরকারী ব্যবসায়ীর দল যাহাতে উড়িষ্যার ঐ উদ্বৃত্ত চাউল হস্তগত না করিতে পারে।

বলা বাহুল্য যে রক্তশোষকের দল ব্যবসা-বাণিজ্যের নামে বাঙালীর বুকের উপর বসিয়া তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া খাইতেছে তাহারা উড়িষ্যা ও বাংলার মধ্যে এই আদান-প্রদানে প্রাণপণ বাধা দিবে। এবং ইহাও বলা বাহুল্য যে, ঐ অসৎ ব্যবসায়ী দলের টাকার অভাব নাই এবং আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলির মধ্যে উহাদের দাক্ষিণ্যে পরিপুষ্ট দালালেরও অভাব নাই সে কিবা কংগ্রেসী দল কিংবা কম্যুনিষ্ট দল—সুতরাং এই প্রস্তাবের ভবিষ্যৎ খরদৃষ্টিতে লক্ষ্য করা প্রয়োজন।

মাছের বাজার সম্পর্কে "যুগান্তর" খবর দিয়াছেন যে :—

কলিকাতা, ১৩ই নভেম্বর—রাজ্য সরকার আগামী কয়েকদিনের মধ্যে (খুচরা ও পাইকারী) মাছের সর্বোচ্চ দর সংশোধন করিবেন এবং কোন কোন মাছের দর কিলোপ্রতি ১১ টাকা পর্যন্ত হ্রাস করা হইতে পারে। কিন্তু এই দর হ্রাসের ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চল এলাকায় পার্শ্ববর্তী যেসব অঞ্চল হইতে মাছ আমদানী হইয়া থাকে, তাহা নির্দ্দেশিত এলাকায় অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তাও চিন্তা করা হইতেছে। বিজয়গড় (যাদবপুর) বাজারের মাছ-বিক্রেতারা অভিযোগ করিয়াছেন যে, ক্যানিং অঞ্চলকে সরকারী নিয়ন্ত্রণাদেশভুক্ত এলাকার মধ্যে আনা না হইলে তাহাদের পক্ষে নির্দ্দিষ্ট দরে মাছ কেনা ও বেচা সম্ভবপর হইবে না। বর্ত্তমান ক্যানিং অঞ্চল কলিকাতা শিল্পাঞ্চলের মধ্যে ধরা হয় না। অথচ ঐ অঞ্চল হইতে টালিগঞ্জ-যাদবপুর অঞ্চলের মৎস্য-ব্যবসায়ীরা মাছ আনিয়া থাকেন।

জানা গিয়াছে, এবার বাজারে প্রচুর ভেটকি মাছ পাওয়া যাইতেছে এবং ভেটকি মাছের প্রাচুর্যের ফলে সরকারী নির্দ্ধারিত সর্ব্বোচ্চ মূল্যের অনেক কম দামে বাজারে ভেটকি মাছ বিক্রয় হইতেছে। আশা করা যাইতেছে ভেটকি মাছের মূল্য বিশেষভাবে হ্রাস পাইবে।

অন্যদিকে মফঃস্বলের সংবাদে দেখা যায় যে, মাছের দর অধিকাংশ স্থলেই ৭।৮ টাকা কিলো রহিয়াছে। এদিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

আর এক খবরে দেখা যায় যে, সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপক ভাবে দেশবাসীর পুষ্টির অভাব দুর করার অভিযান আরম্ভ করা হইয়াছে। এই অভিযানে রাজ্য সরকারের সহিত বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এবং জাতিসঙ্ঘের খাদ্য ও কৃষি (FAO) ও শিশুরক্ষা সংস্থা (UNICEF) যুক্ত রহিয়াছে। ইহার কার্য্যক্রম দীর্ঘকাল চলিবে এবং ইহা শেষ পর্য্যন্ত সকল গ্রামাঞ্চলে প্রসারিত হইবে। ইহার কার্য্য প্রকরণের মধ্যে দেশবাসীর খাদ্যের মধ্যে প্রোটিন ও ভাইটামিনের পরিমাণ বৃদ্ধিই আসল। এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পুকুরে মাছের চাষ, স্কুলগুলির সঙ্গে শাকসব্জীর বাগান এবং গ্রামে গ্রামে হাঁস-মুরগী প্রতিপালনের ব্যবস্থা করা হইবে। পল্লীগ্রামের বাসিন্দাদিগের শিক্ষা দিবার জন্য গ্রামাঞ্চলের কর্ম্মীদের প্রথমে শিক্ষাদান করা হইবে। ঐ শিক্ষিত কর্ম্মীগণ-গ্রামবাসীদিগকে শিক্ষা দিবে। সেই শিক্ষার প্রধান অঙ্গ রোগ-প্রতিরোধ-কারী খাদ্যের উৎপাদন ও সেই খাদ্য রক্ষা।

খবরে আরও অনেক আশার কথা আছে—তবে সব কিছুই ভবিষ্যতের কথা। এবং ততদিনে দেশের লোক যে কি অবস্থায় দাঁড়াইবে তাহা সহজেই বুঝা যায়। এই অভিযানে যাহাদের শিক্ষাদীক্ষা ও কর্মপটুত্বের উপর নির্ভর তাহারা মধ্যবিত্তশ্রেণীর সন্তান, কেহ বা চাষী গৃহস্থের কেহ বা স্বল্প আয়ের নিম্নমধ্যবিত্ত গৃহস্থের। কংগ্রেসের—অর্থাৎ কংগ্রেস সরকারের—অবহেলায় এই রাজ্যের মধ্যবিত্ত সন্তানের দুরবস্থা ত চরমে নামিয়াছে। এবং এতদিনে এই অভিযানের গৌরচন্দ্রিকা সুরু হইল। নির্ব্বাণে দীপে কিমু তৈল দানম্ এই প্রশ্নই জাগে এরূপ খবরে। তবে আকাশকুসুমও কুসুম বলা যায় এবং ঐ কুসুমের জন্যই বাংলা সরকার প্রসিদ্ধ এবং দেখা যায় যে, উহা মুকুল ধরে ও ফলও জন্মায়, তবে সে ফল পায় সরকারের অনুগৃহীত ভাগ্যবানে—মধ্যবিত্ত সাধারণ-জনে কখনও বা ছিটে-ফোঁটা পায়, যেমন সমুদ্রে মাছ ধরায়, আবার কখনও বা শুধু স্বপ্নমহলের কাহিনী শুনিয়াই ভুলিয়া থাকে। এই প্রকার এক কাহিনী—যাহার নাম পরিকল্পনা বা উদ্যোগ—সম্প্রতি "আনন্দবাজার" দিয়াছেন, যথা :—

সরকারী উদ্যোগে পলতায় একটি ইটের কারখানা স্থাপিত হইতেছে। এই কারখানায় দৈনিক পঞ্চাশ হাজারের মত ইট নির্ম্মাণ করা হইবে। আগামী ফেব্রুয়ারীর শেষ কিংবা মার্চের প্রথম সপ্তাহে কাজ সুরু হওয়ার কথা।

কারখানাটির জন্য ২৭ লক্ষ টাকার মত খরচ হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। বিদেশী মুদ্রার প্রয়োজন তের লক্ষ টাকার। চেকোশ্লোভাকিয়া হইতে যন্ত্রপাতি আসিতেছে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর সহিত চুক্তি করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন কমিশনার শ্রী এস কে ব্যানার্জ্জি সোমবার প্রাগ্ রওনা হইয়া যান। সেখানে ১৫ই নবেম্বর চুক্তি স্বাক্ষরের কথা আছে।

পশ্চিমবঙ্গে সরকারী উদ্যোগে এই ধরণের আরও চারটি ইটের কারখানা হইয়াছে। সম্ভবতঃ সেগুলি দুর্গাপুর, হলদিয়ার প্রভৃতি অঞ্চলে স্থাপিত হইবে। দুইটিতে দৈনিক ৫০ হাজার করিয়া ইট তৈরী হইবে।

ভারতের যে-কোন রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে এখন ইটের দাম সবচেয়ে বেশী। এখানে কিছু ব্যবসায়ী ইট লইয়া একচেটিয়া ব্যবসায় সুরু করিয়া দিয়াছেন। ইটের ব্যবসায়ে অতি-মুনাফা বন্ধ করার উদ্দেশ্যেই রাজ্য সরকার ইটের কারখানা স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন।

পলতায় প্রস্তাবিত ইটের কারখানার জন্য চাষের জমির কোন ক্ষতি হইবে না। পলতা পাম্পিং স্টেশনের পাঁক হইতেই ইট তৈরী হইবে।

এই সরকারী উদ্যোগকে আকাশকুসুম বলায় হয়ত কেহ কেহ আপত্তি জানাইবেন। কেননা এরূপ উদ্যোগ বাস্তবে পরিণত হইয়াছে বহুস্থলেই। কিন্তু তবুও আমরা ইহাকে আকাশকুসুমই বলিব, কেননা এই রাজ্যের—অর্থাৎ বাংলা-মায়ের সন্তান যাহারা তাহাদের মধ্যে বড় জোর শতকরা ·০০১ জন ভাগ্যবান্ ঐ ইটের কাছে যাইতে পারিবেন। উহা দ্বারা গৃহনির্ম্মাণ করিতে পারিবেন সেই ভাগ্যবানদের মধ্যে যদি কাহারও পিতৃ-পুরুষের কৃপায় কোনও জমির টুকরা জুটিয়া থাকে। অন্য বাংলার সন্তানদের ভিটামাটি হইতে উচ্ছেদের কাজই ত—পলতার আশেপাশে ও কলিকাতা অঞ্চলে এতদিন সমানে চলিয়াছে। এখন বাস্তুহারা ও গৃহহারা বলিতে যদি কেহ থাকে তবে পশ্চিম বাংলার বাঙালী—বিশেষে কলিকাতার গৃহস্থ সন্তান।

কলিকাতার মধ্যে ত যদি কেহ আশ্রয়প্রার্থী হন তবে তাঁহার অশেষ দুর্ভোগ সহিতে হইবেই—যদি না তিনি সরকারী বা বড় বিদেশী কোম্পানীর উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। ভাড়া ত যাঁহারা কলিকাতা হইতে 'বাঙ্গালী' উচ্ছেদের কাজে উদ্যোগী, তাঁহাদের কৃপায় আকাশে উঠিয়াছে। উপরন্তু সেলামী—অর্থাৎ চোরা টাকার ব্যাপার—বৃহৎ অঙ্কের গণনায় দিতে হইবে বিনা বাক্যব্যয়ে। এবং এই ব্যবস্থা এখ-

এতই ব্যাপক হইয়াছে যে, মাড়োয়ারী গুজরাটি ভাটিয়ার সঙ্গে অনেক বাঙালীও জুটিয়া গিয়াছেন।

এই অবস্থার সঙ্গে জমি ও বাড়ীর দাম আকাশে উঠিয়া চলিয়াছে। গৃহবিচ্ছেদ অর্থাভাব এ সবই ত এখন বাঙালী-জীবনের অঙ্গ। সুতরাং স্থাবর সম্পত্তি বিভক্ত হইয়া বিক্রয় চতুর্দ্দিকে চলিতেছে এবং এই কেনা-বেচায় ক্রেতার মধ্যে চোরাকারবারীর সংখ্যা অত্যধিক হওয়ায় কেনা-বেচায় চোরা টাকার লেন-দেনই বেশী হয়। যাহার ফলে কলিকাতার শহরাঞ্চলে এই মত অবস্থা চলিতেছে।

আগেকার দিনে চাকুরে বা সাধারণ-ব্যবসায়ী বাঙালীও বাড়ী-ঘর করার আশা রাখিত। এখন তাহার পক্ষে জমি কেনাই অসম্ভব, বাড়ী করা ত দূরের কথা।

কলিকাতার বাহিরে যাওয়া মানে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করা। কেননা যানবাহনের যে অবস্থা তাহাতে শক্ত-সমর্থ-লোকই হয়রান হইয়া যান। উপরন্তু আগে বাহিরে থাকিলে খাদ্যের সুবিধা হইত। কিন্তু এখন তাহার বিপরীত অবস্থা।

সুতরাং পলতার এই সরকারী উদ্যোগ মধ্যবিত্ত বাঙালীর কাছে আকাশকুসুমের উদ্যান মাত্র।

জয়পুরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি

গত ৩রা ও ৪ঠা নভেম্বর জয়পুরে নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির দুইদিন ব্যাপী অধিবেশন হয়। অধিবেশনে কংগ্রেস দলের মধ্যে দলাদলি ইত্যাদিতে আভ্যন্তরীণ প্রশাসন ও পরিচালন কি ভাবে ব্যাহত হইয়াছে ও কি ভাবে তাহার সংশোধন সম্ভব এই প্রশ্ন এবং কংগ্রেসের নীতি ও আদর্শ স্থির করার বিষয়ই প্রধানতঃ আলোচনা করা হয়। কিন্তু বিতর্কের মধ্যে অন্য অনেক কিছু আসিয়া পড়ে, যাহা এতাবৎ কংগ্রেস কমিটি এড়াইয়া গিয়াছেন।

ঐ দুইদিনের অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বেই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে ২রা নভেম্বর রাত্রে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও কামরাজ পরিকল্পনা সম্পর্কে আড়াই ঘণ্টা ব্যাপী আলোচনা চলে। ইহার পর ওয়ার্কিং কমিটি দুইটি প্রস্তাব প্রকাশ করেন। গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র সংক্রান্ত প্রস্তাবের যে খসড়া ঐ অধিবেশনে আসে তাহার মৌলিক পরিবর্তন করা হইয়াছে। ঐ খসড়ার যে অনুচ্ছেদে মার্কসবাদ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য ছিল উহা একেবারে বাদ দেওয়া হয়।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রথম অধিবেশনে কামরাজ পরিকল্পনা বিবেচনার সময় কংগ্রেস হাইকমাণ্ডকে তীব্র মন্তব্যের ও কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হয়। পরিকল্পনা সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটির বিবৃতি আলোচিত হওয়ার সময়ে উত্তর প্রদেশের মন্ত্রী শ্রীবানারসিদাস অভিযোগ করেন যে, কংগ্রেসে দলাদলির জন্য হাইকমাণ্ড দায়ী। তাঁহার মতে রাজ্যগুলিকে নিজেদের ভিতরে ব্যবস্থা করিয়া ঘর ঠিক করার স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। উত্তর প্রদেশে প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীআলগুরায় শাস্ত্রী যাঁহাকে শ্রীবানারসি দাসের উপদলই গদীচ্যুত করে—এই মন্তব্যের প্রতিবাদ করিয়া বলেন, কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় সংস্থা অবশ্যই কঠোর হস্তে কর্তৃত্ব করিবেন। আনন্দবাজার বিতর্কের সূচনা এইভাবে দিয়াছেন :—

শ্রীমোরারজী দেশাই কামরাজ প্রস্তাবের উপর বিতর্কের সূচনা করেন। তিনি বলেন, কাহারও ৫ অথবা ১০ বৎসরের অধিককাল সরকারী পদে আসীন থাকা উচিত নহে। এরূপ কোন নিয়ম থাকা উচিত বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন। নির্ব্বাচনে পরাজয় হইলে কংগ্রেসের নিজেকে শক্তিশালী করিয়া গড়িয়া তোলা উচিত। কিন্তু প্রশাসন হইতে কংগ্রেস স্বেচ্ছায় সরিয়া আসিলে দেশে বিভ্রান্তি ও গণ্ডগোল সৃষ্টি হইবে বলিয়া তিনি আশঙ্কা করেন।

সংগঠনের বিবিধ দুর্ব্বলতা অপসারণের জন্য কামরাজ প্রস্তাব গ্রহণের পর হাইকমাণ্ড যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে তাহাতে কংগ্রেসীদের মধ্যে ক্ষমতালিপ্সা কার্য্যকরভাবে খর্ব্ব হইবে বলিয়া শ্রীদেশাই আশা প্রকাশ করেন।

উত্তর প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যাপারে শ্রীমহাবীর ত্যাগী হাইকমাণ্ডের তীব্র সমালোচনা করেন। কোন মুখ্যমন্ত্রীকে বিদ্রোহীদের লইয়া 'মন্ত্রিসভার স্থলে ফেডারেশন' গঠনে বাধ্য করা উচিত নহে বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন।

বিহারের সদস্য শ্রীরাধানাথ ঝা হাইকমাণ্ডের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেন যে, যেসব রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করিয়াছেন সেখানে মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যাপারে হাইকমাণ্ড বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া দলাদলি সৃষ্টি করিয়াছেন।

কংগ্রেস দলাদলির কত গভীরে গিয়াছে ঐসব মন্তব্যে তাহা বুঝা যায়। শ্রীত্যাগী যাহাদের বিদ্রোহী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন তাহারা যে একই প্রাদেশিক কংগ্রেস সংস্থার সভ্য, সেকথা তিনি গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন নাই। শ্রীবানারসি দাসও নিজেদের রাজ্যের ভিতরে চক্রান্ত জাল কি ভাবে কংগ্রেসকে অবনতির পথে লইয়া গিয়াছে সেকথা বেমালুম চাপিয়া গিয়াছেন।

হাইকমাণ্ড ও কংগ্রেস সরকারের কার্য্যপদ্ধতির উপর অন্যদিক হইতে যে তীব্র সমালোচনা চলে তাহার মধ্যে অনেক কিছুই যথাযথ। শ্রীমতী রেণুকা রায় ও শ্রীমহাবীর ত্যাগী বিশেষ করিয়া কঠোর মন্তব্য করেন। তাঁহাদের মতে কংগ্রেসের সমাজতন্ত্র রূপায়ণের নীতি ও আদর্শ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে, কেননা যে প্রশাসন যন্ত্র দলীয় নীতিকে রূপায়িত

করার একমাত্র মাধ্যম, সেই যন্ত্রের দিক্ হইতে ঐ নীতিমূলক কাজ বা উদ্যোগ কিছুই করা হয় নাই। তাহাদের মতে প্রশাসন যন্ত্রকে ঢালিয়া সাজা প্রয়োজন, নহিলে সমাজতন্ত্র রূপায়ণের কংগ্রেসী "দৃঢ় সংকল্প" ব্যর্থ হইতে বাধ্য। অন্যান্য কয়েকজন সদস্য সমবায় ও কৃষাণ কল্যাণের উন্নয়ন বিষয়ে কংগ্রেসীদলের কাজকর্ম্মের উপর গুরুত্ব আরোপ বিশেষভাবে করেন। তাঁহারাও প্রশাসন যন্ত্রের আমূল সংস্কার প্রয়োজন এই মন্তব্য করেন। অন্যথায় জনসাধারণের অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে দ্রুত ব্যবস্থা করা যাইবে না, ইহাই তাঁহাদের মত।

রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তর প্রদেশের কিছু সদস্য মণ্ডল, জেলা ও এ আই সি, সি পর্য্যায়ে যাঁহারা পদ আঁকড়াইয়া আছেন তাঁহাদের উপর কামরাজ প্রস্তাব প্রয়োগের অনুরোধ জানান। উড়িষ্যার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপটনায়ক তাঁহার ভাষণেও কংগ্রেসদলের সম্পূর্ণ পুনর্গঠন ও প্রশাসন যন্ত্রের আমূল সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। তিনি প্রধানতঃ নিম্নস্থ তিনটি বিষয়কে বিবেচনা করার প্রস্তাব করেন :—

(১) অন্ততপক্ষে আগামী আরও দুই দশকের জন্য যাহাতে কংগ্রেস দেশকে পরিচালনা করিতে পারে এবং তাহার ভাগ্য নির্ণয় করিতে পারে তাহার জন্য কি প্রকারে কংগ্রেসের পুনর্গঠন প্রয়োজন।

(২) কংগ্রেস যে-সব মূল নীতি নির্দ্ধারণ করিবে সেগুলি যথাযথভাবে প্রয়োগের জন্য কিভাবে দেশের শাসনযন্ত্রের সংস্কার করা যায়।

(৩) সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সংজ্ঞা কংগ্রেসকে সুনির্দিষ্ট ভাবে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। যাহাতে প্রশাসনিক বিভাগ ও জনসাধারণ বিনা দ্বিধায় কংগ্রেসের নীতি অনুযায়ী কাজ করিতে পারে তাহার জন্য দ্ব্যর্থহীন ভাবে ও প্রাঞ্জল ভাষায় কংগ্রেসের আদর্শ ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিতে হইবে।

মোটের উপর এবারের নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে সদস্যদের মনোভাবের বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা দেয়। শ্রীনেহরুর স্তুতিবাদ এবং কংগ্রেস সরকারের ব্যাজস্তুতিই ছিল এতদিন এই কমিটির কার্য্যকলাপের প্রধান অঙ্গ ও প্রস্তাবগুলির মধ্যে পররাষ্ট্র সম্পর্কে শ্রীনেহরুর ভাষণ ও তাহার অন্তর্গত কতকগুলি অবাস্তব প্রস্তাবের ব্যঞ্জনাই ছিল অধিবেশনের বিশেষত্ব। এবারে পররাষ্ট্র সম্পর্কে কোনও বিশেষ ব্যাখ্যান হয় নাই। শুধুমাত্র কংগ্রেস সভাপতি সঞ্জীবায়া পরমাণবিক পরীক্ষা বন্ধের চুক্তিতে সন্তোষ জ্ঞাপন করেন।

পণ্ডিত নেহরুর দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেও বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা যায় তাঁহার কংগ্রেস কমিটির সদস্যদিগের উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণের মধ্যে। তিনি গোড়াতেই কামরাজ পরিকল্পনা সম্পর্কে বলেন যে, উহার বিশেষ প্রয়োজন ছিল, কেননা উহা কংগ্রেস কর্ম্মীদের মনে এক আকস্মিক আঘাত দিয়াছে। যদি তাহাতে কংগ্রেস দলের তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব কাটিয়া যায় তবে উহা নির্ভুল পথে চলিতে পারিবে। কোন কোন রোগের (মানসিক বা স্নায়বিক) চিকিৎসায় ব্যবহৃত স্নায়ুমণ্ডলীর উপর প্রবল ধাক্কা (শক্ ট্রিটমেণ্ট) দেওয়ার সহিত এই আঘাতের তিনি তুলনা করেন। এই শক্ ট্রিটমেণ্টের কিছু ফল যে হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ, কেননা স্বয়ং শ্রীনেহরু কতগুলি কথা তাঁহার ভাষণের মধ্যেই বলেন যাহা তিনি আগে মুখেই আনিতেন না। নিম্নস্থ উদ্ধৃতিগুলি :— "আনন্দবাজারের" রিপোর্টে" আছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশে একটি দুর্নীতি দমন সংস্থা স্থাপনের প্রয়োজন আছে। মন্ত্রী, নেতা এবং প্রশাসনিক কাজে নিযুক্ত ব্যক্তি—সকলের সম্পর্কেই এই সংস্থা ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

তিনি বলেন, জীবনের প্রতিটি স্তর হইতে যতক্ষণ পর্য্যন্ত দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ না ঘটিতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সমাজতন্ত্র সম্পর্কে উচ্চারিত সমস্ত বুলিই অর্থহীন হইয়া পড়িবে।

কংগ্রেসের মধ্যে দল-উপদল সৃষ্টির কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, পরস্পরের মধ্যে কলহ কংগ্রেস সংস্থার বিরাট ক্ষতি করিতেছে। ইহার কারণ, কংগ্রেসের মূল আদর্শ হইতে তাঁহারা সরিয়া গিয়াছেন।

শ্রীনেহরু বলেন, শুধু নির্ব্বাচনে জয়লাভ করিয়া কংগ্রেসের আত্মতৃপ্ত থাকিলে চলিবে না। কি করিয়া জাতির ভবিষ্যৎ উন্নয়ন হইবে, সে সম্পর্কে কংগ্রেস দলকে চিন্তা করিতে হইবে। নির্ব্বাচনে জয়লাভ কংগ্রেসকর্ম্মীদের উপর সেই বিরাট্ দায়িত্ব আনিয়া দেয়। কংগ্রেস যদি শুধু নির্ব্বাচনের কথাই ভাবে, তাহা হইলে তাহার পতন ঘটিবে।

দেশে যে দুর্নীতির প্লাবন বহিয়া চলিয়াছে, কংগ্রেস যে আদর্শচ্যুত হইয়াছে, এবিষয়ে শ্রীনেহরুর চেতনার উদয় বোধ হয় ঐ ভাবে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থা কাটিয়া যাওয়াতে হইয়াছে। নির্ব্বাচনে জয়লাভই যে কংগ্রেসী সংস্থাগুলির একমাত্র লক্ষ্য-বস্তু নয়, সে-কথা এতদিনে স্পষ্টভাষায় ব্যক্ত করিলেন স্বয়ং শ্রীনেহরু। সেই সঙ্গে যদি নিজ নিজ পাতে ক্ষমতা ও অধিকারের "ঝোলটানার" কথাও তিনি বলিতেন তবে ঐ ভাষণ আরও কার্য্যকরী হইত। ভাষণের আরম্ভেই তিনি আর এক মন্তব্য করেন যাহা শুধু সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় উপরন্তু বাস্তব আশঙ্কাজনিত। সেটি এইরূপ :—

শ্রীনেহরু বলেন, ভারতের জনগণ এখনও প্রাচীন ভাবধারা এবং ঐতিহ্যকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছে। তাহার প্রাচীনযুগেই বাস করিতেছে বলিয়া তিনি মনে করেন। তিনি বলেন, ভারতীয় মনের কোন বিকাশ ঘটে নাই। অবশ্য তাঁহার এই উক্তির জন্য তিনি ক্ষমা চাহেন। মানুষের চিন্তা

যে অবস্থায় রহিয়াছে, তাহা তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থা এবং তাহার ঘোর এখনও কাটে নাই। এই সুষুপ্তি হইতে জাগ্রত না হইলে ধ্বংস নিশ্চিত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। দুর্নীতি দমনের উপায় হিসাবে তিনি কোন কোনও স্কান্ডিনেভিয় দেশে প্রচলিত প্রবীণ ও বিচক্ষণ লোকের সংস্থার কথা উল্লেখ করেন। ঐ সংস্থার সভ্যেরা (ওম্বুড্স্‌মান) রাজ্যের উচ্চতম অধিকারীর ও দুর্নীতি সম্পর্কে অপবাদের জবাবদিহি দাবি করার অধিকার রাখেন। সেই অপবাদের মূলে কিছু সত্য থাকিতে পারে কি না সে বিষয় এবং তাঁহাদের আদেশ অনুযায়ী অভিযুক্ত লোক উপস্থিত হইলে সে প্রকৃতই দোষী কি না স্থির করা বিষয় অধিকারও ইঁহারা রাখেন।

তবে শ্রীনেহরুর কংগ্রেসী দল ত নিজেদের কার্য্যসিদ্ধির অন্তরায়বোধে ত সে দলের সংলোকের উচ্ছেদ প্রায় সম্পূর্ণ করিয়াছে। যে কয়জন আছেন তাঁহাদেরও আসন বা অধিকার অতি নগণ্য। কংগ্রেস দলের বাহিরে সৎলোক ও বিচক্ষণ লোক দেশে অনেক আছেন। কিন্তু তাঁহাদের উচ্চাসন বা উপযুক্ত ক্ষমতা ও অধিকার দিলে কংগ্রেসী চাঁই-দের অবস্থা ত কাহিল হইবে, সুতরাং ও পথে চলা অসম্ভব। তবে দেশের লোক ক্ষেপিলে অবস্থা অন্যরূপ হইবে। সে যাই হউক, শ্রীনেহরু যে বুঝিতে পারিয়াছেন দেশের অবস্থা কত নীচে নামিয়াছে এবং সেই অবনতি সাধনের কৃতিত্ব যে অনেকাংশেই তাঁহার প্রশাসন যন্ত্রচালক ও নিয়ামকবর্গের, ইহাও শুভলক্ষণ—যদিও অনেক দেরীতে ইহার প্রকাশ।

দ্বিতীয় দিনের আলোচনা ও বিতর্কের বিষয়বস্তু ছিল "গণতন্ত্র ও সমাজবাদ"। ছয়ঘণ্টা আলোচনার পর উক্ত বিষয়ক বিবৃতি নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি "সাধারণভাবে অনুমোদন" করে। বিষয়টি অর্থাৎ ঐ বিবৃতি ও উহার সংশোধন সংক্রান্ত সকল প্রস্তাব ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র বিভিন্ন প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্যগণের মধ্যে প্রচার করার যে প্রস্তাব কংগ্রেস সভাপতি শ্রীসঞ্জীবায়া করেন তাহাও অনুমোদিত হয়। ইহা-দের বিবেচনা ও সংশোধন সম্পর্কিত প্রস্তাবাদির বিবেচনার পর চূড়ান্ত প্রস্তাব আগামী জানুয়ারীর কংগ্রেস অধিবেশনে (ভুবনেশ্বরে) আলোচনার জন্য দেওয়া হইবে।

আলোচনা ও বিতর্কের মধ্যে বহু সদস্য উক্ত বিবৃতিতে এ বিষয়ে যে তৎপরতা প্রয়োজন ও উহার দ্রুত সিদ্ধি দেশের পক্ষে কতটা জরুরী তাহার কোনই নির্দেশ নাই বলিয়া অসন্তোষ ও অসহিষ্ণুতা জোরের সহিত জ্ঞাপন করেন। সেই সঙ্গেই একের পর এক বহু বক্তাই দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প-উদ্যোগে পুঁজিপতিদের কার্য্যকলাপে নীতিগত অনাচারের কথা বলেন এবং উহাদের উপর তীব্র অভিযোগের আক্রমণ চালান। বক্তাদের অনেকেই এদেশের ব্যবসায়ীশ্রেণীদের দুর্নীতি ও অসদুপায়ে অর্জিত বিপুল ধনের উল্লেখ করেন। কয়েকজনই উহাদের আইন-কানুন এড়াইবার প্রবৃত্তি, ফাটকা-জাতীয় জুয়া খেলা ইত্যাদির কঠোর সমালোচনা করেন। এ বিষয়ে উড়িষ্যার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিজু পট্টনায়ক বলেন যে, "কংগ্রেসের সমাজবাদের সহিত রক্তমাংস যোগে উহাকে বাস্তব রূপ দিতে হইলে প্রথমে উপযুক্ত প্রশাসন যন্ত্র গড়িয়া তোলা প্রয়োজন এবং সেই সঙ্গে দেশের লোকের মানসিক গঠনের ও পরিবর্তনেরও প্রয়োজন। ঐ কংগ্রেস রচিত গণতন্ত্র ও সমাজবাদ সম্পর্কিত বিবৃতিকে দেশের বর্তমান অবস্থা ও পরিবেশের উপর লক্ষ্য রাখিয়া বিশেষভাবে অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। দৃষ্টান্তস্বরূপে দেশের একটি প্রধান সমস্যার কথা উল্লেখ করা যায়। সেটি দেশের 'চোরাই' টাকাকে হিসাবের মধ্যে ফেলার সমস্যা। ঐ চোরাই টাকা, যাহার পরিমাণ মোটামুটি ৩,০০০ কোটি টাকা, এদেশে "এক সমান্তরাল সরকার চালাইতেছে।" সমান্তরাল সরকার বলিতে শ্রীপট্টনায়ক বলিতে চাহেন যে, ঐ টাকার প্রভাবে এবং উহাতে লব্ধ আয়ের অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ দানে ঐ অসৎ ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিগণ দেশের কলুষিত প্রশাসন যন্ত্রের দুর্নীতিপরায়ণ অধিকারী-দিগের মারফৎ যথেচ্ছাচার চালাইতেছে। একথা যে হাড়ে হাড়ে সত্য, তাহার প্রমাণ পশ্চিম বাংলার নগরে-পল্লীগ্রামে ও পথে-ঘাটে সদা-সর্ব্বদাই দেখা যায়।

ইঁহাদের ঐ সকল অভিযোগের উত্তরে কংগ্রেস কমিটির চাঁইগণ বিশেষ কিছু উচ্চবাচ্য করেন নাই। এবং আরও আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, সমাপ্তি কালে শ্রীনেহরু যে ভাষণ দিয়াছিলেন তাহাতে ইঁহাদের মতামতের পূর্ণ সমর্থন ছিল। তিনি বলেন দেশবাসীকে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তৎপর হইতে হইবে। আজি হইতে দশ বৎসরের মধ্যে যদি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হয় তবে দেশের কি হইবে তাহা বলা দায়। দেশের ব্যবসায় ইত্যাদিতে একচেটিয়া অধিকারের পরিমাণ বিগত দশ-পনেরো বৎসরে বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই প্রথাকে কি ভাবে উল্টাদিকে চালাইতে পারা যায় তাহাই এখন তাঁহার বিশেষ চিন্তার কারণ দাঁড়াইয়াছে। শ্রীনেহরুর "গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র" সম্পর্কিত বক্তৃতার কিয়দংশ "আনন্দ-বাজার" হইতে নীচে উদ্ধৃত হইল :—

শ্রীনেহরু বলেন, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকল্পে দেশের বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি সম্পদ কাজে লাগাইতে হইবে। সমাজতন্ত্র বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি অগ্রগতি হইতে উপজাত। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও কারিগরী উন্নতি ব্যতীত সমাজতন্ত্র অর্থ-হীন। উহা দারিদ্র্য বণ্টনমাত্র। বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি পদ্ধতি ব্যতীত শিল্প এবং কৃষি উৎপাদন বাড়াইবার কোন উপায় নাই।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের বহু বৈজ্ঞানিক গবেষণাকার্য্যের

জন্য বিদেশে চলিয়া গিয়াছেন। কারণ, তাঁহারা সেখানে ভাল গবেষণাগার এবং অন্যান্য সুবিধা পাইয়াছেন। এই সুবিধা তাঁহাদের দেশের মধ্যেই দেওয়া প্রয়োজন।

তিনি বলেন, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না আসিলে রাজনৈতিক গণতন্ত্র সম্পূর্ণ হইবে না। এই জন্য ভারত গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের পথ বাছিয়া লইয়াছে।

তিনি বলেন, গত ১৫ বৎসরে ভারত প্রভূত উন্নতি করিয়াছে। ভবিষ্যৎ উন্নতির পরিকল্পনা করা হইয়াছে। কিন্তু এখনও অনেক বাধা আছে; একটি অন্তরায় পুঁজিবাদ হইতে উদ্ভূত। কারণ, ইহারা সম্পদ বিভাগ এবং সমবায়-নীতির সঙ্গে মানাইয়া চলিতে পারিতেছে না।

শ্রীনেহরু বলেন, ইংলণ্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পুঁজিবাদ মূলতঃ সমাজতন্ত্রের ধারণা আত্মগত করিয়া লইয়াছে। কিন্তু ভারতে পুঁজিবাদ এক কঠিন চীজ। সমান ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন তাহারা বুঝে না। তাহারা এক স্বতন্ত্র জগতের অধিবাসী।

তিনি বলেন, কেহই পুঁজিবাদ চাহে না। ইহা অপচয়-মূলক পদ্ধতি।

শ্রীনেহরুর বক্তৃতার সঙ্গেই এই নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন শেষ হয়। এই অধিবেশনের বিতর্কে ও বক্তৃতায় অনেক জোর কথা ও "হক্ কথা" বলা হইয়াছে। কিন্তু "কথা বনাম কাজ" এ বিষয়ে কংগ্রেসী অধিকারিবর্গের পারদর্শিতা এতদিন যাহা প্রদর্শিত হইয়াছে তাহার নিদর্শন দেশের লোকের শোচনীয় দুরবস্থাই। এবারের অধিবেশনের উত্তাপ কয়দিন থাকে তাহাই দ্রষ্টব্য।

মাধ্যমিক শিক্ষার ধারা ও সমাপ্তি প্রসঙ্গ

নয়াদিল্লীতে ১০ই নভেম্বর হইতে তিনদিন ব্যাপী এক সম্মেলনে ভারতের শিক্ষামন্ত্রী ও উপাচার্য্যগণ শিক্ষা—বিশেষতঃ মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা করেন। এই সম্মেলনের উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু যাহা বলেন তাহার প্রত্যেকটি কথা সত্য ও প্রণিধানযোগ্য। তিনি বিশেষে শিক্ষকদের বেতনের উপর ঝোঁক দিয়া বলেন যে, ইট, চুণ, সুরকির পিছনে টাকা না ঢালিয়া শিক্ষকের বেতন বাবদ সেই অর্থ ব্যয় করা ভাল, কেননা সত্যকার শিক্ষা সস্তার স্কুলবাড়ী, এমন কি মুক্তাকাশের নীচেও দেওয়া যাইতে পারে। তিনি বলেন যে, আমাদের পক্ষে শিল্পকৃষি ইত্যাদি অতি-প্রয়োজনীয় বিষয়, কিন্তু একমাত্র গণশিক্ষার পটভূমিতেই এই দুইটির গড়িয়া উঠা সম্ভব। সুতরাং শিক্ষারই গুরুত্ব সর্ব্বাধিক।

অন্য কথার মধ্যে তাঁহার নিম্নস্থ মন্তব্যগুলি (যুগান্তরের রিপোর্ট) বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

শ্রীনেহরু বলেন: সর্ব্বজনীন শিক্ষাই যে আমাদের যোজনাগুলি ও উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির মধ্যে প্রথমস্থানীয়, আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস রহিয়াছে। আপৎকালীন অবস্থার দরুন কয়েকটি রাজ্যে শিক্ষার ক্ষতি হইয়াছে এবং ঐ সকল রাজ্য শিক্ষাখাতের জন্য বরাদ্দ টাকা অন্য কাজে ব্যয় করিয়াছে। শিক্ষা সৈনিকবৃত্তি ইত্যাদি অপর কাজের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আজকাল সৈন্যগণকেও শিক্ষিত হইতে হয়। শিক্ষার খাতে বরাদ্দ টাকা আটকাইয়া রাখিয়া পরে অন্য কাজে ব্যয় করা অপেক্ষা অনগ্রসরতা দূর করার জন্য শিক্ষাখাতে আরও বেশী টাকা ব্যয় করা ঢের বেশী দরকারী। অর্থাভাব গণশিক্ষার ব্যবস্থা করার পথে এক দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। এই বাধা অতিক্রম করার জন্য শিক্ষাব্রতীরা যেন বিদ্যালয় নির্মাণের ব্যয় হ্রাসের বিষয়টি বিবেচনা করেন।

শ্রীনেহরু বলেন যে, পরিমাণগত ও গুণগত উভয় শিক্ষার দ্রুত বিস্তারই সরকারের কাম্য। গুণকে বাদ দিয়া পরিমাণকে গ্রহণ করিলে তাহার ভাল ফল হয় না। শিক্ষকগণকে প্রশিক্ষণের তথোচিত সুযোগ দিতে হইবে। ইহার অভাবই শিক্ষা সম্প্রসারণের বাধা হইয়াছে।

ঐ দিনই অধ্যাপক হুমায়ুন কবির বলেন যে পাঠ্যপুস্তকের ক্রমাগত পরিবর্ত্তন করার যে প্রথা চলিতেছে তাহার অবসান প্রয়োজন। প্রতি বৎসর যাহাতে পাঠ্যপুস্তক পরিবর্ত্তিত না হয়, তাহার প্রতি আমার রাজ্য সহকর্ম্মীরা লক্ষ্য রাখিলে তাঁহারা জনগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন। প্রত্যেক মাতা-পিতা বা অভিভাবক প্রতি বৎসর পাঠ্যপুস্তক পরিবর্ত্তনের ব্যাপারে তীব্র অভিযোগ করিয়া থাকেন। একবার পাঠ্য-পুস্তক নির্ব্বাচিত হইলে তাহা অন্যূন পাঁচ বৎসর চালু থাকা উচিত।

শ্রীকবির বলেন: ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্তির বয়স ১৮ বৎসর নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। এই পরিণত বয়সে ছাত্রগণ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের পক্ষেই হউক আর জীবিকার দায়িত্ব গ্রহণের পক্ষেই হউক অধিকতর শৃঙ্খলাপরায়ণ হইতে পারিবে। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই কৈশোরাতি-ক্রান্তকালে মাধ্যমিক শিক্ষাও সমাপ্ত হইয়া থাকে।

অধ্যাপক কবির বলেন: মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপনের বয়স ১৮ হইবে, ইহা যদি একবার স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে আমরা শিক্ষার মান নির্দ্ধারণ করিতে এবং পাঠ্য-বিষয় স্থির করিতে পারিব। মাধ্যমিক শিক্ষাকাল ১২ বৎসর না ১১ বৎসর হইবে, তাহা স্থির করার ভার রাজ্যগুলির উপর আমরা ছাড়িয়া দিতে পারি। কেননা ভারতের ন্যায় বিরাট্ দেশে পাঠকালের পার্থক্য থাকা অপরিহার্য্য। কিন্তু

দেশের সর্ব্বত্র মাধ্যমিক শিক্ষকাল ও সমাপ্তিকাল মোটামুটি এক হওয়াই উচিত। চতুর্থ যোজনাকালের মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষা ১৭ বৎসর বয়সে শেষ করিতে হইবে এবং পঞ্চম কিংবা ষষ্ঠ যোজনাকাল মধ্যে ১৮ বৎসর বয়সই তাহার লক্ষ্য হওয়া উচিত।

প্রধানমন্ত্রী শিক্ষার উপর যে গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন তাহা সর্ব্বতোভাবে যথার্থ। কিন্তু এতদিন তবে তাঁহার এই বিচার কার্য্যে পরিণত হয় নাই কেন? কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তর প্রথমে যাঁহার হাতে গিয়াছিল তিনি প্রথমদিকে অর্থাৎ তাঁহার ঐ ভার গ্রহণ করার সময়, পাশ্চাত্ত্য ও আধুনিক শিক্ষার দিকে বিশেষ মনোনিবেশ করেন নাই। কারণ প্রথমতঃ তাঁহার সকল কাজেই সাম্প্রদায়িকত্বের উপর ঝোঁক ছিল এবং তাহার দরুণ এ বিষয়ে তাঁহাকে অবহিত করার মত লোকও তিনি বিশেষ নিয়োগ করেন নাই এবং দ্বিতীয়তঃ তাঁহার পাণ্ডিত্য প্রগাঢ় কিন্তু একমুখী ছিল, তাই তিনি অন্যদিকে মনোনিবেশ করিতে বিশেষ সমর্থ ছিলেন না। অথচ তাঁহাকে দীর্ঘদিন ঐ দপ্তরের দায়িত্ব দেওয়া হয়। শিক্ষার প্রতি এই "দায়সারা" ভাব কেন্দ্রে করার জন্য অন্যান্য রাজ্যেও মুখ্যমন্ত্রীর দল সেই পন্থাই অবলম্বন করেন এবং সেই কারণেই ভারতে শিক্ষার সর্ব্বাঙ্গীন অবনতি এতদিন সমানে চলিয়া আসিতেছে। সে যাহাই হউক প্রধানমন্ত্রী এই উদ্বোধনী ভাষণে যাহা বলিয়াছেন তাহা যদি তাঁহার অন্তরের অনুভূতিপ্রসূত হয় এবং যদি সে কথাগুলি তাঁহার কার্য্যে পরিণত করার প্রকৃতই ইচ্ছা থাকে তবেই ভাল, নহিলে এই ষোল বৎসর ধরিয়া যে সকল স্তোকবাক্য উচ্চারণ করিয়াছেন ইহা যদি তাহারই ধারায় বলা হইয়া থাকে তবে ইহা অমার্জ্জনীয়।

অধ্যাপক কবীর পাঠ্য-পুস্তক পরিবর্তন সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন তাহা খাঁটি সত্য। এই পাঠ্যপুস্তকের ব্যাপারকে জুয়া খেলার সামিল করা হয় দীর্ঘদিন পূর্ব্বে। এবং এই শিক্ষায় ফাটকাবাজি চলনের ফলে শুধু যে শিক্ষার মান নামিয়া গিয়াছে তাই নয়, বহু শিক্ষক এই ব্যাপারে জড়িত হইয়া নিজের ও ছাত্রদের অধঃপতনের পথ প্রশস্ত করিয়াছেন এবং এই ব্যাপারে প্রভাবিত হইয়া শিক্ষা দপ্তরেরও পাঠ্যপুস্তক কমিটির বহু লোক টাকার খাতিরে নীতিজ্ঞান বিসর্জ্জন দিয়াছেন। বলিতে কি শিক্ষায় দুর্নীতির সংক্রামণ এই পাঠ্যপুস্তকের দরুণই বিশেষ ভাবে হইয়াছে। আমরা অধ্যাপক কবীরের এই মন্তব্য সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করি কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও বলি যে, এত সহজে এই সুদূর-প্রসারিত অনর্থের মূলকে শিক্ষার ক্ষেত্র হইতে উৎপাটন করা যাইবে না। যদি সত্যই উহা করিতে হয় তবে উহাতে আরও অনেক অধিক গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে।

তাঁহার ভাষণের মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষার সমাপ্তি সম্পর্কিত মন্তব্যের বিষয়ে সম্মেলনে বিশেষ মতভেদ দেখা যায় এবং তাহার যথেষ্ট কারণও ছিল। ঐ ভাষণেই তিনি প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে বলেন যে, তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার শেষে প্রায় ৫২ কোটি ছেলেমেয়ে স্কুলে থাকিবে যাহাদের বয়স ছয় হইতে এগারো বৎসর। ইহার অর্থ ঐ বয়সের ছেলেমেয়েদের শতকরা ৯০ অংশ স্কুলে পড়িবে। তবে সেই সঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, শিক্ষাক্ষেত্রে মেয়েদের অবস্থা মোটেই সন্তোষজনক নয় এবং চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার সময় স্কুলে মেয়ে ভর্ত্তির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন হইবে।

অধ্যাপক কবীর সবশেষে বলেন যে শিক্ষকদিগের গুণাগুণই প্রধান সমস্যা। অসম্পূর্ণরূপে শিক্ষিত এবং প্রায় সকলক্ষেত্রেই অসন্তুষ্ট শিক্ষকের দল যে সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার পূরণ করিতেই হইবে। দেশ ও জাতিকে প্রকৃত শিক্ষার ন্যায্য মূল্য দিতে প্রস্তুত হইতেই হইবে।

তিনি বলেন যে বিশ্ববিদ্যালয় অর্থদান কমিশন (U G C) বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষকদিগের আর্থিক অবস্থার কিছু উন্নতি করিয়াছেন দেখিয়া তিনি খুসী। কিন্তু প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগের জন্য বেতনের মান আরও উন্নত করিতেই হইবে।

প্রাথমিক শিক্ষার মান আরও অনেক উন্নত করা প্রয়োজন এই মন্তব্য করিয়া শ্রীকবির বলেন যে, তিনি রাজ্যগুলির শিক্ষামন্ত্রীদের অনুরোধ করিতেছেন যেন তাঁহারা এই তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার মেয়াদের মধ্যে পাঁচ বৎসরব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষা সমান ভাবে নিজ নিজ রাজ্যে প্রচলিত করিতে চেষ্টিত হন। সেই সঙ্গে তিনি বলেন যে, প্রাথমিক স্তরেই বিজ্ঞান শিক্ষার আরম্ভ প্রয়োজন, যথাযথভাবে চিন্তাশক্তি ও মনোবৃত্তিকে শৃঙ্খলাযুক্ত করিবার জন্য এবং দেশে বিজ্ঞানের আবহাওয়া সৃষ্টি করার জন্য।

ঐ দিনই প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপ্তি বিষয়ে আলোচনার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী এক নৈরাশ্যজনক সংবাদ দিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, পশ্চিম বাংলায় জন্মহার ও জনসংখ্যার "বিস্ফোরণে" প্রাথমিক শিক্ষায় প্রসারের বদলে সঙ্কোচন হইয়াছে এবং বিগত দশকে প্রাথমিক শিক্ষার বয়সের ছেলেমেয়েদের অনুপাত শতকরা ৭৮ হইতে কমিয়া শতকরা ৬১তে দাঁড়াইয়াছে। বাংলার অবনতি আর কত দিকে হইবে কে জানে।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে স্কুলশিক্ষার মেয়াদ বারো বৎসর করা বিষয়ে আলোচনা চলে এবং সেই সঙ্গে অন্য পরিবর্ত্তনের বিষয়ও আলোচিত হয়। এ বিষয়ে তিনটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। যথা ঃ

মাধ্যমিক শিক্ষার মেয়াদ বারো বৎসর করার বিরুদ্ধে মধ্যপ্রদেশের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীশঙ্করলাল শর্ম্মা তীব্র আপত্তি তুলিয়াছেন। তিনি নাকি সাফ বলিয়াছেন যে, ১১ বছরের স্কুলগুলিকে ১২ বছরী করিবার মত সঙ্গতি ও শিক্ষক তাঁহার রাজ্যে নাই।

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ডঃ লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়ার (মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের সভাপতি) বলেন যে, বর্ত্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তনের দরকার নাই। তিনি বলেন, "গাছের শিকড় উপড়াইয়া লাভ নাই। আরও সার দিলেই হইবে। আমাদের আপাতত দরকার—আরও ভাল শিক্ষক, আরও ল্যাবরেটরি, আরও লাইব্রেরী, এবং উপযুক্ত বই।"

আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ডঃ সি পি রামস্বামী আয়ার ছাত্রদের নিজ দেশের ইতিহাস ও ভূগোলের বিশদ জ্ঞানার্জ্জনের উপর জোর দেন।

অধ্যাপক কবির বলেন যে, সম্মেলন যদি স্কুলে বারো বৎসর শিক্ষাদানের সপক্ষে মত প্রকাশ করেন তাহা হইলে চতুর্থ যোজনা রচনার সুবিধা হয়। তবে যদি সকলে সব প্রশ্নে একমত না হইতে পারেন তাহা হইলেও সাধারণ ভাবে সম্মেলনের সকলেরই মতামত প্রকাশ করা উচিত। এই সম্মেলন হইতে তাঁহারা কি লইয়া যাইতেছেন সে বিষয়ে সকলের স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। তাঁহার মতে সারা দেশে মাধ্যমিক শিক্ষা একই ধরণের এবং বর্ত্তমান অপেক্ষা উন্নততর মানের হওয়া উচিত।

তৃতীয় দিনে, সম্মেলনের শেষে উপসংহার ভাষণে অধ্যাপক কবির বলেন যে, সমস্ত জাতির জন্য কোনও মান স্থির করিয়া দেওয়া সম্ভব নয়। মান উন্নয়নের চেষ্টা শিক্ষামন্ত্রী, উপাচার্য্য ও শিক্ষকদের করা উচিত।

সম্মেলন স্কুলশিক্ষার মেয়াদ সম্পর্কে একমত না হইলেও তাহা ১২ বৎসর হইবে ইহা ধরিয়াই কাজ করা স্থির করিয়াছেন। তবে কবে বা কতদিন পরে ঐ লক্ষ্যে পৌছান যাইবে তাহার বিষয়ে বিভিন্ন রাজ্য আর্থিক ও অন্য সংস্থান অনুযায়ী নিজ নিজ ব্যবস্থা করিবেন।

মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন করা প্রয়োজন এবং এজন্য উচ্চতর পাঠ্য নির্দ্দেশ ও উন্নততর পাঠ্যপুস্তক ও যোগ্যতাযুক্ত শিক্ষক প্রয়োজন, এ বিষয়ে সম্মেলন একমত। সম্মেলন মনে করেন যে, মাধ্যমিক শিক্ষার মান এরূপ হওয়া উচিত যাহাতে উহা পূর্ব্বেকার (চারি বৎসর ডিগ্রি কোর্সের) ইণ্টার-মিডিয়েট পরীক্ষার সমান হয়।

অধ্যাপক কবির প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশের বয়স ১৮ বৎসরের উর্দ্ধে হইবে। কিন্তু সম্মেলনের মতে উহা ১৭ বৎসরের উর্দ্ধে হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং কোন ক্ষেত্রেই কিঞ্চিদধিক ১৬ বৎসরের কম হওয়া উচিত নয়।

সম্মেলনের অভিমত এই যে সমগ্র দেশে প্রথম ডিগ্রী কোর্স ৩ বৎসরের হইবে।

শিক্ষকদের পাঠ্যপুস্তকের গ্রন্থাগার ও ল্যাবরেটরি কেন্দ্রীয় সাহায্যের আওতার মধ্যে পড়া উচিত। যেখানে কোন শ্রেণী কলেজের সহিত প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় শ্রেণী হিসাবে সম্পৃক্ত সেখানে তুলনীয় ভিত্তিতে মঞ্জুরীর মাধ্যমে বিশ্ব-বিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের কেন্দ্রীয় সাহায্য দেওয়া উচিত। যেখানে এই শ্রেণী কোন বিদ্যালয়ের সহিত সম্পৃক্ত, সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের সরাসরি সাহায্য দেওয়া উচিত। ঐ প্রস্তাবে বলা হয় যে, উভয় ক্ষেত্রেই পাঠক্রম ও পঠনপাঠনের মান অবশ্যই সমতুল হওয়া উচিত।

দেশের যে কোন স্থানের বিশেষজ্ঞদের অভিজ্ঞতার সদ্ব্যবহার করিয়া জাতীয় ভিত্তিতে উন্নত ধরনের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশের জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। সম্মেলনের পক্ষ হইতে এই মর্ম্মে প্রস্তাব করা হয়।

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ডঃ এ লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়ার ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান ডঃ ডি. এস. কোঠারি উভয়েই পাঠ্যপুস্তক লইয়া 'কেলেঙ্কারী' উহা লইয়া "ব্যবসার" প্রসঙ্গটি উল্লেখ করেন। উভয়েই বলেন যে, জাতীয় ভিত্তিতে বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে পাঠ্যপুস্তক প্রণীত হওয়া উচিত।

ইহা ভিন্ন সম্মেলন বলেন যে, মেয়েদের পাঁচ বৎসরের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় উদ্যোগের প্রকল্প হিসাবে করা উচিত। মেয়েদের শিক্ষার জন্য বিশেষ কার্য্যসূচী গ্রহণের আহ্বান এই সঙ্গেই জানানো হয়। উহা ত্বরান্বিত করিবার জন্য রাজ্যগুলির ঐ বাবদ ব্যয়ের পুরাপুরি সবটাই কেন্দ্রের মঞ্জুর করা উচিত, সম্মেলন এই মত প্রকাশ করেন।

এই সম্মেলনের গুরুত্ব সম্পর্কে বোধ হয় এইটুকু বলিলেই হইবে যে, ইহাতে দেশের শিক্ষার ভিত্তি কি ভাবে ধ্বংস হইতে চলিয়াছে তাহার আভাস এই সকল আলোচনা হইতে বেশ পাওয়া যায়। শিক্ষাই সকল প্রকার উন্নতি ও প্রগতির একমাত্র উপায়, ইহা সারা জগতে স্বীকৃত—অন্ততঃপক্ষে সারা সভ্যজগতে। শুধু আমাদের দেশই গত ষোল বৎসর সে কথা ভুলিয়া জাতির অধঃপতনের পথ প্রশস্ত করিয়াছে। শিক্ষার বিস্তার প্রয়োজন তাহা এতদিনে যদিই বা আবিষ্কৃত হইল তখন দেখা গেল যোগ্য শিক্ষক নাই, পাঠ্যপুস্তকেও অঢেল ভেজাল!



সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীকরুণাকুমার নন্দী

কৃষি ও জাতীয় উন্নয়ন

গত ৮ই ও ৯ই নভেম্বর তারিখে নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের দুইদিন-ব্যাপী বৈঠকে কৃষি উন্নয়ন ও কৃষিজ উৎপাদনে আশানুরূপ উন্নতির অভাবই যে বর্ত্তমান তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসর ধরিয়া দেশের সামগ্রিক আর্থিক প্রগতি ব্যাহত করিতেছে, এ বিষয়ে সকলেই একমত হইয়াছেন দেখা যাইতেছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরুও তাঁহার উদ্বোধনী বক্তৃতায় এই বিষয়টির উপরেই সবিশেষ জোর দেন। তিনি বলেন যে, সকল আর্থিক প্রগতির মূলেই কৃষির উন্নতি। কৃষিক্ষেত্রে প্রগতি সাধন করিতে না পারিলে কেবলমাত্র শিল্পের প্রসার দ্বারা দেশের সামগ্রিক আর্থিক উন্নয়ন অসম্ভব। দুঃখের বিষয় যে বিভিন্ন রাজ্য সরকারগুলিতে এই বিষয়ে খানিকটা অবহেলার ভাব দেখা যায়। সকলেই বড় বড় কলকারখানা ও শিল্পাদি প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াসেই ব্যস্ত এবং কৃষির দিকে নজর দিবার মতন অবকাশ বা ইচ্ছা রাজ্য সরকারগুলির প্রধান নেতৃবৃন্দের মধ্যে বড় দেখা যায় না। ফলে কৃষি বিভাগটিকে একটি মামুলী সরকারী বিভাগে পরিণত করিয়া রাখা হইয়াছে এবং গতানুগতিক ভাবে ইহার দায়িত্ব পালন করা হইয়া থাকে। কৃষির অবশ্যপ্রয়োজনীয় ন্যূনতম উন্নতির দায়িত্ব অবহেলা করিয়া, কেবলমাত্র বড় বড় কলকারখানার দ্বারা দেশের আর্থিক দুর্গতি বা দেশবাসীর গভীরতম দারিদ্র্য মোচন করা সম্ভব নহে। এই বিষয়ে রাজ্য সরকারগুলির অবহেলার একটি বিশেষ উদাহরণ এই যে, স্বাধীনতা লাভের পর গত ১৫ বৎসরের মধ্যেও অনেক রাজ্যই এখন পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রতিশ্রুত ভূম্যধিকার সংস্কার (land reforms) সম্পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এ ভাবে চলিতে থাকিলে দেশের দ্রুত আর্থিক প্রগতি ও শিল্পোন্নতির সকল পরিকল্পনা ও প্রয়াসও ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

শ্রীনেহরুর এই উক্তির যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে কাহারও অসুবিধা ঘটিবার কারণ নাই। তবে শ্রীনেহরুর তরফেও যে এটা একটা নূতন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়, তাহাও অস্বীকার করা চলে না। মাত্র কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে শ্রীনেহরু অন্য একটি উপলক্ষ্যে যাহা বলেন তাহাতে উন্নয়ন পরিকল্পনাতে কৃষির স্থানটি তিনি কেবলমাত্র হালে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে সুরু করিয়াছেন, তাহাই মনে হইবে। তিনি পূর্ব্ব প্রসঙ্গে বলেন যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনা হইতে সুরু করিয়া বৃহৎ শিল্পোন্নয়নের দিকে যে অধিকতর জোর দেওয়া হইতেছে, কেহ কেহ তাহার সমালোচনা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং বড় বড় কলকারখানা ভালবাসেন, বৃহৎ কলকব্জার স্পর্শ তাঁহার মধ্যে উৎসাহ সঞ্চার করে। এবং শিল্পোন্নতি বাদ দিয়া কেবলমাত্র কৃষির দিকেই নজর আবদ্ধ করিয়া রাখিলে দেশের আর্থিক প্রগতি মন্দগতিতে অগ্রসর হইবে তিনি আশঙ্কা করেন।

অবশ্য এ কথাও অস্বীকার করা চলে না যে, শ্রীনেহরু কিছুকাল ধরিয়া দেশের কৃষির উন্নতির গতি ও প্রকৃতি লইয়া বিশেষ চিন্তাকুল হইয়া উঠিতেছিলেন। গত বৎসরের মাঝামাঝি হইতেই তৎকালীন পরিকল্পনা মন্ত্রী শ্রীগুলজারিলাল নন্দ এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারে তাঁহার সহযোগী মন্ত্রীমণ্ডলীর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার অনবরত প্রয়াস করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু বিশেষ সুফল পাওয়া যায় নাই, বরং বিতণ্ডা ও মতভেদেরই সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং শ্রীনন্দের মতামতের সঙ্গে সায় দিলেও এদিকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলির বিশেষ প্রয়াস উদ্বুদ্ধ করিতে সফলকাম হন নাই। বস্তুতঃ তখন পর্য্যন্ত তিনি এ বিষয়ে নিজেও ততটা জোরও দেন নাই।

অন্যপক্ষে কেবলমাত্র আকাশচুম্বী কলকারখানার চিম্নি দেখাইয়া দারিদ্র্য ও মূল্যবৃদ্ধি-নিষ্পিষ্ট দেশের জনসাধারণকে যে আর বেশীদিন ধোঁকা দিয়া রাখা সম্ভব হইবে না তাহাও ক্রমেই স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছিল। গত মাসে পশ্চিমবঙ্গ

রাজ্যে খাদ্যসঙ্কটের ব্যাপারে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা যে দেশের জনসাধারণের মধ্যে তাহাদিগের অধিকার সম্বন্ধে নবোদ্বুদ্ধ সচেতনতা এবং স্বয়ংক্রিয় সমষ্টিগত প্রয়াসের দ্বারা তাহা প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বাভাষ, সেই সত্যটা হয়ত এতদিনে আমাদের শাসনকর্ত্তারা ক্রমে উপলব্ধি করিতে সুরু করিয়াছেন। না হইলে হঠাৎ জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের বৈঠকে ইঁহারা কৃষির উন্নতি বিধানের দিকে এতটা কড়া নজর দিতে শুরু করিবেন কেন? তৃতীয় পরিকল্পনাকালের প্রথম দুই বৎসরে আর্থিক উন্নয়নের সামান্যতা ও শ্লথ গতির খানিকটা যে কৃষির অচলাবস্থার কারণে ঘটিয়াছে, এ সিদ্ধান্ত পূর্ব্বেই করা হইয়াছিল, কিন্তু তখন এ বিষয়ে এতটা জরুরী তৎপরতার লক্ষণ দেখা যায় নাই।

বস্তুতঃ দুনিয়ার শিল্পোন্নতির ইতিহাসের দিকে চাহিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বর্ত্তমানে শিল্পপ্রধান সকল দেশেই কৃষির প্রভূত উন্নতির পরেই কেবল সার্থক ভাবে শিল্পোন্নতি সাধন করা সম্ভব হইয়াছে। অস্তিত্বরক্ষার জন্য যে ন্যূনতম খাদ্যশস্যের প্রয়োজন, তাহারই জন্য যে-দেশকে অংশতঃ পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়, সে-দেশের পক্ষে যে দ্রুত ও সামগ্রিক শিল্পোন্নতি কোনমতেই সম্ভব নহে, দুনিয়ার ইতিহাসের দিকে চাহিয়া দেখিলে এই মৌলিক সত্যটি বুঝিতে কষ্ট হইবে না। বর্ত্তমান কালেও সর্ব্বাধিক শিল্পোন্নত দেশগুলিতেও যে কৃষি-প্রগতির দিকে কড়া নজর দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা ইউরোপীয় আর্থিক জোট-বদ্ধ দেশগুলির (E, E. C.) দিকে চাহিয়া দেখিলেই বোঝা যাইবে। খাদ্য ও অন্যান্য কৃষিজাত কাঁচা মালের প্রয়োজনাতিরিক্ত (অন্ততঃ দেশের ন্যূনতম চাহিদা সম্পূর্ণ পূরণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট) উৎপাদন প্রতিষ্ঠিত হইলেই তবে অব্যাহত গতিতে এবং দ্রুততালে শিল্পোন্নয়নের পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব, এই মৌলিক সত্যটিকে উপেক্ষা করিয়া দেশে দ্রুত শিল্পোন্নয়নের দ্বারা দারিদ্র্যমোচন কিছুতেই সম্ভব হইতে পারে না। আমাদের সরকারী পরিকল্পনা-রচয়িতারা যে অর্থশাস্ত্রের এই গোড়ার কথাটাই উপেক্ষা করিয়া আঁসিতেছেন, দ্বিতীয় পরিকল্পনা হইতে সুরু করিয়া ইহার গতি ও প্রকৃতি হইতেই একথাটা স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। ফলে প্রভূত পরিমাণ নূতন লগ্নী সত্ত্বেও দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে আশানুরূপ সাফল্য ঘটে নাই এবং তৃতীয় পরিকল্পনাকালের প্রথম দুই বৎসরে আরও বেশী শ্লাথ্যের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালের পাঁচ বৎসরে দেশের জাতীয় আয় মোটামুটি ২১ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া বলা হইয়াছে (১৯৬০-৬১ সনের মূল্যমানের ভিত্তিতে); অর্থাৎ এই পাঁচ বৎসরে বার্ষিক ৪'২ শতাংশ হারে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনার রচনায় ঐ পাঁচ বৎসরে জাতীয় আয় মোটামুটি আরও ৩৪ শতাংশ (পরিকল্পনার অন্তিম বৎসরে জাতীয় বার্ষিক আয় ১৯,০০০ কোটি টাকা হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছিল) বৃদ্ধি পাইবে অর্থাৎ বার্ষিক মোটামুটি ৬'৮ শতাংশ হিসাবে বৃদ্ধি পাইবে, অনুমান করা হইয়াছিল। সরকারী হিসাব মতই দেখা যাইতেছে যে, এই পরিকল্পনাকালের প্রথম দুই বৎসরে বার্ষিক মাত্র দুই শতাংশ হিসাবে জাতীয় আয়বৃদ্ধি পাইয়াছে। কৃষির অসাফল্যই যে এই শ্লথগতির জন্য প্রধানতঃ দায়ী, এই উপলব্ধি ক্রমেই এখন স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া বার্ষিক ১০০০ লক্ষ টনে দাঁড়াইবে আয়োজন করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালের অন্তিম বৎসরে খাদ্যশস্যের উৎপাদনের মোট পরিমাণ ছিল ৭৬০ লক্ষ টন, এবং তৃতীয় পরিকল্পনাকালের দ্বিতীয় বৎসরে (১৯৬২-৬৩ সনে, ইহার পরিমাণ হইয়াছে মাত্র ৭৭৫ লক্ষ টন। আগামী তিন বৎসরে যে পূর্ব্ব-নির্দ্ধারিত ১,০০০ লক্ষ টনে কোনক্রমেই পৌঁছান সম্ভব নয়, এ কথা এখন সকলেই স্বীকার করিতেছেন।

কাজেই এখন কৃষির দিকে অধিকতর এবং জরুরী নজর দিবার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। কৃষির উন্নতি সাধনের জন্য নূতন কেন্দ্রীয় বোর্ড ও কমিটি গঠন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন যে, যেমন করিয়াই হউক তৃতীয় পরিকল্পনাকালের মধ্যেই নির্দ্ধারিত উৎপাদন লক্ষ্যে পৌঁছাইতেই হইবে। কিন্তু তাহাতেও সাফল্য অর্জ্জন করিতে পারা যাইবে কিনা, সে বিষয়ে গভীর সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। পরিকল্পনার প্রথম দশ বৎসরে দেখা গিয়াছে, কোন বিষয়েই আমরা লক্ষ্যে পৌঁছাইতে পারি নাই। শিল্পোৎপাদন বেশ খানিকটা বৃদ্ধি পাইয়াছে সত্য, কিন্তু কৃষির অচলতার দরুণ ইহার সম্ভাব্য সুফল সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইতে পায় নাই। বেকারের সংখ্যা বাড়িয়াছে, মাথাপিছু বার্ষিক আয় কিয়ৎ-পরিমাণে বৃদ্ধি পাইলেও অতিরিক্ত ট্যাক্সের চাপে তাহার প্রায় সবটাই খাইয়া গিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশে ধনীর সংখ্যা বাড়িয়াছে। অন্যদিকে শিল্পপ্রধান মনোবৃত্তির ফলে (emphasis on an industrial economy) এই মধ্যযুগীয় কৃষিপ্রধান দেশে মূল্যবৃদ্ধির চাপ অসম্ভব পরিমাণে বাড়িয়াছে এবং অনবরত বাড়িতেছে। কৃষির প্রভূততর উন্নতি না হইলে, অন্ততঃ খাদ্যশস্যের উৎপাদনে প্রয়োজনাতিরিক্ত লক্ষ্যে পৌঁছাইতে না পারিলে, বর্ত্তমানের জটিলতা-মুক্ত হইয়া অগ্রগতির পথে চলিতে সুরু করা সম্ভব নহে, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এদিকে নজর

পড়িতে শুরু করিয়াছে, ইহা আশার কথা। কিন্তু পরিকল্পনার রূপ ও প্রকৃতি না বদল হইলে, জটিলতা যে আরও বৃদ্ধি পাইবার গভীর সম্ভাবনা আছে, সেই আশঙ্কা সম্বন্ধে নিরসন করা সম্ভব নহে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলিবার আছে। সংবাদপত্রে দেখিতে পাইলাম যে, পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি-বিষয়ক ভারপ্রাপ্ত সদস্য শ্রী শ্রীমান নারায়ণ বোম্বাই শহরে একটি বক্তৃতায় সম্প্রতি বলিয়াছেন যে, আগামী দশ বৎসরাধিক কালের মধ্যে, অর্থাৎ পঞ্চম পরিকল্পনার শেষ পর্য্যন্ত, দেশের দরিদ্রতম পরিবারও যাহাতে একটা ন্যূনতম রোজগারের সুযোগ পাইতে পারেন সেদিকে লক্ষ্য রাখা হইবে। তিনি বলেন যে, পঞ্চম পরিকল্পনাকালের মধ্যেই দেশের দরিদ্রতম পরিবারও (গড়পড়তা ৫ জনকে লইয়া পরিবার) যাহাতে মাসিক অন্ততঃ ১০০৲ টাকা রোজগার করিতে পারেন তাহার আয়োজন পরিকল্পনা কমিশন করিবেন। এই ভাবে মানুষকে বৃথা স্তোক দিয়া লাভ কি? কেননা শ্রীমান নারায়ণ জানেন না যে ইহা অসম্ভব অনুমান মাত্র, একথা কি করিয়া বিশ্বাস করিব? তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খসড়ায় পরবর্ত্তী দশ বৎসরকালের মধ্যে, অর্থাৎ চতুর্থ ও পঞ্চম পরিকল্পনাকালে জাতীয় আয়বৃদ্ধির যে আনুমানিক হিসাব করা হইয়াছে, তাহা হইতে দেখা যায় যে, চতুর্থ পরিকল্পনাকালে জাতীয় আয়বৃদ্ধি পাইয়া (১৯৬০-৬১ সনের মূল্যমানের পরিপ্রেক্ষিতে) দাঁড়াইবে বার্ষিক ২৫,০০০ কোটি টাকায় এবং পঞ্চম পরিকল্পনাকালে ইহা আরও বৃদ্ধি পাইয়া ৩৩,০০০।৩৪,০০০ কোটি টাকায় দাঁড়াইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, তৃতীয় পরিকল্পনাকালে জাতীয় আয় যে পরিকল্পিত ১৯,০০০ কোটি টাকায় উন্নীত হইবে এমন আশা এখন সুদূর পরাহত। তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসরে জাতীয় আয় বার্ষিক মাত্র ২ শতাংশ হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। পরিকল্পিত লক্ষ্যে পৌঁছাইতে হইলে পরিকল্পনার বাকি তিন বৎসরে বার্ষিক নীট প্রায় ১০ শতাংশ হিসাবে জাতীয় আয়বৃদ্ধি করিতে হইবে। ইহার সম্ভাবনা এতই সুদূরপরাহত যে, ইহাকে অসম্ভব বলিয়াই ধরিয়া লওয়া চলে। চতুর্থ ও পঞ্চম পরিকল্পনাকালে জাতীয় আয় যথাক্রমে ২৫,০০০ কোটি এবং ৩৪,০০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা সম্ভব হইবে, এমন আশা পোষণ করিবার কোন সত্যকার কারণ নাই। কিন্তু এমন অসম্ভব অনুমান যদি সম্ভব হয়ও, তবু ১৯৭৫-৭৬ সন পর্য্যন্ত, অর্থাৎ পঞ্চম পরিকল্পনার শেষ পর্য্যন্ত দেশের দরিদ্রতম ২০ শতাংশ লোকেরও মাথাপিছু মাসিক আয়, অথবা পরিবারপিছু আয় ২০৲ টাকা কিংবা ১০০৲ টাকা কিছুতেই হইতে পারে না। হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে পরিকল্পিত জাতীয় আয় পূর্ণমাত্রায় বৃদ্ধি পাইলেও ইহাদের মাথাপিছু বার্ষিক আয় ১৫৮৲ টাকা অর্থাৎ পরিবারপিছু মাসিক আয় কোনক্রমেই ৬৫৲ টাকার উর্দ্ধে উঠিতে পারে না। প্লানিং কমিশনের একজন প্রবীণ ও দায়িত্বসম্পন্ন সদস্যের পক্ষে এরূপ অর্ব্বাচীন উক্তি বাচালতারই নামান্তর মাত্র বলিয়া মনে করিতে হয়।

অর্থমন্ত্রীর নূতন দৃষ্টিভঙ্গি

জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের (National Development Council) হালে অনুষ্ঠিত অধিবেশনের অব্যবহিত পূর্ব্বে নয়াদিল্লীতে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারীর সভাপতিত্বে দেশের বিভিন্ন রাজ্য সরকারগুলির অর্থমন্ত্রী মহাশয়েরা একটি বৈঠকে মিলিত হইয়া দেশের নানাবিধ আর্থিক সমস্যার আলোচনা করেন। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর আহ্বানে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শোনা যায় যে, এই সম্মেলনে আলোচনার মধ্য দিয়া কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর একটি নূতন দৃষ্টিভঙ্গির আভাস স্পষ্ট হইয়া উঠে।

মামুলী ধরণেই অর্থমন্ত্রী জাতীয় উন্নয়নের পথে শ্লথ অগ্রগতির উল্লেখ করিয়া সভার উদ্বোধন করেন। তিনি স্বীকার করেন যে, ইহার জন্য কৃষিক্ষেত্রে অচল অবস্থাই প্রধানতঃ দায়ী। কিন্তু ইহাই সবটুকু নহে। সকল ক্ষেত্রেই—সরকারী ও বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রেই—উদ্যম ও প্রয়াসের অভাবও অন্ততঃ অংশতঃ এই অবস্থার জন্য দায়ী।

এই সম্মেলনে তিনি একটি বিশেষ তৎপর্য্যপূর্ণ ঘোষণাও করেন। তিনি বলেন যে, সামাজিক নিরাপত্তা (Social security measures) বিধান ক্রমেই অত্যন্ত জরুরী হইয়া পড়িতেছে। দেশের দরিদ্র জনসাধারণ অক্ষম হইয়া পড়িলেও যাহাতে নিঃসহায় হইয়া না পড়েন তাহার একটা আশুব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি তাঁহাদের কর্ম্মচারীদিগের জন্য প্রথমে এই ব্যবস্থা উদ্ভাবন ও চালু করিতে পারেন। পরে ক্রমশঃ অন্যান্য জনসাধারণের জন্য অনুরূপ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা যাইতে পারে। সমগ্র সমস্যাটির একটি সুষ্ঠু ও সম্পূর্ণ সমাধান আগামী দশ-বারো বৎসরের মধ্যে করা সম্ভব, তিনি বলেন।

প্রস্তাবটি উত্তম, এ বিষয়ে মতভেদের আশঙ্কা নাই। কিন্তু ইহা কি ভাবে এবং কতদিনে প্রবর্ত্তন করা সম্ভব হইতে পারে তাহা বিবেচনা এবং বিচারসাপেক্ষ। তবে দেশের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থায় ইহা যে আংশিক ভাবেও আশু সম্ভব হইবার সম্ভাবনা নাই, ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। প্রসঙ্গান্তরে আমরা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি যে, আগামী ১০ হইতে ১৩ বৎসরের মধ্যে, অর্থাৎ

পঞ্চম পরিকল্পনার শেষ পর্য্যন্তও দেশের দরিদ্রতম ২০ শতাংশ লোকের মাথাপিছু রোজগার মাসিক ১৩ টাকাও হইবার সম্ভাবনা কম। অর্থাৎ মাথাপিছু দৈনিক রোজগারের অঙ্ক ৪৪ নয়া পয়সাও হইবার আশা নাই। একটা লোকের কেবলমাত্র মুনভাতে উদর পূর্ত্তি করিতে গেলেও এই রোজগারে কুলায় না। এবং দেশের দরিদ্রতম ২০ শতক লোকের রোজগার এই ধাপে কেবলমাত্র তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পরিকল্পনার আশানুরূপ রূপায়ণ হইলেই সম্ভব। সামাজিক নিরাপত্তা বিধি প্রবর্ত্তন করিতে হইলে তাহা যে কেবলমাত্র সরকারী অর্থসাহায্যের দ্বারাই সম্ভব, এমন হইতেই পারে না; তাহার জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে তাহার সম্পূর্ণ ভাবে যোগান দেওয়া সরকারের পক্ষে অসম্ভব। অর্থাৎ অন্ততঃ অংশতঃ এইরূপ আয়োজনের সংস্থান যাহাদের উদ্দেশে এই আয়োজন গঠিত হইবে তাহাদিগের নিকট হইতেই সংগ্রহ করিতে হইবে। দেশের বর্ত্তমান আর্থিক সঙ্গতি এবং দরিদ্র জনসাধারণের আয়ের মান এই দ্বিবিধ দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, আগামী দশ বৎসর কালের মধ্যে এরূপ একটি সার্ব্বভৌম (comprehensive) আয়োজন প্রবর্ত্তিত হওয়ার সম্ভাবনা একপ্রকার নাই বলিলেই চলে।

এই সম্মেলনে অন্যান্য যেসকল গুরুতর প্রশ্নের আলোচনা হইয়াছে, তন্মধ্যে অন্যতম প্রধান বিষয় এই যে, অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, অবশ্য সঞ্চয় আইন প্রত্যাহার করিবার পর হইতে স্বয়ংপ্রণোদিত স্বল্প সঞ্চয়ের পরিমাণ অনেকটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রচেষ্টার দ্বারা এই সঞ্চয়ের পরিমাণ আরও বাড়ান সম্ভব, তিনি মনে করেন। জাতীয় জরুরী অবস্থার প্রবর্ত্তনের সময় এই খাতে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলির বরাদ্দের নির্দ্দিষ্ট সীমা এখন প্রত্যাহার করা হইবে এবং এখন হইতে রাজ্য সরকারগুলি তাঁহাদের এলাকা হইতে সংগৃহীত স্বল্পসঞ্চয় খাতে আমদানীর দুই-তৃতীয়াংশ পাইবেন।

দ্বিতীয়তঃ, নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার আঞ্চলিক দাবি সম্বন্ধেও কিছু আলোচনা হয়। আঞ্চলিক দাবি মিটাইতে গিয়া বিশেষ বিশেষ শিল্পের সর্ব্বোত্তম সুবিধাগুলি উপেক্ষা করাতে দেশের সামগ্রিক ক্ষতি হইতেছে, কেহ কেহ বলেন। শিল্পা-গ্রসর কয়েকটি রাজ্যের তরফ হইতে বর্ত্তমান লাইসেন্সের কড়াকড়ি প্রত্যাহৃত হওয়া প্রয়োজন বলিয়া বলা হয়। ইহার দ্বারা ক্ষুদ্র ও মধ্যাকৃতি শিল্পসমূহের অধিকতর প্রসার সুগম হইবে বলিয়া বলা হয়। অর্থমন্ত্রী প্রস্তাব করেন যে, সিমেণ্ট, কাগজ, বনস্পতি, ইত্যাদি কেন্দ্রীয় আবগারীশুল্ক-বাধ্য কয়েকটি পণ্যের উপর রাজ্য সরকারগুলির বিক্রয়-কর প্রত্যাহার করিয়া, আনুপাতিক আবগারী শুল্ক ধার্য্য করিয়া তাহা পূরণ করা যাইতে পারে, কিন্তু কোন রাজ্য সরকারই ইহা মানিয়া লইতে রাজী হন না। তবে সরকারী ঋণ গ্রহণ নীতি কেন্দ্রীকরণ সম্বন্ধে সকলেই একমত হন। ঋণ শোধ করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলি যাহাতে একটি সিঙ্কিং ফাণ্ডে (Sinking Fund) পরিশোধ্য অর্থের পরিমাণ জমাইতে থাকেন তাহার ব্যবস্থা হওয়া উচিত বলিয়া সকলে বলেন। এই প্রসঙ্গে ট্যাক্স ফাঁকি দিবার বিষয়টিও আলোচিত হয় এবং সেই সাপক্ষে উপযুক্ত কড়াকড়ি ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তাও স্বীকৃত হয়।

এরূপ একটি সম্মেলনে দেশের বর্ত্তমান ট্যাক্স-নীতি (taxation policy) ও তাহার সম্ভাব্য সংশোধন বা পরি-বর্ত্তনের বিষয়ও আলোচিত হইবে, ইহা স্বভাবতঃই আশা করা গিয়াছিল। বিশেষ করিয়া অর্থ-মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পুন-র্গ্রহণের পর অর্থমন্ত্রী স্বয়ং এরূপ একটি সম্ভাবনার আশা দিয়াছিলেন। মূল্যবৃদ্ধি নিয়মিত করিবার প্রয়োজনও অর্থমন্ত্রী স্বয়ং স্বীকার করেন। বর্ত্তমান মূল্যবৃদ্ধির ধারা যে চাহিদা ও সরবরাহের অসঙ্গতি বা অর্থপ্রাচুর্য্যের (infla-tion) ফলে ঘটিতেছে, ইহা স্বীকার করা চলে না। সরকারী ট্যাক্সের দাবিও এখন অতীত কালের তুলনায় অনেক গুণ বেশী। তবুও এই অনবরত মূল্যবৃদ্ধির সুযোগ কোথায় তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বুঝিতে মুস্কিল হয় না যে সরকারী ট্যাক্স নীতি এবং তাহার প্রকৃতিই অংশতঃ ইহার জন্য দায়ী। অবশ্যভোগ্য পণ্যসমূহের আবগারী শুল্ক ও অন্যান্য পরোক্ষ ট্যাক্সের সুযোগেই মূল্যবৃদ্ধির প্রকোপ এতটা সাংঘাতিক হইয়া উঠিয়াছে। আর এই মূল্যবৃদ্ধির ধারা সংযত ও নিয়মিত করিতে না পারিলে যে পরিকল্পনা রূপায়ণের পথে অলঙ্ঘ্য বাধার সৃষ্টি হইবে ইহাও স্বতঃসিদ্ধ। আশা করা গিয়াছিল যে, আলোচ্য সম্মেলনে এ বিষয়টির বিশদ বিচার করা হইবে। কিন্তু নিরাশ হইতে হইয়াছে। যাহা আলোচিত হইয়াছে সেগুলি নিছক প্রয়োগবিধির বিষয়, নীতির বিষয় নহে।

সঙ্গীতের আসর

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

রাধিকাপ্রসাদের রাগ-জ্ঞান

বিগত যুগের বাংলার এক সঙ্গীত-প্রতিভা ছিলেন রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী। শুধু বাংলায় কেন, বাংলার বাইরে পশ্চিমাঞ্চলেও তাঁর সঙ্গীত-কৃতি স্বীকৃতি পেয়েছিল। তাঁর জীবনের শেষ বছরে, (১৯২৪ খ্রীঃ) লক্ষ্ণৌ সঙ্গীত সম্মেলনে পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে, ঠাকুর নবাব আলী প্রমুখ শ্রেষ্ঠ বোদ্ধাদের কণ্ঠসঙ্গীতে মুগ্ধ করেছিলেন রাধিকাপ্রসাদ।

ধ্রুপদ ও খেয়াল দু' অঙ্গেই তিনি গুণপণার পরিচয় দিতেন। তবে বিশেষ ক'রে তিনি ছিলেন ধ্রুপদী। রাগবিদ্যায় যেমন প্রগাঢ় জ্ঞান, তেমনি প্রচুর ছিল তাঁর গানের সংগ্রহ। বড় বড় আসরে এত বিভিন্ন প্রকার, অপ্রচলিত এবং দুরূহ রাগের গান তিনি সাবলীল ভাবে গাইতেন, যা বিস্ময়কর ছিল। এত বেশি রাগে প্রথম শ্রেণীর গান করবার মতন প্রস্তুতি খুব বেশি ওস্তাদের মধ্যে দেখা যেত না। রাগ বিস্তারে ও রাগরূপের চিত্র রচনায়, তাল ও লয়কারীতে নিপুণ নিখুঁত ছিলেন তিনি।

আকারে ক্ষীণকায় এবং স্বভাবে নিরীহ রাধিকাপ্রসাদ সঙ্গীত-জগতে এক বিরাট পুরুষ ছিলেন। এবং এক লব্ধকীর্তি আচার্য। তিনি যাঁদের সঙ্গীত শিক্ষা দিয়েছিলেন, পরবর্তীকালে তাঁরা দেশের এক-এক শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতশিল্পীরূপে পরিগণিত হন। যেমন—গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, মহীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, (ভ্রাতুষ্পুত্র) জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী। তা ছাড়া, ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ললিতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (মহীন্দ্র-পুত্র), ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রভৃতি যাঁরা প্রথমে মহীন্দ্রনাথের ছাত্র ছিলেন, মহীন্দ্রনাথের অকাল মৃত্যুতে তাঁরা রাধিকাপ্রসাদের শিষ্য হয়েছিলেন। দিলীপকুমার রায়ও প্রথম জীবনে সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন তাঁর কাছে। সঙ্গীততত্ত্বে সুপণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে তাঁর শিষ্য হতে চেয়েছিলেন ধ্রুপদ গান সংগ্রহের আশায়। কিন্তু গোস্বামী মহাশয়ের আকস্মিক মৃত্যুর জন্যে তা ঘটে ওঠেনি। এই সমস্ত বিষয় থেকে ধারণা করা যাবে, ভারতীয় সঙ্গীতক্ষেত্রে তাঁর কি সম্মানের আসন ছিল।

সঙ্গীত-জীবনের নানা সময়ে ভারত সঙ্গীত সমাজে, আদি ব্রাহ্ম সমাজে, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে এবং দীর্ঘকাল (মহারাজা মণীন্দ্র নন্দী স্থাপিত) বহরমপুর সঙ্গীত বিদ্যালয়ে নিযুক্ত ছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সঙ্গীত বিষয়ে সহযোগিতা ও তাঁর জীবনের এক উল্লেখ্য অধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ও আস্থাবান্ ছিলেন এবং যে-সমস্ত হিন্দী রাগসঙ্গীত ভেঙ্গে বাংলা গান রচনা করেন, তার মধ্যে কতকগুলি পেয়েছিলেন রাধিকাপ্রসাদের কাছে। আরো একটি স্মরণীয় কথা এই, যে ছয়খানি গান রাধিকাপ্রসাদ রেকর্ড করেছিলেন, তার মধ্যে তিনটি রবীন্দ্রনাথের—'স্বপন যদি ভাঙ্গিলে,' 'বিমল আনন্দে জাগো রে' এবং 'মোরে বারে বারে ফিরালে,' এই তিনটি গানই হিন্দী গানের অনুসরণে ও আদর্শে রচিত। শোনা যায়, রবীন্দ্রনাথের 'এস হে গৃহদেবতা' গানখানির সুর দেন রাধিকাপ্রসাদ। শান্তিনিকেতনে ভীমরাও শাস্ত্রী যোগদানের আগে রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে রাধিকাপ্রসাদ কিছুদিন সেখানে ছিলেনও।

যদু ভট্টের পরে সঙ্গীতজগতে বিষ্ণুপুরের শ্রেষ্ঠ দান—রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী। কিন্তু রাধিকাপ্রসাদের রীতিমত সঙ্গীত শিক্ষা হয় কলকাতায়। ১৫ বছর বয়সে তিনি ওস্তাদদের কাছে গান শেখবার আশায় বিষ্ণুপুর থেকে কলকাতায় চলে আসেন। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বিখ্যাত সভাগায়ক গোপালচন্দ্র চক্রবর্তীর (প্রাকৃত জনের কথায় 'নুলো গোপাল') কাছে প্রথমে তাঁর সঙ্গীত শিক্ষার ইচ্ছা হয়। কিন্তু সে সুযোগ তিনি পান নি। তারপর সে যুগের প্রসিদ্ধ গায়ক-ভ্রাতৃদ্বয় শিবনারায়ণ মিশ্র ও গুরুপ্রসাদ মিশ্রের অধীনে গান শেখবার ব্যবস্থা হয় রাধিকাপ্রসাদের। নিমতলা ষ্ট্রিটের নন্দীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের আনুকূল্যে

(মাসিক ৪০ টাকা) এবং রাধিকাপ্রসাদের পিতৃবন্ধু শৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুরের অন্যতম সঙ্গীত-গুরু ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর মধ্যস্থতায় এটি ঘটে। ধ্রুপদী শিবনারায়ণ এবং ধ্রুপদ খেয়াল গায়ক গুরুপ্রসাদ মিশ্র ছিলেন বেতিয়া ঘরাণাদার এবং রাধিকাপ্রসাদ তাঁদের কাছে একাদিক্রমে ১০ বছরেরও বেশি তালিম পান। তাঁর বিপুল সঙ্গীত-ভাণ্ডারের মূল উৎস এইখানে।

রাধিকাপ্রসাদ যদু ভট্টের কাছেও কিছু কিছু শিখেছিলেন, একথা রবীন্দ্রনাথ বলতেন এবং রাধিকাপ্রসাদের শিষ্যরাও জানতেন। তিনি তাঁর শিষ্যদের মাঝে মাঝে যদু ভট্টের কথা বলতেন, যদু ভট্টের গানের কায়দা কি রকম ছিল তারও পরিচয় দিতেন। বলতেন, 'ভট্‌জী (যদুকে তিনি ওই নামে অভিহিত করতেন) এই রকম করে আলাপ করতেন, ভট্‌জী এই রকম করে চানক দিতেন' আর গলায় সেই সব কাজ করে দেখাতেন।

রাধিকাপ্রসাদ সঙ্গীত-জগতে সুপরিচিত ছিলেন 'গোঁসাইজী' নামে এবং রবীন্দ্রনাথও তাঁকে ওই বলেই উল্লেখ করতেন। এবারে গোঁসাইজীর ক'টি আসরের কথা বলা যাক।

তাঁর নিজের যেমন ওস্তাদসুলভ হাঁকডাক ছিল না, তিনি তেমনি দাপটওলা কলাবতদেরও যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতেন। অন্য কোন কারণে নয়, অশান্তির ভয়ে। শান্তি-প্রিয় মানুষদের যেমন স্বভাব হয়ে থাকে। তাঁর শিষ্য ও ঘনিষ্ঠ অনুরাগীরা গোঁসাইজীর মনের এই দুর্বলতার কথা জানতেন।

তাই সেবার হরেন্দ্র শীল মহাশয়ের বাড়ীর জলসার আয়োজন কথা শুনে তাঁরা একটু ভাবিত হলেন। সেই জলসায় ওস্তাদ কৌকভ খাঁর বাজনা হবার কথা। আর গোঁসাইজীর কোন কোন শিষ্য-সেবক অনুরাগীদের বড় ইচ্ছে যে, তাঁর গানও সে আসরে যেন হয়। বাংলাদেশে কি দরের গুণী আছেন, তার পরিচয় যেন পান খাঁ সাহেব।

ওস্তাদ আসাদুল্লা খাঁ কৌকভ ছিলেন সেকালের সুপ্রসিদ্ধ সরোদী (ব্যাঞ্জো, সেতারবাদকও)। তিনি এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ করামতুল্লা খাঁ হলেন, নবাব ওয়াজিদ আলী শার মেটিয়াবুরুজ দরবারের গুণী বাদক নিয়ামতুল্লা খাঁর দুই সুযোগ্য পুত্র। তাঁরা, তাঁদের পিতার খ্যাতিকেও অতিক্রম করেছিলেন। তাঁরা বাংলাদেশে অনেককাল বাস করেন এবং একটি কৃতী বাঙ্গালী শিষ্যমণ্ডলীও গঠন করেন, যাঁরা পরে সুপরিচিত হয়েছিলেন সঙ্গীত-জগতে নানা যন্ত্রের যন্ত্রীরূপে। যেমন, ধীরেন্দ্রনাথ বসু (সরোদী), হরেন্দ্রকৃষ্ণ শীল (সুরবাহার বাদক), কালিদাস পাল (এস্রাজী), ননী মতিলাল (সেতারী) প্রভৃতি। এসব অবশ্য ওই জলসার অনেককাল পরের কথা এবং করামতুল্লা কলকাতায় আসেন কৌকভ খাঁর অকাল মৃত্যুর পরে।

কথিত জলসার সময়ে কৌকভ খাঁ কলকাতায় কিছুদিন মাত্র এসেছেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গীত-প্রতিভার কথা কলকাতার সমঝদারদের মধ্যে জেনেছেন অনেকেই। তিনি খুবই উঁচুদরের বাজিয়ে। তবে সেজন্যে বেশ খানিক অহমিকা ছিল তাঁর মনে এবং বাংলাদেশে তাঁর তুল্য কলাবত আর ক'জন আছেন—এমন দম্ভও নাকি তাঁর ছিল। অন্তত গোঁসাইজীর কোন কোন শিষ্য ও অনুরাগী কৌকভ খাঁর সম্বন্ধে এমন কথা শুনেছিলেন। তাই তাঁদের ইচ্ছে হয়েছিল, খাঁ সাহেবকে সেই জলসায় গোঁসাইজীর গান শোনাবার। খাঁ সাহেব কি বলেন তাঁর গান শুনে!

কিন্তু তাঁরা ভাবিত হলেন যে, গোঁসাইজীকে জলসায় আনা হবে কি ভাবে? প্রথমত, তিনি তখন কলকাতায় নেই, বিষ্ণুপুরে আছেন। দ্বিতীয়ত, কৌকভ খাঁর জলসায় গাইবার জন্যে তাঁকে আসতে লেখা হলে, খুব সম্ভব আসবেন না গোঁসাইজী। ভাববেন, হোমরা চোমরা পাগড়ী-ধারীর সঙ্গে আসরে হয়ত একটা লড়ালড়ি হবে, কি দরকার ঝামেলার মধ্যে যাবার।

এইসব সাতপাঁচ ভেবে, গোঁসাইজীকে যাঁরা সেই জলসায় আনতে চান, তাঁরা একটি বক্র উপায় স্থির করলেন। অব্যর্থ অস্ত্র হিসাবে একটি টেলিগ্রাম নিক্ষেপ করলেন গোঁসাইজীর বিষ্ণুপুরের ঠিকানায়—'মহীন্দ্রনাথের কলেরা হয়েছে।'

পাথুরিয়াঘাটা নিবাসী মহীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় হলেন গোঁসাইজীর প্রিয়তম শিষ্য। এমন অনুপম মাধুর্যময় কণ্ঠ খুব কম ধ্রুপদীরই ছিল। ১৫। ১৬ বছর বয়স থেকে গোঁসাই-জীর কাছে তিনি গান শিখতে আরম্ভ করেন এবং দ্বিতীয় কোন সঙ্গীতগুরু তাঁর ছিল না। এমন কি, তাঁর অতি সুমিষ্ট গলা শুনে এক আসরে স্বনামধন্য মৌজুদ্দিন তাঁকে ঠুংরী গান শেখাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও মহীন্দ্রনাথ

সবিনয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এ জীবনে গোঁসাইজী ভিন্ন দ্বিতীয় কাউকে গুরু বলে পায়ে হাত দেব না —এই ধরণের কথা তিনি বলেছিলেন মৌজুদ্দিনকে।

তাঁর প্রতি মহীন্দ্রের ভক্তি শ্রদ্ধার কথা গোঁসাইজীর বিলক্ষণ জানা ছিল, যেমন তিনি জানতেন শিষ্যের অপূর্ব্ব কণ্ঠ এবং একনিষ্ঠ সাধনার কথা। তাই মহীন্দ্রনাথকে তিনি শিষ্যদের মধ্যে প্রাণতুল্য ভালবাসতেন।

সুতরাং টেলিগ্রাম পাঠাবার ফল, প্রেরকরা যেমন আশা করেছিলেন ঠিক তেমনি ফলল।

গোঁসাইজী কলকাতায় এসে উপস্থিত। সজল চোখ, ক্লিষ্ট শুষ্ক মুখ। অঙ্গে ফতুয়া। জামা চাদর ইত্যাদি পরবার কথা মনেও আসেনি। বিষ্ণুপুর থেকে প্রথম ট্রেণ ধরেছেন কলকাতার।

কলকাতায় এসেই সোজা লাল মাধব মুখার্জী লেনের বাড়ীতে "মহীন, মহীন"—বলতে বলতে ঢুকলেন। মহীন্দ্রনাথের জ্ঞাতিভাই গোপালচন্দ্র এবং আরো দু'একজন (তাঁরা প্রস্তুত হয়েই ছিলেন) গোঁসাইজীর গলা শুনে এসে তাঁকে প্রথমে যত্ন ক'রে বসালেন। বললেন, "আপনি একটু স্থির হোন, একটু বিশ্রাম করুন। মহীন আজ অনেকটা ভাল।"

গোঁসাইজী বললেন, "না, আমি এখানে বসব না। মহীনের ঘরে আমায় নিয়ে চল। আমি তাকে দেখে আসি।"

মহীন্দ্রনাথের ঘরে, তাঁর বিছানার পাশে গোঁসাইজীকে এনে বসানো হ'ল। (মহীন্দ্র যথানির্দিষ্ট আপাদকণ্ঠ চাদর ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন, গোঁসাইজীর আওয়াজ পেয়ে।) তারপর শিষ্য একটুখানি উঠে গুরুর পায়ের ধূলো নিয়ে বললেন, "আজ ভাল আছি।"

সরলমতি গোঁসাইজী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। তারপর তাঁর যথারীতি পরিচর্যার ব্যবস্থা হ'ল বাড়ীতে।

পরে একথা সেকথা আলোচনার মধ্যে একজন তাঁকে বললেন, "প্রভু, হরেন শীলের বাড়ীতে কাল একটা বড় জলসা আছে। সকলের বড় ইচ্ছে, আপনি সেখানে গান করেন।"

মহীন্দ্রের কলেরা এত তাড়াতাড়ি সেরে যাওয়ায় গোঁসাইজীর মন তখন বড়ই প্রফুল্ল। এক কথায় রাজি হয়ে গেলেন, "বেশ ত, যাব। গাইব সেখানে। তোরা সব যাবি আমার সঙ্গে। মহীন যেতে পারবে ত?"

"আজ্ঞে হাঁ, পারবে বোধ হয়। এই ত কাছেই।"

তারপর তাঁকে মেজাজ বুঝে বলা হ'ল (এটাও আগে জানিয়ে রাখা দরকার), "আসরে আর কে একজন নাকি বাজিয়ে আসবে।"

গোঁসাইজীর তখন ভারি খুশী মন। বললেন, "আসুক কেনে। ওসব কিছু নয়। আমি গাইব, ওখানে জানিয়ে দে তোরা।"

যথারীতি আসরের পক্ষ থেকে তাঁর আমন্ত্রণের ব্যবস্থা হ'ল।

রাজা দুনিয়াচাঁদ শীলের উত্তরাধিকারী হরেন্দ্রকৃষ্ণ শীলের সেই প্রাসাদভবন বর্তমানে (জোড়াসাঁকোর) লোহিয়া মাতৃ-সেবাসদন। সেখানকার সেদিনের জলসাঘরে আসর বসেছে। কৌকভ খাঁ এসেছেন। আরও অনেক সঙ্গীতজ্ঞ উপস্থিত। গোঁসাইজী শিষ্য-পরিবৃত হয়ে বসেছেন। এবার গান আরম্ভ হবে।

কৌকভ খাঁ তখন বাংলায় বেশীদিন আসেন নি ব'লে এখানকার সঙ্গীত-সমাজের সকলকে চিনতেন না। গোঁসাইজীকে তিনি এক নজরে দেখে নিলেন আড়চোখে। গাইয়ের আকার-প্রকার মোটেই ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক নয়। ঈষৎ খর্ব্বকায়, একহারা শরীর। শান্ত, নিরীহ প্রকৃতির মানুষ তা মুখ-চোখে সুপ্রকাশ। দেখে তেমন ছাপ পড়ল না খাঁ সাহেবের মনে। ভাবলেন, কে ত কে! মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে ব'সে রইলেন।

গোঁসাইজী আরম্ভ করলেন গান—দরবারী কানাড়া। মিঞা তানসেন গঠিত এই রাগে গোঁসাইজী সিদ্ধ ছিলেন। আলাপচারীর প্রারম্ভেই তাই আভাস দিলেন অপূর্ব রাগরূপের।

কৌকভ খাঁ অন্যমনস্কের ভান আর করতে পারলেন না। উৎকর্ণ, সচকিত হয়ে শুনতে লাগলেন, গোঁসাইজীর দিকে মুখ ফিরিয়ে।

গোঁসাইজী (উদারাগ্রামে) খাদের কাজ করতে করতে মোচড় দিয়ে মুদারায় গলা চড়ালেন। তারপর একটি মনোজ্ঞ মিড়ে সা থেকে রে-তে উঠতেই শিহরিত হলেন খাঁ সাহেব। নির্লিপ্ত থাকা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হ'ল, তিনি সাবাস দিয়ে উঠলেন। তারপর সবিস্ময়ে আদ্যোপান্ত শুনতে লাগলেন রাধিকাপ্রসাদের দরবারী কানাড়া।

গান শেষ হ'তে গায়ককে অভিনন্দিত ক'রে বললেন, "বাংলায় যে এমন গাওয়াইয়া আছেন, আমার ধারণা ছিল না।"

শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা ক'রে কিংবা বিসদৃশ অবস্থা এড়াবার জন্যে রাধিকাপ্রসাদ হোম্‌রা চোম্‌রা বা তেমন তেমন পাগড়িধারীদের এড়িয়ে চলতেন বটে। কিন্তু তাঁর নিজের (সঙ্গীত) বিদ্যার ওপর কিংবা আত্মশক্তির ওপর বিশ্বাসের অভাব ছিল না। সেখানে যদি কেউ আক্রমণ হানতেন, তিনি যত বড় পাগড়িই ধারণ করুন, গোঁসাইজী রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করতেন না বা শান্তির প্রলেপ দিয়ে অন্যায় অপমান বরদাস্ত করতেন না কখনও।

তা হ'লে ভবানীপুরের নাটোর-ভবনের সেই আসরের কথা এখানে বলতে হয়।

নাটোরের বর্তমান মহারাজা যোগীন্দ্রনাথ রায় তখন 'কুমার', অর্থাৎ তাঁর পিতা মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় তখন জীবিত। এটি সেই সময়কার কথা।

যোগীন্দ্রনাথ যৌবনকালে সঙ্গীত-চর্চা ভাল ভাবেই করেছিলেন। কয়েকজন প্রথম শ্রেণীর ওস্তাদের কাছে রীতি-মত শিক্ষা করেন কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত। তা ছাড়া, বাড়ীর উচ্চাঙ্গের জলসায় নানা গুণীর মাঝে মাঝে যোগদান ত' ছিলই। তিনি যে ওস্তাদদের কাছে তালিম পান, তাঁদের মধ্যে উক্ত করামতুল্লা খাঁ, বিশ্বনাথ রাও এবং রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর নাম বিশেষ ক'রে বলা যায়। প্রথম ব্যক্তির কাছে তিনি সরোদ, দ্বিতীয়ের কাছে ধ্রুপদ ধামার গান এবং গোঁসাইজীর কাছে ধ্রুপদের শিক্ষা পান।

যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে, তখন যোগীন্দ্রনাথ একযোগে করামতুল্লার কাছে সরোদ এবং গোঁসাইজীর কাছে ধ্রুপদের পাঠ নিচ্ছেন। তাঁকে তালিম দিতে একদিন আসেন করামতুল্লা, অন্য একদিন আসেন রাধিকাপ্রসাদ।

একদিন যোগীন্দ্রনাথকে গোঁসাইজী নট কামোদের একটি গান দিয়েছেন। যোগীন্দ্রনাথ সেটি গলায় তোলবার পর, সেদিন কি ভেবে, করামতুল্লাকে শোনালেন গানটি আর জিজ্ঞেস করলেন, "দেখুন ত এই নট কামোদ ঠিক আছে কি না?"

হয়ত কিছু মনে না করেই প্রশ্নটা করে থাকবেন। কিংবা হয়ত নট কামোদ সুরের ঠিক বেঠিক নিয়ে দুই ওস্তাদের মধ্যে একটু বাধিয়ে দিয়ে কৌতুক দেখাও তাঁর উদ্দেশ্য হ'তে পারে, বলা যায় না। একটি রাগের রূপ নিয়ে দুজন আলাদা চালের সঙ্গীতজ্ঞ খুব কম ক্ষেত্রেই তো পুরোপুরি একমত হয়ে থাকেন ভারতীয় সঙ্গীতক্ষেত্রে! তাই কোন একটি নির্দিষ্ট রাগের রূপায়ন নিয়ে একের মত সম্পর্কে অন্যের মন্তব্য শুনতে চাইলে প্রায়ই তর্কাতর্কি বেধে যায়।

তা ছাড়া, করামতুল্লা দাম্ভিকও ছিলেন। অন্য ওস্তাদেরও যে গুণপনা থাকতে পারে তা' অনেক সময় ভাবতেই পারতেন না। নট কামোদটি শুনেই তিনি ফতোয়া দিলেন, "ইয়ে গলদ্ হায়।"

তারপর রাধিকাপ্রসাদ আবার যেদিন এলেন, খাঁ সাহেবের মন্তব্যটি তাঁকে ফিরিয়ে শোনালেন যোগীন্দ্রনাথ, "আপনি যে নট কামোদ দিয়েছেন, করামতুল্লা বলছেন ও-তে ভুল আছে।"

গোঁসাইজী বললেন, "তাই নাকি? ওই নট কামোদ ঠিক নেই বলেছে?" তারপর একটু চুপ করে থেকে, "আচ্ছা, এক কাজ কর। মহারাজাকে ব্যাপারটা বলে একটা আসর বসাও। যে যে ওস্তাদ আর সমঝদারদের পারো খবর দিয়ে আনাও। আমি সকলের সামনে ওই নট কামোদ গাইব, দেখি বাইরের পাঁচজন শুনে কি বলে। করামতুল্লাকেও ওই আসরে আসতে বল্‌বে। তবে আমি যে ওখানে গাইব কিংবা নট কামোদ নিয়ে কথা উঠবে—এসব ওকে বোলো না। তাহলে ও আসবে না।"

যোগীন্দ্রনাথ গোঁসাইজীর কথা মতন জগদিন্দ্রনাথকে বলে একটি আসরের আয়োজন করলেন। এবং জগদিন্দ্রনাথও বুঝলেন গোঁসাইজীর ইঙ্গিত। অনেককেই আমন্ত্রণ জানানো হ'ল। করামতুল্লাকেও।

যথাসময়ে আয়োজিত সেই আসরে যাঁরা এলেন, তাঁদের মধ্যে বিখ্যাত ধ্রুপদী গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপেশ্বরবাবু, করামতুল্লা খাঁ প্রভৃতি ছিলেন। রাধিকাপ্রসাদ উপস্থিত হলেন জলসা আরম্ভ হয়ে যাবার খানিক পরে, সকলের শেষে।

জগদিন্দ্রনাথ তাঁকে দেখে অভ্যর্থনা করলেন, "এই যে গোঁসাইজী, আসুন।" তারপর তাঁর গানের সময় এলে, বললেন, "গোঁসাইজী, আজ নটের ঘর হোক।"

রাধিকাপ্রসাদ সম্মতিতে একবার মাথা হেলিয়ে গান ধরলেন। আরম্ভ করলেন নটের ঘর। অর্থাৎ নব নট—শুদ্ধ নট, ছায়ানট, হাম্বীর নট, নট বেহাগ, নট ভৈরব, নট নারায়ণ, নট কেদার, নট কামোদ এবং নট মল্লার।

এই ন'টি নটের রাগ গোঁসাইজী একে একে গাইতে লাগলেন তাদের পার্থক্য প্রদর্শন করে। প্রত্যেকটিতে রাগ রূপ দেখিয়ে এবং স্থায়ী কলি গেয়ে তিনি নটের ঘরের পরিচয় পরিপাটিভাবে দিতে লাগলেন। প্রথমে শুদ্ধ নট ধরে শেষে গাইলেন নট কামোদ। তার মধ্যে নট কামোদের রূপটি সবচেয়ে বিস্তৃতভাবে দেখালেন।

গান শেষ হতে সভায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাধিকাপ্রসাদের তারিফ শোনা গেল।

তারপর জগদিন্দ্রনাথ উপস্থিত ব্যক্তিদের উদ্দেশ করে বললেন, "গোঁসাইজী এই যে-সব গান গাইলেন, এই যে নট কামোদ শোনালেন—এসব কি আপনারা ঠিক মনে করেন? নাকি এ বিষয়ে আপনাদের অন্য মত আছে?"

এই ব'লে তিনি এক-একজনকে সম্বোধন ক'রে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, "আপনি কি বলেন গোপালবাবু? গোঁসাই-জীর নট সব ঠিক আছে?"

গোপালচন্দ্র বললেন, "না, না, এর মধ্যে কোন ভুল নেই।"

জগদিন্দ্রনাথ সমবেত গুণীদের একে একে প্রশ্ন করতে সকলেই জানালেন যে, গোঁসাইজীর গানে রাগরূপ ঠিক ঠিক আছে।

শেষে তিনি করামতুল্লা খাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "খাঁ সাহেব কি বলেন? নট কামোদ কিছু বেঠিক আছে?"

তিনিও বললেন, "না, এতে কোন গোলমাল নেই।"

তখন যোগীন্দ্রনাথ বলে উঠলেন (যেমন তাঁর বলবার ধরণ মাঝে মাঝে হয়)—"খ্ খ্ খ্ খ্ খাঁ সায়েব, সেদিন যে বলেছিলেন গলদ আছে।"

খাঁ সাহেব মাথা নেড়ে দরাজ গলায় বললেন, "আরে নেহি নেহি। এ্যায়সা তো বোলা নেহি।"

আর একটি আসরের স্মৃতিকথা আছে। তবে এটি শান্তিপ্রিয় গোঁসাইজীর গান না গাওয়ার গল্প।

এই আসর বসেছিল মতিলাল শীলের কলুটোলার বাড়ীর পেছন দিকে একটি বাড়ীতে, সান্‌কিভাঙ্গায়। অতীত কলকাতায় সান্‌কিভাঙ্গা এই অঞ্চলটির নাম ছিল, যা এখন অধিকার করে আছে মেডিক্যাল কলেজের বিস্তীর্ণ চত্বর এবং তারপর ট্রামলাইনের পশ্চিমের কিছু অংশ। সেজন্যে প্রতাপ চাটুজ্যে লেন নিবাসী বঙ্কিমচন্দ্র সান্‌কিভাঙ্গার অধিবাসী ছিলেন। সান্‌কিভাঙ্গার সেই বাড়ীর আসরের আয়োজন করেছিলেন এমন কয়েকজন সঙ্গীতজ্ঞ যাঁরা গোসাইজীর প্রতি মনঃক্ষুণ্ণ ছিলেন সে সময়। কারণ—তখন একটি কথা রটেছিল—রাধিকাপ্রসাদ নাকি কোথায় মন্তব্য করেছেন যে, লক্ষ্মী-প্রসাদ মিশ্র শুধু টপ্পা গাইয়ে আর বিশ্বনাথ রাও ধামার গাইয়ে, ধ্রুপদের কারবারী তাঁরা নন, ইত্যাদি।

কথাটি ওই দলের কানে উড়ে আসে এবং তাঁদের পক্ষে আসরটির প্রধান উদ্‌যোক্তা হন মহীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। মহীন্দ্রনাথ তখনকার নামকরা হার্মোনিয়াম বাদক ছিলেন। তিনি যেমন মজলিসী তেমনি সৌখিন ব্যক্তি, গোলাপ জলে স্নান করতেন ইত্যাদি। পরে তিনি আরো নাম-করা হয়ে-ছিলেন নোট জালের অভিযোগে আন্দামানে দ্বীপান্তর বাস করে। সেখানে নাকি জেলারের পরিবারে সঙ্গীত শিক্ষা দিয়ে আবার ওরই মধ্যে কিছু কিছু সুখ-সুবিধা আদায় করে নিতেন। যা' হোক মহীন্দ্রনাথ এই আসরটির আয়োজন করেছিলেন বিশ্বনাথ রাও এবং লক্ষ্মীপ্রসাদ মিশ্রের ধ্রুপদ গুণপনা রাধিকাপ্রসাদকে দেখাবার জন্যে।

লক্ষ্মীপ্রসাদ মিশ্র অবশ্যই মাত্র টপ্পা গায়ক ছিলেন না। তাঁর তুল্য সর্বতোমুখী সঙ্গীতজ্ঞ পশ্চিমাঞ্চল থেকে খুব কমই আসেন বাংলায়। তিনি একাধারে বীণকার, সেতার ও তবলাবাদক এবং ধ্রুপদী, খেয়াল ও টপ্পা গায়ক। আর বিশ্বনাথ রাও আসলে ধ্রুপদীই ছিলেন, কিন্তু বাংলাদেশে তাঁর অভিনব তারাণা এবং সার্গম ও বাঁট্-যুক্ত ধামার গান অসাধারণ জনপ্রিয় হওয়ায় তিনি অনেক সময় তারাণা, ধামার গাইতেই অনুরুদ্ধ হতেন এবং বিশ্বনাথ ধামালীরূপেই সাধারণের পরিচিত হয়ে ওঠেন।

সেই আসরে আমন্ত্রিত হয়ে রাধিকাপ্রসাদ উপস্থিত হয়েছেন, উদ্‌যোক্তাদের উদ্দেশ্যের কথা কিছুই না জেনে। বিশ্বনাথ রাও এবং লক্ষ্মীপ্রসাদ মিশ্রও (তাঁর পুত্র হরিদাস এবং ভ্রাতা কেশবকে নিয়ে) সেই বাড়ীতে এসেছেন, কিন্তু পূর্ব ব্যবস্থা মতন আসরে আসীন না হয়ে অন্য ঘরে বসেছেন, খানিকক্ষণ আত্মগোপন করে থাকবার জন্যে।

এদিকে আসর আরম্ভ হতে বড় দেরী হয়ে যাচ্ছে—কারণ কোন সঙ্গতকার পাখোয়াজী তখনো এসে পৌছননি—এবং শ্রোতারা অধৈর্য্য হয়ে পড়ছেন দেখে মহীন্দ্রনাথের অনুরোধে রাধিকাপ্রসাদ প্রথমে তবলার গান অর্থাৎ খেয়াল গাইলেন। বিশ্বনাথ রাও, লক্ষ্মীপ্রসাদ প্রভৃতি তখনো বসে আছেন অন্যত্র, আসরে উপস্থিত হননি।

তারপর মৃদঙ্গী দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং দেবেন্দ্রনাথ দে উপস্থিত হওয়াতে ধ্রুপদের আসর আরম্ভ হবার সময় বিশ্বনাথ রাও, লক্ষ্মীপ্রসাদ মিশ্র প্রভৃতি সদলে আত্মপ্রকাশ করলেন। কিন্তু আসরের মধ্যে স্থান না নিয়ে বসলেন একটু দূরে সাধারণ শ্রোতাদের সঙ্গে।

গোঁসাইজী এসব ব্যাপার লক্ষ্য করেন নি। তিনি নতুন করে' তানপুরা বেঁধে ধ্রুপদ ধরবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। এমন সময় মহীন্দ্রবাবু, যেন হঠাৎ শ্রোতাদের দিকে দৃষ্টি পড়ায় আশ্চর্য হয়ে বলে উঠলেন, "এ কি মিশ্রজী, বিশ্বনাথজী! আপনারা ওখানে রয়েছেন কি? এখানে এসে বসুন। এঁর পরে যে আপনাদের গাইতে হবে।"

লক্ষ্মীপ্রসাদ মিশ্র সেখান থেকেই কেমন এক গলায় জবাব দিলেন, "আমি ওখানে বসে কি গাইব? ও তো ধ্রুপদের আসর। আমি ধ্রুপদের কি জানি? আমি তো টপ্পা গাই।"

গোঁসাইজী হাতের তানপুরার গুঞ্জন থামিয়ে কথাটা শুনলেন। মনে খট্‌কা লাগল।

তারপর বিশ্বনাথজীও যখন বাঁকাভাবে বললেন, "আমি কি আলাপ করব, ধ্রুপদ গাইব! তারাণা আর ধামার ছাড়া আমি কি জানি?" রাধিকাপ্রসাদ তখন স্পষ্টই বুঝলেন, হাওয়া বেতালা বইছে। এঁদের ধরণ-ধারণ সব বেসুরো ঠেকছে তাঁর।

মহীন্দ্রবাবু ইঙ্গিতপূর্ণ ভাবে ওস্তাদদের দিকে চেয়ে আবার আহ্বান জানালেন, "সে কি কথা? তাও কি হয়? আপনারা এখানে আসুন। ছেড়ে দিন ওসব কথা!"

গোঁসাইজী তাঁর দিকে ফিরে বললেন, "এসব কি কথা শুনছি? আমি তো কখনও এমন কথা বলিনি!"

"যেতে দিন গোঁসাইজী, যেতে দিন। আড়ালে অমন কত কথা হয়ে থাকে। সামনে কেউ কিছু বলে না। ওসব কথা বাদ দিয়ে এখন গান আরম্ভ করুন।"

গান আরম্ভ করবার মুখেই এই ধরণের বাদ-বিসম্বাদে গোঁসাইজীর গানের মেজাজটি একেবারে নষ্ট হ'ল। মনের সূক্ষ্ম তারটি ছিঁড়ে গেল। তিনি বললেন, "না, এ আসরে আমি গাইব না।"

মহীন্দ্রবাবু তাঁকে আটকে রাখবার জন্যে বললেন, "কিন্তু আপনি গান না গেয়ে এখান থেকে এভাবে চলে গেলে আপনার নাম খারাপ হবে।"

রাধিকাপ্রসাদ ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন। জবাব দিলেন, "হোক নাম খারাপ। আমি চললাম।"

তিনি চলে যাবার পর বিশ্বনাথ রাও এবং লক্ষ্মীপ্রসাদ মিশ্র দুজনেই ধ্রুপদ গেয়েছিলেন সে আসরে।

গোঁসাইজীর আর একটি আসরের গল্প বলে তাঁর প্রসঙ্গ শেষ করা হবে। এই ঘটনাটি থেকে তাঁর যেমন প্রগাঢ় রাগ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি প্রভূত আত্মবিশ্বাসেরও। রাগের গঠন ও রূপ অবিকৃত রাখার বিষয়ে আগেকার আমলের ধ্রুপদীরা যে কতখানি নিষ্ঠাবান্ ছিলেন, এই আসরের বৃত্তান্তটি তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

এ আসরের সূত্রপাত হয় রামপুর ঘরাণার বিখ্যাত খেয়াল ও তারাণা গায়ক মুস্তাক হোসেন খাঁর মালকোষ গাইবার উপলক্ষ্যে। মনমোহন থিয়েটার তখনো সেন্ট্রাল এ্যাভেনিউয়ের উত্তরমুখী অভিযানে নিশ্চিহ্ন হয়নি। সেই মনমোহন মঞ্চে সেবার মুস্তাক হোসেনের গান হল—মালকোষ। ওস্তাদজীর অসাধারণ রেওয়াজী গলা এবং মালকোষ রাগে তিনি সিদ্ধ (তিনি এখনও জীবিত আছেন শতায়ু হয়ে।) অপূর্ব তান কর্তবে সমুজ্জ্বল খাঁ সাহেবের সেই গান শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে। সেখানে গোঁসাইজীর কয়েকজন শিষ্য উপস্থিত ছিলেন—ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ললিতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। তাঁদের মনেও গভীরভাবে ছাপ দেয় খাঁ সাহেবের গান।

তাঁরা ফিরে গিয়ে গোঁসাইজীর কাছে মুস্তাক হোসেনের সেই অসাধারণ গানের বিবরণ দিলেন এবং তাঁর মনে একটি বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্যে টীকা টিপ্পনী জুড়ে দিলেন. "প্রভু, মালকোষে এত রকমের কাজ আমরা কখনো শুনিনি আপনিও তো আমাদের মালকোষ দিয়েছেন কিন্তু এত ভ্যারাইটির কাজ আমরা পাইনি।"

তাঁদের বাক্যবাণ লক্ষ্যস্থল অর্থাৎ গোঁসাইজীর মর্ম ঠিক বিদ্ধ করলে। তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, "বলিস কি রে?

এমন গাইলে? তাহলে তো আমাকেও একদিন শুনতে হচ্ছে। খাঁ সাহেবের একটা আসরের ব্যবস্থা কর।"

তখন তাঁরা ৺লালচাঁদ বড়ালের পুত্রদের ব'লে তাঁদের বাড়ীতে একদিন মুস্তাক হোসেনের গান শোন্‌বার ব্যবস্থা করলেন। সেখানে খাঁ সাহেবের গানের দিন গোঁসাইজীও শুনতে এলেন শিষ্যদের সঙ্গে। আরো কয়েকজন সঙ্গীতজ্ঞ, সমঝদারও সভায় এলেন এবং খাঁ সাহেবকে মালকোষ গাইতে অনুরোধ করা হ'ল।

ওস্তাদ মুস্তাক হোসেন মালকোষ গান আরম্ভ করলেন এবং চমৎকার গাইতে লাগলেন। সত্যিই অশ্রুতপূর্ব কারুকর্ম তিনি দেখাতে লাগলেন রাগের অলঙ্করণে।

খানিক শোনবার পর গোঁসাইজী তাঁকে গানের মধ্যেই জিজ্ঞেস করলেন, "খাঁ সাহেব, এটা কিরকম হ'ল? এই যে কাজটা করলেন, এখানে মালকোষ বজায় রইল কি?"

মুস্তাক হোসেন গান থামিয়ে রাধিকাপ্রসাদের মুখের দিকে একটুখানি চেয়ে বললেন, "তা বটে। মালকোষের একটু ফারাক হ'ল।" ব'লে, গাইতে আরম্ভ করলেন। তারপর গোটাকয়েক পাল্‌টি দিতেই আবার গোঁসাইজী বললেন, "খাঁ সাহেব, এখানে কি ভীমপলাশী এসে গেল না?"

মুস্তাক হোসেন গান থামিয়ে বললেন, "হাঁ, কথাটা ঠিকই বলেছেন।" ব'লে আবার গাইতে লাগলেন। খানিক পরে গোঁসাইজী আবার ধরলেন, "এখানটা কিরকম হ'ল? এই কি মালকোষ?"

এইভাবে তিন-চার বার গোঁসাইজী প্রশ্ন করবার পর মুস্তাক হোসেন গান থামিয়ে দিলেন। এ রকম ক'রে ত গান গাওয়া চলে না। খাঁ সাহেবের মুখে চোখে উষ্মার ভাব ফুটে উঠল। কিন্তু কি আর বলেন—গোঁসাইজীর point of order যে অকাট্য। আসরে আরও সমঝদার রয়েছেন, তাঁদের সকলেরই সায় দেখা যাচ্ছে গোঁসাইজীর কথায়। মুস্তাক হোসেন অস্বীকার করতে পারলেন না যে, রাগরূপ বিকৃত হয়েছে। রাধিকাপ্রসাদ নিছক তাত্ত্বিক তর্কের মধ্যে গেলেন না। তাঁর সাঙ্গীতিক ব্যক্তিত্ব তখন দৃঢ়ভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠ! তিনি খাঁ সাহেবকে এবং সভার সকলকে গেয়ে শুনিয়ে দিলেন শুদ্ধ মালকোষের রূপ— অবিকৃত, অকৃত্রিম।

সমস্ত সভার সমর্থন রাধিকাপ্রসাদ নিজের মতের দিকে আকর্ষণ ক'রে নিলেন। মুস্তাক হোসেন গোঁসাইজীর কৃত মালকোষের রাগরূপের কোন ত্রুটি দেখাতে পারলেন না এবং স্বীকার করলেন তাঁর গুণপনা।

গোঁসাইজী শেষে গান থামিয়ে তাঁকে বললেন, "আমরা ত ওই ফিকিরেই পড়ে গেছি, খাঁ সাহেব। বিস্তারের কাজ আমরাও কিছু কিছু জানি। কিন্তু রাগটাও আবার ঠিক ঠিক জেনেছি ব'লে সব মেশামিশি করতে পারি না। জেনে শুনে রাগ নষ্ট ক'রে, গান চটক্‌দার ক'রে শ্রোতাদের বাহবা নিতে কেমন বাধে।"

দুর্লভচন্দ্রের তাল-জ্ঞান

তেজস্বী, নির্লোভ এবং সত্যি কথার মানুষ—আজকালকার সমাজে যা দুর্লভ হয়ে এসেছে, দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য ছিলেন তেমনি একজন খাঁটি মানুষ। আর পাখোয়াজী হিসেবে ছিলেন তাল লয়ে অবিচল, গায়কের অতি কূট তাল ও লয়কারীতে অটুট, অফুরন্ত বোলের অব্যর্থ প্রয়োগপটু সঙ্গতকার।

দুর্লভচন্দ্র ছিলেন বাংলা তথা ভারতের এক শ্রেষ্ঠ মৃদঙ্গী। যেমন নিষ্ঠার সঙ্গে দীর্ঘ ২১ বছর মুরারিমোহন গুপ্তের কাছে শিখেছিলেন, সঙ্গীত জীবনেও ছিলেন তেমনি একনিষ্ঠ সাধক। সঙ্গীতের আসরে তিনি মৃদঙ্গের মর্যাদা নতুন ক'রে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁর নিজের শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব যেন তাঁর পাখোয়াজের মধ্যে ফুটে উঠত সঙ্গীতের আসরে। "শুধু ঠেকা" বাজাতে বলতেন যদি কোন পশ্চিমী ওস্তাদ, তিনি তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ জানাতেন। বাজাতে অস্বীকার করতেন তা হ'লে। শুধু ঠেকা? তবে এত কষ্ট ক'রে এত সব শেখা কি জন্যে? হাত খুলে বাজাতে দিতে হবে। কথা রাখা হ'লে তবে বাজাতেন। তাঁর দৃঢ় চরিত্র ও আত্মপ্রত্যয় দেদীপ্যমান হ'ত আসরে পাখোয়াজ নিয়ে বসলে।

জাত সঙ্গতী ছিলেন দুর্লভচন্দ্র। কিন্তু কোনদিন বাদক জীবনকে পেশা করেন নি। পাখোয়াজ ছাড়া তবলাও তিনি বাজাতেন এবং এই দুই যন্ত্রে তাঁর বিরাট্ শিষ্যমণ্ডলী ছড়িয়ে আছে বাংলার নানা জায়গায়। এই সব শিক্ষাও তিনি কখনও অর্থের বিনিময়ে দেন নি। কতবার এমন হয়েছে, বড় বড় জমিদারের বাড়ীর আসরে মোটা মুজরো নেবার অনুরোধ এসেছে। কিন্তু কোনদিন নেন নি তিনি।

অথচ ধনী ছিলেন না এবং বৃত্তি ছিল যজমানী পুরোহিতের। শুধু টাকা নয়, অন্য কোন ভাবেও সাহায্য বা দান তিনি নিতেন না। একবার কলকাতার এক সুপরিচিত সঙ্গীতপ্রেমী ধনী তাঁর বাড়ীর আসরে ভট্টাচার্য মশায়কে অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে উপহার দেন একটি বহুমূল্য শাল। দুর্লভচন্দ্র সেই শালটি গৃহকর্তার পুত্রের গলায় পরিয়ে দেন, বাড়ী নিয়ে আসেন নি। প্রাচীন কালের ব্রাহ্মণের মতন সামান্য ধুতি চাদরধারী হয়েও তিনি নস্যাৎ ক'রে দিতে পারতেন অর্থের প্রলোভনকে, অন্তরের সম্পদে গরীয়ান্ হয়ে।

সঙ্গীতকে পেশা না করার জন্যে রেডিওতে তিনি বাজাতে চাইতেন না। সঙ্গীত সম্মেলন সম্পর্কেও তাই। অনেক পীড়াপীড়িতে একবার মাত্র নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনে (কাশীতে, সপ্তম বার্ষিক অধিবেশনে) আর একবার কলকাতার নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনে বাজিয়েছিলেন তিনি। তবে কলকাতার বহু আসরে বহু ভারতবিখ্যাত ওস্তাদদের সামনে গুণপনা দেখিয়েছিলেন। নিজের গুরুর স্মৃতিরক্ষার জন্যে দীর্ঘকাল ধ'রে প্রতি বছর যে 'মুরারী সম্মেলন' করতেন, আগেকার আমলে সে সব ছিল উঁচুদরের আসর। শুধু কলকাতার শ্রেষ্ঠ ওস্তাদরা নয়, অনেক সর্বভারতীয় গুণীও সেখানে যোগ দিয়েছেন। সে সব আসরেও অনুরোধে প'ড়ে তিনি অনেক পশ্চিমী ওস্তাদদের সঙ্গেই সঙ্গত করেছিলেন। তাঁর জীবনের অবসানও হয় এক সঙ্গীতের আসরে, পাথুরে-ঘাটার ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে। তখন তাঁর ৬৮ বছর বয়স। আসরে বাজাতে বাজাতেই তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন, সে জ্ঞান আর ফিরে আসে নি। ২৮ ঘণ্টা অজ্ঞান থাকবার পর সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর।

এখন তাঁর যে আসরের গল্পটি বলা হবে, সেটি হয়েছিল—ভারত সঙ্গীত সমাজে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ স্মরণীয় ব্যক্তিদের স্থাপিত এই ভারত সঙ্গীত সমাজ প্রথম দিকে জোড়াসাঁকোর কালীপ্রসন্ন সিংহের (১৪৭, বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট) বাড়ীতে থাকলেও, এই আসরের সময়ে ছিল ১৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের লাহা বাড়ীতে। এখানে দুর্লভচন্দ্রের পাখোয়াজ সঙ্গত হয় বিখ্যাত ধ্রুপদী ভ্রাতৃদ্বয় শিবপশুপতির সঙ্গে। তাঁরা দু'ভাই হলেন ভারত-প্রসিদ্ধ প্রসদ্দু মনোহর ঘরাণার উত্তরাধিকারী। এই মিশ্র ঘরাণা সঙ্গীতের বহুমুখী সাধনায় অসামান্য কৃতী এবং এই ঘরাণার অনেক গুণী ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পা গানের সঙ্গে একাধিক যন্ত্রেও পারদর্শী ছিলেন। সঙ্গীত সমাজে সুপরিচিত শিবপশুপতির মধ্যে পশুপতিসেবক মিশ্র হলেন জ্যেষ্ঠ এবং ধ্রুপদের সঙ্গে বীণা ও সেতারের ওস্তাদ ছিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা শিবসেবক মিশ্র ধ্রুপদী রূপেই বিখ্যাত এবং অনেক আসর তাঁরা দু'ভাই মাৎ করেছেন জুড়িতে ধ্রুপদ গান গেয়ে।

বারাণসীর এই মিশ্র ঘরাণা তালাধ্যায়ে ভারতের প্রায় শীর্ষস্থানীয় বলা যায়। মিশ্র ঘরাণার গায়ক বা বাদকদের মতন তাল ও লয়ের কাজে এমন প্রবীণ অতি অল্পই ছিলেন। শিবপশুপতিরও তাল লয়ে ছিল ভারতব্যাপী খ্যাতি এবং এ বিষয়ে তাঁরা নিজেরাও যথেষ্ট সচেতন আর গর্বিতও ছিলেন। অনেক আসরে তাঁরা তাল লয়ের কূট কৌশলে অনেক নামী সঙ্গতকারকেও করতেন ধরাশায়ী। সেদিক থেকে তাঁরা ছিলেন দুর্ধর্ষ ধ্রুপদী। তাঁদের সঙ্গে সঙ্গত করা এক মহা পরীক্ষার ব্যাপার হত সঙ্গতীদের পক্ষে।

তাই সেবার যখন ভারত সঙ্গীত সমাজে মিশ্র ভ্রাতাদের গানের কথা হ'ল, উদ্‌যোক্তারা চিন্তিত হলেন এই ভেবে যে, তাঁদের সঙ্গে পাখোয়াজ বাজাবেন কে? শেষে সাব্যস্ত হ'ল যে, দুর্লভচন্দ্র হ'লেই সব চেয়ে ভাল হয়। একেবারে শেষ দিনে, অর্থাৎ যেদিন আসর হবে সেদিনই সকালবেলা উদ্‌যোক্তারা বলতে গেলেন তাঁকে।

পথেই দেখা হ'ল তাঁর সঙ্গে। তিনি তখন নামাবলী গায়ে, মাথায় গামছা দিয়ে চলেছেন যজমানের বাড়ী। অনুরোধ শুনে বললেন, "আমি ত এখন পুজো করতে যাচ্ছি। অনেক বেলা পর্যন্ত উপোসে থাকব। আমার আজ না গেলেই ভাল হয়।"

"কিন্তু আপনি না গেলে চলবে না, ভট্‌চায্যি মশায়। এ আসর আর কে সামলাবেন?"

দুর্লভচন্দ্র শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন, যজমানের পুজো শেষে ফিরে ভারত সঙ্গীত সমাজে যাবেন।

সন্ধ্যার পর আসর আরম্ভ হল। পশুপতিসেবক এবং শিবসেবক পাগড়ি মাথায় দরবারী পোশাকে জুড়িতে গান আরম্ভ করলেন। তাঁদের সামনে চাদর গায়ে পাখোয়াজ কোলে নিয়ে বসেছেন দুর্লভচন্দ্র। মিশ্র ভ্রাতারা আগে কখনও তাঁর সঙ্গে গান করেন নি, তবে কলকাতায় আসা-

যাওয়া ছিল বলে তাঁর নাম শুনেছিলেন মাত্র। চাক্ষুষ এই প্রথম। তাঁদের সঙ্গে প্রথম বাজাতে গিয়ে কত পাখোয়াজী তাল লয়ের গভীর আবর্তে পড়ে দিশাহারা হয়েছেন। দুর্লভচন্দ্রকেও সেই অবস্থায় নিক্ষেপ করবার ইচ্ছা তাঁদের মনে ছিল কি না কে জানে!

আলাপচারী শেষ ক'রে শিবপশুপতি গান আরম্ভ করলেন। দুর্লভচন্দ্র সহজাত তালবোধ থেকে বুঝতে পারলেন—অতি কঠিন ব্যাপার। ধা মারা-ই দুর্ঘট! কারণ গায়করা সম পরিষ্কার ক'রে দেখাচ্ছেন না। তা' ছাড়া, কোথায় ছাড়ছেন, তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই!—যেখানে সেখানে তাঁরা ছেড়ে দিচ্ছেন—কখনো ৯ মাত্রায়, কখনো ১১ মাত্রায়। এটা রীতি না হলেও, হিসেবে তাঁদের ভুল ছিল না আদৌ। কারণ বেতালা তাঁরা হচ্ছিলেন না এবং লয়েও কোন গোলমাল নেই। দুর্লভচন্দ্রও অকাট্য হিসেবে ঠিক ঠিক জায়গায় ধা মারতে লাগলেন। আর গায়কদের মুখের দিকে চেয়ে প্রতিটি ধা মারবার পর জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, "কেয়া, ঠিক হুয়া?" হিন্দী শব্দ তাঁর ভাণ্ডারে বিশেষ থাকত না, সুতরাং একটি করে ধা মারেন আর ওই একই প্রশ্ন করেন। মিশ্ররাও ঘাড় নেড়ে জানান যে, ভুল হয় নি, ধা যথাস্থানেই পড়েছে।

এমনি ভাবে তাঁদের গানের সঙ্গে দুর্লভচন্দ্রের পাখোয়াজ চলতে লাগল। তাঁরা যে কোন মাত্রায় ছাড়ুন আর তাল লয় নিয়ে সার্কাস খেলোয়াড়ের মতন যত অসম্ভব কায়দাই দেখান, তিনি সঙ্গতে টললেন না। আসর সচকিত ক'রে সশব্দে তাঁর ধা পড়তে লাগল অব্যর্থভাবে। তারপর গান শেষ হতে গায়কদের উদ্দেশে তাঁর নিজস্ব হিন্দীতে বললেন, "অঙ্ক কষা হুয়া?"

(বলে, আর একটি কথা যা বললেন, তা লেখা যাবে না, কারণ এখনকার কালের বিচারে কথাটি অশ্লীল শোনাবে। অথচ সেকালে এমন দু'চারটে কথা কেউ কেউ সরল ভাবে বলতেন, তাতে দোষ হ'ত না। কালে কালে অন্যান্য জিনিষের মতন শ্লীল অশ্লীলের ধারণাও বদলে যায়।

সে যা হোক, কোল থেকে পাখোয়াজটি ফরাসের ওপর নামিয়ে রেখে তিনি বললেন, "এই কি গান গাওয়া? এমন করলে কি বাজাব? এই রইল বাজনা।"

তখন শিবপশুপতি বললেন, "সত্যি বলতে কি, আমরা আপনাকে পরীক্ষা করছিলাম। কিন্তু আপনি তাল লয়ে নিখুঁত। আমরা এখন ভাল ক'রে গাইছি। আপনি বাজান।"

তার পর সত্যিকার সঙ্গীত আরম্ভ হ'ল।



রায়বাড়ী

দ্বিতীয় পর্য্যায়

শ্রীগিরিবালা দেবী

নবীনা জানে না কভু প্রেমের চাতুরী
নবরাগে অনুরাগে নব নাগরী।
ওই যে কদম্বতলে দাঁড়াইয়া কুতুহলে
ছলে রাধা রাধা ব'লে বাজায় বাঁশরী।
কিবা শ্যাম বাঁকা ঠাম মোহন মুরলীধারী।
শুনে সে বাঁশরী-ধ্বনি এলোথেলো পাগলিনী
ধায় রাধা বিনোদিনী আপনা পাশরি।

হীরাসাগর নদীর ঘাটে নৌকা থামাইয়া প্রসাদ ও বিনু বাড়ী ঢুকিতেই বিনুর ন' ঠাকুরদাদার সামনে পড়িয়া গেল। তিনি সুবিখ্যাত গায়ক সুরশিল্পী। তাঁর বৈশিষ্ট্য স্নেহাস্পদদের বহুকাল পরে কাছে পাইলে সঙ্গীতের মধ্য দিয়া অভ্যর্থনা করা। এবং বিদায়-সম্ভাষণও অমৃতবর্ষী কণ্ঠের মধুবর্ষণে।

প্রণত প্রসাদ ও বিনুর মস্তকে স্নেহহস্ত স্থাপন করিয়া তিনি চারিদিক্ মুখর করিয়া তুলিলেন, "নবীনা জানে না কভু প্রেমের চাতুরী, নবরাগে অনুরাগে নব নাগরী।"

সেই অনির্ব্বচনীয় গানের তানে গোটা বাড়ী সচকিত হইয়া ছুটিয়া আসিল বিনুদের সাদরে বরণ করিয়া লইতে।

বাড়ী জনারণ্য, গম্‌গম্ করিতেছে। বিনুর ঠাকুরদাদার তিনি খুড়তুত ভাই ন'কর্ত্তা মেজকর্ত্তা ছোটকর্ত্তা ও তাঁদের ভাইপো সপরিবারে আসিয়াছেন। আর আসিয়াছে কর্ত্তা-গৃহিণীদের দাসদাসী, দোবে রমানাথ, শিউচরণ, খাস কলিকাতার ঝি মুখরা-প্রখরা বিধুমুখী, হরিদাসী। বিনুর বাবা কাকাও আসিয়াছেন। ইঁহাদের বিশেষত্ব, পূজায় একান্নবর্ত্তী পরিবারের সকলে একত্রিত হওয়া। চারিদিকে কল্‌কল্ খল্‌খল্। পাড়াটা যেন অবিরত নাগরদোলায় দুলিতেছে। গ্রামের লোক বলে 'রাবণের গোষ্ঠী, যদুবংশ।' এহেন মন্তব্য বিনুর ঠাকুমা বড়কর্ত্রী দুর্গাসুন্দরীর কানে যাওয়া মাত্র তিনি মনে মনে বলেন, "ষাট ষাট ষষ্ঠীর ধন।"

ন'কর্ত্তা, মেজকর্ত্তা ও বিনুর বাবা কাকারা কলিকাতা-প্রবাসী, প্রসাদও তাই। আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণে আদর-আপ্যায়নে ইহারই মধ্যে জামাতাকে তাঁরা ঘরের ছেলে করিয়া লইয়াছেন। আলাপ-আলোচনায় শিষ্টাচারে সপ্রতিভ ছেলেটির কোথায়ও বাধে না। জামাই-মেয়েকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছেন বিনুর ঠাকুরদাদারা; সন্ধ্যায় ফিরাইয়া দিবার কড়ারে।

বাহির মহলে বিজয়ার প্রণাম আলিঙ্গন আশীর্ব্বাদ শেষে অন্তঃপুর। সেখানে হাসি-কৌতুকের বন্যা বহিতে লাগিল।

ক্ষুদ্র গ্রামের আদরের, স্নেহের যে বালিকাটি গ্রাম ছাড়িয়া দূরে গিয়াছিল, তাহার আগমন-সংবাদ পাইয়া পাড়ার লোক একটির পরে একটি আসিতেছিল দেখা করিতে। কেউ সস্নেহে জিজ্ঞাসা করে, "বিনু, তুই এত রোগা হয়ে গেছিস্ কেন? জমিদার বাড়ীর জমিদারণী হয়ে পেট ভ'রে বুঝি ভাত খাস্ নে?"

কেহ শুধোয়, "শ্বশুরবাড়ী মধুর হাঁড়ি, তোর লাগছে কেমন রে?" বিনু চোখ তুলিয়া তাকায়, কথা বলে না। মুখচোরা বোবা প্রকৃতির বিনু কবেই বা কথা বলিয়াছিল?

জনতা কমিয়া গেলে ঠাকুমার দল প্রসাদকে কাছে বসাইয়া জলযোগ করাইলেন।

প্রসাদ চলিয়া গেল বাহিরে দাদাশ্বশুরদের দলে।

এবার বিনুর পালা। পূজাবাড়ীর যাবতীয় মুখরোচক খাদ্যদ্রব্য ঠাকুমা ও মা সঞ্চয় করিয়া খাটের নীচে ঢাকা দিয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন সযত্নে।

শয়নগৃহের মেঝেয় বিনুকে বসাইয়া ঠাকুমা ও মা বাহির করিলেন খাদ্যপূর্ণ বৃহৎ পাথরের থালা।

বিনু বলিল, "আমি এখন খেতে পারব না ঠাকুমা, ওখান থেকে লুচি মোহনভোগ খেয়ে এসেছি।"

চিরকালই মেয়ের সামনে খাবার ধরিয়া দিলে এক বুলি, "আমি এখন খাব না।" শ্বশুর ঘর করিয়া স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয় নাই। ঠাকুমা মনে মনে বিরক্ত হইলেন। নাতনী লইয়া তাঁহার এখন আহ্লাদ করিবার সময় নাই। তিনি এ সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। উঁহারা সকলে তাঁহার

কাছেই আসিয়াছেন। তাঁহাদের আহার বিহার শয়ন ভোজনের সমস্ত ভারই তাঁহার। তিনি বধূকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৌমা, আমার ত আর দাঁড়াবার সময় নেই। ওদিকে সৃষ্টি রসাতলে যাচ্ছে। বিনু যা খায়, খাইয়ে দিয়ে খাবারগুলো ঢেকে রাখ। পরে আবার খাইয়ে দিও।'' বলিতে বলিতে তিনি ব্যস্তসমস্ত হইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

এতক্ষণে মা ও মেয়ে নিভৃতে মুখোমুখী হইল।

মা মেয়ের সঙ্গে সঙ্গে থাকিলেও আধঘোমটায় মুখখানি ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন। এইবার ঘোমটা সরিয়া গেল।

বিনু পিপাসিত নয়নে তাকাইয়া রহিল সেই স্নেহ-মমতায় মণ্ডিত অপূর্ব্ব মুখের দিকে।

বিনু সরভাজা ভালবাসে। মা থালা হইতে বড় একখানা সরভাজা বাছিয়া লইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া মেয়ের মুখে দিতে দিতে স্নিগ্ধ কোমলস্বরে বলিলেন, "তুই বড্ড রোগা হয়ে গেছিস বিনু। রাগ করে না খেয়ে থাকিস, পাগলী! ব্রেজ রাজেশ্বরীর কাছ থেকে শুনে আমাকে সব বলেছে।"

বিনুর তখন সরভাজা খাওয়া শেষ হইয়া মুখে উঠিয়াছে ক্ষীরতক্তি। সে তক্তি চিবাইতে চিবাইতে দুঃখে অভিমানে উচ্ছ্বসিত হইয়া উত্তর করিল, "দিন-রাত বকুনি খেলে রাগ বুঝি হয় না, মা? তোমরা কত কাজ জানো, কত কাজ করো, আমাকে কেন কাজ শেখাও নি? আমি কিছু জানি না, পারি না বলেই না ওরা আমাকে যা-তা বলে।"

মায়ের দুই চোখ অশ্রুজলে ভরিয়া গেল। তিনি বিগলিতস্বরে বলিলেন, "সবাই কি সব কাজ শিখে যায় নাকি শ্বশুরবাড়ী? দেখে-শুনে ধীরে ধীরে শিখে নিতে হয়। তোর এক মা কাজ করতে দেয় নি, কাজ শেখায় নি, তাতে কি হয়েছে, বিনু? তোর সেখানকার মা'র কাছ থেকে তুই সব শিখে নিস্। তাঁকে আমার মতন করেই ভালবাসিস, সবাইকে ভালবাসিস। ভালবাসা না দিলে কি পাওয়া যায়, মা? অন্যায় করলে তোর ঠাকুমা কি আমাকে বকেন না? তাই বলে কি আমাকে ভালবাসেন না? দোষ ধরিয়ে না দিলে কেউ কি মানুষ হ'তে পারে রে? হ্যাঁরে বিনু, প্রসাদ তোকে কিছু বলে না?"

বিনুর লজ্জা-শরমের বালাই নাই। সে তক্তি শেষ করিয়া রাঘবসই মুখে পুরিয়া ঘাড় নাড়ে, "বলে না আবার, বলে লেখাপড়া শিখতে। শেষ রাতে বাড়ীশুদ্ধ সকলে ঘুম থেকে উঠে দাপাদাপি করে, আমাকেও তখুনি ঘুম ভাঙিয়ে তাদের কাছে পাঠিয়ে দেয়।"

"কাজের বাড়ীতে বৌ মানুষের কি শুয়ে ঘুমানো উচিত, বিনু? প্রসাদ আমার সোনার ছেলে, কি বুদ্ধি বিবেচনা। নিজে অত লেখাপড়া করেছে, সেই জন্যে শিক্ষার ওপরে ওর অত আগ্রহ।"

"আহা, ভারী লেখাপড়া করেছে, বুড়ো মদ্দ এতদিনে মাত্তর একটা পরীক্ষায় পাশ করে আর একটা পরীক্ষা দেবার পড়া করছে।"

"তুই জানিস্ নে বিনু, ওর বাবা-মা সহজে ওকে কাছ-ছাড়া করেন নি। এ অঞ্চলের উচ্চ প্রাইমারী, নিম্ন প্রাইমারী, ছাত্রবৃত্তি, আদ্য মধ্য সব পরীক্ষায় পাশ করিয়ে তবে না পাঠিয়েছেন বিদেশে ইংরেজি পড়তে। ও তোকে যা বলে তাই তোকে শুনতে হবে। আমার লক্ষী বিনু লেখাপড়া শিখে বড় হবে, তাতে আমার কত আনন্দ।"

বিনু মা'র আনন্দের প্রসঙ্গে আর অগ্রসর হইল না। তাহার ভাল লাগে না। শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হইয়া গিয়াছে। সহসা সে টের পাইল, চিরদিনের মত মা যেমন গল্পে গল্পে তাহার পেট ভরাইয়া দেন, এক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই

বিনু এক গেলাস জল এক চুমুকে নিঃশেষ করিয়া মায়ের কোলের কাছ হইতে উঠিয়া বলিল, "আমি আজ তোমার সাথে নদীতে চান করব মা, পুকুরে কিন্তু নয়। আমি একবার লালমণি-ধলোমণিদের দেখে আসি, তার পরে।"

মা সম্মতিসূচক মাথা নাড়িলেন।

পুকুরের দিকে বারান্দায় বসিয়া মেজকর্ত্রী রাধারাণী স্নানের পূর্ব্বে ঝি হরিদাসীকে দিয়া কাঁচা দুধে মুশুরীর ডাল বাদাম ইত্যাদি শিলে বাঁটাইয়া গায়ে মাখিয়া রূপচর্চ্চা করিতেছিলেন। রাধারাণী যেমন সুন্দরী তেমনি বিলাসিনী। তাঁহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে তিনি সুসজ্জিত এবং সুশোভন করিয়া লোকচক্ষের সম্মুখে ধরিতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তাঁহার রূপের যেমন গর্ব্ব ছিল, তেমনি বাক্যের ধার। তাঁহারা সকলেই ছিলেন শহরের মেয়ে,—বিনুর ঠাকুমা ও মা ভিন্ন। পল্লীবাসিনীদের প্রতি ছিল তাঁহার যেমন অবজ্ঞা তেমনি তাচ্ছিল্যবোধ।

এই সময় গৃহপালিত গাভীগুলিকে তাজা ঘাস খাওয়ানো হইত পুকুরের বিস্তীর্ণ চাতালায়। বারান্দার পাশ দিয়া পুকুরে যাইবার রাস্তা। বিনু চলিয়াছে, তাহার লালমণি-ধলোমণির সন্ধানে, তাহার সঙ্গী হইয়াছে বাঘা ও ভুলু কুকুর, দধিমুখী বিড়াল।

রাধারাণী ডাকিলেন, "ও বিনু, কোথায় চললি? গোচারণে নাকি? আয় একটু এদিকে, তোর শ্বশুরবাড়ীর গল্প শুনি। বড়লোকের বাড়ীর বৌ, তার এমন খড়কের মত চেহারা কেন? বিয়ের পরে মেয়েরা ফুলে ফেঁপে ঢোল হয়, তুই হয়েছিস দেশলাইয়ের কাঠি।"

হরিদাসী রাধারাণীর পায়ের পাতায় ঘষিয়া ঘষিয়া রূপ ডাল মাখাইতেছিল। সে কৃপাকটাক্ষে একবার বিনুর আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া সহাস্যে বলিল, "যা বলেছ মা, আমা-দের কল্‌কেতার একটা কথা আছে 'বিয়ের পরে বাড় কলা-গাছের ঝাড়'। তা সত্যি কথা কইতে কি, তোমাদের বাঙাল দেশের মেয়েদের যেন কোন ছিরিছাঁদ নেই। তোমাকে দিয়েই বলি মা, তোমার এতোখানি বয়েস হয়েছে, কি গড়ন পেটন! যেন ননী দিয়ে গড়া।"

ছোটকর্ত্রী সুরবালা রাধারাণীর পাশে বসিয়া চুলের বিনুনি খুলিতেছিলেন। তিনি মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে সায় দিলেন, "যা বলেছিস্ হরিদাসী। বাঙালদের আছে কি? 'বাঙালের সব বিটকেল, মরে যে তবু দাঁত সিঁটকেল।' ভাগ্যে এদেশে জন্ম নিই নি, তাহলেই গিয়েছিলাম। ছড়ায় যে আছে, "বাঙাল মনুষ্য নয়, উড়ে এক জন্তু, লাফ দিয়ে গাছে চড়ে লেজ নাই কিন্তু, সেটা মিছে কথা নয়।"

হরিদাসীর মুখে রাধারাণী রূপের ব্যাখ্যা শুনিয়া আনন্দে উচ্ছল হইয়াছিলেন। আনন্দের আতিশয্যে তিনি বলিতে লাগিলেন, "তোকে যে শাশুড়ী ননদরা অত খাটিয়ে মারে, তা বলতে পারিস্ নে প্রসাদকে? এমনি বললে কি হয়? বলার মত করে বলতে হয়—'আমি কি সজনি, কুসুমের মালা, বাসী হয়ে পথে পড়িয়া র'বো, কেন হাতে তোলা কেন পায়ে ঠেলা, আশা তো করি না আদর পাবো'।"

সুরবালা খিল খিল করিয়া হাসিতে লাগিলেন, ".মেজদির কথা শুনে আমি আর বাঁচি নে। যে মেয়ের মুখে সাত চড়ে রা নেই, সে-ই বলবে ওই কথা? আর বললেই প্রসাদই বা শুনবে কেন? অমন ঝকঝকে ছেলের মনভোলানোর মতো ওর না আছে রূপ, না আছে যৌবন।"

বিনু স্তব্ধ হইয়া তাহার আপন জনাদের প্রতি তাকাইয়া রহিল। জন্ম হইতে সে ইহাদের সান্নিধ্য লাভ করিয়াছে, নিরবচ্ছিন্ন ভাবে একত্রে বাস না করিলেও উৎসবে আনন্দে একত্রিত হইয়াছে। কিন্তু এতদিন বিনু ইহাদিগকে যেন চিনিতে পারে নাই। আজ তাহার সুপ্তপ্রকৃতি জাগরণ-উন্মুখ। অন্তর্দৃষ্টির সম্মুখ হইতে অজানা অচেনার কৃষ্ণ যবনিকা ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতেছে। ইঁহারা নাগরিকা সুসজ্জিতা সুপ্রশংসিতা, ইঁহাদের সহিত শিবসুন্দরী ভানুমতী সরস্বতীর প্রভেদ কোথায়?

বড় কর্ত্তার পিতৃমাতৃহীন ভাইপো-বৌ নলিনী দেবী বিগ্রহের নিত্যভোগশালার বারান্দায় ভোগের তরকারি কুটিতে বসিয়াছিলেন। তরকারি ফেলিয়া তিনি ত্বরিৎ পদে বিনুর নিকটে আসিলেন। স্নেহ-সুকোমল বাহু বাড়াইয়া বিনুকে বুকের কাছে জড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার জল খাওয়া হয়েছে, মা? এখন চান করবে না? এদিকে কোথায় যাচ্ছিলে, গোরু-বাছুর দেখতে? যাও, চট্ করে দেখা-শোনা সেরে নাও। তোমার পায়রাগুলো এখনো ফেরে নি, চরতে গেছে ধানের ক্ষেতে। আসবে আর খানিক বাদে, ঠিক দুপুর বেলায়।" বলিয়া নলিনী দেবী বিনুকে ঠেলিয়া দিলেন পুকুর-পাড়ের দিকে।

নলিনী দেবীকে এ বাড়ীতে রাঙা বৌ বলিয়া ডাকা হয়। বিনু ডাকে রাঙামা। রাঙা বৌ বলায় রাধারাণীর ভারী ক্ষোভ। এগৃহে রাঙা বৌ আখ্যা পাইবার তাঁরই একমাত্র যোগ্যতা আছে। তিনি হইলেন মেজোঠাকরুণ আর ওই শ্যামবর্ণের লম্বা কাঠ গড়নের মেয়েটা হইল রাঙা বৌ!

রাঙা বধূর প্রতি রাধারাণীর ঈর্ষ্যা ছিল প্রবল। তাঁরা এক বংশেরই মেয়ে। অশিক্ষায় অনাচারে তাঁহার পিতৃকুল রসাতলে তলাইয়া গিয়াছে। শিক্ষায় সংস্কৃতিতে এবং বিত্তে সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে নলিনীর পিতা ও ভ্রাতারা। শুধু তাই নয়, এ বংশের উজ্জ্বল রত্ন স্বরূপ ছেলেটিও নলিনীর করতলগত।

বিপুল জলরাশিতে টলমল্ পুকুর। দক্ষিণে ও বামে বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড। বর্ষাপুষ্ট নবীন দূর্ব্বাদলে আচ্ছাদিত। পয়পারে সারি সারি আমজাম কাঁঠাল তাল নারিকেলের গাছ। আর এক পারে কয়েক ঘর কাহার ও নমঃশূদ্রদের বসতি। জলের গা ছুঁইয়া কলমীলতা বিস্তার লাভ করিয়াছে। বেগুনী

কূলে ঢাকিয়া গিয়াছে সলিলসিক্ত আর্দ্র মৃত্তিকা। পরপারের স্বল্প জলে ফুটিয়া রহিয়াছে অজস্র সাঁপলা ফুল। ফুলরাশিকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে শ্যামল সবুজ পত্রসম্ভার। এ পারের স্নান ও বাসন মাজার ঘাটে সাঁপলা ফুল নাই কিন্তু সবুজ শৈবাল ও জলজ ঘাসের ছোট ছোট নীল ফুলে আবৃত। স্বচ্ছ জল। বাঁশের খুঁটির সহিত লম্বা দড়ি বাঁধিয়া চরিতে দেওয়া হইয়াছে গরু-বাছুরদের।

বিনু উল্লাস ভরে ডাকিল, "লালমণি, ধলি, বুধি, ঘাস খাওয়া রেখে চেয়ে দেখ্, তোদের কাছে কে এসেছে?"

অনুভূতি-সম্পন্ন জীবগুলি সেই চিরপরিচিত কণ্ঠস্বরে সচকিত হইয়া আহার ভুলিয়া গেল। বিশাল চোখ মেলিয়া লেজ নাড়িতে নাড়িতে ছুটিয়া আসিল।

ইহার পরে গাত্রলেহন, আদরের আশায় গলা বাড়াইয়া দেওয়া। বিনুর ছোট ভাইবোন ছিল না। জীব-জন্তুদের মধ্যেই সে তাহার স্নেহ সোহাগ বিলাইয়া দিয়াছিল, তাই দুই হাতে গরুবাছুরদের কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ঝড় বহিয়া গেল আদর সোহাগের। মানুষের মাঝখানে যে কণ্ঠ নির্ব্বাক্, সেই কণ্ঠ মুখর হয় পশুর নিকটে।

রাঙ্গা বধূ অদূরে দাঁড়াইয়া বন্য প্রকৃতির মেয়েটির জীব-প্রীতিতে সকৌতুকে হাসিতেছিলেন। মনে মনে ভাবিতেছিলেন, এমন মেয়েকে এঁরা কেন বিয়ে দিলেন? ওর মন প্রাণ যে নিদ্রায় মগ্ন। ওর ঘুম ভাঙ্গার প্রতীক্ষা করিল না কেউ। তাঁহার শিক্ষায় উন্নত উদার হৃদয়ে বন্য বালিকার প্রতি করুণার প্রবাহ বহিয়া গেল। এমনি করিয়াই ত বাংলা দেশের মেয়েদের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখা হয়। সেইজন্যই 'না ফুটিতে ফুল ঝরিয়া পড়ে আশার মুকুল'।

মা সারা বাড়ীতে অন্বেষণ করিয়া মেয়েকে আবিষ্কার করিলেন রন্ধনশালার পেছনে ঝোপের ভিতরে। এদিক্টাতেও ফলবান্ বৃক্ষের অন্ত নাই। জামরুল বাতাবী কাগজী লেবু পেয়ারা আতা নোনা কুল বেল লিচু করমচা শাখা-প্রশাখা মেলিয়া এক নিবিড় কুঞ্জকানন রচনা করিয়া রাখিয়াছে। বর্ষার আগাছার জঙ্গলে ভরিয়া গিয়াছে তরুতল। ছিদ্রশূন্য আলোকবিহীন সেই জমাটবাঁধা ঘন অরণ্যে বিনু খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল টুনটুনি পাখী। সে এখান হইতে যাইবার সময় দেখিয়া গিয়াছিল, ডুমুর গাছের দুইটি বড় বড় পাতা জুড়িয়া টুনটুনি বাসা নির্ম্মাণ করিয়া চারিটা ডিম প্রসব করিয়াছে। সেই ডিম হইতে বাচ্চারা বাহির হইয়া কত বড় হইয়াছে? কোথায় গিয়াছে? বিনু অবোধ বুদ্ধিহীনা, তাই বনের পাখীকে বৃথা অন্বেষণ করিতেছে।

মা বিনুর হাত ধরিয়া সেই গহন বন হইতে টানিয়া বাহির করিয়া আনিলেন।

তারপর মৃদু তিরস্কার সুরু হইল; "তোর যে দস্যিপনা একরত্তিও কমে নি বিনু, ওই যম যাঁতায় মানুষ ঢোকে? সেখানে সাপের আস্তানা। কতকাল পরে একটা বেলার জন্যে এসেছিস্, না যাচ্ছিস কারো কাছে, না বলছিস দুটো কথা। জামাই রয়েছে সাথে তাতেও সমীহ নেই। ঝোপে-ঝাড়ে ধেই ধেই করে নেচে বেড়াচ্ছিস? আমাকে এক্ষুণি ঢুকতে হবে রান্নাঘরে, রাজ্যের মাছ এসে পড়বে। তখন বলেছিলি আমার সাথে নদীতে স্নান করবি। চল্, তেল মাখিয়ে চট্ করে স্নান করিয়ে নিয়ে আসি।"

বিনু মায়ের সাথে বাড়ীর ভিতরে ঢুকিতে ঢুকিতে নরম গলায় বলিল, "আমি কি এমনি ঢুকেছিলাম জঙ্গলে? এখান থেকে ওখানে যাবার সময় ডুমুর গাছের পাতার বাসায় টুনটুনি পাখীর চারটে ডিম দেখে গিয়েছিলাম। দেখতে গিয়েছিলাম বাচ্চা ক'টা এখন কত বড় হয়েছে, কেমন হয়েছে। খুঁজে পেলাম না তাদের।"

"বনের পাখী কি মানুষের মতন, যে এক জায়গায় ঘর বেঁধে বাস করবে? তারা বড় হয়ে উড়ে গেছে কোন্ মুলুকে। তোকে নিয়ে আমার কত জ্বালা। জ্বালার ওপরে বিষম জ্বালা পরের ঘরে পাঠিয়ে।"

মার স্বরে যেন কি একটা প্রচ্ছন্ন বিষাদ ঝরিয়া পড়িতেছিল। সেইটুকু স্পর্শ করিল বিনুর অন্তর। সহসা সে বিমনা হইয়া গেল। চুলে তেল মাখাইতে লইয়া মার চক্ষুস্থির। এ কি মানুষের চুল না শিবের জটা? না আছে তেলের লেশ, না আছে চিরুণীর চিহ্ন। মায়ের অনুযোগ অভিযোগের উত্তরে বিনু অবিচলিত স্বরে বলিল, "আমি কোন জন্মে নিজে মাথায় তেল মেখেছি, চুল বেঁধেছি যে পারব? তোমরা আমাকে যা শেখাও নি; তা আমি পারব না।"

নদীর সঙ্কীর্ণ বন-পথের গায়ে ঘোষপাড়া। সতীশ

ঘোষের স্ত্রী সুনীতি বিন্নুকে খুব ভালবাসে। বিনু তাকে দিদি বলে। গোপ-কন্যার সরল উদার ব্যবহারে গোটা গ্রামখানা যেন মন্ত্রমুগ্ধ। সুনীতিকে সকলে বলে বিরাট-রাজকন্যা। এই জেলারই এক বন্দর গ্রামে সুনীতির পিতার বৃহৎ গোশালা। সেখানে হাজারের উপরে দুগ্ধবতী গাভী থাকে। পাঁচকুড়ি দাসদাসী নাকি সেবা করে গরু-বাছুরের। মস্ত ব্যবসা; দেশদেশান্তরে লেনদেন। সুনীতির শ্বশুরেরও আছে দই দুধ ঘৃতের ব্যবসা। তার স্বামী কিন্তু গোপবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া ওভারসীয়ারি করে বিদেশে। মাঝে মাঝে বাড়ীতে আসে।

গোপবধূটি যেমন কোমলহৃদয়া, তেমনি সেবাপরায়ণা। পাড়ায় ঘরে ঘরে রোগীর সেবা করিয়া বেড়ায়। দুঃখী কাঙালকে ঘরে ডাকিয়া পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করায়। মুক্তহস্তে দান করে অভাবগ্রস্তকে। শ্বশুর-শাশুড়ী কোন কাজে বধূকে বাধা দেন না। দিবার সাহসও বুঝি নাই। কারণ অবিরত বিরাট রাজ্য হইতে ভারে ভারে জিনিষ আসে। ঘর ভরিয়া যায়।

সুনীতি বিনুকে পথে দেখিয়া ছুটিয়া বাহির হইল। ব্যগ্র বাহু দু'টি মেলিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "আমার আলস্যের গঙ্গা কাছে এসেছে। তোরা এসেছিস্ শুনে আমি এক্ষুণি যাচ্ছিলাম তোদের কাছে। কাল রাতে বাবা পাঠিয়ে দিয়েছেন দই ক্ষীর ছানা মাখন। ভাল দিনেই তোরা এসেছিস। তুই ভাল আছিস বিনু? জামাই কেমন আছেন?"

বিনুর মা উত্তর, দিলেন "ভাল আছে। আজকের বেলাটুকুর জন্য অনেক বলে ক'য়ে ওদের আনা হয়েছে। সন্ধ্যাবেলাই চলে যাবে। তুমি আমাদের ওখানে যেতে চাইছিলে সুনীতি, আমরা চান করে ফেরার সময় তোমাকে নিয়ে যাব।"

সুনীতি বলিল, "না মা; আমি এখন বাড়ী থাকব না। এ পাড়ায় ও পাড়ায় আমাকে ঘুরতে হবে খানিকটা। দেরি হ'লে দই টকে যাবে, ছানায় গন্ধ হবে। আমি বিকেলে যাব প্রসাদবাবুকে দেখতে। দেখ্ বিনু! আমি যা পাঠিয়ে দেব তা কিন্তু খাস্ তোরা।"

"তোমার দেওয়া জিনিষ কবে কে না খায় মা? ওরা খাবে বৈকি। তুমি যে এ গাঁয়ের যশোদা, মা।" বলিয়া বিনুর হাত ধরিয়া মা নদীর দিকে অগ্রসর হইলেন।

বিপুল সলিলভারে হীরাসাগর উছলিত উচ্ছ্বসিত। জলের ধারা তটভূমি ছাড়িয়া নিম্নে প্রবাহিত। তটের কোল ঘেঁষিয়া কাশের শ্রেণী রেখাকারে সন্নিবেশিত।

কাশের স্তবকে স্তবকে শুভ্র পুষ্প বাতাসে দুলিতেছে, নাচিতেছে। পরপারে হৈমন্তিক পাকা ধান সোনার বরণে সাজিয়া ঝকমক্ করিতেছে। এবার ধান কাটার সময় হইয়াছে। কোথাও বা হরিদ্বর্ণের শস্যক্ষেত্র হলুদ শাড়ী বিছাইয়া রাখিয়াছে। মেঘমুক্ত নীলাকাশ হইতে শরতের সোনা-গলানো রৌদ্র অনুরঞ্জিত করিতেছে সোনার ধানের গায়, সোনার সরিষা ফুল। ভরা নদীর ঘোলা জল। জলচর পাখীদের কলরবে নদীর কুলকুল তানে চারিদিক্ মুখরিত। ধান কাটিতে চাষীর দল কেহ কেহ নৌকা লইয়া বাহির হইয়াছে। দাঁড়ের ছলাৎ ছলাৎ শব্দের সহিত তাহাদের সম্মিলিত মেঠো সুর ভাসিয়া আসিতেছে— "আরসী দিচি চিরণ দিচি চুল বাঁধনের ফিত্তা দিচি আর কি দেওন যায়? বাজার শুদ্ধা ঢালি আনি, দিইচি তোর পায়।"

বিনু গলা জলে দাঁড়াইয়া অনিমেষে চাহিয়া চাহিয়া দেখে চারিদিকে। না, সে চিরন্তন অনবদ্য অনির্ব্বচনীয় পল্লী-প্রকৃতির নয়ন ভুলানো অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের কোথাও পরিবর্ত্তন হয় নাই। সেই তরুলতা, ফুল-ফল, সেই বিহগকূজিত বনতল। ধেনুর পশ্চাতে রাখাল বালক। ভরা কলসী কক্ষে কৃষক-বধূ। সেই হাসি, সেই গান।

মা তাড়া দেন, "বিনু, এখন উঠে আয়। বর্ষার নতুন জলে অতক্ষণ থাকতে নেই। তোর আবার পুকুরের বদ্ধ জলে স্নানের অভ্যাস হয়েছে। জ্বর আসতে পারে।"

বিনু জল হইতে উঠবে কি? জল যে তাহাকে ছাড়িতে চায় না। চঞ্চল অশান্ত ঢেউগুলি একটির পর একটি সবেগে ছুটিয়া আসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে তাহার পিঠে গায়ে মাথায়। তারা কানে কানে কলকল করিয়া বলে, "বিনু, আয়, আয়। আরও গভীরে, আরও অতলে আয়।"

এসে ঘাটে দর্শন দিলেন গাঁ-সম্পর্কে বিনুর কাকীমা, জ্যেঠাইমা, ঠানদিদি, সম-বয়স্কা সখী-স্থানীয়া ঘোষেদের বৃন্দা, লাহিড়ীদের চারু, দত্তদের নিস্তারিণী। তাহারা এখনো কুমারী বিনুর প্রতি ঈষৎ ঈর্ষ্যান্বিতা। তবু তারা কুশলপ্রশ্ন করে। সাদর সম্ভাষণ জানায়। মা বিনুর হইয়া সকলের

কথার জবাব দেন। বিন্নু গলা-জলে দাঁড়াইয়া হাসে। সকলে ধরিয়া লয়, নববধূ-সুলভ লজ্জায় সে কথা কহিতে পারিতেছে না। বর সঙ্গে আসিয়াছে তাই লজ্জাবতীর নিদারুণ লজ্জা।

জল বিন্নুকে ছাড়িতে না চাহিলেও মা তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন না। তাঁর সময়ের অভাব। গৃহে বিপুল সমারোহ। মেয়ের জলখেলায় তিনি আবদ্ধ থাকিতে পারেন না।

স্নানান্তে বিন্নু ঘরে ফিরিয়া দেখিল, রায়বাড়ীর কোলাহল ছাপাইয়া এখানে যেন যদুবংশের শঙ্খ ঘন্টা বাজিতেছে। ইতিমধ্যে বিরাটতনয়া পাঠাইয়া দিয়াছে দই, ক্ষীর, ছানা ও ঘি-এর চাঁছি। কর্ত্রীরা কি দিয়া কি করিবেন তাহারই গবেষণা চলিতেছে।

মা মেয়ের সর্ব্বাঙ্গ জলে ভাসা আস্ত একখানা সাবানে ঘষিয়া মাজ্জিত করিয়া আনিয়াছিলেন। এখন চুল আঁচড়াইয়া সিঁদুর পরাইয়া ডুরে শাড়ীতে তাহাকে সাজাইয়া দিলেন। ফের তাহার মুখে দেওয়া হইল সেই আহারের থালার দুই-একটি বস্তু। মাকে আবার শুনিতে হইল, "আমি এখন খাব না, খেতে পারব না।"

রন্ধন-শালায় আসন লইয়াছেন ন'কর্ত্রী সারদাসুন্দরী। তাহাকে বড়কর্ত্তা "দশভুজা মা বলেন। সুরের রাজা সদানন্দ প্রকৃতির যেমন স্বামী, তেমনি তাঁহার সহধর্ম্মিণী সারদাসুন্দরী আপন পর-ভেদ-জ্ঞানরহিত আলস্যশূন্য। নিজেদের সন্তান নাই, কিন্তু বিশ্বের সকল সন্তানই তাঁহার সন্তানের শূন্যস্থান পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। তাদের স্নেহ দিয়াই তাঁর মাতৃ-হৃদয় পরিতৃপ্ত পূর্ণ। ঘরে পরে বাহিরে ভিতরে সকলেরই তিনি বড়মা।

স্নানের পর কর্ত্রীরা এক-একটা ভার স্কন্ধে লইয়াছেন। বড় গৃহিণী বরাবরই গৃহ-প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের সেবা লইয়া থাকেন। তিনি ভোগ চড়াইয়াছেন, তাঁর ফাই-ফরমাস খাটিতেছে রাঙ্গাবৌ নলিনী। বিন্নুর মা হেমাঙ্গিনী মেয়ের পরিচর্য্যা শেষে বৃহৎ রন্ধনশালায় বড়মার সহকারিণী হইয়াছেন। সে কি রান্না, স্তূপ স্তূপ মাছের কাঁড়ি!

ছোটকর্ত্রী সুরবালা কোনদিনই পরিশ্রমের কাজ করিতে পারেন না। রান্নাঘরের ধোঁয়ায় গেলে তাঁহার মাথা ধরে, চোখ জ্বালা করে। তিনি বিধুমুখী ঝিকে লইয়া বসিয়া গিয়াছেন পুবের ঘরে পান সাজিতে। এ বাড়ীর কর্ত্তাদের পানের বিলাস কম নয়। কেয়া খয়েরের সহিত চুন সংযুক্ত করিতে ঝিরা ভাল পারে না। ছোটকর্ত্রীর পান সাজিবার হাতটি ভারি মিঠে। এই প্রশংসায় উৎসাহিত হইয়া তিনি প্রতিদিনই পান লইয়া বসিয়া যান।

মেজকর্ত্রীর স্নানের পরে খানিকটা সময় অতিবাহিত হয় প্রসাধনে। প্রসাধন শেষ করিয়া তিনি উপস্থিত হইলেন রান্নাঘরে। তাঁহার পরিধানে পাটভাঙ্গা শান্তিপুরী শাড়ী ও জামা। গৌরমুখ সাদা প্রলেপে শুভ্র। আলবার্ট ফ্যাসানের চুল শিং-এর আকারে ললাটের দুই পাশে উদ্ধত হইয়া রহিয়াছে। সর্ব্বাঙ্গে নূতন পালিশ করা সোনার গহনা ঝিক্-মিক্ করিতেছে। পরিধেয় হইতে আতরের সৌরভ ভুর-ভুর করিতেছে।

রাধারাণী সারদাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দোবেকে চান করিয়ে আনলাম। তাকে তুমি হেঁসেলে ঢুকতে দিলে না কেন ন'দিদি? এক কাঁড়ি রেলভাড়া দিয়ে তাকে আনা হ'ল কি বসিয়ে রাখবার জন্যে?"

অগ্নির উত্তাপে আরক্তমুখী ন'দিদি উত্তর দিলেন, "এ তোমার কলকাতার রান্না-বাড়া নয় রাধু। এ মৎস্য দেশের মাছ রান্না, তোমার ক্যা হুয়া দোবের পোবের কর্ম্ম নয়। পারবে না, সকলের সাধের জিনিষ নষ্ট ক'রে ফেলবে।"

"তোমরা কাছে থেকে দেখিয়ে দাও, ডাল ভাত তরকারি রাঁধতে দাও। তা হলেও যে অনেক মেহনত বাঁচে ন'দিদি?"

"সকলকে রান্না করে খেতে দেব তাতে মেহনত কিসের রাধু? সবাই ভালবাসে আমার হাতের রান্না খেতে। আমিও একলা রাঁধছি না, হেমা সাথে রয়েছে। হেমার হাতের রান্নাও চমৎকার। ভাতের কথা আলাদা, ডাল তরকারি দোবে রাঁধবে কি? এখানে ডালেও মাছের মুড়ো, তরকারিতেও মাছের কাঁটা। দোবের সাধ্যি নেই তার স্বাদ করে। এবার কতদিন পরে দেশে এসেছি। বড় ঠাকুরকে রান্না করে খাওয়াই। তিনি আমার হাতে খেতে বড্ড ভালবাসেন।"

"তুমি ভারী তোষামুদে ন'দিদি। বঠ্ঠাকুর তোমাকে 'দশভুজা মা' বলেন, সেই আহ্লাদেই তুমি আটখানা। হেমা চমৎকার রাঁধবে না কেন? বার মাস তিরিশ দিন এক-টানা হাঁড়ি ঠেললে অরাঁধুনীও রাঁধুনী হয়।"

বড়মা বিরক্ত হলেন, "তুই কি বলছিস্ রাধু, জন্মে শ্বশুর-

শাশুড়ীকে দেখি নি, ন'বছরের মেয়েকে যে ভাসুরজা আদর করে ঘরে এনেছিলেন। আর যাই হোন, তাঁরা তোষামুদে নন। থাকুক ওসব কথা, তুই না তখন ক্ষীর ছানা দেখে পানতোয়া না ছানার বড়া কি তৈরী করতে চেয়েছিলি? করবি কখন? বেলা ঢের হয়েছে।"

"কোথায় খাবার তৈরী করতে বসি? বারান্দার উনুনে নাকি? তোমাদের ভাঁড়ারে ঘি-ময়দা কি কি আছে? শুধু পানতোয়া না করে গজা বালুসাই করিগে। জামাই মেয়ে এসেছে, এটুকু-সেটুকু ত তাদের বিকেলে জল খেতে দিতে হবে?"

"তোর যা দরকার দিদির কাছ থেকে চেয়ে নেগে। পুজো সবে বেরিয়েছে, এখনো ভাঁড়ার খালি হয় নি। আমার একটা কথা, যা করবি আমার সাতগোষ্ঠীর পাতে যেন পড়ে। কেউ খেলো না, কেউ পেলো না, ও আমি ভালবাসি নে। বারান্দার একটা উনুনে তোর চলবে কি করে? চিনির রস করতে হবে, ভাজাভুজি করতে হবে। পুজোর সময় ভোগ রান্না হয়, সেইখানে তোর দোবে চোবে হরিদাসী বিধুমুখী সাঙ্গ পাঙ্গ নিয়ে যা। মস্ত জায়গায় উনুন পাবি সারি সারি।"

রাধারাণী বিনা বাক্যব্যয়ে প্রস্থান করিলেন বড় গৃহিণীর উদ্দেশে।

পল্লীগ্রামের শাকশুক্তো ঘণ্টমণ্ট রন্ধনের প্রতি তাঁহার তেমন আগ্রহ ছিল না। তিনি নানাবিধ মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে অতিশয় পারদর্শিনী ছিলেন। যেমন সৌখিন প্রকৃতির মানুষ তেমনি সৌখিন খাদ্যবস্তুতে অনুরাগ।

দ্বিপ্রহর বেলা প্রায় সমাগত। কর্ম্মের রথের চাকা চঞ্চল গতিতে ধাবিত হইতেছে চারিদিকে। ব্যস্ততার সীমা নাই। এই কর্ম্মচাঞ্চল্য যেমন রায়বাড়ীতে তেমনি অ-রায়বাড়ীতে, কোথায়ও ইহার বিরতি নাই।

বিনু তাদের শোবার ঘরের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া খাটের তলা হইতে তাহার টিনের পুতুলের ছোট বাক্সটা টানিয়া বাহির করিল। গত বছর রথের মেলা হইতে ফুল লতাপাতা-আঁকা টিনের বাক্সটা তাহার ঠাকুরদাদা কিনিয়া দিয়াছিলেন। ছেঁড়া শাড়ীর পাড় জোড়া দিয়া মা বাক্সের একটা ঢাকনা সেলাই করিয়া দিয়াছিলেন।

বাক্সের ডালা খুলিয়া বিনু অনিমেষে তাকাইয়া রহিল পুতুলগুলির পানে। সে যেমন অচেতন বস্তুদের রাখিয়া গিয়াছিল, তাহারা তেমনি লাল নীল বসনে পুঁতির মালা মতির মালায় শোভন হইয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছে। কাঁচের ও কড়ির পুতুলের কোথায়ও পরিবর্ত্তন হয় নাই। পরিবর্ত্তনশীলতা চেতন পদার্থের।

প্রত্যেকটি পুতুল সস্নেহে নাড়িয়া-চাড়িয়া বিনু পুনরায় রাখিয়া দিল সযত্নে যথাস্থানে। ইহারা আরামে ঘুমাইয়া থাকুক। মহাশান্তিতে মগ্ন হইয়া থাকুক। ইহার পরে যে আসিয়া বসিবে বিনুর পরিত্যক্ত আসনে, সেই ইহাদের সজ্জিত করিবে অভিনব বেশে আদরের পরশ দিয়া।

পুতুলের বাক্স রাখিয়া বিনু উপনীত হইল কামিনী ফুলের গাছের পাশে পায়রার কাঠের খোপের কাছে।

পায়রারা ধানক্ষেত থেকে সবে ফেরা আরম্ভ করিয়াছে। তারা পেট পুরিয়া ধান খাইয়া আসিয়াছে। এখন মাটির প্রকাণ্ড গামলা হইতে জলপান করিবে। স্নান করিয়া খোপে ঢুকিয়া কামিনী-তরুতল ঝঙ্কৃত করিয়া তুলিবে "বক বক কু বক বক কু"।

বিনু ডাকিতে লাগিল "ও লোটন, চাঁদকপালি, তিলক মণি, আয়, আয়, দেখ্ তোদের কাছে কে এসেছে?"

দুই-একটা পায়রা উড়িয়া আসিয়া বিনুর মাথায় বসিল, হাতে বসিল। বাকীগুলি ঢুকিয়া গেল খোপে।

পায়রাদের সহিত সাক্ষাৎ হইল, এখন টুনি পাখীর সেই বাচ্চা চারটি। যাহাদের ডিম অবস্থায় সে এখান হইতে বিদায় লইয়াছিল। না জানি তাহারা কত বড় হইয়াছে? ঠুকরাইয়া খাইতে শিখিয়াছে। তাহাদের চিনিয়া লইতে তাহার বিলম্ব হইবে না। সে জানে যে-পাখীদের গায়ে মসৃণ নূতন পালক, রাঙা ঠোঁট, উদাস আঁখির ভঙ্গিমা, তাহারাই বাচ্চা।

এ বাড়ীর বাহিরের দিকে বাড়ীতে প্রবেশপথের দুই দিকে কুলের বাগান। মেজকর্ত্রীর একমাত্র সন্তান নন্দলাল দেশে আসিলে ইহার তত্ত্বাবধানে মাতিয়া থাকে। সেখানে পাখীরা তেমন যায় না। ভিতর বাড়ীতে কুলের গাছে আগাছার জঙ্গলেই তাদের বাসভূমি।

পুকুরের দিকের আম বাগানটায় কর্ত্তা গৃহিণীর আদরের বাছা বাছা আমবৃক্ষ সন্নিবেশিত।

বিনু চলিল সেই আম্রকুঞ্জে। সামনেই সিঁদুরে আমের

বিরাট্ বৃক্ষ। তাহার বৃহৎ কাণ্ড ভেদ করিয়া আম্রগুলঞ্চের থোকা থোকা ফুল ফুটিয়াছে। আম্রগুলঞ্চ নাকি মহৌষধ। কি কি রোগের ঔষধ বিনু তাহা জানে না। পাতা দেখা যায় না, কিন্তু ফুলের কি বাহার খুলিয়াছে। কত বর্ণ, কত শোভা। ক্ষণেক দাঁড়াইয়া বিনু মুগ্ধনেত্রে ফুলগুলি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। শুধু কি আম্রগুলঞ্চ, পায়ের যে নীচে মাটি ফাটিয়া থলো থলো ভূমি-চাঁপা ফুটিয়া বনতল আলো করিয়া রাখিয়াছে। ভূমি-চাঁপা বড় সুকুমার, রৌদ্রের স্পর্শ সহিতে পারে না। যদিও নিবিড় আম্রকাননে রৌদ্ররশ্মি প্রবেশ করিতে পারে না, তবুও বৃক্ষশিরের তপন তাপে পুষ্পগুলি ইহারই মধ্যে ম্লান হইয়া আসিতেছে।

বিনু ধীরে অগ্রসর হইল। বর্ণচোরা ঝাঁকড়া আমগাছের ডালে লুকাইয়া ঝুঁটিমাথায় দধিলোচন পাখা শিষ দিতেছে। ওই যে ঘন পল্লবে পরিবেষ্টিত বাঁকা শাখায় নীড় দেখা যাইতেছে। নীড়ে নিশ্চয় ডিম আছে; নহিলে জোড়ার অন্য পাখীটা উড়িয়া গেল কোথায়?

মুহূর্ত্তে বিনু তাহার ডুরে শাড়ীর অঞ্চল জড়াইয়া লইল কোমরে। ঝাঁকড়া গাছ শাখা-প্রশাখায় বিজড়িত। আরোহণ করিতে অসুবিধা নাই।

বিনুকে নিকটস্থ হইতে দেখিয়া ঝুঁটিবাঁধা পাখীটা উড়িয়া গেল ফুড়ুৎ করিয়া। নীড় রচনা হইয়াছে। কিন্তু এখনও তাহাতে ডিম হয় নাই।

"ঠাকুজ্জি, গাছে চইড়্যা বসে রইচো? ওহানে সিনানে যাইয়া তোমার সোয়ামী যে চাইয়া চাইয়া দেখতে নাগছে?" বালিকা পেমো ঝি তাহার মায়ের সহিত পুকুরে বাসন মাজিতে বসিয়াছিল। প্রসাদ পুকুরে নামিয়াছে স্নান করিতে। তাহার দৃষ্টির অনুসরণ করিয়া মেয়েটা ছুটিয়া আসিয়াছে বিনুকে সাবধান করিতে। বিনুর বুকের ভিতর ঢিব ঢিব করিতে লাগিল. হাত-পা যেন শিথিল হইয়া আসিল। মনে পড়িল, রায়বাড়ীর পুকুরে লবঙ্গের সহিত সাঁতারের কাহিনী। সেদিন সেই অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে রায়নন্দিনীরা যে মধু বর্ষণ করিয়াছিল, হৃদয় হইতে সে ক্ষতচিহ্ন এখনো নিঃশেষে মুছিয়া যায় নাই। রায়নন্দনের উপস্থিতিতে এখন আবার সে এ কি বিপর্য্যয় কাণ্ড করিয়া বসিল! তাহার কি জ্ঞানবুদ্ধি হইবে না? সে কি মানুষ হইবে না?

বিনু তখনও গাছ হইতে নামিতে চেষ্টা করিল না। পাতার ফাঁক দিয়া তাকাইয়া রহিল প্রসাদের দিকে। না, বিনুর বর রাগ করেন নাই। তাঁর প্রশান্ত নয়ন হইতে কৌতুকের প্রসন্ন হাসি ঝরিয়া পড়িতেছে।

রায়বাড়ীর দাসী রাজেশ্বরীর ভগিনী ব্রজেশ্বরী এখানকার পুরাতন দাসী। সে পুদিনা শাকের চাটনির জন্যে লেবুর পাতা লইতে আসিয়া আশ্চর্য্য। "মাগো, এ কি কাণ্ড-কারখানা! বর পুকুরের জলে, বৌ আমগাছে। এমন মেয়ের আবার বিয়ে? শ্বশুরবাড়ী?"

ক্রমশঃ

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

শ্রীসুধাময়ী মুখোপাধ্যায়

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হচ্ছে এ বৎসর। দেশবাসীকে তিনি এক সময় কবিতায়, গানে, নাট্যে, রস-রচনায় যা দিয়ে গেছেন, তা প্রায় ভুলতে বসেছিল এ যুগের মানুষ। তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে যে আবার তাঁর জীবন ও সাহিত্য আলোচনার সুযোগ এসেছে—তা গ্রহণ ক'রে, আমরা এখানে সংক্ষেপে তাঁর জীবনী ও সাহিত্যের কথা—বিশেষভাবে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা বলছি।

দ্বিজেন্দ্রলালের জন্ম হয় ১৮৬৩ সালের ১৯শে জুলাই (১২৭০ সালের ৪ঠা শ্রাবণ) কৃষ্ণনগরে। তাঁর বাবা কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় ছিলেন কৃষ্ণনগরের মহারাজার দেওয়ান।

ছাত্রাবস্থায় দ্বিজেন্দ্রলালের খ্যাতি ছিল তীক্ষ্ণ মেধার জন্য; কিন্তু প্রায় তিনি রোগাক্রান্ত হওয়ায় তাঁর পড়াশুনায় ব্যাঘাত ঘটত। এম. এ. পরীক্ষা যে বৎসর দেন, সে বৎসর ম্যালেরিয়ায় শয্যাশায়ী হ'তে হয় তাঁকে। ১৮৮৪ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে তিনি ইংরেজীতে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন কৃতিত্বের সঙ্গে।

ঐ বৎসরই কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য তিনি বিলাত যান। সেখানে ইংরেজী কবিতা কয়েকটি লেখেন। সেগুলি Lyrics of Ind নামে প্রকাশিত হয়।

১৮৮৭ সালের এপ্রিল মাসে তাঁর বিবাহ হয় কলিকাতার বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের কন্যা সুরবালা দেবীর সঙ্গে। বিলাত-ফেরতদের তখন সমাজে একঘরে হ'তে হ'ত; তাঁকেও এ অসুবিধা ভোগ করতে হয়। এই ব্যাপার নিয়ে তিনি 'একঘরে' নাম দিয়ে একটি বিদ্রূপাত্মক নক্সা লেখেন। এতে হিন্দুসমাজকে আক্রমণ করায় তাঁকে নিন্দা সহ্য করতে হয়। কিন্তু স্বর্ণকুমারী দেবী সম্পাদিত 'ভারতী ও বালক' পত্রিকায় (১২৯৭ ভাদ্রে) এই নক্সাখানির প্রশংসা বাহির হয়।

স্পষ্টবাদিতার জন্য দ্বিজেন্দ্রলালের সরকারী চাকরিতে তেমন উন্নতি হয় নি। যে কৃষিবিদ্যার ডিপ্লোমা নিয়ে তিনি বিলাত থেকে ফেরেন, তা প্রয়োগ করার সুযোগ তেমন তিনি পান নি। তাঁকে অনেকদিন সেট্‌ল্‌মেণ্ট অফিসারের পদে থাকতে হয়। তারপর যান ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজে।

১৮৯৯ সালে (১৩০৬ সালের ১০ই আষাঢ়) রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ, কুমারখালি থেকে তাঁর 'প্রিয়সুহৃদ্' জগদীশচন্দ্র বসুকে এক চিঠিতে লেখেন :

"আমার চাষবাসের কাজও মন্দ চলিতেছে না।··· দ্বিজেন্দ্রলালবাবু সস্ত্রীক আমার শস্যক্ষেত্র পর্য্যবেক্ষণ করিতে আসিবেন।"

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা এর আগে থেকেই ছিল। উভয়ে পরস্পরের কাব্য-সাহিত্য ভালভাবে পড়তেন; পরস্পরের মধ্যে এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা চলত। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথমদিকের কবিতাগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব দেখা যায়।

দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর নিজের প্রথমদিকের রচনা সম্বন্ধে লিখেছেন : "বিলাত যাইবার পূর্ব্বে 'আর্যদর্শন', 'নব্যভারত' ইত্যাদিতে লিখিতাম।······শৈশব হইতেই, আমি গান ও কবিতা রচনা করিতাম। ১৮৮২ সালে প্রকাশিত 'আর্য্য-গাথায়' (১ম ভাগ) নক্ষত্র বিষয়ক গীতটি আমি দ্বাদশ বর্ষে রচনা করি।···১২ বৎসর হইতে ১৭ বৎসর পর্য্যন্ত রচিত আমার গীতগুলি ক্রমে 'আর্য্যগাথা' নামক গ্রন্থের আকারে প্রকাশিত হয়।"

১ম ভাগ 'আর্যগাথা' প্রকাশের ১১ বৎসর পরে ১৮৯৩ সালে 'আর্য্যগাথা' দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। এই আর্য্য-গাথা, দ্বিতীয় খণ্ড—কবিতা ও গানের সংগ্রহ। রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা' পত্রিকায় এই বইখানির প্রশংসা ক'রে সমালোচনা লেখেন। 'সাধনা' পত্রিকার এই সংখ্যাতেই (১৩০১, অগ্রহায়ণ) দ্বিজেন্দ্রলালের 'কেরাণী' কবিতা বার হয়। কবিতাটির মধ্যে হাস্যরস থাকলেও দীর্ঘশ্বাসের আভাস আছে। রবীন্দ্রনাথ এই কবিতারও প্রশংসা ক'রে দ্বিজেন্দ্র-লালকে চিঠি লেখেন, দ্বিজেন্দ্রলাল তখন ঢাকায়। 'কেরাণী'

কবিতাটির মধ্যে হয়ত রবীন্দ্রনাথের 'প্রেমের অভিষেক' নামে কবিতার কিছুটা ছাপ আছে। ১৩০০ সালের ফাল্গুনে 'সাধনায়' রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাটি বার হয়; তাতে 'কেরাণী জীবনের বাস্তবতার ধূলিমাখা ছবি ছিল অকুণ্ঠিত কলমে আঁকা'। (গ্রন্থপরিচয়, রবীন্দ্ররচনাবলী ৪, পৃঃ ৫৪৬)।

দ্বিজেন্দ্রলালের 'কেরাণী' কবিতা পড়ে রবীন্দ্রনাথের মনে বোধ হয় 'কৌতুকহাস্য' সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠে। ১৩০১ পৌষে সাধনায় রবীন্দ্রনাথের 'কৌতুকহাস্য' ও ফাল্গুনে 'কৌতুক-হাস্যের মাত্রা' প্রবন্ধ দু'টি বার হয়। 'পঞ্চভূতের ডায়েরী'র অন্তর্ভুক্ত হয়েছে পরে এই দু'টি প্রবন্ধ।

'কেরাণী' কবিতা লেখার পর থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্য-প্রতিভা কৌতুকহাস্যের পথ বেয়ে চলে। তাঁর দাম্পত্য জীবনের সুখকর অংশে তাঁর অধিকাংশ হাসির গান, ব্যঙ্গ কবিতা, প্রহসন, ব্যঙ্গকাব্য, গীতিকাব্য, নাট্যকাব্য লেখা হয়।

১৩০২ সালে প্রকাশিত হয় দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসন 'কল্কি অবতার'। দু' বৎসর পরে তাঁর আর একটি প্রহসন 'বিরহ' তিনি উৎসর্গ করেন' 'কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের করকমলে।' 'বিরহ' প্রহসনখানি অভিনীত হয় থিয়েটারে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী-৩৭ এর অভিনয় হয়েছিল। ১৩০৪ সালে প্রকাশিত হয় দ্বিজেন্দ্রলালের 'আষাঢ়ে' নামক কাব্য। রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী' পত্রিকায় (১৩০৫ অগ্রহায়ণে) এর দীর্ঘ সমালোচনা করেন।—১৩০৯ সালে দ্বিজেন্দ্রলালের 'মন্দ্র' কাব্য প্রকাশিত হ'লে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শনে (১৩০৯ কার্ত্তিকে) একে সমাদৃত করলেন। তিনি লিখলেন, "...কাব্যে যে নয় রস আছে, অনেক কবিই সেই ঈর্ষ্যান্বিত নয় রসকে নয় মহলে পৃথক্ করিয়া রাখেন। দ্বিজেন্দ্রলালবাবু অকুতোভয়ে এক মহলেই একত্রে তাহাদের উৎসব জমাইতে বসিয়াছেন। তাঁহার কাব্যে হাস্য, করুণা, মাধুর্য্য, বিস্ময় কখন কে কাহার গায়ে আসিয়া পড়িতেছে, তাহার ঠিকানা নাই।"

১৩১০ সালের কার্ত্তিকে (১৯০৩ সালের অক্টোবর বা নভেম্বরে) দ্বিজেন্দ্রলালের লেখা একটি কবিতা 'নূতন মাতা' দেখা যায়—সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত দ্বিজেন্দ্র গ্রন্থাবলীর ৪১৬ পৃষ্ঠায়। ১৯০৩ সনের ২৯এ নভেম্বর দ্বিজেন্দ্রলালের পত্নী মারা যান একটি শিশুপুত্র ও একটি শিশু-কন্যা রেখে। কবিতাটি দ্বিজেন্দ্রলাল লিখেছিলেন পত্নী মারা যাবার অল্পকাল পূর্বে। এ রকম ঘুমপাড়ানি কবিতা দ্বিজেন্দ্রলাল আরও লিখেছেন। শতবার্ষিকী সংখ্যা দ্বিজেন্দ্র-দীপালীতে এরকম আর-একটি কবিতা দেখা যায়। দিলীপ রায় তার ইংরেজী অনুবাদ করেছেন। প্রসঙ্গত বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের পত্নী মারা যান ১৩০৯ সালের ৭ই অগ্রহায়ণ (১৯০২ সালের ২২শে নভেম্বর)। পত্নীর মৃত্যুর পর—১৯০৩ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বরে তিনি 'শিশু'র কবিতা লিখছেন দেখা যায়। প্রায় এই সময়ে দ্বিজেন্দ্র-লালের লেখা 'নূতন মাতা' কবিতাটি স্বতঃই রবীন্দ্রনাথের মনে রেখাপাত করে। আমরা দেখি—দ্বিজেন্দ্রলালের এই কবিতাটির ইংরেজী অনুবাদ করেছেন রবীন্দ্রনাথ 'The Child' নামে। এইটি রয়েছে রবীন্দ্রনাথের Lover's Gift-এর ৪৭ পৃষ্ঠায় ৫০ নম্বরে।

Lover's Gift and Crossing বইটি প্রকাশ করেন লণ্ডন থেকে ম্যাকমিলান কোম্পানী ১৯১৮ সালে। দ্বিজেন্দ্রলালের বাংলা কবিতার থেকে যে অনূদিত 'The Child' কবিতাটি—তা উল্লেখ করা আছে ঐ বইতে। রবীন্দ্রনাথ এই অনুবাদটি কখন করেছিলেন তার অবশ্য উল্লেখ পাওয়া যায় না। অনুবাদ হয়ত তিনি অনেক পরে করেছেন, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের বাংলা কবিতাটি যখন প্রকাশিত হয়েছিল, তখন 'শিশু' ও 'স্মরণ' রচনার পর্ব চলছে। এ সময় কবিতাটি যে তাঁর চোখে পড়ে ও ভালো লাগে—এ অনুমান করা যায়। আমরা এই প্রবন্ধের শেষে বাংলা কবিতাটি ও তার ইংরেজী অনুবাদ পুরাপুরি উদ্ধৃত করে দেব।

দ্বিজেন্দ্রলালের পত্নী মারা যাবার পর—পত্নীর স্মৃতি-রক্ষার জন্য তিনি কলিকাতায় নন্দকুমার চৌধুরী লেনে 'সুরধাম' নাম দিয়ে একটি বাড়ী তৈরী করান। এই বাড়ীতেই তিনি শেষ জীবন কাটান। এখন নন্দকুমার চৌধুরী লেনের নাম হয়েছে ডি. এল. রায় ষ্ট্রীট।

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রকৃতি ছিল মজলিশী। বিশেষ করে পত্নী মারা যাবার পর তিনি সঙ্গীহীনতার বিষাদ কতকটা দূর করতে চাইতেন বন্ধুবান্ধব, সাহিত্যিকদের তাঁর বাড়ীতে ডেকে সঙ্গীত ও সাহিত্য চর্চা করে। 'পূর্ণিমা-মিলন' হ'ত তাঁদের, কথনও তাঁর বাড়ীতে, কথনও অন্য

কোনও বন্ধুর বাড়ীতে, কখনও কোন ক্লাবে। পূর্ণিমা-মিলনের প্রথম অধিবেশন হয় তাঁর বাড়ীতে ১৩১১ সালের (১৯০৫) দোল পূর্ণিমার দিন। এই অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন। 'কে এসে যায় ফিরে ফিরে, সে যে আমার জননী রে' গানটি তিনি গেয়েছিলেন এই মজলিশে। জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে এ রকম সাহিত্যের মজলিশে রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য ভাইরা মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করতেন বন্ধুদের কৌতুকপূর্ণ চিঠি পাঠিয়ে, তার নমুনা পাওয়া যায়। দ্বিজেন্দ্রলাল যেতেন জোড়াসাঁকোয়—এ সব মজলিশে।

একবার দ্বিজেন্দ্রলাল ডেকেছিলেন বন্ধুবান্ধবকে এক ক্লাবে। রবীন্দ্রনাথকে যে নিমন্ত্রণ পত্র তিনি পাঠান, তার নমুনা দিচ্ছি এখানে—

"কল্য রবিবার রাত্রে ; সাড়ে সাতটায় ;
১ ব্যাঙ্কসাল ষ্ট্রীটে ; ভারতীয় ক্লবে ;
'ডিনার'—ব্যাপার সবই পুর্ববৎ প্রায় ;
ইচ্ছা গোলযোগ করা মাত্র মিলে সবে।
... ...
আমাদের এই সাধু মতলবে
রবিবাবু—আপনার যোগ দিতে হবে।
ভবদীয়
শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।"

বাংলা দেশের জাতীয় জীবনে তখন নূতন আত্মচেতনা জেগেছে। তাকে উদ্দীপ্ত করতে পারবে বীরত্বব্যঞ্জক ঐতিহাসিক নাটক—একথা দ্বিজেন্দ্রলাল বুঝেছিলেন। তাই তিনি নাটক রচনার দিকে ঝুঁকলেন।

১৩১২ সালের বৈশাখে দ্বিজেন্দ্রলালের 'প্রতাপসিংহ' নাটক প্রকাশিত হ'ল। স্বদেশী যুগের গোড়ার দিকে এই নাটকখানি বাঙালীর চিত্তকে কি ভাবে অধিকার করেছিল, তা আমরা জানতে পারি সমসাময়িক পত্রিকা থেকে।

রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের এই নাটক সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করলেন না। রবীন্দ্রনাথের নীরবতায় দ্বিজেন্দ্রলাল ক্ষুব্ধ হলেন। এতদিন পরে দুই বন্ধুর মধ্যে বিচ্ছেদের সূত্রপাত হয়। তারপর নানা উপলক্ষ্য ধরে দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথকে তিক্ততাপূর্ণ পত্র লেখেন ; রবীন্দ্রনাথ নিজের বক্তব্য পরিষ্কার করে বলবার জন্য সে-সব পত্রের জবাব দেন। কারও পত্র কোথাও প্রকাশিত হয়েছে বলে জানা যায় না। কেবল রবীন্দ্রনাথের একটি পত্র বিশ্বভারতী রবীন্দ্রসদন থেকে পাওয়া গেছে। তাতে তিনি লিখছেন—"প্রিয়বরেষু, আপনি আমার স্তাবকবৃন্দের মধ্যে ভর্ত্তি হইতে পারিবেন না—এ কথাটা এতটা জোরের সঙ্গে কেন যে বল্লেন, আমি ভালো বুঝতে পারলাম না। 'আপনার নিন্দুকের দলে আমি যোগ দিতে পারব না'—এ কথাও ত আপনি বলতে পারতেন।..." (দ্রষ্টব্য—রবীন্দ্রজীবনী—নূতন সংস্করণ, দ্বিতীয় খণ্ড—পৃষ্ঠা ৩০৬।)

১৩১২ সালের শেষদিকে বরিশালে প্রাদেশিক সম্মেলনের সঙ্গে একটি সাহিত্য-সম্মিলনীর কথা যখন হয়, তখন এই সভায় রবীন্দ্রনাথ সভাপতি মনোনীত হন। অনেকে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল এই সময় দেবকুমার রায়চৌধুরীকে এক চিঠিতে লেখেন : "...আমি এ কথা মুক্ত কণ্ঠেই মানি যে, বর্ত্তমান সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি (রবীন্দ্রনাথ) সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্যতম ব্যক্তি এবং তাঁর প্রতিভার সঙ্গে এখন আর কাহারও তুলনা হইতে পারে না।..."

রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কবিতাটি ছাপা হয় 'সাধনা' পত্রিকায় ১৩০০ সালের আষাঢ় মাসে—দ্বিজেন্দ্রলালের 'কেরাণী' কবিতা ঐ পত্রিকায় প্রকাশের নয় মাস আগে। তের বৎসর পরে দ্বিজেন্দ্রলাল 'সোনার তরী' কবিতার মধ্যে আইডিয়ার অস্পষ্টতা দেখেন ও বলেন, "এ কবিতাটি দুর্ব্বোধ্য নয়, অবোধ্যও নয়—একেবারে অর্থশূন্য, স্ববিরোধী।" (সাহিত্য ১৩১৩ আশ্বিন, ও প্রবাসী ১৩১৩ কার্ত্তিক।)

দ্বিজেন্দ্রলাল, তাঁর প্রথম ঐতিহাসিক নাটক 'প্রতাপসিংহে'র সমাদরে উৎসাহিত হয়ে, ১৩১৩ থেকে ১৩১৫ সালের মধ্যে পর পর ঐ শ্রেণীর অনেকগুলি নাটক রচনা করেন—দুর্গাদাস, নূরজাহান, মেবারপতন, সাজাহান, চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতি। দেশবাসী সাদরে এগুলি গ্রহণ করে ; এখনও সেগুলির সমাদর পূর্ণমাত্রায় আছে। তাঁর দেশপ্রেমের গানগুলিও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে ; বিশেষ করে 'বঙ্গ আমার, জননী আমার' এবং 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা'—এই গান দু'টি।

এ সব নাটক বা গান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কোন মন্তব্য দেখা যায় না।

১৩১৪ সালে মাঘ সংখ্যার 'বঙ্গদর্শনে' দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর 'কাব্যের উপভোগ' নামে একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের

'যেতে নাহি দিব' কবিতার প্রশংসা করেন, কিন্তু ঐ প্রবন্ধেই তাঁর 'জীবনদেবতা' বাদের বিরূপ সমালোচনা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে অস্পষ্টতার প্রসঙ্গের পরে দ্বিজেন্দ্রলাল দেখাতে চাইলেন চিত্রাঙ্গদা কাব্যনাট্যে দুর্নীতির লক্ষণ। 'চিত্রাঙ্গদা' লেখেন রবীন্দ্রনাথ ১২৯৯ সালে। দ্বিজেন্দ্রলাল-এর আঠার বৎসর পর—'চিত্রাঙ্গদা' দুর্নীতিমূলক ব'লে রবীন্দ্রনাথকে অভিযুক্ত করেন। রবীন্দ্রনাথ এ আক্রমণের কোন জবাব দেন নি। প্রিয়নাথ সেন এক দীর্ঘ প্রবন্ধে 'চিত্রাঙ্গদার' সৌন্দর্য্য নানাভাবে ব্যাখ্যা করেন। (সাহিত্য ১৩১৬ কার্ত্তিক।)

রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাস প্রকাশিত হ'লে দ্বিজেন্দ্রলাল 'বাণী' পত্রিকায় (১৩১৭ কার্ত্তিকে) এর এক সহৃদয় সমালোচনা করেন। মনে আশা হ'ল অনেকের, যে দুই সাহিত্যিক বন্ধুর এবার মিলন হবে। কিন্তু দু'জনের ভক্তরা পরস্পরের প্রতি অভিযোগের তরঙ্গ তুলে শান্তি হবার পথে অন্তরায় সৃষ্টি ক'রে চললেন।

'আনন্দবিদায়' নামে একটি প্যারডি নাটিকা দ্বিজেন্দ্রলাল লিখেছিলেন—'বঙ্গবাসী' সাপ্তাহিক পত্রিকায় এটি প্রকাশিত হয়েছিল। অতুলকৃষ্ণ মিত্রের 'নন্দবিদায়ে'র প্যারডি এটি। দ্বিজেন্দ্রলাল ভূমিকায় লিখেছিলেন, "এ নাটিকায় কোন ব্যক্তিগত আক্রমণ নাই।"

রবীন্দ্রনাথ ১৯১২ সালের মে মাসে বিলাত যাবার পর দ্বিজেন্দ্রলাল ঐ নাটিকাটিকে পরিবর্দ্ধিত করেন।

১৩১৯ সনের ১লা পৌষ (১৯১২ সালের ১৬ ডিসেম্বর) নাটকখানি স্টার থিয়েটারে অভিনীত হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল সেদিন উপস্থিত ছিলেন সেখানে। বইখানির ভূমিকায় যদিও তিনি লিখেছিলেন—এ নাটিকায় কোন ব্যক্তিগত আক্রমণ নাই; তবুও দেখা গেল ব্যক্তিগত আক্রমণ এতে ছিল। নাটিকাটির অভিনয় দর্শকদের চিত্তকে এত ক্ষুব্ধ ক'রে তোলে যে তাঁরা নীরবে তা দেখবার ধৈর্য্য হারান। জনমণ্ডলীর এই ক্ষুব্ধতায় দ্বিজেন্দ্রলালকে সে স্থান ত্যাগ ক'রে চ'লে আসতে হয়।

দ্বিজেন্দ্রলালের শরীর ক্রমশঃ ভাঙ্‌ছিল। একবার ১৯১২ সালের এপ্রিল মাসে সন্ন্যাসরোগে তিনি আক্রান্ত হন; তখন তাঁর বাঁকুড়া থেকে মুঙ্গেরে বদ্‌লি হবার কথা। কলকাতায় এসে অসুস্থ হয়ে পড়ায় তিনি এক বৎসর ছুটি নিতে বাধ্য হন। কিন্তু শরীর ক্রমেই অপটু হওয়ায় ১৯১৩ সালের ২২-এ মার্চ তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

অবসর নেবার অল্পদিন আগে থেকে তিনি একটি উৎকৃষ্ট সচিত্র মাসিক পত্র প্রকাশ করার উদ্যোগ করছিলেন। পত্রিকাটির নাম দেওয়া হয় 'ভারতবর্ষ'। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স এটি প্রকাশের ভার নেন। প্রথম সংখ্যার (আষাঢ় ১৩২০) জন্য দ্বিজেন্দ্রলাল প্রবন্ধ নির্ব্বাচন ক'রে 'সূচনা' অংশও লিখে দিয়েছিলেন। কিন্তু পত্রিকা প্রকাশিত হবার কিছু আগে—১৩২০ সনের ৩রা জ্যৈষ্ঠ (১৯১৩ সালের ১৭ই মে) তিনি আবার হঠাৎ সন্ন্যাসরোগে সংজ্ঞা হারান। সে জ্ঞান আর ফিরে আসে নি। তাঁর অতিপ্রিয় 'সুরধামে' তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তখন তাঁর বয়স ৫০ বৎসর মাত্র। মৃত্যুর পূর্ব্বে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার 'সূচনা'য় তিনি লিখে গিয়েছিলেন—"আমাদের শাসন-কর্ত্তারা যদি বঙ্গ সাহিত্যের আদর জানিতেন তাহা হইলে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ও মাইকেল Peerage পাইতেন ও রবীন্দ্রনাথ Knight উপাধিতে ভূষিত হইতেন।"

দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর অল্পকাল পরে তাঁর বাণী দৈববাণীর মত সত্যে পরিণত হয়। ১৯১৩ সালের নভেম্বরে রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির সংবাদ পাওয়া যায় এবং ১৯১৫ সালের ৩রা জুন সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের জন্মদিন উপলক্ষ্যে তাঁকে নাইট-হুড দেওয়া হয়—অর্থাৎ তিনি 'সার' উপাধিতে ভূষিত হন। এই 'সার' উপাধি তিনি ত্যাগ করেন ১৯১৯ সালে কি উপলক্ষ্যে—সে কথা অনেকেরই জানা।

দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর দেবকুমার রায়চৌধুরী তাঁর যে জীবনচরিত লেখেন, তার ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লেখেন:—"দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ সত্য, অর্থাৎ আমি যে তাঁর গুণপক্ষপাতী, এইটেই আসল কথা এবং এইটেই মনে রাখবার যোগ্য।··· আমি অন্তরের সহিত তাঁহার প্রতিভাকে শ্রদ্ধা করিয়াছি এবং আমার লেখায় বা আচরণে কখনও তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করি নাই।"—(১৩২৪ ভাদ্র।)

প্রায় নয় বৎসর পরে (১৩৩৩ পৌষ) রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের পুত্র দিলীপকুমারকে তাঁর এক পত্রের উত্তরে লিখেছিলেন:—"তোমার পিতাকে আমি শেষ পর্য্যন্ত শ্রদ্ধা করেছি। সেকথা জানিয়ে তাঁকে ইংলণ্ড থেকে আমি পত্র

লিখেছিলাম, শুনেছি সে পত্র তিনি মৃত্যুশয্যায় পেয়েছিলেন এবং তার উত্তর লিখেছিলেন। সে উত্তর আমার হাতে পৌঁছায় নি।" (তীর্থঙ্কর—পৃষ্ঠা ২৮২।)

এবার আমরা দ্বিজেন্দ্রলালের বাংলা কবিতা 'নূতন মাতা' ও রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী অনুবাদ 'The Child' কবিতাটি উদ্ধৃত করে প্রবন্ধ শেষ করছি।

দ্বিজেন্দ্র গ্রন্থাবলী (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্)—১ম ভাগ (কবিতা ও গান) পৃঃ ৪১৬

তৃতীয় চিত্র

নূতন মাতা

(১)

"আয় চাঁদ আ রে চিক্ দিয়ে যা রে"
নূতন মেয়ে কোলে মাতা মধুর বোলে,
কত না আহ্লাদে, ডাকছে পূর্ণ চাঁদে
"আয় চাঁদ আ রে চিক দিয়ে যা রে।"

(২)

সুনীল সন্ধ্যাকালে শরচ্চন্দ্র ভাসে
পূর্বাকাশে। ধীরে, সুমন্দ সমীরে,
পুষ্পগন্ধ মধুর, ভেসে আসছে অদূর
ফুলের বাগান হতে অন্তঃপুরে। পথে
বালকবৃন্দ চলে, উচ্চ কোলাহলে,
উজ্জ্বল হাসিমুখে চিন্তাশূন্য সুখে।
গাছের উপর থেকে উঠছে ডেকে ডেকে
পাপিয়া এক। দূরে প্রবল মিঠে সুরে,
কোনো এক চাষী, বাজায় মেঠো বাঁশী
বাঁশীর ধ্বনি ধেয়ে সুনীল আকাশ ছেয়ে,
পড়ছে গিয়ে শেষে, ধরার উপর এসে
ছড়িয়ে ইতস্ততঃ তারা বাজির মত।

(৩)

এমন সময় বসে বাড়ির মধ্যে ও সে
নতুন মাতা,—কোলে একটি পুষ্প দোলে—
ডাকছে মধুর ডাকে পূর্ণ চন্দ্রমাকে—
"আয় চাঁদ আ রে, চিক দিয়ে যা রে।"

(৪)

চাঁদের কিরণ এসে মেয়ের মায়ের কেশে
কোমল মুখে দেহে, পড়ছে সে ছেয়ে।
চাঁদের কিরণ এসে ঢলে পড়ছে সে
মেয়ের কচি মুখে, মেয়ের কচি বুকে।

(৫)

ডাকছে মাতা চাঁদে বড় মনের সাধে
বড় আদর করে বড় মধুর স্বরে—
"আয় চাঁদ আ রে চিক দিয়ে যা রে।"

(৬)

চাঁদটি বসে হাসে শান্ত নীলাকাশে
জানি না কোন প্রাণে রয়েছে সেখানে,
এডাক শুনেও বসি কঠিন শরৎ শশী।
ডাকে মা আ রে চিক দিয়ে যা রে।
একবার তাকায় সাধে আকাশের ঐ চাঁদে;
আবার তাকায় সুখে কোলের চাঁদের মুখে।
হাস মেয়ে। ডাকে শরচ্চন্দ্রমাকে
সঙ্গে সঙ্গে—"আ রে চিক দিয়ে যা রে।"
—হাসে মেয়ে। হাসে চন্দ্র নীলাকাশে।
হাসে মা—এ ধরায় তিনের হাসি গড়ায়।

(৭)

লুকিয়ে লুকিয়ে আমি মেয়ের মায়ের স্বামী
লুকিয়ে আমি কবি তুলে নিলাম ছবি।

LOVER'S GIFT, Page 47 No. 50

The Child

(Translated from the Bengali of Dwijendra Lal Ray)

"Come moon, come down, kiss my darling on the forehead" cries the mother as she holds the baby girl in her lap, while the moon smiles as it dreams. There came stealing in the dark the vague fragrance of the summer and the night bird's songs from the shadow-laden solitude of the mango-grove. At a far-away village rises from a peasant's flute a fountain of plaintive notes, and the young mother, sitting on the terrace, baby in her lap, croons sweetly, "come moon, come down, kiss my darling on the forehead." Once she looks up at the light of the sky, and then at the light of the earth in her arms and I wonder at the placid silence of the moon.

The baby laughs and repeats her mother's call, "come moon, come down." The mother smiles, and smiles the moonlit night, and I, the poet, the husband of the baby's mother watch this picture from behind, unseen.

বিশ্বামিত্র

চাণক্য সেন

অন্যদিনের, অন্যকালের, অন্যযুগের সে লোকটিকে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আজ সকৌতুক মনোযোগে বার বার দেখলেন। প্রথমে মনে পড়ল না এ ছবির সঙ্গে কোনও দিন তাঁর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল। তারপর স্মরণ হ'ল, বহুদিন আগে এই ভারতবর্ষে কোন্ জীয়নকাঠির যাদুস্পর্শে বিচিত্র নেশায় লক্ষ লক্ষ মানুষের স্তিমিত প্রাণ হঠাৎ আলোর বন্যায় জেগে উঠেছিল; বহু শত বছরের পুঞ্জীভূত অন্ধকার ভেদ ক'রে সে বন্যা দেশকে পরম গৌরবে উদ্ভাসিত করেছিল। সে আলোক-বন্যার বহুধা প্রবাহিত ধারায় বহু মানুষের অনেক কলঙ্ক কালিমা ধুয়ে সাফ হয়ে গিয়েছিল; জেগে উঠেছিল তাদের অন্তরে শুভ্র মনুষ্যত্বের ঝিলিক্। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মনে পড়ল, কি ভাবে তিনি একদিন এ বন্যার স্রোতে ভেসে গিয়েছিলেন; কি ক'রে সেই বন্যা তাঁর জীবনকে ধুয়ে-মুছে সাফ করে দিয়েছিল।

বিলাসপুর রাজধানী, কিন্তু কৃষ্ণদ্বৈপায়নের জন্ম ও প্রথম নিবাস এখানে নয়। পিতা রামচরণ ছিলেন আসলে উত্তর প্রদেশের লোক; চাকুরী নিয়ে এসেছিলেন ছত্রিশগড়ের কোনও এক রাজ্যে। ক্রমে ক্রমে সহকারী দেওয়ানের পদে উন্নীত হয়েছিলেন। সেই রাজ্যে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের জন্ম ও শিক্ষা। বি. এ. পাশ করে ওকালতি পড়বার জন্যে তিনি প্রথম বিলাসপুরে আসেন; পাঠান্তে কুষাণপুর শহরে আইন ব্যবসা সুরু করেন। কুষাণপুর জিলা-শহর, খুব বর্ধিষ্ণু না হ'লেও উদয়াচল প্রদেশের অন্যতম বড় শহর। কুষাণপুর থেকে পিতার কর্মক্ষেত্র দেশীয় রাজ্য বেশি দূরে নয়; উভয়ের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের আদান-প্রদান প্রশস্ত। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের আইন ব্যবসা সুরু হ'ল কিছু কিছু ব্যাপারীদের নিয়ে, যারা কোনও না কোনও কারণে তাঁর পিতার কাছে অনুগত।

ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সদর আদালতে নাম করলেন; পসার বাড়তে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক উচ্চাশার জন্ম হ'ল। পিতার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে জিলা বোর্ডের সভাপতি হবার জন্যে প্রথম রাজনৈতিক সংগ্রামে নামলেন। খুব একটা লড়তে হ'ল না। আগে থেকে জিলা ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে ভাব জমিয়ে তাঁর সমর্থন সংগ্রহ করেছিলেন। জিলা বোর্ডের সভাপতি হয়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বুঝতে পারলেন, ইংরেজ রাজত্বে রাজশক্তির সঙ্গে সহযোগিতা করলে পুরস্কারের অভাব নেই। বুদ্ধিমান্, সুদর্শন, অক্লান্তকর্মী ব'লে তাঁর সুনাম হ'ল, খাতির বাড়ল। পাঁচ বছর জিলা বোর্ডের সভাপতি থাকার পর কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হ'তে চাইলেন। অনেক অর্থ-বিনিয়োগ, সরকারী সমর্থন, যথেষ্ট সুপরিকল্পিত ও সুচালিত নির্বাচন সংগ্রাম সত্ত্বেও এবার তাঁর পরাজয় হ'ল। তিনি হেরে গেলেন কংগ্রেস দলের মনোনীত প্রার্থী ভরতরাম দুবের কাছে।

এই পরাজয় কৃষ্ণদ্বৈপায়নের জীবনধারাকে অনেকখানি বদলে দিল। যতটুকু বুদ্ধি তাঁর ছিল তাতে বুঝলেন যে, পরিবর্তনশীল ভারতবর্ষে বর্তমানে বা ভবিষ্যতে প্রকৃত ক্ষমতা অর্জন করতে হ'লে ইংরেজের দাক্ষিণ্য ত্যাগ ক'রে জনসাধারণের সঙ্গে মিলিত হ'তে হবে, তাদের সংগ্রামের নেতৃত্ব করতে হবে। বুদ্ধিতে বুঝলেও হঠাৎ কোনও কিছুতে ঝাঁপিয়ে পড়ার মত চপল বাষ্পাকুল হৃদয় তাঁর কোনওদিন ছিল না। সব সময় তিনি কাজ করবার আগে ভাবতেন, বিচার-বিশ্লেষণে কর্মপন্থা স্থির ক'রে নিতেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বুঝলেন, রাজনৈতিক নেতৃত্বের জীবন গঠন করতে হ'লে আগে অনেক বিচার-বিশ্লেষণ দরকার। সবচেয়ে বেশি দরকার সময় ও সুযোগের নিপুণ নির্বাচন। তাঁর কবি-মন সায় দিল। পৃথিবীকে আমরা নাট্যশালা বলি; প্রতি মানুষ নট বা নটী। অথচ জীবন-গঠনে নাটকীয় কলাকুশলতা যে কতখানি ফলপ্রসূ, তা ভেবে দেখি না।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন জিলা বোর্ডের সভাপতি রয়ে গেলেন। কিন্তু দেখা গেল, ধীরে ধীরে তিনি অন্য কর্ম-পরিধি খুঁজছেন। একবার জিলা শহর থেকে অন্যতম মহকুমা শহর পর্যন্ত রাস্তা তৈরী নিয়ে সমস্যা দেখা দিল। একটি গ্রামের মধ্য দিয়ে রাস্তা চলবে, কিন্তু গ্রামবাসীর তাতে আপত্তি।

রাস্তার যে প্ল্যান অনুমোদিত হয়েছে তাতে তাদের চাষবাসের ক্ষতি হবে। রাস্তা চলবে চাষের মাঠ ও অদূরবর্তী খালের মাঝখান দিয়ে; রাস্তা তৈরী হ'লে চাষীরা সহজে খালের জল মাঠে টেনে আনতে পারবে না। এসব বিচার-বুদ্ধি চাষীদের মাথায় নিশ্চয় খেলত না, যদি না জনৈক দেশ-কর্মীকে সরকার এ গ্রামে অন্তরীণ ক'রে রাখতেন। অন্তরীণ থেকেও এই যুবকটি—নাম মোহনলাল সকসেনা—চাষীদের সঙ্ঘবদ্ধ করতে চেষ্টা করছিল। চাষীদের দিয়ে জিলা বোর্ডে স্মারকলিপি পাঠাল রাস্তা-তৈরীর প্ল্যানে প্রতিবাদ জানিয়ে। স্মারকলিপিতে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত, যদি তাদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও রাস্তার প্ল্যান বদলান না হয়, তা হ'লে চাষীরা সত্যাগ্রহ করবে।

জিলা বোর্ডের কয়েকটি সভায় চাষীদের স্মারকলিপি নিয়ে আলোচনা হয়ে গেছে। প্রায় সব সদস্য এবং ভাইস-চেয়ারম্যান রামকান্ত মিশ্র রাস্তার প্ল্যান বদলাবার বিরুদ্ধে। তাঁরা বললেন, ইঞ্জিনীয়াররা প্ল্যান তৈরীর আগে সব দিক্ নিশ্চয় বিবেচনা করেছেন; এক গান্ধীমার্কা ছোকরার হুমকিতে সে প্ল্যান বদল করলে রাজত্ব অচল হয়ে যাবে।

একদিন দেখা গেল, জিলা বোর্ডের সীমানা ছাড়িয়ে এ সমস্যা অনেক দূর চ'লে গেছে। বিলাসপুরের অন্যতম সংবাদপত্রে দ্বন্দ্বের খবর ছাপা হ'ল। কিছুদিনের মধ্যে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলেও সংবাদপত্রের মাধ্যমে এ দ্বন্দ্ব প্রচারিত হয়ে গেল। বিলাসপুর থেকে কুষাণপুরে রাজ-পুরুষদের যাতায়াত বেড়ে গেল। সত্যাগ্রহ-সাহসী গ্রাম-খানাকে প্রয়োজনে শায়েস্তা করবার জন্যে বাড়তি বন্দুকধারী পুলিস এল। জিলা ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ীতে বার বার সভা বসল। জিলা পুলিসের অধিকর্তা ঘোষণা করলেন, কংগ্রেস-পন্থী গ্রামখানাকে অবিলম্বে উচিত শিক্ষা না দিলে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা রাখা কঠিন হয়ে উঠবে।

জিলা বোর্ডের সভাপতি হিসেবে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এ ব্যাপারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ জড়িত। চাষীদের ভয় যে অবাস্তব নয়, তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু এমন ভাবে সমস্যা জটিল হয়ে উঠল, রাস্তা হ'ল গৌণ, বড় হ'ল রাজশক্তি ও জনদাবীর আসন্ন সংঘাত, তিনি জোর দিয়ে নিজের মত প্রকাশ করবার সাহস পেলেন না। চাষীদের বিরুদ্ধে কঠিন ভাবে দাঁড়ানও তাঁর পক্ষে সম্ভব হ'ল না। সহজাত কূটনৈতিক বুদ্ধিতে তিনি বুঝলেন, এ পরিস্থিতিতে কোনও পথে সোজাসুজি না দাঁড়িয়ে মধ্যপন্থা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

অনেক ভেবেচিন্তে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন একদিন জিলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে উপস্থিত হলেন। ম্যাজিস্ট্রেট উত্তর প্রদেশের লোক, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন জানতেন; এই জটিল পরি-স্থিতিতে তিনি অস্বস্তি বোধ করছিলেন। অনেকটা কৃষ্ণদ্বৈপায়নেরই মত।

দু'জনে কথাবার্তা হ'ল। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, কুষাণ-পুরে আজ পর্যন্ত কোনও রাজনৈতিক দুর্ঘটনা ঘটে নি। এখন যদি এই রাস্তা নিয়ে সংঘাত হয়, রক্তপাত হয়, তা হ'লে কুষাণপুরের সুনাম নষ্ট হবে। তা ছাড়া, যারা সংঘাতের জন্যে তৈরী, যাদের নীতি হ'ল সংঘাত বাড়ান, তাদের সঙ্গে সংঘাত এড়িয়ে চলা প্রকৃষ্ট রাজনীতি। প্রতিপক্ষকে তার মুখ্য অস্ত্র ব্যবহারের সুযোগ দিতে নেই; সে অস্ত্র যদি না কেড়ে নিতে পার, অন্তত তাকে অকেজো ক'রে রাখ।

কথাটা জিলাধিপতির মনে লাগল। ভাবলেন, লোকটাকে যত বোকা ভেবেছি তত বোকা এ নয়। বুদ্ধি আছে দেখছি কিছুটা।

বললেন, "সংঘাত হ'লে ওরা অতি সহজে হেরে যাবে। চাষীদের এ ধরনের সংগ্রাম করতে দেওয়া বিপজ্জনক। কুঁড়ি উপড়ে না ফেললে পরিণাম বিষময় হবে।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন জবাব দিলেন, "সংঘাত করব সংঘাত যখন অনিবার্য, যখন না ক'রে উপায় নেই। তখন এমন ভাবে করব, প্রতিপক্ষ যাতে একেবারে পঙ্গু হয়ে পড়ে। যে বিবাদ সংঘাত ছাড়া মেটান সম্ভব সেখানে সংঘাত ডেকে আনা শুধু অপ্রয়োজনীয় নয়, বিপদজনক। হিংসা নতুন হিংসা সৃষ্টি করে। আমরা মারলে ওরাও মারবে, অন্তত মারতে শিখবে। আজ মার খাবে, হারবে, কিন্তু অন্যদিন মেরে জিতবার জন্যে মনের গোপন অন্ধকারে হিংসার ছুরিতে লুকিয়ে সান দেবে। স্বদেশীওয়ালারা ত চায় যে আমরা আঘাত করি। ওরা আশা ক'রে আছে আমরা আঘাত ক'রে, মেরে, দেশের ঘুমন্ত জনতাকে জাগিয়ে দেব। ওদের জালে যদি ধরা পড়তে চান তবে অবশ্য আমার কিছু বলার নেই।"

ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, "আপনি কি উপায় নির্দেশ করছেন?"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নিবেদন করলেন, "আমার প্ল্যান পেশ করবার আগে আর-একটা কথা বলে নি, যদি অনুমতি করেন। আপনি নিশ্চয় জানেন, গ্রামবাসীদের দাবীর পেছনে যুক্তি আছে।"

"এখন শুনছি, রাস্তা তৈরী হ'লে, চাষের কিছু ক্ষতি হ'তে পারে।"

"যা বললেন তাকে মিত-ভাষণ বললে দয়া ক'রে নারাজ হবেন না। রাস্তা হচ্ছে, খুব ভাল কথা। কিন্তু রাস্তা তৈরী হ'লে গ্রামগুলির খাদ্য উৎপাদন বোধহয় অর্ধেক কমে যাবে।"

"আমি অবাক্ হয়ে যাই, ইঞ্জিনীয়াররা এসব কথ আগে থাকতে ভাবেন না কেন?"

"প্রয়োজন নেই ব'লে। ওঁদের কি এসে-যায় দু-পাঁচ-খানা গ্রামে চাষ শুকিয়ে গেলে? সরকার যখন রেলপথ তৈরী করলেন, দেশের লোকেদের খাদ্য ও স্বাস্থ্য কি ইঞ্জিনীয়র সাহেবদের বিবেচনায় খুব বড় স্থান পেয়েছিল? কত কম খরচে রেলপথ তৈরী হ'তে পারে এ কথাটাই তাঁদের কাছে মুখ্য ছিল।"

"এবার আপনার প্ল্যান শুনি।"

"আপনার মত বুদ্ধিমান্, দরদী ম্যাজিস্ট্রেট আমরা খুব বেশি পাই নে। তাই আপনাকে পরামর্শ দেবার স্পর্ধা। আপনি যদি বিলাসপুর থেকে বড় ইঞ্জিনীয়র ও কৃষি-পারদর্শী এনে ব্যাপারটাকে নতুন ভাবে বিচার করান ত খুব ভাল হয়। তাতে গ্রামবাসীরা বুঝবে, তাদের চাষবাসের সমস্যা সম্বন্ধে সরকার সহানুভূতিশীল; তাদের ন্যায্য নালিশ সরকার বিবেচনা করতে সর্বদা প্রস্তুত। নতুন ইন্‌ভেষ্টিগেশন সুরু হ'তে সময় লাগবে; আন্দোলন চাপা পড়বে, আগুন যাবে নিভে। তখন প্রচার করতে হবে যে রাস্তার প্ল্যান কিছুটা বদলে দেওয়া হচ্ছে, সরকার নিজে থেকেই চাষীদের মঙ্গল সাধনে এগিয়ে এসেছেন। ইতিমধ্যে ঐ স্বদেশী যুবকটির নেতৃত্ব ভেঙে দিতে হবে; গ্রামের লোকেরাই ওর প্রতি বিরূপ হয়ে উঠবে—এ এমন কঠিন কাজ নয়। তখন একদিন হয় তাকে সরকারী অতিথিশালায় নিয়ে আসুন, নয় অন্যত্র পাচার ক'রে দিন। তারপর রাস্তা তৈরী করুন, ইনভেষ্টিগেটিং কমিটির সুপারিশ যতটা সম্ভব মানুন। এই হ'ল সংক্ষেপে, আমার প্ল্যান।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়নের প্ল্যান মোটামুটি গৃহীত হয়েছিল। এ ঘটনা তাঁর জীবন-রথের চাকাকে নতুন পথে চালিত করেছিল।

দু বছরের মধ্যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কৃষাণ-নেতা হয়ে উঠেছিলেন। কৃষাণপুর কৃষাণসভার সভাপতি। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের গোড়াপত্তন।

আঠারো বছর বয়সে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের বিবাহ হয়েছিল। ধর্মপত্নী পদ্মাদেবী কাণ্যকুব্জ ব্রাহ্মণ ঘরের কন্যা। বিবাহের সময় বয়স ছিল আট। চার বছর পিতৃগৃহে কাটিয়ে বারো বছর বয়সে তিনি স্বামীর ঘরে আসেন। চৌদ্দ বছরে তাঁর গর্ভে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের প্রথম পুত্র জন্ম নিল। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যখন কৃষাণপুর কৃষাণসভার সভাপতি, ওকালতি ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠিত. জিলা বোর্ডের প্রায় পার্মানেন্ট প্রেসিডেন্ট, তখন তাঁর চার পুত্র ও দুই কন্যা জন্মে গিয়েছে—জীবন-পথে চলতে চলতে তিনি সার্থকতার নাতিক্ষুদ্র দুর্গে পৌঁছে গেছেন। পদ্মাদেবী সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়ে, অনেকখানি শুচি ও নির্মলতা নিয়ে স্বামীর ঘরে পদার্পণ করেছিলেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন, সমীহ করতেন, কিন্তু প্রেমের উদ্বেল আনন্দ কোনও দিন পান নি স্ত্রীর সঙ্গ থেকে। তাঁর ব্যক্তিত্বের যে বিরাট্ অংশে সার্থক নেতৃত্বের দুর্বার লোভ প্রথম থেকে অঙ্কুরিত ছিল, সেখানে তমোরসের প্রচণ্ড প্রভাব, জটিল আকাঙ্ক্ষা, কুটিল নীতি-বিমুখতার সাহায্য নিয়ে যেখানে নিরন্তর সাফল্যের পথ-অন্বেষণ, সেখানে ধর্মপত্নী পদ্মাদেবীর স্থান ছিল না। অথচ কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ব্যক্তিত্বের অন্য অংশে, অবয়বে ক্ষীণ হলেও যার প্রভাব একেবারে কম নয়, স্ত্রীর জন্যে নির্দিষ্ট শ্রদ্ধাস্নিগ্ধ স্থান ছিল। তিনি জানতেন, ভাল কাজ, বড় কাজ, সৎ ও মহান্ কাজের আহ্বানে সায় দেবার সময় সবচেয়ে বড় সমর্থন ও সহায়তা পাবেন পদ্মাদেবীর কাছে। তেমনি, অনুশোচনায় অনেকখানি ধুয়ে যাওয়া অন্যায় কর্মের মুখোমুখি হয়েও তিনি জানতেন, তাঁর প্রধানতম আশ্রয় পদ্মাদেবী।

স্বামী-স্ত্রীর এ সম্পর্ক সুখের নয়, আনন্দের নয়। জীবনে ব্যবহারিক ও রাজনৈতিক সার্থকতার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ক্রমে ক্রমে বদলে যাচ্ছিলেন; পদ্মাদেবীর কাছ থেকে দূরে

সরছিলেন। তাঁর সময়কার পারিবারিক জীবনে স্ত্রীর স্থান ছিল প্রধানত অন্দরে, স্বামী-সন্তান-আত্মীয়-কুটুম্ব পরিচর্যায়, সংসার রক্ষাবেক্ষণে। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন থাকতেন নিজের বহির্জগতে বেশি সময়, ওকালতি, জিলাবোর্ড এবং রাজনীতি-জননীতি-ক্ষমতানীতির বর্ধমান পরিসরে। দুপুরে আহারান্তে বিশ্রামের সময় এবং রজনীর স্বল্পালোকিত নির্জনতায় স্বামী-স্ত্রীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে, তবু, তাঁদের মধ্যে জীবনের কিছুটা মূল্যায়ন হ'ত। তখনও কৃষ্ণদ্বৈপায়নের "রাজনীতি"তে ক্ষমতার উন্মাদন বিশেষ ছিল না ; স্ত্রীর সঙ্গে দ্বন্দ্বের পরিধি ছিল সীমিত।

কুষাণপুর কৃষাণ সভার সভাপতি হবার পর পরিধি প্রসারিত হ'ল।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন চাষী ছিলেন না ; চাষীর পুত্রও ছিলেন না। তথাপি গ্রামীন সমাজের লোক তিনি, গ্রামবাসীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। চাষবাসের মোদ্দা সমস্যাগুলি তিনি জানতেন, বুঝতেন ; গ্রামের সমস্যা তাঁর অজানা ছিল না। কিন্তু এ সমস্যার যে কোনও আলাদা রূপ থাকতে পারে, সামাজিক বিবর্তনে চাষীর যে কোনও স্বকীয় সত্তা থাকতে পারে, জমির মালিক ও জমির চাষীর মধ্যে যে দুর্নিবার সংঘাতের অবশ্যম্ভাবী সম্ভাবনা থাকতে পারে, এ কথা তাঁর মনে কখনও জাগে নি। তাঁর গ্রামীন দৃষ্টি ছিল জমিদার কেন্দ্রিক ; চাষীর কল্যাণ করবে জমিদার, এবং চাষী থাকবে সে কল্যাণ-বিতরণে মোটামুটি সন্তুষ্ট। অর্থাৎ, গ্রামের দরিদ্র জনতাকে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ক্ষুদ্রভাগ্য সন্তান মনে করতে পারতেন ; তাদের প্রতি তাঁর মনোভাব ছিল পিতৃকল্প। উদার দৃষ্টি সম্পন্ন কল্যাণকামী জমিদার দ্বারাই গ্রামের মঙ্গল সাধিত হ'তে পারে, গ্রামের উন্নতি সম্ভব, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ তাঁর ছিল না। সুতরাং, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যখন কৃষাণ সভা প্রতিষ্ঠা ক'রে তাঁর সভাপতি হলেন, কুষাণপুরের জমিদারগণ আতঙ্কিত হবার কারণ দেখলেন না। অপর পক্ষে, উপরি-উক্ত গ্রামের দাবী গৃহীত হবার জন্যে, চাষী মহলেও তাঁর প্রতি খানিকটা আস্থা জন্মাল। জিলা কর্তৃপক্ষও ব্যাপারটাকে ভাল ভাবে নিলেন। তখন ভারতবর্ষের নানাস্থানে অস্বস্তিকর চাষী আন্দোলন মাথা তুলতে সুরু করেছে। অপেক্ষাকৃত প্রশান্ত উদয়াচলে অশান্তির ঝিলিক অবশ্য দেখা দেয় নি। এ সময়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মত দায়িত্বশীল নেতারা এগিয়ে এলে কৃষাণদের নেতৃত্ব গ্রহণ করলে রাজশক্তির ভয় পাবার কারণ ছিল না।

প্রথম ভয় পেলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-পত্নী পদ্মাদেবী। একদিন দুপুরে আহারান্তে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বিশ্রাম করছেন, পদ্মাদেবী পাশে ব'সে পাখার হাওয়া দিচ্ছেন। তিনি বললেন, "একটা গুজব শুনছি। মন ভারী হয়ে আছে।"

"কিসের গুজব ?"

"গুজবটা মোহনলালকে নিয়ে।"

"কোন্ মোহনলাল ?"

পদ্মাবতী অবাক্ হলেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মোহনলালকে চিনতে পারছেন না, এ তো স্বাভাবিক নয় !

"মোহনলাল নামটা অবশ্য খুব সাধারণ। কিন্তু মোহনলাল বলতে কুষাণপুরে ত একটি মানুষকেই বোঝায় !"

"আমি দশটা মোহনলালকে চিনি," কৃষ্ণদ্বৈপায়নের কণ্ঠে উষ্মা।

"মোহনলাল সক্‌সেনা।"

"ও। তাকে নিয়ে ত অনেক গুজব। গুজব কেন, কেচ্ছা। তার অনেকগুলিই সত্যি।"

"তুমি খুব ভাল করেই জান তার একটাও সত্যি নয়।"

কথাটা এমন শান্ত জোর দিয়ে পদ্মাদেবী উচ্চারণ করলেন, এমন কমনীয় নিরুত্তাপ প্রত্যয়ে, যে, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন রীতিমত নিস্তব্ধ হয়ে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে রাগতে লাগলেন।

পদ্মাদেবী বললেন, "এসব গুজব রটিয়ে অমন ভাল ছেলেটির সর্বনাশ কারা করছে ?"

"মোহনলাল সক্‌সেনা লোক মোটেই ভাল নয়," কৃষ্ণদ্বৈপায়ন অধৈর্য রুক্ষতার সঙ্গে বললেন।

"কেন ? সে কি করেছে ? কি তার অপরাধ ?"

"সে চাষীদের ক্ষেপিয়ে তুলছে জমিদারদের বিরুদ্ধে, সরকারের বিরুদ্ধে।"

"শুধু এই ?"

"তার চরিত্র খারাপ।"

"মিথ্যে কথা।"

"গ্রামের লোকেরা তাই বলছে।"

"না। তোমরা বলছ। তোমরা ওর নামে মিথ্যে কুৎসা রটিয়ে বেড়াচ্ছ।"

এবার কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ভয়ানক রেগে গেছেন। "তুমি যা জান না, যা বোঝ না, তা নিয়ে কথা বলতে এস না।"

"জানি ও বুঝি বলেই বলছি।" পদ্মাদেবীর কণ্ঠস্বরে রাগ নেই। শুধু বেদনা। "তুমি কৃষাণসভার সভাপতি হয়েছ। গ্রামের লোকেদের উপকার করেছ। কিন্তু এই আদর্শবাদী স্বদেশী ছেলেটির বিরুদ্ধে তুমি কেন লেগেছ বুঝতে পারছি না। সে ত নিজের ইচ্ছায় এখানে আসে নি। সরকার তাকে এখানে আটকে রেখেছে। শহরে পর্যন্ত সে সপ্তাহে দু'দিনের বেশি আসতে পারে না, তাও পুলিশের অনুমতি নিয়ে। তুমি খুব ভাল করেই জান দুশ্চরিত্র সে নয়, সে হ'তে পারে না। বাপ-মায়ের একমাত্র পুত্র, ভাল ঘরের ছেলে; ধন-দৌলত; স্নেহ-প্রেম সব ত্যাগ করে সে স্বদেশী করছে, জেল খাটছে, পুলিশের হাতে মার খাচ্ছে, পাপ তাকে স্পর্শ করবে কেমন করে? তাকে এখান থেকে অন্য কোথাও সরিয়ে দাও তোমরা—কিন্তু তার নামে এ ধরণের দুর্নাম রটিয়ে তোমাদের লাভ কি? এ কি ধর্মের কাজ?"

"তুমি তার এত কথা জানলে কি করে?"

"শুধু কি আমিই জানি? তুমি জান না? তুমিও ত জান!"

"ভুট্টাসিং-এর মেয়ে হরপেয়ারীর সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা জান?"

"শুনেছি। একেবারে মিথ্যে। হরপেয়ারীকে সে জমিদারের হাত থেকে বাঁচিয়েছে।"

"ও রকম সবাই বাঁচায়। রক্ষক পরে ভক্ষক হয়।"

"মোহনলাল সে জাতের লোক নয়।"

"তুমি যে তার বিরাট্ ভক্ত হয়ে উঠলে! জান, সে আমার শত্রু?"

পদ্মাদেবী চমকে উঠলেন। "শত্রু? সে কেন তোমার শত্রু হ'তে যাবে? সে ভিন্‌দেশী। আজ আছে কাল নেই।"

"তবু সে আমার শত্রু।" কৃষ্ণদ্বৈপায়নের কণ্ঠ হিংস্র হয়ে উঠল। "আমার প্রতিপক্ষ।"

"প্রতিপক্ষ হ'লেই শত্রু? আমিও ত অনেক বিষয়ে তোমার প্রতিপক্ষ।"

"সে আমার ভয়ানক শত্রু। কৃষাণসভার বিরুদ্ধে সে প্রচার সুরু করেছে। আমি নাকি জমিদারদের বন্ধু, সরকারের তাঁবেদার। চাষীদের কল্যাণ আমার কাম্য নয়, তাদের হাতে রেখে জমিদারের স্বার্থ রক্ষা ও সরকারের শক্তি সংরক্ষণই আমার কাম্য।"

পদ্মাদেবী কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন। তারপর বললেন, "অত কঠিন বিষয় আমি সহজে বুঝতে পারি নে। কিন্তু তোমার কথা সত্যি হ'লেও তার চরিত্রে মিথ্যে কলঙ্ক চাপিয়ে তাকে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দেওয়া অত্যন্ত অন্যায়। তোমরা চাষীদের বুঝিয়ে দাও যে মোহনলাল যা বলছে তা সত্যি নয়। তোমার বিরুদ্ধে সে পারবে কেন?"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "রাজনীতি বড় কঠিন খেলা। এখানে সত্য, মিথ্যা, ন্যায়, অন্যায়, পাপ-পুণ্যের স্থান নেই। সব মিলেমিশে জগা-খিচুড়ি। রাজনীতির গোড়ার কথা প্রতিপক্ষকে হারাতে হবে, নির্মূল করতে হবে। মোহনলাল সকসেনা শুধু একজন মানুষ নয়, সে একটা আইডিয়া, আদর্শ, শক্তি। তার ও আমার আদর্শে, আইডিয়ায় ও শক্তিতে সংঘাত ঘটেছে। তাকে নির্মূল করতে হবে। আজ যদি সে মান-সম্মান গৌরব অটুট রেখে গ্রাম থেকে বিদায় নেয়, তার আইডিয়া পেছনে প'ড়ে থাকবে, বহু উর্বর মনে অঙ্কুরিত হবে, একদিন মহাবল দানবের মত আমাদের বিরুদ্ধে সে রুখে দাঁড়াবে। মোহনলালের আইডিয়া ধ্বংস করতে হ'লে তার মান-সম্মান-মর্যাদা ধ্বংস করতে হবে। গ্রামের লোক বুঝবে যে তারা ভুল মানুষকে, ভুল ধারণাকে মারাত্মক মোহে অন্তরে স্থান দিয়েছিল; বুঝতে পেরে তারাই মোহনলালকে তাড়াবে। আমি জিলা ম্যাজিস্ট্রেটকে ব'লে দিয়েছি সরকার যেন মোহনলালকে অন্যত্র অন্তরীণ করার মত বিরাট্ ভুল এড়িয়ে চলেন। গ্রামবাসীই দাবী করবে মোহনলালের নির্বাসন।"

পদ্মাদেবী সেদিন আর কথা বাড়ান নি। নীরবে পাখা চালিয়ে গেছেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়নও কিছুক্ষণের মধ্যে নিশ্চিন্ত দিবানিদ্রায় ঘনীভূত হয়েছেন। গৌরবর্ণ মুখে নিঃসন্দেহ সাফল্যের প্রত্যয় তৃপ্তির মৃদুহাস্যে মিলে এমন এক অব্যয় অভিব্যক্তিতে রূপায়িত হয়েছে যা দেখে পদ্মাদেবী বারবার আতঙ্কে শিহরিত হয়ে উঠেছেন।

মোহনলাল সকসেনা মান-সম্মানে বিদায় নিতে পারে নি। যে গ্রামবাসীদের সে সত্যাগ্রহের জন্যে সংগঠিত করছিল তাদেরই অনেকে একত্রিত হয়ে তার নির্বাসন দাবী

ক'রে অপঠিত স্মারকলিপিতে টিপসহি দিয়ে একদিন কৃষ্ণদ্বৈপায়নের হাতে তুলে দিয়েছিল। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সে আবেদনপত্র কুষাণপুর কৃষাণসভার সভাপতি হিসেবে জিলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পেশ করেছিলেন। অবিলম্বে মোহনলালকে গ্রেপ্তার ক'রে বিচারালয়ে হাজির করা হয়েছিল। কর্তৃপক্ষ অবশ্য বুঝতে পেরেছিলেন যে, গ্রামের একটি সুন্দরী বালবিধবার সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ের অভিযোগে তাকে শাস্তি দেওয়া সহজ হবে না। বীরত্বের চেয়ে সুবিবেচনাকে বড় স্থান দিয়ে সরকার বিচার চলবার কালেই মোহনলালকে আর একটা গুরুতর রাজনৈতিক অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত ক'রে অনেক বেশি নাটকীয় বিচারের জন্যে এলাহাবাদ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

এ ব্যাপারেও কৃষ্ণদ্বৈপায়নের হাত ছিল। যাতে তাঁর একেবারেই হাত ছিল না তা হ'ল রেল স্টেশনে বিদায়ী মোহনলালকে সম্মান দেখাবার জন্যে রায়গড় শহরের পঁচিশজন মহিলার আকস্মিক আবির্ভাব। মহিলাগণ মোহনলালের কপালে চন্দন লেপে দিয়েছিলেন, গলায় মালা পরিয়েছিলেন।

যে-মিথ্যা কলঙ্ক কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মোহনলালের ওপর চাপিয়েছিলেন, একদিন, বেশি দিন পরে নয়, তা সত্যি হয়ে তাঁর নিজের জীবনে দেখা দিয়েছিল। গ্রামের বালবিধবা হরপেয়ারী নয়, রায়গড় শহরেরই মেয়ে-ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রী কৌশল্যা। অপূর্ব সুন্দরী, লাস্যময়ী, অতি মার্জ্জিতা তরুণী। জীবনে তখন কৃষ্ণদ্বৈপায়নের উত্থান-পর্ব ; ক্রমবর্ধমান দায়িত্ব-নেতৃত্ব-পরিধিতে মেয়ে-ইস্কুলের সভাপতিত্ব এসে গিয়েছিল। জীবনেরই অমোঘ অলিখিত দুর্বার অনিয়মে তিনি কৌশল্যার আকর্ষণে ধরা পড়েছিলেন। বলিষ্ঠ উষ্ণবীর্য পুরুষ-জীবনের যে বিরাট্ অংশে পদ্মাদেবীর পত্নীত্ব এক নির্জন নিরাশ্রীয় শূন্য সৃষ্টি ক'রে রেখেছিল, কৌশল্যা হঠাৎ, বিনা নোটিসে, তা পূর্ণ ক'রে তুলেছিল। তার প্রখর উত্তাপ পদ্মাদেবীর স্নিগ্ধ অস্তিত্বকে প্রবল ধাক্কায় বহু দূরে সরিয়ে দিয়েছিল ; জ্বলন্ত জীবনের আগুনে দগ্ধ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাতে খুব বেশি ব্যথা পান নি। বরঞ্চ এ সময়ে তাঁর কবি-প্রতিভা হঠাৎ যাদুর স্পর্শে ফুটে উঠেছিল। কোন্ অজ্ঞান সম্মোহনের তন্ময় প্রভাবে তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য "কৃষ্ণলীলাকহানী" এই দুর্বিনীত নির্লজ্জ উল্লসিত অধ্যায়ে রচনা করেছিলেন।

পরিণত-প্রায় জীবনে বিগলিত তামসের ঝল্লরীতে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কিছুদিন সব কিছু ভুলে রইলেন। কিন্তু অদৃষ্ট-দেবতার অদৃশ্য চালনে, সর্বনাশের আগেই একদিন তিনি জাগলেন। মুক্তির পথও পেয়ে গেলেন।

কৌশল্যাকে নিয়ে ঝড় উঠছে, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বুঝতে পারছেন। কৌশল্যা যতই রূপবতী হোক, যত দুর্নিবার হোক তার আকর্ষণ, যত উন্মাদক তার প্রেম, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন জানতেন তাঁর জীবন কৌশল্যার থেকে অনেক বড়, অনেক বেশি মূল্যবান্। সহজাত বাস্তববুদ্ধিতে তিনি বুঝেছিলেন যে, কৌশল্যা-কলঙ্ককে ঢাকবার জন্যে এমন কোনও আলোর প্রয়োজন যা জনচক্ষে তাঁর জীবনকে অভিনব গৌরবে উদ্ভাসিত ক'রে তুলবে। "কৃষ্ণলীলাকহানী" রাধার কলঙ্ক নিয়ে তিনি নিজেই লিখেছিলেন: "চাঁদের কলঙ্ক তার গৌরব, তেমনি রাধারও।" আবার তেমনি কৃষ্ণদ্বৈপায়নকেও চাঁদের মতই আলোক-উজ্জ্বল হ'তে হবে ; কলঙ্ক গৌরব না হোক, অগৌরবের কালিমায় জীবনকে অন্ধকার সে করতে পারবে না।

সে আলোক-প্রবাহ গ'ড়ে তোলবার সুযোগ একদিন এসে গেল। উনিশ শ' একত্রিশের জাতীয় আন্দোলনের বন্যা কুষাণপুরেও এসে পৌছেছে। স্কুল-কলেজের ছাত্ররা মিছিল ক'রে আবগারী দোকানে সত্যাগ্রহী হয়েছে। একদিন পুলিস তাদের ওপর লাঠি চালাল। পরের দিন শহরবাসী বিস্মিত শ্রদ্ধায় দেখতে পেল বিরাট্ ছাত্র মিছিলের পুরোভাগে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন কৌশল। পরনে মোটা খদ্দরের ধুতি, কুর্তা, নগ্ন পা। রাস্তায় লোকের ভিড় জমে গেল। মিছিল চলল সবচেয়ে বিপজ্জনক স্থানে। জিলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছারিতে। যে আদালতে দাঁড়িয়ে দীর্ঘদিন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ওকালতি করেছেন, সেখানে আজ উকিলদের ব্রিটিশ বিচারশালা পরিত্যাগ করবার আবেদন জানাতে হবে। সদর কাছারির ময়দানে সশস্ত্র পুলিসের লাইন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বিজয়ী বীরের মত এগিয়ে গেলেন পুলিসের অধিকর্তার কাছে। দাবী করলেন: কাছারী প্রাঙ্গণে প্রবেশাধিকারের। দাবী নামঞ্জুর হ'ল। তখন মিছিলের যুবক-জনতা নিয়ে সেখানেই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সভা করলেন। তাঁর ভাষণ সবার মন গভীরভাবে স্পর্শ করল। তিনি শুধু স্বাধীনতার আহ্বানে সবাইকে সাড়া দিতে বললেন না, নিজের অক্ষমতা, কর্তব্য-

বিমুখতা, দুর্বলতার জন্যে কুষাণপুরবাসীর নিকট প্রকাশ্যে মার্জনা চাইলেন। "আজ এই মহান্ জন-সঙ্কল্পে যোগদান করবার আগে আমি নিজের জীবনের চেহারা ভাল ক'রে একবার দেখতে চেষ্টা করলাম। দেখে গর্ব ত দূরের কথা, লজ্জা ও ক্ষোভে আমার মাথা নত হয়ে গেল। কত স্বার্থবুদ্ধি, কত অন্যায়, দুর্বলের প্রতি কত অবিচার, সবলের প্রতি অক্ষম আনুগত্য, কত লোভ, লালসা, পাপ—কত জঞ্জালে ভরা আমার জীবন! তবু লোকের চোখে আমি সার্থক পুরুষ, খ্যাতি, ক্ষমতা, যশ আমার সার্থকতার সরঞ্জাম। কেবল আমিই জানি এই সার্থকতার মধ্যে কতখানি ফাঁক ও ফাঁকি লুকিয়ে রয়েছে। তাই আজ মনে হ'ল, সমস্ত পাপ-অন্যায়, স্খলন-পতন এবং সার্থকতা নিয়ে একমাত্র দেশমাতৃকার পদতলে এসে দাঁড়ান যায়; মায়ের কাছে সন্তানের লজ্জা থাকে না, মা সব অন্যায় ক্ষমা ক'রে তাকে কোলে তুলে নেন। আমরা ছোট ছোট মানুষ, কিন্তু বড় আদর্শের আলো যখন এসে আমাদের ওপর পড়ে তখন আমরাও কিছু বড় হয়ে যাই, আমাদের জীবন উদ্ভাসিত হয়, কলঙ্ক-কালিমা, দুর্বলতা হঠাৎ কেটে যায়। আজ আমাদের সবাকার সামনে বড় হবার অপূর্ব সুযোগ। মানে, সম্মানে, ঐশ্বর্যে, ক্ষমতায় বড় হওয়া নয়—ত্যাগে, দুঃখে, বেদনায়, বীর্যে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ানোয়, দেশের জন্যে প্রাণ পর্যন্ত তুচ্ছ করার মহান্ সাহসে বড় হওয়া····· "

পুলিস সেদিন লাঠির আক্রমণে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করেছিল। লাঠি পড়েছিল কৃষ্ণদ্বৈপায়নের বলিষ্ঠ উঁচু দেহে। কে যেন সে সময়ে ছবি তুলে নিয়েছিল। পত্রিকায় সে ছবি ছাপা হয়েছিল সমস্ত দেশে। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন গ্রেপ্তার হয়ে এক দিন হাজতে ছিলেন। পরের দিন তাঁর বিচার হ'ল। ছ' মাসের সশ্রম কারাদণ্ড।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কংগ্রেসের সভ্য হলেন জেলে যাবার আগে। তাঁর কারাবাসের দ্বিতীয় দিনে তিনি কুষাণপুরে জিলা কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন। জীবনের গতি একেবারে বদলে গেল। ক্রমশঃ

———

মোগল বাদশারা নিজেদের সমাধিমন্দির নিজেরাই তৈরি করিয়ে যেতেন—আশঙ্কা ছিল খরচের ভয়ে পুত্রেরা মন্দির নির্মাণ নাও করতে পারে। মৃত্যুর পূর্ব্বেই তাঁরা এসব বালাই চুকিয়ে যেতেন। আমিও তাই করতে চাই। আমার কথা যদি আপনাদের কখনো স্মরণ করতে হয়, তবে এভাবে বিশেষ দিনে সভা ডেকে কখনো আমাকে স্মরণ করবেন না। আমার জন্মদিন মৃত্যুদিন দুটোই আমি সঙ্গে নিয়ে যাব—এ আপনারা পাবেন না। তাই ব'লে কি বৎসরের বাকি ৩৬৩ দিনই আমি জুড়ে থাকব? তা নয়—আমার গানে, আমার কবিতায় আমাকে ক্ষণে ক্ষণে আপনাদের মনে পড়বে, সেই আমার ভালো।

১৩৩৬, বৈশাখ সংখ্যা প্রবাসীতে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'স্মৃতিসভা' প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি।

গোলাপ-কাঁটা

শ্রীঅজিত চট্টোপাধ্যায়

রাঁচী স্টেশনে গাড়িটা থামতেই জগদানন্দ অবাক্ হ'ল। যেন একটা সমভূমিতে এসে দাঁড়িয়েছে গাড়ি। আশেপাশের উঁচু উঁচু পাহাড়পর্বত, খানাখন্দ, নালানদী সব যেন যাদুকরের মন্ত্রবলে অন্তর্হিত। অনেকক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখল জগদানন্দ। তারপর এক সময় কুলির পিঠে বিছানাপত্তর চাপিয়ে রিক্শায় এসে বসল।

আগস্টের শেষ—সেপ্টেম্বর প্রায় আসি-আসি করছে। বর্ষা চ'লে গিয়েও যেন সম্পূর্ণ যেতে চাইছে না। স্কুলবিমুখ ছেলের মত যেতে যেতে এক-একবার ফিরে চাইছে। আকাশের টুকরো টুকরো কালো মেঘে তার সেই অভিমান-ভরা চাহনির ছায়া।

আগে থেকেই চিঠিপত্র লিখে এসেছিল জগদানন্দ। হোটেলে তার জন্য জায়গা ঠিকঠাক। আস্তানা খুঁজে বেড়ানর কোন চেষ্টা তাকে করতে হয় নি। মোটামুটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হোটেল। দক্ষিণ খোলা একটা ছোট্ট ঘরে বিছানাপত্তর পাতল সে। টেবিলের উপর একটুকরো খবরের কাগজ পেতে হাতের ঘড়িটা আর পকেটের মনিব্যাগটা খুলে রাখল। গায়ের জামাটা দেওয়ালের গায়ে টাঙ্গানো একটা ছোট্ট আলনায় ঝুলিয়ে দিল। ফ্যানটা পুরোদমে ঘুরিয়ে দিয়ে বিছানায় শ্রান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল জগদানন্দ। ক্লান্তিতে তার চোখ দু'টি বুজে এল।

সময়টা ঠিক বেড়াতে আসার মত নয়। তবে অন্যসময় বড় ভিড়। ট্রেণে জায়গা পাবে না। পেলেও হোটেলে ঢোকা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। তাই ইচ্ছে ক'রেই পুজোর সময়টা বাদ দিয়েছে জগদানন্দ। বেছে নিয়েছে শরতের প্রথম হাসিমাখানো ভাদ্রের শেষ দিনগুলি।

হোটেলের চাকরের ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙ্গল জগদানন্দর। একদম ভাতের থালা সাজিয়ে নিয়ে এসেছে। চানটান যে এখনও সারে নি জগদানন্দ, এতটা হুঁশ করে নি। ঘুমভাঙ্গা চোখে জগদানন্দ বলল, ভাতের থালাটা টেবিলে ঢাকা দিয়ে রেখে যেতে। আড়মোড়া ভেঙ্গে উঠে বসল বিছানার ওপর।

চানটান ক'রে একটু সুস্থ হ'ল জগদানন্দ। কাল সারা-রাত জাগরণ গেছে ট্রেণে। বসবার জায়গা পেয়েছিল, কিন্তু চোখদুটো কিছুতেই একত্র করতে পারে নি। সমস্ত পথে লোকজন ওঠানামা। যখন একটু ফাঁকা হ'ল গাড়ী, ততক্ষণে মুরী স্টেশনে এসে গেছে। গাড়ি বদলানোর হাঙ্গামা আবার। বড় লাইন ছেড়ে ছোট লাইনে উঠতে হবে। নিজের সামান্য কয়েকটা জিনিষপত্র নিয়ে হিমসিম খেতে হয়েছিল জগদানন্দকে।

মুরী থেকে পথ বড় সুন্দর। ঘুম পেলেও চোখ চেয়ে ছিল জগদানন্দ। হয়ত এ পথ দিয়ে আসা হবে না আর। হ'লেও কতদিন পরে তার ঠিকঠিকানা কি? সবে ভোর হয়েছে। পাখী ডাকছে গাছে গাছে। টুকরো টুকরো কয়েকটা হাল্কা মেঘ কাছের একটা পাহাড়ের চূড়ায় এসে ধাক্কা খেল। উপর দিকে উঠে গেছে বিসর্পিত রেলপথ। দু'পাশে নিবিড়-শ্যাম বনানী। মাঝে মাঝে ছোট ছোট স্টেশন। লোকজন নেই, বসতি নেই,—কারও সাড়াশব্দ পাওয়া যাবে না। চলন্ত ট্রেণ থেকে দু'একবার নীচের দিকে চাইল জগদানন্দ। পাহাড়ের ঢালু অঞ্চল। হাজার হাজার ফিট নীচের দিকে চ'লে গেছে। দিনের আলোতেও সমস্তটা ঠিক নজরে আসে না।

খাওয়া-দাওয়া সেরে একটা সিগারেট ধরাল জগদানন্দ। করিডোরে একটু ঘুরে বেড়াবে ভাবল। অমনি হোটেলটাও দেখা হয়ে যাবে একনজরে। চারপাশের রাস্তাঘাট, ঘরদোর এক-আধটু চোখে আনবে। ম্যানেজারের সঙ্গেও কথাবার্তা বলতে হবে একবার। হুড্রু, গৌতমধারা দেখার কিছু বন্দোবস্ত করা যায় কি না আলোচনা ক'রে দেখবে। সাকুল্যে মাত্র তিনদিন ছুটি। তার একদিন শেষ হ'ল প্রায়। ফেলা-ছড়ার সময় তেমন কই হাতে?

বেড়াতে বেড়াতে পশ্চিম দিক্কার বারান্দাটায় গিয়ে পড়েছে জগদানন্দ। হোটেল প্রায় খালি এখন। সময়টা চেঞ্জারদের আসার উপযোগী নয়। কয়েকজন চাকুরে, দু'চার-জন কাজেকর্মে আসা লোকজন ছাড়া বোর্ডার তেমন নেই

বললেই চলে। কোণের একটা ঘর থেকে গানের কলি ভেসে এল জগদানন্দর কানে। নারীকণ্ঠ। জগদানন্দ কৌতূহলী হ'ল। বেড়াতে বেড়াতে আড়চোখে ঘরের মধ্যে দৃষ্টি ফেলল জগদানন্দ। গুটি চার-পাঁচ মেয়ে ঘরের মধ্যে। গান করছে একজনা। অন্যরা শুনছে। কেউ চেয়ারে ব'সে, কেউ নিজেকে এলিয়ে দিয়েছে বিছানার কোলে। একটু অবাক্ হ'ল জগদানন্দ। এতগুলি মেয়েকে একসাথে হোটেলে দেখবে আশা করে নি। হয়ত বেড়াতে এসেছে, কিংবা কোন কাজকর্মে। মনের মধ্যে চিন্তা ক'রে কোন সদুত্তর পেল না জগদানন্দ।

সন্ধ্যেবেলায় বেড়িয়ে এসে সে বসেছিল চেয়ারে। এক কাপ চা দিতে বলেছিল চাকরকে। পুরানো একটা মাসিক-পত্রের কি একটা গল্পে মনোযোগ দিতে চেষ্টা করছিল একটু। রাত বেশী নয়। হয়ত আটটার কাছাকাছি। তবু কেমন শান্ত আর নিস্তব্ধ হয়ে এসেছে চারিপাশটা।

বাইরে কড়ানাড়ার শব্দ। জগদানন্দ ভেতরে আসতে অনুরোধ করল।

ড্রাইভার-গোছের একজন লোককে নিয়ে ম্যানেজারবাবু উপস্থিত। হেসে জিজ্ঞেস করল জগদানন্দ,—'কি ব্যাপার?'

—'হুড্রু যাবেন বলছিলেন না? সেই ব্যবস্থাই করতে এলাম।'

—'কি ব্যবস্থা করবেন?' জগদানন্দ উৎসুক দৃষ্টিতে তাকাল।

—'ট্যাক্সিতে একটা খালি আসন পাওয়া যাচ্ছে। মোট ছ'জন যাবে। মাথাপিছু দশ টাকা। হুড্রু আর গৌতম-ধারা, দুই দেখে আসবেন।'

জগদানন্দ একপায়ে রাজী। মাত্র দশ টাকায় হুড্রু আর গৌতমধারা দু-ই দেখে আসা যাবে। তাও কষ্টে-সৃষ্টে নয়, দিব্যি হাত-পা ছড়িয়ে ট্যাক্সিতে বসে। ফুরফুরে হাওয়া বইবে। এলোমেলো চুলগুলি এপাশে-ওপাশে উড়বে একটু। জগদানন্দ চোখ বুজে ভবিষ্যৎ আনন্দকে একটু অনুভব করতে চেষ্টা করল।

পরদিন সকালে ট্যাক্সিতে উঠবার সময় প্রায় হোঁচট খেল জগদানন্দ। ট্যাক্সিতে পুরুষ-যাত্রী বলতে সেই একা। ড্রাইভারের পাশের সীটটি তার জন্য সংরক্ষিত। পিছনের সীটে মেয়েরা বসে। সেই পাঁচটা মেয়ে। হোটেলের পশ্চিম দিকের কোণের ঘরে যাদের দেখেছিল জগদানন্দ। বেশী বয়স নয় ওদের। অবিশ্যি মেয়েদের বয়স অনেক সময় মুনিঋষিরও অজানা। তবু জগদানন্দর মনে হ'ল ওরা সমবয়সী। বিশ-পঁচিশের মধ্যে বয়স সব।

বেশ খানিকটা সময় নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব করল ওরা। জগদানন্দ শুনছিল কান পেতে, কিছু বুঝছিল। কিছু কথার খেই পাচ্ছিল না। অল্প কিছুক্ষণ পর থামল ওরা। হঠাৎ যেন ওর উপস্থিতি সচেতন করল মেয়ে-ক'টিকে। ওরা শান্ত হ'ল। এ-ওর গায়ে আর হেসে পড়ল না লুটিয়ে।

হঠাৎ পেছনের একটি মেয়ে ওকে বলল,—'শুনছেন।' ঘাড় ফেরাল জগদানন্দ। হেসে বলল,—'কিছু বলছেন আমায়?'

—'হ্যাঁ, মানে আমরা ভেবেছিলাম যে আপনি নিজেই আলাপ পরিচয় করবেন। কিন্তু, তা ত আর করলেন না। অগত্যা আমরাই'—কথার শেষে নমস্কার জানাল মেয়েটি। জগদানন্দ প্রতি-নমস্কার করল।

হুড্রুতে নামল সকলে। খানিকটা পায়ে হেঁটে যেতে হয়। কি গর্জন। বড় বড় উপলখণ্ডের উপর দিয়ে বয়ে এসেছে জলস্রোত। তারপর হঠাৎ আছড়ে পড়েছে কয়েক শত ফিট নীচে। নজর করলে পরিষ্কার চোখে পড়ে না সবটা। শাদা শাদা ফেনার মত কি অদ্ভুত একটা ধোঁয়া-ধোঁয়া ভাব।

খানিকটা বেড়িয়ে ওরা এসে বসল একটা গাছের নীচে। জগদানন্দ একটু দূরে ছিল। সেই মেয়েটি ওকে ডাকল। বলল,—'আপনাকে আমাদের লীডার করে নিচ্ছি আনন্দ-বাবু। এ যাত্রাপথে আমরা আপনাকে অনুসরণ করব শুধু।' মেয়েটি মিষ্টি করে হাসল অন্য মেয়েদের দিকে তাকিয়ে—। বড়ো বড়ো চোখে ওর দিকে তাকিয়ে জগদানন্দ বলল,—'কিন্তু আমার নামটা কি আনন্দবাবু? আপনি আদ্ধেকটা কোথায় শুনলেন?—

মেয়েটি দুর্বোধ্য হাসি আনল ঠোঁটের কোণে। বলল,—'শুনেছি সবটাই। তবে প্রথম দিকটা ইচ্ছে করেই ছেঁটে দিয়েছি। ও নাম কি এ বয়সে মানায়? সাধু-সন্নিসি হলে না হয়'—, সে ফিক্ করে হাসল।

অন্য মেয়েরাও হাসছে, অল্প অল্প। জগদানন্দ বুঝতে পারল।

সে উত্তর দিল,—'বেশ ত, আনন্দবাবুই বলবেন। কিন্তু

আপনাদের সকলের সঙ্গে আমার ত ভাল করে আলাপই হ'ল না।'

এবার মেয়েটি এগিয়ে এল। বলল,—'নিশ্চয়ই। আসুন এদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। এ হ'ল সাবিত্রী সহায়। আর এর নাম নাজমা।' আর দু'টি মেয়েকে দেখিয়ে বলল,—'এ মাদ্রাজের কাবেরী আর এর বাড়ী এলাহাবাদে। নাম আরতি পরাঞ্জে।'

মেয়েরা নমস্কার করল সবাই।

জগদানন্দ বলল,—'ওদের নাম ত জানলাম। কিন্তু আসল নামটাই জানা হ'ল না এখনও। আপনারটা?'—

—'এত নাম জেনে কি হবে আপনার? পথের আলাপ ত পথেই ফুরিয়ে যাবে'—

—'তা ঠিক।' জগদানন্দ বলল। 'তবু কথাবার্তা চালাতে, ডাকাডাকির জন্য একটা নাম ত প্রয়োজন। তার উপর যখন লীডার সাজাচ্ছেন'—

মেয়েটির চোখের তারায় তারায় হাসি খেলে গেল। বলল,—'বানিয়ে নিন না একটা কিছু। পথের সাথী, না না, ওটা ঠিক হবে না। বরং পথের হাসি বলে ডাকবেন'—

—'বেশ, তাই হবে। কিন্তু কোথা থেকে আসছেন আপনারা? কিছুই ত জানলাম না'—

—'ও বাবা, আবার ঠিকানাও চাই। শুধু নামে চলবে না।' মেয়েটি হাসল। একটু থেমে বলল, 'ধানবাদ থেকে আসছি আমরা। সবাই অফিসের চাকুরে, ছুটি ফুরুলেই আবার চেয়ারে গিয়ে বসব। কি, এতেই হবে ত? না, আরও পরিচয় লাগবে?' প্রগল্‌ভা মেয়েটি ঘাড় দুলিয়ে প্রশ্ন করল।

—'কি কি দেখবেন, কিছু ঠিক করেছেন?'—

—'আমরা ঠিক করব কি? আপনি ত লীডার আমাদের। আপনিই প্রোগ্রাম ছকবেন। আমরা শুধু সায় দেব।'—

হেসে উত্তর দিল জগদানন্দ—'এটা কিন্তু বেশ বলেছেন। আচ্ছা. বাংলা দেশের কোথায় বাড়ী আপনার, তা ত বললেন না?'—

—'কি হবে জেনে? কিন্তু আপনি কোথা থেকে আসছেন, কি করেন কিছুই ত বলছেন না'—

—'আসছি কলকাতা থেকে। কলেজে ছেলে পড়াই। আর কিছু বলার মত নেই।'

—'ওরে বাবা। কলেজে ছেলে পড়ান। তার মানে মাষ্টারমশাই। তিন বছর আগেও যাদের কাছে পড়াশুনা করেছি'—

—'তাতে কি হয়েছে? এখন ত আপনি ছাত্রী নন আর। এখন ত শুধু পথের হাসি'—জগদানন্দ আড়চোখে চেয়ে হাসল।

সাবিত্রী আর নাজমা উঠে গিয়েছে অন্যদিকে। ঘুরে-ফিরে দেখছে সব কিছু। কাবেরী আরতির সাথে আলোচনা করছে কিছু। ভীষণ গর্জন। কানে পৌঁছয় না সব কথা। হুড্রুর কাছে আজ ভিড় নেই তেমন। হয়ত দুপুরের পর ভিড় হ'তে পারে। এখন বারোটার কাছাকাছি—জগদানন্দ ঘড়ির দিকে চাইল।

মেয়েটি বলল,—'কিছু খেয়ে নিন, আনন্দবাবু। আবার ত গৌতমধারায় যেতে হবে!'

জগদানন্দ হেসে উত্তর দিল,—'কিছু ত খেয়েই বেরিয়েছি। আর পথের হাসি যে খেতে দেবে এমন ত কথা ছিল না'—

—'পাকামি করতে হবে না আর। পথের হাসি যা বলবে তাই শুনতে হবে। বুঝলেন মশাই?'—

সকলকে ডাকল মেয়েটি। ড্রাইভার বেচারাও বাদ গেল না। টিফিন ক্যারিয়র খুলে লুচি, মিষ্টি, কি একটা ভাজা, আচার ইত্যাদি কি সব যেন বের করল। সকলকে ভাগ ক'রে দিল। নিজেও নিল খানিকটা।

খেতে খেতে জগদানন্দ বলল,—'এভাবে বেড়িয়েও সুখ। খাও-দাও, হাওয়া গাড়িতে ছুটে চল। নতুন পথ, নতুন গাছপালা—চোখ যেন জুড়িয়ে যায়।'

ওর দিকে তাকিয়ে বলল মেয়েটি—'আনন্দবাবু কি কবিতা-টবিতা লেখেন নাকি?'—

—'মানে?'

—'না, গাছপালা দেখে যেরকম বিভোর হচ্ছেন। তাই বলছিলাম'—

জগদানন্দ বলল,—'ওসব অভ্যেস এখনও হয় নি। তবে যেরকম দেখছি-শুনছি তাতে পরে যে হবে না এমন কথা দিতে পারি না'—

ইংরেজীতে প্রশ্ন করল আরতি পরাঞ্জে। কোন্ কলেজে পড়ায় জগদানন্দ, কি বিষয় নিয়ে এম. এ. পাস করেছে?

ছোট্ট ছোট্ট কথায় জবাব দিচ্ছিল জগদানন্দ। শুনছিল সবাই,—সাবিত্রী সহায়, নাজমা আর কাবেরী।

প্রোগ্রাম ঠিক হ'ল। গৌতমধারা দেখে আজ ফিরবে সকলে। কাল ভোর ভোর-বেরিয়ে পড়বে রাজরোপ্পা দেখতে। ড্রাইভারের সঙ্গে কথাবার্তা ব'লে নিল। বিকেলে সময় থাকলে রাঁচী শহরটা দেখবে ঘুরে। নেতারহাট যাওয়ার ঠিক হয়েছিল। কিন্তু জগদানন্দকে ট্রেণ ধরতে হবে কাল রাত্রে। তিনদিনের খেলা প্রায় সাঙ্গ হয়ে এল যে—।

গাড়ি ছাড়ল। সেই নির্জন ঝোপঝাপ পথের দু'পাশে। পাহাড়ের মাথায় রোদ। পাখী ডাকছে কু কু স্বরে। মাঝে মাঝে ওরাওঁ মেয়েদের দেখা যাচ্ছে। পিঠে বোঁচকাতে ছেলেকে ঝুলিয়েছে। গাড়ি দেখে সভয়ে সরে দাঁড়াচ্ছে।···

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই জগদানন্দর মনে হ'ল তৈরী হবার কথা। চানটান সেরে বেরিয়ে পড়তে হবে। রাজরোপ্পা অন্তত ষাট মাইল। রামগড় হয়ে পথ গিয়েছে।

সকালেই একটা লোক ফুল নিয়ে এসেছে হোটেলে। নানা রঙের ফুল। একটা রক্তগোলাপ নিল জগদানন্দ। আর কয়েকটা চাঁপা ফুল।

যাত্রা সুরু হবার আগে পাঁচজনকে ফুল ক'টি উপহার দিল জগদানন্দ। শুধু পথের হাসিকে রক্তগোলাপটি। ভেবেছিল সুন্দর একটি হাসি ফুটে উঠবে ওর মুখে। কিন্তু ঘটল যা তার জন্য এতটুকু তৈরী ছিল না জগদানন্দ। মুহূর্তে মুখখানা বিরক্তিতে কুঁচকে গেল মেয়েটির। কাবেরী তাড়াতাড়ি ফুলটি হাতে নিয়ে বলল,—'এটা আমি নিচ্ছি, বুঝলেন?'

রাজরোপ্পা যাওয়ার পথে ভীষণ গম্ভীর হয়ে রইল মেয়েটি। মুখের হাসি কোথায় গেল মিলিয়ে। অমন সদা-চঞ্চল ভাব যেন অন্তর্হিত।

রাজরোপ্পা পৌঁছে কাবেরীকে একফাঁকে ডাকল জগদানন্দ। বলল,—'কি ব্যাপার? ফুল দিতে এত বিরক্ত হ'ল কেন পথের হাসি?'

এপাশ-ওপাশ দেখে নিল কাবেরী। আস্তে আস্তে বলল সব কথা। নতুন কিছু নয়। জগদানন্দ এমনি একটা কিছু আশঙ্কা করেছিল। ব্যথা পাওয়ার সেই সনাতন কাহিনী। ধানবাদের এক মাইনিং ইঞ্জিনীয়রের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল মেয়েটির। ইঞ্জিনীয়র হ'লেও কিছু রসজ্ঞান ছিল ছেলেটির। হয়ত কাব্যচর্চা করত আড়ালে। রোজ সন্ধ্যায় একটি ফোটা রক্তগোলাপ উপহার দিত ওকে। সবাই জানত ধানবাদে। জানিত বিয়ে হবে ওদের। তারপর একদিন বিলেত গেল সে ছেলে,—উচ্চতর ডিগ্রী আনতে। প্রথম প্রথম চিঠি লিখত। আজকাল আর আসে না পত্র-টত্র। সবাই জানে ওদের আলাপ-পরিচয় চুকেবুকে গেছে। দুর্জনে বলে সে ছেলের নাকি বিয়ে হয়েছে বিলেতে,—আর ফিরবে না এদেশে। সেই থেকে গোলাপফুল কিছুতেই সহ্য করতে পারে না মেয়েটি। কেউ দিলে ছুঁড়ে ফেলে দেয় অসহ্য রাগে। ওর এই পাগলামীর কথা মেয়েরা অনেকে জানে। নতুন মানুষ হয়ে কেমন ক'রে জানবে জগদানন্দ? কাবেরী একটু হেসে ওর দিকে তাকাল।

মনটা খারাপ হয়ে গেল জগদানন্দর। হাসি-হাসি মুখের ঐ মেয়েটির মনে এত বড় ব্যথার কাঁটা লুকিয়ে আছে, তা সে ভাবতেও পারে নি। একবার ভাবল, প্রসঙ্গটা তোলে ওর কাছে। কিন্তু পরক্ষণেই নিরস্ত করল নিজেকে। যে গোলাপের কাঁটার খোঁচায় অহরহ কষ্ট পাচ্ছে বেচারী, কি প্রয়োজন সে কথা ওকে মনে করিয়ে দেবার?

সারাদিনটা কাটিয়ে বিকেল নাগাদ ফিরল ওরা। ঠিক সহজ হ'তে পারে নি মেয়েটি। পথে কথাবার্তা বলেছে কিছু কিছু। কিন্তু তাতে নেই প্রাণের উত্তাপ। নেই অন্তরঙ্গতার স্পর্শ। সে কথা শুনে জগদানন্দর মন ভরে নি।

বিকেলে নিজের ঘরে এসে চুপচাপ শুয়েছিল জগদানন্দ। ট্যাক্সিটা আগেই ছেড়ে দিয়েছিল। এমনিতেই ক্লান্ত সবাই। তার উপর নিরুৎসাহ ভাব। বিকেলে আর বেরোতে রাজী হয় নি কেউ।

কাবেরী এসে বলল,—'চুপচাপ শুয়ে আছেন কেন? আমাদের ঘরে চলুন না,—সবাই মিলে গল্প করা যাবে।'

অন্যসময় হ'লে উৎসাহিত বোধ করত জগদানন্দ। কিন্তু এখন ভাল লাগল না, পথের হাসির কথা ভেবে। কথা বলতে গেলেই গোলাপ প্রসঙ্গ উঠতে পারে; তখন লজ্জা পাবে পথের হাসি। হয়ত ব্যথা পাবে অন্তরে।

কিন্তু কাবেরী নাছোড়বান্দা। ওকে না নিয়ে যাবে না। বলল,—'আজই ত চলে যাচ্ছেন রাত্রে। আর কি আসবেন গল্প করতে?'

জগদানন্দকে উঠতে হ'ল। তবু একবার সে জিজ্ঞেস

করল,—'আমার সেই গোলাপফুলের কি হ'ল ? ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছেন ত পথে ?'

—'যেয়েই দেখবেন'—কাবেরী হাসল।

ঘরের মধ্যে গিয়ে জগদানন্দ দেখল সুন্দর একটি কাঁচের গ্লাসে জলের উপর ভাসছে গোলাপটি। মিষ্টি একটা গন্ধ কাছে গেলেই নাকে লাগছে।

নাজমা শুয়েছিল খাটে। আরতি পরাণ্ডে কি বই পড়ছিল।

সাবিত্রী বলল,—'ধরে এনেছিস আনন্দবাবুকে ?'

পথের হাসি জানালা দিয়ে চেয়েছিল বাইরে। ওকে দেখে কাছে এসে বসল। একনজরে চাইল জগদানন্দ। বুঝল এখনও পুরোপুরি সহজ হয় নি বেচারী। কেমন আড়ষ্ট-আড়ষ্ট ছাড়-ছাড় ভাব।

কাবেরী বলল,—'বেশ ভাল জাতের গোলাপটা। এই হোটেলেই কিনেছেন ? ভারী সুন্দর কিন্তু'—

চোখ দিয়ে শাসন করছিল যেন আরতি পরাণ্ডে। অন্যরা চুপচাপ। জগদানন্দ বুঝল, প্রসঙ্গটা তুলতে চায় না ওরা। কিন্তু কাবেরী যেন একটু বোকা। সে আবার বলল,—'আমি রেখে দেব ফুলটা এমনি জলে ভাসিয়ে। যতদিন এর গন্ধ থাকে। রোজ সকালে উঠে দেখব আর আপনার কথা মনে হবে।'

কখন এক ফাঁকে উঠে গেছে পথের হাসি। জগদানন্দ খেয়াল করে নি। বুঝল খানিক পরে। আর পাঁচটা কথা ব'লে সেও উঠে পড়ল। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে প্রায়। রোদ আর নেই। তার যাবারও সময় আসন্ন।

সন্ধ্যের পরই ট্রেণ ওর। জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে তৈরী হ'ল জগদানন্দ। ম্যানেজারকে ডেকে টাকাকড়ি ফিরিয়ে দিল। একবার ভাবল, যাবার সময় দেখা করে যায় ওদের সাথে। কিন্তু তেমন উৎসাহ পেল না মনে। ওর অজ্ঞানতার অপরাধে পুরানো স্মৃতির খোঁচায় ক্ষতবিক্ষত হয়েছে মেয়েটি। বিদায় নিতে গেলে হয়ত আবার লজ্জা পাবে বেচারী।

একটা ফাঁকা কম্পার্টমেণ্টে বসেছিল জগদানন্দ। ট্রেণ ছাড়ার দেরি নেই আর। হঠাৎ বিস্মিত হয়ে দেখল, ওরা সকলে এসেছে স্টেশনে। ওকে আশ্চর্য করে দিয়ে স্বাভাবিক স্বরে বলল মেয়েটি,—'বেশ ত আনন্দবাবু, না বলে-কয়ে চলে যাচ্ছেন ?

লজ্জিত হয়ে জগদানন্দ বলল,—'মানে, তাড়াতাড়িতে সময় হ'ল না আর'—

—'ভেবেছিলাম আর দুদিন থাকতে বলব আপনাকে। আজকের দিনটা ত মাটি হ'ল।'—মেয়েটি ম্লান হাসল।

কাবেরী কাছে এসে বলল,—'কই, আনন্দবাবুকে যে ফেরৎ দেবে বললে ফুলটা ?'—

—'গোলাপফুলটা ?' সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করল জগদানন্দ।

সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে মেয়েটি বলল,—'আপনার ঠিকানাটা দিন আনন্দবাবু'—

—'কি হবে ? পথের আলাপ ত পথেই শেষ হয়'—

সেই গোলাপফুলটা ওর হাতে। পিছনে দাঁড়িয়ে মিটি মিটি হাসছে সাবিত্রী সহায় আর আরতি। কাবেরী বড় সাদামাটা। বুঝতে পারে নি। ফুল দিয়ে একজন প্রবঞ্চনা করে গেছে বলেই কি অন্যের কুসুম উপহার আর একটি মেয়েকে বিলিয়ে দেওয়া যায় ? সে ফুল ফেরৎ দেবে না পথের হাসি। রাখবে নিজের কাছে। প্রথম প্রথম কাঁচের গ্লাসে, জলের উপর ভাসিয়ে। তারপর গ্লাসের ফুলকে টেনে তুলবে মনে,—অতি সঙ্গোপনে। কাউকে ভাগ দেবে না।

অবিশ্যি ঠিকানাটা না পেয়ে একটু মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছে সে। জগদানন্দ জানে। কিন্তু যে ব্যথার কাঁটাটি ওর মন থেকে তুলে দিয়ে এসেছে জগদানন্দ, সেই কাঁটাই যে আবার তা হ'লে একদিন বিঁধত ওকে—। ঠিকানা দিলেই চিঠি দেওয়া-নেওয়া। তারপর যদি একদিন উত্তর দিতে ভুলে যায় জগদানন্দ ? তখন গোলাপকাঁটায় যে ক্ষতবিক্ষত হবে পথের হাসি।

ওর দিকে চেয়ে আছে মেয়েটি। এখন আর হাসি নেই মুখে। জগদানন্দরও ভাল নেই মনটা। কিন্তু ভাল হ'তে কতক্ষণ ? জীবনের দোলকটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে,—হাসি আর কান্না, আশা আর অন্ধকার।

এখুনি ছুটতে সুরু করবে গাড়ি। একটু পরেই দেখা যাবে পাহাড়-পর্বত আর ঘন বনের নীলরেখা। তার আড়ালে এইটুকু সুখ-দুঃখ ঢাকা পড়ে যেতে কতটুকু সময় লাগবে ?

সোবিয়েত সফর

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

২০ অক্টোবর, ১৯৬২। লেনিনগ্রাদ

আজ সকালে উঠতে দেরী হয়ে গেল। আসতোরিয়া হোটেলের কেন্দ্রীয়-তাপদেওয়া ঘরে আরামে থাকার ফল। নিচে নামলাম; লিফ্‌টে সেই বুড়ী, যাকে প্রায়ই দেখি। ঠাকুরমার ঝুলির বুড়ীর মত চেহারা—অজানা ভাষায় তার আনন্দ প্রকাশ। নিচে এসে দেখি বারানিকফ্‌ এসেছেন। ব্রেকফাস্ট খেলাম পেট ঠেসে। তারপর এবার চলেছি পুশ্‌কিনের বাড়ী দেখতে।

আজ শনিবার; বাড়ীটাতে গিয়ে দেখলাম—লেখা আছে—শনিবারে বেলা একটার পর খুলবে; এখন বেলা এগারোটা মাত্র। বারানিকফ্‌ কাকে কি বললেন, গাইড্‌ মহিলা এসে গেলেন একটু পরেই। ছোটখাটো বাড়ীতে অনেকগুলি ঘর ঘুরে ঘুরে দেখলাম। ঘরের দেওয়ালে পুশ্‌কিনের নানা বয়সের ছবি, সমকালীন সেণ্ট পিটার্সবার্গের ছবি—তাঁর স্ত্রী ও আত্মীয়স্বজনের প্রতিকৃতি; যে আততায়ী বন্ধুর গুলীতে তিনি মারা পড়েন তারও ছবি; ডুয়েলে আহত হয়ে বাড়ী আসার ছবি। ব্যাপারটা ঘটেছিল, তাঁর সুন্দরী স্ত্রীর নামে কুৎসা রটনা নিয়ে।

অষ্টাদশ শতকের শেষ বৎসরে পুশ্‌কিনের জন্ম (১৭৯৯)। মায়ের দিকে তাঁরা ছিলেন আফ্রিকার লোক; তাই পুশ্‌কিনের টেবিলের উপর দেখলাম নিগ্রোর মূর্তি। রুশীয় নূতন সাহিত্যের স্রষ্টা পুশ্‌কিন; ফরাসী ভালো জানতেন। ফরাসী সাহিত্যের সেরা বই সবই দেখলাম তাঁর বিরাট্‌ লাইব্রেরীতে। সেক্সপীয়র পড়েছিলেন ফরাসী তর্জমায়। Racine-এর পেলব, দরবারী নাটক থেকে সেক্সপীয়রের স্বাভাবিক নাট্য রচনা-রীতি তাঁকে আকৃষ্ট করে বেশী ক'রে। বাইরণের প্রভাবও কিছু কম পান নি। পুশ্‌কিন প্রথম 'জাতীয়' লেখক বলে স্বীকৃত হলেও য়ুরোপীয় সাহিত্য দরবারে তাঁরই স্থান হয় সর্বপ্রথম।

পুশ্‌কিন বিয়ে করেন নাথালি নান্‌চারোভা নামে এক অপরূপ সুন্দরীকে। মহিলা ছিলেন বিলাসী আমুদে ও খরচে। জারের দরবারে অলস অভিজাত মহলের খুব প্রিয়। এই নিয়ে কথা কানাকানি হয়। সৈনিক বিভাগের d'Anthes কুৎসা রটনার মূলে। পুশ্‌কিন স্ত্রীকে যেমন ভালবাসতেন, তেমনি বিশ্বাস করতেন। কিন্তু স্ত্রী বিশ্বাস রাখতে পারেন নি। সেই সৈনিক বিভাগের লোকটিকে পুশ্‌কিন ডুয়েল বা দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেন। 'দ্বন্দ্বযুদ্ধ তখন নিষিদ্ধ—তাই গোপনে সব ঠিক হয়। বাড়ীর কাউকে কিছু বলেন নি।

সকালে তাঁর টেবিলে বসে যা লিখেছিলেন, তা তেমনি ভাবে রাখা আছে। লেনিনগ্রাদে যে জায়গায় ডুয়েল হয়, সেটার মধ্য দিয়ে গেলাম। ১৮৩৭ সালে সেটা ছিল শহরের বাইরের প্রান্তর। এখন জানা যাচ্ছে যে ফরাসীটি যে রিভলবার ব্যবহার করেন, সে রকম মারণাস্ত্র ডুয়েলে ব্যবহৃত হ'ত না। আর তিনি সেটি সংগ্রহ করেছিলেন ফরাসী রাজদূতের কাছ থেকে। আততায়ী নিজে জামার নিচে বর্ম পরে আসেন। সুতরাং এখন অনেকে বলছেন ওটা প্রায় খুনের সামিল! একটা ষড়যন্ত্রের ফল।

পুশ্‌কিনের মৃত্যুর পর চার্চের একটা অতি নিকৃষ্ট স্থান কবরের জন্য দেওয়া হয়েছিল। বন্ধুরা কিন্তু সেখানে তাঁর সমাধি না করে গ্রামে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে কবর দেয়। মৃত্যুর পর তাঁর পরিবারের লোকও গ্রামে চলে যায়।

পুশ্‌কিনের স্ত্রী নাথালি সাত বৎসর পরে পুনরায় বিবাহ করেন। পুশ্‌কিনের ঔরসে দু'টি মেয়ে জন্মেছিল; বড় মেয়ের চরিত্রচিত্র তোলস্তয় তাঁর 'আনা কারানিনা' উপন্যাসে এঁকেছেন বলে শোনা যায়। পুশ্‌কিনের মেয়েদের বিবাহের পর পদবী বদলে যায় বলে—আর পুশকিন নামে বংশধর পাওয়া যায় না। মস্কোর দোভাষী বন্ধুর নাম কার পুশ্‌কিন কিন্তু।

সকালে হোটেল থেকে বের হবার সময় ভারত সরকার থেকে প্রেরিত উপহারের জিনিষগুলি আমরা অ্যাকাডেমির বাড়ীতে রেখে গিয়েছিলাম। এখন পুশ্‌কিনের বাড়ী থেকে

বের হয়ে গেলাম বিদ্বান্‌ভবনে; বিশাল বাড়ী—সম্রাটের কোন্ আত্মীয়ের প্রাসাদ ছিল। বিপ্লবের ঝড়ে কে কোথায় উড়ে গিয়েছে; আজ সে বাড়ীর ব্যবহার হচ্ছে শিক্ষিতদের ক্লাবরূপে। বাড়ীতে বড় বড় 'হল'; ছবিতে, ভাস্কর্যে পূর্ণ, অনেক যুগের ঘড়ি ও টুকিটাকি কত জিনিষ—একটা ম্যুজিয়ম বলতে পারা যায়। একটা ছোটখাটো স্টেজও আছে। সেখানে আমরা দর্শক হয়ে বসলাম। দেখানো হ'ল 'লেনিনগ্রাদ রক্ষা' বা Defence of Leningrad-এর চলচ্চিত্র। ইংরেজীতে বর্ণনা ছবির সঙ্গে সঙ্গে করা হ'ল। দর্শকদের মধ্যে আমরাই ক'জন।

হিট্‌লারের নাৎসীবাহিনী লেনিনগ্রাদ চারদিক্ থেকে ঘিরেছে—বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে দেশ থেকে। নাৎসী দুষমনরা পুরাতন রাজধানী দখল করেছে—তৈজসপত্র, ছবি, ভাস্কর্য্য রুশ সরকার পূর্বাহ্নে সরিয়ে ফেলেছিল; কিছুটা পুঁতে রেখেছিল। তবুও দুর্বৃত্তদের হাতের ছোঁয়া যেখানে লেগেছে সেখানে তার দাগ রেখে গেছে। পুরাতন রাজধানী দখল করে, লেনিনগ্রাদ ধ্বংস করার জন্য কৃতসংকল্প। খাওয়া-দাওয়ার অভাবে, রোগে ছয়লক্ষ লোক মারা গেল। বোমা পড়ে নেভাস্কার বড় শড়কের ঘর-বাড়ী ভেঙে দিচ্ছে। দশ মাস লেনিনগ্রাদ বিচ্ছিন্ন, একমাত্র যোগ রক্ষা হচ্ছে শীতকালে লাডোগা হ্রদের জমাট বরফের উপর মোটরযান দিয়ে, আর গ্রীষ্মকালে তরল জলের উপর নৌযান দিয়ে। লেনিনগ্রাদ বহুকাল থেকে বহু শিল্পের কেন্দ্র; তাই এই রকম বিপদের মুখেও লোকে যুদ্ধের সরঞ্জাম তৈরী করে লড়েছে। এই অবরোধের সময় যারা মারা যায়, তাদের সমাধিক্ষেত্র দেখতে আসার প্রথম দিনই গিয়েছিলাম—সেকথা পূর্বে বলেছি।

হোটেলে ফিরতে বেলা আড়াইটা হ'ল। লাঞ্চ খেয়ে উঠতেই দেখি লেনা ও ইরা এসেছে নোবিকোভার দূত হয়ে—তাঁদের বাসায় যেতে হবে। নোবিকোভার বাসায় পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল, বারানিকফ্ সঙ্গে আছেন। বিরাট্ বাড়ীর একতলায় কয়েকখানা ঘর পেয়েছেন এঁরা, পাড়াটা নূতন হয়েছে। আমাদের জন্য অপেক্ষা করে ছিলেন সবাই অর্থাৎ নোবিকোভা, তাঁর স্বামী ও সেই মেয়ে দু'টি। এঁদের এক ছেলে বছর চোদ্দ বয়স—তার খাওয়া পরে হবে বোধহয়। শুনলাম, বহুদিন কোন maid পান নি; এখন একজন বৃদ্ধাকে পেয়েছেন। তা না হ'লে সব কাজই নিজেদের করতে হয়। নোবিকোভার স্বামী না জানেন ইংরেজী, না বাংলা। খুব আমুদে লোক—আমাদের সকলকেই ভোদ্‌কা খাওয়ালেন একটু ক'রে। খাওয়া-দাওয়ার বিরাট্ আয়োজন দেখি; খাব কত? আমি খুব সাবধানে খাই—ফলে দুই-একটা পদ মাত্র খেলাম। কিন্তু নোবিকোভার বাংলা পড়ে পড়ে স্বভাবটা হয়েছে বাঙালী গিন্নীদের মত, এটা খাও, ওটা খাও; আরেকটু নাও, এটা বিশেষভাবে রুশীয়—ওটা ভাল লাগবে ইত্যাদি। অনেকক্ষণ খাওয়া চলল। হোটেলেও দেখেছি, খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গল্প-গুজবটা বেশী চলে। অবশ্য সার্ভিং-এ দেরি হয় সেখানে। লেনিনগ্রাদেই আমরা দু'টি রুশীয়ের বাড়ীর মধ্যে আত্মীয়ের মত নিমন্ত্রণ খেলাম।

খাওয়া হয়ে গেলে নোবিকোভা রবীন্দ্র-রচনাবলী থেকে চার অধ্যায়ের কয়েকটা জায়গার অর্থ বুঝে নিলেন; লেনা ও ইরাও বই এনেছিল, তাদের সঙ্গে অনুবাদ নিয়ে কথা হ'ল। মিঃ নোবিকোভা রুশ ভাষায় তাঁর আনন্দ ও আবেগ প্রকাশ করলেন; তিনি লোকসাহিত্য নিয়ে কাজ করেন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে। ছেলেটি লাজুক মনে হ'ল অথবা বড়দের ভোজে ছোটদের দূরে রাখা হয়—জানি না।

আমি নোবিকোভাকে আমার সদ্য প্রকাশিত বই 'শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী' উপহার দিলাম; কৃপালানী তাঁর ইংরেজী রবীন্দ্র-জীবনী দিলেন আর বললেন, 'বড়' বইখানা পাঠাবেন পরে।

হোটেলে ফিরলাম। আজই রাতে ১১-২৫ মিনিটে মস্কো যাত্রা। আসবার সময় সকালে লেনিনগ্রাদ স্টেশন দেখেছিলাম—ছাড়বার সময় রাতে দেখলাম। লেনিনগ্রাদ থেকে বিদায় নেবার পূর্বে লিফ্‌টের সেই বৃদ্ধাকে কিছু উপঢৌকন দেওয়া হয়; বৃদ্ধা কি খুশী—চোখ ছলছল ক'রে বলল—তোমরা ত এখানে আবার আসবে তখন কি আর আমি থাকব? বারানিকফ্ অনুবাদ ক'রে দিয়েছিলেন। সেই বৃদ্ধার সেই সদাহাস্যময় মুখটা মনে আছে। তার জীবনে কত ঝড় গিয়েছে কে জানে—তার পিছনে বহু বৎসরের জীবনরেখা অস্পষ্ট হয়ে আসছে।

পৌনে এগারোটায় মোটর এল। জিনিষপত্র ওঠানো ব্যাপারে পোর্টারদের সাহায্য করতে কারও দ্বিধা হয় না। স্টেশনে সারিবাঁধা কুলি দেখি নি।

আমাদের মেইল ট্রেণ। ডাক উঠছে—তবে ঝুপঝাপ

ক'রে ফেলছে না লক্ষ্য করলাম। আমাদের চার বার্থের কামরা; একজন রুশী ভদ্রলোক ছিলেন। কিছুক্ষণ পরে রেল কর্তৃপক্ষের এক মহিলা কর্মচারী এসে তাঁকে নামিয়ে নিয়ে গেল। বুঝলাম, বিদেশী অতিথিদের আপনার মত থাকবার সুযোগ দেওয়ার জন্য এটা এঁরা ক'রে থাকবেন। বুঝলাম, এটা আভিজাত্য যুগের রাজধানী ছিল।

২১ অক্টোবর, ১৯৬২। মস্কো।

মস্কোতে পৌঁছলাম সকাল সাড়ে আটটায় আন্দাজ; স্টেশনে সেরিব্রকোভ এসেছেন। একটু পরেই লিডিয়া হাজির—সেই কর্মতৎপরতা; মোটরগাড়ি না আসার জন্য ফোন্ করতে ছোটা। গাড়ি এল একটু দেরিতে। এবার আমরা উঠলাম বুদাপেস্ত হোটেলে। উকরেইন হোটেল শহরের কর্মকেন্দ্র থেকে একটু দূরে—আমাদের গাইড বন্ধুদের যাওয়া-আসার অসুবিধা হ'ত বুঝতাম। আমি, রুপালানী ঘর পেলাম তিনতলায়, দ্বিবেদী দোতলায়। এ হোটেল থেকে মহানগরীর কর্মব্যস্ত রাস্তা ছাড়া বিশেষ কিছু দেখা যায় না; উকরেইন হোটেল থেকে মস্কো নদী দেখা যেত—বড় বড় রাস্তা আটতলা থেকে ছবির মত দেখাত।

স্নান ক'রে লাঞ্চ খেয়ে তৈরী হলাম। কার পুশ্ কিন এসে গেছেন, সেরিব্রকোভের কাজ আছে, তিনি বিদায় নিলেন, নিত্যসঙ্গিনী লিডিয়া আছেন। এবার চলেছি সোবিয়েতে আর্থিক উন্নতির স্থায়ী প্রদর্শনী দেখতে। গত বৎসর দিল্লীতে যে শিল্প-প্রদর্শনী হয়েছিল, তারই বৃহত্তর সংস্করণ। আমাদের অ্যাকাডেমির গাড়ি—অফিস থেকে বরিস্ গাড়িশুদ্ধ ভিতরে যাবার অনুমতি-পাস আনলেন। সোবিয়েতের অন্তর্গত ১৫টি রাষ্ট্রের পৃথক্ প্যাভিলিয়ান; প্রত্যেকটি বাড়ী বহু যত্নে নিজ নিজ রাষ্ট্রের স্থাপত্য-বৈশিষ্ট্য রক্ষা ক'রে নির্মিত হয়েছে। সমস্তগুলি দেখার সময় কোথা? তাই একবার উকরেইন মণ্ডপে ঢুকলাম, একবার উজবেকিস্তান মণ্ডপে ঘুরে এলাম; যা দেখলাম—বিস্ময়কর। এই কয় বৎসরের মধ্যে কৃষি, শিল্পে কি উন্নতি করেছে! ফলমূলের কি আকার! কাপড়-চোপড়ের কি বৈচিত্র্য! বিজ্ঞানের উন্নতি দেখবার জন্য আকাশবিহারী astronaut-দের ঘরে নিয়ে গেল। প্রথম স্পুটনিক—তাতে যে খরগোস, গিনীপিগ্ পাঠান হয়, তাদের মূর্তি ক'রে রাখা আছে। প্রথম যে কুকুর যায়, পরে যে লাইকা যায়, তাদের মূর্তি রয়েছে। গাগারিনের আকাশযাত্রার ছবি টেলিভিশনে দেখান হ'ল। গাগারিন আকাশযাত্রার জন্য পোশাক পরছেন—সে পোশাকের কত ব্যবস্থা। কত বিজ্ঞানী দাঁড়িয়ে সে সব সাজগোজ পরাচ্ছেন। বাসে ক'রে গাগারিন এলেন, যন্ত্রমধ্যে উঠলেন। যন্ত্রের কপাট পড়ল, তারপর যন্ত্র উঠল। গাগারিন ফিরে এসেছেন, তাঁর অভ্যর্থনা হচ্ছে; লোকে পাগল ফুল দেবার জন্য। বাড়ীর লোকেরা দাঁড়িয়ে, চোখে আনন্দাশ্রু; ছেলেমেয়েরা বাপকে পেয়ে কি খুশী। রেড স্কোয়ারে এঁদের তিনজনের সম্বর্ধনার ছবি দেখলাম।

সেখান থেকে লিডিয়া নিয়ে চললেন Electronics বিভাগে। কিছু বুঝলাম না—কেবল দেখলাম নানাবিধ যন্ত্রপাতি। শুনেছি মানুষের brain-এ যে-সব কাজ হয়, অর্থাৎ মনে রাখা, ভুল ধরা, হিসাব করা প্রভৃতি, তা নির্ভুলে এবং অল্পকালের মধ্যে করবার শক্তি পেয়েছে এই নূতন যন্ত্রদানব। আজকাল চারদিকেই এই Electronics-এর আমদানী হচ্ছে, একশটা মানুষের কাজ দশটা মানুষ ও একটা কলে করবে। টেপ্ রেকর্ড আবিষ্কৃত হওয়ায় স্টেনো-গ্রাফারের ভাত উঠল। কারখানায় নূতন নূতন যন্ত্র আসছে—বলা হচ্ছে Rationalisation, অর্থাৎ বুদ্ধির কেরামতী চলছে, লোক ছাঁটাই করে জিনিষের দাম কমাব। কিন্তু প্রশ্ন—এতগুলো লোক বেকার হ'ল—তারা খাবে কি? এবং তাদের কেনবার শক্তি নষ্ট হওয়াতে সমগ্রভাবে শিল্পের ক্ষতি হ'ল কি না। অত সব ভেবে কি হবে। আপাতত প্রতি-যোগিতায় আমরা ত দাম কমিয়ে মার্কেট দখল করব! একথা আমার নয়—একজন নোবেল প্রাইজপ্রাপক বিজ্ঞানীর।

লিডিয়ার খুব ইচ্ছা—আলো ও সঙ্গীতের সঙ্গে ইলেক্-ট্রনিক্সের কেরামতি দেখতেই হবে। আমরা একটা ঘরে গিয়ে বসলাম, তারপর অন্য লোকেরা এল। ঘর পূর্ণ হতেই দরজা বন্ধ ও কনসার্ট সুরু হ'ল। বাজনার সঙ্গে সঙ্গে সামনে পর্দার উপর (?) নানা রঙের খেলা আরম্ভ হ'ল। বাজনার সুরটা কোন ইতালীয়ের দেওয়া, সেটা মন্দ লাগছিল না; কিন্তু আলোর সঙ্গে তার যোগটা বুঝা গেল না। লিডিয়া মনে করে, এটা একটা ভয়ানক আবিষ্কার।

মোটরে করে সমস্ত প্রদর্শনীর উপর চোখ বুলিয়ে গেলাম, কেবলই মনে হচ্ছিল, ভারতের মধ্যে এরকম স্থায়ী প্রদর্শনী

থাকলে কেমন হ'ত? হয়ত প্রাদেশিকতার ও ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র গড়ার পাগলামি কিছুটা শমিত হ'ত—পরস্পরকে দেখে ও জেনে।

হোটেলে ফিরে খেয়ে উঠতে বেলা তিনটা বেজে গেল। ক্লান্তি নেই। তখনই বের হতে হবে—প্যানারোমা দেখতে। ব্যাপারটা কি—নেপোলিয়নকে যে বারোদিনের যুদ্ধে কুজিনোভ হারিয়েছিলেন, তার ছবির প্রদর্শনী। ছবির প্রদর্শনী আর কত দেখব—লেনিনগ্রাদে যা দেখেছি, মস্কোতে তেত্রিকভ গ্যালারিতে যে সব ছবি দেখেছি—ঐ সবই ত? যাক্, যাওয়া যাক্, ঘরে বসে কি করব? চল। কার-পুশ্ কিন, লিডিয়া চললেন আমাদের সঙ্গে।

আমি পূর্বে বলেছি, নেপোলিয়ন রুশ আক্রমণ করেন ১৮১২ সালে। যেদিন রুশীয়দের কাছে তাড়া খেয়ে তিনি মস্কো থেকে পালাতে আরম্ভ করেছিলেন, সেই দিনটা স্মরণ করে অর্থাৎ ১৯শে অক্টোবর—দেড়শ' বছর পরে উৎসব হয় মস্কোতে; লেনিনগ্রাদে থাকতে আমরা তার ছবি দেখেছিলাম। সেই দিনের স্মরণে এই প্যানারোমা তৈরী হয়েছে। এক রুশ চিত্রশিল্পী ১২০ ফুট লম্বা ও ১২ ফুট চওড়া ক্যানভাসে বোরোদিনোর সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্রটি এঁকেছিলেন। ছবিটার উপর দিয়ে অনেক ঝড় যায়, খানিকটা নষ্টও হয়ে গিয়েছিল; আধুনিক শিল্পীরা খুব যত্ন করে সেই বিরাট্ চিত্রটাকে মেরামত করেছেন। আমরা পৌছলাম একটা বড় কাঁচের বাড়ীতে। কী মসৃণ মেঝে; ভয় হয় পিছলে না পড়ি। ওভারকোট রেখে আগাতেই দেখা হ'ল ডিরেক্টরের সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে পরিচয় করানো হ'ল। তিনি পূর্বে মিলিটারীতে কাজ করতেন—এখন অবসর নিয়ে এখানকার কর্তা হয়ে আছেন। আমাদের নিয়ে ডিরেক্টর স্বয়ং চললেন একটা চত্বরের উপর—ব্যাণ্ড স্ট্যাণ্ডের মত জায়গা। সেই জায়গাটায় উঠে হকচকিয়ে গেলাম। কোথায় মস্কো শহর—এ ত যুদ্ধক্ষেত্র। যেদিকে তাকাই, যুদ্ধের ছবি! ডিরেক্টর শুনলেন যে আমাদের তোলস্তয়ের War and Peace পড়া; খুব উৎসাহিত হয়ে রণাঙ্গনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিতে লাগলেন। ঐ দেখুন সেনাপতি কুজিনোভ—ঐ দেখা যাচ্ছে—নেপোলিয়ন সাদা ঘোড়ার উপর চড়ে, ঐ তাঁর বিশ্বস্ত সেনাপতি মার্শাল নে। ঐ ফরাসীরা হেরে পালাচ্ছে: ঐ ঘোড়ার গাড়িতে আহত সেনাপতিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। গ্রামে আগুন লেগেছে—ধোঁয়া উঠছে যে মনে হচ্ছে। অচল ছবি যেন জীবন্ত মনে হচ্ছে। এ রকম চোখ-ধাঁধানো ব্যাপার দেখি নি। লেনিনগ্রাদে পুতুলনাচ দেখতে গিয়ে চোখের উপর চালাকির খেলা দেখেছিলাম—ছোট ছোট পুতুলগুলো স্টেজে দেখাচ্ছিল আসল আকারের মানুষ, গরু, কুকুর। এখানেও সেই চোখের ভ্রম। প্রায় ঘণ্টাখানেক দেখা হ'ল। তার পর নেমে এলাম নিচে। আবার শহর দেখা গেল—সেই জনতা—সেই গাড়ি-বাস্-এর চলাচল। অফিসে গেলাম, আমাদের মতামত লিখতে হ'ল খাতায়। অনেক ফটো উঠেছে ইতিমধ্যে। দুটি রুশীয় ছেলে আমায় দেখে খুব কৌতুক বোধ করছিল; আমি তাদের কোলের কাছে টেনে নিলাম। ফটোগ্রাফার দেখছি—একটা ফটো তুলে নিলেন—এক বৃদ্ধ ভারতীয় দু'টি রুশীয় বালককে আদর করছেন—প্রাচীন ভারত ও নবীন রুশের প্রতীক যেন আমরা।

বের হ'তে সন্ধ্যা হয়ে গেল। এখনি যেতে হবে সিনেমায়; টিকিট করা আছে। রাস্তা পেরিয়ে ট্যাক্সি পেলাম—তাই ঠিক সময়ে থিয়েটার হলে পৌঁছতে পারা গেল। ক্লোকরুমে ওভারকোট টুপি রেখে ছুটতে ছুটতে উপরে উঠে গেলাম। ভাগ্যে দেরি হয় নি।

থিয়েটার হচ্ছে তোলস্তয়ের Living Corpse বা জ্যান্ত মড়া নাটকের। আমাদের খুব ভাল লাগল। রুশী ভাষা হওয়া সত্ত্বেও অভিনয় বুঝতে অসুবিধা হ'ল না, কাহিনীটি জানা ছিল ব'লে। অ্যাক্‌টিং খুব ভাল লাগল; সংঘাতের দৃশ্যগুলি মনকে স্পর্শ করে। কাহিনী নায়ক সত্যই মরে প্রমাণ করল যে ইতিপূর্বে সে মৃত্যুর অভিনয় করেছিল!

২২ অক্টোবর ১৯৬২। মস্কো-য়াসনাপোলিয়ানা।

আজ তোলস্তয়-এর জন্মভূমি Yasnapolyana দেখতে যাব। ভোরে উঠেছি; বৃষ্টি পড়ছে টিপ টিপ করে; আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, কন্‌কনে হাওয়া বইছে। বের হবার দিন নয়, তবুও যেতে হবে। বরিস ও লিডিয়া এসেছেন—অ্যাকাডেমির গাড়ি আসতে দেরি করছে। লিডিয়া ফোন-এ যাচ্ছে বার বার। গাড়ি এল সাড়ে ন'টায়, বের হ'তে হ'তে পৌণে দশটা হ'ল; মস্কো থেকে ২০০ কিলোমিটারের বেশী পথ অর্থাৎ কলকাতা থেকে আসানসোল।

মহানগরী থেকে বের হলাম, কিন্তু বহুদূর টুকরো টুকরো

শহর পড়ছে পথে। কুঁড়ে ঘর, বাসের অযোগ্য বাড়ীর বদলে মানুষের থাকবার মত বড় চার-পাঁচতলা বাড়ী তৈরী হচ্ছে। চলেছি; গাড়িতে বেগ দিতে পারছে না, রাস্তা ভিজে, পাছে গাড়ির চাকা পিছলে যায়। পথের ধারে বিজলী বাতির পোল ও তার—বাড়ীতে বাড়ীতে টেলিভিশনের দাঁড় খাড়া। একক বাড়ীগুলি মনোরম নয়; এসব সরকারী রাষ্ট্রীয়ত্বে এখনও আসে নি। ঘোড়ার গাড়িতে কপি, তরমুজ চলেছে, বেশীর ভাগ চলেছে শহরমুখো বড় বড় ট্রাকে। রাস্তা সোজা, বহুদূর দেখা যাচ্ছে; দু'পাশে মাঠ; কোথাও বন, বার্চ গাছ বেশী, অন্যান্য গাছও আছে। দূরে গভীর অরণ্যের মত দেখা যাচ্ছে। বসতি আবার—ছোট গ্রাম, দরিদ্রের বাস—হাঁস-মুরগী চরছে পথের ধারে। একটা মাঠে অনেকগুলি গাই গরু—জানি না সেটা যৌথ বাথান কি না। দু'টি লোক ঘোড়ায় চড়ে চলেছে—সঙ্গে একপাল গরু—চরাতে না মারতে নিয়ে যাচ্ছে জানি না। একটা শহর পেলাম, বড় বড় বাড়ী, ট্রাম, বাস, দোকান পাট, সিনেমা, থিয়েটার-বাড়ী পেরিয়ে চলেছি। ওকা নদী ঐ ত—নৌকা চলছে। এই নদীতে ত মস্কো নদী পড়েছে—আবার এগিয়ে পড়েছে ভলগায়। টুলা (Tula) শহরে এলাম—এটা একটা জেলার সদর; মস্কো থেকে আমরা প্রায় দেড়শ কিলোমিটার এসে পড়েছি। এ শহরের খ্যাতি শুনেছি—সামোভার-কেৎলি ও কামান বন্দুক করার জন্য। জার বরিশ গদুনোভ এখানে সব প্রথম বন্দুক কামান তৈরীর কারখানা তৈরী করান। ইনি মস্কো ক্রেমলীনে ঘণ্টাঘর নির্মাণ করান (১৬০০); তখন ভারতে ফতেপুর সিক্রী, সিকান্দ্রা নির্মিত হয়ে গেছে।

টুলায় এসে কোনদিকে য়াসনাপোলিয়ানায় যেতে হবে কেউ জানে না। বরিস, লিডিয়া বা ড্রাইভার এ পথে কখনো আসেন নি। কৃপালানী রেলে এসেছিলেন—পথ বাতলাতে পারছেন না। ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে কোন পথিককে 'তাবারিশ' বলে সম্বোধন করছে, পথ জেনে নিয়ে চলছে আবার।

Yasnapolyana এলাম; ছোট শহর। বড় বড় ইমারত সুরু হয়েছে, বড় একটা আবাসিক বিদ্যালয় দেখা যাচ্ছে। গাড়ি এসে থামল একটা রেস্তোরাঁর সামনে—এখানে হোটেল নেই। তখন বেলা ২টা। রেস্তোরাঁতে ঢুকলাম, ওভারকোট প্রভৃতি রেখে হাত-মুখ ধুলাম; কিন্তু প্রাকৃতিক ক্রিয়া সম্পন্নর জন্য কাদা ঠেলে অনেকখানি যেতে হ'ল; এবং যে জায়গাটায় এলাম, সেখান থেকে বের হয়ে আসবার জন্য যথাসাধ্য তাড়াতাড়ি করলাম। বুঝলাম, সভ্যতার হাত এখনও সর্বত্র পৌঁছয় নি; অথবা একদল মানুষকে নোংরা জিনিষ ঘাঁটবার জন্য ব্যবস্থা পাকা হয় নি।

খাওয়া ভালই লাগল; বুদাপেস্ত হোটেল থেকে নিন্দনীয় ত নয়ই। মেয়েরাই সার্ভ করছিলেন। এখানে মদ দেয় না; তাই কৃপালানী, বরিস শুধু বীয়ার খেয়েই তৃষ্ণা মেটালেন। এখানে একটা জিনিষ লক্ষ্য করলাম। আমরা আমাদের ড্রাইভারকে ডেকেছি একসঙ্গে খেতে, সে লোকটি বীয়ার স্পর্শ করল না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, উনি কি মদ খান না? বরিস বললেন, মোটর গাড়ি যখন চালায়, তখন চালকদের পক্ষে মদ খাওয়া নিষেধ। পথে মিলিশিয়াম্যান বা পুলিশ আছে, তারা হঠাৎ গাড়ি থামিয়ে ড্রাইভার মদ খেয়েছে কি না পরখ করে, মুখ দিয়ে 'হা' শব্দ করতে বলে; মদের গন্ধ পেলেই সর্বনাশ, তার ট্যাক্সি বা গাড়ির নম্বর টুকে পাঠিয়ে দেবে উপরওয়ালারে কাছে। মদ খেয়ে গাড়ি চালানো সম্বন্ধে আমাদের দেশে কোনো নিয়ম নেই। একদিন শেওড়াফুলি যাচ্ছি, একটা সভার আহ্বান। মোটরে যাচ্ছি। পথে দুই ছোকরা গাড়ি চালিয়ে আসছে—আমাদের গাড়ির গা ঘেঁষে ধাক্কা মারল। দুই গাড়ি থেমে গেল। আমি নেমে ধাক্কাদার গাড়ির আরোহীকে ধরলাম—মুখ দিয়ে মদের গন্ধ ছাড়ছে। পুলিসে দেবার জন্য জনতাকে বললাম। কাকুতি-মিনতি করতে ছেড়ে দিয়ে গন্তব্যস্থলে চললাম। এরা নতুন পয়সা পাওয়া অভিজাত। রাতে যারা ট্রাক চালায়, তাদের কথা সুবিদিত। গুরু অনেক উপদেশ দিয়েছিলেন, তামাকটি খেয়ো না বাপধনরা। কিন্তু মদ খেয়ো না—এ কথা বলতে তাঁর ভদ্রতায় বোধহয় বেধেছিল। যারা তাঁর কাছে দীক্ষা নিতে এসেছে, তারা কি মদ খেতে পারে? তাই ও-নামটা করেন নি। তাই মদ সম্বন্ধে এমন উদার তারা। মত্ত চালকের গাড়িতে চড়েছি। অবশ্য বেশীর ভাগই ভদ্র—এ কথা বলবই।

লিডিয়া তোলস্তয়ের জমিদারী বা এস্টেটের মধ্যে গিয়ে জেনে এলেন, গাড়ি নিয়ে আমরা ভিতরে যেতে পারি কি না। এসে বললেন, গাড়ি নিয়ে আমরা যেতে পারি,

আর গাইড অপেক্ষা করছেন আমাদের জন্য। বুঝলাম, আমরা যে এখানে আসব, সে খবর আগেই এসে গিয়েছে।

গাইড ভদ্রলোকের নাম পি. নিকোলাই; তিনি সুশিক্ষিত, তোলস্তয়ের দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়। তোলস্তয়কে তিনি দেখেন নি; তাঁর জন্ম হয় ১৯১০-এ—যে বৎসর তোলস্তয় মারা যান। তোলস্তয় এইখানে জন্মগ্রহণ করেন। সে বাড়ী নেই, তবে যেস্থানে বাড়ীটা ছিল, সে স্থানটি আমাদের দেখান হ'ল। ৩০০ হেক্টার বনভূমি ও জমিজমার মধ্যে কাউন্টের বাড়ী; অরণ্যের মধ্যে আরণ্যকের বাস।

দোতলা বাড়ী; ঢুকবার মুখে জুতোর উপর কাপড়ের জুতো পরতে হ'ল। নিকোলাই আমাদের জামায় তোলস্তয়ের মূর্তি খোদাই ব্যাজ এঁটে দিলেন। ব্যাজ এঁটে দেওয়া —এটা সোবিয়েতের সমস্ত প্রতিষ্ঠানেই আছে। স্মারক চিহ্ন হিসাবে খুব ভাল। বাড়ীর যেখানে যা যেমনভাবে ছিল, সেটা রাখবার চেষ্টা হয়েছে। কত লোক দেখা করতে আসত—শিল্পী সাহিত্যিকই নয়, তাঁর প্রজারা আসত—সুখে-দুঃখের কথা বলতে, উপদেশ নিতে। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর এস্টেটের অনেকখানি অংশ প্রজাদের মধ্যে বিলি ক'রে দিয়েছিলেন।

বেশ বড় লাইব্রেরী, হাজার চব্বিশ বই—নানা ভাষায়। তোলস্তয় নিজে জানতেন ১৩।১৪টা ভাষা। আরবী ও তুর্কী শিখেছিলেন যৌবনে, চর্চার অভাবে সেটা ভুলে যান পরে। বই-এর মধ্যে গান্ধীর জীবনী Doke-এর লেখা চোখে পড়ল। এই য়াসনাপোলিয়ানাতে দেখা করতে এসেছেন তুর্গেনিভ। উভয়ের মধ্যে দেখা হয় পিটার্সবার্গে, প্যারিসে; পত্র বিনিময় হয়েছে সাহিত্য নিয়ে। মতভেদ চূড়ান্ত থাকা সত্ত্বেও উভয়েই পরস্পরকে শ্রদ্ধা করতেন। য়াসনাপোলিয়ানা তখন (১৮৭৮) বহুজনপূর্ণ; জমিদার বাড়ী আত্মীয়কুটুম্বপূর্ণ—অতিথি অভ্যাগত লেগেই আছে।

দোতলার ঘরে তোলস্তয়ের এবং তাঁর স্ত্রী ছেলেমেয়ের প্রতিকৃতি রয়েছে। ১৮৮৭ সালে শিল্পী রেপিন (Repin) এলেন এঁর ছবি আঁকতে। দুটো ছবি চিত্রিত করলেন—একটা ঘরে ব'সে লিখছেন, অপরটি হেলান চেয়ারে আরাম করছেন। বসা চিত্রটা ঘরে দেখলাম, অপরটি দেখেছিলাম তেত্রিয়াকভ চিত্রশালায়। রেপিন তোলস্তয়কে লাঙ্গল-ঠেলা অবস্থায় দেখবার জন্য মাঠে মাঠে ঘুরে তাঁর স্কেচ ক'রে নেন, সেটা তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিকৃতি; যার মধ্যে তাঁর প্রকৃতিও ফুটে উঠেছে—সভ্যতার উপদ্রব থেকে উদ্ধার পাবার নিরন্তর চেষ্টার প্রতীক এই ছবি। এক আত্মীয়হীন বৃদ্ধার জমি চাষ দিচ্ছেন—আত্মীয়, বন্ধুদের বিরাগভাজন হয়েও। তোলস্তয়ের জীবনের কথা বলতে গেলে পুঁথি বেড়ে যাবে। মোটামুটিভাবে সকলেই জানেন যে তিনি চার্চের বা গভর্ণমেন্টের শাসন বিষয়ে তীব্র সমালোচক ছিলেন। ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি অর্জন তিনি পছন্দ করতেন না। ফরাসী বিপ্লবের পূর্বে ভলটেয়ার যেমন তাঁর রচনা দিয়ে ফরাসী জাতির মন বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত ক'রে যান, রুশ বিপ্লবের অনেকখানি প্রস্তুতির আয়োজন দেখতে পাই, তাঁর সাহিত্যে ও জীবনে। তবে তাঁর জীবন ছিল দুটো প্রচণ্ড বিরুদ্ধ পদার্থের মধ্যে টানাটানি। মন বলে, এটা কর, দেহ বলে, না; দেহ বলে, এটা মধুর, মন বলে, না; এই ছিল তাঁর সংগ্রাম। এই সংগ্রাম ছিল ঘরের লোকের সঙ্গে। যে রমণীকে তিনি ১৪টি সন্তানের জননী করেছিলেন, তাঁকে তিনি মৃত্যুকালে কাছে আসতে দেন নি। আত্মখণ্ডন চরমে উঠল, যেদিন তিনি য়াসনাপোলিয়ানার বাড়ী ছেড়ে রাত্রিবেলা ডাক্তার ও ছোট মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে বের হয়ে গেলেন। পথে ঠাণ্ডা লেগে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অস্টপোবো (Astapovo)—বর্তমানে লিও তোলস্তয় নামে ছোট একটা রেল স্টেশনে এই মহাপ্রাণের মৃত্যু হয়। ছেলেমেয়েরা সন্ধান পেয়ে আগেই এসে যায়; স্ত্রী ট্রেণের কামরায় আছেন, দেখা হ'ল না।

মৃতদেহ বাড়ীতে এনে যে ঘরে কফিন রাখা হয়েছিল, সে ঘরটি দেখলাম। অসংখ্য লোক দেখতে আসে এই মহাপুরুষকে। বাড়ীর একটা দিকে দরজা ভেঙে দেওয়া হয় —সেদিক্ দিয়ে ঢুকে কফিন দেখে অন্যদিক্ দিয়ে লোকে বের হয়ে যায়।

বাড়ীতে কোথায় বসে কোন্ বই লিখেছিলেন, কোন্ ঘরে কি ভাবে থাকতেন—সব দেখে চললাম তাঁর কবর দেখতে। খ্রীষ্টান পাদরীরা বলেছিল,ঐ নাস্তিককে তাদের চার্চে কবরিত হ'তে দেবে না। তোলস্তয় নাস্তিক ছিলেন না; তাঁর আন্তরিক ঈশ্বর-নির্ভরশীলতা, তাঁর কঠোর নীতিজ্ঞানের গভীরতা বুঝবার শক্তি সাধারণ ধর্মান্ধদের কাছ থেকে আশা করা যায় না। তোলস্তয়ের সমাধিক্ষেত্র দেখতে চললাম—

বৃদ্ধ বার্চ অরণ্যের মধ্য দিয়ে পথ ; তুষার লেগে এদের গায়ের রং শাদা হয়ে গিয়েছে। শুনলাম হিট্‌লারের নাৎসীবাহিনী এই অঞ্চল দখল করে এই বাড়ীর ও অরণ্যের অনেক ক্ষতি করেছিল। অরণ্যের পথে চলেছি, চলেছি, কি গম্ভীর. কি মহান্। একটি বার্চ গাছের তলায় ঘাসে ঢাকা কবরতলে মহাপুরুষের দেহ সমাধিত রয়েছে। আমরা সেখানে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম। আসবার সময় নিকোলাইকে বললাম, এখানকার দু'টি ছোট ফুল ও বার্চের একটি শাখা পেতে পারি কি? তিনি সানন্দে তা দিলেন। সেগুলি সযত্নে রেখেছি—বন্ধু-বান্ধবরা চেয়েও নিয়েছেন—তীর্থক্ষেত্রের স্মারক-চিহ্ন ব'লে।

মনে পড়ল মস্কোর লেনিন মসোলিয়ম, দিল্লীর রাজঘাটে গান্ধীর উদ্দেশে নির্মিত সমাধিক্ষেত্র। রাজঘাট একবার দেখেছি—দ্বিতীয়বার গিয়ে দেখতে ইচ্ছা হয় নি। সেখানে গেলেই মনে পড়ে সাবরমতীর ঘর, সেবাগ্রামের কুটির; নেকেড্ ফকিরের সমাধি নিরাভরণ হ'লেই মানাত। তাঁর কি এই রাজসিক সমাধিক্ষেত্র শোভা পায়? লেনিন মসোলয়মে লেনিনের দেহ দেখে মনে হয়েছিল—মানুষের নশ্বর দেহ ত একদিন ধ্বংস হবেই—তবে এ কিসের মোহ? মানুষ পুতুল চায়—ধর্মের জন্য হোক আর রাজ্য ভাঙাগড়ার জন্যই হোক! তোলস্তয় ছিলেন সকল প্রকার শক্তিবাদের মূর্তিমান প্রতিবাদ—কি রাজকীয়, কি ধর্মীয়—তাই চার্চ তাঁকে তাদের সমাধিক্ষেত্রে স্থান দেয় নি। তাঁর ইচ্ছায় তাঁর দেহ অরণ্যের মধ্যে ধরিত্রী-বক্ষে সমাহিত হয়।

মস্কো ফিরলাম প্রায় রাত দশটায়—ফিরতে চার ঘন্টা মোটরের মধ্যে তালগোল পাকিয়ে বসে; গল্প-গুজব-হাসি, ঠাট্টার মধ্যে গুরুগম্ভীর আলোচনাও চলছিল। বরিস বাংলা জানে শুধু না, ভাষার মধ্যে রসিকতা বোঝে এবং করতেও পারে।

বুদাপেস্ত হোটেলে পৌঁছে খাবার ঘরে গেলাম। অনেক রাত পর্যন্ত খাওয়া-দাওয়া চলে—লোকে প্রচুর মদ খায়; আমাদের তিনটা টেবিলের পরে দেওয়াল ঘেঁষে একটা টেবিলে এক জোড়া মেয়ে-পুরুষ বসে কি মদটাই গিলছে। শেষকালে দেখি, মেয়েটার এমন নেশা হয়েছে যে, পুরুষটাকে চুম্বন করবার জন্য বার বার এগিয়ে যাচ্ছে। জানি না তারা কোন্ শ্রেণীর বা কোথাকার লোক। নির্লজ্জতার একটা সীমা আছে। খেয়ে বের হয়ে এসেছি; লাউঞ্জে এক বিরাট্‌কায় রুশ ইঙ্গিতে ডাকল, বুঝিয়ে দিল—ভিতরে এস। কৃপালানী সঙ্গে ছিলেন—গেলাম ভিতরে। বরিস্ তখন হিসাবপত্র মেটাচ্ছিল। আমি তাকে ডাকলাম। ইতিমধ্যে মেয়ে সেবিকা একজন অত্যন্ত বিরক্তকণ্ঠে বলে উঠল—লোকটা মাতাল, লোকটা মাতাল। বিদেশীদের এভাবে আহ্বান করার জন্য তারা সকলেই লজ্জিত।

—•—

ভাষা ও সুর

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

বলনি যে, ভালই করেছ।
ও কথা বলেছে কত পানখাওয়া পিচ-ফেলা মুখ
কানপাশা উপহার পাওয়া কত কানে।
ঐ পচা পুরণো কথাটা
বলনি যে, ভালই করেছ।

একটা পুরণো পচা কথা
বলা বাকী থেকে গেল ব'লে দুঃখ কেন?
কত-কিছু বাকী থেকে যায়।

বর্ষা এসে ফিরে গেল।
কত কান্না কেঁদে গেল,
কত দীর্ঘশ্বাস ফেলে গেল,
কত যে করুণ ছায়া আদিগন্ত মেলে গেল,
কিছু বলা হ'ল তার?
কত যুগ কেটে গেল।

ঝুঁকে-পড়া গাছটির ঝাঁকড়া পাতার নীচে ঢাকা
ওদিকটা দীঘির জলের,
যেখানে সাঁতার দিয়ে যায় না ছেলেরা।
খড়ের গাদার পাশে আগাছার বনে
মুখচোরা ছোট দু'টি ফুল।
আকাশে খানিক উঠে থমথমে হয়ে থেমে-থাকা
চিমনির ধোঁওয়া।
আঁধারে নদীর জলে দাঁড়ের আঘাত
অজানা নায়ের।
ছায়ামূর্ত্তি গাছগুলি দূরের গাঁয়ের।
সমুদ্রের কলোচ্ছ্বাস।
পাহাড় প্রান্তর বন আকাশ বাতাস।
ঝিঁঝিঁডাকা রাত।
পাখী-ডাকা প্রতিটি প্রভাত।—
সকলেরই কিছু কথা আছে
যে-কথা হয় না বলা, বাকী থেকে যায়।

ঝিঁঝিঁগুলি কত রাত ধ'রে
ডেকে ডেকে ক্লান্ত হয়ে থেমে থেমে ডাকে,
তারপর বন্ধ করে ডাকাডাকি।
যা-কিছু বলার কথা থেকে যায় বাকী।

তারাগুলি সারারাত ছলছল করে
কোন্ বাণীহীন বেদনায়।

কোন্ কথা বলা যায়?
যদি বলা যেত,
গাছে গাছে ফুল ফুটে ঝরত না
নূতন ফুলের আশা নিয়ে,
আসত না ঋতু ঘুরে ঘুরে।
শেষ গানখানি গেয়ে বিদায়ের সুরে
রূপসী এ বিশ্বসৃষ্টি পিয়ানোর বন্ধ ক'রে ডালা
উঠে গিয়ে বন্ধ ক'রে দরজা-জানালা
ঘর অন্ধকার ক'রে শুতে যেত।

তোমার আরো ত কত-কিছু
বাকী থেকে গেল।

তোমার একটি কান্না ভাল ক'রে কাঁদতে পারনি।
পারলে এ আকাশের হয়ত কোথাও
চিড় ধ'রে যেত।
কোনো কোণ থেকে তার
হয়ত কিছুটা
গ'লে প'ড়ে যেত।
আকাশ আকাশ থাকত না।
সেই কান্না বাকী থেকে গেল।
তোমার একটি হাসি ছিল,
ছুরীর ফলার মত হাসি,
আকাশকে ফালিফালি ক'রে দিত,
আকাশ আকাশ থাকত না।
সে-হাসিটি বাকী থেকে গেল।
একটি অমল আশীর্ব্বাদ
ফুটেছে ফুলের মত মনের গহনে
যখন যেখানে যার মুখে তাকিয়েছ।
কাকেও হ'ল না বলা, বাকী থেকে গেল।

সবই যদি বাকী থেকে যায়,
বলবার মত সব কথা,
তোমার ও কথাটাও বাকীই থাকুক,
ঐ পচা পুরণো কথাটা।

নীরবতার কি কিছু ভাষা নেই ?
ভাবো সেই যুগ,
ভাষা-সৃষ্টি হয়নি যখন
সে-যুগের মানুষের ভাষা।

মরচে-না-ধরা মন,
ঝকঝকে তার ভালবাসা
জানাবার ভাষা।

আমরা সে-ভাষা ভুলে গেছি।

সে-ভাষা কি সুর হয়ে গেছে,
যার ছোঁওয়া পেলে
গান আজও গান হয়,
কবিতা কবিতা হয় ?

সাধারণ মেয়ে

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

অনেকে অনেক কিছু চায়।
কেউ তোমার মন, কেউ বা বাঁকা হাসি,
নীল চাউনি,
কেউ বা হাত, কেউ বা দেহ।

আমাকে তুমি দেবে
গানের শুধু একটি কলি ?
যাতে জীবনের সব জ্বরের ডিলিরিয়াম
বসন্ত-পলাশের মতো আলো হয়ে ওঠে,

যাতে না-পাওয়ার স্মৃতিগুলো
ভেসে যায় শরতের শাদা মেঘ হয়ে,
যাতে যন্ত্রণাগুলো
উড়ে যায় বসন্তের প্রজাপতির মতো ?

ওগো অসাধারণ মেয়ে !
দেবে কি গানের সেই কলি ?
তুমি তো কৃপণ নও বিধাতার মতো !

বন্দরের ছায়া

শ্রীসুনীলকুমার নন্দী

বন্দরে বিষণ্ণ ছায়া, মূর্ছিত প্রহর—
তুমি কেন উন্মনা হে প্রিয় সুন্দর।

স্মৃতির সিঁদুর মোছ, ভোল প্রতিশ্রুতি,—
জোয়ারে উদ্বেল তীর···ভাসার প্রস্তুতি···

জাহাজে মাস্তুলে পালে ব্যস্ত কোলাহল···
তোমার গোপন ইচ্ছা থই থই জল।

আমিও ভাসাই স্রোতে রক্তের মিনতি—
বন্দরে মলিন ছায়া আমার নিয়তি।

হেমন্তের স্বপ্ন

শ্রীকৃষ্ণধন দে

কুয়াসার মেঘখানি সরে সরে যায়
এ ঘাটের কাছ থেকে ও-ঘাটের গা'য়,
রাঙা রবি উঁকি মারে বেউড় বাঁশের ঝাড়ে,
নাচে জল ছল-ছল সোনালী আভায় !

শাঁখ-চিল ঘুরে ঘুরে কোথা উড়ে যায়,
ধানের সুবাস ঝরে বাতাসের পা'য়,
শিশির জমেছে ঘাসে শীত বুঝি আসে-আসে,
প্রজাপতি গাঁদাফুলে রৌদ্র পোহায় !

হে মোর হারানো দিন, এলে কী আশায় ?
যৌবন গেছে চ'লে কি দেব তোমায় !
মাঠের বাতাসে-মেশা খেজুর-রসের নেশা,
—তোমারি স্বপন দেখি প্রভাতবেলায় !

তবুও হেমন্ত, তুমি হও নি বিলীন,
অতীত স্মৃতির মাঝে আছ চিরদিন !

হরতন

বিমল মিত্র

(১৭)

কেষ্টগঞ্জের জীবনে এ-এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। একটা মানুষ একদিন সকলের কাছে মান্যগণ্য ছিল, সকলের শ্রদ্ধা-ভালবাসার পাত্র ছিল। একদিন এই কেষ্টগঞ্জের মানুষ কর্তা-মশাইকেই তাদের দেবতা ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়েছিল। কিন্তু কখন যে দিনকাল সব উল্টে গেল, দুলাল সা'ই তাদের নতুন দেবতা হয়ে গেল, তা তারা নিজেরাও টের পায় নি।

কিন্তু এতদিন পরে আবার যেন পাশার খেলা উল্টে যেতে বসেছে।

চণ্ডীবাবুকে দেখে হরতনও কেমন যেন আবার অনেক দিন পরে সতেজ হয়ে উঠেছে।

—কেমন আছো মা?

—বাবা!

শুধু মাত্র একটি কথা। কিন্তু ওই একটি কথাতেই দু'জনের প্রাণ যেন জুড়িয়ে গেল। কত মাস কত বছর কত রাত একসঙ্গে কেটেছে বাপ আর মেয়ের। কত নগণ্য গ্রামের কত অখ্যাত চণ্ডীমণ্ডপে এই মেয়েকে নিয়ে চণ্ডীবাবু যাত্রা করতে গিয়েছে। কত লোক কত মেডেল দিয়েছে এই মেয়েকে, আজ এইখানে এই কর্তামশাই-এর বাড়ীর অন্দরমহলে দাঁড়িয়ে সে-সব কথা মনে করতে ভাল লাগল। চণ্ডীবাবুর চোখের সামনে যেন রাণী-রূপকুমারীর রূপটা ভেসে উঠল জ্বল্ জ্বল্ করে।

—কে করছে এখন রূপকুমারীর পার্ট বাবা?

—আর বলিস্ নি মা, তুই নেই, আর আমার সব গেছে। দল এবার তুলে দেব ভাবছি—

—না বাবা, দল তুলে দিতে পারবেন না। দল আমি তুলে দিতে দেব না—যা টাকা লাগে আমি দেব, দাদু দেবে—

কর্তামশাই পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। বললেন—না না, দল কেন তুলে দেবেন আপনি? দল তুলে দেবেন না। আমি টাকা দেব—দল চালিয়ে যান—

চণ্ডীবাবু বললে—টাকা থাকলেই ত আর দল চালানো যায় না কর্তামশাই, মেয়ে চাই যে! এই আপনার হরতনের মত আর একটা মেয়ে দিন, আমি দল চালাচ্ছি—

তার পর একটু থেমে আবার বললে—সায়েব-সুবোরা সেকালে ছিল, আমার এই মেয়ের পার্ট দেখে কত বখশিস্ দিয়েছে তা ত আমি ভুলি নি। এই মেয়েই ত ছিল আমার লক্ষ্মী কর্তামশাই, এই লক্ষ্মী যাবার পর থেকেই আমার দল ভেঙে পড়ছে—

তা কথাটা মিথ্যে নয়। যারা চণ্ডীবাবুর দলের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করে তারাও হাড়ে-হাড়ে কথাটা বুঝেছে। তারাও জানে আর একজন ভালো, 'রাণী-রূপকুমারী' না পেলে ভাঙা দল আর জোড়া লাগানো যাবে না।

কর্তামশাই বললেন—আমার বাড়ির উঠোনে একদিন গাওনা হোক চণ্ডীবাবু, আপনার খরচ-পত্তোর যা লাগে দেব —হরতনও একবার দেখবে যাত্রা গান—

চণ্ডীবাবু বললে—সে ত অতীব আনন্দের কথা কর্তা-মশাই—

আমার পক্ষেও আনন্দের কথা চণ্ডীবাবু! আমার এখানে একজন নতুন বড়লোক হয়েছে, সে কথায়-কথায় যাত্রাগান দেয়, আমার বহুদিনের ইচ্ছে আমিও একদিন যাত্রাগান দিই—

ভারি খুশী চণ্ডীবাবু।

—আপনার সামনে গাইবো, এ ত আনন্দের কথা। তা হ'লে আমরা একবার ঘুরে আসি—বায়না নিয়ে ব'সে আছি দু'জায়গায়, সেটা সেরে ফেরবার পথে কেষ্টগঞ্জ ঘুরে যাব—

তার পর চারদিকে চেয়ে দেখতে লাগল চণ্ডীবাবু। কি চমৎকার বাড়ী! বাঙলা দেশে অনেক বাড়ী দেখেছে চণ্ডীবাবু। অনেক রাজা-মহারাজার জমিদারিতে গিয়ে গাওনা করে এসেছে। কিন্তু এ যেন নিজের বাড়ী মনে হ'ল তার কাছে।

চণ্ডীবাবু বললে—আপনার হওয়াও যা, আমায় হওয়াও তাই কর্ত্তামশাই—

কর্ত্তামশাই বললেন—আমার আর বলছেন কেন, এ সবই ত আমার মা'র, আমার হরতনের—ওই মায়ের জন্তেই ত আমার আবার সব হ'ল চণ্ডীবাবু। দয়া করে মা আমার এলেন ঘরে তাই লক্ষ্মী এলেন, নইলে এ সব ত শ্মশান হয়ে পড়ে ছিল য়্যাদ্দিন।—

হরতনও শুয়ে শুয়ে সব শুনছিল। কিন্তু আর বেশিক্ষণ শুতে ভাল লাগছিল না।

বললে—আমি উঠব দাদু—

বন্ধু ছিল পাশে। হাঁ হাঁ ক'রে উঠল।

বললে—উঠ না, উঠ না—তোমার বুকে ব্যথা—

—তুমি থাম দিকি নি, আমার শরীর ভাল আছে কি না আমি বুঝি নে?

কর্ত্তামশাই কেমন ভয় পেয়ে গেলেন।

বললেন—না-ই বা উঠলে মা—

ফটিক সমস্ত বাড়ীটা এতক্ষণ ঘুরে ঘুরে দেখে এসেছে। এত এলাহি কাণ্ড দিদিমণির! এতখানি কল্পনাও করতে পারে নি সে? ঘরের মধ্যে এসে বললে—তুমি যে সত্যিই রাজরাণী হয়েছ দিদিমণি—

হরতন হাসতে লাগল।

বললে—বাবা, ফটিক এখনও তোমার সেই তামাক চুরি ক'রে খায়?

চণ্ডীবাবু ফটিকের দিকে চেয়ে বললে—ওই দ্যাখ, দিদিমণি এখনও তোকে মনে রেখেছে রে? ওর খাওয়ার কথা আর ব'লো না মা, ওর পেট নিয়েই গেলাম—ওর পেটের মধ্যে হুতাশন ঢুকেছে—

চণ্ডীবাবুও কর্ত্তামশাই-এর সঙ্গে বাড়ীটা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। সঙ্গে ফটিক বন্ধু সবাই। নিবারণও ছিল।

—এই দেখুন, আমার মা আসবার আগে এই সব ভেঙে পড়ে ছিল, এখন আবার সব জোড়া লেগেছে। আবার এক লাখ টাকা খরচ ক'রে সব জোড়া লেগেছে। এ সবকিছুই মায়ের দয়ায়—

—কত টাকা খরচ পড়ল সব সুদ্ধ?

নিবারণ বললে—আজ্ঞে, তা প্রায় এক লাখ—

—লাখ টাকা যে অনেক টাকা!

কর্ত্তামশাই বললেন—তা অনেক টাকা লাগলে আমি কি করব? টাকা দেবার কি আমি মালিক চণ্ডীবাবু? মা'ই মালিক! মা নিজেই ফিরে এসেছেন, এখন মা নিজেই আবার নিজের থাকবার-খাবার ভোগ করবার ব্যবস্থা করছেন। মা নিজেই কেড়ে নিয়েছিলেন, এখন আবার নিজেই দিচ্ছেন, আমি আর কি করব? কি করতে পারি আমি বলুন?

ফটিক বললে—তা হ'লে আমাদের একদিন ভোজন করিয়ে দিন কর্ত্তামশাই—

—তুই থাম্ ত ফটকে, থাম্ ত—

কর্ত্তামশাই বললেন—না না, ফটিক ত অন্যায় কিছু বলে নি মশাই, আমার ত একদিন আপনাদের সদল-বলে খাওয়ানই উচিত! আমাদের এখানে একটি লোক আছে, সে কথায় কথায় লোককে খাওয়ায় মশাই,—তা আমিও খাওয়াব চণ্ডীবাবু, কবে আপনাদের সময় হবে বলুন?

চণ্ডীবাবু বললেন—কেন আবার ও-সব হাঙ্গাম করতে যাবেন? ও ফটিকের কথায় কান দেবেন না আপনি! এই এত টাকা খরচ ক'রে আপনি বাড়ী-ঘর সারালেন, আবার কেন মিছিমিছি টাকা খরচ করবেন? এদের খাওয়ান মানেই ত ভূত-ভোজন করান—

চলতে চলতে সদরের দিকে আসতেই দেখা গেল বৈঠকখানা ঘরের সামনে দুলাল সা আর নিতাই বসাক দাঁড়িয়ে আছে।

কর্ত্তামশাইকে দেখেই দুলাল সা উঠে দাঁড়াল।

অতি বিনীত ভঙ্গি। নিচু হয়ে দু'জনেই প্রণাম করলে।

—তোমার আবার কি দুলাল? আবার কি চাও?

দুলাল সা সবিনয়ে বললে—আমি আর কি চাইব কর্ত্তামশাই, আমার ত চাওয়ার আর কিছু বাকি নেই, আমি শুধু একটা কথা বলতে এলাম আপনাকে, আমার বিজয় আসছে বিলেত থেকে আগামী সোমবারে, আপনাকে অনুগ্রহ ক'রে একবার আমার কুটীরে পদধূলি দিতে হবে—

কর্ত্তামশাই বললেন—বিজয় আসছে সে ত ভাল কথা, তা আমি গিয়ে কি করব?

—আজ্ঞে, আপনি আশীর্ব্বাদ করবেন, সে একলা মানুষ, আপনাকেই ত সব দেখতে হবে, আপনি না দেখলে কে দেখবে তাকে?

কর্ত্তামশাই হাসলেন মনে মনে। দুলাল সা এখনও তার চালবাজি ছাড়ে নি। এই চালবাজি দেখিয়েই একদিন তাঁকে ভুলিয়েছিল দুলাল সা। আর তিনি ভুলবেন না এখন থেকে।

বললেন—আমি ? আমার কথা বলছ ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, এই নিতাইকেও তাই বলেছি, দেখবার ত অনেক লোকই আছে, কিন্তু সবাই কি আর আপনার মত ক'রে দেখবে ? তা হ'লে ত আর ভাবনা ছিল না—

—কেন, তুমি ? তুমি কোথায় যাবে ?

নিতাই বসাক এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল চুপ ক'রে। সে-ই দুলাল-এর হয়ে বললে—ও ত চ'লে যাচ্ছে কর্ত্তামশাই, ছেলে এলে ও আর সংসারে থাকবে না—

—থাকবে না মানে ? যাবে কোথায় ?

দুলাল সা বললে—যাব যেখানে দু'চোখ যায়। গুরু আমায় ডেকেছেন যে—

—থাকবে কোথায় ? খাবে কি ? টাকা-কড়ি কিছু লাগবে না ? খরচ-পত্তর কে যোগাবে ?

দুলাল সা হাসল।

—সংসারই যখন ছেড়ে দিচ্ছি, তখন আর ও-সব নিয়ে মাথা ঘামাব কেন কর্ত্তামশাই। মাথা ঘামাবার যিনি মালিক তিনিই মাথা ঘামাবেন। আমি কে ?

তারপর একটু থেমে বললে—তা সে সব নিয়ে আমি ভাবছি নে, আপনি শুধু আমার কুটীরে এসে আমার ছেলেকে আশীর্ব্বাদ করে যাবেন, এই আমার বিনীত কামনা—

কর্ত্তামশাই যেন তখনও ভালো ক'রে তাল সামলাতে পারেন নি।

জিজ্ঞেস করলেন—কিন্তু তোমার এই এত সম্পত্তি ? ছেলে সব দেখবে ? ছেলে ত তোমার ডাক্তার ! ডাক্তারি সে করবে কখন ? আর ব্যবসাই বা কখন দেখবে ?

দুলাল বললে—আমি আর ওসব নিয়ে ভাবব না কর্ত্তামশাই, যিনি সব কিছু দিয়েছেন তিনিই সব দেখবেন। আর না দেখেন ত সব যাবে—সব গোল্লায় যাবে !

তার পর এতক্ষণে যেন চণ্ডীবাবুর দিকে নজর পড়ল। জিজ্ঞেস করলে—ইনি কে ?

চণ্ডীবাবু নিজেই নিজের পরিচয় দিলে। বললে—অধীনের নাম চণ্ডী অধিকারী—আমার যাত্রা দল আছে কলকাতায়—

নিতাই বসাক লাফিয়ে উঠল—ও, আপনিই বুঝি কর্ত্তামশাইয়ের নাতনীকে উদ্ধার করে দিয়েছেন ?

চণ্ডীবাবু বললে—ছি, আমি কেন উদ্ধার করতে যাব, যার কাজ তিনিই করেছেন, আমি ত কেবল নিমিত্ত মাত্র—

—খাঁটি কথা। খুব খাঁটি কথা বলেছেন চণ্ডীবাবু, আমরা কেউ কিছু নই, সবই তিনি। তিনি করান আর আমরা করি। তিনি যন্ত্রী আর আমরা যন্ত্র। লোকে কেবল আমি-আমি ব'লে বড়াই করে—

তার পর কর্ত্তামশাইয়ের দিকে চেয়ে দুলাল সা বললে—তা হ'লে আসতে অনুমতি করুন কর্ত্তামশাই, আমার আবার সব বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়ে বলতে হবে ত—

ব'লে আর একবার মাথা নিচু ক'রে প্রণাম সেরে দুলাল সা গাড়িতে গিয়ে উঠল। নিতাই বসাকও তার সঙ্গে সঙ্গে গেল।

কিন্তু সোমবারের আগেই ঘটনাটা ঘটল।

কবে একদিন কোন্ কুক্ষণে সদানন্দকে এনে ঢুকিয়েছিল দুলাল সা। সে কবেকার কথা। কিংবা হয়ত সে নিজেই এসে ঢুকেছিল সা-মশাইয়ের পাটের আড়তে। কিন্তু সে যে এমন কাণ্ড বাধিয়ে যাবে তা কে জানত।

সেদিন দুলাল সা'র ছেলে এসেছে বিলেত থেকে। কলকাতার হাওড়া ইষ্টিশানে তাকে আনতে গিয়েছিল সবাই। দুলাল সা, নিতাই বসাক, নতুন-বৌ, কেষ্টগঞ্জে ফিরে আসার সময় গ্রামের সমস্ত লোক যাতে স্টেশনে ভিড় করে তারও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ফুলের মালা দিয়ে তাকে গ্রামের লোক অভ্যর্থনা করবে। ক্যামেরা দিয়ে ফোটো তোলা হবে। আর ব্লক-ডেভেলপ্‌মেণ্ট অফিসার সুকান্ত রায় তার জীপ্ গাড়িটা নিয়ে দলবল সমেত হাজির থাকবে।

সুকান্ত শিখিয়ে-পড়িয়ে রেখেছিল সবাইকে। ট্রেণটা এসে পৌছুলেই একজন চিৎকার করে উঠবে—বন্দেমাতরম্—

আর সবাই এক সুরে বলে উঠবে—বন্দেমাতরম্—

একজন জিজ্ঞেস করেছিল—বন্দেমাতরম্ কেন ? এ ত স্বদেশী ব্যাপার নয়—

সুকান্ত বলেছিল—স্বদেশী ব্যাপার নয়ই বা কেন বল্ ?

সা' মশাইয়ের ছেলে ফিরে আসছে দেশের উপকার করতে—জননী-জন্মভূমির সেবা করতে, তাতে দেশেরও কল্যাণ হবে, আমাদের সকলেরই ভালো হবে—

নিতাই বসাক বলেছিল—দরকার হ'লে সকলকে মাথা-পিছু আট আনা ক'রে জলখাবার খাইয়ে দেবেন—অতক্ষণ ধ'রে রোদে পুড়বে সবাই, কেউ যেন না বিরক্ত হয়, দেখবেন—

সেই রকম ব্যবস্থাই হয়েছিল।

দুলাল সা এই ছেলের বিলেত থেকে ফেরার দরুণ হাজার পাঁচেক টাকার বাজেট তৈরি করেছিল। এত লোকের জলখাবার, তারপর দান-ধ্যান, তারপর কেষ্টগঞ্জের ম্যাজিস্ট্রেট থেকে সুরু ক'রে পুলিশ-কমিশনার সকলের কাছে মাছ-দই-মিষ্টি পাঠানর প্ল্যানও ছিল। মোট-মাট এলাহি-কাণ্ড করে ফেলেছিল সা' মশাই।

কিন্তু বাড়ীতে এসে সবাই যখন বিজয়কে নিয়ে ব্যস্ত, তখন সা' মশাই হঠাৎ কান্তকে জিজ্ঞেস করলে—কি রে কান্ত, কর্ত্তামশাইয়ের বাড়ী থেকে কেউ আসে নি ?

কর্ত্তামশাইয়ের বাড়ীতে কে আছে যে আসবে। আসলে এক আসতে পারে কর্ত্তামশাই, আর না হয় নিবারণ।

তা নিবারণ সরকার এসেছিল।

—নিবারণ এসেছিল ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ সা'মশাই, আপনি কলকাতায় যাবার পর সরকারমশাই এসেছিল টাকার জন্যে।

—তা টাকা দিয়েছিস্ ?

—আমি কি করে দিই, আজ্ঞে।

—কত টাকা ?

—বলছিল হাজার দু'য়েক !

—কেন, অত টাকা আবার কেন দরকার হ'ল হঠাৎ ? বাড়ী-গাড়ি সব ত হয়েই গেছে আগে।

কান্ত বললে—আজ্ঞে নাতনীর নাকি আবার বড় বাড়াবাড়ি—কলকাতা থেকে বড়-বড় ডাক্তার আসছে, মোটা-মোটা টাকা নিচ্ছে, ওষুধ-পত্তোর অনেক খরচ চলছে—তাই আমার কাছে এসেছিল টাকা নিতে—

দুলাল সা জিজ্ঞেস করলে—তুই কি বললি ?

—আমি আর কি বলব সা'মশাই, আমি বললাম সা'মশাই নেই, আমি কি ক'রে হাতচিটে নিয়ে টাকা দেব—

—নিবারণ কি বললে ?

—কি আর বলবে, ফিরে গেল। অন্য কোথাও টাকা হাওলাৎ করতে গেল বোধহয়, আমি আর ও-সব জিজ্ঞেস করি নি। দেখলাম চোখ দিয়ে ঝর ঝর ক'রে জল পড়ছে—

তখন বাড়ীতে লোক-জন আত্মীয়-স্বজনের আনাগোনা। এতদিন পরে ছেলে এসেছে ডাক্তার হয়ে। এও যেন ঠিক আবার তার নতুন ক'রে বিয়ে হচ্ছে আজ। তার বিয়ের দিনের মতই উৎসব আরম্ভ হয়েছে বাড়ীতে। তফাৎ শুধু এই যে, সেই দোলগোবিন্দ ঘটক শুধু নেই। সেই বৌভাতের রাত্রে সেই পাগলের মত বিড় বিড় ক'রে বকা নেই। সেই সদানন্দকে খোঁজা নেই। সেই পনের ভরি সোনার জন্যে হা-হুতাশ নেই। আজ এখানে শুধুই আনন্দ।

সকাল থেকেই সবাই আসছে-যাচ্ছে আর অতিথিদের আপ্যায়ন চলেছে।

কান্ত হঠাৎ এসে বললে—সা'মশাই, নিবারণকে দেখে এলাম—

—নিবারণকে ? কোথায় ? কি বললে সে ?

—জিজ্ঞেস করছিল আপনি বাড়ী আছেন কি না ?

—তুই কি বললি ?

—বললাম এখন সা'মশাই বড় ব্যস্ত আছেন।

—তা জিজ্ঞেস করলি না কি জন্যে দেখা করতে চায় ?

—হ্যাঁ, বললে কিছু টাকার দরকার ছিল। হরতনের অসুখ নাকি বেড়েছে খুব ক'দিন থেকে। এই যায়, সেই যায়—

—আচ্ছা, তুই যা—

কান্তকে কথাটা ব'লে কাছ থেকে সরিয়ে দিলে সা'মশাই। তারপর কান্ত চ'লে যেতেই আবার ডাকলে।

—শোন্ কান্ত, শুনে যা—

তারপর কান্ত কাছে আসতেই দুলাল সা বললে—তুই একবার কর্ত্তামশাই-এর বাড়ীতে যেতে পারবি ?

কান্ত বললে—কেন পারব না সা'মশাই—

—তা হ'লে যা। হাজার দু'এক টাকা নিয়ে যা তুই কর্ত্তামশাই-এর কাছে। বলবি, আমি টাকাটা পাঠিয়ে দিয়েছি—

—আর কিছু বলতে হবে ?

—না।

কান্ত ক্যাশ থেকে টাকা নিয়ে চ'লে যেতেই দুলাল সা আবার মালা জপতে বসল। কাছারি ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিলে ভেতর থেকে। আজকে সবাই তার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। সবাই তার সঙ্গেই কথা বলতে চাইবে। কিন্তু কারও সঙ্গে কথা বলতেই ভাল লাগল না আর। বিজয় আসবার পর থেকেই যেন কেমন সব ওলট-পালট হয়ে গেল। এতদিন বিলেতে থেকে ছেলে যা হবে ভেবেছিল তা হয় নি। বিজয় সেই রকমই আছে। কলকাতা থেকে এখানে এই কেষ্টগঞ্জে আসা পর্য্যন্ত একটা সিগারেট কি চুরোট পর্য্যন্ত খেলে না। ট্রেণ থেকে নেমে সমস্ত লোকের সামনে সেই প্লাটফর্ম্মের ওপরেই দুলাল সা'র পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকাল। এমন হবে ভাবে নি দুলাল সা। অথচ অন্যরকম হ'লেও কিছু বলবার ছিল না।

—রাস্তায় তোমার কোনও কষ্ট হয় নি ত বাবা?

—না, আপনি কেমন আছেন?

দুলাল সা সে-কথার উত্তর না দিয়ে বললে—তোমার নিতাই কাকার পায়ের ধুলো নিলে না যে?

সত্যিই চিনতে পারে নি বিজয়। সে কত বছর আগের কথা যেন। যেন তার চোখে সবাই বদলে গেছে। এই হাওড়া স্টেশনের চেহারাটাই যেন অন্যরকম হয়ে গেছে। তারপরে কেষ্টগঞ্জের স্টেশনে নেমেও চারদিকে চেয়ে দেখে অবাক্ হয়ে গিয়েছিল বিজয়।

—ওই দেখ, ওই আমাদের সুগার-মিল! চিম্‌নি দেখা যাচ্ছে—

—ওই দেখ, ওই আমাদের নতুন গদি-বাড়ী—

দুলাল সা'র নতুন বাড়ীটাও দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল। বিজয় যখন কেষ্টগঞ্জ থেকে যায় তখন এ-বাড়ী এত বড় হয় নি। তখন ছোট বাড়ী ছিল। চারদিকে পাঁচিল দিয়েও ঘেরা ছিল না। আজ চারদিকে বাগান হয়েছে। কেষ্টগঞ্জের সমস্ত গাঁ ঝেটিয়ে এসে হাজির হয়েছে স্টেশনে।

—ইনি হলেন মিস্টার সুকান্ত রায়, আর ইনি মিসেস রায়, এঁর স্ত্রী—

নিতাই বসাক পরিচয় করিয়ে দিলে।

সমস্ত লোকের ভিড়ের মধ্যেও দুলাল সা কেবল একখানা মুখ খুঁজছিল। কর্ত্তামশাই-এর এখানে আসাটা অসম্ভব কথা। সে কখনও সম্ভব হ'তে পারে না। এখানে তাঁকে আশা করাই অন্যায়। তবু যেন একবার দেখাতে ইচ্ছে হ'ল দুলাল সা'র। অনেক ঐশ্বর্য্য, অনেক বিলাস, অনেক ব্যসন হয়েছে দুলাল সা'র। আজকে তার বিজয়ের পাস ক'রে কেষ্টগঞ্জে ফিরে আসাটাও একটা ঐশ্বর্য্য। এ-ঐশ্বর্য্যটা যেন কর্ত্তামশাইকে দেখাতে পারলে ভাল হ'ত।

হঠাৎ নজরে পড়ল। দেখলে দূরে প্লাটফর্ম্মের এক পাশে নিবারণ যেন মানুষের ভিড়ের মধ্যে হিম্‌সিম্ খেয়ে কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

এখানে নিশ্চয় বিজয়কে দেখতে এসেছে—

—ও নিবারণ, নিবারণ—

ভিড়ের মধ্যেই একবার ডাকতে ইচ্ছে হ'ল। কিন্তু ততক্ষণে নিবারণ অন্যদিকে চ'লে গেছে। দুলাল সা ভাল ক'রে সেই দিকে ফিরে দেখবার চেষ্টা করলে। সেই ট্রেণ থেকেই বুঝি কে একজন নামল। সেই একই ট্রেণ থেকে। কোট-প্যাণ্ট পরা চেহারা। গলায় ডাক্তারের স্টেথিস্‌কোপ ঝুলছে। সঙ্গে আর একজন লোক। তার হাতে একটা ব্যাগ। বোধহয় ডাক্তারের ব্যাগ।

—ওদিকে কি দেখছেন সা'মশাই?

—ও কে বল ত হে, নিবারণ মনে হচ্ছে না?

লোকটা বললে—হ্যাঁ সা'মশাই, নিবারণ যে ইষ্টিশানে, কলকাতা থেকে ডাক্তার আসছে কি না এই ট্রেণে—

ওই পর্য্যন্ত! কেষ্টগঞ্জের প্লাটফরমে ওই পর্য্যন্তই। তারপরে দলে দলে লোক এসেছে বাড়ীতে। সবাই বিজয়কে দেখতে এসেছে। খাওয়া-দাওয়ার এলাহি কাণ্ড হয়েছে বাড়ীতে। লুচি-মাংসর গন্ধে কেষ্টগঞ্জের বাতাস একেবারে ভরপুর। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব, পুলিস-কমিশনার সাহেব সবাই এসে খেয়ে গেছে। গ্রামের কাওরা-বাগ্দী-মালোরা এখনও উঠোনে ব'সে খাচ্ছে। কিন্তু দুলাল সা সকলের কাছ থেকে দূরে কাছারি-ঘরের মধ্যে ব'সে নিজেকে যেন আড়াল ক'রে রেখেছে। কর্ত্তামশাই কোনওদিন আসেন না এ-বাড়ীতে। একবার মাত্র এসেছিলেন। সে সেই গুরুদেব আসার দিনে। নিজের কোষ্ঠি দেখাতে। তারপর থেকে কেবল নিবারণকে পাঠিয়ে টাকা নিয়ে গেছেন। আর আসেন নি। এবার দুলাল সা'র ব'লে আসা কর্ত্তব্য। তাই

বলতে গিয়েছিল কর্তামশাইকে। আর সকলের সঙ্গে তাঁকেও নেমন্তন্ন ক'রে এসেছিল।

—বাবা!

হঠাৎ নতুন-বৌ অন্ধকার ঘরে ঢুকে অবাক।

—আপনি এখানে বাবা, আর আমরা আপনাকে খোঁজাখুঁজি করছি! আপনার শরীর খারাপ নাকি?

—না মা, শরীর খারাপ নয়! তুমি আমার জন্যে ভেব না।

—কিন্তু আপনার খাওয়া?

—আমি আজ খাব না মা, আর খেলেও তার জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না।

তারপর একটু থেমে দুলাল সা আবার জিজ্ঞেস করলে—বিজয় কোথায়?

—উনি ত ওপরে, ওঁকে খাইয়ে দিয়েছি—

—তুমি মা আজকে বিজয়কেই দেখ। এতদিন পরে বিজয় এল, তুমি ওকেই দেখ, আমার জন্যে ভাবতে হবে না—

—সে বললে শুনব না বাবা।

ব'লে নতুন-বৌ একেবারে দুলাল সা'র সামনে এসে তার হাত ধরলে।

—আপনার আহ্নিকের জায়গা ক'রে দিয়েছি, সব জোগাড়-যন্তর করেছি, আর আপনি এখানে এমনি ক'রে ব'সে থাকবেন, তা হবে না। আহ্নিক সেরে জল খেয়ে আপনি যা-খুশী করুন আমি কিচ্ছু বলতে যাচ্ছি নে—অনেক রাত হয়েছে—

দুলাল সা নতুন-বৌ-এর মুখখানার দিকে ভাল ক'রে চাইলে। ভাল ক'রে যেন মিলিয়ে নিতে চাইলে। যেন খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে মিলিয়ে নিতে চাইলে। যেন না মিললেই ভাল হয়। না মিললেই যেন সব দিক রক্ষে হয়।

হঠাৎ বাধা পড়ল

কান্ত এসে হাজির।

—কি রে, দিয়ে এলি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কার হাতে দিলি?

—নিবারণ সরকারের হাতে।

—ঠিক আছে—

কথাটা বলে কান্ত চলে যাচ্ছিল।

দুলাল সা আবার ডাকলে—হ্যাঁরে কান্ত শোন্, রোগীর অবস্থা কেমন দেখলি?

কান্ত বললে—মনে হ'ল খারাপ—কলকাতা থেকে তিন জন ডাক্তার এসেছে—নিবারণ সরকারের মুখটা গম্ভীর-গম্ভীর। হাতচিটেতে সই নিয়ে আমি চলে এলাম, ভয়ে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারলাম না—

কান্ত চলে যেতেই নতুন-বৌ জিজ্ঞেস করলে—হরতনের কথা বলছেন বুঝি বাবা?

কথাটা চাপা দেবার জন্যেই দুলাল সা উঠে দাঁড়াল।

বললে—তোমার আর আজকে ও-সব কথা শোনবার দরকার নেই মা, আজকে এত বছর পরে বিজয় এল, তুমি যেন কিছু পাগলামী ক'রো না—

ব'লে দুলাল সা' নতুন-বৌয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর-ঘরের দিকে চলতে লাগল।

কিন্তু রাত যখন অনেক, যখন কেষ্টগঞ্জের সব শব্দ বন্ধ হয়ে গেছে, যখন শুধু রাস্তার ঘেয়ো কুকুরগুলো এঁটো কলাপাতা নিয়ে ঝগড়া করতে সুরু করেছে দুলাল সা'র সদরের সামনে, তখন হঠাৎ একটা শব্দে ঘুম ভেঙে গেল দুলাল সা'র।

প্রথমটায় তন্দ্রার ঘোর ভালো করে কাটে নি।

কিন্তু দ্বিতীয়বার শব্দ হতেই কানটা সজাগ হয়ে উঠল।

—বল হরি, হরিবোল্!

আর সঙ্গে সঙ্গে দুলাল সা নিজের দুই কান দুই হাত দিয়ে চাপা দিয়ে দিলে। যেন কানে হাত চাপা দিলে পৃথিবীর লোকের কান থেকে শব্দটা চেপে রাখা যাবে।

কিন্তু হাতটা আবার একটু আল্‌গা করতেই সেই শব্দটা আরো জোরে কানে এল। আবার কান চাপা দিলে। আর যেন শব্দটা না শুনতে হয়। কিন্তু শব্দটা তখন কাছে এসে গেছে। কান দু'হাতে চাপা দিয়েও আর শব্দটা চেপে রাখা গেল না। তখন শব্দটা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে—বল হরি, হরিবোল্—

(ক্রমশঃ)

আন্তর্জাতিক বিদ্যুৎ সভা

শ্রীঅশোককুমার দত্ত

বিজ্ঞানের রূপটি অনেক স্পষ্ট। শিল্প বা সাহিত্যের তুলনায় স্পষ্টতর। যে কোন বিষয়েই তা কথা বলুক তার একটা বিশিষ্ট পরিমাপ থাকে—বিশিষ্ট আকার আয়তন বা পরিমাপের মধ্য দিয়ে তার বক্তব্য নির্ধারণ করে, সম্ভব হলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন প্রমাণ উপপত্তি যুক্তির বিশেষের প্রভাবে তার রূপ কখনো বিচিত্র কখনো বা বিরোধমূলক। বিজ্ঞান যে পুরোপুরি নৈর্ব্যক্তিক তা নয়—আধুনিক পদার্থবিদ্যার অনেক তত্ত্বই অভিনব শিল্প ভাবনার সঙ্গে তুলনীয়, কিন্তু নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে তার প্রমাণিত রূপটিই ক্রমে স্থিতিলাভ করে। তাই



অধ্যাপক জিগ্‌স্‌বার্টাস ড জো এটেন, আন্তর্জাতিক বিদ্যুৎ সভার বর্তমান পেসিডেণ্ট।
সৌজন্যে ঃ শ্রী এস্. এন্ মুখার্জি।

অন্দর মহলে হাজির করতে পিছপা হয় না। শিল্পের জগতে এই সুবিধা নেই। একটু যেন অস্পষ্ট, একটু যেন দ্বিধাগ্রস্ত, কুয়াশার অন্তরালে তার পূর্ণরূপটি কোন কালেই প্রকাশ পেল না। কিন্তু যেটুকুই পায় তা আমাদের জীবন সন্ধানী ধারণা ও মনকে প্রভাবিত না করে পারে না, বায়ুস্তরে 'চুয়ানো' সূর্যরশ্মির মত তা আমাদের পক্ষে নানাদিক দিয়ে অনুকূল হয়ে ওঠে। শিল্পীর প্রকাশের এই নিজস্ব উপায় আছে, ব্যক্তি বলছিলাম, বিজ্ঞানের পথটা অনেক পরিষ্কার। মানুষের মনে যে অনন্ত জিজ্ঞাসা বিজ্ঞান তার উত্তরগুলি নির্দিষ্ট আকারে বেঁধে আমাদের যুক্তির সামনে হাজির করতে চায়, অপর পক্ষে সাহিত্য বা শিল্প সোজাসুজি কোন আলোচনায় প্রবৃত্ত না হয়েও জীবনের নানাবিধ সমস্যা ও পরিণতির বিষয়ে আমাদের প্রভাবিত করে।

শিল্প ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোন বিরোধের জিগীর তোলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু ভাবতে সত্যই অবাক

লাগে বিজ্ঞানের যুক্তিবাদ এতো বড়ো 'বাস্তব' ও ইন্দ্রিয়-নির্ভর হওয়া সত্ত্বেও তার পথের বাঁকে বাঁকে আজো কত অসামঞ্জস্য। যেহেতু বিজ্ঞান কোনমতে সম্পূর্ণ (perfect) নয়, তাত্ত্বিক মতবিরোধের কথা এখানে তুলবো না, কিন্তু যে বিগ্য বস্তু ও পরিমাপের নির্দিষ্টতার পরিমাণ নির্ণয়ে পার্থক্য থাকায় এ তিনটিকে অবলম্বন করে যে শত শত একক (DERIVED UNIT) গড়ে উঠেছে তাদের পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয় নানা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। বিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলি থেকেই এই বিভিন্ন পরিমাপ কৌশল উদ্ভব হয়েছে সত্য, কিন্তু একটিমাত্র



১৯৬০ সালে আন্তর্জাতিক বিদ্যুৎ সভার দিল্লী অধিবেশনের শেষে প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু এবং বিদ্যুৎ সভার বিদায়ী প্রেসিডেন্ট ডঃ হালিজ। —ফোটো: এ-এস্-ই-এ জার্নাল।

মধ্যে গড়ে উঠেছে তার মাপকাঠি নিয়েই নানা গণ্ডগোল। সাধারণ মানুষ না হয় স্থানীয় প্রভাবের চাপে পড়ে নানা বৈচিত্র্যকে মেনে নিয়েছিল; কোথাও হাত মেপে আমরা দৈর্ঘ্য মাপি, অন্য কোথায় ফুট বা গজ. জিনিসের ওজন কখনো সের কখনো বা "বিশা"য় কিন্তু খাঁটি বিজ্ঞানের জগতেও দেখি পাউণ্ড কিলোগ্রামের ঝগড়াঝাঁটি। যে রকেটটি চাঁদের দিকে পাড়ি দিলো বলে তা লম্বায় কতখানি—ফুট না মিটার, ওজনে কতটা ভারী—পাউণ্ড না কিলোগ্রাম, আয়তনই বা কত—ঘন ফুট না ঘন মিটার। সময়ের মাপটা অবশ্য এক রয়েছে, ঘড়ির সময় টিক টিক করে একই হারে—তা হ'ল সেকেণ্ড। কিন্তু কালস্রোতের মধ্যে অনিবার্য মিল থাকা সত্ত্বেও দৈর্ঘ্য আর বস্তুর পদ্ধতির অনুবর্তিতা না থাকায় বৈজ্ঞানিক আলোচনার বিষয়গুলি অকারণে জটিল হয়ে ওঠে। বিদ্যুৎ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আবার দেখি তিনটি মূল একক মানলেই এখানকার পরিমাপগুলি সম্পূর্ণ হয় না। চুম্বকের চারিদিকে যে প্রভাব সঞ্চারিত হয় তার পরিমাণ মধ্যমটির প্রকৃতির উপর নির্ভর করে, ইংরেজিতে এর নাম PERMEABILITY। বৈদ্যুতিক প্রভাবের ক্ষেত্রে অনুরূপ পরিমাণটি হ'ল Permittivity। চুম্বকশক্তির সঙ্গে বিদ্যুতের গভীর সংযোগ থাকায় বিজ্ঞানের এই বিশিষ্ট শাখাটিতে Permittivity-র ন্যায় প্রথমোক্তটিরও যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। মূল তিনটি এককের সঙ্গে এ দুটি পরিমাণ যুক্ত হওয়ায় পরিমাণ কৌশল অনেক বেশী জটিল হওয়ার কথা

ছিল। কিন্তু কি আশ্চর্য, বিদ্যুৎ ও তার প্রয়োগবিস্তার অজস্র জটিলতা সত্ত্বেও এখানকার পরিমাণগুলির মধ্যে যে সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় বিজ্ঞানের অন্য যে কোন প্রয়োগকলাতেই—(Applied Science) তা বিরল। বিদ্যুৎ বিজ্ঞানের ইতিহাস খুব বেশি দিনের নয়, কিন্তু মোটামুটি গড়ে ওঠারই প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এই বিস্তার বিশেষজ্ঞরা মেট্রিক পদ্ধতিকে একমাত্র পরিমাণ নির্দেশক বলে গ্রহণ করেছেন। আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে গঠিত এক বিদ্যুৎ সভা (International Electrotechnical Commission) কার্যকারী থাকার ফলেই এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ অভিমত আগেভাগে গঠন করা সম্ভব হয়েছিল।

বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য বিধানের পক্ষে এমন প্রয়োজনীয় এই সভার পত্তন ১৯০৪ সালে। এই বছর আমেরিকার সেণ্ট লুইস্-এ অনুষ্ঠিত এক বিদ্যুৎ কংগ্রেসে (International Electrical Congress) স্থায়ীভাবে নিযুক্ত এক বিদ্যুৎ সভা গঠনের প্রস্তাব করা হয়। উদ্দেশ্য :

বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিচ্ছিন্ন বিশেষজ্ঞ সমিতিগুলির মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা, যাতে বৈদ্যুতিক সভা পরিভাষা এবং যাবতীয় যন্ত্রপাতির কার্যমান (Rating) এর মধ্যে একটি সামঞ্জস্য গড়ে তোলা যায়। এ সমস্ত উদ্দেশ্য মেনে নিয়ে ঐ বছরই আন্তর্জাতিক ইলেকট্রো টেকনিক্যাল কমিশন গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। দু বছরের মধ্যে সভার প্রথম অধিবেশন বসে স্বনামখ্যাত বৃটিশ বিজ্ঞানী লর্ড ক্যালভিন কমিশনের প্রথম সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন।

এর পর গত ৫৯ বছরে বিদ্যুৎ সভার সাধারণ অধিবেশন বসেছে মোট ২৮টি। সর্বশেষ সভা হ'ল এ বছর ২৯শে মে থেকে ৮ই জুন পর্যন্ত পুরো চৌদ্দ দিন ধরে। স্থান—ইতালির রম্যনগরী ভেনিস্। বিদ্যুতের এই আন্তর্জাতিক সভায় ভারত থেকে তিন জন প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ১৯৬০ সালে কমিশনের সাধারণ অধিবেশন ভারত রাজধানী নূতন দিল্লীতেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

বৈজ্ঞানিক একক বা পরিমাপের সমস্যার কথা ভূমিকায় আমরা একটু বিস্তৃতভাবেই আলোচনা করেছিলাম। কিন্তু পরিমাপ জেনেই যখন বিজ্ঞান তখন তার গুরুত্ব অস্বীকার করার উপায়ই বা কি। সময় জানতে আমরা সাধারণ ঘড়ি দেখেই নিশ্চিন্ত, কিন্তু বিজ্ঞানকে এর জন্য সেকেণ্ডের সামান্যতম ভগ্নাংশের হিসাবটাও সঠিক বুঝে নিতে হয়েছে। সময়ের পরিমাণ ছাড়াও বিজ্ঞানে যে অজস্র পরিমাপ জানার রয়েছে তার মধ্যে বিদ্যুৎ কেবল সম্পর্কেরই আমাদের সমস্যা এখানে সীমাবদ্ধ। অসংখ্য বৈদ্যুতিক মেশিন এবং অন্যান্য যন্ত্র-সামগ্রীর নির্মাণ ব্যবহার কোশল ও কার্যমান (Rating) বিজ্ঞানের জগতে চরম অরাজকতার সৃষ্টি করতে পারে। যন্ত্রের একটি অংশ বিকল হয়ে পড়েছে ঠিক যা চাই তার ছোট বা বড়টি আছে যা দরকার সেটাই শুধু নেই। ০.১৮ সেণ্টিমিটার মোটা তার দরকার, রয়েছে ০.২ সেণ্টিমিটার মোটা। এ হ'ল কয়েকটা উদাহরণ। এর উপরে বৈদ্যুতিক সেই অভিনব ব্যবস্থা—তার শক্তি উৎপাদন সরবরাহ এবং ব্যবহার বিধির মধ্যে যদি পুরোপুরি এক সামাঞ্জস্য ধারা গড়ে তোলা যায় তবে এই জটিল কর্মপদ্ধতির মধ্যে যে সুবিধার সৃষ্টি হয় তা সাধারণ মানুষ অবৈজ্ঞানিক মন নিয়েও কিছুটা অনুমান করতে পারে। ইণ্টার নেশান্যাল ইলেকট্রো টেকনিক্যাল কমিশন এ ব্যাপারেই দায়িত্ব নিয়েছে, তার সহযোগী হিসাবে আছে আর একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ইণ্টার নেশান্যাল স্ট্যাণ্ডার্ড ওরগানিজেশন। এর বিরাট কর্মকাণ্ডের সামান্য ধারণা আমরা পাই যখন শুনি এ ব্যাপারে বিদ্যুৎ সভার মোট ৫৫ টি টেকনিক্যালকমিটি এবং ৪৫টি সব-কমিটি কার্য্যকরী আছে। গত ৫৯ বছরে তাদের বিবরণী প্রকাশ পেয়েছে দু শ'টিরও বেশী। চব্বিশ খণ্ডে প্রকাশ্য বৈদ্যুতিক সংজ্ঞা ও পরিভাষার একটি কোষগ্রন্থ বর্তমানে কমিশনের উদ্যোগে দ্রুত প্রস্তুতির মুখে। বিজ্ঞানের এক বর্ধিষ্ণু শাখা ইলেকট্রনিকস্ নিয়ে সভাকে এখন খুব ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে। তাছাড়া পরমাণু শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় সংশ্লিষ্ট বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও নির্মাণ কৌশল ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় নীতি নির্ধারণের গুরুত্ব এসেছে। ১৯৬০ সালের দিল্লীর অধিবেশনে এ বিষয়ে প্রথম বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে।

বিজ্ঞান অরাজক নয়। এর মধ্যে অবশ্য রাজার শাসন বা অধিকার স্থাপনের ব্যাপার নেই। কিন্তু তার নিজস্ব যুক্তি রয়েছে, তার সভাসমিতি রয়েছে, তার সিদ্ধান্তকে সে সম্মান করে। বিজ্ঞানের সার্বজনীন রূপটির কথা আমরা জানতাম, তার প্রয়োগপদ্ধতির মধ্যেও এতো সামঞ্জস্য। বিদ্যুতের স্রোত অনন্তভাবে বয়ে চলছে, তাকে নিয়মের মধ্যে আকর্ষণ করছে এই বিদ্যুৎ সভা। সেই নিয়মেই বাতি জ্বলে রেডিও বাজে, বৈদ্যুতিক ট্রেন ছুটে চলে।



লক্ষ্ণৌতে বদলি হয়ে আসার পর থেকে কতবার যে এই ইমামবারা দেখতে এলাম তার ইয়ত্তা নেই। এর নির্জন সুন্দর পরিবেশটি আমার বড় প্রিয়। এ ছাড়া যখনই যাঁরা আমার বাড়ীতে অতিথি হয়ে আসেন তাঁদের নিয়েও দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখাতে বেরিয়ে হাজার-দুয়ারিতে আসতেই হয়। এখানকার স্থানীয় লোকেদের এবলাখ ব্যবহারের ত কথাই নেই, খুবই আচার-দুরস্ত এখানকার লোকেরা। সামান্য টঙ্গাওয়ালা থেকে আরম্ভ করে ভদ্রবাসিন্দা, সকলেরই ব্যবহারে বিনয়-নম্রতা ও সৌজন্যের প্রকাশ। বড় ভাল লাগে। এই শহরের রাস্তাগুলির নাম, ইমারতগুলির গঠন সবই সেকালের বাদশাহীর সাক্ষ্য বহন করছে। লক্ষ্ণৌ ইউনিভার্সিটির মিন্টো কলেজ, রেল স্টেশন, সবই ঐ যুগের স্থাপত্যের অনুকরণে গঠিত। হাজারদুয়ারির ভুল ভুলাইয়া এক আজব বস্তু, গাইড সঙ্গে না থাকলে এর ভেতর থেকে বেরোনো মুশকিল। গোলকধাঁধায় প'ড়ে ঘুরেই মরতে হবে। এ ছাড়া আছে গোল গম্বুজের প্রতিধ্বনিপূর্ণ ফাঁপা রেলিং। একবার কথা বললে তিনবার ফিরিয়ে দেয়।

বার বার আসার ফলে গাইড বখত মিয়ার সঙ্গে দোস্তিই হয়ে গেছে আমার। কলকাতা থেকে বন্ধু ও বন্ধুপত্নী এসেছেন, তাঁদের নিয়ে সারা লক্ষ্ণৌ শহরের দ্রষ্টব্য দেখে হাজারদুয়ারিতে পৌঁছতে বেলা দুপুর হয়ে গেল। টঙ্গাওয়ালার প্রাপ্য চুকিয়ে দিতে সে আভুমি নত হয়ে সালাম ক'রে চোস্ত উর্দুতে বলল, "হুজুর দেনেওয়ালা, খিলানে ওয়ালা, ময় আপকো খিদ্‌মদ্‌গার হুঁ। আগার হুকুম হো তো বান্দা হুজুরে হাজির রহেগা। কাঁহেকি, ইয়ে রূপেয়াঁ তো শ্রেফ ইন্‌সান-কি ভুখ মিটায়েগা, ঔর অব যো দেঙ্গে দাতা, উসমে ইয়ে জানওয়র কি পেট ভরেগা।" সুতরাং আরও কিছু বেশী দিতে হবে। তা হোক, এদের চাইবার ঢঙে পকেট খালি করতে বুকে তত বাজে না, না দিয়ে উপায়ও থাকে না, চক্ষুলজ্জায় বাধে। এবার বৃদ্ধ গাইড বখত মিয়া মেহেদি রংএর দাড়ি নিয়ে লক্ষ্ণৌ চিকনের পাঞ্জাবি গায় এসে উপস্থিত। আমাকে দেখেই বিরাট্ খাতির—"আইয়ে হুজুর। তসরিফ লাইয়ে। পধারিয়ে।" নামলাম ত এক ছ্যাকড়া টাঙ্গা থেকে, কিন্তু খাতিরটা পেলাম নবাব খাঞ্জাখাঁর ; সুতরাং আবারও তাকেই পথপ্রদর্শক ক'রে ইমামবারার দিকে পা বাড়ালাম। কিন্তু এবার ও আপত্তি জানাল, বলল, ঠিক দুপুর বেলা আর গভীর রাত্রে আমরা ইমামবারার ভেতরে যাই না। সুতরাং আজ আপনি বাগানে বেড়িয়ে বাইরে থেকে দেখে ফিরে যান, আবার কাল আসবেন। কিন্তু আমি বললাম, তা হয় না মিয়া, আজ রবিবার, কাল আমার অফিস, আর এঁরাও চ'লে যাবেন। এসেই যখন পড়েছি দেখিয়ে দাও। আপত্তিটা কোথায় ভেতরে যেতে, সে

আর কিছুতেই বলতে চায় না। অনেক পীড়াপীড়িতে লক্ষ্ণৌর উর্দুর মেল্ ট্রেণ আর প্যাসেঞ্জার চালিয়ে অশেষ তকল্লুফ ক'রে শেষে বলল, এ সময় ইমামবারার ছাদের ওপর সুরাব দেখা যায় আর বৃন্দাবনী সারেং-এ সুরেলী ঝঙ্কার শোনা যায়। আবার গভীর রাতেও ঠিক তাই হয়। বিশেষ ক'রে পূণমের দিন, সেদিন শোনা যায়, চাঁদনী কেদারা। আর ঐ সুরাব দেখা যায়। আমার কলকাত্তাই বন্ধুবর উর্দুর মধ্যে প্রবেশ করতে অক্ষম, সুতরাং তাঁর প্রশ্ন হ'ল, সুরাব কি? উত্তর দিল বখত মিয়া, "উসকি মানে হ্যায়, মিরাজ পয়েণ্ট।" আমি বাংলা ক'রে বললাম, মরীচিকা। ওরা যুগলেই তখন ঐ দুপুর রোদের মরীচিকা দেখতে উৎসুক হয়ে উঠল। আশ্চর্য, ব্যাপারটা আমার কাছেও কিন্তু নতুন।

কিন্তু চাঁদির ঝঙ্কারেও মিয়া সাহেবকে টলানো গেল না। তাঁর সেই এক বাত, এক ভাব, অতি বিনীত ভাবে মাথা নাড়ছেন, হাত কচলাচ্ছেন, আর উর্দু কপচাচ্ছেন, "মেরা গোস্তাখি মাফ কিজিয়ে মালিক, ম্যয় নাচার হুঁ।" শেষে বোঝা গেল, দিনের বেলা ভেতরে ঢুকলে অন্য কারুর চোখে পড়বে আর মিয়া সাহেবের নোকরিতে টান ধরবে, অতএব রাত্রে যদি আমরা আসি তবে সে চাঁদির ঝঙ্কারও শুনতে রাজী এবং আমাদেরও চাঁদনী কেদারার সুরেলী ঝঙ্কার শোনাতে রাজী। তাই সই, কারণ, আজই পূর্ণিমা। কিন্তু এর মূল কোথায়? সুরাব কেন দেখা যায়? গানই বা কে গায়? বলল, রাত্রে আসবেন, আপনাদের এক আঁসুভরি কিস্সা শোনাব, একটি নাজুক কলির মত সুন্দরী সরল মেয়ের বিষাদময় কাহিনী বলব। কে ছিল সে? বলল, সে ছিল নবাব ওয়াজেদ আলি শার তিসরী বেগম। নাম ছিল কোয়েলী বেগম। আমি উর্দুতে তার সেই দুঃখময় জীবনগাথা যতটা পেরেছি, লিখেছি; সন্ধ্যেয় আসবেন, প'ড়ে শোনাব। তারপর রাত গভীর হ'লে দেখাব, সেই মিরাজ পয়েণ্ট, আর আপনাদের তগদিরে থাকলে চাঁদনী কেদারাও শুনতে পাবেন। তবে আমার এইটুকু সান্ত্বনা যে, আমি তার সেই ব্যথার কাহিনী অপাত্রে পরিবেশন করছি না। কাঁহেকি, ম্যয় জানতা হুঁ বাঙ্গালী লোগ সমঝদার হোতে হেঁ। ইন্‌লোগ কি দিলমে নরমাই রহতি হ্যায়, ইসলিয়ে আপ ম্যাহসুস করেঙ্গে।

সেদিন সন্ধ্যায় বখত মিয়ার উর্দুতে লেখা কাহিনীটি শুনেছিলাম, বাংলায় সেটা বলছি।

হুঃ, কোয়েলী বেগম! বোধ হয় তার নসিবে সঙ্গে দিল্লাগি ক'রেই আম্মি তার নাম রেখেছি কোয়েলী বেগম। গানই যদি সে না গাইতে পারল সোহরের মনই যদি না টলাতে পারল, তবে এই ছা রূপে আর কোয়েলী নামে তার কি কাম? তার নসিবে খোদা কি বাদশার পেয়ার লেখে নি? মনটা কেমন তার উদাস-উদাস লাগে। যদিও এটা তার স্বভাব বিরুদ্ধ। আসলে সে চপলা।

ক্ষীণাঙ্গী হলেও বড় সুন্দরী এই কোয়েলী। নবাবের তিসরী বেগম। স্বভাবে কৈশোরের চাপল্য, নিজের বাঁদীর সঙ্গে খেলা করতে বা অন্য দু'টি বেগমকে নাজেহাল করতে তার জুড়ি নেই।

লক্ষ্ণৌএর নবাব ওয়াজেদ আলি শা তাঁর আলিশান রাজমহল ছত্রমঞ্জিলে বাস করেন। রাজকার্যের থেকে বেশী প্রিয় তাঁর সঙ্গীত-সাধনা। নিজেই সুন্দর সুন্দর নজম ও রুবাই রচনা ক'রে তা নিজের সুকণ্ঠী দুই বেগমের কণ্ঠে তুলে দেন। এ ছাড়া কয়েকজন নাজনীন নর্তকী ও গায়িকা আছে। তারাও তাঁর নিজের রচিত গান তাদের মধুর কণ্ঠে গেয়ে তাঁকেই পরিবেশন করে। অবসর সময় তাঁর এতেই কেটে যায়, অবহেলিত থাকে শুধু একজন, ঐ কোয়েলী বেগম। নাম তার কোয়েলী, কিন্তু কণ্ঠে নেই কোকিলের সুর। হাসিতে তার সুরের ঝর্ণা বয়ে যায়; কথাগুলিও মিঠাস ভরা, কিন্তু কণ্ঠে তার গানের সুর নেই, তাই সে বাদশার প্রিয়া হয়েও প্রিয় নয়। কারণ, বাদশার সম্পর্ক সুরের সঙ্গে, সুরার সঙ্গেও নয়; সাকির সঙ্গেও নয়। তবু তিনি সহৃদয় বিবেচক নবাব, মাঝে মাঝে আসেন বেগমের খবর খয়রিয়ত নিতে। কিন্তু তাতে কোন আন্তরিকতা থাকে না, শুধু থাকে সাড়ম্বর বাক্যবিন্যাস। এদিকে কোয়েলী বেগমের স্বভাবটি হ'ল পাতার আড়ালে

লুকিয়ে ডাকা কোকিলের মতই। গলায় তার সুর খেলে না, মুখেও তার বোল ফোটে না। বাদশার সামনে সে থাকে নীরব, নতমুখী। তখন রাজ্যের লজ্জা এসে ঘিরে ধরে তাকে। কিন্তু সেই হ'ল স্বভাবে আর রূপে নবাবপত্নীদের মধ্যে সবচেয়ে সেরা।

বাদশা যখন সবকিছুর একঘেয়েমিতে ক্লান্ত বোধ করেন, সব কিছুই যখন তাঁর ফিকা ফিকা লাগে তখন খানিকক্ষণের জন্যে দিলবহলাতে আসেন এই নতমুখী শর্মিন্দা কোয়েলী বেগমের কাছে। ও যেন একটি লজ্জাবতী লতা, ছুঁয়ে দিলেই পাতাগুলি সঙ্গে সঙ্গে কুঁকড়ে যায়। এতদিন হ'ল সাদি হয়েছে; তবু তার ভয় কাটে নি, শরম ঘোচে নি। এখনও সে প্রগল্ভ হয়ে উঠতে পারে নি নিজের সোহরের কাছে। আসলে সে কতটুকু কাছে পেয়েছে নবাবকে যে, ঠিকমত তাঁকে চিনবে জানবে বা সহজ হবে তাঁর কাছে? গোঁড়া খানদানি মুসলমান ঘরের মেয়ে সে। সেখানে মেয়েদের গলা থেকে সুর বের করা মানে বাঈজীর রেওয়াজ করা। এই তার হাসির জন্যই কি সে কম বকুনি খেয়েছে আব্বাজানের কাছে? সে তাঁদের একটিমাত্র পেয়ারী বেটী বলেও রেহাই পায় নি। যৌবন ফুটে ওঠার আগেই সে এসেছে আলি শার হারেমে। আলি শার আম্মিজীর পছন্দ করা বেগম সে। আসলে সে স্বভাব-কিশোরী। বাদশার সামনে তার যত শরম, এমনিতে সে বড় দুরন্ত, পাখীর খাঁচার বুলবুলিকে কাকাতুয়াকে খোঁচাবে। কাকাতুয়া তাকে ফরেবি বলে গাল দেবে; ঐ গালি সে নিজেই শিখিয়েছে।

তার মাইকার বুড়ী বাঁদীকে বলবে, যা, জলদি আমার জন্যে মিঠা পান নিয়ে আয়, না আনলে ভাল হবে না। বাঁদী বলে, হ্যাঁ, আমার ওপরেই যত চোট! এর কিছুটা যদি বাদশার ওপর বর্ষণ করতে, কিছুটা কাজ হ'ত।

কোয়েলী বলে, ছিঃ, তিনি আমার মালিক, আর আমি তাঁর ওপর নারাজগি দেখাব?

—তাও পারবে না—এমন মিঠা আওয়াজ, তবু গানও গাইবে না, তবে ঐ কলম নিয়ে ব'সে ব'সে খাতার বুকেই চকোরের দিল-দর্দের কাহিনী লেখ।

—ব্যাস্ ব্যাস্ বহুত খুব। সুন্দর একটা রুবাই মনে এসেছে।

—তবে আর কি, তরন্নুম করতে থাক আর লিখতে থাক।

—দেখ্, তুই খামোখাই রাগ করছিস্। শুধু কি নিজেরটা দেখলেই চলে? অন্যদের দিকেও একটু তাকাতে হয়। আমি যদি গান গাই তা' হ'লে আমার দুই সতীনের কি পরেশানি হবে ভাব্ ত? আর কি বাদশা ওদের দিকে নজর ডালবেন? আরে, উনি ত আমারই দোপাট্টায় বাঁধা আছেন। যে ক'দিন পাচ্ছে পেয়ে নিক। তারপর আমি ত আমার চীজ বুঝেই নেব।

—আহা! সেদিন কি আর আমার নসিবে আসবে? আমি কি আর আঁখ ভ'রে আমার কোয়েলীকে বাদশার পেয়ারীরূপে দেখতে পাব? তা যদি হ'ত অন্য সব বাঁদীগুলোর ঘমণ্ড ভেঙ্গে দিতাম। অহঙ্কারে মট্‌মট্ করছেন সবাই।

—আচ্ছা থাম্, রুবাই শোন্—

গ'র নজরোঁসে হো দূর
তো দিল্ ভি হ্যায় মজবুর।
তব ভি মেরি উলফত সে
দিল তেরা হো মখমুর।

এর মানে কি হ'ল জানিস্? মানে হ'ল, দৃষ্টির নাগালের বাইরে থাকলে মনও দূরে স'রে যায় জানি, কিন্তু তবুও যেন আমার এই ভালবাসার সরাব তোমার মনকে মাতাল করে রাখে।

বাঁদী শশব্যস্তে উঠে দাঁড়িয়ে কুর্ণিশ করতেই—কোয়েলী বেগম বলে, ব্যাস্, ব্যাস্, খুব তারিফ হয়েছে। নে এখন পান বানা।

পেছনে ফিরে বসে কোয়েলী বেগম, টেরই পায় না বাদশার উপস্থিতি। বাঁদী কোন জবাব না দিয়ে ইশারায় বাদশাকে দেখিয়ে দিয়ে আড়ালে স'রে যায়।

কোয়েলী বেগম লজ্জায় ভয়ে কুঁকড়ে যায়। তাড়াতাড়ি গুলসন জালির দোপাট্টা মুখের ওপর নামিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে আভূমি নত হয়ে সালাম জানায়। মিহিস্বরে বলে, "মেরা গোস্তাকি মাফ্ হো জাঁহাপনা।"



আমি যদি গান গাই তাহলে আমার দুই সতীনের কি পরেশানি হবে, ভাব্‌ত ?

বাদশা বলেন, "এবার এমনিই বিনা এত্তেলায় আসব, তবেই না তোমার সহজ রূপটি দেখতে পাব ? আমার ভুল হয় নি, আজ তোমার সালগিরা, জন্মদিন ; তাই তোমার জন্য সামান্য তওফা এনেছি।

একটি রূপার ট্রে এনে নামিয়ে রাখে বাঁদী। কোয়েলী শুধু একটি বার হাত দিয়ে স্পর্শ করল।

বাদশা একটু অবাক্ হন। অন্য বেগমরা কেমন লোভীর মত সব জিনিষ খুঁটিয়ে দেখত, তাদের চোখ দুটো ঝক্ ঝক্ করত এই সৌখিন জেবর কাপড় পাবার আনন্দে। কিন্তু এ ? আজব মেয়ে ! আবার ওর এই নির্লোভিতা ওঁকে খুশীও করে। তবু বলেন, "যাও, ওগুলো পরে এসো আর তারপর তোমার নজম শোনাও। আজ আমি তোমার তরন্নুম শুনে নিয়েছি, তোমার গলায় সুর আছে কোয়েলী, তবু যে তুমি কেন গান কর না জানি না।"

কোন জবাব না দিয়ে তেমনি মাথা হেঁট করেই ব'সে থাকে কোয়েলী বেগম।

একটু নীরস স্বরেই বাদশা বলেন, "এত তোমার কিসের শরম ? এত দিন শাদী হয়েছে, আজ পর্যন্ত আমি তোমাকে ভাল করে দেখতেও পাই নি, তোমাকে জানা ত দূরের কথা। যাও, পরে এসো ঐ নতুন পোশাক।"

ট্রের আবরণ সরাতেই ঝক্‌মক্ করে ওঠে ঠাসা সলমা চুমকির লক্ষ্ণৌএর কামদার সুর্ক রং সানীলের সালোয়ার কামিজ আর আসলি জরির বেহতাব চমক চুন্নি জরিদার নাগরা। লাল নগ্ বসানো কানের ঝালর, গলার নেকলেস আর শোকবন্ধ। কুর্নিস করে বাঁদী এসে তুলে নিয়ে যায় সেই ট্রে।

মস্ত বড় সিসার সামনে বসে নতুন পোশাকে সাজে কোয়েলী আর বাঁদী বলে, ছার জন্ম হয়েছিল ঔরত হয়ে, এমন রূপ, এমন মিঠা আওয়াজ থাকতে মরদকে বশ করতে পার না ? এত শরম কিসের ? বাদশা নারাজ হন যখন, তখন কেন অমন কর ? তোমার অমন হাসি ! সেই হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে দাও বাদশার সামনে, যাও।" কিন্তু হাসবে কে ? চোখের জলে সুর্মা ধুয়ে গেল।

অন্য মহল থেকে সুরেলি গজলের তান ভেসে আসছে, বাদশা নিজের অজান্তেই হাত নাড়তে থাকেন তালে তালে। গজলের দু'একটা কলিও শুনতে পাচ্ছেন—

হাজারোঁ সাল নার্গিস আপনি বেনুরী পে
রোতি হ্যায়।
বড়ি মুশকিল সে হোতা হ্যায় চমন মে
দীদাওয়র পয়দা।

নিজের সৌন্দর্যহীনতার দুঃখে কেঁদে চলেছে নার্গিস ফুল।

কিন্তু যে প্রকৃত রসবেত্তা, সে তার সেই কুরূপের মধ্যেও পাবে অপরূপের প্রকাশ। রাগে গর গর করে পেস্‌মন বাঁদী, বলে, "নাও দেখ, ছলা-কলা কাকে বলে শেখ, নিজের মহলে বসে প্রাণপণে তান ছাড়ছে লোমড়ি বেগম। শেয়ালের মত ধুর্ত তাই ত লোমড়ি নাম দিয়েছি।" পেছনে দাঁড়িয়ে নেকলেসের ফাঁস বাঁধতে বাঁধতে বলে পেসমন, 'ঐ ত রূপের ডালি, মুখময় চেচকের দাগ, গিধরের মত শরীর, ঐ তানের চোটেই তরে গেল। আর একটা ত ভঁয়েস, খালি আছে মিঠা আওয়াজ।"

বেশ বদল করে তাড়াতাড়ি কোয়েলী বেগম যায়। বাদশা একাটি বসে আছেন—কিন্তু পর্দা দুহাতে সরিয়ে আর আগে বাড়তে পারে না—পা যেন চুম্বকের মত আটকে গেছে কোমল কার্পেটে। কার্পেটের যেন শখ গেছে কে বেশী মোলায়েম সেটা যাচাই করার।

নবাব আলি শার হাতে একটি খাতা—তিনি মশগুল হয়ে পাতার পর পাতা ওল্টাচ্ছেন—হঠাৎ কোয়েলীর দিকে চোখ পড়তে হেসে ঐ খাতা থেকেই একটি সের বলেন।

মুঝে যো অর্জ্ তমন্না পে কুছ হিজাওব্ আয়া,
মেরে সওয়াল কী শর্মিন্দগী সওয়াল হুঈ।

বাঃ, চমৎকার লিখেছ তো পেয়ারী—আমার বাসনা তোমাকে জানাতে গিয়ে আমি লজ্জায় মরে গেলাম. তখন আমার সেই লজ্জাই বাসনার রূপ নিল, আর সেই লজ্জাই আমার আকাঙ্ক্ষা তোমাকে জানিয়ে দিল।

নিজে উঠে দাঁড়িয়ে হাত ধরে কাছে নিয়ে বসালেন কোয়েলীকে। দু'হাতে ওর মুখখানি তুলে ধরে বললেন, "তুমি বড় সুন্দর কোয়েলী, এমনি আনারদানার মত রংএই লাল রং মানায়। আমার সুরের পিপাসা তুমি মেটাতে পার নি বটে, কিন্তু তুমি আমার চোখের তৃষ্ণা মিটিয়ে দিলে। বড় সুন্দর আফ্‌সানা লেখ তুমি, সেরগুলিও সুন্দর। তোমাকে গানও গাইতে হবে কোয়েলী, তুমি পারবে, নিশ্চয়ই পারবে। তোমার এই শরমই হয়েছে তোমার শত্রু। তাই তুমি গাইতে চাও না।"

তার ঐ খাতাখানি, যা সে কত রাত্রি জেগে একটির পর একটি আফসানা, আর বুকের রক্ত নিংড়ে ভাষা বের করে সের লিখে ভরেছে, সেটি কিনা বাদশা দেখে ফেললেন? কতদিন পেসমন্ বলেছে, "ঐ খাতা আমি তুলে দেব নবাব আলি শার হাতে, তাজ্জব হয়ে যাবেন তিনি, তোমার ওপর মনোভাব তাঁর বদলে যাবে। শুধু স্নেহ নয়, শ্রদ্ধাও জাগাবে সেই সঙ্গে।" সে খাতাটি বুকে আঁকড়ে ধরে বলেছে, "না না ছিঃ, কক্ষণো ও কাম করিস না, পেসমন। ছিঃ কত ছোট হয়ে যাব তাঁর কাছে বল্‌ত। এ যে সব তাঁরই উদ্দেশে লেখা, আমার মনের সব গোপন ইচ্ছে, আকাঙ্ক্ষা সব যে এর মধ্যে লুকিয়ে রেখেছি। না না, সে আমি মরে গেলেও ওঁকে দেখাতে পারব না। এটি বরং আমার ফর্দএ অমল হয়ে থাকবে।" সেই খাতা আজ বাদশার হাতে, শরম লাগবে না তার?

কিন্তু সেই শরমের ওপর নবাবের কটুক্তি আর পেসমনের গরম গরম বাত সব ভুলিয়ে দিল তাকে। মুখের নকাব করা দোপাট্টা সে ধীরে ধীরে পুরোটা সরিয়ে দিয়ে সেই জর্দ রংএর বড় বড় সুর্মাটানা চোখ তুলে সোজা বাদশার দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, "আমাকে আর কিছুদিন ওয়ক্ত দিন বাদশা, তারপর আমি আপনার খোয়াইস পুরো করব। কিন্তু শুধুই কি সুর ভালবাসেন, নবাব? সুর ছাড়া আর কিছুই কি আপনি বোঝেন না? এই যে আমার বুকভরা ভালবাসা, পেয়ার উলফত, এর কি কোনই মূল্য নেই আপনার কাছে? শুধুই সের আপনার প্রিয়? সায়র নয়? শুধু গজল শুনতেই ভালবাসেন, তার ভেতর দিয়ে যে গায় সে যে তার অন্তরের কত ব্যথা, তকলিফ, পরিসানিয়া বোঝাতে চেষ্টা করে তা আপনার অন্তরে সাড়া তোলে না? আপনার দিলকি দরওয়াজা কি বন্ধ নবাব? তাই বোধ হয় সেখানে সাড়া জাগে না। এই যে সারাক্ষণ আমি তোমার তসবির আমার দিলের মধ্যে দেখছি, এই যে অহুক্ষণ আমি তোমারই নাম তসবিতে জপছি, তার

প্রতিদান কই? কিসে? এই জেবর জায়দাদ? মহলের আরাম এইসব? এবার আত্মগত হয়ে বলে, নাঃ, কানেই তোমার সুর বাজে, মনে পৌঁছয় না।

তার স্বভাববিরুদ্ধ এই প্রগলভতা ও উত্তেজনা নবাবকে যতটা বিস্মিত করে ততটা আনন্দিত করে। চমৎকার কথা বলতে পারে তো কোয়েলী বেগম। তিনি তার হাত ধরতে যান কিন্তু নিজেই সে সরে যায়। এবার ধরা গলায় বলে, "কোয়েলী বেগম আপনার কাছে মাফি মাঙছে। তার সবচেয়ে যা বড় আনন্দ, আকাঙ্ক্ষা, তা হ'ল আপনার সঙ্গে মুলাকাত। তার থেকেও নিজেকে বঞ্চিত করে আপনার এযাযত চাইছে, অনুমতি ভিক্ষা করছে, আপনি তাকে কিছুদিন বড়া ইমামবারায় রেখে দিন। একজন ওস্তাদ ঠিক করে দিন, তিনি নীচে বসে তান ধরবেন, আর আমি ওপরের ঝরোখায় পর্দার আড়ালে বসে তাঁর সেই সুরে সুর মেলাব। আর সেই নির্জন সুনসান পুরীতে বসে সেই গজলের রেওয়াজ করব। ধীরে ধীরে আমার এই শর্মিন্দগী দূর হয়ে যাবে আলি শা। লজ্জা ভেঙ্গে যাবে। আর সে বেওকুফের মত শর্মিন্দা হয়ে আপনাকে নারাজ করবে না।" এই বলে সে অন্তরালে চলে গেল।

ওর মহল ছেড়ে বেরিয়ে আসতে আসতে নবাব ওয়াজেদ আলি শা ভাবেন, কথাগুলো বড় ঠিক বলেছে কোয়েলী বেগম। সত্যিই হয়ত আমার কাছে কারুর দিল-দর্দের কোন দাওয়াই নেই, তবে সুরের পিয়াসের শান্তি আছে। চাঁদনী কেদারার সুর ভেসে আসছে মসরৎ বেগমের মহল থেকে। সত্যিই ত আজ মৌসমে চাঁদনী ছেয়ে গেছে। তবে ওর ভারী গলায় ঐ চাঁদনী কেদারা যেন ঠিক খুলছে না। তানে লয়ে ঠিক আছে, কিন্তু সেই পাগল-করা খোয়াব কই? এই চাঁদনী কেদারা যদি কোয়েলী বেগম গাইত এই ছত্র-মঞ্জিলের ছাদে বসে। আজকের সেই সুর্ক রং পোশাক আর লাল চুনীর গয়না থাকত ওর গায়। আমার থেকে একটু দূরে বসে ঐ গোরা গোরা হাত নাচিয়ে গাইত, এই রাত সোহনী হয়ে যেত, হাওয়া রাতরাণীর সুবাসে ভরে উঠত, মৌসম তর্ হয়ে যেত, মনে হ'ত কোন নাজনীন বেহেস্তের হুরী এইমাত্র ঐ মাহতাবের মধ্যে থেকে নেমে এসেছে, গাইছে চাঁদনী কেদারা। না, ঠিক বলেছে কোয়েলী বড়া ইমামবারায় পাঠিয়ে দেব ওকে, আর আগে শেখাব চাঁদনী কেদারা। ওর কাছে বসে ওর গান শুনতে শুনতে সুরের নেশায় মাতাল হয়ে যাব, আর বলব,

জিতনি ভি আজ পি সকু, উজর না কর, পিলায় যা॥
মস্ত নজর কা বাস্তা, মস্তে—নজর বানায় যা।

ওজর ক'রো না, আপত্তি তুলো না, যতটা পান করতে পারি পান করাও। মাতাল করে দাও তোমার সুরের নেশায়।

মসরত বেগম আর জোহ্‌রা বেগমের মহলে এবার কানাকানি ফিসফাস সুরু হ'ল। বাদশা ক'দিন আনমনা। নতুন এক নেশায় মেতেছেন। এক নয়া কারিগর এসেছে, সে বলছে বড়া ইমামবারার দোতলার ঝরোখার সামনে যে অলিন্দ আছে সেটি বরাবর একটি লম্বা টানা বারান্দা তৈরি করবে আর সেই বারান্দা ঘিরে দেবে একটি রেলিং দিয়ে। সেই রেলিং হবে সুরের ফাহুস। ঐ গোল গম্বুজের নীচে বসে যদি ওস্তাদ গান করেন একবার, ঐ রেলিং দিয়ে তার প্রতিধ্বনি হবে তিনবার। আবার ওপরে ঝরোখায় বসে যখন বেগম তার জবাব দেবেন, তার প্রতিধ্বনি হবে তিনবার। জায়গাটি সুরের আওয়াজ আর গিটকিরির গমকে গম গম করবে। এতে বেগম সাহেবার পরিসানিয়াও কম হবে। মৃদুস্বরে গাইলেও আওয়াজ হবে জোর। এযাযাত দিয়েছেন নবাব: কাম সুরু হয়ে গেছে। ঐ ছোট ছোট ঝরোখার সামনে দিয়ে টানা বারান্দা, আর ফাঁপা রেলিং তৈরি হলেই কোয়েলী বেগম যাবে ইমামবারায় গানের রেওয়াজ করতে।

মসরত বেগম সমস্ত মাথাটা দোপাট্টা দিয়ে ঢেকে কাবার ছবি দেওয়া মখমলের কালিনের ওপর কখনও দাঁড়িয়ে, কখনও বসে, কখনও হাঁটু মুড়ে নমাজ পড়ছিল। মগরিবের নমাজ, দেরি হয় শেষ হ'তে। আর জোহ্‌রা বেগম চাঁদির রহলের ওপর কোরানশরীফ্ রেখে পাঠ



তবে বলছি শোন। তোমাদের আঁখের কিরা, পথের কাঁটা কোয়েলী বেগম কাল চলল।

করছে। মাঝে মাঝে বাতচিতও হচ্ছে। জোহ্‌রা বেগমের ফিরোজা রংএর কামদার কামিজ, আর হীরার ঝালর ঝল্‌কে উঠছে। বলছে, তোবা তোবা, শেষে ঐ বাচ্চিটা বশ করল নবাবকে? মসরত বেগমও একবার মুখের সামনে হাত রেখে জবাব দিল, জঁহা হ্যায় কলি, ওবুঁহা হ্যায় অলি। তার অর্ধেক নমাজ শেষ হয়েছে, আবার সুরু করল পড়তে। সাদা রেশমের ওপর রূপোলি কাজের আঁটো কামিজ আর ঘেরদার গারারায় ঝলমল করছে সে।

হাতে ট্রে, তাতে দু'গেলাস গরম সুরুয়া। বড় ফায়দেমন্দ এই সিনার সুরুয়া। পাঁজরের হাড়ের স্যুপ, আর তাতে আছে নানান মশলা। গলার তাগদ বাড়বে, আওয়াজ সাফ হবে। বাদশার কানে সুরের মধু ঢালবে তারা। রাত হ'তে বড় বাকি নেই। বাঁদীকে বলে, নতুন কি খবর আছে শোনাও ফিরোজা। হাতের ট্রে নামিয়ে রূপার গ্লাস এক এক করে বেগমদের হাতে তুলে দিয়ে ফিরোজা বলে, খুশখবরি শুনতে হ'লে ইনাম দিতে হয়। বল আগে, কি দেবে। পানদান থেকে একমুঠো সোনালী তবকে মোড়া খুসবুদার পান আর ইলাচ, গোরি তুলে ফিরোজার হাতে দিয়ে জোহ্‌রা বেগম বলে, এই নে, বসে এবার বল্‌। কালো কালো দাঁত বের করে হাত ঘুরিয়ে ফিরোজা বলে, এতে হবে না। তবে বলছি শোন, তোমাদের আঁখের কিরা, পথের কাঁটা কোয়েলী বেগম কাল চলল।

কোথায়?

কেন, ইমামবারায়।

এটা ওদের কাছে মোটেই খুশখবরি নয়। যে যাচ্ছে সে আবার তালিম নিয়ে যখন ফিরে এসে নিজের এলেম দেখাতে সুরু করবে, তখন এরা আর হালে পানি পাবে না। সে কথা শুনে ফিরোজা আবার হাত ঘুরিয়ে হাসে, বলে, আমি যে পথ নিয়েছিলাম তবে তোমরাও সেই পথ নিও। আমার মিয়াও সুরের শরাবে মাতাল ছিল, নিয়ে এল এক তরফা আলিকে, কিন্তু এই ফিরোজা বিবির হাতের সুরুয়া, কখনও গলার আওয়াজে মিঠাস

আনে কখনও আনে পিয়াস। আর সে পিয়াস হ'ল মৌত-এর পিয়াস। তরফা আলির নাচনা, গানা লচক দিখানা একেবারে থেমে গেল। কিন্তু কেউ টের পেল না কিসে থামল। অন্দরে খোজা প্রহরী হাঁকল, বাদশা তসরিফ লা রহেঁ হেঁ। সাড়া পড়ে গেল, সাজ সাজ রব উঠল। ফরাস, মছলন্দ, ঠিক-ঠাক হয়ে গেল, বেগমরা মুহূর্তে আর একবার করে চোখে সুর্মা টানল। বাত সেখানেই খতম।

কোয়েলী বেগম হ'ল আলি শার মায়ের আপন বোনের মেয়ে। সুতরাং তিনিও চান নবাব কোয়েলীর আঁচলেই বাঁধা থাকুন। কোয়েলীর অপারগতা এতদিন বিরক্তই করেছে তাঁকে। তিনিও ওকে বাদশার মনোরঞ্জন করতে উপদেশ দিতেন। বলতেন, নাচ শেখো, গানা গাও। ওকে তোমার দিকে ফেরাও। আমি বড় আশা করে তোমায় এনেছি। তোমার আওলাদ তখ্‌তএ বসবে, এই আমি চাই। ওরা ঐ জোহরা, মসরত ওরা ত দিল বহলাবার বিবি, আসলি বেগম ত হ'লে তুমি। মাঝে মাঝে এই যে বাদশা কোয়েলীর মহলে এসে উপস্থিত হতেন, এর পেছনে থাকত তাঁর প্রেরণা। কিন্তু কোয়েলীর শর্মিন্দগী কাটিয়ে ধীরে ধীরে তার লজ্জা ভেঙ্গে তাকে আপন করার মত ধৈর্য ছিল না নবাবের। তিনি চাইতেন মধুগন্ধে ভরা ফুটন্ত ফুল, স্ফুটনোন্মুখ কুঁড়ি নয়। তবু আর কথা ঠেলতে পারতেন না, আসতেন ওর কাছে।

ঐ নতুন কারিগর বানিয়ে দিল সেই সুরেলা রেলিং আর আরও একটি নতুন জিনিষ। ইমামবারার ছাদ। সে ছাদ সহজে তাতবে না তায় যতই শক্ত গরমি পড়ুক। অদ্ভুত তার গঠন-চাতুর্য। প্রচুর ইনাম নিয়ে সে লক্ষ্ণৌএর দরবারে আম থেকে বাদশাকে সালাম দিতে দিতে খুশী মনে বিদায় নিল।

এবার কোয়েলী বেগম যাবে বড় ইমামবারায়, তার তৈয়ারিয়াঁ হতে লাগল। পেটারি ভরা পোশাক উঠল উটের পিঠে। বাজনার সরঞ্জাম, তবলা তানপুরা বীণ উঠল তাঞ্জামে আর সওয়ারী বাঁদী পোসমন্। আর অন্য তাঞ্জামে আপাদমস্তক নীল রেশমের বোর্খা মোড়া কিশোরী কোয়েলী বেগম। যাবার আগে সজল চোখে সবার কাছে বিদায় নিল সে। বাদশার আম্মিজী তাকে জড়িয়ে ধরে মাথায় চুমু দিয়ে বলেছিলেন, আমি দোয়া মাঙ্গব, তুমি নিশ্চয়ই পারবে, মনের জিদ ভেঙ্গ না, আর কদিন—ছয়মাসেই শিখে নেবে তুমি। মাত্র ছয়মাস তোমার এই নিরালায় আর বীরানায় থাকতে হবে। ঈদএর সময় আনব তোমায়। অন্দর মহলে মহফিন বসাব। জান ত, লাল আমার হিন্দুদের মত হোরী খেলে, ফাগ খেলে ঐ দিন,—আর গানা শোনে বৃন্দাবনী সারং। সেই গান এবার ঈদে তুমি গাইবে আমি দোয়া মাঙ্গব তোমার জন্য। যাও বেটি, যাও। চলে গেল তাঞ্জাম। যাবার আগে কোয়েলী শুধু বলে গেল, তবে সেই ঈদের দিনই বাদশার সঙ্গে হবে আমার মুলাকাত, তার আগে নয়। তবে বাদশা যেন নিজে যান আমায় নিয়ে আসতে।

ইমামবারায় পৌছে পোসমন বলে, এখানে থাকব তুমি আর আমি, এই বিরাট্ শূন্য পুরী। দেখ, ভুলেও যেন ভুল-ভুলাইয়ায় ঢুকো না, ঢুকলে বেরুতে পারবে না। বেরুবার পথ আমিও জানি না তুমিও জান না। ছাদে বসে রেওয়াজ কর সকাল-সন্ধ্যে, বাকি সময় নিজের কামরায় থাক। আর ওস্তাদজী এলে ঝরোখায় গিয়ে বস। বাধ্য মেয়েটির মত তাই করে কোয়েলী। দিনান্তে একবার ছত্রমঞ্জিল প্যালেস থেকে খানা আসে, পান তামাকু আসে দুজনের মত। আর নীচে থাকে হুকুম বরদার, পাহারেদাররা। তারা চৌকি দেয়। বড় নীরব নিঃশব্দ এই ইমামবারার চারদিক্। ছাদে উঠলে দূরে দেখা যায় গোমতী বয়ে চলেছে। আর দেখা যায় ছত্রমঞ্জিলের ছাতার মত চুড়া।

যে ভারি, খানা নিয়ে আসে তার হাতে রোজ বা দু'একদিন বাদ বাদ আসে একটি করে ছোট্ট খত। সেটি বাদশার লেখা। বেশীর ভাগ তাতে থাকে সের, আবার তার অন্তরে থাকে সাহস, উৎসাহ বা বিরহ; কখনো আসে আম্মিজীর দরদভরা স্নেহমাখা চিঠি। কোয়েলী বেগম সায়েরী করেই জবাব দেয় বাদশার খত-এর আর আম্মিজীকে লেখে একটিবার আসতে।

বাদশার খত—ইয়ে কৌন উঠা হ্যায় শর্মাতা ?
রুখ্ পে সুর্খি, আঁখ মে জাদু, ভিনী ভিনী
বর মেঁ খুসবু,
বাঁকি চিতবন, সিমটে অবরু, নীচে নজরে,
বিখরে গেসু,
ইয়ে কৌন উঠা হ্যায় শর্মাতা ?

(ঘামে ভেজা পরিশ্রান্ত শরীর, কিন্তু দৃষ্টিতে রয়েছে প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা, তবে নজর কিন্তু শরমে নত। এলো-মেলো খোলা চুল। আর শরমে রাঙ্গা একটি পরিশ্রান্ত শরীর নিয়ে কে এসে আমার সামনে দাঁড়াল ?)

কোয়েলীর জবাব।—ইয়ে কৌন উঠা হ্যায় শর্মাতা ?
হলচল মেঁ দিল কী বস্তি হ্যায়, তুফানে-জুহু মেঁ
হস্তি হ্যায়,
আঁখ মে শব কো মস্তি হ্যায়,
অওর মস্তী দিল কো উসতি হ্যায়।
ইয়ে কৌন উঠা হ্যায় শর্মাতা ?

(আমার সমস্ত পারিপার্শ্বিক হারিয়ে ফেলে আত্মগত হয়ে উন্মাদের মত তোমার চিন্তায় মগ্ন হয়ে আছি। আমার চোখের বাহ্যিক দৃষ্টি আজ মৃত, অপলক, স্থির, আমার অন্তরে প্রদীপের শিখার মত তোমার মূর্তির উজ্জ্বলতা। এমনি করে কেন তুমি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে লজ্জা দিচ্ছ ?)

সুরু হয় কোয়েলীর সুরশিক্ষা। সুবা সাম ওস্তাদ আসেন, বসেন ঠিক গোলগম্বুজের নীচে, সেখান থেকে তাঁর গলার আওয়াজ ভেসে আসে ওপরে, আর ওপরে ঝরোখায় বসে কোয়েলী তাঁর তান তাঁকে ফিরিয়ে দেয়, তার সেই সুরেলি গলার মিহি আওয়াজ সেই কারিগরের গড়া রেলিংএর গা বেয়ে বার বার অনুরণন তুলে পিছলে পিছলে গড়িয়ে পড়ে নীচে ওস্তাদের কাছে। আবার আসে ওস্তাদের তান আবার তা শতধা হয়ে ফেরত যায় নীচে। নীচে থেকে ওস্তাদ বলেন, বাহবা বেটি, বাহবা ! খুদ খোদার দোয়া আছে তোমার ওপর। এ যে সুরের ঢেউ বইয়ে দিচ্ছ, জাদু করে দিচ্ছ গলার নিপুণ কাজে। খুশি উপ্চে পড়ে ওস্তাদের বাতে। পেসমন বাঁদী আরও জোরে জোরে ময়ূরের পাখার পাঙ্খা চালায় আর হাত বুলোয় কোয়েলীর গায়। আনন্দে জল ঝরে তার চোখে।

এস্তেলা যায় নবাবের কাছে। উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন ওস্তাদ, বলেন, অনেক ছাত্র-ছাত্রীকে এলেম দিয়েছি কিন্তু ঐ বেগম সাহেবার মত এমন একটি ছাত্রী আমার কাছে কখনও গানা শিখবে এ আমার কল্পনাতেও ছিল না। আপনি নিজের কানে না শুনলে সেই অপূর্ব সুরের মূর্চ্ছনার কিছুই আন্দাজ করতে পারবেন না আলি শা। বৃন্দাবনী সারংএর তালিম শেষ হ'ল। এবার চাঁদনী কেদারার পালা।

ওস্তাদজীর কাছে বার বার তারিফ শুনে একদিন বাদশা ভাবলেন, থাকুক কোয়েলীর খানা, আজ তিনি যাবেন, তবে ছদ্মবেশে।

এদিকে কোয়েলী বেগম দিন গুণছে, কবে তার ছয় মাস পূর্ণ হবে, কবে আসবে ঈদ, সেদিন সে পাবে আলি শার দর্শন। শুধুই কি মন ? তার দেহের দুয়ারে এসেছে যৌবনের সাড়া, সেও চাইছে আলি শার সেই নিবিড় আলিঙ্গন। না, আর সে লজ্জা করে দূরে থাকবে না, ঝাঁপিয়ে পড়বে তাঁর বুকে। তার সেই বালাপনের চাঞ্চল্য আজ বিদায় নিয়েছে, এসেছে যৌবনের জোয়ার। আপনার ভাবে ভোর হয়ে দুপুরের রোদে ভরা ছাদের দিকে চেয়ে চেয়ে, দিওয়ালের আড়ে বসে রেওয়াজ করছিল বৃন্দাবনী সারংএ। চোখের দৃষ্টি ছিল ছত্রমঞ্জিলের দিকে। যেন এক মনে কাবার দিকে মুখ করে নমাজ পড়ছে, এমনি তন্ময় হয়ে গাইছিল সে। তার লালচে রংএর খোলা চুলে পড়েছে রোদের ঝিলিক্, গায়ের গুলাবি রং রোদের আঁচে হয়েছে আরও লাল। সুরের ঝর্ণা বয়ে চলেছে ছাদের ওপর দিয়ে।

খাবারের ভারির সঙ্গে এসেছেন বাদশা। কেউ তাঁকে দেখল না। ভুল-ভুলাইয়ার পথ তাঁর চেনা। অলিন্দের পর অলিন্দ পেরিয়ে ছাদের সিঁড়ির এক ধাপ নীচে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলেন সেই অপূর্ব সঙ্গীত।

বড় শখ একবার সেই মৃত বিবা, সেই তাঁর কোয়েলীকে, সেই গায়িকাকে দেখার। একটু উঁকি দিয়ে দেখতেই তিনি চম্‌কে ওঠেন। সেই ভরা দুপুরের রোদমাখা সমস্ত ছাদের ওপর দিয়ে জলের ধারা বইছে। যেন নদী বইছে। আর কোয়েলী, ধ্যানমগ্না রূপসী মৎস্য-কন্যার মত বসে আছে সেই জলধারার মধ্যে। এ কি দেখছেন তিনি? সত্যই কি জল না সুরাব দেখছেন? এই দিন-দুপুরে? একেই কি বলে মরীচিকা? এবার তিনি ধাপের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে ভাল করে পরখ করতে যান। আর কোয়েলী তাঁকে দেখতে পায়। ছুটে আসছে সে রোদে ঝিলিক্‌-দেওয়া সেই জলধারা মাড়িয়ে মাড়িয়ে। অথচ তার পায়ে বিন্দুমাত্র জলের স্পর্শ নেই, রোদের তাপে জ্বলন্ত ছাদে পা রাখতে না রাখতেই তুলে নিচ্ছে সে, অথচ তিনি দেখছেন নির্মল জলের ধারা। হঠাৎ খেয়াল হ'ল, ধরা পড়ে যাবেন তিনি। মিলিয়ে গেলেন ভুল-ভুলাইয়ার মধ্যে। কোয়েলীর গলার ডাক শুনলেন, আলিশা? আলিশা? কিন্তু সে চেনে না ভুলভুলাইয়ার পথ।

পেসমন তাকে ফেরাল। বলল, দিন-দুপুরে খোয়াব দেখছ বেগম? চল, নীচে চল। খানা এসেছে, খাবে চল। কিন্তু সে তখন কাঁদছে, অঝোরে কাঁদছে, আর বলছে, আমি দেখেছি পেসমন, তিনি এসেছিলেন, সত্যি এসেছিলেন, তবু একটিবার আমার কাছে এলেন না। কেন এলেন না, কেন 'এলেন না? আমার মুখের মানাটাই কি সব? আমার অন্তরের এই আকুতি তাঁর কাছে পৌঁছল না? এই যে নিরন্তর আমি তাঁকে মনে মনে ডাকছি সে ডাক কি তার মনে সাড়া তুলল না?

এর পর থেকে সে রোজ দুপুরে তেমনি করে গিয়ে বসে, তান ধরে বৃন্দাবনী সারংএ। ধীরে ধীরে তার রাতের ঘুমও ছুটে গেল, সে আয়ত্তে আনে চাঁদনী কেদারা। বাদশার প্রিয় সুর। আর চেয়ে থাকে সেই সিঁড়ির ধাপটির দিকে যদিই আচানক দেখতে পায় আলি শাকে। আরও একটিবার যদিই দেখতে পায়। তবে কি তিনি আসেন নি, তার মনের ছবিই কি আসলি তসবির হয়ে ফুটে উঠেছিল সেই মুহূর্তে?

জোহ্‌রা বেগম আর মসরত বেগমের সুরুয়া খেয়ে সুরের সাধনা বৃথাই যায়। বাদশা আর আসেন না তাদের মহালে। তাঁকে এখন নেশায় পেয়েছে। নতুন নেশা। আম্মিজী বলেন, তখতে বসতে। কাম কাজ দেখতে, না হলে শাহী বরবাদ যাবে। যান, তখ্‌তে বসেন কিন্তু দিল লাগে না। সের লেখেন বসে বসে। সেই সের পাঠান কোয়েলীকে। অদ্ভুত এক প্রেম এসে বাসা বেঁধেছে তাঁর মনের মধ্যে। এমন করে কারুর জন্য কখনও তাঁর মন উতলা হয় নি, কাউকে পাবার আকাঙ্ক্ষা জাগে নি, এ তৃষ্ণা কিসের, সুরের না সায়রীনের। সত্যি, কোয়েলী দূরে চলে গিয়ে সর্বদা যেন আকর্ষণ করছে তাঁকে।

বাদশা সের লিখে পাঠালেন চাঁদের সঙ্গে তুলনা করে।

মেরে বীরানে সে কোসোঁ দূর হ্যায় তেরা বতন।
হ্যায় মগর দরিয়া-এ-দিল তেরী কশিশ সে মৌজ্‌জন॥
আফ্‌রিনশ্‌ সে সরাপানুর তু, জুলমত হু ম্যায়।
ইস সিয়াহ্‌-রোজী পে, লেকিন তেরা হম-
কিসমত হুঁ ম্যায়॥

(আমার আবাসস্থল থেকে অনেক কোশ দূরে তোমার বাস। কিন্তু তবু আমার এই হৃদয়-সাগরে তোমারই আকর্ষণে তরঙ্গ ওঠে। মনটা আমার সমুদ্রের মত উথাল পাথাল করে তোমার বিরহে। সৃষ্টির আদিকাল থেকে তুমি জ্যোতির্ময়ী, আর আমি অন্ধকার। কিন্তু এটাই তোমার দুর্ভাগ্য যে উপস্থিত আমিই হয়েছি তোমার দুঃখদাতা ভাগ্যবিধাতা।)

জবাব যায় কোয়েলী বেগমের:
য়কসাঁ হ্যায় হুস্নো ইশ্ক কী সরমস্তিয়োঁ কা রঙ্গ।
উনকো খবর উন্‌হে হ্যায় ন মেরি খবর মুঝে।
ম্যঁায় দূর হুঁ তো রূয়ে সুখন মুঝসে কিসলিয়ে,
তুম পাস হোতো কিঁউ নেহি আতে নজর মুঝে।

(হৃদয়ে যদি প্রেমের প্লাবন আসে তখন এমনিই হয়। না, তুমি তোমার মধ্যে আছ, না আমি আমার মধ্যে। হুঁস নেই কারো। যদি আমি দূরেই থাকব তবে নিরন্তর তোমার সঙ্গে বাক্যালাপে মত্ত রয়েছি কি করে? আবার যদি তুমি কাছেই থাকবে তবে আমি তোমাকে একটি বার দেখতে পাচ্ছি না কেন?)

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ওদের এই সের লেখা বন্ধ হয়ে যায় আম্মিজীর হুকুমে। আংরেজ ফার্মান দিয়েছে যদি নবাব ওয়াজেদ আলি শা এই ভাবে রাজকার্যে অবহেলা করেন তবে লক্ষ্ণৌএর শাসনভার তারা নিজেরাই হাতে তুলে নেবে।

না, না, সে হয় না। সব ত গেছে। আগে সারা অওধএর বাদশা ছিলে না এঁরা। শত বর্ষ পার হয়ে এসেছে ওদের বাদশাহী। আর আজ বিদেশী এসে হুমকি দিচ্ছে কেড়ে নেবে রাজত্ব! শুধু ত আছে লক্ষ্ণৌএর বাদশাহী তখত, তাও যাবে? আর আছে নামেমাত্র নবাবী খেতাব! সেও কেড়ে নেবে? না, হয় না তা। আম্মিজী জোর পাহারা লাগান আর কড়া নজর রাখেন আওলাদের ওপর। হুকুম করেন রাজকার্য দেখতে। আদায় তহশীল করতে। বলেন, অনেক খোয়াব দেখেছ, তখ্ত থাকলে আরও দেখবে, এখন আর না। লর্ড হার্ডিঞ্জ আসছেন লক্ষ্ণৌতে তাঁর খোয়াগতের বন্দোবস্ত কর।

ঢেলে সাজান হ'ল দরবারে আম। ইরাণ থেকে এল আঙ্গুরী শরাব। রুপার তামুকদান, ফরসি, পানদান সব পালিশ লেগে ঝকতে লাগল। ঝাড়ের মোমবাতি বদলান হ'ল। মেজ কুর্সিতে বড়াখানার ইন্তেজাম হ'ল। আনার, সেউ সিতাফলের ঢের লেগে গেল। ভেড়িদের ভীড় লেগে গেল। হাণ্ডা হাণ্ডা গোস্ত আর সেলোহা পোলাউ, জর্দা বানাল বাবুর্চিরা। গরম গরম নান ভাজা হতে লাগল। সিনা আর পালংএর টম্যাটো সুরুয়া তৈরী হল হাঁড়ি হাঁড়ি। বিরাট্ খানা হ'ল, তারপর দেওয়া হ'ল দরবারি নাচ। হুস্ন্ হুরীদের মত নাচল রাজনর্ত্তকীরা। সবুর পর সবু সেই আঙ্গুরী শরাব পরিবেশিত হ'ল। সুন্দর কারুকার্য করা সোনার ওপর মিনার জয়পুরী কামের কয়েকটি সবু উপঢৌকন দেওয়া হ'ল লর্ড হার্ডিঞ্জকে। সেই ডিকাণ্টার দেখে হার্ডিঞ্জ বললেন, আজ থেকে কয়েক বছর আগে ১৮৪৭ সালেও এমনি আনন্দ পেয়েছিলাম, এই নবাব ওয়াজেদ আলি শার তখ্তে আরোহণের দিন। এই সুযোগে রাজমাতা তাঁকে বললেন তাঁর ছেলের প্রতি একটু কৃপাদৃষ্টি রাখতে।

সেবারের মত ফাঁড়া কাটল। আম্মিজী রোজই একবার ক'রে কানে মন্ত্র দেন এবার কোয়েলীকে নিয়ে আয়। আর মন দিয়ে নিজের কাজকাম কর। তিনি ছেলের উদাসী মনের কারণ বুঝতেন কিন্তু আলি শার সেই এক জিদ, আগে ঈদ আসুক সেদিন আনব কোয়েলীকে। ততদিনে ওর তালিম পুরো হয়ে যাবে। তাঁর মনের মধ্যে একটা বাসনা ছিল যে, ঐ কোয়েলীকে দেখিয়ে হারেমে অন্যদের বুঝিয়ে দেবেন যে কি অমূল্য রত্ন তিনি পেয়েছেন। আগে যে অবহেলা করেছেন কোয়েলীকে সে কথা মনে হলে এখন ব্যথা পান তিনি। এদিকে সেই ঈদের দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতেও তকলিফ হচ্ছে তাঁর। কিছুদিন মায়ের বাত মেনে চলেন। আবার এক নতুন গায়ক আসে তাঁর দরবারে, সে এসেছে সুদূর বাংলার বিষ্ণুপুর থেকে। অদ্ভুত তার গাইবার পদ্ধতি। অতি সুন্দর তার গলার সূক্ষ্ম কাজ। এর কাছে যদি কোয়েলী তালিম পায় আরও মধুর হবে তার গান। ওস্তাদের সব ভাল কিন্তু মেজাজ ভাল না। সে নিজের গোষ্ঠীর ছাত্র ছাড়া কাউকে তালিম দিতে নারাজ।

তার গানা শুনেই তাঁর দিন কেটে যায়। আর মাঝে মাঝে লুকিয়ে যান কোয়েলীর গানা শুনতে। ওস্তাদজীর কাছে খবর পেয়েছেন চাঁদনী কেদারা প্রায় রপ্ত করে এনেছে সে। এবার রাত্রে যাবেন ঠিক করলেন।

এদিকে কোয়েলী প্রায় খানাপিনা ছেড়েই দিয়েছে। বাদশার খতও পায় না। আম্মিজীরও কোন হুকুম পায় না। যেন বয়কট করেছেন তাঁকে। একলা

নির্জনে থেকে থেকে যেন পাগল হবার অবস্থা তার। আজকাল সে সাজগোজও ছেড়ে দিয়েছে। নেহাত পেসমন তাকে জোর করে যেটুকু করায় তাই। কখনও স্নানের সময় বেসন দিয়ে তার চুল ধুয়ে দেয়। কখনও চামেলির তেলে কুসুমের ফুল আর কমলার খোসা বেটে নিয়ে এসে তাকে মাখাতে বসে। সন্ধ্যের নমাজের আগে জোর করে মাথায় আমলার তেল মাখিয়ে নয়া ঢং-এর চোটি বানায়, বিহুনি বাঁধে। উদাস হয়ে বসে থাকে কোয়েলী! কিছুতেই যেন তার উৎসাহ নেই। দস্তরখানের ওপর ভাজ করা রেশমী রোটি পড়েই থাকে, সালনের এক টুকরো গোস্ত হয়ত কোনরকমে খায়। পেসমন ডালের সুরুয়ায় লেবু টিপে এক কটোরি বানায় আর সেটা মুখের কাছে ধরে আদর করে বলে, মেরে পেয়ারী বেটি, পি-জা। চেহ্‌রা যে সুর্খী ছাযায়গী। বলে আবার খেয়ে নাও, শরীর শুকিয়ে যাবে, নাহলে নাচবে গাইবে তার তাগদ পাবে কোথায়? রং কালো হয়ে যাবে চোখের নীচে কালি পড়বে, অমন করে না, ছিঃ! একে ত সারারাত ঘুমাও না। ঈদের ত আর দেরী নেই। আর ক'টা দিন ধৈর্য্য ধর, সবুর কর, তারপর আর তোমায় পায় কে? নবাবের পেয়ারী হয়ে নবাবের মাথার উষ্ণীষের মোতি হয়ে জলবে, তাঁর গলায় মোতির মালা আর আঁখের তারা হয়ে থাকবে। ওঃ, আমি ত তসবি জপার মত জপছি সেই সুনহেরী দিন কবে আসবে। আনন্দে চকচক করে পেসমন বাঁদীর চোখ দুটো। না হয় কোয়েলীকে সে পেটেই ধরে নি, কিন্তু এই এতটুকু বেলা থেকে এত বড়টা করল কে? বেগম ত কবে বেহেস্তে গেছে। সেই থেকে ঐ ত তার মা হয়েছে। আর খাজাসাহেব কোয়েলীর আব্বাজান, তিনিও তাকে যথেষ্ট ইমান দিয়েছেন। কিন্তু মেয়েটা যে বড় সরল আর নাজুক, এত নাজুক হ'লে জিন্দগীর খাক সইবে কি করে?

আর মাত্র দশ চন্দ রোজ বাকি আছে ঈদের। নিশ্চয়ই ছত্রমঞ্জিলে খুব তৈয়ারীয়াঁ হচ্ছে। বড় বড় হালুয়াই এসেছে, লাড্ডু পেঁড়া আর বর্ফি বানাবে, সিসে-কি-চুড়িয়ার দোকান বসেছে। চুড়িবালি হরেক রকম চুড়ি এনেছে। ফিরোজা-হারা-নারাঙ্গী-নীলা সোনেলী কামদার। হরেক নাম, হরেক রং। মেহেদির পাহাড় বানিয়েছে মেহেদিবালি। সবুজ রং গুড়া মেহেদির পাহাড়। দর্জি বসেছে অন্দরে, দিনরাত মেসিন চলেছে, তরহাঁ তরহাঁ সালোয়ার, কামিজ স্খ্যুট সালোয়ার গারারা কুর্তা বানাচ্ছে। তাগাদা দিচ্ছে যার যার জিনিষ সে। বলছে, আগে আমারটা বানাও। কত রকম কাপড়, সানীল, ভেলভেট, সাটিন, মখমল, মলমল, মসলিন। আর তার ওপর আছে সলমা, চুমকি জরির কাম। সব যেন চোখের ওপর দেখতে পাচ্ছে পেসমন। প্রচুর ছোট সিসার প্লেট এসেছে, আর রুমাল এসেছে। ঐ প্লেটে চারটে করে মিঠাই রেখে রুমালে জড়িয়ে জরির ফিতায় বেঁধে সব তওফা পাঠান হবে. শাহী আমির ওমরাহ দোস্ত রিস্তেদারের কাছে। গুলাব পিচকারি আর রংএর হাণ্ডা নামান হয়েছে। সেই পালিশ করা হাণ্ডায় রং গোলা হবে। আর ফাগ এসেছে বোরা বোরা, সেগুলো ঢালা হবে চবুতরার মাঝখানে চাঁদির পরাতে। ফোয়ারার ধারে ধারে নাচতে নাচতে ফাগ ছুঁড়বে হাসিনারা আর বাদশা বসবেন মাঝে। আঙ্গনে মহফিল বসবে। প্রথমে সুরু হবে কাওয়ালি দিয়ে, দুই দল মেয়ে বসবে। এ ওকে গানের মধ্যে দিয়ে গালি দেবে আবার ও তরফ তার জবাব দেবে। যে দল জিতবে সে বাদশার কাছে ইনাম পাবে। অত মেয়েদের অত ঔরতের মধ্যে একলা মরদ থাকবেন শুধু আলি শা। যেন হিন্দুদের সেই শত গোপিনীদের মধ্যে কৃষ্ণ। এরপর রাত যত গভীর হবে গানের ধারাও পাল্টে যাবে জয়জয়ন্তী, আরানা, ছায়ানট, বসন্ত বাহার, কেদারা। যোগীয়া হবে যখন তখন ভোর হয়ে আসছে। নহবতেও বাজবে যোগীয়ার সুর। প্রত্যেক বছর সবচেয়ে যে ভাল গায় সে খেতাব পায় "হারেম রাণী", আর ইনাম পায় মোতির হার। এমনি নাচেরও মহড়া হয়। গানের মাঝে মাঝে থাকে নাচ। ওঃ, সে এক বিরাট



চাঁদের আলো মেখে চিক্ চিক্ করছে জলধারা আর আপন মনে গান গাইছে কোয়েলী।

খোয়াবি মহফিল জমে তিন-চার রাত ধরে। এর মহড়া সুরু হয় ঈদের এক মাস আগে থেকে। এবার মনে মনে পেসমন বলে, আব কি ঈদ মুবারক হো। যে খানা আনে সেই ভারি বলছিল, ছত্রমঞ্জিল এবার খুব ভাল করে রঙাই পোতাই করে সাফসুতর করা হচ্ছে। এবার এক নতুন ব্যাপার হবে। এক ওস্তাদ এসেছে। সে গানা গাইবে বাইরে বসে। কিন্তু তার আওয়াজ শোনা যাবে অন্দরমহলে বসে। না জানে কেমন ভেল্কি? তবে এবার সবচেয়ে সেরা গানা গাইবে আমার কোয়েলী। আল্লা পরবরদিগার, ওকে তুমি রহম কর।

এত আল্হার মধ্যে বাজল বিরহার সুর। আবার এল আংরেজের ফার্মান, তখ্ত নেবার হুমকি। আম্মিজী দেখলেন বিপদ্, বড়লাটকে খানা দিয়ে বিশেষ কিছুই সুরাহা হ'ল না, শুধু খাজনার রুপেয়া কিছু গুণাগার গেল। এবার তিনি ছেলের ওপর খুব নারাজ হলেন, বললেন অযথা রুপেয়া খরচ ক'রো না এই গানা-বাজনা করে। এবারকার ঈদের খরচ কিছু কমাও। ওদের খুশী কর আগে, না হ'লে তখ্ত উল্টাবে তোমার। কোন্ দিন ওরা আর তোমাকে লক্ষ্ণৌএর নবাব বলে মানবে না। তবে আমিও ছাড়ব না, আমি শেষ পর্যন্ত দরবার করব। দরকার হয় মহারাণীর কাছে যাব।

কিন্তু আলি শার তখন কোন হুঁস নেই, আর কদিন বাদেই ঈদের পরব। তাঁর প্রাণের কোয়েলী আসবে তাঁর কাছে। এবারকার ঈদোজ্জোহা হবে আরও জাঁকজমকদার। তাছাড়া ঐ নতুন গায়ক এসেছে, সে বলেছে, তার পরছাঁয় অন্দরে বসে গানা শোনাবে। জীবন্ত মানুষের আত্মা আবার আলাদা হয় কেমন করে তিনি তা পরখ করবেন না?

সেদিন রাতে তিনি গেলেন বড়া ইমামবারায়।

লুকিয়ে রইলেন ভুলভুলাইয়ায়। রাত গভীর হতে ছাদে উঠলেন। আজও, আজও আবার তেমনি স্বরাব দেখছেন তিনি। তেমনি জল ছল্ ছল্ করছে ছাদের ওপরে। চাঁদের আলো মেখে চিক্ চিক্ করছে জলধারা। আর আপন মনে গান গাইছে কোয়েলী। গাইছে চাঁদনী কেদারা। কিন্তু বড় বিষণ্ণ করুণ তার সুর। কোন আবেগ নেই, উচ্ছ্বাস নেই তার গানে। পোশাকেরও কোন উজ্জ্বলতা নেই। এরূপে ত তিনি কোয়েলীকে দেখতে চান নি। এ যেন চৌধবীর চাঁদ। আলো আছে উজ্জ্বলতা নেই। বড় মায়া হয় তাঁর। ভাবেন তাঁরই জন্য ওর এই দশা। একটা খতও লেখেন নি তাকে। নানান ঝামেলা ছিল। তার ওপর আম্মিজী। তাঁকে তিনি ভয় পান, মান্যও করেন। স্বরাব দেখতে দেখতে আর ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন তিনি। হঠাৎ দেখেন, একেবারে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে কোয়েলী বেগম।

বোলো তুম কৌন হো? আমার চিন্তার রূপ কি তুমি? না, সত্যিই তুমি আলি শা? বল তুমি বল? দুহাত বাড়িয়ে ওকে কোলে টেনে নেন আলি শা! তার পর সেই চৌধবী চাঁদের আলোছায়ায় মরীচিকা-মাখা জলের ধারার মধ্যে কোয়েলী তার আলি শাকে নতুন করে পেল। আলি শা তাকে বললেন, তুমি আমাকে নতুন করে ভালবাসতে শিখিয়েছ। সত্যিই আমার দিল-কি-দরওয়াজা বন্ধ ছিল, তুমি তা খুলে দিয়েছ। এখন আমার সায়র আর সায়রীণ দুইই প্রিয়। ঈদের আগের দিন আমি নিজে এসে তোমায় তাঞ্জামে করে প্যালেসে নিয়ে যাব। নিশ্চিন্তে তাঁর কোলে ঘুমিয়ে পড়ল ক্লান্ত কোয়েলী।

ভোরে তার ঘুম ভাঙল খোলা ছাদে পেসমনের ডাকে। তবে কি সে খোয়াব দেখেছিল? আলি শা আসেন নি? কিন্তু সেই আলিঙ্গন, সেই অনুভূতি, সে ত ভোলার নয়। শুধু তার গান নয়, তাকেও যে ভালবাসেন আলি শা সে কথা যে কাল স্বীকার করলেন তিনি? তবে? নিরন্তর অনুক্ষণ তাঁকে চিন্তা করতে করতে তবে কি সে মনে মনেই তাঁকে অমনি করে একান্ত করে পেল?

আলি শা বড় খুশী। তাঁর মনের এই খুশী তিনি তাঁর হারেমের অন্য অন্য বেগমদের মনেও ছড়িয়ে দিতে চাইলেন। বললেন গত রাত্রের কথা, আবার আসার সময় কোয়েলীকে কেমন ঠকিয়ে এসেছেন। নিশ্চয়ই সে তাঁকে পরছাঁয় ভেবেছে। এই বলে খুব মজাক করলেন। ওরা সামনে রঙ্গভরে খুব হাসল। কিন্তু অন্তরে খুশী হ'ল না। বুঝল, আলি-শার অন্তর-বাহির ভরে আছে কোয়েলীতে। তার গানে তাঁর প্রাণ মন ছেয়ে আছে। তার গাওয়া গানের কলিটি মুখে লেগে আছে তাঁর।

ম্যয়নে চাঁদ অওর সিতারোঁ কি তমন্না কী থী।
মুঝকো রাতোঁ কো সিয়াহি কে সিওয়া কুছ ন মিলা।
ম্যয় বহ্ নগমা হুঁ জিসে প্যার কি মহ্ফিল ন মিলি।
বহ্ মুসাফির হুঁ জিসে কোই মঞ্জিল ন মিলি।
ডুবতে দিল নে কিনারোঁ কি তমন্না কী থী
ম্যায়নে চাঁদ অওর সিতারো কি তমন্না কী থী।

(আমি চেয়েছিলাম আমার জীবনে চাঁদ তারার আলো জ্বলুক, কিন্তু শুধুমাত্র রাতের অন্ধকার ছাড়া কিছুই পেলাম না। এমনিই মুক্ত আমি যে কেউ আমায় গলার মালা করল না, এমনই যাত্রী আমি যে কোন-কালেই ঘর খুঁজে পেলাম না। ডুবে যাবার সময় কিন্তু আমি পারে পৌঁছবার রাস্তা পেয়েছিলাম তাই আমি চাঁদ তারার আলোর কামনা করেছিলাম।)

আলি শা নিজেই বলেন, আহা বড় সুন্দর মানেটি এর। কিন্তু জলতে থাকে অন্য বেগমেরা।

এদিকে নতুন গভর্ণর জেনারেল এলেন লর্ড ডালহাউসি। তিনি বললেন, শুধুমাত্র অওধে এত অরাজকতা কেন? বার বার আমাদের সাহায্য করতে হয় কেন? ইংরেজ Resident বসাতে হয়েছে লক্ষ্ণৌতে। আম্মিজী আবার দরবার করলেন। ঠিক করলেন ঈদের সময় ভাল রকম তওফা পাঠাবেন।

ঈদের আর দু'দিন বাকি। এ ক'দিন আর কোন

খবর যায় নি কোয়েলীর কাছে। সে সারা রাত জেগে জেগে গানা গেয়েছে। আর অপেক্ষা করেছে তার সোহরের। একটু শব্দেই চমকে উঠেছে। ঐ বুঝি সিঁড়ির ওপরে নাগরার শব্দ হ'ল। ঐ বুঝি মৌসমে আতরের খুসবু এল।

আজকেই শেষ রাত। বাদশার বাত মত কাল সাম হলে আসবেন তিনি তাঞ্জাম নিয়ে। ওস্তাদজী ছুটি দিয়েছেন তাকে। বলেছেন দু'রাত আরাম কর, তোমার শিক্ষা পুরো হয়ে গেছে। আর আমার কোন কাম নেই। পেসমন সব সময় হেফাজত করছে তার। কিন্তু রাত হ'লে সে আর পারে না। আফিমের নেশায় ঝিমতে থাকে। আর রাতটা কোয়েলীর একার।

সারারাত ধরে সে আর একটিবার এই নির্জন ছাদে ঠিক তেমনি একান্ত করে তার সোহরকে পেতে চায়। তার মন-প্রাণ উন্মুখ হয়ে আছে। এখন ত সে তাঁর উপযুক্ত হয়েছে। গানা গেয়ে তাঁকে খুশী করেছে। তার চেয়েও বোধ হয় খুশী করেছে তাঁকে ভালবেসে, আর সেটা তিনি বুঝেছেন। দাতা গ্রহিতার মিলনেই ত দানের সার্থকতা। সেদিনের খোয়াব যদি সত্যি হ'ত! কিন্তু যদি না হয়; যদি তার অন্তরের অনুভূতির সঙ্গে, বাইরের আলি শার ব্যবহারের তারতম্য হয়, তবে কিন্তু বড় ব্যথা পাবে সে। এমনি কত কথা সে ভাবে। কত ভাবে, কত ঢং-এ নিজের পেয়ার উলফত পরিবেশন করে সোহরকে, আর মনে মনেই তার প্রতিদান পায়। এমনি ভাঙ্গা-গড়ার খেলা চলে তার মনে। একের পর এক প্রেমের ছবি সে দেখে কল্পনায়। আর গান করে চাঁদনী কেদারায়:

ম্যয়নে চাঁদ অওর সিতারেঁা কী তমন্না কী থী।

আবার, আবার সে দেখে সিঁড়ির ধাপে ঠিক তেমনি করে দাঁড়িয়ে আছেন নবাব। 'সে আলিশা মেরে··· আলিশা', করে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরতে যায় তাঁকে, পিছিয়ে যান তিনি, ও-ও তাঁর সঙ্গ ছাড়ে না, পিছু পিছু ছুটে চলে। একটার পর একটা অলিন্দ, ঐ ঐ যে নাগরার শব্দ, আবার ছোটে। হাঁপিয়ে যায় ছুটতে ছুটতে। এ কি, সব যে একরকম অলিন্দ? কোথা দিয়ে কোথায় যায়? আবার ডাকে, আলি শা? মেরে আলি শা? মুঝে ছোড় কর মত যা—ও। কান্নায় ভেঙে যায় তার স্বর, কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। সারারাত ধরে সে বার বার চক্কর কাটে, বুঝতে পারে একই জায়গায় ঘুরছে। মাথা কুটে মরে, কাঁদতে কাঁদতে পেসমনকে ডাকে, কিন্তু বেরুবার পথ খুঁজে পায় না। বোঝে সে ভুল-ভুলাইয়ায় এসে পড়েছে। হঠাৎ তার নজরে পড়ে একটি কুলুঙ্গীতে মোমবাতি জ্বলছে আর তার পাশে রাখা এক গেলাস সুরুয়া। তৃষ্ণায় তার ছাতি ফাটছিল। এক নিঃশ্বাসে পান করে সেই মিঠা মিঠা সুরুয়া। বাতি নিভে গেল। কোয়েলীর মিঠা বোল বন্ধ হয়ে গেল। ঝরাপাতার মত ঝরে গেল কোয়েলী বেগম। এবার পুরুষের পোশাক ছেড়ে নিজের পোশাক পরে মসরত বেগম ধীরে বেরিয়ে আসে ইমাম-বারার গুপ্ত দরওয়াজা দিয়ে। যাবার আগে গলার মোতির মালা বকশিস দিয়ে যায় পাহারাদারকে। অন্ধকারে মিলিয়ে গেল তার তাঞ্জাম। নিঃশব্দে আবার ঢুকে যাবে ছত্রমঞ্জিলের গুপ্ত দরওয়াজায়। নাচগানের জোর মহড়া চলেছে সেখানে। শরাবে আর নাচে মশগুল বাদশা টেরও পাবেন না। মসরত বেগমের ছোটবেলার খেলার জায়গা ছিল এই ভুলভুলাইয়া, এর অন্ধি সন্ধি ছিল তার চেনা। তাই আজ অনায়াসেই সে তার পথের কাঁটা, আঁখের কিরা সরিয়ে দিল।"

শেষ হয়ে গেল বখত মিয়ার কোয়েলী বেগমের কাহিনী। বৃন্দাবনী সারং আর চাঁদনী কেদারার ইতিহাস। মনটা বেদনায় ভার হয়ে উঠল।

নিয়ে গেল ওপরে। আকাশে পুনমের চাঁদ। চতুর্দিক্ নিঃঝুম নিঃশব্দ। শুধু আমাদের ক'টি মাত্র প্রাণীর নিঃশ্বাসের শব্দ। একটা একটানা করুণ সুর ভেসে আসছে কোথা থেকে, সেদিকে মন দিতে না দিতেই বখত মিয়ার ইসারায় ছাদের দিকে চেয়ে চম্‌কে উঠলাম। চাঁদের আলো মেখে ছলছল্ করছে জলের ধারা। গড়িয়ে গড়িয়ে পিছলে যাচ্ছে সাদা

জলের স্রোত। অথচ সেই নীচের ধাপে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে ছাদ স্পর্শ করে দেখলাম একেবারে শুকনো, খট্‌খটে। আশ্চর্য! অথচ আমরা এতগুলি মানুষ একসঙ্গে দেখছি সেই জলের ধারা। অদ্ভুত ব্যাপার! এই ধাপের ওপরেই দাঁড়াতেন নবাব ওয়াজেদ আলি শা। এখান দিয়েই তিনি এসেছেন মনে করে ছদ্মবেশী মসরত বেগমকে অনুসরণ করে ছুটে গিয়েছিল অবোধ বালিকা। গা-টা কেমন শির শির করে ওঠে।

নেমে এসে বাকিটুকু শুনলাম। সেবার আর ঈদ মানানো হয় নি। পরদিন তাঞ্জাম নিয়ে আলি শা ঠিকই এসেছিলেন। কিন্তু কোয়েলীকে ঐ অবস্থায় দেখে দিওয়ানা হয়ে যান তিনি। বার বার পাগলের মত বলতেন, তেরা মেতি কি ফারণ ম্যয়ই হুঁ যদি আমি লুকিয়ে না চলে আসতাম তবে তুমি আমায় ছেড়ে যেতে না।

রাজ্যে আরও অরাজকতা বাড়ল। ছেলের ঐ অবস্থা দেখে আর ইংরেজের হুমকিতে রাজমাতা আম্মিজী, নিজেই গেলেন ইংলণ্ডে ক্যাপ্টেন বার্ডের সঙ্গে। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কাছে দরবার করলেন ছেলের হয়ে। তবু লক্ষ্ণৌ রাখতে পারলেন না।

এক তেরা কো তখ্‌ত মিলি থা, দুসরা তেরা কো তখ্‌তো ছোড়না পড়া হজরতে-আলা-কো। ফিরঙ্গী লোক কহতে হ্যায় না তেরা নম্বর বদনসিবি লাতি হ্যায়? আমি বলি হ্যাঁ, Thirteen is an unlucky figure. কেন, কি হয়েছিল তাতে? ১৮৪৭, ১৩ই ফেব্রুয়ারী তখ্‌তে বসেছিলেন নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ আর ১৮৫৬-র ১৩ই মার্চ সিংহাসন ছাড়তে হ'ল তাঁকে। বাঙ্গালের মেটিয়াবুরুজের নবাব করে দিল তাঁকে আংরেজ। লর্ড ডালহাউসির তাই হুকুম ছিল। যাবার আগে লক্ষ্ণৌ ছাড়ার সময় তিনি গানা গাইলেন। "বাবুল মেরা নৈহার ছুটতী যায়।"

চিরকালের মত আমি আমার পিতৃপুরুষের আবাসস্থল ছেড়ে চললাম।

—

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ বৃদ্ধির মুখে

গত কয়েক বৎসর যাবৎ পশ্চিমবঙ্গে মধ্যবিত্ত পরিবারে বিবাহ বিচ্ছেদ (ডাইভোর্স) ক্রমাগত বৃদ্ধির মুখেই চলিয়াছে। বলা বাহুল্য 'অসুখী' বিবাহিত জীবনের অবসানের জন্যই এই বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে। এই প্রসঙ্গে আলিপুরে জজ-কোর্টে গত তিন বছরের ডিভোর্স সুটের একটা মোটামুটি খতিয়ান দেওয়া যাইতে পারে।

আলিপুর জজ-কোর্টে ১৯৬০ সালে বিবাহ-বিচ্ছেদ মামলা দায়ের হয় ২৮৬টি, ১৯৬১ সালে ৪২০টি এবং ১৯৬২ সালে ৪৩২টি। সিটি সিভিল্ কোর্টে এই প্রকার মামলার সংখ্যা যথাক্রমে ১২৩, ১২৫ এবং ১৪৩ (১৯৬০-৬২ সাল)।

"বিবাহ-বিচ্ছেদে"র মামলা নিম্নলিখিত তিনটি আইন বা Act-এর অবকাশে দায়ের করিতে পারা যায়।

The Special Marriage Act (marriage by registration), The Indian Divorce Act (for Christians only), The Hindu Marriage Act of 1935.

১৯৫৫ সালে উপরি উক্ত তৃতীয় আইনটি পাশ এবং কার্য্যকর হইবার পূর্ব্বে হিন্দু-সমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদ মামলা বোধ হয় দেখা যায় নাই। ১৯৫৬ সালে এই আইন চালু হইবার পর হইতে—কেবল বাঙ্গালী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজেই নহে একান্ত গোঁড়া হিন্দু পরিবারেও, আইনের সাহায্যে "বিবাহ-বিচ্ছেদ" ক্রমাগত অধিক হইতে অধিকতরই দেখা যাইতেছে।

বলা বাহুল্য, আইনের সাহায্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটানো সহজসাধ্য নহে। আবেদনকারীকে 'বিবাহ-বিচ্ছেদ' মামলায় হাকিমের রায় স্বপক্ষে পাইতে হইলে—it can only be obtained only after fulfilling certain specified condition. কিন্তু ইহা সত্ত্বেও, এত কঠোরতা থাকাতেও হিন্দু সমাজে 'বিবাহ-বিচ্ছেদ' ক্রমশ বিস্তার লাভ করিতেছে।

আদালতে বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদন যে কেবলমাত্র পুরুষরাই করিতেছে—এমন মনে করিলে ভুল হইবে। আলিপুর কোর্টে ১৯৬০ সালে ২৮৬টি "বিবাহ-বিচ্ছেদ" মামলার মধ্যে ১২৭টি আবেদন মেয়েদের পক্ষ হইতে হয়। ১৯৬১ সালে ২০০ নির্য্যাতিতা বিবাহিতা নারী আদালতে হাজির হইয়া জজের সম্মুখে তাঁহাদের নির্য্যাতনের কাহিনী ব্যক্ত করেন। ১৯৬২ সালে বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রার্থিনীর সংখ্যা আলিপুর কোর্টে ছিল ২৩৪।

হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্টে—"জুডিশিয়াল সেপারেশনের" একটি ধারা আছে। হিন্দু সমাজে, এই ধারামত জুডিশিয়াল সেপারেশনের কেসের সংখ্যাও ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছেঃ ১৯৬০ সালে ইহা ছিল ৫৪, ১৯৬১তে ১০২, ১৯৬২-৬৩-র সংখ্যা এখনও পাই নাই, তবে এইটুকু বলা যায়, জুডিশিয়াল সেপারেশনের সংখ্যা বাড়তির দিকেই। কলিকাতা এবং আলিপুর কোর্ট ছাড়া এই রাজ্যের জেলা আদালতের রিপোর্ট সহজলভ্য নয় এবং সংবাদপত্রেও ডিভোর্স-কেস্ রিপোর্ট বিশেষ প্রকাশিত হয় না। কাজেই পশ্চিমবঙ্গের "বিবাহ-বিচ্ছেদ" এবং জুডিশিয়াল সেপারেশনের একটা পূর্ণ চিত্র দেওয়া সম্ভব নহে।

হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্টের আওতায় বিবাহ-বিচ্ছেদ মামলার শুনানী প্রকাশ্য আদালতে হয় না, হয় 'ক্যামেরাতে' অর্থাৎ বিশেষ একটি কামরায় যেখানে হাকিম, বাদী-প্রতিবাদী এবং দুই পক্ষের উকিল ছাড়া আর কেহ থাকিতে পারে না। কাজেই উকিল ছাড়া অন্য কেহ বিশদভাবে মামলার খুঁটিনাটি-বিবরণ দিতে পারেন না।

বিবাহ-বিচ্ছেদ কিংবা সেপারেশন প্রার্থী-প্রার্থিনীদের

শতকরা ৭৫ জনই মধ্য এবং উচ্চ মধ্যবিত্ত সমাজের লোক। বিবাহ-সম্পর্কিত সমস্যা দরিদ্র অপেক্ষা ধনীদের মধ্যেই প্রকট দেখা যাইতেছে।

এই নিবন্ধে বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রধান কারণগুলি সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। প্রধানতম কারণগুলি দেখা যায় 'cruelty, disertion and adultery on the part of either party.' এই তিনটি কারণের যে-কোন একটির জন্য (প্রমাণিত হইলে) বাদী বিবাহ-বিচ্ছেদ কিংবা সেপারেশন পাইতে পারেন। নিষ্ঠুরতা বিষয়ে এইটুকু বলা প্রয়োজন যে, তাহা অসহনীয় এবং জীবন, স্বাস্থ্য ও দেহের পক্ষে, কেবল ক্ষতিকর নহে, বিপদজনকও প্রমাণিত হওয়া চাই। নিষ্ঠুরতা দৈহিক এবং মানসিক—উভয়বিধই হইতে পারে।

ব্যভিচার সম্পর্কে বলা আছে "a single act of adultery is no offence; continuous living in adultery must be proved."

প্রসঙ্গত বলা কর্ত্তব্য যে, বর্ত্তমানে সামাজিক ব্যবস্থায়—স্ত্রীলোকের পক্ষে একবার মাত্র পদস্খলনই যথেষ্ট. ইহাতেই তাহাকে পরিবার এবং সমাজ হইতে বিতাড়িত করা অতীব সহজ। স্ত্রীলোকের একটি ভুলের ক্ষমা নাই, তাহার প্রতি সুবিচার, মায়া-মমতার কোন প্রশ্নই সমাজ-বিবেকের অভিধানে নাই—অহরহ ইহাই দেখা যাইতেছে। কিন্তু সমাজ-বিধি পুরুষের বেলা অন্য প্রকার। বহু ধনী ব্যভিচারী পুরুষ সমাজের বুকে বসিয়াই নিত্য নব পাপকর্ম্ম অনুষ্ঠিত করিতে পারে, করিতেছেও—কিন্তু সমাজ-কর্ত্তারা তাহাদের দণ্ড ও দমনের কি ব্যবস্থা করিয়াছেন বা করিতে ভরসা করেন, জানিতে পারিলে বাধিত হইব।

Hindu Marriage Act-এর বিধানে—বিবাহ-বিচ্ছেদ আবেদনকারীর অন্যপক্ষের সহিত বুঝাপড়া যাহাতে হয় এবং যাহার ফলে তাহারা আবার দাম্পত্য-জীবনে সুখী হইতে পারে—এই প্রচেষ্টা করিবার অধিকার হাকিমের আছে। বিধানটি ভাল, কিন্তু শতকরা একটি ক্ষেত্রেও ইহা পূর্ণ সার্থকতা লাভ করে কি না সন্দেহ। প্রসঙ্গত বর্ত্তমান সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিবাহ-বিচ্ছেদ (Divorce) বিধি এবং তাহার প্রয়োগ সম্পর্কে কিছু বলা অবান্তর হইবে না। এই বিষয়ে একজন মার্কিন সমাজ-বিজ্ঞানী লিখিতেছেন :

"No Soviet divorce can be granted now without full testimony offered by persons well-acquainted with the couple. This has a two-fold purpose. First, to discourage a divorce, to make it difficult, to impress on married couples their social responsibilities, to induce man and wife to make every possible effort to solve their problems. Second, the court procedure results in every case being considered on its own unique merit. . . . . The objective is to prevent divorce whenever possible. Before a Soviet marriage can be disolved the couple must satisfy the court that reconciliation is impossible."

"বিবাহ-বিচ্ছেদ" প্রতিরোধকল্পে সোভিয়েট রাষ্ট্রে বিভিন্ন স্থানে "Court of reconcilation" আছে—এই সব কোর্টের কাজই হইল divorce প্রার্থী স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্য দূর করিয়া তাহাদের পারিবারিক জীবন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। ফল যাহা হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, গত কিছুকাল হইতে উক্ত রাষ্ট্রে বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদন পূর্ব্বের তুলনায় দুই-তৃতীয়াংশ হ্রাস পাইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে divorce-এর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে গভীর চিন্তার কারণ আছে। অনেকের মতে ১৯৫৬ হইতে চালু Hindu Marriage Act এ-রাজ্যের মধ্যবিত্ত সমাজের পক্ষে কল্যাণ অপেক্ষা বেশী অকল্যাণকরই হইয়াছে। কথাটা হাল্কা ভাবে গ্রহণ করিবার মত নয়। সমাজের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া আমাদের সকলকেই আজ 'বিবাহ' সম্পর্কে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। আজকাল পিতামাতার অজ্ঞাতে 'ত্বরিত'-বিবাহ বহু বহু ঘটিতে দেখা যায়। সামান্য কালের আলাপেই পাত্র-পাত্রী নিজেদের বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করিতে ব্যাকুল হয়—পরস্পরের পরিচয় এবং অন্যান্য অবশ্য-জ্ঞাতব্য তথ্য না জানিয়াই। পনের দিনের পরিচয়, এক মাস পরে বিবাহ এবং বিবাহের দুই-তিন মাসের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ, এমনও ঘটিতেছে! ইহার ফল শতকরা অন্ততঃ ৬০টি বিবাহের ক্ষেত্রেই ভবিষ্যতে শুভ হয় না।

সমস্যার প্রতিকার কি?

হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট এবং স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্টে যে সকল বিবাহ রেজিষ্টারী করিয়া হইবে, তাহাতে উপযুক্ত সতর্কতা প্রয়োজন। সর্ব্বপ্রথম দেখিতে হইবে, যাঁহারা ম্যারেজ রেজিষ্ট্রার রূপে নিযুক্ত হইবেন, তাঁহারা এই গুরু-

দায়িত্ব পালনের যোগ্য কি না। একমাত্র কলিকাতাতেই বহুস্থানে 'শ্রীঅমুকচন্দ্র অমুক, ম্যারেজ রেজিষ্ট্রার'—সাইন-বোর্ড টাঙ্গান দেখা যায়। দেখিলে মনে হয় বর্ত্তমানে এই কাজটি পেশাতে পরিণত হইয়াছে। শুনিয়াছি এমন বেশ কিছু ম্যারেজ রেজিষ্ট্রার আছেন, যাঁহারা রীতিমত 'দালাল' নিযুক্ত করিয়া 'খরিদ্দার' ধরেন। সাজান-সাক্ষী এবং অন্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে পিত্তরক্ষা মাত্র করিয়া ইঁহারা ঝটপট্ বিবাহ রেজিষ্টারী করিয়া ছাড়িয়া দেন এবং বিহিত দক্ষিণা ছাড়াও অন্য নানাভাবে বেশ কিছু অর্থ আদায় করেন, প্রতিটি পার্টির নিকট হইতে। পাত্র-পাত্রীর declaration-এর সত্যমিথ্যা সন্ধান বা বিচারের কোন দায়িত্ব বা প্রয়োজন ইঁহারা অনুভব করেন না।

কয়েক শত রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত না করিয়া এই সংখ্যা যদি সীমিত করা যায় এবং সাক্ষীদের সম্পর্কেও যদি কঠোর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়, তাহা হইলে হয়ত বা রেজিষ্টারী-বিবাহের এপিডেমিক কিছুটা দমন করা সম্ভব হইতে পারে। ম্যারেজ রেজিষ্ট্রার হইবার নিম্নতম যোগ্যতার একটা মান থাকা প্রয়োজন। ম্যারেজ রেজিষ্ট্রার শিক্ষায়, প্রতিষ্ঠায়, চরিত্রে বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন না হইলে রেজিষ্টারী ব্যাপারে অনাচার বন্ধ করা যাইবে না। বিবাহে-ইচ্ছুক আবেদনকারী পাত্র-পাত্রীর পিতামাতা কিংবা অভিভাবককে সংবাদ দিবার কিছু ব্যবস্থা থাকাও দরকার। প্রাপ্তবয়স্কের বিবাহ বন্ধ তাঁহারা করিতে পারেন না, কিন্তু আপত্তির কিছু থাকিলে তাহা ম্যারেজ রেজিষ্ট্রারের জানা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। রেজিষ্ট্রারের খাস বা 'গোপন' কামরায় রেজিষ্টারী না হইয়া প্রকাশ্য স্থানে—আদালতের কোন স্থানে অনুষ্ঠিত হওয়া ভাল। ইহাতে 'গোপন-বিবাহ' খানিকটা প্রতিরোধ হইতে পারে। বর্ত্তমান নিবন্ধে বিষয়টির সূচনা করা হইল। প্রয়োজন হইলে এ-বিষয় আরও কিছু আলোচনা যথাসময় হইবে। পাঠকবর্গও এ-বিষয় ভাবিয়া দেখিতে পারেন।

কেন্দ্রীয় গৃহ-নির্ম্মাণ পরিকল্পনা

কেন্দ্রীয় গৃহ-নির্ম্মাণ ও পূর্ত্ত দপ্তর এ-দেশের চারিটি বৃহত্তম শহরে সরকারী আপিস এবং কর্ম্মচারীদের বসবাসের জন্য গৃহাদি নির্ম্মাণ-পরিকল্পনা খাতে ১৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন। দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং কলিকাতা এই চারিটি শহরকে লইয়াই এই পরিকল্পনা রচিত। চারিটি শহরের মধ্যে আজ কলিকাতার গৃহ-সমস্যা সর্ব্বাধিক হইলেও কেন্দ্রীয় কর্ত্তারা কিন্তু অর্থ বরাদ্দের বেলায় সর্ব্বাধিক কার্পণ্য এবং কৃচ্ছ্রতা প্রকাশ করিয়াছেন 'পোড়া-শহর' কলিকাতার বেলায়।

প্রকাশ করা হইয়াছে যে, এই ১৪০ কোটি টাকায় নির্ম্মিত গৃহাদিতে সর্ব্বসমেত ৭৪ হাজার পরিবারের বসবাসের ব্যবস্থা করা যাইবে। এই ৭৪ হাজার পরিবারের মধ্যে একমাত্র দিল্লীতেই ৫৫॥ হাজার, অর্থাৎ মোট সংখ্যার তিন-চতুর্থাংশ বাড়ী দিল্লীতেই নির্ম্মিত হইবে! দিল্লীর পরে বোম্বাই, তাহার পরে মাদ্রাজ এবং সর্ব্বশেষ স্থান কলিকাতার। কলিকাতায় বাড়ী নির্ম্মিত হইবে মাত্র ৩২১০টি! বরাদ্দ দেখিয়া মনে হয়, ভিখারী পশ্চিমবঙ্গকে একেবারে বাদ দিতে পারিলেই ভাল হইত, কিন্তু তাহা নেহাত খারাপ দেখাইবে বলিয়াই হয়ত দিল্লীর বর্ত্তমান সম্রাট বাক্‌বর শাহের সরকার পশ্চিমবঙ্গকে মুষ্টিভিক্ষা দান করাই শ্রেয় মনে করিয়াছেন। এ-বিষয়ে বাঙ্গলার কিছু বলিবার, প্রতিবাদ করিবার নাই, কারণ গৃহ-নির্ম্মাণ ব্যয়ের বরাদ্দ টাকাটা সম্রাট্ বাক্‌বর শাহের খাস জমিদারীর এবং ইহা পরম করুণাময় উজীর শ্রীখান্নার হাত দিয়াই দান করা হইতেছে! পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় অন্যান্য বহু ব্যাপারের মত আলোচ্য পরিকল্পনাতেও নেহেরু-শাসিত কেন্দ্র সরকার একান্ত পক্ষপাত-দুষ্ট মনোভাব প্রকাশ করিয়াছে। গত কয়েক বছরের কেন্দ্রীয় কার্য্যকলাপ এবং 'কল্প-প্রকল্প—অকল্প' বিচার করিলে স্পষ্ট মনে হইবে যেন কেন্দ্র-কর্ত্তারা কোন একটি গোপন পরিকল্পনা মত ধীরে ধীরে এই ভাগ্যহত বিধাতা-নিপীড়িত পশ্চিমবঙ্গকে অতলের দিকে ঠেলিয়া দিতেছেন। দেখা যাইতেছে এক-মাত্র পশ্চিমবঙ্গের প্রশ্নেই নেহরু এবং তাঁহার একান্ত আজ্ঞা-ধীন মন্ত্রী আখ্যায়িত বশংবদ ভৃত্যকুলের মন হইতে বিচারবুদ্ধি, বিবেক এমন কি করুণাও এক মুহূর্ত্তেই তিরোহিত হইয়া যায়! যদিও উহা সর্ব্বজন পরিজ্ঞাত যে:

বিভিন্ন কারণে কলিকাতা শহরে বাসস্থানের সমস্যা জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। ভারতের অন্যান্য শহরে বাড়ীঘর নির্ম্মাণের জন্য জনসাধারণকে যে-পরিমাণে সক্রিয় দেখা যায় কলিকাতায় তাহার সিকিও দেখা যায় না। বাড়ী নির্ম্মাণের জিনিসপত্র সংগ্রহের ঝামেলা তো

আছেই, তার উপর জমির চড়া দাম ও বাড়ীভাড়া আইন কলিকাতার বাসস্থান সমস্যাকে কম জটিল করে নাই। সম্ভবতঃ বাসস্থানের অভাবেই ভারতের অন্যান্য বড় শহরের তুলনায় কলিকাতার তেমন সম্প্রসারণ ঘটে নাই। গত দশকে বোম্বাই শহরের জনসংখ্যা যেখানে শতকরা উনচল্লিশ ভাগ বাড়িয়াছে, সেখানে কলিকাতা শহরের বৃদ্ধি পাইয়াছে মাত্র শতকরা আট ভাগ। অথচ ওই সময়ে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা বাড়িয়াছে শতকরা তেত্রিশ ভাগ। সি-এম-পি-ও'র হিসাবে, কলিকাতার বাসস্থান-সমস্যার সমাধানের জন্য বৎসরে কমপক্ষে পঞ্চাশ হইতে ষাট হাজার বাড়ী নির্ম্মাণ করা দরকার। জমির উচ্চমূল্য ও বাড়ী-নির্ম্মাণের খরচের জন্য মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে নিজের সামর্থ্যে কলিকাতায় নিজস্ব বাড়ী করার স্বপ্ন অনেকদিন আগেই বিসর্জন দিতে হইয়াছে। কোনক্রমে বাঁচিয়া থাকাই এখন তাহাদের প্রধান সমস্যা।

কেন্দ্রীয় সৃষ্ট পরিকল্পনা যদি বিন্দুমাত্র সার্থক হয় তাহা হইলে আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যেই কলিকাতা শহরের বাড়ীঘর (ব্যবসা-বাণিজ্যও) সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালীর হাত হইতে চলিয়া যাইতে বাধ্য। ইতিমধ্যে দেখা যাইতেছে নেহরু কথিত এই 'পোড়া শহরে' গত ৫ বৎসরে যত নতুন গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার শতকরা ৭৫টির মালিক অবাঙ্গালী এবং অবাঙ্গালীদের শতকরা ৯০ জন রাজস্থান বিকানীর মেবার প্রভৃতি অঞ্চলের অধিবাসী!

কোন একটি সংস্থার পক্ষে কলিকাতার বাসস্থান-সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকার এখনও পর্যন্ত কোন কৃতিত্ব দেখাইতে পারে নাই। এদিক হইতে কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের অবদান অনেক বেশী। মানিকতলা-উল্টাডাঙ্গা এলাকায় আট কোটি টাকা ব্যয়ে ৮৮০০টি পরিবারের বাসস্থান নির্ম্মাণের পরিকল্পনা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের এই পরিকল্পনা জীবনবীমা কর্পোরেশনের অর্থসাহায্যের উপরেই নির্ভরশীল।

মধ্যবিত্ত সামান্য সম্বল বাঙ্গালী যাঁহারা কোন রকমে গয়না ঘটি-বাটি বিক্রয় করিয়া কলিকাতায় বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতে প্রয়াস পান, তাঁহাদের শতকরা ৯৫ জনই সিমেণ্টের অভাবে কিংবা সিমেণ্ট স্টীল প্রভৃতি দ্রব্যাদির জন্য ঘোরাঘুরির হয়রানীতে শেষ পর্য্যন্ত হাল ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। কিন্তু অবাঙ্গালীদের পক্ষে, টাকার জোরে কালোবাজার সদা আলোকিত! অবাঙ্গালীদের প্রতি পৌরপিতাদের করুণাও অসীম।

বৃহত্তর কলিকাতার উন্নয়নের জন্য সি-এম-পি-ও যে-সময়ে পরিকল্পনা রচনায় ব্যস্ত সেই সময় কলিকাতার কেন্দ্রীয় সরকারী কর্ম্মচারীদের বাসস্থানের জন্য নামমাত্র বরাদ্দ কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক করে। ভারতের বৃহত্তম শহর কলিকাতার তীব্রতম সমস্যার দি[কে] কর্তৃপক্ষ যথাযথ দৃষ্টি না দিলে কেবলমাত্র কলিকাতা [ব]া পশ্চিমবঙ্গেরই ক্ষতি হইবে না, সারা ভারতের অর্থনৈতি[ক] ব্যবস্থাতে তাহার বিষম প্রতিক্রিয়া ঘটিতে বাধ্য।

বড়বাজার—চোরাচালানীর রাজধানী

পশ্চিমবঙ্গের চোরা-চালানীদের রাজধানী (কলিকাতার বড়বাজার এবং এই 'রাজধানীর'—'মুখ্য-দপ্তর' অর্থাৎ চোর[া-] চালানী 'সংস্থার' 'রাইটার্স বিল্‌ডিংস'—বা মহাকরণ বড়[-] বাজারের রাজাকাটরা এবং বাগড়ি মার্কেট। এ-কথা ব[লি] না যে, ঐ দুই বাজারের সকল ব্যবসায়ীই চোরা-কারবারী[,] প্রখ্যাত কয়েকজন অবাঙ্গালী ব্যবসায়ী (?) এই চোর[া-] কারবারের হাই-কমাণ্ড! উক্ত স্থান দুইটিতে এই চোর[া-] কারবারীরা সংখ্যালঘু হইলেও অর্থ-কাম-দৈহিক-বলে আধিক্যে এবং প্রাবল্যে এই সংখ্যালঘু দুষ্ট-ব্যবসায়ীদে[র] দাপট প্রচণ্ড! এবং ইহারাই আসলে সংখ্যাগুরু।

বড়বাজার থানা তথা পশ্চিমবঙ্গের স্থল-শুল্ক বিভাগ—বড়বাজারই যে চোরাচালানের অন্তিম গন্তব্যস্থল বা শে[ষ] ঘাঁটি—এ-উক্তির বিরোধিতা করিতে পারিবেন কি?

স্থলশুল্ক বিভাগের একটি প্রিভেনটিভ ইউনিটআছে। ২৪ পরগণা, নদীয়া ও কলিকাতায় এই ইউনিটের ১৬টি ভ্যানে দিবারাত্র টহল দিয়া চোরাচালানী পাকড়াও করিবার কথা। এই কয় বৎসর লরী, ট্যাক্সি, টেম্পো অথবা প্রাইভেট মোট[র] —যাহাতে এবং যেখানেই চোরাচালানী মাল আটক পড়ু[ক] না কেন, কাষ্টমসের কর্ম্মীদের একটি কথাই শুনিতে হইয়াছে "বড়বাজার যাইতেছি।"

গত এক বৎসরে কাষ্টমস কর্তৃপক্ষ বড়বাজার হইতে বে[শ] কয়েক লক্ষ টাকার রকমারি চোরাই পণ্য উদ্ধার করিয়াছে—অন্য কোন অঞ্চল হইতে এত চোরাই মাল আটক করিবা[র] কথা কেহ ভাবিতেও পারেন না। চোরা-পথে যত রকমে[র] মাল পাচার হয় তাহার সব রকমের নমুনাই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বড়বাজার হইতে পাওয়া গিয়াছে।

চোরাই মালের প্রদর্শনী

বড়বাজার থানাতে চোরাচালানী দ্রব্য-সম্ভারের একটি প্রদর্শনী দেখা যাইতে পারে। এই থানায় একটি পাক[া] খাতায় ১০০ জন চোরাচালানীর নামও নাকি সযত্নে রক্ষি[ত]

আছে! কিন্তু ইহাদের দেহে আঁচড় লাগিতে পারে এমন কোন ব্যবস্থা এখনও গৃহীত হয় নাই।

এই ১০০ জন কারবারীর ৫ জন সেনাপতি। সকলেই অবাঙ্গালী। চোরাচালানী কারবারের পরিচালনা এই পাঁচ জন পিছন হইতে করে। এক কথায় বলা যায়, সমগ্র পশ্চিম-বঙ্গের চোরাচালানী সংস্থার এই পাঁচ জনই সোল্ এজেন্টস্। চোরা চালানীর এই কর্ম্মধারা সোল-এজেন্টস্ সংস্থার অতি চমৎকার।

রাজাকাটরা অথবা বাগড়ি মার্কেটে ইহাদের সংগঠন এবং কার্য্যপদ্ধতি অপূর্ব্ব! মাল পৌছিবার পাচ মিনিটের মধ্যেই অভিজ্ঞ তৎপর কুলীরা উহা নিরাপদ্ স্থানে পাচার করে। মাল যেখান হইতেই আসুক না কেন, পূর্ব্বাহ্ণেই 'সদর দপ্তরে' টেলিফোনে খবর পৌছায়। পুলিশ এমন সন্দেহও করে যে, বড়বাজারে কালো দুনিয়ায় গোপন এবং বে-আইনী বহু টেলিফোন আছে এবং তাহাই চোরাচালানী কারবারকে চালিত করিতেছে।

সর্ব্বদিক হইতে এই দুইটি বাজারকে চোরাচালানী-দের 'গেরিলা' বাহিনী ঘিরিয়া রাখে। পুলিশ বা কাষ্টমস-এর কর্ম্মীদের দূরে দেখিতে পাইলেই তাহারা সে খবর সদর ঘাটিতে জানাইয়া দেয়।

বড়বাজারে ধৃত মোট চোরাচালানী মালের শতকরা আশী ভাগ পাওয়া গিয়াছে রাজাকাটরাতে। বাগড়ি মার্কেটের পরেই লোহাপটির স্থান। বাগড়ি মার্কেটে যায় সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ চোরাই দ্রব্য-সম্ভার।

বড়বাজার থানা গত এক বৎসরে পাঁচ লক্ষ টাকার চোরাচালানী পণ্য শুল্কবিভাগের হাতে তুলিয়া দিয়াছে। এই ব্যাপারে ৭টি লরী, ৪টি টেম্পো, ২টি ট্যাক্সি ও ২টি প্রাইভেট কারও পুলিশের হাতে আটক পড়িয়াছে।

বড়বাজারের এই চিত্র অবশ্য ইতিপূর্ব্বে পাওয়া যায় নাই। হালে বড়বাজার থানা চোরাচালান ধরিতে সুরু করিয়াছেন, পূর্ব্বে উহার ধার দিয়াও যান নাই।

কাষ্টমস এবং বড়বাজার থানার সহযোগিতা—বড়বাজারের চোরাচালানী রূপ উদঘাটিত হইবার আর একটি কারণ।

একটা কথা এখানে বলা কর্ত্তব্য যে, যত চোরাই মাল ধরা পড়ে তাহার শতগুণ মাল ধরা পড়িবার পুর্ব্বেই 'রপ্তানী' হইয়া যায়—এবং বহু ক্ষেত্রে এই কালো 'রপ্তানী' কারবার কিছুসংখ্যক পুলিস কর্ত্তার অজানা থাকে না।

এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ-পাকিস্তান সীমান্ত অঞ্চলের বহু স্থানে যে বিরাট্ চোরাকারবার এবং এপার-ওপার মাল পাচারের সুবিস্তৃত ব্যবসায় দীর্ঘ দিন ধরিয়া অবাধে চলিতেছে, তাহার পূর্ণ বিবরণ এবং তথ্য পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের জানা থাকা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট মহল নীরব। সংবাদপত্রে এ বিষয় যথেষ্ট আলোচনা, বিরূপ মন্তব্য এবং তথ্যপুর্ণ সংবাদও সবিস্তারে প্রকাশিত হইয়াছে বহুবার, কিন্তু কর্তৃপক্ষ এই দুর্নীতি দমন এবং প্রতিরোধকল্পে কোন কার্য্যকর ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া এখনও শুনি নাই। বসিরহাট এবং নদীয়ার সীমান্ত অঞ্চলে যখনই কোন কর্ত্তব্যপরায়ণ পুলিশ অফিসার চোরাকারবার বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতে গিয়াছেন, অতি অল্পকাল মধ্যেই তাঁহাকে বিবিধ প্রকারে অপদস্থ করিয়া অন্যত্র বদলি করা হইয়াছে। বিভাগীয় কর্ত্তাদের এরূপ বিচিত্র ক্রিয়া-কাণ্ডের কোনপ্রকার সৎ ব্যাখ্যা আমরা খুঁজিয়া পাই নাই। সংবাদপত্রেও ইহা লইয়া নানাপ্রকার তীব্র মন্তব্য করা হইয়াছে—কিন্তু সবই হইয়াছে অরণ্যে রোদন।

ইহা আমরা বিশ্বাস করি যে, পুলিশ ইচ্ছা করিলে এক দিনেই এ রাজ্যে প্রায় সব রকম চোরাকারবারীকেই দমন করিতে পারে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য—যে-রাষ্ট্রের প্রধান-মন্ত্রী সরকারের উচ্চস্তরে দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিদের আশ্রয় দান করেন, বড় বড় কর্ত্তাদের বিরুদ্ধে সপ্রমাণ দুর্নীতির অভিযোগ 'কিছু না' বলিয়া বাতিল করেন, সে-রাষ্ট্রে নিম্ন-স্তরে, বিশেষ করিয়া রাজ্যগুলির দুর্নীতি দমন এবং দুর্নীতি-পরায়ণ সরকারী-বেসরকারী ব্যক্তিদের শায়েস্তা করা যাইবে, এ আশা বর্ত্তমানে দুরাশা মাত্র। একমাত্র জনগণ নিজেদের হাতে বিচার-ব্যবস্থা যেদিন গ্রহণ করিবে,সেই দিন সর্ব্বপ্রকার অন্যায়-অনাচার সমূলে উৎপাটিত হইবে।

'দাদার' সমর্থনে 'ভাই'

বর্দ্ধমানে কংগ্রেস কর্ম্মীদের এক সভায় পশ্চিমবঙ্গের অদ্বিতীয় জোড়াবলদী নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষ মহাশয় গুরু-গম্ভীরকণ্ঠে ঘোষণা করেন যে: অত্যধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ধানের জমিতে পাট চাষ এবং অন্যান্য রাজ্য হইতে অসংখ্য শ্রমিক আগমনই পশ্চিমবঙ্গে চাউলের অভাবের প্রধান কারণ। এই সঙ্গে অতুল্যবাবুর শ্রীমুখ হইতে ইহাও নির্গত হয় যে—কায়িক শ্রমের প্রতি বাঙ্গালীদের বিরাগ এবং পরাঙ্মুখতাই এ রাজ্যে তীব্র বেকারীর প্রধানতম হেতু!

'দাদা' প্রফুল্লচন্দ্র সেনের সমর্থনে ভাইয়ের 'অবতরণ' অতি স্বাভাবিক। শ্রীঘোষ অবশ্য শ্রীসেনের সহোদর ভ্রাতা নহেন, মাসতুতো। কিন্তু সে কথা যাক্—পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য-সমস্যার যে কারণগুলি তিনি হঠাৎ আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার দুইটি কারণ রাজ্যসরকার অবশ্যই 'নিরাময়' করিতে করিতে পারেন। যথা:

১। ধানের জমিতে পাটের চাষ—যে পরিমাণ ধানের জমিতে পাটের চাষ পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রীয় অর্থ ভাণ্ডারের অবাঙ্গালী ধনীদের স্বার্থে করা হইতেছে, সেই জমিতে 'হইতে পারিত'—ধান বা যথা পরিমাণ চাউল কেন্দ্র পশ্চিম-বঙ্গকে কেন দিবেন না? পাট রপ্তানীর অর্জ্জিত বিদেশী মুদ্রায় কেন্দ্রীয় সরকারের অকেজো, দুর্নীতিদুষ্ট বড়কর্ত্তারা নবাবীর ঠাট বজায় রাখিবেন, অথচ যে-রাজ্য হইতে তাঁহারা পাট লোপাট করিতেছেন, সেই রাজ্যের লোক তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য খাদ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া পথে পথে ভিখারীর মত ঘুরিয়া বেড়াইবে, ইহা বোধ হয় একমাত্র কংগ্রেসী সম্রাট বাক্‌বর শাহের রাজত্বেই চলিতে পারে। রাজ্যসরকার এবং 'দাদা' ও তাঁহার মাসতুতো ভ্রাতা যদি নিজেদের বাঙ্গালী বলিয়া সত্যই মনে করেন এবং বাঙ্গালীর জন্য কোন মমতা বোধ করেন, তাহা হইলে আলোচ্য বিষয় লইয়া 'দাদাভাই' কেন্দ্রের সঙ্গে একটা বুঝাপড়া করিতে পারেন। কিন্তু হায়! আমরা কাঠের বিড়াল দিয়া কেন্দ্রীয় প্লেগ-দুষ্ট ধাড়ী ইঁদুর ধরার স্বপ্ন দেখিতেছি।

২। বাঙ্গালীর ভয়াবহ বেকারীর কারণ—শ্রীঅতুল্যর মতে: বাঙ্গালীর কায়িক শ্রম-বিমুখতা!—পশ্চিমবঙ্গের জোড়া-বলদ কুলতিলককে 'মিথ্যাবাদী' এবং 'ধাপ্পাবাজ' বলা খুবই সঙ্গত হইলেও, অপরাধজনক, গর্হিত কর্ম্ম হইবে, কাজেই আমরা ইহা হইতে বিরত রহিলাম। কিন্তু শ্রীঅতুল্যকে অনুরোধ জানাইব, তিনি একবার দয়া করিয়া রাজ্যস্থিত কর্ম্মসংস্থাগুলিতে এবং অবাঙ্গালী ও কেন্দ্রীয় সরকার-পরিচালিত কলকারখানাতে সর্ব্বপ্রকার কায়িক শ্রমে সদা-উন্মুখ বাঙ্গালী আবেদনকারীদের সংখ্যা যাচাই করিয়া দেখুন। আমরা সাক্ষাৎভাবে জানি—আজ পশ্চিমবঙ্গে লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত এবং সামান্য-শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক, এমন কি ১২ হইতে ১৬।১৭ বয়স্ক বালকও সাধারণ শ্রমিকের কাজ করিতে প্রস্তুত রহিয়াছে। কাজেই, বাচাল শ্রীঅতুল্য বাজে কথা বলিয়া, বাঙ্গালীর নামে অযথা কলঙ্ক-কালিমা লেপনের চেষ্টা না করিলে ভাল হইত। পশ্চিমবঙ্গে অন্য রাজ্যের অবাঙ্গালী শ্রমিকের হার শতকরা কত—তাহা একবার 'দাদা'র দপ্তরস্থিত শ্রম বিভাগে খোঁজ করিলেই জানিতে পারিবেন। এ-রাজ্যে বাঙ্গালী যুবকদের এই তীব্র বেকারীর একমাত্র না হইলেও, প্রধানতম কারণ রাজ্য-সরকারের ভীরুতা, রাজ্য মুখ্যমন্ত্রীর অন্যরাজ্য হইতে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক 'আমদানী' বন্ধ করিতে অনিচ্ছা এবং বাংলায় অবাঙ্গালীর ব্যবসা-সংস্থা এবং কলকারখানার মালিকদের শতকরা ৭৫ জন বাঙ্গালী কর্ম্মী ও শ্রমিক নিয়োগ করিতে বাধ্য করিতে অপারগতা!

কিন্তু অন্যরাজ্য হইতে আগত শ্রমিকদের জন্য বাঙ্গলার চাউল কম পড়িবে কেন? এই সব শ্রমিক—গুমো মন্ত্রীর মতে গম, ছাতু ইত্যাদি খায়। গুমো মন্ত্রী অবাঙ্গালী শ্রমিকদের গম, ছোলার ছাতু প্রভৃতি ভক্ষণে বাধ্য না করিয়া ক্রমাগত বাঙ্গালীর উদরে গম ঠাসিবার কথা বলিতেছেন কেন? পশ্চিমবঙ্গে অবাঙ্গালী শ্রমিক আগমন নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিবেন না, বাঙ্গালীর মুখের ভাত কাড়িয়া এই বহিরাগতদের খুশী রাখিবেন এবং তাহাদের পরিত্যক্ত পচা গম আর সড়া আলু বাঙ্গালীর অনভ্যস্ত উদরে চালান করিতে প্রয়াস পাইবেন শ্রীসেন! কি কেরামতি!! কি ভীষণ সাধু প্রচেষ্টা!!! গবুচন্দ্র-শাসিত, এবং হবুচন্দ্র-সমর্থিত রাজ্যের অবস্থা আর কি হইতে পারে?

এই প্রসঙ্গে স্বর্গত ডাঃ বিধান রায় বাঙ্গালীর কায়িক পরিশ্রম বিমুখতার বিষয়ে কি বলেন দেখিতে দোষ কি? প্রায় ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বে ডাঃ রায় এক ভাষণে বলেন যে, "বাঙ্গালীকে শ্রম-বিমুখ বলিয়া যে অপবাদ দেওয়া হয় তাহা ভিত্তিহীন। উপযুক্ত পরিবেশ এবং কাজ পাইলে বাঙ্গালী পরিশ্রম করিতে পরাঙ্মুখ নয়।"—বেশী দিনের কথা নয়, যখন এই কলিকাতাতেই ট্যাক্সি এবং বাস ড্রাইভার-কনডাক্টার সবই ছিল অবাঙ্গালী। কিন্তু রাজ্যসরকার যেদিন বাঙ্গালী যুবকদের এ-কাজের সুযোগ করিয়া দিলেন তখনই এই অতি পরিশ্রমের কাজ করিতে শত শত বাঙ্গালী যুবক আগাইয়া আসে এবং বর্ত্তমানে কয়েক হাজার বাঙ্গালী এই কাজে জীবিকা সংস্থান করিতেছে।

পশ্চিমবঙ্গস্থিত কলকারখানায় বাঙ্গালীরা যে কাজ পায়

না, তাহার কারণ বাঙ্গালীর শ্রম-বিমুখতা নহে, তাহার কারণ অবাঙ্গালী মালিকদের বাঙ্গালী নিয়োগে অনিচ্ছা এবং বিমুখতা! এই সকল অবাঙ্গালী মালিক 'জোড়াবলদদে'র 'ঘাস-বিচালী-জলের' যোগানদার বলিয়াই ইহাদের বিরুদ্ধে কোন কথা বলা কিংবা ইহাদের কলকারখানায় বাঙ্গালীকে নিযুক্ত করিবার জন্য সামান্য চাপ দিতেও অ-তুল্য জোড়া-বলদ এবং প্র-ফুল্ল উদর কংগ্রেসীদের সাহসে কুলায় না! অতুল্যবাবু কি খবর রাখেন যে আজ দুর্গাপুর, চিত্তরঞ্জন, ফরাক্কা, হলদিয়া প্রভৃতি স্থানে বাঙ্গালী শ্রমিক নিয়োগ অপেক্ষা অবাঙ্গালী নিয়োগেই কর্তৃপক্ষের পাকা ব্যবস্থা প্রকট হইয়াছে?

তবে একথা স্বীকার্য্য যে, শীর্ণদেহ ক্ষীণপ্রাণ সাধারণ বাঙ্গালী স্ফীতোদর প্রফুল্ল-চিত্ত শ্রীঅতুল্য ঘোষের মত এত কঠোর কায়িক পরিশ্রম করিতে শিখে নাই। শ্রীঅতুল্যের ক্যাম্পফলোয়ার বা তল্পীবাহী হইতে পারিলে হয়ত বাঙ্গালী যুবক কায়িক শ্রমে জবরদস্ত হইবে—কিন্তু তখন কি আর কলকারখানায় কায়িক শ্রমের প্রয়োজন তাহাদের থাকিবে?

পশ্চিমবঙ্গে দুর্নীতি-দমন

বিগত ১৫ই জুলাই হইতে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের (কলিকাতা সমেত) এন্‌ফোর্সমেণ্ট পুলিস বিভাগকে সরাসরি পুলিস দপ্তরের কর্তৃত্বাধীনে আনা হইয়াছে। এই নব-ব্যবস্থার ফলে দুর্নীতি দমন বিভাগ এতদিন পর্য্যন্ত যে ৮।৯ শত পুলিসের সাহায্য পাইতেছিল তাহা আর পাইতেছে না—এখন মাত্র ২৫।৩০ জন পুলিস এই কার্য্য করিতেছে। কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী কর্তৃপক্ষ যে-সময় দুর্নীতি-দমন (প্রশাসনিক স্তরে) করিবার দিকে নজর দিতেছেন বলিয়া প্রকাশ, ঠিক সেই সময় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দুর্নীতি-দমন ব্যবস্থা এমন ভাবে বিপর্য্যস্ত করিয়া প্রায় অকেজো করিবার অদ্ভুত "প্রকল্প"-প্রণেতা কে—জানিতে ইচ্ছা হয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিচিত্র আদেশের কল্যাণে এ-রাজ্যের দুর্নীতি-দমন বিভাগের স্পেশাল অফিসার (পদাধিকার বলে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সচিব) এই দপ্তরের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি প্রার্থনা করিয়াছেন। তিনি বুঝিয়াছেন, ঠুঁটো-জগন্নাথ রূপে দপ্তরের শোভা বর্দ্ধন করার কোন সার্থকতা নাই, প্রয়োজন নাই। —

এনফোর্সমেণ্ট ব্রাঞ্চটি পুলিশ বাহিনীর প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বের অধীনে আসার পর হইতে উপরতলার দুর্নীতিপরায়ণ অফিসারদের সম্পর্কে তদন্ত করার সম্ভাবনা সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়াছে।

বলা হইতেছে যে, পুলিশ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী একটি পৃথক ডি-আই-জি'র পদ সৃষ্টি করিয়া তাঁহার অধীনে সি-আই-ডি ও এনফোর্সমেণ্ট ব্রাঞ্চ দেওয়া হইয়াছে। অথচ অত্যন্ত অভিজ্ঞ অফিসাররা বলিয়াছেন, কমিশনের এই সুপারিশ সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে করা হইয়াছিল। কমিশন পুলিশের ইন্সপেক্টার জেনারেল ও পুলিশ কমিশনার পদে ভিন্ন রাজ্যের পুলিস অফিসার কিংবা সামরিক অফিসার নিয়োগ করার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন! সেই অভিমত কার্য্যকর না করিয়া এনফোর্সমেণ্ট ব্রাঞ্চ পুলিসকে পুলিশ দপ্তরের অন্তর্গত করায় এক দিকে দুর্নীতি দমন শাখাকে বিপর্যস্ত করা হইয়াছে এবং অন্য দিকে রাজ্যের সবচেয়ে বেশী দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত পুলিস দপ্তরে দুর্নীতি রোধের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বানচাল করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

নব-বিধান কার্য্যকর করিবার প্রাক্কালে দুর্নীতি দমন বিভাগের স্পেশাল অফিসার শ্রীঅমিতাভ নিয়োগী, আই-এ-এস, তাঁহার তীব্র প্রতিবাদে বলেন যে, নূতন ব্যবস্থায় এনফোর্সমেণ্ট বিভাগের পুলিস দ্বারা দুর্নীতির তদন্ত করা যাইবে না। ইহার জবাবে বলা হয় যে প্রয়োজনমত এনফোর্সমেণ্ট বিভাগের একটি দল স্পেশাল অফিসারের নির্দ্দেশে কাজ করিবে।

প্রশাসনিক ব্যাপারে অভিজ্ঞ কোন অফিসার, এমন কি সাধারণ ব্যক্তিও এই যুক্তিতে বিশ্বাস করেন না। পুলিশের কর্তৃত্ব থাকিবে পুলিস কর্ত্তাদের কাছে আর তাঁহারা প্রয়োজন মত স্পেশাল অফিসারের নির্দ্দেশে কাজ করিবে—এইরূপ ঐতিহ্য রাজ্য পুলিসের অন্ততঃ নাই। পুলিস হুকুম মানিতে অভ্যস্ত। তাঁহাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা যদি স্পেশাল অফিসার হন তবেই তাঁহারা তাঁহার হুকুম মানিবেন। অন্যথায় নহে।

ব্যবস্থা যাহা হইল, তাহাতে পুলিশ কর্ত্তাদের মর্জ্জি মত হুকুম তামিল করিবেন এনফোর্সমেণ্ট পুলিস। শ্রীনিয়োগীও এই তথ্য জানেন, তাই তিনি বেকুব বনিবার পূর্ব্বেই দায়িত্ব হইতে মুক্তি চাহিয়াছেন।

আবগারী পুলিস অফিসারদের বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্ত

স্বাধীনতা (?) লাভের পর দীর্ঘ ষোল বৎসরে এমন ঘটনা বিরল যেখানে পুলিস কর্তৃপক্ষ—কোন ওপরতলার পুলিস অফিসারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির তদন্ত করিয়া শাস্তি দিয়াছেন। যে কয়টি বড় ঘটনায় ওপরতলার অফিসার দুর্নীতির অভি-যোগে শাস্তি পাইয়াছেন বা অভিযুক্ত হইয়াছেন তাহার প্রায়

সব ক্ষেত্রেই দুর্নীতি দমন শাখা তদন্ত করিয়াছে। সেখানেও এইরূপ অভিযোগ আছে যে, পুলিস অফিসারদের বিরুদ্ধে তদন্ত করিতে যাইয়া দুর্নীতি দমন শাখার পুলিস অফিসারেরা উর্দ্ধতন পুলিস অফিসারদের বাধার সম্মুখীন হইয়াছেন। কিন্তু তখন এনফোর্সমেণ্ট ব্রাঞ্চ আর এন্টি-করাপশান পুলিস স্পেশাল অফিসারদের (আই-সি-এস কিংবা আই-এ-এস) অধীনে অনেকটা নির্ভয়ে কাজ করিতে পারিত। জেলাগুলিতেও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে তাহারা প্রয়োজন মত উর্দ্ধতন পুলিস অফিসারদের বিরুদ্ধেও তদন্ত করিত। কলিকাতার এনফোর্সমেণ্ট ব্রাঞ্চ ত এককালে দুর্নীতিপরায়ণ পুলিস অফিসারদের কাছে বিভীষিকার সৃষ্টি করিত। তাহারা কলিকাতার দুইজন ভূতপূর্ব্ব পুলিস কমিশনারের বিরুদ্ধে তদন্ত করিয়াছে। বটানিক্যাল গার্ডেনে মধুচক্রের ঘটনায় জড়িত সন্দেহে উর্দ্ধতন পুলিস অফিসারদের বিরুদ্ধে ইহারা তদন্ত করিয়াছে। সেই জন্য দীর্ঘদিনের আক্রোশ ছিল এনফোর্সমেণ্ট ব্রাঞ্চ পুলিসের উপর। জরুরী অবস্থায় পুলিস কমিশনের সুপারিশের সুযোগ লইয়া স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ওপরতলার প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় পুলিস দপ্তর এনফোর্সমেণ্ট ব্রাঞ্চকে তাঁহাদের করায়ত্ত করিয়াছেন।

এক কালে কলিকাতার যে-এন্‌ফোর্সমেণ্ট ব্রাঞ্চ পুলিসের এবং এই বিভাগের যে অফিসারগণ দুর্জ্জয় সাহস এবং অবিশ্বাস্য যোগ্যতা দেখাইয়া উর্দ্ধতন পুলিস এবং উচ্চপদস্থ সিভিল অফিসারদের বিরুদ্ধে তদন্ত চালাইয়া বহু দুর্নীতি দমন করেন, বর্ত্তমান ব্যবস্থা এবং প্রশাসনিক ওলট-পালটের ফলে সেই এনফোর্সমেণ্ট বিভাগটি রাজ্য পুলিস সংস্থার দুর্ব্বলতম এবং অকেজো শাখাতে পরিণত হইল। আলোচ্য বিভাগ হইতে সুখ্যাত এবং নির্ভীক পুলিস অফিসারদের কলিকাতা পুলিসের অবনত স্থানে বদলী করা হইয়াছে, কাহাকেও বা সামান্য প্রমোশন দিয়া পুলিস বিভাগের খাস মহলের কর্ত্তাদের 'নজরাধীন' রাখার ব্যবস্থা হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে এই দুর্নীতি দমন বিভাগের একজন প্রাক্তন স্পেশাল অফিসার স্পষ্টই বলেন যে, এই শাখার একজন অতি সুযোগ্য অফিসারকে মেদিনীপুরে বদলী করার ফলে ঐ অফিসার ভবিষ্যৎ চিন্তায় ভীষণ আশঙ্কিত হইয়া অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং এই অসুখেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে!

প্রশাসন এবং সমগ্র রাজ্যের পক্ষে এমন প্রয়োজনীয় একটি পুলিস-শাখা লইয়া যখন এই প্রকার দুর্নীতি দমনের পরিহাস চলিতেছে—সেই সময় রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তর নিরুদ্বেগ নির্ব্বিকার চিত্তে তাহা অবলোকন করিতেছেন! এমন কি সুযোগ্য পুলিস অফিসারদের স্বাভাবিক প্রটেকশন দানও করেন নাই। দুর্নীতির দ্বারাই দুর্নীতি দমন বিভাগ দমিত হইল!

জবাহরলালের ঐক্যের আবেদন

গত ১৯শে অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী ভারতকে ঐক্যবদ্ধ হইবার এবং চীনা-আক্রমণ প্রতিরোধ প্রচেষ্টা শিথিল না করিবার জন্য রেডিও মারফত আবেদন প্রচার করেন। নেহরু বলেন ঃ

"মনে এবং হৃদয়ে, সমস্ত বিপদের সম্মুখীন হইবার মত দৃঢ়তায় এবং দেশের স্বাধীনতা ও ঐক্য রক্ষায়ই জাতির প্রকৃত শক্তি নিহিত।

"চীনের সহিত শান্তিপূর্ণ মীমাংসায়ও ভারত আগ্রহী, তবে আমাদের ঐক্য ও মর্য্যাদার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়াই এই মীমাংসা করিতে হইবে, কারণ আমাদের স্বাধীনতা, আমাদের ঐক্য, আমাদের মর্য্যাদার কথা যদি আমরা বিস্মৃত হই তবে সেই মীমাংসার কোন অর্থই হইবে না। দেশের মঙ্গল হইবে না এইরূপ মীমাংসা লজ্জাকর ও হীন আত্মসমর্পণ ছাড়া আর কিছুই নয়।"

শ্রী নেহরু জনসাধারণকে এই অঙ্গীকার গ্রহণ করিতে বলেন যে, তাহারা দেশের স্বাধীনতা ও ঐক্য রক্ষা করিবে এবং "আমরা একই দেশের অধিবাসী। আমরা কোনরূপ অমর্য্যাদা বরদাস্ত করিব না এবং যে-কোন আক্রমণকারীকে আমরা প্রতিহত করিব।"

শ্রী নেহরু আরও বলেন যে, সেনাবাহিনী ও বিমানবাহিনীকে শক্তিশালী করিয়া তোলার জন্য তাঁহারা প্রস্তুত কিন্তু সকলের একথাও স্মরণ রাখা উচিত, দেশের ঐক্য এবং কঠোর পরিশ্রমের দ্বারাই প্রকৃত শক্তিশালী হওয়া যায়।

সাধারণ ভাবে প্রপণ্ডিত প্রধানমন্ত্রীর আবেদনে আপত্তি করিবার কাহারও কোন কারণ থাকা উচিত নয়—কিন্তু এই প্রসঙ্গে বিশ্বপণ্ডিত নেহরুকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই—ভারতের উপর চীনা-আক্রমণের জন্য প্রধানতঃ দায়ী কে এবং কাহারা। চীনের মতলব ১৯৫৫ সাল হইতে প্রকা

হয়, এবং চীনারা ভারতের জমি কিছু কিছু দখল করিতে সুরু করে—কিন্তু সবকিছু জানিয়া, দেখিয়া কে বা কাহারা দেশবাসীকে মিথ্যা স্তোকবাক্যে ধাপ্পা দিয়া ভুলাইয়া রাখে—এবং যাহাদের মিথ্যাচারের জন্য আজ ভারতের এই চরম দুর্ভোগ, অপমান এবং অসীম কষ্টভোগ, সেই অপরাধী-দেশদ্রোহীদের কি-বিচার, কি-দণ্ডবিধান রাষ্ট্র সরকার করিয়াছে? অন্য দেশ হইলে প্রকাশ্য আদালতে প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁহার অনুচরদের বিচার হইয়া চরম দণ্ডবিধান হইত। অন্য কোন দেশে দেশ এবং জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার ক্ষমা নাই!

"শাসকের আসনে বসিয়া নিজেদের অদূরদর্শিতা, হঠকারিতা এবং ভোগবিলাস-পরায়ণতায় যাহারা শত্রুর রাস্তায় লাল শালু পাতে তাহাদিগকে কি বলা যায়? কম্যুনিষ্টদের গালাগাল দিলেই যদি দেশপ্রেম হইত, দেশপ্রেম যদি এতই মেড-ইজি হইত, তাহা হইলে দেশরক্ষার জন্য এত অর্থব্যয়, এত অস্ত্র সংগ্রহ, এত কষ্ট স্বীকার কিছুরই প্রয়োজন হইত না। দেশরক্ষার জন্য পাঁচ লাখ টাকা তুলিয়া যাহারা ওয়েলিংটন স্কোয়ারে সাতদিন নাচিয়া-কুঁদিয়া উহা ফুঁকিয়া দেয় তাহারা কি দেশপ্রেমিক? জরুরী অবস্থায় সাধারণ মানুষ যে সময়ে অসহ্য কষ্ট সহ্য করিতেছে সেই মহা সঙ্কটকালে যাহারা কেবিনেট মিটিং-এর নামে দার্জ্জিলিং পাহাড় এবং দীঘার সৈকতে ফুর্ত্তি করিতে যায় তাহারাও কি দেশপ্রেমিক?"

কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী এবং নেতারা আজ যদি পথে নামিয়া জনগণের সঙ্গে সকল দুঃখ-কষ্টের ভাগ লইতেন, ভিক্ষা-অন্নের অংশ এক সঙ্গে ভক্ষণ করিতেন, জনগণের কাধে হাত রাখিয়া কৃচ্ছ্রতা সাধন এবং বিপদসঙ্কুল কণ্টকময় পথে চলিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের আবেদনে যে সুফল ফলিত, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাহা আশা করা দুরাশা মাত্র। পাপীর মুখে ধর্ম্মকথা বিকৃত পরিহাস বলিয়া গৃহীত হইবে!

দেশবাসী সদা-প্রস্তুত

স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দেশবাসী সদা-প্রস্তুত। চীনা-আক্রমণের প্রথম দিন হইতেই দরিদ্র জনগণ সর্ব্বস্ব দান করিয়া অসীম কষ্টভোগ করিতে দ্বিধা করে নাই। এ-রাজ্যের পথের ভিখারীও তাহার দিনের ভিক্ষালব্ধ সামান্য কয়েকটি নয়া পয়সাও প্রতিরক্ষা ভাণ্ডারে অকাতরে প্রসন্নচিত্তে দান করিয়া উপবাস বরণ করিয়াছে। কিন্তু যে-সকল কংগ্রেসী মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, রাষ্ট্রমন্ত্রী এবং নেতা অহরহ দেশবাসীকে দেশ-রক্ষার জন্য "দান কর, আরও দান কর, কষ্টভোগ কর, আরও কষ্টভোগ কর" প্রভৃতি অমূল্য বাণী দান করিতেছেন, তাঁহাদের ব্যক্তিগত দানের, কৃচ্ছ্রতা সাধনের এবং ব্যক্তিগত দুঃখভোগের একটা তালিকা প্রকাশ তাঁহারা করিবেন কি? দেশে আপৎকালীন জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিবার কাল হইতে দেশের শাসকগোষ্ঠী এবং তাঁহাদের কংগ্রেসী চেলা-চামুণ্ডারা তাঁহাদের রাজকীয় আরাম-বিলাসের কতটুকু অংশ দয়া করিয়া ত্যাগ করিয়াছেন, আহার-বিহার বসবাসের কারণে, গরীব প্রজাদের হাড় গুঁড়া করিয়া সংগৃহীত অর্থের নিদারুণ রাজকীয় ব্যয় মন্ত্রীমহাশয়গণ কতটুকু কমাইয়াছেন? এ-হিসাব দাখিল করার প্রয়োজন আছে কি না কর্ত্তারা ভাবিয়া দেখিতে পারেন। যতদুর দেখা যায় কংগ্রেসী মহলের—মন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যাঙ-ব্যাঙাচী শ্রেণীর নেতারাও—দেশের এই তথাকথিত আপৎকালীন অবস্থাতেও নিজেদের সুখ-বিলাসের আয়োজন পুরা মাত্রায় বজায় রাখিয়াছেন। কলিকাতার 'রাজভবনে'র আওতায় যে-সকল মন্ত্রী বাস করেন, তাঁহাদের ত কথাই আলাদা! (নেহরুর গালভরা এই "Socialistic Pattern" গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজ্যপালদের প্রাসাদের নাম "রাজভবন" কেন রাখা হইল জানি না, আশা করি এটা পরিহাস করিয়া করা হয় নাই!) দরিদ্র দেশে মন্ত্রী এবং অন্যান্য নেতাদের ব্যয়বহুল জীবনযাত্রা বিদেশীর চোখেও বিসদৃশ লাগে, এ-কথা কি কর্ত্তারা জানেন?

সাধারণ মানুষ দেশরক্ষার জন্য সবই করিবে—প্রাণদান করিতেও তাহারা পশ্চাৎপদ হইবে না। কিন্তু শাসকগোষ্ঠীর আচরণ এবং রাজকীয় ষ্টাইলে জীবনযাপনের ধারা পরিবর্ত্তন একান্ত প্রয়োজন। কর্ত্তারা মনে রাখিবেন, আজ সামান্য দিনমজুরেরও চোখ প্রখর হইয়াছে—কর্ত্তা মহাশয়দের কাণ্ড-কারখানা সবই তাহারা অবাক্ হইয়া অবলোকন করিতেছে অতএব—?

স্বভাব যায় না ম'লে

প্রধানমন্ত্রী যাহা বলেন, তাহা অ-মূল্য হইলেও সকল ভারতবাসী তথা পশ্চিমবঙ্গবাসীর পক্ষে প্রণিধানযোগ্য। ভারতের বর্ত্তমান প্রধানমন্ত্রী বাক্যসিংহ নেহরু একটি নূতন

মেশিন টুল কারখানার উদ্বোধনকালে বলেন: "দেশ হইতে বেসরকারী শিল্প উদ্যোগ লোপ পাক তাহা আমি চাই না, কিন্তু সরকারী উদ্যোগকে অকারণ যে নিন্দা করা হয় তাহাকে আমি ঘৃণা করি।" নেহরুর মতে সরকারী আওতায় শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি নাকি চমৎকার (?) চলিতেছে! পূর্ব্বেও দেখা গিয়াছে নেহরু স্থানে অস্থানে বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তাঁহার বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়াছেন। "বেসরকারী শিল্প-উদ্যোগগুলি লোপ পাক ইহা আমি চাই না" —এ-কথার অর্থ কি? দেশের কি লোপ পাইবে আর কি পাইবে না, তাহা কি হিটলারী মনোভাবযুক্ত এই ব্যক্তির উপরেই নির্ভর করিতেছে? "সরকারী শিল্প কলকারখানা-গুলি চমৎকার চলিতেছে"—সত্য কথা। কিন্তু সরকারী ইস্পাত কারখানাগুলি গত কয়েক বৎসরে যে কোটি কোটি টাকা লোকসান দিয়াছে এবং এখনও দিতেছে, তাহা কি এই চমৎকারিত্বের দৃষ্টান্ত? গৌরীসেনের টাকায় সবকিছুই মজা করিয়া 'চমৎকার' চালানো যায় এবং এই 'চমৎকার' চালানো'র জন্য দিল্লীর বর্তমান সম্রাট্ বাকবর শাহকে কাহারো কাছে কৈফিয়ত দিতে হয় না। বেসরকারী কল-কারখানার পরিচালকদের যাহা অহরহ করিতে হয় এবং সেইজন্যই তাঁহারা কোম্পানীর লাভ লোকসানের প্রতি সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া সুষ্ঠুভাবে কার্য্য পরিচালনা করিয়া থাকেন।

বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করিয়া কলকারখানার প্রতি নেহরুর বিদ্বেষ এবং গাত্রদাহ সুখ্যাত। এবং এই বিদ্বেষের কারণ ঐ প্রতিষ্ঠানগুলির সুপরিচালনা, যাহার তুলনায় গৌরী সেনের টাকা বরবাদ করিয়া প্রতিষ্ঠিত নেহরুর সরকারী কলকারখানাগুলি নিকৃষ্ট বলিয়া লোকের কাছে প্রতিভাত হয়। ফলে: বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি নেহরুর চোখের বালি! নেহরুর ভাবে-ভঙ্গিতে ইহাই মনে হয় যে —দেশের বেসরকারী শিল্প উদ্যোগগুলি কোন বিদেশীর সম্পত্তি এবং এইগুলি বন্ধ করিতে পারিলেই দেশ একদিনে ধনধান্যে পূর্ণ হইয়া উঠিবে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের গলদ থাকিতে পারে, কিন্তু নেহরুর অতি-প্রিয় সরকারী উদ্যোগ-গুলির মত কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান—এতো বেপরোয়া ভাবে পরিচালিত হয় না। সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানে (সব না হইলেও শতকরা ৯৫টিতে) কি পরিমাণ দুর্নীতির খেলা চলিতেছে তাহা আজ কাহারো জানিতে বাকী নাই। একথাও সবাই জানে যে, সরকারী শিল্প উদ্যোগগুলি উপরতলার কর্তাব্যক্তিদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং আশ্রিতজনদের জগন্নাথ ক্ষেত্র! এখানে উচ্চ-বেতনভোগী কর্ম্মচারী নিয়োগে গুণ অপেক্ষা 'পরিচয়'এর মূল্যই অধিক। সামান্য অবকাশ পাইলে এবং যে কোন ছুতায় বেসরকারী কলকারখানার পরিচালকদের অযথা নিন্দাবাদ দেশের প্রধান-মন্ত্রীর পক্ষে অশোভন। প্রধানমন্ত্রী বলিয়া কথিত ব্যক্তির মনে রাখা অবশ্যকর্তব্য যে—বেসরকারী শিল্প উদ্যোগ এবং কলকারখানাগুলি দেশেরই সম্পত্তি এবং সরকারী কলকার-খানার স্বার্থে এগুলিকে বরবাদ করার পক্ষে কোন প্রকার (সু কিংবা কু) যুক্তি থাকিতে পারে না। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলা যায় যে—গত কিছুকাল হইতে নেহরুর বাণী এবং প্রশংসা সমালোচনার কোন মূল্যই আজ কেহই দেয় না, একমাত্র আকাশবাণী এবং সরকারী প্রেসনোট ছাড়া। সরকারের অর্থাৎ আত্ম-প্রশংসার দ্বারা বাক্যসিংহ প্রধানমন্ত্রী আত্ম-বেকুফীর নির্লজ্জ প্রচার করিতেছেন—এই সামান্য কথাটা বুঝিবার মত জ্ঞানও তিনি আজ হারাইয়াছেন। নেহরু জীবনের ইহাই পরম ট্র্যাজেডি!

সমস্যা

শ্রীমিহির সিংহ

প্রণব সেন যে বিয়ে-থা করবে না সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলাম। ছেলেবেলায়—বোধ হয় ক্লাস নাইনে পড়বার সময়ে তার সঙ্গে প্রথম পরিচয়। তবে বন্ধুত্বটা জমল কলেজে উঠে। আমাদের স্কুল থেকে আমরা মাত্র তিনজন গিয়েছিলাম সিটি কলেজে। সেই প্রকাণ্ড সওয়া শ' ছেলের ক্লাসে আমাদের তিনজনের মধ্যে স্বভাবতঃই সম্পর্কটা ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। তারপরে বি. এ. ক্লাসে উঠে যখন শঙ্কর চ'লে গেল অন্য কলেজে তখন প্রণব আর আমি অভিন্ন-হৃদয় হয়ে উঠলাম। ও চাকরিতে ঢুকল আমার আগে, তাছাড়া আমার চাকরি হ'ল মফঃস্বলে, ফলে দুজনের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ কমে এল। কিন্তু বন্ধুত্বটা তাতেও অটুট রইল—তিরিশ বছর বয়সে যখন দুজনেই আবার একই শহর কলকাতার বাসিন্দা হ'লাম তখন দেখলাম, পরিচিতের সংখ্যা বা পরিধি দুজনেরই বেড়ে থাকলেও দুজনেরই দুজনকে প্রয়োজন আছে।

আমি ঠিক করেছিলাম কলকাতায় এসে বসতে না পারলে সংসার পাতার চেষ্টা করব না। নতুন চাকরিটা ভালই, ছ মাসের মাথায় যখন পাকা হওয়া গেল তখন মনে হ'ল, যে ভদ্রমহিলাটিকে এতদিন ধ'রে সিনেমা দেখিয়ে, টুকটাক্ উপহার দিয়ে আর আইস্‌ক্রীম খাইয়ে এসেছি, এবারে তাঁকে নিজের বাড়ীতে এনে বসাতে পারলে মন্দ হয় না। দিদি তার দিবানিদ্রাবিলাসী স্বামী এবং দুরন্ত কন্যা দু'টিকে নিয়ে যথেষ্ট বিব্রত আছে, আমার ব্যাপারে বিশেষ মাথা দেবার সময় তার নেই। প্রথম যখন বললাম, বিয়ে করব ঠিক করেছি তখন খুব উৎফুল্ল হওয়ার পরিবর্তে যেন মস্ত হাঁফ ছাড়ল। বলল, এতদিনে নাকি আমার ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ান বন্ধ হবে। মাখনদা ওপাশ থেকে টিপ্পনি কেটে বললেন, হ্যাঁ, এবার বনের মহিষী ঘরে এসে যাবেন। তবে মহিষীর আগমন সংবাদে সব চাইতে যে খুশী হ'ল সে প্রণব। বিয়েটা হ'ল অবশ্য রেজিষ্ট্রি ক'রে, তবু পার্টির আয়োজন থেকে সুরু ক'রে ঘর সাজানো পর্য্যন্ত সে-ই করল। মহিষী বললেন, আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবার জন্যে প্রণবের বিয়ের সব ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া হবে।

তার পরে বছর কয়েক হয়ে গিয়েছে। মহিষী তাঁর ক্রমবর্দ্ধমান সাংসারিক দায়িত্বের ফাঁকে ফাঁকে বহুবার চেষ্টা করেছেন আমার বন্ধুটির স্বাধীনতার ল্যাজটুকু কাটবার। প্রথম প্রথম নিজের দূরসম্পর্কের ভগিনী বা সহপাঠিনীদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছেন, একসঙ্গে পিকনিক্ কিংবা সিনেমা যাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। তারপরে বলেছেন তাকেই পছন্দ ক'রে নিতে, বিয়ের বন্দোবস্ত তিনি ক'রে দেবেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাঁর সব প্রয়াস ও প্ররোচনা ব্যর্থই হয়েছে। কিছুদিন আগে একবার খুব বিরক্ত হয়ে প্রণবকে বললেন, শুনলাম যে, আর কিছু যদি না-ই হয় ত না-হয় অফিসের ষ্টেনোগ্রাফার-টাফার কাউকে একটা বিয়ে করুক, খবরটা পেলেই তিনি খুশী হবেন। প্রণব বলল, দেড় লাখ ভদ্রমহিলার সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে, ইচ্ছে আছে ওটাকে তিন লাখ করা—তার পরে বিয়ের কথা ভাবা যাবে। মহিষী যে কতটা চটে গেলেন তার সব চাইতে বড় প্রমাণ এই যে, তার পর থেকে ঐ প্রসঙ্গটি তিনি সম্পূর্ণ ভাবে বর্জ্জন ক'রে এসেছেন।

আমি কিন্তু যখন ভেবে দেখি তখন মনে হয়, প্রণব খুব খারাপ নেই। ভালো উপার্জ্জন করে, চাকরিতে বেশ নাম করেছে। এর মধ্যেই একটা বাড়ী ওঠাতে সুরু করেছে, ছোট একটা গাড়ি আগেই কিনেছে, আর টেনিস খেলা আছে, সঙ্গীত-সম্মেলন আছে, এখানে-ওখানে সাহিত্যিক আড্ডা আছে—বাড়ী ফিরতে দেরি হ'লে কোনও অসুবিধাই নেই। ভৃত্য বাদল রান্না করে ভালই, যতদূর যত্ন করার সবই করে, আর তা ছাড়া মহিষীদের মতন শিং নাড়িয়ে ভয়ও দেখায় না। বাদলের হাতে সংসারের খরচ যতটুকু বেশী হয় সেটুকু আমার মতে ভাল ভাবেই পুষিয়ে যায়। সে কথাটা অবশ্য মহিষীকে বলতে সাহস করি নি।

এ-হেন প্রণব সেদিন দুপুরে আমাকে অফিসে ফোন ক'রে বলল, মহিলা-সংবাদ আছে। ওর মহিলা-সংবাদ

সাধারণতঃ যে ধরণের হয় তা আমার জানা ছিল। হয় কোনও নতুন ষ্টেনোগ্রাফার এসেছে কাজে, নয় সিনেমা দেখতে গিয়ে পাশে কোনও সুন্দরী সিন্ধী মেয়ে ব'সে ওর দিকে তাকিয়ে হেসেছে। কিন্তু আমার অবিশ্বাসকে দূরীভূত ক'রে প্রণব বলল, ব্যাপারটা ভিত্তিহীন হলেও সিরিয়াস। আমি বললাম, বেশ, কাল বিকেলে অফিস ছুটির পর চ'লে এস—বাড়ীতে বসে মহিষীর সাক্ষাতেই কথা হবে। ও অনভ্যস্ত ভাবে সঙ্কুচিত হয়ে বলল, ওর নাকি লজ্জা করবে। এটা নিতান্তই অপ্রত্যাশিত। সাধারণতঃ এ ধরণের গল্প ও বেশ জমিয়ে রসিয়ে বলতেই ভালবাসে। ভাবলাম, ব্যাপারটা সত্যিই বোধ হয় গুরুতর। বললাম, তা হ'লে বিকেলে অলিম্পিয়াতে দেখা হবে। মহিষীকে টেলিফোন ক'রে ব্যাপারটার আভাস দিয়ে বললাম, সন্ধ্যেয় যখন বাড়ী যাব তখন যেন প্রণবকে এ ব্যাপারটা নিয়ে ঠাট্টা না করেন।

ঘটনাটা শুনে কিন্তু একটু হতাশই হলাম। ওদের বাড়ীর একতলার ফ্ল্যাটে থাকেন একজন চিত্রাভিনেত্রী। খুব নাম করা নয়—তবে নাম জানে সবাই-ই। দেখতে কেমন সে-সম্বন্ধে আমার ধারণা কিছু নেই—কেননা বাংলা ছবি বিশেষ আমি দেখি না। তবে প্রণবের মতে খুব নাকি ব্যক্তিত্ব আছে তাঁর চেহারায় ও ধরণে-ধারণে। মেয়েদের সম্বন্ধে যখন বলা হয় চেহারায় ব্যক্তিত্ব আছে তখন বোধ হয় বেশীর ভাগ সময়েই তাঁরা দেখতে খুব ভাল নন। তবে সে কথা চেপে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, আসল ঘটনাটা কি। প্রণব বলল, মেয়েটি বাড়ীতে থাকে খুব চুপচাপ। কখনও কখনও সকালে কাজে বেরোনোর সময় দেখে তিনিও বেরুচ্ছেন, কিংবা বিকেলে ফিরবার সময়ে দেখে তিনি দুএকজন আগন্তুকের সঙ্গে বসবার ঘরে ব'সে কথাবার্ত্তা বলছেন। আলাপ হয় নি—তিনি বেশ স্পষ্টতঃই পাড়ার মধ্যে মেলামেশা করতে অনিচ্ছুক।

কিন্তু সেইদিন সকালে প্রণব যখন উপর থেকে নামছে তখন নাকি ভদ্রমহিলা দরজা খুলে বেরিয়ে এসে প্রণবকে বললেন, নমস্কার মিষ্টার সেন, আপনার সঙ্গে ত কখনও পরিচয় হয় নি, আমার একটু বিশেষ দরকার ছিল। প্রণব হকচকিয়ে গিয়েছিল, প্রতি-নমস্কার ক'রে বলল, বলুন। ভদ্রমহিলা হেসে বলল, না, এ ভাবে বলব না, এখন ত আপনি অফিসে বেরোচ্ছেন। এখন দেরি করাব না। পরে যখন ফ্রি থাকবেন তখন যদি আসেন ত এক পেয়ালা চা খাবেন, আমার কথাটাও বলব। প্রণবের মাথাটা তখন মনুমেণ্টের চেয়েও উঁচুতে খুব হাল্কা হাওয়ায় বিচরণ করছিল। জিজ্ঞাসা করল, ওবেলা আসব? মেয়েটি দুঃখিত ভাবে বলল, আমার শূটিং রয়েছে ওবেলা, কালও আছে, পরশুও আছে, আপনি যদি বৃহস্পতিবার আসেন ত খুব ভাল হয়। আপনি ত সাধারণতঃ ফেরেন সাড়ে পাঁচটা নাগাদ?

প্রণব বলল, কি হ'তে পারে বল ত ব্যাপারটা? আমিও সত্যি ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। মেয়েটি ও বাড়ীর বাসিন্দা হয়েছে বোধ হয় মাস আট-দশ হবে। বৃদ্ধা মা ছাড়া আর কেউ থাকেন না তাঁর সঙ্গে। তবু সম্পূর্ণ অপরিচিত অবিবাহিত একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে তার কি প্রয়োজন থাকতে পারে? তাছাড়া প্রণব একটু দ্বিধা ক'রে বলল যে, তার যতদূর মনে পড়ে, যখন সে চলে আসছে তখন নাকি তিনি বলেছেন যে,ব্যাপারটা নেহাতই তাঁর আর প্রণবের, কাজেই একটু নিরিবিলিতে কথা বলতে চান! আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "যতদূর মনে পড়ে" মানে? প্রণব বোকার মতন হেসে বলল, তখন মাথাটা এমন গুলিয়ে গিয়েছিল যে সব কথাগুলো আর মনে নেই। আমি আর কি বলব, শুধু বললাম, কি আর করবি? এই তিনটি দিন কাটিয়ে দে—তার পরে সন্দেহ ভঞ্জন হয়ে যাবে।

মহিষী শুনে বললেন, টাকা ধার চাইবার জন্যে ডাকছে বলতাম, কিন্তু ও মেয়েটি ত এখন অনেক ফিল্মে কাজ করছে, ওর ত টাকার অভাব হওয়ার কথা নয়। বলা বাহুল্য তাঁর এই মন্তব্য প্রণবকে আমি বলি নি। তার একটা কারণ, এই দু-আড়াই দিনেই তার অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন হয়ে দাঁড়াল। অনেক রকম থিয়োরী খাড়া করল। এক নম্বর হ'ল, মেয়েটির হয়ত জীবনে অনেক কিছু ঘটনা ঘটেছে যেটা কাউকে ব'লে ও হাল্কা হ'তে চায়। আর—হয়ত ও প্রণবের সাহিত্যিক খ্যাতি শুনেছে। ভেবেছে, সে সেই জীবন-কাহিনী অবলম্বনে এক উপন্যাস লিখে নায়িকা ও লেখক দুজনকেই অমর ক'রে যাবে। প্রণব অবশ্য চাকরির ফাঁকে ফাঁকে দুটো চারটে গল্প লিখেছে এ ও তা কাগজে। কিন্তু তার সাহিত্য প্রতিভা বা সাহিত্যিক খ্যাতি সম্বন্ধে এত উচ্চ ধারণা আমার ছিল না যে, এই থিয়োরীটাকে মেনে নিতে পারি।

প্রণব নিজেও যে অবশ্য থিয়োরীটাকে মেনে নিল তা নয়। কেননা নিজেই আবার বলল, এমনও ত হতে পারে যে, আসলে মেয়েটি কোনও একটা বাজে

দলের মধ্যে পড়েছে যার থেকে কাটিয়ে উঠতে পারছে না, তাই হয়ত তার সাহায্য চাইবে। আমি হেসে বললাম, আসলে ওল্ড ব্যাচিলরগুলো দারুণ ভীতু, ভরসা ক'রে ভাবতে পারছিস্ না কেন যে তোর প্রেমে পড়েছে। ও খুব অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে বলল, ভাগ্! একটু পরে নিজেই বলল, কিন্তু জানিস, কখনও কখনও লক্ষ্য করেছি যে যখন অফিসে বেরোচ্ছি কিংবা ফিরছি তখন বসার ঘরের জানলায় পর্দার ওপাশ থেকে কেউ দেখছে আমাকে। ওর পিঠ চাপড়ে বললাম, তা হ'লে আর কি, ঝুলে পড়্। ও বলল, দাঁড়া দেখি, বৃহস্পতিবারের ফাঁড়াটা কাটুক।

বৃহস্পতিবার সকাল বেলায় মহিষী প্রণবকে ফোন ক'রে বললেন, মনে জোর করতে। দুপুরে ও আমাকে অফিসে ফোন ক'রে বলল, প্রথম চাকরিতে ইণ্টারভিউ দেবার মতন মনে হচ্ছে। আমি ওর মানসিক উত্তেজনা একটু কমানোর জন্যে বললাম, অত ভাবছিস কেন, হয়ত কিছুই নয়, পাড়ার লোকজনের সঙ্গে আলাপ করতে চাইছে তাই তোকে দিয়ে সুরু করছে। প্রণব বোধ হয় একটু মনঃক্ষুন্নই হ'ল, বলল, তা হ'লে দোতলার ওদের বাদ দিয়ে আমাকে ধরল কেন? আমি বললাম, র‍্যাণ্ডম্ সিলেকশন করেছে। কিন্তু মনে মনে ওর যুক্তিটা ওড়াতে পারলাম না। সারাদিনই কাজের ফাঁকে ফাঁকে ব্যাপারটা মনের মধ্যে উঁকি দিতে লাগল। সত্যি কথা বলতে কি প্রণবটার উপরে একটা সামান্য ঈর্ষ্যার ভাবও যেন আসছিল, ভাবছিলাম, তার গতানুগতিক চাকুরে জীবনে এমন একটা গল্পের মতন জলজ্যান্ত রোমান্সের উদয় হয়ে সে যেন আমাদের উপর খুব একটা টেক্কা দিয়ে গেল।

এ ক'দিন চায়ের টেবিলে, রাত্রে খাওয়ার সময়ে, রেডিওটা বন্ধ ক'রে শুয়ে পড়বার আগে থেকে থেকেই প্রণবের মহিলা-সংবাদ এসে পড়েছে মস্ত একটা সমস্যার মতন। প্রণব অবশ্য সাধারণতঃই ব'লে এসেছে যে তার উদীয়মান সাহিত্য প্রতিভাতেই আকৃষ্ট হয়েছেন ভদ্রমহিলা, তবু আমরা দুজনে বরাবরই প্রেমের থিয়োরীটাকেই সমর্থন করে এসেছি। প্রণব যখন হিসেব করতে বসছে, যদি ভদ্রমহিলা তাকে দিয়ে পুরো একটা ফিল্মস্ক্রিপ্ট্ করিয়ে নেওয়ার আশায় থাকেন ত তার লাভের অঙ্কটা কত হ'তে পারে, আমরা তখন দুজনে বসে আঁকজোক কেটেছি ছোট ক'রে একটা পার্টি দিলে কত খরচ হ'তে পারে। প্রণব যখন সবাক্ স্বপ্ন দেখেছে এই একটা চিত্রনাট্য পরিচালক-প্রযোজকদের নজরে পড়ে গেলে তার থেকে তার ভবিষ্যৎ উন্নতির সোপান কেমন রূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে, আমরা তখন নিজেদের মধ্যে সকৌতূহল আলোচনা করেছি বাড়ীতে কর্ত্রীর আগমনে বাদলের মানসিক প্রতিক্রিয়া কেমন হতে পারে তাই নিয়ে। যাই হোক্, আজ সেই বহু প্রতীক্ষিত বৃহস্পতিবার।

অফিসে কাজের চাপ ছিল। বাড়ী যখন ফিরলাম তখন সাতটা বেজে গেছে। মহিষী গিয়েছেন তাঁর পুরোণো কলেজে—বাৎসরিক রি-ইউনিয়নে মাতব্বরি করতে। ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করলাম, সেন সাহেব ফোন করেছিলেন কি না। বলল, না। আমি হাতমুখ ধুয়ে জামা-কাপড় ছেড়ে চা খেয়ে ভাবলাম, ধরি ফোনটা, তারপরে হিসেব ক'রে দেখলাম, প্রণব যদি বাড়ী ফিরে স্নান করে তারপরে নেমে থাকে ত এখনও উপরে উঠবার সময় হয় নি। কি করি—ষ্টেট্সম্যানটাই আবার উল্টে-পাল্টে দেখলাম, আগের মাসের প্রবাসীটা প'ড়ে ছিল, দণ্ডকলস ফুলের কবিতাটা আর একবার পড়লাম। সাড়ে আটটার সময়ে আর পারলাম না…ভাবলাম, ফোনটা করি, অন্ততঃ বাদলের কাছ থেকে ত খবরটা পাওয়া যাবে তার মনিব কখন নেমেছেন নীচে। ধরল অবশ্য প্রণবই। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কি করছিলি? ও বলল, পেশেন্স খেলছিলাম। ব'লে পাল্টা জিজ্ঞাসা করল আমি কি করছিলাম। বললাম, মহিষী গিয়েছেন কলেজ রি-ইউনিয়নে, আমি স্নিগ্ধ মনে কড়িকাঠ গুনছিলাম। কিছুতেই আসল কথাটা বলে না দেখে মরীয়া হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, তা তোর নতুন বান্ধবীর ওখানে কি হ'ল বল্। প্রণব একটু সচেষ্ট ভাবে অবহেলাভরে বলল, কি আর হবে—বাড়ীর পিছনে যে একটা টিউবওয়েল আছে সেখানের থেকেই ত খাবার জলটা আসে, আমার বাদলের সঙ্গে নাকি ওঁর দাসীর কদিন ধ'রে জল আনা নিয়ে ঝগ্ড়া-ঝাঁটি চলছিল, তাই পরামর্শ করতে চাইছিলেন কি ক'রে কি ব্যবস্থা করা যায়।

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী

শ্রীকল্যাণ সেন

স্বামী দয়ানন্দ উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ-সংস্কারকদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর জীবনের বিস্তৃতি দীর্ঘ নয়—১৮২৪ থেকে ১৮৮৩, উনষাট বছর মাত্র। জনসাধারণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্ম্মজীবন তাঁর খুবই স্বল্পায়তনের—জীবনের শেষের সতের বছর। দয়ানন্দের জন্ম গুজরাটের প্রাক্তন মর্ভি রাজ্যে এক ব্রাহ্মণ বংশে। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের মর্ভি শিক্ষায় দীক্ষায় পশ্চাদ্পদ ছিল বলা বাহুল্য। ভারতীয় পুনর্জ্জাগরণের কোন স্পর্শ সেখানে লাগে নি। তাঁর বাবা মা নিষ্ঠাবান্ শৈব উপাসক ছিলেন। তাঁদের আর্থিক অবস্থা বেশ ভালই ছিল। বাল্যের দু'টি অভিজ্ঞতা তাঁর চিত্তকে জিজ্ঞাসু ক'রে তোলে। একবার শিবরাত্রি উপলক্ষে তিনি যথারীতি সারা রাত জেগে পুজো করছিলেন। দেখলেন, একটা ইঁদুর অবাধে শিবলিঙ্গ বেয়ে উঠে যাচ্ছে আর নৈবেদ্য খাচ্ছে। এ পর্য্যন্ত তিনি সনাতন বিশ্বাস আর আচরণের মধ্যেই মানুষ হচ্ছিলেন। এই ঘটনায় তাঁর মনে প্রশ্ন জাগল মূর্ত্তি পূজার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে। প্রাণ-প্রতিষ্ঠার পরেও যদি দেবমূর্ত্তি নিজেকে সামান্য ইঁদুরের কাছ থেকে রক্ষা করতে না পারে তবে কি এরকম প্রতীক পূজা পাবার যোগ্য? আত্মীয়-স্বজনের কাছে তিনি মনঃপূত উত্তর পেলেন না। দ্বিতীয় ঘটনা হ'ল, কিশোর বয়সে তাঁর এক সুস্থ সবল বোনের আকস্মিক মৃত্যু। এই অভাবনীয় ঘটনায় তিনি জীবনের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে চিন্তাকুল হলেন। এসব প্রশ্নের উত্তর বিষয়ী লোকের কাছে পাবার আশা তাঁর ছিল না। তাই সংসার ছেড়ে তিনি সাধু সন্ন্যাসীর সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। তাঁর বয়স তখন কুড়ি-একুশের বেশী নয়। বাড়ীতে তখন তাঁকে বিয়ে দিয়ে সংসারী করার উদ্যোগ চলছিল। এর পরে চলে দীর্ঘ একুশ বছরের সাধনা। একজন সাধক থেকে আর একজন সাধকের কাছে তিনি যেতে লাগলেন তাঁর জ্ঞানের পিপাসা মেটাবার জন্য। সাধু সন্ন্যাসী, তান্ত্রিক, হঠযোগী, কবীরপন্থী, নানা রকম পথের পথিকের কাছে তিনি ঘুরতে লাগলেন। এদের মধ্যে একজনের কাছ থেকে সন্ন্যাস দীক্ষাও নিলেন। দয়ানন্দ সরস্বতী তাঁর সন্ন্যাস আশ্রমেরই নাম। ঘুরতে ঘুরতে আসল সত্য কি এ সম্বন্ধে তাঁর মন সন্তুষ্ট না হলেও কয়েকটা মত যে ভ্রান্ত এ প্রত্যয় তাঁর জন্মাল। তাঁর মনে হ'ল যে তান্ত্রিক সাধন পন্থা, বলিদান, এসব ভুল আচরণ। শবদেহ ব্যবচ্ছেদ ক'রে হঠযোগীদের নির্দ্দিষ্ট ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, এসব নাড়ীর সন্ধান না পেয়ে হঠযোগেও তিনি আস্থা হারালেন। বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানে তাঁর বিশ্বাস রইল না—যেমন, ছাপ, তিলক, ফোঁটা তাঁর কাছে নিরর্থক মনে হতে লাগল। মূর্ত্তি-পূজা সম্বন্ধে সংশয় তাঁর ত বাল্যকাল থেকেই ছিল। পুরাণাদিতে বর্ণিত দেবদেবীর জয়-পরাজয়, ঈর্ষা-দ্বন্দ্বের কাহিনী তাঁর কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হ'ল না। এমন অবস্থায় ঘুরতে ঘুরতে চৌত্রিশ বছর বয়সে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মথুরায় বিরজানন্দ স্বামীর কাছে উপস্থিত হলেন।

বিরজানন্দ তখন একাশী বছরের বৃদ্ধ। পাঁচ বছর বয়সে তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছিলেন, তবে তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অদ্ভুত। এই অন্ধ সন্ন্যাসী অনন্য মনে শাস্ত্র চর্চ্চায়ই তাঁর সমস্ত সময় ও শক্তি নিয়োগ করেছিলেন। ফলে তিনি একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। বিরজানন্দের দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে, ভারতবর্ষের আদিতম শাস্ত্র বেদই হচ্ছে প্রামাণ্য ও অভ্রান্ত, এবং বেদবিরুদ্ধ অন্য কোন শাস্ত্রই নির্ভরযোগ্য নয়। এ সিদ্ধান্তে তিনি কি করে পৌঁছেছিলেন জানা নেই। বিরজানন্দের অন্য একটি বিশ্বাস ছিল যে, ব্যাকরণে অধিকার একমাত্র পাণিনি থেকে হতে পারে, তার পরের যুগের কোনও টীকা-ভাষ্য থেকে নয়। এ সিদ্ধান্তে তিনি নাকি পৌঁছেছিলেন আধুনিক কয়েকটি গ্রন্থে ভুল দেখে। এতে তাঁর মনে আধুনিক গ্রন্থের উপর এমন অবিশ্বাস আর আদিতম গ্রন্থের উপর এমন শ্রদ্ধা জন্মাল যে তিনি নিজের লেখা টীকার পাণ্ডুলিপি নষ্ট করে ফেললেন, যাতে টীকার আকর্ষণে লোকে মূল গ্রন্থকে অবহেলা না করে। ভাষা শেখাতে গিয়ে আদিতম গ্রন্থের উপর বিশ্বাস তাঁর মনে প্রথম এসেছিল এবং তার পর তা ধর্ম্মক্ষেত্রে প্রতিফলিত

হয়েছিল—না, ক্রমপর্য্যায়টা অন্যরকম ছিল, ধর্ম্মজীবনের বিশ্বাসের অনুরূপ সিদ্ধান্ত তিনি ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছিলেন—এ জানা নেই।

সমাজ-সংস্কারক অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, সমাজের আদর্শ রূপ ইতিহাসের আদি যুগে পাওয়া যায়, আর সেই স্বর্ণযুগকে ফিরিয়ে আনাই সমাজের হিতসাধন। বিরজানন্দ যাকে আদিতম যুগ বলে জানতেন তাকেই শ্রেষ্ঠ যুগ বলে মানতেন।

বিরজানন্দের কাছে দয়ানন্দ দুই দফায় শিক্ষালাভ করেছিলেন। প্রথমে ১৮৫৮ থেকে পাঁচ-ছয় বছর পাঠাভ্যাস করেন। এ সময়ে শাস্ত্রগ্রন্থ তিনি অনেক পড়েছিলেন, তবে তাঁর মনে কোন একটা স্থির বিশ্বাস পাকা হয়ে বসে নি। কিন্তু তর্ক করে, অন্যের বিশ্বাসকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করার ইচ্ছা তাঁর মনে খুবই প্রবল ছিল। এ সময়ে তিনি কিছুদিনের জন্য পর্য্যটনে বেরিয়েছিলেন। মধ্যভারত ও রাজপুতানার বিভিন্ন রাজসভায় তর্কে জয়ী হয়েও তাঁর মনে পুরাতন প্রশ্ন জেগে রইল, আসল সত্য কি? এই প্রশ্নের সমাধান করতে তিনি আবার গুরুর কাছে ফিরে এলেন। তাঁর শেষ বারের অবস্থান বেশীদিনের নয়, কারণ সন তারিখ মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে যে পর্য্যটন থেকে ফিরে এসে গুরুর কাছে মনের সন্দেহ দুর করে ১৮৬৬তে হরিদ্বারের কুম্ভমেলাতে তিনি উপস্থিত আছেন। গুরুর কাছে পত্যাবর্ত্তনের সময় তাঁর মন হয়ত অর্দ্ধেক প্রস্তুত ছিল। তাই গুরু যখন বললেন যে, বেদই সত্য, বেদই অভ্রান্ত,—তিনি অচিরেই তা নিজের বিশ্বাসের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করে নিলেন। কথিত আছে, চিরাচরিত প্রথামত দয়ানন্দ গুরুদক্ষিণা দিতে উপস্থিত হলে, বিরজানন্দ বলে দিলেন যে, টাকাকড়ি বস্ত্র অলঙ্কার এসব কিছুই তিনি চান না, শুধু প্রতিশ্রুতি চান যে, তাঁর শিষ্য সমগ্র ভারতে বেদোক্ত আর্য্যধর্ম্ম প্রচার করার চেষ্টা করবেন।

দয়ানন্দ কোন্ দৃষ্টিতে বেদকে দেখেছিলেন? তাঁর মতে 'আর্য্যধর্ম্ম' কি? সমাজ সম্বন্ধেই বা তাঁর চিন্তাধারা কি ছিল? এসব প্রশ্নের উত্তর "সত্যার্থ প্রকাশে"১ খোঁজা যেতে পারে। সত্যার্থ প্রকাশই তাঁর প্রধান গ্রন্থ—এ তাঁর পরিণত কালের চিন্তাপ্রসূত। এই বইয়ের পূর্ব্বার্দ্ধে দশ অধ্যায়ে (সমুল্লাস) ধর্ম্মসম্মত জীবন কি, আচার কি, এ সবের আলোচনা আছে, আর উত্তরার্দ্ধে চার অধ্যায়ে (সমুল্লাস) আর্য্যাবির্ভাব—পুরাণাদি আশ্রিত প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম, জৈনধর্ম্ম, খ্রীষ্টধর্ম্ম ও মুসলমান ধর্ম্মের 'ভ্রান্তি' আলোচিত হয়েছে। পূর্ব্বার্দ্ধে আছে আড়াই শ' পাতা, আর উত্তরার্দ্ধে তিন শ' পাতা। বইয়ের শেষ ছয় পাতাতে তিনি নিজের বিশ্বাসের চুম্বক দিয়েছেন।

নিজের মত সম্বন্ধে দয়ানন্দের এই উক্তিগুলি তাৎপর্য্যপূর্ণ:—

"......ঈশ্বর সচ্চিদানন্দাদি গুণযুক্ত।......(তাঁহার) গুণ কর্ম্ম ও স্বভাব পবিত্র; (তিনি) সর্ব্বজ্ঞ, নিরাকার, সর্ব্ব-ব্যাপক, অজন্ম, অনন্ত, সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, দয়ালু, ন্যায়কারী, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা...। (আমি) চারিবেদকে নিভ্রান্ত ও স্বতঃপ্রমাণ বলিয়া বিশ্বাস করি।...বেদ সকলের অবিরুদ্ধ, পক্ষপাতহীন, ন্যায়াচরণ, ও সত্যভাষণাদিযুক্ত যে সকল ঈশ্বরাদেশ, তাহাকে ধর্ম্ম এবং বেদবিরুদ্ধ ও পক্ষপাতযুক্ত, অন্যায়াচরণ ও মিথ্যাভাষণাদি ঈশ্বরাজ্ঞা-ভঙ্গকে অধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করি।...মাতা, আচার্য্য, অতিথি, ন্যায়বান্ রাজা, ধর্ম্মাত্মা, পতিব্রতা স্ত্রী, স্ত্রীব্রত পতি ও বিদ্বান্‌দিগের সৎকার করাকে দেবপূজা কহে...উহাদিগের মূর্তিগুলিই পুজ্যবস্তু—ইতর পাষাণাদি জড়মূর্ত্তি সকল সর্ব্বপ্রকারে অপুজ্য মনে করি।...সত্যভাষণ, বিদ্যা, সৎসঙ্গ, যমাদি যোগাভ্যাস, পুরুষার্থ, দানাদি শুভকর্ম্মকেই তীর্থ মনে করি। ইতর জল ও স্থলকে তীর্থ বলিয়া মনে করি না।...শিক্ষিত জ্ঞানবান্‌দিগকে 'আর্য্য' এবং অশিক্ষিত মূর্খদিগকে 'দুষ্ট বা দস্যু' বলা যায়...। ঈশ্বরের গুণ, কর্ম্ম ও স্বভাব যেরূপ পবিত্র, আপনারও তদ্রূপ করা,...ঈশ্বর আমাদের নিকটবর্ত্তী এইরূপ মনে করিয়া যোগাভ্যাস দ্বারা তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করাকে উপাসনা কহে...।"২

ঈশ্বর ও উপাসনা সম্বন্ধে আর নীতি সম্পর্কে দয়ানন্দের যে সব মৌলিক বিশ্বাস উপরে ধৃত হয়েছে তা অনেকাংশে সার্ব্বজনিক, কিন্তু বেদকে তিনি এক রহস্যময় দৃষ্টিতে

১। উদ্ধৃতিগুলি গৃহীত হয়েছে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে দীনবন্ধু বেদশাস্ত্রী সম্পাদিত ও কলিকাতা থেকে প্রকাশিত চতুর্থ বাংলা সংস্করণ থেকে।

২। ৫৪৮—৫৪ পৃষ্ঠা।

দেখতেন। তাঁরই উক্তি থেকে বেদ সম্বন্ধে ও বিভিন্ন ধর্ম্ম-মতের উৎপত্তি সম্বন্ধে তাঁর কি ধারণা ছিল তা অনুমান কিছুটা করা যায়।

"...এ কথা সিদ্ধ যে পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বেদমত ভিন্ন অন্য কোন মত প্রচলিত ছিল না, কারণ বেদোক্ত বিষয় সকল বিদ্যার অবিরুদ্ধ......। পৃথিবীতে আর্যাবর্ত্ত দেশের মত কোন দেশ নাই। ......এইজন্য সৃষ্টির আদি সময়ে আর্যগণ এই দেশে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন।......উত্তমপুরুষদিগের নাম 'আর্য' এবং আর্য ভিন্ন অন্য মনুষ্যদিগের নাম 'দস্যু'।......সৃষ্টি হইতে পাঁচ সহস্র বৎসর সময় পর্যন্ত পৃথিবীতে আর্যদিগের সার্বভৌম...... রাজ্য ছিল।......এই আর্যাবর্ত্ত দেশে উৎপন্ন ব্রাহ্মণ অর্থাৎ বিদ্বান্দিগের নিকট হইতে পৃথিবীর যাবতীয় মনুষ্য......আপনার উপযুক্ত বিদ্যা এবং আচারের শিক্ষা এবং বিদ্যাভ্যাস করিত......। ...... মহাভারতের যুদ্ধ পর্যন্ত (পৃথিবীর) সমস্ত রাজ্য এই দেশের রাজাধীন ছিল।......চীনের ভগদত্ত, আমেরিকার বভ্রুবাহন, ইউরোপ দেশের বিড়ালাক্ষ অর্থাৎ মার্জ্জার সদৃশ চক্ষু বিশিষ্ট......ইরাণের শল্য প্রভৃতি রাজা......মহাভারতের যুদ্ধে আজ্ঞানুসারে আসিয়াছিল। ......যাবতীয় বিদ্যা পৃথিবীতে বিস্তৃত আছে, তৎসমস্ত আর্যাবর্ত্তদেশ হইতে মিশর, মিশর হইতে গ্রীস, তথা হইতে রোম, রোম হইতে ইউরোপ এবং ইউরোপ হইতে আমেরিকাদি দেশে বিস্তৃত হইয়াছে।... বড় বড় বিদ্বান্ রাজা মহারাজা ঋষি এবং মহর্ষিগণ অনেক পরিমাণে মহাভারতের যুদ্ধে নিহত হওয়াতে এবং বহুসংখ্যক ব্যক্তি মৃত্যু প্রাপ্ত হওয়াতে বিদ্যা ও বেদোক্ত ধর্মের প্রচার নষ্ট হইতে লাগিল।......ব্রাহ্মণগণ বিদ্যাহীন হইল......।"

শিখ ও ব্রাহ্মধর্ম, আধুনিক যুগের এই দুই একেশ্বরবাদী সম্প্রদায়ের সঙ্গে দয়ানন্দের বিশ্বাসের কিছুটা মিল আছে। কিন্তু তিনি তাঁদের উপলক্ষ করে যে সমালোচনা করেছেন তাতে তাঁর বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। নানক সম্বন্ধে বলেছেন—"মহাত্মা নানকের উদ্দেশ্য উত্তম ছিল। পরন্ত বেদাদি শাস্ত্র......তিনি কিছুই জানিতেন না।......

......বেদ সমস্ত বিদ্যার আধার, পরন্ত যে চারিবেদকে অলীক গল্প মনে করে, তাহার সকল কথাই মিথ্যা।" (৪)

ব্রাহ্মসমাজ ও প্রার্থনা সমাজের নিয়মাবলী সম্বন্ধে বলেছিলেন—"(এইসব) সর্বাংশে উত্তম নহে। কারণ বেদবিদ্যাহীন লোকেরা সত্য কল্পনা করিতে কি সমর্থ হইতে পারে?......ইহাদের স্বদেশভক্তি অতিশয় শিথিল, খ্রীষ্টিয়ানদিগের আচরণ ইহারা অনেক অনুকরণ করেন এবং বিবাহাদির নিয়মও পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। স্বদেশের প্রশংসা এবং পূর্বকালীন লোকদিগের গৌরব করা দূরে থাকুক, বরং তৎপরিবর্তে (যৎপরোনাস্তি) নিন্দা করিয়া থাকেন এবং দৃষ্টান্তস্থলে খ্রীষ্টান ইংরাজদিগের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন। ব্রহ্মাদি মহর্ষিগণের নাম গ্রহণও করেন না। ......ব্রাহ্ম সমাজ সম্বন্ধীয় পুস্তকে সাধুদিগের সংখ্যায় 'ঈসা,' 'মুসা', 'মহম্মদ', 'নানক', এবং 'চৈতন্য' লিখিত আছে।

......যখন আর্যাবর্ত্তে উৎপন্ন হইয়াছে, এই দেশের অন্ন ও জল পান করিয়াছে,......তখন নিজের মাতা, পিতা ও পিতামহের ধর্মমার্গ ত্যাগ করিয়া অন্য বিদেশীয়গণের মতের উপর অধিক আসক্ত হওয়া......সংস্কৃত বিদ্যাহীন হইয়াও যে আপনাদিগকে বিদ্বান্ বলিয়া প্রকাশ করা ও ইংরেজী ভাষা পাঠ মাত্রেই পণ্ডিতাভিমানী হইয়া সহসা মতবিশেষ প্রচার করা কিরূপে (লোকের)......উন্নতিবিধায় কার্য্য হইতে পারে?......আর্যাবর্তীয়গণ (ব্রাহ্মদের) আপন বলিয়া মনে করে না......। (ব্রাহ্মরা) মনে করিয়াছে যে স্বদেশ যেন ভিক্ষুক......, বেদাদি সত্যশাস্ত্র বিশ্বাস না করিলে (ব্রাহ্মরা) কি আপনাদিগের বাক্যের সত্যাসত্যের পরীক্ষা এবং আর্য্যাবর্ত্তের উন্নতি কখনও করিতে পারিবে?"৫

দয়ানন্দের পক্ষে খ্রীষ্টান ও ইসলাম ধর্ম্মের সমালোচনা করা কঠিন ছিল না। এমন কি, তিনি এই দুই মতের বিরুদ্ধে যা লিখেছিলেন তার জন্য 'সত্যার্থ প্রকাশের' প্রচার স্থানবিশেষে নিষিদ্ধ হইয়াছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের একটা পরিণতি স্বধর্ম্মের ও স্বদেশের প্রতি ভারতবাসীর ভক্তি ফিরিয়ে আনা। রামমোহনও তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে প্রথম প্রথম ইউনিটারিয়ান (Uniterian) গীর্জ্জায় উপাসনা করতে যেতেন। তারপর তাঁদের মনে ধিক্কার এল, আমরা কেন আমাদের নিজদেশীয় প্রথায় উপাসনা করতে পারব না। ব্রহ্মসমাজ স্থাপনের

৩। একাদশ সমুল্লাস, ২৪৭—২৬১ পৃষ্ঠা।
৪। একাদশ সমুল্লাস, ৩৩২—৪৪৪ পৃষ্ঠা।
৫। একাদশ সমুল্লাস, ৩৫১—৩৫৫ পৃষ্ঠা।

ইতিবৃত্ত এই। শতাব্দীর শেষের দিকে এসে এ ভাব অনেক বেড়ে গিয়েছিল। হিন্দুমতের নূতন করে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা যাঁরা করেছিলেন—যেমন, বঙ্কিমচন্দ্র, শশধর তর্কচূড়ামণি, চন্দ্রনাথ বসু, বিবেকানন্দ, নিবেদিতা—এঁদের প্রত্যেকের লেখায় প্রাচীন ভারত, প্রাচীন হিন্দুধর্ম্ম, প্রাচীন আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি, একটা গভীর শ্রদ্ধায় পরিচয় পাওয়া যায়। কখনও কখনও এই শ্রদ্ধা যুক্তির আশ্রয় ছাড়িয়ে রোমান্টিক বা মিষ্টিক স্তরে পৌঁছাত। ভারতবর্ষকে উদ্দেশ করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

"প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে, প্রথম সামরব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে, জ্ঞানধর্ম্ম কত কাব্য কাহিনী।"

তেমনি দ্বিজেন্দ্রলাল লিখেছিলেন :

"ভারত আমার, ভারত আমার, যেখানে মানব মেলিল নেত্র,
মহিমার তুমি জন্মভূমি মা, এশিয়ার তুমি তীর্থ ক্ষেত্র।
দিয়াছ মানবে জগজ্জননী দর্শন উপনিষদে দীক্ষা।
দিয়াছ মানবে জ্ঞান ও শিল্প কর্ম্ম-ভক্তি ধর্ম্ম শিক্ষা॥
ভারত আমার, ভারত আমার, কে বলে মা তুমি
কৃপার পাত্রী ?
কর্ম্মজ্ঞানের তুমি মা জননী, ধর্ম্মজ্ঞানের তুমি মা ধাত্রী॥"

অন্তরের অনুভূতির প্রকাশই গান বা কবিতার প্রাণ। সেখানে কেউ ওজন করা যুক্তি খুঁজবে না। কিন্তু দয়ানন্দ এবং আরও কেউ কেউ, যুক্তিতর্ক-আশ্রিত প্রবন্ধ রচনা করতে বসে ভাবাবেগে যা বিশ্বাস করতেন তাই ব্যক্ত করেছেন। দয়ানন্দের মধ্যে বেদের প্রতি রহস্যাপ্লুত শ্রদ্ধার চরম প্রকাশ দেখা যায়।

দয়ানন্দ বেদের চিরাচরিত অর্থ অনেক জায়গায় বর্জন করেছেন। তিনি অহিংস ও নিরামিষাশী ছিলেন। তাই অশ্বমেধের অর্থ তাঁর মতে, রাজার পক্ষে ন্যায়বিচারের সহ রাজ্য শাসন করে অগ্নিতে ঘৃত আহুতি দেওয়া. গোমেধের অর্থ পৃথিবী ইত্যাদিকে পবিত্র রাখা।৬ গোহত্যা নিবারণ আন্দোলনের তিনি একজন উদ্যোক্তা ছিলেন।

প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মধ্যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে দয়ানন্দ আমূল সংস্কার চেয়েছিলেন। প্রতিমা পূজা বর্জন 'আর্য্যজাতি' অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের মধ্যে জাতিভেদ দূরীকরণ, আর 'অনার্য্য'কে শুদ্ধ করে 'আর্য্য' সমাজভুক্ত করা। প্রথম দুই সংস্কারের প্রেরণা তিনি বেদ থেকে পেয়েছিলেন। বৈদিক যুগে প্রতিমা পূজার পদ্ধতি ছিল না। প্রতিমাপূজা ভ্রান্তিমূলক এ কথা প্রচার করার জন্য তিনি পণ্ডিত সভায় বহুবার বিতর্ক করেছেন। তেমনি 'আর্য্য' জাতির মধ্যে বর্ণভেদের বিরুদ্ধেও তিনি অবিশ্রান্ত সংগ্রাম করেছেন। বেদের চর্চ্চা উঠে যাওয়ায় এই সব অবনতি দেখা দিয়েছে, এই ছিল তাঁর অনুমান। তাই তিনি যেখানে পেরেছেন সেখানেই বেদবিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা করেছেন। তাঁর কাছে অনার্য্যের সংজ্ঞা যারা অশিক্ষিত অর্থাৎ যারা বেদের সন্ধান পায় নি বা যারা বেদকে গ্রহণ করে নি। তারা যখন বেদকে গ্রহণ করবে, তখনই তাঁর মতে তারা শুদ্ধ হয়ে 'আর্য্য' সমাজভুক্ত হওয়ার যোগ্য হবে। সনাতন বিশ্বাস মতে এ জন্মে যে অহিন্দুর ঘরে জন্মেছে সে হিন্দু সমাজভুক্ত হবার যোগ্য নয়। দয়ানন্দ পথ দেখালেন 'শুদ্ধি' আন্দোলনের। তাঁর দৃষ্টান্তে উদ্বুদ্ধ হয়ে অন্যান্য সংস্কারপন্থী হিন্দু সংস্থা ও শুদ্ধি আন্দোলনে ব্রতী হয়। স্ত্রী জাতির অধিকার সম্বন্ধে আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু কিছু আলোচনা তিনি করেছিলেন। আচার অনুষ্ঠান (Ritual)) তিনি সব বাদ দিয়েছিলেন, একটি ছাড়া, তা হল হোম। হোমে তিনি বিশ্বাস করতেন। তবে তার জন্য স্বতন্ত্র পুরোহিত শ্রেণীর প্রয়োজন আছে এই কথা তিনি মানতেন না। হোমের স্বপক্ষে যুক্তি দিয়েছেন যে, অগ্নিতে মন্ত্রসহ ঘি আহুতি দিলে দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নষ্ট হয়। এসব বিষয়ের আলোচনাকালে তিনি পদার্থবিদ্যাকে স্বীয় মতের সমর্থনে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছেন।৭ দয়ানন্দ রামায়ণ মহাভারতের উল্লিখিত আগ্নেয়াস্ত্র, পাশুপতাস্ত্র ইত্যাদির সত্যতায় বিশ্বাস করতেন। তাঁর যুক্তি ছিল যে, আধুনিক যুগের পদার্থবিদ্যায় প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এ সব জিনিষ সম্ভব।৮

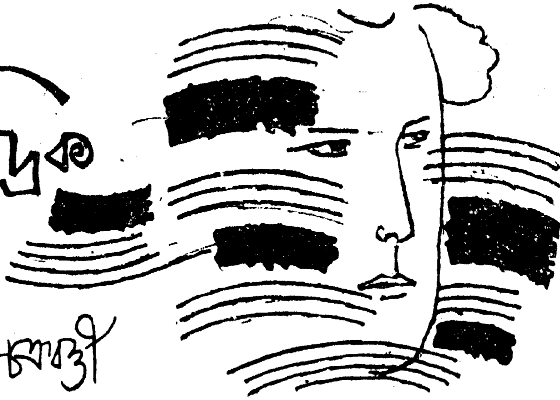
দয়ানন্দের প্রভাব পড়েছিল মহারাষ্ট্রে এবং তার চেয়েও বেশী পাঞ্জাবে। আর্য্যসমাজ স্থাপিত হয় ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে। এর পরে দয়ানন্দ খুব বেশী দিন বাঁচেন নি। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর তিনি দেহরক্ষা করেন। আর্য্যসমাজের প্রচেষ্টায় দয়ানন্দের তিনটি প্রধান লক্ষ্য—প্রতিমা পূজার স্থানে নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা প্রবর্ত্তন, জাতিভেদের অবসান ঘটানো, আর বেদের চর্চ্চা—উত্তর ও পশ্চিম ভারতের হিন্দু সমাজে অনেকখানি সাধিত হয়।

৬। ২৫৯ পৃষ্ঠা।

৭। ৩২—৩৩ পৃষ্ঠা।

৮। ২৫০—২৫১ পৃষ্ঠা।

সামুদ্রিক



শৈবাল চক্রবর্তী

তার শোবার ঘরে এতক্ষণে একা হলেন মিষ্টার সেন। এক-এক করে সবাই চলে গেল। স্ত্রী বিশ্রাম নিতে বললেন, মামাশ্বশুর বললেন, আগে খেয়ে নাও। কিন্তু সব কাজেই আলস্য লাগছে তাঁর। কাঙ্ক্ষিত ছিল একাকিত্ব, এতক্ষণে তাই পেলেন। এখন সময়টাকে সমস্ত ইন্দ্রিয় ক'টা দিয়ে ভোগ করতে ইচ্ছে করছে। সব দৃশ্যবস্তু আর আলোর তরঙ্গ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করবার একটা গোপন সাধ উঁকি দিচ্ছে মনের মধ্যে। একেবারে নির্লিপ্ত নিরালায় ডুব দেওয়া যায় কি ক'রে? মনের মধ্যে যে সুন্দর ভাবনা সুপ্ত হয়ে আছে, তাকে জাগানো যায় নির্জনতার স্পর্শেই। কিন্তু তা বোধ হয় হবার নয়। চাকর-বাকর কি ছেলে-পুলেরা কেউ-না-কেউ আসছেই। ঘরে আসাটা একটা ছুতোমাত্র, আসলে তাঁর কাছাকাছি থাকা বা নজরে পড়াই উদ্দেশ্য। বিনুকে তিনি প্রায় কথা দিয়েছিলেন একটা ট্রাইসাইকেল কিনে দেবেন ছুটি থেকে ফিরে। বিনু সেই কথাটা এখন জ্যাঠা-বাবুকে মনে করিয়ে দিতে চায়। কয়েকবার সে ঘরে উঁকি দিয়েছে। কিন্তু জ্যাঠাবাবুর মুখটা কেমন গম্ভীর, আর বাবাও বারণ ক'রে দিয়েছেন এখন তাঁকে বিরক্ত করতে।

শুধু বিনু নয়, বলার কথা সজলের ছিল। তার কথা বিনুর মত খেলনার জিনিষ নিয়ে নয়—ভবিষ্যৎ নিয়ে। তাকে আবার ডিগবয়ে বদলি করবার চক্রান্ত হচ্ছে। এ নেহাতই ম্যানেজারের শয়তানি। মেসোমশায় যদি টেলিফোন তুলে মিষ্টার বাগচিকে একটুখানি বলে দেন তা হ'লে সব গোলমাল মিটে যায়। ম্যানেজারও জানতে পারে তাঁর খুঁটি কে! কিন্তু এসব কথা বলার উপযুক্ত সময় বোধ হয় এটা নয়। টানা মোটরে অনেকখানি জার্ণি ক'রে এসেছেন মেসোমশায় আর তাঁর প্রেশারটাও ইদানীং বিচ্ছিরি রকমের বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছে। এইরকম ধকলের মুখে তার বদলির কথা নিয়ে সুপারিশের কথা বলতে গেলে ফল উল্টো হতে পারে বলেই সজলের সন্দেহ হয়। এখন থাক্, পরে সুযোগমত কথাটা পাড়া যাবে।

প্রায় এগারোটার সময় ঘর খালি হ'ল। তার মানে দু'ঘণ্টা; দু'ঘণ্টা সময় তাঁকে বকতে হয়েছে আশ্রিত, আত্মীয় আর চাকর-বাকর মিলিয়ে জনা পনের মানুষের সঙ্গে। তাদের উৎকণ্ঠাকে গ্রহণ করতে হয়েছে হাসিমুখে, অনুসন্ধিৎসাকে সন্তুষ্ট করতে হয়েছে মুহুর্মুহুঃ উত্তরদানে কিন্তু এই মুহূর্তে চোখের সামনে আর দ্বিতীয় প্রাণী নেই। যে যার কাজের চক্রে ফিরে গেছে। এখন তিনি একা। একা, কি আনন্দ! হাত দু'টোকে দু'পাশে ছড়িয়ে মাথার ওপর তুলে আড়মোড়া ভাঙলেন বিনায়ক সেন। বেশ লাগছে। শরীরে যেন বল এল। জুতো মোজা খুলে দিয়ে গিয়েছিল নন্দু। বাইরের পোশাক না ছেড়েই বিছানার ওপর টান টান হয়ে শুয়ে চোখ বুজলেন বিনায়ক। আর অমনি সব মুছে গেল, শুধু অন্ধকার থই থই করতে লাগল। দূর থেকে গর্জন শোনা গেল, চোখ বুজেই দেখতে পেলেন নীল অসীমের ঢেউ। সমুদ্র! কি তার লাবণ্য! কি মহিমময় তার সর্বাঙ্গ! উজ্জ্বল নীল চাদরে সমস্ত অবয়বকে ঢেকে সূর্যের আলোর সঙ্গে চলেছে আনন্দময় খেলা। প্রায়-অন্ধকার তটের বিলীন রেখায় আছড়ে আছড়ে পড়ছে কার কান্নার মত ঢেউ। বহুদূরে, প্রায় দিগন্ত ঘেঁষে পরিচিত পৃথিবী

থেকে যেন অনেক দূরে। এতদূর! অথচ এই ত তিনি কয়েক ঘণ্টা আগে সেখানে ছিলেন। হ্যাঁ, সকাল সাতটার সময়েও তিনি তার বাতাসে নিঃশ্বাস নিয়েছেন। শেষ বারের মত দেখে গিয়েছেন তার অপরূপ কান্তি। গাড়িতে আসতে আসতেও বার বার ঘাড় ফিরিয়ে দেখেছেন, কানে ভেসে এসেছে গম্ভীর শব্দ, যেন তাকে বিদায় জানাচ্ছিল। আর এরই মধ্যে এতদূর! মনে হচ্ছে যেন অন্য জন্মে দেখা দেশ।

ফিরে ফিরে কতবার সেই স্বপ্নের আরামে ডুবে গেলেন বিনায়ক সেন। সমুদ্র আর তার তীরে গাঢ় কুয়াশার মধ্যে রূপ নিয়ে ফুটে উঠল একটি মূর্তি। দীর্ঘাঙ্গী আর চঞ্চল, কিন্তু কি আশ্চর্য-ঘন তার চোখের পল্লব!

অমনি সুটকেশটা খুলতে ইচ্ছা করল তাঁর। অধীর হয়ে উঠলেন ও থেকে কি একটা বার ক'রে বার বার দেখবার জন্যে। কিন্তু না, এখন প্রায় বারোটা বাজে, এখুনি স্নান-খাওয়ার তাগিদ দিতে আসবেন স্ত্রী আর তাঁর পিছু পিছু আরো কেউ কেউ। কাজ সেরে রাখাই ভালো। দোর খুলে বাইরে এলেন তিনি। হঠাৎ সব গোলমাল শান্ত হয়ে গেল। কুটনো কাটা, মশলা বাটার যাবতীয় কাজ বন্ধ ক'রে সবাই তাঁর দিকে তাকাল। হাসিমুখে দেখলে যদি তিনি খুশী হন—এই ভেবে হাসি টানল মুখে কেউ কেউ। কত লোক! সবাইকে চেনেনও না বিনায়ক। পরিচিত, অপরিচিত মুখের মেলা। আত্মীয়তার ক্ষীণসূত্র অবলম্বন ক'রে কেউ, কেউ বা জীবনে ব্যর্থ হয়ে এই বটবৃক্ষে এসে বাসা বেঁধেছে। ভিড়ের মাঝখান দিয়ে নীরবে হেঁটে গেলেন তিনি। এক-এক সময় বিনায়কের মনে হয়, তিনিই যেন হারিয়ে যাচ্ছেন, মিশে যাচ্ছেন ক্রমবর্ধমান জনবাহুল্যে। তাঁর ফাই-ফরমাশ খাটার জন্যে নিরুদ্দিষ্ট দেশ থেকে দু'টি ছোকরা বেছে পাঠিয়েছিলেন, তারা যেমন কর্মী তেমনি সৎ। কিন্তু প্রয়োজনে তাদের কাউকেই হাতের কাছে পান না বিনায়ক। তাদের ধ'রে-বেঁধে আনবার জন্যে আর-একজন লোক রাখার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে এখন। তিন হাজার টাকা মাইনে পাওয়ার অনেক বিপদ, আয়কর দেওয়া ছাড়া আশ্রয় দিতে হয় বহুজনকে। এভাবে পরোপকার করা ছাড়া ব্যূহরচনা ক'রে নিজেকে সুরক্ষিতও রাখা যায় অতি সহজে। কিন্তু ক্লান্ত দৃষ্টির সামনে ঘরগুলো এত দরিদ্র লাগছে কেন আজ? কোণে কোণে এত আবর্জনা জমেছে আর আসবাবে ভারাক্রান্ত হয়ে রয়েছে যেন চারিপাশ। বিনায়কের চোখে বিরক্তি দেখা দিল। কোন ঘরেই আলো সম্পূর্ণভাবে আসে নি। কিন্তু এরকম হওয়ার ত কোন কারণ নেই? বিনায়কের যতদূর মনে আছে, এ বাড়ীর প্ল্যান তিনি করিয়েছিলেন কোন বিলেত ফেরৎ ইঞ্জিনিয়ারকে দিয়ে। সখ করে বড় বড় জানলা করিয়েছিলেন, আর সব শার্সী-দেওয়া, যাতে পর্যাপ্ত আলো এসে ঘরকে উজ্জ্বল রাখতে পারে। পূবে-দক্ষিণে অনেকখানি ক'রে জমি ছেড়ে রাখা, বাতাসকে স্বচ্ছন্দ ভাবে খেলতে দেওয়ার জন্যে। কিন্তু নিঃশ্বাস নিতে গিয়ে বুকে চাপ লাগছে। সামনের লনে ঝাউ আর বাড়ীর গা ঘেঁষে আইভিলতা। কিন্তু এখন তারা কোন মায়ায় ভোলাতে পারল না মন। দেয়াল বারান্দা উঠোন ঘেরা তাঁর এই এতদিনকার বাসস্থানটিকে যেন বড় সংকীর্ণ, অপরিচ্ছন্ন আর জীর্ণ লাগছে আজ।

গরম জল দেব বাথরুমে? সুলেখা তাঁকে দেখতে পেয়েছেন। হাঁপাতে হাঁপাতে দোতলায় উঠে এসেছেন।

স্নান ক'রে এসো, তিনি অনুরোধের সুরে বলেন, দু'টি খেয়ে নাও।

ডাইনিং রুমে টেবিলের পাশে চেয়ারে বসেছিলেন সুলেখা। প্রসন্ন-তৃপ্ত তাঁর মুখ। আজ ক'দিন বাদে স্বামীকে খাওয়াচ্ছেন। সুগন্ধি পেশোয়ারী চালের গন্ধ আসছে; এ ক'দিন বেশ মোটা চালে ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়েছিল তাঁর। খেতে খেতে পেছনে ফেলে-আসা সেই সব সংগ্রামী দিনগুলির কথা মনে পড়ছিল, মনে পড়ছিল সাধারণ আর সামান্য অবস্থার মধ্যে কাটানো জীবনের সেই প্রথম দিক্‌কার কথা। সুলেখা বাটি সাজাচ্ছিলেন একের পর এক। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে আজ রান্না করিয়েছেন তিনি।

—মাথাটা মোছ নি ভাল ক'রে? চেয়ার থেকে উঠে পড়লেন তিনি। আলনা থেকে তোয়ালে নিয়ে ঘাড় আর কানের দু'পাশ মুছিয়ে দিলেন। ওখানেও এইরকম অযত্ন করতে বোধ হয়···? ও কি? মুড়োটা খাও। না, না, সরিয়ে দিলে চলবে না। নিরুত্তরে খেয়ে যেতে লাগলেন বিনায়ক। নতুন লোকটা বেশ ভালই রাঁধে।

—জানো, রিজেন্ট পার্কের সেই জমিটা···তোমাকে বলেছিলাম। সেই যে পাঁচকাঠার প্লট···মনে আছে? সেগুলো নাকি ভারী সস্তায় পাওয়া যাচ্ছে। কতয় জানো? দাম শুনে হাসবে তুমি। হাতের আঙুলে অঙ্কটা দেখালেন সুলেখা। দাঁত মেলে হাসলেন। বিশ্বাস হয়? আমারও হয় নি। মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন ভদ্রলোক, তাই খুব সস্তায় ছেড়ে দিচ্ছেন। আমি কি করেছি জানো? একটু থামেন সুলেখা, তারপর বলেন,

একটা প্লট বুক করিয়েছি দু'শ টাকা পাঠিয়ে এক···। ···ওকি আনারসের চাট্নিটা টেনে নাও। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, ধর ওইখানে একটা বাড়ী ক'রে যদি ভাড়া দেওয়া যায়। তবে, তবে আমাদের আর কার জন্যে করা···, শুধু এই কথায় মনে হ'ল সুলেখারও কোন দুঃখ আছে।

নাকে-মুখে অ'রও ক'টা ভাত গুঁজে উঠে পড়লেন বিনায়ক। জীবনের মানে কি এবং সুখ কোথায় এই দুই মহা প্রশ্নে মাতাল হয়েছিল মন তখন। আনারসের চাট্নি বা চিংড়িমাছের মালাইকারির মত দেবভোগ্য খাদ্যবস্তুতেও রুচি আসছিল না তেমন। মুখ ধুতে ধুতে তার কান্না পেল। ভগবানের অদৃশ্য চাবুক কার পিঠে কখন পড়ে! জলের ঝাপ্টা দিলেন চোখে-মুখে, যাতে বেদনার্ত মুখের ছবি গোপন থাকে। বিছানা পাতাই ছিল, চাদরটা টান-টান ক'রে, জানলা ভেজিয়ে দিলেন সুলেখা। প্রায় টলতে টলতে বিছানায় পড়লেন বিনায়ক।

ঈশ্বর দয়াময়, সুলেখা প্রায় তখুনি বেরিয়ে গেলেন। নাঃ, আর কিছু চাই না। এবার নিঃসঙ্গ অবসর, খালি। সব মুছে যাক্। কালিমাখা দু'হাতে মুছিয়ে দাও সব আলো। মন ছুটুক রমণীয় স্মৃতির তীর্থে। দূরে, দৃষ্টির অন্ধকার অতলতায় আবার পথ-ভোলা অবাক্ চাহনি মেয়ের ছবি ফুটে উঠল। মেয়েছেলে এত সুন্দর হয়! এত নরম মাখন দিয়ে তৈরি হয় তাদের শরীর! হাসিতে থাকে এত অজস্র মোহ! ঝাউবনের ধারগুলি কি নির্জন, কি প্রশস্ত উদার তীরভূমি! কিনারে বড় বড় পাথর, তাতে ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে; সেইখানেই দাঁড়িয়ে ছিল সে। পাথরের গা বেয়ে জল পড়ছে, তার পা-ও ছিল ভিজে। প্রথম দেখা সেই পাথরের ধারেই। যেন প্রথম যৌবনের দৃষ্টি আর শেষ কৈশোরের স্বপ্ন ফিরে এসেছিল বিনায়ক সেনের চোখে। সাতান্ন বছর বয়সের ব্লাডপ্রেশারে আক্রান্ত ক্ষয়িষ্ণু শরীরের শিরায় শিরায় রক্ত ছুটল। পাতলা অল্প লাল দু'টি ঠোঁটে সে হাসছে, হাসছে না কি তার ঠোঁটের ভঙ্গিই ওই রকম? মধুর, মধুর হাসি, যেন জীবনের সমস্ত অনাবিষ্কৃত সত্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সলজ্জ দু'টি চোখ তুলে তাকাতে যেন বিকেলের রং মেদুর হয়ে উঠল, আর তাঁর রঙীন কামনার স্পর্শে আকাশ আর দিগন্ত হ'ল স্বপ্নিল। কেমন অদ্ভুত কৌতূহল মাখা চোখে বিনায়ক সেনের দিকে তাকাল ও, যেন জীবনে এই প্রথম পুরুষ দেখল আর বিনায়ক এই নির্জন সামুদ্রিক সন্ধ্যায় আবিষ্কার করলেন তাঁর একমাত্র ভালবাসার পাত্রীকে।

—কে? কে তুমি?

হাসল। কে আবার—একটা মেয়ে। সমুদ্রের এই মুক্ত প্রাঙ্গণে তার জন্ম আর জীবন। তার শৈশব কেটেছে এই তীরে খেলে, কৈশোর শেষ হয়েছে ঢেউয়ের দোলায় দোলায় ভেসে।

—কি কর? কোথায় থাক?

হেসে ফেলেছিল প্রশ্ন করার ধরণে। কি করে? কিছুই করে না, হেসে-খেলে দিন কাটে। কখনো বা জেলেদের ডিঙি ক'রে চ'লে যায় অনেক···অনেক দূরে। তারা মাছ ধরে, জাল ফেলে, সে গান গায়। সমুদ্রের গান, হে সমুদ্র মাছ দাও, আর তোমার ঢেউয়ে আমার পা ধুইয়ে দাও, রাতে ঝড়ে যেন আমার কুঁড়ে ভেঙ্গে দিও না—আমি যে একা। অনেক রত্ন তোমার বুকে, হে সমুদ্র, তার কিছু আমি চাই না, তোমার ওপর দিয়ে অনেক পাখী উড়ে যায়, আমি যেন তাদের মত আনন্দে থাকি।

হাত তুলে ঘর দেখিয়েছিল দূরে। সেই ভঙ্গি এখনো তাঁর মনে আঁকা। আত্মবিস্মৃত বিনায়ক ভুলে গিয়েছিলেন তাঁর সমস্ত পরিচয়, কলকাতায় তাঁকে চেনে না এমন লোক নেই, তাঁর অনেক চিন্তা, অনেক ভার। ভুলে গিয়েছিলেন, তিনি এডওয়ার্ড কোম্পানীর ম্যানেজার। নীলাম্ভ, নিঝুম সমুদ্রের তীরে তাঁর জন্যে একটা ছোট কুঁড়ে পাওয়া যাবে না? এই বালুচরে ছুটে, খেলে বেড়াবার জন্যে আবার এক যৌবনের মেয়াদ দেবেন না বিশ্ববিধানের রচয়িতা?

ঝিনুক কুড়িয়ে বেড়ায় ওরা। তাঁর সামনে আঁচল মেলে ধরেছিল, তাতে কত ঝিনুক, কত রং! বিনায়কের মনে হ'ল তিনি তাঁর ফুরিয়ে-যাওয়া দিনগুলিকে দেখছেন।

কি জীবন! কোন লোভ নেই, নেই কোন কপট বন্ধুত্বের অভিনয়। যেন মুক্ত করতে এসেছে তাঁকে। রূপ, রহস্য আর প্রেম নিয়ে বদ্ধ, ঘৃণ্য, পাপাচার থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে এসেছে। বিনায়ক উঠলেন, সুটকেস থেকে বার করলেন সেই স্বপ্নে পাওয়া রত্নকে, হাতের মুঠোয় নিয়ে বারবার দেখতে লাগলেন জীবনের সাতরঙ।

কেন এক জীবনে এত অবসাদ আর অন্য মুক্তির দিকে ছুটতে চায় প্রাণ? হাত বাড়িয়ে সেই ভালো লাগার স্বাদকে, সেই দূরাগত আলোকে বারবার স্পর্শ করতে ইচ্ছে করে! আজ পঁয়ত্রিশ বছর চুমুকে চুমুকে তিনি

এই জীবনের মদিরা পান করেছেন, বিন্দু বিন্দু ক'রে গড়ে তুলেছেন সাফল্যের আকাশ ছোঁয়া ইমারত, স্বজন—বন্ধুর মধ্যে থেকে পরিচিত সূর্য্যের উদয়-অস্ত দেখেছেন অভ্যস্ত চোখে। সুর কাটেনি কখোনো, বিচ্যুতি ঘটেনি একতিল। আজ যেন চতুর্দিকে ভূমিকম্পকে অনুভব করলেন বিনায়ক। মাটি কেঁপে কেঁপে উঠছে পুরণো অভ্যাসের, ক্ষয়ে যাওয়া দৃষ্টির আর চিরাচরিত জীবন-বোধের জীর্ণ শিকড়ে আজ টান ধরেছে।

সুখ কোথায়? অন্ধকারে ছটফট করতে করতে প্রশ্ন করলেন বিনায়ক। কালো মেয়ে হাসল, সে তাঁর মন চুরি ক'রে হৃদয়কে অসহ যন্ত্রণা দিয়ে দূরে দূরে ছুটে বেড়াচ্ছে, হাসছে, সমুদ্রের হাওয়া ফিরছে তার গান নিয়ে।

পরমানন্দকে দেখলেন আজ বিনায়ক, দেখলেন রূপোজ্জ্বল সত্যকে। কি কষ্ট, কি সুখ। বিনায়কের মনে হ'ল তিনি মারা যাচ্ছেন। জীবন একদিকে ঘৃণ্য, ঘর্মাক্ত, পাপলিপ্ত; জীবন অন্যদিকে রঙীন উদার আর এক প্রাণোচ্ছল হাতছানি! যাদুকরীর মত খিলখিলিয়ে হাসছে সমুদ্র, হাসছে সেই রূপসী মেয়ে।

যেন একটা কাতর চিৎকার শুনতে পেলেন সুলেখা। ভয়ে দিশেহারা হয়ে ঘরে ঢুকলেন তিনি, স্বামীর বিছানার কাছে ছুটে এলেন। চোখ ঠেলে বেরিয়ে এল তাঁর, প্রাণপণে চীৎকার ক'রে উঠতে গেলেন। এ কি মুখ! এত রেখা! জালের মত ছড়ান রেখা কপালে কপালে, চোখের কোলে! এমন বার্দ্ধক্য তো তিনি দেখেন নি কোনদিন এ মুখে! শরীর বরফের মত ঠাণ্ডা, সাড় নেই; তাঁর স্বপ্নের পিছু পিছু অন্য কোথায় গিয়ে পৌঁছেছেন বিনায়ক। সুলেখার মুখ দিয়ে কথা সরল না। স্বামীর পাশে ব'সে, তাঁর বুকে মাথা রাখতে গিয়ে অবাক্ হয়ে হঠাৎ দেখলেন, তাঁর দু'হাতের মধ্যে একটি আধখোলা ঝিনুক।

—•—

আপনি অসহযোগ প্রচেষ্টার উল্লেখ করেছেন। আপনি হয়ত লক্ষ্য করেছেন—যদিও সে বিষয়ে কিছু লেখেননি—যে, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের সমকালিক ও পরবর্তী স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে বাংলা যত উৎকৃষ্ট গান (এবং কিছু প্রবন্ধ ও গীতিকবিতা) রচিত হয়েছিল, অসহযোগ আন্দোলনের সেরকম কোন ফসল পাওয়া যায়নি। বোধহয় এটি প্রধানতঃ "না"-আত্মক ব'লে। বোধহয় এটি স্বদেশী প্রচেষ্টার মত বাঙালীর মনকে গভীরভাবে প্রভাবিত এবং হৃদয়কে আলোড়িত করতে পারেনি।

— ১৫. ১০. ১৯৪১ তারিখে শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়কে লেখা
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পত্রাংশ।

পাঁচশস্য

ঘুঘুরা কি শান্ত-স্বভাবের পাখী ?

অন্য পাখীদের সঙ্গে তুলনায় ঘুঘুরা যে বেশী শান্তশিষ্ট তা বলা চলে না। ইউরোপ আমেরিকার লোকদের কাছে ঘুঘুরা শান্তির প্রতীক। কিন্তু কোন কিছু নিয়ে কলহ বাধলে প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রুকে চঞ্চুর আঘাতে ক্ষতবিক্ষত ক'রে তারপর নির্মমভাবে বধ করতেও এদের দেখা গেছে।

নিশি-পাওয়া লোককে জাগানো কি নিষিদ্ধ ?

অনেকের মনে ধারণা আছে যে, ঘুমের মধ্যেই চ'লে ফিরে বেড়াচ্ছে এমন লোককে হঠাৎ জাগিয়ে দিতে গেলে শক্ (shock) পেয়ে তার অত্যন্ত বেশী শারীরিক ক্ষতি, এমন কি, মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। এটা একটা ভুল ধারণা। ঘড়ির এলার্ম্ শুনে জাগ'লে তার যতটা ক্ষতি হ'ত, এতে তার চেয়ে বেশী ক্ষতি তার হয় না।

নিশি-পাওয়া লোকদের কোন বিপদাপদ্ হয় না, এ আর-একটা ভুল ধারণা। অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে প'ড়ে গিয়ে বা কোন কিছুতে ধাক্কা লেগে সহজেই এরা আঘাত পেতে পারে।' সুতরাং দ্বিধা না ক'রে নিশি-পাওয়া লোকদের জাগিয়ে দেওয়াই সুপরামর্শ :

দ্রুতগামী জাপানী ট্রেণ।

জাপান ন্যাশনাল রেলওয়েতে টোকিও এবং ওসাকার মাঝখানকার একটা অংশে একটি বৈদ্যুতিক সুপার এক্সপ্রেস্ ট্রেণের গতিবেগ ঘণ্টায় ১৫১'৮৮ মাইল উঠেছে। অবশ্য এই প্রচণ্ড গতিবেগ এক মিনিটের বেশী স্থায়ী হয় নি। এটা অবশ্য একটা পরীক্ষার ফল।

ট্রেণটির দেহ এরোপ্লেনের দেহের ধরণে তৈরী। এর ভারকেন্দ্র খুব নীচে। হাল্কা ধাতু ও প্লাষ্টিক এর ভিতরের এবং বাইরের সব কিছুতে।

গতিবেগ এতটা ওঠা সম্ভব প্রমাণিত হওয়ামাত্র টোকিও-ওসাকা রেলপথটির সমস্ত রেল নূতন ক'রে পাতা হচ্ছে। পথের বাঁকগুলিকে যতটা সম্ভব সরল করা হচ্ছে, এবং বাঁক একেবারে বাদ দিয়ে রেল পাতা যায় কি না, সে চেষ্টাও হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। আগামী বৎসর নূতন পাতা রেলপথটি সম্পূর্ণ হ'লে এতে যখন বৈদ্যুতিক ট্রেণ চলাচল সুরু হবে, তখন এই ৩২০ মাইল পথ তিন ঘণ্টায় অতিক্রম করা যাবে। গাড়ির সাধারণ গতিবেগ হবে ঘণ্টায় ১৩৮ মাইল, তবে মাঝে মাঝে তা ১৫৩ মাইল পর্যন্ত উঠবে।

আবু শিম্বেলের গুহামন্দির ও মিশরের আসোয়ান বাঁধ পরিকল্পনা।

আসোয়ান বাঁধ বাঁধা হ'লে দ্বিতীয় রামেসেস নির্ম্মিত মিশরের সুবিখ্যাত গুহা মন্দিরগুলির সলিল-সমাধি হয়ে যাবে। এগুলিকে রক্ষা করবার জন্যে স্থির করা হয়েছিল, পাহাড়ের গা থেকে কেটে নিয়ে এগুলিকে এতটা উঁচুতে নিয়ে বসানো হবে যেখানে আর বাঁধের জল পৌঁছবে না।।

খবর পাওয়া গেছে, যে এ-সম্পর্কিত শেষ স্কীমটি, যা নিয়ে ইতালীর এঞ্জিনিয়াররা এতদিন কাজ করছিলেন, সেটি পরিত্যক্ত হয়েছে। কারণ, অর্থাভাব। স্কীমটির সাফল্যের জন্যে প্রয়োজন ১৫ কোটি টাকা। এ টাকা তোলার অনেক চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু দেখা গেল তা একেবারেই অসম্ভব।

সম্প্রতি ব্রিটিশ এঞ্জিনিয়ারদের এক প্রতিষ্ঠান থেকে একটি পরামর্শ এসেছে যা নিয়ে বিচার-বিবেচনা ক'রে দেখা হচ্ছে। এঁরা বলেছেন,



দ্রুতগামী জাপানী ট্রেণ

মন্দিরগুলি ডুবে যাক ক্ষতি নেই, কেবল দেখতে হবে, যে জায়গাটায় তারা ডুববে সে-জায়গার জলটা পরিষ্কার থাকে, নীল নদের জলের মত ঘোলা না হয়।

কংক্রিটের একটি পাতলা স্তর নির্মাণ ক'রে এ ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে ব'লে তাঁরা অভিমত প্রকাশ করেছেন। হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থা আছে, জলতলস্থ এমনতর কাঁচের ঘরে ব'সে পর্যটকরা সলিল-সমাহিত মন্দিরগুলিকে তখন স্বচ্ছন্দেই দেখতে পাবেন। যাঁরা আরো কাছে গিয়ে মন্দির এবং মূর্তিগুলিকে দেখতে চাইবেন, তাঁরা ডুবুরীদের মত aqualung বা 'জলতলের ফুসফুস'-সম্বলিত পোশাক প'রে তা করতে পারবেন।

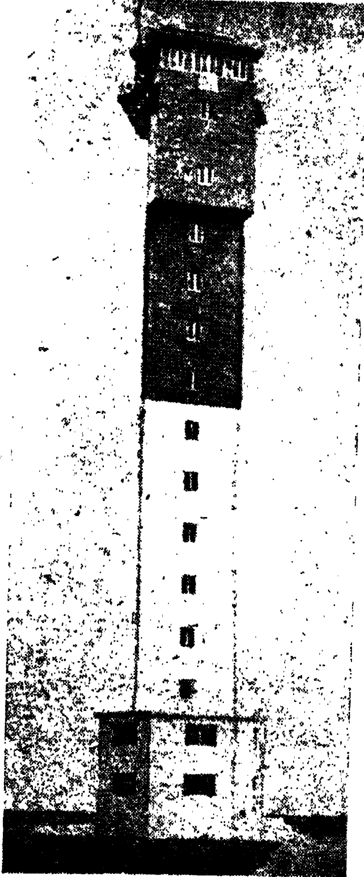
দুই কোটি আশী লক্ষ ক্যাণ্ড্‌ল্‌-পাওয়ারের বাতি।

আমেরিকার সাউথ কেরোলিনার এই বাতি-ঘরটি উচ্চতায় ১৬৩ ফুট। এর মাথায় যে বাতি জ্বলে তার ঔজ্জ্বল্য দু কোটি আশী লক্ষ ক্যাণ্ড্‌ল পাওয়ারের সমান। ১৯ মাইল দূর থেকে এর আলো দেখতে পাওয়া যায়। এর ত্রিকোণাকার দেহ এনামেল করা এলুমিনিয়ামের তৈরি, কিছুতেই যাতে এর গায়ে লোনা না ধরতে পারে। এইটিই পৃথিবীর প্রথম বাতি-ঘর যার ভিতরে ওঠা-নামা করবার জন্যে লিফ্‌টের ব্যবস্থা আছে।

তিন চাকার স্টেশন-ওয়াগন।

কিছুদিন হ'ল তিন চাকার ষ্টেশন-ওয়াগন ধরণের একটি গাড়ি ইংলণ্ডের বাজারে ছাড়া হয়েছে। এলুমিনিয়াম ও কাঁচের এই গাড়িতে চ'ড়ে বড়রা দুজন, ছোটদের দুজনকে এবং পঁচনব্বই জনের জিনিষপত্র সঙ্গে নিয়ে চলাফেরা করতে পারেন। ইংলণ্ডে ৫০০০ টাকায় এই গাড়ি পাওয়া যাচ্ছে। এদেশে ১২০০০ টাকার নীচে কোনো গাড়ি পাওয়া যায় না, যদিও ভারতবর্ষ পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশ। সুতরাং আমরা শুনেই খুশী।

স.চ.



দুই কোটি আশী লক্ষ ক্যাণ্ডেল-পাওয়ারের বাতী।



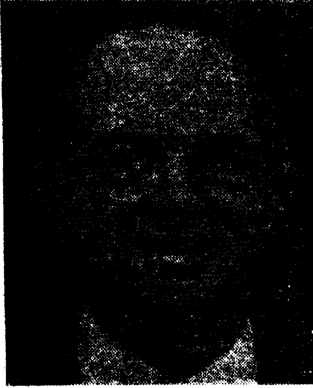
তিন চাকার ষ্টেশন-ওয়াগন

শান্তির দূত ডঃ পলিং।

"পরমাণুর এই মারাত্মক বিস্ফোরণ যদি বন্ধ না হয়, অন্তত দু লক্ষ লোকের আয়ু পাঁচ থেকে দশ বছর কমে যাবে, এবং তেজস্ক্রিয়তার সুদূর-প্রসারী ফল হিসাবে ভবিষ্যতে কয়েক পুরুষের মধ্যে কুড়ি লক্ষ শিশু দৈহিক বা মানসিক বিকার নিয়ে জন্ম নেবে।"

"ইতিমধ্যেই মানুষ পরমাণুর 'বিষক্রিয়া'র ফলে মরতে শুরু করেছে। মহাপরমাণুর বিপদ প্রতি বিস্ফোরণের সঙ্গে বেড়ে চলেছে। যুদ্ধের থেকেও এই বিপদ্ ভয়ঙ্কর। মানবতা এবং বস্তুগত কারণ—দু দিক থেকে বিচার করলেই পরমাণুর এই বিস্ফোরণ একেবারে বন্ধ করা উচিত।"

অধ্যাপক লাইনাস কার্ল পলিং-এর কয়েকটি বিক্ষিপ্ত উক্তি এখানে উদ্ধৃত করলাম। ১৯৫৪ সালে প্রথম এটম বোমাপাত, এমন কি তার আগে থেকেও তিনি পরমাণু বিস্ফোরণের দারুণ প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে জনমত গঠন করে আসছেন। একটি প্রবল আন্তরিকতায় বিস্ফোরণের বিরুদ্ধে কথা বলতে গিয়ে তিনি অনেক সময় দেশের রাজনৈতিক নেতাদের বিষদৃষ্টি লাভ করেছেন। কিন্তু সমগ্র মানুষ জাতির ভবিষ্যতের কথা ভেবে অধ্যাপক পলিং, তিনি যা কর্তব্য বলে বুঝেছেন তা থেকে বিরত হন নি, পরমাণু-যুদ্ধ-বর্জিত এক নিরস্ত্রীকরণের পক্ষে অক্লান্তভাবে কাজ করে গেছেন। ডঃ পলিং বর্তমানে পৃথিবীর একজন সেরা রাসায়নিক



ডঃ লাইনাস পলিং

এবং পরমাণুবিদ্‌। পরমাণুর সঙ্গে পরমাণুর মিলন, যা আমাদের কাছে রাসায়নিক মিলন হিসাবে প্রতিভাত হয়, সে সম্বন্ধে তাঁর তত্ত্ব বিজ্ঞানের নানা শাখায় প্রভাব বিস্তার করেছে। ১৯৫৪ সালে অধ্যাপক পলিং রসায়নশাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার পান। এ বছরে পুনরায় তাঁর নাম নোবেল পুরস্কারের জন্য ঘোষণা করা হয়। এবার পুরস্কার শান্তির জন্য। ১৯৬২ সালের শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার। ম্যাডাম কুরির পর অধ্যাপক পলিং-ই হলেন একমাত্র ব্যক্তি, যিনি দু'দুবার নোবেল প্রাইজ পেলেন। কিন্তু তা থেকেও যা বড় কথা—অধ্যাপক পলিং-এর এই স্বীকৃতি লাভের মধ্যে পরমাণুর যুদ্ধের সমস্যায় বিক্ষুব্ধ মানুষের মনে ক্ষীণ এক আশার জ্যোতি ঝলক দিয়ে ওঠে,—ভবিষ্যতের প্রতি ভরসা রাখার মত এই উজ্জ্বল দৃষ্টান্তকে সকলেই অভিনন্দন জানাবে।

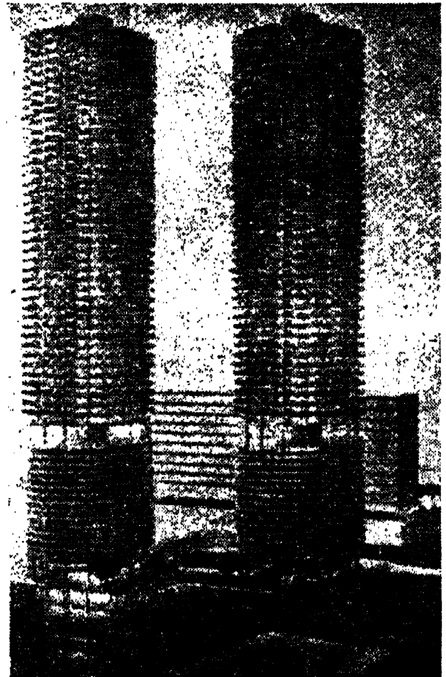
অণু এবং পরমাণু

"অণু আর পরমাণু এক কথা নয়। ঘর আর বাড়ী যেমন। বাড়ীর মধ্যেই ঘর—দুটি কি তিনটি কি দশটি। একটিও থাকতে পারে। ঘর আর বাড়ী তখন একই কথা। পরমাণুও তেমনি। এক বা একাধিক পরমাণু দানা বেঁধে থাকে। এই দানা বাঁধা জিনিষকে বলি অণু। জলের অণু জলেরই সামান্য ভাগ। তার মধ্যে থাকে পরমাণু তিনটি—দু'টি হাইড্রোজেন, অক্সিজেন একটি। ক্লোরিন গ্যাসের অণুতে দুটি পরমাণু—জোড়া বেঁধে থাকে। চিনিতে রয়েছে, তার মিষ্টত্বে ভুলেই বোধ হয়, ৪৫টি। আর্গন সোডিয়াম বা অ্যালুমিনিয়ামের মত অনেক জিনিষ আছে যাদের পরমাণু একা থাকাই পছন্দ করে। অণু আর পরমাণু তখন একই কথা। এক ঘরওয়ালা বাড়ী যেমন, এককোষী প্রাণী যেমন। একমাত্র তখন বিশেষ অর্থে অণু আর পরমাণু, একই জিনিষ।" (একটি পরমাণু; যুগান্তর সাময়িকী ; ২১শে শ্রাবণ, ১৩৬৮।)

পরমাণু সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ভাষ্য উদ্ধার করলাম। পদার্থের মূল জিনিষ হিসাবে এটম বা পরমাণু সম্বন্ধে ভারতীয়দের ধারণা নাকি মৌলিক এবং প্রাচীনতম। মহর্ষি কণাদের "কণাবাদ" দুরূহ পরমাণু তত্ত্বেরই আদিরূপ। কিন্তু সেই সনাতনী "কণা" বা এটমের পরিভাষা যে যথার্থ কি হওয়া উচিত তা নিয়ে নানা বিজ্ঞান লেখক ও পত্র-পত্রিকার মধ্যে অহেতুক ঝগড়াঝাঁটি। অবশ্য পরিভাষা রচনার মধ্যেই বৈজ্ঞানিক আলোচনার উদ্দেশ্য সার্থক সম্পূর্ণ নয়, তাদের মাধ্যমে সাধারণের কাছে হাজির করাই হচ্ছে বড়ো কথা। কিন্তু এই বিশেষ একটি ক্ষেত্রে অন্তত এটমের পরিভাষা নিয়ে মতদ্বৈধ যেন কেবলমাত্র জিদকে আশ্রয় করেই বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। এটমের বাংলা অণু বলতে যাওয়ায় যুক্তির চেয়ে অযুক্তিই বেশী। এক বা একাধিক মৌলিক কণা বা এটম নিয়ে যে রাসায়নিক একক তাকে তখন কি নামে অভিধা করি। অণু আর পরমাণুর মধ্যে ভেদ এখানে স্পষ্ট। এটমের অনুবাদ পরমাণু—এ সম্বন্ধে এই এটমের যুগে কোন সংশয় বা দ্বিমত থাকা উচিত নয়।

মেরিণা সিটি

একটি বাড়ী মাত্র, তবু নামটি সবদিক্ থেকে সার্থক। মেরিণা সিটি—৬৭ তলার দুই মহল যুক্ত বাড়ী, সেদিক্ দিয়ে এটি একটি সিটি বটে। শিকাগো শহরের মেরিণা সিটি এ জাতীয় বাড়ীগুলির মধ্যে সবচেয়ে উঁচু। মোট ৬৭টি তলার মধ্যে নিচের দুটি তলা হলো গ্যারেজ, তার উপর ২০টি তলায় রয়েছে ৯০০টি গাড়ি দাঁড় করানোর মতো ব্যবস্থা, আরও উপরে ৪০টি তলা পর্য্যন্ত মোট ৮৯৬টি ফ্ল্যাটঘর,



মেরিণা সিটি
৬৭ তলার দুই-মহলা বাড়ী

একেবারে উপরে ৫টি তলা জুড়ে পাম্প, বিজলী, লিফ্‌ট ইত্যাদির বন্দোবস্ত—সব মিলিয়ে মেরিণা সিটি সত্যই একটি শহর। কিন্তু আরো রয়েছে। বাড়ীটির পশ্চিম দিকে গম্বুজে ৯১৭ ফিট উপরে টেলিভিশনের

অ্যান্টিনা বসানো। সমস্ত শহরে এখান থেকেই টেলিভিশনের ছবি প্রচারিত হয়ে থাকে। তাছাড়া, এই "নগর-বাড়ী"টির নিচের তলায় রয়েছে সুইমিং পুল, স্কীং-এর ক্ষেত্র, এবং ১৮০০ জন দর্শকের উপযোগী প্রেক্ষাঘর।

এর পর মেরিনা সিটিকে সিটি না বলে আর উপায় কি?

শারদীয় সাহিত্য—বিজ্ঞান প্রসঙ্গে।

আজকের এই সমস্যাজটিল জীবনযাত্রায় ৺পূজার এই দিন কয়টি তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মধ্যে সবুজ দ্বীপের মতই আশ্চর্য এক অবকাশ রচনা করে। আমাদের সাহিত্য-সচেতন মন তখন নানা পূজা সংখ্যার বৈচিত্র্যে সাড়া দেয়—নানা গল্প উপন্যাস কবিতা ইত্যাদির আয়োজনে ডালি ভরে ওঠে। বিজ্ঞানের সর্বব্যাপী প্রভাব সাহিত্যের উপরও কিছু ছায়া ফেলে—শারদ সাহিত্যের নৈবেদ্যে বিজ্ঞানেরও কিছুটা অংশ থাকে। তবে এই অংশ নিতান্ত ভগ্নাংশ মাত্র। শারদীয় সাহিত্যের আয়তন যদি এক শ স্কোয়ার মিটার ধরা যায়, তাতে বিজ্ঞানের স্থান কয়েক স্কোয়ার সেন্টিমিটারের বেশি হয় না। বিজ্ঞানকে সাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব সাহিত্য—আমাদের বাংলা সাহিত্য—এখনও তেমনভাবে গ্রহণ করে নি। কথাটা একটু রূঢ় শোনায় বটে, তবু সাধারণের কাছে বিজ্ঞানের যা কিছু পরিচয় তা প্রধানত দোকানদারের ব্যবসায়িক জিনিষগুলিরই দৌলতে। আর আর অনেক গুরুতর বিষয়গুলির মত পাটোয়ারি বুদ্ধি এখানেও দিগ্‌দর্শন। তবে অতি সম্প্রতি রকেট স্পুৎনিক মহাকাশযাত্রা ইত্যাদি মানুষের দৃষ্টি অন্য দিকে খুলে দিয়েছে। খবরের কাগজ তার কয়েকটি কলম এ জন্য ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু যে যুগকে আজ আমরা বিজ্ঞানের যুগ বলে থাকি, মুষ্টিমেয় কয়েকজনের কাছেই তা সত্য। খুবই অস্পষ্ট কুয়াশাচ্ছন্ন—বিজ্ঞান আমাদের কাছে আশ্চর্য এক অঘটন-পটিয়সী; একটি বিরাট্ ধাঁধাঁ। যেন যাদুবিদ্যার খুব কাছাকাছি। বিজ্ঞানের একটি দিক্‌কে তাই সাহিত্যের পথ ধরে অগ্রসর হতে হবে। জাতির মজ্জায় মজ্জায় বিজ্ঞানের মূল ধরণাগুলি মিশিয়ে দিতে হ'লে সাহিত্যই শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। শারদীয় সাহিত্যে তার অবকাশ খুব কমই সৃষ্টি হয়েছে—বিশেষ এ বছরে।

বিভিন্ন পূজাসংখ্যায় প্রকাশিত বিজ্ঞান রচনাগুলির একটা তালিকা এখানে রাখা হ'ল। তালিকা অবশ্য গুণগত বা সম্পূর্ণ নয়।

১। গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য—নবজীবন সৃষ্টি রহস্য (যুগান্তর)
২। শিবতোষ মুখোপাধ্যায়—প্রাণ ও নিষ্প্রাণের নূতন সামারেখা (ঐ)
৩। পূর্ণেন্দুকুমার চট্টোপাধ্যায়—শারীরিক অঙ্গাদির দেহান্তরে প্রতিরোপণ (যুগান্তর)
৪। সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়—দুরন্ত বাধা—দিগন্ত জয় (আনন্দবাজার পত্রিকা)
৫। পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত—দেবীকল্পনার উৎস (অমৃত)
৬। রুবী দত্ত—পৃথিবীর আদি মানুষ (দৈনিক বসুমতী)
৭। পশুপতি ভট্টাচার্য—ধূমপান (অমৃত)।

বিদ্যুতের দুর্ভিক্ষ।

আকাশে বিদ্যুতের কোন অভাব নেই, কিন্তু যে বিদ্যুৎ মানুষের সভ্যতার "জোয়ালে" বাঁধা রয়েছে—অর্থাৎ যা কিনা কলকারখানায় শিল্প-উৎপাদনে আমাদের শক্তি জোগাচ্ছে তার আজ রীতিমত "দুর্ভিক্ষ"। অবশ্য দুর্ভিক্ষ বলতে আমরা ভিক্ষার বা অন্নের অভাব বুঝে থাকি। তবু বিদ্যুতের ক্ষেত্রে কথাটা খুব ভাল করে খাটে। বিদ্যুতের অভাবে শুধু যে খাদ্যের অভাব ঘটতে পারে তা নয়। সভ্যতার যা কিছু উপকরণ—তার বস্ত্র-সম্ভার, ওষুধ-পত্তর, নানা রকম বাণিজ্য-দ্রব্য সমস্তকিছুর উৎপাদন বন্ধ হয়ে পড়ে। শিল্প-বিপ্লবের ফসল হিসাবে মানুষ যা কিছু জাগতিক সুখসুবিধা লাভ করেছে, বিদ্যুতের শক্তি আয়ত্তে এনেই তার বেশির ভাগ সম্ভব হচ্ছে। আজকের এই সভ্যতাকে যদি একটা অতিকায় ফুল হিসাবে কল্পনা করা যায় তবে তার কোটার মূলে সার হ'ল এই বিদ্যুৎ, এই ফুলের গন্ধও হ'ল বিদ্যুতের গন্ধ—অবশ্য বিদ্যুতের গন্ধ বলে যদি কিছু থেকে থাকে।

এ হেন বিদ্যুতের ক্ষেত্রে সারা এশিয়া মহাদেশ যে পিছিয়ে রয়েছে তার এক হিসাব কষে দেখা হয়েছে। সম্প্রতি ব্যাঙ্ককে অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের দৌলতে এ খবর জানা গেল। পৃথিবীতে মোট যা বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়, তার মাত্র শতকরা সাত ভাগ সমস্ত এশিয়ায় (কমুনিষ্ট চীন বাদে) উৎপন্ন হচ্ছে, এবং তারও একটা প্রধান ভাগের জোগানদার জাপান। আমাদের দেশের অনুন্নতির কারণ আর একদিক্ থেকে স্পষ্ট হ'ল। দেশ যে এগিয়ে চলবে তার গোড়াতেই গলদ—বিদ্যুৎশক্তির উৎপাদনের ব্যাপারেই যে আমরা পেছিয়ে রয়েছি।

ঘোড়ার অশ্বশক্তি।

মনুষ্যের মানুষত্বের মত ঘোড়ার "ঘোড়াত্ব" বা অশ্বশক্তি একটি সাধারণ বিবেচনা। কিন্তু অশ্বশক্তি কথাটার একটা বিশেষ তাৎপর্য



যন্ত্রের অশ্বশক্তি ঘোড়ার অশ্বশক্তির কত গুণ, যান্ত্রিক ঘোড়া তৈরি ক'রে তা বোঝানো হচ্ছে

রয়েছে। ষ্টীম ইঞ্জিনের আবিষ্কর্তা (?) জেমস্ ওয়াটের মতে কুয়ো থেকে জল তুলতে ঘোড়া যতটা কাজ করছিল সে হ'ল তার অশ্বশক্তি বা হর্সপাওয়ারের হিসাব। দৈর্ঘ্যের একক যেমন মিটার বা জিনিষের ওজন যেমন কিলোগ্রাম, তেমনি শক্তির পরিমাপ এই অশ্বশক্তি। ঘোড়ার শক্তি মেপে এভাবে শক্তির হিসাব। তবে ঘোড়া মাত্রেরই শক্তি এক অশ্বশক্তি নয়। যে ঘোড়া এত পাউণ্ড জল এত ফুট নিচে থেকে এক মিনিটে উপরে তুলে দিতে পারবে তার শক্তিকেই বলি এক অশ্বশক্তি। এমন ঘোড়া হ'ল আদর্শ ঘোড়া, এবং ঘোড়া না হয়েও যদি অন্য কিছু যথা পাম্প বা মোটর দিয়েও এই কাজটি করিয়ে নেওয়া যায় তখন তাও হবে এক অশ্বশক্তি। মানুষের যা শক্তি তা ঘোড়ার সঙ্গে তুলনা হ'লেও অশ্বশক্তির মাপেই তার মাপ। এভাবে ঘোড়ার এককে সমস্ত শক্তির পরিমাপ। তা হলে বিশ্বসংসারে মানুষের যা কাজ তা ঘোড়ার শক্তিতেই হচ্ছে না—হচ্ছে বিজ্ঞানের মনীষায় যন্ত্রের শক্তিতে। ঘোড়া নয়—যন্ত্রই—আজ মানুষের শক্তির মূল উৎস। যন্ত্রের শক্তি যে ঘোড়ার শক্তি থেকে ঢের বড় তা বোঝাতে গিয়ে বিচিত্র এক যান্ত্রিক ঘোড়া তৈরী করা হয়েছে। তার বিভিন্ন অংশ হিসাবে যে যন্ত্র বসানো হয়েছে তাদের মোট শক্তি ঘোড়ার ক্ষমতাকে বেশ কয়েকগুণ ছাপিয়ে ওঠে।

রোবট—একটি যান্ত্রিক মানুষ

বাংলা সাহিত্যের আঙ্গিনায় সম্প্রতি রোবটের খুব আমদানী হয়েছে। রোবট এক কথায় যন্ত্রদানব। অবশ্য তার পুরো তাৎপর্য্য এভাবে পরিস্ফুট হ'ল না। রোবট—যন্ত্রের মানুষ, মানুষের কাজ তা মানুষের মতই সুন্দরভাবে করতে পারে, এবং তার আকার-প্রকার ইত্যাদিও মানুষের মত। গল্পকাহিনীকারদের মতে মানুষের সমস্ত ব্যাপারেই তা "প্রক্সি" দিতে পারে। উদাহরণ হিসাবে একটা গড়পড়তা ধরনের রোবটের গল্প উল্লেখ করা যায়। মনে করা যাক ক ডাকাত খ ভালমানুষের পেছু নিয়েছে, উদ্দেশ্য—কি ভাবে গুপ্তধনের চাবিকাঠি হাত করা যায়। একদিন সন্ধ্যার আঁধারে বাগে পেয়ে ক খ-য়ের উপর আক্রমণ চালালো। আর রক্ষা নেই—জানে-প্রাণে খতম। পাঠকের ধমনীর রক্ত দ্রুত হয়ে উঠল। যাঃ, এ তো ভালোমানুষ খ নয়, খ-এর হয়ে অন্য আর একজন—দ্বিতীয়—রোবট। ক ডাকাত এই ভেজাল খ-এর পিছু নিয়েই বোকা বনেছিল। আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে যমজ ভাইয়ের পাট রোবট এসে দখল করেছে। কল্পনাভিত্তিক কাহিনী এভাবে নাকি বিজ্ঞানভিত্তিক হয়ে উঠেছে।



যান্ত্রিক মানুষ সাধারণ পরিচারকের মত গৃহকর্ত্রীর আদেশ পালন করছে

সত্যিকারের রোবট কিন্তু রয়েছে, খাঁটি রোবট—গল্পকথার বাইরে তার অস্তিত্ব। যন্ত্রের উপাদানে তৈরি এই যন্ত্রের মানুষ কয়েকবার চেষ্টার পরে আজ অনেকটা গল্পলিখিয়েদের কল্পনার কাছাকাছি সার্থক হয়ে উঠেছে। ভিয়েনার ইঞ্জিনিয়ার ক্লাউস শোলজ্ নানা যন্ত্রের সমবায়ে যে যান্ত্রিক মানুষ তৈরী করেছেন তা রান্নাবান্না থেকে দমকল কর্মীর কাজ পর্য্যন্ত সমস্তই এক হাতে করতে পারে। "দূরক্রিয়" সারভো মোটরে তৈরি এই রোবটটিকে তার পরিচালক অনেক দূরে থেকেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। চিত্রে দেখুন, বিচিত্র রোবট পরিচারকের মত কেমন গৃহকর্ত্রীর আদেশ পালন করছে।

এ. কে. ডি.

অর্থিক

শ্রীচিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

আমাদের খাদ্যদ্রব্যের মূল্য

চালের দাম মণ-প্রতি ৩৫৲, ৩২৲ বা ৩০৲ টাকায় "নেমে এল," রেডিওতে এই ঘোষণা শুনে আমরা অনেকেই অস্বস্তি বোধ করছি, ভাবছি, 'পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত ত উঠেছিল, সে তুলনায় যে অনেক দাম কমেছে এটাই আনন্দের কথা।'

সম্প্রতি চালের মূল্য যেরকম আকস্মিক ভাবে বেড়ে চলছিল, এ ধরনের বৃদ্ধি আমাদের দেশে আজকাল আর কিছুমাত্র অভিনব নয়। সরকার যথারীতি প্রথমে এই ঊর্দ্ধগতি রোধে তাঁদের অক্ষমতা জানালেন, বললেন যেখানে চালের চাহিদা ও উৎপাদনে বিরাট্ পার্থক্য আছে সেখানে বিশেষ কিছু করবার নেই, খাদ্য-তালিকা বদল না করলে এই মূল্যবৃদ্ধি অনিবার্য। অতঃপর, চাউল বিক্রেতাদের ঘরে মোটা মুনাফা চলে যাবার পর, তাঁরা 'সমাজবিরোধী' কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা অবলম্বনের হুমকি দেখালেন। এতে কিছুটা ফল হয়ত ফলেছে, কিন্তু ৩৫৲ বা এমনকি ৩০৲ টাকাতে চালের দর বেঁধে দেবার অর্থ এই দাঁড়ালো যে, কিছু কালের মধ্যেই যখন নতুন চাল বাজারে আসবে তখন আর পূর্বের হারে দাম নেমে আসা সম্ভব হবে না। আকস্মিক ভাবে অনটন সৃষ্টি করা, আর তারপর সরকারের সমর্থন নিয়ে মূল্যবৃদ্ধি করার এই পন্থা গত কয়েক বছর ধরেই আমাদের দেশে চলে আসছে। চিনির ক্ষেত্রেও ইদানীং তাই হয়েছে, কেরোসিনের ক্ষেত্রেও প্রায় তাই, মাছের দরও এই ভাবেই বেড়ে চলবার দিকে। প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বিকল্প দ্রব্যের মূল্যও অনিবার্যভাবে বাড়ছে; আটার দাম বৃদ্ধি তার দৃষ্টান্ত।

বাঙালীর খাদ্য-তালিকা পরিবর্তন করা আবশ্যক, এ বিষয়ে অবশ্যই কোন সন্দেহ নেই। চাল ছেড়ে গম খেতে হবে, আমেরিকার PL 480 আমদানীর দৌলতে এখন আমাদের দেশে গমের ঘাটতি নেই; ভাতের ফ্যান ফেলে দেবার যে অভ্যাস আমরা করেছি তারও পরিবর্তন এই সময়েই করতে হবে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এই বিষয়ে যে আমাদের বারংবার সজাগ করে দিচ্ছেন তার জন্য তিনি অবশ্যই দেশবাসীর ধন্যবাদ অর্জন করেছেন।—কিন্তু সেই সঙ্গেই তিনি যে বলছেন, চালের বর্তমান মূল্যবৃদ্ধির অন্যতম কারণ হচ্ছে চাহিদার আধিক্য (আর মজুতকারী-দের কার্যকলাপের প্রভাব বিশেষ ভাবে এই মূল্যবৃদ্ধির কারণ নয়) এতে জনসাধারণ কিছু বিভ্রান্ত বোধ করছেন। গত ষোল বছর ধরে আমরা 'পরিকল্পনা' সম্বন্ধে নানান কথা অস্পষ্টভাবে বারবার শুনছি, আর শুনছি আমাদের আরও 'ত্যাগ স্বীকার' করতে হবে, তা নাহলে আমরা সুদিনের মুখ দেখতে পাব না। কথাটা অবশ্যই অতি সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গেই জীবনধারণে ব্যতিব্যস্ত জনসাধারণের মনে কয়েকটি প্রশ্ন জাগে: (ক) তৃতীয় ও পরবর্তী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা-পর্বে আমাদের মূল্যনীতিটি কি রকম পথে চলবে বলে স্থির করা হয়েছে। আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামো 'মিশ্রনীতি' অনুসরণ করে চললেও আমরা এইটুকু শুনেছি যে, আমাদের লক্ষ্যস্থল হচ্ছে, 'সমাজতান্ত্রিক' রাষ্ট্রগঠন; সেই লক্ষ্যে পৌছাতে হ'লে 'মূল্যনীতি' কি রকম হওয়া উচিত এই প্রশ্নের সদুত্তর সাধারণ লোকে এখনো জানতে পারে নি।

(খ) প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সুরু থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের দেশে মোট খাদ্যশস্য উৎপাদন এবং একর-প্রতি উৎপাদনের হার কি পরিমাণে বেড়েছে এবং শস্য উৎপাদনের ব্যয় ও মূল্যের সঙ্গে তার সম্পর্ক কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে।

(গ) বাংলা দেশে গত পনেরো-ষোল বছরে যত লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে তার মধ্যে কত অংশ লোক প্রধানত ভাত খায় এবং কত অংশ লোক পূর্ব অভ্যাস অনুযায়ী গম খায়। এইটুকু আমরা দেখছি যে, বাংলা দেশের বহু

স্থানেই আজকাল অন্য প্রদেশাগত লোকের সংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে, এবং এই সব লোক প্রধানতঃ গম বা অন্যান্য শস্যের উপর নির্ভরশীল। বাংলা দেশে যত লোক বাস করছে তার মধ্যে ঠিক কি পরিমাণ লোক তাদের জন্মগত অভ্যাসবশতঃ ভাতের ওপর নির্ভরশীল এই তথ্যটিও আমাদের স্বভাবতঃই জানতে আগ্রহ হয়।

(ঘ) শুধু বাংলা দেশের মাত্র নয়, সারা ভারতবর্ষের মোট চালের ঘাটতি কি পরিমাণ এবং যে বাংলা দেশে অন্য প্রদেশের লক্ষ লক্ষ লোক তাদের অন্নসংস্থান করছে, সেই প্রদেশের ঘাটতি মেটাবার দায়িত্ব অন্যান্য প্রদেশের সরকারের উপর কতখানি বর্তাচ্ছে। একথা প্রায়ই বলা হচ্ছে যে, বাংলা দেশে লোকের তুলনায় কৃষিজ পণ্য উৎপাদন কম অতএব ঘাটতি হতে বাধ্য; কিন্তু বাংলা দেশ ভারতবর্ষের একটি অংশমাত্র এবং এই বিরাট্ দেশের একটি অংশে (বিশেষতঃ যেখানে সকল প্রদেশের লোকই এসে রোজগার করছে) খাদ্য উৎপাদন স্বয়ংসম্পূর্ণ না হলেই বর্তমান হারে ঘাটতি ও মূল্যবৃদ্ধি হবে এই যুক্তি গ্রহণীয় কি না।

চাষের যোগ্য নয় এরকম জমি যদি আবাদ করা আরম্ভ হয় তা হ'লে সম্ভবতঃ অর্থনীতির এবং বাজার দর নির্ধারণের গৃহীত রীতি অনুযায়ী যে-জমির উৎপাদন ব্যয় সবচেয়ে বেশী (অর্থাৎ যাকে বলা যেতে পারে marginal land) সেই জমির উৎপাদন ব্যয়ই বাজার-দর স্থির করে, এবং ফলে মোট উৎপাদন বাড়লেও বাজার-দর বেড়ে যাবার লক্ষণ দেখা দেয়। কিন্তু ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বাংলা দেশে সেই রকম জমির পরিমাণ সামান্যই। কৃষকদের মধ্যে যে সব মুষ্টিমেয় কৃষক তাঁদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত শস্য (marketable surplus) বাজারে বিক্রীর জন্য আনছেন তাঁদের উৎপাদন বৃদ্ধির অন্যতম আকর্ষণ স্বভাবতঃই হচ্ছে তাঁদের পণ্যের বর্ধিতমূল্য; আর এই বর্ধিতমূল্য যে তাঁরা পাচ্ছেন এর মূলে অনেকাংশে আছে জনসাধারণের টাকায় ও সরকারের চেষ্টায় যে সব ব্যবস্থাদি (জলসেচ, ভাল শস্য ও বীজ, যানবাহনের ব্যবস্থার উন্নতি ইত্যাদি) আজ কৃষকদের কাজে সহজলভ্য হয়েছে। কৃষির উন্নতির জন্য যত অর্থব্যয় হয়েছে এর অনেকাংশই বহন করেছেন দেশের জনসাধারণ; তাঁরা অন্ততঃ এইটুকু আশা করতে পারেন যে, অতঃপর আর কিছু না হোক, এই কয় বছরের 'ত্যাগ স্বীকারে'র ফলে অন্ততঃ আর উত্তরোত্তর শস্যের মূল্য বৃদ্ধি পাবে না। জমির উৎপাদিকাশক্তি বাড়ছে ব'লে শোনা যাচ্ছে, এর ফলে একরপিছু উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি পাবে এটা আশা করা যায় না, সেক্ষেত্রে পণ্যের দাম যদি নাও কমে, নিদেন পক্ষে সমান থাকবে এটুকু অন্ততঃ আশা করা অন্যায় নয়। প্রশ্ন উঠবে, লোকসংখ্যা বাড়ছে; কি ক'রে দাম স্থির থাকবে? কিন্তু তা হ'লে কি এই ধ'রে নিতে হবে যে, কৃষির উন্নতির জন্য যত কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে, তার কোন ফলই পাবার সময় হয় নি? কোন কোন বছর উৎপাদন কম হ'তে পারে; তার ওপর মানুষের হাত নেই; কিন্তু তার দ্বারাই কি উত্তরোত্তর মূল্যবৃদ্ধির সম্পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যায়? আর জনসংখ্যা কি হারে বৃদ্ধি পেতে পারে সে বিষয়ে ত গত আদমসুমারীর (১৯৫১) সময়েই অন্ততঃ কিছুটা আন্দাজ পাওয়া গিয়েছিল। সপ্তাহে সপ্তাহে সমস্ত হিসাব বানচাল করে দিয়ে ত জনসংখ্যা বাড়ছে না, তা হ'লে চালের দামই বা প্রতি সপ্তাহে মণ-পিছু তিন-চার টাকা বা আরো বেশি করে বাড়ে কি করে। একথা ঠিকই যে, ধানকাটার আগে কয়েকমাস সাময়িক ঘাটতি হবেই যতদিন সরকারী গোলাঘর যথেষ্ট পরিমাণে তৈরী না হচ্ছে, কিন্তু সেই যুক্তিতেই কি প্রতি বছরই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে ডিঙিয়ে ধানকাটার আগে কয়েকমাস চালের দর উত্তরোত্তর বেড়ে চলবে? কৃষকরা বলবেন, গ্রামীন স্বয়ং-সম্পূর্ণতার দিন চলে গেছে, বাজারের মূল্যই আজ বর্ধিত উৎপাদনের প্রধান আকর্ষণ হিসাবে গৃহীত হ'তে বাধ্য; আজ কৃষি কালের গতিকে Commercialised হয়েছে, বাজার-দরই আজ শিল্পের ক্ষেত্রেও যেমন উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করছে, কৃষির ক্ষেত্রেও তাই করবে। কিন্তু বাজার-দরকেই যদি বর্ধিত উৎপাদনের একমাত্র নিয়ন্ত্রণকারী হিসাবে ধরা হয় তা হ'লে কৃষিজপণ্যের ও শিল্পজাত পণ্য দ্রব্যের মধ্যে যে প্রতিযোগিতা চলছে তার শেষ কোথায় হবে? এক্ষেত্রে স্বভাবতঃই প্রশ্ন আসে, উৎপাদন ব্যয় ও মূল্যের পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখার দায়িত্ব 'কল্যাণকারী রাষ্ট্রের' হাতে আসে কি না। জনসাধারণের অর্থ প্রভূত পরিমাণে সরকার ব্যয় করেছেন কৃষি এবং শিল্পের উন্নতির জন্য, এক্ষেত্রে অবশ্য-প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলবে এবং তারই জেরে অন্যান্য পণ্যের মূল্য টেনে তুলবে, এই পরিস্থিতি কিভাবে চলতে পারে! জনসংখ্যা বৃদ্ধির মধ্যে আকস্মিক বা অপ্রত্যাশিত কিছু নেই, যত লোকসংখ্যা গত দশ বছরে বেড়েছে তার সঠিক হিসাব সম্ভব না হ'লেও অনেকাংশে নির্ভুল হিসাব বহু পূর্বেই জানা ছিল! এবং তার জন্য সরকারের তরফে প্রস্তুতিরও যথেষ্ট সময় ছিল। সম্প্রতি যে হারে খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে তা দেখে স্বভাবতঃই ১৯৪২, ১৯৪৩ সালের 'মানুষের দ্বারা সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ'-র কথা মনে আসে।

আমাদের গৃহীত মূল্যনীতি যদিও খুবই অস্পষ্ট, তবু টাকার মূল্য স্থির রাখার প্রয়োজনীয়তা অন্ততঃ নীতিগত-ভাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু মিশ্রনীতির মধ্যে দিয়ে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের এই যে পরীক্ষা চলেছে, তার মধ্যে অনিবার্যভাবে যে সব স্বাভাবিক ঘাটতি ক্ষেত্রবিশেষে সৃষ্টি করা হবে বলে ধরেই নেওয়া হয়েছে, সে সব সংশোধনের জন্য শুধুমাত্র উপদেশ, অনুরোধ-উপরোধ করেই যদি সরকার ক্ষান্ত হন তা হ'লে ধরে নিতে হয় মিশ্র-নীতি মেনে নিলেও কার্যতঃ আমরা Laissez faire নীতিই বহাল রাখতে ইচ্ছুক। কর্তৃপক্ষ যুক্তি দিচ্ছেন যে, প্রধান শস্য সরবরাহের ক্ষেত্রে এই ধরণের অস্বাভাবিক অনটন সৃষ্টি করা হ'লে তার সংশোধন করার উপযোগী হাতিয়ার রাষ্ট্রের হাতে নেই। কিন্তু ষোল বছর আগেও আমাদের সরকারের যতটুকু হাতিয়ার ছিল, আজও কি মানুষের দ্বারা সৃষ্ট অভাব মোচনের ক্ষেত্রে সরকারের হাতিয়ার ততটুকুই রয়ে গেছে ?

খাদ্যশস্যের মূল্য কোন বিশেষ স্তরে বেঁধে দেওয়া খুবই কঠিন কাজ সন্দেহ নেই ; বিশেষত যে দেশে এক-দিকে জমিদারী লোপ হওয়া সত্ত্বেও জমির আসল মালিকানা থেকে বেশির ভাগ লোক এখনো বঞ্চিত অথবা বেশির ভাগ লোকেরই জমির পরিমাণ প্রয়োজনের থেকেও কম, এবং অপর দিকে মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান্ ও উদ্যোগী লোকের হাতেই উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করার চাবিকাঠি রয়ে গেছে, সে-দেশে এই সমস্যা আরোই জটিল ; এই রকম ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান মূল্যই উৎপাদনবৃদ্ধির একমাত্র "incentive" হিসাবে গণ্য হ'তে বাধ্য। আজ যখন আমরা "take off stage"-এর মধ্যে দিয়ে চলেছি এবং কৃষিনির্ভর লোকের তুলনায় অকৃষি কাজে লিপ্ত লোকের সংখ্যা বাড়িয়ে চলার কথা ভাবছি (অথচ লাভের প্রত্যাশায় যেসব অগণিত কর্মোদ্যোগ দেশ জুড়ে চলছে ; তার উপর কোন প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা সরকারের হাতে থাকবে না) তখন স্বভাবতঃই ইংলণ্ডের অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের কৃষি-ব্যবস্থার সঙ্গে আমাদের দেশের বর্তমান কৃষি-ব্যবস্থার এক তুলনা মনে আসে। নেপোলিয়ানের সঙ্গে যুদ্ধের পূর্বের ও পরের Corn Law, 'Enclosure Movement, Peterloo'-র ঘটনা, 'Rural exodus'-এর গতি, 'Poor Law', শ্রমিকদের মজুরি দেবার ব্যবস্থা হিসাবে "Speenham land system"-এর প্রবর্তন, ছোট ছোট জমির চাষীদের হাত থেকে ক্রমাগত জমি হস্তান্তর, অবশেষে তাদের হাতে জমি ফিরিয়ে দেবার ব্যর্থ চেষ্টা, এই সবকিছুর সঙ্গে এখনকার ঘটনাবলীর বহুল সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। সাম্প্রতিককালে চাল চিনি ইত্যাদির মূল্য নির্বাচন নিয়ে যা ঘটল, পার্লামেণ্টে গ্রামীন মজুরের দৈনিক আয়ের হার নিয়ে যে অর্থহীন বিতণ্ডা হয়ে গেল, ভূতপূর্ব কৃষিমন্ত্রী খাদ্যশস্যের মূল্য "Producer Oriented" করবার জন্য যা যুক্তি দেখালেন, কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে চালের দোকানে হাঙ্গামা হবার পর অকস্মাৎ যেভাবে সরকার হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠলেন, গ্রামাঞ্চলে প্রভূত কাজ করাবার সুযোগ সত্ত্বেও যেভাবে Dry Dole বিতরণ ক'রে গ্রামবাসীদের পঙ্গু ও আত্মমর্যাদাহীন করা হচ্ছে, যে হারে এখনও "Rural exodus" চলেছে, কৃষিজ জমির দাম যেভাবে বেড়ে চলেছে—এই সব কিছু দেখে স্বভাবতঃই অভাব-জর্জরিত জনসাধারণের মনে এই ধারণা হয় যে, আমাদের সরকার এখনো কয়েকজনের স্বার্থ এবং জনসাধারণের স্বার্থের কিভাবে সমন্বয় ঘটানো যায় যে সম্বন্ধে উদাসীন। গত শতাব্দীর ইংলণ্ডের অবস্থার সঙ্গে আমা-দের বর্তমান অবস্থার তুলনা আর বেশিদূর এগোয় না ; ইংলণ্ডে জনসংখ্যার হার বৃদ্ধি পেলেও মোট সংখ্যার চাপ ছিল অনেক কম, শিল্প বিপ্লবে যে দেশ ছিল অগ্রণী, তার সাম্রাজ্য ছিল পৃথিবীজোড়া, উদ্বৃত্ত লোক অন্যত্র পাঠাবার পথ ছিল খোলা ; নির্বিচারে কয়লা রপ্তানী করে বহির্বাণিজ্য প্রসারের কোন বাধা সে দেশে ছিল না। এত চেষ্টার পরও অবশ্য সে দেশ সমৃদ্ধির শিখরে বেশিদিন থাকতে পারে নি। আজ সে দেশের জনসাধারণ স্বীকার করছে যে, তাদের পূর্বপুরুষ কৃষিব্যবস্থাকে যে পথে নিয়ে গিয়েছিল তাতে আজ তাদের সমূহ ক্ষতি হয়েছে। আজ যদি আমরা নির্বিচারে খাদ্যশস্য আমদানী করে (অবশ্যই তার বিনিময়ে নগদ মূল্য দিয়ে) শিল্পপণ্যের উৎপাদন ব্যয় ও শ্রমিকের মজুরির হার হ্রাস করার ব্যবস্থা ক'রে আমাদের রপ্তানী-যোগ্য শিল্পপণ্যের মূল্য কমিয়ে আনবার কথা ভাবি তা হ'লে আমরা দেখব যে, না আছে আমাদের খাদ্যশস্য আমদানীর মত যথেষ্ট পয়সা, না আছে রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধির অবাধ সুযোগ। অতএব আমাদের ভিন্নপথ অনুসরণ করার কথাই ভাবতে হবে। সেই পথটি যে কি হ'লে ভাল তাই নিয়ে মত-দ্বৈধ থাকতে পারে, তবে এবিষয়ে সকলেই একমত হবেন যে, এ যাবৎ যে ভাবে চলা হচ্ছে তার পরিবর্তন আবশ্যক।

জনসাধারণকে খাদ্য-তালিকা বদলের অভ্যাসও করতে হবে, জন্ম-নিয়ন্ত্রণও করতে হবে ; কিন্তু তারই সঙ্গে আমা-দের সরকারকে খাদ্যশস্য উৎপাদন ও তার মূল্য নির্ধারণ বিষয়ে কি করণীয় তা সঠিক ভাবে স্থির করতে হবে। মিশ্র অর্থনীতিতে যদি "Price mechanism"-এর স্থান

সম্পূর্ণ বর্জিত না হয় তা হ'লে সেই সঙ্গে বলতে হয় "কল্যাণকারী" রাষ্ট্রের পক্ষে খাদ্যশস্যের মত গুরুত্বপূর্ণ পণ্যের মূল্য নির্ধারণ সম্পূর্ণরূপে কয়েকজন উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীর হাতে ছেড়ে দেওয়াও সম্ভব নয়। উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থাদি করে দিলেই Welfare State-এর কর্তব্য শেষ হচ্ছে না; যে জনসাধারণ এ যাবৎ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের জন্য অর্থ জোগান দিয়েছে, তাদের উপর উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতমূল্য চাপিয়ে দিয়ে অসহায় ভাবে ব'সে থাকলে কল্যাণকারী রাষ্ট্রের কর্তব্য মিটছে না। (একথা যদি মেনে নেওয়া যায় যে, আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বহু লোকেরই খাদ্যের অভ্যাস বদলাচ্ছে এবং মোটা চালের বদলে মিহি চালের চাহিদা বাড়ছে তা হ'লে সরকারকে কম ব্যয়সাধ্য মোটা চাল উৎপাদনের জন্য কৃষকগোষ্ঠীকে বাধ্য করতেই হবে।)

যদি সরকার খাদ্যশস্য উৎপাদন এবং তার মূল্য নির্ধারণ ব্যবস্থা যথেষ্ট যোগ্যতার সঙ্গে সম্পন্ন করতে না পারেন তা হ'লে কৃষিজপণ্য ও শিল্পজপণ্যের মূল্যের যে উর্দ্ধমুখী প্রতিযোগিতা চলেছে তা কোন কালেই রোধ করতে পারবেন না। এর জন্য একাধারে যেমন পরিকল্পনারত প্রয়োজনমত অদলবদল আবশ্যক তেমনি প্রশাসনিক ব্যবস্থারও আমূল সংস্কার আবশ্যক। পরিকল্পনার মধ্যে কি বদল আনা যেতে পারে সে বিষয়ে বিতর্কমূলক আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধে করা হচ্ছে না। পরিকল্পনার রূপ যাই হোক্ না কেন, তার প্রয়োগ সম্বন্ধে আরোই শিথিলতা দেখা যাচ্ছে। গত কয়েক বছরে দেখা গেছে, ব্যবসায়ীগোষ্ঠী সরকারের নির্দেশ অগ্রাহ্য করেই সামান্যতম সুযোগ পেলেই তিল তিল করে জিনিষের দাম বাড়াতে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন; কোরিয়ার যুদ্ধ, চীনের আক্রমণ, বাজেটের পূর্বে অথবা যানবাহনের সাময়িক অসুবিধা, যে কোন পরিস্থিতিই হোক্ না কেন, মূল্যবৃদ্ধির কোন সুযোগই তাঁরা ছাড়েন না। এই অভ্যাস রোধ করতে না পারলে কোন ব্যবস্থাই কার্যকরী হবে না। (কিন্তু সেই গতি রোধ করতে হ'লে সরকারের কি করণীয়? একশো টাকা জরিমানা অথবা আদালত যতক্ষণ চলবে ততক্ষণের জন্য আদালতে বসিয়ে রাখা?) জনসাধারণ এই কথাই মনে করেন যে, কোন সিদ্ধান্ত কঠোরভাবে প্রয়োগ করা মানেই totalitarian planning নয়; তেমনি "democratic planning" মানেই সর্বরকম কঠোর ব্যবস্থার শিথিলতা বোঝায় না। বারো বছরের 'পরিকল্পনা' পর্বের পর জনসাধারণ একথাই অনুভব করছেন যে, পরিকল্পনার মধ্যে ভাল বা মন্দ যাই থাকুক না কেন, সরকার যে-সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন সে-সব যদি সততা ও দৃঢ়তার সঙ্গে প্রয়োগ করা যেত তা হ'লে অপেক্ষাকৃত বেশি সুফল পাওয়া যেত।

—

প্রাগ্‌জ্যোতিষ বা কামরূপ রাজ্য

শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার

পার্জিটার সাহেবকৃত মার্কণ্ডেয় পুরাণের ইংরাজী অনুবাদ ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইতিপূর্ব্বে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় তিনি পূর্ব্ব ভারতের প্রাচীন জনপদসমূহের অবস্থান সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রবন্ধটিতে আলোচিত মতামতের সারাংশ পরে মার্কণ্ডেয়পুরাণের ভুবনকোষ অংশের ব্যাখ্যায় ব্যবহৃত হইয়াছিল। পূর্ব্ব ভারতের জনপদ সম্বন্ধে পার্জিটারের কয়েকটি সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত। প্রাগ্‌জ্যোতিসবা কামরূপ অর্থাৎ প্রাচীন আসাম-রাজ্যের বিস্তার সম্বন্ধে তাঁহার মতামত উহার অন্যতম। এ বিষয়ে পার্জিটারের ভ্রমের কারণ এই যে, তিনি পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্রজনপদের অবস্থান বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিতেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার ভ্রান্তমত আসামের ইতিহাস লেখকগণকে অনেকটা প্রভাবিত করিয়াছে।

পার্জিটারের সিদ্ধান্ত অনুসারে পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্রজাতি বর্ত্তমান ছোটনাগপুরের উত্তরাঞ্চলে বাস করিত এবং উত্তরবাংলা প্রাগ্‌জ্যোতিষ-কামরূপ জনপদের অন্তর্গত ছিল। আদি মধ্যযুগে যে উত্তরবাংলাকে পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি বলা হইত, তাহা তিনি অবগত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার বিবেচনায় উহা হইতে উত্তরবাংলার সহিত পুণ্ড্রজাতির প্রাচীনতর সম্পর্ক প্রমাণিত হয় না। অবশ্য এই ধারণায় কিছুমাত্র সত্য নাই। কারণ সুপ্রাচীন কাল হইতে পুণ্ড্রজাতি উত্তরবাংলায় বাস করিত, তাহার অকাট্য প্রমাণ আছে।

পুণ্ড্রবর্দ্ধন জনপদের প্রাচীননগর পুণ্ড্রবর্দ্ধনপুর বর্ত্তমান বগুড়াজেলার অন্তর্গত মহাস্থানে অবস্থিত ছিল। সপ্তম- শতাব্দীর, চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউয়েন-চাঙের বিবরণে এবং গুপ্তযুগ অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ হইতে ষষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত সময়ের লেখাবলীতে ঐ পুণ্ড্রবর্দ্ধন নামক জনপদ ও নগরের উল্লেখ আছে। প্রাগ্‌ গুপ্ত-যুগের বৌদ্ধ-গ্রন্থ দিব্যাবদানেও ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলে অবস্থিত পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরের নাম দেখিতে পাই। আবার মহাস্থানে আবিষ্কৃত মৌর্য্যযুগ অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর একটি লেখে স্থানটিকে পুণ্ড্রনগর বলা হইয়াছে। সুতরাং মৌর্য্য আমল হইতে মধ্যযুগ পর্য্যন্ত পুণ্ড্রজাতি উত্তরবাংলায় বাস করিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই পুণ্ড্রেরা যে কোনকালে ছোটনাগপুর অঞ্চলে বাস করিয়াছেন অনুমান ব্যতীত উহার পক্ষে নির্ভরযোগ্য কোনই প্রমাণ নাই। গুপ্তযুগের লেখাবলীতে দেখা যায়, সেকালে কোটিবর্ষ জেলা অর্থাৎ আধুনিক দিনাজপুর অঞ্চল পুণ্ড্রবর্দ্ধন প্রদেশের অন্তর্গত ছিল।

মহাভারতে প্রাগ্‌জ্যোতিষ-কামরূপের অধিপতি ভগদত্তকে পূর্ব্বনগরবাসী বলা হইয়াছে এবং তদীয় সেনা-দলে চীন, কিরাতও ম্লেচ্ছগণের সহিত সাগরানূপবাসী দিগের উল্লেখ রহিয়াছে। পার্জিটারের মতে ভগদত্ত স্বরাজ্যের চতুর্দ্দিগ্‌বর্ত্তী ভূভাগ হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিতেন এবং এই সাগরানূপবাসীরা গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদের মোহনাসমূহের নিকটবর্ত্তী নিম্নাঞ্চলে বাস করিত। সুতরাং বর্ত্তমান জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, রঙ্গপুর বগুড়া, মৈমনসিংহ, ঢাকা ও ত্রিপুরা, পাবনার কিয়দংশ এবং সম্ভবতঃ নেপালের পূর্ব্বাঞ্চল ভগদত্তের রাজ্য অর্থাৎ প্রাচীন প্রাগ্‌জ্যোতিষ বা কামরূপ রাষ্ট্রের অন্তর্গত ছিল। কিন্তু ভগদত্তের আমলে পুণ্ড্রজাতির রাজা ছিলেন পৌণ্ড্রক বাসুদেব। উত্তরবাংলায় বাসুদেবের রাজত্ব স্বীকার করিলে, উহাকে ভগদত্তের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত মনে করা সম্ভব হয় না। তাই পার্জিটার স্থির করিয়াছিলেন যে, পুণ্ড্রজাতি মগধরাজ জরাসন্ধের রাজ্যের দক্ষিণ দিকে বাস করিত। এই সিদ্ধান্ত যে ভ্রান্ত তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও লেখাবলীতে লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্রনদের তীরাঞ্চলে প্রাগ্‌জ্যোতিষ বা কামরূপ রাজ্যের অবস্থান নির্দ্দেশ করা হইয়ছে। কালিদাসের রঘুবংশে বলা হইয়াছে যে, দিগ্বিজয়ী রঘু লৌহিত্য উত্তরণ করিলে প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্যের হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছিল। দুঃখের বিষয়, পার্জিটারের মতে প্রাগ্‌জ্যোতিষ-কামরূপের অবস্থান সম্বন্ধে কালিদাসের সম্যক জ্ঞান ছিল না। কিন্তু কালিদাস গুপ্তবংশীয় সম্রাট্‌গণের সভাকবি ছিলেন। আবার লেখাবলী হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে, গুপ্তসাম্রাজ্যের অন্তর্গত পুণ্ড্রবর্দ্ধন প্রদেশের পূর্ব্বসীমান্তে কামরূপ নামক প্রত্যন্ত রাষ্ট্র অবস্থিত ছিল। এ অবস্থায় কামরূপের অবস্থান সম্পর্কে কালিদাসের কোন জ্ঞান ছিল না, ইহা একেবারেই অসম্ভব।

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত Early History of Kamarupa সংজ্ঞক গ্রন্থের রচয়িতা কনকলাল বড়ুয়া মহাশয় মনে করেন যে, একসময় পূর্ব্ব-বিহারের পূর্ণিয়া জেলা পর্য্যন্ত প্রাচীন প্রাগ্‌জ্যোতিষ বা কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। শ্রীহট্টবেলার নিধনপুরে আবিষ্কৃত একখানি তাম্রশাসনে দেখা যায়, ষষ্ঠ শতাব্দীতে কামরূপরাজ ভূতিবর্ম্মা (আঃ ৫১৮-৪২ খ্রীঃ) বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণকে যে ভূমি দান করিয়াছিলেন, দানপত্র অগ্নিদগ্ধ হওয়ায় সপ্তম-শতাব্দীতে রাজা ভাস্করবর্ম্মা (আঃ ৬০০-৫০ খ্রীঃ) উহার জন্য নূতন শাসনদান করেন। প্রদত্ত ভূমির সীমাবর্ণনায় কৌশিকা বা শুষ্ক কৌশিকানদীর উল্লেখ আছে। বড়ুয়ার মতে এই নদী বর্ত্তমান কোশী; সুতরাং বিহারের পূর্ণিয়া জেলা ভূতিবর্ম্মা ও ভাস্করবর্ম্মার শাসনাধীন ছিল। কিন্তু এই রূপ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ আছে। প্রথমতঃ দামোদরপুরে প্রাপ্ত একখানি তাম্রশাসনের তারিখ ৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দে এবং উহাতে গুপ্তসাম্রাজ্যের প্রদেশরূপে পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির উল্লেখ আছে। দ্বিতীয়তঃ চীনাপরিব্রাজক হিউয়েন-চাং (৬২৯৪৫ খ্রীঃ) বলিয়াছেন যে পুণ্ড্রবর্দ্ধন দেশের পূর্ব্বসীমায় একটি বড় নদী পার হইয়া তিনি কামরূপে পৌঁছিয়াছিলেন এবং তাঙ্‌বংশের ইতিহাসে এই নদীর নাম করতোয়া লিখিত আছে। সুতরাং প্রাচীন প্রাগ্‌জ্যোতিষ বা কামরূপ রাজ্যের পশ্চিম সীমা ছিল করতোয়া নদী। ইহা হইতে আরও বুঝা যায়, নিধনপুর শাসনের কৌশিকা বর্ত্তমান কোশীনদী হইতে পারে না। কেহ কেহ বলিয়াছেন, ঐ কৌশিকা বর্ত্তমান শ্রীহট্ট অঞ্চলের কুশিয়ারা। ইহাই সম্ভব। অনেকের মতে, প্রাচীনকালে করতোয়া একটি বৃহৎ নদী ছিল এবং কোশী, তিস্তা ও মহানন্দার জলস্রোত উহাতে আসিয়া পড়িত। এই সিদ্ধান্তেও সত্য আছে।

এই প্রসঙ্গে ইহাও বলা প্রয়োজন যে, পালযুগে পুণ্ড্রবর্দ্ধনদেশটিকে কখনও কখনও বরেন্দ্রীয় বলা হইত। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে পুণ্ড্রবর্দ্ধনপুরকে বরেন্দ্রীয় রাজধানী এবং বরেন্দ্রীকে গঙ্গা ও করতোয়া নদীর মধ্য-বর্ত্তী জনপদ বলা হইয়াছে। সুতরাং করতোয়া নদী ছিল পুণ্ড্রবর্দ্ধন বা বরেন্দ্রীর পূর্ব্বসীমা এবং প্রাগ্‌জ্যোতিষ বা কামরূপের পশ্চিম সীমা।

করতোয়া নদী যে প্রাগ্‌জ্যোতিষরাজ্যের পশ্চিম সীমায় প্রবাহিত হইত, কালিকাপুরাণ এবং যোগিনীতন্ত্র হইতেও তাহা জানা যায়। কালিকাপুরাণ অনুসারে, ভগবান্ বিষ্ণুর পৃথিবী গর্ভজাত পুত্র নরক কামাখ্যা দেবীর মন্দিরের নিকটবর্ত্তী প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে উপস্থিত হন। স্থানীয় কিরাতদিগকে বিতাড়িত করিয়া তিনি করতোয়া হইতে দিক্করবাসিনী পর্য্যন্ত ভূভাগে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের বসতি স্থাপন করেন এবং ললিতকান্তা হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত দেশে কিরাতজাতির বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন। ইহাতে দেখা যায়, প্রকৃত পক্ষে প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্য পশ্চিমে করতোয়া হইতে পূর্ব্বে দিক্করবাসিনী ও ললিতকান্তা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আবার যোগিনীতন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, কামরূপের উত্তরে কঞ্জগিরি বা নেপালের অন্তর্গত কাঞ্চনাদ্রি (সম্ভবতঃ বর্ত্তমান কাঞ্চন-জঙ্ঘা), পশ্চিমে করতোয়া, পূর্ব্বে দিক্ষুনদী বা দিক্কর-বাসিনী, এবং দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র ও লাক্ষানদীর সঙ্গমস্থল। দিক্ষুনদী আধুনিক দিখু। উহা শিবসাগরের নিকটে ব্রহ্মপুত্রে মিলিত হইয়াছে। লাক্ষা ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গম মৈমনসিংহ জেলায় অবস্থিত। এখানে প্রাচীন বা কামরূপরাজ্যের সীমা স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে প্রাগ্‌জ্যোতিষরাজ্যের অবস্থান কখনও উত্তরদিকে, কখনও বা পূর্ব্বদিকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, দেশটি উত্তরের পার্ব্বত্য অঞ্চল হইতে দক্ষিণে শ্রীহট্ট ও মৈমনসিংহ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মহাভারতে ভগদত্তকে শৈলালয় (অর্থাৎ পর্ব্বতবাসী) এবং পূর্ব্বসাগরবাসী বলা হইয়াছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, তাঁহার সেনাদলের প্রসঙ্গে চীন, কিরাত, ম্লেচ্ছ এবং সাগরানূপবাসীর উল্লেখ আছে। পাণ্ডবদিগের দিগ্বিজয় বর্ণনায় বলা হইয়াছে যে, অর্জ্জুন উত্তরদিকে গিয়া চীন ও কিরাতগণের সহিত ভগদত্তকে পরাজিত করেন এবং ভীম পূর্ব্বদিকে লৌহিত্যের তীরাঞ্চলে ম্লেচ্ছ ও সাগরানূপবাসীদিগকে দমন করেন। এস্থলে সাগর বলিতে কি বুঝাইতেছে, তাহা বিবেচ্য।

পূর্ব্বসাগর বলিতে বঙ্গোপসাগর বুঝায়। পার্জিটার এখানে সাগর বা পূর্ব্বসাগর সেই অর্থেই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু কনকলাল বড়ুয়া মহাশয় বলেন যে, এস্থলে সাগর শব্দে শ্রীহট্ট-মৈমনসিংহ অঞ্চলের জলভূমি বুঝাইতেছে; কারণ আজিও উহার স্থানীয় নাম 'হাওর' (সংস্কৃত 'সাগর')। বড়ুয়া মহাশয়ের সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়াই বোধ হয়। কারণ প্রথমতঃ, আসামের প্রাচীন লেখা বলিতে ব্রহ্মপুত্রনদকে লৌহিত্য নামক সমুদ্র বলা হইয়াছে। সেকালে যে পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্রের মোহনাগুলিকেও সমুদ্র বলা হইত, তাহার কিছু প্রমাণ আছে। শ্রীহট্টের রাজা গোবিন্দ কেশবদেবের ভাটেরা তাম্রশাসনে প্রদত্ত ভূমির সীমায় সাগরের উল্লেখ দেখা যায়। আবার বিশ্বরূপসেনের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ তাম্রশাসনেও প্রদত্ত ভূমির সীমা হিসাবে সমুদ্রের উল্লেখ পাই। দ্বিতীয়তঃ, মধ্যযুগের একটি কিংবদন্তী অনুসারে প্রাচীনকালে দেবকোট্ট অর্থাৎ দিনাজপুর অঞ্চল পর্য্যন্ত পূর্ব্বসমুদ্র অর্থাৎ বঙ্গোপসাগর বিস্তৃত ছিল। প্রাচীনকালে জোয়ারের মুখে সমুদ্রের লবণাক্ত জল পূর্ব্ববাংলার অভ্যন্তরে বহুদূরে অগ্রসর হইত বলিয়া বোধ হয়। এই সূত্রেই সম্ভবতঃ প্রাচীন প্রাগ্‌জ্যোতিষ বা কামরূপরাজ্য তখন বঙ্গোপসাগরের নিকটবর্ত্তী মনে করা হইত।

পরমাণু বিজ্ঞানে ফার্মি পুরস্কার

অমিয়কুমার মজুমদার

উনিশ শো বাষট্টি সালে 'ফার্মি পুরস্কার' লাভ করেছেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী অধ্যাপক এডওয়ার্ড টেলার। পুরস্কারটি সামান্য বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। আমেরিকার পরমাণু শক্তি কমিশন পঞ্চাশ হাজার ডলারের এই পুরস্কারটি দিয়ে থাকেন। পরমাণু শক্তির ব্যবহার, নিয়ন্ত্রণ এবং উন্নয়ন বিষয়ে যাঁর অবদান অসামান্য কৃতিত্বসম্পন্ন, তিনিই এই পুরস্কার পাবার যোগ্য। বিচারের ভার ন্যস্ত থাকে কমিশনের "সাধারণ উপদেষ্টামণ্ডলী"র উপরে। অধ্যাপক টেলারকে মনোনীত ক'রে কমিটি জানিয়েছেন, "ইনি বর্তমান জগতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৌলিক চিন্তাবিদ্ এবং বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানে তাঁর অবদান অসামান্য। রসায়ন বিজ্ঞান থেকে পদার্থবিজ্ঞান; ইঞ্জিনীয়ারিং ও টেকনলজি থেকে বিজ্ঞানের সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ অংশ কোয়াণ্টাম তত্ত্ব পর্যন্ত সর্বত্র তাঁর অতুলনীয় মনীষার স্বাক্ষর বর্তমান।"

জন্ম তাঁর ১৯০৭ সালে—বুডাপেষ্ট শহরে। কার্লসুরুহেতে সুরু হয় তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা। অথচ ১৯৩০ সালে লাইপজিগ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ. ডি পেলেন। এখানে তিনি বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী হাইসেনবার্গের সংস্পর্শে আসেন। তাঁর প্রভাবে টেলার যথেষ্ট প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন এবং সেই প্রভাব আজও চলছে। ডক্টরেট পাবার পর ডঃ টেলার গটিনগেনে জে, ফ্ল্যাঙ্কের ইনষ্টিটিউশনে গেলেন। এখানে থাকাকালীন আকৃষ্ট হলেন ভৌত রসায়নের নানা সমস্যার দিকে। হিটলারের নাৎসী সরকার তাঁকে জার্মেনী ছাড়তে বাধ্য করলে তিনি প্রথমে লণ্ডনে উপস্থিত হন, সেখান থেকে চ'লে আসেন আমেরিকায় জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই সময়ে তিনি পরমাণু পদার্থবিদ্যার দিকে অতিমাত্রায় আকৃষ্ট হন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় প্রথমে চিকাগো এবং পরে লস্ আলামসে তিনি ইউরেনিয়ম প্রোজেক্ট নিয়ে কাজ শুরু করেন। যুদ্ধের পরে চিকাগো, লস্ আলামস, বার্কলে, লিভারমোর ইত্যাদি নানা জায়গা ঘুরে বর্তমানে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা শাখার পূর্ণাঙ্গ অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত আছেন।

বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের প্রধানতঃ তিনটি শাখায় তাঁর অবদান আছে—ভৌত রসায়ন, পরমাণু বিজ্ঞান এবং সৃষ্টি-তত্ত্বে (কস্‌মলজি)। ভৌত রসায়নের প্রতি তিনি প্রথম আকৃষ্ট হন এবং এই আকর্ষণ এখন পর্যন্ত আছে। তাঁর প্রথম গবেষণা পত্র "কোয়াণ্টাম থিয়োরী অব দি হাইড্রোজেন মলিকিউলার আয়ন" বিজ্ঞানের জগতে এক অত্যুত্তম সংযোজন।

সংক্রামণগত গতি বা ট্রানজিসনাল গতি এবং অণুর স্পন্দনের মধ্যে শক্তির বিনিময় অত্যন্ত মন্থর গতিতে হয়ে থাকে। শব্দতরঙ্গ পরিবহনকারী গ্যাস বা বায়ু যখন পর্যায়ক্রমে সঙ্কুচিত হয় তখন শব্দতরঙ্গে যে তাপ-বৃদ্ধি করে তা এই মন্থরতার জন্যে অণুর কম্পনকে (স্পন্দন) প্রভাবিত করতে পারে না। এর ফলে শব্দের গতিবেগ বেড়ে যায়। শক্তি বিনিময়ের শ্লথগতি আর একটি ব্যাপারকেও প্রবলভাবে প্রভাবিত করে। "চুম্বকীয় শীতলতা পদ্ধতিতে" চৌম্বক শক্তি এবং সাধারণ সংক্রমণ-গত গতির মধ্যে এই বিনিময়ের কাজটি অত্যন্ত শ্লথবেগ সম্পন্ন। তার জন্যে চৌম্বক-তাপ এবং পরমাণুর সাধারণ গতির জন্য উদ্ভূত তাপমানের মধ্যে পার্থক্য প্রচুর। এই দু'টি তাপমাত্রা সমপর্যায়ে আসতে কয়েক ঘণ্টা বা আরও বেশী সময় লাগে। এই তথ্যটি ডঃ টেলার সর্বপ্রথম উদ্ভাবন করেন।

পরমাণু-বিজ্ঞানের বহুবিধ উন্নতিসাধনে তাঁর কৃতিত্ব অবিস্মরণীয়। হুইলার এবং হ্যাফ্‌ষ্টোভের সঙ্গে একত্রে কাজ করেও অসংখ্য উল্লেখযোগ্য উন্নতিবিধান করেন। টেলার তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে একযোগে গবেষণার ফলে সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, ভারী নিউক্লিয়াস আল্‌ফা কণিকা দিয়ে তৈরী, সরাসরি কেন্দ্রক, প্রোটন এবং নিউট্রন দিয়ে

গঠিত নয়। তিনি বললেন এই মাঝের বস্তু আল্‌ফা কণিকা একজোড়া প্রোটন আর একজোড়া নিউট্রন দিয়ে তৈরী। টেলারের এই সিদ্ধান্ত পদার্থ বিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে এক যুগান্তর এনেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। টেলারের এই ধারণার সঙ্গে বিশেষভাবে জৈব-অণুর গঠনের বেশ সামঞ্জস্য দেখা যায়। জৈব-অণুগুলি সাধারণতঃ পরমাণুর চেয়ে বড় বড় বস্তু বা পরমাণুর গুচ্ছ দিয়ে গঠিত। উদাহরণ স্বরূপ—মিথাইল, ফিনাইল ইত্যাদি নানা মূলকের (র‍্যাডিকাল) নাম বলা যেতে পারে। এ ছাড়া আরও অনেক সাদৃশ্য বর্তমান আছে।

সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে ডঃ টেলারের অবদানের প্রকৃত মূল্যায়ন এখনও হয় নি। মৌল পদার্থ এবং মহাজাগতিক রশ্মির উদ্ভব-সংক্রান্ত তাঁর গবেষণালব্ধ তথ্য সম্পর্কে এখনও নানা সন্দেহ প্রকাশ করা হচ্ছে। অথচ এই সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে নানা কাজের জন্যই তিনি সাধারণের কাছে সমধিক পরিচিত। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, তিনিই সর্বপ্রথম কৃত্রিম উপায়ে উগ্র এবং নিয়ন্ত্রিত পর্যায়ের থার্মোনিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন সৃষ্টির সম্ভাবনা প্রকাশ করেন। টেলারের আগে বিজ্ঞানীরা জানতেন যে, কেবলমাত্র সূর্য এবং তারার মধ্যেই এই ধরণের বিক্রিয়া ঘটে থাকে। তীব্র বেগসম্পন্ন থার্মোনিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশনের আর এক নাম আমাদের খুবই পরিচিত—তা হ'ল হাইড্রোজেন বোমা। যুদ্ধের সময়ে টেলার-ই প্রথম এই জাতীয় বোমার সম্ভাব্যতার কথা বলেছিলেন। আশ্চর্যের কথা যে তখন ফিসন বোমা বা অ্যাটমবোমারও কোন অস্তিত্ব ছিল না।

হাইড্রোজেন বোমার প্রচণ্ড শক্তিকে কল্যাণকর কাজে প্রয়োগ করার নানাবিধ পরিকল্পনা তাঁরই সৃষ্টি। পোতাশ্রয় এবং খাল তৈরী করবার কাজে এবং আরও অন্যান্য শান্তিপূর্ণ কাজে তিনি এই শক্তি ব্যবহার করার পক্ষপাতী ছিলেন। থার্মোনিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন থেকে শক্তি এবং বিদ্যুৎ তৈরী করবার পরিকল্পনা যাঁরা দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে ডঃ টেলার অন্যতম। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র অনেক আয়াসের ফলে এই দুরূহ কাজে সফলতা লাভ করেছেন। এর মূলে সক্রিয়ভাবে কাজ করেছে ডঃ টেলারের উৎসাহ এবং অকুণ্ঠ সমর্থন।

ডঃ টেলার সঙ্গীত-প্রিয়, ভালবাসেন কবিতা, লম্বা একটানা বেড়াতে আর হৈ চৈ ক'রে আমোদ করতে ভারী উৎসাহ তাঁর। যে কোন ধরণের হিংসায় তিনি বিমুখ, হিটলারের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের সংবাদে তিনি দীর্ঘদিন নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করেছেন।

হাঙ্গেরী দেশের নাগরিকেরা নাকি রসিক হয় এমন একটা কথা চালু আছে ওদেশে। কথাটা অন্ততঃ টেলারের ক্ষেত্রে খুব সত্যি। তাঁর থলিতে প্রচুর মজার গল্প থাকে আর নানা ধরণের লাগসই রসিকতা করতে তাঁর জুড়ি খুব কম। কি রাজনৈতিক, কি অর্থনৈতিক, কি বৈজ্ঞানিক—সব রকম আলোচনাতেই তাঁর আগ্রহ। তবে বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা পেলে একেবারে ডুবে যান, তা হ'লেও জেগে থাকে তাঁর রসিক সত্তা। গুরুগম্ভীর আলোচনার মধ্যেও সরস অথচ নিজের প্রয়োজনমাফিক উক্তি করতে ভোলেন না—এর ফলে অধিকাংশ সময়তেই আলোচনাযুদ্ধে জয় তাঁর কাছে এসে দাঁড়ায়।

গ্রন্থ-পরিচয়

দ্বিচারিণী—দিলীপকুমার রায়। বাক্ সাহিত্য, ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯। মূল্য দু'টাকা পঁচাত্তর নঃ পঃ।

জীবনে কোন মেয়ে দু'জন পুরুষকে একত্রে ভালবাসতে পারে কি? আর পারলেও দুটো ভালবাসাই কি সমান সত্যি? ইতালিয়ান মেয়ে ওলগার প্রশ্নের উত্তরে রোমের টাইবার নদীর তীরে একটি ছোট নির্জন কক্ষেতে ব'সে নিলয় তার জীবনের করুণতম অভিজ্ঞতাটির উল্লেখ করেছিল।

দুজনকে একসঙ্গে ভালবেসেছিল মিনা। হল্যাণ্ডের মেয়ে সে। জর্মন স্বামী হারমানকে আর প্রকৃতিস্থে যাযাবর নিলয়কে একই হৃদয়ের ভালবাসা দিয়েছিল। প্রথমজনকে স্বামীর প্রাপ্য ভালবাসা,—দুর্নিবার বাঁধভাঙা প্রেম। (পৃঃ—১০১) আর দ্বিতীয়জনকে প্রেমিকার স্বতঃ-উৎসারিত অনুরাগ। প্রথম আলাপের পর নিলয় গিয়েছে মিনার বাড়ী, নিমন্ত্রণ রাখতে। পরিচিত হয়েছে হারমানের সঙ্গে। হারমান অনুরোধ করেছে নিলয়কে, অবসর সময়ে মিনাকে সঙ্গ দিতে। ব্যাংকের কাজে ভীষণ ব্যস্ত সে। এতটুকু বাড়তি সময় তার নেই। অসুস্থ মিনাকে সেবা করেছে নিলয়, সারিয়ে তুলেছে তাকে। দিনে দিনে রূপে-রসে নিটোল হয়ে উঠেছে প্রেম। তারপর হারমানেরই অনুরোধে মিনাকে নিয়ে গেছে চেজ্বে—রাইনের উপত্যকায়।

সেখানে এক বৃষ্টিঝরা বিকেলে দুজনে এসে উঠেছিল একটা টিনের ছাউনিতে, আশ্রয় নিতে। যা ঘটেছিল, তা ক্লাইমেক্স। লেখকের ভাষায়,—'......আর পারি না—এই এক কুটির জাতীয় প্রিমিটিভ ছাউনির নিচে অশ্রান্ত ঝড় বৃষ্টি বাজ বিদ্যুতের আদিম পরিবেশে আমার মধ্যেকার বন্য মানুষটাই উঠল জেগে। ......এ-চাওয়ার মধ্যে অন্যায় কি থাকতে পারে—যখন বিশ্বপ্রকৃতি বলছে: হেলায় হারিও না এমন ফুলশয্যাকে, সমাজ বিধিবিধান সব মনগড়া। একমাত্র বাস্তব হ'ল দেহের জন্য দেহের কামনা।...' (পৃঃ—৮২)

ত্রিভুজ প্রেমের এই কাহিনী পাঠকপাঠিকার নিতান্ত অপরিচিত নয়। কিন্তু এর মধ্যে একটা জোরালো বক্তব্য আছে লেখকের। একটা যুগের সুনীতি দুর্নীতির মাপকাঠিকে আমরা প্রায় চিরযুগের ব'লে ধ'রে থাকি। বিবাহিতা নারী যদি স্বামী ছাড়াও অন্য এক পুরুষকে ভালবাসে তার কাছে নিজেকে বিলিয়ে দেয় তবে সেটা কি শুধু অন্যায়, না যুগযুগের কুসংস্কার বোধ?

শ্রীযুত রায়ের ভাষা সুন্দর,—মনকে আকৃষ্ট করে। বিদেশী শব্দের প্রয়োগ স্থানে স্থানে আধিক্যদোষে দুষ্ট। ঘটনা মাঝে মাঝে অতি নাটকীয় মনে হলেও বিষয়বস্তুর পক্ষে অনুপযোগী নয়। কাহিনীর পটভূমি সুদূর ইউরোপ। এটি একটি বিশেষ আকর্ষণ। কিন্তু মিনার স্বামী হারমানের চরিত্র আমাদের কাছে দুর্বোধ্য। প্রায় জেনেশুনেও সে তার স্ত্রীকে নিলয়ের সঙ্গে পাঠিয়েছে চেজ্বে। যে কোন মানুষের দিক থেকে এরূপ আচরণ বড় অদ্ভুত ও বিসদৃশ।

প্রচ্ছদপট সুন্দর। ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

অজিত চট্টোপাধ্যায়

ইন্দ্রনীলা—নমিতা চক্রবর্তী, সুতপা প্রকাশনী, ৪সি, রজত আলী লেন, কলিকাতা-২৩। মূল্য দুই টাকা।

একটি নূতন পট-ভূমিকায় এই উপন্যাসখানি রচিত। পট-ভূমিকার গুণেই গল্পটি পড়িতে ভাল লাগিল। রুথ এই গল্পের নায়িকা। সুন্দরী। নেটিভ খ্রীষ্টান। মিশনে মানুষ। লেখাপড়া শিখিয়া মিশনেরই বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী সে আজ। রুথের মা কমক, ধাত্রী। রুথের জন্মবৃত্তান্ত ভাল নয়, রুথ তাহা ভাল করিয়াই জানে।

তপনবাবু খ্রীষ্টান নন। "হিন্দু, ব্রাহ্মণ। টকটকে গৌর বরণ। সবল দীর্ঘ দেহ।...দর্শনে অনার্স নিয়ে বি-এ পাস করেছেন। কেন যে মিশন-ইস্কুলের মাষ্টার হয়েছেন, বোঝা শক্ত।...তপন কেবল ছেলেদের ইংরেজী পড়ায় না হরিশের বাবা নিবারণ মিস্ত্রীর জ্বর ছেড়েছে কিনা খোঁজ নেয়, নিটুল হাতুই, জোহান কুর্মকে বই আর প্যাণ্ট কিনে দেবার জন্য চকবাজারে নিয়ে যায়। আরো কত কি যে করে কে তার খোঁজ রাখে! তপন যখন রাস্তায় চলে—মেয়ে-ইস্কুলের মাঠে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। বোর্ডিং-এর সব মেয়েরাই খ্রীষ্টান। তাদের মায়েরা ঘর লেপতো, রাজমিস্ত্রীর ইট বইতো আর নালায় কুঁচো মাছ ধরে কিংবা পড়শিনীর মাথার উকুন বেছে অবসর বিনোদন করত। পিতৃ-পরিচয় আরো নগণ্য। মিশনারীরা এদের আলোয় এনেছেন সত্যি সত্যি। এখন পুরুষরা ডকে কিংবা মিশনে চাকরি করে, মেয়েরা আয়া, ঝি, দাই বা নার্স। রবিবারে তারা ফরসা কাপড় প'রে গির্জা-বাড়ী যায়।"

নেটিভ খ্রীষ্টানদের এই পরিবেশে লেখিকা যে রোমান্স সৃষ্টি করিয়াছেন, এবারে তাহার পরিচয় আবশ্যক। দেখা যাইতেছে তপন রুথকে ভালবাসিয়াছে, রুথও তপনকে ভালবাসিয়াছে। হিন্দু বলিয়া তপনের মনে যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়াছিল, তাহারও নিরসন একদা হইল। তপনের মা সম্মতি দিলেন, কারণ রুথকে তাঁহারও ভাল লাগিয়াছিল।" "রুথকে ভালবেসেছে ছেলে, স্নেহে ভরে গেল মায়ের মন। কে-না ভালবাসবে রুথকে। খ্রীষ্টান? জন্মে কলঙ্ক? থাক্। রুথকে কোনো পাপ স্পর্শ করে নি। মা ভুলে গেলেন আজ সারাদিন ধরে সর্বনাশের ভয়ে তাঁর বুক ধড়ফড় করেছে, ভুললেন রুথের প্রতি কত বিদ্বেষ জমেছিল মনে। রুথকে ভালবাসলেন।...রুথ অবাক হলো। সঙ্কুচিত হলো। সে ভালো করেই জানে, তাকে স্পর্শ করলে মা স্নান করেন।...আজ এই সন্ধ্যার সময়, মা রুথকে প্রায় কোলের কাছে টেনে এনেছেন! কেন? কেন এমন অসম্ভব ঘটনা ঘটলো? রুথ তাকালো মায়ের দিকে, মা তার দিকেই চেয়ে ছিলেন। কি দেখলো মায়ের চোখে রুথ? রুথ চোখ নামালো, চোখ বুজলো।...মুহূর্তে রুথকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন মা। রুথ নিজেকে সামলাবার আগেই তারও মা হয়ে গেলেন তপনের মা। সেই সর্বংসহা মায়ের বুক ভিজিয়ে রুথের চোখের জল ঝরতে লাগলো। কেবল ভালবাসার দুঃখ নয়, জন্মসূত্রে গাঁথা যত লাঞ্ছনা, যত অপমান, মেয়ে জীবনের যত বেদনা জমা হয়েছিল রুথের বুকে—সব তার চোখের জলে গলে পড়তে লাগলো।"

কিন্তু এ বিবাহ হইল না—রুথই হইতে দিল না। সে স্থির করিল, "জন্মের কলঙ্কে কালো করবে না তার ভালবাসাকে।" সে উৎসর্গ করিল নিজেকে মিশনের কাজে। দূর সাঁওতাল পরগণায় তপনের চোখের আড়ালে সে চলিয়া গেল। রুথের এই চরিত্র-চিত্রণ অপূর্ব হইয়াছে।

কয়েকটি টাইপ চরিত্রও ভাল লাগিল। যেমন মিশনের ওয়াচার হরিশ, তার স্ত্রী মনোরমা। আর চমৎকার লাগিল 'বিলু' চরিত্রটি। অদ্ভুত একটি টাইপ। তপন যখন বলিতেছে—"তুই অনেক বড় হবি বিলু!

—অনেক বড় হবো, মেজদা! এমন একটা বায়নাকুলার বানাবো আমি, যাতে পাঁচশো মাইল দূরের জিনিসও দেখা যাবে।

চক্‌চক্ করে বিলুর চোখ। সে মনে-মনে বলে :

—আমি সব জানি, মেজদা।—সব। আমি পাতা-ভরে লিখবো আমাদের বাড়ীর কথা, মায়ের কথা—যেমন মা কখনো কেউ পায়নি; আর তোমাদের—তোমার, রুথদির ভালবাসার কথা।

বিলু বায়নাকুলার বানাবে। তাতে ধরা পড়বে অনেক দূরের মানুষ। অনেক দূরে, পাহাড়-ঘেরা কালো আদিবাসীদের জন্য মিশন, সেখানে ঘুরে বেড়ায় একটি মেয়ে। এক সন্ন্যাসিনী, তাঁর মাথায় সাদা ভেল। সে চলেছে প্রত্যহ ক্রশ বয়ে তার প্রভুর সঙ্গে মিলিত হতে। তাকে একদিন দেখতে পাবে 'বাণী-বীথি'র সর্বত্যাগী হেড মাষ্টার তপন চৌধুরী।"

বিলুই গল্পের ছেদ টানিয়াছে। এর চেয়ে ভাল ছেদ আর টানা যাইত না। বইখানি এক নিঃশ্বাসে পড়িবার মতো কৌতূহল লেখিকা সৃষ্টি করিয়াছেন। লেখিকার ভাষা সুন্দর, আরো সুন্দর তাঁহার প্রকাশভঙ্গি। বহুদিন পরে এমন সুন্দর একখানি বই পাইয়া তৃপ্তিলাভ করিলাম।

পরিশেষে একটি কথা না বলিয়া পারিলাম না,—উৎসর্গ-পত্র যাহা শ্রদ্ধায় দেওয়া, তাহা শেষ পৃষ্ঠায় না দিলেই ভাল হইত।

পুষ্পপরাগ—পুষ্পদেবী, ১ ডাঃ শ্যামাদাস রো, কলি-১৯। মূল্য—৩'৫০ নঃ পঃ।

'পুষ্পপরাগ' উনিশটি গল্পের গ্রন্থসংকলন। গল্পগুলি পূর্বে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থকর্ত্রী পূর্বে 'গীতা' ও 'উপনিষদে'র কাব্যানুবাদ করিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। দেখিলাম গল্পের হাতও তাঁর চমৎকার। ছোট গল্প লিখিবার টেক্‌নিক—যাহা শেষ মোচড়ের উপর নির্ভর করে, তাহার সুনিপুণ প্রয়োগে গল্পগুলি প্রাণবন্ত হইয়াছে। বিশেষ করিয়া গল্প বলিবার তাঁহার সহজ ভঙ্গিটি শুধু সুন্দর নয়, চমৎকার। লেখকের ইহা একটি বড় সংযম। অনেকেই তাহা পারেন না বলিয়া বিষয়বস্তুকে জটিল করিয়া তোলেন। ভাষা সহজ হওয়ার ফলেই গতিও স্বচ্ছন্দ হইয়াছে। ইহার প্রথম গল্পটি 'সূত্রপাত'। প্রথম হইবারই উপযুক্ত। গল্পের শেষ মোচড়টি লক্ষ্য করিবার মতো। এক কথায় গল্প হিসাবে ইহা সার্থক রচনা। বইখানি সমাদৃত হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

একদা যাহার বিজয় সেনানী : দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট : কলিকাতা-১৩। মূল্য দুই টাকা।

ছেলেমেয়েদের উপযোগী করিয়া, সেকালের বাদশার যে চিত্র লেখক আঁকিয়াছেন, তাহার প্রয়োজন যে আজ কতখানি তাহা প্রত্যেকেই অনুভব করিতেছিলেন। কলিকাতা পূর্বে কি ছিল, আজকের কলিকাতা দেখিয়া যেমন বুঝিবার উপায় নাই, বাংলার পূর্বরূপ'

জানিবার কৌতূহল থাকিলেও, জানাইবার লোকের অভাব ছিল। গ্রন্থকার সেই অভাব দূর করিয়া সকলেরই দৃষ্টি ফিরাইয়া দিলেন অতীতের দিকে। কোথায় সপ্তগ্রাম, কোথায় তাম্রলিপ্ত ইহা আজ পুরাণ-কথায় দাঁড়াইয়াছে। তখন ছিল খণ্ড খণ্ড রাজ্য। "যত রাজা তত রাজ্যপাট। সে রাজাদের নামও ইতিহাসে লেখা নেই। কেউ মনে করেও রাখেনি তাঁদের কাহিনী।"

সেই কাহিনীকে মনে করাইয়া দিবার আজ প্রয়োজন ছিল। গল্পছলে সেইসব কাহিনী বলার মধ্যে লেখকের যে কৃতিত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা অনন্যসাধারণ। কারণ, লেখক শুধু কাহিনীই বলিয়া যান নাই, তাহার পূর্বাপর রক্ষা করিয়া বাংলা ও বাঙালীর এক তথ্যবহুল ইতিহাস রচনা করিয়া গেলেন। স্বাধীন দেশে এ ইতিহাস নিশ্চয়ই আদর পাইবে। কিশোর-পাঠ্য হিসাবে এ বইখানি অবশ্য পাঠ্য। লেখকের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, তাঁহার এই এই সহজ করিয়া বলার মধ্যে। তাঁহার লেখনী জয়যুক্ত হোক্।

গৌতম সেন

ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ

প্রথম খণ্ড—নেপাল মজুমদার

প্রকাশক—বিদ্যোদয় লাইব্রেরী, কলিকাতা। মূল্য দশ টাকা।

রবীন্দ্রনাথের কবিকৃতি ও সাহিত্য সাধনার ব্যাখ্যা বাংলা এবং অন্যান্য ভাষায় অপ্রতুল নয়—আলোচ্য গ্রন্থখানা আরেকটি সংযোজন নিঃসন্দেহে। লেখক আপন বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতে রবীন্দ্র ব্যক্তিমানসে ভাষ্য দিয়েছেন—সেইদিক্ থেকে একটা মৌলিকতা রয়েছে, আর রয়েছে লেখকের অক্লান্ত পরিশ্রমের স্বাক্ষর।

ভারতের জাতীয় আন্দোলন এবং স্বাদেশিকতার আদি যুগ থেকে আরম্ভ ক'রে রবীন্দ্র সমসাময়িক কাল পর্যন্ত বহু জাতীয় নেতার কর্মকৃতির ইতিহাস ও বিন্যাস উল্লেখ ক'রে সেই পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তাধারার তুলনামূলক বিচার বইখানাকে তথ্যপ্রধান ক'রে তুলেছে ঠিকই, কিন্তু লেখকের আপন বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে এর প্রয়োজন ছিল।

ভারতবর্ষে জাতীয় আন্দোলনের যে ঢেউ উঠেছিল, তৎকালীন যুগে তা' রবীন্দ্রমানসকেও আলোড়িত ক'রে তুলেছিল। কিন্তু কবির স্বদেশপ্রেম প্রকাশ পেল প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নয়—কাব্যে, সাহিত্যে ও প্রবন্ধে। বর্তমান লেখক রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সাধনার মাধ্যমে দেশপ্রেমের চিত্রটি বিভিন্ন সময়ের কবির বিভিন্ন কাব্য প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতির সাহায্যে তুলে ধরেছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন জাতীয় কংগ্রেসকে কেন্দ্র ক'রেই গ'ড়ে উঠেছিল। সে-যুগের অন্যান্য দিক্‌পালদের মতো রবীন্দ্রনাথ কিন্তু নিজেকে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত করেন নি। আলোচ্য গ্রন্থে এর কারণ দেখাতে গিয়ে প্রচ্ছন্ন ভাবে লেখক বলেছেন যে, রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা সব সময়ই কেবলমাত্র ইংরেজ শাসনের বিরোধিতা করার মধ্যেই সীমিত ছিল না। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রকার আবেদন-নিবেদনের বিপক্ষে ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যেই আন্দোলন সীমাবদ্ধ থাকবে না—জনগণের চিত্তে দেশাত্মবোধ জাগরিত না হ'লে কেবলমাত্র দু'একটা সভা ক'রে কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করলেই উদ্দেশ্য সফল হবে না।

রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মতবাদ উপস্থাপিত করতে গিয়ে লেখক এটাকে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ক'রে তুলেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ স্বাদেশিকতা বলতে কোন সময়ই কেবলমাত্র বিদেশীশৃঙ্খল মোচন বোঝেন নি—সামগ্রিক ভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনই তাঁর মূলমন্ত্র ছিল। "আইনের সাহায্যে সম্মান পাওয়া যায় না, সম্মান নিজের হস্তে। আমরা সানুনাসিক স্বরে যে ভাবে ক্রমাগত নালিশ করিতে আরম্ভ করিয়াছি তাহাতে আমাদের আত্মমর্যাদা নিরতিশয় লাঘব হইতেছে"—এই উক্তিতেই রবীন্দ্র-ভাবধারাটি পরিস্ফুট।

বর্তমান গ্রন্থে লেখক অনেকক্ষেত্রেই রবীন্দ্রকাব্যের স্বকীয় ব্যাখ্যা উপস্থাপিত ক'রে নিজের বক্তব্যকে যুক্তিসহ করে তুলতে চেয়েছেন। এ স্বাধীনতা লেখকের অনস্বীকার্য। কিন্তু সমগ্র প্রবন্ধ বা কবিতার অংশ বিশেষের উদ্ধৃতি অনেক সময়ই সম্পূর্ণ রচনার ভাবের অনুকূল হয় না—তাই কেবলমাত্র অংশ বিশেষের উল্লেখ বিভ্রান্তিকরও হ'তে পারে।

বর্ষশেষ কবিতা—কেবলমাত্র বর্ষশেষ কেন—রবীন্দ্রনাথের কোন কবিতাই কবির সমগ্র জীবনবেদ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে ব্যাখ্যা করা চলে না এবং তাতে অপব্যাখ্যার সম্ভাবনাই বেশী। এই প্রসঙ্গে লেখক কবিকে প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারায় ভাবিত বলে অভিহিত করেছেন, তিনি বলছেন—"নৈবেদ্যর যুগ থেকেই রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগতে একটি প্রতিক্রিয়াশীল ধারা প্রবল হইয়া উঠিতে থাকে, ইহা লক্ষ্য না করিয়া পারা যায় না এবং তাহা হইতেছে 'হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদ'।" লক্ষ্য করবার বিষয় যে, কবি বা সাহিত্যিকের কবিকৃতি বা সাহিত্যকর্ম আলোচনা করতে হ'লে বন্দনতত্ত্ব ভিত্তি ক'রে করলেই সুবিচার করা হয়—তা না ক'রে রাজনৈতিক মতবাদ আরোপ করতে গেলেই দেখা দেয় নানা বিপত্তি। বর্তমান লেখক একটি বিশেষ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে কবির কাব্য বিচার করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর প্রতি শুধু অবিচারই করেন নি—উপরন্তু কবি সম্পর্কে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন। কবির বিশেষ ভাবধারাকে আপন আলোচনার সুবিধার জন্য বিশেষ ভাবে নামাংকিত করা স্বচ্ছ দৃষ্টিভংগির পরিচায়ক নয় বলেই মনে হয়।

"......ভারতবর্ষের ন্যায় বহু জাতি, বহু ধর্ম ও বহু সম্প্রদায়ের দেশে জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি করিবার প্রশ্নে যেখানে ধর্ম-নিরপেক্ষতা ও গণতান্ত্রিক আদর্শের ব্যাপক প্রসার হওয়া উচিত ছিল, সেখানে নূতন করিয়া 'হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদ' (Hindu Revivalism) দেখা দিল।" কবির সম্পাদনায় বঙ্গদর্শনের নবপর্যায়ের ভাবধারা সম্পর্কে লেখকের এই অনুযোগ একদেশদর্শী। রবীন্দ্রনাথ 'ধর্ম' 'ব্রাহ্মণ' প্রভৃতি শব্দের আধুনিক কালে গৃহীত অর্থ গ্রহণ করেন নি—এই শব্দগুলি সম্পর্কে তাঁর একটা বিশেষ চিন্তা ছিল—তার পরিচয় 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের আপন উক্তিতেই, যা লেখক নিজেও উল্লেখ করেছেন, উক্ত মন্তব্যের যাথার্থ্য নাই। "ধর্ম বলিতে রিলিজন্ নহে, সামাজিক কর্তব্য তন্ত্র—তাহার মধ্যে যথাযোগ্য ভাবে রিলিজন্ পলিটিক্স সমস্তই আছে।" হিন্দুধর্ম বলতেও তিনি একটা বিশেষ ভাবকেই বুঝেছেন, যার সাথে ইসলাম বা অন্যধর্মের কোন বিরোধ নাই এবং যেটাকে তিনি ভারতের জাতীয় আদর্শ বা National Idealism বলে মনে করেছেন।

বর্তমান লেখকের সাথে হয়ত মতানৈক্য থাকবে অনেকেরই—তার প্রধান কারণ হ'ল রবীন্দ্রমানস বিচারের দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতা। কিন্তু এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, লেখকের পরিশ্রম সার্থক হ'য়ে উঠেছে তখনই, যখন দেখি ভারতীয় জাতীয়তাবোধের একটা বিরাট্ পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথকে বিচার করবার প্রয়াস পেয়েছেন তিনি। অঞ্জলি ভদ্র

NOTICE

We have the pleasure to announce the appointment

of

Messrs PATRIKA SYNDICATE PRIVATE LTD.

12/1, Lindsay Street, Calcutta-16,

as

Sole Distributors through newsvenders in India

of

THE MODERN REVIEW

(from Dec. 1962)

PRABASI

(from Paus 1369 B.S.)

All newsvenders in India are requested to contact the aforesaid Syndicate for their requirements

of

The Modern Review and Prabasi henceforward.

Manager,

THE MODERN REVIEW & PRABASI

কৃষিক্ষেত্র, কারখানা বা অফিসে
যেখানেই আপনি কাজ করুন না কেন, সেই
কাজ এমনভাবে করুন যেমনটি এর
পূর্ব্বে আর কখনও করেন নি।
পূর্ব্বের তুলনায় দ্বিগুণ এমন কি তার
চাইতেও কিছু বেশী উৎপাদন করুন।
মনে রাখবেন আপনি যত বেশী কাজ
করবেন, জাতির প্রতিরক্ষা তত বেশী
শক্তিশালী হয়ে উঠবে।



দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে কাজ করুন





আরও বেশী উৎপাদন, প্রতিরক্ষা আরও শক্তিশালী করার জন্য

DA 63/F 15 (Beng.)

সূচীপত্র—পৌষ, ১৩৭০

আপনার সন্তান কি কর নিয়ে মাথা ঘামায়?

না, ঘামায় না। টাকাকড়ির ব্যাপারে পরিবারের সকলেই আপনার ওপর নির্ভর করে। তারা জানে যে তাদের ভালোর জন্য আপনিই মাথা ঘামাবেন।

এই বছরে করবৃদ্ধি ও বাধ্যতামূলক সঞ্চয় পরিকল্পনার জন্য আপনার মাহিনা থেকে যে টাকাটি ঘরে আসে, তার পরি-মাণটি কমে গেছে। কিন্তু দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিসেবে আপনি জানেন যে জীবন বীমার মত একটি প্রয়োজনীয় বিষয়ে ব্যয় সঙ্কোচ করা অসম্ভব। পলিসিহোল্ডার হিসেবে প্রিমিয়াম দিয়ে যাবার জন্যে আপনি সব কিছুই করবেন। কিন্তু যদি আপনার জীবন বীমা না করা থাকে, তাহ'লে আপনি অবশ্যই এখন একটি পলিসি নেবেন।

মনে রাখবেন, আপনার বর্তমান আয়ে আপনি যদি সংসার চালাতে না পারেন, তাহ'লে আপনার আয় থেকে সহসা বঞ্চিত হ'লে আপনার পরিবারের লোকের পক্ষে সংসার চালানো কী কষ্টেরই না হবে!





জীবন বীমার কোন বিকল্প নেই

ASP/LIC-2-

সূচীপত্র—পৌষ, ১৩৭০



451

সূচীপত্র—পৌষ, ১৩৭০

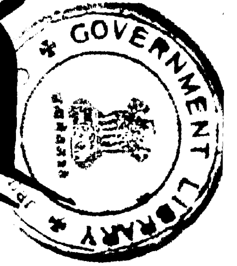
— চিত্র সূচী —



জন কেনেডি

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

প্রবাসী



"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৩শ ভাগ
২য় খণ্ড

৩য় সংখ্যা
পৌষ, ১৩৭০

বিবিধ প্রসঙ্গ

কংগ্রেস ও গোয়া-দমন-দিউ নির্ব্বাচন

সে একদিন ছিল যখন কংগ্রেস যে-কোন নির্ব্বাচনে, যে-কোনও প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে নিজ মনোনীত প্রার্থীকে জিতাইতে পারিত শুধু যদি জনমতের প্রভাব সেখানে অপ্রতিহত ভাবে চলিতে পারিত। দিল্লীর প্রথম কেন্দ্রীয় সংসদে দিল্লীর "হাব্সি মিঠাই" প্রস্তুতকারী হালুইকর এবং কোথাকার যেন মুচি, কংগ্রেসের মনোনয়নের জোরে অন্য হোমরা চোমরা-দের হটাইয়া আসন পাইয়াছিল। তার পর কংগ্রেস "স্বরাজ পার্টি"ও নিজের প্রার্থীদের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই জিতাইতে সক্ষম হয়। দেশবাসী কংগ্রেসের "টিকিট" দেখিয়া বিনা দ্বিধায়, যোগ্যতা বিষয়ে কোন প্রশ্ন না তুলিয়া অনেক অজ্ঞাতকুলশীলকে ভোট দিয়া নির্ব্বাচনে জয়ী করিয়াছে। ঐ সময় দেশবন্ধু দাশ প্রমুখ নেতৃবর্গ গর্ব্ব করিয়া বলিতেন যে কংগ্রেস ইচ্ছা করিলে 'ল্যাম্পপোষ্ট'কে মনোনয়ন দিয়া জয়ী করিতে পারে।

তার পর হাওড়ার পুলের নীচ দিয়া গঙ্গায় ও যমুনা-ব্রীজের নীচে যমুনায় অনেক জল বহিয়া গিয়াছে। আগেকার নির্ব্বাচকমণ্ডলীর মত সরল ও কংগ্রেসে বিশ্বাসী নির্ব্বাচকের দল এখন প্রধান প্রধান শহরে ও গণ্ডগ্রামগুলিতে নাই। নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের "ফতোয়ার" সে ব্যাপক প্রভাব আর নাই। তবুও অল্প কিছুদিন পূর্ব্বে যে ভারতব্যাপী সাধারণ নির্ব্বাচন হইয়াছে তাহাতে মোটের উপর কংগ্রেসের প্রতিপত্তি পূর্ব্বেকার মতই প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়। কোনও প্রদেশে কংগ্রেস-বিরোধী কোনও দল রাজ্য সরকারের গদি দখল করিতে পারে নাই। কোথায়ও বা হয়ত স্থানীয় আন্দোলনের প্রভাবে বা কংগ্রেস প্রতিদ্বন্দ্বী কোনও দলের শ্রেণীগত বা জাতিগত গণ্ডির ভিতরে অথবা কোনও প্রার্থীর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে, দুই-চার-দশটি কংগ্রেসী "ল্যাম্পপোষ্ট" পরাজিত হইয়াছে—যেমন হইয়াছে মাদ্রাজে দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাঝাঘাম্ আন্দোলনে, পাঞ্জাবে শিখ চরমপন্থীদের গণ্ডিবদ্ধ কয় এলাকায় এবং রাজস্থানে মহারাণী গায়ত্রী দেবীর বেলায়। কিন্তু মোটমাট প্রায় সকল রাজ্যেই কংগ্রেসের আধিপত্য অটুট থাকে। সাধারণ নির্ব্বাচনে কংগ্রেস প্রায় কোনও প্রতিষ্ঠিত আসন হইতে বিচ্যুত হয় নাই বা "প্রেষ্টিজের" লড়াইয়ে মার খায় নাই।

কিন্তু ঐ সাধারণ নির্ব্বাচনের অল্পদিন পরেই যেন জনমতের হাওয়ায় একটু ঝড়ের আভাস দেখা দেয়। লোকসভায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বিষয়ে সমালোচনা ক্রমে তীব্রতর হইতে থাকে এবং সেই বিতর্কের আলোচনায় সাধারণ জনেও কংগ্রেসী নেতৃবর্গের জবাব ইত্যাদিতে অসন্তোষ প্রকাশও আরম্ভ করে। ওই ঝড়ের প্রকোপ কতদূর যাইতে পারে তাহা দেশবাসী বুঝিল লোকসভার তিনটি উপনির্ব্বাচনে। ঐ তিনটির মধ্যে দুইটি ছিল কংগ্রেসের দুই দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত কেল্লায়, যথা উত্তর প্রদেশের আমরোহায় ও গুজরাটের রাজকোটে। তৃতীয়টি ছিল উত্তর প্রদেশের ফররুকাবাদে, যেখানে পূর্ব্বকালের সমাজতন্ত্রীগণের কিছু প্রভাব ছিল, কিন্তু পর পর নির্ব্বাচনে কংগ্রেসী প্রার্থীই জয়লাভ করে।

উপনির্ব্বাচনে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যাঁহারা দাঁড়াইয়াছিলেন,

তাঁহারা তিনজনই সাধারণ নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের দ্বারা পরাজিত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের তিন জনই কংগ্রেসের প্রবল বিরোধী এবং সেই কারণে ঐ উপনির্ব্বাচনে কংগ্রেস তাহার সকল শক্তি নিয়োগ করে ইঁহাদের হারাইতে—কিন্তু মার খাইল কংগ্রেসই এবং তাহাও বিষমরূপে।

এই পরাজয়ে কংগ্রেস প্রচণ্ড ধাক্কা পাইল। কিন্তু দেখা গেল যে ইহাতে কংগ্রেসী নেতৃবর্গকে কিছুটা আক্কেল দিতে পারিয়াছে বটে কিন্তু পূর্ণমাত্রায় চেতনা দেয় নাই। জনমতের মুখ ফিরিয়াছে সেটা কর্ত্তাব্যক্তিরা বুঝিলেন কিন্তু তাঁহাদের মাথায় ঢুকিল না এ কথা যে, দেশের লোক কংগ্রেসে বিশ্বাস হারাইতেছে কেন। তাঁহারা বুঝিলেন যে কংগ্রেস কর্ম্মী-দলের মধ্যে সহযোগিতা ও কর্ম্মনিষ্ঠার অভাব হইয়াছে এবং সে কারণে নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের সপক্ষে প্রচার যথাযথ ভাবে হয় নাই। সেই কারণে বিগত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে আসিল—ও গৃহীত হইল—কামরাজ প্রস্তাব। এবং তার পর কেন্দ্রীয় ও রাজ্য মন্ত্রিসভাগুলিতে কার্য্যকরী করা হইল কামরাজ প্রস্তাব, যাহার ফলে কয়েকজন উচ্চকোটির কংগ্রেস প্রধানকে মন্ত্রিসভা হইতে "মুক্ত" করা হইল কংগ্রেসে সংহতি ও সংগঠনের কাজ পূর্ণোদ্যমে চালাইবার জন্য। অবশ্য দেশবাসীর মধ্যে অনেক দুষ্ট লোকে বলিল যে কংগ্রেসে সংস্কারের কাজটা উপলক্ষ্য মাত্র, আসলে অবাঞ্ছিতদের বহিষ্কারই হইল প্রধান কথা, দুই-চার জন প্রকৃত দলনেতাও সেই সঙ্গে গিয়াছেন—কেহ বা স্বেচ্ছায়-কেহবা দারুণ অনিচ্ছায়। সংহতি ও সংগঠনের কাজ তাঁহারা কে কি ভাবে করিতেছেন তাহার ফলাফল এখনও প্রত্যক্ষভাবে দেখা যায় নাই।

কংগ্রেসের ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের পালা কিন্তু ঐ তিন লোক-সভার উপনির্ব্বাচনে শেষ হয় নাই। সম্প্রতি গোয়া, দমন ও দিউর প্রথম সাধারণ নির্ব্বাচন শেষ হইয়াছে। ওখানের নির্ব্বাচনের লক্ষ্য ছিল ৩০টি বিধান সভার আসন ও দুইটি লোকসভার আসন। নির্ব্বাচনের ফলাফল দেখিলে ঠিক বুঝা যায় না যে এই প্রথম সাধারণ নির্ব্বাচনে যে কয়টি দল লড়িয়াছে তাহারা কে কোন্ সিদ্ধান্তের সমর্থন করে। প্রথমে লোকসভার একটি আসন ও বিধান সভার ৩০টি আসনের ফলাফল এইভাবে ঘোষিত হয়।

বিধান সভা। দলগত অবস্থা :

মহারাষ্ট্রবাদী গোমন্তক	১৪
ইউনাইটেড গোয়ান্স	১২
নির্দ্দলীয়	৩
কংগ্রেস	১

মার্মাগোয়া লোকসভা আসনে মহারাষ্ট্রবাদী গোমন্তক দলের প্রার্থী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এই সংবাদও ঐদিন (১১ই ডিসেম্বর) ঘোষিত হয়। পরের দিন জানা যায় যে, পাঞ্জিমের লোকসভা আসনও মহারাষ্ট্রবাদী গোমন্তক-দলের প্রার্থীই পাইয়াছেন। গোয়ার কংগ্রেস সভাপতি এই নির্ব্বাচনে শুধু হারেন নাই তাঁহার জমানতও বাজেয়াপ্ত হইয়াছে।

এখন এই দলগুলি কি তাহার কিছু আলোচনা প্রয়োজন। বৃহত্তম দল মহারাষ্ট্রবাদী গোমন্তক, একদিকে শুধু মহারাষ্ট্রীয় স্বার্থে সংযুক্ত মহারাষ্ট্রের প্রসার চায় এবং সেই কারণে গোয়ার হিন্দুদিগকে খ্রীষ্টান গোয়ানিজদিগের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ করার চেষ্টা করে। কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীচওয়ন গোয়ায় নির্ব্বাচন প্রচার হিসাবে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহাতে তিনি গোমন্তক দলের প্রস্তাবিত গোয়া-মহারাষ্ট্র এক রাজ্য-ভুক্তির সমর্থনই করেন। এই মহারাষ্ট্রবাদী গোমন্তক দলের প্রধান ও প্রায় একমাত্র লক্ষ্য মহারাষ্ট্র রাজ্য ও মহারাষ্ট্রীয় জাতির প্রাধান্য বিস্তার। তাহাদের কাছে—যেমন হিন্দীরাজ সমর্থকদিগের কাছে—সমগ্র ভারতের সংহতি বা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের কোনও অর্থ নাই। এই গণ্ডিবদ্ধ স্বার্থের বাহিরে তাহারা কংগ্রেসের সাধারণ জলমিশান আদর্শগুলির সমর্থক।

অন্যদিকে ইউনাইটেড গোয়ান্স দল চাহেন যে, গোয়া, দমন ও দিউ যুক্তভাবে ভারতের আর একটি রাজ্যে গঠিত হউক, যাহাতে ইহার চার শতাব্দীতে অর্জ্জিত ও প্রাপ্ত সভ্যতার মূল রূপ থাকিয়া যায়। কিন্তু সেই সঙ্গেই ইঁহারা চাহেন যে, পুরাতন পোর্ত্তুগীজ আইনকানুন ও বিচার বিভাগ অপরিবর্ত্তিত থাকুক, যদিও পুরাতন বিচারবিভাগ একহিসাবে পোর্ত্তুগীজ পাদ্রীদিগেরই প্রভাবে চালিত হইত। এবং সেই সঙ্গে ইঁহারা প্রতিষ্ঠিত স্বার্থের সপক্ষে চরম দক্ষিণপন্থী।

কংগ্রেস যাঁহাদের হাতে ছিল তাঁহারা স্বাতন্ত্র্য-সংগ্রামে যাহারা প্রকৃত ভাবে যুক্ত ছিল তাহাদের অধিকাংশের আবেদন প্রত্যাখ্যান করিয়া নিজেদের পছন্দসই ও আজ্ঞাবহ ভাগ্যান্বেষীদিগকে মনোনয়ন দিয়াছিলেন। ফলে ঐভাবে প্রত্যাখ্যাত কয়েকজন গোমন্তক দলে যোগ দিয়া কংগ্রেসী প্রার্থীদের প্রচণ্ডভাবে পরাজিত করিয়াছে।

কম্যুনিষ্ট ও অন্য বামপন্থী কয়েকটি দল 'ফ্রেন্টে পপুলার' —অর্থাৎ সাধারণ জনের দল গঠন করে। ইহাদের কোনও চিহ্নই নির্ব্বাচনের পর দেখা যায় না।

এই ত গেল দলগত পরিচয় এই নির্ব্বাচনের প্রার্থী-দিগের। তারপর যাঁহারা কংগ্রেসের নেতারূপে সেখানে গিয়াছিলেন প্রচারকার্যে—তাঁহাদের কথা। পূর্ণ বিবরণ

এখনও আসে নাই। কিন্তু যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহাতে বুঝা যায় যে, কংগ্রেসের এই পরাজয়ের অনেকখানি কারণ ইহাদের উল্টাপাল্টা কথা। গোয়ায় যাঁহারা কংগ্রেসের নেতৃত্বে নিজেদের বসাইয়াছেন তাঁহাদের প্রার্থী মনোনয়ন ইত্যাদি কার্য্যকলাপ ভারতের কেন্দ্রে ও রাজ্যে যাঁহারা কংগ্রেসের উচ্চ অধিকারি, তাঁহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণে করা হয়। প্রভেদ এই যে, ভারতের কেন্দ্রে ও রাজ্য সরকারে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং সে সকল অঞ্চলে প্রসাদ ও "পারিতোষিক" বণ্টন তাঁহাদেরই হাতে। গোয়ায় এখনও তাহা হয় নাই সুতরাং যে-পথে এবারের ভারতীয় সাধারণ নির্ব্বাচনে কংগ্রেস জয়ী হইয়াছে, গোয়ার নির্ব্বাচন সে পথে চলে নাই। উপরন্তু গোয়ার জনসাধারণ এই প্রথম নির্ব্বাচনে খুব বেশী আগ্রহ দেখাইয়াছে এবং যে যাহা বলিয়াছে তাহা শুধু মনোনিবেশ করিয়া শুনিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, বক্তাদের ভাষণ বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছে ও প্রশ্নও করিয়াছে অজস্র। ভারতের যেভাবে শ্লোগান, বেকার যুবক-যুবতীর দৌরাত্ম্য ও জনসাধারণের ১৫শ নিস্ক্রিয়তার যোগ-বিয়োগের ফলে নির্ব্বাচন চলে, এখানে এই প্রথমবারে তাহা হয় নাই এবং সেই কারণে কংগ্রেসের প্রচণ্ডতম ভাগ্য-বিপর্যয় এই গোয়া-দমন-দিউ সাধারণ নির্ব্বাচনে ঘটিল।

এই ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে যদি কংগ্রেসের হাই-কম্যাণ্ডের চৈতন্য ফিরিয়া আসে তবেই ভাল। না হইলে গোয়ার পুনরাবৃত্তি আরও অনেক ক্ষেত্রেই হইবে। কংগ্রেসের ভিতর ভাঙ্গন ধরিয়াছে কিসের কারণে ও তাহার প্রতিকার কি, এ বিষয়ে মনগড়া বিচারে প্রাপ্ত উদ্ভট সিদ্ধান্ত যে কার্য্যকরী হয় না তাহার প্রমাণ এই সাধারণ নির্ব্বাচন। মুখের কথা ও হাতের কাজ বিপরীত হইলে এই হয়।

দুর্নীতি ও প্রশাসনিক শ্লথ উচ্ছেদ চেষ্টা

লোকসভা ও রাজ্যসভায় বিতর্ক ও আলোচনার ধারা কিছু ভিন্নপথে প্রবাহিত হইতেছে মনে হয়। এবারের প্রশ্নজালও যেন ভিন্ন ধরণের মনে হয় এবং তাহার উত্তর সন্তোষজনক না হইলে কংগ্রেসের নিজ দলের মধ্যেও বিরক্তি ও বিদ্রোহের লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

এই প্রশ্নোত্তর ব্যাপারে সরকারী মহলে দুর্নীতি ও শ্লথ এই দুইয়ের ব্যাপক প্রাদুর্ভাব সম্বন্ধে তীব্র অভিযোগ-অনুযোগের ফলে এখন দেখা যাইতেছে যে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমহলে কিঞ্চিৎ চেতনা আসিয়াছে। এতদিন ত এ জাতীয় প্রশ্ন বা অভিযোগের উত্তরে অতি রূঢ় তিরস্কার বা তির্যকভাবে অস্বীকৃতি দেওয়াই ছিল রীতি। উদাহরণস্বরূপে শ্রীমান মুরারজী দেশাইয়ের বাজেট ভাষণকালে রাজকুমারী অমৃত কৌরের সরকারী অপব্যয় অপচয় ও দুর্নীতির অভিযোগ ও উক্ত শ্রীমান-প্রদত্ত নির্লজ্জ বক্রোক্তি ও তিরস্কারের কথা উল্লেখ করা যায়। এখন কিন্তু অবস্থা অন্যরূপ, কেন না, ঐ ভাবে উত্তর দিলে আরও রূঢ় ও তীব্র পাল্টা জবাব আসিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং সেই সঙ্গে জনমতের ইঙ্গিতও ক্রমেই স্পষ্টভাবে বিরূপ হইতে দেখা যাইতেছে। তাই শেষ পর্য্যন্ত ঐ দুই অভিযোগের যে শুধু ভিত্তি আছে এ কথার স্বীকৃতি পাওয়া যাইতেছে এমন নয়, উপরন্তু উহার প্রতিকারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও অন্ততঃ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমণ্ডলে কিছু চিন্তার লক্ষণ দেখা গিয়াছে। এ বিষয়ে আনন্দবাজার জানাইয়াছেন যে :—

দুইটি নূতন এবং উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কেন্দ্রীয় সংস্থা গঠিত হইতে চলিয়াছে। একটির কাজ হইবে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই এবং অপরাধীদের শাস্তিবিধান। দ্বিতীয়টির মুখ্য উদ্দেশ্য, প্রশাসনিক ঢিলেমি দূর করা।

শনিবার (৭ই ডিসেম্বর) নয়াদিল্লীতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীনন্দ একথা ঘোষণা করিয়া বলেন যে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ কর্ম্মের দক্ষ এবং উপযুক্ত যন্ত্র হিসাবে প্রশাসন ব্যবস্থাকে প্রতি স্তরে ঠিকভাবে সংস্কার, পুনর্গঠন ও আধুনিকীকরণের কথা চিন্তা করা হইতেছে।

প্রথম সংস্থাটি কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ছাঁচে গড়া হইবে। উহার নাম হইবে 'সেণ্ট্রাল ভিজিলেন্স কমিশন।' এই কড়ানজর সংস্থাটির কাজ হইবে কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক কাঠামোয় লুকাইয়া থাকা দুর্নীতি খুঁজিয়া বাহির করা এবং নির্ভয়ে ও পক্ষপাতশূন্য ভাবে অপরাধীদের শাস্তি-বিধানের ব্যবস্থা করা।

কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মত এই নূতন কেন্দ্রীয় সংস্থাও সরকারের নিকট একটি করিয়া বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করিবেন। সংস্থার কোন্ কোন্ সুপারিশ বা উপদেশ অগ্রাহ্য করা হইয়াছে তাহার একটি তালিকা রিপোর্টে থাকিবে। রিপোর্টটি সংসদে পেশ করা হইবে।

এই নূতন কমিশন—বিশেষ পুলিস সংস্থা, বিভিন্ন দপ্তর-স্তরীয় তদন্ত ও মন্ত্রণালয়গুলির নিজস্ব দুর্নীতি দমন ব্যবস্থার কাজকর্ম্ম সমীক্ষা করিতে পারিবেন।

দ্বিতীয় সংস্থাটির (এজেন্সি) মুখ্য কাজ হইবে সরকারী কাজে ঢিলেমি, সুবিবেচনা ও শিষ্টাচারের অভাব, এবং অন্য ধরণের অব্যবস্থা প্রসঙ্গে জনগণের অনুযোগ সম্পর্কে ব্যবস্থা করা।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একটি নূতন বিভাগ স্থাপনের কথাও জানান। ইহার নাম হইবে প্রশাসনিক সংস্কার বিভাগ, 'ডিপার্টমেণ্ট অব অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ রিফর্ম্মস।' এই দপ্তরের কাজ হইবে

সমস্ত প্রশাসনিক কাঠামোকে কল্যাণরাষ্ট্রের উপযোগী করিয়া তোলা।

শ্রীনন্দ স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সংশ্লিষ্ট ঘরোয়া সংসদীয় কমিটির বৈঠকে এই সংবাদ প্রকাশ করিয়া আরও বলেন যে, রাজ্য-গুলিও এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে পারেন।

আরও পরের খবরে আছে:

নয়াদিল্লী, ১২ই ডিসেম্বর: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ আজ রাজ্যসভায় বলেন যে, কেন্দ্র ও রাজ্য হইতে দুর্নীতির মূলোচ্ছেদের জন্য যাহাতে একটি পথ গ্রহণ করা হয়, সেজন্য তিনি বিভিন্ন রাজ্যের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীদের এক সম্মেলন আহ্বানের বিষয় বিবেচনা করিতেছেন।

রাজ্যসভায় প্রশ্নোত্তরের সময় নন্দজী বলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের কর্ম্মচারীদের জন্য প্রস্তাবিত ভিজিলেন্স কমিশন ছাড়াও মন্ত্রীদের এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনা হইলে কিভাবে তাহার নিষ্পত্তি করা হইবে, সরকার তাহাও চিন্তা করিয়া দেখিতেছেন।

শ্রীগুলজারীলাল নন্দ বর্ত্তমান "কামরাজ ছাঁটা" কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার একজন শক্তিশালী মন্ত্রি। ইঁহার সততার খ্যাতি আছে, এবং "কামরাজ ছাঁটাই" পর্ব্ব শেষ হওয়ায় অন্ততঃ দুই বৎসরের মত নিশ্চিন্ত অবস্থা আছে। সুতরাং দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হইবার যোগ্যতা কিছুটা আছে। অন্যদিকে আছেন দুর্নীতিপরায়ণ অসংখ্য ছোট-বড়-মাঝারি অধিকারী, প্রত্যেকটি দপ্তরেও সম্ভবতঃ বেশ কয়েকটি উচ্চাসনে। এবং সেই সঙ্গে আছেন এই সকল দুর্নীতিপরায়ণ লোকের "খুঁটি" শ্রীনেহরু, চাটুকারবৎসল, স্বজন ও অনুচরজন-পোষক। ইঁহারা "কর্ণেন পশ্যতি" নীতির ও অনুচর-বাৎসল্যের ফলেই সমস্ত দেশের প্রশাসনিক ও পরিচালনিক সংস্থা দুর্নীতি ও ঢিলেমির আগাছায় ছাইয়া গিয়াছে। এখন ঐ প্রতিষ্ঠানগুলিকে ঐ আগাছার শাখা-প্রশাখা ও শিকড়ের জাল হইতে মুক্ত করা যে কি দুঃসাধ্য কাজ, তাহা শ্রীনন্দ বোধ হয় ক্রমে বুঝিবেন। তবে এই কাজ এখনই আরম্ভ না করিলে দেশের উন্নয়ন বা প্রগতির সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইবে।

এই কাজের বাধা অনেক, তার মধ্যে আছে আমাদের সংবিধান, যাহা জুয়াচোর, ঠগ ও দুরাচারির পরিত্রাণ ও পরিশোষণ জন্যই যেন বিশেষ করিয়া গঠিত হইয়াছে। দুর্নীতির প্রধান সহায়ক হইল অসৎ উপায়ে অর্জ্জিত ঐশ্বর্য্যের মালিক-শ্রেণী। এই পুঁজিপতির দল যতদিন প্রশাসনিক ও পরিচালনিক সংস্থা এবং কেন্দ্রীয় সংসদ ও রাজ্য অঞ্চলের বিধানমণ্ডলিকে প্রভাবিত ও আচ্ছন্ন করিতে পারিবে ততদিন এদেশের মন্ত্রিসভাগুলি দুর্নীতিমুক্ত হইতে পারিবে না। ঐ পুঁজিপতিদের দমনের জন্য কঠোর ব্যবস্থা না করিলে দুর্নীতি দমনের ও প্রশাসনিক শ্লথ নিবারণের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইবে।

যে দুইটি সংস্থা গঠনের চেষ্টা শ্রীনন্দ করিতেছেন তাহার আকার-প্রকারে ও ক্ষমতার কোনও নির্দ্দেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত সে বিষয়ে আলোচনা বৃথা। তবে এ বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই যে, যদি উহাতে পেশাদার রাষ্ট্রনীতিক ধুরন্ধরবর্গ তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষক অধিকারীবর্গের প্রতিনিধি যদি বেশী থাকে তবে ঘুষ দেওয়া-নেওয়ার আর একটি বা কয়েকটি ঘাঁটি স্থাপিত হইবে মাত্র।

পাপ অনেক দূর গিয়াছে, তাহার প্রমাণ ত চতুর্দ্দিকে। পাঁচশালা পরিকল্পনা ত একে একে তিনটি শেষ হইতে চলিল। অথচ দেশের দারিদ্র্য, শিক্ষার অভাব, স্বাস্থ্য সংস্কৃতির অধঃপতন ত বাড়িয়াই চলিতেছে। সব কিছুরই মূলে রহিয়াছে দুর্নীতি ও শ্লথ। কংগ্রেসে চৈতন্যের উদয় ত এখনও দেখা যায় নাই। শ্রীনন্দের চেষ্টা জয়যুক্ত হউক।

পরলোকে মার্কিন রাষ্ট্রপতি জন কেনেডি

গত ২২শে নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জন কেনেডি আততায়ীর গুলীতে নিহত হইয়াছেন। মৃত্যু যে এমন অতর্কিত আক্রমণে সারা পৃথিবীর মর্ম্মমূল ধরিয়া নাড়া দিতে পারে, একদিন আগেও তাহা অভাবনীয় ছিল। এ মৃত্যু যেমন বেদনাদায়ক, তেমনি মহান। পৃথিবীতে যাঁহারা ভাল করিতে আসেন তাঁহাদের আত্মাহুতি বোধহয় এইরূপই। এই একই কারণে প্রেসিডেন্ট লিঙ্কন আততায়ীর গুলীতে নিহত হন। তিনি তখন সাফল্যের সর্ব্বোচ্চ শিখরে। কিন্তু কেনেডি? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তরুণতম প্রেসিডেন্ট তাঁহার অসংখ্য শুভ-সংকল্প ও প্রয়াস অসমাপ্ত রাখিয়া জীবনের মধ্যপথেই বিদায় লইতে বাধ্য হইলেন। কি ছিলেন কেনেডি, মাত্র তিন বৎসর রাষ্ট্রপরিচালনার গুরু দায়িত্ব পালনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই তরুণতম প্রেসিডেন্ট এমন কি কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, লক্ষ-লক্ষ হৃদয়ে আশার আলোক জ্বালাইয়াছেন, যাহার জন্য সারা আমেরিকার ও পৃথিবীর দেশে দেশে অগণিত মানুষ আজ শোক-বিহ্বল?

মাত্র তিনটি বৎসরে আমরা কি দেখিলাম—এই তিন বৎসরে তাঁহার নেতৃত্বে আমেরিকার ঘরে ও বাহিরে রাজ-নীতিতে নূতন সুর তিনি সংযোজন করিয়া গেলেন। সে সুর উদার মানবতার। নিগ্রো জাতির দুর্গতি দূরীকরণে সকল বাধা তুচ্ছ করিয়া, যে পথে তিনি আগাইয়া গিয়া-ছিলেন, সেই পথেই তাঁহার মৃত্যু হইল। স্বদেশে তিনি যে

ব্যাপক পরিবর্ত্তনের সূচনা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—তাঁর কর-হ্রাস-সংক্রান্ত প্রস্তাব, আমেরিকান অনুন্নত এলাকাগুলিতে—বিশেষতঃ শিল্পব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের কারণ যেখানে আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্য দেখা দিয়াছে, সেখানে ঢালাও আর্থিক সাহায্যদানের ব্যবস্থা, ব্যাপক হারে গৃহ-নির্ম্মাণ পরিকল্পনা, বার্দ্ধক্যে চিকিৎসাদান ব্যবস্থা এবং দেহ-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকল মার্কিন নাগরিকের জন্য সমানাধিকার আদায়। শেষোক্তটি প্রেসিডেণ্ট কেনেডির রাজনৈতিক কর্ম্মসূচীতে বৃহত্তম, মহত্তম সংকল্প।

আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতায় বিশ্বাসী কেনেডির কাছে এশিয়া আফ্রিকার অগ্রসরমান দেশগুলির ঋণও কম নয়। বিশেষতঃ ভারত তাঁর আন্তরিকতা এবং উদ্যমের কাছে চিরকাল ঋণী থাকিবে। তাঁর একাধিক বক্তৃতায় প্রেসিডেণ্ট বার বার প্রমাণ করিয়াছেন তিনি 'ভারত-বান্ধব'। ১৯৬১ সনের নভেম্বরে প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে ওয়াশিংটনে সম্বর্দ্ধনা জানাইতে গিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, মার্কিন দেশ আজ যে-আদর্শের প্রতিভূ, আপনি এবং আপনার দেশ ভারত সেই আদর্শের জীবন্ত ইতিহাস—আমি আপনাকে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে গ্রহণ করি।

আব্রাহাম লিঙ্কন ও সেদিনের রিপাবলিকান দলের পর ডেমোক্রাট প্রেসিডেণ্ট কেনেডিই প্রথম—শুধু মৌখিক সহানুভূতি নয়, হাতে-কলমে প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন নিগ্রোদের সমানাধিকার দাবির তিনিও একজন সমর্থক।

পরলোকে সর্দ্দার পানিক্কর

সর্দ্দার কে. এম. পানিক্কর গত ১০ই ডিসেম্বর পরলোকে গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৮ বৎসর হইয়াছিল। তিনি একজন প্রখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তি, ঐতিহাসিক প্রশাসক শিক্ষাব্রতী ও কূটনীতিবিদ ছিলেন।

১৮৯৫ সনের ৩রা জুন কেবলম মাধনম পানিক্কর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মাদ্রাজে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া অক্সফোর্ড কাইষ্ট চার্চ্চ কলেজে অধ্যয়ন করেন। এবং পরে মিডল টেম্পল হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া আসেন। তিনি আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের কাজ করেন, কিন্তু পরে 'হিন্দুস্থান টাইমস' পত্র সম্পাদনায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখান। তাঁহার জীবন বৈচিত্র্যময়। ১৯৪৪ সনে বিকানীর রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৪২ সনে কানাডার প্রশান্ত মহাসাগরীয় সম্মেলনে ভারতীয় সামন্ত রাজ্যসমূহের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৪৫ সনে তিনি লণ্ডনস্থ কমনওয়েল্‌থ সম্মেলনেও সামন্ত রাজ্যসমূহের প্রতিনিধিত্ব করিয়াছিলেন। ১৯৪৭ সনে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর পানিক্কর রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে ভারতীয় প্রতিনিধিদলে ছিলেন। তাহার পর ১৯৪৮ সনে তিনি চীনে ভারতের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন এবং পাঁচ বৎসর পরে মিশরে ভারতের রাষ্ট্রদূত হইয়া চলিয়া যান। পানিক্কর দীর্ঘকাল সামন্ত রাজ্যসমূহে অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ পদে কাজ করিয়া গিয়াছেন, শুধু তাহাই নহে, ব্রিটিশ আমলেও তিনি আন্তর্জ্জাতিক আইন সম্পর্কে একজন সুপণ্ডিত বলিয়া খ্যাত ছিলেন।

ইতিহাস, শিক্ষা, সাংবাদিকতা ও কূটনীতি সর্ব্ববিষয়েই সর্দ্দার পানিক্কর তাঁর পাণ্ডিত্য, দূরদর্শিতা এবং মৌলিকতার নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুতে আমরা ব্যথিত।

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীকরুণা কুমার নন্দী

কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টে খাদ্য-বিতর্ক

গত ২রা এবং ৩রা ডিসেম্বর তারিখে কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টের লোক সভায় যে খাদ্য-বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয় তার ফলে দেশে বর্ত্তমান খাদ্য-সঙ্কট সম্বন্ধে একটা সত্যকার বাস্তব সিদ্ধান্ত কিংবা এই সঙ্কট-মোচনের কোন কার্য্যকরী পন্থা যে উদ্ভাবিত হবার সম্ভাবনা আছে, এমন আশা পোষণ করবার কোন কারণ দেখা যায় না। বিতর্ক-কালে কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রী এ এম্ টমাস যা বলেন তার সংক্ষিপ্তসারটুকু এই ঃ—

(ক) খাদ্য-সঙ্কট ইতিমধ্যেই নিরসনের পথে অগ্রসর হ'তে সুরু করেছে এবং অচিরেই পরিস্থিতি যে অনেকটা উন্নত হয়ে উঠবে এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিত

(খ) সমগ্র দেশেই এবং বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে আগামী ফসলের পরিমাণ যে পূর্ব্বের তুলনায় অনেকটাই বেশী হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই এবং চিনির কলগুলিতে বর্ত্তমান উৎপাদনের গতি লক্ষ্য ক'রে আশা করা যায় যে চিনির নির্দ্দিষ্ট উৎপাদন লক্ষ্যে পৌঁছুতে এবার কোন বিঘ্ন ঘটবে না;

অতএব তিনি আশা করেন যে সম্প্রতি বিভিন্ন রাজ্য এলাকায় এবং বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রে যে খাদ্যসঙ্কট দেখা দিয়েছিল, সেটা সম্পূর্ণ কাটিয়ে ওঠা যাবে।

এই প্রসঙ্গে শ্রী টমাস খাদ্যসঙ্কটের পুনরুদ্ভাবন নিবারণকল্পে সরকার খাদ্য-ব্যবসায়টির নিয়ন্ত্রণের জন্য কি কি পন্থা অবলম্বন করেছেন তার পুনরুক্তি করেন, কিন্তু খাদ্য-ব্যবসায়টির সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীকরণে যে তিনি গররাজি, এই কথাটাও স্পষ্ট করেই বলেন। তিনি বলেন—

(১) খাদ্য সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যেই বিশেষ করে সঙ্কটজনক অবস্থা উদ্ভূত হয়। এই পরিস্থিতির কারণ-বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে গত মে মাস থেকে সুরু ক'রে ওড়িষা থেকে পশ্চিমবঙ্গে চাউল আমদানী বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এই রাজ্যে চাউলের দর অতিরিক্ত বৃদ্ধি পায়। ব্রহ্মদেশ, নেপাল ও কেন্দ্রীয়-মজুত থেকে চাউল আমদানীর ফলে এই মূল্যবৃদ্ধি খানিকটা প্রশমিত হয়, কিন্তু আগষ্টের শেষ ভাগ থেকে ব্যবসায়ীদের মজুত কমতে থাকায় মূল্যমানের ওপর আবার চাপ বাড়তে থাকে এবং এই সম্পর্কে কয়েকটি সংবাদপত্রে শঙ্কাজনক সংবাদ প্রকাশিত হবার ফলে অক্টোবরে আবার হঠাৎ অধিকতর মূল্যবৃদ্ধি সুরু হয়।

(২) এই দুই-তিন মাসের টালমাটাল ব্যতীত, দেশের খাদ্যপরিস্থিতি সম্বন্ধে বর্ত্তমান বৎসরে আর কোন আশঙ্কার কারণ ঘটে নাই।

(৩) খাদ্যমূল্যস্থিতি নিয়ন্ত্রণকল্পে সরকার যে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তার মধ্যে অন্যতম কেন্দ্রীয় তহবিলে ৪০ লক্ষ টন গম ও ২০ লক্ষটন চাউল মজুত করা। বস্তুতঃ গমের মজুতের পরিমাণ ইতিমধ্যেই যথেষ্ট "নিশ্চিন্ততাব্যঞ্জক" (Comfortable) এবং যখনই কোন রাজ্যের প্রয়োজন ঘটবে তখনই ঘাটতি এলাকায় এই মজুত থেকে অবিলম্বে যতটা প্রয়োজন গম সরবরাহ করবার ব্যবস্থা এখনই সম্ভব।

(৪) সাধারণতঃ খাদ্যমূল্যস্থিতি রক্ষাকল্পে ব্যবসায়ীমহল সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে এসেছেন বটে, কিন্তু কোন কোন অঞ্চলে সাময়িক ঘাটতির সুযোগ নিয়ে তাঁরা যে ইচ্ছাকৃত মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়ে জনসাধারণ ও সরকার উভয়কেই বিব্রত করেছেন, সে বিষয়েও সন্দেহ নাই।

(৫) কেন্দ্রীয় সরকার খাদ্যস্থিতি রক্ষাকল্পে প্রয়োজনবোধে রাজ্য সরকারগুলিকে অর্থসাহায্য করতে প্রস্তুত আছেন এবং সাংগঠনিকভাবেও বিবেকহীন ব্যবসায়ীরা যাতে খাদ্য-মূল্যবৃদ্ধি করতে না পারেন তার জন্য সাহায্যদান করতে প্রস্তুত আছেন। ব্যবসায়ীদের নিকট মজুত মাল নির্দ্ধারিত মুনাফায় এবং উচিত মূল্যে বিক্রয় করতে সরকার তাঁদের বাধ্য করবেন। চাউলের মূল্য-পরিসংখ্যান ১৩৩·১ পর্য্যন্ত উঠেছিল কিন্তু নভেম্বরের শেষ ভাগে কমে গিয়ে ১২৬-এ দাঁড়ায়।

খাদ্যমূল্য-সমতা রক্ষা প্রসঙ্গে শ্রী টমাস বলেন যে, ১৯৫৭ সনে প্রভূত ফসল সত্ত্বেও খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই বিষয়টি বিশেষ করে অশোক মেহতা কমিটির অনুসন্ধান ও বিবেচনার বিষয়ভুক্ত করা হয়েছিল। বর্ত্তমান বৎসরে আশানুরূপ ফসল না হওয়া সত্ত্বেও সাধারণতঃ মূল্যমান স্থিরই ছিল এবং কোন কোন সময়ে কিঞ্চিৎ নিম্নাভিমুখীও হয়েছিল দেখা গিয়েছে।

তিনি বলেন যে নানা বিভিন্ন কারণে মূল্যবৃদ্ধি ঘটে থাকে। বাজেট-সূচীত নানা আর্থিক ব্যবস্থা, বর্দ্ধমান পরিকল্পনা-লগ্নী, দেশরক্ষা খাতে অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দ, রাজস্বের ক্রমবর্দ্ধমান চাপ, বর্দ্ধিত বাহন-খরচ (freight rates) ইত্যাদি খাদ্যমূল্যবৃদ্ধি ঘটানয় সহায়তা করেছে। যথা, পঞ্জাব রাজ্যের কৃষি-পণ্য-বিক্রয় আইন (punjab Agricultural Market Act) ঐ রাজ্যে অন্ততঃ ৩·৬% মূল্যবৃদ্ধি ঘটায়। তেমনি কতগুলি কেন্দ্রীয় আইনের প্রয়োগের ফলে কৃষিপণ্যের মূল্য ২% থেকে ৪% পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

শ্রী টমাস এই প্রসঙ্গে আরও অনেক কথা বলেন যার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তাঁর মন্ত্রণালয়ের উচ্চতম অধিকর্ত্তা সর্দ্দার স্বর্ণ সিং পরে এই বিতর্ক প্রসঙ্গে যাহা বলেন তাতে আগামী ফসলের প্রাচুর্য্য ও নিম্নতর মূল্যমান প্রতিষ্ঠিত হবার আশা প্রকাশ করবার অধিক খাদ্য সম্বন্ধে তাঁদের যে আরও কিছু ভাববার আছে, কিংবা এ সম্পর্কে সরকারের কোন সুপরিকল্পিত ব্যবস্থার আয়োজন আছে এমন আভাস পাওয়া যায় নাই। বস্তুতঃ এ সম্পর্কে ষ্টেট্‌সম্যান পত্রিকার খ্যাতনামা লেখক শ্রীভূষণ ভাটিয়া সরকারের নীতিটিকে hand to mouth নীতি বলে বর্ণনা করেছেন।

শ্রী টমাস মূল্যবৃদ্ধি সম্বন্ধে সাধারণতঃ যা বলেছেন সেটা বিষয়টির একটি আংশিক চিত্রমাত্র সূচীত করে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে কতকগুলি সরকারী আর্থিক নীতি ও সেগুলির প্রয়োগ, বিশেষ করে রাজস্ব নীতি সাধারণতঃ মূল্যবৃদ্ধিকারক বলে প্রমাণিত হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৫০-৫১ সনে প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার প্রয়োগের প্রাক্কালে এদেশে গড়পড়তা মাথাপিছু ট্যাক্সের পরিমাণ ছিল ৮৲ টাকা মাত্র; এর মধ্যে পরোক্ষ করের মোট পরিমাণ ছিল মাত্র ৭%। বর্ত্তমান বৎসরে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির ট্যাক্সের মাথাপিছু পরিমাণ প্রায় ৩৭৲ টাকায় এসে দাঁড়িয়েছে এবং এর মধ্যে পরোক্ষ করের পরিমাণ এখন প্রায় ৭৪%; এবং এই পরোক্ষ করভারের প্রায় ৫০% অবশ্যভোগ্য পণ্যাদির উপর আবগারী শুল্ক, বিক্রয়কর ইত্যাদির রূপে প্রয়োগ করা হয়েছে। এই প্রকার রাজস্বনীতির ফলে। যে মূল্যমানের ওপর চাপ অবশ্যম্ভাবী বর্ত্তাবে, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কোথায়। তা ছাড়া ভোক্তার দিক থেকে—এ সকল শুল্কের ফলে—সরকারের প্রাপ্য দাবির থেকেও যে অনেক বেশী মূল্য দিতে হয় এবং এই অতিরিক্ত অংশটি যে বিক্রেতা আত্মসাৎ করে, তাহাতে সন্দেহের কারণ নেই।

কিন্তু শ্রী টমাস একটা কথা মোটেই খোলসা করে বলেন নাই, সেটা এই যে, সাধারণ মূল্যমানের তুলনায় খাদ্যমূল্যবৃদ্ধি অনেক বেশী পরিমাণে ঘটেছে। শ্রী টমাস তাঁর মূল্য-পরিসংখ্যান কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন জানি না, কিন্তু সরকারী পাইকারী মূল্য পরিসংখ্যানের তালিকা থেকে দেখতে পাওয়া যায় যে, ১৯৫০-৫১ সনের তুলনায় ১৯৬২-৬৩ সনে সাধারণ মূল্যমানের পরিসংখ্যানের সংখ্যা ছিল ১১৯, কিন্তু খাদ্যমূল্যের পরিসংখ্যানের উচ্চতা ছিল ১৩৫·৮। কলিকাতায় (এবং সাধারণতঃ পশ্চিমবঙ্গে) চাউলের খুচরা মূল্য ১৯৬৩ সনের ৩০শে এপ্রিল তারিখে পূর্ব্ব বৎসরের ঐ দিনের তুলনায় ছিল ৫৮% অধিকতর এবং ১২ই অক্টোবর ১৯৬৩ সনে এপ্রিলের দরের তুলনায় ছিল আরও প্রায় ৩০% অধিক। শ্রী টমাস তাঁর বক্তৃতায় এ সকল তথ্যের বিন্দুমাত্র উল্লেখও করেন নাই।

অন্য একটি প্রসঙ্গে শ্রী টমাস উচ্চতর খাদ্যমূল্যের অজুহাত হিসাবে বাজারে চলতি অর্থের বৃদ্ধির পরিমাণের উল্লেখ করেন। কথাটা উপেক্ষণীয় নয়। তবে শ্রী টমাস হয়ত ইচ্ছা করেই একথা উহ্য রেখে গিয়েছেন যে, এই প্রভূত পরিমাণ অতিরিক্ত অর্থ বাজারে চালু হবার প্রধানতম কারণ গত ৭ বৎসরে এবং বিশেষ করে তৃতীয় পরিকল্পনার গত দুই বৎসরে সম্পূর্ণ অসার্থক পরিকল্পনা-লগ্নী।

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, লোকসভার কোন সদস্যই শ্রীটমাসকে এ বিষয়ে এবং বিশেষ করে সাধারণ মূল্যমানের তুলনায় খাদ্য-মূল্যের অধিকতর বৃদ্ধির বিষয়ে চাপিয়া ধরিতে সক্ষম হন নাই। মনে হয় যে এ বিষয়ে তাঁহাদের কোনই প্রস্তুতি ছিল না। কর্ত্ত্য সম্বন্ধে কিরূপ উদাসীন ও প্রস্তুতির দিক দিয়ে অক্ষম ব্যক্তিবর্গকে আমরা আমাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করে থাকি, এটা তার একটা বিশিষ্ট উদাহরণ।

মোটামুটি খাদ্যবিতর্ক থেকে এমন কোন আভাস পাওয়া যায় নাই যে, কেন্দ্রীয় সরকারের এই বিষয়ে সত্যকার কোন কার্য্যকরী পরিকল্পনা রচনা ও তাহার সার্থক প্রয়োগ করবার মত বুদ্ধি, বিবেচনা বা সত্যকার ক্ষমতা আছে। বিরোধী দল সরকারী নীতি (বা তাহার অভাব) নিয়া সন্তুষ্ট হন নাই। এমন কি কোন বিশিষ্ট কংগ্রেস সদস্যও এ বিষয়ে তাঁদের অসন্তোষ স্পষ্ট করেই জানিয়েছেন। কিন্তু তাঁদেরও যে এ বিষয়ে কোন বাস্তব বিচার বা সিদ্ধান্তের প্রস্তুতি আছে—কেবলমাত্র একটি মূল্যস্থিরতা-নির্দ্ধারক কমিটি গঠন করা ছাড়া—তাহারও কোন প্রমাণ মেলে নাই।

বস্তুতঃ দেশের খাদ্য পরিস্থিতির কোন বাস্তব মূল্যায়ন যে ১৯২৮ সনের পর থেকে আর হয় নাই, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই মূল্যায়নটি না হলে সমস্যার সত্যকার রূপের সঙ্গে পরিচয় ঘটবার সম্ভাবনা নেই এবং সেটা না হওয়া পর্য্যন্ত সমাধানের উপায় রচনা করাও সম্ভব নহে। আমাদের সবজান্তা মন্ত্রীমণ্ডলীর যে এই বিষয়ে কোন সত্যকার বোধ আছে তাহার কোন প্রমাণ পাই নাই। এরূপ একটি বাস্তব মূল্যায়ন যে একান্ত জরুরী হয়ে পড়েছে সে বোধটি জাগরূক করা খুব সহজ হবে বলে মনে হয় না।

পার্লামেণ্টে প্ল্যান প্রসঙ্গ

গত ৬ই ডিসেম্বর থেকে সুরু করে কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টে তৃতীয় পরিকল্পনা ও সাধারণতঃ উন্নয়ন পরিকল্পনার গতি ও প্রকৃতি বিষয়ে যে ছয়দিনব্যাপী বিতর্ক হয়ে তার বাস্তব ফলাফল কি হয়েছে বা হবার সম্ভাবনা আছে তার চিত্রটা যে খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এমন কথা দাবী করা চলে না। এই বিষয়ে একটা কথা অবশ্য খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সেটা এই যে, উন্নয়ন পরিকল্পনা ও তার রূপায়ণের গতি ও প্রকৃতি কেবলমাত্র বিরোধী দলসমূহের তীব্র সমা-লোচনার বিষয়ে আবদ্ধ থাকে নাই, কংগ্রেস দলেরও বিশিষ্ট নেতৃবর্গও ইহার সমালোচনা করেছেন।

বস্তুতঃ পার্লামেণ্টে বিষয়টি আলোচিত হবার অব্যবহিত পূর্ব্বে কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দলের একটি অধিবেশনে বিষয়টি আলোচিত হয়। কংগ্রেস দলের বিশিষ্ট নেতা ও মহীশূর রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব মুখ্যমন্ত্রী শ্রী কে. হনুমন্থাইয়া এই অধিবেশনে অভিযোগ করেন যে উন্নয়ন পরিকল্পনার অসার্থকতার দায়িত্ব বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রীকে স্বয়ং স্বীকার করতেই হবে; তাঁর

সীমাহীন ক্ষমতা এবং তার দ্বিধাহীন প্রয়োগই এই ব্যর্থতার প্রধান কারণ (The Prime Minister must take personal responsibility…for the simple reason that his authrity was all pervasive and almost absolute)। তিনি বলেন যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী-মণ্ডলীর সকল মন্ত্রী এবং পরিকল্পনা কমিশনের সভ্যবৃন্দ সকলেই প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকেন, ফলে আর কিছু বা কাহারও প্রতি তাঁহাদের কোন দায়িত্ব আছে এমন মনে করেন বলে মনে হয় না। কংগ্রেস দলের অন্যতম বিশিষ্ট নেতা ডাঃ এম্. এম্, সিধু বলেন, উন্নয়ন পরিকল্পনার ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান কারণ গণতান্ত্রিক সংস্থাসমূহের উপর (democratic institutions) সরকারী দপ্তরগুলির (bureaucracy) অপ্রতিহত ক্ষমতা ও প্রভাব। কংগ্রেস কোষাধ্যক্ষ শ্রীরামেশ্বর তাঁতিয়া উল্লেখ করেন যে, তৃতীয় পরিকল্পনার ২০টি প্রধান লক্ষ্যের অন্ততঃ ১৫টি ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়েছে। এই অধিবেশনে প্রস্তাব করা হয় যে, উন্নয়ন পরিকল্পনা কমিশনটিকে কেবলমাত্র উচ্চতম মন্ত্রীদের নিয়ে পুনর্গঠন করা প্রয়োজন যাতে তাঁদের প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য সর্ব্বতোভাবে দায়ী করা সম্ভব হয়।

পার্লামেণ্টে এই বিষয়ে বিতর্ককালে সমালোচনার ধারা দুইটি বিশিষ্ট পথে অগ্রসর হয়। স্বতন্ত্র নেতা শ্রীমাসানী এবং তাঁর মতাবলম্বী দলের সভ্যগণ বলেন যে, এই পর্য্যন্ত তৃতীয় পরিকল্পনার রূপায়ণের গতি সম্পূর্ণ অসার্থক কল্পনা, অর্থের প্রভূত অপচয়, সরকারী ক্ষমতার অতিরিক্ত অপ-প্রয়োগ, ও ঘনায়মান অসন্তোষের পথে প্রবাহিত হয়েছে। জাতীয় ভবিষ্যৎ বন্ধক রেখে এরকম উন্নয়ন পরিকল্পনার অনুসরণ করে যাবার কোন নৈতিক অধিকার কোন সরকারের নাই। তার বদলে উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষতিকারক পথে আর অগ্রসর না হয়ে সমস্ত ব্যবস্থাটাকেই বাতিল করে দেওয়া একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কংগ্রেস দলের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের মধ্যেও অনেকে সমালোচনার তীব্রতায় কম যান নাই। ডাঃ হরেকৃষ্ণ মহতাব বিদ্রূপ করে বলেন যে, যদিও ছোট ছোট সেচ ব্যবস্থার অধিকাংশই ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে, তবু আজ পর্য্যন্ত সেগুলিকে কৃষি-উন্নয়নের চিহ্নস্বরূপে সরকারী কাগজপত্রে দাবী করা হয়ে থাকে। তা ছাড়া, তিনি বলেন কৃষি উৎপাদনের যে সব হিসাব আজ পর্য্যন্ত প্রচার করা হয়েছে, তার বেশীর ভাগই সম্পূর্ণ কাল্পনিক, অবাস্তব ও ভুল। এ ছাড়া ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্প-সমূহ সম্বন্ধে সরকারী নীতি স্পষ্টতঃই পরস্পরবিরোধী,—ফলে দেশের অনেক ক্ষুদ্র শিল্প আজ সম্পূর্ণ মৃতাবস্থায় উপস্থিত হয়েছে।

বিতর্ককালে এরূপ অসংখ্য এবং তীব্র সমালোচনা কংগ্রেস ও বিরোধী, উভয় পক্ষ থেকেই করা হয়েছে। এর মধ্যে একটা বিশিষ্ট অভিযোগ এই যে, গত দশ বৎসরের তথা-কথিত গণতান্ত্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনার ফলে আজ দেশের অর্থ পূর্ব্বের থেকেও আরও বেশী পরিমাণে ক্ষুদ্রতম সংখ্যক ধনীর হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে এবং দরিদ্রের দারিদ্র্য আরও বেশী হয়ে পড়েছে। কেহ কেহ অভিযোগ করেন যে, এই ধারাটি কতদূর এগিয়েছে তার একটি বাস্তব চিত্র দেশের লোকের কাছে প্রকাশ করবার দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার উদ্দেশ্যেই সরকার এতদিনের মধ্যেও এই সম্পর্কে মহলানবীশ কমিটির রিপোর্টটি প্রচার করতে দ্বিধা করছেন।

সরকার পক্ষে এই বিতর্কে প্রধান মুখপাত্র ছিলেন প্রথমতঃ নূতন পরিকল্পনা মন্ত্রী শ্রী বি, আর, ভগৎ। তিনি প্রথমতঃ এই কথা বলে সমালোচনার তীব্রতা প্রশমিত করবার চেষ্টা করেন যে সমালোচকেরা পরিকল্পনা রূপায়ণের কেবল অসার্থকতার দিকটাই দেখিতেছেন, কিন্তু পরিকল্পনানুযায়ী গত দশ বৎসরে দেশের যে প্রভূত আর্থিক উন্নতি সাধিত হয়েছে, সেই বিষয়টা তাঁরা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে গিয়েছেন। তিনি বলেন যে সরকার এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন এবং প্ল্যানিং কমিশনের অন্তর্ব্বর্ত্তী মূল্যায়নের ফলে একটা বাস্তব চিত্র এখন পাওয়া গিয়াছে। অবস্থাটা আশঙ্কাজনক (disconcerting) এ কথা অস্বীকার করা চলে না, কিন্তু সরকার এখন পরিকল্পনাটির সম্পূর্ণ সার্থকতা ঘটাবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছেন। এই সম্পর্কে সরকার যে-সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তার মধ্যে অন্যতম :—

(ক) কৃষি-উৎপাদন বোর্ড প্রতিষ্ঠা ;

(খ) আগামী বৎসরে অধিকতর ফসল উৎপাদনের উপর জোর দেওয়া ;

(গ) প্রজেক্ট সম্বন্ধীয় গবেষণার জন্য বিশেষজ্ঞ সংস্থা-গুলিকে আরও জোরদার করা ;

(ঘ) লগ্নীবৃদ্ধির অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করা ; এবং

(ঙ) ভূমি-সংক্রান্ত সংস্কার-কার্য্য দ্রুততর করবার জন্য কমিটি গঠন।

সরকার পক্ষে এই বিতর্কে অন্যতম প্রধান মুখপাত্র ছিলেন অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারী এবং প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং। শ্রীকৃষ্ণমাচারী বলেন যে, এই উন্নয়ন পরিকল্পনার পথে অগ্রসর হওয়া বাঘের পিঠে সওয়ার হওয়ার মতন। একবার এই বাহকের পিঠে সওয়ার হবার পর আর নেবে দাঁড়ান চলে

না—তা হ'লে চালককে বাহকেরই গ্রাস হতে হবে। অতএব যাহাই এ পর্য্যন্ত ঘটে থাকুক না কেন, পরিকল্পনার পথ ত্যাগ করা সম্ভব নয়, এই পথেই অগ্রসর হয়ে চলতে হবে। একমাত্র উপায় ক্রমাগত উৎপাদন বৃদ্ধি করে চলা। তিনি স্বীকার করেন যে, পরিকল্পনার ফলে হয়ত মুষ্টিমেয় সংখ্যক লোকের হাতে অর্থ ও সম্পদ পূর্ব্বের তুলনায় আরও বেশী কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছে। তিনি বলেন যে, উৎপাদনবৃদ্ধির গতি বাড়াবার জন্য এই অবস্থাটাকেই আপাততঃ স্বীকার করে নিতে হবে; এই কেন্দ্রীকরণ বন্ধ করবার জন্য উৎপাদন-গতি রুদ্ধ করা চলে না। তিনি বলেন যে, এই অর্থকেন্দ্রী-করণের ধারা রুদ্ধ করবার জন্য অন্য উপায় প্রয়োগ করা যেতে পারবে এবং তিনি কিভাবে তা করা সম্ভব তাও চিন্তা করে উপায় উদ্ভাবন করে রেখেছেন। তা ছাড়া দরিদ্রের আর্থিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করে, বৃদ্ধ, অক্ষম ও উপায়হীনের নিরাপত্তার প্রয়াস করতে হবে। প্রাথমিক প্রয়াস হিসাবে নিম্নবেতনভোগী সরকারী কর্ম্মচারীদের জন্য যে এরূপ একটা সামাজিক সংস্থা গঠনের আয়োজন ইতিমধ্যেই করা হয়েছে, এই প্রসঙ্গে তিনি তারও আভাস দেন। তিনি বলেন যে, তাঁর দৃঢ় ভরসা আছে যে এদেশ আগামী দশ বৎসরের মধ্যেই বর্ত্তমান সঙ্কীর্ণ আর্থিক সীমান্ত অতিক্রম করে অগ্রসর হতে সমর্থ হবে। পরিকল্পনা রূপায়ণের বর্ত্তমান ব্যর্থতা বা অকিঞ্চিৎ-করতার জন্য, শ্রীকৃষ্ণমাচারী বলেন, প্লানিং কমিশনের দায়িত্ব সামান্য মাত্র, এর সম্পূর্ণ দায়িত্ব সরকারকেই স্বীকার করতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী এই বিতর্কে অংশ গ্রহণ করবার সময়ে লোক-সভার সদস্যবৃন্দ ও দেশবাসীর নিকট আবেদন জানান যে, উন্নয়ন পরিকল্পনার সার্থকতার সম্বন্ধে যেন তাঁরা নিরাশবাদী না হয়ে পড়েন। গত দুই বৎসরে পরিকল্পিত লক্ষ্য অনুযায়ী প্রগতি, বিশেষ করে কৃষি উৎপাদনে, সাধন করা সম্ভব হয় নাই সত্য, কিন্তু উন্নয়ন পরিকল্পনার ফলে গত দশ বৎসরে দেশের যে আর্থিক উন্নতি সাধিত হয়েছে তা কেবল আশানুরূপ নয়, অভূতপূর্ব্বও বটে। পরিকল্পনা কমিশনটিকে বাতিল করে দেওয়ার বা এর রচনার কোন আমূল পরিবর্ত্তনের জন্য যে দাবী উঠেছে, তা তিনি সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেন। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেন যে, গণতান্ত্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে সকলের পক্ষে সমান সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং দেশের আর্থিক কাঠামোয় সরকারী সংস্থাগুলিই সমধিক প্রভাবশালী হবে। অবশ্য এতে বেসরকারী সংস্থাগুলিরও (private sector) একটা বিশিষ্ট ভূমিকা থাকবে; গত কয়েক বৎসরে এ সকল সংস্থাগুলি অভূতপূর্ব্ব ভাবে শক্তিমান ও প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠেছে, একথা অস্বীকার করা চলে না। এই প্রসঙ্গে শ্রী নেহরু স্বীকার করেন যে, বর্ত্তমানে দেশে কেন্দ্রাভিসারী অর্থ ও আর্থিক ক্ষমতার গতি শঙ্কাজনক অবস্থার সৃষ্টি করেছে, কিন্তু তিনি আশা করেন যে, অদূর ভবিষ্যতে ইহার নিরশনকল্পে কার্য্যকরী ব্যবস্থা প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। দেশের জনসংখ্যার একটা মস্ত বড় অংশ যে জাতীয় আর্থিক প্রগতির ফলভাগী এখনও হয় নাই, এবং অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য যে তাঁরা এই অতল দারিদ্র্য ভোগ করতেই থাকবে বলে আশঙ্কা হয়, সেজন্য অবশ্য প্রধানমন্ত্রী বাচনিক ভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু দেশের অধিকাংশ জনসমষ্টিকে কি করে কিংবা কোন্ উপায়ে এই নিরন্ধ্র দারিদ্র্য ও বঞ্চনার হাত থেকে মুক্ত করবার পথ পাওয়া যাবে এমন কোন আবিষ্কারের আলোক তাঁর ভাষণে দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

এই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী আর যা যা বলেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য এই যে, তিনি মনে করেন যে দেশে সরকারের বিরুদ্ধে অসততার অভিযোগ অতিশয়োক্তিদুষ্ট। তিনি বলেন যে এ সম্পর্কে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা আরও খারাপ। দেশের প্রধানমন্ত্রী যে কি করে এরূপ দায়িত্ব এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন তুলনা উত্থাপন করতে পারলেন সে কথা ভাবিয়া বিস্ময় বোধ হয়। তা ছাড়া শ্রী নেহরু স্বীকার করেন যে আধুনিক কলকারখানা ও বৈজ্ঞানিক উৎপাদন-রীতির প্রতি তাঁর গভীর ভরসা সত্ত্বেও তিনি উত্তরোত্তর গান্ধীনির্দ্দেশিত পন্থা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে সুরু করেছেন।

এই ছয়দিনব্যাপী বিতর্কের একটি অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত সারমর্ম্ম উদ্ধৃত করলাম এই কারণে যে, বিতর্কে অংশ-গ্রহণ-কারী নেতৃবৃন্দ, সরকারী ও বিরোধী উভয় পক্ষেরই, কেবল-মাত্র অবাস্তব আলোচনায় দেশের পার্লামেন্টের কতটা মূল্যবান সময় অযথা অপব্যয় করে থাকেন তার উদাহরণটি স্পষ্ট করে তুলে ধরবার জন্য। ১৯৫০-৫১ সন থেকে পরিকল্পনানুসারী উন্নয়ন ব্যবস্থার প্রয়োগ সুরু হয়েছে। প্রথম পাঁচ বৎসরে কৃষি-উন্নয়ন-বিধায়ক আয়োজনের ওপরেই সমধিক জোর দেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে বন্যানিবারক, সেচ-সম্পাদক ও বৈদ্যুতিক শক্তিউৎপাদনকারী আয়োজন এবং রাসায়নিক সার উৎপাদনব্যবস্থার ওপরেই সবচেয়ে বেশী প্রয়াস ও লগ্নী কেন্দ্রীভূত করা হয়েছিল। দ্বিতীয় পাঁচ বৎসরে এই জোরটা অনেকটা সরিয়ে নিয়ে শিল্প-গঠন, বিশেষ করে ইস্পাত, বৈদ্যুতিক শক্তি, পরিবহন ব্যবস্থা ইত্যাদি নানাজাতীয় ভিত্তিমূলক (Basic) উৎপাদক শিল্পের উপরে আরোপ করা হয়। অবশ্য কৃষি উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকৃত না হলেও এর ওপর থেকে জোরটা খানিক সরিয়ে

নেওয়া হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় শিল্পসৃষ্টির উপরে আরও বেশী জোর দেওয়া হয়—লক্ষ্য স্থির হয় যে এই পাঁচ বৎসরে শিল্পোৎপাদনের উন্নতির গতি বার্ষিক গড়পড়তা ১১% হিসাবে বৃদ্ধিতে রূপায়িত হবে—আর কল্পনা করা হয় (ইহাকে নিছক কল্পনা ছাড়া আর কিই বা বলা যায়!) যে, এই পাঁচ বৎসরে কৃষি উৎপাদন (খাদ্যশস্যের খাতে) মোটামুটি ৩২% বৃদ্ধি পাবে যার ফলে এই পাঁচ বৎসরের শেষে বার্ষিক খাদ্যোৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াবে ১০০,০০০,০০০ টনে এবং এই ধারায় শিল্পোৎপাদনে এবং কৃষি উৎপাদনে বৃদ্ধি সাধিত হলে পাঁচ বৎসরের শেষে জাতীয় আয় ৩৪% বৃদ্ধি পেয়ে ১৯,০০০ কোটি টাকায় দাঁড়াবে।

পরিকল্পনা কমিশন উন্নয়ন-ছক প্রস্তুত করে দিয়েছেন, তার জন্য লগ্নীর প্রয়োজনের পরিমাণও নির্দ্ধারিত করে দিয়েছেন। কিন্তু ফলাফলের হিসাবে দেখা যায় যে, তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসরে জাতীয় আয় ১৩·৬% এর পরিবর্ত্তে মাত্র ৪·৭% বৃদ্ধি পেয়েছে। শিল্পোৎপাদনের বৃদ্ধির হার প্রথম বৎসরে প্রায় ৯% আন্দাজ ছিল এবং দ্বিতীয় বৎসরে সেটি আরও ঢিমে হয়ে ৬·৮%এ দাঁড়িয়েছে। এবং কৃষি উৎপাদনে যেটুকু উন্নতি দুই বৎসরে হয়েছে তার গড় পরিমাণ দাঁড়ায় ৪%-এরও কম। ইতিমধ্যে সরকারী হিসাবমতে দেশের জনসংখ্যা ৪·৮% বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে জাতীয় আয়ের মাথাপিছু অংশের পরিসংখ্যান ১৯৬০-৬১ সনের ১২৭·৫ থেকে কমে গিয়ে এখন ১২৫·২-এ দাঁড়িয়েছে। অন্যপক্ষে পরিকল্পনা কমিশনের সম্প্রতি প্রকাশিত হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় যে তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম তিন বৎসরে সরকারী খাতে লগ্নীর অঙ্ক হবে মোট ৪,১৯৮ কোটি টাকা এবং পূরা পাচ বৎসরে লগ্নীর পরিমাণ দাঁড়াবে মোট ৮,০০০ কোটি টাকা। পরিকল্পনার মূল হিসাবমতে সরকারী খাতে ৮৩০০ কোটি টাকার লগ্নীর ব্যবস্থা ধরা হয়েছিল, এর মধ্যে ৭৫০০ কোটি টাকার আয়োজন ছিল এবং ৮০০ কোটি টাকার ব্যবস্থা তখন পর্য্যন্ত অনির্দ্দিষ্ট আয়োজন থেকে সংগৃহীত হবে বলে হিসাব করা হয়েছিল। অতএব দেখা যায় যে, পরিকল্পনা রূপায়ণের আংশিক (এবং মোটা অংশের) ব্যর্থতা সত্ত্বেও নির্দ্দিষ্ট লগ্নীর হিসাবের মোটামুটি ৯৩·৪% অংশ কাজে লাগান হবে। কিন্তু এর থেকে প্রবহমান ফলাফল. আনুপাতিক পরিমাণমাফিক হবার বিন্দুমাত্র আশা নাই, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ দেখা যায় না। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে দুই বৎসরে জাতীয় আয়ের হিসাবে বৃদ্ধির পরিমাণ ৪·৭%-এর বেশী হয় নাই। তৃতীয় বৎসরেরও প্রায় তিন ভাগ এর মধ্যেই অতিবাহিত হয়েছে এবং এই সময়ের মধ্যে উন্নতির গতি যে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে এমন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। তবু যদি অনুমান করা যায় যে তৃতীয় বৎসরে প্রথম দুই বৎসরের তুলনায় উন্নতির দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায় তা হলেও তিন বৎসরের মোট বৃদ্ধির পরিমাণ ৯·৪%-এর বেশী হয় না। তা হলে পরিকল্পিত লক্ষ্যে পৌছুতে হলে বাকী দুই বৎসরে জাতীয় আয় বার্ষিক ১২·৩% হারে বৃদ্ধি পাওয়া প্রয়োজন। এটা যে একান্তই অসম্ভব সেটা বাতুলও বুঝিতে পারে। দেশের স্বাধীন ও খ্যাতনামা অর্থ-বিশেষজ্ঞদের অভিমত যে, আপ্রাণ চেষ্টাতেও বর্ত্তমান প্লানের বাকী তিন বৎসরে খুব বেশী করে হলেও বার্ষিক ৪·৫% হারের চেয়ে দ্রুততর গতিতে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব নয়। এঁদের অভিমত গ্রহণ করলে দেখা যাবে ১৯৬০-৬১ সনের তুলনায় বর্ত্তমান পঞ্চ-বার্ষিকী যোজনার অন্তিমে জাতীয় আয়ের হার মোট ১৮·২%-এর বেশী বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব নয়। তা হলে এই যোজনার অন্তিমে জাতীয় আয়ের হার মোটামুটি ১৯,০০০ কোটি টাকার পরিবর্ত্তে মাত্র ১৭,০০০ কোটি পর্য্যন্ত হওয়া সম্ভব। তৃতীয় পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত চতুর্থ ও পঞ্চম পরিকল্পনায় ২৫,০০০ কোটি টাকা ও ৩৪,০০০ কোটি টাকা জাতীয় আয় প্রতিষ্ঠা করাও অনুরূপ অসম্ভবই প্রমাণ হবে।

এই সম্পর্কে উন্নয়নের কাজে প্লানিং কমিশনের ব্যর্থতা সম্পর্কেও তীব্র সমালোচনা হয়েছে। প্লানিং কমিশনের সত্যকার ভূমিকাটি যে কি সে বিষয়ে এই বিতর্ককালে উভয় পক্ষে যে সকল বাদানুবাদ হয়েছে তা থেকে একটা সত্যকার বাস্তব উপলব্ধি যে, ছিল এমন মনে হয় না। প্লানিং কমিশনের সত্যকার রূপটা যে কি সেটা এই প্রসঙ্গে স্পষ্ট হওয়া উচিত ছিল। কমিশনটি কেন্দ্রীয় সরকারের কোন বিভাগীয় দপ্তরের মধ্যে পড়ে না। কমিশন এবং পার্লামেণ্ট উভয়ের মধ্যে যোজক হিসাবে অবশ্য একটি কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়ের অস্তিত্ব বরাবরই ছিল, এখনও আছে কিন্তু প্লানিং কমিশন এই মন্ত্রণালয়টির ঠিক বিভাগীয় দপ্তরের অন্তর্ভুক্ত নয়। পূর্ব্বে প্লানিং মন্ত্রী কমিশনের সহ-সভাপতি ছিলেন এবং কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটের অন্যতম সদস্য ছিলেন। বর্তমানে কমিশনের সহ-সভাপতি সরকারী দায়িত্ব থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং বর্ত্তমান প্লানিং মন্ত্রী কেবিনেট পদাধিকারী নন; যতদূর বোঝা যায় ইনি কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা ও অর্থসংযোগ মন্ত্রণালয়ের (Defence & Economic Coorduiation) অন্তর্ভুক্ত একটি দপ্তরকর্তা মাত্র। অতএব প্লানিং কমিশনের পার্লামেণ্টের নিকট অন্যান্য সরকারী বিভাগসমূহের মতন কোন সরাসরি দায়িত্ব নাই। তেমনি কমিশন-নির্দ্ধারিত প্লান বা পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের দায়িত্বও প্লানিং কমিশনের উপর ন্যস্ত হয় নাই। কেননা প্লানিং কমিশনের সৃষ্টি হয়েছে ভারত সরকারের একটি

প্রস্তাব অনুযায়ী—এ প্রস্তাব পার্লামেণ্টে উপস্থিত হয় নাই। ইহার সংবিধানসম্মত কোন নির্দিষ্ট অস্তিত্ব নাই, যেমন আছে অডিটার জেনারেল, কিংবা প্রধান বিচারপতি ইত্যাদির। অথচ কমিশনের উপর দেশের আর্থিক উন্নয়নের গতি, প্রকৃতি, পথ ও লক্ষ্য নির্দেশ করবার ভার দেওয়া হয়েছে। এই নির্দেশ সুষ্ঠুভাবে পালন করে লক্ষ্যে অগ্রসর হবার সত্যকার দায়িত্ব কমিশনের নহে। এখানে কৃষ্ণমাচারী ঠিকই বলেছেন, এ দায়িত্ব যৌথভাবে ভারত সরকারের এবং নিজ নিজ এলাকায় ভারত সরকারের প্রত্যেকটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের। অতএব প্ল্যানের লক্ষ্যে পৌছাইবার পথে বিঘ্ন ও ব্যর্থতার জন্য কমিশনকে ঠিক দায়ী করা যায় না। কমিশনের দায়িত্ব মাত্র একটি সুষ্ঠু সুসমঞ্জস্য পরিকল্পনা রচনা করার, যে পথে অগ্রসর হওয়ার ফলে উন্নতির কতগুলি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছান সম্ভব হতে পারে।

প্লানিং কমিশন তাঁদের এই দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পেরেছেন কি না, পার্লামেণ্টে বিতর্ককালে এমন প্রশ্ন কোন পক্ষের কেহ করেছেন বলে দেখা যায় না। প্লানমাফিক দেশ অগ্রসর হয় নি এবং তার সম্ভাবনাও নেই, এই ছিল অভিযোগ। অতএব তাঁরা দাবি করেন যে, প্লানিং কমিশনকে বাতিল করে দেওয়া হোক। সরকার পক্ষ স্বীকার করছেন যে, এ পর্যন্ত উন্নতি লক্ষ্যানুযায়ী হয় নি; এই ব্যর্থতা শোধরাবার তাঁরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, কিন্তু প্লানিং কিংবা প্লানিং কমিশনকে বাতিল করে দেবার প্রস্তাব তাঁরা গ্রাহ্য করেন নি।

এই সম্পর্কে প্লানিং কমিশন সম্বন্ধে মাত্র দুইটিই প্রশ্ন উঠতে পারে;—প্রথম, প্লানিং কমিশনের পরিকল্পনাটি বাস্তববাদী কি না, এবং দ্বিতীয়তঃ, প্লান-রূপায়ণে কমিশনের কোন সরাসরি ভূমিকা থাকা সম্ভব কি না। প্রথম প্রশ্নটিই আসল বিবেচ্য। পরিকল্পনায় ভুল বা অবাস্তবতা থাকিলে সেটাই গোড়ার গলদ এবং সেইটির সংশোধন বা পুনর্বিন্যাস একান্ত জরুরী। নানা দিক দিয়া এই প্রশ্নের গুরুত্বটি অধিকতর প্রকট হয়ে উঠছে। যথা, পরিকল্পনায় কৃষির যে ভূমিকা নির্দিষ্ট হয়েছে, তার মধ্যে দেখা যায় যে, খাদ্যোৎপাদনে ১৯৬০-৬১ থেকে ১৯৬৫-৬৬ সনের মধ্যে ৩২% উৎপাদন-বৃদ্ধির লক্ষ্য স্থির করে নেওয়া হয়েছিল। কি কি তথ্যের ভিত্তির উপর এমন লক্ষ্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল তার কোন হদিস পরিকল্পনার খসড়ায় দেখিতে পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ দেশের সমগ্র কৃষিক্ষেত্রের একটা বাস্তব হিসাবে উপস্থিত হবার কোন সত্যকার প্রচেষ্টার কোন প্রয়াস কোথাও দেখতে পাই না। অথচ লক্ষ্য স্থির করা হয়ে গেল। কৃষির বর্তমান পারিপার্শ্বিক, সার সরবরাহ, সেচের ব্যবস্থা, খণ্ড খণ্ড ক্ষেত্রে চাষ এবং আনুষঙ্গিক তথ্যাদি বিচার করে কৃষি উৎপাদনের বৃদ্ধির বাস্তব সম্ভাবনা সত্যকার কতটা আছে তার উপরে ভিত্তি করে যে এই লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে, তারও কোন প্রমাণ নাই। বস্তুতঃ, ১৯২৮ সনের পর থেকে আজ পর্যন্ত দেশের কৃষি-ব্যবসায়ের একটা তথ্যানুকূল মূল্যায়ন এখনও করা হয় নাই। এই অবস্থায় পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি-উৎপাদন সম্পর্কীয় লক্ষ্যনির্দ্দেশ যে অবাস্তব এবং অসম্ভাব্য প্রমাণিত হবে, তাতে আর সন্দেহ কি?

অন্যদিকে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন সম্বন্ধে দেখা যায় যে, এই শক্তির সরবরাহের সামান্যতার ফলে দেশের মোট উৎপাদন ক্ষমতার (established capasity) প্রায় ২০% এখন অকার্য্যকরী হয়ে থাকে। এটাকে যদি অবাস্তব পরিকল্পনার ফল বলে নির্দ্দেশ করা যায় তবে তাহা অন্যায় হয় না। এভাবে আরও উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে যাতে দেখা যায় যে, অবাস্তব পরিকল্পনার ফলে অসামঞ্জস্য বা অসার্থকতার সৃষ্টি হয়েছে।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পার্লামেণ্টে বিতর্ককালে এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে কোনই আলোচনা হয় নাই। তাই যদি আমরা সমস্ত বিষয়টিকে সম্পূর্ণ বাস্তববোধহীন, অপরিণত-বুদ্ধি বালকোচিত বাদানুবাদে পার্লামেণ্টের এবং জাতির মূল্যমান সময়ের নিরর্থক অপচয় বলে অভিযোগ করি, তা হ'লে সেটা কি অন্যায় হয়?

ডি-ভি-সি ও পশ্চিমবঙ্গ

ডি-ভি-সি লইয়া আজ পর্য্যন্ত অনেক খেলাই খেলা হইয়াছে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার পরীক্ষামূলক ভাবে চারি মাসের জন্য ডি-ভি-সির পশ্চিমবঙ্গস্থিত অংশগুলির সেচ-ব্যবস্থাগুলির ভার নেওয়াতে এই খেলার সাম্প্রতিক অবসান ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়। শুনা যাইতেছে কেন্দ্রীয় সরকার এক্ষণে ডি-ভি-সি'র বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন ও বণ্টনের ভার গ্রহণ করিবার কথা বিবেচনা করিতেছেন। সেচ ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপর বর্তাইল, শক্তি উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করিবেন। তবে এই বিরাট ও অঢেল অর্থব্যয়কারী স্বয়ংশাসিত কর্পোরেশনটির হাতে বাকী কি রহিল?

প্রথম ডি-ভি-সি পরিকল্পনা প্রস্তুত হয় স্বাধীনতালাভের প্রাক্কালে। প্রাথমিক ভাবে কেবলমাত্র বন্যানিরোধ-কল্পে এবং আনুসঙ্গিক ভাবে সেচ-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য লইয়া এই পরিকল্পনাটি প্রস্তুত হয়। যতদূর স্মরণ আছে এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মোটামুটি তখন ৫৭ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ হয়। তার পর

কর্পোরেশনটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবার পর এর অধিকর্ত্তার পদ অধিকার করে বসলেন একজন সবজান্তা আই সি-এস্। এঁর আমলে কর্পোরেশনের প্রাথমিক লক্ষ্যের সঙ্গে যুক্ত হ'ল জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা। বস্তুতঃ এই সময়েই ডি-ভি-সিকে আমেরিকার টি-ভি-এর অনুকরণে একটি বহুমুখী এবং স্বয়ংশাসিত সংস্থার রূপ দেওয়া হয় এবং ইহার মোট ব্যয়বরাদ্দও আনুপাতিক অঙ্কে বৃদ্ধি করা হয়। এঁর আমলে কর্পোরেশনটির প্রচার দপ্তর থেকে যে সকল প্রচার-পুস্তিকা প্রকাশ করা হয় তাতে তিলাইয়া, পাঞ্চেৎ এবং মাইথন বাঁধের জল দিয়ে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন করা হবে বলে বলা হয় তার ফলে সমগ্র দামোদর উপত্যকা অঞ্চল যে অচিরেই একটি প্রগতিশীল কর্ম্মমুখর বৃহৎ ও ক্ষুদ্রশিল্পপ্রধান এলাকায় রূপান্তরিত হবে এমনই একটি চিত্র দেখা যায়। অবশ্য অত্যল্পকাল পরেই এই চেতনা জন্মায় যে, দামোদর ও বরাকর নদীর মত নদীর প্রবাহ থেকে যে জল পাওয়া যাবে তাতে সারা বৎসর বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন সম্ভব হবে না। তখন যুক্ত হয় কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদক ব্যবস্থা এবং আনুসঙ্গিক বৃহত্তর ব্যয়-বরাদ্দ।

দামোদর পরিকল্পনার কোন লক্ষ্যই যে আজ পর্য্যন্ত সার্থকভাবে পূর্ণ হয় নি সে কথা বলাই বাহুল্য। এর প্রাথমিক লক্ষ্য, বন্যা-নিরোধ, তাও সম্পাদিত হয় নি; ১৯৫৬ এবং আবার ১৯৫৯ সনের প্রবল বন্যা তার প্রকৃষ্টতম প্রমাণ। ডি-ভি-সির জল দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের দশ লক্ষ একর খারিফ শস্য ও তিন লক্ষ একর রবিশস্যের জমিতে সেচের ব্যবস্থা হবার প্রতিশ্রুতি ছিল। আজ পর্য্যন্ত শত লক্ষ্য একর খারিফ শস্য ও মাত্র ৫০,০০০ হাজার একর রবি শস্যের জমিতে জল পাওয়া গিয়াছে—এটা বর্ত্তমান বৎসরে মাত্র পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে তাহারও অনেক কম জমিতে সেচের জল সরবরাহ হইয়াছে। এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার ও ডি-ভি-সির পারস্পরিক দায়িত্ব লইয়া অনেক বিতণ্ডা ও মতান্তর হইয়াছে, কিন্তু চাষের জল যে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পাওয়া যায় নাই তাহা নিঃসন্দেহ। বৈদ্যুতিক-শক্তি সরবরাহের ব্যাপারেও পশ্চিমবঙ্গ যে ডি-ভি-সির নিকট অনুরূপ ভাবে বঞ্চিত হইয়াছে তাহাও সুবিদিত। ডি-ভি-সির সরবরাহের উপর ভরসা করিয়া থাকিবার ফলে (এবং প্রাসঙ্গিক ভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একরকম জোর করিয়া পশ্চিমবঙ্গকে ডি-ভি-সির বিদ্যুৎশক্তির উপরে নির্ভর করিতে বাধ্য করা হয়) আজ কলিকাতা ও সংশ্লিষ্ট শিল্পাঞ্চলগুলির মোট প্রতিষ্ঠিত শিল্পোৎপাদনে ক্ষমতার (established industries capacity) অন্ততঃ ৯০% চালক শক্তির সরবরাহের অল্পতার জন্য অলস বসিয়া থাকিতে বাধ্য হইতেছে।

অথচ ডি-ভি-সির মোট ১৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ের ৮৬ কোটি টাকারও অধিক পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে দিতে হইয়াছে। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যাপারেই ডি-ভি-সি একদিকে চূড়ান্ত ব্যর্থতা ও অন্যদিকে বিরাট অপচয়ের উদাহরণস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ এখন সেচের দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহের ভার লইলে, ডি-ভি-সির ভবিষ্যৎ অস্তিত্বের কারণ প্রায় সবটাই চলিয়া যায়। এখন পশ্চিমবঙ্গ এলাকার বাঁধ দুইটির ভার রাজ্য সরকার এবং অন্যটি বিহার সরকারের হাতে তুলিয়া দিলে এবং সঙ্গে সঙ্গে ডি-ভি-সির অস্তিত্ব অবসান করিয়া দিলে মঙ্গলই হয়।

কলিকাতা পুলিশী ঔদাসীন্য

নিজেদের মূল দায়িত্ব সম্বন্ধে পুলীশী ঔদাসীন্যের ভূরি ভূরি উদাহরণ সকলেরই জানা আছে। সম্প্রতি এরূপ একটি ঘটনায় আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। কলিকাতার বুক কোম্পানী একটি প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়। এককালে এই বইয়ের দোকানটি কলিকাতার খ্যাতনামা পণ্ডিত ও মনীষীদের শিক্ষণস্থল ছিল। ইহার স্বত্বাধিকারী শ্রীগিরীন মিত্র মহাশয়ের নিকট কোন না কোন রকমে উপকৃত হন নাই, আজিকার প্রবীণ বিদগ্ধ সমাজে এমন ব্যক্তি সহসা মিলিবে না বলিয়া মনে হয়। সম্প্রতি বাকী ভাড়ার দায়ে ডিগ্রী লইয়া বাড়ীর মালিক ইঁহাকে দোকানঘর ছাড়িতে বাধ্য করেন। দোকানের আসবাবপত্র, বহু মূল্যবান পুস্তকাদি সব রাস্তায় বাহির করিয়া দেওয়া হয়। অন্যত্র স্থানান্তরিত হওয়া পর্য্যন্ত এ সকল রক্ষা করিবার ভার পুলিশ লয় নাই এবং উপস্থিত পুলিশের নাকের উপর দিয়াই নাকি লুটপাট হইতে থাকে। থানায় টেলিফোন করিয়াও নাকি কোন সুরাহা হয় নাই। কলিকাতার বুকের উপর যে এরূপ ঘটনা ঘটিতে পারে কল্পনা করিতেও বিস্ময় বোধ হয়। এ বিষয়ে অচিরে উপযুক্ত ব্যবস্থা প্রয়োগ করা একান্ত প্রয়োজন বলিয়া মনে করি।

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

শ্রীহরিমোহন ভট্টাচার্য্য

মহামনীষী আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের শতবার্ষিকী আগতপ্রায়। ১৯৩৮ সালে তাঁহার দেহত্যাগের পর হইতে কয়েকজন মাত্র তাঁহার অনুরাগী বাঙ্গালী বৎসর বৎসর মিলিত হইয়া তাঁহার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের এই উদ্যম ও প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহার উদাত্ত মানসিকতা ভারতে ও ভারতের বাহিরে বিদ্বৎ-সমাজে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এবং তাঁহার দেহাবসানের পরেও তাঁহার লিখিত অমূল্য রচনাবলী পাঠকের মনে এখনও যে অলৌকিক সসম্ভ্রম বিস্ময় উৎপাদন করে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, উক্তপ্রকার বাৎসরিক সম্মেলন দ্বারাই এই বিরাট্ মনীষীর আধ্যাত্মিক অবদানের উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করা হইতেছে না। এই জ্ঞানবীরের পূজার অনেকগুলি উপচার বা উপকরণের অভাব আমাদের সম্ভারের দৈন্য যেন অঙ্গুলি-নির্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিতেছে। তাঁহার স্মৃতির পূজা, যাহা বৎসরান্তে করা হইতেছে, তাহা পঞ্চোপচারের পূজা, ষোড়শোপচারে হইতেছে না। এই দৈন্যের জন্য আমরা শিক্ষিত বাঙ্গালীরাই দায়ী। শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজের এই দায়িত্ব; আজ যাহা সতের-আঠার বৎসর অপূর্ণ অবস্থায় ফেলিয়া রাখা হইয়াছে, আজও তাহার পূরণের জন্য সচেষ্ট না হইলে বিশ্বমানবের নিকট আমাদের হেয়ত্ব প্রতিপন্ন হইবে সন্দেহ নাই। কোন্ কোন্ উপায়ে আমরা এই দায়িত্বের অনেকটা পূরণ করিতে পারি তাহার আভাস এই প্রবন্ধের শেষ ভাগে দিবার চেষ্টা করিব। অবশ্য এই কার্যে আচার্য শীলের গুণগ্রাহী প্রত্যেক বাঙ্গালীকেই, এই দায়িত্ব পূরণের উপায়গুলির উদ্ভাবন করিয়া, এক সম্মেলনে পরস্পর পরামর্শের পর নির্ধারিত উপায়গুলিকে কার্যে পরিণত করিবার আহ্বান জানাই।

প্রতি বৎসর জন্মবার্ষিকী সম্মেলনে আচার্য শীলের প্রতিভা, বিপুল বিদ্যাবত্তা, দার্শনিকতা, অধ্যাপনার অলৌকিকতা প্রভৃতি বিবিধ বিষয় আলোচিত হইলেও তাহা মুষ্টিমেয় সভ্যগণের মধ্যে প্রায় সীমাবদ্ধ থাকে, কোনরূপ নিয়মিত বিবৃতি প্রকাশিত হয় না। ফলে জনসাধারণের নিকট তাঁহার এই সমস্ত গুণাবলী ও অন্যান্য সাধারণ মানসিকতার পরিচয় পৌঁছে না। এই প্রকার পরিস্থিতি উপলব্ধি করিয়া এই উপলক্ষ্যে সেই মহামনীষীর সম্বন্ধে আমার যে ধারণাগুলি গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি। বলা বাহুল্য যে, এই উক্তিগুলির ভিত্তি তাঁহার সহিত আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক।

আচার্য শীল ছিলেন একজন বিপুল ও মহান্ ব্যক্তি। সাধারণতঃ তিনি একজন বড় দার্শনিক বলিয়া পরিচিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি কেবলমাত্র দার্শনিক ছিলেন না। এমন কোন উচ্চশিক্ষার বিভাগ ছিল না, যাহাতে তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভার আলোকপাত হয় নাই। কি সাহিত্য সমালোচনায়, কি অর্থনৈতিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক বিশ্লেষণে, কি বহু শাখা-সমন্বিত বিজ্ঞানের মূলসূত্র নিরূপণে, সকল ক্ষেত্রেই তাঁহার ভাস্বর পাণ্ডিত্য ও অলৌকিক বিচারশক্তি তাঁহার মানসিকতাকে সমুজ্জ্বল করিয়া এমন একটি অপূর্ব চিত্রণের সৃষ্টি করিয়াছিল এবং তদানীন্তন বিদ্বৎসমাজের মানসক্ষেত্রে এমন একটি অতি গভীর প্রতিফলন প্রদান করিয়াছিল যে, তাহার বিস্মৃতি সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া মনে হয়।

আচার্য শীলের বিপুল মনীষার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা কোন সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে সম্ভব নহে। আমার ব্যক্তিগত ধারণা এই এবং বোধহয় অনেকেই তাহা সমর্থন করিবেন যে, তাঁহার দৃষ্টিতে ছিল সামগ্রিকতা বা ইংরেজীতে যাহাকে Synthetic vision বলে। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করিয়া দেখার প্রবৃত্তি তাঁহার নিকট ভ্রান্ত প্রবৃত্তি বলিয়া বিবেচিত হইত। কি স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে অধ্যাপন-কালে, কি সাধারণ বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তাঁহার সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, যাহা তাঁহার দার্শনিকতার পরাকাষ্ঠা, বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু এই জড়জগৎ, নীতিতত্ত্বের কর্ম ও তাহার প্রাণ, ইতিহাসের সমাজ ও রাষ্ট্র-সংস্থার ক্রমবিবর্তন, ধর্মে মানবীয় আধ্যাত্মিকতার মূলসূত্র ও তাহার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকারে বিকাশ এবং মানবীয় সংস্কৃতির অন্যান্য যাবতীয়

অঙ্গ, এই সকল বিষয়ই তাঁহার সামগ্রিক দৃষ্টির সম্মুখে ধরিয়া এক বিশ্বমানবতার অভিব্যক্তি বলিয়া ভাবিতেন এবং বলিষ্ঠ আত্মবিশ্বাসের সহিত শ্রোতৃগণের নিকট প্রকাশ করিতেন। দুঃখের বিষয় এই যে, এ প্রকার উচ্চস্তরের দার্শনিকতার ফলস্বরূপ কোন সুবিস্তৃত পুস্তক তিনি লিখিয়া যান নাই, যাহাতে তাঁহার পরবর্তীরা এই দার্শনিক মতবাদের বিচার ও প্রচার করিবার সুযোগ পান। তাঁহার এই মতবাদের একমাত্র সূচনা তাঁহার একটি মাত্র লিখিত বক্তৃতায় পাওয়া যায়, যাহা তিনি ১৮৯৯ সালে Congress of Orientalists in Rome-এর অধিবেশনে অতি সংক্ষিপ্ত আকারে দিয়া গিয়াছেন। সেই বক্তৃতাটির নাম ছিল "Vaishnavism and Christianity"। এই বক্তৃতার ভূমিকাতে তাঁহার উক্ত সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির ফলস্বরূপ বিশ্বমানবতা বা Universal Humanity-র ধারণার উল্লেখ করিয়াছেন। দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, এই বিশ্বমানবতা সমগ্র মানব-সংস্কৃতিকে বিভিন্ন দেশে ও কালে বিভিন্ন ভঙ্গিতে চালিত করিয়া, পরিপুষ্ট করিয়া এক চরম লক্ষ্যের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর করিয়া লইয়া চলিয়াছে। ইহাই বিশ্বমানবীয়তার ইতিহাস। এই সংক্ষিপ্ত সূচনায় আচার্য শীলের ধারণার সহিত প্রখ্যাত পাশ্চাত্ত্য সাংস্কৃতিক ঐতিহাসিক টয়েন্‌বির বিশ্ব-সাংস্কৃতিক আদর্শের কয়েক বিষয়ে মিল, অন্য কয়েক বিষয়ে গরমিল আছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক এই ভূমিকার বক্তব্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। রোমের এই ভাষণের ভূমিকায় তাঁহার এই সামগ্রিক দার্শনিক দৃষ্টির প্রাথমিক সূচনা, যাহা তিনি তাঁহার মধ্য-বয়সে লিপিবদ্ধ করিয়া জীবন-দর্শনের একটি অভিনব দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাহাই তাঁহার প্রথম যৌবনের পুস্তক Quest Eternal-এ রূপায়িত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বলিষ্ঠ সক্রিয় চিন্তাশীলতার আলোকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কত যে নূতন নূতন তথ্য উদ্ভাবিত হইত তাহা, যাঁহারা তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন তাঁহারা উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইয়াছেন। তাঁহার মানসভাণ্ডার ছিল অফুরন্ত, তাঁহার চিন্তাশক্তি ছিল অক্লান্ত ও সতত সক্রিয়, কিন্তু লেখনী ছিল মন্থর। তিনি ভাবরাজ্যে সদাই বিভোর হইয়া থাকিতেন। বহু অমূল্য ভাবসম্পদ্ পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া ভারতের দার্শনিক চিন্তাকে বহুভাবে সমৃদ্ধ করিয়া যাইতে পারিতেন। পরবর্তী ভারতীয় দার্শনিক সমাজ জগতের সমক্ষে গর্বের সহিত এই চিন্তা-নায়ককে অটল অজেয় শীর্ষ-আসনে সমাসীন করিবার অধিকার অর্জন করিতে পারিতেন। ক্ষোভের বিষয় এই যে, তাঁহার লিপিবদ্ধ করিবার প্রবৃত্তি চিন্তার সক্রিয়তার তুলনার অনুপাতে অনেক পরিমাণে শূন্যতা ও অক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। তবুও তিনি যে অল্পসংখ্যক কয়েকখানি পুস্তক রাখিয়া গিয়াছেন, সেগুলি পরিশীলন করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, এবং জগৎসভায় দেখাইতে পারা যায় যে, উহারা চিন্তা-সম্পদের অতি গভীর সুবর্ণখনি।

অধ্যাপক রূপে আচার্য শীল

আচার্য শীলের অধ্যাপনা-জীবন দীর্ঘদিনব্যাপী ছিল। বঙ্গদেশের অনেক মহাবিদ্যালয়ে তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ অধ্যাপনার কথা বহুলপ্রচার প্রাপ্ত হইয়াছিল। আমরা শুনিয়াছি, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু উচ্চাভিলাষী ছাত্র জ্ঞানলাভের জন্য কলিকাতা হইতে মফঃস্বলে তাঁহার নিকট সুযোগমত অধ্যয়ন করিতে যাইতেন। পরে পরিণত বয়সে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন, যে সময় স্বর্গত স্বনামধন্য শিক্ষানায়ক স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় অন্যান্য মহাবিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীগুলিকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীভূত করিলেন। সেটা ১৯১৩ সাল, তখন আমি দর্শন বিভাগের পঞ্চম বার্ষিক ছাত্র। পঞ্চম ও ষষ্ঠ বার্ষিক ছাত্র রূপে তাঁহার সহিত আমার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক সংঘটিত হয় এবং ১৯২১ সালে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হইয়া তাঁহার কলিকাতা ত্যাগ করিবার পূর্ব পর্যন্ত এই সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয়। এই সময়ের মধ্যে তাঁহার অধ্যাপনার এবং আলাপ আলোচনার পদ্ধতি সম্বন্ধে আমি যে অভিজ্ঞতা ও ধারণা অর্জন করিতে পারিয়াছিলাম তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছি।

আমাদের পঞ্চমবার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যাপকরূপে তাঁহার আবির্ভাব একটি সম্পূর্ণ নূতন, সসম্ভ্রম এবং গম্ভীর পরিস্থিতির সৃষ্টি করিত। তাঁহার বিরাট্ দেহ, সশ্মশ্রু মুখমণ্ডল, তারস্বরে বক্তৃতা, নূতন ধরণের স্বরচিত ইংরেজী ভাষায় তাহার প্রকাশন, বক্তৃতার মধ্যে মধ্যে নূতন তথ্য প্রদানজনিত আত্মপ্রসাদ ও মৃদুস্মিত হাস্য ও স্বীয় দীর্ঘ শ্মশ্রুতে পুনঃ পুনঃ দক্ষিণ হস্তাবলেপ—এই সমুদয় সম্মিলিত ভাবে আমাদের নিকট সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত একটি অভিনব পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া আমাদিগকে একেবারে মুগ্ধ ও বিহ্বল করিয়া ফেলিত। এই সময় তিনি সাধারণ দর্শন শ্রেণীতে পড়ান ছাড়া, নির্বাচিত ভারতীয় দর্শন শাখার

ছাত্রদিগেরও অধ্যাপনা করিতেন। সর্বসময়ই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ব্যতীত বহু অধ্যাপক ও দর্শনানুরাগী বহু প্রাচীন ব্যক্তিকে শ্রোতৃগণের মধ্যে দেখা যাইত। আমাদের ক্লাস লেকচারগুলি পাবলিক লেকচারে পরিণত হইত। তাঁহার বক্তব্যগুলি এতই মূল্যবান্ হইত যে, ছাত্রগণের ত কথাই নাই, সাধারণ শ্রোতৃগণও অতি যত্নসহকারে ঐগুলি নোট করিয়া লইতেন। পুঁথিগত মামুলি ব্যাখ্যা ও অন্যের চর্বিত-চর্বণ তাঁহার রীতিবিরুদ্ধ ছিল। প্রতিটি বিষয় সম্পূর্ণ মৌলিকতার আলোকে আলোকিত করিতেন। এই মৌলিকতা তাঁহার লিখিত পুস্তকগুলিতেও সর্বত্র বিদ্যমান। তাঁহার বিদ্যাবত্তা এতই গভীর ও বিস্তৃত ছিল যে, যে কোন বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণে নূতন তথ্যের উদ্ঘাটন করিয়া উহার তুলনা ও পার্থক্যমূলক আলোচনায় উহাকে নূতন আলোকে উদ্ভাসিত করিতেন। একটি আলোচ্য বিষয়বস্তুর অতিসূক্ষ্ম সূত্র ধরিয়া শ্রোতার মনকে তাহার উপর দিয়া ভাবজগতের কত যে অজানা দেশে লইয়া গিয়া ফেলিতেন তাহার ইয়ত্তা হয় না। চিন্তাশীল অনুগামী শ্রোতার অন্ততঃ সেইসময়ের জন্য মনে হইত, যেন তাঁর সমগ্র অস্তিত্বটা ক্ষিতিতল ত্যাগ করিয়া ভাবময় হইয়া ভাবসমুদ্রে সন্তরণ করিতেছে। পাশ্চাত্ত্য দর্শনের সিদ্ধান্তের সহিত তাঁহার বক্তব্যের তুলনাপ্রসঙ্গে গ্রীক, ফরাসী, জার্মান দার্শনিকদের স্ব স্ব ভাষায় লিখিত শব্দাংশ অনর্গল উদ্ধৃত করিয়া আমাদের অন্তরাত্মাকে একেবারে চমৎকৃত করিতেন। তাঁহার বক্তৃতা কিছুদূর অনুসরণ করিবার পর মনে হইত, যেন মস্তিষ্ক ব্যথিত ও বিঘূর্ণিত। এই প্রকার বিহ্বল মানসিক অবস্থাতেও আমাদের একটা আনন্দ অনুভব হইত। এই কার্যেও একটা সুখ ছিল। সঙ্গে সঙ্গে আত্মপ্রসাদ ও গর্ব অনুভব করিতাম এই ভাবিয়া যে, আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের মত বিরাট্ অধ্যাপকের নিকট পড়িবার সুযোগ আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। তদানীন্তন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগ বোধহয় অক্সফোর্ড অথবা কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের সহিত তুলিত হইবার স্পর্ধা করিবার যোগ্য ছিল। অন্যান্য অধ্যাপকমণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন কাণ্ট-দর্শনের সুবিখ্যাত ব্যাখ্যাতা ডাক্তার হীরালাল হালদার, ডাক্তার আদিনাথ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক অম্বিকাচরণ মিত্র প্রভৃতি। বলা বাহুল্য এই অধ্যাপকমালার মধ্যমণি ছিলেন আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল।

আচার্য শীলের অধ্যাপনা-পদ্ধতির প্রধান লক্ষ্য করিবার বিষয় ছিল তাঁহার সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ বলিষ্ঠ যুক্তিযুক্ততা। বিষয়বস্তুর বিচারে সর্বক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন পক্ষপাতশূন্য। তাঁহার আলোচনায় কুত্রাপি ইংরেজীতে যাহাকে আমরা bias বলিয়া থাকি, তাহা লক্ষ্য করা যাইত না। ভারতীয় সংস্কৃতি, বিশেষতঃ ভারতীয় দর্শনের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। সকলকেই তিনি ভারতীয় দর্শন বিশেষ করিয়া অধ্যয়ন ও অনুধাবন করিতে বলিতেন। সেটা কেবল হইল অনন্ত বিশ্ব, উন্নত দার্শনিক মতবাদের আকর হিসাবে এবং ইহার সহিত পরিচিত হওয়া প্রত্যেক দার্শনিকের সার্থকতা হিসাবে, কিন্তু ইহার প্রতি পক্ষপাতিত্বের জন্য নহে। প্রত্যেক মতবাদই তীক্ষ্ণ ও বলিষ্ঠ যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া লইতে তিনি বার বার উপদেশ দিতেন, যাহা প্রকৃত দার্শনিকের সর্বপ্রথম ও প্রধান লক্ষণ।

আবাল্য প্রতিভা ও বিদ্যানুরাগ

আচার্য শীলের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তাঁহার আবাল্য প্রতিভা ও বিদ্যানুরাগ সম্বন্ধে দু-চারিটি কথা বলা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক নহে। এই কথাগুলি স্বর্গীয় ডাক্তার হীরালাল হালদার মহাশয়ের নিকট হইতে শ্রুত; সুতরাং উহাদের সত্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। অতিরঞ্জনের সম্ভাবনাও নাই। ১৯৩৫ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিখিল ভারত দর্শন সংসদ (Indian Philosophical Congress)-এর দ্বিতীয় বার অধিবেশন আহূত হয়। তখন আচার্য শীল প্রায় স্থবিরতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু তথাপি তিনি উহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। প্রথম দিন সকালের দিকে মূল সভাপতির ভাষণান্তে যখন ডাক্তার হীরালাল হালদার মহাশয় সংসদের অন্যান্য সদস্যদের সহিত একত্র বসিয়া নানা বিষয়ে আলোচনা করিতেছিলেন, তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। প্রসঙ্গক্রমে আচার্য শীলের ছাত্রাবস্থার প্রতিভার উল্লেখ করিতে করিতে তিনি একটি ঘটনার কথা বলিতে লাগিলেন। আচার্য শীল ১২ বৎসর বয়সে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করিয়া তখনকার ডাফ কলেজে ভর্তি হইয়া তখন প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতেন। এই সময় তাঁহার ইচ্ছা হয়, Luberweg-এর সুবৃহৎ লজিক-এর পুস্তকখানি পড়িবেন। পুস্তকাগারে খোঁজ করিয়া জানিলেন যে, পুস্তকখানি তখন library-তে নাই। অধ্যক্ষ হেষ্টি সাহেবের নিকট আছে। প্রথম বার্ষিক ছাত্রের পক্ষে

উহা পড়িয়া সার সংগ্রহ করা এখনকার দিনে অভাবনীয় বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক, এই সংবাদ পাইয়া অনুসন্ধিৎসু বালক ব্রজেন্দ্রনাথ অধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং নিজেহ অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন।অধ্যক্ষ মহাশয় কিছু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তুমি এত বড় কঠিন পুস্তক পড়িতে পারিবে না, তোমাকে উহা দেওয়া হইতে পারে না।" ব্রজেন্দ্রনাথ সনির্বন্ধ প্রার্থনা জানাইলে অধ্যক্ষ মহাশয় অবশেষে সম্মত হইলেন। কিন্তু বলিলেন, "তুমি তিন দিন বইখানি রাখিতে পারিবে এবং ফেরত দিবার সময় উহা হইতে তোমায় প্রশ্ন করিব। সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পারিলে তোমার এই ধৃষ্টতার জন্য শাস্তি লইতে হইবে।" ব্রজেন্দ্রনাথ উহাতে সম্মত হইয়া বইখানি লইয়া গেলেন এবং তিন দিন পরে যথাসময়ে অধ্যক্ষ মহাশয়ের হাতে উহা প্রত্যর্পণ করিতে আসিলে পূর্ব-ব্যবস্থামত অধ্যক্ষ তাঁহাকে কয়েকটি প্রশ্ন করিলেন। সেই প্রশ্ন কয়টির এত সন্তোষজনক উত্তর তিনি দিলেন যে, অধ্যক্ষ মহাশয় ব্রজেন্দ্রনাথকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার ধীশক্তির ভূয়সী প্রশংসা করিলেন এবং আরও বলিলেন, "তোমার এত অল্পবয়সে এরূপ তীক্ষ্ণ মেধাশক্তি দেখিয়া আমি বাস্তবিকই স্তম্ভিত হইয়াছি।"

তাঁহার জ্ঞানার্জন-স্পৃহা সাধারণ জীবনযাত্রার বাঁধাধরা নিয়মগুলিকে অবহেলিত করিতে কুণ্ঠিত হইত না। শুনা যায়, অধ্যয়নকালে তিনি এতই তন্ময় হইয়া পড়িতেন যে তাঁহার টেবিলের উপর রক্ষিত রাত্রের খাবার অনেক সময় খাওয়াই হইত না, যেমন অবস্থায় রাখা হইত ঠিক সেই অবস্থাতেই থাকিত। পরদিন দেখা যাইত যে, খাবারের ত কথাই নাই আলোটি পর্যন্ত নিভান হয় নাই। তিনি নিজ টেবিলের উপর পুস্তকাদিতে একনিষ্ঠ ভাবে আবিষ্ট অবস্থায় ধ্যানযোগীর মত বসিয়া আছেন। জিজ্ঞাসা করিলে তখন তিনি সুপ্তোত্থিতের ন্যায় বলিয়া উঠিতেন—ওহো, ওটা ভুল হয়ে গেছে। একনিষ্ঠ বাণীর সেবকদিগের জীবনে এরূপ ব্যাপার অবশ্য নূতন নহে। মহামনীষীদিগের জীবনের আদর্শ চিরদিনই শিক্ষিত সমাজের জ্ঞানস্পৃহার উৎসাহবর্ধক—এই জন্যই উহার উল্লেখের পুরাতনতা সত্ত্বেও সার্থকতা আছে। আচার্য শীল ছিলেন বহুভাষাবিদ্। রসায়নশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, গণিত, জ্যোতিষশাস্ত্র, জৈব ও উদ্ভিদ্ বিজ্ঞান তাঁহার নিকট হস্তামলকবৎ পরিস্ফুট ছিল। তাঁহার Positive Science of the Ancient Hindus পুস্তকখানি তাঁহার অসামান্য জ্ঞানলিপ্সার ও জ্ঞানগভীরতার অনশ্বর সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ভারতীয় মনীষা আজ জগৎ-সভায় যে উচ্চ আসন অধিকার করিয়াছে, তাহার সহায়কগণের মধ্যে আচার্য শীল অন্যতম, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

পরিশেষে আমার নিবেদন এই যে, আচার্য শীলের শতবার্ষিকী উপস্থিত। খুব শীঘ্রই তাঁহার শত জন্মবার্ষিকী পূর্ণ হইবে। তাঁহার মৃত্যুর পর এই দীর্ঘকালের মধ্যে বাঙ্গালী শিক্ষিত সমাজ তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য কতটুকু অগ্রসর হইয়াছেন? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক তাঁহার নামে দর্শনশাস্ত্রের এক চেয়ার প্রতিষ্ঠা ছাড়া আর কোন প্রচেষ্টা হয় নাই বলিয়া মনে হয়। তাঁহার রচনাবলীর পুনর্মুদ্রণ পর্যন্ত নানাপ্রকার মতভেদ বশতঃ সম্ভাবিত হয় নাই। অতীতের এই অবহেলার জন্য আফশোস ভুলিয়া যাহাতে তাঁহার জন্মশতবার্ষিকীতে ১৯৬৪ সালের মধ্যে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার দায়িত্ব পূরণ করা যায়, সে বিষয়ে শিক্ষিত বাঙ্গালীর সমবেত চেষ্টা একান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে হয়। এই চেষ্টা ফলবতী করিতে হইলে যে কয়েকটি উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে, নিম্নে তাহার আভাস দিতেছি। উহাদের গ্রহণ, সংশোধন এবং আবশ্যকমত সংযোজনের জন্য শিক্ষিত সমাজকে সহযোগিতার জন্য আহ্বান জানাই।

ক) তাঁহার রচনাবলীর আশু মুদ্রণ

খ) তাঁহার নামে পাঠাগার স্থাপন।

গ) এই পাঠাগারে তাঁহার রচনাবলী পঠনপাঠনের ব্যবস্থা।

ঘ) বিশ্ববিদ্যালয় বা কলিকাতার কোন উপযুক্ত স্থানে তাঁহার মর্মর প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠাপন।

ঙ) অর্থসাপেক্ষ এই উদ্যোগের জন্য বঙ্গ সরকার এবং ভারত সরকারের নিকট অর্থ সাহায্যের আবেদন।

গ্রন্থি

শ্রীপঙ্কজভূষণ সেন

কম ক'রে পাঁচ বছর বয়েস লালটুর হয়েছে—সুতরাং নিজের ভালমন্দ এখন নিজে যতটা বোঝে ততটা আর কে বোঝে? কেউ না! এই যে বেলা বারটা নাগাদ খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকে যেতে না যেতেই লালটুকে নিয়ে গিয়ে মা বন্দী করলেন শোবার ঘরে, এটা কি লালটুর ভালর জন্য? মা-কালীর দিব্যি করে লালটু বলতে পারে—মোটেই নয়! এর ওপর আবার হুকুম হ'ল—"হয় পড়, না হয় চুপ করে ঘুমোও!" নিজের আর কি! পাঁচ মিনিট যেতে না যেতেই নিজের আদুরে গোপাল ঐ কোলের বাচ্চা নিতুকে কাছে নিয়ে এমন ঘুম দেবে যে, লালটুর অনিদ্রা আর সটকে পড়ার প্রবৃত্তি—এ দুটো তাকে যে কতটা উৎপীড়ন আর অস্থির করে মা সেটা পর্যন্ত দেখতে পায় না! মা কিন্তু এমন নিষ্ঠুর ছিল না—কোথা থেকে যে নিতেটা এসে জুটল ভগবান্ জানে! ঐটাই ত যত নষ্টের গোড়া! মায়ের যত আদর, যত সোহাগ সবই ষোল আনা রকম কেড়ে নিচ্ছে ত ঐ পুচকে বজ্জাতের ডিমটা! কিন্তু লালটুও যে-সে ছেলে নয়—সে'দিন টেরটি পাইয়ে দিয়েছিল বাছাধনকে, এমন এক খামচি দিয়েছিল নিতেটাকে—

লালটু একবার ঘাড় তুলে দেখে নিল তার পুচকে অংশীদারটি সবশুদ্ধ তার দু'টি কাজের মধ্যে—ঘুম আর খাওয়ার মধ্যে—কোনটায় এখন ব্যস্ত আছে এবং যদি তেমন সুযোগ থাকে ত এইসা টান দেবে চুল ধরে—ও বাবাঃ! মা ত ঘুমায় নি, চোখ বুজে পান চিবিয়ে চলেছে এখনও!

যা, খুব বেঁচে গেলি নিতে! দীর্ঘশ্বাস ফেলে লালটু স্বীকার করল—সত্যি ওর কপালটাই ভাল! লালটুর সাধের যাবতীয় রঙচঙে জামা-পেন্টুল, লালটুর এখন গায়ে হোক বা না হোক, এখন মা ওর চোখের সামনে একটি একটি ক'রে বার করছে আর নিতুকে পরাচ্ছে! কি বা মানাচ্ছে! কিন্তু তবু মায়ের কাণ্ড দেখ না—ঐ ঢাক-ঢোলা জামা-পরা ফোকলা নিতেটার মুখে অন্ততঃ দুটো-দশটা চুমো খাচ্ছেই! মায়েরও আবার আদিখ্যেতা আছে অনেকটা—কি যে আছে নিতের ফোকলা দাঁতের হাসিতে! ইচ্ছে করে নিতেটার নাকটা উপড়ে দেয় খামচি দিয়ে এবং যদি সুযোগ পায় ত একদিন লালটু দেবেও—

উপুড় হয়ে শুয়ে শুয়ে লালটুর এতক্ষণ এসব চিন্তা হচ্ছিল, হঠাৎ মাথা তুলে কান খাড়া করল—ঠিক! কোন ভুল নেই—গলা শুনেই বোঝা যাচ্ছে যে ওরা জুটেছে। টুটুলের, খোকনের, মণ্টুর—আর—আর ভণ্ডুলের গলা দিব্যি পাওয়া যাচ্ছে। বেশী দূরে ত নয়—লালটুদের পাকা প্রাচীরের ওদিকেই। ভণ্ডুলটা এমন ঝগড়াটে! লালটু উপস্থিত না থাকলেই ও নিঘ্‌ঘাত টিপ চুরি ক'রে গাব্বুর কাছে এগোবেই। হ্যাঁ—ঠিক আজও টিপ চুরি করেছে! টুটুল ধরে ফেলেছে—মণ্টু মা-কালীর দিব্যি করছে যে সে টিপ চুরি করতে দেখেছে—খোকন রেগে গিয়ে থুথু দিয়ে দিয়েছে মার্বেল খেলার গাব্বুতে—ব্যস্, লণ্ডভণ্ড—কিচির-মিচির!

লালটু ধড়মড় ক'রে উঠে বসল—এই রকম একটা জটিল কূটনৈতিক পরিস্থিতিতে লালটু যদি উপস্থিত থাকতে পেত! সতৃষ্ণ নয়নে তাকাল দরজার দিকে—ছিট্‌কিনি বন্ধ! মা আজকাল আবার লালটুর নাগালের মধ্যে দরজার যে খিলটা আছে শুধু সেটার ওপর আর নির্ভর করে ঘুমোয় না—উই লালটুর তিনগুণ ওপরের ছিট্‌কিনিটা তুলে দেবেই—!

ঝঞ্চাট আর ফ্যাঁকড়া অবশ্য আছে, মা হয়ত জানে না, কিন্তু ছিট্‌কিনিটা বোধ হয় লালটু খুলতে পারে! বোধ হয় কেন? নিশ্চয় পারে! প্রথমে ফোল্ডিং চেয়ার; তার ওপরে? তার ওপরে-?—লালটু গোটা ঘরটা একবার নজর বুলিয়ে নিল—ঐ বেতের মোড়াটা—তারপরে গোটা কয়েক বালিশ—ব্যস্! ব্যস্!

আশু মুক্তির আনন্দের আতিশয্যে দিগ্বিদিক্ শূন্য হয়ে হাততালিই দিয়ে ফেলল গোটা কয়েক—মোটেই খেয়াল হ'ল না যে, এতে মায়ের ঘুমটাই ভেঙ্গে যেতে পারে—এবং গেলও তাই—

"লালটু, কি হচ্ছে—?" কাঁচা ঘুমভাঙ্গা গলায় মা ধমকে উঠল।

জিভ কেটে লালটু সেই মুহূর্তে সাট্পাট দিয়ে আবার শুয়ে পড়ল মেঝেতেই। বড্ড রাগ হ'ল নিজের ওপর—এমন বোকা কেউ থাকে? কৃশ আর বৃষ বানানটা আজও ঠিক হ'ল না লালটুর—'শ' আর 'ষ'টা নির্ঘাৎ উল্টোপাল্টা ক'রে বানান করায় বাবা কানমলা দিয়ে বিশেষ এক ভারবাহী জীবের সঙ্গে লালটুর বুদ্ধির যে তুলনা করে সেটা একেবারে মিথ্যে নয়! মায়ের ঘুমটা আবার নতুন করে আসতে অন্ততঃ পনের মিনিট সময় যে লাগবে তাতে আর কোন সন্দেহই নেই এবং সেটা ত শুধু লালটুর বুদ্ধির দোষেই হ'ল! এই পনের মিনিটে কম করে তিন দান মার্বেল খেলা হয়ে যেত।

চোখ দু'টো জলে ভরে এল লালটুর। মায়ের থেকে বাবাই অনেক ভাল। এক পড়ার সময় বাবা লালটুর খাতির-টাতির অবশ্য রাখে না বটে, কিন্তু নিতেটা তেমন জুত করতে পারে না বাবার কাছে। মাছের মুড়োর ভাগ, জলখাবারের কিছু শেষাংশ, দুটো-একটা পয়সা, সে ত বাবা লালটুকেই দেয়—নিতেকে নয়! ক'টা বাজল? য'টাই বাজুক, লালটু আর ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে না! এই ত গতকাল—মা ঘুমোচ্ছিল, লালটু তাক থেকে ঘড়িটা নামিয়ে কেবলমাত্র ওটার কলকব্জার আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনার একটু নড়চড় করেছিল, ব্যস্! মা রুখে এসেছিল, বাবা লাগিয়েছিল কষে এক চাঁটি! না—না, ওরা দু'জনেই সমান, কেউ কম নয়! দু'জনেই বেশী ভালবাসে নিতুকে—অকস্মাৎ লালটু তার বাবা সম্বন্ধে ইদানীন্তন মতবাদটা বদলে ফেলল। তা নয়ত কি? বাবাও নিতেটাকে বেশী ভালবাসে—অফিস থেকে ফিরে ওটাকে একবার কোলে নেওয়া চাই-ই। লালটু যেন—

দেখেছ? ভগুলটা আবার টিপ করে গাব্বুর দিকে মার্বেল সরিয়েছে—খোকনা লাগিয়েছে এক চাঁটি! মণ্টুটা কাঁই কাঁই ক'রে সমর্থন করছে ভগুলকে—ওঃ! ভগুলটা নিশ্চয় আজ ওদের বাড়ীর বিখ্যাত কুলের আচার খানিকটা চুপিচুপি মণ্টুকে খাইয়েছে—তাই মণ্টু এখন ভগুলের দিকে! লালটুও অবশ্য ঐ একই কারণে ভগুলকে মাঝে মধ্যে সমর্থন করতে বাধ্য হয়ে পড়ে—

আচার—! লালটুর জিভের জল সড়াৎ ক'রে কশ বেয়ে বেরিয়ে এল—ভগুল যদি কালীর দিব্যি ক'রে বলে যে আচার খাওয়াবে তা হ'লে লালটু এক্ষুণি গিয়ে ভগুলকেই সমর্থন করবে, কিন্তু মা'টা এমন মেয়ে যে দুপুর বেলায় কিছুতেই বেরোতে দেবে না—রৌদ্র লেগে অসুখ করবে! এমন উদ্ভট ডাক্তারী মত কোন বিলেত-ফেরৎ ডাক্তারও দেয় না! রৌদ্রে বেড়ালে কি হয়? ঘোড়ার ডিম হয়। ঐ ত হনুমানগুলো দিব্যি লুটোপুটি করছে গাছের ডালে, হীরাদিদের চিলেকোঠার ছাদে,—কাকগুলো তারে শুকোতে দেওয়া কাপড়ে ব'সে কা-কা করছে—কই ওদের মাও নিষেধ করে না, অসুখও করে না! তা ছাড়া ঐ যে টুটুল ভগুলরা চুরি ক'রে পালিয়ে এসে খেলা করে, কই ওদের ত অসুখ করে না! কাজেই লালটুকে অনর্থক কষ্ট দেওয়া নিয়ে কথা, অসুখ-টসুখ নেহাত ভাঁওতা—

কিছুক্ষণ পরে নিতুর কান্নায় মায়ের ঘুম ভেঙ্গে গেল, একবার ওদিক্ পানে চেয়ে দেখল, লালটু যে পড়বে না তা জানে—এতক্ষণ যখন সাড়াশব্দ নেই তখন ঘুমিয়েই বা পড়ল?

লালটু ঘরের মধ্যে নেই—

দরজার কাছে ফোল্ডিং চেয়ারটা রাখা, তার ওপর তোশক ভাঁজকরা আর গোটা কয়েক বালিশ! দরজাটা সামান্য খোলা—! কান-খাড়া করল মা—না, ছোঁড়া-গুলো পাঁচিলের পাশ থেকে পালিয়েছে কোন নিরাপদ জায়গায়—এ নিশ্চয় লালটুর বুদ্ধি!

"আচ্ছা, এস বাড়ী—" নিজের মনেই গজরাতে থাকে মা,—"জ্বালিয়ে খেল হাড়মাস—"

সূর্য ডুববার কিছু আগে রৌদ্রে পুড়ে কালি হয়ে বাড়ী ফিরল লালটু এবং এতক্ষণ যে কথাটা মনের মধ্যে এক মুহূর্তের জন্যও উঁকি দেয় নাই বাড়ীতে পা দিয়েই

সেই কথাটা বারংবার মনে হ'ল যে—চুরি করে পালিয়ে যাওয়াটা সত্যি অন্যায় হয়েছে! আজ আর রেহাই নেই। সেই কখন বেলা ১১টায় ভাত খেয়েছে—খিদেতে পেটটা চোঁ চোঁ করছে। মা কি করছে কি? পরোটা ভাজছে—বিকেল বেলার জলখাবার। ক্ষুধার্থ লালটুর নাকে পরোটা ভাজার গন্ধ যা লোভনীয় লাগল!

কলতলায় খুব সন্তর্পণেই হাত-পা ধুচ্ছে আর গভীর ভাবে লালটু চিন্তা করছে কি উপায়ে আজকের এই বিপদ্‌টা কাটান যায়। সোজাসুজি বললেই হয়—আর কখ্‌খন করবে না! এই কান মলছে—নাক মলছে। কিন্তু এই রকম আশ্বাস ইতিমধ্যে লালটুর যে কতবার কত ব্যাপারে দেওয়া হয়েছে তার হিসাব নেই। ভবী ভুলবার নয়—লালটুকে ধরতে পারলেই এক-গুচ্ছের চুড়ি আর তারের বালাসমেত মায়ের হাতের যা চাঁটি—মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্‌ করে ওঠে ব্যথায়। সুতরাং লালটু এই রকম পরিস্থিতিতে বেশ খানিকটা নিরাপদ্‌ দূরত্ব বজায় রেখেই দাঁড়িয়ে থাকে,—আর যাই হোক, মা যেন কিছুতেই ছুটে ধরতে না পারে। দিনের বেলা হ'লে ত কথাই ছিল না—মা ধরতে এলেই একছুটে কাঠবেড়ালীর মত পাঁচিলের মাথায়, তারপর সেখান থেকে ছাদে—ব্যস্‌! ছাদের সিঁড়ি নেই—মা গজ গজ করুক না যত খুশি! যতক্ষণ না তিন সত্যি করে ততক্ষণ লালটু ছাদেই বসে থাকে বহাল তবিয়তে। ভগুলের কাছে এই ভাবে পরিত্রাণের বুদ্ধিটা অবশ্য লালটু পেয়েছে এবং ভগুল এই ফন্দিটা কি সকাল, কি বিকাল—দু'বেলায়ই চালায়, কিন্তু লালটুর বেলায় বিকালের দিকে ও-ফন্দিটা একেবারে অচল। ভগুলের বাবা মোটা থপ্‌থপে মানুষ—দেওয়াল বা ছাদে ওরকম ভাবে উঠতেই পারে না, কিন্তু লালটুর বাবা? এখনও ফুটবল খেলে রীতিমত—ছাদেই ওঠ আর গাছেই ওঠ, ঘাড় ধরে নামিয়ে নিয়ে আসবে! এখন বাবার অফিস থেকে ফেরার সময় হ'ল বলে—কাজেই লালটুর ছাদে ওঠা এখন আর চলে না।

জলের ঘটিটা লালটুর হাত থেকে ফস্কে পড়ে গেল কলতলায়—

মা যেন কান খাড়া করেই ছিল—"লালটু—!"

"আমায় ডাকছ মা?" লালটু কত বিনয়ী, কত বিনীত!

"লক্ষ্মী বাবা আমার—এইবার খাবে এস—!" মায়ের গলার স্বরে যেন আদর ঝরে পড়ছে।

লালটু পা বাড়িয়েও থমকে দাঁড়িয়ে গেল—ব্যাপার কি? যে কীর্তিটা লালটু আজ করে ফেলেছে তার জন্য মায়ের কোন রাগ নেই, কোন গালাগালি নেই, উপরন্তু "এইবার খাবে এস—।" ও! লালটু বুঝে নিয়েছে—একবার কোন রকমে সরল-বিশ্বাসী লালটুকে হাতের মধ্যে ধরে ফেলার ফন্দি!

"এদিকে এস—"

লালটু ভিজেবেড়ালের মত আস্তে আস্তে গিয়ে উঠোনের এক দিকে দাঁড়াল—চোখ দুটো কিন্তু যেন মিটিমিটি হাসছে, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে মায়ের অভিসন্ধিটা যেন আগে থেকেই ধরে ফেলেছে লালটু।

"আয়—খাবি আয়—"

"না, তুমি মারবে—"

"মারব? কেন রে?" আকাশ থেকে যেন পড়ল মা, কিন্তু না হেসেও পারল না—এইটুকু বয়সে কি ধূর্তই না হয়েছে। মনে মনে শঙ্কাও হ'ল—এই সন্ধ্যা বেলায় ছাদে উঠতে গিয়ে একটা বিপদ্‌ না ঘটিয়ে বসে—

যাক—! মা হেসেছে—লালটু নিশ্বাস ফেলে বাঁচল। আজকের মত রক্ষে পাওয়া গেল। লালটু আর জীবনে কোন দিন দুপুর বেলায় বাইরে বেরুবে না। সত্যি, শঙ্কর যে আজ সাতদিন ধ'রে জ্বরে ভুগছে তার কারণ ঐ রৌদ্রে বেড়ান ছাড়া আর কি হ'তে পারে? কারও মা মিথ্যা বলে না। ভাত ত দূরের কথা বেচারা শঙ্কর একটুখানি কুলের আচারও খেতে পায় না। মা যখন পইপই করে মানাই করেছিল তখন শঙ্করের কি দরকার ছিল রৌদ্রে বেড়াবার?

পরোটা ছিড়তে ছিঁড়তে লালটু বলল—"রৌদ্রে বেড়ানর জন্যই ত শঙ্করার অসুখ হয়েছে, না মা?"

"খুব হয়েছে, জ্যাঠামি করতে হবে না, চটপট্‌ খেয়ে নিয়ে পড়তে বসগে—"

ঐ জন্যই ত লালটুর বনে না মায়ের সঙ্গে! এই

দিব্যি হাসিখুশি ভাল মানুষ, আবার পরক্ষণেই দেখ না মেজাজটা!

লালটুর চর্বণক্রিয়া মুহূর্তে বেড়ে গেল—বাবা এসে পড়ল বলে—তার আগেই বর্ণপরিচয় বইখানা নিয়ে বসে যেতে হবে, পাড়া মাথায় ক'রে পড়তে হবে সরবে—

নিতু আবার এক সুযোগে এসে একখানা গোটা পরোটা লালটুর বাটি থেকে টেনে নিয়ে মুখে পুরতে যাচ্ছিল—অন্যদিন হ'লে একটা কুরুক্ষেত্র কাণ্ড লালটু বাধিয়ে দিত কিন্তু আজ লালটুর মেজাজ খুব উদার। পরোটা অবশ্য সেই মুহূর্তে নিতুর কাছ থেকে পুনরুদ্ধার করে নিল কিন্তু ও কাঁদবার আগেই খানিকটা কামড়ে নিয়ে দিয়ে দিল নিতুর হাতে।

কিন্তু ঐ রকম এক-আনা পনের-আনা বিভাগ বণ্টন নিতু মেনে নিতে মোটেই রাজি নয়—কেঁদে গড়িয়ে পড়ল লালটুর বাটির কাছে—

"কি হ'ল—লালটু মেরেছিস্ বুঝি?"

"না মা, গোটা পরোটা চাইছে—" কাঁদ কাঁদ হয়ে উত্তর দিল লালটু।

"বাবাঃ, ওটা আবার তোর চেয়েও রাক্ষস হ'ল দেখছি—"

সন্ধ্যার পর লালটু পড়তে বসেছে—

মা নিজের হাতের কাজ সেরে নেবার জন্য নিতুকে বসিয়ে দিয়ে গিয়েছে লালটুর কাছে। ঠিক পড়ার সময়ে দামাল ছেলে নিতুকে যদি মা আগলাবার জন্য দিয়ে যায় তার চেয়ে সুখের বিষয় লালটুর আর কিছু নেই! লালটু বারংবার নিজের বর্ণপরিচয়টা নিতুর হাতে ধরিয়ে দিয়ে পড়ার কাজ থেকে অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য নিষ্কৃতি পাবার যতই চেষ্টা করুক না কেন, নিতেটা কিন্তু বইটা কিছুতেই নেবে না—খালি ধরতে চাইছে গরম লণ্ঠনটা। এইটুকু উপকার—তা করবে কেন! লালটুর পরোটা ধ'রে টান লাগাতে পারে, ছিঁড়তে পারে কিন্তু লালটুর বর্ণপরিচয়-খানা ছিঁড়ে আজকের রাতের মত উপকার ত করবে না! সাধে কি আর লালটু দেখতে পারে না নিতেটাকে!

বাবা জলখাবার খেয়ে লালটুর কাছে চেয়ারটায় বসে পড়ল, মা এক্ষুণি চায়ের কাপটা দিয়ে যাবে হাতে। লালটুর পড়াশুনো একটু দেখিয়ে দেবেন—একটু আদর করবেন নিতুকে—চা চিনি পাঁচফোড়ং-এর ফর্দের সঙ্গে লালটুর দুষ্টুমির ফর্দও মা দাখিল করবে এই সময়ে—

যাক্ রক্ষে! মায়ের আজ কোন নালিশ নেই।

বাবার হাতে চায়ের কাপ-প্লেট দেখলেই হ'ল—নিতেটা হামা দিয়ে ঠিক হাজির হবে বাবার কাছে, তারপর বাবার কাপড়টা খামচে ধ'রে টলমল ক'রে দাঁড়িয়েই—"উঁ-আঁ-হুঁ-হাম—" অর্থাৎ প্লেটের চা'টা যে ওর, সেটা কি নিত্যি মনে পড়িয়ে দিতে হবে বাবাকে?

কি আর করে—নিজে চুমুক দেবার আগে বাবা প্লেটটা ধরে নিতুর মুখে—ব্যস্! নিতু চা খাচ্ছে না ত, প্লেটখানাই যেন খাচ্ছে কামড়ে কামড়ে। কাণ্ড দেখে লালটু খুক করে হেসে ফেলে।

বাবা ধমক দেয়—"লালটু!"

বাড়ুজ্যেদের বাড়ীর যদু একটানা পড়ছে—এবার স্কুলের শেষ পরীক্ষা দেবে, খোকন পড়ছে গলা ছেড়ে। পিছনের বাড়ীতে হীরাদি গান গাইছে—"যখন পড়বে না মোর—" তারপর কি বলছে হীরাদির গানে লালটু বুঝতে পারছে না, কান খাড়া করল আর একবার—"যখন পড়বে না মোর পায়ের—" নাঃ, বোঝাই গেল না সবটা। ভারি মিষ্টি সুর! লালটু দু'তিনবার গানের সুরটা মনে মনে ভেঁজে নিল—যখন রইবে না মোর—

চোখের পাতা দুটো ভারি হয়ে এল লালটুর, খোকনের পড়া আর শোনা যাচ্ছে না, ওর বোধ হয় খাওয়া-দাওয়া সারা! কি আরামসে শুয়ে পড়েছে বিছানায়। লালটুদের দলের মধ্যে খোকনই সবচেয়ে সুখী—পাঁচ বোনের পর একটি ভাই, বাড়ীতে ওর খাতিরই আলাদা—! লালটুর চোখ দুটো বন্ধ হয়ে মাথাটা ঢুলে নেমে এল বুকের দিকে—নিজেই চমকে উঠে চাইল বই-এর দিকে বৃষ আর কৃশ বানানটার ওপর, কিন্তু কতক্ষণ? ক্রমে ক্রমে বৃষ কৃশ হ'তে হ'তে একেবারে মিলিয়ে গেল লালটুর দৃষ্টিপথ হতে—মাথাটা নেমে এল আবার—

"লালটু—!"

চট্ ক'রে ঘুম ছেড়ে গেল লালটুর, বাবা ধরে

ফেলেছে, উঠে এসেই হয়ত কানটা ছিঁড়ে দেবে টেনে—কিন্তু নিতেটা কখন ঘুমিয়ে পড়েছে বাবার কোলে—উঠবার আর জোর নেই! মায়ের রান্না বোধ হয় শেষ হ'ল, শিকল তুলে দিল রান্নাঘরে। এইবার নিতুকে বাবার কাছ থেকে নিয়ে ভাল করে ঘুম পাড়াবে। ইতি-মধ্যে বাবাও জামা-কাপড় বদলে ছুটবে ক্লাবে—ব্যস্, ছুটি লালটুর!

'—ক্লাবে ঢুকলে ক'টা বাজল তোমার আর হুঁস থাকে না—আজ যদি দেরি কর ত নিজেই ভাতটাত বেড়ে খেও, আমি উঠব না—" প্রতিদিনের মত মা বাবাকে সতর্ক করে দিল আজও।

—"খেপেছ—এলাম বলে—" প্রতিদিনের মত আজও বাবা প্রতিশ্রুতি দিল।

সত্যি, মা খেপে যায় দু'একদিন অন্তর। ভাত ঠাণ্ডা, মেজাজ গরম—এ পরিস্থিতি প্রায়ই হয়। বাবা দোষ চাপিয়ে দেয় অনিলবাবু না হয় পরিতোষবাবুর ঘাড়ে—"কিছুতেই ছাড়ল না! প্রায় দশ হাজার ডাউন যাচ্ছিল, বুঝলে না? তাই—" কিন্তু লালটুর বেলায়? আর এক দান আর এক দান করে যখন ওরও দেরি হয়ে যায় তখন খোকনের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া দোষটা মোটেই গ্রাহ্য করে না বাবা! মা ঠিক করে, বকুনি দেয় বাবাকে।

বাবা সদর রাস্তায় পা দিতে না দিতেই লালটু ঝেড়েঝুড়ে উঠে পড়ল—ওকে আর পায় কে? বইটা এমন ভাবে ছুড়ে দিল তাকের দিকে যে, ওটার আর কোন দিন প্রয়োজন হবে না লালটুর জীবনে—

"মা—?"

"রস। ঘুম পাড়িয়ে নি—"

লালটু হুড়মুড় করে শুতে যাচ্ছিল নিজের যায়গায়।

"পা মুছেছিস্?" মা জিজ্ঞেস করল।

হাত ধুয়েছিস্? দাঁত মেজেছিস্? পা মুছেছিস্?

—পদে।পদে বাধা, পারা যায় না আর! এখন বিছানায় গা'টা গড়াবার জন্য তর সইছে না লালটুর—না, পা মুছেছিস্?

"মুছেছি—" লালটু সংক্ষিপ্তভাবে উত্তর দিয়েই হামা দিয়ে চলেছিল নিজের বিছানার দিকে কিন্তু আর এগোনো হ'ল না—

"মিথ্যুক! কি করে মুছলি শুনি? পা-পোষখানা রোদে দিয়ে আর আনাই হয় নি ঘরে—আর তুই বলে দিলি মুছেছি—"

কি আর করে, লালটুকে ফের নামতেই হ'ল পা-পোষখানা আনবার জন্য।

মা কিন্তু মনে মনে হাসল—এ সময়ে লালটুকে একবার বিছানায় গড়াতে দিলে আর ঘুম ভাঙ্গায় কার সাধ্য! মায়ের তখন বিড়ম্বনার শেষ থাকে না, যদিও বা কোন রকমে ওঠান যায়, দু এক গ্রাস খেয়েই আর খেতে চায় না। কাজেই মা এখন কোনরকমে লালটুকে জাগিয়ে রাখতে চায়—আর পাঁচ-দশ মিনিট!

পা মুছেই বিছানায় উঠতে যাচ্ছিল আবার—

"লালটু—ঐ পাখাটা দে ত—"

মহা বিরক্তির সঙ্গে পাখাটা এনে দিল—

"লক্ষ্মী বাবা আমার—দেখে আয় ত রান্নাঘরে শিকলটা দিয়েছি কি না, আমার আর কি! তোরই মাছের মুড়োটা যদি বেড়ালের পেটে যায়—!"

সর্বনাশ! লালটু আর এক মুহূর্ত দেরি করল না, চলে গেল রান্নাঘরের দিকে। মাছ ত আসেই না, যদি বা কালেভদ্রে আসে—সেই মুড়ো যদি বেড়ালের পেটে যায়!

"মা? তোমার কি কিছুই মনে থাকে না? শিকল ত দিয়েছ।" তারপর বিশেষ সঙ্কোচের সঙ্গে একটা প্রস্তাব করল—"মা, এক কাজ করি না, মুড়োটা না হয় খেয়েই আসি শুধু মুখে - "

"কি বললি রাক্ষস?" মা ধড়মড় করে উঠে বসল—নিতু ঘুমিয়ে পড়েছে কাজেই—"চ-চ—" মা খেতে দিতে চলল রান্নাঘরে।

খোকনের বাবা খোকনকে একটা ট্রাই-সাইকেল কিনে দিয়েছে—লালটু দু'দিন যাবৎ লুব্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছে সেই সাইকেলটা এবং তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় মায়ের কাছে জানাল যে খোকনের মত লালটুকেও একটা ট্রাই-সাইকেল কিনে দিতে হবে—

মা খেঁকিয়ে উঠল,"বুড়ো ছেলে আবার ট্রাই-সাইকেল চড়ে নাকি!"

লালটু বুড়ো ছেলে? তা হ'লে কালীপুজোর দিন ছুঁচো-বাজি কিনতে দিল না—ছোট ছেলেরা আবার ছুঁচো-বাজি পোড়ায় নাকি? ছুঁচো-বাজির বেলায় লালটু ছোট ছেলে আর ট্রাই-সাইকেলের বেলায় বুড়ো!

এমন মা কারও আছে? খোকন ভণ্টুল টুটুল—এদের? বেশ দিও না সাইকেল। লালটুকে কি দিয়েছ তোমরা? কিছ্ছু না! লালটু আঙুল গুণে দেখল ন'দফা জিনিষ লালটুকে ওরা দেয় নি—আরও বেশী দেয় নি কিন্তু দশের বেশী গুণতে না জানায়, ন'দফাই সাব্যস্ত করল। যেমন—ঘুড়িলাটাই, ছিপ-বঁড়শী, পিতলের পিচকারী-! লালটুকে ওরা কিচ্ছু দেবে না। অথচ মা নিতেটার জন্য কিনেছে দোলনা, দুধ খাবার খাগড়াই বাটি! হু হু করে জল বেরিয়ে এল লালটুর চোখ দিয়ে।

ক'দিন মুখভার করে থাকল লালটু—খেল না ভাল করে—বাড়ী হতেও বের হ'ল না। খোকন টুটুল ভণ্টুলরা ডাকতে এল—এত জিদ করল, মা কতবার বলল, তবুও না!

সেদিন দুপুরে মা যথারীতি শুয়েছে। লালটু একদিন বাড়ীর বার হয় না কাজেই আর প্রয়োজন হয় না দরজায় ছিটকিনি দেবার। মায়ের পিঠের দিকে লালটু মেঝেয় শুয়ে আছে—চুপচাপ কি যে চিন্তা করছে লালটুই জানে, হঠাৎ খুটখাট শব্দে মা পিছন ফিরে চাইল—

লালটু নিজের পুরাণ সার্ট কোট প্যাণ্ট—যেগুলো ছোট হয়ে যাওয়ায় মা আজকাল নিতুকে পরায় সেগুলো, মাসীমা ঝালর দেওয়া যে সুজনিটা লালটুকে ছোট বেলায় শোবার জন্য দিয়েছিল, যেটাতে মা এখন নিতুকে শোওয়ায়, সেটা,—সমস্ত একত্র জড় ক'রে একটা পাড় দিয়ে বিশেষ যত্ন ক'রে বেঁধে তুলে রাখল আলনার হুকে—

"লালটু, ও কি হচ্ছে—"

বাঁধ যেন ভেঙ্গে গেল—ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল লালটু, এমন করে কোনদিন ত কাঁদে নি—"বেশ করেছি—আমি তোমাদের কে? আমার জিনিষ আমি কাউকে দেব না—কাউকে না—কাউকে না"— লালটু কেঁদে গড়িয়ে পড়ল মেঝেয়।

"আচ্ছা, দিও না কাউকে—আমার কাছে এস দেখি—"

"না! আজ থেকে আমি রান্নাঘরে শোব, তার পর—" আর কিছু বলতে পারল না লালটু।

উঠে গিয়ে মা আদর করে টেনে নিল লালটুকে— "এ কি! লালটু, তোর জ্বর—"

"জ্বর? আঃ—" খুব খুশী হ'ল লালটু, পরম তৃপ্তিতে ভ'রে গেল লালটুর অন্তরটা! ভাল হয়েছে—জ্বর তাতে তোমাদের কি আসে-যায় মা? ছেড়ে দাও। বুড়ো ছেলেকে মায়ে কোলে নেয় নাকি?

মায়ের কোল থেকে নীচে মেঝেয় শোবার জন্য লালটু করছে ছটফট—

মায়ের মুখটা বিবর্ণ হয়ে উঠল কেমন যেন অজানা ভয়ে—জোর করে লালটুকে চেপে ধরে রাখল বুকের কাছে—"লক্ষ্মী বাবা আমার—সোনা আমার! সাইকেল আমি কালই আনিয়ে দেব—বিশ্বাস কর! হ্যাঁ রে লালটু—কত দাম জানিস্?"

বিশ্বাস কর! না!—লালটুর আর দরকার নেই সাইকেলে—বড় হলে তোমাদের আদরের নিতুকে কিনে দিও সাইকেল! শুধু ছেলেবেলার জামা পেণ্টুল কেন, লালটু এখন যে জামা-পেণ্টুল পরছে সব—সব দিয়ে দাওগে নিতুকে, লালটু কিচ্ছু নেবে না!

লালটু শ্রান্ত হয়ে মায়ের বুকে মাথা রাখল—চোখ দুটো বন্ধ হয়ে এল জ্বরের ঘোরে আর ক্লান্তিতে—

মা ঠায় ব'সে আছে লালটুকে বুকে নিয়ে। নিতু আসার পর আজ বোধহয় প্রথম আদর করে কোলে টেনে নিল লালটুকে! দিন গেলে কত গাল, কত মার যে ও খায়—ছেলেমানুষ বলে কোন দিন ত রেহাই দেয় নি মা! নিজেই চান করে, নিজেই মাথা আঁচড়ায়, নিজেই পরে জামাকাপড়—মাকে কোনদিন এসব দেখতে হয় নি। সেবার মামীর সঙ্গে মামার বাড়ী গেল পাঁচ দিনের জন্য—বাড়ীটা যেন খাঁ খাঁ করছিল এই দুরন্ত ছেলেটার অভাবে।

মায়ের গাল বেয়ে ক'ফোঁটা চোখের জল নেমে

এল—মা হয়ত খেয়াল করে নি, লালটুর ক'দিন ধরে যে জ্বর হয়েছে তারই বা ঠিক কি? জ্বর গায়েই হয়ত খেয়েছে, চান করেছে। লালটুর গায়ের উত্তাপের স্পর্শে মায়ের গায়ে যেন ছেঁকা লাগছে। সর্বনাশ!

তিন দিন গেল—সমান ভাবেই লেগে রইল জ্বর—ডাক্তার বলল—কিছুদিন না গেলে ঠিক ধরা যাচ্ছে না, তবে ভাবনার কিছু নেই।

ভাবনার কিছু নেই, মামুলি ডাক্তারী আশ্বাসে আর যা'ই হোক মায়ের মন ভরে না—দিন নেই, রাত্রি নেই মায়ের অক্লান্ত হাতের পাখা ঘুরে চলল লালটুর মাথার ওপরে—দুরন্ত লালটু নির্জীব হয়ে পড়ে থাকে বিছানায়—এক-আধ বার চোখ খুলে কি যেন খোঁজে।

রাত্রি ন'টা বাজল, পাড়ার ছোট ছেলে-মেয়েদের পড়ার শব্দ আর পাওয়া যাচ্ছে না, শুধু পিছনের বাড়ীতে হীরা গাইছে—"যেদিন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন— .."

"মা?" লালটু চোখ মেলে চাইল।

"কি বাবা?" মা লালটুর মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে পরম আগ্রহে জিজ্ঞাসা করল।

"ও কে গান করছে?"

"ঐ যে, হীরু—"

"কি গাইছে—?"

"যেদিন পড়বে না—"

"ওর মানে কি মা?"

মানে? মায়ের বুকটা কেঁপে উঠল। যদি লালটুর ছোট্ট পদচিহ্ন মুছে যায় মায়ের আঙ্গিনা হ'তে—না-না-না, কিছুতেই না! হু হু ক'রে কেঁদে ফেলল মা। ছোট্ট বেলায় কি রাগীই না ছিল লালটু—ঝোঁকের মাথায় মাকে কতদিন কামড়ে খামচে একশেষ করে দিত। আজ মায়ের বুভুক্ষু অন্তরটা সেই ক্রোধক্ষিপ্ত লালটুর ক্ষুদে হাতের কিল খামচানি আবার অন্তর ভরে চাইছে।

সেদিন ভোররাত্রে লালটু চোখ মেলল—গোটা ঘরটা মাথা ঘুরিয়ে কি যেন খুঁজছে নিষ্প্রভ চোখে—"মা?" তারপর আলনার হুকে টাঙ্গান নিজেরই বাঁধা জামা-পেন্টুলের বাণ্ডিলটার দিকে চেয়ে বলল—"মা, আমি আর নেব না, বেশ?" লালটুর ছোট্ট বুক কাঁপিয়ে বেরিয়ে এল একটা ক্ষীণ দীর্ঘশ্বাস!

অভিমানী লালটু কথা রেখেছে—কিছুই আর নেয় নি সবই ফেলে রেখে গেছে!

* * *

অবাধ গতিতে পৃথিবী ঘুরে চলেছে নিজের নির্দিষ্ট কক্ষপথে। এক-দুই ক'রে অবাধ গতিতে কেটে গেল কুড়িটা বছর।

নিতু এবার এম-এ পরীক্ষা দিল। মায়ের মাথার দু-একটা চুলে পাক ধরেছে কিন্তু বিশ বছর আগে লালটুর বাঁধা সেই ছোট্ট জামা-পেন্টুলের বাণ্ডিলটা ঠিক সেই অবস্থাতেই মা পরম স্নেহ-সন্তর্পণে আজও সাজিয়ে রেখে দিয়েছে বাক্সের এক কোণে।

সেদিন রাত্রে হীরার ষোড়শী মেয়েটা ভারি মিষ্টি গলায় গাইছে—"যেদিন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে—"

নিতুর মা ধড়মড় করে উঠে বসল নিজের বিছানায়—কালের কৃষ্ণ আবরণী সরিয়ে মায়ের চোখের সামনে ভেসে উঠল ছোট্ট একটা মুখ—"মা আমি কিচ্ছু নেব না, বেশ—?"

বিছানা থেকে সন্তর্পণে উঠে গিয়ে খুলে ফেলল নিজের বাক্সটা—নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে রইল লালটুর গিঁট-বাঁধা জামা-পেন্টুলগুলোর দিকে।

স্বামী সন্তর্পণে এসে পিছনে দাঁড়াল, তার পর স্ত্রীর মাথায় মৃদুভাবে হাত বুলিয়ে ধরা গলায় বলল—"কুমু—আবার খুলেছ বাক্সটা?"

—

সোবিয়েত সফর

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

২৩ অক্টোবর, ১৯৬২। মস্কো।

সকালবেলায় স্নানাদি করে কৃপালানীর ঘরে গেছি, গল্পসল্প হচ্ছে। এমন সময়ে টেলিফোনে কৃপালানী কার সঙ্গে কথা বলছেন। দেখছি, কৃপালানীর মুখ অত্যন্ত পাংশু হয়ে আসছে; বার বার বলছেন—"আই সি, আই সি।" ফোন রেখে বললেন, "বিশ্রী খবর। চীন ভারত আক্রমণ করেছে; ভারতকে হটে আসতে হচ্ছে।" এই অতর্কিত হামলার কথা শুনে আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এই ত কয়বৎসর আগে চু-এন লাইকে বিশ্বভারতী বিশেষ সমাবর্ত্তন করে উপাধি দান করলেন। কতদিন শুনলাম, 'হিন্দী চীনী ভাই ভাই' আওয়াজ। বই লিখেছি—ভারতের সঙ্গে চীনের আধ্যাত্মিক সম্বন্ধের ইতিহাস। রবীন্দ্রনাথ মনে করেছিলেন, রুশ, চীন ও ভারত এককালে পৃথিবীর নিয়ন্তা হবে। কিন্তু বারাঙ্গনার ছলাকলা ও রাজনীতিকদের মিতালিপনা—একই জাতের মুখোস। চীন বোধ হয় চায় না শরিকী সম্মান—এশিয়ার সর্বময় কর্তা হতে চায় সে একাই—যেমন একদিন চেয়েছিল জাপান।

জাভায় বানদুঙ সম্মেলনে সকলেই মেনে নিয়েছিলেন 'পঞ্চশীল তত্ত্ব'। সংবাদটা শুনে মনে হ'ল—এতকাল শুনে আসছি কম্যুনিষ্টরা কখনও অন্যদের দেশ আক্রমণ করে না। কথাটা কি সত্য? তিব্বতের সঙ্গে চীনের যোগ কোথায়? না ভাষায়, না সংস্কৃতি, না সভ্যতায়। লিপি আলাদা—সমাজ-ব্যবস্থা পৃথক্; তবুও তারা দাবি ক'রে দখল ক'রে বসেছে সে দেশ। কবে কোন্ শতাব্দীতে বিদেশী মংগোলরা যেমন চীনের সম্রাট্ হয়, তেমনি তিব্বতের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে। শান্তির কথা কত শুনেছি। মাওৎ সুঙ বলেছিলেন, তাঁর উদ্যানে শত পুষ্প ফুটবে। ভাবছি—এই কি চীনা সভ্যতা সংস্কৃতির রূপ।

শুনেছিলাম মার্ক্স-লেনিন-স্তালিনের সমাজতন্ত্রবাদে ধর্মরাজ্য গ'ড়ে উঠবে।, হজরত মহম্মদ ও খলিফারা ভেবেছিলেন—দুনিয়ার সব ভেদ-বিভেদ দূর হয়ে যাবে এক ধর্ম গ্রহণ করলেই। হ'ল না তা। হজরতের দৌহিত্ররা মারা পড়লেন স্বধর্মীদেরই হাতে। সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠার আয়োজন হ'তে না হ'তেই ট্রট্স্কিকে দেশ ছাড়া হতে হ'ল, দূর দেশে আততায়ীর হাতুড়িতে মাথার খুলি চূর্ণ হ'ল। সেই শক্তিমদের মত্তত৷ কি কোথাও কমছে? চীনের ভারত আক্রমণ ও সোবিয়েত রুশের এই আক্রমণ সম্বন্ধে নীরবতা—দু'টিতেই মর্মাহত হলাম। মনে অনেক কথা উঠছে, আমরা তিনজনেই চুপচাপ ভাবছি "একেই কি বলে সভ্যতা!"

কারপুশকিন ও লিডিয়া এলেন। গাড়ি প্রস্তুত, যেতে হবে পীপলস্ ফ্রেণ্ডশীপ য়ুনিভার্সিটি। এই প্রতিষ্ঠানের নাম এখন প্যাট্রিস লুমুম্বা। ইনি কংগোর বীর—যাঁকে নিষ্ঠুরভাবে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরা হত্যা করে। কংগোলী নেতা লুমুম্বা য়ুরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের কব্জি মুচড়ে দিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন তাঁর দেশে। স্বার্থে বেধেছিল সেই সব লোকদের—যারা এখন পর্যন্ত পেশাদার সৈন্য হয়ে, বৈজ্ঞানিক পরামর্শদাতা সেজে অস্ত্রশস্ত্র জোগান দিয়ে কাটাঙ্গাকে বিচ্ছিন্ন করে রাখবার চেষ্টায় আছে। সেই ষড়যন্ত্রের বলি হয়েছিলেন লুমুম্বা। সোবিয়েত-রুশ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছে। গাইড আমাদের দেখালেন—ফিজিক্স, কেমিষ্ট্রি, জিওলজি, বায়োলজির ক্লাশ—ছেলেমেয়েরা কাজ করছে। ছাত্র-ছাত্রীরা নানা জাতির—আফ্রিকা, এশিয়া, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার। পরিচয় নিলাম অনেকের; আফ্রিকার অসংখ্য উপজাতি; কেউ কারও ভাষা বোঝে না। কথা বলে ইংরেজী বা ফরাসীতে। এখন রুশ ভাষা শিখছে ও সেটাই হয়ে আসছে চলতি কথার মাধ্যম। ঘানা, নাইজেরিয়া, উগাণ্ডা, মালি প্রভৃতি সমস্ত নূতন রাষ্ট্র থেকেই ছাত্রছাত্রী

এসেছে। বরিশাল থেকে যে ছাত্রটি এসেছে, সে আসলে ভারতীয়, বিহারে বাড়ী ছিল। তিন পুরুষ পূর্বে তারা মরিশাসে গিয়েছিল ইক্ষুক্ষেতে কাজ করতে। তার মাতৃভাষা ফরাসী, তবে হিন্দী বলতে পারে এবং এখানে রুশী শিখেছে। প্রত্যেক ছাত্রকে প্রথম ছয় মাস ভাষাটা রপ্ত করতে হয়। ভাষা শেখাবার জন্য রেকর্ড আছে; দেখলাম কানে হেডফোন লাগিয়ে শুনছে। বড় একটা ঘরে অনেক ছাত্রছাত্রী ব'সে নিবিষ্ট মনে ভাষা শিখছে। ভাষা না শিখলে তাদের কোন উপায় নেই; সমস্ত অধ্যাপনা হয় রুশীভাষায়, বই সমস্ত রুশীভাষায় লেখা। রুশভাষায় যে কি বিরাট্ বিচিত্র সাহিত্য লেখা হয়েছে এবং হচ্ছে, তা এদেশের লাইব্রেরী না দেখলে ধারণা করা যায় না, লেনিন লাইব্রেরীর রিপোর্ট থেকে কিছুটা জানা যায় অবশ্য।

অধ্যক্ষ মিঃ এরজিন-এর ঘরে গেলাম। ভারতীয় চারটি ছাত্রকে ডেকে পাঠানো হ'ল। তাদের মধ্যে একজন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসেছে; তার সঙ্গে পূর্বে দেখা হয়েছিল হাউস অব ফ্রেণ্ডশীপে। একটি ওড়িয়া ছাত্র, অপরটি শিখ। এই প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস অধ্যক্ষ বললেন, সোবিয়েত-রুশের নানা কমিটি থেকে প্রস্তাব হয় যে, পৃথিবীর অনগ্রসর দেশগুলির দরিদ্র ছাত্রদের জন্য একটা বিদ্যায়তন স্থাপন করা দরকার। সোবিয়েত আফ্রো-এশিয়ান দৃঢ় মিলন কমিটি, বিদেশের সঙ্গে সখ্য ও সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য কমিটি এবং ট্রেড ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কাউন্সিল—এঁরাই উদ্যোক্তা হন এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায়। ১৯৬০ সালের নভেম্বর মাসে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার ৬০টি দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হয়। সেদিন ক্রুশ্চেভ যে কথা বলেছিলেন, তা আমাদের ছাত্রদেরও স্মরণ করে রাখবার মত। তিনি বলেছিলেন:

"Study diligently, do not waste a single day, use every opportunity to gain extensive knowledge, to study science and technology,"

অত্যন্ত সাধারণ কথা—ছাত্ররা সর্বদাই শুনছে, কিন্তু উপদেশ শুনতে যত উৎসাহ, উপদেশ মত কাজ করতে ততটাই অরুচি!

অধ্যক্ষ ভারতীয় ছাত্রদের প্রশংসা করলেন; বললেন, তারা পড়াশুনায় খুব serious। মুশকিল হয়েছে কতকগুলি আফ্রিকান ছাত্রদের নিয়ে। তারা এই নরনারীর সমান অধিকারের দেশে এসে মেয়েদের সঙ্গে অবাধে মেশে এবং অনেক সময় বিবাহও করে। এদের অসুবিধা হবে দেশে ফেরবার সময়। রুশীয় মেয়েরা পাসপোর্ট যদি না পায়, তবে কি হবে। সরকারকে বোধ হয় এ বিষয়ে ব্যবস্থা করতে হবে।

ছাত্ররা এখানকার হষ্টেলে থাকে—সব জাত, সব ধর্ম, সব বর্ণের ছাত্র—এক সঙ্গেই। অর্থাৎ শাদা রুশীয় ও লাল ইণ্ডিয়ান, কালো নিগ্রো ও আধা-পীত জাভানীর থাকা-খাওয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য সৃষ্টি করা হয় না। নাস্তিক, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, মুসলমান—সবই আছে পাশাপাশি। খাওয়া-দাওয়া একত্র; দেখলাম সে-সব। নিজেরা রেকাবি নিয়ে খাবার আনছে। শুনলাম খাওয়ার খরচ পড়ে ৫০।৬০ রুবল। কাফেতেরিয়া থেকে কিনে খেতে পারে ইচ্ছামত। তবে এখানে মদ চলে না। আমরা অধ্যক্ষের ঘরে লাঞ্চ খেলাম, সেখানে লেমনেড ছাড়া কিছু ছিল না। তবে ছেলেরা সিগারেট খায় এবং যেখানে-সেখানে ফেলে, তাও দেখলাম। প্রাচ্য অভ্যাসটা যায় নি বোধ হয়।

একবার একটা integration অর্থাৎ মিলন সভায় একটা প্রস্তাব করে বেয়াকুফ বনেছিলাম। স্কুল, কলেজের হিন্দু, মুসলমান ছেলেরা পৃথক্ বোর্ডিং-এ থাকে। হিন্দুপ্রধান শহরে মুসলমানদের বোর্ডিংগুলি প্রায়ই তুলনায় খাটো। আমি বলেছিলাম, পড়ছে একসঙ্গে, হাটবাজার করছে একসঙ্গে, ট্রেণে-বাসে চলছে একসঙ্গে—আর একসঙ্গে থাকাতে দোষ কি? উভয় ধর্মের লোকই ফোঁস করে উঠলেন—হিন্দুর হিন্দুয়ানী ও মুসলমানের মুসলমানী নষ্ট হবে। বললাম, 'একসঙ্গে থাকবে—দুটো খাওয়ার ঘর থাকবে; সেখানে অখাদ্য খেতে কেউ পাবে না।'…সকলের মনের ভাব, এসব সম্ভব নয়—এটা শান্তিনিকেতনেই হ'তে পারে।

কিন্তু শান্তিনিকেতনে যারা এটা পালন করে, তারা ভারতীয়—হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রীষ্টান সবই আছে।

মনে আছে এক নামকরা মুসলমান ভদ্রলোকের ছেলে মাদ্রাসায় পড়তেন; তিনি বলেছিলেন যে, প্রেসিডেন্সী কলেজে এসে প্রথম হিন্দু ছাত্র দেখেন।

কলকাতায় এক কলেজে ছোট কাজ করতাম—তবু ছাত্রদের সঙ্গে বেশ ভাব হয়েছিল। একটি মুসলমান ছেলে প্রায়ই আসত আমার ঘরে। তাকে শুধোই—কোথায় থাক। সে বললে, মুসলমানদের জন্য বিশেষ হষ্টেলে। আমি বললাম, ভালই ত, খাওয়া-দাওয়া নিয়ে কোন কষ্ট হয় না। ছাত্রটি বললে, বলেন কি? সর্বনাশ হচ্ছে। কাছাকাছি বাস করলে পরস্পরকে জানতে, বুঝতে, ভালবাসতে পারতাম—সে-সব ত আর হয় না। কথাটা শোনা প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর আগে। মনে আছে এখনও।

মোট কথা, সোবিয়েত-রুশ জাত-পাত তোড়ে জাতে জাতে জোড় লাগাবার চেষ্টায় আছে।

লুমুম্বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে ফোটো তোলা হ'ল · শাদা, কালো, হলদে, কটা মিশে গেল—এই মহামানবের সাগরতীরে।

ছাত্রসংখ্যা প্রায় ২০০০; শুনলাম ৮৬টি দেশ থেকে তারা আসছে। ২৬টি লাতিন আমেরিকান দেশগুলি থেকে প্রায় ৫০০, ২৯টি আফ্রিকান রাষ্ট্র থেকে ৪৫০, মধ্যপ্রাচ্য অর্থাৎ মিশর, সিরিয়া, লেবানন, ইরাক প্রভৃতি দেশ থেকে ৩০০, এশিয়ান দেশগুলি থেকে ৫০০। ইন্দো-নেশিয়া থেকে সবচাইতে বেশী ছাত্রছাত্রী—২০০। এরা ধর্মে সব মুসলমান; এখানে এসে তাদের ধর্মভাব উত্তেজিত হবার কোন ভরসা নেই। জানলাম, য়ুরোপীয় দেশ থেকে ছাত্র নেওয়া হয় না; অনগ্রসর দেশ থেকে দরিদ্র ছাত্র সংগ্রহ করে তাদের শিক্ষিত করা হয়। বলা বাহুল্য, এদের মতামত যে-দেশ থেকে এত ভালবাসা, এত আর্থিক সহায়তা আসছে, তাদের প্রতি অনুকূল হওয়াই স্বাভাবিক। ছাত্র নির্বাচনের সময় তার বিদ্যাবুদ্ধি ও আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করা হয়। ভারত সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করেই ছাত্রদের আনা হয়। মেয়ের অনুপাত ১৫%।

দেখা-শোনা, খাওয়া-দাওয়া, ফোটো তোলা সব হয়ে গেল—বেশ হৃদ্যতার সঙ্গে বিদায় নিলাম। এই প্রতিষ্ঠান ও পায়োনিয়ার্স প্যালেস প্রত্যেক শিক্ষাবিদের দেখা দরকার।

এবার চলেছি হাউস অব ফ্রেণ্ডশীপ-এ—যেখানে এক সন্ধ্যায় রেল ইউনিয়নের ক্লাবের বিচিত্র অনুষ্ঠান দেখেছিলাম। এখানে সোবিয়েত-ইণ্ডিয়া সোসাইটির পক্ষ থেকে সভা আহূত হয়েছে, সেরেব্রিয়াকভ্ এই সভার উদ্যোক্তা। ভারতে ইন্দো-সোবিয়েত সভার এক বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবার জন্য বোম্বাই গিয়েছিলাম। মনে পড়ে জাহাঙ্গীর পেটিট হলে প্রদর্শনী উন্মোচন হয়। সেখানে রুশ-ভারত মৈত্রীর চিত্র ও রবীন্দ্রনাথের সোবিয়েত ভ্রমণের চিত্রাদি প্রদর্শিত হয়, বহু রুশ উপস্থিত হন—মারাঠী, গুজরাটী বেশী।

আজকের সভায় রুশীয় সদস্য ছাড়া ভারতীয়দের মধ্যে আমরা ছিলাম। চা, টফী, বাদাম চলছে কথা-বার্তার সঙ্গে সঙ্গে। সকলেই বললেন, আমাদেরও বলতে হ'ল। কারপুশকিন রুশভাষায় তর্জমা করে দিলেন, আমি ত বাংলায় বললাম। এখানে একজন স্কলারের সঙ্গে পরিচয় হ'ল, তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস লিখছেন। এ সম্বন্ধে সমাজতন্ত্রবাদী রাষ্ট্রদের কৌতূহল বেশী। পূর্ব-জার্মেনীর এক যুবকের সঙ্গে দিল্লীতে সাহিত্য আকাদেমির রবীন্দ্র উৎসবে পরিচিত হই। ইনি বার্লিনে যে-সব নথিপত্র পেয়েছেন, তার থেকে তথ্য সংগ্রহ করছিলেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলে বুঝেছিলাম, পশ্চিম বার্লিনের তথ্যাদি তাঁর হাতের নাগালের বাইরে। এ ছেলেটি পূর্ব-জার্মেনী অর্থাৎ কম্যুনিষ্ট দেশের লোক—পশ্চিম বার্লিনে তার প্রবেশ নিষেধ। হায় রে ন্যাশনালিজম!

সভাশেষে একটা সিনেমা ঘরে গেলাম। সেখানে বিমানবিহারী astronaut-দের রেড স্কোয়ারে ক্রুশ্চেভ কর্তৃক অভিনন্দনের ছবি দেখানো হ'ল। তিনজন বীরকে দেখবার জন্য, ফুল দেবার জন্য লোকে কি পাগল। ক্রুশ্চেভ সকলকে আদর করছেন, তাদের বুকে পদক দিচ্ছেন—কি সম্মান। এর পর রবীন্দ্রনাথের

রুশ-পরিক্রমার ফিল্ম; এটা পূর্বে দেখি নি কোথাও। মোটরকার থেকে কবি নামছেন, হাওয়া বইছে জোরে, জোব্বা সামলে চলছেন।

এখান থেকে বের হবার সময় কর্মীরা আমাদের কিছু বই ও দু'খানা রেকর্ড দিলেন; এর একটা আছে Do we want war কবিতাটি রুশভাষায় ও ইংরেজী তর্জমায়।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। যেতে হচ্ছে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগের বাড়ীতে। এটা পুরাণো বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশ—এখনও এখানে প্রাচ্য বিভাগ ও জর্নালিজম প্রভৃতি বিভাগ আছে। একটা খুব সাধারণ ঘরে জন ত্রিশ ছাত্রছাত্রী জমায়েত হয়েছে—কয়েকটি শিক্ষকও আছেন। এরা সবাই হিন্দীর ছাত্র। ছেলেমেয়েরা পাশাপাশি বসেছে—ছোঁয়াছুঁয়ি নিয়ে এদের মধ্যে খুঁত্‌খুঁতানি নেই বললেই হয়। জানি না, এই জন্যই কি বিবাহটা সহজে হয়? আমেরিকা সম্বন্ধে পড়ছিলাম 'টীন-এজারস্' অর্থাৎ বিশ না পেরোতেই ছেলেমেয়েরা বিয়ে করছে—শতকরা হার বেশ বাড়ছে; সমাজের চিন্তাশীলদের ভাবিয়ে তুলেছে। সে হাওয়া সোবিয়েত দেশেও লাগছে। যাক্ সে যৌনসমস্যার কথা।

আমাকে শান্তিনিকেতন ও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলতে হ'ল। অধ্যক্ষ বললেন, ছাত্ররা ইংরেজী জানে; সুতরাং ইংরেজীতেই বলতে হ'ল। বললাম, দুঃখের বিষয় এমন একটা ভাষায় কথা বলতে হচ্ছে, যা বক্তা বা শ্রোতা, কারও মাতৃভাষা নয়। রুশভাষা জানি নে, শেখবার বয়স নেই, আর হিন্দীতে বলতে পারতাম, যদি sexless হিন্দী বলবার অনুমতি পেতাম। কিন্তু শ্রোতারা সবাই হিন্দী জানেন ভাল করে—তাঁরা লিঙ্গরহিত হিন্দী বরদাস্ত করতে পারবেন না; তাছাড়া দ্বিবেদী আছেন, হিন্দীর নামজাদা অধ্যাপক—তিনিও তাঁর ভাষায় কর্কশ ক্রিয়াপ্রয়োগ করতে দেবেন না। মিনিট চল্লিশ বললাম, রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনের মূল কথাটি। একটি ছাত্র প্রশ্ন করল 'সোনার তরী' কবিতাটির অর্থ কি? আমি আশ্চর্য হলাম, হিন্দীর ছাত্র হয়ে এ প্রশ্ন করছে। আমি বুঝিয়ে বললাম আমার বিদ্যা ও বুদ্ধি মত। সেটা তার ভাল লাগল কি না জানি না। আর একটি মেয়ে বললে, 'হে ক্ষণিকের অতিথি' গানটি তার খুব ভাল লেগেছে। আমি শুধালাম, "কোথা থেকে শিখলে?" সে বললে, "বিশ্বজিতের কাছে শুনি, তারপর রেকর্ড থেকে অভ্যাস করে নিয়েছি।"

দ্বিবেদীকে হিন্দী সম্বন্ধে ছাত্র-ছাত্রীরা অনেক প্রশ্ন করল। দেখলাম, তারা নিষ্ঠার সঙ্গে ভাষাটা শিখছে। দ্বিবেদী তাদের সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিলেন।

সভাশেষে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথা বলছি, ইংরেজী জানে বলে অসুবিধা হচ্ছে না। সেই মেয়েটিকে ডেকে বললাম, "you ক্ষণিকের অতিথি, come to me!" সে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, "I am not ক্ষণিকের অতিথি; you are ক্ষণিকের অতিথি।" তার উত্তর শুনে সকলেই খুশী; কিন্তু চলে আসছি বলে অনেকেই দুঃখিত।

মোট কথা, জীবনের প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কাটিয়েছি বলে, যেখানেই তাদের দেখি, মনে হয় তাদের সবারই এক জাত। এখনও যে তাদের বিষদাঁত গজায় নি। কিন্তু একদিন দেখা যাবে তাদের অন্য রূপ। কোথায় যাবে সেই জ্ঞানের জন্য তৃষ্ণা, প্রেমের জন্য পাগলামি।

এখনই যেতে হবে বিশ্বজিতদের বাসায়। বিকালবেলায় জয়শ্রী এসেছিল ফ্রেণ্ডশীপ হাউসে নিমন্ত্রণ করতে। আমি বলেছিলাম, আমাদের গার্জেনদের ব্যবস্থা ছাড়া কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়। জয়শ্রী নাছোড়বান্দা—ঠিক ব্যবস্থা করে চলে গিয়েছে।

আমাদের সঙ্গে বরিস, লিডিয়া, দানিয়েল চুক চললেন। বিশ্বজিতরা থাকে পাঁচতলার ফ্ল্যাটে। শুভময় একটু পরে এল সুপ্রিয়াকে নিয়ে। কিছু খেতে হ'ল—সময় খুব কম, আকাদেমির গাড়ি দাঁড়িয়ে; আমাদের গাইডরা পৌঁছে দিয়ে ছুটি পাবে—ঘড়ি-ধরা কাজ, সময়মত চলাফেরা। লিফ্‌টে উঠে আসি—অবশ্য এসব লিফ্‌ট স্বয়ংচল। নামবার সময় এ লিফ্‌ট ছ'তলা থেকে সরসরিয়ে নেমে যায়—ঘণ্টা বাজালে থামে না পাঁচতলায়। তাই শুভময় ও বিশ্বজিৎ ছুটে ছয়তলায়

চলে গিয়ে দুটো লিফ্‌টে দু'জন ঢুকে নামিয়ে আনল পাঁচতলার মুখে। তাতে উঠে আমরা নেমে এলাম।

হোটেলে ফিরে এলাম। বরিসের সঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছে; সে জানত না যে, চীনারা ভারত আক্রমণ করেছে। আমি বলাতে সে খুব আশ্চর্য হয়ে গেল; কেবলমাত্র বললে, madness। এদের সঙ্গে আমরা রাজনীতি চর্চা করি নি; স্থানীয় রাজনীতিও জানতে চাই নি।

এমন সময় ফোন বেজে উঠল, লিডিয়া নিচের তলা থেকে ডাকছে, ডিনার তৈরি।

খাবার ঘরে যথারীতি নৃত্য চলছে, মঞ্চে ব'সে বাজনদাররা বাজিয়ে যাচ্ছে। আজ হোটেলে অনেকগুলি কিউবান্ অতিথি। আমাদের মত বর্ণশীলই বেশী—শ্বেতাঙ্গ বড় চোখে পড়ল না, খাস্ আফ্রিকান বর্ণ অনেকেরই। কিন্তু সবাই স্পেনীশভাষী ও সাহেব। খানাপিনায়, বিশেষত পিনায় কোন কার্পণ্য ও অনিচ্ছা নেই। কিউবায় মার্কিনরা হামলা করবে ব'লে হুমকি করেছে বলে মস্কোর কাগজ সব খুব গরম। ক্রুশ্চেভের দীর্ঘ ভাষণ বের হয়েছে। রুশ অতিথিদের অনুরোধে কিউবানরা আজ নাচগান করল। শুনলাম এরা jazz নাচছে।

আমার পিছনে আধাবয়সী এক মহিলা বরিসকে আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন; তিনি রুশীয় ইহুদী—আমার আকৃতি দেখে তিনি বোধ হয় ভেবে নিয়েছিলেন, আমি বুঝি তাঁদেরও স্বজাতি ও স্বধর্মী বা বিজাতীয়। উঠে আসছি; একজন অবসরপ্রাপ্ত মিলিটারী লোক বরিসকে জিজ্ঞাসা করলেন—আমি যদি তাঁর সঙ্গে বসে একটু পান করি, তবে তিনি খুব খুশী হবেন। বরিস তাঁকে বললেন—এঁরা ভারতীয়, মদ খান না। কথাটা আংশিক সত্য, কারণ দ্বিবেদী ও আমার মত বেরসিক কমই। কারণ লঙ্কায় যে যায় সেই রাবণ হয়। থাক্ সে আলোচনা। মদ খাওয়াটা যে ভাল নয়, এটা এখন নীতি উপদেশের মধ্যে ফেলা হচ্ছে, অর্থাৎ এখন এ সম্বন্ধে ইতর-ভদ্র প্রায় একমত—দোষ কি খেলে? ওসব ব্রাহ্মণ, নীতিবাগীশদের খুঁৎখুঁতানি। কিন্তু মুশকিল যে লোকে ত মদ খায় না, মদ যে তাকে খেয়ে বসে শেষকালে। দেখেছি যুবক ছাত্র সুকুমার সরকারকে—এই আধুনিকতার নামে মত্তপ হয়ে কলকাতার পথে পথে ঘুরে বেড়াতে, সে দৃশ্য ভুলতে পারি নে। শেষে একদিন এল আমাদের বাড়ীতে, স্ত্রীকে বললে—"মা, মরতে এলাম।" নানা ব্যাধিতে আক্রান্ত। কলকাতায় ফিরে গিয়ে অকালে মরল—বরিশাল থেকে মা এসেছেন; মরার সময় মাকে বলে, "মা, ভাইদের কলকাতায় পাঠিয়ো না।" সে জানত, কলকাতার আধুনিকতার নেশায় সর্বনাশের পথে সে গিয়েছিল। সংযম, ব্রহ্মচর্য প্রভৃতি উপহসিত হয়। মনের মধ্যে অনেক কথা উঠল—এই কয়েক মুহূর্তের মধ্যে।

লিডিয়া উপর পর্যন্ত উঠে এল, ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললে, "এবার যেমন অনুভব করছি, এমনটা কোনবার হয় নি।" এই ব'লে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল: আমি তার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলাম। আজ মস্কোতে আমাদের শেষ রজনী।

২৪শে অক্টোবর, ১৯৬২। মস্কো।

আজ সোবিয়েত-রুশে বাসের শেষদিন। সকালে উঠেই এই কথাটি মনে হ'ল—জীবনে অঘটন ঘটল। আর কখনও এ দেশে আসা কি হবে? বয়স যে অনেক হ'ল। সকালে আজ ভারতীয় দূতাবাসে সকলে চললাম; শ্রীজয়পাল এখন চার্জে আছেন। সুবিমল দত্তের পর আসার কথা মিঃ কাউল-এর; অন্তর্বর্তী পর্বে জয়পালের উপর ভার। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মালবীয় ও এস কে দে এসেছেন সোবিয়েতের নিমন্ত্রিত অতিথি হয়ে। তাই তাঁদের ব্যবস্থা সরকার থেকে হোটেলেই করা হয়েছে। তা না হ'লে দূতাবাসেই উঠতেন। সেখানে ভারতীয় ভাজিভুজি চা-এর সঙ্গে এল; জয়পালের লোকটি দেশ থেকে আনা, তাই পকোড়ি প্রভৃতি খেতে পান। চীনাদের ভারত আক্রমণ সম্বন্ধে যে খবর পেলাম, তা খুবই খারাপ। বোঝা গেল, এটা সীমান্ত হাঙ্গামা নয়—বহু দিনের সুচিন্তিত প্ল্যান মাফিক আক্রমণ, অথচ যুদ্ধ ঘোষণা না করেই যুদ্ধ।

এখান থেকে মার্কেটে চললাম—কৃপালানী লেখক-

গোষ্ঠীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে, হোটেলে খাবেন না। আমাদের হাতে যে কয়টা রুবল আছে, ফুঁকে দিতে হবে।

হোটেলে ফিরলাম, কিন্তু আজ মোটা কিছু খেলাম না—টুকিটাকি চলল—ক্ষিধে নেই। বের হ'তে হ'ল দু'টার মধ্যে—মস্কো রেডিও স্টেশনে উপস্থিত হলাম। ইতিমধ্যে ফোনে ফোনে কথা ঠিক হয়ে গেছে যে তিনটার সময় আমাদের তিন জনকে হিন্দীতে দশমিনিট ক'রে বলতে হবে। রেডিও স্টেশনের বাড়ীটা আমাদের কলকাতায় গারস্টিন প্লেসের পুরাণো রেডিও বাড়ীর মত। শুনলাম, নূতন বাড়ী তৈরি হচ্ছে বিরাট্ করে; সেখানে উঠে যাবে।

আমাদের বক্তব্য প্রথমে শুনে নিল মধু নামে একটি হিন্দীভাষী যুবক—মিষ্টভাষী, প্রিয়দর্শন যুবকটিকে বেশ ভাল লাগল। রেকর্ডে কণ্ঠস্বর প্রভৃতির রিহার্সাল হ'ল। তারপর আমার বক্তব্য রেকর্ড করা হ'ল, শোনান হ'ল। আমার পর দ্বিবেদী এবং তারপর কৃপালানী। আমি হেসে বলেছিলাম, বাঙালীর অ-লিঙ্গী হিন্দী, সিন্ধীর সিন্ধীগন্ধী হিন্দী আর বালিয়াবাসীর খাঁটি হিন্দী সকলে শুনবে। বক্তৃতার জন্য ১৭ রুবল ক'রে বোধ হয় পেলাম। কিন্তু খরচ করতে হবে, চল মার্কেটে। কিন্তু তার আগে খেতে হবে আকাদেমিতে—তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে। প্রাচ্যবিদ্যার কর্ণধার চেলিশভ ফিরেছেন বিশ্রাম মন্দির থেকে। দেশের নানা স্থানে Sanatoria আছে—সেখানে সোবিয়েত-কর্মীরা বিশ্রামের জন্য যেতে পারেন—ছুটি পেলে। চেলিশভ খুব ভাল হিন্দী, উর্দু জানেন—কথাও বলতে পারেন অনর্গল। আমরা কয়জন এবং আকরোমেভিচ, সেরিব্রেকভ এবং আর দুচারজন ছাড়া আর কেউ ছিল না পার্টিতে। নানা কথার মধ্যে চেলিশভ বললেন, তিনি হয়ত ভারতে যেতে পারেন স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম শতবার্ষিকী উৎসবে। তবে তখনই বললেন, স্বামীজির রাজনৈতিক মতামত ছাড়া অন্য কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করব না। আমি দেশে ফিরে স্থানীয় লোকদের বলেছিলাম—স্বামীজিকে নিয়ে তোমরা ভজন-পূজন, যাগযজ্ঞ হোম, চণ্ডীপাঠ—যা খুশি কর—কিন্তু তাঁকে মানুষ রূপে দেশের কাছে ধরবার ব্যবস্থাও রেখ, তাঁর বীরের মূর্তি দেখতে দিও।

এখান থেকে বের হয়েই চললাম মার্কেটে—পকেটে রেডিওতে পাওয়া রুবল-নোটগুলো খড় খড় করছে—তাদের খরচ করতেই হবে। বাজার ঘুরতে টুকিটাকি কেনা ত হয়েছে, একটা ক্যামেরাও কিনে ফেললাম, ইতিপূর্বে কৃপালানী, দ্বিবেদী কিনেছিলেন। জীবনে ক্যামেরায় কখনও টিক করি নি। ভাবলাম দেশে গিয়ে ছেলে-বৌদের কাউকে দেওয়া যাবে।

জিনিসপত্র নিয়ে বরিস চলে গেলেন হোটেলে—আমরা লিডিয়ার সঙ্গে চললাম বলশই থিয়েটারে। মার্কেট থেকে কাছেই—তাই হেঁটে যাওয়া গেল। বলশোই থিয়েটারে আজও টিকিট কাটা হওয়াতে আমি বললাম—"আর্ট থিয়েটার দেখলে হ'ত না?" শুনলাম—আর্ট থিয়েটার এখন তার পূর্ব গৌরব হারিয়েছে। স্ট্যানিসলাভস্কির মৃত্যুর পর (১৯৩৮) তাঁর সহকর্মী নেমিরোভিচ দানচেন্‌কো তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত (১৯৪৩) আর্ট থিয়েটারের মর্যাদা রক্ষা করে চলেছিলেন। লণ্ডন, প্যারিস, টোকিওতে আর্ট থিয়েটার সুনাম অর্জন করে। আজ বলশইতে কেবল ব্যালে—নাটক অভিনয় নেই। তবে কাহিনীকে নৃত্যে রূপ দিয়েছে।

প্রথমেই Chopin-এর বাজনা; এই স্বল্পায়ু পোলিশ সঙ্গীত-শিল্পী অমর হয়ে আছেন কয়েকটি Polonaise Fianaisil ও গোটা কয়েক mazurka-র জন্য। প্রথমগুলো পোল অভিজাতদের নৃত্য থেকে, দ্বিতীয় পোলচাষীদের গ্রাম্য নৃত্য থেকে গৃহীত। কিন্তু শিল্পীর হাতে পড়ে তাদের নূতন রূপ হয়েছে। আজকের রাতে mazurka দুটো হ'ল। ক্রচ্-কোবার নৃত্য অনবদ্য—লোকের কি উৎসাহ।

প্রথম বিরামের পর C. Ryno-র ব্যালে; তিনি গ্যেতের ফাউস্ট থেকে একটা অংশ সংগীতে নৃত্যে রূপ দিয়েছেন। শেষটি যাকে বলে জিমনাস্টিক ডান্‌স অর্থাৎ দেহের কসরতের সঙ্গে ছন্দ রেখে নৃত্য। বহুকাল পূর্বে রবীন্দ্রনাথকে এক ফরাসী যুবক এই দেহছন্দের নৃত্য দেখিয়েছিল—সর্বাঙ্গের পেশী যেন ছন্দোবদ্ধ হয়ে নৃত্যে যোগ দিয়েছে। কিন্তু তাতে ভঙ্গি ছিল বেশী;

আজকে যা দেখলাম, তাতে গতিটাই বেশী। মোট কথা—মুগ্ধ হয়ে দেখেছিলাম। পাশ্চাত্ত্য নৃত্য ও বাদ্যের টেকনিক বুঝিনে ব'লে নিজেকে অশিক্ষিত মনে হ'ল। বাল্যকাল থেকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য পড়তে এবং চিত্রকলা দেখতে ও বুঝতে 'অভ্যস্ত হই। তখন কানে শুনে শুনে পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতটার রস-গ্রহণ শক্তি অর্জন করব না কেন?

যাক্ তত্ত্বকথা। রাত দশটা বেজে গেছে। চল হোটেলে। বরিস এসে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে সাহায্যও করলেন। হোটেলে আজ অনেকেই খাচ্ছি, আমরা ছাড়া সেরিব্রেকোভ, চেলিশভ, বলরাজ সাহানীর ভাই। দেখা করতে এসেছেন অনেকে—বালপুরী সস্ত্রীক, শুভময়, বিশ্বজিৎ।

খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেল। সাড়ে এগারোটার পর আমরা হোটেল ছাড়লাম। জিজ্ঞাসা করেছিলাম—হোটেল-পোর্টার বা অন্যদের কিছু দেব নাকি। বরিস জানালেন সে রীতি এ দেশে নেই। সকলেই আমাদের সঙ্গে এয়ার-পোর্টে চললেন; মাঝরাত্রি তখন; বহুলোক অপেক্ষা করছে। বরিস আর আমি একটা লাউঞ্জে বসে, অন্যেরা কাফেতে গিয়েছেন। মাঝে একবার কোথায় যাবার জন্য কি একটা ঘোষণা করে উঠল। বরিস খোঁজ নিতে গেল। না, সে প্লেন আমাদের না—অন্যদিকে যাচ্ছে।

প্লেন ছাড়ল রাত দু'টায়, এ প্লেন যাবে জাকার্তা (জাভা) পর্যন্ত, অনেকগুলি ইন্দোনেশিয়ান এখান থেকে উঠল। অধিকাংশই নিতান্ত বালক; জানি না কি শিখতে এসেছিল।

একটু একটু বৃষ্টি পড়ছে, তবুও সকলে প্লেনের সিঁড়ি পর্যন্ত এলেন। লিডিয়ার চোখ ছলছল করছে। বুঝলাম এ-কয়দিনের সান্নিধ্যে তার মায়া পড়েছে।

প্লেন ছাড়ল—উড়ল। অন্ধকারের মধ্যে মস্কোয় নেমেছিলাম, অন্ধকারের মধ্যে উড়লাম।

রাত তিনটায় চা এনে দিল। এ যে সেই এয়ার হোস্টেস্, যাকে সেবার দেখেছিলাম আসবার সময়। সেও বোধ হয় চিনেছিল; স্মিত হাসল।

আমাদের তিন জনের আসন এবার কাছাকাছি ছিল। একটু ঘুম এল; ঘুম ভাঙলে দেখলাম, আকাশে আলো হয়েছে। তার পর বেলা ৭টায় তাসকন্দ বিমানবন্দরে এসে প্লেন থামল।

পাসপোর্ট দেখানর পর্ব শেষ করে নামলাম। শুল্কঘরে শুধাল রুবল আছে কি না—অর্থাৎ দরকার থাকে ভাঙিয়ে নিয়ে যাও ভারতীয় টাকায়। বললাম—যা পেয়েছিলাম সব খরচ করে এসেছি। কয়েকটা কোপেক নিয়ে যাচ্ছি, নাতি-নাতনীদের দেবার জন্য।

তাসকন্দ এয়ারপোর্টের রেস্তরাঁতে ব্রেকফাস্ট খেলাম। ভূরিভোজের আয়োজন—কে খাবে অত? তাসকন্দের বিখ্যাত তরমুজ—সবাই খাচ্ছে, আমিও খেলাম। বন্ধুরা খেলেন না, বললেন—এই ঠাণ্ডায় তরমুজ খায়? কিন্তু মস্কো লেনিনগ্রাদের অত শীতে রোজ রাতে ডিনারের পর আইসক্রীম খেতাম—আমারই শখ বেশী।

আলাপ হ'ল—সুদ নামে এক পাঞ্জাবী যুবকের সঙ্গে, সুইডেনে চার বছর ছিল—ইঞ্জিনীয়র, ধাতুবিদ্যাপারদর্শী। কথায় কথায় সে বললে, দেশে ফিরছি থাকব বলেই। অনেক সময়ে আমাদের মত যুবকদের সম্বন্ধে বলা হয় যে, আমরা টাকার জন্য বিদেশে পড়ে থাকি; আসলে কাজের সুবিধা পাই ব'লে থাকি। দেশে যদি কাজ করবার সুযোগ পাই, তবে থেকে যাব। সুদর্শন যুবক আন্তরিকতার সঙ্গে কথাগুলি বললে।

আরেকজন শ্বেতকায়—বললেন, তিনি মালয়ান। আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, আপনাকে দেখে ত মনে হয় না, আপনি মালয়বাসী। ভদ্রলোক বললেন—এখন মালয় চীনা ইংরেজ ভারতীয় সকলেই মালয়ান্। ভদ্রলোক সিঙ্গাপুরে থাকেন - ব্যবসা আছে। বললেন, সিঙ্গাপুর নিয়ে মালয় ফেডারেশন শীঘ্র হবে। বোর্ণিও-র সারাবককে ফেডারেশনের মধ্যে টানবার কথাও চলছে; তা হ'লে একটা বিরাট্ ফেডারেশন তৈরি হয়ে উঠবে। বোঝা গেল—এটা ব্রিটিশের পৃষ্ঠপোষকতায় সৃষ্ট হবে। পাশেই ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীন রাষ্ট্র। তাদের রঙ অস্পষ্ট। তাই ব্রিটিশ স্বার্থের অনুকূলে মালয় ফেডারেশনটা গ'ড়ে দিতে পারলে হয়ত আখেরে একদিন

কাজে লাগতে পারে। ইংরেজের দৃষ্টি শকুনিকেও হার মানায়।

তাসকন্দ থেকে প্লেন ছাড়ল পৌনে নটা— মস্কো টাইম।

আবার সেই তুষার-তরঙ্গ এল—কারাকোরাম, হিমালয়ের উপর দিয়ে চলেছি—চোখ ভ'রে দেখে নিচ্ছি নগাধিরাজের শোভা, আর ত দেখা হবে না এ চোখ দিয়ে এই শোভা।

দিল্লীর পালাম এয়ারপোর্টে প্লেন নামল ১২-৩০ মিনিট অর্থাৎ ভারতীয় ঘড়ির ২-৫৫ মিনিটে। কৃপালানীকে স্বাগত করবার জন্য এসেছেন নন্দিতা ও তার বান্ধবী রেখা ও অন্যেরা। দ্বিবেদীকে নি এসেছেন বাড়ীশুদ্ধ প্রায় সকলেই। সকলেই আম চেনা—পনেরো দিন আগে দেখা হয়েছিল। আমা নিতে এসেছে আমার কনিষ্ঠ পুত্র বিশ্বপ্রিয়। তা দেখে খুবই ভাল লাগল। কাস্টম্‌সে বেশী দেরি হ' না; বললাম, যা এনেছি, ক্যামেরা আছে—দাম বলল। অফিসারটি একবার তাঁর বড়কর্তার কা গেলেন। ফিরে এসে বললেন, ঠিক আছে, আপনা যান।

বিশ্বপ্রিয় ট্যাক্সিতে এসেছিল, সেই গাড়িতে করেই দিল্লীতে আমার ভাইঝির বাড়ী সুন্দর নগরে পৌছলাম।

সমাপ্ত

সুড়ঙ্গ

শ্রীপ্রফুল্ল সরকার

সেই অতল নিস্তব্ধতার মধ্যে খালি তিনটে আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল—ঠক্-ঠক্-ঠক্, আওয়াজ মৃদু এবং তীক্ষ্ণ।

এই কানাগলির জমাট অন্ধকারে ছায়ামূর্তি দুটোর মুখ দেখা যাচ্ছে না। এখন সবাই ঘুমিয়ে আছে। একদল ইঁদুর তাদের সুড়ঙ্গ পথ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর ক'রে নিয়ে যাচ্ছে। সেই সুড়ঙ্গ কাটার শব্দ কদাচিৎ শোনা যায়। গভীর থেকে আরও গভীরে চলে যাচ্ছে। ধ্বস হয়ত নামে কিন্তু দেরি হয়, কম-বেশি অনেক দেরি হয়। কেউ জানে না কতখানি কাটছে, কখন কোথায় কাটছে, কেমন ক'রে। ভেতরে ভেতরে অনেক দূর ফোঁপরা হয়ে যাচ্ছে।

আকাশে অনেক তারা। এখানে অন্ধকার। কিন্তু একটু দূরে বড় রাস্তার মোড়ের ওপর কড়া ফ্লোরেসেন্ট্ আলোও ফলতঃ অন্ধকার, যেহেতু দু'জন পাহারাদারই অনিবার্য মানবিক নিয়মে গভীর ঘুমের নেশায় আচ্ছন্ন। কয়েকটা মোটা ইঁদুর তাদের ভারি বুটের চারপাশটা একবার লেজ বুলিয়ে আবার সুড়ঙ্গের অন্ধকারে চলে যাচ্ছে।

এতক্ষণে দরজা খুলে গেছে আবার বন্ধ হয়েছে। ভেলোবাবুর ঘরের মধ্যে কানাই আর নরেন ফিরিস্তি পেশ করছে। সেই পাঁচ-পাওয়ারের নীল আবছা আলোয় ভেলোবাবুর চৌকো ভারি মিশ কালো রঙের মুখটা কালিঘাটের পটে যমরাজার মুখের মত ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। প্যান্ট আর হাওয়াই শার্ট পরা আছে ব'লে কানাই আর নরেনকে যমদূতের মত মনে হচ্ছে না, যেহেতু হাওয়াই শার্ট চীফ্ সেক্রেটারীও পরেন আবার এরাও পরে।

ভেলোবাবুর ওজনদার শরীরটা খুশিতে ভারি হয়ে ওঠায় তিনি একটা চেয়ারে বসলেন। চেয়ারটার গাঁটে গাঁটে আওয়াজ উঠল। কারণ, ভেলোবাবু রোজ একটা আস্ত পাঁঠার মাথার রোস্ট, তিন ডজন ডিম আরও অনেক কিছু খান। কিন্তু তবুও ঠোঁটের দু' প্রান্তে সাদা ঘা! বি-কম্‌প্লেক্স ভিটামিনের অভাব, না অন্য কিছু!

তা হ'লে কবুল করেছে? ভেলোবাবুর ভারি গলা শোনা গেল।

হ্যাঁ, বিলকুল সব। কানাই আর নরেন দু'জনে প্রায় একসঙ্গে বললে।

লাস্‌টা ঠিকমত পাচার করেছিস্ ত?

হ্যাঁ, তক্ষুণি। বিল্ট আর হায়দর চলে গেছে বর্ধমানে। ফিরতি পথে ঐ লরীতে নীলু আসবে চন্দননগর থেকে আলু আর মদের ব্লাডার নিয়ে কাল ভোরেই, নরেন বললে।

বিল্ট আর হায়দারকে হোটেলে থাকতে বলেছিস্ ত?

ভেলোদা, সে আমাদের ব'লে দিতে হবে! ব'লে দিয়েছি, বর্ধমানে ওদের নামে আগের থেকেই ঘর দখল আছে আমাদের নন্দবাবুর হোটেলে। সেখানে দিন পনের থাকতে বলেছি।

দাগটাগ কিছু রেখে আসিস্ নি ত।

রবারের দস্তানা ত ছিল। আঙুল থাকলে ত ছাপ! কানাই আর নরেন দু'জনেই হাসল।

আর কুকুর? ভেলোবাবু মুচকি হাসলে।

নরেন সে হাসি ফিরিয়ে দিয়ে বললে, মানে মিতা আর লাকি? এখানে আর টু-ফোঁ করতে হবে না। মাইরি ভেলোদা, পায়ের ধুলো দাও। কড়া একখানা প্যাঁচ ছেড়েছ মাইরি। আমি আর কানাই ত ব্যাটাকে চেপে ধরলাম, হায়দর ধরলে মুখ চেপে, আর ব্যাটা ত টিঙ্‌টিঙে ফড়িং, বিল্ট চাকুখানা তলপেটে ফ্যাঁচ ক'রে ঢুকিয়ে এমনি এক পাক দিয়ে কব্জি ঘোরালে যে, এক ফোঁটা রক্ত বাইরে বেরোল না। ভেতরের মাল সব ভেতরেই রয়ে গেল। বেটা একটুখানি থরথরিয়ে টান মেরে গেল। কাপড়-জামা সাফ, যেন বাইস্কোপ দেখে ফিরলাম। মাইরি ভেলোদা, পায়ের ধুলো দাও। নরেন হেঁট হয়ে সত্যিই পায়ের ধুলো নিলে।

ভেলোবাবুর ছোট ছোট চোখ দুটো কুটিল কোন এক সাপের চোখের মত চিক্ চিক্ করে উঠল। গালের ভগাট চর্বিগুলো খুশিতে আরও চক্‌চকে হ'ল।

এতদিনে বদলা নেওয়া গেল। হোলির দিনে সেই

দেশী মদের দোকানের ভেতর ঘনার মত তাগড়াই জোয়ানকে আছড়ে আছড়ে থেঁতলে থেঁতলে ঘায়েল ক'রে তারপর উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে সাবাড় করে দিয়েছিল। ঘনার বদলা ল্যাংচা। কিন্তু ল্যাংচা ত ঘনাকে মারে নি। ভেলোবাবু নাক দিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে শব্দ উঠিয়ে ও ভাবনাটাকে ঝেড়ে ফেললে। শক্ত, বেয়াড়া ভাবনার মুখোমুখি হ'লে ভেলোবাবু এই রকম শব্দ ক'রে তাদের তাতিয়ে দেয়। বদলা ইজ্ বদলা। ভেলোবাবু মনের মধ্যে বলে উঠল। ও শালা ত বাবুয়ার সাকরেদ। ঐ শালাই ত পুলিসকে খবর দিয়ে স্টেনগানটা ধরিয়ে দিয়েছিল। হাতিয়ারটাও গেল আর অতীনলাল এখনও জেলে পচছে। বাবুয়া এখন হাওয়ায় হাত ছুঁড়ে মরুক। ঘনা জানল না, এইটুকুই আফশোস।

জান ভেলোদা, আমরা যখন ল্যাংচাকে ডেকে নিয়ে এলাম মাল খাবার লোভ দেখিয়ে, ওর বুড়ী কানা মা-টা বললে, ল্যাংচা বাবা, একটু সকাল সকাল ফিরিস্। আমার শরীরটা ভাল নেই। আমরা তখন মনে মনে হাসছিলাম। ও আর ফিরছে না বুড়ী, জন্মের মত যাচ্ছে। নরেন বলতে বলতে হাসতে লাগল।

কানাই বললে, ভেলোদাকে বল্, শালাকে টোপ খাওয়াতে কত মেহনৎ করতে হয়েছে। ব্যাটা ভারি হুঁসিয়ার।

ভেলোবাবু হাসতে হাসতে গম্ভীর হয়ে গেল। গম্ভীর হ'লে ভেলোবাবুকে বড় ভয়ঙ্কর দেখায়। কানাই আর নরেন যেন চ'লে যাবার সঙ্কেত পেল। ওরা আস্তে আস্তে বেরিয়ে এসে পাশের বস্তিতে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

ভেলোবাবু এখনি ঘর অন্ধকার করবে। ভেলোবাবু এখনি আবার ঘুমিয়ে পড়বে। তার আগে ভেলোবাবু পাশের আলমারী থেকে হোয়াইট লেবেলের পাশের দেশী বোতলটা খুলে ঢক ঢক ক'রে অর্ধেকটা টেনে নিলে। এই সব স্ফূর্তির ব্যাপারে পুরাণো দোস্তই ভাল জমায়। তারপর চারটে সিগারেট পর পর। পাঁচ পাওয়ারের আলোটা খট্ করে নিভে গেল।

অন্ধকারে আকাশের দিকে মুখ করে তখন ল্যাংচার লাসটা বড় গঙ্গার ঢেউয়ে ঢেউয়ে দূরে দূরে ভেসে যাচ্ছে। কখন কোথায় কোন্ জেটিতে গিয়ে ঠেকবে। তারপর লাস ওঠাবে, চেরাই হবে। ততদিনে ওকে আর চেনা যাবে না। একটা কানা বুড়ী বাইরের শব্দ ঠাওর করে শুধু দিন গুণবে।

আর চন্দননগরের একটা ভাঙা-চোরা বাড়ির পলেস্তারা-ওঠা ঘরে ব'সে সুমিতাও দিন গুণছে ভেলোদার জন্যে। ভেলোদা তাকে চাকরি করে দেবে বলেছে। একুশ বছরের এত সুন্দর মুখ, রঙ, সুন্দর চোখ, সুন্দর চুল থাকতেও যখন সুমিতার জন্যে, উপসর্গ না চাইতে অনেক এলেও, শেষ পর্যন্ত কোন বর আনা গেল না, তখন চাকরিই ভাল। আর ভেলোদাও যখন কপালগুণে জুটে গেল। ভেলোদা আছে ব'লে বাবার চিকিৎসা হচ্ছে। তারা দুটো খেতে-পরতে পারছে। তার ভাই কানাইকে কলকাতায় চাকরি করে দিয়েছে। কি চাকরি সুমিতা জানে না। ভেলোদাও বলে নি। তার চাকরির জন্যে ভেলোদা অবিশ্যি বলেছে, কিন্তু তার কি চাকরি হবে? সে ত মাত্তর ক্লাস টেন পর্যন্ত পড়েছে। পড়াশোনা আর হ'ল না। বাবা গাড়ি চাপা পড়ে মরতে মরতে বেঁচে গেল। ভেলোদা না থাকলে কিছুতেই বাঁচত না। খুঁজে খুঁজে ভেলোদাই ত তাদের বাড়ীতে এসে খবরটা দিয়ে গেল। দেখা-শোনা করলে। বাবা আর ভাল হ'ল না, চাকরিও রইল না। ভেলোদা আর তার কি করবে? ভেলোদা ত আর ইচ্ছে করে বাবাকে চাপা দেয় নি? বাবার নিজেরই কপাল-ফের। ভেলোদা অনেকদিন আসে নি। সুমিতার ভালমানুষ মা-ও দিন গোণে। ভেলোদা নরেনের মারফৎ টাকাটা ঠিক মাসে মাসে পৌঁছে দিয়ে যায়। নরেন ছেলেটা বেশ, বেশ দেখতে। কথাবার্তাও খুব ভাল। ওর ভাই কানাইয়ের বন্ধু। কিন্তু কানাইটা যেন কেমন-কেমন হয়ে যাচ্ছে। কতদিন অন্তর অন্তর বাড়ীতে আসে। বলে অনেক কাজ। কানাইটা বেশ ভাল ভাল জামা-কাপড় পরে। মাঝে মাঝে মাকে টাকা দেয়। গেল মাসে তাকে খুব দামী শাড়ী কিনে দিয়েছে। বেনারসী পিসের চারটে ব্লাউজও। ভেলোদাকে বলতে হবে কানাইয়ের দিকে একটু নজর রাখতে। কানাই যদি একটা পাস করত ত বেশ হ'ত। ভেলোদাকে একদিন আসতে বলবে নরেনকে দিয়ে। কিন্তু ভেলোদার নাকি অনেক কাজ, সময় নেই।

ভেলোবাবুর সত্যিই সময় নেই। কতদিকে কত কাজ-কারবার। পাটনা থেকে কাল মাঝরাত্তিরে একটা ভারি মাল এসেছে। সেটা ভোর থাকতেই নেবুলালের গুদোমে পাঠিয়ে দিতে হবে আবগারী আর পুলিসের চোখ এড়িয়ে। আবগারীর কথা ভাবলে ভেলোবাবুর হাসি পায়। সেদিন তার লরীভর্তি

মদের র‍্যাডার আসছিল, ক'টা টিংটিঙে মড়াখেকো সেপাই—পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন টাকা মাইনের খাবেই বা কি, আর ক'টা দারোগা বোধ হয় ওৎ পেতে ছিল। ভেবেছিল, হাত দেখালেই লরী থামবে। আর একটু হ'লে দুটো সেপাই চাকার তলায় পড়েছিল আর কি! তারপর তাদের সেই ভাঙ্গা গাড়ি নিয়ে পেছনে ছোটা। মার্সিডিজ গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দেবে সরকারী ভগ্ন-রথ! ভেলোবাবু শুনে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে খুব হেসেছিল। খুব আনন্দের সময়ও ভেলোবাবু ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ করে। কিন্তু খবরটা দিচ্ছে কে? সন্ধান নিতে হবে। ল্যাংচার মত তাকেও সরাতে হবে। ভেলোবাবুর দাঁতটা আপনা-আপনিই কড়মড় করে উঠল। তার মোটা-মোটা বেঁটে আঙুলগুলো মুঠো পাকিয়ে শক্ত হয়ে গেল। ভেলোবাবুর রাগ হ'লে এমনি হয়। সবাই তা জানে।

সেদিন দুপুর বেলা এক সাধুবাবা কাঁদতে কাঁদতে এল। ভেলোবাবুকে কোথায় পাব—ভেলোবাবু—ও মশায়-সকল,—গলির চায়ের দোকানে বুড়ো জিজ্ঞেস করল।

ভেলোবাবু চায়ের দোকানেই ছিল।

কেন—কি হয়েছে? আমি ভেলোবাবু—ভেলোবাবু তার বাষট্টি ইঞ্চি ছাতিতে আঙুল দেখিয়ে বললে।

সাধুবাবা একবার সেই মুখের দিকে চাইল, তারপর হাউ হাউ ক'রে কাঁদতে কাঁদতে পা জড়িয়ে ধরলে। আমার সর্বনাশ হয়েছে বাবু, আমার সারা জীবনের পুঁজি একশো পাঁচটা টাকা আমার পুঁটলিতে ছিল। পাড়ে রেখে নাইতে নেমেছি, এমনি সময় একটা ছোকরা নিয়ে পালাল। একজন বললে, আপনাকে বললেই হবে। দয়া করুন বাবু, আমি ম'রে যাব—সাধুবাবা পা ছাড়ে না।

ভেলোবাবুর হাতের মুঠো শক্ত হয়ে গেল। সাধুকে ধমক দিয়ে বললে, উঠে দাঁড়ান। দেখছি।

দু'জন সাকরেদ ছুটল। দেখতে দেখতে ন' দশজন ছোকরাকে হাজির করলে সেই গলিতে। তাদের লাইন করে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হ'ল। ভেলোবাবু বললে, চিনতে পারেন ত—বলুন—

সাধু দেখালে—ঐ—ও—

ও হীরালাল—বসন্তের দাগভর্তি মুখ।

ভেলোবাবু বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। তারপর সে কি প্রচণ্ড মার! ছাড়িয়ে না নিলে হয়ত মরেই যেত। টাকা কি আর তখন হীরালালের কাছে ছিল, কখন পাচার হয়ে গিয়েছে। বিকেল বেলা নাগাদ সেই টাকা উদ্ধার হ'ল দমদমার এক ভাঙা বাড়ীর ইটের ফোকর থেকে। ভেলোবাবুর ট্যাক্সী ভাড়া পড়ে গেল ত্রিশ টাকার ওপর। সাধুবাবা জয়জয়কার দিয়ে চ'লে গেল।

এর কিছুদিন পরে সকালবেলা একজন কবি-কবি গোছের পাতলা চেহারার ছোকরা ভেলোবাবুকে এসে ধরলে। সঙ্গে তার নতুন বিয়ে-করা বউ।

বললে, আমরা নতুন এই পাড়ায় শ্যামরতনবাবুর বাড়ীতে ভাড়া এসেছি। কাল নাইট শোতে সিনেমা দেখে ফিরছিলাম। ক'জন লোক ঐ গলির বাঁকটায় দাঁড়িয়ে ছিল, ছোরা দেখিয়ে এর সব গয়নাগুলো কেড়ে নিয়েছে। আপনি যদি—আমরা আপনারই পাড়ার লোক—

ভেলোবাবু মেয়েটির মুখের দিকে চাইলে। ভারি সুন্দর মুখটা। গয়নার শোকে বোধ হয় সারারাত কান্নাকাটি করেছে। চোখ দুটো লাল হয়ে আছে।

নীলিমা, অঞ্জলি, রেবা, সন্ধ্যা, গৌরী, ললিতা, মলিনা,—পর পর আরও অনেক মুখ ভেলোবাবুর চোখের ওপর সারি সারি ভেসে গেল। শুধু সুমিতার মুখটা স্থির হয়ে রইল।

ভেলোবাবু বললে,—সুর গম্ভীর— সন্ধ্যেয় আসবেন। এখন যান।

সন্ধ্যেবেলায় নতুন বউটি তার সবগুলো গয়না ফেরত পেয়েছিল।

ঝামেলা কি একটা? কত শুকনো ঝঞ্ঝাট—তার কি ঠিক আছে? তরুণ সঙ্ঘের ছেলেরা এসে বললে, ভেলোদা, আমাদের কালীপুজোর ফাংশানে কৃতান্তকুমার আর নর্মদাদেবী গাইতে পারবে না বলছে—ভারি ডাঁট দেখাচ্ছে, বলে সময় নেই।

ভেলোবাবু হুঙ্কার দিয়ে বললে, যা, গিয়ে বলুগে— ভেলোবাবু আসতে বলেছে, তা হ'লেই কাজ হবে। যা—যা—এখন,—ব'লেই ভেলোবাবু মোটরে স্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে গেল চল্লিশ মাইল স্পীডে। বেলঘরিয়ার সেই বিধবার মেয়েটার বিয়ের খরচ দিতে হবে। বুড়ী অনেক ক'রে ধরেছিল। বর নাকি কোন্ কারখানায় কাজ করে। কত আর মাইনে পায়। মেয়েটা বেশ চালাক-চতুর, ফুটফুটে। সুযোগমত দু'জনকেই কাজে লাগানো যাবে। ভেলোবাবু টাকা ছড়ায়, সময়মত কুড়োয়ও তেমনি। পাড়ায় কে এমন আছে যে, বড় দুঃসময়ে ভেলোবাবুর কাছে বিনা সুদে টাকা ধার পায় নি। সে তিনতলার সুধাময়বাবুই হোক্ আর এক-

তলার নীলমণি রায়, পুলিস কোর্টের উকিলই হোক্। তবেই ত এত জোর। দিনদুপুরে এই গলির মধ্যে খুন করলেও কেউ এগিয়ে এসে বলবে? ভেলোবাবু জানে, ভদ্রলোকরা ওসব ঝামেলা-টামেলায় জড়াতে চায় না। সাক্ষী দাও, ঘরের খেয়ে কোর্টে দৌড়োদৌড়ি কর, থানা-পুলিসের বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। তারপর রাত-বিরেতে যখন ছুরি বসিয়ে দেবে, কি ধর, তোমার মুখে যদি অ্যাসিড ছুঁড়ে মারে, তখন কে তোমাকে বাঁচাবে? তার চেয়ে চুপচাপ সহাবস্থানই ভাল। দুনিয়া জুড়েই ত তাই হচ্ছে। তুমি তোমার কাজ কর, আমি করি আমার। তা ছাড়াও আছে কত সুপারিশ, কত মাথাওয়ালা হোমরাচোমরা। ১৯৬৭ সালের আর কতই বা দেরি?

বরানগরের গঙ্গার ধারে এই পুরণো বাগান বাড়ীটা আজ সরগরম হয়ে উঠেছে। চার বছর আগে ভেলোবাবু এটা কিনেছে। মধুকুঞ্জের মজলিশ বসবে আজ। এমনি বসে মাঝে মাঝে। তিনশো পঁয়ষট্টি দিন বুড়ো নরহরি মল্লিক এর তদারক করে। মজলিশের দিন হৈ-হল্লায় সারারাত তার ঘুম হয় না। মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েও তার আফিমের কড়া মৌতাত চুরমার হয়ে যায়। চোখের কোণের পিচুটি জলে চকচক্‌ করে ওঠে। মনে মনে বলে, মা বসুমতী, এই সব পাপিষ্টি পাষণ্ডের ভার আর কদ্দিন বইবি মা! দু'ফাঁক হয়ে গেরাস করে নে—গেরাস করে নে। বসুমতী বড় সহনশীলা, হয়ত বধিরাও। নরহরির রুজি-রোজগারের মুখ চেয়ে মা বসুমতী হয়ত কিছু করেন না। মজলিসের রাত ভোরে নরহরির হাতে করকরে পাঁচ-দশ টাকার নোটগুলো জল্ জল্ করতে থাকে। নইলে মাইনে আর সে কি এমন পায়। ভোরে যাবার সময় সাহেবরা খুব খুশী থাকে, হাত পাতলেই হাত ভর্তি।

আজ এরা দলে খুব ভারি। একবারে সাত-সাতজন। মজলিশ নিশ্চয়ই জমকালো। নরহরি সবাইকেই জানে। নীলিমা, অঞ্জলি, সন্ধ্যা, রেবা, ললিতা, মলিনা। আর একজন নতুন মেয়ে। একে নরহরি এর আগে দেখে নি। মুখটা যেন লক্ষ্মী-সরস্বতীর প্রতিমার মুখের মত। বয়েসটা বড্ড কম। মেয়েগুলো খুব আমুদে। নরহরিকে দাদু বলে, খেপায়। নরহরির ভাল লাগে। খারাপও লাগে, ওরা যদি ঘর পেত, সংসার পেত। হঠাৎ সব যেন উলটে-পালটে গেছে। সেই চল্লিশ সালের লড়াইয়ের পর থেকে কি যেন সব হয়ে গেল। কোথাকার হাওয়া কোন্ দিকে যাচ্ছে, কে জানে।

ভেলোবাবুকে নরহরি ভয় করে, মনে মনে শাপ-মন্যি দেয়। নরকের কঠিনতম শাস্তির বরাদ্দ করে। তবু এই বয়েসে কে আর তাকে চাকরি দেবে। তার একটা ছেলেও মানুষ হয় নি।

দুটো মেয়ের বিয়ের বয়েস অনেকদিন পার হয়েছে। বিয়ে দিতে হবে। তাড়াতাড়ি দিতে হবে। নরহরি এদের দেখে আর নিজের মেয়েদুটোর জন্যে ছটফট করে।

ঠিক রাত দশটার সময় সাতটা চকচকে মোটরে সাতজন দেশী সাহেব এল। পোশাকে চেহারায় ঝকঝকে ফিট্‌ফাট। চৌকো চৌকো ভারি মুখ, মোটা কব্জি, মোটা মোটা বেঁটে আঙ্গুলের জোরালো থাবা। জুতোর মচমচ আওয়াজ, জোয়ান সব দৈত্যের মত।

ভেলোবাবুর একমুখ হাসি আর অমায়িক সাদর আপ্যায়ন, আসুন স্যার, আসুন।

সব ভাল ত ভেলোবাবু, তিন-চারজনের সমস্বরের পিঠ-চাপড়ানো ছিটোনো অনুগ্রহের টুকরো।

আপনাদের দয়ায় স্যার—কোনরকমে টিকে আছি—

ভেলোবাবু দু'হাত কচলাতে লাগল।

তারপর সেই সাতজন সাত ঘরে চ'লে গেল। নিস্তব্ধ রাত্রির বাতাস স্খলিত চীৎকারে, হাসিতে, বীভৎস বেলেল্লাপনায় ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে কেঁপে উঠল।

দত্ত সাহেব একবার বাইরে এলেন। ঘোষ সাহেবও। দত্ত সাহেব ঠোঁটে সিগারেট চেপে জড়িত-গলায় বললে, ওহ্, শি ড্রিংক্‌স লাইক এ সোয়ালো!

ঘোষ বললে, মাইন্ ইজ এ টাইনি ট্যান্টালাইজিং স্প্যারো!

তারপর বাইরের হাওয়া নিয়ে দু'জনে দু'জনের ফেলে-আসা আমোদের ঘরে ঢুকে গেল।

ভোর থাকতেই সাহেবরা আবার মোটরে উঠলেন। যাবার আগে ঘোষ সাহেব শুধু ভেলোবাবুর কানে কানে বললে, একবারে নতুন, না? মনে হচ্ছে যেন একটু ইয়ে হয়েছে। একটু দেখ ত। তিনি মোটরে উঠলেন। মোটর স্টার্ট পেয়ে থরথরিয়ে উঠল। তারপর পাকা রাস্তায় টপ গীয়ারে উড়ে চলল।

হ্যাঁ, সাবিত্রী যেন মূর্ছার ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। নরহরি দেখলে একটা কচি নরম চিত্রল হরিণকে একটা রক্তলোলুপ বাঘ সারারাত তীক্ষ্ন নখে আর দাঁতে ছিঁড়ে-খুঁড়ে ফেলে রেখে গেছে। ভেলোবাবু একটু ছুটাছুটি

করলেন। চেনা নার্স হরিমতী এল। বাগানবাড়ীর সেই ঘরটা দিনকয়েক হাসপাতালের একটা ঘর হ'ল। এ আর এমন কি! আকছারই হয়। নরহরি মোটা বকশিস পেয়েছে। সাহেবরাও কেউ কেউ তার আগের চেনা। তবুও বসুমতীকে উদ্দেশ ক'রে নিয়মমাফিক অভিশাপের ফিরিস্তিও সে ঠিক ঠিক আউড়েছিল। আর আশ্চর্য, সেদিন তার হরিণের মাংস খেতে বড় সাধ হয়েছিল। কিন্তু হরিণের মাংস চাইলেই কি পাওয়া যায়?

সকাল হ'তে না হ'তে চোদ্দদিক থেকে ভেলোবাবুর চোদ্দখানা ট্যাক্সি তার ছাপ্পান্নখানা চাকা দিয়ে কলকাতার রাস্তাঘাট রোজকার মত চষে বেড়াতে লাগল। শুধু কি ট্যাক্সির, নানান্ বাঁকাচোরা রাস্তার নানান্ চলতি চাকার মিটারে টাকার অঙ্ক বাড়তে থাকে। ভেলোবাবুর গোপন আয়রণচেষ্টগুলোয় আর জায়গা ধরে না। টাকা—টাকা—টাকা। উত্তর-দক্ষিণ, পূব-পশ্চিম, ঈশান, অগ্নি, বায়ু, নৈঋত—ওপর-তলা, পাতালের নিচুতলা—সব দিক সব কোণ থেকে সুড়ঙ্গের মাটির মত টাকা ঝরঝর ক'রে ঝ'রে পড়ছে। ডিফেন্স ফাণ্ডে ভেলোবাবু পঁচিশ হাজার টাকা দিয়েছে। পার্ক সার্কাসে ভেলোবাবুর প্রকাণ্ড মোটরের কারখানা আছে ত! তার আয় কি কম? খাতির বাড়ছে, নাম হচ্ছে। ভেলোবাবু হয়ত কর্পোরেশনের আসছে ইলেকশনে দাঁড়াতে পারে। ছোঁড়ারা ত আছেই। তার পেছনে আরও আছে—অন্ধকারে অতর্কিতে ছোরা, বোমা, অ্যাসিড বাল্‌ব্।

সেদিন রাত্তির বেলায় সুমিতা আশ্চর্য হয়ে দেখল, তাদের সামনের দোতলা বাড়ীটার সব ক'টা ঘরের জানলা খোলা। আলো জ্বলছে। অনেক লোকজনের চলা-ফেরার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। শুভেন্দুরা কি ফিরে এল, না আর ফিরবে না ব'লে এতদিন পরে গোটা বাড়ীটা ভাড়া দিয়ে দিলে? মা'র শরীর খারাপ। একটু আগে লক্ষ্মীর পট পূজো করে শুয়েছে। তা ছাড়া সারাদিন উপোস গেছে। এই কৌতূহলের অংশ মাকে দিতে ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু মাকে আর জাগাতে ইচ্ছে হ'ল না। বাবা রোগা মানুষ, আগেই খেয়ে শুয়ে পড়েছেন। সুমিতা ঘর-বার ক'রে একটা বই টেনে নিয়ে পড়তে লাগল। দশটা না বাজলে তার খিদে পায় না। দশটার এখনও অনেক দেরি।

বাইরে জুতোর শব্দ হ'ল। তাদের দরজায় কে যেন কড়া নাড়ছে। সুমিতার একটু ভয় করতে লাগল। কানাই এসেছে কি, না নরেন?

সে দরজার এপার থেকে বললে—কে?

বাইরে থেকে ভরাট মিষ্টি গলার প্রশ্ন এল, মাসীমা আছেন? আমি শুভেন্দু।

শুভেন্দু! সুমিতা দোর খুলে দেখলে। লম্বা জোয়ান শুভেন্দু দাঁড়িয়ে। এ শুভেন্দুকে চেনা যায় না। সেই দশ বছর আগের তার খেলার আর নানান খুনসুটির সে শুভেন্দু এই বলিষ্ঠ যুবকের মধ্যে কোথায় হারিয়ে গিয়েছে।

সে কি করবে না করবে ঠিক করতে না পেরে, পায়ে হাত দিয়ে ঠক্ ক'রে একটা প্রণাম ক'রে ফেললে।

শুভেন্দু রঙ্গ করে পিছিয়ে যাবার ভান করে হেসে বললে, তুমি নিশ্চয়ই সুমিতা। কি ভাগ্যি! ভেবেছিলাম, তুমি নিশ্চয়ই এখন শ্বশুরবাড়ী। মাসীমা, মেসোমশায় ওঁরা সব কোথায়?

সুমিতা বললে, মা'র শরীরটা একটু খারাপ, শুয়ে পড়েছেন। আর বাবা—বাবাও শুয়ে পড়েছেন। দুর্ঘটনার সংবাদটা আজ এখনই নাই দিল। কতদিন পরে এল। দুঃখের কাহিনী ত আছেই, সে কাল সকালে হবে'খন। তারপরে বললে, বাঃ! আপনি—তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন। এস ভেতরে এস।

শুভেন্দু বললে, ওঁদের আর জাগাতে হবে না। আমি আবার কাল সকালেই আসব। চল, তোমার সঙ্গে একটু গল্প করে যাই। তার পর বিয়ে হ'ল কোথায়?

সুমিতা কিছু বললে না। শুভেন্দুকে হারিকেন দেখিয়ে তার পড়ার ঘরে নিয়ে এল। আলোটা টেবিলের ওপর রাখল। শুভেন্দু তার দিকে মুগ্ধের মত চেয়ে আছে দেখে বললে, কি দেখছ, বিয়ে হয় নি দেখে খুব নিরাশ হয়েছ বোধ হয়? ব'লে হেসে ফেললে।

শুভেন্দু হেসে বললে, ওরে বাবা, একবারে ফুল গ্রোন লেডী। কি সুন্দর তোমায় দেখতে হয়েছে সুমিতা। মনে হচ্ছে, সেই দশ বছর আগের ঝগড়াটে পাঁকাটি গড়ন মেয়েটার বদলে এ আবার কে? শুভেন্দু চিরকাল ভারি সরল, মনে যা আসে ব'লে দেয়। মাঝখানে দশটা বছর যে কেটে গেছে হয়ত সে খেয়ালই নেই।

সুমিতা হেসে বললে, আমিও মশায় বলতে জানি। তার পর এতদিন পরে যে চন্দননগরের কথা মনে পড়ল?

শুভেন্দু বললে, বাবা রিটায়ার করেছেন। কলকাতায় আমার চাকরি হওয়ারও কথা হচ্ছে। জয়ার বিয়ের পাত্তর খোঁজা হবে? বিদেশে আর কতদিন পড়ে থাকা যায় বল?

সুমিতা বললে, এবার থেকে থাকবে ত?

শুভেন্দু বললে, তা কি বলা যায়? বাবা-মা নিশ্চয়ই থাকবেন। আমার কথা কি বলতে পারি?

সুমিতা বললে, বাঃ রে, আমি কি শুধু তোমার কথা জিজ্ঞেস করছি?

শুভেন্দু বললে, ও।

সুমিতা হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে বললে, কতদিন পরে তুমি এ বাড়ীতে এলে। তোমাকে মিষ্টিমুখ না করিয়ে ত ছাড়তে পারছি না। মা'র কাছে নইলে কাল সকালে বকুনি খেতে হবে। কি দিই বল দেখি? নারকোল নাড়ু খাবে?

শুভেন্দু বললে, নারকোল নাড়ু, তা দাও। অনেকদিন ও দ্রব্যটি খাওয়া হয় নি। তবে কিন্তু বলে রাখছি, ছুটো-একটায় হবে না।

সুমিতা যেতে যেতে হেসে মুখ ফিরিয়ে বললে, আগে ছিলে খুদ্দুর, এখন যে একটি বিশালকায় রাক্কোস্ হয়ে এসেছ সে আমার আগেই মালুম হয়েছে। যা আছে, থালাশুদ্ধ সব এনে দিচ্ছি।

শুভেন্দু হেসে ঝট্ করে পাল্টা জবাবে বললে, সাবধান, একা পেয়ে তোমাকেও খেয়ে নিতে পারি কিন্তু। বলেই শুভেন্দুর হঠাৎ মনে হ'ল, কথাটা বলা কি ঠিক হয়েছে? দশ বছরের ব্যবধানটা দূর লাগছে না কেন তার? সে কি রূপবতী সুমিতাকে দেখার অপ্রত্যাশিত আনন্দে, না তার পূর্বপরিচয়ের স্বতঃসিদ্ধ দাবী?

সুমিতা অবিশ্যি কিছুই বললে না। একটা রেকাবিতে দশটা নাড়ু আর জল নিয়ে এল।

শুভেন্দু হেসে বললে, আমায় তুমি যত বড় রাক্ষস মনে করে আছ, ঠিক ততটা নই। এর অর্ধেক আমার, আর বাকী অর্ধেক তোমার। সেই আগেকার মত সমান সমান ভাগ, কেমন?

সুমিতা কি বলবে? তার ভারি ভাল লাগছে। বাবার ঐ দুর্ঘটনা হবার পর থেকে আজ প্রায় তিন বছর মনটা এত হালকা লাগে নি। ভাল লাগছে, সব ভাল লাগছে। এই স্বল্প আলো, এই আলাপ, এই হাসি। মনে হচ্ছে যেন ভারী সুন্দর একটি সুখ-স্বপ্ন। মনে হচ্ছে শুভেন্দু যেন সেই দশ বছর আগেকার ছেলে-বেলার হারিয়ে-যাওয়া হাওয়াকে সঙ্গে ক'রে এনে এ বাড়ীময় ছড়িয়ে দিয়েছে। দুঃখ নেই, অভাব নেই ভবিষ্যতের অন্ধকার নেই।

শুভেন্দু তাকে সত্যি সত্যিই পাঁচ পাঁচটি না খাইয়ে ছাড়লে।

তা হ'লে এখন উঠি, কাল সকালে আবার আসব— কেমন? শুভেন্দু চ'লে গেল। সুমিতা তাকে লণ্ঠ নিয়ে সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল।

সে রাত্রিতে অনেকক্ষণ সুমিতা তাদের সামনের আলো-ঝলমল বাড়ীটার দিকে চেয়ে রইল। ঘুম আসা আগে কেবলই ভাবতে লাগল, কখন সকাল হবে, বাড়ীর সকলের সঙ্গে কতদিন পরে আবার দেখা হবে জ্যেঠামশায়, জ্যেঠীমা না জানি কত বদ্লে গেছেন জয়া কত বড়টি আর শুভেন্দুর মত হয়ত কত সুন্দর হয়েছে। এই সব ভাবনার আনন্দে দোল খেতে খেতে সুমিতা এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল।

তার পর হারিয়ে-যাওয়া শুভেন্দু এ বাড়ীতে ফিরে এল অনেক মাধুর্য, অনেক মমতা, অনেক আশা আর আশ্বাস নিয়ে। সুমিতার মা বেশি কথার মানুষ নয়, বিশ্বাসে চিন্তায় এত সরল এ যুগে দেখা যায় না। সুমিতার বাবা এখন শুধু ঘরের মধ্যে একটু-আধটু উঠে-হেঁটে বেড়াতে পারেন। শুভেন্দু সময় পেলেই অনেকক্ষণ তাঁর বিছানার পাশে বসে। আশা দেয়, আশ্বাস দেয়। পড়বার জন্যে বই এনে দেয়। সেদিন এনে দিয়েছে নেহরু 'ডিস্কভারি অফ ইণ্ডিয়া' খানা। বলেছে, পড়ুন মেসোমশায়, ভারি ভাল বই, ভারতবর্ষের এত সত্যি কারের রূপ আর কম লোকই দেখেছেন।

সুমিতার বাবা দেবেনবাবু ডেলিপ্যাসেঞ্জারী ক'রে চাকরি করেছেন। সংসার আর আপিসের বাইরে যে আরও একটা বৃহৎ জগৎ আছে সে কথা ভুলেই গিয়েছিলেন। খবরের কাগজ অবিশ্যি ট্রেণে যেতে যেতে পড়তেন। সে আর কতটুকু। কংগ্রেস-কম্যুনিস্ট পলিটিক্সের তর্ক, মন্ত্রীদের মুণ্ডপাত, সিনেমা আর খেলা হল্লোড় ছাড়া ডেলিপ্যাসেঞ্জাররা আর কিছুরই ধার মাড়াত না। তার পর পঙ্গু হয়ে আজ তিন বছর এ ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী হয়ে আছেন। এ সব নানান বইয়ের পাতায় তিনি যেন এক নূতন মুক্তি স্বাদ পেলেন। এখন বুঝতে পারছেন, আসল বন্দি আর পঙ্গুতা দেহে নয়, মনে।

একটা বড় দাঁও সামনে এসেছে। কিন্তু শালা কিছুতেই বাগে আসছে না। বলে, না, ভেলোবাবু আই অ্যাম্ বোরড্ উইথ ইয়োর ওল্ড রট্ন্ স্টাফ্!

পুরোণ পচা মাল! শালা মগের মুল্লুক, না! নিত্যি-নতুন কোথায় পাওয়া যায়। ওদিকে মাগ্‌নিরাম্ আর বাট্‌লিওয়ালা খুব পটাচ্ছে। নিউ ইণ্ডিয়া হোটেলে নাকি এক জব্বর পার্টি দিয়েছে। রাত-ভোর খুব হুল্লোড় হয়েছে। খোদ্ প্যারিসের নাইট ক্লাবকেও নাকি হারিয়ে দিয়েছে। ভেলোবাবুর এখন আর দিগ্বিদিক্‌ জ্ঞান নেই। বাংলা দেশে বাঙ্গালীর ছেলেকে হটিয়ে দিয়ে ঐ ছ'বেটা কোন্ দেশ থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসবে, এ হ'তে পারে না। এদিকে সময়ও নেই, দিন পনেরর মধ্যে বেটা দিল্লী ফিরে যাবে।

হঠাৎ বিদ্যুৎ-চমকের মত সুমিতার কথা মনে হ'ল। ঐ একশো হাত-ফেরৎ পার্শী মেয়েটার কাছে সুমিতা। বেটার মাথা যদি না ঘুরে যায় ত ভেলোবাবু সারা সার্কুলার রোড ধ'রে নাক-খত দেবে। এত বড় একখানা দাঁও হাতছাড়া করা যায় না, কিছুতেই না, কোন মতেই না। সবচেয়ে বড় কথা ঐ শালাকেও ত হাতছাড়া করা যায় না।

কিন্তু সুমিতা বড় একটা নরম মায়ার কুহকের মত ভেলোবাবুর মত জবরদস্ত লোককেও কোথায় যেন কাবু করে রেখে দিয়েছে। ভেলোবাবু লেখাপড়া তেমন কিছু শেখে নি, তা হ'লে হয়ত খানিকটা বুঝতে পারত। মেয়েমানুষ সে অনেক দেখেছে। সমস্তিপুরের রাধা বৌদি, মুঙ্গেরের রত্না, আসানসোলের পুতুল—আরও অনেক। সবাইকেই ভেলোবাবুর চিনতে বাকী নেই। তার পর সি আই টি রোডের নিভা বৌদি, যার ওখানে তার ফ্লাশ বোর্ড বসে। কে না আসে, কেন আসে ভোলাবাবু জানে। খুব ভালভাবেই জানে। নিভা বৌদির হাড়গিল্লা স্বামীটাও জানে। নিভা বৌদি না কি সিনেমায় চান্স পাচ্ছে। কেমন করে পাচ্ছে তাও জানে। যেখানেই যাক, তার বোর্ডও থাকবে, তার বখরাও। মেয়েমানুষ জাতটাকেই সে ঘেন্না করে। শুধু টাকার দিকে ওদের চোখ। ইচ্ছে করলে, ভেলোবাবু ওদের নিয়ে যা খুশি তাই করতে পারে। কিন্তু দেখে দেখে ভেলোবাবুর কেমন একটা বমি-বমি ভাব আসে। রাধা বৌদির কত চিঠি জমে আছে—ঠাকুরপো, আমাদের কি ভুলে গেলে? এখানে এখন মাছ খুব সস্তা, তোমাকে খুব খাওয়াতে ইচ্ছে হচ্ছে। এমনি আরও কত কি। রাধা বৌদির স্বামী নাকি ঐ সব চিঠির জবানী বলে দেয়, হাতের লেখা শুধু রাধা বৌদির। আসল কথা, এস, টাকা দাও, আরও টাকা দাও।

শুধু সুমিতার বেলা কেমন একটা অন্য রকম ভাব আসে। সুমিতা অনেকবার চাকরি করতে চেয়েছে। চাকরি যে কি পদার্থ সে জানে ব'লেই সুমিতাকে এতদিন থামিয়ে রেখেছে। এক মুহূর্তেই ওকে ছিঁড়ে কুটে ফেলতে পারে। কিন্তু ভাবনাটাই কেমন যেন বুকের মধ্যে খচ্ খচ্ ক'রে কাঁটার মত ফুটতে থাকে। মেয়েমানুষকে বশ করবার জন্যে টাকা ছাড়া তার আর কিছু নেই। তবু আশ্চর্য, তার এই গরিলার মত চেহারাটাকে মেয়েগুলো ত ভয় পায় না? টাকা কি সব করতে পারে? সুমিতার চোখকেও ধাঁধিয়ে দিতে পারে? ভেলোবাবু একবার হঠাৎ জ্বরে পড়ে সুমিতাদের বাড়ী দু'দিন ছিল। সুমিতা ত তার চেহারা দেখে ঘেন্না করে নি? তাই সেই কপালে হাত বুলিয়ে দেওয়ার আমেজ মাঝে মাঝে চোখ বুজলে এখনও যেন সে স্পষ্ট অনুভব করতে পারে।

ভেলোবাবুব গোঁ বুনো শূয়োরের গোঁ। আজই একটা এস্পার ওস্পার হয়ে যাক। তার গাড়ি ছুটল গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ধ'রে চন্দননগরের দিকে।

গঙ্গার ধারে ষ্ট্র্যাণ্ডে দেখা হয়ে গেল। শুভেন্দু আর সুমিতা গল্প করতে করতে বেড়াচ্ছিল। একবারে সামনাসামনি ভেলোবাবু গাড়ি ব্রেক কযে দিলে। সুমিতা ততক্ষণে এগিয়ে এসেছে।

ভেলোবাবু বললে, তোমাদের বাড়ীই যাচ্ছিলাম। উঠে এস।

শুভেন্দুকে সুমিতা বললে, আমি একবার বাড়ী যাচ্ছি, শুভেন্দুদা। তুমি চ'লে যেও না। আমি আসছি।

সুমিতা পেছনের সীটে বসতে যাচ্ছিল। ভেলোবাবু তার পাশের সীট দেখিয়ে বললে, এখানে বস।

সুমিতা পাশে এসে বসল।

ভেলোবাবু বললে, তোমার সঙ্গে ও ছোকরাটা কে?

সুমিতা বললে, শুভেন্দুদা, ওরা এতদিন দিল্লীতে ছিল। মাসখানেক হ'ল ফিরে এসেছে। আমাদের বাড়ীর ঠিক সামনেই ওদের দোতলা বাড়ী।

ভেলোবাবু গম্ভীর হয়ে বললে, ও। হাত দুটো ষ্টীয়ারিংএ না থাকলে, আঙুলগুলো এখুনি মুঠো পাকিয়ে উঠত। একটা দেহাতী লোক চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গেল। ভেলোবাবু স্থান-কাল ভুলে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি দিয়ে উঠল। সেই অশ্লীল

হুঙ্কার শুনে সুমিতার সারা শরীর চমকে উঠল। কি ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে ভেলোদার মুখ।

বাড়ীতে পৌঁছে সুমিতা বললে, মাকে ডাকি?

ভেলোবাবু বললে, না, তোমার সঙ্গেই একটা খুব জরুরী কথা আছে। আজ আমার একটুও সময় নেই। এক্ষুণি চ'লে যাব।

সুমিতা অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসুর মত চেয়ে রইল। ভেলোবাবু বললে, তোমার জন্যে একটা চাকরি ঠিক করেছি। আজ এক্ষুণি যেতে হবে।

সুমিতা বললে এক্ষুণি? কলকাতায় যেতে ত রাত হয়ে যাবে। আর—চাকরি? কি চাকরি—কোথায়?

ভেলোবাবু রেগে গিয়ে বললে, সে সব খবরে তোমার দরকার নেই। আমি বলছি, তুমি চল।

সুমিতা বললে, একবার শুভেন্দুদাকে—

হঠাৎ ভেলোবাবুর হাত দুটো অজান্তেই কঠিন মুঠি পাকিয়ে উঠল। সে মোটরে আসতে আসতে অনেক কিছু ভেবে এসেছিল গুছিয়ে গুছিয়ে বলবে। কিন্তু ঐ শুভেন্দুই হঠাৎ সব গোলমাল করে দিল। শুভেন্দু আর বাবুয়া তার চোখে এক হয়ে গেল। বন্দুকের গুলীর মত তার মুখ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এল, তা হ'লে বিয়ে করবে?

সুমিতা আরও অবাক্ হয়ে গেল, বিয়ে!

ভেলোবাবু যেন গর্জন ক'রে বললে, হ্যাঁ, বিয়ে।

সুমিতা হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞেস করলে, কাকে?

ধর আমাকে। ধর কেন, আমি এক রকম ঠিক করেই ফেলেছি।

সুমিতা এতক্ষণ ভয় পাচ্ছিল। এখন ভাবলে, ভেলোদার এটা বোধ হয় একটা ভয়-দেখান তামাসা। তাকে নিয়ে মজা করবার জন্যে। হঠাৎ সে খিলখিল করে হেসে উঠল, ভেলোদা ব্যাপার কি বল ত? এত ভয় দেখাতেও পার তুমি! সুমিতা কিছু না ভেবেই বলেছিল।

কিন্তু এই কথাগুলোই তীক্ষ্ণ ছুরির ফলার মত ভেলোবাবুর সব চেয়ে দুর্বলতম স্থানে গিয়ে একবারে ঘা লাগালে। অন্ধ ঈর্ষায়, রাগে, অপমানে একবার ভাবলে কোমরের ছুরিটা খুলে সুমিতার বুকটা এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেয়। তার সমস্ত শরীরটা একটা ভয়ঙ্কর আক্রোশে কাঁপতে লাগল।

সুমিতা ভয় পেয়ে বললে, কি হয়েছে তোমার ভেলোদা? নিশ্চয়ই তোমার কোন অসুখ করেছে। দাঁড়াও, মাকে ডাকি। সুমিতা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যখন মাকে নিয়ে ফিরে এল তখন ঘরে কেউ নেই। বাইরে মোটরের স্টার্টের শব্দ শোনা গেল।

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় শুভেন্দু সুমিতাকে জিজ্ঞেস করেছিল, লোকটা কে সুমিতা? সুমিতা সব বলেছিল।

শুভেন্দু বললে, লোকটার চেহারা কি বীভৎস। কেমন ক্রিমিন্যাল—ক্রিমিন্যাল—

না না, শুভেন্দুদা, ভেলোদার বাইরেটা ওই রকম, মনটা ভারি সুন্দর। তুমি জান না, আমাদের দুঃসময়ে কত করেছে। কানাইয়ের চাকরি করে দিয়েছে। বাবার এক্সিডেন্টের পর থেকে আজ তিন বছর ধরে আমাদের সংসারের যত খরচ কানাইয়ের মাইনে বলে প্রতি মাসে ধরে দিচ্ছে। কানাই কত টাকা মাইনে পাবার যুগ্যি তা কি আমরা বুঝি না, ভেবেছ? ও টাকা ভেলোদাই দিয়ে আসছে।

শুধু আজকের ব্যাপারটা হাজার রকম চিন্তা করেও সুমিতা একটুও বুঝতে পারল না।

ভেলোবাবুর দিনরাত শান্তি নেই, স্বস্তি নেই। একটা একটুখানি গাঁইয়া মেয়ে, রূপের দেমাকে চোখে কানে দেখতে পাচ্ছে না। শুধু মায়া ক'রে এতদিন কিছু করে নি সে। বোকামি করেছে। যে কোনদিন ওকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিতে পারত। সেই না-দেওয়ার আফসোসে সে জ্বলে-পুড়ে মরতে লাগল। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শাস্তি সে দেবে, যেমন অনেককে সে দিয়েছে। তখন দেখবে, অত, দেমাক কোথায় থাকে। কোন্ শুভেন্দু তাকে বাঁচায় সে তাও দেখবে। ভেলোবাবু কে আর কি প্রকৃতির, ঐ মেয়েটা যদি জানত তা হ'লে তার সামনে অমন বিদ্রূপের খিল-খিল হাসি আর বেরোত না। ভেলোবাবুর বেড়াজাল তৈরী হয়ে গেল। শুধু এবার ঠিক মত ঘুরিয়ে পেতে ফেলবার অপেক্ষা।

দিন সাতেক পর সুমিতা জালে পড়ল। কানাইয়ের মারাত্মক অসুখের অছিলায় নরেন সুমিতাকে এনে ফেললে মধুকুঞ্জে সেদিন বিকেলে। এর আগেই কানাইকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে লক্ষ্ণৌয়ে, আপিসের একটা বড় চোরা-চালানের সঙ্গে সঙ্গে আসবে। মাস খানেকের মধ্যে সে আর ফিরবে না। ফিরে এসে যদি হৈ চৈ করে ত ল্যাংচার মত নিঃশব্দে সরিয়ে ফেললেই হবে।

সুমিতা এখন মধুকুঞ্জের একটা নিভৃত ঘরে কয়েদ হয়ে রয়েছে। ভারি তালার বড় চাবি বুড়ো নরহরি

মল্লিকের কোমরে বাঁধা। রাত দশটায় আজ শুধু একজন আসবে। চালকুমড়ো সাহেব। বেটার গোটা মাথাটা টাক, বেঁটে-খাটো চালকুমড়োর মত চাঁছা-ছোলা চেহারা। সই করেনি। বলেছে, আগে দেখি, তার পরে সই।

রাত তখন ন'টা। হুইস্কির একটা গোটা বোতল ভেলোবাবু প্রায় শেষ করে এনেছে। একবার ভাবলে, সুমিতাকে আমার প্রতাপটা বুঝিয়ে দিয়ে আসি। তার পর ভাবলে, না, কাল সকালে যখন সব দেমাক ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে, তখন সেই ছেঁড়া ফুলের পাপড়ির ওপর পা রেখে সে হো-হো করে হেসে আসবে। খিলখিলের উত্তর হো-হো। ভেলোবাবু তার বিরাট্‌ শরীর কাঁপিয়ে সেই হাসির যেন একটা মহড়া দিয়ে দিলে।

নরহরি ছট্‌ফট্‌ করছে। কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। হারামজাদা ভগবান্‌ মরেছে। মা বসুমতীর নিকুচি করেছে। বিড়বিড় করতে করতে চারদিক্‌ দেখে-শুনে সে ঘরের চাবি খুলে দিলে। চাপাগলায় বললে, ওগো শুনছ, ও মেয়ে, পালাও, ঘর খুলে দিয়েছি—এই বেলা পালাও—গাছগুলোর আড়ালে আড়ালে গা ঢেকে পেছনের ছোট গেট দিয়ে বেরিয়ে পাকা রাস্তা ধ'রে দৌড়ে পালাও—যতদূর পার। পালাও—নইলে সব্বোনাশ হবে।

সুমিতা যেন স্বপ্নের ঘোরে উঠে দাঁড়াল। গাছের আড়াল দিয়ে গেট পেরোল। তারপর সদর রাস্তা। আলোগুলো মিট মিট করছে। সে দৌড়তে লাগল। একটু দূরে একটা ট্যাক্সিওয়ালা তার ট্যাক্সির কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। সুমিতা হুড়মুড় ক'রে ট্যাক্সিতে উঠে ব'সে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, ড্রাইভার, চালাও, চালাও—

ড্রাইভার জিজ্ঞেস করলে—কোথায়?

সুমিতা অত কথার জবাব দিতে পারছে না। সে বোধ হয় এক্ষুণি অজ্ঞান হয়ে যাবে। সে কান্নার মত করে বলে উঠল, আমার বড় বিপদ্‌, যেখানে লোক আছে, জন আছে, সেইদিকে চালাও। ড্রাইভার জল্‌দী কর।

ড্রাইভারের সঙ্গের লোকটি নেমে গেল। ট্যাক্সি খানিক গিয়ে পাক ঘুরে উত্তরমুখো নৈহাটির দিকে ছুটল।

কাঁটায় কাঁটায় দশটার সময় চালকুমড়ো সাহেব এসে হাজির। গাড়ি বাগান-বাড়ীর ভেতরে গাড়ি-বারান্দায় থামল। ভেলোবাবু আপ্যায়িত করে বললে, আসুন স্যার।

আজ খুব টেনেছেন দেখছি। চালকুমড়ো সাহেব ভারিক্কি গলায় বললে। চালকুমড়ো সাহেব বাংলাটা বলে ভাল।

এই একটু স্যার। ভেলোবাবু বিনয়ে গদগদ হয়ে বললে। তারপর মনে মনে বললে, শালা, তুমিও টানবে। তুমি ত একটা মদের পিপে শালা। মনের কথা মনে চেপে মহা আপ্যায়িত করে বললে, আসুন স্যার, ভেতরে সব রেডি।

ছ'-সাতটা বড় পেগের পর মনটায় বেশ যখন রং ধ'রে এল, চালকুমড়ো সাহেব বললে, কই মিষ্টার ভেলোবাবু, তোমার চীজ দেখলাও।

ভেলোবাবু বললে, চলুন স্যার, একটু ঘুরে আসতে হবে। পিঁজরায় রাখতে হয়েছে। একবারে ব্র্যাণ্ড নিউ কিনা?

চালকুমড়ো হুড়মুড় করে উঠে পড়ল—লীড মি, কাইণ্ডলি লাইট।

কিন্তু ঘর খোলা হাঁ হাঁ করছে। পিঁজরায় পাখী নেই। চালকুমড়ো মহা রেগে গর্জন করে উঠল—ড্যাম্‌ড জোক্‌—দিল্লাগী—তাম্‌সা—সোয়াইন্‌—

নরহরি শরীর টান টান করে এগিয়ে এসে বললে, আমি খুলে দিয়েছি বাবু, যা করবার করুন।

ভেলোবাবু একবার কটমট করে নরহরির দিকে তাকাল, তারপর প্রচণ্ড জোরে চালকুমড়ো সাহেবের গালে তার সেই বিরাট্‌ হাতের এক চড়, তারপর ঘুঁষির পর ঘুঁষি আর লাথি। চালকুমড়ো সাহেব তখন সেই বারান্দার ধুলোর ওপর গড়াগড়ি যাচ্ছে। ভেলোবাবু যেন ক্ষেপে গিয়েছে, শালা, ঘুষখোর—মেয়েমানুষের মাংসখোর—শালা—

চালকুমড়ো সাহেব চেঁচাতে পাচ্ছে না কেলেঙ্কারীর ভয়ে। কোনরকমে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ি-মরি ক'রে গাড়ির দিকে ছুটতে ছুটতে বললে—আই উইল্‌ সী ইউ।

ভেলোবাবু বললে, শালা, আমি দেখতে জানি না? তোর কি না জানি আমি? শালা—

ভেলোবাবু তার দিকে দৌড়ে আসছে দেখে চালকুমড়ো সাহেব হুড়মুড় করে মোটরে উঠে স্টার্ট দিয়ে ছ'বার ছোটখাটো ধাক্কা খেয়ে তারপর পাকা রাস্তায় পড়ে জোরে মোটর হাঁকিয়ে পালাল।

মেহেরচাঁদ এসে বললে, হুজুর, ছুকরি ভাগ্‌নে নহি

শকা। হামারা ট্যাক্সি মে উঠ্‌গয়ী, কই পুলিসকা ঝামেলা হোয় ইস্‌লিয়ে রামপিয়ারা লে গিয়া উস্‌কী নৈহাটি দাসবাবুকা আড্ডামে।

কাঁহে—ব'লে গর্জন করেই মেহেরচাঁদের গালে প্রচণ্ড জোরে এক ঘুসি মারল ভেলোবাবু। মেহেরচাঁদ ছিট্‌কে দু'হাত দূরে মাটির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

তার নিজের প্ল্যান ঠিক ঠিক খেটে গিয়েছে জেনে আজ ভেলোবাবু যেন রাগে ক্ষেপে গিয়েছে। জাল যদি ছিঁড়ত, প্ল্যান কোথাও যদি ভেস্তে যেত, ভেলোবাবু বোধ হয় আরাম পেত। শুধু মেহেরচাঁদের কাছে নয়, তার নিজের কাছেও দুর্বোধ্য লাগছে। নরহরি শুধু মৃত্যুর আঘাতের জন্যে অপেক্ষা করছে। সে পালাবেও না, পুলিসও ডাকবে না। নরহরির প্রভুভক্তি এ আমলের নয়। কিন্তু সেই চরম আঘাত তখনও আসছে না দেখে নরহরিও ভয়ঙ্কর আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে।

হঠাৎ ভেলোবাবু চঞ্চল হয়ে উঠল। হাতঘড়িতে এগারোটা বেজেছে। সত্য আর শচীকে রুখতে হবে। যে ক'রেই হোক, রুখতেই হবে। গাড়িতে স্টার্ট দিয়েছে, এমন সময় আর একটা ট্যাক্সি ভেতরে ঢুকল। সত্য আর শচী এসেছে।

ভেলোবাবু চীৎকার করে উঠল—সত্য—শচী—

কাম্ ফতে ভেলোদা। দুজনেই মোটরের কাছে এসে মহা উল্লাসে বললে। এক বোমাতেই বেটার ধড় থেকে হাত-পা সব আধ মাইল দূরে ছিটকে গেছে। বেটার নাড়ীভুঁড়ি ট্রামের তারে ঝুলছে।

ভেলোবাবু যেন আর্তনাদ করে বললে, শুভেন্দু নেই?

সত্য আর শচী যেন ভীষণ চমকে উঠল, কি হ'ল ভেলোদা?

একটা মোটর-বাইক ভেতরে ঢুকল। দুজন লাফিয়ে ভেলোবাবুর কাছে এসে বললে, সর্বনাশ হয়েছে ভেলোদা, ফাঁসিতলার মোড়ে বিল্টুকে বোমায় উড়িয়ে দিয়েছে বাবুয়ার লোক। বিল্টু একেবারে খতম।

হঠাৎ ভেলোবাবুর হাত মুঠি পাকিয়ে উঠল। চোখ দুটো লাল হয়ে উঠল। হুঙ্কার দিয়ে উঠল, চল, মাটিরে ওঠ। আজ শালা বাবুয়াকেই খতম করব। যোড়া যন্তরটা নিয়ে আদি। বাগানের কোন্ অন্ধকার কোণ থেকে ভেলোবাবু তার ষ্টেনগান আর অসংখ্য কার্তুজ নিয়ে উঠল। মোটর বাইকটা মোটরের পিছু পিছু চলতে লাগল।

সুমিতার ট্যাক্সি তখনও চলছে। এক-একটা আলোর পোস্ট পার হয়ে যাচ্ছে, সুমিতা আশা আর আশ্বাসে ফিরে আসছে। ভাবছে, কোন মতে শুভেন্দুর কাছে যদি একবার পৌছতে পারি। এ ছাড়া আর কোন সংজ্ঞা তার নেই। কিন্তু ও ত জানে না, এক সুড়ঙ্গের অন্ধকার থেকে আর এক সুড়ঙ্গের অন্ধকারের দিকে সে চলেছে। এই রাস্তা আলো সবই সেই অদৃশ্য সুড়ঙ্গের এলাকা। এ অন্ধকারে শুভেন্দু আগেই হারিয়ে গেছে। সেও হয়ত যাবে।

সুমিতার মা মেয়ের পথ চেয়ে দুয়ারের ধারে মেঝের ওপর ব'সে আছেন। কখন ঝিম এসেছে টের পান নি।

সুমিতার বাবাও ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন।

আজ দোস্‌রা অক্টোবরের রাত। আজকে সবচেয়ে জোর মিটিংএর বক্তৃতার রিপোর্ট টেলিপ্রিণ্টারে খবরের কাগজের আপিসে আপিসে পৌঁছে গেছে। বাংলা কাগজের সহযোগী সম্পাদকেরা রাত জেগে জেগে তার অনুবাদ করছে—আমাদের সামনে দীর্ঘ চড়াই পথ। যে কোন মুহূর্তে হয়ত আমাদের সকলকে লড়াইয়ের মুখোমুখি হতে হবে। আমাদের এই প্রাচীন সভ্যতা আর ঐতিহ্যের শক্ত মাটির ওপর দাঁড়িয়ে আমরা শত্রুকে হটিয়ে দেবই। আমাদের যুদ্ধের গর্জন হোক্— সত্যমেব জয়তে।

সুমিতার বাবার টেবিলের ওপর উঠে গোটা কয়েক ধূর্ত শয়তান হিংসুটে ইঁদুর তখন 'ডিস্‌কভারি অফ ইণ্ডিয়া'র পাতাগুলো কাটছে। আর আর যাবতীয় ইঁদুরসকল অন্ধকারে নিঃশব্দে শহরে গ্রামে গঞ্জে মহাধিকরণে মাটির তলা দিয়ে দিয়ে দূরে দূরে সুড়ঙ্গ কেটে চলেছে।

সঙ্গীতের আসরে

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

স্মরণের স্বর্ণ-দেউল

বিগতযুগের বাংলা দেশে কীর্তন গানে শ্রীমতী পান্নাময়ীর ছিল অসামান্য খ্যাতি। কীর্তন গায়িকারূপে তাঁর নাম একসময়ে কীর্তনপ্রিয় বাংলার ঘরে ঘরে সুপরিচিত হয়েছিল। অর্ধ শতাব্দীরও আগে তাঁর একটি আসরের মুজ্‌রো ছিল ২০০।২৫০ টাকা। টাকার হিসেব দেওয়া হ'ল, কেননা এটি এখন আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় মাপকাঠি!

তাঁর গলা যেমন ভরাট, তেমনি ছিল তার বিস্তার। সেই দরাজ গলায় সুরকে তিনি দূর পাল্লায় প্রসারিত ক'রে দিতেন আরতোর ধারা-নিঃসারে আসর ভ'রে যেত। 'একবার দেখা দাও হে' ব'লে কোন গানের কলিতে যখন উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানাতেন, তখন ফুটে উঠত হৃদয়-মথিত এক অপূর্ব আকুতি। তাঁর সেই প্রাণ আকুল-করা এবং আন্তরিকতায় উদ্বেল কীর্তন শ্রোতাদের মনে জাগাত পুলক বেদনার বিচিত্র মাধুরী। কারণ, তাঁর কণ্ঠে সেই সঙ্গে দরদ ছিল আর মনে অনুভব। গানের অন্তর্নিহিত ভাবের তিনি কণ্ঠে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতেন। কীর্তনের বাণীরূপ সুরের পাখা মেলে পৌঁছাত শ্রোতাদের মরমে। আর সেখানে অনুরূপ ভাবের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করত।

শোক-বাসর থেকে সঙ্গীতের আসর পর্যন্ত অসাধারণ জনপ্রিয়তা ছিল পান্নাময়ীর গানের। সেই সব আসরে শোনা তাঁর কীর্তন মুখে মুখে ছড়িয়ে প'ড়ে বিখ্যাত হ'ত। যেমন, 'একবার এইখানে দাঁড়াও হে বংশীধারী,' 'উঠিতে কিশোরী, বসিতে কিশোরী, কিশোরী করেছি সার' ইত্যাদি গান।

গ্রামোফোন রেকর্ডের প্রথম যুগে তাঁর কয়েকটি গান রেকর্ড হয়েছিল। তিন মিনিটের রেকর্ডে কীর্তন গানের রূপ সুষ্ঠুভাবে বিধৃত হ'তে পারে না, তবু সেই সীমাবদ্ধতার মধ্যেও তাঁর রেকর্ডগুলি বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করেছিল শ্রোতাদের কাছে। সেকালে যাঁদের রেকর্ড সবচেয়ে বেশি বিক্রয় হ'ত, যাঁদের রেকর্ডের চাহিদা ছিল সর্বাধিক, পান্নাময়ী তাঁদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট। 'কি ছার দারুণ মানের লাগিয়ে বঁধুরে হারায়েছিলাম,' 'কানু কহে রাই কহিতে ডরাই,' 'ও কুব্জার বন্ধু হরি) আজ হ'তে রাধানাথ আর বলব না হে,' 'উঠিতে কিশোরী, বসিতে কিশোরী' তাঁর এইসব রেকর্ডের গান একসময়ে বাংলার আকাশে-বাতাসে ভাসত আর কীর্তনপ্রিয় সবাই কান পেতে সাগ্রহে শুনত।

কণ্ঠে মাধুর্য ও দরদ, আর মনে ভাবের আবেগ যে গায়ক-গায়িকার আছে, তাঁদের কীর্তন গানে শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে থাকে। পান্নাময়ীর কীর্তন শুনেও তাই পরিপূর্ণ তৃপ্তিলাভ হ'ত শ্রোতাদের। শ্রেষ্ঠ কীর্তন গানের জন্যে গায়ক-গায়িকার যে গুণাবলীর প্রয়োজন, তা তাঁর ছিল।

কীর্তন বাংলার এক নিজস্ব এবং অপরূপ সঙ্গীতসম্পদ। বাংলার প্রেমের অবতার শ্রীচৈতন্যের সঙ্গীতজগতে অমর ও মধুর দান। বাঙালী চরিত্রের বিশিষ্ট হৃদয়াবেগ ও মাধুর্য, এবং বাংলার কাব্য-সৌন্দর্যের নির্যাস মিলিত ক'রে যেন কীর্তনের সৃষ্টি হয়েছে। কীর্তনের তাই এমন মর্মস্পর্শী আবেদন দেখা যায় বাঙালীর প্রাণে আর মনে। পান্নাময়ীর কীর্তন তাই এত প্রিয় ছিল সেকালে। আজ থেকে প্রায় ৬০ বছর আগে, তাঁর সঙ্গীত-প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের যুগে।...

কিন্তু কে ছিলেন সেই পান্নাময়ী? কি তাঁর পরিচয়? অর্থাৎ তাঁর সঙ্গীত-পরিচয় ভিন্ন অন্য কিছু জানবার আছে কি?

এ প্রশ্নের উত্তর কোন পাঠক-পাঠিকা দিতে পারবেন কি না সন্দেহ!

পান্নাময়ীর সামাজিক বা পারিবারিক পরিচয় জানা বা দেওয়া হয়ত কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়। সে এক অন্ধকারের যবনিকা। কে তা উন্মোচন করবে?

প্রশ্নটিও অনেকের কাছে অবান্তর, এমনকি হৃদয়হীন মনে হ'তে পারে। পান্নাময়ীর গায়িকা ভিন্ন অন্য কি পরিচয় থাকতে পারে, দেবার মতন? সে যুগের গায়িকাদের আবার সামাজিক পরিচয় কি? তাঁদের সামাজিক বা

পারিবারিক পরিচয় জানতে চাওয়া কি অর্থহীন নয়? সামাজিক পরিচয় না থাকাই ত তাঁদের 'সামাজিক' পরিচয়! তাঁদের যে 'সমাজ', সে ত সমাজবহির্ভূত! সে পরিচয় ত কারুরই জানবার কথা নয়, একমাত্র সমাজ-বিজ্ঞানী ছাড়া! সেকালের গায়িকারা (অভিনেত্রীদের মতন) সমাজ-বহির্ভূত একটি বিশেষ স্তর থেকে আবির্ভূত হতেন, একথা কার অবিদিত আছে?

তাই প্রশ্নটি অবান্তর বোধ করতে পারেন অনেকেই। কেন এই গায়িকাকে অকারণ সেই কলঙ্কিত পরিবেশের সঙ্গে জড়িত করে আবার স্মরণ করা? সেই কালিমাময় স্মৃতির পুনরুজ্জীবনের প্রয়োজন কি?

না। সেই অসামাজিক শ্রেণী থেকে পান্নাময়ী উদ্ভূত হন নি! তা যদি হতেন, তা হ'লে এ প্রসঙ্গের নিশ্চয়ই অবতারণা করা হ'ত না! জন্মসূত্রে কোন সমাজ-নিন্দিত কলঙ্ক তাঁকে স্পর্শ করে নি। সমাজের সব শিশুদেরই মতন পিতৃ-পরিচয় চিহ্নিত হয়ে তাঁর প্রার্থিত জন্ম হয় এক বিশিষ্ট পরিবারে। যার নাম উল্লেখ করলে সে বংশ পাঠক-পাঠিকাদের অনেকেই চিনতে পারবেন। সুতরাং সে পরিচয় উদ্ঘাটন করা সম্ভব নয়—অস্বীকৃতির অতলে তা বিলুপ্ত হয়ে গেছে বহুকাল আগে। আর তাকে সূর্যালোকে মেলে ধরবার কোন সার্থকতা নেই। যা গেছে, আর তাকে ফিরিয়ে আনা যাবে না। আর যাঁদের নিয়ে এই মর্মন্তুদ প্রসঙ্গ, তাঁরাও সুখ-দুঃখ সম্মান-অপমানের সমস্ত চিহ্ন ইহজগতে ফেলে রেখে প্রয়াণ করেছেন চির-অজানা লোকে!

তবে পান্নাময়ীর সম্মান প্রতিষ্ঠায় কিছু সার্থকতা আছে, উত্তরকালের দরবারে। ভাবীকালের মানুষ তাঁর সত্য পরিচয় জেনে হয়ত তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে একবিন্দু সহানুভূতির অশ্রু ফেলতে পারে।

পান্নাময়ীর সে বংশ-পরিচয় অবশ্য বিবৃত করতে হবে নাম-ধামের উল্লেখ না ক'রে। শুধু ঘটনার বিবরণ দিয়ে। কারণ সেই সুপরিচিত কুল-পরিচয়ে তিনি পরিচিতা হ'তে পারেন নি। সেই তাঁর চরম দুর্ভাগ্য এবং সে দুর্ভাগ্যের জন্যে তাঁর নিজের কোন অপরাধ ছিল না।

নচেৎ 'দাসী' পদবীতে আখ্যাতা হবার কথা তাঁর নয়। সে আমলের রেকর্ডের গানের পুস্তিকা এবং অন্যান্য সূত্রে প্রকাশিত তাঁর চিত্র বা গানের সঙ্গে তাঁর নাম দেখা যায়—পান্নাময়ী দাসী! অথচ মাতৃ-পিতৃকুলের যথার্থ পরিচয়ে 'দেবী' রূপে ভূষিতা হবার অধিকার তাঁর ছিল। সে যুগের দেবী—অর্থাৎ বিগত কালের প্রথারূপে ব্যবহৃত ব্রাহ্মণকন্যার পদবী। প্রাক্-সাম্প্রতিক যুগের সিনেমাজগতে রাতারাতি যে সব দেবীদের উদয় হ'ত (যাদের উদ্দেশে মনীষী রাজশেখর বসু মহাশয় বলেছিলেন—"সিনেমাওয়ালীরা দেবীদের জাত মেরে দিয়েছে"), তেমন দেবী পান্নাময়ী নিশ্চয়ই ছিলেন না।

তাঁর কথা বলতে গেলে প্রায় গল্পকথার মতন শোনাবে। সুদূর কালের ব্যবধানও তাকে অবাস্তব ক'রে তুলেছে। অতীতের অতলে নিমজ্জিত হয়ে আছে সে কাহিনী। সেখান থেকে যদি উদ্ধার করা হয় সত্যকার বিবরণ, তবেই প্রকাশ হবে পান্নার প্রকৃত বৃত্তান্ত। জানা যাবে একটি মাটির মানুষের জীবন-ইতিহাসের এক অধ্যায়। একটি অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং একটি ছন্দপতনের ইতিকথা। আর তারই পৃষ্ঠপটে পান্নার পূর্বকথা।

সে কাহিনীর যবনিকা উন্মোচন করতে হ'লে আরও কিছুকাল পিছিয়ে যেতে হবে। স্থানেরও পরিবর্তন ঘটবে। উত্তর কলকাতার যে অংশে পান্নার বাস ছিল, যেখান থেকে তাঁর সঙ্গীতক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ হয়েছিল, তার অনেক দূরে এই ঘটনাস্থল। স্থানের নাম উল্লেখ করলে সকলেরই পরিচিত হ'তে পারত! কাল—আজ থেকে একশ' বছর আগে।

সে-সময়ে সেখানে যে পরিবারটির অবস্থান ছিল, তা যেমন বৃহৎ, তেমনি বিখ্যাত। সে বংশের নাম-পরিচয়ের বিষয়ে আর কিছু বলা সম্ভব নয়। শুধু একটি কথা জানান যায় যে, সেই বংশ তারও আগে থেকে সঙ্গীত-চর্চার জন্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। সে বিষয়ে এক ডাকে চেনবার মতন ছিল সেই পরিবার। কারণ সেই বংশের একাধিক গুণী বাংলার সঙ্গীতের আসরে নিজেদের নাম স্মরণীয় ক'রে গেছেন। বাংলা দেশের সঙ্গীত-চর্চার ইতিহাসে অতিশয় সম্মানের সঙ্গে লেখা থাকবে তাঁদের নাম।

কিন্তু তাঁদের সঙ্গে কিংবা সঙ্গীতের সঙ্গে এই ঘটনার কোন সম্পর্ক নেই। সেই পরিবারের হ'লেও এ এক স্বতন্ত্র কাহিনী।

সেকালের নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ সংসার। তার এক ভিন্নতর

পরিবেশ। সংস্কৃত চর্চা থেকে আরম্ভ করে আচার-বিচার আর বিধি-নিষেধের পালন যথাযথ হয়ে থাকে। যে সময়ের কথা, তখন শাস্ত্র-চর্চার সঙ্গে সঙ্গীত-চর্চা যুক্ত আছে নামে মাত্র। তার আগে বংশে সঙ্গীত-চর্চাই ছিল প্রধান, সঙ্গীত-সাধনাই বলা উচিত। সঙ্গীতের ঝঙ্কারে পরিপূর্ণ থাকত সেই বাড়ীটি, আগেকার আমলে। সে-সব সঙ্গীত-সাধকের সঙ্গে সঙ্গীত-চর্চার পাটও প্রায় তখন উঠে গেছে। সঙ্গীতকে তেমন করে অবলম্বন ক'রে থাকবার মতন মানুষ আর তখন বংশে কেউ নেই।

তবে সঙ্গীতপ্রীতি একেবারে অন্তর্ধান করে নি। সঙ্গীত-প্রেম তখনও বজায় আছে, বিস্মৃতপ্রায় সুরের রেশের মতন। পরিবারের প্রায় সকলেই মনেপ্রাণে সঙ্গীত ভালবাসে। সুরের আবেদন ঠিক সাড়া জাগায় অন্তরে। সুরের কানও আছে। ভাল-মন্দ গানের আর সুর-বেসুরের পার্থক্য সহজাত বুদ্ধি দিয়েই এ বংশের লোকেরা বুঝে থাকে। সঙ্গীতের চর্চা আর না থাক, তার শখ আছে ঠিকই। সঙ্গীত-শিল্পী আর না থাক, সঙ্গীতের প্রতি আন্তরিক আকর্ষণ একটা আছে। সাঙ্গীতিক পরিবার ব'লে আগে যে নাম-ডাক ছিল তার ক্ষীণ অবশেষ দিয়ে লোকে তখনও দিত তার পরিচয়। সঙ্গীতের সেই পুরণো সূত্র ধরে বংশের পরিচয় দিত সবাই, অন্তত যারা জানত সে-সব আগেকার আমলের কথা।

সঙ্গীত-খ্যাতি আর না থাক, সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন তখন তাদের একরকম চলে যায়। স্বচ্ছল সুখী পরিবার, শান্তিতে দিন কাটে। সেকালের নিস্তরঙ্গ, কিন্তু আনন্দময় দিন। সংঘাত-সঙ্কুল নয়, সমস্যা-সংগ্রামও নেই। কাছের শান্ত নদীটির প্রায় স্থির বুকে পাল-তোলা নৌকোর মতন একটানা তার ছন্দ।

কিন্তু সংসারে নিরবচ্ছিন্ন সুখ-শান্তি আছে কোথায়? পরিবারটির একটানা চলার ছন্দে অকস্মাৎ যতিভঙ্গ হ'ল। নিস্তরঙ্গ সরোবরের স্থির জলে যেন লোষ্ট্রপাত হয়ে তটের কিনারা পর্যন্ত চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে গেল জলের স্তরে স্তরে। সেই পরিবারের একটি ঘটনা সংবাদ হয়ে সে অঞ্চলের লোকের মুখে ক'দিন ফিরতে লাগল। কারুর আর জানতে বাকি রইল না সেই অঘটনের কথা।

একটি তরুণী তার পরম দুর্ভাগ্যের বোঝা বহন ক'রে সেই পরিবারে দিন যাপন করত। আশ্রিতা নয়, সেই বংশেরই আদরের মেয়ে। বাড়ীর অন্য সকলের সঙ্গে মিলে-মিশে দিন চ'লে গেলেও, তাদের মতন জীবন তার ছিল না। তার ব্যর্থ জীবন। প্রথম যৌবনেই বিধবা হয়ে সব সাধ-আনন্দ তার নিঃশেষ হয়ে যায়। একটি নবজাত শিশু কোলে নিয়ে যেদিন সে স্বামীকে হারিয়েছিল, সেদিন থেকেই তার সব সুখের জলাঞ্জলি। তারপর থেকেই শ্বশুরবাড়ীর পাট চুকিয়ে তার এইখানে বাস চলছিল। তার দুর্ভাগ্যের জন্যে স্নেহে আর সহানুভূতিতে ভরা ছিল সকলের মন। আদর দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে সবাই তাকে আনন্দে রাখবার যথাসাধ্য চেষ্টা করত। জীবনের পরম অভাব অবশ্য তাতে পূর্ণ হবে না, ভাগ্য আর তাকে ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না। এ কথাও সকলের জানা ছিল। তবু যতটুকু সুখে-শান্তিতে তাকে রাখা যায়! আর শিশুটির মুখ চেয়ে সে একরকম সন্তুষ্ট হয়েই থাকত। অন্তত বাড়ীর সকলের সেই ধারণাই ছিল।

কিন্তু মানুষের মনোলোক বিচিত্র আর বিচিত্রতর সে মনের গহন গতি। সেই তরুণীর রুদ্ধ বুকের অন্তরালে যে তরঙ্গ দোলা দিত, বাইরে থেকে কেউ তার সন্ধান পায় নি। কেউ কল্পনাও করতে পারে নি, সেই নতমুখী মেয়েটি কোনদিন এমন নস্যাৎ ক'রে দিতে পারে তার এতদিনের সমস্ত শিক্ষা-দীক্ষা সংস্কারকে!

একদিন সকালে সেই অসূর্যম্পশ্যাকে আর দেখতে পাওয়া গেল না। বাড়ীতে কোথাও নেই!

বিপদের প্রথম বিস্ময়ের মুখে তার অনুসন্ধানে চতুর্দিকে চেষ্টা করা হ'ল। বিমূঢ় হয়ে পড়লেন বাড়ীর কর্তাব্যক্তিরা। এ কি আত্মহত্যা? পুকুরে, খালে-বিলে জেলে দিয়ে জাল ফেলে তন্ন তন্ন ক'রে খোঁজা হ'ল। সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের বাড়ী সংবাদ গেল—এমন করে না ব'লে কোথাও সে কখনও যায় নি, তবু খবর নেওয়া হ'ল আপনার লোকদের বাড়ী বাড়ী। কিন্তু কোথাও কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

এ সবই নিরুদ্দেশ হওয়ার প্রথম দিকের কথা। প্রথম উত্তেজনার সময়ে, সব দিক্ ধীরভাবে বিবেচনা করে দেখবার আগে। আর একটা সম্ভাবনা যে থাকতে পারে, এমন চিন্তা কারুর মনে তখন উদয় হয় নি। কিংবা সে কথা এতই অসম্ভব, এমন অপ্রীতিকর বোধ হয়েছিল যে, ঘৃণায় সে চিন্তা মনেও স্থান দেয় নি কেউ।

কিন্তু অবশেষে সেই নিতান্ত অনভিপ্রেত সম্ভাবনাই

সত্যে পরিণত হ'ল। জানা গেল—এটি পলায়ন। গৃহত্যাগ। কুলত্যাগ। মুখে মুখে কোথা থেকে খবর এল—সেই একই রাত থেকে জানাশোনা আর একটি বাড়ীর একজনও নিরুদ্দেশ হয়েছে। সে ব্যক্তি পুরুষ।

তখন থেকে সে হতভাগিনীর অনুসন্ধানের সব চেষ্টা বন্ধ হ'ল। তার নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করা নিষিদ্ধ হয়ে গেল পরিবারে। অথচ চেষ্টা করলে শুধু সন্ধান নয়, তার উদ্ধার করাও অসম্ভব হ'ত না। কিন্তু সংসারে, সমাজে আর তাকে ফিরিয়ে আনা তার নিকট আত্মীয়দের কাম্য ছিল না। একটিবারের ভুলের জন্যে সমাজ থেকে একেবারে বহিষ্কার—এই ছিল রীতি। সেকালের হৃদয়হীন অর্গলবদ্ধ সমাজ। একবার কুলের বার হ'লে আর তার সেখানে স্থান নেই—তারপর তাকে অকূলে ভাসতেই হবে। ক্ষণিকের মোহ, বারেকের পদস্খলন—কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত আমৃত্যু অভিশপ্ত জীবন। আর অবশ্যই এ শাস্তি শুধু নারীর জন্যে। সমান, কিংবা আরও বেশি পাপী পুরুষ যে কোনদিন আবার ফিরে এসে স্বস্থানে দশজনের সঙ্গে নতুন ক'রে সংসার পাততে পারে।

সেই তরুণীও যে সেই রাতের অন্ধকারে পুরনো জীবনকে ফেলে আর এক জগতে চলে গেল, সেখান থেকে ফিরে আসবার আর কোন পথ রইল না! একটি মায়া শুধু কাটাতে পারে নি সে। দু'বছরের কন্যাটিকে বুকে নিয়ে কুলত্যাগিনী হয়েছিল!

ফুলের মতন নিষ্পাপ, ফুলেরই মতন সুন্দর সেই মেয়েটির পরে নাম হয়—পান্না।······

নতুন জায়গায় এসে নতুন করে জীবন আরম্ভ করলে পান্নার মা। কলকাতা শহরের মধ্যেই বিধবার আবার নতুন সংসার পাতা হ'ল। কিন্তু সে আর এক কলকাতা। সমাজের বাইরে। আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে দুস্তর ব্যবধান, তা অতিক্রম করবার ক্ষমতা কোনদিনই নেই। শুধু মনের অদৃশ্য সূত্র দুই প্রান্তে যুক্ত রয়ে গেল। বাইরেকার বিষম ঝড়েও তা ছিন্ন হ'ল না। পান্নার মায়ের পক্ষে ত না-জানার না-ভোলার কথাই নেই। আকাশের চাঁদের মতন, সোনার মন্দিরের মতন তার মনোলোক আলোকিত ক'রে রইল পূর্ব-জীবনের অক্ষয় স্মৃতি। সে এক বিচিত্র অনুভব। অদৃশ্য অন্তর্লোকে স্মৃতির শিকড় সঞ্চারিত থাকে। মানুষ ভুলতে পারে না। অন্য প্রান্তেও তেমনি এক অবর্ণনীয় যোগ রইল, যার কোন প্রকাশ নেই।

দুই তটের মাঝখান দিয়ে কালের স্রোত দুর্নিবার বয়ে চলল। সময়ের সমষ্টিতে গড়া মাস, বছর, যুগ পার হয়ে গেল অন্তরের যাত্রাপথে।

এমনিভাবে দু' যুগ পার হয়ে গেছে। অল্প সময় নয়। বহু পরিবর্তন ঘটেছে এর মধ্যে। সেই দু' বছরের শিশু-কন্যাটি এখন উদীয়মানা কীর্তন গায়িকা পান্নাময়ী!

খুব কম বয়স থেকেই তার গানের গলা লক্ষ্য করেন তার মা। মেয়ের মিষ্টি গলা আর গানের দিকে ঝোঁক দেখে মা স্পষ্টই বোঝেন, বংশের সঙ্গীত-চর্চার ধারা ঘুরে এসেছে মেয়ের মধ্যে। আর সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে—কিন্তু অন্তরের এই একটি সম্পদ কেমন অন্তঃসলিলা হয়ে বয়ে এসেছে। এ কি আশ্চর্য জীবনলীলা!

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পান্নার সুকণ্ঠ উত্তরোত্তর ফুটতে লাগল এবং তার মা মেয়ের সঙ্গে এই সম্পদটিও সযত্নে লালন-পালন করতে লাগলেন। ভিন্নতর পরিবেশে পান্নার সঙ্গীত-শিক্ষায় আর কোন বাধাও নেই। মেয়ের সঙ্গীতে নৈপুণ্য দেখে মা তার এটিকে পেশা করবার কথাও চিন্তা করলেন এবং তার নিয়মিত সঙ্গীত-শিক্ষারও ব্যবস্থা হ'ল।

ক্রমে দেখা গেল, মেয়ের কীর্তন গানই সবচেয়ে বেশি ভাল লাগে আর কীর্তনই সে সবচেয়ে বেশি ভালবাসে গাইতে। তখন তার মা বিশেষ ক'রে মেয়ের কীর্তন শেখবার ব্যবস্থা করলেন উপযুক্ত শিক্ষকের কাছে। অতি দ্রুত পান্না কীর্তনের রীতি-নীতি গায়ন-পদ্ধতি আয়ত্ত করতে লাগল। আর অল্প বয়স থেকেই তার নাম হ'ল, সুমধুর কীর্তন গানের জন্যে। কীর্তন-গায়িকা পান্নার খ্যাতির বৃত্ত দেখতে দেখতে বৃদ্ধি পেলে। শেষে কীর্তনই হ'ল তাঁর জীবনের প্রধান অবলম্বন। কাছে দূরে নানা জায়গা থেকে তাঁর ডাক আসতে লাগল কীর্তনের আসরে। আর যেখানে গাইতেন, সেখানে তাঁর নামে একটা সাড়া প'ড়ে যেত। তাঁর গান শোনবার জন্যে আসর ভরে উঠত উৎসাহী শ্রোতায়।

পান্নাময়ীর মা মেয়ের কাছে বংশ-পরিচয় গোপন রাখেন নি। নিজের পিতৃকুলের কথা মেয়েকে সবই জানিয়েছিলেন, তার বোঝবার মতন বয়স হ'লে। সে যেন নিজেকে হীন

যা মনে করে, আত্মমর্যাদা যেন তার সদা-জাগ্রত থাকে, কারণ অতি সৎকুলে তার জন্ম। দেশের লোক জানে না, সমাজ জানে না, তবু পান্না যেন ভুলে না যায় তার বংশ-গৌরবের কথা। এই চিন্তায় ব্যাকুল হয়েই তিনি মেয়ের কাছে নিজের পিতৃ-পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করেছিলেন। না ক'রে পারেন নি। পান্নার গানের গলার কথায় তাকে স্মরণ করিয়ে দিতেন, কোথা থেকে এসেছে এই সঙ্গীতের ধারা। নিজে যেমন বংশ-গৌরবের বিষয়ে সচেতন ছিলেন, মেয়েও যেন তেমনি থাকে, এই তাঁর বড় ইচ্ছা ছিল। আর সেই সঙ্গে রক্তসম্পর্কের টান—তা ত কোনদিনই যাবার নয়। যত বেদনা-তত আনন্দ বয়ে আনে এই নিষিদ্ধ পরিচয়-কথা।

মায়ের মুখে শোনা এই সব অতীত কাহিনী পান্নার মধ্যেও গভীরভাবে মুদ্রিত হয়ে যায়। তাঁর মনের পটে অপূর্ব মায়া-অঞ্জন এঁকে দেয় সেসব কথা এবং তিনি অদম্য আকর্ষণ বোধ করতেন সেই হারানো কুলের কথা স্মরণ করে। বিশেষ করে বড় হবার পর থেকে। সেই উৎসমূল, যার বৃন্তের ওপর দল মেলেছে তাঁর মায়ের জীবন, তাঁর নিজের জীবন—তাকে মনের সঙ্গোপনে পরম মমতায় লালন করতেন। অন্তরে সেই সুদূর স্মৃতির এক স্বর্ণ-দেউল রচনা করে অঞ্জলি দিতেন নিজেরই মনের মাধুরী দিয়ে। আর এক অদ্ভুত সাধ জাগত। 'সপ্ত পুরুষ যেথায় মানুষ' সেই সোনার চেয়ে দামী ভিটাকে একবার প্রণতি জানাতে প্রাণ চাইত সেখানে গিয়ে। সেখানকার মানুষদের কাছে গিয়ে একবার দাঁড়াতে। তাঁদের বলতে—আমি তোমাদেরই একজন, আমাকে তোমরা চেন না। কিন্তু আমি তোমাদের চিনি। আমি মনে মনে তোমাদের সঙ্গে মিশে আছি। আমি তোমাদের কাছে আর কখনও আসব না। কিন্তু তোমরা আমাকে ভুলে যেও না। মনের এক কোণে আমায় একটু ঠাঁই দিও। আমি আর কিছু চাই না তোমাদের কাছে।

এমন সাধ যে কি অদ্ভুত আর কত অসম্ভব, পান্নার নিজেরও তা অজানা নয়। তাই সে সাধের অসাধ্য সাধন করবার কথা সত্যি সত্যি মনে হয় না। শুধু একটি প্রিয় দিবাস্বপ্ন হায় মনের আকাশ মাঝে মাঝে রঞ্জিত করে দেয়। শুধু নিভৃত অবসরে জল্পনা-কল্পনা। নিজের মনের গহনে স্বর্গ রচনা।......

কিন্তু অবশেষে একদিন সেই আকাশের স্বপ্ন মাটির কাছাকাছি নেমে এল। পান্নাময়ীর তখন গায়িকারূপে আরও প্রসিদ্ধি, আরও প্রতিষ্ঠা হয়েছে। জীবনে প্রতিপত্তি লাভ করলে, যশস্বিনী হ'লে অনেক অভাবিত বিষয়ও সম্ভব হ'তে পারে। তিনিও এক অভিনব উপায় স্থির করলেন জন্মভূমি দর্শন করবার।

মায়ের মুখে শুনেছিলেন, সেই স্বর্গপুরীর সামনে আছে একটি দেবস্থান। এক প্রাচীন মন্দির। তিনি সেই মন্দিরের চত্বরে একটি কীর্তনের আসর করবেন দেবতাকে গান শোনাবার জন্যে। সেখানে লোক মারফৎ সংবাদ পাঠালেন নিজের ইচ্ছার কথা জানিয়ে। এবং সেখানকার প্রধানদের কাছে অনুরোধ করলেন তাঁর এই সাধ যেন পূর্ণ করা হয়।

বলা বাহুল্য, স্থানীয় নেতৃমণ্ডলী সানন্দে সম্মত হলেন পান্নাময়ীর মতন স্বনামধন্যা গায়িকা স্বেচ্ছায় গান শোনাতে আসতে চান—এই কথায় সেখানে সাড়া পড়ে গেল। তাঁরা তাঁকে আসবার আমন্ত্রণ জানিয়ে অবিলম্বে আসরের আয়োজন করলেন মন্দিরের বিরাট চত্বরে। প্রকাণ্ড সামিয়ানা বাঁধা হ'ল। তার একদিকে পুরুষদের জায়গা আর একদিকে ঘন চিকের আড়ালে মহিলাদের নির্দিষ্ট স্থান। মাঝখানে ফরাসের ওপর কীর্তনের আসর।

যথাসময়ে পান্নাময়ী সেখানে সদলে এসে উপস্থিত হলেন। বিশেষ অভ্যর্থনা জানালেন উদ্‌যোক্তারা। পান্নার সমস্ত ইন্দ্রিয় তখন অধিকার ক'রে আছে একটিমাত্র চেতনা—ওই সেই জন্মস্থান আমার চোখের সামনে এতদিন পরে ধরা দিয়েছে। ওই আমার সাধের পূর্বপুরুষের ভিটা। মায়ের মুখে শুনে শুনে সে বাড়ীর রূপ তাঁর মনের পটে আঁকা হয়ে আছে। সে বাড়ী চিনে নিতে তাঁর মুহূর্তও দেরি হ'ল না। প্রাণ ভ'রে দেখতে লাগলেন সেই চির আপন আর চিরকালের পর বাড়ীটির দিকে। শুধু ইটকাঠে গড়া তার বহিরঙ্গ নয়। সেই ভিটায় সুখ-দুঃখ হাসিকান্নায় ভরা জীবন্ত সংসার এখনো আছে। বেঁচে আছেন তাঁরই কত আত্মজন।

যত ব্যবধানই থাক, সেই সব সংসারের সামনে যে তিনি এতদিন পরে সত্যিই এসেছেন, একথা চিন্তা করেই পান্নার মন ভরে উঠেছে। পরিচিত হ'তে, পরিচয় পেতে, আত্মীয়তার দাবি করতে—কিছুই তিনি চান না। এখানে উপস্থিত হ'তে পেরেই তিনি কৃতার্থ হয়েছেন। জীবনের পরম

তীর্থস্থানে আজ তিনি সমাগতা, আর কোন আকাঙ্ক্ষা তাঁর নেই। স্মৃতির স্বর্ণ দেউলের দ্বারে তীর্থযাত্রিণী আজ সমুপস্থিত। অন্য সকলে যাকে মন্দিররূপে দেখছে, তা তাঁর মন্দির নয়। তাঁর সোনার মন্দির ওই ভিটার মাটি!...

পরিপূর্ণ সভার মাঝখানে ব'সে পান্নাময়ী গান আরম্ভ করলেন। তাঁর নিজের কাছে তা' গান নয়, প্রাণের একান্ত আকুতি। সুরের অঞ্জলি যেন অঝোর ধারে নিবেদন করতে লাগলেন মনোমন্দিরের দেবতাকে। তৃপ্ত অন্তরের আবেগে তিনি গাইতে লাগলেন—

কি ছার দারুণ মানের লাগিয়ে
বঁধুরে হারায়েছিলাম।

উৎকর্ণ শ্রোতৃমণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছেন পান্নাময়ীর সেই বিখ্যাত কীর্তন। তিনি আপন ভাবে বিভোর হয়ে আঁখর দিয়ে গেয়ে চলেছেন—

এমন বঁধু কার বা আছে—বঁধুর মতন গো,
এমন বঁধু আর কার কার বা আছে।...

তাঁর অন্তস্তল থেকে সুরের মন্দাকিনী ধারা উৎসারিত হ'তে লাগল। আর এক বেদনা-মধুর সুধারসে পূর্ণ হয়ে উঠল সকলের মন। চক্ষু সজল।

পান্নাময়ী সেদিন নিজেই নিজেকে অতিক্রম করে গেলেন, এত দরদ দিয়ে তিনিও সচরাচর গান করেন না। শ্রোতারা উপলক্ষ্য, মন্দিরের দেবতা উপলক্ষ্য। লক্ষ্য—নিজের অন্তরাত্মা। তাকে তৃপ্তি দেবার জন্যে তিনি সুরের ডালি উজাড় করে দিয়েছেন। তাই তাঁর নিজের অনুভব এমন প্রাণ পেয়েছে গানের সার্থক ব্যঞ্জনায়।

আসরে চিকের আড়াল থেকে যে মহিলারা গান শুনছিলেন, তাঁদের মধ্যে পান্নার মাতৃকুলের কয়েকজন ছিলেন তাঁরা জানতেন গায়িকার পরিচয়, অর্থাৎ তাঁর সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কের কথা। আর তা' জেনেই তাঁরা কীর্তনের আসরে এসেছিলেন। গান শুনতে তত নয়, যত গায়িকাকে দেখবার জন্যে। আসরের পুরুষদের মধ্যেও সে পরিবারের কেউ কেউ ছিলেন।

পান্না অবশ্য এসব কথা জানতেন না। যাঁদের জন্যে তাঁর সমস্ত অন্তর এক বিচিত্র আকর্ষণ বোধ করছে, তাঁদের কয়েকজন তাঁর সামনেই বসে রয়েছেন এবং তাঁরা তাকে জানেনও! তাঁরই কয়েকজন আত্মীয়া চিকের নেপথ্যে উন্মুখ কৌতূহলে তাঁর দিকে চেয়ে—তাঁর প্রত্যেকটি কথা, সুর, হাব-ভাব সাগ্রহে লক্ষ্য করছেন। এসব তাঁর জানা ছিল না।

তাঁদের কথা জানতে পারলে নিশ্চয় পান্নার ভাল লাগত। কিন্তু দু' পক্ষে কোন জানাজানি হ'ল না, এত কাছাকাছি এসেও। সেই অকূল ব্যবধান খণ্ডন করবার সাধ্য কারুরও নেই। না হলে পান্নার মনের কাঁটা হয়ত ফুল হয়ে ফুটতে পারত।

এক আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসতে চায়, আর এক আবেগে সুরের উৎস বাধা মানে না। সারা মন প্রাণ মথিত ক'রে সুর ঝরে পড়ে আর সেই গান এগিয়ে চলে পান্নার কণ্ঠে—

একি কেমন সুন্দর রূপ মনোহর,
আমি পরশে সে পরাণ পেলাম
সখি জুড়াইল মোর হিয়ে।
আমার বঁধুর অঙ্গের সুগন্ধ সৌরভ
তাহার বাতাস পেয়ে।

নীড়হারা বিহঙ্গের মন নিয়ে পান্না শেষের কলিটি গাইলেন—

তোমরা সখিগণ করহ সিনান,
(পাপিনী পরশ করহে)
আমার বঁধুর যত অমঙ্গল সকল যাউক দূরে॥

তারপর গান শেষ হ'ল। শ্রোতারা একে একে দলে দলে আসর শূন্য ক'রে চলে গেলেন। কিন্তু পান্না তখনও আচ্ছন্ন হয়ে বসে। স্মৃতির স্বর্ণ-দেউল থেকে তাঁর কাঙ্গাল মন তখন স্মরণের বালুচরে পথ হারিয়েছে। সম্বিৎ ফিরে পেলেন স্থানীয় কয়েক ব্যক্তির কথায়।

সচকিত হয়ে পান্না শুনলেন, তাঁকে মুজরো নেবার জন্যে অনুরোধ করা হচ্ছে। যদিও পান্না স্বেচ্ছায় এসেছেন দেবস্থানে গান শোনাতে, তবু তাঁরা তাঁকে দক্ষিণা দিতে চান। এত নামী গায়িকাকে—আর গানই যাঁর জীবিকা—টাকা না দেওয়া তাঁরা উচিত মনে করেন নি। বিশেষ, প্যালাও পড়েছে অনেক টাকা। সে সমস্তই তাঁরা পান্নাকে দিতে চাইলেন।

তাঁরা বললেন, 'এ টাকা আপনারই প্রাপ্য। তা ছাড়াও আপনাকে দক্ষিণা দেওয়া আমাদের কর্তব্য। আপনি অনুগ্রহ ক'রে এতদূর থেকে এসেছেন'—

পান্নাময়ী বাধা দিয়ে ব'লে উঠলেন, 'আমি এখানে দেবতাকে গান শোনাতে এসেছি। এখান থেকে আমি কিছুই নিতে পারব না। প্যালার টাকা মন্দিরে দিয়ে দিন। আমি এখানে টাকার জন্যে আসি নি। আমায় ক্ষমা করুন...'

তাঁদের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে থেকে পান্না মুখ ফিরিয়ে নিলেন। উদ্‌গত অশ্রু গোপন করতে কি ?

বাঁশীর সুরে পাখীর ঝাঁক

সুরশিল্পী আফ্‌তাব্‌উদ্দিনের নাম এখন হয়ত অনেকে জানেন না। তাঁকে পরিচিত করতে হবে ওস্তাদ আলাউদ্দিনের অগ্রজ বলে। কিন্তু এমন একদিন ছিল, যখন কলকাতার সঙ্গীত-সমাজে দু'জনের মধ্যে আফ্‌তাবুদ্দিনের নামই ছিল বেশি। কারণ, আলাউদ্দিন বাংলা দেশে বা কলকাতায় বিশেষ থাকতেন না। প্রথমে সঙ্গীত-শিক্ষার জন্যে রামপুরে, তারপর মাইহার দরবারে নিযুক্ত হবার পর থেকে সেখানে—এইভাবে পশ্চিমাঞ্চলেই আলাউদ্দিন খাঁর অবস্থান ঘটত। কলকাতায় সেকালে অনেক সময় তাঁর পরিচয় ছিল আফ্‌তাবুদ্দিনের কনিষ্ঠ বলে। পরে অবশ্য তিনি স্বনামধন্য হয়েছিলেন।

আফ্‌তাবুদ্দিন ছিলেন বাংলার এক আপনভোলা জাত সঙ্গীতশিল্পী। সঙ্গীত বিষয়ে অনেক গুণ ছিল তাঁর। আর একটি পরিচয় ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলে—অনেক হিন্দু সংস্কারের সঙ্গে তিনি কালীভক্তও ছিলেন। চিরকুমার, সঙ্গীতের সেবক, অ-সাংসারিক মনবুদ্ধি নিয়ে সরল ও খেয়ালী আফ্‌তাবুদ্দিন সাধুর মতনই বাস করে গেছেন সংসারে। তাই পরিচিত গোষ্ঠীতে তাঁর নাম ছিল—আফ্‌তাবুদ্দিন সাধু। সঙ্গীত জগতের চেয়ে অধ্যাত্ম জগতে তাঁর বিচরণ ছিল বেশি। নচেৎ সঙ্গীতকে যদি তিনি একান্তভাবে অবলম্বন করতেন, সঙ্গীত যদি হ'ত তাঁর পেশা, তা হ'লে সঙ্গীতজ্ঞরূপে তাঁর পরিচয় আর নতুন করে দিতে হ'ত না।

বাংলার এক প্রতিভাধর সঙ্গীত গুণী ছিলেন তিনি, যদিও তাঁর নৈপুণ্যের অনেকখানি ছিল অশিক্ষিতপটুত্ব। সঙ্গীতের প্রতিভা তিনি জন্মসূত্রে লাভ করেছিলেন। পিতা সদু খাঁ ছিলেন সেতারবাদক, সংসারে উদাসী, সঙ্গীতসাধক। সেনী ঘরের বিখ্যাত রবাবী কাসিম আলী খাঁর ছাত্র সদু খাঁ। কাসিম আলী খাঁ ভাওয়াল দরবারে শেষ জীবনযাপন কর আগে যখন ত্রিপুরা দরবারে ছিলেন, তখন সদু খাঁ তালিম পেয়েছিলেন। তাঁর বাড়ী ছিল কাছেই, (ত্রি জেলার) শিবপুর গ্রামে।

সদু খাঁর সঙ্গীত-সাধনা তাঁর সন্তানদের মধ্যে বর্তেছি দ্বিতীয় আফ্‌তাবেরও সঙ্গীতে আসক্তি বালক বয়স থেকে প্রকাশ পায়। পিতা তাই দেখে তার সঙ্গীত-শিক্ষার ব্যব করেছিলেন কুমিল্লা অঞ্চলের দু'জন বাঙ্গালী ওস্তাদের কা একসঙ্গে। রামধন শীল এবং রামকানাই শীলের কা আফ্‌তাব তখন বেহালা আর তবলা শিখতে আরম্ভ করে পরে সুরের নানা যন্ত্রে তাঁর অদ্ভুত ক্ষমতা প্রকাশ পায় অনেক সময় তিনি দোতারা বাজাতেন। তাঁর সঙ্গীত মহলে কদর ছিল বাঁশী ও ন্যাসতরঙ্গ বাদকরূপে। বিশে বাঁশীতে তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর শিল্পী ছিলেন, যদি বাঁশীতে তিনি কোন তালিম পান নি। অতি কঠিন ন্যাস তরঙ্গ যন্ত্রেও তিনি ছিলেন পারদর্শী। একবার মিনা থিয়েটারের একটি জলসায় ন্যাসতরঙ্গ বাজিয়ে শ্রোতাদে তিনি চমৎকৃত করেছিলেন। গত শতকে কালীপ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টান্তের পরে আফ্‌তাবুদ্দিন ন্যাসতর বাদনে কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

তবে তাঁর সবচেয়ে প্রসিদ্ধি ছিল বাঁশীর জন্যে। বাঁশীতে তাঁর ফুঁ ছিল অতি সুমিষ্ট। সেই মিষ্টি বাঁশির সুরে শ্রোতাদের তিনি মনোহরণ করতেন। কথায় বলে, তেমন সুরে বাঁশী বাজাতে পারলে পশুপক্ষীও বশ হয়, মানুষ দূরের কথা। আফ্‌তাবুদ্দিন তার এক জাজ্বল্যমান নিদর্শন ছিলেন।

এখানে তাঁর একটি সেইরকম বাঁশী শোনাবার ঘটনা উল্লেখ করা হবে। তবে তা কোন সাজান আসরের রীতিমত সঙ্গীতানুষ্ঠান নয়। তেমনভাবে আগে থেকে বন্দোবস্ত করে আসর সাজিয়ে তাঁকে বেশি নিয়ে যাওয়া যেত না। কারণ নিয়মনিষ্ঠ শহুরে মানুষ ছিলেন না তিনি। খামখেয়ালী আর আত্মভোলা আফ্‌তাবুদ্দিন সাধু কখন কোথায় থাকেন, কখন কোথায় যান তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই—তাঁকে যারা চিনতেন একথা তাঁদের ভালরকম জানা ছিল। তাই তাঁকে নিয়ে খুব বেশি জলসার আয়োজন করা যেত না। হাতের কাছে পাওয়া গেলেই তবে তাঁকে আসরে বসানো

বিষয়ে নিশ্চিত হ'তে পারতেন তাঁর অনুরাগীরা। ভবিষ্যতের জন্যে আসরের ব্যবস্থা করতে গেলেই তিনি অনিশ্চিত হয়ে পড়তেন। আর এইভাবে হঠাৎ-পাওয়া অবস্থাতেই তাঁর অনেক আসর হয়ে গেছে কলকাতায়।

এই ঘটনাটির জন্যেও কোন আসর বসাবার সুযোগ ঘটে নি। স্থান—ভবানীপুরের নাটোর-ভবন। মহারাজ জগদিন্দ্রনাথের আমল। তিনি ছিলেন আফ্‌তাবুদ্দিনের একজন গুণগ্রাহী ও অনুরাগী। তাঁর সঙ্গীত-প্রেমের বাঁধনে আফ্‌তাবুদ্দিন মাঝে মাঝে বাঁধা পড়তেন। এখানকার জলসা-ঘরে তাই খাঁ সাহেবের অনেক আসর হয়ে গেছে। কলকাতার আর কোন আসরে তাঁকে এত বেশি দেখা গেছে কি না সন্দেহ।

সেদিন সকালবেলা। জগদিন্দ্রনাথ বাড়ীতে ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ এসে পড়লেন আফ্‌তাবুদ্দিন। জগদিন্দ্রনাথ আনন্দিত হলেন তাঁকে পেয়ে। কিন্তু সুরশিল্পীকে কাছে পেয়ে কিছু না শুনে ত লাভ নেই। আফ্‌তাবুদ্দিনের আল্‌থাল্লার ঝোলায় দেখা গেল, বাঁশের বাঁশী।

'আজ তা হ'লে একটু বাঁশীই হোক খাঁ সাহেব। অন্য কিছুর ত এখন সুবিধে হবে না। একটু বাঁশী শোনান।'

খাঁ সাহেব ঝোলা থেকে বাঁশীটি বার করে ফুঁ দিলেন। আরম্ভ হ'ল সুরের তরঙ্গ। স্বচ্ছন্দ সুমিষ্ট সুরবিহার। পাখীর মতন অনায়াসে সুরের লহরী ফুটতে লাগল বাঁশীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে। সেই সামান্য বাঁশের বাঁশী থেকে শিল্পী সুরের ইন্দ্রজাল রচনা করতে লাগলেন।

আবিষ্ট হয়ে শুনছে শুনতে [illegible]

দেখলেন জগদিন্দ্রনাথ।

বাঁশীর সেই অপরূপ সুরে আকৃষ্ট হয়ে ঘরের মধ্যে একটির পর একটি পাখী উড়ে আসতে লাগল। বাড়ীর বাগানের গাছে গাছে আনাচ-কানাচে যে-সব পাখী ছিল, তারা।

শান্ত সকালে আফ্‌তাবুদ্দিনের সুরেলা বংশীধ্বনি ঘর ছাপিয়ে বাগানের হাওয়ায় ভাসতে থাকে। আর সেখানকার পাখীদের সবুজ রাজ্যে সাড়া পড়ে যায়। তারা টিক্ টিক্ করে মাথা দোলায়, এদিক-ওদিক অবাক্ হয়ে চায়। মুখ তুলে উৎকর্ণ হয়ে শোনে—বাঃ, বেশ ত, সুরটা যে চেনা চেনা মনে হচ্ছে। সুন্দর লাগছে। এ কোন্ পাখীর গান? কোন্ দিক থেকে আসছে? ওই বড় ঘরটার মধ্যে থেকে, না? দেখি ওখানে কে গান গাইছে।

সুরের হাওয়ায় উড়ে উড়ে এসে পাখীরা সেই ঘরের জানলা দিয়ে ভেতরে এসে বসতে লাগল জানলা-দরজার মাথায় মাথায়। আর এদিক্-ওদিক্ উঁচু জায়গায়, যে যেখানে পারলে। তারপর ঘাড় কাৎ করে মাথা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে লাগল, শুনতে লাগল আফ্‌তাবুদ্দিনের মুখের বাঁশীর দিকে চেয়ে।

ঝাঁকে ঝাঁকে ঘরে পাখী এসে বসে আফ্‌তাবুদ্দিনের বাঁশী শুনছে—এই দৃশ্যে জগদিন্দ্রনাথ চমৎকৃত হলেন। অদ্ভুত ব্যাপার বটে। পাখীর ঝাঁক একমনে বসে বসে বাঁশী শুনছে।

তারপর বাঁশী বাজানোও শেষ হ'ল আর পাখীরাও এদিক্-ওদিক্ দেখে সব উড়ে গেল ফুর্ ফুর্ করে।

রায়বাড়ী

শ্রীগিরিবালা দেবী

২

শরতের স্বল্পায়ু বেলা দেখিতে দেখিতে যেন নিবিয়া গেল। যাহাকে ধরিয়া রাখিতে চাওয়া যায়, সে-ই তাড়াতাড়ি পলাইয়া যায়। বিনুর দিবসটা এক স্বপ্ন জড়িমায় কাটিয়া গেল। সে স্বপ্নে চালিত হইয়া স্নান ভোজন বিচরণ করিয়াছে বটে, কিন্তু প্রাণ ভরিয়া তাহা যেন উপলব্ধি করিতে পারে নাই। যাহাদের সহিত সে আবাল্য হইতে নিবিড় বন্ধনে বন্দিনী হইয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে সেই হীরাসাগর কাননকুন্তলা বনশ্রী জীবজন্তু বিহগের ক্ষণিক সাহচর্য্যে তাহার চিত্তের অপরিসীম পিপাসা নিবৃত্তি লাভ করিতে পারে না। কিন্তু বিদায়ের সময় আসন্ন হইয়া আসিতেছে।

রায়বাড়ী হইতে মকরমুখী পান্‌সি নৌকা গলুইতে জবাফুলের মালা পরিয়া তাহাদিগকে লইতে আসিয়াছে।

বর্ষাকালের প্রধান যান রায়দের কয়েকখানা ছোট-বড় নৌকা। বর্ষার পরে নৌকাগুলিকে দুর্গাদহের গভীর সলিলে ডুবাইয়া রাখা হয়। গ্রীষ্মের সময় তরণীরা উঠিয়া তরুণ বেশ ধারণ করে। মিস্ত্রি আসে, বড় বড় মাটির গামলায় ঝাঁকা ঝাঁকা গাব ভিজানো হয়। সেই গাবের রসে মাজ্জিত হইয়া ঝক্ ঝক্ করে নৌকা কয়খানা।

বিনুর পিত্রালয় ও শ্বশুরালয়ে একটা তেপান্তর মাঠের মাত্র ব্যবধান। বর্ষাকালে নৌকায় রওনা হইলে ঘণ্টা দুই-এর বেশী সময় লাগে না। বর্ষার জল কমিয়া গেলে পান্‌সি নৌকা সোজা যাইতে পারে না। ছোট ডিঙ্গি নৌকা চলে কিছুকাল পর্য্যন্ত। অনেক সময় "হুকুমের নৌকা শুকনো দিয়ে চলে।" কিন্তু রায়বাড়ীর বধূ ডিঙ্গিতে চড়িলে সম্মান থাকে না। তাই পান্‌সি আসিয়াছে। হীরাসাগরের মধ্য দিয়া চলন বিল পার হইয়া নৌকা যাইবে গ্রামের গলিপথে।

কন্যাযাত্রা স্বজনদের মুখে নামিয়া আসিয়াছে বিষাদের ঘন মেঘ। মা'র আঁখির প্রান্তে অশ্রুজল টলমল করিতেছে। চারিদিকে সাড়া পরিয়া গিয়াছে। পূজার পরে মেয়েজামাই আসিয়াছে, শূন্য নৌকায় তাহাদিগকে তুলিয়া দিতে নাই। রাধারাণীর সমস্ত দিনের পরিশ্রমের নমুনা তিনি তিনটি মাটির নূতন হাঁড়িতে সাজাইয়া দিয়াছেন। পানতুয়া খাস্তা-গজা ও বালুসাই। সেখানে বিধবারা আছেন, তাঁহারা এ ভাজা জিনিষ স্পর্শ করিবেন না। তাঁদের জন্য দেওয়া হইল চিনির সাঁচ ও ফেনি-বাতাসা। আর পূজার সময় আনীত এক ঝুড়ি সুপক্ক নাসপাতি।

সাজ সাজ রব উঠিলেও মেয়েজামাইকে আহারাদি করাইয়া সাজ-পোশাক বদ্‌লাইয়া বাহির করিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। পাড়া ভাঙ্গিয়া লোক আসিয়াছে বিনুকে বিদায় দিতে। সকলেরই সজল নয়ন। মুখ মলিন। বিনু যে সকলের আদরের ধন, স্নেহের দুলালী। এ গোলমালের মধ্যে আর এক বিপর্য্যয় কাণ্ড সাগরকাঁদির বিখ্যাত যাত্রাদলের আগমন।

যাত্রাওয়ালারা পূজায় কোন জমিদার ভবনে গান গাহিতে গিয়াছিল। ফেরার পথে প্রণাম করিতে আসিয়াছে, তাহাদের ওস্তাদ গুরুদেবকে। এ পদধূলি লইবার মানে পালার পর নূতন গানের পালা শোনানো। গুরুগৃহে পরিশ্রম লইবার প্রশ্ন নাই, পালা শোনাইয়াই কৃতার্থ ও ভূরি-ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত।

দুই বৃহৎ গহনার নৌকা বোঝাই হইয়া যাত্রার সরঞ্জাম আসিয়াছে ঢোলক-করতাল বেহালা হারমনিয়ম ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র। চোখ-বসা গাল-ভাঙ্গা কিশোর বয়স্ক সখীর দল নামিয়া কলকলি আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। বিনুর হৃদয় হাহাকার করিতে লাগিল। এই সখীদের নৃত্যগীত তাহার দেখা হইবে না। শোনা হইবে না। সকলে দেখিবে চক্ষু ভরিয়া। শ্রবণ করিবে প্রাণ ভরিয়া। শুধু বঞ্চিত রহিবে একমাত্র বিনু। সে শেষ হইয়াছে। ফুরাইয়া গিয়াছে।

বিদায় মুহূর্ত্তে ন'কর্ত্তা উভয়ের মস্তক স্পর্শ করিয়া গাহিলেন—

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর"

ত্রয়োদশীর নির্ম্মল জ্যোৎস্না গলিয়া পড়িতেছে ভুবনে। বিমল জ্যোৎস্না-ধারায় অবগাহন করিতেছে স্থল জল অন্তরীক্ষ।

হীরাসাগর অতিক্রম করিয়া নৌকা ভাসিয়া যাইতেছে চলনবিলে। নামে বিল হইলেও আকারে চলনবিল নদীর সদৃশ। বর্ষায় নদীর সহিত সংযুক্ত হইয়া তাহার গতি উদ্দাম। তরঙ্গে তরঙ্গে তরঙ্গময়ী। বিলের দুই তীরে পাটের বন, ধানের ক্ষেত জ্যোৎস্নায় প্রফুল্লিত।

নৌকার পেটকাটা ছইয়ের পেছনে বিনু আশ্রয় লইয়াছিল। কাঠের পাটাতনে ছোট একখানা পুরু গালিচা পাতা রহিয়াছে। গালিচার দুই দিকে দুই তাকিয়া বালিস নীল সাটিনের আচ্ছাদনে আবরিত।

মাঝি-মাল্লা দু'টি রায়বাড়ীর ভৃত্য সম্প্রদায়। ছোট-খাট ব্যাপারে ইহারাই হয় কর্ণধার। বড় নদীতে দূরের পাল্লায় তখন ডাক পড়ে সাক্ষাৎ গঙ্গাপুত্র জেলেদের।

নবীন চাকর নৌকার গলুইয়ের কাছে বসিয়া গাল-গল্প ফাঁদিবার সুযোগ খুঁজিতেছিল। কিন্তু তাহার অনতি দূরে বেতের মোড়ায় সমাসীন প্রসাদের জন্যে সেটা হইতেছিল না।

বিনু শয়ন করিয়াছে। এখন তাহার নির্জ্জনতার প্রয়োজন ছিল। যে অবারিত অশ্রুজলকে সে চাপিয়া রাখিয়াছিল হৃদয়ের সুগোপন গুহায়। গিরিনদীর, মতন সে দুর্ব্বার অশ্রুস্রোত বাহিরে প্রবাহ বহাইতে আকুলি-ব্যাকুলি করিতেছিল।

বিনু নৌকার পিছন দিকে মুখ ফিরাইরা খুলিয়া দিল তাহার অশ্রুর উৎস-দ্বার। ধারার পরে ধারা বহিতে লাগিল দুই গণ্ড বাহিয়া।

হঠাৎ নবীন ডাকিল হালের মাঝিকে, "জুড়ান, হাঁসখালির জলায় যে এসে পড়লি, শক্ত করে হাল ধ'রে মোচড় দিয়ে ছাড়িয়ে যা এখানটা। রাত হইচে, জায়গা ভাল না।"

পশ্চাৎ হইতে জুড়ান উচ্চস্বরে উত্তর দেয় "হয় দাদা বুঝিচি, হাল জোরেই টানচি, বিলের বোবা জলে নাও আগাইতে চায় না।"

হাঁসখালির জলা শোনামাত্র বিনুর কোথায় গেল কান্না, কোথায় গেল স্মৃতির ধ্যান। সে সচকিত হইয়া মনে মনে আবৃত্তি করিতে লাগিল "ভূত আমার পুত, পেত্নী আমার ঝি, রাম-লক্ষ্মণ বুকে আছে ভয়টা আমার কি?" এই জলা সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে অনেক কিংবদন্তী তার কানে গিয়াছে। জলার উচ্চে রায়বংশের 'কি ভীষণ শান্তিপূর্ণ' শ্মশানভূমি। বট পাকুড় বেল তেঁতুল ও শ্যাওড়া বৃক্ষের প্রাচীরে আবৃত হইয়া রহিয়াছে। জলার গভীর কালো জলে শ্যাওলা হয় না, কুমুদ-কহ্লার ফোটে না। ভেক ডাকে না, বন্য হংস চরিতে আসে না। স্থির জল শান্ত স্তব্ধ হইয়া কেবল চাহিয়া থাকে উর্দ্ধে উন্মুক্ত আকাশের দিকে। দুইজনা দুইজনাকে নয়নে নয়নে রাখিয়াছে। দ্বিপ্রহরে দমকা বাতাসে সন্ধ্যার উতলা পবনে সময় সময় অতল জলের বুকে শিহরণ জাগে, মৃদু মৃদু তরঙ্গ বয়। গ্রামের বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা বলে, "ও বাতাস নয়, প্রেতের দীর্ঘনিঃশ্বাস।"

হাঁসখালির জলার সন্নিকটে নৌকা আসিতেই প্রসাদ ছইয়ের ভিতরে আসিয়া বিনুকে কহিল, "কি, এখানেও ঘুম? জ্যোৎস্নায় চারদিক্ কি সুন্দর দেখাচ্ছে, উঠে বসে একবার চোখ মেলে চেয়ে দেখ না? আমরা কোথা দিয়ে যাচ্ছি টের পেয়েছ ত? এ সেই হাঁসখালির জলা। যেখানে ভূত পেত্নী ব্রহ্মদৈত্য শাঁকচুন্নী দিনরাত মড়ার হাড় চিবোয়।" আর নয়, ইহাই যথেষ্ট। অকস্মাৎ বিনু উঠিয়া বসিল। মনে মনে তাহার মহামন্ত্র "ভূত আমার পুত, পেত্নী আমার ঝি, রাম লক্ষ্মণ বুকে আছে ভয়টা আমার কি?" জপ করিতে করিতে দুই হাতে চাপিয়া ধরিল প্রসাদের একখানা বাহু।

প্রসাদ ভীতাত্রস্তা বধূর পিঠে আর একখানা হাত রাখিয়া সস্নেহে কহিল, "তুমি ভয় পেলে বিনু? ভয় কিসের? ভূত প্রেত মিছে কথা; আসলে কিছুই নেই। যে মেয়ে সাঁতার দিয়ে নদী পার হতে পারে, গাছে চড়ে পাখীর বাসা খোঁজে, তার আবার এত ভয় কেন?"

প্রসাদ স্ত্রীর চরিত্রের এ দিকটা দেখিতে পায় নাই। দিবালোকে যাহার মূর্ত্তি সিংহবাহিনী, নিশীথে সে হইয়া যায় ভূলুণ্ঠিত ক্ষীণ লতার মতন বায়ুহিল্লোলে কম্পিতা-বিবশা। দিবসারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব-প্রকৃতি তাহার মুগ্ধ বিহ্বল নেত্রপথে যে অপরূপ অনবদ্য রূপের ভাণ্ডার খুলিয়া দেয়, নিশীথের তরল তিমিরতায় সে রূপ রস স্পর্শ গন্ধবিলীন হইয়া যায়। মুক্ত বাতায়ন-পথে যতটুকু আকাশ বিনুর দৃষ্টিপথে পড়ে, সেই তারায় তারায় মালা-গাঁথা, সেই অমল উজ্জ্বল চন্দ্ররশ্মি, অন্ধকারে আবৃত ঘন বৃক্ষশ্রেণী, ঝিল্লীর ঐক্যতান, নিশাচর পাখীর সুতীক্ষ্ণ স্বরলহরী ইহার বেশি যে হৃদয়ের নিভৃতে সঞ্চয় করিয়া লইতে পারে না। কেন এই অজানা অচেনা প্রেত-ভীতি।

পেটকাটা ছইয়ের মাঝখানে জ্যোৎস্না-লেখা লুটাইয়া পড়িয়াছিল। প্রসাদ সেইখানে গালিচাখানি টানিয়া আনিল।

ভীত বিনুকে কাছে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমরা হাঁসখালির জলা ছাড়িয়ে এসেছি। তবু কি তোমার ভয় করছে? যে মেয়ের বারবিক্রম সারাটা

দিন উপভোগ করে এলাম। রাতে তার এত ভয় কেন?

বিনু কথা কহিল না, চুপ করিয়া তাকাইয়া রহিল বাহিরের দিকে। কাছেই কোন উচ্চ ভিটে হইতে সহসা ক্ষুধার্ত্ত শৃগালের দল প্রহর ঘোষণা করিতে লাগিল। ধানক্ষেত হইতে শোনা গেল সাপের ব্যাঙ ধরার আর্ত্তনাদ। পাটের ক্ষেতে কাহারা যেন ফিস্‌ফাস স্বরে কথা বলিতেছে। জ্যোৎস্নামাখা ঝোপের ভিতরে কার যেন খল্‌খল্ হাসি শোনা যায়। পাতায় পাতায় ওই যে জোনাকি একবার জ্বলিয়া পরক্ষণে মিলিয়া যায় ও জোনাকি নয়, কে যেন সকৌতুকে বার বার প্রদীপ জ্বালাইয়া নিভাইয়া দিতেছে। বনান্তরের সর্ সর্ খস্ খস্ শব্দ, উহা কি এমনি হয়? কাহাদের পদধ্বনি।

প্রসাদ বুঝিতে পারিল, বিনুর ভয়ের ভাব এখনও কাটে নাই। তাই তাকে অন্যমনা করিতে বলিল, "তোমাদের ওখানে অনেক বই দেখলাম, অধিকাংশই ধর্ম্মগ্রন্থ। ওর ভেতরের তুমি কি কিছু পড়েছ?"

বিনু নড়িয়া-চড়িয়া সোজা হইয়া বসিল। উৎসাহে প্রদীপ্ত হইয়া জবাব দিল, "কত বই আমি পড়েছি। রামায়ণ. মহাভারত অক্রুরসংবাদ, নন্দবিদায়।"

"অনেক অনেক বই পড়েছ দেখছি। আচ্ছা, তুমি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কোন বই, কি কবিতা পড় নি?"

বিনু যেন ধপ করিয়া পড়িয়া গেল অগাধ সমুদ্রের জলে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা, সে আবার কি বস্তু?

প্রসাদ কহিল, "জান না রবীন্দ্রনাথকে? গ্রামোফোনের রেকর্ডে সেদিন যাঁর লেখা গান শুনে মোহিত হয়েছিলে। সেই গানটা—

'কেন বাজাও কাঁকন কন কন কত ছল ভরে,
ওগো, ঘরে ফিরে চল কনক কলসে জল ভরে।'

ওঁর কত লেখা তার সীমা সংখ্যা নেই। ছোটদের জন্যেও কত লিখেছেন—

'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান

মনে পড়ে সুয়োরাণী দুয়োরাণীর কথা,
মনে পড়ে অভিমানী কঙ্কাবতীর ব্যথা'।"

নিমেষে বিনু আনন্দে উচ্ছলিত হইল। হাঁ, মনে পড়িয়াছে, তাহাদের প্রতিবেশী পদুদাদা স্কুলে পড়ে, তাহার একটা পাঠ্য-পুস্তকে বিনু পড়িয়াছিল—

'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান
দিনের আলো নিবে এল সূর্যি ডোবে ডোবে।
আকাশ ঘিরে মেঘ ছুটেছে চাঁদের লোভে লোভে।'

এই লেখাটার নিচে নাম লেখা ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেই অপূর্ব্ব মধুর লেখাটার কথা প্রসাদ বলিতেছে। বিনুর কাছে কাহারও নাম-ধামের বালাই নাই বটে, কিন্তু সেই কবিতাটা যে তাহার সুকুমার হৃদয়ে দাগ কাটিয়া রাখিয়াছে।

বিনু হাসিয়া অস্থির, "ও আমি পড়েছি পদুদাদার বইতে। ক'দিন পড়ে পড়ে মুখস্থ করেছিলাম। ও আমার মনে আছে।"

প্রসাদ খুশী হইয়া বলিল, "আমি তোমাকে রবীন্দ্রনাথের কবিতার বই এনে দেব। তুমি যখন বড় হবে, লেখাপড়া শিখবে তখন কত আনন্দ পাবে বিখ্যাত লেখকদের রচনা পড়ে। শোন রবীন্দ্রনাথের আর একটু লেখা—

'বেলা যে পড়ে এল, জলকে চল
পুরাণো সেই সুরে কে যেন ডাকে দূরে
কোথা সে ছায়া সখি, কোথা সে জল,
কোথা সে বাঁধা ঘাট, অশথ তল?'"

বংশীস্বরে মুগ্ধ হরিণীর মতন বেণু সেই সুললিত শব্দ ঝঙ্কারে তন্ময় হইয়া রহিল। তার অন্তরের নিভৃত মণিকোঠায় অহরহ যে অস্ফুট ক্ষীণ বাঁশরী বাজে এ যেন তাহারই সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি।

দুই জনাই চুপচাপ। নৌকা দাঁড়ের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ করিয়া অগ্রসর হইতেছে। চন্দ্রকিরণ ঝরিয়া পড়িতেছে বিলের ভরা জলে। জলো হাওয়া বহিয়া আনিতেছে মধুর সৌরভ।

প্রসাদ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বিনুকে প্রশ্ন করিল "বল দেখি এ কিসের গন্ধ?"

বিনু বলিতে পারিল না।

প্রসাদ বলিল, "পদ্মফুলের গন্ধ। খানিকটা দূরেই প বিল। তুমি কী ফুল ভালবাস?"

"পদ্মফুল।"

"কি পদ্ম, সাদা না লাল রং-এর?"

বিনু বলিল, "লাল পদ্ম আমি খুব ভালবাসি। চলু না আমরা পদ্ম বিলের মধ্যে দিয়ে যাই?"

বিনুর আর ভয় নাই। তাহার পাশের এই জীব সাথীটিকে লইয়া যে যাইতে পারে দূরে-সুদূরে—অনন্ত পথে। এই জ্যোৎস্না-হসিত নিশীথিনী পুষ্পপরিমলে উতলা সমীরণ, সলিলে প্লাবিত ধরণীর পথ বাহি তাহারা যুগ হইতে যুগান্তর এমনি করিয়াই ভাসি যাইবে। কি হইবে গৃহে ফিরিয়া কলরোল কোলাহলে মাঝখানে?

প্রসাদ বলিল, "এত রাতে আজ পদ্মবনে যাওয়া সম্ভব নয়। ঘুরতে হবে অনেকটা। বাবা-মা চিন্তা করবেন। বেশি দেরি হ'লে পাইক-পেয়াদা পাঠিয়ে দেবেন আমাদের খোঁজে। এর পরে আমি তোমাকে পদ্মবন নন্দনবন গহনবন দেখাব।

নৌকা বিল ছাড়াইয়া গ্রামের গলিপথে চলিল। জুড়ান হাল রাখিয়া লগি লইল। এখন অল্প জল, লগি ঠেলিয়া আগাইতে হইবে।

রায়বাড়ী নীরব নিস্তব্ধ। অধিকাংশ ঘরের আলো নির্ব্বাপিত। মহেশবাবু গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত বই পড়েন। তাঁহার গৃহে উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছে। তিনি নৌকা বাঁধার শব্দে গোল বারান্দায় আসিয়া ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের এত দেরি হ'ল কেন প্রসাদ? রাত দশটা বেজে গেছে।"

প্রসাদ বধূসহ অন্দরের দিকে যাইতে যাইতে কহিল, "বেরোতেই ওঁরা দেরি করে দিলেন। না খাইয়ে ছাড়লেন না। বিল ঘুরে আসা।" মহেশবাবু আর কোন কথা না বলিয়া ঘরে চলিয়া গেলেন। বিনুর পশ্চাতে নবীন হাঁড়ি ও ঝুড়ি লইয়া আসিতে লাগিল।

আঙিনার দে-লাইট দপ দপ করিয়া জ্বলিতেছে। ছেলেমেয়েরা আহারান্তে শয়ন করিয়াছে। মনোরমা ছেলে-বধূর প্রতীক্ষায় ঘর-বার করিতেছিলেন। ঝি-চাকরদের খাওয়া তখনও হয় নাই। তাহারা রন্ধনশালায় কলরব করিতেছে। আর এত রাত্রেও হস্তী সিংহাসনে সমাসীনা ঠাকুমা। মনোরমা বলিলেন, "ফিরতে রাত করেছিস্ প্রসাদ, চল খেতে বস্ গে!"

"আমরা খেয়ে এসেছি মা, তাই দেরি হ'ল। তোমরা এখন খাওয়া-দাওয়া মিটিয়ে ফেল গে। লোকজনেরা অযথা বসে রয়েছে।" বলিয়া প্রসাদ উপনীত হইল ঠাকুমার কাছে।

নবীন হাঁড়িগুলি বারান্দায় নামাইতে উদ্যত হইয়াছিল মনোরমা নিষেধ করিলেন, "ওঁরা মিষ্টি পাঠিয়েছেন। সকলে ঘুমিয়ে পড়েছে। এখন হাঁড়ির মুখ খুলে কি হবে? রেখে দে গে আমার ঘরের বেঞ্চির ওপরে, ভেঙ্গে ফেলিস্ নে যেন। কাল সকালে সবাই খাবে।"

বিনু শাশুড়ী ও দিদিশাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া কামিনীর মা'র সঙ্গে ঢুকিল মনোরমার ঘরে। রায়বাড়ীর বধূদের নিয়ম এপাড়া হইতে ওপাড়ায় পদক্ষেপ করিতে গেলে গুরুজনদের পায়ের ধুলা লইয়া যাইতে হয়। ফিরিয়াও তাহাই। রায়বাড়ীর ছেলেমেয়েদের কিন্তু এ নিয়মের বাঁধাবাঁধি নাই। শ্বশুর তখনই ঘরে গিয়াছিলেন সেজন্য তাঁহাকে প্রণাম করা হয় নাই।

কামিনীর মা জিজ্ঞাসা করিল, "ওখানে সকলে ভাল আছে ত বৌমা? বেজ আছে কেমন?"

বিনু মুখের ঘোমটা সরাইয়া নিম্নস্বরে কহিল, "বেজ-দিদি ভাল আছে মাসী। আমাদের বাড়ীর সকলেও। আজ এরা এত শিগ্‌গির শুয়েছে কেন?" কি হয়েছে?

"রাত দুপুর অবধি সকলে হবিষ্যি-ঘরে ঘট ঘট করে রাতদুপুরে খেতে বসে কর্ত্তাবাবু গাল দিয়েছিলেন বলে সকলকার রাগ হইচে। তাই আজ সাঁঝ-সকালে খেয়ে-দেয়ে বিছানা গিইচে। আমি এখন যাই, ওঁনার আবার খাওয়া হয় নি।" বলিয়া কামিনীর মা সতর্ক দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া বাহির হইয়া গেল।

মনোরমার বিছানায় সুমন্ত গভীর নিদ্রায় মগ্ন। বিনু সস্নেহে তাহার গায়ে একটুখানি হাত বুলাইয়া দিল। আহা, সুমন্ত যদি এখন একবার জাগিয়া মা বলিয়া কাঁদিয়া উঠিত, তাহা হইলে বিনু তাহার পাশে জায়গা করিয়া খানিকটা সময় ঘুমাইয়া লইতে পারিত। বিনুর চোখের পাতা ঘুমে জড়াইয়া আসিতেছে। সে বোকা, সে বুদ্ধিহীনা—নৌকায় শুইয়া অযথা কাঁদিয়া সময় নষ্ট করিয়াছে। তাহার কান্নার কি হইয়াছিল? কার জন্যে সে কাঁদিয়াছিল মা, ঠাকুমা আর সকলের কথা স্মরণ করিয়া। কিন্তু ঠাকুমা, মা, বড়মা, রাঙ্গামা প্রভৃতি কোথায় হইতে আসিয়াছেন? এ বাড়ীর ঠাকুমা মা-ও ত অন্য বাড়ী হইতে এ বাড়ীতে আসিয়াছেন। কই, তাঁহারা কেহ কখনও বাপের বাড়ীর জন্যে কাঁদিতে বসেন না? বিনুর সবতাতে বাড়াবাড়ি। তখন ঘুমাইয়া লইলে এখন ঘুমে ঢুলিতে হইত না।

সুমন্তর আশা পরিত্যাগ করিয়া বিনু বড় ঘরে পদার্পণ করিল। সে ঘরও নিদ্রিত পুরী। এক কোণে সরস্বতী শুইয়াছে। আর এক পাশের জোড়া-খাটে মধুমতী ও তরু ঘুমাইতেছে। হেমন্তের কল্যাণে বর্ত্তমানে ভানুমতী হইয়াছে দ্বিতল-বাসিনী।

প্রসাদ বাড়ী আসায় ঠাকুমার ঘরের পাশে ছোট ঘরে ছোট ঠাকুমা আশ্রয় লইয়াছেন। ঠাকুমার কাছে কেউ শুইতে চায় না। ঠাকুমা নাকি সারা রাত্রি জাগিয়া আপনার মনে কথা বলেন, ছড়া কাটেন।

বড় ঘরের সামনে চওড়া লম্বা বারান্দা। যে বারান্দার সিঁড়ি হাতীমুখো।

বিনু দরজার আড়াল হইতে উঁকি দিয়া দেখিল নাতির সঙ্গে ঠাকুমা দিব্যি জমাইয়া তুলিয়াছেন।

প্রসাদ বলিতেছে, "তুমি কেন এত রাত পর্য্যন্ত জেগে বসে আছে ঠাকুমা ?"

ঠাকুমার প্রত্যুত্তর, "বসে থাকব না ? তোরা অকূল পাথারে ভাসছিলি, আর আমি ঘুমিয়ে থাকব ? আমার মন-পরাণ যে এতক্ষণ তোদের আশাতেই ছিল রে ভাই—

'আমার আশায় আছিল চারিজন, মন প্রাণ নয়ন শ্রবণ'।"

প্রসাদ হাসিল, "ঠাকুমা, তোমার শোলোক যে এ কালের দিকে এগিয়ে আসছে। 'কি উপমা মন প্রাণ নয়ন শ্রবণ।' বিল দিয়ে ত এলাম, সেই তোমার অকূল সমুদ্দ্র হ'ল ?"

"আমি তোদের চলন বিল দেখেছি রে পেসাদ, বর্ষাকালে সমুদ্দ্র হয়ে যায়। তুই ব্যাটাছেলে, তোর তরে যত না হোক, ভয় করছিল আমার মাণিকমালার জন্যে। তোদের কি ?

'থাকলে পরে চূড়াবাঁশী মিলবে কত সেবাদাসী'।"

"মণিমালার থেকে মাণিকমালা হয়ে গেল। আমি যদি ডুবে মরতাম তখন তোমার মাণিকমালা নিয়ে কি করতে ?"

ঠাকুমা সচমকে নাতির মাথায় হাত রাখিয়া কহিলেন, "ষাট ষাট আমার ষষ্ঠীর ধন, ও কথা কইতে নাই। আমার আশীর্ব্বাদে তুই লাঠি ভর দিয়ে হাঁটবি। তোর মাথার চুল শোনের নুড়ি হবে। মাণিকমালা শিলে ছেঁচে পান খাবে। পাকাচুলে সিঁদুর পরবে।"

মনোরমার খাওয়া হইয়াছিল। তিনি বারান্দায় আসিয়া ছেলের হাতে দুইখানা বাতাসা ও গেলাসে জল দিয়া বলিলেন "বাড়ীতে এসে বাসী মুখে থাকতে নেই প্রসাদ, মিষ্টি মুখে দিয়ে জল খেয়ে যা শুয়ে পড়্‌গে। রাত ঢের হয়েছে।"

প্রসাদ জল-মিষ্টি খাইয়া ঠাকুমার হাত ধরিয়া তাঁহার বিছানায় লইয়া গেল।

ঠাকুমা শয্যাধরা হইলে সে চলিয়া গেল তাহার শয়ন-গৃহে।

মনোরমা ভাত-খাওয়া শাড়ী ছাড়িয়া ধোয়া কাপড় পরিলেন। রায়বাড়ীতে খাওয়া-বস্ত্রে কেহ শয়ন করে না। তিনি বধূর হাতে জল-মিষ্টি দিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে কামিনীর মাকে আদেশ করিলেন বিনুর সঙ্গে দাঁড়াইতে।

বিনু আশা করিয়াছিল প্রসাদ এতক্ষণ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। আজ সারাটা দিন তাহার হৈ চৈ কম যায় নাই। রজনীও গভীরতার দিকে। কিন্তু সব সময় কি মানুষের আশা ফলবতী হয় ?

অন্যদিন বিনু আসিবার আগে প্রসাদ বিছানায় শুইয়া চোখের সামনে বই মেলিয়া থাকে। আজ বিদ্যাকান্ত বিদ্যা লইয়া বসিয়াছেন টেবিল-চেয়ারে।

বিনু দরজা বন্ধ করিয়া বিছানার দিকে পা বাড়াইতেই প্রসাদ বই হইতে মুখ তুলিয়া ডাকিল, "শুতে যাচ্ছ নাকি ? এস, এইখানটায় একটুখানি বস।"

বিনুর ঘর মস্ত। একদিকে জোড়া খাট পাতা। আর একদিকে চেয়ার টেবিল আলনা প্রসাধন টেবিল ইত্যাদি দিয়া সাজানো। ছোট টেবিলের দুই পাশে দুইখানা চেয়ার মুখোমুখি।

প্রসাদের নির্দ্দেশে বিনুকে অনিচ্ছার সঙ্গে সেই মুখোমুখি চেয়ারে বসিতে হইল। এই প্রথম দুইজনার একত্রে চেয়ারে উপবেশন।

টেবিলের টানার ভিতর হইতে প্রসাদ বাহির করিল একখানা হাতীর দাঁতে বাঁধানো ছুরি ও একটা গাঢ় হলুদবর্ণের বড় নাসপাতি। ছুরিটা বিস্মিতা বিমূঢ়া বিনুর সামনে ধরিয়া বলিল, "ঝুড়ির ভেতর থেকে বেছে একটা নাসপাতি তোমার জন্যে এনেছি। ছাড়িয়ে খাও তুমি। ছুরি দিয়ে ছাড়াতে পারবে কি ? না আমি ছাড়িয়ে দেব ?"

সঙ্কোচে বিনু মলিন হইয়া গেল। এ আবার কি অভিনব ব্যাপার ? বিবাহের পর তাহারা একসঙ্গে কিছুই খায় নাই। প্রসাদের সামনে খাদ্যদ্রব্য মুখে তুলিতে তাহার লজ্জার সীমা রহিল না। সে নত নেত্রে আরক্তিম মুখে ঘাড় নাড়িল, "না, এখন আমি কিছু খাব না, আমার ক্ষিধে নেই। ছুরি দিয়ে খোসা ছাড়াতে আমি ভাল পারি না। বঁটিতে পারি। এ ঘরে বঁটি নেই, ছুরি দিয়ে ছাড়িয়ে আপনি খান।"

"আচ্ছা, আমিই ছাড়িয়ে নিচ্ছি, আমারও ক্ষিধে নেই। দু'জনে ভাগ করে খেলে কারোর বেশী খাওয়া হবে না।" বলিতে বলিতে প্রসাদ ক্ষিপ্র হস্তে নাসপাতি ছাড়াইয়া দুই ভাগ করিয়া ফেলিল।

এক খণ্ড বিনুর সামনে ধরিয়া বলিল, "এই নাও, খেতে সুরু করে দাও।"

বিপন্ন বিনু প্রবলভাবে প্রতিবাদ করিতে লাগিল, "না, না, আমি খেতে পারব না। ও আমি ভালবাসি নে। আপনি খান।"

"আপনার না ভালবাসার খবর আজকেই আমার

জানা হয়ে গেছে। নিন, এখন চট করে মুখে তুলুন। না সেধে খাওয়ালে আপনার নাকি খাওয়া হয় না?"

বিনু আশ্চর্য্য, এ আবার কি কথার ছিরি? এর নাম কি পরিহাস, না আর কিছু? অন্য কিছু হইলে বিনুকে বোধ হয় এত বলিতে হইত না। টুপ করিয়া মুখে তুলিয়া গিলিয়া ফেলিত। নাসপাতি চিবাইয়া খাইতে হয়। কচমচ শব্দ হয়।

বিবশা বিনুর শিথিল হাতে নাসপাতিখণ্ড গুঁজিয়া দিয়া প্রসাদ ফের তাড়া দিতে লাগিল, "নিন ধরুন, খেয়ে ফেলুন। অকারণ ব'সে থেকে ঘুমের ব্যাঘাত করছেন কেন?"

সহসা বিনুর দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল। সে নাসপাতি মুঠোয় চাপিয়া অশ্রুবিগলিত কাঁপা গলায় কহিল, "আপনি কেন আমাকে বারে বারে 'আপনি' বলছেন? আমি আপনার কি করেছি?" ইহার বেশি বিনু বলিতে পারিল না। তাহার চোখে অশ্রুর ধারা বহিল।

উজ্জ্বল দীপালোকে সে অশ্রুজল প্রসাদের নিকটে গোপন রহিল না।

প্রসাদ বিনুর নাসপাতি-ধরা বাহুমূল সস্নেহে স্পর্শ করিয়া কোমল স্বরে কহিল, "তুমি কাঁদছ কেন বিনু? কান্নার কি হয়েছে তোমার? তুমি আমাকে 'আপনি' বল, আমার বিশ্রী লাগে, তাই তোমাকে আপনি বলেছি।"

"আপনি যে আমার বয়সে বড়। আপনাকে আমার আপনিই বলতে হয়।"

"তুমি একেবারে ছেলেমানুষ, কিছু জান না। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ভেতরে ছোট-বড়র বিচার থাকে না। আমাদের মায়েরা কি আমাদের বাবাদের আপনি বলেন? না আর কারুকে বলতে শুনেছ?"

বিনু মাথা তুলিয়া অঞ্চলে চোখ মুছিল। ভাবিয়া দেখিল, একমাত্র সে ভিন্ন কেহ স্বামীকে আপনি সম্বোধন করে না। না করুক, তবু অত বড় মানুষটাকে তুমি বলিতে তাহার সঙ্কোচ হয়, দ্বিধা হয়। সেটা প্রসাদের কাছে প্রকাশ না করিয়া বিনু বলিল, "তাঁরা যে সবাই বুড়ো হয়ে গেছেন। তাই বলেন।"

"হোন তাঁরা বুড়ো, আমরা না হয় ছোট থেকেই আরম্ভ করি। আপনি কথাটাতে দূরত্ব থাকে। আমি আমাদের ভেতরে দূরত্ব রাখতে চাই নে।

"নাও এখন খেয়ে ফেল, অনেক মুক্তো ছড়ানো হয়েছে, এইবার খেতে খেতে মাণিক ছাড়াও।"

"আপনি আগে খান।"

"ফের আপনি, খাব না আমি। চললাম শুতে।"

বিনু লজ্জায় লাল হইয়া নতমুখে কোনরূপে ঠোঁটের ফাঁক দিয়া ব্যক্ত করিল "খাও তুমি।"—

এ কয়েকটা দিন ঠাকুমার বড়ই নিরানন্দে কাটিয়া গিয়াছে। পূজার পরে তিনি নিঝুম হইয়া পড়িয়াছিলেন। অবিরাম উলুধ্বনি দিতে দিতে তাঁহার গলা বসিয়া গিয়াছিল। এখন বিরামে কণ্ঠস্বর আরাম হইয়াছে। একটা উপলক্ষ্য আড়ম্বর না হইলে নিষ্কর্মা বৃদ্ধার দিন কাটিতে চায় না। কোজাগরী লক্ষ্মী পূর্ণিমায় পুনরায় তিনি সজীব হইলেন। তিনি যে রায় পরিবারের ন্যাড়া-বুড়া বটবৃক্ষ। পত্র-বিরল ছায়াশূন্য বটের যে মূল্য কতটুকু, সেটা তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। তাই বকিয়া বকিয়া সকলকে জ্বালাতন করিয়া তোলেন। যদিও তিনি একাধিকবার একই শোলোক আওড়ান, "এক রাজা চলে যাবে, আর রাজা হবে বাংলার সিংহাসন শূন্য নাহি রবে।"

পরের বেলায় টিকা-টিপ্পনীর ঝটিকা বহিয়া যায়। নিজের বেলায় অন্ধ।

আগামী কাল লক্ষ্মীপূজা, একদিন পূর্ব্বেই ঠাকুমার রণডঙ্কা বাজিতে সুরু হইয়াছে। ইহাদের ঐতিহ্য অনুষ্ঠান, বিশেষতঃ গরিমা তিনি স্মরণ করাইয়া না রাখিলে সকলে যে ভুলিয়া যাইবে।

এ অঞ্চলের ভুমিমালী সম্প্রদায় বাড়ী বাড়ী ঢাক-ঢোল কাঁসি বাজায়। ধান মলাইয়ের সময় ধানের 'জাত' করিয়া দেয়। পারিশ্রমিক পায় ধান। বাজনা বাজাইবার বরাদ্দ পৃথক্‌। ভুমিমালী মেয়েদেরও বাৎসরিক অনেক কিছু বরাদ্দ থাকে। তাহারা ভোরবেলা আসিয়া গোটা আঙ্গিনা আনাচ-কানাচে গোবর-জলের ছড়া দিয়া উঠান ঝাঁটা দিয়া নিকাইয়া দেয়।

ভোরে পচামালীর বৌ উঠানে গোবর-জল ছড়াইতে-ছিল। ঠাকুমা তখন স্নানপর্ব্ব শেষ করিয়া হাতীর মাথায় বসিয়া জপের ভঙ্গিমা করিতেছেন। জপ ত নামের জপ, আসলে বাক্যের উল্কাবৃষ্টি। তখনও বাড়ীর কেহ ওঠে নাই, সামনেই মালী-বৌ, এ সুযোগ ছাড়িয়া দিবার পাত্রী তিনি নন।

হাত ঘুরাইতে ঘুরাইতে তিনি ডাকিলেন, "শোন্ ত পচার-বৌ, কাল লক্ষ্মীপুজো, আজ থেকেই বাড়ীর চারদিক্ ঝাড়ালেপা আরম্ভ করে দে। মা লক্ষ্মী কারোর অনাচার সইতে পারেন না।

'আচারে ভাত, অনাচারে হা ভাত।'

শুনিস নি, লক্ষ্মীর বচন,

'সকাল বেলা ঝাড়-ছড়া সন্ধ্যাবেলা বাতি,
লক্ষ্মী বলেন সেইখানে আমার বসতি।'
ভাল করে লেপা-পোঁছা করবি, ফাঁকি দিস্ নে।"

মালী-বৌ মাথার কাপড় একটু খাটো করিয়া দিয়া সবিনয়ে জবাব দিল, "না মাঠান, ফাঁকি দিমু ক্যানে? মা নক্ষী-মালেরি, তেঁনার স্থাবায় কি ফাঁকি ঝুকি চলে?"

ঠাকুমা খুশী হইলেন। মালীর ঘরে জন্ম হইলেও বৌটার ধর্ম্ম-জ্ঞান আছে।

ঠাকুমার জপ হইয়া গিয়াছিল, যুক্তকরে ললাট স্পর্শ করিয়া পুনরায় বলিলেন, "কলার খোলের পাঁচটা ডোল আজকেই দিয়ে রাখ বৌ। গেল বছর লক্ষ্মীপুজোর পঞ্চশস্যের ডোল তোর ছেলে বলাই বানিয়ে দিয়েছিল। পুজোর সময় একটা ডোলের বাঁশের খিল খুলে সে কি অনর্থ। সেটা ছিল ধানের ডোল, টাটের ওপরে ঝর্ ঝর্ করে ধান পড়ছিল। এবার যেন তেমন ধারা না করে, শক্ত করে খিল দেয় যেন। বাপের কাছ থেকে ভাল করে শিখে নিতে পারে না কেন? 'দেখে শুনে করি কাজ হারিজিতি নাহি লাজ।' এ কালের হ্যাংলা-প্যাংলার সে বোধ নেই।"

মালী-বৌ গোবর জলে গুলিয়া ঝাঁটা হাতে কহিল "তহন ছাওয়াডা চ্যাংড়া ছেল মাঠান, খিল জুত করে নাগাতে পারে নি, এহন স্থায়না হইচে, ভাল করি নাগায়ে দিবে।"

ঠাকুমার কলা গাছের ডোলের ব্যাখ্যা শেষ হইতে না হইতেই রায়বাড়ীতে জাগরণের সাড়া পড়িয়া গেল।

হেমন্ত সস্ত্রীক নামিল উর্দ্ধ হইতে। বিনুর ঘরের দরজা খুলিল। ছোট ঠাকুমা জলের ঘটি হাতে গামছা কাঁধে বাহিরে আসিলেন। সারি সারি মুখ-বাঁধা মাটির হাঁড়ি ও নাসপাতির ঝুড়ি দেখিয়া ছেলেমেয়েরা উল্লাসে কলরব করিতে লাগিল।

সকলে মুখ ধুইয়া বসিয়া গেল হাঁড়ি লইয়া। মনোরমা কাঁসার রেকাবি সাজাইতে লাগিলেন। চায়ের জল বসিয়াছে। চায়ের সঙ্গে কুটুম-বাড়ীর মিষ্টান্ন পরিবেশন করিবেন।

মেয়েরা সকলেই উপস্থিত। তরু বলিল, "বৌদির মায়েরা কি সুন্দর খাবার বানিয়ে দিয়েছে। তোমাদের খালি গাদা গাদা নারকোল আর দুধের কাঁড়ি। রোজ রোজ ভাল লাগে না খেতে।"

মধুমতী বলিল, "যা বলেছিস্ তরু, নারকোলের তক্তি নাড়ু আমার দু'চোখের বিষ। শুনলাম বৌয়ের মেজ-ঠাকুমা এই সমস্ত খাবার নিজের হাতে করে পাঠিয়েছেন। শহরের মেয়েদের পছন্দই আলাদা।"

ভানুমতীর মনটা তেমন ভাল ছিল না। হেমন্তের সহিত প্রণয়ের কলহ বাধিয়াছে। হেমন্ত প্রস্তাব করিয়াছিল লক্ষ্মী-পূর্ণিমার পরে সে স্ত্রীকে লইয়া বাড়ী যাইবে। কয়েকদিন পিতা-মাতার কাছে থাকিয়া ভাই-ফোঁটার পূর্ব্বে দিদির কাছে যাইবে। দিদির কাছে ফোঁটা লইয়া সেই পথেই চলিয়া যাইবে কলিকাতায়।

ভানুমতী স্বামীর কথায় সম্মত নহে। যাঁহার সঙ্গে নিরানন্দ শ্বশুরালয়ের সম্বন্ধ তিনি ফুড় ফুড় করিয়া উড়িয়া বেড়াইবেন। ভনুমতী সেখানে বসিয়া ভেরেণ্ডা ভাজিবে? না, সে যাইবে না।

প্রভাতে কিছু কথা কাটাকাটি হইয়াছিল। যদিও সে মেঘে ঝড়ও বয় নাই, অশ্রু বর্ষণও হয় নাই। তবু ভানুমতীর মেজাজ ভাল ছিল না।

সে মধুমতীর কথায় ঝঙ্কার দিল, "তুইও শহরে থাকিস্ শহরের মেয়েদের যোগ্যতা দেখিয়ে দে না। ময়দা, সুজি, ঘি,—ঘি-ময়দা-সুজি, এর বেশী ত ফুলবাবুদের কেরামতি নেই? আসুক না একবার কলকেতানীরা বাঙ্গাল মেয়েদের সাথে পাল্লা দিতে? ননীর পুতুল সব, ফুলের ঘায়ে মূচ্ছা যায়।"

সামান্য তর্কের মধ্য দিয়াই ইহারা তুমুল কোন্দল বাধাইতে ওস্তাদ, মনোরমা গোড়াতেই সাবধান হইলেন।

একটুখানি হাসিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "তাদের দিক দিয়ে তাদের যোগ্যতা, তোমাদের দিক দিয়ে তোমরা। ময়দার খাবারও ভাল, নারকোলের ক্ষীরের খাবারও ফেল্না নয়। যে দেশের যে রেওয়াজ। এই যে বিধবার জন্যেও ওঁরা সাঁচ ফেণীফল বুদ্ধি করে দিয়েছেন। সরি, এই হাঁড়িটা নিয়মের ঘরে নিয়ে যা। তোর দুই ঠাকুমাকে দিস্।"

সরস্বতী আহারাদির ম্লেচ্ছপনার দিকে পা বাড়ায় না। কি জানি কোথা হইতে ছোঁয়া-লেপা হইয়া যাইবে। আজ সে নিতান্ত কৌতূহলের বশীভূত হইয়াই বধূর পিত্রালয়ের বেসাতি নিরীক্ষণ করিতে আসিয়াছিল। মা'র প্রস্তাবে জোড়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ঠোঁট বাঁকাইল। "এ কেমন করে নিয়মের ঘরে নেব? এঁটো কাঁটা হাঁড়ির সঙ্গে ছোঁয়া লেগেছে। ঠাকুমারা ও যদি খায় খাক, আমি খাব না।"

ভানুমতী বলিল, "না খাও, না খেয়ো। নাসপাতি খাবে ত? না, তারও জাত গেছে?"

"ফল পুকুরে থেকে চুবিয়ে আনলেই জাতে উঠবে বড়দি ?" বলিয়া মধুমতী মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

সরস্বতী আর সেখানে দাঁড়াইল না, তাহার চক্ষু অশ্রুসজল হইয়াছিল। সে হাতীমুখো বারান্দায় উপনীত হইতেই ঠাকুমা চাপিয়া ধরিলেন, "ও সরি, আজকেই যে লক্ষ্মীর আসনে আলপনা দিয়ে রাখতে হবে। নইলে আসন শুকুবে না। তুই এখুনি সাতসকালে চান করে আয়, জপতপ সেরে জল খেয়ে নিয়ে লক্ষ্মীর আসনটা জাত করে রেখে দে। কাল পূর্ণিমা তিথি লাগা মাত্তর লক্ষ্মী বসাতে হবে। আমাদের লক্ষ্মীর প্রতিমে নেই, ঘটে-পটে পুজো। আসনে আলপনায় আঁকতে হয়, লক্ষ্মীর মুখ, জোড়া জোড়া চরণ, ধানের শিষ। পদ্মলতা, শঙ্খলতা। আজকে আসন চিত্তির করে রাখতে হয়, কাল হ'ল গোটা বাড়ী, তুলসীতলা ধামা কাঠা ডালা কুলো ধানের মড়াই চালের জালার গায়ে লক্ষ্মীর পা আর ধানের শিষ দিয়ে নিয়ম রক্ষে করতে হবে। এ গাঁয়ে তোর যেমন আলপনার হাত এমনটি আর কারো দেখি নি সরি। তা কাল পূর্ণিমা লাগবে কয় দণ্ডে ?"

"যাদের লক্ষ্মী পূজো তারা দণ্ড প্রহরের হিসেব-নিকেশ করুক গে; আমার কি দায় ?" বলিয়া সরস্বতী সরিয়া গেল।

ঠাকুমার বুদ্ধি কম হইলেও অনুভূতি প্রখর। রায়-বাড়ীর কোন্ মহলে কি ঘটে না ঘটে তাহা অনুমান করিতে তাঁহার বিলম্ব হয় না।

ভানুমতী ও হেমন্তের হৃদয়ের ক্ষীণ মেঘের রেখা তিনি নাতনীর মুখেই পাঠ করিয়া লইয়াছেন। তাই তাঁহার অনতিদূরে কার্য্যারতা ভানুমতীর মুখের পানে একটা চোরা কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া তিনি আপনার মনে বলিয়া উঠিলেন—

মহাজন রাধিকা সুন্দরী, দাসখৎ লিখে দেয় ব্রজের হরি, লিখিত—শ্রীবাঁকানয়ন, সাকিন শ্রীবৃন্দাবন, পেশা হ'ল গোপীমন চুরি, মানময়ী রাধিকা সুন্দরী।

ঠাকুমার অসংলগ্ন প্রলাপে সহজে কেহ কর্ণপাত করে না। ভানুমতীও করিল না। একখানা ছোট বাঁশের ডালায় কয়েকখানা সাঁচবাতাসা লইয়া ভানুমতী ঠাকুমার সামনে রাখিয়া দিয়া কহিল, "কুটুমবাড়ী থেকে এসেছে, তোমার কৌটোয় তুলে রাখ গে, যখন ইচ্ছে খেয়ো।"

ঠাকুমা ডালাখানা হাতে লইয়া বিড় বিড় করিয়া বলিলেন, "বেঁচে থাকতে দেয় না ভাত-কাপড়, মরে গেলে করে দান সাগর।"

মধ্যাহ্ন কাল, খররৌদ্রতাপে চরাচর ঝলসিত। ঠাকুমা বিষ্ণুর পূর্ব্বের বারান্দায় আশ্রয় লইলেন। আঙ্গিনার দিকে ঢাকা নির্জ্জন নিভৃত স্থান। সম্মুখে দুইখানা ঢেঁকিশালা, তাহার পরেই শস্যসম্ভারে পরিপূর্ণ লম্বা গোলাঘর। একটি পুষ্পিত শেফালি গাছ বারান্দার গায়ে হেলিয়া ছায়াঘন করিয়া রাখিয়াছে। তাহার পরে টানা প্রাচীর। প্রাচীরের পরেই বিশাল পুষ্করিণী। স্নিগ্ধ শীতল বাতাস বহিতেছে ঝিরঝির করিয়া।

কামিনীর মা ঘাট হইতে ফিরিতেছিল, ঠাকুমা স্নেহ-সিক্তস্বরে তাহাকে আহ্বান করিলেন, "ও রাজেশ্বরী, আয় এইখানে একটুখানি বসে জিরিয়ে যা। দিন-রাত করনা করতে করতে সোনার অঙ্গ কালি করে ফেললি ? আজ এদের লক্ষ্মী পুজোর নাড়ু-বড়ি কি হচ্ছে রে ? কয় কুড়ি নারকোল ভাঙ্গা হয়েছে ? মণি বৌ ত ঘরে নেই। কোথায় গেল ?"

এই নিরালা স্থানটুকু শুধু ঠাকুমার নয়, ঝিদেরও আরামের জায়গা। কাজের ফাঁকে ফাঁকে দিবসের অধিকাংশ সময় তাহারা এখানে আঁচল পাতিয়া ক্ষণিক বিশ্রাম করিয়া লয়।

কামিনীর মা আসিয়া ঠাকুমার অনতিদূরে বসিয়া কহিল, "তোমার মণি বৌকে সাত সকালে চান করিয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছি বড় হবিষ্যি ঘরে। লক্ষ্মীপুজোর নাড়ু-তক্তি করছে ওনাদের সাথে। নারকোলের মাথায় বাড়ি দেওন ত শুনেছিলাম মা; তা কয় কুড়ির ভাঙ্গল জল জানি না। কালকের দিনটা মিটে গেলে সকলকার পরাণে বাতাস লাগবে। আবার কালী পুজোর ধুমধাম আছে।"

ঠাকুমা কাজ ভুলিবার পাত্রী নন। একবার হাই তুলিয়া নড়িয়া-চড়িয়া শরীরের জড়তা ভাঙ্গিয়া কাজের কথায় আসিলেন—"দেখ্ রাজেশ্বরী, সেই ভোর থেকে দুপুর পর্য্যন্ত হারাণীরে পই পই করে কইলাম, কলাগাছের খোলার ডোলে দেবার জন্যে পঞ্চশস্যি ঝাড়াবাছা করে ভাগে ভাগে রেখে দিতে। তাতে তার কানও গেল না, মনও নয়। আলস্যতেই শরীর গদগদ। 'আলস্য অশেষ দোষ স্কন্ধে যার চাপে, সুখের জীবন তার যায় পরিতাপে'।

"তা মা রাজেশ্বরী, তোরে ভিন্ন আমি কারে কইব ? কেউ কি আমার কথা শোনে ? ওরা হলগে দুই দিনের পিঁপড়ে—

'পিপীলিকা পাখা মেলে উড়িবার তরে, আকাশে উড়িয়া যায় পাখীরা ধরিয়া খায়।' তুই ত আজকের

মাহুষ নোস, রাম রাজাও দেখেছিস, রামের বনবাসও দেখেছিস?”

কামিনীর মা নরম গলায় বলিল, “তা দেখিচি মা, রায়বাড়ীর কিছুটি দেখন আমার বাকী নেইকো। তা আবাগীর বেটিরা বোঝে না, সমান সমান হতে চায়। রাত পোয়ালে না লাগবে তোমার পঞ্চশস্যি? আমি এরি মধ্যি ঝাড়ি-বাছি রাখি দেব।”

ভবি ভুলিবার নয়। ঠাকুমার কণ্ঠ হইতে মিনতি ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, “সাত কাজের ভেতরে তুই ভুলে যাবি রাজেশ্বরী, তখন আছাড়া আবাছা দ্রব্য দিয়ে গিন্নীরা লক্ষ্মীপুজোর ডোল সাজাবেন। ওদের কি, ছেলে-ছোকরার কারবার, সেই জন্যেই না আমার মরণ হয়েছে। যে ক'দিন আছি না কয়ে বাঁচি নে। পাঁচটা মাটির সরায় করে ধান যব মাসকলাই তিল সরষে বেছে ঝেড়ে রেখে দে তুই। ওই হলগে পঞ্চশস্যি।”

কামিনীর মা মনে মনে বিরক্ত হইলেও মুখে আশ্বাস দিল,', আমি এখনি তোমার কাছে বসেই ঝাড়া বাছায় লেগে যাই মাঠান।”

মাঠান, খুশিতে ডগমগ, “তোরে কি আমি সাধে কই রাজেশ্বরী, তুই না হ'লে এ বাড়ীর কোন কর্ম্মে সুসার আছে? দেখ্ আর একটা কথা—লক্ষ্মী বসাবার সময় জলশঙ্খের ভেতরে বেলপাতা ত্রিদল, জবাফুল, সতের গাছা দুব্বো, সতেরটা সেদ্ধ ধানের চাল খুঁটে অর্ঘ্য সাজিয়ে দিয়ে লক্ষ্মী বসাতে হয়। লক্ষ্মীর আলপনা তেল-সিঁদুর দেওয়া কাঠের আসনের দুই দিকে তেল ঘিয়ের প্রদীপ জেলে উলু দিয়ে লক্ষ্মী বসানোর নিয়ম। আমাদের ঘটে পটে পূজো। লক্ষ্মীর পটখানা নামিয়ে ঝেড়ে মুছে রাখতে হবে। দুটো পিলসুজ প্রদীপ, পূজোর তামার ঘট মেজে ঘষে আজকেই রাখা ভাল। পূর্ণিমা লেগে গেলেই যে মা কড়ি শঙ্খ সিদুরের কৌটো শাঁখা আয়না চিরুণী পঞ্চশস্যের ডোল নিয়ে বসবেন চেলীর শাড়ীতে মুখ ঢেকে বৌ হয়ে।”

“মা, জন ঠাকুজ্জী তোমার সগল যোগাড়ে নেগে গেইচে। আসন চিত্তির হইচে। ঘরে ঘরে দ্রব্যজাত জড়ো করিছে লক্ষ্মী বসানের লেগে। তোমার চিন্তে কিসের মাঠান?”

না, ঠাকুমা আর চিন্তা করিবেন না। সরস্বতীর প্রতি তাঁহার অগাধ বিশ্বাস। মেয়েটি পূজার কাজ আশ্চর্য্য নিপুণতার সহিত করিতে জানে। সে কাজের কোথায়ও ফাঁকি থাকে না, কেহ খুঁত ধরিতে পারে না।

কামিনীর মা চলিয়া গেলে তরু একটা নাসপাতি কামাড়াইতে কামড়াইতে উপস্থিত হইল।

নিকটে লোক পাইলে ঠাকুমা সময়ের অব্যবহার করিতে ভালবাসেন না। কে বা স্বেচ্ছায় তাঁহার কাছে আসে? সকলকে ডাকিয়া সাধিয়া কথা বলা ভিন্ন তাঁহার কথা বলিবার লোক নাই। তাই বৃদ্ধা আপনার মনে ছড়া কাটিয়া আপনার মনে হাসিয়া কাঁদিয়া সময় কাটাইয়া দেন।

ঠাকুমা নাতনীকে সাদরে আহ্বান করিলেন, “আয় তন্বি, এখানে বোস। কি খাচ্ছিস? নাসপাতি, কেমন লাগছে খেতে?”

“তুমি কি নাসপাতির স্বাদ ভুলে গেছ ঠাকুমা? তোমাকে একটা এনে দেই কেটে?”

“পাগল, আমি খাব কি দিয়ে? আমার কি দাঁত আছে? যখন ছিল তখন কত খেয়েছি। ভালমন্দ ফল পেলে দুই হাতে লোককে বিলিয়ে দিয়েছি। আমার সেদিনের কথা যদি কই, তা হলে ‘গাঙ দিয়ে যায় মই'।”

“দাঁত নেই, তোমাকে শিলে ছেঁচে এনে দেব ঠাকুমা?”

ঠাকুমার চক্ষু অল্প সজল হইল। তিনি নাতনীদের দেখিতে পারেন না। তাঁহার যত স্নেহ ভালবাসা নাতিদের প্রতি। কিন্তু বলিতে ত নাতনীই শিলে ছেঁচার উল্লেখ করিল।

ঠাকুমা সবেগে মাথা দুলাইতে লাগিলেন, “না রে তন্যি পেটে আমার সয় না কিছু। আমি বাতাসা ভিজিয়ে জল খেয়ে নিয়েছি। ভোগ হলে একেবারে পেসাদ পাব। কাল তোদের বাড়ীতে লক্ষ্মীপুজোর উপোস করবে কে রে? আজ দুই বছর হ'ল পেসাদ আমাকে লক্ষ্মীপুজোয় উপোস করতে দেয় না। একাদশী করি, তাতেই দাপিয়ে খুন হয়।”

“হবে না, এত বড় বুড়ো মাহুষটার আবার একাদশী। মেজদি যেন ছোট, তার গায়ে বল রয়েছে। করুকগে সে ফষ্টি-নষ্টি। আচ্ছা একাদশীর উপোস করলে কি হয় ঠাকুমা?”

ঠাকুমা মহা মুশকিলে পড়িলেন। এ প্রশ্নের কি উত্তর দিবেন? ইহার কতটুকুই বা তিনি জানেন। লোকাচার, দেশাচার, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিধবারা যাহা আজীবন পালন করিয়া আসিতেছে তিনিও তাহাই করিতেছেন মাত্র। ইহার অধিক তাঁহার অগোচরে।

কোন কালেই তিনি কাহারও আলোচনায় যোগ দিতে জানেন না। বাক্যের সূত্র এড়াইয়া অবান্তর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হইয়া যান। আজও তাহার ব্যতিক্রম হইল না।

ঠাকুমা বলিলেন "ভাল হয়। সেইজন্যেই ভাগ্নি কত বর্ত্ত করে, উপোস করে, তার ভাল হবে ব'লে, ছেলে হবে ব'লে। গলায় হারের সাথে ছেলে হবার মাদুলি ঝুলিয়ে রেখেছে। কিন্তু ছেলেমেয়ের দেখা নেই। কপালে থাকা চাই, কপালের নাম গোপাল। 'তুমি যাবে ব্রজের পথে, তোমার কপাল যাবে সাথে সাথে।' হেমন্ত ডাক্তার, সে বোতলে বোতলে ওষুধ দিচ্ছে, কত কবজ তাবিজ কিছুতেই কিছু না। 'মা হওয়া কি মুখের কথা, যে না জানে সন্তানের ব্যথা।' জানে না জন্যেই সন্তান আসে না।"

ঠাকুমা থামিলেন। তরুর চোখের সম্মুখ হইতে যবনিকা সরিয়া গেল। তরু ছোট হইলেও এটুকু বোঝে মানুষ কাম্যবস্তু না পাইলেই রাগ করে, মেজাজ দেখায়। আক্রোশে ফাটিয়া যায়। আহা, সন্তান অভাবে বড় দিদি অমন মুখরা, কলহপ্রিয়া। ছল ছুতোয় উপবাস করে, সাধু-সন্ন্যাসীদের সেবা করে। ভিখারীকে ডাকিয়া ভিক্ষা দেয়। সকলের হাতে হাতে নানারূপ ফল বিতরণ করে। ছেলে মেয়েরাই বা বড়দিদির কাছে আসে না কেন? মা ষষ্ঠী না দিলে নাকি ছেলেমেয়ে কেউ পায় না? এবার ষষ্ঠীপূজায় তরু মা ষষ্ঠীর কাছে প্রার্থনা করিবে বড়দিদিকে ছেলে দিতে। ক্রমশঃ

———

জয়দেব ও অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব

শ্রীযোগীলাল হালদার

প্রবাদ আছে—যা নেই ভারতে, তা নেই ভারতে। এই প্রবাদের অর্থ—যা মহাভারতে নেই, তা ভারতবর্ষে নেই। মহাভারতে রাধার উল্লেখ কোথাও আছে ব'লে জানা নেই। মহাভারতে কৃষ্ণের দুই স্ত্রীর নাম পাওয়া যায়—রুক্মিণী ও সত্যভামা। এ ছাড়া কৃষ্ণের স্ত্রী জাম্ববতী ও আরও যোল হাজার স্ত্রীর উল্লেখ মহাভারতে পাওয়া যাচ্ছে। রুক্মিণী বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের কন্যা এবং কৃষ্ণের প্রধানা স্ত্রী। এঁর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ণ, সুদেষ্ণ, মহাবল, সুষেণ, চারুগুপ্ত, চারুবিন্দ, সুচারু, ভদ্রচারু ও চারু নামে দশ পুত্র হয়। অন্যতমা স্ত্রী সত্যভামা যদুবংশীয় রাজা সত্রাজিতের কন্যা। এঁর গর্ভে কৃষ্ণের ভানু প্রভৃতি সপ্তপুত্রের জন্ম হয়। অন্য উল্লেখনীয় স্ত্রী জাম্ববতী ভল্লুকরাজ জাম্ববানের কন্যা। এঁর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের শাম্ব প্রভৃতি দশটি পুত্রের জন্ম হয়। অন্য যোল হাজার স্ত্রীর সন্তানাদির কথা জানা নেই। মহাভারতের মৌষল পর্বে পাওয়া যাচ্ছে—শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের পর তাঁর অন্তিম ইচ্ছা অনুসারে কৃষ্ণের সারথি দারুকের সঙ্গে অর্জুন দ্বারকায় এলেন। তাঁকে দেখে কৃষ্ণের যোল হাজার স্ত্রী উচ্চকণ্ঠে কাঁদতে থাকলেন। দ্বারকায় নারীকুলের আকুল ক্রন্দনে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল। সেই মর্মভেদী ক্রন্দনের শব্দে অর্জুন ভূপতিত হলেন। রুক্মিণী-সত্যভামা প্রভৃতি কৃষ্ণের অন্যতমা মহিষীরা তাঁকে উঠিয়ে স্বর্ণময় পীঠে বসিয়ে বিলাপ করতে লাগলেন। অতঃপর অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেব ও মাতা দেবকী এবং বসুদেবের অন্য তিন স্ত্রী—ভদ্রা, মদিরা ও রোহিণীর, বলরাম কৃষ্ণ ও অন্য সকলের মৃতদেহ সৎকার করলেন। সপ্তম দিনে তিনি জীবিত সকলকে নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে যাত্রা করলেন। এর পর অর্জুন ভোজবংশীয় যাদবপ্রধান (১) কৃতবর্মার পুত্র ও সেই সঙ্গে ভোজ-নারীগণকে মার্তিকাবত নগরে এবং বৃষ্ণিবংশীয় যাদববীর সত্যকের পুত্র ও শিনির পৌত্র সাত্যকির পুত্রকে সরস্বতী নদীর নিকটস্থ প্রদেশে রাখলেন। অতঃপর অবশিষ্ট বালবৃদ্ধ নারীগণকে ইন্দ্রপ্রস্থে এনে কৃষ্ণের পৌত্র বজ্রকে (২) তথাকার সিংহাসনে বসালেন। অক্রূরের পত্নীরা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন। রুক্মিণী গান্ধারী শৈব্যা হৈমবতী ও জাম্ববতী—কৃষ্ণের এই পাঁচ স্ত্রী এখানে অগ্নিতে আত্মাহুতি দিলেন। কৃষ্ণের অন্যান্য স্ত্রীসহ সত্যভামা হিমালয় পার হয়ে কলাপ গ্রামে এসে কৃষ্ণের ধ্যানে সমাহিত হলেন।

মহাভারতে রাধার নাম পাওয়া গেল না। এর পর ভাগবত নিয়ে আলোচনা করার পালা। ভাগবতেও রাধার নাম আছে বলে জানা যায় নি। শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনি শ্রীশুক মহারাজ পরীক্ষিৎকে কৃষ্ণলীলা শুনাচ্ছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের প্রথম দিকে এই কৃষ্ণলীলার পরিচয় আছে। এই লীলার বিষয় আলোচনা করলে সম্যক্ উপলব্ধি করা যায় যে, ইহা কিশোর কৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা। অবশ্য এই দশম অংশের শেষাংশে বসুদেবসুত শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় ও তাঁহার শৌর্য-বীর্যের বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে।

শ্রীশুক উবাচ,

ভগবানপি তা রাত্রীঃ শরদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥১॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্। ১০ম স্কন্ধঃ, ২৯শ অধ্যায়ঃ)

এই উনত্রিংশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ কৃষ্ণের রাসমণ্ডলস্থ গোপীগণের সহিত কথোপকথন এবং সেই রাসমণ্ডল হইতে শ্রীভগবানের অন্তর্ধান বর্ণনা করা হইতেছে। শুকদেব বলিলেন—হে রাজন্! (ইন্দ্রের দর্পহরণ করতঃ সর্ববিজয়ী মদনকেও জয় করিবার মানসে) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শরৎকালীন বিকশিত মল্লিকার শোভায় শোভিতা রজনী দর্শনে প্রফুল্ল হইয়া যোগমায়াকে অবলম্বন করতঃ রমণার্থ (গোপীগণের মনোরথ পূরণার্থ) ইচ্ছা করিলেন॥১॥

কস্যাঃ পদানি চৈতানি যাতায়া নন্দসূনুনা।
অংসন্যস্ত প্রকোষ্ঠায়াঃ করেণোঃ করিণা যথা॥২৭॥

---

(১) যাদবগণের বিভিন্ন শাখার নাম অন্ধক ভোজ বৃষ্ণি কুকুর। কৃষ্ণ বৃষ্ণিবংশীয়।

(২) ভাগবতে উল্লিখিত আছে—ইনি কৃষ্ণের প্রপৌত্র, প্রদ্যুম্নের পৌত্র, অনিরুদ্ধের পুত্র।

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥২৮॥
(ঐ, ১০ম স্কঃ, ৩০শ অঃ)

[ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদি চিহ্ন দ্বারা উপলক্ষিত কৃষ্ণের চরণের অনুসরণে কৃষ্ণকে অনুসরণ করিতে করিতে অবলাগণ অপর কোন বধূর পদচিহ্নের সহিত কৃষ্ণের চরণ মিলিত দেখিয়া অতিশয় দুঃখের সহিত পরস্পর বলিতে লাগিলেন। দ্রঃ ২৬ শ্লোকঃ, ঐ, ১০ম স্কন্ধঃ, ৩০শ অঃ]

হে সখি! হস্তীর সহিত গমনকারিণী তাহার পত্নীর ন্যায়, স্কন্ধদেশে বিন্যস্তহস্তা, নন্দনন্দনের সহিত গমনশীলা কোন কামিনীর এই পদচিহ্ন প্রকাশ পাইতেছে ॥২৭॥

হে সখি! নিশ্চয়ই এই রমণী সর্বশক্তিমান্ বিভু সর্বদুঃখহারী শ্রীকৃষ্ণকে আরাধনা করিয়া পাইয়াছে, নতুবা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গোবিন্দ আনন্দের সহিত ইহাকে একান্তে গ্রহণ করিবেন কেন ॥২৮॥

এবং পরিষ্বঙ্গকরাভিমর্শ স্নিগ্ধেক্ষণোদ্দাম বিলাসহাসৈঃ।
রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভির্যথার্ভকঃ
স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ ॥১৮॥
(ঐ, ১০ম স্কঃ, ৩৩শ অঃ)

বালক যেমন নিজের প্রতিবিম্বে নিজে ক্রীড়া করে, শ্রীলক্ষ্মীকান্ত হরিও নিজের হ্লাদিনী শক্তির বিকাশস্বরূপ সেই গোপীগণের সহিত এই প্রকারে আলিঙ্গন, করস্পর্শ, প্রেমনিরীক্ষণ এবং চুম্বনাদি ভাবোদ্দীপক ব্যাপারে রাসক্রীড়া করিলেন, বস্তুতঃ গোপীগণ কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ নন ॥১৮॥

নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া।
মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ব্রজৌকসঃ ॥৩৭॥
(ঐ, ১০ম স্কঃ, ৩৩শ অঃ)

হে নৃপ (পরীক্ষিৎ)! ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব দেখুন, যদিও গোপাঙ্গনাসহ কৃষ্ণ বিহার করিলেন, কিন্তু তাঁহার মায়ায় বিমুগ্ধ গোপগণ আপন আপন পত্নীকে নিজের পার্শ্বে বর্তমান মনে করিয়া লোকের কথা বিশ্বাস করিলেন না এবং কৃষ্ণের প্রতি দোষারোপও করিলেন না ॥৩৭॥

সুতরাং ভাগবতকার বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলায় যে-সব গোপাঙ্গনার সঙ্গে কিশোর কৃষ্ণের বিহার বর্ণনা করেছেন তার মধ্যে রাধার নাম পাওয়া গেল না। কিশোর কৃষ্ণই যে লক্ষ্মীকান্ত শ্রীহরি এবং গোপীরা তাঁর হ্লাদিনী শক্তি, শ্রীমদ্ভাগবতের এই অংশে সে পরিচয় পাওয়া গেল। হ্লাদিনী শক্তির বিকাশ-স্বরূপ এই গোপীগণের সঙ্গে তাঁর বিহারের সংবাদটিও তাঁর মায়ায় বিমুগ্ধ গোপগণ জানতে পারল না। সমস্যা দেখা দিল এখানে। শারদীয়া পূর্ণিমার স্নিগ্ধোজ্জ্বল রজনীতে বৃন্দাবনের গোপ-বধূরা স্ব স্ব স্বামীর শয্যা থেকে উঠে গেল, আর সারা রাত তারা কিশোর কৃষ্ণের সঙ্গে রাস-মণ্ডলে রাসলীলা করল, কিন্তু একজন গোপও তার সংবাদ রাখল না। দুই-একজনের হ'লে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু এখানে ত দুই-একজন নয়; সমস্ত বৃন্দাবনের গোপ-সমাজের কেহই এই সংবাদ জানতে পারল না। শ্রীমদ্ভাগবতকার অবশ্য সুকৌশলে শ্রীভগবানের 'মায়া'—এর কথা এনেছেন।

আমরা অবশ্য এই 'মায়া'র কথা না বলে বৈষ্ণবধর্মের ক্রমবিবর্তনে অতীন্দ্রিয়বাদের ভূমিকার কথাই বলব। এই বৈষ্ণবধর্মের সার্থক পরিণতি গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে। 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও রাধাতত্ত্ব' আলোচনার ইহা অবতরণিকা। শ্রীমদ্ভাগবতকার ইঙ্গিতে জানিয়েছেন যে, প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণ আপন প্রেম আস্বাদনের ইচ্ছায় প্রেমের বিলাসরূপা হ্লাদিনী শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। অলৌকিক বৃন্দাবনে এঁরা এক হলেও লৌকিক বৃন্দাবনে মানব-কল্পনাতে এঁরা পৃথক্ হয়ে আছেন। 'এক হয়েও পৃথক্'—এই তত্ত্বই অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব। এক নিজেকে আস্বাদনের জন্য পৃথক্ হলেন—যার মূল কথা আনন্দরস আস্বাদন। ইহাই মানসবিহার এবং এই মানসবিহারই অতীন্দ্রিয়বাদ। 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও রাধাতত্ত্বে' এই অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। এই পরিপূর্ণতা প্রমাণের ইহাই আমাদের প্রথম প্রয়াস।

যা হোক, শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত রাসলীলা যে সারা ভারতে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল তার পরিচয় ভারতের বিভিন্ন স্থানে আছে। আমরা এখানে একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করছি। ভ্রমণব্যপদেশে উত্তর-ভারতের শিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের সঙ্গে অল্প-স্বল্প পরিচয় থাকলেও দক্ষিণ-ভারতের শিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শন দেখবার সৌভাগ্য হয় নি। ১৯৫৭ সালের ডিসেম্বর মাসে বড়দিনের বন্ধে সেই সৌভাগ্য আসে। ঐ সময় মাদ্রাজে অখিল ভারত শিক্ষা-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সম্মেলনে যোগ দিয়ে দক্ষিণ-ভারতের বিভিন্ন স্থানের শিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের সঙ্গে যৎসামান্য পরিচয় ঘটে। এখানে অন্যগুলি বাদ দিয়ে মহাবলীপুরম্-এর পল্লবযুগের ভাস্কর্যের বিষয়ই উল্লেখ করব। পল্লব নৃপতিগণের অন্যতম নরসিংহ বর্মণ (৬৩০-৬৬৮ খ্রীঃ) মহাবলীপুরম্-এ 'পঞ্চপাণ্ডবের মন্দির' নামে প্রস্তর-নির্মিত এক বিরাট্ মন্দির নির্মাণ করেন। উহার গাত্রে শিল্পীগণ যে-সব ভাস্কর্যের নিদর্শন রেখেছেন তা সত্যই মনোমুগ্ধকর।

পাথর যে এমন করে পালিশ করা যায়, এমনভাবে বিনা বন্ধনে যে গাঁথা যায়, নিপুণতার সঙ্গে যে এমন করে লীলা-বিলাস-পরায়ণা নারী ও সুভঙ্গিমঠামে পুরুষ মূর্তি খোদাই করা যায়, তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। এই মন্দিরের গাত্রে 'গঙ্গাবতরণ' ও 'গোকুল বা বৃন্দাবন'-এর দৃশ্য সমধিক উল্লেখযোগ্য। গোকুলের দৃশ্যে ভাগবতের উক্ত রাসলীলার কাহিনীটি অতি নিপুণতার সঙ্গে খোদিত হয়েছে। সুনিপুণ ভাস্করের ভাস্কর্যের গুণে মন্দির-গাত্রের মূর্তিগুলি যেন প্রাণবন্ত। দর্শক তাঁর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভুলে ক্ষণেকের তরে শ্রীভগবানের রাসলীলার আনন্দে বিভোর হয়ে থাকবেন। তিনিও যেন তখন ভগবানের পার্শ্বচর।

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের শেষের দিকে বসুদেব-সুত শ্রীকৃষ্ণের যে পরিচয় ও শৌর্য-বীর্যের বিবরণ আছে তাহা আর্ষ মহাভারতের অনুরূপ। বসুদেব-সুত শ্রীকৃষ্ণের শৌর্য-বীর্যের কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশুক মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলছেন,—

ভগবান্ ভীষ্মকসুতামেবং নির্জ্জিত্য ভূমিপান্।
পুরমানীয় বিধিবদুপযেমে কুরূদ্বহ ॥৫৩॥
(ঐ, ১০ম স্কঃ, ৫৪শ অঃ)

হে কুরুকুলশ্রেষ্ঠ রাজা পরীক্ষিৎ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে সমাগত নৃপতিগণকে পরাজয় করিয়া (কুণ্ডিন নগরের রাজা) ভীষ্মক-তনয়া রুক্মিণীকে নিজ ভবনে আনিয়া যথাবিধি বিবাহ করিলেন ॥৫৩॥

ইত্যুক্তঃ স্বাং দুহিতরং কন্যাং জাম্ববতীং মুদা।
অর্হনার্থং য মণিনা কৃষ্ণয়োপজহার সঃ ॥৩২॥
(ঐ, ১০ম স্কঃ, ৫৬শ অঃ)

এইরূপ শ্রবণ করিয়া সেই মহাবুদ্ধিমান্ জাম্ববান্ (ঋক্ষরাজ) নিজের দুহিতা বিবাহের যোগ্যা সুন্দরী জাম্ববতীকে ঐ মণির (স্যমন্তক মণি) সহিত শ্রীকৃষ্ণকে সমর্পণ করিলেন। ॥৩২॥

এবং ব্যবসিতো বুদ্ধ্যা সত্রাজিৎ স্ব যুগং শুভাম্।
মণিঞ্চ স্বয়মুদ্যম্য কৃষ্ণায়োপজহার হ ॥৪৩॥
(ঐ, ১০ম স্কঃ, ৫৬শ অঃ)

বিচার করিয়া এইরূপ নিশ্চয় করতঃ সত্রাজিৎ (দ্বারকাবাসী জনৈক সূর্যভক্ত) আপন সুন্দরী কন্যা সত্যভামাকে ঐ স্যমন্তক মণিটিসহ শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিলেন ॥৪৩॥

অহং দেবস্য সবিতুর্দুহিতা পতিমিচ্ছতী।
বিষ্ণুং বরেণ্যং বরদং তপঃ পরমাস্থিতা ॥২০॥
(ঐ, ১০ম স্কঃ, ৫৮শ অঃ)

(কালিন্দী বলিল) মহাশয়, আমি সূর্যদেবের কন্যা; সর্বোত্তম, বরদ শ্রীকৃষ্ণকে পতি পাইব বলিয়া পরম তপস্যা করিতেছি ॥২০॥

তথাবদদ্ গুড়াকেশো বাসুদেবায় সোঽপি তাং।
রথমারোপ্য তদ্বিদ্বান্ ধর্মরাজমুপাগমৎ ॥২৩॥
(ঐ, ১০ম স্কঃ, ৫৮শ অঃ)

জিতেন্দ্রিয় অর্জুন নির্বিকার চিত্তে শ্রীকৃষ্ণকে ঐ সকল কথা বলিলে, পূর্বেই কৃষ্ণ এই বিষয় জানিয়াছিলেন, পরন্তু অর্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া ঐ কন্যাকে রথে আরোহণ করাইয়া অর্জুনের সহিত যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিলেন ॥২৩॥

অথোপযেমে কালিন্দীং সুপুণ্যর্ত্তৃক্ষ উর্জ্জিতে।
বিতন্বন্ পরমানন্দং স্বানাং পরম মঙ্গলঃ ॥২৯॥
(ঐ, ১০ম স্কঃ, ৫৮শ অঃ)

অনন্তর ভক্তগণের পরমানন্দ প্রদানপূর্বক আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণ শুভলগ্নে শুভ ঋতু ও শুভ নক্ষত্রযুক্ত সময়ে কালিন্দীকে বিবাহ করিলেন ॥২৯॥

বিন্দানুবিন্দাবাবন্ত্যৌ দুর্যোধনবশানুগৌ।
স্বয়ম্বরে স্বভগিনীং কৃষ্ণে সক্তাং ন্যষেধতাম্ ॥৩০॥
রাজাধিদেব্যাস্তনয়াং মিত্রবিন্দাং পিতৃস্বসুঃ।
প্রসহ্যহৃতবান্ কৃষ্ণোরাজন্ রাজ্ঞাং প্রপশ্যতাম্ ॥৩১॥
(ঐ, ১০ম স্কঃ, ৫৮শ অঃ)

দুর্যোধনের বশবর্তী অবন্তীর অধিপতি বিন্দ ও অনুবিন্দ ইহারা স্বয়ম্বরে শ্রীকৃষ্ণকে পাইতে অভিলাষিণী নিজ ভগিনী মিত্রবিন্দাকে নিষেধ করিল ॥৩০॥

(শুকদেব গোস্বামী রাজা পরীক্ষিৎকে বলিলেন) হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ পিতৃস্বসা রাজাধিদেবীর তনয়া সেই মিত্রবিন্দাকে সকল রাজগণের সমক্ষে সহসা অপহরণ করিলেন ॥৩১॥

ততঃ প্রীতঃ সুতাং রাজা দদৌ কৃষ্ণায় বিস্মিতঃ।
তাং প্রত্যগৃহ্লাদ্ভগবান্ বিধিবৎ সদৃশীং প্রভুঃ ॥৪৭॥
(ঐ, ১০ম স্কঃ, ৫৮শ অঃ)

অনন্তর ঐ কার্য দর্শনে চমৎকৃত এবং কৃষ্ণই কন্যার বর হইলেন ভাবিয়া প্রীত হইয়া রাজা কৃষ্ণকে কন্যাদান করিলেন; সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণও নিজের যোগ্যা ঐ কন্যাকে (অযোধ্যার অধিপতি নগ্নজিতের কন্যা নাগ্নজিতী ও সত্যা এই দুই নামেই প্রসিদ্ধা একটি কন্যা) যথাবিধি গ্রহণ করিলেন ॥৪৭॥

শ্রুতকীর্তেঃ সুতাং ভদ্রামুপযেমে পিতৃস্বসুঃ
কৈকেয়ীং ভ্রাতৃভির্দত্তাং কৃষ্ণঃ সন্তর্দনাদিভিঃ ॥৫৬॥
(ঐ, ১০ম স্কঃ, ৫৮শ অঃ)

পরে শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কর্ষণাদি ভ্রাতৃগণ প্রদত্তা কৈকেয়দেশীয় পিতৃষ্বসা শ্রুতকীর্তির কন্যা ভদ্রাকে বিবাহ করিলেন ॥৫৬॥

সুতাঞ্চ মদ্রাধিপতের্লক্ষ্মণাং লক্ষণৈর্যুতাম্।
স্বয়ংবরে জহারৈকঃ স সুপর্ণঃ সুধামিব ॥৫৭॥
(ঐ, ১০ম স্কঃ, ৫৮শ অঃ)

গরুড় যেমন অসুরগণের মধ্য হইতে সুধা হরণ করিয়াছিল, সেইরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ম্বরসভায় শুভ লক্ষণযুক্তা মদ্রাধিপতির কন্যা লক্ষ্মণাকে একাকীই অপহরণ করিলেন ॥৫৭॥

অন্যাশ্চৈবংবিধা ভার্য্যাঃ কৃষ্ণস্যাসন সহস্রশঃ।
ভৌমং হত্বা তন্নিরোধাদাহৃতাশ্চারুদর্শনাঃ ॥৫৮॥
(ঐ, ১০ম স্কঃ, ৫৮শ অঃ)

হে রাজন্ (পরীক্ষিৎ)! জরাসন্ধকে বিনাশ করিয়া তাহার অন্তঃপুর হইতে আহৃত সুন্দরনয়না এইরূপ আরও সহস্র সহস্র রমণী শ্রীকৃষ্ণের ভার্য্যা হইয়াছিল ॥৫৮॥

সুতরাং ভাগবতেও রাধার নাম পাওয়া গেল না। মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণের শৌর্য-বীর্যের এবং অন্যান্য পরিচয়ের সঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের শেষাংশের মিল আছে। দশম স্কন্ধের প্রথমাংশে বর্ণিত কিশোর কৃষ্ণের রাসলীলায় বিন্দুবিসর্গও মহাভারতে নেই। তবুও এস্থলে উল্লেখনীয় যে, শ্রীমদ্ভাগবতেও রাধার উল্লেখ নেই। দশম স্কন্ধের রাসলীলা নিয়ে এর আগে অনেক বিদগ্ধ সুধী আলোচনা করেছেন, তাই দশম স্কন্ধ থেকে বিশেষ বিশেষ শ্লোক উদ্ধৃত করে দিয়েছি। এর পর আমরা 'রাধা' নামের উৎপত্তি প্রসঙ্গ, বৈষ্ণব ধর্ম, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও রাধাতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনায় অগ্রসর হব। সেই আলোচনায় আমরা প্রমাণ করব যে, 'রাধা' নামটি, রাধাতত্ত্ব বা রাধাবাদ, রাধাকৃষ্ণলীলা প্রচার বাঙালীর সাধনার অপূর্ব অবদান; আর সেই প্রাতঃস্মরণীয় বাঙালী বীরভূম জেলার কেন্দুবিল্বের ভক্তসাধক কবি জয়দেব গোস্বামী।

মহাভারতের কৃষ্ণ চক্রধারী। তিনি সাধুদিগের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতকারীদিগের বিনাশ ও ধর্ম স্থাপনের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। মহাভারতের সৌপ্তিকপর্বে পাওয়া যাচ্ছে—পাণ্ডবেরা বনবাসে চ'লে গেলে অশ্বত্থমা দ্বারকায় যেয়ে শ্রীকৃষ্ণের নিকট তার ব্রহ্মশির অস্ত্রের বিনিময়ে কৃষ্ণের সুদর্শন চক্র নিতে চেয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ অশ্বত্থমার ব্রহ্মশির অস্ত্র নিতে চান নি, কিন্তু তাকে বিমুখ না করে তাঁর চক্রধনু শক্তি বা গদা, এর যা' তার ইচ্ছা তাই তাকে দিতে চেয়েছিলেন। অশ্বত্থমা সুদর্শন চক্র নিতে গিয়ে দু'হাতে ধরেও চক্র তুলতে পারে নি। সুতরাং মহাভারতের এই চক্রধারী কৃষ্ণ কি ভাবে বংশীধারী কৃষ্ণে রূপান্তরিত হলেন তাহাই এখানে আলোচ্য বিষয়।

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকে ভক্তকবি জয়দেব স্বীয় সাধনার দ্বারা মহাভারতের চক্রধারী কৃষ্ণের হাতের চক্র সরিয়ে দিয়ে তার স্থানে বংশী তুলে দিয়েছেন। সাধনার শক্তিবলে শ্রীজয়দেব গোস্বামী এমনভাবে চক্রধারীকে বংশীধারী করলেন যে, সারা ভারত সেই বংশীধারীর বংশীরবে সম্মোহিত হয়ে গেল। সেই সম্মোহন শক্তির প্রভাব এত প্রবল যে, আজিও বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ভারতবাসী সেই বংশীধ্বনিতে মুগ্ধ হয়ে আছে। অবশ্য মাঝে মাঝে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসীদের উদাত্ত কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—

"নিদ্রিত ভারত চাহে তোমারে,
এস সুদর্শনধারী মুরারি।"

কিন্তু সন্ন্যাসীদের সেই ক্ষীণকণ্ঠ শ্রীজয়দেবের সাধনার বজ্রধ্বনিতে ডুবে যাচ্ছে।

শ্রীজয়দেব গোস্বামীই 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম'-এর প্রবর্তক। অবশ্য একথা অনস্বীকার্য যে, এই 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম' প্রাচীন 'বৈদিক বৈষ্ণব ধর্ম'-এর পূর্ণ পরিণত রূপ। শ্রীরাধা বিষ্ণুর কমলা না হ'লেও তিনি স্বয়ং যে কমলিনী, এ সত্য আজ বৈষ্ণব-ভক্তের কাছে পরিপূর্ণরূপে সত্য। ধর্ম-মলয়ের স্পর্শে এই কমলিনীর পাপড়িগুলি অল্পে অল্পে মেলে গিয়েছে, আর তার সুগন্ধে আকৃষ্ট হয়ে ভক্ত মধুকর তার মধ্যে উড়ে পড়ে মধুপানে মত্ত হয়ে আছে। শ্রীরাধার এই কমলিনী রূপের আলোচনা প্রসঙ্গে আচার্য শ্রীযুত শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন, "পরবর্তী কালের পদাবলী সাহিত্যে রাধা 'কমলা' না হইতে পারেন, কিন্তু 'কমলিনী' বটেন।"—'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ—দর্শনে ও সাহিত্যে।' পৃঃ ১২৬।

'গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম' যে প্রাচীন 'বৈদিক বৈষ্ণব ধর্ম'-এর পরিণত রূপ—একথা পূর্ব অনুচ্ছেদে উক্ত হয়েছে। বৈষ্ণব ধর্ম বৈদিক ধর্ম। ঋগ্‌বেদ-এর অনেক শ্লোকে বিষ্ণুর নাম পাওয়া যাচ্ছে। আবার বিষ্ণুকে উরুক্রম, পৃশ্নিগর্ভ নামেও অভিহিত করা হয়েছে। বিষ্ণুর ত্রিপাদ ক্ষেপের উল্লেখ প্রসঙ্গে ঋগ্বেদে উল্লিখিত আছে: "ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং" (১।২২।১৭)। সুতরাং বিষ্ণু যে স্বর্গ, মর্ত্য ও মহাব্যোম পরিব্যাপ্ত করে আছেন

অর্থাৎ তিনি যে সর্বব্যাপী, অনন্ত—এর সম্যক্ পরিচয় পাওয়া গেল। আবার—

তদস্য প্রিয়মভি পাথো অশ্যাং নরো দেব যবো মদন্তি ॥
উরুক্রমস স-হি বন্ধু রিথা বিষ্ণোঃ পদে পরমে মধ্বা উতে ॥
তাবাং বাস্তু, ন্যুশ্মসি গমধ্যে যত্র গাবো ভূরি শৃঙ্গা অযাসঃ॥
অত্রাহ তদরুগায়স্য বৃষ্ণঃ পরমং পদমবভাতি ভূরি ॥

(ঋগ্‌বেদ, ১ম মণ্ডল, ১৫৪ সূক্ত, ৫।৬ ঋক্)।

বিষ্ণুর পরম পদ মধুর উৎপত্তি স্থান। তিনি আমাদের প্রকৃত বন্ধু। সেই উরুক্রম উরুগায় বিষ্ণুর আনন্দলোক ভূরিশৃঙ্গ গোরুতে পরিপূর্ণ।

এই মন্ত্রের মধ্যে বিষ্ণুর রসমূর্তি বা আনন্দময় স্বরূপেরই সন্ধান পাওয়া যায়। শুধু তাহাই নয়, ঋষিরা সেই মহাবিষ্ণুকে তাঁহাদের প্রিয় বন্ধুরূপেও উপাসনা করতেন। এই বৈদিক যুগেও ঋষিরা ধ্যানে গো-পাল পরিবৃত মহাবিষ্ণুকে দর্শন করেছিলেন। সুতরাং রসময় কৃষ্ণের মহাবিষ্ণুরূপ রসমূর্তি সেই ঋগ্‌বেদের যুগেও আর্য ঋষিরা দর্শন করেছিলেন। অতএব বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনের রাসলীলার পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে ঋগ্‌বেদে। আবার বৈদিক যুগের ঋষিগণ বিষ্ণুকে তাঁহাদের বন্ধুরূপেও উপাসনা করেছেন। পরবর্তী কালে আমরা বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের ক্রমবিবর্তনে যে দাস্যভাবের উপাসনার পরিচয় পেয়েছি তার উৎস এই ঋগ্‌বেদের মধ্যেই নিহিত আছে।

ছান্দোগ্য উপনিষদে বসুদেব-দেবকী-তনয় কৃষ্ণের কথা উল্লিখিত আছে। বৈদিক যুগের বৈষ্ণব ধর্মের দুইটি ধারার পরিচয়ও পাওয়া যাচ্ছে। এই দুইটি ধারা—বৈখানস ও পাঞ্চরাত্র। বৈখানস ধারার প্রবর্তক স্বয়ং বিখনস বা ব্রহ্মা, আর পাঞ্চরাত্র ধারার প্রবর্তক স্বয়ং নারদ। নারদ আবার ব্রহ্মার নিকট থেকে বৈষ্ণব ধর্মের উপদেশ লাভ করেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে 'নারদ-সংগ্রহ' বা 'নারদ-পাঞ্চরাত্র' নামে যে গ্রন্থখানি পাওয়া যায় তার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। হয় এই গ্রন্থখানিতে সাত নকলে আসল পরিবর্তন হয়েছে, না হয় এখানি অর্বাচীন কালে প্রণীত। কারণ উপনিষদের যুগে রাধাতত্ত্ব বা রাধাবাদ-এর কথা কোন গ্রন্থে আছে ব'লে আমাদের জানা নেই। শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য বর্ণনায় শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ তাঁকে মহেশ্বর, পরমদেবতা আখ্যায় আখ্যাত করেছেন।

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ বিদাম দেবংভুবনেশ মীড্যম্।

সুতরাং ঋগ্‌বেদ, ছান্দোগ্য উপনিষদ্, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত-এ রাধার উল্লেখ পাওয়া গেল না। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, মহাভারতে কৃষ্ণের যে বিরাট্ ভূমিকা আছে তার মধ্যে রাধার নামগন্ধও নেই। অথচ পরবর্তী কালের পুরাণ, তন্ত্র, সংস্কৃত কাব্য ও নাটক এবং নানা স্থানে প্রচলিত নানা কথার সূত্র ধ'রে কেহ কেহ রাধাকৃষ্ণলীলার প্রাচীনত্ব প্রমাণে যথেষ্ট প্রয়াস পেয়েছেন। এর জন্য তাঁদের প্রচেষ্টা প্রশংসার যোগ্য, কিন্তু তাতে রাধাকৃষ্ণলীলার প্রাচীনত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে মনে হয় না। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, নানা স্থানের মন্দিরে বা পর্বতগাত্রে উৎকীর্ণ পূর্বোক্ত শ্রীমদ্ভাগবতের কৃষ্ণলীলা তাঁরা রাধাকৃষ্ণের রাসলীলা বলে চালিয়ে দিয়েছেন। ব্রহ্মসংহিতা ও গোপাল-তাপনীতে রাধার নাম নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের মত ব্রহ্মসংহিতায় মন্ত্র বিচারে গোপী শব্দের উল্লেখ আছে শুধু, কোন নাম নাই। আবার গোপাল-তাপনীতে এক গোপীর নাম গান্ধর্বী ব'লে পাওয়া যায়। কেহ কেহ এই গান্ধর্বীকে রাধা ব'লে প্রচার ক'রে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছেন, কিন্তু তাতে রাধার প্রাচীনত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ব'লে আমাদের মনে হয় না। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, পদ্মপুরাণ, দেবী ভাগবত, রাধাতন্ত্রের রাধাকৃষ্ণলীলার কথা আমরা ধরছি না. কারণ আমাদের মতে এগুলি অতি অর্বাচীন কালের গ্রন্থ। আর মহাপ্রভু এবং ষড়্ গোস্বামী যে জয়দেবের পরবর্তী, একথা উল্লেখ না করলেও চলে।

অনেকের ধারণা, দাক্ষিণাত্যে বহু পূর্বেই নাকি রাধাকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ জনসমাজে প্রচলিত ছিল। এই সূত্রে তাঁরা আচার্য নিম্বার্কের নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি যে, বাংলার রাজা লক্ষ্মণ সেন ১১৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। আর জয়দেব ছিলেন তাঁর সভাকবি। জয়দেবের কবি-প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে নিশ্চয় রাজা লক্ষ্মণ সেন তাঁকে তাঁর সভাকবি করেছিলেন। যদি তাই হয়, তবে লক্ষ্মণ সেনের সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে নিশ্চয় মহাকবি জয়দেবের খ্যাতি অন্ততঃ সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। আর সেই জন্য জয়দেবের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল পবন দূতের লেখক ধোয়ী, হলায়ুধ, শ্রীধর দাস, উমাপতি ধর, বিদ্যাপতি, দ্বিজ চণ্ডীদাস প্রভৃতি কবির। দাক্ষিণাত্য থেকে আচার্য নিম্বার্ক এসে তাঁর সঙ্গে যোগ স্থাপন করেছিলেন—একথা আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে পারব। আর একথা প্রতিষ্ঠিত হ'লে প্রমাণিত হবে—জয়দেবের রাধাতত্ত্ব আচার্য নিম্বার্কই দাক্ষিণাত্যে প্রচার করেছিলেন।

দাক্ষিণাত্যের আচার্য রামানুজ লক্ষ্মীনারায়ণের পূজারী ছিলেন। তাঁর পর আচার্য নিম্বার্ক দক্ষিণ দেশে রাধাকৃষ্ণের পূজা প্রবর্তন করেন, ইহাই আমরা প্রমাণ করতে চাই। একথা প্রমাণিত হ'লে দক্ষিণ দেশে রাধাকৃষ্ণলীলা প্রচারের সমস্ত সংশয়ের নিরসন হবে। আমরা পূর্বেই বলেছি যে, 'রাধা' নামটি, রাধাবাদ বা রাধাতত্ত্ব, রাধাকৃষ্ণলীলা প্রচার বাঙালীর সাধনার অপূর্ব অবদান; আর সেই প্রাতঃস্মরণীয় বাঙালী বীরভূম জেলার কেন্দুবিল্বের ভক্তসাধক কবি জয়দেব গোস্বামী। 'রাধা' নামটি তাঁর সাধনালব্ধ। কপিলাবস্তুর রাজপুত্র যেমন বোধি লাভ করেছিলেন, বাঙালী-সাধক জয়দেব তেমনি আরাধনার দ্বারা 'রাধা' নাম, রাধাতত্ত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। আর রাধাকৃষ্ণলীলা—যা তাঁর উপলব্ধির ফল—প্রচার করেছেন তাঁর শ্রীগীতগোবিন্দের মধ্যে। তাই বাঙালী জয়দেবের কাছ থেকে রাধামধু সংগ্রহ করেছিলেন তৎকালীন ভারতের ভক্তসাধক সুধীসমাজ। জয়দেবের সাধনা, জয়দেবের কবিপ্রতিভা যখন সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল, আমাদের মনে হয় ঠিক সেই সময় আচার্য নিম্বার্ক তাঁর কাছ থেকে এই রাধাকৃষ্ণভজনপূজন পদ্ধতি গ্রহণ করেন এবং দক্ষিণ দেশে রাধাকৃষ্ণের পূজা প্রচার করেন। সুতরাং রাধার প্রাচীনত্ব নিয়ে কথার বাগাড়ম্বর না ক'রে রাধাতত্ত্ব বা রাধাবাদ বাঙালীর বিশিষ্ট অবদান ব'লে গ্রহণ করাই সমীচীন।

জয়দেবের রাধাকৃষ্ণলীলাই যে আচার্য নিম্বার্ক দাক্ষিণাত্যে প্রচার করেছিলেন, এ কথার সত্যতা প্রমাণ করতে হলে আমাদিগকে আচার্যের কাল নির্ণয় করতে হবে। এই কাল নির্ণয়ে আমরা বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক ডঃ রাধাকৃষ্ণন-এর Indian Philosophy—Vol. II থেকে উপযুক্ত উদ্ধৃতি দিলাম। ডঃ রাধাকৃষ্ণন লিখেছেন:

"Ramanuja was born in Sriperumbudur in the year A.D. 1027...... Ramanuja wrote Vedantasara, Vedanthasamgraha and Vedantadipa, and composed his great commentaries on the Brahma Sutra and the Bhagabatgita. The learned among the Vaisnavas gave their approval to Ramanuja's exposition of Brahma Sutra, and it became the commentary (Sribhasya) for the Vaisnavas. Ramanuja toured round South India, restored many Vaisnava temples and converted large numbers to Vaisnavism."—pp. 665-66.

আচার্য রামানুজ লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজারী ছিলেন। সারা দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণ ক'রে তিনি নানা স্থানে বহু বিষ্ণুমন্দির সংস্কার করেছিলেন এবং বহু লোককে তিনি বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষাও দিয়েছিলেন। আচার্য নিম্বার্ক পরম বৈষ্ণব ছিলেন। দাক্ষিণাত্যে রাধাকৃষ্ণলীলা প্রচারও করেছিলেন তিনি। জয়দেব তাঁর শ্রীগীতগোবিন্দে যে রাধাকৃষ্ণলীলা লিখেছেন, সেই রাধাকৃষ্ণলীলার রাধাই ছিল তাঁর সাধনার ধন, আরাধনালব্ধ ফল। জয়দেব বর্ণিত রাধাকৃষ্ণলীলাই আচার্য নিম্বার্ক দাক্ষিণাত্যে প্রচার করেন। আচার্য নিম্বার্ক আচার্য রামানুজের অনেক পরবর্তী এবং আচার্য মাধবের ঠিক পূর্ববর্তী। শ্রীজয়দেব যখন ভারত-বিখ্যাত সাধক-কবি, সেই সময় আচার্য মাধব (১১৯৯ খ্রীঃ অব্দে) জন্মগ্রহণ করেন। পূর্বেই উক্ত হয়েছে, ১১৭৮ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্মণ সেনের সিংহাসনে আরোহণের সময়ে সাধক-কবি জয়দেবের কবিপ্রতিভা সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল, বিশেষতঃ তাঁহার নূতন সাধনার ধারা ভারতের তদানীন্তন আচার্যগণকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করেছিল এবং তারই ফলে জয়দেবের মধুর ভাবের সাধনা—যাকে পূর্বে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম বলা হয়েছে—সারা ভারতে প্রচার লাভ করেছিল। আচার্য নিম্বার্কই জয়দেবের কাছ থেকে এই সাধনা গ্রহণ ক'রে দাক্ষিণাত্যে প্রচার করেছিলেন।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

—

ছায়াপথ

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

॥ চোদ্দ ॥

দয়ালবাবুর বাবা ছিলেন, যাকে বলে আমীর লোক। তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ, আহার-বিহার, সবই আমিরী চালে চলত। প্রতিদিন মধ্যাহ্নে ঘুম ভাঙামাত্র সরকার তাঁকে একশ' এক টাকা দিয়ে যেত। সেটা তাঁর প্রাত্যহিক হাত-খরচ।

নেশা ছিল তিন রকমের : গাঁজা, আফিম, মদ। নিজে ত ছিলেনই, পল্লীর অর্ধেক বয়স্ক ব্যক্তিকে শুদ্ধ তিনি এই ত্রিবিধ নেশায় পরিপক্ব ক'রে তুলেছিলেন।

নেশায়, নবাবীতে, যাকে বলে সত্যিকারের জমিদার।

কিন্তু একমাত্র পুত্র শিবচন্দ্র যেন বংশছাড়া।

শিবচন্দ্রের পড়াশোনার মাথা পিতৃ-পিতামহের মতই। তিনজন গৃহশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে নিজের যথেষ্ট আগ্রহ সত্ত্বেও এণ্ট্রান্সের উপরে আর উঠতে পারলেন না।

কিন্তু তার জন্যে দয়ালবাবুর দুঃখ ছিল না। লেখাপড়া ত চাকরির জন্যে। সুতরাং যাকে কোনদিন চাকরি করতে হবে না, তার লেখাপড়ার জন্যে পরিশ্রম এবং সময়ের অপব্যয় করার প্রয়োজন কি?

তাঁর চিন্তা হ'ল, এণ্ট্রান্স ফেল করার পরেও যখন শিবচন্দ্র হাত-খরচের জন্যে কিছু বললেন না।

তিনি সরকারকে বলে দিলেন, হাত-খরচের জন্যে শিবচন্দ্র যখন যা চাইবেন যেন দেওয়া হয়। তাঁর ধারণা হ'ল শিবচন্দ্র হয়ত সঙ্কোচবশেই চাইতে পারছেন না।

মাসকয়েক পরে সরকারকে জিজ্ঞাসা করলেন, শিবচন্দ্র মাসে মাসে কি রকম টাকা নিচ্ছেন?

—এক পয়সাও না।

দয়াল আকাশ থেকে পড়লেন : বল কি?

মাথা চুলকে সরকার বললে, আজ্ঞে তাই।

দয়াল চিন্তিত হলেন। সুস্থভাবে চিন্তা করবার সময় তাঁর খুবই কম। মধ্যরাত্রে অচৈতন্য অবস্থায় অন্দরে ফেরেন। মধ্যদিন পর্যন্ত সেই অবস্থায় শয্যালগ্ন থাকেন। অপরাহ্ণে বাথরুমে ঢোকেন, সন্ধ্যায় বেরিয়ে আসেন। সন্ধ্যায় মধ্যাহ্নাহার সেরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম। তারপরে বালাখানায় আসেন। ইয়ার-বক্সির দল তখন জুটে গেছে।

কিন্তু ছেলে ব'লে কথা!

জমিদারের ছেলে। গোঁফ বেরিয়েছে। এখনও সে হাত-খরচ নেয় না, সন্ধ্যায় মায়ের কাছে ব'সে গল্প করে, এ কি রকমের জমিদারপুত্র!

শিবচন্দ্রের জন্যে দয়াল উদ্বেগ বোধ করতে লাগলেন। লক্ষ্য করলেন, তার পোশাক নিতান্তই সাদাসিধা, সাধারণ গৃহস্থ-সন্তানের মত। অন্যান্য চাল-চলনও সেই রকম। মেজাজও জমিদার-নন্দনের মত মোটেই নয়। অত্যন্ত কৃপণ।

হেসে দয়াল বললেন, ছেলেটা মামাদের মত হচ্ছে।

মামারা ব্যবসাদার। বাগবাজারে চালের আড়ৎ আছে। সকলেই অত্যন্ত কৃপণ এবং অত্যন্ত বিনয়ী। দয়াল তাঁদের খুব ঘৃণা করতেন।

একমাত্র সন্তান অবিকল সেইরকম হচ্ছে দেখে তিনি মনে মনে শঙ্কিত হলেন। এটা ত ঠিক নয়। সকলেরই তার বংশের ঐতিহ্য রক্ষা করে চলা উচিত।

তিনি পুত্রের বিবাহ দিলেন।

ধনী ব্যবসায়ী বংশে নয়, বনেদী জমিদার বংশে। তাঁর নিজের বংশের মতই বনেদী এবং মেজাজী। অসামান্যা সুন্দরী একটি বধূ।

বৎসর যায়।

কিন্তু বংশের ঐতিহ্য-রক্ষায় শিবচন্দ্রের কোন আগ্রহ দেখা গেল না।

সকাল-বিকাল শিবচন্দ্র ঘোরেন। কোথায় ঘোরেন তা তিনিই জানেন। সন্ধ্যায় বাড়ী ফেরেন। খবর পাওয়া গেল, মাঝে মাঝে সেরেস্তায় বসেন, খাতাপত্র দেখেন।

দয়াল নিজে ও কাজটা কখনও করেন নি। হিসাব তাঁর কাছে বাঘ। তবু মনে মনে স্বীকার করলেন, ও কাজটা মন্দ নয়। কিন্তু জমিদারের ছেলের ওইটেই কি সব কাজ? তাকে জমিদারী চাল রপ্ত করতে হবে না?

ছেলেটা মামার বাড়ীর দিকে যাচ্ছে।

কি আর করা যাবে?

হঠাৎ একদিন তাঁর খেয়াল হ'ল, শিবচন্দ্রকে অনেকদিন যেন তিনি দেখেন নি।

খাবার সময় গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করলেন, শিবু কোথায় গেছে বল ত?

—কোথায় আবার যাবে?

—এখানেই আছে? কিন্তু অনেকদিন দেখি নি মনে হচ্ছে।

—তুমি কতটুকু সময় সজ্ঞানে থাক, যে দেখবে?

সেটা মিথ্যা কথা নয়। দয়াল চুপ ক'রে রইলেন।

কিন্তু কথাটা তাঁর মনের মধ্যে রইল। একদিন সরকারকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, শিবুবাবু এ পর্যন্ত তহবিল থেকে কত টাকা নিয়েছেন?

—আজ্ঞে, দশ হাজার।

দশ হাজার! দয়াল চমকে উঠলেন। অত টাকা! শিবচন্দ্র এই বয়সেই কি বাপের উপর গিয়েছে।

দয়ালের মনের ভাব সরকার বোধ হয় বুঝল। তাঁর আশঙ্কা অপনোদনের জন্যে বললে, একবারেই টাকাটা নিয়েছেন।

—একবারেই!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার হুকুম ছিল, উনি যা চাইবেন তা যেন দেওয়া হয়।

—তা ত ছিল। কিন্তু ছেলেমানুষ, একবারেই অত টাকা কেন নিচ্ছে!

—আজ্ঞে দোকান করবার জন্যে।

—দোকান!—দয়াল লাফিয়ে উঠলেন,—কিসের দোকান?

—আজ্ঞে তেলের।

—তেলের!

দয়াল ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে লাগলেন।

সরকার বললে, উনি বড়বাজারে একটা তেলের দোকান খুলেছেন। সকাল ন'টায় বেরিয়ে যান, রাত ন'টায় ফেরেন। আপনি জানেন না?

দয়াল তার আর উত্তর দিলেন না। বুঝলেন, শিবচন্দ্রকে অনেকদিন যে দেখেন নি, সে এই জন্যেই।

শিবচন্দ্র যে ব্যবসায়ে ঝুঁকলেন, তার পিছনে ছিলেন তাঁর মা। তিনি ব্যবসায়ীর ঘরের মেয়ে। জমিদার বাড়ীর ফাঁকা ঐশ্বর্য-বিলাস তাঁর ভাল লাগত না। তিনি নিজে সাদাসিধে ভাবে থাকা পছন্দ করতেন, ছেলেকেও সেইভাবে মানুষ করেছিলেন।

তাঁরই পরামর্শে শিবচন্দ্র জমিদারী সেরেস্তার কাজ-কর্ম দেখতে সুরু করেন।

কিছুদিন দেখার পর শিবচন্দ্র বুঝলেন, ভিতর অত্যন্ত দ্রুতবেগে ফাঁপা হয়ে আসছে।

ম্যানেজার বললেন, বাবুর অমিতব্যয়িতা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এরকম চললে, তাঁর জীবনকালটা হয়ত কোনমতে চলে যাবে। কিন্তু শিবচন্দ্রের জন্যে কিছু থাকবে না।

কি করা যায়?

বাবুর অমিতব্যয়িতা রোধ করার শক্তি কারও নেই। শিবচন্দ্রের মায়েরও না। ঋণ প্রচুর হয়েছে। তার সুদ ত আছেই, নতুন ঋণও বেড়ে চলেছে। অনেক সময় এক জায়গার ঋণ শোধ করতে অন্য জায়গায় ঋণ করার প্রয়োজন হয়।

—ঋণের পরিমাণ কত হবে?

—সাত-আট লাখের মত হবে।

কি সর্বনাশ!

মা বললেন, সর্বনাশ যা হবার তা ত হয়েছে। ও গর্ত কোনদিনই হয়ত বন্ধ করা যাবে না। এখন তুমি যাতে দুটো খেতে-পরতে পাও, তার উপায় দেখ।

—কি উপায়?

—ব্যবসা।

—কিসের ব্যবসা?

তা মা জানেন না। বললেন, ঘোর, খবর নাও কোন্ ব্যবসা তোমার সুবিধে হবে।

শিবচন্দ্র ঘুরতে লাগলেন। যত ঘোরেন, ততই বিস্ময় বাড়ে। কত রকমের ব্যবসাই না চলছে! সে সব ব্যবসার নামও তিনি কখনও শোনেন নি।

অবশেষে এই তেলের ব্যবসাটা তাঁর হাতে এল। একটা পুরণো গদি বিক্রি হচ্ছিল। শিবচন্দ্র কিনে নিলেন।

দয়াল সমস্ত দেনা পরিশোধ হওয়া দেখে যেতে অবশ্য

পারেন নি, কিন্তু ছোট-খাটো দেনাগুলো (যেগুলোর তাগাদার তীক্ষ্নতা বেশি) তাঁর জীবিতকালেই পরিশোধ হয়ে যায়। এবং মৃত্যুর পূর্বেই তিনি এই আশা নিয়ে যেতে পেরেছিলেন যে, হিসাবী পুত্র একে একে সব দেনাই শোধ করে ফেলবেন।

কিন্তু জমিদারপুত্রের এই হিসাবীপনা তিনি পছন্দ করেন নি। তাঁর সংস্কার ছিল, এই ধরনের ব্যবসায়িক হিসাবী-পনায় জমিদার-বংশের অমর্যাদা হয়।

ঋণের জ্বালায় শিবচন্দ্রের কাজের ও আচরণের তিনি অবশ্য প্রতিবাদ করেন নি। কিন্তু পুত্রের ব্যবসায়ের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিতেও তিনি প্রসন্ন হ'তে পারেন নি।

নিজের বিবাহের উপর তাঁর হাত ছিল না। বাপ নিতান্ত বালক-বয়সে ধনী ব্যবসায়ী বংশে তাঁর বিবাহ দিয়েছিলেন। তার ফলে পুত্র মাতুলক্রমঃ হয়ে গেল। পুত্রের বিবাহ সেই জন্যে তিনি জমিদার-বংশে দিলেন। এবং পৌত্রকে নিজের হাতে পুরাদস্তুর জমিদার ক'রে মানুষ করতে লাগলেন।

মহিমচন্দ্রের মেজাজ এবং বিলাস-ব্যসনে শিশুকাল থেকেই পাকা জমিদারী রঙের ছোপ পড়তে লাগল। শিবচন্দ্র দোকান নিয়ে ব্যস্ত। পুত্রের দিকে নজর দেবার তাঁর সময় ছিল না। মাঝে মাঝে, কিছু কিছু চোখে পড়লেও তিনি জানতেন এর পিছনে তাঁর বাবা রয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে কথা বলবার ক্ষমতা শিবচন্দ্রের ছিল না।

দয়ালের ইচ্ছা ছিল, সকাল-সকাল পৌত্রের বিবাহ দেন। কিন্তু যুগের হাওয়া ইতিমধ্যে অনেক বদলে গেছে। তাঁর গৃহিণীই এ বিষয়ে প্রবলভাবে বাধা দেন। সুতরাং ইচ্ছা সত্ত্বেও আর একটি জমিদার-বংশের দুহিতা পৌত্রের জন্যে আনা হয়ে উঠল না।

মহিমচন্দ্র বি. এ. পাস করার পর শিবচন্দ্র তাঁর বিবাহ দেন। এই বিবাহে বংশের রীতি বিসর্জন দিয়ে শিবচন্দ্র একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষিতা সুন্দরী মেয়েকে বধূরূপে নিয়ে এলেন।

সেই মেয়ে এই বৌরাণী মালতী।

মালতী কলেজে পড়ছিল।

দুপুরে কলেজ, সকাল-সন্ধ্যা পড়াশুনা, বিকেলে কোনদিন সঙ্গীত-চর্চা, কোনদিন বা সিনেমা-থিয়েটার,—এই ছিল তার দৈনন্দিন কর্মতালিকা।

পাড়ার একটি ছেলে মনোহর ডাক্তারী পড়ছিল। মালতীর দাদার বন্ধু। সেই সূত্রে এ বাড়ীতে মনোহরের যাওয়া-আসা ছিল। মালতীর সঙ্গে পরিচয়ও ছিল। সেই পরিচয় কখন ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়, দু'জনে টেরও পায় নি।

মনোহর বিকেলের দিকেই প্রায় আসত। সেটা মালতীর সঙ্গীত-চর্চার সময়।

এই রেডিও-গ্রামোফোনের যুগে, গান যখন পথে-পথে ছড়ান, কেউ শোনে কেউ শোনে না, সেই সময় বিকেলের দিকে মালতীর গান না শুনলে মনোহরের মনটা প্রসন্ন হ'ত না। অন্যদিকে গানের সময় মনোহর একটু উঁকি না দিলে মালতীরও কেমন ফাঁকা-ফাঁকা বোধ হ'ত।

অবস্থাটা ওরা দু'জন স্পষ্ট টের না পেলেও মালতীর মা যেন অনুমান করতে পেরেছিলেন।

কিন্তু তিনি বাধা দেন নি। বরং নানা ছুতায় ওদের মেলামেশার সুযোগ ঘটিয়ে দিতেন। মনোহরের মত স্বামী লাভ ত মালতীর পক্ষে ভাগ্যের কথা।

উভয়ের মধ্যে বিবাহের প্রস্তাবটা আরও কিছুদিন পরে উত্থাপন করলেন।

ভদ্রলোক ত অবাক্‌: তুমি কি পাগল হয়েছ?

—কেন?

—মনোহরের বাবাকে তুমি চেন না? ছেলের বিয়েতে ভদ্রলোক ছেলের আঁতুড়-খরচ থেকে ডাক্তারী পড়ানর খরচ পর্যন্ত সব উশুল ক'রে নেবেন। অত টাকা আমি কোথা পাব?

চোখ মটকে গৃহিণী বললেন, তা নাও লাগতে পারে। তুমি দেখ না একবার।

অর্থপিশাচ ব'লে মনোহরের বাবা এ পল্লীতে বিশেষ পরিচিত। গৃহিণীও তাঁর কথা অনেক শুনেছেন। কিন্তু তাঁর ভরসা মনোহরের বাপের উপর নয়, মনোহরের উপর।

কিন্তু পড়ুয়া-ছাত্র মনোহর পিতার উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। মালতীর বাবা গৃহিণীর নির্বন্ধাতিশয্যে কথাটা মনোহরের বাবার কাছে পাড়লেন। কিন্তু সুবিধা হ'ল না।

মনোহরের বাবা প্রস্তাবটা শুনে মুচকি হাসলেন: সে ত

অনেক টাকার ব্যাপার মশাই। আপনি কি হাজার বিশেক খরচ করতে পারবেন ?

মালতীর বাবার চোখ কপালে উঠল : বিশ হাজার !

—পাড়ার লোক, আপনাকে জানি ব'লেই কম ক'রে বললাম। আরও বেশিই পাওয়া যেতে পারে।

মুখ নিচু ক'রে মালতীর বাবা ফিরে এলেন।

কিন্তু মনোহর চুপি চুপি একদিন মালতীকে বললে, তোমার বাবাকে ব্যস্ত হ'তে নিষেধ কর। আমাকে ডাক্তারী পাস করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে দাও, তারপর দেখা যাবে।

এই আশ্বাসের উপর মালতীর মা অনেকখানি ভরসা করেছিলেন। হয়ত মালতীর বাবাও কিছুটা। ইতিমধ্যে লোকমুখে মালতীর রূপের এবং শিক্ষার কথা শুনে শিবচন্দ্র যখন নিজের পুত্রের সঙ্গে মালতীর বিবাহের প্রস্তাব করে পাঠালেন, সব উল্টে গেল।

কোথায় জমিদারপুত্র মহিমচন্দ্র আর কোথায় হবু-ডাক্তার মনোহর !

তার উপর একটি পয়সা দাবি নেই।

মালতীর মা-বাবা দু'জনেই তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেলেন।

মালতী ?

তার মতামত কেউ জিজ্ঞাসা করে নি, সে কোন মতামত দেয়ও নি। পারিবারিক আনন্দ-উল্লাসের মধ্যে তার মতামত কোথায় তলিয়ে গেল, তা সে নিজেও বুঝতে পারলে না।

মেয়েরা ঐশ্বর্য ভালবাসে। সম্ভবত শ্বশুরালয়ের ঐশ্বর্যের বিবরণে মালতীও মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

শ্বশুরবাড়ী এসে দেখলে, যে বিবরণ সে শুনেছে তা আসলের কিয়দংশ মাত্র। ঐশ্বর্য আরও বেশি।

প্রশস্ত দেউড়ি। তার ভিতর দিয়ে একটা হাতী যেতে পারে। তার দু'পাশে, নিচে দারোয়ানদের ঘর এবং দপ্তরখানা। উপরে আমলাদের থাকবার ঘর। ডানদিকে শ্বেতপাথরে বাঁধান, অসংখ্য কারুকার্য-খচিত ঠাকুরদালান। তার সামনে প্রশস্ত উঠান। তারপরে বালাখানা। তার পরে অন্দর। সমস্ত প্রচুর মূল্যবান্ বিলিতি আসবাবে সজ্জিত।

গৃহস্থঘরের মেয়ের তাক লেগে গেল।

তার উপর বিবাহের ধুমধাম। প্রতি সন্ধ্যায় নৃত্য-গীত, কিছু-না-কিছু। প্রতিদিন তার নতুন নতুন সজ্জা। হীরা-জহরৎ-সোনার ভারে সে চলতে পারে না, এমন অবস্থা। দাস-দাসী ছাড়াও বাড়ীতে অসংখ্য আত্মীয়-কুটুম্বের সমাবেশ।

মালতীর জীবনে সমস্তই অভিনব।

এ সমস্তের উপর কন্দর্পের মত রূপবান্ স্বামী। দিনরাত্রি তার স্বপ্নের মত কাটতে লাগল। তার পিতৃগৃহ এবং মনোহর দূরে মিলিয়ে গেল।

কোথায় এসে পড়ল সে ?

ঐশ্বর্য যে এমন অপরিমিত হ'তে পারে তার ধারণা ছিল না। এ বাড়ীর দাসীদের গায়ে যা গহনা, তার মায়ের গায়ে তত গহনা নেই। আর কী তাদের চাল-চলন !

গৃহস্থ-ঘরের মেয়ে-বৌ-এর নানা কাজকর্মের মধ্যে দিন কাটে। এখানে এই বিপুল ঐশ্বর্যের মধ্যে তার কর্মহীন দিনগুলোই বা কাটবে কি করে ?

মালতীর সন্দেহ হ'তে লাগল, সে বোধ হয় জেগে নেই। স্বপ্ন দেখছে ব'সে ব'সে। স্বপ্নের ঘোরেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। যা করছে, যা দেখছে, তার কিছুই সত্য নয়।

সমস্ত দিন স্বামীর সঙ্গে দেখা হয় না। সমস্ত দিন কোথায় তিনি থাকেন, কি করেন, মালতী জানে না। আসেন রাত্রি দশটার পর। আসামাত্র প্রকাণ্ড শয়নকক্ষ যেন একটা অপার্থিব রহস্যে ভ'রে যায়।

কাঁচা সোনার মত রং। দীর্ঘচ্ছন্দ কোমল দেহ। মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। মসৃণ মুখে ভ্রমরকৃষ্ণ গোঁফ এবং ঈষদারক্ত আয়ত চোখ।

অত্যন্ত মনোহর হাসি।

অল্প কথা, কিন্তু ভারি মিষ্টি কণ্ঠস্বর। মহিম যখন আদর করে, মালতী আত্মহারা হয়ে যায়।

এই ত স্বর্গ ! আর স্বর্গ কোথায় ?

বিবাহের এক বৎসরের মধ্যেই শিবচন্দ্র পরলোকগমন করেন। সংসারের দিক্ দিয়ে কিছু বোঝা গেল না। দীর্ঘকাল থেকেই সংসার গিন্নীমার হাতে। সুতরাং শিবচন্দ্রের মৃত্যুর পরেও তা বাঁধা রাস্তায় আগের মতই চলতে লাগল। বিষয়-সম্পত্তিও তিনিই দেখতেন। শিবচন্দ্র ব্যবসা নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। সুতরাং বিষয়-পরিচালনার দিক্ দিয়েও পরিবর্তনের চিহ্ন দেখা দিল না।

পরিবর্তন যা এল, তা মালতীর জীবনে।

যতদিন শিবচন্দ্র বেঁচে ছিলেন, মহিম সংযতভাবে চলবার চেষ্টা করত। শিবচন্দ্রকে সে ভয় করত। কিছু পরিমাণে মালতীকেও সমীহ করত এই জন্যে যে, শিবচন্দ্র মালতীকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন।

পিতার মৃত্যুর পর মহিমের রাশ ধীরে ধীরে শিথিল হ'তে লাগল।

গিন্নীমা খুব জবরদস্ত ছিলেন। খুবই তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী। কিন্তু একমাত্র পুত্রের সম্বন্ধে তাঁর অপরিসীম দুর্বলতা ছিল। মহিমের গতিবিধি সম্বন্ধে সমস্তই তিনি জানতেন। কিন্তু দুর্বলতাবশে কোনদিন তা কঠোরপ্রকৃতি স্বামীর কানে তোলেন নি।

তা ছাড়া দয়ালচন্দ্রকে তিনি দেখেছিলেন। পুত্রের বিলাস-ব্যসন সম্বন্ধে সেজন্যে তাঁর সহ্যশক্তি ছিল। মনকে তিনি এই ব'লে প্রবোধ দিতেন যে, একটি সুন্দরী বউ এলে দু'দিনেই সব ঠিক হয়ে যাবে। উঠ্‌তি বয়সে ধনীর দুলালদের অমন একটু-আধটু ধর্তব্যের মধ্যে নয়।

শিক্ষিতা, সুন্দরী স্ত্রীই এল। অলক্ষ্য থেকে গিন্নীমা লক্ষ্য করতে লাগলেন উভয়কেই।

মহিম কোনদিন সকাল-সকাল ফিরলে তিনি মনে মনে উল্লসিত হতেন: এইবার মহিমের পরিবর্তন হচ্ছে। কিন্তু পরের দিন আবার বিলম্ব হ'লে হতাশ হতেন। অনেক সময় মনে মনে তিনি মালতীর উপর ক্রুদ্ধ হতেন।

তাঁর মতে এ কাজ মালতীর। স্বামীকে সে বিপথ থেকে ফেরাতে পারছে না, কিরকম সুন্দরী এবং শিক্ষিতা সে!

সত্য কথা বলতে কি, শিবচন্দ্রের জীবিতকালে ব্যাপারটা সে বুঝতেই পারেনি, তার খাস দাসীও কোনদিন ঘৃণাক্ষরে তাকে বলে নি। বোধ হয় স্বয়ং গিন্নীমার নিষেধ ছিল। গিন্নীমার নিষেধ অমান্য করতে স্বয়ং শিবচন্দ্রও সাহস করতেন না, দাসী ত ছাড়।

সুতরাং স্বামীর সম্বন্ধে কোন সন্দেহই তার মনে উদিত হয় নি। প্রথম যেদিন টের পেলে, তার জীবনের সে একটা কঠিন দিন।

রাত্রি তখন কত হবে? এগারটা, কি বারটা।

অনেকগুলো চাকর পাঁজাকোলা ক'রে মহিমকে নিয়ে এল।

মালতী এ সময় প্রায়ই ঘুমিয়ে পড়ে। লোকজনের পায়ের শব্দে ধড়মড় ক'রে উঠে যে দৃশ্য দেখলে, তাতে ভয়ে তার বুকের রক্ত শুকিয়ে গেল।

সে চীৎকার করে উঠল। তার আশঙ্কা হ'ল, কোন একটা দুর্ঘটনায় মহিম অজ্ঞান হয়ে গেছে।

কিন্তু চাকরেরা নিশ্চিন্ত মনে তাকে বিছানায় শুইয়ে দিলে।

মালতী চীৎকার করে জিজ্ঞাসা করলে, কি ব্যাপার? কি হয়েছে? মাকে খবর দিয়েছ?

খাস ঝি মুচ্‌কি হেসে বললে, তাঁকে খবর দেবার কিছু নেই। চীৎকার করবেন না। একটু বেশি হয়ে গেছে।

—বেশি হয়ে গেছে! কি বেশি হয়ে গেছে?

—নেশা।

নেশা!

মালতীর সর্বদেহ ঝিম্ ঝিম্ ক'রে উঠল।

চাকরেরা পরিচর্যা করছে। খাস ঝি নানাপ্রকারে মালতীকে সান্ত্বনা দিয়ে চলেছে। কিন্তু মালতীর মাথার মধ্যে একটি প্রশ্ন অসংখ্য মৌমাছির মত গুঞ্জন করছে: নেশা! তার স্বামী নেশা করেন! সেই জন্যেই ফিরতে অত দেরি হয়! কি সর্বনাশ!

ক্রমশঃ

কুমুদিনী

শ্রীছায়া সাহা

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য রবীন্দ্রনাথের প্রিয় আর তারই রূপায়ণ ঘটেছে তাঁর 'যোগযোগ' উপন্যাসে। যোগাযোগের বিষয়বস্তু দাম্পত্যজীবনের ব্যর্থতা। কুমুদিনীই উপন্যাসের কেন্দ্র। কুমুদিনী প্রিয়া নয়, মাতা নয়, সে নারী। রবীন্দ্রনাথের প্রিয় চরিত্র এই কুমুদিনীর মধ্যে কবি তাই তাঁর প্রিয় বক্তব্য নারী-স্বাতন্ত্র্যকে উপস্থাপিত করেছেন। নারীকে তিনি পুরুষের পুরোভাগেও রাখেন নি, আবার অবহেলায় পশ্চাতেও ঠেলেন নি। নারীকে তিনি স্থান দিয়েছেন পুরুষের পার্শ্বে তার সহচরী রূপে, তার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে সমর্থন করে।

যুধিষ্ঠিরের নরকদর্শন মাত্র একবারের, কিন্তু পৃথিবীর হাজার হাজার মেয়ে নরকবাস করছে এমন একটা দাম্পত্য-সম্পর্ককে স্বীকার করে, যার মধ্যে ভালবাসা নেই, নেই পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা-বিশ্বাস। নারী যে শুধু পুরুষের হাতের খেলার পুতুল নয়, তার যে আত্মমর্যাদা আছে, স্বাতন্ত্র্য আছে, কবি বার বার তাকেই প্রকাশ করতে ব্যগ্র হয়েছেন। তাই দেখি, কুমুদিনী মাতা নয়, প্রিয়া নয়, সে নারী। 'শেষের কবিতা'র লাবণ্যের মত কুমু উচ্চশিক্ষিতা নয়, 'ঘরে-বাইরে'র বিমলার মত পুরুষের স্থূল আকর্ষণ তাকে টানতে পারে নি, 'চোখের বালি'র বিনোদিনীর মত পুরুষের মন নিয়ে খেলা করতেও সে রাজি নয়, 'নৌকা-ডুবি'র কমলার সরলতা থাকলেও কুমু তেজস্বিনী, 'গোরা'র সুচরিতার আত্ম-সমর্পণ থাকলেও কুমু অন্যভাবে গড়া। কুমু অত্যন্ত স্পর্শচেতন।

বিবাহ সম্বন্ধে কুমুর আদর্শ কুমারসম্ভবের শিব-পার্বতী। মধুসূদনের বেশী বয়স ও কুরূপ সত্ত্বেও সে বলেছিল—"যাঁর কথা বলছ, নিশ্চয়ই তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ঠিক হয়েই আছে।"

সম্পূর্ণ প্রাচীন অন্ধ-সংস্কারের উপর এই মনোভাবের ভিত্তি। বিপ্রদাসের স্নেহচ্ছায়ায় একটি পতনোন্মুখ ধনী পরিবারের নির্জন অন্তঃপুরে সে পালিত। বংশের দুর্গতির জন্য নিজেকে দোষী মনে ক'রে কুমু আপনার কাছে সঙ্কুচিত। কিন্তু স্বামীর কাছে কখনো সে নিজেকে সঙ্কুচিত করতে প্রস্তুত নয়। ওস্তাদ বীণকারের স্পর্শে বীণার মত সহজ সুরে বাজতে চেয়েছিল কুমুদিনী। কিন্তু বর্বর মধুসূদনের হাতে সে বীণা বাজল না। মধুসূদন শুধু হুকুম করতেই শিখেছে, ভালবাসতে নয়। কুমু হুকুম মানতে প্রস্তুত, কিন্তু হুকুমওয়ালার কাছে ধরা দিতে নয়। কুমু একদিন মধুসূদনকে বলেছিল :

"তুমি আমাকে অপমান করতে চাও? হার মানতে হবে। তোমার অপমান মনের মধ্যে নেব না।"

কুমু চায় স্বাতন্ত্র্য। শ্রদ্ধাহীন আত্মসমর্পণে তার অসীম ঘৃণা। তাই এত সমস্যা, তাই এত বেদনা। মধুসূদনের সঙ্গে কুমুদিনীর তাই যথার্থ অ-সবর্ণ বিবাহ। এরা দু'জাতের মানুষ। বিভিন্ন কালচারের স্তরে এরা পালিত। স্ত্রীকে শ্রদ্ধার সঙ্গে, সংযমের সঙ্গে গ্রহণের শক্তি ছিল না মধুসূদনের। সে চায় স্ত্রীকে ভোগের সামগ্রী রূপে।

'সহধর্মিণী' শব্দ তার একেবারেই অজ্ঞাত। কুমু যদি সাধারণ উপাদানে গঠিত হত তবে সকল অপমানকে মেনে নিয়ে, আত্ম-স্বাতন্ত্র্যকে বিসর্জন দিয়ে, আপনাকে স্বামীগৃহের তৈজসপত্রের, ঐশ্বর্যের একটি উপাদান মনে করেই সহজ সুখে আত্মসমর্পণ করতে পারত। মধুসূদন বাস করে আয়নার ঘরে। তাই নিজেকে ছাড়া আর কাউকেই সে দেখতে পায় না। এই অতি আত্মকেন্দ্রিক পুরুষকে কোন তেজোদীপ্ত আত্ম-স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী মেয়ে ভালবাসতে, এমন কি মেনে নিতেও পারে না। তাই কুমুর অসন্তোষ এ উপন্যাসে বিদ্রোহে ও বলিষ্ঠ প্রত্যা-খ্যানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কুমুর মনের অব্যক্ত উক্তি :

নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার—হে বিধাতা!

কুমুর আভিজাত্যে দুঃখ সহ্য করার শিক্ষা আছে, অপমানকে মেনে নেবার কোন শিক্ষা নেই। কুমু বলছে তার দাদাকে :

"মিথ্যে হয়ে মিথ্যের মধ্যে থাকতে পারবো না। আমি ওদের বড়বৌ, তার কি কোন মানে আছে যদি আমি কুমু না হই ?"

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে বলি দিয়ে কুমু যদি শ্বশুরবাড়ী থাকতে রাজি হ'ত, তবে সেই স্বীকৃতির দ্বারা কুমু আত্মঘাতিনী হ'ত।

মানুষের স্বাতন্ত্র্যের পবিত্রতাকে শ্রদ্ধা করতেন রবীন্দ্রনাথ। তাই দেখি বিপ্রদাস বলছে কুমুকে :

'কুমু, অপমান সহ্য করে যাওয়া শক্ত নয়। কিন্তু সহ্য করা অন্যায়।'

কুমু বলছে : 'আমার ভয় হচ্ছে, আজকেকার এই সব কথাবার্ত্তায় তোমার শরীর আরও দুর্বল হয়ে যাবে।'

'না কুমু, ঠিক তার উল্টো। এতদিন দুঃখের অবসাদে শরীরটা যেন এলিয়ে পড়েছিল। আজ আমার মন বলছে, জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত লড়াই করতে হবে, আমার শরীরের ভিতর থেকে শক্তি আসছে।'

'কিসের লড়াই দাদা ?'

'যে সমাজ নারীকে তার মূল্য দিতে এত বেশী ফাঁকি দিয়েছে তার সঙ্গে লড়াই।'

রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে সংগ্রামের আহ্বান। বিপ্রদাস এক জায়গায় বলছে কুমুকে : 'মেয়েদের অপমানের দুঃখ আমার বুকের ভিতর জমা হয়ে আছে।'

ভালবাসার বন্ধন ছাড়া অন্য যে কোন বন্ধনই কারাগার। অন্তরে যদি ভালবাসার আলোক না থাকে, তবে পুরোহিতের মন্ত্রের কি মূল্য থাকতে পারে ? কুমুরও মধুসূদনের বাড়ীতে কোন স্বাধীনতা নেই। যেখানে স্বাতন্ত্র্য নেই, সম্মান নেই, সেখানেই ত নরক। বোনকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাতে বিপ্রদাসের তাই এত আপত্তি। দাদা বলছে বোনকে :

'আজ যেখানে তোর স্বাতন্ত্র্য কেউ বুঝবে না, সম্মান করবে না, সেখানে যে তোর নরক। আমি কোন্ প্রাণে তোকে সেখানে নির্বাসিত করবো ?'

Ibsen-র A Doll's House নাটকের নায়িকা নোরাও কুমুর মতই স্বামীর কাছে একটা মূল্যবান্ খেলনার অতিরিক্ত আর কিছুই নয়। নোরা আপন স্বাতন্ত্র্যে যেদিন জাগ্রত হয়ে উঠল, তার পর মুহূর্ত থেকেই আর সেখানে থাকার অপমানকে সহ্য করতে পারল না।

নোরা বলছে হেল্‌মারকে :

But our home has been nothing but a play-room. I have been your doll-wife, just as, at home, I was papa's doll-child, and here the children have been my dolls.

খেলাঘর ভেঙে দিয়ে নোরা যখন পথে পা বাড়াতে যাচ্ছে, তখন সন্ত্রস্ত স্বামী প্রশ্ন করছে :

Before all else you are wife and mother.

মোক্ষম উত্তর দিয়েছে বিদ্রোহিনী স্ত্রী :

That I no longer believe. I believe that before all else, I am a human-being. Just as much as you are, or at least I should try to become one.

স্বামী বলল—নোরা, নোরা, এখন নয়। কাল পর্যন্ত অপেক্ষা কর। কিন্তু নোরা সেকথা কানে নিল না। বলল :

I can't spend the night in a strangeman's room.

কোন আত্মমর্যাদাবোধ-সম্পন্না ভদ্রমহিলাই কোন অপরিচিত পুরুষের গৃহে রাত্রিবাস করতে পারে না। চ'লে যাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছে নোরা। এই নাটকীয় মুহূর্তটিতে নোরার অন্তরের পুঞ্জিত ক্ষোভ এবং আত্মগ্লানি কি মোক্ষম ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে।

Travold, it was then it downed me that for eight years, I had been living here with a strangeman, and had borne him three children—oh, I can't bear to think of it! I could tear myself into little bits!

নোরার মত উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য কুমুর না থাকলেও সে নোরার মতই বলে উঠল, 'আমি ওদের বড়বৌ, তার কি কোন মানে আছে, যদি আমি কুমু না হই ?'

মধুসূদনের সন্তান কুমুর গর্ভে এসেছে, নারীজীবনের এত বড় একটা ব্যাপার কুমুকে কোন আনন্দই দিতে পারল না।

'মধুসূদনের সঙ্গে ওর রক্তমাংসের বন্ধন অবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, তার বীভৎসতা ওকে বিষম পীড়া দিল।'

যে মেয়ের মনের মধ্যে সুতীব্র আত্মমর্যাদাবোধ আছে, শিক্ষা ও সংস্কৃতি যার বৌদ্ধিক জীবনকে উজ্জ্বল ক'রে তুলেছে, সে কখনও একটা ইতর স্বামীকে ভালবাসতে পারে? কুমুর দেওয়া বরমাল্য পরেও তাই মধুসূদন তার কাছে Strange-man।

"মধুসূদনের মধ্যে এমন কিছু আছে যা কুমুকে কেবল যে আঘাত করেছে, তা নয়, ওকে গভীর লজ্জা দিয়েছে। ওর মনে হয়েছে সেটা অশ্লীল।"

তাই কুমুকে নিতে এসে মধুসূদন যখন বলল:

'শূন্যঘর কি ভালো লাগে?'

তখন দৃঢ়তার সঙ্গে কুমু জবাব দিয়েছে:

'আমি যাব না।'

বিপ্রদাস বলছে কুমুকে: 'তুই যদি অন্য মেয়ের মত হতিস্, তা হ'লে কোথাও তোর ঠেকত না। আজ যেখানে তোর স্বাতন্ত্র্যকে কেউ বুঝবে না, সম্মান করবে না, সেখানে যে তোর নরক।'

তাই কুমু আপনার মাঝেই আপনাকে অনুসন্ধান করে বিদ্রোহী হয়েছে। 'ঘরে বাইরে'র বিমলা যা করতে সাহস করল না, 'যোগাযোগে'র কুমুদিনী আপন নারীত্বের প্রতিষ্ঠাকল্পে তাতেই অগ্রসর হল।

বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য নারী-চরিত্রের সঙ্গে কুমুর পার্থক্য তার উক্তি থেকেই অনুভূত হয়। সে বলছে:

'জানি, স্বামীকে এই যে শ্রদ্ধার সঙ্গে আত্মসমর্পণ করতে পারছি নে, এ আমার মহাপাপ। কিন্তু সে পাপেও আমার তেমন ভয় হচ্ছে না, যেমন হচ্ছে শ্রদ্ধাহীন আত্ম-মর্য্যাদার গ্লানির কথা মনে করে।'

কিন্তু ঘটনাস্রোত হঠাৎ অবরুদ্ধ হয়ে গেল কুমু অন্তঃসত্ত্বা হওয়ায়। সেই মুহূর্ত থেকেই পিতৃ-কেন্দ্রিক সমাজতন্ত্রে নারীর সমস্যা জটিল হয়ে পড়েছে, সমস্ত দাবি গিয়ে পড়ল নারীর উপর—কারণ, ভাবী সন্তানের অধিকারী পিতা।

এই সমস্যার মুখেই উপন্যাসের উপসংহার। বিদ্রোহী নারীকে স্বামীগৃহে, মধুসূদন-শ্যামার অশুচি সংসারে ফিরতে হ'ল। কারণ তার আর কোন গতি নেই। হয়ত ক্ষুব্ধ নারীর মনে এই প্রশ্ন উঠেছিল:

শুধু শূন্যে চেয়ে রবো,
কেন নিজে নাহি লব চিনে
সার্থকের পথ?

কিন্তু নোরার মত গৃহত্যাগের শক্তি কুমুর নেই। প্রাচীন ধারায় শিক্ষিত মেয়ে আধুনিক যুগে অত্যন্ত অসহায়; তারপর গর্ভে যখন তার সন্তান। তাই কুমু বলছে তার দাদা বিপ্রদাসকে:

'দাদা, সেইদিন তুমি আমাকেও স্বাধীন করে নিও। ততদিনে ওদের ছেলেকে আমি ওদের হাতে দিয়ে যাব। এমন কিছু আছে, যা ছেলের জন্যেও খোওয়ানো যায় না।'

অসুস্থ দাদাকে রেখে কুমু চলে গেল তার নির্বাসনে। "কালু তবু রইল বসে। দাদার ঘরে আজ কুমু নেই, এ-শূন্যতা তার বুকে চেপে রইল। হঠাৎ শুনতে পেল বিছানার নিচে টম কুকুরটা গুমরে গুমরে কেঁদে উঠল। কুমুকে সে চলে যেতে দেখেছে, কী একটা বুঝেছে, ভাল করে বোঝাতে পারছে না।"

কুমুর জন্যে এ কান্না আমাদের সকলেরই। এ ত শুধু তার একার কান্না নয়, এ-যে বাংলা দেশের ঘরে ঘরে বিবাহ-মন্ত্রে বন্দিনী নিরুপায় নারীর ক্রন্দন। আধুনিক কালের সবলা স্বাধীনা নারীর মুক্তজীবনের সূত্রপাত করে গেছে কুমু। কুমুদিনী তাই বাংলা-সাহিত্যে অনন্যা—অপরূপা।

———



স্নেহের ঋণ

শ্রীভৈরবলাল রায়

স্মৃতির পাঁচন চাপিয়ে দিয়ে ব'সে আছি। খানিকটা বাদেই দেখি, সেটা বেশ সু-তার হয়েছে। সেটাকে নামিয়ে নিয়ে খানিকটা ঠাণ্ডা করে অল্প একটু আস্বাদ নিয়ে বুঝলাম কষায় এবং তিক্ত স্বাদ। অম্লমধুরের কোন সম্বন্ধই নেই। সামান্য মাইনের চাকরি করি তাই ঋণের পরিমাণ বেশ লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চলেছে। সেই জন্যই কি স্মৃতির পাঁচনটায় তিক্ত এবং কষায়ের এত আধিক্য? তাই বা হবে কি করে? উত্তমর্ণ ত আমায় ভালবেসে ধার দেয় নি—সে দু' টাকা দিয়েছে, পাঁচ টাকা আদায় করেছে, আরও চাইছে। এর মধ্যে স্নেহ, দয়া, মায়া, অনুকম্পার ত কোন স্থান নেই। তা হ'লে আমার এত কুণ্ঠা কেন? বোকারা চিরকালই ভয় পায়। উত্তমর্ণ আমার মতন আরও পাঁচজন বোকাকে চক্রবৃদ্ধি হারে ধার দিয়ে পরে সীতারাম কিংবা হনুমানজির মন্দির বানিয়ে দেবে। দাতা ব'লে তাদের নাম ছড়িয়ে পড়বে। আর আমার মত সাধারণ বাঙ্গালী কেরাণীর কি হবে? কেন—ঋণের বোঝা পুত্র-কন্যাদের মাথায় চাপিয়ে অজানা দেশে পাড়ি জমাবে, স্ত্রীকে কাঁদাবে, ছেলেমেয়ে-দের পথে বসাবে, আর কি। আমার মৃত্যুর পর যারা আমার ভেতরের খবর সম্পূর্ণ জানে না তারা বলবে—অতগুলো টাকা ধার ক'রে সব হজম করে দিল হ্যা! আর একজন হয়ত মুচ্‌কি হেসে বলবে, তুমি ত্‌ জান না ভায়া, ওর বাবাও য্যা·········এই নিয়ে আক্ষেপ ক'রে লাভ নেই, কারণ এই রকমই হ'ল সাধারণ বাঙ্গালী কেরাণী-জীবনের ইতিবৃত্ত।

তা হ'লে কি আমার জীবনে কোথাও অম্লমধুর রস মিলবে না? এও কি সম্ভব? এই ব'লে স্মৃতির পাঁচনের কড়াইটা আবার চাপিয়ে দিলাম। দেখি আগুনটা নিভে এসেছে। তাই আগুনটা একটু উস্কে দিয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইলাম। টগ্‌বগ্‌ ক'রে পাঁচনটা ফুটতে থাকল। আস্বাদ না করেই বুঝলাম, অম্লমধুর গন্ধ বেরিয়েছে। পাঁচনটা নামিয়ে ফেললাম—মনের অন্দর-মহলে চ'লে গেলাম। দেখি, স্মৃতির মণিকোঠার দরজাগুলোয় মরচে-পড়া তালা ঝুলছে। এইগুলো খোলবার চাবি বহুদিন হ'ল হারিয়ে ফেলেছি। একটু ঠেলাঠেলি দিতেই কয়েকটা ঘরের তালা আপনি ভেঙ্গে গেল। দোরগুলো ক্যাঁচ-কুচ শব্দ করে উন্মুক্ত হ'ল। যা দেখলাম তাতে অবাক্ না হয়ে পারলাম না। যে ক'টা ঘর খুলেছে সবই অন্ধকার। চামচিকে ছুঁচো আর আবর্জনা ছাড়া ঘরে কিছু আছে ব'লে বোধ হ'ল না। হতাশ হয়ে ফিরে আসছি, হঠাৎ কোণে ছোট একটি ঘর নজরে পড়ে গেল—তাতেও তালা ঝুলছে। একটা অনুসন্ধিৎসু ভাব দেখা দিল। থাকতে পারলাম না। আগেকার প্রক্রিয়ায় ঘরটা খুলে ফেললাম। দেখি, অন্ধকারে কি একটা ঝক্‌ঝক্ করে জ্বলছে—হীরে নয়ত? মনটা ধক্ করে উঠল। পরমুহূর্তে ভাবলাম—গরীবের আবার হীরে? হীরে না হোক কাঁচ ত বটে, তাই বা এল কি করে? মনের অন্দরমহল থেকে সদরে চ'লে এলাম।

আমার একটু ডায়রী লেখার বাতিক ছিল। তবে এখন আর লিখি না, কারণ লেখার মত আর কিছু খুঁজে পাই না। শুধু অফিস যাওয়া আর আসা। তবে মাঝে মাঝে যে ঝুনঝুনওয়ালাদের কাছে যাই না এই বললে সত্যের অপলাপ হবে। নিয়মের নিগড়ে একেবারে বাঁধা। শিকলি কাটলে তবে না লেখা। হাতীটা যখন সুবোধ শিশুর মত দর্শকদের নিয়ে ঘুরে বেড়ায় তখন তার খবর কাগজে ওঠে না, তার ছবিও ছাপা হয় না। কিন্তু যেদিন নিয়ম ভেঙ্গে হঠাৎ তার মাহুতটাকে মেরে ফেলে, অমনি তার কথা খবরের কাগজে উঠে যায়, তার ছবিটা বেরয় কাগজের প্রথম পাতায়। মানুষের বেলায়ও তাই। সাধারণ মানুষ মেষেরই মতন। কিন্তু এর মধ্যেই দু' একটা মানুষ দৈবাৎ পরিচয় দিয়ে ফেলে যে, সে মেষ নয়, মানুষ। অমনি পাঁচজন তার স্তাবক হয়ে ওঠে; হাজারটা চোখ এসে তার ওপর পড়ে। আর সব মানুষকে সে তখন হুঙ্কার ছেড়ে বলে ওঠে—চলে এস নিয়মের খাঁচার বাইরে তবে ত পৃথিবীটাকে দেখতে পাবে। মিথ্যাকে আঘাত হান, তবে ত সত্যের পরিচয় মিলবে। এতদিনের অনাদৃত বস্তুর ওপর দৃষ্টি ফেরাও তবে ত শিবকে দেখবে, সুন্দরকে আহ্বান জানাও—

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, তবে ত সুন্দরের সম্যক্ পরিচয় লাভ করবে।

আমি ডায়রী দেখতে লাগলাম, নিয়ম ভাঙ্গার কোন হদিস মেলে কি না। পাতার পর পাতা উল্টে চলেছি—না, সব জায়গায় নিত্য-নৈমিত্তিকের হুড়োহুড়ি, ঋণের বাড়াবাড়ি আর স্ত্রীর তাড়াতাড়ি ছাড়া কিছু খুঁজে পাচ্ছি না। তবুও আশা রেখে পাতা উল্টে চলেছিলাম। হঠাৎ দেখি এক জায়গায় লেখা আছে—মিশিরলাল আমাদের বহুদিনের পুরাণ চাকর। এরপর আর পড়তে পারা যাচ্ছিল না। ডায়রীটা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ ব'সে ব'সে ভাবলাম, মিশিরলালের কথা যতদূর স্মরণ হয় তাতে মনে হয় সে ত নিয়ম নয়—নিয়মের ব্যতিক্রম। আর লেখাটা ঠিক পড়তে পারছিলাম না, তবু হতাশ হই নি। ডায়রীটা আলোর কাছে নিয়ে গিয়ে চশমার কাঁচ বেশ করে দু'চার বার মুছে নিয়ে দেখলাম অল্প অল্প পড়তে পারা যাচ্ছে। তাই হোঁচট খেতে খেতে জোরে জোরে পড়া আরম্ভ করেছিলাম।—মিশিরলাল আমাদের বহু দিনের পুরাণ চাকর। তার মুখে শুনেছি তার দেশ দারভাঙ্গা এবং জাতিতে সে কুর্মি ছিল। যৌবনে সকলেরই হয়ত কবিত্ব করবার ইচ্ছা জাগে কিন্তু সকলের প্রকাশ করবার ক্ষমতা থাকে না। আমার হয়ত সামান্য ছিল তারই জোরে লিখে ফেলেছিলাম—স্নেহ মানুষকে জাত ভোলাতে পারে—উচ্চ-নিচের পার্থক্য ঘুচিয়ে দিতে পারে, এমন কি স্থান কাল পাত্রেরও ব্যবধান ঘুচিয়ে দিতে সক্ষম। এই রকমই কাব্যে পড়েছি এবং লোকের কাছে শুনেছি তবে স্নেহের যে এমন মোহিনী-শক্তি আছে, খানিকটা বয়ঃবৃদ্ধির পর মিশিরলালকে দেখে বুঝেছিলাম। সে আমার ছেলেমেয়েদের অত্যধিক স্নেহ করত, বিশেষ করে আমার মেয়েকে। বাইরের লোক মিশিরলালের ভালবাসার আধিক্যের বহিঃপ্রকাশ দেখে অনুযোগ করে বলেছে, অতটা ভাল নয়। দেখ, তোমাদের এতে প্রথম সন্তানের অকল্যাণ হবে। আমরা ভেবেছি, হায়রে, স্নেহ যদি অকল্যাণ নিয়ে আসে ত নিয়ে আসুক। আমরা চাই না নিরস, পণ্ডিতমশাইয়ের কতকগুলো সংস্কৃত শব্দ সমাবেশে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন।

একদিন দেখি, মিশিরলাল একটা ছেঁড়া কাপড় পরে তাতে পাঁচ-সাতটা গেরো দিয়ে এসে উপস্থিত। আমি অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করলাম—এ কি মিশিরলাল, তুমি এ কি বেশে এসে উপস্থিত হ'লে? এটা কি তোমার উচিত হচ্ছে, একটা ভাল কাপড় পরে এস গিয়ে। মিশির-লাল আমাকে পেয়ারে ব'লে ডাকত, সে বললে, পেয়ারে, সে কি হ'তে পারে। আমি বলি, কেন? তার উত্তরে সে যা বললে তাতে আশ্চর্যবোধ না করে উপায় নেই। সে বললে, তার দাদুরা কি নিয়ে খেলা করবে—এই বলে কাপড়ের গেরোগুলো দেখিয়ে সে কি খিল্ খিল্ করে হাসি। আমি হয়ত মনে মনে রেগেছি এই ভেবে যে, এটা মিশিরলালের বাড়াবাড়ি। কারণ সে চাকর বই ত আর কিছু নয়। তার পরেই ভেবেছি কবিরা ত আমাদের মত সাধারণ কথা নিয়েই কারবার করেন, কিন্তু এরই সাহায্যে কখনও কখনও কোন কবি এমন কাব্য সৃষ্টি করে ফেলেন, যা কালজয়ী। তা আর সাধারণ থাকে না, সেটা ওঠে গিয়ে অসাধারণ স্তরে। মিশিরলাল সাধারণ চাকর বটে কিন্তু সব চাকরই ত সব মনিবকে ভালবাসে না—তাই মালিকও হয়ত চান চাকরের সঙ্গে মালিক-ভৃত্য সম্বন্ধ বজায় রাখতে।

ভালবাসা কখন যে মানুষের মনে একমুঠো আবির ছড়িয়ে দিয়ে সাদাকে লাল ক'রে তোলে, তা বলা খুবই শক্ত। সে বহুদিনের কথা—আমি তখন দেশের বাড়ীতে। ছুটি ফুরিয়ে এসেছে তাই দু'একদিনের মধ্যেই পাড়ি জমাতে হবে বিদেশে, কর্ম্মস্থানে। মিশির-লালকে ডেকে বললাম, মিশিরলাল তুমি হয় তোমার দেশে চলে যাও, নয় আমাদের সঙ্গে চল। আমার প্রথম কথার উত্তরে সে বলেছিল, আমার আবার দেশ কোথায় আছে—তুহারাই সব আপনার জন আছে। আমি বললাম, তা হ'লে আমাদের সঙ্গে চল। বলেছিল যাব কিন্তু পরে। আগে তুহাদের সব ঠিক-ঠর হয়ে যাক্। সে আরও বলেছিল, আমাদের সঙ্গে সে এখন যাচ্ছে না বটে কিন্তু আমাদের জন্য তার মন খুব খারাপ থাকবে, বিশেষ করে আমার মেয়ে "পুতলাদিদির" জন্য (আমার মেয়েকে মিশিরলাল আদর ক'রে পুতলা ব'লে ডাকত)। পুতলাদিদিকে কোলে ক'রে নিয়ে তার হাতে কি যেন একটা দিয়েছিল, পরে শুনেছিলাম বহুদিন আগে তার দেশ থেকে আনা বাঁশের রঙ-করা একটা ছোট চুপড়ি। আরও শুনেছিলাম যে পুতলাদিদির কানে কানে বলেছিল, বড় হয়ে তুমি এতে ফল রাখবে, মিষ্টি রাখবে। হ্যাঁ, তোমার পুতুলের রঙিন কাপড়-জামাও রাখতে ভুলো না যেন। তুমি বড় হয়ে যদি এই রঙকরা চুপড়িটা দেখ তা হ'লে আমার কথাটা তোমার "ইয়াদ" হবে। আমার স্ত্রীকে বলেছিল, তিনি যেন তাঁর শরীরের দিকে দৃষ্টি রাখেন। আমার শরীরের প্রতিও যেন তাঁর প্রখর নজর থাকে। তার পর আর কিছু সে বলতে পারে নি, কারণ, বাষ্পে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল—আমাদের

গাড়ি ছেড়ে দিল, আমরা স্টেশনের দিকে রওনা হলাম।

এখন আমার মেয়ে বেশ বড় হয়েছে। সে বিদেশে মিশনারী স্কুলে পড়ে। তাই কবে তার অজ্ঞাতে পুতুলের দেশ ছেড়ে কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ, সেক্সিপিয়ারের রাজত্বের দিকে পা বাড়িয়েছে। সেইজন্যে তাদের আদরের দাদু মিশির ভাইয়ের দেওয়া সে রঙ-করা চুপড়িটার কথা মনে না থাকা খুব অস্বাভাবিক নয়। আমি কিন্তু একদিন আমার স্ত্রীকে বলেছিলাম বলে মনে হয়—দেখ, ঐ চুপড়িটা ভাল করে রেখে দিও। এর উত্তরে আমার স্ত্রী কি বলেছিলেন তা আমার ঠিক মনে নেই। একদিন দেখি হঠাৎ মিশিরলাল তার ছেলের হাত ধ'রে আমার কর্মস্থলে এসে উপস্থিত! আমরা সবাই একসঙ্গে জিজ্ঞেস করে উঠলাম—মিশিরলাল, এটি তোমার ছেলে বুঝি? সে বললে, হ্যাঁ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হঠাৎ ওকে নিয়ে এলে যে? মিশিরলাল বললে, আমাদের দেশের বাড়ীতে তার ছেলে এসে উপস্থিত। ওদের বাড়ীঘর নিয়ে কি একটা গোলযোগ উপস্থিত হয়েছে আর ওর মায়েরও নাকি শরীর ভাল নেই। তাই তার ছেলে দেশে নিয়ে যেতে এসেছে তার বাবাকে। কিন্তু মিশিরলাল কি আমাদের সঙ্গে দেখা না করে যেতে পারে? তার ইচ্ছে আমাদের সঙ্গে দেখা করে ছেলেকে নিয়ে এখান থেকে দেশে ফিরবে। একটি বালক থাকলেই আর একটি বালকের সঙ্গে হুড়োহুড়ি দৌড়াদৌড়ি করা কিছু অস্বাভাবিক নয়। দুই-একদিনের মধ্যেই মিশিরলালের ছেলে আমার ছেলেদের সঙ্গে বেশ দৌরাত্মপনা আরম্ভ করেছিল। মিশিরলালের সে কি উৎকণ্ঠা। বারবার তার ছেলেকে ডেকে বলে—তুই বড় বোকা, তুই হুড়োহুড়ি করতে গিয়ে ওদের ফেলে দিবি, তুই আমার কাছে চুপটি ক'রে ব'সে থাক্। কিন্তু কে কার কথা শোনে। মিশিরলাল দুই-একদিনের মধ্যেই তার ছেলেকে দেশে নিয়ে চ'লে গেল। এর পর মিশিরলালের খবর রাখার বড় বেশী সুযোগ আমার মেলে নি। হঠাৎ দেশের বাড়ী থেকে একটা চিঠি এসে উপস্থিত যে মিশিরলাল কয়েকদিন হ'ল দেশ থেকে অসুস্থ শরীর নিয়ে ফিরে এসেছে। আমি ভাবলাম, এ কি উৎপাত, সে যখন অসুস্থ, তখন দেশ থেকে আসার কি দরকার ছিল—বুড়ো হয়েছে, কখন কি হয় বলা যায় না। যাই হোক্, যথা সময়ে এই খবরটি আমায় স্ত্রীকে জানাতে ভুললাম না। তিনি বললেন, তুমি কিছু ভেব না, আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। অকস্মাৎ দেখি মিশিরলাল একদিন হাঁপাতে হাঁপাতে এসে উপস্থিত। আমার ছেলে-মেয়েরা কিন্তু মিশিরলালকে দেখে হাতে স্বর্গ পেল। তাকে ঘিরে সবাই প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলেছে।—আমার এক ছেলে তাকে জিজ্ঞেস করল, মিশির ভাই, তুমি আম এনেছ দেখছি, এটা কোন্ গাছের আম? মিশিরলাল বলে, কেন, সেই যে পুকুরের উত্তর-দক্ষিণ কোণে যে গাছটায় তুমি জল ঢেলেছিলে আর আমি পুতলাদিদির ছোট ছোট হাত দিয়ে যে গাছটা পুতে দিয়েছিলাম। আমার ছেলেদের এবং মেয়ের সেই গাছটার কথা স্মরণ থাকতেই পারে না তবুও তারা হাততালি দিয়ে বলে, কি মজা, কি মজা। হঠাৎ তাদের মা ধমকে ওঠেন, বুড়ো মানুষটাকে নিয়ে এ কি তোমরা করছ? তার পর আমার মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, হ্যাঁরে, তোর মিশিরভাইকে একটু বাতাস কর্ না। মিশিরলাল একটু লজ্জিত হ'ল তবুও একটু হেসে উত্তর দেয়, "হামাকে আর বাসাত করতে হবে না, আউর হামরা হোলাম গিয়ে নোকর চাকর আদমী, হামাদের আবার কষ্ট।" আনন্দ একটা সংক্রামক ব্যাধিবিশেষ; বিশেষ করে আমার মত এক দরিদ্র কেরাণীর জীবনে ও বস্তুটা দুর্লভ বললেই হয়। কখন যে আমায় আনন্দের ছোঁয়াচ লেগেছে তা বুঝতেও পারি নি। তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও হঠাৎ বলে ফেললাম, আচ্ছা মিশিরলাল, তুমি যে আমায় বলেছিলে আমি নাকি ছেলেবেলায় রেগে গিয়ে তোমার পিঠে কামড়ে দিয়েছিলাম, সে কথা মনে আছে? মিশিরলাল শুধু হাসে, হঠাৎ দেখি তার ফতুয়া তুলে ফেলেছে, আর হাত দিয়ে আমার স্ত্রীকে ডাকছে। আমি বললাম, যাও, গিয়ে দেখ কিছু দেখতে পাও কি না। অমুকবাবু এখন শান্ত কেরাণী কিন্তু আমিও একদিন দুষ্টু ছিলাম, সে খবরটা না হয় জেনেই রাখ। আমার স্ত্রী গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে নিরীক্ষণ করে মিশিরলালের পিঠে কি দেখলেন তিনিই জানেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি দেখলে—? তিনি বললেন, কয়েকটা দাগ দেখলাম বটে, তবে দাঁতের কামড় বলে মনে হ'ল না। আমি বললাম, তা হ'লে আমার সুবোধ নামটা ঘুচল না, কি বল? ব'লে একটু হাসবার চেষ্টা করলাম কিন্তু হাসি থামিয়ে দিতে হ'ল কারণ স্ত্রী হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন। আমার স্ত্রী বললেন, মিশিরলাল এতদিন ধরে কাজ করল, এবার যাই হোক ওর একটা ব্যবস্থা করে দাও। মনে মনে ভাবলাম, আমি মরে গেলে আমাকে পোড়াবার কাঠের দাম থাকবে কি না সন্দেহ

আর আমি করব মিশিরলালের সুব্যবস্থা—হায় রে! মুখে বললাম, হ্যাঁ, তাইত ভাবছি। মিশিরলাল অশিক্ষিত হলেও হয়ত বুঝতে পেরেছিল আবহাওয়াটা একটু ভারি হয়ে এসেছে। তাই আমার ছেলেমেয়েদের হাত ধ'রে ওদিকে কোথায় চলে গেল। আমার স্ত্রীও উসখুস করতে লাগলেন, আমিও উঠতে পারলেই বাঁচি। আমার স্ত্রী হঠাৎ রান্নার কথা বলে উঠে পড়লেন, আমিও ছেলেমেয়ের খোঁজ করতে উঠে গেলাম। গিয়ে দেখি আমার ছেলেরা মিশিরলালকে ঘিরে বসে আছে, আর মিশিরলাল আমার মেয়ের হাত ধরে কি যেন দেখাচ্ছে। আমি আমার মেয়েকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম—হ্যাঁরে, মিশিরলাল তোকে কি দেখাচ্ছিল? সে অভিমান করে বলল—দেখ না বাবা, মিশির ভাই বলছে কবে নাকি ছোট বেলায় আমি আম পাড়তে গিয়ে ঢিল ছুঁড়েছিলাম, সেটা নাকি আমে না লেগে ওর কপালে লেগেছিল। ও কি যে সব বলে? বলেই সে কেঁদে ফেলল, আমি স্নেহে তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললাম, কাঁদতে নেই মা। এর কিছুক্ষণ বাদে দেখি, আমার ছেলেদের কাছে অঙ্গভঙ্গি করে ভাঙাভাঙা বাংলায় একটা গল্প জুড়ে দিয়েছে মিশিরলাল। আমি আমার মেয়েকে বললাম—ওই শোন্, তোদের মিশির ভাই গল্প আরম্ভ করে দিয়েছে—তুই যাবি না? মেয়ে বলল, নিশ্চয় যাব বাবা, ব'লে হাসতে হাসতে চলে গেল। পিতামাতার স্নেহ, বন্ধুদের অকৃত্রিম ভালবাসা আমিও ত একদিন লাভ করেছিলাম। মিশিরলালের এই প্রাণঢালা ভালবাসা দেখে আমারও অতীতের মধুময় চিত্রটি চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। তবে সেটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় নি, কারণ রূঢ় বাস্তব তার বীভৎস মুখচ্ছবি নিয়ে অতীতকে লাগিয়েছিল তাড়া। তবে মিশিরলালের বেলায় এমন হয় না কেন? তারও ত বর্তমান খুব সুখকর নয়, তবু ত সে বর্তমান নিয়েই আনন্দে আছে। অতীত তার সামনে এসে কখনও দেখা দেয় না? হয়ত দেয়, অতীতকে ভুলে গিয়ে বর্তমানকে নিয়ে আনন্দে থাকবার কলাকৌশল মিশিরলালের জানা আছে। আমার নেই। মিশিরলালের গল্প শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েদের হাসির আওয়াজ আমার কানে ভেসে এসেছিল। দেখি মিশিরলালও তাদের সঙ্গে হেসে গড়িয়ে পড়ল। আমি ভাবছিলাম, আমিও যদি ওর মত হ'তে পারতাম, জীবনের অনেক সমস্যাই সরল হয়ে আসত। এমন সময় আমার স্ত্রী এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, আজকে কি খাওয়া দাওয়া করবে না, সারাক্ষণ ভাবলেই চলবে? কি করি, শান্তশিষ্টের মত তাঁর সঙ্গে উঠে গেলাম। খাওয়া-দাওয়া সেরে দুরুদুরু বুকে শোবার ঘরে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। ভাবনা আর ত কিছু নয়, ভাবনা শুধু আমার স্ত্রী কখন তুলে ফেলেন মিশিরলালের সুবন্দোবস্তের প্রসঙ্গটা। কিছুক্ষণ বাদে আমার স্ত্রী শয়নকক্ষে ঢুকলেন এবং বিছানায় শোবার পাঁচ-সাত মিনিট পর অকস্মাৎ আমায় জিজ্ঞেস করে বসলেন, হ্যাঁগো, তুমি ঘুমোলে নাকি? প্রথমটা মনে করলাম নাক ডাকার ভান করি, কিন্তু পরক্ষণেই চিন্তা এল এক মাঘে ত শীত পালায় না। তাই বললাম, ঘুমোই নি বটে, তবে বড়ই ঘুম পেয়েছে। তিনি নিবিড় হয়ে আমার কাছে সরে এসে বললেন, হ্যাঁগো শুনছ, এখুনি খাওয়া-দাওয়ার পর মিশিরলালকে বলছিলাম কিছু টাকা নিয়ে দেশে চলে যাও। সে কি বলল জান? আমি অনিচ্ছা-সত্ত্বেও বললাম, কি? ও দেশে যেতে রাজি নয়, ও বলে যতদিন বেঁচে আছে আমাদের বাড়ীতেই থাকবে। এমন জটিল সমস্যাটার এমন সরল মীমাংসা হয়েছে জেনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লাম। সে রাত্রে ঘুমিয়েও ছিলাম ভাল।

এর পর ডায়রীর খানিকটা জায়গা ফাঁক দেখলাম। মনে করলাম এই অবধি লিখেছি বোধ হয়···হাওয়ায় ডায়রীর দু'একটা পাতা উড়ে গেল। দেখলাম; এক জায়গায় লেখা আছে—একদিন আফিস থেকে ফিরেছি। দেখি, পোষ্ট আপিসের একটি লোক এসে আমার স্ত্রীর হাতে একটি টেলিগ্রাম দিল। আমার স্ত্রী তাড়াতাড়ি সই ক'রে নিয়ে খাম ছিঁড়ে দেখলেন, তার এসেছে আমাদের দেশ থেকে—অত্যন্ত অসুস্থ দুর্ব্বল শরীর নিয়ে আমাদের দেখতে আসবার জন্যে স্টেশনের পথে বেরিয়ে পথে পড়েই মিশিরলাল মারা গিয়েছে। আমার স্ত্রী. ডুকরে কেঁদে উঠলেন, মেয়েও খুব কেঁদেছিল, ছেলেদের মনও ভারাক্রান্ত দেখেছিলাম। আমি আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে কুলুঙ্গি থেকে অযত্নে রক্ষিত আমার মেয়েকে মিশির-লালের দেওয়া সেই রঙকরা চুপড়িটা পেড়ে নিয়ে অল্প একটু ঝেড়ে দেখলাম। তার পর যা ভাবলাম তা ভাবনাতেই সম্ভব, ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়।

একটা দমকা বাতাস এসে ডায়রীর পাতাগুলো উল্টেপাল্টে দিয়ে চ'লে গেল।

আর্থিক

শ্রীচিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা

[পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সুরুতে, ১৯৫১ সালের আদমসুমারীর সময়, ভারতবর্ষের জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি যা অনুমান করা হয়েছিল, পরবর্তী কালে, ১৯৬১-র আদমসুমারীর সময়ে, দেখা গেছে জনসংখ্যা তার থেকে বেশি হারেই বেড়েছে। এই উর্ধগতি আরো কিছুকাল চলবে, বিশেষজ্ঞরা এই রকম অনুমান করেন। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্য বা অসাফল্য নিয়ে বর্তমানে যে আলোচনা চলেছে তার মূলে প্রধানত: প্রশাসনিক দুর্বলতাজনিত ত্রুটির কথাই সঙ্গত কারণে স্থান পেয়েছে। এই ত্রুটি-বিচ্যুতিরও অন্তরালে আছে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুণ সুদূরপ্রসারী সমস্যার কথা; এই বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা চলছে বহুকাল থেকেই, কিন্তু সঠিক সমাধান কোন্‌পথে আসবে তা এখনো অনিশ্চিত। পৃথিবীব্যাপী "Freedom from Hunger" আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা শুনছি যে, বিংশ শতাব্দীর শেষেও ভারতের বহুগুণে বর্দ্ধিত জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ অর্ধভুক্ত থাকবে। শিল্পোন্নতি দেশগুলির ইতিহাসে যা ঘটেছে, আমাদেরও সেই পথ দিয়েই যেতে হবে; প্রগতির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হবার কালে জন্মহার থাকবে অব্যাহত, মৃত্যুহার হ্রাস পাবে; জন্মহার মন্থর হবে আরও কিছুকাল পরে। ইতিমধ্যে চরম দারিদ্র্য দুর্দশার মধ্যে থাকার দরুণ একদল লোকের কাছে জন্মনিয়ন্ত্রণের কথা অর্থহীন, আরেকদিকে বিদেশ থেকে সহজে খাদ্য জোগান হয়ে চলেছে ব'লে অপর একদল লোক জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে উদাসীন।]

ভারতবর্ষের এই সামগ্রিক সমস্যার থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে বাংলা দেশের জনসংখ্যার সমস্যা বিচার করা চলে না; শিল্পপ্রধান বাংলা দেশের খাদ্যসমস্যা সমাধানের দায়িত্ব সারা ভারতবর্ষের। স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনৈতিক কাঠামো গ'ড়ে তোলা বাংলা দেশের পক্ষে সম্ভব বা প্রয়োজন না হলেও, ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে জনসংখ্যা ও খাদ্যসংস্থানের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানের চেষ্টা অন্যান্য প্রদেশের মত বাংলা দেশকেও অচিরে করতে হবে। সমস্যা-জর্জরিত এবং অন্য প্রদেশাগত ব্যবসায়ীদের দ্বারা অধিকৃত বাংলা দেশের সমূহ-বিপদের কথা ইদানীং বহু পণ্ডিত ও গবেষক আলোচনা করছেন; তাঁদেরই অনুসন্ধানের ফলাফলের সারাংশ বর্তমান প্রবন্ধে কিছুটা উত্থাপন করছি।

১৯৬১-র আদমসুমারী থেকে দেখা যাচ্ছে :

(১) ভারতবর্ষের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার হার গত কয়েক দশকে নিম্নলিখিত হারে এগিয়েছে :

	ভারতবর্ষ	পশ্চিমবঙ্গ
১৯২১-৩১	(+) ১১·০	(+) ৭·৭
১৯৩১-৪১	(+) ১৪·২	(+) ২৩·৬
১৯৪১-৫১	(+) ১৩·৩	(+) ১৩·৬
১৯৫১-৬১	(+) ২১·৫	(+) ৩২·৭৯

গত শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে বাংলা দেশে অন্য প্রদেশাগত লোকের হার কি ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তার হিসাব ১৯৫১ পর্যন্ত পাওয়া যায়; মোট জনসংখ্যার শতাংশ হিসাবে এই অঙ্ক ১৮৮১-তে ছিল গড়ে ২·২ ভাগ, ১৮৯১-তে ৪·৭ ভাগ, ১৯০১-এ ৬·৬ ভাগ; ১৯৪১-এ এই অঙ্ক দাঁড়ায় ৯·৫ ভাগ আর ১৯৫১-তে উদ্বাস্তুদের সংখ্যা (৮·৫ ভাগ) নিয়ে দাঁড়ায় ১৮·৫ ভাগ। ১৯৫১-তে কলকাতাতে অন্য প্রদেশাগত লোকের হার ছিল ৫৪·৫ ভাগ, ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলীতে যথাক্রমে ২১·২,

১২'৫, আর ১১'৭ ; জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কুচবিহারে যথাক্রমে ৩০'৫, ২২'৫ এবং ২১'৭ ; নদীয়াতে উদ্বাস্তু (৩৭'৩ ভাগ) সহ এই সংখ্যা ছিল ৪০'৬ ভাগ।

(২) পশ্চিমবঙ্গের মোট এলাকা হচ্ছে ভারতের শতকরা ২'৮৭ ভাগ আর ১৯৬১-র জনসংখ্যা ছিল সারা ভারতের ৭'৯৬ শতাংশ ; ১৯৫১-তে এই অঙ্ক ছিল ৭'৩৭ শতাংশ।

(৩) ১৯৫১ থেকে ১৯৬১-র মধ্যে সারা ভারতের জনসংখ্যা বেড়েছে ২১'৫ শতাংশ আর খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে ৩৮'৩ শতাংশ ; পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে উভয় অঙ্ক হচ্ছে যথাক্রমে ৩২'৮ এবং ৪'৩ শতাংশ !

(৪) ১৯৫১ ও ১৯৬১ সালে সারা ভারতবর্ষে ও পশ্চিমবঙ্গে কর্মরত লোকের শতকরা হার ছিল :

	১৯৫১			১৯৬১		
	পুরুষ	স্ত্রী	মোট গড়	পুরুষ	স্ত্রী	মোট গড়।
ভারতবর্ষ	৫৪'০৫	২৩'৩০	৩৯'১০	৫৭'১২	২৭'৯৬	৪২'৯৮
পশ্চিমবঙ্গ	৫৪'২৩	১১'৬৩	৩৪'৪৭	৫৩'৯৮	৯'৪৩	৩৩'১৬

(৫) ১৯৫১ সালে ভারতবর্ষের জনসংখ্যার মোট ১৭'৩৫ শতাংশ ছিল শহরবাসী, ১৯৬১-তে ১৭'৯৭ শতাংশ। শহরবাসী জনসংখ্যা এই দশ বছরে যে হারে বেড়েছে তা হ'ল ২৬'২২ শতাংশ। বাংলা দেশের ক্ষেত্রে এই অঙ্ক যথাক্রমে ২৩'৮৮, ২৪'৪৪ এবং ৩৫'৯৭ ভাগ।

অর্থাৎ বাংলা দেশের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি, খাদ্য-উৎপাদনের হার কম, কর্মরত লোকের হার নিম্নগামী এবং চাষের পরিবর্তে, বা গ্রামীণ জীবনের পরিবর্তে নগরের জীবনযাপন করবার দিকে অপেক্ষাকৃত বেশি হারে লোক অগ্রসর হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গের 'জাতীয় আয়' বিশ্লেষণ ক'রে দেখা গেছে সারা ভারতের তুলনায় এই প্রদেশ থেকে শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতিতে আয়ের পরিমাণ বেশি ; এই আয়ের কতখানি বাংলা দেশেই পুনর্নিয়োগ হচ্ছে আর কতটা অন্য প্রদেশে ব্যয়িত হচ্ছে তার হিসাব সম্পূর্ণ না হলেও পাওয়া যায়। পূর্বে একটি প্রবন্ধে আমরা এ বিষয়ে কিছু তথ্য একত্রিত করে উপস্থিত করেছি। কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করে যে শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্য বহুকাল ধ'রে গ'ড়ে উঠেছে, আখেরে তার কতখানি সুফল পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য স্থানে পৌঁছাচ্ছে, সেই আলোচনার অবতারণা না করে, আমরা পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাস-সংক্রান্ত কয়েকটি তথ্য উপস্থিত করছি। ১৯৫১-র আদমসুমারীতে পশ্চিমবঙ্গকে চারটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছিল। (ক) বর্ধমান, হুগলী, হাওড়া ২৪ পরগণা ও কলকাতা মিলে যে শিল্পাঞ্চল। পশ্চিমবঙ্গের মোট এলাকার ৩১'৮০ ভাগ জুড়ে এই অঞ্চলটি অবস্থিত ; ১৯৫১ সালে মোট জনসংখ্যার ৫০'৪৪ শতাংশ ছিল এই অঞ্চলে, ১৯৬১ সালেও এই অঙ্ক ছিল ৪৯'৩৫ শতাংশ (পুরুলিয়ার জনসংখ্যা এই হিসাবের বহির্ভূত)। তাছাড়া অন্যান্য জেলারও এলাকা কিছু বদলেছে। ১৯০১-৫১র মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় ৫৬'৭ শতাংশ ; আর সেই সময়ের মধ্যে উপরোক্ত পাঁচটি জেলায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ৪৩'৪ ; ৪৮'২ ; ৮৯'৫ ; ১১৩'৮ এবং ১৭৬'৭।

(খ) কৃষিপ্রধান বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর জেলার মোট এলাকা হচ্ছে বাংলা দেশের ৩১'৪৩ শতাংশ ; মোট জনসংখ্যার ২৩'১৬ ভাগ ছিল এই অঞ্চলে ১৯৫১-তে ; ১৯৬১-তে সেই অঙ্ক দাঁড়ায় ২২'২১ শতাংশে। ১৯০১ থেকে ১৯৫১-র মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ১৭'৬ ; ১৮'২ এবং ২০'৪ ভাগ।

(গ) মধ্য এবং উত্তরাঞ্চলের কৃষিপ্রধান জেলাগুলি : নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদা, পশ্চিম দিনাজপুর এবং কুচবিহার। মোট এলাকার ভাগ ২৫'১৭ শতাংশ ; ১৯৫১ ও ১৯৬১-তে মোট জনসংখ্যার ভাগ যথাক্রমে ২০'৯২ ভাগ এবং ২২'৫৪ ভাগ। পঞ্চাশ বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৪৮'১ ; ২৯'৭ ; ৫৫'৩ ; ৫৭'৮ এবং ১৮'৪ ভাগ।

(ঘ) চা উৎপাদনে অগ্রণী জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার মোট এলাকা ১১'৫০ শতাংশ ভাগ, আর মোট জনসংখ্যার ভাগ ১৯৫১ ও ১৯৬১-তে যথাক্রমে ৫'৪৮ ভাগ এবং ৫'৯০ ভাগ। পঞ্চাশ বছরে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৬৭'৮ ভাগ ও ৭৮'৭ ভাগ।

উল্লিখিত চারটি অঞ্চলের বৃদ্ধির হারে পার্থক্য প্রচুর, আবার এরই মধ্যে বিভিন্ন জেলার ভৌগোলিক পরিবেশ, লোকের স্বাস্থ্য ও উদ্যম, শিক্ষাদীক্ষার হার প্রভৃতির পার্থক্য অনেক। প্রবন্ধের শেষে যে সামান্য কয়টি

তথ্য সমাবেশ করা হ'ল, তার থেকেই বিভিন্ন স্থানে ভবিষ্যৎ কর্মপ্রণালী ও পরিকল্পনা কোন্‌দিকে যেতে পারে তার কিছু আভাস পাওয়া যায়।

১৯০১-৫১র মধ্যে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার যেখানে ৫৬·৭ ভাগ, পরবর্তী দশ বছরেই সেক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার ৩২·৯ শতাংশ; এর মধ্যে, পূর্ববর্তী ৫০ বছরের তুলনায় পরবর্তী দশ বছরে বৃদ্ধির হার বেশি, এই রকম জেলাগুলি হচ্ছে, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও কুচবিহার; কিন্তু এর মধ্যে নদীয়া ও মুর্শিদাবাদের বর্গমাইল-পিছু ঘনত্ব (১১১৪ এবং ১১৩২) পশ্চিমবঙ্গের গড় ঘনত্বর (১০৩২) থেকে বেশি হয়েছে, অপর জেলাগুলিতে এখনও বর্গমাইল পিছু ঘনত্ব পশ্চিমবঙ্গের গড়ের থেকে কম (৮২৩, ৬২৭, ৮২৬, ৭৯১)। অপরদিকে মোট জমির তুলনায় 'নীট' কর্ষিত জমি ও মোট কর্ষিত জমির পরিমাণ ঐ ছয়টি জেলায় নিম্নরূপ:

	(১) 'নীট' কর্ষিত জমির হার	(২) মোট কর্ষিত জমির হার	(৩) নীট কর্ষিত জমির সঙ্গে দোফসলী জমির হার
বীরভূম	৭৩·১	৮১·৫	১১·৫
বাঁকুড়া	৫০·২	৫৩·৩	৬·২
মেদিনীপুর	৬৬·১	৬৯·৬	৫·৩
নদীয়া	৭১·৫	১০৯·০	৫২·১
মুর্শিদাবাদ	৭০·৩	১০০·৫	৪২·৯
কুচবিহার	৭৪·৮	৮৭·৩	১৬·৭
পশ্চিমবঙ্গ	৬০·৪	৭০·৭	১৭·০

বিভিন্ন কারণের সমন্বয়ে এক এক জেলায় কৃষির কাজে নিযুক্ত জমির ব্যবহারে যে বিরাট্ পার্থক্য আছে তা উপরের তালিকা থেকে লক্ষিত হচ্ছে, জল সরবাহ, জমির উৎকর্ষতা, প্রয়োজনের তাগাদা, স্থানীয় কর্মী সংস্থার কর্মোত্তম সবকিছুর পার্থক্যই অনুমান করা যায়। ১৯৫১-৬১র মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির গড় হার ৩২·৯; বীরভূম (৩৫·৭%) নদীয়া (৪৯·৮%), মুর্শিদাবাদ (৩৩·৫%), কুচবিহারে (৫১·৯%) এই গড়ের থেকে বেশি হারে লোক বৃদ্ধি হয়েছে; অন্য জেলা দু'টির লোকবৃদ্ধি প্রাদেশিক গড়ের নীচে রয়ে গেছে। কুচবিহারে দেখা যাচ্ছে জনসংখ্যার হার খুবই বেড়েছে এবং গ্রামবাসীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি হারে বেড়েছে; এরই সঙ্গে তুলনীয় মোট জনসংখ্যার তুলনায় কর্মরত লোকের হার এবং নীট কর্ষিত জমির সঙ্গে দোফসলি জমির হার। গ্রামবাসী পুরুষ কর্মীর (৫৭·৩%) হার পশ্চিমবঙ্গের গড়ের চেয়ে বেশি, কিন্তু অপর তিন ক্ষেত্রেই কম * (৪৯·৯%, ৩·৭%, ৩·৬%); দোফসলি জমির হারও পশ্চিমবঙ্গের গড়ের থেকে বেশি নয়।

গ্রামবাসী পুরুষ কর্মীর হারে বিভিন্ন জেলায় যেমন বহু পার্থক্য, তেমনি পার্থক্য লক্ষিত হয় শহরবাসী পুরুষ এবং স্ত্রীলোকদের কর্মসংস্থানের হারে। গ্রামবাসী পুরুষ কর্মীর হার সর্বাপেক্ষা কম হাওড়াতে (৪৯·৮), আরও ৬টি জেলার হার পশ্চিমবঙ্গের গড়ের তুলনায় কম। অপর দিকে শিল্পপ্রধান জেলা বলিতে শহরবাসী পুরুষ কর্মীর হার সর্বক্ষেত্রে খুব উল্লেখযোগ্য ভাবে বেশি নয়। চব্বিশ পরগণায় দেখা যাচ্ছে যে, শহরবাসীর হার অনেক বেশি (৩১·৮%—এই সূত্রে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৬১-তে কলকাতার এলাকা বর্ধিত এবং ২৪ পরগণার এলাকা সেই পরিমাণে কমানো হয়েছে) গ্রামবাসী পুরুষ কর্মীর তুলনায় শহরবাসী পুরুষ কর্মীর হার কম।

সব শেষে, গ্রাম ও শহরবাসী স্ত্রীলোকের কর্ম-সংস্থানের তথ্যটি উল্লেখযোগ্য। সারা পশ্চিমবঙ্গে গ্রামবাসী স্ত্রীলোক কর্মীর গড় অঙ্ক ১০·৬%। হাওড়া ২৪ পরগণার সঙ্গে দার্জিলিঙের অঙ্ক তুলনীয়। বাঁকুড়া

---

* ১৫—৬০ বছর বয়সের মধ্যে যত লোক আছে তার হারও যেমন স্থান-ভেদে কম-বেশি আছে; কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকা না থাকার দ্বারাও তেমনি, ১৫—৬০ বছর বয়সের লোকের মধ্যে রোজগারি লোকের হারে তারতম্য ঘটছে। ১৯৫১০ হিসাবে দেখাযায় মোট লোকের মধ্যে ১৫—৬০ বছরের লোকের হার পশ্চিমবঙ্গে ৬০·২৬%, এর মধ্যে কলকাতার হার সর্বোচ্চ (৭০·৫%), সর্বনিম্ন হার মালদহে (৫৬·১৬%)। আর ১৫—৬০ বছরের সমস্ত লোকের মধ্যে রোজগারি লোকের হার মাত্র ৫৭·৩১%, তার মধ্যে সর্বোচ্চ জলপাইগুড়িতে (৭১·৯৫%), সর্বনিম্ন মালদহে (৪৭·৯৪%)। গ্রাম ও শহরে এবং স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যেও এই উভয় হারেই বহু পার্থক্য লক্ষিত হয়। (TECHNO-ECONOMIC SURVEY OF WEST BENGAL)

মেদিনীপুর, মালদহ, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, পুরুলিয়ার সঙ্গে নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, পঃ দিনাজপুর, কুচবিহার প্রভৃতির তারতম্যও লক্ষণীয়। সর্বত্রই ঠিক যে সুযোগের অভাবেই কর্মরত স্ত্রীলোকের সংখ্যা কম, একথা এক বাক্যে বলা চলে না অবশ্যই; তবে যাবতীয় সুযোগ সুবিধা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই যে আদমসুমারীর সংজ্ঞা অনুযায়ী সব কর্মহীন স্ত্রীলোক সর্বত্রই সমানভাবে সেই সুযোগ গ্রহণ করবেন, একথাও হয়ত বলা যায় না। শহরবাসী স্ত্রীলোকের কর্মসংস্থানের ঘাটতি আরও স্পষ্ট।* বাঁকুড়া, দার্জিলিং, মুর্শিদাবাদের অঙ্কের সঙ্গে হাওড়া, ২৪ পরগণা, দিনাজপুর ইত্যাদির পার্থক্যও এই সূত্রে লক্ষণীয়।

* * * *

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে বলা হয়েছে গ্রামের 'উদ্‌বৃত্ত' জনশক্তি শহরে আনতে হবে কালক্রমে। কৃষির উৎপাদন বাড়াতে হবে, যাতে কম লোকেই বেশি উৎপাদন করা যায় সে ব্যবস্থাও করতে হবে। শহরে লোক জমায়েৎ হচ্ছে তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু, শহরে লোক বাড়লেই কর্মসংস্থান বাড়বে না। গ্রামের বিকেন্দ্রীকৃত শিল্পকে শহরে কেন্দ্রীভূত করলেও—উৎপাদন যদি বা কিছু বাড়ে (সবক্ষেত্রে তাও বাড়বে না, কর্মপদ্ধতির এবং লোকের বদল হবে মাত্র), কর্মসংস্থান বাড়বে না। Techno-Economic Survey Committee প্রস্তাব করেছেন বাংলা দেশের উদ্‌বৃত্ত জনসংখ্যা কিছু অন্যত্র পাঠাবার জন্য। যথেষ্ট পরিমাণ লোক অন্যত্র পাঠিয়ে বাংলা দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর ভারসাম্য আনবার জন্য দণ্ডকারণ্য যথেষ্ট নয়। শহরাঞ্চলে এখনও প্রচুর পরিমাণে 'উদ্‌বৃত্ত, অব্যবহৃত জনশক্তি আছে; গ্রাম থেকে 'উদ্‌বৃত্ত' জনশক্তিকে শহরে টেনে আনার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ব্যবস্থা করার আগে গ্রাম ও শহর উভয় অঞ্চলেরই উদ্‌বৃত্ত জনশক্তিকে কি ক'রে কাজে লাগান যায় সেইটিই আমাদের বিশেষ ভাবে বিবেচ্য। একদিকে কর্মসংস্থান আরেকদিকে কৃষি ও শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধি, আরেকদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস—এই তিনটির সমন্বয় করা কোন প্রাদেশিক সরকারের পক্ষে অবশ্যই সম্ভব নয়। তবে সমস্যাগুলির গতি যেদিকে সেদিকে প্রাদেশিক সরকার যথেষ্ট দূরদর্শিতা ও উদ্যোগের সঙ্গে নজর দিচ্ছেন কি না সেটিই প্রশ্ন থেকে যায়।

---

* ১৯৫১ সালে ১৫—৬০ বছর বয়সের গ্রামবাসী স্ত্রীলোকের হার ছিল ৫৮·২% (সর্বোচ্চ, বর্ধমান, ৬৩·৪%, সর্বনিম্ন, বাঁকুড়া ৫৪·১০%)। আর এই বয়সের মোট স্ত্রীলোকের মধ্যে কর্মরত ছিল মাত্র ২১·৮০ ভাগ (দার্জিলিং ৪৮·৬২%, জলপাইগুড়ি ৪৬·২৪%, পুরুলিয়া ৪৫·১০%, কুচবিহার ৮·৯১%, হাওড়া ১১·২৩%, ২৪পরগণা ৮·৭৫%)। শহরবাসী স্ত্রীলোকের (১৫—৬০ বছর) মধ্যে ১৯৫১তে কর্মরত ছিল মাত্র ১৫·৮০ ভাগ (মুর্শিদাবাদ ২৭·৩৯%, কুচবিহার ৯·৬৬%)।

তথ্য-তালিকা

	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (১৯৫১-৬১)	শহরবাসীর হার (শতাংশ) ১৯৫১	শহরবাসীর হার (শতাংশ) ১৯৬১	মোট জমির তুলনায় নীট কর্ষিত জমির হার	মোট জমির তুলনায় মোট কর্ষিত জমির হার	মোট লোকের তুলনায় কর্মরত লোকের হার (১৯৬১) গ্রামবাসী পুরুষ	শহরবাসী পুরুষ	গ্রামবাসী স্ত্রীলোক	শহরবাসী স্ত্রীলোক
বর্দ্ধমান	৪০·৭	১৪.৮	১৮.৪	৬৯·৮	৭৩·৮	৫৪·৬	৫৬·২	৯·৮	৫·২
হুগলী	৩৯·২	২৪·৬	২৫·৯	৭৫·৭	৮৪·৭	৫০·৩	৫৩·২	৭·৯	৫·৭
হাওড়া	২৬·৮	৩২·৪	৪০·৫	৬২·৬	৭৪·০	৪৯·৮	৫৮·৫	২·৩	৩·৩
২৪ পরগণা	৪১·১	২৯·৮	৩১·৮	৪৪·৮	৫২·২	৫২·৬	৫১·৫	২·৮	৩·১
কলিকাতা	৮·৪	১০০·০	১০০·০	...	...	...	৬১·৪	...	৬·১
বীরভূম	৩৫·৭	৬·৫	৬·৯	৭৩·১	৮১·৫	৫২·৭	৪৮·২	৯·৬	৬·৯
বাঁকুড়া	২৬·৪	৭·২	৭·৪	৫০·২	৫৩·৩	৫৪·৪	৪৫·৭	১৯·৫	৯·০
মেদিনীপুর	২৯·৫	৭·৫	৭·৭	৬৬·১	৬৯·৬	৫২·৯	৪৬·৬	১১·৮	৫·৪
নদীয়া	৪৯·৮	১৮·২	১৮·৪	৭১·৫	১০৯·০	৫০·৯	৪২·৯	৩·২	৫·৬
মুর্শিদাবাদ	৩৩·৫	৭·৮	৮·৫	৭০·৩	১০০·৫	৫১·৮	৪৩·৯	৬·০	৮·৩
মালদহ	৩০·২	৩·৭	৪·২	৭৯·৭	১০০·৫	৫৩·৭	৪৬·৬	১১·৭	৫·৪
পঃ দিনাজপুর	৩৫·৮	৫·৮	৭·৫	৭৭·৪	৯২·৪	৫৭·২	৪৭·৭	৬·৭	৩·৬
কুচবিহার	৫১·৯	৮·১	৭·০	৭৪·৮	৮৭.৩	৫৭·৩	৪৯·৯	৩·৭	৩·৬
জলপাইগুড়ি	৪৮·৭	৭·২	৯·১	৪২·৯	৪৭·২	৫৫·৫	৪৯·২	২০·৬	৩·৭
দার্জিলিং	৩১·৯	১৩·১	২৩·২	২৮·৫	৩৩·৫	৫৩·৪	৫৩·৩	৩৫·৮	৯·১
পুরুলিয়া	...	...	৬ ৮	...	...	৫৯·৫	৪৮·৭	৪০.৭	৭·৮
পশ্চিমবঙ্গ	৩২·৯	২৬·৯	২৪·৫	৬০·৪	৭০·৭	৫৩·৫	৫৫·৪	১০·৬	৫·১

আংটি

হেনা হালদার

অনেক ইতস্ততঃ করে সুরজিৎ নাগকে বাড়ীতে আনাই স্থির করলে শবরী। সুরজিৎ নাগ পোস্ট এ্যাণ্ড টেলিগ্রাফের টেলি-কমিউনিকেশনের উচ্চপদস্থ অফিসর। শবরী সিংহ ওর স্টেনো-টাইপিস্ট। যদিও আলাপটা সম্প্রতি ওদের আরো ঘনিষ্ঠতরতেই পৌছেছে। বাড়ীতে শবরীর মা আছেন, আছেন বাবা আর ছোট ভাই শান্তনু। এ ছাড়া আছে দিদি শর্মিষ্ঠা। স্থানীয় এয়ার-পোর্টে এয়ার হোস্টেস সে। বাবা শ্রীকান্তবাবু করোনারি থ্রম্বসিসের প্রথম আক্রমণের পর থেকে প্রায় বিছানায় শুয়েই কাটান।

বছর দুই আগে শর্মিষ্ঠার বিয়ে হয়েছিল লক্ষ্ণৌএর আর্কিটেক-চ্যারল এঞ্জিনিয়র অনিরুদ্ধ দত্ত চৌধুরীর সঙ্গে। কিন্তু বিয়ের দু'বছর পরেই অনিরুদ্ধর মস্তিষ্ক-বিকৃতির লক্ষণ দেখা যায়। এখন সে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে আগ্রার মেন্টাল হোমে রয়েছে। শর্মিষ্ঠা শুধু সুন্দরীই নয়, প্রখর মেধাবিনী ও অনিরুদ্ধও ছিল পরম রূপবান্। ওদের দুজনকে পাশাপাশি দেখলে বিস্ময়ে দম্ আটকে আসত লোকের। অথচ মাত্র দু বছরেই এই অভাবিত করুণ পরিণতি সমস্ত পরিবারটাকেই চরম ভাবে আঘাত করেছে। ওদের আনন্দের সংসারে বিষাদের স্থায়ী দাগ কেটেছে। শর্মিষ্ঠাকে বেশী বেগ পেতে হয় নি অবশ্য উন্মাদ স্বামীর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদে। এখন সে আকাশচারিণী হাওয়াই হোস্টেস। নাগপুর থেকে পালম এয়ার-পোর্ট, পালম থেকে দমদম, দমদম থেকে সাণ্টাক্রুজে উড়ে বেড়াচ্ছে। ওর হাস্যলাস্যময় ভাব-সাব দেখে ওর মনের দুঃখের আভাস পাওয়া কঠিন। মুখ নয় ওর মনের সূচীপত্র।

আর ওকে নিয়েই যত ভয় আর ভাবনা শবরীর। মৃগয়ার লোভ যেন শর্মিষ্ঠার রক্তে। ওর রূপে শুধু আলো নেই, আগুনও আছে। আর সে আগুনে পোড়বার জন্যে পতঙ্গের অভাব হয় নি কোনও দিন। বিয়ের আগেও নয়, বিয়ের পরেও নয়, বিবাহ-বিচ্ছেদান্তেও নয়। স্কুল থেকে কলেজ, কলেজ থেকে ইউনিভার্সিটি একই উন্মাদনায় আবর্তিত হয়েছে। ফ্রক ছেড়ে শাড়ী ধরেছে শর্মিষ্ঠা, পুরণো খেলায় এনেছে নতুন টেকনিক। কিন্তু অভ্যাসটা ছাড়তে পারে নি। কুমারী থেকে হয়েছে সীমন্তিনী, বিবাহিতা থেকে বিবাহবিচ্ছেদের নায়িকা, তবু ওর আকর্ষণ যেন বেড়েই গেছে পুরুষের চোখে। শবরীর আজও মনে পড়ে, কলেজে থাকবার সময়ে কি অজস্র এ্যাড্মায়রারই না ছিল দিদির। তার এক-তৃতীয়াংশও ছিল না শবরীর কোন কালে। শর্মিষ্ঠা পাশে থাকলে শবরীর দিকে আর কেউ চোখ ফেরাবে না। স্পট লাইটের সম্পূর্ণ ফোকাসটা নিজের ওপর টেনে নেবার আশ্চর্য ক্ষমতা ওর বরাবর। শবরীর বন্ধু পৃথা লাহিড়ীর কথা এখন মাঝ মাঝে মনে পড়ে শবরীর। পৃথা বলত, 'তোর দিদির চুম্বক-শক্তিতে সব সোনার টুকরো ছেলেরাই লোহা হয়ে আটকে যায় রে, কেউ আত্মরক্ষা করতে পারে না।' কথাটা অবশ্য সেদিন খুব খারাপ লেগেছিল শবরীর তবুও প্রতিবাদের সাহস হয় নি। কেননা পৃথার বয়ফ্রেণ্ড ধ্রুব চ্যাটার্জিকে সত্যিই টেনে নিয়েছিল শর্মিষ্ঠা তার তীব্র চৌম্বক শক্তিতে। অবশ্য মোহটা বেশীদিন স্থায়ী হয় নি, হয়-ও না কখনো।

বাবা-মা'র একান্ত আদুরে শর্মিষ্ঠা। বেচারার জীবনের এই অকাল-ট্র্যাজিডির জন্য ওদের সহানুভূতির সীমাশেষ নেই। মিঠুয়ার জন্যে ওদের যত দুশ্চিন্তা আর দুর্ভাবনা। উদ্বেগ আর অশান্তি। মিঠুয়া চাকরি করতে চায় করুক, সৌখীন নাট্যাভিনয় নিয়ে মেতেছে, মাতুক। পিকনিক-পার্টি ডান্স-সিনেমা-কার্ণিভালের মেরী-গো-রাউণ্ডে চড়ে প্রচণ্ড গতিবেগে জীবন আবর্তিত হয় শর্মিষ্ঠার, ওঁরা বাধা দেন না। ওর সব কিছুতেই ওঁদের সম্মতি, প্রশ্রয়। ফলে চুম্বক-শক্তির অনুশীলন থাকছে অব্যাহত। সহরের নতুন ডাক্তার সুরেশ সাক্সেনার নতুন মডেলের ল্যাণ্ডমাস্টারে শর্মিষ্ঠাকে ঘুরতে দেখা যায় যেমন, তেমনি আবার পলিটিক্যাল সায়েন্সের হেড অফ দ্য ডিপার্টমেণ্ট পঞ্চান্ন বছরের বিজয় আর্যনায়েকমের সঙ্গে সিনেমাতেও পাওয়া যায় ওকে মনো

হারিণী বেশবাসে। কেউ ওর বল্ নাচের সঙ্গী, কেউবা ওর টেনিসের পার্টনার। কারুর কাছে শেখে গান, কারুর কাছে শেখে স্কুটার চালানো।

এদের হোস্টেসের মাইনেটা ভালো, তাই বেশবাস ও কেশপাশের বৈচিত্র্যও সর্বদাই নতুন, সর্বত্রই মোহময়।

শর্মিষ্ঠার সম্পর্কে ওর মা-বাবার নিশ্চিন্ত নির্ভয়তা ক্লিষ্ট করে তোলে শবরীকে। কেমন একটা দুজ্ঞেয় আতঙ্ক ওকে কেবলি কুরে কুরে খায়। অনিরুদ্ধকে স্পষ্টই মনে পড়ে শবরীর। হাসিখুশী উজ্জ্বল প্রাণবন্ত ছেলেটা কি করে যে হঠাৎ পাগল হয়ে গেল ভেবে পায় না ও। দিদিকে কি যে ভালবাসত অনিরুদ্ধদা! অথচ দিদি বলে, অনিরুদ্ধ নাকি বরাবরই এ্যাবনর্মাল ছিল, প্রথমটা বোঝা যায় নি। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না শবরীর। মনে হয় দিদিই বরং কেমন এ্যাবনর্মাল।

সুরজিৎকে তাই বাড়ীতে আনতে ভয় পায় শবরী। কিন্তু শেষ পর্যন্ত না এনে উপায় রইল না। প্লাজা সিনেমায় ওরা গিয়েছিল একটা ইংরেজী ছবি দেখতে, সেখানেই দেখা হয়ে গেল শর্মিষ্ঠার সঙ্গে। শবরী জানত না শর্মিষ্ঠাও ঐ ছবিটা দেখতে যাবে। অগত্যা আলাপ করাতেই হ'ল। আর দশ মিনিটের মধ্যেই শর্মিষ্ঠা এমন ঘনিষ্ঠ আর সহজ হয়ে উঠল যা শবরী তিন বছরেও হয়ত পারে নি।

শর্মিষ্ঠার সাবলীল অন্তরঙ্গতা সুরজিৎকে বিমুগ্ধ করল। হাসতে হাসতে সুরজিৎকে বললে শর্মিষ্ঠা: 'বাব্‌লি যে কেন অন্য চাকরি নিতে চাইছে না আজ বুঝলাম, এমন চমৎকার বস্ পেলে চাকরির ওপর আগ্রহ বেড়ে যায় নিশ্চয়ই।'

হাসল সুরজিৎও। শবরীর লজ্জাটা উপভোগ করে করে বললে, 'আপনার ডাকনাম বাব্‌লি নাকি? এবার থেকে তা-ই ডাকব তো?'

'মোটেই না।' ভ্রুভঙ্গিতে কুপিতা হ'ল শবরী। বললে 'ওর নামটা, মিঠুয়া, জানেন?'

'বাঃ, খুব মিষ্টি নাম।' শর্মিষ্ঠার দিকে না তাকিয়ে পারল না সুরজিৎ, আর সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিকে নামিয়ে আনল। শর্মিষ্ঠার দুঃসাহসিক ছাঁটের ব্লাউজের গলার প্রান্ত ছুঁয়ে দুলছে মলন্তিকা হারের মণিমুক্তো বিজড়িত বিরাট্ পেণ্ডেণ্টটা। সেই দোলা ওর বুকেও যেন লাগল আচমকা।

'আর আপনার ডাক-নামটা শুনি।' চোখে অযথাই বিলোল কটাক্ষ হানল শর্মিষ্ঠা। 'সেই চিরকেলে খোকন ত?'

'নাঃ,' হাসল সুরজিৎ, 'আমার ডাকনামটা খুবই নতুন। কুটুস্।' ছেলেবেলায় মা ভাত খাওয়াতে বসলেই আঙুলে কুটুস্ করে কামড় দিতাম। ওটা শুধু নাম নয়, ওটা আমার কোয়ালিফিকেশনও।' ওরা তিনজনেই হেসে উঠল। এর পর ওরা বিদায় নিয়েছিল যথারীতি।

পরদিন অফিসের পর ওরা দেখা করল। একটা নামকরা রেস্তোরাঁয়। শবরী ও সুরজিৎ।

ক্যাবিনের পর্দাটা টেনে দিয়ে হাসিমুখে শবরীকে লক্ষ্য করতে করতে সুরজিৎ বললে, 'আপনার কাজকর্মে মোটেই মনোযোগ নেই আজকাল; সুতরাং ইনক্রিমেন্ট না হ'লে আমার কোন হাত নেই তাতে।'

শবরী নিঃশব্দে ওর চোখের দিকে তাকাল একটুক্ষণ। তার পর গুনগুনিয়ে উঠল, 'জানি বন্ধু জানি তোমার আছে ত হাতখানি......'

'Here's my hand।' ব'লে সরাসরি হাতটা মুঠো ক'রে বাড়িয়ে দিলে সুরজিৎ শবরীর দিকে। তার পর ফিস্ ফিস্ ক'রে বললে, 'with my heart in it।'

গম্ভীর হয়ে গেল শবরী। যেন গভীর চিন্তামগ্ন।

ওর হাতখানা মুঠোর মধ্যে তুলে নিলে সুরজিৎ। মেয়েদের মতন নবনীত-কোমল হাত নয় শবরীর। দস্তুর মত খেটে-খাওয়া মানুষের হাত। কঠিন আর শক্তিশালী। সাইকেলের হাণ্ডেল ধরে ধরে কড়া পড়ে গেছে। কিন্তু এ না হ'লে যেন শবরীকে মানাত না। সারাদিন ধ'রে টাইপ করার চিহ্ন ওর আঙুলের ডগায়। পাখীর মতন হাল্কা শরীর নয় ওর। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল শরীরে কিশোরসুলভ ঋজুতা। দাঁড়ের ময়না ওকে মনে করতে পারা যাবে না। ও হ'ল দায়-দায়িত্ব-বওয়া শালিক পাখী। 'কি দেখছেন অত অভিনিবেশ করে?' হেসে হাতটা টেনে নিল শবরী। 'এ হাত নিয়ে কবিতা করা যায় না। এ হাত শর্মিষ্ঠার মত চাঁপা কোরকের শিখা নয়।'

'না, এ হাত কর্মিষ্ঠার হাত।' সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল সুরজিতের। 'কিন্তু কবিতা করা যাবে না কেন? অন্ততঃ আধুনিক কবিতা করতে বাধা কোথায়?'

'না-না, আধুনিক কবিতা আমার ভাল লাগে না।'

ারতর প্রতিবাদের ভঙ্গিতে বললে শবরী। 'পূর্ণিমার চাঁদকে ছুঁতেই ঝলসান রুটি মনে হবে না আমার। কিংবা 'নামে ্যা তন্দ্রালসা, সোনার আঁচল খসা, হাতে দীপশিখা'র চেয়ে ্যারাইজড্ পেশেন্টের মতন মুমূর্ষু রোগী সন্ধ্যাকে াকাশের অপারেশন টেবিলের ওপর শায়িত দেখে রোমাঞ্চ াধ করব না। বলতে পারেন ওল্ড-ফ্যাশান্ড্, প্রতিবাদ রব না।'

'কিন্তু কেন বলুন ত?' বললে সুরজিৎ। 'আপনি এত ান্তই ম্যাটার অফ্ ফ্যাক্ট মানুষ। একটুও ইম্প্র্যাক্টিক্যাল ন কোনখানে?'

'হবার সুযোগই পাই নি কখনও।' হাসল শবরী। ছেলেবেলা থেকেই শর্মিষ্ঠার সঙ্গে যেন আমার এক অলিখিত ক্তি। সংসারের কাজের দিক্‌টা আমার, সাজের দিক্‌টা ওর। ড্রয়িংরুমের কার্টেনের শেডের আর বাগানের ডালিয়ার বেডের জন্য আমার সঙ্গে পরামর্শের কথা কেউ কোনদিন ভাববে না। যেমন বাজার থেকে মাছ এলে কুটে দেবার কিংবা ধোপা এলে কাপড় মিলিয়ে নেবার জন্যে ওকে ডাকবার কথা কারুর মনে হবে না কখনও।'

'বাঃ, তার মানে এ নয় যে, তুমি সাজানর কৌশলে অনভিজ্ঞ। আসলে তুমি সুযোগই পাও নি।' জলের মতন সহজে আপনি থেকে তুমিতে চ'লে এল সুরজিৎ। 'বরং সাজবার আর সাজাবার শিল্পটা আরও নিপুণভাবেই ফুটবে তোমার হাতে।'

'কি জানি।' বিষণ্ণতায় কোমল হয়ে এল শবরীর কালো চোখের মেঘলা দৃষ্টি। 'চেষ্টা ক'রে দেখি নি।'

'আমার ঘরে, মানে আমাদের মিলিত সংসারেই তার পরীক্ষা নেওয়া যাবে।' হাসল সুরজিৎ।

'তা হ'লে শনিবার সন্ধ্যায় আমাদের বাড়ী আসছেন ত?' কথা ঘোরাতে চাইল শবরী।

'তুমি ডাকলে না-এসে উপায় আছে আমার?'

'ডাকটা আমার নয়, শর্মিষ্ঠার।'

'তা হ'লে কথা দিতে পারলাম না। ভেবে দেখব।'

'বা রে আমি যে আপনার হয়ে কথা দিয়ে এসেছি।' উদ্বিগ্ন হ'ল শবরী।

'কোন্ অধিকারে দিয়েছ? ও-কথা রাখার দায় নেই আমার।' কিন্তু মুখে যাই বলুক, সুরজিৎ শনিবারে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যথাসময়েই এল। হয়ত না এলেই ভাল করত। কারণ, যে-মন নিয়ে এসেছিল, সে-মন নিয়ে ফিরে যেতে পারল না।

শনিবার দিন অফিস থেকে তাড়াতাড়িই ফিরেছিল শবরী। কিন্তু ফিরেই শুনল ওর বাবার সামান্য হার্ট এ্যাটাকের মতন হয়েছিল। ডাক্তার বরাট একটা ইঞ্জেক্‌শন দিয়ে গেছেন আর একটা ওষুধ লিখে দিয়ে গেছেন, বলেছেন এনে রাখতে। শান্তনু তখনও হকি খেলে ফেরে নি। সুতরাং শবরীকেই বেরুতে হ'ল। কাছের ড্রাগ স্টোরে ওষুধটা পাওয়া গেল না, যেতে হ'ল ক্যান্টনমেন্টের বড় দোকানে। ফিরতে বেশ খানিকটা দেরি হয়ে গেল।

বাড়ী ফিরে চা আর খাবার সাজিয়ে ট্রে হাতে যখন ও বসবার ঘরে ঢুকল, সুরজিৎ তার প্রায় আধঘণ্টা আগেই এসে গেছে। লম্বা সেটীটায় পাশাপাশি ব'সে ছিল শর্মিষ্ঠা আর সুরজিৎ। ওদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে কেমন যেন থমকে গেল শবরী। ক্লিয়োপাত্রার মহিমায় বসে আছে শর্মিষ্ঠা। গায়ে টোম্যাটো-লাল শাড়ীতে ও বিস্ফারিত গলার ব্লাউজে উদগ্র যৌবনকে অনেকখানি অনাবৃত ক'রে। নিজের সমস্ত আলোগুলোই জ্বালিয়ে দিয়েছে ও। সারা রঙ্গমঞ্চ জুড়ে ওরই একনায়িকাত্ব। হাসির মাধুর্যে, সংলাপের চাতুর্যে, নয়নের কারুকার্যে বিচ্ছুরিত করছে নিজেকে। কেশপাশে আর বেশবাসে অসংখ্য ফাঁদ পেতে রেখেছে যেন। অঙ্গ-সজ্জার স্তরে স্তরে অনঙ্গের গোপন আমন্ত্রণ। ওর পাশে বড় সাদাসিধে, বড় কমনপ্লেস শবরীর আটপৌরে তাঁতের শাড়ী আর হাণ্ডলুমের ব্লাউজ। টেনেটুনে বাঁধা খোঁপা। আকাশিনীর পাশে মৃন্ময়ী। কবিতার পাশে হিসেবের খাতা।

ওকে দেখে অপ্রস্তুতভাবে সরে বসল সুরজিৎ। হাসবার চেষ্টা করে বললে, 'কতক্ষণ বসিয়ে রেখেছ দেখ। অথচ আমার কিন্তু শবরীর প্রতীক্ষায় থাকবার কথা নয়।'

গম্ভীর ভাবে খাবারের প্লেট ওর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে শবরী বললে, 'প্রতীক্ষার সময়টুকু খুব দুর্বিষহভাবে কেটেছে ব'লে মনে হচ্ছে না ত, বরং আরও দীর্ঘতর হ'লে খুব আপত্তিকর হ'ত না বোধ হয়।' হাসল শবরী। আবহাওয়াকে সহজ ক'রে দেবার জন্য ওরাও ওর সঙ্গে যোগ দিল। কিন্তু জমল না।

খাওয়া-দাওয়ার পরই সুরজিৎ উঠে পড়ল। কেমন যেন

অন্যমনস্কের মত সারাক্ষণ কি যেন ভাবছে। শবরীর স্থির দৃষ্টির দর্পণ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে না পারলে বুঝি নিজের দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়বে।

অনেক রাত। ঘুমোতে পারছে না শবরী। আশ্চর্য দুর্বলচিত্ত সুরজিৎ নাগ। শবরীর ধারণা ছিল না। শুধু কি রূপের মোহ! বিবাহ-বিচ্ছেদের নায়িকার গ্ল্যামরটা,ই কি উপেক্ষণীয়? নারীর পরশ্রীকাতরতার মতন পুরুষের পরস্ত্রী-কাতরতাও বোধ হয় সহজাত সংস্কার। রক্তে রক্তে এই অনুরক্তি। তা না হ'লে এই লঘুচিত্ত দেহসর্বস্ব নারী কি পারত এত সহজে ওকে আলোড়িত কর্‌তে? ভেবে ভেবে কূল পাচ্ছে না শবরী। নিজেকে এমন অপমানাহত লাগছে ওর। চাকরিটা ছেড়ে না দিতে পারলে স্বস্তি পাবে না যেন। কয়েকদিনের জন্য ছিন্দোয়ারায় বেলা-মাসীর বাড়ী চ'লে গেলে কেমন হয়? আর ওখান থেকেই ডাকে সুরজিৎকে পদত্যাগ-পত্র পাঠাতে অসুবিধে কোথায়? মনস্থির করে ফেললে শবরী।

একই ঘরে পাশাপাশি দুই বোন শোয় ওরা। কিন্তু আজ যেন শর্মিষ্ঠার উপস্থিতি সহ্য করা যাচ্ছে না। দিদির প্রতি সব স্নেহ কোমলভাব ঈর্ষার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে বোধ হয়।

'কি রে বাব্‌লি, ঘুম আসছে না তোর? কেবলি উস্‌খুস্‌ করছিস্‌ যে?' সরল স্বাভাবিক গলায় প্রশ্ন আসে শর্মিষ্ঠার।

কথা বলতে ভাল লাগছিল না শবরীর। তবুও বললে, 'কয়েকদিনের জন্যে ছিন্দোয়ারা যাব ভাবছি, বেলা-মাসী ডেকেছে।'

'ক'দিনের জন্যে?'

'তা এক সপ্তাহ লেগে যাবে ওখানে গেলে।'

'বলিস্‌ কি, এক হপ্তা!' অন্ধকারে কাঁচভাঙা হাসি শোনা গেল, কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাবি?' শেষের কথাগুলো কীর্তনের সুরেই গাইলে শর্মিষ্ঠা।

'তুমি থাকতে সে ভাবনা করে লাভ নেই।' বিরস কণ্ঠে বললে শবরী।

'আমাকে দিবি?' আবার হাসির টুকরো ছড়িয়ে দিলে শর্মিষ্ঠা। 'তোর সাহস ত কম নয় রে বাব্‌লি!'

'ভয় নিয়ে ত আর ঘর করা যাবে না চিরকাল। একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাওয়াই ভাল।' হাসতে চেষ্টা করলে শবরী কিন্তু অন্ধকারে ওর কান্নার চেয়ে করুণ হাসিটা শর্মিষ্ঠা দেখতে পেল না।

'এবার চুপ কর দিদি, বড্ড ঘুম পাচ্ছে।' কথোপকথনে ছেদ টেনে দিলে শবরী। এই মুহূর্তে দিদির সংসর্গে স্বর্গ সুখ অনুভব করছে না ও। মনে মনে বললে: আমরা দু'জনে কত বিপরীতমনা, কত অন্যরকম দিদি। নামের মধ্যেই যে চরিত্রলিপি লুকিয়ে রয়েছে আমাদের। শর্মিষ্ঠার মতই দেবযানীর সর্বস্ব অপহরণ করে নেবার লোভ রয়েছে তোর রক্তে, আর শবরীর আমৃত্যু প্রতীক্ষার যন্ত্রণাই আমার অস্থিমজ্জায়।

ছিন্দোয়ারা থেকে ফিরল শবরী প্রায় এক মাস কাটিয়ে। ফিরে এসে শর্মিষ্ঠার প্রাণোচ্ছল আলাপ-ব্যবহারে মনে হ'ল যেন কিছুই ঘটে নি। যদিও মা ওকে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাঁরে বাব্‌লি, সুরজিৎ কি মিঠুয়াকে বিয়ে করবে নাকি? মিঠুর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় ব্যাপারটা পাকাপাকিই হয়ে গেছে ঠিক। তুই কিছু জানিস?'

শান্ত প্রসন্নতাকে নষ্ট হ'তে দিলে না শবরী। মায়ের দৃষ্টি থেকে মুখটা সরিয়ে নিয়ে শুধু বললে, 'জানি না'ত।'

কয়েকটা দিন কেটে গেল চাকরির দরখাস্ত করে। তার পর হঠাৎ একটা ছোট্ট পোস্টকার্ড এল সুরজিতের কাছ থেকে। কোয়ালিটিতে দেখা করবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ নিয়ে। একটা সামান্য পোস্টকার্ড যে এতখানি নাড়া দিতে পারে কে জানত? অনেক ভাবনায় তোলপাড় করেও শেষ পর্যন্ত নির্দিষ্ট সময়ে কোয়ালিটিতে পৌঁছতেই হ'ল শবরীকে।

আবার দেখা হ'ল দু'জনের। দৃশ্যপট সব পূর্বানুরূপ, শুধু নায়ক-নায়িকাই আর তেমন নেই।

ঘামে-ভেজা কচি ফলের মতন টস্‌টসে চিকণ-শ্যাম মুখখানা রুমাল দিয়ে মুছতে মুছতে শবরী আলগোছে সুরজিতের মুখখানা দেখে নিলে। বললে, 'কই, কি বলবেন ব'লে ডেকেছেন, শীগ্‌গীর বলে ফেলুন—এক্ষুণি একটা ইণ্টারভিউ-এ যেতে হবে। সময় নেই।' মণি-বন্ধের ঘড়ির ওপর চোখদুটোকে ফেলে রেখেছে সে। দেশী সাদা তাঁতের জলডুরে শাড়ীতে কেমন অপরিচিত লাগছে শবরীকে। এ মেয়েকে যেন আজই প্রথম দেখল

সুরজিৎ। ক্যালেণ্ডারের আনকোরা নতুন পাতার মত এই সুন্দর ঝল্‌মলে দিনটির গায়ে কোন অচেনা গন্ধের মত ওকে ভাল লাগল সুরজিতের।

—'কই, বলুন।' তাগিদ দিলে শবরী।

পকেট থেকে শবরীর পদত্যাগ পত্রটা বের করলে সুরজিৎ। বললে, 'এটা দিয়েই কি আমার হাত থেকে রেহাই পেতে পারবে শবরী? আমি কিন্তু অন্য একটা আর্জি এনেছি।'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিটা সুরজিতের মুখের ওপর ফেলে চুপ ক'রে রইল শবরী।

অন্য পকেট থেকে একটা ছোট্ট নীল কৌটো বের করে আনলে সুরজিৎ। একটা আংটি। পাশাপাশি দু'টি নীলা, পোখরাজের কুচি দিয়ে ঘেরা। পরাতে গেল শবরীর আঙুলে। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত হাতটা সরিয়ে নিলে শবরী। সাগ্নিক দৃষ্টিতে সুরজিতকে ঝল্‌সে দিয়ে তীক্ষ্ণ চাপা স্বরে ব'লে উঠল: 'সকলকেই ইচ্ছে করলে আংটি পরানো যায় না মিষ্টার নাগ, একথা হয়ত জানা নেই আপনার।'

আংটিটা ছিট্‌কে গিয়ে পড়েছিল ঘরের কোণে। সেই দিকে চেয়ে রইল সুরজিৎ। তারপর করুণ দুটো চোখ তুলে তাকাল শবরীর মুখের দিকে। আশাভঙ্গের বেদনায় যেন ওর চোখ দুটো নীলার মতই পাথর হয়ে গেছে।

দয়া অনুভব করল না শবরী। কোন মমতা কোন অনুকম্পা নয়। অনুচ্চ কঠিন কণ্ঠে বললে, 'তাছাড়া দুধের সাধ ঘোলে মেটে না, যেমন মদের সাধ মেটে না জলে, কিংবা শর্মিষ্ঠার স্বাদ শবরীতে।' হঠাৎ কোন জবাব দিতে পারলে না সুরজিৎ। একটু নীরবে থেকে শবরী বললে, 'কিন্তু দোষ আপনার নয়। ভুল আমারই। স্টেনলেস্ ষ্টীল বলে যাকে শ্রদ্ধা করতাম তা ছিল নিতান্তই বেঙ্গল পটারী। চায়না কলেকশনের বাতিক আমার নেই। যাক্, এবার চলি, নমস্কার।' নীচু হয়ে সাদা হাত-ব্যাগটা টেবিল থেকে কুড়িয়ে নিলে শবরী।

এতক্ষণে মুখ তুলল সুরজিৎ। বললে, 'আমাকে যত কথা বলেছ সব মেনে নিয়েছি। প্রতিবাদ করি নি। কিন্তু তোমাকে বলবার কি আমার কিছুই নেই? কোনও অনুযোগ কিংবা অভিমান? আমার দুর্বল মনটাকে কি চিনতে না তুমি? কিংবা শর্মিষ্ঠার দুর্বার আকর্ষণকে? সব জেনে-শুনে কেন তুমি ফেলে গেলে আমাদের? ঠেলে দিলে প্রলোভনের মুখে? আগলে রাখলে না, এগিয়ে দিলে ইচ্ছে ক'রে? তোমার অপরাধটা কি কিছু কম শবরী? ভালবাসার পরীক্ষায় আমি ত হেরেই গেছি, কিন্তু তুমিই কি পেরেছ জিততে? ভালবাসা সম্পর্কে তুমি যদি সিরিয়স্ হতে, হতে সিন্সিয়র, তবে নিজের পরম ধনকে কি পারতে অপরের খেয়ালের খেলনা হতে দিতে? এর কোন্ কৈফিয়ৎ দিতে পার তুমি—কোন জবাব?'

কথাগুলো যেন চাবুকের মতন ওর মনের ওপর কেটে কেটে বসছে। আগুনের মত গলিয়ে দিচ্ছে শবরীর জমাট অভিমান আর বেদনাকে। যন্ত্রণায় মর্মমূল পর্যন্ত থর থর করে কাঁপছে।

টেবিলের ওপর দু'হাতের মধ্যে মুখ ঢেকে ব'সে আছে সুরজিৎ। অনেকক্ষণ ওর দিকে নিঃশব্দে চেয়ে রইল শবরী……তারপর নীচু হয়ে আংটিটা কুড়িয়ে নিলে।

অমর কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র

শ্রীঅমল হালদার

শ্মশান না হ'লে নাকি শব সাধনা হয় না! বর্তমানকালের সাহিত্য-সাধনার শ্মশান নাকি আধুনিক বঙ্গ-প্রাণকেন্দ্র কলকাতা। সত্যই সম্প্রতিকালের সাহিত্য-সংস্কৃতির গতি একান্তভাবে কলকাতা-মুখী। কলকাতা কালচারই আজ সারা বাংলার কালচার। কিন্তু এমন একদিন ছিল যখন সংস্কৃতিতীর্থ নদীয়ার কৃষ্ণনগর-নবদ্বীপ-শান্তিপুরের কালচারই ছিল সারা বাংলার কালচার। বাংলা-সাহিত্য-সংস্কৃতির তখন প্রাণকেন্দ্র ছিল কৃষ্ণনগর। বাংলা সাহিত্যের সে যুগের নাম মধ্যযুগ। সে কালের নাম অষ্টাদশ শতাব্দী, ভারতচন্দ্র সেই মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ ছান্দসিক কবি—ভারতচন্দ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি।

বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের বিস্তৃতি হ'ল ১৪৫০ থেকে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। বাংলা কাব্যসাহিত্যের মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্য হ'ল ছন্দ-বৈচিত্র্য এবং ছন্দালোচনার সূচনা। শুধু তাই নয়, এই যুগেই সূচিত হয় গদ্যের পূর্বাভাষ। এই যুগের আরও একটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল ছন্দ-বন্ধনের মুক্তি। এ যুগের কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তিনজনের নাম ভারতচন্দ্র, গোবিন্দদাস এবং রামপ্রসাদ। এই যুগে 'ভারতচন্দ্র ভঙ্গ-প্রকৃতি ও শুদ্ধ তৎসম ছন্দের, গোবিন্দদাস শুদ্ধ প্রাকৃত ছন্দের এবং রামপ্রসাদ দেশজ ছন্দের শ্রেষ্ঠ কবি।' ভারতচন্দ্র-অনুসারিত ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দ এই যুগে প্রতিষ্ঠালাভ করে। এই ছন্দে আখ্যানমূলক মহাকাব্যগুলি লেখা হয়েছে। এই যুগে বৈষ্ণব-কবি গোবিন্দদাস অনুসরিত শুদ্ধ প্রাকৃতের সঙ্গে ভঙ্গ-প্রাকৃতের প্রভেদ স্পষ্ট হয়। শুদ্ধ প্রাকৃত ছন্দে বৈষ্ণব-পদাবলী রচিত হয়। এই পয়ারের বিভিন্ন-পদীয় ছন্দের উন্নতি ঘটে এবং এই যুগে পর্ব-গঠনেও বৈচিত্র্য দৃষ্ট হয়।

ভারতচন্দ্রের কাব্যশ্রবণে মুগ্ধ হয়ে সংস্কৃতিবান্ কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় তাঁকে সভাপতি করেন এবং 'রায়গুণাকর' উপাধিতে ভূষিত করেন। ভারতচন্দ্র তাঁর বিখ্যাত 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য কৃষ্ণনগরে রচনা করেন এবং কৃষ্ণনগর রাজপ্রাসাদের বিষ্ণুমহলে রাজসভায় কৃষ্ণচন্দ্র সমক্ষে গুণীজন সমাবেশে পাঠ ক'রে শোনান।

ভারতচন্দ্র মধ্যযুগের শুধুমাত্র শ্রেষ্ঠ কবিই ছিলেন না, একজন জনপ্রিয় কবিও ছিলেন। তাঁর কাব্যের অতুলনীয় অনুপম প্রসাদগুণ এবং বাগ্‌বৈদগ্ধই তাঁকে মধ্যযুগে সর্বজনপ্রিয় এবং শ্রেষ্ঠ ক'রে তুলেছিল। তিনি মধ্যযুগীয় অন্যান্য কবিদের মত পয়ার ত্রিপদীতে কাব্য রচনা করেন নাই। মূল আখ্যানকে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত ক'রে বিভিন্ন অংশ বিষয়ানুযায়ী ছন্দে রচনা করেন! ছন্দের নূতনত্বে, সুন্দর শব্দ-চয়নে অনুপম রূপ-গঠনে প্রতিটি অংশই এক-একটি নিটোল হীরকখণ্ডের মত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

ছান্দসিক কবি ভারতচন্দ্র ছন্দে একঘেয়েমি দূর ক'রে বৈচিত্র্য আনবার জন্য বিভিন্ন ছন্দে কাব্য রচনা করেন। কি তৎসম, কি প্রাকৃত আবার কি দেশী, কি বিদেশী সর্বপ্রকার ছন্দেই তিনি কাব্য রচনা করেন। তিনি মধ্যযুগের মঙ্গল-কাব্য রচয়িতাগণ কর্তৃক ব্যবহৃত 'ছন্দের অতিরিক্ত তৎসম-ছন্দ, ভঙ্গ-প্রাকৃত চৌপদী এবং দুই একটি ফার্সী শব্দ ব্যবহার ক'রে মধ্যযুগের কবিদের মধ্যে রূপদক্ষতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রেখে গেছেন।' তিনি 'কাহিনী বর্ণনায় সাধারণতঃ' পয়ার ও লঘু ত্রিপদী, করুণ ও গম্ভীর বিষয়বস্তু বর্ণনায় দীর্ঘ ত্রিপদী, অদ্ভুত রস বর্ণনায় একাবলী ও দশক্ষরা এবং উৎসাহ-দ্যোতনে তূণক, তোটক, ভুজঙ্গ প্রয়াত ও মালঝাঁপ ব্যবহার করেছেন।' ছন্দ-বৈচিত্র্যে ভারতচন্দ্র রস-বৈচিত্র্য সৃষ্টি ক'রে জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠেন।

মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে সাধারণতঃ সমপংক্তিক ছন্দই ব্যবহৃত হ'ত। ভারতচন্দ্র এই সময় মিশ্র-পংক্তিক কাব্য রচনা শুরু করেন। বাংলা কাব্যে ভারতচন্দ্রই প্রথম মিশ্র পংক্তিক স্তবক গঠন করেন। তৎপর মধুসূদন ও বিহারীলালের সাধনার ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথে এসে গাঠনিক কারুকার্য মণ্ডিত হয়। ভারতচন্দ্রের কবি-মন ছিল লিরিকধর্মী তাই তিনি যুগ্মকের বৈচিত্র্যহীনতা দূর করবার জন্য মিশ্র-পংক্তিক ছন্দে স্তবক গঠন ক'রে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেন।

ভারতচন্দ্র বৈষ্ণব-কবিগণকৃত ছন্দের ন্যায় একই প্রকার মিত্রাক্ষর ব্যবহার করেন। এতে যুগ্মকের এক-

ঘেয়েমি ব্যাহত হয়। তাঁর রসমঞ্জরীর কবিতাগুলি এই ছন্দে রচিত। রসমঞ্জরীতে ক্রিয়াপদের মিত্রাক্ষর ব্যবহৃত হয়েছে। লো, গো, হে, প্রভৃতি শব্দ চরণের শেষে দিয়ে মিত্রাক্ষরের সমতা রাখা হয়েছে। ভারতচন্দ্র যুগ্মকের বৈচিত্র্যহীনতা দূর করেছেন অন্যভাবেও। তিনি দশমাত্রার একপদী যুগ্মকের দীর্ঘ ত্রিপদীর এক-পংক্তি সংযুক্ত ক'রে তিনটি চরণের স্তবক রচনা করেছেন।

আবার ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের "মালিনী নিগ্রহ" অংশ একটি বিশেষ ত্রিপংক্তিক স্তবকে রচিত :

এই তিন প্রহর রাতি,
ডাকিয়া কর ডাকাতি।
দোহাই রাজার লুঠিলি আগার
ধরিয়া খাইলি জাতি॥

এখানে আট মাত্রা একপদী যুগ্মক প্রথম দুই চরণরূপে ব্যবহৃত হয়ে লঘু ত্রিপদীর এক পংক্তি দিয়ে তৃতীয় চরণ গঠিত হয়েছে। এই ছন্দ-শিল্পকর্ম অনন্যসাধারণ প্রতিভা-ব্যঞ্জক। ভারতচন্দ্র ছন্দে বৈচিত্র্য এনেছিলেন বিভিন্নভাবে। তিনি পয়ার পংক্তির শেষে বা প্রথমে অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যবহার করেছেন।

যথা, চাতকিনী কুতুকিনী ঘন দরশনে।
যথা কুমুদিনী প্রমোদিনী হিমাংশু মিলনে।

ভারতচন্দ্র-রচিত ত্রিপর্বিক চরণের উদাহরণ :

কৈলাস ভূধর অতি মনোহর
কোটি শশী পরকাশ
গন্ধর্ব কিন্নর যক্ষ বিদ্যাধর
অপ্সরাগণের বাস।

লঘু ত্রিপদীর উদাহরণ—এখানে ছয় মাত্রার পর্বপ্রধান। প্রাচীন বাংলা কবিতায় এই ছন্দের বিশেষ প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। এই ছন্দে ভঙ্গ-প্রকৃতির স্বাভাবিকতা সম্পূর্ণভাবে বিরাজ নাই। এই ছন্দকে আবার অতিশয় প্রবল শ্বাসাঘাতের সাহায্যে শুদ্ধ-প্রকৃতিরূপে আবৃত্তি করা যেতে পারে।

কৈলাস ভূধর অতি মনোহর
কোটি শশী পরকাশ।

বর্তমানকালের বাংলা কবিতায় এই ধরণের লঘু ত্রিপদীর আর প্রচলন নাই। ভারতচন্দ্র চতুষ্পদী ছন্দেও কবিতা রচনা করেছেন। তাঁর রচিত 'রসমঞ্জরী'তে চতুষ্পদী ছন্দই প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়েছে। প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে 'একাবলী' নামে এক বিশেষ ছন্দই প্রচলিত ছিল। প্রাচীনকালে এই ছন্দ খুব জনপ্রিয়ও ছিল। অনেক প্রাচীন কবি এই ছন্দে সুন্দর কবিতা লিখে গেছেন। বড়ু চণ্ডীদাস পর্যন্ত অনেকেই এই ছন্দে কিছু বৈচিত্র্য সঞ্চার করেছিলেন। 'একাবলী' ছন্দের বৈশিষ্ট্য হ'ল পর্বের ইউনিট মাত্র, অক্ষর নয়। ভারতচন্দ্রও এই ছন্দে কবিতা লিখেছেন।

বড়র পিরীতি বালির বাঁধ
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ।

৬+৫=১১ মাত্রার একটি ছন্দের উদাহরণ। অবশ্য ছান্দসিকেরা ১২ মাত্রার একাবলী ছন্দকেই খাঁটি ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দ বলে গ্রহণ করেছেন।

ভারতচন্দ্র-রচিত একটি ছত্রকে বিভিন্ন ছন্দে বলা যায় : সমপর্বিক অতিপূর্ব পর্ব—কৈলাস ভূধর। অতি মনোহর। কোটি শশী পরকাশ।

(৬+৬+৮)

আবার এইটি ত্রিপর্বিক বা ত্রিপদী লঘু চরণও :

কৈলাস ভূধর। অতি মনোহর। কোটি শশী পরকাশ। ভারতচন্দ্র-রচিত শুদ্ধ তৎসম ছন্দ :

লটাপট্ট জটাজুট। ট সংঘট্ট গ ঙ্গা।
ছলচ্ছল্ টল ট্টল। কলকল্ তরঙ্গা।
ফণাফণ ফণাফণ। ফণীফণ্ন গাজে।
দিনেশ প্রতাপে। নিশানাথ সাজে।

এখানে সংস্কৃত উচ্চারণ-রীতি তদনুযায়ী লঘু গুরু অক্ষর প্রয়োগ হয়েছে। বৃত্তছন্দের গঠন ও স্বরধ্বনির তৎসম উচ্চারণ লক্ষ্য করবার মত। এই ছন্দের নাম ভুজঙ্গ-প্রয়াত ছন্দ। একটি লঘু অক্ষরের পর দু'টি গুরু অক্ষর—এই ক্রমানুযায়ী বারটি অক্ষর ব্যবহারের পর ছয় অক্ষরের পর যতি স্থাপিত হয়েছে। অ, ঈ, উ, এ, ও অক্ষর দীর্ঘ। ব্যঞ্জনান্ত ও যৌগিক স্বরান্ত অক্ষরও এখানে প্রসারিত। বৃত্তছন্দের নিয়ম এখানে নাই।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের' ৭+৭=১৪ পর্বের ছন্দের মতও ভারতচন্দ্র কবিতা রচনা করেছেন : নখে নখ বাজায়ে। নীরদমণি হাসে।

এখানে ৭+৭ পর্ব সমাবেশিত হয়েছে।

বাংলা কাব্যসাহিত্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিদের একটি শ্রেষ্ঠতম অবদান—ভঙ্গপ্রাকৃত চৌপদী ছন্দ। ইতি-পূর্বে চৌপদী ছন্দ প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু এই শতকেই সার্থকরূপে চৌপদী ছন্দে কাব্য রচিত হয়। ভারতচন্দ্রের সুন্দর চৌপদী ছন্দের রচনাই তার প্রমাণ।

ভারতচন্দ্রই এই ছন্দকে শ্রবণমধুর করে তোলেন। পরবর্তীকালে ভারতচন্দ্র-রচিত এই চৌপদী ছন্দ বিশেষ

সমাদৃত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, হেমচন্দ্র, মধুসূদন, রঙ্গলাল, বিহারীলাল প্রভৃতি উক্ত ছন্দে কাব্য রচনা করেন।

ভারতচন্দ্র সংস্কৃত, বাংলা, ফার্সী ও হিন্দীভাষা মিশিয়েও কবিতা রচনা করেছেন :

শ্যাম হিত প্রাণেশ্বর বায়দুকে গোরদ কবর
কাতর দেখে আদর কর কাহে মর রো-রোয়কে।

ছান্দসিক শ্রীসুধীভূষণ ভট্টাচার্যের মত বলা যেতে পারে যে, এখানে ভারতচন্দ্র ফার্সী ছন্দের অনুকরণের চেষ্টা করেছিলেন। ভারতচন্দ্র কৃষ্ণনগরে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি। কৃষ্ণনগরের কাছেই নবদ্বীপ। এই নবদ্বীপেই প্রেমের ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ধর্ম আন্দোলনের ব্যাপকতায় ষোড়শ শতাব্দী থেকে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে কি ধর্মে কি কর্মে কি সমাজ কি সাহিত্যে সুদূর-প্রসারিত পৌরাণিক প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে।

বাংলা ভাষায় এই সময় সংস্কৃত শব্দ মিশ্রিত হয়। ক্রিয়াপদবর্জিত এবং সমাসবদ্ধ সংস্কৃত শব্দে পদ রচিত হয়। ভারতচন্দ্রও এই টেকনিকে কবিতা রচনা করেছেন। এই ভাষা মিশ্রণ উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্'ই' জলন্ত উদাহরণ। আবার, বাংলা ভাষাও এই সময় শক্তিশালী হয়ে ওঠে। প্রাচীন বৃত্তছন্দের অনুকরণে কাব্য রচিত হয়। যেমন, 'তূণক' একটি সংস্কৃত ছন্দ। এই ছন্দের রচনা :

সা সুবর্ণ কেতকং বিকাশি ভৃঙ্গা পূরিতং
পঞ্চবাণ বাণজাল পূর্ণ হোতি তূণকম্।

এর সঙ্গে ভারতচন্দ্র-রচিত তূণক ছন্দের কবিতা তুলনা করা যেতে পারে :

ভূতনাথ ভূতসাথ দক্ষযজ্ঞ নাশিছে।
যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ অট্ট অট্ট হাসিছে।

ভারতচন্দ্র তাঁর রচিত খণ্ড কবিতাগুলিতে নূতন ধরণের ছন্দ রচনার পরীক্ষা করেছেন। তিনি 'নাগাষ্টক' নামক একটি খণ্ড কবিতা রচনা করেন। আটটি শ্লোকে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে দুঃখ-কষ্টের নাগ-নিপীড়ন থেকে রক্ষার প্রার্থনা জানিয়েছেন। প্রথমে তিনি 'শিখরিণী' নামক সংস্কৃত ছন্দে একটি শ্লোক লিখে তারপর তারই বাংলা অনুবাদ 'শিখরিণী' ছন্দের গঠন অনুকরণে রচনা করেছেন।

ভারতচন্দ্রের ছন্দের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল বিষয় ও চরিত্রানুগ ছন্দ ব্যবহার। তাঁর রচিত বিদ্যাসুন্দর কাব্যে বিদেশী ভাটের মুখে ফার্সী ছন্দের ব্যবহার :

ভূপ মৈঁ তিহারি ভট্ট কাঞ্চীপুর জায়কে।
ভূপকো সমাজ মাঝ রাজপুত্র পায়কে।

আবার ভাটের প্রতি রাজার উক্তি :

চন্দ্র মুণ্ড। মুণ্ডি খণ্ডি। খণ্ড মুণ্ড। মালিকে।
লট্ট পট্ট দীর্ঘ জট্ট মুক্ত কেশ জালিকে।

এখানে মিশ্রভাষা ও অসম মিশ্রছন্দ ব্যবহার হয়েছে। ভারতচন্দ্র দেশজ ছন্দ রচনাতেও নিপুণ ছিলেন।

আই আই। ওই বুড়া কি। এই গৌরীর। বর লো।
উমার কেশ। চামর ছটা। তামার শলা বুড়ার জটা।
তার বেড়িয়া। ফোঁকায় ফণী। দেখে আসে জ্বর লো।

ভারতচন্দ্র মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ ছান্দসিক কবি হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কাব্যে অমিলও দৃষ্ট হয়। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে রাধামোহন সেন 'অন্নপূর্ণামঙ্গল' নামে একখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। তিনিই ভারতচন্দ্রের কাব্যের ভুলত্রুটি দেখান। অমিল সম্বন্ধে তিনি বলেন :

আনুপূর্বী যদিস্যাৎ করেন শীলন।
বহুপদে দেখিবেন আছে কুমিলন।

শুধু তাই নয়, ভারতচন্দ্রের কাব্যে মধ্যযুগীয় লোকায়ত ভাব-ভঙ্গি একান্তভাবে বিরল। গণ-মানসের স্বাভাবিক অভিব্যক্তির এখানে অভাব। এই অভাবেই তাঁর সঙ্গে রামপ্রসাদের পার্থক্য ঘটিয়েছে। তাই ভারতচন্দ্র একান্তভাবে রাজসভার কবি।

ছায়া

শ্রীসুনীতি দেবী

ভাস্কর,

পাষাণে মূর্ত্তি গড়ে চলেছ,
চেয়ে আছ মুগ্ধ দৃষ্টিতে
নিজের সৃষ্টির দিকে।
দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছ তাকে,
হায়, সে শুধু কঠিন মর্ম্মর!
অন্তরালে যে ছায়া ছিল
সে বুঝি সরে গেল নিঃশব্দে।

চিত্রক,

তোমার তুলির টানে কত বিচিত্র ছবি,—
তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ, উত্তাল জলধি,
শীর্ণা নদী।
মাঝে মাঝে ফুটে ওঠে অনবদ্য একটি মুখ,
কার মুখ তাও মনে পড়ে না আজ,—
শুধু তার ছায়া মিলিয়ে থাকে
তোমার প্রতিটি ছবির কায়াতে।

সুরকার,

বীণার মন্দ্রে কাকে জানাও আহ্বান?
কার উদ্দেশে গেয়ে যাও গানের পর গান?
সভার উজ্জ্বল আলোতেও দেখ না সে মুখ।
তার ছায়া এসে কাছে বসে
তোমার শেষ গানের রেশের দীর্ঘশ্বাসে।

কবি,

কার বন্দনা গাঁথ নিত্য নূতন ছন্দে?
তোমার গরবিনী প্রিয়া হেলায় কিছু শোনে,
কিছু বা শোনে না।
তখন তোমার বক্ষলীনা মানসীর ছায়া
কেঁদে বলে,—
আমায় শোনাও, আমায় শোনাও।
স্বপ্নঘোরে তাকে বাহুপাশে বাঁধতে চাও,
ঘুম ভেঙ্গে যায় প্রেয়সীর কঙ্কণ-ঝঙ্কারে।
বল কবি বল—
সেই রূঢ় দিবালোকে
মানসীর ছায়া কি মিলিয়ে যায় চিরতরে?

পলাতক মেঘ

হেনা হালদার

অঝোর-ঝরণ বর্ষা কোথাও নেই প্রাণে, নেই গানে;
হৃদয় যেন রৌদ্র-পোড়া মাঠ।
ঘুমের মধ্যে জলের শব্দ শুনি···
বর্ষা নামুক মুষলধারায় ওইখানে, এইখানে;
মগ্ন শাখায় শাখায় মত্ত হাওয়ার পাখসাট
শুনতে পাব হয়ত বা এক্ষুণি!

আষাঢ় গেল, শ্রাবণ গেল, ভাদ্র মাসের জের
টানল না রে অভীষ্ট আশ্বিন।
কই রে, আমার বৃষ্টি এল কই?
মরল কুঁড়ি, ঝরল পাতা, আশার আনন্দের
মৃত্যু হ'ল। এবারও চাষ-হীন
বন্ধ্যা-মাটির ইচ্ছারা সংশয়ী।

কোন্ আকাশে পালাল মেঘ সে-ই জানে, সে-ই জানে,
হৃদয় হ'ল রৌদ্র-ফাটা মাঠ।
কী আশ্বাসে তবুও দিন গুনি!
লাগুক শরীর-মনে এবার একটু জলের ছাট,
জীবন্মৃত হয়ে বাঁচার নেই মানে, নেই মানে,
রক্তে অঝোর জলের শব্দ শুনি।

অমৃত

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

কাল সন্ধ্যা ছ'টার একটু পরে
হঠাৎ আমার মৃত্যু হ'ল।
এল না ভিড় ক'রে
খবর নিতে এ পাড়ার আর নানান পাড়ার লোকে,
আমার জন্যে শোকে
বাড়ীর লোকের হ'ল না চোখ অশ্রু-ছলছল।

মরল যে সে অন্য মানুষ। কিন্তু সে যে কবে
একটুখানি মিশেছিল আমার মধ্যে আমির অনুভবে।
তাই সে যখন গেল তখন টুকরো একটা আমি
হ'ল যেন সেই মানুষের মৃত্যু-সহগামী।

জানি আমি, সেই মানুষের চিন্তা প্রেতের মত
মনের আনাচ-কানাচ জুড়ে ঘুরবে যে দিন-কত,
তারপরে তা বর্ষাশেষের মেঘের মত হয়ে
মিলিয়ে যাবে দিগন্তরে। কেবল রয়ে রয়ে
আমার মনের দিক্‌চক্ররেখার একটি দিকে
আঁধার হবে একটু ফিকে
আর কিছুদিন দূরস্মৃতির বিদ্যুৎ-ঝিলিকে।
তারপরে সব অন্ধকারে ডুবে যাবে।

এমনি ভাবে
কতজন যে এল গেল! একটুখানি আমার আমি, সেও
আমার আমির অনুভবে নয় ত অবজ্ঞেয়?
হিসাব ক'রে দেখি,
আজকে আমার এই যে আমি, সে কি
সেই সেদিনের আমি
যাকে নিয়ে জীবন সুরু করেছিলাম? মৃত্যুপথগামী
আজকে কোথায় তা'রা
আমার মধ্যে আমির সাড়া
যাদের ডাকে পেতাম? তাই ত দেখি হিসাব ক'রে,
সেই সেদিনের আমার আমির সবটা গেছে ম'রে।

অমর হবে কোন্ আমিটা, কেমন ক'রে চিনব আমি তাকে,
আমায় যা'রা নাম দিয়েছে, সে-নাম ধ'রে ডাকে,
আমার আশেপাশে তা'রা কেউ যদি না থাকে?

আমার সে-সব দিনের আমি,
সুন্দর সে আমিগুলি,
অমরতার বর পাবে না তা'রা?
অন্ধকারে সবাই হবে হারা?
বুঝতে পারি না যে,
তাদের ছেড়ে অমরতা লাগবে আমার
কোন্ আমিটার কাজে।

সেই যে ছোট বোনটি আমার কবে সে কোন্ যুগে
আঠারো দিন টাইফয়েডে ভুগে
মারা যাবার দু'দিন আগে তুলেছিল কান্নাকাটির রোল,
খাবে ব'লে লাউডগাতে কাঁঠালবীচি দিয়ে
কাঁচালঙ্কার ঝোল,
কেউ দিল না খেতে,
তাকে ত আজ ভুলেই গেছি।
এই জীবনের পথে যেতে যেতে
মুখরোচক কতকিছুই খেলাম ত তার পরে,
একটা-আমি ঐটি শুধু নেয়নি মুখে।
বুক জুড়ে সেই আমিটা যে রয়েছে এই বুকে।
অমর যদি হই দেবতার বরে,
আর যদি অমৃতে লোভ থাকে,
সঙ্গে ক'রে নিতেই হবে তাকে।
সুধার পাত্র সরিয়ে দিয়ে সুরুতেই সে বাধিয়ে দেবে গোল
সে-বোনটিকে ফিরে পেতে,
খাইয়ে তাকে আপনি খেতে
লাউডগা আর কাঁঠালবীচি দিয়ে
কাঁচালঙ্কার ঝোল।

হরতন

বিমল মিত্র

১৮

সকাল বেলাই দুলাল সা'র কাজ-কর্ম্ম সুরু হয়ে যায়। সকাল মানে সেই যার নাম ভোর পাঁচটা। সেই ভোর পাঁচটার সময়ই নিত্য-কর্ম্ম পালন করা তার চিরকালের নিয়ম। ইছামতীর ঘাটে গিয়ে নিজের হাতের ঝাঁটা দিয়ে সিঁড়ি ধোয়া।

কিন্তু সেদিন মনটা বড় খারাপ ছিল। দুলাল সা'র নিজেকেই যেন বড় দুর্ব্বল মনে হ'তে লাগল। এ-রকম দুর্ব্বলতা দুলাল সা'র অনেক বার মনে উদয় হয়েছে। কোন্‌টা বল আর কোন্‌টা দুর্ব্বলতা তা নিয়ে দুলাল সা বহুকাল মাথা ঘামিয়েছে। কিন্তু এখন এমন একটা সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছিল যেখান থেকে তাকে আর নাড়াবার ক্ষমতা নেই কারও। যদি বল অত্যাচার, যদি বল অন্যায় ত তারও উত্তর আছে দুলাল সা'র। উত্তরটা বাইরের লোককে দেয় না, দেয় সে নিজেকেই।

কেউ যখন কাছে থাকে না, তখন অনেক সময় হরিনামের মালা নিয়ে জপ করতে করতে নিজের সঙ্গেই কথা বলে।

বলে, আমি কি করব বল, পৃথিবীটাই যে এই রকম হয়ে গেছে, আমি ভাল থাকতে চেষ্টা করলেও যে কেউ আমাকে ভাল থাকতে দেবে না—

আবার বলে—কেউ বলে আমি সাধুপুরুষ! তা কে বললে আমি সাধুপুরুষ নই? টাকা আছে বলেই ত লোকে আজ আমাকে সাধুপুরুষ বলে—আগে কর্ত্তামশাই-এর টাকা ছিল, তখন কর্ত্তামশাইকেও লোকে সাধুপুরুষ বলত—

তারপর মালাটা আর একটু জোরে জোরে নাড়তে নাড়তে বলতে লাগল, এইবার এখানে একটা বড় করে আমার পাথরের মূর্ত্তি ক'রে দিয়ে যাব, যাতে মারা যাবার পর সবাই আমাকে পুজো করে—

মনে মনে প্ল্যানটাকে বেশ তারিফ করতে লাগল দুলাল সা।

—আর তারপর টাকা থাকলে আরও অনেক কিছু করা যায়। যেমন ধর ছেলেদের টেক্‌স্‌ট্‌ বইতে নিজের জীবনীটাও ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। শুধু টাকা খরচ, আর কিছু নয়। তারপর ধর ইস্কুলে ইস্কুলে সেই বই পড়াবার ব্যবস্থাও করা যায়। টাকা দিলে কেন পড়ানো হবে না? হেড্‌-মাস্টারদের টাকা দেওয়া হবে। টাকা থাকলে ত আরও অনেক কিছুই করা যায়।

দুলাল সা নিজেই নিজেকে জিজ্ঞেস করলে, কি করা যায় শুনি?

—কেন? এই যে কেষ্টগঞ্জ, এই কেষ্টগঞ্জের নামটা পর্য্যন্ত বদলে দুলালগঞ্জ করা যায়।

—তাও করা যায়?

—খুব করা যায়। কলকাতার রাস্তার নাম বদলাচ্ছে লোকে টাকা দিয়ে, আর এই গাঁয়ের নাম বদলানো যাবে না?

বেশ! বেশ! প্ল্যানটা মাথায় আসতেই দুলাল সা'র মনটা বেশ প্রসন্ন হয়ে উঠল আবার। তা হ'লে একেবারে অমর হয়ে যাওয়া গেল। দুলাল সা'কে আর কেউ ঠেকাবার রইল না তা হ'লে। এবার বিদ্যাসাগর, রবি ঠাকুর, গান্ধীর সঙ্গে তার নামটাও চিরস্থায়ী হয়ে গেল। স্টেশনের নামটাও বদ্‌লানো যায়। রেল-অফিস ত ঘুষের রাজা। টাকা দিলে তারা সমস্ত করতে পারে। তাও দেওয়া যাবে। ঘুষ দিলে যদি স্টেশনের নাম বদলায় ত তাও দেওয়া যাবে। এক হাজারে যদি না হয় ত এক লাখ দেব। এক লাখে না হ'লে দু'লাখ দেওয়া যাবে। নিতাই বসাক বলছিল, কলকাতার কোন্ হাসপাতালেও নাকি টাকা দিয়ে কোন মাড়োয়ারী নিজের নাম করে দিয়েছে। তখন ইষ্টিশানে রেলগাড়ি এসে থামবে। প্যাসেঞ্জাররা জিজ্ঞেস করবে—এটা কোন্ ইষ্টিশান গো?

লোকেরা বলবে—এ দুলালগঞ্জ!

—দুলাল সা'র নামেই বুঝি এর নাম হয়েছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমাদের এই গাঁয়েই তিনি থাকতেন, বড় সাধুপুরুষ ছিলেন। চিরজীবন নিজের হাতে এই নদীর ঘাট ঝাঁটা দিয়ে ধুতেন তিনি, বড় দেবতুল্য মানুষ ছিলেন তিনি—

আসলে ত এমনি করেই বড়লোকদের নাম ছড়ায়। ছোটবেলা থেকে বইতে তারা বিদ্যাসাগরের নাম পড়ে।

প্রথম ভাগ পড়ে। নইলে সবাই-ই ত মানুষ। মানুষের দোষ-ত্রুটি থাকবে না, এ-ও একটা কথা হ'ল? তেমন টাকা দিলে দুলাল সা'কেও বিদ্যাসাগর ক'রে তুলতে পারে। দুলাল সা'র দান-ধ্যানের খবর বই-এর পাতায় পাতায় ছড়িয়ে দিতে পারে। মোট কথা সবই হয়, সবই সম্ভব!

বেশ ভোর হয়ে আসছিল।

স্নান ক'রে মালা জপ্‌তে জপতে বাড়ীর দিকে আসছিল দুলাল সা। কাল রাত্রে কেমন বিদ্‌ঘুটে একটা শব্দ শুনে মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আবার মনটা চাঙ্গা হয়ে উঠল। সবই নশ্বর এ-পৃথিবীতে। একমাত্র নামই সত্য। তাই কথায় আছে—নামৈব কেবলম্—

—নমস্কার সা' মশাই!

—কে?

—আজ্ঞে আমি সতীশ!

—সতীশ! কোন্ সতীশ? বিধু স্যাকরার ছেলে সতীশ, না শশী কবিরাজের জামাই সতীশ? কোন্ সতীশ?

—আজ্ঞে না, আমি ব্লক-অফিসের কেরাণী সতীশ জোয়ার্দ্দার।

—ও, তা তুমি বুঝি ওই সুকান্তবাবুর আপিসে চাকরি কর বাবা? ভাল, ভাল। ভোরবেলা বেড়াচ্ছ বুঝি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ!

—খুব ভাল। ভোরবেলা বেড়াবে আর ওই সঙ্গে যদি বাবা মনে মনে একটু হরিনাম করতে পার ত আরও ভাল। কলিযুগে নামই সত্য, আর সবই মিথ্যে—জান ত, শাস্ত্রে আছে—নামৈব কেবলম্—

সতীশ জোয়ার্দ্দার কথাটা বুঝল কি না কে জানে। হয়ত বুঝল, হয়ত বুঝল না।

বললে, আজ্ঞে, আমাদের কি আর অত পুণ্যফল আছে সা'মশাই? এই দেখুন না, কলকাতা থেকে চাকরি নিয়ে এই বন-জঙ্গলে এসে পড়েছি, কত লোক কলকাতায় চাকরি করছে, আরাম করে সেখানে বাড়ীর ভাত খেয়ে টাকা রোজগার করছে, আর আমার বেলাতেই এই কর্ম্মভোগ—

—ছি বাবা, ছি—

ব'লে দুলাল সা মালা জপ করতে করতেই হাত দুটো হরির উদ্দেশে কপালে ঠেকাল।

বললে, শ্রীহরির কাছে কেউ ছোট-বড় নয় বাবা সতীশ, তাঁর কাছে সবাই সমান! এই যে বাবা আমার কথাই ধর না, আমি যে বাবা এত টাকা করেছি, তার জন্যে কি এই ঘাট ধোওয়া বন্ধ করেছি? তোমাদের টাকা হোক তখন দেখবে বাবা টাকার শান্তি নেই। টাকা থাকাও যা ও না-থাকাও তাই! শান্তি যদি পেতে চাও বাবা ত হরিনাম সার কর, দেখবে ও তোমার টাকা চাকরি সব কিছু তুচ্ছ হয়ে যাবে—

সতীশ বললে, আপনার ছেলে কালকে এসেছেন বিলেত থেকে—

—কেন, তোমরা আস নি? তোমাদেরও ত নেমন্তন্ন করেছিলাম—

—হ্যাঁ, এসেছিলাম বৈ কি! অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল তাই আর ব্লকে ফিরে যাই নি, এখানেই এক বাড়ীতে শুয়ে রাত কাটিয়ে দিয়েছি—

বাড়ীর কাছে আসতেই হঠাৎ যেন দুলাল সা'র চোখ দুটো কিসের ওপর আটকে গেল। পুলিস-দারোগা মনে হচ্ছে। ভাল ক'রে ভোর তখনও হয় নি কেষ্টগঞ্জে। ভোর হ'তেই কেষ্টগঞ্জের থানা থেকে পুলিস-দারোগা এল কি করতে?

সামনে এগিয়ে গিয়ে দুলাল সা আগ বাড়িয়ে বললে, কি বাবা, আবার কি হ'ল? কিছু বিপদ্-আপদ্ হয়েছে নাকি?

নিতাই বসাককে এতক্ষণ দেখতে পাওয়া যায় নি। দুলাল সা'কে দেখে সে এগিয়ে এল।

—কি হ'ল? সদানন্দর খুনের কিছু কিনারা করতে পারলে তোমরা?

নিতাই বসাক বললে, সেই সব এন্‌কোয়ারী করেই এঁরা আমাদের কাছে এসেছেন—

—ধরা পড়েছে তা হ'লে? অপরাধীকে কিন্তু শাস্তি দেওয়া চাই বাবা, আমার বড় আপন-জন ছিল সদানন্দ। সদানন্দ যাবার পর থেকে আমার পাটের গদির সব তছ্‌নছ্‌ হয়ে গেছে বাবা, তেমন লোক আর একটা পাচ্ছি নে—

নিতাই বসাক বললে, না, তা নয়—

দারোগাবাবু বললে, আসলে সেই সদানন্দর মার্ডার-কেস্ নিয়েই এতদিন এন্‌কোয়ারী চলছিল, সেই এন্‌কোয়ারী করতে করতেই আমরা একটা খেই ধ'রে বড়-চাতরায় গিয়েছিলাম—

—বড়-চাতরা? সে কোথায়?

—আজ্ঞে, বর্দ্ধমান জেলায়।

—তা সেখানে সদানন্দর কে ছিল? সদানন্দর ত তিনকুলে কেউ নেই জানতাম—

—কেউ নেই বটে, কিন্তু একজন আছে।

দুলাল সা জিজ্ঞেস করলে, কে সে?

—আপনি তাকে চিনবেন। তার নাম দোলগোবিন্দ প্রামাণিক।

দুলাল সা নামটা আওড়ালে। দোলগোবিন্দ প্রামাণিক! চিনতে পারলে ব'লে মনে হ'ল না।

নিতাই বসাকের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে, তুমি চেন নাকি?

নিতাই বসাককে আর উত্তর দিতে হ'ল না। দারোগাবাবু বললে, সে একজন ঘটক, ঘটকালি করা তার পেশা, আপনার ছেলের বিয়ে দিয়েছিল সে—

—ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ—

যেন এতক্ষণে মনে পড়ল নামটা। বললে, কিন্তু সে ত মাথা-গরমের লোক, বৌভাতের দিন কিছু খেলে না দেলে না, শুধু মাথা-গরম ক'রে বিড় বিড় করতে লাগল—

—কেন বিড় বিড় করতে লাগল আপনি কিছু জানেন?

—কেবল বলছিল তার পনেরো ভরি সোনা নাকি কে ঠকিয়ে নিয়েছে!

—না, ওটা বাজে কথা! আমরা বড়-চাত্‌রায় গিয়ে তার স্টেটমেণ্ট নিয়ে এসেছি। এখন সে অন্যরকম লোক!

—তা তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে পারলে না বাবা। তার সঙ্গে একবার কথা বলতাম! জিজ্ঞেস করতাম কেন সে সদানন্দকে খুন করতে গেল!

দারোগাবাবু বললে—না, সদানন্দকে সে খুন করে নি।

—তা হ'লে? তা হ'লে কে খুন করলে?

—তার ইন্‌ভেষ্টিগেশন এখনও চলছে।

তারপর দারোগাবাবু চারদিকে চাইলে একবার।

জিজ্ঞেস করলে, আপনি কে?

সতীশ জোয়ার্দ্দার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ সব শুনছিল। বললে, আমি সতীশ জোয়ার্দ্দার, ব্লক-আপিসের কেরাণী—

দুলাল সা'র দিকে চেয়ে দারোগাবাবু জিজ্ঞেস করলে, এর সঙ্গে আপনার কিছু দরকার আছে? আপনার সঙ্গে একটু নিরিবিলি কথা বলতে চাই আমরা—

কেউ-ই বলতে গেলে ছিল না তখন আশে-পাশে এক সতীশ জোয়ার্দ্দার ছাড়া। কথাগুলো হচ্ছিল দুলাল সা'র কাছারি-ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে। পাশেই কান্তর বসবার কুঠুরি। তখন তার আসবার কথা নয়। একটু পরেই গদি-বাড়ীর চাবি নিতে আসবে দারোয়ান। গরুর দুধ দুইতে আসবে কেরষাণ। তারপর আসবে খাতক, দেনদার, চাষী, প্রজা। তখন দুলাল সা নতুন ক'রে এখানে মহাজনি করতে করতে হরিনামের মালা জপবে। তখন তমসুক, দলিল, দস্তাবেজ লেখা হবে। কান্তই বলতে গেলে দুলাল সা'র খাজাঞ্চীকে খাজাঞ্চী, আবার মুহুরীকে মুহুরী। আগে ওই সদানন্দই এই কাজ করত। সদানন্দই সব হিসেবের গরমিল, ইনকাম-ট্যাক্সের গোঁজামিল, ব্ল্যাক-টাকার হিসেব-পত্তোর রাখত।

দুলাল সা বললে, আচ্ছা বাবা সতীশ, তুমি বাবা এস এখন। দেখছ ত, একটু যে ধীরে-সুস্থে হরির নাম করব, সংসারে তাতেও অনেক বাধা—

সতীশ আর দাঁড়ায় নি। সে যেন চ'লে যেতে পারলেই বাঁচে—

নিতাই বসাক বললে—চল, এখানে নয়, বাইরের লোক কেউ এসে যেতে পারে, এ-সব কথা নিরিবিলিতে হওয়াই ভাল—

—কিন্তু ব্যাপারটা কি?

দুলাল সা বুঝতেই পারছিল না এত লুকোচুরি করবার কি দরকার। সদানন্দ খুন হয়ে গেছে। তার খুনের কিনারা তোমরা কর। পারলে খুনীকে ধর। ধ'রে তার ফাঁসি দাও। আমাদের তার সঙ্গে কিসের সম্পর্ক! তা ছাড়া কালকেই বিজয় এসেছে বিলেত থেকে কতকাল পরে। কাল অনেক রাত পর্য্যন্ত সবাই খাওয়া-দাওয়া করেছে। এখনও বাড়ীর সামনে কলা-পাতার ডাঁই পড়ে আছে। ভাঙা মাটির খুরি-গেলাস পড়ে আছে। আর তারপর এই ভোর বেলাই আবার এ কি হ্যাঙ্গাম রে বাবা!

ঘরের ভেতরে একটু তবু আড়াল হ'ল।

দারোগাবাবু বললে, আপনার ত একই ছেলে, ওই কালকে যিনি বিলেত থেকে এলেন!

নিতাই বসাক বললে, হ্যাঁ—

—আপনি কোথায় বিয়ে দিয়েছেন সেই ছেলের?

—নদীয়া জেলার মালিকান্দায়। মালিকান্দার সামন্ত-বাড়ীর মেয়ে আমার বৌমা, আমি বলি নতুন-বৌ—

—সেখানে কে আছে আপনার ছেলের শ্বশুর-বাড়ীতে?

নিতাই বসাক বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করলে, আপনি

এত কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন? সদানন্দর খুনের সঙ্গে তার সম্পর্ক কিসের?

দারোগাবাবু বললে, আছে বসাকবাবু, আছে। কিছু সম্পর্ক না থাকলে কি আর মিছিমিছি জিজ্ঞেস করছি! দোলগোবিন্দ প্রামাণিক আমাদের কাছে যে স্টেটমেণ্ট দিয়েছে তার সঙ্গে মিলিয়ে নিচ্ছি।

তারপর দুলাল সা'র দিকে ফিরে বললে, এত কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করছি ব'লে আশা করি আপনি কিছু মনে করবেন না। আপনি ভাল ক'রে দেখে-শুনে খোঁজ-খবর নিয়েই ছেলের বিয়ে দিয়েছেন নিশ্চয়।

—ও-কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?

—কেন জিজ্ঞেস করছি তা শিগগিরই জানতে পারবেন। আমিও চাই দোলগোবিন্দর কথা মিথ্যে হোক্। দোলগোবিন্দর কথা মিথ্যে হ'লে আমিও আপনার মতই খুশী হব।

নিতাই বসাক বললে, দোলগোবিন্দ পাগল মানুষ, তার স্টেটমেণ্টের দাম কি?

—দাম আমাদের কাছে আছে।

দুলাল সা বললে, তা ত বটেই বাবা, সদানন্দর খুনের যদি তাতে কিনারা হয় ত নিশ্চয় দাম আছে—

দারোগাবাবু জিজ্ঞেস করলে, খোঁজ-খবর নিয়ে দেখেছেন কি যে সত্যিকারের সামন্ত-বাড়ীর মেয়ে আপনার বৌমা?

—তা দেখেছি বৈ কি বাবা। ছেলের বিয়ে দেব আর খোঁজ-খবর নেব না?

—কিন্তু দোলগোবিন্দ বলেছে, আপনার ছেলের সঙ্গে নাকি সে জেলের মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিয়েছে—

—জেলের মেয়ে? বলছেন কি আপনি?

হঠাৎ নতুন-বৌ এই সময়ে ঘরে ঢুকল।

বললে, বাবা—

তারপর পুলিস-দারোগাকে দেখে কেমন যেন অবাক্ হয়ে গেল। বললে, আপনার পূজোর জোগাড় করেছি যে বাবা—

দারোগাবাবু, নিতাই বসাক, দুলাল সা সবাই নতুন-বৌ-এর দিকে যেন অন্য দৃষ্টি দিয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। এ কি কাণ্ড! এমন হবে তা কি জানত কেউ! নতুন-বৌ-এর মুখে কি তার কোনও ছাপ প'ড়ে আছে এখনও?

ক্রমশঃ

তৈত্তিরীয়োপনিষদ্

নবম অনুবাদ

শ্রীপুষ্প দেবী

সেই ব্রহ্মরে নম, এই বলি' উপাসনা যেই করে,
কামনা আপনি বশে আসে তার, নত হয় লাজভরে।
ব্রহ্মরে সেই প্রভু বলি' জানে
প্রভুত্ব লাভ করে সেই জ্ঞানে।
ব্রহ্মরে সেই আকাশ বলিয়া অনন্ত বলি মানে।
অজাতশত্রু হয় সেই জন, অন্তরে মনে প্রাণে।

বিরাট্ বিশাল অনন্তরূপে সর্ব্বব্যাপী যে জন
তাহার শত্রু, দ্বেষ-বিদ্বেষ হবে বলো কি কারণ?
সূর্য্যের মাঝে উজ্জ্বলতম
রহে সেই জন প্রতীক যে মম,
তাঁর সাথে মোর অভেদ-আত্মা, আমিই জগৎময়,
একথা যে জানে তাহার শত্রু সমূলে বিনাশ হয়।

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

শিশু দিবসের উপলক্ষ্যে

রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণ 'শিশু দিবস' পালনের উপলক্ষ্যে এক বেতার ভাষণে জাতির উদ্দেশ্যে বলেন: "কি ভাবে আমরা শিশুদের দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটাইব, তাহার উপরেই জাতির ভবিষ্যৎ রূপ নির্ভর করে। শিশুদের এমন ভাবে মানুষ করা উচিত যাহাতে বড় হইয়া তাহারা সহিষ্ণুতা ও সার্ব্বজনীন প্রীতির (?) মুল্য বুঝিতে পারে।"

রাষ্ট্রপতি আরো বলেন যে, "শিশু দিবস দুই দিক্ দিয়া তাৎপর্য্যপূর্ণ। জাতির জীবনে শিশুর ভূমিকা আর শিশুদের প্রতি জাতির দায়িত্ব। শিশুদের জাতির ঐক্য এবং সংহতির মূল্য বুঝিতে হইবে। দেশের সহিত এবং পরস্পরের সহিত একাত্মতা অনুভব করিতে হইবে। যুগ যুগ ধরিয়া ভারতের মহান্ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মূল বাণী, জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা, সর্ব্বজীবে প্রীতি ও পরমত-সহিষ্ণুতা যেন তাহারা শিখিতে পারে।"

আদর্শ এবং নীতি হিসাবে রাষ্ট্রপতির বাণী সকলজনের শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণের যোগ্য বলিয়া মনে করি। কিন্তু শিশুদের যে মহান্ কর্ত্তব্য এবং দায়িত্ব সম্যক্ অনুধাবন এবং বুঝিবার কথা রাষ্ট্রপতি তাঁহার ভাষণ প্রসঙ্গে জাতিকে বলিতেছেন—সেই মহান্ দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্যবোধ আমাদের 'শিশু রাষ্ট্রের' (১৬ বছর বয়ঃপ্রাপ্তিতেও) 'বুড়ো' খোকাদের সর্ব্বপ্রথম বুঝাইবার এবং বুঝিবার উপদেশ দিলে ভাল হইত বলিয়া মনে করি। শিশুরা "জাতীয় ঐক্য এবং সংহতি" কি বস্তু, তাহা, যাহারা বয়সে-কিঞ্চিৎ-বড়, আমাদের কংগ্রেসী "শিশু" শাসকের ক্রিয়াকর্ম্ম দেখিয়াই শিখিবে। শিশুমনে "জাতীয় ঐক্য এবং সংহতি" বোধ কিছুটা গুরুপাক দ্রব্য বলিয়া মনে হয়। 'বয়স্ক শিশুরা' এ-দুইটি প্রয়োজনীয় বস্তু লইয়া নিজেদের খেয়ালখুশি এবং স্বার্থের প্রয়োজনে যে-খেলা করিতেছেন, তাহা শিশুচিত্তে শ্রদ্ধা জাগরিত না করিয়া ঘৃণা এবং বিতৃষ্ণাই জাগ্রত করিবে। নিজে ধর্ম্ম আচরণ করিয়া, ধর্ম্মে সত্য বিশ্বাস স্থাপন করিয়া—পরকে শিখাইবার কাজে ব্রতী হওয়াই শ্রেয় এবং কার্য্যকর হইতে পারে। এ-দেশের নিপীড়িত শিশুদের জীবনে বড় বড় বাণীর উৎপীড়ন কতখানি সহ্য এবং সুফলদায়ক হইবে—সন্দেহের বিষয়।

শিশু দিবস এবং জবাহরলাল

রাষ্ট্রপতি বলেন যে "—শিশু দিবস এমনই একজনের জন্মদিনে পড়িয়াছে, যিনি শিশুদের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার উপর চিরদিন জোর দিয়া আসিতেছেন এবং যাঁহার জীবন হইতে শিশুদের অনেক কিছু শিখিবার আছে।" বলা বাহুল্য এই ব্যক্তিটি আর কেহ নহেন—এক এবং অদ্বিতীয় শ্রীজবাহরলাল নেহরু—আমাদের প্রধানমন্ত্রী। অদ্যকার জবাহরলালের জীবন হইতে শিশুদের আর যাহাই শিখিবার থাকুক—'পরমত-সহিষ্ণুতা' নামক গুণটি অবশ্যই শিখিবার মত নহে বলিয়া মনে করি। শিশু দিবস উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি জবাহরলালকে টানিয়া না আনিলেই ভাল করিতেন।

রাষ্ট্রপতির "ঐকান্তিক ইচ্ছা এই যে, তিনি (জবাহরলাল) সুদীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া আমাদের দেশ ও পৃথিবীকে (?) নেতৃত্ব দান করুন।" রাষ্ট্রপতির ঐকান্তিক-ইচ্ছায় আমাদের আপত্তি করিবার কিছুই নাই—। জবাহরলাল সুদীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকুন—কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দেশ তাঁহাকে আর যে চাহিতেছে না—এই বোধটুকু শ্রীভগবান্ তাঁহাকে অচিরে দান করুন! দেশ-শাসকের সর্ব্বোচ্চ পদ হইতে সরিয়া গিয়া তিনি মহানন্দে এবং প্রসন্নচিত্তে পৃথিবীর নেতৃত্ব করুন—এই আমাদের-প্রার্থনা।

রাষ্ট্রপতির কামনামত 'অদ্যকার'-শিশুরা যদি 'অদ্যকার'-

প্রধানমন্ত্রীর মত বাক্য-সর্ব্বস্ব হইয়া উঠে এবং নেহরুর মত কাজে-অকাজে, প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে, কারণে-অকারণে কেবলমাত্র বাক্যের স্রোতই বহাইতে শিক্ষালাভ করে, তাহা হইলে ভবিষ্যৎ ভারতের সম্পর্কে আশা করিবার কিছুই থাকিবে না। এই প্রসঙ্গে বলা কর্ত্তব্য—আমরা বিশ বৎসর পূর্ব্বের জবাহরলাল নামক পরম দেশভক্ত, মহান্-চরিত্র এক ব্যক্তি সম্পর্কে কোন মন্তব্য করিতেছি না। আমাদের বর্ত্তমান মন্তব্যগুলি বিশেষভাবে অদ্যকার প্রধানমন্ত্রী জবাহরলাল নেহরু সম্পর্কেই। আমাদের একদা-আদর্শস্থানীয় জবাহরলালকে চিরতরে হারাইয়াছি! দুঃখ ও বেদনা এইখানেই।

ভারতের শিশু ও ডাঃ সুশীলা নায়ার

সুশীলা নায়ার শিশু দিবস উপলক্ষ্যে বলিয়াছেন যে, "শৈশব যেন সুন্দর ও সুস্থ হয়। শিশুরা যেন পরে যোগ্য ও দায়িত্বশীল নাগরিক হয়। তাহারা যেন দক্ষতা ও প্রত্যয়ের সহিত ভবিষ্যতের ভার বহনের উপযুক্ত শিক্ষা পায়।—ইহাই হইল শিশুদের সম্পর্কে জাতীয় নীতি।"

শিশুদের সম্পর্কে উপরি-উক্ত 'জাতীয় নীতি' অতীব সাধু এবং উত্তম। কিন্তু এই সাধু ইচ্ছা এবং উত্তম পরিকল্পনা বাস্তবে কতটুকু পালিত হইতেছে? ডাঃ নায়ারকে পরিহাস করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে—কিন্তু শিশুদের সম্পর্কে নেহরু সরকারের 'জাতীয় নীতির' কথা আমরা গত ১৫।১৬ বৎসর ধরিয়া কর্ণে শ্রবণ করিতেছি—কিন্তু চোখে ভারতের শতকরা অন্ততঃ ৮০টি শিশুর কি রূপ দেখা যাইতেছে? ডাঃ নায়ার স্বয়ং যদি একবার পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম এবং শহরগুলিতে দয়া করিয়া পদব্রজে পরিভ্রমণ করেন—এ-রাজ্যের শিশুদের বাস্তব রূপ কি এবং শিশুদের সম্পর্কে জাতীয় নীতি কি ভীষণ নিষ্ঠা এবং সততার সহিত প্রতিপালিত হইতেছে তাহার সামান্য কিছু পরিচয়সহ কঠিন অভিজ্ঞতাও লাভ করিবেন।

এ-রাজ্যের শতকরা প্রায় ৮০টি শিশু এক বেলাও পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, না পায় অসুখে সামান্য ঔষধ, সহস্র সহস্র দরিদ্র শিশু বাল্যকালটা দিগম্বর হইয়াই কাটাইতে বাধ্য হয়। ইহাদের শিক্ষার কথা না বলাই ভাল! মফঃস্বল অঞ্চলে হাজার হাজার টাকার শ্রাদ্ধ করিয়া বিরাট্ আয়তন বহু বিদ্যাভবন নির্ম্মিত হইয়াছে, এখনও হইতেছে, কিন্তু এই সকল বিদ্যালয়ে যে-সব শিশু এবং বালক-বালিকা ছিন্ন-মলিন বসনে এবং বদনে, খালিপেটে আধমরা অবস্থায় বিদ্যাশিক্ষা করিতে যায়, তাহাদের প্রতি একবার কৃপাদৃষ্টিপাত করিলেই ডাঃ নায়ার এবং অন্যান্য উপরতলাবাসী কংগ্রেসী কর্ত্তারা পশ্চিমবঙ্গের পরম ভাগ্যবান্ শিশুদের সম্পর্কে হয়ত কিছুটা জ্ঞানলাভ করিবেন এবং শিশুদের কারণে, প্রতি বৎসর বিশেষ একটা দিনে ঘটা করিয়া বড় বড় 'জাতীয় নীতির' কথা উচ্চারণের সঙ্গে শিশুদের জন্য মায়া-কান্নার স্রোত আর বহাইবেন না।

ডাঃ নায়ার আশা করিতেছেন—ভারতের বর্ত্তমান শিশুরা যেন দক্ষতা ও প্রত্যয়ের সহিত ভবিষ্যতের ভার বহনের উপযুক্ত শিক্ষা পায়। অতি উচ্চ আশা সন্দেহ নাই। ভারতের অন্যরাজ্যের কথা জানি না, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের শিশুদের সম্পর্কে এরূপ কোন আশা পোষণ বা তোষণ করিবার পক্ষে কোন সঙ্গত কারণই চোখে পড়ে না। এ-রাজ্যের হতভাগ্য পিতামাতার আরও শতগুণ-হতভাগ্য শিশুদের বর্ত্তমান জীবন-ধারা এমন ভীষণ এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন যে, তাহাদের পক্ষে ভবিষ্যৎ বলিয়া কিছু যে আছে ইহা কল্পনাতীত, ধারণাতীত। উপরে পরম আরাম-বিলাসের মধ্যে বসবাস করিয়া—নিচের দৃশ্য হয়ত চোখে ভাল দেখায়, কিন্তু যাহারা নিচুতলার কর্দ্দমাক্ত মাটিতে নারকীয় দারিদ্র্য এবং অভাব-অভিযোগের ভীষণ চাপে এবং তাপে প্রতিনিয়ত দগ্ধ হইতেছে—তাহাদের পক্ষে জীবনে আশা করিবার এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনার কোন অবকাশ থাকিতে পারে কি না চিন্তার বিষয়। যে-দেশের প্রধানমন্ত্রী নিজের দৌহিত্রদের শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে হ্যারোতে পাঠাইতে দ্বিধাবোধ করেন না, সেই প্রধানমন্ত্রীর পক্ষেও দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত শিশুদের 'বুনিয়াদি' বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিবার প্রেরণা দান শোভা পায় না! 'বুনিয়াদি' শিক্ষা বর্ত্তমানে কংগ্রেসী হঠাৎ-ধনীদের একচেটিয়া এবং 'বুনিয়াদি' শিক্ষার নামে অকেজো অবহেলার দান—ইতরজনের জন্যই, এ-কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন কি?

প্রসঙ্গক্রমে এ-কথা বলার প্রয়োজন আছে যে, শাসন-কর্ত্তারা দেশের শিশুদের সম্পর্কে বৎসরে অন্ততঃ একদিন প্রচুর দরদের সঙ্গে সুপ্রচুর আদর্শ নীতি প্রচার করেন, কিন্তু এ-কথা তাঁহারা জানেন কি যে—এই ভাগ্যহত পশ্চিমবঙ্গে অন্ততঃপক্ষে শতকরা ৭০টি পরিবার অর্থের অভাবে তাঁহাদের ছেলেমেয়েদের কোন প্রকার সামান্যতম শিক্ষার ব্যবস্থাও

করিতে অপারগ ? গ্রামাঞ্চলে ছেলেমেয়েদের এই করুণ অবস্থা আরও প্রকট।

ভারত সরকারের সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক এক অপূর্ব্ব চিত্র পরিস্ফুট হইয়াছে। সমীক্ষায় দেখা গিয়াছে :

১৫০টি পরিবারের এক গ্রামের মাত্র ৬০টি পরিবার কাপড় কাচার জন্য সাবান ব্যবহার করে, কয়লা ব্যবহার করে ৫০টি পরিবার। মশারী ব্যবহার করিবার মত অবস্থা মাত্র ৬০টি পরিবারের। এই ১৫০টি পরিবারের মধ্যে ১১টি পরিবার সংবাদপত্র পাঠ করে, ভাল বাড়ীতে বাস করে মাত্র ১০টি পরিবার। সাইকেল ক্রয় এবং ব্যবহার করিবার অবস্থা ১০টি পরিবারের এবং কেবলমাত্র ১০টি পরিবারের দুইটি করিয়া গো-সম্পদ্ আছে ! এই ১৫০টি পরিবারের মধ্যে ১০।১২টি পরিবারের ছেলেমেয়েরা সামান্য লেখাপড়া করিবার অবকাশ পায়, অবশিষ্ট নিরক্ষরের দল। গ্রামাঞ্চলের বেশীর ভাগ লোকই 'জাতীয় সম্প্রসারণ পরিকল্পনা'র কোন কিছু জানে না, জানার প্রয়োজন বোধও করে না !

এ-বিষয় অধিক মন্তব্যের অবকাশ নাই। শাসনকর্ত্তাদের ধন্যবাদ—তাঁহারা দেশের এই চির 'পতিত-জমি' হইতেই জাতির ভবিষ্যৎ সু-ফসল উঠাইবার সু-চিন্তা করিতেছেন।

ডি-ভি-সি করুণা-প্রবাহে পাকা ধানে মই

পশ্চিমবঙ্গে যখন নিদারুণ ভাবে ধান এবং চাউলের অভাব চলিতেছে এবং লক্ষ লক্ষ লোক চাউলের অভাবে প্রায় অনাহারে জীবনযাপন করিতে বাধ্য হইতেছে—ঠিক সেই সময় পরম করুণার আধার ডি-ভি-সির কর্ত্তারা—

অক্টোবর মাসের শেষে ...... "অসময়ে" জল ছাড়িয়া হুগলী জেলার খানাকুল থানার ২৫ হাজার বর্গ একর ধানের জমি ডুবাইয়া দেওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন কেন্দ্রীয় সেচমন্ত্রী ডাঃ কে এল রাও-এর নিকট এক "কড়া চিঠি" লিখিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

ড ভি সির হঠকারিতায় প্রায় ৪০ বর্গ মাইল এলাকা প্লাবিত হয় এবং রাজ্য সেচ দপ্তরের হিসাবে ৫ লক্ষাধিক মণ ধান (আনুমানিক মূল্য ১ কোটি টাকা) এবং সাড়ে সাঁইত্রিশ হাজার কাহন খড় (আনুমানিক মূল্য লক্ষাধিক টাকা) নষ্ট হইয়াছে। ডি ভি সি ৮০ হাজার কিউসেক জল ছাড়িয়া দেন বলিয়া প্রকাশ। হুগলীর জেলা শাসক দুর্গত এলাকার অধিবাসীদের সাহায্যের জন্য মহাধিকরণে জরুরী বার্তা প্রেরণ করিয়াছেন।

ডি-ভি-সির বর্ত্তমান কর্ত্তৃপক্ষ অবাঙ্গালী এবং ভিন্ন রাজ্যের লোক। তাঁহাদের বেপরোয়া 'জলকেলী' দেখিয়া ইহাই মনে করা স্বাভাবিক যে—এ-রাজ্যের ইষ্টানিষ্টের সহিত তাঁহাদের কোন ক্ষয়-ক্ষতির কোন ভাবনাই নাই। তাঁহারা আসিয়াছেন অর্থ রোজগার করিতে, এবং অনর্থ সৃষ্টি করিলেও যদি তাঁহাদের টাকার থলিতে হাত না পড়ে তাহা হইলে জল ছাড়িয়া অনর্থ সৃষ্টি করাটা তাঁহাদের কাছে একটা পরিহাস ছাড়া আর কি হইতে পারে ?

সংবাদে জানা যায়—যে ক্ষেতের ধান প্লাবনে নষ্ট হইল, তাহা আর কয়েকদিনের মধ্যেই কাটিয়া ঘরে তুলিবার অপেক্ষায় ছিল। দয়াময় ডি-ভি-সি কর্ত্তৃপক্ষ কি আর দুইটা দিন অপেক্ষা করিয়া এবং কয়েকদিনের নোটিশ দিয়া বাঁধের জল ছাড়িতে পারিতেন না ? এই পরম দায়িত্বহীনতার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ডি-ভি-সির সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষের সম্পর্কে কি ব্যবস্থা করিবেন জানি না, কিন্তু এই এক কোটি টাকার ধান এবং প্রায় দেড়লাখ টাকার খড়ের ক্ষতিপূরণ কে করিবে ? দরিদ্র কৃষকদের উপর এ-নিষ্ঠুর অত্যাচারের বিচার কোন মহাপ্রভু করিবেন ?

মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সেন যদি ডি-ভি-সির কর্ত্তাদের আদালতে অভিযুক্ত করিয়া বিচারের দাবী করেন—তাহাতে কি দোষ হইবে ? প্রধানমন্ত্রীর নিকট হইতে অপরাধীর সুবিচার আমরা আশা করি না—কারণ ইতিপূর্ব্বে ইহাই দেখা গিয়াছে যে,—প্রশাসনের উচ্চস্তরে সর্ব্বপ্রকার অনাচার, দায়িত্বহীনতা এবং প্রশাসনিক-ব্যভিচারের পরম এবং চরম আশ্রয়দাতা জবাহরলাল নেহরু। বাক্যে এবং কার্য্যে তাঁহার 'বিন্দুপ্রমাণ মিলও দেখা যায় না।

আমরা আশা করি শ্রী প্রফুল্ল সেন, পশ্চিমবঙ্গের যে-ক্ষতি ডি-ভি-সির কয়েকজন অর্ব্বাচীন বড় কর্ত্তা ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় করিলেন, সেই মারাত্মক অপরাধের বিচার এবং ক্ষতিপূরণের দাবির জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। এ-বিষয় প্রধানমন্ত্রীর মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিলে কোন লাভ হইবে না, কারণ প্রধানমন্ত্রী মহাশয় বর্ত্তমানে দেশের 'সমৃদ্ধি বৃদ্ধির' জন্য কলকারখানা 'লইয়া মশগুল এবং ব্যস্ত-চিন্তিত আছেন। দু-চার কোটি টাকার ফসল রহিল কি গেল, বিশেষ করিয়া ঐ ফসল যদি পোড়া-কপাল পশ্চিমবঙ্গের হয়, তাহাতে তাঁহার মস্তক-বেদনার কোন কারণ ঘটিতে পারে না !

আমাদের প্রধানমন্ত্রীর সকল বিষয়ে দৃষ্টি অতি প্রখর—

কিন্তু এত দৃষ্টি-প্রখরতা সত্ত্বেও গত কয়েক মাস ধরিয়া পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়া খাদ্যাভাব এবং সেই খাদ্যশস্যের অসম্ভব মূল্যবৃদ্ধির বিষয়ে আমরা পশ্চিমবঙ্গবাসী অধীন প্রজারা তাঁহার শ্রীমুখ হইতে একটা সমবেদনা কিংবা আশার ফাঁকা বাণীর একটি কথাও আজ পর্য্যন্ত শুনিতে পাইলাম না? তিনি রাজকার্য্যে এতই ব্যস্ত যে—একটা রাজ্যের কয়েক কোটি লোকের দুঃখকষ্ট, অভাব-অভিযোগের বিষয় তাঁহার ভাবিবার সময়াভাব একান্ত!

ডি-ভি-সি'র রহস্য

প্রায় ১৫ বৎসর পূর্ব্বে আকাশপ্রমাণ উচ্চ আশা এবং 'প্রতিশ্রুতি' লইয়া দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন কার্য্যারম্ভ করে। স্বয়ংশাসিত এই কর্পোরেশন কেন্দ্রীয় সরকার, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার সরকারের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত। এই কর্পোরেশনের উপরেই ডি ভি সি'র পরিচালনা ভার দেওয়া হয়। গত ১৫ বছরে ডি ভি সি ১৫৫ কোটি টাকারও কিছু বেশী খরচ করিয়াছে এবং এই অর্থের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গকে দিতে হইয়াছে প্রায় ৮৬ কোটি টাকা। বিহার সরকার দিয়াছে ৩১ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের হিসাবে আছে ৩৮ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গকে এই কর্পোরেশনের মোট খরচার শতকরা ৫৬ ভাগ বহন করিতে হইয়াছে। অর্দ্ধেকেরও বেশী টাকা পশ্চিমবঙ্গের ট্যাক হইতে গেলেও ডি ভি সির লাভের গুড় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভোগ করিতেছে বিহার, মোট খরচের মাত্র ২০ শতাংশ দিয়া। বলা বাহুল্য ডি ভি সি'র জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে অর্থ ব্যয় করেন, সেই ৩৮ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকার মধ্যেও পশ্চিমবঙ্গ হইতে আদায়ী প্রায় ৮।১০ কোটি টাকা আছে। কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের নিজস্ব জমিদারী কিছু আছে বলিয়া জানা নাই। কেন্দ্রীয় সরকার— সোজা কথায় 'নেপোয় মারে দৈ', ভূমিকায় অভিনয় করিতেছেন:

> পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুতের স্থায়ী ঘাটতি সত্ত্বেও মোট উৎপাদনের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ বিহারকে সরবরাহ করা হয় বলিয়া ডি-ভি-সির বিরুদ্ধে একাধিকবার অভিযোগ উঠিয়াছে। বন্যা-নিয়ন্ত্রণ ডি-ভি-সির অন্যতম উদ্দেশ্য হইলেও, সে-উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। পশ্চিমবঙ্গের দশ লক্ষ একর খারিফ শস্যের ও তিন লক্ষ একর রবিশস্যের জমিতে সেচের জল সরবরাহ করার কথা ছিল। এই দীর্ঘ পনেরো বৎসর পরেও ডি-ভি-সি সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে পারে নাই। ১৯৬৩ সালেও নাকি মাত্র সাত লক্ষ একর খারিফশস্য ও পঞ্চাশ হাজার একর রবিশস্যের জমিতে জল সরবরাহ করা সম্ভব হইয়াছে। ডি-ভি-সি প্রধান সেচখালে জল ছাড়িয়াই তাহার দায়িত্ব সারিতে চাহিয়াছে। জমিতে জল পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য ছোট খাল কাটার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের উপর বর্ত্তাইলেও মাঝারি সংযোগ-খাল কাটার ব্যাপারে ডি-ভি-সি চূড়ান্ত অবহেলা করিয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে মাঝারি খাল কাটার জন্য তিন কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। পুরাতন খালগুলির উন্নয়ন ও দরকার অনুসারে নূতন খাল কাটার জন্যও তৃতীয় পরিকল্পনায় আড়াই কোটি টাকা বরাদ্দ আছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও ডি-ভি-সি কর্তৃপক্ষের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই চলিতে থাকায় কাজ কিছুই হয় নাই। ফলে চাষীদের জমিতে দরকারমত জল পৌঁছায় নাই এবং গড়ে শতকরা তিরিশ ভাগ জল অপচয় হইয়াছে। জলের এই অপচয়ের জন্য একদিকে অনেক জমি সেচের জল হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, এবং অপরদিকে জমিতে বেশী জল সরবরাহ হওয়ায় ফসলের ক্ষতি হইয়াছে এবং ভূগর্ভস্থ জলের স্তর উপরে উঠিয়া আসায় বন্যানিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা নষ্ট করিয়াছে।
>
> ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে রাজ্য সরকার ডি-ভি-সির সেচ-বিভাগের ভার গ্রহণ করিবেন। (আপাততঃ করিয়াছেন)। চাষীদের নিকট ডি-ভি-সির জল-সরবরাহ লইয়া রাজ্য সরকার ও ডি-ভি-সি-কর্তৃপক্ষের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরিয়া যে-বিরোধ চলিতে-ছিল, ডি-ভি-সির অঙ্গচ্ছেদ করিয়া তাহার অবসান হইবে বলিয়া আশা করা হইতেছে। বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলী ও হাওড়ার চাষীরা প্রয়োজনের সময় সেচের জল পায় না—পরিমাণমত ত নয়ই। চাষের জন্য মাঠে জল-সরবরাহের দায়িত্ব রাজ্য সরকারের, কিন্তু বাঁধ হইতে সেই জল ছাড়ার অধিকার ডি-ভি-সির। এই দ্বৈত কর্তৃত্বের জন্য কোথাও কোন অভিযোগ উঠিলে পরস্পরের ঘাড়ে দোষ চাপাইবার চেষ্টা করা হইত। ডি-ভি-সির বর্ত্তমান কাঠামো বজায় রাখিয়া সেই অভিযোগের প্রতিকারের কোন চেষ্টা হয় নাই। তাই ডি-ভি-সির সেচবিভাগ হস্তান্তর করিয়া সমস্যার সমাধান খুঁজিতে হইয়াছে।

কিন্তু এই পরিবর্তনের ফলে ডি ভি সির মূল সমস্যার সমাধান হইবে কি? কারণ—পশ্চিমবঙ্গ

> রাজ্য সরকার সেচের জল সরবরাহ করিবার সুযোগ লাভ করিলেও ডি-ভি-সি-প্রতিশ্রুত সেচের লক্ষ্য পূরণ করা সম্ভব হইবে না। ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত শ্রীকুঙ্গারের রিপোর্টে দেখা যায় যে, জলের চাহিদা যেখানে ১২·৮ লক্ষ বর্গ-ফুট, সেখানে ডি-ভি-সি বাঁধের সঞ্চয়ক্ষমতা নাকি মাত্র ৭·৬ লক্ষ বর্গ-ফুট। কাজেই ৫·২ লক্ষ বর্গ-ফুট জলের ঘাটতি পূরণ করিতে হইলে জলের সঞ্চয়ক্ষমতা দেড়গুণ বাড়ান দরকার। কিন্তু বৃষ্টির জল ধরিয়া রাখিতে হইলে বিহারের মধ্যে যে-সব নূতন বাঁধ নির্ম্মাণ করিতে হইবে, রাজ্য সরকারকেই তাহার খরচ বহন করিতে হইবে। এজন্য বিহারের মধ্যে প্রয়োজনীয় জমি সংগ্রহ করার ব্যাপারে অসুবিধা দেখা দিবে। কারণ ডি-ভি-সিই পাঞ্চেত জলাধারের আয়তন বড় করিবার জন্য জমি সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু বিহার সরকারের অসহযোগিতার ফলে তাহা সম্ভব হয় নাই।

আরো ভাবিবার কথা এই যে:

> সেচ-বিভাগের কর্তৃত্ব পরিবর্ত্তনের ফলে ডি-ভি-সির পক্ষে কলিকাতা হইতে মাইথনে হেড-অফিস স্থানান্তর করা সহজ হইবে এবং পশ্চিমবঙ্গের

স্বার্থ আগের চেয়ে অনেক বেশী উপেক্ষিত হইবে। আবার ডি-ভি-সি'র সেচ-খালগুলি রক্ষণাবেক্ষণ পুরাতন খাল ও নদীগুলি গভীর রাখা এবং জলের অপচয় বন্ধ করিবার ব্যবস্থা এবং এ ব্যাপারে কর্ম্মীদের শিক্ষাদানের জন্য টাকা খরচ করিবার দায়িত্ব হইতে রেহাই পাইবেন। এখন হইতে রাজ্য সরকারকেই যাবতীয় ব্যয় বহন করিতে হইবে।

তবে ইহার একটা সামান্য ভালো দিক্‌ও আছে। এত-দিন পশ্চিমবঙ্গ ডি ভি সি'র রাজকীয় ব্যয়ভারের অর্দ্ধেকের বেশী বহন করিতে বাধ্য হইলেও—ডি ভি সি'র বড় বড় বড় উচ্চ বেতনযুক্ত পদগুলিতে বাঙ্গালীকে বিশেষ সুবিধা করিতে দেওয়া হয় নাই। বিহারকেও না। বড় বড় চাকরির ব্যাপারে দক্ষিণ ভারতীয়দের দামোদর ভ্যালীর ক্ষীরটুকু বিশেষ ভাবে ভোগ করিবার অধিকার দেওয়া হয় কোন এক অলিখিত কারণে। পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহার রাজ্যের মধ্যে যাহাতে চাকুরি লইয়া কোন তিক্ততা না দেখা দেয় বোধহয় সেই কারণেই দুই রাজ্যের দাবী অগ্রাহ্য করিয়া একেবারে দক্ষিণ ভারতীয় আমদানী করা হয়। দক্ষিণ ভারতের এই প্রকার কোন প্রকল্পে কিন্তু বাঙ্গালী বা বিহারীরা অপাংক্তেয়! নূতন ব্যবস্থায় হতভাগ্য পশ্চিম বঙ্গের আরো কিছু সংখ্যক লোকের কর্ম্মসংস্থান হয়ত হইবে। তবে না আঁচাইলে বিশ্বাস নাই।

প্রখর-দৃষ্টি প্রধানমন্ত্রী

কিছুদিন পূর্ব্বে দুর্গাপুরে প্রাধানমন্ত্রী নেহরু একটি সরকারী কারখানা উদ্বোধন করিতে দয়া করিয়া গমন করেন। এই উদ্বোধনী সভায় পশ্চিম বঙ্গের দুর্গাপুরে হাজার হাজার পশ্চিমবঙ্গবাসীর নিকট প্রধানমন্ত্রী 'রাজভাষা' হিন্দীতে ৩০ মিনিটের একটি 'ছোট' বক্তৃতা দেন। বলা বাহুল্য মন্ত্রী-প্রধানের ভাষণে সেই বহু-বহু বহুবার বলা ফাঁকা আদর্শবুলির একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি। তবে 'হিন্দী'তে ভাষণ দেওয়ার ফলে বাঙ্গালী শ্রোতাদের নিকট হয়ত বা ইহা নূতন কিছু (অবোধ্য বলিয়া) বলিয়া মনে হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের অভিযোগ ইহা লইয়া নহে—। প্রধানমন্ত্রী

"মঞ্চ হইতে নামিয়া রুশ-ভারত সহযোগিতার প্রতীক হিসাবে নির্ম্মিত ত্রিকোণ স্তম্ভের নিকট যান এবং ইংরেজী ভাষায় লেখা একটি ফলকের আবরণ খোলেন। কিন্তু শুধু ইংরেজীতে ফলক লেখা থাকায়......" প্রধানমন্ত্রী নেহরুর ক্রোধাগ্নি জ্বলিয়া উঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে চেয়ারম্যান ডঃ রাওকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করেন—"ফলক হিন্দীতে লেখা হয় নি কেন? (চার্জশীট দেওয়া হইয়াছে কি না জানা নাই)। শীগগিরই আর একটি হিন্দীতে লেখা ফলক যেন লাগানো হয়—" এই আদেশ দেন।

প্রধানমন্ত্রী বাঙ্গলা দেশের বুকে হাজার হাজার বাঙ্গালীর সামনে বাঙ্গলাতে লেখা ফলকের কথা বলিতে পারিলেন না কেন? এখানেও সেই জোর করিয়া হিন্দী ঘাড়ে চাপাইবার প্রচেষ্টা! আশ্চর্য্যের কথা মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন এবং পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের অন্যান্য প্রখ্যাত দুঁদে মন্ত্রীরা সভায় উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রীর এই জবরদস্তিমূলক হঠকারিতার বিরুদ্ধে কেহ মৃদু প্রতিবাদ করিতে ভরসাও করিলেন না! দক্ষিণ ভারতে নেহরু কি এই বেয়াদবী করিতে সাহস করিতেন? খাস পশ্চিমবঙ্গে বাঙ্গালীর পিঠে হিন্দী ফলকের চাবুকই আমাদের প্রাপ্য!

আনন্দ উৎসবে বাঙ্গালীর রুচিসঙ্কট

শারদীয়ার সীমাহীন আনন্দ উৎসব অন্তে—এই উৎসবের 'আনন্দ' আজ কি উচ্চ মার্গে আরোহণ করিয়াছে সে বিষয়ে কিছু আলোচনা সময়োপযোগী এবং একেবারে নিরর্থক নহে। কিন্তু এ-বিষয়ে আমরা আনন্দবাজার পত্রিকার অহিফেন-বিলাসী শ্রীকমলাকান্ত বাবাজীর মন্তব্য মাত্র উদ্ধৃত করিব কারণ ইহার বেশী কিছু বলা আমাদের সাধ্যাতীত এবং প্রয়োজনও নাই। শ্রীকমলাকান্তের চোখে:—

শহরে কোন উৎসব আরম্ভ হ'লে নিরীহ লোকের কান বাঁচিয়ে চলা কঠিন, মাইকের সুরের দীর্ঘ কর্কশ আঙুল ঘরে ঢুকে কর্ণ বিমর্দিত করতে থাকে। পাড়া ছেড়ে পালিয়ে ত্রাণ নেই, সর্বত্রই মাইকের প্রাদুর্ভাব। ঢাকের বাজনা অবশ্য মিষ্টি নয়, তবে বাজায় মানুষে হাত ক্লান্ত হ'লে থামে কিন্তু যন্ত্রের ত ক্লান্তি নেই, কেবল রেকর্ড বদলাবার সময়টুকুতে বিরাম। তার উপরে যেমন সুর তেমনি কথা। পুরাণো ক্ষয়প্রাপ্ত রেকর্ডের কথা সব সময়ে বুঝতে পারা যায় না প্রয়োজনও নেই শুধু সুরটাই যথেষ্ট। সেই উচ্ছ্বসিত সুরে Twjst নাচের কোমর দুলুনি ছন্দরু আকাশের প্রশান্তকে ধিকৃত করছে। এমনি চলতে থাকে উৎসবের ক'দিন। আবার বিসর্জনের শোভাযাত্রায় দেখতে পাওয়া যায় সেই কর্ণগোচর কদর্যতাকে চক্ষুগোচররূপে। এক সময়ে উৎসবগুলো ছিল সৌন্দর্য্য চর্চার অবসর, এখন হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে বীভৎসতার বিলাস। কিন্তু কেবল আমাদের উৎসবগুলোই বা কেন, বেতারে যখন আধুনিক সঙ্গীত সুরু হয় চাবি বন্ধ ক'রে দিয়ে প্রাণ বাঁচাতে হয়। এদিকে আবার ট্রাউজারের পা শুকিয়ে নর্দমার নল হ'য়ে উঠল। চুড়িদার পায়জামা আর ট্রাউজারের মিলনে এ বোধ করি প্রাচ্য-পাশ্চাত্যে সমন্বয়সাধক প্রচেষ্টার দৃষ্টান্ত। দেখতে দেখতে অসুন্দরের মহামারী দেশকে ছেয়ে ফেলছে। পনেরো কুড়ি বছর আগেও এমন ছিল না। এমন অবাঞ্ছনীয় পরিবর্তনের কি কারণ? দারিদ্র্য নিশ্চয় নয়, সে-সময়ে দেশ দরিদ্রতর ছিল (পরি-

সংখ্যান যাই বলুক)। তবে কি এ সম্পদের ছোঁয়াচ? আমাদের দেশ অবশ্য বৈষয়িক উন্নতির বর্ণমালায় এখনো "ক লখল" পাঠ করছে কিন্তু যে-সব সৌভাগ্যবান দেশ ইতিমধ্যে "ঐক্য বাক্য মাণিক্য ও রুক্মিণীতে" পৌঁছেছে Rock and Roll, Twist নাচ, নর্দমা নল ট্রাউজার তো সেই সব দেশের "অবদান"। তবে কি বুঝবো ঐশ্বর্যের সঙ্গে, অন্তত তার প্রথম পদক্ষেপের সঙ্গে এই বীভৎসতার অঙ্গাঙ্গী যোগ। কিংবা আর কিছু কারণ সম্ভব। কিংবা যে বারোয়ারী শিক্ষার পঙক্তিভোজের আয়োজন হ'য়েছে তার মধ্যেই এমন কিছু ত্রুটি আছে যাতে দেশের রুচি দ্রুত বিকৃত হ'য়ে পড়ছে। কি মূল কারণ বুঝতে পারছিনে কিন্তু কায সম্বন্ধে তো তিলমাত্র সন্দেহ নেই, চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি যাবতীয় ইন্দ্রিয় একবাক্যে সাক্ষ্য দেবে। সে সাক্ষ্যের মূল কথা এই যে যে, বৈষয়িক উন্নতির সঙ্গে তাল রক্ষা ক'রে (কিংবা দ্রুততর তালে) দেশব্যাপী রুচির অবনমন ঘটেছে। যদি এ কথা সত্য হয়, 'যদি' শব্দটা বিশেষভাবে ব্যবহার করা আবশ্যক, কেন না রুচির ক্ষেত্রে সকলে একমত হবে এমন আশা করা অন্যায়—তবে তো দেখছি সমূহ বিপদ্। ম্যাথু আর্নল্ড অনেককাল আগে তৎকালীন ইংলণ্ডের অবস্থা দেখে মন্তব্য করেছিলেন উচ্চশ্রেণী materialised। মধ্য শ্রেণী vulgarised এবং নিম্ন শ্রেণী brutalised হয়ে পড়ছে জুৎসই প্রতিশব্দ না পাওয়ায় মূল শব্দ রাখতে বাধ্য হ'লাম। তা ছাড়া প্রতিশব্দে মূল অর্থের ব্যতিক্রম ঘটা অসম্ভব নয়। মনে রাখতে হবে যে তখন (১৮৭৯ সাল) নূতন সম্পদ নূতন শিক্ষা ছড়াতে শুরু করেছে। আমাদের বর্তমান অবস্থা সর্বাংশে না হ'লেও কতকাংশে সেদিনকার ইংলণ্ডের অনুরূপ অন্তত এদিক দিয়ে। সংক্ষিপ্ত আলোচনায় বিষয়টির গুরুত্ব ও ব্যাপকতা প্রকাশ সম্ভব নয় তবে যে উল্লেখ করলাম তা চিন্তাশীলদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার আশায়। রুচিবিকার ও চিন্তদীনতা বৈষয়িক অভাবের চেয়েও অধিকতর সঙ্কট জাতির পক্ষে।"

কমলাকান্তের এই কাতর আবেদনে কি ফল হইবে জানি না, বিশেষ করিয়া যখন দেখি মহা মন্ত্রী, ক্ষুদে মন্ত্রী, পুলিশ অধিকর্ত্তা, অধ্যাপক, প্রখ্যাত সমাজ কর্ম্মী প্রভৃতি সুখ্যাত, খ্যাত এবং অখ্যাত বহুজন বারোয়ারী পূজার উদ্বোধন কালে যে ভাষণ দান করেন, তাহাতে পূজা প্রাঙ্গণে এবং প্রতিমা বিসর্জ্জন কালে—পূজা-উৎসাহীদের অসংযম অসৌজন্য এবং অশোভন আচরণের বিষয় কোন প্রতিবাদ করেন না! করিতে বোধ হয় ভয় পান। 'বেলা' যতই বাড়িতেছে—পূজার উৎসবের নামে বাঙ্গালীর বেল্লাল্লাগিরীও প্রতি বৎসর ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার প্রতিকার কোথায় এবং কিসে? বাঙ্গালী জাতির প্রাণশক্তি কি এইভাবেই নিঃশেষিত হইবে?

হিন্দী রাজ?

লোকসভায় কিছুদিন পূর্ব্বে হিন্দী লইয়া আবার এক প্রচণ্ড বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। আমরা ইতিপূর্ব্বে জোর করিয়া অহিন্দীভাষীদের ঘাড়ে হিন্দী চাপাইবার বিরুদ্ধে (হিন্দীর বিরুদ্ধে নহে) বহু কিছু বলিয়াছি—ভাবিয়াছিলাম আর এ-বিষয় কিছু মন্তব্য করার প্রয়োজন নাই। আমরা ইহাও ভাবিয়াছিলাম যে, হিন্দীওয়ালাদের মস্তিষ্কে হয়ত বা কিছু সুবুদ্ধির উদয় হইয়াছে—কিন্তু হায়! আমরা পতিত জমিতে (Fallow land) শস্য ফলাইবার বৃথা আশা করিয়াছিলাম! এ-বিষয় আমাদের বক্তব্য নিচের উদ্ধৃতিতেই ভাল করিয়া বলা হইয়াছে:

হিন্দীওয়ালারা দেখিতেছি একেবারে বেসামাল হইয়া পড়িয়াছেন। মুসলিম-লীগ-মার্কা "লড়কে লেঙ্গে"র কায়দাটা পার্লামেণ্টের মধ্যে পর্যন্ত ঢুকাইতে তাঁহাদের লজ্জা নাই। সাধে কি বলে হিন্দী সাম্রাজ্যবাদ। ইহা এমন চীজ যে, গণতান্ত্রিক রীতিনীতি ও শালীনতারও তোয়াক্কা করে না। উপমন্ত্রী শ্রীমতী লক্ষ্মী মেনন বিবৃতি দিতেছিলেন কাশ্মীরের যুদ্ধবিরতি-সীমারেখা সম্পর্কে, ইংরেজীতে। হিন্দীপ্রেমীদের তাহা সহ্য হয় নাই, তাঁহাদের দাবি "হিন্দী বয়ান চাই।" শ্রীমতী মেনন হিন্দী জানেন না, ইহা নিশ্চয়ই অপরাধ নয়। তাহা ছাড়া ইংরেজীও সহযোগী সরকারী ভাষা। ইংরেজীতে বলিলে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না। কিন্তু হিন্দীওয়ালাদের মতে হয়। তাঁহাদের জিদ, শ্রীমতী মেনন হিন্দীতে না বলিতে পারেন তাঁহার মাতৃভাষা মলয়ালমে বিবৃতি দিন কিন্তু ইংরেজী কিছুতেই চলিবে না। পার্লামেণ্টের জরুরী কাজ কিসে চলিবে কি চলিবে না, হিন্দীপ্রেমান্ধরা তাহা বিবেচনা করিতে নারাজ, বিচার করিতে অক্ষম। প্রধানমন্ত্রী নেহরুর একটি প্রশ্নের উত্তরে বিবৃতি দিবার সময়েও বিভ্রাট ঘটিয়াছে; তাঁহার জবাব হিন্দীতে, অধিকাংশ অহিন্দীভাষী সদস্য তাহা বুঝিতে পারেন নাই। হিন্দী চালু করার জন্য এই ধরনের বাড়াবাড়িকে প্রশ্রয় দিলে পার্লামেণ্টের কাজ অচল হইবে। প্রধানমন্ত্রী হিন্দীতে বিবৃতি দিলে হিন্দীওয়ালারা ভাবিলেন তাঁহাদের মস্ত জিত, ইংরেজী তো হটিল। আসলে তাঁহারা যাহা হটাইতেছেন ও হারাইতেছেন তাহা কাণ্ডজ্ঞান, গণতান্ত্রিক নীতির প্রতি আনুগত্য এবং পরস্পর-সহনশীলতা।

ইংরেজীকে এভাবে হটানো যাইবে না, হিন্দীওয়ালাদের হঠকারিতা বেচারা হিন্দীর প্রতি সর্ব্বজনের বিরাগ আরও প্রবল করিবে।

হিন্দীর প্রতি কেবল বিরাগই নহে হিন্দীর প্রতি অহিন্দীভাষীদের বিদ্বেষও ক্রমে ঘনীভূত হইয়া হঠাৎ এক-সময় দারুণভাবে প্রজ্বলিত হইয়া কংগ্রেসী কর্ত্তাদের বহু ইপ্সিত এবং সর্ব্বজনকাম্য দেশের ঐক্যকেও সমূলে উৎপাটিত করিবে। হিন্দী ভাষার নামে গুণ্ডামি আবার প্রকট হইতেছে। নেহরু ইংরেজী এবং অন্যান্য অহিন্দী অঞ্চলের ভাষা সম্পর্কে মুখে বহু বৃহৎ বৃহৎ বাক্য বলেন, কিন্তু কাজের বেলায় দেখা যায় সেই হিন্দী-ফোবিয়া! মাত্র কিছুকাল পূর্ব্বে দুর্গাপুরেও ইহার কিছু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরিতে হিন্দী

মাত্র এক বৎসর পূর্ব্বে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লাল-বাহাদুর বাবু লোকসভায় ঘোষণা করেন যে—হিন্দী জানা না থাকিলে কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরিতে অহিন্দীভাষীদের প্রতি কোনপ্রকার তারতম্য করা হইবে না। অর্থাৎ সরকারী চাকুরিতে যোগ্যতার বিচারে হিন্দীর কোন প্রাধান্য থাকিবে না। প্রধানমন্ত্রীও ইহা সমর্থন করেন। সেই সময় আমরা এই ঘোষণাকে বিশেষ মূল্য দিই নাই। ঘোষণার মাত্র কিছুদিন পরেই আন্দামানে কতকগুলি সরকারী চাকুরিতে লোক নিয়োগের ব্যাপারে 'হিন্দী' জানা অত্যাবশ্যক বলিয়া ঘোষিত হয়—ইহাও আমরা প্রকাশ করি।

মাত্র কিছুদিন পূর্ব্বে আর একটি বিজ্ঞাপন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের তরফে প্রকাশিত হয়:

চারজন সিনিয়র ট্রানশ্লেটর:—বেতন ৩০২৲-১৫৲-৪২৫৲ মোঃ বাঃ ১৫৲-৫৩০৲ টাকা: যোগ্যতাবলী (১) হিন্দীর সম্যক জ্ঞান সহ আর্টস বা সায়েন্সে মাষ্টার্স ডিগ্রী (২) ইংরেজী হইতে হিন্দীতে অনুবাদ করার তিন বৎসরের অভিজ্ঞতা (৩) বৈজ্ঞানিক কারিগরী এবং বিমানবিষয়ক পুস্তিকা ও পুস্তকাদি ইংরেজী হইতে হিন্দীতে অনুবাদ করার ক্ষমতা। বয়স: ১৮—৩০ বৎসর।

অর্থাৎ অন্যান্য গুণাবলী যতই থাক—হিন্দী-জানাটাই হইবে প্রার্থীর সর্ব্বাপেক্ষা বড় গুণ। ইহাতে আর একটি বড় দিক্ বা গভীর উদ্দেশ্য নিহিত আছে। তাহা এই যে—প্রতিরক্ষা দপ্তরে এবং ভারতীয় সৈন্যদলে প্রবেশ করিতে হইলে—প্রাথাদের অবশ্য হিন্দী শিখিতে হইবে। হিন্দীর সঙ্গে সঙ্গে যদি বাঙ্গলা, তামিল, তেলেগু, ওড়িয়া, অহমীয়া প্রভৃতি ভাষার জন্য অনুবাদকের জন্য বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হইত—আমাদের কিছু বলিবার থাকিত না। কেবল হিন্দী অনুবাদকের জন্য বিজ্ঞাপন প্রকাশের অর্থই হইল—অহিন্দীভাষী অঞ্চলে বহুগুণে যোগ্যতর প্রার্থীদের মুখের উপর প্রতিরক্ষা দপ্তরের সিংহদ্বার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

ভারতে বড় জোর প্রায় ১০।১২ কোটি হিন্দীভাষীর প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের এই অনুগ্রহ-মুলক ব্যবহার—এবং দেশের প্রায় ৩৪ কোটি লোকের উপর ভাষার এ-অত্যাচার কতদিন চলিবে? বর্ত্তমান শাসকদের অপসারণ ক্রমশঃ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিতেছে।

শুভ-সংবাদ ঝুটাও ভাল!

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির এক বৈঠকে কয়েকদিন পূর্ব্বে স্থির করা হইয়াছে যে অসাধু লোকদের 'অসাধুভা'বে অর্জ্জিত সমস্ত সম্পদ্ সরকারে বাজেয়াপ্ত করিতে হইবে। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কাহারো কিছু বলিবার নাই, কারণ বাস্তবে যদি এই প্রস্তাবমত সামান্য কিছুও দেখা যায়, সৎ ব্যক্তি মাত্রেই খুশী হইবেন। কেন্দ্র এবং রাজ্য কংগ্রেসগুলিতে বহু বহু আদর্শ প্রস্তাব ইতিপূর্ব্বে বহুবার গৃহীত হয়, কিন্তু বাস্তবে লোকচক্ষুর দৃষ্টি-গোচর কিছু ঘটে নাই। তবে যদি লোকচক্ষুর অন্তরালে কিছু হইয়া থাকে—সে বিষয় আমরা কিছুই বলিতে পারিব না।

প্রসঙ্গক্রমে কিছুকাল পূর্ব্বে কংগ্রেসে একটি মনোহর প্রস্তাব সম্পর্কে কিছু বলা যাক। প্রস্তাব করা হয় যে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সকল মন্ত্রী এবং উচ্চপদে অধিষ্ঠিত প্রত্যেক কংগ্রেসীকে তাঁহাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির (আর্থিক এবং অন্যবিধ) বিশদ তালিকা প্রকাশ করিতে হইবে। কিন্তু কার্য্যকালে (আজ পর্য্যন্ত) দেখা গিয়াছে, প্রধানমন্ত্রী নেহরু, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সেন এবং আর নগণ্য দু-একজন ছাড়া আর বিশেষ কেহ কিংবা কোন মন্ত্রী তাঁহাদের সম্পত্তির কোন বিবরণ প্রকাশ করেন নাই এখন পর্য্যন্ত।

আমরা এ-কথা বিশ্বাস করি যে, শতকরা অন্ততঃ ৬০।৬৫ জন মন্ত্রী তাঁহাদের মর্য্যাদা কোন প্রকারে মসীলিপ্ত করেন নাই—কিন্তু তেমনি ইহাও বিশ্বাসযোগ্য যে এমন বহু মন্ত্রী আছেন যাঁহাদের বর্ত্তমান অবস্থার সহিত মন্ত্রী হইবার পূর্ব্বের অবস্থার সহিত কোন তুলনা করা যায় না। একদা যাঁহারা কোনক্রমে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, আজ তাঁহাদের চাল-চলন, রাজকীয় ধাঁচে ব্যয়বহুল বসবাস এবং জীবনযাত্রার মান পূর্ব্বতন ধনী জমিদারের অপেক্ষা বহুগুণে উর্দ্ধে! যে বেতন মন্ত্রীরা পাইয়া থাকেন, তাহাতে আমাদের মত লোকের পক্ষে বুঝা অসম্ভব কেমন করিয়া এক-একজন মন্ত্রী তাঁহার রাজকীয় ঠাট বজায় রাখিতে পারেন। বহু মন্ত্রীর সম্পর্কে ইতর লোক নানা কথা বলে, 'নানা বদনাম রটায়—ইহাতে আমরা মনে বড়ই বেদনা পাই। লোকের সন্দেহ নিরসন করিতে হইলে—অন্য রাজ্যের না হোক, পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীগণ যদি অবিলম্বে তাঁহাদের সকল সম্পত্তির সত্য বিবরণ প্রকাশ করেন একমাত্র তাহা হইলেই কুৎসা-কারীদের নির্ব্বাক্ করিয়া দিতে পারা যায়। এই সঙ্গে রাজ্য সরকারের উচ্চপদাধিকারী চাকুরেদেরও সম্পত্তির

প্রমাণ সহ বিবরণ পেশ করিতে বাধ্য করা উচিত এবং অবিলম্বে।

আমরা মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেন সম্পর্কে নানা মন্তব্য করিতে বাধ্য হই, কিন্তু সেটা ব্যক্তিগত কোন বিদ্বেষের বশে নহে—করি গভীর মানসিক যাতনা এবং আশাভঙ্গের কারণেই। সেন মহাশয়কে ব্যক্তিগত ভাবে জানি এবং তাঁহার সম্পর্কে একথা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে তিনি একজন নির্লোভ, নিঃস্বার্থ, দেশভক্ত, সৎ এবং সদাশয় ব্যক্তি। মুখ্যমন্ত্রী সেন মহাশয়ের নিকট হইতে আমরা বাঙ্গালী এবং বাঙ্গলার জন্য বহু কিছু আশা করিয়াছিলাম। এ-কথাও বলিতে দ্বিধা করি না যে শ্রীপ্রফুল্ল সেন মেহনতী মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র সমাজের আপন জন, এবং একমাত্র এই কারণেই স্বর্গত বিধান রায় যেখানে ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই অর্জ্জন করেন নাই, শ্রী সেন সেখানে সার্থকতা অর্জ্জন করিবেন। এখনও আমরা শ্রী সেনের উপর গভীর বিশ্বাস এবং আস্থা রাখি এবং ইহাও জানি যে বর্ত্তমান বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর তিনি পরম আশা এবং ভরসাস্থল।

শ্রীপ্রফুল্ল সেন দলীয় বাধা-নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস এবং প্রাদেশিক মন্ত্রিমণ্ডলীর বহু কলঙ্ক দূর করিতে পারেন। এই দুঃসাহসিক কার্য্যে আপামর সকল বাঙ্গালী তাঁহাকে সর্ব্বভাবে সকল সহযোগিতা দান করিতে সদা প্রস্তুত। পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিমণ্ডলীকে প্রকৃত দেশসেবক করিতে পারেন শ্রী সেন—এবং একবার ইহা করিতে পারিলে রাজ্য সরকারের বহু গলদ সহজেই দুর করা সম্ভব হইবে।

শিক্ষার আদর্শ

বহুকাল পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "আমাদের শিক্ষাকে আমরা বাহন করিলাম না, শিক্ষাকে আমরা বহন করিয়াই চলিলাম।" এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, "বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীটাই যে আমাদের ব্যর্থতার কারণ, অভ্যাসগত অন্ধ মমতার মোহে সেটা আমরা কিছুতেই ভাবিতে পারি না।" ইহার পর বহুদিন গত হইলেও আজ পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা লইয়া যে-প্রকার 'গো-বেষণা' চলিতেছে, তাহাতে শিক্ষার অগ্রগতি না হইয়া 'জল' আরও ঘোলা হইবার আশঙ্কাই প্রবল-প্রকট হইতেছে।

শিশুদের শিক্ষাদর্শের প্রসঙ্গে আনাতোল্ ফ্রাঁস একটি নিবন্ধে বলেন, "শিশুদের চিত্তবৃত্তিকে আপনারা যে-ভাবে বিকশিত করিয়া তুলিবেন তাহার উপরেই দেশের সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করিবে।" কিন্তু দেশের বর্ত্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা শিশুদের শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তকের ভারবাহী এক জন্তুতে পরিণত করিয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং দেশ বিভাগের কল্যাণে আমাদের সামাজিক ও নৈতিক যে বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে—শিক্ষা লইয়া যাঁহারা আজ নানা কথা বলিতেছেন, নানা বিচিত্র শিক্ষা-আদর্শ প্রচার করিতেছেন, সেই সব পণ্ডিতদের প্রায় সকলেই এই বিপর্য্যয়কেই চিরন্তন করিবার পথ প্রশস্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

দেশের বর্ত্তমান শাসন ব্যবস্থায় 'শিক্ষা'ও একটা 'পাব্লিক সেক্টার' শিল্পের পর্য্যায়ে পরিগণিত হইয়াছে। এই বিচিত্র 'পাব্লিক সেক্টার' শিল্পে প্রকৃত শিক্ষাবিদদের কোন ভূমিকাই বোধহয় নাই। সরকারী নির্দ্দেশ এবং হুকুমনামা মতই আজ প্রাথমিক পর্য্যায় হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সমাপ্তি পর্য্যন্ত সকল স্তরই সরকারী প্রেসক্রিপসন মত করিতে হইবে। কোন স্কুল-কলেজ যদি নিজেদের বুদ্ধি-বিবেচনা এবং অভিজ্ঞতা মত স্বাধীন ভাবে কোন ব্যবস্থা (তাহা যতই ভাল এবং নিখুঁত হউক না কেন) করিতে চায়, তবে তাহাদের সরকারী সর্ব্বপ্রকার আর্থিক এবং অন্যান্য সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে। মনে হয় শিক্ষার খাতে সাহায্যের টাকাটা সরকারের কোন 'ব্যক্তিগত' জমিদারী হইতেই দেওয়া হইয়া থাকে।

আজ এই সামান্য কথাটা বুঝিবার সময় হইয়াছে যে সরকারী আওতায় কল-কারখানা, রেল-ষ্টীমার, ডাক-তার বিভাগ ইত্যাদি হয়ত বা খোঁড়াইয়া চলিতে পারে; কিন্তু সরকারী আওতায় শিক্ষা এবং শিল্পকলা কখনও স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ গতিতে চলিতে পারে না। শিক্ষা রেল-লাইনে একটা প্রাণহীন রেল-গাড়ির মত কখনও চলিতে পারে না।

অহিন্দীভাষী অঞ্চলে স্কুলের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জোর করিয়া হিন্দী পঠন বাধ্যতামূলক কেন হইবে বুঝি না। ভারতের অন্যান্য বহু অহিন্দীভাষী রাজ্যে এখন পর্য্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের বুকের উপর দিয়া হিন্দী-ষ্টীম-রোলার চালাইবার ব্যবস্থা গৃহীত না হইলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁহাদের সাম্প্রতিক এক নির্দ্দেশে ১৯৬৪-এর জানুয়ারী মাস হইতে

পঞ্চম শ্রেণী হইতে তিন বৎসর হিন্দী বাধ্যতামূলক করিয়াছেন! অযথা এবং অকেজো একগাদা পাঠ্য-পুস্তকের বিষম চাপে এমনিতেই অল্প বয়স্ক ছাত্র-ছাত্রীরা হিমসিম খাইতেছে—এই অবস্থায় আবার অর্দ্ধপক্ক হিন্দী ভাষার কাঁচা চামড়ার চাবুক কেন? যদি বুঝিতাম হিন্দী ইংরেজী-বাঙ্গলার মত—বিশ্ব ভাষার পর্য্যায়ে উঠিয়াছে এবং হিন্দী সাহিত্য সমৃদ্ধির দিক্ হইতেও বিশেষ গৌরবমণ্ডিত এবং এমন সব পুস্তক হিন্দীতে আছে যাহা ভারতীয় অন্য কোন আঞ্চলিক ভাষায় নাই, তাহা হইলে সরকারী চাপ ছাড়াও অহিন্দীভাষীরা নিজের গরজে এবং আগ্রহেই হিন্দী শিখিত। কিন্তু বাস্তবে কি দেখি—সমৃদ্ধির বিচারে হিন্দী, ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে বড়জোর পঞ্চম স্থান পাইতে পারে। এই কারণেই বলি, হিন্দী শিক্ষা জ্ঞান ও বিদ্যার দিক্ হইতে সময় এবং অর্থের নিছক অপচয়। আর কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরি? বাঙ্গালী ছেলেদের পক্ষে হিন্দী শিক্ষা করিয়াও বিশেষ কোন সুবিধা হইবে না। চাকরি যাহারা পাইবার তাহারাই পাইবে, বাঙ্গালী প্রার্থীদের অবস্থা এখন যাহা—বর্ত্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের পতন না হইলে তাহার কোন্ পরিবর্ত্তন হইবে না।

অতএব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে করজোড়ে নিবেদন জানাই—দয়া করিয়া তাঁহারা হাজারোরকমে নিপীড়িত, বাঙ্গালী স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের হিন্দী চাবুক মারিয়া নির্য্যাতন অসহনীয় করিবেন না। বাঙ্গালী জনসাধারণকেও বলি—তাঁহারা আর একটি 'ক্রেতা-প্রতিরোধে'র জন্য প্রস্তুত থাকুন। এ-বিষয় দক্ষিণ ভারতীয়েরা বাধ্য হইয়া যে পন্থা গ্রহণ করিয়াছে, হিন্দী ষ্টীম-রোলারের গতিরোধ করিতে হইলে অদূর ভবিষ্যতে বাঙ্গালীদেরও সেই পথে চলা ছাড়া অন্য উপায় থাকিবে না। তবে আশা করি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সেন মনে একটু সাহস সঞ্চয় এবং কেন্দ্রের অন্যায় অযথা চাপ অগ্রাহ্য করিয়া এ-রাজ্যকে একটা অপ্রীতির গোলমাল হইতে রক্ষা করিবেন। ইতিমধ্যেই হিন্দীর বিরুদ্ধে একটা চাপা হিংসার ভাব দেখা যাইতেছে।

—

পাঁচমিশালি

সাঁতারু পেঙ্গুইন

কালো ফ্রক-কোট পরা মানুষের দাঁড়ানর কিংবা চলার ভঙ্গিতে আমরা সচরাচর পেঙ্গুইনদের ছবি দেখে থাকি। এরা উড়তে পারে না সেটি আমরা জানি। কিন্তু মাছ নয় এমন অন্য জীবদের তুলনায় এরা যে কত ভাল সাঁতারু, তা হয়ত আমরা অনেকেই জানি না।

সাঁতার দেবার প্রয়োজন হ'লে এরা ঘণ্টায় পঁচিশ মাইল বেগে সাঁতরে যেতে পারে।

শুশুকরা যদিও মাছ নয়, তবু পুরোদস্তুর জলচর জীব। তাদের সাঁতারের দৌড় হচ্ছে ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল।

আর মাছেদের কথাই যদি ধরা যায়, তাদের সকলেই যে সাঁতারের ব্যাপারে খুব ওস্তাদ, তা নয়। এদের অধিকাংশেরই গতিবেগ পেঙ্গুইনদের চেয়েও কম। স্যামন মাছের শরীরের গড়নটাই এমন যে, মনে হয়, ছুট দেবার জন্যেই ভগবান্ তাকে তৈরি করেছেন। তারও গতিবেগ ঘণ্টায় সাত থেকে চোদ্দ মাইল। মাছেদের মধ্যে সবচেয়ে দ্রুতগামী ব'লে যাদের প্রসিদ্ধি আছে, তাদেরও দৌড় ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল ছাড়ায় না।

হঠাৎ মাথা ঘুরে গেলে

হঠাৎ মাথা ঘুরে গেলে, যদি ঘরের জানালা বন্ধ থাকে, সেগুলোকে খুলে দেবেন। তারপর তাড়াতাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়বেন।

যদি রৌদ্রে তেতে মাথা ঘোরে, অবিলম্বে নিকটতম ছায়াশীতল জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নেবেন। কপালে এবং দুহাতের কব্জিতে বরফ বা ঠাণ্ডা জলের পটি লাগাবেন। যদি মাথা ঘোরার সঙ্গে বমিবমি ভাব থাকে, বা মনে হয় আপনার চেতনা-বিলুপ্তি ঘটছে, তা হ'লে হাঁটু মুড়ে ব'সে প'ড়ে দু' হাঁটুর মধ্যে মাথাটাকে গুঁজে রাখবেন, যাতে আপনার মস্তিষ্কে রক্ত-চলাচল বৃদ্ধি পেতে পারে।

মাথা কেন ঘুরল তা যদি আপনার নিঃসংশয়ে জানা না থাকে ত উত্তেজক কোন কিছু পানাহার অথবা স্মেলিং সল্ট্ ব্যবহার করবেন না। রক্তচাপের আধিক্য বা ঐ জাতীয় কোন কারণে মাথা ঘুরে থাকলে তাতে লাভের বদলে ক্ষতি হতে পারে।

সিগারেটটা ধরাবেন না, ফেলে দিন

কিছুদিন ধ'রে সিগারেটের ধূমপানের সঙ্গে ক্যান্সার, বিশেষতঃ ফুসফুসের ক্যান্সার রোগের কোন সম্পর্ক আছে কি না এ বিষয়ে বাদানুবাদ চলছে। সম্পর্ক আছে যাঁরা বলছেন, তাঁরা সংখ্যার অনুপাত ধ'রে দেখাচ্ছেন, ধূমপান যাঁরা করেন না তাঁদের তুলনায় ধূমপান যাঁরা করেন তাঁদের মধ্যে এই রোগের প্রাদুর্ভাব স্পষ্টতই অনেক বেশী।

কিন্তু সিগারেটের ধূমপানের সঙ্গে সম্পর্কিত আর-একটি রোগের কথা নিয়ে বিতর্ক বিশেষ শোনা যায় না, যদিও সেই রোগটিও কিছু "সহজ পেয়াদা নয়।"

ইউনাইটেড স্টেটস, গ্রেট ব্রিটেন প্রভৃতি দেশের বারো-তেরোটি বিভিন্ন কেন্দ্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে দেখা গেছে, বহুকাল ধ'রে বেশী মাত্রায় সিগারেটের ধূমপান হৃদ্‌যন্ত্রের 'করোনারী' জাতীয় ব্যাধির জন্যে অনেক ক্ষেত্রেই দায়ী। সিগারেট যাঁরা খান না তাঁদের সঙ্গে তুলনায়, যাঁরা দিনে এক প্যাকেটের (দশটির) বেশী সিগারেট খান তাঁদের মধ্যে হৃদ্‌যন্ত্রের বিকলতা-জনিত মৃত্যুর সংখ্যা তিন থেকে ছ'গুণের মধ্যে।

মোমবাতির অপচয় নিবারণ

আপনি কি মোমবাতি ব্যবহার করেন? দেয়ালীর দিন করেন, আর সেগুলোকে সাজিয়ে জ্বালিয়ে দেবার পর দেখতে পান, একটু হাওয়াতেই বাতির মোম জ্বলে যতটা, তার চেয়ে বেশী গ'লে গড়িয়ে প'ড়ে যায়। এই রকম ক'রে গ'লে প'ড়ে যাওয়া বন্ধ করতে হ'লে বাতিগুলোকে জ্বালবার আগে কিছুক্ষণ রেফ্রিজেটরে বন্ধ ক'রে রেখে দেবেন।

লাফিয়ে মরার জায়গা

লাফিয়ে প'ড়ে যাঁরা মরতে চান, তাঁরা যদি প্যারিসের অধিবাসী হন ত এইফেল টাওয়ারটিকে বেশী পছন্দ করবেন। ১৮৮৯ সালে এই টাওয়ারটি তৈরি হয়। তখন থেকে ৭৪ বৎসরে এর সর্বনিম্ন প্লাটফর্মটি থেকে ৩২১ জন, অর্থাৎ বৎসরে গড়-পরতা ৪ জনেরও বেশী লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছেন।

কলকাতার নূতন সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংটির জনপ্রিয়তা এইদিক্ দিয়ে ক্রমশঃ বাড়ছে।

এব্রাহাম লিঙ্কন ও জন কেনেডি

গত বৎসর প্রবাসীতে শ্রীমতী কমলা দাশগুপ্ত যখন এব্রাহাম লিঙ্কনের জীবন-কথা লিখছিলেন তখন ফিজেরাল্ড জন কেনেডি ইউনাইটেড স্টেটসের প্রেসিডেন্ট। কেউ স্বপ্নেও তখন ভাবে নি যে, এব্রাহাম লিঙ্কনের মতই এঁরও আততায়ীর হাতে মৃত্যু হবে। কিন্তু তাই হল।

এব্রাহাম লিঙ্কন স্মৃতিমন্দিরে তাঁর প্রতিমূর্তির পিছনে ইংরেজীতে যে-কথা ক'টি খোদিত আছে তার অনুবাদ:

"যেমন এই মন্দিরে, তেমনি জনগণের হৃদয়ে,—যে জনগণের (মঙ্গলের)



এব্রাহাম লিঙ্কন স্মৃতিমন্দিরে তাঁর প্রতিমূর্ত্তি

জন্যে তিনি (রাষ্ট্র) যুতি রক্ষা করেছিলেন,—এব্রাহাম লিঙ্কনের স্মৃতি চিরকাল মূর্ত্তিময় হয়ে থাকবে।"

ফিজেরাল্ড জন কেনেডি শুধু রাষ্ট্রযুতি নয়, সর্ব্বরাষ্ট্র-যুতির দিকে মন দিয়েছিলেন। তাঁর সমাধি-মন্দিরে এই কথাটার উল্লেখ নিশ্চয়ই থাকবে।

জিপ্‌সীরা কি ভারতীয় ?

কিছুদিন আগে জিপ্‌সীদের রোমানী ভাষার কিছু পরিচয় দিয়েছিলাম। তাতে উত্তর ভা রতের ভাষাগুলির কতগুলি শব্দের সঙ্গে তাদের ভাষার কতগুলি শব্দের কতকটা সাদৃশ্য দেখা গিয়েছিল।

জিপ্‌সীদের আচার-ব্যবহারের মধ্যেও এমন অনেক-কিছু এখন অবধি রয়ে গিয়েছে যাতে মনে হয়, তারা সত্যিই মূলতঃ ভারতীয়, অথবা পৃথিবীর ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়বার আগে তারা ভারতবর্ষে বহুকাল বসবাস করেছিল।

তবে তারা মূলতঃ যে জাতির লোকই হোক, তারা মনেপ্রাণে যাযাবর। ভারতবর্ষে এখনও যাযাবর জাতির অভাব নেই। তারা যে ভারতবর্ষীয় যাযাবর, সেটা মনে হয় এই কারণে, যে, তারা গৃহস্থদের যে শ্লেষাত্মক নামে অভিহিত করে সেটি হচ্ছে (গৃহস্থ-গেরস্ত) গড়জো।

এবারে জিপ্‌সীদের ভারতীয়ত্বের অন্য নিদর্শনগুলিকে নিয়ে বিচার ক'রে দেখা যাক।

জিপ্‌সীদের কোন দিক্ দিয়েই অসভ্য বলা চলে না, তাদের ভাষাও অসভ্যদের ভাষা নয়, কিন্তু সে-ভাষার লিপি নেই। অর্থাৎ জাতি হিসাবে জিপ্‌সীরা সম্পূর্ণ নিরক্ষর। পৃথিবীতে একমাত্র ভারতবর্ষেই এখন অনেক জাতির দেখা মেলে, যারা সভ্যতা-লক্ষণাক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও সম্পূর্ণ নিরক্ষর।

জিপ্‌সী স্ত্রীলোকদের কাছে বন্ধ্যাত্বের চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আর কিছু হ'তে পারে না। এটাকে তারা একটা অভিশাপ বলেই মনে করে। ভারতবর্ষের নারীরাও সমভাবে ভাবিত।

ভারতবর্ষীয়দের মত জিপ্‌সীদের মধ্যেও একটি গাছের সঙ্গে আর-একটি গাছের বিবাহ প্রচলিত।

গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের ভারতবর্ষে যেমন সাধ খাওয়ানো হয়, বস্ত্র-অলঙ্কারাদি উপহার দেওয়া হয়, জিপ্‌সী স্ত্রীলোকদের বেলাতেও ঠিক সেইরকম করা হয়ে থাকে।

ভারতবর্ষীয় হিন্দুদের মত জিপ্‌সীরাও প্রসবের সময় প্রসূতিকে বাসগৃহে রাখে না। পৃথক্ সূতিকাগারে স্থানান্তরিত করে। আঁতুড় ঘরে আগুন জ্বেলে রাখা দুই জাতিরই বিশেষত্ব।

জিপ্‌সীরা ভারতবর্ষীয় হিন্দুদের মতই জাতাশৌচ পালন করে। ভারতবর্ষে অব্রাহ্মণদের মধ্যে একমাস এই অশৌচ পালিত হয়। ইংলণ্ডের জিপ্‌সীরা এক মাস এবং জার্ম্মানীর জিপ্‌সীরা দেড় মাস এই অশৌচ পালন করে। ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য কোন দেশে সন্তানজন্মকে একটা অশুচি ব্যাপার ব'লে মনে করা হয় না।

নামকরণের সময় ভারতবর্ষীয় হিন্দুরা যেমন শিশুর একটি রাশ নাম ও একটি ব্যবহারিক নাম রাখে, জিপ্‌সীরাও তেমনি দু'টি নাম রাখে, একটি গোপন ও একটি প্রকাশ্য।

ভিন্নজাতীয় ছেলে বা মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হ'লে ভারতবর্ষীয় হিন্দু মেয়ে ও ছেলের যেমন জাত যায়, জিপ্‌সীদের বেলাতেও তাই।

জিপ্‌সীদের মধ্যে তিনরকম বিবাহ প্রচলিত। হরণ ক'রে বিবাহ, পণ দেওয়া-নেওয়া ক'রে বিবাহ, দুই পক্ষের পরস্পর সম্মতিমূলক বিবাহ। ভারতবর্ষের হিন্দুদের মধ্যে এগুলি যথাক্রমে রাক্ষস বিবাহ, আসুর বিবাহ ও গান্ধর্ব্ব বিবাহ ব'লে পরিচিত।

হিন্দুদের মত জিপ্‌সীরাও রাক্ষস বিবাহটাকে এখন একটা অভিনয়ের পর্য্যায়ে এনে ফেলেছে।

নববিবাহিত জিপ্‌সী বধূকে শ্বশুরবাড়ী যাবার সময় হিন্দু নববধূদের মত কাঁদতে হয়।

এই বিয়ের ব্যাপারে ভারতবর্ষীয় হিন্দুদের মত জিপ্‌সীরাও অনেক সময় সর্ব্বস্বান্ত হয়ে যায়।

একটা বড় জায়গায় ভারতবর্ষীয় হিন্দুদের সঙ্গে জিপ্‌সীদের পার্থক্য চোখে পড়ে। জিপ্‌সীরা মৃতদেহ দাহ করে না, সমাধিস্থ করে।

মজ্জমানের রক্ষাকবচ

প্লাষ্টিকের তৈরি ছোট একটি কৌটো, আয়তনে যা একটি সিগারেট



বেলুনের কবচ পরা

কেসের চেয়ে বড় নয়, রিষ্টওয়াচের মত ক'রে হাতে প'রে নৌকোয় চড়ুন। ঝড়ে প'ড়ে যদি নৌকো ডুবে যায়, আপনি ডুবে মারা যাবেন না। তার কারণ, কৌটোটির গায়ে লাগানো একটি ঘোড়া টিপলেই কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাসের একটি কার্ত্তুজ ফুটো হয়ে কৌটোর মধ্যেকার একটা বেলুনকে ফাঁপিয়ে তুলবে। কৌটোর মুখ ঠেলে খুলে বেলুনটা একটা হরতনের ফোঁটার আকারে বেরিয়ে আসবে। তখন তার মোটা দিক্‌টার মাঝখানকার নীচু জায়গাটায় চিবুক রেখে আপনি জলের উপর মাথা জাগিয়ে যতক্ষণ প্রয়োজন ভেসে থাকতে পারবেন।



কবচ থেকে বেলুনের নির্গমন

সস্তায় কংক্রিটের বাড়ী

ঢালাই কংক্রিটের এই বাড়ীটির ভিতের মাপ ১৬×২৪ ফুট। চারজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের একটি বা দু'টি পরিবার সাতটি ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে এতে স্বচ্ছন্দে বাস করতে পারে। রুশীয় মডেলে এই বাড়ীটি আমেরিকাতে যিনি তৈরি করেছেন, তিনি বলেছেন, যে, ১০০০০ টাকায় বাড়ীটি বেচে দিলে তাঁর যথারীতি লাভ থাকবে।



রুশ মডেলের সস্তা বাড়ী

ছবিতে বাড়ীটির দুতলাটাকে খুব সংকিপ্ত আকারের মনে হচ্ছে। কিন্তু তাতেও আছে একটি একসঙ্গে জোড়া বসবার ও শোবার ঘর, একটি রান্নাঘর এবং একটি পাইখানা। স্নানের ঘর অবশ্য নেই।

জোড়ে লাফানো

ছবিতে দু'টি প্যারাশুটিষ্ট হাত ধরাধরি ক'রে এরোপ্লেন থেকে লাফিয়ে নীচে পড়ছেন। কয়েক হাজার ফুট পর্য্যন্ত এঁরা এই ভাবেই পরস্পরের হাত ধ'রে পড়তে থাকবেন। কারণ, এঁদের একজন শিখছেন, আর



দু'জন প্যারাশুটিষ্ট হাত-ধরাধরি ক'রে পড়ছেন

একজন শেখাচ্ছেন। উল্টে না গিয়ে, ডিগবাজি না খেতে খেতে কিরকম ক'রে পড়তে হয়, কতটা পড়বার পর কি অবস্থায় প্যারাশুট খুলবার রশি টানতে হয় সেসব দেখিয়ে দেওয়া হলে শিক্ষক ও ছাত্রের ছাড়াছাড়ি হবে, তখন তাঁরা নিজের নিজের প্যারাশুট খুলবেন। শিক্ষক তখনও যতটা সম্ভব ছাত্রের কাছাকাছিই থাকতে চেষ্টা করবেন। পড়তে পড়তে চীৎকার ক'রে ছাত্রকে বলতে থাকবেন, কি ক'রে প্যারাশুট আয়ত্তে রাখতে হয়, যেরকম জায়গায় নামলে আঘাত লাগার সম্ভাবনা, কি রকম ক'রে সেসব জায়গা এড়িয়ে যেতে হয়, ইত্যাদি।

স. চ.

মানুষ : কয়েকটি পরিসংখ্যান

"জগত জুড়িয়া এক জাতি আছে সে জাতির নাম মানুষ জাতি" (= কবি সত্যেন দত্ত)। এই বিশ্বজোড়া মানুষ জাতির লোকসংখ্যা ৩০৭ কোটি। ১৯৬১ সালের মাঝামাঝি এই হ'ল মোট হিসাব। পৃথিবী বিপুলা, তার সমুদ্র নাকি "অসীম"। কিন্তু মানুষের সংখ্যা মিনিটে মিনিটে যে হারে বেড়ে চলছে তাতে প্রতি ২৩ জন লোকপিছু মাত্র এক স্কোয়ার কিলোমিটার জায়গায় সংস্থান হয়। মরুভূমি পাহাড় পর্বত পতিত জমি সমস্তই এই হিসাবের মধ্যে ধরা হয়েছে। দশ বছর আগেও এই পরিমাণ জমিতে লোকের গড়সংখ্যা ১৮ জন ছিল। জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্যই জমির উপর এভাবে চাপ বেড়ে চলেছে।

১৯৫০-৫১ সালে পৃথিবীর লোকসংখ্যা দু'শ একান্ন কোটি। গত এগার বছরে যা প্রজাবৃদ্ধি ঘটেছে তা ভারতের মোট জনসংখ্যাকেও ছাড়িয়ে যায়—মোট বেড়েছে ৫৬ কোটি। তার মধ্যে এক এশিয়া মহাদেশেই ৬০ শতমিক (বা শতাংশ)। এই বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার ক্ষুধা ও বেকারত্বের সম্ভাবনা নিয়ে পৃথিবীর অনুন্নত দেশগুলির রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতি ক্রমশঃ জটিল হয়ে উঠছে।

১৯৫০ থেকে ১৯৬১ সালের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত লোক বেড়েছে বছরে গড়পড়তা শতকরা ১·৮ ভাগ। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির এই হার ক্রমশই বেড়ে চলছে। ১৯৬০-৬১ সালে দক্ষিণ আমেরিকায় এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা ৩·৫ ভাগ। জন্মের হার সবচেয়ে বেশি আফ্রিকার আইভরি কোষ্ট অঞ্চলে (প্রতি হাজারে গড়পড়তা ৫৬·১ জন), অবশ্য সর্বাধিক মৃত্যু সংখ্যার নিদারুণ সংবাদও এখান থেকেই পাওয়া যায়—হাজারকরা ৩৩·৩ জন। এ প্রসঙ্গে নিম্নতম মৃত্যুহার: হাজারকরা হিসাবে ৭ জন (আইসল্যাণ্ড), ৭·২ জন (রাশিয়া)। পশ্চিম জার্মানীতে জন্মহার সবচেয়ে কম—হাজারে মাত্র ১·৬০ জন

শিশু-মৃত্যু সবচেয়ে বেশী হ'ল গ্যবন অঞ্চলে—এখানে হাজারে ১৬০টি শিশুই পৃথিবীতে এক বছর টিকে থাকার আগেই অকালে ঝরে পড়ে। শিশুমৃত্যুর নিম্নতম হার নেদারল্যাণ্ড্স্ ও সুইডেনে, সংখ্যা হাজারে ১৫·৪ ও ১৫·৫ যথাক্রমে।

বিবাহ সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ফক্‌ল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জে, এখানে প্রতি বছর হাজারে ১৩·৭টি বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বিবাহ বিচ্ছেদ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জই সব থেকে বেশি (হাজারে ৪·৩১টি), তারপরে ইউনাইটেড আরব রিপাবলিক (হাজারে ২·৩২টি)। সবচেয়ে কম বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা—(না, "সনাতন" ভারতবর্ষ নয়) পেরু এবং নর্দার্ন আয়র্ল্যাণ্ড অঞ্চলে, এখানে বিবাহ বিচ্ছেদ হাজারকরা মাত্র ·০৯টি। পৃথিবীর সবদেশে অবশ্য বিবাহ বিচ্ছেদের আইন এখনো চালু হয় নি।

সম্ভাব্য আয়ুষ্কাল—গড়পড়তা ৭৫ বছর, এবং ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের পক্ষেই তা বেশি। সুইডেন নেদারল্যাণ্ড্স্ নরওয়ে এবং ফ্রান্সের একটি মেয়ে শিশু ৭৫ বছর জীবনলাভের আশা করতে পারে।

নেদারল্যাণ্ড্‌স্‌ নরওয়ে ও সুইডেনের কোন ছেলের পক্ষে এই সম্ভাবনা ৭১ বছর।

মধ্য ইউরোপ হ'ল পৃথিবীর সবচেয়ে ঘন বসতিপূর্ণ জায়গা, প্রতি স্কোয়ার কিলোমিটারে ১৩৮ জন লোকর বাস। দেশ হিসাবে ধরলে নেদারল্যাণ্ডসের স্থানই সবচেয়ে উপরে—প্রতি স্কোয়ার কিলোমিটারে ৩৪৩ জন। শহরগুলির মধ্যে হোলি সী সবচেয়ে জনবহুল—লোক-সংখ্যা প্রতি স্কোয়ার কিলোমিটারে ২,২৭৩ জন। এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে জনবিরল স্থান ওসেমনিয়া—মাত্র দু'জন প্রতি স্কোয়ার কিলোমিটারে।

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শহর টোকিও। তার কিছু পর একে একে—সাংহাই বোম্বাই পেকিং শিকাগো কায়রো এবং রাও-ডি-জেনিরো। কলকাতার উল্লেখ নেই, কারণ কলকাতা বলতে সম্ভবত বৃহত্তর কলকাতা ধরা হয় নি, করপোরেশনের এলাকাভুক্ত সীমানার মধ্যেই তা সংকীর্ণ রাখা হয়েছে।

সে যা হোক মানুষ জাতি এবং তার বসবাস রীতিনীতি ইত্যাদি বিষয় জাতিসংঘ—বা ইউনাইটেড নেশনস্‌ তন্নতন্ন করে খোঁজ খবর নিয়েছেন। "জগৎ জুড়িয়া" এই বিরাট জাতি, সমস্যাগুলিও তার জনসংখ্যার মতই বিরাট। জাতিসংঘের সংগৃহীত এই তথ্য (আমরা তার কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করলাম) মানুষের সামগ্রিক উন্নয়ন-সূচী রচনার ক্ষেত্রে প্রাথমিক বলে কার্যকরী হবে—আশা রাখি।

"শান্তির জন্য পরমাণু"

পরমাণুর অভিঘাতে বিশ্বরাজনীতি যেভাবে আবর্ত তুলেছে, জাতি হিসাবে সমস্ত মানুষেরই অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলেছে—ডেমোক্লিস্‌-এর খড়্গের মত, তাতে শান্তির উদ্দেশ্যযুক্ত পরমাণুই একটা মস্ত পুরস্কার। তবে "শান্তির জন্য পরমাণু" ("Atom for Peace) এ নামে একটা পুরস্কার রয়েছে, পুরস্কার ঘোষণা করেছেন আমেরিকার বিখ্যাত ফোর্ড মোটর কোম্পানী, ১৯৫৫ সাল থেকে প্রতি বছর সোনার মেডেল সহ নগদ ৭৫ হাজার ডলার মূল্যের এই পুরস্কার পৃথিবীর অগ্রণী পরমাণু-বিদ্‌দের প্রদান করা হয়। সমস্ত পারমাণবিক বিস্ফোরণের মধ্যেও যে সমস্ত বিজ্ঞানী আজীবন গবেষণার মধ্যে পরমাণুর একটি শান্ত রূপের খোঁজ করেন "শান্তির জন্য পরমাণু" পুরস্কার তাঁদের প্রাপ্য।

এ বছর এ পুরস্কার যুক্তভাবে লাভ করেন রাশিয়ার ভ্লাডিমির ভেক্‌স্‌লার এবং আমেরিকার এডউইন মেক্‌মিলান। এঁরা দু'জনেই একে অপরের অজ্ঞাতসারে সিনক্রোট্রন যন্ত্রের উদ্ভাবন করেন, এই যন্ত্র পরমাণুর ভিতরকার গঠন এবং শক্তির সন্ধানে খুবই কার্যকরী! এ প্রসঙ্গে প্রথম "শান্তির জন্য পরমাণু" পুরস্কার পান স্বনামধন্য বিজ্ঞানী নীল্‌স্‌ বোর।

হেভী ইঞ্জিনিয়ারিং-এর তাৎপর্য্য

পুতুল নাচ! পুতুলের অভিনয়!

রাজার প্রতিকৃতি পুতুল রাণীর প্রতিকৃতি পুতুলের প্রতি আকর্ষণ বোধ করছে। পুতুলের প্রণয়-লীলার মধ্যে মানুষের মান-অভিমান-অনুরাগ জীবন্ত হয়ে উঠছে। মাটির পুতুলের এই অভিনয়ের পিছনে যে শিল্পীর কুশলী হাতের ইসারা থাকতে পারে হঠাৎ সে কথা মনেই হতে চায় না। অথচ এটাই আসল ব্যাপার—দর্শকের আড়ালে অদৃশ্য [illegible]

স্বাধীনতার পরবর্তী এই ষোল কি সতেরো বছরে দেশের যা-কিছু উন্নতি তা অনেক ক্ষেত্রে এই পুতুল নাচের মতই আপাতত এবং আংশিক মাত্র। দেশের নানা জায়গায় আজ কলকারখানা বাঁধ ব্যারেজ তেলের রিফাইনারি ইত্যাদি—শিল্প-স্থাপনায় নানান্‌ চেষ্টা,—দেশের বিষয়গত উন্নতি পরিসংখ্যার মানকে ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী করে তুলেছে। কিন্তু এ সমস্তের আড়ালে যা দেখি, দেশের যে-কোন শিল্প উদ্যমের মূলেই বিদেশী বুদ্ধি, বিদেশী চিন্তা—আর কিছু না হোক খোদ যন্ত্রগুলি অন্তত বিদেশী। দেশে আজ সিমেণ্ট তৈরি হচ্ছে, কিন্তু সিমেণ্ট তৈরির যন্ত্রগুলি প্রধানত বিদেশ থেকে আমদানী করা। রেডিওর ভাল্‌ব্‌ রেলইঞ্জিন উড়োজাহাজ রাইফেল যে জিনিষই আমাদের দেশে তৈরি হয় তার মূলেই রয়েছে ঐ বিদেশী যন্ত্র—বিদেশী ব্যবস্থা, নিজেদের ব'লে যা আমরা দাবি করি তার একটা প্রধান অংশই আমাদের তৈরি নয়। দেশের শিল্পগত উন্নতি যতদূরেই প্রসারিত হোক আমাদের প্রচেষ্টাগুলি আজও স্বয়ংনির্ভর নয়। পুতুল নাচে অদৃশ্য সূতোর মত বিদেশের প্রভাব এখানে স্পষ্ট। আমরাও এক ধরণের পুতুল নাচ নেচে যাচ্ছি যেন। আমাদের শিল্পোন্নতির সূতো বিদেশী চাকায় বাঁধা।

সম্প্রতি অবশ্য অবস্থা পরিবর্তনের দিকে ঝোঁক এসেছে। দেশের রাষ্ট্রনায়করা মূল বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছেন। শিল্পপ্রচেষ্টার মূলে যে মৌলিক যন্ত্র—হেভী মেশিনারি, সে সমস্ত তৈরির দিকে সরকারী উদ্যোগ আয়োজন চলছে। রাঁচির হেভী ইঞ্জিনিয়ারিং করপোরেশন এর একটি প্রধান ধাপ। এখানকার চারটি বিরাট্‌ প্ল্যাণ্ট-এ তৈরি যন্ত্রপাতি ভারতের শিল্পবিকাশের প্রধান খুঁটি হয়ে দেখা দেবে। সম্পূর্ণ অবস্থায় এখানে বছরে বিভিন্ন ধরণের যে দেড় লক্ষ টন হেভী মেশিনারি তৈরি হবে তাতে দেশে যে শুধু যন্ত্রবিপ্লব সম্ভব হবে তা নয়, শিল্পবিস্তারের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্র তৈরির মৌলিক যন্ত্র তৈরি হওয়ায় এতদিনে সত্য সত্যই শিল্পবিপ্লব দেশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে।

নভেম্বরের ১৫ ও ১৬ তারিখে হেভী ইঞ্জিনিয়ারিং করপোরেশনের হেভী মেশিন বিল্ডিং প্ল্যাণ্ট ও কোল মাইনিং মেশিনারি প্ল্যাণ্ট যথাক্রমে রাঁচী ও দুর্গাপুরে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হ'ল।

স্পুৎনিকের নূতন দিক্‌

সূর্য্যের একটি গ্রহ এই পৃথিবী আমাদের চোখে "বিপুলা", তার সমুদ্র আমাদের কাছে "অসীম"। কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে আজকের মানুষ সেই বিপুল পৃথিবীর সীমানার মধ্যে আর বাঁধা থাকতে চাইছে না, সীমাহীন অনন্ত মহাকাশের পথে তার কল্পনা ও অভিযান ধেয়ে চলছে। মানুষের এই জয়যাত্রার পথ কৃত্রিম উপগ্রহগুলি খুলে দিয়েছে। ৪ঠা অক্টোবর ১৯৫৭ সালে প্রথম স্পুৎনিকের উদয় পৃথিবীর ইতিহাসে অবিস্মরণীয় ঘটনা। এরপর একে একে অনেক উপগ্রহই আকাশে ছাড়া হ'ল—মানুষের মহাকাশ পরিক্রমায় তারা প্রত্যেকেই এক একটি ধাপ। কৃত্রিম উপগ্রহ আকাশচারী হয়ে মর্ত্ত্যের মানুষের আশা ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গী হয়েছে।

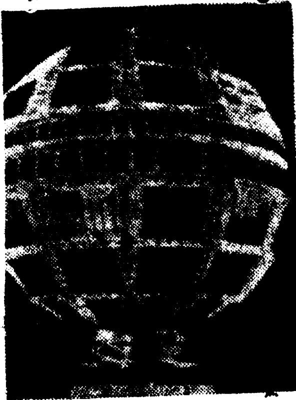
এই উপগ্রহের কয়েকটি আবার বেতার তরঙ্গের ধারক—স্পুৎনিকের এ এক নূতন দিক্‌। কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে বেতার-বার্ত্তা বা টেলিভিশন প্রচার সত্যই একটি অভিনব প্রচেষ্টা। রেডিও সংযোগ স্থাপনের

…মস্যাটি প্রকৃতিগত। আমরা জানি বেতার-তরঙ্গ আলোর তরঙ্গেরই একটা বিশেষ রূপ। এই তরঙ্গগুলি সাধারণ আলোর থেকে অনেক বড় বা দীর্ঘ হওয়ায় দেওয়াল বা অন্য যে কোন বাধা অতিক্রমের বিশেষত্ব



ইকো—১ (১৯৬০)

অর্জন করেছে। রেডিও-রশ্মি আলোর মত সোজা পথ ধরে যায়। প্রায় গোলাকার এই পৃথিবীর দূরতম দুটি স্থানের মধ্যে বেতার সংযোগ তাই অসম্ভব থাকার কথা, কিন্তু তা সম্ভব হচ্ছে এই কারণে যে বাতাসের একটি উপরকার স্তর আয়নোস্ফার রেডিও-তরঙ্গকে আয়নার আলো ফেলার মতই প্রতিফলন করে সঠিক স্থানে পৌঁছে দেয়। লণ্ডন বা ন্যু-ইয়র্কের মানুষের কথা তাই কলকাতার বেতার গ্রাহক যন্ত্রে ধরা পড়ে। কিন্তু সমস্যা আরও জটিল হয় টেলিভিশনের



টেলষ্টার (১৯৬২)

ক্ষেত্রে। টেলিভিশনের ছবি রেডিও তরঙ্গকে আশ্রয় ক'রে ফুটে ওঠে : কিন্তু এই তরঙ্গগুলি খুবই ছোট ছোট। ফলে তারা আকাশের "রেডিও আয়না" আয়নোস্ফারকে সহজেই অতিক্রম ক'রে যায়। উঁচু জায়গা থেকে ফ্লাড লাইটের আলো ফেলার মত সামান্য ৫০ কি ৭০ কিলোমিটার মাত্র তার প্রচার-পরিধি, এর পরই টেলিভিশনের চিত্রবাহী ছোট তরঙ্গের বেতার-রশ্মি মহাশূন্যে বিলীন হয়। টেলিভিশনের ছবিকে তাই দেশব্যাপী বা আরও দূরে মহাদেশব্যাপী ছড়িয়ে দিতে হলে খানিক দূরে দূরে "রীলে" সেণ্টার বসানো দরকার। বিষয়টি খুবই ব্যয়সাধ্য এবং ইঞ্জিনিয়ারিং প্রথায় অত্যন্ত "মামুলী" বলে তার বিকল্প উপায় হচ্ছে আকাশের বুকে টেলিভিশন রশ্মির প্রতিফলক "আয়না"র সৃষ্টি করা। কৃত্রিম উপগ্রহগুলিই একমাত্র এ উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতে পারে। "স্কোর" "ইকো" "করিয়ার" "টেলষ্টার" "রীলে" এবং "সিনকম" এ জাতেরই বিভিন্ন উপগ্রহ (দ্রঃ টেলষ্টার, প্রবাসী কার্ত্তিক ১৩৬৯ ; টেলষ্টারের পর, প্রবাসী আশ্বিন ১৩৭০) ১৯৬২ সালের ১০ই জুলাই কৃত্রিম উপগ্রহ টেলষ্টারের মাধ্যমে টেলি-



সিনকম-২ (১৯৬৩)

ভিশনের ছবি সর্বপ্রথম ইউরোপ আমেরিকার মধ্যে প্রচার সম্ভব হ'ল। ১৯০৩ সালে মার্কনী কর্ত্তৃক আটলাণ্টিকের দু'পারের মধ্যে বেতার সংযোগ স্থাপনের পর এটি হচ্ছে আর একটি স্মরণীয় ঘটনা। ঘটনার তাৎপর্য্য এই যে ১৯৬৪ সালের জাপানের অলিম্পিক না হোক ১৯৬৫ সাল থেকে অন্তত লর্ডের টেষ্ট খেলা বা মার্কিন প্রেসিডেণ্টের শপথ গ্রহণের দৃশ্য পৃথিবীর সমস্ত দেশেরই টেলিভিশনের পর্দায় ফুটে উঠবে।

পৃথিবী আমাদের কাছে যে অনেক "ছোট" মনে হচ্ছে তার কারণ উন্নত পরিবহন এবং সংযোগ ব্যবস্থা। কলকাতার প্রাতরাশ থেকে দিল্লীতে দুপুরের ভাত খাওয়ার মত ওয়াশিংটন থেকে প্যারিস যাত্রা আজ প্রায় দৈনন্দিন হতে চলেছে। একই আকাশে মানুষ আজ

একাধিকবার সূর্য্যোদয় দেখে। বিভিন্ন দেশের মধ্যে যোগাযোগ আজ বহুগুণ ছড়িয়ে পড়েছে। বেতার ও টেলিভিশনের তরঙ্গ বিভিন্ন ব্যবহারকারীদের জন্য আগে থেকেই নির্দিষ্ট থাকে। ১৯৫৩ সালে এই প্রয়োজন ছিল ১০,১০০টি। ১৯৫৯ সালে তা বেড়ে দাঁড়ালো ২০,২০০। বর্তমানে এই সংখ্যা ত্রিশ হাজারকেও ছাড়িয়ে গেছে। রেডিও ও টেলিভিশন ছাড়াও রেডিওফোন রেডিওটেলিগ্রাফ ইত্যাদি সংযোগ ব্যবস্থা আজ বহুগুণ প্রসারিত ও উন্নত হয়েছে। সে সঙ্গে রকেট ও স্পুৎনিকের কার্য্যকরী দিকগুলি সফল হওয়ায় বিভিন্নধর্মী রেডিও-তরঙ্গ ভাগ বাটরা আবার নূতন ভাবে করে নিতে হচ্ছে। আজকের সভ্যতায় এই শিল্পগত উন্নতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত বলে সমস্ত দেশই এ ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়েছেন। সম্প্রতি ইণ্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়নের আহ্বানে পৃথিবীর ৭০টি দেশের প্রায় ৪০০ জন প্রতিনিধি জেনেভায় মিলিত হয়েছিলেন, টেলস্টারের মাধ্যমে জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উ থাণ্টের একটি টেলিভিশন বক্তৃতা দিয়ে সভার কাজ সুরু হয়। গত ৮ই নভেম্বর এই অধিবেশনের পাঁচ সপ্তাহব্যাপী অধিবেশন সমাপ্ত হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের দ্বারা বিবেচিত অধিবেশনের প্রস্তাবগুলি পৃথিবীব্যাপী সংযোগব্যবস্থাকে আরো নিবিড় ও নিখুঁত করে তুলবে। এ সম্ভাবনাকে বহন করেই স্পুৎনিকগুলি নূতন পরিক্রমায় রত হয়েছে।

রেলগাড়ি : কয়লা বনাম বিজলী

রেলগাড়ির লোহার সড়ক বেয়ে শিল্পবিপ্লব আজ দেশের প্রতিটি কোণে ছড়িয়ে পড়ছে। কূপমণ্ডুকতার মোহে বাঁধা গ্রামের সেই সহজ আশ্রয়গুলি আর নেই। জীবন ও জীবিকার আকর্ষণে মানুষ আজ যন্ত্রের আবর্তনে দেশের শিল্পকেন্দ্রগুলির দিকে ছিট্‌কিয়ে পড়ছে। দেশ জুড়ে সমস্ত মানুষ এক গতি লাভ করেছে। পরিবহন আর সেই প্রসঙ্গে রেলগাড়ির গুরুত্ব তাই এত বেশি। এবং এই রেলগাড়ির মধ্যে বিজলীতাড়িত রেলগাড়ি। দুনিয়ার সর্বত্রই আজ ইলেক্‌ট্রিক ট্রেণের দিকে ঝোঁক পড়েছে। বর্তমান পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মোট ২০০০ কিলোমিটার ইলেক্‌ট্রিক ট্রেণের লাইন পাতার কথা আছে। শিয়ালদহ-রাণাঘাট লাইন তার সর্বাধুনিক সংযোজন।

কিন্তু সাধারণ বাষ্পচালিত ট্রেণের বদলে কেন এই ইলেক্‌ট্রিক ট্রেণ? কি তার বিশেষ সুবিধাগুলি? এখানে তার মূল বিষয়গুলি তুলনা করে দেখা হচ্ছে :

[এক] সাধারণ ট্রেণগুলি তাদের প্রয়োজনমত বাষ্প তৈরির জন্য কয়লা বা ডিজেল জ্বালানী হিসাবে বহন করে চলে। ইলেক্‌ট্রিক ট্রেণের পক্ষে এই বাষ্পেরই প্রয়োজন নেই, জ্বালানী বহনের সমস্যা তাই অবান্তর। ইলেক্‌ট্রিক ইঞ্জিন গাড়ি চালানোর জন্য ইলেক্‌ট্রিসিটি গ্রহণ করে—বৈদ্যুতিক পাখা যেমন সরাসরি বিদ্যুৎ টেনে থাকে। এই বিদ্যুৎ তাপ বা জলশক্তি থেকে উৎপন্ন হয়ে তারের পথে সঞ্চারিত হয়।

[দুই] কামারশালার আগুনের মত সাধারণ ইঞ্জিন সবসময়েই তাতিয়ে রাখা দরকার। অপর পক্ষে, ইলেক্‌ট্রিক ট্রেণ চালানোর জন্য সময়মত 'সুইচ্'টি দিয়ে দিলেই হ'ল।

[তিন] ইলেক্‌ট্রিক ট্রেণে ধোঁয়া বা ইঞ্জিনের উত্তাপের সমস্যা নেই। মাটির তলায় বা লম্বা সুড়ঙ্গপথে ট্রেণ চালানোর পক্ষে এটি সমস্ত সুবিধা।

[চার] এ ধরণের ট্রেণ সহজেই "স্পীড" নেয় এবং সহজেই থামানো চলে। শহরতলী অঞ্চলের পরিবহন ব্যবস্থায় এটি বিশেষ বিবেচনা, কারণ এ সব অঞ্চলে লোকের বসতি খুব ঘন থাকায় ষ্টেশনগুলি বেশ কাছাকাছি রাখতে হয়।

[পাঁচ] ইলেক্‌ট্রিক ট্রেণ সামনে-পিছনে দু'দিক্ থেকেই চলতে পারে। "শাণ্টিং"-এর বৃথা সময় এভাবে বাঁচানো চলে।

[ছয়] কেনায় ব্যয় অবশ্য যথেষ্ট—সাধারণ ইঞ্জিনের তুলনায় বেশি, তবে চলতি খরচ অনেক কম।

এ সমস্ত বিষয়গুলির কথা ভেবে বিজলী-চালিত ইঞ্জিন তৈরির দিকে দেশে আজ পরিকল্পনা তৈরি হয়েছে।

মাতৃভাষার দাবি

হিন্দী বনাম ইংরেজী তথা মাতৃভাষার প্রশ্নে সম্প্রতি লোকসভা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। সীমান্তের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা ইংরাজীতে চলার মুখে হঠাৎ বাধা এল, দাবী—হিন্দীতে বলতে হবে—"হিন্দীমে বোলিয়ে"। এর পরেই সেই দক্ষযজ্ঞ, ভাষার প্রশ্ন বিষয়ের গুরুত্বকে অনায়াসে অস্বীকার করল। যুক্তিকে অগ্রাহ্য করে একটা নিছক আবেগ নানা রাজনৈতিক প্রশ্নকে এভাবে অযথা জটিল করে তুলছে। হিন্দীপ্রেমী নেতা ভোট-পরাক্রমে অধৈর্য্য হয়ে ইংরাজীর ব্যবহারিক মূল্যকে অস্বীকার করতে চাচ্ছে। এবং সে সঙ্গে অহিন্দীভাষীর মাতৃভাষার দাবীও তার কাছে সমান মূল্যহীন প্রতিপন্ন হচ্ছে। জাতি ও জাতীয়তা বিকাশের পক্ষে এই সর্বনাশা মনোভাব যত তাড়াতাড়ি যুক্তির শাসনে বশ মানে ততই দেশের মঙ্গল।

এই প্রসঙ্গে শিক্ষায় মাতৃভাষার অবদান সম্বন্ধে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় যা বলেন—

স্বাধীন দেশে বিদেশী সরকারের বাধা যখন অপসারিত হয়েছে, তখন দেশের সর্বসাধারণের কাছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা আমরা আহরণ করে আনতে চাই, সকলের মধ্যে শিক্ষা ছাড়িয়ে দিতে চাই। সেটা করতে হ'লে মাতৃভাষা ছাড়া গত্যন্তর নেই। জাতীয় সংহতির কথা তুলে যাঁরা ইংরেজী বজায় রাখতে চান, তাঁদের প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে, এতদিন আমাদের সংহতির মূলে কি ছিল—ইংরেজী ভাষা, না ইংরেজ শাসনের চাপ? এখন ত ইংরেজী ভাষার চর্চা বাড়ছে, কিন্তু জাতীয় অসংহতি দেখা যাচ্ছে কেন? সূর্যের কেন্দ্রে প্রবল চাপের জন্যে বায়বীয় পদার্থের অণুগুলিকেও পরস্পরের নিকট অবস্থিত ও সুসংহত ব'লে প্রতিভাত হয়। কিন্তু চাপের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাদের বায়বীয় প্রকৃতি প্রকট হয়ে পড়ে। আমাদেরও হয়েছে তেমনি—বিদেশীরা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভিতরের প্রকৃতিটা বেরিয়ে পড়ল। ভাষা ও সংস্কৃতি মানুষের প্রাণের জিনিষ। ভাষার বিভিন্নতা, সংস্কৃতির বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও মানুষের মন উদার হলে তারা এক হ'তে পারে। আমি ভাবি—মানুষের মন এমন উদার হবে কবে, যেদিন ভাষা ও সংস্কৃতির বিভিন্নতা সত্ত্বেও তারা এক হ'তে পারবে? সব শেষে বলি—এখন দ্বন্দ্বের সময় নয়, কাজের সময়। বিশ্ববিদ্যালয় মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে শিক্ষাদানের নীতি গ্রহণ করুন, আর নাই করুন—আমরা চুপ করে বসে থাকব না। যেখানে যা সুযোগ আছে, তা গ্রহণ করে আমরা বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের কথা সকলকে শোনাব। রোজ একবার করে আমরা যদি মানুষের মনে ধাক্কা মারতে পারি, একদিন তারা আমাদের কথা শুনবেই।

(মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের উচ্চশিক্ষা বিষয়ে ২৭শে এপ্রিল ১৯৬২ সালের এক আলোচনা সভায় বক্তৃতা।)

এ. কে. ডি.

প্রাচীন ভারতে উদ্ভিদ্ বিজ্ঞান

শ্রীনিত্যেন্দ্রনাথ সরকার

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্যতম অবদান—নানাবিধ বিজ্ঞানের বিকাশ। এই সমস্ত বিজ্ঞানের ব্যবহারিক মূল্য যাহাই থাকুক না কেন, উহাদের দার্শনিক ভিত্তি সমসাময়িক অন্যান্য, বিশেষতঃ পাশ্চাত্য সভ্যতার বিচারে বা মাপকাঠিতে অতুলনীয়।

এই ভারতীয় বৈজ্ঞানিক প্রতিভার পশ্চাতে রহিয়াছে গভীর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি। অনাদিকাল হইতে প্রকৃতির নানাবিধ রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য মানবমনের যে গভীর জিজ্ঞাসা তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে হয় দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম। তাই মনে হয়, যে সভ্যতার দর্শন যত উন্নত তাহার বিজ্ঞানও সেইরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত। কারণ, দর্শনই বিজ্ঞানের জনক।

উদ্ভিদ্‌বিদ্যা সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতীয় মনীষীদিগের অবদান আধুনিক বৈজ্ঞানিক জগতের দৃষ্টির বাহিরে রহিয়াছে। ভারত যে এই বিদ্যায় কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যায় মহর্ষি পরাশর-রচিত 'বৃক্ষায়ুর্বেদ' গ্রন্থে। এই গ্রন্থের বিষয়বস্তুসমূহ এতই সুসম্বদ্ধ এবং গভীর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পরিচায়ক যে ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয় সভ্যতার এই সুপ্রাচীন যুগে এইরূপ উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ রচনা সম্ভবপর হইয়াছিল।

'বৃক্ষায়ুর্বেদ'-রচয়িতা পরাশর—ভারতীয় চিকিৎসা গ্রন্থ চরকসংহিতার মূল রচয়িতা আত্রেয়-শিষ্য—অগ্নিবেশের সতীর্থ ছিলেন।[১] সম্ভবতঃ পরাশর চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নকারীদিগের সুবিধার জন্যই এই বৃক্ষায়ুর্বেদ রচনা করিয়াছিলেন। বস্তুতঃপক্ষে চরকীয় বা সমসাময়িক যুগে চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিলাভ বহুলাংশে নির্ভর করিত—উদ্ভিজ্জ-ভেষজ পরিচয়ের বা জ্ঞানের উপর।[২] তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের চরম পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইবার সময় ভেষজ-বিদ্যায় পারদর্শিতার জন্য ভগবান্ বুদ্ধের চিকিৎসক—জীবককে বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্যোজনের মধ্যে অবস্থিত সমুদয় বৃক্ষলতার পরিচয় ও গুণাগুণ বর্ণনা করিতে হইয়াছিল। ইহা হইতে বুঝা যায়, প্রাচীন যুগেও উদ্ভিদ্ বিজ্ঞানের ব্যবহারিক মূল্য কিরূপ ছিল।

বাৎস্যায়ন কামসূত্রে চৌষট্টি কলাবিদ্যার মধ্যে বৃক্ষায়ুর্বেদের উল্লেখ আছে। অগ্নিপুরাণেও বৃক্ষায়ুর্বেদের কোন কোন বিষয় উক্ত হইয়াছে।[৩] চরক-সুশ্রুত প্রভৃতি চিকিৎসাগ্রন্থে এবং অন্যান্য আয়ুর্বেদীয় ভেষজনিঘণ্টু সমূহে (Pharmacopoeas) বৃক্ষলতার নাম গৃহীত হইয়াছে এই বৃক্ষায়ুর্বেদ মতানুসারেই। বৃক্ষলতার পরিচয়ে সাধারণতঃ তিন প্রকার নাম গৃহীত হইয়াছে, যথা—(১) পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা (botanical names), (২) গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা (therapeutic index), এবং (৩) প্রাকৃত নাম বা উৎপত্তিবোধক সংজ্ঞা (habitat)। পরিচয়জ্ঞাপক নামগুলি বৃক্ষায়ুর্বেদসম্মত। বৃক্ষায়ুর্বেদে জ্ঞান না থাকিলে এই পরিচয়জ্ঞাপিক সংজ্ঞাগুলি মোটেই বোধগম্য হয় না। ভেষজনিঘণ্টুতে জ্ঞানলাভের জন্য বর্তমান সময়ের মত প্রাচীনকালেও চিকিৎসাগ্রন্থের সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষায়ুর্বেদও অধ্যয়ন করিতে হইত। প্রাচীন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি লুপ্ত হওয়ার জন্য এই বৃক্ষায়ুর্বেদীয় বিদ্যাচর্চ্চা—যাহা গুরুপরম্পরায় বা হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিতে নিবদ্ধ হইয়া কোনরূপে জ্ঞানধারাকে অব্যাহত রাখিয়াছিল—তাহা লোপ পাইতে থাকে। এতকাল যে জ্ঞানধারা সুসম্বদ্ধভাবে চলিয়া আসিতেছিল তাহা নানা ভাবে বিকৃত হইয়া বা প্রক্ষিপ্ত ভাবে আরও কিছুকাল আত্মরক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু চর্চার অভাবে তাহাও কালক্রমে বিস্মৃতির গর্ভে লুপ্ত হইয়া যায়। ইহার ফলস্বরূপ পরবর্তীকালে এবং আধুনিক যুগে আয়ুর্বেদীয় বৃক্ষলতার পরিচয়ে আয়ুর্বেদীয়

---

১ অগ্নিবেশশ্চ ভেলশ্চ জতুকর্ণঃ পরাশরঃ।
হারীতঃ ক্ষারপাণিশ্চ জগৃহুস্তন্মুনের্বচঃ ॥ ৩১ ॥
চরকসংহিতা, সূত্রস্থান, ১ম অঃ।

২ যোগবিন্নামরূপজ্ঞস্তাসাং তত্ত্ববিদুচ্যতে। ৫৬ ॥
চঃ সং, সূত্রস্থান, ১ম অঃ।
[অর্থাৎ—যিনি ওষধিদিগের প্রয়োগ, নাম ও রূপ—তিনিই অবগত আছেন, তাঁহাকেই উদ্ভিদ্‌বিৎ কহে।]

৩ কুরণ্টাস্থাত্র বীজাঃ মূলজাস্তূৎপলাদয়ঃ—অগ্নিপুরাণ।
(রাধাকান্ত দেবের 'শব্দকল্পদ্রুম' অভিধানে উদ্ধৃত)

চিকিৎসকদিগকে সম্পূর্ণ অসহায়ের মত অবৈজ্ঞানিকভাবে চলিতে হইয়াছে বা হইতেছে। তাঁহারা অনেকক্ষেত্রে বেদে বা বেনের উপর নির্ভর করিয়াই সন্তুষ্ট আছেন। অধিকন্তু, তাঁহাদের এই বিকৃত জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া যে-সমস্ত আধুনিক গবেষক বা ভেষজনিঘণ্ট রচয়িতাগণ (যথা, ডাঃ উদয়চাঁদ দত্ত, ডাঃ কানাইলাল দে, রক্সবার্গ, ডিমক্, ওয়ার্ডেন, হুপার, এবং অতি আধুনিক—কর্ণেল স্যর রামনাথ চোপরা) গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন এবং যেগুলি প্রামাণিক গ্রন্থ হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত, তাহাতেও নানারূপ ভুলপ্রমাদ রহিয়াছে এ বিষয় বর্তমান লেখক একাধিক বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় নিবন্ধাকারে আলোচনা করিয়াছেন বা করিতেছেন।

কিছুকাল পূর্বে বর্তমান লেখকের পিতা—নবদ্বীপ-নিবাসী পরলোকগত যোগেন্দ্রনাথ ভিষগ্‌রত্ন মহাশয় পরাশরীয় বৃক্ষায়ুর্বেদের এক পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেন। বর্তমান লেখক এই পাণ্ডুলিপির এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিবন্ধাকারে বঙ্গীয় রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটির জর্নালে (Vol. XVI, No. 1, 1950) প্রকাশ করেন। কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের উদ্ভিদ বিজ্ঞানের অধ্যাপক পরলোকগত গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার, Ph. D, F. N. I মহাশয় ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক এবং ভারত-তত্ত্ববিদ্‌গণ এই আবিষ্কারের গুরুত্ব সম্বন্ধে উচ্চ মত পোষণ করেন। বর্তমানে লেখক এই পাণ্ডুলিপির উপর ভিত্তি করিয়া নব্য উদ্ভিদবিদ্যার সহিত পরাশরীয় উদ্ভিদ-বিদ্যার এক তুলনামূলক আলোচনা লিখিতেছেন। এই লেখা সম্পূর্ণ হইলে মূল পাণ্ডুলিপিসহ প্রকাশ করা হইবে। এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির শেষের দিকের চিকিৎসিত কাণ্ডের কতকাংশ পাওয়া যায় নাই। তথাপি প্রধান অংশ হইতে ভারতীয় উদ্ভিদবিজ্ঞান যে কত উচ্চাঙ্গের ছিল তাহা জানিতে পারা যায়।

বর্তমান সময়ে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় বৈজ্ঞানিকগ্রন্থ রচনা করিতে পারিভাষিক শব্দের জন্য যথেষ্ট অসুবিধায় পরিতে হয়। অনেকক্ষেত্রে নানারূপ কষ্টকল্পিত পরিভাষা সৃষ্টি করিতে হয়। কিন্তু এই পরাশরীয় বৃক্ষায়ুর্বেদ সর্বভারতীয় ভাষায় গ্রহণযোগ্য বৃক্ষবিদ্যা সম্বন্ধীয় অধিকাংশ পারিভাষিক শব্দ সরবরাহ করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম। ইহার পারিভাষিক সংজ্ঞাগুলি শব্দবিন্যাসে ও অর্থসম্পদে অত্যাশ্চর্যরূপে বিজ্ঞানসম্মত। যেমন Xylemকে অর্থাৎ রসবহস্রোতকে বলা হইয়াছে 'স্যন্দনী'। স্যন্দ শব্দের ধাতুগত অর্থ—গতি। এবং স্যন্দনীর অর্থ রথ ('স্যন্দতে অনেন স্যন্দনম্')। ইংরেজী Xylem-এর সমার্থবাচক স্যন্দনী কথাটির ভিতর physiological এবং histological তাৎপর্য কত পূর্ণাঙ্গভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে তাহা সুধীগণ নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। তাঁহারা আরও আশ্চর্যান্বিত হইবেন যে, বৃক্ষদেহে যে নির্দিষ্ট রসবহস্রোতসমূহ আছে তাহা প্রাচীন ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণ কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বেই অবগত হইয়াছিলেন।

যাহা হউক এই নিবন্ধের ক্ষুদ্র পরিধির ভিতর যথাসম্ভব আমরা পাঠকদিগের অবগতির জন্য পরাশরীয় বৃক্ষায়ুর্বেদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব। পরি-শেষে পারিভাষিক শব্দের তালিকা হইতে প্রধান প্রধান বৃক্ষায়ুর্বেদীয় সংজ্ঞার বিষয় জানিতে পারা যাইবে। সংস্কৃত ভাষায় রচিত হওয়ায় পরাশরীয় পরিভাষা সর্বভারতীয় পাঠ্যপুস্তকে গ্রহণযোগ্য হইতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম। এই প্রসঙ্গে সুধীগণ লক্ষ্য করিবেন 'বৃক্ষায়ুর্বেদ' শব্দটিই বা কত গভীর অর্থব্যঞ্জক! বৃক্ষ+আয়ুঃ+বেদ—অর্থাৎ বৃক্ষসমূহের প্রাণবিজ্ঞান; আয়ু অর্থে প্রাণ (life)। ইংরেজী ভাষায় এই শব্দটির অর্থ 'Science of plant life'।

বৃক্ষায়ুর্বেদ গ্রন্থটি ছয়টি কাণ্ডে বিভক্ত, যথা—(১) বীজোৎপত্তিকাণ্ড, (২) বনস্পতিকাণ্ড, (৩) বানস্পত্য-কাণ্ড, (৪) বীরুধবল্লীকাণ্ড, (৫) গুল্মক্ষুপকাণ্ড, (৬) চিকিৎসিতকাণ্ড।

বীজোৎপত্তিকাণ্ডে বিস্তৃত আলোচনাসহ বৃক্ষবিজ্ঞানের সংজ্ঞাসমূহের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ বীজ হইতে পুনরায় বীজ হওয়া পর্যন্ত বৃক্ষের বা উদ্ভিদের সর্বাবস্থার বিষয় এই কাণ্ডে আলোচিত হইয়াছে। বীজোৎপত্তিকাণ্ডে আটটি অধ্যায় আছে, যথা—(১) বীজোৎপত্তিসূত্রীয়াধ্যায়, (২) ভূমিবর্গাধ্যায়, (৩) বন-বর্গাধ্যায়, (৪) বৃক্ষাঙ্গসূত্রীয়াধ্যায়, (৫) পুষ্পাঙ্গ-সূত্রীয়াধ্যায়, (৬) ফলাঙ্গসূত্রীয়াধ্যায়, (৭) অষ্টাঙ্গ-সূত্রীয়াধ্যায়, (৮) দ্বিগণীয়াধ্যায়।

চৈত্ররথ বনে (বনং চৈত্ররথং রম্যং মানসসরঃ শোভিতম্) ভরদ্বাজপ্রমুখ মুনিগণ[৪] জগতের হিতকর বৃক্ষ-লতার বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিয়া মহর্ষি পরাশরকে প্রশ্ন

৪ পৃষ্টেন মুনিভিঃ সর্বৈঃ পরাশরোঽব্রবীত্ততঃ।
অথর্বাঙ্গং প্রবক্ষ্যামি ব্রহ্মোক্তং বৃক্ষবৈদ্যকম্॥ ৪॥
(বৃক্ষায়ুর্বেদ, বীজোৎপত্তিকাণ্ড, ১ম অঃ)
আপোহি কললং ভূত্বা যৎ পিণ্ডস্থানুকং ভবেৎ
তদেবং বুহ্যমানত্বাৎ বীজত্বমধিগচ্ছতি।
(বৃঃ আঃ, বীজোৎপত্তিকাণ্ড, ১ম অঃ)

করিলে, তদুত্তরে তিনি বলিলেন, "ব্রহ্মোক্ত বৃক্ষবৈদ্যক—যাহা অথর্ববেদের অঙ্গ—আপনাদিগকে বর্ণনা করিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন। এইরূপ ভূমিকা করিয়া পরাশর সূত্রাকারে 'বীজোৎপত্তিসূত্রীয়াধ্যায়' আরম্ভ করেন। এই অধ্যায়ে আদিবীজের উৎপত্তি কিরূপে হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করিতে পরাশর বলিয়াছিলেন—"জল কলসীভূত হইয়া যে পিণ্ডস্বানুকের (আদিম জৈবপিণ্ড—a nucleus) উৎপত্তি হয় তাহা বসুশক্তি দ্বারা (terrestrial energies) ব্যূহমান হইয়া (regulated) বীজত্ব প্রাপ্ত হয়। আধুনিক বিজ্ঞানে যাহাকে protoplasm অর্থাৎ আদিম জৈবপদার্থ বলা হয়, পরাশর তাহাকে 'কলল' বলিয়াছেন, (সম্ভবতঃ এই কললের সহিত Colloid বা Colloidal body-র কিছু Etymological সম্বন্ধ আছে)। এই বিষয়ে বর্তমান লেখক এসিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত উল্লিখিত প্রবন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।

এই বীজোৎপত্তিসূত্রীয়াধ্যায়ে সূত্রাকারে বৃক্ষাঙ্গসমূহ অর্থাৎ—পত্র, পুষ্প, ফল, মূল, ত্বক্‌, কাণ্ড, সার, স্বরস, নির্যাস, কণ্টক, বীজ প্ররোহ (অঙ্কুর) ইত্যাদির বিষয় আলোচিত হইয়াছে। এই স্থানে প্রসঙ্গক্রমে পরাশর বলিয়াছেন যে, বৃক্ষাঙ্গসমূহের তুল্যাতুল্য প্রকৃতি ও আকৃতি উপলব্ধি করিয়াই বিভিন্ন বৃক্ষলতার গণবিভাগ সম্ভবপর।৫

বীজোৎপত্তিকাণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে অর্থাৎ ভূমিবর্গসূত্রীয়াধ্যায়ে বিভিন্ন প্রকৃতির ভূমির বিষয় বলা হইয়াছে। ভূমিকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে, যথা—'জাঙ্গল', 'আনুপ' এবং 'মিশ্র'। নদনদীবিরল, উষর, সিকতাবহুল এবং তদ্ধেতু বৃক্ষলতাবিরল দেশকে জাঙ্গলদেশ বলা হইয়াছে। আনুপদেশ নদনদী-বহুল। এই দেশের ভূমি কর্দমাক্ত, এখানে হরিৎ-তৃণরাজি ও নল, কুমুদ, বেতসবনের প্রাচুর্য দেখা যায়।৬ যে-দেশে জাঙ্গল ও আনুপের মিশ্র লক্ষণ দেখা যায় এবং ঐ দুই দেশের উৎপন্ন বৃক্ষলতা দৃষ্ট হয়, সেই দেশকে মিশ্র বা সাধারণ দেশ বলে। সাধারণতঃ মিশ্রদেশের ভূমি উর্বরা এবং এইরূপ ভূমিতে সর্বপ্রকার বৃক্ষলতা গুল্ম উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভূমি বা দেশের তারতম্যানুসারে অর্থাৎ জাঙ্গল, আনুপ বা মিশ্রভেদে উৎপন্ন বৃক্ষলতার রস, বীর্য গুণেরও তারতম্য হয়—তাহাও পরাশর বলিয়াছেন। যেমন ভূমির বিরসভাবহেতু এবং অগ্নি-বায়ু-পার্থিব গুণ-বহুল প্রকৃতি ও স্বাভাবিক রুক্ষতাহেতু জাঙ্গলদেশে প্রায়শঃ কষায়, কটু, তিক্ত প্রভৃতি রুক্ষরসান্বিত বৃক্ষলতা-গুল্ম উৎপন্ন হয়।৭ আনুপদেশে ভূমির স্বরসভাব এবং সলিল-পৃথিব্যাত্মক গুণ ও সলিলের স্বাভাবিক সোমগুণ-হেতু প্রায়শঃ মধুর অম্লরসবিশিষ্ট অরুক্ষ প্রকৃতির সৌম্য-বৃক্ষলতা ও 'ওষধিসকল' উৎপন্ন হইয়া থাকে।৮

তৃতীয় অধ্যায়ে অর্থাৎ বনবর্গসূত্রীয়াধ্যায়ে ভারত-বর্ষের নৈসর্গিক বনসমূহের নাম এবং তাহাদের অবস্থিতি ভৌগোলিক পন্থায় বর্ণনা করা হইয়াছে। এই বনসমূহের নাম—চৈত্ররথবন, কালকবন, কিরাতবন, পাঞ্চনদবন, প্রাচ্যবন, বেদিকাকসবন, আঙ্গিরেয়বন, কালিঙ্গকবন, দাশার্ণকবন, অপরান্তবন, সৌরাষ্ট্রবন।৯

তৎপর চতুর্থ অর্থাৎ—বৃক্ষাঙ্গসূত্রীয়াধ্যায়ে সূত্রাকারে বৃক্ষের অঙ্গসমূহের বিষয় বলিয়া, পত্রের বিষয় বিস্তৃত ভাবে বলিয়াছেন। পত্র কি? পত্রের কার্য কি? পত্র যে বায়ু, আতপ ও রঞ্জক (বর্ণাত্মক পদার্থ) গ্রহণ করে তাহা বলিয়াছেন। "পত্রাণি তু বাতাতপরঞ্জকানাভিগৃহ্ণন্তি"—পরাশরের এই উক্তি দ্বারা প্রাচীন ভারতীয় মনীষীদিগের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার

৫ অঙ্গৈশ্চৈতৈশ্চ বৃক্ষবল্লীগুল্মানাং সাধর্ম্যং বৈধর্ম্যং তুল্যাতুল্য প্রকৃতিমভিসমীক্ষ্য গণবিভাগমুপদেক্ষ্যামঃ—বৃক্ষায়ুর্বেদ, বীঃ কাঃ, বৃক্ষাঙ্গসূত্র।

৬ অথানুপঃ পুনঃ স্বরঃ সরিৎ সমুদ্র পর্যন্তপ্রায়ঃ।
শাদ্বলনড়নলকুমুদ বেতস্বানদপ্রপঙ্কিল ভূমিভাগঃ।
সিক্তাম্ব ধূম্রসংকাশপ্রবাতবহুলো হিন্তালতমালকদলী
নারিকেলবেত্রবেণু বল্বজবানীরবেতসোপশোভিত-
তটতরঙ্গিণীভিঃ।
অনেক দ্রুমবল্লীপ্রতানা তরুণবিটপপুষ্পিতবনভূমিভাগঃ॥ ৮॥
বৃক্ষায়ুর্বেদ, ভূমিবর্গসূত্রীয়াধ্যায়ঃ।

৭ ভূমের্বিরসভাবত্বাদগ্নি পবনপৃথিব্যাত্মকত্বাচ্চ জাঙ্গলে
নৈসর্গিক রুক্ষত্বাচ্চ প্রায়শঃ কষায়কটুতিক্তরুক্ষ-
রসান্বিতাবৃক্ষা উদ্ভবন্তি॥ ৭॥
বৃঃ আঃ ভূমিবর্গ

৮ তস্মাদানুপে ভূমেঃ স্বরসভাবত্বাৎ সলিলপৃথিব্যাত্মকত্বাচ্চ
মধুরাম্লপ্রায়োঽরুক্ষপ্রকৃতিবৃক্ষ বল্ল্যোষধিগুল্মা উদ্ভবন্তি
সলিলস্য নৈসর্গিক সৌম্যত্বাচ্চ॥ ৯॥—বৃঃ আঃ ভূমিবর্গ

৯ বনং চৈত্ররথং রম্যং মানসসরঃ শোভিতম্॥
ততশ্চ প্রতীচিদেশে কালকং বনমুচ্যতে॥
প্রাক্‌দেশে কিরাতঞ্চৈব হ্লাদিনী প্লাবিতে স্থিতম্॥
ত্রয়মেতত্ মহারণ্যং হিমাদ্রি শিখরাশ্রিতম্॥
সিন্ধুসাগরসংগমাত্ হিমালয়কৃতাবধি॥
কালঞ্জরেকুরুক্ষেত্রে বনং পাঞ্চনদং স্মৃতম্॥
... ...
সহ্যাদ্রিভৃগুকচ্ছান্তমপরান্তং বনং স্মৃতম্॥
অবন্ত্যাং দারবত্যাং চ সৌরাষ্ট্রবনমুচ্যতে॥

বিষয় বিস্ময় মানিতে হয়। বৃন্তে (বোঁটায়) যে ভাবে পত্রের সংযোগ হয় তাহা এবং পত্রবৃন্ত বৃক্ষকাণ্ডে বা শাখায় যত প্রকারে সন্নিবিষ্ট হয় তাহা বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন এবং সেই সকল সন্নিবেশের সংজ্ঞা দিয়াছেন। পরিচিত ব্যবহারিক দ্রব্যের এবং কোন কোন পরিচিত জীবজন্তুর বা তাহাদের অঙ্গের আকৃতি অনুসারে পত্রের নাম দেওয়া হইয়াছে, যথাঃ 'জুহুর্পণ' (বৈদিকযজ্ঞের ঘৃতাহুতির পাত্র বা দর্বীসদৃশ, যেমন—বটপত্র); 'মণ্ডূকপর্ণী' ভেকের আকৃতি-বিশিষ্ট, যেমন থানকুনী বা থুলকুড়ির পাতা (আয়ুর্বেদের 'ব্রাহ্মী')।

পত্রসমূহের শিরাসন্নিবেশের (venation) প্রকৃতি-অনুসারে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা: 'প্রগুণ সন্নিবেশ' (parallel venation) ও বেল্লিত সন্নিবেশ (reticulate venation)। প্রগুণ সন্নিবেশে শিরা-সমূহ পত্রপক্ষে (leaf blade) ঋজুক্রমে অবস্থান করে। এই জাতীয় পত্রকে 'মৌঞ্জপর্ণ' বলে এবং ইহারা এক-মাতৃক বীজসম্পন্ন (monocotyledonous) উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য, যেমন—তাল, নারিকেল, ধান্য ইত্যাদি তৃণ-জাতীয় উদ্ভিদ। বেল্লিত সন্নিবেশ—এলোমেলো জালবৎ। এইরূপ সন্নিবেশযুক্ত পত্রকে 'জালিকপর্ণ' বলা হইয়াছে এবং ইহারা দ্বিমাতৃক বীজসম্পন্ন (Dicotyledonous) উদ্ভিদেই সম্ভব।

পঞ্চম, অর্থাৎ—পুষ্পাঙ্গসূত্রীয়াধ্যায়ে পুষ্প সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। পুষ্পের বিভিন্ন অঙ্গের সংযোজন অনুযায়ী পুষ্পের চতুর্বিধ মণ্ডলের সংজ্ঞাসহ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, যথা—তুঙ্গমণ্ডল, কুম্ভ-মণ্ডল, তুঙ্গমণ্ডল ও বাট্যমণ্ডল—ইহারা যথাক্রমে Hypogynous, Epigynous, Perigynous ও সমগ্র Malvaceae family-র পুষ্পের সহিত তুল্য।

চন্দ্রকিরণ ও সূর্যরশ্মি দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া যে দুই বিভিন্ন জাতীয় পুষ্প বিকশিত হয় তাহাও প্রাচীন ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণ জানিতেন। এই দুই জাতীয় পুষ্পকে 'চন্দ্রকান্ত' ও রবিকান্তগণীয় পুষ্প বলা হইয়াছে।[১০]

প্রধানতঃ পুষ্প অনুসারেই বৃক্ষলতার গণনির্দেশ করা হইয়াছে। কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বেই ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণ এই তত্ত্ব প্রথম আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই গণনির্দেশ অনুসারেই ভারতীয় ভেষজনিঘণ্টুগুলিতে বৃক্ষায়ুর্বেদীয় নাম ও 'গণ' উল্লেখ করা হইয়াছে। আলোচ্য উদাহরণে ইহা প্রস্ফুট হইবে। "কুটজো মল্লিকাপুষ্প কালিঙ্গোগিরিমল্লিকা" (পাতঞ্জল নির্ঘণ্টু)। এই শ্লোকের প্রত্যেকটি শব্দই একই কুটজ বৃক্ষের (বাংলা-কুড়চী) পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা ব্যতীত আর কিছুই নহে। 'কুটজ' -এই শব্দটির দ্বারা পরিষ্কাররূপে বলা হইয়াছে যে, এই বৃক্ষ সাধারণতঃ পাহাড়ীয়া অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। মল্লিকাপুষ্প শব্দটির দ্বারা এই বৃক্ষের পুষ্পানুযায়ী গণ-নির্দেশ করিতেছে, এবং ইহা আধুনিক বৃক্ষবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত তাহা বৃক্ষায়ুর্বেদের মল্লিকাপুষ্পের সংজ্ঞা হইতে জানা যাইবে। 'কালিঙ্গ'—এই প্রতিশব্দের দ্বারা ইহা বুঝা যায় যে, এই কুটজ বৃক্ষের স্বাভাবিক জন্মস্থান (habitat) কলিঙ্গ দেশ অর্থাৎ উড়িষ্যা-ছোটনাগপুর অঞ্চল। বস্তুতঃ এই অঞ্চলেই কুটজ বৃক্ষের প্রাচুর্য বিশেষ ভাবে দেখা যায়। 'গিরিমল্লিকা' শব্দটি দ্বারা কুটজ এবং মল্লিকাপুষ্পের তাৎপর্যবোধক এক অভিন্নার্থ শব্দ-বিন্যাস করা হইয়াছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে অর্থাৎ ফলাঙ্গসূত্রীয়াধ্যায়ে ফলের বিষয় বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। বীজাধার ও পুষ্পের অন্যান্য অঙ্গের অবস্থানভেদে ফলসমূহকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে ভুক্ত করা হইয়াছে, যথা—'পুষ্পক্রান্ত ফল', 'পুষ্পশীর্ষক ফল' এবং 'সংবৃত ফল'। আকৃতি ও প্রকৃতি-ভেদে এবং নানাবিধ বৈচিত্র্যময় গঠনের উল্লেখ করিয়া ফলসমূহের সংজ্ঞা নির্দেশ করা হইয়াছে। ফলশস্যকে 'শলাটু' বলা হইয়াছে এবং খণ্ড ও অখণ্ডভেদ দুই প্রকার, যেমন যথাক্রমে আমলকী ও আম্র।

সপ্তম অধ্যায়ের নাম অষ্টাঙ্গসূত্রীয়াধ্যায়। এই অধ্যায়ে বৃক্ষের মূল, ত্বক্‌, কাণ্ড, সার, স্বরস, নির্যাস, স্নেহ ও কণ্টক—এই আটটি বৃক্ষাঙ্গের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

অষ্টম অধ্যায়ে অর্থাৎ দ্বিগণীয়াধ্যায়ে—বীজ ও অঙ্কুরের বিষয়[১১] সবিস্তারে আলোচনা করিয়া পরাশর বীজোৎপত্তি-

---

১০। তত্র পুষ্পানি যানি বিকশিতানি রজন্যাং তানি চন্দ্রকান্ত-গণীয়ানি ভবন্তি। নিশাহি চন্দ্রবলবত্বাৎ। যানি তু পুষ্পানি দিবায়াং বিকশন্তি তানি রবিকান্তগণীয়ানি দিবসংহি রবিবলত্বাৎ ॥ ৫২ ॥
—বৃঃ আঃ, পুষ্পাঙ্গসূত্র, ৫ম অঃ।

১১। কেবাঞ্চিদবকেশীনাং পত্রপৃষ্ঠে বীজস্বভাবঃ পত্রাঙ্কুরঃ সঞ্জায়তে। এতেন পত্রাঙ্কুরেণ-তে বৃক্ষাগুল্মমুপাদয়ঃ-সমুদ্ভবন্তি ॥ ১১ ॥
—বৃঃ আঃ, বীজোৎপত্তিকাণ্ড, দ্বিগণীয়াধ্যায়ঃ।

কাণ্ডের সমাপ্তি করিয়াছেন। পরাশর এই অধ্যায়ে 'ফার্ণ' (Fern) জাতীয় উদ্ভিদের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহাদিগকে 'অবকেশী' বলিয়াছেন। অবকেশী জাতীয় উদ্ভিদেরা উহাদেরই পত্রপৃষ্ঠে অবস্থিত পত্রাঙ্কুর হইতে উৎপন্ন হয়।

বীজোৎপত্তিকাণ্ডে—পরাশর বৃক্ষ-বিজ্ঞানের যাবতীয় পরিভাষার বিস্তৃত আলোচনা ও সংজ্ঞাভুক্ত করিয়া তৎপর বনস্পতি, বানস্পত্য, বীরুধবল্লী (লতাজাতীয়) ও গুল্মক্ষুপ কাণ্ডের বিস্তৃত বিবরণ যথাক্রমে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সর্বশেষ চিকিৎসিতকাণ্ড। দুঃখের বিষয়, পাণ্ডুলিপির আবিষ্কর্তা এই কাণ্ডের সন্ধান বা উদ্ধার করিতে পারেন নাই।

এই প্রসঙ্গে পাঠকগণকে জানাইতেছি যে পরাশর বৃক্ষায়ুর্বেদ রচনাসূত্রে নানাবিধ মৌলিক বৈজ্ঞানিক সত্যের বিষয়ও উদ্ঘাটন করিয়াছেন। যেমন বলিয়াছেন—সূর্যকিরণ দহন এবং রঞ্জনের কারণ ('আতপো দহনে রঞ্জনে এব কারণং ভবতি')। পুনরায় বলিয়াছেন—তাপ, বর্ণ, বৃক্ষপত্র তৈজসাত্মক—অর্থাৎ (সূর্য)-তেজসম্ভূত (ঔষ্ণ্যং বর্ণং পত্রঞ্চেতি তৈজসাত্মকানি)। উপরোক্ত দুইটি শ্লোকের মর্মার্থ এই যে, বৃক্ষপত্রে রঞ্জক পদার্থের উৎপত্তি এবং বৃক্ষদেহে দহনক্রিয়া সূর্যতেজ দ্বারাই সম্পন্ন হয়।

যাহা হউক বর্তমান প্রবন্ধে লেখক আলোচ্য গ্রন্থের সাধারণ পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র। যথাসময়ে মূল গ্রন্থ প্রকাশ হইলে পাঠকগণ ভারতীয় বৃক্ষবিজ্ঞানের এক গৌরবময় অস্তিত্বের বিষয় জানিতে পারিবেন।

পরাশরীয় পরিভাষা প্রকরণ*

কলল—Protoplasm.
আদিবীজ—First organic body or germ.
রসকোষ—Cell, cellular unit of leaf.
কলা—Cell wall.
আদিপত্র—Cotyledon.
রঞ্জক—Chlorophyll.
পিণ্ডস্নায়ুক—Nucleus.
প্ররোহ—Shoot.
মূল—Root.
কাণ্ড—Stem.
পত্র,পর্ণ—Leaf.
কুসুম, প্রসূন, পুষ্প—Flower.
ফল—Fruit.
বীজ—Seed.
(পত্র) পক্ষ—Wing or blade or lamina; চারি প্রকার, যথা—(১) সমপক্ষ—Two wings of the blade equal, symmetrical.
(২) বিষমপক্ষ—Oblique, unequal wings, asymmetrical.
(৩) সমকর্ণ—Symmetrically incised.
(৪) বিষমকর্ণ—Asymmetrically incised.
পত্রবৃন্ত—Petiole.
বৃন্তপক্ষ—Winged petiole.
উপপক্ষ—Stipule.
পৃষ্ঠগ্রন্থিক পত্র—Peltale leaf.
প্রান্তগ্রন্থিক পত্র—Petiole attached to the base of the lamina.
বৃন্তবন্ধন—Attachment of the petiole to the axis.
বৃন্তহীন পত্র—Sessile leaf.
পত্রবন্ধন—Articulation of the petiole or rachis with blade.
পত্রশিরা—Veins.
(রসবহশিরা)

শিরাসন্নিবেশ—Venation, দুই প্রকার, যথা—
(১) প্রগুণ সন্নিবেশ—Parallel venation.
(২) বেল্লিত সন্নিবেশ—Reticulate venation.
মৌঞ্জপর্ণ—Leaf with parallel venation.
জালিকপর্ণ—Leaf with a reticulate venation.
যাষ্টি—Rachis, common stalk of leaflets.
বিস্তার—Tendril
পট্টিক—Sheath, characteristic of monocotyledons.
শুঙ্গ—Bud-scale, falls off as the bud unfolds—as in Banyan; thus Banyan is called 'শুঙ্গি'।
পুষ্পপত্র—Bract.
কুট্মল, কলিকা—Flower bud.

* কেবলমাত্র প্রধান প্রধান সংজ্ঞাগুলি উদ্ধৃত হইল।

বল্লরি, মঞ্জরি—Inflorescence ; two groups :

১। সশাখবল্লরি—cymose.

২। অশাখবল্লরি—racemose.

আটপ্রকার বল্লরি—

১। পলাশবল্লরি—raceme.

২। পংক্তিমঞ্জরি—corymb.

৩। স্তবকমঞ্জরি—cyme or head.

৪। ছত্রা—umbel.

৫। পুচ্ছবল্লরি—capitulum.

৬। সংকুল—compound or mixed.

৭। ওতুপুচ্ছিকা—catkin.

৮। অক্ষমঞ্জরি—spadix.

পুষ্পবৃন্ত—pedicel.

স্থালক—thalamus.

সমাঙ্গপুষ্প—regular flower.

পুষ্পশীর্ষক বীজাধারা—epigynous flower.

স্থালকোৎসঙ্গ পুষ্প—perigynous flower.

পুষ্পক্রান্ত বীজাধার—hypogynous flower.

জালক—sepals, দুই প্রকার :

১। যুক্তজালক—gamosepalous.

২। মুক্তজালক—polysepalous.

পুষ্পান্তজালক—caducous calyx.

স্থিরজালক—persistent calyx, accompanies fruits.

দল—petals, চারি প্রকার

১। মুক্তদল—polypetalous.

২। যুক্তদল—gamopetalous.

৩। কেশরাঙ্কদল—epipetalouus (stamen).

৪। স্বৈরদল—free from stamen.

সমদল—zygomorphic petals.

বিষমদল—actinomorphic petals.

কেশর—stamens.

পরাগ—pollen grains.

কিঞ্জল্ক—anthers ; দুই প্রকার :

১। প্রান্তসন্ধিত—innate and adnate.

২। পৃষ্ঠসন্ধিত—dorsifixed & versatile.

বীজাধার—ovary ; দুই প্রকার :

১। সন্ধিত, বিদর—apocarpus.

২। অসন্ধিত, কুড্য—syncarpus.

বীজাধারবর্ত্তক—locule of the ovary : দুই প্রকার

১। একবর্ত্তক—unilocular.

২। বহুবর্ত্তক—multilocular.

বরাটক—style.

বরাটকশীর্ষ—stigma.

মৌচিক—spathe.

সফলপুষ্প—hermaphrodite flower.

নিষ্ফলপুষ্প—unisexual flowers ; দুই প্রকার :

১। মল্লপুষ্প—staminate.

২। স্ত্রীপুষ্প—pistillate.

ফলবল্কল—pericarp (of a fruit).

একমাতৃকবীজ—monocotyledons

দ্বিমাতৃকবীজ—dicotyledons.

বীজশস্য, বীজমাতৃকা—endosperm.

আদিপত্র—plumule.

ত্বক্—cortex.

স্যন্দনী—vascular system.

সার—heartwood.

স্বরস—sap.

রসকোষ—cell, cellular unit of leaves.

কলা—cell-wall.

রঞ্জক—chlorophyll.



গ্রন্থ-পরিচয়

প্রবন্ধমালা—ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা, এম্. এ, এল্. এল্. বি, পি-এইচ ডি, ডি. লিট। ভারত বিদ্যা বিহার, কলিকাতা—৪। ১৯৬৩, বঙ্গাব্দ ১৩৭০। পৃষ্ঠা ১২৫+প্রমাণ তালিকা+নির্ঘণ্ট। মূল্য—৪৲

প্রবাসী পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে লিখিত লেখকের নয়টি প্রবন্ধ লইয়া এই গ্রন্থখানির প্রকাশ। বিক্ষিপ্ত কতকগুলি প্রবন্ধের এইরূপ একত্র সমাবেশের সার্থকতা সম্বন্ধে দ্বিমত থাকিতে পারে না।

গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধটি দ্বাদশ শতাব্দীর সিংহলের নরপতি প্রথম পরাক্রমবাহুর জীবনী লইয়া লিখিত। পরবর্তী ছয়টি প্রবন্ধ প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও ভূগোল-সংক্রান্ত,—আল্-বিরুণীর ভারতীয় ভূগোল, কালিদাসের ভৌগোলিক আলোচনা, প্রাচীন মিথিলা, প্রাচীন বিদিশা, প্রাচীন মাহিষ্মতী, ও সুপ্রসিদ্ধ জৈনগুরু। এই শেষের প্রবন্ধটিতে জৈনদের প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভদেব (আদিনাথ), দ্বাবিংশ তীর্থঙ্কর নেমিনাথ ও ত্রয়োবিংশ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের জীবনকথা আলোচিত। গ্রন্থের শেষে সন্নিবিষ্ট প্রমাণপঞ্জীতে গ্রন্থকার প্রাচীন সাহিত্য, লেখমালা ও আধুনিক ঐতিহাসিকদের গবেষণামূলক যে-সকল পুস্তক হইতে তাঁহার রচনার উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। কাজেই প্রবন্ধগুলির প্রামাণিকতা অনস্বীকার্য। ভূমিকায় গ্রন্থকার নিজেই বলিয়াছেন, "আশা করি যাঁহারা এ বিষয়ে গবেষণা করেন তাঁহাদিগকে এই পুস্তকখানি বিশেষ সাহায্য করিবে।"

গ্রন্থের অষ্টম প্রবন্ধটি কবি করুণানিধানের (১৮৭৭—১৯৫৫ খৃঃ) কাব্যের উৎকর্ষ, এবং নবম ও শেষ প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের বাল্মীকি-প্রতিভা ও চিত্রাঙ্গদা সম্বন্ধে আলোচনা। ডক্টর লাহার লেখার বৈশিষ্ট্যই এই যে, ইহাতে ভাষার জটিলতা থাকে না। নবম প্রবন্ধটির আরম্ভ দেখিলেই এই উক্তির যথার্থতা প্রতিপন্ন হইবে,—"রবীন্দ্রনাথের লেখনীর মধ্যে 'বাল্মীকি-প্রতিভা' ও 'চিত্রাঙ্গদা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঐ

দুইটি রচনা সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত। কবির শব্দবিন্যাস প্রশংসার্হ।"

গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি, এবং আশা করি, গ্রন্থকার নানাস্থানে তাঁহার লিখিত অন্যান্য বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধগুলিও এইভাবে ক্রমশঃ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়া বঙ্গভারতীর শ্রীবৃদ্ধি করিবেন।

শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ—শ্রীগোপালচন্দ্র রায়, এম-এ, অধ্যক্ষ, ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা। প্রকাশনা: সাহিত্য সদন, এ ১২৫ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট। কলিকাতা—১২। দাম—৩.০০ টাকা।

শ্রীগোপালচন্দ্র রায় দীর্ঘকাল ধরিয়া বাংলা সাহিত্যের সেবা করিয়া আসিতেছেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের অনাবিষ্কৃত ও লুপ্তপ্রায় খণ্ড খণ্ড রচনা ও তাঁহাদের সাহিত্যকীর্তি সম্পর্কে মূল্যবান্ অনেক তথ্য প্রাচীন পত্র-পত্রিকা ও চিঠিপত্র হইতে উদ্ধার করিয়া সেগুলিকে পুস্তকাকারে পুনর্মুদ্রিত করিয়া বাংলা সাহিত্যের অশেষ হিতসাধন করিয়াছেন। গোপালচন্দ্র তাঁহার এই সাধনার জন্য যে শুধুমাত্র ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন, তাহাই নয়। এই সম্পর্কে তাঁহার রচিত প্রবন্ধাবলী এবং বিস্মৃতপ্রায় সাহিত্য-কীর্তিগুলির পুনরুদ্ধার বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ও ক্রমবিবর্তনের ধারা নির্ণয়ের উল্লেখযোগ্য সহায়তা করিয়াছে এবং সাহিত্যের সম্পদ্ বৃদ্ধি করিয়াছে।

আলোচ্য গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার সহিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয়, বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রথম দর্শন ও প্রথম পরিচয়, ঠাকুরবাড়ীর সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের সৌহার্দ্য, বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের অভিনন্দন, রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধপাঠ সভায় বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য ও উপন্যাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আলোচনা ও মতামত-বিষয়ক অনেকগুলি মূল্যবান্ তথ্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বইখানি যে বাংলা সাহিত্যের উচ্চতম মানের ছাত্রছাত্রীগণের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। গোপালচন্দ্রের এই বিশেষপন্থী সাহিত্য-সাধনাকে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি। তাঁহার ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি অতি প্রশংসনীয়।

হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

চিত্রে গীতগোবিন্দ—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার চিত্রিত ১৬ খানি বৃহৎ আকারের রঙিন প্রতিলিপিযুক্ত, দুইটি দীর্ঘ ভূমিকা সম্বলিত। প্রকাশক: ইণ্ডিয়ান প্রেস (পাব্লিকেশন) লিমিটেড, এলাহাবাদ, ১৯৬২। মূল্য—২৫৲।

বর্তমান পুস্তকে চিত্রিত ক্ষিতীন্দ্রনাথের চিত্রাবলী সম্বন্ধে বেশী কথা বলিবার আবশ্যক নাই। বইগুলি সকলশ্রেণীর রূপ-রসিকদের নিশ্চয়ই চিত্ত জয় করিবে। কারণ 'গীতগোবিন্দের' পদাবলীকে চাক্ষুষ রূপ দিতে এই প্রতিভাশালী চিত্রকর এমন একটি রেখাবর্ণের সুমধুর আঙ্গিক সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহার মাধ্যমে, উপযুক্ত পরিবেশে, আপাত-রমণীয় 'কামুকতা' বর্জন করিয়া একটি শুচিস্মিত সুরুচিসম্মত ভাষায় একটি পবিত্র নির্মলরসে স্নাত হইয়া 'গীতগোবিন্দ' সম্পূর্ণ নূতন কলেবর ধারণ করিয়াছে, যাহাতে সর্বপ্রকার 'কামগন্ধ' একেবারে নির্বাসিত হইয়াছে। বইখানি বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে আদর পাইবে এই কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়।

শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী

অশুদ্ধি-সংশোধন

অগ্রহায়ণের 'প্রবাসী'তে শ্রীযুক্ত কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের কবিতাটির নাম ভুলক্রমে 'সাধারণ মেয়ে' ছাপা হয়েছে। হওয়া উচিত ছিল অসাধারণ মেয়ে।

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ১২০।২ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা।

সূচীপত্র—মাঘ, ১৩৭০



শুভেচ্ছা বা অভিনন্দন…অভিনন্দন টেলিগ্রামে পাঠান।
বিশেষ চিত্রশোভিত ফর্মে এবং তেমনি সুন্দর খামে অভিনন্দন টেলিগ্রাম বিলি করা হয়।
ব্যক্তিগত এবং সামাজিক সমস্ত রকম আনন্দ উৎসবের উপযোগী অনেকগুলি সংক্ষিপ্ত বার্ত্তা রয়েছে এবং তা থেকে ইচ্ছানুযায়ী বার্ত্তা পছন্দ করা যায়।
সাধারণ অভিনন্দন টেলিগ্রামের জন্য সর্ব্বনিম্ন ব্যয় ৭৫ নঃ পঃ।
অতিরিক্ত প্রতিটি শব্দের জন্য ১০ নঃ পঃ।

ডি ল্যুক্স টেলিগ্রাম

আপনি যদি আপনার বার্ত্তায় আরও আন্তরিকতার স্পর্শ দিতে চান, তাহলে তার জন্য রয়েছে ডি ল্যুক্স টেলিগ্রাম।
আপনার ইচ্ছানুযায়ী টেলিগ্রাম লিখে, বিশেষ নির্দ্দেশের জায়গায় "ডি ল্যুক্স" কথাটি লিখে দিন। তাহলে আপনার টেলিগ্রামটি, বিশেষ অভিনন্দন ফর্মে বিলি করা হবে।

অভিনন্দন
বা
ডি ল্যুক্স
টেলিগ্রামে
আপনার শুভেচ্ছা
জানান

ডাক ও তার বিভাগ

DA 63/436

সূচীপত্র—মাঘ, ১৩৭০

সূচীপত্র—মাঘ, ১৩৭০

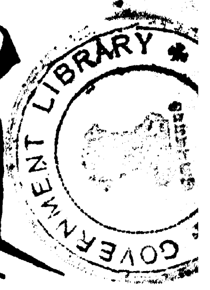


প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

কৈকেয়ী ও মন্থরা
মহাদেব বিশ্বনাথ ধুরন্ধর

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

প্রবাসী



"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৩শ ভাগ
২য় খণ্ড

৪র্থ সংখ্যা
মাঘ, ১৩৭০

বিবিধ প্রসঙ্গ

হজরতবাল ও পাকিস্তান

কাশ্মীরের জনসাধারণ চকিত ও স্তম্ভিত হয় হজরতবাল মসজিদ হইতে হজরত মহম্মদের পবিত্র কেশ অপহৃত হওয়ার সংবাদে। দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ জনসাধারণ একদিকে তাহাদের ক্ষোভ ও শোক প্রকাশের জন্য শ্রীনগরের স্থানে স্থানে মিছিল করিয়া ফিরিতে থাকে। কিছু দুর্বৃত্ত এই শোকোচ্ছ্বাসের সুযোগ লইয়া জনসাধারণকে হাঙ্গামা ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করার জন্য উস্কাইতে থাকে। বলা বাহুল্য এই দুর্বৃত্তগণের ঐরূপ দুষ্কৃতির সকল ফন্দি-ফিকিরের উৎস সীমান্তের পরপারে অবস্থিত। কিছু হাঙ্গামা বাধে একদিন। সেদিন পুলিশের উপর ইট-পাটকেল নিক্ষেপ, রেডিও ষ্টেশন ও দমকল ইত্যাদিতে অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি হয়। এই হাঙ্গামা দৃঢ়হস্তে রোধ করায় ও সান্ধ্য আইন জারি হওয়ায় উহা সঙ্গে সঙ্গেই নির্ব্বাপিত হয়। তবে ঐ হাঙ্গামা বা বিক্ষোভের মধ্যে ধর্ম্মসম্প্রদায়কে ভিত্তি করিয়া কোন অশান্তি বা হিংসাত্মক কাজের সূত্রপাতও হয় নাই, বরঞ্চ ঐ বিক্ষোভ মিছিলে বহু হিন্দু ও শিখ যোগদান করে। এবং সেরূপ যোগদান ও শোকপ্রকাশ ইত্যাদি সহজ ও সরল ভাবেই হয়। সারা ভারতে এই শোকের ছায়া পড়ে, কেননা এদেশের প্রায় সকল হিন্দু মুসলমান পরস্পরের পবিত্র ও স্থান বস্তুকে সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে শিখিয়াছে দীর্ঘদিন যাবৎ। যাহারা ধর্ম্মান্ধতা বা উগ্র সাম্প্রদায়িকতা প্রচার করে, সাধারণভাবে শিক্ষিত কোন হিন্দু মুসলমান বা খ্রীষ্টান তাহাদের অপপ্রচার এখন শুনিতে চাহে না। লোকে এখন বুঝে যে ঐরূপ সঙ্কীর্ণ মনোভাব ঘৃণা এবং করুণার বস্তু। সেই কারণে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা এখন জনসাধারণের মধ্যে কোনও সমর্থন বা সহযোগ পায় না এবং যদি কচিৎ কোথাও তাহার আরম্ভ কোন কারীর দল করে তবে পুলিশ এখন সহজে তাহা দমন করিতে সমর্থ হয়।

সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকার যখন সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগের উচ্চতম আধিকারিক ও সহকারিগণকে এই চুরির তদন্ত ও অপহৃত পবিত্র সামগ্রিক উদ্ধার করিতে পাঠাইলেন এবং কাশ্মীরের সরকার সাধারণকে জানাইলেন যে এই তদন্ত ও অনুসন্ধান ব্যাহত হইতে পারে যদি রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ও হাঙ্গামা ছড়াইয়া পড়ে, তখন কাশ্মীরের জনসাধারণ সে ঘোষণার যথার্থতা বুঝিল ও ঐ অল্পক্ষণের উদ্বেলিত ও বিশৃঙ্খলার শান্তি অতি সহজেই হইল—অবশ্য শোকপ্রকাশ, হরতাল ইত্যাদি চলিল। গোয়েন্দা বিভাগ ঐরূপ পরিবেশ ও জনসাধারণের সমর্থন পাওয়ায় অবিশ্রাম অতি তীব্র খোঁজ চালাইতে পারিল। গোয়েন্দাদিগের প্রখর দৃষ্টি ও ব্যাপক বেড়াজাল নিক্ষেপে ভীত হইয়া চোরের দল ঐ পবিত্র সামগ্রীকে পুনর্ব্বার যথাস্থানে রাখিয়া দেয়। বিগত ২৭শে ডিসেম্বরে শ্রীনগরের নিকটবর্ত্তী হজরতবাল মসজিদ হইতে অপহৃত এই পয়গম্বরের পবিত্র কেশ অবিশ্রাম তল্লাসীর ফলে ৪ঠা জানুয়ারীর সন্ধ্যায় উদ্ধার হয়। শ্রীনগরে এই সংবাদ ঘোষিত হইবামাত্র আনন্দের প্লাবন বহিতে থাকে। শ্রীনগরে এইরূপ আনন্দ-অধীর জনতা আর কখনও দেখা যায় নাই। এই জনতার মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, শিখ ইত্যাদি সকল ধর্ম্মের লোকে সমানে আনন্দ

জ্ঞাপন করে। এই আনন্দ জ্ঞাপনের বিবরণ আনন্দবাজার এইরূপে দিয়াছেন :—

গত তিনশত বৎসর যাবৎ হজরতবাল মসজিদে রক্ষিত ও সম্প্রতি অপহৃত এই পবিত্র কেশ উদ্ধারের সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছ্বসিত আনন্দবেগের স্রোত বহিয়া যায়। নারীরা তাঁহাদের অবগুণ্ঠন খুলিয়া ফেলেন এবং পুরুষেরা তাঁহাদের টুপী ও পাগড়ি আন্দোলিত করিতে থাকেন। সমস্ত মুসলমান বিভিন্ন মসজিদের দিকে ছুটিতে থাকেন এবং হিন্দুরা শঙ্খধ্বনি করেন। কয়েক হাজার লোক তাহাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে ও প্রার্থনা করিবার জন্য এখান হইতে প্রায় ছয় মাইল দূরবর্ত্তী ডাল হ্রদের তীরে অবস্থিত হজরতবাল মসজিদের দিকে যাত্রা করে।

সমগ্র জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণ নৃত্যগীত ও শোভাযাত্রা করিয়া পবিত্র কেশ উদ্ধারের উৎসব-আনন্দে মাতিয়া উঠে।

হজরত মহম্মদের পবিত্র কেশ অপহৃত হওয়ায় গভীর বেদনার নিদর্শনরূপে দোকানপাট বন্ধ রাখা হইয়াছিল এবং প্রত্যহ বেদনাকাতর জনতার মিছিল বাহির হইতেছিল। আজ তাহার পরিবর্ত্তে অভূতপূর্ব্ব আনন্দের দৃশ্য দেখা যায়। আজ দোকানগুলিতে আবার আলো জলিয়া উঠে। বহু দোকান ও বাসভবনে আলোকসজ্জা করা হয়।

শহরের বহু স্থানে চলন্ত যানের উপর রক্ষিত চুল্লী হইতে জনগণকে গরম গরম খাদ্য পরিবেশন করা হয়।

বিক্ষোভ প্রদর্শনের আহ্বান জানাইবার জন্য যে সব লাউডস্পীকার স্থাপন করা হইয়াছিল, সেগুলি হইতে পবিত্র কেশ উদ্ধারের আনন্দজনক সংবাদ প্রচার করা হইতে থাকে।

অপহৃত কেশ উদ্ধারের জন্য কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা-সংস্থার ডিরেক্টর শ্রী বি, এন, মল্লিক জনগণের প্রশংসা লাভ করেন। "মল্লিক জিন্দাবাদ" বলিয়া তাহারা ধ্বনি করে।

এই চুরির তদন্তকার্য্যে বিশেষ আগ্রহ দেখাইবার জন্য জনতা ভারত সরকারকেও ধন্যবাদ জানায়।

শুধু কাশ্মীরে নয় সারা ভারতে এই অপহৃত পবিত্র কেশ উদ্ধার হওয়ায় অস্বস্তি ও উদ্বেগের শান্তি ঘটে এবং সন্তোষ ও আনন্দের ব্যাপক অনুভূতি হয়। সেই সন্তোষ এবং আনন্দ জ্ঞাপন উচ্চতম অধিকার হইতে অতি সাধারণ জনও সমানে করেন। এই অপহরণ কে বা কাহারা করিয়াছিল সে বিষয়ে তদন্তের শেষ ও পরে তাহার বিচার সম্পর্কের বিবরণ যথাকালে দেওয়া হইবে।

এখন সীমান্তের ওপারে যে রাষ্ট্র ভারত ও ভারতবাসীর উপর বিদ্বেষকে মূলধন হিসাবে ব্যবহার করিতে সদাই ব্যস্ত, সেখানের ঘটনাবলীর কথা বলা প্রয়োজন। আমাদের ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ দেশের লোক সাধারণ ভাবে ধর্ম্মের ও মানবত্বের পথেই চলে। সুতরাং উপরে যে ধারাবাহিকভাবে ঘটনার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহা এদেশের ও এদেশবাসীর পক্ষে স্বাভাবিক। অন্যদিকে সীমান্তের ওপারে ধর্ম্মান্ধতা ও মানবত্ববর্জ্জিত কার্য্যকলাপই ওই দেশের একনায়কত্বের অধিকারি ব্যক্তির ও সেই ব্যক্তির এবং তাহার সহকারীদের স্বভাবগত প্রবৃত্তি। সুতরাং এইরূপ ঘটনার সুযোগ লইয়া তাহারা যে নিজেদের মানবত্ববর্জ্জিত হিংসাদ্বেষজনিত স্পৃহা চরিতার্থ করিতে চেষ্টা করিবে ইহাও উহাদের পক্ষে স্বাভাবিক।

এই ঘটনার বিষয়ে পাকিস্তানী প্রেস অপপ্রচারের কিছুই কমতি করে নাই, পাকিস্তানী অধিকারিবর্গও নানা প্রকার মিথ্যার সৃষ্টি ও প্রচার ক্রমাগত করিয়া গিয়াছে। স্বয়ং আয়ুব খাঁ প্রথমে কয়দিন চুপ থাকিয়া ৪ঠা জানুয়ারী রাওয়ালপিণ্ডিতে এই বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করেন। বোধহয় তাহার ধারণা হইয়াছিল যে অতদিনে চোরের দল নিরাপদে সীমান্ত পার হইতে পারিয়াছে এবং একবার সেই গণ্ডি ডিঙ্গাইতে পারিলে তাহাদের ধরে কে? সম্ভবতঃ এইরূপ ধারণার বশেই তিনি ৪ঠা জানুয়ারি মুখ খুলিয়াই বিষোদ্গার করেন। তাঁহার মন্তব্যের রিপোর্টে তাহার অভিসন্ধি সুস্পষ্ট ভাবেই পাওয়া যায়। রিপোর্টে এইরূপ :

"রাওয়ালপিণ্ডি, ৪ঠা জানুয়ারী—প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁ আজ এখানে বলেন যে, হজরতবাল মসজিদ হইতে হজরত মহম্মদের পবিত্র দেহাবশেষ অপহরণ কোন মুসলমানের কার্য্য নহে, পড়ন্তু ইহা "একটি ষড়যন্ত্রের ফল"।

প্রেসিডেণ্ট সুক্কুর যাত্রার প্রাক্কালে লাহোরে সাংবাদিকদের সহিত আলোচনাপ্রসঙ্গে বলেন যে, এই পবিত্র দেহাবশেষ লোপাট হওয়া মুসলমানদের পক্ষে "ভয়ানক শোচনীয় ব্যাপার"।

নয়দিন পূর্ব্বে পয়গম্বরের পবিত্র কেশ অপহৃত হওয়ার পর হইতে প্রেসিডেণ্ট আজ সর্ব্বপ্রথম এই বিষয়ের উল্লেখ করিলেন।"

এইরূপ বিষোদ্গার চতুর্দ্দিকে চলিবার পিছনে কি উদ্দেশ্য ছিল তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। ইহার ফলে পূর্ব্ব-পাকিস্তানে খুলনায় ও তাহার আশে-পাশের গ্রামে মুসলমান দুর্ব্বৃত্তেরা দলে দলে অসহায় সংখ্যালঘু হিন্দুবাসিন্দাদের উপর আক্রমণ চালায়। যে সকল নিগৃহীত হিন্দু পাকিস্তান হইতে ভারতে আসিয়া পৌছায় তাঁহারা বলেন যে ঐ দুর্ব্বৃত্ত নরপশুরা অ-বাঙালী মুসলমান।

ঢাকা হইতে পকিস্তান সরকার প্রথমে যে প্রেসনোটে এই হাঙ্গামার কথা শুক্রবার রাত্রে জানায় তাহাতে ব্যাপক ও

সশস্ত্র দাঙ্গার কথা ছিল, কিন্তু আহত বা নিহতের কোন সংখ্যা দেওয়া ছিল না। পরে পাক সরকার জানায় যে খুলনায় নিহতের সংখ্যা ৫ এবং আহতের সংখ্যা ১৫। খুলনার আশেপাশেও এইভাবে সশস্ত্র মুসলমান দল আক্রমণ চালায়। ঐভাবে দৌলতপুর, মাহেশ্বরপাশা সেনহাটি ইত্যাদি অঞ্চলে হাঙ্গামা ও অগ্নিকাণ্ড চলে।

পরে, যশোহর অঞ্চলেও দাঙ্গা ছড়াইয়া পড়ে, সেখানে বিখ্যাত জনতা হোটেল লুট হয়। চালনার নিকটে মঙ্গলা গ্রামে ১৪ জন হিন্দু গ্রামবাসী নিহত হয়। পূর্ব্বপাকিস্থান সরকারের হিসাবে শুক্রবার সন্ধ্যা হইতে রবিবার সকাল পর্য্যন্ত ১৯ জন হিন্দু নিহত। আহতের সংখ্যা দেওয়া হয় নাই, অনুমানে তাহা শতাধিক।

এই সকল অঞ্চলেই ব্যাপকভাবে লুটতরাজ, অগ্নিকাণ্ড, নারীধর্ষণ ইত্যাদি চলে। এবং প্রত্যেকটি স্থলে হাঙ্গামা অবাধভাবে চলার পর পুলিস—ও পরে সৈন্যদল উপস্থিত হয়। বহু দুর্ব্বৃত্ত গ্রেপ্তার হইয়াছে এবং সান্ধ্য আইন জারি ও সৈন্য এবং পুলিস পাহারা চলিতেছে, এ সংবাদও পাওয়া গিয়াছে।

এই ঘটনার বিষময় ছায়া এদিকেও ব্যাপক ভাবে দেখা দেয়। এটা অত্যন্ত দুঃখের ও বেদনার কথা। ইহা কঠোর হস্তে নিবৃত্তি চলিতেছে।

পাকিস্থান-প্রেমী মার্কিন ও ইংরেজ সাংবাদিকের দল ত মালদহে সামান্য ঘটনার খবর পাইয়া করাচি হইতে লম্ফ-দানপূর্ব্বক সেখানে ও সীমান্তের পারে পৌছাইয়াছিল। তাহাদের কোনও চিহ্ন ত এই ঘটনার পর কোথায়ও দেখা যায় নাই। মার্কিন সরকারকে বোকা বানাইবার প্রধান উদ্যোগী এই সাংবাদিকের দল। ইহারাই পাকিস্তানের ভরসা।

কংগ্রেসের ৬৮-তম অধিবেশন

এবারের অধিবেশন ভুবনেশ্বরের উপকণ্ঠে নূতন "ছাউনি" মণ্ডপ, তোরণদ্বার ইত্যাদিতে সজ্জিত, অস্থায়ী নগরে হইতেছে। এই নগরের নাম উড়িষ্যার সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় দেশসেবক উৎকলমণি পণ্ডিত গোপবন্ধু দাসের পুণ্যস্মৃতি অনুসারে গোপবন্ধুনগর রাখা হইয়াছে। নাম হিসাবে ইহাপেক্ষা যোগ্য নাম হওয়া সম্ভব ছিল না। কেননা উৎকলমণি গোপবন্ধুর মত অক্লান্তকর্ম্মী সরল ও নির্ম্মল হৃদয় লোক যাঁহার দেহ-মন-প্রাণ দেশসেবায় উৎসর্গীকৃত এবং যাঁহার শুধু আত্মনিবেদনই সম্পূর্ণ নয়, উপরন্তু যাঁহার দেশসেবাও সম্পূর্ণ নিষ্কাম ও নিরহঙ্কার, এরূপ মহাপ্রাণ লোক সারা জগতেই দুর্ল‍ভ। তাঁহার মৃত্যুর ৩৫ বৎসর পরে তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয় উড়িষ্যা কংগ্রেসের অধিবেশনে তাঁহারই নামে কংগ্রেস শিবির স্থাপন করিয়া ঐ-খানের কর্ম্মকর্ত্তারা নিজেদের ধন্য করিয়াছেন, ইহা আনন্দের কথা।

তবে কাজে-কর্ম্মে এই নামকরণ সার্থক হইবে কিনা সন্দেহ। উৎকলমণির দেশসেবা ব্যাপক কিন্তু অনাড়ম্বর ছিল। তিনি শিক্ষা, স্বদেশী প্রচার, দুর্ভিক্ষে ও বন্যায় জনসেবা, গ্রামে গ্রামে খদ্দর প্রচার, অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন, দরিদ্র ও আর্ত্তের সেবা ইত্যাদিতে আত্মনিয়োগের নিদর্শন যাহা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা আজও তাঁহার দেশের সর্ব্বজনের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছে। অথচ এই সরল মধুর প্রকৃতির প্রকৃত সজ্জনের ঋষিতুল্য নিরাসক্ত জীবনে আত্মপ্রচারের লেশমাত্রও প্রকাশ ছিল না। অন্যদিকে আজিকার যুগের কংগ্রেস অধিবেশনে আড়ম্বর ও আত্মপ্রচারই প্রধান কার্য্য। যাঁহারা সেখানে উপস্থিত হইয়া নিজেদের জাহির করেন তাঁহাদের অধিকাংশেরই আসক্তি নানা-মুখী। বলিতে কি কংগ্রেস অধিবেশন ও ঋষিজীবনের মধ্যে এমন সাদৃশ্য শুধু পাওয়া যায় ঋষিশ্রাদ্ধের "বহ্বারম্ভে লঘু-ক্রিয়া"র সহিত।

যাহা হউক এবারের অধিবেশনে কিছু নূতনত্ব ও বৈশিষ্ট্য দেখাও যাইতেছে। তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা লক্ষ্যণীয় বিষয় হইল বিতর্কের ও আলোচনার মধ্যে খোলাখুলিভাবে মতামত প্রকাশ ও বিচারের ধারা। এবারের বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতিতে ঐরূপ বিতর্ক ও আলোচনা রুদ্ধ করার জন্য বা ভিন্ন পথে—অর্থাৎ পূর্ব্বনির্দিষ্ট পথে—চালিত করার জন্য কোনও মহারথী একক বা সংযুক্ত ভাবে হস্তক্ষেপের চেষ্টাও করিতেছেন না। প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত থাকিলে কি হইত সে বিষয়ে চর্চ্চা করা এখানে অবান্তর, তবে কিছুদিন যাবৎ দেখা যায় যে প্রধানমন্ত্রী পূর্ব্বেকার মত যদিচ্ছা মত প্রকাশ বা অন্যের আলোচনায় বাধা দিয়া নিজের মতক্ষেপ ইদানীং করিতেছেন না।

এইবারের বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতিতে প্রবল বিতর্ক চলে গণতন্ত্র ও সমাজবাদ সম্পর্কে প্রস্তাব কার্য্য পরিচালনা কমিটি কর্ত্তৃক যেভাবে রচিত হইয়াছে তাহাতে গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করার ফলে।

বিতর্ক তুমুলভাবে চলে, ব্যাঙ্ক ও চাউল কলগুলিকে রাষ্ট্রীয়-করণের প্রশ্নে। কংগ্রেস এ-আই-সি-সি'র এক বড় অংশ এই রাষ্ট্রীয়করণের সপক্ষে বিতর্কের ঝড় তুলেন। তাহাদের মতে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ও কংগ্রেস সরকার এতদিন শুধু বড় বড় আদর্শের কথাই বলিয়া আসিতেছেন। কিন্তু কার্য্যতঃ ঐ আদর্শের রূপায়ণে তাঁহারা এ যাবৎ কিছুই করেন নাই।

কথাটা খুবই সত্য। বর্ত্তমান বৈশ্যযুগে ভারতের ব্যবসায়ী ধন-সম্পদ কর্ত্তৃত্বের অধিকারী ও শিল্পপতিগণের প্রায় সকলেই, যেভাবে নিজেদের কর্ত্তৃত্ব ও অধিকারের প্রয়োগ

নিজের সঙ্কীর্ণ স্বার্থে চালাইতেছে এবং যেভাবে ঐরূপ অধিকারিদের এক বিরাট্ অংশ রাষ্ট্র ও জাতিকে প্রবঞ্চিত করার জন্য দুর্নীতির প্লাবন বহাইতেছে তাহাতে দেশের যাবতীয় ধন-সম্পদ ও যন্ত্রশিল্প খনি ইত্যাদি রাষ্ট্রায়ত্ত করার দাবী খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ঐ সমাজদ্রোহী ও রাষ্ট্রদ্রোহী পুঁজিপতি-দিগকে অধিকারচ্যুত করিয়া সেই অধিকার বা কর্ত্তৃত্ব দিবেন কাহাদের হস্তে? শুধু "টুপি বদল" হইলেই কি দেশ এই মহা পাতক হইতে উদ্ধার হইবে?

উদাহরণ স্বরূপে দেখা যাইতে পারে জীবনবীমার বিরাট্ প্রতিষ্ঠানের রাষ্ট্রায়ত্তকরণের কথা। রাষ্ট্রায়ত্ত করার পর জীবনবীমার আয় বাড়িয়াছে ও পুঁজিও বাড়িয়াছে, একথা ত মহা ধুমধামের সহিত প্রচার হয় এবং যে সকল সংবাদ-পত্র শুধু বিজ্ঞাপনের লোভে ও সরকারের রক্তচক্ষুর ভয়ে চালিত হয় তাহারা ঐ বিজ্ঞপ্তিতে রসান দিয়া সরকারের জয়-গান করেন। কিন্তু এই রাষ্ট্রায়ত্তকরণের ফলে ঐ জীবনবীমা প্রতিষ্ঠান সাধারণজনের কি কাজে লাগিতেছে এবং উহা রাষ্ট্রায়ত্ত করার সুফল কতটা দেশের সাধারণ নাগরিক ভোগ করিতেছে, ইহার সদুত্তর আমরা এখনও অনেক চেষ্টা করিয়াও পাই নাই। জীবনবীমার সাধারণ উদ্দেশ্য যাহা সে কাজ কি পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত ভাবে চলিতেছে? রাষ্ট্রীয়-করণের পূর্ব্বে ভাল জীবনবীমা প্রতিষ্ঠানগুলি যেভাবে কার্য্য চালনা সুষ্ঠুভাবে করিয়া জীবনবীমার মুখ্য উদ্দেশ্য ঠিকমত করিয়াও নানাভাবে অল্পবিত্ত মধ্যবিত্ত ও ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিরপেক্ষ ও সহজভাবে সাহায্য করিত, আজ রাষ্ট্র যাহাদের হাতে এই বিরাট্ প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃত্ব ও অধিকার দিয়াছেন তাহারা কি সেকাজ সেই নিরপেক্ষ সহজ অথচ সতর্ক ভাবে করিতেছে? কখনই না। এই প্রতিষ্ঠানের সকল সম্পদ ও গচ্ছিত ধনের এক বিরাট্ অংশ ব্যবহৃত হইতেছে বর্ত্তমান অধিকারিবর্গের ইচ্ছামত। এবং সেই ইচ্ছা "সম্পূর্ণ সদিচ্ছা" নয়, এ কথা বলা বাহুল্য, কেননা তাহা নিরপেক্ষ ত নয়ই উপরন্তু উহার অধিকাংশই চলিতেছে সঙ্কীর্ণ স্বার্থের ও প্রাদেশিকতার পথে।

সুতরাং কংগ্রেস আদর্শ পথে চলিতেছে না এ কথা ধ্রুব সত্য হইলেও ঐ অবস্থার সংশোধন বোধহয় অত সহজ নয়, যতটা রাষ্ট্রীয়করণের প্রস্তাবকারীরা মনে করেন।

কংগ্রেসের প্রধান অপকীর্ত্তি যোগ্যতা, দক্ষতা ও সততার কোনও আদর কদর বা মূল্যদান না করা। যদি কংগ্রেসের উক্ত অধিকারিবর্গ আত্মীয়-স্বজন ও অনুগত চাটুকার জাতীয় অনুচরদিগকে সর্ব্বত্র নিয়োগ ও অধিকার দানে উন্মাদের ন্যায় ব্যগ্র না হইতেন তাহা হইলে বোধহয় সরকারী প্রশাসন-যন্ত্রে ও রাষ্ট্র-চালনার অন্যান্য অঙ্গে এরূপ যোগ্য ও দক্ষ লোকের অভাব হইত না এবং সমস্ত সরকারী ব্যবস্থার এরূপ ব্যাপক ভাবে দুর্নীতির ক্ষতে আচ্ছন্ন হইত না। এতদিন যেভাবে সরকারি কাজে-কর্ম্মে অকর্ম্মণ্য লোক নিয়োগ ও কর্ম্মিষ্ঠ ও যোগ্য লোকের অনাদর চলিয়াছে এবং প্রধানমন্ত্রী নেহরুর প্রদর্শিত পথে যে ভাবে চাটুকার পোষণ ও নির্ভীক সমালোচক বিতাড়ন ক্রমেই বাড়িতেছে, তাহাতে রাষ্ট্রের প্রশাসন ও পরিচালন যন্ত্রের অবস্থা অতি শোচনীয়। ব্রিটিশ আমলের জীর্ণ মরিচাধরা ভাঙ্গা ও ফাটা "ইস্পাত কাঠামো" এখন শ্রীনেহরু ও তাঁহার সহযোগী-দের কৃপায় ঘুণ-আক্রান্ত ও কীটদষ্ট "বাঁশের কাঠামোয়" পরিণত হইয়াছে। ফলে রাজ্যের ও রাষ্ট্রেরও জাতীয় জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ও অঙ্গে দুর্নীতি, অযোগ্যতা ও অক্ষমতার ছাপ সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত হইয়াছে।

রাষ্ট্রীয়করণ আরও ব্যাপকভাবে করিলে বিশেষে ব্যাঙ্ক ও চাউলের কল ইত্যাদি "কাঁচা টাকার" খনি রাষ্ট্র ও রাজ্যচালক-দিগের আয়ত্তে আনিলে তাহার ভার কি ঐ দুর্নীতিপরায়ণ ও অযোগ্য লোকে ভরা সরকারী বিভাগগুলি বহিতে পারিবে? অবশ্য রাষ্ট্রীয়করণ হইলেই আরও কয়েক সহস্র কুপোষ্য চাটুকার বা তাহাদের অযোগ্যতর আত্মীয়-স্বজনের "ঠাঁই" মিলিবে ও সুযোগ জুটিবে রাষ্ট্রের অর্থসামর্থ্যের বুনিয়াদ খুঁড়িয়া ভাঙ্গিয়া নিজ স্বার্থ পূরণের। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয়করণ প্রার্থনীয়, সে উদ্দেশ্য আরও দূরে চলিয়া যাইবে। শ্রীএস. কে. পাতিল এ বিষয়ে যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন তাহা আমরা সমর্থন করিতে বাধ্য।

কংগ্রেসের সংবিধান সংশোধন প্রস্তাবের আলোচনার মধ্যে সক্রিয় সদস্যদের বাধ্যতামূলকভাবে খাদি-পরিধান ব্যবস্থা উহাতে পরিবর্ত্তিত হইতেছে বলিয়া সাধারণ প্রতিনিধিদলের অনেকে তীব্র প্রতিবাদ জানান। কার্য্যপরিচালন কমিটির প্রস্তাবে ছিল সক্রিয় সদস্যদের খাদি পরিবার সংকল্প গ্রহণ করিতে হইবে। তুমুল বিতর্কের পর মূল প্রস্তাবক ঐ বিরোধী-দের কথা মানিয়া বাধ্যতামূলক খাদি পরিধান সর্ত্ত পুনস্থাপন করিলে শান্তি আসে। বাস্তবিকই ঐ পরিবর্ত্তন প্রস্তাব অন্যায় ছিল। অকাজ-কুকাজ-সুকাজ, সুনীতি-দুর্নীতি, সততা ও কাপট্য, এসব কিছুই একই ভাবে চাপা দেওয়া বা প্রকাশ করার জন্য এই খাদি-মার্কা "উর্দ্দি" অতুলনীয়। আমরা নিজেরা অবশ্য চল্লিশ বৎসরাধিক খদ্দর পরিয়া আসিতেছি। কিন্তু কংগ্রেসের দল হইতে সরিয়া দাঁড়াইবার পরই খাদি পরিধানে আমরা স্বস্তি অনুভব করিতেছি।

অবশ্য এই খাদি পরিধান লইয়া যাঁহারা বিতর্ক তুলিয়া-ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে প্রকৃত গান্ধীবাদী হয়ত কেহ কেহ ছিলেন, যাঁহারা মহাত্মার পূণ্যস্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের কারণেই এই

বিতর্কে যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহাদের আমরা উপহাস করিতে চাহি না।

বর্ত্তমান বারের কংগ্রেস অধিবেশনের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কংগ্রেসকে দুর্নীতি হইতে মুক্ত করার বিষয়ে কোনও প্রস্তাব বা সম্যকরূপে আলোচনা বিষয় নির্ব্বাচন কমিটিতে হয় নাই। অথচ দুর্নীতি মোচন না হইলে কংগ্রেসের আদর্শবাদ, গণতান্ত্রিক সমাজবাদ ইত্যাদি আড়ম্বর-পূর্ণ "গালভরা" নাম কংগ্রেস সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও অন্য জাতীয় প্রগতির ব্যবস্থার মতই ভুয়াই দাঁড়াইবে। বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতির অধিবেশনে কংগ্রেসী সরকার ও কংগ্রেস সংগঠনের কাজকর্ম্মের ধারা ভারত স্বাধীন হওয়ার পর কিভাবে চলিতেছে সে সম্পর্কে কয়েকজন কংগ্রেসেরই নেতা ও কর্ম্মী যে মতামত আলোচনার মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আনন্দবাজার এইভাবে দিয়াছেন :—

"শ্রী এস কে পাতিল বলেন, ভারতের ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি কৃষক সম্প্রদায়ের উন্নতির উপর নির্ভর করে। কৃষিপণ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় উৎপাদন ঋণ তাহাদের একান্ত প্রয়োজন। চাউল-কল মালিক ও অন্যান্য মধ্যবর্ত্তী দালালরা এতদিন এই প্রয়োজন মিটাইতেছে এবং মুনাফা লুটিতেছে। ইহাদের উৎখাত করিয়া চাষীদের কাছে সহজ উপায়ে কৃষিঋণ পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা এই পর্য্যন্ত আমরা কিছুই করিতে পারি নাই। আজ রাতারাতি মিলমালিকদের উৎখাত করিলে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার গালভরা শ্লোগানই দেওয়া যাইবে, কৃষকগণ কিন্তু জলে পড়িবে।

শ্রীহরেকৃষ্ণ মহতাব বলেন, সমাজবাদের আদর্শ সম্পর্কে গত ১৬ বৎসর যাবৎ আমরা যত বেশী কথা বলিয়াছি তাহা কার্য্যকরী করিতে তত কম চেষ্টা করিয়াছি। প্রস্তাব অনেক লইয়াছি, কিন্তু কাজ কতটুকু হইয়াছে এখন তাহা খতাইয়া দেখা উচিত। জনগণের সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য আমরা যে প্রকৃতই কিছু করিতে চাই তাহা দেখাইবার সময় আসিয়াছে। বড় বড় ইস্পাত কারখানা গড়িয়াছি। তাহাতে ইস্পাতের দাম কমে নাই, বরং বাড়িয়াছে। মানুষে মানুষে আয়ের বৈষম্য দূর করার চেষ্টার কোন লক্ষণ দেখা যায় না।

অন্ধ্রের শ্রীরাজু বলেন, প্রস্তাবে শুধু গালভরা কতকগুলি আদর্শের কথাই আছে। কার্য্যকরী কোন পন্থা নাই। আমাদের কংগ্রেস সরকার ও কংগ্রেস সংগঠনের ঊর্দ্ধতন নেতৃবৃন্দ সরকারী চাকুরিয়াদের দ্বারা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার দিবাস্বপ্ন দেখিতেছেন। আদর্শ রূপায়ণে তাহাদের ব্যর্থতায় কংগ্রেস সংগঠনের মুখে চুনকালি পড়িতেছে।

শ্রীগোবিন্দ সহায় (বিহার) এবং শ্রী এইচ এন বহুগুণা মনে করেন, দেশের শিক্ষার মান উন্নতির জন্য এবং শিক্ষকদের অবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্য তেমন কিছু করা হয় নাই।

শ্রীমতী সাবিত্রী নিগম বলেন, সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি দূর করার জন্য সক্রিয়ভাবে কিছুই করা হয় নাই। অভিযোগ সত্য হইলে নির্ম্মমভাবে তাহা দূর করিতে হইবে।"

শুধু একটি রিপোর্ট আছে যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীনন্দ ৭ই জানুয়ারী বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতির মণ্ডপের পিছনে, "ভি. আই. পি."দের জন্য রক্ষিত একটুকু স্থানে, মুখ্যমন্ত্রীদের লইয়া প্রশাসনিক ও অন্য সরকারী বিভাগে যে দুর্নীতিজনিত সমস্যা রহিয়াছে সে বিষয়ে ঘণ্টাখানেক আলোচনা করেন। এই আলোচনার আরম্ভ হয় দিল্লীতে এবং সেখানেরই মত এখানেও অতি গোপনে কথাবার্ত্তা চলে। এই রিপোর্টটুকুর বাহিরে সকল সংবাদই "গালভরা শ্লোগানে"র এবং তাহার উপর ভুয়া আলোচনা ও বিতর্কের।

ওয়ার্কিং কমিটির ৭ জন সদস্যের নির্ব্বাচন সম্পর্কে যা রিপোর্ট আসিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে কংগ্রেসী "হাইকমাণ্ড" সেই পুরাণো "ঘোঁট" অনুযায়ীই চলিতেছেন। সুতরাং "ঋষিশ্রাদ্ধই" চলিবে মনে হয়।

কংগ্রেস সভাপতি কামরাজের ভাষণ

শ্রীকামরাজের কংগ্রেস সভাপতিরূপে প্রদত্ত অভিভাষণ আরম্ভ হয় শিষ্টাচার অনুযায়ী কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে, এবং তাহার অব্যবহিত পরেই আসে শ্রদ্ধা নিবেদন মৃত বন্ধুদের উদ্দেশ্যে। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়, শ্রীপুরুষোত্তমদাস টণ্ডন ও শ্রীকান্নামত্তারের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের পরে আততায়ীর হস্তে নিহত মার্কিন প্রেসিডেণ্ট কেনেডির গুণাবলীর উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, মরজগতের মানুষেরই শুধু মৃত্যু হয় কিন্তু শহীদগণ অমর, এবং প্রেসিডেণ্ট কেনেডি মহাত্মা গান্ধী ও আব্রাহাম লিঙ্কন প্রমুখ আত্মদানী অমরদের সঙ্গে যোগদান করিয়াছেন।

তাহার পর আসে চীন আক্রমণ ও চীন-পাক চুক্তির উপর মামুলি মন্তব্য, ঠিক পণ্ডিত নেহরু অনুসৃত পথে এবং সেই সঙ্গে অন্তরাষ্ট্রীয় অবস্থার উন্নতির বিবরণের পরে এই প্রসঙ্গে আসে আমাদের শক্তি জোট বর্জ্জন নীতির গুণ কীর্ত্তন। সেই ধারাতেই চলে আফ্রিকায় কয়েকটি দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির উল্লেখ এবং সেই সঙ্গে নিজেদের কীর্ত্তি গান। সভাপতির অভিভাষণের এই অংশ যেন প্রধানমন্ত্রীরই কথাবার্ত্তার প্রতিধ্বনির মত শোনায়।

ঐরূপ গতানুগতিক ধারায় দেওয়া হয় কংগ্রেসে সমাজবাদ প্রবর্ত্তন চেষ্টার ইতিহাস ও তারপর আসে ঐ সমাজবাদ প্রবর্ত্তনের কাজে বর্ত্তমান কংগ্রেস সরকারের

অবদান সম্পর্কে বিবৃতি। এবং সেই কীর্ত্তিগাথা শেষ করা হয় 'অলমতি বিস্তারেণ' বলিয়া।

কিন্তু তার পরই আসে কিছু খাঁটি কথা। এবং স্বাধীনতার পর এতাবৎ কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট যাঁহারা হইয়াছেন তাঁহাদের ভাষণ ও শ্রীকামরাজের ভাষণের মধ্যে প্রভেদ আসে ঐ খাঁটি কথায়। তিনি বলেন: "যদিচ আমাদের প্রগতি বিরাটরূপে হইয়াছে, তথাপি আমাদের সম্মুখে যে সমস্যাগুলি রহিয়াছে তাহা বৃহত্তর। উদাহরণ স্বরূপে আমাদের অর্থনৈতিক কাজকর্ম্মে কতকগুলি উদ্বেগজনক লক্ষণ দেখা দিয়াছে। আমি বলিতেছি অল্প কয়েকজনের হস্তে দেশের অর্থসামর্থ্যের বিরাট অংশ পুঁজিগত হওয়ার ও দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তাহাদের আয়ত্তাধীন হওয়ার কথা এবং সেই কারণেই সেই লোকেদের কয়েক শ্রেণীর শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর একাধিপত্য লাভের কথা ট্যাক্স ফাঁকি দুষ্প্রাপ্য জিনিষের কালোবাজারে চালান, খাদ্যে ভেজাল এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাপারে সাধারণ নীতি ও সাধুতার মানের ব্যাপক অবনতি এরূপ বিষম আকার গ্রহণ করিয়াছে যে তাহার প্রতিকারে দৃঢ় হস্তক্ষেপ এখন প্রয়োজন। আমাদের সমাজকে এই পাপগুলি হইতে মুক্ত করিতে হইবে, যাহাতে সমাজ ঐ পাপের প্রভাবে বিধ্বস্ত না হইয়া যায়। কি পথে ঐ সমাজবিরোধী কাজ রোধ করা হইবে সে বিষয়ে মতভেদ থাকিতে পারে কিন্তু কংগ্রেসে ঐ পাপ দমনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে অন্যমতের অবকাশ নাই।"

ইহার পর শ্রীকামরাজ ঐ পাপ দমনের প্রয়োজনীয়তার কারণ বিশ্লেষণ করিয়া লম্বা বিবৃতি দিয়া পরে দারিদ্র্য নিবারণ বেকার সমস্যার পূরণ, গ্রামাঞ্চলের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন এসব করা নিতান্ত প্রয়োজন কেন, সে বিষয়ে সাধারণ ভাবে চর্চ্চা করেন। তার পরই আসে শিক্ষার কথা এবং মাধ্যমিক স্তর পর্য্যন্ত অবৈতনিক ভাবে শিক্ষাদানের কথা—যেটা তিনি সরকারকে চেষ্টা করিতে বলেন। সেই সঙ্গে তিনি বলেন যে শুধু শিক্ষা বিনাপয়সায় দিলেই সরকারের কর্ত্তব্য শেষ হইবে না, ছোটদের পড়ার বই, কাপড়-চোপড় এবং প্রয়োজন হইলে বোর্ডিং-এর ব্যবস্থা এসবও করা প্রয়োজন। জাতি গঠনের ভিত্তি ঐ ছোট ছেলেমেয়ে এবং সভাপতির মতে উহাদের যত্নই জাতিগঠনের পথ। ছোটদের কথা বলার পূর্ব্বে তিনি বার্দ্ধক্য ও কর্ম্মক্ষমতার অভাবে যাহারা উপায়হীন তাহাদের জীবন ভয়মুক্ত করার ব্যবস্থা বিষয়েও সরকারকে অবহিত হইতে বলেন।

তাহার পর আসে কংগ্রেসে সংগঠন, ঐক্য ইত্যাদির বিচার ও বিবৃতি। কামরাজ পরিকল্পনার আর এক অধ্যায় আসে তারপর যাহাতে কেন্দ্রে ও রাজ্যের মন্ত্রিসভা ও কংগ্রেসের কমিটির মধ্যে সদস্যদের বদলা-বদলীর কথা—কংগ্রেসের ভিতরে জোটবাঁধার প্রতিশেধক হিসাবে। সেই সঙ্গে শ্রীকামরাজ কংগ্রেস সভ্যদের মধ্যে নিয়মানুবর্ত্তিতার অভাব বিষয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেন। অবশেষে তিনি মহাত্মার জীবন হইতে গৃহীত দুইটি আদর্শের উল্লেখ করিয়া বলেন, ঐ দুইটি যন্ত্রের সাহায্যে আমরা আমাদের স্বপ্ন-কল্পিত ভারত আগামী দিনে গড়িতে পারিব। সে দুইটি হইল কাজে কর্ম্মে ও ব্যবহারে সরলতা ও বিশ্বমানবের সেবা।

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীকরুণা কুমার নন্দী

পশ্চিমবঙ্গের নূতন খাদ্যনীতি

গত ৪ঠা জানুয়ারী তারিখে রাজ্য বিধান সভা ও বিধান পরিষদে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন তাঁর পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুত খাদ্যনীতি ঘোষণা করেছেন। এই নবঘোষিত নীতির প্রধান ভিত্তি খাদ্যশস্যের—বস্তুতঃ ধানের—মূল্যনিয়ন্ত্রণ বিধির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান খাদ্যশস্য চাউল। গত বৎসরের খাদ্যসঙ্কটের ফলে এ রাজ্যেও এখন আনুসঙ্গিক খাদ্যশস্য হিসাবে গমের ব্যবহারও প্রভূত পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর হিসাব মতন গত বৎসর এ রাজ্যে ১০ লক্ষ পরিমাণ গম,—অর্থাৎ তাঁর পূর্ব্বনির্দ্ধারিত মোট ৬২.৬ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের চাহিদার মোটামুটি এক-ষষ্ঠমাংশ, গমের দ্বারা পূরণ করা হয়েছে। বর্ত্তমান বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে ধানের ফসল প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারী হিসাবে আমনের মোট উৎপাদন থেকে এ বৎসর ৫৪ লক্ষ টন চাউল পাওয়া যাবে। এ ছাড়া আউসের ফসলের পরিমাণ অনুমান করা হয়েছে আরও ৪ লক্ষ টন। এ ভাবে, সরকারী হিসাব অনুযায়ী, এ রাজ্যে বর্ত্তমান বৎসরের চাউলের মোট উৎপাদনের পরিমাণ হবে ৫৮ লক্ষ টন।

কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গকে ১ লক্ষ টন চাউল এ বৎসর সরবরাহ করবেন বলে প্রতিশ্রুত আছেন। তা ছাড়া ওড়িষ্যা থেকে আরও ৩।৪ লক্ষ টন আসবে ব'লে প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে। ওড়িষ্যার চাউল যাতে সরকারী খাতে আমদানী করা হয় তার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। যাই হোক, কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া এবং ওড়িষ্যা থেকে আমদানী-করা চাউল নিয়ে এবৎসর তা হ'লে পশ্চিমবঙ্গের চাউলের মোট সরবরাহের পরিমাণ দাঁড়াবে ৬২।৬৩ লক্ষ টন। অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রীর পূর্ব্ববর্ণিত পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যশস্যের মোট ৬২.৬ লক্ষ খাদ্যশস্যের চাহিদার হিসাবের সবটাই এখন কেবলমাত্র চাউল দিয়েই পূরণ করা সম্ভব হবে। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে গত বৎসর পশ্চিমবঙ্গে মোট ১০ লক্ষ টন পরিমাণ গম ব্যবহৃত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গবাসী এখন সাধারণতঃ তাঁদের দৈনন্দিন খাদ্যশস্যের চাহিদার মোটামুটি এক-ষষ্ঠমাংশ গম দিয়ে পূরণ করতে অভ্যস্ত হয়েছেন। গমের সরবরাহে যদি ঘাটতি না পড়ে —পশ্চিমবঙ্গ ও কেন্দ্রীয় সরকার উভয়েই যথা প্রয়োজন গম সরবরাহ করে যেতে পারবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন—তা হ'লে আশা করা যায় যে বর্ত্তমান বৎসরেও অনুরূপ পরিমাণ গম এ-রাজ্যে ব্যবহৃত হবে। তা হ'লে আন্দাজ ১০ লক্ষ টন পরিমাণ চাউল মজুদ রাখা সম্ভব হ'তে পারে। এর মধ্যে, মুখ্যমন্ত্রীর আলোচ্য ঘোষণায় বলা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারী ভাণ্ডারে স্থানীয় চাউল-কলগুলির কাছ থেকে ২ লক্ষ টন চাউল কিনে মজুদ করা হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা প্রতিশ্রুত ১ লক্ষ টন চাউলও এই ভাণ্ডারে মজুদ করা হবে। আর ওড়িষ্যার ৩।৪ লক্ষ টন চাউলও যদি সরকারী ভাণ্ডারে ওঠে, তা হ'লে বর্ত্তমান বৎসরে সরকারী ভাণ্ডারে, এ রাজ্যে মোটা ৬।৭ লক্ষ টন চাউল মজুদ হবে।

যা হোক্, মুখ্যমন্ত্রীর নবনির্দ্ধারিত খাদ্যনীতি প্রধানতঃ মূল্যনিয়ন্ত্রণ, অর্থাৎ ধানের মূল্যনিয়ন্ত্রণের উপরে গড়ে তোলবার চেষ্টা করা হয়েছে। ধানের মূল্য তিনটি বিভিন্ন শ্রেণীতে যথা মাঝারি ১৪৲ মণ, মিহি ১৫৲ মণ এবং অতি মিহি (সুগন্ধ) ১৬৲ মণ। এই মূল্যনিয়ন্ত্রণ অবিলম্বেই প্রয়োগ করা হবে এবং আগামী ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত বলবৎ থাকবে। যদি এই নির্দ্ধারিত মূল্যে সাধারণভাবে অবাধে ধান কেনা-বেচা হ'তে থাকে, তা হ'লে তার পরেও এই মূল্যমানই চালু থাকবে। অন্যথায়, অর্থাৎ বাঁধা-দরে বাজারে যদি ধান-চাউলের সরবরাহে বিঘ্নের লক্ষণ দেখা যায়, তবে ১লা এপ্রেল তারিখ থেকে প্রতি শ্রেণীর ধানের মূল্য মণ-প্রতি আরও ১৲ টাকা করে কমিয়ে দেওয়া হবে এবং সরকারী ভাণ্ডারের জন্য তখন ধানও খরিদ করা হবে। প্রয়োজন হ'লে সরকার তখন যথাপ্রয়োজন জরুরী আইনের প্রয়োগের দ্বারা জবরদস্তি করেও ধান খরিদ করবেন। এই নিম্নতর মূল্যমান নির্দ্ধারণ করবার প্রয়োজন হ'লে, সেটি বর্ষাকাল পর্য্যন্ত চালু থাকবে। বর্ষাকালে স্বাভাবিক কারণেই বাজারে ধান-চাউলের সরবরাহের কিছুটা টান পড়ে। সেই সুযোগে যদি বর্ষারম্ভে ধান-চাউলের অবাধ সরবরাহে ঘাটতি সৃষ্টি করিবার প্রয়াস লক্ষিত হয়, তবে নির্দ্ধারিত মূল্যমান প্রতি শ্রেণীর ধানের মণ-প্রতি আরও ১৲ টাকা করে কমিয়ে দেওয়া হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই নির্দ্ধারিত মূল্যমান কার্য্যকরী করবার এবং রাখবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছেন এবং এটা করবার জন্যে প্রয়োজন হ'লে দেশরক্ষা এবং অন্যান্য জরুরী আইনের বলে সরকারের হাতে যে প্রভূত অতিরিক্ত ক্ষমতা রয়েছে তাহাও প্রয়োগ করতে দ্বিধাবোধ করেন না।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বিশেষ করে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণায় ধানের দামের সঙ্গে সঙ্গে চাউলের দামও নির্দ্ধারণ করা হয় নাই, বিশেষ করে চাউলের খুচরা দর। তিনি কেবল বলেছেন যে চাউলের দরও আনুপাতিক হিসাবেই নির্দ্ধারণ করা হবে এবং ইঙ্গিত করেছেন যে উল্লিখিত বিভিন্ন শ্রেণীর চাউলের মূল্য মোটামুটি সর্ব্বনিম্নস্তরে মণপ্রতি ২৫৲ টাকার কিছু বেশী থেকে সুরু করে সর্বোচ্চ স্তরে ৩০৲ টাকার কিছু কমের মধ্যেই থাকবে। তিনি একথাও খুব স্পষ্ট করে বলেন নি যে, এই যে দরের ইঙ্গিত তিনি দিয়েছেন সেটা চাউলের মিলের দর, বাজারের পাইকারী দর, না খুচরা দর। একথা অবশ্য তিনি বলেছেন যে পূর্ব্বেই মুনাফার আইনসম্মত হার সকল স্তরেই বেঁধে দেওয়া হয়েছে এবং তিনি আশা করেন যে বর্ত্তমানে নির্দ্ধারিত দরে কেনা-বেচা করে সংশ্লিষ্ট সকল স্তরের ব্যবসায়ী মহলই উপযুক্ত লাভে তাঁদের পণ্যের কেনা-বেচা করতে পারবেন।

মুখ্যমন্ত্রী-ঘোষিত মূল্যনিয়ন্ত্রণ বিধি প্রচারিত হবার পর প্রায় বর্ত্তমান প্রসঙ্গ রচনার সময়ে এক সপ্তাহকাল গত হয়েছে। কিন্তু খুচরা বাজারে চাউলের মূল্যের উপরে ইহার কোন প্রভাব এখনও লক্ষ্য করা গেল না! আমরা বাজার ঘুরিয়া দেখিতে পাইলাম যে সবচেয়ে মোটা, লাল চাউলের খুচরা দর এখনও ৮০।৮৫ নয়া পয়সার নীচে অর্থাৎ মণ-প্রতি প্রায় ৩০৲।৩১।।০টাকার কমে এখনও পাওয়া যায় না; মাঝারি চউলের দর ১৲।১.০৫ টাকা কিলো, অর্থাৎ মণ-প্রতি ৩৭৲।৩৮।।০ টাকা; মিহি চাউল কিলোপ্রতি ১ টাকা ২০ নয়া পয়সা থেকে ১ টাকা ২৫ নয়া পয়সা অর্থাৎ মণ-প্রতি ৪৪৲।৪৬৲ এবং সুগন্ধি মিহি চাউল কিলোপ্রতি ১।।০ টাকা, অর্থৎ মণপ্রতি প্রায় ৫৫।।০ টাকায় কেনা-বেচা চলছে।

নির্দ্ধারিত মূল্য প্রয়োগ খুচরা বাজারে খুব সহজ নহে একথা আমরা জানি। মিল-মালিক কিংবা বড় পাইকারদের উপরে নির্দ্দিষ্ট মূল্য প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু তার ফলটা যদি খুচরা বাজারে না বর্ত্তায় তা হ'লে সাধারণ ভোক্তার পক্ষে এই মূল্যনির্দ্ধারণের আড়ম্বর একটা প্রাণান্তকর পরিহাসেরই নামান্তর মাত্র হইবে। আমরা মনে করি যে মুখ্যমন্ত্রী ধানের যে দর বাঁধিয়া দিয়াছেন, তাহা চাষীর পক্ষে প্রকৃতই ন্যায্যমূল্য সূচক। ১৪৲ মূল্যের ধান থেকে মিলের খরচা সমেত মণপ্রতি চাউলের খরচা দাঁড়ায় প্রায় ২২৲ টাকা। মিল-মালিককে ৫% মুনাফা দিয়া এই চাউলের মিলের দর ২২৷৷৹ টাকার বেশী হওয়া সমীচীন নহে। অতএব পাইকার ও খুচরা দোকানদারকে ন্যায্য মুনাফার সুযোগ দিয়েও এই চাউল খুচরা বাজারে ২৫৷৹ টাকার মধ্যেই বিক্রী করা সম্ভব হওয়া উচিৎ। অনুরূপভাবে মাঝারি, মিহি ও সুগন্ধি চাউলের খুচরা দর অনুরূপ শ্রেণীর ধানের নির্দ্ধারিত মূল্য অনুযায়ী যথাক্রমে ২৫ টাকা ৫০ নঃ পঃ, ২৭ টাঃ ৩৫ নঃ পঃ এবং ২৯টাঃ ১৫ নঃ পয়সার বেশী হওয়ার কোন ন্যায্য কারণ নাই।

মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে স্বাভাবিক ভাবে নির্দ্ধারিত মূল্যের মধ্যে অবাধ কেনা-বেচায় বিঘ্ন লক্ষিত হলে জরুরী ক্ষমতার বলে নির্দ্দেশ পালনে বাধ্য করতে তিনি দ্বিধা করিবেন না। এ বিষয়ে দ্বিধান্বিত হ'লে যে মূল্য নির্দ্ধারণ কার্য্যকরী করবার কোন উপায় নাই তাহা একপ্রকার নিশ্চিত। সেই কারণেই বিশেষ করিয়া খুচরা বাজারে নির্দ্ধারিত মূল্য প্রয়োগ বাধ্য করবার উপযুক্ত আয়োজন পূর্ব্বাহ্নেই একান্ত প্রয়োজন। এর জন্য প্রয়োজন ছিল প্রথম থেকেই বিভিন্ন শ্রেণীর চাউলের খুচরা মূল্যও একই সঙ্গে নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া। মুখ্যমন্ত্রী কেন যে এই অত্যাবশ্যকীয় ব্যবস্থাটি করেন নাই তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখেছি খুচরা বাজারেই মুনাফাবাজীর অবসর প্রশস্ততম এবং সেখান থেকে সুরু করে পেছনের দিকে ক্রমান্বয়ে মিল পর্য্যন্ত চোরা অতিরিক্ত মুনাফার সুযোগ সৃষ্টি করে নেওয়া হয়ে থাকে। এর দ্বারা কেবল যে খুচরা ক্রেতা বিপন্ন হন তাই নয়, দেশের রাজস্বও তার উচিৎ প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হয়। গোপন মুনাফার উপরে রাজস্ব দিতে হয় না। এবং এইভাবে যে দেশের সরকারী প্রাপ্য প্রতি বৎসর কয়েকশত কোটি টাকা ফাঁকি পড়ে থাকে, এটাও সকলেরই কাছে সুবিদিত। তাই খুচরা বাজারকে উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণে বাঁধিতে না পারিলে যে এই মূল্য নিয়ন্ত্রণের আয়োজন-ভিত্তিক নূতন খাদ্য-নীতি সম্পূর্ণ বানচাল হবার আশঙ্কা আছে তাহা অনুমান করা কঠিন ছিল না। সেই কারণে অবিলম্বে প্রয়োজন বিভিন্ন শ্রেণীর চাউলের খুচরা বিক্রয় মূল্য স্থিরীকরণ ও নির্দ্ধারণ। সঙ্গে সঙ্গে এই নির্দ্ধারিত মূল্য প্রয়োগের উপযুক্ত আয়োজনও গড়িয়া তোলা। এটি না করিতে পারিলে এই বহু-প্রত্যাশিত এবং সাধারণতঃ বহুপ্রশংসিত খাদ্যনীতি কেবল নীতিই থাকিয়া যাইবে ইহার কার্য্যকরী প্রয়োগ সম্ভব হইবে না।

আমাদের বিবেকহীন ব্যবসায়ী মহল বিনা-প্রতিবন্ধকে মুখ্যমন্ত্রী-প্রচারিত খাদ্যমূল্যনীতি যে সহজে মেনে নিতে স্বীকৃত হবেন না, তাহার আভাস ইতিমধ্যেই পাওয়া গিয়াছে। ৫ই জানুয়ারী তারিখের "যুগান্তরে" প্রকাশিত ষ্টাফ রিপোর্টারের বিবৃতিতে দেখা গেল যে চাউলের মিল-মালিক ও বড় বড় পাইকারী ব্যবসায়ীগোষ্ঠী যে মুখ্যমন্ত্রীর নূতন নীতি বানচাল করে দেবার যথেষ্ট প্রয়াস করবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। একজন ব্যবসায়ী বলেন যে চাষীকে ১৪৲ টাকা হিসাবে ধানের দাম দিয়ে কোনক্রমেই খুচরা চাউল ২৮৲ টাকার নীচে বিক্রী করা সম্ভব নয়। তিনি বলেন ধানের দাম ১৪৲ হ'লে চাউল ২১৲ টাকা মণ এমনিতেই দাঁড়ায় এবং খরচ-খরচা, ঝড়তি-পড়তি ও মিলের ন্যায্য মুনাফা মিলিয়ে সে চাউল তাহার পক্ষে ২৫৲ টাকার কমে বিক্রী করা সম্ভব নয়। তার পর পাইকার ও খুচরা দোকানদারকে তাদের ন্যায্য মুনাফা দিয়ে ১৪৲ টাকার ধান থেকে যে চাল পাওয়া যাবে তা কোনক্রমেই খুচরা ২৮৲ টাকার কমে বিক্রী করা যায় না। ইনি আভাস দেন যে এই নিয়ন্ত্রণবিধির প্রতিবাদে ব্যবসায়ী-গোষ্ঠী আন্দোলন গড়িয়া তুলিয়া ইহাকে বানচাল করিবার চেষ্টা করিবেন। বাস্তব হিসাব অন্যপ্রকার। দেড় মণ ধান থেকে নীট ১ মণ চাল পাওয়া যায়। অতএব এক মণ চালের ধানের দাম পড়ে ২১৲ টাকা। মিলের খরচা ও ঝড়তি-পড়তির জন্য সাধারণতঃ ৩% ধরা হয়। তার অঙ্ক দাঁড়ায় ৬৩ নয়া পয়সা। পূর্ব্বকালে মিলগুলি কখনই ৩%, ৪%-এর বেশী মুনাফা করেন নাই। বর্ত্তমানে যদি তাঁদের জন্য ৫% মুনাফাও বরাদ্দ করা হয়, তবে সেই চাউলের মিলের দাম দাঁড়ায় ২২ টাকা ৭১ নঃ পঃ। পাইকারও কোনকালে ২%, ৩%-এর বেশী লাভ করিতেন না। তবু তাঁহাদের ৬% মুনাফা বরাদ্দ করিলে পাইকারী দর হয় ২৪ টাঃ ৭ নঃ পঃ। এবং খুচরা দোকানদারকে তার উপরে ৬% লাভ দিলে, খুচরা দর দাঁড়ায় ২৫ টাঃ ৫১ নঃ পঃ। অতএব মুখ্যমন্ত্রী চাউলের খুচরা দরের যে আভাস দিয়াছেন তাহা অলীকও নয়, অসমীচীনও নয়। এখন প্রয়োজন ইহার সরকারী নির্দ্ধারণ এবং কার্য্যকরী প্রয়োগ। সেটি করিবার এখনও কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না এবং তাহা না হইলে এই নূতন খাদ্যনীতি একটি মর্ম্মন্তুদ প্রহসনে পর্য্যবসিত হইবে।

কেন্দ্রে নূতন অর্থনীতির সূচনা ?

গত ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টে অর্থমন্ত্রী শ্রী টি টি কৃষ্ণমাচারী ষোলটি পণ্যের উপরে—প্রধানতঃ শিল্প প্রজননের কাঁচা মাল কিন্তু ইহার মধ্যে কাপড় কাচা সাবান সাইকেলের টায়ার ও টিউব, শীটকাঁচ এবং কাগজের বোর্ড ইত্যাদি কয়েকটি ভোগ্য পণ্যও ছিল—তখন পর্যন্ত বলবৎ মূল্য নিয়ন্ত্রণ বিধি প্রত্যাহার করিবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। সিদ্ধান্তটি গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নাই। কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ, সেই প্রসঙ্গে কৃষ্ণমাচারী মহাশয় তাঁর দীর্ঘ বিবৃতিতে তাঁর হেফাজতে দেশের অর্থনীতির যে নূতন ধারা প্রবর্ত্তনের ইঙ্গিত তিনি দেন, সেইটি। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বিষয়টি এখনও পর্যন্ত সাধারণের নজরে যে বিশেষ স্থান পেয়েছে এমন আভাস পাওয়া যায় না।

মনে থাকতে পারে যে প্রথম বার যখন শ্রীকৃষ্ণমাচারী কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রণালয়ের ভার গ্রহণ করেন, সেই সময়ে দেশের আর্থিক পরিস্থিতি ও প্রগতির ধারায় এদেশের শেয়ার বাজারগুলির যে কোন একটি বিশিষ্ট কার্য্যকরী ভূমিকা ছিল, একথা তিনি মনে করিতেন না। অবশ্য আংশিক নিয়ন্ত্রিত পরিকল্পনানুযায়ী দেশের আর্থিক উন্নয়নের যে সিদ্ধান্ত ও প্রগতি ব্যবস্থা চালু হয়েছিল, তাতে উন্নয়ন সংস্থানের গতি (allocation of resources) এবং লগ্নীর প্রকৃতি নির্দ্ধারণে (resulting pattern of investments)বাজারের স্বাধীন গতির প্রভাবের (free operation of market forces) একটা প্রশস্ত অবকাশও ছিল না। অবশ্য পরিকল্পনার মধ্যে বেসরকারী প্রয়োজনার একটা প্রশস্ত স্থানও রক্ষিত ছিল, কিন্তু এই স্থানটিতেও লগ্নীর গতি ও প্রকৃতি সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা এমন ভাবে প্রয়োগ করা হইতেছিল যে, বাজারের স্বাধীন গতির প্রভাব স্বতঃই ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল। বেসরকারী প্রচেষ্টাতেও কোন্ কোন্ শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহাদের উৎপাদন ক্ষমতা কতটা হইবে, ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি পরিকল্পনার খসড়ায়ই নির্দ্ধারিত হইতেছিল, ফলে বেসরকারী মহলেও (private sector) নির্দ্দিষ্ট উন্নয়ন রূপায়ণের জন্য যথাপ্রয়োজন লগ্নীর ব্যবস্থার দায়িত্বও স্বতঃই সরকারের উপরেই প্রধানতঃ বর্ত্তাইয়াছিল। পরিকল্পনা-নির্দ্দিষ্ট উন্নতি সাধনের প্রয়োজনে উপযুক্ত সংস্থান ব্যবস্থাও তাই প্রধানতঃ সরকারের উপরেই বর্ত্তাইয়াছিল। ফলে লগ্নী-নিয়ন্ত্রণ, সরকারী লগ্নী সংস্থা (investments Corporations), আমদানী-লাইসেন্স ইত্যাদি নানাবিধ জটিল ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। এরূপ অবস্থায় দেশের শেয়ার বাজারগুলির ভূমিকা যে অবাশ্যম্ভাবীরূপে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িবে ইহাতে সন্দেহের কোন কারণ নাই।

এবার দ্বিতীয় বারের মতন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রণালয়ের ভার গ্রহণ করিবার পর শ্রীকৃষ্ণমাচারীর পূর্ব্ববর্ণিত দৃষ্টিভঙ্গি যে অনেকটা বদল হইয়াছে তাহার আভাস ইতিপূর্ব্বেই পাওয়া যাইতেছিল। এবার অর্থমন্ত্রনালয়ের ভার গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তাঁহার পূর্ব্বসূরীর নীতির ফলে যে কতকগুলি ব্যাপক এবং হানিকর ব্যবস্থা চালু হইয়াছিল তাহার মেরামতের কাজে লাগিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি ব্যবস্থার দ্বারা তিনি খানিকটা জনপ্রিয়তা অর্জ্জনেরও চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু মোটামুটি দেখা যায় যে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রণালয়ের ভার পুনর্বার গ্রহণ করিবার পর হইতে বাজারের স্বাধীন প্রভাবের প্রয়োজনীয়তা এবং দেশের সার্ব্বভৌম উন্নতির গতিতে ইহার বিশিষ্ট ভূমিকার প্রয়োজন তিনি ক্রমেই উপলব্ধি করিতে সুরু করিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ পণ্য সরবরাহ ও পণ্যমূল্য-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে তাঁহার বর্ত্তমান দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখ করা যাইতে পারে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়ে পুনবার প্রবেশ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে দক্ষিণ ভারতে কয়েকটি জনসভায় শ্রীকৃষ্ণমাচারী যে সকল ভাষণ দেন তাহাতে পণ্য সরবরাহ ও পণ্যমূল্য (বিশেষ করিয়া খাদ্যাদি, অবশ্য ভোগ্যপণ্য সম্বন্ধে) নিয়ন্ত্রণ বিধির ব্যাপক প্রবর্ত্তন ও প্রয়োগ একান্ত আবশ্যক বলিয়া তিনি বারংবার বলেন। কিন্তু অর্থমন্ত্রণালয়ের ভার পুনবার গ্রহণ করিবার পর হইতে এ বিষয়ে তাঁহার পূর্ব্ব মত যে সম্পূর্ণ বদলাইয়াছে তাহার প্রভূত প্রমাণ তিনি দিয়াছেন। উৎপাদন বৃদ্ধি ও উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি (Production and productivity) না করিতে পারিলে যে-কোন প্রকারেই কেবলমাত্র কৃত্রিম বিধি ব্যবস্থার দ্বারা মূল্যস্থিরতা (price stabilization) রক্ষা করা সম্ভব হইবে না, একথা তিনি উত্তরোত্তর উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

আলোচ্য প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণমাচারী তাঁহার নূতন চিন্তাধারার যে একটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়াছেন তাহার গুরুত্ব অনেকখানি। কেননা আশা করা যায় যে এই চিন্তাধারার উত্তরোত্তর প্রতিফলন সরকারী আর্থিক নীতির প্রয়োগে ক্রমেই বেশী করিয়া লক্ষিত হইতে সুরু করিবে। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে তিনি যে কেবল ষোলটি পণ্যের উপরে এতদিন ধরিয়া চালু মূল্য নিয়ন্ত্রণ বিধি প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন শুধু তাহাই নহে, সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-নিয়ন্ত্রণ নীতি (industrial licensing policy) এবং লগ্নীনিয়ন্ত্রণ নীতিরও (capital issues control policy) খানিকটা সংশোধনের সিদ্ধান্তও ঘোষণা করিয়াছেন। যথা, ১০ লক্ষ টাকার অধিক লগ্নীভিত্তিক

নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে সরকারী লাইসেন্স লওয়া আবশ্যিক ছিল এবং ১০ লক্ষ টাকার অধিক নূতন লগ্নীর ব্যবসা প্রবর্ত্তন করিতে হইলে সরকারী অনুমতির প্রয়োজন হইত। বর্ত্তমান ঘোষণার দ্বারা উভয় বিষয়েই ২৫ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত লাইসেন্স বা অনুমতির প্রয়োজন হইবে না। অর্থাৎ এ ভাবে বাজারের স্বাধীন গতির পথ অনেকটা প্রশস্ততর করিয়া দেওয়া হইল। ইহার ফলে বেসরকারী প্রচেষ্টায় মধ্যমানের শিল্প-প্রগতির স্বাধীনতা যে অনেকটা বাড়াইয়া দেওয়া হইল তাহার ফলে শেয়ার বাজারগুলির ভূমিকাও যে আনুসঙ্গিক পরিমাণে গুরুত্ব লাভ করিবার অবকাশ পাইবে সে বিষয়ে সন্দেহের কারণ নাই।

আলোচ্য বিবৃতি প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণমাচারী অবশ্য তাঁহার রাজস্ব নীতির সম্ভাব্য গতি ও প্রকৃতির বিষয়ে কোন বিশদ চিত্র এখনও প্রকাশ করেন নাই। তিনি কেবল উল্লেখ করিয়াছেন যে আগামী বৎসরের বাজেটে আরও অতিরিক্ত ট্যাক্স প্রবর্ত্তনের প্রয়োজন হইবে। ক্রমবর্দ্ধমান প্রতিরক্ষা-ব্যয় ও বিস্তৃততর উন্নয়ন লগ্নীর অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজনে অতিরিক্ত রাজস্বের প্রয়োজনও আনুপাতিক পরিমাণে অনিবার্য্য ভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে এবং সেই কারণে অতিরিক্ত কর ধার্য্য করাও অনিবার্য্য হইয়া পড়িবে। সরকারী ঋণের inelasticityর কারণে এবং ইচ্ছাসৃষ্ট মুদ্রার পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট বিস্তৃতির পরিধির মধ্যে সঙ্কুচিত করিয়া রাখিবার অনিবার্য্য প্রয়োজনে (the need to maintain deficit financing within severely restricted limits) আরও অতিরিক্ত রাজস্বের প্রয়োজন অনিবার্য্য হইয়া পড়িবে বলিয়া তিনি বলেন। দেশের পণ্যমূল্যমান একটা নির্দ্দিষ্ট উচ্চতার মধ্যে সীমায়িত করিয়া রাখা এবং মূল্য-সমতা সাধনের জন্য এই উভয়বিধ দিকে বিশেষ প্রচেষ্টার প্রয়োজন অনস্বীকরণীয়।

এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণমাচারী সরকারী মালিকানায় যে প্রভূত লগ্নী করা হইয়াছে তাহা হইতে একটা আশানুরূপ মুনাফা প্রবাহিত হইবার বিশেষ প্রয়োজনের কথাও উল্লেখ করেন। দেশের উন্নয়নের ধারায়, তিনি মনে করেন, সরকারী মালিকানায় পরিচালিত শিল্পগুলির অধিকতর অবদানের গুরুতর দায়িত্ব রহিয়াছে এবং সেই কারণে যাহাতে এ সকল শিল্পপ্রচেষ্টাগুলি হইতে আশানুরূপ অর্থাগম হয় তাহার ব্যবস্থা করিতেই হইবে। এ বিষয়ে কোন মতভেদের কারণ অবশ্যই নাই। কিন্তু পরে তিনি যাহা বলেন, যে হয়ত সরকারী মালিকানায় পরিচালিত শিল্পগুলির মুনাফার অঙ্ক, অন্ততঃ অংশতঃ, একমাত্র ইহাদের উৎপাদিত পণ্যসমূহ সম্পর্কে বর্ত্তমান মূল্যনীতির সংশোধনের দ্বারাই সম্ভব হইতে পারে ("It may well be that the profits of the public sector enterprises can be raised, in part at any rate, only by an adjustment of their pricing policies"), এই উক্তিটি সন্দেহ ও শঙ্কা উদ্রিক্ত করিতে বাধ্য। বস্তুতঃ অর্থমন্ত্রীর এই বিশেষ উক্তিটি সবিশেষ শঙ্কাজনক বলিয়া সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। অব্যবহিত পূর্ব্বেই শ্রীকৃষ্ণমাচারী যে বলিয়াছিলেন—ক্রমবর্দ্ধমান মূল্যমান এবং উন্নয়ন ধারায় আশানুরূপ ফললাভে অসাফল্য এই দ্বিবিধ এবং পারস্পরিক সম্বন্ধযুক্ত সমস্যা (related problems) সরকারকে শঙ্কান্বিত করিয়া তুলিতেছে—সরকারী মালিকানার শিল্পগুলিতে মুনাফা বৃদ্ধি করিতে হইলে যে সম্ভবতঃ একমাত্র তাহাদের মূল্যনীতির সংশোধনের দ্বারাই তাহা সাধিত হইতে পারে, এই পরবর্ত্তী উক্তির সঙ্গে তাহার সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন হইয়া পড়িবে। একথা সুবিদিত যে সরকারী মালিকানায় পরিচালিত শিল্পগুলি তাহাদের উৎপাদন-অসাফল্য ও অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের উৎপাদিকা-শক্তির কারণেই এখনও পর্য্যন্ত আশানুরূপ ফল লাভে ব্যর্থ হইতেছে। ব্যক্তিমালিকানায় পরিচালিত অনুরূপ শিল্পগুলির মোট উৎপাদন সাফল্য এবং সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদিকা শক্তিও অপেক্ষাকৃত অনেক অনেক বেশী বলিয়া আগাগোড়াই প্রমাণিত হইয়াছে। উৎপাদিত পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি করিয়া এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নহে; ইহা সহজেই অনুমেয়। অসার্থক উৎপাদনগতির দ্বারা সরকারী শিল্পগুলির উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী। মূল্যবৃদ্ধি করিয়া আপাতঃ-দৃষ্টিতে এই উচ্চতর উৎপাদন-ব্যয়ের নিরসন হইবে না, কেবল ইহাদের আশানুরূপ মুনাফা সাধন করিবার জন্য মূল্যমানের উপরে চাপ আরও বৃদ্ধি পাইবে। নির্দ্দিষ্ট ব্যয়ের পরিধির মধ্যে উৎপাদন-প্রচেষ্টা সীমিত রাখিয়া দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করিতে পারিলেই তবে সত্যকার মুনাফাবৃদ্ধি ও উন্নয়ন-সাফল্য সাধিত হইতে পারে। সরকারী অর্থনীতির ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রীর এইরূপ একটি বিবেচনাহীন উক্তি যে একটা অনিশ্চিয়তার আবহাওয়া সৃষ্টি করিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

বিষয়টির আরও বিশদ, আরও গভীরতর বিচারের প্রয়োজন আছে বলিয়া আমরা মনে করি। বস্তুতঃ সরকারী মালিকানায় বিস্তৃত এবং গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে শিল্পপ্রযোজনার গুরুত্ব দেশের সমগ্র আর্থিক ভবিষ্যৎ ধারার উপরে অনেকখানি। উন্নয়নের কোনই অর্থ হয় না, যদি এই উন্নয়ন-প্রচেষ্টা নির্দ্দিষ্ট মূল্যমানের গণ্ডির মধ্যে দেশের সমগ্র সম্পদ বৃদ্ধিতে ক্রমিক বিস্তৃতির ধারা প্রবর্ত্তন না করে। এই প্রসঙ্গে

তাই একটা কথা বিশেষ করিয়া বিচার করা প্রয়োজন। কি সরকারী-মালিকানায়, কি ব্যক্তি-মালিকানায় দেশের সমগ্র উৎপাদন-প্রচেষ্টা যদি নির্দ্দিষ্ট লগ্নী ও উৎপাদন-ব্যয়ের পরিধির মধ্যে সম্পদ বৃদ্ধির দ্বারা সাফল্যমণ্ডিত না হয়, তবে ইহাকে কোনমতেই উন্নয়ন-পরিপূরক বলিয়া স্বীকার করা যায় না। সরকারী-মালিকানায় বা ব্যক্তি-মালিকানায়, দেশের সমগ্র আর্থিক প্রচেষ্টাটিকে একটি অবিভাজ্য সমষ্টি হিসাবে বিচার করা প্রয়োজন। উভয় ক্ষেত্রেই পরিচালন-সাফল্য লগ্নীর পরিমাণ, উৎপাদন পরিমাণ এবং উৎপাদন ব্যয়, এই ত্রিবিধ মাপে বিচার করিতে হইবে। ইহার কোন একটি ক্ষেত্রের অসাফল্য সমগ্র আর্থিক প্রচেষ্টাটিরই ব্যর্থতা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতেই হইবে। বস্তুতঃ উৎপাদনের এই দ্বিবিধ (সরকারী ও ব্যক্তিগত) ক্ষেত্রে সমতা (balance) সাধিত না হইলে একের অসাফল্য অনিবার্য ভাবে অপর ক্ষেত্রের উপরেও অপঘাত সৃষ্টি করিবে। বর্ত্তমানে স্পষ্টতঃই ইহার লক্ষণও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। সরকারী-মালিকানায় বিস্তৃত ক্ষেত্রে শিল্পপ্রযোজনার সুরু হইতেই বেসরকারী ব্যক্তি-মালিকানায় পরিচালিত অনেক বৃহৎ শিল্পই আজ পরিচালন-সাফল্যের কষ্টিপাথরে তাহাদের পূর্ব্বসাফল্য হইতে বিচ্যুত হইতে সুরু করিয়াছে। মূল্যবৃদ্ধির দ্বারা সরকারী শিল্পগুলির মুনাফাবৃদ্ধি করিতে গেলে অনুরূপ ক্ষেত্রে বেসরকারী শিল্পগুলির অসাফল্য আরও বৃদ্ধি পাইতে বাধ্য এবং ইহার সকল দায় বর্ত্তাইবে নিরুপায় ভোক্তার (Consumer) উপরে।

বস্তুতঃ লগ্নীর বিচারে দেশের সমগ্র শিল্প-প্রচেষ্টা যে আজ দারুণ ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নাই। এই প্রসঙ্গে সম্প্রতি আলোচিত তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রূপায়ণের অন্তর্ব্বর্ত্তীকালীন (mid term) মূল্যায়নের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। পরিকল্পনা কমিশন তাঁহাদের এই রিপোর্টে স্বীকার করিয়াছেন যে তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসরে মোট লগ্নীর পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে সমগ্র পঞ্চমবর্ষের জন্য নির্দ্দিষ্ট লগ্নীর প্রায় ৫৭·২% এবং তাঁহাদের হিসাবে সমগ্র পঞ্চবর্ষে মোট লগ্নীর পরিমাণ দাঁড়াইবে নির্দ্দিষ্ট লগ্নীর প্রায় ৯৪·৩%। অথচ এই দুই বৎসরে পরিকল্পনায় নির্দ্দিষ্ট গড়পড়তা বার্ষিক ৬% জাতীয় আয় বৃদ্ধির পরিবর্ত্তে মাত্র ২·৩৫% হারে জাতীয় আয় বৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে। খাদ্যশস্য উৎপাদনে গড়পড়তা বার্ষিক ৭% উন্নতির পরিবর্ত্তে মাত্র ২·২% উন্নতি সাধিত হইয়াছে এবং শিল্পোৎপাদনের গতি নির্দ্দিষ্ট বার্ষিক ১১% হারে বৃদ্ধি পাওয়ার পরিবর্ত্তে মাত্র ৭% হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কমিশনের অন্তর্ব্বর্ত্তীকালীন রিপোর্টে সমগ্র পঞ্চবার্ষিক কালে কতটা মোট উন্নতি সাধিত হইবে তাহার কোন নির্ভরযোগ্য নির্দ্দেশ পাওয়া যায় নাই। সরকারের তরফ হইতে পরিকল্পনা-বিতর্ক কালে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু, অর্থমন্ত্রী কৃষ্ণমাচারী ও পরিকল্পনা-মন্ত্রী শ্রী বি আর ভগৎ সকলেই অবশ্য প্রতিশ্রুতি দেন যে অন্তিমবর্ষ পর্য্যন্ত তৃতীয় পরিকল্পনা রূপায়ণের সম্পূর্ণ সার্থকতা সাধন করিবার জন্য যাহা কিছু আয়োজন দরকার তাহা সাধিত হইবেই। এই বিষয়ে সাফল্য-সাধন যদি ইঁহাদের ইচ্ছাধীন হইত, তাহা হইলে ইঁহারা তাহা অবশ্যই করিতেন সন্দেহ নাই। কিন্তু বাস্তবপক্ষে যখন তাহা নহে, তখন ইঁহাদের প্রতিশ্রুতির যে বিশেষ কোন মূল্য নাই, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। অন্যদিকে দেশের অর্থনীতি-বিশেষজ্ঞদের মোটামুটি অভিমত এই যে, তৃতীয় পরিকল্পনার অবশিষ্ট আড়াই বৎসর কালে সর্ব্বাত্মক সরকারী প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনা রূপায়ণের বিভিন্নক্ষেত্রে পারস্পরিক অধিকতর সামঞ্জস্য সাধিত হইবার ফলে জাতীয় আয়ের মানে উন্নতির গতি অবশ্যই খানিকটা বৃদ্ধি পাইবে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে তাহা হইলেও এই গতি বার্ষিক ৩·৫%-এর বেশী হইবার সম্ভাবনা খুবই কম। অন্য একদল বলেন যে সম্ভবতঃ ইহার গতি বার্ষিক ৪·৫% পর্য্যন্ত হইলেও হইতে পারে। শেষোক্ত অঙ্কটিই অধিকতর বাস্তব বলিয়া ধরিয়া লইলেও সমগ্র পঞ্চবার্ষিকী কালে, জাতীয় আয়বৃদ্ধির মানে উন্নতির পরিমাণ মোট ১৮·২%-এর বেশী হইবে না, অর্থাৎ পরিকল্পনায় নির্দ্দিষ্ট ৩৬% জাতীয় আয় বৃদ্ধির মাত্র অর্দ্ধেক পরিমাণ বাস্তবপক্ষে সাধিত হইলেও হইতে পারে। অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট লগ্নীর ৯৪ শতাংশেরও বেশী বস্তুতঃ লগ্নী করিয়া ফল লাভের বেলায় আশানুরূপ উন্নতির মাত্র ৫০ শতাংশ উচ্চতম পক্ষে সাধিত হইবার সম্ভাবনা দেখা যায়। ব্যর্থতার ইহা হইতে আর কি প্রমাণ আশা করা যাইতে পারে?

অবশ্য এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, এই ব্যর্থতার জন্য পরিচালন-সাফল্যের অভাবই, বিশেষ করিয়া বেসরকারী ব্যক্তি-মালিকানায় পরিচালিত শিল্পসমূহের বেলায়, একমাত্র দায়ী নহে। সরকারী-মালিকানায় পরিচালিত শিল্পসমূহের সুবিধার জন্য এবং অন্যান্য কারণে যে সকল আর্থিক নিয়ন্ত্রণ, ও অন্যান্য বিধি-বিধান সকল (fiscal, monetary, trice and other policies and controls) ও অন্ততঃ আংশিক ভাবে এই শঙ্কাজনক পরিস্থিতির জন্য বিশেষ ভাবে দায়ী। এই সকলই সমগ্রভাবে দেশের শিল্পোন্নয়ন সার্থকতা অংশতঃ ব্যাহত করিয়াছে এবং আনুসঙ্গিক ভাবে মূল্যমানের উপরে চাপ দিতেছে, এ বিষয়ে সন্দেহের কোনই অবকাশ নাই। কৃষ্ণমাচারী মহাশয় আলোচ্য প্রসঙ্গে সুবিবেচনার কথা বেশ কয়েকটি বলিয়াছেন,

কিন্তু এই বিষয়ে তিনি যে বিচার এবং আলোচনা একেবারেই এড়াইয়া গিয়াছেন তাহা খুবই স্পষ্ট। সম্ভবতঃ তিনি ইচ্ছা করিয়াই তাহা করিয়াছেন। পরিকল্পনা-বিতর্ক উপলক্ষ্যে লোকসভায় তাঁহার ভাষণ এই প্রসঙ্গে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য বলিয়া প্রতীত হইবে। সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেন উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজে একবার নামিলে তাহা হইতে নিরস্ত হওয়া আর কোনক্রমেই সম্ভব নয়,—ব্যাপারটা বাঘের পিঠে সওয়ার হওয়ার মতন, অর্থাৎ বাহক যে পথেই অগ্রসর হউক না কেন অস্তিত্ব বজায় রাখিবার অমোঘ প্রয়োজনে সওয়ার হইয়াই চলিতে হইবে, নামিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিলে বাহকেরই গ্রাস হইতে হইবে। উপমাটি কবিত্বপূর্ণ সন্দেহ নাই। কিন্তু ফলাফলের কথা চিন্তা করিলে ব্যাপারটা যে বিশেষ আরাম-প্রদ বা স্বস্তিসূচক নয়, তাহা বুঝিতে কষ্ট-কল্পনার প্রয়োজন হয় না। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, সরকারী পরিকল্পনায় ক্রম-বিস্তৃত শিল্পোন্নয়ন প্রচেষ্টার একটা সীমারেখা নির্দ্দিষ্ট না করিতে পারিলে অন্তিমে দেশের আর্থিক অবস্থা আরও অধিকতর সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে পর্য্যবসিত হইবে ইহাও তিনি স্পষ্টই অনুমান করিতে পারিতেছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণমাচারী এককালে এই সরকারী শিল্পোন্নয়ন ক্ষেত্রের বৃহৎ বিস্তৃতির যে বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন সে কথা সর্ব্বজন-বিদিত। দেশের শাসন-সংস্থায় তিনি যে স্থান অধিকার করিয়া আছেন, এবং বিশেষ করিয়া যে দলের প্রতিনিধি এবং মুখপাত্র হিসাবে তিনি এই শাসন সংস্থায় তাঁহার গুরুত্বপূর্ণ পদ অধিকার করিয়া আছেন তাহার সামগ্রিক মনোভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া এই পক্ষপাত সরাসরি অস্বীকার করা বা ইহা হইতে সম্পূর্ণ নিরস্ত হওয়া বাস্তবপক্ষে সম্ভব নয়। আর্থিক নীতিকে দলীয় রাজনীতির প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ করিয়া লওয়া সম্ভব নহে, সহজ'ত নহেই। তবুও এই সকল সীমা ও বাধা মানিয়া লইয়াই অর্থমন্ত্রী যে তাঁহার পূর্ব্ব দৃষ্টিভঙ্গি প্রায় আমূল পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করিতে এবং তাঁহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থমন্ত্রী-কর্ত্তৃক প্রচলিত নীতিসমূহের বেড়াজাল হইতে তাঁহার মন্ত্রণালয়ের ভবিষ্যৎ কার্য্যক্রমকে মুক্ত করিয়া লইতে প্রস্তুত হইতেছেন তাহার বেশ খানিকটা আভাস তাঁহার নীতিসূচক বিবৃতির মধ্যে পাওয়া যাইতেছে বলিয়া মনে হয়। উদাহরণ স্বরূপ এই প্রসঙ্গে ভোগ সঙ্কোচ সম্বন্ধে তাঁহার উক্তির বিচার করিয়া দেখিতে পারা যায়। তিনি বলেন যে দেশের বর্ত্তমান আর্থিক পরিস্থিতিতে অতিভোগ (Conspicuous Consumption) নিয়ন্ত্রণাধীন করিয়া রাখার প্রয়োজন খানিকটা পরিমাণে চালু রাখা অনিবার্য্য হইয়া পড়িবে বটে কিন্তু ইহাতেই মূল সমস্যার সমাধান পাওয়া যাইবে না। মূল সমস্যার সমাধান পাওয়া যাইবে উৎপাদন উন্নয়নের দ্বারা সাধিত সম্পদ বৃদ্ধির দ্বারা। কেবল এই সমূহের সামঞ্জস্যবিধায়ী সমাধান সম্ভব হইতে পারে, তিনি বলেন। বস্তুতঃ মূল্যসমতা বিধান এবং সরবরাহ সমস্যার সমাধান কেবলমাত্র এই পথেই সম্ভব। দেখা যাইতেছে যে শ্রীকৃষ্ণমাচারী এ বিষয়ে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থমন্ত্রীর অনুসৃত নীতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ অনুসরণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। শ্রীমোরারজী দেশাই-অনুসৃত অর্থনীতি প্রধানতঃ ভোগ নিয়ন্ত্রণ-ভিত্তিক ছিল। মূল্যবৃদ্ধির ধারা নিরসনকল্পে কিংবা মূল্যসমতা নির্দ্ধারণে তাঁহার একমাত্র নীতি ছিল ভোগসঙ্কোচ করিবার উপাদেশ বিতরণ করা, ইহা ব্যতীত তাঁহার বা সরকারের যে অন্য কোন সরাসরি এবং কার্য্যকরী (direct and positive) ভূমিকার প্রয়োজন থাকিতে পারে তাহার কোন লক্ষণ চারি বৎসরব্যাপী কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রণালয়ের উপরে তাঁহার নেতৃত্বের ধারায় কখনও পরি-লক্ষিত হয় নাই। বস্তুতঃ মূল্যবৃদ্ধির বিষয়ে এবং মূল্যসমতা নির্দ্ধারণের প্রয়োজন সম্বন্ধে তিনি যে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। স্মরণ থাকিতে পারে যে তদানীন্তন পরিকল্পনা এবং বর্ত্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগুলজারিলাল নন্দ ১৯৬২ সনের মধ্যভাগ হইতেই ক্রমান্বয়ে মূল্যবৃদ্ধি, বিশেষ করিয়া অবশ্যভোগ্য পণ্যসমূহের মূল্যবৃদ্ধির ফলে তৃতীয় পরি-কল্পনার সার্থকতা অনিবার্য্যভাবে ব্যাহত হইবে বলিয়া তাহার আশঙ্কা প্রকাশ করিতে থাকেন, তখন শ্রীমোরারজী দেশাই কেবলমাত্র ভোগসঙ্কোচের উপদেশ বিতরণ করিয়াই তাঁহার দায়িত্ব শেষ করেন। পরে চীনা হামলা-জনিত জরুরী অবস্থার উদ্ভবের কারণে ভোগ্যপণ্য বিশেষ করিয়া খাদ্যপণ্যাদির আরও মূল্যবৃদ্ধির আশঙ্কা যখন আরও ঘনীভূত হইয়া পড়িয়াছিল, তখনও শ্রী দেশাই এ বিষয়ে তাঁহার কোন কার্য্যকরী ভূমিকা গ্রহণের লক্ষণ দেখান নাই। বরং গত বৎসরের কেন্দ্রীয় বাজেটে অতিরিক্ত কর ধার্য্য করিবার ব্যাপারে মোট আনুমানিক আদায়ী করের ৭৪% পরোক্ষ করের খাতে ধরিয়া লইয়া এই মূল্যবৃদ্ধির প্রকোপ আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছিলেন। সেই সময়েই উৎপাদনগতির অপেক্ষাকৃত মন্দীভূত গতির পরিপ্রেক্ষিতে যে এইরূপ করনীতি অনিবার্য্য ভাবে বিষময় ফল প্রসব করিবে এই অভিযোগ তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া গিয়াছেন। আশার কথা এই যে, শ্রী কৃষ্ণমাচারী এক্ষণে সম্পূর্ণ ভিন্ন নীতি প্রবর্ত্তন করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। ভোগসঙ্কোচের আংশিক প্রয়োজন তিনি অস্বীকার করেন নাই। কিন্তু তাহার সীমা উৎপাদনের পরিমাণের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইবে বলিয়া তিনি বলেন। দেশের জটিল আর্থিক সমস্যাসমূহের আসল সমাধান খুঁজিতে হইবে আর্থিক উন্নয়ন এবং উৎপাদনবৃদ্ধির সফল প্রচেষ্টার মধ্যে এবং যতদূর পর্য্যন্ত এই দ্বিবিধ প্রয়োজনের ধারা একই সঙ্গে সাধিত হইবে ততটা পর্য্যন্তই বর্ত্তমান [illegible] জটিল

সঙ্গীতের আসরে

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

ধ্রুপদ পিতার খেয়াল সন্তান

ওজস্বী কণ্ঠে বিশুদ্ধ স্বর, সুর ও তাল-লয়ে অসাধারণ অধিকার ও রাগবিদ্যায় সুগভীর পাণ্ডিত্য—এই হ'ল ধ্রুপদী গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। সঙ্গীত জগতে তিনি একজন আচার্যস্থানীয় ছিলেন এবং শুধু বাংলা দেশে নয়, পশ্চিমাঞ্চলেও ধ্রুপদীরূপে তাঁর অতি সম্মানের আসন ছিল। তিনিও ছিলেন বিগত যুগের এক আদর্শবাদী সঙ্গীতজ্ঞ, কোন ফাঁকি ছিল না তাঁর সঙ্গীত-শিক্ষায় বা সঙ্গীতচর্চায়। সঙ্গীত তাঁর জীবিকার উপায় না হলেও, এমন নিষ্ঠার সঙ্গে সুদৃঢ় ভিত্তিতে তিনি এই বিদ্যা আয়ত্ত করেছিলেন, যা অনেক পেশাদার ওস্তাদের মধ্যেও সুলভ নয়।

আসরে ধ্রুপদাচার্যরূপে সুপরিচিত হলেও বিভিন্ন রীতির সঙ্গীতে তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন, কারণ সুদীর্ঘকাল ধ'রে নানা রীতির সঙ্গীত সাধনা তিনি করেছিলেন কয়েক-জন দিক্‌পাল ওস্তাদের শিক্ষাধীনে। তাঁর জন্ম এবং সঙ্গীতশিক্ষা কাশীতে হওয়ায় শিক্ষালাভের এক অপূর্ব সুযোগ তিনি পান। তাঁর প্রায় সব সঙ্গীতগুরুই ছিলেন কাশীনিবাসী। যথা:—বিখ্যাত বীণকার মিঠাইলাল (তানসেনের কন্যা-বংশীয় সাদিক আলী যাঁর শিষ্য এবং বড় ও ছোট রামদাসের গুরু), স্বনামধন্য টপ্পাগায়ক বাখর আলী (টপ্পারীতির এক প্রচলনকর্তা শোরী মিয়াঁর শিষ্যধারায় মিয়াঁ গামুর শিষ্য), সেকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গায়ক অঘোরনাথ চক্রবর্তী (শেষ বয়সে কাশীবাসী) প্রভৃতি। মিঠাইলালের কাছে খেয়াল ও কিছু ধ্রুপদ, বাখর আলীর কাছে টপ্পা ও ধামার এবং অঘোরনাথের কাছে ধ্রুপদ ও ভজন—এই হ'ল গোপালচন্দ্রের প্রধান কণ্ঠসঙ্গীত শিক্ষা। তাছাড়া, তৎকালীন অপ্রতিদ্বন্দ্বী খেয়াল গায়ক গোয়ালিয়রের রহমৎ খাঁ একবার কাশীতে কিছুকাল অবস্থান করায় তিনি খাঁ সাহেবের কাছে কিছু লাভ করেছিলেন। সেই সঙ্গে ধ্রুপদগুণী রামদাস গোস্বামীর প্রসিদ্ধ শিষ্য হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ও উপেন্দ্রনাথ রায়ের (দুজনেই কাশীনিবাসী) কাছে ধ্রুপদ এবং লক্ষ্ণৌর যশস্বী গায়ক নথে খাঁর শিষ্য লক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্যের কাছে খেয়াল ও টপ্পাও সংগ্রহ করেন গোপাল-চন্দ্র। তাঁর কণ্ঠসঙ্গীতচর্চা বা রাগবিদ্যা শিক্ষার কথা এই পর্যন্ত।

কিন্তু সঙ্গতকার হিসাবেও তিনি পারদর্শী ছিলেন এবং একাধিক সঙ্গতযন্ত্রে তাঁর দস্তুরমত রেওয়াজ ছিল। বিশেষ, তবলায় তিনি একজন গুণী বাদক ছিলেন, যদিও তাঁর পরিণত বয়সে আসরে আর সঙ্গত না করায় শ্রোতা-সাধারণ সেকথা বিস্মৃত হয়ে যায়। তিনি তবলা, পাখোয়াজ ও ঢোল বাদন ভালভাবে শিখেছিলেন। ছ' বছর তিনি বেতিয়ায় ছিলেন লয়কারীর শিক্ষানবীশ হয়ে। সেখানে ভারতবিখ্যাত পাখোয়াজী কদৌ সিং-এর শিষ্য যোধ সিং-এর কাছে তিনি তবলায় তালিম নেন। কাশীর নামী তবলাবাদক বিনায়ক মিশ্রও তাঁর আর-এক গুরু ছিলেন।

তা ছাড়াও তাঁর সেতার বাজনার কথা আছে। তবে সেতার তিনি অমন রীতিমত রেওয়াজ করেন নি এবং আসরেও বাজান নি। ঘরে বাজাতেন মাঝে মাঝে। বোধহয় বীণকার মিঠাইলালের কাছে সেতারের কিছু পাঠ নিয়েছিলেন।

তাঁর বিচিত্র ও বহুমুখী সঙ্গীতশিক্ষার এই হ'ল পট-ভূমি। তবে আসরে তাঁর পরিচিতি ও স্বীকৃতি ছিল ধ্রুপদীরূপে। কারণ, আসরে তিনি খেয়াল বা টপ্পা গাইতেন না। গাইতেন ধ্রুপদ এবং কখনো কখনো ভজন, ধ্রুপদাঙ্গের। এমন নানামুখী শিক্ষা লাভ করায় তাঁর সঙ্গীত-ভাণ্ডার যে কি পরিমাণ সমৃদ্ধ হয়েছিল, তা ধারণা করা যায়।

প্রথম জীবনে তিনি সঙ্গতযন্ত্রে সাধনা বেশি করে-ছিলেন আর সে-সময় আসরে তাঁর পরিচয় ছিল

সঙ্গতকার ব'লে। জীবনের প্রথম অর্ধাংশ তাঁর কাটে বারাণসীতে এবং সেখান থেকে তিনি ব্যবসায় সূত্রে প্রতি বছর কয়েক বার কলকাতায় আসতেন। তখন তিনি কলকাতার সঙ্গীতাসরে তবলা বাজাতেন, তাই তবলাবাদক ব'লে অনেকেই চিনতেন তাঁকে। ধ্রুপদী ব'লে বাংলা দেশে সুপরিচিত হন তার অনেক পরে। তাই ওস্তাদ রমজান খাঁ প্রথম যখন তাঁকে গান গাইতে শোনেন, বড়ই আশ্চর্য হয়ে যান। মধুকণ্ঠে টপ্পাশিল্পী রমজান খাঁর এক যোগ্য শিষ্য হলেন—তেলিনীপাড়ার জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (কালোবাবু)। একদিন কালোবাবুর বাড়ীর আসরে গোপালচন্দ্রকে প্রথম ধ্রুপদ গাইতে শোনেন খাঁ সাহেব আর অবাক্ হয়ে ব'লে ওঠেন, 'আরে, এ ত বড় গুণী গাওয়াইয়া, আমার সঙ্গে আগে তবলা বাজিয়েছেন?' তাঁর ধ্রুপদ গান শুনে সেদিন রমজান খাঁ যেমন মুগ্ধ তেমন বিস্মিত হয়েছিলেন। শুধু খাঁ সাহেব নন, সে আসরের অনেকেই। কারণ, বাংলা দেশ তার আগে গোপালবাবুর গান তেমন কেউ শোনেনি। সকলেই তাঁকে দেখেছে তবলা বাজাতে।

উত্তর-জীবনে তিনি বহুকাল কলকাতায় বাস করেছিলেন এবং সসম্মানে বিদ্যমান ছিলেন সঙ্গীতের আসরে। তিনি যে আসরের অনুষ্ঠানে অংশ নিতেন, তার মান সঙ্গীত সমাজে স্বীকৃত হ'ত। ধ্রুপদাচার্য রূপে বাংলায় তাঁর গৌরবের আসন ছিল। বলা যায়, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর মৃত্যুর পর বাংলার সঙ্গীতক্ষেত্রে গোপালচন্দ্র অধিষ্ঠান করেন সেই মর্যাদায়।

সঙ্গীতাচার্যকে তিনি এমন শ্রদ্ধা ও সাধনার সামগ্রী মনে করতেন যে, সঙ্গীতকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করতে তিনি প্রাণে আঘাত পেতেন। দৈনন্দিন জীবিকা-রূপে সঙ্গীতকে অবলম্বন না করায় পরিণত বয়সে তাঁকে যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল। কিন্তু নিজের আদর্শ ত্যাগ করেন নি। সঙ্গীত বিষয়ে তিনি ছিলেন যেমন পরম আদর্শবাদী, সঙ্গীত পরিবেশনের রীতিতেও তেমনি নিষ্ঠাবান্। জনপ্রিয়তার অভিলাষী হয়ে কখনও তিনি রাগপদ্ধতি থেকে বিচ্যুত হতেন না এবং সঙ্গীতের উপযুক্ত আবহ যেখানে নেই, সেখানে গান করতে অসম্মত হতেন। ধ্রুপদ সঙ্গীতের মান (standard), তা পরিবেশনের যথাযথ পরিবেশ ইত্যাদির বিষয়ে তিনি ছিলেন অতি সচেতন। বেতার অনুষ্ঠানে তিনি একবারের পর আর দ্বিতীয় বার গাইতে সম্মত হন নি, কারণ ধ্রুপদ গানের আগে বা পরে এমন শ্রেণীর গান হয় যা তিনি সমর্থন করতে পারতেন না। তাই এমন শক্তিশালী প্রচার-যন্ত্রকেও অম্লান বদনে পরিত্যাগ করেছিলেন। গ্রামোফোন-রেকর্ডের প্রতিও তাঁর অনাস্থা ছিল তার ক্ষণস্থায়িত্বের জন্যে। আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করেও এমনি ভাবে তিনি আদর্শকে আঁকড়ে থাকতেন। কি সঙ্গীত-জীবনে, কি ব্যক্তি-জীবনে নিজস্ব রুচি ও ধ্যান-ধারণাকে তিনি বিশ্বস্তভাবে মেনে চলতেন। তাঁর অটল নীতিপরায়ণতার মধ্যেও ছিল এই আদর্শ-প্রীতি। এবং বাইরে থেকে তাঁকে যে কোপনস্বভাবের মনে হ'ত, তারও কারণ এই আদর্শবাদ। কোন প্রয়োজনেই তিনি আদর্শকে খাটো করতে পারতেন না এবং কোন রকমের অন্যায় বা কপটাচার বা বেচাল তাঁর সহ্য হ'ত না। বেঠিক কিছু দেখলেই তাঁর চড়া সুরে-বাঁধা মনোবীণার তার ঝঙ্কার দিয়ে উঠত। এবং তাঁর ক্রোধ প্রকাশ হয়ে পড়ত সরল পথে, ঘুঘু লোকের মতন বিষকুম্ভ পয়োমুখ হয়ে জনপ্রিয় সাজতেন না।

সঙ্গীত শিক্ষাদানের ব্যাপারে তিনি পরম উদার ছিলেন, যথার্থ শিক্ষার্থীকে দান করতেন অকৃপণ ভাবে। কিন্তু সেখানেও ছিল এক উচ্চ মানের আদর্শ। শিষ্যের কাছে তিনি আশা করতেন ঐকান্তিক নিষ্ঠা, সাধনা, শ্রম ও সঙ্গীতের প্রতি প্রীতি, শ্রদ্ধার ভাব। সেই সঙ্গে যোগ্যতার কথাও অবশ্য ছিল। কিন্তু তেমন শিষ্য এ যুগে কজন মেলে? ধ্রুপদ শিখতে তেমন আগ্রহে এগিয়ে আসে কজন শিক্ষার্থী? তাই মাঝে মাঝে আক্ষেপ ক'রে তিনি বলতেন, "আমার দুঃখ এই, কলকাতায় কেউ আমার কাছে তেমন করে নিতে এল না! কারুর খেটে শেখবার আগ্রহ নেই। না হ'লে আমার অনেক কিছু দেবার ছিল!"

আসরে গান গাইবার সময়েও তিনি তেমনি শ্রোতাদের কাছে আশা করতেন আন্তরিকতা এবং সঙ্গীতের প্রতি অনুকূল মনোভাব। সঙ্গীতপ্রেমী শ্রোতাদের আসর পেলে তিনি সানন্দে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গান শোনাতে প্রস্তুত ছিলেন, শ্রোতা যতক্ষণ পর্যন্ত ধৈর্য ধ'রে শুনতে পারে। অপাত্রে পরিবেশনে তাঁর ছিল একান্ত বিরাগ।

তাঁর এমনি ধরণের সব মনোভাব অনেকের কাছে মনে হ'ত উন্নাসিকতা বা অহমিকা। কিন্তু তাঁর মতন সঙ্গীতাচার্যের পক্ষে সাঙ্গীতিক ধ্যান-ধারণা খাটো করা সম্ভব ছিল না।

বলিষ্ঠ, দীর্ঘকায় এবং সুপুরুষ গোপালচন্দ্র আসরে অবস্থান করলে তাঁর ব্যক্তিত্ব সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। যেমন নির্ভীক তেমনি স্পষ্টবাদী। তিনি যে আসরে উপস্থিত থাকতেন সেখানে হোমরা-চোমরা আত্মম্ভরী ওস্তাদদের সমঝে চলতে হ'ত। তাঁর সাহসিকতার ভিত্তি ছিল আত্মবিশ্বাস এবং আত্মবিশ্বাসের ভিত্তি ছিল সঙ্গীতে সুদৃঢ় অধিকার। প্রয়োজন হ'লে প্রতিদ্বন্দ্বীর সামনে প্রচণ্ড বিক্রম প্রকাশ করতে পারতেন। কিন্তু সেই কাঠিন্যই তাঁর চরিত্রের সমগ্র রূপ নয়। যথার্থ সঙ্গীতসাধক কখনো একান্তভাবে কঠোর প্রকৃতির হ'তে পারেন না, তিনিও তা ছিলেন না। উপযুক্ত ক্ষেত্রে এবং সত্যিকার সঙ্গীতরসিকের সামনে তিনি বিনীত হতেও জানতেন। তার অনেক দৃষ্টান্তের মধ্যে একটি এখানে উল্লেখ করা যায়।

সেটি নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনের একটি জলসার কথা। ১৯৩৬ সাল। তখনকার হ্যারিসন রোডের আলফ্রেড থিয়েটারের মঞ্চে আসর বসেছিল। বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় শুদ্ধ কল্যাণ রাগের ধ্রুপদ গেয়েছিলেন। তাঁর গানের সময়ে আসরে উপস্থিত ছিলেন বোম্বাইয়ের স্বনামধন্য ওস্তাদ আল্লাদিয়া খাঁ (শ্রীমতী কেশরবাঈ কেরকরের গুরু)। খাঁ সাহেবের অত্যন্ত ভাল লেগেছিল গোপালচন্দ্রের গান, তাঁর কল্যাণ রাগের সুপরিকল্পিত রূপায়ণ। গান শেষ হ'তে খাঁ সাহেব তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে ওঠেন, 'এমন শুদ্ধ সুর বহুদিন শুনি নি।

গোপালবাবু তখন সবিনয়ে বলেন, 'একশবার গান্ধার দিয়ে এসেছি, গেছি, কিন্তু খাঁ সাহেব, ঠিক গান্ধার একবারও লাগাতে পারি নি।'

আল্লাদিয়া খাঁ এতক্ষণ তাঁর 'কল্যাণে' মুগ্ধ হয়েছিলেন, এবার মুগ্ধ হলেন তাঁর নম্রতায়। তাঁর কথা খাঁ সাহেব নিশ্চয়ই মেনে নেন নি। গান্ধার ঠিক ঠিক না হলে কল্যাণ এমন সার্থক হ'ল কি করে?

এত বড় সমঝদার শ্রোতা অবশ্য তাঁর হামেশা পাবার কথা নয় এবং সে আশাও তিনি করতেন না! গুণী না হ'লে গুণীর মর্ম কে বুঝবে? তাই মাঝে মাঝে বিরূপ পরিবেশে পড়ে বিরক্ত হতেন তিনি। কিংবা অকারণে অসম্মান পেলে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠতেন। প্রতিযোগীর সামনে ফুটে উঠত তাঁর শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব। তখন দরকার হ'লে তিনি এগিয়ে গিয়ে আক্রমণ ক'রে আসতেন। আক্রমণ করতেন আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায় হিসাবে। পশ্চিমী ওস্তাদদের সঙ্গে অর্থাৎ যাঁরা বাঙ্গালী সঙ্গীতজ্ঞদের সম্পর্কে একটা অহেতুক হীনমন্যতার ভাব পোষণ করতেন—তিনি অকুতোভয়ে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হতেন। অবশ্যই সে সংঘর্ষ সঙ্গীত বিষয়ে, সুর বা তালের কোন কূট সমস্যা বা কৌশল নিয়ে। সে-সব জায়গায় তিনি বীরের মতন সম্মান আদায় করে নিতেন অনিচ্ছুক হাত থেকে। তখন তিনি দুর্ধর্ষ ধ্রুপদী এবং তাঁর সেই ক্রুদ্ধ মূর্তি অনেক দর্শকের স্মৃতির পটে এখনো আঁকা আছে।

এবারে তাঁর একটি আসরের কথা উল্লেখ করা যাক। এটি পাথুরিয়াঘাটার ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের (নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক) বাড়ীর একটি জলসার কথা। ঘরোয়া হলেও আসরটি উঁচুদরের ছিল। বাংলার কয়েকজন শ্রেষ্ঠ গায়ক-বাদক শুধু নন, পশ্চিমাঞ্চলের কোন কোন গুণীও উপস্থিত ছিলেন সেখানে। বিশেষ একজন পশ্চিমা গায়ক ছিলেন, যিনি যেমন খ্যাতনামা তেমনি আত্মম্ভরী। অন্যান্য গায়কদের প্রতি তিনি আসরে এমন একটা হেলাফেলার ভাব দেখাতেন যা দৃষ্টিকটু লাগত অনেকের কাছেই। গোপালচন্দ্রও মনে মনে ক্ষুব্ধ ছিলেন এই গায়কের ওপর। কারণ অনেক আসরে তাঁদের পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে, কিন্তু পশ্চিমা ওস্তাদ কখনো তাঁর গান শুনতে চান নি এবং প্রচ্ছন্ন অবহেলার ভাব দেখিয়েছেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় সেটি লক্ষ্য করেছেন এবং শিল্পীসুলভ অভিমান পোষণ করেছেন মনের সঙ্গোপনে। বাইরে তার কোন প্রকাশ ছিল না এবং মৌখিক আলাপ, সম্ভাষণ ইত্যাদি যথারীতি হ'ত।

সেদিন যেন একটা সুযোগ পেলেন, এই ঘনিষ্ঠ পরিবেশের মধ্যে—হ্যাঁ, সামনাসামনি তাঁকে আক্রমণ করবার

অর্থাৎ উৎকট অহমিকার জন্যে তাঁকে অপদস্থ ক'রে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দেবার ইচ্ছা গোপালবাবুর মনে জেগেছিল।

পশ্চিমা গায়কটিকে আসরে দেখেই তিনি তাঁর প্রথম গানটি কি গাইবেন তা নির্বাচন করলেন। তাঁর প্রায় অফুরন্ত সঙ্গীত-ভাণ্ডার থেকে একটি নিতান্ত অপ্রচলিত এবং অন্যের পক্ষে অপ্রাপ্য রাগের গান স্থির করে নিলেন মনে মনে।

আসর বসেছে সন্ধ্যার পরে। গাইতে অনুরুদ্ধ হয়ে তিনি প্রথমে সেই গানটি ধরলেন। গানখানির স্থায়ীর আরম্ভ হ'ল—'প্রথম রাগ বোলো।' তারপর স্থায়ী কলিটি গেয়ে তার বিচিত্র অন্তরা ধরলেন—'পাঁচ সুর দো গ্রাম পনরহি মুরছনা'…ইত্যাদি।

গান শেষ ক'রে তিনি পশ্চিমাঞ্চলের সেই গায়ককে সম্বোধন ক'রে চোস্ত হিন্দুস্থানীতে বললেন, 'এটা কি, আমায় অনুগ্রহ ক'রে বলবেন?' অর্থাৎ গানের রাগটির নাম তিনি জিজ্ঞেস করলেন, যে রাগের পাঁচটি স্বর আছে (অর্থাৎ দুটি স্বর-বর্জিত), দু'টি গ্রাম আছে (অর্থাৎ তিন গ্রামের মধ্যে একটি একেবারে নেই, এমন শোনা যায় না) এবং পনেরটি মূর্ছনা!

এমন একটি অদ্ভুত রাগের নাম জানা বাস্তবিক পক্ষে বহু গায়কের পক্ষেই অসম্ভব। তবে সেই পশ্চিমা গায়ক ভারতপ্রসিদ্ধ এবং সত্যই একজন শীর্ষস্থানীয় সঙ্গীতবেত্তা। তাঁকে এমন ভাবে প্রকাশ্য আসরে বহু গুণীর সামনে আহ্বান জানাতে বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় ভীত হলেন না। তাঁর স্থির ধারণা ছিল যে, উক্ত গায়কের পক্ষেও সম্ভব হবে না এর উত্তর দেওয়া। এটি গোপালচন্দ্রের গুপ্ত-বিদ্যার সামিল। কারণ, যে সূত্রে এই গান তিনি লাভ করেছিলেন, সেই বিশেষভাবে রক্ষিত ধারার নাগাল পাওয়া ওই পশ্চিমা গায়কের পক্ষে কোনক্রমেই ঘটতে পারে না।

ওদিকে আসরের বিশিষ্ট শ্রোতৃবর্গ তাঁর এই অভিনব চ্যালেঞ্জ শুনে চমৎকৃত হলেন এবং নাটকের দুই প্রধান পাত্রের প্রতি অখণ্ড কৌতূহলে লক্ষ্য করতে লাগলেন। বিশেষ, অবাঙালী গায়কের ওপর সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ হ'ল —কি নাম তিনি দেন এই অপ্রচলিত রাগটির! এ রাগের পরিচয় ত তাঁরা আগে কেউ পাননি।

প্রশ্ন যাঁকে করা হয়েছে, তিনি ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে থেকে মুখে আপ্যায়নের হাসির প্রলেপ দিয়ে এবং উত্তরটি এড়িয়ে যাবার অছিলায় বললেন, 'ইয়ে তো বহুৎ কুট প্রশ্ন হ্যায়, লেকিন্ আপকো এ্যায়সা জবান্ কেইসে হুয়া?' (প্রশ্নটা তো বড়ই কুট দেখছি। কিন্তু আপনার এমন (চমৎকার) উচ্চারণ কি ক'রে হ'ল (বাঙালী হয়ে?))।

বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় তাঁর শেষের কথাটির উত্তর দিলেন, 'বাচ্পন্‌মে উস্তাদ লোগোঁসে কুছ্ ইলেম্ কিয়া।' (ছেলেবেলায় ওস্তাদ লোকদের কাছে কিছু শিখেছিলুম)।

কিন্তু নিজের আসল জিজ্ঞাস্যের উত্তর সেই পশ্চিমা সঙ্গীতজ্ঞের কাছে পেলেন না, আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেও। শ্রোতারাও দেখলেন, গোপালচন্দ্রের প্রশ্নের জবাব দিতে এত বড় ধুরন্ধর গায়ক অপারগ হলেন।

বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় তখন জনান্তিকে 'আচ্ছা, বোঝা গেছে' ব'লে তাঁর পরের গান আরম্ভ করলেন।

ওস্তাদজীর অনেকদিন ধরে দেখানো উপেক্ষা আর আত্মম্ভরিতার জবাব সেদিন বেশ ভালভাবেই দিয়েছিলেন এবং শ্রোতাদের রীতিমত উপভোগ্য হয়েছিল ব্যাপারটি।…

আর একদিনের কথা। তবে এটি কোন আসরের ঘটনা নয় এবং এখানে কোন সঙ্গীতানুষ্ঠানও হয়নি। এখানে তিনি সেদিন সঙ্গীত বিষয়ে, সঙ্গীতের তত্ত্ববিষয়ে একটি উক্তি করেছিলেন যা উল্লেখযোগ্য। এবং ক্রুদ্ধ হয়ে বললেও সঙ্গীততত্ত্বের একটি পরম সত্য উচ্চারিত হয়েছিল তাঁর মুখে।

তখন একটি সঙ্গীত সম্মেলনের বার্ষিক অনুষ্ঠানের জন্যে তার কার্যকরী সমিতির বৈঠক বসেছিল। তিনিও সেখানে ছিলেন সমিতির এক সদস্যরূপে। সমিতির কার্য ও আলোচনা তখন শেষ হয়েছে। সভ্যরা এ-কথা সে-কথা বলাবলি করছেন নিজেদের মধ্যে। এমন সময় একজন বন্দ্যোপাধ্যায় মশায়কে একটি প্রশ্ন করে বসলেন এবং প্রশ্নটি বিশেষ বুদ্ধিমানের মতন হ'ল না।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, খেয়াল বড়, না, ধ্রুপদ বড়? আপনার কি মনে হয়?'

অন্তত: বন্দ্যোপাধ্যায় মশায়ের তুল্য ধ্রুপদাচার্যকে একথা জিজ্ঞেস করা উচিত হয় নি। কারণ প্রশ্নটি স্থূল। খেয়াল, টপ্পা ইত্যাদি সব অঙ্গের সঙ্গীতেই অভিজ্ঞ গোপালচন্দ্রের সঙ্গীত-জীবন পরিণতি লাভ করেছিল ধ্রুপদের চর্চায় ও সাধনায়। প্রধানত: তিনি ছিলেন ধ্রুপদী। ধ্রুপদ সঙ্গীতের ঐশ্বর্যে তিনি ঐশ্বর্যবান্ ছিলেন। প্রশ্ন শুনে তাঁর মেজাজটি চোট্‌ খেল।

তিনি চটে উঠে নিজের বুকে একটি চাপড় মেরে চড়া গলায় বললেন, 'ধ্রুপদ হ'ল বাপ।' তারপর নাটকীয় ভাবে ডান হাতখানি আন্দোলিত করে যোগ করলেন— 'আর খেয়াল সব তার ব্যাটা!'

প্রশ্নকারী প্রাকৃতভাষায় প্রাঞ্জল উত্তর পেয়ে অধোবদন হলেন। যথা কথা। খেয়ালের তুলনায় ধ্রুপদ বনিয়াদী। ধ্রুপদই ভিত্তি। ধ্রুপদ থেকেই খেয়ালের উৎপত্তি। ধ্রুপদের ধীর গম্ভীর স্থাপত্য-কারুর ওপরে অপেক্ষাকৃত গতিশীল, দ্রুত লয়ের তান কর্তবে বিশিষ্ট খেয়াল কালের গতিকে জন্মলাভ করেছে। খেয়ালের জনক ধ্রুপদ। ধ্রুপদের এই গৌরবের আসন অনস্বীকার্য। সক্রোধে এবং সরল ভাষায় বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় সেই কথাই জানিয়ে দিলেন।

নগেন্দ্রনাথের নাকাল

পটলডাঙ্গার নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় একজন জনপ্রিয় পাখোয়াজী ছিলেন। বনেদী ঘরের গৌরবর্ণ, সুপুরুষ বনেদী চেহারা। সুশ্রী মুখচোখ, হাসিখুশিতে উজ্জ্বল। নগেন্দ্রনাথ যে আসরে উপস্থিত হতেন, তা' তাঁর সুরসিক ও মধুর স্বভাবের জন্যে জীবন্ত, দীপ্ত হয়ে থাকত। এবং তিনি হয়ে উঠতেন সেখানকার প্রধান অকর্ষণের বস্তু। যেমন সদানন্দ, তেমনি রসোচ্ছল, হাস্যপ্রিয় মজলিসী মানুষ ছিলেন। যেমন রসালাপে সকলকে আমোদ দিতে পারতেন, তেমনি মজা ক'রে জমিয়ে সঙ্গত করতেন আর মাতিয়ে দিতেন আসর। হাতটি বড় মিষ্টি ছিল আর ধা মারতেন অতি চৎকার। খুব কম পাখোয়াজীই এমন সরস সঙ্গতে সঙ্গীতকে প্রাণবন্ত করে তুলতে পারতেন। গানকে কি ক'রে জমাটি করতে আর আসর মাৎ করতে হয়, সেই কলানিপুণতা তাঁর সহজাত ছিল।

নগেন্দ্রনাথ সঙ্গতযন্ত্র বাজাতেন নিতান্ত বালক বয়স থেকে। তবে আগে বাজাতেন ঢোল, পাখোয়াজ নয়। প্রায় শুনে শুনেই বাজাতে শেখেন, বলা যায়। তখন তাঁর ওস্তাদ কেউ ছিলেন না (বড় হয়েও যে ওস্তাদের কাছে খুব শিখেছিলেন, তাও নয়)। সেই কম বয়সেই বাড়ীর কাছাকাছি এখানে সেখানে বাজাতেন আর তখন থেকেই ঢোল বাজনায় তাঁর নামও হয়েছিল বেশ। এতটুকু একটি ছেলে এমন চমৎকার বাজাচ্ছে দেখে শ্রোতারা অবাক্ হয়ে যেত। এমন সুন্দর মিলিয়ে সঙ্গত, এমন ছন্দের কাজ এই ছেলেবয়সে বাস্তবিক দেখা যায় না। তাই যারা শুনত, তারাই বাহবা দিত।

একদিন ত এক আসরে খুবই হৈ চৈ পড়ে যায়। নগেন্দ্রনাথের তখন আট-নয় বছর বয়স। হাফ আখড়াই-এর এক বড় আসর বসেছিল। সেই জমজমাট হাফ আখড়াই গানের সঙ্গে সঙ্গত করল অতটুকু ছেলে। আর তাও কি অদ্ভুত বাজনা! বালকের ঢোলের তালে তালে গান আরও জমে উঠল। সঙ্গীতে এমন একটা উন্মাদনার সৃষ্টি হ'ল যে, শ্রোতাদের মধ্যে ধন্য ধন্য রব পড়ে গেল। ক্ষুদে বাজিয়েটির গলায় অনেকে ফুলের মালা পরিয়ে দিতে লাগল এসে। তাকে দেখতে দেখতে এত মালা পরানো হ'ল যে, মাথাটি ছাড়া তার শরীরের আর কিছু দেখা গেল না। মালায় ঢেকে গিয়ে ব'সে বাজাতে লাগল সেই বালক-প্রতিভা।

বড় হয়ে নগেন্দ্রনাথ ঢোল ছেড়ে পাখোয়াজ ধরলেন। পাখোয়াজেও তেমনি মিষ্টি হাত, তেমনি সঙ্গতের মাধুর্য দেখা যেতে লাগল ক্রমে ক্রমে। পাখোয়াজ-বাজিয়ে বলে ধ্রুপদের আসরে তাঁর নাম হতে খুব বেশি সময় লাগল না। তাঁর সেই মিষ্টি হাতের বোলে আর অপূর্ব ধা মেরে কতদিন কত আসর যে মাৎ করেছেন তিনি। ছন্দ-জ্ঞান তাঁর বড় সুন্দর ছিল। গানের ছন্দকে নিজের সহজ সঙ্গত-বুদ্ধির প্রেরণায় মনোমুগ্ধকর ক'রে ফুটিয়ে তুলতেন আর সঙ্গীতে সত্যিকার রসসঞ্চার হ'ত। সঙ্গতকার হিসেবে তিনি ছিলেন স্বভাবশিল্পী।

কারণ তাঁর নৈপুণ্যের প্রায় সবটাই ছিল অশিক্ষিত-পটুত্ব। দিলখোলা ঢিলেঢালা মানুষ তিনি। কঠিন সাধনায় অজস্র বোল্ তেহাই আয়ত্ত করা, লয়কারীর

অতি জটিল, আর কুটিল কৌশল আর নানা প্যাঁচের অন্ধি-সন্ধির সন্ধান রাখা তাঁর ধাতে ছিল না। তালের অতিরিক্ত কচ্‌কচির সঙ্গে তিনি খাপ খাওয়াতে পারতেন না নিজেকে। তাঁর নিজের স্বভাব যেমন সরল, প্রাণঢালা আর ঈষৎ রঙ্গীন, সঙ্গীতকেও তিনি সেই চোখে দেখতে ভালবাসতেন এবং সেইভাবে অনুষ্ঠিত হলেই নিজের শ্রেষ্ঠ জিনিষ দিতে পারতেন। পরম উপভোগ্য করে তুলতেন আসর।

নগেন্দ্রনাথের সঙ্গতের বিষয়ে এক কথায় বলতে গেলে—গানটা যদি অতিরিক্ত রকমের কুট লয়কারীর ব্যাপার না হয়ে একটু সাদামাটা হ'ত, বেশি টিমে-লয়ের কিংবা প্যাঁচের না হ'ত, তা হ'লে তিনি পাখোয়াজের সঙ্গতে ফুল ফোটাতে পারতেন। আসরে সুরধুনী বইয়ে দিতেন ছন্দের নির্ঝরে। অশিক্ষিতপটু হলেও তিনি ছিলেন যথার্থ সঙ্গত-শিল্পী।

বছরের পর বছর পদ্ধতিগত ভাবে নিয়মনিষ্ঠ শিক্ষা করার স্বভাব তাঁর ছিল না। তেমনভাবে কোন ওস্তাদের অধীনে দীর্ঘকাল ধরে তালিমও নেন নি তিনি। প্রথম যৌবনে দেশের এক শ্রেষ্ঠ পাখোয়াজ-গুণী কেশবচন্দ্র মিত্রের (বিচারপতি স্যর রমেশচন্দ্র মিত্রের অগ্রজ) কাছে প্রায় বছরখানেক মাত্র যা' শিখেছিলেন, কিন্তু ওই পর্যন্ত। অত খেটেখুটে অজস্র বোল রপ্ত করা তাঁর আর বেশিদিন পোষাল না। নিজের সহজ শিল্প-বুদ্ধি ও ছন্দ-জ্ঞান দিয়ে গানকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে দিতেন। তাঁর চেয়ে কম বয়সী গাইয়েদের বলতেন (আর লক্ষ্মীনারায়ণ বাবাজী বা রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর মতন কয়েকজন মাত্র ছাড়া আর সব বাঙ্গালী ধ্রুপদীরাই ছিলেন তাঁর বয়োকনিষ্ঠ এবং সুতরাং আন্তরিক স্নেহের অধিকারে প্রথম পুরুষে সম্বোধনের পাত্র)—'ও রে, বেশি প্যাচ কষিস নি বাবা, সুরের কাজ কর্। দেখ্ না, তোর গানে ফুল ফুটিয়ে দিচ্ছি।' এ তাঁর অহঙ্কারের কথা নয়—সরল শিল্পী-মনের প্রকাশ। সত্যিই তাঁর মিষ্টি হাতে ছন্দের ফুল ফুটত। পাখোয়াজ যেন মুখ ফুটে কথা কইত।

কিন্তু মসৃণ পথে সুরসৃষ্টি সব সময়ে আসরে হ'ত না। সঙ্গীত পরিবেশন করবে ত মানুষ, মানুষের মন, যার মতিগতি জটিল কুটিল হয়ে পড়ে অনেক সময় অনেক কারণে। কোন গায়ক মেজাজ বিগড়ে ফেলে, কেউ ইচ্ছে করেই কালোয়াতী ফলাবার জন্যে, কেউ বা ক্রুদ্ধ হয়ে তাললয়ের অতি কুট গ্রন্থিতে সঙ্গতকারের হাত বেঁধে ফেলবার চেষ্টা করেন। ধ্রুপদ সঙ্গীতে তালের ব্যাকরণ এত জটিল, তার লয়কারীতে এমন ঘনঘটা সৃজন করা যায় যে, তালাধ্যায়ে অতিশয় বিচক্ষণ না হ'লে বিভ্রম তাঁর ঘটবেই। বিশেষ নগেন্দ্রনাথের মতন পাখোয়াজীর, যিনি তালের আঙ্কিক প্রক্রিয়াকে অতি ভীতির চক্ষে দেখতেন। তাই সুরের আসরে তাঁকে কয়েক বার পড়তে হয়েছিল তালের চক্রান্তে। তার ক'টি ঘটনা এখানে বলা হবে।

প্রথমে লক্ষ্মীনারায়ণ বাবাজীর আসরের কথা। সেখানে লক্ষ্মীনারায়ণ ছিলেন বাংলার এক প্রবীণ গুণী, নগেন্দ্রনাথের চেয়ে প্রায় ত্রিশ বছরের বয়োজ্যেষ্ঠ। লক্ষ্মীনারায়ণের বহুমুখী সঙ্গীতপ্রতিভা ছিল। তিনি একাধারে ধ্রুপদ, খেয়াল ও ঠুংরি গায়ক এবং পাখোয়াজ ও তবলাবাদক। তা ছাড়া সেতার, বীণা ও এস্রাজ যন্ত্রেও তাঁর হাত ছিল। তবে আসরে তিনি সুপরিচিত ছিলেন গায়করূপে, বিশেষ ধ্রুপদী ব'লে। পাখোয়াজী এবং তবলাবাদক হওয়ায় তিনি অসাধারণ লয়দার ছিলেন। তিনি প্রায় সন্ন্যাসীর মতন জীবনযাপন করতেন, সঙ্গীতকে একান্ত সাধনার বস্তু করে। পোশাকও ছিল কাপড়ের ওপর একটি আলখাল্লা আর কাঁধে ঝোলা। তাই 'বাবাজী' উপাধিতেই তিনি আসরে সুপরিচিত ছিলেন।

সেদিন লক্ষ্মীনারায়ণের এক আসর বসেছে। নগেন্দ্রনাথ পাখোয়াজ বাজাতে এসেছেন তাঁর সঙ্গে। বাবাজী তানপুরা বেঁধেছেন, মুখুজ্যে মশায়ও পাখোয়াজ মিলিয়ে নিয়েছেন। গান আরম্ভ হ'তে আর দেরি নেই। এমন সময় নগেন্দ্রনাথ লক্ষ্মীনারায়ণের উদ্দেশে বললেন—যেমন মজা করে তাঁর কথা বলার ধরণ ছিল, 'বাবাজী—, ঝুলি থেকে ধামার-টামার বার করুন।'

কথার ভঙ্গিতে শ্রোতাদের মধ্যে অনেকে হেসে ফেললেন। কিন্তু লক্ষ্মীনারায়ণ গম্ভীর হয়ে গেলেন এবং চটলেন মনে মনে। নগেন্দ্রনাথ কিন্তু কিছু ভেবে ওকথা

বলেন নি। ফস্‌ ক'রে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। মুখের তেমন আকুঢাক ছিল না, যখন-তখন ফুটে বেরুত তাঁর নিজস্ব ধাঁচের রসিকতা।

লক্ষ্মীনারায়ণ তাঁর দিকে ফিরে বললেন, 'আগে চৌতাল বাজাও একটু।'

ব'লে তানপুরার গুঞ্জনের সঙ্গে গান আরম্ভ করলেন, এবং ধরলেন একটি অত্যন্ত কড়া চালের চৌতাল, আড়ানা রাগে। গানের প্রথম কথা হ'ল: 'কুণ্ডল ডালন।'

গানখানি তিনি এমন ঠাস লয়ে গাইতে লাগলেন যে, নগেন্দ্রনাথ একেবারেই সুবিধে করে উঠতে পারলেন না। এমন চালে লক্ষ্মীনারায়ণ গেয়ে চললেন যে, সম্‌ বোঝা অসম্ভব হ'ল পাখোয়াজীর পক্ষে। একটি ধা তিনি মারতে পারলেন না খানিকক্ষণের মধ্যেও।

এই আসরের কথা নগেন্দ্রনাথ পরবর্তী কালে নিজেই হাসতে হাসতে গল্প করতেন। সেদিন লক্ষ্মীনারায়ণের লয়কারী আর নিজের দিগদারীর কথা এইভাবে বলতেন, 'উঃ, সে কি বিপদেই পড়েছিলুম রে। বাবাজী এক-এক বার 'কুণ্ডল ডালন' ব'লে আস্থায়ীটি গেয়ে চলেছেন, আর আমার মাথার ভেতরে সব কুণ্ডলী পাকিয়ে যাচ্ছে। কোথায় সম্‌ কোথায় ফাঁক কিছুই ধরতে পারছি না। বাজাব কি? সাধারণ লোককে দেখাবার জন্যে কোন রকম করে শুধু হাত নেড়ে যাচ্ছি। সম্‌ ফাঁক সব কুণ্ডলী পাকিয়ে গেছে। শেষে বাবাজী নিজে থেকেই দেখিয়ে দিলেন, তখন বাজিয়ে বাঁচি।'···

আর একদিন নগেন্দ্রনাথ নাকাল হয়েছিলেন রাধিকা-প্রসাদের হাতে। সেটি ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটের একটি জলসা। সেখানে বাজাবার কয়েক দিন আগে তিনি গোঁসাইজীর সম্পর্কে একটা বেফাঁস কথা বলে ফেলেছিলেন, আর কথাটি একজন আবার গিয়ে লাগিয়েছিল গোঁসাইজীর কানে। নগেন্দ্রনাথের কিন্তু সেকথা আর মনে ছিল না। কখন কি কথা রসিকতা করে বলে ফেলেন, সে সব অতশত তাঁর মনে থাকত না। তাই যথারীতি খোলা মন নিয়ে সেদিন গোঁসাইজীর গানের সঙ্গে সঙ্গত করতে এসেছিলেন ইন্‌স্টিটিউটে। কিন্তু রাধিকাপ্রসাদের কথাটি মনে ছিল, কারণ তাঁর অভিমানী মন ক্ষুণ্ণ হয়েছিল কথাটি শুনে। তাই তিনি মনের ক্ষোভ সাঙ্গীতিক পদ্ধতিতে মেটাতে চাইলেন। শান্তিপ্রিয় ধাতের মানুষ হলেও অপমানিত বোধ করলে ভুলতে পারতেন না তিনি।

নগেন্দ্রনাথের দুর্বলতার স্থান তিনি জানতেন। সুতরাং সেই পথ নিলেন। গান এমন চালে ক'রে ধরলেন যে, পাখোয়াজী পড়লেন বেকায়দায়। একটু হাত খুলে বাজাবার কোন রাস্তা পেলেন না। কি যেন এক দুর্বোধ্য আঙ্কিক হিসেবে তাঁর সব গোলমাল হয়ে যেতে লাগল। এমন করে বাজনা হবে কি করে? বুঝলেন, গোঁসাইজী বড়ই চটেছেন, তাঁর দিকে একবারও মুখ ফেরাচ্ছেন না। তাঁকে অপ্রস্তুত করাই ইচ্ছে।

আসরে নগেন্দ্রনাথের কাছেই আরও কয়েকজন ধ্রুপদী বসেছিলেন—রাধিকাপ্রসাদেরই শিষ্যধারা, ভুতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ললিতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

নগেন্দ্রনাথ পাখোয়াজ বাজাতে বাজাতেই চট্‌ করে তাঁদের এক এক জনকে জিজ্ঞেস করে নিলেন, 'ওরে বুঝছিস্‌ কিছু? বলে দে না রে।'

কিন্তু তাঁরাও ধরতে পারেন নি। ধরবার কোন পথ রাখেন নি গোঁসাইজী। সুতরাং নগেন্দ্রনাথ যাঁদের জিজ্ঞেস করলেন, তাঁরা কেউই তাঁকে সাহায্য করতে পারলেন না।

অগত্যা তিনি নিরুপায় হয়ে স্বয়ং গোঁসাইজীকেই সম্বোধন করলেন (বাজাতে বাজাতেই), 'প্রভু, মুখ একবার এদিকে ফেরান।'

গোঁসাইজী নিরুত্তর এবং মুখও যথাপূর্বম্‌ অন্যদিকেই ঘুরিয়ে রইলেন।

নগেন্দ্রনাথ আবার অনুনয় জানালেন, 'প্রভু, শুনছেন?'

এবার রাগতভাবে জবাব এল, 'কি?'

নগেন্দ্রনাথ তেমনি সুরে বললেন, 'একটু দেখিয়ে দিন প্রভু। এ বয়েসে আর সভার মধ্যে বেইজ্জৎ করবেন না। দোহাই আপনার।'

গানের এক ফাঁকে গোঁসাইজী এবার জানালেন, 'আমি কি জানি যে বলব? আমি ত বিষ্টুপুরী লুচিভাজা বামুন।'

এতক্ষণে নগেন্দ্রনাথ বুঝতে পারলেন গোঁসাইজীর রাগের কারণটা। তাঁকে কি তিনি এই কথা বলেছিলেন কোনদিন ? হতেও পারে হয়ত, এখন মনে পড়ছে না।

'আর কখনো এমন কথা হবে না, প্রভু। এ যাত্রা বাঁচান।'

শেষ পর্যন্ত গোঁসাইজীর রাগ ঠাণ্ডা হ'ল এবং তিনি কুজ্ঝটিকা জাল মুক্ত ক'রে নগেন্দ্রনাথকে স্বচ্ছন্দে বাজাতে দিলেন ··।

আর একটি আসর হয়েছিল গড়পারে। ওখানকার নিবারণচন্দ্র দত্তের পুত্র সুশীলচন্দ্র দত্ত (ইনি সৌখীন পাখোয়াজী) এই আসরের একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। সুকণ্ঠ ধ্রুপদী ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানের সঙ্গে নগেন্দ্রনাথের সঙ্গত হয় আসরে। এই জলসার কোন কোন উদ্যোক্তা নাকি নগেন্দ্রনাথের ওপরে তখন বিরূপ হয়েছিলেন এবং তাঁকে একটু অপদস্থ করতে চান। ভূতনাথবাবুকে নাকি তাঁরা রাজী করিয়েছিলেন অনুরোধ-উপরোধ করে। সে আসরে ধ্রুপদী গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পাখোয়াজী দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং আরও কয়েকজন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ উপস্থিত ছিলেন।

ভূতনাথবাবু গান ধরলেন আড়া চৌতালে, অত্যন্ত ঢিমা লয়ে। আড়া চৌতাল একটু লয় বাড়িয়ে না ধরলে পাখোয়াজীর পক্ষে হাত খুলে বাজানো বড়ই কঠিন হয়। এত ঢিমা লয়ে আড়া চৌতাল আরম্ভ হতে দেখে নগেন্দ্রনাথ প্রমাদ গণলেন। এই লয়ে হাতের সুখ ক'রে বাজানো দূরের কথা, ঠেকা দিয়ে যাওয়াও দুর্ঘট হবে তাঁর পক্ষে। চট্ করে ব্যাপারটি হৃদয়ঙ্গম করে নিয়ে এই নিছক কালোয়াতী প্রচেষ্টাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে চাইলেন, ঠাট্টা তামাসা দিয়ে।

পাখোয়াজ থেকে দু'হাত নাটকীয় ভাবে ওপর দিকে তুলে গানরত ভূতনাথবাবুকে (নগেন্দ্রনাথের চেয়ে প্রায় ২৫ বছরের ছোট) ব'লে উঠলেন, 'ওরে ভূতো, তুই ডাকাত। আমায় এমন ক'রে সভার মধ্যে মারিস নি।'

তাঁর কথা শুনে ভূতনাথবাবু হেসে ফেললেন, শ্রোতারাও হেসে উঠলেন। আসরের গুরুগম্ভীর, অ-সরস আবহ নগেন্দ্রনাথের এই কথায় তরল হয়ে গেল।

তখন ভূতনাথবাবু হাসিমুখে লয় একটু বাড়িয়ে নিয়ে গানখানি নতুন ক'রে ধরলেন আর নগেন্দ্রনাথ প্রেমের সঙ্গে বাজাতে লাগলেন। আসর সঞ্জীবিত হয়ে উঠল এবার।

—০—



রায়বাড়ী

শ্রীগিরিবালা দেবী

প্রভাতে লক্ষ্মীপূজার উদ্বোধন করিলেন ঠাকুমা। আজ তিনি আশ্রয়চ্যুত হইয়াছেন। লক্ষ্মীপূজা করিবার বিধি শয়ন-গৃহে। হাতীমুখো বারান্দার সামনের হলঘরে রায়বাড়ীর লক্ষ্মীপূজা হয় বরাবর। সেখানেই রায়রঙ্গিণীদের দুইটা লোহার সিন্দুকে স্বর্ণসম্ভার ও রৌপ্যের স্তূপ। ভোরে নবীন চাকর গোবর-জলে ঘর বারান্দা সিঁড়ি হাতীর মাথা ধুইয়া-মুছিয়া ঝকঝকে করিয়া রাখিয়াছে। এবেলা ওই স্থান দিয়া কেহ যাতায়াত করিবে না। মনোরমার ঘরের ভিতর দিয়া লোক চলাচল করিবে। কারণ সিঁড়ি হইতে বারান্দা-ঘর আল্পনায় বিচিত্র করা হইবে। ঠাকুমা আজ আসন লইয়াছেন বিনুর ঘরের সোপানে। তাঁহার ভাঙ্গা পা! পা না ঝুলাইয়া বসিতে পারেন না। যা বলিতেছিলাম, ঠাকুমা লক্ষ্মীপূজার উদ্বোধন করিলেন। গ্রন্থারম্ভের ভূমিকা সুরু হইল—"ভাদ্রখন্দ আশ্বিনখন্দ পৌষখন্দ চৈত্রখন্দ নাড়ো চাড়ো, ঘরের লক্ষ্মী বার না করো।"

লক্ষ্মীস্বামী নারায়ণের নিকটে নিবেদন করিতেছেন—

"সাদাবর্ণের পারাবত থাকে যে আলয়ে
গৃহিণী সতর্ক থাকে সকল বিষয়ে—
নির্ব্বিবাদে বাস করে পরিজনগণ,
সেইখানে থাকি আমি শোন নারায়ণ।"

গৌরচন্দ্রিকার পরে আরম্ভ হইল, "ও হারাণি, মালীবৌ কলার খোলের ঢোল এনেছে, পুকুর থেকে চুবিয়ে এনে রোদে দে। শুকিয়ে গেলেই না প্রত্যেক ঢোলের গায়ে তিনটে করে লম্বা টানের সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে লক্ষ্মীর আসনে বসিয়ে পঞ্চশষ্যি ভরে দিতে হবে। পূর্ণিমে লাগবে বেলা আড়াইটায়, তখন লক্ষ্মী বসবেন ডাইনে-বাঁয়ে ঘি ও তেলের প্রদীপ জেলে। উলু দিতে হবে, শাঁখ বাজাতে হবে। কিন্তু লক্ষ্মীপূজোয় ঘণ্টা বাজানো বারণ। উনি ঘণ্টার বাদ্যি সইতে পারেন না। পূজোর ঠাঁই আলপনায় জোড়া পেঁচা দিয়ে রাখতে হয়। লক্ষ্মীদেবীর বাহন পেঁচাপক্ষী, তাদেরও পূজো দিয়ে ভোগ দিতে হবে! লক্ষ্মীর ছেলে কুবীর, তারও পূজো ভোগ আছে। জলপানি সাজাতে হবে সাত ভাগে। লক্ষ্মী, নারায়ণ, সরস্বতী, অলক্ষ্মী, সত্যনারায়ণ, কুবীর, পেঁচা। এ বাড়ীর নিয়ম লক্ষ্মী-পূর্ণিমায় সত্যনারায়ণের সিন্নী দেওয়া। দুধকলা আটা গুড় নারকেলকোরা কর্পূর ঘি কিসমিস দিয়ে প্রসাদ মাখতে হয়। প্রত্যেকটি জিনিষ বিজোড় সোয়া করে দেবার প্রথা। কোজাগরীর দিন রাতে রায়বাড়ীতে ভাত-মাছ খাওয়া হয় না। পায়েসের ভেতরে চাল থাকে ব'লে পরমান্নের বদলে ক্ষীর-দই করা হয়। মা লক্ষ্মীর ভোগ দিতে হবে লুচি মোহনভোগ, ছোলার ডাল আর পাঁচ পদ তরকারি। ভাজা, আছে অম্বল আছে তার সাথে। দেবতার ভোগে তিন তরকারির কমে দেওয়া যায় না।"

একটানা ঝাড়া মুখস্ত বুলি ঝাড়িয়া ঠাকুমা ক্ষণিক বিরতি দিলেন। এখন যেন কেমন ভুল হইয়া যায়, বলিতে বলিতে থামিতে ইচ্ছা করে। সত্তরের উপরে বয়েস হইয়া গিয়াছে, আর কেন?

এখন "পার করে দাও পারের নেয়ে, শূন্য ঘাটে বসে আছি তোমার আসার পথ চেয়ে।"

সরস্বতী অখণ্ড মনোযোগ সহকারে আলপনা দিতে-ছিল। তাহার ভিতরে শিল্পীসুলভ নৈপুণ্য ছিল অসীম। ধানের শিষ, লক্ষ্মীদেবীর যুগল পদচিহ্নের পাশে কত লতাপাতার অপূর্ব্ব সমাবেশ তাহার আঙ্গুলের ডগায় ফুটিয়া উঠিতেছিল! পদ্মলতা শঙ্খলতা তরুলতা কুঞ্জলতা আঙ্গুরলতা জিলেপিলতা লবঙ্গলতা ঝুমকালতা লতায়-পাতায় ফুলের চিত্র-বিচিত্রতায় ঠাকুমার হাতীমুখো বারান্দার দুই দিক ভরিয়া গেল। এই আলপনা সযত্নে কয়েকদিন রাখা হইবে। কত লোক নিরীক্ষণ

করিয়া পঞ্চমুখে সরস্বতীর শিল্পকলার সুখ্যাতি করিবে, সেই জন্যেই তাহার এ পরিশ্রম প্রয়াস, নহিলে কিসের দায়?

আজ নিয়মের ঘরে বিপুল সমারোহ। মনোরমা লক্ষ্মীর ভোগ চড়াইয়াছেন। ভানুমতী ও মধুমতী পূজার আয়োজন করিতেছে। বিনু এসব কাজে দক্ষ নহে, সে বসিয়া গিয়াছে এক মণ দুধ ক্ষীর করিতে। প্রকাণ্ড ঘর হইলেও দুই দিকে কাঠের উনুন জ্বলিতেছে দাউ দাউ করিয়া। দ্বিপ্রহরের আকাশ অনল বর্ষণ করিতেছে। গৃহও অগ্নিকুণ্ড। ঘামে বিনু স্নান করিয়া উঠিয়াছে।

ক্ষণকালের নিমিত্ত তাহাকে মুক্তি দিল মধুমতীর পানের নেশা। সরস্বতী এখানে উপস্থিত নাই। তাহার ভুল-অন্বেষণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আলপনায় আবদ্ধ।

মধুমতী হাতের কাজ রাখিয়া বিনুর কানের কাছে মুখ লইয়া চুপে চুপে কহিল, "বৌ, আমি তোমার দুধ নাড়ছি! তুমি নিজের হাতে আমার জন্যে দুটো পান সেজে আনগে। বাটার সাজা পান এন না যেন, ও আমার ভাল লাগে না। তোমার হাতের সাজা পানের ভারী মিঠে স্বাদ হয়। পানের সাথে আমার ভাজা মসলার কৌটোটাও এন। মার ঘরে তাকের ঝাঁপির ভেতরে আছে। পান আঁচলের তলায় ঢেকে এন। সেজদি যেন টের না পায়।"

বিনু বাহিরে আসিয়া মুক্ত বাতাসে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। ছোট ঠাকুমা তাঁহার নিত্য ভোগের ঘরে নারায়ণের ভোগ রাঁধিতেছেন। ঠাকুমা পৈঠায় বসিয়া অন্তরঙ্গ ভাবে জায়ের সহিত কিসের যেন আলোচনা করিতেছেন। দাসদাসীদের ব্যস্ত আনাগোনার কলকলিতে সারা বাড়ী মুখরিত।

বিনু বারেক সরস্বতীর আলপনায় দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গেল মনোরমার ঘরে।

পান সাজিতে সাজিতে সে ভাবিতে লাগিল, এত লতাও আঁকতে জানে, কিন্তু কই কলমিলতা ত তার নজরে পড়িল না? সেও আলপনা দিতে শিখিয়াছে। তার ঠাকুমা আলপনায় ওস্তাদ। কেউ তাকে আলপনা দিতে বলিল না, ডাকিল না। বলিলে সে এমন কলমিলতা আলপনা দিয়া দিতে পারিত যাহা দেখিয়া কাহারও নিন্দা করিবার সাধ্য থাকিত না। সে যে কিছু জানে না, জানিতে পারে না—এইটা ধরিয়া লইয়া ইহাদের আনন্দ সমালোচনা। জানিবার খবর কে লইতেছে? এ পৃথিবীর কতটুকু কে জানে?'

"কত শত মণি যার কিরণ উজ্জ্বল। সিন্ধুমাঝে রহে যাহা, সলিল অতল॥ কত শত ফোটে ফুল অরণ্য ভিতর। বৃথা নষ্ট হয় যার গন্ধ মনোহর॥"

বেলাশেষে সূর্য্যদেব দূরদিগন্তে লোহিত ছটায় বিলীন হইতে না হইতেই বাঁশবনের মাথায় কোজাগরী পূর্ণিমার চাঁদরৌপ্যজ্যোতিতে মণ্ডিত হইয়া উদয় হইল। আজিকার চন্দ্র যেন প্রতি পূর্ণিমার চাঁদ হইতে স্বতন্ত্র সুমধুর।

প্রতি গৃহে গৃহে ধূপ দীপ জ্বালাইয়া গঙ্গাজলের ছিটা দেওয়া হইল। লক্ষ্মী পেঁচাকে বাহন করিয়া নামিয়া আসিতেছেন বৈকুণ্ঠ হইতে। অনাচার অমার্জ্জিত আবাস দেখিলে তিনি অভিমান ভরে ফিরিয়া যাইবেন। তাই তাঁহার শুভ আগমনের প্রত্যাশায় প্রদীপ জ্বলিতেছে, ধূপ দগ্ধ হইতেছে, দিকে দিকে শঙ্খ বাজিতেছে। ফুলে-ফলে পুষ্পমাল্যে সজ্জিত হইয়াছে তাঁহার উপবেশনের আসন।

বাজনাদাররা উপস্থিত হইল তিনজন। ঢাকে কাঠি পড়িল "নাকতা পাতার নাকতা পাতার", ঢোল বোল ধরিল "তাক দুমাদুম", কাঁশি বলিতে লাগিল "ঠুনুর ঠুনুর ঠুনুর", ইহাদের সহিত সংযুক্ত হইল ঠাকুমার উলু উলু উলু। রায়-ভবন কাঁপিতে লাগিল। পাড়া প্রকম্পিত হইল।

রায়বাড়ীর কুলপুরোহিত দর্শন দিলেন। গৌর-কান্তি প্রৌঢ় সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ, পরিধানে তসরের ধুতি গায়ে কালীনামে নামাবলী; শিখায় জবা ফুল দুলিতেছে। মুখে স্তবগান

'নগ নন্দিনী ভামিনী ভূতপতে,
ফণি নিন্দিত লম্বিত বেণী যুতে,
অকলঙ্ক শশাঙ্কনিন্দিত মুখে
হর পাপ মম, নম দক্ষসুতে॥'

পুরোহিতকে অদ্য বহু বাড়ী ঘুরিতে হইবে। ধনী দরিদ্র সকলে অর্চ্চনা করে লক্ষ্মীদেবীর। ইতর শ্রেণীর

হিন্দুদের মধ্যে কোজাগরী লক্ষ্মী পূজার প্রচলন আছে। তবে তাহাদের পুরোহিত জাতিতে ব্রাহ্মণ হইলেও শূদ্র-যাজক হীন ব্রাহ্মণ বলিয়া সমাজে প্রতিপন্ন।

পুরোহিত পূজায় বসিলেন। সন্ধ্যাতারার উদয়ের সঙ্গে তাঁহার আরাধনা আরম্ভ হইল। ইহার সমাপ্তি ঘটিবে প্রভাতী নক্ষত্রের আগমনে। গ্রামে তাঁহার বহু শিষ্য, বহু যজমান।

বাজনাদাররা বাড়ী ঢুকিয়া তুমুল শব্দে ঢাক ঢোলে জানান দিয়া পরস্পর পরস্পরের সহিত গল্প করিতেছিল। ঘণ্টাধ্বনির সঙ্কেত না পাইলে তাহারা বুঝিতে পারে না পূজাপদ্ধতি।

ঠাকুমা গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, "এই পচা, বলাই, করছিস কি? এসে একবার ঢাকে কাঠি দিয়ে দিব্যি আরাম করা হচ্ছে। এ যেন জেলেপাড়ার বিয়ে,

এক ঢোল এক কাড়া বিয়ে হ'ল খাড়া খাড়া।

ঘট বসছে, ঘটের বাজনা বাজা?"

"ঘণ্টা বাজে না, টের পাই নি মাঠান।"

"আচ্ছা, আমি এই দোরগোড়ায় বসে উলু দেব, তাই শুনে পুজোর ভোগের আরতির বাদ্যি বাজাবি, 'কালা যে না জানে তারে জানা'?"

ফের উলু উলু ঢাক ঢোল কাঁশি।

পূজা সারিয়া পুরোহিত প্রস্থান করিলেন অন্য গৃহে।

সকলে এক-একটি ফুল হাতে লইয়া লক্ষ্মীর কথা শুনিতে বসিয়া গেল। ক্ষিতি আজ অন্তঃপুরে বিরাজমান। ক্ষিতি সুমন্তর মাঝখানে তরু বসিয়াছে। ঠাকুমা নাতনীদিগকে দুই চক্ষে দেখিতে পারেন না, স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁহার নিদারুণ ঘৃণা। তিনি ফুল হস্তে বিড় বিড় করিয়া কহিলেন, "দুই দিকে দুই সোনার চূড়ো, মধ্যিখানে খড়ের মুড়ো।' আর যেন ঠাঁই নাই, উনি সুভদ্রা হয়েছেন।"

ভানুমতী ব্রতের কথা আরম্ভ করিয়াছে। চলনে বলনে বচনে এবং কর্ম্মকুশলতায় সে অসামান্যা। তাহাকে মহীয়সী মহিলা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

কথা হইতেছিল লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্র ও কন্যা দুশনাকে লইয়া। ছেলে শান্ত সুবিনীত, মেয়ে অবুঝ অশান্ত। ইত্যাদি—

কথাশেষে আবার উলুধ্বনি হইল, ঢাক ঢোল বাজিল। সকলে হাতের ফুল ঘটের উপরে নিক্ষেপ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া লক্ষ্মীদেবীকে প্রণাম করিল—

"লক্ষ্মী পদ্মালয়া দেবি, হরিপ্রিয়া হেমাঙ্গিনী,
যক্ষ রক্ষ আরাধিতা নমো নমো নারায়ণী।"

ঠাকুমার প্রণামের মন্ত্র পৃথক্—

"হুরুর বুকুর ভারই বাসা লক্ষ্মী দিলেন ধানপরসা
এ কালে লক্ষ্মী পরকালে নারায়ণ।"

এবার কোজাগরী করিবার পালা। শ্বেত পাথরের বাটিভরা চিনি মিশ্রিত নারিকেলের জল। তাহারই নাম কোজাগরী।

কর্ত্তা আসিলেন জামাতা ও ছেলেকে লইয়া কোজাগরী করিতে। রূপার চামচেয় ও তামার কুশিতে একটু-একটু নারকেলের জল গলায় ঢালিয়া বাড়ীর প্রতিটি প্রাণী নিয়ম রক্ষা করিল।

প্রস্ফুট জ্যোৎস্নাধারায় জগৎ স্নাত হইয়া হাসিতেছে। আজ রায়বাড়ীর আঙ্গিনায় ডেলাইট হেজাক জ্বালানো হয় নাই। চন্দ্রদেব বিমান হইতে শত-সহস্র আলোক-রশ্মি বিতরণ করিতেছেন।

লেপা-পোঁছা উঠানে সারি সারি মাদুর পাতা হইল। পাড়ার ভদ্র-সম্প্রদায়রা বাড়ী বাড়ী হইতে আসিয়া কোজাগরী-অন্তে জলযোগ করিয়া যাইবে। এ অনুষ্ঠান সামাজিক। এ-বাড়ীর ছেলেরাও যাইবে পাড়ার ভিতরে।

সুমন্তর অভ্যাস সন্ধ্যায় ঘুমাইয়া পড়া। পূজা দেখার উত্তেজনায় সেটা এতক্ষণ স্থগিত রহিয়াছে। কিন্তু সে আর পারিতেছিল না। নিদ্রায় চোখের পাতা জড়াইয়া আসিতেছিল। ঠাকুমা নাতি ভুলাইতে লাগিলেন, "চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে অলক ছলক দিয়ে, খোকন সোনা পান খেয়েছে শাশুড়ী বাঁধা থুয়ে।"

পান খাইবার প্রলোভনেও সুমন্তর নিদপরী পলায়ন করিল না।

মনোরমা কলাপাতায় একখানা লুচি এক টুকরা বেগুন ভাজা ছেলের সামনে রাখিয়া বধূকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন, "তুমি ওকে এইটুকু খাইয়ে নিয়ে যাও। বিছানায় শুইয়ে দিলে এক্ষুণি ঘুমিয়ে পড়বে। তোমার

এ ঘরে এখন আর কাজ নেই, রাজ্যের লোক এসে উঠোন ভ'রে যাবে। তুমি ওর কাছেই থাকগে।" কি অমৃতমাখা দৈববাণী, অভয়বাণী! বিনুর কল্পনার স্বর্গরাজ্য সহসা ধরাতলে নামিয়া আসিল।

সারাটা দিন গিয়াছে রায়বাড়ীর প্রত্যেকটি লোকের প্রাণান্ত পরিশ্রম। যাহা সহজ সংক্ষেপ, ইহারা সে পথে পা বাড়ায় না। কাজকে দীর্ঘ করিয়া, জটিল করিয়া বাড়াইয়া লওয়াতেই ইহাদের আনন্দ। সেই কারণে খাটুনি হয় বেশি।

সুমন্ত খায় না, ঠাকুমা বৃথাই ছেলে-ভুলানো ছড়া কাটেন:

"পুকধিনা পুকধিনা মায় ভেঙ্গেছে ডানা,
পিসিছোলা দাঁড়ি, খুড়ী বুড়োধাড়ি
ছেলেটারে নাচায় না; পুকধিনা।"

মনোরমার শয়ন-গৃহ প্রশস্ত লম্বা। বিরাট্ একখানা খাটে দুগ্ধফেননিভ বিছানা। পাশের অপেক্ষাকৃত ছোট ঘরটিতে মহেশবাবু শয়ন করেন। মাঝখানের দরজায় ঘন নীল রং-এর মোটা পর্দা। সুমন্তর ছোট বালিসটার পাশে চীনেমাটির বাটিতে গন্ধযুক্ত ফুল। মার বড় বালিসের কাছেও আর এক বাটি ফুল। ছেলের ঘুমের সময় নবীন নীল আলো জ্বালাইয়া দিয়া যায়। নীল আলোর নীল আভা ম্লান করিয়া দক্ষিণের মুক্ত বাতায়ন পথে উজ্জ্বল অম্লান পূর্ণিমার শুভ্র প্রভা লুণ্ঠিত হইতেছিল বিছানায়, বালিসে সুমন্তর ঘুমন্ত কোমল কচি-মুখে মুদ্রিত আঁখিপাতে। কিসের সুগন্ধে ঘর যেন ভরিয়া গিয়াছে। কেমন মিষ্টি-মধুর গন্ধ।

বিনু শাশুড়ীর নরম বিছানায় খানিকটা গড়াইয়া খোলা-জানলা দিয়া তাকাইল অঙ্গনে।

ভদ্রলোকদের কোজাগরীর মিছিল শেষ হইয়া গিয়াছে। মাদুর গুটানো হইয়াছে। চাঁদের আলোকে কলার পাতায় ভোজনে বসিয়াছে সারি সারি লোক। একদিকে মেয়ে, অন্যদিকে পুরুষ। কামার, কুমার, ছুতার, নাপিত, ধোপা, ভুঁইমালী ইত্যাকার। বাড়ীর ঝি-চাকর, সরকার পাচক কেহই বাকি নাই। প্রথমে তাহাদের পাতায় পড়িল কাটা ফল, নাড়ু, তক্তি, সত্য-নারায়ণের প্রসাদ। তাহার পরে মা-লক্ষ্মীর ভোগ, লুচি, ডাল, তরকারি, ভাজা, ক্ষীর, মোহনভোগ। পরিশিষ্ট দই-চিড়া, গুড়-কলা। সমস্ত দিন উপবাসের পরে সরবৎ ও কাঁচা প্রসাদ খাইয়া ভানুমতী পরিবেশনে নামিয়াছে। তাহার সঙ্গে মধুমতী সরস্বতী। ভানুমতী যেন অন্নপূর্ণা দশভুজা। লোককে খাওয়াইতে কি ভালবাসে। মা লক্ষ্মী, এবার তুমি ওঁকে একটি ছেলে দাও। তুমিও যে, ষষ্ঠীদেবীও সেই।

বিনুর প্রার্থনা বেশি দূর অগ্রসর হইল না। চন্দ্রকিরণে উদ্ভাসিত গৃহে স্বর্গের নিদ্রাপরী তাহার আঁখিপ্রান্তে ধীরে ধীরে আসন পাতিয়া বসিল।

যেমন জ্যোৎস্না-পুলকিত মধু যামিনী, তেমনি মাধুরী-ভরা বিনুর সুখের স্বপ্ন। বিনু স্বপ্ন দেখিতেছিল—

সে যেন বিনু নয়, রায়বাড়ীর বধূ নয়। সে কুঁচবরণ কন্যা মেঘবরণ চুল, ডাইনী বুড়ী তাহাকে ভুলাইয়া ধরিয়া আনিয়াছে। তাহার রূপার কাঠির পরশ দিয়া গভীর অরণ্যে পাথর-পুরীতে অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত করিয়া রাখিয়াছে। যে পাষাণ-পুরীর কানন কান্তারে প্রভাতের আলোর অঞ্জলি ঝলকিত হয় না। তরুলতা পুষ্প-হারে প্রসাধন করে না। বিহগকণ্ঠ নীরব, সমীরণ স্তব্ধ। ভরা নদীর কলতান অবরুদ্ধ। যুগের পরে যুগ চলিয়া যায়, কল্পান্তরের পরে কল্পান্তর।

একদা কি এক মহালগ্নে শুভক্ষণে তেপান্তরের রাজ-পুত্র তাঁহার পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়িয়া প্রবেশ করিলেন সেই লৌহ দুর্গে। হাতে তাঁহার সোনার কাঠি।

সোনার কাঠির স্পর্শে কুঁচবরণ কন্যার মহাসুপ্তির ঘোর অকস্মাৎ কাটিয়া গেল। অমনি ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী গাহিতে লাগিল। গাছে গাছে রাশি রাশি ফুল ফুটিল। নিদ্রিত নদী জাগ্রত হইয়া তান ধরিল কুল কুল কুল। মত্তপবন মুখর হইল। কুঁচবরণ কন্যার শিথিল বাহুমূল পরম সমাদরে আপনার করপল্লবে ধারণ করিয়া তেপান্তরের রাজপুত্র চুপে চুপে কহিল, "তুমি আমার বধূ, আমি তোমার বর। আমার কাছে সোনার কাঠি আছে; তোমাকে আর ঘুমোতে দেব না।"

বিনু স্বপ্নে নিরীক্ষণ করিল যে তেপান্তরের রাজপুত্র আর কেহ নয়। তাহারই নবীন বর প্রসাদ।

"বৌমা, আর কত ঘোম দিবা? উইঠে পড়ো, খাওন-

দাওয়া সারে 'পান খাইয়ে মুখ করি টুকটুক' ফের ঘোম দিও।" কামিনীর মা বিন্থর গায়ে ঠেলা দিয়া ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিল। তখনও তাহার হৃদয় সুখস্বপ্নের আবেশে বিভোর। কি মধুর স্বপ্নের জগতে সে এতক্ষণ বিচরণ করিতেছিল। অপূর্ব্ব, সুন্দর সরস মধুর।

বিন্থ সচমকে বিছানায় বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "অতগুলো লোকের খাওয়া হয়েছে মাসী? তোমরা কখন খাবে?"

"কোনকালে আমাগরে খাওন-দাওন হইবে বৌমা? সগলকার সাথে বড় ঠাকুর্জি বসায়ে দিইছেল। য্যামন মুখের দাপট ত্যামনি সগলের ওপরে যতন আত্যি ওঁনার। বাবুরা খাইতে বসিছে, ওঁনাদের হইলে তোমরা। তা হলেই মিঠে যায় আজকের মতন। ভোর হ'তে না হ'তে গাঁ ভেঙ্গে আস্‌তে নাগ্‌বে চাষাভুষার ছাওয়াল ম্যায়েরা লক্ষ্মীপূজার পরসাদ ভিক্ষে করতে। যাও বৌমা, চোখে মুখে জল দাও গে, ঘোম ছুটে যাইবে। জলে কাপড় ভিজাইয়ে ফেল না যেন, 'আইছে আশ্বিন গা করে মিন মিন।' তুমি যাও ওঁনাদের কাছে। আমি এখন বাবুগরে পান বানাইয়া রাখি।"

প্রসাদ ও ক্ষিতীকে এ ঘরে আসিবার পূর্ব্বে বিন্থ দেখিয়াছিল পাড়ায় বাহির হইতে। তাই সাগ্রহে প্রশ্ন করিল, "ওরা না কোজাগরী করতে গিয়েছিল? আবার খেতে বসেছে?"

কামিনীর মা পানের বাটা টানিয়া লইয়া উত্তর দিল, "সমাজের লোকের কাছে একটুখানি নারকোলের জল মুখে দিয়ে একটা নাড়ু বাতাসা তুলে নিলে কি কারোর পেট ভরে মা? ও ত নৈকুকতা।"

বিন্থ আর কথা কহিল না। বাহির হইয়া গেল।

এতদিন বিন্থ শয়নঘরে ঢুকিয়া প্রসাদকে শয্যাসীন দেখিয়াছে। আজ দুই-তিন দিন হইল দেখিতেছে চেয়ারে আসীন। তখনও শিয়রে আলো রাখিয়া চোখের সামনে বই খোলা। এখন চেয়ারে বসা, টেবিলে বই খোলা। এত বই ও কি পড়িতে পারে? পড়ার বিরাম নাই, বিরতি নাই।

বিন্থর পদশব্দে প্রসাদ মুখ তুলিয়া ডাকিল, "এই, এস এদিকে। দেখে যাও তোমার জন্যে কি এনেছি?"

প্রাণ ভরিয়া নিদ্রা উপভোগ করিবার পরে বিন্থ প্রীত প্রসন্ন হইয়াছে। সে কৌতূহলী হইয়া সরিয়া গেল প্রসাদের নিকটে।

প্রসাদ টেবিলের টানার ভিতর হইতে একটি প্রস্ফুটিত রাঙ্গা পদ্মফুল তাহার হাতে দিয়া কহিল, "নাও তোমার প্রিয় পদ্ম। আমি নিজেই ডিঙ্গি নিয়ে তুলে এনেছি পদ্মবিল থেকে। লক্ষ্মীপুজোয় মাকে দিয়েছি ছোট ছোট ক'টা। বড়টা তোমার জন্যে রেখেছি। পদ্মবিল উজাড় হয়েছে দুর্গা পুজোয়। ক'টা মাত্র ফুল ছিল বিলের মাঝখানে।"

বিন্থ ফুল পাইয়া পরম পুলকিত। সত্যই সে পদ্মফুল ভালবাসে। কিন্তু কে তাহা কবে মনে করিয়া রাখিয়াছে। মাত্র সেদিন গল্পচ্ছলে পদ্মের উল্লেখে কে যায় ডিঙ্গি বাহিয়া পদ্মবনে?

কৃতজ্ঞতায় আনন্দে বিন্থ অভিভূত হইল। ফুলের আঘ্রাণ লইতে ফুলটা নাকের কাছে ধরিতেই তাহার চোখে পড়িল একটা পাপড়ির গায়ে কাল কালিতে ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—

"দেখিতে ঠিক তোমারি মত, তেমনি সুন্দর মাধুরীময়,
তাই তব করে অনুরাগভরে দিলাম এ উপহার।"

বিন্থ নির্ণিমেষে অক্ষরগুলি দেখিতে লাগিল। হৃদয়ে অপরূপ সুধার সমুদ্র বহিয়া যায়। ভুবন আনন্দে ভরিয়া যায়। কর্ণমূলে শত বীণা বেণুরবে বাজিতে থাকে, "দেখিতে ঠিক তোমারি মত, তেমনি সুন্দর মাধুরীময়।" এই স্বীকৃতির স্বাক্ষর বিন্থ কাহাকে দেখাইবে? কে ইহার মর্ম্ম বুঝিবে? না, যাহার যাহা ইচ্ছা বলিতে থাকুক, বিন্থ আর নগণ্যা তুচ্ছ নয়। সে পদ্মের মতন দেখিতে, "তেমনি সুন্দর মাধুরীময়।"

কতক্ষণ কাটিয়া যায় নীরবে। নীরব অভিব্যক্তিতে মধুর বারি ঝরিয়া পড়িতে থাকে। পত্নীর মৌনতা ভঙ্গ করিয়া প্রসাদ পুনরায় মুখর হয়—"ফুল হাতে নিয়ে তুমি চুপ করে রইলে কেন? খুশী হও নি? আমি নিজে ডিঙ্গি বেয়ে গিয়েছিলাম পদ্মবিলে, কত কষ্ট করে এনেছি।"

পুলকের বিহ্বলতা ধীরে ধীরে প্রশমিত হয় বিন্থর।

সে বলে, "তুমি একলা গিয়েছিলে কেন? তুমি কি নৌকা বাইতে জান? বিলের মধ্যিখানে কেউ কি ফুল তুলতে যায়? সেখানে পদ্মের পাতার ভেতরে নালের সাথে জড়িয়ে মস্ত মস্ত গোখরো সাপ থাকে।"

"তাই নাকি? আমার অতশত জানা ছিল না। সাপের বিষে যদি মরতাম তাহ'লে তোমার খুব সুবিধাই হ'ত। আমি মরে গেলে অলক্ষ্মী অপয়া বৌ বলে কেউ তোমাকে এখানে আটকে রাখত না। দিব্যি মজা করে বাপের ঘরে বসে থাকতে পারতে? আমাদের এখানে তোমার ভাল লাগছে না। মনের কষ্টে রয়েছ?"

বিনু চুপ, তাহার রামায়ণ পড়া ছিল কিন্তু সীতাদেবী যেমন শ্রীরামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন :

"তব সনে থাকি যদি ধূলি লাগে গায়,
অগুরু চন্দন চুয়া জ্ঞান করি তায়।
তব সনে থাকি যদি পাই তরুমূল
রম্য অট্টালিকা নয় তার সমতুল।"

বিনু যে তেমন করিয়া বলিতে পারে না। তাহার ভাষা-মূক, অব্যক্ত। প্রকাশের ভঙ্গি তাহার জানা নাই। জানা নাই বলিয়াই কি এত আঘাত করিতে হয়? যার অন্তরে অমৃতভাণ্ড সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে সে আবার হলাহলের অধিকারী হয় কিরূপে? বিনুর চোখ জলে ভরিয়া যায়, অনাবিল আনন্দে বিষাদ। যে আস্তে আস্তে আর্দ্র বিজড়িত স্বরে বলে, "ছিঃ, ওকথা বলতে নেই। আমি আর কোথায়ও যেতে চাইব না। যাব না।"

প্রসাদের অগোচরে বিনুর অবাধ্য নয়ন হইতে ঝরিয়া পড়ে অশ্রুজল। ক্ষণিক পূর্ব্বে যে নির্ম্মল নীলাকাশে অবারিত জ্যোৎস্না-লেখা হাসিতেছিল, সামান্য বাক্যের মেঘে তাহাকে ম্লান করিয়া প্রসাদ ঈষৎ লজ্জিত হইল। মেয়েটা শুধু বুদ্ধিহীনা অবোধ নহে, উহার মনের শিরীষ কুসুম এখনও মধুকরের পদভার সহিতে শেখে নাই। যে মেঘ আনিয়াছিল সেই ফের চেষ্টা করিল মেঘ-ভার অপসারণের।

প্রসাদ কহিল "আমি নৌকো বাইতে জানি কি না তুমি জানতে চাইছিলে? ছেলেবেলা থেকে কত যে বাইচ দিয়েছি তোমাদের হীরাসাগর নদীতে, বিলে খালে হাঁসখালির জলায়—তার কি আদি-অন্ত আছে? তোমাদের নদীতে যখন যেতাম তখন তীরে দাঁড়িয়ে তুমি গান গাইতে—

"কমনে যাও নায়ের নেয়ে নৌকা বাইয়া?
নাও ভিড়ায়ে যাইবে পিছে পান খাইয়া।
আঁকড় ধানের হুড়ুম দিমু পানের সাথে গুইয়া,
খাওন দাওন শ্যাষ করিয়া ডিঙ্গায় যাইও নাইয়া।"

মনে পড়ে, এক বছর আগেও তুমি যে আমার দিকে চেয়ে চেয়ে এই গান গেয়েছিলে?"

বিনু খিল খিল করিয়া হাসে। তাহার সর্ব্বাঙ্গ হাসির দমকে কাঁপিতে থাকে।

হাসিতে হাসিতে বিনু সবেগে ঘাড় নাড়ে, "না, না, আমি কেন ওই গান গাইব? কই, নৌকো বাচ দিতে আমি ত তোমাকে দেখি নি? চাষার মেয়েরা ওই সব বলে। ছিঃ, আমি কেন, আমি না।"

আকাশ নির্ম্মল মেঘমুক্ত হইল।

প্রসাদ বলিল, "তা হ'লে ভুল করেছি, তুমি ছিলে না তাদের ভেতরে। তোমার কি ঘুম পেয়েছে? চল না একটুখানি চাঁদের আলোয় বারান্দায় বসিগে?"

বিনু আপত্তি করিল না। সে খানিকটা ঘুমাইয়া লইয়াছে।

রূপা-গলানো পূর্ণিমার প্রমত্ত রজনী। ধীর-মন্থর পদে অগ্রসর হইতেছে গভীরতায়। রায়পাড়া নিস্তব্ধ হইয়া আসিয়াছে। দূর-দূরান্ত হইতে তখনো ভাসিয়া আসিতেছে উলুধ্বনি ও ঢোলকের ধুম ধুম শব্দ। নিম্ন-শ্রেণীর হিন্দুদের গৃহে লক্ষ্মীপূজার ভোঃ নমো শেষ হয় নাই। শূদ্রযাজক পুরোহিতের সংখ্যা কম, অথচ চাহিদা বেশি। শুভ্র জ্যোৎস্নাকে দিবাভ্রম করিয়া ঘন তরুশাখা হইতে রহিয়া রহিয়া কাক ডাকিয়া উঠিতেছে। পাখীরা যোগ দিতেছে কাকের সহিত। বাতাস মত্ত-মুখর।

প্রসাদ বলিতেছিল, "কোজাগরী পূর্ণিমায় রাত জাগতে হয় জান ত? যারা রাত জেগে কাটায় তাদেরি লক্ষ্মী লাভ হয়। শোন নি, কাঠেদের মার কথা?"

বিনু সাগ্রহে মাথা দুলায়, "জানি না আবার, কত শুনেছি। রাত জাগতে আবার কষ্ট কি? রাত ত

শেষ হয়েই গেছে, আর ঘুমবার দরকারই বা কি? দিব্যি চাঁদের আলোয় বসে গল্প করি আমরা?"

প্রসাদ মায়ের বিছানায় গাঢ় নিদ্রায় অচৈতন্য বিনুকে নিরীক্ষণ করিয়াছিল। তাই সে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। তাহার অবলা অখলা গোপের বালা বধূ ক্রমে ক্রমে জ্ঞান-বৃক্ষের ফলের আস্বাদন পাইতেছে। আর দেরি নাই, "মুকুলে রবে না ফুল ফুটিবে যবে। ধীর সমীর এসে হেসে জানাবে।"

প্রসাদ জিজ্ঞাসা করিল, "তখন যে তুমি বলেছিলে কোথায়ও তুমি যাবে না, যেতে চাও না। সেটা কি তোমার রাগের কথা?"

"না, রাগ কিসের? সত্যি সত্যিই বলেছিলাম।"

"সত্যি, কেন বিনু?"

"বারে, আমি যে এখানকার কতজনকে ভালবেসে ফেলেছি। ছেড়ে থাকতে কষ্ট হবে যে।"

"কাকে কাকে বলতে পার?"

"তা আবার পারব না কেন? বাবা মা, তরু সুনু ঠাকুমা আর সবচেয়ে তোমাকে।"

প্রসাদ কথা কহিল না। সাদরে সস্নেহে স্ত্রীর এক-খানা হাত হাতের মুঠোয় লইয়া তাকাইয়া রহিল চন্দ্রা-লোকে বেষ্টিত ষোলকলায় পরিপূর্ণ পূর্ণিমার চন্দ্রমার দিকে।

সুপ্তির নিভৃতে প্রেমের মুক্তা জন্মলাভ করিল।

সেদিন বিপুল জনতার মাঝখানে উজ্জ্বল আলোক-মালার ও তুমুল বাদ্যভাণ্ডের সমারোহে গুরুজনরা তাহাদের দুইখানি করপদ্ম সুরভিত পুষ্পমাল্যে বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু এ-চাঁদনী যামিনীতে তাহারা প্রকৃত বাঁধা পড়িল হৃদয়ে হৃদয়ে আত্মায় আত্মায়। সাক্ষী মাথার উপরে উন্মুক্ত অনন্ত গগন, শ্যামল ধরিত্রী। পুষ্পিত শেফালী তরু,হিল্লোলিত মৃদুমন্দ সমীরণ।

মেঝেয় মাদুর বিছাইয়া বিনু বসিয়াছিল প্রসাদের দেওয়া বাঁধানো লাল টুকটুকে খাতায় হাতের লেখা লিখিতে। কালির দোয়াত, রাজহাঁসের পালকের কলম। তাহার পাঠ্যপুস্তক হইতে নকল করিতে ভাল লাগে না। তাহার তরল সুকুমার-চিত্ত ছন্দ ও মিল বড় ভালবাসে। টেবিলের উপরে ছিল হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী। বিনু সেই খানাই লইয়াছিল হাতের লেখা লিখিতে।

পূজার সময় রায়বাড়ীতে যাত্রাগান হইয়াছিল বৃত্র-সংহার। যদিও সে তাহা ভালরূপে শুনিতে পায় নাই, তবু যেটুকু উপভোগ করিয়াছিল তাহার দৃশ্যপট সঙ্গীতের মাধুর্য্য তাহাকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল।

সে পাতা উল্টাইয়া উল্টাইয়া বৃত্রসংহার বাছিয়া লইল।

"বসিয়া পাতালপুরে ক্ষুব্ধ দেবগণ—
নিস্তব্ধ, বিমর্ষ ভাব চিন্তিত, আকুল ;
নিবিড় ধূমান্ধ ঘোর পুরী সে পাতাল,
নিবিড় মেঘডম্বরে যথা অমানিশি।"

আঁকা-বাঁকা অসমান লেখায় এক পাতা ভরিয়া গেল। এমন সময় ছুটিতে ছুটিতে তরু আসিয়া উপস্থিত।

বেলা দ্বিপ্রহর গড়াইয়া গেলেও আজ সকলে সুখ-নিদ্রায় মগ্ন। লক্ষ্মীপূর্ণিমা চলিয়া গিয়াছে, সামনে বিশেষ তাড়া নাই। চঞ্চল রায়বাড়ীতে শান্তির স্তব্ধতা নামিয়া আসিয়াছে। বিনু ঘুম-কাতুরে হইলেও তাহার দিবা-নিদ্রার অভ্যাস নাই। তরুও তাহারই মতন। সারা-দিন বিচরণ করিয়া বেড়ায়।

তরু সাবধানের তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া মুঠোয় দলা-পাকানো এক চিলতে কাগজ বিনুর হস্তে গুঁজিয়া দিল। হাতের লেখা প্রসাদের, সে লিখিয়াছে, "তোমার নিকটে যদি টাকা থাকে তরুর হাতে দিবে। রাত্রে সমস্ত বলিব।"

বিস্মিত হইয়া বিনু তাকাইয়া রহিল তরুর মুখের প্রতি।

তরু চুপে চুপে বলিল, "কি কাণ্ড হয়েছে জান বৌদি, আমাদের প্রজা ভিকু শেখকে বাকী খাজনার জন্যে পাইকরা ধরে এনেছে। ভিকুর ক্ষেতখামার কিছু নেই। থাকবার ভেতরে আছে বুড়ো জোড়া বলদ। তাই নিয়ে সে অন্যের ক্ষেতে চাষ করে। কিই বা তাতে হয়? দুটো ছেলে মেয়ে বৌকে খেতে দিতে কুলোয় না। খাজনা দেবে কোথায় থেকে?"

বিনু ব্যথিত হইল। ভিকুর বাকী খাজনার সহিত

প্রসাদের টাকা চাহিবার অর্থ কি? অর্থ যাই হোক, তিনি যে চাহিয়াছেন।

বিনু তাহার বাক্স খুলিয়া, সাবানশূন্য কাগজের বাক্স ও চন্দন কাঠের কৌটা খুলিয়া খুঁজিয়া-পাতিয়া পাইল মাত্র ছাব্বিশটা টাকা। তাহার কখন কি প্রয়োজন হয় ভাবিয়া এখানে আসিবার সময় মা দিয়াছিলেন। সেই নোট ক'খানা ভাঁজ করিয়া তরুর হাতে দিতে দিতে বিনু বলিল, "তোমার দাদা টাকা দিয়ে কি করবেন তরু? আমার কাছে এই ছিল, আর নেই।"

তরু বিরক্ত হইল, "যা থাকবে তা দেবে না ত চুরি করে কি দেবে? এর আগেও দাদা যা করেছেন এবারেও তাই করবেন। সরকার কাকাকে দিয়ে চুপে চুপে মিটিয়ে দেবেন বাকী খাজনা।"

বিনু সভয়ে প্রশ্ন করিল, "সকলে জানলে তখন কি হবে?"

"কে জানতে যাবে? আমি কি তোমার মতন হাবা-গোবা নাকি যে, বলে দেব? সরকার কাকা ত দাদার ভালবাসার লোক, কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছিল। দাদা যা বলবেন সে তাই করবে। এখন শীগ্‌গির করে ভিকুকে ছেড়ে দিলে আমি বাঁচি। ওর ছেলেমেয়ে দুটো ম্যালেরিয়া জ্বরে অজ্ঞান হয়ে রয়েছে। ওর বাড়ীর পেছন দিকের ডোবায় পাটের 'জাগ' দিয়েছে। যেমন বিচ্ছিরি গন্ধ, তেমনি মশা। জ্বর হবে না ত কি? সাবু বার্লি কিনতে পারে না, জ্বর হয়েছে, ভাতের ফেন খাইয়ে রেখেছে।"

"তুমি বুঝি ওদের বাড়ী গিয়েছিলে?"

"আমার দায় পড়েছিল মুসলমান বাড়ী যেতে? আমি গিয়েছিলাম ওদের আমগাছ থেকে সোনালতা আনতে, শেফালী ফুলের মালা গাঁথব বলে। ওমা, যেয়ে দেখি ভিকুকে ধরে এনেছে পাইকরা। ছেলেমেয়ে চাটাই পেতে শুয়ে জ্বরে কাঁপছে। ছেঁড়া কাপড় একখানা মাত্তর ছিল ওদের, তাই পরে এসেছে ভিকু। বৌ কাঁথা গায়ে জড়িয়ে কাঁদছে ছেলেমেয়ের শিয়রে।"

বিনু সংক্ষেপে কহিল, "আহা, কি দুঃখ?"

তরু মুরুব্বি চালে গম্ভীর মুখে উত্তর দিল, "হবে না দুঃখ, ওরা যে মূর্খ—বুদ্ধিবিবেচনা নেই। যখন হাতে পয়সা থাকে তখন এক একজনা দুই-তিনটে করে ইলিশ মাছ খায়। এখন বোঝ ঠ্যালা। অসুখে ফেন খেয়ে-মর। ন্যাকড়া পরে লুকিয়ে থাক কোণে। 'যেমন কুকুর ওরা, তেমনি মুগুর এরা'।"

বিনু তাহার প্রখরা-মুখরা ক্ষুদে ননদিনীটিকে কম সমীহ করিত না। বিষধর সাপের ছোট-বড় নাই। বিনু ভয়ে ভয়ে প্রস্তাব করিল, "আমি একখানা শাড়ী দিতে পারি ভিকুর বৌকে; তুমি যদি কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দিতে পার?"

বিনু পিত্রালয়ে থাকিতে তাহার বহু শাড়ী-জামা গরীবদের বিলাইয়া দিয়াছে। কাহারও অনুমতি লইবার প্রয়োজন হয় নাই। তাহার অভ্যাস আছে, সেই জন্য তরুকে বলিতে সাহসিনী হইয়াছিল। তরু গর্জ্জন করিতে লাগিল, "নতুন বৌয়ের গিন্নীপনায় বাঁচি নে। যা করবার আমিই করেছি। এক টিন বার্লি, এক টিন সাবু, এক ঢ্যালা মিছরি, আমার পুরাণো প্রজাপতি-পেড়ে শাড়ীর আঁচলে বেঁধে ভিকুর বৌকে দিয়ে এসেছি। একথা কাউকে বলো না কিন্তু বৌদি, আর দাদার টাকা চাইবার কথা।" বলিতে বলিতে তরু শাড়ীর প্রান্তে নোট কয়-খানা বাঁধিয়া চলিয়া গেল।

বিনু আবার বসিল তাহার লেখা লইয়া। এখনও বেলা আছে, কাহারো জাগরণের সাড়া পাওয়া যাইতেছে না। প্রসাদ যদি তাহার খাতা পরীক্ষা করিতে চায়, পাতা ভরা ভরা লেখা দেখিলে সে খুশী হইবে। কিন্তু বাছিয়া বাছিয়া এ কি সে লিখিতেছে? রসশূন্য কটকটে কথা—"বসিয়া পাতালপুরে ক্ষুব্ধ দেবগণ—" না, এ কবিতা চলে না। বিনু পুস্তকের পাতা উল্টাইতে লাগিল।

একস্থানে কয়েক ছত্রে তাহার পিপাসিত নয়ন আবদ্ধ রহিল, "আহা এই ধনু চারু পুষ্পময়!

মন মম দিলা তাঁয়,
যুদ্ধ ছল করি কত পুষ্পশর
ফেলিলা আমার গায়।"

আনমনা বিনু কাগজের বুকে টুকিয়া লইতে লাগিল অক্ষর-গুলি।

রাত্রে দেখা হইল উভয়ের। প্রসাদ জিজ্ঞাসা করে বিন্নুকে, "তোমার এখন ত টাকার কোন দরকার হবে না? হ'লে আমাকে বলো, আমি যাবার সময় তোমার টাকাগুলো ফেরত দিয়ে যাব।"

বিন্নু আস্তে কহিল, "না, ও অমনিই পড়েছিল। ওতে আমার কিছু দরকার নেই। টাকা দিয়ে তুমি কি করেছিলে আজ?"

প্রসাদ বারেক ইতস্তত: করিয়া জবাব দিল, "বেশি কিছু করি নি, পঞ্চাশ টাকার বাকী খাজনার জন্যে একজনকে ধরে আনা হয়েছিল তাঁই দিয়ে দিয়েছি। আমার কাছে সব টাকা ছিল না, তারজন্য তোমারটা নিতে হয়েছিল। তোমার দরকার থাক বা না থাক, যেমন তোমার টাকা ছিল তেমনি রেখে দিও। আমি যাবার সময় দিয়ে যাব। বাবা আমাকে কলেজের মাইনে আর হোস্টেল খরচ যা দেবেন তার থেকে দেব।"

"কিন্তু সেখানে কলেজের মাইনে না দিলে তোমাকে পড়তে দেবে না। টাকা না দিলে খেতে দেবে না। কেন তুমি বাকী খাজনা দিতে গেলে, এঁরা জানলে কি হবে?"

করুণায় মমতায় বিন্নুর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। প্রসাদ বিস্মিত হইল। বিন্নু এখন ভাবিতে শিখিতেছে, পাষাণ প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইতেছে।

প্রসাদ বলিল, "এ আমার নতুন নয়, অনেক হয়ে গেছে। কেউ জানতে পারে নি। তোমার ভয় নেই বিন্নু, আমি কলকাতায় না খেয়ে মরব না। লেখাপড়াও ছেড়ে দেব না। সেখানে গেলেই আমার রোজগার হবে। আমি পরীক্ষার গার্ড দেই, খবরের কাগজে প্রবন্ধ লিখি। এক হোস্টেল খরচ, কলেজের মাইনে ছাড়া একপয়সাও নিই না জমিদারী থেকে। যা নিচ্ছি তারও হিসাব লিখে রাখছি, উপার্জ্জনক্ষম হ'লে শোধ করে দিতে হবে।"

"শোধ করবে কেন? তুমি না বড়ছেলে, পরে তুমিই ত রায়বাড়ীর জমিদার হবে?"

"না, ঘৃণা করি আমি জমিদারী প্রথাকে। আমার দুই ভাই আছে, দরকার হ'লে তারাই হবে। আমি লেখাপড়া শিখে মানুষ হব, উদয়-অস্ত পরিশ্রম করে খাব। নেব না জমিদারির টাকা। রায়বাড়ীর গণ্ডি ভেঙ্গে বেরিয়ে পড়েছি। আমার জগৎ পৃথক্ হয়ে গেছে। আমাকে মানুষ হ'তে হবে।"

বিন্নু আড়চোখে একবার স্বামীর মুখের প্রতি চাহিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। উত্তেজনায় আবেগে সে মুখ আরক্ত। বিশাল চোখ জ্বলিতেছে দুইখণ্ড হীরকের মতন ধক্ ধক্ করিয়া। প্রসাদের এ রূপের সহিত বিন্নুর পরিচয় ছিল না। এ কি পৌরুষত্বের দীপ্তি; না শক্তির মহিমা? বিন্নু ভীত হইল। ভয়ে ভয়ে কহিল, "তুমি বুঝি চাকুরি করবে?"

"না, স্বাধীন ব্যবসা করব। শরীরে রয়েছে জমিদারবংশের রক্ত, সে করতে দেবে না গোলামি। সে মানতে চাইবে না উপরওয়ালার হুকুম। সে হবে ভবিষ্যতে, তার জন্যে তুমি কেন মন ভারী করছ? পরে তোমাকে কোন দুঃখের সমুদ্রে টেনে নিয়ে যাব ব'লে কি এখন থেকেই ভয় হচ্ছে?"

বিন্নু মলিন হাসি হাসিল, "আমি ভয় পাই না। তুমি কষ্ট করলে আমিও করতে পারব।"

প্রসাদ প্রীত হইল। "বেশ লক্ষ্মী মেয়ের মতন কথা। আজ এখনো তোমার ঘুম পায় নি? দুপুরে বোধহয় সেরে রেখেছ খানিকটে।"

বিন্নু লজ্জায় নত-আঁখি হইল, "আমি দুপুরে ঘুমুই না, হাতের লেখা করছিলাম।"

"দেখি কতটা লিখেছ?"

বিন্নু খাতা বাহির করিয়া টেবিলে রাখিল।

লাল নীল মোটা পেনসিল হস্তে প্রসাদ হইল পরীক্ষক। বেশি নয়, তিন পৃষ্ঠা মাত্র লেখা হইয়াছে। অসমান অক্ষর, বই খুলিয়া টুকিলেও দাঁড়ি-মাত্রার অভাব। কিন্তু তিন পৃষ্ঠা লেখার পরে এ কি—

"আমাকে দিয়াছে পত্র, আমি যাকে ভালবাসি;
আনিলে পদ্মের ডাঁটা, বাজিত মোহন বাঁশী।
পদ্মের বনেতে থাকে কাল নাগ নাগিনীরা,
ও কেন সেখানে গেল, ভয়ে আমি হই সারা।"

প্রসাদ কৌতুকের হাসিতে উচ্ছ্বসিত হইল, "এ কি লিখেছ? স্বরচিত কবিতা দেখছি। এদিকে নিরেট,

ওদিকে দেখছি ঠাকুমার উপযুক্ত শিষ্যা। যাক, শুনে সুখী হওয়া গেল, 'আমি যাকে ভালবাসি'। আর আছে নাকি? না এই প্রথম অঙ্কুর?"

বিনু লজ্জায় মাটির সহিত যেন মিশিয়া গেল। সে জানে না, কখন সে ওই কথাগুলি লিখিয়াছিল। তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে লেখা হইয়াছে। ছেলেমানুষ, কি লিখিতে কি লিখিয়াছে, সেই আবোল-তাবোল লেখাটুকু তাহার চোখের সামনে ধরিয়া স্বামীর উচ্চ হাসি তাহার ভাল লাগিল না। ছিঃ, ছিঃ, বিনু কোথায় যাইবে? কোথায় লুকাইবে?

আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির নিশীথ রাত্রে রায়বাড়ীর 'গারসী' পূজা। এ বারমেসে লক্ষ্মী ব্রতের পর্য্যায় পড়ে। এখানে একটা উপলক্ষ্য হইলেই হইল। রক্ষণশীল মেয়েমহল হইতে কোনটাই বাদ যায় না। ছোটখাটো নটাই-পাটাই ষষ্ঠী মঙ্গল বণ্ডী মনসা সমানে সজাগ হইয়া বিরাজ করিতেছে রায়বাড়ীতে। ইহাদের ভ্রমেও ভুল হয় না, ত্রুটি হয় না। পৃথিবীর বাহিরের দরজা বন্ধ করিয়া সীমাবদ্ধ অন্তঃপুরে ক্ষুদ্র পরিসরের ভিতরে ইহাদের রাজত্ব। সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না।

শত-সহস্র ছিদ্রযুক্ত চালুনি ডালায় গারসী পূজার উপকরণ সজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছে। তেল, তেলের প্রদীপ, সিঁদুর। কাঁচা হলুদ, কাঁচা তেঁতুল, পান, সুপারি, আদা, মাসকলাই ভিজানো। কলা-বাতাসা, পাটকাঠি, কুলা।

তখন রাত্রি কত কাহারও খেয়াল নাই। নিদ্রিত পুরীতে প্রথমে জাগিয়া ঠাকুমা দ্বারে দ্বারে করাঘাত করিয়া বেড়াইতেছিলেন, "ও সাবি, তন্বি, সন্নি, রাজেশ্বরী, তোরা ওঠ্ লো, ভাগ্নিরে ডাক দে, গারসীর সময় হইচে। আমি মাণিকমালাকে ডেকে তুলি। তার আবার যে ঘুম, পেসাদ তুলে দিক ঠ্যালা দিয়ে।"

ঠাকুমার জাগ্ জাগ্ সাজ সাজ চিৎকারে গোটা রায়বাড়ীর সুপ্তির ঘোর মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিয়া খান খান হইয়া গেল।

লবঙ্গদের বাড়ীর দিকের প্রাচীরের দ্বার খোলা হইল। ক্ষিতির হাতে কুলা ও মোটা একখণ্ড পাটকাঠি। ভানুমতীর হাতে বরণডালা। তরুর হাতে আর একখানা কুলা। মনোরমা সুমন্তকে ঘুম ভাঙ্গাইয়া জাগান নাই। অতটুকু ছেলের আবার গারসী পূজা কিসের? কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিয়ে নিয়ে গেলে কান্নার রোল তুলবে। কামিনীর মা পাটকাঠির বোঝা লইল। আর বাকী সকলের হস্তে হারিকেন লণ্টন।

কুলা সশব্দে বাজিতে লাগিল, "দুমাদুম, দুমাদুম।" ঠাকুমা উলুধ্বনি দিয়া বচন ঝাড়িতে লাগিলেন, "ভূত-প্রেত দূর হ, লক্ষ্মী এস ঘরে। ভূত প্রেত দূরে যা লক্ষ্মী আসুক বাড়ীতে। আপদ-বালাই দূরে যাক লক্ষ্মী আসুক ঘরে।"

একটি শেয়াল যেমন প্রহর ঘোষণা করিবার সঙ্গে সঙ্গে সকল শেয়াল জিগির দেয়, তেমনি রায়বাড়ীর কুলার বাজনায় পাড়ায় পাড়ায় কুলা বাজিতে লাগিল। কলরোল উচ্চারিত হইল, "ভূত প্রেত দূরে যা, লক্ষ্মী এস ঘরে।"

বড় হবিষ্যি ঘরের প্রাচীরের দরজার পরে খানিকটা সমতল জমি রায়বাড়ীতে ঢোকার পায়ে-চলা পথ। পথের দুই পাশে ঝাঁকড়া বড় বড় আম-কাঁঠালের গাছ, ঝোপ-জঙ্গল। তার পরেই রায়গোষ্ঠীর আবাসগৃহ। লবঙ্গদের পাকা-কোঠা।

পথে মাঝখানে গারসী পূজার দ্রব্যসম্ভার নামানো হইল। লবঙ্গরাও কুলায় কাঠি দিতে দিতে বাহির হইয়া আসিল। কামিনীর মা পাটকাঠিতে আগুন ধরাইয়া দিল। আগুন জ্বলিতে লাগিল দাউ দাউ করিয়া। ভানুমতী বরণের ডালা হইতে প্রত্যেকটি জিনিষ অগ্নি স্পর্শ করাইতে লাগিল। পাটকাঠির ছোট ছোট জ্বলন্ত অংশ লইয়া আরম্ভ হইল ধূমপান। গারসীর পাটকাঠির ধোঁয়া গলায় গেলে সর্দ্দি-কাশি হয় না, গলার অসুখ হয় না। এমনি জাগ্রত এবং মহামূল্যবান্ সেই ধোঁয়া।

ঠাকুমা পাটকাঠিতে দুই-একটা টান দিয়া কাশিতে কাশিতে ভূতের মন্ত্র আওড়াইতে লাগিলেন—

"ভূতের বাপের বিয়ে জলার কাঁধায় বাদ্যি বাজে
তাথই থই থই থিয়া।
প্যাঁচায় চড়ে লক্ষ্মী আসেন ঘরে, ভূত পলায় ডরে।

লক্ষ্মীর হাতে ধানের বাল, মাথায় সোনার ছাতি
ভূত পালালো, জ্বালা তোরা হাজার সোলার বাতি।"

গারসী উদ্‌যাপনের নিয়ম রজনীর শেষ যামে। তখনই নাকি পথে-ঘাটে ভূত-প্রেতের মেলা বসিয়া যায়। কিন্তু কুলা পিটাইয়া পিটাইয়াও ত পূব গগনে তরুণ তপনের রক্তিম-রশ্মির আভা সূচিত হইতেছে না? ভোরের শুকতারা উজ্জ্বলতা বিকীরণ করিতেছে না দূর-দিগন্তে।

লবঙ্গ তাহাদের কুলা পিটানো শেষ করিয়া আগাইয়া আসিয়া কহিল, "কই, ভোরের লক্ষণ ত দেখছি না কোথায়? ঘড়ি দেখা হয় নি, সময়ের বোধ হয় ভুল হয়েছে।"

ঠাকুমা লবঙ্গকে দেখিতে পারিতেন না। তাহার সবজান্তা বাক্যে তিনি বিরক্ত হইতেন। একবার বক্রদৃষ্টি তাহার প্রতি নিক্ষেপ করিয়া বিড় বিড় করিতে লাগিলেন, "'পিঠে নাই চাম, রাধাকেষ্ট নাম।' ফড়-ফরানির সীমে নেই।"

সুমন্তকে একলা রাখিয়া আসিয়াছেন বলিয়া মনোরমা সেখানে আর দাঁড়াইলেন না। পূজা-আর্চার কিছু নাই, যাহা করিবার মেয়েরাই করিতেছে। ক্ষিতি চলিল মা'র পিছনে পিছনে ঘড়ি দেখিতে।

ঠাকুমা পুনরপি নাত্‌নীদের স্মরণ করাইতে বসিলেন, "তেঁতুলগুলান আধ-পোড়া করে রাখ ভাজি, কাল চানের সময় কাঁচা হলুদ বেঁটে তেলে মিশিয়ে তেঁতুল গায়ে মেখে চান করিস্। তা হ'লে শীতে গা ঠোঁট চড় চড় করবে না? সকালে উঠেই আদা কুচিয়ে ভেজা মাসকলাই, কলা, বাতাসা খেতে দিস্ সবাইকে। তা হ'লে ভূত-প্রেতের ভয় থাকে না। একখানা সোলা নিয়ে যাস্ হেমন্তের জন্যে দোতলায়, ও যেন ধোঁয়া নেয় গলায়। সন্ধ্যাবেলা আমি ওকে খুক খুক করে কাশতে দেখে-ছিলাম। পেসাদকেও দিতে হবে একখানা সোলা। মাণিকমালার হাতে দিলেই ও নিয়ে দেবেখ'ন।"

ভানুমতী ঠাকুমার বকুনিতে আজ বিরক্ত হইল না। তাহার মনে আজ দক্ষিণা বাতাসের পরশ লাগিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে ঝটিকা ও বাদলের সাহায্যে হেমন্তকে আরও কয়েকদিন এখানে থাকিতে সম্মত করিয়াছে। "জোর যার মুল্লুক তার।" ভানুমতীর প্রচণ্ড জোর।

মধুমতীর মেজাজ তেমন প্রসন্ন নয়। মামার বাড়ী হইতে ফিরিয়া তাহার স্বামী চিঠি লিখিয়াছে। "অনেক দিন বাদে পূজার কয়েক দিন মামাদের কাছে খুবই আনন্দে কাটাইয়া আসিয়াছি। আশা করি তোমরাও পূজায় বেশ আমোদ করিয়াছ। এখন তোমার এখানে আসা দরকার। তুমি নিকটে না থাকায় অসুবিধা বোধ করিতেছি। তোমাকে আনিতে আমার যাইবার উপায় নাই। তুমি সরকারকে লইয়া রওনা হইয়া আসিও। তোমার মত পাইলে তোমার এখানে আসার বিষয় শ্রীযুক্ত শ্বশুরমহাশয়কে লিখিব।"

পত্রপাঠ জামাতার শ্বশুর-কন্যা পত্রাঘাত করিয়াছে—"যে স্বামী, যে মাতুলালয়ে আনন্দে কাটাইবার সময় পায়, অথচ স্ত্রীকে লইয়া যাইবার যাহার সময় হয় না, তাহার স্ত্রী সরকার কাকার সাথে ঠেকা নৌকায় পার হইতে পারিবে না। যখন লইয়া যাইবার সময় হইবে, তখন যাইব।"

প্যাকাটির আগুন নিবিয়া আসিতেছে, পাড়ার কুলার বাজনা থামিয়া গিয়াছে। এমন সময় ক্ষিতি দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিয়া সংবাদ দিল, "এতক্ষণে রাত দুটো বাজল, আমি ঘড়ি দেখে এলাম।"

সকলে হাসিয়া অস্থির, কোথায় রাত চারটেয় গারসী জাগরণ, আর কোথায় রাত্রি দেড়টায় তাহার সূচনা।

সরস্বতী ভ্রূ বাঁকাইল, "যত অনাসৃষ্টি কাণ্ডকারখানা। শেষ রাতের কাজ দুপুর রাতে সাড়া তাড়া।"

মধুমতী বলিল, "আমাদেরই অন্যায় হয়েছিল, ঠাকুমার ডাকে ঘড়ি না দেখে বের হওয়া।"

লবঙ্গ ফর্ ফর্ করিতে লাগিল, "শুধু কি আমরা গারসী করলাম? গোটা পাড়া করল। কীর্ত্তি রইল একটা।"

ঠাকুমা পুনরায় লবঙ্গের প্রতি বিষদৃষ্টি হানিয়া বলিয়া উঠিলেন, "মনে বিষ, মুখে মধু, কত রঙ্গ জান যাদু।"

ভানুমতী প্রবল প্রতাপশালিনী, সকলের বয়সে বড়, তাহার কথার মূল্য আছে। সে সকলের সমস্যার সমাধান করিয়া দিল, "রাত চারটাই বা কি, দুটোই বা কি?

এ ত পুজো-আচ্চা নয়, মেয়েলী ব্যাপার। চিরকাল শুনে আসছি রাত-দুপুরেই নাকি ওঁনাদের বাতাস চলাচল করে। ভোরবেলার ঘুম নষ্ট না ক'রে সেরে রাখা গেল ভাল হ'ল। চল, এখন মজা করে ঘুম দেই গে।" বলিয়া ভানুমতী বরণডালা তুলিয়া লইল। ঠাকুমা উলু দিলেন। ক্ষিতি ও তরু কুলা বাজাইতে বাজাইতে বাড়ীর পথ ধরিল। সকলের মুখে এক রা, "ভূত-প্রেত আপদ বালাই, পোকা মাকড় চলে গেছে লক্ষ্মী এলেন ঘরে।"

"এস লক্ষ্মী, বস খাটে সোনার মুকুট দিয়ে মাথে।"

ক্রমশঃ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রো

শ্রীযোগনাথ মুখোপাধ্যায়

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রোর সংখ্যা কত? এই প্রশ্নের উত্তরে একটা তুলনামূলক হিসাবে বলা যায়, আফ্রিকার আটটি রাষ্ট্র ঘানা, গিনি, দাহোমে, ক্যামেরুন, চাদ, কঙ্গো-ব্রাজাভিল, সেন্ট্রাল আফ্রিকা রিপাবলিক ও গাবোঁয় যত কৃষ্ণাঙ্গ নরনারীর বাস, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রো নাগরিকের সংখ্যা তার সমান।

১৭৯০ সালে স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম লোকগণনায় দেখা যায়, সেদেশে নিগ্রোর সংখ্যা ছিল ৭,৫৭,২০৮, যার মধ্যে ক্রীতদাসের সংখ্যা ছিল ৬,৯৭,৬৮১। ঐ সময় যুক্তরাষ্ট্রে শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৩১ লক্ষ ৭২ হাজার। অর্থাৎ, তখন যুক্তরাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার ১৯.৩ শতাংশ ছিল কৃষ্ণাঙ্গ। কিন্তু ১৮০৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ক্রীতদাস ব্যবসায় আইনত নিষিদ্ধ হওয়ায় সে দেশে কৃষ্ণাঙ্গদের আসা বন্ধ হয়ে যায়। অপর পক্ষে ইউরোপ হ'তে শ্বেতাঙ্গদের আগমন শুধু যে অব্যাহত থাকে তাই নয়, তা দ্রুতহারে বৃদ্ধি পায়। ফলে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গদের সংখ্যানুপাতিক হারের দ্রুত তারতম্য ঘটতে থাকে। শতাব্দীকাল পরে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার তুলনায় নিগ্রোদের সংখ্যা কমে মাত্র নয় শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

নিগ্রো জনসংখ্যা দ্রুতহারে বৃদ্ধি না পাওয়ার অন্যতম কারণ ছিল তাদের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস এবং সে-কারণে মৃত্যুহারের আধিক্য। ১৯৫৬ সালের হিসাবেও দেখা যায়, শ্বেতাঙ্গদের মৃত্যুহার যেখানে ছিল হাজারকরা পুরুষ ১০.৮ ও নারী ৭.৮ জন, সেখানে নিগ্রোদের মৃত্যুহার ছিল হাজারকরা পুরুষ ১১.৪ ও নারী ৮.৮ জন। এক বছরের কম বয়সের শেতাঙ্গ শিশু মারা যেত পুরুষ হাজারকরা ২৯.৮ ও নারী হাজারকরা ২২.৪; সে জায়গায় কৃষ্ণাঙ্গ শিশু মারা যেত, পুরুষ হাজারে ৫৭.১, আর নারী হাজারে ৪৪.১। তবুও ১৯৬০ সালের লোকগণনায় নিগ্রোদের সংখ্যা বৃদ্ধির হার বিস্ময়কর। ১৯৫০-৬০ সালের ব্যবধানে যুক্তরাষ্ট্রে শ্বেতাঙ্গের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে ১ কোটি ৯৫ লক্ষ; আর নিগ্রোর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে ৩৫ লক্ষ অর্থাৎ '৫০-এর হিসাবের ভিত্তিতে, শ্বেতাঙ্গের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে ১৪.৪%, আর নিগ্রোর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে ২২%। আরও এক হিসাবে বলা যায়, গত এক দশকে শ্বেতাঙ্গের তুলনায় কৃষ্ণাঙ্গদের বৃদ্ধির হার প্রায় ৫০% বেশী। এটা নিঃসন্দেহে কৃষ্ণাঙ্গদের স্বাস্থ্যের ও বৈষয়িক অবস্থার অপেক্ষাকৃত উন্নতির লক্ষণ। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রোর সংখ্যা প্রায় এক কোটি আশী লক্ষ, এবং ঐ দেশের মোট জনসংখ্যার তারা এগারো শতাংশ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অশ্বেতকায় অধিবাসীদের নিগ্রো না ব'লে কৃষ্ণাঙ্গ বলাই বোধহয় অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। কারণ, নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, পবিত্র নিগ্রো রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে তাদের মধ্যে শতকরা মাত্র ২২ জনের ধমনীতে। বাকি ৭৮ জনের মধ্যে ২৭.২ জনের সঙ্গে রেড ইণ্ডিয়ানদের সংমিশ্রণ ও ৫০.৮ জনের দেহে আছে শ্বেতাঙ্গের রক্ত। যুক্তরাষ্ট্রের শতকরা ৭৮ জন নিগ্রো বর্ণসঙ্কর, যাদের বলা হয় মুলেটো।

এখনও পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণী রাজ্যগুলিতেই অধিকাংশ নিগ্রোর বাস। ১৯১০ সালের জনগণনার হিসাবে দেখা যায়, নিগ্রোদের মধ্যে শতকরা ৮৯ জন ছিল দক্ষিণী রাজ্যগুলির বাসিন্দা। দাসপ্রথা নিষিদ্ধ হওয়ার পর বহু নিগ্রো উত্তরের শিল্পাঞ্চলে চলে আসা সত্ত্বেও দক্ষিণী রাজ্যগুলিতে নিগ্রোদের সংখ্যার কোন উল্লেখযোগ্য হ্রাস ঘটেনি। ১৯৬০ সালের লোকগণনার হিসাবে দেখা যায়, মিসিসিপি রাজ্যে কৃষ্ণাঙ্গ অধিবাসীর সংখ্যা ৪৫.৪%, আলবামায় ৩২.১%, লুসিয়ানায় ৩৩%, দক্ষিণ ক্যারোলিনায় ৩৮.৯%, জর্জিয়ায় ৩০.৯%। দক্ষিণী রাজ্যগুলি থেকে কৃষ্ণাঙ্গরা সবচেয়ে বেশী এসেছে ইলিয়নিস, মিশিগান, নিউ ইয়র্ক, ওহিও ও পেনসিলভানিয়া—উত্তরের এই পাঁচটি রাজ্যে। শুধু নিউ ইয়র্ক শহরেই বর্তমানে দশ লক্ষ কৃষ্ণাঙ্গের বাস। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে এই বিপুল সংখ্যক নরনারী এইভাবে এসে উপস্থিত হওয়ায় উত্তরের রাজ্যগুলির পক্ষে তাদের জীবিকা বা বাসস্থান সমস্যার কোন সুসমাধান করা সম্ভব হয় নি। ফলে উত্তরের রাজ্যগুলিতে বর্ণবৈষম্য সমস্যা বিশেষ না থাকা সত্ত্বেও কৃষ্ণাঙ্গদের অর্থনৈতিক অসন্তোষ সে সব জায়গায় গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের কৃষ্ণাঙ্গরা প্রায় সকলেই খ্রীষ্টধর্মী, তাদের মধ্যে আবার শতকরা ৮৭ জন প্রোটেষ্টাণ্ট। ১৯৬০ সালের লোকগণনার হিসাবে দেখা যায়, কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে মুস্লিম ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা ছিল ছত্রিশ হাজার। তারা "ব্ল্যাক মুস্লিম" নামে পরিচিত। কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে দ্রুত হারে মুস্লিমধর্ম প্রসারিত হচ্ছে। বর্তমানে ব্ল্যাক মুস্লিমদের সংখ্যা লক্ষাধিক বলে মনে করা হয়। এদের সম্বন্ধে পরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হবে।

কৃষ্ণাঙ্গদের উপাধি তাদের দাস জীবনের নিষ্ঠুর সাক্ষ্য। বর্তমান কৃষ্ণাঙ্গদের পূর্বপুরুষরা যেসব শ্বেতাঙ্গের ক্রীতদাস ছিল, সেইসব শ্বেতাঙ্গদের উপাধিতেই পরিচিত হয় তারা। এ সম্বন্ধে জেমস বলডুইন নামে এক নিগ্রো লেখক তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত চাঞ্চল্যকর গ্রন্থ The Fire Next Time-এর এক জায়গায় লিখেছেন :

"Every American Negro bears a name that originally belonged to the white man whose chattel he was. I am called Baldwin because I was either sold by my African tribe or kidnapped out of it into the hands of a white Christian named Baldwin, who forced me to kneel at the foot of the Cross......this is what it means to be an American Negro—a kidnapped pagan who was sold like an animal and treated like one, who was once defined by the American Constitution as "three-fifths" of a man, and who, according to the Dred Scott decision had no right that a white man was bound to respect."

এই উদ্ধৃতিটুকু পাঠ করলেই বোঝা যায় যে, খ্রীষ্টধর্ম বা তাদের উপাধি সম্বন্ধে কি দারুণ ক্ষোভ সঞ্চিত হয়ে আছে যুক্তরাষ্ট্রের কৃষ্ণাঙ্গদের মনে। মুস্লিম ধর্মপ্রচারকদের তড়িৎ সাফল্যের কারণ এই বিক্ষোভের মধ্যেই লুকিয়ে আছে। যে সকল মার্কিন কৃষ্ণাঙ্গ খ্রীষ্টধর্ম ত্যাগ করে মুস্লিম ধর্মে দীক্ষিত হচ্ছে তারা সকলেই উপাধি বর্জন করে নামের শেষে লিখেছেন X। যেমন ব্ল্যাক মুস্লিম দলের সহকারী নেতা পরিচিত Malcolm X নামে। খ্রীষ্টধর্মী কৃষ্ণাঙ্গরাও সব সময়ে তাদের ধর্মবিশ্বাসের কথা উল্লেখ করে না।

নিগ্রোদের আগমনের ইতিহাস

নিগ্রোরা কিন্তু আমেরিকায় প্রথম দিনই ক্রীতদাস হয়ে আসে নি। নতুন মহাদেশে তারা প্রথমে এসেছিল কলম্বাস, বলবোয়া, কোর্টিস, পিজারো প্রমুখ প্রখ্যাত অভিযাত্রীদের সঙ্গী হয়ে, এবং সে সব অভিযানে তাদের ভূমিকা খুব অনুল্লেখ্য ছিল না। তাদের মধ্যে এস্টেভানিকো বা ছোট ষ্টিফেন বলে একজনের বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগের অভ্যন্তরে প্রবেশে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ষোড়শ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত এমন অনেক নিগ্রো বাস করত আমেরিকায় বা ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে, যারা ক্রীতদাস ছিল না।

ক্রীতদাসরূপে আমেরিকায় নিগ্রোদের আসা সুরু হয় ১৫১৭ সালে, যখন প্রত্যেক স্পেনীয়কে সরকারীভাবে ১২ জন পর্যন্ত নিগ্রো ক্রীতদাস আমেরিকায় নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। ১৫৪০ সালের হিসাবে দেখা যায় তখন বছরে প্রায় ত্রিশ হাজার নিগ্রো ক্রীতদাস চালান আসত আমেরিকায়।

উত্তর আমেরিকার ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিতে প্রথম ক্রীতদাস আসে ১৬১৯ সালে, ভার্জিনিয়ায়। ভার্জিনিয়ায় তামাকের চাষে অনেক শ্রমিকের প্রয়োজন হওয়ায় প্রথমে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ থেকে একদল কৃষ্ণাঙ্গকে নিয়ে আসা হয়। তারা কিন্তু ঠিক ক্রীতদাস ছিল না। বাধ্যতামূলক শ্রমদানের চুক্তিতে তাদের নিয়ে আসা হয় এবং ঐ চুক্তির মেয়াদ ছিল সাধারণত পাঁচ থেকে সাত বছর। এই বাধ্যতামূলক শ্রমদান চুক্তি (indentured servitude) স্বাক্ষর করে ইউরোপ থেকে অনেক শ্বেতাঙ্গও ঐ সময় আমেরিকায় আসত। আমেরিকায় আসার আর্থিক সামর্থ্য যাদের ছিল না তারাই ঐ ভাবে আসত এবং পাঁচ সাত বছর দাসরূপে কাজ করার পর তারা মুক্তি পেত। মুক্তির পর ঐ শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিকরা স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করত এবং ক্রমে তারাও এক একজন বড় বড় খামারের মালিকে পরিণত হ'ত। তখন তারাও আবার তাদের খামারের প্রয়োজনে ক্রীতদাস সংগ্রহ করত। এন্টনি জনসন ব'লে একজন কৃষ্ণাঙ্গ খামারের মালিকের শ্বেতাঙ্গ ক্রীতদাস পর্যন্ত ছিল এবং একজন দাসের উপর জীবনস্বত্বের দাবি জানিয়ে ঐ ব্যক্তিটিই সর্বপ্রথম ভার্জিনিয়ার আদালতে মামলা দায়ের করে। কিন্তু কফি, তামাক, চিনি ও পরে তুলার চাষে প্রচুর শ্রমিকের প্রয়োজন হওয়ায় ক্রীতদাসদের চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায় এবং তখনই অরণ্য-আবৃত আদিম আফ্রিকায় দলে দলে হাজির হয় মানুষ ধরার দল।

১৮০৮ সালে দাসব্যবসায় নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে পর্যন্ত কত নিগ্রোকে আফ্রিকা থেকে ধরে আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে হাজির করা হয় তার কোন হিসাব নেই। তবে ন্যূনতম হিসাবেও সে সংখ্যা দেড় কোটির কম নয়।

এর মধ্যে যারা বাধা দিতে গিয়ে নিহত হয়েছে বা গ্রেপ্তার হওয়ার পর আত্মহত্যা করে ঘৃণিত দাসজীবনের অবসান ঘটিয়েছে, বা শৃঙ্খলিত অবস্থায় তিন হাজার মাইল বিস্তৃত অতলান্তিক মহাসাগরের বুকে পাড়ি দেওয়ার কালে ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় প্রাণ হারিয়েছে, তাদের ধরা হয় নি।

ঐসব হতভাগ্য ক্রীতদাসদের উপর দুই শতাব্দীরও অধিককাল যে ভয়ংকর নির্যাতন হয়েছে, সভ্য জগতের ইতিহাসে তার তুলনা খুব বেশী নেই। কোন ক্রীতদাসই মালিকের অনুমতি ছাড়া কোন খামার ত্যাগ করতে পারত না। খুন বা ধর্ষণের অভিযোগে ধৃত ক্রীতদাসদের সকল ক্ষেত্রেই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হ'ত। ডাকাতি বা অপেক্ষাকৃত লঘু অপরাধে অভিযুক্তদের বেত মারা হ'ত অথবা কোন প্রত্যঙ্গ ছিন্ন ক'রে দেওয়া হ'ত। অথচ মালিকরা ক্রীতদাস রমণীদের উপর ধর্ষণ করলে বা অত্যাচার করলে সেটা কোন অপরাধ বলে মনে করা হ'ত না। নিজের স্ত্রীপুত্রের উপর ভয়াবহ নির্যাতন অসহায় ক্রীতদাসরা চোখের সম্মুখে ঘটতে দেখত কিন্তু তার কোন প্রতিবাদ জানাতে পারত না। সেই ভয়ংকর দিনগুলির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলডুইন তাঁর গ্রন্থের এক জায়গায় বলেছেন:

"The Past, the Negro's Past, of rope, fire, tortures, castration, infanticide, rape, death and humiliation; fear by day and night, fear as deep as the marrow of the bone; doubt that he was worthy of life, since every one around him denied it; sorrow for his women, for his kinsfolk, for his children, who needed his protection and whom he could not protect; rage, hatred and murder, hatred with white men so deep that it often turned against him and his own, and made all love, all trust, all joy impossible."

এই ভয়াবহ চিত্রের ব্যতিক্রমও অবশ্য ছিল। কিছু কিছু শ্বেতাঙ্গ মালিকের মনোভাব এ ব্যাপারে খুবই উদার ছিল। বিশেষ করে তাদের ঔরসজাত সন্তানদের প্রতি তাদের ব্যবহার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সহৃদয় হ'ত। যদিও এমন পিশাচেরও অভাব ছিল না যারা নিগ্রো ক্রীতদাসীদের গর্ভে নিজ ঔরসজাত সন্তানদের অন্য খামারের মালিকদের কাছে ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করতে দ্বিধাবোধ করত না। কিন্তু এ ব্যাপারে যারা উদার ছিল তারা ঐসব সন্তানদের অনেক সময় আইন লঙ্ঘন করেও লেখাপড়া শেখাত বা তাদের মুক্ত করে অনেক দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত করত, অথবা উচ্চতর শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে উত্তরের রাজ্যগুলিতে পাঠিয়ে দিত।

মুক্তির পরে

ঠিক একশ' বছর আগে মহান রাষ্ট্রপতি লিঙ্কনের ঐকান্তিক প্রয়াসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষ্ণাঙ্গদের দুর্ভাগ্যজনক দাসজীবনের অবসান হয়। এই একশ' বছরে কি পরিবর্তন ঘটেছে তাদের রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে? এ প্রসঙ্গ আলোচনা কালে বলডুইন তাঁর গ্রন্থে সক্ষোভে বলেছেন:

"And today, a hundred years after his technical emancipation, he remains, with possible exception of the American Indians—the most despised creature in his country."

বলডুইন অসত্য উক্তি করেন নি বা তা অতিরঞ্জিতও নয়। কিন্তু তবুও বিষয়টি আলোচনাসাপেক্ষ।

নিগ্রোদের শিক্ষাব্যবস্থা

যুক্তরাষ্ট্রের সব রাজ্যে সাত থেকে চৌদ্দ বছরের ছেলেমেয়েদের স্কুলে যাওয়া বাধ্যতামূলক। কোন কোন রাজ্যে আবার ষোল বছর বয়সের আগে স্কুল ছাড়ার অনুমতি নেই। শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গ সকলের ক্ষেত্রেই এই আইন। ১৯৫৭ সালের পরিসংখ্যান-তত্ত্বে দেখা যায় যে, গ্রামের স্কুলগুলিতে শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গ শিক্ষার্থীর সংখ্যানুপাতিক হার প্রায় সমান। হাই স্কুলের শিক্ষার্থীদের মধ্যেও শ্বেতাঙ্গদের সংখ্যানুপাতিক হার দশ শতাংশের বেশী নয়। একমাত্র কিণ্ডারগার্টেন এবং কলেজেই শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় কৃষ্ণাঙ্গ শিক্ষার্থীদের সংখ্যানুপাতিক হার কিছুটা কম।

১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের পরিসংখ্যান-তথ্যে দেখা যায়—শ্বেতাঙ্গ শিক্ষার্থীদের তুলনায় কৃষ্ণাঙ্গ শিক্ষার্থীদের সংখ্যানুপাতিক হার নিম্নরূপ:

৫-৬ বছর বয়সে ৯৪%; ৭-১৩ বয়সে ৯৮%; ১৪-১৭ বয়সে ৯৪%; ১৮-১৯ বয়সে ১০৬% (বালক ৮৮% ও বালিকা ১৩০%); ২০-২৪ বয়সে ৬০%; ২৫-২৯ বয়সে ৮১%; ৩০-৩৪ বয়সে ৬৩%। এই হিসাব থেকে নির্ভয়ে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, একমাত্র শৈশব শিক্ষায় ও স্নাতকোত্তর শিক্ষায় নিগ্রোরা শ্বেতাঙ্গ শিক্ষার্থীদের তুলনায় এখনও কিছুটা পেছিয়ে আছে।

উত্তরের তুলনায় দক্ষিণী রাজ্যগুলিতে পৃথকীকরণ ব্যবস্থা অনেক বেশী কঠোর। সেখানেও দেখা যায়,

১৯৫২-৫৩ সালে যেখানে নিগ্রো শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২৪,৫৫,০০০, সাত বছর পরে ১৯৫৯-৬০ সালে সে সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৩০,৫৭,৫৯০। ১৯৫৯ সালের অক্টোবর মাসে দক্ষিণের রাজ্যগুলির বর্ণবৈষম্য-বর্জিত (integrated) বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে ২৫ লক্ষ শ্বেতাঙ্গ শিক্ষার্থীর সঙ্গে একাসনে ব'সে শিক্ষাগ্রহণ করে ৫ লক্ষ ১৮ হাজার কৃষ্ণাঙ্গ শিক্ষার্থী।

১৯৫২-৫৩ সালে নিগ্রোদের জন্য নির্দিষ্ট দক্ষিণের প্রাক্-স্নাতক বিদ্যালয়গুলিতে উচ্চ শিক্ষার্থী নিগ্রো ছাত্রের সংখ্যা ছিল ৪৯ হাজার, ১৯৬০ সালে ঐ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৯৫ হাজার ; ঐ বছর স্নাতক উপাধি লাভ করে দশ হাজার নিগ্রো ছাত্র। নিগ্রোদের জন্য নির্দিষ্ট স্নাতক ও কারিগরি শিক্ষালয়গুলিতে ১৯৪৭ সালে ছাত্রের সংখ্যা ছিল ৯৭০ ; ১৯৬০ সালে ঐ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় তিন হাজার।

এ পর্যন্ত পর পর অনেকগুলি মামলায় যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত এটা পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, শিক্ষালয়ে পৃথকীকরণ যুক্তরাষ্ট্রের আইন ও নীতিবিরোধী। এ সম্বন্ধে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বিচার বিভাগের বক্তব্য— বিচার বিভাগ নিজের থেকে কোন বিদ্যালয়কে বলতে পারেন না যে, তাকে পৃথকীকরণ ব্যবস্থা রদ করতেই হবে। আদালতের তা বিচার্য, বিচার বিভাগের নয়। কিন্তু যেখানে আদালত আদেশ দিয়েছেন যে কোন নির্দিষ্ট বিদ্যালয়ে পৃথকীকরণ ব্যবস্থা রদ করতে এবং যদি সেই আদেশ মান্য করা না হয়, তবে সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে বিচার বিভাগ অবশ্যই ব্যবস্থাবলম্বন করেছেন।

এ সম্বন্ধে প্রেসিডেণ্ট কেনেডির ভাই ও যুক্তরাষ্ট্রের এটর্নী জেনারেল রবার্ট এফ কেনেডি বলেছেন— আমাদের হিংসাত্মক কার্যকলাপের সম্মুখীন হতে হবে ; আমাদের অসুবিধা ও হাঙ্গামার সম্মুখীন হতে হবে। একশ' বছরেরও বেশী কাল ধরে যে সব প্রথা, সংস্কার চলে এসেছে, তা আজ ভেঙে ফেলা হচ্ছে এবং এই ভাঙার কাজ যখন চলবে, হাঙ্গামার গণ্ডগোল তখন হবেই। কিন্তু আমি মনে করি, গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হ'ল যে, সরকার এবং মার্কিন জনগণ এক্ষেত্রে স্থিতাবস্থা মেনে নিতে প্রস্তুত নয়।

বৃত্তির ক্ষেত্রে বৈষম্য

বৃত্তির ক্ষেত্রে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গদের নিয়োগ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সমাজ ও অর্থনীতির বিচারে যেগুলি নিম্ন শ্রেণীর কাজ, নিগ্রোদের ভিড় এখনও পর্যন্ত সেখানেই বেশী। দিনমজুর, গৃহভৃত্য ও পরিচারক, ক্ষেত-মজুর, কুলি, মিস্ত্রি প্রভৃতির কাজগুলিতে শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় নিগ্রোদের নিয়োগ অনেক বেশী। আবার উচ্চতর বৃত্তিগুলির ক্ষেত্রে অবস্থা ঠিক তার বিপরীত। ১৯৫৮ সালের বৃত্তির পরিসংখ্যান তথ্য বিশ্লেষণ করলেই এই বৈষম্য ভালভাবে বোঝা যায়। ঐ বছর উভয় সমাজের কত শতাংশ লোক কোন্ কাজে নিযুক্ত ছিল তার কয়েকটি তথ্য এখানে দেওয়া হ'ল :

	বৃত্তি	শ্বেতাঙ্গ	কৃষ্ণাঙ্গ
১	অধ্যাপক, সাংবাদিক, হিসাব-পরীক্ষক, শিল্পী, গ্রন্থকার, গায়ক, ইঞ্জিনীয়ার প্রভৃতি (Professional, technical and kindred works)	১১·৯	৪·৩
২	খামার-মালিক ও পরিচালক	৫·১	৪·১
৩	ম্যানেজার ও পদস্থ কর্মচারী	১১·৫	২·৫
৪	কেরাণীবৃত্তি ও অফিসের কাজ	১৫·৩	৬·০
৫	সেলসম্যান	৭·১	১·৪
৬	ক্রাফ্‌টসম্যান, ফোরম্যান ইত্যাদি	১৪·৩	৫·৫
৭	বাস ড্রাইভার ও বিভিন্ন পেশায় শিক্ষানবিশ	১৭·২	২০·২
৮	গৃহভৃত্য ও পরিচারক	২·৩	১৬·৩
৯	কুলি মজুর	৭·৭	১৮·০
১০	ক্ষেতমজুর, সর্দার	৩·০	৭·২
১১	খনি খামারের বাইরে মজুর	৪·৬	১৪·৫

১৯৬০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে শ্বেতাঙ্গ পরিবারগুলির তুলনায় কৃষ্ণাঙ্গ পরিবারগুলির গড় আয় ছিল ৫৩ শতাংশ। উত্তর ও উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতে ছিল ৬৭ শতাংশ ও দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে নীচের দিকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত।

বিদ্যা, বুদ্ধি ও দক্ষতার কাজে নিগ্রোদের সংখ্যাল্পতার প্রধান কারণ নিঃসন্দেহে দীর্ঘায়ুস্থত বর্ণবৈষম্য। এতদিন পর্যন্ত একই বিদ্যা-বুদ্ধি ও দক্ষতা নিয়ে একটি কৃষ্ণাঙ্গ ও একটি শ্বেতাঙ্গ যুবক কোন কাজের প্রার্থী হ'লে শ্বেতাঙ্গ মালিকরা প্রায় সর্বক্ষেত্রেই শ্বেতাঙ্গ প্রার্থীটিকে মনোনীত করেছে। কিন্তু উপযুক্ত বিদ্যা-বুদ্ধি ও কর্মক্ষমতার অভাবও বৃত্তির ক্ষেত্রে নিগ্রোদের এই অনগ্রসরতার জন্য অনেকাংশে দায়ী। একশ' বছর আগে নিগ্রোদের যখন দাসজীবনের অবসান ঘটে তখন অধিকাংশ নিগ্রোই খামারের কাজের বাইরে অন্য কিছুই প্রায় জানত না। অধিকাংশই ছিল নিরক্ষর, তাদের পুত্ররাও ছিল শিক্ষার সুযোগ হ'তে

বঞ্চিত। এ কারণে ক্রীতদাসপ্রথার অবসান সত্ত্বেও পঞ্চাশ-ষাট বছরের মধ্যে বৃত্তির ক্ষেত্রে বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে নি। পরিবর্তন যেটুকু ঘটেছে তা সবই ঘটেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। এবং এই পরিবর্তন দ্রুত হারে ঘটে যাবে, কারণ নিগ্রো বালকরা এখন সকলেই ছাত্র, এবং যুক্তরাষ্ট্র হতে বর্ণ-বৈষম্যের লজ্জাকর ব্যবস্থাও দ্রুত হারে লোপ পাচ্ছে।

১৯৫০-৫৮ সালের পরিবর্তন লক্ষ্য করলে দেখা যায়, চাষী ও ক্ষেতমজুররূপে নিগ্রোদের সংখ্যা ঐ আট বছরে কমেছে যথাক্রমে ৫৫ ও ২১ শতাংশ। সে জায়গায় 'প্রফেশনাল ও টেকনিক্যাল ওয়ার্কার্সে' ঐ সময়ে নিগ্রো-দের সংখ্যাবৃদ্ধি হয়েছে ৪৯ শতাংশ, কেরাণীবৃত্তিতে ৬৯ শতাংশ, সেলস ওয়ার্কারের কাজে ২৪ শতাংশ, ক্র্যাফটস-ম্যানের ক্ষেত্রে ২০ শতাংশ, বিভিন্ন কারিগরী বিদ্যায় শিক্ষানবিশীর ক্ষেত্রে ১২ শতাংশ, অন্যান্য ছোটখাটো বৃত্তিতে ২০ শতাংশ, কলকারখানার কাজে ১২ শতাংশ।

অপর পক্ষে ১৯৪০ সালে যেখানে গৃহভৃত্য ও পরি-চারকের কাজে নিগ্রো নিযুক্ত ছিল ৪৮·১ জন, ১৯৫৮ সালে সে সংখ্যা কমে হয়েছে ৪৩·৮ জন। এমনি ভাবে ঐ সময়ের ব্যবধানে ক্ষেতমজুরদের মোট সংখ্যাতেও নিগ্রোদের ২৬·৬ থেকে কমে হয়েছে ২১·১।

১৯৬০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে নিগ্রো সদস্য ছিলেন চারজন, ডিষ্ট্রিক্ট ফেডারেল কোর্টের তিনজন বিচারপতি-সহ মোট বিচারপতির সংখ্যা ছিল ১২, ক্লীভল্যাণ্ড ও সানফ্রান্সিস্কোয় ফেডারেল সরকারের পক্ষে প্রধান ব্যবহারজীবীরা নিগ্রো। এ ছাড়াও নিগ্রো সমাজের মধ্যে আছেন নিউইয়র্ক শহরের বরো প্রেসিডেন্ট, একটি রাজ্যের কম্পট্রোলার, একজন সিটি এটর্ণী, বিভিন্ন রাজ্যে আইনসভার সদস্য, সিটি কাউন্সিলের সদস্য ও স্কুলবোর্ডের সদস্য। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের হাউসিং এণ্ড হোম ফাইনান্স এজেন্সীর ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত আছেন একজন নিগ্রো, নাম রবার্ট সি উইভার।

বর্তমানে নিগ্রোদের মালিকানাভুক্ত ও পরিচালিত ব্যাঙ্কের সংখ্যা ১৩টি, তাদের নিজস্ব সঞ্চয় ও ঋণসংস্থা আছে ২০টি, জীবনবীমা কোম্পানী আছে ৬৫টি এবং তাতে নিয়োজিত মোট অর্থের পরিমাণ ২৫ কোটি ডলার।

বিভিন্ন উচ্চ পর্যায়ের বৃত্তিতে নিগ্রোদের নিয়োগ এই ভাবে বেড়ে চলায় বিভিন্ন বিপণি ও পণ্যশালায় তাদের খরিদ্দাররূপে আকর্ষণ ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রধানত এই অর্থনৈতিক কারণেই আজ শ্বেতাঙ্গ-পরিচালিত বিপণি ও পণ্যশালাগুলিতে বর্ণবৈষম্য দ্রুত হারে লোপ পাচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্র সরকারের উদ্যম

বর্ণবৈষম্য লোপের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসনে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের হস্ত-ক্ষেপের পথে সবচেয়ে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা সংবিধান। প্রায় দু'শ' বছর আগে রচিত যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা এত সীমিত যে, আটঘাট না বেঁধে রাজ্যসরকারগুলির কার্যকলাপে হাত দিতে গেলেই কেন্দ্রীয় সরকারকে সংবিধান-বিরোধী আচরণের দায়ে পড়তে হয়। সুতরাং সংবিধান পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত, এবং যা পরিবর্তিত হওয়া প্রায় অসম্ভব ঘটনা (কারণ যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে পবিত্র দলিল তার সংবিধান) পৃথকীকরণের অবসানের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের রাজ্যসরকারগুলির শুভবুদ্ধির উপর বহু পরিমাণে নির্ভর করা ভিন্ন উপায় নেই। এ ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র সরকার উত্তরের রাজ্যগুলির যে সহযোগিতা পেয়েছেন, দক্ষিণের রাজ্যগুলির কাছে তা পান নি।

তবুও যুক্তরাষ্ট্র সরকার অপেক্ষা করে থাকেন নি। কেন্দ্রীয় সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত যাবতীয় বিষয়গুলি হতেই প্রায় পৃথকীকরণ ব্যবস্থার অবসান ঘটানো হয়েছে। প্রেসিডেন্ট কেনেডির শাসনকালে ২০০টিরও বেশী রেলসড়ক টার্মিনাসে, ১০০টিরও বেশী বাস টার্মিনাসে এবং ১৫টি বিমানবন্দরে পৃথকীকরণ ব্যবস্থার অবসান ঘটানো হয়েছে।—এবং যে কথার পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের এটর্ণী জেনারেল রবার্ট কেনেডি সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, যত অসুবিধা হোক, যত হাঙ্গামার সম্মুখীন হ'তে হোক, বর্ণবৈষম্যের অবসান ঘটাতে যুক্তরাষ্ট্র সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

যুক্তরাষ্ট্র সরকারের এই ঘোষণা যে, শুধু কথার কথা নয় এবং এক শ্রেণীর উদ্ধত শ্বেতাঙ্গের প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েই কেনেডি সরকার যে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র ও সমাজ-জীবনের সবচেয়ে কলঙ্কজনক অধ্যায়ের অবসান ঘটাতে চান তার প্রমাণ পাওয়া গেছে প্রথমে মিসিসিপিতে, পরে আলবামায়। তারপরেই পরলোকগত প্রেসিডেন্ট কেনেডি কংগ্রেসের নিকট প্রেরিত এক বাণীতে জানান, বর্ণবৈষম্য ব্যবস্থার স্থায়ী অবসানকল্পে একটি কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

প্রেসিডেন্ট কেনেডির ১৯শে জুনের ঐ ঘোষণায় বলা হয়—হোটেল, রেস্তোরাঁ, প্রমোদভবন, স্কুল, কলেজ ও

অন্যান্য সাধারণ প্রতিষ্ঠানে বর্ণবৈষম্য বে-আইনী ঘোষণা করতে হবে। নিগ্রোদের মধ্যে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটিয়ে ও তাদের মানবিক শক্তি উদ্বুদ্ধ করে তাদের বেকারত্বের পূর্ণ অবসান ঘটাতে হবে। সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিগ্রোদের প্রতি যাবতীয় অবিচার আইন করে নিষিদ্ধ করতে হবে।

আইন এখনও কংগ্রেসে উত্থাপিত হয় নি এবং এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, আইন পাশ করার সময় যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে দুরতিক্রম্য বাধার সম্মুখীন হ'তে হবে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র সরকার এ বিষয়ে এখনও অবিচল এবং পররাষ্ট্রসচিব ডীন রাস্ক বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সুনাম বজায় রাখার জন্যেই তাকে এই কলঙ্কজনক অধ্যায়ের অবসান ঘটাতে হবে। নিগ্রো আন্দোলনের নেতা মার্টিন লুথার কিং, জেমস বলডুইন, ঔপন্যাসিক জন অলিভার কিলেনস প্রভৃতির সঙ্গে পরলোকগত প্রেসিডেন্ট কেনেডি, রবার্ট কেনেডি, ডীন রাস্ক প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ব্যাপকভাবে আলোচনা সুরু হয়ে গেছে ব'লে জানা গিয়েছিল।

কিন্তু নিগ্রোদের অধিকার অর্জনের আন্দোলন আজ এমনই বেপরোয়া হয়ে উঠেছে যে অনতিবিলম্বে যুক্তরাষ্ট্র সরকার যদি কোন বৈপ্লবিক ব্যবস্থাবলম্বন না করেন তবে হয়ত সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রব্যাপী এক রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ সুরু হয়ে যাবে।

এখন যুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রো আন্দোলন দু'টি পথ ধরে চলেছে। একটি পথ ব্যাপক গণআন্দোলন ও অসহযোগের, অপরটি সন্ত্রাসের। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সংগঠক 'ব্ল্যাক মুশ্লিম' সমাজ, যারা শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে কোন বিষয়েই আপোষ করতে প্রস্তুত নয়। এই সংগঠনটি প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণের শ্বেতাঙ্গ সন্ত্রাসবাদী সংগঠন কুক্লাক্সক্লানের কৃষ্ণাঙ্গ সংস্করণ। এদের সম্বন্ধে একটু বিস্তৃতভাবে জানা দরকার।

ব্ল্যাক মুশ্লিম

যুক্তরাষ্ট্রে ব্ল্যাক মুশ্লিমদের সংখ্যা এখন নিঃসন্দেহে লক্ষাধিক, সমর্থকদের ধারণা প্রায় দুই লক্ষের কাছাকাছি। শ্বেতবর্ণ ও খ্রীষ্টধর্মের প্রতি তাদের তীব্র বিদ্বেষ। তাদের ধর্মগুরু এলিজা পুল, জর্জিয়াবাসী ৬৫ বছর বয়স্ক এক মুলেটো। মাত্র এগারো বছর বয়সে তিনি শ্বেতাঙ্গ বালিকা ধর্ষণের দায়ে অভিযুক্ত এক নিগ্রো যুবকের নিষ্ঠুর মৃত্যু প্রত্যক্ষ করেন। গাছে ঝুলিয়ে শ্বেতাঙ্গরা তাকে গুলীবিদ্ধ ক'রে হত্যা করে। বাপ্টিষ্ট ধর্মযাজকের বালকপুত্র এলিজা সেইদিনই শপথ নেন, যদি কখনও মানুষ হতে পারেন তবে এই অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেবেন।

আজকের ব্ল্যাক মুশ্লিম সমাজ এলিজার সেই দুর্জয় শপথের ফলশ্রুতি। এলিজা ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন ১৯৩৪ সালে ও সেই সময় তাঁর 'দাস-উপাধি' পুল বর্জন করে নাম গ্রহণ করেন এলিজা মহম্মদ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এলিজা তাঁর কয়েকজন সহকর্মীসহ দীর্ঘকাল কারারুদ্ধ থাকেন, আর সেই কারাগারেই প্রথম উচ্চারিত হয় ব্ল্যাক মুশ্লিম সমাজের মূলমন্ত্র 'বিচ্ছেদ অথবা মৃত্যু' (separation or death)। সমগ্র কৃষ্ণাঙ্গ সমাজকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা ও যুক্তরাষ্ট্রের এক-সপ্তমাংশ স্থান নিয়ে একটি স্বতন্ত্র মুশ্লিম রাজ্য গঠন করা তাদের ব্রত। শ্বেতাঙ্গ সমাজের সঙ্গে কোন সম্পর্ক তাদের নেই, কারণ তাদের শত্রু বলে মনে করে তারা। এখনও পর্যন্ত অশিক্ষিত, অপরাধপ্রবণ, বেপরোয়া কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যেই তাদের কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ, কিন্তু ব্ল্যাক মুশ্লিম সমাজের কর্মকর্তারা বিশ্বাস করেন, শিক্ষিত কৃষ্ণাঙ্গরাও শেষ পর্যন্ত তাদের সঙ্গে যোগ দেবেন। এই শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র কৃষ্ণাঙ্গ সমাজ ইসলামধর্মে দীক্ষিত হবে এবং এই শতাব্দীতেই প্রতিষ্ঠিত হবে তাদের স্বতন্ত্র ধর্মরাজ্য। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে ব্ল্যাক মুশ্লিমদের মসজিদও মিশনের সংখ্যা এখন প্রায় সত্তর, এবং তাদের তিনটি ঘাঁটি জেলখানায়।

ব্ল্যাক মুশ্লিম সমাজের আর্থিক সামর্থ্য যথেষ্ট। তাদের নিজস্ব পত্রপত্রিকা আছে, বড় অর্থভাণ্ডার আছে, স্বতন্ত্র কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্র আছে এবং সবচেয়ে বড় কথা, আছে স্বতন্ত্র অর্থনীতি। প্রায় কোন ব্যাপারেই তারা শ্বেতাঙ্গদের উপর নির্ভরশীল নয়। তাদের দোকানপাট, হাটবাজার এমনকি খেতখামার সব আলাদা। যে কোন কৃষ্ণাঙ্গ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেই সে মুশ্লিম সমাজের কাছে পায় খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, জীবিকা। ব্ল্যাক মুশ্লিম সমাজের শৃঙ্খলাবোধও উল্লেখযোগ্য। তাদের কিশোর ও যুবক সমাজের সততা ও শিষ্টাচার শ্বেতাঙ্গ সমাজেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের নাৎসী পার্টির সঙ্গে ব্ল্যাক মুশ্লিমদের খুব সৌহার্দ্য এবং নাৎসীদের অনুকরণেই তাদের যুবসমাজ সুসংবদ্ধ, নাৎসী জার্মাণীর ষ্টর্ম ট্রুপার তাদের আদর্শ। যুক্তরাষ্ট্রের নাৎসী পার্টির নেতা রকওয়েল প্রায়ই সদলবলে ব্যাক মুশ্লিমদের সভায় উপস্থিত থাকেন। এলিজা মহম্মদ এখন আর বিশেষ সভা শোভাযাত্রায়

উপস্থিত থাকেন না, তাঁর স্বাস্থ্য বর্তমানে খুব ভাল নয়। তাই তাঁর সহকর্মী ম্যালকোম এক্স (বেশ্যালয়ের প্রাক্তন দালাল ও চোর—এ পরিচয় তিনি গর্বের সঙ্গেই দেন) এখন দলের নেতৃত্ব করেন। নিউইয়র্ক মসজিদের তিনি পরিচালক, সুবক্তারূপে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি। তাঁর ব্যক্তিগত মধুর ব্যবহার তাঁর জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ।

ক্রমবর্ধমান এই ব্ল্যাক মুস্লিম সমাজ আজ যুক্তরাষ্ট্রের শ্বেতাঙ্গ সমাজের ত্রাস। কুক্লাক্স ক্লানের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপও আজ এদের জন্যে অনেকটা সংযত। কিন্তু সন্ত্রাসবাদে আশু উদ্দেশ্য কিছু সিদ্ধ হলেও তা যে কোন সামাজিক বা রাজনৈতিক সমস্যার প্রকৃত সমাধান নয়, এটা ইতিহাস-পরীক্ষিত সত্য। একারণে কৃষ্ণাঙ্গ সমাজের শিক্ষিত মহলে ব্ল্যাক মুস্লিম সমাজের কর্মসূচী ও চিন্তাধারা কোন সাড়া জাগাতে পারে নি। তাই তাদের আন্দোলন চলেছে গণতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ করে, এবং গান্ধীজীর অহিংসা ও অসহযোগই তাদের আন্দোলনের মূলমন্ত্র।

গণ-আন্দোলনের ব্যাপক প্রস্তুতি

দক্ষিণের আন্দোলন আজ সারা যুক্তরাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়েছে। কৃষ্ণাঙ্গ সমাজের পূর্ণ মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত সে আন্দোলন কিছুতেই থামবে না। প্রেসিডেণ্ট কেনেডি ও এটর্ণী জেনারেল রবার্ট কেনেডি এবং পররাষ্ট্র-সচিব ডীন রাস্কের সঙ্গে নিগ্রো নেতাদের ঘন ঘন বৈঠক বসছিল, কিন্তু তারপরেই বিরাট জনসভায় ভাষণ দিয়ে নিগ্রো নেতারা জনগণকে সতর্ক করে দিচ্ছিলেন, শুধু আলাপ আলোচনা ও বৈঠক থেকে তাঁরা যেন খুব বেশী ফললাভের প্রত্যাশা না করেন। সংগ্রাম ছাড়া অধিকার অর্জনের অন্য কোন পথ নেই।

সভা, শোভাযাত্রা, অসহযোগ, বিক্ষোভ, যাবতীয় শ্বেতাঙ্গ প্রতিষ্ঠানে অবস্থান ধর্মঘট আজ ফিলাডেলফিয়া, বোষ্টন, শিকাগো, সানফ্রান্সিস্কো, ডেট্রইট, নিউইয়র্ক প্রমুখ যুক্তরাষ্ট্রের বড় শহরগুলির প্রতিদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ওহিও রাজ্যের ডেটন শহরে গত ৩০শে জুন নিগ্রোদের অন্যতম জাতীয় সংগঠন 'কংগ্রেস অফ্ রেসিয়াল ইউনিটি'র বাৎসরিক সম্মেলনে ভাষণদানকালে ঐ সংগঠনের জাতীয় পরিচালক জেমস ফার্মার সকলকে সতর্ক করে বলেন, এবারের গ্রীষ্মকাল হবে অতি দীর্ঘ।

নিগ্রো ঔপন্যাসিক জন অলিভার কিলেনস, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিগ্রো সৈনিকদের প্রতি অবিচারের কাহিনী নিয়ে রচিত যাঁর সাম্প্রতিক গ্রন্থ 'And Thus We Heard the Thunder' যুক্তরাষ্ট্রের চিন্তাশীল মহলে রীতিমত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। তিনি সম্প্রতি মিসিসিপি- আলবামার এক জনসভায় বলেছেন, কর্তৃপক্ষের অনুরোধ ও চাপ সত্ত্বেও আমরা যেন সভা শোভাযাত্রা ও বিক্ষোভ প্রদর্শন বন্ধ না করি। এখন থামার অর্থ হবে জয়ের মুহূর্তে মুষ্টিযোদ্ধার মুষ্টিসংবরণ করা। উত্তরে আমরা যে অধিকার অর্জন করেছি, দক্ষিণের নিগ্রোরা এখন তার জন্যে সংগ্রাম করছে। কিন্তু উত্তরেও আমাদের প্রতি অবিচার কম নয়। আইনত না হ'লেও কার্যত উত্তরেও আমাদের প্রতিদিন জীবিকার ক্ষেত্রে, বিদ্যালয়ে, বাড়ীভাড়ার ব্যাপারে বর্ণ-বিদ্বেষের অপমান সহ্য করতে হয়। তাই আজ এমন সংগঠন আমাদের গড়ে তুলতে হবে যার প্রচণ্ডতা শ্বেতাঙ্গদেরও উপলব্ধি হবে।

গণতান্ত্রিক বিশ্বের অগ্রনায়ক যুক্তরাষ্ট্র যে আজ এক ঐতিহাসিক পরীক্ষার সম্মুখীন, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

পশ্চাৎপট

শ্রীসুনন্দা মুখোপাধ্যায়

আজ ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই কমলিকার মনে পড়ল আর সাতদিন পরে তার বিয়ে। ঘরের চারপাশে ভাল করে তাকাল। বিরাট্ খাট জুড়ে প্রকাণ্ড বিছানা। মেজদি কস্তুরী আর ছোড়দি কুমকুমের সঙ্গে কাল এইঘরেই শুয়েছিল কমলিকা। দিদিদের সকলেরই বিয়ে হয়ে গেছে। ছেলেমেয়ে নিয়ে ওরা সবাই এসেছে—শুধু আসে নি বড়দি কাজল। পাশের বড় ঘরখানায় মা, বাবা মেজদির ছেলেমেয়েদের নিয়ে শুয়েছেন।

পিসীমারাও এসেছেন কেউ কেউ। বড়পিসীমা এসেছেন ভাগলপুর থেকে, মেজপিসীমা মুর্শিদাবাদ থেকে কালই এসে পৌঁছেছেন। সেজ ও ছোটরও আসার কথা, তাঁরা অবশ্য কলকাতাতেই থাকেন, বিয়ের দিন সকালেই আসবেন। মেজকাকা আর কাকীমাও এসেছেন। থাকেন গৌহাটিতে, প্রায় মাস দুয়েকের ছুটি নিয়ে এসেছেন। মামা-মাসীরাও এসেছেন সকলে। ছোটমামা মণীশ এসেছেন কাল রাতে, সঙ্গে তাঁর মেম-বউ লিজা।

কমলিকার যখন ঘুম ভাঙ্গল, সবেমাত্র ভোর হয়েছে। কেউই প্রায় ওঠে নি—দক্ষিণের জানলায় এসে দাঁড়াল সে। কল্যাণীর এই বাড়ীখানা বেশীদিনের নয়। বছর চারেক আগে কমলিকার বাবা এখানে বাড়ী করেন। ভারী সুন্দর লাগে জায়গাটা, কলকাতার কাছেই, কিন্তু ঘিঞ্জি নয়। খোলামেলা পরিচ্ছন্ন। এখানে ভোরের আকাশ স্নিগ্ধ, রাতের তারা উজ্জ্বল। আর শরতের রোদে, ঝিলের ধারে সাদা কাশের শোভায়, শিউলির গন্ধে, অজানা পাখীর ডাকে কল্যাণী সত্যিই পূর্ববঙ্গের সেই শহরটিকে মনে করিয়ে দেয়—যে দেশ তাদের একান্ত আপন ছিল। আজ সুদূরতম।

জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখল কমলিকা, শিশির-ভেজা ঘাসের ওপর অজস্র শিউলির সমারোহ। মুরগীর ঘরটা বোধহয় খুলে দিয়েছে জ্ঞানদা। সাদা লেগহর্ণগুলো খাদ্যসংগ্রহে ব্যস্ত। দূরে মল্লিদের বাড়ীর ছাদে কে যেন দাঁড়িয়ে। সৌমিত্রকে মনে পড়ল কমলিকার।......

সঙ্গে সঙ্গে ওঘর থেকে মা'র গলার আওয়াজ পাওয়া গেল, বড়মাসীকে ডাকছেন।

"দিদি উঠেছ?"

কমলিকা পর্দা সরিয়ে বাইরে এল। বড়মাসী গৌরী একটা সাজিতে ফুল তুলে ঠাকুরঘরের দিকে চলেছেন। এত ভোরেই তাঁর স্নান সারা হয়ে গেছে। সাদা থানের মধ্য দিয়ে সুগৌর রূপের আভা। যেন সকালের শ্বেত-পদ্ম শিশিরে অভিষিক্ত।

কমলিকার দিকে তাকিয়ে হাসলেন তিনি, বললেন, "এত ভোরে উঠেছিস্ আজ।"

"হাঁ, আজ খুব তাড়াতাড়ি ঘুম ভেঙ্গে গেল", একটু হেসে জবাব দিল কমলিকা। তারপরই প্রশ্ন করল, "মমতা ওঠে নি এখনও?"

মমতা ছোটমাসীর কন্যা, কমলিকার চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট, মাত্র ষোল বছর বয়সে তার বিয়ে হয়ে গেছে। সে-ও এসেছে কুমুদির বিয়ে উপলক্ষ্যে। কমলিকার কথা শেষ হ'তে না হ'তেই ওপাশের ঘর থেকে বোন মমতা আর মাসীমা উমালতা বেরিয়ে এলেন। মমতার সদ্যঘুমভাঙ্গা মুখ, অবিন্যস্ত বেশবাস, তবুও কি অপরূপ লাগছে তাকে। একমুখ হেসে বলল, "বাব্বা, কুমুদির যে রাতে ঘুম হ'তেই চায় না, সারারাত বুঝি......"

"কি বকিস্ যা-তা," বলতে বলতে কমলিকা হাত ধরে টেনে নিয়ে এল বাইরে। বাগানের ঘাসে শিশির আর নেই তখন। সোনাঝরা রোদ-ছড়ানো সুন্দর সকাল। কি গোলাপ ফুটেছে মার্শাল নীল গাছটায়। মমতা অলস ভাবে বসে পড়ল সামনের বারান্দায়। শীগগিরই মা হবে ও, ভারী কমনীয় দেখাচ্ছে মুখখানা।

"কি রে? সুমন আসবে না?" কমলিকা প্রশ্ন করল।

"কে জানে?" ঠোঁট ওল্টাল মমতা। পরক্ষণেই বলল, "ওর যা কাজ, খেতে শুতে সময় পায় না। অবশ্য এসব লাইনে টাকাও যেমন দেয়, খাটিয়েও নেয় তেমনি।"

"তুই তা হ'লে ফিরবি কার সঙ্গে?" কমলিকা বলল।

মমতা নির্বিকার ভাবে জবাব দিল, "রাত্রে ফার্স্ট-ক্লাসে একা যেতে একটু ভয় করে অবশ্য, কিন্তু ও ছুটি না পেলে কি আর করি বল?" মমতার গলার স্বরে কিসের যেন আভাস পেল কমলিকা, ভাল লাগল না এসব আলোচনা। একটু অবান্তর প্রশ্নই তাই করে বসে, "তোর ননদ চিত্রার বিয়ে কি হ'ল?"

একটু গর্বের হাসি খেলে গেল মমতার অধরে, "সম্বন্ধে ত কতই আসছে, কিন্তু তিনশ সাড়ে তিনশ টাকা মাইনেতে ত চিত্রা করবে না। করবেই বা কেন বল্? ওদের একমাত্র বোন, দেখতে সুন্দর, টাকা-পয়সার ত অভাব নেই। সুরুতে অন্ততঃ ছশ সাতশ টাকা না হ'লে আর ভাল প্রস্পেক্‌ট্‌স্ না থাকলে কি আজকাল......' কমলিকা বুঝল, কোন কিছু না ভেবেই কথাগুলো বলেছে মমতা, কিন্তু তবু ভাল লাগল না।

বড্ড বুড়োটে দেখাল মমতার মুখ, বিয়ে হয়ে যেন বয়স তার অনেকটা বেড়ে গেছে। কমলিকা আবার প্রসঙ্গান্তর করে, "মুখ ধুবি না মলি?"

"এই যে যাই"—মমতা উঠে দাঁড়াল। মাসীমা উষালতা প্লেটে করে ক্ষীরের ছাঁচ নিয়ে এলেন। বেঁটে-খাটো ছোট্ট মানুষটি কথাবার্তা বেশী বলেন না। কমলিকার দিকে প্লেটটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "একটু খেয়ে নে কুমু।"

ততক্ষণে প্রায় সকলেই উঠে পড়েছে, নানাজনের কলরবে বাড়ী মুখর। দোতলার বড়ঘরখানায় মেজ-কাকার ছেলেমেয়েরা রেডিও চালিয়েছে, বোধহয় সীলন ধরেছে, হাল্কা চটুল গানের সুর ভেসে আসছে, "তুমসে মহব্বৎ..." আবারও সৌমিত্রকে মনে পড়ল, সে থাকলে হেসে উঠত এসব গান শুনলে। সে বলে, "প্রেমের কথা আবার কেউ এমন হাল্কা ভাবে জাহির করে নাকি?" বড় সূক্ষ্ম তার রুচিবোধ, হাল্কা সিনেমা, হাল্কা গান তার একান্ত অপছন্দ। সে বড় গভীর। সহজে তার মনের নাগাল পাওয়া যায় না; সকলে তাকে বোঝেও না। সেই মনের মুক্তার সন্ধান পেয়েছে কমলিকা। গান ভালবাসে সৌমিত্র। কিন্তু সে গান কানের নয়, প্রাণের।

কিন্তু তবু ত সকলে অবজ্ঞা করেছিল, বলেছিল......

ছোড়দি কুমকুম এসে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে তাকে, কানে কানে বলে, "দেখ্ না তোর জামাইবাবুর কাণ্ড। সকাল থেকে ক্যামেরা হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমার আর তোর নাকি ছবি তুলবে।" সঙ্গে সঙ্গে আর একটি কণ্ঠস্বর শোনা যায়, চোখে পড়ে একটি প্রসন্ন মুখ।

"এর পরে ত আর তোমার সঙ্গে ছবি তুলবেই না তোমার বোন, এই বেলা তুলে নাও।"

ছোড়দির বর অরুণদা এসে দাঁড়িয়েছে, চোখ দু'টি সদাহাস্যময়, ভারী সুন্দর চেহারা। ছোড়দি তার দিকে তাকিয়ে তর্জনী তুলে বলল, "সব সময় ইয়ারকি করো না, ভাল লাগে না।" কপট গাম্ভীর্য মুখখানা ম্লান করে অরুণ বলল, "কি করলে যে তোমরা খুশী হও বুঝি না! বুঝলে কুমু, তোমার এই দিদিটিকে বোঝা অসম্ভব। সাধে কি আর কবি বলেছেন 'রমণীর মন, সহস্র বর্ষেরই সখা, সাধনার ধন।' যদি কখনও তোমার দিদির রান্না কি আর কোন কিছুকে ভাল বলেছি, অমনি বিরক্ত হয়ে বলবে, ওসব তোমার মনরাখা কথা। আর যদি একটু ত্রুটি ধরি, তা হ'লে ত আর রক্ষা নেই—চেঁচিয়ে বলবে, তোমার খুঁতখুঁতে স্বভাবের জ্বালায় গেলাম।"

কথাটা শুনেই ওরা দুবোনে হেসে উঠল, কুমকুম অবশ্য তক্ষুণি রাগের ভান করে কিল মারে অরুণের পিঠে। কিন্তু তবু মনে মনে অনুভব করে কুমু, ওদের পরিতৃপ্ত জীবনের স্বাদ। ছোড়দি-অরুণদার দাম্পত্য-জীবনে রাগ আছে, অভিমান আছে, আছে কলহের উত্তাপ। তবু ওরই সঙ্গে গলা জড়াজড়ি করে রয়েছে ভালবাসা আর মমতা। পরস্পর পরস্পরের জন্য ভাবে, অনুভব করে।

বড়মামা অমলেশ সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামছেন, ভারী সুন্দর চেহারা তাঁর, বয়স প্রায় আটচল্লিশ, কিন্তু তবু স্বাস্থ্যের বাঁধুনি অটুট, বলিষ্ঠ দেহ এতটুকু ভাঙ্গন ধরে নি। শুধু রগের কাছে চুলে একটু পাক ধরেছে।

গুনগুন করে গান গাইছিলেন তিনি। ইদানীং গান তাঁর মুখে শোনাই যায় না, এককালে খুব ভাল গাইতেন, কবিতা লিখতেন, ছবি আঁকার হাত ছিল। আজকাল আর কোন কিছুরই চর্চা নেই, কোন ব্যবসাদারের অফিসে কি একটা চাকরি করেন। যৎসামান্য আয়, সংসারে পোষ্য কম নয়, চারটি সন্তান ও স্ত্রী।

বড়পিসীমা শকুন্তলা ভাঁড়ার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে মা'র সঙ্গে কি বলাবলি করছেন, যৌবনে অসাধারণ সুন্দরী ছিলেন তিনি। এখন বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। একটু মোটাও হয়ে পড়েছেন, তবু বর্ণে এখনও উজ্জ্বল গৌর আভা আর সিঁথির সিঁদুরে হাতের শাখায় তিনি যেন মাতৃত্বের প্রতিমূর্তি। যৌবনের আবেশ-বিহ্বলতা নেই, কিন্তু প্রৌঢ়ত্বের এক অপরূপ শোভায় দীপ্ত তিনি। বড় বড় চোখে মমতা ঝরে পড়ছে।

পিসীমার কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে মেজদির ছেলে শুভ, আর মেয়ে শম্পা।

বড় পিসীমা মাকে জিজ্ঞেস করছিলেন, "আজ কি রান্না হবে বউ।"

মা নম্র হেসে বললেন "আপনি যা বলেন।"

"তরকারিটা তা হ'লে কেটে দিই।" বড়পিসীমার কথার মাঝে মাঝে বাঙাল টান এসে পড়ে। সেই ভুলে-যাওয়া দেশের অস্তিত্বের ঐটুকু এখনও রয়ে গেছে। যদিও তিনি প্রায় বত্রিশ বছর দেশছাড়া, সেই ত আঠারো বছরে বিয়ে হয়েছিল, স্বামীর কর্মস্থল সুদূর বর্মাদেশে গিয়েছিলেন, ভাগলপুরে ত এসেছেন যুদ্ধের সময়, তাও অবশ্য প্রায় কুড়ি বছর হ'ল।

ভাঁড়ার ঘরের বারান্দায় বঁটি পেতে বসে পড়েন পিসীমা। মা আর ঝি জ্ঞানদা ধরাধরি করে তরকারির ঝুড়িগুলো এনে রাখে, কুমড়ো, বেগুন, আলু, কপি।

ছোড়দির দু'বছরের মেয়ে রুমি কোত্থেকে ছুটে আসে, তরকারির ঝুড়ির ওপর ঝুঁকে পড়ে বলে, "আমি কপি খাব।" কমলিকা দু'হাত বাড়িয়ে তাকে কোলে তুলে নেয়। মেজদি কস্তুরী স্নানের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। মুখে তার বিষাদের ম্লান ছায়া, পরনে কালোপাড় সাদা শাড়ী, বোনেদের মধ্যে সেই সবচেয়ে সুন্দরী। কমলিকার চেয়ে বছর ছয়েকের বড়, দু'টি ছেলেমেয়ের মা। অথচ দেখলে মনে হয়, এখনও কুড়ি বছর পেরোয় নি। কস্তুরী কোনদিকে তাকাল না, আস্তে আস্তে ওপরে উঠে গেল। মনে হ'ল বড়পিসীমা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন, আর মা ওদিকে মুখ ফিরিয়ে চোখের জল গোপন করলেন। কমলিকার মনটাও কেমন ভারী হয়ে উঠল। সে মনে মনে ভাবল, সোমেনদা এত নিষ্ঠুর হলেন কেমন করে?

ভাবতে ভাবতে জানলায় গিয়ে দাঁড়ায়। সামনের রাস্তা দিয়ে অর্চনাদি আর স্বাতীদি তাদের বাড়ীর দিকেই আসছেন। ওঁরা কমলিকাকে পড়াতেন। এককালে বড়দির সহপাঠিনীও ছিলেন। সম্প্রতি এখানকার স্কুলে কাজ নিয়ে এসেছেন দুজনে, এক পাড়াতেই থাকেন। কমলিকাকে খুবই স্নেহ করেন। স্বাতীদি ইংরেজী পড়াতেন, ভারী মিষ্টি স্বভাব, চেহারাটিও বেশ। অর্চনাদি বিবাহিতা, বেশ মোটাসোটা ভারিক্কী চেহারা। কমলিকাদের বাংলা পড়াতেন।

ওঁদের নিয়ে বসবার ঘরে এল কমলিকা, বড়দি এখনও আসে নি শুনে একটু ক্ষুণ্ণ হলেন ওঁরা। খানিকক্ষণ সবার সঙ্গে গল্পগুজব করার পর, অর্চনাদি কমলিকার বিয়ের শাড়ী ব্লাউস সব দেখতে চাইলেন।

শখ ক'রে একখানা লালপেড়ে কড়িয়াল গরদও কিনেছিল কমলিকা। সেটা দেখে অর্চনাদি সোৎসাহে বললেন, "কড়িয়াল শাড়ী না? বাঃ, চমৎকার।"

অবাক্ হয়ে স্বাতীদি বললেন, "কড়িয়াল আবার কি?"

"বাঃ বাঃ, কড়িয়াল চেন না? তুমি কি বাংলা দেশে জন্মেছিলে স্বাতী?" অর্চনাদি হেসে ওঠেন।

মুখ লাল করে স্বাতীদি চুপ ক'রে যান।

ছোড়দি কুমকুম ট্রাঙ্ক খুলে একটার পর একটা শাড়ী দেখায়, শাড়ী ব্লাউসের দোকান বসে যায় খাটের ওপর।

স্বাতীদি খানিক পরেই উঠে পড়েন বাড়ী যাবার জন্য, তাঁর আজ বড় তাড়া। মায়ের শরীর ভাল নেই, কলকাতা থেকে কয়েকজন বন্ধুবান্ধব আসবেন। যাবার আগে কমলিকার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি ক'রে হাসলেন স্বাতীদি, বললেন, "আবার তোমার বিয়ের দিন আসব কুমু। আজ যাই।"

অর্চনাদি এবার জাঁকিয়ে বসেন, স্বাতীদি গেট খুলে বাইরে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সুরু করেন, "ও চিনবে কড়িয়াল শাড়ী? তা হ'লেই হয়েছে! জন্মে এসব দেখেছে নাকি চোখে? দুদিন আগে কি অবস্থা ছিল ওর? কিছুই ত আমার অজানা নয় ভাই। এখন নেহাৎ চাকরি করছে, তাই সংসার চলছে।" একটু হেসে সকলের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে আবার বললেন, "কড়িয়াল শাড়ী এক নজরেই চিনতে পারি আমি। আমার বিয়ের সময় বাবা সব বোনদের কড়িয়াল গরদ দিয়েছিলেন।" অর্চনাদির গলার স্বরে গর্বের আভাস।

অবাক্ হয়ে অর্চনাদির মুখের দিকে তাকাল কমলিকা। এই কি সেই অর্চনাদি নাকি? কবিতা পড়ার সময় যাঁর গলার স্বর ভাবোচ্ছ্বাসে কাঁপতে থাকে? আর স্বাতীদি সম্বন্ধে এ কি বললেন তিনি? নাই বা চিনলেন তিনি কড়িয়াল শাড়ী। অমন দৃঢ় সংযমী মেয়ে খুব কমই চোখে পড়ে। দারিদ্র্যের সঙ্গে কি দুঃসহ সংগ্রাম করে লেখাপড়া শিখেছেন স্বাতীদি। বাবা নেই। ভাইবোনদের মধ্যে তিনিই বড়, সংসারের সব কর্তব্য তাঁর মাথায়। সকলের জন্য নিজের সুখশান্তি সবই বিসর্জন দিয়েছেন তিনি। বড়দির কাছেই স্বাতীদির সব কথা শুনেছে কমলিকা। বড়দি প্রায়ই বলে, "স্বাতীর মত মেয়ে হয় না।"

অর্চনাদির ধরণ-ধারণ মোটেই ভাল লাগল না কমলিকার। পাশের ঘরে চলে এল সে। মেজপিসীমা

সরমা বসে বসে সেলাই করছেন। কমলিকারই কয়েকখানা ব্লাউস আর পেটিকোট। সেলাইয়ে পটু সরমা। এর জন্য প্রচ্ছন্ন গর্বও আছে তাঁর মনে। মেজপিসীমাকে দেখলে কেমন ভয় ভয় করে কমলিকার। মুখের ভাবে বড়পিসীমার মত কোমলতা নেই। একটু রুক্ষ চালচলন, সবসময়ই বেশ গম্ভীর হয়ে থাকেন। কমলিকা ঘরে ঢোকা মাত্রই মেজপিসী চোখ তুলে তাকালেন, হাসি তাঁর ঠোঁটে সহজে দেখা যায় না। কমলিকা বিয়ের কনে, সেই খাতিরেই বোধহয় একটু খুশীর ভাব দেখালেন। ঠোঁটটা সামান্য ফাঁক হ'ল তারপরেই বেশ গম্ভীর গলায় বললেন, "এদিকে এস কুমু, তোমার ব্লাউসটা ফিট্ করেছে কি না প'রে দেখ।"

ওপাশের খাটে শুয়েছিলেন মেজপিসেমশাই রত্নেশ্বর, তিনি বেশ রসিক মানুষ। মাঝে মাঝে অবশ্য তাঁর ব্যঙ্গ বিদ্রূপে তিক্ততার আমেজই বেশী থাকে। তবে তাঁর মনমেজাজ বেশ ভালই ছিল, হেসে বললেন, "ওকে আবার ডাকাডাকি কর কেন? ওর এখন 'কি কথা স্মরিয়া, এ তনু ভরিয়া পুলক রাখিতে নারি'।" ব'লেই হা হা করে হেসে উঠলেন তিনি। কমলিকার মনে হ'ল তাঁর ব্যবসাদার পিসেমশাই এককালে বোধহয় কবিতা লিখতেন, যৌবনের সেই প্রখর ঔজ্জ্বল্য হঠাৎ যেন আজ ঝলকে উঠল তাঁর চোখে। বড় ভাল লাগল কমলিকার। রুগ্ন, শীর্ণ, ক্ষয় হয়ে-যাওয়া রত্নেশ্বরের মধ্যে এক নূতন মানুষকে আবিষ্কার করল সে। সৌমিত্রের সঙ্গে সে মানুষের কোন তফাৎ নেই। হঠাৎ মনে হ'ল কমলিকার, মানুষের মন সাগরের মত অতল, সবাই তার নাগাল পায় না। কোন এক পরম লগ্নে অকস্মাৎ একটি মুক্তার সন্ধান মেলে। তারপর আবার সেই আতলান্তিক সাগরের মত সে গোপন করে রাখে নিজেকে। রত্নেশ্বরের কথায় পিসীমা কিন্তু একটুও খুশী হলেন না, ঠোঁটটা কেমন করে যেন বাঁকালেন। মৃদু অথচ স্পষ্ট সুরে বললেন "যত ন্যাকামি।"

কমলিকা মনে মনে আহত হ'ল তাঁর কথায়। ও ঘর থেকেও সরে এল সে। চলে এল নিজের ঘরে, সেখানে কেউ নেই। প্রকাণ্ড খাট-জোড়া বিছানা, নীল বেডকভারে ঢাকা, ঘরের ফুলদানীতে একগুচ্ছ রক্তগোলাপ কে যেন রেখে গেছে। কমলিকা একবার এদিক্-ওদিক্ তাকাল, চাবি দিয়ে সুটকেসটা খুলল, একেবারে তলা থেকে টেনে বের করল বড় একটা এ্যালবাম, প্রথম পাতাটা খুলতেই চোখে পড়ল, বড়দি আর সুজিতদার ছবি। প্রথম বিয়ের পর তোলা, ভারী মিষ্টি দেখাচ্ছে বড়দিকে, ঠোঁটের কোণে সলজ্জ হাসির আভাস, বড়দির রং কালো, ছবিতে রং ধরা পড়ে না, চেহারার মাধুর্যটুকুই থেকে যায়।

পাতার পর পাতা ওল্টাল কমলিকা। মেজদি কস্তুরী আর সোমেনদার ছবিতেই এ্যালবামটা প্রায় ভরা।

বিয়ের পর ওরা দার্জিলিং গিয়েছিল হনিমুনে, সেখানেই তোলা অজস্র ফটো। কত ভঙ্গিতে, কত বেশে মেজদির ছবি তুলেছে সোমেনদা। সোমেনদাকে ভালবেসে বিয়ে করেছিল মেজদি। কিন্তু তবু এমন কেন হ'ল? সে কথা শত চেষ্টাতেও বুঝতে পারে না কমলিকা। ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে, যাকে বিশ্বাস করে সব সমর্পণ করা যায়, সে কি একদিন তা হ'লে··? আবার এ্যালবামের পাতা উল্টে যায়, বড়দি সুজিতদার ছবি, তাঁদের ছ'টি ছেলেমেয়েকে সঙ্গে নিয়ে—বিয়ের পর থেকে দু'বছর বাদে বাদেই বড়দি বাচ্চা হ'বার সময় মায়ের কাছে আসে। মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে ছ'টি সন্তানের জননী সে। ছোড়দিকে ত কতদিন বলতে শুনেছে কমলিকা, "বড়দিটা যে কি, এক নম্বরের বোকা। আজকালকার দিনেও কি ক'রে যে এত ছেলেমেয়ে হয়?" সুজিতদা নাকি খুব বাচ্চা পছন্দ করেন, তাঁর সংসারের সব ভারও বড়দির ওপর, তাই সবচেয়ে ছোটবোনের বিয়েতেও সাতদিন আগে আসা হয় নি তার। সুজিতদা নিজে সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন আবার যাবার সময় সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবেন। নিঃসঙ্গ শয্যায় তাঁর রাত নাকি কাটে না।

এ্যালবাম দেখতে দেখতে আবার সৌমিত্রকে মনে পড়ে গেল কমলিকার, সেই শিলং-এ দেখা হয়েছিল তার সঙ্গে, দু'জনেই বেড়াতে গিয়েছিল। কমলিকা তার এক মাসীর বাড়ীতে, সৌমিত্র তার দাদার বাড়ী।······মেজদি কস্তুরী এসে ঘরে ঢুকল, তার দিকে ভাল করে তাকাতেই পারল না কমলিকা।

"শম্পা আর শুভ খেয়েছে কি কুমু?"

মেজদির প্রশ্নে চমকে তাকাল কমলিকা, "আমি ত জানি না মেজদি।"

"খুব ভাল লাগছে, না রে?" দুহাতে গাল দুটো টিপে দিল কস্তুরী।

"আয় না বিছানায় শুই, কি দেখছিলি ওটা, এ্যালবাম? আমায় দে।" মেজদি ওর হাত ধরে টানল।

কমলিকা এ্যালবামটা লুকোবার ব্যর্থ প্রয়াস করছিল এতক্ষণ, একবার ক্ষীণস্বরে বলল, "থাক না মেজদি।"

করুণ হাসল কস্তুরী, "তুইও আমায় ভোলাচ্ছিস্

কুমু? এ্যালবাম না দেখলেই কি সব ভুলতে পারব? মনের ছবিটা কি অত সহজে মোছে?" বলতে বলতে একটু জোরেই হেসে উঠল, বলল, "কি বাজে বকছি, আয় গল্প করি।"

কমলিকা কিন্তু কিছুই বলতে পারল না। গলার স্বর তার কান্নায় রুদ্ধ হয়ে এসেছিল। বলতে পারল না, "না মেজদি, একটু হাল্কা হও, বল তোমার সব কথা।"

এই অদ্ভুত অবস্থা থেকে দু'জনকেই বাঁচিয়ে দিল শম্পা। দৌড়ে এসে ডাকল, "মা, ছোট মাসী, শীগগির নীচে এস, দিদা তোমাদের খেতে ডাকছে।"

সিঁড়ি দিয়ে দুজনে নীচে নামছে, হঠাৎ মোটরের আওয়াজ পেল—সিঁড়ির পাশের জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখে, সলিলাদি আর অসিতদা নামছে মোটর থেকে, সলিলাদির হাতে বেশ বড়সড় একটা প্যাকেট। বাড়ীতে ঢোকার আগেই সলিলাদি "কুমু কুমু" বলে ডাকছিল। বড়পিসীমার বড় মেয়ে সলিলাদি ভারী স্ফূর্তিবাজ মেয়ে, কুমুর চেয়ে বছর চারেকের বড়, কিন্তু প্রায় সমবয়সীর মত ভাব তার সঙ্গে। সিঁড়ি দিয়ে প্রায় দৌড়ে নেমে এল কমলিকা, সলিলাকে জড়িয়ে ধরে ভেতরে নিয়ে গেল, এদিকে অসিতদাকে নিয়ে সবাই অস্থির। মেজকাকীমার মত অমন গম্ভীর মানুষও তার সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছেন। হঠাৎ সেদিকে তাকিয়ে একটু হাসি পেল কমলিকার। বছর ছয়েক আগে যখন সলিলার বিয়ে হয়, তখন এই মেজকাকীমাই মুখ বেঁকিয়ে কত কি বলেছিলেন। অসিতদা তখন সামান্য মাইনের কেরাণী। সলিলাদি তাকে ভালবেসেছিল। বাড়ীর সহস্র বাধাকে তুচ্ছ করে সেই দরিদ্র মানুষটিকে বরণ করে নিয়েছিল। কমলিকার সঙ্গে তার খুবই অন্তরঙ্গতা ছিল, বিয়ের আগে ম্লান হেসে বলেছিল তাকে, "আমার ত বিয়ে হচ্ছে চোখের জলে। মেজমাসীমা কি বলেছে জানিস, —'কি আছে ওই ছেলেটার মধ্যে? দেখতে ত কালো কুৎসিত, চাকরিও ত যেমন তেমন। কি দেখে মজলি?' আমি কি বলেছিলাম জানিস্?—'যা দেখা যায় না, তাই দেখে'।" সেদিন ভারী ভালো লেগেছিল সলিলাদির কথা ক'টি। তার পরে অসিতদার উন্নতি হয়েছে। অপ্রত্যাশিত ভাবে পদোন্নতি ঘটেছে। সমাজে বেড়েছে তার সম্মান প্রতিপত্তি। আগে আগে এ বাড়ীতে আসতই না সলিলাদিরা। কুমকুমের বিয়ের সময় একগুচ্ছ রজনীগন্ধা আর একখণ্ড গীত-বিতান পাঠিয়ে দিয়েছিল কার হাতে। সে উপহার অনেকেরই পছন্দ হয় নি, সান্ত্বনার সুরে তাঁরা বলেছিলেন—"কি আর দেবে ওরা? অসিতের যা আয়! সংসারের খরচই কুলোতে চায় না।" ছবি আঁকত অসিতদা। পরে মোটা মাইনের কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট হয়েছে, বড় ফার্মে বিরাট্ চাকরি পেয়েছে।

সলিলাকে বিয়ে করার সময় শিল্প ছিল তার সাধনার মত। বিয়ের আগে সলিলার জন্মদিনে তাকে একটা ছবি উপহার দিয়েছিল অসিত। সবাই গা টেপাটেপি করে হেসেছিল। ছোট কাকীমা ত বলেই ফেলেছিলেন "পয়সা ত নেই, তাই দু'আনার কাগজ আর রং-তুলিতেই কাজ সেরেছে।" ব্যথায় বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল সলিলার মুখ। ছোট কাকীমা অবশ্য সলিলার উপস্থিতিটা জানতে পারেন নি। পরে তাকে দেখে একটু অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন।

বিয়ের পর আজ তারা প্রথম এল কুমুদের বাড়ী। আজকে অসিতদার সম্মান দেখে কে? বিরাট্ ক্রাইসলার গাড়ি হাঁকিয়ে এসে নামল। সম্পদ্, সম্মান, দুয়েরই স্বাক্ষর তাদের সর্বাঙ্গে। সকলেরই চোখ জলজ্বল ক'রে উঠল, অসিতদাকে কোথায় বসাবে ভেবে পেল না। সলিলাদি কিন্তু কারুর দিকেই তাকাল না। হাতের বাক্সটা খুলতে খুলতে কুমুর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে প্রশ্ন করল,—"বল্ ত তোর জন্য কি এনেছি?" বাক্সের মধ্যে ঘন নীল রংএর একটা বেনারসী শাড়ী, তার সঙ্গে ম্যাচ করা ব্লাউস, পেটিকোট, আর একজোড়া সোনার দুল। কমলিকা মিষ্টি হেসে বলল, "বাঃ, কি সুন্দর!"

সকলেই বাক্সের ওপর ঝুঁকে পড়ল, "বাঃ বাঃ।" "চমৎকার।" "অপূর্ব।" প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠল সবাই।

সলিলাদি কারও কথায় বিশেষ কান দিল না। কুমুকে বলল, "চল্, বড় মামীমার সঙ্গে দেখা ক'রে আসি। তিনি নিশ্চয়ই রান্নাঘরে?" ব'লেই কুমুর হাত ধরে টানতে টানতে ছুটে চলে গেল রান্নাঘরের দিকে। কুমুর মা মৃণালিনী তখন মাছের ঝোলের বিরাট্ গামলা থেকে মাছ বাড়ছিলেন, সলিলাকে দেখে একমুখ হেসে বললেন, "আয়, বোস্।"

"আজ আর না মামীমা, বিয়ের দিন নিশ্চয়ই আসব। আজ চলি," সলিলাদি বলল।

"সে কি, এখনই যাবি কি? খেয়ে যা।" সকলে মুখর হয়ে উঠল। একটু হাসি ফুটল সলিলার ঠোঁটে, বলল, "সব সময়ই ত খাই, আজ আর না।"

মৃণালিনী তবু জোর ক'রে একটুকরো মাছ ভেঙে ওর মুখে পুরে দিলেন, ততক্ষণে অসিতের সামনে কাঁচের প্লেটে সন্দেশ রসগোল্লা সাজানো হয়ে গেছে। সে মৃদু হেসে সবিনয়ে বলছে, "এখন এই অবেলায় কিছু খাব না, আমাকে মাপ করবেন।"

সলিলা এসেই স্বামীকে তাড়া দিল, "চল তাড়াতাড়ি, দেরি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু, আজ আবার তোমার সেই লণ্ডনের বন্ধুটির সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে। তিনি ত আবার কালই চলে যাবেন।" দুজনেই গাড়িতে উঠে বসল, যাবার আগে কুমুর গালে একটা চুমু দিল সলিলা, বলল, "আজ আসি রে, বিয়ের দিন সকালেই আসব।"

খাবার ঘরে তখন সবাই খেতে বসে গেছে। ছোট মামীমা লিজা ত সবার সঙ্গে মাটিতে বসে খেতে পারবে না, তাই ঘরের কোণে একটা টেবিলে তার জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা হয়েছে। খাদ্যের উপকরণও ভিন্ন, মাংসের ষ্টু, পাঁউরুটি, পুডিং, ইত্যাদি। এদিকে কুমকুম ত বেগুন ভাজা দেখেই চেঁচিয়ে উঠেছে; "আমি বেগুন খাব না মা।"

"ও কি কথা?" মেজপিসীমা বললেন, "সব খেতে হয়। শ্বশুরবাড়ী গেছিস্, বিয়ে হয়েছে, এখন অত বায়না ভাল না।"

কুমকুম মুখটা একটু গম্ভীর করেই খেতে লাগল। পিসীমার ব্যবস্থাটা কিন্তু ভাল লাগল না কমলিকার। কথায় বলে, "আপ রুচি খানা"। সে ব্যবস্থা যে একেবারেই হয় নি, তাও ত নয়। ঐ ত ছোট মামীমা লিজা, তাকে ত তার রুচি অনুযায়ী খেতে দেওয়া হয়েছে। বাড়ীর সবাই, এমন কি ছোটমামা পর্যন্ত মাটিতে বসে খাচ্ছেন। অথচ লিজা বেশ নির্বিকার ভাবে খেয়ে চলেছে চেয়ার-টেবিলে ব'সে।

মমি বসেছিল কমলিকার পাশে, ফিসফিস করে বলল, "মালিনীদি ত এল না এখনও? কাল তোকে বলছিলাম না ওর কথা? বোধ হয় রজতদা আসতে দেয় নি। যা কড়া!" কইমাছের কাঁটা বাছতে বাছতে একটু হেসে বলল, "এমনিতে অবশ্য ভালই, টাকা-পয়সার অভাব নেই, মালিনীদিকে সুখেই রেখেছে। তবে শুনেছি গানটান বিশেষ ভালবাসে না..."

কুমু ওর কথায় বিশেষ কান দেয় নি, সে একমনে কি যেন ভাবছিল। হঠাৎ বাইরে বাবার গলা কানে এল, "এই যে, মালু এসে গেছে।"

কমলিকা এঁটো হাতেই ছুটে এল বাইরে। মালিনীদি মোটর থেকে নামছে, ওদের মেজমাসীর একমাত্র কন্যা। ছোটবেলায় মালিনীদি সম্বন্ধে কেমন আশ্চর্য একটা অনুভূতি হ'ত তার। শ্রদ্ধা, ভালবাসা, সব কিছু মেশানো। সুন্দর ত ছিলই সে, স্বভাবের মাধুর্য তাকে অপরূপ করেছিল। হাসিটি স্নিগ্ধ, মিষ্টি গলার স্বর, নম্র কথা বলবার ভঙ্গি। অপূর্ব গান গাইত মালিনী। মেজমাসীমা আর মেসোমশাই বড় যত্ন করে গান শিখিয়েছিলেন তাকে।

ধনী ব্যারিষ্টার রঞ্জন মিত্রের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। রঞ্জনদা মেজাজী মানুষ, সাহেবী চালচলন তাঁর। মালিনীকে তিনি অনাদর করেন নি। আলমারী ভর্তি শাড়ী তার, বাক্সভর্তি গয়না। প্রতিদিন বিকেলে ফুলের মত সেজে বারান্দায় বসে থাকতে হয় তাকে। রঞ্জনদা আলুথালু বেশ সহ্য করতে পারেন না। সাত বছর বিয়ে হয়েছে ওদের, এখনও সন্তান হয় নি। বাচ্চাকাচ্চা রঞ্জনদার পছন্দ নয়। দামী একটা কুকুরের বাচ্চা এনে দিয়েছেন, সেই মালিনীদির সঙ্গী। রবীন্দ্র-সঙ্গীত ভাল লাগে না রঞ্জনদার, মাঝে মাঝে পিয়ানোর টুংটাং শুনতে ভালবাসেন। আজকাল পিয়ানোই বাজায় মালিনী। গান গাওয়া, এস্রাজ বাজানো ছেড়েই দিয়েছে। বিয়েতে অনেক কবিতার বই উপহার পেয়েছিল, কিন্তু সে-সব শোনাবে কাকে? আইনের বইয়ে রঞ্জনের ঘর ঠাসা। এদিকে মালিনীর অবকাশ প্রচুর, ঘরে চাকর ঠাকুরের অভাব নেই। বাগানে মালী আছে। বাচ্চা-কাচ্চাও নেই যে তাকে নিয়ে সময় কাটবে। মালীর বউয়ের তৃতীয় সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর তার জন্য কিছু জামা সেলাই করেছিল সে, বুনেছিল একটা সোয়েটার। তাতে একটু বিরক্তই হয়েছিলেন রঞ্জনদা। বলেছিলেন, "ওসব জীবকে বাঁচিয়ে লাভ কি? তার চেয়ে আরও কিছু রেকর্ড কেন, সময় যদি না কাটে, মেট্রোতে যাও না, সিনেমা দেখে এস। আমার অবস্থা ত দেখছ, এত কেস যে নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই।"

কোথাও যাওয়া হয় না মালিনীদির। মুখে যতই বলুন, মনে মনে যে সিনেমা যাওয়া-টাওয়াও পছন্দ করেন না রঞ্জনদা তা ত মালিনীদি ভাল করেই জানে। বাড়ীতেই একটা রঙীন পুতুলের মত সেজেগুজে ব'সে থাকে সে। মালিনীদির জীবনের এসব কথা অজানাই ছিল তার কাছে এতদিন। মমি কি করে সব জেনেছে, কালকে সে-ই বলছিল।...

মালিনীদি গাড়ি থেকে নেমে হেঁট হ'য়ে প্রণাম করল কমলিকার বাবাকে, একটু হেসে বলল, "ভাল আছেন

বড় মেসোমশাই ?" বাবা জিজ্ঞেস করলেন, "রঞ্জন কোথায় গেল ? নামল না যে।"

"উনি একটু পরে আসবেন, এখানে ওঁর কে এক বন্ধু আছেন, তার কাছে গেছেন।" ব'লেই তাকাল কুমুর দিকে, সলিলার মত উচ্ছ্বাসভরে জড়িয়ে ধরল না। একটা হাত ধরে একটু চাপ দিল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, "কুমুটা কি সুন্দর হয়েছে! কতদিন পরে দেখলাম, আমার ত আর আসাই হয় না।" কথার সঙ্গে করুণ হাসি, ওর রূপ যেন শ্রাবণ রাতের জ্যোৎস্নার মত স্নিগ্ধ, আলোর ওপর জলভরা মেঘের কালোছায়া। মালিনীদির হাত ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে বসাল কমলিকা। পাখার হাওয়ায় মালিনীদির চুল উড়ছে, সাদা জর্জেট পরেছে, গা থেকে ভেসে আসছে দামী সেন্টের মৃদু গন্ধ, কানে হীরের দুল, কিন্তু বড় রোগা দেখাচ্ছে তাকে। কমলিকা বলল, "তুমি একটু বোস মালুদি, আমি হাত ধুয়ে আসি।"

মুখ ধুয়ে যখন আবার ঘরে এল সে, বাড়ীর সবাই ততক্ষণে মালিনীদিকে ঘিরে ধরেছে। মমি ত তার গা ঘেঁষে বসেছে, হাত ধরে চুড়িগুলো দেখছে। কমলিকার মা মালিনীর সামনে পায়েসের বাটি ধরলেন, বললেন, "একটু খা মালু। মাছ ভাজা খাবি ?"

মালিনীদি বলল, "খেয়ে ত এসেছি বাড়ী থেকে। আচ্ছা, অল্প একটু দাও। কতকাল তোমার হাতের রান্না খাই নি।"

তার খাওয়া শেষ হ'তে না হ'তেই বাইরে মোটরের হর্ণ শোনা গেল, মালিনীদি ত্রস্ত ভীরু চোখে বলল, "ঐ যে উনি এসে গেছেন।"

সকলেই ছুটে এল বাইরে। মোটর থেকে নামলেন ব্যারিষ্টার রঞ্জন মিত্র। নিভাঁজ সুট পরনে। কমলিকার বাবা-মাকে কোনমতে প্রণাম সারলেন মাথা নুইয়ে, তারপরই চলে এলেন ঘরের ভেতর, কোনদিকে না তাকিয়ে মালিনীদির দিকে চেয়ে বললেন, "মালু, আমার কিন্তু বিকেল পাঁচটায় একটা এন্‌গেজমেণ্ট আছে। তুমি আর দেরি ক'রো না।"

"এই যে যাই।" মালিনীদি খাবারের প্লেট রেখে উঠে দাঁড়াল। মুখে সেই করুণ হাসি। সবার দিকে তাকিয়ে বলল, "আজ যাই, আবার বিয়ের দিন আসব। কুমু চলি।" কুমুর পিঠে একবার হাত রাখল। তারপর দ্রুতপদে চলে গেল বাইরে। মোটরে উঠে পড়ল। কমলিকার মনে হ'ল, রুমাল দিয়ে গাল দুটো মুছছে মালিনীদি। হয়ত তার দেখার ভুল।

খাওয়া-দাওয়া সারা হ'তে প্রায় দুটো বাজল। বড়-পিসীমা শকুন্তলা গোটা-দুয়েক পান মুখে পুরে শোবার ঘরে এসে বসলেন। কুমকুম, কস্তুরী আর কমলিকা বিছানায় শুয়েছিল। কুমকুম বড়পিসীমার কোলের ওপর মাথা রাখল, তাঁর গালের ওপর হাত বোলাতে বোলাতে বলল, "বাব্বা, তোমার কি রং। এই বয়সেও আবার কনে সাজানো যায়। পিসেমশাই যখন তোমায় দেখেছিলেন, তখন না জানি কি ছিল।" পিসীমার পানের রস-ভেজা ঠোঁটে একটু হাসি ফুটল। বললেন, "এই রূপের জ্বালায় ত অস্থির। তোদের পিসে আমাকে কম জ্বালিয়েছে ? বাইরে একা বেরোতে দিত না। সারাক্ষণ দরজা বন্ধ করে থাকতে বলত। ওই এক রোগ ওর, ভাবে, সবাই বুঝি আমার দিকে চেয়ে আছে। এই বুড়ো বয়সেও ওর এই রোগ গেল না। আর পারা যায় না বাপু। এখন এই দুমসী বুড়ীর সঙ্গে কে প্রেম করতে আসবে, তোরাই বল্।"

পিসীমার কথার ভঙ্গিতে ওরা তিন বোনেই হেসে উঠল। পিসীমা এমনিতে ভারী খোলামেলা মানুষ; সকলের সঙ্গেই তাঁর ভাব। মেয়ের বয়সী ভাইঝিদের সঙ্গেও সমবয়সীদের মতই গল্প করেন।

পিসীমার কথা শুনে গত বছরের একটা ঘটনা মনে পড়ল কমলিকার। পিসীমা পিসেমশাই; তাদের আটটি ছেলেমেয়ে, সবাই এসেছিল সেবার। বিকেল-বেলা পাশের বাড়ীর বিনোদ কাকা বেড়াতে এসে-ছিলেন। পিসীমা তাঁর সঙ্গে হেসে কথা বলেছিলেন ব'লে পিসেমশাইয়ের সে কি রাগ! পিসীমাকে সেদিন কাঁদতে পর্যন্ত দেখেছে কুমু। এই বুড়ো বয়সেও কি আশ্চর্য্য সন্দিগ্ধ মন পিসেমশাইয়ের! যে স্ত্রীর সঙ্গে প্রায় বত্রিশ বছর ঘর করেছেন, যিনি তাঁর সন্তানদের ধারণ করেছেন গর্ভে, মমতা দিয়ে ভালবাসা দিয়ে সংসার গড়েছেন তিলে তিলে, স্বামীর সুখ-শান্তি-স্বস্তির দিকে যাঁর সর্ব্বদা সজাগ দৃষ্টি, সেই মানুষকে একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে এত বিশ্রী সন্দেহ কি করে করেন, আর এত কঠিন আঘাতই বা কি করে দেন ভেবে পায় না কমলিকা। অথচ পিসেমশাইকে ত তারা শ্রদ্ধাই করেছে বরাবর। কি সুন্দর ছবি আঁকেন তিনি, আর মনও তাঁর এমনিতে কত বড়। লোককে দেবার সময় দিয়ে দিয়ে আর কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। এই ত এবারই কুমুকে কি চমৎকার একখানা নেকলেস দিয়েছেন। অথচ ওঁদের অবস্থা ত কারও অজানা নয়।

এককালে প্রচুর ধনসম্পদ্ ছিল, দেশের জমিজমা থেকে যথেষ্ট আয়ও হ'ত। কিন্তু এখন আর সেদিন নেই।

সেই উদার শিল্পী মানুষটির সঙ্গে ঐ বাতিকগ্রস্ত খুঁতখুঁতে লোকটির কোন সাদৃশ্য খুঁজে পায় না সে। আর একটা কথাও বারে বারে মনে হয় কুমুর। এক মানুষ কি কিছুতেই আর এক মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যেতে পারে না, নদী যেমন সাগরে মিশে তার সব সত্তাকে লীন ক'রে দেয়? সব মানুষই যেন এক একটা গ্রহের মত আত্মকেন্দ্রিক। দু'জনে মিলেমিশে সংসার করছে, সৃষ্টি করছে সন্তান, তাদের মিলিত দায়িত্বে পালন করছে, তবু তারা ব্যবধান রাখে—সেই দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অতিক্রম করে পরস্পর পরস্পরের একেবারে কাছাকাছি পৌঁছতে পারে না। তারা কি সত্যই অক্ষম—এ ব্যবধান কি তারা সত্যি ঘোচাতে চায়?

সৌমিত্রকে আবার মনে পড়ল। কুমুও কি আর সবার মত নিজের ইচ্ছা, নিজের সুখ নিয়ে তার চারপাশে ব্যবধানের প্রাচীর সৃষ্টি করবে? যে মুক্তাকে এত আদরে আহরণ করেছে, তা কি আবার হারিয়ে যাবে, মিশে যাবে ধুলোয়? প্রতিদিনের শত তুচ্ছতার মধ্যে ক্ষয় হয়ে যাবে সেই ঐশ্বর্য? সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল, বাসর ঘরের ফুল শুকোয়, আলো নিভে আসে, প্রথম প্রেমের মদিরতা কমে যায়। কিন্তু তবু সঞ্চয় করতে হয় মধু, দৈনন্দিন জীবনের কোষ থেকে তিলে তিলে, পলে পলে।

কমলিকা চোখ বুঁজে ভাবছিল। কুমকুম তাকে এক ঠেলা মারল। "এই কুমু, এখন অত ধ্যান না করলেও চলবে। দু'দিন পরে ত ওকে সারাদিনই পাবি—ও ত আর ঘর থেকে সহজে নড়বে না—শুনছি ত এক মাসের ছুটি নেবে।" ব'লেই মুখ টিপে হাসতে লাগল সে। কুমু সজোরে চিমটি কাটল কুমকুমের হাতে।

"উঃ" ব'লে চেঁচিয়ে উঠল কুমকুম। অরুণদা হাসিমুখে পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকলেন। "কি হ'ল? আমার গিন্নীর উপর এ কি অত্যাচার? রীতিমত ক্রিমিনাল অফেন্স!"

নীচ থেকে রিকশার হর্ণ কানে এল। মা'র গলা শোনা গেল। "সুমিত্রারা এসে গেছে।"

কুমকুম আর কমলিকা দৌড়ে নীচে নামে। সুমিত্রা ওদের ছোটকাকীমা। ছোটকাকা কলকাতায় একটা কলেজে প্রফেসরী করেন। কুমুরা নীচে এসে দেখে ছোটকাকু বাবার সঙ্গে বসে গল্প করছেন। তাঁর দুই ছেলে তোতন আর ছোটন এরই মধ্যে শম্পা শুভ্রর সঙ্গে খেলায় মেতে গেছে। কাকীমা, মা আর মেজকাকীমার সঙ্গে কি যেন বলাবলি করছেন। মুখে উত্তেজনার আভাস স্পষ্ট। ছোটকাকীমার কথা কানে এল কমলিকার।

"ওর কথা আর বল কেন বড়দি! আমি কত ভাবলাম, একখানা সিল্কের শাড়ি দেব কুমুকে, আর উনি গাদাখানেক বই কিনে এনেছেন কাল। আবার বলছেন, 'শাড়ি ও অনেক পাবে, এত ভাল বই ওকে কেউ দেবে না; কুমু বই পড়তে কত ভালবাসে'।" তার পর মেজ কাকীমার দিকে একটু সরে এসে গলার স্বর নীচু করে বললেন, "কথা শুনে রাগে গা জ্বলে যায়—বিয়ের পরে সংসার করবে না বই পড়বে! তুমিই বল মেজদি!" মেজকাকীমা ঘাড় নেড়ে ছোটকাকীমার কথায় সায় দিলেন।

মা শান্তস্বরে বললেন, "থাক না, সুমুর যা ইচ্ছা হয়েছে কিনেছে—কুমুকে ও ছোটবেলায় বড় ভালবাসত।" মা'র গলার স্বর স্নেহভারাতুর। ছোট দেওর সুমন্ত্রকে তিনি তার দশ বছর বয়স থেকে দেখছেন, তার প্রতি তাঁর অসীম মমতা। ছোটকাকীমা সুমিত্রা এম.এস-সি পাশ, ছোটকাকার সহপাঠিনী ছিলেন তিনি। ছোটকাকা একটু আপনভোলা পড়ুয়া মানুষ, বই পেলে তাঁর আর জ্ঞান থাকে না। ছোটকাকীমা সাধারণ সংসারী মেয়ের মত, বেশ গোছালো স্বভাবের। স্বামীর ধরণ-ধারণে খুঁৎ ধরেন তিনি সব সময়, শোধরাবার চেষ্টাও করেন প্রাণপণে—বেহিসাবীপনা তাঁর ভাল লাগে না। সংসারটি বেশ ছিমছাম, সারাদিন ধরে এই সংসারের পেছনেই লেগে আছেন তিনি। চাকরদের বকুনি, ছেলেদের শাসন, স্বামীর প্রতি অনুযোগ, এতেই সময় কেটে যায়। বাড়ীখানাকে ছবির মত করে রেখেছেন, নিজেও ফিটফাট পরিচ্ছন্ন। বেশ দামী দামী শাড়ী-ব্লাউস পরেন, গয়না-গাঁটিও বেশ ক'খানা গড়িয়েছেন। কৃপণ ব'লে তাঁর একটু অখ্যাতি আছে, কিন্তু সে-সব কথায় সুমিত্রা কান দেন না।

মেজ-জার সঙ্গে তাঁর জমে বেশ। অনেক মুখরোচক আলোচনা চলে। স্বামী ত সারাদিনই পড়ায় মগ্ন, বিয়ের পর প্রথম প্রথম কোন লেখা ভাল লাগলে সুমিত্রাকে পড়ে শোনাতেন। প্রথম বিয়ের পর তখন সুমিত্রার চোখেও রং-এর ঘোর ছিল। বেশ মন দিয়ে শুনতেন।

প্রকাশ করতেন নিজের মতামত। এখন আর সুমন্ত্র পাত্তা পান না। অনেকবার পড়ে শোনাতে গিয়ে রূঢ় জবাব শুনেছেন। "এখন আমার কত কাজ! আলুর চপটা ছোককুকে দেখিয়ে না দিলে যা তা ক'রে করবে।" নয়ত বলেন, "তোতনের শার্টটা সেলাই না করলে আর চলছে না। তোমার আর কি? বই পেলে ত জ্ঞান থাকে না। সংসার কি করে চালাচ্ছি তা ত আমিই জানি। তুমি ত টাকা দিয়েই খালাস। এই মাইনেতে ......" এই ধরণের কথাবার্তা চলতেই থাকে। সুমন্ত্র শেষ পর্যন্ত আর শুনতে পারেন না। কমলিকা সেবার কলকাতায় যখন ওঁদের বাড়ীতে ছিল, তখন দেখেছে, কি রকম করুণ অসহায় মুখে ছোটকাকা পালিয়ে গেছেন কাকীমার সামনে থেকে। কার মুখে যেন শুনেছে কমলিকা,—যখন কলেজ পালিয়ে সুমিত্রা সুমন্ত্রের সঙ্গে প্রেম করতেন, তখন তাঁকে "রাজপুত্র" বলে ডাকতেন। কল্পলোকের সেই রাজকুমার কি প্রতিদিনের ধূলি-মালিন্যে একেবারেই অবলুপ্ত?

ছোটকাকু বাবার সঙ্গে কথা বলতে বলতে তার দিকে চেয়ে মিষ্টি করে হাসলেন। তারপর বললেন, "কুমু, তোর জন্যে কত বই এনেছি, দেখবি চল্।"

ছোটকাকুর সঙ্গে ঘরের মধ্যে চলে এল সে। বড় সুটকেসটা খুলতেই প্রথমে চোখে পড়ল, মডার্ণ লাইব্রেরীর কমপ্লিট ওয়ার্কস অব্ শেলী অ্যাণ্ড কীটস, আরও কয়েকখানা ভাল ভাল বই। কুমু ত আনন্দে অস্থির, বই পেলে সে যত খুশী হয়, আর কিছুতে বোধ হয় তত হয় না। ছোটকাকীমা পেছন থেকে টিপ্পনী কাটলেন, "যেমন কাকা, তার তেমনি ভাইঝি। বই পেলে অজ্ঞান। সংসার করতে গেলে দেখবি, বই পড়ার ফুরসৎ কত। আমার ত বাপু দু'একখানা মাসিক পত্রিকা ওল্টালাম, খবরের কাগজটা খুঁটিয়ে পড়লাম, হয়ে গেল। ইনি যে রাশি রাশি বইয়ের মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কি রস পান ভগবান্ই জানেন। নিজের সাবজেক্ট সম্বন্ধে পড়েন ত বুঝি, তা না দুনিয়ায় যত রকমের বই আছে সব পড়া চাই। এর মানে বুঝি না।" একটু থেমে আবার বললেন, "এ ভাবে সময় নষ্ট না করে থিসিস লিখলে এতদিনে ডক্টরেট পেয়ে যেতেন।"

কুমুর এ সব কথা বিশেষ ভাল লাগছিল না। ছোট-কাকার ম্লান মুখের দিকে চেয়ে ভারী কষ্ট হচ্ছিল তার। একটু আগে এই মুখখানাই কি রকম উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেছিল। কাকীমা সরে যাবার পর, সে কাকুর দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি বলল, "বইগুলো পেয়ে আমার কিন্তু খুব ভাল লেগেছে কাকু। পড়ার সময় আমি করে নেব'খন......" একটু থেমে মুখ নীচু করে বলল, "ও-ও ত পড়তে খুব ভালবাসে।" ছোটকাকার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল, সস্নেহে তার পিঠে হাত রাখলেন তিনি।

কুমকুম আর মমতা এসে পেছন থেকে তাড়া লাগাল, "বিকেল ত হয়ে এল, শীগগির গা ধুয়ে চুল বাঁধ্। ভাল শাড়ী-টাড়ী পর্। এক্ষুণি কেউ এসে পড়বে।"

কুমু মৃদু হেসে উপরে চলে গেল। এই দু'দিন আগে সন্ধ্যে পর্যন্ত ছাদে বসে বই পড়েছে। চুল বাঁধে নি, কাপড় ছাড়ে নি। মা একটু-আধটু বলেছেন, কিন্তু এমন বিশিষ্ট স্থান পায় নি সে সকলের কাছে। এখন যেন তার আলাদা বৈশিষ্ট্য, আলাদা সম্মান। সে-ই যেন এখন সম্রাজ্ঞী।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হ'ল, আকাশে তারা ফুটল, গা ধুয়ে, চুল বেঁধে ঘন সবুজ রঙের একখানা ঢাকাই শাড়ী পরে বারান্দায় এসে বসল কুমু। মনটা একটু ভারী লাগছিল। আর সাতদিন পরে এ সব ছেড়ে চলে যাবে সে, তার আজন্মের পরিচিত ঘর, বাড়ী, মা, বাবা, আত্মীয়-স্বজন! একটি মানুষের জন্যে এত ছাড়তে হয়? ছাড়তে পারে মানুষ? যে জীবন তার কুড়ি বছরের জানা, সে জীবনটাকে এত সহজে পিছনে ফেলে চলে যাওয়া যায়? আশ্চর্য নিয়ম!

মা'র মুখ মনে পড়ল। কি অসীম মমতা তাঁর সন্তানদের প্রতি, অপরিসীম ধৈর্য। সমস্ত সংসারকে এই বত্রিশ বছর ধরে বুক দিয়ে আগলে রেখেছেন। কত পরিশ্রম করেন সারাদিন। তার জন্য এতটুকু অভিযোগ নেই, সর্বদা হাসিমুখ। বাবা সব সময় কাজে ব্যস্ত, খাবার শোবারও সময় পান না তিনি। একটা কলেজের প্রিন্সিপাল, অনেক দায়িত্ব তাঁর ওপর। বাবার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে মা'র সর্বদা সজাগ দৃষ্টি। কমলিকা সব সময় অনুভব করে, তাদের পরিবারের মানুষগুলির মধ্যে একটা নিবিড় বন্ধন আছে। তাদের চার বোন আর মা বাবার মধ্যে গভীর যোগ, অন্য অনেক ক্ষেত্রে যদি তারা অসুখী হয়েও থাকে, মা বাবার সম্পর্কে তাদের সুখ অপরিসীম। এর মূলে আছেন মা। তিনি তাঁর স্নেহস্নিগ্ধ বাহুবন্ধনে তাদের সকলকে ঘিরে রেখেছেন। মা, বাবার সম্বন্ধের মধ্যেও এমনি স্নিগ্ধ সরসতা আছে। কত যুগ হ'ল তাঁদের বিয়ে হয়েছে। বিয়ের পরে নিজেরা একলা হবার সুযোগ কখনও পান নি। মস্ত বড় সংসারের ভার নিতে হয়েছিল তাঁদের।

বাবা ত বাড়ীর বড় ছেলে। তিনি ছোট ছোট ভাই-বোনদের মানুষ করেছেন, লেখাপড়া শিখিয়েছেন, বিয়ে দিয়েছেন। ঠাকুরদা চিরকালই খেয়ালী স্বভাবের, তিনি নিজের কর্তব্য পালনে বিশেষ তৎপর ছিলেন না। বড় ছেলের ওপর সব দায়িত্ব দিয়েই নিশ্চিন্ত।

বাবা মা'র চারটি কন্যা-সন্তান, পুত্র তাঁদের হয় নি। এই বয়সেও বাবাকে কাজ করতে হচ্ছে, পাশে এসে দাঁড়াবার কেউ নেই, কাকুরা নিজেদের সংসার নিয়ে ব্যস্ত। পিসীমারা, দিদিরা পরের ঘরের বউ।

কত দায়িত্ব, কর্তব্য, কত বিপদের ঝড়-ঝাপটা তাঁদের ওপর এসেছে। কিন্তু তবু মনে হয়, মা'র সলজ্জ হাসিটি আজও অম্লান, বাবার সম্বন্ধে তাঁর অনুভূতি প্রথম প্রেম-বিধুরা নববধূর মত। সংসারের শত কাজের মধ্যেও তিনি বাবার পায়ের শব্দের জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকেন। রোজ বিকেলে বাবার জন্য খাবারের থালা সাজিয়ে সাগ্রহে অপেক্ষা করেন। সারাদিন মা'র বেশবাস যেমন-তেমন, কিন্তু বাবা ফেরার আগে ধপ্‌ধপে একখানা শাড়ী পরেন, কপালে সিঁদুরের টিপ, মুখে পান, ঠোঁটে মিষ্টি হাসি। কমলিকা ছোটবেলা থেকে দেখছে—প্রায় কোনদিনই এর ব্যতিক্রম ঘটে নি। বড় হবার পর মনে মনে বুঝেছে, মা বাবার দাম্পত্য-জীবনের প্রতিদিনের ধূলোর মালিন্য, শত তুচ্ছতার আঘাত সবই আছে। তবু তাঁরা সব কিছু থেকে মুক্ত। মনে মনে ভালবাসার মধু সঞ্চিত হয়েছে তিলে তিলে। সংসারকে দু'জনের মমতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। ব্যবধানের প্রাচীর অন্তরাল রচনা করে নি। তীব্র বিরোধের উত্তাপে দগ্ধ হয় নি মন। মুখের হাসিতে আজও তাই দীপ্তি আছে, চোখের দৃষ্টি স্নিগ্ধোজ্জ্বল। মা বাবার এই সুখটুকুকে, তাঁদের মনের পরম প্রাপ্তিটিকে নিবিড় ভাবে অনুভব করল কুমু। গেট খোলার শব্দে চমক ভাঙ্গল তার। সুবোধ মেসোমশাই আর সন্ধ্যা মাসীমা এসেছেন। এ পাড়াতেই থাকেন তাঁরা। কুমুকে বড় স্নেহ করেন। সুবোধ মেসোমশাই ত ঠিক তার বন্ধুর মত। মনের সব কথা ওঁর কাছে খুলে বলা যায়। সুবোধ মেসোমশাই বারান্দায় উঠে এলেন। দীর্ঘদেহ, গৌরবর্ণ, মুখে সিগার, পরণে ঢিলা পাজামা আর পাঞ্জাবী। বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি। কিন্তু তবু তাকিয়ে থাকবার মত চেহারা। তাঁর চোখ দু'টির দৃষ্টি বেশ গভীর, মনে হয় একবার তাকিয়ে যেন ভেতরটা পর্যন্ত দেখে নেন। কুমুর লম্বা বিনুনী ধরে একটু টান দিলেন, বললেন, "ওগো সখী, কার ধ্যানে রত?"

কুমু সলজ্জ হেসে উঠে দাঁড়াল। বলল, "বসুন।"

মেসোমশাই বসলেন, তারপর বেশ সস্নেহ স্বরে প্রশ্ন করলেন, "কিরে ভয় করছে নাকি?"

কুমু ঘাড় নেড়ে বলল, "না, ভয় কি?"

খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন তিনি, তারপর হাসলেন একটু, বললেন, "না, ভয় আর কি! বিশ্বাস করলে ভয় থাকে না। এই দেখ না, সন্ধ্যা আমাকে বিশ্বাস করে না, তাই আমি ওকে·····" ওপাশ থেকে মাসীমা চেঁচিয়ে উঠলেন, "ছোট মেয়েটাকে কি যা তা বোঝাচ্ছ। আয় ত কুমু, ঘরে চল্।" সন্ধ্যা মাসীমা কুমুর হাত ধরে মৃদু আকর্ষণ করলেন। "মেসোমশাই, আপনিও ভেতরে চলুন," ব'লে কুমু ঘরের দিকে পা বাড়াল।

"না, আমি অন্ধকারে বেশ আছি। তুমি বরং তোমার মাসীমাটিকে মা'র জিম্মায় দিয়ে আমার কাছে এসে বস।"

খানিক পরে কুমু এসে সুবোধ মেসোমশাইয়ের পাশে বসল। অনেক কথা বললেন তিনি। বড় ভাল লাগে তাঁর কথা শুনতে। কখনও বড়দের মত উপদেশের সুরে কিছু বলেন না, এমন গভীর ভাবে অনুভব করেন সব কিছু যে, তাঁর কাছে কোন সঙ্কোচ থাকে না। দাম্পত্য-জীবনের কয়েকটি পরম সত্য তাঁর কাছেই জেনেছে কুমু, অন্য কেউ এমন ভাবে বলতে পারতেন না। কুমুই লজ্জায় পড়ত, অথচ সুবোধ মেসোমশাইকে একটুও লজ্জা করে না। তিনি বন্ধুর মত, পরম স্নেহময় অন্তরঙ্গজনের মত তার মনটাকে বোঝেন। আর এমন কথা বলেন যা অত্যন্ত দামী। সাধারণ মূল্যে তাদের যাচাই করা যায় না। তিনি সর্বত্র যান, সকলের সঙ্গে মেশেন, কিন্তু এমন একটা ব্যক্তিত্ব তাঁকে ঘিরে আছে যা সকলের চেয়ে স্বতন্ত্র, সহজে তার নাগাল পাওয়া যায় না। কুমু কেমন করে যেন তাঁর মনটাকে ছুঁয়েছে। তিনি সন্তানহীন, কুমুর মধ্য দিয়ে সেই শূন্যতার ব্যথা ভোলেন। তার মধ্যে কন্যার স্বাদ পান।

সেদিন বেশ কিছুক্ষণ ধরে কুমুর সঙ্গে গল্প করলেন সুবোধ মেসোমশাই। কথায় কথায় বললেন, "দেহের মধ্য দিয়েই মানুষের সব কিছুর প্রকাশ। দেহ না থাকলে মনের ভালবাসা প্রকাশ করবে কি করে? তুমি যে তার হাতখানি ধরেছ সেও ত হাত দিয়েই। কিন্তু এই ধরার মধ্যে আরও অনেক কিছু আছে। শুধু ছোঁয়ার 'sensation'-এই এর শেষ নয়। সে অনুভূতি অনন্ত। ভালবাসার নেশায় মানুষ অনেক অনুভূতির শিহরণ অনুভব করে, কিন্তু কিছুদিন পরেই আবার সব রং ধুয়েও যায়। সেটা আমাদের নিজেদেরই দোষ, অনেক কিছুই

পেতে চাই, কিন্তু যাকে আমরা সুখের দাম্পত্য-জীবন বলি, সেটা পাবার চেষ্টা কতটুকুই বা করি আমরা? সেইখানেই ত যত গণ্ডগোল, তখন আমাদের অভিযোগ-অনুযোগেরও অন্ত থাকে না—কিন্তু তবু নিজেদের গলদটা ভুলেও ভাবি না কক্ষণো।" কথাটা শেষ করে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন তিনি। বাইরে অন্ধকার আকাশে অজস্র তারার সমারোহ। সামনের রাস্তা দিয়ে কে যেন গান গাইতে গাইতে সাইকেলে ক'রে চলে গেল। সামনের দিকে তাকিয়ে সুবোধ মেসোমশাই আস্তে আস্তে বললেন, "বিয়েটা একরাতের নয়, কুমু। সারা জীবন ধরে বিয়ে চলে মানুষের। এক দিনেই যদি সব ফুরিয়ে যেত তা হ'লে ত আর হাঙ্গামাই ছিল না। কিন্তু সমস্ত জীবন ধরে একে বাঁচিয়ে রাখতে হয়—একে সম্মান দিতে হয়, তা না হ'লে সব ফুরিয়ে যায়, হারিয়ে যায়।" করুণ হয়ে এল তাঁর কণ্ঠস্বর! একটু থেমে তারপর আবার বললেন, "পরস্পর পরস্পরকে ভুল বোঝে, বিয়েটা একটা বন্ধন হয়ে দাঁড়ায় কিন্তু সে বন্ধনে মনের কোন স্থান থাকে না। আমাদের দেশে অনেকক্ষেত্রে জোর ক'রে বিয়েটাকে টিঁকিয়ে রাখা হয়। একটা পনেরো বছরের বিধবা মেয়ে যদি দশ বছর অসহ্য বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করার পর কুলত্যাগ করে, আমরা কাজটাকে বলি অবৈধ। কিন্তু কত শত স্বামী স্ত্রী যে শুধু মাত্র দৈহিক সম্পর্ক নিয়ে দাম্পত্য-জীবন কাটায়, আর কোন সম্বন্ধ থাকে না তাদের মধ্যে, অথচ তাকেই আমরা পরম বৈধ বলে গর্ব করি। সংসার করি, ছেলেপিলে নাতি নাতনী হয়, কিন্তু বিবাহের আসল উদ্দেশ্যটাকেই ভুলে যাই।" বলতে বলতে তাঁর কণ্ঠের উত্তেজনা শান্ত হয়ে এল। কুমুর পিঠে হাত রেখে আস্তে আস্তে বললেন, "কিছু মনে করিস্ না কুমু, আজ অনেক কথা বলে ফেললাম। কিন্তু আমি ত জানি, হাজার ভালবেসে বিয়ে করুক, বিয়ের আগে মনের মধ্যে কতরকম ভাবনা হয়, বিয়ে না হ'লে অনেক কথাই জানা যায় না। দু'জনে প্রেম করার সময় সবদিকে দৃষ্টি থাকে না, কিন্তু প্রতিদিন একসঙ্গে থাকা খাওয়া ওঠা বসা শোওয়া সব কিছুর মধ্যে দিয়ে দু'জনকে জানা, সে আলাদা। এই জন্যই তোকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ভয় করছে কি না। একটা কথা ত জানিস্, 'ঘরখানি ছেড়ে দিয়ে ঘরখানি পেতে হয় তারে'। এই ছাড়া আর পাওয়ার মধ্যে ব্যথা আর আনন্দের ভাগ বোধহয় সমান,—অন্ততঃ আমার ত তাই মনে হয়।" শেষের দিকে কেমন ভারাতুর হয়ে এল তাঁর গলা। কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপ। তারপর উঠে দাঁড়ালেন সুবোধ মেসোমশাই। পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে কি যেন লিখে ওর হাতে দিলেন। কুমু দেখল তাতে লেখা আছে "A maxim for the married—Don't cease to be lovers."

দরজার কাছে গিয়ে সুবোধ মেসোমশাই বললেন, "আজ চলি কুমু।—কই গো এস।"

সন্ধ্যা মাসীমা আর সুবোধ মেসোমশাই চলে গেলেন। কুমু চুপ করে বসে রইল বারান্দায়। ভেতর থেকে মা'র গলা কানে এল, "কুমু কোথায় রে?" বারান্দা থেকে সোজা রান্নাঘরে চলে এল সে। মা শম্পা আর শুভকে খাইয়ে দিচ্ছেন। কুমকুমের মেয়ে রুমি দুধ খেতে খেতে ঘুমিয়ে পড়েছে। কুমকুম তাকে নিয়ে শোয়াতে চলেছে, বড়পিসীমা আর মাসীমা কুলোয় করে চাল বাছছেন, ছোটকাকীমা যাঁতিতে সুপুরি কেটে স্তূপাকার করছেন। কুমু মা'র গা ঘেঁষে বসে পড়ল, বলল, "বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে মা।"

মা ব্যস্ত হয়ে বললেন, "তুইও এই সঙ্গে খেয়ে নে না? তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়্। শেষে আবার শরীর খারাপ হবে।"

বড়পিসীমা স্নেহের হাসি হেসে চোখ তুলে তাকালেন, বললেন, "ওই থালাতেই ভাত মেখে তুমি ওকে খাইয়ে দাও বড় বউ। আর ক'দিনই বা। তারপর ত নিজের ঘর-দোর, সংসার, খেতে-শুতে সময় পাবে না। যে ক'দিন আর মায়ের কাছে, সে ক'দিনই সুখ।" সকলের মুখেই কেমন একটা বেদনার ছায়া ঘনাল। কুমুর নিজেরও বুকটা কিরকম ব্যথা করতে লাগল, বিয়েটা আশ্চর্য জিনিস! এত হাসি, গান, আনন্দ! তবু তার আড়ালে অশ্রুজলের ধারা ফল্গু নদীর মত বয়ে চলেছে। কন্যাকে বিয়ে না দিয়ে মা-বাবার সুখ শান্তি কিছুই হয় না। তবু বেদনার অন্ত নেই, বিচ্ছেদ-ব্যথায় প্রিয়জন-চিত্ত অধীর হয়ে ওঠে।·· মা থালায় ভাত মেখে কুমুর মুখে দিলেন, খেতে খেতে ওপাশের ছোট্ট ঘরখানার দিকে চোখ পড়ল কুমুর। নিরামিষ রান্নার জন্য আলাদা কোন ঘর নেই, তাই বড়মাসী এলে ওখানেই রান্নাবান্না করেন। দেখল বড়মাসী সেখানে বসে একমনে ক্ষীরের ছাঁচ গড়ছেন। আগুনের আভায় আরক্ত তাঁর মুখ, স্বেদাক্ত ললাট। সারাদিন ধরে দেখছে কুমু, কি নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন তিনি। মুখে কিন্তু হাসিটি আছে ঠিক। প্রকাশের এতটুকু আতিশয্য নেই। অথচ ঠিক সময় ঠিক জিনিষটি সকলের হাতের কাছে এনে দিচ্ছেন। অন্যরা হয়ত গল্পই করছে শুধু, বড়মাসীর কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হাতও চলেছে।

তাঁর দিকে তাকিয়ে অনেক কথাই মনে আসছিল তার। বড়মাসী নিঃসন্তান বিধবা। মাত্র কুড়ি বছর বয়সে তিনি স্বামীকে হারান। কিন্তু তবু আশ্চর্য লাগে একটা কথা ভেবে, এই শূন্যতার স্বাক্ষর কিন্তু তাঁর মধ্যে কোথাও খুঁজে পায় না কুমু। সাদা থান পরেছেন, নিরাভরণ অঙ্গ। চোখ দু'টি কিন্তু সব সময় হাসছে। মনে হয় কোন বঞ্চনা নেই ওঁর জীবনে। তাঁর অস্তিত্বের মধ্যেই একটা পরম আশ্বাস রয়েছে। তিনি যে আছেন এই অনুভূতিটুকুই সকলকে আনন্দ দেয়, ভরসা দেয়। আঠারো বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল আর কুড়ি বছর বয়সে তিনি সব হারান। আজ তাঁর পঁয়তাল্লিশ বছর বয়েস। মনে হয় এতদিন ধ'রে কি পেলেন আর কি পেলেন না, তার কোন হিসেব করেন নি তিনি। দু'টি বছরের পাওয়ার মধ্যেই তিনি চির জীবনের ঐশ্বর্য্য পেয়ে গিয়েছেন। কোন কিছুর জন্যই তাঁর কোন ক্ষোভ নেই যেন, ঠোঁটের হাসির মধ্যে কোন ম্লানতা নেই। বড়মাসীকে যত দেখে তত মুগ্ধ হয় সে। মেসোমশায়ের কথা তাঁর মুখে কখনও শোনেনি বললেই হয়। অথচ সে খুব ভাল করেই জানে, তাঁর দিনরাত্রির চিন্তার মধ্যে স্বামী কতখানি জুড়ে আছেন। হঠাৎ একদিন তাঁর সম্বন্ধে কি বলতে গিয়ে বড়মাসীর চোখ জলে ভ'রে এসেছিল। এতদিন পার হয়ে গেছে, কিন্তু স্বামার স্মৃতি এতটুকু ম্লান হয় নি।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ থালার দিকে তাকিয়ে দেখল পাতের সব ভাত শেষ হ'য়ে গেছে। মা জিজ্ঞেস করছেন, "একটা সন্দেশ খাবি নাকি রে?"

"না, থাক।" থালা ছেড়ে উঠে পড়ল কুমু।

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে বড়মাসীর কথাই খালি মনে পড়ছিল তার, হঠাৎ শম্পা শুভদের চেঁচামেচি কানে এল। প্রথমেই শুভর গলা, "ছোটমাসীর বিয়ের দিন কি হবে জানিস্ ছোটন? পোলাও, মাংস, চিংড়ী মাছের মালাই-কারী···" তার কথায় বাধা দিয়ে শম্পা চেঁচিয়ে ওঠে, "আমি টেরিলিনের লাল ফ্রকটা পরব। আর রুমিকে চেলী পরিয়ে দেব।" বড়মামার দুই মেয়ে ইলা, নীলা একটু বড়। একজনের তেরো আর একজনের পনেরো। তারাও আলোচনা করছে। "কুমুদির বিয়ের দিন তুই মা'র সেই নীল বেনারসীটা পরিস্ দিদি," নীলা বলছে।

ইলার গলা শোনা গেল, "না, আমি গোলাপীটা পরব। তুই বরং নীলটা পরিস্।" ওদের আনন্দ-কলরবে মনটা আবার কেমন করে উঠল, বিয়ের উৎসবটুকুই ওরা জানে, তারই জন্য ব্যাকুল ওদের প্রাণ। বিয়েটা যে এ সবের চেয়েও কত বেশী, এটা যে কি নিদারুণ হারজিতের খেলা, সব সমারোহের আড়ালে কত বেদনার ইতিহাস যে লেখা থাকে, বাঁশীর সুরের পেছনে কত করুণ কান্না। তা কি এরা জানে? ক'দিন আগে কুমুই কি কিছু জানত? হয়ত তখনই সুখী ছিল, ওরা যেমন সুখী!···

সকলের অলক্ষ্যে শোবার ঘরে এল সে, আজ কারও সঙ্গে কথাবার্তা বলতে ভাল লাগছে না তার। শোবার ঘরে কেউ নেই, কুমকুম বোধ হয় বিছানাটা পেতে রেখে গেছে, রুমি খাটের একপাশে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। শুয়ে পড়ল কুমু। আলো-নেভা ঘরে শুয়ে কত কথাই মনে এল তার। হঠাৎ কার কথার আওয়াজ শুনতে পেল, মনে হ'ল, এ কি, ঠাকুমা কথা বলছেন যেন? পরক্ষণেই বুঝল ওটা বড়পিসীমার গলার স্বর। কি আশ্চর্য! ঠিক ঠাকুমার মত মনে হচ্ছে। কমলিকা ভুলেই গিয়েছিল, ঠাকুমা ত এখানে নেই। দিন কয়েক আগে কলকাতায় গিয়ে ছোটপিসীর বাড়ীতে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ঠাকুমার কথা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আরও কত ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠল চোখের সামনে, "কুমু" তাঁর বড় প্রিয়। ঠিক বন্ধুর মত মেশেন তার সঙ্গে। সৌমিত্রর কথা যখন ঠাকুমাকে বলেছিল, আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল তাঁর চোখ দু'টি। বলেছিলেন, "ভালবাসার মত জিনিষ কি আর আছে রে? ও বড় মিষ্টি।" একটু থেমে হেসে আবার বলেছিলেন, "আমাদের ছেলেবেলায় বিয়ে হয়েছিল, সে রকম সম্পর্কই ছিল না ওঁর সঙ্গে। তোরা আছিস্ বেশ। কি সুন্দর দুজনকে জানছিস্। আমরা ত ভাই ভয়েই সারা হয়ে যেতাম, বয়সে ত ঢের বড় ছিলেন, তার ওপর যা গম্ভীর, এখন ত দেখছিস্, তখনও ঠিক ওই রকম। সারাটা জীবন ভয়ে ভয়েই কাটল।" কথার শেষে আবার হেসেছিলেন ঠাকুমা, কিন্তু সে হাসিতে কান্না জড়িয়ে ছিল যেন। চোখের সামনে একটি হাস্যমুখী চঞ্চলা কিশোরীর ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। কৈশোরের সন্ধিক্ষণে জীবনের পরমলগ্ন এসেছিল, মূল্য বোঝেন নি। যখন যৌবন এল, বন্যার মত দুর্বার আবেগে ভাসিয়ে নিতে চাইল সব। তিনি তখন চারটি সন্তানের জননী। সহস্র দায়িত্বে, কর্তব্যে ঘেরা জীবনে প্রণয়ের অবকাশ কোথায়? সংসারে তার স্থানই বা কই? আগে তবু স্বামীকে শয্যাসঙ্গী হিসেবে পেয়েছিলেন, সেই সান্নিধ্যটুকু প্রথম প্রথম ভালই লাগত। কিন্তু প্রতিবছর একটি করে সন্তান আসতে লাগল, স্বামী ধীরে ধীরে

দূরে সরে গেলেন, মনের কাছাকাছি তাঁকে কোনদিনই পান নি। এবার দেহের সান্নিধ্য থেকেও বঞ্চিত হলেন। শয্যার দাবিদার বাড়ল, স্বামী কক্ষান্তরে গেলেন। মনে মনে ভাবল কুমু, সারাজীবন শুধু মুখ বুজে সংসারই করেছেন ঠাকুমা। সন্তানের জন্ম দিয়েছেন, পালন করেছেন তাদের। কিন্তু হৃদয় তাঁর উপবাসী হয়েই রইল। কথায় কথায় আজও কবিতা আওড়ান ঠাকুমা। মাঝে মাঝে ছড়াও লেখেন, কিন্তু কমলিকা জানে, সারাজীবন তিনি কিছুই পান নি। তাই হাসিতে কথায়, ছড়ায়, গানে নিজেকে ঢেকে রাখেন, লুকিয়ে রাখতে চান তাঁর শূন্যতা। ছোটবেলা থেকেই ঠাকুমার প্রতি কেমন একটা কোমল অনুভূতি হ'ত তার। দাদু চিরকালই কড়া মেজাজের মানুষ, ঠাকুমাকে কথায় কথায় কেবলই বকেন। সেই তিরস্কৃতার বেদনার্ত অসহায় মূর্তি কমলিকা যেন সইতে পারত না। আজ তার নিজের জীবনে পরম সুখের লগ্ন আসছে, কিন্তু বার বার এই কথাটাই মনে হচ্ছে, ঠাকুমা কি পেলেন সারা জীবন ধ'রে? তিনি কি শুধু অন্যের সুখে সুখী হবেন চিরদিন, কমলিকাদের যুগল জীবনের রোমাঞ্চ তাঁকেও শিহরিত করবে? শুধু কি এইটুকুই তাঁর প্রাপ্তি?

ভাবতে ভাবতে নিজের চোখ দু'টিই জলে ভরে এসেছিল তার। হঠাৎ মনে এল ছোড়দির কথা। সঙ্গে সঙ্গেই অনিরুদ্ধদাকে মনে পড়ল। অনিরুদ্ধ রায়। এক সময় ছোড়দি ওকে ভালবেসেছিল। ভদ্রলোকের চেহারা চমৎকার, মাজিত রুচি, ভদ্র ব্যবহার, আদর্শবাদীও ছিলেন তিনি। খদ্দর পরতেন, গান্ধীজীর পরম ভক্ত। শুধু ছোড়দি কেন, বাড়ীর সকলেই তাঁকে দেখে মুগ্ধ। বাবার সঙ্গে কি সূত্রে জানি আলাপ হয়েছিল, সেই থেকেই এ বাড়ীতে যাওয়া-আসা। কুমকুমের তখন অল্প বয়স, অনিরুদ্ধকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিল। সাধারণ ছেলেদের মত মেয়েদের প্রতি হৃদয়-দৌর্বল্য প্রকাশ কখনও করে নি অনিরুদ্ধ। কুমকুম তাকে দূর থেকেই ভালবাসত। ভালবাসার চেয়ে বোধ হয় শ্রদ্ধাই করত বেশী। মন জানাজানি হ'তে বেশ দেরি হয়েছিল। কুমকুম তাঁকে আবেগভরা চিঠি লিখত। সে সব চিঠি কমলিকা দেখেছে, জবাব আসত সংযত সুন্দর, উচ্ছ্বাসের বাষ্প নেই।

মনের কথাকে বাইরে প্রকাশ করা পছন্দ নয় অনিরুদ্ধর।

শ্রদ্ধা আরও বাড়ছিল। এত সংযত ভদ্র মানুষকে কি শ্রদ্ধা না ক'রে পারা যায়? কুমকুমকে নানা বই এনে দিত অনিরুদ্ধ, গান্ধীজীর আদর্শের নানা কথা থাকত তাতে। কুমকুম প'ড়ে মুগ্ধ হ'ত, অনিরুদ্ধর প্রতি শ্রদ্ধায় বিহ্বল হ'ত তার মন। সেও অনিরুদ্ধর মত খদ্দর ধরে। তার সঙ্গে নানা সভাসমিতিতে যায়। শুধু প্রিয়াই নয়, সে যতখানি প্রিয়া, তার চেয়ে বেশী বোধ হয় শিষ্যা, ভালবাসার কথা মুখে কিংবা চিঠিতে খুব কমই প্রকাশ করে অনিরুদ্ধ। সবই তার মনে মনে। মুখে চিঠিতে তার শুধু আদর্শের জয়গান। সেই একটা বিষয়ে সে উচ্ছ্বসিত হ'তে জানে। বাবা অনিরুদ্ধকে খুবই পছন্দ করতেন। মনে মনে তাঁরও এই আদর্শবাদের প্রতি ছিল শ্রদ্ধা। কুমকুমকে কাছে ডেকে তার মন জানলেন বাবা। তারপর অনিরুদ্ধর কাছে নিজেই মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব করেন। অনিরুদ্ধ প্রথমে কিছুই বলল না। লাজুক মুখে চুপ করে রইল। তার পর বলেছিল, "আমার ত কোন আপত্তি নেই। তবে বিয়ের পরে ত সাধারণ জীবন-যাপন করা চলবে না, আমরা দুজনেই কোন আশ্রমে চলে যাব, যেখানে গান্ধীজীর আদর্শ অনুযায়ী জীবন কাটাতে পারব। আপনাদের তাতে কোন আপত্তি হবে না ত?"

বাবা হেসে বলেছিলেন, "তোমার হাতে মেয়েকে দিচ্ছি। তাকে নিয়ে তুমি যা খুশি করতে পার; আমি আপত্তি করব কেন?" তার পর অনিরুদ্ধই কুমকুমকে লিখে জানিয়েছে সব কথা। বিয়ের পরে অন্তত: বছর দুয়েক কুমকুমকে একাই থাকতে হবে আশ্রমে। ভাল করে জেনে নিতে হবে সেখানকার জীবন-যাত্রার খুঁটিনাটি। আদর্শবাদ সম্বন্ধেও পড়াশুনা করা দরকার। আদর্শকর্মী হতে হবে ত তাকে? তারপর অনিরুদ্ধ ত আছেই, সে যখন দরকার মনে করবে, তখন নিশ্চয়ই এসে দাঁড়াবে কুমকুমের পাশে। আরও অনেক কথা লিখেছিল অনিরুদ্ধ, সে সব আজ আর মনে নেই কমলিকার। ছোড়দি তাকে চিঠিটা দেখিয়েছিল। কমলিকার কিন্তু একটুও ভাল লাগে নি সে চিঠি। অনিরুদ্ধকে বড় সুবিধাবাদী মনে হয়েছিল। আদর্শের চেয়ে নামের মোহ তার অনেক বেশী। স্ত্রী যদি আশ্রমে থাকে, তা হ'লে লোকের কাছে ত্যাগীর ভান করা খুব সহজ হয়। নিজের জীবনযাত্রার এতটুকু বদল না করে শুধু মিষ্টি কথার জোরে যদি মহৎ মানুষের আখ্যা পাওয়া যায়, সেটা কি কম লাভ? গান্ধীজীর শিষ্যের কাছে ঠিক এই ধরণের ব্যবহার আশা করে নি কুমু। সেদিন অনেক ছোট ছিল সে, তবু এসব কঠিন

কথা তার মনে এসেছিল, কিন্তু ছোড়দি আঘাত পাবে ভেবে কিছুই বলে নি। কুমকুম অনিরুদ্ধর সব প্রস্তাব নির্বিবাদে মেনে নিয়েছিল, তার আন্তরিকতাতে কোন খাদ ছিল না। তাছাড়া অনিরুদ্ধর সুন্দর চেহারা, সুন্দর কথা ছোড়দির মত সরল মেয়েকে মুগ্ধ করার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু তবু বিয়ে হয় নি। সেদিনও মনে হয়েছিল, আজও মনে হয়, ভাগ্যে বিয়ে হয় নি তাই ত অরুণদার মত স্বামী পেয়ে ধন্য হ'ল কুমকুম। তা না হ'লে কি হ'ত! কুমকুমের চিঠি পাবার পর আর আসে নি অনিরুদ্ধ। পরপর দু'চারখানা চিঠি দেবার পর অল্প কথায় জানিয়ে দিয়েছিল। এখন অনেকদিন অপেক্ষা করতে হবে। প্রতীক্ষাতেই নাকি প্রেমের পরীক্ষা, ভালবাসা কি অত সহজ? মানুষকে তিলে তিলে তার পরীক্ষা দিতে হয়। এর পরেও কুমকুম আশা ছাড়ে নি, অনেক চেষ্টা করেছে অনিরুদ্ধের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেও বুঝেছিল, শুধু কথারই জাল বুনেছে অনিরুদ্ধ এতদিন ধরে। তার মনে কুমকুমের কোন ছায়া নেই। সব আলো সেদিন নিভে গিয়েছিল কুমকুমের জীবন থেকে। কমলিকাই ছিল তার একমাত্র সঙ্গী, সে বয়সে ছোট, কিন্তু তবু নানা কথায় পরামর্শে ছোড়দির মনকে সে সুস্থ করে তুলেছিল। ফিরে এসেছিল জীবনের হারানো আনন্দ গান। এর পরে কোন মোহই ছিল না ছোড়দির অনিরুদ্ধ সম্বন্ধে। ও বুঝেছিল, অনিরুদ্ধ একটা আমি-সর্বস্ব জীব। নির্দয়, ক্ষমতালোভী, আদর্শবাদের নামে ক্ষমতা লাভেরই সাধনা করেছে সে। শেষ পর্যন্ত তাকে ঘৃণা করতেই সুরু করেছিল ছোড়দি। এই ঘটনার বছর খানেক পরে অরুণের সঙ্গে কুমকুমের বিয়ে হ'ল। প্রথমে সে রাজী হয় নি, কমলিকাই তাকে বুঝিয়ে রাজী করেছিল। অরুণদাকে পেয়ে সুখী হয়েছে কুমকুম। বিয়ের কিছু দিন পর নিজের জীবনের এই বেদনার্ত অধ্যায়ের কথা স্বামীকে বলেছিল কুমকুম। বলতে গিয়ে চোখে জল এসেছিল তার, অরুণদা নাকি হেসে বলেছিলেন, "দূর, পাগল নাকি? ঐ জন্য আবার কাঁদে? তুমি ত ভালবেসেছিলে—যে সব মেয়েদের vitality আছে তারাই ভালবাসে—ভালবাসতে পারে এমন মন কি সহজে মেলে নাকি?"

অরুণদা মমতা দিয়ে, প্রেম দিয়ে ঘিরে রেখেছেন ছোড়দিকে। ওদের এই আনন্দ গভীর তৃপ্তিতে ভরে দেয় কমলিকার মন।

ছোড়দির কথা ভাবতে ভাবতেই মেজদির কথা মনে পড়ল তার। ব্যথায় ভরে উঠল মন। সঙ্গে সঙ্গে বড়মামার কথাও মনে পড়ে। মেজদি সোমেনদাকে নিজে পছন্দ করে বিয়ে করেছিল। বড়মামা মামীমাকে পছন্দ করে ঘরে আনেন নি। তাঁর বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দুজনের কেউই সুখ পেল না। সার্থক হ'ল না। মেজদি সোমেনদার ভালবাসা ত সে নিজে চোখে দেখেছে, একদিনের বেশী দু'দিন এসে বাপের বাড়ী থাকত না সে। আর সেই সোমেনদা শেষ পর্যন্ত একটা ফিরিঙ্গী মেয়েকে ঘরে রেখে মেজদিকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিল। এর চেয়ে অবিশ্বাস্য আর কি হ'তে পারে? এই সোমেনদাকেই ত একদিন সকলে হীরের টুকরো ছেলে বলেছিলেন। তার বাপের অগাধ টাকা, ব্রিলিয়াণ্ট কেরিয়ার তার, চেহারা চমৎকার। হীরের টুকরো হ'তে আর বেশী কি দরকার হয়?

বড়মামার জীবনে অবশ্য মেজদির মত ট্র্যাজেডি ঘটে নি, কিন্তু ব্যবধানের বেদনা কি বিচ্ছেদের চেয়ে কম? বিচ্ছেদে ত তবু চোখের আড়ালে থাকে মানুষটা, যেটুকু সুখ-স্মৃতি আছে তা নিয়ে নাড়াচাড়া করা চলে, কিন্তু ব্যবধানে ত প্রতি-নিয়ত কাঁটা বেঁধে, ক্ষতস্থানে রক্ত ঝরে, প্রতি মুহূর্তে জীবনের স্বপ্ন চূর্ণ হয়ে যায়। যেমন ক'রে বড়মামা অমলেশের গেছে। স্তিমিত হয়ে এসেছে দু'টি চোখের দৃষ্টি। এককালে হীরের মত উজ্জ্বল ছিল দু'টি চোখ। অমলেশ নাকি বিপ্লবী ছিলেন প্রথম যৌবনে. সে কি গতজীবনের কথা, না গতজন্মের? প্রায়ই কথাটা মনে মনে ভাবে কমলিকা, আজকের বড়মামা ত বলির পশুর মত ত্রস্ত অসহায়। সংসারের হাড়িকাঠে মাথা দিয়েছেন, সঙ্গিনী যাকে পেয়েছেন তার কোন সহায়তাই পান নি সারা জীবন। বড়মামার শয্যাসঙ্গিনীই হয়েছেন শুধু তিনি, চারটি সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। বড়মামা এককালে অনুভূতিপ্রবণ ছিলেন, ভাবোচ্ছ্বাসে পূর্ণ ছিল হৃদয়। সংসারের দাব-দাহে আজকের অমলেশ পুড়ে ছাই হয়ে গেছেন। সেই ভস্মাবশেষের মধ্যে এককণা অঙ্গারও আজ আর অবশিষ্ট নেই। বড় অভিমানী হয়ে পড়েছেন আজকাল, অতিরিক্ত স্পর্শকাতর। কারুর সঙ্গে বনতে চায় না, কারণে-অকারণে মানুষকে আঘাত করেন। মা'র কাছেই শুনেছে কমলিকা, এককালে বড়মামা খুব ভাল গান গাইতেন, কিন্তু আস্তে আস্তে সংসারের শত তুচ্ছতার মধ্যে নিজেকে বিসর্জন দিয়েছেন, সুর আজ নির্বাসিত তাঁর জীবন থেকে।

ঢং ঢং করে নটা বাজল, এখনও ওরা কেউ শুতে এল না, রুমিটা ওর কাছ ঘেঁষে ঘুমচ্ছে। বাইরের আকাশটা

চোখে পড়ে। অজস্র তারা ফুটেছে। বাইরের বারান্দা দিয়ে কে যেন খালি পায়ে চলে গেল। ফিস ফিস কথার আওয়াজ। জানলার কাছেই চাঁপা গাছ, ফুলের গন্ধ আসে হাওয়ায়। অন্ধকার ঘরে শুয়ে, সকলের ভাবনার মাঝখানে একজনের চিন্তাই বুক জুড়ে বসতে চাইছিল বারবার, সৌমিত্র এসে তার সামনে দাঁড়াল যেন। দীপ্ত চোখে ওর দিকে চেয়ে আছে সে, ঠোঁটে মিষ্টি হাসি। ছ'মাস আগের কথা মনে পড়ল, যেদিন দুর্ঘটনার সংবাদটা এল। ল্যাবরেটরীতে কাজ করতে গিয়ে সালফিউরিক এ্যাসিডে সৌমিত্রর মুখের বাঁ-পাশটা একদম পুড়ে গিয়েছিল। ঘটনাটা ঘটবার বেশ কিছুদিন পরে হাসপাতাল থেকে সে নিজেই খবরটা জানিয়েছিল কুমুকে। লিখেছিল, "কুমু, বীভৎস হয়ে গেছি। এককালে জানতাম লোকে আমাকে সুন্দর বলে, এখন কিন্তু যে দেখে সেই মুখ ফিরিয়ে নেয়, তুমিও কি মুখ ফিরিয়ে নেবে?" চিঠিটা পড়ে চোখে জল এসে গিয়েছিল কমলিকার, উত্তরে অনেক কিছু লিখেছিল, মনের বেদনায় ভরে দিয়েছিল সেই চিঠি। শেষের দিকে লিখেছিল, "আমাকে এমন ভাবতে পারলে কি করে? আমি ত তোমারই সৌমিত্র, চিরকাল তাই থাকব। তুমিই না একদিন গেয়েছিলে, রূপে তোমায় ভোলাব না····· "

আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে অনেকেই কিন্তু ব্যাপারটাকে সহজভাবে নিতে পারেন নি। অনেকেই বলেছেন, "ওর সঙ্গে বিয়ে দেবার কি দরকার? এর চেয়ে কত ভাল পাত্র ত ছিল।" এসব আলোচনা কমলিকার সামনাসামনি করে নি কেউ। কিন্তু অনেক আত্মীয়াদেরই বাড়ীতে এসে বারবার সৌমিত্রর খোঁজ নেওয়াটা কেন যেন ভাল লাগে নি কমলিকার। তাদের কারও মুখেই সহানুভূতির ছায়া দেখে নি সে। আড়ালে প্রায়ই ফিস ফিস করতে দেখেছে। যে দু'একটা কথা কানে এসেছে, তাতেই বুঝেছে সকলের মনোভাব। একবার ঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে শুনেছে, বাবার এক খুড়তুতো বোন বলছেন, "আমাদের ত প্রথম থেকেই ভাল লাগে নি, কোন একটা বাজে কলেজে আড়াইশ টাকা মাইনের চাকরি করে। বাড়ীর অবস্থাও ত তেমন ভাল নয়। বড়দারই বা কি আক্কেল! মেয়ে চাইল অমনি রাজী হয়ে গেল। ঐটুকু মেয়ে বিয়ের বোঝে কি?" মেজকাকীমা স্বর্ণলতা একটু নীচুস্বরে বলছেন, "আমিও ত তাই বলি, ওসব প্রেম-ট্রেম নিয়ে অত মাথা ঘামাতে নেই। ভাল ইঞ্জিনীয়ার কি ডাক্তার পাত্র দেখে বিয়ে দিয়ে দিলে ঠিক হ'ত। দু'দিনে ভুলে যেত সব। এখন ত আবার মুখটুখ পুড়িয়ে একাকার কাণ্ড, মানুষ জনের সামনে জামাই বলে পরিচয় দেব কি করে? আমার ত লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে করছে।"

কমলিকা দ্রুতপায়ে চলে গেছে সেখান থেকে। মা'র কাছে এসে কেঁদেছে। মা স্নেহভরে পিঠে হাত বুলিয়েছেন, কিন্তু মনের ব্যথা সম্পূর্ণ মোছে নি। সেদিন সন্ধ্যায় সুবোধ মেসোমশায়কে সব কথা খুলে বলেছিল কমলিকা। তিনি বলেছিলেন, "কে কি বলছে, না বলছে, তাই নিয়ে এত ভাবছ কেন? তোমার নিজের মন কি বলে?"

"আমি ত ওর ভেতরটাকে জানি, মেসোমশাই। সেটা ত কোনদিন বদলাবে না।" আকুল হয়ে বলেছিল সে।

"ব্যস, তা হ'লেই ঠিক আছে। কোনদিকে তাকিও না। কারও কথা শুনো না। চটপট বিয়ে সেরে নাও; নিজের মনের চেয়ে বড় পরামর্শদাতা আর আছে নাকি?" হাসিহাসি মুখে কথাটা বলেছিলেন সুবোধ মেসোমশাই। মন একেবারে শান্ত হয়ে গিয়েছিল। দিন পনেরো আগে সৌমিত্র একবার এসেছিল, দেখা করেছিল তার সঙ্গে। মুখের বাঁ দিকে বিশ্রী ক্ষতচিহ্ন তার সৌন্দর্য অনেকখানি কেড়ে নিয়েছে, কিন্তু চোখ দুটো তেমনি প্রসন্ন। ঠোঁটের হাসিতে এতটুকু অস্বচ্ছন্দতা নেই। দু'হাত দিয়ে তার হাত দুটো চেপে ধরেছিল কমলিকা। আর কিছু বলতে পারে নি। বলবার দরকার হয় নি, কান্নায় গলার স্বর রুদ্ধ। কিন্তু সব কথা স্পষ্ট হয়ে ধরা দিয়েছিল ওই চোখের জলের মধ্যে।

বাইরে বড়মাসীর গলার আওয়াজ পেল কুমু, চুপ করে চোখ বুজে পড়ে রইল, আজ রাতে কারও মুখোমুখি হ'তে ভাল লাগছে না তার। শুধু স্বপ্নে ডুবে থাকতে চাইছে মন। না, বড়মাসী এ ঘরে ঢুকলেন না। কাকে যেন চুপিচুপি বললেন, "এই, আস্তে,···কুমু ঘুমচ্ছে।" তাঁর পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল বারান্দার অপর প্রান্তে। টুকরো টুকরো কত কথা মনে পড়ল। সৌমিত্রের সঙ্গে আজ তার প্রায় পাঁচবছরের আলাপ। কিন্তু কোনদিন তার মধ্যে আবেগের এতটুকু আতিশয্য দেখে নি সে। তাই বলে সৌমিত্র নিরুচ্ছ্বাস মোটেই নয়। আসলে সে বড় চাপা, চিঠিতে তার আবেগের কিছুটা প্রকাশ, বাকিটা প্রকাশিত হয় চোখের দৃষ্টিতে, হাতের ছোঁয়ায়, ঠোঁটের হাসিতে। কত পেয়েছে এই পাঁচবছর ধরে, আরও কত পাবে। সৌমিত্র তাকে কত ভাবে পূর্ণ

করবে। সে প্রিয়া হবে, বন্ধু হবে, জায়া হবে, অবশেষে জননী। হাত বাড়িয়ে টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে দিল কমলিকা। বালিশের তলা থেকে ছোট্ট একটা ডায়রী বার করল, তার মধ্যে অনেকদিনের শুকিয়ে-যাওয়া একটা চাঁপাফুল, ফুলের পাপড়িগুলি বিবর্ণ, তবু তার মৃদু গন্ধ এল নাকে। ডায়রীর ভেতরে সৌমিত্রর ছোট্ট একটা ফটো। চোখ দুটো হাসছে, ওই দৃষ্টির মধ্যেই আছে সব আশ্বাস।

কানের কাছে সুবোধ মেসোমশায়ের গম্ভীর গলার স্বর শুনতে পায়। "সুখের সংজ্ঞা অনেক রকম কুমু, কেউ দু'পয়সার ফুল পেয়েই সুখী হয়, আবার কেউ কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েও কেবলই সুখের জন্য হা-হুতাশ ক'রে মরে। আমার ত খালি সেই কবিতাটাই মনে পড়ে, 'তেমন করে হাত বাড়ালে সুখ পাওয়া যায় অনেকখানি'।"

একথা ত অনেকদিন আগেই জেনেছিল কমলিকা। প্রথম যখন সৌমিত্রকে ভালবাসল তখন এই সুখের আস্বাদেই ভরে ছিল মন। সৌমিত্র তাকে ভালবাসে, এই অনুভূতিটুকুই সব। আজও মন ভরে আছে সেই পরম সুখের আস্বাদনে। সৌমিত্র সুন্দর কি কুৎসিত, অর্থবান্ কি দরিদ্র, এ নিয়ে কোনদিন ভাবে নি। যে ঐশ্বর্য সে পেয়েছে, তার মূল্য সকলে বোঝে নি, হয়ত কোনদিন বুঝবে না। এই ত মাস কয়েক আগে সুলতা আর রমা এসেছিল, ওরই সহপাঠিনী ছিল তারা। একটু বিদ্রূপের সুরই ছিল তাদের কণ্ঠে। স্পষ্ট করে অবশ্য কিছু বলে নি। তবু তাদের কথার অন্তর্নিহিত খোঁচাটুকু ঠিক বুঝেছিল কুমু। সুলতা একটু হেসে বলেছিল, "তুই চিরকালই বড্ড ইমোশনাল। অত সহজেই ফাঁদে পড়ে গেলি······" তার কথায় বাধা দিয়ে রমা বলেছিল, "তুই থাম্ না লতা, ও যে পেরেমে পড়েছে, সেটা বুঝিস্ না। আমার বাপু প্রেম-ট্রেম শুনলেই বার্নার্ড শয়ের সেই লাইনটা মনে পড়ে: Love is a misunderstanding between two fools," ব'লেই হো হো করে হেসে উঠেছিল রমা, সুলতাও যোগ দিয়েছিল তার সঙ্গে। রমার কথা চিরকালই এরকম ধারাল। ব্যথা পেয়েছিল কুমু। তবু সেটা ওদের বুঝতে দেয়নি। জানত এসব বুলি ত শুধু ওদের মুখেরই। তার ধারণা ঠিকই হয়েছে। এই ত মাসখানেক আগে রমার বিয়ের চিঠি পেয়েছে। পাত্র বিলেত-ফেরত, ইঞ্জিনীয়ার। অতএব রমার আপত্তির কোন কারণ ঘটেনি।

বন্ধুদের কথা থাক। অনেক আপন-জনেরাও ত কম তিরস্কার করেন নি তাকে। আজ তাই বারবার মনে হচ্ছে, বিয়ে ত অনেকেই করে। চায় বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ রূপবান্ অর্থবান্ পাত্র, বিদুষী সর্ববিদ্যায় পারদর্শিনী রূপবতী পাত্রী। পরম সমারোহে বিয়ে হয়। কিন্তু সুখী কি হয় সবাই? ঘুরে-ফিরে সেই একই প্রশ্নের আনাগোনা চলেছে মনের মধ্যে। তার নিজের বিয়েতে অনেক বাধা-বিঘ্ন এসেছে। বারবার তাই নানাজনের বিবাহিত জীবনের ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠছে আজ। এরা যেন তার আগামী জীবনের পশ্চাৎপট। কি ছবি ফুটবে, সে ত সকলেরই অজানা। চোখের সামনে মা-বাবার মুখ ভেসে উঠল। অনেক বেদনা এসেছে তাঁদের জীবনে, রুক্ষ পথের শ্রান্তি তাঁদের অপরিসীম। তবু দেখেছে কমলিকা, তাঁদের সুখের ত কোন কমতি নেই, তৃপ্তির শেষ নেই। আসল কথা, তাঁরা পরাজিত হন নি। কত অজস্র দম্পতি এই পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে দিন কাটাচ্ছে। নিজেদের মাঝখানে ব্যবধানের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর, তবু রাতের পর রাত কাটছে এক শয্যায়। দুজনেই পালন করছে একই সংসারের শত কর্তব্য। এমন করে হারতে পারবে না কমলিকা। মা-বাবাকে ত দেখছে, ছোড়দি অরুণদাও আছে সামনে। পরাজয় ত প্রতি মুহূর্তে ঘটতে পারে, সুখ অন্ধকারের মধ্যে মুখ লুকোতে চাইতে পারে বারেবারে। কিন্তু তবু··· চোখের সামনে জলজল করে উঠল সুবোধ মেসোমশায়ের লেখা সেই লাইনটি। "Don't cease to be lovers"। সৌমিত্রর ছবিটা বুকের মধ্যে চেপে ধরে সে। তৃপ্তিতে বুজে আসে দু'টি চোখ। আলোটা নিভিয়ে দেয়। বুক ভরে নিঃশ্বাস নেয় চাঁপার গন্ধভরা বাতাসে। ওপাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ে কমলিকা।

হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

শ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ঊনবিংশ শতাব্দী আধুনিক বাংলার স্বর্ণযুগ। এই শতাব্দীতেই যুগপ্রবর্তক রাজা রামমোহন রায়, পুরুষসিংহ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোধা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষাগুরু আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু, ছাত্রবন্ধু আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং যোগীন্দ্র অরবিন্দ ঘোষ, বঙ্কিমচন্দ্র, শিবনাথ শাস্ত্রী, কেশব সেন, রমেশ দত্ত, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন।

য়ুরোপীয় সংস্কৃতির সংঘাতক্ষেত্রে বাঙ্গালী সর্ব্ববিষয়ে মস্তক উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইবার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিল। ধর্ম্মে, কর্ম্মে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে, সমাজ-সংস্কার, বিদ্যা-চর্চ্চায় ও শিক্ষা বিস্তারে বাঙ্গালী সে যুগে যেরূপ প্রতিভা প্রদর্শন করিয়াছিল, দেশের ও দশের জন্য যেরূপ আত্মত্যাগ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল, নিজেকে বিলুপ্ত করিয়া, নিজের সর্ব্বস্ব পণ করিয়া জনসাধারণের কল্যাণযজ্ঞে আত্মাহুতি দিতে অগ্রসর হইয়াছিল সেরূপ আজ আর দেখা যাইতেছে না। নিজের নাম প্রচারের চেষ্টা না করিয়া, দল গঠনে প্রয়াসী না হইয়া যে-বাঙ্গালী যাত্রাপথে একাকী নিঃশঙ্কায় চলিয়াছিল সে-বাঙ্গালী আজ কোথায়? দেশপ্রাণ হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন সেইরূপ একজন বাঙ্গালী, যিনি তিলে তিলে নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন জাতির কল্যাণকর্ম্মে, অথচ তাঁহাকে আজ সকলেই ভুলিতে বসিয়াছে। তাঁহার নামাঙ্কিত পথের উপর দিয়া চলিয়া যাইবার কালে একবার কাহারও মনে পড়ে না যে, তাঁহার স্বল্পপরিসর জীবনে তিনি দেশের জন্য অভূতপূর্ব্ব কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া গিয়াছেন, অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া সর্ব্বস্ব খোয়াইয়াছেন। আজ আমরা সেই কঠোরব্রতী সাংবাদিকের জীবন-কথা সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

হরিশচন্দ্রের মাতুল দেবনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় কলিকাতার উপকণ্ঠে ভবানীপুরে এক দরিদ্র পল্লীতে বাস করিতেন। সেইযুগে কুলীন ব্রাহ্মণদিগের কন্যারা অধিকাংশস্থলেই পিত্রালয়ে বাস করিতেন। হরিশচন্দ্রের মাতা রুক্মিণী দেবীর ভাগ্যেও কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই। সেইখানেই ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে হরিশচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা রামধন মুখোপাধ্যায় উচ্চ শ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি তিনটি বিবাহ করেন। প্রথমা দুই পত্নীর কোন সন্তানসন্ততি হয় নাই। কনিষ্ঠা রুক্মিণী দেবীর গর্ভে দুইটি পুত্র জন্মে। জ্যেষ্ঠ হারাণচন্দ্র এবং কনিষ্ঠ হরিশচন্দ্র।

মাতুলালয়ে থাকিয়াই পাঁচ বৎসর বয়সে হরিশচন্দ্র পাঠশালায় বাংলা লেখাপড়া আরম্ভ করেন। দুই বৎসর পাঠশালায় পড়াশুনা করিয়া সাত বৎসর বয়সে তিনি ভবানীপুর ইউনিয়ন স্কুলে ভর্তি হইয়া ইংরেজী ভাষা, ইতিহাস, ভূগোল এবং অন্যান্য বিষয় শিক্ষালাভ করিতে থাকেন। বিনা বেতনে পড়িবার সুযোগ পাইয়াও সাত বৎসরের বেশী সময় সেই বিদ্যালয়ে পড়িবার ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তায় অল্প বয়সেই তাঁহাকে বিদ্যালয় ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার মাতুলের সাংসারিক অবস্থা ভাল ছিল না। পিতা ছিলেন উদাসীন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা হারাণচন্দ্র কিছুই করিতেন না। সুতরাং হরিশচন্দ্রকেই মা, বড় ভাই ও নিজের ভরণপোষণের জন্য অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে হইল।

চৌদ্দ বৎসর বয়সের বালককে কে আর কাজ দিবে? চেষ্টা করিয়াও হরিশচন্দ্র কোন কাজকর্ম্ম সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। অবশেষে সাধারণ লোকের দরখাস্ত, চিঠি, বিল প্রভৃতি লিখিয়া, এবং দলিল-দস্তাবেজ নকল ও তর্জ্জমা করিয়া কিছু কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাহাতেই তাঁহাদের সংসারযাত্রা কোনরকমে নির্ব্বাহ হইতে লাগিল। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে তৎকালীন খ্যাতনামা সাংবাদিক শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহার প্রসিদ্ধ "মুখার্জ্জি ম্যাগাজিনে" লিখিয়াছিলেন—"একদিন হরিশচন্দ্রের বাড়ীতে একটি পয়সা বা একমুঠা চালও ছিল না। নিরুপায় হরিশচন্দ্র স্থির

রিলেন, ভাত খাইবার কাঁসার থালাখানি বাঁধা দিয়া কিছু য়সা সংগ্রহ করিয়া সেইদিনের মত চাউল কিনিয়া লইবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেদিন সকাল হইতেই মুষলধারে বৃষ্টি নামিল। হরিশচন্দ্রের বাড়ীতে একটি ছাতাও ছিল না। তিনি অগতির গতি শ্রীভগবান্‌কে একমনে ডাকিতেছেন এমন সময় কোন ধনী জমিদারের গাড়ি আসিয়া তাঁহার বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইল। জমিদারের মোক্তার আসিয়া হরিশচন্দ্রকে দুইটি টাকা দিয়া একখানি দলিল তর্জ্জমা করিতে দিলেন। বালকের কাতর প্রার্থনায় ভগবানের কৃপা হইল। সেদিনের মত তাঁহারা অনাহার হইতে রক্ষা পাইলেন। হরিশচন্দ্র এইরূপে দৈবকৃপায় বহুবার বহু ক্লেশ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন।" হরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর এই ঘটনাটি প্রকাশিত হয়। জীবনের প্রথম দিকে তাঁহাকে অনুরূপ আরও অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল।

অনেক চেষ্টার পর সতের বৎসর বয়সে হরিশচন্দ্র টুলো এণ্ড কোম্পানীর নীলাম ঘরে মাসিক দশ টাকা বেতনের একটি চাকুরি পাইলেন। গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তা কথঞ্চিৎ দূর হইল। অর্থাভাবে বিদ্যালয় ত্যাগ করিতে হইলেও, তিনি লেখাপড়া কোনও দিনই ছাড়েন নাই। জ্ঞান-পিপাসা তাঁহার এত তীব্র ছিল যে বেতনের এই সামান্য দশ টাকা হইতে কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া নানা বিষয়ের পুস্তক ক্রয় করিয়া বিশেষ আগ্রহ ও মনোযোগের সহিত পড়িতেন। একখানি ইংরেজী বাংলা অভিধান ব্যতীত ইংরেজী শিখিবার আর কিছু সহায় তাঁহার ছিল না। ইহা সত্ত্বেও তিনি অচিরে ইংরেজী ভাষায় প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

চাকুরি পাইয়াও স্বাধীনচেতা হরিশচন্দ্র সে চাকুরি বেশীদিন রাখিতে পারিলেন না। বেতন বৃদ্ধি করিতে বলায় কোম্পানীর মালিক একদিন অপমানসূচক কোন কথা বলেন। তেজস্বী হরিশচন্দ্র এ অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ চাকুরি ছাড়িয়া দিলেন। ভাগ্যক্রমে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে পরীক্ষা দিয়া তিনি পঁচিশ টাকা মাসিক বেতনের একটি চাকুরি পাইলেন। মিলিটারী অডিটার জেনারেল অফিসে কেরাণী সংগ্রহের জন্য তখন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা লওয়া হইত। হরিশচন্দ্র সেই পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া চাকুরিটি পান। নিজ কর্ম্মদক্ষতায় তদানীন্তন অডিটার জেনারেল কর্ণেল চ্যাম্পনিসের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া ওঠেন। মিলিটারী অডিট বিভাগের অধিকর্ত্তা কর্ণেল গোল্ডিও তাঁহার কর্ম্মনিপুণতায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কিছুদিন পরেই ৪০০ টাকা মাসিক বেতনের এক দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত করেন। চরিত্রের দৃঢ়তা ও অসীম অধ্যবসায়ের গুণে হরিশচন্দ্র জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

হুগলী জেলার অন্তর্গত উত্তরপাড়ার গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা মোক্ষদা দেবীর সহিত অতি অল্প বয়সেই হরিশচন্দ্রের বিবাহ হয়। ষোল বৎসর বয়সে তিনি একটি পুত্রসন্তান লাভ করেন। অতি শৈশবেই উহার মৃত্যু ঘটে। কিছুদিন পরেই তাঁহার স্ত্রীও পরলোকগমন করেন। হরিশচন্দ্র দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিলেও দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভে কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করে নাই।

চাকুরিতে উন্নতি লাভ করিয়াও হরিশচন্দ্রের জ্ঞান-পিপাসা নিবৃত্ত হয় নাই। তিনি কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর সদস্য হইয়া নানা বিষয়ের পুস্তক বিশেষ নিষ্ঠার সহিত পড়িতে আরম্ভ করেন। আর রোপার লেথব্রিজ এই বিষয়ে একস্থানে বলিয়াছেন—"হরিশচন্দ্র 'এডিনবারা রিভিউয়ের' সাতান্ন খণ্ড পুস্তক দুই-তিন বার পড়িয়া শেষ করেন।" উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাস লেখক একজন ইংরেজ লিখিয়া গিয়াছেন—"গিবনের ডিক্লাইন এণ্ড ফল অব্ রোম্যান এম্পায়ার নামক পুস্তকের এবং ক্যান্টের দার্শনিক তত্ত্ববিষয়ক লেখাগুলির অনেক অংশই হরিশচন্দ্র মুখস্থ বলিতে পারিতেন।" কলিকাতা হাইকোর্টের প্রথম ভারতীয় বিচারপতি শম্ভুনাথ পণ্ডিত হরিশচন্দ্রের প্রতিবাসী ছিলেন। তিনি আবার সদর আদালতের 'রেকর্ড কীপারের' সহকারীর কাজ করিতেন। হরিশচন্দ্র শম্ভুনাথের নিকট আইনের পুস্তকগুলি বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিতেন। সপ্তাহের পর সপ্তাহ বার মাইল পথ হাঁটিয়া হরিশচন্দ্র ডাক্তার জসের দর্শন সম্বন্ধীয় বক্তৃতাগুলি শুনিতে যাইতেন। সাহিত্য, ইতিহাস ও আইনের ন্যায় তিনি মনস্তত্ত্বেরও আলোচনা করিতে ভালবাসিতেন। তাঁহার ধারণা ছিল, ঐ সকল বিষয় ভাল করিয়া আয়ত্ত করিতে না পারিলে সুষ্ঠুভাবে সমাজ-সেবা করা যায় না।

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে হরিশচন্দ্র ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সদস্য নির্ব্বাচিত হন। এই সময়ই তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ভবানীপুর ব্রাহ্মমন্দিরে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ

করেন। তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতাগুলি অনেকেই আগ্রহ করিয়া শুনিতে যাইত। এই বক্তৃতাবলী ব্রজলাল চক্রবর্ত্তী পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। গ্রন্থখানি এখন দুষ্প্রাপ্য।

চিঠি ও দরখাস্ত লিখিয়াই হরিশচন্দ্রের জীবন আরম্ভ হয়, লেখনী হস্তেই তাঁহার জীবনলীলার অবসান ঘটে। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে কাশীপ্রসাদ ঘোষ "হিন্দু ইন্‌টেলিজেন্সার" নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। হরিশচন্দ্র সেই পত্রিকায় প্রথম লিখিতে আরম্ভ করেন। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীনাথ ঘোষ "বেঙ্গল রেকর্ডার" পত্রিকা প্রকাশ করিলে হরিশচন্দ্র ইহাতে আইন-আদালত ঘটিত সংবাদাদি প্রেরণ করিতে, এবং ঐ সকল বিষয়ে কিছু কিছু মন্তব্যও লিখিতে থাকেন। এইভাবে সাংবাদিকতায় তাঁহার হাতেখড়ি হয়। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে শিমুলিয়ার শ্রীনাথ ঘোষ ও ক্ষেত্রনাথ ঘোষ মধুসূদন রায়ের কালাকার ষ্ট্রীটস্থ ছাপাখানা হইতে "হিন্দু পেট্রিয়ট" পত্রিকা প্রথম প্রকাশ করেন। হরিশচন্দ্র সেই পত্রিকাতেও সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার প্রবন্ধগুলি যেরূপ তথ্যপূর্ণ সেইরূপ নির্ভীক হইত। ঐ সকল প্রবন্ধে তিনি প্রায়ই রাষ্ট্র ও সমাজ-নীতির নিরপেক্ষ সমালোচনা করিতেন। সর্ব্বসাধারণের দাবি-দাওয়া স্পষ্টরূপে উপস্থাপিত করিতে তিনি কণামাত্র দ্বিধা বোধ করিতেন না। প্রথম শ্রেণীর সাংবাদিকের সকল গুণই তাঁহাকে কেন্দ্রীভূত হইতে দেখা গেল। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকাখানি তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বেনামে কিনিয়া লন এবং 'প্রেসটি' নিজের বাড়ীর নিকটে ভবানীপুরে উঠাইয়া আনেন। হারাণচন্দ্রকে নামে সম্পাদক রাখিয়া হরিশচন্দ্র নিজেই উহার পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন এবং মাত্র দেড়শতখানি কাগজ (copies) প্রতিবারে ছাপাইতে থাকেন। নিজের উপার্জ্জিত অর্থের দ্বারাই পত্রিকাখানি প্রকাশের সকল ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইত। কারণ উহার বিক্রয়লব্ধ অর্থে পত্রিকা মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিবার সম্পূর্ণ ব্যয় সঙ্কুলান হইত না। নিজের গুণপনায় ইতিমধ্যে তিনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের একজন বিশেষ প্রভাবশালী সদস্য হইয়া ওঠেন।

তদানীন্তন বড়লাট লর্ড ডালহৌসীর রাজ্যভুক্তিনীতির (policy of annexation) কঠোর সমালোচনা করেন হরিশচন্দ্র তাঁহার হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকায়। সরকারের বিরুদ্ধে ইহাই তাঁহার প্রথম লেখনী ধারণ। নানা যুক্তি দেখাইয়া অবশেষে তিনি লেখেন—"যদি তোমার প্রতিবাসী তাহার নিজের চেরীফলের বাগানটির যথোপযুক্ত যত্ন না করেন, তাহা হইলেও তুমি উহা হস্তগত করিতে পার না।" সম্পাদকীয় মন্তব্য যতই যুক্তিপূর্ণ ও তীব্র হউক না কেন, সার জেম্‌স্ আউটরামের সঙ্কল্পে কিছুমাত্র শৈথিল্য দেখা গেল না। কারণ বড়লাট ও হোম গভর্ণমেণ্ট উভয়ই তাঁহার সহায়।

অযোধ্যার চেরীফল যখন তিক্তবীজে পরিপূর্ণ দেখা গেল তখন হরিশচন্দ্র উহাকে দূরে নিক্ষেপ করিতেই উপদেশ দিলেন। রাজ্যভুক্তিনীতি তখন বিড়ম্বনায় পরিণত হইল। লর্ড ডালহৌসী এবং তাঁহার প্রবর্ত্তিত নীতির বিরূপ সমালোচনা করিলেও তিনি ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এবং তাহার পরেও লর্ড ক্যানিং-এর কার্য্য সমর্থন ও তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা করিতে তিলমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই। ইউরোপীয় সমাজ যখন লর্ড ক্যানিংকে দমননীতি গ্রহণের জন্য প্ররোচিত করিতেছিল এবং তাঁহার ক্ষমানীতির জন্য (for his policy of clemency) তাঁহাকে নানা দিক্ দিয়া আক্রমণ করিতেছিল, তখন একমাত্র হরিশচন্দ্রই তাঁহার কার্য্যকলাপ সমর্থন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার অক্ষমানীতি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য উৎসাহিত করিলেন। শুনা যায় 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকা ছাপাখানা হইতে বাহির হইবামাত্র বড়লাট তাঁহার একজন কর্ম্মচারীকে দিয়া একখানি পত্রিকা আনাইয়া লইতেন, এবং হরিশচন্দ্রের মতামত জনসাধারণের মতামত বলিয়া বিলাতে পার্লামেণ্টের সদস্যদিগকে জ্ঞাপন করিতেন। এইভাবে তিনি ইউরোপীয়দিগের সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতেন।

১৮৫৯-৬০ খ্রীষ্টাব্দে নীল বিদ্রোহের সময় হরিশচন্দ্র কৃষাণদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়া নিজ পত্রিকায় কৃষকদিগের উপর নীলকরদিগের অমানুষিক অত্যাচার এবং তাহাদের প্রতি বে-আইনী ব্যবহার বিষয়ে তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধাবলী অগ্নিগর্ভ ভাষায় লিখিতে থাকেন। নীলকরেরা যখন কৃষক-দিগকে হাজতে পুরিয়া তাহাদের দ্বারা নীলচাষের চুক্তিপত্র জোর করিয়া সই করাইয়া লইতে লাগিল, তখন রায়তেরা সেই সকল চুক্তিপত্র অস্বীকার করিয়া নীলকরদিগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিল। কেহ কেহ- নীলকরদিগের

কারখানা পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়া উহা ধ্বংস করিয়া দিল। কিন্তু তাহারা সরকারের বিরুদ্ধে কোন অসৎ আচরণ বা অন্য কোনরূপ আইনবিরুদ্ধ কাজ করে নাই। তথাপি কোন কোন ম্যাজিষ্ট্রেট নীলকরদিগকে বে-আইনী ভাবেই সাহায্য করিতে থাকে; আবার কেহ কেহ নীলকরদিগের অত্যাচার হইতে কৃষকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া উহাদিগকে আশ্রয় দিতে লাগিলেন। এইরূপ ন্যায়সঙ্গত কারণেও নীলকরেরা এবং উহাদের পৃষ্ঠপোষকগণ কৃষকদিগের আশ্রয়দাতার প্রতি বিশেষ কুপিত হইয়া উঠিল এবং নানা উপায়ে প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। লর্ড ক্যানিং-এর আশঙ্কা হইল—নীলকর ও তাহাদের পৃষ্ঠপোষক ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের সহযোগে ভারতে আবার একটি বিপজ্জনক বিদ্রোহের ক্ষেত্র সৃষ্টি হইতে পারে। নীলকরেরা এরূপ ব্যাপক ষড়যন্ত্র করিতে সমর্থ হইয়াছিল যে লর্ড ক্যানিং এই সময় একবার বলিয়াছিলেন—"সিপাহী বিদ্রোহের সময় দিল্লীর জন্য আমি যত না দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়াছিলাম, নীল বিদ্রোহের ব্যাপারে আমি এক সপ্তাহ তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী চিন্তিত ছিলাম।"

কলিকাতার বিলাতী সংবাদপত্রগুলি নীলকরদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া লর্ড ক্যানিংকে তাহাদিগের পক্ষাবলম্বন করিতে প্ররোচিত করিতে লাগিল এবং মাঝে মাঝে ভ্রূকুটি করিতেও ছাড়িল না। কিন্তু বাংলার সদাশয় ছোটলাট সার জন পিটার গ্র্যাণ্ট কৃষকদিগের দুঃখ-দুর্দ্দশা বুঝিতে পারিয়া তাহা দূর করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যে সকল রাজকর্ম্মচারী সুবিচারের পক্ষপাতী ছিলেন, হরিশচন্দ্র ঠিক এই সময় তাঁহাদিগকে অকপটে সাহায্য করিতে লাগিলেন। ন্যায়ের পথে থাকিয়া তাঁহারা কৃষকদিগের দুঃখ মোচনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। হরিশচন্দ্র এই সময় বিপন্ন রায়তদিগকে নিজগৃহে আশ্রয় দিলেন, অর্থ ও উপদেশ দিয়া তাহাদের মোকদ্দমা চালাইতে সাহায্য করিলেন এবং তাহাদিগের দরখাস্ত মুসাবিদা করিয়া দিতে লাগিলেন।

হরিশচন্দ্রের এবম্বিধ কাজের জন্য নীলকরগণ তাঁহার উপর বিরূপ হইয়া উঠিল। তাঁহারই লেখনী-প্রভাবে সরকার যে রায়তদিগের পক্ষ অবলম্বন করিবার নীতি গ্রহণ করিতেছেন ইহা স্থির করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা করিতে লাগিল। ফলে আর্চিবল্ড্ হিলস নামে একজন নীলকর ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে দশ হাজার টাকার মানহানির দাবি করিয়া ২৪ পরগণা জেলার প্রধান সদর আমীন আদালতে হরিশচন্দ্রের বিরুদ্ধে এক মোকদ্দমা রুজু করিল। হিন্দু পেট্রিয়টের একটি প্রবন্ধে হরিশচন্দ্র আর্চিবল্ড হিলসকে তাহার এলাকায় একটি নারীহরণের দায়ে অভিযুক্ত করিয়াছিলেন। রায়তদিগের প্রতি অত্যাচারের অনুসন্ধানের জন্য সরকার কর্ত্তৃক যে কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল, সেই কমিশনের নিকট রেভারেণ্ড বাউমেট্শ সাহেব (Rev. Mr. Bowmetsch) এই কাহিনী বর্ণনা করিয়াছিলেন। দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ও তাঁহার বিখ্যাত নাটক "নীলদর্পণে" এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। স্বনামধন্য জ্যোতির্বিদ্ হার্শেলের পৌত্র ডব্লিউ জে. হার্শেল তখন কৃষ্ণনগরের ম্যাজিষ্ট্রেট। তিনি এই অভিযোগের সত্যতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছিলেন যে ঘটনাটি মোটেই অলীক নহে। হরিশচন্দ্র জীবিত থাকিলে এই মোকদ্দমার ফল কিরূপ হইত বলা কঠিন। কিন্তু এই মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বেই ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ই জুন মাত্র ৩৭ বৎসর বয়সে হরিশচন্দ্রের অকাল মৃত্যু ঘটে। সুতরাং তদ্বিরের অভাবে নীলকরেরাই এই মোকদ্দমায় জয়ী হয়। হরিশচন্দ্রের হিন্দু পেট্রিয়ট প্রেস এবং অন্যান্য স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিয়া তাঁহার দুঃখিনী বিধবা স্ত্রীকে উহারা পথের ভিখারিণী করিয়া ছাড়ে।

এইস্থানে আর একটি কথা বলিলে বিশেষ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়া ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে নীল বিদ্রোহ বাংলা দেশে ব্যাপক হইয়া উঠে। ইহার পূর্ব্বে সঙ্ঘবদ্ধ কোন আন্দোলন সম্ভব হয় নাই। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বিশ্বনাথ বা বিশে ডাকাত এই দুর্দ্ধর্ষ অত্যাচারী নীলকরদিগের বিরুদ্ধে একাকীই দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদের অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বিশ্বনাথই বাংলা দেশে নীল বিদ্রোহের পুরোধা এবং তিনিই প্রথম শহীদ, এ কথা বলিলে ভুল বলা হইবে না। ফেডী (Mr. Faddy) নামে একজন নীলকরের নীলকুঠি আক্রমণ করিয়া বিশ্বনাথ ফেডী সাহেবকে ধরিয়া লইয়া যায় এবং অনুচরদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাহাকে ছাড়িয়া দেয়। এই ফেডী সাহেবই আবার বিশ্বনাথকে সদলবলে ধরাইয়া দেয়। বিচারে বিশ্বনাথের ফাঁসী হয়। নীলকরদিগের প্রতিশোধস্পৃহা এইরূপই ছিল।

হরিশচন্দ্র দেশের ও দশের কল্যাণ কামনায় আজীবন লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে চার্টার অ্যাক্ট প্রবর্তনের পূর্ব্বে হরিশচন্দ্র ভারতীয় জনসাধারণের পক্ষ হইয়া পার্লামেন্টে পাঠাইবার 'মেমোরিয়াল' মুসাবিদা করিয়া দেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ১০ম আইন প্রবর্ত্তন সম্ভব হইয়াছিল হরিশচন্দ্রের অকুতোভয় ও সহানুভূতিশীল লেখার গুণেই। ইহার ফলে নীলকরদিগের অবৈধ কার্য্যকলাপ বন্ধ হইয়া যায়। উহাদিগের অত্যাচারের অনুসন্ধানের জন্য নীল কমিশন বসে। নীল কমিশনকে উদ্দেশ করিয়া তখন হরিশচন্দ্র তাঁহার পত্রিকায় লেখেন—"আমাদের আইনের ক্রটি-বিচ্যুতি, আদালতের অধর্ম্ম ও অনাচার, পুলিসের অকর্ম্মণ্যতা, এবং দেশে অরাজকতার প্রবল লক্ষণসমূহ এমন ভাবে প্রকাশ হইয়া পড়িবে যে সকল বিষয়েই সংস্কারের ব্যবস্থা অপরিহার্য্য হইয়া উঠিবে।" ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে আগষ্ট এই কমিশন যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেন, এবং ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর সার জন পিটার গ্রান্ট উহার উপর যে মন্তব্য লেখেন তাহা রায়তদিগের অনুকূলেই হইয়াছিল। ভারত সরকারও উহা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মানিয়া লইলেন। ফলে নীলকরদিগের অত্যাচার একেবারে বন্ধ হইল। কৃষকেরা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

দেশাভিমান ও মানবিকতার অভিমানের ন্যায় হরিশচন্দ্রের জাত্যভিমানও প্রবল ছিল। কোন এক সময় একজন মিশনারী সাহেব কোন ইংরেজী পত্রিকায় কৌলিন্য প্রথার উল্লেখ করিয়া তাঁহার প্রতি অসম্মানসূচক কটাক্ষপাত করিলে হরিশচন্দ্র সগর্ব্বে উত্তর দেন—"আমি জাতিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ কুলীন এবং কুলীনশ্রেষ্ঠ ফুলিয়া।" অথচ তিনি সংস্কারমুক্ত পুরুষ ছিলেন। মার খাইয়া মুখ বুজিয়া পিছাইয়া আসিবার পাত্র ছিলেন না। কোনরূপ অপমান নীরবে হজম করিতে জানিতেন না। তাঁহার লেখনীর অগ্রভাগে উপযুক্ত উত্তর সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিত।

এই তেজস্বী ব্রাহ্মণ সন্তানের মৃত্যুর এক মাস পরেই বেঙ্গলী সম্পাদক গিরীশচন্দ্র ঘোষ লিখিয়াছিলেন—"রাজা রামমোহনের পর এত বড় হিন্দু আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই।" ব্যাসদেবের সমগ্র মহাভারতের অনুবাদক, পণ্ডিতদিগের পরিপোষক, প্রকৃত গুণগ্রাহী কালীপ্রসন্ন সিংহ হরিশচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষাকল্পে অর্থ সংগ্রহের নিমিত্ত ত্রিশ পাতার *একখানি আবেদন পুস্তিকা প্রকাশ করেন। উহাতে তিনি লেখেন—"হরিশচন্দ্রের দেশসেবার মূল্য রামমোহন রায়ের সতীদাহ নিবারণ ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহ প্রবর্ত্তন অপেক্ষা অনেক বেশী।" এই সময় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান* এসোসিয়েশনেও একটি স্মৃতিরক্ষা কমিটি গঠিত হয়। উক্ত কমিটিতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি সে যুগের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন। ঐ কমিটির হাতে কালীপ্রসন্ন সিংহ পাঁচ হাজার টাকা নগদ দেন, এবং সুকিয়া ষ্ট্রীট ও আপার সার্কুলার রোডের মোড়ে এক খণ্ড ভাল জমি দিবারও প্রতিশ্রুতি দিয়া বলেন—যদি কমিটি ঐ জমির উপর একটি বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া সেই বাড়ীতে হরিশচন্দ্রের নামে একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করেন, তাহা হইলেই ঐ জমি দেওয়া হইবে। সকলের সমবেত চেষ্টায় হরিশচন্দ্রের স্মৃতিভাণ্ডারে দশ হাজার পাঁচ শত টাকা সংগৃহীত হয়। পনের বৎসর পরে ঐ কমিটির বিশেষ প্রভাবশালী কয়েকজন সদস্যের চেষ্টায় হরিশচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার জন্য সংগৃহীত সমস্ত অর্থব্যয়ে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের গৃহ নির্ম্মিত হইল। ঐ গৃহের লাইব্রেরী কক্ষে হরিশচন্দ্রের নামে একখানি স্মৃতিফলক সংলগ্ন করা হইল। এখন সেই স্মৃতিফলকেরও আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।

ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের এফ. এইচ. বি. স্ক্রাইন অন্য একজন সাংবাদিকের জীবনীপ্রসঙ্গে হরিশচন্দ্রের বিষয়ে বলিয়াছেন—"সমসাময়িক সকল লোক অপেক্ষা দেশের কল্যাণকর্ম্মে এবং উন্নতি পরিকল্পনায় হরিশচন্দ্রের স্বল্পায়ু জীবনের প্রভাব অনেক বেশী ছিল।" মাইকেল মধুসূদন দত্তও হরিশচন্দ্রের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া বিশেষ ব্যথিত হইয়াই বলিয়াছিলেন—"আমি লোকটির মূল্য বুঝিতাম এবং উঁহাকে ভালবাসিতাম। উঁহার স্মৃতিরক্ষাকল্পে অর্থ সাহায্য করিব।"

এত উদ্যোগ আয়োজন করিয়াও তাঁহার স্মৃতিরক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা হইল না। এরূপ ঘটনা বাংলা দেশে ইহাই প্রথম নহে। তরুণ বাংলার প্রথম পুরোহিত ডিরোজিওর মৃত্যুর পর ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে ৫ই জানুয়ারী ১২ নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারে পেরেন্ট্যাল অ্যাকাডেমিক ইনষ্টিটিউশনে জে. ডব্লিউ. রিকেট্স সাহেবের সভাপতিত্বে এক সভা আহূত হয় এবং সেই সভায় ডিরোজিওর স্মৃতিরক্ষার্থে নয় শত টাকা চাঁদায়

প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায় এবং প্রায় আট শত টাকা পরে আদায় হয়। সে টাকা যে কোথায় গেল বা কিভাবে ব্যয়িত হইল তাহা জানিতে পারা যায় নাই। ডিরোজিওর সমাধির উপর একটি স্মৃতিফলক স্থাপন করিবার উদ্দেশেই এই অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু পার্ক সার্কাসের পুরাতন সমাধি-ক্ষেত্রে ডিরোজিওর সমাধি স্থানটির এখন আর সন্ধান পাওয়া যায় না। এমনই আত্মভোলা জাতি আমরা!

হরিশচন্দ্রের এমন কোন চিত্র নাই, এমন কোন স্মৃতিস্তম্ভ নাই যে তাঁহার চিন্তায় আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারিবে, তাঁহার অপূর্ব্ব আত্মদানের কথা, অকুতোভয়ে লেখনী চালনার কথা আমাদিগকে অনুধ্যান করাইতে পারিবে। এমন অকৃতজ্ঞ জাতি আমরা। কিন্তু পল্লীকৃষাণেরা তাঁহাকে এখনও ভুলে নাই। নীল বিদ্রোহকালে যে সকল পল্লীগীতি রচিত হইয়াছিল এখনও তাহার দুই-একটি গান শুনিতে পাওয়া যায়—যাহাতে হরিশচন্দ্রের নাম চিরতরে গ্রথিত হইয়া আছে।

——

বিশ্বামিত্র

চাণক্য সেন

॥ চার ॥

দপ্তর ঘরে নিজের নির্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হয়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তিন বার ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করলেন। এক পাশে সযত্নে কয়েকটি অত্যন্ত জরুরী ফাইল রাখা ছিল, রাজকার্যের কয়েকটি সমস্যা, যাতে অবিলম্বে মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত প্রয়োজন। তার প্রথমটির চর্মাবরণ খুলে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মনোনিবেশ করলেন। ফাইলের দ্বিতীয় পৃষ্ঠা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন করবার প্রয়োজন হ'ল।

নম্বর ডায়াল ক'রে কয়েক সেকেণ্ড কৃষ্ণদ্বৈপায়ন অপেক্ষা করলেন। অন্যপ্রান্তে কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হ'লে বললেন ঃ

"আপনি কখন আসছেন?"

"দশটায় এসে হাজির হব, স্যর।"

"তার আগেই একটু আসুন।"

"গভর্ণর সাহেব তলব করেছেন। সাড়ে ন'টায় পৌঁছতে হবে।"

"তা হ'লে সোওয়া ন'টায় এখানে আসুন।"

"এখন ত প্রায় ন'টা বাজে।"

"আটটা চল্লিশ। সোওয়া ন'টার অনেক দেরি।"

"আচ্ছা, স্যর।"

"আর একটা কথা।"

"বলুন, স্যর।"

"এখনও এ দেশের মুখ্যমন্ত্রী কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল।"

"নিশ্চয় স্যর।"

"কথাটা মনে রাখবেন।"

টেলিফোন নামিয়ে রেখে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মৃদু হাসলেন। ফাইলটি সযত্নে বন্ধ ক'রে একপাশে সরিয়ে রাখলেন। দ্বিতীয় ফাইল খুলে মিনিট দশেক পড়লেন। তারপর তাতে নিজের মন্তব্য লিখলেন। টেলিফোন বাজল।

"নমস্তে দেশপাণ্ডেজী," সবিনীত কণ্ঠে মধু-স্বাদ বাক্য উচ্চারণ করলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। "এই সকাল বেলা আপিস-ঘরে এসে প্রথমেই আপনার কণ্ঠস্বর শোনা গেল। আজ দিন ভালো যাবে মনে হচ্ছে।"

অন্যপ্রান্তে মাধব দেশপাণ্ডে।

"বিনয়েও আপনি অজেয়, কোশলজী।"

"অজেয় আর কোথায়, দেশপাণ্ডেজী?" কৃষ্ণদ্বৈপায়নের স্বরে পরাজয়ের চিহ্নমাত্র নেই। "আমার যা কিছু বল ছিল, সবই আপনার, বিশেষ ক'রে আপনার সাহায্যে। আজ বড় কমজোর লাগছে।"

"বলেন কি কোশলজী! আপনার মত শার্দূলের মুখে এমন কথা শোভা পায় না। আপনি আমাদের নেতা। আমি আগেও যেমন, এখনও তেমনি, আপনার সঙ্গে আছি।"

"দেশপাণ্ডেজী, আপনি অসত্য বলতে পারেন, কিন্তু অপ্রিয় কদাচ বলেন না! আমার কালিদাসের একটি শ্লোক মনে পড়ছে। 'অর্থো হি কন্যা পরকীয় এব—'। তেমনি গভর্ণমেণ্ট বস্তুও পরকীয়। কাশ্যপ মুনি বলেছিলেন, কন্যা পরের সম্পত্তি মত। আজ তাকে স্বামীগৃহে পাঠিয়ে দিয়ে গচ্ছিত সম্পদ ফেরৎ দিলে যেমন হয় আমার আত্মা তেমনি শান্ত হয়েছে।" সুন্দর স্বরে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আবৃত্তি করলেন, "জাতো মমায়ং বিশদঃ প্রকামং প্রত্যর্পিতন্যাস ইবান্তরাত্মা।" তারপর বললেন, "আমিও এই সরকার কোনও যোগ্য ব্যক্তির হাতে সঁপে দিয়ে শান্তচিত্ত হ'তে চাই, দেশপাণ্ডেজী।"

মাধব দেশপাণ্ডে অবাক্ হলেন।

"বলেন কি কোশলজী? আপনি ছাড়া এ দায়িত্ব বহন করবে কে?"

"পৃথিবীতে কেউ চিরস্থায়ী নয়, দেশপাণ্ডেজী; কারুর স্থান খালি থাকে না। কোনও অভাবই অপূরণীয় নয়। মা মরে গেলে ক'দিন পরে সন্তান মাতৃশোক ভুলে যায়। সন্তানহারা জননীর মুখেও কালে হাসি ফিরে আসে।" হঠাৎ তাঁর কণ্ঠস্বর বড় ক্লান্ত শোনাল। বললেন, "বহুদিন এ বোঝা বয়েছি, ফুলের মালা পেয়েছি, ইট-পাটকেলও কম পাই নি। এবার আর ভাল লাগছে না! দেহটাও যেন কেমন বিকল মনে হচ্ছে। তাই কাল থেকে ভাবছি, এবার কারুর হাতে সঁপে দিতে পারলে হয়। আজ সকালে সুদর্শনজী এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গেও কথাবার্তা হ'ল। তিনি কংগ্রেসের সভাপতি। তাঁরই দায়িত্ব উপযুক্ত লোক ঠিক করা।"

মাধব দেশপাণ্ডে কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে রইলেন।

"আপনি নিশ্চয় তামাসা করছেন, কোশলজী।"

"না মাধব-ভাই, তামাসা নয়। বয়স অনেক হ'ল। কাল থেকে আমার মহাভারতের কয়েকটি শ্লোক বার বার মনে পড়ছে। বনপর্বে পাণ্ডবগণ নরনারায়ণের রমণীয় আশ্রমে উপনীত হয়েছেন। 'মনোজ্ঞে কাননবরে সর্বর্তু-কুসুমোজ্জ্বলে'। সেই মনোজ্ঞ কানন, সকল ঋতুর কুসুমে উজ্জ্বল, গাছে গাছে ফুলের বাহার, ফলের ভারে বৃক্ষকুল অবনত। 'দিব্যপুষ্প সমাকীর্ণাং মনঃপ্রীতিবিবর্ধনীম্'। মনে পড়ছে, মাধবভাই, আর ভাবছি, এবার ত যমরাজ একদিন শিয়রে এসে হাজির হবেন, তার আগে কিছুদিন অন্তত নিরালা একটু ঈশ্বরচিন্তা করে নি।"

মাধব দেশপাণ্ডে উত্তেজিত হলেন।

"এ হ'তে পারে না কোশলজী। আপনি যদি অবসর নেন, মুখ্যমন্ত্রিত্ব যাবে সুদর্শন দুবের হাতে।"

"না, না, দেশপাণ্ডেজী। আপনি থাকতে সুদর্শন দুবে কেন মুখ্যমন্ত্রী হ'তে পারবেন?"

"আপনি খুব ভাল ক'রেই জানেন, উদয়াচলে মারাঠা রাজত্ব চলবে না।"

"কেন চলবে না? উদয়াচলে হিন্দী-মারাঠী রেষারেষি দূর করতেই হবে।"

"দূর করতে হবে সবাই বলে। আবার সবাই রেষারেষি বাড়িয়ে দেয়। আসল কথা তা নয়। আপনার সঙ্গে আমার মতবিরোধ আছে। কিন্তু তা ব'লে সুদর্শন দুবেকে মুখ্যমন্ত্রী হ'তে দেব না।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বিস্মিত হলেন।

"সে কি, দেশপাণ্ডেজী! সুদর্শন দুবে ত বললেন, তিনি মুখ্যমন্ত্রী হ'লে আপনি অর্থমন্ত্রিত্বের দাবি করবেন, এবং সে দাবি তিনি মেনে নেবেন।"

মাধব দেশপাণ্ডে বললেন, "কোশলজী! এ কথা আর টেলিফোনে হয় না। আমি আপনার কাছে আসছি। এখন সময় হবে আপনার?"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন. "সাড়ে দশটায় আসুন। এগারোটায় ত ক্যাবিনেট মিটিং। আধ ঘণ্টা আগে আসুন।"

টেলিফোন নামিয়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সাফল্যের হাসি হাসলেন। মাধব দেশপাণ্ডের উচ্চাশা যত, বুদ্ধি তার চেয়ে অনেক কম। তা হ'লেও তিনি জানেন, সুদর্শন দুবে মুখ্যমন্ত্রী হ'লে মন্ত্রীসভায় তাঁর স্থান হবে না। কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে তিনি তাড়াতে চান না। সুদর্শন দুবের সঙ্গে আঁতাতের ভয় দেখিয়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের কাছ থেকে অর্থমন্ত্রিত্ব আদায় করা তাঁর অভিপ্রায়। শ্রম ও সমবায় নিয়ে তিনি শ্রান্ত ও ব্যথিত। ন'টা বাজতে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের পার্সনাল সেক্রেটারী জগন্মোহন তিওয়ারী হাজির হ'ল। বয়স ছেচল্লিশ, জোয়ান, টাক-মাথা, বেঁটে-খাটো চেহারা, বেশ সযত্নে সাজান বড় একজোড়া গোঁফ। তিওয়ারীকে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দীর্ঘদিন পোষণ করেছেন। সেই কৃষাণপুরে ওকালতী করবার সময় থেকে। মুখ্যমন্ত্রী হবার পর তাকে সরকারী পদে বহাল ক'রে নিজের সঙ্গে রেখেছেন। একাধারে তিওয়ারী তাঁর দেহরক্ষী, বিবেক-রক্ষী, ও বিশ্বস্ত অনুচর।

ঘরে ঢুকে তিওয়ারী প্রণাম জানিয়ে ফরাসে বসল।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তার মুখের দিকে তাকালেন।

তিওয়ারী বলল, "দুর্গাভাই।"

দাঁতে দাঁত চেপে জ্বলন্ত চোখে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রশ্ন করলেন, "ঠিক জান?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"দুর্গাভাই?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"সঙ্গে আর কেউ ছিল?"

"না।"

"গাড়ি কোথায় গিয়ে দাঁড়াল?"

"প্রজাপতি শেউড়ের বাড়ীতে।"

"সলা-পরামর্শ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কতক্ষণ পর্যন্ত?"

"রাত দুটো।"

"সরোজিনী এখন কোথায়?"

"সুদর্শনজীর বাড়ীতে।"

"আজ সারাদিন থাকবে?"

"রাত্রে যাবার কথা।"

"কোথায় যাবে?"

"এলাহাবাদে।"

"ট্রেণে?"

"না, গাড়িতে?"

"কার গাড়ি?"

"সুদর্শনজীর।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কিছুক্ষণ ভাবলেন। দীর্ঘ বলিষ্ঠ নাসিকা আরও কঠিন দেখাল। প্রশস্ত কপালে চিন্তার কুঞ্চন। কয়েক মিনিট পরে টেলিফোনে ডায়াল করলেন।

অন্যপ্রান্তে আওয়াজ হ'লে বললেন, "আমি কে. ডি. কোশল বলছি। দুর্গাভাই আছেন?

"এখনও পূজার ঘরে রয়েছেন।"

"এত দেরিতে?"

"কাল অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরেছিলেন। সকালে উঠতে দেরি হ'য়ে গেছে।"

"শরীর ঠিক আছে ত?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। বাবাকে বলব আপনাকে ফোন করতে।"

"না, না। আমিই আবার করব।"

মৃদু হেসে টেলিফোন রাখলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। তিওয়ারীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "গুড্ ওয়ার্ক। এবার আর একটা কাজ কর।"

তিওয়ারী নীরবে আদেশের অপেক্ষা করল।

"ভারত টাইমসের সংবাদদাতা গোপালকৃষ্ণণকে বল বারটায় আমার সঙ্গে দেখা করতে।"

তিওয়ারী বিদায় হ'ল।

সোওয়া ন'টায় উদয়াচলের চীফ সেক্রেটারী সি. কে. শ্রীবাস্তব আই-সি-এস এসে হাজির হলেন। তাঁকে বসতে দিয়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "বেশিক্ষণ আপনাকে আটকে রাখব না। গবর্ণর সাহেবের সঙ্গে আপনার যখন কাজ আছে। এই যে ফাইলটা—এটা আমার কাছে আসবার আগেই হরিশঙ্কর ত্রিপাঠীজীর কাছে গেল কি ক'রে?"

শ্রীবাস্তব ফাইলে চোখ বুলিয়ে বললেন, "হোম সেক্রেটারী পাঠিয়েছেন মনে হচ্ছে।"

"না। প্যাটেল পাঠায় নি, আমি জানি।"

"তা হ'লে—"

"আপনার পরামর্শে রামকৃষ্ণণ পাঠিয়েছে।"

"আমার পরামর্শে?"

"হ্যাঁ। আপনি তা খুব ভাল ক'রে জানেন। তাই, আপনাকে বলছিলাম, মুখ্যমন্ত্রী এখনও আমি, অন্য কেউ নন। একথা মনে রাখবেন।"

একটু থেমে: "আপনার বদলির জন্যে দিল্লীতে আমি লিখেছি। এ ধরনের রাজনীতি ক'রে আপনি এখানে থাকতে পারবেন না। চীফ সেক্রেটারী কদাচ রাজনীতি করবে না। এ সাধারণ কথাটা আপনার জানা থাকা উচিত।"

গলা নামিয়ে: "আরও একটা কথা বলি। নতুন মন্ত্রী-সভা তিনদিনের মধ্যে তৈরী হবে। আর, মুখ্যমন্ত্রী হব আমিই। আপনি এখন আসতে পারেন।"

শ্রীবাস্তব উঠে দাঁড়াবার পর: "আশা করছি মন্ত্রীসভা শপথ গঠনের পরের দিনই আমি নতুন চীফ সেক্রেটারী নিযুক্ত করব। আপনি বদলির জন্যে তৈরী থাকুন।"

চীফ সেক্রেটারী বিদায় নিলে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পুনরায় রাজকার্যে মনোনিবেশ করলেন। পনের মিনিটে তিনি বাকী বিশেষ জরুরী ফাইলগুলি সেরে ফেললেন। দু'বার টেলিফোনে কথাও বললেন। ইতিমধ্যে তাঁর নিজস্ব সেক্রেটারিয়েটের কর্মচারীগণ এসে গিয়েছে। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন খুব বেশি লোককে এখানে এনে ভীড় বাড়ান নি। তাঁর তিনজন ষ্টেনোগ্রাফার-সেক্রেটারী, পাঁচজন টাইপিষ্ট, আট-জন কেরাণী নিয়ে এই আংশিক সেক্রেটারিয়েট। একজন ডেপুটি সেক্রেটারীও এ বাড়ীতেই বেশির ভাগ সময় বসেন; হোম ডিপার্টমেণ্ট থেকে এঁকে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেছে নিয়েছেন, নাম ব্রীজমোহন। দোতলায়, কৃষ্ণদ্বৈপায়নের যেখানে ফরাস পাতা দপ্তর, খুব কম লোক আনাগোনা করে। আগন্তুকদের একতলায় বসানো হয়; নেম-কার্ড বা শ্লিপ পাঠান হয় ওপরে; কৃষ্ণদ্বৈপায়ন একে একে তাঁদের ডেকে পাঠান। কদাপি-কখনও বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তিকে স্বাগত করবার জন্যে তিনি নিজেই নীচে নেমে আসেন; তাঁদের বিদায় দেবার সময়ও তিনি মুখ্যমন্ত্রীভবনের প্রধান-দ্বার পর্যন্ত এসে গাড়ি ছাড়ার অপেক্ষা করেন। সাক্ষাৎপ্রার্থীদের সঙ্গে দেখা করা ব্যাপারে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের কয়েকটা বিশেষ নিয়ম আছে। সকালের দিকে নিতান্ত প্রয়োজনীয় কাজ ছাড়া কাউকে তিনি দর্শন দেন না। যথাসম্ভব যারা যেমন আসেন তেমন তিনি তাঁদের ডেকে পাঠান; অনেকক্ষণ কাউকে বসিয়ে রাখেন না। কিন্তু এরই মধ্যে নিয়মের ব্যতিক্রম তিনি ক'রে থাকেন। সাক্ষাৎপ্রার্থীদের মধ্যে লেখক, শিক্ষক, সমাজকর্মীদের তিনি কিছু আলাদা খাতির দেখিয়ে থাকেন। বিরোধী দলগুলির নেতাদের নিজে এসে ওপরে নিয়ে যান, দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেন বিদায় নেবার সময়। কংগ্রেসী নেতাদেরও তাই। তাঁর সংবাদপত্রের সম্পাদক এবং চীফ সেক্রেটারী এক সময় হাজির হ'লে, রাজকার্যের অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন না থাকলে, তিনি সম্পাদককে আগে ডেকে পাঠান।

পেশাদার রাজনীতির সবচেয়ে কঠিন অংশ হ'ল দলরক্ষা, দলের নেতৃত্ব আয়ত্তে রাখা। এ জন্যে বহু রকম বহু চরিত্রের মানুষের সঙ্গে কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে দেখা করতে হয়, আলোচনা, গল্প, দলনীতি, কূটনীতি চালিয়ে যেতে হয়। যতটা সম্ভব এ জাতীয় লোকেদের সঙ্গে তিনি সন্ধ্যাবেলা সাক্ষাৎ করেন।

খাস-বাড়ীর একতলায় বিরাট বসবার ঘরে তিনি সন্ধ্যাবেলা সমাসীন থাকেন। একে একে, বা দু-চারজনের দলে দলে এঁরা সব আসতে সুরু করেন। বারান্দায় সারি-বাঁধা বেতের চেয়ারে উপবিষ্ট হন। যাঁরা কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের "আপনার" লোক, তাঁরা অন্যদের তুলনায় সহজ ভাবে চলাফেরা করেন; অন্যরা এঁদের দেখে খানিকটা

দমে যান। "আপনার" লোকেরা বাড়ীর এদিক্‌-ওদিক্‌ ঘুরে বেড়ান, কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ছেলেদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ গল্প করেন, তিওয়ারীর সঙ্গে নিচু-গলা সলা-পরামর্শ। মাঝে মাঝে এক-একজন আলাপ-রত কৃষ্ণদ্বৈপায়নের সামনে সটান চলে গিয়ে হাঁটু ছুঁয়ে প্রণাম ক'রে বারান্দায় এসে উপবিষ্ট হন: মুখে তৃপ্তির ও অহঙ্কারের হাসি ফুটে ওঠে। মাঝে মাঝে আবার একদল "আপনার" লোক হৈ-হল্লার সঙ্গে বাড়ীতে ঢুকে সোজা বসবার ঘরে চলে যান; কৃষ্ণদ্বৈপায়নও আরব্ধ বাক্যালাপ অসমাপ্ত রেখে উঠে দাঁড়ান, "নমস্তে"-র আদান-প্রদান হয়, হাসি-হল্লায় ঘর মুখরিত হয়ে ওঠে, বারান্দায় এসে মুখ্যমন্ত্রী এঁদের আসনে বসিয়ে পুনরায় অপ্রতিভ, সঙ্কুচিত সাক্ষাৎপ্রার্থীর সঙ্গে খণ্ডিত আলাপের অবিস্মৃত সূত্র পুনর্ধারণ করেন। এ সব সাক্ষাৎপ্রার্থীর মধ্যে একদিকে যেমন রাজনৈতিক খেলার সব রকম খেলোয়াড়—ছোট, মাঝারী, বড়, আদর্শবাদী, আদর্শহীন, ভ্রষ্টাদর্শ; ঐকান্তিক কর্মী ও ঐকান্তিক স্বার্থান্বেষী; দলীয় ষড়যন্ত্রে হাত-পাকা বিশ্বস্ত অনুচর, সতত বিশ্বাসভঙ্গে অভ্যস্ত বিনীত-মুখোস অপরিহার্য সাঙ্গাত; আবার অন্যদিকে কন্ট্রাক্টার, জমিদার, গাড়ি-লরী-বাসের লাইসেন্স প্রার্থী, শিল্পপতি, কৃষাণ-শ্রমিক-আন্দোলনের নেতা; এক-কথায় উদয়াচলের মানব-সমাজের সব প্রকার প্রতিনিধি। এঁদের চেহারা বহু বছর ধ'রে প্রতিদিন দেখে দেখে, প্রতিদিন এঁদের সঙ্গে কথা বলে, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এঁদের নাড়ী নক্ষত্র চিনে গেছেন। এঁরা হা করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি এঁদের পেটের কথা বুঝতে পারেন; মুখের দিকে তাকালেই বেশির ভাগ সময় এঁদের অভিপ্রায়, প্রার্থনা, মতলব, ব্যথা-বেদনা-নালিশ তাঁর কাছে ধরা প'ড়ে যায়। রাজনৈতিক খেলায় যারা নেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ, তাঁদের প্রত্যেকের চরিত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ভাল ক'রে জানা হয়ে গেছে; তাঁদের দুর্বলতা, স্খলন-পতন, আবার দৃঢ়তা ও শক্তির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘনিষ্ঠ। তিওয়ারীর তত্ত্বাবধানে তিনি নিজস্ব সংগোপন সংবাদ সরবরাহের একটি কার্যকরী চ্যানেল তৈরী করেছেন; প্রকৃত বা সম্ভাবিত রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী অথবা দল রাখতে গেলে যাদের গতিবিধি কার্য-কলাপ চিন্তাধারার ঘনিষ্ঠ পরিচয় অপরিহার্য, তাদের প্রায় সবকিছু কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রয়োজনের পূর্বাহ্ণেই জানতে পারেন। দুষ্ট লোকেরা ব'লে থাকে তিনি তাঁর একান্ত নিজস্ব গোয়েন্দা-বিভাগ জনসাধারণের পয়সায় এ দেশের সর্বত্র প্রসারিত ক'রে তুলেছেন। কিন্তু তিনি জানেন, রাজকার্যের জন্যে এই ধরনের সংবাদ সরবরাহ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের গতিবিধি, স্খলন-পতন, ত্রুটী-বিচ্যুতি সম্বন্ধেও তিনি নিজস্ব সংবাদদাতাদের কাছ থেকে নিয়মিত খবর পেয়ে থাকেন। প্রত্যেক উচ্চপদস্থ অফিসারের সম্বন্ধে তাঁর নিজের একটি ক'রে "ডোসিয়র" আছে, তিওয়ারীর সুদক্ষ হাতে তৈরী। প্রয়োজন না হ'লে তিনি এ সব অস্ত্র ব্যবহার করেন না। অফিসারদের হেনস্তা করা কৃষ্ণদ্বৈপায়নের স্বভাব নয়; বরং তিনি মনুষ্য-চরিত্রের শত-সহস্র দুর্বলতা জানেন, বোঝেন, মার্জনাও করেন। কিন্তু তিনি এ কথাও জানেন যে, ভারতবর্ষের বর্তমান রাজ-নৈতিক পরিস্থিতিতে অফিসারদের ওপর পুরা কর্তৃত্ব বজায় রাখা মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে সহজ নয়। অথচ এই অপরিহার্য কর্তব্য সম্পাদন করতে না পারলে শাসনযন্ত্র বিকল হতে বাধ্য। তাই তিনি নিজস্ব পরিচালনা-নীতি আবিষ্কার ক'রে তার নিপুণ ব্যবহারে দিনে দিনে পারদর্শী হয়ে উঠেছেন।

চীফ সেক্রেটারী বিদায় নিলে, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তিওয়ারীকে ডাকলেন।

"শ্রীবাস্তব হরিশঙ্কর ত্রিপাঠির সঙ্গে গতকাল দেখা করেছিল?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"ওর ধারণা হরিশঙ্করজী নতুন মুখ্যমন্ত্রী হবেন!"

"তাই মনে হচ্ছে।"

"শ্রীবাস্তবের ফাইলটা আমাকে দিয়ো।"

"আজ্ঞে।"

"দিল্লী যেতে হবে আমাকে।"

"কবে?"

"খুব সম্ভব কাল।"

"প্লেনে সীট রিজার্ভ ক'রে রাখব।"

"আর একটা কথা।"

"আজ্ঞা করুন।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন।

তিওয়ারী দেখল তাঁর গৌরবর্ণ কঠিন মুখখানা হঠাৎ বেদনা-গম্ভীর।

"দুর্গাপ্রসাদ শহরে আছে?"

"তিলকগড় গিয়েছিল। গতকাল ফিরেছে।"

"তাকে একবার ডেকে আনতে পার?"

তিওয়ারী চুপ ক'রে রইল। দু'বছর কৃষ্ণদ্বৈপায়নের সঙ্গে পুত্র দুর্গাপ্রসাদের দেখা হয় নি।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "তাকে বল, আমার তার কাছে বড় দরকার। আমি, তার পিতা, সাক্ষাৎপ্রার্থী।"

একটু পরে টেলিফোন বাজল।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন রিসীভর তুলে বললেন, "কোশল।"

অন্যপ্রান্তে দুর্গাভাই কৃপাশঙ্কর দেশাই।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "নমস্তে দুর্গাভাইজী। আপনি কেন ফোন করতে গেলেন? আমি নিজেই এক্ষুণি আপনাকে ফোন করতে যাচ্ছিলাম।"

দুর্গাভাই বললেন, "আপনি যখন তলব করলেন তখনও আমার পুজো শেষ হয় নি। এক্ষুণি পুজো সেরে ঘরে এসেছি। বলুন, কি হুকুম?"

"লজ্জা দেবেন না, দুর্গাভাইজী। আপনাকে হুকুম করতে পারে উদয়াচলে এমন ব্যক্তি জন্মায় নি।"

"তা হ'লে, বলুন কি প্রয়োজন?"

"এগারটায় ক্যাবিনেট মিটিং। তার আগে আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল।"

"বলুন।"

"গোবর্ধন বাঁধ পরিকল্পনায় দুটো ব্রীজের কন্‌ট্রাক্ট ব্যাপারটা আজ ক্যাবিনেটে আসছে শুনছি।"

"হুঁম্।"

"উদয়াচল কনষ্ট্রাক্‌শন এ কনট্রাক্টটা চাইছে।"

"হুঁম্।"

"ওদের টেণ্ডার ত দেখছি ভালই।"

"আমি দেখি নি। পুরো ফাইল আপনাকে পাঠিয়ে দিয়েছি।"

"ওদের দিতে আমার আপত্তি নেই।"

"আমার আছে।"

"কেন বলুন ত?"

"কোশলজী, মন্ত্রীদের বোধ করি সবচেয়ে বড় সমস্যা তাদের সন্তানরা। আমি জানতাম না উদয়াচল কনষ্ট্রাক-শনের সঙ্গে আমার ছেলে শঙ্করের কোনও সম্পর্ক আছে। দিন সাতেক আগে আমি জানতে পেরেছি। অন্য যে কেউ কনট্রাক্ট পাক না কেন, উদয়াচল কনষ্ট্রাকশন কিছুতেই পাবে না।"

"দুর্গাভাইজী," কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নরম সুরে বললেন, "আপনার এই লৌহকঠিন সততাকে আমি শ্রদ্ধা করি। সারা ভারতবর্ষে আপনার মত চরিত্রবান্ কংগ্রেস নেতা বেশি নেই। তবু আমার একটা কথা আছে।"

"বলুন।"

"মন্ত্রীর ছেলে হওয়া কি অন্যায়? মন্ত্রীর সন্তানরা সৎভাবে ব্যবসা করতে গেলেও তাদের সুযোগ দেওয়া যাবে না?"

দুর্গাভাই বললেন, "কোশলজী, মন্ত্রী হওয়াটাই ভয়ানক অন্যায়। মন্ত্রী হয়ে আমরা যদি সাধারণ মানুষের মত বাস করতে পারতাম, অন্যায়টা কম হ'ত। মন্ত্রীর ছেলেদের এমন কিছু করতে যাওয়া উচিত নয়, আমার মতে, যাতে বাপের মন্ত্রিত্বের বিন্দুমাত্র অপব্যবহারের সুযোগ থাকতে পারে। শঙ্কর, যতদূর জানি, খুব সচ্চরিত্র নয়। দু'একবার আমার নাম ভাঙ্গিয়ে ছোটখাট সুবিধে সে আদায় করতে চেয়েছে ব'লে খবর পেয়েছি। আপনি কবি মানুষ, জানেন ত শেক্‌সপীয়র বলেছেন, সুনাম একবার গেলে মানুষের আর কিছুই বাকী থাকে না।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "আপনি খুব খাঁটি কথা বলেছেন। আপনাকে বলতে দ্বিধা নেই, শঙ্করভাই আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। আমি তার কাগজপত্র দেখেছি—ব্যবসায় সে যথাসম্ভব সততা দেখিয়ে এসেছে। ব্রীজ দুটোর জন্যে ওদের টেণ্ডার সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক। আমি ভেবে-ছিলাম ন্যায্যভাবে কনট্রাক্ট উদয়াচল কনষ্ট্রাকশন পেতে পারে। তবু একবার আপনাকে জিজ্ঞেস ক'রে দেখব ভাবছিলাম।"

দুর্গাভাই জবাব দিলেন, "ক্যাবিনেটে এ ব্যাপারটা টেনে আনবার দরকার ছিল না।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "একেবারেই না।"

"তবে এল কি করে?"

"ত্রিপাঠীজি চাইলেন, তাই।"

"হরিশঙ্করজী?"

"তিনি আমার কাছে নোট পাঠালেন গোবর্ধন বাঁধের যাবতীয় কনট্রাক্ট সম্বন্ধে ক্যাবিনেটে আলোচনার দাবী জানিয়ে।"

"হুঁম্।"

"আচ্ছা, দুর্গাভাইজী। আপনাকে কষ্ট দেবার অপরাধ মার্জনা করবেন। আপনি যা ঠিক করেছেন আমার তাতে পুরো সায় আছে। কনট্রাক্টটা বোধ করি হনুমান নেশন-বিল্ডিং কোম্পানী পাবে।"

দুর্গাভাই কিছুক্ষণ চুপ রইলেন। তারপর বললেন, "ওটা কার কোম্পানী আপনি ভালই জানেন।"

"আপনি যতটা জানেন আমি তার চেয়ে বেশি জানি না।"

"তা হ'লে ওদের দেবেন কেন?"

"দেবার ইচ্ছে আমার নেই। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে খুব জোর দিয়ে আমি কিছু করতে চাই না। তবে আপনি যদি আপত্তি করেন, আমি আপনার পেছনে দাঁড়াতে পারি।"

দুর্গাভাই বললেন, "দেখা যাক।"

সাড়ে দশটায় মাধব দেশপাণ্ডের গাড়ি মুখ্যমন্ত্রী ভবনের দ্বারে উপস্থিত হ'ল। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নিচে নেমে এসে মাধব দেশপাণ্ডেকে স্বাগত করলেন। চিরকালের অভ্যাসমত দু'জনে আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন। হাসিমুখে কুশলমঙ্গল বিনিময় হ'ল। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মাধব দেশপাণ্ডেকে নিয়ে নিজের অফিস ঘরে ঢুকলেন। সযত্নে তাঁকে বসিয়ে দু'চারটে মামুলী কথার পর দলীয় রাজনীতিতে নিমগ্ন হলেন। ক্রমশঃ

জয়দেব ও অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব

শ্রীযোগীলাল হালদার

এখানে আচার্য নিম্বার্ক ও আচার্য মাধবের জীবনী আলোচনা করা প্রয়োজন। কারণ এই দুই আচার্যের জীবনী আলোচনা করলে অনায়াসেই ধারণা করা যাবে যে, আচার্য নিম্বার্ক জয়দেবের গুণমুগ্ধ ভক্ত এবং তাঁরই সাধনা তিনি তাঁর দেশ দাক্ষিণাত্যে প্রচার করেন। এখানে দাক্ষিণাত্যের আলবারগণের নামও উল্লেখনীয়। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের এই প্রাচীন বৈষ্ণব সম্প্রদায় শ্রীমদ্ভাগবতের কৃষ্ণলীলাই প্রচার করেছেন মাত্র, তার বেশী কিছু তাঁরা করেছেন বলে জানা যায় নি। যা হোক, আচার্য নিম্বার্কের জীবনী সম্বন্ধে ডঃ রাধাকৃষ্ণণ তাঁর Indian Philosophy, Vol-IIতে লিখেছেন,

"Nimbarka was a Telegu Brahmin of Vaisnava faith who lived sometime after Ramanuja and prior to Madhava, about the eleventh century A.D."—p. 751......"The Vaisnavism of South India did not pay much attention to the glorification of the Vrindavana lila, though some of the Alvaras refer to Krishna's sports with the Gopis. In the north, however, the case was different. In Nimbarka, Radha, the beloved mistress, is not simply the chief of the Gopis but is the eternal consort of Krishna. The writings of Joydeva, the author of Gitagovinda, Vidyapati, Umapati and Chandidas (14th century), show the growing influence of Radha Krishna cult in Bengal and Bihar, thanks to the influence of the Sakta system of thought and practice. Trained in such an atmosphere, Chaitanya, the great Vaisnava teacher (15th century), was attracted by the account of Krishna in the Visnu Purana, Harivamsa, the Bhagabata and the Brahmavaivarta Puranas and by his personality and character gave a new form to the Vaisnava faith."—p. 760-61.

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রভাব সারা ভারতে বিদ্যমান আছে। সুতরাং অনায়াসে ধরে নিতে পারা যায় যে আচার্য রামানুজের সময় পর্যন্ত বৈষ্ণব ধর্মের উপর শ্রীমদ্ভাগবতের প্রভাব বিশেষ ভাবে বর্তমান ছিল। দক্ষিণ ভারতের আলবারগণও এই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। কৃষ্ণের সঙ্গে গোপীর লীলার কথা তাঁরা উল্লেখ করেছেন, তাহাও শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত ঐ গোপীর কথাই আমাদিগকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

ডঃ রাধাকৃষ্ণণের উক্ত উদ্ধৃতি হ'তে জানা গেল যে, আচার্য রামানুজের (১১শ শতাব্দী) পরে এবং আচার্য মাধবের ঠিক পূর্বে আচার্য নিম্বার্ক আবির্ভূত হন। এখন আচার্য মাধবের জীবনী আলোচনা করলে বুঝতে পারা যাবে যে, আচার্য নিম্বার্ক কখন আবির্ভূত হয়েছিলেন। ডঃ রাধাকৃষ্ণণ আচার্য মাধবের জীবনীও আলোচনা করেছেন তাঁর উক্ত Indian Philosophy, Vol-II গ্রন্থে। আচার্য মাধবের জীবনী আলোচনায় তিনি লিখিয়াছেন,

"Madhava, also known as Purnaprajna and Anandatirtha, was born in the year 1199 in a village near Udipi, of the South Canara district. He became early very proficient in the Vedic learning and soon became a sannyasin. He spent several years in prayer and meditation, study and discussion. He developed his dualistic philosophy in discussions with his preceptor Achintapreksa, an adharent of Samkara's school. He proclaimed the supreme godhead of Visnu and admitted the validity of branding one's shoulders with the arms of Visnu, a practice accepted by Ramanuja. He made many converts to his faith in different parts of the country, founded a temple for Krishna at Udipi, and made it the rallying centre for all his followers. Prohibition of bloodshed, in connection with sacrifices, is a salutary reform for which he is responsible. He died at the age of seventy-nine."—page 738.

আচার্য নিম্বার্ক আচার্য মাধবের ঠিক পূর্ববর্তী হ'লে নিম্বার্ক দ্বাদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন এ কথা নিঃসন্দেহে মেনে নিতে পারা যায়। রাজা লক্ষ্মণ সেন ১১৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ঐ সময়ে

তিনি নিশ্চয়ই শ্রীজয়দেব গোস্বামীর কবিপ্রতিভায় বিমুগ্ধ হয়ে তাঁকে তাঁর সভাকবির আসন দিয়েছিলেন। ইহা হ'তে অনায়াসে বলা যায় যে, এই সময় আচার্য নিম্বার্কের সঙ্গে শ্রীজয়দেবের মিল হয়েছিল এবং তার ফলে আচার্য নিম্বার্ক জয়দেবের রাধাতত্ত্ব গ্রহণ করে দক্ষিণাপথে প্রচার করেছিলেন।

পূর্বোক্ত ব্রহ্মসংহিতার সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' গ্রন্থখানির বহুল প্রচলন দেখেছেন মহাপ্রভু। গ্রন্থ দুইখানি মহারত্ন মনে করে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব নকল করে আনেন। এই 'কৃষ্ণকর্ণামৃত'- আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয়। এই 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' এর দু'টি পাঠ পাওয়া গেছে। একটি দাক্ষিণাত্যের, অপরটি বঙ্গদেশের। দাক্ষিণাত্যের যে পাঠটি পাওয়া গেছে, তার প্রামাণিকতার উপর পণ্ডিতেরা গভীর সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। বাংলা দেশের পাঠটির একটি সংস্করণ—যার মধ্যে মাত্র ১১২টি শ্লোক আছে—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডাঃ সুনীলকুমার দে প্রকাশ করেন। বঙ্গদেশের এই সংস্করণের ১১২ শ্লোকের মধ্যে মাত্র দু'টি শ্লোকে রাধার উল্লেখ আছে। এই শ্লোক দুইটি ও কৃষ্ণকর্ণামৃতের প্রাচীনত্ব আলোচনার পূর্বে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বর্ণিত মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ, কৃষ্ণকর্ণামৃত প্রাপ্তি ও দাক্ষিণাত্যে কর্ণামৃতের জনপ্রিয়তার আলোচনা প্রয়োজন।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ১৮ই ফেব্রুয়ারী দোলপূর্ণিমা তিথিতে শ্রীধাম নবদ্বীপে আবির্ভূত হন। ২৪ বৎসর বয়সে তিনি কাটোয়ার কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করেন। সন্ন্যাসগ্রহণের পর তিনি ৬ বৎসর ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে বাংলা, উড়িষ্যা, দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন স্থান এবং বৃন্দাবনে তদীয় বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করবার জন্য ভ্রমণ করেছিলেন। এই সময় বাংলা দেশে বৈষ্ণব ধর্মের প্লাবন এসেছিল। ভ্রমণ শেষে জীবনের শেষ ১৮ বৎসর মহাপ্রভু পুরীধামে অবস্থিতি করেছিলেন। দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণকালে মহাপ্রভু একদা মাধবপুরীর শিষ্য রঙ্গপুরীর নিকট নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। তাঁর গৃহে পাঁচ-সাত দিন অবস্থিতি-কালে—

কৌতুকে পুরী তাঁরে পুছিল জন্মস্থান।
গোঁসাঞি কৌতুকে কহেন নবদ্বীপ নাম॥
শ্রীমাধব পুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরী।
পূর্বে আসিয়াছিলা নদীয়া-নগরী॥
জগন্নাথ মিশ্র ঘরে ভিক্ষা যে করিল।
অপূর্ব মোচার ঘণ্ট তাহা যে খাইল॥
জগন্নাথের ব্রাহ্মণী মহাপতিব্রতা।
বাৎসল্যে হয়েন তেঁহ যেন জগন্মাতা॥
রন্ধনে নিপুণা নাহি তা সম ত্রিভুবনে।
পুত্রসম স্নেহে করে সন্ন্যাসী-ভোজনে॥
তাঁর এক যোগ্যপুত্র করিয়াছে সন্ন্যাস।
শঙ্করারণ্য নাম তাঁর অল্প বয়স॥
এই তীর্থে শঙ্করারণ্যের সিদ্ধিপ্রাপ্তি (মৃত্যু) হৈল।
প্রস্তাবে শ্রীরঙ্গপুরী এতেক কহিল॥
প্রভু কহে পূর্বাশ্রমে তিঁহো মোর ভ্রাতা।
জগন্নাথ মিশ্র মোর পূর্বাশ্রমের পিতা॥
এই মতে দুই জনে ইষ্ট গোষ্ঠী করি।
দ্বারকা দেখিতে চলিলা শ্রীরঙ্গপুরী॥
দিন চারি প্রভুকে তাঁহা রাখিল ব্রাহ্মণ।
ভীমরথী স্নান করি বিঠ্‌ঠল দর্শন॥
তবে মহাপ্রভু আইলা কৃষ্ণবেন্না-তীরে।
নানা তীর্থ দেখি তাহা দেবতা মন্দিরে॥
ব্রাহ্মণ সমাজ সব বৈষ্ণব চরিত।
বৈষ্ণব সকল পড়ে কৃষ্ণকর্ণামৃত॥
কর্ণামৃত শুনি প্রভুর আনন্দ হইল।
আগ্রহ করিয়া পুঁথি লেখাঞা লৈল॥
কর্ণামৃত সমবস্তু নাহি ত্রিভুবনে।
যাহা হৈতে হয় শুদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম-জ্ঞানে॥
সৌন্দর্য মাধুর্য কৃষ্ণলীলার অবধি।
সে জানে যে কর্ণামৃত পড়ে নিরবধি॥
ব্রহ্মসংহিতা কর্ণামৃত দুই পুঁথি পাঞা।
মহারত্ন প্রায় পাই আইলা সঙ্গে লঞা॥
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, নবম পরিচ্ছেদ।)

এই পংক্তি-নিচয় থেকে আমরা কতকগুলি তথ্য পেতে পারি। প্রথম—সেই দূর অতীতে দাক্ষিণাত্যের সঙ্গে বাংলার একটা নিবিড় সম্পর্কে গড়ে উঠেছিল। তাই দাক্ষিণাত্যের মাধবপুরীর শিষ্য রঙ্গপুরী বাংলার জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে আতিথ্য গ্রহণ করে তার পতিব্রতা স্ত্রীর হাতের মোচার ঘণ্ট পরিতোষ সহকারে ভোজন করেছিলেন। দ্বিতীয়—মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ বাদ দিলেও তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিশ্বরূপ সন্ন্যাস নিয়ে শঙ্করারণ্য নাম গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি দাক্ষিণাত্যের পাণ্ডুপুর তীর্থে দেহ রক্ষা করেন। তৃতীয়—দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণ-সমাজ পরম বৈষ্ণব ছিলেন। চতুর্থ—দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ-সমাজে 'ব্রহ্মসংহিতা' ও 'কৃষ্ণকর্ণামৃত'—এর

বহুল প্রচলন ছিল। পঞ্চম—মহাপ্রভু মহারত্ন মনে করে এই দুই মহাগ্রন্থ নকল করে এনেছিলেন।

সেই দূর অতীত দাক্ষিণাত্যের সঙ্গে বাংলার যে যোগসূত্র ছিল, বাংলার নবদ্বীপের জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে দাক্ষিণাত্যের রঙ্গপুরীর আতিথ্য গ্রহণ থেকে সেটা অনায়াসেই ধারণা করা যেতে পারে। আর এই জন্যে এই সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে যে, বীরভূমে কেন্দুবিল্বে অজয়ের তীরে শ্রীজয়দেবের কাব্যবীণার তারে যে ঝঙ্কার অনুরণিত হয়েছিল তার সম্মোহিনী শক্তিতে আচার্য নিম্বার্ক আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং আকৃষ্ট হয়েছিলেন বলে তিনি তাঁর কাছে এসে তাঁর রাধাতত্ত্ব অনুধাবন করে পরে দাক্ষিণাত্যে প্রচার করেছিলেন। আচার্য নিম্বার্কের পরে বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' রচিত হয়—একথা আমরা সহজেই মেনে নিতে পারি। তা ছাড়া 'কৃষ্ণকর্ণামৃত'র রচনা-কাল নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বহু মতভেদ আছে। বিভিন্ন পণ্ডিত খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত এর রচনা-কাল বলে মত প্রকাশ করেছেন।

এক্ষণে আমরা কৃষ্ণকর্ণামৃতের বঙ্গদেশের সংস্করণের যে দু'টি শ্লোকে রাধার উল্লেখ পাওয়া গেছে তার প্রাচীনত্বের আলোচনা করব। কৃষ্ণকর্ণামৃতের উপর শ্রীগীতগোবিন্দের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান। আমাদের উল্লিখিত উক্ত কৃষ্ণকর্ণামৃতের যে দু'টি শ্লোকে রাধার উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে, তার সঙ্গে শ্রীগীতগোবিন্দের দু'টি শ্লোকের তুলনা করলে কৃষ্ণকর্ণামৃতের উপর শ্রীগীতগোবিন্দের প্রভাব অনায়াসে ধরা পড়বে। প্রথম শ্লোক—

তেজসেহস্তু নমো ধেনুপালিনে লোকপালিনে।
রাধাপয়োধরোৎসঙ্গ শায়িনে শেষশায়িনে ॥ ৭৬ ॥

যিনি ধেনুপালক এবং লোকপালক, যিনি রাধার পয়োধরোৎসঙ্গে শায়িত অবস্থায় আছেন, আবার যিনি শেসনাগের উপর শায়িত আছেন—সেই তেজোরূপকে নমস্কার ॥ ৭৬ ॥

শ্রীগীতগোবিন্দের মধ্যে আছে—
পদ্মা পয়োধরতটী পরিরম্ভলগ্ন—
কাশ্মীর মুদ্রিতমুরো মধুসূদনস্য।
ব্যক্তানুরাগমিব খেলদনঙ্গ খেদ—
স্বেদাম্বুপূরমনুপূরয়তু প্রিয়ং বঃ ॥ ১ ॥ ২৬ ॥

প্রগাঢ় আলিঙ্গনে পদ্মার (রাধার) স্তনতটের কুঙ্কুম লাগিয়া যাঁহার বক্ষদেশ বিশেষরূপে চিহ্নিত হইয়াছে, মদনসন্তাপ জন্য ঘর্মবিন্দু শোভিত এইরূপ কুঙ্কুম-চিহ্নচ্ছলে যাঁহার অন্তরের অনুরাগ বাহিরে প্রকাশ পাইতেছে, সেই মধুসূদন আপনাদিগের আনন্দ বর্দ্ধন করুন ॥ ১ ॥ ২৬ ॥

কৃষ্ণকর্ণামৃতের কবি শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার জানাতে গিয়ে সেই তেজোরূপের মহিমা বর্ণনার উপমা প্রসঙ্গে শ্রীগীতগোবিন্দের "পদ্মাপয়োধরতটী পরিরম্ভলগ্ন—কাশ্মীরমুদ্রিতমুরো মধুসূদনস্য"—এই শ্লোকের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছেন, একথা নিঃসন্দেহ বলা যেতে পারে। আর বিল্বমঙ্গল ঠাকুর যে শ্রীজয়দেব গোস্বামীর পরবর্তী, একথা আমরা পূর্বেই বলেছি। আবার পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যেও কৃষ্ণকর্ণামৃতের রচনা-কাল নিয়েও মতভেদ ঘটেছে। সুতরাং তিনি যে কবিশিরোমণি শ্রীজয়দেবের পরবর্তী, একথা আমরা বলবই।

এক্ষণে আমরা অপর শ্লোকটির আলোচনা করব।

যানি তচ্চরিতামৃতানি রসনালেহ্যানি ধন্যাত্মনাং
যে বা শৈশবচাপলব্যতিকরা রাধাবরোধোন্মুখাঃ।
যে বা ভাবিত বেণুগীতগতয়ো লীলা মুখাম্ভোরুহে
ধারাবাহিকরা বহন্তু হৃদয়ে তান্যেব তান্যেব মে
॥ ১০৬ ॥

'তোমার যে সমস্ত চরিতামৃত ধন্যাত্মাগণের অর্থাৎ পুণ্যাত্মাগণের রসনাদ্বারা লেহনযোগ্য, রাধাকে অবরোধ করিতে উন্মুখ তোমার সমস্ত শৈশব-চাপল্য তোমার কমলাননে ভাবিত বেণুগীত গতিসমূহের লীলা, সে সমস্ত ধারাবাহিকভাবে আমার হৃদয়ে প্রবাহিত হইতে থাকুক।

শ্রীগীতগোবিন্দের মধ্যে আছে—

তির্য্যকৃকণ্ঠ বিলোল মৌলিতরলোত্তংসস্য বংশোচ্চরদ্—
গীতিস্থান কৃতাবধান ললনালক্ষৈর্ণ সংলক্ষিতাঃ
সম্মুগ্ধং মধুসূদনস্য মধুরে রাধামুখেন্দৌ মৃদুস্পন্দং
কন্দলিতাশ্চিরং দধতু বঃ ক্ষেমং কটাক্ষোর্ম্ময়ঃ
॥ ৩ ॥ ১৬ ॥

গ্রীবা বাঁকাইয়া, চূড়া হেলাইয়া, কুণ্ডল দোলাইয়া, মোহন বংশীরবে গোপাঙ্গনাগণকে অন্যমনা করিয়া তাহাদের অলক্ষিতে রাধার মধুর মুখচন্দ্রোপরি মুগ্ধ মধুসূদনের যে কটাক্ষলহরী আন্দোলিত হয়, সেই তরলায়িত কটাক্ষে আপনাদের মঙ্গল বিধান করুন।
॥ ৩ ॥ ১৬ ॥

কৃষ্ণপ্রেমে মজ্জমান কৃষ্ণকর্ণামৃতের কবি শ্রীজয়দেবের রাধাকৃষ্ণলীলায় যে কিভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন তার পরিচয় মিলছে শ্রীগীতগোবিন্দের উপরি-উক্ত শ্লোকের "সম্মুগ্ধং মধুসূদনস্য মধুরে রাধামুখেন্দৌ মৃদুস্পন্দং কন্দলিতাশ্চিরং দধতু"—এই অংশে। এ ছাড়া শ্রীগীত-

গোবিন্দের ১॥ ২৬ শ্লোকে শ্রীজয়দেব যেখানে বললেন, "সেই মধুসূদন আপনাদিগের আনন্দ বর্দ্ধন করুন," কৃষ্ণকর্ণামৃতের কবি প্রায় একই ভাবে একটু ঘুরিয়ে বললেন, "সেই তেজোরূপকে নমস্কার।" আবার শ্রীগীতগোবিন্দের ৩॥ ১৬ শ্লোকে শ্রীজয়দেব যেখানে বললেন, "সেই তরঙ্গায়িত কটাক্ষ আপনাদের মঙ্গল বিধান করুন," কৃষ্ণকর্ণামৃতের কবি একটু অন্যভাবে বললেন, "সে সমস্ত ধারাবাহিকভাবে আমার হৃদয়ে প্রবাহিত হইতে থাকুক।" যুক্তিসম্মত যেকোন ভাবে বিচার করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, কৃষ্ণকর্ণামৃতের কবি বিল্বমঙ্গল ঠাকুর শ্রীগীতগোবিন্দের ভক্তসাধককবি শ্রীজয়দেব গোস্বামীর প্রভাবে বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে কৃষ্ণকর্ণামৃতের মধ্যে শ্রীগীতগোবিন্দের ছাপ বিদ্যমান।

আজ ভারতের তথা বাংলার ঐতিহাসিকদের নিকট আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ, তাঁরা ধর্ম ও সংস্কৃতি এই অংশের ইতিহাস রচনা করে ধর্মপিপাসু মানবের উপকার করে শ্রদ্ধা লাভ করুন। এ ছাড়াও বাঙালী বিভিন্ন সময়ে যেভাবে ভিন্ন ভিন্ন চালে পদক্ষেপ করেছে, তারও একটা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার দায়িত্ব আজ তাঁদের উপর পড়েছে। আমরা আশা রাখি যে, তাঁরা নিশ্চয় এই সমস্ত কাজে অগ্রসর হয়ে দেশের ও জাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করবেন। অপ্রাসঙ্গিক হলেও আজ একথা না বলে পারি না।

কৃষ্ণকর্ণামৃতে যেমন রাধার উল্লেখ পাওয়া গেছে, ঠিক সেইরূপ আরও দুই-চারিখানি গ্রন্থে রাধার উল্লেখ আছে, দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা নাম করতে পারি প্রথমতঃ হাল-সাতবাহনের প্রাকৃত গানের সঙ্কলন গ্রন্থ 'গাহা-সত্তসঈ'। তিনি খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে প্রতিষ্ঠানপুরে রাজত্ব করতেন। কাব্য-রসিক ছিলেন তিনি এবং এজন্য প্রাকৃত কবি-মনের প্রেমের কবিতার এক সঙ্কলন-গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এর প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ গভীর সংশয় প্রকাশ করেছেন। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতক হইতে ষোড়শ শতক পর্যন্ত এমন একটা সময় ছিল যখন বহু কবি কবিযশঃপ্রার্থী ছিলেন না। তাঁরা কবিতা রচনা করে বহু পূর্ববর্তী কোন কবির নামে অনায়াসে চালিয়ে দিতেন। আজ আমরা একথা ধারণা করতে পারি না, কারণ দিন এখন এমন-ভাবে পালটিয়েছে যে স্মরণ করেলও আমরা শিউরে উঠি। আগে যা' ছিল, এখন ঠিক তার বিপরীত ভাব এসেছে কাব্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে। তা' ছাড়া একথা ভাবতেও আশ্চর্য লাগে—কোথাও কিছু নেই হঠাৎ বিচ্ছিন্নভাবে একটা 'রাধা' নাম একটি গ্রন্থের একটা বা দু'টা স্থানে আসে কিভাবে। বেশি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করে আমরা প্রবন্ধের কলেবর বাড়াতে চাই না, কিন্তু দ্বাদশ শতকের গৌড়ের রাজা আদিশূর বৈদিক ক্রিয়া-কর্ম সংস্কার করবার জন্য কান্যকুব্জ থেকে যে পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ এনেছিলেন, তার মধ্যে অন্যতম ভট্ট-নারায়ণের 'বেণী-সংহার' ও নবম শতকের আনন্দ-বর্ধনের 'ধ্বন্যালোক'-এর উল্লেখ না করে পারছি না। বেণী-সংহার নাটকের নান্দী শ্লোকে আছে,—

> কালিন্দ্যাঃ পুলিনেষু কেলিকুপিতামুৎসৃজ্য রাসে রসং।
> গচ্ছন্তী মনুগচ্ছতোঽশ্রু কলুষাং কংসদ্বিষো রাধিকাম্।
> তৎপাদ প্রতিমানিবেশিত পদস্যোদ্ভূত রোমোদ্গতে—
> রক্ষুণ্ণোঽনুনয়ং প্রসন্নদয়িতা দৃষ্টস্য পুষ্ণাতু বঃ॥

আবার ধ্বন্যালোকে আছে—

> তেষাং গোপবধূবিলাসসুহৃদাং রাধারহঃ সাক্ষিণাং।
> ক্ষেমং ভদ্র কলিন্দরাজতনয়াতীরে লতাবেশ্মনাম্।
> বিচ্ছিন্নে স্মরতল্পকল্পনবিধিচ্ছেদোপযোগেঽধুনা
> তে জানে জরঠীভবন্তি বিগলন্নীলত্বিষঃ পল্লবাঃ॥

মথুরা প্রবাসকালে শ্রীকৃষ্ণের নিকট তাঁর সুহৃদ অক্রূর বৃন্দাবনের সংবাদ নিয়ে এসেছেন। তাঁকে দেখেই আগ্রহ-ভরে শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করছেন,—"ভদ্র, সেই গোপবধু-দের বিলাস-সুহৃদ রাধার সাক্ষী কালিন্দী তীরের লতা-মণ্ডপগুলির সংবাদ ভাল ত? স্মরশয্যা কল্পনবিধির জন্য ছেদনের প্রয়োজন না হইলেও খুব সম্ভব এখন সেই পল্লবগুলি শুকাইয়া জীর্ণ ও বিবর্ণ হইতেছে।"

এক্ষণে আমরা ভট্টনারায়ণের উক্ত শ্লোক সম্বন্ধে আলোচনা করব। কবি ভট্টনারায়ণের উক্ত শ্লোকটি আলঙ্কারিক বামনের অলঙ্কার গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। তা' হ'লে কি ভট্টনারায়ণ খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের পূর্বে কবি? কবি ভট্টনারায়ণকে আদিশূর এনেছিলেন কান্যকুব্জ থেকে —একথা আমরা পূর্বেই বলেছি। ভি. এ. স্মিথ তাঁর বিখ্যাত Oxford History of India—Part I গ্রন্থে আদিশূরের সম্বন্ধে লিখেছেন,—

"Bengal tradition has much to say about a king named Adisura, who ruled at Gaur or Lakshmanavati and sought to revive the Brahmanical religion which had suffered from Buddhist predominance. He is believed to have imported five Brahmans from

Kanauj, who taught orthodox Hinduism and became the ancestors of the Radhiya and Barendra Brahmans. His date may be placed in or after A.D. 700."—p. 185.

স্মিথ সাহেবের ঐ বিবরণ থেকে কোন সম্ভাব্য ঐতিহাসিক সত্যে উপস্থিত হ'তে পারা যায় না। বাঙলায় পাল রাজাদের পর এবং প্রথম দিক্‌কার কোন সেন রাজার সমকালে আদিশূর গৌড়ের রাজা ছিলেন। সুতরাং তিনি দ্বাদশ শতকের রাজা। এমত অবস্থায় আলঙ্কারিক বামনের অলঙ্কার গ্রন্থে তাঁর উক্ত শ্লোকটি কি করে স্থান পেল—এ এক আশ্চর্য রহস্য। আবার সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুত রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত History of Bengal—Part 1 গ্রন্থের একাদশ পরিচ্ছেদের দশম ও একাদশ শতকের কাব্য-অংশে পাওয়া যাচ্ছে,—

"A Bengal tradition of doubtful value, again, would credit Bhatta Narayana, author of the Veni-Samhara, to Bengal, for he is alleged to be one of the five Kanauj Brahmanas brought to Bengal by Adisura."—p. 306.

সুতরাং এই বিবরণ থেকেও কোন ঐতিহাসিক সত্যে উপস্থিত হতে পারা যাবে না। আমাদের মনে হয় এবং সত্য বলেই ধারণা, ভট্টনারায়ণ দ্বাদশ শতকের কবি এবং তিনি জয়দেবের সমসাময়িক। আর জয়দেবের প্রভাবে তিনিও প্রভাবিত হয়েছিলেন। এক্ষেত্রে আলঙ্কারিক বামনের অলঙ্কার গ্রন্থে উক্ত শ্লোকটি অনেক পরে কোন এক শুভমুহূর্তে সংযোজিত হয়েছে বলে আমাদের স্থির বিশ্বাস।

আনন্দ বর্ধন-এর প্রসিদ্ধ অলঙ্কার গ্রন্থ ধ্বন্যালোক-এ উক্ত শ্লোকটিও পরবর্তী কালের সংযোজন। ঊনবিংশ শতকের পূর্বে অর্থাৎ এদেশে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হওয়ার আগে এমন ভাবে আরও অনেক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণ-লীলা-বিষয়ক এক-আধটি পদ অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। এই অনুপ্রবেশের ইতিহাস গবেষকের গবেষণার বিষয়। এই বিষয়ের গবেষণা করলে দেখতে পাওয়া যাবে, ঠিক যেমন ভাবে আর্ষ রামায়ণ-মহাভারতে কিছু কিছু সংযোজিত হয়েছে, দ্বিজ চণ্ডীদাস ও দীন চণ্ডীদাসের পদগুলি মিশে একাকার হয়ে গেছে, কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত ঢেলে সাজা হয়েছে—ঠিক তেমনভাবে উক্ত প্রসিদ্ধ গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদ অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। এই অনুপ্রবেশের মূলে পুঁথি-লেখকদের কবিসুলভ-মনোভাব ক্রিয়াশীল। সেই রহস্য নিরসনে প্রবৃত্ত না হয়ে ঐ কাজের ভার বিদগ্ধ ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ এবং ঐতিহাসিকদের উপর দিয়ে আমরা প্রসঙ্গান্তরে আসি।

এক্ষণে আমাদের আলোচ্য বিষয় "মহাভারতের চক্রধারী কৃষ্ণের রূপ-পরিবর্তন।" ঋষি-কবি ব্যাসের মহাভারত থেকে শ্রীমদ্ভাগবতের কাল পর্যন্ত যে-সময়টা ছিল, এই সময়ের মধ্যে চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণের বীরত্বব্যঞ্জক মূর্তির স্থানে এসেছে তাঁর ঐশ্বর্যভাবমণ্ডিত রূপ। যিনি একদিন ছিলেন 'শত্রুনিসূদন', তিনি হলেন 'গোপীজনবল্লভ'। এইরূপ পরিবর্তনের কারণ প্রসঙ্গে মনে পড়ে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের কবিতা—

আজি হতে শতবর্ষ পরে
এখন করিছে গান সে কোন্ নূতন কবি
তোমাদের ঘরে।

এমনই হয়। আর হয় বলে আজ বাল্মীকি, হোমার, শেক্‌স্পীয়র প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় কবিদের অস্তিত্বের সম্বন্ধে কোন কোন সন্দিগ্ধ মনে সন্দেহের উদয় হয়েছে।

মহাভারতের মধ্যে ঋষি-কবি ব্যাস অতীন্দ্রিয়ানুভূতির বিশিষ্ট পরিচয় দিয়েছেন। মহাভারতের অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে চক্রধারী কৃষ্ণের বীরত্ব-ব্যঞ্জক মূর্তির সঙ্গে তাঁর অতি-মানবীয় ভাবগুলির কথাই আমাদের মনে পড়ে। সেই অতি-মানবীয় ভাবগুলির পরিচয় মহাভারতের সর্বত্র আছে। তার পূর্ণ পরিচয় দিতে গেলে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি হয়ে আর এক মহাভারত তৈরী হবে। আমরা সবগুলির পরিচয় না দিয়ে কয়েকটির উল্লেখ করে ঋষি-কবির অতীন্দ্রিয়ানুভূতির পরিচয় দেব।

মহাভারতের সভাপর্বে দেখতে পাওয়া যায়, মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন রাজসূয় যজ্ঞ করেছিলেন, তখন তিনি কাকে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য দিতে পারেন জানতে চেয়েছিলেন ভীষ্মের নিকটে। ভীষ্ম তার উত্তরে বলেছিলেন,—

অস্মর্যমিব সূর্যেণ নিবাতমিব বায়ুনা।
ভাসিতং হ্লাদিতঞ্চৈব কৃষ্ণেনেদং সদো হি নঃ॥

—সূর্য যেমন অন্ধকারময় স্থান উদ্ভাসিত করেন, বায়ু যেমন নির্বাত স্থান আহ্লাদিত করেন, সেইরূপ কৃষ্ণ আমাদের এই সভা আলোকিত ও আহ্লাদিত করিয়াছেন।

তখন ভীষ্মের উপদেশে সেই যজ্ঞসভামধ্যে সহদেব কৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য যথাবিধি দান করলেন এবং কৃষ্ণও সেই অর্ঘ্য গ্রহণ করলেন। এর ফলে চেদিরাজ দুষ্ট শিশুপাল কৃষ্ণনিন্দা আরম্ভ করল সেই সভামধ্যে। শ্রীকৃষ্ণের পিতৃস্বসার পুত্র হয়েও শিশুপাল বহুপূর্ব হ'তে

শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর পরমাত্মীয়দের প্রতি যে অকথ্য অত্যাচার করেছে, তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তাঁর দ্বারকা দগ্ধ করছে, শ্রীকৃষ্ণ সে সব সহ্য করেছিলেন। কিন্তু যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য দিলে পর শিশুপাল যেভাবে কৃষ্ণ-নিন্দা আরম্ভ করল তাতে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে সেই নিন্দা সহ্য করা আর সম্ভব হ'ল না। তার ফলে তিনি সুদর্শন চক্র দ্বারা শিশুপালের মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন। আর সেই মুহূর্তে সভার সকলে দেখতে পেল, সূর্যের ন্যায় একটি উজ্জ্বল তেজ শিশুপালের দেহ থেকে বেরিয়ে এল ও শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করে তাঁর দেহে প্রবেশ করল।

মহাভারতের উদ্‌যোগ পর্বে আছে কৌরব সভায় পাণ্ডবদের পক্ষ হয়ে শ্রীকৃষ্ণ যখন সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন দুর্যোধন কোন প্রকারে তার সেই সন্ধির প্রস্তাব গ্রহণ করেন নি। বরং কৃষ্ণ যখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের উদ্দেশে বলেছিলেন,—

ত্যজেৎ কুলার্থে পুরুষং গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ।
গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ॥

কুলরক্ষার প্রয়োজনে একজনকে ত্যাগ করিবে, গ্রামরক্ষার জন্য কুলত্যাগ, দেশরক্ষার জন্য গ্রামত্যাগ এবং আত্মরক্ষার জন্য পৃথিবীও ত্যাগ করিবে।

শ্রীকৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রকে উপদেশ দিয়েছিলেন কুলরক্ষার জন্য দুর্যোধনকে ত্যাগ করতে। দুর্যোধন সেই সংবাদ জানতে পেরে শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন করে রাখবার চক্রান্ত করেছিল। এরপর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনের দুষ্টবুদ্ধির কথা জানতে পেরে তাকে রাজসভাতে ডেকে তিরস্কার করলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ সেই সভার সকলের সমক্ষে এক পরমরূপ ধারণ করলেন। সহসা তাঁর ললাটে ব্রহ্মা, বক্ষে রুদ্র, মুখ থেকে অগ্নি এবং অন্যান্য অঙ্গ থেকে ইন্দ্রাদি দেবতা যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব প্রভৃতি, বলরাম ও পঞ্চপাণ্ডব আবির্ভূত হলেন। আয়ুধ উদ্যত করে অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণ তাঁর সম্মুখে এলেন এবং শঙ্খ চক্র গদা শক্তি শার্ঙ্গ ধনু প্রভৃতি সর্বপ্রকার অস্ত্রও উপস্থিত হ'ল। সহস্রচরণ সহস্রবাহু সহস্রনয়ন কৃষ্ণের ঘোর মূর্তি দেখে সভার সকলে ভয়ে চোখ বুজলেন, কেবল ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর সঞ্জয় ও ঋষিরা চেয়ে রইলেন; কারণ শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের দিব্যচক্ষু দিয়েছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রও দিব্যদৃষ্টি পেয়ে কৃষ্ণের পরম রূপ দেখলেন। দেবতা গন্ধর্ব ঋষি প্রভৃতি প্রণাম করে কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, "প্রভু, প্রসন্ন হও, তোমার রূপ সংবরণ কর, নতুবা জগৎ বিনষ্ট হবে।" এর পর কৃষ্ণ পূর্ব-রূপ গ্রহণ করলেন।

মহাভারতের ভীষ্মপর্বে দেখতে পাই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ-ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে অর্জুন কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষের সৈন্য-গণকে দেখবার জন্য তাঁর সারথি শ্রীকৃষ্ণকে উভয় পক্ষের সেনার মধ্যে তাঁর রথ রাখতে অনুরোধ জানালেন। তখন অচ্যুত দুই সেনার মধ্যে অর্জুনের রথ স্থাপন করলে পর দুই পক্ষেই পিতা ও পিতামহ স্থানীয় গুরুজন, আচার্য-মাতুল-শ্বশুর-ভ্রাতা-পুত্র ও সুহৃদ্‌গণকে দেখে অর্জুন বিষাদ-ক্লিষ্ট হয়ে পড়লেন এবং হৃষীকেশকে জানালেন যুদ্ধে ঐ সব আত্মীয়কে বিনাশ না করে নিরস্ত্র অবস্থায় ধার্তরাষ্ট্রগণ কর্তৃক নিহত হওয়াও তাঁর পক্ষে শ্রেয়। এর পর বিষাদ-গ্রস্ত অর্জুন আপনার রথের মধ্যে বসে পড়লেন। বিষাদ ক্লিষ্ট অর্জুনকে হৃষীকেশ অনেক বুঝালেন, আত্মার অবিনশ্বরত্ব সম্বন্ধে উপদেশ প্রসঙ্গে বললেন,—

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥১৩॥ ২ অঃ ॥ গীতা
অবিনাশি তু তদ্ বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্তুমর্হতি ॥১৭॥ ২ অঃ॥ ঐ
ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥২০॥ ঐ

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২ ॥ ঐ

—দেহধারী আত্মার যেমন এই দেহে কৌমার যৌবন জরা হয়, সেইরূপ দেহান্তর প্রাপ্তি ঘটে; ধীর ব্যক্তি তাহাতে মোহগ্রস্ত হন না। যাহার দ্বারা এই বিরাট্ বিশ্ব পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে তাঁহাকে অবিনাশী জানিবে; কেহই এই অব্যয়ের বিনাশ করিতে পারে না। আত্মা কদাচ জন্মেন না বা মরেন না, অথবা একবার জন্মগ্রহণ করিয়া আবার জন্মাইবেন না—ইহাও নহে; আত্মা জন্মহীন নিত্য অক্ষয় অনাদি, শরীর হত হইলে এই আত্মা হত হন না। মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করিয়া অন্য নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ দেহী (আত্মা) জীর্ণ শরীর ত্যাগ করিয়া অন্য নব শরীর গ্রহণ করেন।

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদ পরিহার্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি
॥ ২৭ ॥ ২ অঃ ॥ গীতা
অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮ ॥ ঐ
স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।

ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥ ৩১ ॥ ঐ
যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥৩২ ॥ ঐ
অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্মং কীর্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি
॥ ৩৩ ॥ ঐ
হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭ ॥ ঐ
সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৮ ॥ ঐ

—যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহার মৃত্যু নিশ্চয়ই হইবে এবং মৃত ব্যক্তি নিশ্চয়ই পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিবে; অতএব এই অপরিহার্য বিষয়ে তুমি শোক করিতে পার না। হে ভারত, জীবসকল আদিতে (জন্মের পূর্বে) অব্যক্ত, মধ্যে (জীবিত কালে) ব্যক্ত। নিধনে (মরণের পর) অব্যক্ত; তবে কি জন্য তোমার এই প্রকার বিষাদ। অপর পক্ষে, তোমার স্বধর্ম বিচার করিয়াও তুমি বিকম্পিত হইতে পার না, কারণ ধর্মযুদ্ধের অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শ্রেয়স্কর আর কিছু নাই। উন্মুক্ত স্বর্গদ্বার আপনা হইতে উপস্থিত হইয়াছে, সুখী ক্ষত্রিয়গণই এমন যুদ্ধ লাভ করেন। যদি তুমি এই ধর্মযুদ্ধ না কর তবে স্বধর্ম ও কীর্তি হারাইয়া তুমি পাপগ্রস্ত হইবে। যদি যুদ্ধে তুমি নিহত হও তবে স্বর্গলাভ করিবে, আর যদি তুমি জয়ী হও তবে পৃথিবীর রাজ্য ভোগ করিবে। অতএব হে কৌন্তেয়, যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া গাত্রোত্থান কর। সুখ-দুঃখ লাভ-অলাভ জয়-পরাজয় সমান মনে করিয়া যুদ্ধে নিযুক্ত হও, এইরূপ করিলে তুমি পাপগ্রস্ত হইবে না।

হৃষীকেশ অর্জুনকে পরমার্থ বিষয়ে বহু উপদেশ দিলেন। তিনিই যে সৃষ্টি-স্থিতি লয়ের কর্তা, তিনিই যে বিরাট্ পুরুষ—সে কথা অর্জুনকে জানালেন। তখন অর্জুন তাঁকে তাঁর বিরাট্ রূপ, তাঁর অব্যক্ত স্বরূপ, তাঁর পরম বিশ্বাতীত—বিশ্বব্যাপক বিশ্ব-কারণরূপও দেখাতে অনুরোধ করলে শ্রীকৃষ্ণ বললেন,—

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্
॥৮॥ ১১শ অঃ॥ গীতা

—হে অর্জুন, তুমি তোমার এই চর্মচক্ষু দ্বারা আমার এই রূপ দর্শনে সমর্থ হইবে না। এজন্য তোমাকে দিব্য-চক্ষু দিতেছি, তদ্দ্বারা আমার এই ঐশ্বরিক যোগসামর্থ্য দর্শন কর।

এক্ষণে 'অনেন স্বচক্ষুষা এবতু" অর্থাৎ এই তোমার নিজ চক্ষুদ্বারা এবং "তে দিব্যং চক্ষুঃ দদামি" অর্থাৎ তোমাকে দিব্যচক্ষু দিতেছি, এর ব্যাখ্যা প্রয়োজন। 'স্বচক্ষু' অর্থাৎ প্রাকৃত চক্ষু। এই চক্ষুতে সাধারণ প্রাকৃত বস্তুমাত্র দৃষ্ট হয়। পূর্বে অর্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলে-ছিলেন যে, যদি ভগবান্ তাঁকে তাঁর বিশ্বরূপ দেখাবার যোগ্য মনে করেন—তবে তাঁর বিশ্বরূপ দেখাতে পারেন (গীতা, ১১শ অঃ, ৪ শ্লোক)। এখানে ভগবান্ বললেন যে, প্রাকৃত চক্ষে কেহ তাঁর সেই বিশ্বরূপ দেখতে পারে না এবং সেই জন্য তার 'দিব্যচক্ষু' প্রয়োজন। অর্জুন তাঁর বিশ্বরূপ দেখবার যোগ্য না হলেও ভগবান্ তখন তাঁকে কৃপা করে দিব্যচক্ষু দিয়ে বিশ্বরূপ দেখালেন। 'দিব্যচক্ষু' অর্থাৎ অপ্রাকৃত চক্ষু। ইহাই যোগনেত্র। যোগবলে এই নেত্র লাভ হয়। তখন চর্মচক্ষু বন্ধ হয় এবং মর্মচক্ষু খুলে যায়। মর্মচক্ষু-দ্বার খুলে গেলে ভগবানের অপ্রাকৃত লীলা দর্শন করা যায়। এই অপ্রাকৃত লীলা-দর্শনই অতীন্দ্রিয়ানুভূতি। বৈদিক ঔপনিষদিক যুগে আর্য-ঋষিরা যোগবলে দিব্যচক্ষু লাভ করে ব্রহ্মের অপ্রাকৃত লীলা দর্শন করেছিলেন। তাঁরাই আবার প্রাকৃত জনের জন্য অরূপকে রূপের, অনন্তকে সান্তে, অসীমকে সসীমে, Ideal-কে Real-এ এনেছিলেন। তন্ত্রমতে আজ্ঞাচক্রে বা মনস্তত্ত্বস্থানে এর স্থান। প্রজ্ঞার আলোকে এই দিব্য-চক্ষুর বিকাশ হয়।

এখানে দেখা যাচ্ছে—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সামনে তাঁর সারথিরূপে অবস্থিত আছেন। তখন শ্রীকৃষ্ণের মানুষী রূপ। অর্জুন তাঁর বিশ্বরূপ দেখতে চাইলে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের চিত্ত আকর্ষণ করে, তন্ময়তা দিয়ে, তাঁর সেই মানুষী রূপের মধ্যে বিশ্বরূপ দেখালেন অর্থাৎ সীমার মাঝে অসীমের প্রকাশ করলেন। ঐ তন্ময়তাই যোগশক্তি। ভগবানের দয়ায় অর্জুন যোগশক্তি লাভ করলেন, আর সেই মুহূর্তেই ভগবানের মানুষী রূপের স্থানে তাঁর বিশ্বরূপ দেখলেন। ঠিক এই একই ভাবে দেবী ভগবতী তাঁর পিতা নাগাধিরাজ হিমালয়কে তাঁর বিশ্বমূর্তি দেখিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গটি দেবী গীতায় আছে।

মহাভারতের আশ্বমেধিকপর্বে দেখতে পাই, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর যখন শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা যাত্রা করেছেন, তখন তাঁর পথে এক মরু প্রদেশে উপস্থিত হয়ে তিনি মরুবাসী মুনিশ্রেষ্ঠ উতঙ্কের দর্শন পান। কুরুপাণ্ডবদের মধ্যে সৌভ্রাত্র স্থাপিত হয়েছে কি না জানতে চাইলেন উতঙ্ক শ্রীকৃষ্ণের কাছে। যুদ্ধের পরিণাম

শুনে মুনি শ্রীকৃষ্ণের উপর ক্রুদ্ধ হলেন। তাঁর ধারণা, শ্রীকৃষ্ণ সমর্থ হয়েও কুরুপাণ্ডবকে রক্ষা করেন নি, তাঁর মিথ্যাচারের ফলেই কুরুকুল বিনষ্ট হয়েছে; আর সেইজন্য তিনি শ্রীকৃষ্ণকে অভিশাপ দেবেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে অনুনয় করে নিরস্ত করলেন এবং জানালেন যে—অল্প তপস্যার ফলে কেহ তাঁকে পরাভূত করতে পারে না, বরং তাঁর তপস্যার ফল নষ্ট হয়ে যায়। এর পর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উতঙ্কের কাছে আপনার দিব্য ঐশ্বর্য সকল বিবৃত করলে মুনি ভগবান্কে তাঁর বিশ্বরূপ দেখাবার জন্য অনুরোধ জানালেন। মুনির অনুরোধে ভগবান্ তাঁকে তাঁর বিশ্বরূপ দেখালে মুনি তাঁকে নমস্কার করলেন। তার পর মুনির অনুরোধে আবার তিনি পূর্বরূপ গ্রহণ করলেন এবং মুনিকে বর দিয়ে প্রস্থান করলেন।

মহাভারতের এই চক্রধারী ষড়ৈশ্বর্যশালী শ্রীকৃষ্ণ কি ভাবে আমাদের ধ্যানের জগতে বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণে রূপান্তরিত হলেন, কি ভাবে ভক্তসাধক লীলাময় অরূপরতনকে সরূপে এনে তাঁর সুমধুর বংশীরবে বিমোহিত হ'ল আর মুগ্ধ নায়িকার মত তাঁর রূপসায়রে ডুবে অতীন্দ্রিয়ানুভূতি লাভ করল—সেই ঐতিহাসিক বিবর্তন আলোচনার প্রয়োজন। এই ঐতিহাসিক আলেখ্য দেখতে হ'লে আমাদিগকে মৌর্য-সাম্রাজ্যের মানচিত্র দেখতে হবে এবং সম্রাট্ অশোকের কাল থেকে অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব ২৭৩ অব্দ থেকে বাংলার রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজত্ব কাল অর্থাৎ ১১৭৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ভারতের ধর্মজগতের বিবর্তনের ইতিহাস আলোচনায় আসতে হবে। এই আলোচনার শেষ পর্যায়ে দেখা যাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ভারতের সুপ্রাচীন বৈষ্ণব ধর্মের পরিণত অবস্থা, আর এই পরিণতিতে রাধাবাদের মাধ্যমে শ্রীজয়দেব অতীন্দ্রিয়ানুভূতিকে বিশেষ পরিণত অবস্থায় এনেছেন। এই আলোচনার সুষ্ঠু সমাধান হ'লে ধর্মজগতের এক বিশেষ আলো দেখা যাবে।

সম্রাট্ অশোক খ্রীষ্টপূর্ব ২৭৩ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। খ্রীষ্টপূর্ব ২৬৯ অব্দে তাঁর অভিষেক হয়। খ্রীষ্টপূর্ব ২৬১ অব্দে তিনি কলিঙ্গ যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধে যে লোকক্ষয় হয়েছিল তার পরিণতি তাঁর মনে সামরিক জয়ের প্রতি এনেছিল চরম বিতৃষ্ণা। মহারাজ অশোক ধর্মবিজয়ের দ্বারা মানব-জয়ের নীতিই চরম পন্থা হিসাবে গ্রহণ করলেন। এর ফলে ভারতের সামরিক শক্তির উপর চরম আঘাত হানলেন তিনি। মহারাজ অশোক বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে যেমন বুদ্ধের বাণী প্রচার প্রধান কর্ম হিসাবে গ্রহণ করলেন, তেমনই তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিও তুল্য শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁর একটি শিলা-লিপিতে জানতে পারা যায় যে, তিনি সকল সম্প্রদায়ের লোকের প্রতি সমান অনুগ্রহ করতেন। এই সময় থেকে যুগপৎ ভারতের সামরিক শক্তির হ্রাস ও আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ আরম্ভ হ'ল। এর পর হিন্দুধর্মাবলম্বী গুপ্তসম্রাট্গণ বৈষ্ণব মতের সমর্থক হওয়াতে বৈষ্ণবধর্ম বিশেষ উদ্দীপনা লাভ করেছিল। সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতে বিস্তৃত ছিল, আর দক্ষিণ ভারতে মান্দ্রাজ পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্যের সীমা প্রসারিত হয়েছিল। এ ছাড়া পূর্ব সীমান্তে সমতট (দক্ষিণপূর্ব বঙ্গ), দবক (আসামের নওগাঁ), কামরূপ (উত্তর আসাম), নেপাল, কারত্রীপুর (পাঞ্জাবের জলন্ধর জেলা) প্রভৃতি স্থানের রাজারা তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে সর্বপ্রকার কর দিতেন।

বৈষ্ণব মতাবলম্বী গুপ্তরাজাদের অনুপ্রেরণায় বৈষ্ণব ধর্ম যে উদ্দীপনা লাভ করেছিল তার ফলে চক্রধারী ষড়ৈশ্বর্যশালী শ্রীকৃষ্ণের রূপ পরিবর্তিত হয়ে গেল। যিনি ছিলেন বসুদেব-দেবকীসুত তিনি হলেন নন্দ-যশোদা দুলাল। বিভিন্ন মন্দির-গাত্রে যেভাবে কৃষ্ণলীলার নিদর্শন পাওয়া গেছে সেইভাবে কৃষ্ণরূপ পরিবর্তন হ'তে লেগেছে প্রায় ১১৫৬ বৎসর অর্থাৎ কলিঙ্গ যুদ্ধ (খ্রীষ্টপূর্ব ২৬১ অব্দ) থেকে পল্লব-বর্মণ বংশীয় শেষ সম্রাট্ অপরাজিত বর্মণ (৮৭৬-৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ) পর্যন্ত। মৌর্য সম্রাটেরা হিন্দু ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, আর গুপ্ত সম্রাটেরা ত বৈষ্ণব মতাবলম্বীই ছিলেন; সুতরাং এই দীর্ঘ সময়ে বৈষ্ণব-ভক্ত কবিদের সাধনায় বিষ্ণুর ঐশ্বর্যভাব শ্রীকৃষ্ণে আরোপিত হ'ল এবং শ্রীকৃষ্ণের চক্রের স্থানে এল বংশী। কৃষ্ণত্ব ও বিষ্ণুত্ব এক হয়ে কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার নররূপী নারায়ণ বলে বৈষ্ণব সমাজে পূজিত হলেন। বিষ্ণুভক্ত হলেন কৃষ্ণভক্ত। কৃষ্ণভক্ত-কবি যশোদা-দুলালকে অবলম্বন করে সাধনার নূতন রূপ দিলেন। বিষ্ণুভক্তের শান্ত ভাবের সাধনার পরিপূরকরূপে এল ক্রমান্বয়ে কৃষ্ণভক্তে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের সাধনা।

প্রাচীন ভারতের জনসাধারণ স্বভাবতঃই ধর্মপ্রাণ ছিলেন। আবার কলিঙ্গ যুদ্ধের পর যেভাবে সামরিক শক্তি হ্রাস হয়েছিল, তার ফলে আধ্যাত্মিক শক্তি বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়ে যায়। যদিও পল্লব যুগ পর্যন্ত ভারতীয় রাজাদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই ছিল, কিন্তু তার জন্য আধ্যাত্মিক

শক্তির বিকাশে কোন প্রকার বাধা আসে নি। আর ঐ সময় রাজাদের যে ক্ষুদ্র শক্তি ছিল তাতে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটাও সম্ভব ছিল বলে মনে হয় না। তা' ছাড়া ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রবল প্রতিপত্তির জন্য লোকায়ত হিন্দুধর্ম ও দর্শনেরও বিশেষ বিকাশ ঘটেছিল। সুতরাং এই সময় বৈষ্ণব ধর্মের লোকায়ত ভাবটির নানাভাবে বিকাশ লাভ করবার সুযোগ এসেছিল। তাই দেখা যায় গুপ্তবংশীয় বুদ্ধগুপ্তের মৃত্যু (সম্ভবতঃ ৫০০ খ্রীষ্টাব্দ) পর্যন্ত বৈষ্ণবেরা বিষ্ণু এবং লক্ষ্মীর পূজা করলেও বৈষ্ণব ধর্মের লোকায়ত ভাবটির মধ্যে বিশেষ পরিবর্তন এসে গেল। গুপ্তবংশীয় রাজাদের সামনেই 'নানা পুরাণ রচিত হ'তে থাকল এবং এই সব পুরাণের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্মের ঐ লোকায়ত ভাবটির বিকাশ দেখা গেল। এই সময় একদিকে যেমন পুরাণের মধ্যে ঐ লোকায়ত ভাবটির প্রকাশ দেখা দিল, আবার অন্যদিকে ভাস্কর্যের মধ্যেও ঐ লোকায়ত ভাবের রূপ এসে গেল। ঠিক এই সময় বৈষ্ণব ধর্মের ঐ লোকায়ত ভাবের প্রভাবেই বিষ্ণুর দশাবতারের কল্পনা জেগেছিল সাধারণ বৈষ্ণবের মনে। অবশ্য বৈষ্ণব ধর্মের তাত্ত্বিক দিকের প্রতি তাদের দৃষ্টি পড়বার কথা নয়। কারণ গভীর তত্ত্ব সমুদ্রে অবগাহন করবার শক্তির অভাব ছিল এই সব সাধারণ বিষ্ণুভক্তের। তারা শুধু মহাবিষ্ণুর নানারূপের কল্পনা করেই সন্তুষ্ট ছিল। বুদ্ধও এই সময় বিষ্ণুর এক অবতার ব'লে গণ্য হন।

বৈষ্ণবধর্মের এই লোকায়ত ভাবটি এখনও আমাদের দেশে বিশেষ ভাবে দেখা যায়। এর পরিচয় নিতে হলে যেতে হবে বৈরাগীর আখড়ায়। এমন একটি আখড়ার সঙ্গে একদা আমার বিশেষ পরিচয় ছিল। সে প্রসঙ্গের উল্লেখ না করেও পারছি না। খুলনা জেলায় (অধুনা পূর্ব পাকিস্তান) সাতক্ষীরা মহকুমা সহর থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে দশ-এগার মাইলের মধ্যে কপোতাক্ষীর তীরে ফায়না গ্রাম। কপোতাক্ষী এখানে কুল কুল শব্দে চলেছে সাগরে মিশতে। অবশ্য বঙ্গোপসাগর এখান থেকে বহু দূর। স্বচ্ছতোয়া কপোতাক্ষীর তীরে অবস্থিত ফায়না গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বড় মনোরম। এর সৌন্দর্য অ-কবিকেও কবি করে তোলে। এর তীরে নিধুবন নেই, নেই ময়ূরের দল; কিন্তু আছে স্থানে স্থানে কদম্ব বৃক্ষ আর কেতকী ঝাড়। প্রাবৃটের ঘন বরষায় তাদের ফুলের গন্ধে চারিদিক্ আমোদিত করে তোলে। এখানেই ছিল ব্রজ গোঁসাই-এর আখড়া। এ অঞ্চলে তিনি ফায়নার গোঁসাই নামে পরিচিত ছিলেন। এঁর আশ্রমে রাধাশ্যাম প্রতিষ্ঠিত। গোঁসাই আর তাঁর শিষ্য-শিষ্যারা রাধাশ্যামের সেবায় ভোরবেলা থেকে রাত্রি পর্যন্ত লেগেই আছেন দেখেছি। নাম ও লীলা কীর্তনের সুমধুর ধ্বনিতে আখড়াটি জমজমাট থাকত। নবাগত কেহ সেই আখড়ায় গেলে আখড়াবাসীরা তাঁকে 'রাঃ শ্যাঃ' বলে অভিনন্দন জানাতেন। বৈষ্ণবধর্ম ও দর্শনের তাত্ত্বিক দিকটির আলোচনার অবসর এখানে ছিল না, কিন্তু তার স্থানে ছিল ভক্তহৃদয়ের ভক্তির উচ্ছ্বাস। বৈষ্ণবধর্মের লোকায়ত ভাবটি উপলব্ধি করতে হ'লে আসতে হবে এই সব আখড়ায়। ভারতের নানাস্থানে এই ধরণের আখড়ার উৎপত্তি হয়েছিল সম্ভবতঃ গুপ্তবংশীয় রাজাদের রাজত্বকালে। আর এই লোকায়ত ভাবটির বিকাশের ফলে বৈষ্ণবী সাধনার ধারার মধ্যে এল বৈচিত্র্য, তার ফলে বৈষ্ণবের শান্তভাবের উপাসনার ক্রমবিকাশে পাওয়া গেল দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। এই মধুর ভাবের সাধনা আবার স্বকীয়া ও পরকীয়াতে ভাগ হয়ে গেল। ঐ সময়কার পুরাণে তার প্রতিফলন পাওয়া যায় এবং ভারতের নানাস্থানের শিল্প ও ভাস্কর্যের মধ্যেও তার স্বাক্ষর আছে।

অতঃপর চক্রধারী কৃষ্ণ বংশীধারণ করে যেভাবে ভক্ত-হৃদয়ে আসন গ্রহণ করলেন সেই আলোচনা করে আমরা এ প্রসঙ্গের যবনিকা টানব। আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি কৃষ্ণের রূপ পরিবর্তিত হ'তে লেগেছে সাড়ে এগার শত বৎসরেরও অধিক। এই সময়ের মধ্যে কৃষ্ণত্ব ও বিষ্ণুত্ব এক হয়ে কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার রূপে বৈষ্ণব সমাজে পূজা পেয়েছেন। আমরা আরও বলেছি, বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণবের শান্তভাবের সাধনা কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবের শান্তভাবের সাধনায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু এই শান্ত ভাবের সাধনায় উহা স্থিতিশীল না হয়ে গতিশীল হয়েছে এবং তাতে ইন্ধন দিয়েছে বৈষ্ণবধর্মের লোকায়ত ভাব। এর ফলে ভারতীয় বৈষ্ণবধর্মের যে ক্রমবিকাশ ঘটেছে, তার ফলে কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবের শান্তভাবের সাধনা পর্যায়ক্রমে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবে পরিণতি লাভ করেছে। মধুর ভাবের সাধনা আবার স্বকীয়া ও পরকীয়াতে রূপলাভ করেছে। এই সময়ের মধ্যে নারায়ণের লক্ষ্মী বৈষ্ণব-ভক্তের কাছে কৃষ্ণের প্রধানা স্ত্রী লক্ষ্মীর অবতার রুক্মিণীতে বর্তিত হয়েছে। এই রুক্মিণী এর পর ভাগবতে প্রধানা গোপীরূপে গৃহীত হয়েছেন এবং কৃষ্ণের অন্যান্য স্ত্রী বৃন্দাবনের অন্যান্য গোপীরূপে রূপলাভ করেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের প্রথম অংশে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা ও শেষাংশে কুরুক্ষেত্র লীলার বিবরণ থেকে

অনায়াসেই ভারতীয় বৈষ্ণবধর্মের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। পল্লব যুগের মধ্যে এই পরিবর্তন ঘটেছিল বলে আমাদের দৃঢ় ধারণা। এ পর্যন্ত ভারতীয় বৈষ্ণবধর্মের শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের সাধনার মধ্যে অতীন্দ্রিয়ানুভূতির বিকাশ ঘটলেও তার পূর্ণতা লাভ হয়নি। তার জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে আরও প্রায় আড়াইশত বৎসর অর্থাৎ পল্লব যুগের পর থেকে জয়দেবের আবির্ভাব পর্যন্ত।

পল্লব যুগের পর থেকে শ্রীজয়দেবের আবির্ভাব কালের মধ্যে কৃষ্ণের কুরুক্ষেত্রলীলা ক্রমে ক্রমে বৈষ্ণব সমাজ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং তার স্থানে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা মহাসমারোহে প্রকাশ লাভ করেছে। আর জয়দেবের আবির্ভাবে সত্যভামা, চন্দ্রাবলী, জাম্ববতী, কুব্‌জা, অন্য ষোল হাজার স্ত্রী ললিতা বিশাখা প্রভৃতি ষোল হাজার গোপীরূপে রূপলাভ করেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রুক্মিণী রূপিনী ভাগবতের ঐ প্রধানা গোপীকে রাধা নাম দিয়ে শ্রীজয়দেব গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের রাগানুগা বা পরকীয়া (Spontaneons or Dynamic) তত্ত্বের বা রাধাতত্ত্বের বা অতীন্দ্রিয়তত্ত্বের চরম সাধনার পথ দেখিয়েছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ফলশ্রুতি এখানেই। জয়দেবের সাধনার বৈশিষ্ট্যই এখানে।

—



ক্যাকটাস ও ফুলবানু

শ্রীবিমল বসু

মিসেস চাকলাদারের ক্যাকটাস সংগ্রহের বাতিক ছিল। শুধু বাতিক নয়, নেশা। 'ক্যাকটাস আমি ভালবাসি, আই এ্যাম ইন লাভ উইথ ক্যাকটাস'—এ কথা তিনি প্রায়ই বলতেন। বলার সময় তাঁর গলার স্বরটা একটু বিচিত্র শোনাত। তবুও কথাটা কতদূর হার্দিক, কতখানি বাস্তব সত্য, মনের কোমলতম অনুভূতির দূর্বাশীর্ষগুলি স্পর্শকাতর মখমলী হাওয়ার মত ছুঁয়ে ছুঁয়ে আসে কি না, বাইরে থেকে যাচাই করে দেখা সম্ভব ছিল না। সুযোগও ছিল না। কেননা মিসেস চাকলাদার অর্থাৎ প্রভাবতী দেবী যথেষ্ট অমিশুক ছিলেন। তিনি অসামাজিক ছিলেন একথা বলি না। তবে খুব একটা সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মুষ্টিমেয় মানুষের মধ্যে তাঁর বলা-কওয়া, আচার-আচরণ এবং সামাজিক কর্ত্তব্য সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁর স্বামী মিঃ চাকলাদার ভারত গভর্ণমেণ্টের একজন ক্লাশ ওয়ান অফিসার। স্বভাবতঃই হরদম পার্টি দেওয়া এবং পার্টিতে যোগদান করা তাঁর চাকরিরই একটা অঙ্গ ছিল। কিন্তু মিসেস চাকলাদার বড় একটা এসব দিকে ঘেঁষতে চাইতেন না। বলতেন, ভাল লাগে না। আমি চিৎকার ও হৈহল্লা ভালবাসি না। আসল কথা বহু বিচিত্র মানুষের সংসর্গ তাঁর কাছে বিরক্তিকর ও অপছন্দকর ছিল। পঁয়তাল্লিশ উত্তীর্ণা নিঃসন্তানা মহিলা; আমরা ভাবতাম জীবনের এই একটা বড় দুঃখ এবং অতৃপ্তিকে ভুলে থাকবার জন্যেই তিনি একটা বিশেষ খেয়াল বা নেশাকে আশ্রয় করে আছেন। ক্যাকটাসের আশ্চর্য্য স্তব্ধ মূক এক বিচিত্র জীবন-জগতে নির্ব্বাসন নিয়েছেন। কিন্তু এইসঙ্গে তাঁর রুচিবৃত্তির আর একটি দিক্ আমাদের বিস্মিত করত। তিনি ফুল পছন্দ করতেন না। তাঁর বাড়ীতে ফুলের ছায়া পর্য্যন্ত ছিল না। না বাগানে, না ফ্লাওয়ার ভাসে। মাঝারি আকারের সুন্দর সবুজ কার্পেটের মত ঘাসে ছাওয়া বাগানে ছোট ছোট কাঁচের ঘরের মধ্যে বহু জাতীয় বিচিত্র এবং অভিনব সংগ্রহের ক্যাকটাসে তিনি একটি স্বতন্ত্র পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন। সেই পৃথিবীর মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটা বিস্ময় যেমন আমাদের ঘিরে থাকত তেমনি একটা সন্দেহও। ফুলের কোমলতা ফেলে ক্যাকটাস জগতের কণ্টকতায় যাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় আনন্দ সংহত তাঁর মনের কোমল বৃত্তিগুলি কি এখনও জীবিত? আমরা সন্দেহে আর সংশয়ে ক্ষত-বিক্ষত হতাম। তবে কি মিসেস চাকলাদার এক পাষাণ-হৃদয়া নিষ্ঠুর-প্রাণা নিরনুভব মনের মহিলা? এ কি তাঁর মানসিক বিকৃতির লক্ষণ?

মিসেস চাকলাদারের ক্যাকটাস বাগান পরিচর্য্যার জন্যে একটি মালী ছিল। নাম খোদাবক্স। অত্যন্ত সরল প্রকৃতির গ্রাম্য মানুষ। কিন্তু মিসেস চাকলাদার তাঁকে শিখিয়ে-পড়িয়ে তৈরী করে নিয়েছিলেন। তাঁর দশ বছর বয়েসের এই একটা 'হবি'র সঙ্গে খোদাবক্সের দশ বছরের দীর্ঘ মালী-জীবন জড়িত ছিল। সেই জন্যেই বাগান-সেবার মধ্যে তার আন্তরিকতা লক্ষ্য করতাম।

সেদিন বাগানে ঘুরে ঘুরে কয়েকটা নতুন সংগ্রহ দেখছি। খোদাবক্স বিষণ্ণ মুখে এসে দাঁড়াল।

হুজুর। খোদাবক্সের স্বর কাঁদো কাঁদো।

কি ব্যাপার? আমি মুখ তুললাম।

হুজুর, মাকে বলে আমার তিনদিনের ছুটি করিয়ে দিন।

সে কি! কেন?

আজ্ঞে আমার বিবির বড় অসুখ। খোদাবক্সের চোখে জল। অসুখ! নিশ্চয়ই বাড়াবাড়ি। বিচলিত হলাম। কেন, তুমি নিজেই মাকে বল না কেন।

না, না, হুজুর। ছুটির কথা বললে উনি বড় রাগ করেন।

প্রসঙ্গতঃ একটা কথা বলে রাখি। মিসেস চাকলাদার আমার দূর সম্পর্কের আত্মীয়া। কিন্তু একমাত্র সেই দাবিতে আমি খোদাবক্সের হয়ে তাঁকে কিছু বলতে পারি না। যদিও ব্যবহারিক প্রকাশ দেখি নি, তবু কেমন যেন মনে হয় উনি আমায় মনে মনে একটু স্নেহ করেন! এবং

একেবারে অসম্ভব না হ'লে আমার অনুরোধ উনি ঠেলবেন না।

বলতে গিয়ে বেশ বেকুব হলাম।

শোনামাত্রই প্রায় গর্জ্জে উঠলেন, কেন, ছুটি কেন?

স্ত্রীর অসুখ শুনে আরও ক্ষেপে গেলেন: স্ত্রীর অসুখ ত হয়েছে কি। ও আপনি সেরে যাবে। এদিকে ও না থাকলে নতুন যে ক্যাকটাসগুলো আনানো হয়েছে সেগুলোর অবস্থা কি হবে ভেবে দেখেছ?

মনে মনে যথেষ্ট আঘাত পেলাম। এই কি মানবতা? একটা মানুষের জীবনের চাইতে কতকগুলো ক্যাকটাস বড় হ'ল? বিরক্ত ব্যথিত চিত্তে ফিরে আসছি, উনি বললেন, ওকে বলে দিও তিনদিনের বেশী যেন এক মুহূর্ত্তও দেরি না হয়।

দিন পাঁচেক পরে এসে বেশ অবাক্ হলাম। বাগানের লনে বছর চার-পাঁচের একটি সুন্দর মেয়ে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। সেই সময় প্রভাবতী দেবী বাইরে এলেন।

জিজ্ঞেস করলাম, এটি কে?

প্রভাবতী হাসলেন। ও ফুলবানু। খোদাবক্সের মেয়ে।

ফুলবানু! ফুলবানু ফুলের মতই। ইসারায় ডাকতেই মেয়েটি কাছে এল। চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে। জিজ্ঞেস করলাম, নাম কি তোমার?

ফুলবানু।

কি করো?

একটু ভেবে নিয়ে বলল, খেলা করি।

হো হো ক'রে হেসে উঠলাম। আশ্চর্য্য হয়ে লক্ষ্য করলাম প্রভাবতীও সে হাসিতে যোগ দিয়েছেন।

ওর গালটা একটু টিপে দিয়ে বললাম, যাও খেল গিয়ে।

তারপর খোদাবক্সের সঙ্গে দেখা হতেই লোকটা হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল। হুজুর। আমার বিবি আর নেই। ঐ মেয়েটাকে বুকে করে ফিরে এসেছি।

বললাম, বেশ করেছ।

প্রভাবতী আমায় ভেতরে ডেকে নিয়ে গেলেন। হাসি-মুখে বললেন, আজ তোমায় একটা নতুন সংগ্রহ দেখাব। জিনিষটা খুবই অদ্ভুত। বহু কষ্টে যোগাড় করতে হয়েছে। এক আফ্রিকার কেনিয়া অঞ্চল ছাড়া এ জিনিষ আর কোথাও জন্মায় না।

ক্যাকটাসের আমি বিশেষ কিছু বুঝি না, যদিও দেখতে মন্দ লাগে না। কিন্তু প্রভাবতী যে সংগ্রহটি দেখালেন সেটা সত্যিই অদ্ভুত। এরকম ধরণের ক্যাকটাস এর আগে আমার কখনো চোখে পড়ে নি।

প্রভাবতী বললেন, কত কাণ্ড করে যে এটা যোগাড় করেছি। এই একটির দামই নিয়েছে দু'শো টাকা।

বলেন কি!

প্রভাবতী কোন কথা বললেন না। শুধু একটু হাসলেন। তারপর বললেন, তুমি আজ এখানে খেয়ে যাবে।

বুঝলাম এই দুষ্প্রাপ্য বস্তুটির অভাবনীয় প্রাপ্তির আনন্দে আজ উনি মশগুল।

এরপর প্রায় দু'সপ্তাহ আর এদিকে আসা হয়ে ওঠে নি। নানা কাজের চাপ পড়েছিল। কলকাতা অফিস থেকে বদলি হওয়ারও একটা রিউমার শুনছিলাম। তারপর এক ছুটির দিনের নরম বিকেলে হঠাৎ ফুলবানুকে মনে পড়ল। ফুলের মতই ফুলবানু।

বাগানের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে একবার মনে হ'ল প্রভাবতী দেবী হয়ত আজ বাড়ী নেই। বাড়ীর আবহাওয়াটা কেমন থমথমে নিঝুম। একটা কঠিন যন্ত্রণাকর নৈঃশব্দ্যের ঠাণ্ডা স্পর্শের অস্বস্তি যেন অনুভব করছিলাম। খোদাবক্স বা ফুলবানুকেও ধারে কাছে কোথাও দেখতে পেলাম না।

ব্যাপার কি! গেল কোথায় সব!......হঠাৎ একটা চাপা কান্নার শব্দ কানে আসতেই চমকে উঠলাম। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ভেতর-বাড়ীর উঠানে এসে দেখি খোদাবক্স বিষণ্ণ আহত মুখে এককোণে বসে আছে। তার চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছে। আর ফুলবানু বাবার বুকে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ফুলবানুর ফুলের মত ছোট্ট শরীর যেন হাওয়ার দোলায় কাঁপছে থরথর করে।

কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালাম।

খোদাবক্স ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে বললে, নসীব, সবই নসীব হুজুর। নইলে খোদার দোয়ায় এমন শত্তুর মেয়ের বাপ হব কেন? ফুলবানু আজ মায়ের সেই দামী নতুন ক্যাকটাস ভেঙ্গে নষ্ট করে দিয়েছে।

শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। প্রভাবতী দেবীকে ভাল করেই চিনি। একটি দামী ক্যাকটাস নষ্ট করে ফেলা মানেই তাঁর পাঁজরের একখানি হাড় খুলে নেওয়া। এর পরিণাম যে কতদূর গড়াতে পারে, ভাবতেও ভয় হ'ল। তবু আমায় চেষ্টা করতে হবে। সরল নিষ্পাপ নির্জ্ঞান শিশু। তারই একটা খেলার ভুলের জন্যে যেন কোন নির্মম নিষ্ঠুর দণ্ড খোদাবক্সকে না পেতে হয়।

নিচের তলা ওপর তলা কোথাও প্রভাবতী দেবীকে না দেখতে পেয়ে একেবারে তেতলার ছাত পর্য্যন্ত উঠতে হ'ল। সেখানে ছাতের এককোণে একটি চেয়ারে গুম হয়ে বসে-ছিলেন। সারা মুখে আসন্ন এক প্রচণ্ড ঝড়ের পূর্ব্বাভাস! দু'চোখে কঠিন হিংস্রতা! কাছে যেতে প্রথমে কোন কথা বললেন না। তারপর বললেন, বস। পাশেই একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লাম।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। একটা যন্ত্রণার অপেক্ষার মধ্যে ছটফট করছি।

হঠাৎ তাঁর গলা দিয়ে সাপের মত হিসহিস শব্দ বেরুল। জান, ফুলবানু আমার সেই বহু কষ্টের সংগ্রহটির দফা নিকেশ করেছে।

আমি উত্তর দিই না।

মেয়েটা ভেতরে ভেতরে এতদূর শয়তান, নচ্ছার, এ ত জানতাম না।

অদ্ভুত আশ্চর্য্য অভিযোগের ভঙ্গি! বিচিত্র ঈর্ষ্যা! যেন প্রভাবতী দেবীও শিশু হয়ে গিয়েছেন। যেন একটি ঈর্ষিত শিশুমন আর একটি শিশুর বিরুদ্ধে তার আদরের খেলনা ভেঙ্গে দেওয়ার অভিযোগ পেশ করছে।

আমি বললাম, ও ত অবোধ শিশু। ও কি জেনেশুনে বুঝে ওটা নষ্ট করেছে। এবারকার মত বরং আপনি ওদের—

তুমি থাম! সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের একটি গর্জ্জন কানে এল। মনে মনে কেঁপে উঠলাম। প্রভাবতীর চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরোচ্ছে! একটা ভয়াবহ প্রতিহিংসা জ্বলছে!

কে জানে ঐ ছোট্ট মেয়েটার ওপর এরপর কি ভীষণ অভিশাপ নেমে আসবে! প্রভাবতী দেবীর হিতাহিত জ্ঞান লুপ্ত হয়েছে। কিন্তু তার আগে—তার আগে আমায় একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতে হবে।

মাসীমা, অন্ততঃ আমার অনুরোধেও এবারকার মত ওদের রেহাই দিন। না হয় একমাসের মাইনে কাটুন। খোদাবক্সের পক্ষে সেইটেই চরম শাস্তি হবে। মেয়েকে শাসনে রাখবে।

প্রভাবতী তখন দাঁতে দাঁত ঘষছেন। যেন আমার কোন কথাই তাঁর কানে যায় নি। বিড়বিড় করছেন, অবোধ শিশু! পাপ! পাপ—জীবন্ত একটা পাপ! ওরা বিষাক্ত সাপের চেয়েও সাংঘাতিক!

এই একটি কথার আঘাতই আমায় স্তব্ধ করে দিল। যেন নিজের হৃদ্‌স্পন্দন আর শুনতে পাচ্ছি না। এই প্রথম একটা ঘৃণা—প্রচণ্ড দুর্দ্দমনীয় ঘৃণায় আমি প্রভাবতীর চোখ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। ওঁর সংসর্গ আমায় চাবুক মারছে। এখানে আর এক মুহূর্ত্ত দাঁড়িয়ে থাকার প্রবৃত্তি হচ্ছে না!··· খোদাবক্স ফুলবানুর শুভচিন্তা সব কেমন ঘুলিয়ে গেল। প্রায় উদ্‌ভ্রান্তের মত সেদিন সেই ছুটির দিনের এক নরম বিকেলকে চোখের সামনে যন্ত্রণায় নীল হয়ে যেতে দেখে আমি বেরিয়ে এসেছিলাম।

তারপর আর বহুদিন ওমুখো হই নি। হবার প্রবৃত্তি ছিল না। সুযোগও ছিল না। বদলি নিয়ে বাইরে চলে গিয়েছিলাম।

প্রায় পাঁচ বছর পর কলকাতায় এসে আবার ফুলবানুর কথা মনে পড়ল। কে জানে ফুলের মত ফুলবানু এতদিন শুকিয়ে ঝরে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে কি না। ভেতর ভেতর একটা বিচিত্র ব্যাকুলতা আমায় অস্থির করতে থাকে। একবার যেতে হবে। খোদাবক্স ফুলবানুর ভাগ্যের পরিণাম না জেনে আমি কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছি না।

বিকেল নয়, স্বচ্ছ একটি হেমন্ত সকালের রোদ আর হাওয়া গায়ে নিতে নিতে পার্কসার্কাসের সেই বাড়ীটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। গেট খুলে ভেতরে ঢুকতেই থমকে গেলাম। একটা আশ্চর্য্য শিহরণ আমার শিরায় শিরায় রক্তে রক্তে ঝনঝনিয়ে উঠল। এ কি! সারা বাগান জুড়ে সাত রঙের মেলা বসেছে। কোথায় সেই কাঁচের ঘর! সেই কাঁটাওলা ক্যাকটাসের ভিড়! গোলাপ, ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা আরও নানা ফুলের রঙে মাঝারি সাইজের একটা বাগান আশ্চর্য্য অতুলনীয় এক আলোর মত জ্বলছে!

এক আনন্দের হাওয়ায় হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে ভেতরে গেলাম। দেখি প্রভাবতী দেবী খাটের ওপর বসে একটি ন'দশ বছরের মেয়ের চুল বেঁধে দিচ্ছেন। মেয়েটিকে পাশ থেকে দেখতে পাচ্ছি। গোলাপী সুন্দর গড়নের নিখুঁত মুখ। আর মেঘের মত কালো একরাশ চুল।

আমাকে দেখেই একমুখ হাসলেন প্রভাবতী। এস অনিল, বস।

এটি কে? সেদিনের মতই জিজ্ঞেস করলাম।

ওমা! ওকে চিনতে পারছ না? ও যে ফুলবানু। তারপর একটু থেমে বললেন, ওকে পুষ্যি নিয়েছি।

আর আপনার বাগানের ঐ সব ফুল···?

ও ফুলবানুর শখ। প্রভাবতী সুন্দর করে হাসলেন।

কিন্তু আপনার সেই অদ্ভুত অদ্ভুত সব ক্যাকটাস···?

প্রভাবতী উত্তর দিলেন না। ফুলবানুর কপাল থেকে দুটো অবাধ্য চুল সরিয়ে এনে সযত্নে আঁচড়ে দিলেন। তাঁর মুখে একটি মধুর হাসির রঙ লেগে রইল।

ছায়াপথ

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

॥ পনের ॥

প্রথম ধাক্কাটা মালতীর ভীষণ লেগেছিল।

স্বামীর অত রূপ, অত মিষ্ট কথা এবং ব্যবহার, তার আড়ালে এই বস্তু ছিল, তা কল্পনারও অতীত। এ যেন শ্যামস্নিগ্ধ নয়নাভিরাম কালো মেঘের আড়ালে বজ্র-বিদ্যুতের সমাবেশ।

এর জন্যে সে প্রস্তুত ছিল না।

কয়েকটা দিন সে স্তব্ধ হয়ে রইল। তার খাস ঝি তার মুখে হাসি ফোটাবার জন্যে অনেক চেষ্টা করে ব্যর্থ হ'ল। তার দিকে দূর থেকে চেয়ে গিন্নীমাও আঘাত পেলেন। কিন্তু তাঁর মনের কথা মুখ দেখে কোনদিনই কেউ বুঝতে পারে না, আজও পারলে না।

পরদিন সকালে মহিমও লজ্জা পেলে। কয়েকদিন লজ্জায় সে ভিতরেই এল না।

গিন্নীমা তাও লক্ষ্য করলেন। হয়ত তাঁর মনে একটু আশাও জাগল। তিনি ভাবেন নি, লজ্জা প্রথম দিনই থাকে। তার পরে ভেঙে যায়। এবং যখন ভেঙে যায় তখন সে দুর্বার হয়ে ওঠে।

মহিমের ক্ষেত্রেও তাই হ'ল।

মালতী অশিক্ষিতা, গোবেচারী মেয়ে নয়। মহিম তাকে মনে মনে সমীহ করত, এবং নিজের কার্যকলাপ সম্বন্ধে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেই চলত।

কিন্তু মানুষ প্রত্যেক দিন সতর্ক থাকতে পারে না। বিশেষ এরকম ক্ষেত্রে। নেশার মাত্রা সব সময় ঠিক রাখাও যায় না। সেদিন যেমন হয়েছিল।

সকালে যখন ঘুম ভাঙল, মহিমের লজ্জার সীমা রইল না। চারিদিকে চেয়ে দেখলে ঘরে কেউ নেই। বহু পূর্বেই মালতী ঘর থেকে চলে গেছে। শুধু তার খাস ভৃত্য বাইরে ঘোরাঘুরি করছিল, বাবুর জেগে-ওঠার সাড়া পেয়ে ভিতরে এল। হাতে এক গ্লাস লেবুর জল।

—চা আনি বাবু?

—আন।

ব'লে মহিম চারিদিকে চাইতে লাগল ভয়ে ভয়ে, কখন মালতী এসে পড়ে।

মালতী এল আরও কিছু পরে।

গম্ভীর মুখ, ছলছল চোখ। মহিমের দিকে মালতী চাইলেই না। আলমারীটা খুলে কি যেন খুঁজতে লাগল।

অনুতপ্ত মুখে মহিম সামনে গিয়ে দাঁড়াল: এবারের মত ক্ষমা কর। আর কখনও এমন হবে না।

কিছুক্ষণ মান-অভিমানের পর আপোষ হয়ে গেল। কয়েকটা দিন মহিম ভদ্রভাবে বাড়ী ফিরতে লাগল।

তারপর আবার একদিন।

তারপর আরও একদিন। প্রত্যহ।

মহিমের মেজাজ রুক্ষ। মালতী বলতে যদি গেল ত তাকে যাচ্ছেতাই অপমান করলে। সে রকম অপমান কোন স্বামী কোন স্ত্রীকে করতে পারে ব'লে মালতীর জানা ছিল না।

পরিষ্কার জানিয়ে দিলে: গরীবের ঘর থেকে বাবা দয়া করে তোমাকে ঘরে এনেছিলেন। সেইটেই ভাগ্যি বলে মেনে নাও। আরামসে খাও-দাও-থাক। আমার পেছনে টিসটিস করতে এলে লাথি মেরে দূর করে দেব। প্যান-প্যানানি আমি পছন্দ করি না।

জলন্ত দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে মালতী বললে, তাই হবে।

দৃপ্তকণ্ঠে মহিম বললে, হ্যাঁ। সেটা খেয়াল রেখ।

—রাখব।

মালতী শাশুড়ীর কাছে গেল।

—কিছু বলবে বৌমা?

—মায়ের শরীর ভাল যাচ্ছে না। ভাবছি দিন কয়েকের জন্যে মাকে দেখে আসব।

—দিন কয়েকের জন্যে?

—তাই ভাবছি।

গিন্নীমা নিঃশব্দে মালতীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তাঁর বেশির ভাগ সময় ঠাকুর-দালানেই কাটে। জমিদারী, ব্যবসাপত্র সব চালান সেইখান থেকে। সেইখানে বসেই বাড়ীর প্রত্যেকটি খুঁটিনাটির খবর তাঁর নখদর্পণে।

তাঁর চর নেই। ঝি-চাকরে সব সময়ে এসে যে খবর দিয়ে যায় তাও নয়। পরিজনবর্গের মুখের দিকে চেয়েই কি করে যেন তাদের মনের কথা টের পেয়ে যান।

মালতীর মুখের দিকে চেয়েই তিনি বুঝতে পারলেন

ব্যাপারটা। মায়ের অসুখটা হয়ত মিথ্যা নয়। কিন্তু আসল কারণ মহিম। তিনি নিজের জীবনে স্বামীকে নিয়ে দুঃখ পান নি। কিন্তু শাশুড়ীর অসীম দুঃখ, এবং সেই সঙ্গে অসীম ধৈর্যও দেখেছেন। মনে মনে ভাবলেন, যাক, মেয়েটা কয়েকদিনের জন্যে মায়ের কাছ থেকে ঘুরেই আসুক। তাকে তিনি বাধা দিলেন না। কিন্তু নিঃশব্দে একটা দীর্ঘশ্বাস তাঁর অন্তস্তল থেকে বেরিয়ে এল।

বললেন, তাই যাও। আমি বলে দিচ্ছি, বিকেলে তোমাকে কেউ পৌঁছে দিয়ে আসবে। তারপর ফিরে এলে—

ফিরে এসে কি হবে সেটা তাঁর মনের মধ্যেই রইল।

বাপের বাড়ী এসে মালতী কিন্তু নিজের দুঃখের কথা কাউকে বললে না। এমন কি তার মাকেও না। যে ধাক্কা সে পেয়েছে সেটা সামলাবার জন্যে কোথাও তার যাওয়া দরকার ছিল। আর বউদের পক্ষে বাপের বাড়ী ছাড়া যাবার আর জায়গা কোথায়?

এই ক'বছরে বাপের বাড়ী সে যে একেবারেই আসে নি তা নয়। গাড়ি করে এসেছে। ঘণ্টা কয়েক থেকে তখনই চলে গেছে। কি হয়ত সকালে এসে বিকেলে চলে গেছে। রাত্রিবাস কখনও করে নি। শুধু বাপ-মাকে চোখের দেখা দেখতে আসা। এবং কিছুটা দেখা দিতেও আসা।

বাবা অথবা ভাইদের পক্ষে দেখতে যাওয়ার অসুবিধা অনেক। বড়লোকের বাড়ী। তার অনেক আদব-কায়দা। শ্লিপ পাঠিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করতে হয় বহুক্ষণ।

বাইরের চাকর শ্লিপ নিয়ে ভিতরের দাসী-চাকরকে দেবে। সে গিন্নীমাকে একবার দেখিয়ে বৌরাণীকে দেবে। একতলায় দেখা করবার ঘর। বৌরাণীর অনুমতি পেলে দর্শনার্থীকে সেই ঘরে নিয়ে আসবে। সেখানে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর বৌরাণী আসবে দেখা দিতে।

অন্তত বাপ-ভাইয়ের ক্ষেত্রে মালতী এটা পছন্দ করত না। সে বলে দিয়েছিল, কাউকে আসতে হবে না। মালতী মাঝে মাঝে নিজেই যাবে সকলের সঙ্গে দেখা করতে।

ব্যবস্থা ভালই হ'ল।

প্রকাণ্ড বড় গাড়ি করে এসে পাড়াকে চমক লাগিয়ে দেওয়া। প্রতিবারই প্রত্যেকের জন্যে উপহার আনা। কিছুক্ষণ সকলের সঙ্গে হাসি-গল্প করা। এমন কি বারান্দায় দাঁড়িয়ে রূপের এবং অলঙ্কারের ছটায় চমক লাগিয়ে দিয়ে কুশল-বিনিময় করা। তারপর আবার গাড়ি হাঁকিয়ে প্রস্থান করা। এর মধ্যে যে গৌরব, বাপ-মাও তার অংশ পেত।

এবারেও মস্ত বড় গাড়ি হাঁকিয়ে মালতী এল। এবারও উর্দীপরা শোফার সসম্ভ্রমে গাড়ির দরজা খুলে দিলে। কিন্তু এবারে আর গাড়ি অপেক্ষা করলে না। মালতীকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল।

মা জিজ্ঞাসা করলেন, গাড়ি চলে গেল যে?

মালতী বললে, হ্যাঁ।

—আবার কখন আসবে?

—আজ নয়, কাল নয়, পরশুও নয়। কয়েকদিন থাকব বলে এসেছি।

—তাই নাকি?

আনন্দে আত্মহারা মা মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। অন্য মেয়ে হ'লে কেঁদে ফেলত। কিন্তু মালতী কাঁদলে না। শাশুড়ীর সংস্পর্শেই হোক আর আঘাতের তীব্রতার জন্যেই হোক, সে যেন পাথর হয়ে গেছে।

কিন্তু মায়ের আলিঙ্গনের স্পর্শে কিছুটা আরাম বোধ করলে।

মা বললেন, কিন্তু থাকতে পারবি ত মালতী?

—কেন? পারব না কেন?

—সেখানে কত বড় বাড়ী। কত সুখ-ঐশ্বর্য।

এবারে মালতীর কেঁদে ফেলবার কথা। কিন্তু মালতী কাঁদবে না স্থির করেই এসেছে। যা হবার হয়ে গেছে। সবই অদৃষ্ট। নিজের দুঃখের কথা শুনিয়ে বাপ-মায়ের মনে দুঃখ দিয়ে কোন লাভ নেই।

শুধু বললে, সুখ কি আসবাবে-ভরা ঘরে মা, না শ্বেত-পাথরের মেঝেয়?

—তবে কোথায়?

মালতী হাসলে। অত্যন্ত করুণ, অত্যন্ত মিষ্টি একটা হাসি।

বললে, সুখ মায়ের কোলে।

—তাই বটে মা, তাই বটে।

মায়ের চোখ জলে ভরে এল, কণ্ঠ অবরুদ্ধ।

করুণ হাস্যে মালতী বললে, রাজার ঐশ্বর্যও মেয়ের চোখ থেকে মাকে আড়াল করতে পারে না মা। তোমার বাপ-মা বেঁচে নেই বলে ভুলে গেছ। সমস্ত দিন আমার তোমাদের কথাই মনে হয় মা। রাত্রে শুয়ে শুয়ে পুরাণো দিনের কথা ভাবি। কবে, কখন কেমন করে আমাকে তুমি আদর করেছিলে, কবে কি বলে বকেছিলে। সব সমান মনে হয় মা। তোমার আদর, তোমার তিরস্কার সব।

একটু থেমে আবার বললে, যে ক'টা দিন এখানে আছি মা, আমাকে তুমি ঐশ্বর্যের কথা ব'লো না মা। ঐশ্বর্যের কোন মূল্য নেই মা, যদি তা সুখ দিতে না পারে।

ব'লেই বললে, চীৎকার শুনছি না মা, পল্টুর মোটা গলার গান। বাড়ীতে কেউ নেই নাকি?

ব'লেই তর তর ক'রে উপরে চলে গেল। গর্বভরে মা তার দিকে চেয়ে রইলেন।

দিন দুই পরে মালতী অসুখে পড়ল।

সর্দি এবং কাশি। তার সঙ্গে বুকে ব্যথা। আর নিশ্বাস নিতে খুব কষ্ট। জ্বর সামান্যই। হয়ত অসুখও সামান্য। এ বাড়ীর ছেলেমেয়ের পক্ষে এ রকম অসুখে ডাক্তার ডাকার রেওয়াজ নেই। কিন্তু মালতী এখন বড় লোকের বাড়ীর বউ। বিনা চিকিৎসায় ফেলে রাখা যায় না।

মালতীর বাবা ও মা দুজনেই চিন্তিত হলেন।

মা বললেন, ডাক্তারকে খবর দিই মালতী। কি বলিস্?

—দাও।

—আমাদের মনোহর এখন ভালই চিকিৎসা করছে। তাকে খবর দেব?

—দাও।

—তোর শ্বশুরবাড়ীতেও একটা খবর দেওয়া দরকার। না কি বলিস্?

—কিছু দরকার নেই মা। সামান্য ব্যাপারে তাদের বিরক্ত ক'রে লাভ কি?

মনোহরকে খবর দেওয়া হ'ল।

মনোহর এসে রোগিণীর বুক, পিঠ ভাল ক'রে পরীক্ষা করলে। চিন্তিত মুখে মালতীর মা পাশে দাঁড়িয়ে। কিছুটা যন্ত্রণায়, কিছুটা অবসাদে মালতী চোখ বুঁজে করে নিঃশব্দে শুয়ে ছিল।

মালতীর মা জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন দেখলে?

মনোহর সংক্ষেপে জবাব দিলে, খারাপ কিছু নয়।

বাইরে এসে বললে, বুকটা খুব দুর্বল দেখলাম। অসুখটা হাঁপানীতে দাঁড়ান অসম্ভব নয়। সাবধানে রাখবেন।

মা ভয় পেয়ে গেলেন: হ্যাঁ বাবা, কোন বড় ডাক্তার ডাকতে হবে কি? ওর শ্বশুরবাড়ীতে খবর দেব?

মনোহর হাসলে: তা ত আমি বলতে পারব না। তবে বড় ডাক্তার ডাকবার মত কঠিন অসুখ কিছু নয়।

—তাই বল বাবা। বড়লোকের বাড়ীর বউ। ওদের কাণ্ড-কারখানাই আলাদা। ওর মাথা ধরলে ভয়ে মরি।

—সেই ত মুশকিল।

—আমি শ্বশুরবাড়ীতে খবর দিতে চেয়েছিলাম। তা ও ত জানে, সেখানে খবর পৌঁছুলে তারা তখনই গাড়ি পাঠিয়ে নিয়ে যাবে। তার পরে সমারোহে চিকিৎসা হবে। সেই ভয়ে ও খবর দিতে নিষেধ করলে।

মনোহর হাসলে: আছে ত ক'দিন?

—তাই বা কি ক'রে বলব? বললে ত ক'দিন থাকব। তার পরে বড়লোকের মর্জি। হুট্ ক'রে গাড়ি পাঠিয়ে নিয়ে যেতেও পারে।

—তা ত বটেই।

চিকিৎসা চলতে লাগল।

মনোহর প্রত্যহ দুবেলা আসে। রোগী দেখে। ঔষধ দেয়। দিন দুয়েকের মধ্যে মালতীর শ্বাসকষ্টটা গেল। সর্দিও। কিন্তু দুর্বলতা যায় না।

মনোহর রোজই জিজ্ঞাসা করে, কেমন আছ?

—ভাল।

—শ্বাসকষ্টটা?

—অনেক কম।

—সর্দি?

—নেই বোধ হয়।

—কিন্তু দেখে মনে হয়, তুমি খুব দুর্বল।

মালতী সাড়া দিলে না।

মনোহর বললে, তোমার মা ভয়েই অস্থির।

—রোগের জন্যে?

মনোহর হেসে বললে, যত না রোগের জন্যে, তার চেয়ে বেশি বড়লোক বেয়ানের জন্যে।

মালতী নিঃশব্দে হাসলে।

বললে, বড়লোকদের সবাই ভয় করে, না?

—করবে না? বড়লোক ব'লে কথা!

—হুঁ। প্রথম প্রথম আমারও খুব ভয় করত।

—এখন?

মালতী জবাব দিলে না। শুধু হাসলে।

মনোহর হেসে বললে, এখন আর করবে কেন? এখন তুমি নিজেও ত বড়লোক।

—সেজন্যে নয়।

—তবে?

বলতে গিয়ে মালতী থেমে গেল। বললে, সে আর একদিন বলব। তুমি ত রোজই আসছ?

মনোহর হেসে বললে, এখন ত তুমি প্রায় সেরে উঠেছ। আর কি রোজ আসবার দরকার হবে?

—বেশ ত। মাঝে মাঝেই এস।

—তার মানে তুমি এখন আছ ক'দিন।

মালতী হেসে বললে, কিন্তু ক'দিন তা বলতে পারব না। তলব এলেই ফিরতে হবে আবার সেই গোয়ালে।

—গোয়াল বলছ কেন?

—কারণ ওটা গোয়ালই। বাইরে থেকে যাকে রাজবাড়ী ব'লে মনে হয়, আসলে সেটা গোয়াল।

বিস্মিত দৃষ্টিতে মনোহর ওর দিকে চেয়ে রইল। 'গোয়াল' কথাটা তার ভাল লাগল না। কিন্তু কিছু বললে না। নিঃশব্দে চ'লে গেল।

ক্রমশঃ

হাওয়ার ফুঁয়ে

শ্রীসুনীলকুমার নন্দী

নিভলে-নিভুক আলোর শিখা
ঝাঁপিয়ে যদি পড়ে পড়ুক··· ··
হাওয়ার ফুঁয়ে, অন্ধকার
পথের রেখা সনাক্ত

যায় না করা মলিন চোখে,
মুখ তোলে না, গা ঢেলে দেয়
নতুন পথের উৎসাহ
নির্বিকল্প আলস্য।

পথের স্রোতে ভাসলে ভেলা
সে-ও যে কখন টাল খেয়ে ওই
ঝঞ্ঝা অনেক...সাবধানী
দূরের পাড়ির পাল তোলে—

চোখের কোলে জ্বলছে তখন
বুকের তলে রোল তুলেছে :
ঝল্ মল্ ঝল্ স্বর্ণদ্বীপ,
কার আগে কে পা রাখে।

ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ ডাক দিয়ে ফের
ব্যাকুল হয়ে ঢেউয়ের চূড়ায়
দৃশ্যে মিলায় সুন্দরী—
ভাঙছে ভেলা অসংখ্য।

নিভুক, নিভুক আলোর শিখা
অন্ধকারে ভগ্নজানু,
হাওয়ার ফুঁয়ে, আকাঙ্ক্ষা
ঈষৎ উষ্ণ আলস্যে

পা ছড়ালে চারদেয়াল···আর
আসে না, রই যে যার মত
পথের অলীক মন্ত্রণা
তৃপ্ত ; যে যার আঙিনায়

ইচ্ছে হলে সব্জি করো
ফুটলে ফোটে এরই মধ্যে
নয়তো করো ফুলের চাষ—
স্বর্ণদ্বীপের আবিষ্কার···

অথচ নেই ঝঞ্ঝাবিবাদ
নেই প্রতিকূল রক্তপাত।

তোমাকে ?

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

ঊষার আকাশের মত শ্লথ নীবিবন্ধ
সুরের রেশের মত ক্ষীণকটি
কমলা-কোয়া ঠোঁট
—কী করে তাদের উপর কালো তুলি বোলাই ?

দুঃখের স্মৃতি লোকে ভোলে
আনন্দের স্মৃতিও।
কিন্তু যে না-দুঃখ না-আনন্দ
তাকে ?
তোমাকে ?

আগুন-রঙা

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

এক-একটা দিন পশ্চিমের ঐ আকাশটা
এমন ভীষণ লাল হয় !
ঠিক মনে হয়, অস্তে যাবার ক্ষণটিতে
গ'লে গেছে সূর্য্যটা,
তারই আগুন ছড়িয়ে গেছে আকাশে ।

সেদিনগুলোয় চোখে কেমন ঘোর লাগে ।
যা দেখি তা হয়ত কেবল ঐ আলোতেই দেখা যায় ।
দেখি, যেন আবছা-মতন একটা কালো ডিনোসর
দূরের বনরেখায় ঢেকে শরীরটা
আস্তে গলা বাড়ায় সে লাল আকাশে ।

লম্বা, কি যে লম্বা গলা জন্তুটার,
মস্ত, সে কি মস্ত যে তার মাথাটা,
জ্বলজ্বলে, কি জ্বলজ্বলে তার দু'টি চোখ
জ্বলতে দেখি সূর্য্যগলা আকাশে ।

আগুনরঙা লাল আলো
আস্তে মিলায় । অন্ধকারে যায় মিলিয়ে ডিনোসর ।

এই যে ছায়া ডিনোসর
সে কি কেবল আগুনরঙা লাল আলোতেই চোখ মেলে !
কোটি কোটি বছর আগের আকাশটা
অগ্নিগিরির উৎসারে
এমনি ভীষণ আগুনরঙা লাল ছিল তাই ব'লে কি ?

এই আলোতে চোখ মেলে
কি দেখে সে, কি ভাবে সে, সেই জানে ।

হয়ত বা সে দেখে কিছু,
হয়ত মনে রাখে কিছু,
হয়ত বা সে আশা রাখে, আকাশটা
এবার যেদিন আগুনরঙা আলোয় লালে লাল হবে
সে আলো আর নিববে না,
আসবে ফিরে কোটি কোটি বছর আগের দিনগুলি ।

অনেক যন্ত্র, অনেক মন্ত্র, কি বোঝে তার ডিনোসর ?
সে কি কেবল আকাশটারই রঙ দেখে ?

গভীর রাতে ঘুম ভেঙে যায় শুনে বিকট কোলাহল ।
জানলা খুলে দেখি, দূরের বস্তিতে
আগুন দিয়ে পালায় কারা । টকটকে লাল আকাশটায়
উঠছে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ।
ঠিক মনে হয়, গলা বাড়ায় একটা কালো ডিনোসর
কোটি কোটি বছর আগের আগুনরঙা আকাশে ।

দ্বিরাগমন

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

'Things fall apart ; the centre cannot hold ;
Mere anarchy is loosed upon the world.
The blood-dimmed tide is loosed,
and everywhere
The ceremony of innocence is drowned.'
—The Second Coming : W. B. Yeats

যেন এই প্রথম বুঝতে পেলো কি হয়েছে : যেন
এতক্ষণে টের পেলো দাঁড়িয়েছে কোন্ রজ্জুপথে।
কোথায় ফেলবে পা ? কোন্‌খানে ? নিচে গর্জমান
কালো প্রজলন্ত নদী : বুঝি তাকে গিলে খাবে ব'লে
শ্যাওলায়-পাথরে-শঙ্খে সারাক্ষণ তোলপাড় চলে
অস্থির বিষম গর্ভে : কোন্‌খানে ? পা ফ্যালে কোথায় ?
কিছুতেই ডরাবে না—যতই গর্জাক জল ঘূর্ণিতে, ফেনায়
চোরাটানে !

এই তো পেরিয়ে এলো দিব্য আন্দোলিত রজ্জুপথ !
কিছুই হয় না তবে ? দড়ি, জল, শ্যাওলা ও পাথর—
তারা বৃথা প'ড়ে ছিলো ? তারা মিথ্যে ভয়ের উৎস কি ?
তাহ'লে গহ্বর থেকে—স্রোত থেকে—কার এতগুলি
ব্যগ্র হাত
ছিনিয়ে নেবার জন্য উঠেছিলো ? ভগবান্ !
হায় ভগবান্ !

মিথ্যে এত ভয় পেলো ! কিছুই হ'লো না, কোনো কিছু !
সে কি কারখানার ধোঁয়া ? কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠে
গির্জের আড়ালে
আতঙ্কে কোঁপাবে ? ঢুকবে ঘণ্টাঘরে ? গম্বুজের
পিছনে ? ক্রুশকাঠে ?

বুকে হেঁটে চ'লে যাবে কে দেবে আশ্রয় তার খোঁজে ?
কোনো দিনও কেউ দয়া করে না, যখন এই বোধ
মরীয়া টান দেবে, বুঝি লক্ষ হাতে আকাশ হাৎড়াবে ?
সে বুঝি অবোধ ? না কি রাশি রাশি কুণ্ডলিত ধোঁয়া ?
সে বুঝি জানে না কবে কোন্ লগ্নে পুনরাগমন ?

ঝাউবনের মধ্যে শুধু ঝ'রে গেলো চীৎকৃত বাতাস !

এবার পাহাড় বেয়ে উঠে যাবে শিখরে, যেখানে
কোনো ভয় নেই, শুধু দলে-দলে শুভ্র মেষপাল
স্বেচ্ছায় বেড়ায়, যেন শাদা হাওয়া পাল তুলে দিলো।

যেই সে উঠতে যাবে, পাহাড় হাঁ করে ধীরে-ধীরে :
আগুন ছিটোয়, রং জ্ব'লে ওঠে শিখার উল্লাসে
যেন কোন্ ঘুলঘুলির ঢাকা খুলে আরক্ত উনুন বের হ'লো।
জ্ব'লে ওঠে নীল কাচ, তামা, লোহা, হলুদ গন্ধক :
শিখা, শুধু শিখা—কেউ তেজস্ক্রিয়, ঝলসায়, চমকায়,
চিবোয় পাথর, মাটি, নিশাদল, মৌলিক লবণ !

চুম্বক টেনেছে ব'লে কম্পাসের উজ্জ্বল শলাকা
এখানে উদ্ধারহীন গিরিবর্ত্মে টান দিয়ে এনে
আগুন, রক্তের নদী, বারবেলা উপহার দিলো !
কোথায় পালাবে ! হায়, উপদ্রুত উপত্যকা তবে
মিথ্যে ভেবেছিলো এটা প্রচণ্ডের পুনরাবির্ভাব !
তাহ'লে সপ্তম দূত কেন তার তূরীর নিনাদে
আকাশ ফাটালো, কেন ছিঁড়ে গেলো গ্রন্থের শেলাই—
কেন শুধু শীর্ষদেশে মেষপাল খেলা করে ? হায়,
এখন শেলাই খুলে খোলা পাতা মিথ্যে উড়ে যাবে
ঝাউবনে, রেঙ্গুনে, কিংবা কোনারকে চীৎকৃত বাতাসে ?

বিষাক্ত মধুর

হেনা হালদার

প্রেম আর প্রতারণা নিরন্তর সহ-অবস্থানে
বিষাক্ত মধুর স্বাদ ! দুই চক্ষে জল কিংবা জ্বালা !
মিথ্যার বিভ্রমে মুগ্ধ, অনাবৃত সত্যের সন্ধানে
উন্মুখ ? হে লখিন্দর, শেষ দৃশ্যে কার জন্যে মালা ?

নির্মল নর্মদা নয়, নর্দমার পঙ্কে নেমে গিয়ে
গ্লানির শেষাঙ্কে পৌঁছে : আকাঙ্ক্ষিত তরী কিংবা তীর
নির্বাচনে দ্বিধাগ্রস্ত। নরকের দ্বারে থেমে গিয়ে,
ত্রিশঙ্কু-হৃদয় স্বর্গে খুঁজবে না শান্তির শিবির ?

তাহলে কি ছদ্মবেশী আকাশের কৃষ্ণ পরচুলা
নেমে আসবে রাত্রি হয়ে ? লখিন্দর ! সূর্য ঢেকে দিতে ?
ভাসাবে দুঃখের ভেলা ? উর্বশী তো হবে না বেহুলা ?
সোনার যৌবন সে কি তুলে দেবে মৃত্যুর বেদীতে ?

প্রেম আর প্রতারণা দুইমুখো শঙ্খচূড়-সাপ,
রক্তের সুরায় ঢালবে বিষ, ঢালবে অমৃতের কণা।
সমস্ত পাপড়িকে মেলে কীটদষ্ট প্রাণের গোলাপ :
ফোটাবে কাঁটার বৃন্তে পুর্নবব স্বপ্নের যন্ত্রণা।

প্রতিভাধর এ্যারিস্টটল্

শ্রীকমলা দাশগুপ্ত

সেক্সপিয়ার লিখে গেছেন, "এ্যারিস্টটল্ দেখতে সুন্দর ছিলেন না কিন্তু তাঁর রূপের অভাবের ক্ষতিপূরণ করে দিয়েছিল তাঁর অতুলনীয় প্রতিভা। প্লেটো তাঁকে সত্যানুসন্ধানী দার্শনিক' নামে অভিহিত ক'রে গেছেন। সিসেরো সসম্ভ্রমে তাঁকে বাগ্মী, বিশ্বজ্ঞানী, তৎপর তত্ত্বানুসন্ধানী এবং উদ্ভাবনীশক্তিসম্পন্ন মননশীল ব্যক্তি ব'লে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানিয়েছেন।" এইসব শ্রদ্ধাঞ্জলি থেকে এ্যারিস্টটল্-এর বিরাট্ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি 'ইউনিভার্সাল নলেজে'র (Universal Knowleedge) অধ্যাপক ছিলেন। শত শত বছর ধরে ইউরোপ তাঁকে শিক্ষাগুরু ব'লে গ্রহণ করেছে। পাশ্চাত্যের জীবন ও চিন্তাধারার উপর তাঁর মতো এমন গভীর এবং স্থায়ী প্রভাব আর কোন দার্শনিকেরই ছিল না।

"এ্যারিস্টটল্, ফিলিপের অভিবাদন গ্রহণ করুন। আমার একটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়েছে। আমি আনন্দের সঙ্গে দেবতাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি—শিশুটির জন্মগ্রহণের জন্য ততখানি নয়, যতখানি সে আপনার কালে পৃথিবীতে এসেছে ব'লে। কারণ, আমি আশা করি, আপনার শিক্ষকতার অধীনে থেকে শিক্ষিত হয়ে সে আমাদের যোগ্য পুত্র এবং সিংহাসনের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী বলে নিজেকে প্রমাণ করতে পারবে।"

এইভাবেই ম্যাসিডনের সম্রাট্ ফিলিপ তাঁর পুত্রের জন্মগ্রহণের সংবাদটি এ্যারিস্টটল্‌কে জানিয়েছিলেন। এই পুত্রই ভবিষ্যতে 'আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট' নামে বিশ্ববিজয়ী সম্রাট্ হয়েছিলেন এবং এই কথা বলে আপশোস করেছিলেন যে, পৃথিবীতে জয় করবার মত আর কোন দেশ নেই। মানুষের চিন্তাধারার উপর যে দার্শনিকপ্রবর সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তাঁর যোগ্য সম্বর্ধনাই ছিল সম্রাট্ ফিলিপের ঐ চিঠিখানিতে। এ্যারিস্টটল্-এর বয়স তখন ত্রিশ বছরও হয় নাই।

গ্রীক মনস্বী এ্যারিস্টটল্ চিন্তারাজ্যের প্রায় সমস্ত প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রেই বিচরণ করেছিলেন। তাঁর লিখিত 'পলিটিক্স্' আধুনিক রাজনৈতিক দর্শনের ভিত্তি গেঁথেছিল। তাঁর 'পোয়েটিক্স্' বিয়োগান্ত নাটকের মধ্যে ঐক্যবোধের তত্ত্ব প্রথম ঘোষণা করে। তাঁর 'অন দি সোল' নামক প্রবন্ধ আধুনিক মনস্তত্ত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে। তিনি হচ্ছেন জীব-বিজ্ঞানের পথিকৃৎ। এসোসিয়েশন অব আইডিয়াজ (Association of Ideas) তত্ত্বকে তিনিই প্রথম সূত্রাকারে গ্রথিত করেন। বর্তমানের অনেক অবিসংবাদিত থিওরীরও তিনিই জনক।

যীশুখ্রীষ্টের জন্মের ৩৮৪ বছর পূর্বে এজিয়ান সাগরের তীরে স্টাগিরা নামক স্থানে এ্যারিস্টটল্ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতা নিকোমেকাস ছিলেন একজন বিজ্ঞ ডাক্তার। ম্যাসিডনের সম্রাট্ ফিলিপের পিতা ছিলেন সম্রাট্ দ্বিতীয় আমিণ্টাস। তাঁরই সভার রাজবৈদ্য ছিলেন নিকোমেকাস। ম্যাসিডনের রাজসভার সঙ্গে পিতার এই সম্বন্ধ পুত্র এ্যারিস্টটল্-এর জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। এ্যারিস্টটল্ প্লেটোর বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করতে সুরু করেন। প্লেটো এই ছাত্রকে তাঁর বিদ্যালয়ের সর্বাপেক্ষা মননশীল বিদ্যার্থী ব'লে আখ্যা দেন।

প্লেটোর মৃত্যুর পর তাঁর ভাগিনেয় স্পিউসিপাস্ তাঁর স্থান দখল করেন। তখন এ্যারিস্টটল্ তাঁর গুরুর স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি শোকগাথা লিখে আটারনিউস্ নামক স্থানে গিয়ে বাস করতে থাকেন। সেখানে অবস্থান করতেন তাঁর গুরুভ্রাতা হার্মিয়াস।

হারমিয়াসের ভাগিনেয়ীকে (মতান্তরে ভগ্নীকে) এ্যারিস্টটল্ বিবাহ করেন। তাঁদের একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। এ্যারিস্টটল্ পুত্রকে নিজের পিতার নাম অনুসারে ডাকতেন। দুই গুরুভ্রাতার মধ্যে গভীর হৃদ্যতা ছিল। যখন পার্শিয়ানগণ হারমিয়াস্‌কে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় এবং ক্রুশবিদ্ধ করে, এ্যারিস্টটল্ তাঁর প্রিয় বন্ধুর স্মৃতির উদ্দেশ্যে অতি সুন্দর একটি গীতিকবিতা লেখেন।

যখন তিনি মিটিলিন্ নামক স্থানে সামুদ্রিক প্রাণিবিদ্যা এবং অন্যান্য বিষয়ে অধ্যয়ন করছিলেন তখন বালক আলেকজাণ্ডারকে শিক্ষা দেবার জন্য তাঁর কাছে সম্রাট্ ফিলিপের আহ্বান এল। সম্রাট্ পুত্রের জন্ম-

লগ্নেই এ্যারিস্টটল্‌কে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছিলেন। এক দার্শনিকের সঙ্গে এক বিশ্ববিজয়ীর এই যোগাযোগ সম্বন্ধে জনৈক লেখক লিখে গেছেন, "একজনের ছিল বিশ্বের উপর প্রভুত্ব ও শাসন করবার ক্ষমতা ও দুরাকাঙ্ক্ষা, অপরজন মানুষের মনোজগতের একটা অনুদ্ঘাটিত দিক্‌কে আবিষ্কার করেছেন এবং সেই নতুন জগৎকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্তে আনতে পেরেছেন।"

আমরা যদি এ্যারিস্টটল্‌কে ম্যাসিডন সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারীর এক গৃহশিক্ষক হিসাবে দেখি তা হ'লে মস্তবড় ভুল করব। গ্রীকদের চিন্তাধারার রীতিই অন্যরূপ ছিল। ইমাথিয়া প্রদেশে মিজা নামক স্থানে এ্যারিস্টটল্‌কে নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী বিদ্যালয় স্থাপন করতে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। দেবী ও অপ্সরাদের মূর্তিবেষ্টিত কুঞ্জে, আলেকজাণ্ডার এবং অন্যান্য অভিজাত-বংশীয় বালকগণ এ্যারিস্টটল্‌-এর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করত। বালকগণ কখনও গুরুর বিশাল প্রস্তরনির্মিত আসনের চতুর্দিক্‌ বেষ্টন করে দাঁড়াত, কখনও বিদ্যামন্দিরের চতুর্দিকে ছায়া-সুনিবিড় পথে তাঁর সঙ্গে পাদচারণা করত।

প্রত্যেকেরই ছিল গুরুর প্রতি অসীম শ্রদ্ধা, প্রায় দেবতার কাছে পূজারীর মতই। কিন্তু আলেকজাণ্ডারের শ্রদ্ধা গুরুর জ্ঞানসমুদ্রের নিকট কোনরূপ দাস্য মনোভাব দেখাত না। একদিন প্রাতঃকালে এ্যারিস্টটল্‌ একটি সম্ভ্রান্তবংশীয় ছাত্রকে জিজ্ঞেস করলেন, "সাধারণ-রীতিতে উত্তরাধিকারসূত্রে তুমি যখন রাজা হবে, তখন তুমি কি করবে?" বালক বিনীতভাবে জবাব দিল, প্রত্যেক সংকটকালে সে তার প্রাক্তন শিক্ষাগুরুর উপদেশ চাইবে এবং সেই অনুসারে কাজ করবে। আরেকজন রাজকুমারও ঐ প্রশ্নের একই উত্তর দিল। বালক আলেকজাণ্ডারকেও এই প্রশ্নই করা হয়। সে উত্তর দিল, "আগামীকাল কি হবে সেকথা আমি বলতে পারি না, কেউই বলতে পারে না। যখন সময় আসবে তখন আবার আমাকে এই প্রশ্নই জিজ্ঞেস করবেন, আমি অবস্থা অনুসারে তখন আপনাকে জবাব দেব।"

সম্রাট্‌ ফিলিপ তাঁর পুত্রের শিক্ষকের জন্য কি করতে পারেন সে বিষয়ে চিন্তা করতেন। ঐ অত্যাচারী শাসক পূর্বে একসময় এ্যারিস্টটল্‌-এর জন্মস্থান ষ্টাগারিয়াকে মরুভূমিতে পরিণত করেছিলেন। কিন্তু পরে দার্শনিক এ্যারিস্টটল্‌-এর প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ ঐ নগরটিকে তিনি পুনর্নির্মাণ করান এবং যে সমস্ত নাগরিককে পূর্বে নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন তাঁদের ফিরিয়ে আনেন। তাঁরা সকলেই নির্বাসনে অতি দুর্দশায় দিন যাপন কর ছিলেন। কেউ কেউ ক্রীতদাসের মত জীবন কাটাচ্ছিলেন। ফিলিপের এই কাজটি ছিল এক মহান্‌ রাজার মহানুভবতার পরিচায়ক। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে প্রাচীন গ্রীস দেশের এক-একটি নগর আজকালকার এক-একটি ছোট শহরের চেয়ে বিশেষ বড় ছিল না।

এ্যারিস্টটল্‌ বালক আলেকজাণ্ডারের হৃদয়ে মহাকবি হোমারের প্রতি একটা অদম্য আকর্ষণ জাগিয়ে দিয়েছিলেন। হোমারের কাব্যের প্রতি এই ভালবাসা আলেকাজণ্ডারের জীবনে চিরদিন অম্লান ছিল। অন্যান্য বিষয়েও এ্যারিস্টটল্‌-এর শিক্ষা এমন উন্নত ধরণের ছিল যে ফিলিপ সশ্রদ্ধ প্রশস্তির সঙ্গে আলেকজাণ্ডারকে বলেছিলেন, "এ্যারিস্টটল্‌কে সম্মান দান করা আমাদের বৃথা হয় নি, তাঁর জন্মস্থানকে পুনর্নির্মাণ করাও ব্যর্থ নয়। যিনি তোমাকে রাজার যোগ্য কর্তব্য ও কর্মপন্থা সম্বন্ধে এমন সুন্দরভাবে শিক্ষা দিয়েছেন তাঁর মত লোকের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার পাওয়াই উচিত।"

ছাত্রজীবন শেষ হবার বহুকাল পরেও গুরুর প্রতি আলেকজাণ্ডারের গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল। তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে গেছেন, "আমার জীবনের জন্য আমি পিতার নিকট ঋণী; এ্যারিস্টটল্‌-এর কাছে ঋণী আমি এজন্য যে, তিনি আমাকে মানুষের মত বেঁচে থাকার শিক্ষা দিয়েছেন।" এ্যারিস্টটল্‌ যখন জীব-বিদ্যা বিষয়ে গবেষণা করছিলেন, আলেকজাণ্ডার তখন এ্যারিস্টটল্‌-এর অধীনে থেকে তাঁকে সাহায্য করবার জন্য এক হাজার সেবক দিয়েছিলেন। এই সেবকবৃন্দ এ্যারিস্টটল্‌কে পশু, পাখী ও মৎস্য প্রভৃতির অভ্যাস, রীতি-নীতি ও বিশেষত্ব পর্যবেক্ষণ করে এবং তাঁকে সে সম্বন্ধে অবহিত রেখে সাহায্য করতেন। আলেকজাণ্ডার একাজে অর্থসাহায্য করতেও মুক্তহস্ত ছিলেন। তিনি এ্যারিস্টটল্‌-এর ব্যবহারের জন্য, তাঁর আয়ত্তে রেখেছিলেন বহু মূল্যবান্‌ গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি। নয়ত এগুলি যোগাড় করা এ্যারিস্টটল্‌-এর পক্ষে সম্ভবই হ'ত না।

আলেকজাণ্ডার যখন দিগ্বিজয়ের উদ্দেশ্যে এশিয়ায় যাত্রা করেন এ্যারিস্টটল্‌ তখন এথেন্সে ফিরে যান। এথেন্স তখন কেবল গ্রীস দেশের নয়, সমগ্র পৃথিবীর সংস্কৃতি-কেন্দ্র ছিল। এখানে এসে তিনি একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বয়স তখন তাঁর পঞ্চাশ। 'এ্যাপোলো লাইসিয়াম' দেবতার মন্দিরের নিকটে স্থাপিত হওয়াতে বিদ্যালয়টির নাম 'লাইসিয়াম' দেওয়া হয়। সে যুগের

সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিকের পদতলে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাবার জন্য দলে দলে ছাত্র সেখানে ভীড় করে আসতে লাগল। 'লাইসিয়াম' শব্দটি আজও প্রচলিত আছে, যদিও মূর্তিপূজার মন্দিরের সঙ্গে এই শব্দটির সম্পর্ক আছে একথা কারও মনে ওঠে না। সে সময়ে যাঁরা 'লাইসিয়ামে' যেতেন তাঁদের বলা হ'ত পাদচারী দার্শনিক, সম্ভবতঃ এই কারণে যে, তাঁরা পাদচারণা করতে করতে আলোচনা করতেন।

এ্যারিস্টটল্-এর শিক্ষার পরিধি বহুদূর বিস্তৃত ছিল। তাঁর দর্শন বাস্তব তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, কারণ, শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকের বৈশিষ্ট্য যেমন নির্ভুল বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধান, তাঁরও মনের বিশেষত্ব ছিল ঠিক তেমনি। প্রকৃতপক্ষে প্রথমে তিনি পিতার ডাক্তারী পেশাই অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন এবং ডাক্তারীশাস্ত্রের শব ব্যবচ্ছেদ ও অন্যান্য বিভাগের কিছু কিছু অভিজ্ঞতাও তিনি সঞ্চয় করেছিলেন। কিন্তু পরে তিনি এই মত পরিত্যাগ করেন। শেষ পর্যন্ত জীববিদ্যা অনুশীলনই তাঁর অধ্যয়নের প্রিয় বিষয় হয়।

বেবিলোন নামক স্থানে আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর এ্যারিস্টটল্ অনেকের নিকট সন্দেহের পাত্র হয়ে দাঁড়ালেন। ম্যাসিডনের অধিবাসীদের প্রতি তিনি পক্ষপাতদুষ্ট, এই দোষারোপ তাঁর উপর করা হ'তে লাগল। তিনি অধর্মাচরণ করছেন এই দোষ দিয়ে আদালতে তাঁকে দণ্ড দেবার ষড়যন্ত্র চলতে লাগল। গ্রীকদের চিত্তের চপলতা সম্বন্ধে এ্যারিস্টটল্ খুব ভাল ভাবেই জানতেন। সক্রেটিসের ভাগ্যে কি ঘটেছিল সে কথা তিনি ভোলেন নাই। সক্রেটিসের মত হেম্‌লক্ বিষ পান করবার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। সেজন্য তিনি এথেন্স ত্যাগ ক'রে ইউবোয়া দ্বীপে চালসিজ নামক স্থানে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই স্বেচ্ছা-নির্বাসনের অল্প কিছুদিন পরেই খ্রীষ্টপূর্ব ৩২২ অব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

তাঁর সমসাময়িক লেখকরা বলেছেন, তাঁর ঠোঁট ছিল দৃঢ়তাব্যঞ্জক, তাঁর চোখের দৃষ্টি ছিল একাগ্র। তাঁরা অবশ্য একথাও বলেছেন, তাঁর উচ্চারণ অস্ফুট ছিল এবং পোশাক সম্বন্ধে তিনি খুব সচেতন ছিলেন, যা সাধারণতঃ দার্শনিকদের মধ্যে বড় একটা দেখা যায় না।

বহু শতাব্দী পরে ইংরেজ কবি জন ড্রাইডেন তাঁর সম্বন্ধে অসীম শ্রদ্ধাভরে বলেছিলেন, "তিনি তাঁর হাতের আলোকবর্ত্তিকাকে বিশ্বজনীন আলোতে পরিণত করেছিলেন।"

এ্যারিস্টটল্ সত্যই নতুন আলোর দিশারী, নীতিশাস্ত্র, অধ্যাত্মবিদ্যা, ছন্দশাস্ত্র, রাজনীতি এবং অলংকারশাস্ত্র—এই সমস্ত বিষয়গুলি তিনি কেবল শিক্ষাই দিতেন না, তিনি সেগুলি নতুন আলোতে প্রকাশ করতেন, উদ্ভাবিত করতেন। টমাস একুইনাস, ডান্টে, স্পেন্সার, গেটে প্রভৃতি বিভিন্ন মননশীল ব্যক্তির উপর তাঁর দর্শন গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

যুগ যুগ ধ'রে যখন পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা গ'ড়ে উঠছিল সেই সুদীর্ঘ কালের সভ্যতা গঠনের উপর এ্যারিস্টটল্-এর যে অসীম প্রভাব ছিল তা সামান্য বিবেচনা করলেই আমরা বুঝতে পারি, কেন এ্যারিস্টটল্-এর নাম অমর হয়ে আছে। প্রথমতঃ আমরা দেখি, তাঁরই দার্শনিক চিন্তাধারা ছিল মধ্যযুগের মহান্ দার্শনিক মতবাদের ভিত্তি। তাঁর ঐ চিন্তাধারাই বর্তমান যুগের সহস্র তর্কজাল-বেষ্টিত দর্শনের মধ্যেও নিজের স্থান বজায় রেখে চলেছে। খ্রীস্টান চার্চের মনীষিগণ এই মহা অখ্রীস্টান দার্শনিকের চিন্তাধারাকে তাঁদের ধর্মশাস্ত্রে সম্পূর্ণভাবে মিশিয়ে নিয়ে গ্রহণ করেছিলেন।

এ্যারিস্টটল্-এর নোটবইগুলি অর্থাৎ যাকে বলে ভাষ্য বা টিকা-টিপ্পনী ছিল তাঁর গ্রন্থাবলী। সেগুলি একত্র ক'রে দাঁড়িয়েছে যেন দর্শনের একটি বিশ্বকোষ। তাঁর 'অর্গানন' পুস্তকে তিনি লজিকের (তর্কশাস্ত্রের) নিয়মাবলী লিখে গেছেন। এর মধ্যে তাঁর যুক্তিপরম্পরার এবং চিন্তাপ্রণালীর যে পথ দেখিয়ে গেছেন তা-ই পৃথিবীর লোকে আজ পর্যন্ত কিছু অদল বদল ক'রে অনুসরণ ক'রে চলেছে। তাঁর 'রেটারিক' পুস্তক প্রবর্তনা-শক্তির শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। তাঁর বহুমুখী মননশীলতা, তাঁর শতধারায় প্রবাহিত জ্ঞান, সুতীক্ষ্ণ বিচারশক্তি উদ্ঘাটিত হয়েছে তাঁর 'ফিজিক্স', 'মেটাফিজিক্স' এবং 'টপিকস' নামক গ্রন্থে। 'অন দি সোল' পুস্তকে তিনি জীবজগৎ এবং মনস্তত্ত্ব জগতের দ্বার উন্মুক্ত করেছেন। তাঁর 'পোয়েটিক্স' নামক ছোট বইখানি সাহিত্য এবং নাটক বিষয়ে সমালোচনার যত বই আছে সমস্ত পুস্তকের অপেক্ষা বেশী প্রভাব বিস্তার করেছে। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য জগতে যে দুইখানি গ্রন্থের বহুদূর প্রসারী প্রভাব অতীতেও ছিল এবং এখনও আছে, তা হচ্ছে তাঁর 'এথিকস' এবং 'পলিটিকস'। যে নীতি ও চিন্তাধারা তিনি প্রবর্তন করে গেছেন তা মধ্যযুগের এবং বর্তমান যুগের রাষ্ট্রবিদ্‌গণের এবং দার্শনিকগণের গভীর মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। মানব-মনের এমন কোন ক্ষেত্র নাই যেখানে এ্যারিস্টটল্-এর শিক্ষা আলোকপাত করে নাই এবং তাকে উজ্জীবিত করে নাই।

তাঁর জীবনটা ছিল সেইকালের মনোজগতের একটা রোমাঞ্চকর অধ্যায়, যেকালে জড়পদার্থ সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানা ছিল না। তিনি ছিলেন এই সত্যের চরম দৃষ্টান্ত যে, প্রতিভা যুগ ও কালের অতীত, সে চিরন্তনের।

ডি আরচি টমসন লিখেছেন—"দু হাজার বছর ধরে পৃথিবীর সমস্ত দেশের লোক তাঁর প্রতিভার স্পর্শ পেয়েছে, তাদের জ্ঞানলাভের স্পৃহা তৃপ্ত হয়েছে।" যেখানেই তাঁর উপস্থিতি, তাঁকে দেখা যাক বা না যাক, তাঁর প্রতিভা ছড়িয়ে পড়েছে। এমন কি মুরজাতি এবং আরবজাতির লোকেরা আজ পর্যন্তও তাঁর মধ্যে নিজেদের মনের মত শিক্ষক খুঁজে পায়। তিনি ছিলেন চিরসত্যের শিক্ষাদাতা। তিনি বলে গেছেন, নিদ্রা ও স্বপ্নের কথা যৌবন ও বার্দ্ধক্যের গল্প ; জীবন ও মৃত্যুর কাহিনী, উৎপত্তি ও অবক্ষয়ের মূলকথা, বিকাশ ও ধ্বংসের বৃত্তান্ত। তিনি ছিলেন প্রকৃতিপাঠের পরিচালক, আত্মোপলব্ধির পথ-প্রদর্শক, জগদীশ্বরের বাণী-প্রচারক।

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি, বর্ত্তমানে বিশ্বভারতী মহাবিদ্যালয়ের উপাচার্য্য (শান্তিনিকেতনের পুরাতন ছাত্র) পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আনীত দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইয়াছেন, ইহা পুরাতন সংবাদ। এই তদন্ত কার্য্য পরিচালনার জন্য তাঁহাকে মাসিক (যতদিন কমিশনের কাজ চলিবে) পাঁচ হাজার টাকা পারিশ্রমিক প্রদানের ব্যবস্থা হয়। সংবাদে প্রকাশ, দাস মহাশয় এই কার্য্যের জন্য বেতনবাবদ কোন অর্থ গ্রহণ করিতে গররাজি হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত দাস বলেন যে তিনি সুপ্রীম কোর্টের জজিয়তী হইতে অবসর গ্রহণের পর যথাবিহিত পেন্সন পাইতেছেন, কাজেই নূতন কোন তদন্ত-বিচারকার্য্যের জন্য তাঁহার পক্ষে কোন উপরি বেতন গ্রহণ করা অনুচিত। প্রাক্তন বিচারপতি হিসাবে তিনি ইহা তাঁহার কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, বিশ্বভারতী মহাবিদ্যালয়ের উপাচার্য্য হিসাবেও দাস মহাশয় বোধহয় এক কিংবা দুই টাকা মাত্র মাসিক বেতন হিসাবে নিয়ম রক্ষার জন্যই গ্রহণ করিতেছেন। উপাচার্য্য হিসাবে তাঁহার মাসিক বেতনবাবদ প্রাপ্য বোধহয় দুই-আড়াই হাজার টাকা।

শ্রীযুক্ত সুধীরঞ্জন দাস কর্ত্তব্যবোধে যাহা করিয়াছেন, যে-বিপুল অর্থের মায়া পরিত্যাগ করিতে কোন দ্বিধা করিলেন না, তাঁহার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবার কোন প্রয়োজন নাই, মনে মনে তাঁহাকে শ্রদ্ধা-ভক্তির প্রণাম মাত্র জানাইব।

দাস মহাশয় কিন্তু একটা বিষম অন্যায় এবং বহুজনের পক্ষে 'অপরাধজনক'-কু-দৃষ্টান্ত স্থাপন করিলেন। দেশে আজ নানা প্রকার নানা কমিশন অহরহই হইতেছে, এবং এই সকল তদন্ত এবং অন্যপ্রকার কমিশনে চেয়ারম্যান এবং সদস্য হিসাবে পেন্সনপ্রাপ্ত জজ, হাকিম এবং অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী এবং বিশেষ ক্ষেত্রে নেহরু-অনুগৃহীত বিত্তবান কংগ্রেসী আত্মত্যাগীরাও নিযুক্ত হইয়া পেন্সনের উপর বেশ মোটা রকম প্রচুর উপরি আয় করিতেছেন—অর্থাৎ সরকার হইতে তাঁহাদের এই উপরি আয়ের অবকাশ করিয়া দেওয়া হইতেছে। শ্রীযুক্ত দাসের 'গর্হিত, অবিবেচনা-প্রসূত' কার্য্যের ফলে—উল্লিখিত সদাশয় এবং নির্লোভ ব্যক্তিদের হয়ত একটু মানসিক 'কলিক'-বেদনা ঘটিতে পারে। তদন্ত এবং অন্যবিধ কমিশনে নিযুক্ত কংগ্রেসী সদস্যের অবশ্য কোন প্রকার দ্বিধা-সঙ্কোচের বালাই নাই—কিন্তু পেন্সন ভোগী বিচারকদের কেহ কেহ হয়ত অতঃপর—'উপরি' আয়ের সুযোগ গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে দ্বিধাগ্রস্ত হইতে পারেন। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রীসুধীরঞ্জন দাস মহাশয় তাঁহার নির্লোভ দৃষ্টান্তের কারণে হয়ত বহুজনের বিরাগভাজনই হইলেন!

দি বুক কোম্পানী লিমিটেড

একদা অতি সুখ্যাত এবং 'অমূল্য' পুস্তকালয়—কলেজ স্কোয়ারে অবস্থিত 'বুক কোম্পানী লিমিটেডের' অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলা দেশে পুস্তক ব্যবসায়ের একটি গৌরব এবং ঐতিহ্যমণ্ডিত অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটিল। বুক কোম্পানীর শেষ অধ্যায় যেমন শোকাবহ, তেমনি, কলিকাতা পুলিসের কর্ত্তব্যপরায়ণতা এবং জনসাধারণের প্রতি দায়িত্বজ্ঞানের এক চরম কলঙ্কজনক দৃষ্টান্ত। এই পুস্তকালয়ের মালিক শ্রীগিরীন্দ্রনাথ মিত্র গত কয়েক বৎসর যাবত অসুস্থ এবং একমাত্র এই কারণেই নিজের ব্যবসায়ের প্রতি যথোচিত দৃষ্টি দিতে পারেন নাই, ফলে দোকান ঘরটির কিছু ভাড়া বাকি পড়ে। আইনের সাহায্যে বাড়ীওয়ালা দোকানের দখল লাভ করেন এবং যে-সময় শ্রীগিরীন্দ্রনাথ মিত্র পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়া আছেন, ঠিক সেই শুভ সময়ে লোকজন লইয়া দোকান

হইতে হাজার হাজার ইংরেজী, বাংলা প্রভৃতি অমূল্য পুস্তক, ফার্নিচার এবং অন্যান্য জিনিষপত্র সামনের রাস্তায় নিক্ষেপ করেন—এ-বিষয়ে সামান্য কোনপ্রকার মায়া-মমতা এবং মানবিক করুণা-কর্ত্তব্যও তিনি দেখাইবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই।

বইপত্র যখন রাস্তায় নিক্ষিপ্ত হইতে থাকে—অদূরে কর্ত্তব্যপরায়ণ পুলিস মোতায়েন ছিল, কিন্তু রাস্তার লোকে যখন দোকানের নিক্ষিপ্ত বহুমূল্য পুস্তকাদি পরমানন্দে লুঠ করিতেছিল—পুলিস এই দৃশ্য অবলোকন ছাড়া আর কিছু করা তাহাদের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে নাই। আইনের বলে বাড়ীওয়ালা বাড়ীর দখল লইতে পারেন—সত্য কথা, কিন্তু রাস্তায় নিক্ষিপ্ত ঐ বাড়ীর জিনিষপত্র পুলিসের চোখের সামনে লুঠতরাজ হইতে থাকিবে—ইহাও কি আইনসঙ্গত বলিয়া মনে করিতে হইবে? পুলিস কিসের জন্য? কাহাদের জন্য? কলিকাতা পুলিস লুঠতরাজের কার্য্যে যে এমনভাবে —'এডিং' না হইলেও প্রকারান্তরে, 'অ্যাবেটিং' করিবে—তাহা কেহ কল্পনা করে নাই।

বর্ত্তমানে সরকারী এবং বেসরকারী উচ্চপদে এবং পেশায় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি রহিয়াছেন, যাঁহারা শ্রীগিরীন্দ্র মিত্রের নিকট বিবিধপ্রকারে উপকৃত। এমন অনেকেও আছেন যাঁহারা প্রথম জীবনে গিরীন মিত্র মহাশয় তথা বুক কোম্পানীর সাহায্য-সহযোগিতা এবং কৃপা লাভ না করিলে হয়ত জীবনে অদ্যকার প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিতেন না, তাঁহারা কয়জন গিরীন মিত্র মহাশয়ের দুঃখের দিনে তাঁহার পাশে দাঁড়াইয়াছেন জানি না। বোধহয় দু-চারজন ছাড়া আর কেহই না।

বুক কোম্পানীর যে-সমস্ত পুস্তক লুঠ হইয়া গেল—সেই প্রকার গ্রন্থরাজি কলিকাতায়, এমন কি ভারতের কোন পুস্তকালয়ে আর কখনও পাওয়া যাইবে না। গিরীনবাবু যে-দৃষ্টিভঙ্গী, নিষ্ঠা এবং আদর্শ লইয়া পুস্তক ব্যবসায় সুরু করেন—সে-দৃষ্টিভঙ্গী নিষ্ঠা এবং আদর্শ বর্ত্তমানকালের পুস্তক ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিরল। এই পুস্তকালয়টি স্থাপিত হয় ১৯১৯ সালে—এবং সেই কালের অধ্যাপক, ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক, আইন-ব্যবসায়ী, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, ছাত্র এবং অন্যান্য বহু শিক্ষিতজন বুক কোম্পানীতে নিয়মিত মিলিত হইতেন। এই পুস্তকের দোকানটি প্রকৃতপক্ষে পণ্ডিত, ছাত্র এবং পুস্তক-অনুরাগী সকলজনের মিলনকেন্দ্র বলিয়া তৎকালে প্রসিদ্ধিলাভ করে এবং তাহা অকারণ নহে।

স্বর্গত: রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ সুরেন সেন, ডঃ মেঘনাদ সাহা, ডঃ জ্ঞান ঘোষ এবং দেশখ্যাত আরো অনেকেই এই স্থানে নিয়মিত যাতায়াত করিতেন এবং নিজ নিজ প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি গিরীনবাবুর নিকট হইতেই নিয়মিত পাইতেন। বুক কোম্পানীর অনুগ্রাহক এবং পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ইহাদের মধ্যে এই কয়েকজন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য: স্যর নীলরতন সরকার, স্যর নৃপেন সরকার, স্যর উপেন ব্রহ্মচারী, স্যর রাসবিহারী ঘোষ, স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ডঃ বিধানচন্দ্র রায়, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। এই সকল স্বনামধন্য গুণীজন তাঁহাদের প্রয়োজনীয় পুস্তক নির্ব্বাচন এবং তাহা জোগানের সকল দায়িত্ব গিরীনবাবুর উপরই ন্যস্ত করেন। গিরীনবাবু বহুক্ষেত্রে আর্থিক ক্ষতি সহ্য করিয়াও এই গুরুদায়িত্ব পালনে কখনও কোন ত্রুটির অবকাশ রাখেন নাই।

আজ বুক কোম্পানীর দরজা বন্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই কলিকাতা তথা বঙ্গদেশ এখন একটি দুর্লভ ঐতিহ্য-গরীয়ান এবং অমূল্য পুস্তক-প্রতিষ্ঠান হারাইল, যাহা অদূর ভবিষ্যতে পূরণ হইবে বলিয়া মনে হয় না। বুক কোম্পানী কি ছিল, কি জ্ঞানের ভাণ্ডার এখানে সঞ্চিত ছিল, একটি অমায়িক, অনাড়ম্বর ভদ্রমানুষ নিঃস্বার্থভাবে তাঁহার সকল সম্পদ অকাতরে উজাড় করিয়া কি ভাবে কত কষ্টে কি পরিশ্রমে এই প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলেন, তাহার পূর্ণ পরিচয় সামান্য কথায় দেওয়া অসম্ভব এবং বর্ত্তমানের তথাকথিত পণ্ডিতদের কাছে তাহার কোন মূল্যও হয়ত নাই।

পরিশেষে একটি কথা বলা দরকার। আজ ডঃ বিধান চন্দ্র রায় বাঁচিয়া থাকিলে হয়ত বুক কোম্পানীর এমন দুঃখজনক পরিসমাপ্তি ঘটিত না। ডাঃ রায়ের অমূল্য দুর্লভ পুস্তকাদির সম্পর্কে যে মূল্য-বিচারবোধ এবং মানব জীবনে তাহার যে প্রয়োজন কতখানি সে সম্পর্কেও যে অসাধারণ জ্ঞান ছিল, আজিকার রাজ্য সরকারের মাথাওয়ালা শাসকদের মধ্যে যে তাহা কাহারো নাই, লজ্জা ও দুঃখের সঙ্গে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য।

হাসপাতালের বিষম সমস্যা

কিছুকাল পূর্ব্বে নব স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত পূরবী মুখার্জ্জিকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপনের জন্য আয়োজিত এক সভায় ডাঃ বি. পি. ত্রিবেদী কলিকাতার হাসপাতালগুলি তথা এ-রাজ্যের স্বাস্থ্য-বিভাগীয় বিভিন্ন বিষয় ও অবস্থার কথা প্রসঙ্গে বলেন, "মেডিক্যাল ছাত্ররা হাসপাতালে রোগীদের 'বেডসাইডে' দাঁড়াইয়াই প্রকৃষ্ট শিক্ষা লাভ করিতে পারেন। কিন্তু এখানকার হাসপাতালগুলিতে রোগীদের এমন ভীড় আর ঠেলাঠেলি যে, সে-সমস্ত জায়গায় 'বেড' থাকিলেও 'সাইড' নাই, বরযাত্রীদের ঢালাও ফরাসের মত যেন সেখানে রোগীদের শয্যা পাতা রহিয়াছে।"

সরকারী চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস করা, না-করা সম্বন্ধে সরকারী অব্যবস্থা, মেডিক্যাল ছাত্রদের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা, মৌলিক গবেষণার অনুকূল পরিবেশের অভাব, অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় এখানকার ছাত্রদের শিক্ষার মান অবনতি, কোনও সুনির্দিষ্ট নীতি অনুসরণের পরিবর্ত্তে ব্যক্তিগত তদ্বিরের জোরে হাসপাতালে রোগী ভর্ত্তি—ইত্যাদি বহুবিধ সমস্যার কথা উল্লেখ করিয়া ডাঃ ত্রিবেদী ঐগুলির নিরাকরণের জন্য নবনিযুক্ত স্বাস্থ্যমন্ত্রীর আশু হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেন।

শ্রীমতী মুখার্জ্জি এ-রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের ভার সম্প্রতি গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বাস্তবে কতদূর কি করিতে পারিবেন এখনই সে বিষয়ে কিছু বলা বা মন্তব্য করা সঙ্গত হইবে না। শুধু এইটুকু মাত্র বলা যায় যে শ্রীমতী মুখার্জ্জি এ-রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর নামক নোংরা এবং বিবিধপ্রকার দুর্নীতিপূর্ণ আস্তাবল যদি পরিষ্কার করিয়া সুস্থ আবহাওয়া আনিতে চাহেন তাহা হইলে কঠোর হস্তে তাঁহাকে শক্ত তারের ঝাঁটা লইয়া কাজ আরম্ভ করিতে হইবে।

নিখিল ভারত মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ডাঃ ত্রিবেদী সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন উপলক্ষ্যে শ্রীমতী মুখার্জ্জিকে খোলাখুলি যাহা বলিয়াছেন, তাহা যে অতি সঙ্গত এবং সময়োচিত হইয়াছে, বলা বাহুল্য। মামুলি প্রশংসা-বাণী বলিয়া এবং মন্ত্রী মহাশয়ার অযথা গুণকীর্ত্তন না করিয়া ডাঃ ত্রিবেদী এ-রাজ্যের স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসা বিষয়ক যে চিত্রটি নবনিযুক্ত মন্ত্রী মহাশয়ার গোচরে আনিয়াছেন তাহাতে শ্রীমতী উপকৃত হইবেন বলিয়া মনে করি। এ-রাজ্যের স্বাস্থ্য এবং হাসপাতালগুলির প্রকৃত সমস্যা কি এবং মূল গলদ কোথায়—তাহার পূর্ণ পরিচয় পাইলে, সে-বিষয়ে সম্যক্ অবহিত হইলে সমস্যা সমাধানে এবং গলদ দূরীকরণে কর্ম্মপদ্ধতি এবং কার্য্যধারা ঠিক পথে পরিচালনা করা সহজ হয়। এই প্রচেষ্টা যিনি করিবেন, তাঁহার যদি আন্তরিকতা থাকে, তাহা হইলে সমস্যার পূর্ণ সমাধান না হইলেও কাজের কাজ অনেক কিছু হইবে।

> "ডাক্তার ত্রিবেদী এ রাজ্যের চিকিৎসা-ব্যবস্থা, যাহাকে বলে গোড়া ধরিয়া টান দেওয়া, তাহাই দিয়াছেন। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলিয়াছেন যে, গত কয়েক বৎসরের পরিকল্পনা সত্ত্বেও এই রাজ্যে চিকিৎসাবিজ্ঞানের শিক্ষাব্যবস্থা 'শোচনীয়'। সোজা কথায় ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, রোগীর যাঁহারা চিকিৎসা করিবেন সেই চিকিৎসকগণ রোগচিকিৎসার উপযুক্ত শিক্ষা পাইতেছেন না। তাহার উক্তির ব্যাখ্যা করিয়াই বা বুঝিতে হইবে কেন, তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে, এই অবস্থার পরিবর্ত্তন না ঘটিলে ভবিষ্যতে নিম্নমানের চিকিৎসকই দেখা যাইবে।
>
> "শিক্ষাব্যবস্থার এইরূপ শোচনীয় পরিণতির তিনি কতকগুলি কারণও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, হাসপাতালগুলির বর্ত্তমান অবস্থায় চিকিৎসাবিজ্ঞানের ছাত্রেরা হাতে-কলমে পুরাপুরি অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে পারিতেছে না। অথচ একথা বলা বাহুল্যমাত্র যে, চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শিতা বহুল পরিমাণে হাতে-কলমে শিক্ষা-লাভের উপরই নির্ভর করে। কিন্তু হাসপাতালে রোগীদের অত্যধিক ভিড়ের জন্য ছাত্রদের রোগীর শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ বড় একটা হয় না। ইহার ফল যাহা হইবার তাহাই হয়। শিক্ষার্থীরা রোগ ও তাহার চিকিৎসা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের সুযোগ হইতে বহুলাংশে বঞ্চিত হয়। ইহা ভবিষ্যতে যিনি চিকিৎসক হইতে যাইতেছেন, তাঁহার পক্ষে কি গুরুতর অভাবের ও ক্ষতির কারণ হইতেছে, তাহা নিশ্চয়ই ব্যাখ্যা করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই।
>
> "চিকিৎসাবিজ্ঞান-শিক্ষার পক্ষে অবনতিকর ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতির পরিপন্থী আরও দুইটি

কারণের উল্লেখ ডাঃ ত্রিবেদী করিয়াছেন। তাহা হইল, মেডিক্যাল কলেজগুলির শিক্ষকদের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ এবং নূতন গবেষণার সুযোগের অভাব। যাঁহারা শিক্ষা দিবেন তাঁহাদের যদি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা থাকে তবে তাঁহারা যে শিক্ষাদান ব্যাপারে ইচ্ছা থাকিলেও আন্তরিকভাবে মনঃসংযোগ করিতে পারেন না, তাহা বুঝিতে কাহারও অসুবিধা হওয়া উচিত নহে। কারণ শিক্ষাদানকার্য্যে যে মানসিক অবস্থার প্রয়োজন, অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যৎ সে অবস্থা সৃষ্টির অনুকূল নহে।

"দ্বিতীয় কারণটি চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভবিষ্যতের দিক হইতে বিচার করিলে খুবই উদ্বেগকর বলিয়া বিবেচিত হইবে। মৌলিক গবেষণার উপরই সমস্ত বিদ্যার অভ্যুন্নতি নির্ভর করে। শুধু তাহাই নহে, কোন্ দেশের কোন্ বিদ্যায় কি মৌলিক দান তাহা দিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সেই দেশের মর্য্যাদাও নিরূপিত হয়। কাজেই প্রতিভাশালী, মেধাবী ও কৃতী ছাত্রগণ যদি গবেষণার সুযোগ না পায় তাহা হইলে তাহাদের নিজেদের ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের ত ক্ষতি হইবেই, পরিণামে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জাতীয় মর্য্যাদাও ক্ষুণ্ণ হইবে।

"অন্যান্য প্রসঙ্গে ডাঃ ত্রিবেদী এই রাজ্যে হাসপাতালগুলির যে কি দুরবস্থা, তাহাও আলোচনা করিয়াছেন। মাঝে মাঝে মর্ম্মান্তিক অনেক ঘটনা প্রকাশিত হইয়া পড়াতে এবং রোগীদের স্বলব্ধ অভিজ্ঞতা হইতেও হাসপাতালগুলির শোচনীয় চিত্রের পরিচয় জনসাধারণ যে না পায় তাহা নহে। সংবাদপত্রসমূহও হাসপাতালগুলির দুরবস্থা, অব্যবস্থা ও দুর্নীতি সম্বন্ধে নানা উপলক্ষ্যে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু প্রতিকার তাহাতে কিছু হয় বলিয়া মনে হয় না। রোগীর সংখ্যার তুলনায় স্থানাভাব ত আছেই, রোগীভর্ত্তির ব্যাপারেও রোগের প্রয়োজনীয়তা অপেক্ষা তদ্বির-তদারক ও দুর্নীতি অধিক কার্যকর হয়। কি করিলে এ অবস্থার প্রতিকার হইবে তাহা এককথায় বলা সহজ নহে, সমীচীনও নহে। কারণ বহুকাল ব্যাপিয়া যে দুর্নীতি হাসপাতালগুলির রন্ধ্রে রন্ধ্রে শিকড় প্রবেশ করাইয়াছে, তাহা দূর করিতে হইলে সুচিন্তিত পরিকল্পনা লইয়া সতর্কতার সহিত অগ্রসর হওয়া আবশ্যক। তবে ডাঃ ত্রিবেদী যাহা বলিয়াছেন এবং এ রাজ্যে সর্ব্বসাধারণও যাহা অনুভব করে তাহা হইতে একথা বলা চলে যে, এ রাজ্যের চিকিৎসাক্ষেত্রে এক অত্যন্ত সংকটজনক অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। ডাঃ ত্রিবেদী এই সংকটমোচনের উপায় নির্দ্দেশ করিবার জন্য এক নিরপেক্ষ তদন্ত-কমিশন নিয়োগ করিতে স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করিয়াছেন।..."

আমরা ইহাও আশা করিব যে, শ্রীমতী মুখার্জ্জি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর মত কেবল আদর্শমূলক অসম্ভব কথা বলিয়াই তাঁহার কর্ত্তব্য সমাপন করিবেন না। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেন শ্রীমতী মুখার্জ্জিকে "কাজ" করিবার পূর্ণ অবকাশ এবং সহযোগিতা দিবেন এ আশা বিশ্বাস আমাদের আছে।

বেসরকারী হাসপাতাল

কলিকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের বেসরকারী হাসপাতাল এবং অন্যবিধ স্বাস্থ্য-সংস্থা সম্পর্কে অভিযোগ অনুযোগের পরিমাণ কম নহে। সংবাদপত্রে প্রায়ই হাসপাতাল সম্পর্কে নানা প্রকার অভিযোগ এবং দুর্নীতির কথা প্রকাশ পাইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, বহু ক্ষেত্রে অভিযোগগুলি একতরফাই হইয়া থাকে। প্রায়ই দেখি যে কোন হাসপাতাল সম্পর্কে সংবাদপত্রে কোন অভিযোগ প্রকাশের পূর্ব্বে ঐ অভিযোগের জবাব দিবার সৌজন্য অভিযুক্ত হাসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষকে দেওয়া হয় না। এ-কথা বলার জন্য কেহ যেন মনে করিবেন না আমরা হাসপাতালের সাফাই গাহিতেছি কিংবা হাসপাতালের পক্ষে ওকালতি করিতেছি। আমাদের একমাত্র বক্তব্য এই যে সর্ব্বক্ষেত্রে হাসপাতালকে দোষী বলা অন্যায় এবং অযথা। হাসপাতাল সম্পর্কে কিছু প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা আছে বলিয়াই এ-কথা বলিবার মত সাহস রাখি। এমন বহু অভিযোগের কথা (হাসপাতালের বিরুদ্ধে) জানি যেক্ষেত্রে রোগী, বিশেষ করিয়া রোগীর অভিভাবক, অযথা নানা প্রকার গোলমালের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। তাঁহাদের দাবি—তাহা যত অন্যায় এবং অসঙ্গত-অসম্ভব হউক না কেন—পূরণ না করিতে পারিলে বা অক্ষম হইলে—রোগী এবং তাঁহার অভিভাবক হাসপাতাল কর্ত্তৃপক্ষ, নার্স এবং সাধারণ কর্ম্মীর সহিত এমন ব্যবহার করেন, যাহাকে

কোন ক্রমেই ভদ্র এবং শিষ্ট বলিয়া মনে করা যায় না। এ-কথা হয়ত বাহিরের লোক না জানিতে পারেন যে বহু সময় রোগী এবং রোগীর অভিভাবক হাসপাতালের নিকট হইতে এমন বহু কিছু দাবি করেন, যাহা মানুষ নিজের বাড়ীতে—এমন কি শ্বশুরালয়েও আশা করিতে পারেন না। প্রয়োজন হইলে—এমন ঘটনার কথা ভবিষ্যতে দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইবে। এমন অনেকে আছেন যাঁহারা বেসরকারী হাসপাতালগুলির শক্তি সামর্থ্য এবং অর্থ-সঙ্গতির কোন সংবাদই রাখেন না, এবং সেই কারণেই হয়ত তাঁহারা হাসপাতালের নিকট হইতে অসম্ভব অন্যায় দাবি-দাওয়া করিতে কোন দ্বিধা বা সঙ্কোচ বোধ করেন না। বেসরকারী হাসপাতালে বেড সংখ্যা অতি সীমিত এবং এই জন্যই সকল সময় অত্যন্ত পীড়িত রোগীকেও হাজির হওয়া মাত্র ভর্তি করা অসম্ভব হয়। এই ভর্তির ব্যাপার লইয়াই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অভিযোগ সাধারণে করিয়া থাকেন। ইহার উপর আছে ডাক্তার, নার্স এবং সাধারণ হাসপাতাল কর্ম্মীর অতি-স্বল্পতা এবং অত্যধিক পরিশ্রম এবং দীর্ঘকালব্যাপী একটানা ডিউটি।

হাসপাতাল-কর্ম্মী

বহু কষ্ট এবং অসুবিধা সত্ত্বেও বেসরকারী হাসপাতালের সাধারণ কর্ম্মী তাহাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করে রোগীদের প্রতি তাহাদের কর্ত্তব্য পালনে—কিন্তু একটা কথা বোধহয় সকলেরই জানা আছে যে, পেটে ক্ষুধা এবং গৃহে দারিদ্র্য লইয়া মানুষের পক্ষে সকল সময় হাসিমুখে কর্ত্তব্যপালন করা সম্ভব হয় না। বেসরকারী হাসপাতালের সাধারণ কর্ম্মী এবং কর্ম্মচারীদের প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য বেতনে আজ এই বিষম দুর্মূল্যের বাজারে—নিজেকে বাদ দিয়াও স্ত্রীপুত্রকন্যা এবং আশ্রিত পরিবারস্থ অন্যান্য ব্যক্তিদের মুখে এক বেলা আধ-পেটা আহার এবং বছরে এক-আধখানা বস্ত্র জোগান দেওয়াও প্রায় অসম্ভব হইয়াছে।

যে-সকল ডাক্তার কম বেতন পান, তাঁহাদের কথা বাদ দিলাম এই কারণে যে, তাঁহাদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস সকলেরই কিছু-না-কিছু আছে—(অবশ্য এই সূত্রে প্রাপ্ত আয়ের জন্য তাঁহারা আয়কর দেন কি না, এবং আয়কর বিভাগও তাহার কোন খোঁজ রাখেন কি না জানা নাই।) কিন্তু সাধারণ হাসপাতাল কর্ম্মী-কর্ম্মচারীর এ সুযোগ সুবিধা নাই।

বেসরকারী হাসপাতালের উচ্চতম কর্ম্মকর্ত্তারা তাঁহাদের অধীনস্থ সামান্য বেতনভোগী লোকদের কর্ত্তব্যপালন বিষয়ে বহু ন্যায্য উপদেশ দিয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হইতে প্ররোচিত করেন, কিন্তু অধীনস্থ ব্যক্তিদের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের পক্ষে প্রয়োজন ন্যূনতম অর্থের সংস্থান করিবার বিষয়ে কোন চিন্তা করেন কি? এই বিষয়ে কর্ত্তাদেরও যে-একটা মানবিক কর্ত্তব্য এবং দায়িত্ব আছে, তাহার কথা কে তাঁহাদের স্মরণ করাইয়া দিবে? রাজ্য সরকার এ-দিক দিয়া কিছু করিবেন না, অথচ ইহাও অতি বাস্তব সত্য যে, রাজ্য সরকার, কলিকাতা পৌরসভা এবং অন্যান্য সমবর্গের সংস্থা হইতে বেসরকারী হাসপাতালে অর্থ সাহায্য যথোপযুক্ত পরিমাণে না করিলে, বেসরকারী হাসপাতাল-কর্ত্তাদের পক্ষে অর্থের দিক হইতে বিশেষ কিছু করা একপ্রকার অসম্ভব। কারণ যাহাই হউক, সাধারণ হাসপাতাল কর্ম্মচারী ও কর্ম্মী 'ক্রনিক' অনশন ব্রত পালন করিতে বাধ্য হইলে হাসপাতালের অব্যবস্থা এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য নানা গোলযোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে বাধ্য। পেটে যাহাদের ক্ষুধার চিতা দীর্ঘকাল ধরিয়া জ্বলিতে থাকে তাহাদের নিকট সু-নীতি এবং সু-যুক্তির কোন মূল্যই নাই—এবং এই দু'টি উথাপন করিলে হিত অপেক্ষা অহিতই বেশী হইবে—হইতেছেও।

গত কিছুকাল হইতে প্রায় সর্ব্বপ্রকার ব্যবসায়, প্রতিষ্ঠানে ও সরকারী-বেসরকারী কর্ম্মশালায়, কল-কারখানা, দপ্তরে, এবং অন্যান্য সংস্থার কর্ম্মীদের দাবি উঠিয়াছে—দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অনুপাতে বেতন এবং মহার্ঘ-ভাতা বৃদ্ধির জন্য। ইতিমধ্যেই বহু কর্ম্মসংস্থা এবং দপ্তর ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে কর্ম্মীদের সম্ভবমত মহার্ঘ্য-ভাতা, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বেতন বৃদ্ধিও করিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্ম্মীদের জন্যও সরকার খানিকটা করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারও এ-বিষয় তৎপর হইয়াছেন। ট্রাম কর্ম্মীদের হুমকিও উঠিয়াছে—দাবিমত বেতন, মহার্ঘ্য-ভাতা না বাড়াইলে ধর্ম্মঘট অনিবার্য্য!

বেঙ্গল চেম্বার অব্ কমার্স কর্ম্মীদের জন্য বেতন এবং মহার্ঘ্য-ভাতা বাবদ যাহা দিতেছেন, দেশীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান-গুলি ততখানি করেন নাই, করিবেন কি না জানি না। ইহা তাঁহারা 'পারিবেন না' বলিয়া পালন করেন নাই—'করিবেন না' বলিয়াই কর্ম্মীদের যথোপযুক্ত অর্থের বরাদ্দ হয় নাই।

অবশ্য মার্টিন বার্ণ, টাটা, জয় ইণ্ডাষ্ট্রিজ প্রভৃতি সামান্ত দু-একটি ব্যতিক্রম এ-বিষয়েও আছে। কিন্তু ভাগ্যহত হাসপাতাল কর্ম্মীদের দেখিবার বোধ হয় কেহই নাই, বিশেষ করিয়া বেসরকারী হাসপাতালের কর্ম্মীদের। ইহারা না ঘাটকা না ঘরকা। এ-অবস্থার কোন প্রতিকার হইবে কি না, তাহা কর্ম্মীদের জানাইবার প্রয়োজন এখনও অনুভূত হয় নাই। বেসরকারী কোন কোন হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ এ-বিষয়ে নীরব আছেন, এবং এই কারণে কর্ম্মী-মহলে ক্রমশঃ অসন্তোষের মাত্রা এবং তীব্রতা বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা বলা যায়—'উচ্চতম-কর্ত্তাদের' বাদ দিয়াও হাসপাতাল হয়ত চলিতে পারে, কিন্তু ডাক্তার ও কর্ম্মীদের বাদ দিয়া বোধ হয় চলে না। এ-বিষয় কাহারও যদি সন্দেহ থাকে একবার মাত্র কয়েকদিনের জন্য পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দোষ কি? আশা করি যথা মহলে নূতন করিয়া এবং অবিলম্বে দরিদ্র, অভাব-নিপীড়িত এবং করভার-জর্জ্জরিত হাসপাতাল-কর্ম্মীদের বিষয়ে মানবিক বিচার করা হইবে, এবং কর্ম্মীরা যাহাতে খানিকটা নিশ্চিন্ত মনে এবং শান্তিতে তাহাদের কর্ত্তব্যপালন করিতে পারে, তাহার কিছু ব্যবস্থা হইবে। না হইলে শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বদেশে, সর্ব্বস্তরে সর্ব্বভাবে বঞ্চিত, ভাগ্যহত কর্ম্মীরা যে-পথে যায়, যে-উপায় গ্রহণ করে, এক্ষেত্রেও তাহারই দুঃখজনক এবং অনভিপ্রেত পুনরাবৃত্তি হইবে।

অন্যদিকে

এই প্রসঙ্গে হাসপাতাল কর্ম্মীদের সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা কর্ত্তব্য। গত কয়েক বৎসর হইল, হাসপাতালগুলিও 'ইউনিয়ন' নামক একটি বিশেষ 'বস্তুর' দ্বারা বিবিধ প্রকারে বিব্রত আক্রান্ত হইতেছে। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি—শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়, অনাথ আশ্রম এবং চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক ইউনিয়নের কোন স্থান হওয়া উচিত নহে। বাস্তবে দেখা গিয়াছে ইউনিয়নের তথাকথিত, লিডারগণ বহিরাগত এবং ইহাদের একমাত্র কাজ, যথা-অযথা, দরকারী-অদরকারী, ন্যায়-অন্যায় নানা প্রকার দাবী উত্থাপন করিয়া হাসপাতালের কর্ম্মীদের উচ্ছৃঙ্খল হইতে এবং আইন অমান্য করিতে প্ররোচনা দান। এই সকল তথাকথিত লেবার লিডার পেশাদার এবং লিডারী করিয়াই ইহাদের বেশ দু পয়সা রোজগার হয়। বেতন বৃদ্ধি একটি প্রধান দাবী, কিন্তু লেবারলিডার মহাশয়গণ ভাবিয়া দেখেন না কিংবা দেখিবার প্রয়োজন বোধ করেন না, বেসরকারী হাসপাতাল, যাহা প্রধানত দান এবং গ্রান্টের উপর সর্ব্বতোভাবে নির্ভর-শীল, কেমন করিয়া, কোন অর্থের উপর নির্ভর করিয়া কর্ম্মীদের বেতন এবং অন্যান্য আর্থিক দাবী মিটাইবে। ব্যবসায় সংস্থার সহিত বেসরকারী হাসপাতালগুলির গোত্র এক করা কেবল বেকুফী নহে, ইহার মধ্যে খানিকটা শয়তানী মতলবও আছে। লেবার লিডারদের প্ররোচনার ফলে আজ হাস-পাতাল কর্ম্মীদের এক অংশের মধ্যে যে প্রকার উচ্ছৃঙ্খলতা এবং অযথা গোলমাল সৃষ্টির অতি-প্রবণতা দেখা যাইতেছে, তাহা অবিলম্বে দমিত হওয়া প্রয়োজন, না হইলে অদূর ভবিষ্যতে হাসপাতালের শান্তি সর্ব্বতোভাবে ব্যাহত হইবে, ফলে রোগীদের অবস্থা কি হইবে তাহা সহজে অনুমেয়।

এক শ্রেণীর কর্ম্মী হাসপাতালের নিয়ম-কানুন সবই ইচ্ছা-মত ভঙ্গ করিবে—নিজের খেয়ালখুশী মত ডিউটি করিবে। কর্তৃপক্ষের কোন আদেশ পালন করিবে না, অথচ ইহার বিরুদ্ধে কাহারও কিছু বলিবার নাই! কেহ কিছু বলিলে কর্ম্মীদের হাতে তাঁহার নিগৃহীত হইবার সম্ভাবনা সু-প্রচুর। বলা বাহুল্য, আমরা সকল কর্ম্মীকেই দোষী বলিতে চাহি না, পারি না, কিন্তু সামান্য সংখ্যক কর্ম্মী হৈ-হল্লা করিয়া হাস-পাতালের কাজে প্রায়ই বিষম বিঘ্ন সৃষ্টি করে। যে-সব কর্ম্মী স্বভাবতঃ শান্ত এবং আইন-কানুন মানিয়া চলার পক্ষে, তাহারাও ভয়ে হল্লাকারীদের দলে যোগ দিতে বাধ্য হয় একান্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই।

দাবী পেশ করিবার ভদ্র উপায় আছে এবং ভদ্র উপায় দ্বারা দাবী আদায় বোধহয় সহজতর। অযথা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অবমাননা, তাঁহাদের সহিত অশিষ্ট ব্যবহার করিয়া কোন লাভ হইবে না, একমাত্র তিক্ততা সৃষ্টি করা ছাড়া। হাসপাতাল পরিচালনা আজ কর্তৃপক্ষের নিকট বিষম এক মাথাব্যথার কারণ হইয়াছে এবং এই মাথাব্যথা দূর করিতে হইলে রাজ্য সরকারকে আগাইয়া আসিতে হইবে। চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলি সর্ব্বতোভাবে সরকারী দায়িত্ব, কাজেই হাসপাতাল কর্ম্মীদের দাবী-দাওয়া বিষয়ে সরকারকে অবিলম্বে চিন্তা করিতে হইবে, বিশেষ করিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় হাসপাতাল তথা সর্ব্বপ্রকার চিকিৎসা-সংস্থাকে Industrial Disputes Act-এর আওতা হইতে মুক্ত

করিতে পারা যায় কি না, যদি যায় তাহা হইলে ঐ সম্পর্কে আইনানুগ ব্যবস্থার কথা চিন্তা করা একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে বলিয়া বহু বিজ্ঞ ব্যক্তি মনে করিতেছেন। যেখানে মানুষের প্রাণ লইয়া টানাটানি এবং ডাক্তারী ছাত্রদের শিক্ষার প্রশ্ন জড়িত, সেখানে তথাকথিত লেবার লিডার এবং ট্রেড ইউনিয়নের ইয়ার্কি চলে না।

এবার গবাদি-পশুর পালা

একটি সংবাদে প্রকাশ যে পশ্চিমবঙ্গের চাউলের 'তুষ' নাকি শীঘ্রই হাঙ্গেরীতে রপ্তানীর ব্যবস্থা হইবে। গবাদি-পশুর খাদ্য হিসাবে বাঙ্গলার 'তুষ' নাকি বিশেষ উপাদেয় এবং পুষ্টিকারক বলিয়া হাঙ্গেরীর বিশেষজ্ঞরা মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাঁহারা ইহাও মনে করেন যে বাঙ্গলার 'তুষ' হাঙ্গেরীর গবাদি-পশুর পোষণ এবং দুগ্ধ পরিমাণ বৃদ্ধির পক্ষে অতি সহায়ক হইবে। তুষ রপ্তানীর বিষয় তথ্য তদন্তের কারণে হাঙ্গেরীর একটি পশুখাদ্য-বিষয়ক বিশেষজ্ঞ দল শীঘ্রই পশ্চিমবঙ্গে আসিতেছেন।

এতদিন পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ জন চাউলের অভাব নিদারুণ ভাবে ভোগ করিতেছিলেন এবং এখনও করিতেছেন—এবার পশ্চিমবঙ্গের গবাদি-পশুদেরও মানুষের সমপর্য্যায়ে নামানোর প্রচেষ্টা হইবে এবং অনতিবিলম্বে উপযুক্ত খাদ্যের অর্থাৎ তুষের অভাব সৃষ্টি করিয়া বাঙ্গলার গো-বধের একটা প্রচণ্ড প্রকল্পও হয়ত নির্দ্ধারিত হইবে! বাঙ্গলার হাড্ডিসার গবাদি-পশু এমনিতেই কোন প্রকারে শুকনো ঘাসপাতা এবং সামান্য পরিমাণ তুষ খাইয়া প্রাণে বাঁচিয়া থাকে মাত্র। এই কারণেই বাঙ্গলার গরু যে দুধ দেয়, তাহার পরিমাণ অন্যান্য দেশের তুলনায় বহুগুণে কম। এইবার বাঙ্গলা হইতে বিদেশী মুদ্রা অর্জ্জনের অজুহাত-অছিলায় তুষ রপ্তানী করা সুরু হইলে অবস্থা সোনায় সোহাগা হইবে। বাঙ্গলার গবাদি-পশুর একটা প্রধান খাদ্য ছিল খৈল। ঐ বস্তু এখন দুর্লভ, কারণ এ দেশ হইতে প্রভূত পরিমাণে খৈল রপ্তানী হইতেছে এবং এ রপ্তানীর ব্যাপারে এ দেশের গো-পূজক এবং গো-রক্ষক সম্প্রদায়ই অগ্রণী এবং মূল-গায়েন! খৈল গিয়াছে, এবার বাঙ্গলা হইতে তুষও অদৃশ্য হইলে একটি অতীব ভাল ফল দেখা দিবে—এ ফল আর কিছুই নহে—অবাঙ্গালীদের কাঁচা চামড়ার রপ্তানী ব্যবসা বাঙ্গলা দেশে আরও বিস্তার লাভ করিবে।

বিভিন্ন যুগে পণ্যমূল্য

পত্রিকান্তরে বিভিন্ন যুগে পণ্যমূল্যের একটি মনোহর বিবরণী শ্রীহৃদয়রঞ্জন ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করিয়াছেন :

"ভারতবর্ষের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখা যাবে, অতীতে যে কোন জিনিসপত্রের মূল্য এক আনা বাড়তে প্রায় একশো বছর লাগত, আর বর্ত্তমানে এমন অনেক জিনিস দেখা যায়, যেগুলো প্রতি মাসে এক আনা করে বেড়ে চলেছে। নিম্নোক্ত তালিকা থেকে অতীত ও বর্ত্তমানের দরের গতির তারতম্য বুঝা যাবে।

এইবার বিভিন্ন সময় প্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্যের দরের হার দেখুন :

কৌটিল্যের আমলে (খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৪০০ অব্দে) প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দর :

চাউল	মণকরা	৫	তাম্রপণ	অথবা		এক	আনা
তৈল	,,	৪১	,,	,,	(প্রায়)	৮	,,
ঘৃত	,,	৬০	,,	,,		১২	,,
ডাল	,,	৬	,,	,,	(প্রায়)	১	,,
লবণ	,,	২	,,	,,	(প্রায়)	½	,,
চিনি	,,	৪৮	,,	,,	(প্রায়)	১০	,,

কাপড় (সাধারণ ১ থানি) ১ তাম্রপণ এবং ৫ থানি মাত্র ১ আনা।

কয়েকশত বছর পরে খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে চাউলের দর কম ছিল, কিন্তু ডাইল, তৈল, ঘৃত, লবণ ও চিনির দর অর্দ্ধেক কমিয়া গিয়াছিল।

মুসলমান রাজত্বে চাউল ও নিত্য ব্যবহার্য্য অন্যান্য জিনিসপত্রের দর ধীরে ধীরে বাড়িতে থাকে। কিন্তু সে-আমলেও দ্রব্যমূল্য দেশের সাধারণ লোকদের ক্রয়-ক্ষমতার আয়ত্তে ছিল।

মহম্মদ তুগলকের শাসনকালে (খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে) ইবন বতুতা নামে জনৈক পরিব্রাজক ভারতে আসেন। দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থার যে বিবরণ তিনি দিয়াছেন, তাহাতে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দর এখনকার টাকার হিসাবে ছিল :

চাউল প্রতিমণ সাত পয়সা
তৈল প্রতিমণ ॥৶১০ আনা

ঘৃত	,,	১।৶০	,,
চিনি	,,	১।৶০	,,
বড় মুরগী একটি		৫ পয়সা	
বড় ভেড়া ,,		।০	আনা

মোগল সম্রাট আকবরের আমলে (ষোড়শ শতকে) দর ছিল :

চাউল (ভাল)	প্রতিমণ	৩০	'দাম'	অথবা	৸৶০	আনা
চাউল (মোটা)	,,	২০	,,	,,	॥৵০	,,
ডাল	,,	২৭	,,	,,	৸/১০	,,
ঘৃত	,,	১৫৮	,,	,,	৪৸৶০	,,
লবণ	,,	২৪	,,	,,	৸০	,,
চিনি	,,	১৮২	,,	,,	৫॥৶০	,,

আলিবর্দ্দীর আমলে, অর্থাৎ ইংরেজ রাজত্বের প্রাক্কালে (১৭২৯ খ্রীষ্টাব্দে) মুর্শিদাবাদের বাজার দর ছিল :

বাঁশফুল চাউল (উৎকৃষ্ট)	প্রতি টাকায়	১ মণ ১০ সের
মোটা চাউল	,,	৭ মণ ২০ ,,
তৈল	,,	— ২৪ ,,
ঘৃত	,,	১০॥০ ,,

১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকায় চাউলের দর ছিল টাকায় ২ মণ ২০ সের হইতে ৩ মণ।

১৮১০ সালের কাছাকাছি বাংলা দেশে নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির মুল্য নিম্নরূপ ছিল :

উত্তম চাউল	প্রতিমণ	১।০	আনা
মোটা চাউল	,,	১৲	টাকা
অড়হর ডাল	,,	১॥০	আনা
মুগ ডাল	,,	১॥০	,,
স: তৈল	প্রতিসের	৵০	আনা
ঘৃত	,,	।৶০	আনা
মোটা ধুতি	একখানি	।৵০	আনা

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি চট্টগ্রামে বাজার দর ছিল নিম্নরূপ :

চাউল (ভাল)	প্রতিমণ	১॥০
চাউল (মোটা)	,,	১।০
ডাল	,,	১৸০
স: তৈল	প্রতিসের	৶০
ঘৃত	প্রতিসের	॥০

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রামে নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য ছিল :

চাউল (ভাল)	প্রতিমণ	৩।০
চাউল (মোটা)	,,	২৸০
ডাল	প্রতি সের	⁄১৫
আলু	,,	৫১৫
বেগুন	,,	৫৫
স: তৈল	,,	।৵০
ঘৃত	,,	২॥০
দুধ (খাঁটি)	,,	⁄১০
সাধারণ ধুতি	১ খানি	১৲
বড় রুই, ইলিশ (আস্ত)	১টি	।⁄০ হতে ।৶০

উক্ত মুল্য তালিকা বাংলার একটি বিশেষ পল্লী অঞ্চলে হইলেও ১৯৩৭ সালে বাংলা দেশ তথা সারা ভারতে মোটামু ঐ মূল্যেই জিনিসপত্র পাওয়া যাইত।

দেশবিভাগের পর হইতেই বর্ত্তমান ভারত সম্রাট 'বাকব শাহের আমলে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মুল্য ক্রমশঃ বৃ পাইতে থাকে। বর্ত্তমানে দ্রব্যমুল্য দেশের শতকরা জনের ক্রয়ক্ষমতার আয়ত্তের বাহিরে।

২২।১১।৬৩ তারিখে আনন্দবাজার পত্রিকায় নবে ১৯৬২ ও নবেম্বর ১৯৬৩ সালের দ্রব্যমূল্যের যে তালি প্রকাশিত হয় তাহা নিম্নে দেওয়া হইল।

	নবেম্বর ১৯৬২		নবেম্বর ১৯৬৩	
চাউল (মাঝারি)	০.৭৪	(কিঃ)	০.৯৬	(কিঃ)
(সরু)	০.৮১	,,	১.১০	,,
মসুর	০.৮০	,,	০.৯৬	,,
মুগ	০.৮১	,,	০.৯৬	,,
স: তৈল	২.৮০	,,	২.৪০	,,
চিনি	১.১৮	,,	১.২৬	,,
জিরা	৩.৫০	,,	৪.০০	,,
হলুদ	১.৫০	,,	২.০০	,,
লঙ্কা	৩.৫০	,,	৩.৫০	,,
মাংস	৩.৫০	,,	৪.০০	,,

অতীত ও বর্ত্তমানের দ্রব্যমূল্য তালিকা পাশাপাশি রাখিলে দেখা যাইবে যে, দেশবিভাগের পূর্ব্বে জিনিসপত্রের মূল্য খুব ধীরে ধীরে উঠা-নামা করিত, কিন্তু বর্ত্তমানে সকল প্রয়োজনীয় ভোগ্য এবং অন্যান্য পণ্যের মূল্য রকেটের গতিতে উর্দ্ধ মুখে চলিয়াছে। এমন কি যে দ্রব্য সকালে এক টাকায় পাওয়া গেল, সেই দ্রব্যই বৈকালে দেড় টাকার কাঁটা স্পর্শ করিল!

বাকবর-নেহরু অবশ্য বলিয়াছেন এবং এখনও বার বার বলিতেছেন, পুরাতনকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিলে চলিবে না—পৃথিবীতে উন্নত দেশগুলির সমকক্ষ হইতে হইলে আমাদেরও উন্নত এবং উর্দ্ধমুখী হইতে হইবে। এই 'বাকবরী'-আদর্শ রক্ষার কারণই হয়ত দেশের নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য অসম্ভব রকম 'উন্নত' করা হইয়াছে, এবং এ উন্নতি পৃথিবীর উন্নততম দেশগুলিকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে!

দায়ী কে?

ভোগ্যদ্রব্যের অসম্ভব মূল্যবৃদ্ধির জন্য সরকার বাহাদুরের বিশিষ্ট মুখপাত্র মহাশয়গণ দায়ী করিয়া থাকেন কালো-বাজারী এবং মুনাফা-শিকারী ব্যবসায়ীদের। ইহা কেহই অস্বীকার করেন না, কিন্তু ইহাদের দলে সরকারী ব্যবসা সংস্থাগুলিও কি হাত মিলান নাই? যেমন দেখুন:

আমদানীকৃত সুপারি ভারতের মাটিতে যখন পৌছায়:

মূল্য থাকে—	(১০০ কেজি)	৩৭.২০
তাহার পর ইহার উপর চাপে		
আবগারী শুল্ক	(১০০ কেজি)	৩০০.০০
ষ্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশনের		
মুনাফা	(১০০ কেজি)	৬৯.৫০
ব্যবসায়ীর মুনাফা	(১০০ কেজি)	৮.১০
শেষতক ক্রেতার কাছে		————
এই মূল্য দাঁড়ায়	(১০০ কেজি)	৪১৪ টাঃ ৮০ নঃ পঃ

উপরি-উক্ত বিচিত্র মূল্য-তথ্যটি বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রি কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। আদতে আমদানীকৃত যে ভোগ্য-পণ্যের মূল্য থাকে মাত্র ৩৭ টাঃ ২০ নঃ পঃ সরকারী আদায়ী মিটাইয়া ভাগ্যবান ক্রেতাকে সেই পণ্যের মূল্য দিতে হইতেছে মাত্র ৪১৪ টাঃ ৮০ নঃ পঃ!

প্রকাশিত তথ্য হইতে স্পষ্টই দেখা যায়—পণ্যদ্রব্যের উপর কালোবাজারী এবং মুনাফা-শিকারীদের লজ্জা দিয়া সরকার বাহাদুর দ্রব্যমূল্য কোথায় উঠাইতেছেন। ব্যবসায়ী যেখানে লাভ করিতেছেন মাত্র ৮ টাঃ ১০ নঃ পঃ সে-ক্ষেত্রে সরকারী লাভের পরিমাণ কি?

এদিকে সরকার বাহাদুর চাষীদের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া আখের মূল্য মণ-প্রতি ২ টাকা বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং এই কৃপায়-দায় চিনি ক্রেতাদের কিলো-প্রতি ৬ নঃপঃ আরও বেশী দিতে হইবে। চিনির মূল্য বিষয়ে বলিবার কথা এইটুকু মাত্র যে—চিনি যখন খোলা বাজারে বিরল হইল সেই সময় কালোবাজারে ইহার মূল্য দর দাঁড়াইল কিলো-প্রতি ১ টাঃ ২০ নঃ পঃ হইতে ১ টাঃ ২৫ নঃ পঃ পর্য্যন্ত। সরকার বাহাদুর অন্যান্য সকল পণ্যের বেলায় যেমন করিয়াছেন—চিনির মূল্য স্থিতিশীল করিবার অতি মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া চিনির সরকারী মূল্য ধার্য্য করিলেন কিলো-প্রতি ১ টাঃ ২৬ নঃ পঃ! কালোবাজারী এবং মুনাফাশিকারীর দল লজ্জাতে, ভয়ে এবং সরকারের প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় নয়ন মুদিত করিল এবং সেই সঙ্গে নিপীড়িত ক্রেতা-সাধারণও কালোবাজারীদের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিল!

ধুতী-শাড়ীর মূল্যের বেলাতেও একই কথা। এক-জোড়া ধুতীর মিলের দাম যেখানে আজ ১৩৷১৪ টাকা—সেখানে সরকার হইতে এই মূল্যের উপর আবগারী শুল্ক বসানো হইয়াছে প্রায় ৪৷৷-৫৷৷ টাকা! ইহার উপর আছে পাইকার এবং খুচরা বিক্রেতার মার্জিন। এই ভাবে প্রায় সকল অত্যাবশ্যকীয় ভোগ্যপণ্যের উপর সরকার বাহাদুর বিবিধ প্রকার প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষ বিষম কর চাপাইয়া আজ শাকের আঁটিকে মানুষের পক্ষে অসহনীয় বোঝায় পরিণত করিয়াছেন! সরকারের পাঁচ-শালার পরিকল্পনার বেমক্কা খরচার ধাক্কা এই ভাবেই দশ-শালার উপর দিয়া চালাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের অবস্থা আজ সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্গীন—কিন্তু তাহাতে সরকারের কি আসে যায়? তাঁহারা পরমানন্দে বর্ত্তমান মানুষকে সর্ব্বভাবে বঞ্চিত করিয়া সর্ব্বপ্রকারে অভাব-অনাহারে জর্জ্জরিত করিয়া সাধারণ জনের সমাধির উপর দেশের ভবিষ্যৎ তাজমহল রচনায় সুখচিন্তা এবং অবাস্তব পরিকল্পনায় মগ্ন

রহিয়াছেন। আজকের মহান পরিকল্পনা যদি সুদূর ভবিষ্যতে কখনও সার্থকতা লাভ করে তবে তাহার সুফল ভোগ করিতে বর্ত্তমানের নিপীড়িত দুঃখদৈন্য-জর্জ্জরিত মানুষকে নাতি-নাতনী লইয়া কবর হইতে বাহির হইয়া আসিতে হইবে, কারণ আর কিছুদিন এই ভাবে নেহরুর আকাশের পরী ধরার সুখ-কল্পনা বাধাহীন ভাবে চলিতে থাকিলে—দেশ এবং জাতিকে পাতাল প্রবেশ করিতেই হইবে। কেবল বাক্য-বীজ বপন করিয়া বাস্তবে এক কণামাত্র ফসলও পাওয়া যাইবে না।

পূর্ব্ববঙ্গে চীনা আমদানী

শ্রীআবদুল ছোবান নামক একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক পত্র মারফত প্রকাশ করিয়াছেন যে :

"পূর্ব্ববঙ্গে প্রতিদিন পাক প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁ তাঁর দোস্ত লাল চীন হইতে সাদা পোশাক পরিহিত চীনা সৈন্য দলে দলে আমদানী করাইতেছেন। তার কোন খবর আপনারা রাখেন কি? চট্টগ্রাম, ঢাকা ও পূর্ব্ববঙ্গের অন্যান্য বিমান বন্দরের দিকে তাকাইলে ইহা নজরে পড়িবে। চট্টগ্রাম হইতে আগত দুইজন মুসলমান বন্ধুর নিকট জানিতে পারিলাম, চীনারা নাকি ব্যবসায় করিবার জন্য পূর্ব্ববঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বলাবাহুল্য, ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। কারণ, পূর্ব্ববঙ্গ অধিবাসীরা বড়রকমের কোন ব্যবসায় করিবার সুযোগ পায় না। বাঙ্গালীদের ব্যবসায় করিবার কোন লাইসেন্সও দেওয়া হয় না। তা ছাড়া ব্যবসায় করিবার লোকের অভাব পূর্ব্ববঙ্গে নাই। কোন্ মতলবে আয়ুব খাঁ এসব চীনাদের পূর্ব্ববঙ্গে আমদানী করিতেছেন একটু চিন্তা করিলে আপনারাও ইহার গূঢ় রহস্য বুঝিতে পারিবেন। আমি একজন বাঙ্গালী। সেজন্য বাংলার জনসাধারণকে এ বিষয়ে দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করিতেছি। চীনা সৈন্যের পূর্ব্ববঙ্গে প্রবেশের ফলে উভয় বঙ্গেরই বিপদ ঘনাইয়া আসিবে। আয়ুব খাঁ ইচ্ছা করিয়াই এভাবে বাঙ্গালী-নিধন যজ্ঞের ক্ষেত্র রচনা করিতেছে। সময় থাকিতে ভারত সরকার ও বাংলার জনসাধারণ এ বিষয়েও সতর্ক হউন।"

এ-বিষয় পূর্ব্বেও আমরা কিছু কিছু সংবাদ পাই—এবং আশা করি পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারত সরকারও এ-বিষয় অবহিত আছেন। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। পূর্ব্ববঙ্গে ছদ্মবেশে চীনা সৈন্য আমদানী পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে কি বিপর্য্যয় ঘটাইতে পারে, সে বিষয় বাস্তব চিন্তা এবং কার্য্যকর কোন প্রতিবিধান ব্যবস্থা এখন পর্য্যন্ত কিছুই করা হইয়াছে কি না জানা নাই। এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন না করার প্রধান এবং একমাত্র কারণ প্রধানমন্ত্রী নেহরুর অত্যধিক এবং অকারণ পাকিস্তান-প্রীতি। গত কিছু কালের বহু ঘটনা হইতে বার বার প্রমাণিত হইয়াছে যে পাকিস্তান তাহার ইচ্ছা এবং মেজাজমত ভারতকে লাথি, চড়, কিল, জুতা যখন যাহা মারিয়া যাইতেছে এবং আমাদের তরফ হইতে একমাত্র প্রতিবাদ, ভীষণ প্রতিবাদ এবং আরো আরো হাজারো রকমের প্রতিবাদ ছাড়া আর কোন অস্ত্রই প্রয়োগ করা হইতেছে না। মধ্যে মধ্যে পাকিস্তানের সঙ্গে নানা প্রকার তথাকথিত চুক্তিও হইতেছে এবং এ সকল চুক্তি হইতেছে পাকিস্তানকে কেবলমাত্র চুক্তি-ভঙ্গ-খেলার সুযোগ দিবার জন্যই! ভারতের ক্লীব নীতির জন্যই পাকিস্তানের বেয়াদব আয়ুব খাঁ আজ ভারত সম্পর্কে এমন অবহেলা এবং অবমাননার ভাব দেখাইতে সাহস পাইয়াছে।

সীমান্তে অযথা গুলী বর্ষণ, ভারতীয় নাগরিক খুন-জখম, গো-মহিষাদি পশু চুরি, ক্ষেতের ফসল কাটিয়া লওয়া, বিমানে ভারত আকাশসীমা লঙ্ঘন, আজ ত একটা রুটিন-মাফিক কার্য্যে পরিণত হইয়াছে! রাজশাহীতে ভারতীয় হাই কমিশনের আপিস পাকিস্তান গায়ের জোরে বন্ধ করিয়া দিল—ইহার বিরুদ্ধে আবার সেই নেহরুসুলভ ভীষণ প্রতিবাদ মাত্র। পাল্টা জবাবে শিলং-এ পাকিস্তানী হাই কমিশনের কার্য্যালয় বন্ধ করিয়া দিবার কথা উঠিল—কিন্তু ভারত সম্রাট নেহরু বলিলেন 'না'—আমরা ঘৃণা এবং হিংসার পরিবর্ত্তে প্রেম এবং ক্ষমার দ্বারাই পাকিস্তানের হৃদয়-মন ভিজাইব, তাহার চিত্ত জয় করিব!" অতএব শিলং-এ পাকিস্তানী হাই কমিশনে পাকিস্তানী চরদের কার্য্যকলাপ অবাধে চলিতে থাক! নেহরুর এই 'পেলেন্স' খেলার শেষ কোথায়? শেষ-পরিণতি দেশের পক্ষে কি ট্র্যাজেডির দৃশ্য দেখাইবে?

পূর্ব্ব-পাকিস্তানে যখন সাধারণ নাগরিক-বেশে চীনা সৈন্য আমদানী চলিতেছে প্রতিদিন, সেই সময় আমাদের এ-দিকে কি ঘটিতেছে :

"কেন্দ্রের এবং বিভিন্ন রাজ্যের গোয়েন্দা-দপ্তর বুঝিতে পারিয়াছেন, ভারতের বহু উচ্চপদস্থ সামরিক ও অসামরিক কর্ম্মচারীর ড্রাইভার খানসামা ও ভৃত্য হিসাবে নিযুক্ত বিশেষ এক সম্প্রদায়ের লোক পাকিস্তান ও চীনের পক্ষে গুপ্তচরের কাজ করিতেছে। কয়েকদিন আগে তেজপুরের একটি সংবাদেও প্রকাশিত হইয়াছে যে, ঠিকাদারদিগের নিযুক্ত পাকিস্তানী ভৃত্য ও কর্ম্মচারী নেফা-সীমান্তে ঘুরিবার সুযোগ পাইয়া পাকিস্তানের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তি করিবার সুযোগ পাইতেছে। কিন্তু বুঝিতে পারিতেছি না, এই শ্রেণীর ব্যক্তিদিগের গুপ্তচরবৃত্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে গোয়েন্দা-বিভাগের অক্ষমতার কি কারণ থাকিতে পারে? যে-সকল সামরিক ও অসামরিক সরকারী কর্ম্মচারী ভৃত্য নিয়োগের ব্যাপারে কোন সতর্কতার ধার ধারেন না, তাঁহাদের মনোবৃত্তিকে সন্দেহ করিবার যুক্তি আছে। সরকারী নির্দ্দেশে তাঁহাদিগকে সতর্ক হইতে বাধ্য করা কর্ত্তব্য এবং গোয়েন্দা-বিভাগের পক্ষেও কোন অসুবিধা বা দুরূহতাকে তাঁহাদের অক্ষমতার কৈফিয়ৎ হিসাবে ব্যবহার করা উচিত নহে। গোয়েন্দা-বিভাগকে এ বিষয়ে কঠোরভাবে কর্ত্তব্যে তৎপর হইতে হইবে, যে-সব রন্ধ্রে শনির প্রবেশের সম্ভাবনা আছে, তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়াই সার্থক সতর্কতা। ভারতীয় সরকারী কর্ম্মচারীদের অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের সুযোগ লইয়া পাকিস্তানের পক্ষের গুপ্তচরবৃত্তিকে সক্রিয় হইতে দেওয়া চলে না। নির্ভরযোগ্য সম্প্রদায়ের লোকদিগকে ছাড়া অন্য কাহাকেও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীর ভৃত্য হওয়া নিষিদ্ধ করাই প্রয়োজন। সবার আগে জাতির বৃহত্তর স্বার্থ ও নিরাপত্তার প্রয়োজন বিবেচনা করিতে হইবে।"

পশ্চিমবঙ্গেই এ-সমস্যা গুরুতম এবং সেই কারণে অদূর ভবিষ্যতে বিপদের সম্ভাবনাও খুব বেশী। কিন্তু বাস্তবে কি দেখিতেছি? সবার আগে জাতির বৃহত্তর স্বার্থ ও নিরাপত্তার প্রয়োজন ভাবিতে হইবে—ইহা অবশ্যস্বীকার্য্য হইলেও আজ ইহা অপেক্ষাও বহুগুণে বড় কথা, ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পদাধিকারী ব্যক্তিটির প্রেষ্টিজ এবং বাহিরের জগতে শান্তি-ও-মৈত্রীর-পরম-ধারক-ও-বাহক বলিয়া খ্যাতি সর্ব্বাগ্রে দেখিতে এবং রক্ষা করিতে হইবে! আমরা বুঝিতে পারিতেছি না—'ভারতের সেবক প্রধানমন্ত্রী নেহরু', না, 'প্রধানমন্ত্রী নেহরুর আজ্ঞাবহ সেবক ভারত।' বাস্তবে মনে হয় শেষোক্ত কথাটিই আজ সত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সংবাদপত্র ব্যবসায়ে একচেটিয়া মালিকানা

সংবাদপত্র ব্যবসায় সম্পর্কে শ্রী নেহরু বলিতেছেন যে, বড় বড় সংবাদপত্রগুলি আজ এক-একটি বৃহৎ কারবারে পরিণত হইয়াছে এবং বৃহত্তর শিল্পপতিদের দ্বারাই চালিত হইতেছে এবং ক্রমশঃ এই ব্যবসায়ে একচেটিয়া মালিকানাও গড়িয়া উঠিতেছে। সত্য কথা। কিন্তু এই একচেটিয়া মালিকানা মনোভাব আমাদের প্রধানমন্ত্রীর আদর্শ অনুকরণেই হইতেছে। নেহরু স্বয়ং যদি ভারতের তথাকথিত ডিমোক্র্যাসীর, এবং অন্যান্য সকল গুণের তথা রাষ্ট্রশাসন ক্ষমতার, পাবলিক সেক্টার কলকারখানার এবং ন্যায়-অন্যায় বিচারের সোল মনোপলী হোল্ডার অর্থাৎ ধারক হইতে পারেন—তাহা হইলে সংবাদপত্রের বেলায় তাঁহার এত আপত্তি কেন?

হরতন

শ্রীবিমল মিত্র

১৯

ভাদ্র মাসটাই যাত্রাদলের খারাপ মাস। তখন তেমন পুজো-টুজোও কোথাও থাকে না। বিয়ে-সাদিও হয় না সে-সময়ে। যাকে বলে মল মাস, ভাদ্র মাসটাই আসলে তাই। সে-সময়ে চণ্ডীবাবুর দল আবার চিৎপুরের অফিসে ব'সে কেবল চেয়ার-টেবিলে ধুনো গঙ্গাজল ছিটোয়। তখন আবার গণেশের কপালে ফুল-চন্দন জোটে।

চণ্ডীবাবু চেয়ারে চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে বাইরের দিকে চেয়ে দেখছিল এক-একবার।

চণ্ডীবাবু বলে—এবার দল তুলে দেব রে ফটিক—

ফটিক তামাক সাজতে সাজতে বলে—আর ত ক'টা দিন অধিকারী মশাই, আর ক'টা দিন দেখুন না—

—আরে দুর, একটা পয়সা আমদানী নেই, খাবার বেলায় অনেকগুলো পেট—

ফটিক বলে—আজ্ঞে আমি ত ক'দিন ধরেই খাচ্ছি নে—

—কেন? খাচ্ছিস্ নে কেন?

চণ্ডীবাবু ফটিকের দিকে চাইলে। এই ফটিকটার কপালে যেমন বকুনিও জোটে, আবার স্নেহও তেমনি কম জোটে না। ফটিক তা জানে। নইলে এত কাল ধরে ফটিক আছেই বা কেন এ-দলে।

—কেন? তোর আবার কি হ'ল? তুই আবার খাচ্ছিস্ না কেন?

ফটিক বললে—আজ্ঞে আমদানী-টামদানী কিছু নেই—

—তা আমদানী নেই বলে তুই খাবি নে? এত দয়া আমার ওপর?

—আজ্ঞে, দয়া নয়—

—তবে? দয়া নয় ত কি?

ফটিক বললে—আজ্ঞে, আমি ত দেখতে পাচ্ছি দলের অবস্থা—

—ছাই দেখতে পাচ্ছিস্! তুই কি ভেবেছিস্ তুই না-খেয়ে আমাকে কৃতার্থ করে দিবি? তুই ভেবেছিস কি?

ফটিকের মুখে আর তখন কথা নেই। চণ্ডীবাবু যখন রেগে যায় তখন আর কথা না-বলাই নিয়ম। রেগে গেলে অধিকারী মশাই কি করে বসে তার ঠিক নেই।

—তুই ভেবেছিস তুই আমার এখানে না খেয়ে-খেয়ে মরবি আর আমি তাই দেখব? আমাকে তেমনি আহাম্মক পেইছিস? বল্, কথা বলছিস্ না কেন? কথা বল্? আমাকে তেমনি আহাম্মক পেইছিস্?

ফটিক যেমন কলকেতে ফু দিতে যাচ্ছিল তেমনি ফুঁ-ই দিতে লাগল। রা-টি করলে না।

—আজ সকালে কি খেইছিস? সকালে? কথা বল্, উত্তর দে—

—আজ্ঞে, বাতাসা-মুড়ি!

—ক'পয়সার বাতাসা-মুড়ি?

—আনা আষ্টেকের।

চণ্ডীবাবু একটু শান্ত হ'ল। জিজ্ঞেস করলে—আনা আষ্টেকের বাতাসা-মুড়ি তুই একলা খেলি? তবু বলছিস তুই কিছু খাস্ নি? আর তার পর? ভাত খাস্ নি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, খেইছি!

—ভাতও খেইছিস? ভাত কি কম পড়েছিল?

—আজ্ঞে না, ভাত কম পড়বে কেন, তরকারি কম পড়েছিল।

—কিসের তরকারি?

—আলু-পটলের তরকারি।

—কম পড়েছিল কেন? পকেটে পয়সা ছিল না?

ফটিক বললে—আজ্ঞে তা নয়, ভেবেছিলাম ইলিশ মাছ দিয়ে খাব, তাই আর তরকারি নিই নি—

—তা ইলিশ মাছ খেলি নে কেন?

—আজ্ঞে মাংস হয়েছিল যে। মাংস ফেলে কি মাছ খাব?

চণ্ডীবাবু আর থাকতে পারলে না। বললে—বেটা তুমি আলু-পটলের তরকারি খেয়েছ, ইলিশ মাছ খেয়েছ,

মাংস খেয়েছ তবু বলছ তোমার খাওয়া হয় নি? তুই বেটা রাঘব-বোয়াল এসেছিস আমার দলে। তুই নিজেকেও খাবি, আমাকেও খাবি—

—না, আজ্ঞে, সত্যি বলছি, খেয়ে আমার সুবিধে হয় নি।

—কেন, সুবিধে তোর কিসে হবে? কবে হবে? আমাকে খেলে তবে তোর সুবিধে হবে ত আমাকেই খা—খা আমাকে—

ফটিক এবার ভয়ে ভয়ে উঠে দাঁড়াল।

বললে—আপনি খামোকা চটছেন কেন?

—চট্‌ব না? আহাম্মকের মতন কথা বললে চটব না? পেট-ভরে খেয়ে-দেয়ে এসে এখন আমার কাছে ছিঁচ্‌কাঁদুনি গাওয়া হচ্ছে তুমি কিচ্ছু খাও নি?

ফটিক বললে—আজ্ঞে, খাওয়াটা আমার হ'ল কোথায় বলুন তাই?

—কেন, অত খেয়েও তোমার পেট ভরল না? তুমি কি বৃকোদর বাপু? তুমি যদি বৃকোদর হও বাপু ত তোমার ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে জন্ম নেওয়া উচিত ছিল, আমার যাত্রাদলে তামাক সাজতে আসা উচিত হয় নি। কিসে তোমার খাওয়াটা হ'ল না শুনি!

—আজ্ঞে আমি ত খাচ্ছিলাম মাংস দিয়ে—

—তারপর?

—শেষকালে খাওয়া যখন হয়ে এসেছে তখন হোটেলের ম্যানেজারবাবু বললেন কিনা গল্‌দা চিংড়ির কালিয়া করেছে!

—য়্যাঁ! তুই গল্‌দা চিংড়ির কালিয়াও খেলি নাকি?

চণ্ডীবাবুর তখন অগ্নিশর্ম্মা অবস্থা। ফটিককে এই মারে ত সেই মারে।

ফটিক তাড়াতাড়ি বলে উঠল—আজ্ঞে না, খাই নি। মাইরি বলছি অধিকারী মশাই, খাই নি—আপনার পায়ে হাত দিয়ে দিব্যি গালছি, খাই নি—

—তা কে তোমায় সেটা গিলতে মাথার দিব্যি দিয়ে বারণ করেছিল? গিললে না কেন?

—সেই কথাই ত আমি ম্যানেজারবাবুকে বললাম, আজ্ঞে। আমি বললাম—গল্‌দা চিংড়ির কালিয়া আছে তা পূর্ব্বাহ্ণে আমাকে বললেন না কেন? তা হ'লে আমি আলু পটল ইলিশ মাছ দিয়ে পেট ভরাতাম না মিছিমিছি—

চণ্ডীবাবু পকেট থেকে ঝনাৎ করে একটা আধুলি বার করে সামনের মেঝেতে ফেলে দিলে। বললে—যা, এখন গিয়ে সেটা খেয়ে আয়—

ফটিক কিন্তু কিন্তু হয়ে বললে—না হুজুর, থাক—

—না, থাকবে না, শেষকালে সারারাত তোমার ঘুম হবে না রাত্তিরে, তখন আমাকে জ্বালিয়ে খাবে। যা, খেয়ে আয় গে—

ফটিক তবু নড়ে না। বলে—না, দলের আমদানী নেই—

—তোকে আর দলের আমদানীর কথা ভাবতে হবে না, আমি একলাই যথেষ্ট। যা—

—তা হ'লে বলছেন, যাব?

—হ্যাঁ, যা তুই, গিলে আয়—

ফটিক হুঁকোটা এগিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি আধুলিটা কুড়িয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ দরজা দিয়ে বঙ্কুকে ঢুকতে দেখে অবাক্!

—আরে, বঙ্কুদা?

চণ্ডীবাবুও অবাক্ হয়ে গেছে। বঙ্কুর চুল উস্কো-খুস্কো। বঙ্কুর চেহারাটাও অর্দ্ধেক শুকিয়ে গেছে। যেন অনেক দিন খায় নি, ঘুমোয় নি।

—কি গো? কি খবর তোমার, বঙ্কুবাবু? রঞ্জনা বেঁচে আছে, না পটল তুলেছে?

কথাগুলো বলতে পেরে যেন বড় মজা পেলে চণ্ডীবাবু। যেন অনেক দিনের ক্ষোভ আজ বঙ্কুকে সামনে পেয়ে মিটিয়ে নিলে।

—আমি তখনই বলেছিলুম বাবা যে যাচ্ছ যাও, কিন্তু ও হ'ল রাজরোগ, ও সারে না। ও-রোগ একবার যাকে ধরেছে, তার আর ছাড়ান-ছোড়ন নেই। তুমি গেলে আর আমাকেও মেরে গেলে। এখন যে তুমি এসে বলবে একটা চাকরি দিন আমাকে অধিকারী মশাই, আমি আবার এ্যাক্টো করব, তা ত দিতে পারব না—

ব'লে ভুড়ুক করে একবার হুঁকোয় টান দিয়ে বঙ্কুকে দেখিয়ে দেখিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল চণ্ডীবাবু। বঙ্কু

তখনও কিছু বলছে না। শুধু শুকনো মুখে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

সেদিকে তাকিয়ে চণ্ডীবাবু আবার বললে—কি, তখন তাই বলি নি তোমায়? উত্তর দিচ্ছ না কেন? কথার জবাবটা দাও! তখন ভাবলে চণ্ডীবাবু আর কতটুকু জানে আর কতটুকুই বা দেখেছে। তখন ভাবলে জমিদার বাড়ীতে যখন যাচ্ছি তখন চর্ব্যচোষ্য-লেহ্যপেয় খাব আর আয়েস করে স্ফূর্ত্তি করব! বলি পীরিত এখন ঘুচল ত? সেই জন্যেই ত কথায় আছে—খাবার খাবে চেখে আর পীরিত করবে দেখে।—

তখনও বন্ধু কথা বলে না।

—তা তোমার বাক্স-প্যাঁটরা কোথায়? সে-সব আন নি? না কি তাও ফেলে এসেছ মনের দুঃখে? অতই যদি মনের দুঃখ ত আবার চাকরি করবার সখ কেন? পেটের কথা ভেবেই ত এয়েছ? ওই একটা জিনিষ বাপু। সেই জন্যেই ত ভগবান্‌কে বলি। বলি—আর যা-কিছু দিয়েছ বেশ করেছ, পোড়া পেটটা দিলে কেন মরতে? ওই পেটটা না-থাকলে ত ইহকালের সব ল্যাঠা চুকে যেত! তোমাকেও আর চাকরির জন্যে আমার দ্বারস্থ হতে হ'ত না, আমাকেও আর এই ভাঙা দল নিয়ে বুড়ো বয়সে টো-টো করে কাঁহা-বাঁকুড়া আর কাঁহা-গৌহাটি করতে হ'ত না—

ব'লে আবার ভুড়ুক্ ক'রে এক টান দিলে হুঁকোয়।

তারপর হঠাৎ একটা মহা অপরাধ করে ফেললে চণ্ডীবাবু।

বললে—তা ভাল করে পুড়িয়েছ ত বাপু মেয়েটাকে? জলে ভাসিয়ে দাও নি ত······

কথাটা শেষ হবার তর সইল না। বন্ধু বোধ হয় এতক্ষণ রাগে ফুলছিল। একেবারে বিদ্যুতের গতিতে সামনে এসেই চণ্ডীবাবুর মুখের ওপর একটা প্রচণ্ড ঘুঁষি মারলে। আর মারবার সঙ্গে সঙ্গে হুঁকোসুদ্ধ চণ্ডীবাবু চেয়ার থেকে ছিট্‌কে পড়ে গেল মেঝের ওপর। কিন্তু তবু বোধ হয় রাগ গেল না বন্ধুর। আবার সেই মরার ওপর খাঁড়ার ঘা মারবার জন্যে এগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই পেছনে ফটিক এসে গেছে।

ফটিক ব্যাপারটা দেখেই চমকে উঠেছে।

—তুমি করলে কি বন্ধুদা? অধিকারী মশাইকে মারলে তুমি?

বন্ধুর তখনও রাগ যায় নি। তখনও রাগে ফুলছে সে।

—রাগব না? এত বড় মিথ্যেবাদী!

—কেন, মিথ্যে কথাটা কি বললেন তোমায়?

—আমি খুন করে ফেলি নি এই-ই যথেষ্ট, আবার আমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছে! আমি যেন ওর চাকরি করতে এখানে এসেছি! চাইনে আমি চাকরি, চাকরির দরকার নেই আমার—

কিন্তু চণ্ডীবাবুর তখন অবস্থা বেশ সঙ্গীন। সেই মেঝের ওপর শুয়ে শুয়েই কাত্‌রাচ্ছেন। বোধ হয় কথা বলবারও ক্ষমতাটুকু নেই। কথা বলবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু পারছেন না। কথা বলবার চেষ্টা করতে গিয়ে গোঙাচ্ছেন।

—এখন কি হবে!

ফটিক গল্‌দা চিংড়ির কালিয়া খেয়ে এসেছে তখুনি, কিন্তু এই কাণ্ড দেখে খাওয়ার আনন্দটা যেন সমস্ত মাটি হবার যোগাড়। কি করবে সে তাই-ই বুঝতে পারলে না।

পাশের ঘরের লোকরা বোধ হয় শব্দ পেয়েছিল। এতক্ষণে তারা দৌড়ে এল।

—কি হ'ল? চণ্ডীবাবুর কি হ'ল? পড়ে গেলেন নাকি?

শেষকালে অনেক লোক জমে গেল ঘরে। ছোট ছোট ফালি ফালি ঘর পাশাপাশি। তারা সবাই জিজ্ঞেস করলে—কি হ'ল ফটিক? চণ্ডীবাবুর কি হ'ল? একটা ডাক্তার ডাক না—

কথাটায় যেন এতক্ষণে খেয়াল হ'ল ফটিকের। তাড়াতাড়ি একতলায় ছুটল ডাক্তার ডাকতে।

বহুদিন দেশের বাইরে ছিল দুলাল সা'র ছেলে। ছোট-বেলাতেও বাবার কাছে থেকে লেখাপড়া করে নি সে। কলকাতায় কলেজে লেখাপড়া করেছে। কোথা থেকে তাদের আয় হয়, কি তাদের ব্যবসা তা খোঁজ রাখার সুযোগও পায় নি, সে-খবর তাকে জানানও হয় নি।

এমনি করেই কলেজে ঢুকেছে, ডাক্তারি পড়েছে। তার পর একদিন টেলিগ্রাম পেয়ে বিয়েও করতে এসেছে।

দুলাল সা তাকে বলেছিল—তোমাকে এবার বিয়ে

করতে হবে বাবা ; তোমার মা নেই, আমিও আর বেশি দিন নেই—

যাকে বিয়ে করছে, তাকে কেমন দেখতে, তাদের বংশ-পরিচয় কি, তা নিয়ে তার মাথাব্যথা করবার দরকার হয় নি। স্কুলে-কলেজে যেখানেই থেকেছে লেখাপড়া নিয়েই সময় কাটিয়েছে। নিতাই বসাক মাঝে মাঝে গিয়ে হোস্টেলে তার সঙ্গে দেখা করত। দুলাল সা'রও ভয় ছিল। কলকাতা শহর বলে কথা। দাঙ্গা, হরতাল, গণ্ডগোল লেগেই আছে কলকাতা শহরে। কিন্তু নিতাই বসাক যতবার গিয়েছে ততবার দেখে এসেছে, বিজয় তার লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত। অন্য ছেলেরা যখন খেলা, সিনেমা, রাজনীতি নিয়ে মেতেছে, বিজয় তখন তার বই নিয়েই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে।

নিতাই বসাক গিয়ে জিজ্ঞেস করত—তোমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না ত? অসুবিধে হ'লে বলবে আমাদের—

বিজয় বলত—আমার কিছু অসুবিধে হচ্ছে না—

—টাকা-কড়ি দরকার হলে ব'লো—

—টাকা ত রয়েছে আমার কাছে—

—আর কিছু টাকা নেবে?

বিজয় বলত—দরকার হ'লে চেয়ে নেব—

কিন্তু দরকার তার কখনও হয় নি। যে-টাকাটা যেত তার কাছে তাও পুরো খরচ হ'ত না। খরচ করবার কিছু ছিল না।

দুলাল সা নিতাই বসাককে জিজ্ঞেস করত—কি রকম দেখে এলে? সিগারেট বিড়ি-টিড়ি ধরেছে নাকি—

নিতাই বসাক বলত—ধরে নি ত দেখে এলাম—

—আড়ালে-টাড়ালে খায়?

—তাও খোঁজ নিয়েছিলাম, কিছু ত টের পেলাম না।

ভাল ভাল! কিন্তু তবু মন থেকে সন্দেহ যেত না দুলাল সা'র। আজকালকার যুগে এ আবার কেমন ছেলে। এতখানি যে বিশ্বাস করতেও ভয় হয়।

ছেলে ছুটিতে বাড়ীতে এলে লক্ষ্য রাখত। কাছারি-বাড়ীতে কাছে বসিয়ে উপদেশ দিত। বিজয় শুনত সব বাপের কথা। প্রতিবাদ করত না। দেখে-শুনে দুলাল সা মাঝে মাঝে হতাশ হয়ে পড়ত। এ-ছেলে কি তার এত বড় সম্পত্তি রাখতে পারবে? দুলাল সা-ও চিরকাল থাকবে না। নিতাই বসাকও চিরকাল থাকবে না। চিরকাল থাকবার জন্যে কেউই আসে নি এখানে। একদিন ত যেতেই হবে সকলকে। তখন? তখন এত ভাল মানুষ হ'লে সম্পত্তি রাখা যাবে? এটা কি ভাল-মানুষির কাল? এ-যুগে ভাল-মানুষরাই ত ঠকে। ভাল-মানুষকেই ত সবাই ঠকিয়ে নেয়।

বিজয়কে বলত, বুঝলে বাবা, সংসারে সবাই ত ধর্ম্ম করতে আসে নি—ঠগ্ জোচ্চোর বদ্মাইসদের রাজ্য এটা, এখানে টিঁকে থাকতে গেলে একটু বুদ্ধি খরচ করতে হবে বাবা—তোমাকে ঠকাবার জন্যে সব লোক ওৎ পেতে বসে আছে, তা জান ত?

বিজয় বলত, হ্যাঁ—

—তবে? তবে কেন সব বুঝেও এমনি করে চুপ করে সব শোন? সেদিন যে লোকটা টাকা দিতে পারবে না বলে কান্নাকাটি করছিল, তার কথায় তুমি কেন অমন করে গলে গেলে?

ঘটনাটা মনে ছিল না বিজয়ের। জিজ্ঞেস করলে—কোন্ লোকটা?

—ওই দেখ, সেটাও তোমার মনে নেই। সমস্ত কিছু মনে রাখতে হবে বাবা। ভালকেও মনে রাখতে হবে, মন্দকেও মনে রাখতে হবে। সাবধানের মার নেই জগতে। তুমি একটু অসাবধান হয়েছ কি লোকে তোমাকে চাঁটি মেরে যাবে, বুঝলে? এই-ই জগৎ। আমি তোমার মত অত বই পড়ি নি, কিন্তু ভগবান্ যে-বুদ্ধি দিয়েছেন সেই বুদ্ধি খাটিয়েই এই বাড়ী-ঘর-গাড়ি-সুগারমিল এই যাবতীয় সম্পত্তি যা-কিছু দেখছ, সমস্ত করেছি। ওই কর্ত্তামশাই আমাকে কম ঠকাতে চেয়েছিল! আমাকে কত রকমে বানচাল করে দিতে চেয়েছিল তা ত তুমি জান না। কিন্তু আমি কি ঠকেছি? ঠকি নি। ঠকি নি বলেই এখনও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছি এমনি করে—

এমনি কত উপদেশ, কত সাবধান-বাণী শুনিয়েছে দুলাল সা। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নি। বিজয় ঠিক তেমনি আছে। বিলেত থেকে ফিরেও তার কোনও পরিবর্ত্তন হয় নি। দুলাল সা ভেবেছিল, ছেলে বিলেত থেকে সাহেব হয়ে ফিরবে। কিন্তু কিছুই না। লাজুক-গোবেচারা মানুষ। এতদিন সেখানে কাটিয়েও সেই মুখচোরা মানুষই রয়ে গেল।

ছেলে বলেছিল, একটা ডিস্পেন্সারি করে আমি দেশেই প্র্যাক্টিস্ করব বাবা—

—তা কর না। প্র্যাক্টিস্ কর! কত কি নেবে?

—কিছু নেব না, টাকার ত আমাদের দরকার নেই—

এই রে! কথাটা শুনেই দুলাল সা'র মাথায় বজ্রাঘাত হ'ল। এই সব দুর্ব্বুদ্ধি মাথায় ঢুকেছে। এই রকম করলে এ-সম্পত্তি কি আর থাকবে শেষ পর্য্যন্ত!

—টাকা নেবে না? কেন?

—এ দেশে ত সবাই গরীব!

দুলাল সা বললে, গরীব? গরীব তুমি কোথায় দেখলে?

—গরীব না হ'লে ওদের ভাল জামা-কাপড় নেই কেন? ওদের স্বাস্থ্য ভাল নয় কেন?

দুলাল সা মুশকিলে পড়ল। বিলেতে গেলে ছেলেরা যে এমন হয় তা আগে জানত না। বিজয়ের মতি-গতি দেখে বড় দুর্ভাবনা হ'ল দুলাল সা'র। একদিন নিতাই বসাককে কাছে ডাকলে। কাছে ডেকে সব বুঝিয়ে বললে।

নিতাই বসাক বললে, ও তুমি কিছু ভেব না, আমি সব ঠিক করে দেব—

—কি করে ঠিক করে দেবে?

—সে তোমাকে এখন বলব না—

এই পর্য্যন্তই হয়ে ছিল। এমন সময় পুলিসের দারোগা আসায় সব গণ্ডগোল হয়ে গেল। এতদিনকার সব আয়োজন এখন বুঝি সব পণ্ড হয়ে যায়। কোথাকার কে সদানন্দ এমন করে সব ভণ্ডুল করে দিয়ে যাবে কে জানত। নিতাই বসাক ভেবেছিল, সদানন্দকে সরিয়ে ফেলে দিলেই বুঝি ধুয়ে-মুছে সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। সদানন্দই একমাত্র সমস্ত ব্যাপারটা জানত, তাকে যদি এ-পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া যায় তা হ'লে আর দুলাল সা'র বংশের কোনও কলঙ্ক প্রকাশ হয়ে পড়বার ভয় থাকবে না। কিন্তু সেই দোলগোবিন্দ যে আবার সব প্রকাশ করে দেবে তা কারও মাথায় আসে নি।

তখনও পুলিস-দারোগা সবাই দাঁড়িয়ে আছে।

দুলাল সা নতুন বৌ-এর দিকে চেয়ে বললে, তুমি আবার এখানে কেন এলে মা? তুমি নিজের কাজ করগে যাও না, বিজয় কি ঘুম থেকে ওঠে নি?

নতুন বৌ সে কথার উত্তর না দিয়ে বললে, দারোগাবাবু, আপনি আমার সম্বন্ধে কি বলেছেন আমি আড়াল থেকে শুনতে পেয়েছি—

—তুমি আবার কি শুনেছ? দারোগাবাবু ত তোমার কথা কিছু বলেন নি!

—না বাবা, আমি সব শুনেছি, আমি তবু আর একবার শুনতে চাই—আমার বংশ-পরিচয় নিয়ে যদি কোনও কথা উঠে থাকে তা শোনবার অধিকার আমার আছে—

দারোগাবাবুর দিকে চেয়ে নিতাই বসাক বললে, আপনি বাইরে চলুন দারোগাবাবু, বাইরে আপনার সঙ্গে কথা বলব—

দুলাল সা বললে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই-ই চল, তুমি ভেতরে যাও নতুন বৌ, আমি আসছি—

নতুন বৌ সোজা এসে দারোগাবাবুর সামনে পথ আটকে দাঁড়াল।

বললে, না, আপনাকে আমার সামনেই বলে যেতে হবে—

দুলাল সা বললে, তুমি মেয়েমানুষ, আবার এর মধ্যে কেন থাকবে নতুন বৌ—?

নতুন বৌ বললে, না, আমি নিজের কানে শুনতে চাই, আমি জেলের মেয়ে কি না।—আমি শুনবই, নইলে এখান থেকে আপনাদের যেতে দেব না—

ক্রমশঃ

আর্থিক

শ্রীচিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

জাতীয় আয়ে কৃষিজ পণ্যের অংশ

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রায় তিন বছর অতিবাহিত হবার সুরুতে পরিকল্পনার সাফল্য সম্বন্ধে দেশব্যাপী যে বিশ্লেষণ ও সমালোচনা সুরু হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে, এত বছরের বহুমুখী চেষ্টার পরও কৃষিজ পণ্য উৎপন্ন আশানুরূপ হচ্ছে না, ফলে মোট জাতীয় আয়ও যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাচ্ছে না।

মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্য নির্ধারণ করার সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে "চাহিদা এবং সরবরাহের অবাধ গতি."— এই নীতি বিশ্বব্যাপী মন্দার দিনেই ধনতান্ত্রিক দেশগুলিও প্রায় পরিত্যাগ করেন; বিশেষ করে কৃষিজ পণ্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ফলে সব দেশেই আর্থিক কাঠামোতে যে অদল-বদল ঘটে, তার জের সামলে পুনর্গঠনের কাজে সকলে যখন লিপ্ত হলেন তখন কৃষিপণ্যের মূল্য নির্ধারণের প্রশ্নটি নতুন করে আবার দেখা দিয়েছে। Freedom from Hunger আন্দোলনে আজ পৃথিবীর সব দেশ যোগদান করেছেন, জনসংখ্যা বৃদ্ধিও অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলেছে, তা সত্ত্বেও আমাদের মত কৃষিনির্ভর "অনুন্নত" দেশে এবং আমেরিকার মত সম্পদশালী দেশে একই সমস্যা ভিন্ন আকারে বিদ্যমান। অতিরিক্ত উৎপাদন করে কৃষকগোষ্ঠী বিপন্ন, বাজার দর স্থির করার ক্ষমতা কৃষকের নাগালের বাইরে। আমাদের দেশে এখনও বহুলোক অর্ধাহারে থাকছে; বিংশ শতাব্দীর শেষেও এক-তৃতীয়াংশ লোক যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য পাবে না ঐ রকম অনুমান করা হচ্ছে; তা সত্ত্বেও কৃষিপণ্যের, বিশেষতঃ খাদ্যশস্যের মূল্য নিয়ে প্রতি বছরই কৃষকদের উদ্বেগের সীমা নেই। গত বার বছরে খাদ্যশস্যের মূল্যের যেরকম উত্থান-পতন হয়েছে, তার থেকেই দেখা যায় যে, আমাদের দেশে সমস্যাটি খুবই প্রবলভাবে বিদ্যমান। বহির্জগতের প্রভাবমুক্ত হয়ে কোন দেশের অর্থ নৈতিক কাঠামো আজকাল থাকতে পারে না, মূল্যমানও তেমনি বহুপ্রকারে জড়িত হয়ে আছে বহির্জগতের সঙ্গে। রপ্তানীযোগ্য, বৃহৎ শিল্পাশ্রয়ী কৃষিপণ্যের সমস্যা এবং আভ্যন্তরীণ ব্যবহারে প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যের সমস্যা প্রায় বিপরীত, কিন্তু যেদেশে জমির পরিমাণ স্বল্প, কৃষিকার্য এখনও প্রায় সম্পূর্ণরূপেই প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল, অগণিত কৃষকগোষ্ঠী স্বল্পপ্রধান হয়ে পরস্পরের সঙ্গে যোগবিহীন, বিচ্ছিন্ন অবস্থায় চাষের কাজে লিপ্ত এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতির কাঠামো থেকে বেরিয়ে এসে বাণিজ্যিক লেনদেনের উত্থান-পতনের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছে, সেদেশে মূলতঃ কৃষকগোষ্ঠীর সমস্যা একটিই; উৎপাদন যা করা হচ্ছে তার মূল্যনিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষমতা তাদের হাতে নয়। এরই সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি, ঘাটতি বাজেটের ও ট্যাক্স বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা, জনসাধারণের খাদ্য-তালিকার পরিবর্তন, সঙ্ঘবদ্ধ শিল্পপতিদের বাজার দর নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা, অনাবৃষ্টিজনিত অনিশ্চয়তা, রপ্তানীযোগ্য কৃষিপণ্যের মূল্য সম্বন্ধে অসহায়তা, জমির মালিকানা সম্বন্ধে বেশির ভাগ কৃষকের পরনির্ভরশীলতা ইত্যাদি।

এই বিবিধ সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারকে কৃষিপণ্য মূল্যের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কথা বিচার করতে হচ্ছে। কৃষিপণ্যের মূল্য যদি "Producer oriented" করতে হয়, তা হ'লে প্রথমতঃ সেই মূল্যের লভ্যাংশ কার হাতে যাচ্ছে এই প্রশ্ন আসে, দ্বিতীয়তঃ কৃষকেরা তাদের নিত্যব্যবহার্য পণ্যাদি (non-agricultural products) কি দরে কিনছে এই প্রশ্নটি আসে। Price Support Policy এযাবৎ বহু দেশেই পরীক্ষিত হয়েছে। সাম্প্রতিক FAO

Report-এ দেখা যায় যে, বিভিন্ন দেশে তার বিভিন্ন রকম প্রতিক্রিয়া হয়েছে ; যে সব দেশ প্রধানতঃ কৃষিপণ্য রপ্তানী করে, তাদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে কৃষকেরা যে হারে বর্ধিত মূল্য পাচ্ছে এবং যে হারে তাদের প্রয়োজনীয় পণ্য কিনছে তার ফলে কৃষকদের লাভের থেকে লোকসানই হচ্ছে বেশি। আমাদের দেশে সমস্যাটি নানা কারণে আরও জটিল ; 'Producer' এবং 'Consumer'-এর স্বার্থ রক্ষা করে 'Fair Parity Price' বা 'Fair Parity Income' স্থাপনের চেষ্টা করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে 'Producer' এবং 'Consumer'-এর মধ্যে সীমারেখা নির্দিষ্ট করা প্রায় অসম্ভব ; যে দেশে শতকরা ৭০ জন লোক কৃষিনির্ভর, সে দেশে এক অঞ্চলের কৃষিউৎপাদক আর এক অঞ্চলের কৃষিপণ্যের ক্রেতা ; কৃষকমাত্রেই 'Producer' গোত্রের, এবং অন্যান্য কাজে লিপ্ত শহরবাসী মাত্রেই 'Consumer' গোত্রের লোক,—এই সূক্ষ্ম ভাগ আমাদের দেশে প্রযোজ্য কি না সেটা বিচার্য।

কোন একটি বিশেষ কৃষিপণ্যের মূল্য নির্ধারণ, বা তারই জন্য উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা কোন দেশেই ফলপ্রসূ হয় নি, আমাদের দেশেও হয় নি (পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ করবার বহু চেষ্টা এককালে হয়েছিল) ; তেমনি মূল্য নির্ধারণ করার সূত্রে আর একটি যে প্রশ্ন আসে তা হচ্ছে, উৎপাদক যে মূল্যে বিক্রয় করছে এবং সর্বশেষ ক্রেতা যে মূল্যে কিনছে তারই সামঞ্জস্য বিধান, এই প্রশ্নটিরও কোন সন্তোষজনক সমাধান এ যাবৎ আবিষ্কৃত হয় নি। কৃষিপণ্য মূল্য স্থির করার সূত্রেই উৎপাদনের ব্যয় ও আয়ের সম্পর্কের কথাও আসে, আর তারই সঙ্গে আসে আয়-ব্যয়ের প্রশ্ন বাদেও কোন্ শস্য কি পরিমাণে উৎপাদন করা বাঞ্ছনীয় সেই কথা। যদি সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ সম্ভব না হয় তা হ'লে যে শস্য উৎপাদনে ব্যয় কম, আয় বেশি সেই দিকেই স্বভাবতঃ ঝোঁক যাবে। বাজরার তুলনায় চাল দেশের লোকের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল কি মন্দ সে কথা বিচার না করেই কৃষক-গোষ্ঠী যদি সুবিধাজনক মনে করে তা হ'লে চাল ছেড়ে বাজরা উৎপাদনেই ঝুঁকবে ; গত পঞ্চাশ-ষাট বছরে আমাদের দেশের চাষে সেই পরিবর্তন ঘটেছে। অপর দিকে, আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লোকের খাদ্য-তালিকা অনিবার্যভাবে বদলায়। এই শতাব্দীর গোড়া থেকে আজ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য-তালিকা বিশ্লেষণ করলে আমাদের দেশেরও ভবিষ্যৎ খাদ্য-তালিকার গতি অনুমান করা যাবে।

অতএব কৃষিপণ্যের মূল্য "ন্যায্য" হারে বাঁধতে হ'লে শুধু কয়েকটি শস্যের মূল্য বেঁধে দিলেই আখেরে সুফল হবে না ; কিন্তু সর্বাঙ্গীন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করতে হ'লে যা করণীয় তা করতে গেলে Price mechanism-এর নীতি, —যা আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূলে আছে,—আমূল ভাবে পরিবর্তন করতে হয়, প্রশাসনিক ব্যবস্থাও সুদৃঢ় করতে হয়। আজকাল এক দলের মত হচ্ছে, ১৯২৫-২৯-এর মধ্যে কৃষিপণ্যে যা মূল্যান্তর ছিল, তারই সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে এখনকার মূল্য স্থির করতে হবে, তাতে যদি কৃষিপণ্যের মূল্য আরও কিছু বেড়ে যায় তা হ'লেও আপত্তির কিছু নেই। কিন্তু আমাদের দেশে যেখানে মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব বা তার সম্ভাবনা সম্পূর্ণরূপেই বিরাজমান এবং অধিকাংশ লোকের ব্যয়ের প্রধান অংশ খাদ্যদ্রব্যের জন্য নির্ধারিত (এবং সেই সঙ্গেই, Harvest price এবং Consumers price-এর ব্যবধান বিরাট্) সেখানে মূল্যবৃদ্ধি ক'রে "Fair Parity Price" স্থাপনের পরিবর্তে যা করণীয় তা হচ্ছে শিল্পপণ্যের মূল্যের সঙ্গে কৃষিপণ্যের মূল্যের সামঞ্জস্য বিধান এবং কৃষি-পণ্যের মূল্যের আকস্মিক উত্থান-পতন রোধ করা। (তারই সঙ্গে শিল্পপণ্যের মূল্যের উর্ধগতি রোধের কথাও বিশেষভাবে ভেবে দেখার দরকার।)

সরকার কর্তৃক নিম্নতম ও উচ্চতম মূল্য স্থির করে ব্যাপকভাবে "Open market operations"-এর মধ্যে প্রবেশ করার (এবং সেই সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে Buffer stock তৈরী করবার) প্রস্তাব সম্পূর্ণ কার্যকরী করতে হ'লে বর্তমান পরিস্থিতিতে যা করণীয় ততদূর সরকার অগ্রসর হবেন কি না, এবং তা না করলে টাকার ক্রয়ক্ষমতা স্থির রাখা যাবে কি না, এ আশঙ্কা বিশেষজ্ঞ মহল প্রকাশ করেন। গত কয়েক বছরের মূল্যমান সূচক সংখ্যা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে শিল্পপণ্যে ব্যবহার্য কাঁচামালের দাম সব শ্রেণীর উপরে রয়েছে, আর শিল্পপণ্যের দাম ও খাদ্যদ্রব্যের দাম একটি অপরটিকে ঠেলে নিয়ে ওপরের দিকে তুলছে ; এই গতি কি ভাবে রোধ হবে সেই বিরাট্ জিজ্ঞাসা লোকের মনে থেকে যাবে।

এই সূত্রেই একটি কথা আসে, কৃষিকার্যে লিপ্ত লোকে-দের, ও অন্যান্য কাজে লিপ্ত লোকেদের গড় মাথাপিছু আয়ের সামঞ্জস্য বিধান। সব দেশেই কৃষকের গড় আয় অন্যান্যদের থেকে কম এবং প্রচুর উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে চলে। ১৯২৯ থেকে আমেরিকায় উভয় গোষ্ঠীর লোকেদের গড় আয় কি রকম ভাবে বদলেছে তা নিম্নলিখিত তালিকা থেকে লক্ষ্য করা যায়—

উৎপাদন বিচার করা যায় তা হ'লেও দেখা যায় মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় শস্য উৎপাদন বেশি হয়েছে) দেখা যায় যে, মাথাপিছু খাদ্যশস্য সরবরাহ (Net Availability of Cereals) পূর্ব বৎসরের তুলনায় বেশিই হয়েছে; তা সত্ত্বেও কৃষিপণ্যের মূল্য এবং সেই সঙ্গে কৃষকগোষ্ঠীর গড় আয় অনেক উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে চলেছে। (অপর দিকে, বড় বড় শহরের খাদ্যমূল্য সূচক সংখ্যা বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখি যে, দাম উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে।) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রকাশিত এক সাম্প্রতিক হিসাবে দেখা যায় যে, টাকার সরবরাহ (money in circulation) প্রয়োজনের অতিরিক্ত হারে বাড়ে নি। (জাতীয় আয় ও টাকার সরবরাহ, উভয়ের ব্যবধান পূর্বের চেয়ে কমে আসছে; এর অন্যতম কারণ হচ্ছে monetised sector-এর প্রসার; মোট জনসংখ্যা ও উৎপাদন বৃদ্ধির তুলনায় অত্যধিক মুদ্রা প্রচলন হয়েছে এ কথা সম্ভবতঃ বলা চলে না।) অপর দিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক চাল গম প্রভৃতি খাদ্যশস্য বন্ধক রেখে টাকা দাদন দেওয়া সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের ওপর selective credit control-এর ব্যাপক প্রয়োগ থেকে অনুমান করা যায় যে খাদ্যশস্য কৃষকের হাত থেকে ব্যবসায়ীর হাতে আসার পর মজুদ করে রাখবার ও দাম বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা বেড়েছে এবং এর দরুণ যা লাভ, তা কৃষকগোষ্ঠীর হাতে যাচ্ছে না।

আমেরিকাবাসীর গড় মাথাপিছু আয়

	(১) কৃষিকাজে লিপ্ত (ডলার)	(২) অন্যান্য কাজে লিপ্ত (ডলার)	(৩) ২-এর সঙ্গে ১-এর অনুপাত
১৯২৯	২২৩	৮৭১	৩·৯০
১৯৩০	১৭০	৭৬১	৪·৪৮
১৯৩১	১১৪	৬০৫	৫·৩১
১৯৩২	৭৪	৪৪২	৬·০০
১৯৩৯	১৭৩	৬৬৩	৩·৪৩
১৯৪০	১৮১	৭২১	৪ ০০
১৯৪১	২৫৩	৮৫০	৩·৩৬
১৯৪২	৩৮৯	১০৪৬	২·৬৯
১৯৪৩	৫২২	১২৫০	২·৩৯
১৯৪৪	৫৫০	১৩২০	২·৪০
১৯৪৫	৫৮৫	১২৯৪	২·২১

১৯২৯-এর তুলনায় ১৯৩২-এ কৃষকগোষ্ঠীর আয় নেমে এসেছিল শতকরা ৩৩·১৮ ভাগে, অন্যান্যদের ক্ষেত্রে সেই ভাগ দাঁড়াল ৫০·৭৪ শতাংশ। কৃষকদের তুলনায় অন্যান্যদের আয়ের উত্থান-পতন যে অপেক্ষাকৃত কম তা দ্বিতীয় কলম থেকে লক্ষিত হয়। তৃতীয় কলমে উভয় গোষ্ঠীর লোকেদের আয়ের বৈষম্য ও উত্থান-পতন দেখা যায়। আমাদের দেশে পরিকল্পনাপর্বে কৃষি-উৎপাদন কোন কোন বছরে নেমেছে, কিন্তু আমদানীকৃত খাদ্যশস্য এবং আভ্যন্তরীণ উৎপাদন মিলিয়ে (এবং স্বতন্ত্রভাবে যদি আভ্যন্তরীণ

গত কয়েক বছরের জাতীয় ও মাথাপিছু গড় আয়ের হিসাব থেকে কৃষকগোষ্ঠীর আয়ের উত্থান-পতনটি লক্ষ্য করা যাবে:

	জাতীয় আয় (কোটি টাকা)			মাথাপিছু গড় আয় (টাকা)			৪ এবং ৫-এর অনুপাত
	(১) কৃষিজ	(২) অন্যান্য	(৩) মোট	(৪) কৃষিজ	(৫) অন্যান্য	(৬) গড়	(৭)
১৯৫১-৫২	৫০২০	৪৯৫০	৯৯৭০	১৮৯·৮	৫০০	২৭৪·২	২·৬২
১৯৫২ ৫৩	৪৮১০	৫০১০	৯৮২০	১৭৮·৬	৪৯৭·৮	২৩৫·৪	২·৭৯
১৯৫৩-৫৪	৫৩.০	৫১৭০	১০৪৮০	.৯৩·৬	৫০৪·৪	২৭৮·১	২·৬০
১৯৫৪-৫৫	৪৩৫০	৫২৬০	৯৬১০	১৫৫·৭	৫০৩·৪	২৫০·৩	৩·২৩
১৯৫৫-৫৬	৪৫২০	৫৪৬০	৯৯৮০	১৫৮·৬	৫১২·৮	২৫৫·০	৩·২৩
১৯৫৬-৫৭	৫৫২০	৫৭৯০	১১৩১০	১৯০·৪	৫৩২·৩	২৮৩·৩	২·৭৯
১৯৫৭-৫৮	৫২৮০	৬১১০	১১৩৯০	১৭৮·১	৫৫১·১	২৭৯·৬	৩·০৯
১৯৫৮-৫৯	৬২৪০	৬৩৬০	১২৬০০	২০৬·০	৫৬২·৪	৩০৩	২·৭৩
১৯৫৯-৬০	৬২৫০	৬৭০০	১২৯৫০	২০২·২	৫৭৯·১	৩০৪·৮	২·৮৬
১৯৬০-৬১	৬৯০০	৭২৬০	১৪১৬০	২১৮·২	৬১৩·০	৩২৬·২	২·৮১

কৃষিজ পণ্য থেকে উদ্ভূত জাতীয় আয়ের উত্থান-পতন এবং সেই সঙ্গে মাথাপিছু আয়ের পরিবর্তন লক্ষণীয়। (আর তারই পাশাপাশি যদি কৃষিজ পণ্যের ও শিল্প পণ্যের মূল্যমানের গতি লক্ষ্য করা যায় তা হ'লে দেখা যাবে যে অকৃষিগোত্রের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল হচ্ছে)। সাত নং কলমে দেখা যাচ্ছে ১৯৫১-৫২-এর তুলনায় ১৯৬০-৬১-তে উভয় গোত্রের ক্রয় ক্ষমতার ব্যবধান বেড়ে গেছে। মাথা-পিছু গড় আয়ের অঙ্ক থেকে আমরা দেখছি যে, ১৯৫১-৫২-কে ১০০ ধরলে উভয় গোত্রের আয়ের শতকরা হার নিম্নরূপে পরিবর্তিত হয়েছে ঃ

	কৃষিজ	অন্যান্য
১৯৫১-৫২	১০০	১০০
১৯৫২-৫৩	৯৪·১	৯৯·৬
১৯৫৩-৫৪	১০২·০	১০০·৯
১৯৫৪-৫৫	৮২·০	১০০·৭
১৯৫৫-৫৬	৮৩·৬	১০২·৬
১৯৫৬-৫৭	১০০·৩	১০৬·৫
১৯৫৭-৫৮	৯৩·৮	১১০·২
১৯৫৮-৫৯	১০৮·৫	১১২·৫
১৯৫৯-৬০	১০৬·৫	১১৫·৮
১৯৬০-৬১	১১৪·৯	১২২·৬

কৃষিজ গোত্রের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন হারের যে বিরাট্ পার্থক্য তার সঙ্গে তুলনা করে অপর ক্ষেত্রে দেখা যায় উত্থানপতনের হার সামান্য।

অকৃষি গোত্রের আয়ের সঙ্গে বৈষম্য এবং আয়ের প্রবল উত্থানপতন, কৃষকগোষ্ঠীর এই দু'টি চিরন্তন সমস্যার সমাধান আনবার প্রকৃষ্ট পন্থা কি, এই তর্কের এখনও চূড়ান্ত মীমাংসা দেখা যাচ্ছে না। Price mechanism-কে আমরা বাদ দিতে পারছি না, subsistence agriculture-কেও আমরা market oriented করতে চাইছি; সরকারী হস্তক্ষেপ যদি সর্বাঙ্গীন না হয় তা হ'লে মূল্য বা উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা সফল হয় না, বিভিন্ন দেশের এবং আমাদের দেশের অতীত প্রচেষ্টা থেকে সেই সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করা চলে না।

সম্প্রতি আমাদের সরকার নব উদ্যমে এই জটিল সমস্যা মিশ্রনীতির মাধ্যমেই সমাধান করতে উদ্যত হয়েছেন; টাকার ক্রয়ক্ষমতা স্থির রাখতে হবে, কৃষকগোষ্ঠী ন্যায্য মূল্য পাবেন, ক্রেতাকেও সাধ্যের অতিরিক্ত হারে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য দিতে হবে না, আর তারই সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান করে রপ্তানীযোগ্য পণ্যের যথোচিত মূল্য থাকায়, ট্যাক্স বৃদ্ধি ও ঘাটতি বাজেটের সাহায্যে রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত কার্যকলাপের প্রসার, এবং আমদানী-করা খাদ্যশস্যের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করতে হবে। কৃষকগোষ্ঠীর মধ্যেও যে মুষ্টিমেয় অংশ নিজস্ব প্রয়োজন মিটিয়ে (marketable surplus) বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রী করতে পারছে, তাদের স্বার্থের সঙ্গে সমন্বয় ঘটাতে হবে জমিবিহীন এবং সামান্য জমির মালিক অগণিত কৃষকদের। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তোলবার কাজে বদ্ধপরিকর আমাদের কর্তৃপক্ষ এ যাবৎ যে পন্থা অনুসরণ করে আসছেন তাতে এই সব সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না; অতঃপর কোন্ পথে তাঁরা দেশকে পরিচালিত করেন, মূল সমস্যাগুলি কি ভাবে কতটা দৃঢ়তা ও দূরদর্শিতার সঙ্গে গোড়া ঘেঁষে মেটাতে চেষ্টা করবেন সে কথা দেশবাসী সম্ভবতঃ অচিরে জানতে পারবেন।

পাঁচমিশালী

গুহাঘর

লিবিয়ার কোনো-কোনো মরু-অঞ্চলে এখনো অনেক গুহাবাসী মানুষের দেখা মেলে। কিছু বা প্রাকৃতিক, কিছু বা কৃত্রিম এই-সব গুহাতে এরা বহু শতাব্দী ধরে বাস করছে।



গুহাবাসী মানুষ

সাধারণতঃ এই অঞ্চলের লোকেরা ভূপৃষ্ঠের উপরকার ঘরবাড়ীর চেয়ে এইসব গুহাঘরকে বেশী পছন্দ করে। তার একটা কারণ, তুলনায় এরা অনেক বেশী ঠাণ্ডা, এছাড়া শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে এরা অনেকটা দুর্গের মত কাজ করে।

এইরকম একটি গুহা এখনো ত্রিপোলীর ইহুদীদের উপাসনালয় রূপে ব্যবহৃত হয়।

এক-একটি বড় ইঁদারার মত গর্তের মধ্যে পাথরের সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি বেয়ে নেমে যান, দেখবেন, একটু পরেই এদিক ওদিক সুড়ঙ্গের রাস্তা চ'লে গিয়েছে। এই সমস্ত রাস্তার এধারে ওধারে ছোট ছোট এক-একটি গুহাঘরে এক-একটি পরিবার বাস করে। এই রকম করে নেমে গিয়ে ৬০ ফুট নীচ অবধি আপনি গুহাঘর দেখতে পাবেন। উপরে যখন তাপমাত্রা ১৩৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট, তখনো এইসব সুড়ঙ্গের পথে যে হাওয়া চলাচল করে তা বেশ ঠাণ্ডা।

সাহারা অঞ্চলের গুহাবাসী মানুষরা নবদম্পতিকে এইরকম একটি গুহার মধ্যে এক সপ্তাহ বন্দী ক'রে রেখে দেয়, অবশ্য যথেষ্ট খাদ্য এবং পানীয়ের ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে। প্রেমে পড়ে বিবাহের রেওয়াজ অস্মদ্দেশীয়দের মধ্যে যেমন নেই, তাদেরও মধ্যে নেই। ওরা মনে করে, নব বিবাহিত যুবক-যুবতীকে প্রেমে পড়াবার এটি একটি প্রকৃষ্ট উপায়।

একারোহী হেলিকপ্টার

নীচের ছবির হেলিকপ্টারটিকে কিরকম ভাবে বাক্সবন্দী ক'রে ছোট একটি মোটর গাড়ি টেনে নিয়ে যাচ্ছে, তা পরের পৃষ্ঠার ছবিটিতে দেখানো হচ্ছে।



একারোহী হেলিকপ্টার

এই হেলিকপ্টারটিকে বায়বীয় মোটর সাইকেল আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এতে মাত্র একজন আরোহীর স্থান হয় ব'লে।

৯০ অশ্বশক্তি বিশিষ্ট এই বায়বীয় মোটর সাইকেলের ১২ ফুট ডানা দু'টিকে গুটিয়ে একটি সাড়ে বারো ফুট বাক্সে বন্ধ ক'রে নেওয়া যায়।



বায়ুবন্দী হেলিকপ্টার

। গতিবেগ ঘণ্টায় ৭৫ মাইল, এবং এর ট্যাঙ্কে সাড়ে বারো গ্যালনের তেল ভ'রে নিলে ৫০ মিনিট একে চালান চলে।

অর্থাৎ আপনি যদি এতে চড়ে কলকাতা থেকে দুর্গাপুর যেতে চান পথে একবার পাণ্ডুয়া বা মেমারীতে নেমে ট্যাঙ্কটাকে ভ'রে নিতে হবে। এতে খুব বেশী সময় না নিলে আপনি দেড়ঘণ্টায় দুর্গাপুর পৌছে যাবেন।

অবশ্য মোটর সাইকেলের দামে এটাকে পাওয়া যাবে না। বাজারে যখন এটাকে ছাড়া হবে, তখন এর দাম হবে ৪৫,০০০ টাকা।

অন্যরা চড়বে, আমরা দেখব। এখনও ত তাই করছি।

স্পেনের লোকদের কাছে আর 'আকর্ষণীয়' (একটা অত্যন্ত ব্যাকরণদুষ্ট অশিক্ষিত-জনোচিত কথা) নয়। এর চেয়ে ফুটবল খেলা তারা আজকাল অনেক বেশী পছন্দ করে। কিন্তু হ'লে হবে কি, বিদেশী টুরিষ্টদের কথা ভাবতে হবে না? বিশেষ ক'রে সেই সব বিদেশীদের কথা, যারা দুহাতে পয়সা ওড়ায়? তারা ত আর ফুটবল খেলা দেখতে স্পেনে আসে না? সুতরাং বুল্‌ফাইটের আয়োজন করতেই হয়।

আমরা যেমন বিদেশী টুরিষ্টদের জন্যে মণিপুরী নৃত্য, নাগা নৃত্য, গরবা নৃত্য এবং এমন আরও অনেক নৃত্যের আয়োজন করি যা আমাদের দেশের সাধারণ লোকেরা সাধারণতঃ দেখে না, বা দেখবার জন্যে বিশেষ কিছু আগ্রহ দেখায় না।

ষাঁড়ে-মানুষে লড়াই

এটি স্পেন দেশের বিশেষত্ব তা আমরা সকলেই জানি। সকলে যা জানি না সেটা হচ্ছে এই যে, এই ষাঁড়ে-মানুষে লড়াই, বা বুল্‌ফাইট,

ইউরোপের সবচেয়ে উঁচু সাঁকো

এখনো তৈরি শেষ হয়নি, প্রায় হয়ে এসেছে। ৮০ ফুট খানিক আর জুড়ে দিলেই এই ২৫০০ ফুট লম্বা সাঁকোটিকে বলা চলবে



ষাঁড়ে-মানুষে লড়াই



ইউরোপা ব্রিজ

ইউরোপের সবচেয়ে উঁচু সাঁকো। আল্‌প্‌স পর্ব্বতের অষ্ট্রিয়ার অন্তর্গত একাংশে এই সাঁকোটি তৈরি হয়ে গেলে অষ্ট্রিয়া, জার্ম্মানী এবং ইটালীর অনেকগুলি বড় বড় সুদূরপ্রসারী রাস্তায় পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়ে যাবে।

এর নাম দেওয়া হয়েছে "ইউরোপা ব্রিজ", আর এর সর্ব্বাধিক উচ্চতা হবে ৬০০ ফুট।

স. চ.

ভারতীয় ছাত্রদের বিদেশযাত্রা

ইম্‌পোর্ট লাইসেন্স নিয়ন্ত্রণের পর থেকে বিদেশী জিনিষের চাহিদা বৃদ্ধির মত, স্বাধীনতার পর ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিদেশযাত্রার হিড়িক পড়ে গেছে। অবশ্য বিজ্ঞানের এই বিশেষ যুগে বিজ্ঞানচর্চার জন্য বিজ্ঞানের লীলাভূমি ইউরোপ আমেরিকার দিকে তাদের মন আকৃষ্ট হবে, এতে অস্বাভাবিক বা অসঙ্গতি কিছু নেই। কিন্তু এটি ঘটনার একাংশ বা আপাত মাত্র। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় যা কি না অসার চাকুরি-লোলুপ "ডিগ্রীপ্রিয়তা" বলে তিরস্কার করে এসেছেন, ভারতীয় ছাত্রদের বিদেশযাত্রার পাকা সড়কটি সেই মোহজালেই বাঁধা। অধ্যাপক জে. বি এস হলডেন এর স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে এক জায়গায় লিখেছেন:

"প্রতি বছর শত শত ভারতীয় ছাত্র বিজ্ঞানের ডক্টরেট ডিগ্রী নিয়ে প্রত্যাবর্ত্তনের আশা বহন করে বিদেশ যাত্রা করে। আমি এই রীতির সম্পূর্ণ বিরোধী এবং আমার সঙ্গে কাজ করতে চায় এমন যে কোন লোকের বৈদেশিক ডিগ্রী থাকলে আমি সেটা তার যোগ্যতার প্রতিকূল বলে মনে করি, অবশ্য আমি অবহিত যে এ ধরণের ডিগ্রী ভারতবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এবং অন্যত্র কর্ম্মপ্রাপ্তির সহায়ক।......ভারতের স্নাতকোত্তর ছাত্রেরা যে বিদেশে যেতে চায় তার একটা কারণ খুবই সরল। বহু প্রতিষ্ঠানে শাসন বিভাগীয় কর্ম্মচারারা এবং কখনও কখনও অধ্যাপক স্থানীয় ব্যক্তিরাও তাদের নিয়মিত ভাবে অপমান করে থাকেন এবং তা এমনভাবে যে, ইয়োরোপ বা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে কখনই বরদাস্ত করা হয় না। আমার জীবিতকালে আমি এই অবস্থারও প্রতিকার দেখে যেতে চাই।

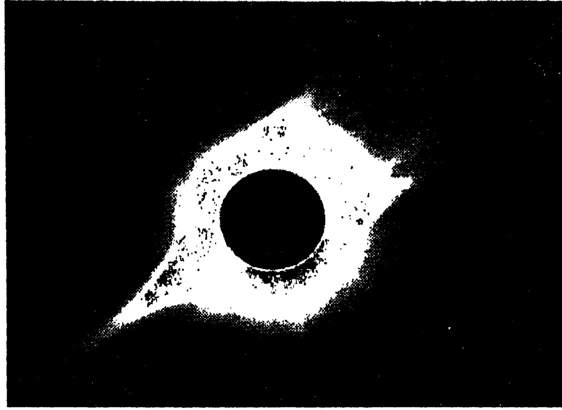
"বিদেশে অধ্যয়ন করে যারা সর্বাধিক লাভবান্ হবে তাদেরই বিদেশে পড়াশোনার জন্য যাওয়া উচিত। প্রশ্ন এই যে, তারা কারা? তারা হ'ল সেই সব তরুণ-তরুণী যারা ভারতেই কিছুটা গবেষণা করেছে, যার ফলে কিছুটা আন্তর্জাতিক পরিচিতি ঘটেছে তাদের, নিজেদের জ্ঞানের সীমা বোঝাবার মত জ্ঞান তাদের হয়েছে। নিজেদের অগ্রগতির জন্য যা শেখা প্রয়োজন তা কোথায় শিক্ষা করা যায় তাও তারা জানে, তাদের স্বক্ষেত্রে যাঁরা গবেষণায় অগ্রণী সেই সব বিদেশী অধ্যাপকরা তাদের স্বাগত জানাতে পারেন এমন একটা অবস্থায় উপনীত হয়েছে তারা। তাদের মধ্যে কেউ হয়ত ষ্টকহোলমে অধ্যাপক গুস্তাফসন-এর কাছে আরণ্যক বৃক্ষলালন শিখতে চায়, কেউ বা প্যারিসে অধ্যাপক মনোর কাছে জৈব রসায়নের কোনো শাখায় গবেষণা করতে ইচ্ছুক, আবার কেউ বা লেনিনগ্রাদে অধ্যাপক আইভানভ-এর কাছে অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের জণতত্ত্বে গবেষণায় উৎসাহী, স্বদেশেই এরা হয়ত এমন কিছুটা কাজ করেছে যাতে এই সব মহৎ বিজ্ঞানীদের কাছে একটা পদ বা বৃত্তি পাওয়া এদের পক্ষে খুব কঠিন হবে না।

"আর এক ধরণের ভারতীয় বিজ্ঞানীদের বিদেশে যাওয়া উচিত—যাদের আদৌ কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী নেই, যেমন শ্রীনিবাস রামানুজন-এর ছিল না। কিংবা যাদের শুধু সাধারণ একটা বি. এস-সি ডিগ্রী মাত্র আছে; ফলে ভারতবর্ষে যাদের উন্নতির আশা চিরতরে অবরুদ্ধ। এরকম অবস্থায় কোন ছেলে বা মেয়ে যদি যৎসামান্য গবেষণার কাজও করে থাকে তবে সেটাই বিজ্ঞানে তাদের আগ্রহ ও দক্ষতার শক্তিশালী সাক্ষ্যরূপে বিবেচিত হওয়া উচিত, একেবারে প্রথম শ্রেণীর না হলেও এই ধরণের ছেলে-মেয়েদের বিদেশে ডিগ্রী পেতে সাহায্য করা উচিত, যাতে তারা ভারতে স্বীয় যোগ্যতানুযায়ী কাজ পেতে পারে।

"শেষ পর্য্যন্ত যারা বিদেশে যায় তারা প্রায়শঃই গবেষণার সম্পূর্ণ অযোগ্য হয়ে থাকে তা সে পরীক্ষায় তারা যতই না কেন ভালো করুক। মৌলিক গবেষণা কি করে করতে হয় তা তারা শেখে না এবং স্বদেশের বিজ্ঞাপন হিসাবেও বিদেশে তারা ভালো হয় না।"

শান্ত সূর্য্য: একটি বিজ্ঞান-বর্ষ

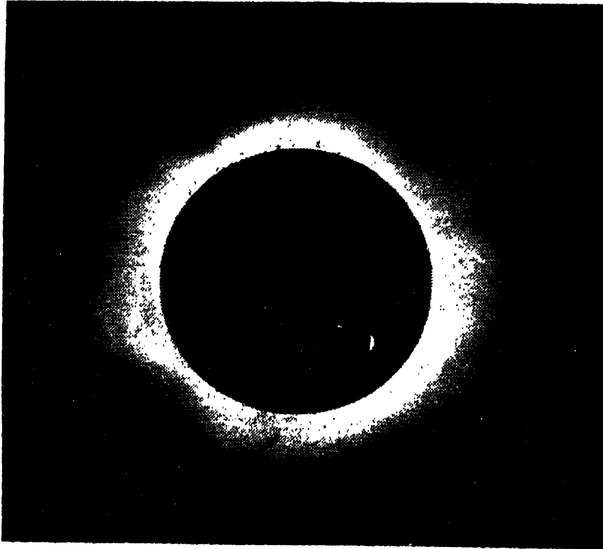
সূর্য্য একটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণশীল জ্যোতিষ্ক। তার চৌদ্দ লক্ষ কিলোমিটার ব্যাসযুক্ত গহ্বরে সর্ব্বদা হাইড্রোজেন পরমাণু হিলিয়াম পরমাণুতে রূপান্তরিত হচ্ছে। বস্তুতঃ সূর্য্য একটি প্রকাণ্ড হাইড্রোজেন বোমা। তার এই বিস্ফোরণ-জাত আলো উত্তাপ এবং গতিসম্পন্ন বস্তুকণা সমস্ত সৌরজগতে প্রসারিত হয়ে আশ্চর্য্য এক আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই সূর্য্য নাকি আবার শান্ত। "শান্ত সূর্য্য"—মাঝে মাঝে এই প্রচণ্ড



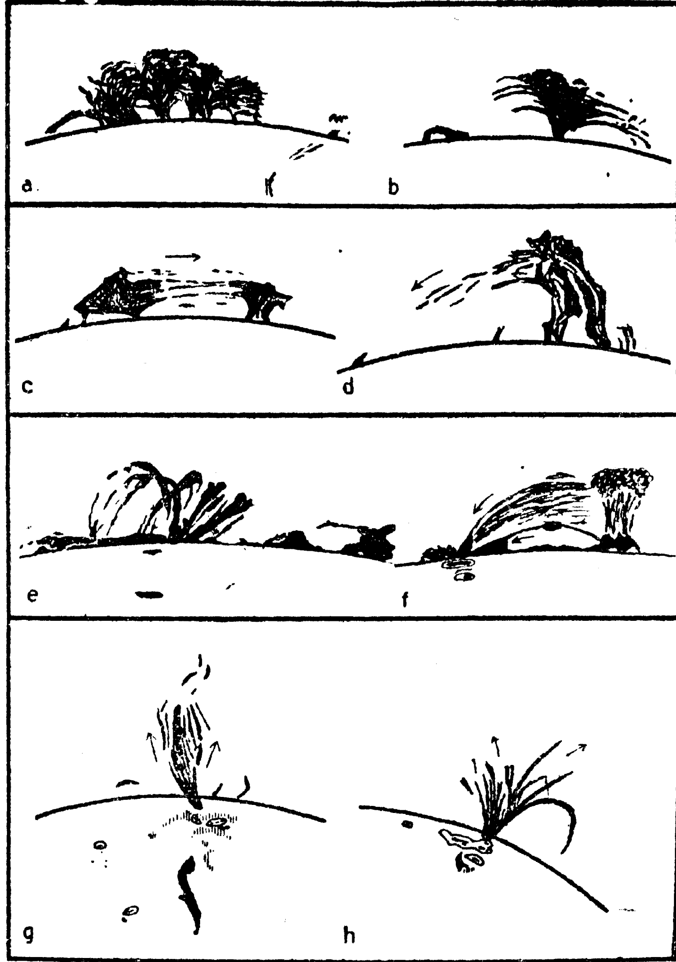
সূর্য্যকলঙ্ক যখন খুব কম, সেই অবস্থায় পূর্ণ গ্রহণের সময় সূর্য্যশিখার ছবি

বিস্ফোরণরত নক্ষত্র (সূর্য্য একটি নক্ষত্র) কেমন যেন শান্ত হয়ে যায় —মুখর বক্তা যেমন মাঝে মাঝে নীরব হয় কিংবা বলি, জলের জটিল আবর্ত্ত যেমন সহসা স্তিমিত হয়ে পড়ে। শান্ত বললাম, সূর্য্যের আভ্যন্তরীণ বিস্ফোরণ অবশ্য তখনো চলতে থাকে। তবে তার তেজোময় অগ্নিময় অংশ, যা কিনা মাঝে মাঝে রক্তাক্ত জিহ্বার মত বাইরের দিকে কয়েক হাজার মাইল প্রসারিত হয়, তা স্থগিত থাকে মাত্র। এটিই সূর্য্যের তথাকথিত "শান্ত" অবস্থা। সূর্য্যের এই বহির্মুখী "শিখা" তার ভিতরকার দারুণ আলোড়নেরই ফল। আধুনিক মতে এর সঙ্গে বৈদ্যুতিক ও চুম্বকশক্তির প্রভাব জড়ানো রয়েছে। "অশান্ত" সূর্য্যের এই বহিঃপ্রকাশ পৃথিবীকে প্রভাবিত করে। পৃথিবী সৌরজগতেরই একটি গ্রহ। কিন্তু সে সঙ্গে তা যেন আবার সূর্য্যের "বায়ুমণ্ডলেরই" অন্তর্গত। তেজোময় সূর্য তার আলো উত্তাপ এবং বস্তুকণার প্রবাহে যে পরিমণ্ডল রচনা করে পৃথিবীর সীমানায় এসেও তা শেষ হয় না। সূর্য্যের এই "বায়ুমণ্ডল" (বায়ুমণ্ডলই তাকে বললাম) পৃথিবীকে অন্তর্ভুক্ত করে পৃথিবী ছাড়িয়েও প্রসারিত হয়েছে।

সে যাক, আমরা বলছিলাম সূর্য্যের অগ্নিময় অংশ মাঝে মাঝে



সূর্য্যে কলঙ্কের প্রাদুর্ভাব যখন খুব বেশী, পূর্ণ গ্রহণে সেই সময়কার সূর্য্যশিখার ছবি



সূর্য্যপৃষ্ঠে অগ্নিশিখার নানা বিচিত্র রূপ

বিস্ফোরণের তোড়ে কেমন সূর্য্যের স্বাভাবিক পরিধিকে ছাড়িয়ে যায়। কল্পনা করা যাক, সূর্য্যের জ্বলন্ত গর্ভ থেকে কে যেন ঝলকে ঝলকে আগুন পিচ্‌কিরির ধারায় চারদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। সূর্য্যের পরিধিতে এমনি "হোলী" খেলার দৃশ্য দূরবীণ আবিষ্কারের আগেকার যুগে ৯৫ বার নাকি পুঁথিতে উল্লেখ পাওয়া যায় (১৮৩ থেকে ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে), জাপানের টোকিও মানমন্দিরের হিরামায়া এই তথ্য সংগ্রহ করেছেন। ১৮৭০ সালের পর থেকে সূর্য্যের এই "বহ্নি উৎসবের" সংখ্যা ও বিবরণ বিস্তারিত ভাবে লিপিবদ্ধ করা আছে। এ থেকে ১৯৫১ সালে স্বয়াবে (SCHWABE) লক্ষ্য করেন যে সূর্য্যের এই "বহ্নি তাণ্ডব" মোটামুটিভাবে কয়েক বছর অন্তর প্রবল হয়ে ওঠে। সময়ের এই অন্তর এগার বৎসর। এগারো বছর পর পর সূর্য্যের পরিধিতে অগ্নিময় উৎসব শুরু হয়। তার মধ্যবর্ত্তী কাল হ'ল শান্ত সময়—সূর্য্য তখন শান্ত। শান্ত বলতে অবশ্য যে সূর্য্যের অগ্নিময় অংশ তার পরিধির মধ্যেই গোপন থাকে তা নয়, তবে সংখ্যায় তা অনেক কম। শেষবারের মত সূর্য্যের "অশান্ত" অবস্থা গেছে ১৯৫৭-৫৮ সালে। ঠিক এ সময়েই সমবেত উদ্যোগে নানা বৈজ্ঞানিক চেষ্টা চালানোর জন্য আন্তর্জ্জাতিক ভূ-পদার্থ বর্ষের আয়োজন করা হয়েছিল। আকাশ মাটি এবং সমুদ্র সম্বন্ধে সে সময়ে সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টায় যে সব তথ্য সংগ্রহ করা গেছে, আমাদের সাধারণ জীবনযাত্রার মধ্যেও তা আজ ছড়িয়ে পড়েছে। সূর্য্যের পরবর্ত্তী বিক্ষুব্ধ অবস্থা ১৯৬৮-৬৯ সালে। এর মাঝামাঝি সময় হ'ল সূর্য্যের সবচেয়ে শান্ত অবস্থা। ১৯৬৪ সাল হ'ল সেই শান্ত সময়। এই অগ্নিময় তেজোময় সূর্য্য এখন অপেক্ষাকৃত

শান্ত। বিজ্ঞানীরা এ সময়টাকেও সুবিধাজনকভাবে কাজে লাগাতে চান। ১৯৫৭-৫৮ সালে ছিল ভূ-বিজ্ঞান বর্ষ। ১৯৬৪ সালে শুরু হচ্ছে "আন্তর্জাতিক শান্ত সূর্য্য বর্ষ"। সমবেত উদ্যোগে সূর্য্য,—এবং পৃথিবীতে তার বহুমুখী প্রভাব সম্বন্ধে অনুসন্ধান।

এত দূরবর্ত্তী পৃথিবীতেও সূর্য্যের প্রভাব যে কত গভীর তা ১৯৬০ সালের এই ঘটনাটি থেকে বেশ প্রতীয়মান হবে। দিনটি ছিল মার্চ মাসের দশ তারিখ, ১৭টা ১৩ মিনিটের সময় সূর্য্যের পরিধিতে প্রথম একটি আগুনের "শিখা" বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। ১৭টা ২০ মিনিটের সময় তা সবচেয়ে বেশি মাত্রায় বিস্তৃত হ'ল। এ বিক্ষোভজাত বিকিরণ দেড় মিনিটের মধ্যেই পৃথিবীর বুকে ধরা পড়ল। আকাশের বায়ুস্তরে এক আলোড়ন সৃষ্টি হ'ল। রেডিও সংযোগ ব্যবস্থায় ব্যাঘাত হ'ল—চরমক্ষেত্রে দূরবর্ত্তী রেডিও সংযোগ আধ ঘণ্টার জন্য একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এমনও দেখা যায়। পৃথিবীর নিজস্ব যে চুম্বকক্ষেত্র, সেখানেও এই বিক্ষোভ গিয়ে সঞ্চারিত হয়। "চুম্বকের ঝড়" তখন ওঠে—অবশ্য এই ঝড় সৃষ্টি হ'তে কিছু সময় নেয়—অন্তত চব্বিশ ঘণ্টা। চুম্বকের ঝড়ের এই বিলম্বিত প্রভাব পৃথিবীর আকাশের ঊর্দ্ধসীমানায় নানা আকারে রূপ নেয়—মেরুজ্যোতি বা অরোরা তখন বিচিত্র উপায়ে আরো সক্রিয় হয়ে ওঠে। সূর্য্যের অগ্নিময় বিক্ষোভের প্রভাব এখনও পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত এবং বহু সময়ব্যাপী গবেষণা চালানোর জন্য আন্তর্জাতিক শান্ত সূর্য্য বর্ষের আয়োজন করা হয়েছে।

বছর কি তারও অধিক সময় জুড়ে বিশেষ একটা বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া ১৮৮২-৮৩ সালেই প্রথম শুরু হয়। এ সময়ে অনুষ্ঠিত হ'ল প্রথম মেরুবর্ষ। মেরু অঞ্চল সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান সে সময় চাঁদের তুলনায়ও অনেক কম ছিল। সমবেত ভাবে পৃথিবীর কয়েকটি বিশেষ অঞ্চল সম্বন্ধে জানার জন্য তাই এই বর্ষব্যাপী উদ্যোগ গ্রহণ করা হ'ল। দ্বিতীয় মেরুবর্ষ পালন হয়, ১৯৩২-৩৩ সালে। তার পরের উদ্যম আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ বর্ষ। এবং অতি সম্প্রতি এই শান্ত সূর্য্য বর্ষ। সূর্য্য—যা একটি নক্ষত্র হয়েও নক্ষত্রের মত মিটি মিটি করে না, পরমাণুর বিস্ফোরণের মধ্যে সর্ব্বদা তেজোময় থাকে, অথচ পৃথিবীর আকাশে কেমন শান্ত স্থির—গ্রহে গ্রহে জীবন বিকাশের কারণ। আমাদের চোখে আলো এবং উত্তাপের উৎস তার ক্ষণস্থায়ী শান্তরূপের মধ্যে, আশা করি আমাদের আকাশ ও পৃথিবীর পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠবে।

একটি নমস্কার

সত্তর বছর আগে আমাদের এই মহানগরী কলকাতা আশ্চর্য্য এক পুরুষকে অঙ্কে ধারণ করেছিলেন। সব্যসাচীর দু'হাতে সমান অস্ত্র চালনার মত যিনি হৃদয়চর্চ্চা ও বুদ্ধিচর্চ্চায় অনন্য, একই বৃন্তে দু'টি ফুলের মত যাঁর মননশীলতা ও মানবতাবোধ সমানভাবে উজ্জ্বল, নিঃসন্দেহে তিনি হলেন আমাদের সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

"যাঁকে চেনা মনের একটি জয়,
মানবিক বড় অভিজ্ঞতা।
আশ্চর্য্য সে মন, ব্যাপ্তি যার সর্ব্বদিকে,
শিল্পে সাহিত্যে বিজ্ঞানে সঙ্গীতে অথচ
প্রত্যহের জীবনসম্ভোগে—এমন কি জর্দ্দাপানে!
ধূমপানেও কিংবা ধূমপান ছেড়ে! অসামান্যে সাধারণ!"
(বিষ্ণু দে)

এই বহুমুখী "প্রতিভায় অগ্নিময়", "আত্মভোলা বেহিসাবী নির্বিকার সাত্ত্বিক" পুরুষের আজীবন সাধনা ও সমৃদ্ধির পরিচয় আমরা পঞ্চশস্যের এই সামান্য আধারে তুলে ধরার কথা চিন্তাও করি নি। তবে সূর্য্যের অসামান্য আলোর ছটায় শিশিরের বিন্দুটি যেমন ভরে ওঠে আমরা তেমনি এই মহাবিজ্ঞানী মহামানবের বহু-প্রার্থিত "সত্তরের জন্মদিনে" আমাদের প্রাণের অর্ঘ্য এখানে নিবেদন করছি। অধ্যাপক বসুর বিজ্ঞান সাধনা, বিশেষতঃ তাঁর প্রবর্তিত সংখ্যায়ন (BOSE STATISTICS) আধুনিক বিজ্ঞান ধারণায় মৌলিক প্রভাব সঞ্চার করেছে। আমাদের জীবনযাত্রায় বিজ্ঞানের এই সর্ব্বব্যাপী প্রভাবের যুগে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চ্চা বিষয়ে তাঁর সত্যবোধ দেশের সংস্কৃতি মহলে বারবার আলোচিত হচ্ছে। অধ্যাপক বসুর জীবনের ছোট-খাট আপাতত বিশেষত্বহীন বহু ঘটনা দেশের তরুণ ও ছাত্রসমাজে অজস্র কিংবদন্তীর সৃষ্টি করেছে। একাধারে এই "প্রবল বাঙ্গালী" ও "বিশ্বমানব" তাদের চোখে আশ্চর্য্য আলোকে উদ্ভাসিত। সামান্য একটি ঘটনা এখানে শুধু উল্লেখ করব। এ বছর ১লা জানুয়ারী অধ্যাপক বসুর জন্মদিন। এদিনেই আবার তাঁর বহু সাধ ও সাধনার ধন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের নিজস্ব ভবনের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপনের দিন। সকাল ৯॥টায় ভিত্তি স্থাপনের অনুষ্ঠান। বহু লোকের সমাগম। মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন মশায় এসেছেন এই উৎসবে, তিনিই ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করবেন। মঙ্গলাচরণ মন্ত্র আবৃত্তি শুরু হয়েছে, গোয়াবাগান সি-আই-টি পার্কের কোণে শীতের আমেজভরা পৌষের সকাল আশ্চর্য্য পরিবেশ রচনা করেছে। অগুণতি উদ্‌গ্রীব মুখ—তাদের মধ্যে বৃদ্ধ এবং তরুণ সংখ্যায় সমানভাবে রয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী সাদা পাথরের ফলকটি ধীরে ধীরে বাঁধানো জায়গায় টেনে বসালেন, ক্যামেরা ক্লিক ক্লিক করে উঠল—একসঙ্গে অনেকগুলি। হঠাৎ একটি ছেলে চেঁচিয়ে উঠল—প্রফেসার বোসের ছবি নিন। সঙ্গে আরো কয়েকজন। উৎসবের নায়ক যেখানে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী, তাদের আশঙ্কা অধ্যাপক বসু বুঝি সেখানে নেপথ্যে আড়াল হয়ে পড়েন। সামান্য ঘটনা। কিন্তু এ সমস্ত সাধারণ সামান্য বিষয়গুলির মধ্যে যে নিবিড় ভালবাসা ও আন্তরিক শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায় তাতে অভিভূত না হয়ে পারা যায় না। একবার অনেক কৌতূহল নিয়ে একটি ইন্টারন্যাশানাল হুজ্ হু (International Who's Who) পাতা খুলেছিলাম—দেখি অধ্যাপক বসু সম্বন্ধে কি লেখা আছে, কিন্তু হায়, তাঁর মত একজন বরেণ্য বিজ্ঞানীর নামের সেই বিরাট্ আয়তন রেফারেন্স বইয়ে উল্লেখমাত্রও ছিল না, অনেক দেশী বিলাতী জীবনী-গ্রন্থকার তাঁর সম্বন্ধে অনুরূপ নীরব দেখেছি। ব্যথা পেয়েছি নিঃসন্দেহ, কিন্তু ১লা জানুয়ারীর সেই অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে অজানা কয়েকটি ছেলের মুখে শোনা সেই সামান্য কথায় পুরাণো সমস্ত আবেগ এবং দুঃখ যেন কোথায় মিলিয়ে গেল। ফটোগ্রাফের ব্রোমাইড পাতায় অধ্যাপক বসুর ছবিটি বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিল কি না জানি না, কিন্তু তরুণ মনের সজীব পাতায় তাঁর ছবিটি যে গভীর ভাবে ফুটে রয়েছে সে সম্বন্ধে আর সন্দেহ রাখি নি।

এই শুভ জন্মদিনে তাঁর শতায়ু কামনা করি।

চোখ—ক্যামেরার "চোখে"

চোখ থাকলেই সব দেখা যায় না। সঙ্গের এই ছবিটি চোখেরই একটা ফটোগ্রাফ। মানুষের দেখার ক্ষমতা যেখানে শেষ, সেখানে অণুবীক্ষণ দূরবীক্ষণ রাডার ইত্যাদি কাজ করে। ক্যামেরাও একটি সুদক্ষ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র—সাধারণের হাতে তা যতই সৌখীন মনে হোক



অন্ধের চোখের সাদা অংশের ছবি

না কেন। সেই পুরাণো আমল থেকে ক্যামেরা এ পর্য্যন্ত অনেক বৈজ্ঞানিক গবেষণাতেই সহায় হয়েছে। তার একটা বেশ আধুনিক নিদর্শন সঙ্গের এই ছবিটি। চোখের সাদা অংশের এই ছবিটি হঠাৎ কেমন বিভ্রম জাগায়। চোখ থাকলেই সব দেখা যায় না—এমন কি "চোখে" চোখ রাখলেও নয়। কথাটার প্রসঙ্গ এবার আশা করি পরিষ্কার হ'ল। অবশ্য এই "চোখ" অন্ধের "চোখ"। আরো স্পষ্ট করে বলি। ক্যামেরায় এই যে বিস্তারিত ছবিটি তোলা হয়েছে তা হ'ল একজন অন্ধলোকের। অন্ধত্বের কারণ কি, সে সম্বন্ধে নূতন ভাবে অনুসন্ধান করা এই ছবির উদ্দেশ্য। যে উপায়ে এই ছবি তোলা হয়েছে তা তার উদ্দেশ্যের মতই মহৎ। অধ্যাপক হেঁরল্ড এড্ গারটন বন্দুকের দ্রুত গুলী এবং সমুদ্রের "অতল" তলের ছবি তোলার আশ্চর্য্য উপায় আবিষ্কার করেছেন। তাঁরই এই পদ্ধতি অনুযায়ী অন্ধের চোখের এই ছবি তোলা হ'ল। ছবির এই বিশদ বিস্তারের মধ্যে দৃষ্টিহীনতার সমস্ত অসঙ্গতি ধরা পড়েছে। বিজ্ঞানীরা এবার পরীক্ষা করে দেখবেন, জীবরসায়ন-বিজ্ঞানসম্মত কোন উপায়ে এ সমস্ত অসঙ্গতি দূর করা যায় কি না।

ক্যামেরার "চোখে" চোখ রেখে এভাবে একদিন দৃষ্টিহীনের দৃষ্টি দৃশ্যময় হয়ে উঠবে আশা করি।

স্থিরলক্ষ্য চাঁদ

কালিফোর্ণিয়া ইনষ্টিটিউট অব টেক্‌নোলজির বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি এক কামান তৈরীর জন্য উঠে-পড়ে লেগেছেন। উদ্দেশ্য—চাঁদের গায়ে তারা "গোলা" নিক্ষেপ করবেন। এমন একটা কামান যদি আগে সম্ভব হত তা হ'লে ইতিহাসের অনেক কাহিনীই অন্যভাবে লেখা হ'ত। পানিপথের যুদ্ধে তা হ'লে বোধ হয় সেনাপতি হিমুর প্রাণহানি হ'ত না। মহীশূরের টিপু সু[illegible]ানকেও বোধ হয় এভাবে যুদ্ধে প্রাণ হারাতে হ'ত না—অবশ্য নবা[illegible]ের হাতে এমন একটা কামান থাকলেও ক্লাইভের পক্ষে পলাশীর [illegible]দ্ধ জয়লাভ মোটেই শক্ত হ'ত না, কিন্তু এ সমস্তই অবান্তর কথা। বিজ্ঞানীরা যে এমন একটা "চাঁদমুখী" (মাপ করবেন, ভাষায় ভুল ধরবেন না। বিজ্ঞানের নিত্য-নূতন বিষয়গুলি বোঝবার মত শব্দ তৈরীর কারখানা কোথায় খুঁজে পাই বলুন ত! চাঁদমুখী মানে চাঁদের মত মুখ নয়, বরং চাঁদ-অভিমুখী, চন্দ্রগামী) কামান তৈরী করতে যাচ্ছেন তার কারণ—নিশ্চিন্ত থাকুন—বিজ্ঞান-গল্পকারদের কল্পনাকে টেক্কা দিয়ে চাঁদে মানুষের শত্রু কোন মহাশূন্যচারী জীবের আবির্ভাব ঘটে নি, চাঁদের দিকে কামান তাক্ করা হচ্ছে মানুষের এই বড় চেনা অথচ অজ্ঞাত উপগ্রহটি সম্বন্ধে নানা তথ্যের জোগাড় করতে। চাঁদমুখী কামানটি থেকে ছোঁড়া একটি অতিকায় "গোলা"র মধ্যে থাকবে কয়েকটি বিভিন্ন আকারের "বোমা"। চাঁদের দেশে গিয়ে এই "বোমা" একের পর এক ফাটতে থাকবে। বোমার প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে একটি কাঁপন চাঁদের এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ছড়িয়ে পড়বে। অর্থাৎ কৃত্রিম উপায়ে ভূমিকম্পন সৃষ্টি। এই ভূমিকম্পন মাপার উপযুক্ত যন্ত্র অত্যন্ত ছোট আকারে তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। এ ধরণের বিশেষ যন্ত্রও চাঁদে পাঠানো হবে। ফলে বিস্ফোরণের ফলে জাত ভূমিকম্পনের প্রকৃতি যন্ত্রের মাধ্যমে ধারা পড়বে। ঠিক পৃথিবীতে যেভাবে পরীক্ষা করে দেখা হয়—চাঁদের বিভিন্ন স্তর, তাদের গঠন, বিভিন্ন উপাদান ইত্যাদি সম্বন্ধে তখন বিস্তারিত জানা যাবে।

কামান দাগিয়েও যে অজানা রহস্যের দুর্গ "জয়" করা যায় বিজ্ঞানের উন্নতিতে তা আজ সম্ভব হচ্ছে। লক্ষ্য তাই স্থির রয়েছে।

বিকিরণের নির্দোষ মাত্রা নেই

বিংশ শতাব্দীর এই মাঝামাঝি সময় পেরিয়ে আমরা পরমাণুকে ভাল চিনেছি। তার জটিল প্রকৃতি তত্ত্বের আকার দানা বেঁধে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাগুলিকে আশ্চর্য্যভাবে প্রসারিত ও ফলবান্ করে তুলেছে। সে সঙ্গে তার আনুষঙ্গিক বিকিরণ বিস্ফোরণের মধ্যে জন্মলাভ করে পৃথিবীর আকাশ বাতাস এমন কি মানুষের দুর্জয় মনকে পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত করে তুলেছে। পরমাণুকে তার নানা বস্তু ও শক্তির সংঘাতে যতটুকুই চিনে থাকি, তার বিকিরণকে আজও যেন ভাল বুঝি নি। জীবদেহের বিশেষত মানুষের উপর তার যে দারুণ বিষময় ক্রিয়া, তার স্বরূপ আমরা আজও বুঝে উঠতে পারি নি। বিজ্ঞানের এই বিশেষ উন্নতির ফলে যখন মানুষের বিচরণক্ষেত্র পৃথিবীর পরিধি ছাড়িয়েও চাঁদ ও

মঙ্গলগ্রহের কাছাকাছি গিয়ে ঠেকেছে, বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত রহস্যই যখন একে একে ধরা দিতে বসেছে, সে সময় পরমাণুর বিকিরণ সম্বন্ধে মানুষের এই অজ্ঞতা বিরোধমূলক বলেই মনে হয়। কিন্তু কথাটা হ'ল শতকরা নিরানব্বই মাত্রায় সত্য। নানারকম রাজনৈতিক এবং সামরিক পাকচক্রে এই যুদ্ধহীন সময়েও যুদ্ধের মহড়ায় নানা সাইজের বোমা ফাটানো হচ্ছে। কিলোটন এবং মেগাটন ছাড়িয়েও যাদের পরিধি, তাদের রাশি রাশি তেজস্ক্রিয় ভস্ম এবং বিকিরণ রশ্মির মধ্যে রাজনৈতিক বীরদের অস্পষ্ট ছবি দেখে আমরা চমকিত হই সত্য, কিন্তু যে সত্যটি অনিবার্য্য ভাবে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তা হল এই যে—আমরা কি করতে বসেছি আমরাই তা জানি না। মানুষের দেহে পরমাণুর প্রভাব কি এবং কতদূর পর্য্যন্ত তা প্রসারিত, সে সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অনিশ্চিত। অর্থাৎ আগুন কি তা না জেনেই আমরা আগুন নিয়ে খেলা করছি।

বিকিরণ সম্বন্ধে মানুষের এই অসুবিধাজনক অবস্থার মূলে অবশ্য রয়েছে বিকিরণের বিশেষ প্রকৃতি। পরমাণু বিকিরণের প্রভাব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বহুদূরপ্রসারী—আপাততঃ যা "কিছু নয়" বা অকিঞ্চিৎকর, বহু বছর এমন কি কয়েক পুরুষ পরেও তা দুরারোগ্যভাবে দেখা দিতে পারে। এক দীপ থেকে আর এক দীপ আগুন জ্বালার মত জীবনের যে অনন্ত প্রবাহ বংশগতির ধারায় প্রবাহিত হয়, বিকিরণের "বিষ" তারই মধ্যে অসুপ্ত থেকে সহসা এক সময় জেগে উঠতে পারে। স্পষ্টতঃই এই ধরণের প্রভাব অনুধাবন করা সময়সাপেক্ষ। কিন্তু ইতিমধ্যে বিকিরণের আর একটি স্বরূপ সম্বন্ধে সঠিক জানা গেছে। সে কথাই আমরা শিরোনামায় উল্লেখ করেছি।

বিকিরণের নির্দোষ মাত্রা নেই—কথাটা একটু ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। পরমাণু-বিজ্ঞানীদের মহলে "ম্যাক্সিমাম পারমিসিব্‌ল লেভেল" (Maximum permissible level) বলে একটা কথা চালু ছিল যার মানে হ'ল, বিকিরণের পরিমাণ একটি নির্দ্দিষ্ট মাত্রা পর্য্যন্ত "পারমিসিব্‌ল" বা অনুমোদনযোগ্য—পরমাণুর বিকিরণ এই নির্দ্দিষ্ট মাত্রার কম হ'লে কোন রকম শারীরিক ক্ষতির আশঙ্কা নেই। অর্থাৎ খানিকটা পরিমাণ বিকিরণ আমরা প্রত্যেকেই সহ্য করতে পারি, তবে তার বেশী কখনো নয়। কিন্তু মানুষের সহ্যশক্তি সম্বন্ধে এই ধারণা সম্প্রতি একেবারে পাল্‌টে ফেলতে হয়েছে। বিকিরণ সহ্য করার নাকি কোন নিম্নতম মান নেই। মানুষ পরমাণুর বিকিরণ একেবারেই সহ্য করতে পারে না। বিকিরণের প্রভাব যখন বংশগতির ধারায় অত্যন্ত গোপনে অনেকদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত হ'তে পারে তখন বিশেষজ্ঞদের এই অভিমত নিঃসন্দেহে আমাদের খুব অভিভূত করে। পরমাণুর বিস্ফোরণ অবশ্য আপাতত বন্ধ রয়েছে। কিন্তু সংসারের অনেক সাধারণ জিনিষের মধ্যেই বিকিরণের উৎস লুকানো। টেলিভিশন আমাদের দেশে আজও চালু হয় নি, কিন্তু এই টেলিভিশনের পর্দা পরমাণু বিকিরণের একটি সাধারণ উৎস। পরিমাণ অবশ্য খুবই কম, কিন্তু পরিমাণে কিবা কাজ—বিকিরণ মাত্রই যে নির্দোষ নয়। ঘড়ির জ্বলজ্বলে লেখাগুলিও এমনি বিকিরণের "বিভীষিকা"। আমাদের নিত্যদিনের ব্যবহার্য্য অনেক জিনিষের থেকেই এভাবে বিকিরণ উদ্‌গত হচ্ছে। "সুধা" বলে যা আমরা একদিন গ্রহণ করেছিলাম তার মধ্যেই দেখি "গরল"। তারপর যা আরও মারাত্মক, পৃথিবীর স্বাভাবিক শিলা বালি এবং খনিজ পদার্থের মধ্যে বহু বিকিরণের উৎস এখানে ওখানে অজস্র ভাবে ছড়ানো। মানুষের তৈরি বিকিরণ ছাড়াও আছে এই স্বাভাবিক বিকিরণ। এই বিকিরণও মানুষের পক্ষে ভয়াবহ। পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের অনেক আগে থেকেই এই প্রাকৃতিক বিকিরণ পৃথিবীকে মানুষের পক্ষে "দূষিত" করে তুলেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব সম্ভব হয়েছে। বিকিরণ ভয়াবহ। কিন্তু এই বিকিরণকে গ্রহণ করে মানুষ আজও পর্য্যন্ত বেঁচে রয়েছে। বর্ত্তমানে মানুষের তৈরি বিকিরণ নূতন সমস্যা নিয়ে এসেছে। জ্বলজ্বলে ডায়ালের ঘড়ি এবং টেলিভিশন যা আজ জীবনযাত্রার অঙ্গ, তাও আজ বিকিরণের উৎস হিসাবে দেখা দিয়েছে। বিকিরণ পরিমাণে বাড়ছে। কোন বিকিরণই নির্দোষ নয়। বিশেষজ্ঞদের অভিমতকে অগ্রাহ্য করার কোন কারণ নেই। তবু বিকিরণকে আমরা পুরোপুরি দূরে সরিয়ে রাখতে পারি না। কিন্তু বিষয়টি তখনই অত্যন্ত জটিল হয়, যখন রাজনৈতিক ইন্ধন বিকিরণের উৎসকে বিস্ফোরণের আঘাতে অর্গলমুক্ত করে।

কোন বিকিরণই নির্দোষ নয়, কিন্তু পরমাণুর বিস্ফোরণ থেকে পাওয়া বিকিরণ বোধ হয় তার চেয়ে কিছু বেশি।

রেডিওর আবিষ্কর্তা কে ?

প্রাক্ত বছর ৭ই মে তারিখটি সোভিয়েত রাশিয়ায় "রেডিও দিবস" হিসাবে পালন করা হয়। ১৮৯৫ সালের ঐ দিনটিতে আলেকজাণ্ডার স্টেপানোভিচ্ পোপভ রেডিও আবিষ্কার করেছিলেন ব'লে রুশ বিজ্ঞানীরা দাবী করে থাকেন (পুরাণো সাল গণনার মতে দিনটি হলো ২৫শে এপ্রিল, ১৮৯৫ সাল)। সে যাহোক, রেডিও আবিষ্কারকের দাবী নিয়ে একাধিক লোকের নাম উচ্চারিত হয়েছে। আমাদের দেশে অনেকে এখনো আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুকেই আবিষ্কারকের সম্মান দিয়ে থাকেন। অবশ্য অনুষ্ঠানিকভাবে ইতালীর মার্কনীই এই স্বীকৃতি পেয়েছেন। এ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যা অনুসন্ধান করে দেখা হয়েছে তাতে রেডিও উদ্ভাবনের বিবরণটি খুব সংক্ষেপে নিম্নলিখিত ভাবে লিপিবদ্ধ করা যায় (বিস্তৃত আলোচনা পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধের আয়তন নেবে) :

ম্যাক্সওয়েলের একটি সূত্রকে অবলম্বন করে বিজ্ঞানী হার্ট্‌জ্ একটি যন্ত্র তৈরি করলেন যা থেকে রেডিও তরঙ্গ আলোর তরঙ্গের মত চারধারে ছড়িয়ে যেতে পারে, এবং আশ্চর্য্য-কথা, এই অভিনব তরঙ্গটি দেওয়ালের বাধাকেও সোজাসুজি অতিক্রম করে যায়। কিন্তু এ ঘটনার কিছু দিন পরেই হেনরিখ্ হার্ট্‌জ অকালে দেহরক্ষা করেন। ইতিমধ্যে এই বিচিত্র গবেষণার কথা পৃথিবীর বিজ্ঞানী মহলে ছড়িয়ে পড়েছে। আলোক সদৃশ এই অদ্ভুত বেতার তরঙ্গকে আশ্রয় করে বিনা তারে সংকেত বা কথা পাঠানোর উদ্দেশ্যে দেশে দেশে বিজ্ঞানীরা সচেতন হয়ে ওঠেন। ইংলণ্ডের অলিভার লজ, ভারতের জগদীশচন্দ্র, ইতালীর মার্কনী এবং রুশদেশের পোপভ রেডিও গবেষণার প্রাথমিক পর্য্যায় রচনা করেছেন। এঁদের মধ্যে নিঃসন্দেহে মার্কনীই হলেন সেই ব্যক্তি যিনি যোগাযোগ ব্যবস্থায় রেডিও তরঙ্গের গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন।

এ. কে. ডি.

গ্রন্থ-পরিচয়

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ—শ্রীমণি বাগচি প্রণীত, 'জিজ্ঞাসা' কর্ত্তৃক ১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভেনিউ, কলিকাতা-২৯ এবং ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ছয় টাকা। প্রথম প্রকাশ আগষ্ট ১৯৬৩।

গ্রন্থারম্ভেই লেখক বলিয়াছেন আধুনিক ভারতবর্ষে 'জাতির জনক'-এইগৌরব একজনেরই প্রাপ্য। তিনি রাজা রামমোহন রায়। তেমনি 'জাতীয়তার জনক'—এইগৌরবও এক জনেরই প্রাপ্য। তিনি রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার কিছু নাই। অবশ্য বর্ত্তমান ভারতের বিশেষ এক রাজনৈতিক দলের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইহা স্বীকার করিবেন না, কিন্তু ইহার দ্বারা চিরন্তন সত্যকে চিরকাল আবৃত করিয়া রাখা যাইবে না। বর্ত্তমান গান্ধী যুগের বহু পূর্ব্বেই সুরেন্দ্রনাথ বলেন, "Moral re-generation is the precursor of political re-generation."

সুরেন্দ্রনাথের জীবন, জীবন-ব্রত এবং জীবন-সাধনা আমাদের, কেবল বাঙ্গলার নহে, সমগ্র ভারতের যে কত বড়, কত মহান সম্পদ, দেশবাসী-বোধ হয় আজিও সে-বিষয় সম্যক্ ধারণা করিতে পারে নাই। ইহা দেশের, বিশেষ করিয়া বাঙ্গালীর পরম দুর্ভাগ্য। রাষ্ট্রগুরুর প্রতি তাঁহার উত্তরপুরুষ সুবিচার করিতে পারেন নাই, সে-যোগ্যতাও বোধহয় এখনও আমরা অর্জ্জন করিতে পারি নাই।

ইতিহাসে বিশ্বাস করিতে হইলে একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, সুরেন্দ্রনাথই বাঙ্গালী তথা ভারতবাসীকে জাতীয়তা বোধ এবং রাজনীতির অক্ষর পরিচয় করাইয়াছিলেন। তাঁরই নেতৃত্বে সর্ব্বপ্রথম স্বায়ত্ত্ব-শাসন লাভের জন্য দেশব্যাপী নিয়মানুগ আন্দোলন পরিচালিত হয়। দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া একাদিক্রমে এই একটি মানুষ এদেশে রাজনৈতিক আন্দোলন চালনা করেন। দেশবাসীর রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ সাধনে সুরেন্দ্রনাথ একদা যুগান্তর আনয়ন করেন। ভারতবর্ষ যে এক দেশ, সমস্ত ভারতবাসী যে একই জাতি, তাহা সুরেন্দ্রনাথ বহুপূর্ব্বে ঘোষণা করেন, কিন্তু এ-সত্য বাঙ্গালী ছাড়া অন্য প্রদেশবাসী স্বীকার করিতে পারিবেন কি?

সুরেন্দ্রনাথই তাঁহার অলৌকিক বাগ্‌বিভূতি, রাজনৈতিক প্রাজ্ঞতা

এবং অক্লান্ত কর্ম্মশক্তির দ্বারা পরাধীন নিদ্রিত জাতিকে স্বাধীনতার অগ্নিবাণী শ্রবণ করাইয়াছিলেন। এককালে "সুরেন বাঁড়ুজ্যে" নামধারী পুরুষ সিংহ দেশের সহস্র সহস্র যুবককে দেশসেবা এবং ভাবীকালে দেশের স্বাধীনতার ব্রতে উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় ছিল—ভারতবর্ষ অবশ্যই একদিন স্বাধীন হইবে এবং এই ধ্রুব বিশ্বাসই তাঁহার সর্ব্ব কর্ম্মপ্রচেষ্টা চিন্তা ভাবনার মধ্যে উৎসারিত হইত।

লেখক রাষ্ট্রগুরুর জীবনী চর্চ্চা করিয়াছেন গভীর নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা এবং পরিশ্রমের সহিত। সুরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে বহু অজ্ঞাত তথ্যাদি তিনি এই জীবনীতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথের পূর্ণ জীবনী মাত্র ২৫৩ পৃষ্ঠায় লেখা এক প্রকার অসম্ভব, কিন্তু এই ২৫৩ পৃষ্ঠাতেই গ্রন্থকার বাঙ্গালীর তথা ভারতের এক অসামান্য পুরুষের জীবনী জানিবার মত বহু কিছুই দিয়াছেন। পুস্তকে এমন বহু তথ্য ও ঘটনার কথা আছে যাহা বর্ত্তমান কালের খুব কম লোকেরই জানা আছে, অথচ দেশের, বিশেষ করিয়া বাঙ্গলার স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম যুগের বা আদিপর্ব্বের কথা আলোচনা করিতে হইলে যাহা জানা একান্ত প্রয়োজন, এক হিসাবে কর্ত্তব্যও বটে। আনন্দমোহন বসু এবং সুরেন্দ্রনাথ—এই দুই মহাপুরুষের জীবনের সাধনা ছিল ভারতবর্ষকে এক মহাজাতিতে পরিণত করিয়া পরাধীনতার বন্ধন মোচন করা।

সুরেন্দ্রনাথের জীবনী আলোচনা করিতে গিয়া লেখক রমেশচন্দ্র দত্ত, আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিপিন চন্দ্র পাল এবং আরো কয়েকজন তৎকালীন পরম শ্রদ্ধেয় দেশভক্ত নেতা ও দেশসেবকের বহু উক্তি প্রভৃতি পুস্তকে দিয়াছেন। এইগুলি পাঠ করিয়া বর্ত্তমান পাঠক সমাজ দেশের ও বাঙ্গলার স্বাধীনতা যুগের দিবারম্ভের বহু কিছুই জানিতে পারিবেন। জানিয়া পুলকিত হইবেন।

আমরা মনে করি এমন একটি পুস্তকের এখন বড়ই প্রয়োজন ছিল। বাঙ্গালী আজ আত্মবিস্মৃত, আশাহীন জাতিতে পরিণত হইয়াছে। স্বাধীন ভারতের দরবারে বাঙ্গলা ও বাঙ্গালী উপেক্ষিত, বাঙ্গালীর ইতিহাস বিকৃত। ঘটা করিয়া আজ যে "স্বাধীনতার ইতিহাস" রচিত হইতেছে, সেই ইতিহাসে বাঙ্গালীর ত্যাগ, বাঙ্গালীর আত্মদান, দেশের স্বাধীনতার কারণে বাঙ্গালীর সর্ব্বস্ব পণ, এ-সব কথা প্রায় পরিত্যক্ত হইতেছে এবং ইহা ইচ্ছাকৃত। বাঙ্গালীকে আজ আবার নূতন করিয়া রামমোহন, আনন্দমোহন বসু, রাজনারায়ণ বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি বিস্মৃতপ্রায় মহাজনদের জীবনকথা জানিতে হইবে। আমাদের মৃতপ্রায় জীবনে ইহা মৃত সঞ্জীবনীর কাজ করিবে।

আলোচ্য পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি। গঠন পারিপাট্যে পুস্তকখানি মনোহর। উপহারে নাটক নভেল অপেক্ষাও লোভনীয়।

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

লোকমাতা নিবেদিতা—মণি বাগচী, সুতপা প্রকাশনী, ৪-সি রজবআলি লেন, কলিকাতা-২৩, মূল্য ২·৫০ ন. প.।

নামেই বইখানির পরিচয়। ইহাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ পরিচয়। সেবিকা হইয়াই তিনি এদেশে আসিয়াছিলেন—সেবা করিয়াই চলিয়া গেলেন। এমন করিয়া নিজেকে যিনি সমর্পণ করিতে পারেন তিনিই ত মুক্ত। নিবেদিতার এই দিকটি লইয়া আর কেহ আলোচনা করেন নাই—অবশ্য এ উপলব্ধি-সাপেক্ষ। এজন্য মণিবাবুকে ধন্যবাদ। চিনিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ, "নিবেদিতা ছিলেন লোকমাতা। ভারতবর্ষের মঙ্গলের প্রতি তাঁর প্রীতি একান্ত সত্য ছিল। মানুষের মধ্যে যে শিব আছেন সেই শিবকেই এই সতী সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছিলেন। তিনি দরিদ্রের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখতে পেয়েছিলেন, স্বয়ং তাদেরই সেবায় তিনি তাঁর জীবনকে সার্থক করেছিলেন।"

নিবেদিতা চরিত্রের এমন বিশ্লেষণ আর কোথাও পাই নাই। গ্রন্থকার তাঁর এই ছোট্ট বইখানিতে মার্গারেটের বাল্যজীবন, স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ, ভারতে আগমন, সন্ন্যাসিনীর জীবন যাপন, দীক্ষাগ্রহণ এবং নিজেকে সমর্পণ সকল কথাই সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। তারপর তাঁহার কর্ম্মজীবন, ভারতদর্শন—সংক্ষিপ্ত হইলেও, লেখকের বর্ণনা-চাতুর্য্যে সুপরিস্ফুট। পাথর কুঁদিয়া কুঁদিয়া শিল্পী যেমন মূর্ত্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে, স্বামীজী তেমনি নিবেদিতাকে তিলে তিলে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। নিবেদিতা ছিলেন তাঁর মানস-কন্যা। লেখককে ধন্যবাদ, সেই মানস-কন্যার রূপটি তিনি অতিসুন্দর ভাবে ফুটাইয়া তুলিতে পারিয়াছেন।

তিমির বিদার—সমর বসু, কনটেমপোরারী পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১২, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১। মূল্য তিন টাকা।

বর্ত্তমান যুগে একদল অসাধু ব্যবসায়ী শহরের বুকে যেসব পাপচক্রের-ফাঁদ পাতিয়া রাখিয়াছে এবং অভাবের তাড়নায় নারীরা সেই ফাঁদে পড়িতে বাধ্য হইতেছে, তাহারই একটি চিত্র গ্রন্থকার উপন্যাসের মাধ্যমে তুলিয়া ধরিয়াছেন।

এই সুযোগ লইয়াছে বিশেষ করিয়া ধনীরা—অর্থ আছে, অর্থ বিলাইতেও তাহারা জানে। শিক্ষা সংস্কৃতি একটা আবরণ মাত্র—প্রত্যেক মানুষই এখানে মুখোস পরিয়া আছে। ইহারা পাঁকে নামাইতে জানে, পাঁক হইতে তুলিতে জানে না। এই পাঁক হইতে তুলিবার ব্রত লইয়াছিল নীলাদ্রি। নীলাদ্রির মত ছেলেরাই পারে যারা আত্মসচেতন, যারা তপস্যা করে আলোর—অন্ধকারের নয়। আর একটি চরিত্র দীপালির। যে সকল রকম প্রলোভনকে উপেক্ষা করিতে পারে—এমনি তার কঠিন স্থৈর্য্য, এমনি সংযম। মাতৃরূপা মা মনীষা—জগদ্ধাত্রী মা। নীলাদ্রি যাহার সমাধান করিতে পারিল না, মা তাহা করিলেন। নীলাদ্রি জানিত, একমাত্র মা-ই পারে পথ দেখাইতে। তাইত সে প্রমীলাকে মা'র কাছে লইয়া আসিয়াছিল। মা সবকথাই মন দিয়া শুনিলেন, বলিলেন, "তুমি ওকে আগুন বলে ভুল করেছো। বাইরে যেটা জ্বলছে সেটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিলেই দেখবে সৌগন্ধে তোমার মন ভরে উঠেছে। ধূপ জ্বললে কি গন্ধ পাওয়া যায়? নিভিয়ে দিতে হয়। একটু আশ্রয় পেলেই, দেখবে ও কত কোমল, কত কমনীয়।"

এমনভাবে সমাধান মা নহিলে কেই-বা করিতে পারিতেন। 'তিমির বিদার' একটি প্রবলেম। গ্রন্থকার যে উদ্দেশ্য লইয়া ইহা রচনা করিয়াছেন তা সার্থক হইয়াছে। চরিত্রগুলি জীবন্ত—তাই এত সুন্দর। লেখার বাঁধুনিও ভাল। মনে হয়, প্রত্যেকেরই ইহা পড়িতে ভাল লাগিবে।

শ্রীগৌতম সেন

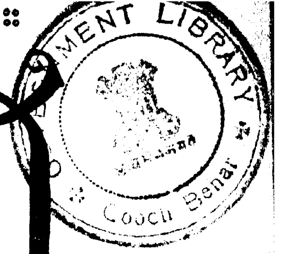
সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—কল্যাণ দাশগুপ্ত, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ১২০।২ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা।



ঃঃ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ঃঃ

প্রবাসী



"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৩শ ভাগ
২য় খণ্ড

৫ম সংখ্যা
ফাল্গুন, ১৩৭০

বিবিধ প্রসঙ্গ

নিরাপত্তা পরিষদে পাকিস্তান

ভারত বিভাগের পর সতের বৎসর পূর্ণ হইতে চলিল। এই বিভাগের পর যে সকল "দেশী রাজ্য" ঐ বিভাগ ব্যবস্থার বাহিরে ছিল তাহাদের মধ্যে কাশ্মীর ছিল পাকিস্তানের লোলুপ দৃষ্টির লক্ষ্য। দেশ বিভাগের নিয়ম—যাহা ভারত ও পাকিস্তান দুই তরফই স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন—অনুসারে ঐ দেশীয় রাজ্যের অধিপতি তাঁহার রাজ্যের সীমানার সহিত সংযুক্ত যে কোন রাষ্ট্রের নিকট আবেদন করিয়া নিজ রাজ্যকে সেই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিতেন এবং সেই অধিকার অনুযায়ী, আবেদনের ফলেই কাশ্মীর ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্গত হয়। পাকিস্তান সেই সময়ে সশস্ত্র অভিযানের বলে কাশ্মীর দখলের চেষ্টা করে কিন্তু ভারতীয় সেনার প্রতিরোধে তাহা সফল হয় নাই। পরে ভারতীয় সেনাদলের প্রবল পাল্টা আক্রমণে যখন পাক সেনাদল কাশ্মীর অঞ্চলের অধিকাংশ ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছে তখন প্রধানমন্ত্রী নেহরু তাঁহার বুদ্ধিদাতাগণের পরামর্শে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া এই কাশ্মীর আক্রমণের বিষয়টি রাষ্ট্রপুঞ্জের সম্মুখে উপস্থিত করেন। বলা বাহুল্য এই বিষয়টি রাষ্ট্রপুঞ্জের বিবেচনাধীন করার পরামর্শের পিছনে তদানীন্তন বৃটিশ সরকারের কূটনৈতিক চাল ছিল। পাকিস্তানকে তখনকার বৃটিশ রাজের অধিকারিবর্গ বিশেষ অনুগ্রহের অধিকারী (most favoured nation) রূপে গণ্য করিতেন এবং এই ব্যাপারে তাঁহারা স্বাধীনতাবাদী ভারতের উপর তাঁহাদের বিদ্বেষ ও প্রচ্ছন্ন হিংসা চরিতার্থ করিবার সুবর্ণ সুযোগ বলিয়া মনে করেন।

ভারতের অভিযোগ ছিল যে পাকিস্তান বিনা কারণে কাশ্মীর আক্রমণ করিয়া দখলের চেষ্টা করিয়াছে। পাকিস্তানের পক্ষে যে বক্তৃতার ঝড় বহাইয়া জাফরুল্লা খাঁ সমস্ত অভিযোগের মোড় ফিরাইয়া ভারতের বিরুদ্ধে "মনুষ্য হননে"র (genocide) অভিযোগ আনেন তাহার পিছনেও পাকিস্তানের পোষকবর্গের সমর্থন ছিল। যাহাই হোক রাষ্ট্রপুঞ্জে নিরপেক্ষ বিচারের পথ একেবারে রুদ্ধ করার মত ক্ষমতা সেই পোষকবর্গের ছিল না। সুতরাং সিদ্ধান্ত হইল যে, (১) পাকিস্তান আক্রমণকারী (aggressor) কি না সে বিষয়ে সরেজমিনে তদন্ত করিবেন রাষ্ট্রপুঞ্জ-নিযুক্ত নিরপেক্ষ বিচারক, (২) পাক-অধিকৃত কাশ্মীর ও ভারতীয় কাশ্মীর এই দুইয়ের সীমান্তে রাষ্ট্রপুঞ্জের পর্য্যবেক্ষকদল শান্তি রক্ষা করিবেন যতদিন না এই বিষয়ে একটা হেস্তনেস্ত হয়, এবং (৩) পাকিস্তান তাহার আক্রমণ উদ্ভূত অধিকার অপসারণ করিলে, অর্থাৎ পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের অংশ ছাড়িয়া দিলে, কাশ্মীরীরা পাকিস্তানের অন্তর্ভূত হইতে চায় না ভারতেই থাকিতে চায় সে বিষয়ে জনমত (plebiscite) লওয়া হইবে। পণ্ডিত নেহরু নিজ বুদ্ধিগুণে এই তৃতীয় দফাটি স্বীকার করিয়া পাকিস্তান ও তাহার বন্ধুবর্গের সকল ভারত-বিদ্বেষী চক্রান্তের পথ খুলিয়া দিলেন।

সরেজমিনে তদন্তের ফলে পাকিস্তান আক্রমণকারী (aggressor) সাব্যস্ত হয়। এই সত্যটি ব্রিটিশ ও মার্কিন প্রেসের সহযোগিতায় পাকিস্তান চাপা দিবার বহু চেষ্টা করিয়াছে ও করিতেছে। কাশ্মীরের পাক-অধিকৃত অঞ্চলের সীমান্তে রাষ্ট্রপুঞ্জের পর্য্যবেক্ষক দল আজও রহিয়াছে। এখানে বলা প্রয়োজন যে অল্পদিন পূর্ব্বে যখন পাকিস্তান বাহজগতকে জানায় যে ভারত চাকনোট অঞ্চলে সৈন্য ও অস্ত্রবল বৃদ্ধি

করিতেছে তখন ভারতের অনুরোধে রাষ্ট্রপুঞ্জের পর্য্যবেক্ষকদল সেখানে যাইয়া রিপোর্ট দেয় যে সৈন্য বলবৃদ্ধি করিয়াছে ও যুদ্ধ প্রস্তুতি ক'রয়াছে পাকিস্তান, ভারত নয়। পাকিস্তান তাহার অন্যায় আক্রমণলব্ধ অধিকার এখনও ছাড়ে নাই, যদিও তার পর পনের বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কিছুদিন পুর্ব্বে যখন পাকিস্তান রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে ঐ কাশ্মীরে জনমত লওয়ার দাবী জানায় তখন তাহার প্রচ্ছন্ন সমর্থন আসে মার্কিন ও ব্রিটিশ সরকারের কাছ হইতে। বলিতে কি রুশ রাষ্ট্র ইহাতে আপত্তি না জানাইলে সেবার ভারতকে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হইত। তবে সেইবার শ্রীকৃষ্ণ মেনন রাষ্ট্রপুঞ্জকে সুস্পষ্টভাবে জানাইয়া দেন যে, যখন পাকিস্তান অতদিনেও তাহার অন্যায় দখল খালি করে নাই তখন ভারত আর ঐ জনমত গ্রহণের সর্ত্ত মানিতে রাজি নয় এবং সেই সর্ত্ত অতঃপর অকেজো।

সেই প্রথম পর্ব্বের পর আরও অনেক কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এদিকে কাশ্মীর আরও দৃঢ় ভাবে ভারতরাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট হইয়াছে। ওদিকে পাকিস্তান তাহার দুরভিসন্ধি পূরণে ব্রিটিশ ও মার্কিন সরকারের সক্রিয় সহায়তা পাওয়ার বিষয়ে কিছুটা হতাশ হইয়া নূতন নায়ক চীনের গলে মাল্য দান করিয়াছে। ব্রিটিশ সরকারকে উপেক্ষা এখন স্পষ্ট ভাবেই সে করে তবে মার্কিন সরকারের অর্থ, পণ্য ও অস্ত্র সাহায্যের উপর তাহার রাষ্ট্রের ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এখনও অতি-বৃহৎ অনুপাতে নির্ভর করিতেছে, সুতরাং সেখানে একেবারে ফারকাৎ হওয়া পাকিস্তানের পক্ষে বিপজ্জনক।

অন্য দিকে ভারত এখন চীন কর্ত্তৃক প্রবল ভাবে আক্রান্ত। এই অবস্থা পাকিস্তানের স্বার্থসিদ্ধির পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল। সেই সঙ্গে কাশ্মীরের জনগণের মতিগতির উপর পাকিস্তান আর ভরসা রাখিতে পারিতেছে না। হজরতবালে পয়গম্বরের পবিত্র কেশ হারাইয়া যাওয়ায় পাকিস্তান ঐ দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা ও পাকিস্তান ভুক্তির জন্য প্রবল বিক্ষোভ হইবে ভাবিয়াছিল। সেজন্য পাকিস্তানের বেতারে অবিরাম অগ্নিবর্ষণের ন্যায় অপপ্রচার, সংবাদপত্রে ঐ চুরির সঙ্গে ভারতের "হিন্দু সরকার"কে জড়িত করিয়া বিক্ষোভ উত্তোলনের চেষ্টা, পাকিস্তানী গুপ্তচর মারফৎ উস্কানি ও নানা প্রকারে হাঙ্গামা বাধাইবার চেষ্টা, কোনটারই কিছু কম করে নাই এবং এখনও সে চেষ্টা অবিশ্রাম চলিতেছে। কিন্তু সে সকলই ব্যর্থ হওয়ায় এখন রহিল রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদ। এই ত নিরাপত্তা পরিষদে পাকিস্তানী অভিযোগের পশ্চাদ্‌ভূমি।

অভিযোগের শুনানী হইয়া গিয়াছে নিউইয়র্কে, রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের সম্মুখে বিগত ৪ঠা ফেব্রুয়ারি। মিঃ ভুট্টোর বিবৃতিতে নূতন কিছুই ছিল না। তবে সেই বাঁধিগতের কিছু পুনরাবৃত্তি বোধ হয় এইজন্য প্রয়োজন যে, তাহাতে পাকিস্তানের মনোবৃত্তি কি অবস্থায় পৌঁছাইয়াছে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। ঐ বিবৃতিতে যাহা ছিল তাহার মোটামুটি বিবরণ এইরূপ :—

"ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের দ্রুত অবনতি হইতেছে। এই অধোগতিরোধ না করিলে উহার পরিণামে অসীম ও সুদূরপ্রসারী দুর্গতি হওয়া সম্ভব। এই ব্যাপারে সমস্ত মানবজাতির এক-ষষ্ঠাংশ জড়িত, সুতরাং এ অবস্থা কিছুদিন চলিলে এমন বিস্ফোরণ হইবে যাহাতে দুই পক্ষেরই সর্ব্বনাশ নিশ্চিত। আমরা যখন এই অধিবেশনের জন্য অনুরোধ জানাই তখন ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি এক প্রেস সাক্ষাৎকারে নাকি বলেন যে; এই অধিবেশনে শুধু মাত্র কাদা ছোঁড়া হইবে এরূপ রিপোর্ট আছে। মহাশয় আমি বলি যে এই বিরোধে বাজি পণ এতই বেশী, ইহাতে এত অসংখ্য লোকের মরণ-বাঁচন নির্ভর করে এবং ইহার মধ্যে এত বড় ও সাংঘাতিক আন্তর্জ্জাতিক আলোড়নের সম্ভাবনা রহিয়াছে যে শুধু কাদা ছুঁড়িয়া ইহার সমাধান আমরা চাহিতে পারি না। ন্যায় বিচারেই এই সমস্যার পূরণ হইতে পারে ইহাই আমাদের প্রস্তাব, কাদা ছোঁড়ায় নহে।"

তার পর তিনি বলেন, "জনমত গ্রহণ সম্পর্কিত প্রস্তাব উভয়তঃ গৃহীত হইবার পর ১৬ বৎসর পার হইয়া গিয়াছে অথচ জনমত গৃহীত হয় নাই। এর মধ্যে কোন সময়েই পাকিস্তান বা কাশ্মীরের জনসাধারণ ভারত কর্ত্তৃক কাশ্মীরের অধিকাংশ দখলকে মানিয়া লয় নাই। আমরা আমাদের ন্যায়সঙ্গত দাবী কখনও ছাড়ি নাই এবং সেই বিরোধজনিত উৎকণ্ঠাপূর্ণ অবস্থার কোনও উন্নতি এতাবৎ কখনও হয় নাই। এই সঙ্গে আমি নিবেদন করি যে, আন্তর্জ্জাতিক বিরোধে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়াছে এই কারণ দর্শাইয়া কোন পক্ষ যদি তাহার স্বার্থ পূরণ করিতে পারে তবে রাষ্ট্রপুঞ্জের সংবিধান বাতিল হইয়াছে ধরা উচিত।"

তার পর উপনিবেশবাদ ইত্যাদির নানা কথার অবতারণার পর মিঃ ভুট্টো বলেন, "যদি ১৯৪৮ সালে নিরাপত্তা পরিষদ কাশ্মীরের অবস্থা দেখিয়া চিন্তিত ও ব্যস্ত হইয়াছিলেন তবে ১৯৬৪ সালে সেরূপ চিন্তিত ও ব্যস্ত হইবেন না কেন? যদি বলা হয় যে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে তবে বলিব যে পরিবর্ত্তন এইমাত্র যে ১৯৪৮ সালে কাশ্মীরের জনগণ ভারতের বিরুদ্ধে সশস্ত্র ভাবে লড়িয়াছিল এবং এখন তাহারা লড়িতেছে না।"

মিঃ ভুট্টোর লিখিত অভিযোগের মধ্যে ছিল ১৯৪৮ সালে কাশ্মীরের জনগণ ও উপজাতিবর্গ সশস্ত্র যুদ্ধ করে। ভাষণে মিথ্যার পসরা আরও "ঝাড়া" করিবার জন্য উপজাতির কথা বাদ দেওয়া হয়।

অতঃপর আসে জগতে বৃহতের বিরুদ্ধে 'ক্ষুদ্ররাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষা, প্রেসিডেণ্ট জনসন ও মিঃ ক্রুশ্চভের শান্তির পথে

আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিরোধের নিরসনের উদারনীতিপূর্ণ প্রস্তাবের উল্লেখ ও সেই সঙ্গে বলা হয় যে, যদি বৃহৎ অর্থাৎ ভারতকে—কালের গতির অজুহাতে স্বার্থ-পূর্তি করিতে দেওয়া হয় তবে এ সবই বৃথা! তার পর আসে কাশ্মীরের জনগণের জন্য পাকিস্তানের মর্ম্মবেদনার নিবেদন এবং কাশ্মীরবাসীর স্বাতন্ত্র্যের অধিকার অনুযায়ী ভবিষ্যৎ নির্ণয়ের অধিকার ইত্যাদি ইত্যাদি। সেই সঙ্গে মিঃ ভুট্টো জানাইয়া দেন যে কাশ্মীরের জনগণের মধ্যে প্রবল আলোড়ন চলিতেছে।

তার পর আসে উভয় রাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের কথা। এই সঙ্গে মিঃ ভুট্টো বেশ গম্ভীর ভাবে বলেন যে, "সভ্য রাষ্ট্র মাত্রের ধর্ম্মনিরপেক্ষ ভাবে সকল নাগরিকের মানবীয় অধিকার রক্ষা করাই একান্ত কর্ত্তব্য! আশ্চর্য্যের বিষয় এ কথা উচ্চারণের সময়ও তাঁহার মুখে কোনও বিকার দেখা যায় নাই। সত্যই অভিনেতা হিসাবে এই ব্যক্তি বাহবা-প্রাপ্তির অধিকারী। যাহাই হউক নিজেদের এ বিষয়ে সাফাই গাহিয়া ও ভারতের উপর দোষ চাপাইয়া সব শেষে কাশ্মীরের বিষয়টি নিষ্পত্তি না হওয়ায় পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে সম্পর্ক "বিষাক্ত" হইতেছে ও উহার সমাধান হইলে ভারতের সঙ্গে সৎ প্রতিবেশী সম্পর্ক হইতে পারে বলিয়া তিনি ক্ষান্ত হন। অবশ্য শেষ করার পূর্ব্বে তিনি রণহুঙ্কার দিতেও কসুর করেন নাই, কেননা শান্তিপূর্ণ সমাধান যদি না হয় তবে কাশ্মীরে ফের লড়াই বাধিবে একথাও তিনি বলেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মূলে যে ভারতের ঔপনিবেশিক অত্যাচার ও চক্রান্ত রহিয়াছে একথাও তিনি বলেন। জানি না তিনি এই সকল নির্লজ্জ মিথ্যাপূর্ণ উক্তি কি ভরসায় করিয়াছিলেন। তাঁহাদের দুই নায়কের (ব্রিটেন ও আমেরিকার) মিথ্যাকে সত্য করার জাদুকরি ক্ষমতার উপর এতটা বিশ্বাস কিসের দরুণ আসিয়াছে আমাদের জানা নাই।

অবশ্য ভারতের পক্ষ হইতে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীচাগলা এই সকল মিথ্যার আবরণ মোচন করিয়া তাহার প্রকৃত নির্লজ্জ নগ্নরূপ প্রকাশ করিয়া দেন। তাঁহার ভাষণে প্রবীণ ও অভিজ্ঞ ন্যায়াধীশের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার ১৪,০০০ শব্দযুক্ত যুক্তিতথ্যপূর্ণ ভাষণের অনুবাদ এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং অতি সংক্ষেপে তাহার বিষয়-বস্তুর উল্লেখ ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

তিনি বলেন যে, একথা প্রায়ই ভুলিয়া যাওয়া হয় যে ১৯৪৮ সালে ভারতই কাশ্মীর বিরোধ বিষয়ে নিরাপত্তা পরিষদে অভিযোগ (পাকিস্তানের বিরুদ্ধে) আনে, পাকিস্তান ফরিয়াদি ছিল না। সেই সঙ্গেই তিনি বলেন পাকিস্তান এইখানে তখন আসিয়াছিল অভিযুক্ত আক্রমণ-কারী রূপে এবং আজও সে নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়া আক্রমণজনিত অধিকৃত এলাকায় রহিয়াছে সুতরাং সেই এই মহান প্রতিষ্ঠানের (নিরাপত্তা পরিষদ) প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশে দোষী। তিনি বলেন, পাকিস্তানের অভিযোগগুলি কল্পনাপ্রসূত এবং তিনি অকাট্য তথ্য ও যুক্তিতে তাহার অসারতা প্রমাণ সঙ্গে সঙ্গেই করিবেন।

তিনি বলেন, পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতির মূলসূত্র ভারতের সঙ্গে সকল দিকে বিরোধ সৃষ্টি। বর্ত্তমানে সেই সূত্র অবলম্বনেই পাকিস্তান ভারতকে স্বদেশে ও আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে দুর্ব্বল করিবার জন্য চীনের সঙ্গে চক্রান্তে লিপ্ত হইয়াছে। চীনের সাম্রাজ্যবাদ ও আক্রমণ অভিযানের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার ক্ষমতা একমাত্র ভারতেরই আছে। যদিবা ভারত পড়িয়া যায় তবে চীনের বিজয় অভিযান প্রতিরোধে কিছুই টিঁকিবে না। সুতরাং শুধু ভারতের স্বার্থে নয় জগৎ শান্তির জন্যও ভারতের শক্তিবৃদ্ধি প্রয়োজন। এই কারণে আমরা, যাঁহারা এ বিষয়ে আমাদের সাহায্য করিতেছেন, তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রের ভিতরেই যদি দৌর্ব্বল্য আসে তবে সে শক্তিবৃদ্ধি বৃথাই হইবে।

পাকিস্তান অভিযোগ করিয়াছে যে ভারত কাশ্মীরে রাষ্ট্র পরিস্থিতি বদল করিতেছে। পাকিস্তান নিজেই চীনকে কাশ্মীরের ২০০০ বর্গ মাইল ভূমি—যাহার উপর পাকিস্তানের কোনও ন্যায়সঙ্গত অধিকার নাই—দান করিয়া সেই কাজ করিয়াছে। কিন্তু কাশ্মীর আইনতঃ ও সংবিধান অনুযায়ী ভারতের অঙ্গ একথা ছাড়িয়া দিলেও, আমরা হিন্দু ও মুসলমান যে পৃথক জাতি ইহা স্বীকার করি না সে কথা ছাড়িয়া দিলেও এবং কাশ্মীর যে আমাদের রাষ্ট্রের ধর্ম-নিরপেক্ষতার প্রতীক সে কথাও ছাড়িয়া দিলে এখন বলিতে হইবে যে চীনা আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে কাশ্মীর এখন জীবন-মরণ সম্পর্কিত গুরুত্ব ধারণ করিতেছে। ভারতের মানচিত্রে একবার দৃষ্টিপাত করিলেই একথা বুঝা যাইবে।

সর্ব্বাগ্রে ভারত ও পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ অবস্থা শান্তিময় করা যে প্রয়োজন এবং সে কারণে যে পাকিস্তানের তরফ হইতে হুমকি দিয়া ভয় প্রদর্শনের চেষ্টা বন্ধ করা ও ভারতের সঙ্গে যুদ্ধযাত্রা বিরোধী প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন এ বিষয়ের বিশেষ উল্লেখ করিয়া শ্রীচাগলা বলেন যে "পাকিস্তানের বর্ত্তমান আবেদনে যে সকল ঘটনার বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে তাহা অতি ভয়ানক লোমহর্ষণকারী কাহিনীর মত শোনায়। আমি সবিশেষ প্রমাণে আপনাদের সম্পূর্ণ রূপে বুঝাইব যে এই কাহিনী উর্ব্বর কল্পনাপ্রসূত মিথ্যা মাত্র।"

তার পর একে একে পাকিস্তানের প্রত্যেকটি যুক্তি খণ্ডন করিয়া ও অকাট্য তথ্য ও নজীরের সাহায্যে পাকিস্তানের বিবৃতির অসারতা ও অলীকত্ব প্রমাণ করিয়া শ্রীচাগলা বলেন যে পাকিস্তান এই আবেদনের সঙ্গেই ভয় প্রদর্শনও করিয়া-ছেন এবং আমাদের সেই ভয় দেখানোর সম্মুখে নতি স্বীকার করিতে বলা হইয়াছে। তাঁহার তথ্যের মধ্যে পাকিস্তান

যাঁহাদের কথা নিজের উক্তির সমর্থনে উল্লেখ করিয়াছে তাঁহাদেরই লিখিত বিবৃতি হইতে পাকিস্তানের যুক্তির বিপরীত মত ও মন্তব্য উদ্ধৃত করেন। অন্য পাকিস্তানী নজীরের বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপে পরিসংখ্যানে প্রদত্ত বিবরণ উপস্থিত করেন। কাশ্মীরে জনমত বা গণভোট গ্রহণ সম্পর্কে তিনি সুস্পষ্ট ভাবে নিরাপত্তা পরিষদকে জানাইয়া দেন যে উহাতে ভারত কোন ক্রমেই রাজী হইতে পারে না এবং (পাকিস্তান দীর্ঘদীন ঐ গণভোট সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদের নির্দ্দেশ অগ্রাহ্য করায়) এবিষয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের নির্দ্দেশ অচল হইয়া গিয়াছে। এ বিষয়ে তিনি বলেন :—

"কাশ্মীর বিরোধ আরম্ভ হওয়ার পর অনেকদিন কাটিয়া গিয়াছে। এই কথাটা আজ অনেকেই ভুলিয়া গিয়াছেন যে, ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসে ভারতই নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর সম্পর্কে অভিযোগ উত্থাপন করে। ঐ সময়ে ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করে যে পাকিস্তান কাশ্মীর আক্রমণ করিয়াছে।

ঐ সময়ে পাকিস্তান কাশ্মীরের উপর তাহাদের অধিকার সম্পর্কে কোন কথা বলে নাই। তাহারা শুধু এই কথাই বলিয়াছিল যে, কাশ্মীরে হানাদারদের অভিযানের সহিত তাহাদের কোন যোগ নাই। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী পাকিস্তানের যে কাশ্মীরে অবস্থানের কোন অধিকার নাই, পাকিস্তান সে সম্পর্কে সচেতন ছিল। অনেক পরে পাকিস্তান এই কথা বলিল যে, কাশ্মীরীদের মুক্তি আন্দোলনের সাহায্যের জন্য পাকিস্তানকে কাশ্মীরে প্রবেশ করিতে হইয়াছে।' ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা।

ছলচাতুরী এবং গায়ের জোরে কাশ্মীর দখল করিয়াছে, পাকিস্তানের এই অভিযোগের কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীচাগলা বলেন যে, এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। ভারত কাশ্মীরের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করে নাই, পাকিস্তানই কাশ্মীরের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করিয়াছে। কাশ্মীরের জনগণ যখন বিদ্রোহ করিয়াছিল তখনই ভারত কাশ্মীরের মহারাজাকে ভারতের সহিত যুক্ত হইতে বাধ্য করিয়াছিল, পাক পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এই অভিযোগ খণ্ডন করিয়া শ্রীচাগলা বলেন, পাক নাগরিকরা এবং খণ্ডজাতীয় হানাদাররা যখন কাশ্মীরের অভ্যন্তরে অবাধে লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও হত্যাকাণ্ড চালাইতেছিল, তখনই কাশ্মীরের মহারাজা ভারতের সহিত যুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ঐ সময়ে শেখ আবদুল্লা বলেন, "কাশ্মীরের জনগণ যখন ভারত হইতে আগত বিমানগুলি এবং কাশ্মীরের রাজপথে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর ট্যাঙ্কগুলি দেখিতে পাইল, তখন কাশ্মীরের অধিবাসী হিন্দু-মুসলমান এবং শিখেরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া অনুভব করিল যে, তাহাদের সম্মান ও মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে।"

১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে রাষ্ট্রপুঞ্জের কাশ্মীর কমিশনের সদস্যগণ যখন করাচী পরিদর্শন করেন, তখন স্যার মহম্মদ জাফরুল্লা খান কমিশনকে এই কথা জানাইতে বাধ্য হন যে, ১৯৪৮ সালের মে মাস হইতে তিনদল নিয়মিত পাকিস্তানী সৈন্য কাশ্মীরে সংগ্রামরত রহিয়াছে। ঐ পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপুঞ্জ ১৯৪৮ সালের আগষ্ট ও ১৯৪৯ সালের জানুয়ারী মাসে কাশ্মীর সম্পর্কে দুইটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ভারত ঐ দুইটি প্রস্তাব স্বীকার করিয়া লয়। ঐ দুইটি প্রস্তাবের মূল কথা ছিল এই যে জম্মু ও কাশ্মীরের অংশ বিশেষে পাকিস্তানের উপস্থিতি অবৈধ এবং পাকিস্তানকে কাশ্মীর হইতে তাহার সৈন্য সরাইয়া লইতে হইবে এবং কাশ্মীরের অধিকৃত অংশ ছাড়িয়া দিতে হইবে। পাকিস্তান ঐ দুইটি প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ করিলে কাশ্মীরে গণভোট গ্রহণের প্রশ্ন উঠিতে পারিত। কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ করে নাই। সুতরাং কাশ্মীরে গণভোট গ্রহণের কোন সম্ভাবনা দেখা দেয় নাই।

শ্রীচাগলা বলেন, এ কথা মনে করিলে ভুল হইবে যে, গণতান্ত্রিক রীতির প্রতি আনুগত্যবশতঃ পাকিস্তান কাশ্মীরে গণভোট গ্রহণ করিতে চাহিতেছে। গণতন্ত্রের প্রতি পাকিস্তানের যে বিন্দুমাত্র অনুরাগ নাই, পাকিস্তানের শাসনব্যবস্থা হইতে তাহা বোঝা যায়। পাকিস্তানে এ পর্য্যন্ত প্রতিনিধিমূলক সংস্থা গঠনের জন্য কোন প্রত্যক্ষ সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নাই। ১৭ বছর স্বাধীনতা লাভের পরেও পাকিস্তানের জনগণ আজ পর্য্যন্ত গণতান্ত্রিক অধিকার লাভের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই।

পাকিস্তান কাশ্মীরে গণভোটের উপরে এই কারণে জোর দিতেছে যে, কাশ্মীরে গণভোট অনুষ্ঠিত হইলে সেখানকার জনগণকে উস্কানি দিয়া পুনরায় দেশবিভাগের সময়ের মত হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি অনুষ্ঠানের সুযোগ সৃষ্টি হইবে।

শ্রীচাগলা বলেন, একটি কথা আমাদের সর্ব্বদাই মনে রাখা উচিত যে, পাকিস্তান কাশ্মীরে আক্রমণকারী। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সে অবৈধভাবে অধিকৃত কাশ্মীরের এলাকা ছাড়িয়া দেয়, ততক্ষণ তাহার রাষ্ট্রপুঞ্জে কথা বলার কোন অধিকার নাই। পাকিস্তান আমাদের কাশ্মীরের জনগণকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দিতে বলিতেছে, কিন্তু পাখতুনিস্তানের জনগণের ক্ষেত্রে সে কি নীতি অনুসরণ করিতেছে? সে কি পাখতুনদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দিতে প্রস্তুত আছে?

ভারত হইতে ভারতীয় মুসলমানদের উচ্ছেদ করা সম্পর্কে পাকিস্তানের অভিযোগের উল্লেখ করিয়া শ্রীচাগলা পরিসংখ্যানের সাহায্যে ঐ অভিযোগের অসারতা প্রমাণ করেন। তিনি দেখান যে, ভারতসংলগ্ন পূর্ব্ব পাকিস্তানের জেলাগুলিতে মুসলমান জনসংখ্যা সামান্য পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু পূর্ব্ব পাকিস্তান সংলগ্ন ভারতীয় জেলাগুলিতে মুসলমানদের সংখ্যা অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পায়। পূর্ব্ব পাকিস্তান হইতে বহু সংখ্যক মুসলমানের বে-আইনীভাবে ভারতে প্রবেশের ফলেই ঐ সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে।

শ্রীচাগলার উত্তরের প্রত্যুত্তর দেওয়ার সময় পাকমন্ত্রী ভুট্টো প্রায় ১২৫ মিনিট বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ইহা প্রারম্ভিক বক্তৃতা অপেক্ষা দীর্ঘতর ছিল এবং অধিকাংশ কথাই প্রথমবারের পুনরাবৃত্তিই ছিল। উপরন্তু পাকিস্তান তাহার দুই পুরাতন নায়কের সমর্থন যাহাতে পায় সেজন্য অকারণে মিঃ ভুট্টো তাঁহার লিখিত প্রত্যুত্তর ছাড়িয়া দিয়া ঐ দুই পশ্চিমী শক্তির গঠিত শক্তিজোটের সহিত যে চুক্তি আছে তাহার প্রতি আনুগত্যেরও দায়িত্বগ্রহণের শপথ উচ্চারণ করেন। শ্রীচাগলার মন্তব্য ইত্যাদিকে পাকিস্তানের ঘরের কথা বলিয়া উড়াইয়া দিয়া তিনি পরিসংখ্যানের তথ্যও অগ্রাহ্য করিতে বলেন। তিনি বলেন পরিসংখ্যানের "হিমশীতল" সংখ্যাতত্ত্ব ছাড়িয়া উৎপাটিত মানবের দারুণ অবস্থার কথাই বিচার করা উচিত। ভুট্টো উচ্চকণ্ঠে বক্তৃতা দিবার সময় ক্রমাগত ব্রিটেনের স্যর প্যাট্রিক ডীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিঃ এডলাই ষ্টিভেনসনের মুখের দিকে চাহিতে-ছিলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাদের পাকিস্তানী তরফদারি করার সোজা ও নির্লজ্জ অনুরোধ করিয়া তিনি বলেন "আমার বিশ্বাস আছে যে নিরাপত্তা পরিষদের কয়েকজন সভ্য তাঁহাদের সহিত চুক্তিবদ্ধ মিত্র ও সুবিধাবাদি পক্ষের মধ্যে প্রভেদ বুঝিতে পারিবেন।"

বলা বাহুল্য পাকিস্তানের সকল ভরসাই ঐ দুই নায়কের উপর নহিলে এরূপ নির্লজ্জ মিথ্যা সম্বলিত প্রস্তাব নিরাপত্তা পরিষদে আসিতে পারিত কি না সন্দেহ। ঐ দুই জনের মধ্যে প্যাট্রিক ডীন ব্রিটেনের একজন "ঘাঘি" প্রাচীন পররাষ্ট্র সম্পর্কিত কূটনীতি বিশারদ। ইঁহাদের কার্য্যকলাপে ন্যায় বিচার, মনুষ্যত্ব মানবত্ব সরল রাষ্ট্রনীতির কোনও পরিচয় পাওয়া কঠিন। সত্যাসত্য বিচার, বিশ্বস্ততা, পরের ন্যায্য অধিকার রক্ষা ইত্যাদি এ জাতীয় কূটনীতিবিদগণ এতাবৎ কখনও ধর্ত্তব্যের মধ্যে আনিয়াছেন এ কথা ব্রিটেনের ইতিহাসে পাওয়া যায় নাই। উপরন্তু ছলে বলে কৌশলে নিজের উদ্দেশ্যসাধনে মিথ্যাকে সত্য বলিয়া চালাইতে ও অন্যায়কে ন্যায়ের সাজে সাজাইতে ইঁহাদের স্পৃহা জগদ্বিখ্যাত। বর্ত্তমান ব্যাপারের শেষ নিষ্পত্তি এই প্রসঙ্গ লিখিবার সময় পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। কিন্তু এই বিষয়ে যে সময় শ্রীচাগলা তাঁহার উত্তর প্রদান করিতেছিলেন তখনই এই কূটনীতিবিদ ও তাঁহার সঙ্গে মার্কিন প্রতিনিধি ষ্টিভেনসনের এ ব্যাপারে সত্যের পথে চলার সম্বন্ধে ঘোর সন্দেহ দেখা দিয়াছিল। মিঃ ষ্টিভেনসন "অনুরোধে ঢেঁকি গেলায়" অভ্যস্ত সেটা আমরা পোর্ত্তুগালের সঙ্গে গোয়া লইয়া বিরোধের সময় দেখিয়াছি। তাঁর অন্যদিকে সৎলোক বলিয়া খ্যাতি আছে কিন্তু "মিত্র" শব্দ উচ্চারণে তিনি গলিয়া যান, তা সে মিত্র যতই বেইমানী করুক বা অন্যায় করুক।

সুতরাং এই প্রহসনের শেষ অঙ্কে কি থাকিবে বলা কঠিন।

সংখ্যালঘু প্রশ্নে পূর্ব্ব পাকিস্তান ও পশ্চিমবঙ্গ

পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানে সংখ্যালঘু বলিতে অতি সামান্য কিছু হিন্দু শিখ ও খ্রীষ্টান আছে। পশ্চিম পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় জীবনে তাহারা কোনও দিকে কিছুমাত্র ছায়াপাত করিতে পারে না, কেন না তাহাদের অস্তিত্বমাত্র আছে, অধিকার হিসাবে বিন্দুমাত্র নাই। পূর্ব্ব পাকিস্তানে প্রায় ৯০ লক্ষ হিন্দু সংখ্যালঘু হিসাবে আছে—এবং তাহারা এই বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে থাকিয়াও, রহিয়াছে, যেন মধ্যযুগের ধর্ম্মান্ধ রাষ্ট্রের কবলে। পাকিস্তানের চালকবর্গ বর্ত্তমান যুগের সভ্যজগতে সংখ্যালঘু সম্পর্কে রাষ্ট্রের দায়িত্ব কি সে সম্বন্ধে জ্ঞান যথেষ্টই রাখেন মনে হয়। নহিলে সেই দায়িত্ব সম্পর্কে রাষ্ট্রপুঞ্জে নিরাপত্তা পরিষদের সম্মুখে এরূপ নির্লজ্জ ও কপটতাপূর্ণ ভাষণ ও অভিনয় তাঁহাদের প্রতিনিধি করিতে পারিতেন না। মনে হয় যে, এই অভিনয় ইত্যাদিতে তাঁহারা তাঁহাদের শিক্ষাগুরু ব্রিটেনকেও প্রায় ছাড়াইয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্ব পাকিস্তানে সংখ্যালঘু উচ্ছেদ এখনও সক্রিয়ভাবেই চলিতেছে মনে হয়। তবে যে লুণ্ঠন, ধর্ষণ, অগ্নিকাণ্ড ও হত্যাকাণ্ড দিয়া উহার আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার বীভৎস ও নির্ম্মম নগ্নরূপ মার্কিন প্রত্যক্ষদর্শীর মারফৎ প্রকাশিত হওয়ায় পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ প্রকাশ্য ও ব্যাপকভাবে সেই নরমেধ করায় বাধা দিয়াছে। এবং ইহাও সত্য যে শিক্ষিত পূর্ব্ব পাকিস্তানী মুসলমানেরা এই পাশবিক অত্যাচারকে পছন্দ করেন নাই। তবে পাকিস্তানের শাসক ও চালক বলিতে যিনি ও যাহারা, তাঁহাদের মধ্যে পূর্ব্ব পাকিস্তানী মুসলমানের কোন বিশেষ ওজন আছে মনে হয় না। সুতরাং এই নিদারুণ ব্যাপারের শেষ এখনও বহুদূরে মনে হয়। এবং শেষের দিকে পূর্ব্ব পাকিস্তানেও পশ্চিম পাকিস্তানের মত সংখ্যালঘুর সংখ্যা ও অস্তিত্ব নাম মাত্রই থাকিবে মনে হয়।

পূর্ব্ব পাকিস্তানের হিন্দুর একমাত্র ভরসা ভারত। এবং ন্যায়ধর্ম্ম ও মানবত্বের কারণে সেই শরণার্থী বিপন্ন জনগণকে সকল প্রকারে সাহায্য ও আশ্রয় দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য এ বিষয়ে সারা ভারতে কোথায়ও দ্বিমত নাই একথা সম্প্রতি লোকসভা ও পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু সমস্যার আরম্ভ যেখানে সেখান হইতে ভারত সীমান্ত পর্য্যন্ত আসার পথে এখনও বহু বাধা বিঘ্ন ও অত্যাচার চলিতেছে। সে বিষয়ে প্রতিকারের উপায় স্থির করা প্রয়োজন। নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তির কথা পাকিস্তানকে জানান হইয়াছে, কিন্তু সেই চুক্তি স্বীকার বা অস্বীকার করা পাকিস্তানের উপর নির্ভর করে। বহির্জগতের জনমতের

কথাও উঠিয়াছে তাহাও সময়সাপেক্ষ। সুতরাং এ বিষয়ে এখনও যথেষ্ট চিন্তার ও উৎকণ্ঠার কারণ রহিয়া গিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা এখন তিক্ত ও বিরূপ স্মৃতিচিহ্নরূপে এখন বিশেষ কিছু নাই এবং ভীতত্রস্ত শরণার্থীদিগের মধ্যে শতকরা ৯০ জনেরও অধিক নিজের পুরানো ঘরে ফিরিয়া গিয়া সহজ ভাবে কাজে কর্মে লাগিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান—সারা ভারতের হিন্দু মুসলমান শিখ-খ্রীষ্টানেরই মত এই রাষ্ট্রের সকল নাগরিক ও প্রজাতন্ত্রের অধিকারী। সে ভারতের কোথায় থাকিবে ও কি ভাবে থাকিবে, না ভারত ছাড়িয়া বিদেশে যাইবে, সে বিষয়ে তাহার নিজের ইচ্ছা, সাংসারিক অবস্থা ও সামর্থের উপর নির্ভর করে। তাহাকে জোর করিয়া বিদায় করা—যাহা লোক বিনিময়ের সহজ ও সরল অর্থ—তখনই সম্ভব যখন সমগ্র ভারত স্বেচ্ছায় মানবত্ব বিসর্জন দিয়া পাকিস্তানের সঙ্গে একই স্তরে নামিয়া যাইতে সম্মত হইবে। এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার আলোচনা সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়াছে।

কলিকাতায় দাঙ্গার সময় পশ্চিম জার্মানী হইতে একদল লোক সিনেমা ও টেলিভিশন গ্রহণের যন্ত্রপাতি লইয়া এদেশে আসে। আমাদের দেশে সংবাদ গ্রহণের বা ছবি তোলার কোনও কড়াকড়ি বাধা নিষেধ কিছুই নাই। যে সংবাদ এখানে বসিয়া, মনের আনন্দে এক ছটাক সত্যের সহিত এক সের ভারত-বিদ্বেষ প্রসূত মিথ্যা মিশাইয়া বিদেশী সংবাদদাতারা—বিশেষতঃ ইংরাজ ও মার্কিন "নিউজহাউণ্ড" জাতীয় কুত্তার দল—পাঠাইয়া থাকে তাহার কথা আমাদের মত পুরানো সাংবাদিকেরা ভালই জানে, কিন্তু কর্তৃপক্ষের মহাপণ্ডিতগণ সে বিষয়ে কতটা জানেন বা খবর রাখেন জানি না। যাই হোক, পশ্চিম জার্মান ফোটো তোলার দল কোনও বাধা নিষেধ নাই দেখিয়া মনের সুখে দাঙ্গার ছবি তুলিয়া এবং সেই সঙ্গে তীব্র বিদ্বেষ ও বিদ্রূপাত্মক কথিত মন্তব্য চালান দিয়াছে। ইংরাজ ও মার্কিন সাংবাদিকগণ কিছু ছবি ও বিস্তর "মিথ্যামিশ্রিত খাঁটি সত্য সংবাদ" পাঠাইয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন যতদূর জানা যায়। যাই হোক পশ্চিম জার্মানী ব্রিটেন ও আমেরিকায় ভারতের পররাষ্ট্র বিভাগীয় দপ্তর নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত ইত্যাদিরা নিশ্চয়ই এই সকল সিনেমা ও টেলিভিশন দেখিয়াছেন ও সংবাদ পড়িয়াছেন, কিন্তু সে বিষয়ে যে কেহ কিছু বলিয়াছেন মনে হয় না। আমাদের নয়া দিল্লীর পররাষ্ট্র দপ্তরের "বুঝন মোড়ল" জাতীয় কর্তা এবং তাঁহার সহকারিবৃন্দ সেরূপ যোগ্যতাযুক্ত স্বয়ংক্রিয় ও তৎপর লোক সহজে বিদেশে পাঠান না, দৈবাৎ দুচারিজন বীরেন চক্রবর্তী বা পূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় কখনও বা কোনও স্থলে হয়ত ভুলক্রমে নিযুক্ত হয়। ফলে সারা ইয়োরোপ ও আমেরিকা জানিয়াছে আমরা কিরূপ বর্বর।

বলা বাহুল্য এই সিনেমা ও টেলিভিশনওয়ালারা পাকিস্তানে যাইলে সেখানের কর্তৃপক্ষ তাহাদের হয় পদাঘাতে বিদায় করিত, নয় মিথ্যা দাঙ্গায় ফেলিয়া সমস্ত যন্ত্রপাতি ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া শেষ করিত। সংবাদাতাদের ত যাতায়াতই নিষিদ্ধ। শুধু রয়টার, মার্কিন "শান্তি সেবিকা" জাতীয় নানা ওয়াকিবহাল বিদেশীর কাছ হইতে আংশিক খবর সংগ্রহ করিয়া পাঠায় তাহাতেই করাচী রাওয়ালপিণ্ডি ও ঢাকায় সরকারী মহল ক্রোধে কম্পমান হইয়াছে।

আমাদের কর্তৃপক্ষ কি লাইসেন্স জাতীয় কোনও কিছুর ব্যবস্থা করিতে পারেন না? মিথ্যা সংবাদ যাহারা পাঠাইতেছে তাহাদের সম্পর্কে অসন্তোষ জানাইয়া তাহাদের সাবধান করাও কি যায় না? অবাঞ্ছনীয় বিদেশী বলিয়া ঐরূপ লোককে বিদায় করিলে আমাদের কি সর্বনাশ ঘটিতে পারে?

সংবাদ যাহা এদেশ হইতে তার বা বেতার যোগে প্রেরিত হয় তাহার রেকর্ড তার বা বেতার অফিসে থাকে। বেতার টেলিফোন যোগে যাহা যায় তাহার কি কোনও টেপ রেকর্ড থাকে? অনেক সভ্য দেশেই তাহা থাকে আমরা জানি এবং এখানে তাহা রাখিলে বোধ হয় পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্তার জাত যায়, কিন্তু তাহাতে এদেশের লোকের পক্ষে কে শত্রু কে মিত্র সেটা চেনার সহায়তা করে।

আমাদের শাসনতন্ত্র ও রাষ্ট্রপরিচালন বিভাগগুলিতে উচ্চতম অধিকারী যাঁহারা আছেন তাঁহাদের সকলেই অনভিজ্ঞ ও অজ্ঞ অবস্থায় প্রথমে নিজ নিজ আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। পররাষ্ট্র দপ্তরের মালিকের "আক্কেল দাঁত" এখনও ওঠে নাই দেখা যাইতেছে তবে প্যাট্রিক ডীনের খোঁচায় উঠিতে পারে।

পরলোকে রাজকুমারী অমৃতকুমারী

ভারতের প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজকুমারী অমৃতকুমারী গত ৭ই ফেব্রুয়ারী পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৫ বৎসর হইয়াছিল।

১৮৮৯ সনের ২রা ফেব্রুয়ারী লক্ষ্ণৌ-এর কর্পূরতলা প্রাসাদে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজা স্যার হরনাম সিংএর একমাত্র কন্যা ছিলেন। ভারতের নারীশিক্ষা, সাধারণ স্বাস্থ্য, শিশুকল্যাণ এবং ক্রীড়াজগতের উন্নয়নের দিকে বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন এবং নিখিল ভারত মহিলা শিক্ষা সম্মেলনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যা ছিলেন। তিনি বহু বৎসর ভারত সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের সদস্যারূপে কাজ করিয়াছেন।

ষোল বৎসর যাবৎ তিনি মহাত্মা গান্ধীর সেক্রেটারি ছিলেন, ইহাই তাঁহার বড় পরিচয়। ১৯৪৭-৫৭ সনে রাজকুমারী অমৃতকুমারী ভারতের কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীরূপে কাজ করিয়াছেন। ঐ সময়েই ১৯৫০ হইতে তিনি ভারতীয় রেডক্রসের পরিচালকমণ্ডলীর সভানেত্রীরূপে কাজ করেন।

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীকরুণা কুমার নন্দী

কংগ্রেসের সমাজবাদী গণতন্ত্র

আবাদী হইতে সুরু করিয়া ভুবনেশ্বর পর্যন্ত—এই কয়েক বৎসর ধরিয়া কংগ্রেসদলের রাষ্ট্রপরিকল্পনার আদর্শে ও লক্ষ্যে একটা আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে এমন কথাটি অনেকে বলিতেছেন। সংজ্ঞার দিক দিয়া একটা পরিবর্তন যে সাধিত হইয়াছে তাহা প্রত্যক্ষ। আবাদী কংগ্রেসের অধিবেশনে ইহার সংগঠনের যে সংবিধান বিদ্ধিবদ্ধ করা হয়, তাহার প্রথম শুক্তে (Art. I) বলা হয় যে কংগ্রেসের আদর্শ ও লক্ষ্য ভারতে সমবায়-ভিত্তিক সমাজ-বাদী গণতন্ত্র (co-operative socialistic democracy) প্রতিষ্ঠা করা। এবার ভুবনেশ্বর অধিবেশনে কংগ্রেস সংগঠনের আদর্শ ও লক্ষ্যের এই সংজ্ঞা সংশোধন করিয়া যে প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে তাহার মর্মার্থ এই যে, এখন কংগ্রেসদলের আদর্শ ও লক্ষ্য হইবে ভারতে সমাজ-বাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র (socialist democratic state) কায়েম করা।

আক্ষরিক সংজ্ঞার অবশ্যই পরিবর্তন হইয়াছে একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু তাহার ফলে কংগ্রেসের এযাবৎ অনুসৃত নীতি ও তাহার প্রয়োগের কি পরিবর্তন ঘটিল বা ঘটিবে তাহার সঠিক ও সম্যক মূল্যায়ন বিচার ও সময় সাপেক্ষ। সমবায়-ভিত্তিক অথবা রাষ্ট্রায়ত্ত-প্রযোজনা-ভিত্তিক কি প্রকার প্রচেষ্টার দ্বারা এই সমাজবাদী অর্থ ও সমাজব্যবস্থা প্রবর্তন বা কায়েম করা হইবে তাহা মূলতঃ প্রয়োগবিধির কথা। আসলে অন্তিম লক্ষ্য উভয়বিধ প্রয়োগ-ক্ষেত্রেই এক, অর্থাৎ সমাজবাদী অর্থব্যবস্থা প্রবর্তন করা। সেই দিক দিয়া বিচার করিতে হইলে আবাদী কংগ্রেসের তুলনায় ভুবনেশ্বরে যে কোন একটা আমূল নূতন আদর্শ এমন কি কোন একটা নূতন বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া গিয়াছে এমন কথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা চলে না। আবাদী কংগ্রেস অধিবেশনে নেতৃগোষ্ঠীর ভাষণ ও ব্যাখ্যাদির বিশ্লেষণ হইতে ইহাই প্রতীতি হয় যে যেমন বৃহৎ ও মূল শিল্পাদির (Key industries) ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রযোজনার দ্বারা, তেমনি কৃষি ও ক্ষুদ্র এবং ভোগ্য শিল্পাদির ক্ষেত্রে সমবায়-ভিত্তিক প্রচেষ্টার দ্বারা একাধারে দেশের সম্পদ বৃদ্ধি ও সমাজবাদী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করা হইবে। আবাদী কংগ্রেস অধিবেশনের পর হইতে এতাবৎকাল পর্যন্ত কি কৃষি ক্ষেত্রে কি ক্ষুদ্রাকার ভোগ্যশিল্পের ক্ষেত্রে সমবায়-ভিত্তিক প্রচেষ্টার কোনরূপ প্রসার লক্ষিত হয় নাই। বস্তুতঃ দেশের জনসাধারণ এমন কি কংগ্রেস সংগঠনের কর্মকর্তাগোষ্ঠীও যে সমবায় প্রচেষ্টার উপরে বিশেষ আস্থাবান এমন কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই। অতএব এই পথ শেষ পর্যন্ত পরিত্যাগ করিবার যে সিদ্ধান্ত এবার ভুবনেশ্বরে গৃহীত হইয়াছে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। তাই সম্ভবতঃ ভুবনেশ্বরে কংগ্রেস সংগঠনের সংবিধানের প্রথম শুক্তটি সংশোধন করিয়া সরাসরি সমাজ-বাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েম করিবার সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

সমাজবাদী গণতন্ত্র

এই সমাজবাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলিতে কংগ্রেসের নেতৃগোষ্ঠী ঠিক কি ব্যবস্থাটা কায়েম করিতে চাহিতেছেন এবং তাহার প্রয়োগবিধিই বা কি প্রকারের হইবে তাহার খানিকটা পূর্বাভাষ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির জয়পুরে অনুষ্ঠিত গত নভেম্বর মাসের অধিবেশনেই পাওয়া গিয়াছে। স্মরণ থাকিতে পারে জয়পুর অধিবেশনে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি সরাসরি কোন প্রস্তাব গ্রহণ করেন নাই। তবে একটি বিবৃতির (Note) খসড়ায় কংগ্রেস সমাজবাদের ঠিক কোন্ সংজ্ঞাটি গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করেন তাহার একটা স্পষ্ট আভাস পাওয়া গিয়াছিল। পরে ভুবনেশ্বর অধিবেশনের প্রাক্কালে নয়া দিল্লীতে প্রধান মন্ত্রী নেহরুর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত একটি সাব-কমিটির বৈঠকে আগামী ভুবনেশ্বর কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশনে (plenary session) পেশ করিবার জন্য এই বিষয়ের মূল প্রস্তাবটির খসড়াটি রচিত হয়। এই প্রস্তাবের খসড়াটি জয়পুরে প্রচারিত বিবৃতিটিরই মোটামুটি অনুসরণে রচনা করা হয়। তাহাতে যে সকল বিষয়গুলি

অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তাহার মধ্যে অন্যতম, "শ্রেণী স্বার্থ, আর্থিক অগ্রাধিকার ও বৈষম্যের সুযোগ নষ্ট করিয়া দিয়া অচিরে প্রাচুর্যপূর্ণ অর্থব্যবস্থা (economy of abundance), সকলের জন্য সমান সুযোগ এবং আর্থিক উন্নয়নের ফললাভে সকলের সমান অংশভোগী হইবার ব্যবস্থা কায়েম করিয়া পূর্ণ সমাজবাদী রাষ্ট্র প্রবর্তন," আধুনিক এবং পরিকল্পনানুসারী প্রয়োগ ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া এবং বর্তমান বৈষম্য আর বৃদ্ধি পাইতে না দিয়া জাতির আর্থিক উন্নয়ন সাধন ; এবং "দেশের সকলের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় নিম্নতম মান যথাসম্ভব তৎপরতার সহিত প্রবর্তন করা।" এই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে অন্ততঃ পঞ্চম পরিকল্পনাকালের মধ্যে, অর্থাৎ ১৯৭৫-৭৬ সনের মধ্যেই দেশে এই নিম্নতম জবীনমান প্রতিষ্ঠা করিতেই হইবে। এই প্রস্তাবে ব্যক্তিগত মালিকানায় রোজগার ও সম্পত্তির একটা উচ্চতম মান বাঁধিয়া দিবার সঙ্কল্পও ঘোষিত হইয়াছে। তাহা ছাড়াও লগ্নীর উপরে অধিকতর পরিমাণে এবং কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দ্বারা যাহাতে দেশের লগ্নীযোগ্য সম্পদ জাতীয় অগ্রাধিকার (priorities) অনুসারী হয় এবং রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প-প্রযোজনার উত্তোরত্তর প্রসারে সহায়তা করিতে পারে তাহারও নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়াও প্রস্তাবটিতে শিল্পপরিচালনার ক্ষেত্রে কর্মীগোষ্ঠীর সহযোগীতা সাধন, মূল্যস্থিরতা রক্ষাকল্পে প্রয়োজনানুরূপ নিয়ন্ত্রনাদি প্রবর্তন, চাষীর উৎসাহ-বর্দ্ধক ব্যবস্থাদি প্রণয়ন, চাউলকলগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ব পরিচালনার অন্তর্ভুক্ত করা এবং ভূম্যধিকার-বিষয়ক সংস্কারক আইনাদির দ্রুত প্রণয়ন ও প্রয়োগের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

প্রস্তাবটি যে রূপে প্রথমে বিষয়-নির্বাচক কমিটির (Subjects Committee) নিকট উপস্থাপিত করা হইয়াছিল, সেইরূপেই সাধারণ অধিবেশনে পেশ করা এবং সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। কিন্তু বিষয়-নির্বাচক কমিটিতে এইটির আলোচনার সময়ে যে গভীর মতভেদ ও তুমুল বিতণ্ডার সৃষ্টি হইয়াছিল এ কথা কাহারও অজানা নাই। বস্তুতঃ বিষয়-নির্বাচক কমিটিতে বিবেচনার সময় প্রস্তাবটির উপরে মোট ৬৪টি সংশোধক প্রস্তাব পেশ করা হয়। ইহার মধ্যে ভূতপূর্ব কেন্দ্রীয় তৈল মন্ত্রী শ্রীকেশবদেও মালব্য মূল প্রস্তাবটি সম্পূর্ণ বাতিল করিয়া দিয়া তাঁহার রচিত নূতন খসড়া গ্রহণের স্বপক্ষে একটি সংশোধনী প্রস্তাবও করেন। কংগ্রেসের ইতিহাসে ইহা একটি অভূতপূর্ব ঘটনা কিন্তু হয়তো আরো আশ্চর্য এই যে শেষ পর্যন্ত একটি বাদে এই ৬৪টি সংশোধনী প্রস্তাবের সব কথটিই সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবকদের দ্বারা প্রত্যাহৃত হয় এবং যে একটি মাত্র সংশোধন বাস্তবপক্ষে প্রস্তাবিত হয়, তাহার একটিও সমর্থক না পাওয়া যাওয়ায় সেটিও বাতিল হইয়া যায়। বিষয়-নির্বাচক কমিটিতে আলোচনাকালে যে বিষয়টি নিয়া সব চেয়ে বেশী বিতণ্ডার সৃষ্টি হয় সেটি দেশের ব্যাঙ্কগুলির রাষ্ট্রীকরণ সম্বন্ধীয় দাবি লইয়া। উড়িষ্যার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও কংগ্রেসের উচ্চতম নেতৃত্বের বিশেষ স্নেহ ও পক্ষপাতভাজন শ্রীবিজয়ানন্দ পট্টনায়ক ব্যাঙ্কগুলির রাষ্ট্রীকরণের স্বপক্ষে তুমুল আন্দোলন করেন। তিনি বলেন যে এদেশে ব্যক্তিমালিকানায় পরিচালিত ব্যাঙ্কগুলির সর্বসাকুল্যে শেয়ার লগ্নীর পরিমাণ মাত্র ৩৮ কোটি টাকা কিন্তু তাহাদের মোট জামানতের পরিমাণ ১৪৮০ কোটি টাকা। মাত্র ৫টি ব্যবসায়ী গোষ্ঠী এই ব্যাঙ্কগুলির হর্তাকর্তা এবং তাঁহাদের অধীনে দেশের ১৬০০ শিল্প প্রতিষ্ঠান চালু আছে। এই সকল ব্যাঙ্ক ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে আভ্যন্তরীণ লেনদেন (interlooking) প্রচুর পরিমাণেই হইয়া থাকে এবং ব্যাঙ্কগুলিতে জামানত করা এই বিপুল অর্থভাণ্ডার ইঁহাদের অধীনস্থ শিল্পাদি ও ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পেই প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শ্রীপট্টনায়কের মতে কংগ্রেসের উচ্চতম নেতৃগোষ্ঠী ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীকরণের একান্ত প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। এই রাষ্ট্রীকরণের দ্বারা ব্যক্তিমালিকানার প্রযোজিত শিল্পায়নের পথে বাধা সৃষ্টি হইবার কোন কারণ নাই, বরং রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কের নিকট হইতে বর্তমানে কোনপ্রকার অর্থসাহায্যবঞ্চিত অসংখ্য ক্ষুদ্র শিল্পপতি সফল ভাবে তাঁহাদের শিল্পগুলির উন্নয়ন সাধনের দ্বারা কায়েমী (monopoly) শিল্পস্বার্থ অচল করিয়া তুলিতে পারিবেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীপট্টনায়ক আরো বলেন যে অর্থসাহায্যদানে চিরাচরিত প্রথায় স্থায়ী মূলধনের (fixed assets) বিচার মাত্র করিলে চলিবে না, গ্রহীতার উৎপাদন ক্ষমতার ভিত্তিতে তাহাকে দেয় অর্থসাহায্যের পরিমাণের পরিমাপ করিতে হইবে। আশ্চর্যের বিষয় সমাজবাদী প্রস্তাবে কংগ্রেস এই মাপকাটিই মানিয়া লইয়াছেন। এই প্রস্তাবটির কি করিয়া কার্যকরী প্রয়োগ করা সম্ভব হইবে তাহা বোধগম্য হয় না।

ব্যাঙ্ক কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে লগ্নী করিতে হইলে হয় স্থায়ী লগ্নীর মূল্যায়নের উপর, নয়তো চল্‌তি কাঁচা মাল (raw materials under process) বা উৎপাদিত মালের (finished manufactures) মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের স্থির-সম্পত্তি (fixed assets) কিম্বা মালের বন্ধকের পরিবর্তে ঋণদান করিতে পারে। সম্ভাব্য-উৎপাদন ক্ষমতার উপরে কি করিয়া এরূপ লগ্নীর পরিমাণ নিরূপিত হইতে পারে তাহা বুঝা সহজ নহে।

মামুলী উদ্দেশ্য, নূতন ভাষা ?

ভুবনেশ্বরে গৃহীত সমাজবাদী প্রস্তাব ও তাহার পশ্চাদপটে অনুষ্ঠিত বিতণ্ডাদির একটা সম্যক বিচারে আপাতদৃষ্টিতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে এবারও কেবল মাত্র নূতন ভাষার বহিরাবরণের অন্তরালে কংগ্রেসের মামুলী প্রহসনই পুণরাভিনীত হইয়াছে। বস্তুতঃ এখানে ওখানে দুই একটি অতিরিক্ত বাক্যের বা ভাবের সংযোজন ব্যতীত ভুবনেশ্বরও নূতন কথা কিছুই বলিতে পারেন নাই। একটি মাত্র নূতন যাহা ঘটিয়াছে দেখা যাইতেছে তাহা এই যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবসায় ও শিল্পপ্রচেষ্টার পরিধি এতাবৎ নির্দিষ্ট এলাকা অতিক্রম করিয়া ব্যক্তি-প্রচেষ্টায় অনুষ্ঠিত শিল্প ও ব্যবসায়ের গণ্ডীর মধ্যেও প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছে। বস্তুতঃ ভুবনেশ্বরে কংগ্রেস-সমাজবাদের যে চিত্রটি ফুটিয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয় তাহা মোটামুটি এই যে একমাত্র কৃষিক্ষেত্র ব্যতীত দেশের সকল প্রকার উৎপাদন ব্যবস্থাই ক্রমশঃ রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইবে, ইহাই কংগ্রেস দলের লক্ষ্য এবং সম্ভবতঃ সমাজবাদ বলিতেই এটুকুই তাঁহারা বোঝেন। কৃষিক্ষেত্রে রাষ্ট্রীকরণের প্রয়াস এখন পর্য্যন্ত বিশেষ লক্ষ্য হইতেছে না; তাহার একমাত্র কারণ এই যে এদেশে বহুকাল ধরিয়া ভবিষ্যতেও চিরাচরিত প্রথায় চাষবাস চলিতে থাকিবে—হয়ত কিছু রাসায়নিক সারের ব্যবহার বৃদ্ধি পাইবে, কোথাও কোথাও হয়ত কিছু সেচের জলেরও ব্যবস্থা হইবে, কিন্তু মোটামুটি দেশের চাষ ব্যবস্থায় মামুলী প্রয়োগই যে চলিতে থাকিবে এ বিষয়ে সন্দেহের কারণ নাই। এই অবস্থায় কোটি-কোটি চাষীকে একটা রাষ্ট্রায়ত্ত পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টাধীন করিয়া লওয়া যে প্রায় অসম্ভব এ কথা কংগ্রেস বক্তারাও বুঝেন। তাই বোধ হয় ভুবনেশ্বরে কৃষি ক্ষেত্রটিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়া লইবার প্রস্তাবটি আর উথাপিত হয় নাই। কিন্তু কৃষিজ উৎপাদনের একটি বিশিষ্ট অংশকে—অর্থাৎ চাউল কলগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার সঙ্কল্প বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই ঘোষিত হইয়াছে।

প্রস্তাবটিতে একটি নূতন কথা যে সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহা সমাজবাদের সংখ্যাসূচক ন্যূনতম জীবনমানের নির্দ্দেশ। বস্তুতঃ প্রস্তাবটিতে এই ন্যূনতম জীবনমান যাহাতে পঞ্চম পরিকল্পনাকালের অর্থাৎ ১৯৭৫-৭৬ সনের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তাহার প্রয়াস করিতে হইবে বলিয়া নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। প্রস্তাবটিতে বলা হইয়াছে আহার বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও শিক্ষাব্যবস্থা যাহাতে সকলের নিকটই একটি ন্যূনতম মানে অধিগম্য হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই ন্যূনতম মানটি কি হইবে? ভুবনেশ্বর কংগ্রেসের কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে প্ল্যানিং কমিশনের কৃষি-সদস্য শ্রীশ্রীমান নারায়ণ বোম্বাই শহরে একটি ছাত্রদের বৈঠকে বক্তৃতা দিবার সময় ইহার একটি মান নিরূপণ করিয়াছেন। তিনি বলেন যাহাতে ১৯৭৫-৭৬ সনের মধ্যে দেশের সকল পরিবারের (গড়ে পাঁচজন লইয়া) নিম্নতম মাসিক আয় বর্ত্তমান মূল্যমানের ভিত্তিতে অন্ততঃ ১০০৲ শত টাকা হয় পরিকল্পনা কমিশন তাহার ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়াছেন। এই মানের আয় হইতে পরিবারের সমগ্র চাহিদা মেটান সম্ভব হইবে কিনা—অর্থাৎ তাহার দ্বারা উপযুক্ত পুষ্টি-সাধক আহার্য্য, ভদ্রমানের বস্ত্রাবরণ, স্বাস্থ্যকর পরিবেশে প্রয়োজন মতন বাসস্থান, স্বাস্থ্যরক্ষার ন্যূনতম আয়োজন এবং শিক্ষার প্রগতিসূচক ব্যবস্থার সম্পূর্ণ ব্যয় সঙ্কুলান হইবে কিনা তাহা বিচারের বিষয়। কিন্তু এটুকুও যে ১৯৭৫-৭৬ সনের মধ্যে সম্ভব হইবার কোনই আশা নাই সে বিষয়ে সন্দেহের কারণ দেখি না। প্রস্তাব গ্রহণেই যদি এই বিষয়ে কংগ্রেসের এবং কংগ্রেস পরিচালিত দেশের শাসন ও অর্থব্যবস্থার দায়িত্ব শেষ হইত তাহা হইলে কথা ছিল না। কিন্তু প্রস্তাবটির কার্যকরী প্রয়োগের দায়ীত্ব যদি তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিতে হয়, তবে একথা স্বতই মনে হইবে যে গত ১৬ বৎসরের কংগ্রেস শাসন এবং ১২ বৎসর ধরিয়া কংগ্রেস অনুশাসিত উন্নয়ন পরিকল্পনার গতির মধ্যে এমন কোন লক্ষণ আজিও দেখা যায় নাই, যাহার ফলে ভরসা করা যাইতে পারে যে প্রস্তাবিত ন্যূনতম জাতীয় জীবনমান (National minimum) নির্দিষ্ট কালের

মধ্যে দেশের লোকের জীবন সমৃদ্ধ ও তাহাদের জীবনে আশার সঞ্চার করিতে সক্ষম হইবে।

ইহা ছাড়া প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত আর সকল বিষয়ই মোটামুটি বহু অস্ফালিত মামুলী অতীত অভিব্যক্তির পুনরুক্তি মাত্র। উদাহরণ স্বরূপ আলোচ্য প্রস্তাবে বর্ণিত ব্যক্তি-সম্পদ বা ব্যক্তি-আয়ের (private property and income) উর্দ্ধতম মান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবার সঙ্কল্পের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এ সঙ্কল্প পূর্ব্বেও ব্যক্ত হইয়াছে, কিন্তু কখনো ইহার কার্যকরী প্রয়োগের আয়োজন হয় নাই। হওয়া সম্ভবও ছিল না। কেন না কংগ্রেস দল ক্ষমতার আসনে যে আজিও টিঁকিয়া আছে তাহা সম্ভব হইয়াছে নির্ব্বাচন সাহায্যে দেশের কায়েমী ধনী শিল্পপতিদের এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের অকাতর অর্থ সাহায্য। এই অর্থ সাহায্য না পাইলে কংগ্রেস দল প্রথম সাধারণ নির্ব্বাচন ব্যতীত পরবর্তী দুই-দুইটি সাধারণ নির্ব্বাচনে যে কোন মতেই এমন প্রবল পরাক্রমে জয়লাভে সমর্থ হইতে পারিত না একথা নিতান্ত বালকেও বোঝে। সেই ধনী শিল্পপতিদের বা ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের স্বার্থে ঘা মারিয়া কংগ্রেস নিজেকে হীনবল করিয়া ফেলিতে চাহিবে এমন অসম্ভব কথা লোকে বিশ্বাস করিবে কেন? দেশের মস্তিষ্কহীন, চিন্তায় অক্ষম জনগণের নিকট বাহবা পাইবার এবং ভবিষ্যৎ নির্বাচনে তাহাদের সমর্থন পাইবার জন্য গরম গরম প্রস্তাব পাশ করান যাইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া তাহার প্রয়োগ করিতে গিয়া কংগ্রেস যে ডালে বাসা বাঁধিয়াছে তাহারই গোড়া কাটিয়া ফেলিতে চাহিবে একথা কল্পনা করাও ভুল।

বস্তুতঃ যে ভাবে ধনী সম্প্রদায়ের সম্পদ ও আয় আইনানুমোদিত পথে ক্রমশঃ সঙ্কুচিত করিয়া আনিতে পারা যাইত এবং দেশের জনসংখ্যার বিভিন্ন স্তরের অন্তর্বর্তী অর্থ-বৈষম্য খানিকটা দূর করা যাইত, আজি পর্য্যন্ত দেশের কংগ্রেসী শাসনকর্তারা সে পথ দিয়া একবারও পা বাড়ান নাই। নবনির্বাচিত কংগ্রেসপতি কামরাজ নাদার তাঁহার ভাষণে সে পথের ইঙ্গিত অবশ্য করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন দেশের রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার ও তাহার প্রয়োগের দ্বারাই এই বৈষম্য নিরসণ করা সম্ভব। এ কথা সত্য কিন্তু কংগ্রেস শাসন অধিকরণে দেশের অর্থব্যবস্থার জন্য যাঁহারা আজ পর্য্যন্ত দায়ীত্ব বহন করিয়াছেন তাঁহারা কেহই বৈষম্যবিরোধী রাজস্ব ব্যবস্থা অনুসরণ করেন নাই। বরং তাহার উল্টাটাই করিয়াছেন। দেখা যায় যে প্রথম পরিকল্পনাকালের প্রাক্কালে অর্থাৎ ১৯৫০-৫১ সনে এ দেশে মাথাপিছু মোট রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৮৲ টাকা আন্দাজ। ইহার শতকরা ৯৩% অংশ আদায় করা হইত সরাসরি রাজস্ব হিসাবে, পরোক্ষ রাজস্বের চাপ ছিল মোট আদায়ী রাজস্বের শতকরা ৭% অংশ মাত্র। ১৯৬৩-৬৪ সনের মোরারজী দেশাইয়ের শেষ বাজেটে এই আদায়ী রাজস্বের পরিমাণ কেবল মাত্র কেন্দ্রীয় দাবী মিটাইতেই মাথাপিছু প্রায় ৩৮৲ টাকায় উঠিয়াছে। ইহার উপরে রাজ্য সরকারগুলির দাবী মিটাইতে মাথাপিছু আরো প্রায় ৮৲টাকা আন্দাজ পড়ে। অর্থাৎ ১৯৫০-৫১সনের তুলনায় দেশের লোকের উপরে রাজস্বের চাপ মোটামুটি পাঁচ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সেই সময়ে আর্থিক উন্নয়নের ফলে জাতীয় আয়ের মাথা পিছু অংশ শতকরা ২৫% বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া দাবী করা হইতেছে। অর্থাৎ, শতকরা হিসাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত আয়ের সবটা দিয়াও এই বৰ্দ্ধমান রাজস্বের দায় মেটান সম্ভব হয় নাই, আরো কিছু বেশীও দিতে হইয়াছে। কিন্তু এটিই সম্পূর্ণ চিত্র নয়। ১৯৬৩-৬৪ সনে দেশের সমুদয় রাজস্বের প্রায় শতকরা ৭৪% অংশ পরোক্ষ (indirect) দাবীর দ্বারা আদায় করা হইতেছে এবং মোট পরোক্ষ রাজস্বের প্রায় অৰ্দ্ধেক নানাবিধ ভোগ্যপণ্যের এবং তাহাদের মধ্যে অনেকগুলিই একেবারেই অবশ্যভোগ্য—উপরে আবগারী শুল্ক ধার্য্য করিয়া আদায় করা হইতেছে। এরূপ রাজস্ব ব্যবস্থা যে দরিদ্রের উপরে আনুপাতিক পরিমাণে অত্যাধিক চাপ সৃষ্টি করে তাহা রাজস্ব-বিজ্ঞানের (public finance) প্রথম পাঠেই জানা যায়। তাহা ছাড়া এরূপ রাজস্ব ব্যবস্থার অনিবার্য্য ফল এই যে আবগারী দাবীর অজুহাতে সরকারী দাবীর অতিরিক্ত আরো বেশী মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়া মুনাফাখোরের মুনাফার অঙ্ক বৃদ্ধি করিয়া থাকে। এই ভাবেই কালোবাজারী মুনাফার দুষ্টচক্র গড়িয়া ওঠে এবং ক্রমে প্রবল প্রতাপশালী হইয়া উঠে। ইহার প্রচণ্ডতম দায়টা পড়ে দরিদ্র, নিম্ন ও মধ্যবিত্ত অসহায় সম্প্রদায়ের উপরে এবং এভাবেই অর্থ-বৈষম্যের ফাঁকটা ক্রমে আরও বড় হইতে থাকে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারী বলিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ যে বর্তমানে দেশে, তাঁহার অন্দাজে, হিসাবে ধরা যায় না এমন অন্ততঃ কয়েক হাজার কোটি-টাকা অতিরিক্ত অর্থ চালু রহিয়াছে।

সমাজবাদের সংজ্ঞা

অতএব দেখা যাইতেছে ভুবনেশ্বরে কংগ্রেস এত বিতণ্ডার পর সমাজবাদের যে সংজ্ঞা পেশ করিয়াছেন তাহার মধ্যে নূতন কিছুই নাই। সমাজবাদ বলিতে মনে হয় যে ইঁহারা দেশের সমগ্র জীবন সকল ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রায়ত্ব করাটাকেই বুঝেন। অথচ আলোচ্য প্রস্তাবে একথাও বেশ স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে যে গণতান্ত্রিক পার্লামেণ্টারী রাষ্ট্রের (parliamentary democracy) অধীনে তাঁহাদের আদর্শগত সমাজবাদের প্রতিষ্ঠা করা হইবে। পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রকে সাধারণতঃ জনসম্পতিভিত্তিক রাষ্ট্রতন্ত্র

বলা হইয়া থাকে। কংগ্রেস দাবী করেন যে তাঁহাদের ক্রমবিস্তারমান রাষ্ট্রায়ত্ত উৎপাদন নীতি দেশের জনসাধারণের সম্মতি লাভ করিয়াছে বলিয়াই পর পর তিনটি সাধারণ নির্বাচনেই কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টে ও রাজ্য-বিধান সভার অধিকাংশ গুলিতেই তাঁহারা প্রবল সংখ্যাধিক্যে নির্বাচিত হইয়াছেন। অতএব দেশের লোক, অন্ততঃ অধিকাংশ সংখ্যক দেশবাসী তাঁহাদের সমাজবাদের আদর্শ ও লক্ষ্য সমর্থন করেন।

পাগলেও নিজের মূল স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন। দেশের লোক এখনও সম্পূর্ণ পাগল হইয়া যায় নাই। তথাপি তাহাদের মৌলিক স্বার্থহানীকর নীতি ও তাহার প্রয়োগ তাহারা স্বেচ্ছায় সমর্থন করিবে এমন কথা কি করিয়া বিশ্বাস করা যায়? সম্প্রতি প্রকাশিত কংগ্রেস মুখপত্র এ আই সি সি ইকনমিক রিভিয়ুর ভুবনেশ্বর-স্মারক বিশেষ সংখ্যা হইতে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি এ সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া মনে হয়:—

"পরিকল্পনা প্রয়োগের ফলে ভারতের জাতীয় আয় ১৯৫০-৫১ হইতে ১৯৬০-৬১ সন পর্য্যন্ত শতকরা ৪২% বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঐ সময়ে শতকরা ২২% জনসংখ্যা বৃদ্ধির হিসাব ধরিয়া লইলে দেখা যাইবে যে ঐ সময়ের মধ্যে মাথাপিছু আয় মোটামুটি ১৬% বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাৎসরিক শতকরা ১½% হিসাবে আয় বৃদ্ধি খুব একটা তৃপ্তিবাচক অবস্থা নহে কিম্বা আমাদের কৃতিত্বেরও পরিচায়ক নহে। কিন্তু যখন এই প্রশ্ন মনে উদয় হয় যে দেশের অধিকাংশ লোকের জীবন মানে কি পরিমাণ উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তখন তাহার জবাবটি নিতান্তই বেদনাদায়ক বলিয়া মনে হয়।

"সকলেই জানেন যে যখনই মুদ্রাস্ফীতি ঘটে তখনই সমাজে কায়েমী অর্থ-বৈষম্য দরিদ্রের উপরে অন্যায় রকম চাপের সৃষ্টি করে। মুদ্রাস্ফীতিজনিত মূল্যবৃদ্ধির ফলে একদিকে যেমন ধনীর সঞ্চিত সম্পত্তির মূল্যবৃদ্ধি ঘটায়, অন্যদিকে তেমনি দরিদ্রের তাহার সামান্য আয়ের ক্রয়-ক্ষমতা আনুপাতিক পরিমাণে সঙ্কুচিত হইয়া গিয়া জীবন-ধারণ দুর্বহ করিয়া তোলে।

"পরিকল্পনা প্রয়োগের প্রথম দশ বৎসরে দেশের লোকের কায়েমী সংস্থান ব্যবস্থায় (occupational structure) কোন মূল পরিবর্তন ঘটে নাই। এখনও দেশের জনসংখ্যার শতকরা ৬৭ জন সরাসরি একমাত্র কৃষির উপরেই জীবিকার জন্য নির্ভরশীল হইয়া রহিয়াছে। অন্যান্য ধরণের জীবিকা যাঁহাদের তাঁহাদের তুলনায় চাষীদের মধ্যেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি মোটামুটি একই রূপ। গত দশ বৎসরে মোট কৃষিজ উৎপাদনের পরিমাণ শতকরা ৪০% বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু শিল্পোৎপাদনের পরিমাণ শতকরা ৯৪·৩% হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। অতএব জনসংখ্যা বৃদ্ধির হিসাব ধরিয়া লইয়া দেখা যাইবে যে গত দশ বৎসরে চাষীর মাথাপিছু আয় শতকরা ১৪% বাড়িয়াছে, কিন্তু শিল্পক্ষেত্রে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির পরিমাণ হইয়াছে প্রায় শতকরা ৬৮%, অর্থাৎ চাষীর প্রায় পাঁচ গুণ। সেই একই সময়ে অবশ্যভোগ্যের মূল্যমানের ভিত্তিতে জীবনধারণের ব্যয় (cost of living) শতকরা ২৩% বাড়িয়াছে।

অন্যদিকে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের দিকে চাহিলে দেখা যাইবে যে প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনা-নির্দিষ্ট দেশের মোট নূতন লগ্নীর প্রায় অর্দ্ধাংশ রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের জন্য বরাদ্দ হইয়াছিল। তৃতীয় পরিকল্পনার মোট নূতন লগ্নীর যে অংশ রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের জন্য বরাদ্দ হইয়াছে তাহা এখন মোট বরাদ্দের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ। আলোচ্য প্রস্তাবে দাবী করা হইয়াছে যে রাষ্ট্রায়ত্ত উৎপাদন ব্যবস্থার পরিধি আরও বিস্তীর্ণ করিতে হইবে। তাহা ছাড়া শিল্পে রাষ্ট্রাধিকারের ক্ষেত্র প্রথম হইতেই বিস্তৃতির দিকে চলিতে সুরু করিয়াছিল। প্রথম সরকারী শিল্পনীতি নির্দেশক প্রস্তাব (Industrial policy Resolution) ১৯৪৮ সনে বিধিবদ্ধ করা হয়। ইহাতে সরকারী অধিকারে কতকগুলি নির্দিষ্ট মূল শিল্প বাদে অন্যান্য ক্ষেত্রে বেসরকারী পরিচালনার অধিকার নির্দিষ্ট হইয়াছিল। ১৯৫৬ সনে নূতন নীতি প্রবর্তন করিয়া পূর্ব্বনীতি বাতিল করিয়া দেওয়া হয়। ইহার ফলে শিল্পে রাষ্ট্রাধিকারের ক্ষেত্রটি অনেকখানিই প্রসারিত করিয়া দেওয়া হয়। এবার কেবল মাত্র মূলশিল্প ও দেশরক্ষাসূচক শিল্প গুলিই নয়, তাহা ছাড়াও সকল প্রকার খনিজ শিল্পে ও অন্যান্য উৎপাদক শিল্পেও রাষ্ট্রাধিকার প্রসারিত করা হয়। ইহার পরে যদিও আজ পর্য্যন্ত নীতির দিক দিয়া কোন নূতন ঘোষণা প্রবর্ত্তন করা হয় নাই, কিন্তু ফলতঃ দেখা যাইতেছে যে, ক্রমশঃই এতাবৎ নির্দিষ্ট গণ্ডী অতিক্রম করিয়া রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পপ্রচেষ্টা আরও নানাদিকে তাহার বাহু বিস্তার করিতে সুরু করিয়াছে। এতদিন পর্য্যন্ত অন্ততঃ এইটুকু স্থির ছিল যে ভোগ্যশিল্পগুলিতে রাষ্ট্র আপন অধিকার বিস্তার করিবে না, সেগুলি বেসরকারী মালিকানায়ই চলিতে থাকিবে। এখন ক্রমে এই দিকেও সরকার পা বাড়াইতে সুরু করিয়াছেন। ভুবনেশ্বরে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী এক্ষণে যে এই গতি আরও বেগ লাভ করিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

অতএব সমাজবাদী অর্থব্যবস্থা কায়েমী করিতে হইলে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ও ব্যবসায়ের ক্ষেত্র ক্রমাগতই বিস্তৃত করিতে হইবে, ইহাই হইল ভুবনেশ্বরের সিদ্ধান্ত। অথচ দেখা যাইতেছে ফলের দিক দিয়া রাষ্ট্র পরিচালনা একান্তই অসার্থক। সম্প্রতি বিশদভাবে আলোচিত তৃতীয় পরিকল্পনার অবস্থা ও সম্ভাবনার কথা সকলেই জানেন। এই পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসরে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে মোট বরাদ্দ লগ্নীর অর্দ্ধাংশ ইতিমধ্যেই নিয়োগ করা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু

ঐ সময়ের মধ্যে ফলের দিক দিয়া আনুমানিক সম্ভাব্য উন্নতির মাত্র শতকরা ২৫% সাধিত হইয়াছে। অর্থাৎ পাঁচ বৎসরের মোট বরাদ্দের শতকরা ৫০% লগ্নী করিয়া জাতীয় আয় দুই বৎসরে শতকরা ১২% এর পরিবর্ত্তে মাত্র ৪·৭% বাড়িয়াছে। পরিকল্পনার অন্তিম বৎসর পর্য্যন্ত, পরিকল্পনা কমিশনের হিসাব মত মোট বরাদ্দের শতকরা ৯৩·৪% বাস্তব পক্ষে লগ্নী হইয়া যাইবে। ইহার ফলে জাতীয় আয় কতটা বৃদ্ধি পাইবার আশা এখন করা যায় সে বিষয়ে কমিশন বুদ্ধিমানের মতন চুপ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু অর্থ-বিশেষজ্ঞরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, পরিকল্পনার অবশিষ্ট তিন বৎসরে জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার কোনক্রমেই গড়পড়তা বার্ষিক শতকরা ৩·৫% এর বেশী হইতে পারে না। অর্থাৎ পাঁচ বৎসরে জাতীয় আয় মোট ১৫·২% এর বেশী বৃদ্ধি পাইবে না। অর্থাৎ ১৯৬৫-৬৬ সনে, তৃতীয় পরি-কল্পনাকালের শেষে দেশের মোট জাতীয় আয় আনুমানিক ১৭,৫০০ কোটি টাকা পর্য্যন্ত উঠিতে পারে। ইতিমধ্যে বার্ষিক শতকরা ২·৪% হারে দেশের জনসংখ্যা পাঁচ বৎসরে শতকরা মোট ১২% বৃদ্ধি পাইবে। অর্থাৎ এই হারে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইলে পাঁচ বৎসর পরে দেশের লোকের মাথাপিছু আয় মোট ·৬% বাড়িলেও বাড়িতে পারে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ১৯৭৫-৭৬ সন পর্য্যন্ত একটা ন্যূনতম জাতীয় জীবনমান প্রতিষ্ঠা করিবার যে সঙ্কল্পের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার মূল ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তৃতীয় কল্পনার অন্তর্ভুক্ত ভবিষ্যৎ উন্নয়ন চিত্রটি। ইহাতে অনুমান করা হইয়াছে যে, তৃতীয় পরি-কল্পনার সার্থক রূপায়ণের ফলে চতুর্থ পরিকল্পনায়, অর্থাৎ ১৯৭০-৭১ সন পর্য্যন্ত জাতীয় আয়ের মান বার্ষিক ২৫০০০ কোটি টাকায় এবং পঞ্চম কল্পনায় বার্ষিক ৩৪,০০০।৩৫,০০০ কোটি টাকায় উঠিবে। তৃতীয় পরিকল্পনার বর্ত্তমান অবস্থায় এ সম্ভাবনা সম্পূর্ণ হইবার কোনই আশা নাই একথা বলাই বাহুল্য। এই প্রসঙ্গে একটি বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতার উক্তি প্রাসঙ্গিক হইবে। তিনি বলেন: "যদি আমরা নিজেদের এই প্রশ্নটি করি যে জাতীয় সমগ্র উৎপাদনের কতটুকু অংশ রাষ্ট্রায়ত্ব অধিকারে উৎপাদিত হইতেছে, তবে আমাদের বর্তমান আত্মশ্লাঘার অহমিকা স্তব্ধ হইয়া যাইত।" লজ্জা থাকিলে তাহাই যে হইত এ বিষয়ে সন্দেহ কি?

সার্বজনীন ভোটাধিকার ও কংগ্রেস শাসন

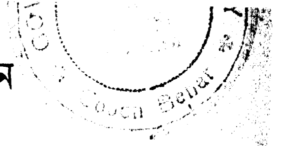
তবু একথা অস্বীকার করা চলে না যে, দেশের ক্রম-বর্ধমান দারিদ্র, কংগ্রেসের কুশাসন, দুর্নীতি এবং অন্যান্য নানাবিধ দুর্দশা সত্ত্বেও কংগ্রেসই এ পর্যন্ত বার বার জন-সমর্থনে প্রবল সংখ্যাধিক্যে দেশের শাসনদণ্ড অধিকার করিয়া রহিয়াছে। কংগ্রেস অবশ্যই দাবি করে যে, দেশের জনসাধারণের কংগ্রেসের নীতির ও সমাজবাদের প্রতি সর্বান্তকরণ সমর্থনের ফলেই ইহা ঘটিতেছে। কিন্তু হাটে মাঠে সর্বত্র সকলে আজ প্রাণ ভরিয়া কংগ্রেসের কুশাসনের, তাহার ধনীর পোষণ ও দরিদ্রের পেষণ নীতির নিন্দা করিতেছে। তবু কেন তাহারা বারে বারে কংগ্রেসকেই নির্বাচিত করিয়াছে?

আমাদের দেশের লোক মোটামুটি নিরক্ষর, আধুনিক রাজনৈতিক যন্ত্রাদি ও তাহাদের প্রয়োগ সম্বন্ধে তাহার কোনই ধারণা নাই। তাহা ছাড়া কার্যকারণ সম্বন্ধ বিশ্লেষণের তাহার ক্ষমতা নাই। চিন্তা করিবার শিক্ষা সে কখনও পায় নাই। দেশের প্রবীণ নেতৃগোষ্ঠী তাহাকে বলিতেছেন তুমি এত যে কষ্ট পাইয়াছ তাহা পরাধীনতার ফল, সমাজব্যবস্থার ফল, শ্রেণীবৈষম্যের ফল। আমরা পরাধীনতা ঘুচাইয়াছি। ক্রমে সমাজব্যবস্থারও প্রবর্তন করিব, শ্রেণীবৈষম্য বিলোপ করিব। সময় লাগে, উপায় নাই। ধৈর্য ধরিয়া প্রতীক্ষা কর, আমাদের উপরে আস্থা রাখ, শীঘ্রই তুমি যাহাতে যথেষ্ট খাইতে পরিতে পার, উপযুক্ত স্বাস্থ্যকর বাসস্থান পাও, শিক্ষালাভ কর, আমার সমকক্ষ হইতে পার তাহার আয়োজন করিতেছি। তাহারা কি করিয়া বুঝিবে যে এই প্রতিশ্রুতির অন্তরালে সে ধনীর সহিত চুক্তি করিয়া নিজের ক্ষমতার আসন কায়েম কারয়া লইতেছে? মুখে সে যাহাই বলুক, ধনীর বদান্যতার প্রসাদে কংগ্রেস কায়েমী শক্তিতে প্রতিষ্ঠীত রহিয়াছে। তাহার মূল্য তাহাকে দিতেই হইবে। রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্পপ্রসারেও ধনীরই সুবিধা হইতেছে—একদিকে অক্ষমতার চূড়ান্ত, দুর্নীতির অতল গহ্বর ও অন্যদিকে অফুরন্ত অপচয়। ইহারই অন্তরালে শ্রেণীবৈষম্যের ফাঁকটি ক্রমেই দ্রুত বিস্তৃত হইয়া যাইতেছে। আজ কংগ্রেসী নেতারা পর্যন্ত স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছেন যে, অর্থ বৈষম্য আজ এ দেশে যে স্তরে পৌঁছাইয়াছে ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই।

ইহার বদলে প্রতিযোগিতামূলক স্বাধীন অর্থব্যবস্থায় (free competitive economy) দেশের লোকের অনেক সুরাহা হইত। ধনী অবশ্যই থাকিত কিন্তু রাষ্ট্র তাহার সীমা নির্দেশ করিতে পারিত। দেশের লোক স্বাবলম্বী হইতে পারিত, কর্মঠ হইত, আত্মবিশ্বাসী হইত, মানুষ হইত।

কিন্তু তাহা হইলে এই অক্ষম, পঙ্গু, ক্লীব কংগ্রেস শাসন টিঁকিত না। সার্বজনীন ভোটাধিকারের জোরে এবং সমাজবাদের ধাপ্পাবাজীর ফলে কংগ্রেস তাহার শাসনদণ্ডের উপর অধিকার কায়েম করিয়া রাখিতে পারিয়াছে। ইহাই কংগ্রেসী সমাজবাদের মূল স্বরূপ।

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে ইতিহাসের উপাদান



শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্ত্তী

বিগত ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে মহীশূরের প্রখ্যাত পণ্ডিত ডাঃ শ্যাম শাস্ত্রী কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের একটি সংস্করণ প্রকাশ করিলে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে আগ্রহশীল পাঠক সমাজে এক আলোড়নের সূত্রপাত হয়। অনেকেই ইহাকে একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার বলিয়া অধ্যাপক মহাশয়কে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। ইহার পূর্ব্বে বিবিধ প্রাচীন গ্রন্থে এই গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত নানা মতামতের উল্লেখ মাত্র দেখা যাইত। কিন্তু মূল গ্রন্থটি যে কি বস্তু, সে সম্বন্ধে অনেকেরই বিশেষ কোন সঠিক ধারণা ছিল না। সুতরাং গ্রন্থটি প্রকাশিত হইবার পর হইতে এ পর্য্যন্ত ইহার বিভিন্ন দিক্ লইয়া বহু গবেষণা হইয়াছে, এবং ভবিষ্যতেও হইবে, ইহা নিশ্চিত বলা যায়। কিছুকাল পূর্ব্বে লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক ডাঃ রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় ২ খণ্ডে অর্থশাস্ত্রের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালী পাঠক সাধারণের অশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। প্রথম খণ্ডের মুখবন্ধে ডাঃ বসাক একটি অতি মূল্যবান্ প্রবন্ধ সন্নিবেশিত করিয়াছেন। অর্থশাস্ত্রে উল্লিখিত ও আলোচিত নানা বিষয়ের বিচার-বিবেচনা নানাদিক্ হইতে এই প্রবন্ধে করা হইয়াছে, যাহা অনিসন্ধিৎসু পাঠকের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয়।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা এই গ্রন্থের মধ্যে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের যে-সব উপাদান আছে, তাহারই কিছু কিছু ইঙ্গিত দেওয়ার চেষ্টা করিব। বস্তুতঃ নামে অর্থশাস্ত্র হইলেও ইহা একটি মহাগ্রন্থ, এবং নানা বিষয়ের আকর; একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। রাষ্ট্র-বিষয়ক প্রায় সবকিছুর আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত ইহাতে আছে। গ্রন্থশেষে কৌটিল্য লিখিয়াছেন, "যিনি ক্রোধের বশে শস্ত্র, শাস্ত্র ও নন্দরাজ অধিগত ভূমি শীঘ্র উদ্ধার করিয়াছিলেন, তিনি (অর্থাৎ স্বয়ং কৌটিল্যই) এই শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন।" ইহাতে মনে হয় যে, নন্দরাজগণ শুধু বংশগৌরবেই হীন ছিলেন না, হিন্দুশাস্ত্র-বিরোধী কার্য্যেও লিপ্ত ছিলেন। সর্ব্বশেষ শ্লোকে তিনি বলিতেছেন,

দৃষ্ট্বা বিপ্রতিপত্তিং বহুধা শাস্ত্রেষু ভাষ্যকারাণাম্।
স্বয়মেব বিষ্ণুগুপ্তশ্চকার সূত্রং চ ভাষ্যং চ॥

অর্থাৎ শাস্ত্রসমূহের ভাষ্যকারগণের মধ্যে ব্যাখ্যা বিষয়ে নানা-প্রকার মতদ্বৈধতা বা মতানৈক্য লক্ষ্য করিয়া, গ্রন্থ-রচয়িতা বিষ্ণুগুপ্ত স্বয়ং এই গ্রন্থ ও ইহার ভাষ্য উভয়ই রচনা করিয়াছেন।

দ্রোমিণ, অংশুপ, কৌটল্য, কৌটিল্য, চাণক্য, ইত্যাদি বিষ্ণুগুপ্তের বহু নাম বা উপাধির মধ্যে কয়েকটি মাত্র। চণকের সন্তান বা বংশধর বলিয়া তাঁহার চাণক্য নাম। কৌটিল্য নামটিও বংশসূচক বা বংশ-পরিচায়ক উপাধি। কামন্দক নীতির টীকাকার কৌটিল্য নামের এই ব্যাখ্যা দিয়াছেন:—কূটোঘটস্তং ধান্যপূর্ণং লান্তি সংগৃহ্ণন্তি ইতি কূটলাঃ কুম্ভীধান্যা ইতি প্রসিদ্ধিঃ। অতএব তেষাং গোত্রাপত্যং কৌটিল্যো বিষ্ণুগুপ্তোনাম। কূট অর্থাৎ ধান্য-পূর্ণ কুম্ভবা জালা যাঁহারা সঞ্চয় করেন, তাঁহারা কূটল অর্থাৎ কুম্ভীধান্য বা সম্পন্ন গৃহস্থ। যাহাদের গৃহে বহুদিনের জন্য ধান্য মজুদ থাকে, তাঁহারাই কূটল। আর সেই কূটলগণের সন্তান চাণক্য বিষ্ণুগুপ্ত কৌটিল্য। অনেকের মতে কৌটিল্য উপাধিটি চাণক্যের কুটিল মতিরই পরিচায়ক। চাণক্যের কয়েক শতাব্দী পরে রচিত—"মুদ্রারাক্ষস" নাটকে কৌটিল্য অর্থে "কুটিলমতি" এই সিদ্ধান্তই করা হইয়াছে। ডাঃ বসাকও মতটির অনুমোদন করিয়াছেন। কিন্তু মতটি যে কত ভ্রান্ত তাহা অর্থশাস্ত্র পাঠেই জানা যায়। প্রতি অধ্যায়ের শেষে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "ইতি কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে……অমুক অধ্যায় সমাপ্ত।" যে যে স্থলে তিনি কোন বিষয়ে পূর্ব্বাচার্য্যদের সঙ্গে একমত হইতে পারেন নাই, সে সে স্থলে তিনি লিখিয়াছেন, "কিন্তু কৌটিল্যের মত এই যে…ইত্যাদি ইত্যাদি।" কৌটিল্য অর্থে কুটিলমতি হইলে চাণক্য বিষ্ণু-গুপ্ত স্বয়ং এই কুৎসা-সূচক উপাধিটির ব্যবহার অবশ্যই করিতেন না। সুতরাং যাঁহারা কৌটিল্য অর্থে "কুটিলমতি" এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের সিদ্ধান্তটি সম্পূর্ণ ভুল।

কেহ কেহ অবশ্য বলিয়াছেন যে, অর্থশাস্ত্রটি স্বয়ং কৌটিল্য রচিত নয়, তদীয় শিষ্য-প্রশিষ্যগণের মধ্যে কেহ পরবর্ত্তী কোন যুগে কৌটিল্যের নামে ইহা রচনা করিয়া থাকিতে পারেন। এই অনুমান সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইলেও কৌটিল্য অর্থে কুটিলমতি, ইহা সঙ্গত হয় না। কারণ নিজের পক্ষে নিজেকে গালি দেওয়া যেমন সম্ভব নয়, তেমনই শিষ্য-প্রশিষ্যগণের পক্ষেও গুরু বা মহাগুরুকে কুৎসা-সূচক নামে আখ্যাত করা সম্ভব নয়। আমরা এই বাগ বিতণ্ডার প্রবেশের ইচ্ছা না করিয়া ধরিয়া লইতেছি যে, গ্রন্থটি স্বয়ং কৌটিল্যেরই রচিত, অপরের নহে। "নীতিসার" গ্রন্থ-প্রণেতা আচার্য্য কামন্দক কৌটিল্যের শিষ্য ছিলেন। তদীয় গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে কামন্দক লিখিয়াছেন :

বংশে বিশাল-বংশ্যানামৃষীণামিব ভূয়সাম্।
অপ্রতিগ্রাহকাণাং যো বভূব ভূবিবিশ্রুতঃ॥
জাতবেদা-ইবার্চ্চিষ্মান্ বেদান্ বেদবিদাংবরঃ।
যোঽধীতবান্ সুচতুরশ্চতুরোঽপ্যেক বেদবৎ॥
যস্যাভিচারবজ্রেণ বজ্রজ্বলনতেজসঃ।
পপাত মূলতঃ শ্রীমান্ সুপর্ব্বা নন্দপর্ব্বতঃ॥
একাকী মন্ত্রশক্ত্যা যঃ শক্ত্যা শক্তিধরোপমঃ।
আজহার নৃচন্দ্রায় চন্দ্রগুপ্তায় মেদিনীম্॥
নীতিশাস্ত্রামৃতং ধীমানর্থশাস্ত্র মহোদধেঃ।
সমুদ্দধ্রে নমস্তস্মৈ বিষ্ণুগুপ্তয়ে বেধসে॥

অর্থাৎ, "যিনি ঋষিতুল্য অপ্রতিগ্রাহী (নিজে দান করেন, অথচ দান গ্রহণ করেন না), মহান্ পূর্ব্বপুরুষগণের মহাবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বকীয় জ্ঞানের আলোকে জগৎ উজ্জ্বল করিয়াছেন; যিনি অগ্নিতুল্য তেজস্বী এবং প্রতিভাবলে অবলীলাক্রমে চতুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া বেদজ্ঞগণের অগ্রণী হইয়াছেন; বজ্রাগ্নিতুল্য যে মনীষীর অভিচারবজ্র দ্বারা লক্ষ্মীপতি প্রখ্যাতনামা পৃথ্বীশ্বর নন্দরাজ পর্ব্বতের ন্যায় সমূলে নিপাতিত হইয়াছেন; যিনি শক্তিধর কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় শক্তিসম্পন্ন এবং একাকী মন্ত্রপ্রভাবে নৃচন্দ্র চন্দ্রগুপ্তকে পৃথ্বীপতির সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; যিনি প্রভাবলে অর্থশাস্ত্ররূপ মহাসাগর মন্থনপূর্ব্বক নীতিশাস্ত্ররূপ অমৃত উদ্ধার করিয়াছেন, সাক্ষাৎ ব্রহ্মার ন্যায় সেই গুরুদেব বিষ্ণুগুপ্তের চরণে নমস্কার করি।"

কৌটিল্য বলিতে দেশের অনেক লোকেরই কুৎসিদ্দর্শন, ভ্রূকুটি কুটিল ও অতি-সংদিগ্ধচিত্ত এক কাটখোট্টা লোকের চেহারা মনে হয়। বলা বাহুল্য কৌটিল্য-পরবর্ত্তী যুগের দুই-একখানি নাটক হইতেই এই ভুল ধারণা লোকের মনে বাসা বাঁধিয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু কৌটিল্য-শিষ্য কামন্দকের গুরু-স্তুতিতে যে কৌটিল্যকে আমরা দেখি, সেই কৌটিল্য সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জগতের লোক। এখানে আমরা কৌটিল্য বলিতে অতি সৌম্যদর্শন জ্ঞানের আলোকে উজ্জ্বল এবং লোকোত্তর প্রতিভাদীপ্ত এক অকিঞ্চন সন্ন্যাসী আর্য্যগুরুকেই দেখিতে পাই। সুতরাং আসল কৌটিল্য এইটিই, নাট্যকারগণের কুটিলমতি কৌটিল্য নহে।

প্রাচীন কবি ও আলঙ্কারিক আচার্য্য দণ্ডি তদীয় "দশ-কুমার চরিত" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন : অধীষ্ব তাবদ্দণ্ড-নীতিম্। ইয়মিদানীমাচার্য্যবিষ্ণুগুপ্তেন মৌর্য্যার্থে ষড় ভি শ্লোকসহস্রৈঃ সংক্ষিপ্তা—ইত্যাদি। অর্থাৎ এই অবসরে দণ্ডনীতি অধ্যয়ন কর। ইদানীং আচার্য্য বিষ্ণুগুপ্ত সংক্ষেপে ছয় হাজার শ্লোকে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সুতরাং অর্থশাস্ত্র কৌটিল্য রচিতই, অপরের নহে।

গ্রন্থারম্ভেই কৌটিল্য বলিতেছেন—১।১ : শুক্রাচার্য্য ও আচার্য্য বৃহস্পতিকে নমস্কার। মনুষ্য-অধ্যুষিত ভূমির লাভ ও ইহার সংরক্ষণ বিষয়ে পূর্ব্বাচার্য্যগণ যে যে অর্থশাস্ত্র প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, প্রধানতঃ সেগুলি সংগ্রহ করিয়া আমরা এই অর্থশাস্ত্রখানি প্রণয়ন করিয়াছি। ১৫।১ শ্লোকে তিনি বলিতেছেন, "মানুষের বৃত্তি বা জীবিকাকে অর্থ বলা যায়। মনুষ্যযুক্ত ভূমির নামও অর্থ হয়। যে শাস্ত্র সেই ভূমির লাভ ও পালনের উপায় নিরূপণ করে, তাহার নাম অর্থশাস্ত্র।" সুতরাং পূর্ব্বাচার্য্যগণের মত ধর্ম্মসংহিতা, ধর্ম্মসূত্র, ইত্যাদি নাম না রাখিয়া কৌটিল্য স্বরচিত গ্রন্থের নাম কেন অর্থশাস্ত্র রাখিয়াছেন, তাহার কৈফিয়ৎ স্বয়ংই দিয়াছেন। অর্থশাস্ত্রে আলোচিত অর্থনীতি ও রাজনীতি সম্বন্ধীয় বিষয়গুলি পাঠ করিলে এই ধারণাই জন্মে যে, কৌটিল্য মৌর্য্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেই স্বীয় গ্রন্থখানি রচনা করিয়া প্রখ্যাত রাজ-নীতিবিদ্ ও অর্থনীতিবিদ্ হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া-ছিলেন এবং সেই প্রসিদ্ধিই কুমার চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে তাঁহার সহযোগিতার পথ প্রশস্ত করিয়াছিল। বাস্তবিক, যে যুগে সমগ্র উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর ভারতে বহু সংখ্যক রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ছিল এবং সেই রাজ্যগুলি একে অপর

হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া ও পরস্পরের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদে লিপ্ত থাকিয়া কোন সুপ্রতিষ্ঠিত সার্ব্বভৌম রাষ্ট্রগঠনে বাধা প্রদান করিত, অর্থশাস্ত্র যেন ঠিক সেই রকম একটা যুগেরই জীবন্ত চিত্র।

ইতিহাস বলিতে শুধুমাত্র রাজা-রাজড়ার কাহিনীই বুঝায় না। দেশের সামাজিক, ধর্ম্মনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার বর্ণনাও ইতিহাসেরই অন্তর্ভূত বিষয়। আমরা এই-সব দিক্ হইতেই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। ইতিহাস বলিতে কৌটিল্যও পুরাণ, ইতিবৃত্ত, আখ্যায়িকা, উদাহরণ, ধর্ম্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্র,—এই সব কয়টিকেই বুঝাইয়াছেন বলিয়া মনে হয়—১৫ অধ্যায়।

কৌটিল্য উত্তর-পশ্চিম ভারতের লোক এবং তক্ষশীলায় শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। সম্ভবতঃ গ্রীক আক্রমণের পূর্ব্বে হইতেই তিনি স্বীয় মাতৃভূমি ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব ভারতের কোথাও আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পরে চন্দ্রগুপ্তের সহায়ে আর্য্যধর্ম্ম-বিদ্বেষী নন্দরাজ বংশ ধ্বংস করিয়া বিশাল মৌর্য্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। নন্দবংশের প্রতি কৌটিল্যের ক্রোধের অন্যতম প্রধান কারণ সম্ভবতঃ এই আর্য্যধর্ম্মবিদ্বেষ; নতুবা অর্থশাস্ত্রের শেষদিকে উল্লিখিত—"ক্রোধবশে শাস্ত্র ও ভূমি উদ্ধারের" তাৎপর্য্য স্পষ্ট হয় না। ঐতিহাসিক Vincent Smithও অনুমান করিয়াছেন যে, নন্দরাজ বংশ সম্ভবতঃ আর্য্যধর্ম্মবিরোধী (heretic) ছিলেন। আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের প্রাক্কালে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে মনে হয় যে, ইতিপূর্ব্বে এই সকল স্থান হইতে পারসিক অধিকার বিলুপ্ত হইয়া স্থানীয় বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। নতুবা যেখানে আলেকজাণ্ডার মাত্র কয়েকটি বড় যুদ্ধ করিয়া সুদূর এশিয়া মাইনর হইতে আফগানিস্তানের কিয়দংশ পর্য্যন্ত সহজেই অধিকার করিয়া ফেলিলেন, সে-স্থলে বিশাল পারসিক সাম্রাজ্যের এই প্রত্যন্ত প্রদেশসমূহে এবং পঞ্চনদে আসিয়া তাঁহাকে প্রতি ইঞ্চি জমির জন্য এত যুদ্ধবিগ্রহ করিতে হইবে কেন? ভারতের অভ্যন্তর প্রদেশসমূহেও অবস্থা খুব একটা সুবিধাজনক ছিল বলিয়া মনে হয় না। পূর্ব্ব-ভারতের নন্দ সাম্রাজ্য খুব শক্তিশালী হইলেও এবং তাহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি গ্রীক্ বিবরণ অনুযায়ী উত্তর-ভারতে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পূর্ব্বকালীন রাজ্যসমূহের স্বতন্ত্র পরিচয় বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই, এরূপ মনে করিবার কারণ বিদ্যমান আছে। কেন্দ্রীয় শক্তির সামান্যতম দুর্ব্বলতার লক্ষণ প্রকাশ পাইলেই ইহাদের স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্য মাথা চাড়া দিয়া উঠিত। অন্য সময়ে ইহাদের রাজা অথবা প্রধানগণ অধীনতার নিদর্শন-সূচক কিছু কিছু কর দিয়া স্ব স্ব স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখিতেন। চাণক্যের পরিচালনায় মৌর্য্য সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে অবশ্য এই অবস্থার অনেকটা পরিবর্ত্তন হইয়াছিল।

কৌটিল্যের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগকে ইতিহাসে সাধারণতঃ বৌদ্ধ ও জৈন যুগ বলা হইয়া থাকে। প্রকৃত অবস্থা কিন্তু মোটেই তাহা ছিল না। বর্দ্ধমান মহাবীর জিন মৃত্যুকালে কিঞ্চিদধিক মাত্র ১৪,০০০ লোককে তদীয় ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিয়াছিলেন। সে তুলনায় গৌতম বুদ্ধ-প্রবর্ত্তিত বৌদ্ধধর্ম্ম হয়ত প্রচার ও প্রসারে পূর্ব্ব-ভারতের কোন কোন স্থানে একটু বেশী প্রতিপত্তিশালী ছিল মাত্র। মৌর্য্য সম্রাট্ অশোকের সময় বৌদ্ধধর্ম্ম রাজকীয় ধর্ম্ম হিসাবে সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রচার ও প্রসারের প্রায় একচেটিয়া অধিকার লাভ করিলেও দেশের অধিকাংশ লোকই হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করে নাই। বৌদ্ধগণ নানা স্থানে মঠ বা সংঘ গড়িয়া তুলিলেও তাহাদের সংখ্যা কখনও খুব বেশী ছিল না। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মই সর্ব্বকালে প্রবলতম শক্তি ছিল। কৌটিল্যের সময়ে মক্খলি গোসালের অনুগামী আজীবিকগণও বৌদ্ধ ও জৈনগণের তুলনায় সংখ্যায় নেহাৎ ন্যূন ছিল বলিয়া মনে হয় না।

পূর্ব্বাচার্য্যগণ

কৌটিল্যের পূর্ব্বে দেশে রাজধর্ম্ম-বিষয়ক বহু গ্রন্থ প্রচলিত ছিল, জানা যায়। কৌটিল্যের গুরুও বিচক্ষণ নীতিবিদ্ ছিলেন বলিয়া মনে হয়। অর্থশাস্ত্রে ৫৩ বার "আচার্য্যাঃ" শব্দটির প্রয়োগ করা হইয়াছে। খুব সম্ভবতঃ এই "আচার্য্যাঃ" শব্দটির দ্বারা কৌটিল্য স্বীয় গুরুকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। এতদ্ব্যতীত যে সমস্ত পূর্ব্বাচার্য্যের নাম ও মতামত উল্লিখিত বা খণ্ডিত হইয়াছে, তাঁহারা হইলেন—১। শুক্রাচার্য্য (উশনা), ২। আচার্য্য বৃহস্পতি, ৩। মনু, ৪। আচার্য্য ভারদ্বাজ (সম্ভবতঃ আচার্য্য দ্রোণ), ৫। আচার্য্য বিশালাক্ষ (শিব), ৬। আচার্য্য পিশুন (নারদ), ৭। আচার্য্য কৌণপদন্ত (ভীষ্ম), ৮। আচার্য্য বাতব্যাধি (উদ্ধব),

৯। আচার্য্য বহুদন্তিপুত্র (ইন্দ্র), ১০। আচার্য্য পরাশর ও ১১। আচার্য্য পারাশর (ব্যাস)। গ্রন্থারম্ভেই অবশ্য কৌটিল্য প্রসিদ্ধ ধর্ম্মসূত্রকার হিসাবে আচার্য্য শুক্র ও আচার্য্য বৃহস্পতি, এই দুই দিক্‌পালকে প্রণাম জানাইয়াছেন। কিন্তু তিনি ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের নাম কোথাও করেন নাই বলিয়া মনে হয়। নীতিসার-প্রণেতা ও আচার্য্য কামন্দকেরও কোন উল্লেখ অর্থশাস্ত্রে নাই। কারণ কামন্দক কৌটিল্য-শিষ্য, নীতিসার অর্থশাস্ত্রের পরেই রচিত হইয়াছিল। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার অনুল্লেখ সত্যই তাৎপর্য্যপূর্ণ। সম্ভবতঃ শুক্ল যজুর্ব্বেদী বলিয়াই যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতি এই উপেক্ষা, যেমন উপেক্ষা করিয়াছেন আচার্য্য পাণিনি তদীয় অষ্টাধ্যায়ীতে। যাহা হউক, এই সমস্ত আচার্য্যকৃত গ্রন্থসমূহের কয়েকটি অন্ততঃপক্ষে স্বতন্ত্রভাবে বিলুপ্ত হইয়াছে, বা এ যাবৎ অনাবিষ্কৃত আছে। আচার্য্য দ্রোণ রচিত বা কথিত কোন স্মৃতিশাস্ত্রের নাম পাওয়া গিয়াছে বলিয়া জানি না। তবে ধনুর্ব্বেদের কোথাও হয়ত ইহা উল্লিখিত হইয়া থাকিতে পারে ব্যূহ-রচনার ব্যাপারে। কৌণপদন্ত বা ভীষ্ম রচিত বা কথিত স্মৃতিশাস্ত্রের সন্ধান মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে পাওয়া যায়। কিন্তু আচার্য্য বাতব্যাধি বা উদ্ধব-কথিত কোন ধর্ম্মশাস্ত্রের নাম শুনি নাই। পুরাণে এবং মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণভক্ত এক উদ্ধবের কথা পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতা আচার্য্য উদ্ধব কি না, তাহা বলা যায় না। সম্ভবতঃ এই আচার্য্য উদ্ধব বাতব্যাধি রোগগ্রস্ত, পরবর্ত্তী যুগের কোন এক প্রখ্যাত ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রবক্তা ছিলেন, এবং কৌটিল্যের যুগ পর্য্যন্ত তদীয় গ্রন্থ সুপ্রচলিত ছিল। এ সব ছাড়া অর্থশাস্ত্রের নানা স্থানে অজ্ঞাত-পরিচয় কতিপয় স্মৃতিশাস্ত্রকারের উল্লেখ "ইত্যেকে" ও "ইত্যপরে" শব্দদ্বয় দ্বারা করা হইয়াছে। তাঁহাদের নাম জানিবার আজ আর কোন উপায় নাই। কৌটিল্যের গুরু-কৃত গ্রন্থের নাম, পরিচয়, ইত্যাদিও এতাবৎ পাওয়া গিয়াছে বলিয়া জানা যায় না।

উপরে উদ্ধৃত তালিকায় পূর্ব্বাচার্য্যগণের মতামতের উল্লেখ প্রসঙ্গে কৌটিল্য যে-সব ইঙ্গিতপূর্ণ বিশেষণের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাদের ইতিহাস বা উৎপত্তির কারণ মহাভারতে পাওয়া যায়। শান্তিপর্ব্বে (রাজধর্ম্মানুশাসন অধ্যায়) দেখা যায়, প্রথমে প্রজাপতি ব্রহ্মা লক্ষ অধ্যায়ে নীতিশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। শিব সেই শাস্ত্রকে সংক্ষিপ্ত আকারে দশ সহস্র অধ্যায়ে পরিণত করেন। শিবের এক নাম বিশালাক্ষ বলিয়া তদীয় নীতিশাস্ত্রে বৈশালাক্ষ নামে প্রসিদ্ধ হইল। ইন্দ্র শিব-কৃত শাস্ত্রকে পঞ্চ সহস্র অধ্যায়ে রূপান্তরিত করেন। দেবরাজ ইন্দ্রের এক নাম বহুদন্তীপুত্র বলিয়া সেই শাস্ত্রের নাম হইল বাহুদন্তিক। আচার্য্য বৃহস্পতি আবার দেবরাজ-কৃত গ্রন্থকে তিন সহস্র অধ্যায়ে, এবং আচার্য্য শুক্র এক সহস্র অধ্যায়ে সংক্ষিপ্ত করেন। বৃহস্পতি-কৃত শাস্ত্রের নাম বার্হস্পত্য, আর শুক্রকৃত শাস্ত্রের নাম ঔশনস। উশনা শুক্রাচার্যের এক নাম। এইরূপে মূল প্রাজাপত্য নীতিশাস্ত্র ক্রমশঃ সংক্ষেপিত হইতে হইতে নারদ (পিশুন), ভারদ্বাজ (ভরদ্বাজ পুত্র), ভীষ্ম (কৌণপদন্ত), পরাশর, পারাশর (ব্যাস), মনু ও অন্যান্য ঋষি-মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক প্রণীত হইতে লাগিল।

ইহা ছাড়াও কৌটিল্য আর-এক পন্থী আচার্য্যের উল্লেখ এক স্থানে করিয়াছেন। তাঁহারা হইলেন আম্ভীয়। নাম হইতে বুঝা যায়, ইঁহারা আম্ভী নামক কোন আচার্য্যের শিষ্য-সম্প্রদায়। অনুবাদক ডাঃ বসাকের মতে আম্ভীয়গণ সম্ভবতঃ আলেকজাণ্ডারের সমসাময়িক তক্ষশীলাধিপতির পুত্র কুমার আম্ভির মতবাদে বিশ্বাসী সম্প্রদায় (১ম খণ্ড—১৷৵০ পৃষ্ঠা)। এই মত যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। কারণ আলেকজাণ্ডার ও কৌটিল্য সমসাময়িক। কুমার আম্ভি স্বদেশে ও বিদেশে মেরুদণ্ডহীন দেশদ্রোহী বলিয়াই কুখ্যাত। তাঁহার মতবাদ গৃহীত হইয়া তদীয় শিষ্য-প্রশিষ্য মারফতে বাহিত হইয়া কৌটিল্যের স্বরচিত গ্রন্থে নিবদ্ধ হইবে, ইহা অসম্ভব ব্যাপার। সুতরাং এই আম্ভীয়গণ নিঃসন্দেহে আম্ভী নামক কোন এক প্রাচীনতর আচার্য্যের শিষ্য-সম্প্রদায়, তক্ষশীলার কুমার আম্ভীর মতাবলম্বীগণ নহে।

ব্রাহ্মণ ও সমাজ-জীবনে তদীয় প্রভাব

কৌটিল্যের যুগে দেশে বর্ণাশ্রমধর্ম্মই প্রধানতঃ প্রচলিত ছিল। আর ছিল সমাজ-জীবনে ব্রাহ্মণের অপ্রতিহত প্রভাব। ব্রাহ্মণ কোন গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইলেও তাহার প্রাণদণ্ড হইত না। রাজ্য হইতে নির্ব্বাসনই ছিল তাহার চরমতম দণ্ড। কেবলমাত্র একটি বিশেষ ক্ষেত্রেই কৌটিল্য ব্রাহ্মণের প্রাণদণ্ডের অনুমোদন করিয়াছেন, আর সেই ক্ষেত্রটি ছিল রাণী কিংবা রাজমাতার সঙ্গে ব্যভিচার।

সুপণ্ডিত ও নীতিবিদ্ ব্রাহ্মণই রাজার মুখ্যসচিব ও পরিচালক হইতেন। রাজ-পুরোহিতের ক্ষমতাও বড় কম ছিল না। তাঁহারা উভয়েই রাজাকে কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য ও ঔচিত্য-অনৌচিত্যাদি বিষয়ে পরামর্শ ও উপদেশাদি দিতেন। এমন যে বৌদ্ধ-ধর্ম্মাশ্রয়ী রাজা অশোক, তাঁহারও মুখ্য সচিব ব্রাহ্মণই ছিলেন বলিয়া জানা যায়। কেবল সম্রাট্ অশোক কেন, সমগ্র মৌর্য্যবংশেরই মুখ্য সচিবগণ পূর্ব্বাপর ব্রাহ্মণ ছিলেন। সেই যুগে সকল ক্ষত্রিয় রাজারই মুখ্য সচিব ব্রাহ্মণ হইতেন, এবং ইহাই ছিল চিরাচরিত প্রথা।

তৎকালে কয়েকটি অব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রভাবে সমাজ-জীবনে ব্রাহ্মণ-বিরোধী আন্দোলন বেশ কিছুটা দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছিল, জানা যায়। বিগত দুইশত শতাব্দীর অধিক কাল ধরিয়াই এসব ধর্ম্মীয় আন্দোলন চলিয়া আসিতেছিল, এবং তাহাতে কয়েকজন প্রতিপত্তিশালী রাজা-মহারাজাও কমবেশী প্রভাবিত হইয়াছিলেন বলিয়া ইতিহাসে দেখা যায়। পাছে এই অব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মান্দোলনসমূহ বেশীদুর গড়াইয়া রাজানুকূল্য লাভ করে, এবং ব্রাহ্মণের বহুকালস্থায়ী অধিকারসমূহে হস্তক্ষেপ করে, এই ভয়েই হয়ত কৌটিল্য স্বীয় গ্রন্থের প্রথম ভাগে এক সূক্ষ্ম ও প্রচ্ছন্ন সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। কৌটিল্য বেদ ও ব্রাহ্মণ-বিরোধী নন্দ-বংশ ধ্বংস করিয়া স্বকীয় জীবনেই ব্রাহ্মণ-বিরোধিতার পরিণাম জনসাধারণকে প্রত্যক্ষ করাইয়াছিলেন। তথাপি হয়ত এই নূতন সাবধান বাণীর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইয়াছিল—অর্থশাস্ত্র—১।৬ অধ্যায়।

অজিতেন্দ্রিয় ও জিতেন্দ্রিয় রাজা

এই ১।৬ অধ্যায়েই কৌটিল্য বলিতেছেন যে, অজিতেন্দ্রিয় রাজা কখনও আদর্শস্থানীয় হইতে পারেন না, বা তাঁহার রাজ্য কখনও স্থায়ী হয় না। আদর্শস্থানীয় রাজাকে অবশ্যই জিতেন্দ্রিয় হইতে হইবে; নতুবা তিনি বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর বা চাতুরন্ত (চতুঃ সমুদ্রান্ত পৃথিবীর অধীশ্বর) হইয়াও তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হন। এই প্রসঙ্গে কৌটিল্য প্রাচীন যুগের যে কয়টি উদাহরণের উল্লেখ করিয়াছেন, দুইটি ক্ষেত্র ছাড়া বাকী সব কয়টিতেই ব্রাহ্মণের সংশ্রব ছিল দেখা যায়। যথা: (ক) ভোজবংশীয় দাণ্ডক্য নামক রাজা ও বিদেহরাজ করাল, উভয়েই 'কামবশতঃ ব্রাহ্মণ কন্যাকে পাইতে ইচ্ছা করিয়া বান্ধব ও রাষ্ট্রসহ বিনষ্ট হইয়াছিলেন। (খ) কোপবশতঃ রাজা জনমেজয় ব্রাহ্মণের উপর বিক্রম প্রকাশ করিতে গিয়া, ও তালজঙ্ঘরাজ ভৃগুগণের উপর বিক্রম প্রকাশ করিয়া বিনষ্ট হইয়াছিলেন। (গ) লোভের বশে ইলানন্দন এবং সৌবীর-রাজ অজবিন্দু ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণ হইতে অতিমাত্রায় কর আদায় করিতে গিয়া বিনষ্ট হন। (ঘ) অভিমানবশতঃ লঙ্কাধিপতি রাবণ সীতাকে ফিরাইয়া না দিয়া, ও অতি-লোভী দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণকে তাহাদের প্রাপ্য ফিরাইয়া দিতে অস্বীকার করিয়া স্ববংশে নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (ঙ) গর্ব্বোদ্ধত রাজা ডম্বোদ্ভব (নর-নারায়ণ হস্তে) এবং হৈহয়-রাজ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন পরশুরামের হস্তে বিনষ্ট হইয়াছিলেন। (চ) অতিমাত্র উল্লসিত বাতাপি ঋষি অগস্ত্যকে আক্রমণ করিয়া, এবং গর্ব্বিত বৃষ্ণিবংশ ঋষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে তেমনই আক্রমণ করিয়া তাঁহাদের অভিশাপে ধ্বংস হইয়াছিলেন। (ছ) আবার কামাদি ষড়্ রিপুকে দমন করিয়া, জামদগ্ন্য, রাজা অম্বরীষ ও নাভাগ বহুকালাবধি পৃথিবী ভোগ করিয়াছিলেন।

বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত এবং বহু প্রদেশে বিস্তৃত সুপ্রাচীন যদুবংশের ভোজশাখার দাণ্ডক্য নামক রাজা কোন্ রাজ্যে রাজত্ব করিতেন, পুরাণাদিতে তাহার কোন সন্ধান নাই। পুরাণাদির মতে বৈদিক যুগ হইতেই যদু-বংশীয়গণ পাঞ্জাব, মথুরা, কাশী, মগধ (রাজগৃহ), বিদর্ভ, ত্রিপুরী বা ত্রৈপুরী, নর্ম্মদাতীরবর্ত্তী মাহিষ্মতী, অবন্তী, সৌরাষ্ট্র (দ্বারকা) প্রভৃতি স্থানে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। দাণ্ডক্য নামক এই রাজা সম্ভবতঃ কৌটিল্যের কিছুকাল পূর্ব্বে ইহাদের কোন একটি স্থানে রাজত্ব করিতেন। বিদেহ-রাজ করাল সম্ভবতঃ মিথিলার জনকবংশীয় মূল শাখার কেহ নহেন। কারণ ইক্ষ্বাকু-পুত্র নিমি হইতে আরম্ভ করিয়া এই বংশের শেষ রাজা কৃতি পর্য্যন্ত করাল নামধারী কাহাকেও পাওয়া যায় না। রামায়ণের আদি কাণ্ডে (৪৭ সর্গ) অবশ্য দেখা যায় যে, মূল জনকবংশ মিথিলায় রাজত্ব করিলেও তৎকালীন রাজা সীরধ্বজ জনকের (রামচন্দ্রের শ্বশুর) কনিষ্ঠভ্রাতা কুশধ্বজ সাঙ্কাশ্য বা কাশীর অধীশ্বর ছিলেন, আর তাঁহারই জ্ঞাতিবংশীয় সুমতি নামক এক রাজা বিশালায় (বৈশালী মজঃফরপুর জেলায়) রাজত্ব করিতেন (সম্ভবতঃ সামন্ত হিসাবে)। রাজা করাল ইহাদের কাহারও উত্তর পুরুষ হইতে পারেন, অথবা জনকবংশের অবসানে মিথিলায়

প্রতিষ্ঠিত অপর কোন বংশের রাজাও হইতে পারেন। বৈশালী ও তৎসংলগ্ন স্থানসমূহে গৌতমবুদ্ধ ও মহাবীর বর্দ্ধমানের সময় গণরাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। করালের রাজ্যনাশ ও বৈশালীতে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার কোন সম্পর্ক হয়ত থাকিতে পারে।

পরীক্ষিৎ-তনয় জনমেজয় পিতার মতই অভিশাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন। বায়ুপুরাণ মতে রাজা জনমেজয় অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানে ইচ্ছুক হইয়া পুরাতন পুরোহিত ব্যাস-শিষ্য বৈশম্পায়ন প্রমুখ ঋষিগণকে অনাদর করিয়া অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন শুক্লযজুর্ব্বেদাধ্যায়ী পুরোহিতগণকে বৃত করেন। ইহাতে ক্ষুব্ধ ও অপমানিত বোধ করিয়া বৈশম্পায়ন রাজা জনমেজয়কে অভিশাপ দেন যে, "অতঃপর পৃথিবীতে তোমার কথায় কোন মূল্য কেহ দিবে না, অন্ততঃ আমি যতদিন জীবিত আছি, ততদিন নয়।"

"ন স্থাস্যতীহ দুর্ব্বুদ্ধে তবৈতদ্বচনং ভুবি।

যাবৎ স্থাস্যাম্যহং লোকে তাবন্নৈতৎপ্রশস্যতে। ৯৯ অধ্যায়

এস্থলে বলা প্রয়োজন যে, পিতার অপঘাতজনিত মৃত্যুর পর রাজপদে অভিষিক্ত হইয়াই যখন জনমেজয় স্বীয় পিতৃহত্যার প্রতিশোধ-মানসে তক্ষক নাগের বংশীয় অনেকানেক শিশু, স্ত্রী ও বৃদ্ধকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া মহাপাতকে লিপ্ত হইয়াছিলেন, তখন এই ঋষি বৈশম্পায়নই তাঁহাকে "জয়াখ্য" মহাভারত কাহিনী শুনাইয়া সেই পাপ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। আজ সময় পাইয়া জনমেজয়-প্রতিদ্বন্দ্বী বাজসনেয়ী বা শুক্লযজুর্ব্বেদীগণকে স্বীয় যজ্ঞে বৃত করিয়াছেন, ইহা সত্য-সত্যই ন্যায়সঙ্গত বা কৃতজ্ঞতাসূচক কার্য্য নহে। বায়ুপুরাণের মতে রাজা জনমেজয় দুইবার অশ্বমেধ যজ্ঞে এই বাজসনেয়ীগণকে পৌরোহিত্যে বরণ করিয়াছিলেন। শতপথ ব্রাহ্মণের মতে (১৩।৫।৪।১) প্রধান পুরোহিতের নাম ছিল ইন্দ্রোত দেবাপ শৌনক। আবার ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মতে দেখা যায় (৮।৩৯।৭) যে, জনমেজয়ের ঐন্দ্রমহাভিষেকের সময় যে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহাতে পুরোহিত ছিলেন (কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয়) তুরকাবষেয় নামক ঋষি। ঋষি কবষের পুত্র তুরকাবষেয় জনমেজয়ের পিতা পরীক্ষিতেরও প্রধান পুরোহিত ছিলেন। সে যাহা হউক, জনমেজয়ের আনুকূল্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায় নবীন বাজসনেয়ীগণ কুরু-পাঞ্চাল দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গেলেন। বেদব্যাস তৎকালে প্রচলিত প্রাচীন যজুর্মন্ত্রসমূহ সঙ্কলন করিয়া তদীয় অন্যতম প্রধান শিষ্য বৈশম্পায়নকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তদবধি বৈশম্পায়নই যজুর্মন্ত্রের প্রধান প্রবক্তা। ইতিমধ্যে যাজ্ঞবল্ক্য নামক অন্যতম শিষ্যের সঙ্গে কোন বিষয়ে মতান্তর হওয়ায় বৈশম্পায়ন ক্রুদ্ধ হইয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে তাঁহা হইতে প্রাপ্ত সমুদয় বেদমন্ত্র পরিত্যাগ করিতে আদেশ দেন। যাজ্ঞবল্ক্যও সেই সমুদয় মন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া কঠোর তপস্যাবলে সূর্য্যদেবের নিকট হইতে নূতন যজুর্মন্ত্র লাভ করেন। ইহাই শুক্ল যজুর্ব্বেদ বা বাজসনেয় সংহিতা নামে খ্যাত। এ স্থলে দেখিতে হইবে যে, বৈশম্পায়ন মন্ত্র-প্রবক্তা হইলেও, ভূতপূর্ব্ব শিষ্য এবং বর্ত্তমানে প্রতিদ্বন্দ্বী যাজ্ঞবল্ক্যের ন্যায় স্বয়ং "মন্ত্রদ্রষ্টা" ঋষি ছিলেন না। সুতরাং অপেক্ষাকৃত নূতন হইলেও মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য-প্রোক্ত যজুর্মন্ত্রের দিকেই হয়ত জনমেজয়ের ঝোঁক একটু বেশী পড়িয়াছিল। বায়ুপুরাণের মতে রাজা জনমেজয় বৈশম্পায়নের শাপে "ত্রিখর্ব্বী" হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ বৈশম্পায়ন ও তদীয় অনুগামীগণের প্রভাবে ও প্ররোচনায় অঙ্গ, অশ্মক ও মধ্যদেশের রাজাগণ জনমেজয়ের বিরুদ্ধাচরণ করেন বা তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ইহারই অর্থ "ত্রিখর্ব্ব" হওয়া। ইহাতে মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া, এবং স্বদেশীয় ও বিদেশীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ ও ঋষিগণ কর্ত্তৃক ধিকৃত হইয়া জনমেজয় স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র শতানীককে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া স্বয়ং বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন।

আদিতে হৈহয় ও তালজঙ্ঘগণ যদুবংশের একটি শাখার অন্তর্ভুক্ত ছিল। হৈহয়-রাজ কার্ত্তবীর্য্যের এক পৌত্র তালজঙ্ঘ হইতে তালজঙ্ঘ শাখার উৎপত্তি। তাহাদের কথা পরে বর্ণিত হইবে।

ইলা-নন্দন বলিতে ঋগ্বেদে উল্লিখিত উর্ব্বশী-প্রণয়ী পুরূরবা ঐলকে যদি কৌটিল্য মনে করিয়া থাকেন তবে বলিতে হয় যে, প্রজা-বিদ্রোহে পুরূরবা বিনষ্ট হইয়াছিলেন, এরূপ কোন ঘটনার কথা পুরাণাদিতে দেখা যায় না। হয় এই ইলা-নন্দন ঘটিত কোন আখ্যান বা উপাখ্যান কৌটিল্যের যুগে প্রচলিত ছিল, যাহা এ যুগে প্রচলিত পুরাণাদিতে পাওয়া যায় না, নতুবা এই ইলা-নন্দন পুরূরবা-বংশীয় অপর কোন রাজা, বা অপর কোন ইলা-নন্দন হইবেন। ভাগবতের নবম স্কন্দের শেষ দিকে বসুদেবের বহু পত্নীর মধ্যে ইলা নামে এক পত্নীর উল্লেখ আছে। এই ইলার গর্ভে বসুদেবের

উরু, বল্ক প্রভৃতি কয়েক পুত্রের জন্ম হয়। কৌটিল্য-উল্লিখিত ইলা-নন্দন বাসুদেবের এই ধারার, পরবর্ত্তী কালের কোন রাজাও হইতে পারেন। যদু-বংশীয়গণের ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষ পুরাণাদিতে বহুস্থলে উল্লিখিত আছে।

সুবীর-রাজ অজবিন্দুরও কোন উল্লেখ পুরাণাদিতে পাওয়া যায় না। সুবীর বা সৌবীর দেশ সিন্ধুদেশ সন্নিহিত কোন প্রদেশের প্রাচীন নাম। মহাভারত ও পুরাণাদিতে সিন্ধু-সৌবীরগণের যুক্তভাবে উল্লেখ বহু স্থানে দেখা যায়। যদুবংশীয় বহু ধারা মহাভারতের যুগে সৌরাষ্ট্র অঞ্চলে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে, ইহা জানা যায়। সম্ভবতঃ এই রাজা অজবিন্দু যদুবংশীয় কোন একটি ধারাসম্ভূত হইবেন, যাহা পরবর্ত্তী কালে সৌরাষ্ট্র-সন্নিহিত সৌবীর প্রদেশে বিস্তৃত হইয়াছিল।

লঙ্কাধিপতি রাবণ ও কুরুরাজ দুর্য্যোধন, উভয়েই স্বকীয় দুর্ব্বুদ্ধিবলে সবংশে বিনষ্ট হইয়াছিলেন, একথা রামায়ণ ও মহাভারত পাঠকমাত্রই জানেন। যে-সমস্ত পণ্ডিত ব্যক্তি অভিধান ও ব্যাকরণের সাহায্যে এই সমস্ত ঐতিহাসিক নামের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বাহির করিয়া, ইহাদিগকে রূপক বা কাল্পনিক চরিত্র বলিয়া আখ্যা দিয়া সারগর্ভ প্রবন্ধ রচনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে, এমন কি তাহার পূর্ব্ব হইতেই, এই সমস্ত নামকে ঐতিহাসিক বলিয়াই বিবেচনা করা হইত, রূপক বা কাল্পনিক নহে।

মদগর্ব্বিত রাজা দম্ভোদ্ভব (নর-নারায়ণ হস্তে) বিনষ্ট হন বলিয়া কৌটিল্য লিখিয়াছেন। পুরাণাদিতে দম্ভোদ্ভব নামে কোন রাজার উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত-পুত্র হংস ও ডিম্বকের আখ্যান বর্ণিত আছে। এই ব্রহ্মদত্ত মথুরার শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের সমসাময়িক ছিলেন বলিয়া জানা যায়। হংস ও ডিম্বক মহাদেবের বরে অপরের অবধ্য হইয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। এই বর-দৃপ্ত ভ্রাতৃদ্বয় ক্রমে অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়া উঠেন, এবং ডিম্বক কোন এক সময় ভৃগুবংশীয় প্রখ্যাত ঋষি দুর্ব্বাসার কৌপীন ছিঁড়িয়া দিয়া তাঁহাকে লাঞ্ছিত করেন। এই ঘটনার কথা শ্রীকৃষ্ণকে জানান হইলে তিনি দুষ্টদ্বয়কে দমন করিবার সুযোগ খুঁজিতে থাকেন। কিছুকাল পরে রাজা ব্রহ্মদত্ত কোন এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে (সম্ভবতঃ রাজসূয়) এই গর্ব্বিত ভ্রাতৃদ্বয় মথুরার যাদবগণের নিকট কর চাহিয়া পাঠান। শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম পালিত যাদবগণ কর দিতে অস্বীকার করিলে উভয় পক্ষে যুদ্ধ বাধিয়া উঠে, এবং যুদ্ধে হংসধ্বজ শ্রীকৃষ্ণের পরাক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া যমুনার জলে ঝাঁপ দেন। হংস জল হইতে আর উঠিলেন না দেখিয়া কনিষ্ঠ ডিম্বকও মনের দুঃখে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া প্রাণত্যাগ করেন। এই ডিম্বকও দম্ভোদ্ভব এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হইলে দম্ভোদ্ভব কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের পুত্র ছিলেন। বৌদ্ধ জাতকগ্রন্থসমূহে কাশীরাজ এক ব্রহ্মদত্তের উল্লেখ বহু স্থানে পাওয়া যায়। পুরাণ ও জাতকসমূহে উল্লিখিত কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত এক ও অভিন্ন হইতে পারেন। হংস ও ডিম্বক এবং তাঁহাদের পিতা ব্রহ্মদত্ত মগধরাজ জরাসন্ধের অনুগত ছিলেন বলিয়া জানা যায়।

হৈহয়-রাজ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন ভৃগুবংশীয় ঋষি জমদগ্নিকে ক্রোধবশে হত্যা করিয়াছিলেন। এই নিদারুণ ঘটনার কথা শুনিয়া জমদগ্নি-পুত্র পরশুরাম জামদগ্ন্য হৈহয় রাজকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়া সবংশে নিধন করেন বলিয়া রামায়ণ (আদিকাণ্ড—৭৫ সর্গ) ও পুরাণে উল্লেখ আছে। পুরাণ-মতে যদুবংশীয় হৈহয় শাখার অন্তর্ভুক্ত রাজা কৃতবীর্য্যের পুত্র কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুন ভগবৎ-প্রতিম ঋষি দত্তাত্রেয়ের বরে ইচ্ছামাত্র (প্রয়োজন বোধে) সহস্রবাহু হইতে পারিতেন। মধ্যভারতের মাহিষ্মতীপুরী বা মহিষমাটি তাঁহার রাজধানী ছিল। নর্ম্মদার অনতিদূরে মহিষমাটি বা চুলী মহেশ্বরকে স্থানীয় লোকেরা এখনও "সহস্রবাহু কি বস্তি" বলিয়া থাকে। Col. Tod-এর মতে এই হৈহয় জাতির অবশিষ্টাংশ এখনও বাঘেলখণ্ড অঞ্চলের সোহাগপুর উপত্যকায় বাস করিতেছে। পূর্ব্ব ঐতিহ্যে গর্ব্বিত এই জাতি এখনও স্বীয় শৌর্য্য-বীর্য্যের জন্য ঐ অঞ্চলে সুপ্রসিদ্ধ (Tod's Rajasthan, Vol. 1, p. 39)। তালজঙ্ঘ ক্ষত্রিয়গণ কার্ত্তবীর্য্যের পৌত্র তালজঙ্ঘ হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল। পরশুরাম একুশবার ক্ষত্রিয়গণের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া পুরাণাদিতে কথিত হয়। সম্ভবতঃ কার্ত্তবীর্য্যের নিধনের পর তাঁহার বংশধরগণ (হৈহয় ও তালজঙ্ঘ প্রভৃতি) ও তাঁহাদের আত্মীয়বর্গ ও সমগোত্রীয় রাজন্যবর্গ প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য পরশুরামের সঙ্গে পুনঃপুনঃ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রতিবারই তাঁহারা পরশুরামের হস্তে পরাজিত ও পর্য্যুদস্ত হন।

সুতরাং দম্বোদ্ভব এবং কার্ত্তবীর্য্য এই দুই ক্ষেত্রেই প্রতিপক্ষ ছিলেন প্রকৃত প্রস্তাবে ভৃগুবংশীয়গণ। প্রথম ক্ষেত্রে দম্বোদ্ভব বা ডিম্ভক কর্তৃক ঋষি দুর্ব্বাসার লাঞ্ছনা, আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কার্ত্তবীর্য্য কর্তৃক ভৃগুবংশীয় ঋষি জমদগ্নির হত্যা।

অসুর-প্রধান বাতাপি ও তস্য ভ্রাতা ইল্বলের কাহিনী রামায়ণে ও অন্যত্র উল্লিখিত আছে। এই কাহিনী কৌটিল্যের যুগেও সুপ্রচলিত ছিল, দেখা যায়। রামায়ণের অরণ্যকাণ্ড—১১ সর্গে ইহা বিশদভাবে বর্ণিত আছে। ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি অগস্ত্য দণ্ডকারণ্যে মুনিঋষিগণের বাস সুগম করিবার জন্য তথায় বাস করিতেন। বাতাপি ও ইল্বলের একটি সিদ্ধাই ছিল। বাতাপি মেষ সাজিত ও ইল্বল ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়া বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় মুনি-ঋষিগণকে মিথ্যা শ্রাদ্ধের নামে নিমন্ত্রণ করিয়া বাড়ী লইয়া আসিত ও সেই মেষের মাংস রান্না করিয়া তাহাদিগকে ভোজন করাইত। আহার শেষে ইল্বল 'বাতাপি, বাতাপি' করিয়া চীৎকার করিত, আর বাতাপি মুনিঋষিগণের পেট চিরিয়া বাহির হইত। এই দুষ্টদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্য ঋষি অগস্ত্য একদিন ইল্বলের আতিথ্য স্বীকার করিয়া বাতাপিকে খাইয়া সঙ্গে সঙ্গেই জীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। এদিকে ভ্রাতা ইল্বল 'বাতাপি, বাতাপি' বলিয়া চীৎকার করিতেছে দেখিয়া অগস্ত্য হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বাতাপি যমালয়ে গমন করিয়াছে, আর কোনদিন বাহির হইবে না।" ইহাতে অতিমাত্র ক্ষুব্ধ হইয়া অগস্ত্যকে আক্রমণ করিলে ঋষি তৎক্ষণাৎ ইল্বলকে ভস্ম করিয়া ফেলেন। কৌটিল্যের বর্ণনায় এইটুকু ভুল হইয়াছে যে, নামটি বাতাপি না হইয়া ইল্বল হইবে। কারণ বাতাপিই মেষ সাজিত আর ভ্রাতা ইল্বল সাজিত বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ। সুতরাং ইল্বলই অগস্ত্যকে আক্রমণ করিয়াছিল। তবে যদি কৌটিল্যের সময় হইতে ইদানীং কালের মধ্যে নাম দুইটি উলট-পালট হইয়া থাকে, সে কথা স্বতন্ত্র।

বাল্মীকি রামায়ণের আদিকাণ্ড—২৫-২৯ সর্গ পাঠে মনে হয় যে, গয়ার বিষ্ণুপীঠে বা বিষ্ণুর সিদ্ধাশ্রমেই তপস্যা করিয়া অগস্ত্য সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। এবং এই স্থানেই পরে ঋষি বিশ্বামিত্র সিদ্ধ হইয়া ব্রহ্মর্ষি হইয়াছিলেন। এখানেই বিশ্বামিত্র সহায়ে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ তাড়কাবধ ও তৎপুত্র মারীচকে আহত করিয়া দূরীভূত-করতঃ আশ্রমটিকে নিষ্কণ্টক ও নিরাপদ্ করেন।

শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম প্রভৃতি যদুবংশীয় বৃষ্ণিশাখার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁহাদের বংশধর ও অনুগামীগণকেই (বৃষ্ণি-অন্ধক-ভোজ-কুকুর প্রভৃতি শাখাসমূহ) বৃষ্ণিসংঘ বলা হইয়াছে। মগধরাজ জরাসন্ধের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া তাঁহারা হতাবশিষ্ট যাদবগণের অনেককে সঙ্গে লইয়া মথুরা রাজ্য ছাড়িয়া সুদূর সৌরাষ্ট্রের অন্তর্গত দ্বারাবতী নগরে (আধুনিক জুনাগড় রাজ্য) গিয়া বাস করিতে থাকেন। কৃষ্ণ-বলরামের প্রতাপে দৃপ্ত যাদবগণ কালক্রমে অত্যন্ত দুর্বিনীত ও কদাচারী হইয়া উঠেন। তাঁহারা কাহারও কথা সহ্য করিতে পারিতেন না বা কাহাকেও গ্রাহ্য করিতেন না। এমন কি, সর্ব্বজনমান্য ঋষিগণও তাঁহাদের হাতে নিস্তার পাইতেন না। মহাভারতের মৌসলপর্ব্বে (২য় ও ৩য় অধ্যায়) ঋষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের স্থলে অন্য ঋষির নাম থাকিলেও ব্রহ্মশাপজনিত একটি ব্যাপার যে ঘটিয়াছিল তাহা বেশ বুঝা যায়। বৌদ্ধধর্ম্মপুস্তক ঘটজাতকের মতে বাসুদেববংশীয় যাদবগণ ঋষি কণ্হদীপায়নকে (পালি ভাষায় কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নাম কণ্হ দীপায়ন) অপমান করায় তদীয় অভিশাপে বিনষ্ট হইয়াছিলেন (Cowell's Edition Vol. iv. Buddhist Jatakas)। সুতরাং অর্থশাস্ত্র ও ঘটজাতক, এই দুই মতেই দেখা যায় যে যাদবগণ ঋষি দ্বৈপায়নের শাপেই ধ্বংস হইয়াছিলেন। অবশ্য মহাভারতের মতে এই ব্রহ্মশাপ ছাড়াও ৩৬ বৎসর পূর্ব্বে দেওয়া গান্ধারীর একটি অভিশাপও এই সঙ্গে যুক্ত হইয়াছিল। পুরাণাদিতে যদুবংশের ইতিহাস পাঠ করিলে এই সত্যটিই দেখা যায় যে, যদুগণ পূর্ব্বাপরই (অবশ্য কৃষ্ণ-বলরামাদি মুষ্টিমেয় কয়েকজন মহাপুরুষ ছাড়া) যুদ্ধবাজ, অবিনয়ী ও ব্রাহ্মণদ্বেষী। মধ্যভারতের হৈহয়-তালজঙ্ঘগণ, মথুরার কংস, রাজগৃহের জরাসন্ধ, ত্রিপুরী বা ত্রৈপুরীর দমঘোষতনয়, চেদিরাজ শিশুপাল প্রভৃতি সকলেই দুর্বিনীত ও অসদাচারী বলিয়া কীর্ত্তিত।

ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা অম্বরীষ ও নাভাগের নাম বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে বৈদিক সাহিত্যের বহুস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। আর বহু সমরবিজয়ী এবং বহু ক্ষত্রিয় রাজন্যের মন্ত্রগুরু ভৃগুবংশীয় জামদগ্ন্য পরশুরাম (ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা

ঋষি) জিতেন্দ্রিয় ছিলেন, একথা সর্ব্বজনবিদিত। পূরবর্ত্তী কালে পরশুরাম একজন অবতারের মধ্যে গণ্য হইয়াছেন।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের কয়েকজন রাজা ও রাজ-সচিব

৫।৫ অধ্যায়ে কৌটিল্য আকার-ইঙ্গিতজ্ঞ বিগত দিনের কয়েকজন বিচক্ষণ সচিব ও আচার্য্যের নামের উল্লেখ করিয়াছেন :

(ক) পৌণ্ড্ররাজ সোমদত্তের বিচক্ষণ মন্ত্রী কাত্যায়ন রাজরোষ অনুমান করিয়া রাজ্যত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন।

পৌণ্ড্র বলিতে সাধারণতঃ উত্তর বঙ্গকেই বুঝাইত। পুণ্ড্র, পৌণ্ড্র বা পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অনেক উল্লেখ মহাভারত, পুরাণাদি ও প্রাচীন গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়। পৌণ্ড্ররাজ্য কোন কোন সময় সমগ্র উত্তরবঙ্গ ও গঙ্গার পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক অংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পৌণ্ড্র রাজ্যের রাজধানীর নামও ছিল পৌণ্ড্রবর্দ্ধন। বগুড়া শহরের ৭ মাইল দূরবর্ত্তী মহাস্থানগড়কেই প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরীর স্থান বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন। উল্লিখিত রাজা সোমদত্ত ও তদীয় সচিব কাত্যায়ন অবশ্যই কৌটিল্যের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক ছিলেন। দুইটিই আর্য্য নাম, অনার্য্য নাম নহে, ইহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয় বলিয়া মনে করি। এই সোমদত্ত রাজা কে এবং কোন্ বংশীয় ছিলেন, তাহা জানা যায় না। কিন্তু তদীয় মন্ত্রী কাত্যায়ন সম্পর্কে চেষ্টা করা যাইতে পারে। বৈদিক সাহিত্যে এক ঋষি কাত্যায়নের নাম পাওয়া যায়। প্রশ্নোপনিষদে ঋষি পিপ্পলাদ-শিষ্য আর এক কবন্ধী (ঋষি কবন্ধের বংশধর) কাত্যায়নের নাম পাওয়া যায়। এই দুইটি নামই বাদ দেওয়া চলিতে পারে। তৃতীয় এক কাত্যায়ন হইলেন মগধের শেষ নন্দরাজ-মন্ত্রী, বার্ত্তিককার বেদজ্ঞ (বেদের সর্ব্বানুক্রমণী ও বাজসনেয়ী অনুক্রমণীর রচয়িতা) কাত্যায়ন। কিন্তু এই কাত্যায়ন কৌটিল্যের সমসাময়িক লোক, এবং তিনি মগধ-রাজ্যের সচিব পদ গ্রহণের পূর্ব্বে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন কি না, তাহা জানা যায় না। বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে আর এক কাত্যায়নের নাম পাওয়া যায়, যিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত পরিব্রাজক আচার্য্য। সম্ভবতঃ পৃষ্ঠদেশে কিংবা ঘাড়ে কুঁজ বা আঁব ছিল বলিয়া তাঁহাকে ককুদ কাত্যায়ন নামে আখ্যাত করা হইয়াছে। এই ককুদ কাত্যায়ন বুদ্ধ ও মহাবীরের সমসাময়িক লোক ছিলেন, এবং সম্ভবতঃ বয়সের দিক্ দিয়া কিছু বড়ও ছিলেন। সুতরাং তিনি নিঃসন্দেহে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৭ম শতাব্দীর লোক ছিলেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ দীঘনিকায়ের ব্রহ্মজাল সূত্রে এই ককুদ কাত্যায়ন (পালি ভাষায় পকুদ কচ্চায়ন) প্রচারিত মতবাদের উল্লেখ আছে। জৈন ধর্ম্মশাস্ত্রের টীকাকার সিলাঙ্কের মতে ককুদ কাত্যায়নের মতের সঙ্গে গীতা, সাংখ্য ও শৈব মতবাদের মিল ছিল, (Historical Gleanings, Dr B. C. Law, pp. 33-34)। এই প্রখ্যাত পরিব্রাজকাচার্য্য কাত্যায়ন ও পুণ্ড্ররাজ সোমদত্তের রাজ্য-ত্যাগ ও প্রব্রজ্যাগ্রহণকারী মন্ত্রী কাত্যায়ন এক ও অভিন্ন হইলে, রাজা সোমদত্ত নিঃসন্দেহে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৭ম শতাব্দীর শেষ পাদে কিংবা তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তীকালে পুণ্ড দেশে রাজত্ব করিতেন।

(খ) কোশলরাজ পরন্তপের অর্থশাস্ত্রবিৎ মন্ত্রী ভরদ্বাজ-গোত্রীয় কণিঙ্ক রাজরোষ অনুমান করিয়া রাজ্য পরিত্যাগ-করতঃ স্বীয় প্রাণরক্ষা করেন।

এখানে অর্থশাস্ত্রবিদ্ বলিয়া কৌটিল্য কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত কণিঙ্ক ভারদ্বাজের (ভরদ্বাজ গোত্রীয়) নামটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে করা যায়। পূর্ব্বাচার্য্য হিসাবে কৌটিল্য তদীয় গ্রন্থে যেসব আচার্য্যের মতামতের উল্লেখ ও সমালোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে আচার্য্য ভারদ্বাজ অন্যতম। এই আচার্য্য ভারদ্বাজ আচার্য্য দ্রোণ না হইয়া কণিঙ্ক হইলে সম্ভবতঃ ব্যাখ্যাটি সুসঙ্গত হয়। কারণ আচার্য্য দ্রোণ কোন ধর্ম্মশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন বলিয়া এ যাবৎ জানা যায় নাই। অথচ এস্থলে আমরা স্বয়ং কৌটিল্য কর্ত্তৃক অর্থশাস্ত্রবিদ্ বলিয়া (উল্লিখিত) এক আচার্য্য ভারদ্বাজের সন্ধান পাইতেছি। সুতরাং বিষয়টি নিঃসন্দেহে প্রণিধানযোগ্য।

কোশল রাজবংশের যে ধারাবাহিক নাম পুরাণে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে পরন্তপের নাম পাওয়া যায় না। সুতরাং তিনি সূর্য্যবংশীয়ও হইতে পারেন, আবার না-ও হইতে পারেন। এই সূর্য্যবংশীয় ধারা বুদ্ধ ও মহাবীরের সমসাময়িক রাজা প্রসেনজিৎ-এর পর চতুর্থ পুরুষে সুমিত্র পর্য্যন্ত আসিয়া শেষ হইয়াছে।

(গ) মগধ দেশের কোন অল্পবয়স্ক রাজার মন্ত্রী চারায়ণ-

গোত্রীয় আচার্য্য দীর্ঘ তদীয় রাজার অনাদর অবগত হইয়া রাজ্য ত্যাগ করেন।

এখানে রাজার নাম লিখিত না হইলেও রাজমন্ত্রীর নামটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থে ও বাৎস্যায়নের "কামসূত্রে" এই দীর্ঘ চারায়ণের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ মগধরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চারায়ণ প্রতিদ্বন্দ্বী-রাষ্ট্র কোশলে যাইয়া রাজা প্রসেনজিতের আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং তথায় সচিবের পদ লাভ করেন। এই চারায়ণ অত্যন্ত কূট-কৌশলী এবং প্রভাবশালী ব্যক্তি বলিয়া কোশলে পরিগণিত ছিলেন। ডাঃ লাহার মতে "He was as much a king-maker as perhaps Kautilya himself", p. 15.

মগধের এই অল্পবয়স্ক রাজাটি খুব সম্ভবতঃ অজাতশত্রু, যিনি পিতা বিম্বিসারকে বন্দী করিয়া স্বয়ং রাজ্য দখল করিয়াছিলেন।

(ঘ) অবন্তীরাজ অংশুমানের সচিব ঘোটমুখ রাজার বিরক্তি অনুমান করিয়া রাজ্য ত্যাগ করেন।

এই সচিব ঘোটমুখও গৌতমবুদ্ধের সমসাময়িক লোক ছিলেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র মজ্‌ঝিম নিকায়ে ঘোটমুখ সুক্তে, এবং বাৎস্যায়ন রচিত কামসূত্রে ঘোটমুখের উল্লেখ আছে। সচিব ঘোটমুখের বৈষয়িক জ্ঞান খুব প্রখর হইলেও নীতি-জ্ঞান খুব উঁচুদরের ছিল বলিয়া জানা যায় না। তিনি বলিতেন যে, পরিব্রাজকেরা কখনও ধার্ম্মিক হয় না—"নাস্তি ধার্ম্মিকঃ পরিব্রাজকঃ।" ইহা তাহার অবিশ্বাসী মনেরই পরিচায়ক।

ইতিহাসে অবন্তী ও উজ্জয়িনী অভেদ বলিয়া জানা যায়। সুতরাং এই অবন্তীরাজ অংশুমান সম্ভবতঃ রাজা প্রদ্যোতের পিতা ছিলেন।

(ঙ) বঙ্গাধিপতি শতানন্দের অন্যতম সচিব কিঞ্জল্কও প্রাণনাশের কারণ অনুমান করিয়া রাজ্য ছাড়িয়া স্বীয় প্রাণ রক্ষা করেন।

এই বঙ্গাধিপ শতানন্দ ও তদীয় বুদ্ধিমান্ সচিব কিঞ্জল্কের কোন হদিশ পাওয়া গিয়াছে বলিয়া জানি না। তৎকালে বঙ্গ বলিতে সম্ভবতঃ আধুনিক পশ্চিমবঙ্গকেই (প্রাচীন রাঢ় দেশ) বুঝাইত। পুরাণাদিতে অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গ দেশের নাম যুক্তভাবে বহুস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। অঙ্গ বলিতে বিহারের মুঙ্গের ও ভাগলপুর জেলাদ্বয়, এবং কলিঙ্গ বলিতে উড়িষ্যা দেশকেই বুঝাইত। সুতরাং বঙ্গ বলিতে রাঢ় দেশ বা পশ্চিমবঙ্গকে মনে করিলে এই যুক্ত উল্লেখের তাৎপর্য্য বুঝা যায়। শতানন্দ ও কিঞ্জল্ক, এই দুইটিই আর্য্য নাম। সুতরাং মনে করিতে হয় যে, কৌটিল্যের বহু পূর্ব্ব হইতেই বঙ্গদেশে আর্য্য শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। যে-সমস্ত পণ্ডিত এক প্রকার বিনা বিচারে, বাংলা দেশ অনার্য্য-অধ্যুষিত ও অনার্য্যশাসিত দেশ ছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন, তাঁহারা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও অন্যান্য গ্রন্থগুলি একটু ভাল করিয়া পড়িয়া দেখিবেন। আচার্য্য বৌধায়ন বিদ্বেষবশে কবে কোন্ মন্তব্য করিয়া গিয়াছেন, তাহাই শেষ কথা নহে। বৌধায়নের ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষেরও পূর্ব্ব হইতে বঙ্গ, পুণ্ড্র ও তৎসংলগ্ন মিথিলা, অঙ্গ ও মগধ দেশে আর্য্য-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদিতে দেখা যায়। উত্তরবঙ্গ সংলগ্ন মিথিলায় রামায়ণী যুগের পূর্ব্ব হইতেই অর্থাৎ প্রাচীন বৈদিক যুগ হইতেই আর্য্যবংশ (জনক-বংশ) প্রতিষ্ঠিত। অঙ্গরাজ (রামপাদ রাজা দশরথের মিত্র ছিলেন। তদীয় জামাতা অথর্ব্ব বেদপারগ ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গ (রামায়ণ—আদিকাণ্ড—১৫ সর্গ) ও তদীয় পিতা কাশ্যপ-বংশীয় ঋষি বিভাণ্ডক (আদিকাণ্ড—৯ম সর্গ) নিশ্চয়ই অনার্য্য ছিলেন না। মগধের রাজগৃহে প্রতিষ্ঠিত যদুবংশীয় ঋষি বৃহদ্রথও (জরাসন্ধের পিতা) ও অনার্য্য ছিলেন না। আর মহাভারতের উল্লিখিত পৌণ্ড্র রাজ বাসুদেবও অনার্য্যবংশীয় ছিলেন না। এই পৌণ্ড্র বাসুদেব কৃষ্ণবাসুদেবের প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিস্পর্দ্ধী ছিলেন বলিয়া জানা যায়। আর সর্ব্বোপরি, ঋগ্বেদের ত্রিবিক্রম বিষ্ণু নিশ্চয়ই অনার্য্য-অধ্যুষিত দেশ গয়ায় আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া তথায় তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন, যেখানে পরে ঋগ্বেদীয় দুই শ্রেষ্ঠ ঋষি অগস্ত্য ও বিশ্বামিত্র তপস্যাদ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৭ম শতাব্দীতেও এই স্থানমাহাত্ম্যেই আকৃষ্ট হইয়া সম্ভবতঃ দুই প্রখ্যাত ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহাবীর 'জিন ও গৌতমবুদ্ধ এই গয়া ও তৎসংলগ্ন স্থানেই কৈবল্য ও নির্ব্বাণমুক্তির সন্ধান লাভ করিয়াছিলেন, বৌধায়নের দেশে নহে। বেদের শেষ নিরুক্তকার আচার্য্য যাস্ক (আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৭ম কি ৮ম শতাব্দীর লোক) তদীয় বিখ্যাত নিরুক্ত গ্রন্থে ঋগ্বেদের

প্রসিদ্ধ মন্ত্র "ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নি দধে পদম্— ১।২২।১৬"-এর ব্যাখ্যায় দুই পূর্ব্বাচার্য্য প্রসিদ্ধ ঔর্ণবাভ ও শাকপূণির মতের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেনঃ "ত্রেধা ভাবায় পৃথিব্যামন্তরিক্ষে দিবীতি শাকপূণিঃ। সমারোহণে গয়শিরসীত্যৌর্ণবাভঃ।" অর্থাৎ শাকপূণির মতে ত্রি-বিক্রমবিষ্ণু (তদীয় তিন পদ দ্বারা) পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও আকাশ, এই তিনলোক অধিকার করিয়াছিলেন। আর ঔর্ণবাভের মতে সমারোহণকালে ভগবান্ বিষ্ণু বিষ্ণুপদ বা গয়াপাহাড়ের শীর্ষে এক পদক্ষেপ করিয়াছিলেন। এই শাকপূণি ও ঔর্ণবাভ যাস্কের পূর্ব্ববর্ত্তী দুই প্রখ্যাত বেদ-ভাষ্যকার। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে পূর্ব্বদেশ কীকট (বা গয়া) সত্য সত্যই অপবিত্র স্থান বলিয়া খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৭ম বা ৮ম শতাব্দীতেও গণ্য হইত না।

(চ) উজ্জয়িনীরাজ প্রদ্যোতের পুত্রের অধ্যাপক আচার্য্য পিশুন তদীয় শিষ্যের বাক্যে কোন গূঢ় ইঙ্গিতের সন্ধান পাইয়া রাজ্য ছাড়িয়া পলায়ন করেন।

(ছ) কুকুরের অস্বাভাবিক ডাক শুনিয়া আচার্য্য পিশুনের অল্পবয়স্ক পুত্রও প্রদ্যোতের রাজ্য পরিত্যাগ করেন।

(চ) ও (ছ)—উজ্জয়িনীরাজ প্রদ্যোৎ ও পরীক্ষিৎ-বংশীয় বৎসরাজ উদয়ন পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। উভয়েই খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে রাজত্ব করিতেন, এবং গৌতম বুদ্ধ, বর্দ্ধমান মহাবীর ও কোশলরাজ প্রসেনজিতের সমসাময়িক ছিলেন বলিয়া জানা যায়। স্বপ্নবাসবদত্তা নাটকে উদয়ন কর্ত্তৃক কৌশলে প্রদ্যোত-কন্যা বাসবদত্তাকে লইয়া পলায়ন ও বিবাহের কাহিনী বর্ণিত আছে।

কৌটিল্যবর্ণিত এই সমস্ত আখ্যান হইতে এই ধারণাই জন্মায় যে বিচক্ষণ কৌটিল্য তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বহু রাজদরবারেরই খবরাখবর রাখিতেন এবং এজন্য নিজেও সর্ব্বদাই সাবধানে স্বীয় রাজাকে লক্ষ্য করিতেন, যাহাতে কোন আকস্মিক বিপদ্ নিজের উপর না আসিতে পারে।

দ্যূতক্রীড়া ও তাহার কুফল

৮।৩ অধ্যায়ে দ্যূতক্রীড়ার দোষ বর্ণনাব্যপদেশে কৌটিল্য অতীত কালের দুইটি প্রধান ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, দ্যূত বা জুয়াতে বিচক্ষণ খেলোয়াড়েরই জয় হইয়া থাকে, যেমন হইয়াছিল বিদর্ভ-রাজ নলের বিরুদ্ধে জয়ৎ সেনের, এবং যুধিষ্ঠিরের বিরুদ্ধে দুর্য্যোধনের। বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয় যে, কৌটিল্যের মতে উভয় ক্ষেত্রেই বিচক্ষণতা জয়লাভের সহায়ক হইয়াছিল, কপটতা বা ভণ্ডামি নয়। এই দুইটি ঘটনার কথা মহাভারতে এবং পুরাণে বিশদ ভাবে বর্ণিত আছে। বিশেষতঃ, দ্বিতীয় ঘটনাটিকে উপলক্ষ্য করিয়া পরিণামে যে জ্ঞাতি-বিধ্বংসী ভীষণ সংগ্রামের অবতারণা হইয়াছিল, তাহাই মহাভারতের মূল উপজীব্য। তৎকালীন এবং ভবিষ্যৎ রাজন্যবর্গকে দ্যূতক্রীড়া সম্পর্কে সম্যক্‌ভাবে সাবধান করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে যে ভাবে কৌটিল্য এই ঘটনা দুইটির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে এই সিদ্ধান্তটিই অপরিহার্য্য হইয়া উঠে যে, কৌটিল্যের যুগে ত বটেই, বস্তুতঃ তাহার বহুপূর্ব্ব-কাল হইতেই এগুলি ঐতিহাসিক মর্য্যাদালাভ করিয়াছিল। সুতরাং ঘটনাগুলি হয়ত সত্যসত্যই ঘটিয়াছিল, পরবর্ত্তী যুগের বানানো বা রচিত নয়। ৯।৭ অধ্যায়ে কৌটিল্য বিদর্ভরাজ সুগাত্র বা নলের এবং বৎসরাজ উদয়নের পুনরায় স্বরাজ্য প্রাপ্তির কথা ঐতিহাসিক ঘটনা হিসাবেই বর্ণনা করিয়াছেন।

দুর্গ নির্ম্মাণ ও বৈদিক দেবদেবী

অর্থশাস্ত্রের ২।৪ অধ্যায়ে কৌটিল্য বলেন যে, দুর্গ-সন্নিহিত-নগরের মধ্যে অপরাজিতা (দেবী দুর্গার এক নাম), অপ্রতিহত (সম্ভবতঃ বিষ্ণু দেবতা), ও জয়ন্ত ও বৈজয়ন্তের (দেবরাজ ইন্দ্রের পুত্রদ্বয়) কোষ্ঠক বা অন্তর্গৃহ থাকিবে; এবং শিব, বৈশ্রবণ (কুবের-ধনাধিপতি), অশ্বিনীকুমারদ্বয়, শ্রী (লক্ষ্মী) ও মদিরা দেবতার (সম্ভবতঃ দুর্গার নাম বিশেষ) গৃহ থাকিবে। পূর্ব্বোক্ত প্রকোষ্ঠ ও আলয়সমূহে তৎ তৎ দেশে স্বীকৃত ও পূজিত বাস্তু দেবতাসমূহও স্থাপন করিতে হইবে। নগরের চারদিকে চারটি সিংহদ্বার থাকিবে। উত্তর দিকে ব্রাহ্মদ্বার (প্রজাপতি ব্রহ্মার নামে উৎসর্গিত), পূর্ব্বদিকে ইন্দ্রদ্বার, দক্ষিণ দিকে যাম্যদ্বার (মৃত্যুর অধিপতি বৈবস্বত যমের নামে), এবং পশ্চিমদিকে সৈনাপত্যদ্বার (দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের নামে) থাকিবে। এই তালিকা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, তৎকালে বহু বৈদিক দেবদেবীর পূজা প্রচলিত ছিল, যাহাদিগকে এই

বিংশ শতাব্দীতেও হিন্দুগণ ভুলিয়া যায় নাই। এতদ্ব্যতীত জলাধিপতি বরুণ দেবতা ও নাগদেবতার পূজার ব্যবস্থাও বলবৎ ছিল। (অর্থশাস্ত্র ৪।১৩, ১৩।১ ও ১৩।২ অধ্যায়)। দেবী দুর্গা দুর্গরক্ষিণী দেবী হিসাবে কৌটিল্যের পূর্ব্ব হইতেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, ইহাও বিশেষ লক্ষ্যণীয়। বৌদ্ধ সাহিত্য ললিত-বিস্তর (খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৫ম শতাব্দীতে রচিত) পাঠে জানা যায় যে, তৎকালে হিন্দু সমাজে ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রুদ্র, বিষ্ণু, দেবী (দুর্গাদেবী), কুমার (কার্ত্তিকেয়), কাত্যায়নী (দেবীর আর এক নাম), চন্দ্র, আদিত্য, বৈশ্রবণ (কুবের), বরুণ প্রভৃতি দেবতার পূজা সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল—১৭ অধ্যায়।

মূর্ত্তি, প্রতিমা, পট ইত্যাদি

কৌটিল্যের যুগে অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিমার সাহায্যে দেবদেবীর উপাসনা করা হইত। পরবর্ত্তীকালের মত কৌটিল্যের যুগেও স্থায়ী বা প্রতিষ্ঠিত দেবদেবীর মন্দিরাদি ছিল। প্রতিমা মূল্যবান্ ধাতু নির্ম্মিত হইলে আবার একালের মত তৎকালে ঐ প্রতিমা চুরি হইত। ৪।১০ অধ্যায়ে কৌটিল্য দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত পশু-চোরের এবং প্রতিমা-চোরের জন্য উত্তম সাহস নামক দণ্ড, অথবা শুদ্ধ বধের (অক্লেশ মারণ) ব্যবস্থা করিয়াছেন। ৪।১৩ অধ্যায়ে স্ত্রীদেবতার প্রতিমায় গমনকারী নরপশুদের জন্য ২৪ পণ দণ্ড বিধানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় যে, একালের মত তৎকালেও দেবদেবীর প্রতিমা সজ্জিত ও অলঙ্কৃত করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা ছিল। ৫।৩ অধ্যায়ে কৌটিল্য রাজকীয় শৈল-খনক বা প্রস্তর-শিল্পীর জন্য বাৎসরিক ৫০০ হইতে ১,০০০ পণ্যমুদ্রা বেতনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সুতরাং প্রস্তর-শিল্পীরা সে-যুগে যে বিশেষ সম্মানের অধিকারী ছিলেন তাহা বলাই বাহুল্য। তাঁহারা বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্ত্তি ত গড়িতেনই, অন্যান্য মূর্ত্তিও নিশ্চয়ই তৈয়ার করিতেন। ১১।১ অধ্যায়ে কৌটিল্য অদিতি স্ত্রী নামে একশ্রেণীর স্ত্রীলোকের উল্লেখ করিয়াছেন। বিভিন্ন দেবদেবীর ছবি বা পট প্রদর্শন করিয়াই তাহার জীবিকা অর্জ্জন করিত। একালের পটুয়াগণের মধ্যেও স্ত্রীলোকের সংখ্যা কম নহে। সুতরাং স্বীকার করিতে হয় যে, তৎকালে ছবি, বা আলেখ্য নির্ম্মাণকার্য্য বেশ ভাল ভাবেই রপ্ত ছিল।

৫।২ অধ্যায়ে কৌটিল্য বলিতেছেন যে, রাজার দেবতাধ্যক্ষ দুর্গ ও রাষ্ট্র-মধ্যস্থ দেবতাগণের ধন (অর্থাৎ প্রণামী ও দক্ষিণা-বাবদ প্রাপ্ত ধন) একত্রিত করিয়া রাজাকে দিবেন। আয় বৃদ্ধির জন্য কৌশলী দেবতাধ্যক্ষ রাজ্যের কোনও প্রসিদ্ধ পুণ্যস্থানে রাত্রিকালে গোপনে কোনও দেবতার বেদী বা মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া লোকমধ্যে প্রচার করিয়া দিবেন যে, দেবতা সেখানে ভূমি ভেদ-পূর্ব্বক নিজেই প্রকট হইয়াছেন। ইহাতে সরল-বিশ্বাসী নরনারীরা সহজেই আকৃষ্ট হইয়া পুণ্যলোভে প্রচুর প্রণামী দিবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ধর্ম্ম লইয়া ব্যবসা ও জুয়াচুরি বর্ত্তমানের ন্যায় তৎকালেও বেশ ফলাও ভাবেই বর্ত্তমান ছিল এবং এই ব্যবসায়ে কোন কোন অর্থলিপ্সু রাজা তদীয় অনুগত জুয়াচোর ধর্ম্মাধ্যক্ষের সাহায্য লইতেও দ্বিধা করিতেন না।

কিছুকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিদেশীয় ও দেশীয় একশ্রেণীর পণ্ডিত ব্যক্তি এই বলিয়া নাচানাচি করিতেন যে, গ্রীক আক্রমণের পূর্ব্বে এদেশে মূর্ত্তি তৈয়ার পদ্ধতি একপ্রকার অজ্ঞাত ছিল। হারাপ্পা ও মহেঞ্জোদারো হইতে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২৫০০।৩০০০ বৎসরের পুরাতন ভারতীয় প্রস্তর শিল্পের নমুনা আবিষ্কৃত হওয়ায় এই দাপাদাপি বন্ধ হইয়াছে।

ইতিহাস ও পুরাণ

বৈদিক সাহিত্যে ইতিহাস ও পুরাণের বহু উল্লেখ আছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে হয়ত সেগুলি পৃথক্ পৃথক্ গ্রন্থ হিসাবেই রচিত ও প্রচারিত হইত। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে এই ইতিহাস ও পুরাণ এক হইয়া গিয়াছে। ফলে আমরা যে-সমস্ত পুরাণ পাইতেছি, তাহা এই মিশ্রজিনিষ। আদিতে পুরাণসমূহে পুরাতনী কথা বা সৃষ্টিতত্ত্ব ও নদী-পর্ব্বত দেশ-বিভাগ ইত্যাদির বর্ণনাসমূহ থাকিত; আর ইতিহাসে থাকিত বড় বড় ঘটনার বর্ণনা, বিভিন্ন দেবতা, ঋষি ও রাজবংশসমূহের ধারাবাহিক উল্লেখ। অর্থশাস্ত্রের ৫।৩ অধ্যায়ে পুরাণ-প্রবক্তা ও সূত প্রভৃতির জন্য বাৎসরিক ১,০০০ পণ্যমুদ্রা বেতনের ব্যবস্থার কথা বলা হইয়াছে। ৫।৬ অধ্যায়ে কৌটিল্য বলিতেছেন যে, অমাত্য স্বয়ং অর্থ-শাস্ত্রবিদ্ হইয়া রাজাকে ইতিহাস ও পুরাণ কথা দ্বারা অর্থশাস্ত্র বুঝাইবেন। সেই যুগে ইতিহাস ও পুরাণ প্রচলিত ও প্রচারিত না থাকিলে পুরাতনী কথা বা ইতিহাসের কথা

কোথা হইতে আসিত ? আর কাহার জন্যই বা এই বেতনের ব্যবস্থা ?

ধর্ম্ম-সম্প্রদায়

কৌটিল্যের যুগে দেশের অধিকাংশ লোকই বৈদিক ধর্ম্মমার্গ অনুসরণ করিয়া চলিত। অবৈদিক কয়েকটি সম্প্রদায় সমাজে বিদ্যমান থাকিলেও বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম প্রবল ভাবেই বিদ্যমান ছিল। পূর্ব্বের এক অধ্যায়ে যে সমস্ত বৈদিক দেবদেবীর উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদের ছাড়াও গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী প্রভৃতি নদীপূজা, এবং কাত্যায়নী, ভবানী, ঈশানী প্রভৃতি ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্ যুগের দেবীপূজা তৎকালে প্রচলিত ছিল। হিন্দুধর্ম্মের অভ্যন্তরে শৈব বা পাশুপত, ভাগবত (বাসুদেবীয়), বিষ্ণুভক্ত প্রভৃতি প্রধান কয়েকটি ধারা পূর্ব্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। আর সেই সঙ্গে চলিতেছিল দেবী উপাসনা বা শক্তি উপাসনা। এই শক্তি-উপাসকগণের কোন কোন ধারা হয়ত বিশুদ্ধ বৈদিক অথবা বিশুদ্ধ তান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াই চলিতেন, আবার কোন কোনটি হয়ত শ্মশান ক্ষেত্রে বা জঙ্গলে মদ্য-মাংসাদি সহকারে নানা ক্রিয়া-কলাপের অনুশীলনও করিতেন। ফলিত বিস্তর—১৭ অধ্যায় ও অর্থশাস্ত্রের বহু স্থানে এই শেষোক্ত শ্রেণীর উল্লেখ নানা ভাবে করা হইয়াছে। অর্থশাস্ত্রের ১।১৬, ১।১৮, ১।১৯, ২।৪, ২।৩৬ প্রভৃতি বহু অধ্যায়ে পাষণ্ড নামে এক শ্রেণীর লোকের উল্লেখ দেখা যায়। কেহ কেহ বলেন যে, শৈব বা শাক্ত ব্যভিচারী কাপালিকগণই এই পাষণ্ড পর্য্যায়ভুক্ত হইবেন। ২।৪ অধ্যায়ে কৌটিল্য পাষণ্ড ও চণ্ডালগণের জন্য শ্মশান-ক্ষেত্রের নিকটেই বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কোন কোন স্থলে আবার বৌদ্ধ প্রভৃতি সম্প্রদায়কেও প্রকারান্তরে পাষণ্ড বলা হইয়াছে মনে হয়। বৌদ্ধ সাহিত্যে অজিত কেশ-কম্বলী নামে এক উগ্র বেদ ও বৈদিক ধর্ম্ম-বিরোধী নাস্তিক আচার্য্যের সন্ধান পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ এই আচার্য্যের শিষ্য সম্প্রদায় কৌটিল্যের যুগেও বর্ত্তমান ছিলেন। ইহাদিগকেও অর্থশাস্ত্রে পাষণ্ড সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করিলে অন্যায় হইবে না। শ্মশানচারী তান্ত্রিকগণের সকলেই যে পাষণ্ড বলিয়া নিন্দনীয় ছিলেন, তাহা মনে হয় না। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সিদ্ধ পুরুষ বলিয়াও প্রচারিত হইতেন এবং রাষ্ট্রের প্রয়োজনে তাঁহাদের সাহায্যও লওয়া হইত। ৫।২ অধ্যায়ে দেখা যায় যে, গুপ্তধন প্রাপ্তি, রাজাকে বশীকরণ, ঈপ্সিত স্ত্রীলোক বশ, আয়ু বৃদ্ধি, পুত্র প্রাপ্তি প্রভৃতি নানা কাজে ইঁহাদের শরণ লওয়া হইত। এই বিংশ শতাব্দীতেও এই বিশ্বাস সমাজের এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে বদ্ধমূল আছে দেখা যায়। সুতরাং কৌটিল্য হইতে আরম্ভ করিয়া এই কিঞ্চিদধিক সওয়া দুই হাজার বৎসরেও সাধারণ মানুষের মন ও প্রবৃত্তি বিশেষ বদলায় নাই বলিতে হইবে। ৪।৪ অধ্যায়ে সংবননকারী (বশীকরণকারী) কৃত্যাশীল (ভূত-প্রেত-পিশাচাদির আবেশনকারী) ও অভিচারশীল বলিয়া বর্ণিত তিন প্রকার লোকের উল্লেখ আছে। হীন তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের মধ্যে এই তিন প্রকার গুরুর সাক্ষাৎ এখনও মিলিয়া থাকে। অবশ্য ঋগ্বেদের ১।১৯১, ১০।১৬৬, ১০।১৪৪, ১০।১০০, ১।১৫৮ প্রভৃতি সূক্তে এবং অথর্ব্ববেদের বহু স্থলে অভিচার ক্রিয়ার উল্লেখ আছে। কিন্তু বৈদিকে কোন ক্রিয়াকলাপ বা যজ্ঞ কার্য্যই শ্মশানে বা চৈত্য স্থানে করণীয় নহে। সুতরাং শ্মশানে বা চৈত্য স্থানে করণীয় সংবনন, কৃত্যা, বা অভিচার ক্রিয়া বৈদিক নহে, তান্ত্রিক পদ্ধতি-সম্মত। তৎকালে দেশে মধ্যে মধ্যে রাক্ষস ভয়ের কারণ ঘটিত বলিয়া মনে হয়। নরমাংস-ভক্ষণকারী আদিবাসী ও পিশাচের সাক্ষাৎ এখনও মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। ৪।৩ অধ্যায়ে দেখা যায় যে, কোন স্থানে রাক্ষস ভয় উপস্থিত হইলে অথর্ব্ববেদবিৎ আভিচারিক অথবা মায়া-যোগে অভিজ্ঞ কোন মান্ত্রিকের দ্বারা রাক্ষস-নাশন বা রক্ষভয় দূরীকরণ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হইত।

অনেকেরই এই ভুল ধারণা আছে যে, নাগদেবতার পূজা অনার্য্যগণের নিকট হইতেই আর্য্য সমাজে আসিয়াছে। নাগ আর্য্য-অনার্য্য সকলের পক্ষেই সমান ভয়প্রদ। সুতরাং নাগ-ভয়ে ভীত হইয়া আর্য্যগণ নাগদেবতার পূজা করিলে তাহা অনার্য্য-বৃত্তি হইয়া যায় না। ফলতঃ আর্য্য ও অনার্য্য উপাসনার মধ্যে কোন দাড়ি বাঁধিয়া দেওয়া আছে বা কোন-কালে ছিল বলিয়া মনে করা বিচার-বুদ্ধির পরিচায়ক বলিয়া মনে হয় না। ঋগ্বেদের সর্পরাজ্ঞী একজন প্রখ্যাত ঋষি বা ঋষিকা (১০।১৮৯ সূক্ত)। আচার্য্য শৌনক তদীয় বৃহদ্দেবতা গ্রন্থে এবং কাত্যায়ন তদীয় সর্ব্বানুক্রমণীতে একবাক্যে বলিয়াছেন যে, এই সূক্তে ঋষি ও দেবতা এক হইয়া গিয়া-ছিলেন। সুতরাং সর্পরাজ্ঞী দেবতা। ঋগ্বেদের এই

সর্পরাজ্ঞীই কি সর্পরাণী দেবী মনসা হইয়া পূজা গ্রহণ করিতেছেন ? অর্থশাস্ত্রের ৪।৩ অধ্যায়ে আছে যে, কোন স্থানে সর্প-ভয় দেখা দিলে রাজা বিষ-বৈদ্যের দ্বারা মন্ত্র ও ঔষধ প্রয়োগের ব্যবস্থা করিয়া বিষের প্রতিকার করাইবেন, অথবা লোক লাগাইয়া সাপ মারিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করিবেন। অথবা অথর্ব্ববেদে অভিজ্ঞ অভিচার-কর্ম্মপটু পণ্ডিতের দ্বারা সর্পবধের ব্যবস্থা করিবেন এবং বিশেষ বিশেষ পর্ব্বে নাগপূজা করাইবেন। সুতরাং নাগপূজা বা নাগ-দেবতার পূজা দেখিলেই তাহাকে অনার্য্য আচরণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা সমীচীন হইবে না।

তৎকালে অবৈদিক সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে জৈন, বৌদ্ধ এবং আজীবিকগণই সম্ভবতঃ সংখ্যায় অধিক ছিল। এই সমস্ত সম্প্রদায় উত্তর ও পূর্ব্ব ভারতের কোন কোন বিশেষ বিশেষ স্থানেই তৎকালে সীমাবদ্ধ ছিল বলিয়া মনে হয়। কৌটিল্য ৩।২০ অধ্যায়ে লিখিয়াছেন যে, যে-সকল ব্যক্তি শাক্য (বৌদ্ধ), আজীবিক, বৃষল (শূদ্র) ও প্রব্রজিতদিগকে দেবকার্য্যে ও পিতৃকার্য্যে (শ্রাদ্ধাদিকার্য্যে) ভোজন করাইবে, তাহাদের প্রত্যেকের ১০০ পণ দণ্ডবিহিত হইবে। এখানে জৈনগণের অনুল্লেখ বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। ইহারা সকলেই বেদবিরোধী ও নিরীশ্বরবাদী। জৈনগণের অনুল্লেখের কারণ সম্ভবতঃ এই যে, জৈনগণ বেদ না মানিলেও দেবতা পূজায় বিশ্বাসী ছিলেন। পক্ষান্তরে বৌদ্ধ ও আজীবিকগণ দেবতায় অবিশ্বাস না করিলেও দেবতা পূজায় উৎসাহী ছিলেন না। কৌটিল্যের প্রায় দুই শতাব্দী পরে মহাযানী বৌদ্ধগণ বুদ্ধ-পূজার সঙ্গে দেবতার পূজারও প্রবর্ত্তন করেন। জৈন ও বৌদ্ধগণ হিন্দুধর্ম্ম হইতে উদ্ভূত হইলেও জৈনগণ পূর্ব্বের ন্যায় এখনও নিজেদের হিন্দু বলিয়াই পরিচয় দিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে বৌদ্ধ সম্প্রদায় নিজেদের বৌদ্ধ বলিয়াই পরিচিত করেন, হিন্দু বলিয়া নহে। ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম কালক্রমে লোপ পাইবার ইহাও অন্যতম প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয়। জৈন সম্প্রদায় পূর্ব্বের ন্যায় এখনও ক্রিয়াকর্ম্মে ব্রাহ্মণের সাহায্য লইয়া থাকেন। এই তিন প্রধান সম্প্রদায় ব্যতীত তৎকালে দেশের স্থানে স্থানে আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় ছিল বলিয়া মনে হয়। পরে ইহাদের নাম করা হইবে

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য

রায়বাড়ী

শ্রীগিরিবালা দেবী

শিশির-সিক্ত স্নিগ্ধ সুমিষ্ট হেমন্তের ভোর। কোমল রৌদ্র এখনও তরুশিরে পাকা ধানের ক্ষেতে নদীর জলে আবীর রং-এর তুলি বুলাইয়া দেয় নাই। সবে আকাশের পূর্ব্বভাগে তরুণ-অরুণরাগে সূর্য্যদেব উদয় হইতেছে।

হীরাসাগরের ধূসর ধোঁয়া ধোঁয়া বক্ষে নৌকা ভাসিতেছে।

বিনুর দাদামহাশয় রসময় ওরফে রাঙ্গাঠাকুরের বাড়ী হরিরামপুরে। বিবাহের পর প্রসাদ বিনুর দাদামহাশয়ের গৃহে যাওয়া হয় নাই। তাই তিনি স্বয়ং লইয়া যাইতেছেন তাহাদিগকে। সঙ্গে চলিয়াছেন বিনুর মা। রাত্রে প্রসাদ ও বিনু মা'র কাছে আসিয়াছিল। ভোরে রওনা হইয়াছে। বিনুদের বাড়ী একেবারে খালি হইয়া গিয়াছে। পূজার সময় দেশ-দেশান্তর হইতে যেমন পাখীর ঝাঁক উড়িয়া আসিয়াছিলেন; তেমনি ফিরিয়া গিয়াছেন যে যাঁহার কর্ম্ম-ক্ষেত্রে। শুধু যান নাই ন-কর্ত্তা ও বড়মা। আর রাধারাণীর ছেলে নন্দলাল, বিনুর নিজের কাকা রতীশ। স্কুল খুলিলে তাহারাও চলিয়া যাইবে।

হরিরামপুর বিনুর জন্মভূমি। সেই টানেই বোধ হয় সেই সু-প্রাচীন তপোবন-সদৃশ বিশাল পল্লীগ্রামখানাকে বিনু খুবই ভালবাসিত। অত ভাল তাহার কোথাও লাগে না। হরিরামপুর বিনুর কাছে—

"ধনে ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা
স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।
অমন দেশটি কোথায় খুঁজে পাবে নাকো তুমি—
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।"

সেই দেশে যাইতেছে, বিনুর কি আনন্দ, কত উল্লাস।

বরাবর নদীপথে যাইতে হয় হরিরামপুরে। ভোরে রওনা না হইলে অনেক রাত্রি হইয়া যায় পৌঁছিতে। সেই কারণেও রাঙ্গাঠাকুর সকন্যা নৌকায় রান্না-খাওয়া করিতে অতিশয় ভালবাসেন, তাই ভোরে নৌকা ছাড়িবার ব্যবস্থা। নৌকার রন্ধন-ভোজন ভারী আনন্দদায়ক। পেটকাটা ছই ঘেরা প্রকাণ্ড নৌকা। রান্নার সমস্ত সরঞ্জাম সুসজ্জিত। ছইয়ের খোলা জায়গায় মাটির তোলা উনুনে কাঠে রান্না হয়। হাঁড়ি কড়া খুন্তি হাতা শিল নোড়া বঁটি কিছুরই অভাব হয় না। নদীর জল তুলিয়া রান্না খেপনা জালের সদ্য-ধরা মাছ। মাঝিদের রীতিমতন একটা সংসার পাতা থাকে নৌকার ভিতরে। তারা নৌকা বাহিয়া কত দেশে যায় দূর-দূরান্তরে। কত গ্রাম বন্দর, মেলা মহোৎসব চোখে পড়ে। রান্নার পাত্রগুলি মাঝিরা নদীর খরসান বালি দিয়া মাজিয়া-ঘষিয়া ঝকঝকে করিয়া রাখে। এক রান্না ভিন্ন কখন কোন কাজে সে পাত্র তাহারা ব্যবহার করে না। তাহাদের নৌকা আরোহণ করিবেন কত ব্রাহ্মণ সাধু বৈষ্ণব নিষ্ঠাবতী বিধবা। জ্ঞানতঃ তাহারা অনাচার করিতে পারে না। তাহারা যে গঙ্গাপুত্র, মকর-বাহিনী মায়ের আশ্রিত প্রতিপাল্য।

রাঙ্গাঠাকুরের অনুগৃহীত অনুগত ভজন মাঝিই আসিয়াছিল তাহার রূপার চোখওয়ালা লম্বা গড়নের নৌকা লইয়া। সঙ্গে ছেলে গজানন ও ভাইপো কার্ত্তিক।

বিনুর মনে পড়িল কয়েক বছর পূর্ব্বে এই ভজন মাঝির নৌকাতেই দাদামহাশয় দিদিমা মা আর ও পাড়াপ্রতিবেশী-দের সহিত গিয়াছিল রাণীভবানী-প্রতিষ্ঠিত জাগ্রত দেবী-ভবানী মন্দিরে তাহার ছোট ভাইটি কেদারের মানস পূজা দিতে। জলপথে যাতায়াতে তাহাদের চৌদ্দ-পনের দিন লাগিয়াছিল। যাহাকে কেন্দ্র করিয়া যাওয়া হইয়াছিল সে যেন কবে কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। সময় সময় স্মৃতিতে জাগে একটি কচি সুকোমল মুখ। বায়ুস্তরে যেন কদাচিৎ ভাসিয়া আসে হারানো সুরের ক্ষীণ রেশ "দিদি, দিদি।"

সেই ভজন মাঝি এখনও আছে। মাথার কাল চুল সাদা হইয়াছে। বলিষ্ঠ সুঠাম দেহ হেলিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আজও সে নৌকার হাল ছাড়িতে পারে নাই। ছেলেরা আগা নৌকায় বৈঠা বায়, ভজন পিছু নৌকায় বসিয়া থাকে হাল ধরিয়া। হালের টানে সে কতবার পদ্মা, যমুনা, মেঘনা, দুর্জ্জয় নদী পাড়ি দিয়া আসিয়াছে। ঝড়ের বেগ রোধ করিয়া তীর-ভূমিতে নৌকা ভিড়াইয়াছে। "পবন-মাঝির নাও, বাতাসে চলে যাও।"

ভজনের অনুমতি পাইয়া হীরাসাগরের গভীর বক্ষে আলোড়ন তুলিয়া নৌকা ছুটিয়া যাইতেছে।

ক্রমে প্রভাতের রৌদ্র তীরে তীরে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। ভুবন চিল গাঙ-শালিকরা খাদ্যের সন্ধানে উড়িল জলে ছায়া ফেলিয়া। মাছ-ধরার জেলে নৌকার ফাঁকে

ফাঁকে দেখা দিতে লাগিল চাষাদের ধান কাটার ডিঙ্গি। পাকা ধানের সোঁদা সোঁদা গন্ধে পুলকিত হইয়া কৃষকদের কণ্ঠ খুলিয়া গেল আনন্দের আবেগে. "ও ডালিম, তুই যাস নে বাপের বাড়ী, দোলের মেলায় দিমু তোরে আসমান-তারা শাড়ী।"

নৌকার গলুইয়ের কাছে সতরঞ্চি ও চাদর পাতিয়া বসিবার জায়গা করা হইয়াছিল। প্রসাদকে লইয়া রান্না-ঠাকুর সেইখানে গল্প জমাইয়া তুলিয়াছিলেন। প্রসাদ তাঁহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া ভাবিতেছিল, "কি রূপ? এমন দেবোপম মূর্ত্তি সচরাচর চোখে পড়ে না। এই অপরূপ রূপের জন্যই কি ইনি ঘরে-বাইরে রাঙ্গাঠাকুর আখ্যা পাইয়াছেন?" তাহাদের বিবাহের সময় বিনুর দিদিমা গঙ্গামণিকে যে দেখিয়াছিল, তিনিও রূপের ঘরে রূপের বাসা বাঁধিয়াছিলেন। রূপের সাগর মন্থন-করা রূপসী হেমাঙ্গিনী দেবী। তাহার পরে আলোর পশ্চাতে অন্ধকার।

নৌকার পেছনে হালের পাশে কাঠের বেড়ার গায়ে এক ক্ষুদ্র গবাক্ষ, সেইখানে বিনুদের বিছানা পাতা হইয়াছিল।

বিনু সেইখানে আশ্রয় লইয়া একবার সামনে একবার পশ্চাতে তাকাইয়া পান করিতেছিল জল-স্থলের অপূর্ব্ব মাধুরী। অনন্ত অসীম সৌন্দর্য্যরাশি। দুই চোখে দেখিয়া হৃদয়ের পিপাসার নিবৃত্তি হয় না। যে দৃশ্যটুকু সরিয়া যায় আড়াল হয়, তাহাকেও মনের পটভূমিকায় আঁকিয়া রাখিতে সাধ হয়।

সঙ্গে নূতন জামাতা যাইতেছে, হেমাঙ্গিনী ক্ষীরের ছানার জলখাবার করিয়া আনিয়াছিলেন। ঝুড়ির ভিতর হইতে রেকাবি গেলাস বাহির করিয়া তিনি খাবার সাজাইলেন জামাই-মেয়ের জন্য। রাঙ্গাঠাকুর স্নানাহ্নিক না করিয়া জলগ্রহণ করিবেন না। তাঁহার কন্যারও সেই ব্যবস্থা। যদিও কন্যার বয়স এখনও ত্রিশ পার হয় নাই, কিন্তু নিয়ম-নিষ্ঠায় তিনি পাকা গৃহিণীর পর্য্যায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। নৌকায় মাটির গামলায় মাঝিদের তামাক খাইবার আগুন জ্বালাইয়া রাখা হয়। সেই আগুনে হেমাঙ্গিনী একটা পিতলের গেলাসে মুখে বাটি চাপা দিয়া জামাইয়ের জন্যে চায়ের জল বসাইয়াছিলেন।

চা প্রস্তুত করিয়া খাদ্যপূর্ণ রেকাব প্রসাদের সামনে ধরিয়া দিলেন। প্রসাদ চায়ের আবির্ভাবে প্রসন্ন হইয়া কহিল, "চা হয়েছে দেখছি, আগুন পেলেন কোথায়? খাবার আমাকে অর্দ্ধেক করে দিন মা, সকালবেলা এত খেতে পারব না।"

মা আধ-ঘোমটায় মুখ ঢেকে ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন, "বেশী কিছু দেই নি, ওটুকু খাও। নৌকায় রান্না খেতে দেরি হবে। এদের সব রকম ব্যবস্থাই থাকে। আলের আগুনে এক পেয়ালা জল গরম করে নিয়েছি।"

বিনুর স্বভাবের এখনও পরিবর্ত্তন হয় নাই। খাবার লইয়া মা'র সঙ্গে বাদানুবাদ "সাত-সকালে এত মানুষ খেতে পারে না কি? আমার ক্ষিধে পায় নি, পেলে পরে খাব। নৌকার দুলুনিতে আমার গা গোলায়। সামনের অজগর নদী আগে পার হতে দাও, তার পরে খেতে দিও।"

মা মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিলেন। বিনু পৃথিবীর আলোকে প্রথম নয়ন উন্মীলিত করিয়া তাহার জন্মভূমি হরিরামপুরের ক্ষীণা স্রোতস্বতী মুক্তাঝারা নদীটিকে দর্শন করিয়াছিল। তাহার পরে তাহার জীবন-সঙ্গিনী হইয়াছিল তরঙ্গময়ী হীরাসাগর। কিন্তু সে প্রীতি ডুবের পর ডুব দেওয়া সাঁতার কাটা ঝাঁপ খেলা। নৌকায় ভ্রমণ বিনু ভালবাসে না। বিশেষ করিয়া দুর্জ্জয় নদী ভেড়াখোলার। এখনও সমুদ্রের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হয় নাই। তাহার বিশ্বাস ওই গভীর অশান্ত নদীটি সমুদ্রের সমতুল্য, সেই জন্য তাহার নাম দিয়াছে অজগর।

হেমাঙ্গিনীরও নদীভীতি বিলক্ষণ। এই নদীমাতৃকার দেশে নদীপথ ভিন্ন তাঁহার পিত্রালয়ে যাইবার দ্বিতীয় পথ নাই। তাই আতঙ্ক আশঙ্কা তাঁহাকে মনের মধ্যে চাপিয়া রাখিতে হয়। হেমাঙ্গিনী মেয়েকে খাওয়াইতে কৌশল জানেন। খাবারের টুকরা ভাঙ্গিয়া বিনুর মুখে দিতে দিতে প্রশ্ন করেন, "আজ তোর কি মাছ খেতে ইচ্ছে করছে বিনু? আমরা ত মাছের রাজ্য দিয়েই যাচ্ছি। জেলেরা ইলিশ মাছ ধরে বোঝাই করছে নৌকা। ওদের জালে ছোট মাছ পড়ে না। খরার জালে ছোট মাছ ধরা হচ্ছে।"

বিনু খাইতে খাইতে বলে, "এখুনি মাছ কেন মা? হীরাসাগরের মাছ যে চিরকাল খাচ্ছি। তোমাদের অজগর নদীর মাছ কেমন? তাই কিনে নিও।"

জামাই-মেয়েকে জলযোগ করাইয়া মা বড় একটা পিতলের গামলায় থলে হইতে মোটা রাঙ্গা রাঙ্গা আউস ধানের চিড়া ঢালেন এক গামলা, আধসেরটাক গুড়। দুই ছড়া পাকা বিচে কলা তাঁহাদের বাগানের। ছিপের হাল-ধারীকে ক্ষুদ্র বাতায়ন হইতে হেমাঙ্গিনী ডাকেন."ভজন দাদা, তোমরা এবার জল খেয়ে যাও।"

ভজন মাঝি হালে একটা মোচড় দিয়া বলিল, "আরও খানিকটা আগাই দিছি, বড় গাঙে পড়ার আগে খাইয়া নিব।"

আগা নৌকা হইতে কার্ত্তিক কহিল, "কাকা, তামুক খাইবে নাকি? সাজি?"

"না ব্যাটা, মোহনগঞ্জের বাঁকে যাইয়া খাওন-দাওন হইবে। দাঁড়ে জোরে টান মাইর‍্যা আগাইয়া যা।"

মোহনগঞ্জের আঘাটায় নৌকা বাঁধা হইল পিটালি গাছের গুঁড়িতে। মেঘমুক্ত হেমন্তের স্নিগ্ধ রৌদ্রে চারিদিক ঝল্‌মল্ করিতেছে। বর্ষার সলিল রাশি ক্রমে নামিয়া যাইতেছে, নদীগর্ভে উচ্চ তটরেখা জাগিয়া উঠিতেছে। এপারে কাশের শুভ্র ফুলে সাজিয়া রহিয়াছে তটিনীর তট। পরপারে দেখা যাইতেছে ধু ধু বালির চরা। চরার গা ঘেঁষিয়া সোনার রং-এর পাকা ধানের ক্ষেত। হরিদ্রা বর্ণের সরিষা ক্ষেতের গালিচা পাতা। তাহার পরে অস্পষ্ট মসীরেখা গ্রাম, মিশিয়া রহিয়াছে আনত আকাশে। ঘাটে কৃষকবধূরা আসিয়াছে মাটির বৃহৎ কলসী কাঁখে জল লইতে। কোথাও বা তক্তা পাতিয়া ক্ষারে সিদ্ধ-করা কাপড় কাচিতেছে কৃষক-রমণী। এখন তাহাদের নিকটে জলের সমারোহ ফুরাইয়া আসিয়াছে। খাল খন্দে ঘোলা জল আবদ্ধ হইয়া থাকিলেও সে জল নদীর চলতি জলের মতন পরিষ্কার নাই।

বালির চরায় দূর হইতে বিচরণ করিতে আসিয়াছে বন্য হাঁসের ঝাঁক। কত রং-এর বৈচিত্র্য তাহাদের পাথায়, কতগুলি শুভ্র মল্লিকা ফুলের মত, কতকগুলি হরিৎ বর্ণের, নীল ও পাটকেলি রং-এর। নানা রং-এর ফুলের স্তবক কে যেন স্তূপ করিয়া রাখিয়াছে বালির চরায়। বন্য হংসের কল-কূজনে মুখর হইয়া উঠিয়াছে সলিলসিক্ত হেমন্তের উতলা বাতাস।

নৌকার গলুইয়ের দিকে রৌদ্রে ভরিয়া গিয়াছে। রাঙ্গা-ঠাকুর প্রসাদকে লইয়া ভিতরের দিকে আসিয়া বসিয়াছেন।

হাঁসের ঝাঁকের দিকে অনিমেষে তাকাইয়া প্রসাদ আক্ষেপ করিতে লাগিল সঙ্গে বন্দুক না আনার জন্য।

শুনিয়া বিনুর হৃদয়ে ব্যথা বাজিল, এই শান্তিপূর্ণ শিশির-মণ্ডিত প্রভাত রূপরসে গন্ধে স্পর্শে সমুজ্জ্বল দিবসারম্ভ, ইহার পরিবেশে মানব প্রকৃতির আদিম বন্য বর্ব্বরতা জাগরিত হয় কিরূপে? মানুষ শিক্ষায় সংস্কৃতিতে সভ্যতায় উন্নত হইলেও তাহার রক্তে মিশিয়া থাকে সেই অতীত যুগের উন্মাদ উদ্দীপনা।

দুই ছড়া বিচিকলা সংযোগে এক গামলা চিড়া-গুড়ের সদ্‌ব্যবহার করিয়া তিন বাপ ব্যাটা ভাইপো মিলিয়া তামাকের সেবা করিয়া লইল ছিলিমের পর ছিলিম।

নৌকায় সাদা কাপড়ের তালি-মারা পাল তুলিয়া দেওয়া হইল। অনুকূল পবনে পালের নৌকা ছুটিতে লাগিল তর্ তর্ করিয়া। হাড়গিলা নদী পার হইয়া বড় গাঙ। বড় গাঙ কুমীরের রাজধানী। বর্ষায় রাজারা হীরাসাগরে সফর করিতে যান। কুমীরের কবলে কত লোক প্রাণ হারায়। হাহাকারে পূর্ণ হইয়া যায় হীরাসাগরের তটভূমি। বর্ষা অবসানে জলের টান ধরিলে কুমীররা ফের ফিরিয়া আসে স্বস্থানে। বড় গাঙের পরপারে গভীর শরবন। আর এক পাড়ে শুভ্র বালিচর কুমীরদের রৌদ্র উপভোগের স্থান। জলের আবর্ত্তময় পুঞ্জীভূত ফেনার মধ্যে এক এক খণ্ড কচুরী-পানা নীল ফুলের ডালা লইয়া আটকা পড়িয়া রহিয়াছে। মরা পশু-পক্ষীর গলিত শব খড়কুটা সবেগে ভাসিয়া চলিয়াছে খরস্রোতে। হেমন্তকালের নদী আস্তে আস্তে কৃশ দুর্ব্বলতার দিকে অগ্রসর হইলেও এখনও দুর্ব্বার তরঙ্গ, "মরা হাতী লাখ টাকা।"

বড় গাঙ ছাড়াইয়া বেড়ার বন্দর বামে রাখিয়া পালের নৌকা সবেগে ধাবিত হইতেছে। তীরে কত জনপদ কানন কান্তার, শ্যামলপল্লী গ্রামের সীমা মিলাইয়া মিলাইয়া আবার ভাসিতে থাকে আঁখির আগে।

বিনুর অজগর নদী ভেড়াখোলা। আপনার মহিমায় আপনি মহিমান্বিত। এ নদী কুল কুল গানে কাহাকেও ঘুম পাড়ায় না। হাসে পৈশাচিক হাসি খল্ খল্ শব্দে। জল ডাকে কল কল কল কল। সুউচ্চ ঢেউগুলি ধাইয়া আসে ফেনপুঞ্জ মাথায় লইয়া। নৌকার পেটকাটা অংশে আসিয়া রাঙ্গাঠাকুর দাঁড়াইলেন প্রসাদকে লইয়া। মাঝিরা সজাগ, একজন পালের দড়ি চাপিয়া ধরিল। আর একজন নৌকার ডগরা হইতে জল ছেঁচিতে লাগিল। হালে বসিয়া ভজন মাঝি।

নৌকা পাড়ি ধরিয়াছে। ঢেউয়ের পরে ঢেউ আসিয়া নৌকার গায়ে আছাড় থাইয়া পাটাতন জলে জলময় করিয়া তুলিয়াছে। নৌকা যেন একখানা ছোট মোচার খোলা। কখন দুলিতেছে কাত হইয়া গভীর অশান্ত জলের তলে আশ্রয় খুঁজিতেছে।

বিনু ভয়ে মাকে জড়াইয়া ধরিয়া চোখ বুজিয়া আছে। মা'র অবস্থাও শোচনীয়। হঠাৎ নৌকা কাত হইল, কল কল শব্দে জল আসিয়া ঢুকিল ডগরায়। বিনু অস্ফুট স্বরে কাঁদিতে লাগিল।

ভজন মাঝি পেছন হইতে হাসিল হি হি করিয়া, "বিনু মা, তরাস পাইচো কেনে? দিদির নাগাল তুমিও তরাসে হইচো। দিদিরে লয়ে আসন-যাওনের কালে ওই ভেড়া-কোলার গাঙে কত কাঁদন দেখিচি। ম্যায়ে হইতে মায়ের নাগাল তরাসে। এ তোমাগরে হ্যাংলা-প্যাংলা নেড়ে চাঁড়াল হাল ধরে বইসে নাই। এ হইল গঙ্গামার সন্তান ভজন মাঝি। মা হালে আইস্যা বইসে রইচে পার করে লিতে এই আইলাম বলি, ওই যে, ডাঙ্গা দেখন যাইচে।"

বিনু চোখ খুলিল, সত্যই পাড়ি হইয়া গিয়াছে, তীরভূমি অনতিদূরে।

নৌকা বাঁধা হইল এক স্নানের ঘাটে বুড়া বটের ছায়ায়। হাল ছাড়িয়া ভজন নামিয়া বটতলায় বসিল। গজানন থেলো হুঁকার মাথায় কলিকায় তামাক সাজিয়া বাপের হাতে দিল।

কার্ত্তিক মাটির তোলা উনুন বাহির করিয়া কাঠ ধরাইতে লাগিল। এক হালি ইলিশ মাছ আরও দুই-তিন রকমের মাছ কিনিয়া ডগরার ভিতরে রাখা হইয়াছিল। মাছ বাহির করা হইল কোটার জন্য।

প্রসাদ রাঙ্গাঠাকুরকে কহিল, "আমি একটু ঘুরে আসি গাঁয়ের ভেতর থেকে। বসে বসে পা ধরে গেছে।"

রাঙ্গাঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখন চান করে নেবে না?"

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, "রান্নার ত দেরি আছে, তুমি একটু কিছু খেয়ে নিয়ে যাও গাঁ দেখতে?"

"না, সকালবেলা যা খাইয়েছেন তাই হজম হয় নি। এখন আর খেতে পারব না। আপনার রান্না হতে না হতেই আমি ফিরে এসে স্নান করে নেব। রাঙ্গাদাদু, আপনারা এইবার স্নান সেরে পূজো করে নিয়ে জল খান। আমরা ত একবার পেটপুরে খেয়ে নিয়েছি। আপনাদেরই এতখানি বেলা অবধি কিছু খাওয়া হয় নি।" বলিতে বলিতে প্রসাদ গেঞ্জির উপরে পাঞ্জাবী চাপাইয়া জুতা পায়ে দিয়া নামিয়া গেল তীরে।

গজানন বঁটি বাহির করিয়া মাছ কুটিতে বসিল।

হেমাঙ্গিনী মাথার আধ ঘোমটা সরাইয়া পিতার পানে চোখ তুলিয়া কহিলেন, "এক কাঁড়ি মাছ কিনেছেন বাবা, মা'র জন্যে খালি খানেক ইলিশ মাছ কিনে কুটে বেশি করে নুন মেখে নিয়ে গেলে ভাল হ'ত। মা বড্ড ইলিশ মাছ ভালবাসেন। আমাদের এক বেলার চারটে মাছ বেশি হবে না?"

রাঙ্গাঠাকুর কহিলেন, "এক হালি মানে ত চারটে, বেশি কোথায়? মাঝিদের দিলে তারাই ত দুটো করে খেতে পারে। তোমার মা'র জন্যে আর মাছ নিতে চাইনে। আমাদের মুক্তাঝারা নদীতে এসময় কত মাছ ধরা পড়ে। তোমরা যাচ্ছ, তোমার মা তোমাদের জন্যে কত হাঁলির যোগাড় করেছেন। গেলেই দেখতে পাবে। আমি বলি কি, আর ডাল-তরকারি রান্নার দিকে যেও না। চার রকমের মাছ, ঝোল ঝাল ভাজা অম্বল করে নাও। তোমাদের গয়লা বৌ সুনীতি না একহাঁড়ি খাসা দই নৌকায় তুলে দিয়ে গিয়েছিল। তুমি ভাত বসিয়ে দিয়ে স্নান করে নাও মা। নৌকোর পেছনে আড়াল আছে। তোমাদের অসুবিধা হবে না।"

"তাই যাচ্ছি বাবা, আপনি তেল মাখুন, আপনার জপতপ করতে দেরি হয়। বেলা হয়েছে, বিনু চুল খোল্, আমি ভাতের ডেকচি উনুনে চাপিয়ে চল্ চট্ করে নৌকোর পেছন থেকে দুটো ডুব দিয়ে আসি। হাঁ, বাবা, আমি ভাবছি সঙ্গে নতুন জামাই, ডাল-তরকারি না রাঁধলে তার ত অসুবিধা হবে না খেতে?"

রাঙ্গাঠাকুর উত্তর দিবার আগেই বিনু মাথার কাপড় ফেলিয়া দিয়া মুখ খুলিল, "দেখো মা, বৈরাগী বোস্টমের আখড়া থেকে কেউ আসে নি যে তার জন্যে নিরামিষ ঘাঁটি রাঁধতে বসবে। আগে মাছ রান্না শেষ ক'রে তোমার রাক্ষুসে মাঝিদের খেতে দাও। বাবাঃ মানুষের খাওয়া নয় ত. কুম্ভকর্ণের আহার। এক গামলা চিঁড়ে, দুইছড়া কলা, মাগো মা।"

মা মৃদু ভর্ৎসনার সুরে কহিলেন, "খাওয়া নিয়ে মানুষকে খোঁটা দিতে নেই বিনু। জলের হাওয়ায় মানুষের ক্ষিদে পায় বেশি, তার ওপরে এত মেহনত। ওরা খাবে না ত খাবে কে। চল্ তেল মেখে চান সেরে নেই?"

বিনু ঠোঁট ফুলায়, "না, আমি তোমাদের এ অজগর নদীতে নাইতে পারব না! জলের ঝাপটায় আমার জামা-কাপড় ভিজে গেছে। বসে বসে আমার পা ঝিম ঝিম করছে, আমি একটুখানি নামতে চাই ডাঙ্গায়।"

"ডাঙ্গায় নামবি কি রে? প্রসাদ ফিরে এসে দেখলে ভাববে কি? নাইতে ইচ্ছে না হ'লে কাপড়-জামা বদ্‌লে নে। ভিজে কাপড়ে থাকলে সর্দ্দি লাগবে।"

রাঙ্গাঠাকুর তেল মাখতে মাখতে সস্নেহে বলিলেন, "কাপড় বদ্‌লে নৌকোর সামনে এসে দাঁড়া সোনা, পায়ের ঝিম ঝিম সেরে যাবে।"

বিনু জানিত, ভালরূপেই জানিত তাহার দাদামহাশয়ের মতন তাহাকে এ জগতে আর কেহ ভালবাসিতে পারে না, প্রশ্রয় দিতে পারে না। সে যে দাদামহাশয়ের 'সোনা'। তাই সুযোগ সে হারাইল না। রাঙ্গাঠাকুরের চোখে চোখ মেলিয়া সে আবদারের স্বরে কহিল, "না হাঁটলে আমার পায়ের ঝিম ঝিম যাবে না দাদু। আপনি নাইতে যাচ্ছেন, আমি আপনার সাথে নেমে একবার হেঁটে আসি? বেশি দূর যাব না, ওই ঝোপটার পাশে। ভজন মামা যে ওই-খানে বসে রয়েছে। গায়ে রোদ-বাতাস লাগলেই কাপড় শুকিয়ে যাবে। ছাড়তে হবে না।"

রাঙ্গাঠাকুর হাসিয়া ডাকিলেন, "আয় সোনা, আমি জলে নামছি, তুই একটু হেঁটে আসবি।"

বিনুর আর তর সইল না সে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া একলাফে তীরে নামিয়া গেল। এতক্ষণে কাটিয়া গেল তাহার হৃদয়ের অভিমানের মেঘভার। প্রসাদ যে গ্রাম-পরিভ্রমণে বাহির হইয়াছে তাহাকে না লইয়া এই আক্রোশে সে ফুলিতেছিল, মাকে মেজাজ দেখাইতেছিল।

এ ত প্রসাদের রায়বাড়ী নয়, এখানে রায়বাঘিনীরা বিরাজ করিতেছে না। বৃদ্ধ দাদামশায় ও মা চেনা-জানার বাহিরে পথে-ঘাটে বিনুকে সাথে লইলে প্রসাদের কোথাও বাধিত না। বিনু কি লজ্জাবতী লতা? অত লাজ-লজ্জার ধার সে ধারে না। আর যিনি ফুলবাবু সাজিয়া বেড়াইতে গেলেন, তাঁর লজ্জা-সঙ্কোচের পরিচয় বিনু অনেক পাইয়াছে। উনি যাহা পারেন বিনু যেন তাহা পারে না? কিন্তু তখনই বিনু ভুলিয়া গেল প্রসাদের অপ্রিয় ব্যবহার।

কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ তরল ধারায় যেন ঝরিয়া পড়িতেছে দিকে দিকে। প্রখর রৌদ্র-পরশে তটের বালুকা-কণা জলিতেছে হীরকচুর্ণের মতন। সুদূর হইতে ভাসিয়া আসিতেছে "বৌ কথাকও বৌ কথাকও" পাখীর আকুল বিলাপ। গাঙ শালিক বাজ পাখী চক্রাকারে ঘুরিতেছে জলে ছায়া বিস্তার করিয়া। তাহাদেরই ফাঁকে ফাঁকে আর্ত্তনাদ করিতেছে "ফটিক জল, ফটিক জল" চাতকের দল।

পরপার অস্পষ্ট, একটা কাল রং-এর রেখা কে যেন টানিয়া দিয়াছে বরাবর। নদীর উত্তাল ঢেউ সগর্জ্জনে ছুটিয়া আসিয়া সজোরে আঘাত করিতেছে তীরভূমিতে।

বিনু সভয়ে শিহরিত হইল, এই ভয়াল-ভীষণ নদী পার হইয়া তাহারা আসিয়াছে এ পারে? ভাগ্যে সে স্নান করিতে নামে নাই ইহারই গভীর জলে। কিন্তু এপারের চাষাদের ছেলেমেয়েরা কোমরে লাল ঘুনসির সঙ্গে এক-ফালি ছেঁড়া মলিন ন্যাকরা আঁটিয়া দিব্যি জলখেলায় মাতিয়াছে। ডুব দিতেছে সাঁতার কাটিতেছে সমবেত কণ্ঠে ছড়া বলিতেছে মেঠোসুরে।

"সোনামণি দারকিনীর বিয়া, গুয়া নাও মীয়া—
রুইমাছ উঠ্যা কয় 'আমারে না মাইরো গোঁসাই আমারে না ধইরো,
আমি যামু এ বিল দিয়া সে বিল দিয়া গাঙ বরাবর জোলা দিয়া।
অবন মাছের পবনসুর, পাঁচ কুটুবের বিটি
কি গলায় রসের কাটি—
চাঁদা, যাবি না লো?"

বিনু ক্ষণকাল বালক-বালিকাদের সলিল-লীলা উপভোগ করিয়া হাসিতে হাসিতে অগ্রসর হইল ঝোপের দিকে।

পাশাপাশি দুইটি ঝাঁকড়া গাবগাছের সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া নদীর একটা ক্ষীণ ধারা আবদ্ধ হইয়া আছে একটা খালে। ছোট খালটি বেড়িয়া সভা বসিয়াছে বকের। সাদা সাদা বকগুলি জলাভূমিটুকু আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। বর্ষাপুষ্ট লতায় গাবগাছের পাতা দেখা যায় না। খালি ফুলে ফুলে ফুলময়। কিন্তু ওদিকে পাখীর এত কলরব কেন? খর্ব্বাকৃতি খেজুর গাছ বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে একটা লক-লকে তেলাকুচা লতা। তাহারই গায়ে পাকা লাল টুকটুকে পাকা তেলাকুচা ঝুলিতেছে অসংখ্য। সেই লোভে পাখীদের এত সমারোহ।

বিনু সন্তর্পণে সরিয়া আসিল সেদিক্ হইতে, আহা, পাখীদের লোভনীয় খাদ্যে সে বিঘ্ন হইবে না। স্থানটি যেমন নির্জ্জন তেমনি ভেজা-ভেজা। রবিকর স্পর্শ করিতে পারে না বনতল, মেটে মেটে কেমন যেন গন্ধ বাহির হইতেছে। কালকাসুন্দে সোনালী ফুলে ভরিয়া গিয়াছে জলার অপর পাশ। এই সোনালী ফুলের শাকভাজা খুব মুখরোচক। বিনু একবার ভাবিল, আঁচল ভরিয়া ফুল তুলিয়া লইয়া যায় মা'র কাছে। কিন্তু মা'র যে কষ্ট হইবে, অত মাছ রান্নার মধ্যে আবার শাক ভাজা। বিনু গাছ হইতে ফুল তুলিতে বড় ব্যথা অনুভব করে। যাহাদের শোভা সৌন্দর্য্য ক্ষণিকের, এই ফোটা, এই ঝরা, তারা যতটুকু সময় তরু-শাখা আলো করিয়া সজীব থাকিতে পারে থাকুক।

এখন পাতা ঝরিবার সময় নহে, তবু ঘন অরণ্যে কেমন যেন একটা সর সর শব্দ হইল। সে আগাইয়া গেল সেই দিকে, একটা প্রকাণ্ড গোসাপ ঠিক ছোটখাট কুমীরের আকৃতি, থাবা পাড়িয়া বসিয়া একটা ব্যাঙ দুই হাতে ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইতেছে। ব্যাঙটা মরিয়া গিয়াছে, তাহা না হইলে এতক্ষণ ট্যাঁ ট্যাঁ শব্দে নিস্তব্ধ বনভূমি সচকিত হইত। গোসাপ হিংস্র নহে, খুব শান্ত, নিরীহ জীব।

গোসাপের অনতিদূরে কয়েকটা দুপুরেচণ্ডী ফুল ফুটিয়াছে। ঘন লাল ফুলে পাতা চোখে পড়ে না। এ ফুল দ্বিপ্রহরে ফুটিয়া সন্ধ্যায় ঝরিয়া যায়। কতটুকু সময় এ ফুলের জীবন?

বিনু ফুলের গাছের দিকে অগ্রসর হইয়া সস্নেহে ফুলের গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। সহসা একটা বন-বিড়াল বিনুর পায়ের উপর দিয়া দৌড়িয়া পলায়ন করিল। বিনুর মনে পড়িল ঠাকুমার কথা, "এই বিড়াল বনে গেলেই বনবিড়াল হয়।" সত্যই, কি বলিষ্ঠ কত বড় বিড়াল, পালিত বিড়ালরা এত বড় হয় না।

বসতিবিরল কানন তাহাকে কেমন যেন মুগ্ধ অভিভূত করিয়া ফেলিল। ইহার গাও হইতে তাহার বাহির হইতে ইচ্ছা করিতেছিল না। কিন্তু বাহির হইতে হইল গজাননের

আহ্বানে। গজানন তাহাকে খুঁজিতে আসিয়াছে। ডাকিতেছে, "ও বিনুদিদি, কনে গেইলে? পিসঠাকরোণ তোমারে লইয়া যাইতে কইচে।"

বিনু বনের মায়াজাল হইতে বাহির হইতে হইতে আপনার মনে খিল খিল করিয়া হাসিতে লাগিল, পিস-ঠাকরোণ। নিজের ভাই-বোন না থাকাতে মা বিশ্বের সহিত সম্বন্ধ পাতাইয়া রাখিয়াছেন। কেবা জানে ইতর, কেবা জানে ভদ্র। তাহার দাদামহাশয়েরও স্বভাব অমনি। একমাত্র সন্তানকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইয়া শত সন্তানের জনক হইয়া স্নেহের ক্ষুধা মিটাইতেছেন।

নৌকার পিছনে আড়ালে উপস্থিত হইয়া বিনু হাত-মুখ ধুইয়া লইল। অঞ্জলি অঞ্জলি-জল মাথায় দিয়া মাথা ধুইয়া স্নান না করাতে তাহার অত্যন্ত অনুতাপ হইতেছিল। নদীর ছোটই বা কি, বড়ই বা কি? যে হীরাসাগরের জল তোল-পাড় করিয়াছে, তাহার ভেড়াকোলার নদীতে ভয়? ছোঃ।

মাথায় ঘোমটা তুলিয়া বিনু নৌকার মধ্যে ঢুকিয়া দেখিল, মার রান্না হইয়া গিয়াছে। আসনের সামনে কলার পাতা পাতিয়া গেলাসে জল ভরিয়া তিনি পিতা ও জামাতার খাইবার ঠাঁই করিয়া রাখিয়াছেন।

প্রসাদ স্নানান্তে দিব্য ফিটফাট হইয়া আহারে বসিবার আয়োজন করিতেছে। দাদামহাশয় ও মায়ের অগোচরে প্রসাদ বারেক বিনুকে লক্ষ্য করিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল। বিনু তাহার চোরা হাসি চোরা কটাক্ষের ধার না ধারিয়া সকলের পাশ কাটাইয়া নৌকার পিছনের বিছানায় ধপ্ করিয়া শুইয়া পড়িল। রাঙ্গাঠাকুর মেয়েকে বলিলেন, "সোনাকেও খেতে দাও মা, ছেলেমানুষ, ওর ক্ষিধে পেয়েছে।"

নৌকার ভিতরে জামাইয়ের মুখোমুখি সোনা খাইতে বসিবে কিরূপে? সেকালে স্বামীর সামনে খাওয়া শুধু নিষেধ নয়, নিন্দিত ছিল। মা তাঁহার স্নানের ভেজা শাড়ী খানা টাঙ্গাইয়া দিলেন পেট-কাটা ছইয়ের গায়ে।

এদিকের খাওয়া হইয়া গেলে ডেকচি-ভরা ভাত, কড়া-ভরা মাছ দেওয়া হইল মাঝিদিগকে। তারা খাবার লইয়া গেল আগা নৌকায়। পাটাতন ধুইয়া-মুছিয়া উনুন সরাইয়া লইয়া তাহারাও আহারে বসিল।

নৌকার দুই পাশে বিছানা। একদিকে নাতজামাই ও দাদামহাশয়। অপর পাশে মা ও মেয়ে। দ্বিপ্রহরের প্রখর উত্তাপে ভুবন খাঁ খাঁ করিতেছে। হেমন্তের হিমেল হাওয়ার আভাসও নাই। পৃথিবী স্তব্ধ, বিহগ-কণ্ঠ নীরব। শুধু নীরবতা নাই ভরা নদীর। রৌদ্রের জন্য মাঝখানের কাটা ঝাঁপ নামাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সামনে পিছনের বাতায়ন-পথে জলের বাতাস বহিতেছে।

"করতা, সাহাজাদপুর আইলাম।" ভজনের আহ্বানে সকলের তন্দ্রার ঘোর কাটিয়া গেল। নৌকার দোলায় জলের বাতাসে সকলেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। হরিহর-পুর যাইতে সাহাজাদপুর ঠিক রাস্তায় পড়ে না। ইচ্ছামতী নদীর বাঁক ধরিয়া ঘুরিয়া যাইতে হয়। রাঙ্গাঠাকুরের নির্দ্দেশে মাঝিরা নৌকা ঘুরাইয়া আসিয়াছে। সাহাজাদ-পুরের মধু ময়রার জোড়া সন্দেশ কাঁচাগোল্লা এ অঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ খাবার। রাঙ্গাঠাকুরের সাধ হইয়াছিল, নূতন জামাইকে মধু ময়রার মিষ্টান্ন খাওয়াইতে। সাহাজাদপুর, পড়ন্ত বেলা উত্তাপ নাই, জ্বালা নাই, স্নিগ্ধ শীতলতা নামিয়া আসিতেছে।

সকলেই ত্রস্তে-ব্যস্তে বিছানা ছাড়িয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিতে লাগিল ঠাকুর জমিদারের কুঠি বাড়ী।

কার্ত্তিককে লইয়া প্রসাদের সঙ্গে রাঙ্গাঠাকুর নামিয়া গেলেন মিষ্টির সন্ধানে। গজানন মাঝখানের ঝাঁপ সরাইয়া দিলে বিনু উঠিয়া দাঁড়াইল সেইখানে।

ইতিপূর্ব্বে ঠাকুর জমিদারের কুঠি বাড়ীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছে, মধু ময়রার মিষ্টান্নের আস্বাদ পাইয়াছে, কিন্তু তখন সে জানিত না, ওই কুঠির মালিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। যাঁর লেখা, "বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান।"

মধু ময়রার মধুর জোড়া সন্দেশ কাঁচাগোল্লা খাইতে দিয়াছিল, তাই কি তিনি বিশ্বে এত মধু বর্ষণ কারতেছেন:

"বেলা যে পড়ে এল, জলকে চল্।"—

কুঠিতে নূতন কলি ফিরানো হইয়াছে, সম্ভবতঃ মালিকের শুভাগমন উপলক্ষ্যে। বিনু তৃষাতুর নয়নে তাকাইয়া রহিল ঝিলিমিলি দেওয়া বারান্দার দিকে। সত্যই যদি রবীন্দ্র-নাথ আসিয়া থাকেন এখানে, একবার আসিয়া ইচ্ছামতীর দিকে আঁখি মেলিয়া যদি বারান্দায় দাঁড়াইতেন তাহা হইলে বিনু তাঁহাকে দর্শন করিয়া তাহার স্মৃতির ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া রাখিতে পারিত। কিন্তু কেহই বারান্দায় দেখা দিলেন না। অনতিকাল পরে প্রকাণ্ড দুই মাটির মুখ-বাঁধা হাঁড়ি লইয়া রাঙ্গাঠাকুরদা সগর্ব্বে নৌকায় ফিরিয়া আসিলেন।

বাতাসের বিপরীত গতিতে এবার কার্ত্তিক ও গজাননকে গুণে নামিতে হইল। নৌকার মাস্তলে গুণের রশি বাঁধিয়া তীর ধরিয়া নৌকা টানিয়া লইয়া তাহারা অগ্রসর হইতে লাগিল। হালে ভজন ব'সয়া।

ইচ্ছামতীর পর মধুমতী ভাজন নদী, তাহার পরেই মুক্তাঝরা হরিরামপুরের নদী। আর গুণ টানিবার

প্রয়োজন হইল না। ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে গজানন ও কার্ত্তিক গুণ গুটাইয়া নৌকায় আসিয়া উঠিল।

বেলা-শেষের অনুজ্জ্বল স্নিগ্ধতায় ঘনায়মান হইয়া আসিয়াছে ছায়াময় পল্লীর পরিবেশ। বাতাসের গতি এবেলা প্রসন্ন, স্রোতের টানে নৌকা ধাবিত।

দূর হইতে ছবির মতন দৃষ্টিপথে পড়িল হরিরামপুরের জমিদার চৌধুরীদের সুরম্য প্রাসাদশ্রেণী। চৌধুরীরা অতিশয় সমৃদ্ধিশালী প্রাচীন জমিদার। এ অঞ্চলে বিস্তীর্ণ তাঁহাদের জমিদারি। দানে অনুষ্ঠানে পুণ্যে পাপে শাসনে প্রতাপে তাঁহারা প্রসিদ্ধ। নদীর উপকূলেই জমিদার-ভবন। হাই স্কুল, বালিকা বিদ্যালয়, অতিথিশালা, হাসপাতাল। বর্ত্তমান জমিদারের শখে কলিকাতার চিড়িয়াখানার অনুকরণে ক্ষুদ্র একটা পশুশালাও স্থাপিত হইতেছে। তাহাতে বাঘ ভালুক হরিণ কালগাই বানর হনুমান ময়ূর ময়না টিয়া পাখী ইত্যাদি সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। নৌকারোহীরা ঘাটে নৌকা বাঁধিয়া চৌধুরীবাবুদের পশুশালা পরিদর্শন না করিয়া ফিরিয়া যায় না। স্থলপথের পথিকদের ত কথাই নাই। স্থলপথের পথিকরা সারাদিন ঘিরিয়া রাখিয়াছে পশুশালা। জমিদার-বাড়ীর ঘাটে একখানা বজরা ও একটি বোট বাঁধা।

তন্বী লাজনতা বধূটির মতনই এতকাল মুক্তাঝরা নদীটা শান্ত মৃদুস্বরা, গ্রামবাসীদের কল্যাণব্রত উদ্‌যাপন করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু বছর কত হইতেই সে প্রখর হইতে প্রখরতমার প্রয়াসী হইয়াছে। ফলে বাবুদের বাড়ীর দুই পাশের কুঞ্জকানন ও দুইটি বিশাল দীঘিতুল্য পুষ্করিণীর সহিত মিতালি পাতাইয়া এক হইয়া সরিয়া আসিয়াছে আরও নিকটে। সকলেই ভীত-ত্রস্ত নদীর আকস্মিক পরিবর্ত্তনে। সে কাহারও কিছু আত্মসাৎ করিতে চাহে না। এক পার হইতে লইয়া অপর পারে সঞ্চিত করিয়া রাখে। মুক্তাঝরার পরপারে চাষীপ্রধান গ্রাম। ভদ্রলোকের সংখ্যা কম। সেইখানে সুউচ্চ প্রাচীর-ঘেরা জমিদারদের এক বাগান-বাড়ী আছে। নাম তাহার বিজন কুঞ্জ। দূরে-নিকটে জেলায় জেলায় চৌধুরীদের বিস্তর মহল কাছারি বাড়ী। সেখানে ম্যানেজার নায়েব গোমস্তারা জমিদারির শাসনকর্ত্তা। জমিদাররা দুই ভাই, ছোট সহরবাসী, বড় গ্রামবাসী। গ্রামের উন্নতিতে যত্নবান্ আগ্রহশীল। এক এক পাশাপাশি গ্রাম খণ্ড খণ্ড নাম লইয়া একত্রে মিশিয়া রহিয়াছে। উৎসবে-আনন্দে, আপদে-বিপদে সকলের সহিত সকলের যোগসূত্র অটুট। এমন বিরাট্ আদর্শ গ্রাম পল্লী অঞ্চলে দুর্লভ।

সন্ধ্যা হয় হয়, তারার মালা প্রদীপ জ্বালাইতেছে নীলাকাশে। রাঙাঠাকুরের ক্ষুদ্র গৃহাঙ্গনে সহসা পুলকের তরঙ্গ বহিতে লাগিল। বিনুরা হরিরামপুরে আসিয়া গিয়াছে, বিনুর জননী জন্মভূমির প্রসারিত কোলে। বাড়ীতে দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে উপস্থিত হইয়াছে রাঙাঠাকুর ও গঙ্গামণির দুই পালিত কন্যা—সুমিত্রা ও সুবর্ণ। একদা তাহাদের শিশু অবস্থায় রাখিয়া জননী পরলোকে গমন করিয়াছিলেন। মাতৃহারা শিশু দুইটিকে বুকে তুলিয়া লইয়াছিলেন গঙ্গামণি ও রাঙাঠাকুর। এখন তাহারা এই বাড়ীরই মেয়ে হইয়া গিয়াছে। বড়মেয়ে সুমিত্রা নাদুস-নুদুস গড়নের হাবা-গোবা ভালমানুষ। তাহার বিবাহ হইয়াছে গ্রামের ছেলের সহিত। হৃদয়নাথ মাষ্টারী করে গ্রামের স্কুলে। পোষ্য কম, এক বিধবা মা, নিজেদের দুইটি ছেলেমেয়ে হইয়াছে। তাহারা ঠাকুমার খুবই বাধ্য। সুমিত্রা এবাড়ীতে আসিলে সহজে তাহার পিছে ধাওয়া করে না। সুবর্ণর বিবাহ হইয়াছে পাবনা সুজা নগরে। স্বামী ডাক্তার। একটি ছেলেও হইয়াছে সুবর্ণের। নাম কানু, তাহার বয়স এখনো দুই বছর পূর্ণ হয় নাই।

দুই ভগিনীর চেহারা ও স্বভাবে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। সুবর্ণর দীঘল গঠনের চিক্কণ শ্যাম বর্ণে জোড়া ভ্রমরের মত কালো চঞ্চল চোখে হাসি যেন বাসা বাঁধিয়া রহিয়াছে। সুবর্ণ রাগিলেও হাসে, কাঁদিলেও হাসে, সে ঘুমাইলেও তাহার তরুণ অধর হইতে হাসি পলাইয়া যাইতে পারে না। গঙ্গামণির সহিত সুবর্ণ সকলকে সমাদর করিয়া ঘরে তুলিল। নদীর ধারে অপ্রত্যাশিত রূপে প্রসাদও লাভ করিল বন্ধু সহপাঠী বিজয়কে। বিজয় চৌধুরীদের ভাগ্নে। প্রসাদের হোষ্টেলে থাকিয়া একই কলেজে পড়ে। ছুটিতে মামার বাড়ীর পূজা দেখিতে আসিয়াছে। বিজয়ের বন্ধু ললিত। প্রসাদের বন্ধু হইতেও ললিতের বিশেষ বিলম্ব হইল না। মুহূর্ত্তে হাসি-গল্পে ক্ষুদ্র গৃহ মুখরিত হইতে লাগিল।

চালে চালে বসতি, এক বাড়ী হাঁচি পাড়িলে, টিকটিকি টিক টিক করিলে সকল বাড়ীতে সাড়া পড়িয়া যায়। জামাই-মেয়েকে দেখার ভিড় লাগিয়া গেল রাঙাঠাকুরের অঙ্গনে।

সুমিত্রা চা করিয়া আনিলে, মধু ময়রার জোড়া সন্দেশ ও কাঁচাগোল্লার সঙ্গে ঘরে তৈরি দুধ ও নারিকেলের খাবার মিশাইয়া সকলকে খাইতে দিল সুবর্ণ। কানুকে কোলে লইয়া মেয়ে-অন্তপ্রাণ গঙ্গামণি হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে সঙ্গে ঘোরা-ফেরা করিতে লাগিলেন।

অনেক রাতে সমবেত সভা ভঙ্গ হইল। ইহার পরে রাত্রের আহারের পালা। হৃদয়কে গঙ্গামণি যাইতে দেন নাই। রাত্রের আহারের পরে তাহার ছুটি। এক ভোজের রান্না রাঁধিয়াছে সুমিত্রা। কতকাল পরে গঙ্গামণির কন্যা

আসিয়াছে মেয়ে-জামাইকে লইয়া। যেমন-তেমন হইলে চলিবে কেন? এখানেও হালি হালি ইলিশ মাছ আসিয়াছে। রুই চিতল কই কিছুই বাকী নাই। প্রসাদ যে কই মাছের ভক্ত, সেটা জানিতে গঙ্গামণির বাকী নাই।

আহার পর্ব্ব মিটিয়া গেলে হৃদয় বিদায় চাহিল গঙ্গামণির কাছে। ছেলে মুরারি, মেয়ে মাধুরী সন্ধ্যায় এখান হইতে জলযোগ করিয়া ঠাকুমার কাছে চলিয়া গিয়াছে। তাহারা ঠাকুমাকে ভিন্ন ঘুমাইতে পারে না।

গঙ্গামণি বলিলেন, "তুমি লণ্ঠন নিয়ে এস তা হ'লে? সকাল বেলা মুরারি মাধুকে সাথে নিয়ে আসবে। আমার কাছে ওরা একবেলা থাকলে তাদের ঠাকুমা ফুরিয়ে যাবেন না।" হৃদয় হাসিতে লাগিল।

সুবর্ণ ছিল নিকটে, সে গঙ্গামণির প্রতি তাহার উজ্জ্বল হাসভরা চোখ তুলিয়া কহিল, "এত রাতে জামাইবাবুকে একলা যেতে দিচ্ছ মা, রাস্তায় বুঝি পেত্নীর ভয় নেই? দিদি যাক না ওঁর সাথে? আমাদের ত সব চুকে-বুকে গেছে। দিদি রাতে এখানে থেকে আর কোন্ কর্ম্ম করবেন?"

গঙ্গামণি বলিলেন, "সুমি যদি বাড়ী যেয়ে শুতে চায়, যাক্ তা হ'লে।"

"তা হ'লে কেন মা, ও হল গে ঠেলামারা কথা। ঘরভরা লোক পেয়েছ আজ, তবু প্রাণ ধরে তোমার আদরের সুমিকে ছাড়তে চাইচ না?"

গঙ্গামণি অপ্রতিভ হইলেন, "না রে সুবর্ণ, সুমিও আমার যেমন আদরের, সুবর্ণও তেমনি। সুমি, তুই এখন যা হৃদয়ের সাথে, ভোরবেলা উঠেই চলে আসিস্।"

কানুকে একা ঘরে রাখিয়া আসিয়াছেন মনে পড়ায় গঙ্গামণি তাড়াতাড়ি শয়নগৃহে চলিয়া গেলেন। হৃদয়ের সহিত সুমিত্রা পথে বাহির হইল।

রাঙ্গাঠাকুর আহারান্তে বাহিরের বৈঠকখানা ঘরে আজ আশ্রয় লইয়াছেন। পিতার বিছানায় বসিয়া গল্প করিতে-ছিলেন হেমাঙ্গিনী।

প্রসাদকে সুবর্ণ দেখাইয়া দিয়াছে তাহাদের জন্য সুসজ্জিত করিয়া রাখা পশ্চিমের ভিটের ঘর। যাহার পশ্চাদ্‌ভাগে নিবিড় অরণ্য। অন্যান্য গৃহ হইতে খানিকটা দূরে।

মধ্যবিত্ত সাধারণ গৃহস্থের ঘর। তাহার সাজ-সরঞ্জাম কি? দক্ষিণের জানলা ঘেঁষিয়া প্রকাণ্ড একখানা খাটে বিছানা। এদিকে কাপড়ের আলনা। দুই-একখানা বেতের কেদারা। টেবিলের মতন উঁচু একটা চারকোণা টুল। টুলের উপরে হারিকেন লণ্ঠন। মাটির ছোট কলসীতে খাবার জল। কলসীর মুখে কাঁসার গেলাস। ঘরের অন্য পাশে এক লম্বা বেঞ্চি পাতা, তাহার উপরে একটা বেতের ঝাঁপি। একটা কাঠের বাক্স। চার দেওয়ালে চারিখানি চিত্র—শিবের ধ্যানভঙ্গ, রামরাজা, রাধাকৃষ্ণের যুগল রূপ, অসুর-দলনী দুর্গা প্রতিমা। দরজার পাশে কড়ি দিয়া গাঁথা একটি শিকে। তাহার উপরে রঙ্গীন একটা মাটির ঘট, ঘটের মাথায় কড়ির একটা চুবড়ি, কাঠের বাক্সের উপরে খান কতক পুরাতন পুস্তক শ্রীমৎভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীকৃষ্ণের শতনাম, শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস।

খাট-বিছানায় সুবর্ণ ফুলশয্যার খাটের অনুরূপে রাশি রাশি ফুল ছড়াইয়া রাখিয়াছিল। খাটের বাজুতে গুলঞ্চ ফুলের দুই ছড়া মালা। একটি কাঁসার পানের ডিবায় কয়েকটা পানের খিলি, কতগুলি মালা খাটের পাশের রূপার ছোট ত্রিপদির উপরে রাখিয়া দিয়াছিল।

গঙ্গামণি প্রসাদকে বাহির হইতে ডাকিয়া শয়ন গৃহে আসিয়া কহিলেন, "এই তোমাদের শোবার ঘর ভাই, গরীবের বাড়ী, ক'টা দিন কষ্ট করে কাটাও। দিন-ভোর নৌকোর খোপে কাটিয়ে এসেছ, এখন শুয়ে হাত-পা মেলে দাও।"

প্রসাদ গৃহের চতুর্দ্দিকে বারেক চক্ষু বুলাইয়া পরিতৃপ্ত হইল। তাহাদের শয়নঘরে মূল্যবান্ আসবাবপত্রে বেলোয়ারী ঝাড়ে এবং রবিবর্ম্মার চিত্রে যাহা ছিল না, এখানে তাহারই প্রচুর সমাবেশ ফুলের বিছানা, ফুলের মালা গৃহের সমস্ত দৈন্য ঢাকিয়া দিয়াছে।

প্রসাদ কেদারার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া সবিনয়ে কহিল, "আপনি এইখানে বসুন দিদিমা। চমৎকার এ-ঘরখানা। চারদিকে জানলা, খোলা-মেলা। এখানে কি কারুর কষ্ট হয়?"

প্রসাদকে কেদারায় বসাইয়া দিদিমা বসিলেন মেঝেয়। সেকালে মেয়েমানুষের চেয়ারে কেদারায় বসা লজ্জার বিষয় ছিল। সাধারণতঃ মেয়েদের বসিবার স্থান হইত মাদুরে, পাটিতে কিংবা আসনে।

গঙ্গামণি বলিতে লাগিলেন, "তুমি যে আমার ভাঙা-ঘরের চাঁদের আলো প্রসাদ। কোথায় রাখি, কি করি তা ভেবেই পাই না। ছেলে ত নাই; মেয়ে, তাও ওই এক। তোমাদের নিয়েই জীবনের সাধ-আহ্লাদ মেটানো।"

"মেয়ে আপনার একটি কোথায় দিদিমা? আরও দু'টিকে ত দেখছি?"

গঙ্গামণি হাসিলেন, "হাঁ, তা বলতে পার সুমু সুবি দু'টি মেয়ে আছে আমাদের। ওদের মা যখন যায়, তখন সুমু ছিল তিন বছরের আর সুবি এক বছরের এতটুকু।

আমরাই ওদের মানুষ করেছি, বড় ক'রে বিয়ে দিয়েছি। ওরা মনে-প্রাণে আমাদেরই হয়ে গেছে।"

"ওঁদের আর কে আছেন? বাবা কিংবা ভাইরা?"

"বাবা আছে বৈকি। ফের বিয়ে করেছে। এ-বৌয়ের গণ্ডাখানেক ছেলেমেয়ে হয়েছে। ওরা সেখানে থাকতে ভালবাসে না। যখন এখানে আসে আমাদের কাছেই থাকে। সুমুটা ত আমাদের কাছাকাছিই রয়েছে। রোগে-ভোগে ক্রিয়াকর্ম্মে কি করাটা যে করে আমাদের তা বলার নয়। তোমাদের দাদামশাইয়ের আবার বাতিক, কোন পুজোই বাদ দেবেন না। বচ্ছর ভ'রে একটানা চলবে দুর্গোৎসব, দীপান্বিতা, জগদ্ধাত্রী, রটন্তী, দোল, অন্নপূর্ণা পুজো। এক-একবার আবার আরম্ভ করে দেন কাত্যায়নী পুজো। গোটা কার্ত্তিক মাস ভরে নিত্যি দুর্গোৎসব, নিত্যি পুজোভোগ বলি, আরতি। প্রতিমাও দুর্গা পুজোর মতন। দুর্গোৎসবে তিন দিনের খাটুনির ঠ্যালায় মানুষের হাড় গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায়। সেই ব্যাপার একমাস চালানো অসাধ্য ব্যাপার। এবারেও গোঁ ধরেছিলেন কাত্যায়নী পুজো আরম্ভ করে দেবেন। আমি বলেছিলাম, 'এবার আমাদের কাত্যায়নী হোক হেমাঙ্গিনী সোনা প্রসাদকে নিয়ে।' তা তোমার বাবা মা যে তোমাদের দুই জনাকে আমাদের কাছে আসতে দিয়েছেন, এই আমাদের ভাগ্যি প্রসাদ। তোমাদের কাছে পেয়ে আমাদের কাত্যায়নী পুজো হয়ে গেল।"

প্রসাদ বলিল, "এমন করে বলছেন কেন দিদিমা? বাবা মা দেবেন না কেন আপনাদের কাছে আসতে? তবে আমি থাকি কলকাতায়, ছুটিতে বাড়ী এসেই বা ক'দিন থাকতে পারি? এবার থেকে বাড়ী এলে আপনাদের কাছে আসতে চেষ্টা করব। বিজয়ের কাছে শুনেছি চৌধুরীদের বাসন্তী পুজোয় নাকি খুব ঘটা হয়?"

"হাঁ ভাই, ঘটা বলে ঘটা, এক মাস ভরে উৎসব চলে। এ গাঁয়ে আর কারও বাসন্তী পুজো নেই, ওই জমিদার বাড়ীতেই একখানা। যেমন পুজোয় ওঁরা গাঁ-শুদ্ধ লোককে খাওয়ান-দাওয়ান, তেমনি দান-ধ্যান করেন। কলকাতা থেকে থিয়েটার আনা হয়। দেশ-বিদেশ থেকে যাত্রা, খেমটা, কবি, কীর্ত্তনে আউল-বাউলে ভরে যায় জমিদার বাড়ী। তুমি একবার বাসন্তী পুজোয় এসে দেখে যেও। আমরা আনাব তোমাদের। তোমার বন্ধু বিজয়রা ত আসে প্রত্যেক বার বাসন্তী পুজোয়। জমিদার বাড়ীর আত্মীয়-স্বজনরা কেউ বাদ যায় না বাসন্তী পুজোয় আসতে।"

প্রসাদ ক্ষণকাল ভাবিয়া উত্তর করিল, "বাসন্তী পুজোর সময় যদি আমাদের কলেজ বন্ধ থাকে তা হ'লে আসতে চেষ্টা করব।"

ইহাদের আলাপ-আলোচনার মধ্যে বিনুর হাত ধরিয়া সুবর্ণ গৃহে প্রবেশ করিল।

"যার ধন সে নিজে নেপোয় মারুক দই।' এখন আমি যাই তোমরা শয়ন দাও।" বলিয়া গঙ্গামণি হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

প্রসাদ হাসিমুখে কহিল, "আরে, বসুন না দিদিমা, এত ব্যস্ত কিসের? আপনার বাসন্তী পুজোর গল্প সবে যে জমে উঠেছে।"

"আর একদিন জমিয়ে দেব বাকীটা। ঢের রাত হয়েছে। এরপর বকবক করলে তোমাদের রাঙ্গাঠাকুর তেড়ে আসবেন।"

গঙ্গামণি বাহির হইয়া গেলেন।

প্রসাদ সুবর্ণকে সাগ্রহে ডাকিল, "দিদি বসুন. বড়দিদি কই? আপনাদের সঙ্গে এতক্ষণ আলাপ-সালাপ ভাল করে করতেই পারি নি।"

সুবর্ণ বিনুর হাত ছাড়িয়া দিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া উত্তর দিল, "বসবার কি সময় আছে এখন? শালীমহলে আলাপ করবে কখন? রাস্তা থেকেই যে বন্ধুমহল নিয়ে বাড়ী ঢুকেছিলে? দিদিকে এই খানিক আগে জামাই-বাবুর পিছনে চালিয়ে দিয়েছি। এখন একেও তাড়িয়ে এনে দিয়ে গেলাম যার জিনিষ তাঁর কাছে। তোমরা এবার শুয়ে পড়। আমিও যাই।"

"এসেছেন যদি, একটু বসে যান। দিদি, বন্ধুরা যে সময়টুকু নষ্ট করে গেছে, সেটুকু আমি পূরণ করে দিচ্ছি আপনাকে, কাল দেব বড়দিকে। সকলকে যে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন, আপনি এখন নিজেকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবেন কোথায়?"

"যাব আঘাটায় নয়, ভাল জায়গাতেই। যার একদিকে মা একদিকে কানু তারই মাঝখানে। জান ত প্রসাদ, সময় নদীর স্রোতের মত চলে গেলে ফেরান মুশকিল। আমাদের গরীব ঘরে রাজকুমার এসেছ, তোমার উপযুক্ত কিছু দিয়েই বাসর সাজাতে পারি নি। ওই কোণে রেখেছি তোমাদের খাবার জল, ডিবেয় পান-মশলা, জোড়া ফুলের মালা। যার সঙ্গে ফুলখেলা খেলবে তাকেও দিয়ে গেলাম। এখন চলি, আর অভিসম্পাত কুড়াব না।" বলিয়া একটুখানি মুচকি হাসি হাসিয়া সুবর্ণ প্রস্থান করিল।

বিনু আধ-ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া আড়ষ্ট ভাবে তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল। নূতন পরিবেশে সে যেন আবার নবীন রূপে নব হইয়া গেল। মুখের কাপড় সরাইতে তাহার

সঙ্কোচের অবধি রহিল না। সুবর্ণ ক্ষণকাল পূর্ব্বে তাহাকে এক অভিনব বেশে সাজাইয়া দিয়াছে। মা নৌকার ভিতরে মাথা জুড়িয়া যে প্রকাণ্ড চ্যাপটা খোঁপা বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, সুবর্ণের সে চুল বাঁধা পছন্দ হয় নাই। তাই এত রাত্রে সে বিনুর চুল খুলিয়া ললাটের উপরে থাকে থাকে পাতা কাটিয়া হরতন খোপা বাঁধিয়া দিয়াছে। চুলের কাঁটার সঙ্গে খোপায় আটকাইয়া দিয়াছে তিনটা গন্ধরাজ ফুল। মুখ ধুইয়া-মুছিয়া গালে ঠোঁটে আলতার ছোপ লাগাইয়া দিয়াছে। কপালে সিন্দুরের টিপ। বিনু সর্ব্বাঙ্গে গহনা পরিয়া ঝমঝম করিয়া নামিয়াছিল নৌকা হইতে। সামান্য কিছু গায়ে রাখিয়া সুবর্ণ গহনাগুলি খুলিয়া লইয়াছে।

সুজানগরের তাঁতে বোনা শাড়ী বিখ্যাত। সুবর্ণ বিনুর জন্য মিহি সুতার একখানি গঙ্গাজলি ডুরে শাড়ী কিনিয়া আনিয়াছিল। সেই শাড়ী লেসযুক্ত গোলাপি সেমিজের উপরে বিনুকে পরাইয়া দিয়াছে। এত সজ্জার জন্যই বিনুর বিষম লজ্জা হইতেছিল প্রসাদের কাছে। বিবাহের দিন ও ফুলশয্যার রাত্রি ভিন্ন কেহ কখনও তাহাকে সুসজ্জিতা করিয়া স্বামী-সম্ভাষণে পাঠাইয়া দেয় নাই।

শুধু কি সজ্জা, এত রাত্রে সে এখন শুইবে কোথায়? বিছানা ফুলে ফুলে ফুলময়। মালা আবার কিসের? তাহাদের কি ফের মালা বদল হইবে? তাহার পর এই ঘর, এখানে আসিয়া জীবনে কোন দিন বিনু শোয় নাই।

দক্ষিণের ভিটেয় সামনে চওড়া বারান্দাযুক্ত দাদা-মহাশয় ও দিদিমার মস্ত শয়ন-গৃহ। বিনুরা আসিয়া বরাবর সেইখানেই শয়ন করিয়াছে। এ ঘরখানা আঙ্গিনা হইতে সরানো একেবারে বাগানের গা ঘেঁষিয়া। পাশে কত যুগের এক বুড়া জলপাই গাছ ঠিক শিয়রের জানালার সম্মুখে। এখন সে তেমন ফল দেয় না কিন্তু ছায়ায় অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছে অনেকটা জায়গা। এখানকার প্রতি তৃণলতা-ধুলিকণা পর্য্যন্ত বিনুর প্রিয় হইতে প্রিয়তর, কিন্তু তাই বলিয়া রজনীর নিবিড় বন-বনান্তর তাহার প্রিয় নহে। সে রাত্রে ওদিকে চাহিতে পারে না, গা ছম ছম করে।

প্রসাদ দ্বার বন্ধ করিয়া বিহ্বলা বিনুর পিঠে হাত রাখিয়া ফিসফিস করিয়া কহিল, "নতুন জায়গায় এসে তুমি যে ফের নতুন বৌ হয়ে গেলে বিনু? শোবে চল বিছানায়। আস্তে আস্তে কথার জবাব দাও। সুবর্ণদিদি কিন্তু ঘরের পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ওঁর আড়িপাতা আমি বন্ধ করে দিচ্ছি, কথা না বলে। আমরা চুপ করে থাকলে বেচারা আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে? চলে যাবে শুতে।"

বিনু প্রসাদের কানের কাছে মুখ লইয়া চুপে চুপে বলিল, "শোব কোথায়? বিছানা ভরা যে ফুল?"

প্রসাদ নীরবে প্রদীপের শিখা কমাইয়া দিয়া বিছানার ফুলগুলি সযত্নে কুড়াইয়া কুড়াইয়া তাহাদের শয়নের জোড়া বালিসের ফাঁকে স্তূপ করিয়া রাখিয়া দিল। খাটের বাজুতে মালা দুইগাছা বাতাসে দুলিতে লাগিল। দুই জনে দুই পাশে মুখ ফিরাইয়া মাঝখানে মোটা পাশ-বালিস রাখিয়া শয়ন করিল।

"ধুতুম, তুই থুলি না মুই থুলি, টাকার থলি কুণায় থুলি?" রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে। ম্লান জ্যোৎস্না-রেখা ঝরিয়া পড়িতেছে চতুর্দ্দিকে। বৃক্ষপত্রে দূর্ব্বাদলে শিশির ঝরিতেছে টুপ টুপ শব্দে। ভুবন শান্ত সমাহিত।

সেই নিরবচ্ছিন্ন শান্তি সহসা খান খান হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল নিশাচর পাখীর বিকট আর্ত্তনাদে। জলপাই গাছের ডালে বসিয়া দুইটা ধুতুম পাখী ডাকিতেছে।

বিনু আতঙ্কে অস্ফুট চিৎকার করিয়া প্রসাদকে জড়াইয়া ধরিল। ধুতুম পাখীকে বিনুর বড় ভয়। তাহাদের গ্রামে ধুতুম পাখী বিশেষ নাই। কালেভদ্রে ডাক শোনা যায়। ইহাদের বাস প্রাচীন গ্রামে, প্রাচীন বৃক্ষে।

প্রসাদ কহিল, "একি, ধুতুম পাখীর ডাক শুনে তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন? সামান্য পাখীর ডাকে ভয় কিসের?"

ধুতুম দু'টি সমানে ডাকিয়া যাইতেছে। ইহাদের আকৃতি বৃহৎ বাজ পাখীর অনুরূপ। মুখ অনেকটা পেঁচা জাতীয়। নিশাচর পাখী, পরস্পর পরস্পরের সহিত দেখা হওয়া মাত্র বিকট রবে পাড়া কাঁপাইয়া তোলে। বিনুর ঘুম সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। ধুতুমের ডাকও ক্রমে কর্ণমূলে সহিয়া আসিতেছিল। এতক্ষণে বিনু অনুভব করিল, তাহার খোঁপায় গুলঞ্চ ফুলের মালা দুইটি জড়ানো রহিয়াছে। কত রাত্রে নিদ্রিত বিনুর খোঁপায় প্রসাদ মালা জড়াইয়া দিয়াছে সে তাহা টের পায় নাই। হয়ত প্রসাদ তাহাকে ডাকিয়া জাগাইতে পারে নাই। বিনু মনে মনে লজ্জিত হইয়া স্বামীর চিত্তবিনোদনের আশায় জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি ধুতুম পাখীর গল্প শুনেছ ত?"

"শুনলাম আর কার কাছ থেকে? তুমিই বল শুনি। প্রথম রাত্রে সুবর্ণদিদির অত্যাচারে কথা কইতে পারি নি। এখন তোমার ধুতুমের কাহিনী শুনি?"

প্রসাদের কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের স্বর। সেটুকু বুঝিতে বিনুর বিলম্ব হইল না। এক জায়গা হইতে আর এক জায়গায় আসিয়া অন্য কোন কথা নাই, ধুতুমের গল্প। বিনু বুদ্ধিহীনা তাই। প্রসাদ তাহার নিকটে বাজে কথার অবতারণা করিতেছে। অভিমানে তাহার চোখে জল আসিল। সে নীরবে বাঁ-হাতে খোঁপার মালা পরীক্ষা করিতে লাগিল।

প্রসাদ কহিল, "মালা দুটো বৃথা নষ্ট হবে বলে তোমার খোঁপায় পরিয়ে দিয়েছি। কত ধাক্কা দিয়েছি, কুম্ভকর্ণের ঘুম কিছুতেই ভাঙাতে পারি নি। ভাগ্যে ধুতুম ডেকেছিল; নইলে তুমি জাগতে না। মালার সন্ধান নিতে না। কিন্তু দিদি যে রেখে গিয়েছিলেন দুটো মালা, নিশ্চয় দুজনার জন্যে। তুমি আমাকে দাও নি; আমি কিন্তু দুটোই তোমাকে দিয়েছি।"

বিনু অপ্রতিভ হইল, সে জানে না মালা কেমন করিয়া দিতে হয়? মেয়েরা যেন খোঁপায় দেয়। পুরুষ মানুষ গলা ভিন্ন কোথায় পরিবে? কিন্তু শুইয়া থাকিলে গলা পাওয়া যায় না। তবু বিনু আস্তে আস্তে খোঁপার একগাছা মালা খুলিয়া প্রসাদের কোঁকড়া চুলের উপর রাখিয়া কহিল, "এই নাও, তোমারটা ফিরিয়ে দিলাম।"

প্রসাদ হাসিল, "এই ত দিব্যি বুদ্ধি হয়েছে। আমার আর ভাবনা নেই। এখন ধুতুমের গল্প বল। তার পরে আমার কথা হবে।"

"ধুতুমের গল্প আর কি—এক গাঁয়ে ছিল দুই বামুন আর বামুনী। দুই জনারই টাকার লোভ খুব। ভিক্ষে করে না খেয়ে-দেয়ে তারা এক থলে টাকা জমিয়েছিল, হঠাৎ টাকার থলেটা কোথায় হারিয়ে গেল। টাকার শোকে তারা পাখী হয়ে খুঁজে বেড়াতে লাগল টাকার থলি। খুঁজতে খুঁজতে যখনই দেখা হয় দুজনার, তখনই ঝগড়া বেধে যায়। 'টাকার থলি তুই রেখেছিলি না আমি রেখেছিলাম? কোথায় গেল'?"

প্রসাদ সকৌতুকে হাসিতে লাগিল, "ওই বিকট ধুতুম, 'তুই থুলি, না মুই থুলি, টাকার থলি কুথায় থুলি?' শব্দের এ কি সুন্দর ব্যাখ্যা! তুমি দেখছি বেশ গল্প বলতে পার বিনু, এখন থেকে আমাকে গল্প শুনিও। কেমন, পারবে ত?"

বিনু সানন্দে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

কথায় কথায় ভোরের দিকে প্রসাদ ও বিনু তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়াছিল। এ রায়বাড়ী নয়, এখানে ঘড়ি ধরিয়া শয়ন-গৃহ পরিত্যাগ না করিলে তেমন ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না।

প্রভাতের সুখনিদ্রাটুকু উভয়ের ভাঙিয়া গেল দরজার ছোট হাতের থাবা ও কোমল আধ-আধ কণ্ঠস্বরে, "মেছো, মাছি, তোলা ওঠোনালে। লোদ হয়েছে উঠানে।"

দরজা খুলিতেই দুজনার চোখে পড়িল বালগোপাল-মূর্ত্তি। সুবর্ণর ছেলে কানু মায়ের শিক্ষায় তাহাদিগকে ডাকিতেছে। কানুর এখনও বয়স দুই বছর পূর্ণ হয় নাই। গোলগাল স্বাস্থ্যবান্ শিশু। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মুখখানি মায়ের মতন ঢলঢল করিতেছে। সেই সুগঠিত চিবুক, গালে টোল, জোড়াভ্রমর চক্ষু দু'টি।

সাত সকালেই মা ছেলের প্রসাধন করিয়া দিয়াছে। ঝাঁকড়া চুল চূড়ার আকারে বাঁধা। চোখের কোণে কাজলের রেখা। ললাটে কাজলেরই একটি বড় টিপ। হাতে সোনার বালা। গলায় লাল সুতায় বেণী করিয়া গাঁথা পদক। মাঝখানে সোনার পান, দুই পাশে সোনার দুইটা বক ফুলের কলি। পায়ে ঝুমুর বল। কার্ত্তিক মাস, ভোরের দিকে বাতাস শিশিরসিক্ত শীতল। তাই কানুর গায়ে একটা হাতকাটা ছিটের পিরাণ পরান হইয়াছে। কটিতটে একখানি লাল টুকটুকে গামছা।

গত রজনীতে প্রসাদ বা বিনু কানুকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতে পারে নাই। আজ যেন প্রভাতের নবোদিত আলোর অঞ্জলি তাহাদের মুগ্ধ নয়নসম্মুখে উপস্থিত হইল।

প্রসাদ শিশুকে হাত ধরিয়া নিজের দিকে আকর্ষণ করিতে করিতে কহিল, "তোমার ঘুম ভেঙ্গেছে কানুবাবু?"

কানু হাসিভরা মুখে মাথা দোলায়, "ঘুম পালানি মাছি-পিছি আমাল বালী যেয়ো, বাটা ভলে দেব পান গাল ভলে খেয়ো। মাছি, তোকে কে পুজো কল্লে, এত ফুল কেন?"

"তোমাকে আর ফুলের নিকেশ নিতে হবে না। এখন এদের মুখ ধুতে দাও। প্রসাদ যাও, মুখ হাত ধুয়ে নাও। তোমার চায়ের জল বসিয়েছে দিদি।"

"বড়দিদি এসেছেন নাকি?"

"অনেকক্ষণ। দিদি ত তোমাদের মতন চালাক-চতুর নয়। প্রথম রাতে ঘুমিয়ে, শেষ রাতে জেগে থাকে।"

"আমরাও জানতাম না দিদি, আপনার কল্যাণে শিখে গেলাম। আপনার ভগিনী ত ভূতের ভয়ে অস্থির। কিছু-দিন ওকে আপনার কাছে রেখে সাহসী করুন না?"

"তুমি হাসালে প্রসাদ, আমার আবার সাহস? আমি চিরকালের ভয়-কাতুরে।"

"কাল রাতেই তার প্রমাণ পাওয়া গেছে।" বলিয়া কানুর হাত ছাড়িয়া দিয়া প্রসাদ মুখ ধুইতে চলিয়া গেল।

বিনুও চলিল কানুকে সঙ্গে লইয়া দরমা-ঘেরা কুয়োতলায়।

রাঙাঠাকুরের চিরকালের অভ্যাস প্রাতঃস্নান করা। ইহারই মধ্যে তিনি স্নানান্তে চণ্ডীমণ্ডপে ঢুকিয়াছেন। একটি বাণেশ্বর পাথরের শিব ও তিনটি শালগ্রাম শিলা পিতলের চৌদোলের ভিতরে রক্ষিত। একটি নারায়ণ শিলা ও শিব তাঁহার নিজস্ব। আর দু'টি উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছেন।

রাঙাঠাকুরের গৃহের সংলগ্ন নীলকান্ত চক্রবর্ত্তীর বাড়ী।

নীলকান্তর পিতাও নাই, নীলকান্তও নাই। আছে দুই বিধবা আর প্রচুর জোত জমি। যুবতী বিধবা বধূ তরঙ্গিণী। বৃদ্ধা নীলকান্তর মা'র তত্ত্বাবধানের ভার রাঙ্গাঠাকুর ও গঙ্গামণি করিয়া থাকেন। তাঁদের শালগ্রাম রাঙ্গাঠাকুরের মণ্ডপে স্থান পাইয়াছে। আর এক পুরুষ-শূন্য বাড়ীর বিগ্রহও এখানে আসিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। শালগ্রাম শিলা স্ত্রীলোকের পূজা নিষেধ। তিনটি বিগ্রহ হইলেই তাহাদের পূজা ভোগ আরতি একত্রে নির্ব্বাহ দিবার নিয়ম। বিগ্রহের ভোগ রান্না হয় নীলকান্তদের বাড়ীতেই। দুই বিধবার হবিষ্যান্নে নারায়ণ দৃষ্টিভোগ দিয়া আসেন।

পূজার সাজ নৈবেদ্য তরঙ্গিনী প্রভাতে আসিয়া গোছাইয়া দিয়া যায়। নীলকান্তর মা প্রতিদিন পূজার ফুল দুর্ব্বা তুলসীপাতা সযত্নে সংগ্রহ করিয়া রাখেন।

রাঙ্গাঠাকুর নিত্যনৈমিত্তিক চণ্ডীপাঠ করিতেছিলেন। চণ্ডীপাঠের পরে শিব ও নারায়ণ পূজা।

এ গ্রামে জমিদার-ভবনে চায়ের পাট থাকিলেও সাধারণের ভিতরে চায়ের প্রচলন নাই। প্রসাদ শহরে থাকে, তাহার অভ্যাস, সেইজন্য সুমিত্রা চা প্রস্তুত করিতে বসিয়াছিল। গঙ্গামণি হেমাঙ্গিনী জামাতার নিমিত্ত নানারূপ খাবার সাজাইতেছিলেন পদ্মকাটা কাঁসার বড় রেকাবি ভরিয়া।

প্রাতঃকালীন জলযোগ সারিয়া প্রসাদ বাহির হইয়া গেল বন্ধু বিজয়ের সহিত গ্রাম প্রদক্ষিণে।

হরিরামপুর দেখিবার মতন। উঁচু সড়ক বরাবর চলিয়া গিয়াছে গ্রামের বাহির পর্য্যন্ত। সড়কের দুই দিকে বিশাল দীঘি, পুষ্করিণী, তড়াগ। জল নিকাশের নালার উপরে পাকা সেতু। বিরাট্ বিরাট্ বৃক্ষশ্রেণীতে সড়ক ছায়াময় করিয়া রাখিয়াছে। দোকান পসরার বাজার কোনটার অভাব নাই। জমিদার গ্রামে বাস করেন, ফলে গ্রাম হইয়াছে নগরের কাছাকাছি।

বিনুর সই কুসুমলতা সংবাদ পাইয়া আসিয়া উপস্থিত। কুসুম ভারী চাপা মেয়ে, অত্যন্ত লজ্জাশীলা। দেখিতে ভাল, বিনু অপেক্ষা বয়েসে কিছু বড়। বিনুর বিবাহের পরে তাহার বিবাহ হইয়াছে। রাঙ্গাঠাকুরদের উভয়ের স্নেহের ক্ষুধার কিছুতেই যেন নিবৃত্তি নাই। কন্যার পরিবর্ত্তে গৃহে জোড়া মেয়ের আবির্ভাব হইয়াছে। নাতনীর পরিবর্ত্তে নিজেরা উদ্যোগী হইয়া অগ্নি ও দেবতা সাক্ষী করিয়া কুসুমের সহিত বিনুকে সই পাতাইয়া দিয়াছেন। নহিলে বোকা বিনু চাপা কুসুমের মধ্যে তেমন সখ্য ছিল না। আর থাকিবেই বা কিরূপে? দুইজনা দুই গ্রামবাসিনী। দেখা-সাক্ষাৎ কদাচিৎ হয়, আলাপ-আলোচনা সীমাবদ্ধ। দাদা-মহাশয় ও দিদিমা, নাতনীর প্রতিনিধি হিসাবে কুসুমকে বাড়ীতে আনিয়া খাইতে দেন, আদরযত্ন করেন। টুকি-টাকি জিনিষপত্র উপহার দিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন।

কুসুম ও বিনু নিভৃতে বসিল। সুবর্ণ কানুকে তাহাদের নিকটে একডালা মাটির হাতী ঘোড়া পুতুল দিয়া বসাইয়া দিল। ছেলেটার জল বাতিক। কোথায়ও জল দেখিলে স্থির থাকিতে পারে না। ঘটি-বাটি যার ভিতরে জল পায়, মাটিতে ঢালিয়া কাদা করিয়া গায়ে মাখে।

সুবর্ণ কানুকে খেলনা দিয়া বিনুর পানে চোখ তুলিয়া কহিল, "এ মূর্ত্তিমানের দিকে একটু নজর রাখিস্ তোরা। বার তিনেক মাটি-কাদা মাখা হয়ে গেছে। ফের ধুইয়ে-মুছিয়ে দেখে গেলাম। দস্যি ছেলে নিয়ে আমার প্রাণান্ত। 'সই সই, মনের কথা কই'। নিয়ে থাক তোরা।"

সুবর্ণর বলিবার ভঙ্গিতে বিনু ও কুসুম লজ্জিত হইল। কেহ কাহারও সঙ্গে সঙ্কোচ কাটাইয়া কথা কহিতে পারে না। নীরবে কাটিয়া গেল কতক্ষণ। তাহার পরে বিনুই জিজ্ঞাসা করিল, "তোর বর কেমন হয়েছে সই? আমি তাকে দেখতে পেলাম না।"

কুসুম বলিল, "বিজয়ার পরের দিনই যে চলে গেছে। রেলে চাকুরি করে, ছুটি নেই। হয়েছে এক রকম। প্রসাদবাবু সয়ার মতন সুন্দর নয়। ঝাঁটার মতন গোঁফ আছে।"

বিনু গর্ব্ব-মিশ্রিত আনন্দ মনে মনে উপভোগ করিয়া পুনরপি কহিল, "তার মুখে ঝাঁটার মত গোঁফ আছে তাতে তোর কি?"

কুসুম হাসিল, "সে ঝাঁটা যে আমার মুখ ঝাড় দিতে চায়।"

দুই সখী কৌতুকে খিল খিল করিয়া হাসিতে লাগিল।

বৃন্দা ঝি সবে এক বালতি জল কূয়া হইতে তুলিয়া উঠোনে নামাইয়াছে। সেই দিকে চোখ পড়ায় কানু খেলা ফেলিয়া দৌড়াইতে লাগিল জলের উদ্দেশে।

দুই সখী কানুর পিছনে ছুটিতে ছুটিতে বিনু অনুচ্চস্বরে বলিল, "গোঁফের জন্য তুই মন খারাপ করিস্ নে সই। এর পরে দেখা হলে নাপিত দিয়ে কামিয়ে নিস্। বালাই যাবে!"

গঙ্গামণি এই দিকে আসিতেছিলেন। তিনি কুসুমকে আদর করিয়া প্রস্তাব দিলেন, "এখানেই আজ নেয়েখেয়ে সইয়ের কাছে থাক। আমি বৃন্দাকে পাঠাচ্ছি তোর মাকে বলতে।"

কুসুম আপত্তি করিল, "না দিদিমা, আজ তা হবে না। পিসীমা খেয়ে-দেয়ে আজ শ্বশুরবাড়ী যাবেন। আমি না

থাকলে মনে দুঃখ পাবেন। আমি আর একদিন এসে থেকে যাব।"

কানু জলের বালতি ধরি-ধরি করিতেই বিনু তাহাকে টানিয়া কোলে তুলিয়া লইল।

কানু সজোরে হাত-পা ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে আবদার ধরিল, "আমি দল খাব মাছি, নামিয়ে দে। কোলে থাকি না, খেলা কলি!"

"আয়, তোর জল খাওয়া খেলা করা বের করছি জলের পোকা।"

বলিতে বলিতে সুবর্ণ আগাইয়া আসিল।

কানু হাত বাড়াইল মায়ের দিকে।

কুসুম জলযোগ করিয়া প্রস্থান করিলে সুবর্ণ ছেলেকে তেল মাখাইয়া স্নান করাইয়া দিল। বিনুকে লইয়া নিজেও স্নান সারিয়া লইল। আজ বাড়ীতে বিশেষ খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন হইয়াছে। বিজয় ও তাহার বন্ধুকে প্রসাদের সহিত খাইতে বলা হইয়াছে। সেইজন্য পাড়ার নিমন্ত্রণ লওয়া হয় নাই।

রান্না করিতেছে সুমিত্রা। সে রান্না করিতে খুব ভালবাসে। রান্না করিতে না দিলে তাহার রাগ হয়। হেমাঙ্গিনী তরকারির ডালা লইয়া বসিয়াছে বঁটি পাতিয়া। গঙ্গামণি তদারক করিয়া বেড়াইতেছিলেন। এমন সময় সুবর্ণ কানুকে গঙ্গামণির কাছে ঠেলিয়া দিয়া কহিল, "আমি বিনুকে নিয়ে একটু পাড়ায় থেকে ঘুরে আসি মা, ও রইল।"

"এত বেলায় আবার কোথায় টো টো করতে যাচ্ছিস্? শিগ্‌গির করে ফিরে আসিস্ কিন্তু? রান্না-বান্না প্রায় হয়ে গেছে, প্রসাদরা বেড়িয়ে ফিরলে স্নান করে খেতে বসবে।" বলিয়া গঙ্গামণি সস্নেহে কানুকে বুকে তুলিয়া লইলেন।

সুমিত্রা রান্না রাখিয়া বাহির হইয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া সুবর্ণর কানে কানে কহিল, "আজ শনিবার, তুই যে কোথায় যাচ্ছিস্ আমি তা টের পেয়েছি। ক'দিন ডাক্তারের চিঠি আসে না তাতেই এত দাপাদাপি। মাগো, কি ঢং জানিস্ সুবর্ণ? মাকে সত্যি কথা বলে গেলে কি হ'ত?"

সুবর্ণ ধীরে জবাব দিল, "বলে গেলে যেতে মানা করতেন। দেখ্ দিদি তোর পায়ে পড়ি, তুই আর হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিস্ নে।" বলিয়া সুবর্ণ হাসিতে হাসিতে বিনুকে লইয়া পথে পা বাড়াইয়া দিল।

বিনু দুই বোনের কথার অর্থ বুঝিতে পারিল না। প্রশ্নও করিল না। পথে বাহির হইয়া তাহার চিত্ত পুলকে পূর্ণ হইয়া গেল। তখন স্নানের বেলা হইয়াছে, পাড়ার বৌ-ঝিরা কলসী কাঁখে চলিয়াছে দীঘিতে। এ পাড়ার মেয়েরা নদীতে যায় না। সড়কের দুই ধারে সরোবর বিপুল জলভারে টলমল করিতেছে। এক এক পাড়ার এক এক ঘাট। ঘাট আলো করিয়া জটলা করিতেছে হরিহরপুরের মহিলামণ্ডলী।

দক্ষিণে সড়ক রাস্তা রাখিয়া সুবর্ণ দীঘির গায়ের সঙ্কীর্ণ বনপথে চলিল। ছায়ানিবিড় বনতল বিহগের কলকূজনে মুখরিত।

পথিপার্শ্বে টিনের আটচালা একখানা ঘর। প্রকাণ্ড আঙ্গিনা। বেল শেওড়া তেঁতুল বটবৃক্ষে যেন প্রাচীর দেওয়া হইয়াছে। অতি নির্জ্জন স্থান, 'পাখী সব করে রব' ভিন্ন এ অঞ্চল বসতিবিরল। চারদিকে ফাঁকা ফাকা মাঠ, কোথায়ও শস্যক্ষেত্র, কোথায়ও জলাভূমি।

সুবর্ণ বিনুকে লইয়া সেই তরুশ্রেণী পরিবেষ্টিত আঙ্গিনায় প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে কহিল, "তুই এখানে আর কখনও কি আসিস্ নি বিনু? এটা হ'ল বগলা সখীর থান। বগলা বিধবা হয়ে অভয় মিস্তিরের সাথে বেরিয়ে এসে এখানে কালীর বার করেছে। কালী পুজো করে বারে ব'সে সে সব কথা জানতে পারে, বলে দেয় লোককে। রাজ্যের ভূতে-ধরা লোকের ভূত ছাড়ায়। অভয় দেয় শিকড়-বাকড় ওষুধ, জলপড়া ধুলোপড়া তেলপড়া।"

বিনু কালীর বারের কথা জানে কিছু কিছু। তাদের গ্রামেও শনি মঙ্গল বারে শ্রীমতী গোপিনী বারে বসে মা কালীর প্রতিনিধি হইয়া ভূত-ভবিষ্যৎ বলিয়া দেয় ইতর-সাধারণকে। শ্রীমতী বালবিধবা, তাহার ভৈরব হইল তারিণীচরণ নমঃশূদ্র। সেখানেও ভূত-প্রেতের মেলা বসিয়া যায়।

এখানেও তাহাই, কিন্তু বগলা দাসীকে বিনু এ পর্য্যন্ত স্বচক্ষে দেখে নাই। সুবর্ণর কথায় তাহাকে দেখিবার আগ্রহ যেমন সজাগ হইল, তেমনি ভূত-প্রেতের নামে কেমন ভয় ভয় করিতে লাগিল। বিনু সবিস্ময়ে ভাবিতে লাগিল, এখানে সুবর্ণর কিসের প্রয়োজন? কিন্তু তাহার সে বিস্ময়ের সমাধান হইতে বিশেষ বিলম্ব হইল না।

ঢেউতোলা আটচালা ঘরখানা তিন ভাগে বিভক্ত। সম্মুখের অংশে জলচৌকির উপরে এক মাটির কালীমূর্ত্তি। সামনে মাটির ঘটের উপরে আম্র-পল্লবের উপরে সিন্দুরের ফোঁটায় শোভিত একটি নারিকেল। সামনে একখানা বিবর্ণ চটের আসন পাতা। সেই আসনে বসিয়াছে এক আধা-বয়সী আধ-ময়লা থান-পরা এক স্ত্রীলোক। মাথায় তাহার লম্বা লম্বা জটা, বক্ষে বাহুতে লুটাইয়া পড়িয়াছে। গলায় ও বাহুমূলে রুদ্রাক্ষের ও জবা ফুলের মালা। ইনিই বগলা দাসী, ইহারই বার হয় শনি মঙ্গল

বারের ভরা দ্বিপ্রহরে। একটি বিল্বদল ও জবা মায়ের পায়ে অর্পণ করিয়া খানিকটা জিভ বাহির করিয়া বগলা দাসী কালী হইয়া যায়।

উঠানভরা নিম্নশ্রেণীর স্ত্রী-পুরুষ। সকলে ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিতে লাগিল। স্ত্রীলোকরা উলুধ্বনি দিয়া উঠিল।

সুবর্ণ কালী প্রতিমার সামনে প্রণামান্তে বিনুর হাত ধরিয়া বসিল বারান্দায়।

বগলা আধ-বোজা চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সুবর্ণকে লক্ষ্য করিয়া প্রথমেই বলিতে লাগিল, "সুবর্ণ দিদি আইচে জানতে ডাক্তারবাবুর বার্তা। তেঁই ভাল রইচে। পত্তর আসিবেন শিগ্‌গির। ভাবনের কিছু নাই। ঠিক কইচি না?"

সুবর্ণ অঞ্চলে বাঁধা পাঁচটা পয়সা সেইখানে নামাইয়া দিয়া পুনরায় প্রণাম করিয়া মাথা তুলাইল।

আবার উলুধ্বনি হইল চতুর্দ্দিক্ হইতে।

এবার বাগ্দী বৌ মলার ভূত ছাড়াইবার পালা। মলার বয়স বেশী নয়, মাত্র পনের-ষোল বছরের দিব্য হৃষ্টপুষ্ট লাবণ্যবতী মেয়ে। মাথায় আধ-ঘোমটা, সঙ্গে পিতামাতা ও স্বামী নফর আসিয়াছে। সাত-আট দিন হইল মলার উপরে প্রেতের আবির্ভাব হইয়াছে। সে আপনার মনে কখনও হাসে, কাঁদে, কথা বলে। কিছু খাইতে চায় না। স্নান করিতে আপত্তি করে।

প্রৌঢ়বয়স্ক অভয় মিস্তির সহসা রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইল মলার ভূত ছাড়াইতে। তাহার পরিধানে লাল টকটকে একখানা চেলির শাড়ী, গায়ে কালী নামের নামাবলী। গলায় জবাফুলের মালা। লম্বা চুলের গ্রন্থিতে একটা জবাফুল বাঁধা, হস্তে একখানা সরু লিকলিকে বেত।

অভয় আচমকা মলার পিঠে এক ঘা বেত মারিয়া বিকট কণ্ঠে চিৎকার করিল, "তুই কে? কেনে আইচিস্ মলার লগে?"

কঠিন আঘাতে মলার মাথার কাপড় খসিয়া গেল। গায়ের কাপড় আলুথালু হইল। সে ভীত ব্যাকুল হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল, "আমারে মাইরো না ওস্তাদ, দুঃখু লাগিচে।"

"মাইরব না, মাইরা তরে ছাতু ছাতু কইর‍্যা দিমু। তুই কেনে আইচিস্ ওর ঠাঁই, তুই কে? ক', কয়ে ফ্যাল?" বলিতে বলিতে অভয় সজোরে আরও দুই ঘা বেত বসাইয়া দিল মলার পৃষ্ঠে বাহুতে।

মলা দুই হাতে তাহার মাকে জড়াইয়া ধরিয়া ডুকরাইয়া কাঁদিতে লাগিল "ওরে, মারে, আমারে মাইর‍্যা ফেলাইলো, ফুলে ঢোল হইল বেবাক অঙ্গ। জ্বলনে লাগছে আগুনের নাগাল। মারে, আমারে এ্যাকটুনি জল খাইতে দে।"

মা'র চোখ দিয়া জল ঝরিতেছিল ঝর ঝর করিয়া। সে অভয়কে জিজ্ঞাসা করিল, "ওস্তাদ বাবা, ম্যায়াডারে জল দিমু এ্যাকটু?"

"জল দিবে, কিসের লেগে? আগে ওইটা ঘাড়ে থিকা নামুক তবে না জল?" কহিয়া ওস্তাদ আর এক ঘা বেত লাগাইল মলার কোমরে।

মলা মায়ের কোলের উপরে যন্ত্রণায় আছাড়ি বিছাড়ি করিতে লাগিল।

এক মাটির সরায় কিসের শিকড়-বাকড়ের আগুন করাই ছিল। তাহার মধ্যে কয়েক খণ্ড হলুদ নিক্ষেপ করিয়া অভয় সরাখানা ধরিল মলার নাকের সম্মুখে। ধরিয়া ফের হুঙ্কার দিল, "ক, শীগ্‌গিরি তুই কে? তর মা'র নাম কি? বাপের নাম কি? তুই কয়মাসের জ্যাইরা? ইহারে পাইলে কনে? ধরিলে কেনে? ক,' না কইলে তরে এহনি শ্যাষ করে দিমু।"

অর্দ্ধমূর্চ্ছিতা মলার মুখ হইতে কাতরোক্তি বাহির হইতে লাগিল, "মোর বাপ হইচে করিম সেখ, মা হইচে কাতু বামুনী। চার মাসের সময় পাচি ওযুধ দিইয়া আমারে নষ্ট করে দিইছেল। আমি পাগাড়ে তেঁতুল গাছের মগ ডাইল্যে বস্যা ছেলাম। মঙ্গলবারের দুপুরে মলা গেইছেল আগলা চুলে পাতা কুড়াইতে। চুল বায়ে ওর ঘাইর‍্যে চইড়্যা আইচি মুই।"

"আইচিস্ যেমতি-তেমতি এহন ছাইড়্যা যাইবি কি না তাই ক'?"

"ছাড়ুম কেনে? সরেশ মাল পাইচি, মজা কইরা রইব?"

'তর মজা কইর‍্যা থাকন বার করচি শয়তান! চাবুকের চোটে গায়ের ছাল-বাকলা তুইল্যা ছাড়মু।" বলিবার সঙ্গে সঙ্গে চলিল চাবুক।

মলার প্রতি ভয়াবহ অত্যাচার নিরীক্ষণ করিয়া বিনুর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল। নিজের অজ্ঞাতসারে চোখের জলে বুকের কাপড় ভিজিয়া গিয়াছিল। সে অস্ফুট কণ্ঠে সুবর্ণকে কহিল "দিদি, চল বাড়ী যাই। আমি আর থাকতে পারচি না এখানে।"

সুবর্ণও বিগলিত হইয়াছিল, কিন্তু কৌতুহলের তথনও নিবৃত্তি হয় নাই। সে চুপে চুপে উত্তর দিল, "ভূতটা ছেড়ে গেলেই চল যাই। ভূত-প্রেত ডাক্তার বিশ্বাস করেন না। বলেন হিষ্টিরীয়া ব্যারাম।"

"তা হ'লে ওসব কথা বলবে কেন?"

এবারের প্রহারের চোটে মলা অজ্ঞান অবস্থায় অতিকষ্টে উচ্চারণ করিল, "মুই যাইচি, যাইচি।"

"তুই যে ছাড়ি যাইচিস্ তার নিশানা দে। নিশানা কি?"

মলা গোঁ গোঁ শব্দে কি বলিল তাহা সাধারণ বুঝিতে পারিল না। অভয় কিন্তু ঠিক বুঝিয়া অট্টহাস্য করিয়া কহিল, "কাঁচ্চা ব্যাল নিশানা। হাঃ হাঃ, কাঁচ্চা ব্যাল।"

জঙ্গলের মধ্য হইতে অকস্মাৎ একটা কাঁচা বেল ধুপ করিয়া উঠানে আসিয়া পড়িল।

মেয়েরা আনন্দে উলুধ্বনি দিতে লাগিল। মলার স্বামী সোয়া পাঁচ আনা পয়সা কালী প্রতিমার সামনে রাখিয়া আভূমি নত হইয়া প্রণাম করিয়া, নখে খুঁটিয়া খানিকটা মাটি লইয়া স্ত্রীর মাথায় সারা গায়ে মাখাইয়া দিতে লাগিল। কিন্তু মলা অচৈতন্য, তাহার সাড়া নাই।

অভয় পাকা ওস্তাদ ভূত ছাড়াইবার। সে তাড়াতাড়ি লইয়া আসিল এক ঘটি জলপড়া, এক বাটি তেলপড়া। মাটির সরায় করিয়া পড়া ধুলা।

মলার দাঁতে দাঁত লাগিয়া গিয়াছিল। লোহার শিক দিয়া দাঁত খুলিয়া জল দেওয়া হইতে লাগিল মুখে-চোখে। তেল দেওয়া হইল খাবলা খাবলা মাথায়। নফর সারা গায়ে ধুলা মালিস করিতে লাগিল।

সেবা-যত্নে অনেকক্ষণ পরে মলার জ্ঞান হইল। সে চারিদিকে তাকাইতে লাগিল ফ্যাল ফ্যাল করিয়া।

এবার আসরে প্রবেশ করিল একটি কুড়ি-বাইশ বছরের কৃষাণ ছেলে, তাহাকে নাকি তেপান্তরের মাঠের শেওড়া গাছের পেত্নী দৃষ্টি করিয়াছে।

'বার' হইতে বাহিরের পথে পা বাড়াইয়া বিনু পিঠে হাত দিয়া দেখিল। সে স্নানান্তে আসিয়াছে। সুবর্ণ সাবধানী মেয়ে, বিনুর ভিজা চুলের আগায় একটি গ্রন্থি বাঁধিয়া দিয়াছিল, এখনও তাহা খুলিয়া যায় নাই। কাজেই চুলের ডগা বাহিয়া ভূতের ঘাড়ে চাপিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ভরা দ্বিপ্রহরে ঘন ছায়াচ্ছন্ন দীঘির পাড় দিয়া পথ চলিতে চলিতে তাহার গা ছম ছম করিতেছিল। "চোখ গেল, চোখ গেল" পাখীর ডাকে সে সচকিত হইয়া বলিল, "এমন জায়গায় কেউ আসে নাকি দিদি? কেন তুমি এসেছিলে?"

দিদি বলিল, "কেন যে এসেছিলাম তা ত শুনলি বিনু। তুই কি এর আগে আর কখনও বার দেখিস্ নি? তোদের গাঁয়ে কি কালীমার থান নেই?"

"আছে, শ্রীমতী গয়লানীর কালীর থান। ঠাকুমা আমাকে একদিনও সেখানে যেতে দেন নি। রাম রাম, ওখানে মানুষ নাকি যায়, দু'দিন জামাইবাবুর চিঠি পাও নি, তাতে হয়েছে কি?"

সুবর্ণ মুচকি হাসি হাসিল, "কি যে হয়, সেটা তুই দুদিন পরে বুঝবি। ছেলেমানুষ, সবে বিয়ে হয়েছে, জানবি কি ক'রে?" ক্রমশঃ

পুরণো খাতা

শ্রীসীতা দেবী

শিপ্রার ঠাকুরমা বড় হঠাৎ মারা গেলেন। বয়স তাঁর অবশ্য যথেষ্টই হয়েছিল, রুগ্ন আর জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছিলেন, তবু সংসারের হাল দৃঢ়হাতে তিনিই ধরেছিলেন। নাতি-নাতনীরা তাঁকে বাদ দিয়ে নিজেদের সংসারটাকে ভাবতেই পারত না। মাও কাকীমারা কাজ করে যেতেন বটে, কিন্তু সবই ঠাকুরমার নির্দেশ মত। তাঁরা যে স্বাধীনভাবে কাজকর্ম চালিয়ে যেতে পারেন তা যেন কেউ ভাবতেই পারত না, তাঁরা নিজেরাও পারতেন কি না সন্দেহ।

ঠাকুরমা হঠাৎ ঘণ্টা-খানিকের অসুখেই চলে গেলেন। কাউকে বেশী কিছু বলেও যেতে পারলেন না। তাঁর সবচেয়ে আদরের নাতনীকে শুধু বললেন, "কালো ষ্টীল ট্রাঙ্কটা খুলে দেখো।"

কয়েকটা দিন এমন দারুণ গোলমালের ভিতর দিয়ে কাটল যে শিপ্রা কাউকে সে কথা বলবারই সময় পেল না। শ্রাদ্ধ-শান্তির জোগাড়টা আগে হ'ল। ব্রাহ্মণের পরিবারে তাড়াতাড়ি সেটা চুকেও গেল। তার পর সাংসারিক দিকে দৃষ্টি পড়ল নূতন কর্ত্তা-গিন্নীদের। উইল করা আছে উকীলের বাড়ী শোনা গেল। উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবার, টাকা কড়ির অঢেল প্রাচুর্য্য যেমন ছিল না, তেমনি অভাব-অনটনও ছিল না। ঠাকুরমা নিজে বড়লোকের মেয়ে ছিলেন, গহনাগাঁটি টাকাকড়ি সবই প্রচুর পেয়েছিলেন, সে সবের ব্যবস্থা চিরকাল নিজেই করেছেন। শিপ্রার ঠাকুরদা অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সেই মারা গিয়েছিলেন, ছেলেদের তখনও বিয়েই হয় নি। তিনিও সম্পন্নঘরের ছেলে, বিষয়-সম্পত্তি ছিল খানিক। সব তিনি স্ত্রীর নামে লিখে গিয়েছিলেন, যতদিন মা বেঁচে থাকবেন ততদিন সন্তানেরা দখল পাবে না। সুতরাং সবকিছুরই কর্ণধার ছিলেন ঠাকুরমা।

এরপর উকীলবাবু এসে উপস্থিত হলেন একদিন। উইল পড়া হ'ল। যে যা পাবে ভেবেছিল, মোটামুটি তাই পেল, বেশী নিরাশ কাউকে হ'তে হ'ল না। কিন্তু উইলে লেখা একটা ব্যবস্থার মানে কেউ বুঝতে পারল না। ঠাকুরমার বাপের বাড়ীর গ্রামের এক প্রতিবেশী পুত্রকে তিনি বরাবরের মত দেড়শ' টাকা করে মাসহারা দেবার ব্যবস্থা করে গিয়েছেন। কিসের জন্য, কেউ জানে না। উকীলবাবুও এবিষয় কিছু ব্যাখ্যা দিতে পারলেন না।

বললেন, "এমনি রাশভারি মানুষ ছিলেন যে, নিতান্ত দরকারী কথা ছাড়া, একটা বেশী কথা তাঁকে কোনদিন জিজ্ঞেস করতে পারি নি। যা বলেছেন শুনেছি, নির্দ্দেশমত কাজ করে গেছি।"

বড়ছেলে প্রভাস বললেন, "সত্যি কথাই, জন্মাবধি মাকে ভালবেসেছি যত না, ভয় করেছি তার চেয়ে বেশী। এখন যে বুড়ো হ'তে চললাম, মাথার চুলে পাক ধরেছে, এখনও তাঁর কথার উপর কথা বলতে সাহস হয় নি। তিনি যে ব্যবস্থা করেছেন সেই ব্যবস্থাতেই সংসার চলেছে।"

বড়বৌ, অর্থাৎ শিপ্রার মা বললেন, "ভাগ্যে সেই ব্যবস্থায় চলেছিল সব, তাই এখনও ভিক্ষে করতে বেরোতে হয় নি, নইলে এতদিনে কিছু বাকি থাকত কি না? সব ফুটকড়াই হয়ে যেত।"

মেজছেলে বিভাস বললেন, "তা বাপকে বেটা যখন, তখন খরচের হাত খানিকটা হবেই। উনি নাকি বাবা অল্পবয়সে খুব খরচে লোক ছিলেন। এই নিয়ে ঠাকুরদাদার সঙ্গে তাঁর মতান্তর, মনান্তর লেগেই থাকত। কিন্তু বাবার সহায় ছিলেন ঠাকুরমা, তিনি দরাজ হাতে যত খেয়ালের রসদ যোগাতেন। কিন্তু তিনি বাঁচেন নি বেশীদিন, কাজেই বাবার সুখের দিন শেষ হ'ল। তার পর মাও এই সময় এসে সংসারের হাল ধরলেন। ব্যস্, তখন থেকেই বাবা একেবারে ভালমানুষ হয়ে গেলেন। পৈত্রিক সম্পত্তি নিতান্ত মন্দ পান নি, তা পেতে না পেতেই

সব মায়ের নামে লিখে দিলেন। হাত পেতে তাঁর কাছ থেকে হাতখরচের টাকা নিতেন ছেলেমানুষের মত, মনে আছে। মা-ই ছিলেন বাড়ীর কর্ত্তা-গিন্নী একাধারে।''

ছোটছেলে সুভাস বললেন, "আমার কিন্তু বেজায় রাগ হ'ত বাবার উপর। কেন এমন তিনি?''

শিপ্রার মা বললেন, ''তিনি এমন ছিলেন বলেই বেঁচে গেছ সবাই। নইলে যা মাগ্যিগণ্ডার দিন এখন, কাউকে আর সংসার চালাতে হ'ত না। মেয়ের বিয়ে, ছেলের পড়াশুনো, কোন্ ভাবনাটা তিনি না ভেবে গেছেন বল দেখি? প্রত্যেক ছেলের পড়ার জন্যে টাকার ব্যবস্থা আছে, প্রত্যেক মেয়ের নামে গহনা আছে, টাকা আছে। তোমাদের কারও এত লক্ষ্য আছে সংসারের দিকে?"

প্রভাস বললেন, ''তা না হয় নাই আছে। যাক্, তাঁর তুলনায় আমরা যে একেবারেই বাজে সে বিষয়ে সন্দেহ কি? কিন্তু আমার এখন একান্ত জানবার আগ্রহ তিনি কিসের জন্যে এই অজানা মোহন মিত্রকে মাস মাস এতগুলো করে টাকা দিতে বলে গেলেন। এর নামও ত আমি কোনদিন শুনি নি।"

শিপ্রা এই সময় উঠে এসে মায়ের কানে কানে বলল, ''ঠাকুরমা আমাকে বলে গেলেন, 'কালো ট্রাঙ্কটা খুলে দেখো'।"

শিপ্রার মা বললেন, ''ওমা তাই নাকি? আগে বলিস্‌নি ত? এখনি খুলে দেখছি আমি।"

যে ঘরে ঠাকুরমা মারা গিয়েছিলেন, সবাই মিলে এখন সেই ঘরে এসে ঢুকলেন। উকীলবাবুকেও তাঁরা নিয়ে এলেন সঙ্গে করে।

মস্ত বড় ঘর। এই ঘরেই ঠাকুরমা বৌ হয়ে এসে ঢুকেছিলেন, এইখানেই দীর্ঘ জীবন কাটিয়ে গিয়েছেন। তাঁর বাপের বাড়ী থেকে আনা আসবাবপত্রে ঘর এখনও তেমনি ভাবেই সাজান আছে। পুরণো ধাঁচের জোড়া-ঘাট, আলমারি, আলনা, আয়না সব এখনও ঝকঝক্ করছে, কিছু নষ্ট হয় নি, রংটা কালের প্রকোপে একটু ম্লান, একটু গাঢ় হয়ে গেছে এই যা। তিনি বেঁচে থাকতে যে জিনিস যেখানে ছিল, সেই ভাবেই রাখা আছে, নড়ান হয় নি এক চুলও। ছোট টেবিলের উপর তাঁর হিসেব লিখবার খাতা, ধোপার খাতা আর একটি পুরণো ফাউণ্টেন পেন সাজান আছে। পাশে চশমা জোড়া। আর একধারে চার-পাঁচখানা বই। সবই যে ধর্ম্মপুস্তক তা নয়। গীতা যেমন আছে, গীতাঞ্জলিও আছে, রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' আছে। এ বইখানি তিনি প্রায়ই বারবার করে পড়তেন। ঘরে ছোট একটি আলমারিতে অনেক বই সাজান। এগুলি শিপ্রা ছাড়া আর কারো হাতে করবার অধিকার ছিল না। তাঁর সব বইগুলি তিনি তাকেই দিয়ে গিয়েছিলেন। সেগুলির দিকে তাকিয়ে শিপ্রার চোখে জল এসে গেল।

কাপড় গহনাই কি তাঁর কম ছিল? সব ঐ বড় আলমারিতে তোলা আছে। কতবার খুলে নাতনীদের দেখিয়েছেন। কে কোন্‌টা নেবে তাও ভাগ হয়ে গেছে। নাতিদের বৌ এলে এক একখানা গহনা পাবে, বাকি গহনা ও সমস্ত কাপড়-চোপড় নাতনী আর বৌদের ভাগ করে দিয়ে গিয়েছেন। নাতবৌরা নূতন মানুষ সব আসবে, তারা তাঁকে জানবে না, চিনবে না, তাঁর জিনিস-পত্রের সঙ্গে কোন স্মৃতির সুবাস জড়ান থাকবে না তাদের কাছে। পুরণোকালের সাবেকী পছন্দের জিনিস অবহেলায় নষ্ট করে ফেলবে তারা। তার চেয়ে নাতনীদের কাছে থাক। তারাও আধুনিকপন্থী কম নয়, তাদের রুচি সম্পূর্ণ অন্যরকম হয়ে গেছে, তবু তাঁকে ভালবাসত বলে জিনিসগুলিকে অযত্নে নষ্ট করবে না।

ঠাকুরমা জীবনে বোধহয় কখনও ময়লা কাপড় পরেন নি। এখনও ধবধবে শাদা দুখানা থানধুতি আলনায় ঝুলছে, পূজার সময় যে গরদখানা পরতেন তাও রয়েছে। কাপড় ধোপার বাড়ী দিতেন না, যতদিন শরীরে শক্তি ছিল, নিজেই 'লাক্স' দিয়ে কাচতেন। বেশী বুড়ো হয়ে যাবার পর বৌরাই একাজের ভার নিয়েছিলেন।

মেজবৌ বিষণ্ণভাবে বললেন, ''কে বলবে যে মা চির-দিনের মত চলে গেছেন। মনে হচ্ছে এখনই যেন এসে ঘরে ঢুকবেন।''

বিভাস বললেন, "তাঁর আলমারি দেরাজ সবই ত তোমরা অনেকবার খুলে দেখেছ। খাটের তলার ঐ কালো বাক্সটা কেউ কোনদিন খোল নি?"

শিপ্রা বলল, "ওটা ত তিনি কখনও আমাদের সামনে খুলতেন না। কি আছে জিজ্ঞেস করলে বলতেন, সব পুরণো কাগজ, খাতাপত্র।"

বড়বৌ ঠাকুরমার চাবির তাড়াটা আঁচলে বেঁধে নিয়ে এসেছিলেন। সেটা স্বামীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "খুলে দেখ।"

ট্রাঙ্কটা টেনে বার করা হ'ল। প্রভাস চাবি বেছে বেছে ঠিকটা বার করে চাবি ঘোরালেন। মৃদু আর্ত্তনাদ করে বাক্সের ডালা উঠে পড়ল।

সত্যিই বেশীর ভাগ কাগজ আর খাতা। চেহারা দেখে বোঝা যায় সবই আগের দিনের। চিঠিপত্র অনেক। ঠাকুরমার বাবা-মায়ের লেখা, কাগজ হলদে খড়খড়ে হয়ে এসেছে। মাঝে-মাঝে কালো ছোপ ধরেছে। খাতাও অনেকগুলি। হিসাবের খাতা বেশীর ভাগ। সবের উপর তারিখ দেওয়া।

তিন ছেলে তিনখানা খাতা নিয়ে দেখতে লাগলেন। প্রভাস বললেন, "ঠাকুরদা যখন মারা যান, তখন থেকেই হিসাব আরম্ভ দেখছি। তাঁর শ্রাদ্ধের সব খরচ টোকা রয়েছে।"

সুভাস বললেন, "পরে পরে ঠিক সাজান আছে। একটাও missing নয়।"

বিভাস হঠাৎ এক জায়গায় আঙুল দিয়ে বললেন, "এখানেও একজন মানুষের নাম দেখছি যাঁকে কোনদিন আমরা চিনি নি। পর পর তিনমাস দেখছি লেখা রয়েছে 'মহিমদাকে—২০০৲'।"

শিপ্রার ছোটবোন বুলু বলল, "ঠাকুমার কাছে আমি দু-একবার এঁর নাম শুনেছি, কিন্তু ঠাকুমার বাপের বাড়ী রতনপুরের লোক উনি। ওঁর গায়ে সে কি ভীষণ জোর ছিল। একবার নাকি তাঁর মা আর তিনি মিলে একদল ডাকাত তাড়িয়েছিলেন। মায়ের হাতে ছিল রামদা, ছেলের হাতে ছিল লোহার ডাণ্ডা। ডাকাতরা সব বাপ্ বাপ্ করে পালাল মার খেয়ে।"

শিপ্রার দাদা অতুল গুরুজনদের কান বাঁচিয়ে নীচু গলায় বলল, "একেবারে ভারতীয় রবিন হুড। সে কালেও রোমান্স জিনিষটা ছিল বলে সন্দেহ হচ্ছে।"

শিপ্রা তাড়া দিয়ে বলল, "আঃ, কি বাজে বকছ, কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই।"

হিসাবের খাতাগুলি উল্টে-পাল্টে সবাই দেখল। এখন থেকে বছর পনের আগে মহিমদাকে টাকা পাঠান বন্ধ হয়েছে। তার জায়গায় লেখা আছে এর পর থেকে "মোহনের খরচের জন্য ১৫০৲ টাকা।"

এই খাতাগুলির নীচে অপেক্ষাকৃত আরো একখানি মোটা খাতা রয়েছে। উপরে লেখা "আমার মৃত্যুর পর প্রভাস, বিভাস ও সুভাস পড়িয়া দেখিবে।"

উকীলবাবু বললেন, "তিনজনের ত একসঙ্গে পড়া সুবিধে নয়। প্রভাসবাবু আগে পড়ুন, আপনি বড় ছেলে। তারপর অন্যরা পড়বেন এখন। আমি এখন আসি। পরে জেনে নেব সব আপনাদের কাছে।" এই বলে তিনি প্রস্থান করলেন।

ছেলে-বৌ, নাতি-নাতনী সবাইকারই কৌতূহল, কিন্তু এ ত সবাই মিলে বসে চেঁচিয়ে পড়বার জিনিষ নয়! বড়দের হয়ে গেলে তবে ওঁরা খানিক খানিক জানাবে ছোটদের, তাও সবটা হয়ত জানাবে না। এখনকার মত যে যার নিজের কাজে চলে গেল। প্রভাস খাতাখানা নিয়ে নিজের শোবার ঘরে ঢুকে খাটে শুয়ে পড়লেন। প্রথম পৃষ্ঠা খুলে দেখলেন, এ তাঁর মায়ের আত্মজীবনের ইতিহাস। সমস্ত জীবনের না হ'তে পারে, তবে তাঁর তরুণ বয়স থেকে আরম্ভ করে, প্রায় প্রৌঢ় জীবনের শেষ পর্যন্তই হয়ত। মায়ের লেখা বেশ স্পষ্ট গোটাগোটা, পড়তে কোন কষ্ট হ'ল না।

আমি পাড়াগাঁয়ের মেয়ে। ভাগ্যচক্রে বিয়ে হয়েছিল কলকাতার শহরে। এখানেই চিরজীবন কাটিয়ে গেলাম। একটা দুরাশা ছিল যে শেষ বয়সে যদি সব কর্ত্তব্য শেষ করতে পারি, তা হ'লে আবার রতনপুরে ফিরে যাব। যেখানের আলোয় প্রথম চোখ চেয়েছিলাম, সেই আলোতেই পৃথিবীর দিকে শেষ-চাওয়া চেয়ে চির-দিনের মত চোখ বুজব। কিন্তু আমি পারি নি ফিরে যেতে। কর্ত্তব্যের শৃঙ্খল আমাকে এই শহরের সঙ্গে বেঁধে রেখে দিল, এইখানেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলে যাব। রতনপুর একবার শুধু ভেসে উঠবে মানস-চোখে ছবির মত। সেই পথঘাট, সেই বাড়ী, বাগান,

নদী আর মাঠ। যদি মানুষের আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে মৃত্যুর পর, যদি তার যেখানে ইচ্ছা যাবার সাধ্যি থাকে, তা হ'লে ফিরে যাব আমার প্রথম জীবনের সেই আনন্দ-নিকেতনে।

বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান আমি। বাবা বেশ সম্পন্ন মানুষ ছিলেন, গ্রামের মধ্যে তিনি দিক্‌পালের গৌরবে বিরাজ করতেন। শুধু টাকায় বড় লোক ছিলেন না তিনি, হৃদয়ের দিকে বড় ছিলেন, চরিত্রের দিকে বড় ছিলেন, বিদ্যায় বুদ্ধিতে বড় ছিলেন। গ্রামের সমস্ত লোক তাঁকে পিতার মত ভক্তি করত, পিতার প্রতি মানুষের যে নির্ভর, সেই নির্ভর ছিল তাঁর প্রতি। আচার-আচরণে তিনি যথাসম্ভব সামাজিক নিয়মাদি পালন করেই চলতেন। কিন্তু মানবধর্ম্মের খাতিরে কুসংস্কারকে গোঁড়ামিকে ভাঙতেও অনেক সময় দ্বিধা করতেন না। ন্যায়ধর্ম্মের চেয়ে বড় ব'লে তিনি আর কোন ধর্ম্মকে মানতেন না।

আমার সব শিক্ষা তাঁর কাছে। লেখাপড়া শেখাটা পাড়াগাঁয়ের ছেলেদেরই তখন বিশেষ ঘটে উঠত না। অধিকাংশ লোকের শিক্ষা দেবার মত ক্ষমতা ছিল না। জাত-ব্যবসা শিখে কোনমতে তারা করে খেত। মেয়েদের বেলা এ চিন্তাই কেউ করত না, এ যে অসম্ভব বিলাসিতা।

আমি কিন্তু ছোটবেলা থেকেই পড়াশুনা আরম্ভ করেছিলাম। বাবা আমাকে ইংরিজি আর অঙ্ক শেখাতেন, গ্রামের পাঠশালায় পণ্ডিতমশায় আমাকে শেখাতেন বাংলা আর সংস্কৃত। আর পাশের বাড়ীর মহিমদার কাছে লাঠি খেলা, ক্রিকেট খেলা শিখতাম। তিনি আমার চেয়ে সাত-আট বছরের বড় ছিলেন, কিন্তু বাল্যকালে তাঁর সমান বন্ধু আমার কেউ ছিল না, সমবয়সীদের মধ্যেও না। বাবা কোন কিছুতে বাধা দিতেন না। বলতেন, "আমাদের ছেলে বলতেও সুলোচনা, মেয়ে বলতেও সুলোচনা। ওকে ছেলের শিক্ষা মেয়ের শিক্ষা দুইই পেতে হবে। না হ'লে এত সব বিষয়-সম্পত্তি পাঁচ ভূতে লুটে নেবে, ও সামলাতে পারবে না।"

মা বলতেন "যাই হোক, ও হিন্দুর মেয়ে ত বটে, বিয়ে করে সংসার করতে হবে ত? বৌ হাতাবেড়ি ছেড়ে লাঠি-শড়কি ধরলে কেউ খুশী হবে শ্বশুর-বাড়ীতে?"

বাবা বলতেন, "আমার মেয়ে যে-বাড়ীতে যাবে, সেখানকার সবাইকে খুশী করবে, দেখে নিও।"

মহিমদার সঙ্গে মেশাটা মা অপছন্দ করতেন না, কিন্তু মাঝে মাঝে অনুযোগ করতেন, "বাবা মহিম, ওকে এরকম মহিষমর্দ্দিনী করে কি লাভ হচ্ছে? মেয়েছেলে ঘর-করণার কাজ শিখলেই ত ঢের।"

মহিমদা বলতেন, "সংসারে মহিষ যে বড় বেশী কাকীমা, তাদের মর্দ্দন করবার ক্ষমতা রাখা ভাল। সারাদিনই ত ওকে লাঠি খেলা শেখাই না, ঘর-করণার কাজ শেখবার যথেষ্ট সময়ই থাকে।"

পাড়াগাঁয়ের আদর্শে আমার বুড়ো বয়সে বিয়ে হয়। চৌদ্দ বছর যখন আমার বয়স, তখন বিয়ের সম্বন্ধ হ'তে আরম্ভ হ'ল। ঘটক-ঘটকীর আনাগোনা সুরু হ'ল। সাধারণতঃ কিশোরী মেয়েরা বিয়ের ব্যাপারে খুবই উৎসাহ অনুভব করে, আমার কিন্তু দারুণ অভিমান হ'তে লাগল। আমি যে একেবারে চাই না সবাইকে ছেড়ে যেতে। মা, বাবা, সব আত্মীয়-স্বজন, রতনপুর গ্রাম, আমার সহচর-সহচরী সব ছেড়ে আমি কোথায় যাব, কাদের মধ্যে? কোন নূতন মানুষকে কি এমনি করে কোনদিন ভালবাসতে পারব? বাবা, মা কেন এমন শত্রুতা করছেন আমার সঙ্গে? অথচ এও জানতাম যে, হিন্দুর মেয়ে, আমার বিয়ে না করে উপায় নেই।

কত সম্বন্ধ এল, কত সম্বন্ধ গেল। মুখ ফুটে কেউ কিছু বলত না, কিন্তু বাবারও সমালোচকের অভাব ছিল না গ্রামে। মেয়েছেলেকে একেবারে ছেলের বাড়া করে তুলেছে, এই ছিল বেশীর ভাগ লোকের মত। গ্রামের মেয়েদের দশ বছর বয়স হ'তে না হ'তেই বিয়ে হয়ে যেত। আমার চৌদ্দ বৎসর বয়স গ্রামের লোকের মুখে মুখে সেটা আঠার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারপর আমি বেটাছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা করি, বাবা নিষেধ করেন না। মহিমদা কায়স্থের ছেলে, তার সঙ্গে এত ভাব কেন? বাবা কেন এর প্রশ্রয় দেন? এমন ত নয় যে জামাই করে ঘরে রেখে দেবেন? কাজেই টাকাকড়ির

প্রাচুর্য্য দেখে যে-সব লোক সম্বন্ধ করতে আসত, তাদের কান ভাঙাবার মানুষের অভাব হ'ত না। মহিমদাকে আমার বাবা মা ছেলের মতই ভালবাসতেন, তাকে জানতেন একেবারে অনিন্দ্য চরিত্রের ব'লে। সুতরাং তাকে বাড়ী আসতে বারণ করা, বা আমার সঙ্গে মিশতে বারণ করার কথা তাঁরা স্বপ্নেও ভাবতেন না।

দৈবাৎ কখনও মায়ের কানে এ সব কথা গেলে তিনি বলতেন, "আমার পেটের ছেলে হ'লে তাকে যতখানি বিশ্বাস করতাম ঠিক ততখানিই বিশ্বাস করি আমি মহিমকে। ওর প্রাণ গেলেও মুলুর কোন অনিষ্ট ওকে দিয়ে হবে না।"

সে বিশ্বাস যে শুধু মায়ের ছিল তাই নয়, আমারও ছিল। জানতাম, জগতে মা-বাবার পরে আমার যদি বন্ধু কেউ থাকে ত মহিমদা। তিনি যতদিন বেঁচে থাকবেন, আমি পাহাড়ের আড়ালে থাকব। পাড়া-প্রতিবেশীদের কানাঘুষো যে একেবারে জানতে পারতাম না, তা নয়। দুঃখ হ'ত, কেন এত বাজে কথার চর্চ্চা। আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে, ব্রাহ্মণের ঘরেই বিয়ে হবে, এ ত জানাই আছে আমার। মহিমদা কি ভাবতেন জানি না, কোনদিন এ ধরণের কোন আলোচনা তাঁর সঙ্গে আমার হয় নি।

সম্বন্ধ ভাঙতে ভাঙতে একটা শেষ পর্য্যন্ত লেগে গেল। ঘর-বর ভালই। বরের বাবার জমিদারি আছে মাঝারি গোছের, দু'টি মাত্র ছেলে। যাঁকে বর বলে হাজির করা হ'ল, তিনি দ্বিতীয় ছেলে। পড়াশুনা করেছেন, স্বাস্থ্য ও চেহারা ভাল। জমিদারের বড়ছেলে নাকি চিররুগ্ন, তাঁর সংসারী হওয়া চলে না। শ্বশুর বেঁচে আছেন, শাশুড়ী অল্প কিছুদিন আগে মারা গিয়েছেন। এঁরা বড়-সড় শিক্ষিতা মেয়েই খুঁজছেন, যে গিয়েই গৃহিণীর পদে অধিষ্ঠিত হতে পারবে।

কনে দেখতে এলেন তাঁরা। পছন্দই করলেন, এবং পাকা কথা দিয়ে গেলেন। দেনা-পাওনা নিয়ে কোন কথাবার্ত্তা হ'ল না। জানা কথা যা, তা নিয়ে আর আলোচনা কি? একমাত্র সন্তান, সবকিছুই আমার প্রাপ্য। ও পক্ষেও শোনা গেল, সবকিছু এই দ্বিতীয় ছেলেই পাবেন, বড়ছেলে আজীবন মাসহারা পাবেন।

বর আমাকে দেখতে আসেন নি, তখনকার দিনে সে দস্তুর ছিল না। আমার ছবি তাঁকে দেখান হ'ল, তাঁরও একখানা ছবি ঘটকীরা মাকে এনে দিয়ে গেল। চেহারাটা অপছন্দ করার মত ছিল না। সব জড়িয়ে ব্যাপারটাকে আমার ভালও লাগল না, মন্দও লাগল না। এই রকম বিয়েই আমার হবে, তার জন্যে আমি প্রস্তুতই ছিলাম।

আমার বিয়েতে যা ধুমধাম হ'ল, তেমনটি রতনপুরে কেউ কখনও দেখে নি। জিনিসপত্র, গহনাগাঁটি, পোশাক আসাক, যা পেলাম, তা আমার কল্পনাকেও ছাড়িয়ে গেল। পরবর্ত্তী জীবনে এগুলি খুব বেশী কাজে লাগে নি। যে সময় মেয়েরা সবচেয়ে বেশী সাজগোজ করে, সেই সময়েই কেমন করে জানি না, আমার মন থেকে সাজগোজের সব স্পৃহা চলে গেল। অবশ্য একেবারে সাদামাটা হয়ে থাকতে পারতাম না। শ্বশুরবাড়ী তখন আত্মীয়া ও কুটুম্বিনীতে ভর্ত্তি, তাঁরা সারাক্ষণই সাজিয়ে-গুজিয়ে রাখতেন। স্বামীও এ বিষয়ে অবহেলা দেখলে অনুযোগ দিতেন। তবে কিছু দিন বাদে যখন বাড়ী খালি হয়ে গেল, মেয়ে বলতে একমাত্র আমিই রইলাম, তখন এদিকে শৈথিল্য আমার ক্রমেই বাড়তে লাগল। স্বামীর মনোরঞ্জন করার খাতিরেও ঘটা করে সাজ করতে হাত উঠত না, মনও উঠত না। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, বড়মানুষের মেয়ে হলেও বেশী প্রসাধনের ঘটা করা আমার অভ্যাস ছিল না। আগের ধরণটাই আমার পাকাপাকি থেকে গেল।

নাতনীরা আমাকে অনেক সময় বলে, "তুমি কি ম্যাজিক জান ঠাকুরমা? পঞ্চাশ ষাট বছর আগেকার সব জিনিস, কি করে এত নূতন রাখলে? মনে হচ্ছে যেন কালই দোকান থেকে তুলে নিয়ে এসেছ।" ম্যাজিক জানি না, তবে সব জিনিসপত্র খুব যত্নে রেখেছি চিরকাল, আর অনেক জিনিস কোনদিন ব্যবহারই করি নি।

শ্বশুরবাড়ীতে দিন কাটতে লাগল। বাবা বলেছিলেন তাঁর মেয়ে যেখানে যাবে সবাইকে খুশী করবে, সেটা বেশীর ভাগ ফলল বটে, তবে একেবারে পুরোপুরি নয়। শ্বশুর আমাকে পেয়ে যেন আকাশের চাঁদ হাতে

পেলেন। অতি রুগ্ন ভাসুরও উঠতে-বসতে আশীর্ব্বাদ করতে লাগলেন। শুধু স্বামীকে পরিপূর্ণভাবে খুশী করতে পারি নি। তিনি আর আমি দুই জগতের মানুষ ছিলাম। তিনি ভালবাসতেন হৈ-হল্লা, হাসি-গল্প, সাজগোজ, আমোদ-প্রমোদ। আমি ভালবাসতাম, পড়াশুনা, কারুকর্ম্ম, সেলাই ফোঁড়াই। মাটির পুতুল গড়া, আলপনা দেওয়া এসবের হাতও আমার ভাল ছিল। তখনকার দিনে বাড়ীর বৌদের স্বামীর বন্ধু-বান্ধবদের সামনে বেরোনোর দস্তুর ছিল না। কিন্তু আমার স্বামীর ইচ্ছা ছিল বন্ধু-বান্ধবের সামনে আমাকে বার করেন, তাদের একেবারে চমৎকৃত করে দেন। কিন্তু তার বন্ধু গুলিকে আমি দুচোখে দেখতে পারতাম না। অতি লঘুচিত্ত আর চপল-প্রকৃতির মনে হ'ত সব ক'জনকে। এই নিয়ে তোমাদের বাবার সঙ্গে আমার প্রায়ই মনান্তর হ'ত। অন্য পরিবারে হ'লে হয়ত আমাকে জোরের কাছে মাথা হেঁট করতে হ'ত, কিন্তু এ বাড়ীতে আমার উপর জোর করা সহজ ছিল না। শ্বশুর ছিলেন আমার অকুণ্ঠ সমর্থক, আমার কোন কাজের কোন প্রতিবাদ তিনি গ্রাহ্য করতেন না। আমার মতেই সংসার চলত। এতটুকু মেয়ে এসেছিলাম বৌ হয়ে। এক বছরের মধ্যেই সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রীর আসনে আমাকে বসতে হ'ল। ভাঁড়ারের চাবি, খাজাঞ্চীখানার চাবি, সব আমার হাতে এসে জমা হ'ল। বৈষয়িক কাজকর্ম্ম আমি যাতে অল্প-অল্প করে শিখে নিতে পারি, সেইজন্য আমার সঙ্গে শ্বশুরমশায় সে-সব আলোচনা করতে লাগলেন। লেখাপড়া আমি যে বেশ কিছুটা জানি এতে তিনি খুবই সন্তোষ প্রকাশ করতেন। বলতেন, "আমাকে আর হাতে ধরে কিছু শেখাতে হ'ল না। তোমার বাবা যেন আমারই ঘরের লক্ষ্মী হবার জন্যে তোমাকে এমন করে গড়ে তুলেছিলেন। প্রকাশ ত চিররুগ্ন, কোনদিন কিছু করতে পারবে না। খাটে শুয়ে শুয়েই ওর অভিশপ্ত জীবন শেষ হবে। আর বিকাশ ত আমোদ-প্রমোদ ছাড়া সংসারে আর কিছু বুঝতে পারে না। খালি হৈ-চৈ করে কি সার্থকতা পায় মানুষে? পাছে ওরও প্রকাশের দশা হয় তাই প্রয়োজন না থাকলেও আমি ওকে একটা ভাল অফিসে ঢুকিয়ে দিয়েছি, আমার এক বন্ধুর সাহায্যে। কিন্তু তাঁদের কাছেও যা খবর পাই, তা খুশী হবার মত কিছু নয়। সেখানেও কাজে ফাঁকি দেবারই চেষ্টা করে। আমি যখন থাকব না তখন সব দিক্ তোমাকেই দেখতে হবে।"

এই রকম করে আমার দিন কেটেছে। আদরিণী স্ত্রী আর পুত্রবধূ হবার জন্যে আমার জন্ম হয় নি। শ্বশুরের সহকর্ম্মিণী ছিলাম, স্বামীর সহধর্ম্মিণী হ'তে পারি নি। তাঁরে যা ধর্ম্ম ছিল, তা আমি ধর্ম্ম বলে মেনে নিতে পারি নি। একটা দুঃখ বড় অনুভব করতাম। রতনপুরে যাবার আমার কোন সুবিধা ছিল না। যেতে চাইলে যে বাধা পেতাম, তা নয়, কিন্তু আমার যাবার নামে সকলের মুখের যা ভাব হ'ত তা দেখে আর এ বিষয় পীড়াপীড়ি করতে পারতাম না। ষোল বৎসর বয়স হতে না হতেই আমি সকলের লালন-পালনের বোঝা মাথায় করে-ছিলাম। বাবা প্রায়ই কলকাতায় আসতেন বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে, তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ত। মা আসতেন না, আর কেউও আসত না। বাবার কাছেই গ্রামের সকলের খবর পেতাম। মনের কষ্ট মনেই চাপা থাকত, কারও কাছে প্রকাশ করবার যো ছিল না। ক্রমে সয়ে এল। ছেলে-পিলে হবার সঙ্গে সঙ্গে এই পরিবারেরই একজন হয়ে গেলাম যেন। কিন্তু প্রথম জীবনকে ভুললাম না, জাতিস্মর যেমন করে পূর্ব্বজন্মকে মনে রাখে, তেমনই করে রতনপুরের স্মৃতি আমার মন জুড়ে রইল।

তোমরা তিন ভাই হবার পর, আর আমার ছেলে-পিলে হয় নি। ভাসুর এই সময় মারা গেলেন। তাঁর দুঃখময় জীবনের অবসানে অন্যরা স্বস্তি পেলেও শ্বশুরমশায় একেবারে ভেঙে পড়লেন। তাঁর মনে যদি একটু সান্ত্বনা আসে এই আশায় আত্মীয়-স্বজনরা তাঁকে নিয়ে তীর্থ ভ্রমণে বেরোলেন। তিনি যাবার আগে অনুমতি দিয়ে গেলেন যে ইচ্ছা করলে আমি কয়েকদিনের জন্যে রতন-পুরে ঘুরে আসতে পারি। স্বামীর অফিস, কাজেই তিনি গেলেন না।

দীর্ঘ আট বছর পরে আমি রতনপুরে ফিরে এলাম। সব যেমন ছিল তেমনই আছে। কিন্তু আমি ত আর তেমনই নেই? আমার বাল্যজীবন, কৈশোরের জীবনে, এই গ্রাম, এই মানুষগুলিই ছিল আমার জগৎ-সংসার।

কিন্তু এখন কত লোক এসে ঢুকেছে আমার জীবনে। স্নেহের বন্ধনে আজ আমি যে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা আর একটা সংসারের সঙ্গে? তিনটি কচি মুখ যে আমার হৃদয়ে সবার সামনে এগিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। আমি সেই আগেকার সুলোচনা আর নেই।

মহিমদার সঙ্গে কতকাল পরে দেখা হ'ল। তেমনই আছেন প্রায়, শুধু রগের কাছে চুলে পাক ধরতে আরম্ভ করেছে। তেমনই হাসিখুশি, তেমনই আত্মভোলা, তেমনই নিজের সম্বন্ধে উদাসীন। সৎমার ছেলেমেয়ে মানুষ করছেন, নিজে সংসার করার চেষ্টা করেন নি। আমাকে দেখে মহা খুশী, আমার ছেলেদের নিয়ে খেলা করতে তাঁর অর্দ্ধেকদিন কেটে গেল। আমার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলতে লাগলেন, যেন আমি চোদ্দ বছরের সুলোচনাই আছি। মাও আমাকে কাছে পেয়ে এতকাল পরে যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। কয়েকটা দিন কেটে গেল পূর্ব্ব পরিচয় নূতন করে ঝালিয়ে নিতে। যাঁদের বুড়ো-মানুষ দেখে গিয়েছিলাম, তাঁদের মধ্যে অনেকে বেঁচে নেই, যারা শিশু ছিল তারা কিছু বড় হয়েছে, যারা ছিল না এমন অনেকগুলি নূতন মানুষ নানাঘরে এসেছে। প্রভাসের ইলেক্‌ট্রিক-বিহীন বাড়ী দেখে বড় বিস্ময় লেগেছিল এখনও মনে পড়ে। ছোট দু'জন অত বুঝত না।

আমি দিন পনের থাকব, এই মত ব্যবস্থা করে এসেছিলাম। কিন্তু সাতদিন যেতে না যেতে আমার স্বামী এসে উপস্থিত হলেন। বাবা মা ত জামাইকে পেয়ে মহা খুশী। কিন্তু আমি তাঁর চেহারা দেখে একটু ঘাবড়ে গেলাম। এরকম কেন দেখাচ্ছে? কোন অসুখ করেছে কি? না, কিছু অঘটন ঘটেছে? সবাই-কার সামনে স্বামীর সঙ্গে কথা বলা চলল না; রাত্রির জন্যে অপেক্ষা করে রইলাম।

সন্ধ্যার পরেই নামমাত্র খেয়ে স্বামী গিয়ে শুয়ে পড়লেন। মা একটু উদ্বিগ্ন হয়ে আমাকে বললেন, "তুই চট্ করে খেয়ে নিয়ে শুতে চলে যা। আমার মনে হচ্ছে বিকাশের কিছু অসুখ-বিসুখ করেছে, লজ্জায় আমাদের কাছে বলছে না।"

আমি খেয়ে দেয়ে গিয়ে শোবার ঘরে ঢুকলাম। উনি জেগেই শুয়ে আছেন, ছেলে তিনটি বড় খাট জুড়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। আমাকে দেখেই স্বামী বললেন, "দরজটা বন্ধ করে দাও।"

দিলাম বন্ধ করে। কাছে এসে বললাম, "তোমার কি হয়েছে বল ত। এরকম করছ কেন?"

উনি বললেন, "বলছি। তোমাকে ছাড়া কাকে বা আর আমি বলব? বাবা এখানে নেই, থাকলেও তাঁকে বলবার সাহস আমার হ'ত না। আমি ঘোর বিপদে পড়েছি।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "কি বিপদ্?"

"যে অফিসে কাজ করি, তার তহবিল থেকে কুড়ি হাজার টাকা পোওয়া গিয়েছে। আমারই দোষে। যদি এই সপ্তাহের মধ্যে সে টাকা আবার পুরিয়ে দিতে না পারি, তা হ'লে নির্ঘাৎ জেল। জেলে যদি যেতে হয়, তা হ'লে আমি আর জ্যান্ত ফিরে আসব না।"

আমার বুকের ভেতরটা যেন পাথর হয়ে গেল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি করলে অত টাকা নিয়ে?"

স্বামী বললেন, "আমি আর আমার এক বন্ধু মিলে রেস খেলেছিলাম।"

একটু থেমে বললেন, "তোমার বাবাকে বলে আমাকে এই টাকাটা জোগাড় করে দাও, আর ত কোন উপায় দেখি না।"

আমি বললাম, "বাবা একথা শুনলে ইহজন্মে আর তোমার মুখ দেখবেন না, এবং আমারও হয় স্বামীকে না হয় বাবা-মাকে ছাড়তে হবে।"

উনি হতাশ হয়ে বললেন, "তবে কি আমাকে জেলেই যেতে হবে?"

আমি বললাম, "আমার গহনাগাঁটি আছে অবশ্য, তবে কুড়ি হাজারের কি না জানি না। তাছাড়া বেশীর ভাগই আছে ব্যাঙ্কে। সে locker শ্বশুরমশায়ের নামে। তিনি না ফিরলে বের করা যাবে না। আর অত জিনিষ ন্যায্য দামে বিক্রী করা অত হট করে হবে না, সময় লাগবে তাতে, লোক-জানাজানিও হবে।"

উনি অস্থির হয়ে বারবার বলতে লাগলেন, "কি হবে তা হ'লে? আমার কি হবে?"

আমি বললাম, "আমি ভাবতে চেষ্টা করছি। চেষ্টার ত্রুটিও রাখব না, তবে চেষ্টার ফল কি হবে, তা ত বলতে পারছি না। তুমি একটু স্থির হও, ছট্‌ফট্‌ করে লাভ নেই কিছু।"

কিন্তু স্থির কেউই হ'তে পারলাম না। সমস্ত রাত জেগে বসে রইলাম দুজনে।

ভোর হবার একটু আগে আমি বললাম, "দেখ, আমি এখন একটু বেরোব। তুমি এই ঘরেই থাক, নইলে ছেলেরা উঠে ভয় পাবে। ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই ফিরে আসব।"

উনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায়, কার কাছে যাবে? কোন আত্মীয়ের কাছে?"

আমি বললাম, "সে সব পরিচয় পরে দেব। আর এক কথা। টাকা যদি আমি জোগাড় করতে পারি, তা হ'লে সেটা কি ভাবে শোধ করব, সে সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থাও করব। সে ব্যবস্থা তোমায় মেনে নিতে হবে। দায় তোমার, কাজেই কোন কষ্ট পেলে তা সহ্য করতে হবে।"

উনি বললেন, "নিশ্চয়, জেল এড়াতে পারলে যে কোন সর্ত্তে আমি প্রস্তুত।"

পাড়াগাঁয়ের লোক অনেকেই খুব ভোরে ওঠে। অন্ততঃ মহিমদা যে রাত থাকতেই উঠে পড়েন, তা জানতাম। ঘর থেকে বার হয়ে একটু সঙ্কুচিত লাগল, কিন্তু নিতান্ত নিরুপায় যেখানে, সেখানে সাহস করা ছাড়া উপায় নেই। বাড়ী ছেড়ে বেরোলাম। তখনও চাঁদ অস্ত যায় নি, ভোরের তারা আকাশে জল্ জল্ করছে।

মহিমদাদের বাড়ী প্রায় আমাদের বাড়ীর পাশেই। মস্ত বড় বাগান বাড়ীর সামনে। এইখানে তিনি সকালে বেড়াতেন, ব্যায়াম করতেন। আমাকে এমন সময় হঠাৎ দেখে তিনি রীতিমত অবাক্ হয়ে গেলেন। দ্রুতপদে কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি সুলু, এত ভোরে যে? কারো অসুখ-বিসুখ করেছে নাকি?"

আমি বললাম, "না, অসুখ না, অন্যরকম বিপদ্। আর কার কাছে সাহায্য চাইব ভেবে পেলাম না, তাই তোমার কাছে এলাম। বাবাকে এসব কথা প্রাণ থাকতে বলতে পারব না।"

মহিমদা একটু যেন অসহিষ্ণুভাবে বললেন, "কি হয়েছে সেটা আগে বল ত?"

বললাম সব কথা। মাথা নীচু হয়ে গেল এই অপাপবিদ্ধ মানুষের কাছে, নিজের স্বামীর কলঙ্কের কথা বলতে। কিন্তু আর কি উপায় ছিল?

বললাম, "তুমি যদি কোনরকমে গোবিন্দ সাহার কাছ থেকে এই টাকাটা ধার করে দাও, তিন-চার দিনের মধ্যে, ত হ'লে আমরা বেঁচে যাই।"

মহিমদা বললেন, "টাকা তার অঢেল, দিতে যে সে না পারে তা নয়। কিন্তু হয় জমি, নয় সোনা বন্ধক রেখে তবে দেবে। আর চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ নেবে। ওর ঋণ কোনদিন কেউ শোধ করতে পারে না। তুমিও পারবে না।"

আমি প্রায় কেঁদে ফেলে বললাম, "তা হ'লে কি হবে?"

মহিমদা একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "একটা উপায় আছে, কিন্তু তুমি তাতে রাজী হবে কি না জানি না।"

আমি বললাম, "তুমি অকরণীয় কিছু আমাকে করতে বলবে না। আমি সব করতে প্রস্তুত, কোন কষ্টকে কষ্ট বলে মনে করব না।"

মহিমদা বললেন, "নিজের কষ্ট তুমি ঠিকই সইবে তা জানি, কিন্তু আমার কষ্ট সইতে পারবে কি?"

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, "ঠিক বুঝতে পারছি না, একটু খুলে বলতে হবে।"

মহিমদা বললেন, "আমার খানিকটা জমি-জমা আছে জানই ত। এরই আয়ে আমাদের সংসার চলে, আমাকে চাকরি করতে হয় না। জমি খুবই ভাল, এ তল্লাটে এত ভাল জমি আর নেই। গোবিন্দ সাহার নিদারুণ লোভ এই জমির উপর। অনেকবার আমার কাছে লোক পাঠিয়েছে জমি কেনার জন্যে। আমি কান দেই নি। যে দাম চাইব সেই দাম দিতেই সে প্রস্তুত। কুড়ি হাজার উঠে যাবে সব জমি বেচলে।"

আমি ত আকাশ থেকে পড়লাম। বললাম, "সে কি মহিমদা, এ কি সর্ব্বনেশে প্রস্তাব? তুমি সর্ব্বস্বান্ত হবে যে? তোমার চলবে কি করে? এমন কথায় রাজী হওয়া যায়?"

মহিমদা বললেন, "আমার থাকার বাড়ী, তরকারির বাগান আর পুকুর রইল। তুমি যদি আমাকে মাসে দু'শ টাকা করে দাও, তা হ'লে আমি চালিয়ে নেব। এটা সুদ নয়, আসলটাই শোধ করছ বলে ধরে নেব। তুমি নিজেকে ঋণী মনে করে মোটেই মন খারাপ ক'রো না। তুমি যে রকম বুদ্ধিমতী, হিসাবী মেয়ে, এ টাকা তুমি শোধ শেষ অবধি করেই দেবে। বাপের এক সন্তান তুমি, শ্বশুরের এক সন্তান তোমার স্বামী, ভবিষ্যতে বিষয়-সম্পত্তি তোমরা হাতে অনেক পাবে। তখন ধার শোধ স্বচ্ছন্দে হতে পারবে।"

আমি তবুও নির্ব্বাক্ হয়ে রইলাম। মহিমদা আবার বললেন, "দেখ, আমি অবিবাহিত মানুষ, নিজের কোন সংসার নেই। কর্ত্তব্যবোধে বিমাতার সংসার ঘাড়ে করে বসে আছি। জমিজমা যা বিক্রী করতে চাইছি, তা একান্ত আমারই, আমার মাতামহের কাছ থেকে পাওয়া। অন্য ভাইদের এতে অংশ নেই। বাড়ী আর পুকুর বাবার, সেটা তাদের রইল। ভাই দুটোর মধ্যে বড় যেটা, সেটা জড়বুদ্ধি, জন্তুর সমান, তার চলে যায় এমন কিছু থাকলেই হ'ল। অন্যটা পড়াশুনা করছে, করে খেতে পারবে। বোনটার বিয়ে দিতে হবে, তা হ'লেই আমি নিশ্চিন্ত। কিন্তু তারা এখনও ছোট আছে, তুমি সময় অনেক পাবে, এ সবের ব্যবস্থা করতে। সম্প্রতি টাকাটা নাও, নিয়ে বিকাশকে বিপদ্‌মুক্ত কর। ভবিষ্যতে আর যেন এরকম প্রলোভনে না পড়ে, সেদিকে দৃষ্টি রেখ।"

আমার চোখ ফেটে জল আসছিল, তবু রাজী আমাকে হ'তেই হ'ল। আর কোথায় বা হঠাৎ আমি এত টাকা জোগাড় করতে পারতাম।

মহিমদা বললেন, "এখন নিশ্চিন্ত মনে বাড়ী যাও, আজই আমি এর ব্যবস্থা করছি। সন্ধ্যাবেলা জানতে পারবে।"

লোকজন সব উঠে পড়বার আগে আমি বাড়ী ফিরে এলাম। মা, বাবা তখনও ওঠেন নি। আমার স্বামী ঘরের ভিতর পায়চারি ক্যর বেড়াচ্ছিলেন, আমাকে দেখে উদ্‌গ্রীব হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কিছু হ'ল?"

আমি বললাম, "কুড়ি হাজার টাকা ধার নেবার ব্যবস্থা করে এলাম। দু-একদিনের মধ্যেই পাবে।"

উনি বললেন, "কে ধার দেবে এত টাকা বিনা security-তে?"

সব কথা তাঁকে বললাম। অবাক্ হয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, "সব মেনে নিলাম। আমি অপদার্থ বটে, কিন্তু অমানুষ নয়। ওঁর টাকার ধার শোধ হয়েই যাবে। কৃতজ্ঞতার ঋণটা কখনও শোধ হবে না।"

কলকাতার বাড়ীতে আমি না থাকলে অসুবিধা হচ্ছে, মা-বাবাকে এই কথা বুঝিয়ে আমরা দিন-চার পরে ফিরে এলাম।

স্বামী সেবারকার মত রক্ষা পেলেন, এই দারুণ ধাক্কায় কিছুটা শুধরেও গেলেন। কিন্তু তাঁর নিজের উপরে বিশ্বাস ছিল না। টাকাকড়ি আর হাতে করতেই চাইতেন না, মাইনে পেলেই এনে আমার হাতে দিয়ে দিতেন। হাতখরচ যা দরকার, আমার কাছে চেয়ে নিতেন।

পরের মাস থেকেই মহিমদাকে টাকা পাঠাতে লাগলাম। একটু রেখে-ঢেকেই পাঠাতে হ'ত, যাতে শ্বশুরমশায় না জানতে পারেন। সাধারণ হিসাবের খাতায় এর হিসাব থাকত না।

কয়েক বৎসরের মধ্যেই শ্বশুরমশায় মারা গেলেন। আমার স্বামী সম্পত্তি হাতে পেয়েই সমস্তটা দানপত্র লিখে আমাকে দিয়ে দিলেন। এতে আত্মীয়স্বজন সকলে অবাক্ হলেও কেউ এর আসল অর্থ আবিষ্কার করতে পারল না।

এখন ইচ্ছা করলে মহিমদার সব টাকা শোধ করে দিতে পারতাম। কিন্তু কেন জানি না তিনি মাসে মাসে ২০০ টাকা নেবার ব্যবস্থাটাই বহাল রাখলেন। তাঁর শরীর ভাঙছিল, মাঝে মাঝে খবর পাচ্ছিলাম। বৈমাত্রেয় যে ভাইটি পড়াশুনা করছিল, সে পড়াশুনা শেষ করে কাজে ঢুকল। তবে তার স্বভাব-চরিত্রটা ভাল

উত্তরোল না। বাড়ীর থেকে কিছুদিনের মধ্যে সে চলেও গেল।

বোনের বিয়ের সময় কয়েক হাজার টাকা চেয়েছিলেন মহিমদা, সেটা দিয়েছিলাম।

তারপর হঠাৎ খবর পেলাম যে মহিমদা মারা গেছেন। আমার নামে একটা চিঠি রেখে গিয়েছিলেন, তাতে শুধু তাঁর জড়বুদ্ধি ভাই মোহনের খরচের জন্য কিছু মাসে মাসে পাঠাতে লিখেছিলেন। সে মানুষটা এখনও বেঁচে, তাকে ঐ ক'টা টাকা পাঠাতে কুণ্ঠিত হ'য়ো না। ভগবান্ ত কোন অভাব রাখেন নি তোমাদের?

আর আমার কিছু জানাবার নেই। ঋণ যথাসাধ্য শোধ করেছি, এই তৃপ্তি নিয়ে যাচ্ছি। তোমরা কখনও ধর্ম্মের পথ ত্যাগ ক'রো না, এই আমার শেষ অনুরোধ।

* * *

খাতাখানা শেষ করে প্রভাস অনেকক্ষণ চুপ করে শুয়েই রইলেন। অত্যন্ত কাছের মানুষকেই বা কতটুকু চেনা যায়? বাবার যে স্মৃতি তাঁদের মনে ছিল তা যেন হঠাৎ কুয়াশায় ঢাকা পড়ে গেল। মায়ের মূর্ত্তিটাও যেন দেখাচ্ছে অন্যরকম।

বিভাস এই সময় খাতার খোঁজে এসে ঘরে ঢোকাতে প্রভাস বললেন, "নিয়ে যাও, আমার পড়া হয়ে গেছে। আমরা তিন ভাই জানলাম, আমাদের স্ত্রীরাও জানবেন। তবে ছোটদের কিছু না জানানই ভাল। খানিকটা বয়স হয়ে না গেলে, মানুষে অন্য মানুষের দোষ-ত্রুটি ক্ষমার চোখে দেখতে পারে না। অতি সংক্ষেপে ওদের বলে দিলেই হবে যে, বিশেষ বিপদের সময় মহিমবাবু যথাসর্ব্বস্ব বিক্রী করে মা-বাবার সাহায্য করেছিলেন। সেই জন্যেই এই টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা।"

—০—

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও বাংলা সাহিত্য

রণজিৎকুমার সেন

বিজ্ঞান ভিন্ন জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হয় না। খুব সম্ভব এই কারণেই বাংলা সাহিত্যের প্রতি অনন্যসাধারণ নিষ্ঠা এবং মমতা থাকা সত্ত্বেও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর মূল অধীত বিষয় ব'লে গ্রহণ করলেন পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়নশাস্ত্রকে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় যে, বিজ্ঞানকে গ্রহণ করেও সর্বাংশে তিনি বাংলা সাহিত্যেরই উৎকর্ষ বিধান ক'রে গেছেন। কি ভাবে বাংলা সাহিত্যের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানকে সহজতম পদ্ধতিতে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা যায়, এবং বাংলা সাহিত্যকে বৈজ্ঞানিক অলঙ্কারে ভূষিত ক'রে নব নব উন্মেষশালিনী চিন্তার পথ প্রশস্ত ক'রে তোলা যায়, নিরন্তর এই চিন্তায় বিভোর থাকতেন তিনি। এজন্য যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক পরিভাষার প্রয়োজন, রামেন্দ্রসুন্দর বহুলাংশেই তা উদ্ভাবন করে গেছেন।

যে পরিবারে তাঁর জন্ম, পিতৃপিতামহের কাল থেকেই সেই পরিবারের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য লক্ষ্য করবার মত। রামেন্দ্রসুন্দরের পিতা, পিতামহ, পিতৃব্য প্রত্যেকেই সাহিত্যকীর্তির অধিকারী ছিলেন। কাব্য এবং নাটকের ললিতরসে পারিবারিক পরিবেশটি বিশেষ মধুর হয়ে উঠেছিল। এই মধুর পরিবেশের মধ্যেই ১৮৬৪ সালের ২০শে আগষ্ট চন্দ্রকামিনী দেবীর গর্ভে রামেন্দ্রসুন্দরের জন্ম হয়। পিতা গোবিন্দসুন্দর ত্রিবেদী সেদিন পুত্রকে কেন্দ্র ক'রে বিরাট কিছু একটা স্বপ্ন দেখেছিলেন কি না জানি না, উত্তরকালে রামেন্দ্রসুন্দর কিন্তু মহীরুহের মতই বাংলার সংস্কৃতি-ক্ষেত্রকে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে আচ্ছন্ন ক'রে দাঁড়ালেন। ডাঃ শিশিরকুমার মৈত্র বলেন: "কোনও কোনও বিষয়ে বঙ্গসাহিত্য বলিতে ত্রিবেদী মহাশয়কেই বুঝায়; ত্রিবেদী মহাশয় সে সকল বিষয়ের প্রাণ। মেটারলিঙ্‌ককে বাদ দিয়া আধুনিক রোমান্টিক সাহিত্য যেরূপ হয়, গেরার্ড হাউপ্ট্‌ম্যানকে ছাড়িয়া রিয়ালিষ্টিক ড্রামা যেরূপ দাঁড়ায়, বাঙ্গলা সাহিত্যের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বিভাগে এবং কতক পরিমাণে ইতিহাস বিভাগে রামেন্দ্রবাবুকে বাদ দিলেও ঠিক সেইরূপ হয়। বাঙ্গলায় যে কতদূর উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ লেখা যাইতে পারে, ইহা রামেন্দ্রবাবু স্পষ্ট দেখাইয়া দেন।"

রামেন্দ্রসুন্দরের এই মনীষা শুধু তাঁর বিদ্যাবত্তাকে আশ্রয় ক'রেই গ'ড়ে ওঠে নি, শিশুকাল থেকেই সুকুমার অনুভূতিশীলতার দ্বারা ধীরে ধীরে তিনি এই মনীষার উচ্চশিখরে আরোহণ করেছেন। তৎকালীন ছাত্রবৃত্তি পাঠশালায় যেমন অধ্যয়নের উপর জোর দেওয়া হ'ত, তেমনি ধর্ম, জাতীয়তা ও চরিত্রশিক্ষাও চলত সেই সঙ্গে। মাত্র ছ'বছর বয়সে এই ছাত্রবৃত্তি পাঠশালাতেই প্রথম তাঁকে ভর্তি ক'রে দেওয়া হয়। পিতা গোবিন্দসুন্দর নিয়মিত জ্যোতিষশাস্ত্র, অঙ্ক ও বিজ্ঞান চর্চা করতেন। গৃহশিক্ষক বলতে তিনিই ছিলেন পুত্রের শিক্ষাগুরু। গোবিন্দসুন্দরের আদর্শেই ধীরে ধীরে আদর্শবান্ হয়ে উঠতে লাগলেন রামেন্দ্রসুন্দর। পাঠশালায় এমন বার্ষিক পরীক্ষা ছিল না—যাতে তিনি প্রথম স্থান অধিকার না করতেন; ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষাতেও সমগ্র মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যে তিনি প্রথম স্থান অধিকার ক'রে বৃত্তিলাভ করেন, অতঃপর কান্দি হাইস্কুলে এসে ভর্তি হন। এসময় থেকেই তাঁর মধ্যে কাব্য-সাধনার একটা দুরন্ত আবেগ লক্ষ্য করা যায়। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে এন্‌ট্রান্স পরীক্ষায় তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার ক'রে ২৫৲ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। এটা যত বড় আনন্দের কারণ হ'ল, সেইসঙ্গে তত বড়ই শোকাবহ ঘটনা ঘটল আকস্মিক পিতৃবিয়োগে। গোবিন্দসুন্দর ছিলেন একাধারে তাঁর পিতা, গুরু ও বন্ধু। এত বড় সুহৃদ্ পৃথিবীতে বিরল। সেই পিতৃদেবকে হারিয়ে এন্‌ট্রান্স পাশের কৃতিত্বের আনন্দকে ভুলে গেলেন রামেন্দ্রসুন্দর। এদিকে কলেজে এসে ভর্তি হবার সময় অতিবাহিত হয়ে যায়, গভীর শোক বুকে চেপে তাই পিতৃব্যের সঙ্গে কলকাতায় এসে একদিন প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। এ সময়ে অধীত বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে, যখনই এক-বিন্দু অবসর জুটত, ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্য এবং ইতিহাস পাঠের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর সে অবসর বিনোদন করতেন। কিন্তু এর প্রভাব এসে অলক্ষ্যে কখনও তাঁর অধীত বিষয়কে গ্রাস করত না। যথা-

নিয়মেই তিনি এফ-এ এবং বি-এ পরীক্ষায় বিজ্ঞানশাস্ত্রে অনার্স সহ প্রথম স্থান অধিকার ক'রে ৪০৲ টাকা বৃত্তি পান। বাংলার বিদগ্ধ-সমাজে তখন 'নবজীবন' পত্রিকার বিশেষ খ্যাতি ছিল। বি-এ পাশ করবার পর এই পত্রিকাতে তাঁর প্রথম বাংলা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় এবং সুধীজন দ্বারা প্রবন্ধটি বিশেষ সমাদৃত হয়। অতঃপর পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্র নিয়ে তিনি এম-এ পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত হন। রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন তখন পেডলার সাহেব। রামেন্দ্রসুন্দরকে বিশেষ স্নেহ করতেন তিনি। বললেন: 'Simultaneously try to get P. R. S. Scholarship also'। সহৃদয় অধ্যাপকের উপদেশটি সঙ্গে সঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর আনন্দে গ্রহণ করলেন এবং যথাক্রমে এম-এ পরীক্ষায় স্বর্ণপদকসহ ১০০৲ টাকা বৃত্তি ও প্রেমচাঁদ ছাত্রবৃত্তি লাভ করে সকলের বিস্ময় সৃষ্টি করলেন। অতঃপর আইন অধ্যয়নের জন্য কিছুকাল তিনি আইন কলেজেও যোগদান করেন, কিন্তু মনের দিক্ দিয়ে সাড়া না পাওয়ায় অল্পদিনের মধ্যেই সে-পাঠ তিনি বন্ধ করেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে তাঁকে জেমোর রাজপরিবারের কন্যা ইন্দুপ্রভার সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হয়। তাঁদের পরিবার বা সমসমাজে তখন প্রায় এরকম বিবাহরীতিরই প্রচলন ছিল। ইন্দুপ্রভাও বিশেষ সর্বগুণ-সম্পন্না মহিলা ছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দরের মহৎ চরিত্রের সঙ্গে স্ত্রীর সেই গুণের সমন্বয় ঘটে তাঁদের সাংসারিক পরিবেশটি বিশেষ শান্তিময় হয়ে উঠেছিল।

সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র কলকাতা। কলকাতাকেই রামেন্দ্রসুন্দর একসময় তাঁর কর্মক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিলেন। শিক্ষাবিভাগ থেকে বহু চাকরির আহ্বান পাওয়া সত্ত্বেও কলকাতার আকর্ষণ ত্যাগ ক'রে অন্যত্র যেতে তিনি কোনদিন রাজী হন নি। এর আর একটি কারণ হ'ল স্বর্ণময়ী বঙ্গভূমি তথা বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর অনন্যসাধারণ মমতা। এর পর ১৮৯২ সালে তিনি রিপন কলেজের পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ণশাস্ত্রের অধ্যাপক পদ গ্রহণ করেন এবং স্থায়ীভাবে কলকাতায় বসবাস আরম্ভ করেন। অধ্যাপক পদ থেকে ক্রমে তিনি রিপন কলেজের স্থায়ী অধ্যক্ষ পদে উন্নীত হন। ছাত্রও অধ্যাপকদের সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশবার ফলে তাঁর অধ্যক্ষতাকালে রিপন কলেজে এক অভূতপূর্ব প্রাণঃশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। রামেন্দ্রসুন্দরের স্বভাবগত সহৃদয়তাই ছিল এর মূল কারণ। তৎকালীন অধ্যাপক রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষের মতে—"তাঁহার নিকট প্রাণের কারবার ছিল; সেখানে তিনি যন্ত্রনীতির অধিকার স্বীকার করিতেন না। তাঁহার বিজ্ঞান-শ্রেণীর বাহিরে যে অগণিত ছাত্র ছিল, তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপন অসম্ভব ব্যাপার হইলেও তিনি অনেকস্থলে পরিচয়ের সুযোগ খুঁজিতেন। এই ব্যাপার তাঁহার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক ছিল। ছাত্রেরা কলেজের অধ্যক্ষের নিকট যে-সকল আবেদন করে, অধিকাংশ কলেজেই সেই আবেদনপত্রগুলি আপিসের হাত দিয়া অধ্যক্ষের হাতে পৌঁছায়। রামেন্দ্রবাবু নিয়ম করিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক ছাত্র নিজ নিজ আবেদনপত্র হাতে লইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিবে এবং প্রত্যেকের সঙ্গে কথা কহিয়া তিনি বিচার মীমাংসা করিবেন।"

এইভাবে ছাত্রসমাজের সান্নিধ্যে এসে অল্পদিনের মধ্যেই রামেন্দ্রসুন্দর তাদের আপনজন হয়ে উঠলেন। অন্যদিকে দেশবিদেশের দর্শন প্রভৃতি আলোচনা ক'রে অধ্যাপকবৃন্দকে তিনি নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করতেন। উপদেশচ্ছলে একটিমাত্র কথাই তাঁর মুখে নিয়ত উচ্চারিত হ'ত: 'চর্চা কর, অনুসন্ধান কর, লেখ।' এ ছাড়া কোন শিল্প-বিজ্ঞান-সাহিত্যই দাঁড়াতে পারে না। অধ্যাপকবৃন্দকে তিনি যে-সকল প্রবন্ধ লিখে শোনাতেন, পরবর্তীকালে সেই প্রবন্ধগুলিই একত্রে সংগ্রথিত হয়ে 'জগৎ কথা' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। বিশ্ব-ইতিহাসে দর্শন ও বিজ্ঞানের এমন মধুর সমন্বয় বড় একটা দেখা যায় না। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষের উক্তিটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন: "রামেন্দ্রসুন্দরের মুখে আধুনিক দার্শনিক বের্গসঁর দার্শনিক মত বা আধুনিক বৈজ্ঞানিক মেণ্ডেলের বংশক্রমতত্ত্ব বা নবাবিষ্কৃত সংস্কৃত কবি ভাসের নাট্যগ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার চিত্তবৃত্তির সজীবতার ও চিরনবীনতার পরিচয় পাইয়াছেন।"

দীর্ঘ ষোল বছর রিপন কলেজের অধ্যাপনা কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। এই ষোল বছরের জীবনে তিনি শুধু নিজের কলেজের গণ্ডির মধ্যেই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিস্তৃত পরিবেশের মধ্যেও বিশেষ একটা প্রাণচাঞ্চল্যকর আলোড়নের সৃষ্টি করে গেছেন। ১৯১৭ সালে স্যাড্‌লার কমিশন নিযুক্ত হয়, উদ্দেশ্য—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার-সাধন। এই সংস্কার সম্পর্কে কমিশন রামেন্দ্রসুন্দরের নিকট কতকগুলো প্রশ্নের অভিমত চেয়ে পাঠালে তিনি যে সুচিন্তিত মন্তব্য লিখে

পাঠান, সে সম্পর্কে কমিশন তাঁদের রিপোর্টের একাধিক স্থানে উল্লেখ ক'রে প্রসঙ্গক্রমে মন্তব্য করেন: রামেন্দ্রসুন্দরের কথিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এইরূপ কৃতিত্বে আমরা মুগ্ধ এবং ইহার ভবিষ্যৎ পরিণাম সম্বন্ধে আমরা তাঁহার সহিত একমত। আমরা শিক্ষাসংস্কারের জন্য যে-সকল পরিবর্তন প্রস্তাব করিয়াছি, সেগুলি কার্যে পরিণত হইলে আশা করি সঙ্কল্পিত আদর্শ লাভ হইবে ও বিশ্ববিদ্যালয় নবজীবনের সৃষ্টি সাধন ও স্বাধীনতা দান করিতে পারিবে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সুন্দর ভাবসমূহের মধুর সম্মিলন ঘটিবে।

তাঁর জীবনে বাংলা সাহিত্যের ব্রত উদ্‌যাপন সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন: "যথাশক্তি বাংলা সাহিত্যের সেবা করিব, এই আকাঙ্ক্ষা বাল্যকাল হইতেই পোষণ করিয়াছিলাম। কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া তদর্থেই আমার প্রায় সকল শক্তি নিযুক্ত করিয়াছি।"—জীবনের অগ্রগামিতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর এই সাধনার নিষ্ঠা উত্তরোত্তর বেড়েছে। সাহিত্যজীবনে প্রবেশ করে তাঁর প্রথম প্রবন্ধ 'মহাশক্তি' প্রকাশিত হয় অক্ষয়চন্দ্র সরকারসম্পাদিত 'নবজীবন' পত্রিকায়। এর পর থেকে স্বনামে ও বেনামে তাঁর বহু রচনা বহু সাময়িক পত্রে আত্মপ্রকাশ করে। পরবর্তীকালে রামেন্দ্রসুন্দর সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লেখেন: "অনেকেই বলেন—কথাটাও সত্য যে—দর্শনই হউক বা বিজ্ঞানই হউক, ইতিহাসই হউক বা প্রত্নতত্ত্বই হউক—রামেন্দ্রবাবু যাহাই লিখিতেন, তাহাই যে শুধু প্রাঞ্জল হইত এমন নয়, সত্য সত্যই তাঁহার মধুরতায় প্রাণকে জল করিয়া দিত, পড়িতে কবিতার মত বোধ হইত, কল্পনায় মাখামাখি থাকিত, রসে ও ভাবে ভোর করিয়া দিত।"

রামেন্দ্রসুন্দর অন্যূন প্রায় কুড়িখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তার মধ্যে 'প্রকৃতি,' 'জিজ্ঞাসা,' 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা,' 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ,' 'শব্দকথা,' 'বিচিত্রজগৎ,' 'জগৎ কথা,' 'Aids to Natural Philosophy' প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত নানা পত্রে তাঁর বহুতর রচনা বিক্ষিপ্তাকারে ছড়িয়ে আছে। সে যে কি রচনা—তা অনুভূতিশীল পাঠক ভিন্ন অন্যের পক্ষে অনুধাবন করা কঠিন। অথচ বহু কল্পিত কঠিন বিষয়কেই সুললিত-ভাষায় ও সহজ প্রকাশভঙ্গিতে তিনি ব্যক্ত ক'রে গেছেন।

এই বিশ্বনিয়মের প্রাণলীলায় প্রতিনিয়ত যে ঘটনাবর্তন চলছে, তা লোকচক্ষুর অন্তরালে হ'লেও একটি সাম্যসূত্রে ঐক্যবদ্ধ। পৃথিবীর নৈসর্গিক বিষয়ই বা কি, আর নিয়তির লীলাই বা কি, তার একদিকে 'কসমিক' শক্তি, অন্যদিকে 'এথিকাল' শক্তি। এই দু'য়ের সমন্বয়ে পৃথিবী এক এবং অবিভাজ্য। রামেন্দ্রসুন্দরের মতে—"যে নিয়তি গৌরজগতে গ্রহ-উপগ্রহগুলিকে আপনার নির্দিষ্ট কক্ষে ঘুরাইতেছে, যে নিয়তির বশে দিন-রাত্রি হয়, ভূমিকম্প ঘটে ও ঝঞ্ঝাবায়ু বহে, অথবা যে নিয়তির বশে ম্যামথ ও ম্যাষ্টোডনের বাসভূমিতে মানুষ রেলপথ চালাইতেছে ও টেলিগ্রাফের তার খাটাইতেছে, সেই নিয়তি, এবং যে নিয়তি মানুষকে সৎকর্মে ও অসৎকর্মে প্রেরিত করে, যাহাতে সিদ্ধার্থকে গৃহত্যাগ করাইয়াছিল ও যীশুকে ক্রুশে ঝুলাইয়াছিল, এই নিয়তি, এই উভয় প্রকোষ্ঠের উভয় নিয়তির মধ্যে এক পরম ঐক্য বর্তমান আছে।"

বৈজ্ঞানিক পরিভাষার সূত্রে বাংলায় সর্বপ্রথম ভাষাতত্ত্ব লিখবার প্রচেষ্টাও রামেন্দ্রসুন্দরের মধ্যে প্রথম দেখা দেয়। তার পর তাঁর সেই প্রদর্শিত পথ ধরে বহু অনুশীলনকারী ব্যক্তি অগ্রসর হয়ে খ্যাতি অর্জন করেন। রামেন্দ্রসুন্দরের 'ধ্বনিবিচার' গ্রন্থখানি এই ভাষাতত্ত্ব রচনারই সার্থক প্রয়াস।

তাঁর অন্যতম কৃতিত্ব বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পরিচালনা ও সংস্কার-সাধন। সর্বপ্রথম এই পরিষদের বীজ উপ্ত হয় বীম্‌স সাহেব-প্রবর্তিত 'বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার'-এ; পরে তার বাংলা প্রতিশব্দ-রূপে উমেশচন্দ্র বটব্যালের প্রস্তাবানুসারে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' নাম গৃহীত হয়। এর প্রথম কার্যালয় ছিল শোভাবাজার রাজবাটিতে; পরে কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের এক ভাড়াটিয়া বাড়ীতে স্থানান্তরিত হয়। রামেন্দ্রসুন্দর প্রথম থেকেই এর সদস্য ছিলেন। পরিষদের তখন মাত্র শৈশবাবস্থা। ক্রমে এর সম্পাদকীয় দায়িত্ব রামেন্দ্রসুন্দরের ঘাড়ে এসে পড়ে। নিজের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, কর্মক্ষমতা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার দ্বারা তিনি ধীরে ধীরে পরিষদকে নানাদিকে উজ্জীবিত ক'রে তোলেন। দেখতে দেখতে পরিষদ বড় হয়ে ওঠে এবং ক্রমে কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের ভাড়াটিয়া বাড়ী থেকে আপার সার্কুলার রোডের নবনির্মিত নিজস্ব মন্দিরে স্থানান্তরিত হয়। ১৯০৮ সালে ৬ই ডিসেম্বর সেই গৃহপ্রবেশ উৎসবের দিন বাঙালীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিজয়দুন্দুভি সারা ভারতকে আবার নতুন ক'রে মাতিয়ে তোলে। তখন পর্যন্ত

বাংলাই ছিল সারা ভারতের সংস্কৃতির মূল প্রাণ-কেন্দ্র। রামেন্দ্রসুন্দরের সারা হৃদয়ও তখন আনন্দে নেচে উঠেছে। সেই বছরই পরিষদের কার্যবিবরণীতে তিনি উল্লেখ করেন: "সাহিত্য পরিষদের নূতন মন্দির বঙ্গের সাহিত্য-সেবকগণের সম্মিলিত কেন্দ্রস্বরূপ স্থাপিত হইয়াছে। তাঁহারা এই কেন্দ্রস্থলে সমবেত হইয়া সাহিত্যের উন্নতি-কল্পে আলাপ ও পরামর্শ করিবার ও পরস্পর আত্মীয় সম্পর্কে আবদ্ধ হইবার সুযোগ পাইবেন। জ্ঞানান্বেষিগণ এই মন্দিরে উপবিষ্ট হইয়া নব নব তত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত রহিবেন এবং দেশমধ্যে জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রচার দ্বারা স্বদেশকে উন্নতিমার্গে প্রেরণ করিবেন। অতীতকালের মহাপুরুষগণের স্মরণ নিদর্শন সগৌরবে বহন করিয়া এই মন্দির বঙ্গবাসীমাত্রের তীর্থরূপে পরিণত হইবে। অনাগত ভবিষ্যতে পরিষদের এই সকল ও অন্যান্য উচ্চাশা যে পূর্ণ হইবে, পরিষদ এখন তাহার স্বপ্ন দেখিতেছেন। বাঙ্গলা সাহিত্য বর্তমানকালে বাঙালীর একমাত্র গৌরবের বস্তু। এই পতিত জাতির যদি উদ্ধার সাধন হয়, তাহা সাহিত্যের বলেই হইবে, একথা ধ্রুব সত্য।"

কতবড় দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ভাবলে বিস্মিত হ'তে হয়। ঋষিকল্প দৃষ্টি ছিল ব'লেই ভাবীকালের চিত্র তাঁর মনের মধ্যে এমন সত্যের রূপ নিয়ে প্রতিভাত হয়েছিল। চরিত্রগত ভাবে বাঙালী কোনদিনই ব্যবসায়ী বা যোদ্ধাজাতি নয়। শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমি বাঙালীকে একটিমাত্র প্রাণতীর্থেই উজ্জীবিত ক'রে তুলেছে, তা হ'চ্ছে তার কৃষ্টি। কৃষ্টিধর্মী বাঙালীর সার্থক পরিচয় তার সাহিত্যে, কাব্যে, দর্শনে, ও জাতীয়তাবাদী ধর্মে। এর দ্বারাই সে বিশ্বজয় করেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। রামেন্দ্রসুন্দরের উক্তিটি তাই বিশেষভাবে স্মরণীয়।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তখন পরিষদের সহ-সভাপতি। তিনি চেয়েছিলেন—"বাঙলা দেশ এবং বাঙালী জাতি সম্বন্ধে যাহাকিছু জ্ঞাতব্য হইতে পারে, সাহিত্য পরিষদ যদি সেই সমস্ত বার্তা কেন্দ্রীভূত করিতে পারেন তাহা হইলে পরিষদের জীবন সার্থক হইবে।" এই জাতীয় কাব্যের মধ্য দিয়ে সমস্ত বাঙালী জাতির অন্তরে নতুন এক জাগরণের সাড়া আনতে রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন—"পরিষদের বার্ষিক উৎসব যেন বাঙলার ভিন্ন ভিন্ন নগরে পর্যায়ক্রমে অনুষ্ঠিত হয়। বাঙালী জাতিকে তবে সাংস্কৃতিক বন্ধনে বাঁধিতে সুবিধা হইবে।"

বিষয়টি রামেন্দ্রসুন্দরকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে এবং সঙ্গে সঙ্গেই তিনি এর দায়িত্বভার গ্রহণ ক'রে প্রয়োজনীয় কাজে অগ্রসর হন। ১৩১৪ সনে কাশিমবাজারে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে অভিভাষণ প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর বলেন: "বাঙলা দেশের, বাঙালী জাতির ধারাবাহিক ইতিহাস নাই; কিন্তু বাঙলা দেশের অতি পুরাতন সাহিত্য আছে। সেই সাহিত্য বাঙালীর পক্ষে অগৌরবের বস্তু নহে। এমন কি সেই সাহিত্যই বাঙালীর পক্ষে একমাত্র গৌরবের ধন। চণ্ডীদাস মধুর রসের সুধার ধারা ঢালিয়া যে সাহিত্যকে আর্দ্র করিয়াছেন, রামপ্রসাদ তাঁহার মায়ের চরণে আপনাকে নৈবেদ্য স্বরূপে অর্পণ করিয়া যে সাহিত্যে ভক্তিরসের স্নেহসেচন করিয়াছেন, সেই সাহিত্য শিরে ধরিয়া, ভবের বাজারে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার অধিকারে আমাদিগকে বাধা দিতে কেহ সাহস করিবে না,—বসুমতীর বড়বাজারের প্রদর্শনীতে বাঙালীর পক্ষে আর কোন পণ্যদ্রব্য দেখাইবার আছে কি?···জাতির সহিত জাতির ও রাষ্ট্রের সহিত রাষ্ট্রের জীবনদ্বন্দ্বের বিকট কোলাহল, যাহা শত শতাব্দের নীরবতা ভঙ্গ করিয়া আজ পর্যন্ত মানবের ইতিহাসে ধ্বনিত হইতেছে, সেই কোলাহলের মধ্যে বাঙালীর ক্ষীণকণ্ঠ শ্রুতিগোচর হয় না বলিলেই চলে। বাঙালীর ভবিষ্যতের আশা ও ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষা যাহাই হউক, বঙ্গের প্রাচীন ইতিহাসে বাঙালীর বৈশ্যবৃত্তির ও বীরবৃত্তির কীর্তিকথা লইয়া জগতের সম্মুখে উপস্থিত হইতে আমরা কখনই সাহসী হইব না। নাই বা হইলাম। তজ্জন্য লজ্জিত বা কুণ্ঠিত হইবার হেতু দেখি না। বাঙলার পুরুষ-পরম্পরাগত সহস্র বৎসরের ধারাবাহিক সাহিত্য লইয়া আমরা ভবের হাটে উপস্থিত হইব; সেখানে কেহ আমাদিগকে ধিক্কার দিতে পারিবে না।—বাঙলার ইতিহাস নাই বটে, কিন্তু এই সাহিত্য হইতে আমরা প্রাচীন বাঙালীর নাড়ীনক্ষত্রের পরিচয় পাই। সেকালের বাঙালী কিরূপে কাঁদিত, কিরূপে হাসিত, তাহার অন্তরের মর্মস্থানে কখন কোন্ স্বরে ধ্বনি উঠিত, তাহার আশার কথা, আকাঙ্ক্ষার কথা, তাহার স্বপ্নের কথা এই প্রাচীন সাহিত্য হইতে আমরা জানিতে পারি। পৃথিবীতে কয়টা জাতি এতদিনের এমন সাহিত্য দেখাইতে পারে? তাহাদিগকে আপনার অস্তিত্বের জন্য লজ্জিত হইতে হইবে না।···"

বিজ্ঞানী হয়ে বাংলা সাহিত্যকে রামেন্দ্রসুন্দরের ন্যায় এমন ভালবাসবার নিদর্শন বিরল। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ভিন্ন বাংলা

সাহিত্য সাধনার এমন সার্থক দৃষ্টান্ত বড় একটা পাওয়া যায় না। একটি সারস্বত ভবন প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতাও রামেন্দ্রসুন্দর উপলব্ধি করেন। এই সারস্বত ভবন হবে বাংলা ও বাঙালী জাতির শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান। রামেন্দ্রসুন্দরের মতে, "যেখানে বসিয়া আমার বাঙ্গলা দেশকে ও বাঙালী জাতিকে প্রত্যক্ষভাবে ও স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইব, সেইখানে বসিয়া আমরা বঙ্গভূমির বর্তমান অবস্থা তন্ন তন্ন করিয়া জানিতে পারিব ও অতীত ইতিহাসের সম্যক্‌রূপে আলোচনার সুযোগ পাইব। সেই মন্দিরের এক পার্শ্বে একটি পুস্তকালয় থাকিবে, সেইখানে বাঙ্গলা ভাষায় রচিত মুদ্রিত-অমুদ্রিত, প্রকাশিত-অপ্রকাশিত যাবতীয় গ্রন্থ সংগৃহীত হইবে, বঙ্গের নানা স্থান হইতে সংগৃহীত হাতে-লেখা প্রাচীন পুঁথি সেইখানে স্তূপীকৃত হইবে।...মন্দিরের অন্যস্থানে আমরা বঙ্গের সাহিত্যিকগণের স্মৃতিচিহ্ন দেখিতে পাইব।...আর একস্থানে বাঙ্গলার পুরাতত্ত্বের উপাদান সংগৃহীত হইবে। বাঙ্গলার যেখানে যে তাম্রশাসন বাহির হয়, সেখানে যে মুদ্রা পাওয়া যায়, তাহা সেইস্থানে সজ্জিত হইবে। বঙ্গের পরিত্যক্ত রাজধানীসমূহের ভগ্নাবশেষের ছায়াচিত্র উহাদের পূর্ব্ব গৌরব স্মরণ করাইবে।...আর একস্থানে কর্ম্মবীরদের স্মৃতিচিত্রের সংগ্রহ থাকিবে। প্রতাপাদিত্য ও সীতারাম হইতে রামগোপাল ঘোষ ও কৃষ্ণদাস পাল পর্য্যন্ত সকলেরই কোন-না-কোন নিদর্শন দেখিয়া আমরা পুলকিত হইব। কর্মীদের পার্শ্বে পণ্ডিতদের স্থান থাকিবে।...এই মন্দিরকেই আমি মাতৃমন্দির নাম দিতে পারি ও এই মন্দির মধ্যে সংগৃহীত দ্রব্যসম্ভারকে আমি মাতৃপ্রতিমা নাম দিতে পারি।"

পরিতাপের বিষয় যে রামেন্দ্রসুন্দরের এই পরিকল্পনা অদ্যাবধি সর্বাংশে পূর্ণ হয় নি। এই মাতৃমন্দির ও মাতৃপ্রতিমা প্রতিষ্ঠান স্বপ্ন থেকেই রামেন্দ্রসুন্দরের প্রাণে দেশাত্মবোধ জাগ্রত হয়। তাঁর স্বদেশপ্রেমও ছিল অনন্যসাধারণ। স্বাদেশিকতা সম্পর্কে তিনি যে সংজ্ঞা আরোপ ক'রে গেছেন, জাতির জীবনে তা চিরকাল স্মরণীয়। তিনি বলেন: "মূলে স্বদেশানুরাগের ভিত্তি না থাকলে স্বদেশের উন্নতিচেষ্টা কেবল পণ্ডশ্রম; এবং যে জাতির আপনার পুরাতন কাহিনী জানিবার প্রবৃত্তি নাই, তাহার স্বদেশানুরাগের আস্ফালন সর্বতোভাবে উপহাস্য। স্বদেশের উন্নতির জন্য এদেশে রাজনৈতিক আন্দোলন, শিল্পশিক্ষার প্রচার, বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রচার, শিল্পসমিতি স্থাপন প্রভৃতি নানাবিধ উদ্যমই ব্যর্থ ও বন্ধ্য হয়। তাহার মূল কারণ এক। আপনার জাতির অতীত ইতিহাসে যাহার শ্রদ্ধা নাই, সে যেন কৃত্রিম স্বদেশপ্রিয়তার স্পর্দ্ধা না করে। আপনার জাতিকে যে চেনে না, সে যেন কৃত্রিম স্বদেশানুরাগের আস্ফালন না করে।"

১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের অবিমৃষ্যকারী শাসননীতির ফলে বঙ্গভঙ্গ সুনিশ্চিত হ'লে রামেন্দ্রসুন্দর তার বিরুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ ক'রে দাঁড়ান এবং বাংলার নারী সমাজকেও স্বাদেশিকতার ব্রতে উজ্জীবিত ক'রে তোলেন। তাঁর 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' সেই নারী-জাগরণেরই শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। রামেন্দ্রসুন্দরের দেশাত্মবোধ ও সাহিত্যকীর্তির অন্যতম সম্পদ্‌ এই 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা'। নিজের স্বদেশানুরাগ সম্পর্কে তিনি বলেছেন: "শৈশবেই আমি জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী বলিয়া জানিতে উপদিষ্ট হইয়াছিলাম। সে মন্ত্রে দীক্ষা সে বয়সে সকলের ভাগ্যে ঘটে না। যিনি দীক্ষা দিয়াছিলেন, তিনি কোথা হইতে আজিও আমার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছেন; তাঁহার দিব্যদৃষ্টি অতিক্রম করা আমার সাধ্য নহে। আমার শক্তি ছিল না, কিন্তু সেই দিব্যনেত্রের প্রেরণা ছিল; আমার জীবনে যদি কিছু সার্থকতা থাকে, তাহা সেই প্রেরণার ফল।"

রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে এই দেশমাতা ও গর্ভধারিণী জননী এক হয়ে মিশে গিয়েছিলেন। শেষ বয়সে স্বর্গাদপি গরীয়সী সেই গর্ভধারিণীর মৃত্যুশোক তিনি সহ্য করতে পারেন নি। সেই শোকেই তিনি শয্যা গ্রহণ করলেন এবং এই শয্যাই তাঁর শেষ শয্যা হ'ল।

জেনারেল ডায়ারের নির্মম আদেশে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড তখন কেবল সমাপ্ত হয়েছে! নিরীহদের উপর এই নির্মম অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ তদানীন্তন বড়লাট লর্ড চেম্‌সফোর্ডকে পত্র দিয়ে তাঁকে প্রদত্ত 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেন। এতে সেদিন সব চাইতে যিনি বেশী খুশী হয়েছিলেন, তিনি রামেন্দ্রসুন্দর। তাঁর রোগশয্যায় এসে রবীন্দ্রনাথ যখন লর্ড চেম্‌সফোর্ডকে লিখিত তাঁর মূল পত্রের পাণ্ডুলিপিটি তাঁকে প'ড়ে শোনান, দারুণ একটা উত্তেজনায় তখন রোগশীর্ণ রামেন্দ্রসুন্দরের সমস্ত প্রাণসত্তা আবেগচঞ্চল হয়ে ওঠে; মাথা নত ক'রে তিনি রবীন্দ্রনাথের পদধূলি গ্রহণ করেন। অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে তাঁর প্রাণবায়ু নিঃশেষিত হ'য়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরের এই ঐতিহাসিক মিলন ও রামেন্দ্রসুন্দরের মহাপ্রয়াণ যেমন অভিনব, তেমনি বিস্ময়কর। ১৯১৯ সালের ৬ই জুন তিনি তাঁর

চিরস্বপ্নের চির সাধনার বঙ্গভূমিকে মনে মনে শেষ প্রণাম নিবেদন ক'রে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। ২০শে আগষ্টের ন্যায় ৬ই জুন নৈসর্গিক নিয়মে বার বার বর্ষচক্রে ঘুরে আসবে, কিন্তু যে মহান্ অভ্যুদয়ে বাংলা সাহিত্য তথা বঙ্গসংস্কৃতি একদিন অতুল প্রাণৈশ্বর্যে ঐতিহ্যশালিনী হয়ে উঠেছিল, সেই মহাপ্রাণ মনীষীকে এদেশের উন্মুখ দৃষ্টি আর কোন কালেই অবলোকন করবে না। রামেন্দ্রসুন্দরের এক সম্বর্ধনা সভায় তাঁকে সাদর অভিনন্দন জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন: "সর্বজনপ্রিয় তুমি, মাধুর্যধারায় তোমার বন্ধুগণের চিত্তলোক অভিসিক্ত করিয়াছ। তোমার হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর, হে রামেন্দ্রসুন্দর, আমি তোমাকে অভিনন্দিত করিতেছি।"

রামেন্দ্রসুন্দরের প্রতি এই বাণীই বাংলার আত্মনিবেদনের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যরূপে চিরকাল তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদিত হয়ে রইল।

নায়িকা

শ্রীঅজিত চট্টোপাধ্যায়

খবরটা চারুদি এনেছিলেন। নির্মলার কাছে সুসংবাদ বৈকি। অন্য কিছু নয়,—একটা কাজের খবর। নির্মলা যদি নিতে রাজী থাকে, চারুদি চেষ্টা করবেন ওর জন্য।

সেই মোমিনপুর থেকে যাদবপুর পর্যন্ত এতটা পথ এসে প্রায় হাঁফাচ্ছিলেন চারুদি। ওর চিবুকের নীচে আর কপালের কাছে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জলবিন্দুর মত টলটল করছিল। চারুদির বয়স বেশী নয়। তবে মোটা হয়েছেন খুব। এই ভাদ্রের গরমে এতটা পথ এসে কথা বলতে গিয়ে হাঁসফাঁস করবার মত অবস্থা হচ্ছিল তাঁর।

নির্মলা একটা মাদুর পেতে বসতে দিল তাকে। ঘরের এককোণ থেকে একটা তালপাতা কুড়িয়ে এনে জোরে হাওয়া করতে সুরু করে দিল।

একগাল হেসে চারুদি বললেন, 'তোর বাড়ীতে আসতে এইজন্যই এত ভাল লাগে। তোর কথা সব সময়ে এত মনে পড়ে। একবার এলে কি যে যত্ন করিস্ তুই।'

একটু পরে নির্মলার হাত থেকে তালপাতাটা কেড়ে নিয়ে নিজেই হাওয়া খেতে লাগলেন। নির্মলা চুপ করে বসে রইল।

কাজের কথাটা ব্যক্ত করলেন চারুদি। ডালহৌসী অঞ্চলের কি একটা আপিসে পূজার আগেই থিয়েটার হবে। ওদের একজন মেয়ে চাই, মানে নায়িকার রোলে, ওখানকার এক-কর্তা ব্যক্তির সঙ্গে চারুদির জানাশোনা আছে। সেই প্রণব সরকারই এক রকম থিয়েটারের সব। ডিরেক্টর, অর্গানাইজার থেকে ড্রামা কমিটির সভাপতি পর্যন্ত। চারুদি বললে প্রণব সরকার কথা রাখবে। নির্মলাকে নায়িকার রোলটা নিশ্চয় দেবে। ওকে একটা মৃদু ধাক্কা দিয়ে সহাস্যে চারুদি বললেন, 'কিরে, পারবি না অভিনয় করতে?'

—'মানে, অনেক দিন ত এসব করি নি।'—নির্মলা একটু কুণ্ঠিত হয়ে বলল।

—'আহা, তাতে কি হয়েছে। বিয়ের আগে ত ক'বারই করেছিস্। পাড়ার থিয়েটারে তোর নামও হয়েছিল। অভিনয় করা একটা ক্ষমতা। এত সহজে কি চলে যায়?'

নির্মলা বলল, 'তা ঠিক চারুদি। তবে কেমন ভয় ভয় করছে।'

চারুদি হাসলেন শুধু, 'ওসব ভয়টয় দু-একদিনেই কেটে যাবে দেখবি। তুই রাজী হয়ে যা। ওরা আশী টাকার মত দেবে। তা ছাড়া বাস ভাড়া ইত্যাদি, প্রায় শতখানেক টাকার মত পাবি। আমি প্রণব সরকারকে বলি তোর কথা।'

ঘরের মধ্যে বসেছিলেন চারুদি। নির্মলা চা করে আনতে গেছে। বেলা পড়ে আসছে। রোদটা এখন বাদামী রঙের। জানলার ফাঁক দিয়ে ঘরের পিছনকার ছোট্ট বাগানটার দিকে বার বার চাইছিলেন চারুদি। এই শেষ বর্ষায় জলে-রোদ্দুরে কেমন পুরুষ্ট হয়ে বেড়ে উঠেছে গাছগুলো। বেড়ার গায়ে অপরাজিতার লতায় নীল ফুল ফুটতে দেরি নাই আর। কয়েকটা রক্তমুখী জবা বাগানের কোণের একটা গাছে ফুটে রয়েছে—।

ঘরের দৈন্যদশা চারুদির দু'টি চোখকে পীড়া দিচ্ছিল খুব। ছিরিছাঁদে এতটুকু শ্রী নেই কোথাও। অভাবে-অনটনে নির্মলা জেরবার হয়ে যাচ্ছে। বিছানাপত্র, মশারি, আলনায় রাখা কাপড়-চোপড়, সব কিছুতেই দৈন্যদশা। এমনি করে আর কতদিন টিঁকে থাকবে নির্মলা? কতদিন বেঁচে থাকবে মানসম্ভ্রম বজায় রেখে?

নির্মলা আসতেই জোর করে চেপে ধরলেন চারুদি।

—'কি রে, রাজী ত? তোকে রাজী না করিয়ে আমি উঠছি না। তবে একটা কথা আছে'—

চায়ের কাপ এগিয়ে দিতে দিতে নির্মলা বলল, 'আবার কি কথা চারুদি?'

—'থিয়েটারের আগে আর একটু অভিনয় করতে হবে।'

—'সে আবার কি?' উৎসুক হয়ে নির্মলা চাইল।

—'ওরা অবিবাহিতা মেয়ে ভিন্ন নেবে না।'

—'তবে ত চুকেই গেল। কিন্তু এমন ধনুর্ভঙ্গ পণ কেন ওদের? বিয়ে হওয়া মেয়েদের দোষ কিসের?'

চারুদি হেসে বললেন, 'একবার ভারী অসুবিধেয় পড়ে-

ছিল ওরা। নায়িকার রোলে নিয়েছিল এক ভদ্রমহিলাকে। বাড়ীতে তার দু' বছরের ছেলে। থিয়েটারের আগের দিন থেকে সেই ছেলের বাঁকা অসুখ। অনেক বলে-কয়ে ডাক্তার-কম্পাউণ্ডার কাছে বসিয়ে ভদ্রমহিলাকে ষ্টেজে তুলেছিল সবাই। কিন্তু ওই পর্যন্তই। অভিনয় জমে নি'—

—'তাই বুঝি?' নির্মলা মুচকি হাসল।

ওকে কাছে টেনে নিয়ে চারুদি বললেন, 'তুই রাজী হয়ে যা নির্মলা। প্রণব সরকারকে আমি কালই বলি। সামান্য কয়েকদিন আইবুড়ো সেজে যাতায়াত করলে কে বুঝছে? তোর বাড়ীতেও লক্ষ্য করার মত লোক কই তেমন?'

নির্মলা চুপ করে রইল। ওর মনের কথাটা হয়ত চারুদি বুঝতে পারছিলেন। তাই হেসে বললেন আবার, 'এত ভাবছিস্ কেন? তোর সংসারের হাল ত দেখছিস্। ঠিক পুজোর সময় এক সঙ্গে পাওয়া এতগুলি টাকা ছেড়ে দিবি তুই?'

নির্মলাকে এক নজরে দেখেই খুশী হ'ল প্রণব সরকার। চারুদিকে বলল, 'না, আপনি ঠিকই বলেছিলেন। নায়িকার রোলে একে সুন্দর মানাবে।'

অন্য আরও অনেকে বিশ্রীভাবে চেয়েছিল নির্মলার দিকে। ভারী খারাপ লাগছিল নির্মলার। কি অদ্ভুত বেহায়া এখানকার লোকগুলো, নির্মলা ভাবছিল।

চেহারা অবিশ্যি সুশ্রী নির্মলার। গায়ের রঙ মাঝ-গৌর। চোখ দু'টি বেশ আয়ত আর ভাসা-ভাসা। অভাব-অনটনেও স্বাস্থ্যটা ঠিক ভাঙ্গে নি। এখনও বজায় আছে।

চারুদি বললেন, 'আমি তা হ'লে উঠি। কথাবার্তা যা আপনার সঙ্গে বলেছি তাই রইল।'

—'নিশ্চয়ই। আর অভিনয়ের জন্য চিন্তা করবেন না। ও আমি পাখী-পড়ানো করে শিখিয়ে নেব।'

চারুদি হাসছিলেন। প্রণব সরকারের এই দোষ। থিয়েটার-সিনেমার ব্যাপারে নিজেকে একটা কেষ্ট-বিষ্টু গোছের মনে করে। অনেকটা হামবাগ গোছের লোক—

পরদিন থেকেই রিহার্সাল সুরু হয়ে গেল। নির্মলা একা নয়। আরও অনেকগুলি মেয়ে। ছোট-বড় রোলে নামবে। খানিকটা সহজ হ'ল নির্মলা। একটু আশ্বস্তও। এতগুলি দৃষ্টির সামনে আর সঙ্কুচিত হয়ে উঠতে হবে না। কুণ্ঠিত হয়ে বসে থাকতে হবে না এক পাশে।

অল্প কয়েকদিন যাবার পর আরও সহজ হয়ে উঠল নির্মলা। আলাপ পরিচয় হয়েছে দু'একজনের সঙ্গে। কেউ অভিনয় করছে বইটায়, কেউ বা নানা ফাই-ফরমাস খাটছে। দরকার মত এটা-সেটা এনে রাখছে ওদের কাছে। যাতে অভিনয় সহজ সুন্দর হয়ে উঠে। প্রাণবন্ত হ'তে পারে নাটকটা।

বিনয় সেনকে প্রথম দিন থেকেই কেমন পছন্দ হয়েছিল নির্মলার। চোখের দৃষ্টিটা বেশ সভ্য, মার্জিত। কথাবার্তা পরিচ্ছন্ন, আর পাঁচজনের মত থিয়েটারের মেয়েদের সঙ্গে গায়ে প'ড়ে আলাপ করতে আসে না। নির্মলাকে কাছে পেয়েও কোনদিন কথা বলে নি যেচে। অন্য পাঁচজনের মত গদ গদ হয়ে ওঠে নি হিরোইনের সান্নিধ্যে।

বইতে ছোট্ট একটা রোলে অভিনয় করছে বিনয় সেন। একটি টাইপ চরিত্র। নির্মলার সঙ্গে অল্প কয়েকটি কথা আছে। অভিনয় দেখে কেমন মনে হয়েছে তার, মানুষটা ঠিক ষ্টেজের নয়। কথাবার্তা বড় সাদামাটা অভিনয়ে উত্তাপ নেই।

তবু একদিন আলাপ হয়ে গেল বিনয় সেনের সঙ্গে। রিহার্সাল ঘরের বাইরে।

কি একটা ছুটির দিন। শিয়ালদতে ট্রামে উঠল নির্মলা। লেডিজ সীটের এককোণে বিনয় সেন ব'সে। ওকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে হাসল।

বসতে বসতে নির্মলা বলল, 'উঠছেন কেন? বসুন না। গল্প করতে করতে দুজনে চলে যাব।'

—'কোথা থেকে আসেন আপনি? এখানে উঠলেন যে,' বিনয় সেন প্রশ্ন করল।

—'যাদবপুর থেকে, ট্রেণে করে শিয়ালদ আসি। আপনি?'

—'উল্টোদিক্ থেকে। আগরপাড়া ষ্টেশনে ট্রেণ ধরি। এখানেই ট্রাম নিই।'

পাশাপাশি বসে গল্প করল দুজনে। অভিনয় কেমন হচ্ছে। কতখানি সাক্‌সেসফুল হবে নাটকটা। কোনখানে সাসপেন্স রয়েছে বেশী, ইত্যাদি। বেশী কথা বলছিল না

বিনয় সেন। অল্প অল্প হাসছিল। প্রশ্নের উত্তরে ঘাড় নাড়ছিল মাঝে-মধ্যে।

রিহার্সাল শেষ হবার আগে বিনয় সেনকে এক ফাঁকে বলল নির্মলা, 'যাবার সময়ে আমাকে ডেকে নেবেন। এমনিতেই অনেক রাত হয়ে গেল। তবু খানিকটা পথ আপনার সঙ্গে যাওয়া হবে।'

রাত আটটার কাছাকাছি দুজনে ট্রামে উঠল। ভাদ্রের আকাশ মেঘ থংকানো কালো। হয়ত বৃষ্টি হয়েছে আগে। পীচঢালা পথ পিচ্ছিল আর চকচকে। আকাশের এক কোণে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে অল্প-স্বল্প।......

শিয়ালদতে নেমে সাউথ স্টেশন অবধি নির্মলার সঙ্গে গেল বিনয় সেন।

বলল, 'যাদবপুর স্টেশন থেকে কতদূর যেতে হয় আপনার?'

—'বেশী নয়, অল্প খানিকটা পথ।'

—'এই অন্ধকারে অসুবিধা হবে নিশ্চয়'—

—'না, না,' নির্মলা হেসে বলল। 'পথ ত আমার চেনা, কতবার যাই-আসি।'

সাউথ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ঢুকবার গেটের কাছে এসে বিনয় সেন বলল, 'একটা কথা বলছিলাম আপনায়। আর এক জায়গায় অভিনয় করবেন, আমাকে ওরা বলছিল।'

—'কেন করব না? টাকার প্রয়োজনে এসেছি—। একটা ছেড়ে পাঁচটা করতে হবে। নইলে উপায় কি আর?' ম্লান হাসল নির্মলা।

—'কাল ত রবিবার,' কি ভেবে নিয়ে বিনয় সেন বলল, 'আপনি কি ফ্রি আছেন?'

—'হ্যাঁ, কিন্তু কেন বলুন ত?'

—'আসুন না কাল। ওদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই আপনাকে'—

কথামত ঠিক সময়ে পৌছল নির্মলা। সাড়ে তিনটের ঘর তখনও পার হয় নি কাঁটা। সাউথ স্টেশনের বড় ঘড়িটার নীচে এসে দাঁড়াল চুপ করে। 'একটু পরেই বিনয় সেন এল। হাসল মিষ্টি করে।

—'এসেছেন আপনি? আমি ভাবলাম হয়ত শেষটা'—

—'আসব না মানে? গরজটা কার?'—যেন একটা কৌতুক করছে নির্মলা। এমনি দুষ্টুমি মাখানো দু'টি চোখে চাইল ওর দিকে।

একটা ডবল-ডেকার বাসের দু'টি সীটে বসল ওরা। দ্রুতগতিতে বাস ছুটছে। দুপাশে দোকানপাট, লোকজন হাঁটছে পথ বেয়ে।

নির্মলা বলল, 'আচ্ছা, আমার জানাশোনা এক ভদ্র-মহিলাকে পাইয়ে দিন না রোলটা'—

—'তাতে আপনার কি লাভ?'

—'আমার লাভের কথা উঠছে না। ভারী বিপদে পড়েছে বেচারী, তাই'—

—'সেটা বুঝলাম, কিন্তু আপনার মত অভিনয় কি করতে পারবেন তিনি?'

মুচকি হেসে নির্মলা বলল, 'তা বোধহয় পারবে। তবে'—

—'তবে কি?'

—'মেয়েটি বিবাহিতা।'

—'তা হ'লে নেবে না। বিবাহিতা মেয়েদের নিয়ে অনেক ঝামেলা হয়। আজ ছেলের সর্দি, কাল স্বামীর জ্বর। বড্ড কামাই করেন ওঁরা। রিহার্সালের কাজ এগোয় না একদম'—

—'এ আপনাদের মিথ্যে ধারণা'—নির্মলা মুখ ভার করে বলল।

উত্তর কলকাতার কি একটা ক্লাবে বিনয় সেন এনে তুলল নির্মলাকে। আলাপ করিয়ে দিল সেক্রেটারীর সঙ্গে। পূজোর আগেই রিহার্সাল সুরু করবে ওরা। বই মঞ্চস্থ হবে পূজোর পর। শীতের সুরুতে—

কথাবার্তা, টাকাকড়ির ব্যাপার মিটল, সোয়াশ' টাকার মত পাবে নির্মলা। ভদ্রলোক বললেন, 'তা হ'লে এগ্রিমেন্টের কাগজটা বিনয়কে দিয়েই পাঠিয়ে দেব আপনায়, এ্যাডভান্সও কিছু দিয়ে দেব। ওদের নাটকটা শেষ হ'লেই আমাদের এখানে চলে আসুন। বিনয় ত থাকছেই নাটকে। আমাদের সকলের সঙ্গেও আলাপ-পরিচয় হবে আস্তে আস্তে।'—

পথে নেমে বিনয় সেন প্রস্তাব করল, 'এক্ষুণি বাড়ী যেয়ে কি লাভ হবে আর? চলুন না, ময়দানের ওধারে কোথাও গিয়ে বসি, যা গুমোট গরম।'

নির্মলার খুব একটা আপত্তি নেই। সত্যি গুমোট করে আছে। এরই মধ্যে ঘামে ভিজে জবজব করছে জামার কোন কোন অংশ। আকাশে মেঘ আছে ঠিক। কিন্তু বৃষ্টির নামগন্ধ নেই।

আউটরাম ঘাটের থেকে খানিকটা দূরে ময়দানের সবুজ ঘাসের উপর বসল ওরা। সন্ধ্যে নামতে দেরি নেই, চৌরঙ্গীর দোকানগুলিতে আলো জ্বলে উঠছে···রাস্তার নিওন বাতিগুলি আলোয় আলোয় চক্‌চকে করে তুলেছে পীচমাখানো রাজপথকে।

বিনয় সেন বলল, 'বাড়ীতে কে কে আছেন আপনার? মা-বাবা সবাই?

—'বাবা নেই। আপনার বাড়ীতে?'—

—'আমি আর মা শুধু'—

কি ভেবে ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটল নির্মলার। বলল, 'আর কাউকে আনেন নি? আপনার মায়ের পুত্রবধূ?'

—'না, তবে এবার ভাবছি আনব।' নির্মলার চোখের মণির দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে সে উচ্চারণ করল কথা ক'টি। তার পর আবার তরল গলায় খানিকটা হাসি মিলিয়ে বলল, 'কি জানেন, কারও সঙ্গে আলাপই হ'ল না ভাল করে। কাউকে জানলামই না, তা বিয়ে করব কি করে?'

নির্মলা থিয়েটারের নায়িকার মত খিলখিল করে হেসে উঠল। 'না জেনেশুনে কারও গলায় মালা দিতে হাত ওঠে না বুঝি?'

উত্তরে বিনয় সেন কথা বলল না। মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল নির্মলার দিকে!

দিন কয়েক পর। থিয়েটারের দিনটি এগিয়ে আসছে। মহড়া চলেছে পুরোদমে। প্রণব সরকার ব্যস্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তালিম দিচ্ছে সকলকে। নির্মলাকে প্রশংসা করছে সবাই। একটি দারিদ্র্যনিপীড়িত গৃহবধূর রোলে অপূর্ব অভিনয় করছে সে। খুব সহজ আর সুন্দর হচ্ছে ওর রোল।

এক সময় বিনয় এসে বলল, 'শুনুন, একটা কথা আছে।'

নির্মলা এগিয়ে আসতেই বিনয় সেন ওকে দু'টি ছোট ছোট নীল কাগজ তুলে দেখালেন।

—'কি এটা?

—'সিনেমার টিকিট। আজ দুটার শোতে, যাবেন ত?'

চোখের তারায় কৃত্রিম কোপ এনে নির্মলা বলল, 'আপনি কিন্তু আগে আমায় বলেন নি।'

বিনয় সেন হাসল, বলল, 'তাতে ভয় ছিল খানিকটা, যদি আপনি না যান।'

একটু হেসে নির্মলা অন্যদিকে চলে গেল।

সিনেমা হলের অন্ধকারে বিনয় সেনের এত কাছাকাছি এই প্রথম বসল নির্মলা। কেমন শিরশির করছিল গাটা। নিজের মনে ভাবছিল একটা কথা। বিনয় সেন স্বাভাবিক পথে এগিয়ে আসছে। নির্মলা জানত, এমনি হবে। কিন্তু মনকে শাসন করতে পারে নি। প্রথম দিন থেকেই ওকে ভারী পছন্দ হয়েছে নির্মলার। সেইজন্যই প্রশ্রয় দিয়েছে খানিকটা। ওর মত সুন্দর যুবক নির্মলার স্বপ্নে আঁকা হয়ে আছে, বিনয় সেন নির্মলার সেই স্বপ্নলোকের অধিবাসী।

কখন এক সময় নির্মলার বাঁ-হাতের আঙুল ক'টি নিজের হাতে তুলে নিয়েছে বিনয় সেন। নাড়াচাড়া করছে হাল্কা আলতো ভঙ্গিতে। নির্মলা বাধা দেয় নি। কি হবে প্রতিবাদ তুলে? ওর সামান্য এই ভাললাগাটুকুতে সে অমত করতে পারবে না। কিছুতেই না—

সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে বিনয় সেন বলল, 'পরশু ত থিয়েটার। তারপরই নতুন কণ্ট্রাক্টটা আর এ্যাডভান্সের টাকা নিয়ে আপনার বাড়ীতে যাচ্ছি আমি।'

চোখ বড় বড় করে নির্মলা বলল, 'আমার বাড়ীতে কেন? বরং আমি এসে ওগুলো নিয়ে যাই।'

—'আপনার বাড়ীতে যাওয়ার দরকার আছে আমার। এরপর হয়ত আমার মাকেও নিয়ে যেতে হবে।'

কেমন ঠাণ্ডা আর ভিজে ভিজে মনে হ'ল নির্মলাকে। মুখটা ফ্যাকাশে আর অসহায় দেখাল।

—'এখনই কেন? আর কিছুদিন যাক্ না'—ফিসফিস করে কথা ক'টি বলল নির্মলা।

—'আচ্ছা নার্ভাস ত তুমি। এতে ভয় কি নির্মলা?'

কান দুটো লজ্জায় লাল। রগ দুটো গরম মনে হচ্ছিল নির্মলার। সাউথ স্টেশনে এসে লোক্যাল ট্রেণের কামরায় বসে চোখ কুঁচকে চেয়ে রইল বাইরের দিকে। দক্ষিণে বৃষ্টি হয়েছে কোথাও। জলে-ভেজা বাতাস এসে চোখ-মুখে লাগছে। ভাল লাগছে নির্মলার।

যাদবপুর স্টেশনে নেমে পুবদিকের রাস্তাটা ধরল বিনয় সেন। হালতু ইউনিয়ন বোর্ডের আপিসটা ছাড়িয়ে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেল। জায়গাটা কলোনীর মত। ছোট-বড় বাড়ী এখানে-সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। নির্মলা সান্যালের বাড়ীর নম্বরটা অনেক খুঁজে-পেতে বের করল।

বেড়ার গায়ে রাংচিতা। বাগানে ফুল ফুটেছে—দোপাটি আর হলদে গাঁদা। একটি বছর ছয়ের ছেলে ধুলোয় বসে খেলছে। ঘর-বাড়ী তৈরি করছে নিজের মনে। কাগজপত্র, ছোট ছোট কাঠি আর ধুলো-বালি দিয়ে নিজের মনে গড়ছে কত কিছু।

বিনয় সেন বলল, 'খোকা, এখানে নির্মলা সান্যাল থাকেন ?'

ছেলেটি এক ছুটে খবর দিল বাড়ীতে। বিনয় সেন জামাকাপড় ঝেড়েঝুড়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

দাওয়ায় এসে দাঁড়ালেন এক বৃদ্ধা। 'কে এসেছ বাবা ? একটু সামনে এসে দাঁড়াও না। আমি আবার দেখতে পাই নে চোখে।'

—'নির্মলা দেবী কি আপনার মেয়ে? আছেন তিনি ?'

—'মেয়ে নয় বাবা। আমার বৌমা—ঐ ত নাতি। ছেলে আজ বছর-পাঁচ হ'ল নিরুদ্দেশ। কোথায় যে গেল কোন খোঁজ পাই নি আর। তুমি বস না বাবা।'

সমস্ত মুখখানা রক্তশূন্য দেখাল বিনয় সেনের। ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে গলায় বলল, 'আপনার বৌমা কোথায় ?'

—'আসবে এক্ষুণি। তুমি বস না একটু—। আজ সাবিত্রী ব্রতের দিন। পূজো দিতে পাঠিয়েছি। শাস্তরে বলে সাবিত্রী ব্রত উদ্‌যাপন করলে সোয়ামী আবার ফিরে আসে। আজই ত উদ্‌যাপন হ'ল। ওর সোয়ামী কি আর ফিরে আসবে! বেঁচে আছে কি না কে জানে।' একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল তাঁর।

কণ্ট্রাক্টের কাগজখানা আর পঞ্চাশটা টাকা এগিয়ে দিতে দিতে ঘরের সবকিছু এক নজরে দেখে নিল বিনয় সেন। বলল, 'আর বসব না। আপনার বৌমার জানা-শোনা কে একটি মেয়ে নাকি খুব বিপদে পড়েছে। তার জন্য এই টাকা আর কাগজখানা রেখে গেলাম। আপনার বৌমাকে দেবেন।'

—'তোমার নাম বাবা ?'

নিজের নামটা বলল বিনয় সেন। তার পর একটু হেসে বলল আবার, 'একটা কথা বলছি আপনায়। আপনার বৌমা সধবা মেয়ে। সিঁথিতে বড় কম সিঁদুর পরেন। আপনি ত দেখতে পান না চোখে, একটু বলে দেবেন ত—'

পিছন ফিরে আর না তাকিয়ে হন হন করে এগিয়ে চলল বিনয় সেন।

রাস্তার পাশে নির্মলা সান্যালের ছেলেটি খেলা থামিয়ে ওর দিকে চেয়ে। একটু আগে যে ঘরবাড়ী তৈরি করেছিল, তা ভেঙ্গে পড়েছে পায়ের ধাক্কা লেগে। ধুলোবালি, কাগজপত্র, ছোট ছোট কাঠি এখানে-সেখানে গড়িয়ে যাচ্ছে—

বাড়ীর একপাশে রাংচিতার বেড়ার গায়ে ঠেস দিয়ে নির্মলা ভাবছিল। শুকনো মুখ আর মলিন দৃষ্টি। নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর সঙ্গে মনটাও যদি উধাও হ'ত নির্মলার। সাবিত্রী ব্রত উদ্‌যাপন করলে সত্যিই কি ফিরে আসে স্বামী ? ফিরে আসে কি না কে জানে। কিন্তু ফিরেও যায়।

অনেক দূরে বিনয় সেনের মূর্তিটা পথের বাঁকে অদৃশ্যমান। নির্মলা জানে ওর ডাকে আর কিছুতেই ফিরবে না বিনয় সেন। কোনদিন কাছে এসে ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলবে না ওর চোখের দিকে চোখ রেখে। পায়ে পায়ে এগিয়ে যাবে না সাউথ স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম পর্যন্ত। শিয়ালদ'র মোড়ে দেখা হ'লে হয়ত হাসবে বিনয়, নমস্কার জানাবে। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। তারপরই এগিয়ে যাবে যেন স্টেশনের দিকে। একটি লোক্যাল ট্রেণের কামরায় বসে সিগারেট ধরিয়ে শান্তদৃষ্টিতে চাইবে বাইরের দিকে। প্রতীক্ষা করবে আগরপাড়া স্টেশনের……।

এক নিমেষ

শ্রীআভা পাকড়াশী

এলাহাবাদ স্টেশন। একটা থার্ড ক্লাস মেয়ে গাড়ির সামনে ভিড়ে ভিড়।

পুলিশ কর্কশ কণ্ঠে প্রশ্ন করছে, নাম কি তোমার?

—ফুলমতীয়া।

—বয়েস কত? উমর কিতনা?

—আঠ্‌তিস।

তোমার? এই বেওয়া, তোমার নাম কি?

—ব্রিজ্‌বালা।

—উমর? বয়েস কত?

—চালিশ!

—এই বহু—এ-ই, কি নাম তোর? আরে রোতা কিঁউ? নাম বোল।

—নীলম।

—উমর?

—আঠারা।

—এবার ফুলমতীয়া, বল কি হয়েছিল? কে মারল তোমার বাচ্চাকে? কে খুন করল এমনি করে?

চোখে আঁচল চাপা দিয়ে ধীরে ধীরে বলে ফুলমতীয়া, কেউ মারে নি সাহেব, আমার ভাগ্যই খতম করে দিয়েছে ওকে। সবই আমার নসিব। কত পীর ফকিরের পায়ে ধরে, মন্দিরে মন্দিরে পুজো চড়িয়ে ওকে কোলে পেয়েছিলাম, সেই আমার কোলের কাছে দাঁড়িয়ে, আমার চোখের সামনে নিমেষে শেষ হয়ে গেল। বাঁচাতে পারলাম না তাকে। বৃথাই মা হয়েছিলাম। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে আবার। তার পাশেই নক্সা-করা কাঁথায় মোড়া একটি বছর-দুয়েকের বাচ্চার লাশ। তাজা রক্তে একেবারে ভিজে রয়েছে। ধমকে ওঠেন পুলিশসাহেব—আরে, কি হয়েছিল বল না? পহেলে বোল কেয়া হুয়া থা। কেঁদো পরে।

লোকের ভিড় জমে গেছে ওদের ঘিরে। আমিও সেই ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ি। সকলকে জিজ্ঞেস করি, কি হয়েছে ভাই? আহা, কে মেরেছে বাচ্চাটিকে? কেউই কিছু জানে না। দেখলাম সবাই আমার মতই অজ্ঞ।

কানপুর থেকে মোগলসরাই যাচ্ছি দিদির বিয়েতে। এলহাবাদ স্টেশনে গাড়ি থামতে দেখি এই ব্যাপার।

আবার পুলিশ সাহেবের গলা শুনলাম, কি বলছ স্পষ্ট করে বল। আলিগড় স্টেশন থেকে উঠেছ তুমি?

এবার ফুলমতীয়া মেয়েটি কান্না থামিয়ে স্থির হবার চেষ্টা ক'রে কথার জবাব দেয়। হাঁ সাহেব। আমি আলিগড়ে আমার ভাই-এর কাছে গিয়েছিলাম। আমার স্বামী এলাহাবাদের লোকোশেডে কাজ করে, ছুটি পায় নি। তাই আমি একাই মাইকা গিয়েছিলাম। এই বাচ্ছাটিকে নিয়ে। ফেরার সময় ভাই তুলে দিয়েছিল।

স্টেশনের গণ্ডগোলে আবার কথা হারিয়ে গেল। সমানে হেঁকে চলেছে গরম চা……আ। পুরী তরকারি চাইয়ে? বর্ফি লাড্ডু চাইয়ে? ওদিকে পাশের R. M. S-এর ভ্যান থেকে ধপাধপ শব্দ করে ডাক নামাচ্ছে। হুড়মুড় করে লোক বেরুচ্ছে এক্সিট লেখা গেট দিয়ে। এটা এক নম্বর প্লাটফর্ম।

আবার শুনতে পেলাম, ফুলমতীয়া পাশের সেই বিধবা বৌটির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলছে - অলিগড়ের পরের স্টেশনে বোধ হয় এ বেওয়া উঠল তার রাশীকৃত সামান আর পাঁচ-ছয়টি ছেলেমেয়ে নিয়ে। গাড়িতে ভীষণ ভিড় ছিল। তাই দরজা দিয়ে ঢুকতে না পেরে জানলা গলে ঢুকল ওরা। জিনিষগুলোও ঐ জানলা দিয়েই ভেতরে ঢোকাল। মস্ত বড় একটা ট্রাঙ্ক টেনেটুনে আমার বেঞ্চির বাঙ্কের ওপর তুলল। আমি একটা খোপের জানলার ধারে বসবার জায়গা পেয়েছিলাম। ওরা তার উল্টো-দিকের জানলা দিয়ে ঢুকছিল: আমি বেঞ্চিতে বসে ছিলাম আর এই মুন্না আমার কোলের কাছে দাঁড়িয়ে আমার এই চাঁদির গোঠ নিয়ে খেলছিল। ব'লে আবার চোখে আঁচল চাপা দিল। তাকিয়ে দেখলাম ওর গায় অনেক রূপোর গয়না। পরনের শাড়ীখানাও বেশ রঙচঙে আর দামী। ওর তুলনায় বিধবাটির দারিদ্র্য প্রকট। ওপাশের ফর্সা গোলগাল বৌটি সেই নীলম, এখন কান্না থামিয়ে কাজলমাখা চোখে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে।

আবার সুরু করে ফুলমতীয়া, বলে, সেই ভারী ট্রাঙ্কটা ছিল বাঙ্কের ওপর, গাড়ি যখন পুরোদমে চলতে সুরু করল তখন সেই ট্রাঙ্কটা হঠাৎ আমার বাচ্চার মাথার ওপর হুড়মুড় করে পড়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা ওর গুড়িয়ে গেল সাহেব, গুঁড়িয়ে গেল। ব'লেই হু হু করে কেঁদে উঠল। আবার পুলিশ সাহেব প্রশ্ন করায় ধীরে ধীরে বলতে সুরু করল, আমার ভাগ্য সাহেব, তখুনি বাচ্চার আমার মাথাটা ভেঙ্গে গিয়ে গল গল করে রক্ত পড়তে লাগল। আমি তাকে টেনে নেবার সময়টুকুও পেলাম না। দু'বার নিঃশ্বাস টেনেই বাচ্চা আমার তক্ষুণি শেষ হয়ে গেল। আমার চোখের সামনেই আমার কোলের কাছে দাঁড়িয়ে, আমার অত সাধের বাচ্চা, মরে গেল সাহেব। আমি পাথর হয়ে গেলাম।

ঐ বিধবাটির কোলের ঐ দেড় বছরের বাচ্চাটা আমার পাশেই বসেছিল। তাই দেখে আমার মনে একেবারে আগুন জ্বলে উঠল, ঠিক করলাম, বদলা নিতে হবে। এত বড় অন্যায়ের প্রতিশোধ না নিয়ে আমি ছাড়ব না। ঐ বেওয়া তখন গেছে অন্য খোপে, এই কাণ্ড হয়ে যাওয়ায় সাহায্য চাইতে। হায় হায় করছে সেখানে দাঁড়িয়ে। এই সুযোগ আর ছাড়া নয়। টেনে নিলাম বাচ্চাটাকে। গাড়ি তখন পুরোদমে ছুটছে। দূরে দেখতে পাচ্ছি একটা পুল। ভাবছি পুলের ওপর গাড়িটা চড়লেই দেব বাচ্চাটাকে জলে ফেলে। উত্তেজনায় বুক ঢিপ ঢিপ করছে আমার।

এইবার চড়ছে গাড়ি পুলের ওপর, শব্দ উঠছে গুম গুম গুম—এবার ফেলে দিই, এবার ফেলে দিই—কিন্তু বাচ্চাটার গায়েও ঠিক আমার বাচ্চার গায়ের গন্ধ। ও-ও ঠিক তেমনি করে আমার গলার হাঁসুলি, কানের ঝুমর নিয়ে খেলছে। কপালের বিন্দিতে হাত দিচ্ছে। বুকের মধ্যেটা কেমন হু হু করে উঠল। তবু মন শক্ত করে ঠিক করলাম, না, ফেলেই দেব বাচ্চাটাকে। কোন রকম কোমলতার প্রশ্রয় দেব না। এইবার গাড়ি চড়েছে পুলের ওপর, ঘটাং ঘটাং শব্দ উঠছে আর সেই তালে আমার মনও বলছে, ডরো মত্, বদলা লেও, ডরো মত, বদলা লেও। এবার ফেল, এবার ফেল। এই সুযোগ, ওর মা এখনো ফেরে নি। ওকে উঁচু করে তুলে জানলা দিয়ে ছুঁড়ে দিতে গেলাম আর অমনি বাচ্চাটা খিল খিল করে হেসে উঠে সহসা ডেকে উঠল, আম্মা। ও মনে করেছে এটা একটা খেলা। আবার হ্যাঁচকা টান দিয়ে তুলে ফেলতে যাব, আমার গলা জড়িয়ে রইল। পারলাম না ফেলতে সাহেব, পারলাম না। বদলা নেওয়া হ'ল না। বরং ওকেই বুকে জড়িয়ে নিয়ে কেঁদে ভাসিয়ে দিলাম। ও খালি বলছে, আম্মা আম্মা। আমাকেই বলছে। বুঝলাম, ওর আপন-পর জ্ঞান নেই।

এমন সময় একজন জোয়ান পুরুষ ভিড় ঠেলে এসে ঢোকে আর ডাকে, ফুলমতীয়া, এ ফুলিয়া? তখনও লোকটা কিছুই নজর করে নি, বোঝা গেল, স্ত্রীকে খুঁজছে। হঠাৎ ফুলমতীয়া ডুকরে কেঁদে উঠে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে বলে, তোহার বাবুয়া নাই হ্যায়রে। উও দেখ সো গয়ল বা। হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ পুরুষটা, তারপর সেই কাঁথায় মোড়া-মরা ছেলেটাকে বুকে তুলে নিয়ে পাগলের মত চেঁচাতে থাকে—কোন্ মারা ইসে?—অাঁ, কিঁউ মারা?—হম ভি মারেঙ্গে উসে!—জরুর বদলা লেঙ্গে—পুলিসের সাহেব এক ধমক দিয়ে ওঠেন, চুপ হয়ে যায় লোকটা। তারপর কেঁদে ফেলে।

কিন্তু ফুলমতীয়া এবার নিরাসক্ত ভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, কারুর কোন দোষ নেই সাহেব। সব আমার ভাগ্যের দোষ। আমাদের ছেড়ে দাও সাহেব, আমরা যাই। চোখ মুছতে মুছতে স্বামীর হাত ধরে রওনা দিল ফুলমতীয়া। এই পরিবেশ যেন সে আর সহ্য করতে পারছে না। লাশ পড়ে রইল। পোষ্টমর্টেম হবে। অন্য সবাইও যে যার মত রওনা দেবার ব্যবস্থা করতে লাগল।

এতক্ষণ নজরে পড়ে নি, কিন্তু সেই বিধবাটি তখন থেকে বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে নিঃশব্দে চোখের জল ফেলছিল। তার চারদিকে এলোমেলো করে একরাশ পোঁটলা বাক্স ছড়ান। চার পাঁচটি ছেলেমেয়েও তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। তারা মাকে সামলাবার আগেই সেই বিধবাটি ফুলমতীয়ার পেছন পেছন ছুটে গিয়ে বলে, ও বহিনি, ঠাহর যা। মেরে বাত শুন, ইহ বাচ্চাকো তু—লে—লে বহেন, এহিকো তেরে বাবুয়া মান লে। আবার হাউ হাউ করে কেঁদে বলে, তুমি যা বললে বোন আমি ত তার কিছুই জানতাম না। তুমি আমার বাচ্চাকে নাও, আমি একে তোমায় দিলাম। আমার খাওয়াবার সংস্থান নেই। এই এতগুলির পেট ভরাতেই প্রাণ যায়, তার ওপর স্বামী নেই। তোমার সিঁদুর আছে, জানি আবার হবে কিন্তু তুমি আমার এই বাচ্চাটিকে নিয়ে কোল ভরাও দিদি। আমার কথা শোন। সেই প্লাটফর্মের ওপরেই পা জড়িয়ে ধরে

ফুলমতীয়া বলে, হামারি বাত মান যাও বহেন, আমার কথা মান, কিছুটা ত পাপের ক্ষালন হোক আমার। বাচ্ছাটাকে কোল থেকে নামিয়ে দিতে সেও এগিয়ে যায় গট গট করে। এবার ফুলমতীয়া পেছন ফিরে বুকে জড়িয়ে ধরে তাকে।

ইতিমধ্যে আমি নিজের কামরায় ফিরে আসছিলাম। ট্রেণও হুইসিল বাজিয়ে ছেড়ে দিল। ধীরে ধীরে স্টেশনের গোলমাল দূরে মিলিয়ে গেল। কিন্তু এই ব্যথাভরা স্মৃতিতে মনটা কেমন ভার হয়ে রইল। মনে হ'ল, এই জন্যই শরৎবাবুর বৃন্দাবন পণ্ডিতমশাই সেজে অনেকগুলি শিশুর মধ্যে নিজের মৃত ছেলে চরণকেই পেতে চেয়েছিল।

"অপুর পাঠশালা"—এক শ' বছর পরে

শ্রীঅশোককুমার দত্ত

"পৌষ মাসের দিন। অপু সকালে লেপ মুড়ি দিয়া রৌদ্র উঠিবার অপেক্ষায় বিছানায় শুইয়া ছিল, মা আসিয়া ডাকিল—অপু, ওঠ শীগ্‌গির ক'রে, আজ তুমি যে পাঠশালায় পড়তে যাবে! কেমন সব বই আনা হবে তোমার জন্য, শেলেট্‌। হ্যাঁ ওঠ, মুখ ধুয়ে নাও, উনি তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে পাঠশালায় দিয়ে আসবেন।

"পাঠশালার নাম শুনিয়া অপু সগুনিদ্রোত্থিত চোখ দুটি তুলিয়া অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।......

"কিন্তু অবশেষে বাবা আসিয়া পড়াতে অপুর বেশী জারিজুরি খাটিল না, যাইতে হইল।"

পাঠশালার গ্রাম্যপথে সেই প্রথম অভিযানের পর অপু এবং তাঁর পাঁচালীকার বিভূতিভূষণ অনেক পথই অতিক্রম করেছেন। আমরা সে সবের বিশদ বিবরণ বাদ দিয়ে এক শ' বছর পরের একটা চিত্র কল্পনা করছি। ২০৬৪ সালের কথা ধরা যাক্‌, বিভূতিভূষণের সেই অপু আজ অ্যাপ। দুর্গা ডোরা। পাঠশালা ইত্যাদির পর্ব ছেড়ে শ্রীমান অ্যাপ এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।

ভোর ছ'টায় অপু ওরফে অ্যাপের ঘুম ভেঙ্গে গেল। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ বেতার কেন্দ্র থেকে প্রভাতী সঙ্গীত প্রচারিত হচ্ছে—"ওঠো জাগো পুরবাসী কত নিদ্রা যাও গো।" চোখ মুছে অ্যাপ একটা সুইচ টিপে দিল অমনি ঘরের দুটো দেওয়াল "জ্বলে" উঠে বাইরের খোলা মাঠের পরিবেশ ঘরের মধ্যেই ফুটিয়ে তুলল। অ্যাপের মনে হ'ল, সে যেন সত্যসত্যই গাছপালায় ঘেরা ছোট্ট একটা গ্রামে বসে রয়েছে। ঘরের অন্য দুটো দেওয়াল তখনও অন্ধকার। এদের একটি হ'ল টেলিফোনে কথা বলার জন্য, অন্যটি টেলিভিশনের "পর্দা"।

অ্যাপের মাথায় কি যেন একটা অস্বস্তি ভার হয়ে ছিল। গতকাল তাকে একটা ইন্‌জেক্‌শন দেওয়া হয়। আগেকার সে সমস্ত বিভীষিকা—যথা, ক্যান্সার যক্ষা পলিও ইত্যাদি রোগ এখন একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। নূতন অনেক প্রতিরোধক দাওয়াই বার হয়েছে—প্রত্যেককেই তা নিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের যে 'আইডেনটিটি কার্ড' রয়েছে তার নম্বর দেখে কার কি অসুখ, কোন্‌ কোন্‌ টিকা নেওয়া হয়েছে, স্বাস্থ্য বর্তমানে কেমন, এবং ভবিষ্যতেই বা কেমন থাকবে ইত্যাদি বিবরণ উদ্ধার করা চলে। অ্যাপের কার্ড নং EPYZPWNCMDA 229, স্পষ্টতই তার স্বাস্থ্য বেশ ভাল। কিন্তু ব্যাপার হয়েছে এই যে, গত কয়েকদিন যাবৎ নূতন এক অদ্ভুত রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে, কম্প্যুটারে "লেখা" কার্ডে যাদের শরীর সম্পূর্ণ নীরোগ বলে ধার্য করেছে এমন সব ছেলেদেরও আকস্মিকভাবে নানা রকম মানসিক রোগ দেখা যাচ্ছে। এ যুগে এই মানসিক ব্যাধি সে যুগের প্লেগের মতই মারাত্মক হয়ে উঠেছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নূতন এক ধরণের ভাইরাসই তার কারণ। এর সম্বন্ধে সাবধান হওয়ার জন্যই সবাইকে নূতন করে ইন্‌জেকশন দেওয়া হচ্ছে।

শারীরিক অস্বস্তির কথা ভুলে অ্যাপ বিছানা ছেড়ে উঠল। হাত-মুখ ধুয়ে সে প্রথমে মেশিনে চালিত স্প্রিংয়ের মঞ্চে চড়ে বসল। এটি হ'ল ব্যায়াম করার আধুনিক উপকরণ। দশ মিনিট শরীর-চর্চার পর "বুদ্‌বুদের ফোয়ারা"র ঘরে গিয়ে সে শরীরটা ম্যাসেজ করে নিল। এই বুদ্‌বুদের ফোয়ারা একবিংশ শতাব্দীরই একটি উপকরণ। প্লাসটিকের বুদ্‌বুদগুলি ফোয়ারার আকারে ছড়িয়ে পড়ে, গায়ের মাংসপেশীতে মৃদু আঘাত ক'রে তা অদ্ভুত এক বিশ্রামের অনুভূতি জাগায়। অ্যাপ এরপর খাবার টেবিলের সামনে গিয়ে বসল। ঘরের এই কোণটিতে রয়েছে যে অটমেটিক কুকার, তাতে সে "প্রাতরাশে"র জায়গায় বোতাম টিপে দিল। মাত্র ত্রিশ সেকেণ্ডের মধ্যে স্বাদহীন গন্ধহীন বিচিত্র এক খাবার টেবিলে এসে হাজির। খুবই পুষ্টিকর এই খাবার। খাদ্য-বিজ্ঞানীরা বহু বছরের গবেষণায় সমুদ্রের গাছপালা এবং বাথরুমের শেওলা থেকে এমন একটা আশ্চর্য জিনিষ তৈরি করতে পেরেছেন। অ্যাপ এই খাবার ২৩৩ গ্রাম গলাধঃকরণ করে কিছুটা সুস্থ বোধ করল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস সকাল ৮টা থেকে। এজন্য অবশ্য ক্লাস ঘরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। অ্যাপ যে বিষয়টি নিয়ে পড়ছে—অর্থাৎ সিগ্ন্যাল ফিজিক্স, তাতে মোট ছাত্রসংখ্যা ৯৫০ জন। ছেলেরা যে যার ঘরে থাকে, সময় হ'লে দেওয়ালে টেলিভিশনের পর্দাটা জ্বেলে দেয়। আজ বিষয়টির ১৬নং বক্তৃতা। বিশেষ সিগ্ন্যাল ব্যাণ্ড-এর উপযোগী 'কাপলিং' ব্যবস্থার উপর আজ বক্তৃতা হবে। অধ্যাপক জে. এ. এইচ. ফ্যারাওয়ে ৩×২-র এই বক্তৃতা (৩×২—অধ্যাপকের বিশেষ পদক ও ডিগ্রী) আগেভাগেই টেপরেকর্ডে ধরে রাখা হয়েছে। টেলিভিশনের দেওয়াল-পর্দায় ম্যাগনেটিক টেপরেকর্ডের ছবিটা ফুটে উঠছে। পাশে রয়েছেন অ্যাপ যে গ্রুপের ছাত্র তার টাস্ক-মাষ্টার। কোন জায়গায় যদি বুঝতে অসুবিধা হয় তবে 'দেওয়াল-টেলিফোনে' সহজেই টাস্ক-মাষ্টারকে তা জানানো চলবে।

৯টা পর্যন্ত অ্যাপ এই বক্তৃতা শুনল। দরকার মত সে তার ছোট্ট 'কোড রাইটারে' টুকিটাকি নোটও টুকে নিল। হাতে কলম বা পেনসিল গুঁজে কেউ আর নোট টোকে না। হাতের লেখা একমাত্র সই করার সময়েই দরকার হয়। টাইপ-রাইটারও আজ অচল। সে যুগের টাইপ-রাইটার আজ মুজিয়ামে শোভা পাচ্ছে। অনেক কথায় যা বলা হ'ল সামান্য কয়েকটি মাত্র সঙ্কেতেই তা লিখে নেওয়া যায়, এদিক্ দিয়ে কোড-রাইটার সে যুগের টাইপ-রাইটারের ষ্টেনোগ্রাফিক সংস্করণ। সে যাক, অ্যাপ এবার তার টাস্ক-মাষ্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করল। অধ্যাপক ফ্যারাওয়ের বক্তৃতা যে সব জায়গায় তার কাছে দুর্বোধ্য মনে হচ্ছিল এবার তা বিলকুল সহজ হয়ে গেছে। অ্যাপ তার ছোট্ট ইলেকট্রনিক কম্পুটারটা খুলে বসল। কয়েকটা হিসাব কষে নিতে হবে। নামতা-ধারাপাত-লগ্ টেবিল-শ্লাইডরুল ইত্যাদির যুগ অনেক আগেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। পাঠশালার যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ মেশিনেই কষে দিচ্ছে। অ্যাপ কম্পুটারের সাহায্যে অঙ্কের ফলগুলি জেনে নিয়ে সকালের পড়া সাঙ্গ করল।

১০টার সময় প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস। হোটেল থেকে ল্যাবরেটরি চার কি সাড়ে চার কিলোমিটারের পথ। ট্যাক্সি হেলিকপটার-ট্যাক্সি বাস রকেটগাড়ি কোনটারই অভাব নাই। অ্যাপ একটা "চলন্ত ফুটপাথ" চেপে পড়ল। ল্যাবরেটরির দোর-গোড়ায় সে যখন পৌছল, গ্রুপের সমস্ত ছেলেরাই টাস্ক-মাষ্টারকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। সকালে যা নিয়ে বক্তৃতা হ'ল এখন তাই আবার হাতে-কলমে করে দেখতে হবে।

বেলা একটায় যখন অ্যাপ ল্যাবরেটরি থেকে বেরুল তখন সে সত্য-সত্যই খিদে বোধ করছে। সকালের সেই অস্বাস্তটা কখন মিলিয়ে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝখানে রয়েছে বিরাট্ কাফেটেরিয়া—সেখানে দৈনিক ত্রিশ হাজার লোকের খাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। অ্যাপ একটা টেবিলের সামনে বসে বোতাম টিপে দিল। চার ধরণের রান্না। অ্যাপের পছন্দ তিন নং মেনু। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ইলেকট্রনিক কুকারে খাবার সদ্য তৈরি হয়ে তার সামনে এসে হাজির হ'ল। বিরাট্ হলঘরে ঝিমঝিম বৃষ্টিপাতের মত শান্ত এক সঙ্গীতের সুর অদ্ভুত মৃদু তালে সমস্ত শরীর ও মন আবিষ্ট করে তুলছিল।

অ্যাপের একটু তাড়া ছিল। বেলা দুটোর সময় বিশ্ব বেসবল খেলার রিলে প্রচার হবে, সে তা শুনবেই। একালেও সাবেকী যুগের সেই রিলে চলতি রয়েছে। কারণ সমস্ত খেলার মাঠের সেই জীবন্ত পরিবেশ টেলিভিশনের পর্দায় আজও তেমন সার্থকভাবে রূপ নিতে পারে নি।

সে যা হোক্, রিলে শুনে অ্যাপ খুব খুশী। খেলার ফল তার কাছে সন্তোষজনক হয়েছে, আরও বড় কথা, খেলার ধারাবিবরণীর মধ্য থেকে সে প্রচুর আনন্দ ও উত্তেজনার খোরাক পেয়েছে। পড়ার টেবিলের পাশে বসে অ্যাপ সে কথাই ভাবছিল। খেলোয়াড় নং B 3-এর খেলা সত্যই অপূর্ব হয়েছে। বাইরের প্রশস্ত লনের দিকে অনির্দিষ্টভাবে তাকিয়ে থেকে সে হঠাৎ টেবিল থেকে "সাহিত্য-গ্যালেক্স" নামে অর্ধ-মাসিক পত্রিকাটা তুলে নিল। পুরাণো যুগের একটা বেশ মজার বিবরণ রয়েছে। লেখক বিসমাথ নিয়োগী লিখছেন—একশ' বছর আগে প্রথম যখন স্পুৎনিক উড়ল, মানুষ তখন তা দেখার জন্য পাগল হয়ে কেমন দূরবীণ হাতে ছুটে বেড়াত। প্রথম যে ভদ্রলোক স্পুৎনিক দেখতে পায় তার কি সম্মান, কাগজে কাগজে তার ছবি ফলাও করে ছাপা হয়েছিল। পড়তে পড়তে অ্যাপ কখন এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল। যখন তার হুঁশ হ'ল তখন পাচটা বাজে-বাজে। এবার সে যাবে ক্লাবে। অ্যাপ একটা হেলি-

কপটার ট্যাক্সি চড়ে বসল। ক্লাবে আজ জোর আসর। ছেলেমেয়েরা ছোট-বড় নানা টেবিলের সামনে জটলা করছে। আজকেই সেই রকেট প্রতিযোগিতা। বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে যে বিরাট্ মাঠ, সেখান থেকে চাঁদে রকেট ছুটানো হবে। পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে প্রতিযোগীরা এসে পড়েছে। কার রকেট আগে পৌছায় সে নিয়ে দারুণ উত্তেজনা। হোস্টেলে রাত্রির পড়াশুনার পাট আজ বন্ধ। সন্ধ্যার আগেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী মাঠে এসে জমা হয়েছে। সে এক হৈ-হৈ ব্যাপার। টেলিভিশনের পর্দায় প্রতিযোগিতার দৃশ্য দেখতে কেউ আর রাজী নয়। অধ্যাপকদের মতে কলকাস বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙ্গিনায় আজ পুরাণো পৃথিবীর আবহাওয়া গড়ে উঠেছে।

সন্ধ্যা তখন ঠিক সাতটা। ভোস্-ভোস্-শোঁ প্রচণ্ড বিস্ফোরণে রকেটগুলি 'স্পুৎনিক মঞ্চ' ছাড়িয়ে উঠল। দশ-দশটি রকেট এক সঙ্গে। আকাশে সে এক বহ্নি-উৎসব। তারই আনন্দে নীচে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেরা আনন্দমুখর। অ্যাপ এক পাশে দাঁড়িয়ে সমস্ত দেখছিল। ফার্স্ট হ'ল M Z 4 নং রকেট। বেঁটে-খাটো সবুজ রঙের সেই রকেটটা। আশ্চর্য!

এবার ঘরে ফেরার পালা। রাত্রি এখন ৮টা। কেউ হেলিকপটার কেউ ট্যাক্সি কেউ বা চলন্ত ফুটপাথে চেপে হোস্টেলে ফিরছে। অ্যাপ পায়ে হেঁটেই চলল। অনেকদিন পরে আজ সে রাস্তায় হাঁটছে। সে এক আশ্চর্য অনুভূতি। উপরে আকাশের দিকে তাকাল: রকেটের ধূমায়িত পুচ্ছ কখন নিভে গেছে। কালো এক আকাশের পটভূমিকায় কতকগুলি আলোর খণ্ড জ্বল্ জ্বল্ করছে। তাদের কোন্‌টি আসল তারা আর কোন্‌টি বা মানুষের তৈরি কৃত্রিম গ্রহ-উপগ্রহ—হঠাৎ কেমন যেন গুলিয়ে গেল।

সে রাত্রে অ্যাপ এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখল। সে যেন ছোট্ট একটা গ্রাম্য শিশুতে পরিণত হয়েছে। বইদপ্তর বগলে নিয়ে সে তার বাবার পিছনে পিছনে সাজিমাটি দিয়ে কাচা, সেলাই-করা কাপড় পরে পাঠশালায় পড়তে যাচ্ছে। তার ছোট্ট মাথাটির অমন রেশমের মত নরম চিক্কণ সুখ-স্পর্শ চুলগুলি মা যত্ন করে আঁচড়িয়ে দিয়েছেন,—তার কোঁচড়ে এক কোঁচড় মুড়ি বাঁধা। বাবা তাকে উপদেশ দিচ্ছেন—অপু, বসে বসে লিখো, গুরুমশায়ের কথা শুনো, দুষ্টুমি করো না যেন। মুদিখানার মাচায়-বসা পণ্ডিতমশায়, পড়ুয়া ছেলের দল যে যার চাটাইয়ে বসে দুলতে দুলতে নামতা শতকিয়া ধারাপাত মুখস্থ করছে। অ্যাপ যেন তাদেরই এক পাশে খাতা শ্লেট পেনসিল নিয়ে অঙ্ক কষতে বসল। পাঠশালার আশে-পাশের বাতাবীলেবু গাব ও পেয়ারাফুলী আম গাছটার ফাঁক দিয়ে অপরাহ্নের তাজা গরম রৌদ্র বাঁকা ভাবে তার পিঠের উপর এসে পড়তে লাগল।

সুলতার মাষ্টার

শ্রীমণিমোহন মুখোপাধ্যায়

মিসেস্ রায় বেশ একটু মোটা-সোটা। রংটা কালোই ব'লতে হয়। চেহারাটা বেশ নধর আর মুখটাও গোলপানা চ্যাপ্টা-গোছের। মহিলা খুব আলাপী। একটু ইঙ্গ-বঙ্গ গোছের বটে, কিন্তু মনটা খুব সাদা আর মোলায়েম। সুলতা তাঁরই কন্যা। এককালে আশা করা যায় মা'র মতই হয়ে উঠবে, কিন্তু এখনো সে সম্ভাবনা সুলতার চেহারায় আত্মপ্রকাশ করে নি।

সুলতা এবারে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দেবে, আর মাস ছয়েক বাকি; দরকার একজন ভাল টিউটারের। ষ্টেট্‌স্‌ম্যান আর অমৃতবাজার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে; উত্তর পাওয়া গেছে বহু আর চার-পাঁচজনের ইণ্টারভিউও হয়ে গেছে। কিন্তু মিসেস্ রায়ের কাউকেই পছন্দ হয় নি এখন পর্যন্ত। এ বিষয়ে ভার যদি মিষ্টার রায়ের ওপরে থাকত তবে অনেক আগেই অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট হয়ে যেত। কিন্তু এত দায়িত্বপূর্ণ একটা কাজের ভার মিষ্টার রায়ের হাতে দিতে মিসেস্ রায় মোটেই রাজি নন।

অরুণাংশু ঘোষ এম এ-কে পিতা আর কন্যা দুজনেরই পছন্দ হয়েছিল। ভাল অ্যাকাডেমিক কেরিয়ার, স্মার্ট ছেলে, দেখতে সুপুরুষ। কিন্তু মিসেস্ রায় এমন নিখুঁত ছেলেটিকেও বাদ দিয়ে দিলেন। মিষ্টার রায় বলেছিলেন যে, যখন মেয়ের জামাই খোঁজা হচ্ছে না তখন এত বাছবিচারের প্রয়োজন কি? মিসেস্ রায়ের কিন্তু অরুণাংশুকে একটুও ভাল লাগল না। মিষ্টার রায় অরুণাংশুর মত ভাল ছেলেকে ভাল না লাগবার কারণ জানতে চাইলেন মিসেস্ রায়ের কাছে, কিন্তু পরিষ্কার মানে আছে এমন কোন উত্তর পেলেন না। বেশী চাপ দিলে অনর্থের সম্ভাবনা আছে ব'লে মিষ্টার রায় ভয়ে ভয়ে চুপ করে গেলেন। মোট কথা পনের দিন কেটে গেল, সুলতার টিউটার আর পাওয়া গেল না।

অধীর যখন সুলতাদের বাড়ীতে ঢুকল তখন দারোয়ান তাকে সেলাম করল। 'মিষ্টার রায় বাড়ী আছেন কি?' অধীর দারোয়ানকে জিগ্যেস করল। দারোয়ান একটু ব্যস্ত হয়েই রায় সাহেবকে ডেকে আনলে।

'আমি অধীর সেন, ১২ই তারিখের ষ্টেট্‌স্‌ম্যান দেখে আপনার কাছে আসছি, জানলাম আপনার টিউটারের প্রয়োজন।'

এরকম চোস্ত সাহেব পঁচিশ টাকার গৃহশিক্ষক হ'তে পারে এ উচ্চাশা মিষ্টার রায়ের ছিল না। তিনি তাই কিছুটা অবাক্ হলেন। অধীরকে নিজের ঘরে বসিয়ে মিষ্টার রায় তার কোয়ালিফিকেশন ইত্যাদির কথা জানতে চাইলেন।

'না, বিশেষ কিছু না,' অধীর বললে, 'তবে ইণ্টারমিডিয়েট ষ্টুডেণ্টকে পড়াতে পারব, আমি ইকনমিক্সের পি এইচ ডি লণ্ডনের।'

'পি এইচ ডি', অবাক্ হয়ে বললেন মিষ্টার রায়, 'পি এইচ ডি হয়ে এই সামান্য মাইনের টিউটারের কাজ করবেন?'

'এটা আমার একটা শখ ভাবতে পারেন। দিনের বেলায় কলেজে কাজ করি, সন্ধ্যায় কিছু করার থাকে না। আপনি কাজটা দিলে সন্ধ্যেবেলা কি করব সেটা আর ভাবতে হবে না।'

কথা ব'লতে ব'লতে মিষ্টার রায়ের মনে একটা ইচ্ছা জাগল অধীরকে কাজে নিযুক্ত করবার। পি এইচ ডি পাশ টিউটার রাখা একটা ছোট-খাট সোস্যাল ট্রায়াম্ফ, মিষ্টার রায় ভাবলেন। স্ত্রীকে একবার ডাকবার কথা তাঁর মনে এল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ল যে স্ত্রী বাড়ী নেই, কোথায় যেন গেছেন পাড়া বেড়াতে। তিনি সযত্নে অধীরকে আপ্যায়ন করলেন আর চা খাওয়ালেন। গল্পে গল্পে বিলেতের কথা উঠল আর দুজনেই নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা বলতে সুরু করলেন। আস্তে আস্তে স্ত্রীর কথা আর মনে থাকল না মিষ্টার রায়ের। শেষ পর্যন্ত অধীর সেন যাবার আগে জেনেই গেল যে সেই হ'ল সুলতার টিউটার।

অধীর যাবার পরেই কিন্তু মিষ্টার রায়ের মনে ভয় ঢুকল। মিসেস্ রায়ের একটা অনুমতি নেওয়া উচিত ছিল তাঁর। মিসেস্ রায় যা অবুঝ, শেষে সব ওলট-পালট করে না দেন।

মিষ্টার রায় যা ভয় করেছিলেন হলও তাই। রাত্রে

বাড়ী ফিরে এসে সব কথা শুনে মিসেস্ রায় অসম্ভব রকম চটে গেলেন। বললেন, 'তুমি আজকেই ওঁকে গিয়ে জানিয়ে দিয়ে এস যে ওঁকে রাখা হবে না, আমরা অন্য লোক ঠিক করেছি।'

মিষ্টার রায় বললেন, 'এতটা অবুঝ হয়ো না, সুরমা। আমি কোন্ মুখে গিয়ে একথা বলব ডক্টর সেনকে? আচ্ছা, দেখ তুমি একবার সেনকে, তারপর তোমার যদি অপছন্দ হয় তাকে জবাব দেব।'

মিষ্টার রায় সেনের গুণব্যাখ্যায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন কিন্তু এতে সুফল হ'ল না মোটেই। মিসেস্ রায় মনে মনে আরও চটে গেলেন, বললেন, 'সুলতাকে যার-তার কাছে পড়তে দেব না আমি, এ আগেই বলে রাখলাম।'

'লণ্ডনের পি এইচ ডি'র কাছে পড়বে সুলতা, যার-তার কাছে পড়বে কেন?'

'লণ্ডনের পি এইচ ডি হলেই যদি স্বভাব-চরিত্র ভাল হত তবে আর ভাবনা ছিল কি?'

'না, না, ছেলেটির ব্যবহার চমৎকার। দুঘণ্টা তার সঙ্গে কথা বলে কাটালাম আর এটুকু বুঝব না?'

'তোমার সঙ্গে আর তর্ক করতে চাই না। তোমার কথায় আমি অধীর সেনকে দেখব, একদিন বিকেলে ওঁকে চায়ে আসতে ব'লো, কিন্তু মোট কথা এই যে, আমার পছন্দ না হ'ল ওঁকে রাখা হবে না।' মিসেস্ রায় রায় দিলেন। অগত্যা মিষ্টার রায়কে তাই মেনে নিতে হ'ল। ঠিক হ'ল যে সামনের বুধবার অধীর সেনকে চা'য়ে ডাকা হবে সুলতার সঙ্গে আলাপ করবার জন্য। এই সুযোগে মিসেস্ রায় অধীর সেনের স্বভাব-চরিত্র কেমন, বুঝে নেবেন।

বুধবার এসে গেল। মিসেস্ রায় আগে থেকেই অধীর সেনকে অপছন্দ করবার জন্যে প্রস্তুত হ'তে থাকলেন। অধীরের গুণপনায় মুগ্ধ না হবার জন্যে মনকে শক্ত করতে লাগলেন। মিষ্টার রায়ের হঠকারিতার একটা তীব্র প্রতিশোধ নিতে তিনি বদ্ধপরিকর হয়ে উঠলেন। একটা পারিবারিক বিপর্যয়ের সম্ভাবনা নিয়ে বুধবারের চায়ের আসর সুরু হ'ল।

অধীর এবার এল বাঙ্গালী সাজে, এসে রায় দম্পতিকে প্রণাম করল আর সুলতাকে করল নমস্কার। সবাই মিলে ড্রইংরুমে বসবার পর মিসেস্ রায় চা ঢালতে সুরু করলেন আর সুলতা কোয়াটার প্লেটে ডালমোট, পেষ্ট্রি আর সন্দেশ পরিবেশন করল। সঙ্গে সঙ্গে কথা বার্তাও সুরু হ'ল।

অধীরের মার্জিত রুচি, মিষ্টি ব্যবহার আর চমৎকার বাচন-ভঙ্গিতে মিষ্টার রায় আর সুলতা সত্যিই মুগ্ধ হয়ে গেলেন। সুলতা মনে মনে ভাবল, সত্যিই ফ্ললেস মানুষ, এঁর কাছে পড়েও সুখ। কিন্তু মিসেস্ রায়ের পূর্ব প্রস্তুত বর্মে সেনের এ সব অস্ত্র ঠেকে গেল। স্বামী আর কন্যার মুগ্ধ ভাবটাও তাঁর চোখ এড়াল না। তিনি মনকে আরও শক্ত করলেন যাতে শেষ পর্যন্ত তাঁর হার না হয়। তিনি ভাবতে লাগলেন যে, সেনের সুন্দর ব্যবহারের অন্তরালে যে মানুষটা আছে, সে হয়ত অতি নীচ, ভাবতে ভাবতে কিছুটা বিশ্বাসও করে ফেললেন একথা। এই দুর্নীতিপরায়ণ লোকের কাছে মেয়েকে পড়তে দেওয়া মোটেই ঠিক হবে না এই ধরণের একটা সিদ্ধান্ত করলেন তিনি ভেবে ভেবে। তাছাড়া সেনের ব্যবহারের খুঁত ধরবার দিকেও তিনি সজাগ দৃষ্টি রাখলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় কোন খুঁতই তাঁর চোখে পড়ল না। এর ফলে সেন তাঁর কল্পিত দোষগুলো সযত্নে গোপন করছে এ কথাও তিনি মনে করলেন, আর এই জন্যেও সেনের ওপর মনে মনে চটে গেলেন। স্বামী আর মেয়ে সেনের দিকে ঝুঁকেছে ব'লে তাদের ওপরও খুব অসন্তুষ্ট হলেন তিনি, আর ভাবলেন যে তাদের একটা শাস্তি দেবার জন্যেও অন্ততঃ সেনকে রাখা উচিত নয়।

চা খাওয়া হয়ে গেল। সুলতা বড় সোফাটায় বাবার পাশে বসে সবুজ শাড়ীর পাড়টা আঙ্গুলে জড়াতে আর খুলতে লাগল। মিষ্টার রায় আস্তে আস্তে তাঁর পাইপ ধরালেন, আর মিসেস্ রায় থমথমে গম্ভীর মুখে নিজের সোফাটায় বসে রইলেন। অন্য সোফাটায় বসে অধীর সুতৃপ্ত মুখে স্মিত হাসল। মিষ্টার রায় বললেন, 'সিগারেট চলে নাকি তোমার? তুমিই বলি, কি বল।'

'তুমি বলবেন বৈ কি', অধীর বলল, 'না, সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি আজকাল; আগে অনেক খেয়েছি, এখন আর তত ভাল লাগে না।'

মিষ্টার রায় তৃপ্তিতে ধোওয়া ছাড়লেন, আর ভয়ে ভয়ে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'না খাওয়াই ভাল, আমিও কতবার ছাড়ব ভাবি, কিন্তু পেরে উঠি না কিছুতেই।'

'বেশ লাগছে আজকের সন্ধ্যে বেলাটা আপনাদের সঙ্গে গল্প করতে,' অধীর বলল, 'নইলে বড় একা একা লাগে সাধারণতঃ।'

'কি করেন বিকেল বেলা,' সুলতা সাহস করে জিগ্যেস করে ফেলল।

'কলেজ থেকে সোজা ফ্ল্যাটে ফিরি, তারপর একটু হেঁটে বেড়াই। সন্ধ্যে বেলাটা ফ্ল্যাটেই কাটে পড়াশোনা নিয়ে।'

'এখানে আপনার কেউ নেই বুঝি', মিসেস্ রায় হঠাৎ জিগ্যেস করলেন গম্ভীর মুখে।

'না, আমার বাড়ীর লোকেরা থাকে দিল্লীতে, আমার বাবা দিল্লীতেই কাজ করতেন, রিটায়ার করে ওখানেই বাড়ী করেছেন।'

'সুলতা মা, এবার একটা গান শুনিয়ে দাও,' মিষ্টার রায় বললেন, 'গান দিয়েই আজকের সভা শেষ হোক।'

সুলতা পিয়ানো সহযোগে গান ধরল বাবার অনুরোধে। রবীন্দ্র সঙ্গীতের মিষ্টি সুরে ঘর ভরে গেল। অধীর সেন অনুচ্চস্বরে তারিফ করল, বলল, 'একটা কোন সুর বাজিয়ে শোনান পিয়ানোতে।' সুলতা একটা সেন্টিমেণ্টাল সুর স্বচ্ছন্দে আর নিপুণতার সঙ্গে বাজিয়ে গেল।

'আমার আবার একটু যেতে হবে অর্পণাদের বাড়ী,' মিসেস্ রায় বললেন, 'এবার তা হ'লে আমি উঠি।' বলতে বলতে তিনি গম্ভীর মুখে উঠতে সচেষ্ট হলেন। এই গানের আর বাজনার ব্যাপারটা আদপেই তাঁর পছন্দ হয় নি, কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে এটা ঠেকাবারও কোন উপায় ছিল না তাঁর হাতে। যাই হোক, অধীর সেন সম্বন্ধে ফাইনাল ভারডিক্ট মনে মনে ঠিক করে তিনি আর একবার সোফা থেকে ওঠবার চেষ্টা করলেন।

'আপনি পিয়ানো বাজাতে জানেন?' সুলতা জিগ্যেস করল অধীরকে।

'হ্যাঁ জানি, কিন্তু এখন আর বাজাতে পারি না, খুব ভাল লাগে শুনতে।'

'বাজাতে পারেন না কেন এখন, এ কি আর ভোলবার জিনিষ?'

'না, ভোলবার কথা নয়, সুর আমার কানে আছে কিন্তু হাত দিয়ে আর বেরোয় না,' অধীর বলল। আর বলতে বলতে নিজের বাঁ-হাতটা তুলে ধরল। এ হাতটা আমার প্রায় প্যারালাইসড, কিছু ভাল করে ধরতে পারি না, আপনারা লক্ষ্য করেন নি। ডান-হাতটাও প্রায় অবশ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু গত দু-তিন বছর কিছুটা জোর পেয়েছি ডান-হাতে। এককালে বাজাতে কত ভাল বাসতাম, কিন্তু এই হাত দিয়ে আর যাই হোক পিয়ানো বাজান সম্ভব নয়। প্রায় সাতবছর আগে একটা অ্যাক্সিডেন্টের পর থেকেই এটার সুরু। হাত থাকতে হাত যাওয়ার দুঃখ আপনারা বুঝবেন না।'

মিসেস্ রায় অর্পণাদের বাড়ী যাবার জন্যে প্রায় সোফা থেকে উঠে পড়েছিলেন, অধীরের কথা শুনে তিনি আবার বসলেন। যে ছেলেটির মধ্যে কোন দোষই তাঁর সজাগ দৃষ্টি খুজে পাচ্ছিল না তার মধ্যে যে এতবড় একটা খুঁত লুকিয়ে আছে তা কে জানত।

'সারবার কি কোন সম্ভাবনা নেই,' তিনি অধীরকে জিগ্যেস করলেন।

'অনেক ডাক্তারকেই দেখান হয়েছে, আর নানা রকম চিকিৎসাও করে দেখেছি। আগে কিছুটা আশা ছিল মনে মনে, এখন কিন্তু আর কোন ভরসা পাই না।' অধীর বলল।

মিসেস্ রায় সহানুভূতি জানাবার জন্যে বললেন, বড় কষ্ট ত তোমার হাত নিয়ে।'

'নিজের কাজ নিজে চালিয়ে নিতে পারি এই পর্যন্ত, কিন্তু গানবাজনার মত খেলাধূলা, ড্রাইভিং অনেক কিছুই ছাড়তে হয়েছে। এখন এই হাতের সঙ্গে জীবনের আর সবকিছু মিলিয়ে নেওয়া ছাড়া উপায় কি বলুন,' অধীর বলল।

একটা স্বপ্নভঙ্গের আভাস সুলতাকে কিছুটা বিমনা করে ফেলেছিল, এক্ষেত্রে কিছু বলা উচিত জেনেও তার মুখ দিয়ে কোন কথা ফুটল না। এরই মধ্যে অধীর সবাইকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে চলে গেল। সুলতাও তার পরে নিজের ঘরে চলে গেল কাউকে কোন কথা না বলে। অধীর যদি তার টিউটার হয় তবে তার সেটা ভালই লাগবে; একজন পি এইচ ডি'র কাছে পড়ছি এ কথাটা বান্ধবী মহলে ফলাও করে বলা যাবে। তবে মা শেষ পর্যন্ত অধীরকে রাখবেন না বলেই সুলতার মনে হ'ল। আগে থেকেই অকারণে যা চটে ছিলেন, তার ওপর এবার ত একটা কন্‌ক্রীট খুঁতই পেয়ে গেলেন। অবিশ্যি অধীরকে না রাখলেও সুলতার তেমন কিছু খারাপ লাগবে বলে আর মনে হ'ল না। প্রথম পরিচয়ের উগ্র ভাল লাগাটা যেন কিছুটা মিইয়ে গেছে এখন।

মিষ্টার রায় সুলতা যাবার পরেই মিসেস্ রায়কে কিছু বলবেন ভেবেছিলেন। কিন্তু তিনিও বিশেষ কিছু আগ্রহ বোধ করলেন না এ ব্যাপারে। কোন কথাবার্তা সুরু হবার আগেই মিসেস্ রায় তাঁর বান্ধবীর বাড়ী চলে গেলেন। মিষ্টার রায় আর একবার পাইপটি ধরিয়ে মিসেস্ রায়ের সিদ্ধান্ত যে কি হ'তে পারে তাই ভাবতে লাগলেন। গৃহিণী যদি রাজি না হন তা হ'লে বাধ্য হয়েই অধীরকে সে কথা জানাতে হবে। এমনিতেই

তাঁর ত আপত্তি ছিল, আর সন্ধ্যার এই পার্টিতে এমন কিছু ঘটে নি যাতে তাঁর মত পালটাতে পারে। মিষ্টার রায়ের অনুশোচনা হ'ল যে কেন তিনি স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ না করেই অধীরকে কথা দিয়েছিলেন। আবার গিয়ে অধীরকে বলা যে কতটা অপ্রীতিকর তা ত আর সুরমা বুঝবে না। তার চেয়ে অধীরকে টিউটার করে রাখলেই ত হয়, হাজার হোক পি এইচ ডি ত, নিশ্চয়ই পড়াবে ভাল।

অর্পণাদের বাড়ী দূরে নয়, মিসেস্ রায় হেঁটেই চললেন সেখানে। পথে যেতে যেতে তাঁর অধীরের কথা মনে এল বার বার। তাঁকে না জানিয়ে তাঁর স্বামীর এতটা এগিয়ে যাওয়া মোটেই উচিত হয় নি। তাছাড়া বাপ আর মেয়ে, দুজনেরই অধীরকে রাখবার জন্যে এত আগ্রহ কেন? দেবে ত আই এ পরীক্ষা, তার জন্যে পি এইচ ডি টিউটারের দরকারই বা কি? কালকেই সকালে স্বামীকে অধীরের কাছে পাঠাবেন কি না তাই ভাবতে লাগলেন মিসেস্ রায়। যদি না রাখাই হয় তবে তাড়াতাড়ি জানিয়ে দেওয়াই ভাল। ছেলেটি কিন্তু বোধ হয় খুব কিছু খারাপ নয়। আর একেবারে একলাটি কলকাতায় পড়ে রয়েছে, দিল্লীতে হ'লে বেশ বাপ-মায়ের কাছে থাকতে পারত। যাই হোক, মিসেস্ রায় আর তার কি করতে পারেন।

রাত্রে খাবার টেবিলে বাবা, মা আর মেয়ে আবার একত্র হলেন। খেতে খেতে মিসেস্ রায়ের হঠাৎ মনে হ'ল, অধীরের ত বাঁ-হাতটা নেইই বলতে গেলে, ও তা হ'লে কাঁটাটা ধরে কি করে? কিছুটা প'রে মিষ্টার রায় অধীরের কথা তুললেন, মিসেস্ রায়কে জিগ্যেস করলেন, 'অধীরের সম্বন্ধে কি ঠিক করলে শেষ পর্যন্ত, যদি পছন্দ না হয় ত বল কাল ওকে জানিয়ে দিয়ে আসি।'

মিসেস্ রায় প্রায় বলতে যাচ্ছিলেন, হ্যাঁ তাই করো; কিন্তু বলতে গিয়ে তার মনে হ'ল যে মিষ্টার রায়ের কথায় ত অধীরকে রাখা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু আগ্রহ ফুটে উঠছে না। সুলতার দিকে তাকিয়েও তাঁর মনে হ'ল যেন সুলতাও এ ব্যাপারে নির্লিপ্ত আর নির্বিকার। অধীরের সম্বন্ধে তাঁর মনে একটা সহানুভূতির ভাব আস্তে আস্তে জেগে উঠছিল, সেটা এবার আরও জোরাল হয়ে উঠল। মনে হ'ল না যে অধীর স্মার্ট ছেলে, লণ্ডনের পি এইচ ডি আর পুরোপুরি আত্মনির্ভরশীল। ভাবলেন, আহা বেচারা, একটা হাত নেই, মা-বাপ ছেড়ে দূরে পড়ে রয়েছে। তিনি বললেন, 'আমার পছন্দ তেমন কিছু হয়নি, তবে তুমি যখন কথা দিয়েই ফেলেছ, তখন অধীরকেই রাখ—কমাস পড়াবে বই ত নয়।' সুলতা পাশেই বসেছিল। তার মুখে একটা হাসির রেখা একটু দেখা দিয়ে আবার মিলিয়ে গেল। সে গভীর মনোযোগের সঙ্গে প্লেটের খাদ্যবস্তুর সদ্ব্যবহার করে চলল।

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

লঘু-গুরু

মাত্র কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য কয়েকটি স্থানে কিছু হাঙ্গামা (এমন কিছু ভয়াবহ মাত্রায় নহে) হইয়া গেল। এই প্রকার উপদ্রব ইতিপূর্ব্বেও ঘটিয়াছে যাহার ফলে সাধারণ মানুষকে কম-বেশী কিছু কষ্ট এবং বিপদ-বরণ করিতেও হইয়াছে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও। সম্প্রতি যে সামান্য হাঙ্গামা ঘটিল তাহার জন্য দায়ী কে বা কাহারা তাহার বিচার করিয়া দেখিলে ইহাই প্রতীয়মান হইবে যে, 'লঘুর' কারণে 'গুরুকেই' শেষ পর্য্যন্ত অধিকতর শাস্তি-শাসন এবং দণ্ডভোগ করিতে হইল, কর্ত্তৃপক্ষের অকর্ম্মণ্যতা, অতি-বুদ্ধি, অ-বুদ্ধি এবং অবিবেচনার কারণেই। যে-উপদ্রব সহজেই দমন করিতে পারা যাইত, তাহা অতি প্রচারের ফলে 'বৃহৎ রূপ' ধরিয়া জন-জীবন এবং সেই সঙ্গে জনমানসও ক্ষত-বিক্ষত করিল!

ভারতীয়, বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী মুসলমানকে আমরা কখনও পর মনে করি নাই, বিদেশী ভাবি নাই—মনে করিয়াছি বাঙ্গালী মুসলমান আমাদের আপনজন, আমাদেরই আত্মীয়, ভাই। চিরকাল আমরা বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি বসবাস করিয়া একে অন্যের সুখ-দুঃখের, আনন্দ-উৎসবের, বিপদ্-আপদের সমভাগী এবং সমভোগী হইয়াছি। 'ধর্ম্মে' এক না হইলেও, কর্ম্মে আমরা একে অন্যের পাশেই চলিয়াছি, সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্রে আমরা বাঙ্গালী মুসলমানকে কখনও ভিন্ন-গোত্র বলিয়া মনে করিতে পারি নাই, সমাজ-জীবনেও আমরা তাহাদের আপন বলিয়াই জানিয়াছি। কিন্তু আজ যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে—বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানের বহু যুগের পুরাণো সম্পর্কে বিষম ফাটল ধরিয়াছে, দেশ বিভক্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই। বাঙ্গালী-মুসলমান কেবল ধর্ম্মেই নহে, কর্ম্মে, চিন্তায়, আদর্শে, শিক্ষা-দীক্ষায় এবং অন্যান্য প্রায় সকল বিষয়েই, সকল ক্ষেত্রেই উল্টা মুখে চলিয়া বিপরীত-ধর্ম্মী হইয়াছে। বাঙ্গালী-হিন্দু বাঙ্গালী-মুসলমানকে যতই আপন মনে করুক, বহু বাঙ্গালী-মুসলমান নিজেদের আজ এক 'ভিন্ন জাতি' বলিয়া ভাবিতে শিখিয়াছে এবং সেই সঙ্গে তাহারা ইহাও হঠাৎ জানিতে পারিয়াছে যে, বাঙ্গালী-হিন্দু তাহাদের চির-বৈরী এবং বাঙ্গালী-হিন্দু সর্ব্বদা বাঙ্গালী-মুসলমানের অকল্যাণ কামনা করিয়া তাহাদের ধ্বংসই করিতে চাহিতেছে! বাঙ্গালী-মুসলমানদের মধ্যে ইহার সামান্য কিছু ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। ইহাও সত্য যে, পশ্চিমবঙ্গে বাঙ্গালী-মুসলমান দর্জ্জি, রাজমিস্ত্রী, চাষী, ক্ষেত এবং দিনমজুরের দল তাহাদের পেশাতে রুজিরোজ-গারের চিন্তাতেই চব্বিশ ঘণ্টা ব্যস্ত থাকে, 'সাম্প্রদায়িক' কোন্দলে এবং 'লঘু-গুরুর' হাঙ্গামায় তাহারা থাকে না। যদিও অন্যের পাপের শাস্তি তাহাদেরও বাঙ্গালী-হিন্দুর সঙ্গে সমানে ভোগ করিতে হয়।

চিন্তা-বিকৃতি ও মানসিক রোগের ঔষধ কি?

যাহাদের মনে রোগ ঢুকিয়াছে, বিকার ঘটিয়াছে চিন্তায় এবং চিত্তে, সেই সংখ্যায় লঘু মানুষদের দুই-চারিটা গণতান্ত্রিক এবং নৈতিক গালভরা বুলির প্রলেপে মানসিক রোগ হইতে মুক্তিদান করার প্রয়াস অসার্থক হইতে বাধ্য। যে-দেশকে, রাষ্ট্রকে তাহারা নিজের বলিয়া মনে করে না, কখনও ভাবিতেও পারিবে না, তাহাদের সম্ভাব্য-অসম্ভাব্য সব দিক্ হইতে সর্ব্বভাবে তোয়াজ করিলেও তাহাদের মানসিক কোন পরিবর্ত্তন করা বর্ত্তমান অবস্থায় অসম্ভব। মনে-প্রাণে যাহারা নিজেদের পার্শ্ববর্ত্তী 'শত্রু'-রাষ্ট্রের একান্ত অনুগত প্রজা বলিয়া মনে করে, তাহাদের এই মানসিক আনুগত্যের প্রবাহ আর ভিন্নমুখী করা সহজ নহে, অসম্ভবও বটে। মনে যাহারা 'ও-পার বাসী', তাহাদের দেহমাত্র এ-পারে রাখিলে ভবিষ্যতে আরও বহুতর এবং গুরুতর 'লঘু-গুরু' সমস্যার বীজ বপন করা হইবে। 'ও-পার'বাসী লঘুদের সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য।

লঘু-গুরুর বিবাদ-বিসম্বাদ আজ নূতন নহে, এই প্রথমও নহে, বিশেষ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে। পূর্ব্ব-পাকিস্তানে গত তিন বছরে কতবার 'গুরুর' দ্বারা 'লঘু' নিপীড়ন হইয়াছে তাহার একটা মোটামুটি হিসাব দেওয়া হইতেছে। বলা বাহুল্য, এই হিসাবে কেবলমাত্র বড় বড় দাঙ্গাগুলির কথাই বলা হইয়াছে। পাকিস্তানে গ্রামাঞ্চলে বহু দাঙ্গা এবং সংখ্যা-লঘু নিপীড়ন হইয়াছে—তাহার সংখ্যা ৮ হাজার কিংবা তাহারও বেশী হইলেও সকল ঘটনার কথা কখনও প্রকাশ পাইবে না!

বিগত তিন বছরে দাঙ্গার খতিয়ান :

২৫-২-৬১—করাচীতে মুসলিম জনতা কর্ত্তৃক ভারতীয় দূতাবাস আক্রান্ত। বারজন কর্ম্মচারী আহত হন এবং দূতাবাস ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

২৭-২-৬১—করাচীর হিন্দু মন্দির আক্রান্ত। খুলনা, যশোহর এবং রংপুর জেলায় সৈদপুরে ব্যাপক দাঙ্গাহাঙ্গামা।

১০-৩-৬১—কলিকাতায় পাকিস্তানের ডেপুটি হাই-কমিশনার সাংবাদিকদের নিকট বলেন, উহার ফলে খুলনা, যশোহর এবং রংপুর জেলায় অন্তত ১৫ জন নিহত হয়। (বেসরকারী হিসাবে নিহত হিন্দুর সংখ্যা কমপক্ষে প্রায় ৮৫ জন)।

মার্চ্চ, '৬১—রংপুর জেলার বোদায় দেবী দোবেশ্বরীর মূর্ত্তি চূর্ণবিচূর্ণ করা হয়। চিলাহাটিতে আর একটি মন্দিরও অপবিত্র করা হয়।

মে-জুন, ৬১—ফরিদপুরের গোপালগঞ্জ মহকুমায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা। নমঃশূদ্রের কয়েকটি গ্রাম ভস্মীভূত করা হয় এবং বহু সংখ্যালঘু হতাহত হয়। এ সম্পর্কে ঐ বৎসর ১৪ই আগষ্ট ভারতের লোকসভায় পররাষ্ট্র দপ্তরের উপমন্ত্রী শ্রীমতী লক্ষ্মী মেনন জানান, গোপালগঞ্জের দাঙ্গায় নিহতের সংখ্যা পাঁচশতের মত হইবে। হাজারও হইতে পারে।

জানুয়ারী, ১৯৬২—ঢাকা, রাজসাহী, খুলনা, পাবনা এবং অন্যত্র ব্যাপক দাঙ্গা। সংখ্যালঘুদের মধ্যে ঢাকায় নয়-জন, পাবনায় নয়জন নিহত হয়। বগুড়া, ময়মনসিংহ এবং খুলনাতেও বহু হিন্দুকে হত্যা করা হয়। (প্রকৃতপক্ষে প্রদত্ত সংখ্যার অন্ততঃ ১০ গুণ নিহত হয়)।

রাজসাহীর হাঙ্গামায় সাড়ে তিন হাজারেরও বেশীও হিন্দু নিহত হয়। ইহা ছাড়া ভারতে প্রবেশ করিতে উদ্যত সাঁওতালদের উপর পাকিস্তানী বাহিনী গুলী চালাইলে ১০ জন (পরে জানা যায় নিহতের সংখ্যা প্রায় ১০০) নিহত এবং ১০৫ জন আহত হয়।

১-৭-৬৩—নোয়াখালী জেলার চৌমহনীতে মুসলিম জনতা আক্রমণ চালাইলে ২৫ জন হিন্দু নিহত এবং ৫০।৬০ জন আহত হয়।

এখানেও পাড়াগাঁয়ে প্রায় ৫০।৬০ জন হিন্দু নিহত হয় এবং আহতের সংখ্যা কমপক্ষে ২০০ হইতে ২৫০ জন। বহু নিহতের দেহ রাতারাতি গোর দেওয়া কিংবা ঘরে পুড়াইয়া ফেলা হয়।

মোটামুটি এ-কথা বলা চলে যে, দেশ-বিভাগের পর হইতেই পূর্ব্ববঙ্গে একটানা দাঙ্গাহাঙ্গামা প্রায়ই চলিতেছে যাহার ফলে পূর্ব্ব-পাকিস্তানের 'লঘুর' দল 'গুরুর' চাপে ক্রমাগত এ-পারে চলিয়া আসিতে বাধ্য হইতেছে। লঘুর উপর এই গুরু-চাপ পাকিস্তানী শাসকবর্গের পবিত্র এক পাকা পরিকল্পনা মতই চলিতেছে, এবং পূর্ব্ব-পাকিস্তান একেবারে হিন্দু-বাঙ্গালী বর্জ্জিত না হওয়া পর্য্যন্ত চলিতে থাকিবে, ইহা স্থির-নিশ্চয়।

পূর্ব্ব পাকিস্তানের সকল বাঙ্গালী-মুসলমান, বিশেষ করিয়া শিক্ষিত এবং ছাত্রসমাজ পশ্চিম পাকিস্তানের কর্ম্ম-কর্ত্তাদের এ লঘু-সংহার নীতি সমর্থন করেন না, কিন্তু তাঁহারাও আজ নিজেদের অসহায় বোধ করিতেছেন। সংখ্যালঘুদের রক্ষার কারণে কার্য্যকর কিছু তাঁহারা করিতে গেলে পাকিস্তানী পিশাচ গুণ্ডার দল তাঁহাদেরকেও আহত-নিহত করিতে দ্বিধা-সঙ্কোচ বোধ করিতেছে না।

পরিণাম কি?

পূর্ব্ব-পাকিস্তানে হিন্দু নিধন-বিতাড়ন পবিত্র পাক-ক্রিয়া এই ভাবে চলিতে থাকিলে পশ্চিমবঙ্গকে চিরকালের জন্য শান্ত-সুবোধ করিয়া রাখা যাইবে না। ফলে পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী নিরীহ বাঙ্গালী-মুসলমানকে বহু ঝড়-ঝাপটা সহ্য করিতে হইবেই। স্পষ্ট করিয়া বলা ভাল যে, কোন বাঙ্গালীর—তিনি হিন্দু বা মুসলমান যাহাই হউন—প্রতি, কোন অত্যাচার-নিপীড়ন আমরা প্রাণপণে প্রতিরোধ করিব, কিন্তু সর্ব্বদা সর্ব্বত্র গুণ্ডাশ্রেণীর লোকদের দমন করা সম্ভব হয় না। কাজেই দুর্ঘটনা দুই-চারিটা ঘটিতে বাধ্য, আর তাহা হইলেই

'এ-পারে' একজন মুসলমানের (মিথ্যা খবর হইলেও ক্ষতি নাই) দাঙ্গায় মৃত্যুর খবর ও-পারে প্রকাশ পাইবামাত্র অন্ততঃ ১০।১৫টি পাকিস্তানী বাঙ্গালী-হিন্দুর প্রাণ বদলী হিসাবে গৃহীত হইবে !

কেন্দ্রীয় নন্দদুলাল এবারের হাঙ্গামার সময় কলিকাতায় আসিয়া কঠোর হস্তে সর্ব্বপ্রকার দাঙ্গাহাঙ্গামা বন্ধ করিয়াছেন, ইহা ভাবিয়া তিনি তৃপ্তি এবং আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারেন। কিন্তু আমরা মনে করি নন্দাজীর এই অভিভাবকত্বে বেশ একটু বাড়াবাড়ি হইয়া গিয়াছে। প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেনও যেন নন্দমহারাজের হস্তেই কলিকাতা এবং উপদ্রুত অঞ্চলগুলির সর্ব্বশাসন ব্যবস্থা, অন্ততঃ কয়েক দিনের জন্য অর্পণ করেন বলিয়া মনে হইয়াছিল। এমনও হইতে পারে যে, দিল্লীর মহা-শাসকদের আদেশেই শ্রীসেনকে ইহাতে সায় দিতে বাধ্য করা হইয়াছিল। কিন্তু নন্দামহারাজ ও-পারের হিন্দু-বাঙ্গালীদের রক্ষার বিষয়—বাক্যব্যয় ছাড়া আর কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছেন ? এবারেও কি আবার সেই চিরাচরিত-"প্রতিবাদের" পরিহাসই চলিতে থাকিবে ?

খুলনা-যশোহরের দাঙ্গার সময় কেন্দ্রীয় সরকার কিছুই (ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়) করিতে পারেন নাই এবং আমাদের ক্লীব-বাকসর্ব্বস্ব শাসকদের গাফিলতির জন্যই উক্ত দুই জেলায় কত হাজার হিন্দু নিহত এবং কত হাজার আহত হইয়াছে, এবং কত হাজার হিন্দুর সর্ব্বস্ব শয়তান আয়ুবের পাক্-গুণ্ডার দল লুঠ এবং কত হাজার হিন্দুর ঘরবাড়ী পুড়াইয়া ছারখার করা হইয়াছে, তাহার পূর্ণ হিসাব কোন কালেই পাওয়া যাইবে না।

তাহার পর পাক্-ধ্বংসলীলা সুরু হইল ঢাকা এবং নারায়ণগঞ্জে—যাহার অসম্পূর্ণ বিবরণ পাঠ করিয়াই যে-কোন মানুষ ভয়ে, লজ্জায়, দুঃখ-বেদনায় শিহরিয়া উঠিবে—কিন্তু আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার তথা কর্ত্তারা প্রথম পর্য্যায়ে একেবারে নিদ্রিত ছিলেন, একটা প্রতিবাদ বা সমবেদনার কথাও দিল্লী মহল হইতে উচ্চারিত হয় নাই পূর্ব্ববঙ্গবাসী হতভাগ্য বাঙ্গালীদের জন্য !

পূর্ণ শান্তি ?

বেশ কিছুকাল ধরিয়া পাক্-সরকার-সমর্থিত গুণ্ডা রাজত্ব চলিবার এবং অন্ততঃ হাজার ৫।৬ হিন্দু নিহত হইবার পর শুনা যাইতেছে যে, গত ২৪।২৫ জানুয়ারী হইতে খুলনা, যশোহর, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা এবং পূর্ব্ববঙ্গের অন্যত্র নাকি এখন পূর্ণ শান্তি বিরাজ করিতেছে ! ঢাকায়, যেখানে হিন্দু-নিধন পর্ব্ব পূর্ণ সমারোহে এবং বেপরোয়া ভাবে চলে,—সেই ঢাকায় কি প্রকার অপূর্ব্ব শান্তি বিরাজ করিতেছে ?

"ঢাকায় শান্তি নামিয়াছে। বুড়িগঙ্গা নদীর পারে এক সহস্র মৃতদেহের উপর শ্মশানের শান্তি এবং নিষ্ঠুর রাত্রির অন্ধকার ঘনীভূত হইয়াছে। রয়টার জানাইয়াছে যে, ঢাকায় মৃতের সংখ্যা যে-গোপনীয়তার দ্বারা আবৃত করা হইয়াছিল, একজন আমেরিকান নার্স সেই গোপনীয়তা ভঙ্গ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, একমাত্র ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালেই মৃতের সংখ্যা ৬০০। কূটনৈতিক মহল বলিতেছেন যে, মোট মৃতের সংখ্যা সম্ভবতঃ এই সংখ্যার দ্বিগুণ। অর্থাৎ ঢাকায় ভালভাবেই শান্তি নামিয়াছে ! আশ্রয় শিবিরগুলিতে শোকার্ত্ত নরনারীরা যাহাতে গলা ছাড়িয়া কাঁদিবার সাহসও না পায় ; হিন্দু বসতিগুলি যাহাতে প্রকাশ্য দিনের আলোকেও ভয়ঙ্কর ভস্মস্তূপের বিভীষিকা দেখাইয়া পথচারীকে স্তব্ধ করিয়া দেয় ; এবং পুত্রহারা মাতা যাহাতে এই বাঙলা দেশের অভিশপ্ত মাটিতে নীরবে অশ্রুপাত করিয়াই ক্ষান্ত হয়, সেই রকম নিশ্ছিদ্র, কর্কশ শান্তি ঢাকায় নামিয়াছে।...

"...ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে যে শিশু, নারী ও নিরপরাধ মানুষগুলি, কাপুরুষ ও রক্তলিপ্সু (মুসলমান) জনতার হাতে অপঘাতে প্রাণ দিয়াছে, তাহাদের জন্য কোন্ সান্ত্বনা আমরা খুঁজিয়া পাইব ?...

"...আমাদের কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত এইভাবেই তাদের জীবনে অভিশাপরূপে দেখা দিতেছে। বাঙলা দেশকে আমরা বিনা দ্বিধায় ভাগ করিয়াছিলাম...যাহার জন্য আজ নিষ্পাপ শিশুও ঘাতকের অস্ত্র হইতে অব্যাহতি পায় না। গত ১৬ বৎসর যাবৎ আমরা পাকিস্তানকে খোসামোদ করিয়াছি এবং আয়ুব খাঁকে বাড়িতে দিয়াছি, সেই অপরাধের শাস্তি ইতিহাস নিষ্ঠুর হস্তে মৃত্যু ও শোকের মাশুলের দ্বারা আদায়

করিতেছে। আমরা খুলনা ও যশোহরের ঘটনায় সম্বিৎ হারাইয়াছিলাম এবং পূর্ব্ববঙ্গে বাদবাকি এক কোটি হিন্দুর ভবিষ্যতের কথা ভাবি নাই, সেই ক্ষিপ্রতার শাস্তি আয়ুব খাঁর গুণ্ডারা আদায় করিয়াছে। আমরা এই ভয়ার্ত্ত শিশু ও নরনারীগুলির জন্য পলাইবার পথ পর্য্যন্ত রাখি নাই, পশ্চিমবঙ্গের লৌহকপাট উহাদের মুখের উপর বন্ধ করিয়া রাখিয়া এখানে আমাদের ভারতবর্ষীয় বীরপুরুষেরা আয়ুব খাঁর কাছে শান্তির আবেদন পাঠাইয়াছিলেন। আজ শ্মশানের শান্তির দ্বারা পূর্ব্ববঙ্গের হতভাগ্য হিন্দু তাহার মূল্য দিয়াছে।...

"পৌরুষের দ্বারা এই সমস্যার প্রতিকার করিতে হইবে—এখনই পাকিস্তানকে আলটিমেটাম দিয়া পূর্ব্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের জন্য দরজা উন্মুক্ত করিয়া এক কোটি মানুষকে উদ্ধারের চেষ্টা অবিলম্বে করিতে হইবে। কারণ এই মানুষগুলি যে ঘাতক গবর্ণমেন্টের হাতে রহিয়াছে, তাহার কোন নীতিজ্ঞান নাই, তাহার কোন আদর্শ নাই এবং উহা গুণ্ডা ও শয়তানদের দ্বারা সমর্থিত। এমন কি পূর্ব্ববঙ্গের সৎবুদ্ধি-সম্পন্ন বাঙ্গালী মুসলমানের কণ্ঠস্বর পর্য্যন্ত সেখানে স্তব্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু দিল্লী আমাদের এই সতর্কবাণী শুনিবে না!

"কিন্তু এখনও এই শোকের ভাষা দেওয়ার সময় আছে। পূর্ব্ববঙ্গে অবরুদ্ধ মানুষের জন্য আরও মৃত্যু ও নৃশংসতা ডাকিয়া আনার পূর্ব্বে বাঙ্গালীর শিক্ষা, রাজনীতি ও পৌরুষের যদি কোন অবশেষ থাকে, তা হইলে এখন ক্রন্দন নয় এবং কাপুরুষের হিংসাও নয়। এখন আমাদের সমস্ত সঞ্চিত ক্ষোভ সেইদিকে ধাবিত করিতে হইবে, যেখানে নেতৃবৃন্দের ভ্রান্তি, দুর্ব্বলতা ও অপদার্থতা বাংলা দেশের এই সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছে। যাহারা পূর্ব্ববঙ্গে নিরীহ মানুষের উপর অস্ত্র তুলিয়াছে, তাহাদের কেহ হাতের কাছে পাইতেছেন না। এখানে কতকগুলি নিরীহ সংখ্যালঘুর উপর আক্রোশ দেখাইলে পূর্ব্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের আরও সর্ব্বনাশ ঘটিবে। কিন্তু ভারতবর্ষে যাঁরা শৈথিল্য ও দুর্ব্বলতার দ্বারা এই ঘটনা ঘটিতে দিয়াছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গে আন্দোলন আরম্ভ করা যায় এবং পূর্ব্ববঙ্গের বাদবাকি সংখ্যালঘু মানুষগুলির জীবন বিপদমুক্তও করা যায়। আজ প্রয়োজন হইতেছে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে ইহাদের উদ্ধার করিয়া আনা এবং এই জন্য পাকিস্তানের কাছ হইতে জমি, অথবা জমির মূল্য আদায় করা। ইহার জন্য প্রয়োজন হইলে পাকিস্তানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কচ্ছেদ এবং বাণিজ্যিক অবরোধের কথাও ভাবিতে ভারত সরকারকে বাধ্য করিতে হইবে।...

"পশ্চিম ও পূর্ব্ববঙ্গ—দুইটি অভিশপ্ত দেশকে হত্যা ও শ্মশানের শান্তি নয়, যদি নিষ্পাপ এবং পবিত্র শান্তি দিতে হয় তা হইলে বাঙ্গালী মূর্খ আক্রোশের দিকে যাইবেন না, রাজনৈতিক ক্রোধ ও সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের দ্বারা দিল্লীর নির্লজ্জ নীরবতা চূর্ণ করিয়া দিন।...

"মনে রাখিতে হইবে যে, এখানে যাহারা সংখ্যালঘুর গায়ে হাত দেয়, তারা পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুর শত্রু। মানুষের মনুষ্যত্ব রক্ষার জন্য যাহারা বাংলা দেশের ইতিহাসে বার বার লড়াই করিয়াছে, আমরা তাহাদেরই ডাকিতেছি—কিন্তু এ আহ্বানে কে সাড়া দিবে?"

বি. বি. সি., রয়টারকে ধন্যবাদ

যাহা একান্ত ভাবে আমাদেরই কর্ত্তব্য ছিল, এবং যে কর্ত্তব্য আমাদের কংগ্রেসী শাসকবর্গ পালন করিতে দ্বিধাবোধ করেন কিংবা পারেন নাই, সেই-কর্ত্তব্য সমাপন করিল রয়টার এবং বি. বি. সি। ইহাদেরই দয়ায় সমগ্র পৃথিবী জানিতে পারিল যে, মাত্র কয়েক দিনে হাজার হাজার হিন্দু বলি এবং গ্রামের পর গ্রাম আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল পূর্ব্ব-পাকিস্তান নামক কসাইখানায়। এই ভয়াবহ সংবাদ, যাহার তুলনা নাৎসী-ইতিহাসেও বিরল, ঢাকার একজন বিদেশী নার্স প্রথম প্রকাশ করেন—স্বচক্ষে শয়তান আয়ুবের দানব-গুণ্ডাদের নারকীয় ক্রিয়াকলাপ অবলোকন করিয়া! এই মহিলা কেবলমাত্র ঢাকার সংবাদই দিয়াছেন। ঢাকার বাহিরে শত শত গ্রামে কি ঘটিয়াছে—পূর্ব্ব-পাকিস্তান নামক নরকের অন্যত্র কত হাজার হিন্দু (এবং সেই সঙ্গে কত বাঙ্গালী মুসলমানও) হতাহত হইয়াছে, তাহা দেখিবার সুযোগ এই মহিলা লাভ করেন নাই। কিন্তু সমগ্র ভারতে হিমাচলতুল্য শান্তির পরিপ্রেক্ষিতে কলিকাতা বা কতটুকু! পাকিস্তানের বীভৎস, অব্যাহত দাঙ্গার পাশে

কলিকাতার ইতস্ততবিক্ষিপ্ত সামান্য কয়েকটি ঘটনাও বিশেষ কিছুই নয়। অথচ এখানে সামান্য অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটিতে-না-ঘটিতে বুক চাপড়াইয়া, মিলিটারী হাঁকাইয়া এক দিকে এমনই হাহাকার এবং কাঁদুনি, অন্যদিকে এমনই প্রচণ্ড লম্ফঝম্ফ সুরু হইয়া গেল যে, সমগ্র বিশ্বে অবিলম্বে রটিয়া গেল, এখানে না জানি কি ন-ভূতো-ন-ভবিষ্যতি কাণ্ড চলিয়াছে! কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছুটিয়া আসেন! আসেন স্বয়ং প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ।

বহিঃশত্রুর আক্রমণে এ দেশে যখন বিপন্ন বিস্ময়, তখন এই বিষম অভূতপূর্ব্ব তৎপরতা কোথায় ছিল? দেখিতে দেখিতে কলিকাতা পুলিসের কমিশনার (যাঁহার অপরাধ, বাহিরের লোকের কথা বাদ দিই, তিনি স্বয়ং এখনও জানেন না)—বদল। এবং তাহার পরের পর্ব্ব নির্ব্বিচার নিগ্রহ আর ধরপাকড়ের প্রবাহ, দোষী-নির্দ্দোষী কোন বিচার না করিয়াই। ধৃত ব্যক্তিদের বহু জনের হাজতবাস এবং তাহার পর শত শত মামলার জের এখনও মিটে নাই! বিচিত্র এই লঘু-পাপের এমন গুরুদণ্ড বিধান!!

তিল হইল তাল!!

যে সাম্প্রতিক হাঙ্গামা কেবলমাত্র কলিকাতা পুলিসের সক্রিয় প্রচেষ্টায় এমনিতেই দু-চার দিনেই মিটিয়া যাইত, সেই হাঙ্গামা আমাদের অতি-তৎপর, এবং কর্ত্তব্যে ভীষণ-কঠোর শাসকবর্গের বিষম প্রয়াসের ফলে কাগজে-কলমে এবং অতি-প্রচারের ফলে এক অতি-ভীষণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা বলিয়া বাহিরে প্রকাশ পাইতে বিলম্ব হইল না।

কর্তৃপক্ষের ভীষণ-উৎকট তৎপর-অস্থিরতায় হাঙ্গামা সম্পর্কে সত্য অপেক্ষা অসত্যই অধিকতর প্রকট হইয়াছে। আজ অবস্থা শান্ত হইবার পর তথ্যানুসন্ধানীদের বিচারে ইহাই প্রকাশ পাইয়াছে যে, কি বিস্তৃতিতে, কি গভীরতায় হাঙ্গামা কখনও সীমা ছাড়ায় নাই। ইহা একতরফাও ছিল না। যদিও সরকারী বিবৃতিতে এবং পুনর্ব্বাসনের গলদশ্রু নীতিতে শ্রেণীবিশেষের প্রতি পক্ষপাত দেখা দিয়াছে, তথাপি মাত্র তিন-চার দিনের ঘটনায় সকল শ্রেণী সমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এবং ভুক্তভোগী নাগরিক-শ্রেণীর সকলেই। পাকিস্তানের হিন্দু-নিধন অভিযানের সঙ্গে কোন অংশে তুলনীয় তো নয়ই, কলিকাতায় যাহা ঘটিয়াছে, তাহাকে প্রকৃতপক্ষে গুরুতর এবং 'সাম্প্রদায়িক' বলা যায় কি না সন্দেহ। ইহা অপেক্ষা সাঙ্ঘাতিক আকস্মিক বিস্ফোরণ ইতিপূর্ব্বে নানা কারণে বহুবার ঘটিয়াছে, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তখনও সামান্য ছিল না। বিদেশী অপপ্রচারের প্রতিবাদে যাঁহাদের রসনা-আড়ষ্ট, তাঁহাদের মুখ অহেতুক আত্ম-কলঙ্ক রটনায় এমন অনর্গল খুলিয়া গেল কেন?

প্রচার-প্রোপাগাণ্ডা বিষয়ে আমাদের উচিত পাকিস্তানের নিকট হইতে পাঠ গ্রহণ করা। পাকিস্তানের ধ্রুবনীতি অতি স্পষ্ট: প্রথম:—সংখ্যালঘু-নির্যাতন-বিতাড়ন। দ্বিতীয়:—ভারতের বৈরিতাসাধন। তাহার আচরণে সামঞ্জস্য এবং পারম্পর্য, দুই-ই আছে। নহিলে প্রত্যেকবার দুনিয়ার হাটে পাকিস্তান হাসিমুখে সওদা করিয়া ফিরিয়া আসিতে পারিত না। সত্য নহে, সত্যের ভড়ংকেই আমরা ব্রত করিয়াছি, কূটনীতি, রাষ্ট্রনীতিতে যাহা সাজে না। ইহাতে পদে পদে বিপদ ঘটে, অপদস্থ হইতে হয়—ভারতের ভাগ্যে ষোল-সতের বৎসর ধরিয়া যাহা ঘটিতেছে। কাঠ-গড়ায় আমরা কোণঠাসা, আসামী হইয়া রহিয়াছি।

অন্যদিকে পাক্‌-রাষ্ট্রপতি শয়তান আয়ুব খাঁ ভারতের রাষ্ট্রপতির পত্রের জবাবে যাহা বলিয়াছে—তাহাকে পূর্ব্ববঙ্গের হাজার হাজার নিরীহ হিন্দু এবং কয়েক শত বাঙ্গালী মুসলমানের রক্ত-মাখানো হাতের শয়তানী চড় ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

> "কিন্তু প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁকে দুষিয়া লাভ কি? ভারতবর্ষে আমরাই কি তাঁহাকে দায়িত্ব এড়াইয়া যাইবার পথ করিয়া দিই নাই? নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকার হত্যাকাণ্ড শুরু হওয়ার তিনদিন পরে রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণন আয়ুব খাঁকে পত্র দিয়াছেন, অথচ রাষ্ট্রপতির পত্রে এত বড় একটা ঘটনার ঘুণাক্ষরে উল্লেখমাত্র করা হয় নাই। তাহার পরে আরও কিছুদিন কাটিয়াছে। আজ পর্য্যন্ত দিল্লীর চৈতন্যহীন, পৌরুষহীন নেতারা এই ব্যাপারে পাকিস্থানকে একটা কড়া কথাও বলিয়াছেন বলিয়া শোনা যায় নাই। বিদেশী সাংবাদিকরা উদ্যোগী না হইলে একথাও জানা যাইত না যে, একমাত্র ঢাকা সহরেই আয়ুবশাহীর ঘাতকরা অন্ততঃ এক সহস্র পুরুষ নারী ও শিশুকে জবাই করিয়াছে। বিদেশী সংবাদ প্রতিষ্ঠানের এই সংবাদ ভারতবর্ষ সারা পৃথিবীতে প্রচার

করিয়া পাকিস্থানের স্বরূপ তুলিয়া ধরিতে পারিত, যে অপরাধী বিশ্বসভায় গিয়া ফরিয়াদী সাজিবার চেষ্টা করিতেছে তাহাকে আসামীর কাঠগড়ায় তুলিতে পারিত। কিন্তু আমরা শুধুই ভালমানুষী করিয়া হাত কচলাইতেছি এবং পাকিস্থানকে একটার পর একটা কূটনৈতিক জয় অর্জ্জন করিয়া যাইতে দিতেছি। পাকিস্থানের রক্তমাখা হাতটা আমরা তুলিয়া ধরিয়া দেখাইতে পারি নাই। এখন সে তাহার সেই কলঙ্কিত হাত ভারতবর্ষের গায়ে মুছিবার চেষ্টা করিতেছে বলিয়া তাহাকে গালি দেওয়া নিরর্থক। ভারতবর্ষের এই পরাজয়, এই গ্লানির জন্য জনতার সমস্ত ধিক্কার প্রাপ্য দিল্লীর অধিপতিদের। পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের তাঁহারাই আপদ বলিয়া মনে করেন, এই এক কোটি মানুষের গায়ে বা ইজ্জতে আঘাত লাগিলে তাঁহারাই চোখ বুঁজিয়া থাকেন এবং পাকিস্থান উন্টা নালিশ দায়ের করিলে তাঁহারা শুধু মিউ মিউ করিয়া কৈফিয়ৎ দিতে যান এবং তাঁহারাই এই অক্ষমতার দ্বারা ভারতবর্ষের ৪৪ কোটি মানুষকে অপমান বরণে বাধ্য করেন।"

নব-উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধান

আমাদের রাজ্যপালিকা ঘোষণা করেন যে একটি বাস্তুহারা পরিবারও পথে পড়িয়া থাকিলে প্রজাতন্ত্র দিবসে কোন আড়ম্বর-আনন্দ-অনুষ্ঠানের আয়োজন করা আমাদের উচিত হইবে না! শ্রীমতী নাইডুর পক্ষে এমন ঘোষণা সকলেই সর্ব্বান্তকরণে সমর্থন করিবেন—এবং বাস্তবে যদি দেখা যায় যে বাস্তুহারা একটি পরিবার, একটি মানুষও আর পথে পড়িয়া নাই, তাহা হইলে অসুখী হইবে এমন কোন মানুষ দেশে নাই। কিন্তু রাজ্যপালিকা কোন শ্রেণীর বাস্তুচ্যুতদের সম্পর্কে আজ হঠাৎ এ-ঘোষণা করিলেন, তাহাই বিবেচ্য। বর্ত্তমানের কার্য্য-কারণ বিবেচনা করিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে রাজ্যপালিকা সাম্প্রতিক হাঙ্গামায় কলিকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্তত্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 'বাস্তুচ্যুত' পরিবারদের সম্পর্কেই এই কথা বলিয়াছেন।

সময় এবং অবস্থা-বিশেষে মানবতাও কি একদেশদর্শী হইল? পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আজ পর্য্যন্ত যে-সকল মানুষ, কেবল বাস্তু নহে, সর্ব্বহারা হইয়া এ-পারে আসিয়াছে—তাহাদের শতকরা ৩০ জনও কি 'বাস্তু' বলিয়া কিছু পাইয়াছে? হাজার হাজার হিন্দু-পরিবার ও-পার হইতে পশ্চিমবঙ্গে নিষ্ঠুর ভাবে বিতাড়িত হইয়াছে, তাহাদের জন্য কি প্রকার 'বাস্তুর' ব্যবস্থা কংগ্রেসী শাসকবর্গ বলিয়াছেন জানিতে ইচ্ছা করি। কলিকাতা প্রাসাদ-নগরীর শিয়ালদহ নামক ষ্টেশনের হাতায় সর্ব্বজনের চোখের সামনে এবং নাকের ডগায় পূর্ব্ব-বঙ্গ আগত কয়েক হাজার মানুষ যে পশু-অপেক্ষাও হীন এবং নারকীয় জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছে, মানবদরদী রাজ্যপালিকা কি তাহার কোন সংবাদ রাখেন? আজ পর্য্যন্ত একবারও কি তাঁহার মনে হইয়াছে "এইসব মানবরূপী পশুপাল কি ভাবে, কেমন করিয়া, কতসুখে, বিবিধ প্রকার মহামারী এবং জঘন্য দুর্নীতি লইয়া সহাবস্থান করিতেছে তাহা একবার চোখে দেখিয়া আসি"? বছরের পর বছর 'রিপাবলিক্ ডে' এবং স্বাধীনতা দিবসের ঘনঘটাময় উৎসব আনন্দ পালিত হইতেছে কিন্তু কই, রাজপালিকার মুখে একবারও ত এই সর্ব্বহারাদের বিষয় কোন কথাই আজ পর্য্যন্ত উচ্চারিত হয় নাই।

ইতিপূর্ব্বে মহামান্য রাজ্যপালিকা শিয়ালদহ ষ্টেশনে হইতে 'সেলুনে' কিংবা স্পেশাল-ট্রেনে করিয়া কাছাকাছি বহু অঞ্চলে প্রতিরক্ষা তহবিলের অর্থ আদায়ের জন্য গিয়াছেন, কিন্তু নর্থ-ষ্টেশনের চারিপাশের পুলিসের 'চাইনীজ-ওয়াল' ভেদ করিয়া তাঁহার দৃষ্টি বাস্তুহারাদের বসতি 'নরকের' উপর একবারও পড়িয়াছে কি?—

পূর্ব্ব-বঙ্গের হাজার হাজার মানুষ আজ এ-পারে আসিয়া নিম্নতম মানবিক অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া নিষ্ঠুর অবলুপ্তির প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। ১৯৫৮।৫৯ সালের পর যে-সকল পূর্ব্ববঙ্গীয় হিন্দু মাইগ্রেসন নথিপত্র না লইয়া এ-পারে আসিতে বাধ্য হইয়াছে—কংগ্রেসী সরকার তাহাদের উদ্বাস্তু বলিয়া স্বীকার পর্য্যন্ত করেন নাই। এমন কি ইহারা দণ্ডকারণ্যেও আশ্রয় লাভের যোগ্য নহে, সরকারী নিয়মানু-যায়ী! কংগ্রেসী কর্ত্তাদের কর্ত্তব্যপরায়ণতা এবং নিয়মনিষ্ঠার সত্যই প্রশংসা করিতে হয়!

ইহা বলা অযথা এবং অন্যায় হইবে না যে সাম্প্রতিক হাঙ্গামায় কলিকাতা এবং পশ্চিম বঙ্গের অন্যান্য কয়েকটি অঞ্চলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যপালিকা এবং কেন্দ্রীয় কর্ত্তাদের যে

মানবতা-বোধ এবং প্রেমের বন্যা হঠাৎ জাগ্রত এবং প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার হাজার অংশের এক অংশও যদি সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের সমসংখ্যক কিন্তু অধিকতর ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য জাগ্রত এবং প্রবাহিত হইত, আমাদের কিছুই বলিবার থাকিত না। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাইতেছে, সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা—কর্ত্তাদের বিবেচনার বাহিরে এবং তাহাদের সম্পর্কে কোন দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্য শাসকদের নাই! সংখ্যালঘুদের প্রতি দরদে এবং কর্ত্তব্য পালনে কাহারো কিছুই বলিবার নাই, কিন্তু ব্যাপারটা যে-প্রকার মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়িতে ঠেকিয়াছে, তাহাতে আমরা ইহাই মনে করিব যে পাকিস্তানী শয়তান আয়ুব খাঁকে সর্ব্বপ্রকারে খুশী রাখিবার জন্যই রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার আদাজল খাইয়া, গামছা পরিয়া, সংখ্যালঘু রক্ষার নামে পাকিস্তান তোয়াজের ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন।

শয়তানের চড়

কিন্তু যে আয়ুবকে আমরা খুশী করিতে এত তোয়াজ করিয়াছি করিতেছি সেই আয়ুব খাঁ—

'পূর্ব্ববঙ্গের সহস্রাধিক মানুষের তাজা খুনে যাঁর হাত কলঙ্কিত সেই প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ রক্তের দাগ না শুকাইতেই ভারতের গালে এক থাপ্পড় দিয়াছেন। রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণনকে তিনি নিজের ঘর সামলাইবার পরামর্শ দিয়াছেন। এই আয়ুব খাঁ, যিনি হজরতবাল মসজিদ হইতে পবিত্র কেশ চুরির জন্য হিন্দুদের দায়ী করিয়া খুলনা-যশোহরের দাঙ্গায় উস্কানি দিয়াছেন এবং তাহার দ্বারা ভারত ও পাকিস্থানে সাম্প্রদায়িক বীভৎসতাকে নূতন করিয়া জীয়াইয়া তুলিয়াছেন। যিনি নিজের দেশের মানুষকে গণতান্ত্রিক অধিকার দেন নাই, কিন্তু কাশ্মীরের অধিবাসীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য চেঁচাইয়া পাড়া মাৎ করিতেছেন, তিনিই আজ ভারতবর্ষকে উপদেশ দিতেছেন, ঐসব যৌথ আবেদন করিয়া কি ফয়দা? আমার যা করার আমি করিতেছি, তোমার কর্ত্তব্য তুমি কর! এই জল্লাদের মন্ত্রণা শুনিবার জন্যই কি আমাদের রাষ্ট্রপতি পাকিস্থানের প্রেসিডেন্টকে পত্র লিখিয়াছিলেন?

"যৌথ আবেদনে স্বাক্ষর করিতে পাকিস্থান প্রেসিডেন্টের অরুচি দুর্ব্বোধ্যও নয়, নূতনও নয়। কাশ্মীরের ব্যাপারে ভারতের বিরুদ্ধে নালিশ লইয়া পাকিস্থান আবার রাষ্ট্রসঙ্ঘে গিয়াছে। এমন সময়ে ফরিয়াদী ও আসামী এক দলিলে নাম সই করেন কি করিয়া? কিন্তু আজ বলিয়া নয়, বরাবরই পাকিস্থান সরকার এইভাবে ভারত সরকারের সঙ্গে সরাসরি ও সম্মানজনক বোঝাপড়ায় আসিতে অস্বীকার করিতেছেন। ভারতবর্ষ "যুদ্ধবর্জন"-এর প্রস্তাব দিয়াছিল, পাকিস্তান সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। ভারতবর্ষ প্রস্তাব করিয়াছিল, অবৈধ অনুপ্রবেশকারী পাকিস্তানীদের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা যাক, পাকিস্তান সেই প্রস্তাব ধামাচাপা দিয়া রাখিয়াছে। অর্থাৎ আয়ুব খাঁ ও তাঁহার অনুচররা ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের সমস্যাগুলি অমীমাংসিত অবস্থায় টিকাইয়া রাখিতেছেন এবং তাহারই ভিত্তির উপর তাঁহার নিও-ফ্যাসিষ্ট শাসনের সৌধ গড়িয়া তুলিতেছেন।"

শান্তি আবেদনের প্রস্তাব রাষ্ট্রপতি 'প্রথম পদক্ষেপ' হিসাব করেন। এই প্রস্তাব মত কার্য্য আরম্ভ হইলে হয়ত বা দাঙ্গাহাঙ্গামার প্রতিরোধ সম্ভব হইত। কিন্তু তাহা হইলে আয়ুবের শয়তানী চাল এবং পাক-বিষচক্রের গতিরোধ হইবে ভাবিয়াই আয়ুব আমাদের রাষ্ট্রপতির প্রস্তাব ডাষ্ট-বিনে নিক্ষেপ করিল।

কিন্তু আমরা দেখিয়া অবাক হইয়াছি—শয়তানের চড় হজম করিয়া ভারত দ্বিতীয়বার পাকিস্তানের নিকট শান্তি প্রস্তাব (যথারীতি আবার প্রত্যাঘাত) পাঠাইল কেমন করিয়া, কোন মুখে, চড়ের ফলে গালে রক্তের দাগ শুকাইতে না শুকাইতে কেন্দ্রীয় কর্ত্তারা একান্ত নির্লজ্জ এবং বেহায়ার মত আবার আয়ুবের নিকট কর-জোড়ে ভিখারীর মত উপস্থিত হইতে কোন প্রকার দ্বিধা বা সঙ্কোচ বোধ করিলেন না—এই সকল ক্লীবই আমাদের রক্ষাকর্ত্তা?

শয়তানের কাছে মানবীয় আবেদনের কি মূল্য আছে তাহা আমাদের জানা নাই। শয়তান যে ভাষা বুঝে, যে-ঔষধে তাহার রোগ নিরাময় হইতে পারে, এখন সেই ভাষা এবং ঔষধ প্রয়োগের সময় উপস্থিত। কিন্তু দেশের বর্ত্তমান জোড়া-বলদ শাসকগুষ্টি—রক্তলোভী মানুষরূপী-নেকড়ের উপর এই অতি এবং অবশ্যপ্রয়োজনীয় ঔষধ প্রয়োগ করিবার মত সাহস রাখেন না বলিয়াই লোকের বিশ্বাস। কাজেই শাসনক্ষমতা হইতে এই জোড়া-বলদদের বিতাড়িত করিতে না পারিলে দেশের কোন আশাভরসা নাই।

ভরসার কথা এই যে, পাল্টা হাওয়া বহিতে সুরু হইয়াছে- ইহা ঝড়ের পূর্ব্বলক্ষণ।

ঢাকা ও কলিকাতা

ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশনার দাঙ্গাহাঙ্গামার সময় উপদ্রুত অঞ্চলে যাইতে পারেন নাই, তাঁহাকে যাইতে দেওয়া হয় নাই, কিন্তু এ-দিকে দেখুন কলিকাতায় পাক্ ডেপুটি হাই কমিশনার তাঁহার দলবল লইয়া পার্ক সার্কাস, বেনিয়াপুকুর, মেটিয়াবুরুজ, গার্ডেনরীচ, কলা বাগান প্রভৃতি মুসলমান সংখ্যাগুরু অঞ্চলগুলিতে বিনা বাধায় ইচ্ছামত ভ্রমণ করিয়াছেন গত কয়েকদিনের দাঙ্গাহাঙ্গামায় সময়। কেবল ইহাই নহে। সংবাদে প্রকাশ পাক-ডেপুটি হাই কমিশনার এবং তাঁহার চরের দল বিবিধ প্রকারে সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়ের লোকদের সংখ্যাগুরুদের উপযুক্ত শিক্ষা দিবার জন্য প্ররোচনা এবং সাহায্যও করিয়াছেন। এ-রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ইহা প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু প্রতিকার কিছুই করেন নাই কিংবা করিতে পারেন নাই, হয়ত বা প্রতিকার করিতে তাঁহার সাহসও হয় নাই। কেন্দ্রের নন্দ মহারাজ রাজ্য মুখ্যমন্ত্রীকে দাঙ্গাকালীন এবং তাহার পরেও বেশ কিছুদিন তাঁহার একান্ত তাঁবে এবং আজ্ঞাবহ পাত্রে পরিণত করেন। লোকমুখে ইহাই শুনা যায়। এমন কি কেন্দ্রীয় কর্ত্তার নির্দেশ মতই নাকি এক কথায় হঠাৎ এক ঘণ্টার মধ্যে কলিকাতার পুলিস কমিশনার অপসারিত হইলেন। কারণ? এই ভদ্র এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ অফিসারটি কলিকাতার বহু মসজিদ এবং অন্যান্য মুসলীম অধ্যুসিত ডিপো হইতে টমিগান হইতে আরম্ভ করিয়া বহুপ্রকার অস্ত্রাদি উদ্ধার করেন। তিনি একটি বিশেষ অঞ্চলে স্থিত একটি প্রখ্যাত মসজিদ সার্চ করিবার প্রস্তাব করেন এবং ইহার ফলেই নাকি তাঁহার এ-অবনতি ও অপমান! মুখ্যমন্ত্রী লোককে কি জবাব দিবেন জানি না, কিন্তু বিগত দাঙ্গা হাঙ্গামার সময় তাঁহার সিংহ-চর্ম্মের বেথাপ্পা বহিরাবরণ খসিয়া পড়িয়াছে।

জনগণ তাঁহার স্বরূপ এবং বলবীর্য্যের যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছে! এই একটি মাত্র কারণেই তাহার পদত্যাগ করা অতীব শোভন-সমীচীন হইত (কিন্তু সকল মানুষের আত্ম-সম্মান বোধ একই মাপকাঠিতে মাপা যায় না!)

সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার জন্য যে সকল ব্যবস্থা কেন্দ্র এবং রাজ্যসরকারের তরফ হইতে করা হইল, তাহা ভদ্র-রাষ্ট্রের উপযুক্ত কাজ হইয়াছে—স্বীকার্য্য। কিন্তু এই সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, পাকিস্তান ভদ্র এবং সভ্য রাষ্ট্র নহে। তাহারা অতি নগ্নভাবে ইহা প্রমাণ করিয়াছে, সেই জন্য বিংশ শতকের এই অতি বর্ব্বর শয়তানী রাষ্ট্র ভদ্রতা, সভ্যতা এবং মানবতা কি তাহা বুঝিবে না—কিন্তু এইটুকু বুঝিবে যে, ধর্ম্ম নিরপেক্ষ ভারতরাষ্ট্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সম্পূর্ণ নিরাপদ—কাজেই পবিত্র পাকিস্তান রাষ্ট্রে হিন্দু-নিধন কার্য্য আরও বেপরোয়া এবং ভীষণ ভাবে চালাইলেও ভারতে তাহার কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে না! পাকিস্তানের এই মনোভাবের ফল ঐ রাষ্ট্রের হিন্দু সংখ্যালঘুদের পক্ষে কি সাংঘাতিক হইবে, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলার প্রয়োজন নাই।

কেন্দ্রীয় নন্দ-দুলাল কলিকাতায় বহু অসার নীতি-কথা বলিয়াছেন কিন্তু তাহার সঙ্গে যদি এই সামান্য কথাটা বলিতেন যে, পাকিস্তানে হিন্দু নির্য্যাতন এবং নিধন বন্ধ না হইলে ভারতে তাহার ভীষণ প্রতিক্রিয়া অবশ্যই দেখা দিবে—তাহা হইলে হয়ত কাজের কাজ কিছু হইত।

> "আঘাতে আঘাতে বাংলা দেশ জর্জ্জর হইয়াছে—ইংরাজের আঘাত, কংগ্রেসের আঘাত, লীগের আঘাত এবং গুণ্ডার আঘাত। একটা গোটা জাতিকে খণ্ড খণ্ড টুকরা টুকরা করিয়া ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন সতীদেহের মত ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। একই বাঙ্গালী জাতি আজ ঢাকায়, চট্টগ্রামে, বরিশালে, জলপাইগুড়িতে, ২৪ পরগণায়, কলিকাতায়, দণ্ডকারণ্যে, রাজস্থানে, আন্দামানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বনের পশু বিতাড়িত হইয়া যেমন যত্রতত্র পলায়ন করে এবং যেখানে-সেখানে "পশুবৎ জীবন" যাপনে বাধ্য হয়, গত ১৬ বছর ধরিয়া বাঙ্গালী জাতি যত্রতত্র এই পশুবৎ জীবনের যন্ত্রণা এবং অসম্মান মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে। আর আমাদের নিরুপায় যুবক সাধারণ হতভম্বের মত এই অসম্মান ও যন্ত্রণার দৃশ্য দেখিয়া যাইতেছে!"

নির্ব্বাণের পথে বাঙ্গালী?

"তাকাইয়া দেখুন—নয়াদিল্লীর দিকে। আয়ুব-শাহীর কাছে আর এক দফা আবেদন-নিবেদনের নাকি আয়োজন হইতেছে। ইংলণ্ডের দুয়ারে, আমেরিকার

দুয়ারে নাকি ধর্ণা দেওয়ার চেষ্টা চলিতেছে—আয়ুব খানের সুমতি উৎপাদনের জন্য। এঁদের কি ঘৃণা নাই, লজ্জাও নাই? এঁরা কি পুরুষ-মানুষ—না, মেয়েলিপনার নাকি সুরের কান্না এঁদের একমাত্র সম্বল? এঁদের দ্বারা বাঙালী জাতির সমস্যা মিটিবে না, এঁরা বাঙালীকে ধ্বংসের মুখ হইতে বাঁচাইতে পারিবেন না। রাওলপিণ্ডির হাতে যেমন পূর্ব্ব-পাকিস্তানের বাঙালীর ত্রাণ নাই, তেমনি দিল্লীর হাতেও গোটা বাঙালী জাতির মুক্তি নাই। সেই মুক্তি আমাদের নিজেদেরই আনিতে হইবে—শক্তি প্রয়োগের দ্বারা, সংগ্রামের দ্বারা। দুই বাংলার সীমারেখা আমরা ঘুচাইয়া দিব। আমরা সেই আসন্ন যুগ-বিপ্লবের সৈনিক, যার পদধ্বনি শুনিতেছি পদ্মার তীরে, গঙ্গার তীরে। সুন্দরবনের ছায়ায় ছায়ায় সেই নতুন যুবশক্তির ছাউনী গড়িয়া উঠুক। নতুন মুক্তিকামী যোদ্ধদল আয়ুবশাহী পার্টিশানী প্রেমিকদের দুষমনি রাজত্বের অবসান ঘটাক।

"সময় আসিয়াছে বাঙালী যুবকদের ডাক দিয়া বলিবার—"তুমি আজ বেকার, তুমি আজ নিঃস্ব; কলিকাতার ঐশ্বর্য্য-বিপণিশালায় তুমি আজ ভিক্ষা-প্রার্থী—সেই ভিক্ষাও তোমার মিলে না। তোমার রুগ্ন বাপ-মার চিকিৎসা হয় না, তোমার ছোট ভাইয়ের স্কুলের মাহিয়ানা জোটে না, তোমার বোনের বিবাহ হয় না। বড়লোকের দুয়ার হইতে বিতাড়িত কুকুরের মত তুমি আজ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছ। তুমি আজ মানুষের পরিচয়হীন 'রিফিউজি' মাত্র, কিংবা ভদ্রলোকের সুখের সমাজে তুমি আজ গুণ্ডা বলিয়া চিহ্নিত। সুতরাং তোমাকে গুণ্ডামি করিতে হইবে। কিন্তু নতুন ধরণের গুণ্ডামি—যে সংগ্রামশীল মানুষটি তোমার মধ্যে লুকাইয়া আছে, যে কঠিন, কঠোর, উলঙ্গ অসন্তোষের দ্বারা তোমার জীবন বহ্নিমান, সেই অগ্নি-কণা তুমি ছড়াইয়া দাও সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, অবিচারের বিরুদ্ধে—র‍্যাডক্লিফ বাঁটোয়ার কলঙ্কিত চিহ্নকে তোমার ক্রোধের অগ্নির দ্বারা পোড়াইয়া দাও। গুণ্ডার ভিতর হইতে মারমুখী যোদ্ধা বাহির হইয়া আসুক। গুণ্ডাবাহিনী সুশৃঙ্খল সৈন্যবাহিনীতে পরিণত হউক। বঙ্গভঙ্গ অস্বীকার কর। হে বাংলা দেশের বিভ্রান্ত যুবক! তোমাকে এই নতুন বিপ্লবের ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে।"

বাঙলা এবং বাঙালীর বর্ত্তমান চরম সঙ্কটে বাঙালীকে আজ সঙ্গীতের আসর, আনন্দের বাসর, সিনেমার কিউ, থিয়েটারের নেশা, ক্রিকেটের হৈ-হল্লা, পার্কে, রকে বেকার আড্ডা ইত্যাদি অনাবশ্যক সব কিছুই আপাততঃ কিছু কালের জন্য স্থগিত রাখিয়া দেশ এবং জাতিকে রক্ষা করিবার, পূর্ব্ববঙ্গের মা-বোনদের পাক-শয়তানদের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার সক্রিয়. তাহা যতই অসম্ভব এবং বিপদ-জনক হউক, উপায় বাহির করিতেই হইবে।

সঙ্গে সঙ্গে জাতির এই সঙ্কট কালে চাউল, ডাইল, মৎস্য, মাংস, বস্ত্র ব্যবসায়ী-ব্যাপারী প্রভৃতির অত্যাচার হইতেও সাধারণ মানুষকে বাঁচাইবার কথা ভাবিতে হইবে। ভাল কথায় কাজ না হয়, যাহাতে হয়, যে-যুক্তি এই অভদ্র অতি লোভীর দল মানে এবং স্বীকার করে তাহাই করিতে হইবে। মানুষের বিপদের সময় পয়সা লুটিবার নেশা-পেশার অবসান শেষবারের মত ঘটাইতে হইবে।

ইন্দিরা গান্ধীর অমৃত ভাষণ

অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকাল পূর্ব্বে এক ভাষণ প্রসঙ্গে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর একমাত্র সন্তান শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁহার পিতার অনুকরণে সেই বহুবার কথিত আদর্শ উপদেশাবলীর পুনরাবৃত্তি করেন—হয়ত না বুঝিয়াই। ইন্দিরা মাতাঠাকুরাণী বলেন:—

"জনসাধারণের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে দৃঢ় এবং সাহসী নেতৃবৃন্দের প্রয়োজন। দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে সেই দেশের যুবসম্প্রদায়ের গুণাবলীর, চিন্তাধারা এবং সামর্থ্যের উপর।"

"দেশের ক্রমবর্ধমান শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা হইতে বুঝা যায় ছাত্রছাত্রীরা দেশ কিংবা বিশ্ব অপেক্ষা নিজ সমস্যা লইয়াই বেশী উদ্বিগ্ন, ব্যস্ত। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় আমরা (?) ব্যক্তিস্বার্থের উর্দ্ধে উঠিতে পারিয়াছিলাম, আমাদের সত্তা এবং সাহস উজ্জীবিত হইয়াছিল।………

"ভারতের সকল রাজ্যেই যে উন্নয়নের মাত্রায় পার্থক্য আছে তাহা নহে, প্রত্যেক রাজ্যেরই অন্তর্গত

এই পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বহুবর্ষের অবদমন এবং রাজনৈতিক দাসত্ব তাহাদের পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। আমাদের যুবসমাজ পুরাতন বন্ধন হইতে যদৃচ্ছাক্রমে (?) চালিত হইতেছেন, নিজ পায়ে দাঁড়াইবার মত আত্মপ্রত্যয় ও আত্মবিশ্বাস তাঁহারা অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। আমাদের গণতন্ত্রকে যদি সফল করিতে হয়, তবে এই অনিশ্চিত ভিত্তিপ্রস্তরকে দৃঢ় করিতে হইবে।

"পাশ্চাত্ত্য দেশের ঢেউ আজ নগর সভ্যতাকে স্পর্শ করিয়াছে এবং সম্ভবতঃ তাহারই ফলস্বরূপ যুবসমাজের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে।

"আপন আধ্যাত্মিক ক্ষেত্র হইতে উন্মূলিত না হইয়াই আমাদের অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা ও সাফল্যকে গ্রহণ করিতে হইবে। বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিকে ধাতস্থ করিয়া কার্য্যে প্রয়োগ করিতে হইবে।"

শ্রীমতী গান্ধীকে আমরা এ যাবৎ যত বড় মনে করিতাম তিনি আসলে তাহা অপেক্ষা আরো অনেক অনেক বড় এখন বুঝিতেছি।

শ্রীমতী বাক্যে এবং আদর্শ প্রচারে তাঁহার শ্রদ্ধেয় পিতা অপেক্ষা কম নহেন, হয়ত বা কিছু বেশীও হইতে পারেন। ভাষণ প্রসঙ্গে (এই ভাষণ কাহার লেখা বলিতে পারি না।) তিনি দেশের বেকারদের সম্পর্কে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে কিছু বলিবার আছে। ইন্দিরা দেবী বলিয়াছেন—'ছাত্রছাত্রীরা দেশ কিংবা বিশ্ব অপেক্ষা নিজ সমস্যা লইয়াই বেশী উদ্বিগ্ন, ব্যস্ত'—সত্য কথা, কিন্তু ইহার কারণ কি তাহা বুঝা বা হৃদয়ঙ্গম করা আদরলালিতা এবং অনায়াস-জীবনে একান্ত অভ্যস্তা ধনীর দুলালী ইন্দিরার পক্ষে কোন ক্রমেই সম্ভব নহে। বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের বর্ত্তমান অবস্থা কি তাহা দিল্লীতে ৩০-বিঘা কম্পাউণ্ডের মধ্যে পিতার (সরকারী) প্রাসাদে পরম আরাম বিলাসে বসবাস এবং সর্ব্বোত্তম খানাপিনার আস্বাদ গ্রহণ করিয়া—দরিদ্র, প্রায়-অনাহারী এবং সর্ব্বপ্রকার অভাব-জর্জ্জরিত বাঙ্গলার ছাত্রছাত্রীদের দুঃখ-বেদনা কি, তাহা পিতার আদরিণী কন্যা যদি না বুঝেন, তাঁহাকে দোষ দিব না। কিন্তু যাহাদের কথা জানেন না, জানিবার প্রয়োজনও বোধ করেন না, তাহাদের প্রতি গালভরা আদর্শের কথা বর্ষণ না করিলেই বোধ হয় ভাল হইত। পিতাকে যাহা শোভা পায় (?) কন্যা উত্তরাধিকার সূত্রে তাহা সব সময় নাও পাইতে পারেন। ইন্দিরা একটা কথা মনে রাখিবেন—ছাত্রছাত্রীদের বাঁচিবার পক্ষে অতি সামান্য যতটুকু প্রয়োজন, সেইটুকু মাত্র পাওয়া বা সংগ্রহ করাই আজ তাহাদের পক্ষে ভীষণতম সমস্যার কারণ হইয়াছে। এবং এই সমস্যার সুরাহা না হইলে—দেশ এবং বিশ্ব সমস্যা লইয়া তাহাদের কিছু বলা একান্তই বেকুফের কাজ হইবে।

শ্রীমতী ইন্দিরার আলোচ্য ভাষণে অন্যান্য বড় বড় কথাগুলি সম্পর্কে কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই, কারণ রাজনীতি, বিজ্ঞান, আত্মপ্রত্যয়, আধ্যাত্মিকতা প্রভৃতি বিষয়ে কিছু বলার কোন অধিকার এই মহিলার নাই। যে বিদ্যা, বুদ্ধি এবং কিঞ্চিৎ পাণ্ডিত্য থাকিলে মানুষ এই সব বিষয়ে কথা বলিতে ভরসা করে—প্রিয়দর্শিনীর তাহার বিন্দুমাত্রও নাই। এই মহিলার ভাষণ সম্পর্কে এইটুকু মন্তব্যমাত্র করিব যে—যেথানে যাইতে বা সে-বিষয়ে কথা বলিতে বিজ্ঞজন সাহস করেন না, সেথানে যাইতে বা সে-বিষয়ে কথা বলিতে অজ্ঞ পণ্ডিতের কোন ভয় বা দ্বিধা হয় না—অর্থাৎ where Angels fear to tread·········rush in!

অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকদের দুর্ভাগ্য যে ইন্দিরা গান্ধীর ভাষণ মাথা নীচু করিয়া তাহাদের শুনিতে হইল। নিজে যে সদাচরণ, আত্মপ্রত্যয় এবং আধ্যাত্মিকতার কোন পরিচয় দান করেন নাই এবং যাহা নিজের মধ্যে নাই—সেইসব বিষয়ে বৃথা বাক্যব্যয় করিয়া নিরীহ ছাত্রসমাজকে উৎপীড়ন-অত্যাচার করার কোন অধিকারই ইন্দিরার নাই।

অপাঠ্য পাঠ্যপুস্তক

"পাঠ্যপুস্তকের পাল্লায় পড়িয়া কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ভুল বা বিকৃত তথ্য পরিবেশিত হইবে ইহা শুধু বিস্ময়জনক নহে, অত্যন্ত আপত্তিকর। কিছুদিন পূর্ব্বেই রবীন্দ্র-শতবার্ষিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। সেই উপলক্ষ্যে শিক্ষিত বাঙালীরা অল্পবিস্তর রবীন্দ্র-জীবনকথা ও সাহিত্য-চর্চ্চা করিয়াছেন, এরূপ আশা করা গিয়াছিল। কিন্তু পাঠ্যপুস্তকে নানা ভুল তথ্যের সমাবেশ দেখিয়া সে আশার মূল ক্রমশই শিথিল হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু মুশকিল এই যে এইরূপ পুস্তকের

কোন-কোনখানি পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত ব্যক্তিদের নামাঙ্কিত। তাঁহারা রবীন্দ্রচর্চ্চা করেন না, ইহা কোন-মতেই বিশ্বাস্য নহে। তবে এরূপ ভুল তথ্য পরিবেশনের রহস্য কি জানিতে ইচ্ছা হয়।"

'পাঠ্যপুস্তকে রবীন্দ্রচর্চ্চা' শীর্ষক এক পত্রে পত্রলেখক রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ভুল তথ্য সম্বলিত যে পুস্তকখানির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, এই পুস্তকে একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত-ব্যক্তির নামাঙ্কিত রহিয়াছে। 'জল পড়ে পাতা নড়ে' ইহা রবীন্দ্রনাথের রচনা ও প্রথম রচনা, এ তথ্য লেখক কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন? (গো-সার পূর্ণ উর্ব্বর মস্তিষ্ক হইতে)। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতিতে' লিখিয়াছেন—"তখন 'কর খল' প্রভৃতি বানানের তুফান কাটাইয়া কূল পাইয়াছি। সেদিন পড়িতেছি, 'জল পড়ে, পাতা নড়ে।' আমার জীবনে এইটেই আদিকবির প্রথম কবিতা।" ইহাই কি লেখকের এই গবেষণার উৎস? প্রথম জীবনে যদি মনে ভুল তথ্যের ছাপ পড়ে তবে পরবর্ত্তী জীবনে তাহা সহজে মুছিতে চায় না। শিশুদের ও তরুণদের সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনার কাজ সেই জন্যই এত দুরূহ ও দায়িত্বপূর্ণ। পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা (?) তাঁহাদের নাম ভাড়া খাটাইয়াই দায়িত্ব মুক্ত এবং প্রকাশকেরা অভিভাবকদের ট্যাঁক এবং ছাত্রদের মাথায় গাঁট্টা মারিয়াই সরিয়া পড়েন—কাজেই ছাত্রদের ভুল শিখাইবার দায়িত্ব কাহাকে দিব? সরকার বাহাদুর এ-রাজ্যের শিক্ষার ব্যাপারে অনথা এবং অযোগ্য মোড়লী করিতে ব্যস্ত, পাঠ্যপুস্তকগুলি পাঠ্য কি অপাঠ্য—তাহা বিচার করিবার সময় এবং যোগ্যতা রাজ্যের শিক্ষা অধিকর্ত্তাদের নাই। কিন্তু বছর বছর পাঠ্যপুস্তক বদলাইয়া রাজ্য শিক্ষা-বিভাগ প্রকাশকদের ট্যাঁক ভারি করিতে অতি উদার। প্রতি বৎসর নূতন নূতন পাঠ্যপুস্তকের মূল্য বাবদ ছাত্রপ্রতি ৫০।৬০ টাকা দরিদ্র অভিভাবক কোথা হইতে যোগাইবে সে-চিন্তা প্রজাপালক প্রকাশক-বন্ধু রাজ্য সরকারের থাকিবার কথা নহে—নাইও।

নিম্নে একটি অভিনব পাঠ্য (?) পুস্তকের কিছু পরিচয় দেখুন।

শ্রীসুনীলরঞ্জন রায়, পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জ্জিত 'প্রকৃতির কথা ও শরীর সভ্যতা' (?)—১৯৬২, নূতন সংস্করণ। পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকারের নব অনুমদিত সিলেবাসে দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ্য বলিয়া নির্ব্বাচিত। প্রকাশকের নাম ইচ্ছা করিয়াই দিলাম না! এই পুস্তকে গুটিকয়েক প্রশ্ন এবং তাহার উত্তর আছে। নমুনা দেখুন—

১। নাক কি বাতাস টানিয়া লয় ও কি বাতাস বাহির করে?

উত্তর—নাক বিশুদ্ধ বাতাস (অক্সিজেন) টানিয়া লয় এবং দূষিত বাতাস (নাইট্রোজেন বাহির করে)'।

২। সরীসৃপ কাহাকে বলে?

উত্তর—যাহারা ফুসফুস দিয়া শ্বাস লয় ও বুকে ভর দিয়া চলে তাহাদের সরীসৃপ বলে।

৩। কোন বন্যপশুর সিং আছে?

উত্তর—বন্যপশুদের মধ্যে হরিণের সিং আছে।

৪। পাখীদের ডিম হয় কেন?

উত্তর—পাখীরা গিলিয়া খায় বলিয়া উহাদের ডিম হয়।

৫। কি ভাবে তারা চেনা যায়?

উত্তর—রাতে আকাশের গায়ে যে রাশি রাশি মিটমিটে আলো ছুটাছুটি করে ঐগুলি হইল তারা বা নক্ষত্র।

আর কোন মন্তব্য করার প্রয়োজন আছে কি? এই প্রকার পাঠ্য (?) পুস্তক কেমন করিয়া, কোন্ গুণে, কোন্ বিচিত্র কারণে এবং পথে সরকারী স্বীকৃতি লাভ করে তাহার রহস্য কিছু জানা আছে—ভবিষ্যতে প্রকাশ করা যাইবে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, আড়াই হাজারী বেতনভোগী ডি. পি. আই এবং বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ কি অন্ধ? অল্পবয়স্ক ছাত্রছাত্রীদের উপর এই অপাঠ্য পাঠ্যপুস্তকের পরিহাস আর কতদিন চলিবে?

পাঠ্যপুস্তকে আসামকে চীনের অন্তর্গত দেশ বলিয়া যে পণ্ডিত বর্ণনা করেন—তাঁহাকে 'ভারতরত্ন' খেতাব, আর না হয় আলিপুর জেলে নির্জ্জন সেলে বসবাস ব্যবস্থা দিয়া চিন্তা এবং চিত্তশুদ্ধির অবকাশ দেওয়া প্রয়োজন। যাহারা অপাঠ্য-পাঠ্যপুস্তক লিখিয়া, যে-সব পণ্ডিত এই সব পাঠ্য-পুস্তকে তাঁহাদের নাম ভাড়া (প্রণেতা হিসাবে) দেন এবং যে-সকল অর্ব্বাচীন প্রকাশক এই অপরাধজনক ছাত্রমার এবং অভিভাবক বধ ব্যবসা চালাইতেছেন—তাহাদের বিরুদ্ধে কি আদালতে কোন মামলা দায়ের করা যায় না? সরকার বাহাদুর লোকের কল্যাণে বহুৎ ভাল ভাল কাজ করেন—কল্যাণমূলক বহু পরিকল্পনা লইয়া ব্যস্ত আছেন, "পাঠ্যপুস্তক

নির্ব্বাচন" নামক ছোট কাজটা তাঁহারা ছাড়িয়া দিলে বোধহয় দেশের কোন অকল্যাণ হইবে না। শিক্ষার নামে নিরীহ শিশুপাল বধ এবার বন্ধ করিবার সময় উপস্থিত। ইহা যদি না হয় তাহা হইলে যাহাদের মাথায় পুস্তক-প্রণেতা, প্রকাশক এবং রাজ্য সরকারের শিক্ষা বিভাগ কাঁচা-কাঁঠাল পরমানন্দে ভাঙ্গিতেছেন, সেই উপদ্রুত সর্ব্বসাধারণকেই হয়ত শেষ পর্য্যন্ত মাথায় যাহাতে আর কাঁঠাল না ভাঙ্গে সেই পথই লইতে হইবে।

সরকারবিরোধী দলে বিদ্বান এবং পণ্ডিত ব্যক্তির সংখ্যা একেবারে কম নহে, কই, তাঁহাদের কাহাকেও ত অপাঠ্য পাঠ্যপুস্তক লইয়া বিধানসভায় তেমন কোন প্রতিবাদ করিতে দেখি না। খাদ্য সমস্যা লইয়া বিরোধী সদস্যগণ সরকার বাহাদুরকে বিবিধপ্রকারে নাস্তানাবুদ করেন, কিন্তু দেশের ভবিষ্যৎ, আজকের ছাত্রছাত্রীদের অপাঠ্য পাঠ্যপুস্তকের মারফত যে বিষময় এবং গভীর অকল্যাণকর কু-শিক্ষা দেওয়া হইতেছে বছরের পর বছর—তাহার বিষয়ে এই সদস্যেরা নিস্তব্ধ এমন কেন? সদস্যদের মধ্যে শিক্ষক সদস্যও কেহ কেহ আছেন, জানি না তাঁহাদের মধ্যে কেহ পাঠ্যপুস্তক লেখেন কিংবা প্রণেতা হিসাবে পাঠ্যপুস্তকে ছাপার জন্য নাম ভাড়া দেন কি না। এ-প্রশ্নের কোন জবাব পাইব না জানি।

বীরের হুঙ্কার

প্রধানমন্ত্রী ভারতের যেখানে যাহা কিছু বলেন—তাহা সমগ্র ভারত অ্যাণ্ড কোং আন্‌লিমিটেডের সোল এজেণ্ট হিসাবেই বলেন। কাজেই তাঁহার ভাষণ সম্পর্কে পশ্চিম-বঙ্গ নামক কলোনীরও নিশ্চয় কিছু বলার অধিকার এবং যোগ্যতাও আছে। কিছুদিন পূর্ব্বে কেন্দ্রীয় সরকার এ্যাণ্ড কোং লিঃ-এর সোল এজেন্ট নেহরু বোম্বাই শহরে (পারতপক্ষে তিনি গ্রাম বা পাড়াগাঁয়ে পদার্পণ করেন না, —বিবিধ কারণে) ঘোষণা করেন: "চীন ভারতের কোন অঞ্চল স্থায়ীভাবে দখল করিয়া রাখিবে, ভারত (অর্থাৎ নেহরু) তাহা সহ্য করিবে না। বিদেশী রাষ্ট্র কর্ত্তৃক দেশের কোন অঞ্চল দখল হইতেছে দেখিয়াও যাহারা নিষ্ক্রিয় থাকে (এ-সংবাদ দুই-তিন বছর চাপিয়া রাখিলে দোষ হয় না!) তাহারা কাপুরুষ!"

কিন্তু বেদখল অঞ্চল চীনাদের হাত হইতে আর কতদিন পরে উদ্ধার করা হইবে, তাহা শ্রী নেহরু প্রকাশ করেন নাই। চীনারা আজ প্রায় ৩।৪ বছর হইল ভারতের বিশেষ কয়েকটি অঞ্চলে বেশ ঘরসংসার গুছাইয়া বসিয়াছে এবং যত দিন যাইতেছে চীনাদের বেদখল ততই পাকাপোক্ত হইবার সম্ভাবনা বাড়িতেছে। কাজেই চীনাদের কেবল বাক্যবাণেই ঘায়েল করিবার চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া এবার কার্য্যকর পন্থা প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রী কবে তাহা করিবেন?

প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিবার আছে। জোর করিয়া অন্য রাষ্ট্রকে ভারতের কোন অঞ্চল দখল করিতে দেওয়া হইবে না—ইহা খুব ন্যায্য এবং উত্তম ঘোষণা। কিন্তু কোন একজনের খেয়াল-খুশীমত ভারত রাষ্ট্রেরই অঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গের অঞ্চলবিশেষ অন্য রাষ্ট্রকে উপহার দান সম্পর্কে নেহরুর মত কি? বেরুবাড়ী কাটিয়া অর্দ্ধেক পাকিস্তানকে ভেট দেওয়া কেন হইল এবং কোন্ ক্ষমতাবলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী এ-দুষ্কার্য্য করিলেন? আমরা একদা ন্যায়নিষ্ঠ এবং বীর স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রীজবাহরলাল নেহরুর নিকট হইতে এ-প্রশ্নের জবাব প্রার্থনা করিতেছি।

ভারতের যেখানে যত কিছু কল-কারখানা, কনফারেন্স, বিজ্ঞ সম্মেলন—ইত্যাদি সব কিছু উদ্বোধন করিতে প্রধানমন্ত্রী অহরহ আকাশ-যানে উড়িয়া যাইতেছেন এবং যাহার কারণে ভারতের দরিদ্রজনের লক্ষ লক্ষ টাকা অপচয় হইতেছে—(সম্প্রতি রাঁচিতেই প্রধানমন্ত্রীর সম্বর্দ্ধনার কারণে সরকার ৫ লক্ষ টাকা খরচ করিয়াছেন)। ভারতের অডিটর জেনারেল এ-বিষয় কি বলিবেন? আমরা জানিতে চাহি প্রধানমন্ত্রী এ-ভাবে তাঁহার দায়িত্বপূর্ণ কাজ (এবং যে-কাজের জন্য তিনি যথেষ্ট পয়সা এবং অন্যান্য বহু সুখ-সুবিধা ভোগ করেন) ছাড়িয়া করদাতাদের অর্থ শ্রাদ্ধ করিয়া আকাশ-বিহার করিতে পারেন কি?

আর্থিক

শ্রীচিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

পণ্যমূল্যের গতি, জাতীয় আয় এবং টাকার সরবরাহ

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাপর্বের শেষে জাতীয় আয় প্রায় ৩৪,০০০ কোটি টাকা এবং মাথাপিছু গড় আয় ৫৩০ টাকায় দাঁড়াবে এই রকম অনুমান করা হয়েছে। এই আয় বৃদ্ধির কতখানি অংশ অনিবার্য মূল্যবৃদ্ধির দরুণ কার্যতঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হবে তার সঠিক হিসাব করা সম্ভব না হ'লেও পরিকল্পনার বিভিন্ন খাতে খরচ বাড়বার ফলে প্রথম কিছুকাল টাকার ক্রয়-ক্ষমতা যে হ্রাস পাবে, সে কথা মেনে নিতে হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদী কাজগুলি শেষ হবার পর সুদূর ভবিষ্যতে দেশের উৎপাদিকাশক্তি বাড়বে এবং তারপর মূল্যমান নিম্নগামী হবে অথবা স্থির থাকবে, এই সম্ভাবনার কথা পরিকল্পনা-বিশারদরা অন্যান্য দেশের পণ্যমূল্যের গতি এবং মূলধন এবং মূলধন সৃষ্টির ইতিহাস বিশ্লেষণ করে ব্যক্ত করেছেন।

চাহিদা ও সরবরাহের প্রতিক্রিয়া, মূলধন বিনিয়োগের হার এবং তার প্রকৃতি, অথবা টাকার সরবরাহ, এর কোনটির প্রভাবে গড় মূল্যমান বা কোন বিশেষ পণ্যের মূল্য ওঠানামা করে, এই নিয়ে বিশেষজ্ঞ মহলে যতকাল ধ'রে আলোচনা ও বিশ্লেষণ চলেছে তার মধ্যে লড়াই-এর প্রভাবজনিত মুদ্রাস্ফীতি এবং সোনা-রূপার পরিবর্তে কাগজের টাকা আর ব্যাঙ্ক চেক্-এর প্রচলনের ধারায় আমূল পরিবর্তনের ফলে অতীতের অনেক মতবাদ যেমন অচল হয়ে যাচ্ছে, তেমনি মূল্যমানের ভবিষ্যৎ গতি নির্দ্ধারণের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে যুক্তি দেখাবার কাজে অতীতের মূল্যগতি বিচার করার সার্থকতাও আর তত পরিমাণে বলবৎ থাকছে না।—Price mechanism-এর মূলনীতি স্বীকৃত হলেও সরকারী আয়ব্যয়ের এলাকা বিস্তার এবং স্বাধীন ব্যবসায়ের বিভিন্ন দিকে সরকারী হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উত্তরোত্তর বৃদ্ধির ফলেও অতীত কালের নিদর্শন কার্যকরী হওয়ার সম্ভাবনা কম। প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাপর্বে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার, টাকার সরবরাহ, পণ্য উৎপাদন, সরকারী আয়ব্যয় প্রভৃতি বিভিন্ন তথ্য বিচার করে আগামী দিনের দীর্ঘতর কালের মূল্যমানের ধারা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নয়; যুদ্ধকালীন মুদ্রাস্ফীতি যখন পুরোমাত্রায় আমাদের দেশে বর্তমান এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ে বিদেশের মূল্যমানের প্রভাব আমাদের অর্থ নৈতিক কাঠামোর ওপর বিরাজমান, সেই সন্ধিক্ষণে আমাদের উন্নয়নমূলক কাজের জন্যই ঘাটতি বাজেট বা "ডেফিসিট ফাইনান্স"-এর সাহায্য নিতে হয়েছে; জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খাদ্য উৎপাদনের হারকে অতিক্রম করার সম্ভাবনা থাকাতে ক্রমাগত বিদেশী খাদ্য আমদানী করতে হচ্ছে; আভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক বিবিধ সমস্যার চাপে জর্জরিত হয়ে পরিকল্পনা-বিশারদদের কখনও জোর দিতে হয়েছে কৃষিনির্ভর উন্নয়ন ব্যবস্থার দিকে, কখনও ভারী শিল্প বা ভোগ্যবস্তুর উৎপাদনব্যবস্থার দিকে; অথবা এই ত্রিধারার মধ্যে উপযুক্ত ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার দুরূহ কাজে ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের চাহিদার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানে অপারগ হয়ে Private Sector-এর যেদিকে ঝোঁক গেছে সেই দিকে মোড় ঘোরাতে হয়েছে; এরই সম্মিলিত ফল কি ভাবে আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ মূল্যমানের ওপর প্রতিফলিত হবে সেকথা বলবার সময় বোধ হয় এখও আসে নি!

ভারতবর্ষে গত একশ' বছরে দেশের এবং বিদেশের নানান প্রভাবে মূল্যমান অনেকবার ওঠানামা করেছে১, তবে মোটের ওপর দেখা যায় যে, অন্যান্য প্রায় সব দেশের মতই আমাদের দেশেও টাকার ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। ১৯৬৩ সালের ইকনমিক উইকলীর বিশেষ সংখ্যায় (জুলাই) প্রকাশিত এক প্রবন্ধে দেখান হয়েছে, ১৯৫২-৫৩কে ১০০ ধরলে ১৮৮৬-৯০এর মূল্যমান ছিল মাত্র ১৮·৬%; পরবর্তী পর্বের মূল্যমান এখানে উদ্ধৃত করছি।

---

(১) ১৮৬১ থেকে ১৮৬৬ পর্যন্ত আমেরিকার গৃহযুদ্ধের দরুন তুলার ঘাটতি হবার ফলে ভারতবর্ষে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকে; ১৮৬৬ থেকে ১৮৮৩র মধ্যে পৃথিবীব্যাপী মূল্যহ্রাসের প্রভাবে ভারতের পণ্যমূল্যও কমতে থাকে; ১৮৮৩ থেকে ১৮৯৩-এর মধ্যে টাকার বহির্মূল্য হ্রাস হবার ফলে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পায়; ১৮৯৩-৯৯-এর মধ্যে নতুন টাকা তৈরীর কাজে বিশৃঙ্খলার জন্য দাম কমতে থাকে; এই শতাব্দীর সুরু থেকে প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত, খাদ্যউৎপাদন হ্রাস, বহির্বাণিজ্যে ভারতীয় কৃষিপণ্যের চাহিদাবৃদ্ধি, কাগজের নোট ও চেক ব্যবহারের প্রসার ইত্যাদি কারণে মূল্যবৃদ্ধি এবং দুই যুদ্ধের অন্তর্বর্তীপর্বে বহির্জগতের ব্যবসা মন্দার প্রভাব ও অন্যান্য আভ্যন্তরীণ কারণে মূল্যের গতি নিম্নগামী হয়।

১৮৯১-১৮৯৫	২০·৮	১৯১৯-২৫	৪৪·৮	১৯৪৭	৭৮
১৮৯৬-১৯০২	২২·৪	১৯২৬-৩০	৪০·০	১৯৪৮-৪৯	৯৮
১৯০৩-১৯০৭	২৩·৬	১৯৩১-৩৫	২৪·৪	১৯৫০-৫২	১১২·৩
১৯০৮-১৯১২	২৭·৪	১৯৩৬-৪১	২৯·২	১৯৫৩-৫৬	৯৯·৪
১৯১৩-১৯১৮	৩১·৮	১৯৪২-৪৩	৫০·০	১৯৫৭-৫৮	১০৯·৮
		১৯৪৪-৪৬	৬৬·৭		

*　　*　　*

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজ সুরু করার পূর্বে দেশের মুল্যমান বিচার করা হ'ত ১৯৩৯ সালের দামের সঙ্গে তুলনা করে; দুই যুদ্ধের অন্তর্বর্তী বিশ্বব্যাপী মন্দার ঢেউ আমাদের অর্থনীতিকে কিভাবে প্রভাবিত করেছিল, সে প্রশ্ন এযুগে প্রায় অবান্তর হলেও অনুধাবনযোগ্য। প্রথম মহাযুদ্ধের সুরুতে যে মুল্যমান ছিল, তারই সঙ্গে তুলনা করে আমাদের দেশের পরবর্তী মুল্যমান কি রকম ছিল সেটি নিম্নলিখিত তালিকা থেকে লক্ষ্য করা যাবে২ :

একক ভাবে বেড়ে চলতে পারে না, অপরাপর মুল্যকে এক সময়ে প্রভাবান্বিত করবেই। একদল বিশেষজ্ঞ বলেন, যুদ্ধের সময়ে প্রথমে খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধি পায় আর তারপর তারই জেরে শিল্পদ্রব্যের মূল্য অনিবার্যভাবে বাড়ে, এখন সেই দুষ্টচক্রের প্রভাব থামাতে হ'লে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি রোধ সর্বাগ্রে প্রয়োজন। অপর একদল বলেন, শিল্পপতিরা যে হারে পণ্যের দাম বাড়াচ্ছেন তার সঙ্গে খাদ্যশস্য বা কৃষিজ পণ্য পাল্লা দিয়ে পারছে না; সর্বাগ্রে শিল্পপণ্যের

কলকাতার বাজারে পাইকারী মূল্য

(১৯১৪ জুলাই=১০০)

	১৯৩৯	১৯৪৭	১৯৫১	১৯৫৬	১৯৬০
মোট পণ্যাদির গড়	১০৮	৩৮২	৫৪১	৪৩৯	৫৩৬
খাদ্যশস্যাদি	৮৬	২৪২	৪১৪	৩৪৭	৪৩৫
চিনি	১৬৪	৪৯০	৫১৮	৩৫৮	৪৭৪
অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য	১২৫	৬১১	৯২৬	৮২২	১,০৬৬
সরিষার তেল	৮১	৩৪৪	৩৯৭	৩৭৯	৩৭৯
ধাতব দ্রব্যাদি	১৪৭	২০৫	৩২৬	৪০৯	৪৪৩
অন্যান্য কাঁচামাল প্রভৃতি	৯২	৩৭৭	৪৯৮	৩৫৬	৫০৫

বিভিন্ন বছরে কৃষিজ পণ্য, বা তারই মধ্যে খাদ্যশস্যের দাম, আর অপর দিকে ধাতব দ্রব্য কিংবা অন্যান্য পণ্যের দাম বিভিন্ন গতিতে এগিয়েছে। চাহিদা-সরবরাহের তারতম্য অনুযায়ী মুদ্রাস্ফীতি ও অন্যান্য কারণের প্রভাব ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এক-একটি পণ্যের উপর প্রতিফলিত হয়েছে। কোন একটি বিশেষ পণ্য বা কোন গোত্রের কয়েকটি পণ্যের মূল্য মুদ্রাস্ফীতি বা সরবরাহের ঘাটতির ফলে

মূল্যবৃদ্ধি রোধ করা দরকার। পরিকল্পনাপর্বের দশ বছরে কোন্ শ্রেণীর পণ্যের মূল্য কি হারে বেড়েছে, তা দেখবার আগে ১৯২৯এর থেকে পণ্যমুল্য কি ভাবে ওঠানামা করেছে দেখা দরকার :

কৃষিজ পণ্যের মুল্যমান

(১৯২৯=১০০)

	খাদ্যশস্য	তৈলবীজ	পাট	তুলা
১৯৩০	৮০	৮১·৩	৬৬·৩	৬২·৩
১৯৩১	৬২·৪	৫২·৯	৫১·৫	৫৬·৮
১৯৩২	৫৪·৪	৪৯·০	৪৭·৩	৬৩·০
১৯৩৩	৫২·৮	৪৭·৭	৪৩·২	৫৪·৮
১৯৩৯	৬৮·৮	৬৮·৩	৮৪·২	৫১·৩

(২) ১৯০১-এ ভারতের জন সংখ্যা ছিল ২৩·৮৪ কোটি, ১৯১১তে ২৫·২২ কোটি (দশবছরে বৃদ্ধির হার ১·৩৮ শতাংশ); ১৯২১-এ ২৫·১৪ কোটি, ১৯৩১এ ২৭·৯১ কোটি, ১৯৪১এ ৩১·৬৮ কোটি। ১৯১৪ সালে মোট নোট-এর পরিমাণ ছিল ৬৬·১২ কোটি টাকা (অর্থাৎ মাথাপিছু 'নোট' সরবরাহ মাত্র আড়াই টাকার মত); এর জন্য সোনা-রূপা মজুত ছিল-প্রায় ৫২ কোটি টাকা ; ১৯১৮তে মোট 'নোট'-এর পরিমাণ দাঁড়াল ৯৯·৭৯ কোটি টাকায় (সোনা-রূপা মজুদ-এর পরিমাণ দাঁড়াল মাত্র ৩৮·৩ কোটি টাকায়)।

গড় মূল্যমান ভারত ও অন্যান্য দেশ

(১৯২৯=১০০)

ভারতবর্ষ	ইংল্যাণ্ড	আমেরিকা	জাপান
৮২	৮৮	৯১	৮২
৬৮	৭৮	৭৭	৭০
৬৫	৭৬	৬৮	৭৭
৬২	৭৬	৬৯	৯১
৭৭	৯১	৮১	১৪০

আমদানী-রপ্তানীর ক্ষেত্রে ঐ পর্বেই ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের মূল্যমান কি রকম ছিল তা নিম্নলিখিত তালিকা থেকে পাওয়া যাবে :

	রপ্তানী দ্রব্য	আমদানী দ্রব্য
	(১৯২৯=১০০)	
১৯৩০	৮১.৯	৯২.৩
১৯৩১	৫৭.৯	৭৮.৮
১৯৩২	৫৫.৫	৮১.৯
১৯৩৩	৫৪.৬	৭৫.৩
১৯৩৯	৬১.৫	৮০.৫

উপরিউক্ত তিনটি তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের (যার মধ্যে কৃষিজ পণ্যই প্রধান) মূল্য ১৯৩৯ সালে ১৯২৯-এর তুলনায় অনেক কম ছিল এবং অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্যেও ভারতবর্ষকে অপেক্ষাকৃত বেশী মূল্য দিতে হয়েছে। (সম্প্রতি FAO থেকে যে তথ্যাদি প্রকাশ করা হয়েছে তাতেও দেখা যাচ্ছে, দ্বিতীয় যুদ্ধ-পূর্ব বৎসরের তুলনায় ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য 'অনুন্নত' দেশগুলি তাদের রপ্তানীযোগ্য পণ্যে এখনও অপেক্ষাকৃত কম মূল্যই পাচ্ছে ; এ বিষয়ে কয় মাস পূর্বে আলোচনা করেছি।)

যুদ্ধের মধ্যে মুদ্রাস্ফীতি এবং মূল্যবৃদ্ধির গতি লক্ষ্য করা যায় নিম্নের ক-চিহ্নিত তালিকা থেকে।

মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব কি হারে কোন্ শ্রেণীর পণ্যের উপর পড়ল তা' এই তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে ; এর পর যুদ্ধ-বিরতির শেষে আমাদের পণ্যমূল্য বৃদ্ধির গতি কোন্ পথে চলল, সেই তথ্যের উল্লেখ করছি খ-চিহ্নিত তালিকায়।

দেখা যাচ্ছে, কৃষিজ পণ্যের মূল্য এই তিন বছরে অপেক্ষাকৃত বেশি হারে বেড়েছে (অবশ্য এর ফলে যে কৃষকগোষ্ঠীই সম্পূর্ণরূপে লাভবান্ হয়েছে সে কথা বলা চলে না)। এর পরবর্তী দশ বছরের মূল্যবৃদ্ধির গতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, শিল্পদ্রব্য এবং শিল্পে ব্যবহার্য কাঁচামাল-এর মূল্য অপেক্ষাকৃত বেশি হারে বেড়েছে (গ-চিহ্নিত তালিকা) :

মূল্যমান (১৯৩৯ আগষ্ট=১০০)

(ক)	নোট-এর পরিমাণ (কোটি টাকা)	চাল	খাদ্য ও তামাক	কাঁচামাল	শিল্পদ্রব্য	গড়
১৯৩৯ আগষ্ট	১৭০.২৯ (১০০)	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০
১৯৪০ জানুয়ারী	২২৬.৩৫ (১৩৩)	১১০	১২২	১২৬	১৪১	১৩৩.২
১৯৪১ জানুয়ারী	১৩০.২০ (১৩৫)	১৪১	১০৭	১২৬	১২২	১১৫
১৯৪২ জানুয়ারী	৩২৮.৩৯ (১৯৩)	১৫১	১৩১	১৫৮	১৬১	১৪৫
১৯৪৩ জানুয়ারী	৫৮৭.৬০ (৩৪৫)	২১৮	১৯১	১৭১	২২৪	১৯৫
১৯৪৩ জুলাই	৭৩৭.০০ (৪৩০)	৯৫১	৩০৩	১৭৮	২৫৭	২৪২
১৯৪৩ সেপ্টেম্বর	৭৫৯.৭৫ (৪৪৬)	৮৪৭	২৯৯	১৮১	২৫১	২৩৬.৩

(খ) (মূল্যসূচক : ১৯৩৯=১০০)	(১) ১৯৪৫-৪৬	(২) ১৯৪৬-৪৭	(৩) ২ এবং ১ এর অনুপাত	(৪) ১৯৪৭-৪৮	(৫) ৪ এবং ২ এর অনুপাত
কৃষিজ পণ্যাদি	২৭২.৬	৩১৩.৮	+১৫.১	৩৫৬.৯	+১৩.৭
শিল্প পণ্যাদি	২৪০.০	২৫৯.১	+ ৮.০	২৮৭.৮	+১১.১
গড়	২৪৪.৯	২৭৫.৪	+১২.৬	৩০৭.০	+১১.৫

(গ) ১৯৪৭-৪৮ থেকে ১৯৫৬-৫৭ পর্যন্ত মূল্য পরিবর্তনের ধারা

(১৯৩৯=১০০)

	(১) খাদ্যদ্রব্যাদি	(২) বাৎসরিক হ্রাস বা বৃদ্ধির হার	(৩) শিল্পের কাঁচামাল	(৪) বাৎসরিক হ্রাস বৃদ্ধির হার	(৫) শিল্প দ্রব্যাদি	(৬) বাৎসরিক হ্রাস বৃদ্ধির হার	(৭) গড় মূল্য	(৮) বাৎসরিক হ্রাস বৃদ্ধির হার
১৯৪৭-৪৮	৩০৬'১	—	৩৭৭'৫	—	২৮৬'৪	—	৩০৮'২	—
১৯৪৮-৪৯	৩৮২'৯	+ ২৫'১	৪৪৪'৮	+ ১৭'৮	৩৪৬'১	+ ২০'৮	৩৭৬'২	+ ২২'১
১৯৪৯-৫০	৩৯১'৩	+ ২'২	৪৭১'৭	+ ৬'০	৩৪৭'২	+ ০'৩	৩৮৫'৪	+ ২'৪
১৯৫০-৫১	৪১৬'৪	+ ৬'৪	৫২৩'১	+ ১০'৯	৩৫৪'২	+ ২'০	৪০৯'৭	+ ৬'৩
১৯৫১-৫২	৩৯৮'৬	— ৪'৩	৫৯১'৯	+ ১৩'২	৪০১'৫	+ ১৩'৪	৪৩৪'৬	+ ৬'১
১৯৫২-৫৩	৩৫৭'৮	— ১০'২	৪৩৬'৯	— ২৬'২	৩৭১'২	— ৭'৬	৩৮০'৬	— ১২'৪
১৯৫৩-৫৪	৩৮৪'৪	+ ৭'৪	৪৬৭'৭	+ ৭'১	৩৬৭'৪	— ১'১	৩৯৭'৫	+ ৪'৪
১৯৫৪-৫৫	৩৩৯'৮	— ১১'৬	৪৩৬'২	— ৬'৯	৩৭৭'৩	+ ২'৭	৩৭৭'৪	— ৫'১
১৯৫৫-৫৬	৩১৩'২	— ৭'৮	৪১৯'৭	— ৩'৮	৩৭২'৯	— ১'২	৩৬০'৪	— ৪'৫
১৯৫৬-৫৭	৩৮৮'৫	+ ২৪'০	৫০৭'০	+ ২০'৮	৩৮৪'৬	+ ৩'১	৪১৪'০	+ ১৪'৯
দশ বৎসরের হ্রাস/বৃদ্ধি	—	+ ২৬'৯২	—	+ ৩৪'৩০	—	+ ৩৪'২৮	—	+ ৩৪'৩২

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সুরু করার পূর্বের কয় বছর নিয়ে উপরোক্ত দশ বছরের মধ্যে মূল্যমানের উত্থান-পতন বিচিত্র গতিতে চলেছে, কোন বছরে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য এগিয়ে গেছে, কোন বছরে অন্যান্য গোত্রের মূল্য আরও এগিয়ে গেছে, কখনও খাদ্যশস্যের মূল্য পড়ে গেছে, অন্যান্য মূল্যবৃদ্ধি পেয়েছে ; সর্বসাকুল্যে দেখা যাচ্ছে, খাদ্যদ্রব্যাদির মূল্য যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্যান্য মূল্য তার থেকে বেশি হারেই বেড়েছে। অতঃপর আমরা প্রথম দুইটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাপর্বের প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি স্বতন্ত্র তালিকাতে বিশদ ভাবে উল্লেখ করছি। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নোট ও ব্যাঙ্ক-এর চলতি আমানত সহ মোট টাকার (net money supply) পরিমাণ, স্থায়ী আমানত ও অন্যান্য তহবিল বা quasi money সহ মোট টাকার (gross money supply) পরিমাণ, কৃষি ও শিল্পপণ্য উৎপাদনের হার, মাথাপিছু খাদ্যশস্য সরবরাহ, ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে পণ্যদ্রব্যের মূল্য হ্রাস বা বৃদ্ধির বিচিত্র গতি ঐ তালিকায় লক্ষ্য করা যাবে। সরকারী ব্যয়ের হার বাড়ছে ; ভবিষ্যতে আরও বাড়াতে হবে ; সেই সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের হার বাড়ছে ; আর তারই সঙ্গে মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে তিল তিল করে। মিশ্র অর্থনীতির কাঠামোর মধ্যে চলতে হ'লে Price mechanism থাকবে ; তার সম্পূর্ণ প্রভাব খর্ব করার জন্য সরকারকে একাধারে monetary, fiscal এবং administrative measures গ্রহণ করতে হচ্ছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মূল্যবৃদ্ধির প্রভাবও আমাদের অর্থ নৈতিক কাঠামোর ওপর অনিবার্য ভাবে পড়ছে ; অন্যান্য দেশের মতই আমাদের দেশেও মূল্যবৃদ্ধির গতি সম্পূর্ণ রোধ করা একক ভাবে সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু রাজস্ব-নীতিতে, অথবা টাকার সরবরাহ বিষয়ে কিংবা নিছক প্রশাসনিক ব্যবস্থায় সম্ভবতঃ কিছু ত্রুটি বা দ্বিধাগ্রস্তভাব থেকে যাচ্ছে, যার ফলে মূল্যবৃদ্ধির হার সকলেরই উদ্বেগের কারণ ঘটিয়েছে। Deficit financing করতে হবে—এই নীতি অনেক চিন্তার পর গ্রহণ করা হয়েছে, কিন্তু অনেকের মতে এর প্রভাব সামগ্রিক ভাবে ভাল হয় নি। কিন্তু এ ছাড়া অন্য পথ কি আর থাকতে পারে ? উন্নয়নমূলক কাজে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিকল্পনা অনুযায়ী কতকগুলি খরচ ত করতেই হবে, তার সাময়িক ফল কিছুটা ক্ষতিকর হলেও।

এর বিকল্প ব্যবস্থা যদি এই দাঁড়ায় যে সরকারী ব্যয় কম হারে করা হবে, তা হ'লে আখেরে ফল পেতে বিলম্ব হবে। কিন্তু মূল্যবৃদ্ধি যতটা হচ্ছে, তার সবটাই কি সঙ্গত কারণে হচ্ছে? প্রশাসনিক শৈথিল্য বা অমিতব্যয়িতা, কিংবা দীর্ঘমেয়াদী কাজে ব্যয়ের সঙ্গে অবিলম্বে ফল পাওয়া যায়, এ রকম কাজে ব্যয় করার মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য, এরই ফলে কি মূল্যবৃদ্ধি অপ্রত্যাশিত হারে হচ্ছে? মুদ্রাস্ফীতির সমস্ত প্রভাব নিয়ে আমরা পরিকল্পনার কাজ সুরু করেছি, তারপর উন্নয়নমূলক কাজের জন্যই deficit finance করেছি; PL 480 খাতে এমন হারে দান বা ঋণ গ্রহণ করছি যে দেখা যাচ্ছে ভারতের মোট নোট সরবরাহের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ হচ্ছে আমেরিকার ভারতে সঞ্চিত PL 480 ফাণ্ড-এর সমতুল্য; রপ্তানী-বাণিজ্য আশানুরূপ বাড়ছে না, অথচ আমদানী উত্তরোত্তর বাড়ছে; একদল লোকের অতিরিক্ত লোভ বাড়াতে মুনাফার হারও উর্দ্ধমুখী; প্রত্যক্ষ ট্যাক্স যতটা আদায় করার কথা তার সবটা আদায় না হওয়াতে Black moneyর অবাধ ব্যবহার ও মূল্যমানের ওপর তার প্রতিক্রিয়া; এই সব কিছুর প্রভাব কাটিয়ে অদূর-ভবিষ্যতে আমরা কি দেশের মূল্যমান স্থির রাখতে পারব? আর তা যদি না পারি তা হ'লে কবে এবং কি ধরণের পরিবর্তন ঘটলে স্থিতিশীল মূল্যমান আশা করব? বর্তমান প্রবন্ধে প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাপর্বের প্রাসঙ্গিক তথ্য উপস্থিত করেছি, আগামী সংখ্যায় এই তালিকার বিভিন্ন তথ্য নিয়ে কিছু আলোচনা করা হবে।

(দ্রঃ সংলগ্ন তালিকা)

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনা পর্বের কয়েকটি তথ্য : টাকার পরিমাণ : উৎপাদন হার ও মূল্যমান

	১৯৫১-৫২	১৯৫২-৫৩	১৯৫৩-৫৪	১৯৫৪-৫৫	১৯৫৫-৫৬	১৯৫৬-৫৭	১৯৫৭-৫৮	১৯৫৮-৫৯	১৯৫৯-৬০	১৯৬০-৬১
(১) জনসংখ্যা (কোটি)	৩৬·৯৬	৩৭·৬১	৩৮·৩০	৩৯·০২	৩৯·৭৮	৪০·৫৯	৪১·৪৩	৪২·৩৩	৪৩·২৭	৪৩·৯২
১৯৫০-৫১=১০০	(১০১·১)	(১০৩·৫)	(১০৫·৫)	(১০৭·৩)	(১০৯·৪)	(১১১·৭)	(১১৩·৯)	(১১৬·৪)	(১১৯·০)	(১২১·৫)
(২) টাকার সরবরাহ* (Net money supply) কোটি টাকা	১৮৭৫	১৭৫৪	১৭৬৭	১৮৫২	২০৫২	২২২৬	২৩৩৮	২৩৯৯	২৫৫৬	২৭৩০
	(১০০·৬)	(৯৪·১)	(৯৪·৮)	(৯৯·৪)	(১১০·১)	(১১৯·৪)	(১২৫·৪)	(১২৮·৭)	(১৩৭·১)	(১৪৬·৫)
(৩) মোট টাকার সরবরাহ* (Gross money supply) কোটি টাকা	২৫৪৬	২৪১৭	২৪৫৩	২৫৭৫	২৮৪৬	৩০৬১	৩২৪৪	৩৪৮১	৩৮৪৯	৪২৮৯
	(১০৩·০)	(৯৭·৮)	(৯৯·৩)	(১০৪·২)	(১১৫·২)	(১২৩·৯)	(১৩১·৩)	(১৪০·৯)	(১৫৫·৮)	(১৭৩·৬)
(৪) মাথাপিছু টাকার সরবরাহ (ক) 'নেট' সরবরাহ (টাকা)	৫০·৭৩	৪৬·৬৩	৪৬·১৩	৪৭·৪৬	৫১·৫৮	৫৪·৮৪	৫৬·৪৩	৫৬·৬৭	৫৯·০৭	৬২·১৯
	(৯৮·৯)	(৯০·৯)	(৮৯·৯)	(৯২·৬)	(১০০·৬)	(১০৬·৯)	(১১০·)	(১১০·৫)	(১১৫·৯)	(১২১·৩)
(খ) 'গ্রস' সরবরাহ (টাকা)	৬৮·৮৮	৬৪·২৬	৬৪·০৪	৬৬·০০	৭১·৫৪	৭৫·৪১	৭৮·৩০	৮২·২৩	৮৮·৯৫	৯৭·৭০
	(১০১·৩)	(৯৪·৫)	(৯৪·২)	(৯৭·১)	(১০৫·২)	(১১০·৯)	(১১৫·১)	(১২০·৯)	(১৩০·৮)	(১৪৩·৭)
(গ) ক ও খ-এর অনুপাত	৩৫·৮%	৩৭·৮%	৩৮·৮%	৩৯·১%	৩৮·৭%	৩৭·৫%	৩৮·৮%	৪৫·১%	৫০·৬%	৫৭·১%
(৫) শিল্পোৎপাদন হার (১৯৫০-৫১=১০০)	১১২·২	১১৩·৪	১১৭·৩	১২২·১	১৩৮·৬	১৫১·০	১৫২·৫	১৫৭·২	১৭৫·০	১৯৪·৩
(৬) কৃষিপণ্য উৎপাদন হার (১৯৪৯-৫০=১০০)	৯৭·৫	১০২·০	১১৪·৩	১০৭·০	১১৬·৮	১২৪·০	১১৫·৯	১৩২·০	১২৮·৭	১৩৯·১
(ক) বাৎসরিক হ্রাস-বৃদ্ধি	+২·০	+৪·৬	+১২·১	+২·৪	−০·২	+৬·৪	−৬·৮	+১৩·৯	−২·৫	+৮·১
(৭) "ডেফিসিট ফাইনান্স" (কোটি টাকা)	২	৪৪	৩৬	৯৪	১৫৭	২৫৩	৪৯৬	১৩৬	১১২	—

* ৩নং ক্ষেত্রে Money supply with public+Time and Savings deposits with banks+Postal savings deposits+Government balances with RBI.

(৮) জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার (১৯৫০-৫১=১০০)	১০৪·৬	১০৩·	১০৯·৯	১০০·৮	১০৪·৭	১১৮·৭	১১৯·৫	১৩২·২	১৩৫·৯	১৪৮·৬
(৯) গড় পাইকারী মূল্যমান (১৯৫২-৫৩=১০০)	১১৮	১০০	১০৪·৬	৯৭·৪	৯২·৫	১০৫·২	১০৮·৪	১১২·৯	১১৭·১	১২৪·৯
(১০) কৃষিপণ্যের মূল্যমান (১৯৫২-৫৩=১০০)	১১৮·৮	১০০	১০৫·৮	৯৪·৩	৮৮·০	১০৪·৫	১০৭·৪	১১৪·০	১১৬·৫	১২৩·৮
(ক) বাৎসরিক হ্রাস-বৃদ্ধি	—	(−১৫·৮)	(+৫·৮)	(−১০·৯)	(−৬·৭)	(+১৮·৮)	(+২·৮)	(+৬·১)	(+২·২)	(+৬·৩)
(১১) শিল্পপণ্যের মূল্যমান (১৯৫২-৫৩=১০০)	১১৯·৩	১০০·	৯৮·৯	১০০·৬	৯৯·৭	১০৬·৩	১০৮·১	১০৮·৪	১১১·৭	১২৩·৯
(ক) বাৎসরিক হ্রাস-বৃদ্ধি	—	(−১৬·২)	(−১·১)	(+১·৭)	(−০·৯)	(+৬·৬)	(+১·৭)	(+০·৩)	(+৩·৪)	(+১০·৯)
(১২) শিল্পের কাঁচামালের মূল্যমান (১৯৫২-৫৩=১০০)	১৪১·৫	১০০	১০৯·৭	১০১·৯	৯৯·০	১১৬·০	১১৬·৫	১১৫·৬	১২৩·৭	১৪৫·৪
(ক) বাৎসরিক হ্রাস-বৃদ্ধি	—	(−২৯·৩)	(+৯·৭)	(−৭·১)	(−২·৯)	(+১৭·২)	(+০·৪)	(−০·৮)	(+৭·০)	(+১৭·৫)
(১৩) খাদ্যশস্যের মূল্যমান (১৯৫২-৫৩=১০০)	১০২	১০০	৯৮	৮০	৭৬	৯৬	১০১	১০৭	৪০১	১০৪
(ক) বাৎসরিক হ্রাস-বৃদ্ধি	—	(−১·৯	(−২·০)	(−১৮·৪)	(−৫·৪)	(+২৬·৩)	(+৫·২)	(+৫·৯)	(−২·৮)	—
(১৪) মাথাপিছু খাদ্যশস্যের সরবরাহ (net availablity) ১৯৫০-৫১=১০০	৯৭·৪	১০৩·৫	১১৪·৮	১১০·৪	১০৭·৮	১১১·৩	১০৪·৪	১১৮·৩	১১৬·৫	১২০·০
(ক) বাৎসরিক হ্রাস-বৃদ্ধি	—	(+৬·৩)	(+১০·৯)	(−৩·৮)	(−২·৪)	(+৩·৩)	(−৬·২)	(+১৩·৩)	(−১·৫)	(+৩·০)
(১৫) পরিকল্পনা বাবদ সরকারী ব্যয় (কোটি টাকা)	২৫৯·৬০	২৬৭·৫৩	৩৪৩·০৪	৪৭৫·৯২	৬১৩·৯১	৬৩২·৮৩	৮৮৪·১৯	১০০১·৪৪	১০১০·৫১	১০৭১·০৩
(ক) জাতীয় আয়ের শতাংশ	২·৬০	২·৭২	৩·২৭	৪·৯৫	৬·১৫	৫·৬১	৭·৭৬	৭·৯৪	৭·৮১	৭·৫৬
(১৬) কৃষিজ ক্ষেত্রে মাথাপিছু আয় (primary sector) ১৯৫১-৫২=১০০	১০০	৯৪·১	১০২	৮২	৮৩·৬	১০০·৩	৯৩·৮	১০৮·৫	১০৬·৫	১১৪·৩
(ক) বাৎসরিক হ্রাস-বৃদ্ধি		(−৫·৯)	(+৮·৪)	(−১৯·৬)	(+১·৯)	(+২০·০)	(−৬·৫)	(+১৫·৮)	(−১·৮)	(+৭·৯)
(১৭) অন্যান্যদের মাথাপিছু আয় (primary/Tertiary) ১৯৫১-৫২=১০০	১০০	৯৯·৬	১০০·৯	১০০·৭	১০২·৬	১০৬·৫	১১০·২	১১২·৫	১১৫·৮	১২২·৬

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের অধ্যাত্মবোধ

অনীতা গুপ্ত

মধ্যযুগে ভারতবর্ষে অনেক ধর্মপ্রচারকের আবির্ভাব ঘটেছিল। এই ঘটনা আকস্মিক নয়। মধ্যযুগের সমাজে কঠিন বন্ধন ব্যক্তিচিত্তকে পীড়িত করত। সেই প্রতিকূল সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে অতি-সংবেদনশীল চিত্ত মুক্তি খুঁজত ধর্মের মধ্যে। তখনকার সমাজে ব্যক্তির মুক্তি ধর্মান্দোলনের রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। ব্যক্তি তখন কেবল নিজের মুক্তির কথা ভাবে নি, আর্ত মানুষের জন্য মোক্ষ, নির্বাণ লাভের বাণী নিয়ে এসেছিল। ব্যক্তির মুক্তির সঙ্গে এখানে জাতির মুক্তিও বিজড়িত। কিন্তু মধ্যযুগের ধর্মপ্রচারকেরা ধর্ম ও জীবনকে পৃথক্ করে দেখেছিলেন। সেই যুগের পরিবেশে জীবনের সঙ্গে যুক্ত থেকে ধর্মাচরণ সম্ভবপর ছিল না। এক-একজন ধর্মপ্রচারকের বিশেষ মতকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এক-একটি বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়। তাদের নিজস্ব শাস্ত্রগ্রন্থ, রীতি-নীতি, প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। তারপর দেখা গেছে কয়েক শতাব্দী পরে সেই চিন্তা, সেই রীতি-পদ্ধতি আর সময়ের সঙ্গে পা ফেলে চলতে পারছে না। প্রভাব যখন স্তিমিত হয়ে এসেছে, আচার ও শাস্ত্রগ্রন্থ তখন সংস্কারের শৈবালদামের মত কালের চলার গতিকে রুদ্ধ করবার চেষ্টা করেছে। সেই ধর্মসম্প্রদায় সেই বিশেষ মতের মধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে উদাসীন হয়ে গেছে পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে। যুগের কাছে তখন সেই ধর্মমত মূল্যহীন মনে হয়েছে।

বাংলা দেশে উনবিংশ শতাব্দীতেও আমরা কয়েকজন ধর্মপ্রচারককে পাই। এর মধ্যে ব্রাহ্মধর্মের তিনজন কর্ণধারের নাম উল্লেখযোগ্য। রাজা রামমোহন রায় ব্রহ্মোপাসনার পথ নির্দেশ করেছিলেন। সেই মতকে জীবন দিয়ে সার্থক করে তুলেছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। ব্রাহ্মধর্মের প্রধান প্রচারকেরা ঈশ্বরচিন্তাকে মনুষ্যত্ব সাধনার একটা অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তাই তাঁদের ব্রহ্মোপলব্ধির পাশাপাশি চলেছিল সমাজ-সংস্কার, সাহিত্যসাধনা, সংসারজীবনের শত কর্তব্যসাধন। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় 'উপাসনা সভা' স্থাপিত করেন। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে Unitarian Committee ও ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা। ব্রাহ্মসমাজ বলতে তখন ব্রহ্মোপাসনার জন্য একটি মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তারপর ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কমল বসুর বাড়ীতে ব্রহ্মমন্দির স্থাপন করলেন। এরপর রামমোহন রায় ইংলণ্ড গমন করেন। সেখানে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করবার যথেষ্ট সময় তিনি পান নি। কিন্তু ভারতবর্ষের ধর্মচিন্তার জগতে তিনি নূতন দিক্ নির্দেশ করেছিলেন। ভারতবর্ষে আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে জ্ঞান ও কর্মের পথ ছিল ভিন্নতর। রামমোহন এই দুইকে মিলিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। গৃহস্থের পক্ষে ব্রহ্মনিষ্ঠ হওয়া অসম্ভব, এমন সনাতন বিশ্বাসকে তিনি খণ্ডন করতে চেষ্টা করেছিলেন। বস্তুতঃ উনবিংশ শতাব্দীতে মনীষী ব্যক্তিরা সমগ্র মনুষ্যত্ব ও ব্যক্তিত্বের গঠনের দিকে জোর দিয়েছিলেন বেশী। রামমোহন রায় ঈশ্বরবিশ্বাসকে সমস্ত মনুষ্যত্বের একটি দিক্ রূপে গ্রহণ ক'রে অধ্যাত্মবোধের এক নতুন রূপ দিতে চাইলেন। ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে, আচারে, সংস্কারে আমাদের আধ্যাত্মিক চিন্তা বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে। রামমোহন রায়ের প্রথম কাজ হ'ল ব্রহ্মতত্ত্বকে শাস্ত্রের পাতা থেকে, সংস্কারের আগাছা সরিয়ে উদ্ধার করা। ব্রহ্মতত্ত্ব তাঁর কাছে বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে পাওয়া বিশেষ সত্য। এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে তাঁকে বিরুদ্ধবাদীদের সামনে দাঁড়াতে হয়েছিল। ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্বে তাঁর ভূমিকা ছিল প্রধানতঃ যোদ্ধার। যুক্তির কষ্টিপাথরে তাঁকে বিরুদ্ধবাদীদের মত খণ্ডন করতে হয়েছিল। তিনি ব্রহ্মতত্ত্ব নামক থিওরীকে বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তাই তাঁর আধ্যাত্মিক চিন্তা আত্মলীন ধ্যানের মধ্যে নিবিড় উপলব্ধি রূপে জেগে উঠতে পারে নি।

রাজা রামমোহন রায়ের তিরোধানের পর যুবক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই নতুন ধর্মের দীপ জ্বালিয়ে রাখার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকট কুড়িজন অনুগামীসহ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করলেন। তখন এই ধর্মান্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব চলেছে। সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মতত্ত্বকে কেবলমাত্র এক নতুন ধর্মমত রূপে গ্রহণ করলেন না, এই বিশ্বাস তাঁর অন্তরের উপলব্ধির মধ্য দিয়ে জেগে উঠল। এই উপলব্ধিতে আত্মলীন

হয়েছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। ধর্মবোধ তাঁর যুক্তির পথ ধরে আসে নি, এসেছে উপলব্ধি থেকে উৎসারিত হয়ে। ব্রহ্মতত্ত্ব তখন গিণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে সমগ্র বিশ্ব-সৌন্দর্যের মধ্যে উদ্ভাসিত দেখলেন। তাঁর পদসঞ্চার শুনতে পেলেন অন্তরের মধ্যে। কর্মজীবন, সংসারজীবন সমস্ত কিছুর সঙ্গে ব্রহ্মোপলব্ধি জড়িত। তাই তাঁর ধর্মজীবন আর গার্হস্থ্য জীবনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব থাকল না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষের এই রহস্য জানা যায় তাঁর আত্মজীবনী থেকে, বিশ্বপ্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য, বিশ্বসংসারের অসীম মাধুর্যের মধ্যে ঈশ্বরকে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। এইভাবে নিরাকার ব্রহ্ম অন্তরে ও জীবনে, তাঁর প্রতিদিনকার দেখা বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে জেগে রইলেন।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের অধ্যাত্মবোধ এইভাবে আত্মজাগরণের পথ ধরে এসেছিল। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, রাজা রামমোহন রায়ের তিরোধানের পর এই মতের বিশ্বাসীরা সেই প্রত্যয়ে আত্মলীন হবার অবকাশ খুঁজে পেয়েছিলেন। তখন আর যুক্তি দ্বারা বিশ্লেষণ করে সত্যকে পাওয়া নয়, তখন বিশ্বাসে সুস্থির হওয়ার সাধনা। এই বিশ্বাসে নিমজ্জিত হয়েছিলেন কেশবচন্দ্র সেন। রাজা রামমোহন রায় বুদ্ধিমার্গের পথিক। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মত কেশবচন্দ্র সেনেরও ধর্মবোধ তাঁর যুক্তির পথ ধরে আসে নি। এসেছে উপলব্ধি থেকে উৎসারিত হয়ে, তিনি ভক্তিমার্গের পথিক। রামমোহন রায় ব্রহ্মতত্ত্বকে উদ্ধার করেছিলেন শাস্ত্র থেকে। সেই ব্রহ্মস্বরূপকে জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে নেবার সাধনা করেছিলেন কেশবচন্দ্র সেন। ব্রহ্মের প্রতি নিগূঢ় প্রেমে এবং প্রেমাস্পদের আদেশে চলায় তা সার্থক হয়েছিল। তাঁর কর্মজীবন, সংসারজীবন সমস্ত কিছুর সঙ্গে ব্রহ্মচেতনা বিজড়িত। 'জীবন বেদ' নামক গ্রন্থে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন জীবনের শেষ পর্যায়ে নিজমুখে জীবনতত্ত্ব ব্যক্ত করেছেন। এই গ্রন্থে তাঁর অধ্যাত্মজীবনের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

জীবনের সুরুতে আত্মচেতনা জাগরণের সময়ে কেশবচন্দ্র সেন এমন কোন মহৎ সত্যের সন্ধান করেছেন, যে মহৎ ভাব তাঁর সমগ্র মনুষ্যত্বের মূল কেন্দ্র হবে, তাঁর সমস্ত কর্মজীবন হবে ভাববিধৃত। ঊনবিংশ শতাব্দীর স্মরণীয় মনীষীদের জীবনালোচনা করলে দেখা যায় তাঁদের প্রত্যেকের বড় হওয়ার প্রথম লক্ষ্য ছিল মনুষ্যত্বের সাধনা, ব্যক্তিত্বকে গড়ে তোলা। মহৎ ব্যক্তিত্বের প্রধান লক্ষণ হ'ল এই যে, একটি মহৎ ভাবকে কেন্দ্র করে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। যেমন শুক্তির গর্ভকোষে একটি বালুকণাকে কেন্দ্র করে মুক্তা নিটোল রূপ নেয়, তেমনি এঁদের ব্যক্তিত্ব কোন এক মহৎ ভাবকে কেন্দ্র করে সুসম্পূর্ণ রূপ নিয়েছিল ঊনবিংশ শতকের সেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য জাগরণের মুহূর্তে। তাঁদের স্বভাব ও কর্মজীবন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় জ্ঞান, কর্ম, বিশ্বাসের মধ্যে যোগসূত্র রয়েছে, কোথাও বিরোধ নেই। জ্ঞানের দ্বারা যে বিশ্বাস অর্জন করা যায় কর্মে তার প্রয়োগ। এই তিনের সমন্বয়ে সুসম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। জীবনের প্রথম পর্যায়ে কোন এক মহৎ ভাবকে অবলম্বন করার আকাঙ্ক্ষা যখন জেগে উঠেছে কেশবচন্দ্র সেনের মধ্যে তখন ব্রহ্মোপলব্ধিকে তিনি সত্যোপলব্ধিরূপে গ্রহণ করেছিলেন। এই সত্যকে পাবার জন্য আত্মানুশীলনের প্রয়োজন হয়েছিল। গার্হস্থ্য জীবনের মধ্যে থেকেই এই অনুশীলন চলেছিল তাঁর।

সংসার জীবনের মধ্যে মনকে নিরাসক্ত করার সাধনা কম বড় কথা নয়, অবিরত উপাসনা আর প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আত্মস্বরূপকে বিশুদ্ধ রেখেছিলেন তিনি। সংসারের মধ্যে থেকেও মনকে নিরাসক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। আর জাগ্রত চৈতন্যের মধ্যে ব্রহ্মচেতনা তাঁর জাগল। 'জীবন বেদে' তিনি এই আত্মোপলব্ধির কথা ব্যক্ত করেছেন—"হে প্রেমস্বরূপ, আত্মতত্ত্ব শিখাও। এ পুরাণ ছাড়া নূতন পুরাণ—সাক্ষাৎ ঈশ্বরের হাতের লেখা, বাইবেল গ্রন্থ। এ কেবল সামান্য মনুষ্য জীবন, কিন্তু হরি হে, সামান্য মনুষ্য জীবনেই কি লেখা লিখিয়াছ! দয়াময়, জীবন-পুস্তক পাঠ করিলে যে ফল হয়, তাহা ইহ-পরকালে সম্ভোগ করিতে দাও। ইহা ভবিষ্যতে হাজার হাজার লোক পাঠ করিবে, জ্ঞান পাইবে এবং সেই জ্ঞানে শান্তিরস পাইবে।"

তাঁর এই বাণীকে তিনি সমস্ত জীবন দিয়ে সার্থক করে তুলেছিলেন। তাই জীবনকে গঠন করেছেন শিল্পীর মত। যে নিরাকার "ব্রহ্ম" মন্দিরে মূর্তির মধ্যে নেই তাঁকে স্থান দেবেন কোথায়? কেশবচন্দ্র তাঁকে জানলেন আত্মোপলব্ধির মধ্য দিয়ে। জীবনের বেদীতে ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠা করলেন। নিরাকার ব্রহ্ম স্পষ্ট হয়ে উঠল তাঁর চেতনায়, কেশবচন্দ্র সেন জীবন দিয়ে ব্রহ্মোপলব্ধির সাধনা সুরু করলেন।

রাজা রামমোহন রায় যুক্তির দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্বকে উদ্ধার করেছিলেন শাস্ত্রের পাতা থেকে। কেশবচন্দ্র সেন তাঁকে স্থান দিয়েছিলেন হৃদয়ে। তিনি বুঝেছিলেন, সত্যের প্রবেশ পথ শুধুমাত্র বুদ্ধি দিয়ে নয়, কারণ বিশুদ্ধ আবেগের মাধ্যম ব্যতীত কোন কিছুকেই আমরা হৃদয়ে ধরে রাখতে পারি না। সেইজন্য কেশবচন্দ্র সেনের ব্রহ্মোপলব্ধির পরিণতি

ভক্তিবাদে। 'জীবনবেদে' তিনি বলেছেন—"আমি ব্রাহ্মসমাজে থাকিয়া আপনাকে কঠোর শুষ্ক করিলাম না; শান্তি আনন্দ লইয়া বিবেকের পার্শ্বে রাখিলাম। এখন তারতম্য নির্ণয় করা আমার পক্ষে অসম্ভব। এখন এরূপ ভক্তি লাভ করিয়াছি যে, মনে হয়, যেন ভক্তি আমার স্বাভাবিক।"

অন্তরের মধ্যে ব্রহ্মোপলব্ধি গভীর আবেগের মধ্য দিয়ে জেগে ওঠার পর জীবনের মধ্যে তাঁর মহিমাকে বিকশিত করে তোলার সাধনা সুরু করলেন কেশবচন্দ্র সেন। তিনি মনুষ্য-জীবনকে সর্বাপেক্ষা বেশি মূল্য দিয়েছেন। তাই জীবনকেও তিনি মহিমান্বিত করার চেষ্টা করেছিলেন।

এইভাবে অন্তরে জেগে-ওঠা গভীর সত্যবোধ কর্মের মধ্য দিয়ে সার্থক হয়ে উঠল। অন্তর-জীবন ও বহির্জীবনের সঙ্গে বিশ্বাসের সঙ্গে কর্মের সম্পর্ক নিবিড় হ'ল। ব্রহ্মোপলব্ধি এক সূক্ষ্ম যোগসূত্র রূপে এই দুইকে মিলিয়ে দিয়েছে। অধ্যাত্মসাধনা তাই তাঁর জীবন-বহির্ভূত নয়। তাঁর জীবন-সাধনার অঙ্গ, ব্রহ্মোপলব্ধি তখন অন্তর থেকে উৎসারিত এক প্রেরণাশক্তি। রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মবোধ এই ভাবে তাঁর সৃষ্টি কর্মের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল প্রেরণারূপে—

"আমার চিত্তে তোমার সৃষ্টিখানি,
রচিয়া তুলিছে বিচিত্র এক বাণী,
তারি সাথে প্রভু মিলিয়া তোমার প্রীতি
জাগায়ে তুলিছে আমার সকল গীতি।
আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান।"

কেশবচন্দ্র সেন এই উপলব্ধিকে প্রকাশ করেছেন ভিন্নভাবে—"সকল গ্রন্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ জীবন" এবং "সকল বস্তু অপেক্ষা আদরণীয় আপনার জীবন।"

অপরিবর্তনীয়

শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী

১৯৬২ সালে ইংল্যাণ্ডের চলমান একটি ট্রেনের ঘরে বসে দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ ফ্লাস্ক থেকে ঢাকনায় ঢেলে চা খাচ্ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গী একটি আফ্রিকাবাসী ভারতীয় নাম, রঘুলাল। এ কথায় কোনও ঐতিহাসিক চমকে উঠতে পারেন বটে, কিন্তু কবি বা বৈজ্ঞানিকের চমকাবার কথা নয়। কবি কল্পনায় অনেক অসম্ভব ঘটনাকে সম্ভবের মত দেখতে পান আর বৈজ্ঞানিক ত আজকাল অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে পারেন। বেতার থেকে শুরু করে চন্দ্রলোকে ভ্রমণ পর্যন্ত কত অসম্ভবই সম্ভব হ'ল। সময়ের আপেক্ষিকত্ব, স্থানের চতুর্থ ডায়মেনশন ইত্যাদির প্যাঁচ কষে এ ঘটনা ঘটিয়ে তুলতে পারেন আপনার আমার মনে তখন আর কোন সন্দেহই থাকে না। যা হোক এই বিশেষ ঘটনাটি প্রমাণ করবার জন্য এত বিতর্কের প্রয়োজন নেই, কারণ শাস্ত্র ও বিজ্ঞান সকলের উপরে সেরা প্রমাণ হচ্ছে প্রত্যক্ষ প্রমাণ—এবং সে প্রমাণ এই যে, আমি সেখানেই উপস্থিত ছিলাম। শুধু জানলার একটি কোণ ঘেঁষে বসে যস্মিন্ দেশে যদাচার—এই নিয়ম অনুসারে মুখের সবটাই আবৃত করে একটি খবরের কাগজ খুলে ধরেছিলাম। ইংরেজেরা ট্রেণে সর্বদাই এরকম করে, কেন করে অবশ্য জানি না। সময়ের সদ্ব্যবহার বা অনাবশ্যক বাক্যালাপের হাত থেকে রেহাই পাওয়া—এ দুটোর কোন্‌টি উদ্দেশ্য তা জানা নেই। শুনতে পেলাম, পাজামা পাঞ্জাবী পরা ইংরেজ বৃদ্ধটি শ্মশ্রুতে হাত বুলোতে বুলোতে বলছেন:

"তোমার মনে পড়বে না রঘুলাল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের সেই স্বাধীনতার উদ্দীপনা। যেদিন প্রথম মোহনলাল গান্ধীর সঙ্গে দেখা হ'ল—সেদিনই তিনি তোমার বাবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে চা-বাগানের ঠিকাদাররা যেমন কুলী সংগ্রহ করে পাঠাত, তেমনি দক্ষিণ ভারতে আখের ক্ষেতে কাজ করতে আসত ভারতীয় অসহায় মজুর। আমি জানতাম না যে, তারা প্রায় ক্রীতদাস। তোমার বাবা আমার সাদা রং দেখে আমায় বন্ধু মনে করেন নি। আমার একটি কথারও উত্তর দেন নি।"

রঘুলাল বললে, "আমি মনে মনে ভাবি যে, সাউথ আফ্রিকা ত ইংরেজেরও দেশ নয় ভারতীয়রও দেশ নয়, সে ত অন্য একটি দেশ, সেখানে ত দু'পক্ষই সমান হয়ে উঠতে পারত!"

"তা কি করে হবে—তাদের ত জবরদস্ত সরকারের জুতোর তলায় রাখা হয়েছিল!"

"কিন্তু তা হতে পারল কেন, তাই বলি···"

"আহা শোন না ব্যাপারটা, তুমি ত তখন জন্মাও নি—সে অবস্থা কল্পনা করতে পারবে না। ১৮৬১ সাল থেকে নাটালের আখের ক্ষেতে কাজ করবার জন্য ভারতবর্ষের সস্তা মজুর নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হয়েছিল—যেমন আমেরিকায় নিগ্রো ক্রীতদাসদের ধরে নিয়ে যেত তুলোর ক্ষেতে কাজ করাতে। কিন্তু ভারতীয়রা নিয়ম অনুসারে ঠিক ক্রীতদাস নয়, এদের বলত ইন্‌ডেণ্টেড লেবার। ঠিকাদারেরা যত মজুর আনতে পারবে সেই অনুসারে মাথাপিছু টাকা পেত, তারাই নানা জুয়াচুরি, চুরি ও কৌশল করে মজুর সংগ্রহ করে পাঠাত, এই ভাবে নাটালে এত ভারতীয় গিয়েছিল যে, ক্রমে তাদের সংখ্যা ইয়োরোপীয়ানদের চেয়ে বেশি হয়ে গেল।

"ইনডেঞ্চারের নিয়ম অনুসারে ভারত সরকারের সঙ্গে সর্ত ছিল যে, পাঁচ বছর কাজ করবার পর প্রত্যেক ভারতীয় স্বাধীন ভাবে বসবাস করতে পারবে, কিন্তু সে সর্ত কার্যতঃ নাকচ করার উদ্দেশ্যে মাথাপিছু তিন পাউণ্ড করে ট্যাক্স ধার্য করা হয়। ঐ টাকা না দেওয়া পর্যন্ত মুক্তি নেই। হয় খামারে কাজ করতে হবে, নয় দেশে ফিরে যেতে হবে। আখের ক্ষেতের মালিকরা চাইত, স্বাধীন হবার পথ বন্ধ করে চিরকাল তাদের দাস করে রাখা; কিন্তু অন্য ইয়োরোপীয়দের ইচ্ছা, ভারতীয়দের একেবারেই নাটাল থেকে দূর করে দেওয়া। কেন যে এ আপদ্‌গুলোকে আনা হয়েছে এই ছিল তাদের ভাব। তবে যখন এসে পড়েছে এবং সাউথ আফ্রিকায় এই কালা আদমীগুলোকে যদি থাকতেই হয় তবে তাদের সব বিষয়ে ছোট করেই রাখতে হবে।

"এরই বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধী, তখন তিনি বাপুজীও হন নি, তাঁর মাহাত্ম্যও কেউ জানে না, সেই বিদেশে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর আহ্বানে উত্তর নাটালের চুক্তিব কয়লার খনির মজুররা কর্মত্যাগ করে ট্রান্সভালে পদযা

করলে। দু'হাজার মানুষ, স্ত্রী পুরুষ শিশু পাহাড়-পর্বত পার হয়ে ছুটে এল।"

আমি আর ধৈর্য রাখতে পারলাম না। খবরের কাগজ-খানা সরিয়ে আমার বাঙ্গালী স্বভাবকে প্রকাশিত করে অন্যের কথার মধ্যে ঢুকে পড়লাম—

"মাপ করবেন, এ অবস্থায় ত একমাত্র কর্তব্য ছিল, যে করে হোক ভারতীয়দের দেশে ফিরে আসা।"

রঘুলাল বললে, "আপনাকে দেখে ত মনে হচ্ছে এ দেশেই বসবাস করছেন ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, পড়াশুনো করতে এসেছিলাম, পাশ করতে পারলাম না ! বাড়ী থেকে টাকাও বন্ধ করলে, মাও মারা গেলেন, তা থানে রয়ে গেছি—"

"কতদিন ?"

"তা বছর দশেক হবে"—

"আপনি পূর্ববঙ্গের নাকি ?"

"হ্যাঁ, আমার দেশ পাকিস্থান—আমি চাটিগাঁয়ের মুসলমান"—

"বেশ, ধরুন আপনি যদি এখানেই বিবাহ করেন—"

"আজ্ঞে, বিবাহ দু'বার করেছি, ডরোথি আমাকে ছেড়ে গেল, তখন বাধ্য হয়ে একটি দেশী মেয়েকেই···"

"বুঝলাম। এখন প্রশ্ন এই, যদি প্রয়োজন হয় তবে আর কুড়ি বছর পরে আপনার ছেলে কি দেশে ফিরে যেতে পারবে ?"

"এখন আর প্রয়োজন হবে কেন ? এখন ত আর দাসপ্রথা নেই—আমাকে কেউ ধরেও আনে নি—আমার ভাল লাগে তাই আছি।"

এইবার হাসি হাসি মুখ তুলে বৃদ্ধটি বললেন, "আমার নাম এণ্ড্রুজ—তোমার কথা শুনে বড় খুশী হলাম। স্বজাতির প্রশংসা কার না ভাল লাগে। ইংল্যাণ্ড এখন যথার্থ ই ফ্রি কান্ট্রি"—

আমাদের দেশ তখন "ব্ল্যাক কান্ট্রি" অর্থাৎ কয়লার দেশগুলির মধ্য দিয়ে চলেছে—আর দু'ধারেও কালো মানুষের ভীড়—কেউ লাইনে কাজ করছে, কেউ কোদাল ও শাবল দিয়ে লাইনের দু'ধারে জমি ঠিক করছে—পরনের কাপড়ে কালি-ঝুলি, মুখে কালিমাখা—চলমান ট্রেণে আমাদের দেখে বিলিতি কায়দায় হাত নাড়তে লাগল।

এণ্ড্রুজ সাহেব ফ্লাস্কের চা ঢালতে ঢালতে অন্যমনস্ক ভাবে বললেন, "এত ভারতীয় এখানে মজুর খাটছে ?"

"শুধু ভারতীয় নয়, জেমেকান, পাকিস্থানী—"

"ও, হ্যাঁ, পাকিস্থান, ওটি ঠিক মনে থাকে না—আমরা ত দুই নেশন থিওরীতে বিশ্বাস করতাম না, আবদুল গফুরও করতেন না।"

আমার পাকিস্থানের তাজা খুন গরম হয়ে উঠল,—"সে কি মশায়, আগে বিশ্বাস করতেন না বলে এখনও করবেন না ? একটা জলজ্যান্ত দেশ পাকিস্থান, পাখী ত নয় যে উড়ে যাবে—"

রঘুলাল বললে, "চটো কেন ভাই, ওঁদের সেই পুরোনো বিশ্বাস আর আর বদলাবে না—জান না, মৃত্যুর পরে আর নূতন ধারণা মনে ঢুকতে পারে না।"

আমার ভারি রাগ হ'ল, গম্ভীর মুখে বললাম, "তা জানি না মশাই। পরলোকতত্ত্ব আমার পড়া নেই, ডরোথি পড়ত, তবে সেই ত এখন আমার পক্ষে পরলোকে। তা আপনারা যাই বলুন মশায়, আপনারা হিন্দুরা না মানলে কি হবে। পৃথিবীর বড় বড় জাত মানে, আমেরিকা মানে, ইংলণ্ড মানে, এরা সবাই পাকিস্থানকে অনেক বেশি সমাদর করে। আচ্ছা বলুন ত রঘুলালজী, আপনাকে কেউ কখনও জিজ্ঞাসা করে নি আপনি পাকিস্থানী কি না !"

রঘুলাল চায়ের বাটিটা আমার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে সাহেবকে বললে, "সত্যি বলছি চাদিদাদু, এদেশে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করে—আর ইউ ফ্রম পাকিস্থান ? (আপনি কি পাকিস্থানের লোক ?) যদি বলি, না, তখন ত বেশ অবাক হয়ে যায়—তবে কোথায় দেশ ? এতকালের এত বড় যে ভারতবর্ষ, সে কথা যেন কারও মনেই পড়ে না।"

এণ্ড্রুজ সাহেব অস্থির হয়ে উঠলেন, "মণিলাল, মণিলাল, তাড়াতাড়ি আমার নোট বইটি বার করে দাও—"

"জী, আমি মণিলাল নয়, সে ত নাটালে ছিল, আমি রঘুলাল—সেই যে গান্ধীজির কাছে আখের ক্ষেতে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পিঠের ঘা দেখিয়েছিল—দগদগে চাবুকের ঘা দেখে আপনি যার পায়ের কাছে নতজানু হয়ে স্বজাতির অপরাধের জন্য ক্ষমা চেয়েছিলেন, আমি তারই নাতি রঘুলাল···"

"জানি, জানি, আর দেরি করো না," ব্যস্ত হয়ে উঠলেন বৃদ্ধ, "জান ত, কোন নূতন কথা আর মনে রাখতে পারি না, আমি নোট মেলাতে এসেছি, তাই—তাড়াতাড়ি লিখে নিতে হয় !"

খাতাটি হাতে নিয়ে গোটা গোটা অক্ষরে বৃদ্ধ লিখলেন, "ভারতীয় চরিত্র মূলত এখনও এক—এখনও হিন্দু-মুসলমান পরস্পরকে সমাদর করে না—শ্বেতবর্ণের মানুষের কাছে সমাদৃত হলেই গৌরব বোধ করে।"

আমাদের ট্রেণ তখন গন্তব্য ষ্টেশনে ঢুকছে—জিনিষপত্র ঝোলায় পুরতে পুরতে চার্লিদাদু বললেন—

"রঘুলাল, চা খেয়ে আমার মাথাটা একটু ঘুরছে—কোন দিন ত চা খেতাম না—চা বাগানে কুলীদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের ব্যবহার, উভয়ের জীবন-মানের যে বিপুল পার্থক্য—একজনের রাজার মত একজনের পশুর মত, মনুষ্যত্বের এই অপমানের কথা ভেবে কোন দিন চা খেতে প্রবৃত্তি হ'ত না। কিন্তু এখন স্বাধীন ভারতের সম্মানিত মেহনতি মানুষের হাতে উৎপন্ন চা ভাল করেই ত খাই, কিন্তু আজ ইংলণ্ডের মাঠে-ঘাটে এত ভারতীয় মজুর দেখে মনটা বড় অশান্ত হয়েছে।"

আমি বললাম, "এতক্ষণে বুঝলাম আপনি সত্যই অন্য যুগের মানুষ। আপনি কি জানেন না যে গতির যুগে দেশ, এমন কি বোধ হয় কালেরও সীমারেখা মিলিয়ে যাচ্ছে! সারা পৃথিবী কত কাছাকাছি আসছে—একে বলে দিগন্তের বিস্তার, এক্সপ্যাণ্ডিং হোরাইজন—ভারতে ইংরেজ গিয়েছিল, আর আজ জার্মান আমেরিকান রাশিয়ান সবাই যাচ্ছে, তবে ইংলণ্ডে আমরা এলেই কি দোষ হয় মশায়—"

রাগতস্বরে বৃদ্ধ বললেন, "কিছু না, তবে তারা ত মজুর 'খাটতে' যায় না, 'খাটাতে' যায়—মজুরের কাজ নিন্দনীয় নয়, তবু শুধু ভারতীয়রাই যে বংশ বংশ ধরে শ্বেতবর্ণের লোকের কাছে মজুর খাটবে এবং বিদেশেও সেই কাজে এমন দলে দলে আসবে এ ত আমার ভাল লাগে না, স্বাধীন ভারতীয়দের ইংলণ্ডে আমি এ রকম ভাবে দেখতে চাই নি।"

আমি আর মেজাজ ঠিক রাখতে পারলাম না—"ওঃ, ভারতীয়দের জন্যই আপনার যত দরদ দেখছি, আর পাকিস্থানী? তারা নীচু হ'লে আপনার কিছুই হয় না"—এই ব'লে আমি ষ্টেশনে নেমে জোরে জোরে পা ফেলে উল্টো দিকে রওনা দিলাম।

"শোন শোন, হয় হয়, আমার কাছে তোমরা পৃথক্ নও"—

আমি একেবারে দ্রুত-পায়ে ওভার ব্রীজের উপর উঠে নীচে দেখলাম, কাঁধে শান্তিনিকেতনী ঝুলিটি ঝুলিয়ে বৃদ্ধ এগিয়ে চলেছেন, পরণে পাজামা পাঞ্জাবী, ষ্টেশনের লোকজন অবাক্ হয়ে তাকিয়ে আছে। আমার একটু ভয় হ'ল, ভদ্রলোককে না পুলিসে ধরে নিয়ে যায়। শত হলেও আমাদের এক সময়ের মা বা সৎ-মা ভারতবর্ষের জন্য ইনি অনেক করেছেন। গত বছর ম্যানচেষ্টারে আমার বন্ধুর যা দুর্দশা হয়েছিল! এদেশে মেয়েরা একফালি কাপড় পরে বা না পরে ঘুরে বেড়ালে কোনও ক্ষতি হয় না, কিন্তু আমেদ বেচারা সকালবেলা উঠে তাড়াতাড়িতে প্যাণ্টের উপর সার্ট ঝুলিয়ে মোড়ের দোকান থেকে সিগারেট কিনতে গিয়েছিল ব'লে তাকে মাতাল ভেবে পুলিসে ধরে নিয়ে গিয়েছিল।

আমার বাড়ী বেশ ভাল জায়গায়—আমি সাউথ-অল বা ইষ্ট এণ্ডের খোঁয়াড়ে বাস করি না—বাস্ কনডাক্টারিও করি না, কিন্তু আত্মীয়স্বজন অনেক এসে পড়েছে বলে ও-পাড়ায় যেতে হয়, এবং যদিও শিখরা আমাদের চিরশত্রু, তবুও দু'একজনের সঙ্গে একটু বন্ধুত্বই হয়ে গেছে—দেখছি এত দূরদেশে বসে শত্রুতা বজায় রাখা যায় না।

এণ্ড্রুজ সাহেবের সঙ্গে কথাবার্তা বলে মনটা যেন কেমন উদাস হয়ে গিয়েছিল—হ্যাঁ, সেই চট্টগ্রামের হাঠাজারির গ্রামের স্কুলে আমার বন্ধু প্রতাপের কথা মনে পড়েছিল—তার কাকা সূর্যসেনের দলে ছিল···এই সব ভাবতে ভাবতে সর্দার বীর সিং-এর দরজায় এসে পৌঁছে গেলাম। ভিতরে একটা হট্টগোল চলেছে। বেল বাজালাম, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করবার পর একটা লোমশ হাত দরজা খুলে দিয়ে বাজখাই গলায় প্রশ্ন করলে—"কৌন?"

আমি ভাবলাম আমাদের বীর সিং আজ ছয়-সাত বছর ইংলণ্ডে কাপড়ের ব্যবসা করে এদেশের ভাবে-ভঙ্গিতে দোরস্ত হয়েছে। এ যে একেবারে লাহোরের টঙ্গাওলার আওয়াজ!

ঘরে ঢুকে দেখি ঘরময় জিনিষপত্র ছড়ানো, লোটা বাটি থালির মাঝখানে বসে হাতে লোহার বালা পরা সর্দারজী আটা ঠেসছে আর সালওয়ার কামিজ-পরা এক দশাসই চেহারার সর্দারণী ফায়ারপ্লেসে একটি আঙ্গাঠিতে রুটি সেঁকছে—গোটা তিনেক ছেলেমেয়ে মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে—জনদশেকের ঢালা বিছানা পাতা রয়েছে। আমি বললাম, "বীর সিং কোথায়?"

সর্দারজী কিছু বলবার আগেই সর্দারণী কথার তুবড়ি ছুটিয়ে দিলেন, সে এন্তি-উন্থির ধাক্কা সামলাতে না পেরে আমি ছিট্‌কে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। একটু যেতেই দেখি ল্যাম্পপোষ্টের নীচে দাঁড়িয়ে বীর সিং একটা ইভনিং পেপার পড়ছে।—"ব্যাপার কি?"

"আরে ভাই ব্যাপার চমৎকার। দেশ থেকে দাদা-বৌদি পাঁচ ছেলেমেয়ে আর বৌদির দাদা তার দুই ছেলে সব আমার ঐ একটা ঘরের মধ্যে উপস্থিত হয়েছে! আর এর জন্য আমি যাকে দায়ী করি তারই জন্য এই পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি। সে এখুনি ফিরবে এবং এস্পার-ওস্পার হয়ে যাবে, হ্যাঁ, তোমার সামনেই হবে।"

আমি দেখলাম বীর সিং বড় উত্তেজিত হয়েছে, তাকে একটু ঠাণ্ডা করবার জন্য বললাম, "চার বছর আগে ত এই

রকমই একবার আর একজনের আসার খবরে ক্ষেপেছিলে —আর আজ কি মনে হয় ? সে যদি না আসত ?"

বীর সিং বললে, "আরে ভাই, এ সব ত তারই কীর্তি, পাঞ্জাবী মেয়ে পাঞ্জাবীই থাকবে, সে কি কোনও দিন মেম হবে ? তুমি ত দেশী-বিদেশী দু'রকমই দেখেছ, তুমিই বল—তার ভাবী আর দাদার জন্য মায়া উথলে উঠল—এখানে আমরা সুখে আছি, ভাবী আমাকে মানুষ করেছে, তাদের প্রতি কর্তব্য আছে, এ সব বলত বটে কিন্তু তাই বলে যে জমিজমা বেচে তাদের এখানে এসে পড়তে লিখবে, এ কথা কে ভাবতে পারত ?"

আমার মনে পড়ল বিম্‌লি যেদিন ভোরে এসে পৌঁছল সেদিন বীর সিং-এর সঙ্গে আমিও তাকে আনতে গিয়েছিলাম। বীর সিং তখন বছর তিন হয় এসেছে—টাওয়ার অফ লণ্ডনের পাশে রাস্তায় রাস্তায় কাঁধে কাপড় ফেলে পুরো ভারতীয় কায়দায় কাপড় ফেরি করে করে সবে দু'পয়সা করেছে এবং এ দেশের দুশো। মজার মধ্যে লাহোরের একশ' মাইল দূরে এক পাড়াগাঁয়ের বাচ্চা বৌ'র কথা মনেও পড়ে না, এমন সময় দাদার কেব্‌ল্ এল—'ষ্টাপেড্ জাহাজে তোমার বৌ রওনা হয়েছে—জাহাজ-ঘাটে এস'।

সে কি মূর্তি তখন বিম্‌লির—একটি সাদা সালোয়ার কামিজ পরে এই পনের দিন আছে—বদলাবার কাপড় পর্যন্ত আনে নি, কাজেই সেই পাশুটে দুর্গন্ধ পোশাকে উষ্কখুষ্ক চুলে, সে একটি দর্শনীয় বস্তু। কিন্তু মেয়ে চৌকস—স্বামী পাছে হাতছাড়া হয়ে যায় এই ভয়ে একবর্ণ ভাষা জানে না—লিখতে জানে না, এই সুদূর দেশে একবস্ত্রে এসে পড়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম—'তা যেন হ'ল ভাবী, পায়ে একজোড়া জুতো আর একপ্রস্থ পোশাক আনলে না কেন ?' সে ফিক্ করে হেসে বলেছিল—আরে ভাই যে করে আসা, ওসব মনেই ছিল না ; তাতে কি, হিঁয়াই একঠো মাঙ্গা লেগা—অর্থাৎ এখানেই এক থান লংক্লথ কিনে নিলেই হবে !

সেই বিম্‌লি ওয়েলফেয়ার ষ্টেটের পাতকুড়োনো' খেয়ে এই তিন বছরে কি মূর্তি হয়েছে তা দেখলে তবে চার্লি দাদু বুঝতেন কেন এরা এমন দলে দলে ছুটে এসেছে।

বীর সিং ত জানে না আজ আমার কার সঙ্গে দেখা হয়েছে—বললে, "ভাই, পরশু একটা কার্পেট কিনেছি। গত মাসে তুমিই ত পছন্দ করে লেসের পর্দা কিনলে—এই গাঁওয়ারগুলোর পাল্লায় সব যাবে, সব যাবে—দেখো। এখন দোকান খুলেছি, দাদাকে কাপড় কাঁধে ঘুরতে হবে। আর বিম্‌লি ত বলবে—দাদাই দোকানে বসুন, তুমি ঘোরো—উনি বুড়োমানুষ ! সাংঘাতিক মেয়ে ও—আমি ওকে ডিভোর্স করব।"

এমন সময় দূরে দুটি নারীমূর্তি দেখা গেল—চপলা-চঞ্চল—ছাটা চুলে উঁচু জুতোয় একেবারে মেমি ঢং—খট্ খট্ করে এগিয়ে আসছে। বিম্‌লি আর রুথবুদ্ধ্। রুথবুদ্ধ্ জেমেকার ভারতীয়, শিবু অনন্তম্-এর সঙ্গে তার রীতিমত হিন্দুমতে, খৈ ছড়িয়ে বিয়ে হয়েছে। সে আমায় বলেছে যে, আগুনের উপর খৈ ছড়িয়ে দিলেই হিন্দু বিয়ে হয়ে যায়।

রুথবুদ্ধ্ নামটির মানে সবাই বুঝবে না। রুথের দাদামশায়ের নাম বুদ্ধ্। তার মা ছিল জেমেকার ইন্‌ডেণ্টেড মজুরাণী, সেই ক্ষেতেরই জার্মান মালিকের রুথ অবৈধ সন্তান। তবু বাপ একটি নাম দিয়েছিল রুথ, আর অতিবৈধ স্মরণ চিহ্ন নীল চোখ। কালো রং-এর উপর বড় বড় নীল চোখে সজ্জিত এই মেয়ে বিম্‌লিকে গড়ে পিটে ভাষা শিখিয়ে মানুষ অথবা মেম করে তুলেছে। আমি একটু এগিয়ে গিয়ে বললাম—

"বিম্‌লি, ইউ আর ইন্ ফর ট্রাব্‌ল্—তোমার কপালে দুঃখ আছে।"

বিম্‌লি একটুও না ঘাবড়ে ছুটে এল—"সবাই এসে গিয়েছে ?—বীর ডার্লিং, কি করে তুমি রাগ করতে পার ? তোমার দাদাবৌদিকে তোমার সুখ দেখাবে না ? জান, আজ সারাদিন রুথ আর আমি জাহাজ-ঘাটে কাজ করেছি। প্রায় ছ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে—বল ত জেমেকা থেকে আজ কত লোক এসেছে ? প্রায় ও'হাজার ! সেখানে সব সমাজ-সেবিকা মেয়েরা কি কাজই করছে ! আমাদের হেড্ অফ স্টাফ ডাঃ বার্থলমিউ কি অদ্ভুত কর্মী মেয়ে। প্রত্যেকের নাম বয়স ইত্যাদি লেখা, ফ্যাক্টরীগুলোর সঙ্গে বন্দোবস্ত করা, যাতে বেশি সস্তায় কাজ করিয়ে নিতে না পারে, ঠকাতে না পারে মালিকরা, সব দিকে লক্ষ্য—"

বীর সিং কোন কথা না বলে, যাকে বলে এবাউট টার্ণ তেমনি একটা ভঙ্গি করে, বুকের কাছে দুই হাত মুড়ে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে রইল আর দুই নারী ছুটে গিয়ে তার দুই কাঁধ ধরে ঝুলে পড়ল।

রুথ বললে, "বিম্‌লির উপর রাগ কর না বীর ডিয়ার—আমিই ওকে বলেছিলাম আমাদের দেশ থেকে এত আসছে, তোর যখন মন কাঁদছে আত্মীয়-স্বজন আনিয়ে নে না—"

বীর সিং এক ঝট্‌কা মেরে দুই কণ্ঠলগ্না নারীকে দুই দিকে ছিট্‌কে ফেলে দিয়ে বলল,"জান, দাদার সামনে এসব চলবে !"

"কি চলবে না ডার্লিং ?"

"এই আমার কাঁধ ধরে ঝোলা !"

ততক্ষণে ধুলো ঝেড়ে দুজনেই উঠে পড়েছে। রুথ

বললে—"চলবে, খুব চলবে, দ্যাখো না, ছ'মাসের মধ্যে তোমার বৌদিও দাদার কাঁধ ধরে ঝুলবে।"

এই কথায় বীরের মেজাজের উপর ঠাণ্ডা জল পড়ে গেল। এই অসম্ভব অবিশ্বাস্য অদ্ভুত দৃশ্য কল্পনা করে সে হো হো করে শিখের লাহোরী হাস্য করতে লাগল—আর সে হাসি শুনে ঠিক মাথার উপরে একটা বন্ধ ঘরের জানলা খুলে গেল। আমরা ত ঘাবড়ে গেলাম। ভাবছি, হয়ত এখুনি কোন মেমসাহেবের ভর্ৎসনা বা ভ্রূকুটি পাওনা আছে—তা নয়, দেখতে পেলাম, চার্লি সাহেব ঝুঁকে প'ড়ে বললেন: "ভাই পাকিস্থানী, শেষ নোটটি মেলান হ'ল, নানা অর্থে ভালোর দিকে ও মন্দর দিকে ভারত অপরিবর্তনীয়। ও, হ্যাঁ, চটে যেয়ো না, পাকীস্থানীরাও তাই।"

—

পঞ্চশস্য

রুশদেশে ডিভোর্স

ষ্টালিনের সময় জিনিষটা যে রুশদেশে অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল, তা ঠিকই। অন্য দেশের লোকেরা রসিকতা করে বলত, রুশদেশে ডিভোর্স নিতে চাইলে আদালতে একটি পোষ্ট কার্ডে দরখাস্ত লিখে পাঠালেই যথেষ্ট। এটা অবশ্য রসিকতার অত্যুক্তি। তবে ডিভোর্স নেওয়া আজকের দিনে রুশিয়াতে তখনকার মত সহজও আর নেই। তবে এটা হয়ত স্বীকার করতেই হবে যে, অন্য অনেক সভ্য দেশের তুলনায় এখনও তা অপেক্ষাকৃত সহজ। ডিভোর্স নেবার পদ্ধতিটা এখন এইরকম। স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই আদালতে হাজির হ'তে হয়, হয়ে বলতে হয়, ডিভোর্স কেবল একজনের কাম্য, না দুজনেই সেটা চাইছে। তারপর তাদের একক বা যুগ্ম ইচ্ছাটাকে স্থানীয় খবরের কাগজের মারফৎ বিজ্ঞাপিত করতে হয়। মস্কোর একটি খবরের কাগজে এই ধরণের ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটি বিজ্ঞাপন প্রত্যহ ছাপা হয়। এরপর কিছুদিন, কখনো বা মাস-ছয়েকের একটা ফাঁক যায়। এই সময়টা অতিবাহিত হ'লে অদালতের শুনানী যখন হয় তখন ডিভোর্স-প্রার্থী তার পাড়া-প্রতিবাসী ও আত্মীয় বন্ধুদের সাক্ষী হিসাবে সঙ্গে নিয়ে সেখানে হাজির হয়। যেসব কারণে ডিভোর্স দাবী করা হয় সেগুলি অন্য সব দেশেরই মতন, যেমন স্বৈরাচার, ফেলে পালানো ইত্যাদি। শুনানীর পর বিচারক তাঁর রায় দেন এবং মোকদ্দমার ফি ধার্য করেন। এই ফি ক্ষেত্রবিশেষে একটাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা হ'তে পারে, আবার আড়াইশ টাকা হ'লেও সেবিষয়ে কারুর কিছু বলবার থাকতে পারে না। বিগত কয়েক বৎসর রুশদেশের বিচারকরা, যেসব দম্পতির সন্তান বর্ত্তমান, তাদের আর সহজে ডিভোর্স দিতে চাইছেন না, লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

পৃথিবীর লোক কত ভাষায় কথা বলে ?

ভাষাবিদ্‌রা ব'লে থাকেন যে, বিশিষ্ট উপভাষাগুলিকে হিসাবে ধরলে পৃথিবীর ভাষা-সংখ্যা হবে আজকের দিনে ৩০০০। এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার বহু আদিবাসী-সম্প্রদায় আরও যে শত শত দলীয় ভাষা নিজেদের মধ্যে ব্যবহার করে সেগুলিকে না ধরেই।

চীনেদের নিয়ে মুশকিল অনেক, তার একটা হচ্ছে এই যে, পৃথিবীর মানুষ সংক্রান্ত প্রায় সব বিষয়ের আলোচনাতেই তাদের কথা উঠে পড়তে বাধ্য। ন্যাশন্যাল জিওগ্রাফিক সোসাইটির মতে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশীসংখ্যক মানুষের মাতৃভাষা হচ্ছে চীনে। অবশ্য পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী লোক যে-ভাষা নানা কারণে ব্যবহার করে তা হচ্ছে ইংরেজী ভাষা।

প্রাচীন যুগের তুলনায় মেয়েদের প্রসাধন

বিশেষ কিছু বদলায় নি। কারণ, দেখা যাচ্ছে, অনেক হাজার বছর আগে মিশরের মেয়েরা চুলে কলপ দিতেন, হাতের ও পায়ের নখ, হাতের তেলো ও পায়ের পাতা হেনার রঙে রাঙাতেন। এমন কি টোপর খোঁপাও বাঁধতেন।

ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ

ইলেকট্রন অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বিজ্ঞানীরা এমন সব এলাকায় প্রবেশ লাভ করেছেন যা সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের একেবারেই অনধিগম্য ছিল।

যেমন ধরুন, ভিরাসের এলাকা, সাধারণ সর্দ্দি থেকে সুরু ক'রে বসন্তরোগ ও ক্যানসার যার মধ্যে পড়ে।

এক ইঞ্চির দুই কোটি ভাগের এক ভাগের মত দূরত্ব যদি দুটি বস্তুকণার মধ্যে থাকে, ত তাও এই যন্ত্রের চোখে ধরা পড়ে। এর সাহায্যে বস্তুকণাগুলিকে দুই লক্ষগুণ বড় ক'রে আপনি দেখতে পারেন।

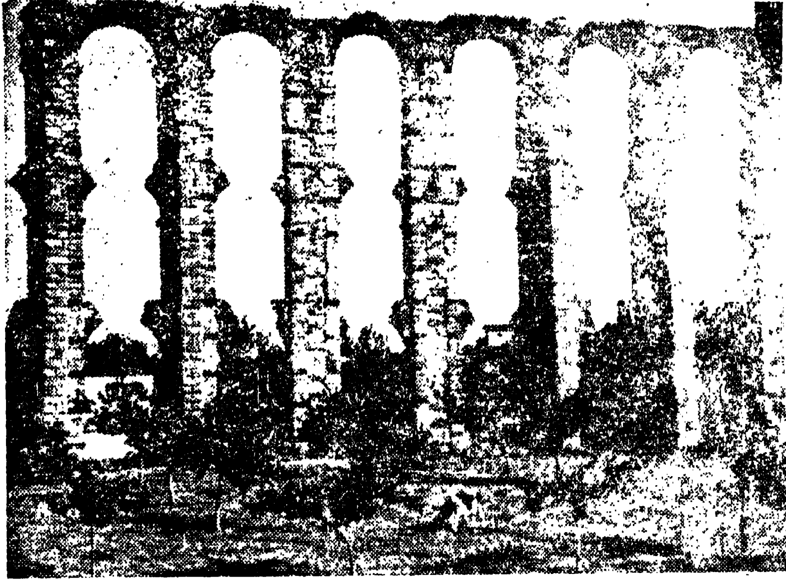
আপনার নিজের আয়নেটা জানা আছে। কাগজ পেন্সিল নিয়ে আঁক কষে সেটা দুই লক্ষগুণ বড় হ'লে কি দাঁড়ায় তা দেখুন। যদি সেটা অনুধাবন করতে পারেন ত এই ইলেকট্রণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রটি যে কি তা আপনার কাছে স্পষ্ট হবে।

যে-সমস্ত যন্ত্রাংশ দিয়ে এই অনুবীক্ষণ তৈরি তাদের সংখ্যা ৭০০০।

বুঝতে পারছেন, এটি যেমন-তেমন যন্ত্র নয়।

যদি তাড়াতাড়ি সারাতে চান ত তালাচাবি ভুলে যান

বহু শতাব্দী ধরে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেরই লোকের ধারণা ছিল যে, মানসিক পীড়াগ্রস্ত রোগীদের তালাবন্ধ ঘরে আবদ্ধ ক'রে রাখাই তাদের সম্বন্ধে সবচেয়ে ভাল ব্যবস্থা। কিন্তু ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রে সম্প্রতিকালে যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে তাতে মানুষের ঐ বহুযুগ-লালিত ও বহু-প্রচলিত ধারণার সম্পূর্ণ অসারতাই প্রমাণিত হয়েছে। এখন এটা নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, হাসপাতালের অন্য রোগীদের মত, মানসিক রোগগ্রস্তদেরও যদি একই রকম স্বাধীনতা দেওয়া যায় ত তারা চিকিৎসায় বেশী ভাল ক'রে সাড়া দেয় এবং অনেক বেশী তাড়াতাড়ি সেরে ওঠে। বদ্ধ দরজা, জেলখানার ধরণের গরাদে-দেওয়া জানালা এবং অন্য নানারকমের বাধানিষেধে এইসব রোগীদের মেজাজ আরও বেশী বিগড়ে যায় ও তাদের রোগের লক্ষণগুলি বৃদ্ধি পেতে থাকে। স্বাধীনতা তাদের নিজের প্রতি শ্রদ্ধা ফিরে এনে দেয় ও তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠ হ'তে সাহায্য করে। অন্যথায় হাসপাতালের কর্ম্মী, তাদের শুশ্রূষাকারীদের সম্বন্ধে তাদের একটি বিরুদ্ধ মনোভাব জমা হয়, আরোগ্যলাভের পক্ষে সেটাও একেবারেই অনুকূল হয় না।



স্পেন দেশে প্রাচীন রোমান একুইডাক্ট

একুইডাক্ট

জলের উৎসস্থান থেকে তাকে প্রয়োজনের জায়গায় বইয়ে নিয়ে যাওয়া সহজ হয় না, যদি পথে চড়াই উৎরাই পড়ে। রোমানরা কি উপায়ে সে সমস্যার সমাধান করতেন, তার বহু প্রমাণ সেকালের রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বহু দেশে আজও রয়েছে। প্রয়োজন অনুযায়ী উঁচু থাম আর খিলানের সাহায্যে নীচু জায়গার উপর দিয়ে জলের নালাকে তাঁরা চালিয়ে নিয়ে যেতেন। এইরকম সাঁকো-বাহিত জলের নালাকে বলা হ'ত একুইডাক্ট। স্পেন দেশের মিরান্ডায় ২০০০ বছরের পুরোনো এই রকম একটি একুইডাক্টের অনেকখানি এখনও প্রায় অক্ষত অবস্থায় আছে।

তারিখে কি হয় ?

আমেরিকার তিনজন প্রেসিডেণ্ট মারা গিয়েছেন একই তারিখে। তারিখটি হচ্ছে ৪ঠা জুলাই। আর যাঁরা মারা গিয়েছেন তাঁদের নাম ও সাল যথাক্রমে, জেফার্স'ন ১৮২৬, জন এ্যাডাম্‌স্ ১৮২৬, মন্‌রো ১৮৩১।

পৃথিবীর কি তাপ বাড়ছে ?

বিজ্ঞানীরা বলছেন, হাঁ। গত ৫০ বৎসর ধরে পৃথিবী ক্রমশঃ বেশী ক'রে উত্তপ্ত হচ্ছে। যাঁরা স্কি প'রে বরফের উপর ছুটোছুটি ক'রে খেলা করতে চান তাঁদের বরফের খোঁজে উত্তরোত্তর বেশী ক'রে উত্তর দিকে যেতে হচ্ছে; যে-সব ঠাণ্ডা অঞ্চলে আগে ঝড়তুফান অজ্ঞাত ছিল বললেই চলে, এখন সেসব অঞ্চলে ক্রমশঃ বেশী ক'রে তা হচ্ছে; হিমবাহ গলে যাওয়ার ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৎসরে এক ইঞ্চির এক-অষ্টমাংশ ক'রে বাড়ছে; অনেক পশুপাখী তাদের আস্তানা বদলাচ্ছে। এইভাবে চলতে থাকলে কি হয় বলা যায় না। কিন্তু আশার কথা এই যে, বিজ্ঞানীরা বলছেন, এভাবে বেশীদিন চলবে না। খানিকটা গরম হয়ে পৃথিবী নৈসর্গিক কারণেই আবার ঠাণ্ডা হ'তে থাকবে।

ধূম্রপায়ীর পঞ্চশীল

মাত্র পাঁচটি-দিন পাঁচটি মাত্র নিয়ম পালন ক'রে চললে ধূম্রপানের অত্যন্ত ক্ষতিকর কদর্য অভ্যাস থেকে আপনি নিষ্কৃতি পেতে পারেন।

১। শরীর থেকে তামাকের নিকোটিন নামীয় বিষের অবশেষ এবং রাসায়নিক (মানসিক নয়) কারণ-জনিত স্পৃহা দূর করবার জন্যে এই ক'দিন প্রত্যহ অন্ততঃ আট গ্লাস ক'রে জল বা সমপরিমাণ ফলের রস পান করবেন।

২। মনে হ'তে পারে যে, একটা নেশা ছাড়বার সময় অন্য নেশাগুলিকে একটু প্রশ্রয় দিলে কাজটা হয়ত একটু সহজ হ'তে পারে। কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ ভুল। কফি বা মদ্য পান করবার পর ধূমপানের ইচ্ছা প্রবলতর হয়। অনেকে কফির কাপে চুমুক দিয়েই নিজের প্রায় অজ্ঞাতসারে পকেট থেকে সিগারেট বের ক'রে ধরান। মদ্যপান বিচার-বুদ্ধিকে ব্যাহত করে। আপনার সঙ্কল্পের দৃঢ়তাকে তা লঘু ক'রে দিতে পারে।

৩। পরিমিত আহার করবেন। উদরপূর্তি ক'রে খেলে শরীরে ও মনে যে জড়তা আসবে তা আপনার সঙ্কল্পরক্ষার পক্ষে অনুকূল হবে না।



উড়ুক্কু মাছ

ঝাল লঙ্কা আচার মিষ্টান্ন ইত্যাদি বাদ দিতে চেষ্টা করবেন। প্রথম দিনটা যদি কেবল ফলমূল আহারের ব্যবস্থা করতে পারেন ত আরো ভাল।

৪। তামাক খাবার ইচ্ছা দুর্দ্দমনীয় হয়ে উঠলে সহজ ধরণের প্রাণায়াম করবেন। পেটের তলায় দিব্‌টা প্রসারিত আঙুলে চেপে আস্তে আস্তে অনেকখানি ক'রে নিঃশ্বাস নেবেন এবং ছাড়বেন।

৫। প্রত্যেকবার আহারের পর, এবং যখনই ধূমপান করতে না পারার জন্যে বিরক্তিবোধ বা সঙ্কল্পচ্যুতির ভাব মনে আসবে, হন্‌ হন্‌ ক'রে বেশ খানিকটা হেঁটে আসবেন। যে-কোনো রকমের নেশা ছাড়বার সময়েই মানুষের স্নায়ুমণ্ডলীর উপর অত্যন্ত বেশী চাপ পড়ে। হাঁটা-চলা জাতীয় ব্যায়ামে দেহমধ্যে এ্যাড্রিনালিন সঞ্চালিত হয়ে সেই স্নায়বিক চাপের লাঘব করে।

আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট ও আততায়ী

আমেরিকার সর্ব্বজনপ্রিয় প্রেসিডেণ্ট জন কেনেডি সম্প্রতি আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছেন। এর আগে এব্রাহাম লিঙ্কন, জেম্‌স্‌ গারফিল্ড্‌ ও উইলিয়াম ম্যাক্‌কিন্‌লী, এই তিনজন প্রেসিডেণ্ট আততায়ীর হাতে প্রাণ হারিয়েছেন। এছাড়া এণ্ড্রু জ্যাকসন, থিওডোর রুজেভেণ্ট, হ্যারী টু্ম্যান এই তিনজন প্রেসিডেণ্টকে হত্যা করবার চেষ্টা করেছিল আততায়ীরা। এব্রাহাম লিঙ্কন ও ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজেভেণ্টের প্রাণনাশের চেষ্টা তাঁরা প্রেসিডেণ্ট হবার আগেই করা হয়েছিল।

পৃথিবীর অভ্যন্তর

পৃথিবীপৃষ্ঠের নীচে প্রতি ১০০০ ফুটে ১৬ ডিগ্রী ফারেনহাইট হিসাবে তাপ বাড়ে। দক্ষিণ আফ্রিকার 'রবিনসন ডীপ' স্বর্ণখনিতে দু'মাইল গভীরতার জায়গায় উত্তাপ এতই বেশী যে, তাপ-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা না থাকলে সেই উত্তাপে 'তন্দুরী' খানা বানিয়ে নেওয়া যেত। পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে ২৫ মাইল নীচেকার যে তাপ, তাতে পাথরও গলে যায়। আগ্নেয়গিরির শিখর-গহ্বরের ভিতরকার গলিত লাভার উত্তাপ নিয়ে দেখা হয়েছে, তা ২২০০ ডিগ্রী ফারেনহাইটের কাছাকাছি।

উড়ুক্কু মাছের কি ডানা আছে ?

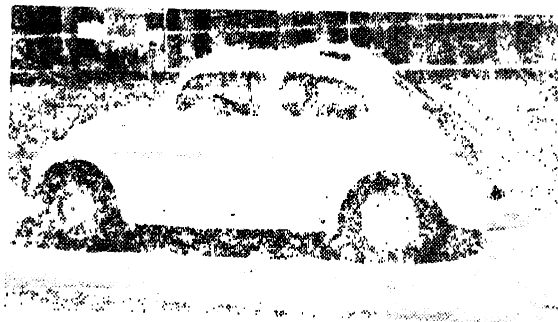
এক হিসাবে বলা যেতে পারে, আছে। তাদের সামনের দিক্‌কার, পাখনা দু'টি এতই বড়, সুগঠিত এবং মজবুত যে বাতাসে ভাসবার পক্ষে সেগুলি পাখীর ডানার মতই কাজে লাগে। এই নকল ডানা সঞ্চালন ক'রে পাখীদের মত এরা যথেচ্ছ উড়ে বেড়াতে পারে না বটে, তবে বাতাসে ভর ক'রে এর সাহায্যে এরা বেশ অনেকদূর অবধি এগিয়ে যেতে পারে। পৃথিবীর উষ্ণ অঞ্চলস্থ সমুদ্রগুলিতেই এদের দেখা মেলে। বঙ্গোপসাগরে এই "উড্ডীয়মান মৎস্য" জাহাজের পাশ দিয়ে অনেক সময় ঝাঁকে ঝাঁকে 'উড়ে' যায়। এমনি এক ঝাঁক মাছ দেখে ১৭৫২ সালে একজন পর্য্যটক যে ছবি এঁকেছিলেন তার প্রতিলিপি এই সঙ্গে ছাপা হ'ল।

লগেজ-বাহী ট্রেলার

আপনার গাড়িটি ছোট ব'লে তাতে যথেষ্ট লগেজ নেবার জায়গা নেই ! সুইজারল্যাণ্ডের একটি গাড়ি-তৈরির কারখানায় এ সমস্যার একটি চমৎকার সমাধানের ব্যবস্থা হয়েছে। এক চাকার ছোট একটি



ছোট গাড়ীর লেজেবাঁধা ট্রেলার



ছোট গাড়ী ট্রেলারটাকে উল্টিয়ে পিছনে এঁটে নিয়ে চলেছে

ট্রেলার ছোট গাড়ির পিছনে জুড়ে নিয়ে তাতে দু'তিন জনের জিনিষপত্র সহজেই চাপিয়ে নেওয়া চলে। সঙ্গে নেবার মত এত জিনিষ না থাকলে চাকাটা খুলে নিয়ে ট্রেলারটাকে উল্টে গাড়ির পেছনে এঁটে নেওয়া যায়।

স. চ.

ধূমপান প্রসঙ্গে

মিঃ মার্জিনো, শ্রীচক্রবর্তী এবং মিস্ জর্ডনের চিকিৎসকের পরামর্শমত বিশেষ ক্লিনিকে এসে ভর্তি হলেন। সব দিক দিয়ে তাঁরা সুস্থ, রক্তের চাপ স্বাভাবিক। করোনারি থ্রম্বসিসের কোন লক্ষণ নেই, হৃৎপিণ্ডের কাজ বেশ ভাল। তবু তাঁদের ক্লিনিকে আসতে হ'ল—বিশেষ ক্লিনিকে, ধূমপান-নিরোধী ক্লিনিকে।

হাঁ, অ্যাণ্টিস্মোকিং ক্লিনিক (ANTI-SMOKING CLINIC)—ধূমপান-নিরোধী ক্লিনিক, এমন ক্লিনিক আজো তৈরি হয় নি। তবে লণ্ডনের চিকিৎসক সমিতি (Royal College of Physicians of London) এ ধরণের ক্লিনিক স্থাপনের পরামর্শ দিয়েছেন। ধূমপানে যারা অনুরক্ত—ধূমপানের অভ্যাস যারা ছেড়ে দিতে চায় অথচ পারে না—তাদের সাহায্য করবে এই ক্লিনিক।

সবাই ধূমপানকে ক্ষতিকর বিবেচনা করার সময় আজ এসেছে। চার শ' বছর আগে ইওরোপে ধূমপান প্রবর্তনের সময় থেকেই এর বিরুদ্ধে একটা মত গড়ে উঠেছিল। তবে এই অভিমত ছিল অনেকটা মানুষের নীতিবোধের সঙ্গে জড়িত। এত দিন পরে তা বৈজ্ঞানিক ধারণায় সমর্থন পেল। লণ্ডনের চিকিৎসক সমিতি সম্প্রতি (১৯৬২ সালে) যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন তাতে ধূমপানের অভ্যাস স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর বলেই মত দেওয়া হয়েছে। কয়েক মাস আগে আমেরিকার চিকিৎসকরাও এ মর্মে রায় দিয়েছেন।

সিগারেটের ধোঁয়া হ'ল অত্যন্ত জটিল complex একটা পদার্থ। অন্তত কয়েক শ' জিনিসের সন্ধান তাতে পাওয়া গেছে। সিগারেটের ধোঁয়ায় এক ধরণের তেলতেলে (OILY) জিনিষ রয়েছে যা অত্যন্ত সূক্ষ্ম আকারে (এক সেণ্টিমিটারের দশ কোটি ভাগের এক ভাগ) গ্যাসের মধ্যে ভেসে বেড়ায়। এ জিনিষ ফুসফুসের গায়ে ব'সে থাকে। বেশী মাত্রায় সিগারেট সেবনে তাই ফুসফুসে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। নানা দেশের ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও তথ্য সংগ্রহ করে চিকিৎসকরা আজ এই অভিমত ঘোষণা করছেন। ফুসফুসের ক্যান্সার ছাড়াও অতিরিক্ত ধূমপানের ফলে ক্ষুধামান্দ্য, বমি-বমি ভাব এবং দেহের ওজন কমে আসে। ধূমপান মানুষের আয়ু পর্যন্ত ক্ষয় করে, ব্রিটিশ বিজ্ঞানীরা নানা পরিসংখ্যান জড়ো করে এ কথাও ঘোষণা করেছেন।

মানুষ কেন ধূমপান করে থাকে তা বিশেষ জানা যায় নি। ধূমপানের সুফল অনেকটা মনের ব্যাপার। ধূমপান নাকি মনের শ্রান্তি নাশ করে, কাজে একাগ্রতা বাড়িয়ে তোলে। কিন্তু এর কুফলগুলি আজ যখন স্থির নিশ্চয় হয়েছে, আমাদের পুরণো অভ্যাসটিও সে অনুসারে বদল করে নিতে হবে। মিঃ নাজিনো, শ্রীচক্রবর্তী এবং মিস্ টুইলার-রা একদিন বোধহয় অ্যান্টি-স্মোকিং ক্লিনিকে ভর্তি হবেন। একদিন ফ্যামিলি প্ল্যানিং ক্লিনিকের মত শহর এবং গ্রামগুলিকে এ জাতের ক্লিনিক ছেয়ে দেবে—কারণ নিজের থেকে ধূমপানের অভ্যাস ত্যাগ করার মত মনের জোর অনেকেরই নেই, ডাক্তারী মতে ধূমপায়ীরা অন্যের উপর বড় বেশি নির্ভর করে।

স্বপ্ন হ'ল সত্যি

মানুষের অনেক স্বপ্নই এ পর্যন্ত সম্ভব হয়েছে। কিন্তু আমরা বলছিলাম সত্যিকারের একটা স্বপ্ন দেখার কথা। মার্কিন যোদ্ধানাবিক ডানিয়েল ডেভিস একবার সমুদ্রযাত্রার ক্লান্তিতে স্বপ্ন দেখেন, তিনি যেন সত্যসত্যই জলে ডুবে যাচ্ছেন। অকূল সমুদ্র, কোন আশ্রয় নেই বাঁচবার, কোন আশা ভরসাই নেই আর, এমন সময় একটা গ্যাস-ভর্তি বেলুন কে যেন তাঁর কোমরে বেঁধে দিল। এই বেলুনের সাহায্যে তিনি সে যাত্রায়—হোক স্বপ্নের—তবু ত জলে ডোবার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলেন।

স্বপ্নে মানুষ কত কিছু না দেখে থাকে। এই স্বপ্ন অলীক, আমাদেরই মনের নানা এলোমেলো ছাপ। কিন্তু জাত-নাবিক ডেভিস স্বপ্নের এ জলে ডোবার ব্যাপারটা নিয়ে সত্যসত্যই চিন্তা সুরু করলেন। তাঁর উদ্দেশ্যঃ বেলুনের সাহায্য নিয়ে জলে ডোবার হাত থেকে বাঁচবার যদি কোন উপায় খুঁজে বার করা যায়। অবশেষে এ স্বপ্নের বিষয়ও একদিন সম্ভব হল। AQUA AID হলো তেমন একটা জিনিষ। ছোট একটি তাসের আকার। কোমরে বা, হাতে বাঁধা থাকবে। এ হল একটা প্লাস্টিকের বেলুন বিশেষ, তাতে খুব চাপে কারবন ডাই অক্সাইড গ্যাস পোরা। বিপদের সময় একটা বোতাম টিপে দিলেই হ'লে—বেলুন ফুলে উঠবে। এ বেলুন অনায়াসে একটা মানুষের ওজন তুলে রাখতে পারবে। (পৌষের প্রবাসীর ৩৯৭ পৃষ্ঠা দেখুন।)

জলে ডোবার হাত থেকে বাঁচার এ এক আশ্চর্য উপায়। স্বপ্ন হ'ল সত্য ও মিথ্যার পাঁচ-মিশালী, নানা রকম সত্য ও কল্পনা বাসনা ও অভিলাষ অবচেতন মনের স্তরে স্বপ্ন হয়ে ওঠে। নাবিকের স্বপ্ন কিন্তু পুরোমাত্রায়ই সত্য হয়ে উঠেছে।

আকাশের চাঁদ ঃ মাটির মানুষ

'হাতে তুলে দাও আকাশের চাঁদ'
এই হ'ল তার বুলি।
দিবস রজনী যেতেছে বহিয়া
কাঁদে সে দুহাত তুলি।

—কবি সে এক মানুষের ছবি কল্পনা করেছেন। পৃথিবীর যা কিছু পার্থিব সম্পদ, মানুষের যা কিছু সাধারণ লভ্য সমস্তই সে অস্বীকার করছে, আর কিছুই সে চায় না, শুধু আকাশের চাঁদকেই সে হাতের মুঠিতে ধরে রাখতে চায়। এভাবে একটা অসম্ভবের পিছনে জীবনপাত করে সে তার জীবনের যা কিছু সহজ এবং বাস্তব পাওয়াগুলি ছিল শুধু তাই যে কেবল হারাল তা নয়, সেই সঙ্গে যার জন্য তার এত ত্যাগস্বীকার সেই চাঁদও সুদূর আকাশেই রয়ে গেল। পণ্ডিতদের মতে এমন লোকই হ'ল যাকে বলে 'মহামূর্খ'—জীবনের ধ্রুব এবং অধ্রুব, স্থায়ী এবং অনিশ্চিত দুই-ই তারা অসার্থক করে তোলে।

আজকের যুগে চাঁদ আর মানুষের কাছে অবাস্তব নয়। এমন কি ছোটদের চোখেও তা স্বপ্নময় রূপকথাময় আশ্চর্য্য অলীক কিছু নয় আর বিশাল অনন্ত জগৎ-ব্রহ্মাণ্ডেরই একটা অংশরূপে নয়টি গ্রহময় সূর্য্যমণ্ডলের একটা উপগ্রহরূপে তা প্রতিভাত হচ্ছে। এই চাঁদকে আজ মানুষ নানাভাবে আপনার করে নিতে চাইছে। আরব-সাহারার মরু, দুই মেরু-দেশের তুষার এবং অরণ্যময় দেশ যেমন মানুষ আপনার করে নিয়েছে। দূরবীনের চোখে চাঁদের দিকে নজর রাখা হচ্ছে। তার কোথায় কোন্ গহ্বরে জলহীন শুষ্ক "সমুদ্র", কোথায় পাহাড় বা উপত্যকা, কি কি তার উপাদান ইত্যাদি, ইত্যাদি যাচাই করে দেখা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, মানুষ আজ চাঁদের বুকে পা বাড়াতে চাইছে। ধাপে ধাপে তৈরি হচ্ছে এই চন্দ্রারোহণ পর্ব। আজকের দিনে তা আর অসম্ভব দেখি না। বাস্তবিকই, "আকাশের চাঁদ" মানুষ একদিন "হাতে" পেতে পারে। কিন্তু একবার বিবেচনা করে দেখি, কি মূল্যে, কতটা মূল্যে তা সম্ভব। কোটি কোটি ডলার, কোটি কোটি রুবল তার জন্য প্রয়োজন হবে। মানুষই এর দাম তুলে ধরবে—যে মানুষ অপরাজেয় এবং যে মানুষ জাতির কোটি কোটি লোক ক্ষুধায় ক্লিষ্ট অনাহারে শীর্ণ—রোগ শোক মহামারী কলেরা বসন্ত প্লেগ অবারিত; নেই অন্ন, নেই বস্ত্র, নেই ওষুধ, নেই শিক্ষা, —শিক্ষা—যে শিক্ষা মানুষকে এত শক্তিশালী এত উন্নত করেছে। বিপরীত বাঁধনে মানুষ বাঁধা পড়েছে। চাঁদকে সে জয় করতে পারে, আবার রোগ ক্ষুধা ও অশিক্ষাকেও সে জয় করতে পারে। মানুষ জাতি একটা মস্ত সংগঠন। কবিতার মানুষটি আকাশের চাঁদে হাত বাড়াতে গিয়ে জীবনের সব কিছুই খুইয়েছে, আজকের মানুষের পক্ষে এতটা কখনই বৃথা যাবে না; চাঁদকে সে পাবে কিন্তু ক্ষুধা দারিদ্র্য এবং অশিক্ষার বিরুদ্ধে মানুষের জয়কে অনেকটা খর্ব করে।

আকাশের চাঁদ ঃ মাটির মানুষ (২)

আকাশের চাঁদ চিরকাল আকাশেই থাকবে, আর বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় মাটির মানুষ মাঝে মাঝে তার বুড়িটি ছুঁয়ে আসবে। একদিন চাঁদের বুকে মানুষের পা পড়বে এতে কোন সন্দেহই নেই। তার জল-বায়ুহীন রুক্ষ প্রতিকূল পরিবেশে মানুষ যন্ত্র স্থাপনা করবে। চাঁদকে আশ্রয় করে মানুষ নাকি অনন্ত মহাকাশযাত্রায় পথিক হবে। কবির কল্পনাকেও অতিক্রম করে এ সম্বন্ধে নানা বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা। অনেক দুঃসাহসিক পরিকল্পনায় চাঁদের মাটি খুঁড়ে তার যা খনিজ সম্পদ তা রকেটে চাপিয়ে পৃথিবীতে চালান দেওয়া হবে। এভাবে মানুষ ক্রমে চাঁদের সম্পদভাগী হবে। বহুমতী বসুন্ধরার অপর্য্যাপ্ত দান মানুষ অসংখ্য যন্ত্রপাতির হাতে গ্রহণ করছে; বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় মাটির মানুষ আজ পৃথিবীর সীমানাকে অতিক্রম করে আকাশের চাঁদের দিকে হাত বাড়াচ্ছে। আপাততঃ তার অভিযান পর্ব, মানুষের চাঁদে গিয়ে পৌঁছুতে এখনো কয়েক বছর বাকি আছে। মানুষ সেদিন কি পাবে না পাবে তুলনায় এখনকার ব্যয়ের দিক্‌টা অনেকের কাছে বড় হয়ে উঠেছে। চাঁদের দিকে মানুষের জয়যাত্রার রথটি চালাতে গিয়ে বিজ্ঞান

ও কারিগরি জ্ঞানের শক্তি যে হারে জাগ্রত করতে হচ্ছে তাতে খরচের পরিমাণ অঙ্কের হিসাবে, আকাশে জ্যোতিষ্কদের দূরত্বের মতই, অতিকায় হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে গত ৩১শে জানুয়ারী টেলিভিশনে চাঁদের ছবি তোলার উদ্দেশ্যে যে "ক্যামেরা" রকেটটি পাঠানো হয়েছিল একমাত্র তাতেই খরচ ২৫ কোটি ডলার—যদিও পরিকল্পনাটি শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিল। এভাবে নানা ব্যর্থতা অভিজ্ঞতা ও আনুষঙ্গিক ব্যয়ের মধ্য দিয়ে একদিন চাঁদে যাওয়ার স্বপ্ন সফল হবে। যাবে বোধহয় একজন কি দু'জন লোক, কিন্তু সমগ্র মানুষ জাতিরই গৌরব তাতে উদ্দীপ্ত হবে। খরচের কথা উঠেছে, কোটি কোটি ডলার রুবল আমরা যে চাঁদের পিছনে খরচ করছি, আধুনিক পৃথিবীর কয়টা সমস্যা আমরা সমাধান করতে পেরেছি? চন্দ্র জয়ের উদ্যোগে যে খরচ, সে টাকাটা আরো কত ভাবেই না কাজে লাগাতে পারতাম। ক্যান্সার রোগটা এখনো প্রায় দুরারোগ্য। পৃথিবী জুড়ে এ নিয়ে অনেক গবেষণা। গবেষণার শক্তিকে আরো ভাল ভাবে নিয়োগ করার জন্য টাকা চাই, আরো টাকা। আরো টাকা চাই—কত লোক অনাহারে অপুষ্ট, আরো টাকা চাই—মারী মহামারী কলেরা বসন্ত এখনো অপ্রতিহত। টাকার অভাবে অনেক যোগ্য পরিকল্পনাই অকেজো হ'তে বসেছে, সেখানে পৃথিবীর প্রয়োজনকে অস্বীকার করে এসব অপার্থিক চাঁদের পিছনে টাকা ওড়ানো অনেকের চোখেই অযৌক্তিক, শুধু অযৌক্তিক নয় অন্যায় বলে মনে হচ্ছে। প্রথম স্পুৎনিক ওড়ার পর থেকে এ নিয়ে তর্ক-বিতর্কে অনেক কথা হয়েছে। আসল কথা, আমাদের ইচ্ছা এবং উদ্যমকে সংঘবদ্ধ করা। ভাল অনেক কিছুই আমরা করতে চাই কিন্তু অধিকাংশ সময়েই তা বিক্ষিপ্ত আগ্রহের বশে সঠিক আকার নিয়ে ওঠে না। বাইরের বাধাগুলি তখন প্রবল হয়ে ওঠে। মনে হয়, এই কারণে বা ঐ কারণে বুঝি আমার এমন ভাল উদ্দেশ্যটা কাজে রূপ পেল না। বারোয়ারী পুজায় পাড়ায় পাড়ায় ছেলেরা চাঁদা তোলে, বাজে খরচ যে একেবারে কিছু হয় না তা নয়, কিন্তু এ ব্যাপারে যাঁরা দামী দামী উপদেশ দিয়ে অপব্যয় রোধ করতে চান এবং ছেলেদের তোলা টাকায় ভাল কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন তাঁরা স্বয়ং ঐ ভাল কাজগুলি করতে পারবেন কি না সন্দেহ। বারোয়ারী পুজার পাশাপাশি বিজ্ঞ লোকদের সেই ভাল কাজগুলিও করা চলত, ছেলেদের চাঁদা তোলার জন্য তার সম্ভাবনা কোন অংশেই খর্ব হয় নি। যে কোন কাজ—যত বড়ই তার লক্ষ্য হোক—খুব সামান্য থেকে তা আরম্ভ করা যায়। সংগঠন বিরাট শক্তি। চাঁদে যাওয়ার জন্য মানুষ প্রস্তুত হয়েছে, দুর্ভিক্ষ ক্যান্সার বা ক্ষুধার বিরুদ্ধে মানুষ যদি আরো ভাল করে প্রস্তুত হয়, চাঁদে যাওয়ার আগ্রহ তার এই উদ্দেশ্য পূরণে বাধা হ'তে পারে না।

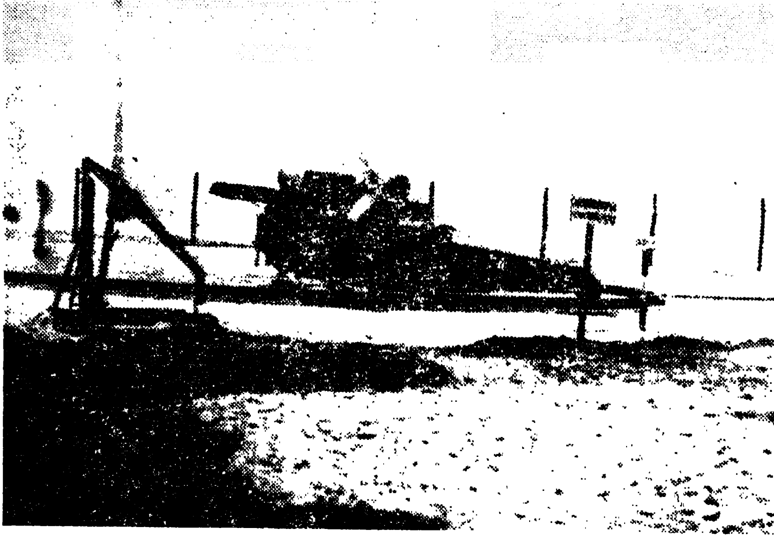
যাত্রা হ'ল সুরু

ঘুঁটে, গরুর গাড়ি এবং সাইকেলের যুগ ছেড়ে ভারত সহসা রকেটের যুগে প্রবেশ করল। প্রবেশ করল ১৯শে নভেম্বর ১৯৬২ সালে। এ দিন ভারতের দক্ষিণবর্তী থুম্বা উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে একটি নাইক-আপাশে রকেট মাটির আশ্রয় ছেড়ে আকাশের উঁচু সীমায় বিচরণ করেছিল। বাতাসের উচ্চস্তর সম্বন্ধে গবেষণা ভারতের রকেট অভিযানের লক্ষ্য। এ ব্যাপারে আমাদের দেশ ফরাসী ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সক্রিয় সহযোগিতা পাচ্ছে। আমরা জানি, বাতাসের স্তরগুলি খুবই অশান্ত এবং জাগতিক নানা কারণে তা সহজেই সাড়া দিয়ে থাকে। এমন কি সুদূর ৯ কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরের যে সূর্য তার পরিবর্তনেও



উৎক্ষিপ্ত রকেট

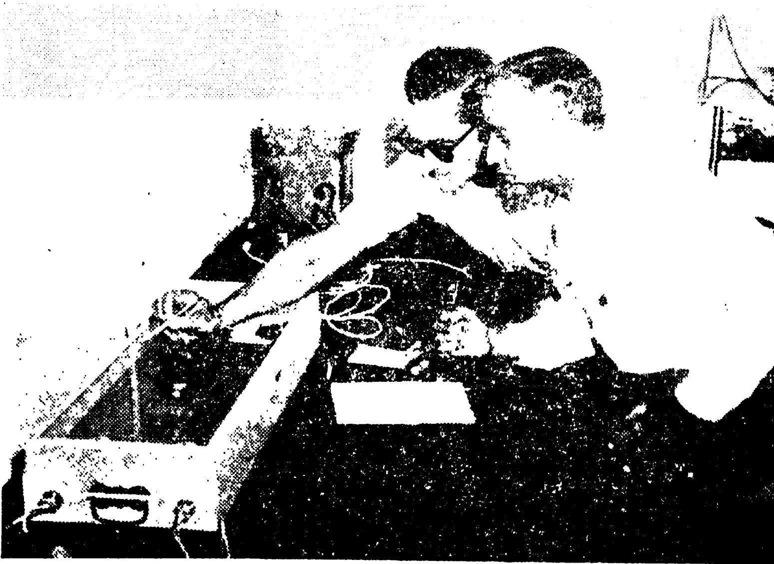
বাতাসের স্তরগুলি আশ্চর্যভাবে আলোড়িত হয়। চন্দ্রের টানে সমুদ্রের জল ফুলে ওঠার মত বাতাসের উঁচু স্তরগুলিতেও নানা ধরণের "জোয়ার-ভাঁটা" খেলে, চুম্বকধর্মী "ঝড়ে"র সৃষ্টি হয়। এর ফলে পৃথিবীর আবহাওয়া প্রভাবিত হচ্ছে। পৃথিবীর জলবায়ুকে বুঝতে হ'লে, এ সম্বন্ধে সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করতে হ'লে তাই সাধারণ বায়ুস্তরের উপরে উর্দ্ধাকাশ (upper atmosphere) এমন কি সূর্যের দিকেও চোখ ফেরাতে হবে। সূর্য গবেষণার জন্য এ বছর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে (গত সংখ্যা প্রবাসীর পঞ্চশস্য পর্যায়ে "শান্ত সূর্য: একটি বিজ্ঞান বর্ষ" দ্রষ্টব্য)। সম্প্রতি এ উদ্দেশ্যে সোডিয়াম গ্যাস-পোরা একটি রকেট ছাড়া হ'ল থুম্বার রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে। সোডিয়াম বাতাসের সংস্পর্শে এসে সরাসরি জ্বলে ওঠে। তারই আলোর শিখার উপর লক্ষ্য রেখে বিশেষজ্ঞদের কাছে উর্দ্ধাকাশের তাৎপর্য্য ধরা পড়ে। দিনের আকাশের উজ্জ্বল পটভূমিতেও এ শিখা উজ্জ্বল। আকাশ এবং সূর্যকে মানুষ এভাবে আবার নূতন করে জেনে নিচ্ছে—আমাদের এত পরিচিত আকাশ, এত পরিচিত সূর্য! এই পরিচয়কে অবলম্বন



ত্রিবান্দ্রাম থেকে ১৫ মাইল দক্ষিণে থুম্বা রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র

করে মানুষ পৃথিবীকে আরো গভীর ভাবে জানবে। পৃথিবীকে আরো নকট করে পাবে।

এই জানাই মানুষকে যুগে যুগে এক পর্যায় থেকে আর এক পর্যায়ে উন্নত করেছে। কালে রকেট মানুষের অর্থনীতিকে বহন করবে।



থুম্বা রকেট ঘাঁটি থেকে প্রথম রকেটটি উৎক্ষেপণের সময় যন্ত্রপাতি সম্পর্কে আমেরিকার একজন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে আলোচনা করছেন রকেট ঘাঁটির ডিরেক্টার এইচ. জি. এন. মূর্তি (ডানদিকে)।

বিদ্যুৎ : পূর্বাঞ্চলে সংহতি

বিদ্যুৎ সম্প্রতি খবরের কাগজের মোটা শিরোনাম পাচ্ছে। জলের আরেক নাম জীবন। বিদ্যুৎও সেভাবে জলের মত অবিরল ধারায় তারের পথে প্রবাহিত হচ্ছে। আমাদের বর্তমান জীবনধারাকে তা বাঁচিয়ে রাখে। বিদ্যুতের আরেক নাম 'আধুনিক জীবন" রাখা যায় কি না পণ্ডিতেরা তা বিবেচনা করবেন। বিদ্যুৎ আধুনিক জীবনযাত্রার প্রাণপ্রবাহ।

কিন্তু সব জিনিষ, তা দৈনন্দিন প্রয়োজনে যতই অপরিহার্য হোক না কেন, খবরের কাগজের পাতায় তার ঠাঁই হয় না। মাটি, কাঠ বা সিমেন্ট তাই কোনদিনই "খবর" নয়। জল অর্থাৎ "জীবন" তখনই খবরের কাগজের শিরোপা পায় যখন তা বন্যার আকারে দারুণ ধ্বংসের রূপ নিয়ে আসে। বিদ্যুৎ-ও সে হিসেবে খবর হ'ল; বিশেষত আমাদের এই পূর্বাঞ্চলে, কারণ—বিদ্যুতের দুর্ভিক্ষ। যে বিদ্যুতের "তেলে" অটিকায় এই সভ্যতার "চাকা" ঘুরছে, মূলে তারই নাকি বড় অভাব। শিল্পবাণিজ্যের প্রগতি তাই পিছিয়ে পড়েছে। শুধু কি এই— ঘর বাতি বা পাখা ঘোরানোর জন্য যে সামান্য বিদ্যুৎ, তারও নাকি জোগান নেই। এমনি সঙ্গীন অবস্থা। ১৯৬১-৬২ সাল থেকে এই অভিজ্ঞতা। আজো তা স্বাভাবিক হয় নি। বিদ্যুতের "রেশন" এখনো রয়েছে। এমন অবস্থা আর কত দিন? প্রতিকার অবশ্যই চাই।

কি সেই প্রতিকার?

প্রতিকার—বিদ্যুতের উৎসগুলিকে "একত্র" করা। গ'ড়ে তোলা সংহত এক সরবরাহ ব্যবস্থা। শরীরের রক্তবাহী শিরা-ধমনীর মত দেশের সমস্ত জায়গায় ছড়িয়ে থাক বিদ্যুৎ পরিবহনের তার। একস্থানে অভাব দেখা দিলে অন্য জায়গার বাড়তি বিদ্যুৎ চালান দিতে তখন আর অসুবিধা হবে না। তাছাড়া, আনুষঙ্গিক আরো অনেক সুবিধা এতে রয়েছে। এভাবে তৈরি হবে দেশজোড়া বিদ্যুৎ সংহতি। কিন্তু এমন একটা বিরাট পরিকল্পনা সহসা পূরণ হবার নয়। সংগঠনমূলক সমস্যা ছাড়াও হাজারো কারিগরি সমস্যা এখন জড়ানো রয়েছে। মূল উদ্দেশ্যকে মনে রেখে তাই অল্প থেকে শুরু করা যাক, পরিকল্পনাকে টুকরো টুকরো করে ভাগ করে। প্রতিবেশী কয়েকটি রাষ্ট্র নিয়ে আগে আঞ্চলিক ভিত্তিতে এই বিদ্যুতের সংহতি তৈরি হোক। পরে এই বিভক্ত "আঞ্চলিক"গুলিই মিলিত হয়ে সামগ্রিক বিদ্যুৎ সংহতির রূপ নেবে। দেশের পূর্বাঞ্চলের কথা বিবেচনা করে সম্প্রতি পশ্চিম বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যাকে নিয়ে একটি আঞ্চলিক ইলেকট্রিসিটি বোর্ড গঠন করা হয়েছে, ডি-ভি-সিও সেখানে এসে যোগ দিয়েছে। বিদ্যুৎ সংহতির পথ এভাবে প্রশস্ত হ'ল—শিল্প ও গাহস্থ্য বিদ্যুতের সংস্থান তাই আরো নিশ্চিত হ'ল।

এ. কে. ডি.

ছায়াপথ

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

॥ যোল ॥

ঘরে বসে রামকিঙ্কর পরীক্ষার পড়া তৈরী করছিল, মালতীর খাস ঝি এসে তলব দিলে: বৌরাণী ডাকছেন।

অন্দরের রাস্তা রামকিঙ্করের এখন কিছুটা পরিচিত হয়ে গেছে। তখনই এসে দাঁড়াল বৌরাণীর ঘরে।

সেদিন বৌরাণী অসুখ থেকে ওঠার পর এই প্রথম এ ঘরে এল। মালতীকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। মুখে যেন রক্তের চিহ্ন নেই। চোখ ঢুলে আসছে। মনে হয়, দিবানিদ্রার ঘোর কাটেনি এখনও।

এবাড়ীর সবই অদ্ভুত। এখানে দিন রাত্রি, রাত্রিটাই দিন। সবাই দিনের বেশির ভাগ সময় ঘুমোয়, আর রাত্রির বেশির ভাগ সময় জেগে থাকে।

এখানে এসে মালতীরও সেই অভ্যাস হয়েছে। করবেই বা কি। কাজ ত কিছু নেই। খাওয়া, শোয়া আর বই পড়া।

মালতী বললে—সেদিন মনোহর ডাক্তারের চেম্বারটা ত চিনে এসেছেন?

—হ্যাঁ।

—সেখানে একবার যেতে হবে এই চিঠিখানা নিয়ে। আমার অসুখের বিবরণ লেখা আছে।

—এখনই যেতে হবে?

—হ্যাঁ।

রামকিঙ্কর চলে যাচ্ছিল, মালতী ডাকলে, আর শুনুন।

রামকিঙ্কর নিঃশব্দে ফিরে দাঁড়াল।

মালতী বললে বরং একটু অপেক্ষা করে জবাবটাও নিয়ে আসবেন।

রামকিঙ্কর ঘাড় নেড়ে জানালে, আচ্ছা।

কিন্তু তার মনটা প্রসন্ন হ'ল না। পরীক্ষার অল্প কয়েকদিন বাকি। মনোহর ডাক্তারের চেম্বার কাছে নয়। জবাবের জন্যে কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে তাই বা কে জানে? আজ সন্ধ্যাবেলার পড়ার দফা ইতি।

এই অবস্থায় মনোহরের চেম্বারে গিয়ে রামকিঙ্কর শুনলে, মনোহর নেই, রোগী দেখতে বেরিয়ে গেছে।

চমৎকার!

কখন ফিরবে কেউ বলতে পারলে না। দেরিও হতে পারে, তাড়াতাড়িও ফিরতে পারে। কিছুই ঠিক নেই।

কি করবে রামকিঙ্কর? তার পরীক্ষার পড়া আছে। ফিরে যাবে? না, আর একটু অপেক্ষা করবে?

মালতী একটু অপেক্ষা করে জবাব আনতে বলেছে। জবাব না নিয়ে ফিরে যেতে তার মন চাইছিল না। মালতীর উপর তার যেন একটু শ্রদ্ধা জেগেছে। তার দুঃখের কথা পাঁচ মুখে শুনে একটু মমতাও পড়ে গেছে।

তার উপর রোগী।

রোগীর জন্যে ডাক্তারের কাছ থেকে নির্দেশ নিয়ে যাওয়া নিশ্চয়ই দরকার। পরীক্ষা ত আছেই। যে সময়টা এখানে নষ্ট হবে, রাত্রি জেগে সেটা পুষিয়ে নিলেই চলবে।

রামকিঙ্কর অপেক্ষা করাই স্থির করলে।

খুব বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। মনোহর এসে গেল। তার হাতে রামকিঙ্কর চিঠিটা দিলে।

মনোহর তার ঘরের মধ্যে ঢুকে চিঠিটা পড়ে রামকিঙ্করকে ডাকলে: আপনি কি একটু অপেক্ষা করতে পারবেন? তা হলে জবাবটা লিখে দিতে পারি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি বাইরে বসছি। খুব বেশি দেরি হবে কি?

—পাঁচ মিনিট।

—আচ্ছা।

রামকিঙ্কর বাইরে অপেক্ষা করতে লাগল। মনোহর চিঠিটা লিখে ওকে দিলে।

রামকিঙ্কর চলে এল।

রামকিঙ্কর পথে নামল।

প্রচণ্ড ভিড়। কলকাতায় পদার্পণের সেই প্রথম দিন থেকে রামকিঙ্কর দেখে আসছে এই ভিড়। সকাল নেই, সন্ধ্যা নেই, মানুষ শুধু দ্রুতবেগে চলছে।

কোথায় যায় এত লোক? কারও যেন মুহূর্তমাত্র নষ্ট করার যো নেই। তার দোকানঘরের শিক-ঘেরা বারান্দায় বসে বসে এই ভিড় সে দেখে আসছে গত অনেক কয়েক বৎসর ধরে পরম কৌতূহলে ও কৌতুকের সঙ্গে।

তার গ্রামে মানুষ এত ঘোরে না, এমন ছোটেও না। সেখানে প্রত্যেকের নষ্ট করবার মত প্রচুর অবসর। সেখানে কাজের মধ্যেও অবসর। রাখাল ছেলে মাঠে গরু ছেড়ে দিয়ে গাছের ছায়ায় বসে বাঁশী বাজায়, খেলা করে।

ক্ষেতের কাজ করতে করতেও আলের মাথায় বসে দু' দণ্ড তামাক টানে, গল্প করে।

এখানে এমন কেন ?

কাজ আর কোথায় নেই ? কিন্তু এমন নিরর্থক নিরেট কাজ আর কোথায় আছে ?

রামকিঙ্করের বুক-পকেটে মনোহরের চিঠি।

একটা পার্কের পাশ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ তারও মনে হ'ল একটু বিশ্রাম নিলে ভাল হয়।

সেখানেও ভিড়।

ছোকরাদের দল পার্কের ভিতর বন বন করে ঘুরছে। বুড়োর দল সারি সারি বেঞ্চ দখল করে বসে। ছেলেরা বোধ হয় তারই মত পরীক্ষার্থী। সমস্ত দিন মেসের অন্ধকার ঘরে বসে পড়া মুখস্থ করেছে। এখন সেই সব কোটর থেকে বেরিয়ে যুগপৎ মুক্ত বায়ু সেবন এবং শরীর-চর্চায় নিযুক্ত।

অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধেরা বসে বাজারদরের গল্প করছেন। কি ছিল আর কি হ'ল ? জিনিষপত্রের দাম হু হু করে বেড়ে চলেছে। কিছুটি কিনে খাবার উপায় নেই। পুরণো দিনের রোমন্থন। অতীতের সব সুখ আর বর্তমানের সবই দুঃখ।

এমনি একটা বেঞ্চের পিছনে রামকিঙ্কর ঘাসের উপর বসে পড়ল।

বেশ লাগছিল শুনতে পুরণো কালের গল্প। মাছ-মাংস, আলু পটল-উচ্ছে-বেগুন, যে সমস্ত কথা একদিনও তার ভাববার প্রয়োজন হয়নি, তারই তুচ্ছ কথা।

বুক-পকেটে খস্ খস্ করছে মনোহরের চিঠি। আলু-পটলের গল্প শুনতে শুনতে তার উপর একবার হাত বুলিয়ে নিলে।

খাদ্যসুখ !

খাদ্যসুখ বলে যে একটা ব্যাপার আছে, রামকিঙ্কর যেন এই প্রথম শুনলে।

কি গ্রামে, কি কলকাতার দোকানে, ক্ষুধার মুখে যা পায়, পেট ভরে খায়। সবই অমৃত বোধ হয়। বাজারে যেতে হয় না। কোন্ জিনিসের কত দর জানবার প্রয়োজন হয় না। বাবুদের বাড়ীতে খাওয়ার কিছু উন্নতি হয়েছে বটে, কিন্তু সেও ত ঠাকুরবাড়ীর প্রসাদ, চালের দর জানবার দরকার হয় না।

চিঠিটা বুকের উপর আবার খস খস করে উঠল। রামকিঙ্কর বুক-পকেট থেকে খামখানা বের করলে।

নীল খামের মধ্যে অল্প কয়েকটি কথা বোধ হয়। খাম খুব ভারী নয়। ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র, সে আর কত ভারীই বা হবে ! গোটাকয়েক কথা।

কিন্তু গোটাকয়েক কথার জন্যে একটা খামই বা কেন ? আর সে-খাম আঁটাই বা কেন ? ডাক্তারের ত খামে এঁটে ব্যবস্থাপত্র বড় একটা দেয় না।

রামকিঙ্কর স্বভাবত সন্দেহপরায়ণ ছেলে নয়। তবু তার মন কেমন যেন সন্দেহে উসখুস করে উঠল। লোভ হ'ল খামটা খুলে দেখবার। কান গরম হয়ে উঠল। আঙুলগুলো নিসপিস করতে লাগল নীল খামটা খোলবার জন্যে।

খোলা খুব কঠিন নয়। আঠা-দেওয়া জায়গাটা একটু জলে ভিজিয়ে নিয়ে খোলা যায়। আঠা এখনও নরম আছে। খুব সহজে খুলে আবার এঁটে দেওয়া যায়।

কি যে ওর হ'ল, হাত ঠক ঠক কাঁপছে। দুই চোখে জ্বালা বোধ করছে। রামকিঙ্কর ঘেমে উঠল। এত বড় বিশ্বাসঘাতকতার কাজ সে জীবনে কখনও করেনি।

মালতী তাকে বিশ্বাস করে।

সে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। চিঠিখানা বুক-পকেটে পুরে হন হন করে হাঁটতে লাগল। এখানে নিরি-বিলি আর বেশিক্ষণ বসে থাকা নিরাপদ নয়। নিজেকে তার বিশ্বাস হয় না। নিজেকে তার বিশ্বাস হয় না।

মালতী বোধ হয় তার জন্যেই প্রতীক্ষা করছিল।

রামকিঙ্করকে দেখেই জিজ্ঞাসা করল, এত দেরি হল যে ? দেখা হয়নি ?

—হয়েছে।

রামকিঙ্কর খামখানি তাকে দিলে। পরিষ্কার বড় বড় অক্ষরে ঠিকানা লেখা আছে : মালতী দেবী। অক্ষর-গুলো তার লোভার্ত চোখের সামনে কালো আগুনের মত জ্বল জ্বল করে উঠল।

বললে, ডাক্তারবাবু ছিলেন না। বাইরে রোগী দেখতে গিয়েছিলেন। তাই অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

—ও !

মালতী নির্নিমেষে ওর চোখের দিকে চেয়ে। রামকিঙ্করের কথাগুলো কেমন বেসুরো বোধ হচ্ছিল। মুখখানা তখনও কি রকম অস্বাভাবিক রক্তাভ।

রামকিঙ্করও সেই বিস্মিত দৃষ্টিতে অস্বস্তি বোধ করছিল। মালতী আর কিছু বললে না দেখে তাড়াতাড়ি ঘরে এল।

নিজের ঘরে এসে কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে ঢক ঢক করে এক গ্লাস জল খেলে আগে। বিছানায় বসে সুস্থ হতে সময় নিলে কিছুক্ষণ। তারপর খোলা বই-এর সামনে বসে ভাবতে সুরু করলে।

উঃ! কি দুরূহ কাজ একটা সে করলে! নিজের উপর তার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল।

কিন্তু শ্রদ্ধার কথা পরে ভাববে। আপাততঃ সামনে পরীক্ষা। তাকে পাস করতে হবে।

রামকিঙ্কর বই খুলে বসল। কিন্তু পড়া এগোয় না। যেটুকু পড়ছে তাও মনে থাকছে না। পড়ছে, কিন্তু যেন বুঝতে পারছে না। এ ত মহা মুশকিল।

রামকিঙ্কর বিরক্ত হয়ে বই বন্ধ করে ফেললে। স্থির করলে খেয়েদেয়ে এসে পড়তে বসবে, একটানা রাত দুটো পর্যন্ত।

কিন্তু খেয়েদেয়ে এসেও সেই একই অবস্থা।

কি যেন তার হয়েছে। মনে মন নেই।

সে বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

অন্ধকার রাত। আকাশে চাঁদ নেই। শুধু জলজল করছে অসংখ্য তারা। কোথাও আলো জলছে না। শুধু দেউড়ির যে আলোটা সারা রাত জ্বলে, সেইটে জলছে।

সামনে উঠান। তার ওপারে অন্দর। ঝিলমিলের জন্যে ঘর দেখা যায় না বটে, তবে আলোর আভা দেখা যায়। সেখানেও আলো জলছে বলে বোধ হয় না।

মালতীকে রামকিঙ্করের বড় ভাল লেগেছে। কিছু গম্ভীর, কিছু বিষণ্ণ, কিন্তু ভারী মিষ্টি।

নিস্তব্ধ রাত্রি।

হঠাৎ যেন একটা দুমদাম শব্দ পাওয়া গেল। একটা গোঙানির অস্ফুট শব্দ। তার পরেই কতকগুলো চীনামাটির পাত্র ঝনঝন করে ছিটকে পড়ার শব্দ।

রামকিঙ্কর চমকে উঠল।

শব্দটা ঠিক কোন্ ঘর থেকে এল বোঝা না গেলেও রামকিঙ্করের সন্দেহ রইল না—শব্দটা বৌরাণীর ঘর থেকেই এল। এমন শব্দ এর আগে কয়েকদিন পেয়েছে।

বাবু যেদিন একেবারে বেহুঁস হয়ে ফেরেন সেদিন ঘর নিস্তব্ধ থাকে। যেদিন সেরকম বেহুঁস থাকেন না, সেদিন এরকম শব্দ ওঠে। দুমদাম মারের শব্দ, বৌরাণীর অস্ফুট গোঙানি এবং তার পরে চীনামাটি ও কাচের জিনিষপত্র ভাঙার শব্দ।

আমলারা সকলেই জানে এবং তাদের কাছ থেকে রামকিঙ্করও শুনেছে সে-সমস্ত কাহিনী।

তার মনটা খারাপ হয়ে গেল। দ্রুতপদে ঘরের মধ্যে এসে দরজার খিল বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে পড়ল। আর কি কান্না!

পশুটা অমন ফুলের মত সুন্দর মেয়েটাকে মারে কেন? ওকে শাস্তি দেবার কি কেউ নেই? ওই মাতাল বদমাইসটাকে?

রামকিঙ্কর অকস্মাৎ উত্তেজিতভাবে বিছানায় উঠে বসল। দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করে বলতে লাগল, এরকম একটা পশুর হাতে বিনাপরাধে প্রতিদিন লাঞ্ছিত হওয়ার চেয়ে রাস্তায় ভিক্ষা করে খাওয়াও ভাল। বৌরাণী, আপনি কেন তাই করেন না? কি আনন্দে এখানে রয়েছেন? কি আনন্দে এখানে রয়েছেন?

তার চোখের সামনে ভেসে উঠল মনোহর ডাক্তারের নীল খাম এবং তার উপর পরিচ্ছন্ন অক্ষরে লেখা: মালতী দেবী।

কে জানে কি আছে তার মধ্যে লেখা। রোগিণীর জন্যে ব্যবস্থাপত্র অথবা অন্য কিছু। তার মনে হ'ল, অন্য কিছুও যদি তাতে থাকে, হৃদয়-সম্পর্কীয় কিছু, সামাজিকতার দিক দিয়ে অবৈধ হলেও সেটা আসলে দোষাবহ নয়। এবং এই ব্যাপারে যদি কখনও বৌরাণীর কাছে তার সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তার অভাব হবে না।

গিন্নীমাকে সে যথার্থ ই মায়ের মত ভক্তি করে। তাঁর কাছে তার অনেক ঋণ। কিন্তু বৌরাণীকে তিনিও ত ওই রাক্ষসটার হাত থেকে রক্ষা করতে পারছেন না। সুতরাং এ ব্যাপারে সে গিন্নীমার মুখের দিকেও চাইবে না।

ধীরে ধীরে তার হাতের মুঠি শিথিল হয়ে এল।

সত্যই ত, গিন্নীমা তাকে রক্ষা করার চেষ্টা করছেন না কেন? তিনি না পারেন কি? সমগ্র এষ্টেট তাঁর ইঙ্গিতে পরিচালিত হচ্ছে। অথচ নিজের সন্তানকে তিনি শাসন করতে পারছেন না কেন?

অন্ধ স্নেহ, দুর্বলতা, না শ্বশ্রূসুলভ ঔদাসিন্য?

কে জানে কি? রামকিঙ্কর আর ভাবতে পারে না। মনে হ'ল তার মাথায় যেন আগুন জলছে। কুঁজো থেকে জল নিয়ে মাথায় খানিকটা নিলে। বারান্দায় খানিকটা পায়চারি করে বিছানায় এসে চোখ বন্ধ করে শুয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে, রামকিঙ্কর সবে পড়তে বসেছে, গিন্নীমা ডেকে পাঠালেন।

রামকিঙ্কর ঠাকুরদালানে গিয়ে দাঁড়াল।

গিন্নীমা মুখ তুলে একবার চাইলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, অনেক দিন তোমাকে দেখি নি। তাই ডেকে পাঠালাম। পড়াশুনায় খুব ব্যস্ত ছিলে বুঝি?

মাথা চুলকে রামকিঙ্কর বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ, একটুখানি আছি।

—একটুখানি? কেন, একটুখানি কেন? পাঁচজনের ফরমাস খাটতে হচ্ছে বুঝি?

—না, না। সেরকম কিছু না।

গিন্নীমা বললেন, শোন, তোমাকে বলি, ওখানে তোমার পড়াশোনার অসুবিধা হলে আমি তোমাকে এখানে এনেছি। মন দিয়ে পড়াশোনা করে তোমাকে পাস করতে হবে। যে জন্যে আনা তাই করবে। বাজে কাজে মন দেবে না।

কি সর্বনাশ!

রামকিঙ্কর শুনে আসছে, এ বাড়ীতে গিন্নীমার অজ্ঞাতসারে কিছুই হবার জো নেই। এখন দেখলে, কথাটা অতিরঞ্জিত নয়। তাঁকে সব সময় দেখা যাক বা না যাক, তিনি সব দেখতে পান, শুনতেও পান।

কাল বৌরাণীর ফরমাইস খাটতে সে যে মনোহর ডাক্তারের চেম্বারে গিয়েছিল, বুঝলে, তাও গিন্নীমার দৃষ্টি এড়ায় নি। এবং এই ইঙ্গিতপূর্ণ হুঁসিয়ারি সেই জন্যেই।

রামকিঙ্কর চিন্তিত মুখে নিজের ঘরে ফিরে এল।

সত্যই ত। গিন্নীমাই তাকে এ বাড়ীতে স্থান দিয়েছেন। বাবুও নয়, বৌরাণীও নয়। আর সেটা নিরিবিলি মন দিয়ে পড়াশোনা করবার জন্যে। গরীবের ছেলে, এতবড় সুযোগের অপব্যবহার করা কখনই সঙ্গত হবে না।

থাকগে, সে যা হবার হয়ে গেছে। এখন মন দিয়ে পড়তে বসা।

সমস্ত দিন মন দিয়েই সে পড়ল।

সন্ধ্যাবেলায় বৌরাণীর খাস ঝি কাপড়ের আড়ালে এক ঠোঙা খাবার নিয়ে এসে উপস্থিত।

কি ব্যাপার?

বৌরাণী পাঠিয়েছেন।

বাজারের খাবার নয়, বাড়ীর তৈরি। হয়ত বৌরাণীর নিজের হাতে তৈরি, কি হয়ত নয়, বাড়ীতে যে খাবার নিত্য তৈরি হয় তাই।

রামকিঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, হঠাৎ বৌরাণী খাবার পাঠালেন?

মুচকি হেসে ঝি বললে, কি জানি।

রামকিঙ্কর বুঝলে, কালকের কাজের মজুরি।

বললে, বৌরাণীর অনুগ্রহ ভুলব না।

ঝি একখানা খাম বের করে রামকিঙ্করের হাতে দিলে, বললে, কালকের মত এটারও জবাব আনতে হবে।

আবার ফরমাস?

রামকিঙ্করের মুখ শুকিয়ে গেল।

ঝি বললে, অন্দরে যাবার দরকার নেই। আমি এক সময় এসে নিয়ে যাব।

রামকিঙ্কর বললে, একটা কথা জিগ্যেস করব?

ফিক করে হেসে ঝি বললে, এখন নয়। এখন আমার দাঁড়াবার ফুরসুৎ নেই। চিঠি নিতে যখন আসব, তখন শুনব।

ঝি যেমন দ্রুতপদে এসেছিল, তেমনি দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল।

আর কিছু নয়, কাল রাত্রে রামকিঙ্কর যে দুমদাম এবং অস্ফুট গোঙানি শুনেছিল সেই সম্বন্ধে ঝিয়ের কাছ থেকে কৌতূহল চরিতার্থ করার ইচ্ছা ছিল।

হ'ল না।

কিন্তু ঝি তো চিঠি দিয়ে নিশ্চেন্তে চলে গেল, সে করবে কি? গিন্নীমার ইঙ্গিত স্পষ্ট। তার পরে বৌরাণীর ফরমাস খাটতে তার ভয় হচ্ছে।

অন্য দিকে বৌরাণীর উপরও তার একটা মমতা পড়ে গেছে। দুঃখ সে অনেক দেখেছে। দুঃখীর ঘরের ছেলে, দুঃখের সঙ্গে তার জন্ম থেকেই পরিচয়। কিন্তু ঐশ্বর্যের মধ্যেও যে এত দুঃখ থাকতে পারে এ সে কখনও কল্পনাও করেনি।

এবং বোধ করি ঐশ্বর্যের মধ্যে বলেই বৌরাণীর দুঃখ তাকে অত বেশি আকর্ষণ করেছে। আহা, কমলবনের লক্ষ্মীর মতো মেয়ে। সেই কমলবন ওই মাতাল হাতীটা বিপর্যস্ত করে দিলে!

সম্ভবত ভয়ের চেয়ে মমতার জোর বেশি।

খানিকটা এ-দিক্ ও-দিক্ করে রামকিঙ্কর গেল মনোহর ডাক্তারের চেম্বারে। জবাবও আনতে হ'ল।

খাস ঝি তাকে অন্দরে যেতে নিষেধ করেছিল। বোধ হয় গিন্নীমার ভয়েই। অন্দরে হয় তো কিছু হয়ে থাকবে। ঝি নিজেই এসে জবাবটা নিয়ে যাবে বলে গেছে। রামকিঙ্কর তার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

অনেকক্ষণ পরে ঝি এল।

হেসে বললে, আপনি ফিরেছেন টের পেয়েছি। কিন্তু আসবার সুযোগ পাচ্ছিলাম না।

—কেন?

—গিন্নীমার খাস ঝি তার জানলায় দাঁড়িয়ে ছিল।

—তাতে কি?

চোখ বড় বড় করে ঝি বললে, ওরে বাবা! ও হ'ল সাংঘাতিক মেয়েমানুষ। ওই তো গিন্নীমার চর। কোথায় কি হচ্ছে, কে কি করছে, ওই তো সব ওঁর কানে তোলে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। ওর সম্বন্ধে খুব হুঁসিয়ার থাকবেন। এখানে এসেছি কত ভয়ে ভয়ে জানেন?

ঝি হাসতে লাগল: ওকে এ বাড়ীর ঝি-চাকর সবাই ভয় পায়।

রামকিঙ্কর ওর চোখের দিকে অপলক চেয়ে। চোখ যেন নাচছে। ঝিও সেটা বুঝতে পারছে এবং থেকে থেকে নিজের দেহে হিল্লোল তুলছে।

রামকিঙ্কর বললে, যে কথা জিগ্যেস করছিলাম, এখন জবাব দেবার সময় হবে?

—সময় নেই। তবু তাড়াতাড়ি বলুন, আমি তাড়াতাড়ি জবাব দিয়ে পালাই।

রামকিঙ্কর গত রাত্রের কথাটা জানতে চাইলে।

ঝি কিছুক্ষণ গুম হয়ে রইল। তার পর বললে, আপনি যা সন্দেহ করছেন ঠিকই। এসব গিন্নীমার কাণ্ড। তিনিই বাবুকে কিছু লাগিয়েছেন।

—তাই নাকি?

রামকিঙ্কর অবাক্।

নাক নেড়ে ঝি বললে, গিন্নীমা কি কম নাকি? বৌরাণীর কোন দোষ নেই। মিছিমিছি লাগিয়ে তাঁকে মার খাওয়ান।

রামকিঙ্কর গুম হয়ে রইল। গিন্নীমার কাছে এত স্নেহ এবং অনুগ্রহ সে পেয়েছে যে, ব্যাপারটা তার পক্ষে বিশ্বাস করাই কঠিন। অথচ অবিশ্বাসেরও কিছুই নেই। পল্লী অঞ্চলে অনেক বৌকাঁটকী শাশুড়ী সে দেখেছে। শাশুড়ী সর্ব্বত্রই শাশুড়ী। গ্রামেই বা কি, আর শহরেই বা কি।

ঝি বললে, এখানে আমি বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারব না। কাল বিকেলে যদি পার্কে যান, সেখানে সব কথা বলব।

এদের বাড়ীর ব্যাপার নিয়ে রামকিঙ্করের কোন আগ্রহ নেই। সে গরীব গৃহস্থ। কি হবে তার ধনীগৃহের কেচ্ছা শুনে? কিন্তু ঝিয়ের গলাটি ভারী মিষ্টি। কথা বলবার ভঙ্গীটাও। তার সঙ্গে নিরিবিলি কিছুক্ষণ কথা বলা যায়। সেই আগ্রহে সে রাজী হ'ল।

বললে, কাল বিকেলে?

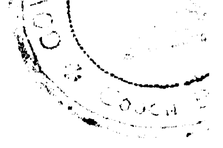
—হ্যাঁ। আপনার সময় হবে না?

—হবে। তোমার নামটি কি?

—আমাকে সারদা বলে ডাকবেন।

চিঠিখানা নিয়ে যাবার সময় সারদা পিছু ফিরে একটা বিলোল কটাক্ষ হেনে চলে গেল।

ক্রমশঃ



মহড়া

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

এই জীবনে যা-কিছু ঘটে গেছে,
যা-কিছু আরো ঘটবে ব'লে ভাবি,
সে-সব যেন ঘটনা ঠিক নয়।
একটা কিছু ঘটবে কোনোখানে,
একটা কিছু ঘটবে কোনোদিন,
এ যেন তারই কেবল মহড়া।

কান্না যত কেঁদেছি, তাও যেন
আসল যেটা কান্না সেটা নয়।
হেসেছি যত, নয় তা যেন হাসি,
কান্নাহাসির দিয়েছি মহড়া।

দিয়েছি মন না রেখে কিছু হাতে,
এ দেহ ভ'রে দিয়েছি দেহ-ভোগ,
কিছুই যেন হয়নি তবু দেওয়া,
হয়েছে যা তা কেবল মহড়া।

নিবিড় ক'রে বেঁচেছি দিনে দিনে,
তবুও আজ কেন যে মনে হয়,
আরেক বাঁচা রয়েছে কোনোখানে,
আরেক বাঁচা বাঁচব কোনোদিন,
এ-বাঁচা তারই কেবল মহড়া।

সূর্য্য যেন সূর্য্য সেজে আসে,
পৃথিবী কোন্ পৃথিবী হতে চায়,
জন্মমৃত্যু দুয়ের নাচানাচি
অন্য কোনো নাচের মহড়া।

সমুখে দেখি রঙীন পট দোলে
বিচিত্র এই জীবন দিয়ে আঁকা।
কখনো সেটা একটু যেন নড়ে,
একটু যেন বায়ও স'রে স'রে,
কি আশা নিয়ে আকুল চোখে চাই,
পিছনে দেখি অকূল অন্ধকার!

তবুও মন বলে যে, হবে, হবে,
একটা কোনো নাটক অর্থে-ভরা।
এই যে বাঁচা, এই যে ম'রে যাওয়া,
এই পিছনে, এই সমুখে চাওয়া,
রঙীন সেই পর্দা উঠে গেলে
জানব, ছিল কিসের মহড়া।

অমর আমি হব কি হব না
তা নিয়ে আজ ভাবনা করা মিছে
আমি যে জানি, আমার আমি নিয়ে
চলেছি দিয়ে আমির মহড়া।

হৃদয়ের হারিয়ে-যাওয়া স্পন্দন

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

হঠাৎ বুকের একটি স্পন্দন যেন হারিয়ে গেলো,
ট্রাফিক পুলিশ হাত তুললে সারি সারি গাড়ি যেমন থেমে যায়।
কোথায় যেন আছে মহুয়ার বন,
কোথায় যেন জ্বলছে পলাশের আগুন,
হৃদয়ের সেই হারিয়ে-যাওয়া স্পন্দন
যেন তাদের খুঁজছে।

কোথায় আছে এমন এক নক্ষত্র
যার আলো এখনো এখানে পৌঁছয় নি ?
কোথায় আছে এমন একটি সুর
এখনো যা গাওয়া হয় নি ?
হৃদয়ের সেই হারিয়ে-যাওয়া স্পন্দন
তাদের খুঁজছে ?

ট্রাফিক পুলিশের হাত নেমেছে,
কখন আবার সারি-সারি গাড়ি চলতে শুরু করেছে।
পাশের লোকের কথা ঠিক কানে আসে না।
জনস্রোত, বাড়ি, কুয়াশা, রোদ্দুর—
কিছুই দেখি না॥

জোয়ার-ভাটার জল

শ্রীসুনীলকুমার নন্দী

কথায় কথায় এসে গেছি অনেক দূরে, যাই—
ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে হবে···ছড়িয়ে আছে কাজ,
এক সংসার টুকিটাকি, ওসব কথা থাক—
ভাটার টানে ফিরবো, তুমি জোয়ার জোয়ার যাও।

আর কথা নয়, রক্তমাখা বুকের নিরুপম
শব্দ কত বইতে পারে···জোয়ার এলো ওই···
যাও তুমি যাও যাবেই যখন, আমিও ফিরে যাই—
ভাটার টানে ফিরবো, তুমি মিথ্যে করো ভয়···

চোখ মুছে নাও···ঘুর্ণিস্রোতে হঠাৎ পরিচয়—
এক ভাসানে ভাসা কি যায় জোয়ার-ভাটার জল !

প্রসাধন

শ্রীসুনীতি দেবী

চোখে নেই কাজলের লেশ,
চুলে বুঝি পড়ে গেছে জটা,
প্রসাধন হয়নি ক' শেষ,
এখনই কি বেজে গেল ছ'টা ?

ছড়ান রয়েছে এত শাড়ী,
কোন্‌টা যে পরে নাহি জানে,
যত ছাই করে তাড়াতাড়ি,
ছোটে ঘড়ি, বারণ না মানে ।

এখনও যে টিপ আঁকা বাকি,
সময় নেই ত আর বেশী,
বেণী আজ বাঁধবে না নাকি ?
থাকবে কি হয়ে এলোকেশী ?

গয়নার ঝাঁপি থাকে পড়ে,
কানে শুধু একজোড়া দুল ;
ঝাপটা ও সিঁথি কেউ পরে ?
খোঁপায় জড়ায় বেলফুল ।

ও-বাড়ীর বৌয়ের মতন
ঠোঁটে রং মোটে দেয় না সে,
কি জানি ভুলে বা কোনক্ষণ
যদি প্রিয়—? থাকে সেই আশে !

টং টং ঘড়ি বেজে ওঠে,
প্রসাধন-স্বপ্ন মিলায়,
নয়নের ঘুমঘোর ছোটে,
জাগা মন করে হায়, হায় ।

রংচটা দেয়ালের পাশে
আলনায় ছেঁড়া শাড়ী ঝোলে,
দাঁতভাঙ্গা চিরুণীটা হাসে,
বাঁকা হয়ে আয়নাটা দোলে ।

গয়নার ঝাঁপি আর নেই,
কানে নেই রতনের দুল,
একা শুধু বসে আছে সে-ই,
নেই মালা, নেই বেলফুল !

স্বপন-ভাবনা ভুলে যায়,
উনুন ধরান আগে চাই,
আপিস ফেরতা খাওয়া চায়—
জানে না সে মাথার বালাই !

এবার নূতন প্রসাধন,
কোমরে আঁচল টেনে বাঁধে,
কড়া ধরে নাড়ে ব্যঞ্জন,
ধোঁয়ার ছলনা করে কাঁদে ।

পথে-বিপথে

শ্রীচারুলতা রায়চৌধুরী

সংসারে আমার একমাত্র বন্ধন আমার মা। অতি শৈশবে পিতাকে হারিয়ে তাঁরই স্নেহচ্ছায়ায় বড় হয়ে উঠেছি। উপার্জনক্ষম লোকটি চ'লে গেলে সকল ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে আমাদের বেলায়ও তাই ঘটেছে, অর্থাৎ কষ্টে জীবনযাত্রা নির্বাহ হয়েছে। যথেষ্ট বয়স হবার পূর্বে পর্যন্ত আমি এ সম্বন্ধে ঘুণাক্ষরে জানতে পারি নি, এবং জানবার তাগিদও বোধ করি নি। কোন্ মহাশক্তির সাহায্যে দৈন্যের সমস্ত লক্ষণ মা আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন তা একমাত্র তিনিই বলতে পারেন। আমার জ্ঞান ও বয়স যখন বোঝার কোঠায় এসে পৌঁছাল তখন দেখতে পেলাম, আমার মা'র শরীরে ভাঙ্গন ধরেছে। এ যে আমার পক্ষে কতবড় ক্ষতি তা তিনি নিশ্চিত জানতেন, তাই এ হেন অপ্রিয় সত্যটাকে আমার কাছ থেকে গোপন রাখবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সক্ষম হন নি। নিজের অসুস্থতার কথাকে আমল দিতে তিনি অনিচ্ছুক সেটা আমার ভাল রকম জানা ছিল, তাই সে কথার উল্লেখমাত্র না ক'রে আমি একদিন তাঁকে বললাম—দেখ মা, তোমার কাজের পালা এবার শেষ করতে হবে। আমি চিরদিন অকেজো হয়ে থাকব এটা ঠিক নয়। এবার আমার কাজের হোক সুরু। কিন্তু তার আগে একবার দেশভ্রমণে বার হবার ইচ্ছা করেছি। তোমাকেও সঙ্গে যেতে হবে। বায়ুপরিবর্তনের কথা বললে মা সেটা হেসে উড়িয়ে দিতেন, তাই এই লুকোচুরির অবতারণা।

এ যখনকার কথা বলছি তখন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের সবগুলি চেক-পয়েন্ট পার হয়ে সরকারী উচ্চপদস্থ চাকুরিতে প্রতিষ্ঠিত হবার ছাড়পত্র পেয়ে গেছি। ছাত্র হিসাবে মন্দ ছিলাম না, তাই খুব বেশী উমেদারির প্রয়োজন হয় নি। মা বললেন,—শোন একবার ছেলের কথা। তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, এখন আমায় যেতে হবে ওঁর সঙ্গে ঘোরাঘুরি করতে। আমার সে বয়স আছে নাকি? তার চেয়ে আমি বলি কি, আগে তুই একটি মনের মত বৌ নিয়ে আয়। তারপর তাকে নিয়ে খুব এদেশ-ওদেশ ঘুরে বেড়াবি আর আমি নেব তোদের সংসার আগলে থাকার ভার। কেমন, রাজী?

আমি বললাম—বাঃ, এ অতি প্রাঞ্জল ব্যবস্থা! কিন্তু সে পরের কথা পরে হবে। উপস্থিত সুযোগ পেলেই আমি পাড়ি দেব এবং তোমাকেও সঙ্গে যেতে হবে। কোন আপত্তি চলবে না। অতএব প্রস্তুত থেক।

এ যুগে জন্ম নিলেও আমি মানুষটা হচ্ছি নিতান্ত কুণো-ধরণের। মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশায় আড়ষ্ট ভাবটা আমার পুরোদস্তুর বজায় আছে। কোন সুন্দরীর পায়ের শৃঙ্খল হবার বাসনা তাই আমার একেবারেই ছিল না। কথাটা বিশ্বাসযোগ্য না হলেও নিছক সত্য, এর মধ্যে ভেজাল মিশ্রিত নেই। তাই পাছে বৌ আনার প্রসঙ্গটা আবার উঠে পড়ে সেই ভয়ে কথা কয়টি ব'লেই সেস্থান ত্যাগ ক'রে তখনকার মত পরিত্রাণ পেলাম।

কারুর ভাল চাকরি হবার খবরটা বাতাসের চেয়েও শীঘ্র চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আমার বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হ'ল না। অমনি আমার দেশের বিবাহযোগ্যা মেয়েদের অভিভাবকের দল চঞ্চল হয়ে উঠলেন। হঠাৎ দেখতে পেলাম, লোকসমাজে মা বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। অতিথি-অভ্যাগতের আমদানি হ'তে লাগল যতটা আশঙ্কা করেছিলাম তার চেয়ে বেশী। এই পরিবেশটি আমার বিশেষ মনোমত হ'ল না। তাই ঘরে যত লোকসমাগম হ'তে লাগল বাহিরের প্রতি আকর্ষণ যেন আমার ততই বেড়ে উঠল। মা বললেন—তুই বড় একলষেঁড়ে মানুষ। লোক এলে অমন করে পালাস কেন বল্ ত? প্রকাশ্যে বললাম—করি কি, কাজ থাকে যে। মনে মনে বললাম, শুভানুধ্যায়ীদের কাছ থেকে নিষ্কৃতি পেতে হ'লে পালানই যে একমাত্র পথ।

হ'ল কিন্তু হিতে বিপরীত। এঁরা মা'র কাছে আমার চরিত্রশুদ্ধির পরামর্শ দিতে লাগলেন, অর্থাৎ কিনা শুভস্য শীঘ্রম্, তা না হ'লে রসাতলের পথ পরিষ্কার। মা সরল মানুষ, তাঁদের গুপ্ত অভিসন্ধি বোঝা তাঁর পক্ষে সহজ হ'ল না।

আমার নাম ছিল বিনয় কিন্তু মা'র কাছে ছিলাম

আমি আজন্ম 'খোকা'। নিতান্ত অপরিচিত মানুষের সামনে অথবা আমার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করবার প্রয়োজন বোধ করলে সেটাকে সংশোধন করে নিয়ে বলতেন 'বিনু'।

একদিন আমি বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি এমন সময় মা ডাকলেন, খোকা শোন্।

আমি বললাম, যা বলবার একটু তাড়াতাড়ি বলে ফেল মা। বিশেষ কাজে এখুনি আমাকে একবার বাইরে যেতে হবে।

মা অভিমানের সুরে বললেন—তবে যা। আমি কিছু বলতে গেলেই তোর আজকাল কাজের অছিলা এসে পড়ে।

কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। মা ডাকলেই ভয় হয়, এই বুঝি বিয়ের প্রসঙ্গটা এসে পড়ে। প্রকাশ্যে বললাম —রাগ কর কেন মা? এই আমি সুবোধ বালকের মত বসলাম। এইবার বল তোমার কথা।

—তুই এই রকম ঘরছাড়া হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিস, লোকে যে আমায় মন্দ বলছে।

তোমায় মন্দ বলছে? কেন বল দেখি?

—তারা বলে, আমি তোকে আঁচলে বেঁধে রাখতে চাই, তাই বিয়ের কথায় কান দিচ্ছি না।

—কি নিঃস্বার্থ প্রেম! আমার জন্য তাদের অত মাথা-ব্যথা কেন বল ত? ঘরে মেয়ে আছে বুঝি? এবার বললে বলে দিও পরের কথা না ভেবে নিজের চরকায় তেল দিতে।

মা মিনতি ক'রে বললেন, না খোকা, তুই আর আপত্তি করিস্ নে। আমি আর কতদিনই বা বাঁচব? যাবার আগে নাতির মুখ দেখে যাবার আমার বড় সাধ।

আমি বললাম, তোমাকে সবাই হিংসা করছে এটা তুমি বুঝতে পারছ না কেন মা? আমরা দু'টিতে কেমন শান্তিতে আছি। কলহ-বিবাদের নাম-গন্ধ কোথাও নেই। এটা তাদের সহ্য হচ্ছে না বলেই না তারা পরের মেয়ে ঘরে এনে ঘর ভাঙ্গার পরামর্শ দিচ্ছে।

—এ তোর কেমন কথা বাবা? পরের মেয়ে হলেই কি সে ঘর ভাঙ্গে? আমাকেও ত তোর বাবা পরের ঘর থেকেই এনেছিলেন।

—মা, তোমার মুখে শুনেছি তুমি বেশী লেখাপড়া কর নি। আমি অনেক লেখাপড়া করেও তর্কে তোমার সঙ্গে কোন দিন পেরে উঠি নি। তাই তর্ক তোমার সঙ্গে আমি করব না।

মা উষ্মা প্রকাশ করে বললেন, তোর চালাকি আমি বুঝি। কথাটাকে অমন করে চাপা দেওয়া চলবে না বিনু। এবার আমার কথা না রাখলে তোর কোন কথাই আমি আর শুনব না। তোর ঘর-সংসার তোর হাতে তুলে দিয়ে আমি কাশী চলে যাব, এই আমি তোকে বলে রাখলাম।

—ঐ দেখ মা, তুমি আবার রাগ করছ। তোমার কথা শুনব না, আমি কি তাই বলেছি? এত বড় একটা বোঝা ঘাড়ে চাপাবার আগে একটু ভাবতে সময় দেবে ত? আজ দেরি হয়ে যাচ্ছে, পরে আবার তোমার কথা শুনব। এই ব'লে সেখান থেকে প্রস্থান করে তখনকার মত নিষ্কৃতি পেলাম বটে কিন্তু কথাটার যে ঐখানেই নিষ্পত্তি হ'ল না তা বেশ ভাল করেই বুঝলাম।

এর কিছুকাল পরে দু'টি আকস্মিক দুর্ঘটনা আমার জীবনের সবকিছু ওলট্-পালট্ করে দিল। প্রথম, আমার মা হঠাৎ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে আমাকে সর্ব-প্রকারে মুক্ত করে দিয়ে ইহলোক থেকে বিদায় নিলেন। তাঁর তিরোধানে পৃথিবী যে আমার কাছে কতখানি শূন্য হয়ে গেল তা প্রকাশ করবার ভাষা আমার নেই। ঘরে আমি টিঁকতে পারলাম না তাই দীর্ঘদিনের মত ছুটি নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়লাম।

নানা দেশ-দেশান্তর ঘুরে-ফিরে যখন এলাম, দেখলাম, এই সাময়িক অনুপস্থিতির মধ্যে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার বেশ একটা পরিবর্তন ঘটেছে। মানুষের অবিমৃষ্যকারিতার ফলস্বরূপ এ অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। তার ফলে চারিদিকে হাহাকার পড়ে গেছে।

আমার ঘরটান ছিল না। নেমে পড়লাম দুঃস্থদের সেবায়। নানা জাতীয় স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গে অবাধ মেলা-মেশার এই হ'ল প্রথম সূত্রপাত। এ ধরণের সেবার কাজ অন্য অনেকের সঙ্গে একযোগে করতে হয়, অন্যদিকে যাদের জন্যে এই কাজ তাদের থেকেও নিজেকে সব সময় দূরে রাখা চলে না। ফলে, যে পরিবেশকে এতদিন পর্যন্ত আমি সভয়ে এড়িয়ে এসেছিলাম তারই মধ্যে এসে আমাকে বেশ নিবিড়ভাবে জড়িয়ে পড়তে হ'ল।

শুধু তাই নয়, নারী-সংসর্গ যে জীবনে কোন রসের খোরাক যোগাতে পারে তাও এই আমি প্রথম উপলব্ধি করলাম। এর ফলে আমার মধ্যেকার-পুরুষ-চেতনা ক্রমে জাগ্রত ও তারপর উন্মুখ হয়ে উঠল।

বিবাহের পাত্র হিসাবে আমার মূল্য তখনও কিন্তু কিছুমাত্র হ্রাস হয় নি। ইচ্ছাপ্রকাশ করলেই বধূ বরণ করে এনে সহজ জীবনযাত্রা নির্বাহ করা আমার হাতের মুঠোর মধ্যেই ছিল। কিন্তু গাঁটছড়ার বন্ধনে জড়িয়ে

পড়লে তা থেকে বেরিয়ে আসার পথ যে খুঁজে পাওয়া যায় না, তা ত জানা ছিল। আমার তখনকার জীবনে চারদিক্‌কার মোহময় পরিবেশে এই বাঁধনে ধরা দিতে মন সায় দিল না।

কি যেন একটা খুঁজে বেড়াচ্ছি অথচ পাচ্ছি না এই যখন আমার মনের অবস্থা, একটি তরুণী এসে রঙ্গমঞ্চে দেখা দিল, নিয়ে গেল ডেকে, দেখিয়ে দিলে পথ। সুরু হ'ল আমার অভিসার। দিনের আলোয় যে পথে চলতে মানুষ দ্বিধাবোধ করে, রাত্রির অন্ধকার চুপিচুপি তাকে সেই পথে টেনে নিয়ে যায়। দিনের বেলা মন বলে, 'ছিঃ, এ তুমি কি করছ।' অন্ধকার এসে সেকথা ভুলিয়ে দেয়। তখন সে বলে, 'আনন্দ পাও কি তুমি একা? প্রতিদানে আনন্দ দাও যে কত।' বিনা বিচারে মেনে নিই এই যুক্তি।

পথ চলতে লোকে ইসারা ক'রে বলে হয়ত—ঐ যাচ্ছে নষ্ট-চরিত্র, কিন্তু কে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করে! আমি তখন চোখমুখ বুজে জলে নেমেছি, কতদূর তলিয়ে যাওয়া যায় দেখব ব'লে।

কিন্তু ভরাডুবি হবার আগে আর একটি ঘটনা আবার আমার জীবনের পর্দা দিল পাল্‌টিয়ে। অভিসারে বার হবার অপেক্ষায় বসে আছি বারান্দায়, দেখি ফটকের সামনে একটি যুবতী নারী অধোবদনে এসে দাঁড়াল। বুকের প্রস্ত আঁচল সে ছবার সম্বরণ করল। জায়গাটা আধ-অন্ধকার, তবু একটু পরেই তার হাবভাবে বুঝতে পারলাম, আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করাই তার উদ্দেশ্য। কাজটাতে যে সে নিতান্তই অনভিজ্ঞা তা বুঝতেও আমার দেরি হ'ল না। সেই সঙ্গে এ সন্দেহও আমার হ'ল যে, আমার সুনাম তার কাছে কোন রকমে পৌঁছে গেছে, আর তাই সে এসেছে আমার কাছে। ইসারায় তাকে কাছে ডাকলাম। ভীত, ত্রস্ত পদে সে এগিয়ে এল। জিজ্ঞাসা করলাম, কি সে চায়। বললে না কিছু, শুধু কাতর দৃষ্টিকে ফিরিয়ে বাইরের দিকে তাকাল একবার। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলাম, অদূরে একটি যুবক মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে। প্রশ্ন করলাম, ওটি কি তোমার স্বামী? তার মুখ দিয়ে অস্ফুট স্বরে বার হ'ল—হ্যাঁ। জিজ্ঞাসা করলাম—এ ব্যবসা তুমি কতদিন সুরু করেছ?

মুখে কিছুই বলল না, সজোরে মাথা নেড়ে প্রতিবাদ জানাল। বুঝিয়ে দিল, ব্যবসা সে করে না।

—তবে কি জন্য এসেছ?

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে এবার সে বললে, আজ পাঁচ-ছয় দিন আমাদের পেটে অন্ন পড়ে নি, ক্ষিদের জ্বালা—আর সে বলতে পারলে না, উদ্গত অশ্রু রোধ করার প্রয়াসেই বোধহয় মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল।

আমি ডাক দিলাম, 'এই শুনে যাও,' কিন্তু কেউ সে ডাকে সাড়া দিল না। পুরুষটি ব্যাপারটা ঠিকমত বুঝতে না পেরে হতভম্বের মত একই ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে ঘরে ডেকে আমার মায়ের কয়েকটি শাড়ী তার হাতে তুলে দিলাম, সেই সঙ্গে দু'টি দশ টাকার নোট। বললাম, তোমার স্ত্রীকে দিও। রহস্যটি তখনও তার কাছে পরিষ্কার হয় নি, তাই সে প্রশ্ন করলে, আবার কবে পাঠিয়ে দেব?

তার প্রয়োজন হবে না শুনে আমার দিকে অর্থহীন দৃষ্টিতে খানিক তাকিয়ে থেকে ক্ষুব্ধ চিত্তেই বোধহয় নিজের আস্তানার দিকে চলে গেল—হয়ত বা ফুটপাথের কোন একটি বিশিষ্ট কোণে।

সে-রাত্রে আমার ঘুম হ'ল না। চোখের সামনে ভাসতে লাগল সেই মেয়েটির চোখের উদ্গত অশ্রু আর তাই সেই দ্রুত মাথা নেড়ে প্রতিবাদ। সেই সঙ্গে মনে হ'ল, সাজে, ভাবে, রঙ্গে যারা এতদিন আমার আনন্দের খোরাক যুগিয়ে এসেছে তাদের মধ্যেও ত এমন অনেকে আছে, যাদের হাসির মধ্যে চাপা কান্না লুকিয়ে থাকে, অন্তরের অন্তরালে যারা ঐ একই কথা বলে, আমরা ক্ষুধিত, আমাদের অন্ন চাই।

সেই রাত্রি থেকেই আমার অভিসারের যবনিকা পতন ঘটল। গৃহের বিলাসিতা আমাকে যেন বিদ্রূপ করতে লাগল। ঘর ছেড়ে আবার আমি বেরিয়ে পড়লাম পথে

গ্রন্থ-পরিচয়

রবীন্দ্র দর্শন অন্বীক্ষণ—ডক্টর সুধীর কুমার নন্দী। প্রকাশক ঃ শ্রীভূমি পাবলিশিং কোং, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ২৪০; মূল্য আট টাকা।

রবীন্দ্র প্রতিভার ভাস্বর দ্যুতি-মহিমার বিশ্লেষণ বিদগ্ধজন নানান্‌ দৃষ্টিকোণ থেকে করেছেন। তাই রবীন্দ্র-সাহিত্যের ওপর যে আলোচনা-সাহিত্য ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে তার বিস্তার ঘটেছে অভাবিত পথে। সাহিত্যিক এবং সাহিত্যরসিক কবিকে একদৃষ্টিতে দেখেছেন; বৈয়াকরণিক অন্তদৃষ্টিতে দেখেছেন কবিকে। বিশ্লেষণবিলাসী দর্শনশাস্ত্রীদের আবার দেখার ভঙ্গি স্বতন্ত্র। আধুনিক দর্শনে সিদ্ধান্ত নেই, শুধু আছে সমস্যার স্বরূপ নির্ণয় আর সমস্যার ওপর বিস্তারিত পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা। যদি জোর দিয়ে অন্য বিকল্প সিদ্ধান্তগুলিকে অস্বীকার ক'রে একটি সিদ্ধান্তকে আঁকড়ে ধরা হয় তবে আধুনিক দর্শনশাস্ত্রীরা এই রীতিকে 'ডগমাটিক' আখ্যায় ভূষিত করবেন। এই রীতি আধুনিক কালে সর্বথা পরিত্যাজ্য। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে ডক্টর নন্দীও এই রীতি পরিত্যাগ করেছেন। তিনি আলোচ্য বিষয় নির্বাচন ব্যাপারে Fanvism-কে গ্রহণ করেছেন তাঁর নীতি হিসাবে। তবে তিনি আলোচনা করেছেন তর্কশাস্ত্রের যুক্তাবলীর অনুসরণে। বিচ্যুতি বা ব্যতিক্রম ঘটে নি কোথাও। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখেছেন ঃ

"যেহেতু কবি-শিল্পীর সৃষ্টি বিচারে Fanvism গ্রহণযোগ্য বলেই মনে হয়। অবশ্য এ কথা মনে রাখা দরকার যে আলোচ্য বিষয়বস্তুর নির্বাচনেই এর তত্ত্বের প্রয়োগ।......নির্বাচিত বিষয়বস্তুর আলোচনা কিন্তু করেছি যুক্তিশাস্ত্রের অনুশাসন মেনে এবং রসশাস্ত্রের নির্দেশ স্মরণে রেখে।"

গ্রন্থকার অতি পরিচিত শ্রেণীকরণের পথ পরিত্যাগ ক'রে নবতর গবেষণার পথে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন সাহিত্য সমালোচনার দুর্গম পথে, তা বহুলাংশে সার্থক হ'য়েছে বলেই আমাদের বিশ্বাস। আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে সেই সঙ্গমতীর্থে, যেখানে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার তরুণ দীপ্তি এসে যুক্ত হ'ল ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবীণ প্রজ্ঞামণ্ডিত সার্থক সৃষ্টির সমন্বয়ী আলোকসমারোহে। সেই আলোচনার ধারা কবির কবি-সত্তা ও দার্শনিক সত্তার সত্যসম্বন্ধটুকু নির্ণয় প্রয়াসী হয়েছে। কবির জীবনদর্শনের মৌলপ্রত্যয় সম্পর্কিত বিশ্লেষণে সেই আলোচনা পূর্ণতর রূপ পেয়েছে। গ্রন্থকার নিপুণভাবে কবির শিক্ষাদর্শন এবং শিল্পদর্শনের আলোচনা করেছেন। তারপরে আলোচিত হয়েছে কবির মানবতাবাদ। ভগবদ-মুখী এই মানবতাবাদের স্বরূপ ব্যাখ্যায় নিপুণ দর্শনশাস্ত্রীর বৈদগ্ধ্য-দ্যুতি আমরা পেয়েছি আলোচ্য অধ্যায়ের প্রতিটি ছত্রে। ভগবানের সঙ্গে মানুষের সম-মর্যাদা লাভের তত্ত্বটি কবির জীবনদর্শনে যেমনটি

প্রতিভাত হয়েছে, ঠিক তেমনটি আর কোথাও বড় একটা দেখা যায় না। গ্রন্থকার সেই মহৎ তত্ত্বটুকুর সবিস্তার বিশ্লেষণ করেছেন। এই বিশ্লেষণ সুধীজনের প্রণিধানযোগ্য।

গ্রন্থকার তৎ পরিবর্ত্তী অধ্যায়ে কবির কবিধর্ম্মের সুষ্ঠু বিশ্লেষণ করেছেন। কাব্যধর্ম্ম এবং কবিধর্ম্মের মধ্যে সর্ব্বজনগ্রাহ্য সীমারেখাটুকু টেনে দিয়ে ডক্টর নন্দী তাঁর বক্তব্যকে সুপরিস্ফুট করেছেন। কবি-ধর্ম্মের অন্তর্গূঢ় কথাটি হ'ল আমি ধর্ম্মের, অহং তত্ত্বের কমল কলিকাটি; সে কলিকার প্রকাশপর্য্যায় মহাকবির সমগ্র জীবনসাধনার অন্তর্ভূত। তাই সে তত্ত্ব পর্য্যালোচনা কালে একদিকে যেমন কবির সমগ্র সৃষ্টিকে প্রয়োজন, অন্যদিকে তাঁর জীবনকথার সঙ্গে নিবিড় যোগসাধনটুকুও দরকার। এই দু'টি দিকের দিকে লক্ষ্য রেখে গ্রন্থকার মহাকবির কবিধর্ম্মকে নিপুণ আলোচনার সামগ্রী করেছেন। সে আলোচনা প্রয়াশঃই বিশ্লেষণধর্ম্ম হয়েছে। ভাষার প্রসাদগুণে, বলার ভঙ্গিকুশলতায় সে আলোচনা রসোত্তীর্ণ হয়েছে। গ্রন্থকার এই আলোচনার পটভূমিতে বলাকা, মহুয়া, বনবানী, পুরবী, সোনার তরী প্রমুখ কাব্যগ্রন্থের নবতর মূল্যায়ন করেছেন। নব্যদর্শনের বিশ্লেষণমুখর বাচনভঙ্গি ডক্টর নন্দীর করায়ত্ত। তাই আলোচনা ভাবগাম্ভীর্য্যে অনন্যসাধারণ হয়ে উঠেছে। তারপর তিনি রবীন্দ্রকাব্যে রূপকল্প বা ইমেজারির এক বিস্তৃত আলোচনার সূত্রপাত করেছেন। এই অধ্যায়টি যেমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ, তেমনি মনোজ্ঞ। যাঁরা পণ্ডিত তাঁদের লেখায় রসের অভাব, আর যাঁরা রসিক তাঁরা তত্ত্বকথা এবং বিশ্লেষণধর্ম্মী আলোচনার প্রবক্তা নন। এ দুয়ের সমন্বয় কচিৎ ঘটে। সেই অঘটন ঘটেছে আলোচ্য গ্রন্থটিতে। তার সুষ্ঠু প্রমাণ বিশেষ ক'রে মিলবে ডাকঘর নাটকের ওপর আলোচনায়। কেমন ক'রে 'ডাকঘর' নাটকের অন্তর্গূঢ় তত্ত্বটুকুকে রবীন্দ্র জীবনদর্শনের সঙ্গে সমন্বিত করা যায়, সে তত্ত্বটা ব্যাখ্যা করা সহজসাধ্য নয়। নতুন কথা, নবতম তত্ত্ব গ্রন্থকার আমাদের দিয়েছেন। সাহিত্যের ছাত্র-ছাত্রীরা, রবীন্দ্র সাহিত্য গবেষকেরা গ্রন্থকার প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হবার অনেক নিশানা পাবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস।

সর্ব্বশেষ অধ্যায় হ'ল "ভবিষ্যতের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ"। এই অধ্যায়ে রবীন্দ্রসৃষ্টির মূল্যায়ন করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন অজস্র, এঁকেছেনও কম নয়। এই লেখা, এই আঁকার সবটুকুই কি বেঁচে থাকবে, তারা কি সত্য হয়ে থাকবে আগামী যুগের মানুষের মনে যেমনটি তারা আজ হ'য়ে আছে? এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন গ্রন্থকার তাঁর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মুকুরে সমগ্র রবীন্দ্রসৃষ্টিকে প্রতিফলিত ক'রে। আমরা এই আলোচনায় নতুন দিগদর্শন করেছি। তাই বাঙলা ভাষা-ভাষী পাঠক সমাজের কাছে এই গ্রন্থটির প্রকাশকে পরম উৎসাহভরে ঘোষণা করছি।

শ্রীগৌতম সেন

•

ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য দর্শন—শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম, এ, পি এচ ডি; প্রকাশনা—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। দাম ৭'৫০।

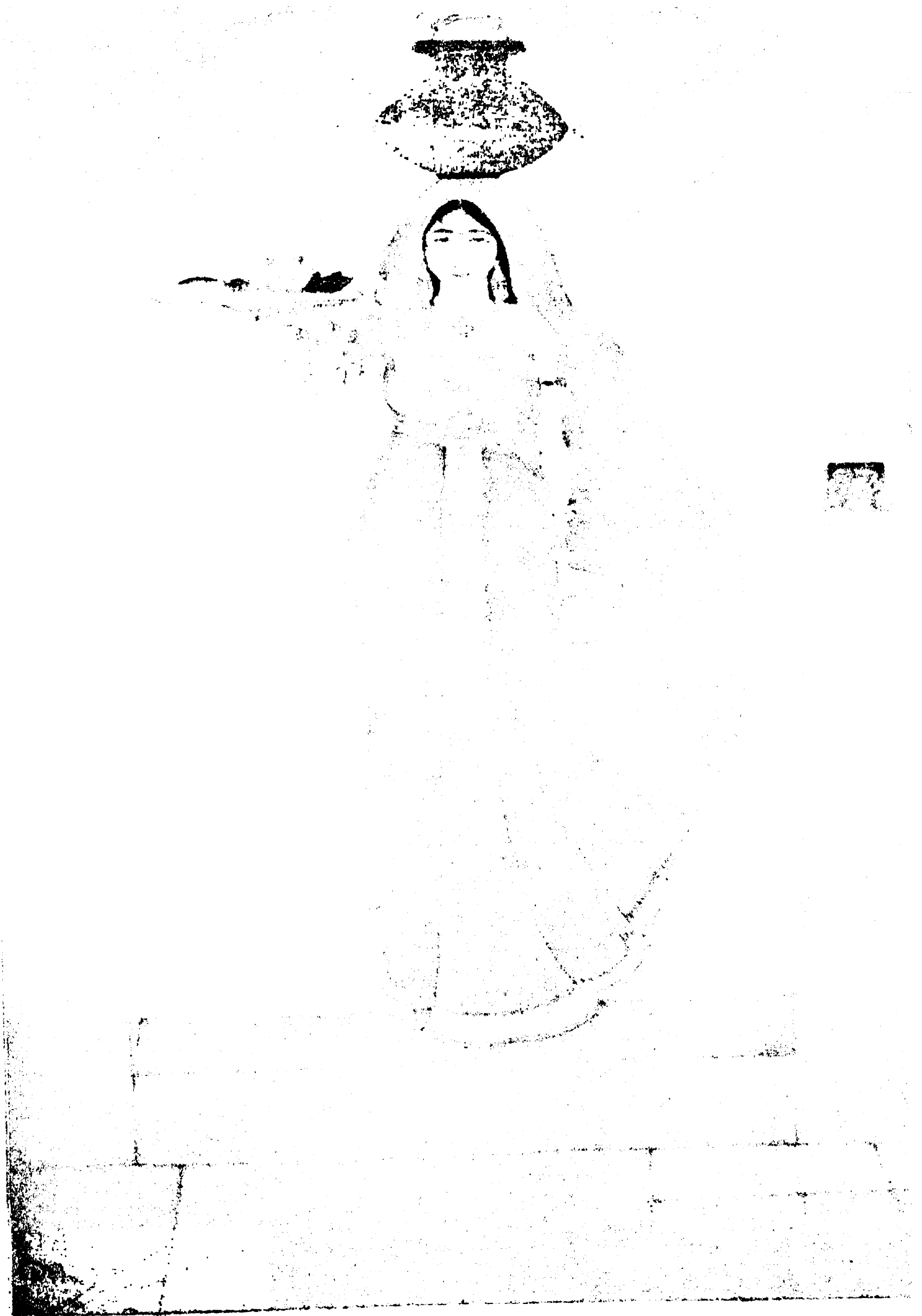
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডক্টর সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনের স্বনামধন্য অধ্যাপক। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়েও ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতির অধ্যাপকরূপেও নিয়োজিত হইয়াছিলেন। গ্রন্থকার ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পণ্ডিত। তাঁহার বিস্তৃত পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। ভারতীয় দর্শন, Nyaya Theory of knowledge এবং Problems of Philosophy প্রভৃতি যে গ্রন্থগুলি তিনি ইংরাজী ভাষায় রচনা করিয়াছেন, তাহা দর্শন শাস্ত্রের ছাত্র ও অধ্যাপকগণের অশেষ উপকার সাধন করিয়াছে।

আলোচ্য গ্রন্থখানি বাংলা ভাষায় রচিত। ভারতীয় দর্শনের মূল ভাবধারা এবং চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা ও বেদান্তদর্শনের সংক্ষিপ্ত অথচ বিশ্লেষণমূলক সর্ব্বাঙ্গীণ আলোচনা এবং সেই সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য দর্শনের তুলনামূলক বিশ্লেষণ ও আলোচনা এই গ্রন্থে অতি সুন্দর ও সহজবোধ্য ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। দর্শনের জটিল ও দুরূহ সমস্যাগুলি গ্রন্থকার এমন প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচনা করিয়াছেন যে, তাৎপর্য্য অনুধাবনে সাধারণ পাঠকেরও কোন অসুবিধা হইবে না। এ যাবৎ বাংলা ভাষায় এই ধরণের একখানি সর্ব্বদর্শন সংগ্রহের বিশেষ অভাব ছিল। দর্শনের ছাত্র ব্যতীতও, ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন তথ্য ও চিন্তাধারার সহিত পরিচিত হইবার একটা সুগভীর আকাঙ্ক্ষা বিদ্বজ্জনের অন্তরে আছে। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় যাঁহাদের উল্লেখযোগ্য অধিকার নাই, তাঁহাদের পক্ষে এই ভারতীয় জ্ঞানসম্পদের পথ ছিল অতি দুর্গম। আলোচ্য গ্রন্থের রচয়িতা তাঁহাদের সেই জ্ঞান-পিপাসা মিটাইবার পথ বহুলাংশে সুগম করিয়া দিয়াছেন। আলোচনা সংক্ষিপ্ত হইলেও, গ্রন্থকার কোথাও কোন মূল তথ্য বর্জন করেন নাই বা বিষয়বস্তুর কোনরূপ অঙ্গহানি ঘটান নাই। গ্রন্থখানি ছাত্র, অধ্যাপক ও সাধারণ পাঠকের পক্ষে সমভাবে উপযোগী ও সহায়ক হইয়াছে।

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—কল্যাণ দাশগুপ্ত, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ১২০।২ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা।



:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৩শ ভাগ
১ম খণ্ড

ষষ্ঠ সংখ্যা
চৈত্র, ১৩৭০

বিবিধ প্রসঙ্গ

দুঃস্বপ্নের বাস্তবরূপ

বৎসরের শেষমুখে, মাঘ-ফাল্গুন-চৈত্রে, পূর্ব্ব ভারতে এবং পশ্চিম বাংলায় যে ঝড় বাহিয়া গিয়াছে তাহার হিসাব-নিকাশের সময় এখনও আসে নাই, কেননা সে ঝড়ের শেষ পরিণতির কোনও আভাস এখনও পাওয়া যায় নাই। তাহার সমসাময়িক বিবরণ ও তাহার আলোচনা আমরা ইহার পূর্ব্বের দুই সংখ্যায় করিয়াছি এবং এ সংখ্যায়ও কিছু করিতেছি।

ঐ ঝড়ের পরোক্ষ ফল হিসাবে কলিকাতায় আসে ছাত্র-আন্দোলন। এই আন্দোলনের পিছনে কে বা কাহারা ছিল সে কথা এখনও সাধারণ জনের কর্ণগোচর হয় নাই। না হওয়ার প্রধান কারণ ছিল ঐ আন্দোলনের দাবি উপলক্ষ্য করিয়া রাষ্ট্রনৈতিক চাল অনেকেই চালিয়াছেন এবং উহার বিষময় প্রতিক্রিয়ার কথা কিছুমাত্র না ভাবিয়া আরও অনেকে আবেগ-উচ্ছ্বাসে পূর্ণ বিবৃতি ও লিখন ছড়াইয়াছেন, যাহার প্লাবনে সরকারী আইন-শৃঙ্খলার উচ্চতম অধিকারিবর্গের বিচার-বুদ্ধি ও বিবেচনা একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। অথচ এ বিষয়ে অনুসন্ধান ও তদন্ত পূর্ণরূপে হওয়া নিতান্তই প্রয়োজন এবং তদন্তের ফলাফল নিশ্চিত ভাবে পাইবার পর যাহারা দায়িত্বজ্ঞানশূন্য হইয়া ঐ আন্দোলন হইতে রাষ্ট্রনৈতিক মূলধন সংগ্রহে চেষ্টিত আছেন তাঁহারা বাংলার ও বাঙ্গালীর ভবিষ্যতের পথ কিরূপ কণ্টকাকীর্ণ করিতেছেন সে কথা স্পষ্ট ভাবে বলা প্রয়োজন। যাহারা ঐ আন্দোলনের সুযোগে নিজেদের ধ্বংসলিপ্সা ও অত্যোধিক ঘৃণা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়াছে তাহাদের কঠোর ভাবে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। কেননা বিগত ১৮ই মার্চ্চ (৪ঠা চৈত্র) ছাত্র ধর্ম্মঘটকে উপলক্ষ্য করিয়া এক শ্রেণীর ছাত্রের উচ্ছৃঙ্খলতা ও হিংসাত্মক কার্য্যকলাপের ফলে কলিকাতা ও শহরতলিতে, বিভিন্ন শিক্ষায়তনে, ব্যাপক অরাজকতা দেখা যায়। পরে অবশ্য বহু ছাত্রনেতা এই সব হিংসাত্মক কার্য্যকলাপের নিন্দা প্রকাশ্যভাবে করিয়াছেন ও বিবৃতি দিয়াছেন। এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে, ঐ দিন কোনও সুপরিচিত ছাত্রসংগঠন ঐ দাবিতে কোনও আন্দোলনের আহ্বান দেন নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বিগত ১৭ই ও ১৮ই মার্চ্চের ঘটনাবলীর পূর্ণ সমীক্ষণ প্রয়োজন।

জাতীয় জীবনের ভবিষ্যতের জন্য এবং এদেশের ও জাতির ভাবিকালের অধিকারী যাহারা আমাদের সেই সন্তান-সন্ততির মঙ্গলের জন্য এই সমীক্ষণ নিতান্তই প্রয়োজন। ভারতের এই অঞ্চলে ও বিশেষ করিয়া কলিকাতা মহানগর ও তাহার সঙ্গে যুক্ত শিল্পময় উপ-

নগরগুলিতে জনসাধারণের জীবনযাত্রাপথে এখন যে সকল অনিশ্চিত, অপ্রত্যাশিত ও অজানিত কারণ অতর্কিতভাবে বাধাবিপত্তির সৃষ্টি করিতেছে সেগুলির কার্য্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় করিয়া দৃঢ়ভাবে তাহার প্রতিকার ও প্রতিরোধের বিধান না করিলে এদেশের এবং বাঙ্গালী জাতির ভবিষ্যৎ মারাত্মকভাবে সঙ্কটপূর্ণ হইতে বাধ্য।

১৭ই মার্চ্চ শান্তিপূর্ণ ছিল এবং সেদিনের হরতালে কোনও শান্তিভঙ্গকারী বা অশোভন ঘটনা ঘটে নাই। তাহার একমাত্র কারণ সেদিন শুধু যানবাহনই বন্ধ ছিল না বরঞ্চ বলিতে হয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার শাসনতন্ত্রের অধিকার ছাড়িয়া, প্রত্যূষকাল হইতে বেলা চারিটা পর্য্যন্ত ধ্যানস্থ ছিলেন বলা চলে। অবশ্য যদি সরকারী তরফ হইতে ট্রাম-বাস চলাচল অব্যাহত রাখার চেষ্টা চলিত তবে ট্রাম-বাসে অগ্নি সংযোগ, পথে-ঘাটে ইট ছোড়াছুড়ি ও দোকানপাট খুলিলে লুটপাট মারপিট চলিতই। এবং পুলিশ তাহা থামাইতে পারিত না—অন্ততঃ যথাসময়ে বাধা দিতে পারিত না, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং সরকারের এই জড়ভরত নীতি অনেকেই সমর্থন করিয়াছিলেন।

কিন্তু দেখা গেল ভূত একবার নাচাইলে দেশের ও দশের (সরকারের নয়, কেননা সরকারের ব্যক্তিগত সম্পত্তি কিছুই নাই) স্থায়ী ও সমূহ ক্ষতি না করিয়া সেই অপদেবতাদিগের তুষ্টি হয় না। কেননা ১৭ই মার্চ্চ এই মহানগর যেমন নিস্তব্ধ ও নির্জ্জীব ছিল, ১৮ই মার্চ্চ তেমনই অশান্তি ও হাঙ্গামার মধ্যে কাটিল—যদিও সেই ধ্বংস-তাণ্ডবের আহ্বান কে দিয়াছিল তাহার কোনও কিনারা আজ পর্য্যন্ত হয় নাই, কেননা প্রায় সকলেই উহার দায়িত্ব অস্বীকার করিয়াছেন।

এবং ইহাও দেখা গেল যে, সেই সকল সংগঠন ও নেতৃত্বের অধিকারীবর্গ, যাঁহাদের এ-জাতীয় আহ্বান উচ্চারিত হইবামাত্রই সমস্ত দৈনিকে তাহার প্রতিধ্বনি বাজে এবং সেই প্রতিধ্বনিতে সমস্ত মহানগর সজাগ ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে, তাঁহারা সকলেই ভূত নাচাইতে সক্ষম কিন্তু থামাইবার কোন ক্ষমতা বা বিন্দুমাত্র অধিকার তাঁহাদের নাই। যদি তাহা থাকিত তবে যে তাঁহারা ঐ পৈশাচিক ধ্বংসলীলায় বাধা দিতে চেষ্টিত হইলেন না, এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন। কেননা ঐ উদ্দাম প্রেত-তাণ্ডবের ফলে বাঙালীর মুখে চূণকালি লেপন করা হইয়াছে ইহাও যেমন সত্য, অন্য দিকে ঐ অকারণ ধ্বংসলীলা ও তাহার পর শিক্ষায়তনগুলিতে পড়াশুনার ব্যাপক বাধা, কোনও সুস্থ-মস্তিষ্ক সৎপ্রবৃত্তিযুক্ত লোকের সমর্থন পাইতে পারে না, ইহাও তেমনিই সত্য।

যাহা ঘটিয়া গিয়াছে তাহার বিবৃতি ঐ পর্য্যন্তই থাকুক। তাহার আলোচনা তখনই চলিতে পারে যখন দেখা যাইবে যে, এ বিষয়ে—অর্থাৎ তথাকথিত ছাত্র-আন্দোলন বিষয়ে—বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান ও তদন্ত হইয়াছে। তদন্ত এ বিষয়ে আরও হওয়া প্রয়োজন কেননা এ প্রকার আন্দোলনের সুযোগ লইয়া একদল গুণ্ডা ধ্বংসকাণ্ডের সঙ্গে লুঠও করিয়াছে এবং স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের মহামূল্য ও দুষ্প্রাপ্য পদার্থবিদ্যার বিজ্ঞানাগারের যন্ত্রগুলির ধাতু অংশ কলিকাতায় চোরাই মালের আড়তদারদিগের নিকট বিক্রয় করিয়াছে, একথা বহু জনবিদিত। যদি এরূপ কাজ নির্ব্বিবাদে চলে তবে কলিকাতা নগরে কোনও প্রতিষ্ঠানের কোনও যন্ত্রপাতিই স্থাবর বলা চলে না।

এই শহরের অবস্থা আরও খারাপ হইয়াছে এখানের শান্তি-শৃঙ্খলার রক্ষণকারী যাহারা, সেই পুলিশ বিভাগের সিপাহী-কনষ্টেবল হইতে অধিকারীবর্গ পর্য্যন্ত, তাহারা প্রায় সকলেই নিস্তেজ ও কর্ম্মশক্তিহীন অবস্থায় আসিয়াছে। এই ক্ষোভজনক অবস্থার জন্য দায়ী অনেক কিছুই কিন্তু প্রধান দায়িত্ব একদিকে রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারীবর্গের কাণ্ডজ্ঞান ও নীতিজ্ঞানের অভাব এবং প্রায় সমান অংশে দায়ী আমরা—সাংবাদিকেরা। আমাদের সকলেরই, অর্থাৎ এই শহরের সকল বুদ্ধি বিবেচনাযুক্ত লোকের এখন ভাবিবার সময় আসিয়াছে যে এইভাবে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ করিয়া আমরা নিজেদের নিরাপত্তা কতদূর বিপন্ন করিতেছি। সরকার ও পুলিশকে আক্রমণ করা ত সাংবাদিকের নিত্যনৈমিত্তিক কাজ হিসাবে গণ্য হইয়াছে প্রায় এক শতাব্দী যাবৎ, এবং তাহার

যথাযথ কারণও ছিল—এবং এখনও আছে। কিন্তু ঐ আক্রমণ ও আলোচনা এখন যে পর্য্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহাতে এখন জনসাধারণের নিরাপত্তা—এবং বলা বাহুল্য সেই সঙ্গে সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের সকল কিছুর—আশঙ্কাজনক অবস্থায় পৌঁছাইয়াছে। আমাদের—সাংবাদিকগোষ্ঠীর সকলেরই—এখন ভাবিবার ও বুঝিবার সময় আসিয়াছে যে পুলিশবাহিনী সম্পূর্ণ বিপর্য্যস্ত হইলে নগরীর অবস্থা কোথায় দাঁড়াইবে। আজ এমন একটি প্রাচীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, যাহার চালনায় লাভের কোনও প্রশ্নই কোনদিন ছিল না, এরূপ শোচনীয় ভাবে ও অসহায় অবস্থায় বিধ্বস্ত হইল। কাল যে ঐরূপ আক্রমণ কোনও সংবাদ প্রতিষ্ঠানের উপর চলিবে না তার কি কোনও স্থিরতা আছে?

তার পর আছে ছাত্রদের কথা। ইহাদের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ভাবিলেই আসে নৈরাশ্য ও অনুশোচনা। তাহারা আমাদেরই সন্তান বা আমাদের সন্তানদের সন্তান। এই সন্তান-সন্ততিদের ভবিষ্যৎ ক্রমেই ধূমাচ্ছন্ন হইয়া অনিশ্চিতের দিকে চলিতেছে, যাহা দেখিলেই মন নৈরাশ্যে অভিভূত হয়। অন্যদিকে মনে হয় অভিভাবক-রূপে আমরা কর্ত্তব্যে অবহেলা নিশ্চয়ই করিয়াছি নাহিলে বাঙ্গালীর সন্তানগণের এরূপ অধোগতি হয় কিরূপে। অভিভাবকের দায়িত্বজ্ঞান ও কর্ত্তব্যজ্ঞান থাকিলে সন্তানের এই অবস্থা হওয়া সম্ভব ছিল না।

আমরা, সাংবাদিকেরা, অপত্য স্নেহের আধিক্যে জনসাধারণকে জানিয়াছি যে, ছাত্রদের সাত খুন মাপ। বিদেশে ঠিক এই পথে, এবং সেই সঙ্গে দায়িত্বজ্ঞানশূন্য প্রকাশক ও সম্পাদকদিগের টাকার লোভে প্রকাশিত ও রচিত উৎকট শিশু ও কিশোর সাহিত্যের দৌলতে অপ্রাপ্তবয়স্ক ও অপরিণতমস্তিষ্ক কিশোর ও তরুণ যুবক অপরাধীর সংখ্যা প্রচণ্ড বেগে—লক্ষের গণনায়—বাড়িয়া চলিতেছে। এইরূপ আসামীদের বয়স ১০, ১১ হইতে ২০,২২ বৎসর পর্য্যন্ত এবং ইহাদের অপরাধের মধ্যে চুরি-ডাকাতি-অগ্নিকাণ্ড ত আছেই, উপরন্তু আছে খুন জখম এবং বালিকা ও তরুণী ধর্ষণ!

আমরা সাবধান না হইলে অতি অল্পদিনেই এ অবস্থা এখানে দেখা দিবে। এবং—অন্য রোগের ন্যায়—এ-দেশে নূতন রোগ দেখা দিলে তাহা যেরূপ ব্যাপক হয়, সেইরূপ হইয়া ইহা এদেশের তরুণ-তরুণীদের ভবিষ্যৎ চিরদিনের মত অন্ধকার ও অভিশপ্ত করিয়া দিবেই। এখন যে অবস্থা, তাহাতে এই সকল ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকবর্গের ও স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের উচিত এদিকে বিশেষ ভাবে নজর দেওয়া। সংবাদপত্রের সম্পাদকদের এখন উচিত যে উত্তেজক বাণী বা ভাষণ বা আহ্বান, যাহা বিধানমণ্ডল বা কেন্দ্রীয় সংসদের অধিবেশনকালে একদল উচ্ছ্বাসপ্রবণ নেতা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া দেশের তরুণ-তরুণী ও ছাত্রমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করেন—ছাপিবার সময় এদিকে লক্ষ্য রাখেন এবং প্রয়োজন হইলে সম্পাদকীয়ের মধ্যে বা অন্য অংশে এ বিষয়ে সতর্কতার নির্দেশ দান করেন। ছাত্রদের উৎসাহ ও উদ্দীপনাকে নিজেদের বা নিজ দলের স্বার্থসিদ্ধির কাজে যাঁহারা লাগাইতেছেন সেই দায়িত্ব-জ্ঞানশূন্য তথাকথিত নেতৃবৃন্দের বিষয়ে সম্পাদকমাত্রেই অনেক কিছু জানেন। এতদিন তাঁহাদের কার্য্যকলাপ সম্পর্কে স্পষ্ট কথা বলতে অধিকাংশ সম্পাদকই চাহেন নাই। এখন যে পরিস্থিতি হইয়াছে তাহাতে এই অপরিণত মস্তিষ্কযুক্ত মস্তক চর্ব্বণকারীদের মতিগতি ও প্রবৃত্তি সম্পর্কে সাধারণজনকে সতর্ক না করিলে জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

ভারত-পাকিস্তান "সমঝোতা" বৈঠক

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে ভারত ও পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীদ্বয় ও তাঁহাদের সহকারিবৃন্দকে লইয়া যে সম্মেলন চলিতেছে তাহার উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রথম দিনের বৈঠকে যাহা স্থিরীকৃত হয় সে-সম্বন্ধে সংবাদপত্রের বিবরণে (আনন্দবাজার) আমরা পাই:—

"বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীনন্দ ছয়টি বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। যথা: (১) সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা, (২) পূর্ব্ব পাকিস্তান হইতে যাহারা চলিয়া আসিতে চায়, তাহাদের আসার সুযোগ দান, (৩) আসার পথে তাহাদের উপর নির্য্যাতন বন্ধ, (৪) সম্পত্তি বিক্রয় করার ও বিক্রয়-বাবদ অর্থ লইয়া আসার অধিকার মঞ্জুর, (৫) পূর্ব্ব পাকিস্তানে অপহৃতা

নারীদের উদ্ধারের জন্য সংস্থা গঠন, এবং (৬) সংখ্যালঘু কমিশন পুনরুজ্জীবন।

অপর পক্ষে শ্রীখান তাঁহার বক্তৃতায় 'মুসলমান উচ্ছেদ' বন্ধের কথাই শুধু বলেন। তাঁহার মতে—'উচ্ছিন্ন' এই লোকেরাই পাকিস্তানে গিয়া সাম্প্রদায়িক অশান্তির উস্কানি দিতেছে। সুতরাং সাম্প্রদায়িক শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে এই উচ্ছেদ বন্ধ করিতে হইবে।"

অনেক আলোচনার পর কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে দুই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী যাহা স্থির করেন তাহার বিবৃতি এইরূপ :—

যেসব প্রশ্নে দুই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী একমত হন, তাহার একটি হইল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নারীর শ্লীলতাহানি ও নারী-হরণকারীদের সম্পর্কে কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

প্রশ্নটি প্রথমে তোলেন শ্রীনন্দ। শ্রীখান শুধু তাঁহার সহিত একমতই হন না, নারীর এইরূপ অমর্য্যাদাকে তিনি 'চরম বর্ব্বরতা' বলিয়াও অভিহিত করেন।

আরেকটি ব্যাপারেও দুই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অনেকটা একমত হন—দুই দেশের উপদ্রুত এলাকাগুলি সফরের জন্য একটি যুক্ত সংস্থা গঠন।

অপরাহ্নের অধিবেশনে নিম্নোক্ত তিন দফা আলোচ্যসূচী গৃহীত হয় : (১) উভয় দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পুনঃ প্রতিষ্ঠা এবং সংখ্যালঘুদের মনে আস্থা ও নিরাপত্তার ভাব ফিরাইয়া আনার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি, (২) মাইগ্রেশন ও উদ্বাস্তুদের দেশ ত্যাগ, এবং (৩) পাকিস্তানী মতে ভারতীয় মুসলমান উচ্ছেদ (ভারতের মতে—চোরাগোপ্তা পাকিস্তানী বিতাড়ন।)

শ্রীখানের পীড়াপীড়িতেই শেষোক্ত বিষয়টি আলোচ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়।"

মোটের উপর নয়াদিল্লীর সরকারী মহল প্রথম দিনের সম্মেলনে সৌহার্দ্যের পরিবেশ দেখিয়া অনেকটা আশান্বিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই পরিবেশের পরিবর্তন হইতেও খুব বেশী সময় লাগে নাই। কেননা তৃতীয় দিনের সম্মেলনের বিবরণে (আনন্দবাজার) আমরা পাই যে ঐ দিনের বৈঠকে :

ভারত হইতে চোরাগোপ্তা পাকিস্তানীদের বহিষ্কার সম্পর্কে পাকিস্তান একটি ত্রিশক্তি আন্তর্জ্জাতিক ট্রাইবুন[al] গঠনের প্রস্তাব করে। ভারত সে-প্রস্তাব অগ্র[াহ্য] করিয়াছে বলিয়া বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেল।

ওদিকে সংখ্যালঘুদের পূর্ব্ববঙ্গ হইতে নিরাপ[দে] ভারতে আসার ব্যবস্থা করিতে নারাজ বলিয়া পাকিস্ত[ান] জানাইয়া দিয়াছে।

দুই পক্ষের মতানৈক্য এমনই প্রকট হইয়া ওঠে [যে] কথা থাকা সত্ত্বেও সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশন আ[র] হয় নাই। এবং সম্মেলনের দুইটি কমিটির একটিই মা[ত্র] বৈঠক আজ বসে। চোরাগোপ্তা পাকিস্তানী বহি[ষ্কার] ও পূর্ব্ববঙ্গ হইতে যাহারা চলিয়া আসিতে চা[য়] তাহাদের নিরাপদে আসার ব্যবস্থা করার জন্য গঠি[ত] কমিটির নির্দ্ধারিত বৈঠক বসে নাই। না বসার কা[রণ] দুই পক্ষের মতে অমিল।

চতুর্থদিনের অধিবেশনে ভারতীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী [ন]মনীয় ভাব দেখাইয়াছেন। পাকিস্তানী অনুপ্রবে[শ]কারীদের বহিষ্কার কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখার ক[থা] শ্রীনন্দ বলেন এবং তাহা যে সাম্প্রদায়িক মৈত্রী স্থাপ[নের] কারণে সাময়িকভাবে করা হইতে পারে এ কথাও তি[নি] বলেন। অন্যদিকে ঐ অনুপ্রবেশকারীদের বহিষ্কা[র] বিচার-সম্পর্কিত কাগজপত্র দেখিতে দিতে ও বিচা[র] সম্পর্কিত কার্য্যকলাপের উন্নতিসাধনের জন্য পাকিস্তানে[র] সঙ্গে আলোচনার কথাও তিনি বলেন। অন্যদিক হইতে অনুরূপ লেনদেন ও হৃদ্যতাবৃদ্ধি-সূচক কোনও প্রস্তাব[ই] আসে নাই। লিখিবার সময় পর্য্যন্ত যে-সকল সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে মনে হয় পাকিস্তানের উদ্দেশ্য শু[ধু] নিজেদের মতলব হাসিল করা এবং সেই সঙ্গে ভারতের সর্ব্বাঙ্গীণ ক্ষতি করা। ন্যায়ধর্ম্ম বা মানবত্বের কোনও লেশমাত্র পাকিস্তানের মনে আছে মনে হয় না।

শেখ আবদুল্লার মুক্তি

কাশ্মীর সমস্যার সমাধানে সহায়তা করিবেন এ[ই] আশায় সাদিক মন্ত্রিসভা শেখ আবদুল্লাকে মুক্তি দিয়াছেন। ঐ মুক্তি দেওয়ার বিষয়ে নাকি পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে পরামর্শ করার পর কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী সাদিক আবদুল্লার মুক্তি ঘোষণা করেন ও যথাসময়ে মুক্তি দেওয়া হয়। এই মুক্তি এখন "accomplished

fact," সুতরাং সে সম্বন্ধে আলোচনা বৃথা। তবে পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে যে আলোচনা হয় তাহাতে অন্য কোনও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী—যথা শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী ও শ্রীগুলজারিলাল নন্দ—অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন কি না সেটা জানা প্রয়োজন। কেননা অতীতে কোনও কাহারও সঙ্গে আলোচনা না করিয়া পণ্ডিত নেহরু যে সকল কাজ করিয়াছেন তাহার অনেকগুলিতেই ভারতের প্রচণ্ড ক্ষতি হইয়াছে ও হইতেছে। এ ক্ষেত্রে এই কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণে পূর্ব্বপশ্চাৎ বিবেচিত হইয়াছিল কি না জানা নিতান্তই প্রয়োজন, কেননা ঐ বিষয়ে পণ্ডিত নেহরু একেবারে অপারগ। যাহাই হউক মুক্তি ত দেওয়া হইয়া গিয়াছে তবে তাহার ফলাফল অনিশ্চিত।

শেখ আবদুল্লা এখন অনর্গল মন্তব্য, ভাষণ ও বক্তৃতা দিয়া চলিতেছেন। তাহার মধ্যে তাঁহার প্রথম সাংবাদিক বৈঠকের বিবরণীতে (আনন্দবাজার) তাঁহার যে সকল মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আংশিকভাবে নীচে উদ্ধৃত হইল :—

"শেখ আবদুল্লা বলেন, গণভোট জনগণের মতামত জানার একটি উপায় মাত্র। অবশ্য গণভোট ছাড়াও জনগণের মতামত জানার আরও বহু উপায় আছে। গণভোটের ফলে এই উপমহাদেশে হাঙ্গামার সৃষ্টি হইবে বলিয়া যদি কেহ মনে করেন, তাহা হইলে এই সমস্যার আপোষ মীমাংসার জন্য অন্য উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে।

শেখ আবদুল্লা এই মর্ম্মে আশ্বাস দেন যে, তিনি কখনই কাশ্মীরের মর্য্যাদা রক্ষার্থে জম্মুর স্বার্থ জলাঞ্জলি দিবেন না বা জম্মুর জন্য কাশ্মীর বিসর্জ্জন দিবেন না। ইহাই হইল তাঁহার অঙ্গীকার। সকলের নিকট যাহা ন্যায়সঙ্গত ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা বলিয়া বিবেচিত হইবে তিনি এমন সমাধান উদ্ভাবনেরই চেষ্টা করিবেন।

সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের সংবাদে প্রকাশ যে, শেখ মহম্মদ আবদুল্লা আজ এখানে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, যদি গণভোট গ্রহণে সমস্যা দেখা দেয়, তবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের অন্য উপায় স্থির করিতে হইবে। এক প্রশ্নের উত্তরে শেখ আবদুল্লা বলেন, 'অবাধ নির্ব্বাচনও' অন্য হইতে পারে।

কাশ্মীর সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে শেখ আবদুল্লা বলেন, 'আমি এখনই কোন কথা বলিতে পারি না।'

জম্মু ও কাশ্মীর (পাকিস্তান এই রাজ্যের যে অঞ্চল গ্রাস করিয়াছে সেই সব অঞ্চলসহ) অবিভাজ্য বলিয়া তিনি মনে করেন কিনা জনৈক বিদেশী সাংবাদিক শেখ আবদুল্লাকে তাহা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, তিনি কাশ্মীরের জন্য জম্মুর 'জন-গণের' অথবা জম্মুর জন্য কাশ্মীরের অধিবাসীদের স্বার্থ বলি দিবেন না। আর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, কাশ্মীরের জনগণকে গণভোটের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল। তাহারাই কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণ করিবে।

তিনি পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রী জেড এ ভুট্টোর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন কিনা জনৈক সাংবাদিক ইহা জিজ্ঞাসা করিলে শেখ আবদুল্লা বলেন, 'আমাদের এখন অপেক্ষা করিতে এবং অবস্থা লক্ষ্য করিতে হইবে। প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর সহিত সাক্ষাতের সময় ঐ বিষয়টি উঠিতে পারে।'

শ্রীনেহরুর নিকট প্রেরিত পত্রে তিনি পূর্ব্ব পাকিস্তান পরিদর্শনের প্রস্তাব করিয়াছেন বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে সেই সংবাদের সত্যতা তিনি অস্বীকার করেন।

এই জাতীয় মন্তব্য ও অন্যান্য মতামতের বিচারে মনে হয় যে, শেখ আবদুল্লা তাঁহার কাশ্মীরের ছত্রপতি হইবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা এখনও ছাড়েন নাই, তবে কোন্ পথে উহা সম্ভব সে বিষয়ে তাঁহার নিজস্ব কার্য্যক্রম তিনি এখনও স্থির করিতে পারেন নাই। পণ্ডিত নেহরুকে বুঝাইয়া তিনি যদি কার্য্যোদ্ধার করিতে পারে তবে অন্য কোনও ঠাঁই তিনি যাইবেন না একথাই খুব যায়। তাঁহার কয়েকটি বিবৃতিতে শিক্ষামন্ত্রী চাগলা বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। বিস্মিত হইবার কিছুই নাই কেননা (Demagogue) বলিতে যাহা বুঝায় শে আবদুল্লা এতদিন তাহারই রূপান্তর বলিয়া পরিচি ছিলেন।

প্রবাসীর স্থান পরিবর্ত্তন

'প্রবাসী' চৈত্র সংখ্যা বাহির করিতে বিলম্ব হওয় কারণ সাম্প্রদায়িক বিপর্য্যয় এবং স্থান পরিবর্ত্তন। বিে করিয়া এই স্থান-পরিবর্ত্তনে বৈদ্যুতিক সংযোগের ঝামে আমাদিগকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে। আ করিতেছি, অতি শীঘ্রই পত্রিকাগুলির প্রকাশ নিয়মি করিতে পারিব।

চৈত্রমাসে বর্ষ শেষ হইয়া যাইতেছে। বার্ষিক চাঁদা যাঁহাদের বাকি পড়িয়াছে এবং যাঁহারা নূ গ্রাহক হইতে ইচ্ছুক তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া নিম্নলি নূতন ঠিকানায় অধ্যক্ষের নামে টাকা পাঠাইয়া আমা কাজে সহায়তা করুন। অধ্যক্ষ, 'প্রবাসী'

৭৭।২।১, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীকরুণাকুমার নন্দী

পাকিস্তানী সাম্প্রদায়িকতার উৎস ও স্বরূপ

সম্প্রতি পূর্ব্ব পাকিস্তানে সংখ্যালঘু হিন্দু অধিবাসীদিগের উপর যে বর্ব্বর সাম্প্রদায়িক অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে, পাকিস্তানী পররাষ্ট্র সচিব জুলফিকার আলী ভুট্টো তাহার জন্য দায়ী করিয়াছেন কাশ্মীর রাজ্যে হজরতবাল মসজিদে সংরক্ষিত পয়গম্বর মহম্মদের পবিত্র কেশ চুরি যাইবার ঘটনাটিকে। তাঁহার মতে মুসলমান সম্প্রদায়ের কেহ তাহাদের নিকট অতি পবিত্র এই কেশগুচ্ছটি কখনোই চুরি করিতে পারে না, অতএব নিশ্চয়ই কোন হিন্দুই এই চুরির জন্য দায়ী এবং ইহার ফলে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যে তীব্র উত্তেজনা ও ক্ষোভের সঞ্চার হয়, তাহার ফলেই এই অতি বর্ব্বর হিন্দু-নিধন যজ্ঞ সুরু হয়। হজরতবাল মসজিদে এই কেশগুচ্ছ কে বা কাহারা চুরি করিয়াছিল, ইহা আদৌ চুরি হইয়াছিল কি না, এবং কি করিয়াই বা তাহা পুনরায় ফিরিয়া আসিল তাহার কোন প্রকৃত তথ্য আজও প্রকাশ করা হয় নাই। এই বিষয়ে গোপনতার কারণই বা কি তাহাও স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে না—তবে এ সংবাদ স্পষ্ট করিয়াই প্রচার করা হইয়াছে যে, যে-কোন হিন্দু এই অপকর্মের জন্য দায়ী নহে। মুসলমানদের এই প্রসিদ্ধ মসজিদের অভ্যন্তরে কোন অমুসলমানের একেবারেই প্রবেশাধিকার নাই এবং কখনও ছিল না। এই চুরির দায়ে যাহাদিগকে গ্রেফ্‌তার করা হইয়াছিল তাহাদের মধ্যেও হিন্দু কেহ ছিল না। কাশ্মীরের নূতন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসাদিক এই সকল অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করিয়া লইবার সিদ্ধান্ত সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন। কি প্রামাণিক তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা আনা হইয়াছিল এবং এখন কি নূতন আবিষ্কৃত তথ্যাদির ফলে পূর্ব্ব অভিযোগ প্রত্যাহৃত হইতেছে, তাহারও কোন সঠিক সংবাদ এখনও প্রচারিত হইতে দেখা যায় নাই। বস্তুতঃ সমস্ত ঘটনাটিই গভীর গোপনতার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রাখা হইয়াছে। ইহার কারণই বা কি তাহাও জানা যায় নাই।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ভারত সরকারের নেতৃবৃন্দ পূর্ব্ব পাকিস্তানে হিন্দুদিগের উপরে এই বর্ব্বরতার যে অজুহাত পাকিস্তানী পররাষ্ট্র সচিব দিয়াছেন তাহাই মানিয়া লইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। নিজেদের অক্ষমতা ঢাকিবার জন্যই হয়ত অজুহাতটি কাজে লাগান গিয়াছে কিন্তু ইহা যে মাত্র আত্মবিভ্রান্তির (self-delusion) নামান্তর মাত্র, রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তা (sagacity) বা দূরদৃষ্টির পরিচায়ক নহে, তাহা নিতান্ত বালকেও বুঝিতে পারে। পূর্ব্ব পাকিস্তানে হিন্দুদের উপরে বর্ব্বর সাম্প্রদায়িক হাম্‌লা এই প্রথম ঘটে নাই, বারে বারে ইহা ঘটিয়াছে এবং ঘটিতেছে এবং প্রতিবারেই এই প্রকার কোন না কোন অজুহাতে নির্য্যাতিত হিন্দুদেরই তাহার জন্য দায়ী করা হইয়াছে এবং ভারত সরকারও কার্য্যতঃ সকলই মানিয়া লইয়াছেন। বিশ্বের দরবারে নির্য্যাতিত হিন্দুই তাহার নিজের উপরে এই বারংবার অনুষ্ঠিত বর্ব্বরতার জন্য অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে।

বর্ত্তমান ঘটনাটির পিছনে আসল কারণ যে অন্য কিছু তাহা বুঝিতে কাহারও অসুবিধা হইবার কোন কারণ ছিল না। পূর্ব্ব পাকিস্তানে সম্প্রতি কিছুকাল হইতে যে রাজনৈতিক আবহাওয়া বহিতে এবং ক্রমশঃ ঘনীভূত হইতে সুরু করিয়াছে তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে পূর্ব্ব পাকিস্তানী শিক্ষিত এবং মধ্যবিত্ত মুসলমানের মধ্যে যে গণতান্ত্রিক দাবী উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া

উঠিতেছে, তাহার ফলে সাধারণের মধ্যে একটা নূতন রাজনৈতিক চেতনা ক্রমশঃ ব্যাপক ভাবে জাগ্রত হইতে সুরু করিয়াছে। ইহার অনিবার্য্য প্রতিক্রিয়া হিসাবে পূর্ব্ব পাকিস্তানের জনগণের উপরে কেন্দ্রীয় আয়ুবশাহী প্রভাব ক্রমে শিথিল হইয়া পড়িতেছে। পাকিস্তানী রাজনীতির প্রকাশভঙ্গির সহিত যাঁহাদের সামান্যতম পরিচয় মাত্র আছে তাঁহাদের নিকট এই কথাটি অজানা থাকিবার কথা নয় যে, যখনই জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার ফলে, কেন্দ্রীয় শাসনকর্তাদের তাহাদের উপর বজ্রমুষ্টি শিথিল হইতে সুরু করে, তখনই তথাকথিত কাশ্মীর সমস্যা এবং সঙ্গে সঙ্গে সুপরিকল্পিত সরকার প্ররোচিত সাম্প্রদায়িক গোলযোগ সৃষ্টির দ্বারা দেশের মূল রাজনৈতিক ও আর্থিক সমস্যাগুলি হইতে দেশের ও জনসাধারণের দৃষ্টি অপসারিত করিয়া লইবার অপপ্রয়াস সুরু হয়। পূর্ব্বেও বারে বারে এই প্রকার ঘটিয়াছে এবং এবারও যে অনুরূপ ভাবেই পাকিস্তানের রাজনৈতিক আবহাওয়া ঘোলাটে করিয়া পূর্ব্ব পাকিস্তানের মূল রাজনৈতিক ও আর্থিক সমস্যাগুলিকে চাপা দিবার প্রচেষ্টা করা হইতেছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহের কারণ আছে কি? অথচ ভারত সরকার বিশ্বাসপ্রবণ শিশুর মত (like a credeloves child) পাকিস্তানী সরকারী অজুহাতগুলিকে মানিয়া লইয়া বিশ্বের দরবারে নিজেদের চিন্তার দৈন্য প্রমাণ করিয়া দিতেছেন।

প্রসঙ্গতঃ একথাও এখন অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে পূর্ব্ব পাকিস্তানে হিন্দুদের উপরে বর্ব্বরতার প্রতিক্রিয়া হিসাবেই ভারতে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ঘটে, একথাটাও সম্পূর্ণ সত্য নহে। পূর্ব্ব পাকিস্তানের খুলনা অঞ্চলে যে ব্যাপক হত্যা ও অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইতেছিল তাহার মর্ম্মন্তুদ সংবাদ এদেশে বহুলপ্রচারিত হওয়া সত্ত্বেও কয়েক সপ্তাহ পর্য্যন্ত এখানে কোন হাঙ্গামাই হয় নাই। সেই সঙ্গে একথাও এখন কাহারও অজানা নাই যে, দেশে পাকিস্তানী সরকারী ও বেসরকারী অনুচরদিগের গোপন কার্য্যকলাপের যে সামান্যতম তথ্য ইতিমধ্যে উদ্ঘাটিত ও প্রচারিত হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যায় যে পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক গোলযোগের মূলেও ছিল এই সুপরিকল্পিত পাকিস্তানী দুরভিসন্ধি।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা প্রয়োজন। খুলনায় নিঃসহায় হিন্দু নরনারীর উপরে বর্ব্বর অত্যাচার, হত্যা ও লুণ্ঠনের সংবাদে ভারতবাসী মুসলমান সম্প্রদায়ের মনে যে কোনরূপ আঘাত দিয়াছিল এমন কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই। বস্তুতঃ ভারতের অঙ্গচ্ছেদ ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রবর্ত্তনের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত বহুবার হিন্দুদের উপরে হামলা ও নির্য্যাতন অনুষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু কখনও সে সকল মর্ম্মন্তুদ ঘটনা ভারতবাসী মুসলমান সম্প্রদায়ের মনে কোন গভীর সমবেদনার উদ্রেক করিতে সমর্থ হইয়াছে বলিয়া দেখা যায় নাই। বর্ত্তমান ঘটনা সম্পর্কেও ইঁহারা পূর্ব্বাপর সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। কলিকাতা ও নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে তথা পশ্চিমবঙ্গে হাঙ্গামা সুরু হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত খুলনা ও পূর্ব্ব পাকিস্তানের অন্যান্য এলাকায় হিন্দুদিগের উপরে যে হৃদয়বিদারক বর্ব্বর অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইতেছিল তাহার সংবাদও ইঁহাদের বিন্দুমাত্র চঞ্চল করিয়াছিল কিংবা তাঁহাদের ঔদাসীন্যকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিয়াছিল এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না! এ-সকল বর্ব্বর ঘটনাবলীর বিরুদ্ধে ইঁহাদের ক্ষীণতম প্রতিবাদও উচ্চারিত হয় নাই। কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গে হাঙ্গামা সুরু হইবার পর যখন স্থানীয় মুসলমান অধিবাসীদিগের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইবার আশঙ্কা ঘটে তখনই কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ভারতবাসী মুসলমান একটি যৌথ বিবৃতিতে পাকিস্তানে হিন্দুনিধন-যজ্ঞের বিরুদ্ধে তাঁহাদের প্র[illegible] প্রতিবাদ প্রচারিত করেন। অর্থাৎ সাম্প্রদায়িকত[illegible] ফলে মুসলমান সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইব[illegible] কোন আশঙ্কা যতক্ষণ ঘটে নাই—ততক্ষণ ইঁহারা প[illegible] পাকিস্তানের বর্ব্বর সাম্প্রদায়িক অত্যাচারকে নিন্দ[illegible] বা প্রতিবাদযোগ্য মনে করেন নাই। স[illegible] কথায়ও ইঁহাদের মনোভাবের যে প্রকাশ্য অভিব্য[illegible] প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহার কেবল ইহাই একটি অর্থ হইতে পারে। অন্য কথায়, ধর্ম্মনিরপেক্ষ ভ[illegible] রাষ্ট্রের সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা ইঁহারা পূর্ণম[illegible] ভোগ করিতে যদিও রাজী আছেন কিন্তু রাষ্ট্রে

নিরপেক্ষতার মূলনীতির উপরে ইঁহাদের কোনপ্রকার আস্থা নাই কিংবা এ-বিষয়ে কোন দায়িত্ব বহন করিতেও তাঁহারা রাজী নহেন। বিষয়টি গভীর ভাবে চিন্তা ও বিচার করা প্রয়োজন। অবস্থাটা এই যে, পাকিস্তানে হিন্দু অন্ত্যজের স্থান মাত্র দাবী করিতে পারে কিন্তু ভারতে মুসলমানের স্থান নৈকষ্য কুলীনের সমপর্য্যায়ভুক্ত করিতে হইবে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভারতের শাসনকর্ত্তারা ধর্মনিরপেক্ষতার এই সংজ্ঞাটিই মানিয়া লইয়াছেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাহা না হইলে হিন্দু কেবলমাত্র হিন্দু বলিয়াই ধর্ম্ম-নিরপেক্ষতার অজুহাতে স্বদেশে এবং বিদেশে উপেক্ষিত এবং নির্য্যাতিত হইতে থাকিবে, হিন্দুকে তাহার নায্য দাবী হইতে উপেক্ষিত হইয়া সে সহায়হীন অবস্থায় কেবল নির্য্যাতিতই হইতে থাকিবে, এমনটি কি করিয়া ঘটিতে পারে? বিশ্বের দরবারে পাকিস্তানী অপপ্রচারে প্রকাশ যে ভারতে মুসলমানেরা হিন্দুর হাতে নির্য্যাতিত হইতেছে ভারত সরকার তাঁহাদের বাক্য এবং ব্যবহারের দ্বারা নিজেরাই স্বীকার করিয়া লইতেছেন। অথচ ইহা যে কত বড় মিথ্যা তাহা মুসলমানেরা নিজেরাই ভাল করিয়া জানেন।

সম্প্রতিকার পূর্ব্ব পাকিস্তানে হিন্দুনিধন ও নির্য্যাতন-যজ্ঞের সত্যকার পটভূমিকা যে বস্তুতঃ রাজনৈতিক, ইহার সঙ্গে যে তথাকথিত কাশ্মীর সমস্যা বা পয়গম্বরের পবিত্র কেশগুচ্ছ চুরির কোন সম্পর্কই ছিল না, তাহা এই হত্যাকাণ্ড সুরু হইবার পূর্ব্বেই ঢাকায় চারি বৎসর ধরিয়া অধ্যাপনায় রত মার্কিনী অধ্যাপক জনসনের রচিত এবং নিউ ইয়র্কের "নিউ লীডার" পত্রিকার ডিসেম্বর সংখ্যায় স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে। অধ্যাপক জনসন চারি বৎসর ধরিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাহা ছাড়া ইনি ঢাকায় অবস্থান কালে পূর্ব্ব পাকিস্তানের গ্রামাঞ্চলের বহু স্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন এবং সাধারণ চাষী-গৃহস্থদিগের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে মেলামেশা করিয়াছেন বলিয়া দাবী করেন। তাঁহার মতে পূর্ব্ব পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক দাবীর উত্তরোত্তর এবং ব্যাপক গণসম্মতির প্রধান কারণ, এই অঞ্চলে দ্রুত প্রসারমান শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজটি। তার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে পূর্ব্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের দারিদ্র্যজনিত গভীর এবং ক্রমবর্দ্ধমান অসন্তোষ। পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রথম উদ্ভবের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত এই অঞ্চলে বিশেষ কোন ব্যাপক শিল্প প্রচারের দ্বারা আর্থিক উন্নয়নের প্রচেষ্টার অভাব। কৃষি উৎপাদনে সরকারী তরফ হইতে দাবী করা হইয়া থাকে যে, এই দিক দিয়া প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে এবং এই অঞ্চলটি খাদ্য উৎপাদনে এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ। কিন্তু অধ্যাপক জনসনের মতে ইহা সত্য নহে এবং পূর্ব্ব পাকিস্তানে দারিদ্র্য ও খাদ্যাভাব প্রভূত পরিমাণেই বর্ত্তমান। ফলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে পাকিস্তানী জনসাধারণের অসন্তোষ যে গণতান্ত্রিক দাবীকে জোরদার করিয়া তুলিবে, ইহা সহজেই অনুমেয়। এই কারণেই পূর্ব্ব পাকিস্তানে আয়ুবশাহী হুকুমৎ শিথিল হইয়া পড়িতেছিল বলিয়া অধ্যাপক জনসন সিদ্ধান্ত করেন। পূর্ব্ব পাকিস্তানের উপর শিথিল হইয়া যাওয়া মুষ্টি আবার দৃঢ় করিয়া তুলিবার প্রয়াসে দেশের মূল রাজনৈতিক ও আর্থিক সমস্যাগুলি হইতে চিন্তা ও দৃষ্টি অন্যপথে অপসারিত করিবার প্রয়োজনেই তথাকথিত কাশ্মীর সমস্যা ও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাকে পরিকল্পনানুযায়ীই বারংবার জাগাইয়া তুলিবার প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন পত্রিকায় পরে প্রকাশিত অধ্যাপক জনসনের অন্য একটি প্রবন্ধে তিনি বিষয়টি আরও বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, আমেরিকার জঙ্গী সাহায্য ও স্যাটোর সহিত জঙ্গী জোট পাকিস্তানের মূল আর্থিক সমস্যাগুলির সমাধানে কোনই সহায়তা করে নাই। পাকিস্তানের কৃষি ও শিল্প এখন সম্পূর্ণই অপরিণত অবস্থায় রহিয়াছে। ফলে দেশের দারিদ্র্য ব্যাপক ও গভীর। বর্ত্তমান শাসন ব্যবস্থার প্রতি এই কারণেই অসন্তোষ ও বিতৃষ্ণা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া চলিতেছে এবং তাহার ফলে শিক্ষিত সমাজের গণতান্ত্রিক দাবী জনসাধারণের উত্তরোত্তর সমর্থন লাভ করিতেছে। পূর্ব্ব পাকিস্তানে এই দারিদ্র্যের মান অপেক্ষাকৃত আরও নিদারুণ হইবার ফলে গণতান্ত্রিক আন্দোলন এখানে অধিকতর জোরদার হইয়া উঠিতেছে এবং সেই

অনুপাতেই আমুবশাহী প্রভাবও শিথিল হইয়া পড়িতেছিল। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক জনসন বলেন যে পাকিস্তানের আর্থিক উন্নয়নকল্পে যে প্রভূত পরিমাণ বৈদেশিকী সাহায্য পাওয়া গিয়াছে তাহার সামান্য অংশ মাত্র সত্যকার আর্থিক উন্নয়নকল্পে প্রয়োগ করা হইতেছে এবং বেশীর ভাগই শাসনকর্ত্তাদিগের অনুগ্রহপুষ্ট উচ্চবিত্ত পশ্চিম পাকিস্তানী গোষ্ঠী সরাসরি আত্মসাৎ করিয়া ফেলিতেছিলেন। পূর্ব্ব পাকিস্তানের আর্থিক উন্নয়নের জন্য বরাদ্দের অধিকাংশ অংশটাই পড়িতেছে সরকারের বিশেষ অনুগ্রহপুষ্ট পূর্ব্ব পাকিস্তানবাসী উচ্চবিত্ত ও প্রভাবশালী পশ্চিম পাকিস্তানীদের ভাগে। ইহার ফলে শাসনসংস্থার উপরে আস্থা অনিবার্য্য ভাবেই এ অঞ্চলে হ্রাস পাইতেছিল। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়া সরকারের প্রতি এই গভীর অনাস্থা ও অসন্তোষটিকে হিন্দুনিধন নামক পবিত্র জেহাদে রূপায়িত করাই ছিল আপাততঃ এই আবহাওয়াটি বদল করিবার একমাত্র উপায়।

বস্তুতঃ অধ্যাপক জনসনের বিশ্লেষণ যদি সত্য ও বিচারসহ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তবে বুঝিতে হইবে যে আপন স্বার্থে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠি প্রাথমিক মানবিকতা বোধটুকুকে পর্য্যন্ত বিনা দ্বিধায় বিসর্জ্জন দিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বা লজ্জাবোধ করেন না। তাহা ছাড়া ধর্ম্মের বুলি দিয়া কিংবা উভয় রাষ্ট্রের মন্ত্রীগোষ্ঠীর পারস্পরিক আলোচনার দ্বারা যে এই অবস্থার সংশোধন হইবে না তাহা নিশ্চিত। ভারত ও পাকিস্তান সম্বলিত উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক শান্তি প্রতিষ্ঠার তথাকথিত উদ্দেশ্যে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে বর্ত্তমানে আলোচনা সুরু হইয়াছে। পূর্ব্বেও অনুরূপ আলোচনার ফলে দুই রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীদ্বয়ের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার কোন ফল বর্ত্তায় নাই। বর্ত্তমান আলোচনার ফলে হয়ত আরও একটি নূতন চুক্তি অনুরূপ ভাবে সম্পাদিত হইবে। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত পাকিস্তানে প্রবল ও কার্য্যকরী মানবতাবোধ জাগ্রত না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত এসকল আলোচনা ও চুক্তির দ্বারা কোন সুফল প্রসবিত হইবার বিন্দুমাত্রও সম্ভাবনা নাই। একথাটা স্পষ্ট করিয়া বুঝা ও স্বীকার করা একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। অন্যথায় এসকল আলোচনা উভয় পক্ষেই ভণ্ডামিরই নামান্তর মাত্র হইয়া থাকিতে বাধ্য।

পশ্চিমবঙ্গের বাজেট বিতর্ক ও বিরোধী দল

গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় যে ১৯৬৪-৬৫ সনের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বা বাজেট রাজ্য সরকারের পক্ষে রাজ্য অর্থমন্ত্রী শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় দাখিল করেন, তাহার মধ্যে নূতন কোন চিন্তাধারা বা এই রাজ্যের মূল আর্থিক সমস্যাগুলি ও তাহার সমাধানের সরকার পক্ষে কোন বলিষ্ঠ চিন্তার আভাস একেবারেই পাওয়া যায় না। বাজেট যে আকারে রাজ্য বিধান সভায় পেশ করা হয়, মোটামুটি সেই ভাবেই অনুমোদন লাভ করে। বিধান সভায় সরকারী দলের প্রবল সংখ্যাধিক্যের কারণে সেটাই অনিবার্য্য ছিল। তাহা ছাড়া আলোচ্য বাজেটে আয়ের তুলনায় ২৪৭ লক্ষ টাকার ঘাট্‌তি দেখান হইয়াছে। ঘাট্‌তি বাজেট মূলতঃ আশঙ্কার কোন পরিচায়ক নহে, অবশ্য যদি আকারে ও প্রকৃতিতে এই ঘাট্‌তি উন্নয়নপ্রগতির বর্দ্ধমান দাবির কারণে ঘটিয়া থাকে। বস্তুতঃ বর্ত্তমান যুগে উন্নয়ন-প্রগতি রক্ষাকল্পে ঘাটতি বাজেট অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। কিন্তু বর্ত্তমান বৎসরের আলোচ্য বাজেটে পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী বাজেট রচনায় এমন কোন পরিচয় দিতে সক্ষম হন নাই। মোটামুটি হিসাবে বাজেটটি মামুলী ব্যবস্থারই বার্ষিক পুনরুক্তি বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না।

উন্নয়নমূলক বাজেট রচনার ধারা সাধারণতঃ জাতিগঠনমূলক ব্যয়বরাদ্দের ক্রমশঃ বর্দ্ধমান আকারে প্রতিফলিত হইয়াছে। শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, ইত্যাদি খাতে বর্ত্তমান বাজেটে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় অতিরিক্ত বরাদ্দের পরিমাণ অকিঞ্চিৎকর মাত্র। তুলনায় পুলিশ বিভাগ এবং সাধারণ প্রশাসনিক বরাদ্দের বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তার পরিচায়ক বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। নিম্ন বেতনের সরকারী কর্ম্মচারীদের এবং সরকারী সাহায্যাশ্রয়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকদের জন্য অবশ্য কিছুটা অতিরিক্ত মাগ্‌গি ভাতার বরাদ্দ আলোচ্য বাজেটে করা হইয়াছে। ইহা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই, কেননা অবশ্যভোগ্য পণ্যাদির ক্রমাগত বর্দ্ধমান মূল্যমান যে নিম্ন ও নিম্নমধ্য আয়ের দেশবাসীর জীবনযাত্রা সংশয়াপন্ন করিয়া তুলিতেছে, এ বিষয়ে কোনই সন্দেহের অবকাশ নাই। যদি ইহাদের খানিকটা স্বস্তিবিধান করা যায় তাহা অবশ্যই করা উচিত এবং তাহাতে কাহারও আপত্তি হইবার কথা নহে। কিন্তু প্রসঙ্গতঃ একথাও বিচার করা প্রয়োজন যে, অবশ্যভোগ্যাদির মূল্যস্থিরতা নির্দ্ধারণ করিবার কোন কার্য্যকরী আয়োজন ছাড়া কেবলমাত্র মাগগি ভাতা বৃদ্ধি করিয়া নিম্ন ও মধ্যবিত্তের জীবনে এই সঙ্কটজনক সমস্যার আসল সমাধান হইবার কোনই আশা নাই। মাগগি ভাতা বৃদ্ধি করিয়া মূল্যবৃদ্ধির ধারাকে কখনই সংযত করা যায় না এবং যায়ও নাই। বরং সাময়িক আয়বৃদ্ধির কৃত্রিম প্রয়োগের দ্বারা আরও মূল্যবৃদ্ধির প্রকোপই ঘটিয়া থাকে। বস্তুত

বাজেটটির একটি সামগ্রিক বিচারে এটাই মনে হয় যে, সরকার কেবলমাত্র দিনগত পাপক্ষয় করিয়া চলিয়াছেন। উন্নয়নমূলক নূতন সৃষ্টির অনুকূল আবহাওয়া গড়িতে হইলে বাজেট রচনায় যে বলিষ্ঠ মনোভাবের প্রয়োজন ইহাতে তাহার নিতান্তই অভাব।

কংগ্রেস দলের নেতৃগোষ্ঠীর মধ্যে চিন্তার সুগভীর দৈন্যের পরিচয় স্বাধীনতার পর হইতেই দিনে দিনে অধিকতর প্রকট হইয়া উঠিতেছে। দেশের সমগ্র শাসন-ব্যবস্থায়, কেন্দ্র এবং রাজ্যসরকার উভয় ক্ষেত্রেই এই দৈন্য ক্রমশঃ অতিমাত্রায় প্রকট হইয়া উঠিতেছে, এ বিষয়ে আজ আর দ্বিমতের কোনই অবকাশ নাই। কিন্তু দেশের বর্ত্তমান রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অবস্থায় এই দলের শাসনবন্ধন হইতেও যে দেশ এবং দেশবাসী অদূর ভবিষ্যতে মুক্তিলাভ করিতে সক্ষম হইবে এমন সম্ভাবনাও সুদূর-পরাহত। দলে সংস্কার-উদ্দেশ্যে নানা প্রকার আয়োজন দল-নেতৃত্বের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে কিছুদিন ধরিয়া অবশ্যই মৌখিক প্রয়াস চলিতেছে। কিন্তু চিন্তা যখন জড়ত্বের বন্ধনে নিশ্চল হইয়া পড়ে তখন ক্ষমতার অপ-প্রয়োগের দ্বারাই কুক্ষিগত ক্ষমতাকে ধরিয়া রাখিবার আপ্রাণ প্রয়াস চলিতে থাকে, সমাজ-ইতিহাসের এই অমোঘ সত্যটিকে অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই। এবং এরূপ অবস্থা যখন ঘটে তখন ইহার প্রচণ্ডতম অপঘাত আসিয়া পড়ে ক্ষমতাসীন দল-নেতৃত্বের চরিত্রের উপরে এবং তাহা ক্রমে দেশের সমগ্র চরিত্রে অবনতি অনিবার্য্য ভাবে ঘটাইয়া থাকে। আজিকার কংগ্রেসে যে তাহাই ঘটিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই।

এই অবস্থা হইতে দেশকে মুক্ত করিয়া আনার কাজটি সহজ নহে। ক্ষমতাসীন দলকে সততার সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে ধরিয়া রাখিবার কাজটি পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রে সাধারণতঃ বিরোধী দলের দায়িত্ব। আমাদের দেশে এখন পর্য্যন্ত কোন মর্য্যাদাসম্পন্ন দল গড়িয়া উঠে নাই। বিরোধী দলসমূহ এখানে প্রথমতঃ অসংখ্য ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত, সরকারী দলের অপশাসন সংযত করিবার ইঁহা-দের কোনই ক্ষমতা নাই। তথাপি ইঁহারা একটি বিশেষ কাজ করিতে পারিতেন,—কেন্দ্রে পার্লামেণ্টে এবং রাজ্য বিধান সভাসমূহে সরকারী প্রশাসনিক দৈন্যের সত্যকার কার্য্যকরী সমালোচনার দ্বারা দেশের অগণ্য অপেক্ষাকৃত নিরক্ষর এবং সাধারণতঃ আধুনিক পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের প্রয়োগবিধির সহিত মোটামুটি সম্পূর্ণই অপরিচিত দেশবাসীর নিকট শাসন-ক্ষমতাসীন দলের অক্ষমতা ও দৈন্যের সত্যকার পরিচয়টি তুলিয়া ধরিয়া ক্রমে সরকারের বিরুদ্ধে কার্য্যকরী বিরূপতা ও বিতৃষ্ণার একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া তুলিতে পারিতেন। বাজেট বিতর্ককালই এই অতিপ্রয়োজনীয় কাজটির প্রকৃষ্টতম অবসর। দুঃখের বিষয় ইঁহাদের সমালোচনা সাধারণতঃ বিচারানুসারী হয় না, মোটামুটি কলহ ও গালিগালাজের রূপেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। হয়ত সত্যকার বিচারের জন্য যে শিক্ষা ও চিন্তা-ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন, বিরোধী দলসমূহের নেতৃত্বের মধ্যে তাহার একান্তই অভাব। তাই আলোচ্য পশ্চিমবঙ্গ বাজেট বিতর্ককালে দেখা যায় যে, বিরোধী দলসমূহের পক্ষ হইতে সরকারী বাজেটের উপর তীব্রতম আক্রমণ হওয়া সত্ত্বেও ইহার মধ্যে বিচারসহ বস্তুর উপাদান প্রায় ছিল না বলিলেই হয়। ফলে সাধারণতঃ বিরোধী পক্ষের সমালোচনার কোন সুফলই দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় বা বেসরকারী জনগণের অনুভূতিতে আজ পর্য্যন্ত কখনই কার্য্যকরী ভাবে প্রতিফলিত হইতে দেখা যায় নাই। অথচ কংগ্রেসী কুশাসনের ফলে সমগ্র দেশে আজ যে অভাব ও অসন্তোষের আগুন ধিকি ধিকি করিয়া জ্বলিতেছে, সামান্য আয়াসেই তাহার ফলে কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করিতে পারা অসম্ভব ছিল না। কিন্তু যে পথে বিরোধী সমালোচনা চলিতেছে, তাহা এমনই অবিমৃষ্যতাজনক যে দেশের লোক তাহাদের উপর কোনও ভরসা বা আস্থা স্থাপন করিতে আদৌ সাহস পায় না। কংগ্রেসের কুশাসন ও অপদার্থতার ফলে তাহাদের জীবন বিষময় হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু বিরোধী দলসমূহের অনুসরণ করিলে যে সম্ভবতঃ আরও তীব্রতর বিষের দংশনে তাহাদের জীবনযাত্রা অধিকতর জর্জ্জরিত করিয়া তুলিবে এমন আশঙ্কা হইতে মুক্তি পাইবার মতন কোন ভরসা তাহারা আজও পায় নাই।

এই প্রসঙ্গে তাই মূল প্রশ্ন এইটি থাকিয়া যায় যে, তবে কি কংগ্রেস দলের কুশাসন ও দুর্নীতিপরায়ণতা হইতে কোন কালেই দেশ এবং দেশবাসী মুক্তি পাইবে না? মুক্তি পাওয়া যে সহজ হইবে না, এ কথা বলাই বাহুল্য। ইহার জন্য গভীর, এমন কি প্রাণান্তকর সাধনার প্রয়োজন আছে। এই সাধনায় প্রাণ উৎসর্গ করিতে হইবে দেশের সেই মুষ্টিমেয়, সৎ এবং সত্যকার শিক্ষিত কয়েক জনকে, যাঁহারা আজও পর্য্যন্ত ক্ষমতার লোভে বা উত্তেজনার তাড়নায় কি ক্ষমতাসীন কিংবা বিরোধী রাজনৈতিক দলের প্রভাব হইতে এখনও পর্য্যন্ত নিজেরা মুক্ত আছেন; যাঁহারা কোন প্রকার লোভের বশবর্ত্তী হইয়া আপন সততা, আপন সমাজ-আদর্শ জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত হন নাই। হয়ত রাজনৈতিক পরিবেশের কুৎসিত বর্ত্তমান অভিব্যক্তি-

গুলি ইঁহাদের চেতনাকে এমন ভাবে ক্ষুব্ধ করে যে কোন প্রকার রাজনীতির সহিতই ইঁহারা যুক্ত হইতে রাজী নন; নির্লিপ্তের মধ্যে যাঁহারা দূরে সরিয়া আছেন। কিন্তু সমাজে বাস করিয়া সত্যকার ন্যায়নিষ্ঠ থাকিতে হইলে তাহার কতকগুলি দায়িত্বও উপেক্ষা বা অস্বীকার করা চলে না। দেশের সমাজ ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রত্যেক দেশবাসীরই একটা অমোঘ দায়িত্ব আছে; যাঁহারা ন্যায়নিষ্ঠ এবং সত্যকার শিক্ষিত বলিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠিত এবং সম্মানিত, তাঁহাদের দায়িত্ব স্বভাবতঃই আরও গভীরতর। এই ধরণের দেশবাসীরা একত্র হইয়া নূতন দলের নেতৃত্ব গড়িয়া তুলিতে পারেন। একত্র হইবার কাজটি সহজ নহে ত বটেই, কিন্তু তাহা হইতেও দুরূহ দেশের সাধারণ উপেক্ষিত ও বঞ্চিত জনগণের আস্থাভাজন হইয়া উঠা। দলীয় রাজনীতির এমনই পরিচয় দেশবাসী ইতিমধ্যে পাইয়াছে যে, কোন নূতন রাজনৈতিক দলকে তাহারা সহজে বিশ্বাসের চক্ষে দেখিবে না। এই বিশ্বাস ক্রমে ক্রমে, ধীরে ধীরে অর্জ্জন করিয়া লইতে হইবে, না হইলে কোন কাজই হইবে না। ইহার জন্য চাই দীর্ঘকালব্যাপী অক্লান্ত সাধনা, প্রয়াস ও অধ্যবসায়। আমরা বলি যে, দল গড়ার কাজ, সে কাজ করিতে হইলে পূর্ব্বে প্রয়োজন এই ধরণের ব্যক্তিদের দ্বারা নিজ নিজ বাসস্থানের অব্যবস্থিত এলাকার মধ্যে একক সাধনা ও প্রয়াস। কাজটা অবশ্য আরও কঠিন। কিন্তু দেশের সমাজ জীবনে ও প্রশাসনিক রাজনীতিতে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতালাভের মদোন্মত্ততা ও ক্ষমতার অপপ্রয়োগের ফলে আমাদের সমগ্র চরিত্রে যে সীমাহীন বিপর্যয় ও গভীর দুর্যোগ ঘনাইয়া আসিয়াছে, তাহার সংশোধনের ও তাহার বিষময় প্রতিক্রিয়া হইতে দেশের ভবিষ্যৎ বংশধরদের বাঁচাইবার পথ প্রস্তুত করিবার কোন সহজতর ও অল্পপ্রয়াস উপায় আমরা কল্পনা করিতে পারিতেছি না।

বস্তুতঃ দেশের সত্যকার শিক্ষিত ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিরা যদি প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রতিবেশীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিয়া, আলাপ, আলোচনা, বিচার ও বিশ্লেষণ দ্বারা সমাজ ও রাজনীতির পারস্পরিক সম্বন্ধের একটা সুস্থ ও বলিষ্ঠ প্রতিচ্ছবি তাঁহাদের মনের মধ্যে আঁকিয়া তুলিতে সক্ষম হন তবেই ক্রমে দেশে সুস্থ জীবনের পুনরাবির্ভাব ঘটা সম্ভব। এ পথ দীর্ঘ ও বন্ধুর, অনেক সন্দেহ, অনেক বিতৃষ্ণা, অনেক দুঃখ অতিক্রম করিয়াই তবে লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভব। কিন্তু "দুঃখে দুঃখে পাপ যদ নাহি পায় ক্ষয়, প্রলয়ের ভস্মক্ষেত্রে বীজ তার রবে সুপ্ত হয়ে, নূতন সৃষ্টির মাঝে হুঙ্কারিয়া উঠিবে আবার।" দেশে যদি অন্ততঃ একশ' জনও এমন দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন, ন্যায়নিষ্ঠ ও সত্যকার শিক্ষিত লোক থাকিয়া থাকেন এবং তাঁহারা যদি এই দুরূহ সাধনায় আপনাদের উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত থাকেন তবেই ভবিষ্যতের আশা আবার নূতন করিয়া সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা আছে।

কৃষ্ণমাচারীর দ্বিতীয় বাজেট

এবারকার কেন্দ্রীয় বাজেটটি অর্থমন্ত্রী কৃষ্ণমাচারীর দ্বিতীয় দফার বাজেট রচনার প্রয়াসের ফল। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রিত্বের প্রথম অধ্যায়ে তিনি যে বাজেটটি রচনা করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান বাজেটটি তাহা হইতে ভিন্ন চরিত্রের হইয়াছে বলিয়া অনেকে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণমাচারী বর্ত্তমান বাজেট বক্তৃতায় কয়েকটি বিশিষ্ট দাবি করিয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি বলেন যে, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাইয়ের অনুসৃত নীতি প্রত্যাহার করিয়া তিনি অল্পবিত্তদের উপরে আয়করের চাপ এবার কমাইয়া দিয়াছেন। দাবীটি কিন্তু বিচারসহ নহে। একথা সত্য যে, তিনি মোরারজী রচিত অবশ্যদেয় জামানত (compulsory deposit) বর্ত্তমান বাজেটে একেবারেই উঠাইয়া দিয়াছেন এবং অতিরিক্ত সারচার্জ্জের দায় হইতেও তাহাদের মুক্তি দিয়াছেন। কিন্তু নিম্নতম মানে মূল আয়করের পরিমাণ এবার তিনি ৬% শতাংশে তুলিয়া দিয়াছেন। ইহা পূর্ব্ব বৎসরের মূল আয়কর, মূল সার-চার্জ্জ ও অতিরিক্ত সারচার্জ্জের যোগফল হইতে অধিক, যদিও পূর্ব্ব বৎসরের আবশ্যিক জামানতের পরিমাণ ইহার সঙ্গে যোগ করিলে বর্ত্তমান আয়কর হইতে তাহা বেশী হইত। তবে আবশ্যিক জামানতের টাকাটা ট্যাক্স-দাতা পাঁচ বৎসর পরে সুদসহ ফেরৎ পাইতেন; বর্ত্তমান ট্যাক্সের সমস্তটাই সরকার সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করিবেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণমাচারীর এই দাবি যে তিনি নিম্নমানের আয়করের ভার খানিকটা লাঘব করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা মোটেই সত্য নহে। বস্তুতঃ এই ভারটি তিনি কিয়ৎ পরিমাণে বৃদ্ধিই করিয়াছেন, কম করেন নাই।

কৃষ্ণমাচারীর বর্ত্তমান বাজেটের আর একটি বৈশিষ্ট্য, তাঁর পূর্ব্ব বাজেটে প্রথম প্রয়োগকৃত ব্যয়কর বা Expenditure tax-এর পুনঃপ্রবর্ত্তন। তিনি অনুমান করেন যে, এই বিশেষ খাতে বর্ত্তমান বৎসরে মোট প্রায় ৩ কোটি টাকা আমদানী হইবে। এই অনুমান কতটা বাস্তবধর্মী সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। পূর্ব্বেকার ব্যয়কর হইতে আমদানী সামান্য মাত্র হইয়াছিল, তাহা এতই কম যে তাহা আদায় করিবার খরচাও পোষায় নাই। বর্ত্তমান বৎসরেও যে ইহার অন্যথা হইবে না, তাহার নিশ্চয়তা কোথায়? এই বিশিষ্ট করটির প্রয়োগবিধি যদি ভিন্ন রকমের হইত, অর্থাৎ করযোগ্য

ব্যয়ের পরিমাণ যদি আয়কর হইতে অব্যাহতি পাইত, তবে হয়ত ব্যক্তিগত ব্যয়ের একটা নির্ভরযোগ্য হিসাব মিলিতে পারিত এবং তাহা হইলে এই খাতে সরকারী সম্ভাব্য আয়ের একটা অপেক্ষাকৃত বাস্তব অনুমান সম্ভব হইতে পারিত।

কৃষ্ণমাচারী আয়কর ও আনুষঙ্গিক করাদির রচনা ও প্রয়োগের ব্যাপারে কল্ডার সাহেবের শিষ্য। স্মরণ থাকিতে পারে যে, কল্ডার সাহেবের সুপারিশে বলা হইয়াছিল যে, উচ্চ-আয় পর্য্যায়ে আয়করের ভার প্রভুত পরিমাণে লাঘব করিয়া দিয়া ব্যয়কর প্রবর্ত্তন ও ট্যাক্স-ফাঁকি বন্ধ করিবার কার্য্যকরী ব্যবস্থা রচনা ও প্রয়োগ করিতে পারিলে এই খাতে একদিকে যেমন মোট সরকারী আমদানী বৃদ্ধি পাইত, তেমনি অন্যদিকে নূতন লগ্নীর প্রয়োজনে অধিকতর সঞ্চয়ের অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি হইতে পারিত। কিন্তু দেশবাসীর চরিত্রের সহিত অধিকতর অন্তরঙ্গ ভাবে পরিচিত অন্তর্বর্ত্তী অর্থমন্ত্রী এই সুপারিশে আস্থা স্থাপন করিতে ভরসা পান নাই। বরং ফলের অকিঞ্চিৎকরতার জন্য তিনি ব্যয়করটিকে উঠাইয়া দিয়াছিলেন। কৃষ্ণমাচারী কল্ডারের সুপারিশ অনুযায়ী কেবল যে ব্যয়করের পুনঃপ্রয়োগ করিলেন শুধু তাহাই নহে, উচ্চমানের আয়ের উপরে করভার বিশেষ পরিমাণে লাঘব করিয়া দিয়াছেন। ইহা ছাড়াও শিল্পক্ষেত্রে তিনি কতকগুলি মূল শিল্পের উপরেও করভার (corporation tax) প্রভুত পরিমাণে কমাইয়া দিয়াছেন। তিনি মনে করেন যে, ইহার দ্বারা আর্থিক উন্নয়নের গতি ও পরিমাণ উভয়ই দ্রুততর বেগে বৃদ্ধি পাইতে সহায়তা করিবে। সময়ে অবশ্য এই অনুমান কতটা বাস্তব আর কতটা পরিমাণে কাল্পনিক মাত্র তাহার প্রমাণ মিলিবে। তবে এই ব্যবস্থার সঙ্গে ব্যক্তিগত মালিকানার প্রাবল্য (monopolies) প্রতিরোধ করিবার যে সঙ্কল্প তিনি তাঁহার বাজেট বক্তৃতায় ঘোষণা করিয়াছেন তাহার সহিত এই আয়োজনের কতটা সামঞ্জস্য ঘটা সম্ভব তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। সাধারণ বুদ্ধিতে আপাততঃ ইহাই মনে হয় যে, করভার লাঘবের ফলে এই বিশেষ পরিতুষ্ট ক্ষেত্রটি আরও প্রবলতর হইয়া উঠিবার আশঙ্কাই বেশী।

বর্ত্তমান বাজেটের আরও একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, গত বৎসর শ্রীমোরারজী দেশাই প্রাইভেট সেক্টারে নিযুক্ত ভারতীয় কর্মচারীদের উপরে সর্ব্বসাকুল্যে প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে বার্ষিক ৬০,০০০ টাকা উচ্চতম অঙ্কে নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যাহার করিয়া লওয়া। দেশী বা বিদেশী সমপর্য্যায়ের কর্মচারীদের সকলেরই সকল বিষয়েই সমান অধিকার স্বীকৃত হওয়া উচিত, সে নীতি আমরা সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। বস্তুতঃ এই প্রসঙ্গে আমরা মনে করি যে, বর্ত্তমানে বিদেশী শিল্প-কুশলীদের উপরে যে আয়কর অব্যাহতির নিয়ম চালু আছে তাহা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত নহে। এই নিয়মের আশ্রয় লইয়া যে বহু সরকারী ও বেসরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানে বহু সংখ্যক নিতান্ত সাধারণ পর্য্যায়ের কর্ম্মী অন্যায় রকম সুযোগ-সুবিধা উপভোগ করিয়া থাকেন তাহা রদ হওয়া উচিত। এই নিয়মের বহু অপপ্রয়োগও হইয়া থাকে; যথা, তিন বৎসর এদেশে অবস্থানের পর বহু নিতান্ত সাধারণ অকুশলী বিদেশী কর্মচারী অল্পদিনের জন্য চাকুরি ত্যাগ করিয়া আবার পুনর্নিয়োগের দ্বারা তাঁহাদের দেয় ট্যাক্স ফাঁকি দিয়া থাকেন। ইহার ফলে কেবল যে জাতীয় কোষাগার অন্যায় রকমে ক্ষতিগ্রস্ত ও বঞ্চিত হয় শুধু তাহাই নহে, অনেক অপেক্ষাকৃত নিম্নতর মানের বিদেশী কর্ম্মী উচ্চতর শিক্ষিত ও কুশলী ভারতবাসী হইতে ঢের বেশী লাভ ও সম্মান পাইয়া থাকেন। ইহাতে কুশলী দেশবাসীদের মর্য্যাদার হানি ঘটে এবং তাঁহাদের মনে অনিবার্য্যভাবে অনেক ক্ষোভ জমিয়া উঠে। দেশ ছাড়িয়া বিদেশে চাকুরির জন্য যে বহু সংখ্যক ভারতীয় বৈজ্ঞানিক ও কুশলী আজ উদ্‌গ্রীব হইয়া পড়িয়াছেন, ইহাও তাহার একটা বিশিষ্ট কারণ।

কৃষ্ণমাচারী তাঁহার বাজেট বক্তৃতায় মূল্যবৃদ্ধি সম্বন্ধে বলেন যে মূল্যবৃদ্ধির জন্য বর্ত্তমান আনুপাতিক হিসাবে প্রভূততর পরিমাণে গৌণ করভার (indirect taxes) অংশত দায়ী, একথা অস্বীকার করা চলে না। তিনি মনে করেন যে, দেশের ট্যাক্সব্যবস্থার কাঠামোটির (taxation structure) একটা আমূল সংশোধন হইলেই তবে মূল্যমানের উপরে ইহার বর্ত্তমান প্রভাব সংযত হইতে পারে। এই প্রসঙ্গে তিনি মনে করেন যে বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণ দ্বারা মূল্যস্থিরতা সাধনের চেষ্টা না করিয়া অনুকূল আর্থিক আয়োজনের দ্বারাই এই উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করা উচিত।

কৃষ্ণমাচারীর বাজেট বক্তৃতায় আর একটি বিশেষ গুরুতর সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করা হইয়াছে। ইহা এই যে, বিদেশী পুঁজির এদেশে অধিকতর লগ্নীর অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করিবার মানসে এখন হইতে যাহাতে সরকারী শিল্পসংস্থানগুলিতে ব্যক্তিগত বিদেশী পুঁজি লগ্নী করা সম্ভব হয় তাহার আয়োজন করা হইবে। প্রস্তাবটি কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটি সহজেই অনুমেয়। সরকারী শিল্পে ব্যক্তিগত ভারতীয় পুঁজি লগ্নীর অবসর নাই। অথচ বিদেশীরা এই বিশিষ্ট সুযোগের অধিকারী হইবে। ইহার ভবিষ্যৎ প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী এবং ভারতের বৃহত্তম জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী হইবার আশঙ্কাই বেশী। স্থানাভাবে ইহার বিস্তৃত বিশ্লেষণ বর্ত্তমান প্রসঙ্গে সম্ভব হইল না।

সঙ্গীতের আসরে

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

বিচিত্র গুরুকরণ

এ আবার কেমন তীর্থযাত্রী দল?

মাথায় পাগড়ি, পোশাক-আশাক আর চেহারা দেখে ত মনে হয়, পশ্চিম থেকে আসছে। কিন্তু সঙ্গে এমন সব বাজনার যন্ত্রপাতি কেন? বীণা, তম্বুরা, মৃদঙ্গ—এসব নিয়ে তীর্থযাত্রা করা বড় একটা দেখা যায় না।

বরাবর পুরী পর্যন্ত চলে গেছে বিষ্ণুপুরের প্রাচীন রাজপথ। তার আধুনিক নাম হয়েছে অহল্যাবাঈ রোড। সেই পথে দেখা গেল ওই নতুন ধরণের যাত্রীদল। বিষ্ণুপুরের লোকেরা তাই কৌতুহলী হয়ে দেখছে আর নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে।

পশ্চিম থেকে তীর্থযাত্রীর দল প্রায়ই এখানে আসতে দেখা যায়। এই পথ বরাবর চলে গেছে দাক্ষিণে—শ্রীক্ষেত্র পুরীতে। তাই এই পথে এত যাত্রীদের আসা-যাওয়া। সেকালের পথঘাট কিছুই নিরাপদ নয়। দস্যুর ভয় পদে পদে। তাই প্রকাণ্ড এক-একটি দল করে তবে যাত্রীরা দূর তীর্থের পথে যাত্রা করত। আর পশ্চিম অঞ্চল থেকে পুরী যেতে গেলে বিষ্ণুপুর রাজ্যের এই অহল্যাবাঈ পথটি না হ'লে চলত না।

তাই এ পথে তীর্থযাত্রীদের আনাগোনা কিছু নতুন নয়। আর বিষ্ণুপুরবাসীরা যাত্রীদের বড় বড় দল দেখে আর তেমন কৌতুহলও বোধ করে না। কিন্তু এই দলটি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ওই সব বাজনার জন্যে। এত বাজনার সরঞ্জাম নিয়ে কোন দলকে তীর্থে যেতে দেখা যায় না।

বিষ্ণুপুরের লোকদের মুখে মুখে ছড়িয়ে কথাটা বিষ্ণুপুর-রাজের কানে গেল। বিষ্ণুপুরের রাজা তখন চৈতন্য সিংহ, দ্বিতীয় রঘুনাথের পৌত্র। সময়টা হ'ল ১৭৮১ কি ১৭৮২ খ্রীঃ। চৈতন্য সিংহের তখন বড় দুরবস্থা। রাজ্যের গৌরব তখন আর কিছু নেই, রাজা রঘুনাথের সঙ্গেই ৭০ বছর আগে সব চলে গেছে। প্রথমে মারাঠা বর্গীদের আক্রমণে, তার পর ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বিষ্ণুপুরের ধ্বংস হ'তে আর বিশেষ বাকী নেই। রাজা চৈতন্য সিংহ ৭ হাজার টাকায় বিষ্ণুপুরের দেবতা মদনমোহনের বিগ্রহ বন্ধক রেখেছেন বাগবাজারের গোকুল মিত্রের কাছে। এ সেই সময়ের কথা।...

চৈতন্য সিংহের তখন অনেক কিছু গেছে বটে। কিন্তু একটি জিনিষ তখনও যায় নি। তাঁর সঙ্গীতপ্রেমও বিষ্ণুপুর রাজাদের বংশগত সঙ্গীতপ্রেম।

চৈতন্য সিংহ লোকমুখে সংবাদ পেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, পশ্চিম অঞ্চল থেকে কোন সঙ্গীতাচার্য সদলে পুরী তীর্থে চলেছেন তাঁর রাজ্যের মধ্যে দিয়ে।

তাঁর রাজ্যের মধ্যে দিয়ে একজন বড় সঙ্গীতজ্ঞ চ'লে যাবেন, আর তিনি তাঁকে এমনি যেতে দেবেন, অভ্যর্থনা ক'রে রাজসভায় আনবেন না, তাঁর সঙ্গীত শোনবার সুযোগ পাবেন না—তাও কি হয়?

তিনি একজন কর্মচারী পাঠালেন সেই দলটির কাছে। সে উপস্থিত হয়ে তীর্থযাত্রীদের রাজসভায় উপস্থিত হবার জন্যে রাজার অনুরোধ ও আমন্ত্রণ জানালে।

দলের এক প্রবীণ ব্যক্তি বললেন—আমরা এখন বহুদূর যাব। পথের মধ্যে অযথা বিলম্ব করবার আমাদের ইচ্ছা নেই।

তখন রাজকর্মচারী তাঁকে নিবেদন করলে—কিন্তু আপনারা রাজার আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করলে তিনি বড় দুঃখিত হবেন। আপনাদের মধ্যে সঙ্গীতজ্ঞ আছেন শুনে তিনি অনুরোধ জানিয়েছেন রাজসভায় যেতে। বিষ্ণুপুর রাজ্যের মধ্যে দিয়ে একদল সঙ্গীতজ্ঞ চলে যাবেন, একবার রাজ দরবারে আসবেন না—তা হ'লে মহারাজা মনে কষ্ট পাবেন।

অগত্যা সেই প্রবীণ ব্যক্তিটি সদলে রাজা চৈতন্য সিংহের সমীপে এলেন। রাজা তাঁদের অভ্যর্থনা করলেন রাজসভায়। তারপর আলাপ-পরিচয়ে জানতে পারলেন

যে সেই দলে এক সঙ্গীতাচার্য আছেন, তিনি শিষ্য ও পরিজনবর্গ নিয়ে পুরীতীর্থে চলেছেন। তিনি আসছেন সুদূর পশ্চিম থেকে। আগ্রা আর মথুরার কাছাকাছি অঞ্চলে তাঁর বাস।

শুনে চৈতন্য সিংহ বললেন—আপনি আমার রাজ্যে অতিথি। আমার বিশেষ ইচ্ছা, বিষ্ণুপুরে আপনি কিছুদিন অবস্থান করুন। আপনার সঙ্গীত শোনবার জন্যে আমি উৎসুক হয়েছি এবং এরাজ্যে সঙ্গীতের গুণগ্রাহী আরও অনেক আছেন। আপনি আমাদের বঞ্চিত করবেন না।

তখন সেই প্রবীণ সঙ্গীতজ্ঞ সবিনয়ে বললেন—কিন্তু মহারাজ, আমি পুরুষোত্তমকে সঙ্গীত শোনাবার সংকল্প করে বেরিয়েছি। এখন যাত্রাভঙ্গ করতে পারব না। যদি অনুমতি করেন, তীর্থশেষে ফেরার পথে আপনার সভায় উপস্থিত হব।

চৈতন্য সিংহ তারপর তাঁকে বাস করবার জন্যে আর পীড়াপীড়ি না করে শুধু বললেন—বেশ তাই হবে। আপনি তীর্থযাত্রা সম্পূর্ণ করে এখানে আসবেন। কিন্তু আমার একটি অনুরোধ—অন্তত আজ আপনি এই আসরে আমাদের পরিতৃপ্ত করুন।

রাজার শেষ কথায় আর সেই সঙ্গীতজ্ঞ আপত্তি করলেন না। তিনি সম্মত হলেন গান গাইতে।

রাজ্যের ও রাজসভার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংবাদ দিয়ে আনান হ'ল। তারপর যথাসময়ে পশ্চিমের সেই গুণী গায়ক তাঁর সঙ্গীত পরিবেশন করলেন।

সঙ্গীত-সাধকের গান শুনে সভার সকলেই তৃপ্ত হলেন। রাজা তাঁকে বিশেষ সাধুবাদ জানালেন। তাঁর কথার প্রতিধ্বনি করলেন মুগ্ধ শ্রোতৃমণ্ডলী। পশ্চিমের সেই সঙ্গীতাচার্য যে একজন বড় গুণী একথা সকলেই বুঝতে পারলেন। ধন্য ধন্য শব্দে সভা মুখরিত হ'ল।

সেই আসরের একজন বিশিষ্ট শ্রোতা হলেন—পণ্ডিত গদাধর ভট্টাচার্য। বিষ্ণুপুর রাজের সভাপণ্ডিত। সংস্কৃতে পাণ্ডিত্যের জন্যে বিষ্ণুপুরে সকলের মাননীয় তিনি। তাঁর সঙ্গে পুত্র রামশঙ্করও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ২০।২১ বছরের তরুণ রামশঙ্কর সংস্কৃত চর্চায় পিতার যোগ্য শিষ্য এবং উদীয়মান পণ্ডিত। এ যাবৎ তিনি কেবল শাস্ত্রচর্চাই করেছেন, সঙ্গীত নয়। সঙ্গীতের প্রতি যে তাঁর আকর্ষণ আছে, একথা আগে কোনদিন জানা যায় নি।

কিন্তু সেই গুণীর গান শুনে তাঁর মধ্যে এক অপূর্ব রূপান্তর ঘটল। সেই অপরূপ সঙ্গীতমাধুর্য তাঁর জীবনে এক সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা হয়ে দেখা দিলে। এমন এক অপূর্ব আনন্দ তিনি অনুভব করলেন, যা তার আগে কখনও হয় নি!

পণ্ডিতজী—রামশঙ্কর সেই গুণীকে পণ্ডিতজী ব'লে পরে উল্লেখ করতেন—সেদিনের গানের পর সদলে চ'লে গেলেন পুরীর পথে। যাবার আগে বিষ্ণুপুর-রাজকে কথা দিলেন যে, ফেরার পথে তাঁর আতিথ্য স্বীকার ক'রে যাবেন।

তিনি চ'লে গেলেন, কিন্তু রামশঙ্করের মনে যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলেন, অনির্বাণ রয়ে গেল তার শিখা। পণ্ডিতজীর সেই সুর-মাধুর্যে রামশঙ্করের সঙ্গীত-সত্তার জন্ম হ'ল। এক অভূতপূর্ব উদ্দীপনার মধ্যে তিনি সঙ্গীতের বিচিত্র প্রেরণা লাভ করলেন মনে। সে এক অনির্বচনীয় পুলক। তাঁর সমস্ত অন্তর সেই সুরের মোহিনী মায়ায় বিহ্বল হয়ে উঠল। এমন এক রসের আবেদনে তাঁর মন প্রাণ ঝঙ্কৃত হ'ল, যার স্বাদ তিনি আগে কখনও পান নি। তাঁর অন্তরাত্মা মুখর হ'ল সেই স্বরলহরীর তরঙ্গে তরঙ্গে। যা ছিল তাঁর মনের অতলে সুপ্ত, সেই গায়কের সুরধারার মায়াপরশে তার নব জাগরণ হ'ল। তিনি খুঁজে পেলেন তাঁর জীবনের অর্থ। তাঁর পরম পথ।

সঙ্গীতের আকর্ষণ তাঁর জীবনে দুর্নিবার হয়ে উঠল। পশ্চিমের সেই গুণীর কণ্ঠে শোনা গান রামশঙ্কর সযত্নে মনের মধ্যে লালন করতে লাগলেন। নিভৃতে গুঞ্জন করতে লাগলেন সকলের অগোচরে। আর পণ্ডিতজীর আশাপথ চেয়ে তাঁর দিন কাটতে লাগল। কিন্তু বাইরে থেকে তাঁর মনের নতুন গতির সন্ধান কেউ পেলে না। কারণ, তাঁকে প্রকাশ্যে গান গাইতে কেউ শোনে নি কখনও।

তীর্থ পরিক্রমার শেষে পণ্ডিতজী একসময়ে ফিরে এলেন বিষ্ণুপুরে। তারপর আবার রাজা চৈতন্য সিংহের অনুরোধে তাঁর গানের আসর বসল। এবারেও অনেকে এলেন তাঁর গান শোনবার জন্যে। কারণ, তাঁর সেই প্রথমবারের গানের জন্যে তিনি বিষ্ণুপুরে খ্যাতিমান হয়েছিলেন। তাঁর গানের প্রশংসা মুখে মুখে ছড়িয়েছিল।

এবারকার আসরেও নিমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত হন রাজার সভাপণ্ডিত গদাধর ভট্টাচার্য। তাঁর সঙ্গে রামশঙ্করও আসেন।

সভা তখন পূর্ণ হয়ে উঠেছে। বিশিষ্ট শ্রোতারা সকলে গায়কের সামনে উপস্থিত। খানিক পরেই গান আরম্ভ হবার কথা।

গদাধর পণ্ডিতজীর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় প্রসঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। আর আসরে সবাই অপেক্ষা করছেন, কখন তাঁর গান আরম্ভ হবে।

এমন সময় রামশঙ্কর তাঁর পিতার কাছে এক অদ্ভুত প্রস্তাব করলেন।

গদাধরকে তিনি জনান্তিকে বললেন—আমি এই আসরে গান গাইব। আপনি মহারাজা এবং পণ্ডিতজীর অনুমতি প্রার্থনা করুন, যেন আমায় গাইতে দেওয়া হয়।

পুত্রের কথা শুনে গদাধর বিস্ময়ে প্রায় হতবাক্। যে রামশঙ্করকে তিনি কোনদিন গান গাইতে শোনেন নি, সে গান করতে পারে এমন কথাও কেউ কখনও তাঁকে বলে নি—সে আজ এই রাজসভায় এত লোকের সামনে, পশ্চিমের এত বড় একজন গায়কের সামনে গাইবে কি!

রামশঙ্করের কথায় তিনি একেবারে কান দিলেন না। পুত্রকে জানালেন যে, রাজার কাছে এমন উদ্ভট প্রস্তাব করতে পারবেন না তিনি। সে আবার কবে গান শিখলে?

কিন্তু রামশঙ্কর নিরস্ত হবার পাত্র নন। পণ্ডিতজীর সামনেই তিনি গান করবার সংকল্প নিয়ে এসেছেন এবং সেজন্যে তিনি প্রস্তুত। নিজের অন্তর থেকেই এমন শক্তি তিনি লাভ করেছেন, যা তাঁকে তাঁরই আদর্শ গায়কের সামনে গাইবার প্রেরণা আর সাহস দিয়েছে।

তিনি আবার বিনীত ভাবে পিতাকে বললেন—আমাকে গাইবার অনুমতি দিন, আমি এখানে গাইব। আপনি দেখুন, আমি গান গাইতে পারি কি না।

—তুমি কখনও গান কর নি! কি করে এমন প্রকাশ্য আসরে গান গাইবে? না, রাজার কাছে আমি এ অনুরোধ জানিয়ে অপদস্থ হতে পারব না।

রামশঙ্কর সবিনয় কিন্তু সবিশেষ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আবার বললেন—আমি পারব। আপনি শুধু আমার গাইবার অনুমতির ব্যবস্থা করে দিন। আপনাকে অপদস্থ হ'তে হবে না।

শেষ পর্যন্ত সম্মত হতে হ'ল গদাধরকে। তিনি রামশঙ্করকে গান গাইবার জন্যে রাজার অনুমতি নিয়ে দিলেন।

পুত্রকে গাইবার সম্মতি তিনি দিলেন বটে, কিন্তু তার কথার ওপর বিশ্বাস রাখতে পারলেন না। রামশঙ্করের গান আরম্ভ হবার আগেই তিনি সভা ত্যাগ ক'রে গেলেন। কারণ, তাঁর দৃঢ় ধারণা হয়েছিল যে, সভায় গান করতে গিয়ে পুত্র হাস্যাস্পদ হবে এবং সেখানে তাঁর থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। তাকে যখন গাইতে নিরস্ত করা যাবে না, তখন সভায় না থাকাই শ্রেয়। পুত্রের সঙ্গীত-ক্ষমতার ওপর তিনি কিছুতেই ভরসা করতে পারলেন না।

রামশঙ্কর কিন্তু তাঁর সংকল্পে অটল রইলেন। পিতা চ'লে গেলেও তিনি মোটেই ভয় পেলেন না।

তারপর যথাসময়ে তাঁর গানের পালা এল।

শ্রোতাদের বিস্মিত ক'রে দিয়ে গান আরম্ভ করলেন রামশঙ্কর। স্থির আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ধীর মধুর কণ্ঠে তিনি গাইতে লাগলেন সার্থকতার পরম আনন্দে।

যে-গান তিনি সেবার সেই পশ্চিমা গুণীর মুখে শুনে অভিভূত হয়েছিলেন, যে-গান তিনি এতদিন সাধনা করে এসেছেন সকলের অগোচরে,—সেই গান তিনি শোনাতে লাগলেন। নিজের প্রাণের এক বিচিত্র অনুভবে পূর্ণ হয়ে তদ্গত চিত্তে সেই সঙ্গীতাচার্যকে তাঁরই সঙ্গীত নিবেদন করলেন। যেন অন্তর থেকে উৎসারিত সুরের নৈবেদ্য অঞ্জলি ভরে সঁপে দিলেন তাঁর চরণে। আর সেই বিদেশী গুণী বিস্মিত পুলকে তাঁর নিজেরই ঘরাণা গান এই অপরিচিত তরুণের কণ্ঠে শুনতে লাগলেন।

রামশঙ্করের গান যখন শেষ হ'ল, শ্রোতৃমণ্ডলী তৃপ্ত হলেন তাঁর সুমিষ্ট ও সুরেলা কণ্ঠে। বিষ্ণুপুরের শ্রোতারা সকলেই তাঁর পরিচিত। তাঁদের বিস্ময়ের সীমা রইল না এই দেখে যে, রামশঙ্কর এমন সুন্দর গান গাইতে পারেন।

রামশঙ্করের সুখ্যাতিতে সভাস্থল পূর্ণ হ'ল। সেই তাঁর প্রথম আসরে গান গাওয়া এবং সেই দিন থেকেই তিনি বিষ্ণুপুরে প্রসিদ্ধ হলেন গায়করূপে।

সেই আসরে তাঁর গান শুনে বোধহয় সবচেয়ে মুগ্ধ

হলেন পণ্ডিতজী স্বয়ং। তিনি আশ্চর্য হলেন এই যুবকের অনুকরণ ক্ষমতা ও সুরবোধ দেখে। তিনি বার বার রামশঙ্করের কণ্ঠের প্রশংসা করতে লাগলেন।

তারপর রাজার দিকে ফিরে বললেন—মহারাজ, এই যুবক শ্রুতিধর এবং প্রতিভাবান্। যথোচিত সাধনা করলে যুবকটি পরে উচ্চশ্রেণীর গায়ক হ'তে পারবে। আপনার কাছে আমার একটি নিবেদন আছে। আমি এই যুবককে সঙ্গীতশিক্ষা দিতে পারি, যদি এখন কারও আপত্তি না থাকে; এবং সেজন্যে বিষ্ণুপুরে যতদিন প্রয়োজন বাস ক'রে যেতেও আমি প্রস্তুত আছি। মহারাজের কাছে আমার এই প্রার্থনা।

রাজা আনন্দের সঙ্গে বললেন—এ অতি উত্তম প্রস্তাব। এতে আপত্তি হবার কোন কথাই নেই। আমি আপনাকে সাদরে বরণ করি। আপনার বিষ্ণুপুরে অবস্থানের ফলে রামশঙ্কর সঙ্গীত-শিক্ষা লাভের সুযোগ পাবে এবং সেই সঙ্গে বিষ্ণুপুরও আপনার সঙ্গীতের আস্বাদ পেয়ে ধন্য হবে।

রামশঙ্করও যে পণ্ডিতজীর প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ সম্মত হলেন, তা বলাই বাহুল্য। তাঁর কাছে সঙ্গীতশিক্ষার চেয়ে বড় কাম্য তখন রামশঙ্করের আর কিছুই নেই। এবং তাও সেই আচার্যের কাছে, যাঁর গান শুনে তিনি জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা, সর্বোত্তম আনন্দ লাভ করেছিলেন। যাঁর কণ্ঠনিঃসৃত সুরধ্বনি তিনি এতদিন সযত্নে মনের মধ্যে লালন ক'রে এসেছেন। যাঁর সুরলহরী অনুসরণ করেছেন সমগ্র অন্তর দিয়ে। যাঁর সঙ্গীতসুধার আদর্শ রূপায়িত করাই তাঁর নিজের জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা রূপে মনে করেছেন! সুতরাং আচার্যের এই অভাবিত সাদর আহ্বান তাঁর কাছে অন্তর-দেবতার পরম আশীর্বাদ স্বরূপই মনে হ'ল। তাঁর প্রার্থনার শ্রেষ্ঠতম বরদান!

সেইদিন থেকে পণ্ডিতজী বিষ্ণুপুরে বাস করলেন প্রায় দু'বছর। এবং একাদিক্রমে রামশঙ্করকে এই দীর্ঘকাল অকপটে সঙ্গীতশিক্ষা দিলেন। রামশঙ্করও ব্রতের নিষ্ঠা নিয়ে একান্তভাবে সঙ্গীতশিক্ষায় নিজেকে নিয়োজিত করলেন। তাঁর প্রতিভা ও সাধনার সঙ্গে যুক্ত হ'ল গুরুর অকৃপণ বিদ্যাদান।

এমনিভাবে রামশঙ্করকে সঙ্গীতসাধনায় দীক্ষিত ক'রে পণ্ডিতজী বছর দুয়েক পরে স্বদেশে ফিরে গেলেন।…

রামশঙ্কর সেই যে সঙ্গীতের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন, তা তাঁর ৯২ বছর বয়সে মৃত্যু পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। তিনিই বিষ্ণুপুর ঘরাণার আদি সঙ্গীতাচার্য এবং তাঁর সঙ্গীতসাধনায় প্রতিষ্ঠিত করলেন বিষ্ণুপুরের গৌরব। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, রামকেশব ভট্টাচার্য, কেশবলাল চক্রবর্তী, দীনবন্ধু গোস্বামী, অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি শিষ্য গঠিত করে রামশঙ্কর ঘরাণার সঙ্গীতধারা বিষ্ণুপুরে এবং বাংলার নানাস্থানে প্রসারিত করলেন।

জীবনের প্রায় শেষ পর্যন্ত রামশঙ্কর আত্মীয়স্বজনদের কাছে তাঁর একমাত্র সঙ্গীতগুরু সেই পণ্ডিতজীর কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করতেন। আর বলতেন, তাঁর নিজের সেই প্রথম আসরটির কথা—যেদিন বিষ্ণুপুর রাজসভায় গান গেয়ে তিনি ভাগ্যক্রমে সেই গুণীকে গুরুরূপে লাভ করেছিলেন।…

এবিষয়ে রামশঙ্কর সচেতন ছিলেন কি না জানা যায় না, কিন্তু তাঁর সেই প্রথম গানের আসরের দিনটি থেকে বাংলা দেশে সঙ্গীতচর্চার ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় আরম্ভ হয়েছিল।

রামশঙ্করের সঙ্গীতশিক্ষা, সঙ্গীতসাধনা এবং সঙ্গীতশিক্ষা দানের ফলে, শুধু বিষ্ণুপুরে নয়, বাংলা দেশে ধ্রুপদ গানের প্রচলন হয়েছিল। আর প্রবর্তন হয়েছিল বিখ্যাত বিষ্ণুপুর ঘরাণার।

বিষ্ণুপুর ঘরাণার প্রবর্তক হলেন রামশঙ্কর ভট্টাচার্য। বিষ্ণুপুরবাসীদের মধ্যে আদি সঙ্গীতগুরু তিনি এবং তাঁরই শিষ্য-প্রশিষ্যের ধারায় বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতচর্চা বিস্তৃতি ও শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছে। এবং তাঁর এই মহান্ অবদানের মূলে আছেন আগ্রা মথুরা অঞ্চলের সেই অজ্ঞাতনামা সঙ্গীতাচার্য।

রামশঙ্করের সেই অপূর্ব গুরুকরণের এই ঐতিহাসিক তাৎপর্য!

সুরের আকাশে নতুন চন্দ্র

সেকালে, অর্থাৎ সঙ্গীত সম্মেলন ইত্যাদির যুগ আরম্ভ হবার আগে, ঘরোয়া আসরেই সঙ্গীতগুণীরা তাঁদের

গুণপনার পরিচয় দিতেন। তখনকার কলকাতায় কয়েকটি বাড়ীর জলসায় উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীতানুষ্ঠান হ'ত। সেই সব ঘরোয়া আসরে লব্ধপ্রতিষ্ঠ কলাবতেরা যেমন তাঁদের মুন্সীয়ানা দেখাতেন, তেমনি উদীয়মান সঙ্গীতজ্ঞরা সেখানকার বোদ্ধাদের স্বীকৃতি লাভ ক'রে প্রতিষ্ঠা পেতেন সঙ্গীত সমাজে। ক্রমে বৃহত্তর সঙ্গীত জগতে তাঁরা সুপরিচিত হতেন। সেদিক্ থেকে ঘরোয়া আসরগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল সঙ্গীতচর্চার শ্রীবৃদ্ধিতে।

এই সমস্ত ঘরোয়া আসর ছিল ধনী সঙ্গীতপ্রেমী ব্যক্তিদের নিজস্ব সঙ্গীতসভা। কলকাতায় এবং বাংলা দেশের নানা অঞ্চলে সমগ্র উনিশ শতক ধরে এই সঙ্গীতাসরগুলিতে উচ্চমানের সঙ্গীতচর্চা পুষ্টিলাভ করে। বাংলার অভিজাত ও নবোত্থিত দুই শ্রেণীর ধনীর গৃহেই সঙ্গীতসভা একটি আবশ্যিক অঙ্গ হয়ে বিদ্যমান ছিল। তাঁদের আনুকূল্যে গুণীরা সঙ্গীতসাধনার সুযোগ পেতেন এবং ফলে সঙ্গীতচর্চাও সঞ্জীবিত থাকত। উনিশ শতকের এই সব সঙ্গীতসভার ধারা বিংশ শতকের প্রথম যুগ পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে এসেছে এবং বিগত কালের সঙ্গীতসম্পদের উত্তরাধিকার লাভ করেছে বর্তমান কালের সমাজ।

এমন অনেক আসর সেকালে বাংলা দেশে ছিল। বলা যায়, খুব কম ধনী গৃহেই সঙ্গীত-সভা ছিল না। তখনকার সম্পন্ন পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে আবার কেউ কেউ নিজেরাই ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞ এবং রীতিমত সঙ্গীতচর্চা করে সম্মানিত হন গুণী বলে। কেউ কণ্ঠসঙ্গীত-সাধক, কেউ বা যন্ত্রী। যেমন, সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর (সেতার গুণী), সাতুবাবু নামে সুপরিচিত প্রমথনাথ দেব (সেতার শিল্পী), পাথুরিয়াঘাটার হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (ধ্রুপদ ও বীণ্কার), শ্রীরামপুরের গোস্বামী পরিবারের রামদাস গোস্বামী (ধ্রুপদী), ঠন্ঠনিয়ার শ্রীরাম চক্রবর্তী (পাখোয়াজী), রামদুলাল সরকারের দৌহিত্র অতুলচাঁদ মিত্র (সেতার সাধক), ভবানীপুরের কেশবচন্দ্র মিত্র (পাখোয়াজী) প্রভৃতি।

সেকালের কলকাতার সমস্ত উচ্চাঙ্গের ঘরোয়া আসরের নাম করা সম্ভব নয়, সকলের নাম জানাও অসম্ভব। মাত্র কয়েকটি আসরের স্থান এখানে উল্লেখ করা হ'ল: পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরগোষ্ঠীর (গোপীমোহন ঠাকুরের সময় থেকে) আসর, শোভাবাজার রাজ-পরিবারের (রাজা নবকৃষ্ণের আমল থেকে) দরবার, পাইকপাড়ার সিংহ-বংশের সঙ্গীতাসর, মসজিদ বাড়ীর গুহ পরিবারের (অম্বুবাবুর কাল থেকে) সঙ্গীত-সভা, শিমুলিয়ার সাতুবাবু লাটুবাবুদের আসর, এন্টালীর দেব-গৃহের সভা, বৌবাজারের মতিলাল বাড়ীর আসর, হিদারাম ব্যানার্জী লেনের দেওয়ান বাড়ীর সঙ্গীত সভা, পাথুরিয়াঘাটার হরকুটীরের আসর, তারকনাথ প্রামাণিকের বাড়ীর আসর, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ী, ঠন্ঠনিয়ার চক্রবর্তী বাড়ী, শিমুলিয়ার কৈলাস বসুর বাড়ী, গড়পারের নিবারণ দত্তের বাড়ী, ভবানীপুরের কেশব মিত্র ও রূপচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী, এল্গিন রোডের নাটোর ভবন, জোড়াসাঁকোর (রাজা) চুনী শীলের (পরে হরেন্দ্রকৃষ্ণ শীলের) আসর, পাথুরিয়াঘাটার সিদ্ধেশ্বর ঘোষ ও ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষের সভা, বড়বাজার অঞ্চলের গোবিন পিঠী ও দমদমার চুনীচাঁদের আসর, প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীটের বড়াল বাড়ী, ইত্যাদি।

কলকাতার বাইরের এই ধরণের ঘরোয়া আসরের কয়েকটি ছিল—মহিষাদলপুরের দত্তবাড়ী, রাণাঘাটের পালচৌধুরী ভবন, গোবরডাঙ্গার মুখোপাধ্যায়-গৃহ, শ্রীরামপুরের গোস্বামী ভবন প্রভৃতি। ময়মনসিংহ, গৌরীপুর, মুক্তাগাছা, তালন্দ, ভাওয়াল, হেতমপুর, কাশীপুর, বিষ্ণুপুর ইত্যাদি। তা ছাড়া, বর্ধমানরাজ, নদীয়ারাজ, ত্রিপুরারাজ, মুর্শিদাবাদ ও ঢাকার নবাব প্রভৃতির দরবার। তবে সে সব আসরে সঙ্গীতামোদী সাধারণের প্রবেশ ছিল না।

কলকাতার উচ্চশ্রেণীর আসরগুলির মধ্যে আর-একটি ছিল বৌবাজারের বেচারাম চন্দ্র মহাশয়ের বাড়ীতে। ২৩, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে (এখনকার নির্মলচন্দ্র ষ্ট্রীট)। নির্মলচন্দ্রের খুল্লতাত ছিলেন বেচারামচন্দ্র। তাঁর বাড়ীর আসর এই শতকের প্রথম দিকে হ'ত। তখন জোড়াসাঁকোর হরেন্দ্রকৃষ্ণ শীলের জলসার জৌলুষ ম্লান হয়ে আসছে। আর বেচারাম চন্দ্রের আসরের রোশ্নি হচ্ছে উজ্জ্বলতর। পরে অবশ্য সে আলোও একেবারে নিভে গিয়েছিল। কিন্তু তত পরের কথা এখনকার বক্তব্য নয়। যে আসরের কথা এখন বলা হবে তখন বেচারামবাবুর জমজমাট আসর বসত আর তার নাম-ডাক শোনা যেত সঙ্গীতামোদী লোকের মুখে মুখে। এ বাড়ীর আসরে অনেক গুণী, অনেক ওস্তাদ সঙ্গীত

পরিবেশন করেছেন, আসর মাৎ করেছেন। এখানকার বড় বড় জল্‌সা হ'ত নীচের উঠোনে। আর একটু ছোট-খাটো হ'লে, দোতলার হল ঘরে। বেচারামবাবু এক-একটি বড় আসরে এক রাতে দু' হাজার আড়াই হাজার টাকা পর্যন্ত খরচ করতেন। সুতরাং বোঝা যায়, তিনি কি ধরণের শখ্‌দার ছিলেন। কারণ সে আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা।

চন্দ্রমশায়ের বাড়ীর যে জলসার কথা এখানে বলা হবে, সেও প্রায় সেই সময়ের। ১৯১৬ সাল।

সেদিনের আসরে কয়েকজন সর্বভারতীয় গুণীকে বেচারামবাবু আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন। সুরশিল্পী এবং ছন্দশিল্পী। গায়ক, যন্ত্রী এবং সঙ্গতকার। সুরশিল্পীদের মধ্যে প্রধানরূপে উপস্থিত ছিলেন ওস্তাদ করামতুল্লা খাঁ, সরদ-গুণী। তবলা গুণীদের মধ্যে উল্লেখ্য হলেন লক্ষ্ণৌ ঘরাণার বিখ্যাত সঙ্গতী, খলিফা আবিদ্ হোসেন খাঁ। যুক্তপ্রদেশের আর-একজন যশস্বী তবলিয়া দর্শন সিংহও সেদিনের জলসায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তা ছাড়া আরও কয়েকজন তবলা-বাদক সে আসরে উপস্থিত ছিলেন। যেমন সেখানে ছিলেন আরও একাধিক গায়ক। আসরের সব ক'জন সুরশিল্পীর নাম শ্রুতিস্মৃতির পথ বেয়ে অমরত্ব লাভ করতে পারে নি। তাঁরা বিস্মৃতির অতলে লীন হয়ে গেছেন। কারণ, একটিমাত্র গায়ক সেই আসরে আপন প্রতিভার দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল হয়েছিলেন, যার ফলে নিষ্প্রভ হয়ে যায় সেই রাতে অন্য গায়কদের স্মৃতি। তিনি এক তরুণ গীতশিল্পী।

যে ক'জন গায়ক বা সুরশিল্পী সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে তিনি ছিলেন সবচেয়ে অখ্যাত। এবং সঙ্গীত সমাজে প্রতিপত্তিহীন। আসরে তাঁর গান হবার আগে শ্রোতৃ-সাধারণ তাঁর পরিচয় বিশেষ জানত না। তিনি শান্ত মুখে করামতুল্লা খাঁর পাশে বসে ছিলেন। সুন্দর আকৃতির একটি তরুণ। বাঙ্গালীর বেশভূষা, গৌরবর্ণ, সুশ্রী। সুগঠিত দেহ, মাথায় চিকণ ঘন কেশ, আয়ত চক্ষু। কিন্তু সে চোখে কোন ভাষা নেই। কটাক্ষবিহীন বিবর্ণ 'দৃষ্টি'।

১৯ বছরের সেই তরুণ গায়কের নাম বৃহত্তর সঙ্গীত জগতে তখনও অপরিচিত। তার আগে কোন বড় আসরে তাঁকে কেউ গান গাইতে শোনে নি। তাই শ্রোতাদের বিশেষ কারুর লক্ষ্য পড়েনি তাঁর দিকে। নিজে গান গাইবার আগে পর্যন্ত তিনি একজন সাধারণ ব্যক্তির মতন সেখানে বসে ছিলেন।

তাঁকে কিন্তু সে আসরে এনেছিলেন ওস্তাদ করামতুল্লা খাঁ। সে রাতের জল্‌সার প্রধান আকর্ষণ ছিলেন খাঁ সাহেব। প্রধানত তাঁর সরদযন্ত্রে গুণপনার পরিচয় পাবার জন্যেই শ্রোতারা সেখানে আসেন। তিনি তখন কলকাতায় বছর খানেক অবস্থান করছেন এবং এখানকার সঙ্গীতসমাজে বিশিষ্ট প্রতিভায় বিশেষ প্রতিপত্তি অর্জন করেছেন। (স্যর আশুতোষ চৌধুরী এবং তাঁর পত্নী প্রতিভা দেবী প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত) সঙ্গীত সঙ্ঘের প্রধান যন্ত্রসঙ্গীত শিক্ষক কৌকভ খাঁর অকালমৃত্যুতে তাঁর শূন্যস্থান পূর্ণ করতে অগ্রজ করামতুল্লা সঙ্ঘের উদ্‌যোগে এলাহাবাদ থেকে কলকাতায় এসেছিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতার অভাব তিনি দক্ষতার সঙ্গেই পূরণ করেছিলেন—শুধু সঙ্গীত সঙ্ঘে নয়, বাংলার সঙ্গীত সমাজেও। কৌকভ খাঁর কৃতী শিষ্যমণ্ডলী (সরদী ধীরেন্দ্রনাথ বসু, সুরবাহার গুণী হরেন্দ্রকৃষ্ণ শীল, এস্রাজী কালিদাস পাল, সেতারী নন্দী মতিলাল ও হীরালাল হালদার প্রভৃতি) তাঁর কাছেও তালিম নিয়েছেন। আরও অনেকেই পরে শিষ্যত্ব স্বীকার করেছেন তাঁর কাছে। আসরে তিনি সঙ্গীত-কৃতির পরিচয় দিতেন সরদীরূপে, কিন্তু সেতার, এস্রাজ ইত্যাদি যন্ত্রেও তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল এবং একাধিক যন্ত্রে তিনি শিষ্যদের শিক্ষা দিয়েছেন। কণ্ঠসঙ্গীতে, খেয়াল গানেও তাঁর কৃতী শিষ্য হয়েছিলেন বাংলা দেশে, এমন একজনের কথা এই বিবরণের মধ্যেই পাওয়া যাবে। প্রায় সব যন্ত্রীই অন্তরালে গায়ক। কৌকভ খাঁর মতন করামতুল্লাও গান গাইতে পারতেন এবং দুই ভ্রাতারই গানের প্রচুর সঞ্চয় ছিল। তবে কৌকভ খাঁর গানে কোন শিষ্য ছিলেন না, কিন্তু করামতুল্লার তাও ছিলেন।

সে আসরে করামতুল্লার বাজনা আর অন্যান্য গায়কের গান হয়েছিল, ভাল ভাবেই হয়েছিল। কিন্তু সেসব কথা এখানে বিশেষ করে কিছু বলবার নেই। বলবার আছে সেই তরুণ গায়কের কথা, তাঁর সেদিনের গানের কথা।

ওস্তাদ করামতুল্লাই তাঁকে গানের জন্যে আহ্বান জানালেন। তখনকার আসরে আজকালকার মতন নাম ঘোষণা করে অনেক সময় শিল্পীদের পরিচয় দেওয়া হ'ত না।

বিশেষ নবীন ও অপেক্ষাকৃত অপরিচিতদের। গুণপনা দেখিয়েই তাঁরা পরিচিতি লাভ করতেন। তা ছাড়া, সেটি ছিল অ-মাইক যুগ। এমন সাড়ম্বরে তখন শিল্পীর নাম ঘোষিত হতে শোনা যেত না, রাগের নাম ইত্যাদির বর্ণনা সমেত।

করামতুল্লা খাঁ শুধু বললেন—এবার এই ছেলেটি গান গাইবে।

গান আরম্ভ হবার আগে গায়কের নাম জানবার জন্যে শ্রোতারা বিশেষ কৌতূহলীও হলেন না। কারণ, বৃহত্তর সঙ্গীত-জগতে তাঁর কোন পরিচিতি বা স্বীকৃতি তখনও পর্যন্ত ছিল না।

কিন্তু সেই তরুণের জীবনের ও সঙ্গীত জীবনের কিছু পরিচয় দেবার আছে এবং সে আসরে তাঁর গানের কথা বলবার আগে তাঁর সঙ্গীতচর্চার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া হ'ল।

অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। বংশে বা বাড়ীতে সঙ্গীতচর্চা বা সঙ্গীতের আবহ কিছুই ছিল না। ছেলেটির কিন্তু বালক বয়স থেকেই প্রকাশ পায় গান গাইবার স্বভাবিক শক্তি। শুনে শুনে সে নানা ধরণের বাংলা গান সুরেলা গলায় গাইতে পারে। আর সেই বালকের গান ভাল লাগে সকলের। যে শোনে সেই মুগ্ধ হ'ত। গান গাইবার ক্ষমতার জন্যেই সে অতি অল্প বয়স থেকে এখানে সেখানে পরিচিত হতে থাকে। এমনই ভাবে তার পরিচয় হয় বিখ্যাত ধনী ও সৌখীন গুণী হরেন্দ্রকৃষ্ণ শীলের সঙ্গে। ছেলেটির বয়স তখন মাত্র ১২।১৩ বছর।

হরেন্দ্রকৃষ্ণের অট্টালিকার জলসাঘরে উচ্চাঙ্গের আসর বসত। তবে সেখানকার জলসায় ছেলেটির গান গাইবার বয়স তখন নয়। শীল মশায়ের একটি সখের থিয়েটার ছিল। সেই থিয়েটারে তিনি মাঝে মাঝে অংশ নেওয়াতেন তাকে। সুকণ্ঠ রূপবান্ ছেলেটি হরেন্দ্রকৃষ্ণের বাড়ীর থিয়েটারে স্ত্রী ভূমিকায় অভিনয় করত, সখীর দলে প্রধান হয়ে গান গাইত। আর মিষ্টি গলার জন্যে প্রশংসা পেত সকলের।

সে যে শুধু গান-বাজনা নিয়ে থাকত, তা নয়। স্কুলে যেত, লেখাপড়া করত। আনন্দ-প্রাণ কিশোর। স্ফুটনোন্মুখ সুরশিল্পী-মন। কিন্তু হঠাৎ এক মর্মান্তিক বিপর্যয় ঘটে গেল তার জীবনে। যেমন অভাবিত, তেমনি অকরুণ।

তখন তার ১৪ বছর বয়স। একদিন স্কুলের ক্লাসে বসে মাষ্টার মশায়ের পড়ানো শুনতে শুনতে মাথার মধ্যে ভীষণ যন্ত্রণা অনুভব করলে। অকস্মাৎ এই অসহ্য যন্ত্রণায় সে অজ্ঞান হয়ে গেল। দিন-দুপুরে নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার ঘনিয়ে এল তার চোখে। অবশেষে জ্ঞান তার ফিরে এল বটে, কিন্তু সে অন্ধকার আর দূর হ'ল না। আলোর জগৎ আর ফিরে এল না তার চোখ ভরে। কোন চিকিৎসাতেই আর সে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল না।

লেখাপড়া, স্কুলে যাওয়া সমস্তই সেদিন থেকে বন্ধ হয়ে গেল। দুঃখে মনস্তাপে একেবারে ভেঙ্গে পড়ল সে। এ আঘাত সামলাতে তার অনেক দিন লাগল। একটি বছর সে বাড়ী থেকে বেরুত না ক্ষোভে আর হতাশায়। তারপর জীবনের এই অপূরণীয় ক্ষতিও তার সহ্য হয়ে এল। নিষ্ঠুর ভাগ্যকে সে ক্রমে মেনে নিলে বাড়ীর সকলের চেষ্টায়, সান্ত্বনায়। তখন স্থির হ'ল, কি নিয়ে সে থাকবে, জীবন কাটাবে—কি হবে তার জীবনের অবলম্বন।

তার প্রাণ-মনের স্বাভাবিক গতি সঙ্গীতের দিকে। সুরের প্রতি তার আবাল্য আকর্ষণ। তাই সঙ্গীতকেই সে জীবনের প্রধান অবলম্বন করলে। এতদিন যা ছিল শুধু সখের শিক্ষা, এখন থেকে তা হ'ল রীতিমত সাধনার বিষয়। তার ভালভাবে সঙ্গীত-শিক্ষার ব্যবস্থা হ'ল।

এই নতুন করে সঙ্গীতচর্চার সময় তার প্রথম ওস্তাদ ছিলেন এক বাঙ্গালী সঙ্গীতগুণী। নাম শশীভূষণ দে। খেয়াল গায়ক। পেশায় তিনি আইনজীবী, কিন্তু সুরের নেশায় সঙ্গীত সাধক। সেকালের অনেক বাঙ্গালী সঙ্গীতজ্ঞের মতন অপেশাদার, কিন্তু সঙ্গীতে যথার্থ অধিকারী। সে-কালের যশস্বিনী গায়িকা শ্রীজান বাঈ—যাঁর কাছে অঘোর-নাথ চক্রবর্তী, বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, জিতেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরী প্রভৃতি বাংলার কৃতী গায়ক-বাদকেরা সঙ্গীত বিষয়ে ঋণী ছিলেন—শশীভূষণ দে'কেও তালিম দিয়েছিলেন। সেই খেয়াল-গায়ক শশীভূষণ হলেন ছেলেটির প্রথম সঙ্গীত শিক্ষক। এই তার হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে হাতেখড়ি। নতুন উৎসাহে সে নিয়ম মতন গান শিখতে আরম্ভ করলে। স্বভাবদত্ত মেধা ও নৈপুণ্যের সঙ্গে যুক্ত হ'ল ঐকান্তিক চেষ্টা। আর

সেই সঙ্গে শিক্ষকের উপযুক্ত নির্দেশ। শিক্ষার্থী অতি দ্রুত রীতিমত গায়ক তৈরি হয়ে উঠতে লাগল।

গানশিক্ষায় তার অসীম আগ্রহ আর গ্রহণ করবার শক্তি। শশীভূষণের কাছে বেশ কিছুদূর অগ্রসর হবার পর তার আর-একজন গুণীর সঙ্গে যোগাযোগ ঘটল। তিনি হলেন সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সতীশচন্দ্র একাধারে টপ্পা-গায়ক এবং তবলাবাদক। বাংলার এক শীর্ষস্থানীয় টপ্পা-শিল্পী এবং সঙ্গীতাচার্য মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অন্যতম শিষ্য সতীশচন্দ্র রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় সঙ্গীতচর্চায় শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেন। প্রথম জীবনে টপ্পা-গায়ক রূপে যেমন তাঁর সুনাম হয়, উত্তর জীবনে তেমনি তবলায় সঙ্গতকার রূপে। সতীশচন্দ্রের কাছে সেই ছেলেটি বিশেষ করে টপ্পা গান আর তার রীতি-নীতি শিখতে লাগল।

এমনি করে স্বভাব-গায়ক শিক্ষিত-গায়ক হয়ে উঠল একনিষ্ঠ সাধনায়। আর তার গুণগ্রাহী, শুভানুধ্যায়ীর চক্র ক্রমে বিস্তৃত হতে লাগল। তার এক পরম হিতাকাঙ্ক্ষী হলেন স্বনামধন্য মল্লযোদ্ধা গোবরবাবু (যতীন্দ্রচরণ গুহ)। সেই তরুণ গায়কের সঙ্গীত জীবনে গোবরবাবুর পৃষ্ঠপোষকতা একটি উল্লেখ্য অধ্যায় হয়ে আছে এবং অপ্রকাশিত অধ্যায়। যেমন অপ্রকাশিত আছে গুহ মহাশয়ের নিজেরই সঙ্গীত-জীবন। একথা সুবিদিত আছে যে, বাংলার বীর সন্তান গোবরবাবু ইউরোপ ও আমেরিকা ভূখণ্ডে অমিতশক্তি মল্লরূপে ভারতের মুখোজ্জ্বল করেছিলেন। মল্ল-বিশ্বের 'লাইট হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন' গৌরব লাভ করে ভারতবর্ষে এক অনন্য-সাধারণ কীর্তি স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু একথা অবিদিত আছে যে, প্রথম জীবনে তিনি রীতিমত সঙ্গীতচর্চা করেছিলেন, গুণী কলাবতের শিক্ষাধীনে এবং নিষ্ঠার সঙ্গে। কৌকভ খাঁ এবং পরে করামতুল্লা খাঁর কাছে দীর্ঘকাল তিনি সেতারে তালিম নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর দেশ-বিদেশে মল্ল-প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্যে সঙ্গীতচর্চা আর নিয়মিত করবার সুযোগ পান নি। তবে সঙ্গীতপ্রেমী এবং সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক থেকেছেন বরাবর। এই গুণে তিনি তাঁর বংশীয় ধারার উত্তরাধিকারী। তাঁদের পারিবারিক সঙ্গীতসভা এবং সঙ্গীতক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতার কথা ভাবী-কালের স্মরণযোগ্য। যতীন্দ্রচরণের পিতামহ অম্বিকাচরণ (অম্বু গুহ নামে সুপরিচিত) শুধু একজন সৌখীন মল্লযোদ্ধা এবং বাংলায় কুস্তিচর্চার অন্যতম প্রচলনকর্তা ছিলেন না। তাঁর আর এক পরিচয় হ'ল—সঙ্গীতজ্ঞদের মুক্তহস্ত পৃষ্ঠপোষক-রূপে। তাঁরই আনুকূল্যে সেকালের বেণী ওস্তাদ (বেণীমাধব অধিকারী) প্রসিদ্ধ খেয়াল-গায়ক আহম্মদ খাঁর কাছে সঙ্গীত শিক্ষার সুযোগ পান। বেণীমাধব ছিলেন নাট্যাচার্য গিরীশ-চন্দ্রের 'চৈতন্যলীলা,' 'দক্ষযজ্ঞ' ইত্যাদি নাটকের সঙ্গীত পরিচালক, সেযুগের একজন খ্যাতিমান গায়ক এবং স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গীতগুরু। গুহ পরিবারের আর-এক সঙ্গীতপ্রেমী তারাচরণের বদান্যতায় বিখ্যাত টপ্পাগুণী মহেশ-চন্দ্র মুখোপাধ্যায় (মহেশ ওস্তাদ নামে সঙ্গীত জগতে সুপরিচিত) সঙ্গীতাচার্য রাজকুমার মিশ্রের কাছে তালিম নিতে পেরেছিলেন। সেযুগের অনেক সঙ্গীতপ্রেমী ধনী এমনি ভাবে প্রতিভাবান বাঙালীদের রীতিমত ভাবে সঙ্গীত-শিক্ষার সুযোগ করে দিতেন পশ্চিমা কলাবতদের কাছে এবং তাঁদের সেই পৃষ্ঠপোষকতার ফলে বাংলায় সঙ্গীতচর্চার শ্রীবৃদ্ধি হ'ত। উক্ত গুহ বংশে হরি গুহ (তাঁর এক বাড়ীর বহির্ভাগে কৌকভ খাঁ বাস করতেন এবং সেখানেই তাঁর আকস্মিক মৃত্যু হয়), ক্ষেতু গুহ প্রভৃতি আরও কয়েক-জন সঙ্গীতপ্রেমী ছিলেন এবং যতীন্দ্রচরণও (গোবরবাবু) সেই ধারার মানুষ। তাঁর বিডন রো-র বাড়ীতে যেমন অনেক উঁচুদরের গান-বাজনার আসর বসেছে, তেমনি অনেক সঙ্গীতজ্ঞদেরও পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন তিনি। সেসব বিবরণ এখানে দেবার প্রয়োজন নেই। শুধু সেই দৃষ্টিশক্তি-হারানো ছেলেটির সঙ্গীত-শিক্ষার কথায় তাঁর প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হবে।

যতীন্দ্রচরণের ৫২, বিডন রো-তে তখন সঙ্গীতের নিয়মিত বৈঠক হয়ে থাকে। তাঁর প্রথম ওস্তাদ কৌকভ খাঁর মৃত্যুর কয়েক মাস পর থেকে আসেন করামতুল্লা খাঁ। তবলিয়া দর্শন সিং মাঝে মাঝে আসেন। পশ্চিম থেকে কলকাতায়-আসা এবং কলকাতাবাসী নানা গায়ক-বাদকদের গান-বাজনার আসর মাঝে মাঝে বসে সেখানে। এমন সময়ে সেই ছেলেটিকে তিনি দেখলেন, তার গান শুনলেন আর বুঝলেন যে, সে একটি সঙ্গীত-প্রতিভা।

সঙ্গীত-শিক্ষার শেষ নেই। রাগবিদ্যা নিরবধি। এক একজন সঙ্গীত-সাধক সারা জীবন চর্চা করেও ত বলে থাকেন যে সঙ্গীতবিদ্যা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করা গেল না। আর

এ ক্ষেত্রে গায়কটি ত নিতান্ত তরুণ। বয়স হবে ১৮ বছর। শশীভূষণের কাছে শিখেছেন, সতীশচন্দ্রের কাছে শিখছেন—ভাল কথা। কিন্তু এইখানেই ত শেষ হতে পারে না। এমন তৈরি গলা, এমন সঙ্গীতৈকপ্রাণ ছেলেটির আরও শিক্ষা করলে ভাল হয়। আরও সঙ্গীত সংগ্রহের প্রয়োজন।

পশ্চিমে গিয়ে সেখানকার কোন হিন্দুস্থানী কলাবতের শিক্ষা নেওয়া তার এখন দরকার। তার জন্যে দস্তুরমত ব্যয় করতে হবে। কিন্তু তার বাড়ীর সে সঙ্গতি নেই। তখন গোবরবাবু নিজে থেকেই এ বিষয়ে উদ্‌যোগী হলেন। ছেলেটির পশ্চিমাঞ্চলে গান শিক্ষার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। দর্শন সিং প্রভৃতির কাছে শুনেছিলেন গয়ার প্রসিদ্ধ খেয়াল-গায়ক হনুমানদাসজীর কথা। গুণী হারমোনিয়ম-বাদক সোনীজীর পিতা সেই হনুমানদাসজীর কাছে তার সঙ্গীত-শিক্ষা করতে যাওয়ার আয়োজন করা হ'ল। গোবরবাবু তাঁর এক ধনী বন্ধুর সহযোগিতায় তার গয়ায় সঙ্গীত-শিক্ষার উদ্দেশ্যে বাস করবার সব ব্যাপারের ভার নিলেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত গয়ায় হনুমানদাসজীর কাছে তার তালিম নিতে যাওয়া হ'ল না দর্শন সিং-এরই পরামর্শে। দর্শন সিং গোবরবাবুকে বললেন, "এত দূরে গিয়ে এত টাকা খরচ ক'রে শিখতে অনেক রকম অসুবিধা হতে পারে। তার চেয়ে হাতের কাছে খাঁ সাহেব রয়েছেন। ওঁর কাছেই শেখবার ব্যবস্থা করুন।"

কথাটি সকলেরই অনুমোদন পেলে এবং ওস্তাদ করামতুল্লা খাঁর কাছে তার খেয়াল শেখবার ব্যবস্থা হ'ল। খাঁ সাহেব বলে দিলেন, 'প্রথম ছ' মাস ও বাইরে কোথাও গাইবে না।' অর্থাৎ তাঁর কাছে শেখা খেয়াল গান কোন আসরে সে গাইতে পারবে না। গাইবে ছ' মাস পরে, এই নতুন ঢংএর গান গলায় ভাল ভাবে বসলে।

খাঁ সাহেবের মাসিক দক্ষিণা ধার্য হ'ল ১০০ টাকা। শিক্ষার্থীর নাড়া বাঁধাও হ'ল গোবরবাবুর বিডন রোর বাড়ীতে। তিনিই তার তখনকার শিক্ষার ভার নিয়েছিলেন। এই ভাবে করামতুল্লা খাঁ তাকে শেখাতে আরম্ভ করলেন গোবরবাবুর আনুকূল্যে এবং দর্শন সিংএর প্রস্তাবে। দর্শন সিংএর সঙ্গে খাঁ সাহেবের পরিচয় অনেক দিনের, এলাহাবাদে থাকবার সময় থেকে। এলাহাবাদেই কাছাকাছি দর্শন সিংএর বাড়ী এবং তিনি এলাহাবাদে করামতুল্লার সঙ্গে মাঝে মাঝে বাজাতে আসতেন, খাঁ সাহেব কলকাতায় আসবার আগে। সেখানে একবার কৌকভ খাঁ কলকাতা থেকে সপরিবারে যান এবং দর্শন সিংএর বাজনা শোনেন জ্যেষ্ঠর বাড়ীতে থাকবার সময়। বাজনাও তাঁর সঙ্গে। আর তাঁকে কলকাতায় চলে আসবার জন্যে বলেন। কৌকভ খাঁ নিজে তখন কলকাতায় কয়েক বছর থেকে এখানকার ধনীদের সঙ্গীতপ্রেমের পরিচয় পেয়েছেন। তাই দর্শন সিংকে কলকাতায় আসবার পরামর্শ দিলেন সঙ্গীতক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভের জন্যে।

তারপরই দর্শন সিং কলকাতায় চলে আসেন (করামতুল্লা খাঁ এলাহাবাদ থেকে কলকাতায় এসেছিলেন তাঁর অনেক পরে, কৌকভ খাঁর মৃত্যুর পরে) এবং কলকাতায় দীর্ঘকাল বাস ক'রে এখানকার সঙ্গীতজগতে সম্মানের সঙ্গে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর আকস্মিকভাবে মৃত্যুও ঘটে কলকাতায় একটি সঙ্গীতের আসরে সঙ্গত করবার সময়েই, লালচাঁদ বড়াল মহাশয়ের (তিনি তখন পরলোকগত) বাড়ীতে। দর্শন সিং কলকাতায় আসবার আগে গয়ায় অনেক সঙ্গীতাসরে বাজিয়েছেন, তা ছাড়া পশ্চিমাঞ্চলের আরও নানা স্থানের আসরে। এই সমস্ত জলসায় তিনি ভারতবর্ষের বহু উচ্চশ্রেণীর গায়ক-বাদকের সংস্পর্শে আসেন এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গতের অভিজ্ঞতার ফলে বিভিন্ন রীতির গানে কিছু কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করেন, বিশেষ ঠুংরি গানে। কারণ তাঁর সুরবোধ এবং গান শুনে তা অনুকরণ করবার বা স্মৃতিতে সংগ্রহ করে রাখবার ক্ষমতাও খানিক ছিল। তাই সেযুগের ভারতের শীর্ষস্থানীয় ঠুংরি গুণী (গোয়ালিয়রের) গণপৎ রাও (ভাইয়া সাহেব নামে সুপরিচিত), মৌজুদ্দিন প্রভৃতি এবং গয়া ইত্যাদি পশ্চিমাঞ্চলের বাঈজী সম্প্রদায়ের সঙ্গে সঙ্গত করবার ও পরিচিত হবার ফলে কয়েকটি ভাল ঠুংরি গান সংগ্রহ করেছিলেন দর্শন সিং। তাঁর বিষয়ে এখানে এত কথা বলা অবান্তর নয়, কারণ সেই তরুণ গায়কের সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে। সে গায়ক উত্তর-জীবনে প্রায় সব রীতির গানের সুকণ্ঠ গায়করূপে সারা ভারতে স্বনামধন্য হয়েছিলেন—ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা থেকে আরম্ভ ক'রে বাংলা কাব্য সঙ্গীত, এমন কি পদাবলী কীর্তন পর্যন্ত। ঠুংরি গানেরও তিনি চর্চা করেছিলেন, ভালই গাইতেন ঠুংরি এবং তাঁর ঠুংরি শিক্ষার মূলে ছিলেন তবলা-বাদক দর্শন

সিং। তিনি গোবরবাবুর বাড়ীতে দর্শন সিংএর সঙ্গে পরিচিত হন এবং দর্শন সিংই তাঁকে প্রথম কয়েকটি ঠুংরি গান দিয়েছিলেন, গলায় তুলতেও সাহায্য করেছিলেন। তার মধ্যে চারখানি গান (দর্শন সিংএর কাছে শেখা) তিনি গোবরবাবুর বাড়ীতে একটি হোলির আসরে গেয়েছিলেন অতি চমৎকার ভাবে। তা হ'ল, বেচারাম চন্দ্র মশায়ের সেই আসরের কিছুদিন আগেকার কথা। সেই চারটি ঠুংরি গানের মধ্যে দু'টি হ'ল—

(১) চলো গুঁইয়া আজো খেলো হোরি, কৌই শামর কোই গোরী।···

(২) কেইসী ধুম বঁচারি।···

সে আসরে তিনি শুধু ঠুংরিই গেয়েছিলেন (সে গান সবই দর্শন সিংএর কাছে পাওয়া) আর গোবরবাবুর বিডন রো'র বাড়ীর রাস্তার ধারের ঘরখানির জানলার সামনে ভিড় জমে যায় তাঁর মাধুর্যময় গানগুলি শোনবার জন্যে।···

ওস্তাদ করামতুল্লার তালিমও তিনি সেই ঘরে বসেই নিতেন। খাঁ সাহেবের কাছে তিনি শিখেছিলেন তিন বছরেরও বেশি। খেয়াল আর তেলেনা। বিভিন্ন রাগের গঠন, প্রকৃতি ও পদ্ধতি। ছ'মাস খাঁ সাহেবের কাছে একভাবে শিক্ষার পর তাঁর গানের চাল অনেকখানি বদলে গিয়েছিল, তাঁর বন্ধু-বান্ধবরা সকলেই এটি লক্ষ্য করেছিলেন। সেই সময়েই হ'ল বেচারামবাবুর সেদিনের বিশেষ আসর।

করামতুল্লা খাঁ তাঁর পাঠান জবানের উর্দুতে 'এই ছেলেটি এবার গাইবে' বলবার পর সেই তরুণ গায়ক গান আরম্ভ করলেন। দরাজ, ভরাট তাঁর গলা প্রথম থেকেই অমনোযোগী শ্রোতাদের মন আকর্ষণ করে নিলে। গলা শুধু তৈরি নয়, বড় দরদী। হৃদয়গ্রাহী ভাব দিয়ে গান করছেন এমন ভাবে যে, শ্রোতাদের মন অনুরণিত হয়ে উঠছে সেই সুরে। তাল-লয়েও কোন খুঁত নেই। যেমন স্বচ্ছন্দ সুরবিহার, তেমনি তালেও পারদর্শিতা। অনায়াস দ্রুতগতির ও নানা রীতির তানকর্তব, রাগের সুনিপুণ বিন্যাস, প্রাণস্পর্শী কণ্ঠস্বর। প্রথম শ্রেণীর গায়কের সমস্ত গুণই সেই তরুণের মধ্যে বর্তমান। সুতরাং কলাবত ও বোদ্ধা সকল শ্রোতারাই তাঁর গানে পরিতৃপ্ত হ'তে লাগলেন। আসর সজীব হয়ে উঠল সুরে সুরে। তাল-লয়ের কাজেও এমন প্রবীণ এই বয়সে সুলভ নয়। তাঁর গানের সঙ্গে ওস্তাদ আবিদ হোসেন এবং দর্শন সিং দুজনেই বাজালেন পালা ক'রে এবং সাবাস দিলেন। তালের কঠিন পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন নবীন গায়ক। ভারতবিখ্যাত ওস্তাদদের সামনে তিনি সমান দাপটে দু'ঘণ্টা ধরে তেলেনা আর খেয়াল গেয়ে গেলেন। একাই আসর মাৎ করলেন সেদিন।

তারপর যখন গান শেষ করলেন, উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় শ্রোতারা মুখর হয়ে উঠলেন। আসরে সাড়া পড়ে গেল।

পশ্চিমা কলাবতেরা সাগ্রহে গায়কের পরিচয় জানতে চাইলেন—এ কে?

দর্শন সিং সংক্ষেপে জানালেন—একটি বাঙ্গালী ছেলে।

শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলেন যে, গায়ক বাঙ্গালী! এই বয়সের একজন বাঙ্গালী এমন সাবলীল দক্ষতায় হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীত গাইতে পারলেন—তাঁদের কাছে এ এক অভিনব অভিজ্ঞতা। উপস্থিত অনেকেই গায়কের নাম জানতে কৌতূহলী হলেন। ছোকরার নাম কি?

কৃষ্ণচন্দ্র দে।······

বেচারামবাবুর বাড়ীর আসরে এমনিভাবে অতি তরুণ বয়সে অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে বৃহত্তর সঙ্গীতগুণী সমাজের স্বীকৃতি লাভ করলেন। সঙ্গীতরাজ্যে তাঁর গৌরবময় জয়যাত্রা সেই আসর থেকেই আরম্ভ হ'ল।

সেদিনের শ্রোতাদের মধ্যে যাঁরা বিচক্ষণ তাঁরা স্পষ্টই বুঝলেন—সুরের আকাশে নতুন চন্দ্রের উদয় হয়েছে।

কৃষ্ণচন্দ্র নয়—পূর্ণচন্দ্র!

বিশ্বামিত্র

চাণক্য সেন

পাঁচ

অনেক বছর আগে ভারতবর্ষকে বিদেশী শাসন থেকে স্বাধীনতায় মুক্ত করবার সম্মোহনী সংগ্রামে আরও অনেক অনেকের মত কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল যখন অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই ভাবেন নি, একদিন তাঁকে সমস্ত এক প্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করতে হবে। গান্ধীজীর নেতৃত্বে তাঁরা নিজেদের দেশের সেবক মনে করতে শিখেছিলেন; সেবক যে শাসক হবে, শাসনের মধ্যে যে সেবার চরম বিন্যাস থাকতে পারে একথা মহাত্মা যত্ন ক'রে তাঁর শিষ্যদের শেখান নি। আজ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাঁর সৃষ্টিশীল মনের নির্জন ভাবচর্চায় বুঝতে পারেন, নেতৃত্ব নামক রহস্যময় ভূমিকা সেদিন থেকেই কতগুলি অনুচ্চারিত কারণে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিল। কৃষাণপুরে তিনি যে অনায়াসে কংগ্রেসের নেতা হ'তে পেরেছিলেন তার কারণ ছিল তাঁর শিক্ষা, সামাজিক প্রতিপত্তি, বংশগৌরব, পসার, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও দল গঠনের নিপুণ কলা-কৌশল জ্ঞান। জিলা বোর্ডের সভাপতিত্ব করবার বছরগুলিতে নানারকম মানুষের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ তাঁর হয়েছিল, মনুষ্যচরিত্রকে বুদ্ধি ও কৌতুকের সঙ্গে বিচার করবার প্রশস্ত সুযোগ আদালতে আইন-ব্যবসা করতে গিয়েও তিনি আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন। পরবর্তী জীবনে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক আন্দোলনে নিজের নেতৃত্বকে কৃষাণপুরের সুগঠিত দলীয় কাঠামোয় দৃঢ় প্রতিষ্ঠার পর প্রাদেশিক ক্ষেত্রের বৃহত্তর পরিধিতে প্রসারিত করবার সার্থক প্রচেষ্টায় জিলা বোর্ড ও আদালতের পরিপক্ক অভিজ্ঞতার তিনি সুচারু ব্যবহার করতে পেরেছিলেন। তথাপি, দীর্ঘকাল উদয়াচলের মুখ্যমন্ত্রিত্ব করবার সময়, তাঁর কবি-মনে বার বার অসহ অস্থিরতার সঙ্গে যে প্রশ্ন জেগেছে, যার উত্তর তিনি কখনও খুঁজে পান নি, তা হল: এই আট কোটি মানুষের সবরকম ভাল-মন্দের ভার বিধাতা আমার উপরে কেন ন্যস্ত করলেন? এ ভার বইবার যোগ্যতা আমার কোথায়? কোন রহস্যকাঠির ছোঁয়ায় সাধারণ মানুষ অসাধারণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়? কেন হয়? ইতিহাস যখন তাঁর বিচার করে, তখন কি তার স্মরণ থাকে যে, আরও দশজনের মত অসাধারণ মানুষও অতি সাধারণ, তার দৃষ্টি অনিবার্য কারণে সীমিত; মাংস তার ক্ষুধার্ত; চিত্ত দুর্বল ও চঞ্চল; মন স্নেহাতুর, প্রলুব্ধ; শক্তি পরিমিত; বুদ্ধি-বিবেচনা অসমাপ্ত? রাজার চেয়ে প্রজার শাসন শ্রেয়তর হতে পারে, কিন্তু অনেক বেশি কঠিন। রাজার সব আছে, তাই কিছুতে তাঁর আকাঙ্ক্ষা নেই। শাসন তাঁর রক্তের বীজ। প্রজার কিছু নেই, তাই আকাঙ্ক্ষা তার অপরিমিত, শাসনে তার প্রতিরোধ মজ্জাগত। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মাঝে মাঝে উপলব্ধি করেছেন, শাসন খাটে একমাত্র দুই শ্রেণীর লোকদের; রাজা ও ঋষি। তাই সবচেয়ে সার্থক শাসক রাজর্ষি। যে রাজা নয়, ঋষিও নয়, অথচ শাসক, ইতিহাস তাকে কঠিন বিচারে কঠোর দণ্ড দেয়, কারণ পদে পদে তার স্খলন অনিবার্য, তার ভুলের সীমা থাকতে পারে না, তার দুর্বলতা বিধবার ভোগলিপ্সার মতই নিন্দনীয় হ'লেও স্বাভাবিক।

কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ব্যক্তিত্বে রাজনৈতিক নেতা ও কবি এই দুই ধারা সমান্তরালে প্রবাহিত। তাই তিনি শাসন করতে পেরেছেন, পেরেছেন দল গঠন ক'রে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে, পুষ্ট করতে। রোম নগরী জ্বলে ছারখার হবার সময় যে নীরো বেহালা বাজিয়েছিলেন তিনি সম্রাট-শাসক ছিলেন না, ছিলেন কবি, শিল্পী। জ্বলন্ত রোমের আর্ত চীৎকার সুরসাগরে নিমগ্ন নীরোর কানেও পৌঁছায় নি। ইতিহাস নীরোকে যতই মন্দ বলুক, সেই ভয়ংকর মুহূর্তে তিনি ছিলেন অপরাজেয়, ইতিহাসের অনেক দূরে, যেখানে সুর ও সৌন্দর্য আনন্দ-ঐক্যতানে প্রেমাচ্ছন্ন। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের অনেক বার মনে হয়েছে, রাজ্য যাদের চালাতে হয় তাদের প্রত্যেকের নীরো হওয়া একান্ত দরকার। যখন রাজকার্য অথবা দলীয় রাজনীতিতে ভয়ংকর কোনও গোলমাল বেধেছে,

নীরোর মত তিনিও চেয়েছেন সবকিছু থেকে পালিয়ে কোথাও গিয়ে বেহালা বাজাতে। বেহালা না বাজালেও অন্ততঃ কবিতার ও সাহিত্যের রসে নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে তাঁর বাসনা হয়েছে। কখনও বা পেরেছেন, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পারেন নি: ঘটনা-দুর্ঘটনার উত্তাল তরঙ্গে তাঁকে বিধ্বস্ত হ'তে হয়েছে। কিন্তু সামলে যে উঠতে পেরেছেন তার কারণ, তিনি জানেন, তাঁর নেতৃত্ব-গুণের চেয়েও কবি-মন, যেখানে নিজের দুর্বলতাকে তিনি মানবজীবনের বৃহত্তর দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পেরেছেন। অন্যের দুর্বলতাকেও: সেখানে সর্বদা মৃদু উচ্চারণে বিশ্ব-বিবর্তনের অমর সাক্ষী তাঁকে অনুক্ষণ ব'লে গেছে: এই অনন্ত ভাঙ্গা-গড়া, ভোগ-ত্যাগ, জীবন-মৃত্যু, উত্থান-পতনের অমীমাংসিত রহস্যের কোনওদিন মীমাংসা হবে না; তুমি যাই করো, যতই করো, একদিন সব লোপ পেয়ে যাবে। তুমি মানুষ, তোমার দুর্বলতা অশোধনীয়। তোমার শক্তির মধ্যে লুক্কায়িত অশক্তি, ক্ষমার মধ্যে প্রতিহিংসা, প্রেমের মধ্যে ঘৃণা, ত্যাগের মধ্যে লোভ, মৈত্রীতে বৈরিতা, বন্ধুত্বে বিশ্বাস-ঘাতকতা। তুমি ক্ষত্রিয় নও, ব্রাহ্মণ নও, শূদ্র নও: তুমি একসঙ্গে সব।

দুর্গাভাই-এর সঙ্গে টেলিফোনে বাক্যালাপ শেষ ক'রে মাধব দেশপাণ্ডের আগমন প্রতীক্ষার স্বল্পক্ষণে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মনে এসব পুরাতন ভাবনা পুনরায় খেলে গেল। রাজনীতি যাঁদের পেশা, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মনে মনে বললেন, তাঁদের প্রথম পরিহার্য হ'ল রাজনীতিকে নেশায় পরিণত করা। অন্য দশটা পেশার মত রাজনীতিকেও যথাসম্ভব নিরাবেগ চিত্তে গ্রহণ করা দরকার। রাজনীতিতে উত্তেজনা নিশ্চয় আছে, বৈচিত্র্যও; কিন্তু আবেগহীন দূরদৃষ্টি ছাড়া এ খেলায় জয় কঠিন। পাকা রাজনৈতিক যদি অসূয়াহীন না হন, যদি তাঁর অন্তরের গভীরে সবকিছু নিয়ে, এমন কি নিজেকে নিয়েও কৌতুকবোধের ক্ষমতা না থাকে, তা হ'লে শেষ পর্যন্ত তাঁর পরাজয়ের সম্ভাবনা। আমি জিতব, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, কেননা আমি নিরাবেগ, সিনিক; দুর্গাভাই হারবেন, কারণ তিনি রাজনীতিকে বড় বেশি বিরাট্ ক'রে দেখেন। আর মাধব দেশপাণ্ডে? কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ঠোঁটে হাসির-বক্ররেখা খেলে গেল।

দুর্গাভাই মেহতা উদয়াচলের মুখ্যমন্ত্রী হ'তে পারতেন। হন নি, তার একমাত্র কারণ, তিনি রাজনীতি খেলতে জানেন না। গুজরাট অঞ্চল থেকে দুর্গাভাই-এর বাবা বহু বছর আগে উদয়াচলে চ'লে আসেন। চাল ও বজরার ব্যবসা করতেন। বিলাসপুরে পাঠ সমাপ্ত ক'রে দুর্গাভাই ওখানকার সরকারী কলেজে অধ্যাপক হয়েছিলেন। ছোটখাট সুদর্শন চেহারা, গমের মতো চকচকে তামাটে গায়ের রং; মুখে-চোখে আদর্শবাদের প্রশান্ত দীপ্তি। ছোটবেলা থেকেই অত্যন্ত নীতিপরায়ণ। সত্যভাষী, সহজ-সোজা আদান-প্রদানে বিশ্বাসী। উনিশ শ' ত্রিশ সালে গান্ধীজীর শিষ্য হয়ে একত্রিশের সত্যাগ্রহের সময় সরকারী কলেজের চাকরিতে ইস্তফা দেন। পত্নী মনোরমা ও চার পুত্রকন্যার অর্থাভাব হ'ত না, যদি দুর্গাভাই পিতার সঙ্গে সদ্ভাব রাখতেন। ব্যবসা-ধনী কৃষ্ণলালভাই ইংরাজ সরকারের সুনজরে প'ড়ে রায় বাহাদুর হয়েছিলেন। পুত্র ইংরাজের বিরুদ্ধে গান্ধীর খাতায় নাম লিখিয়ে লড়াই করবে, এতে তাঁর গভীর আপত্তি ছিল। তাতে দুর্গাভাই-এর স্বার্থহানি হ'ত না যদি না তিনিও পিতার রায়-বাহাদুরিতে আপত্তি ক'রে বসতেন। বাপ চাইলেন, ছেলে স্বদেশী ছাড়ুক; ছেলে চাইলেন, বাপ রায়-বাহাদুর খেতাব বর্জন করুন। গোলমাল বাধল: আদর্শবাদী মনের মস্ত দোষ নীতিতে একগুঁয়ে বিশ্বাস এবং আত্ম-নিপীড়নে গোপন পরিতৃপ্তি। দুর্গাভাই সপরিবারে পিতার সংসার ত্যাগ করলেন। সত্যাগ্রহে যোগ দিয়ে যখন তাঁর জেল হ'ল, কৃষ্ণলালভাই মনোরমা ও নাতি-নাতনীদের ফিরিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তখন স্বামীর জলন্ত গৌরবে মনোরমাও জ্বলছেন। তিনি ফিরে গিয়ে স্বামীর অপমান করতে রাজী হলেন না। বছর দুই বেশ কষ্টেই কাটাতে হ'ল।

জেল থেকে মুক্তি পেয়ে দুর্গাভাই অন্য মানুষ। দেশ-সেবা তখন নেশায় দাঁড়িয়েছে। আদর্শের সঙ্গে মিশেছে অপূর্ব উত্তেজনা। দুই অতল প্রবাহের মায়া-মিশ্রণে তখন তিনি আত্মহারা: দেশপ্রীতির প্রবাহ, গান্ধীবাদের প্রবাহ। তখনকার কংগ্রেসী কর্মপন্থা অনুযায়ী প্রথম দুর্গাভাই চেষ্টা করলেন বিলাসপুরে ন্যাশনাল কলেজ স্থাপন করতে; অর্থা-ভাবে ও যথেষ্ট শিক্ষিত লোকের উৎসাহের অভাবে, সফল হলেন না। তখন তিনি গান্ধী-পন্থায় একটি স্কুল তৈরী করলেন। পত্নী মনোরমাকে নিলেন কর্মসঙ্গিনী ক'রে।

স্কুলে ছাত্র বেশি হ'ত না, বেতন ছিল সামান্য, তাই অর্থকষ্ট দুর্গাভাই-এর নিত্যসহচর হ'ল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাঁর কাজ এগিয়ে গেল। স্কুলের সঙ্গে তৈরী হ'ল আশ্রম, আশ্রমের ভিত্তিতে গ'ড়ে উঠল সাধারণ মানুষের মধ্যে নতুন কর্মপন্থা। চরকা কিনে আশপাশের গ্রামে, সহরের বস্তিতে বিলি করা হ'ল; ক্রমে ক্রমে গ'ড়ে উঠল অনেকগুলি চরকাকেন্দ্র। ছাত্র সমাজে দুর্গাভাই-এর নেতৃত্ব প্রসারিত হ'ল। যুবক-যুবতীদের নিয়ে তিনি একটি কর্মিষ্ঠ দল গঠন করতে পারলেন। এ দলের আদর্শ হ'ল পরিপূর্ণ গান্ধীবাদ। মদের দোকানে পিকেটিং করা, গ্রামবাসী, বস্তিবাসীদের মধ্যে স্বদেশী মন্ত্র প্রচার করা, চরকা-সুতোর কাপড় তৈরী করা, বিদেশী পণ্য বর্জনে জনমত তৈরী করা। দুর্গাভাই উদয়াচলে গান্ধীজীর প্রধান মন্ত্রশিষ্য ব'লে সম্মানিত হলেন।

এ সম্মান আরও বেড়ে গেল দুর্গাভাই যখন ১৯৩৭ সালে উদয়াচলে কংগ্রেসী মন্ত্রিত্বের মুকুট সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলেন। শুধু ত্যাগ ও কৃচ্ছ্রসাধনের পুলকিত নেশায় নয়, এই দৃঢ়বিশ্বাসে যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ইংরাজের হাতে হাত মিলিয়ে শাসন করা স্বদেশ-প্রেমের অবমাননা ছাড়া আর কিছু নয়। গান্ধীজী কংগ্রেসী মন্ত্রিত্বের সপক্ষে ছিলেন না প্রথমে, পরে যখন তিনি নেতাদের সমবেত ইচ্ছায় সায় দিলেন, দুর্গাভাই সেই প্রথম গুরুর সঙ্গে একমত হ'তে পারলেন না। তাঁর ভিন্ন মত গান্ধীজীর কাছে তাঁকে প্রিয়তর করল। ১৯৩৮ সালে দুর্গাভাই সুভাষ বসুর সমর্থক হয়ে উঠলেন; সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহ্বানে প্রাণ তাঁর নেচে উঠল। ১৯৩৭ সালে যদি তিনি সরে না দাঁড়াতেন, উদয়াচলের মুখ্যমন্ত্রিত্ব কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশলের কবলিত হ'ত না। দুর্গাভাই মন্ত্রিত্ব গ্রহণ নীতির বিরোধী হওয়ায় শাসন দায়িত্বের ভার পড়ল কৃষ্ণদ্বৈপায়নের শক্তিমান্ হাতে। পরে, সুভাষ বসুর কংগ্রেস সভাপতিত্ব সমর্থন ক'রে দুর্গাভাই গান্ধীজীর কিঞ্চিৎ বিরাগভাজন হ'লেন। অবশ্য গান্ধীজীর নেতৃত্বে ও গুরু-ভূমিকায় গভীর আস্থা তাঁকে সুভাষ বসুর সঙ্গে একত্র রাজনীতির রাজনৈতিক আত্মহত্যা থেকে বিরত রাখল। ত্রিপুরী কংগ্রেসে তিনি গান্ধীপন্থীদের দলে যোগ দিলেন। তার পর এল বিশ্বযুদ্ধ এবং কংগ্রেসের শেষ "ভারত ছাড়" সংগ্রাম। দুর্গাভাই ও কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দুজনেই কারাবরণ করলেন। কিন্তু স্বাস্থ্যের কারণে এক বছর কারাবাসের পর কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মুক্তি পেলেন। দুর্গাভাই জেল থেকে বেরোলেন কংগ্রেসী নেতাদের শেষ দলের সঙ্গে।

অনেক বাক্-বিতণ্ডা, আলোচনা, কলহ, মারামারি-কাটাকাটির মধ্যে ভারতবর্ষ একদিন স্বাধীন হ'ল। দুর্গাভাই দেখতে পেলেন, ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৭-এর মধ্যে কংগ্রেসের নেতাদের মনে দারুণ পরিবর্তন এসেছে। সংগ্রামের আকাঙ্ক্ষা স্তিমিত, সংগ্রামে অনুচ্চারিত আতঙ্ক। লড়বার বদলে ইংরাজের সঙ্গে আপোষ-মীমাংসায় শান্তিপূর্ণ পথে ক্ষমতার হস্তান্তরে উচ্চারিত আগ্রহ। উদয়াচলে, দুর্গাভাই দেখতে পেলেন, আসন্ন শাসন-ক্ষমতা-হস্তান্তরের অপেক্ষায় কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দলীয় রাজনীতির ওপর আপন নেতৃত্ব সুগঠিত ক'রে নিয়েছেন। তাঁর অন্তরে বিদ্রোহের নিনাদ বেজে উঠল, কিন্তু বাস্তব বিচারে তিনি বুঝলেন, কংগ্রেস নেতারা যে-পথ বেছে নিয়েছেন তার বিপরীত পথে দেশবাসীকে চালিত করবার না আছে সংগঠন, না নেতৃত্ব। বামপন্থী দলগুলির মধ্যে সাম্যবাদীরা দুর্বল, অস্থির-চিত্ত, বিক্ষিপ্ত-মতি; যুদ্ধের সময় বার বার নীতি-পরিবর্তনে দেশবাসীর আস্থা-চ্যুত; সমাজতন্ত্রীরা কংগ্রেসী নেতাদের সঙ্গে আসলে মোটামুটি একমত। দেশের ইতিহাসকে ভিন্নপথে পরিচালিত করতে পারতেন কেবল একজন; তিনি সেই সুভাষচন্দ্র বসু, হয় মৃত, নয় দেশান্তরিত। সতের বছরের সংগ্রাম-তপ্ত দুর্গাভাই দুর্বল আতঙ্কে প্রথম বুঝতে পারলেন, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে লড়বার পথ শেষ; আপোষের পথ সুরু। বুঝলেন, চান কি না চান, আপোষ-বিবর্তনে যোগ না দিলে রাজনীতির পথ এবার শেষ।

রাজনীতি যে করতেই হবে এমন বাধ্যবাধকতা দুর্গাভাই-এর ছিল না। গান্ধীজীর কাছে গিয়ে তিনি নিজের অন্তর্দ্বন্দ্বের হিসাব-নিকাশ করলেন। গান্ধীজীর তখন ভয়ংকর মানসিক সঙ্কট। যে পথে তিনি এতদিন জাতীয় সংগ্রাম চালিত করেছেন, সেই পথের বাস্তব পরিণতি দেখে তাঁর চিত্ত শঙ্কিত। ভারতবর্ষের যে মূর্তি তাঁকে আজীবন সংগ্রামের প্রেরণা জাগিয়েছে সে ছিল শান্ত, বিভব-বিকশিত, আজ সে সংহারী, আত্মসংহারী। অথচ বিকল্প পথের সন্ধান জানা নেই এই ঐতিহাসিক মানুষের: ইতিহাস তৈরী করতে গিয়ে অন্তিম অধ্যায়ে তিনি ইতিহাসের হাতে বন্দী।

"ভারত ছাড়" সংগ্রাম আরম্ভ করবার সময়ে তিনি বলেছিলেন, "যদি আমাদের সর্বনাশের মধ্যেও ছেড়ে যেতে হয়, তবু তুমি ইংরেজ, বিদেয় হও।" তখনও তাঁর আশা ছিল সর্বনাশ থেকে ভারত নিজের মুক্তির পথ বার করবে। কিন্তু ইংরেজ যাবার সঙ্গে সঙ্গে সত্যিই যে ভারত দ্বি-খণ্ডিত হবে, আর তাও ধর্মের ভিত্তিতে এবং দ্বি-খণ্ডনের পর লক্ষ লক্ষ মানুষ পাশবিক অত্যাচারের আগুনে নিজেরা জ্বলবে, দেশকে জ্বালাবে, গান্ধীজী তা কোনদিন ভাবেন নি। কিন্তু ঘটনা প্রবাহ এমন ত্বরিত-গতিতে প্লাবনের মত ধাবিত, যে তিনি নিঃসহায় বেদনায় ক্লান্ত।

দুর্গাভাই গান্ধীজীর কাছে উদ্দীপ্ত পথ-নির্দেশ পেলেন না। তখন তাঁর একমাত্র ব্রত, সাম্প্রদায়িক হত্যার কলঙ্ক থেকে ভারতবর্ষ ও পাকিস্থানকে উদ্ধার করা। দুর্গাভাই চাইলেন গান্ধীজীর সহচর হতে। কিছুদিন তাঁর সঙ্গে কলকাতায় ও বিহারে ঘুরে বেড়ালেন। কিন্তু উদয়াচলের আহ্বান এল। যাঁরা দুর্গাভাই-এর কাছে দেশসেবার দীক্ষা নিয়েছিলেন তাঁরা দাবি করলেন, তাঁকে মন্ত্রিত্ব করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী হ'তে হবে। দুর্গাভাই সহজে রাজী হলেন না। গান্ধীজী তখন থেকেই কংগ্রেসকে রাজনৈতিক দল হিসেবে ভেঙ্গে দেবার কথা ভাবছিলেন। তাঁর অন্তরঙ্গদের সঙ্গে এ নিয়ে কিছু আলাপ-আলোচনাও হয়েছিল। প্রথম শ্রেণীর নেতারা গান্ধীজীর পরিকল্পনায় উৎসাহ দেন নি ; সবচেয়ে নিরুৎসাহ ছিলেন জবাহরলাল নেহরু। গান্ধীজী ভাবছিলেন, কংগ্রেস তার কাজ, ভারতের স্বাধীনতা-অর্জন, অসমাপ্ত ভাবে সমাপ্ত করেছে। তার ঐতিহাসিক ভূমিকা শেষ হয়েছে। এবার ১৮৮৫ সালে প্রারব্ধ সুদীর্ঘ ঘটনাবহুল বিয়োগান্ত নাটকে যবনিকা পড়ুক। যারা রাজনীতি করতে চায়, দেশ-শাসনের নেতৃত্ব যাদের ওপর বর্তেছে, তারা এক বা একাধিক দল গঠন করুক : জবাহরলাল হোক বামপন্থী দলের নেতা, বল্লভভাই দক্ষিণপন্থী দলের নেতা। তা হ'লে ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা চলবে সংগঠিত শক্তিতে। নইলে, বর্তমান ব্যবস্থায়, কংগ্রেস প্রতিদ্বন্দ্বীহীন ক্ষমতার ব্যাপক, দীর্ঘ সম্ভোগে দুর্বল, কলুষিত, আত্মতৃপ্ত হয়ে পড়বে। তার মধ্যে না থাকবে মতের ঐক্য, না পথের।

গান্ধীজী আরও ভাবছিলেন, যাঁরা ক্ষমতার রাজনীতির বাইরে থেকে দেশসেবা করতে চান, তিনি তাঁদের নিয়ে নতুন সংগঠন তৈরী করবেন। কংগ্রেসের ঐতিহাসিক ভূমিকায় গান্ধী-যুগের বিবর্তনের তাঁরা হবেন উত্তরাধিকারী। তাঁরা মন্ত্রিত্ব নেবেন না, ক্ষমতা তাঁদের দম্ভ বাড়াবে না, তাঁরা গ্রামে গিয়ে ভারতবর্ষের আসল লোকেদের সর্বোদয়ে মনোনিবেশ করবেন।

দুর্গাভাই-এর ইচ্ছা ছিল গান্ধীজীর সঙ্গে গ্রামের সর্বোদয়ে কাজ করবার। কিন্তু তাও হ'ল না।

প্রথম বাধা এল গান্ধীজীর কাছ থেকে। তিনি বললেন, তাঁর পরিকল্পনা এখনও ভ্রূণাবস্থিত ; কার্যকরী হবে কি না তাও অনিশ্চিত। ইতিমধ্যে প্রদেশে প্রদেশে যথাসম্ভব বলিষ্ঠ মন্ত্রী সভা গঠন করা দেশের কল্যাণের জন্যে অবশ্য প্রয়োজনীয়। উদয়াচলের রাজনৈতিক চেতনা প্রখর নয়। মন্ত্রী হবার যোগ্যতা রয়েছে এমন লোক কংগ্রেসে বেশী নেই। কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন কোশল দলের ওপর প্রভাব বিস্তার ক'রে রয়েছেন। তাঁকে সরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হয়ত দুর্গাভাই হতে পারবেন না। কিন্তু কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ক্ষমতা যদি কেউ বেশ কিছুটা শাসনের মধ্যে রাখতে পারেন তিনি হলেন দুর্গাভাই। সুতরাং, গান্ধীজীর অভিমত, দুর্গাভাই বর্তমানে উদয়াচলের দাবি মেটান ; পরে, তাঁর নতুন সংগঠন পরিকল্পনা যদি কার্যকরী হয়, মন্ত্রিত্ব ছেড়ে বনবাসী হবার পথ ত খোলাই থাকবে।

দুর্গাভাই বিলাসপুরে ফিরে এলেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন স্বয়ং রেল-স্টেশনে এসে তাঁকে সম্বর্ধনা করলেন। তখন তিনি উদয়াচল কংগ্রেস কমিটির সভাপতি।

দুর্গাভাই-এর ইচ্ছে হ'ল, কিছুদিন উদয়াচলের কংগ্রেস-রাজনীতি ভাল ক'রে বুঝে নেন। সময় হ'ল না। মন্ত্রীসভা গঠন আসন্ন। যেদিন তিনি বিলাসপুরে এসে পৌঁছলেন, সেদিন রাত্রেই একদল কংগ্রেসী সহকর্মী তাঁর বাড়ী এসে উপস্থিত হলেন। এঁরা সবাই আসন্ন নির্বাচনে কংগ্রেসী উমিদ। তাঁদের সমবেত অনুরোধ ও দাবি, দুর্গাভাইকে মুখ্যমন্ত্রী হ'তে হবে।

দুর্গাভাই দেখতে পেলেন, এঁদের সবাই তাঁর মন্ত্রশিষ্য নন। এমন কয়েকজন আছেন যাঁদের তিনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশলের লোক বলে জানতেন। তাঁর একদা-অনুগতদের মধ্যে চারজনকে তিনি খুঁজে পেলেন না। বুঝলেন, মন্ত্রিত্ব গঠন নিয়ে নববিধান আরম্ভ হয়েছে। এ এক নতুন লড়াই। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীর বিরুদ্ধে নয়। ক্ষমতার লড়াই,

নিজেদের মধ্যে, ভাই-এ ভাই-এ। বন্ধুতে বন্ধুতে। সহকর্মীর সঙ্গে সহকর্মীর। এই হ'ল অন্তর্বিরোধের সুরু। আত্মঘাতী অন্তর্যুদ্ধ, যার থেকে নিস্তার নেই, পলায়ন নেই।

কৃষ্ণদ্বৈপায়নের বিরুদ্ধে এদের নালিশ অনেক। তিনি সত্যিকারের কংগ্রেসী নন। একদা ইংরাজের সঙ্গে তাঁর সদ্ভাব ছিল, তিনি জমিদারদের বন্ধু। তিনি ক্যাপিটালিষ্টদের টাকায় রাজনীতি করেন। গান্ধীজীর আদর্শে, কর্মপন্থায় তাঁর বিশ্বাস নেই। তিনি সুবিধাবাদী। তাঁর চরিত্র অকলঙ্ক নয়। তিনি সাম্প্রদায়িক। মুখ্যমন্ত্রী হলে নিজের দলকে তিনি পুষ্ট করবেন। তাঁর ক্ষমতাপ্রিয়তা সীমাহীন।

তাঁকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন উদয়াচলে একমাত্র দুর্গাভাই। প্রদেশের প্রতি, দেশের প্রতি এ তাঁর প্রধান কর্তব্য।

দুর্গাভাই এঁদের কথা মন দিয়ে শুনলেন। তারপর প্রশ্ন করলেন :

"কোশলভাই-এর বিরুদ্ধে আমি দাঁড়ালে আপনারা আমায় সমর্থন করবেন ?"

সবাই বললেন, "নিশ্চয়।"

"নির্বাচনে কংগ্রেসপ্রার্থীদের বেশির ভাগ কোশলভাই-এর অনুরাগী। তাই নয় কি ?"

"তাঁরা আপনার অনুরাগী হবেন, যদি আপনি আমাদের নেতা হন।"

"মাধবভাই, আপনি ত কৃষ্ণদ্বৈপায়নজীর বিশেষ বন্ধু।"

মাধব দেশপাণ্ডে বেশি কথা বলেন নি। হঠাৎ কিছু বলতেও পারলেন না।

দুর্গাভাই পুনরায় প্রশ্ন করলেন, "আপনি তাঁকে ত্যাগ করছেন কেন ?"

মাধব দেশপাণ্ডে এবার বললেন, "মারাঠা-সম্প্রদায় কোশলজীকে চায় না। আমাদের স্বার্থ তাঁর হাতে নিরাপদ্ নয়।"

দুর্গাভাই মনে মনে বললেন, তাহ'লে বিবর্তন-চক্র পূর্ণ ঘুরেছে। এখন অখণ্ডিত ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের বিপরীত স্বার্থের পর খণ্ডিত-স্বাধীন ভারতের উদয়াচল প্রদেশে মারাঠা-হিন্দীরও বিপরীত স্বার্থ !

বললেন, "আপনি মনে করেন মারাঠা সম্প্রদায়ের স্বার্থ আমার হাতে নিরাপদ্ থাকবে ?"

মাধব দেশপাণ্ডে বললেন, "আপনি অন্য মানুষ। আপনি নেতা হ'লে আমরা সুবিচারের আশা করতে পারব। কি উপায়ে আমাদের স্বার্থ নিরাপদ্ করা যেতে পারে তা নিয়ে অবশ্য বিস্তারিত আলোচনা করতে হবে।"

দুর্গাভাই মনে মনে বললেন, অর্থাৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল যে দাম দিতে রাজী আছেন, আমাকে তার চেয়ে বেশি দাম দিতে হবে।

নজর পড়ল সুদর্শন দুবের ওপর। সুদর্শন দুবে উদয়াচল কংগ্রেসের সেক্রেটারী।

দুর্গাভাই বললেন, "সুদর্শন, তুমি মন্ত্রী হ'তে চাও না, শুনেছি।"

সুদর্শন দুবে বললেন, "ঠিকই শুনেছেন।"

"তুমি কেন কৃষ্ণদ্বৈপায়নের বিরুদ্ধে যাচ্ছ ?"

"কংগ্রেসের বৃহত্তর স্বার্থে।"

"বুঝিয়ে বল।"

"আপনি কোনওদিন কংগ্রেসের সংগঠনে বিশেষ সংযোগ রাখেন নি। অনেকটা বাইরে থেকে দেশের কাজ করেছেন। সংগঠনের মধ্যে যে সব দুর্নীতি দুরাচার বাসা বেঁধেছে তার খবর হয়ত আপনার জানা নেই।"

"তোমরাই ত কংগ্রেসকে চালিয়ে এসেছ। যদি দুর্নীতি দুরাচার বাসা বেঁধে থাকে তা হ'লে তোমাদের জন্যই হয়েছে।"

"কোশলজী যতদিন কংগ্রেসের সভাপতি থাকবেন, ততদিন কিছু করার উপায় নেই।"

"তুমি ত সেক্রেটারী !"

"আমার কোনও ক্ষমতা নেই।"

"শুনেছি তুমি এবার সভাপতি হ'তে চাইছ।"

মাধব দেশপাণ্ডে বললেন, "আমাদেরও তাই ইচ্ছে।"

"মন্ত্রী হ'তে চাও না কেন, সুদর্শন ?"

"রুচি নেই, দুর্গাভাইজী। আমি কংগ্রেসকর্মী হয়েই থাকতে চাই।"

"কর্মী নয়, সুদর্শন," ক্লান্ত হেসে দুর্গাভাই মন্তব্য করলেন, "কর্মী আর তোমরা কেউ হ'তে চাও না, নেতা হ'তে চাও।"

রাত্রি গভীর হ'ল যখন এঁরা সব বিদায় নিলেন।

বিছানায় শুয়ে দুর্গাভাই মনোরমাকে প্রশ্ন করলেন : "তুমি জান ওরা কেন এসেছিল ?"

মনোরমা বললেন, "জানি।"

"তুমি চাও আমি মুখ্যমন্ত্রী হই ?"

"আমি চিরদিন তোমার অনুসরণ করে এসেছি। স্বদেশী করবার আগে ত কোনওদিন জানতে চাও নি আমি চাই কি না চাই !"

"করি নি, তার কারণ আমি জানতাম তুমি চাও নি।"

"তবে আজ কেন জিজ্ঞেস করছ ?"

"আজ বড় মজা লাগছে, বড় বিস্ময় লাগছে। আজ সবাই চাইছে, কেউ আর না চাওয়ার দলে নেই। সবাই পেতে চাইছে ; কেউ দিতে চাইছে না। ক্ষমতা চাইছে, শক্তি চাইছে, সেবার জন্যে, ত্যাগের জন্যে আর কেউ রাজী নয়।"

"জমানা বদলে গেছে।"

"নিশ্চয়।"

"দেশ স্বাধীন হয়েছে। তাকে চালাতে হবে। শাসন করতে হবে।"

"সেবা করতে হবে না ?"

"শাসনের মধ্য দিয়ে সেবা করা যায় না ?"

"যায়। তার জন্যে শ্রীরামচন্দ্রের মত রাজা চাই। যুধিষ্ঠিরের মত রাজা চাই।"

"বাজে কথা।"

"হয়ত তাই। আমার প্রশ্নের জবাব দিলে না ?"

"এ প্রশ্ন তোমার। জবাব তুমিই দেবে। প্রশ্ন আমার নয়।"

দুর্গাভাই দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে নীরব হ'লেন। মনোরমা সতের বছর আগে যা ছিল আজ আর তা নেই। সতের বছর আগে গান্ধীর শিষ্যত্ব নেবার সময় তিনি পত্নীর অনুমতি চান নি। জানতেন, চাইলে মনোরমা অনুমতি দেবে না। পিতার ঐশ্বর্য, সরকারী কলেজের সম্মানিত অধ্যাপনা সব কিছু ছেড়ে স্বাধীনতা-সংগ্রামের বন্ধুর বিপজ্জনক পথে স্বামীকে এগিয়ে দেবার কোনও তাগিদ তার ছিল না। অনুমতি চেয়ে না পেলেও দুর্গাভাইকে পথে বেরিয়ে পড়তে হ'ত, পত্নীর সঙ্গে সে সংঘাত তিনি চান নি।

পরবর্তী কালে মনোরমা তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন, কিন্তু অনুচ্চারিত প্রতিবাদ অন্তরে গোপন রেখে। শ্বশুরবাড়ীর সঙ্গে বিরোধ তিনি চান নি, স্বামী যে কৃচ্ছ্রসাধনা স্বেচ্ছায় ডেকে এনেছেন, তাকে গ্রহণ করেও তার মাহাত্ম্যে তিনি বিচলিত হন নি। স্বামীর কাজে যোগ দিয়েছেন, পাশে দাঁড়িয়েছেন গর্বে ও কর্তব্যবোধে, প্রেমে বা আদর্শ-উত্তাপে নয়। দুর্গাভাই-এর কারাবাসের বছরগুলি মনোরমা কেমন ক'রে কাটিয়েছেন তার বিস্তারিত খবর স্বামীকে জানাবার প্রয়োজনবোধ করেন নি। তা হ'লেও দুর্গাভাই জানেন, পিতার অর্থে তিনি নিজে নির্লোভ হ'তে পারেন, কিন্তু মনোরমা নন। মনোরমা তাঁর পুত্রকন্যাদের শ্বশুরালয়ে রেখেছেন, নিজেও মাঝে-মধ্যে গিয়ে থেকেছেন। সন্তানরা দরিদ্র হোক তিনি কখনও চান নি, সহ্য করতে পারেন নি। মনোরমা তাঁর প্রশ্নের জবাব না দিলেও দুর্গাভাই জানেন, পত্নীর ইচ্ছে তিনি রাজসম্মান পান, উদয়াচলের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে এত বছরের স্বেচ্ছাকৃত দুঃখকষ্টের পূর্ণ ক্ষতিপূরণ করুন।

সারারাত দুর্গাভাই-এর ভাল ঘুম হ'ল না। নানা চিন্তার জটাজালে আবদ্ধ হয়ে তিনি ছটফট করলেন। ভোর না হ'তেই উঠে পড়লেন। তখনও বিনিদ্র রজনীর জটিল চিন্তা কাটে নি, দেহমনে ক্লান্তি ও অবসাদ জড়িয়ে আছে। গৃহে ফিরে স্নান সেরে নিত্যকার চেয়ে অনেক বেশি সময় পূজায় বসলেন। তথাপি মন শান্ত হ'ল না। পূজার পর যৎসামান্য প্রাতরাশ ক'রে বসবার ঘরে এসে দিনের করণীয় কাজকর্মের মানসিক পর্যালোচনা করছেন এমন সময় বাইরে গভীর আওয়াজ হ'ল !

"দুর্গাভাই আছেন ?"

দরজা খুলে দুর্গাভাই দেখলেন দ্বারপ্রান্তে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল।

দুর্গাভাই ও কৃষ্ণদ্বৈপায়নের চেহারায় প্রচণ্ড অমিল। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দীর্ঘাঙ্গ, দুর্গাভাই ছোট্ট মানুষ। দুজনেই কৃশ। কিন্তু দুর্গাভাই-এর রং গমবর্ণ, গৌরকান্তি নয়। মাথা ভরতি টাক। কপালে গভীর কুঞ্চন, চোখের প্রান্তেও। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নাসিকায় প্রদীপ্ত দম্ভ, দুর্গাভাই-এর নাক চাপা, চওড়া। নাকে ও চিবুকে কেমন এক কোমলতা। তাঁর ব্যক্তিত্বের ব্যঞ্জনা নম্র, বিনীত : কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মত প্রদীপ্ত নয়। কথা বলেন আস্তে, হাসেন লাজুক অপ্রতিভতায়। অথচ এমন একটি সুদৃঢ় স্থৈর্য তাঁর আয়ত্ত যা কৃষ্ণদ্বৈপায়নের

নেই। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন গ্রীষ্ম মধ্যাহ্নের মত প্রখর। দুর্গাভাই প্রভাতের মত প্রশান্ত।

দেশসেবায় দুজনের মধ্যে দীর্ঘকালের পরিচয়। দুজন দুজনকে জানেন-চেনেন বিলক্ষণ। পরিচয় কদাপি গভীর বন্ধুত্বে উত্তীর্ণ হয় নি। কিন্তু দুজনেই, বিপরীত কারণে, দুজনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন জানেন দুর্গাভাই-এর এমন অনেক গুণ আছে যা তাঁর নেই। দুর্গাভাই জানেন কৃষ্ণদ্বৈপায়নের শাসন করার জন্মগত শক্তি আছে, যা তাঁর নেই।

দুজনের মধ্যে আরও একটি বন্ধনসূত্র আছে, যা খুব বেশি লোকে জানে না। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন জানেন, দুর্গাভাই জানেন, তাঁদের পত্নীরা জানেন।

একটি পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতির বন্ধন আছে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-পত্নীর সঙ্গে দুর্গাভাইএর। আশ্রম ও বিদ্যালয় তৈরীতে দুর্গাভাই সবচেয়ে বেশি অর্থ পেয়েছেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-পত্নীর কাছ থেকে। তাতে মনোরমা খুশী হন নি। কৃষ্ণদ্বৈপায়নও না। সে কথা পরে হবে।

দুর্গাভাই কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে সাদরে ঘরে বসালেন।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "কাল আপনি পথশ্রমে ক্লান্ত ছিলেন, নইলে রাত্রিতেই আসতাম। কিছু জরুরী কথা আছে আপনার সঙ্গে।"

"আমিও ভাবছিলাম একটু পরে আপনার কাছে যাব।"

"তা হ'লে দেখুন, এমন কিছু আছে যা আমাদের পরস্পরের নিকট টেনে আনছে," কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হেসে বললেন।

"তাই ত মনে হচ্ছে।"

"আমাকেই টানছে বেশি, তাই আপনি যাবার আগে আমি এসেছি।"

"আপনি নেতা, সৌজন্যেও আপনারই নেতৃত্ব।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দু'চারটে অন্য কথার পর কাজের কথা পাড়লেন।

"আপনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক আজকের নয়। আমাদের মধ্যে অনেক বিষয়ে অনেক পার্থক্য ও মতানৈক্য আছে, তবু, আপনি নিশ্চয় স্বীকার করবেন, আমরা দুজন দুজনকে চিনি।"

দুর্গাভাই নিঃশব্দে, নিশ্চল সায় জানালেন।

"সুতরাং আমি আপনার সঙ্গে পরিষ্কার কথা বলতে চাই।"

"সেই ভাল।"

"আপনি আমি দুজনেই সাধ্যমত দেশের সেবা করেছি। নানা কারণে উদয়াচলে কংগ্রেসী সংগঠনের নেতৃত্ব আমার হাতে ন্যস্ত হয়েছে। আপনি কখনও দলের সঙ্গে খুব বেশি জড়িয়ে পড়েন নি।"

"ঠিক।"

"দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করা আর দল গঠন করা এক জিনিস নয়, দুর্গাভাইজী।" কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মুখে বাঁকা হাসি ফুটল।

"তা আমি জানি।"

"আপনি প্রজ্বলিত দীপশিখার মত শোভা পেয়েছেন, আলো দিয়েছেন; প্রদীপের পাদদেশে পুঞ্জীভূত অন্ধকার নিয়ে আপনাকে মাথা ঘামাতে হয় নি।"

"এবার আপনি কবির মত বলছেন। আপনার কথা ঠিক। তবু হ'লেও একটা কথা বলব। প্রদীপের নীচের অন্ধকারে তার নিজের ছায়াও মিশে থাকে।"

"থাকে বৈ কি দুর্গাভাইজী। আমি হাজার বার আপনার কাছে মানব যে আমার ছায়া অন্য কারুর ছায়ার চেয়ে কম কাল নয়।"

"বুদ্ধির বা বাক্-চাতুর্যের লড়াইএ আপনাকে কাবু করা আমার সাধ্য নয়। বলুন কি বলছিলেন।"

"স্বাধীনতা সংগ্রাম শেষ হয়েছে; দেশ এখন স্বরাজ পেয়েছে। এবার আমাদের শাসনভার গ্রহণ করতে হবে। উদয়াচলে কংগ্রেস সংগঠন কোনওদিন খুব শক্তিশালী ছিল না। ১৯৪২ সালেও আমরা চারশ ছত্রিশ জনের বেশি কংগ্রেসকর্মীকে জেলে যাবার জন্যে তৈরী করতে পারি নি। কিন্তু কংগ্রেস অপ্রতিদ্বন্দ্বী—অন্য কোনও রাজনৈতিক সংগঠন থেকে আমাদের ভয়ের কারণ নেই। অর্থাৎ আসন্ন নির্বাচনে আমরা স্বল্পায়াসে নিশ্চিন্ত সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করতে পারব।"

"আমারও তাই ধারণা।"

"কিন্তু এর মধ্যে অনেক কথা আছে। গত কয়েক মাসে কংগ্রেসের সভ্য-সংখ্যা কত বেড়েছে জানেন।"

"কত ?"

"ষাট হাজার ?"

"বলেন কি ?"

"এরা কারা, এই নতুন সভ্যরা ! জমিদার, ব্যবসায়ী, তালুকদার, সুদখোর মহাজন, কনট্রাকটার, কুলির সর্দার, মিলের গুণ্ডা, চোরাকারবারী, ঘুষখোর : বোধ করি উদয়াচলে এমন একজনও বাকী নেই যে কংগ্রেসের তহবিলে চার আনা পয়সা জমা দিয়ে সভ্য হয়ে বসে নি।"

"তাতে অবাক্ হবার কিছু নেই।"

"কিন্তু ভয় পাবার কাছে। শিক্ষিত যুবকরা বিশেষ কংগ্রেসে যোগ দিচ্ছে না। কিষাণ বা মজদুরদের সংগঠন উদয়াচলে সামান্য। তাদের মধ্যেও কংগ্রেসের সংগঠিত প্রভাব নেই।"

"তবু তারা কংগ্রেসকে ভোট দেবে।"

"তা দেবে। আমাদের সমস্যা ভোট পাওয়া নয়। কিছু কিছু এলাকায় আমরা হারব। ছত্রিশগড়ের রাজাদের মধ্যে একদল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন, অন্যদল স্বতন্ত্রপ্রার্থী হিসাবে দাঁড়াচ্ছেন। তাঁদের কেউ কেউ জিতবেন। আমাদের আসল সমস্যা অন্য। অধিকাংশ এলাকায় জমিদাররা কংগ্রেসের টিকেট চাইছেন। দিলে কংগ্রেস জিতবে; না দিলে নির্বাচন সংগ্রাম লড়বার জন্যে চাই অনেক টাকা, অনেক কর্মী, জমিদারদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্যে উপযুক্ত সংগঠন। পার্টির তহবিলে বেশি অর্থ নেই। নির্বাচন লড়বার জন্যে যা ব্যয় হবে তার অর্ধেকও আমাদের নেই। তা ছাড়া, লজ্জাকর হলেও একথা সত্যি যে সমস্ত উদয়াচল প্রদেশে তিনশ' ছাব্বিশটি নির্বাচন এলাকায় দাঁড় করাবার মত তিনশ' তেইশ জন দীক্ষিত কংগ্রেস কর্মী আমাদের নেই।"

দুর্গাভাই কিছু বললেন না।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলে চললেন, "শাসন ক্ষমতা হাতে আসবার সম্ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রাজনীতি নতুন রূপ নিয়েছে। এখন আর বিদেশীর সঙ্গে ভারতের সংঘাত নয়। এখন ভারতীয়ের সঙ্গে ভারতীয়ের সংঘাত। নানা রকম স্বার্থ সংগঠিত হচ্ছে। শ্রেণী-সংঘাতের চেয়ে গোষ্ঠী-সংঘাত এখন প্রবল। জমিদারে প্রজায় সংগঠিত সংঘাত নেই, কিন্তু ব্রাহ্মণ-কায়স্থে আছে, ছত্রিশগড়ের সঙ্গে অন্যান্য হিন্দী অঞ্চলের আছে, ভাল জাতের সঙ্গে নীচু জাতের আছে, হিন্দু-মুসলমানে আছে, হিন্দী-মারাঠীতে আছে। প্রত্যেক গোষ্ঠী নিজের দাবী পেশ করছে, বিধান সভায় এত জন সদস্য চাই, এই এই মন্ত্রিত্ব চাই। যার এতটুকু উচ্চাভিলাষ আছে, কিছু অর্থ আর প্রতিপত্তি আছে সেই চাইছে দলপতি হ'তে। এই সহরে রোজ অন্তত চল্লিশটি বৈঠক বসে, তার একমাত্র উদ্দেশ্য উপদল গঠন, ক্ষমতা দখল। এদিকে জমিদার ও মিল-মালিক, ঠিকেদার ও ব্যবসায়ী, কনট্রাক্টর ও মহাজন কংগ্রেসের নির্বাচন তহবিলে অর্থ দিতে প্রস্তুত। মুখে তারা এখন কিছু বলছে না, কিন্তু নির্বাচনের পরে তাদের দাবী কি হবে তা বোঝা কঠিন নয়।"

দুর্গাভাই বললেন, "গতরাত্রে একদল লোক এখানে এসেছিলেন।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হেসে বললেন, "জানি। তারা কারা এসেছিলেন তাও আন্দাজ করতে পারি।"

"সুদর্শন দুবে ত আপনার লোক বলে জানতাম।"

"দুর্গাভাইজী," কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বিরস হাসির সঙ্গে বললেন, "রাজনীতিতে কোনও আপন-পর নেই। এ বড় কঠিন ব্যাপার। আজ যে বন্ধু, কাল সে শত্রু। আজ যে লক্ষ্মণ, কাল সে বিভীষণ। এ কারবারে সবাই অসতী।"

"সুদর্শন দুবে কি চায় ?"

"মন্ত্রিত্ব।"

"সে বলল মন্ত্রিত্ব সে চায় না।"

"মন্ত্রিত্ব চায় কেউ কি সরবে ? চায় গোপনে।"

"তার কি কোনও আশা নেই ?"

"আপনি যদি মন্ত্রীসভা তৈরী করেন, সুদর্শন দুবেকে নেবেন, দুর্গাভাইজী ?"

"না।"

"তা হ'লে বুঝুন।"

"মাধব দেশপাণ্ডে কি চায় ?"

"নিজের জন্যে অন্যতম প্রধান পোর্টফোলিও, অন্ততঃ শতকরা চল্লিশ ভাগ মারাঠা মন্ত্রী।"

"সর্বনাশ ! এ দেখছি জিন্না সাহেবের বুলি।"

"যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। তারপর বললেন : "দুর্গাভাইজী, আমি আপনার কাছে এসেছি এ সব

খবর দেবার চেয়েও বড় উদ্দেশ্য নিয়ে। আমি জানি কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যে সকলে আমার প্রতি সমান দয়াবান্ নন। সবাকার কৃপা পাবার মত যোগ্যতাও আমার নেই। আমার শক্তিও যেমন আছে, দুর্বলতারও শেষ নেই। মানুষ হিসেবে, দেশকর্মী হিসেবে আপনি আমার নমস্য। উদয়াচলের আজ যতটুকু সম্মান ও গৌরব তার অনেকখানি আপনার জন্যে। আপনার সবচেয়ে বড় গুণ আপনি নীতিতে কঠোর, আপনি নির্লোভ। না, না, দুর্গাভাইজী, আপনাকে স্তুতি করছি না, তাতে আমার লাভ নেই, স্তুতি আপনাকে বিগলিত করবে না; আমি যা বলছি তা সত্যি। রাজনীতি আপনার চেয়ে আমি বেশি বুঝি; দল রাখবার কলাকৌশলে আপনার চেয়ে আমি অনেক দক্ষ ও অভিজ্ঞ। আপনাকে প্রতারণা করার চেয়ে আমাকে ঠকানো অনেক সহজ। আমি মহতের সঙ্গে মহৎ ব্যবহার করতে পারি; কাঁটা দিয়ে পায়ের কাঁটাও তুলতে পারি। আপনি তা পারেন না।"

দুর্গাভাই কৃষ্ণদ্বৈপায়নের এই আন্তরিক স্পষ্ট ভাষণে চমৎকৃত হলেন।

"আজ স্বাধীনতার পর উদয়াচলে কংগ্রেসী শাসনপর্বের সূচনা চলছে। দলে অনেক রকম ছোট-বড় সংঘাত বাধবে। কিন্তু একটা সংঘাত কিছুতেই যেন না বাধে দুর্গাভাইজী।"

"কোন্ সে সংঘাত?"

"আপনার আমার।"

দুজনেই কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। কথাটার তাৎপর্য যেন পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করবার সময় নিলেন।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "যদি বাধে, আপনি হারবেন। তার কারণ এই নয় যে আমি মুখ্যমন্ত্রী হবার জন্যে দৃঢ়-সংকল্প। মন্ত্রীসভা গঠনের কলা-কৌশল আপনি প্রয়োগ করতে পারবেন না। কি ক'রে সুদর্শন দুবেকে হাতে রেখেও তার মন্ত্রিত্বের আশা বিনাশ করতে হবে, আপনার জানা নেই। রাজনীতির নোংরামি আপনার সহ্য হবে না। তথাপি, আন্তরিক ভাবে বলছি," কৃষ্ণদ্বৈপায়নের স্বরে গাম্ভীর্যের সঙ্গে বিনম্র কোমলতা এক সঙ্গে বেজে উঠল, "আন্তরিকতার সঙ্গে বলছি, আপনি যদি মন্ত্রীসভা গঠনের দায়িত্ব নিতে চান, আপনার হাতে সে ভার ছেড়ে দিতে আমি প্রস্তুত।"

দুর্গাভাই-এর মুখে কথা সরল না।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "আপনি আমি একত্র না দাঁড়ালে উদয়াচলে কংগ্রেস টিকবে না; সমস্ত প্রদেশের বদনাম হবে। যে আদর্শ নিয়ে আমরা এত দীর্ঘকাল দেশের সেবা করেছি তার কিছুই এবার বাস্তবে পরিণত করা যাবে না। আপনি নেতা হ'লে আমি নেতৃত্ব ছাড়তেই শুধু রাজী নই, আপনাকে যথাশক্তি সাহায্য করতেও রাজী। আরও পরিষ্কার ক'রে বলি। আপনি যদি চান, আপনার অধীনে মন্ত্রীসভায় যে কোনও পদ গ্রহণ করতে আমি তৈরী। যদি আপনার ইচ্ছা হয়, মন্ত্রীসভার বাইরে থেকে কংগ্রেসের সংগঠনে আত্মনিয়োগেও আমার পূর্ণ সম্মতি থাকবে।"

দুর্গাভাই একেবারে অভিভূত হয়ে গেলেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের সম্বন্ধে তাঁর ধারণা বদ্‌লে গেল। তিনি দু'হাতে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন।

বললেন, "আপনি আমায় নিশ্চিন্ত করলেন।"

"তা হ'লে এ দায়িত্ব আপনি গ্রহণ করছেন।"

"না। এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন একমাত্র আপনি। রাজনীতি, দলনীতি আমি বুঝি নে। এ কাজ আপনার।"

"আপনি ভেবে দেখুন, দুর্গাভাইজী।"

"অনেক ভেবেছি। কাল সারারাত ঘুমোই নি। যত ভেবেছি, ভয় তত বেড়েছে। তবু মনে গভীর একটা সংশয় ছিল। আপনাকে আমি পুরো জানতে পারি নি। অনেকের অনেক কথা মনে সংশয় এনেছিল। এবার তা দূর হ'ল। যদি কেউ কংগ্রেসী শাসনের সূচনা উদয়াচলে করতে পারে, সে আপনি।"

"কিন্তু আমার দাবী এবং অনুরোধ আপনাকে রাখতে হবে।"

"সাধ্যের অতিরিক্ত না হ'লে নিশ্চয় রাখব।"

"যে মনোভাব নিয়ে আমি আপনার সঙ্গে কাজ করতে এখনও তৈরী আছি, সে মনোভাব নিয়ে আমার সঙ্গে আপনাকে কাজ করতে হবে।"

"আমাকে মন্ত্রিত্ব থেকে বাদ দিলেই আমি সুখী হব।"

"তাতে উদয়াচলের ক্ষতি হবে।"

"তাই যদি হয়, আমি আপনার সঙ্গে থাকব।"

এবার কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দুর্গাভাইকে আলিঙ্গন করলেন।

"আপনার এ ঔদার্যের আমি কোনওদিন অসম্মান করব না।"

রাজনীতির প্রথম পর্বে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রকাণ্ড বিজয় নিয়ে সেদিন ঘরে ফিরেছিলেন।

ক্রমশঃ

রাধা-বাদ বা রাধাতত্ত্ব

প্রবাসীর পৌষ সংখ্যায় (পৃঃ ৩৪৮-৩৫৩), শ্রীযুক্ত যোগীলাল হালদার মহাশয় রাধা-তত্ত্ব সম্বন্ধে গভীর গবেষণা-মূলক মনোরম আলোচনা করিতেছেন। তাঁহার আলোচনার বিষয়ে, আমি একটি মূল্যবান প্রমাণের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

সাতবাহন বংশের রাজা হালের রচিত "গাথা-সপ্তশতী" গ্রন্থে নিম্নলিখিত শ্লোক আছে:—"মুখমারুতেন ত্বং কৃষ্ণ গোরজো রাধিকায়া অপনয়ন্। এতাসাং বল্লবীনাম্ অন্যাসামপি গৌরবং হরতি॥"

(কাব্যমালা সংস্করণ, ১ম শতক, ৮৯ শ্লোক)।

সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার পণ্ডিত মহাশয়রা—এই গ্রন্থের রচনাকাল—খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতক হইতে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের মধ্যে নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। এই কাল-নির্ণয় সঠিক হইলে, অন্যান্য বৈষ্ণবগ্রন্থের রচনার বহু শতাব্দী পূর্ব্বে—শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়পাত্র শ্রীরাধিকার উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে।

আর একটি কথা।

মহাবলী পুরমের পল্লবযুগে (৬৩০-৬৬৮ খ্রীঃ অঃ) রচিত 'পঞ্চ পাণ্ডবের মন্দিরের ভিত্তিপটে উৎকীর্ণ ভাস্কর্য্যের কথা লেখক মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের 'গিরিগোবর্দ্ধন ধারণে'র একটি চমৎকার প্রস্তর-চিত্র আছে। এই চিত্রে যে গোপিনী শ্রীকৃষ্ণের হস্ত স্পর্শ করিয়া দণ্ডায়মান আছেন, তাঁহাকে শ্রীরাধিকা বলিয়া কেহ কেহ সনাক্ত করিয়াছেন। বাংলার প্রচলিত কীর্ত্তন গানে—আমরা শুক-সারির কথোপকথন পাই:—

"শুক বলে আমার কৃষ্ণ গিরি ধরেছিল।
সারি বলে আমার রাধা বল সঞ্চারিল,
নইলে পারবে কেন?"॥

বিনীত
শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে ইতিহাসের উপাদান

শ্রীঅনিলকুমার চক্রবর্ত্তী

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে কৌটিল্যের যুগে দেশে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মেরই প্রাধান্য ছিল। মহাবীর কিংবা গৌতম বুদ্ধ কেহই এই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম উল্টাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করেন নাই, বা করিলেও কৃতকার্য্য হন নাই। এই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালিত হওয়ার ফলে দেশের সমাজ-জীবনে বহুকালাবধি বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইতে পারে নাই। একে অন্যের কার্য্যে বা পেশায় হস্তক্ষেপ না করা, বা নিজবর্ণের জন্য ব্যবস্থিত কর্ম্ম দ্বারাই জীবিকার্জ্জন করা, ইহাই ছিল বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য। অনেকেই ঋষি-প্রবর্ত্তিত বর্ণাশ্রমের প্রকৃত তত্ত্ব না জানিয়াই ইহাকে জাতিভেদের বা তজ্জনিত দেশের অধঃপতন ও পরাধীনতার একমাত্র কারণ বলিয়া মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান যুগে বর্ণাশ্রম ও জাতিভেদের বাড়াবাড়ি প্রশমিত হইলেও প্রকৃত বর্ণভেদ দূর হইয়াছে কি? দেশের সমাজ-জীবনে অতি বিত্তবান্, মধ্য বিত্তবান্, অল্প বিত্তবান্, শিক্ষিত চাকুরিয়া শ্রেণী ও অল্প শিক্ষিত বা অশিক্ষিত কৃষক মজদুর শ্রেণী সৃষ্ট হয় নাই কি? ইহা কি বর্ণাশ্রম বা জাতিভেদের নামান্তর বা প্রকারান্তর নহে? সত্যকথা এই যে, কোন ভাল নিয়মই একই ভাবে চিরকাল সুফল প্রদান করে না বা করিতে পারে না। অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে এই ভাল নিয়মেরও পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হয়; নতুবা ইহা সুফলের বদলে কুফলই প্রদান করে বেশী।

"পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ"—এই নীতি অনুসারে বৃদ্ধ-বয়সে সংসারধর্ম্ম পালনে বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে কেহ কেহ বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিতেন। আবার কেহ কেহ বা আজীবন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া গুরুগৃহেই অবস্থান করিতেন—অর্থশাস্ত্র ১।৩ অধ্যায়। পরিব্রাজক বা প্রব্রজিত সন্ন্যাসী নামে আর এক সম্প্রদায় ছিল। ইঁহারা সংযতেন্দ্রিয় ও ত্যাগীর জীবন যাপন করিতেন। ভিক্ষান্নই তাঁহাদের জীবিকা ছিল। এই শ্রেণীর লোকেরা সাধারণতঃ লোকালয় সন্নিহিত অরণ্যেই বসবাস করিতেন। শৈব, পাশুপতাদি সন্ন্যাসীরা জটাধারী হইতেন আর বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ হইতেন সাধারণত মুণ্ডিতমস্তক—১।১১ অধ্যায়। ব্রাহ্মণ ও প্রব্রজিত সন্ন্যাসীগণ বিনামূল্যে খেয়াঘাট পার হইতে পারিতেন—২।২৮ অধ্যায়। দল ভারী করিবার উদ্দেশ্যেই হউক, আর স্ব স্ব সম্প্রদায়ের সুবিধার জন্যই হউক, শৈব, তান্ত্রিক, জৈন, বৌদ্ধ, আজীবিক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রধানগণ হয়ত জনসাধারণকে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে উৎসাহিত করিতেন। বিনাশ্রমে সাহায্য প্রাপ্তির লোভে অন্ততঃ কিছু সংখ্যক লোক হয়ত সংসার ছাড়িয়া ভিক্ষু সাজিত। ইহাতে সমাজের যথেষ্ট ক্ষতির সম্ভাবনা দেখিয়াই হয়ত সূক্ষ্মদর্শী কৌটিল্য এই ব্যবস্থা দিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি নিজ পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা না করিয়া সংসারত্যাগী হইবে, কিংবা স্বীয় স্ত্রীকেও প্রব্রজ্যা গ্রহণে প্ররোচিত করিবে, সে ব্যক্তি দণ্ডনীয় হইবে। কৌটিল্যের মতে কেবল তাহারাই ধর্ম্মাধিকরণের অনুমতি লইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে পারিবে, যাহাদের মৈথুনশক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অন্যথা তাহাদের দণ্ডভোগ করিতে হইবে (পুত্রদার সপ্রতিবিধায় প্রব্রজতঃ পূর্ব্বঃ সাহসদণ্ডঃ, স্ত্রিয়ঞ্চ প্রব্রজয়তঃ। লুপ্তব্যবায়ঃ প্রব্রজেদাপৃচ্ছ্য ধর্ম্মস্থান্, অন্যথা নিয়ম্যেত—২-১ অধ্যায়)। এই-অধ্যায়েই কৌটিল্য আরও একটি ব্যবস্থার কথা বলিয়াছেন,—যথা রাজা কর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত নূতন কোন জনপদে বানপ্রস্থী ব্যতীত অন্য কোন প্রকার সন্ন্যাসী বা প্রব্রজিত বাস করিতে পারিবে না। রাজ্যের কল্যাণার্থে প্রতিষ্ঠিত কোন ধর্ম্মসংঘ ব্যতীত অপর কোন সংঘ সেখানে স্থান পাইবে না; অথবা প্রজাহিতের অনুকূলে গঠিত কোন কার্য্যকারী দল ব্যতীত অপর কোন অনিষ্টকারী ও সুসংহত দল সেখানে থাকিবার অধিকারী হইবে না।

সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা

অর্থশাস্ত্রের ১।৩ অধ্যায়ে দেখা যায় যে, কৌটিল্যের মতে শিক্ষা ব্যবস্থা বর্ণাশ্রমের অনুকূল হওয়া উচিত। ব্রাহ্মণের জন্য বেদাদি অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন-যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ অর্থাৎ দানগ্রহণ কার্য্য বিধেয়। বেদাদি অর্থে চতুর্বেদ ও আনুষঙ্গিক বিদ্যাদির অনুশীলনও বুঝাইবে:—যথা ইতিহাস-পুরাণ, শিক্ষা (বর্ণাদির উচ্চারণাদি নির্ণায়ক গ্রন্থ), কল্প (যজ্ঞাদি সম্বন্ধীয় উপদেশক গ্রন্থ), ব্যাকরণ (ভাষা ও শব্দানুশাসন), নিরুক্ত (শব্দাদির ব্যুৎপত্তিনির্ণয়), ছন্দোবিচিতি (ছন্দনিরূপক শাস্ত্র) ও জ্যোতিষ (গাণিতিক ও সামুদ্রিক)।

ক্ষত্রিয়ের জন্য—অধ্যয়ন, যজন (যজ্ঞাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান), দান, শস্ত্রবিদ্যা দ্বারা জীবিকার্জ্জন ও রক্ষণ (দেশ ও প্রাণিরক্ষা)।

বৈশ্যের জন্য—অধ্যয়ন, যজন, দান, কৃষিকার্য্য, পশুপালন ও ব্যবসাবাণিজ্য।

শূদ্রের জন্য—ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের সেবা, কৃষি, পশুপালন, বাণিজ্য, শিল্পকার্য্য ও কুশীলবকর্ম্ম অর্থাৎ গীত-বাদ্যাদি ও ভাট চারণাদির কার্য্য ইত্যাদি।

অবশ্য তাই বলিয়া গীত-বাদ্য বা গন্ধর্ব-বিদ্যার অনুশীলন অন্য বর্ণের জন্যও নিষিদ্ধ ছিল না।

মহামাত্য ও রাজপুরোহিত প্রভৃতির নিয়োগ

১।৮ অধ্যায়ে কৌটিল্য বলিয়াছেন যে, রাজা স্বয়ং তদীয় প্রধান অমাত্য (মহামাত্য) ও পুরোহিতকে নিযুক্ত করিবেন। মহামাত্য রাজার স্বদেশবাসী কোন উচ্চকুলজাত মহাপণ্ডিত ব্যক্তি হইবেন। ঔচিত্যানৌচিত্যবোধ তাঁহার যথেষ্ট পরিমাণে থাকিবে, এবং তিনি হইবেন কৃতবিদ্য, চক্ষুষ্মান্, প্রাজ্ঞ, ধারয়িষ্ণু (তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন), দক্ষ, বাগ্মী, প্রগল্ভ (কোন বিষয় অল্পকথায় প্রাঞ্জলভাবে বুঝাইবার শক্তিসম্পন্ন), প্রভাব প্রতিপত্তিশালী, ক্লেশসহ (পরিশ্রমী), শুচি (শুদ্ধচরিত্র), মৈত্র (জনসাধারণের প্রতি স্নেহশীল), দৃঢ়ভক্তি (রাজার প্রতি অবিচল শ্রদ্ধাসম্পন্ন), শীলযুক্ত (সদাচরণকারী), বলশালী, আরোগ্যসংযুক্ত (নীরোগ পুরুষ), ধৈর্য্যশীল, গর্ব্বরহিত, চাপল্যবর্জ্জিত, সৌম্যদর্শন ও শত্রুনাশক।

সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, কুলশীলে শ্রেষ্ঠ, দৈব ও মানুষ (মনুষ্যকৃত) বিপদের প্রতিকারক্ষম, দৈব, জ্যোতিষ ও নিমিত্তশাস্ত্রে (শকুনবিদ্যা) অভিজ্ঞ, সৌম্যদর্শন ব্যক্তিকেই রাজা তদীয় পুরোহিতের পদে বৃত করিবেন। শিষ্য যেমন গুরুকে, পুত্র যেমন পিতাকে, ভৃত্য যেমন প্রভুকে, সাধ্বী স্ত্রী যেমন স্বামীকে অনুসরণ করে, রাজাও তদ্রূপ স্বীয় পুরোহিতকে অনুসরণ করিবেন—১।৯ অধ্যায়।

রাজা, মহামাত্য ও রাজপুরোহিত, এই তিনজনে মিলিয়া রাজ্যের বিভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত অমাত্যগণকে যথাবিহিত পরীক্ষান্তে স্ব স্ব কার্য্যে বহাল রাখিবেন, বা অনুপযুক্ত বিবেচিত হইলে কার্য্য হইতে অপসারিত করিবেন। এমন কি, কৌটিল্য যুবরাজকেও পরীক্ষা করিয়া দেখিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন, যাহাতে যুবরাজ দুষ্ট লোকের কুপরামর্শে ভুলপথে চালিত হইয়া পিতার বিরুদ্ধে যাইতে না পারে। এই সম্পর্কে কৌটিল্য প্রধানতঃ ১৫ প্রকার অমাত্যের উল্লেখ করিয়াছেন, যাহাদের রাজানুগত্য রাষ্ট্ররক্ষার খাতিরে পরীক্ষাসাপেক্ষ। তাঁহারা হইলেন: ১। সেনাপতি বা মহাসেনানায়ক, ২। দৌবারিক বা প্রধান প্রতিহারী, ৩। অন্তর্বংশিক (অন্তঃপুররক্ষক), ৪। প্রশাস্তা বা কারাধ্যক্ষ, ৫। সমাহর্ত্তা বা করসংগ্রাহক, ৬। সন্নিধাতা (রাজকোষের অধ্যক্ষ), ৭। প্রদেষ্টা বা ফৌজদারী বিভাগের বিচারক, ৮। নায়ক, ৯। পৌর ব্যবহারিক (নগর প্রধান বা Mayor), ১০। কার্ম্মান্তিক (রাজকীয় কারখানা ইত্যাদির অধ্যক্ষ), ১১। মন্ত্রিপরিষদধ্যক্ষ, ১২। দণ্ডপাল বা সেনাধ্যক্ষ, ১৩। দুর্গপাল, ১৪। অন্তঃপাল বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী (Minister of the Interior) ও ১৫। আটবিক বা অরণ্যাধ্যক্ষ—১।১২ অধ্যায়।

গূঢ়পুরুষ বা গুপ্তচর নিয়োগ

সমগ্র অর্থশাস্ত্রে গূঢ়পুরুষের নিয়োগ ও বিভিন্ন কার্য্যে তাহাদের নিয়োগ ব্যবস্থার অতি বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। বস্তুতঃ কৌটিল্যের মতে গূঢ়পুরুষগণের সততা, সেবাপরায়ণতা, নিয়মনিষ্ঠা এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধির উপরই রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব, বিস্তার ও ক্রমোন্নতি প্রভৃতি সম্পূর্ণ নির্ভর করে। এই প্রসঙ্গে কৌটিল্য যে সুষ্ঠু ও সুসংবদ্ধ ব্যবস্থার বিধান দিয়াছেন, তাহা বিচার করিয়া দেখিলে বিস্ময়ে হতবাক্ হইতে হয়। ১।১, ১।১১ ও ১।১২ প্রভৃতি অধ্যায়ে এই গূঢ়পুরুষগণের বিভিন্ন করণীয় ও শিক্ষণীয় বিষয়ের আভাস দেওয়া হইয়াছে। গূঢ়পুরুষগণের কর্ম্মক্ষেত্র অত্যন্ত ব্যাপক, —রাজ্যমধ্যে ও রাজ্যের বাহিরে। পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয় জাতীয় গুপ্তচরই কার্য্যানুরোধে নিযুক্ত করা হইত। দেশের অভ্যন্তরে যুবরাজ ও অন্যান্য রাজকুমার, ও মহামন্ত্রী, রাজপুরোহিত হইতে আরম্ভ করিয়া কেহই এই চক্রের সমীক্ষা হইতে বাদ পড়িত না। নানা বেশে ও ভূষায় ইহারা চলাফেরা করিত, এবং সমাজের সর্ব্বস্তর হইতে গৃহীত হওয়ায় তাহাদের গতিবিধিও সর্ব্বত্রই অবাধ হইত। ১।১১ অধ্যায়ে কৌটিল্য ইহাদের একটি সাধারণ শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন—১। কাপটিক (কপট ছাত্র, আচার্য্য প্রভৃতি), ২। উদাস্থিত (উদাসীন সন্ন্যাসী বা পরিব্রাজক), ৩। গৃহপতিক (গৃহস্থ লোক), ৪। বৈদেহক (ব্যবসায়ী), ৫। তাপসেয় (তাপসেয় বেশধারী) ৬। সত্রী (নানা শাস্ত্রবিদ্ বলিয়া পরিচিত), ৭। তীক্ষ্ণ (অসম সাহসী), ৮। রসদ (বিষ প্রদানকারী), ৯। ভিক্ষুকী (পরিব্রাজিকা ও সন্ন্যাসিনী ইত্যাদি)। অন্যত্র মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী (আপূপিক), মাংস ব্যবসায়ী, সুরা ব্যবসায়ী প্রভৃতিকেও গুপ্তচর বৃত্তিতে নিযুক্ত থাকিতে দেখা যায়। ১।১২ অধ্যায়ে আর-একদলের নাম পাওয়া যায় যাহারা সমাজের বিভিন্ন স্তরে থাকিয়া কার্য্য

উদ্ধার করিত। পাচক, আরালিক (রান্নাকরা মাংস বিক্রয়ী—রেস্তোরাঁ-ওয়ালা), আস্তরক (শয্যা প্রস্তুতকারী), জলবাহক, কল্পক (নাপিত), প্রসাধক (প্রসাধনকারী), কুব্জ, বামন, কিরাত, মূক, বধির, জড়, অন্ধ, নট, নর্ত্তক-নর্ত্তকী, গায়ক-গায়িকা, বাদক, বাগ্‌জীবন (কথক, হরবোলা প্রভৃতি) ও কুশীলব (অভিনয়ের পাত্র-পাত্রী) প্রভৃতির নাম এই প্রসঙ্গে করা হইয়াছে।

অতীতের কয়েকজন হতভাগ্য রাজা

স্বীয় রাণীদিগের বিশ্বস্ততা ও সততায় বিশ্বাস করিয়া, অন্তঃপুরে গুপ্তচরের যথোচিত ব্যবস্থা না রাখার ফলে অতীতে অনেকানেক রাজা স্ব স্ব অন্তঃপুরেই নিহত হইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। ১।২০ অধ্যায়ে এই শ্রেণীর কয়েকজন হতভাগ্য রাজার নাম দেওয়া হইয়াছে, যাঁহারা অসাবধানতা দোষেই প্রাণ হারাইয়াছিলেন।

(ক) পট্ট মহাদেবীর গৃহে গুপ্তভাবে অবস্থান করিয়া রাজভ্রাতা বীরসেন ভদ্রসেন নামক রাজাকে হত্যা করিয়াছিলেন।

(খ) স্বকীয় মাতার শয্যাতলে লুক্কায়িত থাকিয়া কোন এক রাজপুত্র কারূশ নামক নৃপতিকে হত্যা করিয়াছিলেন। বিহারের সাহাবাদ জেলার পূর্ব্বনাম করূশ দেশ। এই কারূশ হয়ত এই করূশ দেশের কোন রাজা ছিলেন।

(গ) বিষমিশ্রিত মধুদ্বারা খৈ মাখাইয়া তাহা খাইতে দিয়া কোন এক কাশীরাজকে হত্যা করা হইয়াছিল।

(ঘ) বিষাক্ত নূপুরের আঘাতে বৈরন্ত্য রাজাকে হত্যা করা হয়।

(ঙ) বিষাক্ত মেখলামণির স্পর্শে সৌবীর রাজাকে, ও বিষদিগ্ধ মুকুরের স্পর্শদ্বারা জালুথ নামক রাজাকে হত্যা করা হয়।

(চ) স্বীয় বেণীতে তীক্ষ্ণ অস্ত্র লুকাইয়া রাখিয়া তদ্দ্বারা বিদূরথ নামক রাজাকে তদীয় রাণী হত্যা করিয়াছিলেন।

এই সমস্ত রাজাদের পরিচয় পাওয়া অসম্ভব। তবে কৌটিল্য যে তাহাদিগকে জানিতেন, বা তাহাদের হত্যার কারণ অবগত ছিলেন, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

সচিবাদি ও অন্যান্য রাজকর্ম্মচারীগণের বেতন

৫।৩ অধ্যায়ে কৌটিল্য বলেন যে, উপযুক্ত বেতন নিয়মিতভাবে পাইলে, রাজার প্রতি বা রাষ্ট্রের প্রতি সকলেরই আনুগত্য থাকিবে, এবং রাজকর্ম্মচারীগণের সকলেই কর্ম্মক্ষম থাকিবেন।

ঋত্বিক্, আচার্য্য, মন্ত্রী, পুরোহিত, সেনাপতি, যুবরাজ, রাজমাতা ও রাজমহিষী—ইঁহারা বৎসরে ৪৮০০০ পণ্যমুদ্রা হিসাবে বেতন পাইবেন।

দৌবারিক, অন্তর্বংশিক, প্রশাস্তা, সমাহর্ত্তা ও সন্নিধাতা—ইঁহারা প্রত্যেকে বৎসরে ২৪০০০ পণ্যমুদ্রা হিসাবে, এবং কুমার (যুবরাজ ব্যতীত অন্যান্য রাজপুত্র ও রাজভ্রাতাগণ ইত্যাদি), কুমারমাতা (পাটরাণী ছাড়া অন্য রাণী), নায়ক, পৌর ব্যবহারিক, কার্ম্মান্তিক, মন্ত্রিপরিষদ্‌গণ, রাষ্ট্রপাল ও অন্তপাল প্রভৃতি পাইবেন বার্ষিক ১২০০০ পণ্যমুদ্রা হিসাবে বেতন।

এইভাবে বিভিন্ন পদের মর্য্যাদা ও স্তরভেদে এবং কর্ম্মভেদে বেতনের পরিমাণও ক্রমশঃ কমিয়া আসিয়াছে।

বিবাহ ব্যবস্থা

৩।২ অধ্যায়ে কৌটিল্য বলেন যে, বিবাহের পরই স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার ব্যবহার আরম্ভ হইয়া থাকে। তাঁহার সময়ে ৮ প্রকার বিবাহ-ব্যবস্থা সমাজে বলবৎ ছিল দেখা যায়; যথা ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, আর্য্য, দৈব, গান্ধর্ব, আসুর, রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহ।

ব্রাহ্ম বিবাহে—সালঙ্কারা কন্যাকে বরের হাতে প্রদান করা হইত।

প্রাজাপত্য বিবাহে—বরকন্যা একসঙ্গে ধর্ম্মাচরণে প্রতিশ্রুত হইয়া বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইত। ইহাতে সম্ভবতঃ পণ বা অলঙ্কারের দাবী কোন পক্ষেই থাকিত না।

আর্য্য বিবাহে—কন্যাপক্ষ পাত্রপক্ষ হইতে একজোড়া গরু (গাই) পাইত; প্রাচীন আর্য্য সমাজে সম্ভবতঃ এই বিবাহ প্রচলিত ছিল। কন্যাপণ হিসাবে পাত্রীপক্ষ গাই পাইত।

দৈব বিবাহে—যজ্ঞবেদীতে উপস্থিত ঋত্বিকের নিকট কন্যা প্রদত্ত হইত। ইহাতে পণ বা অলঙ্কারের কোন উল্লেখ নাই। যজ্ঞবেদীতে উপস্থিত থাকা কালে ঋত্বিক্ কোন এক দেবতার নাম বা উপাধি গ্রহণ করিয়া থাকেন। এজন্যই সম্ভবতঃ এই বিবাহের নাম দৈব বিবাহ।

গান্ধর্ব বিবাহে—বরকন্যা স্ব স্ব অভিভাবকের অনুমতি ব্যতিরেকেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইত।

আসুর বিবাহে—বরপক্ষ কন্যা বা কন্যাপক্ষকে পণ হিসাবে অর্থ প্রদান করিত।
রাক্ষস বিবাহে—বর বা বরপক্ষ কন্যাকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া নিয়া বিবাহ করিত।
পৈশাচ বিবাহে—নিদ্রিতা-কন্যাকে চুরি করিয়া নিয়া বিবাহ করা হইত। রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহে পণের কোন প্রশ্নই উঠিত না।

কৌটিল্যের মতে প্রথম চারটি বিবাহ ধর্ম্মসঙ্গত, কারণ ইহাতে বর ও কন্যা উভয়েরই পিতৃপক্ষের অনুমোদন থাকে। অপর চারটিতে যদি কন্যার পিতামাতার অনুমোদন লাভ করা যায়, তবেই তাহারা ধর্ম্মসঙ্গত হইবে, নতুবা হইবে না। কৌটিল্যের যুগে বলাৎকারের উদ্দেশ্যে কন্যাহরণকারীর কঠোর সাজা হইত। ব্যাভিচারের জন্য ক্ষেত্রবিশেষে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই কঠিন দণ্ড হইত। অর্থশাস্ত্রের ৪।২৭ অধ্যায়ে দেখা যায়, কৌটিল্যের সময় গণিকাবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার জন্য একজন সরকারী গণিকাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইতেন। গণিকার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করিয়া সহবাস করিলে, তাহা বলাৎকার হিসাবেই গণ্য হইত, এবং অপরাধীর সাজা হইত।

কৌটিল্যের যুগে সমাজে বিধবা-বিবাহ চলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। পতির মৃত্যুর পর পত্যন্তর গ্রহণ করিলে, সেই পুনর্বিবাহিতা রমণী পূর্ব্ব স্বামীর প্রদত্ত সম্পত্তিতে অধিকার হারাইত। কিন্তু বিবাহ না করিয়া সংযত জীবন-যাপন করিলে সেই সম্পত্তি আজীবন ভোগ করিতে পারিত। মৃত স্বামীর ঔরস-জাত পুত্র বর্ত্তমানে কোন বিধবা নারী পত্যন্তর গ্রহণ করিলে সে তাহার স্ত্রীধনও হারাইত। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনের মিল না হইলে বিবাহ-বিচ্ছেদ সর্ত্তসাপেক্ষে সম্ভবপর ছিল। দুইয়ের মধ্যে একের অনিচ্ছা থাকিলে বিচ্ছেদ সম্ভব হইত না। বরঞ্চ এই ব্যাপারে উভয়েরই সম্মতি থাকিলে তবেই বিচ্ছেদ সম্ভব হইত—৩।২ অধ্যায়। মহাভারতের যুগের ন্যায় কৌটিল্যের যুগেও ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনের ব্যবস্থা ছিল দেখা যায়—৩।৭ অধ্যায়।

গণরাষ্ট্র বা সংঘরাষ্ট্র সমূহ

কৌটিল্যের যুগে ভারতের নানা স্থানে যে সমস্ত গণরাজ্য ও সংঘরাষ্ট্র বর্ত্তমান ছিল, কৌটিল্য ১১।১ অধ্যায়ে তাহাদের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কয়েকটিতে রাজা উপাধিধারী রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন জানা যায়। তবে এই রাজারা সাময়িক রাজা মাত্র ছিলেন, উত্তরাধিকারসূত্রে রাজ্যের মালিক ছিলেন না। তাঁহার মতে এই সমস্ত সংঘকে মিত্ররূপে পাওয়া বা সেখান হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারা, যে কোন রাষ্ট্রের পক্ষে নিঃসন্দেহে লাভজনক ব্যাপার। এই মন্তব্য হইতে মনে হয় যে, এই সমস্ত রাষ্ট্রের লোকেরা যোদ্ধাজাতি হিসাবে তৎকালে ভারতে সুবিদিত ছিলেন:

১। কাম্বোজ গণরাষ্ট্র—এই ক্ষুদ্র অথচ শক্তিশালী রাষ্ট্রের সঠিক ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণয় করা শক্ত। সম্ভবতঃ ইহা ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে একটি প্রত্যন্ত রাজ্য ছিল। অশোকের অনুশাসনেও এই কম্বোজ উপজাতি অধ্যুষিত কাম্বোজ দেশের নাম পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ এই জাতিটি ভারতের বাহিরের কোন স্থান হইতে আসিয়া উপনিবেশ গড়িয়া তুলিয়াছিল। কৌটিল্য তক্ষশীলার অধিবাসী ছিলেন বলিয়া এই রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অবস্থা সম্যক্ জ্ঞাত ছিলেন।

২। সুরাষ্ট্র সংঘরাজ্য—বর্ত্তমান সৌরাষ্ট্রে অবস্থিত ছিল। অর্থশাস্ত্রের মতে কাম্বোজ ও সুরাষ্ট্রের অধিবাসীরা ব্যবসা-বাণিজ্য ও শাস্ত্রের দ্বারা উপজীবিকা চালাইত। ইহাতে মনে হয় যে, দুইটি রাষ্ট্রই ক্ষাত্রিয় ও বৈশ্য প্রধান স্থান ছিল। বর্ত্তমান যুগেও সৌরাষ্ট্রবাসীরা ব্যবসা-বাণিজ্যে সবিশেষ অগ্রণী। মহাভারতের যুগে সুরাষ্ট্রে যদুকুলের একটি বৃহৎ উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল।

৩। লিচ্ছবিক রাষ্ট্র:—উত্তর বিহার বা মিথিলার মজঃফরপুর জেলায় বৈশালী বা প্রাচীন বিশালা নগর তাহাদের রাজধানী ছিল। বৈশালার বহু লোক মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধের শিষ্য ছিলেন বলিয়া জানা যায়। লিচ্ছবীরা যুদ্ধবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। পরবর্ত্তীকালে মগধের গুপ্ত সাম্রাজ্যের উন্নতির মূলে ছিল এই লিচ্ছবীদের সহায়তা। গুপ্তরাজা প্রথম চন্দ্রগুপ্ত লিচ্ছবী রাজকন্যা কুমার দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

৪। ব্রিজিক (পালি বজ্জিক) সংঘরাষ্ট্র। আয়তনে ক্ষুদ্র অথচ শক্তিশালী রাষ্ট্র। রাজধানীর নাম পাবা।

৫। মল্লক সংঘরাষ্ট্র—রাজধানী কুশীনগর বা কুশীনারা। এই কুশীনগরের উপকণ্ঠেই গৌতম বুদ্ধ মহাপরিনির্ব্বাণ লাভ করেন। উত্তর প্রদেশের দেউরিয়া বা দেওরিয়া জেলায় এই কুশীনগর অবস্থিত। কুশীনগরের বর্ত্তমান নাম কুশিয়া বা কাশিয়া। অধুনা কাশিয়া একটি গ্রাম মাত্র।

অর্থশাস্ত্রের ১।৬ অধ্যায়ে কৌটিল্য বলিয়াছেন যে বিদেহ (মিথিলা) রাজ করাল কোন ব্রাহ্মণ কন্যার উপর লোভ করিয়া স্বজন ও রাষ্ট্রসহ বিনষ্ট হইয়াছিলেন। সম্ভব:

রাজা করালের রাজ্যচ্যুতির পর রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের রণনিপুণ পার্ব্বত্য অধিবাসীগণ অরাজকতার সুযোগ লইয়া রাজ্যের পশ্চিমাংশে স্বীয় শাসন পত্তন করেন। খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতেও পরস্পর সন্নিহিত এই তিনটি রাষ্ট্র,—লিচ্ছবিক, ব্রজিক ও মল্লক—গণরাষ্ট্রই ছিল বলিয়া জানা যায়। সুতরাং কৌটিল্যের সময় পর্য্যন্ত অন্ততঃ দুই শতাব্দী ধরিয়া এই গণরাষ্ট্রগুলি টিঁকিয়া ছিল। বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্র মতে বিশাল ব্রজিক জাতিগোষ্ঠীর ৮টি ভিন্ন ভিন্ন শাখার মধ্যে লিচ্ছবী ও মল্লগণ অন্যতম ২টি প্রধান শাখা। এই আট শাখার মধ্যে লিচ্ছবী শাখাই সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল। ঐতিহাসিক Vincent Smith এর মতে কপিলাবস্তুর শাক্য, বৈশালীর লিচ্ছবী এবং পাবা ও কুশীনারার ব্রজিক ও মল্লগণ একই তিব্বতীয় জাতিগোষ্ঠীর শাখা-প্রশাখা। ডাঃ সতীশ বিদ্যাভূষণের মতে লিচ্ছবীগণ পারস্যের নিসিবী নামক স্থান হইতে আসিয়া ভারতে ও তিব্বতে বসবাস করিয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ লিচ্ছবীগণকে মধ্য এশিয়ার সিথীয় (Scythian) জাতির শাখা বলিয়াও অনুমান করিয়াছেন। এই মতবাদগুলির কোনটিকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। পুরাণ অনুযায়ী কপিলাবস্তুর শাক্যগণ কোশলের সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়। বৌদ্ধ গ্রন্থ মতে ব্রজিক জাতিগোষ্ঠীও ক্ষত্রিয় ছিলেন বলিয়া জানা যায়। বৈজয়ন্তী নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, লিচ্ছবীগণ ব্রাত্য পিতা ও ক্ষত্রিয়া মাতার সন্তান। তুম্ব বা তুলুব নামক পুস্তকেও লিখিত আছে যে, লিচ্ছবীগণ বশিষ্ঠগোত্রীয় ছিলেন। জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর বৈশালীর এক ক্ষত্রিয় রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সম্পর্কে তৎকালীন রাজা বা রাজপ্রধানের ভাগিনেয় হইতেন বলিয়া জৈন কল্পসূত্রে দেখা যায়। দীঘনিকায় নামক গ্রন্থের মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্রে লিখিত আছে যে, গৌতম বুদ্ধের দেহাবশেষের জন্য লিচ্ছবীরা দাবী তুলিয়া বলিয়াছিলেন, "ভগবাপি খত্তিয় ময়মপি খত্তিয়।"—অর্থাৎ ভগবানপি ক্ষত্রিয়ো বয়মপি ক্ষত্রিয়াঃ—ভগবান্ বুদ্ধও ক্ষত্রিয়, আমরাও ক্ষত্রিয়। সুতরাং তদীয় দেহাবশেষের উপর আমাদেরও ন্যায়সঙ্গত দাবী আছে। সুতরাং লিচ্ছবীগণ, এবং সেই হেতু সমগ্র ব্রজিক গোষ্ঠীই, ক্ষত্রবংশসম্ভূত ছিলেন, ইহা অনস্বীকার্য্য!

লিচ্ছবীগণ দেখিতে অতি সুন্দর ছিলেন। গৌতম বুদ্ধ একবার লিচ্ছবীগণকে বৈদিক তেত্রিশ দেবতার সঙ্গে তুলনা করিয়াছিলেন (মহা বস্তু—Vol. I. p. 262)। সুতরাং লিচ্ছবীগণ যে দেখিতে দেবতার ন্যায় সুন্দর ছিলেন, তিব্বতীদের মত কদাকার ছিলেন না, ইহা সত্য। প্রসিদ্ধ বৌদ্ধভাষ্যকার বুদ্ধঘোষের মতে লিচ্ছবী শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইল—লীনা বা লিনা+ছবি=লিচ্ছবি। অর্থাৎ যাহাদের শরীরের রং এত স্বচ্ছ যে ভিতরের জিনিষ শরীরের চামড়ায় প্রতিফলিত হয়, তাহারাই লিচ্ছবী বা নিচ্ছবী অতএব লিচ্ছবী ও ব্রজিকগণ উচ্চকুলজাত আর্য্য ছিলেন।

৬। মদ্রক সংঘরাষ্ট্র—মহাভারতে উল্লিখিত রাজা শল্যের মদ্রদেশ, পাঞ্জাবের শিয়ালকোট জেলা ও সন্নিহিত অঞ্চল,—রাজধানী শাকলনগর বা শিয়ালকোট। অতীতে এই মদ্ররাজ্য আয়তনে বড় কম ছিল না। ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ৮।১৪ অধ্যায়ে হিমালয়ের পরপারস্থ (পরেণ-হিমবন্তং) উত্তরকুরু ও উত্তর মদ্রের উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ কাশ্মীর পর্যন্ত প্রাচীন মদ্ররাজ্যের উত্তর সীমা বিস্তৃত ছিল। কাংড়া বা প্রাচীন ত্রিগর্ত্ত পর্য্যন্ত ইহার পূর্ব্বসীমা অনুমান করা যায়। মদ্রদেশে বহু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের বাস ছিল বলিয়া জানা যায়। বৃহদারণ্যকোপনিষদের মতে (৩।৭।১) প্রখ্যাত ঋষি উদ্দালক, আরুণি ও অপর কয়েকজন উত্তর প্রদেশ (কুরুপাঞ্চাল দেশ) হইতে মদ্র দেশে গিয়া কাপ্য পতঞ্চল নামক জনৈক আচার্য্যের গৃহে ব্রহ্মবিদ্যা লাভের উদ্দেশ্যে কিছুকাল বসবাস করিয়াছিলেন। মদ্রদেশে শল্য বংশের বা তৎপরবর্ত্তী অপর কোন রাজবংশের পতন হইয়া গণরাজ্য কবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা জানা যায় না।

৭। কুকুর সংঘরাষ্ট্র—সম্ভবতঃ সৌরাষ্ট্র বা গুজরাটে অবস্থিত ছিল। কুকুর, অন্ধক, ভোজ, বৃষ্ণি প্রভৃতি প্রাচীন যদুবংশের বিভিন্ন ধারা। কৃষ্ণ-বলরামের অনুগামী দ্বারকা-প্রবাসী যদুগণের মধ্যে বৃষ্ণি, ভোজ, অন্ধক ও কুকুর বংশীয়-গণ ছিলেন বলিয়া মহাভারতে দেখা যায়। পরবর্ত্তীকালে কুকুরগণ বিন্ধ্য পর্বতের পশ্চিমাংশেও বসবাস করিতেন বলিয়া জানা যায়। কৌটিল্যের যুগেও সম্ভবতঃ কুকুর বংশীয় যদুগণ এই অঞ্চলেই তাহাদের গণরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

৮। কুরু সংঘরাষ্ট্র—প্রাচীন রাজধানী হস্তিনাপুর, উত্তর প্রদেশের মীরাট জেলায় গঙ্গাতীরে অবস্থিত ছিল। মহা-ভারতের আমলে যমুনা-তীরবর্ত্তী ইন্দ্রপ্রস্থ (বর্ত্তমান দিল্লীর ইন্দ্রপৎ মহল্লা) কিছুকাল কুরুরাজ্যের এক অর্দ্ধাংশের রাজধানী ছিল। পুরাণাদিতে লিখিত আছে যে, অভিমন্যু-তনয় পরীক্ষিৎ হইতে অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ, রাজা নিচক্ষুর সময় প্রাচীন ঐতিহ্যময়ী রাজধানী হস্তিনাপুর গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়, এবং নিচক্ষু কুরুরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া অনেক দক্ষিণ-পূর্ব্বে প্রয়াগের নিকট কৌশাম্বীতে (বর্ত্তমান কোশম্ নামক গ্রাম) নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিতে থাকেন।

গঙ্গয়াপহৃতে তস্মিন্নগরে নাগসাহ্বয়ে।
ত্যক্ত্বা চ তং প্রবাযক্ষ্ কৌশম্ব্যাং স নিবৎস্যতি॥
বায়ুপুরাণ—৯৯ অধ্যায়—২৭১ শ্লোক।

ছান্দোগ্য উপনিষদের ১৷১০ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, মটচী দ্বারা হত হইয়া (শিলাপাতন বা পঙ্গপাল দ্বারা বিনষ্ট) কুরুরাজ্যে দুর্ভিক্ষাবস্থা দেখা দেওয়ায় প্রসিদ্ধ ঋষি চক্রপুত্র উষস্তি খাদ্যান্বেষণে কুরুরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া পার্শ্ববর্তী অন্য রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ মনে করেন যে, শুধু মাত্র রাজধানী নহে, দীর্ঘস্থায়ী দুর্ভিক্ষের ফলে নিচক্ষুর কুরুরাজ্যও নষ্ট হইয়া যাওয়ায় তিনি রাজ্য ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই অনুমান সত্য হইলে বলিতে হয় যে, রাজার রাজ্য ত্যাগের পর কুরুরাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং পরিণামে সেখানে গণরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজ্যত্যাগী রাজা নিচক্ষু কিংবা তাঁহার কোন বংশধর পরিত্যক্ত কুরুরাজ্যে পুনরায় ক্ষমতা বিস্তারের চেষ্টা করিয়াছিলেন কি না, আর করিয়া থাকিলেও তাহাতে সফলকাম হইয়াছিলেন কি না, পুরাণাদিতে তাহার কোন উল্লেখ নাই। তাঁহারা সকলেই শেষ পর্য্যন্ত বৎসরাজ্যে (কৌশাম্বীর নাম) রাজত্ব করিয়াছেন, ইহারই উল্লেখ মাত্র দেখা যায়। সুতরাং ধরিয়া লওয়া যায় যে, কুরুরাজ্য নিচক্ষুর সময় হইতেই চিরতরে পরীক্ষিৎ বংশধরগণের হস্তচ্যুত হইয়াছিল। তবে সেখানে ঠিক কোন্ সময়ে গণরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহা সঠিকভাবে বলা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক রাজা উদয়ন এই নিচক্ষুর বংশধর ছিলেন।

কাহারও মতে ঋষি বৈশম্পায়নের অভিশাপেই পরিণামে কুরুরাজবংশ স্বরাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হন। আবার কেহ কেহ ইহাও বলিয়া থাকেন যে, যজ্ঞকালে ইন্দ্রপ্রস্থ-রাজ বৃদ্ধ দ্যুম্ন কর্ত্তৃক ভুল ভাবে মন্ত্র পাঠ করিবার ফলেই কুরুগণের রাজ্য ও রাজধানী উভয়ই ধ্বংস হইয়াছিল (শাঙ্খায়ন শ্রৌতসূত্র—১৫৷১৬৷১০-১৩)। এই বৃদ্ধ দ্যুম্ন কুরুবংশের অপর এক শাখার প্রধান ব্যক্তি ছিলেন।

৯। পাঞ্চাল গণরাষ্ট্র—বৈদিক সৃঞ্জয় দেশ। কুরু ও পাঞ্চাল পরস্পর সংলগ্ন রাজ্য ছিল। গঙ্গাতীরবর্ত্তী কনোজ বা কান্যকুব্জ হইতে উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত পর্য্যন্ত এই পাঞ্চাল রাজ্য বিস্তৃত ছিল। বৃহদারণ্যকোপনিষদের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে প্রখ্যাত ঋষি উদ্দালক আরুণির পুত্র শ্বেতকেতু ও পাঞ্চালরাজ জীবল-পুত্র প্রবাহণের মধ্যে শাস্ত্রালোচনার কথা লিখিত আছে। এই শ্বেতকেতু ঋষি কুরুরাজ নিচক্ষু হইতে আনুমানিক ৭০৷৮০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন বলিয়া ধরা যায়। সুতরাং অন্ততঃ সেই সময় পর্য্যন্ত পাঞ্চাল রাজ্যে রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত ছিল, দেখা যায়। অনুমান হয়, পার্শ্ববর্ত্তী কুরুরাজ্যে কিছুকাল পর গণরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার হাওয়া পাঞ্চাল রাজ্যেও সংক্রামিত হয়, এবং পরিণামে সেখানেও গণরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। দুঃখের বিষয়, পুরাণাদিতে সৃঞ্জয় রাজবংশের কোন ধারাবাহিক উল্লেখ নাই। সুতরাং বৃহদারণ্যকোপনিষদে উল্লিখিত এই প্রবাহণ জৈবলী (জীবল-পুত্র) দ্রুপদবংশীয় রাজা ছিলেন কি না, তাহা সঠিক বলা দুষ্কর। বেদের ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদাদি অংশে বহু স্থলে "কুরু-পাঞ্চাল" কথাটির যুক্তভাবে উল্লেখ দেখা যায়। মহাভারতের আমলে এবং তৎপরবর্ত্তী যুগসমূহে কুরু-পাঞ্চাল দেশে বহু প্রখ্যাত ঋষি ও আচার্য্য বাস করিতেন, জানা যায়।

কৌটিল্যের সময় ভারতের এই নয়টি গণরাজ্য বা সংঘ রাজ্যের মধ্যে কাম্বোজ ও সুরাষ্ট্র ব্যতীত বাকি সাতটি রাজ্যেরই রাষ্ট্র-প্রধানগণ রাজা উপাধিধারী ছিলেন।

বন ও হস্তী সম্পদ্

অর্থশাস্ত্রের ২৷২ অধ্যায়ে রাষ্ট্র মধ্যে আটবিক নামক এক অমাত্যের নিযুক্তির কথা পাওয়া যায়। ইহাতেই মনে হয়, বর্ত্তমানের মত কৌটিল্যের যুগেও বন-সম্পদ্‌কে অত্যন্ত মূল্যবান মনে করা হইত। বনের মধ্যে নানা প্রকার পশু-পক্ষী রক্ষার ব্যবস্থাও ছিল। বন সংরক্ষণের নানাবিধ উপায়ের কথা এই অধ্যায়ে বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। হস্তী পালন ও হস্তী বন্ধনের নানাবিধ প্রক্রিয়ার উল্লেখও এই অধ্যায়ে পাওয়া যায়। গজ রাজবাহন এবং যুদ্ধকালে শিক্ষিত গজ বিপক্ষ দলের সৈন্য মধ্যে ভয়ানক উৎপাত ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিতে সক্ষম, এই ধারণার বশেই তৎকালে হস্তীকে রণনিপুণ করিয়া তোলা হইত। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেও উভয় পক্ষে হস্তীর ব্যবহার হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। পশুচর্ম্ম ও হস্তী দন্তের আদর সেকালের মত একালেও আছে।

কৌটিল্যের সময় অঙ্গ, কলিঙ্গ, পূর্ব্বদেশ (আসাম, ত্রিপুরারাজ্য প্রভৃতি), চেদি (মধ্যপ্রদেশের ত্রৈপুরী বা ত্রিপুরী অঞ্চল) ও করূশ (বর্ত্তমান সাহাবাদ জেলা) দেশে জাত হস্তীই সর্ব্বোত্তম বলিয়া বিবেচিত হইত। দশার্ণ দেশের (বুন্দেল খণ্ডের দশান নদীতীরবর্ত্তী অঞ্চল) ও অপরান্ত দেশের (সম্ভবতঃ পশ্চিম দেশীয়,—পাঞ্জাব অঞ্চলের) হস্তী মধ্যম শ্রেণীর এবং সুরাষ্ট্র ও পঞ্চনদ (পাঠান্তরে পঞ্চজন দেশ) দেশের হস্তী নিকৃষ্ট শ্রেণীর বলিয়া বিবেচিত হইত। Vincent Smith-এর মতে পঞ্চজন দেশ গুজরাটের পাঞ্চ-মহাল বা পঞ্চ-মহাল অঞ্চল।

মণিরত্ন ও খনিজ দ্রব্য

বহু পূর্ব্বকাল হইতেই ভারতে মণিরত্নাদির ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। অর্থশাস্ত্রের ২।১১ অধ্যায়ে মণিরত্নাদির উৎপত্তি স্থান, শ্রেণীবিভাগ এবং বিভিন্ন প্রকার রত্নাভরণের নামাদি বর্ণিত হইয়াছে। রাজকোষে প্রবেশের উপযুক্ত মণিরত্নাদি পরীক্ষার জন্য একজন কোষাধ্যক্ষ থাকিতেন।

মুক্তা বা মৌক্তিক : কৌটিল্যের আমলে ভারতে অন্ততঃ ১০টি স্থানে বিভিন্ন প্রকারের মুক্তা পাওয়া যাইত। যথা : (১) তাম্রপর্ণিক (দক্ষিণ ভারতের পাণ্ড্য দেশের তাম্রপর্ণী নদীর সঙ্গমস্থলে উৎপন্ন), (২) পাণ্ড্যক বাটক (পাণ্ড্য দেশের মলয়কোটি পর্ব্বতে উৎপন্ন), (৩) পাশিকা (পাশিকা নামক নদীতে উৎপন্ন ?), (৪) কৌলেয় (সিংহলের কুলা নদীতে উৎপন্ন), (৫) চার্ণেয় (কেরলের চুর্ণী নদীতে উৎপন্ন), (৬) মাহেন্দ্র (মহেন্দ্র পর্ব্বতে জাত), (৭) কার্দ্দমিক (কর্দ্দম বা কর্দ্দমা নদীতে জাত), (৮) স্রোতসীয় (বর্ব্বর সাগরকূলে স্রোতসী নদীতে উৎপন্ন), (৯) হ্রাদীয় (বর্ব্বর সাগরকূলে শ্রীঘণ্ট নামক হ্রদে উৎপন্ন), (১০) হৈমবত (হিমালয় পর্ব্বতে জাত)। শঙ্খ, শুক্তি (ঝিনুক), প্রকীর্ণক প্রভৃতি বিবিধ জিনিসে মুক্তার জন্ম হইতে পারে।

মণি :—তৎকালে প্রধানতঃ ৩টি স্থানে খনি হইতে মণি সংগ্রহ করা হইত : (১) কৌটি, (২) মালেয় ও (৩) পারসমুদ্র। প্রথম দুইটি স্থান দক্ষিণ ভারতে, আর তৃতীয়টি সিংহল দ্বীপে অবস্থিত ছিল। বিভিন্ন প্রকারের বিভিন্ন জাতীয় এবং বহু বর্ণবিশিষ্ট মণির নাম এই অধ্যায়ে আছে।

বজ্রমণি বা হীরকের উৎপত্তি স্থল ছিল ৬টি যথা :— (১) সভারাষ্ট্র (বিদর্ভ বা বেরার প্রদেশে), (২) মধ্যমরাষ্ট্র (কোশল দেশের মধ্যমরাষ্ট্র নামক স্থান), (৩) কাস্তীররাষ্ট্র পাঠান্তরে কাশ্মীররাষ্ট্র, (৪) শ্রীকটন, (৫) মণিমন্ত (উত্তর ভারতের মণিমন্ত নামক পর্ব্বত), (৬) ইন্দ্রবান (কলিঙ্গ দেশের ইন্দ্রবান নামক পর্ব্বত)।

খনিজ দ্রব্যাদির মধ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, সীসক, লৌহ প্রভৃতি নানা প্রকার ধাতু দ্রব্যের উল্লেখ আছে। স্বর্ণশোধন ও অন্যান্য ধাতু শোধনের প্রক্রিয়াদির কথাও বিস্তারিত ভাবে অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। কোন কোন বিদেশীয় পণ্ডিত অর্থশাস্ত্রে এই সমস্ত ধাতুর নাম ও শোধনাদির প্রক্রিয়া লিখিত আছে দেখিয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে, কৌটিল্যের যুগে ভারতে এত সব ধাতুর নাম ও তাহাদের ব্যবহার বিধি জানা সম্ভব ছিল না; সুতরাং অর্থশাস্ত্র খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে রচিত হইয়া থাকিবে। এই খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক হইতেই গুপ্তযুগ আরম্ভ হইয়াছিল, যাহাকে বৈদেশিক ঐতিহাসিকগণ ভারতের স্বর্ণযুগ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন সুতরাং এই তথাকথিত স্বর্ণযুগের পূর্ব্বে ভারতের অবস্থা অবশ্যই অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতা সম্পর্কে যাহাদের জ্ঞান এত গভীর, তাহারা দয়া করিয়া ৪র্থ শতাব্দী না বলিয়া অষ্টাদশ বা উনবিংশ শতাব্দী বলিলেও অন্যায় হইত না। কারণ ঐ সময়েই সভ্য ইয়োরোপীয়গণ ভারতে আসিয়া ভারতবাসীকে ধাতুদ্রব্যাদির ব্যবহার বিধি শিখাইয়া দিয়াছেন।

অশ্ব ও অশ্বাধ্যক্ষ

অনেকেই মনে করিয়া থাকেন যে, প্রাচীন আর্য্যজাতির সঙ্গে কেবল গো জাতিরই নিকট সম্বন্ধ ছিল না, অশ্বেরও অতি নিকট সম্বন্ধ ছিল। যাতায়াতে, যুদ্ধবিগ্রহে এবং অশ্বমেধাদি যজ্ঞে অশ্বের প্রয়োজন অপরিহার্য্য ছিল। ভারতীয় অশ্বের মধ্যে সিন্ধুদেশীয় অশ্বই এযুগেও সর্ব্বোত্তম বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। কৌটিল্যের যুগেও সিন্ধুদেশে জাত অশ্বের আদর ছিল দেখা যায়। অর্থশাস্ত্রের ২।৩০ অধ্যায়ে রাজকীয় অশ্বাধ্যক্ষ কর্ত্তৃক, ক্রয়লব্ধ, যুদ্ধে প্রাপ্ত, অন্য রাজ্য হইতে পুরস্কার হিসাবে প্রাপ্ত, অশ্বশালায় জাত প্রভৃতি অশ্ব সমূহের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখার ব্যবস্থার কথা বলা হইয়াছে। যুদ্ধকালে রথী মহারথী-গণ কর্ত্তৃক অশ্বের নিয়োগের কথা রামায়ণ মহাভারতের যুগেও ছিল, একথা সকলেই জানেন। তবে অশ্বারোহী বাহিনী সে যুগে ছিল বলিয়া জানা যায় না। অর্থশাস্ত্রের ১০।৫ অধ্যায়ে অশ্বারোহী সৈন্যের উল্লেখ দেখা যায়। গ্রীক বিবরণীতেও নন্দরাজগণের অশ্বারোহী বাহিনীর অস্তিত্বের কথা জানা যায়। সুতরাং সেই যুগের পূর্ব্ব হইতেই গজারোহী সেনার সঙ্গে অশ্বারোহী সেনারও প্রচলন হইয়াছিল বলিতে হয়। ইরাণের প্রাচীন ইতিহাসে দেখা যায় যে, প্রাচীন পারসিক অশ্বারোহী তীরন্দাজ সৈন্য এক অদ্ভুত কৌশলে যুদ্ধ করিয়া বিপক্ষ দলকে পর্য্যুদস্ত করিত। গ্রীক সৈন্যদলেও অশ্বারোহী বাহিনীর অভাব ছিল না। সম্ভবতঃ এই দুই জাতির সংস্পর্শে আসিয়া পশ্চিম ভারতে ও কালক্রমে উত্তর ভারতের সর্ব্বত্র অশ্বারোহী সেনার প্রচলন হইয়াছিল।

কৌটিল্যের মতে কাম্বোজ (সম্ভবতঃ তুর্ক দেশীয় অশ্ব এখানে আমদানী হইত), সিন্ধু, আরট্ট, (পাঞ্জাবের কোন স্থান—মহাভারতের শল্যপর্ব্বে আরট্ট ও বাহ্লিকগণের কথা এক সঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে), ও বনায়ু (আরব রাজ্যসমূহ) দেশে জাত অশ্ব সর্ব্বোত্তম, আর বাহ্লীক (আফগানিস্তানের বলখ প্রদেশ), পাপেয় (পশ্চিম সীমান্তের কোন দেশ ?) সৌবীর (সিন্ধুদেশ সংলগ্ন স্থান) ও তিতল দেশে জাত অশ্ব

মধ্যম। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য দেশে জাত অশ্ব অধম শ্রেণীর। কৌটিল্যের সময় অশ্বের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের তুলনামূলক মাপ লইয়াও, অশ্ব উৎকৃষ্ট কি নিকৃষ্ট, তাহা বিবেচনা করা হইত।

ম্লেচ্ছজাতি ও দাসপ্রথা

অর্থশাস্ত্রের অন্ততঃ ৪টি বিভিন্ন অধ্যায়ে ম্লেচ্ছ নামে এক জাতীয় লোকের উল্লেখ করা হইয়াছে। এই ম্লেচ্ছগণ নিঃসন্দেহে অনার্য্য ছিল। ৩।১৩ অধ্যায়ে কৌটিল্য বলেন যে, ম্লেচ্ছ জাতীয় লোক নিজের সন্তান-সন্ততি বিক্রয় করিলে বা বন্ধক রাখিলে তাহা দোষণীয় হইবে না। কিন্তু আর্য্য-জনের দাসভাব হইতে পারে না। অবস্থার বৈগুণ্যে কোন আর্য্য বালককে সাময়িক ভাবে বন্ধক রাখা হইলেও তাহার বন্ধকী মূল্য উশুল করিয়া দিয়া তাহাকে মুক্ত করা হইলে সে পুনরায় আর্য্য হইয়া যাইবে। কিন্তু ম্লেচ্ছদের বেলায় একবার বিক্রীত হইলে জীবনে আর মুক্ত হইবার আশা থাকিত না। অর্থশাস্ত্রের ৭।১০ ও ১৪।৪ অধ্যায়ে ম্লেচ্ছগণকে চৌর ও আটবিকগণের (জংলী বা পার্ব্বত্য জাতি) সহিত সমপর্য্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় যে, ম্লেচ্ছগণ হীন স্বভাবের বা স্বভাবদুর্বৃত্ত লোক ছিল। আর্য্যজাতির চারি বর্ণের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র) গণ্ডীর বাহিরে ছিল এই ম্লেচ্ছগণ। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদের আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতি কিরূপ ছিল, তাহা সঠিকভাবে উল্লিখিত হয় নাই। ১৪।১ অধ্যায়ে ম্লেচ্ছজাতীয় সুদর্শন পুরুষ ও স্ত্রীলোক দ্বারা শত্রু দলের ব্যবহার্য্য বস্ত্রাদিতে বিষ-প্রয়োগের কথা বলা হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় যে, ম্লেচ্ছগণের মধ্যে সুন্দর পুরুষ ও সুন্দরী স্ত্রীলোকের অভাব ছিল না। কৌটিল্য-পরবর্ত্তী-যুগসমূহে সংস্কৃত সাহিত্যে নানা বহিরাগত জাতি ও বেদ-বিরোধী সম্প্রদায় সম্পর্কে এই ম্লেচ্ছ শব্দের অবাধ প্রয়োগ হইয়াছে দেখা যায়। আরও কিছুকাল পরে, মুসলমান (তুরক্) এবং খ্রীষ্টান সম্পর্কেও ম্লেচ্ছ শব্দের ঢালাও ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। কৌটিল্যের যুগে এদেশে দাস-প্রথা সীমাবদ্ধই ছিল।

পরিব্রাজক সম্প্রদায়

অর্থশাস্ত্রের বহুস্থানে পরিব্রাজক বা প্রব্রজিতগণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মোটামুটি ভাবে ইহাদিগকে ২টি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়:—

১। বেদমার্গ অবলম্বনকারী:—শৈব, পাশুপত, ভাগবত (বৈষ্ণব), গাণপত্য, শক্তিউপাসক ও বিদ্যার্থী পরিব্রাজক প্রভৃতি।

২। অবৈদিক বা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মবিরোধী সম্প্রদায়সমূহ। বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থ অঙ্গুত্তর নিকায়ে দুই শ্রেণীর পরিব্রাজকের কথা বলা হইয়াছে,—অন্নতিত্থীয় ও ব্রাহ্মণ। অন্নতিত্থীয় পরিব্রাজকগণ ব্রাহ্মণ পরিব্রাজকগণ অপেক্ষা উন্নততর ছিলেন বলিয়া বলা হইয়াছে। অন্নতিত্থীয়গণের লক্ষ্য ছিল আত্মোপলব্ধির দিকে, আর অপর শ্রেণীটির ছিল জীবনযাত্রা ও জাগতিক বিষয়ের দিকে। এই সিদ্ধান্ত সঠিক বলিয়া মনে করিবার হেতু নাই; কারণ ইহা একটি সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত মাত্র। সেই যুগে কেবলমাত্র অব্রাহ্মণ্য পরিব্রাজকগণই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের একচেটিয়া অধিকার ভোগ করিতেন, এই মতবাদ কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। Prof. Rhys Davids এর মতে বৌদ্ধযুগের প্রারম্ভে বা অব্যবহিত পূর্ব্বকালে দেশে ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী পরিব্রাজক ছিলেন, যাঁহারা বৎসরের ৮ মাস কাল নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া স্ব স্ব মত প্রচার করিয়া বেড়াইতেন, আর বর্ষার ৪ মাস "চাতুর্ম্মাস্য" অবলম্বন করিয়া কোথাও আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। ভারতীয় পরিব্রাজক বা সন্ন্যাসীগণের মধ্যে এই নিয়ম এখনও বলবৎ আছে দেখা যায়। তাহারা বৎসরের ৮-৯ মাস দেশে-বিদেশে ঘুরিয়া বেড়ান, আর বর্ষার ৩।৪ মাস কোথাও আশ্রয় লন। ভিক্ষান্নই তাহাদের একমাত্র জীবিকা ছিল এবং এখনও আছে।

ঋগ্বেদের যুগে এই পরিব্রাজক শ্রেণী বর্ত্তমান ছিল কি না জানা যায় না। পরবর্ত্তী যুগসমূহেই সম্ভবতঃ তাহাদের উদ্ভব হইয়াছিল অধ্যাপক Rhys Davids-এর মতে সময়টি ছিল বুদ্ধ মহাবীরের আবির্ভাবের পূর্ব্বক্ষণে। এই মত সত্য বলিয়া মনে হয় না। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নপুত্র শুকদেব অবধূত ছিলেন বলিয়া ভাগবতে দেখা যায়। অবধূতগণ সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী বা পরিব্রাজক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তাহারা সাধারণতঃ কোন সাম্প্রদায়িক চিহ্ন ধারণ করেন না। কেহ কেহ বৌদ্ধগ্রন্থ "উদ্দালক জাতক"-এর সূত্র ধরিয়া বলিতে চাহেন যে, ছান্দোগ্য, কৌষিতকী ও বৃহদারণ্যকোপনিষদে এবং মহাভারতের আদিপর্ব্বে উল্লিখিত প্রখ্যাত ঋষি উদ্দালক আরুণিই পরিব্রাজক সম্প্রদায়ের আদিগুরু (Historical Gleanings—Dr. B. C. Law, p. 10) এই মতও সত্য নহে। উদ্দালক আরুণি বিদ্যার্থী বা সত্যার্থী হইয়া নানা সময়ে নানা দেশে ভ্রমণ করিলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে সন্ন্যাসী ছিলেন না, গৃহী বা আশ্রমবাসী ছিলেন। শ্বেতকেতু নামে তাহার এক ঋষিপুত্র ছিল, এবং তিনি এককালে স্ত্রী-পুত্রসহ স্বীয় আশ্রমেই বাস করিতেন, ইহা উপনিষদ ও মহাভারত, উভয়স্থলেই দেখা যায়। স্বীয় আশ্রমেই ঋষি আরুণি

তদীয় প্রাপ্তবয়স্ক, বেদজ্ঞ পুত্র শ্বেতকেতুকে ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিয়াছিলেন—কৌষিতকী উপনিষদ)।

বেদ-বিরোধী পরিব্রাজক সম্প্রদায়ের মধ্যে কৌটিল্য স্পষ্টতঃ কেবলমাত্র ৩টি শ্রেণীরই উল্লেখ করিয়াছেন,—জৈন বৌদ্ধ ও আজীবিক। এতদ্ব্যতীত কৌটিল্যের যুগে আরও কয়েকটি বেদ-বিরোধী পরিব্রাজক সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বর্তমান ছিল, ইহা বিশ্বাস করিবার হেতু আছে। উহাদের মধ্যে মাত্র কয়েকটির উল্লেখই এস্থলে করিব।

সপ্ত শ্রেণীর বেদ-বিদ্বেষী প্রচারক
(7 Schools of Heretics)

জৈন ও বৌদ্ধমতসহ সাতটি বেদ-বিদ্বেষী সম্প্রদায়ের মধ্যে বাকী পাঁচটিই জৈন ও বৌদ্ধমত অপেক্ষা প্রাচীনতর বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে পরবর্ত্তী কালের এই দুই প্রধান ধর্ম্মমতের উপর অপেক্ষাকৃত প্রাচীন মতবাদগুলির নৈতিক প্রভাব খুব কম ছিলনা।

১। মক্‌খলি গোসাল পরিচালিত আজীবিক সম্প্রদায়। আদিগুরু নন্দবচ্ছ বা নন্দবৎস, দ্বিতীয় গুরু কিশ সঙ্কিচ্চ বা কৃশ সংকৃত্য,—শেষ গুরু বা তীর্থঙ্কর মক্‌খলি গোসাল বা মক্‌খলি গোসালপুত্ত (পুত্র) বা মসকরিপুত্র গোসাল। আদি প্রবর্ত্তক নন্দবচ্ছের প্রকৃত পরিচয় অজ্ঞাত। কোন কোন প্রখ্যাত ইউরোপীয় পণ্ডিত নন্দবৎসকে শ্রীকৃষ্ণ মনে করিয়া আজীবিকগণকে বৈষ্ণব বা ভাগবতগণেরই একটি শাখা বলিয়া ভুল করিয়াছেন।

অনেকেই অনুমান করেন যে খ্রীঃ পূঃ ৮ম শতাব্দীর কোন এক সময়ে গাঙ্গের উপত্যকায় নন্দবৎস প্রবর্ত্তিত এই ধর্ম্মমতের উদ্ভব হইয়াছিল। জৈন গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, বর্দ্ধমান মহাবীর ও মক্‌খলি গোসাল কিছুদিন একসঙ্গে তপস্যায় রত ছিলেন। গোসাল মহাবীরের অন্ততঃ দুই বৎসর পূর্ব্বেই তপস্যায় সিদ্ধকাম হইয়া শ্রাবস্তী (কোশল রাজ্যের রাজধানী) নগরে স্বীয় আজীবিক মতের প্রচার আরম্ভ করেন। এই আজীবিক গুরু মহাবীরের ১৬ বৎসর পূর্ব্বে দেহরক্ষা করেন বলিয়া জানা যায়।

আজীবিক সম্প্রদায় অহিংসাব্রতী ছিলেন। প্রাচীনতম কয়েকটি উপনিষদে অহিংসা বাদের প্রশস্তি আছে, যাহা আজীবিক সম্প্রদায় গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। সুতরাং মহাবীর বা বুদ্ধ, কেহই অহিংসা মন্ত্রের উদ্ভাবক ছিলেন না, ছিলেন প্রচারক মাত্র। গোসালের অনুগামী প্রব্রজিতগণ নগ্ন সন্ন্যাসী ছিলেন। অবশ্য তাঁহাদের শিষ্য ও ভক্তগণ নগ্ন ছিলেন না, ইহা বলাই বাহুল্য। গোসাল বেদ-বিরোধী হইলেও অদৃষ্টবাদী ছিলেন, এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিতেন যে সকল প্রাণীই জন্মজন্মান্তরের ভিতর দিয়া পরিশুদ্ধ হইয়া একদিন না একদিন মুক্তি লাভ করিবেই। ইহাকে আশাবাদের চূড়ান্ত বলা যায়। আজীবিক পরিব্রাজকগণ শারীরিক কৃচ্ছ সাধনেও পশ্চাৎপদ ছিলেন না। একটানা কয়েকদিন বা কয়েক সপ্তাহ উপবাস তাঁহারা অক্লেশে সহ্য করিতে পারিতেন। আজীবিক ধর্ম্ম পূর্ব্ব ও উত্তর ভারতে প্রচারিত হইয়া ক্রমে দক্ষিণ ভারতেও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, এবং একটি স্বতন্ত্র ধর্ম্মমত হিসাবে খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছিল বলিয়া জানা যায়। মাদ্রাজে প্রাপ্ত কয়েকটি প্রাচীন অনুশাসন হইতে জানা যায় যে খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আজীবিক সম্প্রদায়ের উপর জিজিয়া করের মত এক প্রকার কর ধার্য্য করা হইয়াছিল। সম্ভবতঃ ইহাতেই তাহাদের প্রসার রুদ্ধ হইয়া যায়। ডাঃ বেণীমাধব বড়ুয়ার মতে আজীবিক সম্প্রদায় পরিণামে দিগম্বর জৈন শৈব ও অন্যান্য কয়েকটি সম্প্রদায়ের মধ্যে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে (Journal of the Department of Letters, Cal. University—Vol II)

২। জৈনধর্ম্ম—শেষ-তীর্থঙ্কর বর্দ্ধমান মহাবীর, খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দী—
পূর্ব্ববর্ত্তী তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ বা পরেশনাথ, খ্রীঃ পূঃ অষ্টম শতাব্দী।

৩। বৌদ্ধধর্ম্ম—শেষ বোধিসত্ত্ব বা বুদ্ধ, গৌতম বুদ্ধ, খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দী।

এই দুই ধর্ম্মমত সম্পর্কে সকলেরই অল্পবিস্তর জানা আছে বলিয়া ইহাদের সম্বন্ধে বেশী কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। একথা সত্য যে বেদ বিরোধী এবং নিরীশ্বরবাদী হইয়াও এই দুই ধর্ম্মমত হিন্দুধর্ম্মের উপর নানা ক্ষেত্রে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছে। দুইটি মতকেই হিন্দুধর্ম্মের প্রকারভেদ বলা যায়।

উভয় সম্প্রদায়ই বিশ্বাস করেন যে অতি প্রাচীনকালে হইতেই তাহাদের ধর্ম্মমতের ধারা চলিয়া আসিতেছে। জৈন মতে মহাবীর পর্য্যন্ত ২৪জন তীর্থঙ্কর বিভিন্ন যুগে অবতীর্ণ হইয়া স্ব স্ব অহিংসা মতবাদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। পার্শ্বনাথের পূর্ব্বতন তীর্থঙ্কর ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম ভ্রাতা নেমিনাথ বা অরিষ্টনেমি। জৈনমতে বাসুদেব ও বলরামকে শলাকা-পুরুষ বা জৈন ধারার প্রধান পুরুষ হিসাবে ধরা হয়।

বৌদ্ধ মতেও গৌতম বুদ্ধকে শেষ বুদ্ধ বা এই ধারার শেষ ধর্ম্মগুরু বা সংস্কারক বলিয়া গণ্য করা হয়। গৌতম বুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী অন্ততঃপক্ষে ২৪জন বোধিসত্ত্বের নাম

পাওয়া যায়, যাঁহারা বিভিন্ন যুগে অবতীর্ণ হইয়া অহিংসা ও অষ্টাঙ্গমার্গ ধর্ম্মের প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ঘটজাতকের মতে কৃষ্ণ-বলরাম ভ্রাতা ঘট সেই যুগের বোধিসত্ত্ব ছিলেন। সুতরাং দেখা যায় যে উভয় মতই পূর্ব্বেকার নজীর খাড়া করিয়া দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, মতবাদগুলি আপাতঃদৃষ্টিতে নূতন বলিয়া মনে হইলেও আসলে পুরাতনই, নূতন ভাষায় ও ভঙ্গীতে বলা হইতেছে মাত্র।

৪। সঞ্জয় বেলাত্থিপুত্তের (পুত্রের) সম্প্রদায়। এই সঞ্জয় ছিলেন বুদ্ধের প্রধানতম দুই শিষ্য সারিপুত্র ও মহামৌদ্গল্যায়নের আদিগুরু। বুদ্ধদেবের প্রচারক জীবনের দ্বিতীয় বৎসরে (অর্থাৎ তাঁহার ৩৭ বৎসর বয়ক্রম কালে) এই দুইজন সঞ্জয়ের বহু শিষ্যসহ রাজগৃহে বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই সঞ্জয়ের ধারা সম্রাট্ অশোকের সময়ও বিদ্যমান ছিল বলিয়া জানা যায়। সুতরাং নিঃসন্দেহে তাঁহারা কৌটিল্যের যুগে বর্ত্তমান ছিলেন।

৫। ককুদ কাত্যায়ন (পালি—পকুদ কচ্চায়ন) প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়। অন্যত্র বলা হইয়াছে যে এই ককুদ কাত্যায়ন (সম্ভবতঃ তাঁহার পৃষ্ঠদেশে কিংবা ঘাড়ে ককুদ বা ঝুঁটি ছিল) বুদ্ধ-মহাবীরের সমসাময়িক ছিলেন। বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে এই আচার্য্যের মতবাদের উল্লেখ ও আলোচনা আছে। ইনি সম্ভবতঃ সৎক্রিয়াবাদী ছিলেন। তবে তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে বেদ-বিরোধী ছিলেন কি না, তাহা সঠিক বুঝা যায় না।

৬। অজিত কেশ-কম্বলীর সম্প্রদায়। উপাধি হইতেই বুঝা যায়, ইনি কম্বল পরিধান করিতেন। এই অজিত কেশ-কম্বলী সম্ভবতঃ চার্ব্বাক-পন্থী ছিলেন, ইহা মনে করা যায়। বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে তাঁহাকে অক্রিয়াবাদী এবং ঘোরতর বেদ-বিদ্বেষী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। জন্মান্তরবাদ ও ক্রিয়াফলে তাঁহার কিছুমাত্র আস্থা ছিল না। বুদ্ধ ও মহাবীরের সময় এই সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন পায়াসি নামক এক ব্যক্তি (দীঘনিকায় পায়াসি সুত্তান্ত)। অজিত কেশ-কম্বলীর মতবাদের এই পরিচয় পাইয়া সন্দেহ হয় যে, কৌটিল্য স্বীয় অর্থশাস্ত্রে পাষণ্ডী বলিয়া যাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াছেন, এই কেশ-কম্বলী সম্প্রদায় তৎকালে বর্ত্তমান থাকিলে নিশ্চিত পাষণ্ডীর দলে পড়িবেন।

৭। পূরণ কাশ্যপ বা পূর্ণ কাশ্যপ সম্প্রদায়। প্রবাদ আছে যে এই পূরণ কাশ্যপ বুদ্ধের ৪২ বৎসর বয়ঃক্রমকালে গলায় কলসী বাঁধিয়া নদীতে ডুবিয়া আত্মহত্যা করেন। বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থে তাঁহার মতবাদের কোন স্পষ্ট উল্লেখ নাই। তবে তাহাদের মতে কাশ্যপের মতবাদ সাংখ্য মতবাদ হইতে খুব একটা পৃথক্ ছিল না।

ঔপনিষদিক (শত্রুবধার্থ নানা ঔষধ ও মন্ত্রের প্রয়োগ)

এই ঔপনিষদিক বা চতুর্দ্দশ অধিকরণে কৌটিল্য শত্রু-পক্ষীয়গণের ক্ষতিসাধন ও প্রাণহাণি ঘটাইয়া তাহাদিগকে দুর্ব্বল করিবার উদ্দেশ্যে নানাবিধ ঔষধ প্রয়োগ এবং অভিচার ক্রিয়ার কথা লিখিয়াছেন। ১৪।১, ১৪।২ ও ১৪।৩ অধ্যায় সমূহে বিভিন্ন প্রকার ঔষধ প্রস্তুত, কায়া-বদল প্রণালী, এমন কি, মায়া বা ইন্দ্রজালের কথাও বর্ণনা করা হইয়াছে। ১৪।৩ অধ্যায়ে বিভিন্ন ঔষধি সাহায্যে অন্তর্দ্ধান হইবার ৮ রকম প্রক্রিয়ার কথা বলা হইয়াছে। তার পর আসিয়াছে মন্ত্র প্রয়োগে মানুষকে নিদ্রিত করিবার প্রণালীসমূহ। মন্ত্রগুলি প্রার্থনা মন্ত্র, এবং মন্ত্র মধ্যে বিভিন্ন পুরাণোক্ত ঋষি, দেবী, অসুর ও রাক্ষসের নাম পাওয়া যায়। পুরাণে উল্লেখ নাই, এমন কয়েকটি অসুর এবং রাক্ষসের নামও এখানে আছে। যেমন:—বিরোচন পুত্র বলি, বহু মায়াবিদ্ শম্বর, ভণ্ডীরপাক, নরক, নিকুম্ভ ও কুম্ভকে বন্দনা করি—১৪।৩।২। দেবল ও নারদকে বন্দনা করি, সাবর্ণি গালবকেও বন্দনা করি। এ সমস্ত দেবতা ও দানবের সহায়তায় আমি তোমার নিদ্রা বিধান করি—১৪।৩।৩। মনুকে নমস্কার করিয়া,—দেবলোকে যাহারা দেবতা ও মনুষ্যলোকে যাঁহারা ব্রাহ্মণ, তাঁহাদিগকে—এবং কৈলাসের বেদপারগ সিদ্ধ তাপসগণকে নমস্কার করিয়া, এই সব সিদ্ধ পুরুষগণ হইতে ক্ষমতা লাভ করিয়া, আমি তোমার গভীর নিদ্রার বিধান করিতেছি—১৪।৩।৬-৭। সুবর্ণপুষ্পী দেবী ও ব্রাহ্মণীকে, ব্রহ্মা ও কুশধ্বজকে, এবং অন্যান্য দেবতাগণকে বন্দনা করি; সকল সিদ্ধ তাপসগণকেও বন্দনা করি—১৪।৩।৮।

বিরোচন-পুত্র বলিকে নমস্কার করি। বহু মায়াবিদ শম্বর, নিকুম্ভ, নরক, কুম্ভ, মহাসুর, তন্তুকচ্ছ, অর্ম্মালব, প্রমীল, মণ্ডোলুক, ঘটোবল, কৃষ্ণ ও কংসের উপচারসমূহ এবং যশস্বিনী পৌলমীকে নমস্কার করি—১৪।৩।১৩।

এই অধ্যায় হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে কৌটিল্যের যুগে মায়া ও ইন্দ্রজাল বিদ্যায় অনেকেরই বিশ্বাস ছিল, এবং প্রয়োজনবোধে অনেকেই ইহাদের সহায়তা গ্রহণ করিতেন। এমন যে মহাপণ্ডিত চাণক্য, তিনিও এ সকলে বিশ্বাস করিতেন মনে হয়।

উপরে বর্ণিত প্রার্থনা মন্ত্রসমূহে উল্লিখিত বিরোচন-পুত্র বলির কথা সকল পুরাণেই লিখিত আছে। অসুর-রাজ বিরোচনের উল্লেখ ছান্দোগ্য উপনিষদেও আছে—৮।৭।১।

পুরাণ মতে বিরোচন প্রহ্লাদের পুত্র ও হিরণ্যকশিপুর পৌত্র। দেবল ও গালব বৈদিক যুগের ঋষি, আর নারদ দেবর্ষি। ছান্দোগ্য উপনিষদে—(নারদ-সনৎকুমার সংবাদে —৭ম অধ্যায়) নারদ কর্তৃক ঋষি সনৎকুমার হইতে ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভের কথা লিখিত আছে। ব্রহ্মা ও ব্রহ্মাণী বৈদিক দেবদেবী। কুশধ্বজের পরিচয় পাওয়া শক্ত। অসুর, দানব ও রাক্ষসগণের মধ্যে নরক ও শম্বরের কথা মহাভারত ও পুরাণে পাওয়া যায়। নরক ও শম্বর অসুর ছিলেন। এক নরকাসুর প্রাগ্ জ্যোতিষপুরে (আসামের কামরূপ অঞ্চলে) মহাভারতের যুগে রাজত্ব করিতেন। তৎপুত্র ভগদত্ত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জ্জুন হস্তে নিহত হন। কৃষ্ণ ও কংসের কথা মহাভারতে, হরিবংশে ও সকল পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। যশস্বিনী পৌলমী ইন্দ্রপত্নী শচীদেবী। অন্যান্য নামগুলি হয়ত অতীত যুগের প্রসিদ্ধ ঐন্দ্রজালিকগণের নাম হিসাবে কৌটিল্যের যুগে বহু পরিচিত ছিল, এবং মায়া ও ইন্দ্রজাল-বিদ্যায় মন্ত্রে উচ্চারিত হইত।

পুরাণাদিমতে অসুররাজ বলি যজ্ঞকালে ত্রিপাদভূমি দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া বামন বিষ্ণুর ছলনায় রাজ্যভ্রষ্ট হন। ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ২২শ সূক্তে ১৭শ মন্ত্রে (ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্) বিষ্ণুর ত্রিপদক্ষেপের কথা উল্লিখিত আছে বলিয়া শাকপূর্ণি, ঔর্ণবাভ ও যাস্ক প্রভৃতি সুপ্রাচীন বেদ-ভাষ্যকারগণ মনে করিতেন। এই প্রবন্ধের অন্যত্র বিষয়টি উল্লিখিত হইয়াছে। ভাগবতের মতে (৮ম স্কন্দ—বলি উপাখ্যান) বলির এই যজ্ঞস্থল ছিল নর্ম্মদার উত্তর তীরবর্ত্তী ভৃগুকচ্ছ। ভৃগুকচ্ছকে বোম্বাই প্রদেশের ব্রোচ ও তৎসন্নিহিত অঞ্চল বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে। পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিম ভারতের লোকেরা বলিয়া থাকেন যে, বলি-রাজার রাজ্যচ্যুতির এই আনন্দজনক প্রাচীন ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়াই দেওয়ালি বা দীপাবলী উৎসব এখনও প্রতি বৎসর উদ্‌যাপিত হইয়া থাকে। বাংলা দেশে অবশ্য এই দীপাবলীর রাত্রিতে শ্যামাপূজারও অনুষ্ঠান হয়।

এই প্রসঙ্গে ঋগ্বেদোক্ত অভিচার মন্ত্র ও বিশেষ ভাবে অথর্ব্ব বেদোক্ত অভিচার ক্রিয়া-সম্বন্ধীয় মন্ত্রসমূহের উল্লেখ করা যায়। বেদোক্ত ঐ সমুদয় মন্ত্রই প্রার্থনামূলক। অর্থ-শাস্ত্রে উল্লিখিত মায়িক ও ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রসমূহও প্রার্থনা-মূলকই বলা যায়। উভয়ক্ষেত্রেই কার্য্যসিদ্ধির জন্য কৃপা প্রার্থনা করা হইয়াছে। তবে বৈদিক মন্ত্রসমূহে প্রধানতঃ দেবদেবীরই উল্লেখ আছে। আর এই সমস্ত মন্ত্রে আছে দেবদেবীর সঙ্গে ঋষি ও মহাপুরুষ হইতে আরম্ভ করিয়া পুরাতন যুগের প্রসিদ্ধ মায়াবী ও ঐন্দ্রজালিক অসুর, দানব ও রাক্ষসগণের কৃপা প্রার্থনা। সুতরাং অর্থশাস্ত্রে উল্লিখিত মন্ত্রগুলি বৈদিক ও আসুরিক মতের সংমিশ্রণ, সন্দেহ নাই। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদিতে অসুর, দানব ও রাক্ষস-দিগকে শক্তিশালী ও মায়াবিদ্ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই সমস্ত বর্ণনার মধ্যে হয়ত সত্যের আভাস ছিল। কাল-ক্রমে বৈদিক আর্য্যগণের অভিচার বিদ্যা এবং অসুর রাক্ষস-গণের মায়া বা ইন্দ্রজাল বিদ্যা, এই দুইয়ের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল।

এই প্রবন্ধের প্রথমাংশে "নীতিসার" প্রণেতা কৌটিল্য-শিষ্য কামন্দক-কৃত যে মঙ্গলাচরণ বা গুরুস্তুতি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার "যস্যাভিচারবজ্রেণ বজ্রজ্বলনতেজসঃ" কথাগুলির অর্থ যদি কৌটিল্যের নন্দ-বিরোধী রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ না বুঝাইয়া, আক্ষরিক অর্থে অভিচার ক্রিয়াই বুঝাইয়া থাকে, তবে বলিতে হয় যে, কৌটিল্য শুধু অভিচার ক্রিয়ায় বিশ্বাসই করিতেন না, নিজেও একজন সে যুগের শ্রেষ্ঠ অভিচারিক ছিলেন। অভিচার ক্রিয়া দ্বারা শুধু মারণ, উচাটন প্রভৃতি হীন কার্য্যই সাধিত হয় না, নানাবিধ বিঘ্ন-বিপত্তিরও শান্তি হইয়া থাকে। এ যুগের শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি এবং যাগযজ্ঞাদিও বিঘ্ন-বিপত্তির শান্তির জন্যই করা হইয়া থাকে। অর্থশাস্ত্রেও নানাবিধ বিঘ্ন-বিপত্তির জন্য অথর্ব্ববেদীয় অভিচার ক্রিয়া কিংবা মায়িক ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াকলাপের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে—৪।৩ ও ৫।২ প্রভৃতি অধ্যায়ে।

ভ্রম সংশোধন

এই প্রবন্ধের প্রথমার্দ্ধে অনবধানতা প্রযুক্ত কয়েকটি ভুল তথ্য পরিবেশিত হইয়াছে। তথ্যসমূহ এইরূপ হইবে :—

১। ৫৪২ পৃষ্ঠা—কৌটিল্য সম্ভবতঃ মৌর্য্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেই অর্থশাস্ত্রের রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং চন্দ্রগুপ্তের মহামাত্য-পদে অধিষ্ঠিত থাকার সময়ই গ্রন্থখানি ভাষ্যসহ সমাপ্ত করেন। বস্তুতঃ নন্দবংশ ধ্বংসের পরই গ্রন্থ-রচনার পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছিল।

২। ৫৪৫ পৃষ্ঠা—ভোজবংশীয় রাজা বলিয়া কথিত দাণ্ডক্য সম্ভবতঃ প্রাচীন দণ্ডকারণ্য অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে (৮৭তম অধ্যায়) ইক্ষ্বাকু-পুত্র দণ্ডের নাম পাওয়া যায়, যিনি বিন্ধ্য ও শৈবাল নামক পর্ব্বতদ্বয়ের মধ্যস্থ অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার রাজধানীর নাম ছিল 'মধুমন্ত'। গুরু শুক্রাচার্য্যের জ্যেষ্ঠা কন্যা অরজা দেবীকে বলাৎকারের অপরাধে শুক্রাচার্য্যের অভিশাপে ৭ দিনের মধ্যেই তাঁহার রাজ্য প্রজাশূন্য হয় এবং তিনিও সবংশে নিধন প্রাপ্ত হন। ধর্ষিতা ও পিতৃ-পরিত্যক্তা অরজা যে আশ্রমে বাস করিতেন, একমাত্র সেই স্থানটুকুই ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া পরে 'জনস্থান' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। জনস্থান বর্ত্তমান নাসিকের সন্নিকটে অবস্থিত। শরভঙ্গ জাতকের মতে গোদাবরী তীরস্থ রাজা দণ্ডকী তাপস কৃশবৎসকে অপমান করার সেই শাপে তদীয় রাজ্য বিনষ্ট হয়। মৎস্য (১১৪ অধ্যায়, ৪৬-৪৮ শ্লোক) ও বায়ু পুরাণের মতে (৪৫ অধ্যায়—১২৬) দাণ্ডক রাজ্য দক্ষিণাপথে অবস্থিত ছিল এবং সম্ভবতঃ সেখানে পরবর্ত্তী কোন সময়ে যদুবংশীয় ভোজগণ বসবাস করিতেন। কৌটিল্য সম্ভবতঃ ভুলক্রমে রামায়ণে উল্লিখিত ইক্ষ্বাকু-পুত্র বা ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা দণ্ডকেই ভোজবংশীয় বলিয়া আখ্যাত করিয়াছিলেন; কারণ এই দণ্ডই গুরু-কন্যার উপর অত্যাচার করার পাপে রাজ্যসহ বিনষ্ট হইয়া ছিলেন।

৩।৫৪৪ পৃষ্ঠা—পুরাণাদিতে প্রদত্ত বিদেহ-রাজবংশের তালিকায় করাল নামক কোন রাজার উল্লেখ না থাকিলেও, বৌদ্ধ গ্রন্থ নিমিজাতকের মতে দেবজ্ঞগণ নিমির পিতাকে নাকি বলিয়াছিলেন যে, নিমি হইতেই মিথিলার রাজর্ষি বংশের অবলুপ্তি ঘটিবে। নিমির পুত্র কলার জনক বা করাল-জনক (মজ্‌ঝিম নিকায়—মখাদেব সুত্ত)। এই কলার বা করাল-জনকই লোভবশে কোন এক ব্রাহ্মণ কন্যাকে অপহরণ করিয়া প্রথমে জাতিভ্রষ্ট, ও পরে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। অশ্বঘোষ রচিত বুদ্ধচরিত—৪।৮০) :—

করালজনকশ্চৈব হৃত্বা ব্রাহ্মণকন্যকাম্।
অবাপ ভ্রংশমপ্যেব ন তু ত্যজেচ্চ মন্মথম্॥

সম্ভবতঃ করালের রাজ্য নাশের যে আখ্যান কৌটিল্যের যুগে প্রচলিত ছিল, তাহাই পরে অশ্বঘোষ স্বীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের অন্তর্গত মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়ে (৩০৩ অধ্যায়) রাজর্ষি করাল নামক এক জনকের উল্লেখ অবশ্য আছে; কিন্তু এই রাজর্ষি করাল অবশ্যই কৌটিল্য-বর্ণিত পাপগ্রস্ত করাল নহেন।

৪।৫৪৬ পৃষ্ঠা—প্রজা বিদ্রোহে মহাশক্তিধর পুরূরবা সত্যসত্যই নিহত হইয়াছিলেন। অত্যধিক ধনলোভ হেতু রাজর্ষি (ঋগ্বেদের একজন ঋষি ও প্রখ্যাত রাজা) পুরূরবা মধ্যবয়সে প্রজাবর্গের উপর উৎপীড়ন করিয়া ধনাহরণে প্রবৃত্ত হন। এই উৎপীড়নের হাত হইতে ব্রাহ্মণ-প্রজা এমন কি, মুনি ঋষিগণও রেহাই পান নাই। উৎপীড়িত প্রজাকুলের আবেদন-নিবেদন এবং কাতর ক্রন্দন ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইলে, ক্ষুদ্ধ ঋষিগণ এই গর্ব্বোদ্ধত রাজাকে অভিশাপ প্রদানে বিনষ্ট করিয়া ফেলেন (মহাভারত—আদিপর্ব্ব—৬৩তম অধ্যায়)।

৫।৫৪৯ পৃষ্ঠা—বেদের সর্ব্বানুক্রমণী রচয়িতা আচার্য্য কাত্যায়ন ও পাণিনির বার্ত্তিক-রচয়িতা কাত্যায়ন বিভিন্ন ব্যক্তি এবং উভয়ের মধ্যে সময়ের ব্যবধান অন্ততঃ পক্ষে ১০০-১২৫ বৎসরের। পূর্ব্বোক্ত আচার্য্য কাত্যায়ন খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতকের শেষ পাদ অথবা ৫ম শতকের প্রথম পাদে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি পাণিনিরও পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন। সর্ব্বানুক্রমণী বৈদিক ব্যাকরণের রীতি অনুসারে রচিত। সুতরাং এই কাত্যায়ন উদ্‌গোত্র সম্ভূত বার্ত্তিককার কাত্যায়ন অপেক্ষা ১০০-১৫০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী।

৬।৫৪৯ পৃষ্ঠা—কোশলরাজ পরন্তপের অর্থশাস্ত্রবিৎ মন্ত্রীর নাম কণিষ্ক, কনিষ্ক নহে।

নিবেদক—প্রবন্ধকার।

'এই রকমও হয়"

শ্রীআভা পাকড়াশী

দুর্দান্ত গরম। লুয়ের গরম হাওয়ার ঝড় বইছে সারা ইউ. পির ওপর দিয়ে। ফার্ষ্টক্লাশ কম্পার্টমেণ্ট ভিড়ে কিন্তু ঠাসা। কাল্কা মেল। সিমলা যাচ্ছি। অনেকেই চলেছে ঐ প্রচণ্ড গরমের হাত থেকে রেহাই পেতে। ওপরে দুটো, নীচে তিনটে বার্থ। আগেকার ফার্ষ্টক্লাশ। স্লিপারের চল হয় নি তখন। দুপুরে উঠেছি। সারা দুপুর মে মাসের প্রচণ্ড গরমে আর ভিড়ে সেদ্ধ হয়ে গেছি। ভাবছি, কখন রাত নটা বাজবে আর গাড়ি দিল্লী পৌছবে। সেখানে ভিড় খালি হবে, আর আমরা একটু হাত-পা ছড়াতে পারব।

হুড়মুড় করে কাল্কা মেল দিল্লী স্টেশনে ঢুকল আর প্রায় নিমেষের মধ্যে আমাদের কামরা খালি ক'রে সব লোক নেমে গেল। আগে থেকেই অবশ্য ওরা তোড়জোড় করে জিনিষপত্র গুছিয়ে-গাছিয়ে বসেই ছিল। নামামাত্রই আমিও আমার ছেলেদের সাহায্যে মাঝের বার্থে আর জানলার ধারের বার্থে বিছানা বিছিয়ে নিলাম। ওপরে বাঙ্কে ত কর্ত্তা কায়েমী আছেনই। ঐ এক মানুষ, ট্রেণে উঠলে শুধু খাবে, আর ঘুমুবে। তাই আমাকেই অর্ধনারীশ্বর হ'তে হয়। কুলিদের সঙ্গে বচসা করা, জিনিষ গুণে নেওয়া, গাড়িতে জায়গা দখল করা—একে ভাইয়া, ওকে পিতাজী, তাঁকে মাতাজী বলে কমপক্ষে নিজের ছেলে দুটোর অন্ততঃ শোবার ব্যবস্থা, সবই আমাকে করতে হয়। আসার আগে দুমাসের মত সমস্ত জিনিষ গুছিয়েছি। রান্নার ভাঁড়ার, খাবার বাসন, পরবার কাপড়-চোপড়, মায় কর্ত্তার ফরমাস—ট্রেণে বসে ভাজা কিমা আর লুচি তোফা লাগে তার সঙ্গে তোমার হাতের মশাল-আলু। বেশ বাবা, তাই সই। উনি শুধু টাঙ্গা ডেকে মাল তুলেছেন, কুলি দিয়ে। তারই রোয়াব দেখে কে—বেলা একটায় গাড়ি, ঘুম থেকে উঠেই সুরু করেছে—কই গো সব গুছিয়ে-গাছিয়ে দাও, আবার টাঙ্গা ডাকতে হবে, মালটাল তুলতে হবে। তাড়া দিলে আবার অন্য বিপদ্—কান শুনতে ধান শুনবে, আমি বলব এখন চাই না, সে যখন হবে তখন দেখা যাবে। ও শুনল-টাঙ্গা একেবারেই চাই না। বাজার করতে গিয়ে বারণ করে দিয়ে এল তাদের। কোন ভাবনা নেই, জানে আমি আছি, ব্যবস্থা নিশ্চয়ই একটা কিছু করেছি। না হ'লে, কলকাতায় গিয়ে মেট্রোতে সিনেমা দেখতে গেছি, সিটে বসে ওঁকে বললাম—বড় গরম লাগছে। উত্তর দিলেন বিকট জোরে—অ্যাঁ! গামছা পরে এসেছে! কে! কে গামছা পরে এসেছে? হলশুদ্ধু লোক উঁচু হয়ে দেখছে, এ হেন হলে আবার কে গামছা পরে এল? বকুনি খেয়ে বলেন, শুনতে পাই নি। আসলে অঙ্ক ভাবছিলেন। আমি বলি সুরেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় সংস্করণ। ওঁকে জাগালেই বিপদ্, ঘুমুচ্ছেন ঘুমোন। ক্ষিধে পেলে আপনিই উঠবেন।

ছেলেদের বললাম, জল নেই, কুঁজো ভরে আন। এবার খেতে দেব। ওদিকের দুটো বার্থের লোক এসেছে। দুই বন্ধু। দুজনেই সিন্ধী। কাঁচা পিঁয়াজ দিয়ে পরোটা খাচ্ছে। আর শিক কাবাব। বলল, আমার ছোট ছেলে পিণ্টু ও ওর বাপের মত পেটুক। বড়টি ভালমানুষ। ওর খাবার থেকেও পিণ্টুকে ভাগ দেয়।

আমাদের খাওয়া-দাওয়া শেষ। বিছানা আগেই করে দিয়েছি। মাঝের বেঞ্চিতে ওদের দুভায়ের হয়ে যাবে। আমি জানলার ধারে থাকব। সারারাত জেগে জেগে স্টেশন দেখি, আর চা খাই, গাড়ি চললে গল্পের বই পড়ি, এই করেই রাত কেটে যায়। মুখে যতই তম্বি করি একটা ভয় ত ভেতরে থাকেই। কারুর ওপর ত ভরসা করতে পারি না। তিনজনই ত নাবালক।

গাড়ি ছাড়বে—হুইসিল দিয়েছে। একটা নিশ্চিন্ত নিঃশ্বাস আপনিই বেরিয়ে আসে, যাক্, আর কেউ ওঠে নি! নটা বেজেছে, এবার দিল্লী ছাড়লেই লক্ করে দেব। ওদিকের লোকদুটোও কাল্কা যাচ্ছে। মাঝপথে নামার কেউ নেই। এমন সময়—এই কুলি, ইধার আও, ফার্ষ্টক্লাশ হ্যায়—উঠে পড়ল লোকটা, কুলিটাও মালগুলো ধপাধপ করে ফেলে দিয়েই নেমে দাঁড়িয়ে হাত পাতল, গাড়ি তখন চলতে সুরু করেছে। লোকটা তখন এ পকেট ও পকেট হাতড়ে বলল, যা, ব্যাগটা! ও, এই যে, বলে হাতের মুঠোয় ধরা ব্যাগের মধ্যে থেকে পয়সা বার করতে লাগল। অর্দ্ধেক পয়সা পড়ে গেল—কুলিটা তখন ছুটছে আর বলছে—জল্দি কিজিয়ে সাব। এক টাকার একটা নোট কুলিটাকে ধরিয়ে দিয়ে বলে, লেও বাবা পকড়ো, পয়সা নেহি মিলতা। দরজাটা বন্ধ করে এদিকে ঘুরে দাঁড়াল। ঘামে-ভেজা শুকনো মুখ,

পরনে আধময়লা স্লিপিংস্যুট—দেখেই আমার হাড় জ্বলে গেল। নিশ্চয়ই ফার্ষ্ট ক্লাশের যাত্রী নয় ও। কোথায় বসবে জিজ্ঞেস করার আগেই ছেলেদের শুইয়ে দিয়েছি, আর নিজেও পা ছড়িয়ে বসেছি। কর্ত্তা খেয়েই আবার উপরে উঠেছেন। বলেছেন—ভয় নেই, আমি সজাগ থাকব, তুমি ঘুমিও। অথচ এখনই নাক ডাকছে। আশ্চর্য্য! ঘুম যেন ওঁর পোষা পাখী।

লোকটা দেখি বিনয় জানে, হাত জোড় করে বলছে, কৃপা করকে আপ-কি পায়ের-কি পাশ থোড়া জাগা দিজীয়ে। আমিও পরিষ্কার হিন্দীতে বলি, না—আমি এক্ষুণি শোব, বসতে হয় ত এখানে বোস। ব'লে তাকে বাথরুমের ধারে রাখা ট্রাঙ্কের ওপর বসতে বললাম। প্রতিবাদ না করেই গিয়ে বসল। ট্রেণ চলছে, যতবার চোখ ফেরাই বার বার লোকটির চোখে চোখ পড়ে যায়। আচ্ছা লোক ত, ও কি ঠায় আমার মুখের দিকে চেয়ে ব'সে আছে নাকি? চোখ দুটো বেশ বড় বড়। টানা ভুরু। লোকটা বেশ লম্বা, কিন্তু স্লিম চেহারা। তবে কাঁধ চওড়া, হাতের কব্জি ভারী, বোধ হয়, টেনিস প্লেয়ার। আবার চোখে চোখ পড়তে ও হাসল। আমার রাগ হয়ে গেল, মুখ ফিরিয়ে নিলাম। ছোট ছেলে উঠে বলল, মনুমা! জল খাব। এত গরম, তায় লুচি খেয়েছে, তেষ্টা পাবে না!

জল গড়িয়ে দিলাম। খালি গেলাসটা ক্রেটে বসাতে যাব—শুনি, ভারী গলায়, মনুমা! পানি দিজীয়ে।

আশ্চর্য্য? দিলাম জল।

গাড়ি থামল। নেমে গিয়ে চা কিনে আনল। আমায় দিল, নিজে খেল। গাড়ি ছেড়ে দিতে ষ্টলবালা দৌড়ে এল। গেলাস দাও নি, পয়সা দাও নি। অপ্রস্তুতের মত হাসছে। বলছে, ওহ, ভুলে গেছি। নিজের স্যুটকেশেই ঠোকর খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল। পা পড়ছে এলোমেলো। বললাম, একটু গুছিয়ে রাখ না জিনিসগুলো, নিজেই ত পড়ে যাচ্ছিলে।

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে পাঞ্জাবী ভাষায় উত্তর দিল—থাকতে দাও। সেই বাক্সের ওপর বসে বসে ঝিমুচ্ছে, বড় বড় চোখদুটো লাল হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে বিড় বিড় করে কি বকছে। গাড়ি জোর কদমে ছুটছে। ওপাশের লোকদুটো ত সেই পিঁয়াজ-পরোটা খেয়ে দিল্লী ছাড়া ইস্তক ঘুমোচ্ছে আর আমার তিনটি ত ঘুমে কাদা। যত দেখছি, সন্দেহ বাড়ছে, বাথরুম থেকে এল টলতে টলতে। রিংসুদ্ধ চাবিটা পকেট থেকে পায়ের কাছে পড়ে গেল ভ্রূক্ষেপ নেই। আমাকে জিজ্ঞেস করে পা দুটো তুলে দিয়েছে মাঝের বেঞ্চে। ওরই মধ্যে আমার দিকে চাইছে বার বার। বিশ্রী লাগছে আমার। একটা গুবরে পোকা বোঁ বোঁ শব্দ ক'রে গাড়ির আলোটাকে ঘিরে ঘিরে উড়ছে।

একটু পরে দেখি ওর মাথাটা এদিক্-ওদিক্ টলে পড়ছে। ফের সোজা হয়ে ব'সে চোখ মেলছে। কি একটা স্টেশনে গাড়ি দাঁড়াতে আমি চা কিনছি পেছন ফিরে, হঠাৎ আমার পিঠে হাত পড়তে চমকে পেছন ফিরে দেখি, লোকটা উঠে এসেছে—প্রায় টলছে, টাল সামলাতে না পেরেই আমার পিঠটা ধরে ফেলেছে। আমি তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে ওকে বকে উঠি—এই! এখানে উঠে এসেছ কেন তুমি? কি, মতলব কি তোমার?

হি হি করে বেহায়ার মত হাসছে—বলছে—এইবার ঠিক জমেছে, এই ত ঠিক বুলি। ভাষাটা পাঞ্জাবী। ধপ করে বসে পড়েছে আমারই বেঞ্চিতে। আমার তখন আর কোন সন্দেহ নেই। লোকটা নির্ঘাৎ মাতাল। পাঞ্জাবী ত! ডিনারের পর খুব খানিকটা ড্রিঙ্ক করেছে বোধ হয়, তাই জন্য ঐরকম তাকানি দিচ্ছিল।

সমস্ত কম্পার্টমেন্টের মানুষ ক'টা ঘুমন্ত, শুধু আমি আর এই মাতালটা জেগে আজি। আমার ছোটবেলায় ডানপিটে, আর বড় হয়ে দস্যি খেতাব আছে তবু ভয় পাই একটু, পেছন ফিরে বড় ছেলেকে ডাকার আগে ওকে আর এক চোট বকুনি লাগাই—লজ্জা করে না তোমার! এই গভীর রাতে মদ খেয়ে একজন লেডির কাছে বসে দিল্লাগী করতে! শরাবী মাতাল কোথাকার! এক হাতে ঘুমন্ত ছেলের হাতটা চেপে ধরেছি। আবার বলি, যাও—উঠে যাও এখান থেকে।

উঠেও যায় না, চলেও যায় না বরং লম্বা হয়ে আমার বিছানায় শুয়ে পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, গাড়ি ত ছেড়ে দিল, চাও খাওয়ালে না—তার বদলে বেবাক গালি। এবার শুকনো ঠোঁটটা চেটে, কুঁজোটার দিকে চেয়ে বলে,—তবে জলই দাও আর তুমিও খাও, মেজাজ ঠাণ্ডা হবে। আবার সেইরকমই করে হাসে।

গা জ্বলে যায় আমার। ফের জোর দিয়ে বলে উঠি—বেশ! আগে নিজের জায়গায় যাও, তবে জল দেব। তার আগে নয়।

এবার ও টলতে টলতে কোনরকমে উঠে বসে বলে, আমার হাল ত দেখছ—তবে কেন জিদ করছ!—নিজেও শোবে না, আর আমাকেও শুতে দেবে না। বেশ মানুষ ত? যাও না নিজে গিয়ে এবার ওখানে বোস! দেখ কেমন আরাম। এই বলেই আবার ধপাস করে শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়েই বলল—এবার স্টেশন এলে কিন্তু দু পিয়ালি' চা কিনব। আমার ভীষণ জাড় লাগছে।

আমি তখন পেছন ফিরে বড় ছেলেকে ডাকছি হঠাৎ আমার আঁচলে টান পড়ে—দেখি মিটকে মিটকে হাসছে ছেলেটা, দুটো লাল চোখ নিয়ে— আমি ফিরে চাইতেই বলে, মাফ কর।' গুসসা কো'রো না—আমার এই পাস টা রাখ, অনেক টাকা আছে, বেহুঁশিতে কোথায় ফেলে দেব। এবার চোখ বুজে বিড় বিড় করে বলে, আমি শরাবী নই, শরাব আমি ছুঁই না মম্মুমা।

কি বলল! লোকটা কি বলল! মম্মুমা! আমার ছেলেদের মত মম্মুমা বলে ডাকল আমায়? তাই বলছিল এই ত ঠিক বুলি? এর মানে এই ত মায়ের ভাষা! কি মনে হ'তে ওর কপালে হাত দেই, উঃ, পুড়ে গেল হাতটা। কি দারুণ জ্বর। ফের লাল চোখ মেলে আমার মুখের দিকে তেমনি করে চায় আর মিষ্টি করে হাসে। আর কিন্তু তার চাউনিকে লালসাসিক্ত বা হাসিটা মাতালের হাসি মনে হ'ল না আমার। মাতৃস্নেহ জেগে ওঠায় মনে হচ্ছে, দূর, এ ত একটা ছেলে, মিথ্যেই ভয় পেয়েছিলাম। নিজেরই লজ্জা হয় আমার। আঁচলটা ও ধরে আছে বলে কিন্তু নয়। এবার চোখ বুজেই ক্লান্ত আর নিশ্চিন্ত স্বরে বলে, চাবিটা হারিয়ে ফেলেছি, খুঁজে দিও। যদি খুঁজে পাও, স্যুটকেশে কম্বল আছে চাপা দিয়ে দিও, বড় শীত করছে। বুঝলাম, খুবের জ্বর, বেহুঁশ হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। টেম্পারেচার চড়তেই থাকবে মাথায় না জল ঢাললে। বললাম—তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমাও।

বড় ছেলেকে ডেকে তুললাম। তার সাহায্যে বালতি বের করালাম। প্লাষ্টিকের টেবিলক্লথটা খোলা হোল্ডলেই ছিল, ওর মাথার নীচে পেতে দিলাম। সিমলার কালীবাড়ীতে উঠব। তারা ত দেবে দুটো চৌকি, একটা আলনা, খাবার টেবিল আর চেয়ার কিন্তু বাকি সব সংসারের জিনিষ? নাইতে গেলে বালতি লাগবেই, ঘর সাজাতে টেবিলক্লথ অপরিহার্য্য। এছাড়াও আমার ভাঁড়ারের ট্রাঙ্কে যা ব্যবস্থা আছে তাতে এই ট্রেণের কামরাতেই অনায়াসে ষ্টোভ ধরিয়ে চা, মোহনভোগ করে খাইয়ে দিতে পারি।

বালির কুঁজোর ঠাণ্ডা কনকনে জলে ওর মাথাটা ধীরে ধীরে ধুইয়ে দিই। বড় ছেলে সন্তুই জল ঢেলে দিচ্ছিল। এবার তোয়ালে দিয়ে মাথাটা বেশ করে পুঁছিয়ে দিয়ে আবার নিজে তোয়ালেটা ঘাড়ে চেপে দিই। গায় একটা কম্বল চাপা দিয়ে মাথায় জোরে জোরে বাতাস করছি। এবার জ্বর নামবে। মাথা ধোয়াতে গিয়ে বমি করেছে, কিছুই নেই, শুধু পিত্তি উঠেছে। একেবারে খালি পেট। আহা, তাইতে ল লেগে গেছে। সন্তু কুঁজো ভরতে নেমেছিল স্টেশনে, এবার কুঁজোটা রেখে বলে—মম্মুমা! বাক্সর ওপর ঐ বড় খামটায় একটা ইউনিফর্ম্ম রয়েছে। ও নিশ্চয়ই কোন মিলিটারি অফিসার। ঐ দেখ, টুপিটা রয়েছে, ওর নাম পিক ক্যাপ, হ্যাঙ্গারে টাঙ্গান। ফের তড়বড়িয়ে বলে, দাঁড়াও, ইউনিফর্ম্মের ষ্টারগুলো দেখলেই ওর কি র‍্যাঙ্ক আমি বলে দেব।

এই এক বুদ্ধ, পাগলা ছেলে। ওর স্বপ্ন ও মিলিটারি অফিসার হবে। দেশের জন্য লড়াই করবে। তাই মিলিটারি অফিসারের ওপর ওর অত শ্রদ্ধা।

বড় বড় চোখ করে এসে বলল,—জান মম্মুমা! একটা অশোক চক্র আর একটা ষ্টার তার তলায়; এই ভদ্রলোক একজন লেফ্‌টেনান্ট কর্ণেল। ওর স্যুটকেশের ওপর লেখা আছে L. C. Sondhi.

কে জানে, হবেও বা। আমি ত ভেবেছিলাম একটা বাজে লোক, যে পোশাকে উঠেছে! ফের ওকে বলি—কিন্তু এখন একটু পিঁয়াজের রস ওকে খাওয়াতে পারলে বেচারার জ্বরটা একেবারে ছেড়ে যেত, কি করি বল্ ত?

ওমা, পিন্টু বাবু কখন বা উঠে বসেছে, সে ঘুম-চোখেই বলল,—ঐ যে ওরা পিঁয়াজ খাচ্ছিল, ওদের টিফিন কেরিয়ারটা দেখব মম্মুমা?

—এই না না! ওদের না বলে নেবে কি! ব্যস্ত হয়ে বলি।

বারে! ওর অসুখ তাই পিঁয়াজ চাই, আমরা ত আর চুরি করছি না কিছু।

আর কথার অপেক্ষা নয়, একেবারে গিয়ে বার করে নিয়ে এল দুটো খোসা ছাড়ান আস্ত পেঁয়াজ।

বললাম—তুই নিয়ে ত এলি এখন আমি রস করব কিসে?

উৎসাহের সঙ্গে ওই জবাব ছিল—কেন, তোমার হামানদিস্তের! দাও ভাঁড়ারের বাক্সর চাবি, আমি বার করছি। দাদাই এস ত! দাদাকে ডাকে সাহায্য করতে।

তা পারবে ও বার করতে, ঐ ছোট্ট হামানদিস্তেটায় মশলা কুটতে ও বড় ভালবাসে। তাছাড়া ঐ ভাঁড়ারের বাক্স ত বলতে গেলে ওরাই গুছিয়েছে। আমি সব জিনিষগুলো ধরে দিয়েছি, বলেছি এগুলো যাবে। ওতে সব ধরিয়েছে ওরাই।

বাথরুমের ধারে রুটির টোষ্টার, প্রেশার কুকার, চায়ের কেৎলী, চিনির কৌটো, ছিষ্টি নামিয়ে বের করেছে হামানদিস্তে। পরিষ্কারই ছিল ওটা। ছোটটারই বুদ্ধি বেশী। পিঁয়াজগুলো ছোট বঁটি বের করে তাতে কেটে ছোট করে হামানদিস্তেয় ফেলে কুটে রস বের করেছে, এবার ন্যাকড়ায়

ছেঁকে খাইয়ে দিলেই হয়। সন্তুকে হাওয়া করতে দিয়ে রস করে এনে খাইয়েও দিলাম। পিণ্টু বললে—হাতের তলায় পায়ের তলায় মাখিয়ে দেখো না? ওর সেদিনই লূ লেগে জ্বর হয়েছিল, অভিজ্ঞতাটা তাই টাটকা। ক্রটি হতে দেবে না। ওকে যা যা করেছি একেও তাই তাই করতে হবে। ওদিকে এদের বাক্স প্যাঁটরা নামান আর হামানদিস্তে ঠোকার শব্দে ওদিকের নীচের বার্থের ভদ্রলোক উঠে বসেছেন। তিনি সব শুনে বললেন—জ্বর ছাড়লেই ওকে কিছু খাওয়ান দরকার বেশ পেট ভরে, না হ'লেই আবার জ্বর আসবে আর রক্তবমি করবে।

গরমের দিন সঙ্গে যা আনা হয়েছিল সবাই সব খেয়ে বসে আছে। এখন রাত প্রায় দুটো, রেষ্টুরেণ্ট কারেই বা কি পাওয়া যাবে যা ওকে খাওয়ান যায়? ষ্টেশনের লাড্ডু পেঁড়া ত আর রুগীকে দেওয়া যায় না? কি করি? মেঝের ছড়ান জিনিষগুলো এবার তুলে রাখছিলাম। সুজির কৌটোতে হাত পড়তে আমি বললাম, আমার সঙ্গে সব আছে—কিন্তু ষ্টোভ জ্বালতে ভয় করছে—কি জানি যদি আগুন ধরে যায়? দ্বিধাভরে বলি।

একমাথা পাকা চুল কিন্তু মহা উৎসাহ ভদ্রলোকের, পাঞ্জাবী ভাষায় বললেন, আমার Metal Box কোম্পানী বেঁচে থাক, এই দেখুন আমার কাছে কতবড় একটা ট্রে আছে মেটাল বক্সএর তৈরী। এর ওপর ষ্টোভ রেখে আপনি অনায়াসে খাবার করতে পারবেন। পিণ্টু আমার কানে কানে বলল—মন্নুমা! বাবা কিন্তু অনেকক্ষণ হ'ল উঠেছে। মটকা মেরে পড়ে আছে।

ওপর দিকে চেয়ে একটু হাসি। আমি জানি উনি কখন উঠবেন। সেই ভদ্রলোককে বললাম আপনি যান, ওর মাথায় বাতাস দিন আর একটু করে জল খাওয়ান। ছেলেমানুষ, ঠিক মত পারবে না। এবার ছটফট করছে। আমি তবে খাবারটা করে ফেলি।

পিণ্টুর সাহায্যে, সুজি, চিনি, ঘি, মায় কিসমিস পর্য্যন্ত সব পেয়ে গেলাম। মোহনভোগ নামিয়ে চা চড়ালাম। টি-সেটও সঙ্গে ছিল। কনডেন্সড্ মিল্কও ছিল। এবার দেখলাম, কর্ত্তা ভান ছেড়ে চোখ খুলেই সিগারেট খাচ্ছেন। বুঝলাম চায়ের গন্ধ নাকে গেছে। এদিকের ভদ্রলোক মাথায় বাতাস দিতে দিতে হেঁকে বলেন, বহেনজী! হালুয়া জায়দা করকে বানাইয়ে মেহেরবানী করকে, বড়ি আচ্ছি খুসবু নিকল রহি হায়। শ্রেফ্ মরিজ নহি, হামলোগোঁভি থোড়া থোড়া বাঁটিয়ে আপকি কড়া প্রসাদ। ভারী সুন্দর গন্ধ বেরিয়েছে, শুধু রুগী নয়, আমাদেরও একটু ভাগ দেবেন ঐ কড়া প্রসাদ।

ওঁর রসিকতায় হেসে উঠি—আশ্বাস দেই, বলি—আচ্ছা আচ্ছা, তাই হচ্ছে।

এদিকের বাঙ্কের ভদ্রলোককে চেঁচিয়ে ডেকে দেন, আরে ইয়ার উঠোনা। ভাবীজীকী কড়া পরসাদ চড়হাও' কিতনা শো রহে হো!

সোঁধির জ্বর ছেড়ে গিয়েছিল, এবার তাকে জোর করে তুলে বসিয়ে চা আর মোহনভোগ খাওয়ান হ'ল। প্রথমে আপত্তি করে পরে খুব তৃপ্তি করেই খেল। তার সঙ্গে ছেলেরা আর অন্য সকলেও ভাগ বসাল। কর্ত্তাও নীচে নেমেছেন, বেশ রসিয়ে রসিয়ে চা খাচ্ছেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—আর একটু চা আছে নাকি?

সব তুলে-পেড়ে গুছিয়ে-গাছিয়ে আবার শুতে প্রায় তিনটে বাজল। সোঁধি অকাতরে শুয়ে ঘুমোচ্ছে আমার বিছানায়। মাঝের বেঞ্চে আমি আর সন্তু। পিণ্টু আর তার বাবা ওপরে। ওদিকে ওঁরা যেমন ছিলেন তেমনি। আমাকে বলেছিলেন ওদিকে শুতে, উনি জেগে বসে থাকবেন বাক্সের ওপর। আমি রাজী হইনি। কাল্কায় যখন গাড়ি দাঁড়াল তখনও আমরা ঘুমিয়ে।

মন্নুমা! মন্নুমা! চোখ চেয়ে দেখি পরিষ্কার করে কামানো সুন্দর হাস্যোজ্জ্বল একটি তরুণ মিলিটারি অফিসারের মুখ। সোঁধি। ধড়মড়িয়ে উঠে বসি। বলি, এ কি! কাল্কা এসে গেছে? তেমনি দুষ্টুমিভরা হাসি, খটাস করে এক স্যালুট দেয় আমায় নিখুঁত সামরিক কায়দায়। গা দিয়ে ল্যাভেণ্ডারের গন্ধ বেরুচ্ছে। হেসে বলি—থাক, খুব হয়েছে। মুখটা কাচুমাচু করে বলে—তোমার বালিসের নীচে আমার চাবি পেয়েছি কিন্তু পার্স কই?

কর্ত্তা নীচে নেমেছেন—পিণ্টুকে নামাতে নামাতে বলেন,—আমাকে যে বড় বল—ওই হ'ল সুরেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় সংস্করণ।

আমি সন্তুকে ঠেলে তুলে দিতে দিতে বলি, তবে বুঝি তুমি হলে অদ্বিতীয়!

কোন রকমে তৈরী হয়ে ছোট গাড়িতে গিয়ে উঠলাম। একদিকে মেয়েদের বসার ব্যবস্থা অন্যদিকে পুরুষদের। মাল সব ব্রেক্‌ভ্যানে। রাজ্যের টোষ্ট, ডিমের পোচ, মাছের ফ্রাই, মস্ত বড় একপট চা নিয়ে ঢুকল বয়, গাড়ি প্রায় ছাড়ে ছাড়ে। একরাশ অফিসার পরিবৃত লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল সোঁধি এসে আমার জানালার সামনে জোড়হাত করে দাঁড়িয়েছে। যে অফিসারটি সিমলা যাচ্ছে তাকে কি যেন

বলল—অন্য অফিসাররা কথা বলছে, ও অন্যমনস্কে জবাব দিচ্ছে কিন্তু চেয়ে আছে আমার দিকে। এবার বয়ের ডাকে আমার চমক ভাঙ্গে—উয়ো সাবনে ভেজা—ঐ অত খাবার নিয়ে এসে দাঁড়িয়ে সোঁধিকে দেখিয়ে দিল। আমি চোখ রাঙ্গিয়ে বকতে যেতেই—অমনি করে জোড়হাত করে দাঁড়াল। গাড়ি ছেড়ে দিল। সন্তু ওর কাছে দাঁড়িয়ে ছিল তাকে যেন কি বলে হাত ধরে তাড়াতাড়ি গাড়িতে তুলে দিল। আমি চেঁচিয়ে বললাল—স্বাস্থ্য ভাল রেখ। ও হাত নাড়ল।

সিমলায় যেদিন পৌছলাম সেদিন আবার দারুণ শিলাবৃষ্টি হ'ল। অত লুয়ের গরমের পর হঠাৎ এত ঠাণ্ডা বেশ লাগছিল। ঘরটা বেশ বড়। ঐ ঘরের একপাশে রান্নার ব্যবস্থা করে নিয়েছি। অন্য পাশে বড় আলনায় চাদর টাঙ্গিয়ে একটু আড়াল করে কাপড় ছাড়ার ব্যবস্থা, মাঝখানে খাবার টেবিল, ওপাশে দুটো জোড়া চৌকি। ব্যস্, আমার ঘরের সজ্জা শেষ। প্রথম দিন এসে কালীবাড়ীর ক্যান্টিনে খেয়েছি, তারপর থেকে নিজেই রাঁধছি। না হ'লে কর্ত্তা আর ছেলেদের মুখে রুচবে কেন? মিথ্যে বলব না, সন্তুর আমার কোন বালাই নেই। ও বরং বলে, মনুমা! তুমি এখানে এসেও যদি সেই রান্না করবে, কাপড় কাচবে, তবে বেড়াবে কখন? আবার বাসনও মাজছ। উত্তর দিই হেসে—কেন রে, বিকেলে ত রোজ বেরুচ্ছি—অন্ন মন্দ রেঁধে না খাওয়ালে তোদের শরীর ভাল হবে কি করে? ঐ ক্যান্টিনের ঝাল তরকারি খেলে দুদিনে আমাশা ধরবে। রেগে গিয়ে বলে,—কিচ্ছু হবে না। তবে আর চেঞ্জ হ'ল কি? বিকেলে আলো পড়ে যায়, ছবি তুলতে পারি না। না, ওসব হবে না, শর্টকাট কর। একটা ভাল কিছু রাঁধ আর ভাত। বাপী ভাত খাবে না ত ক্যান্টিনের রুটি খাক। একটা লোকও পাওয়া গেল না যে বাসন মাজবে। আমি বলি—চটিস্ না, কাল সকালে দেখিস ঠিক বেরুব। খুব শিগ্‌গির রান্না সেরে নেব। বলে গরম জলে প্লেটগুলো ধুয়ে দিই আর ও নিয়ে এসে সাজিয়ে রাখে টেবিলে। আমরা নিজেদের মধ্যে কাজ ভাগ করে নিয়েছি। ওরা দুভাই খাবার জল আর রান্নার জল ভরে; আমার সঙ্গে ধোয়া বাসন তোলে। সন্তু বিকেলের চা করে। কর্ত্তা বাজার করেন আর আমার ভোগান্তি বাড়ান। খাদ্যরসিক মানুষ, পাহাড়ে এসেও তাই তাঁর অপূর্ব্ব সব আবিষ্কার, কচুর শাক, আর নয়ত কচ্ছপের মাংস। কিংবা গুচ্ছের চুনোমাছ, যেগুলো আমাকেই কুটতে হবে। দিনে হ'লেও বা কথা ছিল, সারাদিন সব কাজকর্ম্ম সেরে সেজেগুজে বেড়িয়ে এসে দেখলাম মাছের থলে ভরা চুনোমাছ। সুতরাং সেগুলি কোট, ঠাণ্ডার মধ্যে ধোও তারপর ভাজো, না হ'লে পরের দিন পচে যাবে। তারপর সারারাত সেই ভাজামাছের গন্ধ নাকে নিয়ে ঘুমোও। ওঃ, প্রাণ অতিষ্ঠ।

সেদিনও অমনি মাছ এনেছে আর আমি গজ গজ করছি,—ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে, আমারও হয়েছে তাই। একে ত একরাশ কাপড় কেচেছি, সারাদিন বৃষ্টি গেছে কিছু শুকোয়নি, ঘরেই দড়ি টাঙ্গিয়ে শুকোতে দিয়েছি, তার আবার মাছ ভাজার গন্ধ বেরুবে। কর্ত্তা পিন্টুর সঙ্গে দাবা খেলছেন, আমার মুখের দিকে চেয়েই চাল ভাবছেন, আমার কথা কিন্তু কানেও যাচ্ছে না। সন্তু আমার কাছে বসে ষ্টোভ ধরাচ্ছে। পিন্টু কোনদিনও ঘরে থাকে না। ও লাইব্রেরীর দাবার আড্ডায় যায় আর নয় ত কালীবাড়ীতে আরতির ঘণ্টা বাজায়। কিংবা কীর্ত্তনের সঙ্গে খোল বাজায়। রাস্তায় বেরুলে যত সব বুড়ো বুড়ো লোকেরা আমায় নমস্কার করে আর পরিচয় দেয় আমার ছেলে পিন্টুর বন্ধু। আমি হাসলে তারা বলে—হাসছেন কি! ও এমন এক একটা চাল দেয় যে আমাদের পাকামাথাও ঘুরে যায়। আর কি ভক্তিমন্ত ছেলে! মন্দিরটি ছেড়ে কোথাও যায় না। সেকথা সত্যি, পিন্টু কোথাও বেড়াতে যায় না। ঐ আরতির সময় কাঁসর বা ঘড়ি বাজাতে পারবে না বলে। বাইরে বৃষ্টি নেমেছে আজ, তাই ঘরে দাবা নিয়ে বসেছে। সন্তু ছবি তোলে, ছবি আঁকে, পড়ে, আর আমার সঙ্গে কাজ করে। বাইরের দরজাটা কে নক নক করছে। টক্ টক্ টক্। সন্তুকে বলি—দেখ, কে আবার দরজা ধাক্কাচ্ছে! ও মানুষ ত কানে তুলো গুঁজেছে, পণ করেছে কিছু শুনবে না।

হঠাৎ কর্ত্তা কথা বলেন, নাঃ, সহজে পটল তুলবে না—তোর মন্ত্রী। রাগের মধ্যেও হেসে ফেলি ওঁর কথার ধরনে।

কে আবার এল এখন? নিশ্চয়ই পাশের ঘরের মাসীমার মেয়ে রুমী বা পুপু হবে, হয়ত কফির জন্য দুধ বা এক বোতল কেরোসিন চাই। অনেকের সঙ্গেই আলাপ হয়েছে। আমরা দলবেঁধে বেড়াতে যাই। যতটা পারি একে অন্যকে সাহায্য করি। আমার কাজের বহর দেখে অনেক স্বামীরা তাঁদের গিন্নী আর মেয়েদের আমার মত হবার জন্যে উপদেশ দিচ্ছেন! তাঁরা আমার ওপর চটছেন আর বলেছেন, এই, তোমার জন্য আমরা বকুনি খেয়ে আর কথা শুনে সারা হচ্ছি। আর অত কাজের মেয়ে হ'তে হবে না। আবার বোনা ধরেছ! ঐ জ্যাক পাহাড়ে উঠে আমরা পায়ের ব্যাথায় মরে যাচ্ছি—আর তুমি কি করে ফের রাঁধতে বসেছ বুঝতে পারি না বাবা।

সন্তু এসে ধীরে ধীরে একটু বিব্রত ভাবে বলে—মনুমা! সেই সোঁধি এসেছে।

আমি খুন্তি হাতেই ত্রস্তে উঠে দাঁড়াই—অ্যাঁ! সে কি রে ? ছিঃ ছিঃ, এই ঘরের মধ্যে; চারদিকে কাপড় শুকোচ্ছে, এদিকে মাছ ভাজছি; ঐ অতবড় অফিসারকে কি করে বসাব রে! ওগো শুনছ! বলি উঠবে—'কেন, যেমন করে সেদিন বাক্সর ওপর বসিয়েছিলে' গম্ভীর গলায় উত্তরটি দিয়েই ফের দাবায় ডুবে গেল। মিথ্যে ওকে কিছু বলতে যাওয়া, একেবারে বাতুলতা! ব্যস্ত হয়ে উঠি নিজেই। সন্তু আমার অবস্থাটা বোঝে। বিছানার ওপর বেডকভারটা তাড়াতাড়ি টেনে দেয়। খাবার টেবিলটার ওপর থেকে এঁটো চায়ের কাপগুলো নামিয়ে কোণে জড় করে। আর আমি ভিজে কাপড়সুদ্ধ দড়িটা খুলে জানলার অন্য ধারে টেনে দেই। সব ত হল! কিন্তু মাছ ভাজার গন্ধ কোথায় লুকোব? ঘরের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নেই। এক কোণে কাঠ-কয়লার বস্তা তার পাশে আংঠি, আবার প্রাইমাস ষ্টোভ, প্রেশার কুকার, একটা বড় ইকমিক কুকার; এক টিন কেরোসিন, গুঁড়ো মশলার বাক্স আর টেবিল ভরা ষ্টেনলেস্ ষ্টিল-আর কাঁচের বাসন। কে বলবে উটকো সংসার। তবে নিজে হাতে কাজ করি, সবই বেশ ছিমছাম। একটা আসন দিয়ে কাঠ কয়লার বস্তাটা ঢেকে দিই।

ফের নক্ করতে নিজেই গেলাম দরজা খুলতে।

—মুঝে বাহার রখকে অন্দর কেয়া করতি থি আপ! মনমা! একটু অবাক্ অবাক্ ভাব। বলে আজ আরও দুবার এসে ফিরে গেছে ও। আমারও কানে ওর 'আপ' খট করে বাজে। তবু হাসিমুখে বলি—এস, গরীবখানায় এস! ব্যস্ একমুহূর্ত্ত, তারপরই হৈ হৈ করে তেড়ে বৃষ্টি এল বাইরে, আর ভেতরে ওরা চারজনে হো হো করে হাসছে। আমি এতদূরে বসে প্রাইমাস ষ্টোভের সোঁ সোঁ আওয়াজে কিছুই শুনতে পাচ্ছি না। ওর কিট ব্যাগ থেকে কি সব বার করছে আর তাই দেখে দেখেই ওরা সব হাসছে বোধহয়। আমি চেঁচিয়ে বলি—এই! তোমরা হাসছ কেন?

সোঁধি কিচ্ছু বলে না, উঠে এসে প্রাইমাসের চাবিটা ঘুরিয়ে নিবিয়ে দিল।

আমি—এই! এই! করে উঠলাম।

ও আমাকে ভেঙিয়ে উঠল—এই! এই! তারপর বলল—রাতদিন খানা পাকাবে। বড়ি পাকানেবালি আগ্নি হ্যায়। চল, উঠ!

আমার মাছ ভাজা হয়েও গিয়েছিল, এবার হাত ধুয়ে বোনাটা নিয়ে বসব গিয়ে বিছানায়। ওমা! দেখি কিট ব্যাগ ভরা একরাশ খাবার। প্যাকেটে মোড়া ফ্রাইড রাইস, চিকেন কাটলেট, জেলি ফ্রুট কত কি। খাবার টেবিলের ওপর এক এক করে নামিয়েই চলেছে সোঁধি। এবার বলে—বড়ি বারিস্ সুরু হোগয়ী, জলদি করো—ঠাণ্ডা হয়ে যাবে সব, শাগগির পরিবেশন কর।—মুখে ঠকাস্ করে একটা শব্দ করে আমার দিকে চেয়ে বলে—দেখ এবার চেয়ে, নিজের পাকান খানার চেয়ে বেহ্তর কিনা?

খেতে খেতে ওর কীর্ত্তি শুনলাম। মাত্র আজ সারা দিন আর রাত ওর সিমলায় থাকার মেয়াদ। কাল সকালেই কান্কা ফিরতে হবে। Western Command থেকে হোটেল সিসিল-এ থাকার ব্যবস্থা দিয়েছে। বড়া খানাও সাহেবের জন্য তৈরী; উনি সে সব এবং তার সঙ্গে আরও কিছু কিট ব্যাগে পুরে, স্লিপিং স্যুটের ওপর ইউনিফর্ম চাপিয়ে, আগাপাস্তলা ম্যাকিনটসে মুড়ে, অমন গরম ঘরের ডানলপের গদির মায়া ছেড়ে বৃষ্টি মাথায় করে এসেছেন আমার এই মাছের গন্ধভরা ঘুন্সুরির ট্যাঁকে। কথাগুলো ওকেও বললাম। হো হো করে হেসে উঠল—তার পর সোৎসাহে বলল—মাছ কই? মছলি দাও! এই ঘরটা ঠিক যেন আমার দেশের খাবার ঘর, আমি মাছ ধরে আনলে ঠিক এমনি করে—হঠাৎ চুপ করে যায়। গলাটা যেন ধরে আসে ওর। আমি উঠে গিয়েছিলাম মাছ ভাজা আনতে, এসে তাড়া লাগাই—কি হ'ল, খাও! এই নাও টম্যাটোর চাটনি। ফের ধীরে ধীরে খেতে সুরু করে। হঠাৎ মুখ তুলে বলে—মনমা! আমি বিছানার কম্বলটা পর্য্যন্ত আনতে ভুলে গেছি। সারারাত ঠায় কাঁপতে হবে আজ! বেসরম বারিস কি আজ শেষ হবে না?

উত্তর দিই না কিছু। ছেলেরা আজ মহা আনন্দে খাচ্ছে। কর্ত্তা বাইরের খাবার বা হোটেলে খাওয়া পছন্দ করেন না। এই আমি যা করব তাই খাবেন। সুতরাং এই শিক কাবাব থেকে জেলি পুডিং সবই আমাকে করতে হয়। শুধু কি তাই, সহজে ডাক্তার ডাকবে না। অসুখ হ'লে তখনও আমার সেই "পারিবারিক চিকিৎসা"র বিদ্যের ওপর নির্ভর। ভালও হয় আমার হোমিওপ্যাথিক ডোজে। অবশ্য বেশী কিছু হ'লে কি করতাম জানি না। কিন্তু হয় না। স্বাস্থ্যটা এদের ভালই, আর আমার! কই, কিছুই ত হয় না। বরং রাগ করে বলি, জ্বর হ'লে দুদিন শুয়ে বাঁচতাম। রেহাই পেতাম রোজকার কাজ থেকে। কর্ত্তা পাশেই বসেছেন আমার—হঠাৎ আমার পিঠে হাত দিয়ে বলেন—কই মনু, তুমি যে কিছুই খাচ্ছ না! ব'লে নিজের পাতের বেশীর ভাগ জিনিব আমার পাতে চাপিয়ে দিলেন। এটুকু জানেন, আমি

ভালবাসি হোটেলের খাবার—আর উনি ভয় পান খেতে, যদি অসুখ করে। অসুখকে ওঁর বড় ভয়। ওঁকে আমার তৈরী রুটি তরকারি এনে দিলাম।, সোঁধিকেও দিলাম। এ খাবারে সবায়ের কি পেট ভরে নাকি? আমরা খাচ্ছি —প্রায় হয়ে এসেছে খাওয়া—দারুণ ঝড় উঠল বাইরে, তার সঙ্গে শিল পড়ছে। খট্ খট্ করে সার্শির ওপর শব্দ হচ্ছে। আর একটা দমকা ঝড় উঠল আর দুবার দপ দপ করে উঠে আলোটা নিবে গেল। বাইরে চিৎকার চেঁচামেচি হুড়োহুড়ি সুরু হয়ে গেল। আমার ঘর থেকে বেরিয়েই খাবার ঘর। সেখানেও অনেকে খেতে বসেছিল নিশ্চয়ই। আলো ত প্রায়ই নেবে। আমার কাছে মোমবাতি ছিল। পিন্টু ততক্ষণে উঠে গিয়ে জ্বেলেও এনেছে।

খানা-পর্ব্ব শেষ হ'ল কোনরকমে। এবার শোবার পর্ব্ব। বাড়তি বিছানা বা চৌকি কিছুই নেই। এই দুর্য্যোগে ও যাবেই বা কি করে? ভীষণ জোরে জোরে মেঘ ডাকছে আর চড়াক চড়াক করে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বৃষ্টিরও বিরাম নেই। তবে শিল পড়ছে না আর।

"সোঁধি কাকু, তোমার নাম নেই? টাইটেল বলে ডাকছি কেন আমরা?" পিন্টুর এই প্রশ্নের উত্তরে ও নিজের নাম বলেছে। মনজিৎ সোঁধি। আজও কিন্তু সেই রকম চাউনি। ঠায় চেয়ে চেয়ে আমার ওঠা-বসা চলা-ফেরা পর্য্যবেক্ষণ করছে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে যেন বিশ্লেষণী দৃষ্টি দিয়ে। এখন ত ঘরে আলো নেই তবু বুঝতে পারছি, ও আমায় দেখছে। মোমবাতির ঠাণ্ডা আলো ডুবিয়ে দিয়ে শার্সির মধ্যে দিয়ে থেকে থেকে আসছে বিদ্যুতের ঝলক। সেই আলো ওর বড় বড় চোখেও পড়ছে। বাসন ধুতে ধুতে দেখছি, অস্বস্তি অনুভব করছি ওর চাউনিতে, ওঁর আর পিন্টুর প্রশ্নের অন্যমনস্ক জবাব দিচ্ছে। সিগারেট খেতে খেতে আমাকে দেখাটাই যেন ওর আসল কাজ। এটাই যেন ওর ডিউটি। বাইরের ঘনঘটা ভেতরেও গাম্ভীর্য্য এনেছে। থেমে থেমে—টুকরো টুকরো কথা বলছে ওরা।

ওঁকে বললাম—তোমার চৌকিতে দুজনে বোসো, আমি গিয়ে শোবার ব্যবস্থা করছি। দেখছ না পিন্টুর ঘুম পেয়েছে, ও চৌকি ছেড়ে দাও। বড় চৌকিটায় আমরা তিনজনে শুই। মনজিৎ বলল—আমি এক্ষুণি চলে যাব। আমি চুপ করে রইলাম। ওর ঐ চাউনি আমায় কিছু বলতে দিল না। উনি বললেন—না না, সে কি! এই রকম ঝড়-তুফানে লোকে বেড়াল কুকুরকে বেরুতে দেয় না। —কই মনু!—চুপ করে আছ যে? সন্তু এল, পাশের ঘর থেকে আরও দুটো কম্বল নিয়ে।

মনজিৎ বলল—আমি এই জমিনে শুয়ে যাব। আরে আমরা আর্মির লোক কত পরেসানি ওঠাতে হয়।

আমারও হয়ে গিয়েছিল, হাত মুছতে মুছতে গম্ভীরভাবে বললাম—থাক, আর বড়াই করতে হবে না—যা নমুনা দেখিয়েছ মিলিটারী ম্যান।

সন্তু বলল—মনুমা এইখানটায় জানলার ধারে ঐ বাক্সগুলো জুড়ে তার ওপর শোবে, আর আমরা সবাই ঐ দুটো চৌকিতে শোব। সন্তুই টানাটানি করে ট্রাঙ্কগুলো আন-ছিল—ওর সঙ্গে হাত লাগাল সোঁধি। বিছানা পাতা পর্য্যন্ত চুপ করে রইল। আমি বাথরুম থেকে ফিরে এসে দেখলাম সেই জোড়া বাক্সর বিছানায় সটান শুয়ে শুয়ে সিগারেট ফুঁকছে সোঁধি। উনি নিজের চৌকিতে বসে মিটি মিটি হাসছেন।

আমি বললাম—এটা কি হ'ল?

ওর জবাব—ঠিক হ'ল। তক্‌লিফ তোমাদের জন্য নয়, অনেক কষ্টই ত দিয়েছি।

তখন বেশ রাত। ঘরটা বেশ আলো-আলো। বাইরে চাঁদ উঠলে এমনি আলোয় ভরে যায় ঘর। বড় বড় ছটা জানলা। কোনটাতেই পর্দ্দা নেই।

পাঞ্জাবী ভাষায় গুন গুন করে গানের সুরে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। এ গান আমার চেনা, এ সুর আমার জানা। বেশ কিছু দিন ছিলাম ওদের দেশে। ওদের রেওয়াজ কর্ম্ম সবই জানি। এ ত বিলাপের সুর। অতি প্রিয়জনের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে গেলে ওরা এই গান গায়। এ গান ও গাইছে কেন? যেন একটা চাপা গুমরোন সুরে একটানা কেঁদে চলেছে।

সবাই ঘুমোচ্ছে। পিন্টুটা গায়ের ঢাকা ফেলে দিয়েছে, সন্তু শুয়েছে ঐ দিকে দেয়ালের সঙ্গে চেপ্টে—পিন্টুর লাথির ভয়ে মাঝে কতকগুলো চাদর জড়িয়ে পাশবালিশ করে দিয়েছে। তবু ওর গায় পা তুলে দিয়েছে পিন্টুটা। সরিয়ে শুইয়ে ভাল করে চাপা দিয়ে দিই। কর্ত্তার পা বেরিয়ে আছে তাঁর পায় চাপা দিয়ে দিই। সেই গান কিন্তু থামেনি, একটানা গুনগুনিয়ে চলেছে বিলাপের সুরে। উঠব না, দেখব না কি করছে; মনে করেও পারলাম না হয় ত। ঘুমের ঘোরেই কাঁদছে—।

জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে আছে। দুটো বন্ধ চোখের কোণ বেয়ে অঝোরে জল পড়ছে আর ঠোঁটটা ধীরে ধীরে নড়ছে, বেরিয়ে আসছে করুণ সুরের কান্না, কিন্তু কেন? ধীরে ওর মাথায় হাত রাখলাম— মাটিতে উবু হয়ে বসে ওর কানে কানে বললাম—ছিঃ,

কাঁদে না। ও জবাব দিল না, চোখও খুলল না, শুধু আমার হাতটা নিজের মাথার ওপর জোরে চেপে ধরল।

আমি বললাম—ঘুমোও এবার। আমায় ছাড়, শীত করছে আমার। উঠে বসে নিজের দুই বলিষ্ঠ হাত দিয়ে পুতুলের মত টেনে নিল নিজের বিছানায়, কম্বলটা জড়িয়ে দিল গায়। বাইরে সত্যিই জ্যোৎস্নার ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। দুহাত দিয়ে ধরে আমার মুখটা ফিরিয়ে দিল, জানলা দিয়ে-আসা চাঁদের আলোর দিকে। এবার ধীরে ধীরে বলল—বোলো তুম ওহি হো। বলো তুমি সেই! তুমিই আমার মন্‌মা! মেরি মন্‌মা!

ওর বড় বড় চোখ দুটো উত্তেজনায় জ্বলছে—আবার দুটো কাঁধ ধরে নিজের আরও কাছে টানে, মুখটা নেমে আসে আমার মুখের ওপর। সমস্ত শরীর আমার থর থর কাঁপছে—প্রথমটা কথা ফোটে না। তারপর চাপা রাগে—চেপে চেপে বলি—তুম আভি হিঁয়াসে চলা যাও। ঔর কভি ন মেরা সামনে আনা।—যাও, চলে যাও এক্ষুণি, আর কখনও আমার সামনে এস না।

সেই অবস্থায় জুতোটা পরে ইউনিফর্মটা হাতে নিয়েই ঐ কনকনে ঠাণ্ডার মধ্যে বেরিয়ে গেল। আমি পেছন ফিরে জানলাটা ধরে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম—মাথা নীচু করে ধীরে বলল, দরজাটা বন্ধ করে দাও। আমি কাঠের পুতুলের মত ওর সঙ্গে সঙ্গে গেলাম—যাবার আগে শুধু বলল, ভাইজী গায় হাত দিলে ত কই রাগ কর না! আর আমি তোমার কেউ নই মনমা! ওর চোখে জল।

রূঢ় উত্তর দিই না—কেউ না। কে তুমি আমার? যাও। দরজা বন্ধ করে দিয়ে দরজায় পিঠ দিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি। বিছানার গরমে ঢুকতে পারি না। বাধে। মনে হয় তার গায় একটা গরম জামাও নেই। নিজের সঙ্গে বোঝা-পড়া করতেও সময় লাগে না, আমারও শীত করছে না, বরং আগুন ছুটছে গা দিয়ে। আমার অঙ্কের প্রফেসার বাঙালী স্বামীর ঠাণ্ডা রক্তে ত আর ঐ মিলিটারী ম্যান পাঞ্জাবী যুবকের উষ্ণতা নেই! এই অনুভূতি তাই আমার কাছে নতুন। হঠাৎ হাসি পায় ওর শেষ প্রশ্নে—ভাইজী গায় হাত দিলে ত কই রাগ কর না? আচ্ছা পাগল।

উনিশ বছরের সন্তু মিলিটারীতে জয়েন করেছে। সেই সাত বছরের পিণ্টুও আজ হায়ার সেকেণ্ডারী পড়ছে। উনি ইঞ্জিনীয়ার হবেন। সেই কিটব্যাগটা করে গেঞ্জি আর প্যান্ট নিয়ে যায় পিণ্টু। ও সাঁতার কাটে। অনেকবার রেসে জিতে এসেছে। হাপিত্যেশ করে বসে থাকি কবে পুনা থেকে চিঠি আসবে সন্তুর। ও ঐ খাড়াগ ভাসলায় ট্রেনিং-এ আছে। এর পর কোথায় পোষ্টিং হবে কে জানে? চীনের বিরুদ্ধে অভিযান চলেছে যখন তা হ'লে নিশ্চয়ই লাদাকে বা তেজপুরে কোথাও পাঠাবে। ওর ইণ্টারভিউ হয়েছিল সিমলার সেই Western Command-এ। কালী-বাড়ীর সামনেই ঐ Western Command-এর বিল্ডিং। চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সেই ঘটনার পর ঐ বাড়ীটার দিকে চোখ পড়লেই বুকের মধ্যেটা কেমন করে উঠত। তারপর রাজে, ম্যালে বা কোন বড় দোকানে বা হোটেলে মিলিটারী ইউনিফরম পরা ঐ রকম লম্বা স্লিম ফিগারের আদল দেখলেই তার মুখটাও একটিবার দেখার ইচ্ছে জাগত। কতদিন ছেলেদের বলেছি, দেখ দেখ, ওকে পেছন থেকে ঠিক মন্‌জিৎ-এর মত লাগছে না রে? পিণ্টু ছুটে এগিয়ে গিয়ে দেখে এসে বলেছে, না মন্তমা!—আচ্ছা ও নিজের ওয়াটার-প্রুফ, কিটব্যাগ সব ফেলে ঐ অন্তো ভোরে চলে গেল কেন? ওর ত নটার সময় ট্রেণ ছিল। এই প্রশ্ন ও বহুবার করেছে আগে। কখনও উত্তর দিয়েছি, কখনও চুপ করে থেকেছি। কর্তা সেই রাত্রে আমাকে বসে থাকতে দেখে বলেছিলেন, এবার শুয়ে পড়, এখনও রাত আছে। বুকটা আমার ছাৎ করে উঠেছিল, তবে কি উনি শুনেছেন? কিন্তু সকাল থেকে আবার সেই এক রকম ভাব। সেই নানা রকম খাবারের বায়না আর আমার পেছু লাগা।

কাজে জয়েন করেছে সন্তু, সেই ফ্রণ্টে গেছে। লাদাকে কি দারুণ ঠাণ্ডা সেখানে! লিখেছে কাঠের ঘরে থাকি। এত উঁচু বরের জানলাও বরফে ঢেকে যায়, সকালে বরফ কাটতে হয়। কলিগরা বেশ ভাল ব্যবহার করছে। সারাদিন খাটুনিতে ঠাণ্ডা বোধ হয় না কিন্তু রাত্রে হাড় কাঁপিয়ে দেয়। আর লিখেছে আমার 'বস' কে তা যদি শোন, চমকে যাবে।

বড় একা পড়ে গেছি। পিণ্টু চলে গেছে রুড়কিতে। সন্তু ত তার চাকরিতে, কলকাতার এই বাড়ীতে শুধু আমি আর উনি। মানুষটার কোন হুঁশ আছে, না জ্ঞান আছে, না নির্ভর করা যায় তাঁর ওপর? চিরটাকাল ত উনিই নির্ভর করে এসেছেন আমার ওপর, আর আমার ভরসা ছিল ছেলেরা। আজ আমার ডান-বাঁ দুটি হাতই নেই। তার ওপর আমার মস্ত সম্বল ছিল অফুরন্ত স্বাস্থ্য, তাতেও ঘুণ ধরেছে। নিজেই ভেবে অবাক্ হয়ে যাই যে কি করে অত কাজ করতে পারতাম তখন? সারা বছর টাকা জমিয়ে গরমে পাহাড়ে গেছি, প্রায় প্রত্যেক বছর। দুই ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়েছি! তার ওপর ঠিকমত প্রিমিয়াম দিয়ে গেছি। তাই আজ সেই টাকায় নিজের একটু নিজস্ব আশ্রয় গড়ে তুলেছি। নীচের দু'খানা ঘর ভাড়া দিয়েছি; ওপরের দু'খানায় নিজেরা থাকি। ছেলেও টাকা পাঠায়।

আজ কোন ভাবনা নেই। উনি থাকেন ওঁর পড়াশুনো আর কুকুর নিয়ে আর বাজার নিয়ে। আর আমার সঙ্গীও বই আর রেডিও। বরাবর বাইরে থেকেছি, ওদেশের অবাঙ্গালীদের সঙ্গে মিলে-মিশেই অভ্যস্ত। এখানে শুদ্ধ এই সাংসারিক গল্পে যেন মন ভরাতে পারি না। সব চলে যায় এক রকম, কিন্তু অসুস্থ হয়ে পড়লেই বিপদ্।

কার কাছে অভিযোগ-অনুযোগ করব? ব্যথা-বেদনাই বা কাকে জানাব? বললাম হয়ত—"জান! দাঁতটা আজ বড় টাটিয়েছে। উনি একটা কি করছিলেন, বেশ কিছুক্ষণ পর বললেন, "আহা, ভেব না, সেরে যাবে।" আবার একটু চুপ—ফের বললেন, "আমি জানি কান ব্যথা করলে বড় কষ্ট হয়।"—এবার ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, কি যেন মনে পড়ে গেছে, বলেন, "ছোটবেলায় আমার কানে একবার একটা বোলতা ঢুকে গিয়েছিল, ওঃ সে কি কষ্ট! গরম তেল ঢেলে দিয়েছিলেন মা, আর তাইতে······"

আমি বলি, "থামো—এবার সত্যিই আমার কান ব্যথা করছে!"

বলেন,—"বললাম ত ভীষণ কষ্ট হয়।"

আর একদিন সেই ডেঙ্গু-জ্বর থেকে উঠে খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। বুকের মধ্যে কেমন যেন করছিল। বললাম, "ওগো, তুমি বেরিও না—আমার বুকটা কেমন করছে, বোধ হচ্ছে অজ্ঞান হয়ে যাব।"

বলেন, "আমাকে যে এখন জন-এর মাংস আনতে যেতে হবে।"

ভারী রাগ হ'ল—বললাম, "আচ্ছা যাও।"

ফিরে এসে কি মনে হতে বললেন, "যাক্ তবে অজ্ঞান হও নি। আমি খালি ভাবছিলাম, তুমি যদি অজ্ঞান হয়ে যাও তবে আমি কি করব? তাই ত চলে গেলাম।"

খুব কেঁদেছিলাম সেদিন। বুঝতেই পারছিলাম, বেঘোরে মরতে হবে। কে জানে কেন বার বার মনে পড়ত তাকে; যে দু'হাত দিয়ে আমাকে শুধু সামান্য শীত করা থেকে আগলে রাখতে গিয়েছিল। আর মনে পড়ে ছেলেদের—মুখের কথা না খসতেই আমার চাহিদা পুরো করত তারা।

আসছে সন্তু। হঠাৎ এত লম্বা ছুটি কি করে পেল তাই ভাবছি। পুরো তিন হপ্তার ছুটি পেয়েছে। এই সিঁড়িটা ওর পায়ের বুটের আওয়াজে মুখর হয়ে উঠবে। নীচে থেকেই চেঁচিয়ে ডাকবে—মনুমা! জন!

জনটা দৌড়ে যাবে নীচে। উনিও ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়াবেন। আর আমি! আনন্দে উত্তেজনায় বুকটা আমার থর থর করে কাঁপবে। নতুন ঝি কমলাকে ডেকে বলব, ঐ যে বড় দাদাবাবু এসে গেছে, যাও, যাও, নীচে থেকে কিছু কিছু জিনিষ নিয়ে এস। সেও মাথার কাপড়টা টানতে টানতে হাতের জল মুছে দৌড়ে যাবে। সন্তু প্রায় ওর চেনা, আমার কাছে সব সময়েই ত ওর গল্প শোনে। তারপর খাবার টেবিল, বাইরের বারান্দা, শোবার ঘর ওর গল্পে হাসিতে মুখর হয়ে উঠবে। কমলার কথার টান. বেইরে গেল, আর ঢুইরে গেল, ধরে চটাবে। আমি আবার বলব, জানিস ও কি বলছিল—"আয়টের সময় নাকি যাদবপুরে অনেক গুণ্ডার বেরিয়েছিল, তারা ওর 'অসময় মামার' দোকানটা লুঠ করে নিয়েছে।" নিজের মনেই হেসে উঠি। উনি হঠাৎ বলেন, এই ত বেশ হাসছ, এর মানেই তুমি আজ বেশ ভাল আছ, তাই না?

হাসি বন্ধ হয়ে যায়। স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। দেখি উনি আবার নিজের পড়ায় ডুবে গেছেন, কিন্তু আমি কি করি? আমার যে অনেক কথা বলার আছে। এমনি সব অবান্তর কথা বলতে ভাল লাগে যে আমার। ইচ্ছে করে অমনি বেহিসেবি হাসতে। আমার চাই ঐ রকম নির্ভেজাল মুক্তির আনন্দ। শাড়ী, বাড়ী, গাড়ি, গয়নার হিসেবে কথার পারা ওঠানামা করবে না। ওজন করে হাসতে হবে না, কথা কইতে হবে না। আবার আমার কথা শুনতে শুনতে কেউ অন্যমনস্ক হয়ে যাবে না। মন দিয়ে সে সব শুনবে, হাসবে, প্রশ্ন করবে। আছে, আমার এ রকম বন্ধু দু'চারটি আছে। সামনের বাড়ীর চন্দনবাবু, ওরকে চিনি। সে রাতদিন ছড়া কাটে। মুখে মুখে ছড়া বানায়। যদি জিজ্ঞেস করি তোমার নাম কি? ও বলবে,

আমার নামটি চন্দন, আর মিষ্টি যেন চিনি,
তোমার নামটি মনুমা, তোমায় আমি চিনি।

বড় হলে নির্ঘাত কবি হবে ছেলেটা। সত্যি মিষ্টি। ওর মা ওকে চান করাবে বলে গা খুলেছে আর ছুটে পালিয়ে এসেছে আমার কাছে, বলছে, মনুমা! বড্ড শীত।

ওর মোটা-সোটা নরম আদুড় গায় হাত বুলোতে বুলোতে বহুদিন আগের ভুলে-যাওয়া দিনগুলো নতুন করে মনে পড়ে। মনে পরে পিন্টুকে এমনি করে চান করাতে হাঁপিয়ে যেতাম আমি, বড় দুষ্টু ছিল, এমনি করে ওর পেছু পেছু ছুটে ওর আদুড় গায় তেল মাখাতাম। কত সময় না পেরে ওঁকে বলতাম, একটু ধরে দাও না—

উনি বলতেন, দু'জনেই ছেলেমানুষ, তাই তোমার সঙ্গে খেলা করছে ও। সামলাতে পার না তুমি ওকে?

রাগ করে চলে গেছি, কিছু বলি নি আর। সেকথা ত আজও শুনতে হয়। হ্যাঁ, ছেলেমানুষ আমি। তাই ওদের সঙ্গে ছেলেমানুষি করি, করে আনন্দও পাই। কি

হবে বুড়োমানুষ হয়ে? অনেক বুঝলেই ত অনেক জ্বালা, তার চেয়ে ওদের মত অবুঝ হওয়া ভাল। কিন্তু আমি যে না বোঝার ভান করি, বুঝি ত সব, এতে যে আরও জ্বালা বাড়ে।

এক ভাবে বসে বসে পায় ঝিঁঝিঁ ধরে উঠেছে। খাট থেকে নেমে বাইরের বারান্দায় দাঁড়াই, আবার একবার সন্তুর চিঠিটা পড়ি। হিসেব করলে ঠিক আর তিনদিন আছে ওর আসতে। পিণ্টুকে লিখতে হবে তার দাদাই আসছে। এখন আর দাদাই বলে না, বড় হয়েছে যে। আমি যদি এই বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটু আদর করি, বলবে, —আঃ কি করছ, সবাই দেখছে যে। ঠিক ওর বাবার মত করে দাড়ি কামাবে। ছোট্টবেলা থেকে ওর সখ ছিল দাড়ি কামাবে। ওর দাদা যখন দাড়ি কামাত, সেও নিজের গালে সাবান বুলোত। ভাল করে দাড়ি না উঠতেই কামাতে সুরু করে গুচ্ছের দাড়ি বানিয়েছে। তাই মস্ত বড় হয়ে গেছে। ইস্, ঝুলোন ক্যাক্টাসগুলো শুকিয়ে উঠেছে। অনেক দিন জল পড়ে নি। আমারও যেন আর কেমন ভাল লাগে না। কোন কিছুতেই যেন উৎসাহ পাই না আর। কেন, কেন এমন হচ্ছে? তবে কি আমি ফুরিয়ে যাচ্ছি? নাকি শরীরটা অসুস্থ বলে মনটাও এমন নিষ্ক্রিয় আর নির্লিপ্ত হয়ে যাচ্ছে? নাঃ, নিজেই নিজেকে শাসন করি। গা ঝাড়া দিয়ে যাই ওঘরে। এটা ছেলেদের ঘর। দু'পাশে দুটো ছোট খাট। একটা ছোট আলমারি। ওদিকে বড় একটা আয়না টাঙ্গান, তার পাশে একটা টেবিল। ঐখানে দাঁড়িয়ে ওরা চুল আঁচড়ায়, দাড়ি কামায়। চিরুণী, দাড়ি কামাবার জিনিষপত্র রাখে ঐ টেবিলটায়। ঘরের কোণের জলচৌকির ওপর আমার বিয়ের ট্রাঙ্কটা রয়েছে। একটা পুরণো সিল্কের শাড়ী দিয়ে ঢেকে দিয়েছি। ক'দিন পর ওর ওপরেই থাকবে সন্তুর কালো ট্রাঙ্কটা। আমার ট্রাঙ্কটা ভরা রয়েছে সবাইকার গরম কাপড়। শীত গেল, কি আর কাজে লাগবে। মশারী ছাড়া খাটগুলো হাঁ হাঁ করছে, এবার অন্ততঃ একটা খাটে বিছানা পড়বে। খালি আলনায় এবার ঝুলবে একজন সেকেণ্ড লেফটেনান্ট-এর পোশাক। তার নীচে থাকবে জুতো চটি। ঐ চেয়ারটার গায় ঝুলবে বড় টার্কিস তোয়ালেটা। আর কালো রং-এর সিল্কের ড্রেসিংগাউনটা এলোমেলো হয়ে পড়ে থাকবে হয় ত বিছানার ওপর। রেডিওটা জোরে জোরে বাজবে। বাড়ীটা জেগে উঠবে। জন এসে ঝগড়া করবে সন্তুর সঙ্গে। খেলা করবে, লাফাবে। আমাকে মারলেই চটে যাবে আর বকবে। তাই দেখে আমরা হাসব আর ও রাগ করে যাবে ওঁর কাছে নালিশ করতে আর নয় ত অত বড় শরীরটা নিয়ে আমার কোলে শুয়ে শুয়ে কাঁদবে।

কিন্তু কিছুই মিলল না। টেলিগ্রাম পেলাম স্টেশনে এস। উনি গেলেন। ট্যাক্সি এসে থামল, ছুটে গেলাম বারান্দায়, কমলাকেও ডেকে নিলাম—কিন্তু হুড়মুড় করে কেউ ট্যাক্সি থেকে নামল না। ওঁর হাত ধরে নামল সন্তু, উঃ মাগো। ওপর থেকে দেখেই আমার মাথা ঘুরে গেল। মাথার এক পাশে চুল নেই, লম্বা একটা টানা শুকনো ঘায়ের চিহ্ন। কই কিছুই ত জানি না, কি করে এমন হ'ল? কবে হ'ল? নীচে গেলাম, আমাকে দেখে একটু ফিকে হাসি হাসল সন্তু। খুব রোগা হয়ে গেছে। আমি কোন কথা বলতে পারলাম না, চুপ করে রইলাম। চোখ দুটো আমার জলে ভরে উঠল—আশ্চর্য্য, আজ কিন্তু উনি উদাসীনের মত সরে গেলেন না—বললেন, 'চল মণু—ওপরে চল।'

এইটুকুই ত চেয়েছি, এমনি একটু সহানুভূতি। তবে মাঝে মাঝে কেন অমন হয়ে যান উনি?

ওপরে এনে শুইয়ে দিলাম সন্তুকে। হরলিক্স্ এনে খাওয়ালাম। আমার হাতটা ধরে খাটে বসিয়ে নিয়ে বলে উঠল—ব্যস, আর তুমি যাবে না, বসো এইখানে। এই এমনি করে কতদিন হয়ে গেল কেউ জোর খাটায় নি আমার ওপর, বুকটা ভরে উঠল। উনিও এসে ঘরের ভেতর দাঁড়িয়েছেন—সেই সুর ফিরে এসেছে গলায়, একটু লাজুক লাজুক স্বরে বলছেন, আর একটু গরম জল থাকলে আমার কফিটাও······। সে কথার উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, সন্তুর এমনি হয়েছে তুমি কি জানতে?

পেছন ফিরে ঘর থেকে চলে যেতে যেতে বলেন, হ্যাঁ।

তাড়া দিয়ে বলি—তবে আমায় বল নি যে!

—ওরা কেউ নেই, তুমি কাঁদতে সুরু করলে আমি কি করব! আমার বড় অসুবিধে হয়। চলে গেছেন ওঘরে।

—শোন্ একবার কথা! ওনার সুবিধে বুঝে আমায় কাঁদতে হবে।—শোন্ সন্তু! কোন যুক্তি আছে ওঁর কথায়! এবার ওর পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বলি, কি করে হ'ল রে এমন! ইস্, কি লাগাই লেগেছিল! কি হয়েছিল বাপী, বল্ না!

ক্লান্ত সুরে সন্তু বলে, ব্যস্ত হচ্ছ কেন, সেরে ত গেছে ঘাটা। শুধু দাগ আছে। তবে ও না থাকলে এ যাত্রা এত তাড়াতাড়ি সারতে হ'ত না। আর এতদিন ছুটিও পেতাম না। মাথার তলায় ভাল করে বালিসটা টেনে নিয়ে আমার দিকে ফিরে শোয় ও। হাসছে মিটি মিটি। রোগা মুখে দাঁতগুলো আর চোখ দুটো যেন বেশী বড় বড় লাগছে।

আমি ব্যস্ত হয়ে বলি—কার কথা বলছিস্! কে?

বেশ শান্ত স্বরে ও বলে, জানো মন্নুমা। তুমি একটা মস্ত বড় ভুল করেছ।

—কেন! আমি আবার কি ভুল করলাম!

তার উত্তর না দিয়ে ও বলে, শুধু তুমি নও, ভুল করেছে সেও, আর বাপী সেটা ভেঙ্গে দেয় নি।

—কে? সোঁধি! তোর সঙ্গে তার দেখা হয়েছে বুঝি! আর যা তা বানিয়ে বানিয়ে বলেছে!

সেদিনের রাতটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে চোখের সামনে। একটা ঠাণ্ডা স্রোত আমার শিরদাড়া বেয়ে উঠতে থাকে শির শির করে। লজ্জা! ছেলের সামনে নিজের অপরাধ বোধের লজ্জা, যেন সে আজ আমার বিচারক, এটা মনে হতেই সমস্ত মনটা আমার মুহূর্তে বিরূপ হয়ে গেল, সন্তুর ওপর, সোঁধির ওপর, ওঁর ওপর। তবে কি উনি জেগে ছিলেন সেই রাতে! আবার মনে হয়, থাকলেই বা, আমি ত কোন অন্যায় করি নি, বরং তাকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছিলাম সেই ঠাণ্ডার মধ্যে! এতটুকু মায়া করি নি, দয়া দেখাই নি।

—আঃ কি হ'ল তোমার! এ কি, মুখটা অত লাল করে কার ওপর রেগে উঠলে?

উপুড় হয়ে শুয়ে মুখটা উঁচু করে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে সন্তু।

উনি আবার এলেন এ ঘরে—বললেন, এই যে পিন্টুর চিঠি এসেছে। ও আসছে পরশুদিন। আবার নির্লিপ্ত গলায় বললেন, এটা তোমার চিঠি।

হাত বাড়িয়ে দুটো চিঠিই নিলাম. আমায় আবার কে চিঠি লিখবে? খামের ওপর আর্মি হেড-কোয়ার্টারের ছাপ। ছিঁড়ে চিঠিটা বের করলাম। আগেই তলার নামটা দেখলাম। কর্ণেল সোঁধি। আশ্চর্য্য! এতদিন পর আমায় চিঠি লিখেছে সোঁধি! কিন্তু কেন! কি করে সাহস হ'ল ওর! ওপরে নাম লেখা মন্নুমা চ্যাটার্জ্জি—কেয়ার অফ দিয়ে ওঁর নাম লেখা, তার নীচে সেভেন্টি থ্রি যোধপুর পার্ক। পুরো ঠিকানাটা পড়ল সন্তু, জোরে জোরে, আমি তখন চিঠিটা পড়তে ব্যস্ত। টানা ইংরেজীতে লেখা, উদ্দেশ করেছে, "মাই ডিয়ারেষ্ট সিষ্টার"—কেন?

—মন্নুমা। তোমার এই নামটাই যত গণ্ডগোলের মূল।

গম্ভীর ভাবে বললাম, থাক্, এখন কি করে তোর এমন হ'ল তাই বল্।

—আমি ছিলাম ট্রেঞ্চের মধ্যে, একেবারেও য়ার ফ্রন্টের কাছে প্রায়। দু'রাত দু'দিন ধরে সমানে মেশিনগানের শব্দ শুনছি, টিইঁ-ইঁ আর ঠাই ঠাই করে গুলী চলছে, সেল বার্ষ্ট করছে। সেই ধোঁয়া আর ছাই-এর মধ্যে দিয়েও দেখলাম আমাদের ব্যাটেলিয়ান এগিয়ে চলেছে। আমিও ট্রেঞ্চের বাইরে যাব বলে যেই মাথা তুলেছি আর অমনি একটা সেল বার্ষ্ট করল একবারে আমার পায়ের কাছে লাফ দিয়ে সরে যেতে গিয়েও পারলাম না। জ্ঞান হ'ল রেডক্রশের গাড়ির মধ্যে। ও! সে কি যন্ত্রণা আর কত রক্ত। আবার অজ্ঞান হয়ে গেলাম। ফের চোখ মেলতে দেখলাম, মুখের কাছে আলো আর আলোর পাশে ও. সি. ব্রিগেডিয়ার রণজিৎ সোঁধির মুখ। মিলিটারির ব্যাপার ত জান! যেমন-তেমন করে দাঁড় করিয়ে দেবার চেষ্টা করে রুগীকে। কিন্তু আমার বেলায় তা হতে দেয় নি সোঁধি। কি যত্ন নিয়ে চিকিৎসা করিয়েছে। একজনের ওপর পক্ষপাতিত্ব দেখানটা যদিও আর্মির রুল নয় তবু ও রোজ একটা সময় করে আমার কাছে এসেছে, বসে থেকেছে বেডের পাশের টুলটায়। মাথায় কপালে ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিয়েছে। আশ্বাস দিয়েছে, বলেছে, ভাল হয়ে যাবে। একবার ও নিজে কি রকম জখম হয়েছিল তার গল্প করেছে। আমি শুধু জিজ্ঞেস করলাম, তুমি আমায় চিনলে কি করে? বলেছিল, মন্নুমার মুখের সঙ্গে তোমার মুখের খুব মিল আছে যে, ঠিক এমনি আমারও আমার বোনের সঙ্গে ছিল। আর জান, তারও নাম ছিল মন্নুমা।

আমি চমকে উঠে সন্তুর হাতটা চেপে ধরলাম, কিন্তু আমাকে থামিয়ে দিয়ে ও বলেই চলল। খেয়ে-দেয়ে ওর পাশেই শুয়েছি, এখন রাত দশটা—ঘরটা অন্ধকার। সারা দুপুর ঘুমিয়ে এখন ভাল আছে সন্তু। আমাকে থামিয়ে দিয়ে আবার বলে চলেছে ও. আর আমার কানে বাজছে, আমারও বোন ছিল। তারও নাম ছিল মন্নুমা।

মন্নুমা আমার বড় বোন। আমার মা আমাকে জন্ম দিয়ে মারা গেল। বাবা তখন লড়াইতে। তখন ইংরেজ দেশ ছেড়ে যায় নি। আমরা দেশে থাকি। পাঞ্জাবের একটা গণ্ডগ্রাম। বাড়ীতে বুড়ী দাদি, আমি আর মন্নুমা। আমার ছোট্ট দিদি, কিন্তু আমাকে আদর করে ডাকত, "পরাজী"! মানে দাদা বলে। দাদি চোখে দেখত না। তার সেবা করা, আমাকে নাওয়ান-খাওয়ান সব সে করত। তখন আমি একটু বড় হয়েছি, দেখতাম মন্নুমা, ঢিলে-ঢালা সালোয়ার কামিজ-পরা, মাথায় ওড়নি, কুয়া থেকে গাগরী করে জল আনছে। মাথায় পর পর দুটো গাগরী বসান। গরমে তার মুখটা লাল হয়ে উঠেছে। আবার দেখতাম, মাঠ থেকে ভঁয়েস নিয়ে বাড়ী ফিরছে। দাদির খাটিয়া বিছিয়ে দিয়েছে আঙ্গনে, জল ঢেলে স্নান করিয়ে দিচ্ছে তাকে। চৌকায় বসে রুটি সেঁকছে, মটর পাকাচ্ছে। পিতাজী সামান্য টাকা পাঠাতেন, লেখাপড়া জানতেন না বিশেষ, মাত্র হাবিলদার ছিলেন। আর আমার ছিল নানা রকম খাবার

বায়না। হালুয়া খেতে ভীষণ ভালবাসতাম। খালি বলতাম, মনমা! কড়া প্রসাদ বানাও, ভোগ চড়াও গুরু নানককে। আমাদের ঝোপড়িতে মাত্র দুটো ঘর। তার একটায় আছে চারটে খাটিয়া। খাটিয়াগুলো সরু সরু, তার একটা তোলা থাকে, পিতাজী এলে পাতা হয়। আর আছে শিকায় নতুন মাটির গাগরী ঝুলান, তার মধ্যে থাকে মনমার টাকা, পুঁতির গয়না, কাঁচের চুড়ি এই সব। গাগরীর গায় আবার কড়ির মালা ঝোলান। মাটির দেয়ালে টাঙ্গান দড়ি, তাতে আছে আমাদের পোশাক। আর কুলুঙ্গিতে আছে গুরু নানকের তসবীর। ওখানে দিয়া দেয়, ভোগ দেয় মনমা, কি যেন সব বলে বিড় বিড় করে। আমি বলি, কি বলছ! বলে, বলছি—তুই শান্ত হ, ভাল ক'রে লিখাপড়ি শেখ, তারপর পল্টনে যাবি, মস্ত বড় অফসর হবি। কাঁধে অনেকগুলো তারা লাগাবি, ঝক্ ঝক্ করবে সেগুলো আলো লেগে। কর্ণেল হবি তুই। পড়শীরা বলবে, মনমা, আরে মনমা, ঐ যে মনজিৎ, যে কর্ণেল সাহেব হয়েছে, তার বহেন। আমার তখন কত যে আনন্দ হবে, ছাতিটা দশ হাত হয়ে যাবে। মিলটারি অফসর হবে আমার পরাজী। কত লোগ সেলাম বাগাবে, পুরো একটা রেজিমেন্টের মালিক বনবে ভাইজী আমার। ওর মুখটা কেমন যেন হয়ে যেত, চোখ দুটো চক্ চক্ করত আনন্দে, তারপর আমায় কাছে টেনে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমো দিত।

আর একটু বড় হতে গাঁয়ের মাদ্রাসায় ভর্তি দিল মনমা। একা সমস্ত কাজ করে। আমাকে কোন কাজ করতে দেয় না, বলে, না, এ সব তোমার জন্য নয়। ভঁয়েসের দুধ থেকে মাঠা তোলে, ঘি বানায়, আমার জন্য রেখে বাকি সব বেচে দেয়। কাণ্ডা দিয়ে তাও বেচে, আমি রাগ করলে বলে, দাঁড়া না, এমনি দিন কি থাকবে নাকি, তুই একবার অফসর হলে আমিও নোকরাণী রেখে পায়ের দাবাব। দাদির অসুখ বাড়ে, সারা রাত জেগে তার বুকে মালিশ লাগায় মনমা। আমার পড়ার ক্ষতি হবে বলে আমাকে ওপাশের ছোট ঘরটায় বিস্তারা বিছিয়ে দেয়। বলে, তুই শুধু পড়ালিখা কর, আমি আর কিছু চাই না।

পিতাজীর খত আসে না—ব্যস্ত হয় মনমা, আমাকে লুকিয়ে বার বার পিওন ভাইয়াকে জিজ্ঞেস করে বলে, দেখ না ভাইয়া, মনমা কৌর-এর কোন খত আছে কি না! আমার জ্ঞান না হতে ওর সাদী হয়ে গিয়েছিল। আবার ওর আদমী মারাও গিয়েছিল। আমাদের দেশে ক্ষেতের গম নিয়ে বা সীমানা নিয়ে এক রকম মারপিট হামেশাই হয়। চাকু চলে যায়। এমনি এক মারপিটে প্রাণ দিয়েছিল আমার বনুইই। মনমা তখন খুব ছোট। চিনতও না বোধ হয় নিজের আদমীকে। অত ছোটতেই বেচারার সব শখ সাধ শেষ হয়ে গেল। তাই আর শ্বশুরালে যায় নি। তাদেরও অবস্থা ভাল ছিল না, সেধে নিয়েও যায় নি। এদিকে মা মারা গেল তাই আমার জন্য আটকা রইল। আমিই হলাম ওর সব, ওর ভাই হলেও ও আমাকে মায়ের মতন দিত, পেয়ার দিত। জান দিয়ে আগলাত আমায়। কোন বাজে ছেলের সঙ্গে মিশতে দিত না। ময়লা পোশাক পরতে দিত না। কোন দিন আমি ছেঁড়া কামিজ পরি নি। আর যখন যা দরকার হয়েছে মনমার কাছে চেয়েছি, কে জানে কেমন করে ও তা জোগাড় করেছে। বড় হতে আমার এক-মাত্র শখ ছিল তালাওতে মছলি মারা। এটাতে মানা করত না মনমা। বলত জোয়ান লড়কা, কিছু কিছু ত শখ থাকবে। নিজেই আমার ছিপ চার সব গুছিয়ে দিত। তারপর মাছ ধরে আনলে,সে যেমনই মাছ হোক, ছোট হোক, বড় হোক, সে যে কি খুশী হ'ত। লাফাত, গানা গাইত, তারপর মছলি বানিয়ে রসুইতে ভাজতে বসত, আমাকে ডাকত, এস, গরম গরম মছলি ভাজি খাবে এস।

তারপর আমি হাইস্কুলে ভর্তি হলাম। কোথা থেকে মনমা টাকা জোগাড় করল জানি না। পিতাজীকে আমি আর দেখি নি। সরকার থেকে তাঁর কাপড় জামা ফেরত দিয়েছিল। মাসে মাসে সামান্য পেনশন আসত। কি আসত তা আমি জানি না। আমার কোন অভাব ছিল না। সব মনমা পুরো করত। কিন্তু দাদি কাঁদত, পিতাজীর কথা জিজ্ঞেস করত। মনমা তাকে বলত, অনেক দূরে আছে, অনেক দূর দেশে গেছে পিতাজী লড়াই করতে, কি করে আসবে সেখান থেকে। খত ত আসছে, রুপেয়া ত পাঠাচ্ছে, জঙ্গী সেপাহীর মা হয়ে কাঁদছ তুমি? এত নরম কলিজা তোমার? আমার মনজিৎ লড়াইতে গেলে কিন্তু আমি কাঁদব না, ও কত বড় হবে, কত ভারী অফসর বনবে, ওর লস্কররা ওকে সালাম বাগাবে। আর্দালি থাকবে দুটো, ওর সব কাম কাজ করবে। পোশাক পহনাবে, জুতো বুরুষ করবে, বিস্তারা লাগাবে। আমার ভাইজী যে কিছুই পারে না। তবে হ্যাঁ, লিখাপড়ি শিখছে ত আর কি করবে? আমিও দাদির মত অনেক দিন পর্য্যন্ত জানতাম যে পিতাজী অনেক দূর দেশে গেছে লড়াইতে। কিন্তু ইমতিহানের আগে রাত জেগে পড়তে বসলে শুনতাম, মুখে ঢাকা দিয়ে একটানা সুরে কেঁদে চলেছে মনমা। আমি থাকতে পারতাম না, গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরতাম, ওর কপালে চুমো দিতাম। বলতাম, মনমা, কেঁদো না, কেন কাঁদছ! কি হয়েছে তোমার, কিসের দুঃখ তোমার? বল, আমায় বল? বলত না, তবে আর কাঁদতও

না, চোখ মুছে ধীরে ধীরে বলত, যাও ভাইয়া, পড়হাই কর, কাল তোমার ইম্‌তিহান আছে যে। আমার ইম্‌তিহান সুরু হলে আমাকে তাগদদার খানা খাওয়াত, গরম জওয়ারের রুটি সেঁকে মালাই দিয়ে খাওয়াত, বলত, খাও, দিমাগ সাফ্ হবে মালাই খেলে। কাঁচা মুড়ি আর পেঁয়াজ কেটে কেটে দিত দইয়ের মধ্যে, বলত, ফুলকার সঙ্গে খাও, তন্দুরুস্ত ভাল থাকবে। কিন্তু ও যে কি খেত দেখি নি, শুধু দেখতাম মুখটা ওর সরু হয়ে গেছে, চোখদুটো বড় হয়ে গেছে, বলতাম, রাত-দিন কেন এত কাজ কর মনমা! কেন এত খাট! বলত, এ আর কি, আমি ত আর লিখাপড়ি করি না, ওতে ত আরও বেশী মেহ্‌নত। অত বড় বড় কিতাব মুখস্ত করে দিমাগে রাখা কি সোজা কথা!

সুজা সিং, পুরন্দর সিং এরা আমার বন্ধু ছিল। এক রকম আমার পড়শীও, একই হাতার মধ্যে আমাদের ঝোপড়ি। ওদের নাচ-গানে খুব শখ। গোপাষ্টমী বা বীরাষ্টমীতে, কিষণজীকে মাঠা দিয়ে চান করাতে যায় গাঁয়ের মেয়ে-পুরুষ সবাই, তারপর সুরু হয় ঢোলক সঙ্গীত আর নাচ। ভাঙ্গড়া নাচ। আমরা ভাইবোনে মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে দেখেছি, মনমা কখনও নাচত না, আমাকেও নাচতে দিত না—আমারও ভাল লাগত না। কিন্তু ওরা আমাকে ক্ষেপাত, বলত লাজুক কুড়ি, ডাকত—এ কুড়ি! এ কুড়িয়া, গাল্‌শুন্? "এই মেয়ে, একটি কথা শোন্।" ভারী খারাপ লাগত, তবু মনমার চোখের দিকে চেয়ে যাই নি কখনও।

কিন্তু ধীরে ধীরে আমার মধ্যে পরিবর্তন এল। মনের মধ্যে একটা যোশ পয়দা হয়ে গেল, আমি ভাল ছেলে, আমি লিখাপড়ি করি, আমার আর কোন কিছু করা উচিত নয়। একটা অহঙ্কার হ'ল মনে। নেহাত অপারগ হয়ে মনমা যদি আমায় কিছু করতে বলত একটু বিরক্তই হতাম। আমার ছিমছাম পোশাক আমার দোস্তদের ঈর্ষ্যা জাগাত, তাই তারা টিটকিরি কেটে বলত, হ্যাঁ! বহেন কাণ্ডা ঠোকে আর ভাইয়া কাপ্তানী দেখায়।

তাদের কথা শুনে আমি উল্টে মনমার ওপর রাগ দেখাতাম, বলতাম—ছিঃ, এই সব গন্ধা কাম, নোংরা কাজ কেন কর তুমি? আমার শরম লাগে। সকলে হাসি ওড়ায়। গম্ভীর হয়ে যেত মনমা। কথা বলত না। আমিও গ্রাহ্য করতাম না। আমাদের হাতা নয়, অন্য হাতায় একদিন খুব নেচে এলাম। ভারী উত্তেজনা আছে ঐ ভাঙ্গড়া নাচে। ও হোহ্ হোয়ে; ও হোহ্ হোয়ে, কয়ে ধীরে ধীরে বোল তুলে তারপর তাল বাড়িয়ে—দ্রুত তালে পা তুলে তুলে নাচতে নাচতে নেশা লেগে গেল। খুব ভাল লাগল নাচতে। বাড়ী এলাম নাচের ঝোঁকে শিষ দিতে দিতে।

খানা খেতে বসে যা দিল কোন রকমে ফেলে ছড়িয়ে খেয়ে উঠে গেলাম মুখ বুজে। তখনও নাচের তালে টলছে আমার মন, আমার শরীর। কানের পাশ দিয়ে ঝুলিয়ে দিয়েছি গোলাপি মুরেঠার শেষের কাপড়ের টুকরোটা, গায়ে আমার সবচেয়ে ভাল সেই ডোরাদার কামিজ, পরণে সাফ-লুঙি। মনে পড়ছে আমার সঙ্গে যারা নাচছিল সেই সব কম বয়েসী মেয়েদের হাসি, কথা, লচক, ঠমক। আমার তখন জওয়ানী এসেছে, অল্প অল্প দাড়ি-মোচ বেরিয়েছে। এইবার কলেজে যাব।

—চ্যাটার্জি!—এ সোস্তো ভাইয়া! ঘুমিয়ে পড়েছ তুমি? না, শমিন্দা হয়েও না, আজ আমি তোমায় যা কিছু বলছি সব আমার নিজের জন্য, আমার অনেক পাপ জমেছে, আমি আর তার ভার বইতে পারছি না—তোমাকে আমি সব বলব, বলে একটু হাল্কা হয়ে বহুকাল পর আজ রাতে আমি ঘুমোব। আর তুমি এই কহানী বলবে তোমার মনমাকে। সে বলেছে—আমি তার কেউ না। তুমি ভুলে যাও আমি কর্ণেল সোঁধি, ভুলে যাও আমি তোমার বস্। শুধু শুনে যাও একটা বদনসিব ভাইয়ের করুণ কহানী। কি করে সে ধীরে ধীরে খুন করেছিল নিজের মায়ের মত বহেন্‌কে। তারপর আর তার ভুল সংশোধন করারও উপায় ছিল না। তাই সারা জীবন অনুশোচনায় জ্বলে পুড়ে মরছে সে। এ সোস্তো ভাইয়া—তুমি তোমার মনমাকে বলো, আমি বেশরম নই—

আমার হাতটা ধরে নিজের মাথায় রেখে কতক্ষণ চুপ করে থেকেছে। বাইরে কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, তাঁবুটা কেঁপে উঠছে থেকে থেকে। আমাকে ঘেরা দিয়ে আলাদা একটা কোণে রেখেছে। কে জানে তখন কত রাত, আমি ওর মাথাটায় হাত বুলিয়ে ডাকি, পরাজী?

চমকে ওঠে—না না, ডেকো না, ও নামে ডেকো না। তুমি আমার ছোট্ট ভাই, তবু তোমায় আমি সব বলব, সব শোন তুমি—

আমি বলি—আজ থাক্, কাল ত আবার আসবে, তখন বাকিটা ব'লো। ক্যাম্পে যাও।

বলল—না, কাল রাতে আমার ডিউটি আছে। আর দিনের বেলা তুমিও ভুলতে পারবে না আমি কে। আর আমিও ভুলতে পারব না আমি কি। উঠে গিয়ে ছুটো মগে করে চা নিয়ে এসে আমায় দিল আর নিজেও খেতে খেতে আবার বলতে সুরু করল—

এবার আমি বলি—সন্তু, তুই ঘুমো, রাত কিন্তু অনেক হ'ল। দুর্বল শরীর তোর, তার পর এতটা গাড়িতে এসেছিস্। কথাগুলো বললাম, কিন্তু তখনও আমার ঘোর

কাটেনি—মনে হচ্ছিল পঞ্জাবের সেই ছোট্ট গ্রামের বাড়ীতে মাথায় মুরেঠা বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে মনজিৎ।

সন্ত বলে—না, আমার রাতে ঘুম আসে না, তুমি শোন, তোমাকে যে বলতে বলেছে।—

আবার আমার চোখের সামনে ভাসতে লাগল শিস দিতে দিতে চলেছে একটি পঞ্জাবী তরুণ, তার বড় বড় চোখে আর জোড়া ভুরুতে অনেক স্বপ্ন, অনেক আশা।—

কাল আমার সালগিরা। বছরে এইদিন যেমন করে হোক আমাকে নতুন জামা-কাপড় পরায় মনমা। কতদিন আগে থেকে আমাদের মধ্যে বচসা স্থরু হয়। আমি বলতাম, আমার কামিজ চাই না মনমা, বেশ মজবুত আছে, আমি ওটা পরে এখনো ছয় মাহিনা বেশ স্কুলে যেতে পারব, তুমি শুধু লুঙি আর মুরেঠা দিও। নিজের একটা সালোয়ার করাও। একেবারে ছেঁড়া। হেসে বলেছে,—কেন রে, দোস্তরা কিছু বলেছে? নোকরাণী বলেছে আমায়? আমি চোখ পাকিয়ে বলেছি, ইস, বলুক না, মেরে কাটিয়ে দেব না?

কিন্তু এবার আমার সঙ্গে কোন কথাই হয় নি মনমার। আমি কেমন অন্যমনস্ক স্বভাবের মানুষ, আমার নিজের থেকে কিছুই খেয়াল হয় না, কেউ বলে না দিলে।

সেদিন দাদি বলল—'মনজিৎ! তোরা আর হাসিস্ না, কথা বলিস্ না কেন রে! চোখে না দেখি, কানে ত শুনতে পাই! কি হ'ল তোদের?'

ধক্ করে ওঠে আমার মনটা—মনমার দিকে চেয়ে দেখি পেছন ফিরে ঘোল মইছে—সত্যিই ত, কথা বলি না ত আর মনমার সঙ্গে। বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক ত আর আগের মত নেই? কেমন একটা অপরাধবোধ জাগল, নেচেছি আমি, মনমাকে দুঃখ দিয়েছি, কিন্তু কেন তা করলাম। নাঃ, মাফি মাঙ্গব।

পেছন থেকে ওকে জড়িয়ে ধরলাম, মুখ বাড়িয়ে কপালে চুমা দিলাম। আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল।

বলল—যা, যাঃ বকাটে ছেলে কোথাকার, আসিস্ না আমার কাছে। কোন্ দিন শরাব ধরবি তুই। নাম ডোবাবি সোঁধি বংশের।

দারুণ রাগ হয়ে গেল, ছেড়ে দিলাম ওকে।

তারপরই হাই স্কুল পাশ করলাম—দেখলাম পড়শীদের কাছে খুব বড়াই করল আমার নামে—খুশী মানাতে সবাইকে নাচতে ডাকল আমাদের আঙ্গনে। আমাকেও খুশী করতে চেয়েছিল। আমি কিন্তু নিজের কোট ছাড়িনি। সবই করেছি, কিন্তু ক্রমাগত কানে বেজেছে, "বকাটে ছেলে, নাম ডোবাবি সোঁধি বংশের।"

সেবার দেশে বড় আকাল যাচ্ছিল—এক ফোঁটা বারিস নেই। ক্ষেতের ফসল জলে গেল। তরমুজ রুয়েছিল বোধ হয় মনমা। সারাদিন লু চলত, আকাশ অন্ধকার করে লু আসত। সেই গরম হাওয়া গায় লাগলে যেন গায় ফোস্কা পড়ে যেত। এই গরমের ছুটির পর কলেজ খুলবে। তখন ভর্তি হব আমি কলেজে। গাঁয় নয়, শহরে যেতে হবে আমাকে। মনমাকে বলেছি, সেই জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়েছে কত টাকা ফিস্ লাগবে আমার কলেজে ভর্তি হতে। বলেছি, একত্রিশ রুপেয়া। সবই করি; সবই হয়, কিন্তু আমাদের ভাই-বহেনের সেই সুন্দর ভাবে কেমন যেন চিড় খেয়ে গেছে। আর আগের মত নেই দিনগুলো। চেয়ে চেয়ে দেখি আমি, শুকিয়ে উঠছে মনমা। এগিয়ে যাই তাকে সাহায্য করতে, কিন্তু তার ক্লান্তমুখে হাসি ফোটাতে পারি না—আগেও কাজ করত মনমা, কিন্তু তাতে থাকত প্রাণের আনন্দ কিন্তু এখন যেন কাজ হয়েছে ওর বোঝা। অথচ ওর এ কতদিনের স্বপ্ন ছিল কলেজে পড়ব আমি। তাই স্কুলে পাশ করে কলেজে যাব। কত বড় জওয়ান হবে তার ভাইজী। কি হ'ল আমার? কিছুতেই যেন সহজ হ'তে পারি না আমি। আমার অন্যমনস্ক স্বভাবের দরুন ভাল করে কিছু তলিয়ে বুঝিও না। সারাটা সময় বই পড়ে কাটাই। গরমের চোটে দাদি পড়ে পড়ে হাঁপায়, খালি খালি হাত বাড়িয়ে লোটা নিয়ে জল খায়। আর জল ফুরিয়ে গেলে বলে, পানি দে বেটা, পানি দে। তাড়াতাড়ি জল দিই তাকে। মনমা আছে চৌকায়, রসুই পাকাচ্ছে। কোন ভাল জিনিষ আর রাঁধে না সে—কখনো শুধু হারা রং খোসাসুদ্ধ কলায়ের ডাল আর চাপাটি—আর নয় ত শুধু শাক আর চাপাটি। মাঠা দেয় এক লোটা। যদি বলি—আর কিছু নেই?

গম্ভীর হয়ে বলে—না।

যদি বলি, তোমার জন্য রাখলে না? সব চাপাটি দিয়ে দিলে?

বিরক্ত হয়ে বলে—দিক্ করিস না, যা।

সেদিন সকাল থেকে মনমা বাড়ী নেই। ঘরের গাগরীতে এক ফোঁটা জল নেই। দাদি চিল্লাচ্ছে—কি মেয়ে বাবা! খানা দেবে না, পানি দেবে না, ওঃ, তিয়াসে আমার গলা শুকোচ্ছে। আমার চমক ভাঙল, সত্যি ত কোথায় গেল মনমা? গাগরী নিতে গিয়ে দেখি তামার গাগরীটা নেই, রয়েছে মাটির ঘড়া। তাই নিয়ে কুঁয়োয় জল তুলতে গেলাম।

আমায় দেখে সরে গেল পড়শিনীরা। মাথায় গাগরী উঠিয়ে যেতে যেতে তারা কিন্তু একে অন্যকে শোনাবার ছলে

বলল—বহেন গেছে নাগরের ঘরে তাই ভাই এসেছে জল ভরতে।

আমি তেড়ে উঠে গালি দিলাম তাদের—বললাম, খবরদার, আবার বলে দেখ। ওসব নোংরা কথা আমার মনমার নামে বলবে না।—

ওরা হেসে গড়িয়ে পড়ে বলল—নোংরা কাজ করলে দোষ হয় না আর বললেই দোষ—মুখ ঘুরিয়ে বলল—সেও না বহেনের পিছু পিছু, রাতে যখন যায় তরমুজের ক্ষেতে, বেতিতে জল ঢালতে, দেখে এসো নিজের চোখে।

বুকের ভেতরটা জ্বলছে আমার। কোথায় গেল মনমা? আসুক আজ তাকেই জিজ্ঞেস করবো—কে সোঁধি বংশের নাম ডোবাচ্ছে? ছিঃ।

গরম হাওয়ার ঘূর্ণি চলেছে রুক্ষ মাঠের ওপর দিয়ে। চাওয়া যাচ্ছে না রোদের দিকে। যেন গরম আগুন-গলান সীসে রোদ হয়ে ঝরে পড়ছে আকাশ থেকে। দাদি ক্ষিদেয় চিল্লাচ্ছে—আমারও পেটের ভেতর পাক দিচ্ছে। রসুই ঘরে সব উল্টে-পাল্টে দেখে এসেছি কোথাও কিছু নেই। কেন, ঘরে কিছু রাখে নি কেন মনমা? এইভাবে বেলা দুপুর পর্য্যন্ত কোথায় বসে থেকে জব্দ করছে আমাদের? কেন বলল না কোথায় যাচ্ছে? এমন সময় খিড়কি দিয়ে দেখলাম ঐ ফুটি-ফাটা তপ্ত মাঠ বেয়ে বড় বড় দুটো তরমুজ কাঁধে নিয়ে বাড়ীর দিকে আসছে মনমা। পা যেন আর তার চলছে না। বুকটা আমার দুঃখে ভরে গেল, চোখে জল এল, ইস, কত তকলিফ ওঠাতে হচ্ছে আমার বহেনকে, আমি এত বড় ভাই কিনা জেনানার মত ঘরে বসে আছি? ইচ্ছে হ'ল ছুটে গিয়ে নিয়ে আসি তরমুজ দুটো, ওর বোঝা লাঘব করি। ইস্, মুখটা রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে। ওর মাথার রং-ওঠা বিবর্ণ দোপাট্টার মত রং ধরেছে শরীরটা। কিন্তু ঐ তরমুজ দুটোই আবার জ্বালা ধরাল আমার মনে, তার মানে ক্ষেতেই ছিল ও, কেন? কে ছিল ওর সঙ্গে?

আমাকে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলেছিল—লে পকড়, নে ধর, খুব ক্ষিদে পেয়েছে ত? চল, তরমুজ খাবি। আজ ছুটি, তোর ফিস-এর টাকা পুরো করেছি।

আমার তখন মাথায় আগুন জ্বলছে, একটুও দ্বিধা না করে গলায় শ্লেষ ঢেলে দিয়ে বললাম—কি করে পুরো করলে, সোঁধি বংশের নাম ডুবিয়ে? ও টাকা আমার চাই না।

তরমুজ দুটো ওর হাত থেকে পড়ে গেল—লাল মুখটা সাদা হয়ে গেল। ও নিজেও পড়ে গেল—উঠোনের মাঝখানে, তন্দুরি রুটি বানাবার জন্যে তন্দুর কাটা ছিল। সেখানে গড়িয়ে গেল একটা তরমুজ। ধরে তুলতে গেলাম, বোল ফুটল না, বেঁহুশ হয়ে গেছে। জড়িয়ে ধরে কপালে চুমো দিয়ে ঘরের মধ্যে খাটিয়ায় শুইয়ে দিলাম—ডাকলাম, মনমা—মেরি মনমা! সাড়া নেই। আমার রাগ ছুটে গেছে তখন, নিজেই নিজেকে চাবুক মারতে ইচ্ছে করছে তখন—মন বলছে, এ তুই কি করলি মনজিৎ, কাকে কি বললি?

ঐ ধূপ মাথায় নিয়ে হাকিম চাচাকে ডেকে আনলাম, সে এসে নাড়ি ধরে যা বলল, তাই শুনে আমার মাথা কাটা গেল।

সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। হাকিম চাচাকে পৌঁছে দিয়ে আর ঘরে ফিরিনি। ফিরতে পা ওঠেনি। বসে ছিলাম ঐ বড় পিপ্পল গাছটার নীচে। দূর থেকে একটা ডাক ভেসে এল…ভাইয়া…এ ভাইয়া…। ঠিক মনমা ডাকছে। শক্ত হয়ে বসে থাকি, নাঃ, যাব না। কিন্তু কক্ষণো ওর ডাক উপেক্ষা করিনি, পারলাম না বসে থাকতে। এক পা দু পা করে ঘরে ফিরলাম। দূর থেকে দেখেছি আলো জ্বলছে ঘরে। এসে দেখি দাদি তার দাঁতহীন মাড়ি দিয়ে পাকলে পাকলে তরমুজ খাচ্ছে। পাশে লোটা ভরা জল। কতখানি ক্ষিদে পেলে মানুষ অমনি করে খেতে পারে। এইবার আমারও পেটের ভেতরটা গুলিয়ে ওঠে। মুখের ভেতরটা কেমন যেন আঠাআঠা হয়ে রয়েছে। দেখলাম বড় বড় করে ফালা করে তরমুজ কাটা রয়েছে থালিতে আমার চার-পাইয়ের পাশে। এক লোটা জলও রয়েছে। মনমার চারপাই খালি। একটা ছিটের টুকরোয় বাঁধা একটা পুঁটলি পড়ে রয়েছে চারপাইটার ওপরে। তাতে রয়েছে অনেক-গুলো টাকা। কিন্তু মনমা! কোথায় গেল মনমা! তবে আমাকে ভাইয়া বলে ডাকল কে? রসুই ঘরে শিকলি দেওয়া। গাভীন ভঁয়েসটা ধুঁকছে। ঐ একটা ভঁয়েস এখন আমাদের। তারও জাবদানে রয়েছে খোসাসুদ্ধ তরমুজের টুকরো। কিন্তু মনমা! মনমা কোথায় গেল? বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিল যে সে। সেও ত কিছু খায় নি? আমি শুধু একটু জল বুলিয়ে দিয়েছিলাম ওর মুখে। সমস্ত গায়ের জোর দিয়ে চিৎকার দিয়ে উঠি, মনমা! মেরি মনমা…। দৌড়ে বেরিয়ে যাই, কুয়াতলায়, বাওড়ে, শেষে তরমুজের ক্ষেতের রেতিতে ডেকে ডেকে ফিরি, মনমা! মনমা! মেরি মনমা…।

ঝর ঝর করে চোখ দিয়ে জল পড়ে, অত বড় অফিসর কর্ণেল সোঁধির—আমার হাতটা চেপে ধরে বলে—বোলো তুম সোস্তো ভাইয়া! বল তুমি? কোথায় গেল আমার মনমা! আমি জানি সে মরেনি, একা হ'লে মরত, কিন্তু সে একা ছিল না। বাচ্চা তার জানের চেয়ে পেয়ারা। বল তুমি! সেই নাম শুনলে আমি পাগল হয়ে যাব না?

তোমাদের ভাই-বহেনের পেয়ার দেখে আমার মন্মাকে মনে পড়বে না? তোমরা ভিন জাত, কিন্তু তোমার মন্মাকেও যে আমার মন্মার মত দেখতে, তার স্বভাবও যে তার মত, পেয়ার করব না তাকে? তোমার মন্মা আমাকে তবু বলবে —বেশরম! এত বড় গালি দেবে আমার? চুপ হয়ে যায়। তারপর আবার আক্ষেপের সঙ্গে মাথাটা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলে, কি হ'ল আমার কর্ণেল হয়ে? ওঃ, যেদিন আমি কর্ণেল হলাম সেদিন সারারাত আমি কেঁদেছি—কি হবে আমার অফসর হয়ে? লিখাপড়ি শিখে আমি কি করলাম? ভাব ত কত মূল্যে আমি বড় হলাম? একটা মানুষ দিনরাত পরিশ্রম করে, পাসিনা বহিয়ে, ইজ্জত বেচে, শেষে বাড়ী ছেড়ে চলে গিয়ে আমাকে অফ্‌সর বানাল। ওঃ, চাই না, চাই না আমি এই র‍্যাঙ্ক, এই হাজার রূপেয়া মাইনে, এই সুখ, এই আরাম, এত ইজ্জত, সম্মান। আমার কাঁটা ফোটে, কাঁটা। নিয়ে নিক সব, ফিরে দিক আমার সেই গরীবের ঝোপড়ি, আর সেই মমতাময়ী মন্মাকে! যে আমাকে ইজ্জত দিল, তাকে আমি বেইজ্জত করলাম। যে আমার জ্বরে, বোখারে, মুখের সামনে খানা ধরল, সেবা করল, তাকে আমি অসম্মান করলাম—ওঃ বল! সোন্তো ভাইয়া বল? কোথায় আমার সান্ত্বনা? কিন্তু সত্যি আমি তা করিনি, আমি তাকে ভায়ের পেয়ার দিয়েছিলাম! কিন্তু আর কোন দিন তার সামনে যেতে পারব না। যাবার হিম্মত নেই আমার।...ও হো হো! সোন্তো ভাইয়া!—বলে হাতটা জড়িয়ে ধরল আমার।

—আমি আর থাকতে পারি না, চোখের জল মুছতে মুছতে বলি—তুই আর বলিস্ না সন্তু। থাক, আর বলিস্ না।

ওপাশের খাট থেকে হঠাৎ শুনি—

—আহা বেচারা!

চমকে উঠি আমরা দুজনেই। কখন নিঃসাড়ে শুয়েছেন ওখানে মোটে টের পাইনি আমরা। লজ্জাও পায় সন্তু, বাপের কাছে ও এতটা খোলাখুলি নয়।

—আমি বলি—শোও নি তুমি?

উনি কত যেন অসহায়; বলেন—কি করব, মশারী যে ফেলে দিয়ে আসনি তুমি? আবারও বলেন আক্ষেপ করে—আমারই ভুল হয়েছিল, তখন হাসাহাসি না করে যদি ওকে বলে দিতাম তুমি আমার কে, তবে এতটা গড়াত না। তাই ত তোমার নাম দিয়ে চিঠি লিখেছিলাম—কি লিখেছে ও?

রেগে বলি—তুমি আমাকে একটিবার না জিজ্ঞেস করে কি বলে আমার নাম দিয়ে চিঠি দিলে?—ঝেড়ে উঠে বসি খাটের ওপর।—তাই ত বলি হঠাৎ এতকাল পর তার চিঠি কেন?

আমার ঝাঁঝাল প্রশ্নের উত্তর দেন আস্তে আস্তে, থেমে থেমে,—আরে সুরেন্দ্রনাথ কোশের পর কোশ ঘোড়া ছুটিয়েছিল তার বড়দিদিকে ফিরিয়ে আনতে, আর আমি ত মন্মা দিদির হয়ে শুধু একখানা চিঠিই লিখেছি ওকে ফিরিয়ে আনতে—

ঘর অন্ধকার থাকলেও বুঝতে পারছি পা নাচাচ্ছেন। একটু চুপ করে থেকে ফের বলেন—আমি দ্বিতীয় সংস্করণ কিনা?

এত কাণ্ডের পরও সন্তু আর আমি দুজনেই কিন্তু হেসে উঠি।

ছায়াপথ

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

॥ সতেরো ॥

নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগেই রামকিঙ্কর পার্কে উপস্থিত হ'ল।

পার্ক সর্বত্রই এক রকম:

বেঞ্চের উপর অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধের আলাপ-আলোচনা। ঝিয়ের সঙ্গে আসা ছোট শিশুদের খেলা। পরীক্ষার পড়ায় ব্যস্ত ছাত্রদের দ্রুতবেগে পরিক্রমণ। চানাচুর-বাদাম-কাবলীমটরওয়ালাদের ঘোরাফেরা। কিছু লোক ঘাসের উপর ক্লান্তদেহে শুয়ে। নিশ্চিন্তে নয়, মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ স্পষ্ট। এই ভিড়ের মধ্যেই কয়েকটি ঠাকুর-চাকর জাতীয় লোক তাসে বসেছে।

কিছু দূরে একটা নিরিবিলি কোণ দেখে রামকিঙ্কর একটুকরো ঘাসের জমির দিকে এগিয়ে চলল।

দৃষ্টি তার ফটকের দিকে।

অল্প কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পরে দেখা গেল ঝি আসছে। বৌরাণীর খাস ঝি। বড়লোকের অন্দরের খাস-ঝিয়েরা সব সময় ফিটফাটই থাকে। কিন্তু আজ যেন একটু বেশি ফিটফাট বোধ হ'ল। কেশে এবং বেশেও।

তারও চোখ ঘুরছে, চারিদিকের লোকগুলোর উপর। সে রামকিঙ্করকে খুঁজছে।

আরও কাছে আসতে দুজনে চোখে চোখ পড়ল।

সারদা ফিক করে হেসে তার কাছে এসে বসল।

—কতক্ষণ এসেছেন?

—আধ ঘণ্টা হবে।

—আমিও একটু আগেই আসতে পারতাম। বেরুবার মুখে একটু কাজে আটকে গেলাম।

হেসে বললে, কোথাও বেরুবার মুখে কেউ কিছু ফরমাস করলে ভারী বিরক্ত লাগে।

তারপরে কি কাজ, কোথায় কাজ, কার কাজ, সারদা আপন মনে এক গাদা বকে যেতে লাগল।

বকুনি থামলে রামকিঙ্কর বললে, কাল যে কথা জিগ্যেস করেছিলাম, তার জবাব দাও।

—কি কথা জিগ্যেস করেছিলেন?

—বৌরাণীর কথা।

ঝি গম্ভীর ভাবে কি যেন ভাবতে লাগল। তারপর বলল, আপনার কি মনে হয়?

—আমার কিছুই মনে হয় না।

—তা হ'লে ব্যাপার কিছু নয়।

— আর আমার যদি কিছু মনে হয়?

এবারে ঝি ফিক করে হেসে ফেললে। কৌতুকে তার চোখের তারা নেচে উঠল।

বললে, তা হ'লে বলব একেবারে মিথ্যে মনে করেন নি।

এ সন্দেহ রামকিঙ্করের মনে ছিল। সুনিশ্চিত না হলেও, কোন রোগী-ডাক্তারের মধ্যে এত ঘন ঘন পত্র-বিনিময় সন্দেহজনক। একদিন বৌরাণীর দুঃখে বিগলিত হয়ে সে তাকে যথাসাধ্য সাহায্য করার সংকল্প মনে মনে গ্রহণ করেছিল।

কিন্তু এখন একটু দমে গেল।

সন্দেহ প্রমাণ নয়। সুতরাং মনকে সে স্তোক দিয়েছিল, উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক ভাল হ'তে পারে, মন্দও হ'তে পারে। সে যখন নিশ্চয় করে জানে না, তখন সন্দেহ করা অন্যায়। সে শুধু জানে, এই বাড়ীতে অসহায় মেয়েটি বহু নির্যাতন সহ্য করছে। সকলের কাছ থেকে সহানুভূতি তার প্রাপ্য।

সারদার কথায় তার মনের জোর ভেঙে গেল। এখন তার মনে নতুন প্রশ্ন জাগল: এই ব্যাপারে দৌত্য করা তার পক্ষে উচিত এবং সম্মানজনক কি না। সে এসেছে পরীক্ষার পড়া তৈরি করবার জন্যে, মেয়েমানুষের দৌত্য করবার জন্যে নয়।

সারদা বললে, আপনাকে কিন্তু বৌরাণী খুব বিশ্বাস করেন। বলেন, একটা মানুষের মত মানুষ।

রামকিঙ্করের মনটা একটু বোধ হয় নরম হ'ল।

সারদা বলে চলল, গরীবের মেয়ে, বড় লোকের ঘরে পড়ে যা খোয়ার হচ্ছে তা চোখে দেখা যায় না। আর পারছেন না। মাঝে মাঝে বলেন, বাপের বাড়ী চলে যাব। কিছু লেখাপড়া ত শিখেছি, মাষ্টারি করে খাব। আর বড় লোকের বাড়ীতে সুখে কাজ নেই।

—তাই কেন করছেন না?

—আমরা আটকে রেখেছি।

—তা ছাড়া বড় লোকের বাড়ীর আরাম-বিলাসের লোভও ত আছে।

—তাও আছে বই কি। মাষ্টারি করে খাওয়ারও ত কষ্ট আছে। তাও বোঝাই। তা ছাড়া এ বাড়ীর এই দস্তুর। গিন্নীমার কথা আলাদা। তাঁর স্বামীর নেশা-ভাঙ ছিল না। তা নইলে সবই এই রকম। গিন্নীমার শাশুড়ী দু'বার আত্মহত্যে করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু কেউ বাড়ী থেকে চলে যাবার কথা ভাবেন নি। বলুন, বটে কি না।

রামকিঙ্কর বললে, তাঁদের যাবার উপায় ছিল না।

—কেন?

—কারও পেটে ত বিদ্যে ছিল না। ভদ্রভাবে খেটে খাবার ক্ষ্যামতা ছিল না।

—তা বটে। কিন্তু মেয়েদের রোজগারের পথ ত ওই একটাই নয়। আমরাও ত গেরস্ত ঘরের মেয়ে। সোয়ামীর অত্যেচারেই ঘর ছেড়েছি। পেট ত চালাচ্ছি।

সারদা হাসলে।

তারপর বললে, সোয়ামী থাকতেও আজকাল নাকি মেয়েদের আবার বিয়ে হয়?

—জানি না।

—শুনেছি হয়। আসল কথা কি জানেন, ডাক্তার-বাবুর সঙ্গে বৌরাণীর বিয়ের আগেই ভাব ছিল। দুজনে বিয়ের কথাও হয়েছিল।

—তা হ'ল না কেন?

—বাবা-মা বড়লোক জামাই-এর লোভ ছাড়তে পারলে না বোধ হয়।

হঠাৎ রামকিঙ্কর জিগ্যেস করলে, জামাই কি শ্বশুর-বাড়ী যান?

—পাগল নাকি? এরা কি গরীবকে মানুষ বলে মনে করে?

—তাঁরাও ত আসেন না?

—না। গিন্নীমা সেটা পছন্দ করেন না।

দু'টি পরিবারের অতি নিকট বৈবাহিক সম্পর্কের মানেটা এতক্ষণে রামকিঙ্কর উপলব্ধি করলে। স্বামী বর্তমানে মেয়েদের দ্বিতীয় বার বিবাহ হয় কি না রাম-কিঙ্কর জানে না। কিন্তু এরকম বৈবাহিক সম্পর্ক তার মতে না থাকাই বাঞ্ছনীয় বলে বোধ হ'ল।

সারদাকে রামকিঙ্করের চমৎকার লাগল।

শুধু চমৎকার নয়, আশ্চর্য!

এই শ্রেণীর স্ত্রীলোক তার একেবারে অপরিচিত নয়। গ্রামে এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকের অভাব নেই। তারা দাসীবৃত্তি করে না অবশ্য। কলহও খুব করতে পারে। কিন্তু এমন চমৎকার কথা বলতে পারে না। অঙ্গসজ্জার পারিপাট্যেও এত নিপুণ নয়।

একদিন রামকিঙ্কর প্রশ্নই করে বসল: সারদা, তুমি লেখাপড়া জান?

প্রশ্ন শুনে সারদা ফিক করে হেসে ফেললে: কেন, কোথাও মাষ্টারি খালি আছে নাকি?

—খালি থাকলে করতে পার?

—তেমন তেমন ছাত্র পেলে পারি বই কি?

—কেমন কেমন ছাত্র পেলে পার?

—এই আপনার মত গোবেচারী ছাত্র পেলে চেষ্টা করতে পারি।

বলেই ফিক করে হেসে পালিয়ে গেল।

তার হাসি, তার পালাবার লীলায়িত ভঙ্গি রাম-কিঙ্করের সর্বদেহে একটা শিহরণ জাগিয়ে গেল। সে আবিষ্টের মত স্তব্ধ ভাবে বসে রইল।

ফিরে এসে সারদা বললে, যে কথা বলতে এসেছিলাম তাই ভুলে গেলাম।

—কি কথা?

—আজ সন্ধ্যেবেলায় বৌরাণী আপনাকে তলব করেছেন।

—কি ব্যাপার?

—তা আমি কি করে জানব? আমি দাসী-বাঁদী মানুষ, আমাকে কি তিনি সব কথা বলেন?

রামকিঙ্কর হেসে বললে, তোমাকে বলতে হয় না। তুমি যা মেয়ে, মানুষ হাঁ করলে তার পেটের কথা টের পাও।

—পাই?

রামকিঙ্করের প্রশংসাবাক্যে সারদা মনে মনে খুব খুশী হ'ল. তার চোখ এবং ঠোঁটের কাঁপন দেখেই বোঝা গেল।

ভ্রূভঙ্গি করে বললে, আপনি আজ আমার পিছনে লাগলেন কেন বলুন ত?

—কই লাগলাম?

—তখন জিগ্যেস করলেন, লেখাপড়া জানি কি না। কেন জিগ্যেস করলেন?

রামকিঙ্কর হাসলে: কারণ কিছুই নয়। কৌতূহল মাত্র।

—কৌতূহলটা কিসের?

—তুমি এমন চমৎকার কথা বল যে, মনে হয় তুমি লেখাপড়া জান।

সারদা আরও খুশী হ'ল: আহা!

বলে বেরিয়ে চলে গেল।

রামকিঙ্কর ভাবতে বসল। বৌরাণীর সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ সংযোগ কখনও হয় নি। একদিন সে বৌরাণীর ঘরে গিয়েছিল, কিন্তু তা বৌরাণীর আহ্বানে নয়। হয় গিন্নীমার আহ্বানে নয়ত অন্য কারও। বৌরাণীর সঙ্গে তার সংযোগ পরোক্ষ ভাবে, সারদার মাধ্যমে। উভয়েই উভয়কে জানে এইমাত্র।

সেই বৌরাণী হঠাৎ তাকে সরাসরি ডেকে পাঠালেন কেন? কোন্ বিশেষ প্রয়োজন আছে, যা তিনি সারদাকেও জানতে দিতে চান না? সে ত আরও বিপজ্জনক। এখন যা হচ্ছে, আড়ালে আড়ালে। গিন্নীমার সদা-সতর্ক চোখে একবার পড়ে গেলে তার পরকাল ঝরঝরে হয়ে যাবে।

রামকিঙ্কর খুব চিন্তিত হ'ল।

কি করবে, কি করা উচিত ভাবছে, এমন সময় বিকালের দিকে দেখলে. বৌরাণী গাড়ি করে বেরিয়ে গেল।

কে জানে কোথায় গেল। সিনেমা-থিয়েটারে মাঝে মাঝে যায়। সঙ্গে সারদা থাকে।

আজও সঙ্গে সারদা। রামকিঙ্করের দিকে চেয়ে মুচকি হেসে কি যেন একটা ইসারাও করে গেল। বুঝতে পারলে না।

মোট কথা, থিয়েটার-সিনেমাই ওদের গন্তব্যস্থল হ'লে সন্ধ্যার মুখে ফেরা সম্ভব হবে না। তার মানে রামকিঙ্করেরও বৌরাণীর কাছে যাবার প্রয়োজন হবে না। আজকের মত ফাঁড়া কাটল। আর যদি তা না হয়, যদি কাছাকাছি কোথাও গিয়ে থাকে এবং সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসে তা হলেই মুশ্কিল।

এ অবস্থায় সরে পড়াই শ্রেয়।

কিন্তু যাবেই বা কোথায়? রামকিঙ্কর শার্টটা গায়ে চড়িয়ে পার্কে গিয়ে বসল। সেই যেখানে আর একদিন বসেছিল। নিরিবিলি এক কোণে ঘাসের উপর। সারদা এসেছিল খানিক পরে। দু'জনে কিছুক্ষণ গল্প করেছিল।

আজ সারদা আসবে না?

কি করে আসবে? আজ আসবার কথা ত নেই। তা ছাড়া সে গেছে বৌরাণীর সঙ্গে। সিনেমা-থিয়েটারেই হোক অথবা অন্য কোথাও হোক। আজ তার আসবার প্রশ্নই ওঠে না।

কিন্তু এলে ভাল হ'ত।

তার সামনে বেঞ্চের উপর সেই বুড়োর দল বসে। ওরা বোধ হয় রোজই আসে। ওই বেঞ্চটিতেই বসে। এবং মাছ-শাক তরকারির সেই একই গল্প করে। সেই একই আপশোষ: দিনকাল ভারী বিশ্রী পড়েছে। খাওয়ার সুখ একেবারেই গেছে!

তার সঙ্গে কার বাড়ীতে কি রান্না হয়েছিল তার বিবরণ। বিবরণ শুনে মনে হয় না, দিন-কাল বিশ্রী পড়েছে, খাওয়ার সুখ গেছে।

তার পরেই বাতের গল্প। সকলেই বাতের রোগী। কারও হাঁটুতে, কারও পায়ের আঙুলে, কারও বা

হাতে। কিছুতে সারছে না। ঔষধে না, ইনজেকশনেও না। খাওয়ার কত রকমফের করা গেল, তাতেও না।

তার পরেই আবার খাওয়ার গল্প আরম্ভ হ'ল। ওদের মন যত গোলকধাঁধার মধ্যেই ঘোরাফেরা করুক না, ঘুরেফিরে সেই খাওয়ার প্রসঙ্গেই ফিরে আসছে। শেষ বয়সে সমস্ত ইন্দ্রিয় বোধ হয় জিহ্বায় আশ্রয় গ্রহণ করে।

ওদের কথা রামকিঙ্কর মনোযোগ এবং কৌতুকের সঙ্গে শুনছিল। হঠাৎ মনে হ'ল, দূরে একটি মেয়ে হন হন করে আসছিল, সে মেয়েটি সারদা না?

সারদাই বটে।

ফিক করে হেসে সারদা তার কাছে এসে বসল, জিজ্ঞাসা করলে, এখানে কি করছেন?

—তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি।

—আমার জন্যে? সারদা খিল খিল করে হেসে উঠল—আমার ত আসবার কথা ছিল না।

রামকিঙ্কর হেসে বললে, ছিল নিশ্চয়। হয়ত তুমিও জানতে না, আমিও জানতাম না। নইলে তুমি এলে কেন?

—দৈবাৎ এসে পড়েছি।

– দৈবাৎ কিছু ঘটে না।

—বাধা দিয়ে সারদা বললে, ঘটে। শুনুন আমার কথা। বৌরাণীর সঙ্গে গেলাম তাঁর বাপের বাড়ী।

—বাপের বাড়ী? সিনেমা-থিয়েটারে নয়?

—না। সেখানে তিনি বললেন, আমার একটু দেরি হবে সারদা। গাড়ি দাঁড়িয়ে থাক। তোর যদি কোন কাজ থাকে, সেরে আসতে পারিস্।

রামকিঙ্কর ভ্রূ কুঁচকে বললে, তাই কাজ সারবার জন্যে এই পার্কে এলে?

লজ্জিত হাস্যে সারদা বললে, আমি কি জানতাম, আপনি এখানে বসে আছেন?

—জানলে আসতে না?

—না।

সারদা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসতে লাগল।

রামকিঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, বৌরাণীর ফিরতে তা হ'লে দেরি হবে?

—তাই ত বললেন।

—সন্ধ্যের পর আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তা হ'লে আর যাওয়ার দরকার হবে না?

—না। তিনি না থাকলে কার সঙ্গে দেখা করতে যাবেন?

—তাই বলছিলাম।

সারদা বললে, ক'দিন থেকে বৌরাণী কি রকম যেন অন্যমনস্ক। সব কথা সব সময় খেয়াল থাকে না। আপনাকে আসতে বলেছিলেন। নিশ্চয় কোন দরকার ছিল। তার পরে ভুলে আর একটা দরকারে বেরিয়ে পড়েছেন।

—এমন ত হতেই পারে।

—পারে, যদি মনে চিন্তা থাকে। বৌরাণী কি যেন একটা কথা সর্বক্ষণ ভাবছেন।

—কি কথা?

—তা জানি না। বাপের বাড়ী গিয়ে পড়ার কথা তুললেন। বলছেন, বি. এ. পরীক্ষা দিলে কেমন হয়?

—ওঁর বাপ-মায়ের কি মত?

—বাপ এখনও ফেরেন নি। তাঁর জন্যেই বৌরাণী অপেক্ষা করছেন। মায়ের মত নেই, দাদার আছে।

রামকিঙ্কর স্তব্ধ হয়ে গেল। বৌরাণীর মনে কি কথা আন্দোলিত হচ্ছে তার যেন একটা আভাস পাওয়া গেল। খাঁচার পাখীর মনে আকাশের জন্যে ব্যাকুলতা জেগেছে।

সারদাও ভাবছিল। বললে, আচ্ছা, এ কি পাগলামি বলুন ত?

—কোনটা?

—এই বি. এ. পরীক্ষাটা? তোমাকে কি চাকরি করতে হবে?

রামকিঙ্কর ভাবছিল। অন্যমনস্ক ভাবে জবাব দিলে, তাতে দোষ কি?

—দোষ কি? সারদা খিল খিল করে হেসে উঠল। কি দুঃখে চাকরি করবেন শুনি?

রামকিঙ্কর আস্তে আস্তে বললে, কিন্তু এখানে ত উনি সুখে নেই। হয়ত ভাবছেন—

বাধা দিয়ে সারদা বললে, ভাবছেন, লেখাপড়া শিখে রোজগার করে স্বাধীন ভাবে থাকব। তাই না?

—হ্যাঁ।

—আমাকে যদি জিগ্যেস করেন বলব, তাতেও সুখে থাকা যায় না। আমি ত রোজগার করি। ভাল থাকা, ভাল খাওয়া, ভাল পরা সবই পাচ্ছি। কিন্তু সুখে নেই।

বিস্মিত ভাবে রামকিঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, কেন?

– তা জানি না। বোধ হয় উপায় নেই। জানেন না ত, মেয়েদের অনেক জ্বালা।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সারদা বললে, এইবার উঠি। অনেকক্ষণ হয়ে গেল। আপনি কি বসবেন?

—না। আমিও উঠব।

দু'জনে উঠে পড়ল।

ক্রমশঃ

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

বিশ্বভারতীর বিরুদ্ধে অপপ্রচার

গত কিছুকাল হইতে কয়েকজন অবাঙ্গালী পত্রলেখক বিশ্বভারতীর বিরুদ্ধে নানা প্রকার কুৎসা এবং হীন অপপ্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। ইঁহাদের প্রধান অভিযোগ এই যে, বিশ্বভারতীতে অবাঙ্গালী ছাত্রদের জোর করিয়া বাঙ্গলা-ভাষা গিলাইয়া দেওয়া হয়। গিলিতে বাধ্য করা হয়! ইহা যদি সত্য বলিয়া মনে করিতে হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে—অক্সফোর্ড-কেমব্রিজে ইংরেজি, বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে জার্মান, মস্কোতে রাশিয়ান, এবং অন্যান্য সভ্য দেশের সর্ব্বত্র সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই—সেই দেশের ভাষা জোর করিয়া বিদেশী ছাত্রদের গলাধঃকরণ করান হয়! ইহা লইয়া ইতিপূর্ব্বে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির বিরুদ্ধে কাহাকেও কোন অনুযোগ করিতে দেখি নাই।

বিশ্বভারতীতে বাঙ্গলার মাধ্যমে শিক্ষাদানের পদ্ধতির বিরুদ্ধে (অবাঙ্গালী) সমালোচকদের আপত্তির কারণ বোধ হয় এই যে—যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকার এই বিশ্ব-বিদ্যালয়কে কিছু আর্থিক সহায়তা দেন, অতএব ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম অবশ্যই হিন্দী (রাষ্ট্রভাষা?) হওয়া উচিত। পণ্ডিত সমালোচকের দল হয়ত মনে করেন, কেন্দ্রীয় সরকার বিশ্বভারতীকে যে আর্থিক সাহায্য দেন, তাহা তাঁহাদের কোন 'ব্যক্তিগত' তহবিল হইতে, কিংবা, একমাত্র হিন্দিভাষী রাজ্যগুলি হইতে সংগৃহীত অর্থ হইতেই বিশ্বভারতীকে সাহায্য দেওয়া হইয়া থাকে। আমরা যতদূর জানি—তাহাতে কেন্দ্রীয় সরকারের "ব্যক্তিগত" বা নিজস্ব কোন স্বতন্ত্র জমিদারী নাই এবং কেন্দ্রীয় সরকার অথবা ইউ-জি-সি যে-অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সাহায্য হিসাবে দেন, (ভিক্ষা নহে) সেই অর্থ ভারতের বিভিন্ন রাজ্য হইতেই আদায় হয়, এবং এই আদায়ের ব্যাপারে পশ্চিম বঙ্গের দেয়-অর্থ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী না হইলেও,অন্য কোন রাজ্য অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে এবং এই ভাবে আদায়ীকৃত অর্থ হইতেই বাঙ্গলাভাষী পশ্চিম বঙ্গ কেন্দ্রের নিকট হইতে প্রাপ্য অপেক্ষা, খুব কম আর্থিক সহায়তা পাইয়া থাকে। বিশ্বভারতীর বেলাতেও ইহাই ঘটে।

বিহার, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, মাদ্রাজ এবং অন্ধ্র প্রভৃতি রাজ্যে যে সকল বিশ্ববিদ্যালয় আছে, এবং এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজ্য বা প্রাদেশিক ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হইলেও কেহ কোন প্রশ্ন কখনও করেন নাই —'কেন এমন হইবে?' বিহারে বাঙ্গালী ছাত্র আছে হাজার হাজার, কিন্তু বিহার সরকার বাঙ্গালী ছাত্রদের মাতৃভাষায় শিক্ষার দাবি অগ্রাহ্য করিয়া বিহারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে হিন্দীকেই কায়েম করিয়াছেন। এ বিষয়েও আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালী ছাত্রদের কথা স্মরণ করিয়া অবাঙ্গালী কোন পণ্ডিত-সমালোচক একটি কথাও বলেন নাই, বলা প্রয়োজনও বোধ করেন নাই! কেন?

অবাঙ্গালী ছাত্রদের জবরদস্তি করিয়া কেহ বিশ্ব-ভারতীতে অধ্যয়ন করিতে বাধ্য করে নাই। যে সকল অবাঙ্গালী ছাত্রছাত্রীর অভিভাবক তাঁহাদের পুত্র-কন্যাদের এখানে প্রেরণ করেন, যেহেতু তাঁহারা বিশ্বভারতীর আদর্শ, শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু (সিলেবাস) এবং মনোরম সুস্থ পরিবেশের কারণেই, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করেন। ইহাও সত্য যে অবাঙ্গালী ছাত্র-ছাত্রীরা বাঙ্গলা শিখিতে আপত্তি অপেক্ষা আগ্রহই বেশী প্রকাশ করেন। তবে যাহারা বাঙ্গলা শিখিতে পারেন না (চাহেন না, এমন বোধহয় কেউ নাই) —তাঁহাদের জন্য ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে।

বিশ্বভারতীর সমালোচকদের আর একটি অভিযোগ: এখানে না কি সকল অধ্যাপকই 'বাঙ্গালী'। এ অভিযোগ যুক্তিসহ নহে। পশ্চিমবঙ্গের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালী অধ্যাপক (যোগ্য হইলে) নিযুক্ত করাটা মহা অপরাধ নিশ্চয়ই নহে। এমন কথা বলি না যে বিশ্বভারতীর সব কিছুই নিখুঁত এবং সমালোচনার উর্দ্ধে। কিন্তু একথা অবশ্যই বলা যায় ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে বিশ্বভারতী 'একক' এবং 'অনন্যসাধারণ'। এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ে এমন বহু কিছু শিক্ষণীয় বিষয় আছে যাহা

ভারতের অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাওয়া যায় না। গতানুগতিক ধারায় বিশ্বভারতীর কার্য্যক্রম নির্দ্ধারিত হয় না। এখানে ছাত্র-ছাত্রীরা কেবল ডিগ্রীর মোহেই যান না।—কেবল বি-এ, এম-এ প্রভৃতি ডিগ্রী অর্জ্জন ছাড়াও সুস্থ, সবল এবং প্রাণরসে পূর্ণ জীবন ও চরিত্র গঠনের আরও বহু কিছু আছে যাহার, সব না হইলেও অনেকখানি শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতীতে পাওয়া যায়—এবং এই কারণেই, ভারত ছাড়াও পৃথিবীর অন্য বহু সভ্য এবং সম্পদশালী দেশ হইতে বহু ছাত্রছাত্রীই এখানে অধ্যয়ন-মানসে নিয়মিত আসিয়া থাকেন—যাহা অন্য কোন ভারতীয় বিশ্ববিত্যালয়ের ভাগ্যে কদাচিৎ ঘটে।

বিশ্বভারতীতে কি নাই কেবল সেই লইয়া এই বিশ্ববিত্যালয়ের বৃথা সমালোচনা এবং লোকচক্ষে ইহাকে খাটো করিবার অপচেষ্টা না করিয়া—সমালোচকের দল দয়া করিয়া কয়েকদিন বিশ্বভারতীতে কাটাইয়া আসুন—তাঁহাদের একদেশদর্শী ক্ষুদ্র মনের পরিধি বৃদ্ধি পাইবে—তাঁহারা শিক্ষার ক্ষেত্রে নূতন আলোর সন্ধান পাইবেন। বিশ্বভারতীর বর্ত্তমান উপাচার্য্য এবং তাঁহার সুযোগ্য সহকর্ম্মীর দল, কি ভাবে, কি পরিমাণ গভীর নিষ্ঠা এবং কঠোর পরিশ্রমের সহিত গুরুদেবের আদর্শকে মানুষের জীবনে সার্থক প্রতিফলিত করিতে অহরহ প্রয়াস পাইতেছেন, তাহা দেখিয়া অবশ্যই শ্রদ্ধায় মাথা নিচু করিবেন।

'বিশ্বভারতী' এবং শান্তিনিকেতনে অধ্যাপক এবং ছাত্রদের মধ্যে গভীর এবং সুস্থ ব্যক্তিগত সম্পর্ক দেখিয়া সমালোচকের দল হয়ত বিস্মিত হইবেন। ছাত্রদের সহিত অধ্যাপকদের এমন মধুর সম্পর্ক বর্ত্তমানে অন্য কোন ভারতীয় বিশ্ববিত্যালয়ে বোধহয় নাই—অন্যত্র এই সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছে বিরোধের। সংবাদপত্রে প্রায়ই যে-প্রকার গুরু-শিষ্য সংগ্রাম-সংবাদ দেখা যায়, তাহাতে আমাদের কথার সত্যতা প্রমাণ করিবে। ইহার বেশী বর্ত্তমানে বলা, প্রয়োজন থাকিলেও, স্থান নাই।

মিথ্যা-অপপ্রচারের প্রতিবাদ বিশ্বভারতীর তরফ হইতে না করা—শ্রেয় বলিয়া মনে হয়। জন্তু বিশেষের অযথা চিৎকারে যদি কর্ণপাত করিতে হয়, তাহা হইলে তীর্থযাত্রীর পথ চলা হয় না। বিশ্বভারতী নিজের পথে গভীর নিষ্ঠার সহিত চলিতেছে—ইহা বোধ হয় সকলের কাম্য নহে! অন্যত্র যাহা ঘটিতেছে, সেই প্রকার অনাসৃষ্টি কাণ্ডকারখানা বিশ্বভারতীতেও ঘটুক—ইহাই অনেকের কাম্য।

শুষ্ক জমিতে শিক্ষার বীজ

বহুদিন পূর্ব্বে বাইবেলে একটি কথা পাঠ করিয়াছিলাম, আজ হঠাৎ সেই কথা মনে উদিত হইল—

A man went out to sow his seed···some fell upon a rock and as soon as it was sprung up, it withered away because it lacked moisture.

সারহীন কঠিন জমিতে বীজ বপনের এই পরিণাম ঘটিতে বাধ্য। বাঙ্গলা, তথা ভারতে বর্ত্তমানে শিক্ষার বীজ বপনের ফলও ইহাই ঘটিতে দেখা যাইতেছে। কিছুকাল পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয়ের কন্‌ভোকেশনের উদ্বোধন দিবসে আন্নামলাই বিশ্ববিত্যালয়ের উপাচার্য্য প্রখ্যাত পণ্ডিত ডঃ সি. পি. রামস্বামী আয়ার তাঁহার ভাষণে দেশের বর্ত্তমান শিক্ষানীতির বহু গলদ আমাদের চোখের সামনে তুলিয়া ধরিয়া, ঐ সব গলদ নিরাময় করিবার পথও দেখাইতে প্রয়াস করিয়াছেন।

ডঃ আয়ার বিশেষ গুরুত্ব দিয়াছেন দেশের শিক্ষিত বেকার সমস্যার উপর। ভারতের তিনটি রাজ্যে আজ স্নাতক-বেকার সমস্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী—(১) পশ্চিমবঙ্গ, (২) উত্তর প্রদেশ এবং (৩) মহারাষ্ট্র। সমগ্র ভারতে প্রতি বারোজন শিক্ষিত বেকারের মধ্যে একজন গ্রাজুয়েট। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে ইহা প্রতি নয় জনের মধ্যে একজন। ডঃ আয়ার বলিয়াছেন সমগ্র ভারতের শিক্ষিত বেকারদের শতকরা পনেরো ভাগ পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী, অন্যদিকে স্নাতক-বেকারদের শতকরা সতেরো ভাগ এই অভাগা পশ্চিমবঙ্গেই! বলা বাহুল্য, এই পরম রমণীয় চিত্রটির রঙ যতই দিন যাইতেছে ততই কৃষ্ণতর হইতেছে, এবং এই ভাবে আর কিছুকাল চলিতে থাকিলে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত বেকারদের একেবারে পূর্ণ 'কৃষ্ণত্ব' লাভ হইবে—ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়!

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের মধ্যে অতি ভয়াবহ বেকার সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে—ইহা সর্ব্বজনস্বীকৃত হইলেও এ হতভাগ্য রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার যাঁহারা কর্ণধার কিংবা মালিক, তাঁহারা এ সমস্যার সামান্য সমাধানে তৎপর কিংবা উৎসাহী বলিয়া মনে হয় না। কর্ত্তাদের যোগ্যতা-অযোগ্যতার কথা তুলিব না, কিন্তু ইহা দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইবে যে, রাজ্যের এমন একটি ভয়াবহ সমস্যার আশু সমাধান আজ আমাদের বাঁচিবার পক্ষে একান্ত এবং অবশ্য প্রয়োজন। এই প্রকট-কঠিন সত্যটাও কর্ত্তাশ্রেণীর ব্যক্তিরা বুঝিবার, স্বীকার করিবার বুদ্ধিও হারাইয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গে স্কুল, কলেজ এবং তথাকথিত বিশ্ববিত্যালয়ের সংখ্যা গত কয়েক বৎসরে বৃদ্ধি পাইয়াছে ('শিক্ষিত'-শিক্ষকের বিষম অভাব থাকা সত্ত্বেও) সত্যকথা, কিন্তু ইহাতে

কমাত্র শুভ ফললাভ এই হইয়াছে যে, পশ্চিমবঙ্গে ্ক্ষিত বেকারদের সংখ্যা প্রতি বৎসর হু হু করিয়া াড়িয়াই চলিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের এই সমস্যার কারণ ঃ

"...মুখ্যত আমাদের রক্ষণশীল মনোভাব। পঞ্জিকার হিসাবে আমরা বিংশ শতকের পাঁচটি দশক ছাড়াইয়া গিয়াছি বটে, কিন্তু মনটা আমাদের পড়িয়া আছে ঊনবিংশ শতকে, যে-যুগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ থাকিলেই একটা অন্তত মাঝারি ধরনের চাকুরি জুটিত এবং ডিগ্রী-ধারীরা সমাজে একটা "কেষ্টবিষ্টু" বলিয়া গণ্য হইত। তাহার পর কিন্তু অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাড়পত্র পাইলেই যে জীবিকানির্ব্বাহ অনায়াস-সাধ্য হয় না, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু ডিগ্রীর মোহ বাঙ্গালীর কাটে নাই; আর রোগটা সংক্রামক, কাজেই অন্যান্য রাজ্যেও এ ব্যাধি বিস্তারলাভ করিয়াছে।...নিত্য নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের দোহাই দিয়া। উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া যাইতেছে না, গ্রন্থাগার পরীক্ষাগারের অবস্থা প্রায়শ শোচনীয়, মৌলিক গবেষণার কোনও বালাই নাই বলিলেই চলে। তবুও নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উৎসাহে ভাঁটা পড়িতেছে না। সরকারী অর্থে চোখ-ঝলসানো বিরাট্ প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়া লোকের তাক লাগাইতেছে বটে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যার মান ক্রমশই নিচু হইতেছে। তাহাতে কিন্তু কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই। কেননা বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়া তকমার বাজার-দর চাকুরির ক্ষেত্রে বেশী না হইলেও বিবাহের ব্যাপারে আজও চড়া—তাহার সামাজিক মর্য্যাদা আজও অক্ষুণ্ণ আছে। অতএব তাহার চাহিদাও বেশী এবং স্নাতক তৈয়ারি করার কারখানা স্থাপনে উৎসাহও প্রচুর।"

অনগ্রসর দেশের পক্ষে উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন নাই এমন কথা মূর্খেও বলিবে না। যাঁহারা তাঁহাদের সাধনায় সিদ্ধিলাভের কারণে চিরজীবন বিদ্যাচর্চ্চায় দিন কাটাইবেন; তাঁহাদের জন্য সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা অবশ্য প্রয়োজন—কিন্তু এ ব্যবস্থা কেবলমাত্র যোগ্যজনের জন্যই। অধিকারভেদের কঠিন প্রশ্ন এখানে বিদ্যমান এবং অন্যকার শিক্ষাক্ষেত্রে ইহার যথোচিত প্রয়োগ না ঘটিলে শিক্ষিতের বেকার সমস্যার কোন সুরাহাই হইবে না। শিক্ষা সকল জনেরই চাই—কিন্তু উচ্চশিক্ষা সকলের জন্য নহে; সকলে ইহার যোগ্যও নহে। দেশের ভীষণ শিক্ষিত-বেকার সমস্যার নিরাকরণে বর্ত্তমান যুগে প্রয়োগবিদ্যার প্রয়োজন সর্ব্বাধিক বলিয়া অনেকেই মনে করিতেছেন এবং এমন মনে করাটা যুক্তিসহ। কিছুকাল হইতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পাঠক্রম-পরিধি বিস্তার করিয়া বিবিধ প্রকার প্রয়োগবিদ্যাকে বাস্তব জীবনে কাজে লাগাইবার একটা প্রয়াস দেখা যাইতেছে—কিন্তু এ প্রচেষ্টার পূর্ণ সার্থকতার পথে এখনও বহু বাধা রহিয়াছে। আজিকার এই মারাত্মক বেকার সমস্যার কার্য্যকর সমাধানের জন্য অবিলম্বে আমাদের প্রয়োজন প্রচুরসংখ্যক পলিটেকনিক ও এইশ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের, যেখানে ছাত্রেরা হাতে-কলমে কাজ শিখিয়া কল-কারখানায় কাজ করিবে। ইহাতে যেমন তাহাদের অন্ন-সমস্যা মিটিবে, তেমনি উচ্চশিক্ষালাভের নামে দেশের প্রাণশক্তির বৃথা অপচয়ও বন্ধ হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত এ জ্ঞান আমাদের না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত শিক্ষাসংস্কারের গালভরা বুলি আমরা যতই চিৎকার করিয়া বলি না কেন, প্রকৃত হিতকর কোনও কাজ হইবে না। বি-এ, এম-এ প্রভৃতি ডিগ্রীর ভূত আমাদের ঘাড়ে চাপিয়া আমাদের বাস্তবজ্ঞানকে বিনষ্ট করিয়াছে। এই বিষম প্রাণক্ষয়ী ভূত ছাড়াইবার দায়িত্ব তাঁহাদের, যাঁহারা দেশের শিক্ষানিয়ামক ও নীতি-বিধায়ক তাঁহাদের মোহনিদ্রা না টুটিলে শিক্ষা-ও-শিক্ষিতের নিস্তার নাই।

প্রসঙ্গক্রমে আর একটি কথা এখানে বলা কর্ত্তব্য। জাতির শিক্ষাকে 'জাতীয়'-সরকার আজ একটি "পাব্লিক সেক্টার" শিল্পে পরিণত করিয়াছেন! বড় বড় সরকারী মাথা—(যে-মাথার ভিতরে আছে শিক্ষার সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান এবং শিক্ষা ব্যবস্থার বিষয়ে কোন বাস্তব কার্য্যকর ধারণা ছাড়া—আর সব কিছুই!) দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে লইয়া বিরাট এক প্রহসন চালাইতেছেন। এবং এই কারণেই তথাকথিত "প্রপণ্ডিত" শিক্ষাবিদ্‌দের পাল্লায় পড়িয়া, শিক্ষার নামে কুশিক্ষা, বিদ্যার বদলে অবিদ্যারই বিস্তার সর্ব্বদিকে প্রচণ্ডভাবে চলিতেছে। শিক্ষা এবং শিক্ষা-ব্যবস্থাকে যদি সরকারী আওতা হইতে মুক্ত করিয়া প্রকৃত শিক্ষাবিদদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া না হয়—তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে বাঙ্গলা দেশ আগাছাতে ভরিয়া যাইবে এবং দেশীয় শিক্ষাক্ষেত্র, সরকার-পালিত একদল গো এবং অজ-পণ্ডিতের সুখ-বিচরণ ভূমিতে পরিণত হইবে।

হাজার হাজার পিতামাতার আবেদন

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজনৈতিক দলসমূহের নেতৃ-বর্গের প্রতি—

মাননীয় মহোদয়গণ,

বিভিন্ন শিক্ষায়তনে, যেখানে আমাদের সন্তানেরা স্বাভাবিক পড়াশোনা চালাইয়া যাইতে চায়, সেখানে একদল ছেলে গণ্ডগোল সৃষ্টি করিতেছে, ইহা অত্যন্ত মর্ম্মান্তিক। বিগত ১৯শে মার্চ হইতে নগরীর অধিকাংশ বিদ্যায়তন বন্ধ

রহিয়াছে এবং আমাদের শিক্ষাদপ্তর পুনরায় আরো কিছু-দিনের জন্য, অনাকাঙ্ক্ষিত হইলেও, বিদ্যায়তনসমূহ বন্ধ রাখার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। আমরা অভিভাবকগণ আমাদের সন্তানসন্ততির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অতিশয় চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছি। ছেলেদের একটি অংশের গুণ্ডামির ফলে সরকার যদি শিক্ষায়তনসমূহের স্বাভাবিক দৈনন্দিন কাজকর্ম চালাইয়া যাওয়ার নিমিত্ত নিরাপত্তা বিধান করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে আমাদের সন্তানসন্ততির ভবিষ্যৎ অত্যন্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে।

আমরা দাবি করি যে, এই সমস্ত বিশ্রী ঘটনার বিরুদ্ধে আমাদের সরকার অবশ্যই নিরাপত্তা বিধান করিয়া নগরীতে এইরূপ আস্থার মনোভাব ফিরাইয়া আনিবেন, যাহাতে শিক্ষায়তনসমূহের স্বাভাবিক কাজকর্ম আর কিছুতেই ব্যাহত না হয়।

সকল রাজনৈতিক দলের প্রতি আমাদের অনুরোধ, দয়া করিয়া আপনারা আমাদের সন্তানবর্গকে রেহাই দিন। দেশের শৃঙ্খলাবদ্ধ নাগরিক হিসাবে তাহারা গড়িয়া উঠুক। আমরা অবশ্যই স্মরণে রাখিব যে, বিশৃঙ্খলা সর্বাবস্থায় সর্ব-সময়ের জন্যই অকল্যাণকর। তদুপরি, এই বিশেষ সময়ে বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগ কেবল আমাদের শত্রুদের হাতই শক্তিশালী করিবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত
কলিকাতার ছাত্রছাত্রীদের মাতাপিতৃবৃন্দ

দেশের শাসক এবং তথাকথিত নেতৃবর্গের এখনও যদি সর্বপ্রকার হিতাহিত জ্ঞান সম্পূর্ণ লোপ না পাইয়া থাকে—তাহা হইলে অসহায় পিতামাতাদের উপরি উক্ত আবেদন হয়ত একেবারে বৃথা যাইবে না। তবে ভয় আছে—ক্ষেপাকে সাঁকো নাড়াইতে বারণ করার ফলে যাহা ঘটে এক্ষেত্রে তাহাই হয়ত ঘটিবে!

নব-পাকিস্তানের বীজ বপন ?

সংবাদে প্রকাশ যে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করিয়া চব্বিশ পরগণা, নদীয়া জেলা এবং অন্য কয়েকটি সীমান্ত অঞ্চলে হঠাৎ বহু সংখ্যক মুসলমান বসবাস স্থাপন করিতেছে এবং ছলে-বলে-কৌশলে ঐসব অঞ্চল হইতে হিন্দু অর্থাৎ অ-মুসলমান অধিবাসীদের পাকাপাকি ভাবে আরও পশ্চিমে ধাক্কা মারিয়া ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে। বিশ্বাস-যোগ্য সূত্রে জানা যায় যে পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু সংখ্যক প্রভাব এবং প্রতিপত্তিশালী মুসলমান পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত এলাকা হইতে হিন্দু-বিতাড়ন করিয়া মুসলমান অধিবাসী সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার কার্য্যে প্রখর উৎসাহ এবং আর্থিক মদৎ দানে অতীব তৎপরতা দেখাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানা গেল যে, এই প্রভাবশালী মুসলমানদের মধ্যে বহু অতি-ভক্ত-হঠাৎ কংগ্রেসীও আছেন। কিছু সংখ্যক (আগামী নির্ব্বাচনে ভোট-ক্ষুধাতুর) অ-মুসলমান নেতাও এই পাকচক্রের পরম পবিত্র পরিকল্পনায় সমর্থন দান করিতেছেন। এই সকল (অ-মুসলমান) দেশভক্ত, মুসলমান নেতাদের সঙ্গে এবিষয়ে একমত যে "সাম্প্রদায়িক শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সীমান্তের মুসলমানপ্রধান অঞ্চলগুলি হইতে হিন্দুদের সরাইয়া আনা উচিত এবং সেখানে হিন্দুপ্রধান অঞ্চলের মুসলমানদের বসবাসের সুযোগ দেওয়া দরকার।"

সীমান্ত জেলাগুলির কয়েকজন সংখ্যালঘু নেতা এমন এমন বিষম দাবিও তুলিয়াছেন যে, পূর্ব্ববঙ্গাগত উদ্বাস্তুরা যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে পূর্ব্ববঙ্গাগত অফিসার রাজ চলিবে না। একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী সখেদে মন্তব্য করেন, 'ভোটের লোভে কিছু কিছু প্রভাবশালী অ-মুসলমান নেতাও এই বিষম দাবি সমর্থন করিতেছেন। চব্বিশ পরগণায় কয়েকটি ক্ষেত্রে দুই দলের চাপে সরকার এই অসঙ্গত দাবি প্রায় মানিয়া লইয়াছেন, এমন খবরও পাওয়া গিয়াছে।

ইহাতে অবাক হইবার কোন কারণ নাই। পশ্চিমবঙ্গের সিংহচর্ম্মাবৃত হাজি মুখ্যমন্ত্রী আদাজল খাইয়া (রোজার সময় বাদ দিয়া) যে-ভাবে মুসলমান তোষণ এবং পোষণ আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে যদি শুনি যে চব্বিশ পরগণা, নদীয়া, এবং এ-রাজ্যের অন্যান্য কয়েকটি অঞ্চল (ইহার মধ্যে সমগ্র পূর্ব্ব কলিকাতাও পড়িতে পারে) কেবলমাত্র মুসলমানদের জন্যই বরাদ্দ হইল এবং এই সমস্ত স্থান হইতে অ-মুসলমান সকল অধিবাসীকে নব-উদ্বাস্তু হইয়া নব-দণ্ডকে প্রয়াণ করিতে হইবে সাতঘণ্টার মধ্যে—তাহা হইলেও আমরা আশ্চর্য্য না হইয়া, ইহা অতি স্বাভাবিক কার্য্য বলিয়া প্রফুল্লচিত্তে মুখ্যমন্ত্রীর গুণানুবাদ করিব কাঁসি বাজাইয়া প্রতি হিন্দুর ঘরে ঘরে।

ইহা কিসের পূর্ব্বাভাস ?

কয়েকজন রাজনৈতিক পর্য্যবেক্ষক, পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত অঞ্চল হইতে হিন্দু হটাইয়া মুসলমান বসানোর চক্রান্তে মধ্যে একটা ভীষণ পাক-'পরিকল্পনার' আভাস পাইতেছেন ইঁহাদের মতে, এই পাপ-চক্রান্তের মূল উদ্দেশ্য এ রাজ্যে সীমান্তে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি। তাঁহাদের হিসাবমত, রাজ্যের (প্রায়) ৭০ লক্ষ মুসলমান অধিবাসীর প্রায় ৪ লক্ষই পাকিস্তানের গা ঘেঁষিয়া পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত জুড়ি

আছে। পাক-অনুপ্রবেশকারীরাও ক্রমাগত ইহাদের সংখ্যা বাড়াইতেছে।

কিছুকাল পূর্ব্বে পাকিস্তানী ফৌজের অনুপ্রবেশের গুজব রটাইয়া বনগাঁ, বসিরহাট প্রভৃতি অঞ্চলের হিন্দুদের মনে ত্রাস সঞ্চার করার পিছনেও এই চক্রান্ত কাজ করিয়াছে। সাম্প্রতিক ডামাডোলের মধ্যে ক্যানিং অঞ্চলে যে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' প্রভৃতি পোষ্টার পড়িয়াছিল, তাহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুদের আতঙ্কিত করিয়া দূরে হটাইয়া দেওয়া। এই সব ঘটনার পর সীমান্ত হইতে বহু হিন্দু পশ্চিমে সরিয়া আসিয়াছে।

সীমান্ত জুড়িয়া মুসলমান প্রাধান্য সৃষ্টির কাজে এইবার কতকগুলি পঞ্চায়েতও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারিবে। ইউনিয়ন ভাঙ্গিয়া পঞ্চায়েত গঠনের সময় এমনভাবে সীমানা টানা হইয়াছে যে, সীমান্তে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ পঞ্চায়েতের সংখ্যা পূর্ব্বের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ ইউনিয়নের তুলনায় অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। একজন বিশেষজ্ঞের অভিমত এই যে পূর্ব্বে যেখানে সীমান্ত জেলাগুলির শতকরা ১৫টি ইউ-নিয়ন মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল এখন সেখানে কম করিয়া শতকরা ৪০টি পঞ্চায়েত মুসলমানপ্রধান হইল। বলা প্রয়োজন: ইউনিয়ন-পিছু তিনটি পঞ্চায়েত গড়া হইয়াছে। এই ভাঙ্গা-গড়ার সময় বহু মুসলমান নেতা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন এবং কয়েকটি রাজনৈতিক দলও (বিশেষ করিয়া কম্যুর দল) দলগত স্বার্থসিদ্ধির কারণে মুসলমানদের সর্ব্ববিধ অসঙ্গত দাবি সমর্থন করিয়াছে।

স্বায়ত্তশাসনে পঞ্চায়েতগুলিকে যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। আমরা নিশ্চিত জানি সীমান্তে মুসলমানপ্রধান অঞ্চল গড়ার চক্রান্তে এবং পাক্-অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয় দেওয়ার কাজে এই মুসলমানপ্রধান পঞ্চায়েতগুলি মারাত্মক এবং দেশের পক্ষে পরম সর্ব্বনাশকর এক ভূমিকা গ্রহণ করিবেই।

"রোম পুড়িতেছে নিরো বেহালা বাজাইতেছে!"

"Rome burns—Nero fiddles"—পুরাণো কথা এবং অনেকেই এ-কথা জানেন, কাজে অকাজে ব্যবহারও করিয়া থাকেন। কিন্তু রোমে ছিল মাত্র একজন নিরো—কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের এবং বাঙ্গালী জাতির এই চরম সঙ্কট এবং শোকের কালে, যখন লক্ষ লক্ষ হিন্দু বাঙ্গালী তাহাদের সব কিছু খোয়াইয়া, সকল সম্পদ আয়ুবী শয়তানদের দান করিয়া পশ্চিম বাঙ্গলার দরজায় একটু আশ্রয়, একটু সম-বেদনার জন্য মাথা খুঁড়িতেছে—হাজার হাজার শিশু, নর-নারী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, নিরাশ্রয় হইয়া এ রাজ্যে কোন রকমে আসিয়া আজ মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছে—ঠিক সেই সময় আমরা কোন্ মুখে সঙ্গীত সম্মেলন, জাতীয় ক্রীড়া অনুষ্ঠান, মহাজন জয়ন্তী উৎসব প্রভৃতি আনন্দ-বাসরের বিচিত্র আয়োজন, পূজার নামে মাইকের বিষম আওয়াজে মানুষকে অস্থির এবং জোর-জবরদস্তি দ্বারা চাঁদার নামে চৌথ আদায় করিয়া তথাকথিত হৈ-হল্লায় দিন কাটাইতে পারি? পূর্ব্ববঙ্গের অগণিত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যখন কলিকাতার রাস্তায় পড়িয়া অনাহারে নিদারুণ দুঃখ-যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে—সেই করুণ দৃশ্য অহরহ দেখিয়াও আমরা কেমন করিয়া, কোন মুখে ক্রিকেটের মাঠে আসর জমাই, সিনেমার কিউ-এ ভীড় করি, নানাপ্রকার 'জাতীয়'-উৎসবে এমন বেপরোয়া উন্মত্ত হইতে পারি? বিবাহাদি পারিবারিক উৎসবে আনন্দে এমন মশ্‌গুল হই?

আমরা কথায় কথায় ভারতের অন্যান্য রাজ্যের লোকদের বাঙ্গালী-বিদ্বেষী বলিয়া নিন্দা করি এবং একথা বলিতে লজ্জাবোধও করি না যে—ইহাদের জন্যই বাঙ্গালী আজ সর্ব্বক্ষেত্রে পরাজিত হইয়া হীন জীবনযাপনে বাধ্য হইয়াছে! কিন্তু অন্যকে গালি দিবার পূর্ব্বে আমরা কি একবারও ভাবিয়া দেখিতে চেষ্টা করি যে—বাঙ্গালী নিজের, নিজের জাতির এবং প্রদেশের জন্য কি করিতেছে—নিজেদের দুর্দশা মোচনের প্রয়াসে কতখানি চিন্তা এবং সময় ব্যয় করিতেছে? আমরা যদি মনে করিয়া থাকি যে অন্যে আসিয়া আমাদের দুঃখ মোচন করিবে—দারিদ্র্য হইতে আমাদের সমৃদ্ধির পথে লইয়া যাইবে, তাহা হইলে আমরা 'মূখের স্বর্গে' বাস করিতেছি।

ভারতের অন্য রাজ্য হইতে লোক আসিয়া পশ্চিম-বঙ্গকে 'লুট' করিতেছে—এমন অভিযোগ আমরা অহরহ করিতেছি—কিন্তু সবই যদি জানি, দেখিতে পাইতেছি, তবে সেই 'লুটের' পথ রোধ করি না কেন? পশ্চিমবঙ্গের পথে-ঘাটে নাকি টাকা ছড়ানো আছে—যদি থাকে তবে সেই টাকা বাঙ্গালীর চোখে না পড়িয়া—ভিন্ন প্রদেশের ভাগ্যান্বেষীদের চোখে কেন পড়ে এবং থলিতেই বা যায় কেন? আয় কিংবা জাতি-নিন্দার জন্য এ সব কথা বলিতেছি না। বলিতেছি একমাত্র এই কারণে যে—বাঙ্গলার বর্ত্তমান চরম সঙ্কটকালে আজ আমাদের আত্ম পরীক্ষা এবং জাতীয়-চরিত্রের বিশ্লেষণ একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালী যদি আজ নিরাশায় পূর্ণ নিশ্চেষ্টার স্রোতে, কপালে হাত ঠুকিয়া, ভাগ্যের লিখন বলিয়া নিজেদের গা ভাসাইয়া দেয় তাহা হইলে একমাত্র সাগর-সমাধিই তাহার পরিণাম!

পাঞ্জাবের দিকে চোখ ফিরাইয়া দেখুন। পশ্চিম পাঞ্জাব হইতে লক্ষ লক্ষ লোক তাহাদের সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ

করিয়া ভারতে চলিয়া আসিতে বাধ্য হয় দেশবিভাগের পরেই। কিন্তু মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে পাঞ্জাবীরা আজ নিজেদের কি ভাবে, কি কঠোর পরিশ্রমে—অন্যের সাহায্য প্রায় না লইয়া কি ভাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে দেখিলে অবাক হইতে হয়। দেশবিভাগের পরে ওপার হইতে ভারতে আগত লক্ষপতি ধনী পাঞ্জাবী ঠেলাগাড়িতে করিয়া চা-ডিম-রুটি দিল্লীর পাড়ায় পাড়ায় ফিরি করিতে লজ্জাবোধ করেন নাই। লক্ষপতির স্ত্রী-কন্যারা লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া পরের জামা-কাপড় ইস্ত্রি করিয়া কিছু রোজগার করিতে কোন সঙ্কোচবোধ করেন নাই। ওপার হইতে বিত্তবান পাঞ্জাবীরা নিঃস্ব অবস্থায় ভারতে আসিয়া মনোবলের এবং উৎসাহের দিক হইতে নিঃস্ব হন নাই। মানুষের মত বাঁচিবার জন্য অসীম কর্ম্মোৎসাহ এবং প্রাণশক্তি লইয়া তাঁহারা স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকা নির্ব্বিশেষে নূতন ক্ষেত্রে নব-জীবন গঠনের কার্য্যে পুনঃ আত্মনিয়োগ করেন। এই দৃঢ়পেশী মানুষদের আজ ভারতের সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যাইবে—কিন্তু কোথাও পাঞ্জাবী-ভিখারী কেহ দেখিতে পাইবেন না। আর একটা যে-জিনিষ কাহারো চোখে পড়িবে না—পাড়ার রকে, পার্কে, পথে-ঘাটে বেফায়দা আড্ডাধারী পাঞ্জাবী! ইহারা জীবনের কঠিন বাস্তবতায় বিশ্বাস করে—সেইজন্যেই বোধ হয় ইহারা মানুষের বাঁচিবার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন 'গম-ধান' প্রভৃতি ফলনের দিকে বেশী দৃষ্টি দেয়, আমাদের মত পেটে ভাত নাই, পরণে বস্ত্র-নাই অবস্থায়, বর্ত্তমানে-অনাবশ্যক 'ঘেঁটু ফুলের' রূপ দেখিয়া কবিতায় সেই রূপের প্রতিফলন প্রয়াসে দিন কাটানোকে বেকার কার্য্য বলিয়া মনে করে। ইহারা বোধ হয় জানে যে যদি মানুষই মরিয়া যায় অনাহারে এবং দারিদ্র্যের চাপে, তাহা হইলে সেই মানুষের পক্ষে কৃষ্টি, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, মহাজন-জয়ন্তী উৎসব প্রভৃতি নয়না-ভিরাম 'মনো-পুষ্পগুলির' কোন মূল্যই থাকিতে পারে না।

অন্যের সাহায্য-সহযোগিতার আশা না করিয়া বাঙ্গালীকে তাহার বাঁচিবার পথ নিজেকেই বাহির করিতে হইবে। কথায় বলে 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম'—আজ সেই 'বাপের' নাম যদি রাখিতেই হয়, তাহা হইলে সেই 'আপনিকে'ই যেমন করিয়াই হোক খাইয়া-পরিয়া বাঁচিবার শেষ চেষ্টা করিতে হইবে। বাঙ্গলা এবং বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে আজ দিন-দুপুরেই ঘন অন্ধকার নামিয়াছে সত্য কথা, কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না যে, এই ঘন-অন্ধকারের পরেই রহিয়াছে সূর্য্যের আলোতে ঝলমল বৃহৎ আশাপূর্ণ আমাদের অনন্ত ভবিষ্যত। এখনো এ-বিশ্বাস হারাই নাই।

একটু আশার আলো

পশ্চিমবঙ্গের সর্ব্বপ্রকার ও সর্ব্বদিকে এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে পূজার নামে হাজারো বেলেল্লাপনার মধ্যে ছোট একটি সংবাদ আমাদের মনে একটু আশার আলোকপাত করিয়াছে। জাতীয় জীবনাকাশ যখন নিরাশার ঘনকালো মেঘে আবৃত—ঠিক সেই সময় এই সংবাদটিকে মনে হইল ইহা যেন ঘনকালো মেঘের উপর রূপালী আলোর রেখা। সংবাদে প্রকাশ :

> উত্তর কলিকাতার রামমোহন রায় রোডের রামমোহন এথলেটিক ক্লাব প্রতি বৎসরই সরস্বতী বন্দনা করে থাকেন। এবারে তাঁদের মণ্ডপে গিয়ে দেখা গেল একটি শুভ্র বেদীর উপর মাল্যভূষিত বাণী দেবীর বীণা। তার নিচে একটি বিজ্ঞপ্তি : পূর্ব্ববঙ্গের ভাইবোনেদের স্মরণ করিয়া বর্ত্তমান বৎসরের উৎসব অনুষ্ঠান বন্ধ করা হইল।' দর্শনার্থীরা এসে বেদীমূলে অর্থ দিয়ে যাচ্ছেন উদ্বাস্তু ভাইবোনেদের জন্য। তাঁরা এই অর্থ উদ্বাস্তুদের সাহায্য ভাণ্ডারে পাঠাবেন।

এই অঞ্চলে এবারে পূজার সংখ্যা কম ছিল না। কয়েকটি পূজামণ্ডপে উদ্যোক্তারা মাইক এবং লাউড্-স্পীকার বর্জ্জন করেন, কিন্তু বেশীর ভাগ মণ্ডপেই লাউড্-স্পীকারের অত্যাচার মাত্রা ছাড়াইয়া যায়।

পূর্ব্ববঙ্গের হতভাগ্য উদ্বাস্তুদের এবং এখনও যে সব হিন্দু পাক-নরকে মৃত্যুর পথ চাহিয়া আছেন, তাঁহাদের কথা মনে করিয়া—কতকগুলি কিশোরে যে মানবতা এবং মহত্ত্বের পরিচয় দান করিল—তাহা যেমন শ্রদ্ধা তেমনি প্রশংসার যোগ্য। এবারের বাণীপূজার নামে—বিশেষ করিয়া বিসর্জ্জনের রাত্রে একশ্রেণীর "ট্যাপ-ওয়াটার-পাইপ-প্যান্ট" (Tap Water Pipe Pant) পরিহিত তরুণদের যে প্রকার শালীনতার প্রদর্শন প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহাতে বাঙ্গলার ভবিষ্যত রূপ কল্পনা করিয়া আতঙ্কিত হইতেছি—কিন্তু উপরে প্রদত্ত ছোট সংবাদটিতে গভীর হতাশার মধ্যেও যেন একটু আলোর আভাস পাইলাম।

বিবেকানন্দ-জয়ন্তী উৎসবের ঠিক পরমুহূর্ত্তেই কলিকাতার বুকে বাঙ্গালী তরুণদের বিদ্যাদেবীর পূজার নামে যাহা দেখিলাম—তাহাতে মনে হইল—বিদ্যাদেবী বাঙ্গলা দেশ হইতে বিদায় লইয়া মাদ্রাজ এবং মহারাষ্ট্রে প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছেন! বাঙ্গলা দেশে আজ অ-বিদ্যাদেবীর প্রচণ্ড পূজা চলিতেছে—এবং যে পূজাকে বাঙ্গলার "জাতীয়" দৈনিক পত্রিকাগুলি "আনন্দের বন্যা," "ভক্তির স্রোত", "ভাব গম্ভীর" পূজামণ্ডপে বিদ্যার্থীদের

"সভক্তি" সমাগম ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা অভিনন্দিত করিয়াছেন! একই পৃষ্ঠায় পূর্ববঙ্গ-বিতাড়িত অনাথ নিরাশ্রয় বালকবালিকাদের করুণ চিত্র (ছবি এবং বিবরণে) —সেই পৃষ্ঠারই আর এক কলমে—পূজার এবং অন্যান্য আনন্দ উৎসবের বিচিত্র বিবরণ! একদিকে মানবতার চরম দুর্দশার হৃদয়-বিদারক বিবরণ অন্যদিকের দেশ যখন জ্বলিতেছে, হাজার হাজার মানুষ যখন পুড়িতেছে ঠিক সেই সময় উৎসব আনন্দের নির্লজ্জ রসাল চিত্র! বাঙলার এই ভীষণ-ভয়াল-রসাল-রূপ বহু পূর্ব্বেই কল্পনা করিয়া এক কবি —(দুঃখে কিংবা আনন্দে জানি না) লিখিয়া গিয়াছেন "এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গ ভরা।" এ যেন শ্মশানের বুকে চিতার আগুনের আলো।

বাঙলা এবং বাঙালীকে বাঁচিতে হইলে "ফুর্ত্তি মৌজ-খেলা-মেলা"র সর্ব্বনাশা বুদ্বুদবিলাস স্থগিত রাখিয়া বাঙ্গালীকে আজ সর্ব্বাগ্রে ঘর সামলাইতে হইবে—তাহার পর অন্য কথা। পূর্ব্ববঙ্গে প্রায় এক কোটি হিন্দু (নিধন পর্ব্বের ফলে এখন হয়ত কিছু কমিয়াছে) এখনও রহিয়াছে! যাহারা এ-পারে আসিতে চায় তাহাদের আশ্রয় দানের ব্যবস্থা করিতেই হইবে। ভারতের মুসলমান এ-দিকে থাকিবে না ও-দিকে যাইবে, তাহারও একটা অন্তিম ফয়সালা অবিলম্বে প্রয়োজন। কংগ্রেসী শাসকদের "ধর্ম্ম-নিরপেক্ষতা" নামক অর্থহীন ক্লীব-নীতির ফলে দেশের মানুষ আজ সর্ব্বপ্রকার নীতি এবং ধর্ম্মবোধ পরিত্যাগ করিয়াছে—ইহা প্রতিরোধ করিতে হইবে।

ও-পারের ভীত-সন্ত্রস্ত অসহায় লক্ষ লক্ষ হিন্দু নরনারী বালক বালিকা শিশুদের রক্ষা করিবার জন্য শয়তান পাক সরকারের নিকট পত্রে আবেদন-নিবেদনের দ্বারা কোন ফল পাওয়া যাইবে না। গত ষোল বৎসরে ভারত সরকার পাকিস্তানকে বহু পত্র, বহু নিবেদন, বহু প্রতিবাদ পাঠাইয়াছেন, ফল কি হইয়াছে? রাজ্য-শাসনের এই নপুংসক নীতি বর্জ্জন না করিলে বাচিবার পথ পাওয়া যাইবে না। 'জাতি হিসাবে বাঙ্গালী অনেক দিন আগেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালীকে আবার নূতন করিয়া পূবে-পশ্চিমে মিলাইয়া জাতি গঠন করিতে হইবে।' মুখ ফিরাইয়া থাকার দিন বিগত। পশ্চিমবঙ্গের আরামবিলাসী, মেরুদণ্ডহীন, কৃষ্টি, সাংস্কৃতিক জয়ন্তী-উৎসবে প্রমত্ত সমাজকে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া—খাঁটি মানুষ বাহির করিতে হইবে।

বাঙ্গালী কি ছিল, বাংলা দেশে কত মহাপুরুষ বিগত কালে জন্মিয়াছেন—কেবল সেই হিসাব করিয়া, পূর্ব্ব-গৌরব চর্ব্বণ-মন্থন করিয়া, নাকে (ভেজাল) সরিষার তৈল দিয়া ঘুমাইলে দেশ বাঁচিবে না। গুরুর নাম ভাঙ্গাইয়া হয়ত কোন মিশন বাঁচিতে পারে স্বল্পকাল মহারাজদের আরাম-বিলাস-ব্যসন এবং মেকি কালচারের অপচারও কিছুদিন চলিতে পারে।—কিন্তু তাহাতে জাতির কি?

বাঙ্গালী কি শ্রমকাতর?

পূর্ব্বে এত কথা বলা হইল বলিয়া কেহ যেন মনে করিবেন না বাঙ্গালী শ্রমকাতর—মোটেই না। যে কোন সঙ্গীত সম্মেলনে বাঙ্গালী যুবক, এমন কি বালকেরাও, সারা রাত্রি অসীম কষ্টে রাজপথে দাঁড়াইয়া কাটাইয়া দিবে। ক্রিকেট ম্যাচের টিকিট সংগ্রহ করিবার জন্য ইডেন গার্ডেনে দুঃসহ ঠাণ্ডার মধ্যে খোলা আকাশের নীচে দু-তিন রাত্রি কিউ-এ দাঁড়াইয়া, অবশেষে দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনে টিকিট না পাওয়ার দুঃখ-অবসাদ-ভরা ক্লান্ত দেহ-মন লইয়া ঘরে ফিরিবে! ফুটবল ম্যাচের টিকিট সংগ্রহের সম্পর্কেও বাঙ্গালী যুবক এবং বালকের আকাশ-স্পর্শী দারুণ-বিকট উৎসাহের কথা কে না জানে? সরস্বতী পূজার দুই-একদিন পূর্ব্ব হইতেই, বাঙ্গালী যুবক এবং বালকদের, পাড়া-প্রতিবেশী সকলের কর্ণপটাহভেদী বিষম লাউডস্পীকার বাজাইবার পরম-বিক্রম কে না উপভোগ করিয়াছে? গলাভাঙ্গা লাউড-স্পীকার এবং অশ্রাব্য বাজে হিন্দী গানের ফাটা রেকর্ড বাজাইবার সরকারী সময় নির্দ্দেশকে এমন অবহেলার সহিত রস্তা প্রদর্শন ভারতের অন্য প্রদেশে কেহ দেখিবেন কি? আর পুলিসের কর্ত্তব্যপরায়ণতা? লাউড-স্পীকার বাজাইবার সময়-অসময় পুলিস হুকুমে জানাইয়া দেওয়া সত্ত্বেও কোথায় কোন্ পাড়ায় এই ৮-১০টা সময় পালিত হয়? বহুবিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ পুলিসের অতি প্রখর দৃষ্টি আছে জানি, কিন্তু এই নিরীহ-মারী পুলিস যে বধির তাহা অস্বীকার করা যাইবে কি?

লজ্জা বলিয়া কিছু যদি কলিকাতা পুলিসের থাকে—তাহা হইলে পূজা-পার্ব্বণ উপলক্ষ্যে—এমন কোন আদেশ-নির্দ্দেশ ভবিষ্যতে পুলিস আর দিবে না, যাহা ভঙ্গ এবং অগ্রাহ্য করিতে কাহারও পক্ষে আটকায় না! আজ টেগার্ট-সাহেবের মত পুলিস কমিশনার থাকিলে হয়ত ভাল হইত। টেগার্টের হাতে যথেষ্ট মার খাইয়াছি—কিন্তু কতকগুলি বিষয়ে তাঁহাকে শ্রদ্ধাও করিয়াছি।

সরকারী আদেশ, তাহা ভাল বা মন্দ যাহাই হউক, নিজেরা মানিতে এবং সর্ব্বসাধারণকে জানাইতে—টেগার্টের মত পুলিস-কর্ত্তার প্রয়োজন যে কতখানি আজ তাহা হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছি। বহু ভাবে টেগার্টের হাতে নিগৃহীত নির্য্যাতীত হইয়াও—আজ তাঁহাকে কতকগুলি বিষয়ে প্রশংসা না-করা অন্যায় মনে করি।

সদস্যদের ডবল মাহিনা

সামান্য একজন গরীব করদাতা সংবাদপত্রে লিখিতেছেন :

"বিধানমণ্ডলীর সদস্যদের ডবল মাহিনা" শীর্ষক সংবাদটি পাঠ করিয়া অতিশয় ব্যথিত হইলাম। মাননীয় সদস্যগণের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগতভাবে আমার কিছু বলার নাই, তথাপি এ বিষয়ে দুই একটি প্রসঙ্গের অবতারণা না করিয়া পারিতেছি না। বর্ত্তমান জরুরী অবস্থায় আর্থিক সঙ্কটের দোহাই দিয়া বহু উন্নয়নমূলক কার্য্যও স্থগিত রাখা হইতেছে। তাছাড়া মন্ত্রিগণ (একাধারে বিধানমণ্ডলীর সদস্য) দেশের কর্ম্মরত নাগরিকগণকে বর্ত্তমান অবস্থায় কোন প্রকার সঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে বেতন বৃদ্ধির জন্য দাবী না করিতে আহ্বান জানাইতেছেন। সেক্ষেত্রে দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিসাবে কি ভাবে তাঁহারা নিজেদের বেতন দ্বিগুণ করার চেষ্টা করেন? ইহা কি তাঁহাদের নৈতিক আদর্শের পরিপন্থী নহে? আমি বিধানমণ্ডলীর মাননীয় সদস্যগণকে দেশের ও দশের বৃহত্তর কল্যাণ ও প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এ বিষয়ে ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ জানাইতেছি। জননেতা হিসাবে তাঁহারা আদর্শ গড়িয়া তুলুন তবেই ত জনসাধারণ তাহাতে উৎসাহ দেখাইবে।"

দেশের জন্য যে-সকল সদস্য (এম, এল, এ, এবং এম, এল, সি,) অভূতপূর্ব্ব আত্মত্যাগের জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন—আশা করি তাঁহারা সামান্য একজন করদাতার পত্রখানি পাঠ করিয়া লজ্জা বা সঙ্কোচ বোধ করিবেন না। আমাদের মতে সদস্যদের বেতন বর্ত্তমান অবস্থায় সাড়ে সাত গুণ বাড়াইয়া দেওয়া দেশবাসীর কর্ত্তব্য। আর একটু কর-বৃদ্ধি করিলেই এ-দায় মিটানো যাইবে।

রায়বাড়ী

গিরিবালা দেবী

ভয়ে ভয়ে সুবর্ণকে বাড়ী ঢুকিতে হইল। সে টের পায় নাই বেলার পরিমাণ। ভূত ছাড়ান দেখিতে তন্ময় হইয়া গিয়াছিল। পুরুষদের খাওয়া হইয়া গিয়াছে। বাহিরের ঘরে প্রসাদ বিজয়রা তাস লইয়া জটলা করিতেছে।

কানু কাঁঠালতলার ছায়ায় বসিয়া মুঠা মুঠা মাটি লইয়া খেলা করিতেছে, আপনার মনে আধ-আধ স্বরে গান গাহিতেছে, "না জাগিলে ছব ভারত নননা, এ ভারত আর জাগে না জাগে না।"

বিনু কহিল, "কানু কি গান গাইছে দিদি? এতটুকু ছেলে আবার গান শিখেছে।"

"ওর আবার গান, যা শোনে তাই আওড়ায়। ও বলছে, 'না জাগিলে সব ভারত ললনা, এ ভারত আর জাগে না জাগে না।' পুজোয় চৌধুরী বাড়ীতে মুকুন্দ দাসের যাত্রাগান শুনে শিখেছে। মুকুন্দ দাস এসে গান গেয়ে এখানকার ছেলেদের ভেতরে স্বদেশী ঝড় বইয়ে দিয়ে গেছে।"

"কিসের স্বদেশী ঝড় দিদি?"

"ওমা, তা জানিস্ নে? ওই যে কুজার সাহেব নাম, লাট সাহেব সমস্ত দেশকে খণ্ড খণ্ড করে দিয়েছে এ তারই প্রতিবাদ। এখানে কত সভা-সমিতি হয়ে গেল। একদিন অরন্ধন হ'ল। ছেলেরা পতাকা নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় স্বদেশী বন্দেমাতরম্ গেয়ে মাতিয়ে তুললে। বিলাতি জিনিষ বর্জ্জনের প্রতিজ্ঞা করল। এখনো সে ঝড় থামে নি।"

মায়ের কণ্ঠস্বরে কানু খেলা রাখিয়া মুখে হাসির লহর তুলিয়া ছুটিয়া আসিল মাটি-মাখা ক্ষুদ্র বাহু দু'টি প্রসারিত করিয়া। বলিল "মা, তোলে নে। মাছি নিলি; কানু নিলি না কেন?"

"এই যে কানুকে নিচ্ছি, কানু আমার সোনা লক্ষ্মী," বলিতে বলিতে সুবর্ণ সস্নেহে ছেলেকে কোলে লইল।

দুরন্ত ছেলে মুহূর্ত্ত কালও স্থির থাকিতে পারে না। মা'র আদর লইয়া হাত বাড়াইয়া দিল, "মাছি যাব"।

বিনু সাগ্রহে ডাকিল, "আয় কানু, আমার কোলে আয়। তোর ভাত খাওয়া হয়েছে?"

"ভাত মাছ, তলকালি পিঠে পালু তক খেয়েছি।" কথার সঙ্গে সঙ্গে কানু ঝাঁপাইয়া পড়িল বিনুর কোলে।

গঙ্গামণি রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া ঝঙ্কার দিলেন, "তোর কিসের আক্কেল সুবু, ঠিক দুপুরে বোনকে নিয়ে বেড়ানোর বলিহারি যাই। প্রসাদরা কোন্ কালে খেয়ে দেয়ে গেচে। হাঁড়ি হেঁসেল গলায় করে সুমু বসে আছে তোদের জন্যে। আমি এঘর সেঘর টহল দিয়ে বেড়াচ্ছি। কানুকে ঘুম পাড়ানোর সময় পাই নি। এখন হাতে-পায়ে জল ঢেলে খেত বোস্ গে।" মায়ের কটু স্বরের তিরস্কারে রান্নাঘরের সামনে বাহির হইল হেমাঙ্গিনী ও সুমিত্রা।

সুবর্ণ নীরবে চোখ টিপিয়া তাহাদিগকে ইঙ্গিত করিয়া বিনুকে লইয়া কুয়া তলায় পা ধুইতে গেল।

কানু ফের বসিল কাঁঠাল তলায় তাহার খেলার সম্পদ্ লইয়া।

বৈকালে চৌধুরী বাড়ী হইতে বড় কর্ত্তার ছেলে রজত ও মেয়ে মায়া আসিয়া উপস্থিত। ভূতপূর্ব্ব জমিদার গৃহিণী বর্ত্তমান জমিদারের মা কর্ত্তামা নাতি-নাতনীকে পাঠাইয়া দিয়াছেন এ বাড়ীর সকলকে আগামী কাল মধ্যাহ্নে নিমন্ত্রণ করিতে।

এ-গ্রামের প্রথা, গায়ের লোক ভিন্ন গ্রাম হইতে ফিরিয়া আসিলে তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ করিয়া সমাদরে আহ্বান করা। ধনী-দরিদ্র সকল গৃহেই ইহাই প্রচলন।

প্রসাদ বিনুদের ত পাড়ার মধ্যেই এ-বেলা ও-বেলার নিমন্ত্রণ হইয়া রহিয়াছে কিন্তু জমিদার গৃহিণী কর্ত্তামার আদেশ গঙ্গামণি উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। হাজার হউক উঁহারাই সে গ্রামের মালিক, হর্ত্তা-কর্ত্তা বিধাতা। আগে ওখানকার হ্যাঁপা মিটাইয়া পাড়ার ব্যাপার ধীরে-সুস্থে মিটাইবেন।

গঙ্গামণি ছেলে-মেয়েকে আদর করিয়া বারান্দায় মাদুর পাতিয়া বসাইলেন। সামনে সাজাইয়া দিলেন গৃহজাত মিষ্টান্ন। রাজার দুলালরা আসিয়াছে দীনের কুটিরে। তা রাজার দুলাল-দুলালীর ভদ্রতা নিষ্ঠাচারবোধের ত্রুটি নাই। তাহারা রেকাবী হইতে একটা মিষ্টি তুলিয়া লইয়া মুখে দিল। তাহারা বাড়ী হইতে খাইয়া বাহির হইয়াছে অতএব এখন ক্ষিদে নাই। ওজর।

বিনু দ্বারের অন্তরাল হইতে দেখিতেছিল রজত ও মায়াকে। কি রূপ-লক্ষ্মীর ঘরেই রূপের বাসা।

গঙ্গামণি সবিনয়ে জানাইয়া দিলেন, প্রসাদ, বিনু ও সুবর্ণ কাল খাইতে যাইবে। কাল তাঁহাদের সুবচনী ব্রত। তাঁহার সহিত হেমাঙ্গিনী সুমিত্রাকেও ব্রতের নিয়ম পালন করিতে হইবে। কারণ তাহারা দুইজনাই ব্রতী।

সন্ধ্যার সময় রজত ও মায়া বিদায় লইল জমিদারদের ঘোড়ার গাড়িতে। জমিদার ভবন হইতে বাঁধা একটা সড়ক বিরাট্ গ্রামের মধ্য দিয়া বহুদুর পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে। গাড়ি-ঘোড়া চলার অসুবিধা হইত না। জমিদারদের কয়েকটা তেজী ঘোড়া ও নানা প্রকারের কয়েকখানা গাড়ি ছিল। তখন পল্লীগ্রামে কেহ মোটর গাড়ির নাম জানিত না।

কর্ত্তামার আমলে ছিল একখানা রূপার পালকি। কর্ত্তার আমলে তিনি নাকি তাহাতে চাপিয়া গ্রাম পরিভ্রমণ করিতেন সামাজিকতা রক্ষা করিতে।

ব্রাহ্মণ-প্রধান গ্রাম, চৌধুরীরাও ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়, সমাজের আচার-অনুষ্ঠান ধনীদরিদ্র সকলকে মানিয়া চলিতে হইত।

এখন কর্ত্তামা তীর্থ ধর্ম্ম ভিন্ন সমাজিক প্রথা পালন করিতে কাহারও গৃহে পদার্পণ করেন না। তাঁহার পুত্রবধূরা সে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু রূপার পালকিতে নয়। ঘোড়ার গাড়িতে।

এই নিমন্ত্রণে বিনু প্রসন্ন হইতে পারিল না। জমিদার-দের সহিত তাহার তেমন ঘনিষ্ঠতা বা মেলামেশা ছিল না! সে হরিরামপুরে কয়দিনই বা বাস করিতে পারিয়াছে? বিশেষতঃ তাহার বন্য প্রকৃতি জাঁকজমক ঐশ্বর্য্যের সোনার খাঁচার দিকে ধাবিত হইতে চায় না। সে মন উধাও হইয়া যায় মুক্ত প্রান্তরে কানন-কান্তারে।

নিভৃতে সুবর্ণর গলা জড়াইয়া ধরিয়া বিনু বলিল, "দিদি, কাল তুমি গিয়ে জমিদারদের নেমন্তন্ন রক্ষে করে এস। আমি যাব না। আমার ভাল লাগে না। বড় লোকের বাড়ী যেতে আমার বাধ বাধ লাগে।"

দিদি হাসিয়া ছোট বোনের গাল টিপিয়া দিল, "পাগলী, প্রসাদ আর তোকে নিয়েই ত নেমন্তন্নর উপলক্ষ্য। আমার সাথে যাবি, যেয়ে চারটি খেয়ে চলে আসবি; তাতে আবার বাধ বাধ কিসের? তুই যে এখন জমিদারের বৌ হয়েছিস, তোর মুখে এ কথা সাজে না বিনু।"

"এদের জমিদারি যে তাদের চেয়েও বেশি। চাল-চলন ভিন্ন ধরণের। বেশি বেশি বড়লোকী ঢং। এসব আমার ভাল লাগে না।"

"হাঁ, এরা হ'ল তোর কাছে 'একে রামে রক্ষে নেই, সুগ্রীব মিতা।' যার যা আছে, সে তাই নিয়ে থাকুক গে; আমরা ভিক্ষা চাইতে যাচ্ছি না। ওদের জামাই-মেয়ে এলে আমাদেরও খাওয়াতে হয়। যেখানকার যে নিয়ম।"

বিনু নীরবে দেশাচার মানিতে প্রস্তুত হইল।

বেলা এগারটার সময় গাড়ি আসিল। প্রসাদ-বিনুদের লইতে ঘোড়ার গাড়ি লইয়া বিজয় আসিয়াছে। এ-পাড়া আর ও-পাড়া গ্রামের মেয়েরা পদব্রজেই যাতায়াত করিয়া থাকে। কিন্তু বিনুরা যে সম্মানিত অতিথি, সেইজন্য ইহাদের প্রতি ব্যবহার ত্রুটিশূন্য। কর্ত্রীর সহিত প্রসাদের একটা দূর সম্পর্ক বাহির হইয়াছে। কর্ত্রী রায় বংশেরই কন্যা। বিনুর শ্বশুর তাঁহার জ্ঞাতিভাই। নূতন সম্বন্ধে বিনু বিষম ভীত হইল। রায়রঙ্গিণীদের পরিচয় তাহার অবিদিত নাই। সেই বংশসম্ভূতা চৌধুরাণী হইয়া ইনি আবার কি মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন?

প্রসাদ গাড়িতে যায় নাই। বিজয়ের সহিত হাঁটিয়া গিয়াছিল।

সুবর্ণ বিনুকে বহন করিয়া গাড়ি প্রবেশ করিল অন্তঃপুরের প্রাচীরবেষ্টিত অঙ্গনে। সামনেই চৌধুরীদের কর্ত্তামা।

বিনু তাঁহাকে প্রণাম করিল। তিনি সস্নেহে বিনুর নত মুখখানি তুলিয়া তাহার সোনার সিঁথিপরা ললাটে চুনি ও মুক্তা খচিত আর একটি জড়োয়া সিঁথি পরাইয়া দিয়া মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, "বিনু, তোমার সিঁথির ওপরে সিঁথি পরিয়ে আমি আশীর্ব্বাদ করলাম। তুমি রাঙ্গাঠাকুরের নাতনী, এতদিন আমারও নাতনী ছিলে। এখন হয়েছ তুমি আমার বৌমা, আমি তোমার পিসশাশুড়ী। আমাদের সম্পর্ক ফেলনা নয়। তোমার শ্বশুর আমার ভাই হন। দেখা-সাক্ষাৎ নেই বলে আপনজন পর হয়ে গেছেন। প্রসাদকে দেখে আমার চোখ জুড়িয়ে গেল। কি সুন্দর কথাবার্ত্তা। চমৎকার আমার পিতৃ-বংশধর। সুবর্ণ চল; আমার ঘরে গিয়ে তোমরা বোসগে। ও কি বিনু, পিসশাশুড়ী শুনে তোমার মুখ যে লজ্জায় লাল হয়ে গেল। একে সুন্দর মিষ্টি মুখ, তাতে আবার লজ্জায় লাল?" বলিতে বলিতে কর্ত্তামা সুবর্ণ বিনুকে লইয়া তাঁহার মহলে অগ্রসর হইলেন।

বিনু চলিতে চলিতে আড়চোখে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ইঁহাকে পূর্ব্বে সে দেখিয়াছিল কি না তাহা স্মরণ হইল না। কারণ চৌধুরীদের মেয়েরা অতিশয় পর্দ্দানশীন। পথে-ঘাটে পদক্ষেপ করিতে পারে না। অন্দর মহল সুরক্ষিত, অবগুণ্ঠনে আবৃত। বাহির মহল বেপরোয়া। তা বড় রূপসীরা অন্তঃপুর আলো করিতেছে;

'শিরীষ কুসুম জিনি যাহাদের তনু
দেখিয়া যাদের রূপ রথ রাখে ভানু।' তাহাদের বুঝি মহার্ঘ্য রত্ন হিসাবে মণি-মাণিক্যের অন্তরালে গোপনে লুকাইয়া রাখিতে হয়।

বিনু সবিনয়ে কর্ত্তামার দিকে তাকাইয়া রহিল। বর্ষার প্লাবন অনেক কাল চলিয়া গিয়াছে। শুষ্ক শীর্ণ জলাশয় ভাটির টানে খাঁ খাঁ করিতেছে। চন্দ্রমার শুভ্র জ্যোৎস্না অন্তর্হিত, কিন্তু উজ্জ্বল পরিমণ্ডল রেখা এখনও মিলাইয়া যায় নাই। সুদীর্ঘ একহারা তপঃক্লিষ্ট মুখে কোমল নয়নে অপার্থিব করুণা উদ্ভাসিত।

বৈধব্যের পরে কর্ত্তামা সুদীর্ঘ কেশগুচ্ছ সমূলে বিনাশ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে সেই কেশগুলি বর্ধিত হইয়া শুভ্র গ্রীবায় ও সুগৌর ললাটে লতাইয়া পড়িয়াছে। ছেলেরা মাকে থানের ধুতি পরিতে দেন নাই। তাঁহার জন্য ব্যবস্থা হইয়াছে গরদ তসর ও মটকার থান। পল্লীগ্রামের মেয়েদের সংস্কার, সন্তানের জননী শূন্যকণ্ঠে জলপান করিলে সন্তানের অকল্যাণ হয়। এই সংস্কারে গ্রামের অধিকাংশ বিধবার গলায় কাল রঙের একটা করিয়া 'কার' সূতা ঝুলাইয়া রাখে। কেহ কেহ তাহার সহিত ইষ্টকবচ। কেহবা অম্বলের তামার মাদুলী। অনেকে আবার কণ্ঠে ধারণ করে রুদ্রাক্ষের মালা, তুলসীর মালা।

সাধারণ স্ত্রীলোকের পর্য্যায়ে মাকে ফেলিলে জমিদার ছেলেদের মান খর্ব্ব হয়। সেইজন্য কর্ত্তামার গলায় একছড়া হীরার হার। সোনার খামির মধ্যে মটর আকৃতি হীরকগুলি ঝক ঝক করিতেছে। বাম হস্তের অঙ্গুলিতে একটা বৃহদাকার হীরক অঙ্গুরী।

কর্ত্তামার মহলে বিনুরা উপবেশন করিলে বাড়ীর বৌ ঝিরা সকলেই সেইখানে সমবেত হইল।

বধূদের পৃথক্ পৃথক্ মহল, সকলের খাস তালুকের খাস দাসী এক-একটা। সেকালের দাসীরা একালে সুশোভন হইয়া "আয়া" নামে খ্যাত হইয়াছে। উহারা সংসারের কুটাটি ভাঙ্গিয়া দুইখানা করে না। সেবা করে বৌরাণীদের। স্নানের পূর্ব্বে কাঁচা হলুদ বাটিয়া সরিষার তেল সংযোগে মর্দ্দন করে বধূদের সর্ব্বাঙ্গে, তাহার পরে বাসন দিয়া তাহা ঘষিয়া-মাজিয়া তুলিয়া দিতে হয়। স্নানের পরে শ্বেত-চন্দন লেপন। আমলা দিয়া কেশের পরিচর্য্যা ইত্যাদি।

ভোজনালয়ে বিনুদের সহিত দেখা হইল বর্ত্তমান জমিদারণী দুইজনার সহিত ও তাঁহাদের মেয়েদের সঙ্গে।

বড় বাবুর দুই বিবাহ। প্রথম বধূর বিবাহের তিন বছরের ভিতরে সন্তানাদি না হওয়াতে বাবু মহল পরিভ্রমণে যাইয়া পিতৃমাতৃহীনা এক অপূর্ব্ব সুন্দরী ব্রাহ্মণ কুমারীকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছিলেন। মাতা বা পূর্ব্বপরিণীতা পত্নীর অনুমতি গ্রহণেরও প্রয়োজনবোধ করেন নাই। "জোর যার মুল্লুক তার।" এক্ষেত্রে গায়ের জোরের প্রশ্ন ওঠে না। ক্ষমতা ও অর্থের জোর প্রধান।

দ্বিতীয় বার বিবাহের বছর খানেক পরে প্রথম বধূর প্রথম পুত্রের জন্ম হয়। যার নাম রজত। দ্বিতীয়া বধূর প্রথম কন্যা মায়া। দুই বধূ দুই মহলে বাস করে। বাবু অবকাশ সময় উভয় পত্নীকে সঙ্গদান করিয়া ধন্য করিতে আসেন মহলে।

বিনু চোরা দৃষ্টিতে দুই বধূর রূপসুধা পান করিতে লাগিল। যেমন রূপ, তেমনি তাহাদের সাজের ঘটা। বাবাঃ, এত সাজও ইহারা করিতে জানে? এত গহনাও পরিয়া থাকিতে পারে? কিন্তু এত রূপ ভোগ-বিলাসের মধ্যে ইহাদের মুখে হাসি নাই কেন? হাসির ভাণ্ডারটি কোন্ তস্কর অপহরণ করিয়াছে?

আহারাদির পরে সুবর্ণ বিনুকে লইয়া কর্ত্তামার নিকটে বিদায় লইতে গেলে তিনি কহিলেন, "তোমরা এখুনি যাবে কেন? বিশ্রাম কর, না হয় বৌমাদের মহলে যাও, তাস খেলগে। সারা দুপুর ওরা তাস খেলে। বিকেলে গাড়ি তোমাদের পৌছে দেবে।"

কাছেই সুমিত্রার শ্বশুরবাড়ী। এই পরিবেশে সুবর্ণদের থাকিতে ভাল লাগিতেছিল না। তাই সে মিথ্যা করিয়া কহিল, "আমরা একবার দিদির ওখানে যাব। সেখান থেকে বেলা পড়লে বাড়ী ফিরব। ভারী ত এতটুকু পথ, আমাদের গাড়ি লাগবে না কর্ত্তামা। আপনি ব্যস্ত হবেন না।"

সরলা কর্ত্তামা ব্যস্ত হইলেন না। আত্মীয়া অনাত্মীয়া আশ্রিতা, দাসীর দল চারিদিকে কলকল খলখল করিতেছে। তাহাদের পাশ কাটাইয়া বিনুর হাত ধরিয়া সুবর্ণ জমিদার ভবন পরিত্যাগ করিয়া নদীর দিকের পথ ধরিল।

নদীর ঘাটে বজরা ও বোট বাঁধা।....

বিনু নদীর তীরবর্ত্তী ছায়াময় পথ দিয়া যাইতে যাইতে কহিল, "দিদি, কি সুন্দর বজরা। বৌরাণীদের কি মজা, নিত্যি নিত্যি বজরায় চেপে এ-নদী সে-নদীতে ঘুরে বেড়ায়।"

সুবর্ণ মুচকি হাসে, "বৌরাণীদের বেড়ানোর জন্যে এ বজরা নয়রে বিনু, এ জমিদার বাবুর নৈশভ্রমণের।"

"নৈশভ্রমণ কি দিদি?"

"গবা কোথাকার, কিছু জানে না। জমিদার বাবু রাতে

বাড়ী থাকেন না, বজরা ভেসে যায় এদিকে সেদিকে, নদীর পরপারে বাগানে।"

"বাগানে কে থাকে দিদি? স্বামী রাতে ঘরে থাকেন না, বৌরাণীরা কিছু বলেন না?"

"বলবে কোন্ সাহসে? গরীবের ঘর থেকে যাদের নিয়ে এসে রাজ আদরে সোনার খাঁচায় রেখে দিয়েছেন, তাদের কি মানুষ বলে এঁরা মনে করেন নাকি? ওরা গয়না পরে, সাজ করে, পায়ের উপর পা দিয়ে দিন যায়। রাতে বারান্দায় ব'সে রাত কাটায় নদীর দিকে চেয়ে। জমিদারণীরা চিরকাল যা করে গেছে ওরাও তাই করে। এখানে কেউ ওর থেকে বাদ যায়নি; কর্তামাও না। বাগানে কি থাকে, কে জানে? আমরা আদার ব্যাপারী জাহাজের খবর রাখি না।"

বিন্নু চলিতে চলিতে ভাবিতে থাকে এ আবার কি নূতন কথা। বড় জমিদার হইলে তাহাদের কি রাত্রে ঘুমান নিষেধ? কোথায় যান বাবু? বাগান-বাড়ীতে কি আছে? লোকের একটি বৌ থাকে, জমিদারবাবুর দুই দুইটা বৌ, কি রূপ! তাকাইলে চোখ ফিরাইতে ইচ্ছা হয় না। ইহাদের কাছে থাকিতে কেন উনি ভালবাসেন না? এ রহস্য বিন্নুর অজানা, উহাদের জগতের সহিত এখনও তাহার পরিচয় ঘটে নাই।

চৌধুরীদের ছাত্রাবাসের পাশে আসিয়া স্বর্ণ কহিল, "পূজোর ছুটিতে ছাত্রাবাস বন্ধ, ছেলেরা দেশে চলে গিয়েছে, তাই এই সোজা পথে আমরা যেতে পারছি। নইলে ঘুরে যেতে হ'ত।"

বিন্নু সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "কত ছেলে এখানে থেকে ইস্কুলে পড়ে দিদি?"

"অনেক, চৌধুরীরা গরীব ছেলেদের এখানে রেখে খেতে দেন। পড়ার বই দেন, বিনে মাইনায় দলে দলে ছেলে আসে পড়তে। এঁদের পরোপকার দানের তুলনা নেই। বাসন্তী পূজোর সময় যে এখানে কি ধুম হয়, তা তুই জানিস্ নে বিন্নু? গাঁয়ের যত সধবা, কর্তামা সবাইকে ডেকে এনে খাইয়ে-দাইয়ে একজোড়া করে লালপেড়ে শাড়ী সিঁদুর আলতা আয়না চিরুণী মিষ্টি দিয়ে এয়ো দেন। যত কুমারী আছে তাদের আনিয়ে কুমারী পূজো করে শাড়ী জামা গন্ধ তেল মিঠাই মণ্ডা মাটির সরা ভরে দেন।"

"বিধবারা কিছু পায় না?"

"পাবে না কেন? তাদের একজোড়া করে থান ফল সিধে পাঠিয়ে দেন বাড়ী বাড়ী। অল্পবয়সী বিধবাদের ডাকেন না ভয়ে।"

"কেন দিদি, ভয় কিসের? বিধবারা কি মানুষ নন?"

"অতিমাত্রায়, ওয়া বিষ-ঘুনা লোভনীয় বস্তু। একবার নজরে পড়লে আর রক্ষে থাকে না। কাদের পেছনে স্থান বাগান হয়। ভাসুর-দেওরের বাসনা মত ... রান্না ঘাট এড়িয়ে এরা বাগানে ঢোকে সুখ থেকে।"

"আর বড়লোক সব বিধবাই বুঝি বাগানে থাকে, কোথাও যেতে পারে না তারা?"

"যেতে পারে বৈ কি? না পারলে কিছু মতিবাড়ি, লাহোরের আতর বিবিরা কোথা হ'তে কোথা থেকে? কথায় কথায় আমরা বাড়ীর কাছে এসে পড়ি। ওই দেখ আমাদের দেবদারু গাছ।"

বিন্নু তখনও ভাবিতেছিল বাল বিধবাদের কথা, তারা কিরূপে জমিদারের প্রমোদ-কাননে প্রবেশ করে। কেমন করে বেরিয়ে গিয়ে বাঈজি হয়? ভাবিতে ভাবিতে দি অন্যমনস্ক হইয়া বলিল, "দিদি, তুমি না বড়দিদির বাড়ী হয়ে যাবে কর্তামাকে বলে এলে? সে বাড়ী যে ছাড়িয়ে এলে? গেলে না ত?"

স্বর্ণ উত্তর দিল, "বলা বলে এলাম, ছুটো না দিলে কর্তামা কক্ষণো ছেড়ে দিতেন না। সারাদিন কি কেউ ওখানে থাকতে পারে? এক দণ্ডেই প্রাণ আমার হাঁপিয়ে উঠেছে।"

বিন্নু একবার ইতস্ততঃ করিয়া সসঙ্কোচে কহিল, "এখন ত বেরিয়ে এলাম, কিন্তু বিজয়বাবু যে নিয়ে গেছে তাকে সে ফিরবে কখন?"

স্বর্ণ খিল খিল করিয়া হাসিতে লাগিল, "কোর তলে বাণী'। বিন্নু তোর মনে রং ধরে গেছে, আর ঢাকা কারস্ নে। প্রসাদের জন্যে প্রাণ আকুল হয়েছে স্পষ্ট করে জিজ্ঞেস করলেই পারতিস্? আমার কাছে তো লজ্জা কিসের? প্রসাদ ছেলেদের সাথে সভা করছে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের। আমি খবর নিয়ে এসেছি। তার জন্যে তোর ভয় নেই! সে কর্তামার ভাইপো, এখানে তার অনাদর হবে না। দিনের বেলায় তোদের সুবিধে হবে না। রাতে ঠিক সময় হুজুরে হাজির হবে প্রসাদ। তার দিকে ঠিক আছে। পাকা ছেলে।"

বিন্নু লজ্জায় চোখ আনত করিল।

বাঁধা সড়কের গা দিয়া বাহির হইয়াছে এক স্বল্প পরিসর সঙ্কীর্ণ বনপথ। চারিদিকে কলা-বাগানের বেষ্টনী কাঁচাকলা সবরী মর্তমান চাঁপা কাঁঠালি বিচেকলার ঝাড় ভাগে ভাগে বিভক্ত। কলাগাছের মাঝখানে একটি ক্ষুদ্র উঠান, একখানি খড়ের কুটির। কুমার জাতি বামা কুমারণীর এইটুকুই সম্পত্তি। বামা এখন আধবুড়ী হইয়া

রাছে নিঃসন্তান বিধবা, স্বামীর মৃত্যুর পরে সে আর ড়ি ও কলসী মাটির পাত্রে হাত দেয় না। ও সবের মেহনত শি, নৈপুণ্যও চাই। তাই বামা পুতুল গড়ায় মনোনিবেশ রিয়াছে। মাটির হাতী ঘোড়া পাখী পুতুল, বালিকাদের লা ঘরের ছোট ছোট রান্নার পাত্র গড়িয়া বামা মেলায় টে বাজারে বাড়ী বাড়ী বিক্রি করিয়া তাহার একটা টের খরচ চালাইয়া থাকে। তাহার উপরে আছে তাহার গানের কলা। কলার কাঁদিরাও বারমাস তাহাকে কম য় না। এ গ্রামে প্রবাদ আছে, "কলা যদি চাও, বামার াড়ী যাও।"

গ্রামের কোনখানে কলা না মিলিলে বামার নিকটে কদলীর অভাব থাকে না।

বামা বালক-বালিকার খেলনা গড়ে, কলা বেচে আর সরকারদের গোশালা মুক্ত করিয়া দেয়। প্রতিদিন গোয়াল পরিষ্কার করিয়া দিয়া বামা বিনিময়ে পায় আধসের দুধ ও গোবর। গোবরের সারে বামার কলা বাগান যেমন শ্রীমণ্ডিত, তেমনি ফলবতী। বামা একবেলা ভাত রাঁধিয়া খায়, আর একবেলা খায় দুধচিড়া। এক পোয়ার বেশি বামা খায় না, আর এক পোয়া দুধ-কলা সংযোগে দেয় তাহার জোড়া পোষ্যকে। হাঁ, বহুকাল হইতে বামার যুগল পোষ্য দুধকলায় প্রতিপালিত হইতেছে।

বামার বাড়ীর পাশ দিয়া চলিতে চলিতে সুবর্ণ সচকিত হইল। এ কি? বামা আকুল হইয়া কাঁদিতেছে কেন? তাহার ত তিনকুলে কেহ নেই। রোদনের কারণ নাই।

গ্রামের মেয়েরা বামাকে মাসী বলিয়া ডাকে। বিনুকে লইয়া সুবর্ণ উপনীত হইল বামার অঙ্গনে। স্থানে স্থানে মাটির স্তূপ। মাটির গামলা ভরা জল। কতকগুলি নব-প্রস্তুত পুতুল রৌদ্রে শুথাইতেছে। কুটিরের সামনের এক-ফালি বারান্দায় বসিয়া বামা তারস্বরে কাঁদিতেছে, "ওরে আমার দুধরাজ, অহিরাজ, তোরা কেনে গেলি বাপধন? তোগরে বাঁশীর বাদ্যে ভুলাইয়া গর্তের বাইরে আনি ধইর‍্যা নিয়া গেল শয়তানরা। মই কেনে গেইছিলাম সরকারদের গোয়ালে। তাই না ঘটি গ্যাল আমার সর্বনাশ।"

সুবর্ণ কহিল, "মাসী, তোমার হ'ল কি? কে তোমার কিসের সর্বনাশ করল? এমন করে কাঁদছ কেন?"

বামা ললাটে করাঘাত করিয়া কহিতে লাগিল, "মা রে, তোগরে মুই কেমনে কই আমার দুঃখ? তোরা যে গাগুদ্ধা জানিস্ মোর দুধরাজ অহিরাজের কথা? সাঁপুড়ে ব্যাটারা আইস্যা তাগরে ধইর‍্যা নিয়া গেইচে— নতুন পাতিলে কইর‍্যা সরা চাপি।"

"অন্য কিছু নয়, দুটো বুড়ো গোখরো সাপের জন্যে তুমি কেঁদে মরছ? এতদিন যে তারা তোমাকে রেখেছিল সেই তোমার সাতজন্মের পুণ্যি। ভয়ে তোমার বাড়ীতে কেউ পা দিতে সাহস পায় না, সাপের আস্তানা বলে।" কহিতে কহিতে সুবর্ণ বিনুকে লইয়া বারান্দায় উঠিয়া বসিল।

উত্তপ্ত দ্বিপ্রহর বেলা, রৌদ্রের উত্তাপে ও গহনার ভারে বিনুর গায়ে বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরিতেছিল। কলাবনের ছায়াঘন বারান্দায় বসিয়া সে স্বস্তির নিঃশ্বাস মোচন করিল। কিন্তু সাপের আস্তানা শুনিয়া তাহার গা শির শির করিতে লাগিল। সাপ নাকি মানুষের পোষ মানে? তাহার জন্য অকস্মাৎ এ এক বিচিত্র বিস্ময়। সে চুপে চুপে সুবর্ণকে কহিল, "সাপ এখানে কোথায় থাকত দিদি? সাপুড়েরা সাপ ধরে নিয়ে কি করে? সাপের খেলা দেখিয়ে বেড়ায় নাকি?"

সুবর্ণ উত্তর দিবার পূর্বেই বামা সখেদে আরম্ভ করিল, "ওরা বেদের বিষদাঁত ভাঙ্গা সাপ নয় মা। তর-তাজা বিষেভরা আমাগো দুধরাজ অহিরাজ। কবরেজদের ঠাঁই নিইলে বিস্তর ট্যাকা দিইয়া কিনে তেঁনারা বিষ বড়ি বানাইবে। মুণ্ড কাটি। ওরে সোনার ধনেরা, এতকাল দুধ-কলা দিইয়া পুষ্যা ছেলাম এই করতি রে? ওরা কারোরে অনিষ্ট করেনি। বছরে বছরে ডিম ফুট্যা গাদা গাদা ছেনা পোনা হইলে তাগরে খেদায়ে দিইচে বন বাদাড়ে। ঘরের পিছে ডোয়ার গায়ে মাইঞ্জা অবধি গর্তে বাসা বানিয়ে নিইছেল। দিনমান বার হইত না। সাঁজ হইলেই গলা বাইর কইর‍্যা দিইচে। মুই মাটির সরা ভইর‍্যা দুধকলা দিইচি, চুক চুক কইরা খাইচে। মোর কাছে কহনো ফণা তোলে নি, ফোঁস করেনি। সেইবার আমাগো গাঙে বান আইস্যা তামাম গেরাম ভাইস্যা গিইচেল, আমাগো বাড়ীওয়ালা ভেদবমিতে চোখ বুজলেক। আমাগো ছাওয়াল নাই, ম্যায়া নাই, সোয়ামীও গেল, মুই হইছিলাম য্যান পাগল-পারা। কাঁদিকাটি সারা বাড়ী দাপাদাপি কইরা ঘুরি। তহন এই টুকি-টাকি মাচের নাগাল ওরা বানের জলে ভাইস্যা আইসা কলার ঝোড়ে আচয় নিইছেল। সে কি আজের ব্যাপার, দশ-বার বছর হইয়া গিইচে। ছোট ছেল, বড় হইল। যেমন মোটা তেমনি নাম্বা! কাল কুচকুচে বর্ণ, শরীর বাইয়া ত্যাল য্যান চুইয়া পড়িচে। কাইল শ্যাষ রাতে আগড় খুইল্যা বাইরে আইস্যা দেহি মরা জোছনায় উইঠান ভরি গেইচে। ওই পৈঠার তলে ওরা দুইজনে জড়াজড়ি কইর‍্যা খেলন করিছে মনের সুখে। মা রে, তহন কি মুই জানি, সেই খেলনই দুধরাজ অহিরাজের শ্যাষ নীলা।"

বিনু মন্ত্রমুগ্ধের মতন শুনিতেছিল বামার সর্প-কাহিনী।

সুবর্ণ কহিল, "তুমি তোমার দুধরাজ অহিরাজের লীলা-খেলার মধ্যে পৈঠার নীচে নাম নি মামী ?"

বামা ঘাড় নাড়ে, "না মা, ওঁনারা রাগ করিবে বলি মুই নামতি পারি নাই উঠানে, ঘরে যাইয়া ফিরাা আগড় দিইয়া রইলাম। ওয়াগরে দুধের নেগেই আমাগো গোয়ালে কাম। কলা না হইলে চলে না তাই আমাগো কলার বাগিচা। ওরাই ছেল মোর স্বোয়ামী, পুত্র, পুষ্যি। কোন্ আবাগীর ব্যাটা আইস্যা আমাগো এই সর্বনাশ করি গেলরে ? মুই বামু জমিদার থনে নালিশ করতি। আমাগো ডোয়ার মধ্যে থেইক্যা বাঁশি বাজাইয়া সাপ ধর্যা লইয়া যায়, ইহার বিচার করতি হইবেক।"

সুবর্ণ হাসিতে লাগিল, "নালিশ করে সুবিধা করতে পারবে না, লোকে তোমাকে দুয়ো দেবে। জমিদারবাবু হুকুম দিয়েছেন গাঁ থেকে বর্ষার জঙ্গল পরিষ্কার করতে, সাপ মেরে ফেলতে। এতদিন ত সাপ পুষে দুধকলা খাওয়ালে, এবার একটি বেজি পোষ, সে তোমার বিছানার পাশে শুয়ে থাকবে মামী। তিনু গোয়ালার অনেকগুলো পোষা বেজি আছে, তাদের ছানা হয়েছে, তুমি আজকে যেয়েই একজোড়া নিয়ে এস। তারাও তোমার দুধকলা খাবে। আজ বুঝি ভাত রাঁধ নি ? চানও করনি ? দুধ জাল দাওনি, ঘটিতে পড়ে রয়েছে।"

"কোন্ সুখে ভাত-জল পরাণে দিমু মা ? কি হবেক দুধে ; মোর দুধরাজ অহিরাজ খাইবে না। পরাণডা বিছু বিছু করতি নেগেছে।"

"তোমার পরাণ বিছু বিছু রেখে চল মামী আমার সাথে, দীঘিতে চান করে মার কাছে চারটি ভাত খেয়ে নেবে। দুধের ঘটিটা নিয়ে এস, ওখান থেকেই আমি জ্বাল দিয়ে দেব। সাপের জন্যে এমন করে কেঁদে কেঁদে পাগল নাম কিনো না। বেজি আন, তারাই তোমার কলা খাবে।" বলিয়া সুবর্ণ উঠিল।

বামা দ্বারে শিকল টানিয়া দিয়া দুধের ঘটি লইয়া চলিল সুবর্ণ বিনুর পিছনে পিছনে।

—

রাত্রে প্রসাদের সহিত বিনুর দেখা হইলে প্রসাদ কহিল, "হরিহরপুর গাঁ আমার ভারী ভাল লাগছে। যেমন উন্নত পল্লী তেমনি সদাশয় জমিদার। সাধারণ একটা গাঁকে শহরে পরিণত করে তুলেছেন। একেই বলে টাকার যথার্থ সদ্ব্যবহার। যেমন সৎ কাজে দান, তেমনি প্রকৃত দেশ-সেবা। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে নাকি বাজারের সমস্ত বিলেতি কাপড় কিনে নিয়ে জমিদার পুড়িয়ে দিয়েছেন।"

বঙ্গভঙ্গের বিষয় ভালরূপে বুঝিতেই পারে না বিনু। সে আবার কি ? দেশসেবার মানেও জানে না সে। স্বামী বা সুবর্ণের নিকটে প্রশ্ন করিয়া বিশদ বিবরণ জানিয়া লইতেও তাহার কুণ্ঠা হয়। তাই সে বঙ্গভঙ্গ প্রসঙ্গ এড়াইয়া ভাসা-ভাসা ভাবে উত্তর দিল, "এখানকার জমিদার বাবুর সমস্তই ভাল। কেবল মন্দ হল দুটো বিয়ে করা, আর রাতে বজরা নিয়ে বাগানে যাওয়া।"

প্রসাদ ক্ষণেক চিন্তা করিয়া কহিল, "চরিত্রের এই দুর্বলতা ওঁরা যুগ-যুগান্তর হ'তে প্রশ্রয় দিয়ে এসেছেন, তাই চরিত্রগত দোষকে দোষ বলে মনে করতে পারেন না। শত সহস্র মহৎ গুণের ভেতরে ওই সাধারণ দোষটাকে সকলেরই ক্ষমা করা উচিত। আজকালের মানুষরা সভ্য হয়েছে, সংযত হয়েছে, সেইজন্যে বহুবিবাহের প্রচলন থেমে যাবার মধ্যে। নইলে সেকালের লোকেরা বহুবিবাহকে দোষণীয় মনে করেনি। তারা মনে করেছে কন্যাদায় থেকে কারোকে উদ্ধার করাই মহাপুণ্য।"

বিনু সহসা জ্বলিয়া উঠিল, "একটা পুরুষের দুই-তিনটে বৌ শুনলে আমার ঘেন্না করে। মেয়েদের যেমন এক স্বামী, পুরুষদের তেমনি এক বৌ থাকবে। মানুষের যদি চরিত্রই না থাকে, তা হ'লে থাকল কি ? রেখে দাও তোমার মহৎ অশেষগুণ, ঠাকুমা যে বলেন 'ঘি দিয়ে ভাজ নিমের পাত, তবু তার থাকে জাত।' এও তেমনি, ঘরে দুই দুটো বৌ রেখে যে সারারাত বাইরে থাকে, সে আবার কিসের ভাল, তার আবার লোকের উপকার কিসের ? মরণ অমন জমিদারের। ওর চেয়ে গরীব হওয়া ভাল।"

প্রসাদ সবিস্ময়ে তাকাইয়া রহিল বিনুর দীপালোকে উত্তেজিত মুখের প্রতি। যাহাকে সে নিতান্ত অবলা অথলা ভাবিয়া রাখিয়াছে তাহার ভিতরে গোপনে রহিয়াছে সুপ্ত নারী-প্রকৃতি। এখনই সে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সজাগ হইতে উদ্যত। প্রসাদ মনে মনে খুশী হইল, তাহার স্ত্রী তাহা হইলে মাটির ঢেলা নয়, ইহার মধ্যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ লুকাইয়া রহিয়াছে, কালে সেই আগুনে ঘর জ্বালাইয়া দিতে তাহার সাহসের অভাব হইবে না।

প্রসাদ এ প্রসঙ্গ এড়াইবার জন্য কহিল, "থাকুকগে ওসব কথা, যার যা ইচ্ছে করুকগে। আজ দিদি যে বড় এলেন না তোমার দোসর হয়ে ? রোজ যে তিনি তোমাকে দিয়ে যান বাঘের গুহায় ?"

বিনু ফিক করিয়া হাসিল, "তুমি কি বাঘ ? স্বামী আবার বাঘ হয় কবে ? বাঘের মুখ থেকেই ত স্বামীরা চিরকাল স্ত্রীদের রক্ষে করে ? দিদি আজ চিঠি লেখা নিয়ে ব্যস্ত। বিকেলে জামাইবাবুর চিঠি এসেছে কি না, তার উত্তর দিতে সকলকে লুকিয়ে চুরিয়ে সুযোগ খুঁজে

বেড়াচ্ছিল। বাবা চিঠির জন্য কি কাণ্ড! কাল গিয়েছিল বগলার বারে।''

"উনি ঐ সব বিশ্বাস করেন? ছোটলোকের আড্ডায় বারে গিয়েছিলেন? তুমি নিশ্চয় ওঁর সাথী হয়েছিলে? একজনার যেন চিঠি পাবার ব্যাকুলতা, আর একজনার জিজ্ঞাস্য ছিল কি?"

"কি আবার? দিদি নিয়ে গেল, গেলাম। কখনো দেখি নি, দেখা হ'ল। কিন্তু তোমরা বিশ্বাস না করলে কি হবে? কাল বগলা বলেছিল, চিঠি আসবে। ঠিক আজ এসে গেল।''

"হাঁ, বিশ্বাসের মূল্য আছে বইকি, একেবারে দৈব বাণী। দেখা-শোনা খাওয়া-পাওয়ার কিছু বাকী রইল না, এবার নৌকা ভাসাবার পালা। মা বলে দিয়েছিলেন তিন দিনের কথা, আজ হ'ল চার দিন, আর দেরি করা উচিত নয়। কাল দাদুকে ফিরে যাবার ব্যবস্থা করতে বলব। দীপান্বিতা পূজো এসে গেল, মাঝে আর ক'টা দিন?''

বিনুর মুখ মলিন হইল, হায়, সুখের দিন স্বপ্নের মত কোথায় দিয়া যেন নিমেষে ফুরাইয়া যায়। এই শান্ত স্নিগ্ধ সরস পরিবেশ হইতে সেই তিক্ততার ভরা রায়বাড়ীতে কি কাহারও ফিরিয়া যাইতে সাধ হয়? কিন্তু তবুও যাইতে হইবে। যাহার আকর্ষণে ফিরিবে সেই বা আর কয়টা দিন কাছে থাকিতে পারিবে? তাহার পরে—বিনু আর ভাবিতে পারে না। তাহার হৃদয়ে কি যেন এক অনুভূত ব্যথা খচ খচ করিয়া ওঠে। এ ব্যথা এতকাল অজানা, অনুভূতির বাহিরে ছিল।

চৌধুরীদের কর্ত্তামার দেওয়া সিঁথিটা প্রসাদ দেখে নাই জন্য সুবর্ণ তাহার ললাটে পরাইয়া দিয়াছিল। হাতে গলায় গহনা নয়, ললাটিকা ললাটেই থাকে। ভাঙিয়া যাইবার ভয় কম।

হঠাৎ প্রসাদ বিনুর কপালের সিঁথির ধুকধুকিটা স্পর্শ করিয়া কহিল, "কর্ত্তামার যে এটা দেবার কি মানে হ'ল আমি তা বুঝি না, বাবা শুনলে কি ভাববেন? আদর করে ডেকে-ছিলেন, যত্ন করে খেতে দিয়েছিলেন, তাই হয়েছিল যথেষ্ট, তার ওপরে আবার গহনা উপহার কেন?''

বিনুর মন ভার হইয়াছিল বলিয়া যাইবার আশঙ্কায় সে গম্ভীর হইয়া কহিল, "সম্পর্ক যে বেরিয়ে গেল, উনি আমার পিস্ শাশুড়ী, শাশুড়ী হলেই সোনা দিয়ে বৌয়ের মুখ দেখতে হয়। তাতে আর হয়েছে কি? এটার আঁকড়ে ডুটো লাগানো রয়েছে আমার চুলে, তুমি খুলে দেবে? আমি তুলে রেখে আসি ঝাঁপির ভেতরে। দিদির সব যেন আদিখ্যেতা। সিঁথি মাথায় পরে আবার শোয় কে? সুমুদিদি বলেন জামাইবাবুকে ছেড়ে ও নাকি থাকতে পারে না। কি বলে, কি করে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। আমাদের জন্যেই রয়েছে এখানে। আমরা গেলেই ও সেখানে গিয়ে সুস্থির হবে।''

প্রসাদ বিনুর চুলের মধ্য হইতে সিঁথির আংটা সাবধানে খুলিয়া দিতে দিতে জবাব দিল, "দিদি যেমন সুস্থির হবেন ডাক্তারবাবুর কাছে গিয়ে, তুমিও তেমনি সুস্থির হবে আমি কলকাতায় বিদায় হলে, প্রাণ ভরে ঘুমিয়ো।''

বিনু উত্তর দিল না, এ সব রসের কথা তাহার ভাল লাগিতেছিল না।

পরের দিন প্রভাতে প্রসাদ প্রস্তাব করিল তাহাদের ফিরিয়া যাইবার। দাদামহাশয় তাহাদিগকে তিন দিনের কথা বলিয়া এখানে লইয়া আসিয়াছিলেন, সে তিন দিন ত উত্তীর্ণ হইয়াছে। কালী পূজারও তেমন দেরি নাই। কাজেই রাঙা ঠাকুরকে ক্ষুণ্নমনে পঞ্জিকা খুলিয়া আবার যাত্রার শুভ দিনক্ষণ নির্ণয় করিতে হইল। উৎসবে-আনন্দে মণ্ডিত গৃহে যেন বিচ্ছেদের মেঘ নামিয়া আসিল।

বিনুরা তিন দিন পরে চলিয়া যাইবে, মাত্র তিনটি দিন। তাহার পরমানন্দ আর কতটুকু? প্রতিবেশিনীরা নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন, তাঁহাদের গৃহে গৃহে জামাতা ভোজন বাদ পড়িয়া গেল। এ গ্রামে ভোজন-পর্ব্ব ছয় মাসে শেষ হইত কি না সন্দেহ। সেক্ষেত্রে বিনুদের সাত দিনের বেশি থাকা হইবে না।

ফিরিবার দিন স্থির হওয়াতে বিনুর চিত্তে সুখ ছিল না। সে সকলের পাশ কাটাইয়া দিদিমার বিছানায় শুইয়া ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দমঠ'' পড়িতেছিল। সহসা তাহার যেন বই পড়িবার একটা উগ্র নেশা ধরিয়া গিয়াছে। এ পাঠ্যানুরাগের উৎপত্তি অল্প দিন হইল।

পড়িতে পড়িতে তাহার মানস চক্ষের সম্মুখে আসিতে লাগিল ঘনচ্ছায়াময় পথ বাহিয়া দলে দলে সন্তানের দল যাইতেছে দেশরক্ষা করিতে। তাহাদের মধ্যে মিশিয়া আছে প্রসাদ। বিনু যেন কাহার মায়ামন্ত্রে শান্তিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। বাহিরে শান্তির জন্য ঘোড়া প্রস্তুত, শান্তি গাহিতে গাহিতে বাহির হইবে—

"দড়বড়ি ঘোড়া চড়ি কোথা তুমি যাও রে?
সমরে চলিনু আমি, হামে না ফিরাও রে!''

"সই, তোর কি অসুখ হয়েছে? অসময়ে শুয়ে রয়েছিস্ কেন? সুবর্ণদি কোথায়? দেখছি না যে?''

বিনু সচমকে উঠিয়া হাতের বইখানা বন্ধ করিল।

কুসুম আসিয়াছে, আজ সারাদিন সইয়ের

থাকিতে। পাঠের ব্যাঘাত হওয়াতে বিনুর মনটা তেমন প্রসন্ন হইল না। এতদিনে বিনু বুঝিতেছে প্রসাদ পুস্তকের পাতায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া থাকিতে কেন ভালবাসে। বইয়ের পাতার মধ্যে যাহা থাকে সে আনন্দ কি আর কোথায়ও পাওয়া যায় ?

বিনু কুসুমকে সাদরে কাছে বসাইয়া কহিল, "তুই আজ এসে ভাল করেছিস্ সই ; আমরা যে চলে যাব আর দুই দিন পরে। দিদি চাকরকে চিঠি ডাকে দিতে পাঠিয়ে কানুকে নিয়ে গেছে তার পেছনে। ঠিক মতন তার চিঠি ডাকে যায় কি না তাই দেখতে। আমার অসুখ করে নি, অমনি শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিলাম।"

"কি বই, আনন্দমঠ ? তুইও কি বন্দেমাতরমের সাধনা করছিস্ নাকি ? এখানেও যে পথে-ঘাটে আকাশে-বাতাসে বন্দেমাতরমের জিগির উঠেছে। মুকুন্দদাসের বক্তৃতায়, গানে, ঘুমন্ত মানুষের ঘুম ভেঙ্গে গেছে।"

বিনু কুসুমের দিক হইতে তাড়াতাড়ি চোখ নামাইয়া মস্তক নত করিল। তাহার চিত্তে জাগিতে লাগিল একটা ক্ষমাহীন অব্যক্ত ধিক্কার। হরিরামপুরের সাধারণ মেয়েরা যাহা জানে, বিনু সেটুকুও জানে না। সেই জন্যই তাহার স্বামী একটা অমানুষকে মানুষের পর্য্যায়ে উন্নত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। তাতে আবার তাহার রাগ, বিরক্তি।

বিনুর নীরবতায় কুসুম ঈষৎ আহত হইয়া পুনরপি বলিতে লাগিল, "এবার শুয়ে-বসে থাকবার যুগ পালটে যাচ্ছে সই, এখন নাকি আমাদের সেকালের মতন চরকা কাটতে হবে। বাড়ীতে মিস্ত্রী বসে গেছে সকলকার জন্যে এক একটা চরকা বানাতে। মা পিসীমারা কার্পাস তুলোর পাট করছেন। আমি স্পষ্ট বলে দিয়েছি আমার দ্বারা চরকায় সুতো কাটা হবে না। কাঁথার নক্সা, চটের আসন তাই বুনেই সময় পাইনে, তার আবার চরকা ?"

এতক্ষণে বিনু সহজ ও স্বাভাবিক হইল। যাক্, বন্দেমাতরম্ আনন্দমঠের প্রসঙ্গ চাপা পড়িয়া গেল। কুসুম তাহাকে আর অজ্ঞ ধারণা করিতে পারিবে না।

বিনু তাচ্ছিল্যভরে ঠোঁট উল্টাইয়া উত্তর দিল, "আদ্যিকালের বদ্যি বুড়ীর মত এখন আবার চরকা কাটবে কে ? আমাকে সুতো কাটতে বললে আমিও বাপু কাটব না। যে বুড়ো মানুষরা চরকা তাকে তুলে রেখেছে তারাই ফের ঘ্যানর ঘ্যানর করুক গে।"

"যারা তখনও করেছিল, তারা এখনও ছাড়ে নি সই, আমার মেজ পিসীমার শাশুড়ী, যাঁর আশী বছরের ওপরে বয়েস হয়েছে, তিনি নাকি এখনো সমানে চরকায় সুতো কেটে সেই সুতো তাঁতী বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে কাপড় করে পরেন। অন্য কাপড় পরেন না। মেজ পিসীমা ভারী মজা করে বলেন শাশুড়ীর গল্প। তিনি নাকি চরকা ঘোরাতে ঘোরাতে ফোকলা মুখে গান করেন—

'চরকা আমার স্বোয়ামী পুত, চরকা আমার নাতি,
চরকার দৌলতে আমার দুয়ারে বাঁধা হাতী'।"

বিনু কৌতুকে খিল খিল করিয়া হাসিয়া কুসুমের গায়ে লুটাইয়া পড়িল। বিনুর শরীরের চাপে কুসুমের সেমিজের মধ্য হইতে আত্মপ্রকাশ করিল একখানা এনভেলাপের চিঠি। বিনু সাগ্রহে চিঠিখানা তুলিয়া প্রশ্ন করিল, "তোর চিঠি এসেছে সই ? কবে পেলি সয়ার চিঠি, কি লিখেছে রে ?"

"যা লিখেছে পড়ে দেখ্ না কাল পেয়েছি চিঠি, তোকে দেখাতেই আনলাম।"

সেকালের সখিত্বের নিবিড় নিদর্শন ছিল স্বামীর পত্র আসিলে পরস্পরকে দেখানো। কুসুম তাহাদের বন্ধুত্বের ত্রুটি রাখে নাই। বিনু খামের ভিতর হইতে চিঠিখানা বাহির করা মাত্র, কুসুম ত্বরিতপদে উঠিয়া গৃহের মুক্ত দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। এ ব্যাপার যেন অতিশয় লজ্জার বিষয়, গোপনীয় সম্পদ।

কুসুমের স্বামী দানাপুরে রেলে কাজ করে। এখনও সপরিবারে থাকিবার পৃথক্ আবাস পায় নাই। পাওয়া মাত্র সে কুসুমকে লইয়া যাইবে। কুসুম-বিহনে তাহার দিবস-রজনী কাটিতে চাহিতেছে না। জীবন শূন্য বলিয়া উপলব্ধি হয়। ভদ্রলোক নাটকীয় ভঙ্গিতে আবোল-তাবোল লিখিয়া চিঠির কাগজের ছয় পৃষ্ঠা ভরাইয়াছে।

পত্রের উপসংহার করিয়াছে কয়েক লাইন পদ্যে—

"তোমারে পাইব কবে, জুড়াতে তাপিত প্রাণ,
হইবে আমার কবে বিরহের অবসান।"

ইতিপূর্ব্বে বিনু কাহারও প্রেমপত্র পাঠ করে নাই। প্রসাদের কয়েকটা চিঠি, যাহার মধ্যে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস নাই, আবেগ নাই, কেবল একঝুড়ি উপদেশ, আর শিক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে নীতিবাক্যের অবতারণা। তাহাই প্রেমপত্র বলিয়া বিনু মানিয়া লইয়াছিল। আজ তাহার প্রেমপত্র বিষয়ে ভুল ভাঙ্গিয়া গেল। কই প্রসাদ ত তাহাকে এমন প্রাণ ঢালিয়া একখানাও চিঠি লেখে নাই ? জিখিল কিনা রেলের কর্ম্মচারী, যার ঝাঁটার মতন গোঁফ, গোমড়ামুখ, সেই কুসুমের স্বামী।

বিনুর সুকোমল হৃদয়ে ভিমরুলের একটু হুল ফুটিলেও সে মুখে হাসিয়া টানিয়া আনিয়া কহিল, "তোর জন্যে অস্থির হয়ে কি সুন্দর লিখেছেন সই ? গোঁফ রেখেছেন বলে তুই যাকে পছন্দ করিস নে, তিনিই তোকে কত ভালবাসেন।"

কুসুম খুশী মনে চিঠিখানা বুকের জামার ভিতরে

লুকাইয়া তার মুক্ত করিয়া দিল। তাহার পরে যথাস্থানে ফিরিয়া ফিস ফিস করিয়া বলিল, "মেলায় থেকে ত বেছে জিনিস কিনি নি সই, ভগবান্ যা দিয়েছেন তাই নিতে হয়েছে। তা উনি মন্দ নন, আমি দানাপুরে গিয়েই গোঁফ চাঁচিয়ে নেব। প্রসাদবাবুর দুই-একটা চিঠি তুই আনিস নি কেন সই? আমার বুঝি দেখতে ইচ্ছে হয় না? উনি বোধ হয় ওঁর থেকেও ভাল লেখেন? অমন হাসিখুশী মানুষ, উনি কি খারাপ চিঠি লিখতে পারেন?"

বিনু ঘাড় নাড়ে, "হাঁ, ভাল চিঠি লেখেন। তোকে দেখাতে আনব কি করে? সাথে যে দাদামশায়, মা, দিদি টের পেতেন?"

বাহিরে পদশব্দ শুনিয়া দুই সখী থামিয়া সংযত হইল।

সুবর্ণ ছেলে কোলে ফিরিয়া আসিয়াছে। কানুকে মেঝেয় বসাইয়া দিয়া কলকণ্ঠে ঝঙ্কার দিল, "মাগো, ছেলে নয় ত ডাকাত। আমায় শেষ করে দিয়েছে। সারাপথ একবারও হাঁটে নি, নামে নি, ঘাড়ে চড়ে মজা করে এলেন হতচ্ছাড়া।"

কুসুম জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোথায় গিয়েছিলে সুবর্ণদি?" বিনু আগু বাড়াইয়া ফর ফর করিয়া উত্তর দিল, "রাত জেগে কাল জামাইবাবুকে চিঠি লেখা হয়েছিল। সেই চিঠি আজ ডাকে দেওয়া হ'ল। চাকর ঠিক মতন ডাকবাক্সে দেয় কি না তাই পরীক্ষা করতে দিদি গিয়েছিল চাকরের পেছনে। এখন বকা হচ্ছে কানুকে। সাত-সকালে ছেলেমানুষ কি অত হাঁটতে পারে? আমার কাছে ওকে রেখে গেলেই পারতে? বকছো কেন?"

"তোর কাছে রেখে যাব কি করে? তুই ত তখন সারা-নিশি জাগরণে ঢুল ঢুল দু'নয়নে সবে ঘরের কপাট খুলে বের হয়েছিস্। নাম হ'ল আমারি, তোরা কেউ ফেল্‌না নয়। কুসী এসেছে কি সামগ্রী নিয়ে আমি যেন টের পাইনি? 'তোরা হাঁটিস ডালে ডালে, আমি হাঁটি পাতায় পাতায়।' ওকে বকছি কেন? বকবো না সোহাগ করবো? যখন নিজেদের হবে তখন টের পাবি ছেলে মানুষ করা কি ঝকমারি। ওমা, তোদের হ'ল কি রে? ছেলের নাম শুনেই যে লজ্জাবতী লতারা নুইয়ে পড়লেন। এতে লজ্জার হয়েছে কি? আমি কি আজ-কালের কথা বলছি, চার-পাঁচ বছরের কথা রে। তখন তোরা মা হবি। আবার মুখ রাঙা করে মাথা নামিয়ে থাকে? জন্মেই যে পুতুল খেলা করেছিলি, তখন লজ্জা করে নি? রামার ছেলের সাথে শ্যামার মেয়ের বিয়ে দেওয়া, বড়দের নেমন্তন্ন করে ধুমধাম করা। সেই সময় থেকেই যে তোরা মা হবার পাঠ নিয়ে রেখেছিস্। আমি বর দিচ্ছি তোদের, বিনু বিষয়ী ঘরে পড়েছে, বিষয়ওয়ালা ঘরে বেশি ছেলে-মেয়ে ভাল নয়। সম্পত্তি ভাগ হয়ে যায়। সেই জন্যে বিনুকে বর দিচ্ছি দুই ছেলে এক মেয়ের। আর শোন্ কুসী, তোর হবে পাঁচটা ছেলে একটা মেয়ে। তুই পাঁচ-পাঁচটা পাঁঠা বিয়ের বাজারে বিক্রী করে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা নিয়ে বিষয় কিনিস্।"

কানু এতক্ষণ চুপ করিয়া মায়ের বচন-সুধা পান করিতেছিল। এখন উল্লসিত হইয়া আবদার করিতে লাগিল, "মা, কানু পাঁতা নেবে। পাঁতা দে। পাঁতা তই?"

"তুমিই ত একটা মূর্তিমান পাঁঠা কানু, ডাক্তার উপস্থিত থাকলে তাঁকেও না হয় দেখিয়ে দিতাম।"

সুবর্ণর বলিবার ভঙ্গিতে দুইটি কিশোরী মুখ তুলিয়া খিল খিল শব্দে হাসিয়া উঠিল। তাহাদের হাসির সহিত কানু কচি দুধের দাঁত বিকশিত করিয়া হাসির লহর তুলিল।

গঙ্গামণির ইচ্ছা ছিল খনার "সোমে যাত্রা মঙ্গলে পা যথা ইচ্ছা তথা যা।" কিন্তু বার পাওয়া গেল না। শুভদিনেই উষাযাত্রা করিয়া আম্রপল্লব দধি ও সিঁদুর-শোভিত মঙ্গলঘট নিরীক্ষণ করিয়া মণ্ডপে প্রণামান্তে বিনুরা বিদায় লইল হরিহরপুর হইতে। নদীর ঘাট অবধি গঙ্গামণি সুমিত্রা সুবর্ণ কানু নিকটতম প্রতিবেশিনীর দল বিনুদের বিদায় দিতে সঙ্গে আসিয়াছিলেন। রাঙাঠাকুর সকলকে পৌঁছাইয়া দিয়া পরের দিন ভোরে ফিরিয়া আসিবেন ঠিক হইয়াছিল। বিনুরাও রাত্রিটা মায়ের কাছে থাকিয়া প্রভাতে চলিয়া যাইবে রায়বাড়ীতে।

নৌকার কাছি খুলিয়া দেওয়া হইল। তীরে সমবেত সকলের সজল বিষণ্ণ মুখের প্রতি তাকাইয়া বিনু আর নিজেকে সম্বরণ করিতে পারিল না। উচ্ছ্বসিত অবারিত অশ্রুজলে তাহার গণ্ড ভাসিয়া যাইতে লাগিল। একেই সে হরিহরপুরকে ভালবাসিত প্রাণ ভরিয়া। তাহার জন্মভূমি ছিল তাহার নিকটে স্বপ্ন দিয়া ভরা, শান্তির নিলয়। অল্পকালের নিমিত্ত আসিয়া ফিরিবার সময় প্রত্যেক বার তাহার হৃদয় মথিত করিয়া বেদনায় টন টন করিত। এবার সেই ব্যথার স্থানে যুক্ত হইয়াছে সুবর্ণর সান্নিধ্য, কানুর সুমিষ্ট পরশ।

নৌকার কাটা ছইয়ের মাঝখানে দাঁড়াইয়া বিনু অনিমেষে চাহিয়া রহিল তটের অশ্রুসিক্ত প্রিয় মুখগুলির দিকে।

কানু গঙ্গামণির কোলে হাত-পা আছড়াইয়া কাঁদিতেছে "কানু মাতি যাবে। কানু পায়ে তলে মাতি যাবে।"

ক্রমে অস্পষ্ট হইয়া মিলাইয়া গেল শিশুর আকুল ক্রন্দন, ক্রমে তীর-তরুর অন্তরালে বিলীন হইল প্রিয় মুখচ্ছবি।

আজও নৌকার দুই ভাগে দুইটি বিছানা ছিল

প্রসারিত। বিনু পশ্চাৎভাগের বিছানায় গিয়া আশ্রয় লইল। সম্মুখের অংশে রহিলেন দাদামহাশয় ও প্রসাদ। মাঝখানে হেমাঙ্গিনী জলের পানে তাকাইয়া আনমনা।

কয়েক দিন পূর্ব্বে যাহারা এই নদী বাহিয়া গিয়াছিল আশায় আনন্দে প্রদীপ্ত; তাহারাই ফের ফিরিয়া যাইতেছে বিপুল বেদনার ভার বহিয়া। মানব-জীবনের সুখ আনন্দ মাত্র ক্ষণস্থায়ী, তাহার মূল্য নাই।

বিনু খানিক কাঁদিয়া তাহার হৃদয়ের ভার লাঘব করিয়া লইল। তাহার পর দাদামহাশয়ের দপ্তর হইতে আনীত বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর পাতা উল্টাইতে লাগিল। আনন্দমঠ তাহার পড়া শেষ হইয়াছে। সে এবার পড়িতে সুরু করিল 'কৃষ্ণকান্তের উইল'।

ওদিকে ললিতের নিকট হইতে প্রসাদও পড়িতে আনিয়াছে বিদেশী সাহিত্যের একখানা বিরাট্ মোটা বই। কলিকাতায় যাইয়া বইখানা ললিতকে ফিরাইয়া দিবে।

প্রসাদ বই খুলিল, বিনুর চোখের সামনেও তাই। অগত্যা রাঙ্গাঠাকুর মেয়ের পাশে আসিয়া আসন লইলেন।

সেই নদী, তটভূমি, সারি সারি ধানবোঝাই নৌকা, গাঙ-শালিকের কিচির-মিচির। সেদিন ছিল রৌদ্রকরোজ্জ্বল নীলাকাশ, আজ মেঘমণ্ডিত।

বেলা হইয়া গেল, তথাপি আকাশের মুখে হাসি ফুটিল না। আকাশ-মেঘাচ্ছন্ন নদীপথ। হেমাঙ্গিনী উদ্বেলিত হৃদয়ে ডাকিলেন, "ভজনদাদা, আজ যে রোদ উঠছে না; আকাশভরা মেঘ, ঝড় উঠবে না ত?"

ভজন মাঝি হাল ধরিয়া ক্ষুদ্র গবাক্ষ-পথে মুখ বাড়াইয়া আশ্বাস দিল, "না দিদি, ওডা ঝইড়া ম্যাঘ লয়। পূজ্যার পরে গাঁগর নামে নি; এবার কাত্যালী নামাইয়া শীত পড়িবে। তারই যোগাড় দেখন দিইচে।"

হেমাঙ্গিনী আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, "বৃষ্টির পরেই শীত নামবে ভজনদাদা; শীতকালে ঝড়-তুফানের ভয় না থাকলেও জলের ওপরে উত্তুরে বাতাসের ভেতরে নৌকা বাইতে তোমাদের ভারী কষ্ট হয়?"

"না দিদি, কষ্ট কিসের। 'শরীলের নাম মহাশয় যা সহাও তাই সয়।' ছাওয়াল বয়েসে বাপ ঠাকুর্দ্দা গঙ্গামার পূজ্যা দিয়া হালে বস্যাইয়া দিয়াছেল, তহন থেক্যেই রইচি বইস্যা, বুড়া হইয়া গেইছি, মার বুকের পরে বইস্যা জীবনপাত করিচি। ঝড়ে তুফানে জাড়ে গাঁগরে মা গঙ্গা রক্ষে করে আইছেন। যে কয়ডা দিন আর আইচি, হাড়ে কাঁপন লাগলেও হাল ছাড়মু না দিদি। সোনামা যে কেতাপ খুইল্যা শুইয়া পড়িছেন, মনডা ভার হইচে। আসনের কালে কি মাতামাতি কর‍্যাছিল। যাওন কালে সুস্থির হইয়া রইছেন।"

হেমাঙ্গিনী ভজনের কথার জবাব না দিয়া মেয়ের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

মেয়ে তখন গোবিন্দলাল ও ভ্রমরের প্রেমের কাহিনীতে তন্ময়। এতদিন সে এ রসের আস্বাদ পায় নাই। পিত্রালয়ে কত পুস্তক হাতের কাছে পাইয়াও তাহার পাতা খুলিয়া দেখে নাই। হঠাৎ তাহার পাঠের ক্ষুধা জাগ্রত হইয়াছে। ক্ষুধিতের মতন সে গ্রাস করিতেছে মধুর ভাণ্ডার।

ভেড়াখোলার নদী পাড়ি দিয়া এ পাড়ে আসিয়া রান্নাবাড়ার আয়োজন হইল। তিন-চার জাতের মাছ কেনা হইয়াছিল। হেমাঙ্গিনী রান্না চড়াইলেন। রাঙ্গাঠাকুর সেখানে উপস্থিত থাকিয়া মেয়েকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। ওদিকে প্রসাদ পাঠে মগ্ন। এদিকে বিনু ভ্রমরের দুঃখে কাঁদিয়া কাঁদিয়া মাথার বালিশ ভিজাইয়া ফেলিয়াছে। যে দিন যায় তাহা আর ফিরিয়া আসে না। মাত্র এক সপ্তাহের ব্যবধানে বিনুর চিত্তের গতিবেগ প্রবাহিত হইয়াছে ভিন্ন পথে।

আবার রায়বাড়ী। বিনু সারা রাস্তা ভয়ে-ভাবনায় দিশাহারা হইয়া আসিয়াছে। মাত্র তিনদিনের কড়ারে শ্বশুর-শাশুড়ী তাহাদিগকে যাইতে দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা যাতায়াতে রাস্তায় দুই দিন এবং হরিরামপুরে পূরা এক সপ্তাহ অতিবাহিত করিয়া নয় দিনের দিন ঘরে ফিরিল: তাঁহারা হয়ত বিরক্ত হইয়াছেন। সকলে নানা কথার অবতারণা করিবে। কিন্তু তাহা নহে।

বিনুর দাদামহাশয় দিদিমা বিনুর সহিত বহুবিধ দ্রব্য-সম্ভার সরবরাহ করিয়াছিলেন। চার হাঁড়ি ছানা-ক্ষীরের মিষ্টান্ন, দুই হাঁড়ি চিনির সাঁচ বাতাসা। লাল শালুর থলে ভরা ভরা একধামা নানাবিধ মশলা। সেকালে নববধূদের সহিত নানা প্রকার মশলা পাঠাইবার রীতি ছিল। এক লঙ্কা গোলমরিচ বাদে রান্নার ও পানের মশলা দিতে হইত। মেয়ে শ্বশুরালয়ে আদরিণী হইবে এই আশায় চাপড়া চাপড়া আদা পাঠান হইত। ব্রাহ্মণ কন্যাদের সঙ্গে আসিত পৈতা।

গঙ্গামণি একখানা বাঁশের ডালায় মিহি সূতার শতখানিক পৈতা দিয়াছিলেন বিনুর সঙ্গে। আর ঝাঁকা ভরা কাঁসার বাসন।

দুই স্বামী-স্ত্রী নানা তীর্থ পরিক্রমা করিয়াছেন। তীর্থে গেলেই নাকি বাসন কিনিতে হয়। এত বাসনের বোঝা তাঁহারা সঞ্চয় করিয়া রাখিবেন কাহার জন্য? তাঁহাদের সঞ্চিত যাহা কিছু এখনও যাহাদের, পরেও তাহাদেরই।

বিশেষতঃ বিবাহের পরে মেয়েকে পুনরায় পাঠাইবার সময় "ঘর বসতের" কিছু বাসন দিতে হয়। গুরুজনাদের কাপড় প্রণামী দিতে হয়। বাড়ীর অগুরুজনরাও লাভে বঞ্চিত হয় না।

রাঙ্গাঠাকুর নাতজামাই ও নাতনীকে জোড়া জোড়া কাপড় দিয়া বাড়ীর প্রতিজনার নামে নামে প্রণামীর কাপড় পাঠাইয়াছেন। তাঁহার আদরের সোনা চৌধুরীদের জমিদার তনয়ার পায়ে পাইজোড় দেখিয়া পছন্দ করিয়াছিল, তাই তিনি শশী স্যাকরাকে রাত্রি জাগাইয়া বিনুর পায়ে পরাইয়া দিয়াছেন একজোড়া চাঁদির পাইজোড়। আঙ্গুলে একটি সোনার শিল আংটি। গঙ্গামণি তাঁহার হাতের বাজু ও চালের মত একজোড়া কানবালা দিয়াছেন বিনুকে। বিবাহের সময় নূতন গহনা উপহার দিয়াছিলেন। এবার দিয়াছেন নিজের অঙ্গের।

কাহারও নিকট হইতে উপকার ও দান গ্রহণ করিতে রায়দের আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। ইহারা লোককে দিয়াই যান। সহজে কাহারও কাছে দান লইতে পারেন না। কিন্তু কুটুম্বদের বেলায় ভিন্ন বিধান। কুটম্বের তত্ত্বতালাসে ইহাদের মর্য্যাদা বৃদ্ধি পায়।

ঘরভরা জিনিষপত্র দেখিয়া সকলে পুলকিত। প্রসাদ-মা'র কাছে তাহাদের বিলম্বে ফেরার অজুহাত দিতে গিয়াছিল। মা সহাস্যে কহিলেন, "নদীর পথে অতদূরে যাওয়া, তার কি দিনক্ষণ ঠিক থাকে? তোরা যে ভালয় ভালয় এসেছিস, এই মঙ্গল।"

তরু কোথায় হইতে ছুটিয়া আসিয়া দুই হাতে বিনুকে জড়াইয়া ধরিল। তাহার প্রথম আলাপ "বৌদি, তোমরা চলে গেলে বড়দির শাশুড়ীর অসুখের খবর পেয়ে জামাইবাবু বড়দিকে নিয়ে চলে গেছেন। মেজদি ক'দিন থেকে যাবে ভাইফোঁটার পরে। ও বাড়ীতে অনঙ্গ পিসীমা এসেছেন, অনঙ্গমোহিনী লবঙ্গ পিসীমার দিদি। মেজদাদার মাষ্টার-মশায়ের কাছে সকাল-সন্ধ্যেয় বাবা আমাকে পড়তে বলেছেন। এ কি বৌদি, তোমার এ কি সাজের বাহার হয়েছে? কপালে সিঁথির ওপরে সিঁথি। অনন্ত তাবিজ জশমের ওপরে বাজু, মলের সাথে পায়জোড়, আংটির পাশে নতুন আংটি, বাবাঃ কানে আবার কানবালা না চাকা? ক'দিনের জন্যে দাদামশায়ের কাছে গিয়ে হাতড়িয়েছ ত কম নয়?"

হরিরামপুর যাইবার সময় বিনুর সর্ব্বাঙ্গে গহনা দিয়া মধুমতী সাজাইয়া দিয়াছিল। ফেরার সময় মাও তেমনি সাজাইয়া দিয়াছেন। একটার উপরে আর একটা চাপাইয়া দিলে ক্ষতিই বা কি? যাহার আছে সে পরিবে না কেন?

সোনার ভারে ক্লান্ত বিনু তরুর শরণাপন্ন হইল, "এর কতকগুলো খুলে নিয়ে তুই পরে থাক্ তরু, আমি আর বইতে পারছি না।"

"না বাপু তোমার বোঝা আমি বইতে পারব না। 'পরের সোনা দিও না কানে, প্রাণ যাবে হেঁচকা টানে।' বলিয়া তরু হাঁক-ডাক আরম্ভ করিল, ওমা, মেজদিদি, দ্রব্যজাত পরে দেখোশুনো। এইদিকে আগে এস। সোনার ভারে তোমাদের বৌ যে এখন দম বন্ধ হয়ে মরে?"

মনোরমা ত্বরিতপদে আসিয়া বিনুর হাত ধরিয়া তাঁহার ঘরে লইয়া খাটে বসাইলেন। বধূর গায়ে নূতন আভরণ ও তাহার ওজন অনুমান করিয়া তিনি প্রীত হইলেন।

মধুমতী বিনুর মাথার কাপড় খুলিয়া দিল। হেমন্তের প্রভাতেও ঘোমটায় আবৃত হইয়া তাহার মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমিয়াছে।

তরু বলিল, "বৌদির সব গয়না সিন্দুকে তুলে রেখে দাও মা, আমার হাতে যেমন দুটো বালা রয়েছে, ওর শাঁখার পাশে তাই রেখে দাও। মল খুলে দিচ্ছি, শুধু পায়জোড় থাক। গলায় ওই হেলে হার রেখে সব খুলে নাও।"

মা বলিলেন, "নতুন বৌকে কি একেবারে ন্যাড়া করে রাখে? ওপর হাতে অনন্ত, নীচে বালা, নারকোল-ফুল নতুন আংটিটা থাকুক।"

মধুমতী কহিল, "গলায় হেলে হারগাছা রেখে আর সব তুলে রাখ মা। ওর বিয়ের সময় কে যেন ছোট্ট দুটো ঝুমকো দিয়েছিল সেইটে বের করে দাও।"

গহনার ভার নামাইয়া বিনু হাতীমুখো সিঁড়ির উপরে সমাসীনা ঠাকুমার পায়ে প্রণাম করিল। ঠাকুমা একগাল হাসিয়া বিনুকে আদর করিতে লাগিলেন, "মণি আমার, এয়েছিস্? নদীনালা খালখন্দের দেশে তোদের পাঠিয়ে দিয়ে আমি ভাবনায় সারা হয়ে গিয়েছি। এতক্ষণে আমার ধড়ে প্রাণপাখী ফিরে এল। তুই না থাকায় রায়বাড়ী আমার চোখে আঁধার আঁধার ঠেকছিল রে। তুই যে রায়-বাড়ীর 'লক্ষ্মীরূপে গোলকধামে, আবার কৈলাসেতে শিবের বামে'।"

বধূ লজ্জায় সরিয়া গেল সেখান হইতে।

বিনু লক্ষ্য করিতেছিল পূজা অবসানে রায়বাড়ীর উদ্দাম জীবনধারা সংযত স্বাভাবিক হইয়া আসিয়াছে। গোলমাল কলরোল কমিয়া গিয়াছে। দাসদাসীরা যে যাহার কর্ম্মে নিমগ্ন। ভানুমতী নাই, হাঁক-ডাক থামিয়া গিয়াছে।

বিনু আসন্ন দুর্গাপূজার সময় এখানে আসিয়াছিল। কাজের তাড়নায় রায়-নন্দিনীদের ক্রীড়া-কৌতুক সে পর্য্যবেক্ষণ করে নাই।

মধ্যাহ্নে আহারাদি মিটিয়া গেলে হলঘরের মাঝখানে বসিয়া গেল দশ-পঁচিশ কড়ি খেলার আসর। কাঁচা মেঝেয় ছক কাটা হইয়াছে খড়ি দিয়া। এক থলি ছোট-বড় নানা আকৃতিবিশিষ্ট কড়ি। ছকের চারিপাশে বসিয়াছে গোল হইয়া মধুমতী, আনন্দমোহিনী, লবঙ্গ ও সরকারদের দক্ষবালা।

কড়ির দান পড়িতেছে কড় কড় খড় খড় শব্দে, হাসির রোল উঠিতেছে ছাত ভেদিয়া।

খেলুড়ীদের কাছে বসিয়া সরস্বতী-কার্পেট বুনিতেছে। এদেশে তখন কার্পেটের নূতন আমদানী হইয়াছে। সরস্বতী লবঙ্গের দাদাকে দিয়া শহর হইতে কার্পেট সূচ পশম ও প্যাটার্ণ বই আনাইয়া লইয়াছে। শিল্পকলায় সরস্বতীর খুবই অনুরাগ ও নৈপুণ্য। সে ক্ষিতিকে দিয়া কার্পেটের উপরে পেনসিল দিয়া লেখাইয়া লইয়াছে—

"ফুল তুমি শেখাও আমারে তুষিতে তোমার মত পারি যেন সবারে, বালকের খেলিবার, প্রেমিকের কণ্ঠহার, সাধকের অর্চনার সুধা দিয়া ভ্রমরে।"

লেখার উপরে কালো রং-এর পশম দিয়া সরস্বতী নিবিষ্ট মনে গণিয়া গণিয়া ফোঁড় তুলিতেছিল। কড়ি সে খেলে না, হাড়ের কড়ি বিধবাদের খেলা বারণ।

তরু ও মেনী এককোণে বাঘবন্দী ও ছক্কা-পাঞ্জা খেলিতে বসিয়াছিল। মনোরমা তাঁহার বিছানায় বিশ্রাম করিতে-ছিলেন। সুমন্ত মা'র কোলের কাছে শুইয়া এক দুই তিন চার গোনা শিখিতেছে। এখন সুমন্তের সুখ-সূর্য্য উদয় হইয়াছে। সর্ব্বদা মা'র সান্নিধ্য পাইতেছে। বিনুকে দেখিলে হাসিয়া ডাকে "বইদি", কিন্তু সে গায়ে-পড়া ভাব যেন কমিয়া গিয়াছে।

বিনু ভাবে সুমন্ত যেন বড় শান্ত দুর্ব্বল। রায়বাড়ীর ছেলে, লোকের কোলে-পিঠে চড়িয়া বাক্সের আঙ্গুরের মত মানুষ হইতেছে। ধূলা-কাদা মাখা রসে রূপে টলটলে পাকা কালজামের মত উজ্জ্বল কানুকে বিনু হৃদয় হইতে সরাইয়া দিতে পারে না। এখানে অমনি একটা শিশু থাকিলে বিনু প্রাণ ভরিয়া তাহাকে চটকাইয়া আদর করিতে পারিত।

ভজন মাঝির অনুমান মিথ্যা হইল না। দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই বৃষ্টি ঝরিতে লাগিল টিপি টিপি।

ঠাকুমা বিনুর ঘরের বারান্দায় দিবানিদ্রা দিতেছিলেন।

বিনু খেলার স্থানে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া চলিয়া গেল ঠাকুমার কাছে। তাহার পায়ের পায়জোড়ের রুণুঝুনু শব্দে ঠাকুমা চোখ মেলিয়া কহিলেন, "বৃষ্টি নেমেছে, এবার শীত পড়বে মাণিকমালা। অল্প শীতে গায়ে দেবার কাঁথাখানা আমার, পাড় ছিঁড়ে গেছে, তুই সেরে দিবি? বেশি শীতে আবার লেপ বের করতে হবে। তখন গরীব-দুঃখীদের ভারী দুঃখ। যত ঠাণ্ডা পড়বে ততই তারা কেঁদে-ককিয়ে সারা হবে। কইবে, এবার বড় শীত, 'নেংটিওয়ালার নাচনপেচন, কাঁথাওয়ালার গীত।' হ্যাঁরে, তোর ছোট ঠাকুমা কি করচে? শাশুড়ী বুঝি শুয়েছে? শোবে না? পুজোর সময় যে নিয়মের চিড়ে মুড়ি খই মুড়কি মোয়া ছাতুর নাড়ু তিলের নাড়ু একসাথে বানিয়ে পাকা হাঁড়িতে কালীপুজোর জন্যে ভাগে ভাগে তাকে সরিয়ে রেখেচে। এখন আরাম করবে না ত করবে কি? কালীপুজোর যে আর মধ্যে দুটো দিন বাকী। তোরা নারকোলের তক্তি নাড়ু ক্ষীরের স্বপি কবে করবি? নারকোল ভাঙা হবে কয়কুড়ি?"

বিনু উত্তর দিল, "আমি তা জানি না ঠাকুমা। ওঁরা ঘুমিয়ে আছেন।"

"ঘুমিয়ে আছে, কড়ির বাদ্যিতে ঘুমোতে পারে কেউ? কড়ি খেলা ভাল নয়, লক্ষ্মী ছেড়ে যায়। কড়ি নিয়ে মেয়ে গুলান যেন অতি আহ্লাদে ডগমগ। অতির কিছুই ভাল না—

'অতি দর্পে হত লঙ্কা, অতি দর্পে কুরুক্ষয়,
অতি দর্পে বলিরাজার পাতালে বসতি হয়।'

ওই যে লক্ষ ওই নষ্টের মূল।"

বিনু উঠিয়া যাইতে উসখুস করিতেছিল, ঠাকুমার কাছে বসিলে কাহারও নিস্তার নাই। তিনি অবিরত বক বক করিয়া কান ঝালাপালা করিয়া দিবেন।

বিনু উঠিতে উদ্যত হইতে ঠাকুমা তাহার বাহু মুঠোয় চাপিয়া ফের সুরু করিলেন, "তোর ঘুম পেয়েছে মণি? আমার আর একটা কথা শুনে ঘুম দিগে। পেসাদকে তোর দা'মশায় খুব যত্ন করেছিল না? কি কি দ্রব্য খেতে দিয়েছিল?

শিব গেলেন শ্বশুরবাড়ী বসতে দিলেন পিঁড়ে
জলপান করিতে দিলেন শালধানের চিঁড়ে।
শালধানের চিঁড়ে না রে বিন্নেধানের খই,
মস্ত মস্ত সবরিকলা কাকমেরে দই।"

ঠাকুমার দুর্ব্বল হস্তের মুঠো শিথিল হওয়া মাত্র বিনু পলায়ন করিল ঘরে।

বিনুর ঘর যেন সাধারণ এক গৃহ নহে, তাহার শান্তির নীড়, নিভৃত নিলয়। নবীন বিছানা রৌদ্রে দিয়া ধূলা ঝাড়িয়া-মুছিয়া তকতকে করিয়া রাখিয়াছে।

বিনু আরাম করিতে বিছানায় গেল না। এ কয়েক দিন তাহার পাঠ্যপুস্তক পড়া হয় নাই, হাতের লেখা হয়

নাই। রাত্রে প্রসাদ যদি পরীক্ষা করিতে চায় তখন সে কি দেখাইবে?

টেবিলের টানার ভিতরে সে তাহার বই-খাতা চাবি বন্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছিল। অঞ্চলের চাবি দিয়া সে বই-খাতা বাহির করিয়া মেঝের মাদুর পাতিয়া বসিল। কিন্তু লিখিতে ইচ্ছা হয় না, পড়িতে আগ্রহ হয় না। মন উধাও হইয়া ধাবিত হয় হরিরামপুর; মা, দিদিমা, দাদামহাশয় সুবর্ণ কাদুর কাছে। কিন্তু জোর করিয়া সেখান হইতে মনকে ফিরাইয়া আনিতে হয়। না আনিলে সে বিশ্বের রসের ভাণ্ডারের সন্ধান পাইবে না। আনন্দমঠ, কৃষ্ণকান্তের উইল তাহার শেষ হইয়াছে। বিষবৃক্ষ ধরিয়াছে। কিন্তু বিনু ভালরূপে কিছু বুঝিতে পারে না। বুঝিতে হইলে অকাট মুর্খ হইয়া থাকিলে চলিবে না। লেখাপড়া শিখিতে হইবে।

প্রসাদ হরিরামপুর হইতে স্বদেশী আন্দোলনের বাতাস এখানে বহিয়া আনিয়াছিল। অপর গ্রাম যাহা লইয়া মাতিয়াছে তাহাদের গ্রাম তাহার অগ্রগামী না হইলে রায়-গোষ্ঠীর লজ্জা, অপমান।

তাহার ছুটি সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিয়াছে। আসুক, তবু সে বাড়ীতে পদক্ষেপ করিয়া পাড়ায় পাড়ায় বন্ধুমহলে বিলাতী বর্জ্জনের বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। সন্তান গঠনের সঙ্কল্প করিতেছে। ঘরে ঘরে কি উৎসাহ উদ্দীপনা। প্রসাদের প্ররোচনায় গায়ক তরুণের দল প্রেমের গান রাখিয়া গান শিখিতেছে—

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই,
দীন দুঃখিনী মা যে মোদের, এর বেশি আর সাধ্য নাই।"

এই অল্প সময়ের মধ্যেই ছেলেরা সমরানলে ঝাঁপ দিতে যেন উদ্গ্রীব হইয়াছে। সমবেত কণ্ঠ মিলিত হইতেছে—

"একবার তোরা মা বলিয়া ডাক, জগৎজনার শ্রবণ জুড়াক।"

প্রসাদ বাহির লইয়া মত্ত। বিনুর শিক্ষার বিষয়ে তেমন আগ্রহ দেখাইবার সময় পায় না। সে হাল ছাড়িয়া দিলেও বিনু নিজের হাল নিজেই চাপিয়া ধরিল।

দুইদিন অবিশ্রান্ত ধারা বর্ষণের পরে নির্মল নীলাকাশে রৌদ্র উঠিয়াছে হাসিমুখে।

ঠাকুমার মুখখানিও প্রসন্ন হাসিতে ভরিয়া গিয়াছে। পাঁচ দিনের ঝরা একদিনের খরার মত।

দীপান্বিতায় বৃষ্টি হইলে আলোকসজ্জা ব্যর্থ হইয়া যায়। মা কালী করালবদনা মেঘ-বৃষ্টি তাড়াইয়া দিয়া মর্ত্ত্যে আসিতেছেন সকলকে বরাভয় প্রদান করিতে।

ঠাকুমা ফের জড়তা কাটাইয়া সতেজ হইয়াছেন, "সরি, তোদের মনে আছে ত সব? দুর্গাপুজোর মতনই কালীপুজোতেও ভোগরাগ সাজিয়ে দিতে হয়। দুর্গাপুজোর বেশি বেশি, কালীপুজোর ভোগ কম। দুপুর রাতে ভোগ, কে বা আসে প্রসাদ পেতে? তাতে আবার বাদল নেমে ঠাণ্ডা পড়ে গেছে। উত্তরে বাতাসের মরণ হয়েছে সন্ সন্। এর মধ্যে কারোর কি সাধ যায় ভোগ খেতে? তবে পাড়ার বামুনের ছেলে ছোকরা আসবে বলির মাংসের লোভে। আর বাদ্যিকরেরা, নাপিত ধোপা চাকর-বাকরের দলের লোক। পাড়ার বৌ-ঝি ছেলেপেলেরা ভোগের প্রসাদ খেতে আসবে রাত পোহালে। গরীব দুঃখীরা আসবে পালে পালে। মাকালীকে দিতে হয় পাঁচটা ভোগ, পাঁচ ভাজা, পাঁচ তরকারি মাছ। পায়েস লুচি-পুরী যতই হোক-না কেন, ভোগে কলার বড়া আর বোয়াল মাছের বেগুন দিতেই হয়। কালীপুজোর নৈবিদ্যি আমান্ন যতই দাও তার মধ্যে লাগবে কলার খোলার পাঁচটা আমান্ন। বলির মাটির সরায় ঘি মধু চিনি পানের খিলি কলা দিয়ে সাজিয়ে রাখিস্। কোন দ্রব্যে অনাচার হ'তে দিস না। এ কিন্তু যে সে দেবী নয়, রক্ষেকালী।"

এক ঝুড়ি বচন ঝাড়িয়া ঠাকুমা চলিলেন মাছের তদারক করিতে।

মাছ অনেক পাওয়া গিয়াছে। বোয়াল মাছও মিলিয়াছে প্রকাণ্ড একটা। প্রচুর মাছ দেখিয়া ঠাকুমা খুশী হইলেন।

বোয়াল মাছের রন্ধন-প্রণালী সুরু করিতে মুহূর্ত্তকালও বিলম্ব হইল না। কলাই ডালের বড়ি আলু বেগুন দিয়া ঝোল, রাঁধার লঙ্কা ও কালজিরে বাটা দিলে বোয়াল মাছের ঝোল যে চকচকে রং হয় সেটা বলিতেও তাঁহার ভুল হইল না।

ফটিক নাপিত যাইতেছিল সেই পথ দিয়া, ঠাকুমা তাহাকে কাছে পাইয়া ছাড়িয়া দিলেন না, "হ্যাঁরে ফটিক, হোমের বেলপাতার করলি কি? হোমে লাগবে একশ' আট নিখুঁত বেলপাতা। সাবধানে দেখবি বেলপাতায় দাগ-দাগালি যেন না থাকে। মনে রাখবি কালীমা যে সে নয়, জ্যান্ত-খেকো ভয়ানক দেবতা। ত্রুটি পেলে রক্ষে নেই।"

"জানি কর্ত্তামা, ভাল ক'রেই বেছে দেব বিল্বদল। দাগটাগ থাকবে কেনে? ব্যালের ডাল ভেঙ্গে এনেচি এহন যাইচি বাইছ্যা রাখনে।" কহিয়া ফটিক ঠাকুমার পাশ কাটাইল। ঠাকুমা নিকটে লোক পাইলে এত সহজে ছাড়িয়া দেন না। ফটিকের "কর্ত্তামা" তাঁহার কানে অমৃত বর্ষণ করিতেছিল। সত্যই কি তিনি একদিন রায়-ভবনের কর্ত্তামা ছিলেন? গৃহিণী পদে অধিষ্ঠিত হইয়া অনুগত ভৃত্যদের শাসন তাড়ন আদেশ দিয়াছেন? সে যুগ কতদূরে কোন্ সুদূরে বিলীন হইয়া গিয়াছে?

ঠাকুমা খুশী হইয়া নরম গলায় কহিলেন, "দেখ্ ফটিক, তোরে আর একটা কথা কই। মা কালীকে চিত্তির করতে দেউড়ি কুমার এয়েছে কি?"

"হঁ, কর্ত্তামা, তেঁনারা বিহানে আয়্যা দুই ভাই কামে লাগিছে। হাত পা মুণ্ডু জোড়া দেওন হইয়া গিইচে, এহন রং দেওন বাকী।"

ঠাকুমা আশ্বস্ত হইয়া ফটিকের পথ ছাড়িয়া দিলেন। দিন কতক পূর্ব্বে মণ্ডপের বারান্দায় কাঠামোর উপরে মস্তক হস্তপদবিহীন এক নারীমূর্ত্তি দেউড়িয়া গঠন করিয়া রৌদ্রে শুখাইতে দিয়া গিয়াছিল, আজ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ করিয়া লাবণ্যময়ী নারী-মূর্ত্তিতে রূপান্তরিত করিবে। কেশ বেশ আভরণ সংযুক্ত করিতে দুইটা লোকের কত সময় লাগিবে আর? অবাবস্থা লাগিবে রাত্রি আটটায়, তখন পুরোহিত মহা পূজায় বসিবেন। কাজেই সেদিক্ দিয়া ঠাকুমা নিশ্চিন্ত হইলেন।

সহসা বাহির মহল হইতে তরুর তীক্ষ্ণ কলহের স্বর শুনিয়া তিনি উন্মনা হইয়া প্রাচীরের দরজার দিকে অগ্রসর হইলেন। জানকী সরকারের সহিত তরুর ঝগড়া বাধিয়াছে।

গত রাত্রে সরকার এক ঝাঁকা বাজি রংমশাল বন্দর হইতে আনিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছিল কাছারিঘরের চৌকির নীচে। এখন বাহির করিয়া ভাগ বণ্টনের সময় তরু গোলমাল করিতেছে।

বাজির এক অংশ ক্ষিতির, আর এক অংশ দুই ভাগে সুমন্ত ও তরুর। যে ছেলে এখনও রংমশাল ধরিতে শেখে নাই, যাহার প্রতিনিধি হইয়া নবীন বাজি পোড়াইয়া মজা করিবে, তরু তাহাকে অর্দ্ধেক দিতে যাইবে কেন?

বাজি ঠাকুমার পূজার উপাদান নয়, তিনি সেখান হইতে সরিয়া আসিলেন।

হাতীমুখো বারান্দা রৌদ্রকিরণে ভরিয়া গিয়াছে। আসন্ন শীতের বাতাস বহিতেছে। বর্ষণের পরে ঠাকুমার কাছে আজিকার রৌদ্রটুকু মিঠে মিঠে লাগিল। তিনি তাঁহার চিরন্তন আসন অধিকার করিলেন।

বিনুর ঘরের সামনে ঝিরা বসিয়াছে ছেঁড়া ন্যাকরা লইয়া প্রদীপের সল্‌তে পাকাইতে। তাহাদের দিবে দৃষ্টি পড়ামাত্র ঠাকুমার স্মরণপথে ভাসিতে লাগিল মাটির প্রদীপের কথা। তখনই হাঁক দিলেন, "রাজেশ্বরী, কুড়ানী, পসারী, তোদের কেমন আক্কেল লো, কাল গামলাভরা জলে মাটির প্রদীপগুলো ভিজিয়ে রেখেছিস, তা কি জলে ভেজানোই থাকবে? তুলবি না? তুলে এনে রৌদ্রে দে, তারপর তেল-সলতে সাজিয়ে রাখ। সন্ধ্যেবেলা ঢাক-ঢোল বাজা-মাত্তর তোরা ত খ্যামটা নাচন নাচতে থাকবি। তখন কে সাজাবে কার বাতি। বারবাড়ীতে ওরা হ্যাজাক-ম্যাজাক ঝাড় মশাল যা ইচ্ছে জ্বালাক গে। তা দিয়ে আমার দরকার নাই। রায়বাড়ীর ভেতর বাড়ীতে জ্বলবে সারি সারি তেলের প্রদীপ। তুলসীতলায়, বেলতলায়, ঢেঁকিশালায় আনাচে-কানাচে মাটির প্রদীপ দিতে হবে জ্বালিয়ে।"

তরু কাগজের এক বাক্স বাজি বুকে চাপিয়া ধরিয়া বাহির হইতে আসিয়া ঠাকুমাকে ধমক দিল, "তোমার কি কোথাও ছায়া জোটে নি, যে রোদে ভাজা ভাজা হয়ে বক বক করছো? 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল'।"

তরুর মন অত্যন্ত অপ্রসন্ন; সে দাঁড়াইল না। বাজি রাখিতে চলিয়া গেল ঘরে।

ঠাকুমা তাঁহার গমন পথে তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া আপনার মনে বলিয়া উঠিলেন—

"হায়, কি জ্বালা গলার মালা বিষম জ্বালা হ'ল,
ছাড়িতে না ছাড়ে কালা অঙ্গ মাঝে র'ল।"

তিনি নিতান্ত বালিকা বয়সে রায়বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। সে কত যুগের কাহিনী। মোড়লী তাঁহার অস্থিমজ্জায় মিশিয়া গিয়াছে। অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে। তিনি ছাড়িয়া দিলেও মোড়লী তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে চাহে না। একরত্তি মেয়ে তাহার মর্ম্ম কিরূপে বুঝিবে? বুঝুক বা না বুঝুক; কিন্তু ঠিক কথা বলিয়াছে, সত্যই তিনি রৌদ্রে ভাজা ভাজা হইতেছেন।

ঠাকুমা আসন পরিত্যাগ করিয়া রওনা দিলেন নারায়ণের নিত্য ভোগশালায়।

স্নানান্তে ছোট ঠাকুমা বিনু ও মধুমতীকে লইয়া কালীপূজার ভোগের তরকারি কুটিতে বসিয়াছিলেন। দুর্গোৎসবের ভোগের ঝাঁকা ঝাঁকা তরকারি না হইলেও কালীপূজোর ভোগের তরকারিও ফেলনা নয়। রায়বাড়ীর কাণ্ডকারখানাই বেশি বেশি। এই খানিক আগে তাঁহাদের তরকারি কোটা শেষ হইয়াছে। পাচক মণিরাম ঠাকুর সাজি সাজি কোটা আনাজ পুকুরের জলে চুবাইয়া পৌছিয়া দিয়াছে বড় ভোগের ঘরে। কামিনীর মা জোড়া উনুনের পাড়ে গোছাইয়া রাখিয়াছে হাঁড়ি কড়া খুন্তি হাতা কাঠকুটো ইত্যাদি।

মনোরমা উপবাসী থাকিয়া পূজার ভোগ রান্না করিবেন। মায়ের ভোগ না সরা অবধি জল গ্রহণ করিতে পারিবেন না। সেইজন্য দ্বিপ্রহর হইতে ধীরেসুস্থে ভোগ রান্না চলিতে থাকে। পিঠে পায়েস লুচি পুরী হইতে মাছ মাংস কোনটাই বাদ যায় না।

ছোট ঠাকুমা ভোগ চড়াইয়াছেন। মধুমতীকে লইয়া মনোরমা ঢুকিয়াছেন পূজার ভোগের ঘরে। সরস্বতী নারায়ণ বিগ্রহের সামনে পূজায় বসিয়াছে। বিনু কোথায়?

বিনু বিরাট্ পুষ্পপাত্রে ফুল সাজাইয়া কলার পাতায় ঢাকা দিতেছিল।

ঠাকুমা নিয়মের ঘরের সিঁড়ির সম্মুখে উপনীত হইয়া হাত তুলিয়া তাহাকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন নিজের নির্জন গৃহে। দ্বার ভেজাইয়া দিয়া নিম্নস্বরে কহিতে লাগিলেন, "শোন্ মণি, তোরে একটা কথা কইতে ডেকে আনলাম। রায়বাড়ীর চলন হ'ল গিয়ে বিজয়া দশমী আর লক্ষ্মীপূজোয় লক্ষ্মীর কৌটায় নতুন টাকা রাখতে হয়। বারোমেসে পূজোয় নয়, কোজাগরী লক্ষ্মীপূজোর দিনে। কর্তা থাকতে বছরে বছরে পাঁচটা করে রূপোর চকচকে টাকা দিতেন আমাকে লক্ষ্মীর কৌটায় রাখতে। রাখতে রাখতে আমার কৌটা উপচে কড়ি গাঁথা থলে ভরে গেল। আমি বালিশের একটা ওয়াড় নিয়ে তার মধ্যে রাখতে লাগলাম টাকা। আমি ত আজ আসি নি রায়বাড়ীতে, সেই মান্ধাতার কালে। ওয়াড়টাও ভরে গেল টাকায়। তখন কর্তারে কইলাম তামাসা করে, 'তুমি এত বড় জমিদার, তোমার অটুরি চৌরী দক্ষিণদ্বার। তুই কিস্তিতে রূপো দাও কেন? এবার থেকে সোনার টাকা না দিলে আমি নেব না।'

কর্তা হেসে খুন। 'আমার আবার কি? সবই যে তোমার'।"

ঠাকুমা বলিতে বলিতে থামিয়া গেলেন। স্মৃতির সাগর মন্থনে তাঁহার কণ্ঠস্বর বাষ্পারুদ্ধ হইল।

বিনু নীরবে তাকাইয়া রহিল তাঁহার মুখের পানে।

অনেকক্ষণ পরে ঠাকুমা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করিয়া ফের সুরু করিলেন—"সেই থেকে কর্তা আমাকে দিতে লাগলেন ৫টা করে সোনার টাকা মোহর। সে কয়দিনই বা, তিন-চার বছর মাত্তর। তার পরে চলে গেলেন জন্মের মতন। রোগ নেই—ভোগ নেই, ভালমানুষ, কথা কইতে কইতে শেষ হ'ল। তখন কি আমার জ্ঞানকাণ্ড ছিল মণি? তিনি আমার গায়ে দিয়েছিলেন চাপড়া চাপড়া সোনার গয়না। সব খুলে দিলাম মহেশের কাছে। ওয়াড়ভরা টাকাগুলোও। আমি হাবাগোবা মুনিষ্যি; আমার কি সাধ্যি সোনা রূপো সামাল দেওয়া?" আবার চুপ করিলেন ঠাকুমা।

বিনু প্রশ্ন করিল, "সে মোহরগুলো দিলেন না বাবাকে?"

"নারে, মোহরের কথা তখন আমার মনে ছিল না। ভুলে গিয়েছিলাম। এক বছর পরে ঝাঁপি খুলে দেখি, কাশীর বড় সিঁদুরের কাঠের কৌটা ঝাঁপির মধ্যে তেমনি ন্যাকড়া দিয়ে বাঁধা রয়েছে। ভাবলাম পরমাকে ধরে দেব। কিন্তু আবার ভাবলাম পরমা আমার পেটের মেয়ে হলেও পরের বাড়ী গেছে। ভিন্ন গোত্র হয়েছে। আমার ঘরের লক্ষ্মী পরের ঘরে দিতে পারলাম না। তেমনি পড়ে রয়েছে। মেয়েগুলো টের পেলে এতদিন লুটের মাল করে নিত। আমার লক্ষ্মী আমি তোকেই দিতে চাই মাণিকমালা। তুই আমার লক্ষ্মী, রায়বাড়ীর লক্ষ্মী, আমার পেসাদের লক্ষ্মী।"

লক্ষ্মী শব্দের ছড়াছড়িতে বিনুর সঙ্কোচের সীমা রহিল না। ঠাকুমা যে এ পরিবেশের সৃষ্টি করিতে পারেন বিনু তাহা কল্পনা করিতে পারে নাই। সে কুণ্ঠার সঙ্গে ধীরে ধীরে কহিল, "আপনার লক্ষ্মী আপনি মাকেই দেবেন ঠাকুমা, আমি ও নিয়ে কি করব? কোথায় রেখে দেব? মা জানলে বলবেন কি?"

"কারুকে জানতে দিবি না। লুকিয়ে রাখবি তোর বাক্সের তলায়। 'মাকে দেবেন'—আমি তেলে মাথায় আর তেল দিতে চাই না। ছেলেকে যা ধ'রে দিয়েছি, তা সে ওকেই দেওয়া, জানি আমার পেসাদ তোকে অনেক দেবে, রাজার রাণী করবে। সোনার চাঁদ দিয়ে তোর ঘর ভরিয়ে দেবে। কিন্তু আমি তা দেখতে পাব না।"

বিনু মৃদুস্বরে বলিল, "আমার যদি অত-শত হয় তা হ'লে আপনি কেন তা দেখবেন না ঠাকুমা?"

"পাগল, আমি কি তত দিন বেঁচে থাকব? বিধবার বেঁচে থাকায় কি শান্তি আছে? কর্তা যেখানে শেষ হয়ে গেছেন, সেই চিতায় শুতে পারলে তবেই আমার শান্তি। আমি এখান থেকে না দেখলেও পরলোক থেকে দেখে তোদের আশীর্বাদ করব।"

বলিয়া ঠাকুমা তাঁহার বাক্স খুলিয়া বৃন্দাবনী শাড়ীর ছেঁড়া টুক্‌রায় বাঁধা একটা প্রকাণ্ড কৌটা বিনুর হস্তে অর্পণ করিলেন। বিনু সজল নয়নে কৌটাটা কপালে ঠেকাইয়া ঠাকুমাকে প্রণাম করিল।

আজ প্রথম বিনু উপলব্ধি করিল, ঠাকুমা ন্যাকা সাজিয়া থাকিলেও আসলে জ্ঞানে টনটনে।

সন্ধ্যা হইতে না হইতে ঢাক ঢোল কাঁসী বাজিতে লাগিল। রায়বাড়ী দীপমালায় সুসজ্জিত হইল। বাহির মহলে উজ্জ্বল আলো মশাল প্রজ্জ্বলিত হইয়া অমারজনীকে পরিহাস করিল। বাজি পুড়িতে লাগিল দুমদাম। ফুলঝুরি রংমশাল আলোয় আলোময়। অন্দরমহল আলোকিত হইল মাটির সারি সারি প্রদীপে।

এবেলা প্রসাদ বাড়ীতেই ছিল, স্বদেশী করিতে পাড়ায় বাহির হয় নাই। বালি ছড়াইয়া খড়্গে শান দিয়া রাখা হইয়াছে। ঘাতক হইবে প্রসাদ।

ঠাকুমা মণ্ডপের পেছন দিকের দরজায় সিঁড়িতে আশ্রয়

লইয়াছেন পুরোহিতের ঘন্টাধ্বনির সহিত উলুধ্বনি দিতে।

পূজা বলি ভোগ শেষ হইতে হইতে দ্বিপ্রহর রাত্রি উত্তীর্ণ হইয়া গেল। ব্রাহ্মণ ভোজন ও অন্যান্য সকলের ভোজনপর্ব্ব যথন সমাধা হইল তখন গগনে শুকতারা উদয় হইয়াছে।

পরের দিন বেলা হইতে না হইতে পাড়ার বৌ-ঝি বালক-বালিকা ও নিম্নশ্রেণীর প্রসাদপ্রার্থীর দল আসিয়া জুটিল। কড়কড়ে অন্নভোগ সরপড়া বোয়াল মাছের ঝোলের সহিত বিবিধ উপকরণ আহার করিয়া সকলে পরিতৃপ্ত হইল।

নিকানো আঙ্গিনায় চারিজনা গঙ্গাপুত্র কালী-প্রতিমা ধরাধরি করিয়া আনিয়া নামাইয়া রাখিল। কালী প্রতিমা নিরঞ্জনের পালা ইহাদের। এ অঞ্চলে প্রভাতে কালী প্রতিমা বিসর্জ্জন প্রচলিত। আঙ্গিনায় বরণ করিতে হয়। বরণের সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছিল ঠাকুরমার বাক্যবিন্যাসে।

মনোরমা বধূ ও কন্যাদের লইয়া প্রতিমা বরণ করিতে লাগিলেন। আবার ঢাক ঢোলে কাঁসী বাজিল। ঠাকুমা ভাঙ্গা গলায় উলু দিলেন। বরণান্তে প্রতিমাকে তুলিয়া লওয়া হইল দুর্গাদহের শীতল জলের উদ্দেশে।

এদিকে মিটিয়া গেলে ঠাকুমা আগামী দিনের ভাই-ফোঁটার বিবরণে মনোনিবেশ করিলেন। "ও মাধি, কাল যে বেলা নয়টার মধ্যে ফোঁটা দেবার সময়, সেটা জানিস্ কি? শীতের বেলা, ভোর হ'তে না হ'তে হয়ে যায় নয় প্রহর। আজকেই সব গোছগাছ করে রেখে দে। রেকাবিতে ধান-দুর্কো গুছিয়ে কুসীতে ঘি সলতে সাজিয়ে চন্দনের বাটি ও শিশির তোলার বাটি এক ঠাঁই করে রেখে দে। পান সেজে রাখিস্, পৈতা বার করে রাখিস্। পাড়ার ছেলেদের যার যার বোন নাই, তোরাই ত তাদের নেমন্তন্ন করে ভাই-ফোঁটা দিয়ে বছর বছর খাইয়ে-দাইয়ে দিস্। তাদের বলা হয়েছে, না ভুলে গেছিস্?"

মধুমতী এই দণ্ডে বাসী ভোগ খাইয়া পান দিয়াছিল মুখে। পান চিবাইতে চিবাইতে জবাব দিল, "হাঁ, পৃথিবীর সকলের তোমারি মতন স্মরণ শক্তি নিয়ে জন্ম নিয়েছে কিনা, তুমি মনে না করিয়ে দিলে ভুলে যাবে?"

ঠাকুমা উদাস স্বরে বলিলেন, "আমি ঘর করেছি বাহির, বাহির করেছি ঘর, পর করেছি আপন, আপন করেছি পর।"

বিনু যাইতেছিল কোটা তরকারি ছোট ঠাকুমাকে দিতে। বাতাসে তাহার মুখের ঘোমটা ঈষৎ সরিয়া যাওয়া মাত্র ঠাকুমা সে মুখের শুষ্কতা লক্ষ্য করিলেন। কালীপূজার রাত্রি বাড়ীর সকলেরই প্রায় জাগরণে অতিবাহিত হইয়াছে। তাহার উপরে পরিশ্রম। সেই কারণে বিনুর মুখ শুষ্ক হইয়াছিল। ঠাকুমা তাহা নিরীক্ষণ করিয়া কি ভাবিলেন কে জানে। ছড়া কাটিলেন, "কামনা সাগরে কামনা করিয়া মিটিয়াছে মনো সাধা, তুমি হয়েছ নন্দের নন্দন, আমি হয়েছি রাধা।"

তরু শসার মাচা হইতে একটা কচি শসা দাঁতে কাটিতে কাটিতে ঠাকুরমার পাশে বসিয়া প্রশ্ন করিল, "কে রাধা ঠাকুমা, তুমি বুঝি?"

ঠাকুমা হাসিলেন, "রাধা হইতে সাধ জাগিছে মনে, আমি যাব বৃন্দাবনে।' দেখ্ তন্বি, ভাইফোঁটার মন্তর তোর মনে আছে? আসন পেতে পূর্ব্বমুখো করে ভাইদের বসিয়ে, বাঁ হাতের কড়ে আঙ্গুলে আগে তিনবার শিশিরের টিপ দিয়ে পরে তিনবার চন্দনের টিপ, মনে মনে বলতে হয়, 'ভাই-এর কপালে দিলাম ফোঁটা যমের দুয়ারে পড়লো কাঁটা।' তারপরে প্রদীপের শিস কপালে ছুঁইয়ে বড় ভাইকে পায়ে ধান-দুর্ব্বো দিয়ে প্রণাম করতে হয়। ছোটদের মাথায় দিয়ে আশির্ব্বাদ করতে হয়। খাবারের থালায় পান রাখতে হয়। যাদের পৈতা হয়েছে তাদের থালায় পৈতা।"

জুড়ান চাকর বাঁশের এক খালুই বড় বড় কই মাছ লইয়া ভিতরে আসিল। ঠাকুমার বুঝিতে বিলম্ব হইল না মরা বিলে এ সময় জেলেরা কই মাছ ধরে। প্রসাদের জন্যে মনোরমা সেইখানে জুড়ানকে পাঠাইয়াছিলেন।

ভাইফোঁটার পরের দিনেই প্রভাতের পর স্নান-আহার সারিয়া প্রসাদকে যাইতে হইবে সাধুগঞ্জে ষ্টীমার ধরিতে। নাতির বিচ্ছেদ ব্যথায় ঠাকুমার হৃদয় উদ্বেলিত হইল। প্রিয়জনকে না দেখিলে দিন কাটে একভাবে, কিন্তু দেখার পরে ছাড়িতে দিতে হৃদয়ের ব্যাকুলতার সীমা থাকে না। ঠাকুমা আপন মনে সুরু করিলেন, "যত দুঃখ পাই নাই অশোকের বনে, তার চেয়ে বেশি দুঃখ রাম দরশনে।"

মধুমতী হাসিয়া অস্থির, "ঠাকুমা, তোমার মণিমালার বিরহ ঘনিয়ে আসছে ভেবে তুমি এখন থেকেই পাঁচালী গাইতে লেগেছ? তোমাদের সে কাল নেই। তোমরা বলতে, 'শিশিরে কি ফোটে ফুল বিনা বরিষণে—চিঠিতে কি ভোলে মন বিনা দরশনে।' আমরা এখন চিঠিতেই দরশনের চেয়ে বেশি রস আবিষ্কার করে নিয়েছি।"

ঠাকুমা ফ্যাল ফ্যাল করিয়া নাতনীর মুখের পানে তাকাইয়া রহিলেন। মেয়েটা আবার বলে কি?

ভাইফোঁটা ও ভাইদের খাওয়ান নিয়ে সারাদিন কাটিয়াছে গোলমালে। রাত্রে দেখা হইল বিনুর সহিত প্রসাদের।

বিনু আসিবার পূর্ব্বেই প্রসাদ আসিয়া আলোর সামনে

চেয়ারে বসিয়া বিনুর হিজিবিজি হাতের লেখার খাতা পরীক্ষা করিতেছিল। কয়েকদিন দেখা হয় নাই। হরিরামপুর হইতে ফিরিয়া প্রসাদের কোন দিকে মন ছিল না। সে যুবসম্মিলনে মাতিয়া ছিল স্বদেশী বক্তৃতায়।

বাঁধন ছিঁড়িবার সময় নিকটে আসিয়াছে। বাহিরের আকর্ষণ হইতে ঘরের টানে সকাল সকাল তাহাকে টানিয়া আনিয়াছে।

প্রীত প্রফুল্ল স্বরে প্রসাদ কহিল, "এসেছ, বোসো চেয়ারে, ক'দিন তোমার লেখাপড়ার খবর নিতে পারি নি, ব্যস্ত ছিলাম। ক্রমে তোমার হাতের লেখা ভাল হচ্ছে। একখানা খাতা যে ভরে ফেলেছ। কখন লিখেছ?"

"নারী ছলনাময়ী" এক্ষেত্রে পুরুষও ছলনাময় হইয়াছে। বুদ্ধিহীনা বিনু সেটা উপলব্ধি না করিয়া পুলকিত হইল। "যখন সময় পেয়েছি তখুনি লিখেছি। ক'দিন রাতে তোমার মিটিং থেকে ফিরতে দেরি হয়েছে, তখন লিখেছি।"

"আশ্চর্য্য, তোমার ঘুম পায় নি?"

"না, তরু সন্ধ্যার পরে লুকিয়ে আমাকে চা খেতে দেয়, তাতেই ঘুম কমে গেছে।"

"শুনে খুশী হওয়া গেল, তরুকে পুরস্কার দিতে হবে। কাল ত চলে যাচ্ছি, আবার আসব বড়দিনের বন্ধে। এর ভেতরে তুমি তোমার পুরোণ বইকটা শেষ করে রেখ। আমি এসে পড়া ধরব। লেখা দেখব। মনে যেন থাকে।"

বিনু সম্মতিসূচক ঘাড় ফেরায়।

এবেলা বাহিরে প্রসাদের বক্তৃতা দেওয়া হয় নাই। সেই অব্যক্ত বাণী ভিন্ন শব্দে ব্যক্ত হইতে লাগিল বিনুর কাছে, "তুমি লেখাপড়া শিখলে পরে জানতে পারবে উপকারিতা। আজ ছোট আছ, চিরকাল তা থাকবে না। তোমার জন্যে গৃহিণীর পদ, জননীর পদ অপেক্ষা করে রয়েছে। ধর্ম্মে-কর্ম্মে তোমাকে উন্নত হতে হবে। আমরা করে যাব দেশের সেবা। আমাদের সন্তানদের শিক্ষা দিয়ে প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করতে হবে।"

বিনু চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল। রাম জন্মাবার পূর্ব্বেই স্বামী "রামায়ণ" রচনা করিতেছেন। বয়েস ত ভারী, উনিশ-কুড়ি পার হয় নাই, কিন্তু কি পাকা পাকা কথাবার্ত্তা! ধরণ-ধারণ রকমে-সকমে আশী বছরের বৃদ্ধ যেন!

প্রসাদ বিনুর লেখার খাতা পেনসিলের দাগ দিয়া সংশোধন করিয়া পুনরায় বলিল, "আমি বড়দিনে আসবার সময় তোমার জন্যে কি আনব?"

বিনু ক্ষণকাল চিন্তা করিল। তাহার নেশা ধরিয়াছে, ধীরে উত্তর করিল, "রবীন্দ্রনাথের কবিতার বই।"

"হাঁ, তাই পাবে। আরো ঢের বই এনে দেব। শুধু বই পড়লে হবে না। বুঝে নেবার চেষ্টা চাই। তুমি নিজেকে গড়ে নিও আমার পেছনে দাঁড়াতে। জীবনে আমাদের অনেক কিছু করতে হবে। তার মধ্যে কত ঝড় বয়ে যাবে, রায়বাড়ীর গণ্ডি ভাঙ্গতে হবে। কাজ করতে করতে আমাদের অনেক বয়েস হয়ে যাবে। তার পরে ডাক আসবে সেখান হ'তে। যাব চলে দুইজনে।"

"সে কোথায়?"

"তাও কি জানো না?

'দূরে, জন্মান্তের দূরে হৈম কুয়াশায়,
নিমেষের রন্ধ্রপথে অলোক আলোতে
অপূর্ব্ব অমরা শোভে রত্ন সিকতায়
মুখরিত অমরের সঙ্গীত পুলকে।'

এখানকার সমস্ত কাজ শেষ করে আমরা চলে যাব সেইখানে।"

"দুইজনা কি একসাথেই যাব?"

"না বিনু, সহমরণ ভিন্ন সেখানে যে একসঙ্গে যাওয়া যায় না। যাকে আগে যেতে হবে, সে প্রতীক্ষা করবে আর একজনার জন্যে।"

শেষ

আর্থিক

শ্রীচিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

পণ্যমুল্যের গতি, জাতীয় আয় এবং টাকার সরবরাহ (২)

গত মাসে আমরা দেশের পণ্যমূল্যের গতি সম্বন্ধে কিছু তথ্য সমাবেশ করেছি; এ যাবৎ অনুসৃত ব্যবস্থাপনা ও নীতি পরবর্তী কালের মূল্য-গতিকে কিভাবে প্রভাবান্বিত করছে সে সম্বন্ধে বাজেট বক্তৃতার সময় অর্থমন্ত্রীর উক্তি এবং ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অফ কমার্স এ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীজ-এর সভায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর উক্তি (ষ্টেটসম্যান, ৮ই মার্চ) এই সূত্রে উল্লেখযোগ্য।

গত মাসে সন্নিবেশিত তালিকাতে আমরা দেখছি, পরিকল্পনাপর্বের প্রথম দশ বছরে জনসংখ্যা বেড়েছে শতকরা ২১'৫ ভাগ, বর্ধিত মূল্যের হিসাবে জাতীয় আয় বেড়েছে ৪৮'৬ ভাগ, মোট টাকার (gross money) পরিমাণ বেড়েছে ৭৩'৬ ভাগ। কৃষিজ পণ্যের ও শিল্পপণ্যের উৎপাদন বেড়েছে যথাক্রমে ৩৯'১ এবং ৯৪'৩ ভাগ; অর্থাৎ আনুমানিক মোট উৎপাদন (কৃষির ক্ষেত্রে weightage ৪৬'১ ভাগ এবং শিল্পপণ্যের ক্ষেত্রে ৫৩'৯ ভাগ ধরে) বেড়েছে শতকরা ৬৮'৮৫ ভাগ; মাথাপিছু উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছে প্রায় শতকরা ৩৮'৯৬ ভাগ। 'গ্রস' টাকার সরবরাহ ১৯৫২-৫৩র হিসাবে বেড়েছে ৭৭'৪৬ শতাংশ, জাতীয় আয় বেড়েছে ৪৪'১৯ শতাংশ আর পাইকারী মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে ২৪'৯ শতাংশ; অর্থাৎ 'গ্রস' টাকা সরবরাহ ও জাতীয় আয়বৃদ্ধির মধ্যে যে ব্যবধান তা প্রতিফলিত হয়েছে ঐ পরিমাণ মূল্যবৃদ্ধিতে। মাথাপিছু 'গ্রস' টাকা সরবরাহও বেড়েছে ৪৩'৭ শতাংশ, অথচ মোট মাথাপিছু উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছে ৩৮'৯৬ শতাংশ; অপরদিকে মাথাপিছু 'নেট' টাকা সরবরাহ (২১'৩ শতাংশ বৃদ্ধি) এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির মধ্যে খুব অসামঞ্জস্য লক্ষিত হয় না। এর থেকে স্বভাবতঃই প্রশ্ন আসে, বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজে (যার মধ্যে এক বৃহৎ অংশ এখনও বর্ধিত উৎপাদনে রূপান্তরিত হয়নি) যত টাকা ব্যয় হয়েছে তার সবটা কি বর্ধিত কর বা ঋণ আকারে সরকারের হাতে ফিরে এসেছে, অথবা উদ্বৃত্ত টাকা হিসাবে ব্যাঙ্ক, পোস্টঅফিস বা সেভিংস ব্যাঙ্কে স্বাধীন আমানতে সঞ্চিত হয়ে ভবিষ্যৎ মুদ্রাস্ফীতির ভিত্তি হিসাবে থেকে যাচ্ছে?—সরকারী ঋণ সংগ্রহের তালিকা থেকে দেখা যায় (রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বুলেটিন, মার্চ ১৯৬৩, পৃ ৩১০-৩১১ এবং অক্টোবর ১৯৬২ পৃ ১৫৩৭) স্বদেশে সংগৃহীত ঋণের তুলনায় বিদেশী ঋণের পরিমাণ বেড়ে গেছে। বিদেশী ঋণ বৃদ্ধি পাওয়া বর্তমান পরিস্থিতিতে অনিবার্য এবং বাঞ্ছনীয়, কিন্তু দেশে যে পরিমাণ টাকা ব্যয় হচ্ছে তার আরও বৃহত্তর অংশ ট্যাক্স বা ঋণের আকারে সংগৃহীত না হবার দরুণ মূল্যমানের ওপর কোন অস্বাভাবিক চাপ পড়ছে কি না সেকথা এই প্রসঙ্গে স্বতঃই মনে হয়। অপর দিকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের মধ্যেও ভারসাম্য রক্ষা করা হচ্ছে কি না সে প্রশ্নও আসে; ১৯৫০।৫১তে আয় কর বাবদ আদায় হয়েছিল ১২৫'৭০ কোটি টাকা, ১৯৬২-৬৩তে সেই অঙ্ক দাঁড়ায় ২৬৪'৯৩ কোটি টাকাতে (১১০ শতাংশ বৃদ্ধি), আর পণ্যের উপর বিভিন্ন ট্যাক্সের অঙ্ক দাঁড়ায় ২২৭'৪৯ কোটি টাকা থেকে ৬৭২'৮৫ কোটি টাকাতে (১৯৫ শতাংশ বৃদ্ধি)। এযাবৎ এই যুক্তি দেখান হয়েছে যে আমাদের মত দরিদ্র দেশে, যেখানে প্রত্যক্ষ কর আদায় করার মত লোকের সংখ্যা কম,—সেখানে পরোক্ষ করের উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই; কিন্তু পরোক্ষ করের ক্রমবর্ধমান প্রভাব কিভাবে মূল্যমানের ওপর বর্তাচ্ছে, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সজাগতার অভাব ঘটেছে, সেকথা অস্বীকার করা কঠিন।

কৃষিজ পণ্য যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদিত হচ্ছে না

লেই মূল্যবৃদ্ধির পথ প্রশস্ততর হচ্ছে এরকম কথা প্রায়ই শোনা যায়, কিন্তু সরকারী পরিসংখ্যান থেকে যে তথ্য গত মাসের তালিকাতে সন্নিবেশিত হয়েছে, তার থেকে এই যুক্তি খুব স্পষ্টভাবে সমর্থন করা কঠিন; উপরন্তু কৃষিপণ্যের উৎপাদন ও মূল্যহ্রাস বা বৃদ্ধির বাৎসরিক হার যদি তুলনা করে দেখা যায় তাহলে সরবরাহ চাহিদা ও মূল্যের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য লক্ষ্য করাও যায় না। গতমাসের ৬১৮-৬১৯ পৃষ্ঠার তালিকার ৬ (ক) এবং ১০ (ক) সংখ্যক 'কলম'-এর অঙ্ক এবং সেই সঙ্গে ১৩ ও ১৪নং 'কলম'-এর অঙ্ক এই সূত্রে তুলনীয়। খাদ্যশস্যের মাথাপিছু সরবরাহ (net availability) যে বছর বেড়েছে, সেই বছরই খাদ্যশস্যের মূল্য ২৬৩ শতাংশ কিভাবে বাড়ল তার ব্যাখ্যা নিছক সরবরাহ ও চাহিদার মধ্যে খুঁজে পাওয়া কঠিন। Primary Sector-এর মাথাপিছু আয় উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে চলেছে, কখনও কম উৎপাদন বাবদ, কখনও কম মূল্য বাবদ, এই সমস্যারও কোন সদুত্তর শুধুমাত্র কৃষকগোষ্ঠীর প্রচেষ্টা বা নিষ্ক্রিয়তার থেকে উদ্ভূত হচ্ছে না। ৬১৯ পৃষ্ঠার ১০ থেকে ১৪নং কলম বিশ্লেষণ করে এবং ৬১৬ পৃষ্ঠার তালিকা থেকে আমরা দেখছি, আখেরে শিল্পপণ্য এবং শিল্পের কাঁচামাল এই দুই গোত্রের মূল্যই, বিশেষতঃ ডেফিসিট ফাইন্যান্স বৃদ্ধি পাবার পর থেকে, উর্ধ্বমুখী চাপ বজায় রেখে চলেছে। সরকারী তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, ১৯৫২-৫৩ কে ১০০ ধরলে ১৯৫১-৫২ থেকে ১৯৬২-৬৩র মধ্যে, চালের শতকরা দাম বেড়েছে (বা কমেছে) ১০৪ থেকে ১১১তে, গম ৯৪ থেকে ৯০; জোয়ার ৯৭ থেকে ১৩০, বাজরা ৯৯ থেকে ১২৪; অপর দিকে আখ ১১১ থেকে ১০২, চিনি ১০৪ থেকে ১৩১, কয়লা ১০০ থেকে ১৭১, তুলো ১২৮ থেকে ১১৩, এবং কাপড় ১০৮ থেকে ১৩১; লোহা ও ইস্পাত দ্রব্য ৮৭ থেকে ১৬০। এরই সঙ্গে যদি কৃষিজ ও শিল্পপণ্যের উৎপাদন হার দেখা যায় তাহলে লক্ষ্য করা যাবে যে, কোন কোন খাদ্যশস্যে কোন বছর কিছু উত্থান-পতন থাকলেও মোটের উপর উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে; শিল্পপণ্যের উৎপাদন বলা বাহুল্য বেড়েছে, সেই সঙ্গে মূল্যবৃদ্ধি অব্যাহত আছে।

ইদানীং, মূল্যবৃদ্ধি না করলে উৎপাদনে incentive থাকবে না, এই কারণে শিল্পপণ্যের অনেকগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম বাড়ান হয়েছে। কয়লা বা ইস্পাতের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামোতে মূল্যবৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজনীয়; কিন্তু এর ফলে কি আবার সেই vicious circle-এর পুনরাবৃত্তি ঘটানোর সূত্রপাত করা হচ্ছে না? মূল্যবৃদ্ধি না হলে উৎপাদন বাড়ানো চলে না, শিল্পপতিদের এই যুক্তি অকাট্য সন্দেহ নেই, বিশেষ করে সামগ্রিকভাবে সব গোত্রের মূল্যের মধ্যে যখন কোন স্থায়ী সামঞ্জস্য রক্ষিত হচ্ছে না তখন আংশিকভাবে এইরকম মূল্যবৃদ্ধির প্রয়োজন হয়ত আছে। কিন্তু এরই পরে যখন কৃষিপণ্যের মূল্য সমান হারে বাড়ানোর চাহিদা হবে, তার অনিবার্য প্রতিক্রিয়া ঘটবে শিল্প-পণ্যের উপর। অপর দিকে, সরকারী আইনের সাহায্যে শুধু খাদ্যশস্যের মূল্য যদি কম রাখবার চেষ্টা করা হয়, সে চেষ্টাও ফলপ্রসূ হবে কি না বা হওয়া সঙ্গত কি না সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে।

পরিকল্পনার প্রথম অধ্যায়ে উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই কিছু পরিমাণে মূল্যবৃদ্ধি হবে একথা পরিকল্পনা-বিশারদরা পূর্বেই বলেছেন; নিম্নহারে উৎপাদন রেখে মূল্যমান স্থির রাখার থেকে উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে কিছু পরিমাণে মূল্যবৃদ্ধি—বাঞ্ছনীয়। সে কথা মেনে নেওয়া গেল। কিন্তু পরিকল্পনাকে রূপ দেবার কালে সরকারী রাজস্বনীতি বা অর্থনিয়ন্ত্রণনীতি কিংবা প্রশাসনিক ব্যবস্থা, এই তিনটির মধ্যে এক বা একাধিক কোন কারণ বর্তমান অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটাচ্ছে; আর এই গতি রোধ করার জন্য যে পরিমাণ দূরদৃষ্টি এবং নিম্ন-আয়ের লোকেদের ক্রয়-ক্ষমতার প্রতি নজর থাকা দরকার, তার কিছু ঘাটতি পড়ছে। এবারকার বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী এই সমস্যাটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন, এর থেকে আশা করা যায়, সমস্যাটি নাগালের বাইরে চলে যাবার পূর্বেই সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

এয়ারোড্রোমে

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

তখন সন্ধ্যে সাতটা যখন পৌছলাম।
পয়লা ফাল্গুনের শীতের আমেজ :
এখনো শীত যায় নি, বসন্ত আসে নি।
পৃথিবীর নানা জাতের পাঁচ-মিশেলি মানুষকে
কে যেন এক ঠোঙায় ভরে
ক্রমাগত নাড়াচ্ছে
লাউড স্পীকার আর হরেক রকম শব্দের
মশলা মাখিয়ে।

কেউ এলো, কারুর মুখে হাসি ফুটলো,
কেউ গেলো, কারুর চোখ ঝাপসা হয়ে জল নামলো,
রুমাল ভিজলো।

তুলে দিতে এসেছে যারা
তাদের দাঁড়াবার শেষ সীমানার বেড়ার কাছে
খানিক আলো খানিক অন্ধকারে দাঁড়িয়ে
দেখছিলাম সার্চ-লাইটের অসংখ্য তীর-বেঁধা
হাওয়াই জাহাজের মাঠ।
লাল-নীল চোখ মটকে
গুরগুর করে মুহূর্তে মুহূর্তে
জেট আর বোয়িঙ্
ভাইকাউন্ট আর ক্যারাভেল
ফকার ফ্রেণ্ডশিপ এবং আরো কত জাতের প্লেন
মাটি ছুঁচ্ছে বা শূন্যে উধাও হচ্ছে।

দেখতে দেখতে শুনতে শুনতে যেন নেশা ধরে যায়।
কখন জানি না নিজেকে গিয়েছি ভুলে।
হঠাৎ নজর পড়লো লাউঞ্জের দরজায়
একটি মেয়ে পাশ ফিরে দাঁড়িয়ে,
কয়েকটি আলগা চুল তার গালে উড়ছে,
কি যে করবে যেন বুঝতে পারছে না।

সেই আলো-শব্দের আচ্ছন্ন অবস্থায়
হঠাৎ মনে হলো তুমি দাঁড়িয়ে,
আর আমার প্লেন ছাড়লো বলে।
মনে হলো আমার সত্তার এয়ারোড্রোম
যেন দুলছে গুরগুর করছে
আর বলছে,
জীবনে ফিরে আসার চেয়ে
ফিরে যাওয়াই বেশি।

কয়েক সেকেণ্ডের জন্য মনে হলো
এই পাশ-ফেরা মুখ
আর এই কয়েকটি উড়ন্ত চুল
যেন বলছে : এই শেষ, এই শেষ দেখা।
মনে হলো ফেরবার শক্তি নেই.
প্লেনের দিকে পা বাড়াবারও নেই ক্ষমতা।
মনে হলো হৃৎপিণ্ড
ঠিকমত কাজ করছে না।

তারপর সেই মেয়েটি মুখ ফেরালো,
লাউঞ্জের উজ্জ্বল আলো পড়লো তার মুখে।
পেন্সিলে আঁকা ভুরু
মাসকারা টানা চোখ
ঠোঁটে টিজিং-পিঙ্ক লিপষ্টিক
আর সমস্ত মুখ এনামেল করা।

নেশা ছুটলো।
বড় করে একটা নিঃশ্বেস নিলাম
আর ধরালাম চারমিনার সিগারেট
আর মনে হলো এতো ভালো সিগারেট
আগে কখনো টানি নি॥

বাঘ

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

ঐ বাঘ, বাঘটাকে দেখ।
দেখ তার সংবৃত বিক্রম।
বিরূপ এ পৃথিবীকে নিয়ে
কি আক্রোশ তার।
সারা দেহে পেশীতে পেশীতে
নিরন্তর সঙ্ঘাত-প্রস্তুতি
কি সুন্দর দেখতে যে!
থাবা দুটো মেলে
যেখানে বসেছে সেই ঘেসো মাঠটার
মাটির দখল নিয়ে কেমন বসেছে জেঁকে দেখ।

ও যে বাঘ,
ও যে কি সুন্দর,
ও কি সেটা জানে?
ওর যে হলুদ চোখ অগ্নিগর্ভ গন্ধকের মত,
ওর যে হলুদ দাঁত,
হলুদ মেঘের মত দেহে
কালো কালো বিদ্যুতের ডোরা,
সে-দেহে যে পেশীতে পেশীতে
সংহত বিদ্যুৎ,
ওর যে গলাতে মেঘ ডাকে,
ও কি সেটা জানে?

স্পর্দ্ধার উগ্রতা ভরা গন্ধ ওর গায়ে
গন্ধক-ধূমের মত।
তাই দিয়ে বাতাসকে ভারী ক'রে তার
বাতাস দখল করা দেখ।

বাগে পেলে ঐ বাঘ
আমাকে যে ছিঁড়ে খাবে, জানি।
থাবা মেরে, থাবা মেরে কত যে ধারায়
বুকে-পিঠে রক্তস্রোত বওয়াবে আমার।
কামড় বসাবে গলাটায়।
হয়ত শুনতে পাব ক্ষীণ হয়ে আসা চেতনায়
আসন্ন তৃপ্তির গর গর তার গলার গভীরে।
তার পর ম'রে যাব।
ভীষণ যন্ত্রণা পেয়ে যাব।
তবু সে যন্ত্রণা
রোমাঞ্চ ধরাবে দেহে
যেন কোন ভয়ঙ্কর ভাল লাগা দিয়ে।
ওর যে হলুদ চোখ,
ওর যে হলুদ দাঁত,
হলুদ মেঘের মত দেহে
কালো কালো বিদ্যুতের ডোরা,
কি সুন্দর বাঘা-গন্ধ ওর গায়ে,
ও যে কি সুন্দর,
ভীষণ সুন্দর,
আর
ও যে জানে থাবা মেরে রক্ত বওয়াতে,
ও যে কামড়াতে জানে,
ও যে চুষে শুষে খেতে পারে,
ও যে বাঘ,—তাই।

মনে রেখো

শ্রীসুনীলকুমার নন্দী

আবার যখন জমছে মধু পুষ্পশাখে
অতর্কিতে হয়তো এসে মক্ষিরা যেই

ছুঁড়লো থাবা, বেদন মলিন পুষ্পশাখে
কেউ যদি ফের চোখ মেলে দাও, সেই প্রহরে

মনে রেখো, একদা এক বিজন পথিক
চলতে চলতে পুষ্পশাখের বেদন ছুঁয়ে

মেখেছিলো রক্ত যেন গানে গানে,
ওই অসহায় পুষ্পশাখে দস্যু এলে···

শব্দ গড়ায় দুর্গমতার উৎস বেয়ে···
আমি তো গান গেয়েছিলাম···অনুভবে

রইলো সে-গান, হাওয়ায় হাওয়ায় ব্যথার বনে—
মনে রেখো ॥

ভোর হচ্ছে

শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র

যা-কিছু বলছো, ভাবছো,—যতো পথ হাঁটলে, হাঁটালে,
'আলো' বললে যে-দাহকে, যে-দীপ্তিকে হাওয়ায় হারালে,
সবাই আর-এক অর্থে দেখা দেয় অন্যত্র দাঁড়ালে।

টুইট্-টুইট্ শব্দে, লম্বা শিসে, কতো-যে ধ্বনিতে
আকাশ ফর্শা হচ্ছে, জেগে উঠছে পক্ষী-পরিবার!
রাতের ঢাক্‌নি খুলছে, মনে হচ্ছে দেখা দিচ্ছে সে-ই
শরীর উজ্জ্বল যার, অফুরন্ত যে শুধু ঝংকার।

তীক্ষ্ণ ঘটনার শেষে ঘৃণা-লজ্জা-ভয়ের মারীতে
হতাশা দাঁড়ায় এসে অন্ধকার প্রথম সারিতে।
কিন্তু তা চূড়ান্ত নয়; কারণ, সময় এক স্রোত
সব স্থিতি ভেদ করে নেবেই সে শেষ শোধ-বোধ।

তারই ভূমিকায় এই সরু পায়ে মাছির বেড়ানো।
প্রাণের অদ্ভুত দায় এই সব সময় তাড়ানো,
টুইট্-টুইট্ শিসে পাখিদের আকাশ জাগানো।

হরতন

শ্রীবিমল মিত্র

কুড়ি

আসলে এর জন্যে হয়ত কেউই দায়ী নয়। কোথায় কেষ্টগঞ্জের কোন্ এক কর্ত্তামশাই কোন্ এক অতীত বংশ-গৌরবের মিথ্যে আড়ম্বর নিয়ে দম্ভে আত্মগরিমায় অন্ধ হয়ে উন্মাদ হয়েছিলেন, তার সেই সুযোগ নিয়ে সেই রন্ধ্রপথে বুঝি কোন্ এক অশুভ সম্ভাবনা আত্মপ্রকাশ করেছিল। এ যেমন নির্ম্মম তেমনি মর্ম্মান্তিক। মানুষের দৃষ্টিহীন নিয়তি যেমন তাকে হঠাৎ আকাশের উত্তুঙ্গ চূড়ায় তুলে অবিশ্বাসী করে তোলে, তেমনি কঠোর অন্ধকূপের বাস্তব বিশ্লেষণের মধ্যেও তাকে নাস্তিক করতে প্ররোচনা দেয়। সে তখন বলে কিছুই সত্য নয়। ঈশ্বর, পৃথিবী, জীবন, জন্ম, বেদনা, সাফল্য সব মিথ্যে। একমাত্র সত্য আমি। আমার সাফল্য, আমার ব্যর্থতা, আমার জন্ম, আমার মৃত্যু, আমার অনুভব, আমার অনুরাগ ছাড়া আর সব কিছুকে আমি অস্বীকার করি।

এমনি করেই একদিন কর্ত্তামশাই অহঙ্কারের উত্তুঙ্গ শীর্ষে উঠে নিজের শরীর-মন-অনুভূতিকে ঘিরে একটা ব্যূহ রচনা করে তার মধ্যেই বাস করছিলেন। তিনি ভাবতেন নিজের কথা, তিনি স্বীকার করতেন নিজের গৌরব, তিনি অনুভব করতেন নিজের অহঙ্কার। ভেবেছিলেন, সেইটুকু মূলধন দিয়েই তিনি গোটা বিশ্বটা না হোক, গোটা কেষ্টগঞ্জটাকে কিনে ফেলবেন। তারপর তাঁর পূর্ব্বপুরুষের সমস্ত বিস্মৃত গৌরবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে একেশ্বর-অধিপতি হয়ে কেষ্টগঞ্জে প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করবেন।

কিন্তু তা হ'ল না।

হ'ল না, কারণ, তেমন কখনও হয়নি, তেমন কখনও হয় না, তেমন কখনও হবেও না।

সেদিন কি কারণে বৈঠকখানা ঘর থেকে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে যাচ্ছিলেন। যেমন রোজই ওঠেন, উঠতে গিয়ে বুকে ব্যথা লাগে, তবু ওঠেন। চিরকাল এমনি আসছেন বলেই ওঠেন। তাঁর ভাঙা বাড়ী আবার প্রাসাদ হয়েছে বলে আরও বেশি উৎসাহ নিয়েই ওঠেন। শুধু সিঁড়ি দিয়েই ওঠেন, তাই-ই নয়। ছাদেও ওঠেন। ছাদে উঠে সিংহাসনে ওঠার আনন্দে ডগমগ হয়ে যান! এ-সব তাঁর। এই বাড়ী, এই সংসার, এই হরতন, এই ভট্টাচার্য্য বংশ, এই কেষ্টগঞ্জ, এই বাংলা দেশ, এই ইণ্ডিয়াটাও যেন তাঁর নিজের মনে হয়। একমাত্র দুলাল সা ছাড়া আর সবই তাঁর। আবার তাঁর সব হয়েছে। হয়ত দুলাল সা'র কাছে তাঁর অনেক দেনা। এক লক্ষ টাকা দেনা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সমস্তই যখন তাঁর, তখন দুলাল সা'র দেনাটাও আর দেনা নয়। দুলাল সা'ই থাকবে কি না আগে তাই দেখ। দুলাল সা যখন থাকল না, তখন দুলাল সা'র দেনাটাও রইল না। যত জমি তিনি বেচে দিয়েছেন, যত জমি তিনি দুলাল সা'র কাছে বন্ধক রেখেছেন সব আবার তাঁর হয়ে গেল। যতই তিনি ভাবেন ততই পা দুটো তাঁর আরও দুর্ব্বল হয়ে যায়! তিনি আরও জোরে জোরে পা ফেলেন।

কিন্তু সেদিন হঠাৎ ব্যতিক্রম হ'ল।

পা দুটো ঠিক জায়গায় ফেলতে গিয়ে বেঠিক জায়গায় পড়ে গেল। প্রথমে বুঝতে পারেন নি। কিন্তু তিন দিন পরে যখন জ্ঞান হ'ল তখন দেখলেন, তাঁর চারপাশে লোকজন। ডাক্তারবাবু তাঁর মুখের ওপর ঝুঁকে চেয়ে দেখছেন।

তিনি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে সকলের মুখের দিকে চেয়ে দেখতে লাগলেন।

নিবারণ সরকার চেয়ে চেয়ে দেখছিল এতক্ষণ। সামনে ঝুঁকে পড়ে কর্ত্তামশাই-এর মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল—কিছু বলবেন?

তিনি অনেক চেষ্টা করে ঠোঁট-মুখ বেঁকিয়ে কি যেন বললেন।

কিন্তু কেউ কিছু বুঝতে পারলে না কথাটা।

নিবারণ কানটা আরও মুখের কাছে নিয়ে গেল। তারপর বললে—হরতনের কথা জিজ্ঞেস করছেন ত?

সকলকে বলা ছিল হরতনের অসুখের অবস্থার কথাটা যেন না বলা হয়। কর্তামশাই-এর তখন ভাল করে খেয়ালই হচ্ছে না কতদিন তিনি পড়ে আছেন। এতদিন ধরে যে তাঁর চিকিৎসা করবার জন্যে এত টাকা খরচ হয়েছে, কলকাতা থেকে এত ডাক্তার এসেছে, তিনি তার কিছুই টের পাননি। মানুষ সৌভাগ্যের আশায় শুধু টাকা নয়, আয়ুও কামনা করে। সৌভাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে সে-সৌভাগ্য ভোগ করবার মত স্বাস্থ্যও চায়। কিন্তু কর্তামশাই-এর যেন সেই আশা করবার ক্ষমতাটুকুও চলে গিয়েছিল তখন। তিনি হয়ত তখন ভাবছিলেন, আবার তিনি ভাল হয়ে উঠবেন। আবার তাঁর সব ঐশ্বর্য্য ফিরে আসবে!

কিন্তু আর সকলে জানত ভট্টাচার্য্য-বংশ আবার হয়ত নিজের গৌরব ফিরে পাবে, কিন্তু কর্তামশাই হয়ত তা আর দেখতে পাবেন না।

বড়গিন্নীর দুঃখটা ছিল সেইখানেই। তিনি চিরকাল মুখ বুজে সবই দেখে এসেছেন, বুঝে এসেছেন। এ-সংসারের ঐশ্বর্য্যও তিনি দেখেছেন, এ-সংসারের দুঃসময়ও তিনি দেখেছেন। কিন্তু কোনওদিনই তিনি তাতে বিচলিত হননি। কিংবা বিচলিত হলেও বাইরের কেউ তা টের পায়নি কোনওদিন।

তিনিও ঘরের বাইরে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

আর বঙ্কু? তার যেন কোনও দিকে দেখবার, কোনও কিছু ভাববারও সময় নেই। সে যে এ-বাড়ীর কেউ নয়, সে-কথা যেন সে ভুলেই গিয়েছিল। এতদিনে সে যেন এ-বাড়ীর একান্ত আপন-জন হয়ে গিয়েছিল। তার খোঁজ কেউ রাখত না, কিন্তু সে সকলের খোঁজ রেখে রেখে সকলকে অস্থির করে তুলত।

বলত—মাসীমা, তুমি না খেলে আমিও খাব না কিন্তু।

বড়গিন্নী কিছু বলতেন না। বঙ্কুর বকাবকিতে খেয়ে নিতেন।

বঙ্কু বলত—আমিও তোমার মত মাঝে-মাঝে খেতাম না, জান মাসীমা, রাগ হ'লে ভাত ফেলে উঠে যেতাম—

তারপর একটু থেমে আবার বলত—রাগ ত করতাম অধিকারী-মশাইএর ওপর, কিন্তু তখন আমার পেটের মধ্যে হামান্-দিস্তের ঘা পড়ছে—

এমনি গল্প আর তার শেষ হ'ত না।

বলত—অধিকারী মশাইকে চেনেন ত মাসীমা?

বড়গিন্নী বলতেন—না—

—বেটা বড় বদ্‌মাইস্—জান মাসীমা, বড় বদ্‌মাইস—

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ মাসীমা, বড় বদ্‌মাইস, খেতে দিত না মোটে। হরতনকে কি কম জ্বালিয়েছে নাকি?

—কেন? তোমাদের কষ্ট দিত কেন বাবা? তোমরা কি করেছিলে?

বঙ্কু বলত—কিছুই করিনি মা! আর কিই বা করতে যাব! বলতে গেলে ওই হরতনের জন্যেই ত দল চলত—। পাছে হরতনের গ্যাদা বেড়ে যায় সেই জন্যেই আর কি অমন করে বকৃত খালি খালি—

বড়গিন্নী কথাগুলো শুনতেন চুপ করে। আর সারা সংসারটার দিকে নজর দিয়ে খেটে যেতেন। কর্তামশাই-এর বুকে সরষের তেল মালিশ করতেন রাত্তির বেলা। দিনে দিনে সংসারে খাবার লোকও ত বেড়ে চলেছিল। কর্তামশাই-এর যখন আবার অবস্থা ফিরেছে, তখন পোষ্যের সংখ্যাও ত বেড়েছে।

নিবারণ সরকারের কাছে গিয়ে বঙ্কু বলত—দিন সরকার মশাই, টাকা দিন—

টাকার কথা শুনলেই নিবারণের বুকটা ধড়াস্ করে উঠত। আবার টাকা! কর্তামশাই ত টাকা চেয়েই খালাস! হিসেব ত রাখতে হ'ত নিবারণকেই। একমাত্র নিবারণই জানত কত টাকা চেয়ে আনতে হয়েছে দুলাল সা'র কাছারি থেকে। যত টাকা চেয়েছে নিবারণ, তত টাকাই দিয়েছে সা' মশাই। প্রত্যেকবার টাকা নিয়েছে নিবারণ আর মুচলেকায় সই করে দিয়েছে কর্তামশাই-এর ব-কলমায়।

দুলাল সা'র কাছে গিয়ে কাকুতি করতে কেমন যেন লাগত নিবারণ সরকারের।

কিন্তু দুলাল সা'র কোনও কিছুতেই ভ্রুক্ষেপ নেই।

বলত—আরে! তুমি কি পাগল হয়েছ নিবারণ? আমাকে তুমি কি সেই রকম লোক পেয়েছ?

নিবারণ বলত—না না, তবু ত লজ্জা করে হাত পেতে টাকা নিতে—

—দেখ নিবারণ—

দুলাল সা তখন গম্ভীর হয়ে উঠত।

বলত—দেখ নিবারণ, তোমরা কর্ত্তামশাইকে না চিনতে পার কিন্তু আমাকে চেনাতে এস না কর্ত্তামশাইকে। আমি লোক চিনি—

—কিন্তু এত দেনা হয়ে গেল; এ ত আর চারটিখানি টাকা নয়—

—তা না হোক্, হরির দয়ায় টাকার আমার অভাব নেই, আর টাকা নিয়ে কি আমি ধুয়ে খাব? আমিই ত সব টাকা—সম্পত্তি ফেলে রেখে চলে যাব রে বাবা; তখন কে আমার এত টাকা খাবে?

—আপনার এখন ছেলে দেশে ফিরে এসেছে, সে হয়ত……

—ছেলে? আমার টাকা আমি খরচ করব, আর ছেলে তাতে আপত্তি করবে? তুমি কি বলছ নিবারণ? তুমি তা হ'লে আমার ছেলেকে চেননি—

এসব কথা পুরণো। এ-সব নিয়ে অনেক কথা হয়ে গিয়েছে দুলাল সা'র সঙ্গে। এ নিয়ে নিবারণ সরকার ভাবা ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু সেদিন আবার যথাসময়ে দুলাল সা'র বাড়ী গিয়ে সদর-গেটের সামনেই পুলিশের লোক দেখে কেমন অবাক্ হয়ে গেল। শুধু পুলিশ নয়, মাঝে আর একজন লোক। লোকটা যেন কেমন পাগল-পাগল। পাগলের মত মুখে কি যেন সব বিড় বিড় করে বলছে।

তার বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে আছে দুলাল সা আর তার পাশে দুলাল সা'র ছেলে বিজয়। আর তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে নতুন-বৌ। নতুন-বৌ-এর এ-রকম চেহারা কখনও দেখেনি সরকার মশাই আগে।

নিবারণকে দেখে দুলাল সা এগিয়ে আসছিল।

কিন্তু তার আগেই পুলিশ পাগলটাকে ধরে নিয়ে গিয়ে সা-মশাই-এর সামনে হাজির হ'ল।

দুলাল সা নিবারণকে জিজ্ঞেস করলে—কি নিবারণ, তুমি?

কিন্তু নিবারণ কিছু উত্তর দেবার আগেই নতুন-বৌ এগিয়ে এসেছে পুলিশদের সামনে।

বললে—এই সেই লোকটা? কিন্তু এ ত সে নয়। বিয়ের সময় ত আমি একে দেখিনি—

—আজ্ঞে, মিসেস সা, এরই নাম দোলগোবিন্দ, এই লোকটিই আপনার বিয়ের ঘটকালি করেছিল, আপনি বেশ ভাল করে চেয়ে দেখুন—

পাগলটা যেন ঠিক আসল পাগল নয়। নতুন-বৌ-এর দিকে খানিকক্ষণ হাঁ করে চেয়ে রইল।

নতুন-বৌ তার দিকে চেয়ে হঠাৎ বললে—বল তুমি, আমার বিয়ে তুমিই দিয়েছিলে?

দোলগোবিন্দ হঠাৎ হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল।

নিবারণ সরকার এ-ঘটনা দেখবে আশা করেনি। এর পারিবারিক কোনও দুর্ঘটনা ঘটে গেছে নিশ্চয়। এর মধ্যে কেন সে আসতে গেল। তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বাড়ীর দিকেই পা বাড়াচ্ছিল। দরজা পর্য্যন্ত এসেছে এমন সময় পেছন থেকে নতুন-বৌ ডাকলে—সরকার মশাই, আপনি যাবেন না, আপনার সামনেই সব কথা হয়ে যাক্।—আসুন—

ক্রমশঃ

—

রামানন্দ
জন্ম-শতবার্ষিকী

মনীষী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের শতবার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে ১৩৭২ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে কলিকাতায় একটি প্রদর্শনী করার কথা হইয়াছে। প্রদর্শনীতে অন্যান্য জিনিষের সঙ্গে তাঁহার প্রকাশিত "দাসী", "প্রদীপ", "প্রবাসী", "Modern Review" ও হিন্দী "বিশাল ভারত" প্রভৃতি পত্রিকার পুরাতন সংখ্যা প্রদর্শিত হইবে। প্রথম বৎসরের পত্রিকাগুলি বড় কোথাও দেখা যায় না। এইগুলি পাইলে বিশেষ উপকার হয়। অন্যান্য বৎসরের মধ্যে ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বের অর্থাৎ তাঁহার জীবিতকালে প্রকাশিত সকল সংখ্যা প্রদর্শিত হইবে আশা করিতেছি। পত্রিকাদি ছাড়া তাঁহার যে কোন বয়সের একক বা গ্রুপ ফটো (সুস্পষ্ট), পেনসিল স্কেচ, তাঁহার লিখিত মূল্যবান্ চিঠি বা রচিত প্রবন্ধাদির খবরও পাইলে উপকার হয়। তিনি ইংরেজী ও বাংলা নানা পত্রে বহু বৎসর লিখিয়াছেন। সেই সেই পত্রের সেই সেই সংখ্যা কাহারও থাকিলে জানাইবেন। বহু সভা-সমিতিতে অভিভাষণ দিয়াছেন। সেগুলিও সংগৃহীত হইলে ভাল হয়। তাঁহার রচিত বর্ণ পরিচয়, Century Primer, প্রভৃতি শিশুপাঠ্য পুস্তক ও তাঁহার সম্পাদিত রামায়ণ, মহাভারত ও আরব্য উপন্যাস প্রথম সংস্করণের সন্ধান চাই। Chatterjee's Picture Albums, Towards Home Rule, Raja Ravi Varma, Rammohan and Modern India প্রভৃতি পুস্তকও কাহারও নিকট থাকিলে খবর দিবেন। আমরা প্রয়োজন মত কিছু কিছু লইব। যাহা দুষ্প্রাপ্য বলিয়া রাখিতে চাহিব তাহার মূল্য সংগ্রাহক কত চান জানাইবেন। বাকি যাহা প্রদর্শনীর পর ফেরত দিব তাহা ডাকে যাইবার সম্ভাবনা। জিনিষের ফর্দ্দ পাঠাইলে তাহার মধ্যে কি কি রাখিব পরে জানাইব।

"প্রবাসী"র যুগের আগের ভারতীয় মাসিক পত্রিকাদি প্রদর্শনীতে রাখিতে চাই। যথা বঙ্গদর্শন, ভারতী, সাধনা, মুকুল, সখা ও সাথী, হিন্দী সরস্বতী ইত্যাদি। Modern Review-এর পূর্ব্বেকার ভারতীয় ইংরেজী মাসিক পত্র এবং রামানন্দ সম্পাদিত— Kayastha Samachar প্রভৃতি পাইলে ভাল হয়। তাঁহার এলাহাবাদ প্রবাসকালে Advocate প্রভৃতি পত্রে তিনি লিখিতেন, সেগুলো পাওয়া সম্ভব হইলে ভাল। ৭০।৭২ বৎসর পূর্ব্বে "ধর্ম্মবন্ধু" নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হইত। কিছুদিন রামানন্দ তাহার সম্পাদক ছিলেন। তাহা পাইলে সাদরে গৃহীত হইবে।

এই সকল জিনিষ যাঁহাদের নিকট আছে তাঁহারা ইংরেজী ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় খবর দিলে সুখী হইব। আমরা উত্তর দিবার পূর্ব্বে জিনিষ পাঠাইবেন না।

ইতি

শ্রীশান্তিশ্রী নাগ

১০৮, রাজা বসন্ত রায় রোড, কলিকাতা—২৯

পঞ্চশস্য

স্পুৎনিকের "চোখ"

স্পুৎনিক—আকাশযাত্রী যা কি না আমাদের এক পরিচিত চাঁদেরই একটি সামান্য অনুকরণ—পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান, এমন কি সমস্ত মানুষজাতির পক্ষেই তা এক বিরাট গর্বের জিনিষ, মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব এবং ক্ষমতা এই কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপনের মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে। সাধারণের কাছে স্পুৎনিক একটি দর্শনীয় জিনিষ; দর্শনীয় তা নিশ্চয়ই কিন্তু এই দর্শনীয়তাকে অতিক্রম করে বিজ্ঞানের জটিল প্রশ্নগুলি যে পর্যায়ে এসে তার প্রয়োগ সম্ভাবনার পথগুলি উন্মুক্ত করেছে, সেই মূল বিষয়টিই সাধারণের চোখে বিশেষত্বহীন থাকে। রকেটও ওড়ে আবার ফানুসও ওড়ে—ওড়ার দিক থেকে এদের মধ্যে কোন তফাৎ নেই, কিন্তু আর-একদিক থেকে এদের মধ্যে বড় তফাৎ। রকেটের গতি যেভাবে নিয়ন্ত্রিত, রকেটবাহী স্পুৎনিকগুলিও সেভাবে মানুষের ইচ্ছাকে বহন করে চলে। নানা যন্ত্রের সমারোহে এই ইচ্ছাটি বা বিজ্ঞানীর বিশেষ উদ্দেশ্যটি কার্যকরী হয়। "এই সাংকেতিক ইঙ্গিতময়" নিয়ন্ত্রণসূত্র (বিশেষণ দুটির ব্যবহার বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ) রকেট ওড়ার সমস্ত ব্যাপারটিকেই সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে তাৎপর্যময় করে তোলে। ফানুসের অনির্দেশ প্রায় নিয়ন্ত্রণহীন ওড়ার সঙ্গে তার কোন মিলই চলে না। পৃথিবীর কোন কক্ষপথে স্থাপিত যে স্পুৎনিক—কৃত্রিম উপগ্রহ, তা যে শুধু রকেটের দ্বারা বাহিত হয়েছে তা নয়, বিজ্ঞানীর কোন বিশেষ উদ্দেশ্যও তা বহন করে চলে। এ পর্যায়েরই একটি সাম্প্রতিক নিদর্শন ২৫ ইঞ্চি (৬২ সেণ্টিমিটার) ব্যাসের একটি ছোট্ট উপগ্রহ। অ্যালুমিনিয়ামের তৈরী এই গোলক "একস্-রে"র দৃষ্টিসম্পন্ন এ যেন "দেখতে" পায়, সূর্যের থেকে নানা ধরনের নানা তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের যে একস্-রে রশ্মি বিকীর্ণ হচ্ছে এই উপগ্রহের মধ্যকার যন্ত্রে তা ধরা পড়ে। সূর্য—যা আমাদের কাছে শুধু আলো আর উত্তাপের উৎস—এভাবে তার আর এক নূতন রূপ আমাদের কাছে বিকশিত হয়। স্পুৎনিকের "চোখে" আমরা সূর্যকে আরেক ভাবে চিনলাম। তেজোময় জ্যোতিষ্ক চিরদিনের পরিচিত যে সূর্য তাকে আমরা আংশিক ভাবে জানি মাত্র; সাধারণ আলো এবং উত্তাপ ছাড়াও সূর্য যে নানা ধরনের তেজঃকণা এবং রশ্মি বিকিরণশীল তা অনেকদিন পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের কাছে অজানা ছিল। শুধু তাই নয়—সূর্যের প্রভাব পৃথিবীতে যে কি পরিমাণ কার্যকরী—জোয়ার ভাটার কথা বাদ দিলেও আকাশ, উল্কাকোণ, বিশেষত আয়নোস্ফিয়ার অঞ্চলে এই প্রভাব যে কতটা ছড়িয়ে পড়তে পারে এই সেদিন পর্যন্ত তা ছিল আধুনিক বিজ্ঞানের ধারণাতীত, এমন কি আজো যে তা খুব স্পষ্ট তা নয়। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল সূর্যের "বায়ুমণ্ডলে"র নাকি অন্তর্গত, সূর্যের এই পরিমণ্ডল নবগ্রহময় সমস্ত সৌরজগৎ জুড়েই পরিব্যাপ্ত। পৃথিবীর জলহাওয়া সূর্যের অবস্থার উপর নির্ভর করে। সূর্য এমনিতেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণশীল, সময় সময় এই বিস্ফোরণ আরো চরমে ওঠে, নানা রকম তেজস্ক্রিয় রশ্মি একস্-রে এবং আয়নিত বহু বস্তুকণা তখন সূর্যদেহ থেকে ছিটকিয়ে পড়ে। তারই কিছুভাগ পৃথিবীর সীমানায় এসে আকাশের অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়। ফলে শুধু যে জলবাহী নিম্নস্তরের মেঘের গতি বা পরিস্থিতির বদল হয় তাই নয়, আয়নোস্ফিয়ার অর্থাৎ আকাশের বেতার-তরঙ্গ প্রতিফলক যে স্তর তা-ও কেমন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, বেতার-বার্তা যাতে ব্যাহত হয়। পৃথিবীতে সূর্যের প্রভাব এ ভাবে সুদূরপ্রসারী। আবহাওয়ার পরিবর্তন এবং রেডিও-সংযোগ এর দু'টি গুরুত্বপূর্ণ দিক। পৃথিবীকে ভাল করে বুঝতে হ'লে সূর্যকে প্রথমে জেনে নেওয়া চাই। বিজ্ঞানীরা তাই আজ সূর্যের দিকে চোখ ফিরিয়েছেন। দিনের আকাশে কি উজ্জ্বল ভাস্বর এই সূর্য অথচ জ্ঞানের চোখে তা আজও "অন্ধকার"। শুধু মানুষের চোখে এই অন্ধকার দূর হয় না। যন্ত্রের সাহায্য তাই এসেছে। অতি সম্প্রতি স্পুৎনিকের—মানুষের তৈরি কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্য। স্পুৎনিকের "চোখে" সূর্যের বিশেষত্বগুলি একে একে ধরা পড়ছে। একস্-রের দৃষ্টিসম্পন্ন ছোট এই উপগ্রহটি ভারত সহ পৃথিবীর ষোলটি দেশের বিজ্ঞানীদের কাছে এ খবর পৌঁছে দিচ্ছে।

বিজ্ঞান দেখুন

সাহিত্যের একটা অঙ্গ দৃশ্যকাব্য অর্থাৎ যা কিনা দর্শনীয়—নাটক নৃত্যনাটক যাত্রা এবং আধুনিক যুগের সিনেমা তার উদাহরণ। সঙ্গীতের শ্রবণযোগ্যতার মত সাহিত্যের দৃশ্যময়তা বিশেষ একটি গুণ। এমনিতে সাহিত্য উপকরণহীন বিমূর্ত, কিন্তু তার অস্পষ্ট কল্পনা ও ঘটনাগুলির আশ্রয়ে বিচিত্র এক রস জারিয়ে ওঠে, মন যেন কিসের সঙ্গী পায়—অপরূপ অনুভূতিগুলি বর্ণালী লেখায় ফুটে ওঠে। একের মনের এ সমস্ত অভিজ্ঞতা অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত করা বড় জটিল প্রক্রিয়া যে কোন শিল্প-মাধ্যম সম্বন্ধেই এ কথা সত্য। তবে তার কিছু কিছু সরাসরি চোখের সামনে তুলে ধরা যায়। দৃশ্যকাব্যের আয়োজনের মধ্যে সাহিত্যের এ দিকটা সফল হয়েছে। যা আমরা মনশ্চক্ষে দেখি, চামড়ার চোখে তা সহজেই জীবন্ত হয়ে ওঠে। ইন্দ্রিয়ের পাঁচটি জানালা, তারই একটি—দৃষ্টির মাধ্যমে বাইরের কথা মনের মহলে গিয়ে ঘা দেয়। মনসা আমরা বৃন্দাবন যেতে পারি। কিন্তু সে যাওয়াটা খুবই অস্পষ্ট, তাই আমরা সরাসরি বৃন্দাবনের টিকিট কাটি। যে পারে সে ঘরে বসেই তার বৃন্দাবন, কিন্তু বেশির ভাগ লোকের পক্ষে ঐ কথা। সাহিত্যের দর্শনীয় রূপগুলি এদিক দিয়ে খুব সার্থক। তাই দেখি, যা পড়নীয় তার পাঠকের তুলনায় যা দর্শনীয় তার দর্শকের সংখ্যা সহজেই ছাড়িয়ে যায়। কবি জীবনানন্দের "বনলতা সেন" বা বিষ্ণু দে-র "শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু"র উপর সাম্প্রতিক কবিতার যা পাঠক তা থেকে বোধ হয় যে কোন অসফল সিনেমা-চিত্রের দর্শকের সংখ্যা অনেক বেশি। শিল্প বিশেষের গুণগত বিচার সে হ'ল অন্য কথা, কিন্তু এই সহজ দর্শনীয়তার গুণে আজকের সিনেমা এত বেশি পরিমাণে সফল হয়েছে। সাহিত্যের গৌরব এতে কিছু ক্ষুণ্ণ হয় নি। বরং সিনেমা সাহিত্যের বিকাশে সাহায্য করেছে, তার কথাকেই আরো দূর পরিব্যাপ্ত করেছে।

বিজ্ঞান সম্বন্ধেও এ ধরনের কথা। স্পুৎনিক বা রকেট নিঃসন্দেহে মানুষের বিরাট জয়। কিন্তু আমাদের মনকে তা যতখানি অভিভূত করেছে, রাডার ইলেকট্রনিক মাইক্রোস্কোপ বা সাইক্লোট্রন যন্ত্র তা করে

নি। কোন্‌টি ছোট বা কোন্‌টি বড় তার বৃথা বিচার এখানে করতে বসি নি—বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় এদের প্রত্যেকেই এক একটা বড় বড় ধাপ। কিন্তু যে কথার উপর জোর দিতে চাই—স্পুৎনিক যে মানুষের চিত্ত জয় করল তার মূলে জটিল যান্ত্রিকতা ততখানি নয় যতখানি তার দর্শনীয়তা—যা কিনা মানুষের তৈরি হয়েও চাঁদের মত পৃথিবীর চারপাশে ঘুরপাক খায়। সঙ্গে থাকে নানা তথ্যসন্ধানী যন্ত্র, শুধু তাই নয়, দূর আকাশে কুকুর বানর এমন কি মানুষ পর্যন্ত তা বহন করছে। দর্শনীয়তা শ্রুতিগম্যতা স্পষ্টতা—যা আমরা দেখি শুনতে পাই বুঝতে পারি তা যে আমাদের কাছে কতখানি সত্য, স্পুৎনিকের সত্য তা নূতন করে উৎঘাটন করল। বিজ্ঞানের যুগ—অথচ বিজ্ঞান ঠিক এই কারণে সাধারণের কাছে "মার" খাচ্ছে। যদি বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত সত্যগুলি দর্শনীয় করে তুলতে পারি তবে কাজটি সহজ হয়। বিজ্ঞান চলচ্চিত্র, বিজ্ঞান প্রদর্শনী পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে খুবই সাধারণ জিনিষ। বিজ্ঞানভিত্তিক চলচ্চিত্র যত দূর জানি আমাদের দেশে এখনো সম্ভব হয় নি। তবে সুখের কথা বিজ্ঞান প্রদর্শনী একাধিক বার আয়োজিত হয়েছে। বিজ্ঞানের কিছু কিছু তত্ত্ব এভাবে দর্শনীয় হয়ে উঠেছে সাধারণের মনে ধারণার সঞ্চার হয়েছে, "দৃশ্যবিজ্ঞান" দৃশ্যকাব্যের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ৭০তম জন্মতিথি উপলক্ষে সম্প্রতি রামমোহন লাইব্রেরী হলে একটি বিজ্ঞান প্রদর্শনী হ'ল—ফেব্রুয়ারীর ১৩ তারিখ থেকে ২৩ তারিখ পর্যন্ত আট দিনব্যাপী। নীচে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত এই বিজ্ঞান প্রদর্শনীর একটি সাধারণ চিত্র।



শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসুর সপ্ততিতম জন্মতিথি উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিজ্ঞান-প্রদর্শনী

মানুষের ইন্দ্রিয় বোধ নয়, যন্ত্রের ইঙ্গিতময় বিশেষত্বগুলির মাধ্যমে সত্য, তার যা বক্তব্য সাধারণের ভাষায় অ-গাণিতিক কথায় তার বর্ণনা বা ব্যাখ্যা চলে না—মূল কাঠামোটার একটা আভাস মেলে মাত্র। এ সব নিয়ে মস্ত সমস্যা। বিজ্ঞানের ফসলগুলি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে পাচ্ছি সত্য কিন্তু তার প্রভাব সকলের মধ্যে আরো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে হ'লে তার সম্বন্ধে আমাদের ধারণা শুধু বিশেষজ্ঞদের মধ্যে নয়—সাধারণের মধ্যেও ছড়িয়ে দেওয়া চাই। যাঁদের জীবন সবে গ'ড়ে উঠছে সেই ছাত্রছাত্রীদের সম্বন্ধে এ কথা আরো বেশি করে সত্য। জটিল বিজ্ঞান আজীবন সাধনার জিনিষ। সাধারণের মত করে কিছু ধারণা, ছোটদের মত করে কিছু প্রস্তাবনা তাই এত কঠিন। বিজ্ঞানের বিমূর্ত নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্বলোকের কিছু কিছু যদি নানা উপকরণের মাধ্যমে

জিরার্ড পিয়েল একটি ব্যতিক্রম চরিত্র

এ বছর কলিঙ্গ পুরস্কার পেলেন শ্রীজিরার্ড পিয়েল (GERARD PIEL)। সাধারণের জন্য বিজ্ঞান রচনায় এই পুরস্কারের অর্থমূল্য প্রায় ১৪,০০০ টাকা। প্রিয়দর্শী রাজা অশোকের কলিঙ্গ বিজয়ে স্মরণীয় ঘটনার তাৎপর্য্য বহন করে এই আন্তর্জাতিক পুরস্কার উড়িষ্যা ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী ও অগ্রণী শিল্পনায়ক শ্রীবিজয়ানন্দ পটনায়কের আনুকূল্যে প্রবর্তিত হয়।

জিরার্ড পিয়েল আমেরিকার বিখ্যাত বিজ্ঞান মাসিক সাইন্টিফিক আমেরিকার সম্পাদক। বিজ্ঞান লেখক হলেও তিনি মূলে বৈজ্ঞানিক নন। এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান তাঁর পাঠ্যবিষয় পর্যন্ত ছিল না



জেরার্ড পিয়েল

হার্ভার্ডের অর্থনীতি ও ইতিহাসের এই ছাত্র পরবর্তী জীবনে বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হন। অবশ্য সাধারণভাবে বলতে গেলে বিজ্ঞানের চিন্তাধারা ও তথ্যগুলির প্রতি এ যুগে সকলেই আকৃষ্ট থাকেন। তবে তাঁর এই আকর্ষণ তাঁকে বিজ্ঞানের দিকেই জীবন ও জীবিকার পথ বাড়িয়ে দিয়েছিল। প্রথমে (১৯৩৯ সালে) তিনি ছিলেন বিখ্যাত লাইফ (Life) ম্যাগাজিনের বিজ্ঞান সম্পাদক। তার পর গত ১৬ বছর ধরে তিনি সাইন্টিফিক আমেরিকানের সম্পাদনা যোগ্যতার সঙ্গেই করে আসছেন। শ্রীপিয়েল "মানুষের জন্য বিজ্ঞান" (Science for the Service of Man) নামে একটি উল্লেখযোগ্য বইয়ের প্রণেতা।

আমাদের দেশে—যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর মাপকাঠিতে মানুষের গুণ ও যোগ্যতার বিচার হয় সেখানে শ্রীপিয়েল-এর জীবনধারাই আশ্চর্য্য ব্যতিক্রম।

"অবারিত দ্বার"

"অবারিত দ্বার" একটি প্রবন্ধের নাম। প্রবন্ধকার এই একটি মাত্র কথায় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বিজ্ঞান-সাধনা ও চরিত্রের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি একই সঙ্গে ফুটিয়ে তুলছেন। এই বিচিত্র প্রবন্ধটির রচয়িতা খড়্গপুর আই-আই-টি-র বিশিষ্ট অধ্যাপক ডঃ গগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজ্ঞানকে যাঁরা জানেন এবং সেই সঙ্গে তা সাধারণের মন করে সহজ বর্ণনা করতে পারেন এমন লোকের সংখ্যা যে কোন দেশের মণিকাঞ্চনযোগের মত দুর্লভ। আমাদের পক্ষে বিশেষ আনন্দের কথা দেশের জ্ঞানী-গুণী বিজ্ঞানীরা আজকাল মাতৃভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার দায়িত্ব সম্বন্ধে ক্রমশ অধিক মাত্রায় সচেতন হয়েছেন, এবং তাঁদের এই সাধনার ফলে বাংলার ভাষালক্ষ্মী নূতন নূতন সম্পদে ভূষিত হচ্ছেন। কিন্তু এ হ'ল অবস্থার এক পিঠ মাত্র। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানীদের এই যে বিশেষ অবদান দেশের জনসাধারণ সে সম্বন্ধে প্রায় অনবহিত; অধিকন্তু সাহিত্য লক্ষ্মীর অঞ্চল আসন গল্প উপন্যাস এবং রম্যরচনার আপাতরম্য চটকের মধ্যে বাঁধা। আধুনিক জীবনযাত্রায় বিজ্ঞান দিনমণির মত ভাস্বর তবু বিজ্ঞান বলতে আমরা যেন বুঝি রকেট স্পুৎনিক এবং যুদ্ধের বিকট সমস্ত যন্ত্র-দানব। সংবাদপত্রের মোটা-দাগের খবরগুলির মধ্যে বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিকতা প্রায়শই হারায়। মানুষের জয়ের মধ্যে বিজ্ঞানের জয়—তথা মৌলিক চিন্তাধারাগুলির জয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশেষত্ব নিয়ে ওঠে; যোগ্য বৈজ্ঞানিকই একমাত্র এদিকে সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেন—সঠিক বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে বোধকে জাগিয়ে তুলতে পারেন। বিজ্ঞানীর দ্বারা বিজ্ঞান রচনার বিশেষত্ব ঠিক এখানে। ডঃ গগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই প্রবন্ধটি তারই একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বিজ্ঞান সাধনা—বসু-সংখ্যায়ন তত্ত্ব লেখক কি সাবলীলভাবেই না ফুটিয়ে তুলেছেন, বৈজ্ঞানিক এই আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে আবার

অধ্যাপক বসু মহাশয়ের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলিও প্রবন্ধের বুননের মধ্যে আশ্চর্যভাবে ফুটে উঠেছে। "অবারিত দ্বার" প্রবন্ধটি রচনা হিসাবে নিঃসন্দেহে অনবদ্য—পৃথিবীর যে কোন ভাষাতেই ঠিক এ ধরনের লেখা খুবই দুর্লভ। অধিক ভূমিকায় কি কাজ, আমরা রচনাটি থেকে কিছু কিছু অংশ এখানে তুলে ধরছি। উৎসাহী পাঠক পুরো প্রবন্ধটির জন্য "জ্ঞান ও বিজ্ঞান" পত্রিকার আচার্য্য সত্যেন্দ্রনাথের সপ্ততিতম বর্ষ-পূর্তি স্মারক সংখ্যাটির (জানুয়ারী ১৯৬৪) খোঁজ করবেন।

"অধ্যাপক ডিরাক ও তাঁর পত্নী যখন কলকাতায় এসেছিলেন, তখন একদিন একটি মোটরে অধ্যাপক (সত্যেন্দ্রনাথ বসু) তাঁদের উভয়কে এবং বেশ কয়েকজন ছাত্র ও ছাত্রপ্রতিম ব্যক্তিকে নিয়ে যাত্রা করেছিলেন। অধ্যাপক (বসু) মিসেস এবং প্রফেসর ডিরাককে পিছনে বসিয়ে নিজে চালকের পাশে বসলেন এবং বাকী সকলকে একে একে নিজের কাছে নিয়ে নিতে লাগলেন। ফলে চালকের পাশের স্থানটির অবস্থা যা হ'ল তা সহজেই অনুমেয়। অধ্যাপকের কাণ্ড দেখে স্বল্পভাষী অধ্যাপক ডিরাকও চুপ করে থাকতে পারলেন না। কিন্তু ডিরাকের মন্তব্য ও প্রস্তাব অধ্যাপক এক কথায় উড়িয়ে দিলেন। তিনি সহাস্যে বললেন "We believe in Bose Statistics" (আমরা বোস-সংখ্যায়নে বিশ্বাস করি)। অধ্যাপক ডিরাক তৎক্ষণাৎ তাঁর পত্নীকে বুঝিয়ে দিলেন—বসু-সংখ্যায়নে বস্তুরা ভীড় করে।......

"এক কথায় অধ্যাপক ডিরাক সেদিন বসু-সংখ্যায়নের যে ব্যাখ্যা করেছিলেন তা বড়ই চমৎকার। আরও মজার ব্যাপার এই যে, অধ্যাপক ডিরাককে সেদিন যেখানে বসানো হয়েছিল সেখানে যেমন ভীড় নেই—ফের্মি-ডিরাক সংখ্যায়নেও (বা ফের্মি সংখ্যায়নেও) তেমনি অধ্যাপক ডিরাকের ভাষায় বলতে গেলে—বস্তুরা ভীড় করে না। এই সংখ্যায়নগুলি সম্বন্ধে জানবার আগে মৌলিক কণাসমূহের সম্বন্ধে কিছু জানা প্রয়োজন। পদার্থবিদ্যা আজ-যে অবস্থায় এসে পৌঁছেছে তাতে মনে করা হয় যে, সমস্ত জগৎটা কতকগুলি মৌলিক কণার দ্বারা গঠিত। প্রথম ফোটন বা আলোক-কণা। তারপর ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন এদের নিয়েই প্রায় সমস্ত বস্তুজগৎ। প্রোটন ও নিউট্রন মাঝখানে থাকে এবং ইলেকট্রনগুলি তাদের চারিদিকে নানা ভঙ্গিতে ঘোরে। এদেরই নানাপ্রকার সহাবস্থিতিতে নানাপ্রকার বস্তুর সৃষ্টি হয়। শুধু মাত্র একটি প্রোটনের চারদিকে একটি ইলেকট্রন ঘুরলে সেটা হয় হাইড্রোজেন অণু (পরমাণু?)। রসায়নবিদ্যার একটা বড় অংশ শুধু এই মৌলিক কণার সাহায্যেই বুঝতে পারা উচিত। কিন্তু আজ অবধি যে পরিমাণ মৌলিক কণার সন্ধান পাওয়া গেছে, তাদের তুলনায় এরা সংখ্যায় নেহাৎ অল্প। অন্যান্য মৌলিক কণাগুলি প্রায় সকলেই ক্ষণস্থায়ী বলে বস্তুর গঠনে তাদের প্রভাব প্রত্যক্ষ নয়। এদের আবার নানা সমষ্টিতে ভাগ করা হয়েছে। তার মধ্যে একটি সমষ্টির নাম হাইপেরন। অন্য একটি সমষ্টির নাম মেসন। এছাড়াও আছে নিউট্রিনো। তদুপরি গত কয়েক বছরে আর এক অদ্ভুত ধরণের কণা বেরিয়েছে—ঠিক কণাগুলির মত নাম না দিয়ে এদের অনেক সময় বলা হয়ে থাকে 'রেজোনেন্স স্টেট্স'। যা হোক্, মৌলিক কণাগুলির কথার অবতারণা শুধু সংখ্যায়নের কথা বলবার প্রয়োজনে মাত্র। জানা গেছে যে, এই সব মৌলিক কণাই হয় 'বোসন' অর্থাৎ তারা বসু সংখ্যায়ন মেনে চলে, নতুবা 'ফের্মিয়ন' অর্থাৎ তারা ফের্মি সংখ্যায়ন মেনে চলে। এই দুই সংখ্যায়ন মেনে চলার অর্থ কি? ধরা যাক, একটি কে-মেসনকে (উপরি উক্ত মেসনগুলির মধ্যে একটি বিশেষ ধরণের মেসন) প্রতি সেকেণ্ডে দুই সহস্র কিলোমিটার বেগে উত্তর-পশ্চিম দিকে ধাবিত হতে দেখা গেল। অন্য আর একটি কে-মেসনকেও ঠিক ঐ গতিবেগে অর্থাৎ দুই সহস্র কিলোমিটার বেগে উত্তর-পশ্চিমে ধাবিত হ'তে দেখা সম্ভব কি? এই প্রশ্নের উত্তর "হাঁ"—কারণ কে-মেসন বসু সংখ্যায়ন মেনে চলে। এবার মেসনগুলির মধ্যে আরও একটির কথা ভাবা যাক—মিউ-মেসন। এই মেসনটি ফের্মি সংখ্যায়ন মেনে চলে এবং তার ফল এই যে, দু'টি মিউ-মেসন কখনও একই গতিবেগে একই দিকে ধাবিত হ'তে পারে না। সুতরাং যে সব মৌলিক কণা একই অবস্থায় (গতিবেগ হ'ল অবস্থার একটি উদাহরণ মাত্র, অবস্থা—State—অন্য ভাবেও বর্ণনা করা যায়) একাধিক থাকতে পারে—আমরা বলি যে, তারা বসু সংখ্যায়ন মেনে চলছে, আর যারা তা করে না অর্থাৎ যে সব মৌলিক কণা একই অবস্থায় একটির বেশী থাকতে পারে না—আমরা বলি যে, তারা ফের্মি-সংখ্যায়ন মেনে চলছে। জগতের যাবতীয় মৌলিক কণাই এই দু'টি সংখ্যায়নের একটি অবশ্যই মেনে চলে। উপরি উক্ত এক-একটি অবস্থাকে যদি এক-একটি বসবার স্থান বা ঘরের সঙ্গে তুলনা করা যায় ও সমগোষ্ঠীর এক-একটি মৌলিক কণাকে এক-একটি লোক বলে মনে করা হয়, তা হ'লে বলা যেতে পারে যে, ফের্মি-ডিরাক সংখ্যায়ন মানলে একটি বসবার স্থানে একজনই বসবে বা একটি ঘরে একজনই থাকবে, কিন্তু বসু-সংখ্যায়ন মানলে যে খুশী ও যত খুশী লোক সেই আসনে বসতে ও সেই ঘরে আসতে পারবে—সেখানে অবারিত দ্বার।

"এবার পুরাতন প্রসঙ্গে ফিরে আসা যেতে পারে। শুধু মনে রাখতে হবে যে, বসু সংখ্যায়ন অবারিত দ্বার। অধ্যাপকের কাছেও সকলের অবারিত দ্বার। তাঁর ঘরে ঢুকতে অনুমতির প্রয়োজন হয় না। তাঁর বাড়ীতে যাবার সময় অসময় নেই। শুধু তাই নয়, যেখানেই তিনি যাচ্ছেন সেখানেই 'চল' বলে যে কোনও লোককে নিয়ে গেলেই হ'ল, কারণ এক অবস্থায় শুধু একটি মৌলিক কণা থাকবে কেন? সকলেরই ত সেখানে স্থান আছে! দিলীপকুমার রায়ের গানের আসরে তিনি যাচ্ছেন। আসর হয়ত কারো বাড়ীতে বসবে—নিমন্ত্রিত শুধু তিনিই। কিন্তু তাঁর একপাল দিলীপকুমারের গানে অনুরক্ত, ছাত্র ও ছাত্রপ্রতিমদের নিয়ে সেখানে উপস্থিত হতে তাঁর কোনও অসুবিধা নেই। বসু সংখ্যায়নের নীতিতে এ কাজে কোনও দ্বিধা উপস্থিত হওয়া উচিত নয়।......

"একটা সময়ের কথা। ১৯৪৫ সাল। অধ্যাপক (বসু) তখন সবে কলিকাতায় এসেছেন। চাকুরির বাজারে গবেষণার দর তখনও চড়ে নি। স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য বরণ করে যে কয়টি ছাত্র তখন বিজ্ঞান কলেজে গবেষণা করতেন, তাঁদের প্রতি অধ্যাপকের স্নেহ ও ভালবাসার অন্ত ছিল না। এঁরা অনেকেই অন্যান্য অধ্যাপকদের কাছে গবেষণা করতেন, কিন্তু অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ঘরে একবার করে প্রায় সবাই আসতেন।......সারাদিনই অধ্যাপকের ঘরে সকলের চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল। বিশেষ সময় ছিল বিকালের দিকে—এই সময় বেশ কিছু ছাত্র অধ্যাপক (বসুর) ঘরে এসে উপস্থিত হতেন। সকলের জলযোগের ব্যবস্থা তখন অধ্যাপকের কাছেই হ'ত অর্থাৎ সেই পুরাণো কথা—অবারিত দ্বার। হাস্য-পরিহাস, গল্পগুজব, খাওয়া-দাওয়া সব নিয়ে মুখরিত অধ্যাপকের ঘর তখন বসু-সংখ্যায়নের মূর্ত প্রতীক।

"অধ্যাপক তাঁর জীবনে অন্যভাবেও বসু-সংখ্যায়ন মেনে চলেছেন। ঠিক যেমন তাঁর ঘরে তিনি কাজ করছেন বলে কারও আসতে বাধা নেই, তেমন তাঁর কাছে বৈজ্ঞানিক বা অন্য বিষয়ে আলোচনা যখন চলছে

ও হাস্য-পরিহাসের সেখানে 'প্রবেশ নিষেধ' নয় ।······আলোচনার হাস্যরস পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে জ্ঞানেরও পরিবেশন ক সময় হয় ।······

"বহু-সংখ্যায়নের আরও একটি রূপ— একই অবস্থায় যখন একাধিক লিক কথার থাকতে আপত্তি নেই, একই ব্যক্তির পক্ষে তখন ন-বিজ্ঞায় রসায়ন, প্রাণী-বিজ্ঞা, ইতিহাস, সাহিত্য—সবগুলির য যুক্ত হ'তে আপত্তি কি? ফলে রসায়নের গবেষককে নিয়ে াপককে দীর্ঘকাল পড়ে থাকতে দেখা গেছে। জীবনবিজ্ঞার বিশিষ্ট ক্তিদের তাঁর কাছে যাতায়াত করতেও অনেকে দেখেছেন। সংস্কৃত হতিহাসের পণ্ডিতকেও তাঁর কাছে প্রেরণা নিতে দেখা গেছে······ গতের নানান অংশে গবেষণার ত কথাই নেই- অনেক গণিতজ্ঞ করে থাকেন; সুতরাং বহু-সংখ্যায়নে যিনি বিশ্বাসী তাঁর পক্ষে এটা সামান্য কথা।······"

অধ্যাপকের দাবীর তালিকা এত অল্পে শেষ হয় না। অধ্যাপক হু-সংখ্যায়নে বিশ্বাসী- সুতরাং (এত) বিষয়ে জড়িত হয়ে পড়েও তিনি অসুবিধা বোধ করেন না বরং হয়ত এই ভেবে দুঃখ পান যে, ভীড় াড়ানোর আরও কিছু পাওয়া গেল না কেন? কেন তাঁর গবেষণায় সমাজহিতকর, দেশের কল্যাণকর কোনও বিষয় এল না? (তাঁর দ্বারা যে সমাজ ও দেশ ইতিমধ্যেই উপকৃত হয়েছে, সে কথা তাঁকে কে বোঝাবে?")

এ. কে. ডি.

খেয়ে খেয়ে রোগা হোন

পৃথিবীর যেসব দেশের মেয়েদের রূপসী ব'লে খ্যাতি আছে, বলিদ্বীপ তাদের অন্যতম। কিন্তু অন্য দেশের মেয়েদের অনেকেই একটু বয়স হ'লে মুটিয়ে যায়, তখন আর তাদের দিকে তাকানো যায় না; কেবল দেখা গেছে, বলিদ্বীপের মেয়েরা প্রায় সকলেই শেষ পর্যন্ত তন্বী থাকে। কারণ অনুসন্ধান ক'রে আর কিছু পাওয়া গেল না, একটি জিনিষ ছাড়া। সেটি হচ্ছে এই যে, বলিদ্বীপীয় মেয়েরা কোন সময়েই বেশ গুছিয়ে পেট ভ'রে খায় না। তারা সারা দিনমানে একমুঠো দুমুঠো ক'রে বহুবার খায় এবং সব মিলিয়েও পরিমাণে কম খায়।

এরপর নানা জীবজন্তু এবং মানুষদের নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রে দেখা গেল যে, অল্পপরিমাণে বারবার যারা খায় তারা সবসমেত খায় কম, কিন্তু খাদ্যবস্তু তাদের দেহের কাজে বেশী ক'রে লাগে এবং অপ্রয়োজনীয় অংশ যেখানে অন্যদের দেহে চর্বি হয়ে জমা হয়, তাদের দেহে তা হয় না।

হয়ত ভাবছেন, সারাদিন কম কম ক'রে খেলে সারাদিনই খিদে পেয়ে থাকবে। কিন্তু তা থাকে না। খিদে পায় দেহের প্রয়োজনে। কম কম ক'রে বেশীবার খেলে দেহের প্রয়োজন বেশী মেটে ব'লে খিদে কম পায়।

আবার হয়ত ভাবছেন, এমনিতেই দিনের বেশ খানিকটা সময় আপনার গৃহিণীর রান্নাঘরে কাটে, আপনাকে বারবার খাওয়াবার জন্য তিনি কি রান্নাঘরেই বন্দী হয়ে থাকবেন? তাই বা কেন? বাজার আসবার আগে ডাল আর ভাত হ'ল, দুচামচে ভাত আর তিন চামচে ডাল গরম গরম খেয়ে নিলেন। ঘণ্টাদুই পরে তরকারি আর মাছের ঝোল দিয়ে আরও দুতিন চামচ ভাত খেলেন। অফিসে বেরুবার আগে খানিকটা দই খেলেন। মাছভাজাটা নিয়ে গেলেন, অফিসে ব'সে খাবেন। অফিসেও আর একবার একটা বিস্কুট আর একটা সন্দেশ খেলেন। এই-ভাবে, এখন যেসমস্ত খাবার একবারে ব'সে খান, তাই রেখে রেখে কয়েক-বারে খাবেন।

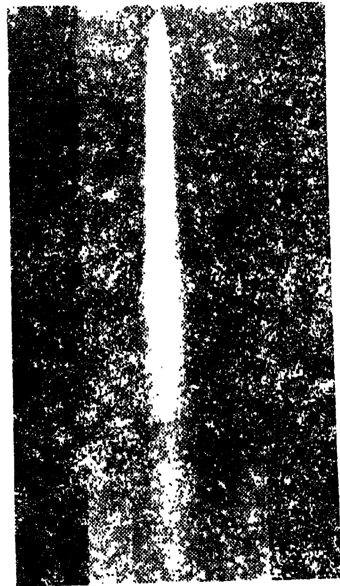
বহুমূত্রে যাঁরা ভোগেন তাঁরাও স্বল্প পরিমাণে বারবার খেলে ভাল থাকেন দেখা গেছে। হৃৎযন্ত্রঘটিত গোলযোগ রাত্রিতে বেশি হওয়ার একটা কারণ, দিনের অনেকটা সময় উপবাসী থেকে রাত্রিতে অপর্যাপ্ত আহার ব'লে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

দিনে দুবার বা তিনবার পেট ভ'রে না খেয়ে, সম-পরিমাণ খাদ্য ছবারে ভাগ ক'রে খেলে আপনি অনেক বেশী ভাল থাকবেন, এবং আপনার ভুঁড়ি হবার সম্ভাবনা কমবে।

আমাদের শাস্ত্রে বলেছে, ষষ্ঠে ষষ্ঠে মিতাহার। তার-অর্থ, প্রতি ছয় দণ্ড বা তিনঘণ্টা পর পর অল্পপরিমাণে আহার করবে। সকাল ছটা, নটা, দুপুর বারোটা, বিকেল তিনটে, সন্ধ্যা ছটা, রাত্রি নটা, এইভাবে সময় ভাগ করে আপনি যদি আহার করেন, আমাদের দেশের প্রাচীন শাস্ত্র এবং আধুনিক পুষ্টি-বিজ্ঞানের মর্যাদা একই সঙ্গে রক্ষা করা হবে।

হ্যালীর ধূমকেতু

১৯১০ সালে যাদের জ্ঞানোন্মেষ হয়েছিল তাঁদের নিশ্চয় মনে আছে, এই ধূমকেতুটি প্রায় অলক্ষ্যে আকাশের এক কোণে দেখা দিয়ে ক্রমশঃ বড় হ'তে হ'তে কি ভাবে এক সময় আকাশের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত



হ্যালীর ধূমকেতু

পর্যন্ত সমস্তটা জুড়ে উদিত হ'ত। ছোট শিশুরা ভয় পেয়ে কাঁদত, মনে আছে। আমরা সে সময় যারা কিশোরবয়স্ক ছিলাম, আমাদের একটু যে ভয় ভয় না করত এমন নয়, যদিও দৃশ্যটা ছিল আশ্চর্য্য রকমের চিত্তাকর্ষক।



জলতল থেকে উদ্ধার করা নুড়িগুলিকে হীরের সন্ধানে পরীক্ষা ক'রে দেখা হচ্ছে

বয়োবৃদ্ধরাও অনেকে সে সময় একটা অবস্থায় ভয় পেয়েছিলেন, যখন বিজ্ঞানীরা হিসাব ক'রে বলেছিলেন, অমুক দিন অমুক সময়ে পৃথিবী ও এই ধূমকেতুর পুচ্ছের সংঘর্ষ ঘটবে। হয়ত পৃথিবী তাতে চুরমার না হয় গিয়ে সেই পুচ্ছের ভিতর দিয়ে চ'লে যাবে, কিন্তু তার ফলে পৃথিবীর কি অবস্থা হবে তা নির্ভর করবে হ্যালীর ধূমকেতুর এই পুচ্ছ কি দিয়ে তৈরি তার উপর। যদি বিষাক্ত বাষ্পে তৈরি হয় ত পৃথিবীর সমস্ত জীব-জন্তুর জীবনান্ত ঘটবে। যদি ছোট ছোট শিলাখণ্ডে তৈরি হয় ত, প্রস্তর-বৃষ্টিতে পৃথিবীর সমস্ত নগর গ্রাম বিধ্বস্ত হয়ে যাবে। যদি ধূলিকণায় তৈরি হয়, সমস্ত জীবজগৎ তাতে সমাধিস্থ হয়ে যাবে।

হিসাব মত পৃথিবী একদিন এই পুচ্ছের ভিতর দিয়ে চলে গেল ঠিকই কিন্তু কিছুই হ'ল না।

এই ধূমকেতুটির আবির্ভাবের বিবরণ প্রথম পাওয়া যায় ২৫০ খ্রীষ্ট-পূর্ব্বাব্দে। এরপর নিশ্চয় প্রতি ৭৬·২ বৎসর পর পর এর আবির্ভাব ঘটেছে, কিন্তু সেগুলি যে একই ধূমকেতুর আবির্ভাব তা প্রথম আবিষ্কার করেন একজন ইংরেজ জ্যোতির্বিদ্। তাঁর নাম এডমাণ্ড হ্যালী। ১৩০৫ ১৪৫৬, ১৫৩১, ও ১৬০৭ সালে যে ধূমকেতুর আবির্ভাবের বর্ণনা পাওয়া যায় সেগুলি যে বস্তুতঃ একই ধূমকেতু, এই তথ্য তিনিই প্রথম প্রচার করেন, সেজন্যে তাঁর নামে এই ধূমকেতুটির নামকরণ হয়।

১৯৮৬ সালের মে মাসে অর্থাৎ আর ২২ বৎসর পরে এই ধূমকেতুটির পুনরাবির্ভাব হবে।

জলের তলায় হীরে

সমুদ্রকে বলা হয় রত্নাকর। এতকাল মুক্তা, শুক্তি, এসমস্ত প্রাণিজ রত্নই সমুদ্রগর্ভ থেকে মানুষ উদ্ধার ক'রে আনত। কিন্তু সম্প্রতি ব্যাপক ভাবে সমুদ্রতল থেকে হীরক উদ্ধারের কাজ চলছে।

দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকায় অরেঞ্জ নদীর মোহানার দক্ষিণদিকে সমুদ্র-উপকূলবর্ত্তী মরুভূমি বহুকাল ধ'রেই খনিজ হীরকের জন্যে প্রসিদ্ধ। এই মরুভূমির বালিতে হাজার হাজার হীরের টুকরো ছড়ানো। খনির মালিকদের মনে এই ধারণা কিছুদিন ধ'রে বদ্ধমূল হতে লাগল যে, এই হীরে-ছড়ানো এলাকা সমুদ্র তীরে গিয়েই শেষ হয়ে যায়নি, সমুদ্রতলেও এর বিস্তৃতি রয়েছে।

১৯৬১ সাল থেকে সুরু হ'ল, এই ধারণা সত্য কি না তার পরীক্ষা। আর এই পরীক্ষার ফলে প্রথম তিন মাসেই জলের নীচে থেকে হীরে যা তোলা হয়েছিল, তার ওজন ১১০০০ ক্যারাট, যার বাজার দাম ১,৫০,০০,০০০ টাকা।

সূর্য্যের আবার কি হ'ল ?

কিছুই এখনও হয়নি। কারণ, বর্ত্তমানে তার বেশ একটা স্থিতিশীল অবস্থা। এই সময়টা সে হাইড্রোজেন গ্যাসকে নানা ভারবান্ পদার্থে

রূপান্তরিত ক'রে energy বা শক্তি বিকিরণ করছে। পরিণতির এই পর্যায়ে আরো যেসব নক্ষত্র ব্রহ্মাণ্ডে রয়েছে তাদের মত সূর্যেরও এই অবস্থাটা কোটি কোটি বৎসর চলবে। এমন একটা সময় আসবে, যখন তার হাইড্রোজেন গ্যাসের পুঁজি নিঃশেষ হয়ে যাবে। তখন আসবে তার নাড়ী ছেড়ে যাবার মত দুর্বলতার অবস্থা। সে-অবস্থায় তার মধ্যে উপর্যুপরি কতগুলি বিস্ফোরণ ঘটবে, তারপর আসবে একটি অত্যন্ত নিরেট শ্বেত নক্ষত্রের রূপে তার আর-একটি বহুযুগস্থায়ী স্থিতিশীল অবস্থা। তখন তার দেহায়তন হবে আমাদের এই পৃথিবীরই মত, এবং তারপর ক্রমশঃ তার অন্তিম কাল ঘনিয়ে আসবে। শক্তির পুঁজি নিঃশেষিত হ'তে হ'তে তার ঔজ্জ্বল্যও ক্রমে ক'মে আসবে এবং একদিন সে একেবারেই নির্বাপিত হয়ে যাবে। অবশ্য তার অনেক আগেই সৌর-মণ্ডল ও পৃথিবীর অবসান ঘটবে, যদি না কোন অচিন্তিত উপায়ে ভগবান্ এদের রক্ষার ব্যবস্থা করেন। তা যে তিনি করতে না পারেন, এমন ত নয়?

জল দিয়ে কাঠ কাটা

ছবিতে ০·১ ইঞ্চি পরিধির সরু কিন্তু প্রচণ্ড বেগবান্ একটি জলধারা দিয়ে কাঠ চেরাই হচ্ছে। এই জলধারার চাপ প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ৭২৫ মণ, আর এর বেগ হচ্ছে সেকেণ্ডে ৩০০০ ফুট। মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় এই আবিষ্ক্রিয়াটি হয়েছে। করাত দিয়ে কাঠ কাটলে কাঠের খানিকটা "করাতের গুঁড়ো" রূপে অপচয়িত হয়। জল দিয়ে



জল দিয়ে কাঠ কাটা

ছবিতে যে দু-ইঞ্চি পুরু তক্তাটি কাটা হচ্ছে তাতে কোন গুঁড়ো প'ড়ে থাকবে না। কাঠের কিছুই নষ্ট হবে না।

স. চ.

অর্থিক, বার্ষিকী

প্রবাসীতে আমরা 'অর্থিক' ও 'বার্ষিকী' এই কথা দু'টি ব্যবহার ক'রে থাকি, এ-নিয়ে কিছু কিছু সমালোচনা আমাদের কানে আসে। এ-বিষয়ে আমাদের বক্তব্য সংক্ষেপে বলি।

অর্থিক সম্পূর্ণ ব্যাকরণ-সম্মত কথা। ব্যুৎপত্তি: অর্থ+ইন্=অর্থিন্+ক, স্বার্থে, ন্ লোপ=অর্থিক।

আর্থিক—অর্থ-সম্বন্ধীয়। অর্থিক—অর্থবিদ্, অর্থ নিয়ে যার কারবার।

বার্ষিক ও বার্ষিকী নিয়ে গোলযোগ আরও কম।

বার্ষিক—annual, বিশেষণ। বার্ষিকী—anniversary, বিশেষ্য। শতবার্ষিক—একশত বৎসর সম্বন্ধীয়, যার মধ্যে প্রত্যেকটি বৎসর হিসাবে ধরা আছে। শতবার্ষিকী—centenary, যার কেবল শততম বর্ষটি নিয়ে কারবার।

স. চ.

অন্য মন

শ্রীঅজিত চট্টোপাধ্যায়

এদিকটায় এলে নদীর ধারে ঠিক একবার আসবে দিবাকর। এমনিতেই খুব চওড়া রূপনারায়ণ। কিন্তু বর্ষায় যেন অকুল। পারাপার দেখা যায় না। কুলে কুলে রাশি রাশি কাশফুল। শাদা পাল তুলে মহাজনী নৌকো ছুটে চলেছে ভাটির টানে। বহু দূরে রেলওয়ে ব্রীজটার একাংশ অল্পস্বল্প চোখে পড়ে। এখান থেকে গেঁওয়াখালি বেশী দূর নয়। উজানে কয়েক ঘণ্টার পথ। ভাটির টানে তরতর করে ছুটে চলেছে নৌকোগুলো—তেরপেখ্যা, গেঁওয়াখালি কিংবা হলদিয়ার উদ্দেশে।

ক্যাম্প অফিস থেকে বেরিয়ে নদীর পথ ধরল দিবাকর। সকালের দিকে বৃষ্টি হয়ে গেছে বেশ, জল জমে আছে পথের মধ্যে। সন্তর্পণে জামাকাপড় বাঁচিয়ে দিবাকর হেঁটে চলল। রূপনারায়ণকে কাছাকাছি না দেখলে মনটা ঠিক ভরে না। নদীটা ওর শৈশবকে মনে করিয়ে দেয়। ওর কৈশোর আর যৌবনের হাসিতরল দিনগুলির কথা উঁকি দেয় মনে। বিশাল এই নদীর পাশে দাঁড়িয়ে রাজসাহীর কথা ভাবে দিবাকর। বর্ষার দিনে ক্ষুধিত পদ্মার সর্বনাশা রূপ,…কুয়াশা-মাখানো সকালে বড়কুঠির মাঠ আর শীতের দুপুরে রাজসাহী কলেজের ছবিটা অলস স্বপ্নের মত চোখের সামনে ভাসতে থাকে। প্রায় ষোল বৎসর আগের দিনগুলো। উনিশ শ ছেচল্লিশে রাজসাহী ছেড়েছিল দিবাকর। তারপর থেকেই পশ্চিমবঙ্গে, কিছুদিন কলকাতায় থেকে চাকরি-বাকরি আর পড়াশুনোর চেষ্টা। শেষে চাকরি নিয়ে ভেসে পড়া, বাঁকুড়া আর বীরভূমের তরঙ্গায়িত গৈরিক অঞ্চলে থেকেছে কতদিন। ওখানে নদী ছিল, কিন্তু বারো মাসই শুকনো, বালিতে ভরা। ও নদী দেখে পদ্মাকে ভাবা যায় না। রাক্ষসীর বাঁধভাঙ্গা রূপের এক কণাও কল্পনায় আসে না।

ভিজে গাছপালা আর সোঁদা সোঁদা মাটির একটা অদ্ভুত ঘ্রাণ দিবাকর অনুভব করছিল। শাখা-প্রশাখা মেলে একটা শিমুলগাছ নদীর ধারে। তারই নীচে দাঁড়িয়ে ওপারের ধোঁয়া ধোঁয়া বনরেখার দিকে চেয়ে ছিল দিবাকর।

লঞ্চটা তীরের দিকে এগিয়ে আসছে। জলে ছলাং ছলাং শব্দ শুধু। তীরে এসে প্রতিহত হচ্ছে ঢেউ: ছোট, বড়…একের পর এক। কিনারে দাঁড়িয়ে কিছু লোক প্রতীক্ষা করছে তরণীর। হয়ত কেউ আসবে লঞ্চে। দিবাকর একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ওদের দেখল।

জেটির গায়ে লঞ্চ এসে ভিড়ল। একটা পাটাতন তীরে ফেলেছে। লোকজন নেমে উঠে আসছে উপরে। দিবাকর একটা শরঝোপের সামনে এসে দাঁড়াল।

…একটি মেয়ে যেন চেনা-চেনা, দিবাকর অবাক্ হয়ে দেখছিল ওর মুখ। প্রসারিত আননে অনেকদিন আগেকার একটি চেনা হাসিমুখ যেন খুঁজে পেল দিবাকর। আরও দু'-একবার চোখাচোখি হতেই সুরঞ্জনাও চিনতে পারল।

বাঁধের উপর উঠে একগাল হাসল সুরঞ্জনা। বলল, 'দিবাকর, তুমি? কি সারপ্রাইজ—আমি ভাবতেও পারি নি নদীর ধারেই তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে আবার।'

স্মিতমুখে দিবাকর চাইল। খুশিতে ওর চোখের তারা দু'টিও ঝিকমিক করছে। কিন্তু আগের চেয়ে অনেকখানি বদলে গেছে সুরঞ্জনা। মোটা হয়েছে বেশ, মুখখানা ভারি-ভারি, চোখে কালো ফ্রেমের চশমা।

দিবাকর বলল, 'কতদিন পরে দেখা, প্রায় আঠারো বছর। তুমি যে চিনতে পেরেছ, এই ঢের।'

আগে সোনালী ফ্রেমের একটা চশমা পরত সুরঞ্জনা। মুখখানা তখন কাঁচা কচি, লাবণ্য সুষমায় মাখা ছিল। ছিপছিপে দেখতে লাগত। একটা হরিণের চামড়ার চটি পায়ে দিয়ে, বড়কুঠির মাঠে ঘুরে বেড়াত।

সুরঞ্জনা বলল, 'কোথায় আছ এখন? এখানে কেন এসেছ?'

'সেটেলমেন্টে চাকরি করি। মহিষাদলে পোষ্টেড। একটা এটেষ্টেশন ক্যাম্প দেখতে এসেছিলাম এখানে। কয়েকটা কমপ্লেন ছিল। এনকোয়্যারি করতে পাঠিয়েছে।'

হাসল সুরঞ্জনা। আগের মতই এখনও হাসে। তবে গালে আর টোল পড়ে না। মোটা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখখানাও গোল হয়ে গেছে।

—'তবু হাকিম হয়েছ ত। গেজেটেড পোষ্ট নিশ্চয়? আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরে। হাকিমের তল্পি বইছি'—

—'সে আবার কি? কোথায় চাকরি নিয়েছ তুমি?'

—'ব্লকে আছি। এই ত মাইল ছয়েক দূরেই জায়গাটা। বনকাপাসী ব্লক অফিস বললেই সবাই দেখিয়ে দেবে। সোস্যাল এডুকেশন অর্গানাইজারের চাকরি। আসলে বি. ডি. ও. সাহেবের পিছু পিছু ঘুরি।'

—'তা ত বুঝলাম,' দিবাকর হেসে বলল, 'এদিকে যাচ্ছ কোথায়?'

হাতঘড়িটার দিকে একবার চাইল সুরঞ্জনা। ওর চোখ দু'টি সামান্য কুঁচকে উঠল। বলল, 'মনে করিয়ে দিয়েছ যা হোক। রাধাবনী ব্লকের অফিসে যেতে হবে। কয়েকটা দরকারী কাজ আছে, আজ আর দাঁড়াব না। কিন্তু'—

দিবাকর সুরঞ্জনাকে দেখছিল, চাকুরে সুরঞ্জনাকে। বেশ কাজের লোক হয়েছে সুরঞ্জনা। কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ। ত্রুটি নেই মনে হ'ল।

সে হেসে বলল, 'কিন্তু কি?'

—'একদিন এস না বনকাপাসীতে। কোন একটা ছুটির দিন। সকালে চলে এস। ওখানেই খাবে, সারাদিন থাকবে'—

দিবাকর একটু ভেবে বলল, 'বেশ ত, যাব'—

—'হ্যাঁ, এস একদিন, কতদিন পরে আবার দেখা হ'ল। রাস্তায় দাঁড়িয়ে কি আর কথা বলা যায়? এখান থেকে বাসেই চলে যেও, লঞ্চ যেতে বড় দেরি করে'—

হাত তুলে নাড়ল সুরঞ্জনা। বিদায় চাইল, তারপর পিছন ফিরল।

মাথার উপর ভাদ্রের আকাশ পেয়ালার মত উপুড় হয়ে রয়েছে। মেঘ নেই কাছাকাছি—একটা ঝোড়ো হাওয়া মাঝে মাঝে বইছে। গাছপালা দুলছে সবেগে।

দিবাকর প্যান্টের পকেটে হাত ভরে এগিয়ে গেল। চল্লিশের কাছাকাছি বয়স, কিন্তু বাঁধুনি ভাল। দেখে ত্রিশ-বত্রিশের বেশী মনে হয় না। অবশ্য কানের কাছে কিংবা ঘাড়ের দিকে খুঁজলে পাকা চুল বেশ কয়েকটা পাওয়া যাবে। কিন্তু দিবাকরের নিজেকে হঠাৎ খুব অল্পবয়স্ক মনে হ'ল। সুরঞ্জনার মুখের দিকে চেয়ে যেন হারানো দিনগুলো খুঁজে পেয়েছে দিবাকর। সেই বড়কুঠির মাঠ, পদ্মা, রাজসাহী কলেজ। সেই আশ্চর্য শান্ত শীতের বিকেলগুলি।

সুরঞ্জনার সঙ্গে প্রথম আলাপ কলেজে। আজও মনে পড়ে—

কলেজ একজিবিশনে কেমিষ্ট্রীর দু'চারটে জিনিষ দেখাবার ভার পড়েছিল দিবাকরের। তখন অল্প বয়স, সেকেণ্ড ইয়ারে উঠেছে। ঠোঁটের উপর কালো কালো গোঁফের রেখা। গলাটা সামান্য পুরুষালি হয়েছে। আরও দু'চারজন মেয়েকে নিয়ে একজিবিশন দেখতে এসেছিল সুরঞ্জনা। সেই বছরই কলেজে ঢুকেছে। ফার্স্ট ইয়ার আর্টসে।

দিবাকরের পিছনে শিশিতে রাখা নানা রঙের কেমিক্যাল্‌স্। সামনে ছড়ানো কয়েকটা পাউডার, ক্রীম আর কসমেটিকসের উপকরণ। একপাশে সালফিউরিক অ্যাসিড প্ল্যান্টের মডেল।

সুরঞ্জনা টেবিলের উপর ভাঁজ করে হাত রেখে বলল, 'কই, বুঝিয়ে বলুন সব'—

একজিবিশনে আসবার আগে বাড়ীতে বসে খানিকটা বক্তৃতা মকশ করেছিল দিবাকর; হাত নেড়ে অভ্যেস করা সেই ভঙ্গিতে বলতে সুরু করে দিল। খানিক পরেই দিবাকরের আত্মোপলব্ধি হ'ল। রসায়নশাস্ত্র আউড়ে শুধু হাস্যরসেরই সৃষ্টি করেছে দিবাকর। মুখ টিপে হাসছে মেয়েরা। ঠোঁটের হাসি ফুটে উঠেছে চোখের তারায়। দিবাকর বক্তৃতা থামিয়ে তাকাল

ওদের দিকে—ওর মাথায় একটা দুষ্টবুদ্ধি খেলে গেল। আচ্ছা মেয়ের দল! তাকে বোঝাতে বলে নিজেরা হাসাহাসি সুরু করে দিয়েছে।

ভ্যানিশিং কালারের একটা শিশি হাতের কাছে ছিল দিবাকরের। শিশিটা হাতে তুলে নিয়ে দিবাকর সুরঞ্জনাকে বলল, 'এটা কি জানেন?'

সুরঞ্জনা মাথা নাড়ল।

—'রং', দিবাকর গম্ভীর হয়ে বলল। তার পর, শিশিটা খুলে খানিকটা ছড়িয়ে দিল সুরঞ্জনার শাদা শাড়ীতে। আঁচলে আর শাড়ীর গায়ে রঙে মাখামাখি।

মেয়েরা অবাক্। পাশাপাশি যারা দেখছিল তারাও।

সুরঞ্জনা রেগে গিয়ে বলল,'এ কি অসভ্যতা আপনার। আমি প্রিন্সিপ্যালকে গিয়ে বলছি এখনি'—

দিবাকর হেসে বলল, 'যদি সত্যি যান, তবে একটু পরে যাবেন।'

অল্প একটু সময় মাত্র। শাড়ীর গায়ের লাল রঙ ফিকে হয়ে এল। আবার আগের মতন শুভ্র বেশবাস। সুরঞ্জনার সঙ্গী মেয়েরা হেসে উঠল।

দিবাকর বলল, 'রং নয়। ভ্যানিশিং কালার। কিছু মনে করবেন না।'

সুরঞ্জনা আর কথা বলে নি। দিবাকরের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে চলে গিয়েছিল।

শিশির রং শাড়ীতে ছোপ ধরায় নি। ছোপ পড়ল অন্য কোথাও। মনের কোণে।

সুরঞ্জনার সঙ্গে সেই আলাপ বন্ধুত্বে পরিণত হ'তে দেরি হয় নি। আই এস-সিতে বেশ ভাল রেজাল্ট হ'ল। অনার্স নিল দিবাকর। রসায়ন শাস্ত্রে।

বন্ধুরা হেসে বলল—'দিবাকর, তুই জিনিয়াস একটা, কেমিষ্ট্রি ল্যাবরেটরীর শিশিতে যে এতখানি প্রেমরস ছিল, তা কে বুঝত বল্?'

দিবাকর বলত—'কি যে বলিস্ তোরা। মেয়েদের সঙ্গে আলাপের শুধু একটা মানেই জানিস।'

বন্ধুরা তুখোড় ছেলে। পাল্টা জবাব দিতে ছাড়ত না। বলত 'অভিধানে যে ঐ মানেটাই লেখা আছে বাবা ভাল ছেলে। সুরঞ্জনা দেবীর সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে ভাল লাগে। উনি কলেজে না এলে খারাপ লাগে এর আবার অন্য কি মানে হয় রে?'

কথাটা সত্যি। কলেজে সুরঞ্জনা এলে মুখটা উজ্জ্বল হ'ত দিবাকরের। বুকটা কেমন খুশির আনন্দে ভরে উঠত। ক্লাসের শেষে দুজনে বসে গল্প করত। কখনও কলেজের মাঠে—বটের ছায়ায়। কখনও পদ্মার ধারে বড়কুঠির মাঠে ঘুরে বেড়াত।

সুরঞ্জনা বলত—'দিবাকর, তুমি ত অনার্সের ছেলে, এম. এস-সিতে চান্স পাবে ঠিক। আমার হয়ত চান্স হবে না, পাসকোর্সের মেয়েদের কি নেবে?'

তখন ফোর্থ ইয়ার দিবাকরের। কেমিষ্ট্রি অনার্সের ভাল ছেলে। অনার্সের অহমিকায় বুকখানা সব সময় ভরে থাকত। তবু সুরঞ্জনার কাছে সে ভাব দেখাত না, হেসে বলত—'আটসে সীট অনেক বেশী। তাছাড়া আমি ত এক বছর আগে যাচ্ছি। তোমার চান্স পাওয়ার ভাবনা আমার।'

ওর হাত দুটো নিজের মুঠোতে টেনে নিত দিবাকর। ভয়ে ভয়ে চারপাশে তাকাত। কেউ দেখছে কিনা কেউ লক্ষ্য করছে নাকি দূর থেকে?

জোয়ারের মুখে ভরা নৌকার মত খুশী-খুশী মন দুজনের। মনটাই ছিল আলাদা। স্বাদে, গন্ধে, রঙে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সমস্ত পৃথিবীটাই কি রঙে মোড়া যেন। ভাল লাগত সব কিছু। বড়কুঠির মাঠ, রাজশাহী কলেজ, পদ্মা নদীটা....

তারপরই যেন একটা ওলটপালট হয়ে গেল দেশে। কে কোথায় ছড়িয়ে পড়ল। একটা কালবোশেখীর ঘূর্ণীঝড়ে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল দেশটা। ছেচল্লিশের দাঙ্গা ....তার পরই সর্বনাশা পার্টিশন। এম. এস-সি পড়তে এসে আর রাজশাহী ফেরা হ'ল না। রাজশাহী থেকে মা-বাবা চলে এলেন কলকাতায়। পড়ার দফা খতম করে চাকরি। নানা জায়গা ঘুরে শেষে সেটেলমেন্টে

মহিষাদলে এসে বাস থামল। ঘণ্টা তিনেকের পথ। বাজারটা ছাড়িয়েই দিবাকরের বাসা, একতলা বাড়ী। সামনে বাগান আছে খানিকটা। মাধবীর ফুলের শখ আছে। সংসারে অবসর পেলেই বাগানে এসে খুরপী ধরে। এটা-সেটা করে। সংসারের মানুষ

আর বাগানের গাছগুলো ওর কোমল দু'টি হাতের পরিচর্য্যায় একসঙ্গে বড় হচ্ছে।

বাড়ী ঢুকতেই মাধবী বলল—'কি ব্যাপার? এত দেরি হ'ল যে।'

ওর মুখের দিকে চেয়ে হাসল দিবাকর।

—'দেরি কোথায়? কাজ কি কম?'

জামা-জুতো ছেড়ে আরাম-চেয়ারে আরামসে গড়াল দিবাকর। সুরঞ্জনার মুখখানা ভেসে এল মনে। ভাবল, মাধবীকে বলে ওর কথা।

চায়ের কাপ হাতে মাধবী এল।

—'কি যেন ভাবছ বসে?'

—'ভাবছি। ভাবনার কি শেষ আছে?' দিবাকর দার্শনিক হবার চেষ্টা করল।

—'রঙ্গ রাখো।' মাধবী ওর কাঁধের ওপর হাত দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়াল। 'বিকেলবেলায় এমন ভারী মুখে থেক না।' হাত বাড়িয়ে দিবাকর টানল মাধবীকে। সামনের চেয়ারে বসিয়ে দিল।

বসতে বসতে মাধবী বলল—'কি যে কর। এতখানি বয়স হ'ল, এখনও তোমার ছেলেমানুষী গেল না।'

মাধবীর মুখের দিকে চেয়েছিল দিবাকর। সুরঞ্জনাকে ভাবছিল। আজকের সুরঞ্জনা সুন্দরী ত নয়ই, সুশ্রী কি না তাও বলা শক্ত। বরং মাধবী এখনও সুন্দরী... ছিপছিপে পাতলা গড়ন...একসার ঝিকিমিকি দাঁত। হাসলে এখনও মনোহারিণী মনে হয় মাধবীকে।

সুরঞ্জনার কথা আর ভাঙ্গল না দিবাকর। এতদিনে মেয়েদের মন খানিকটা বুঝতে শিখেছে। ভালবাসার কথা শুনলেই কেমন কাতুকুতু অনুভব করে মেয়েরা। যে প্রেম রহস্যে ভরা, তার সম্বন্ধে আরও বেশী কৌতূহল। সুরঞ্জনার কথা সামান্য শুনলেই কল্পনার পরে কল্পনার জাল বুনবে মাধবী। সময়ে অসময়ে খুঁচিয়ে ক্ষতবিক্ষত করবে ওকে। অথচ সুরঞ্জনার সঙ্গে আজ কোন সম্পর্কই নেই। প্রায় দেড়যুগ আগেকার রাজসাহী শহরটা, বড়-কুঠির মাঠ আর ক্ষুধিত পদ্মা,...কুয়াশায় ভরা এক শীতের সকালের মতই অস্পষ্ট।

শনিবার বিকেল হতেই মনটা কেমন চঞ্চল হয়ে উঠল দিবাকরের। সুরঞ্জনার নিমন্ত্রণটা বার বার উন্মনা করছিল ওকে। মনের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব। মানসিক ভূভাগে ইচ্ছা-অনিচ্ছার জোর লড়াই সুরু হয়ে গেছে। সুরঞ্জনার সঙ্গে আজ নতুন করে কোন সম্পর্ক হয় না। কি হবে মিছেমিছি দেখা করতে গিয়ে?

তবু যেতে হ'ল। রাতে মাধবীকে বলল দিবাকর—'কাল সকালেই বেরুতে হবে ট্যুরে। সন্ধ্যের দিকে ফিরব। তুমি একটু চা-টা করে দিও।'—

—'ট্যুরে?' মাধবী চোখ বড় বড় করে বলল।

—'হ্যাঁ, বনকাপাসী এটেষ্টেশন ক্যাম্পে যেতে হবে একবার।' সে পাশ ফিরে ঘুমোবার চেষ্টা করল।

দিবাকর যখন পৌঁছল, সুরঞ্জনার স্নান সারা হয়েছে। একটা তাঁতের কাপড় পরে খানিকটা প্রসাধন করছিল সে।

দরজা খুলে একমুখ হাসল সুরঞ্জনা। বলল—'নিমন্ত্রণ ভুলে যাও নি তা হ'লে?'

—'বা রে, তুমি নিমন্ত্রণ করলে, আর আমি বেমালুম ভুলে যাব?'

জুতো খুলে একপাশে রাখল দিবাকর। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।

—'আর কাউকে দেখছি না?'

—'আবার কাকে দেখবে?' সুরঞ্জনা হেসে বলল। 'আমি একাই থাকি। কাজটাজ করার জন্য লোক রেখেছি একটা।'

ঘরের চারপাশে চোখ বুলোল দিবাকর। বেশ ছিমছাম রেখেছে। ঘরখানা সাজিয়েছে ভাল, মনে মনে তারিফ করল দিবাকর। সুরঞ্জনা মোটা হয়েছে ঠিক, কিন্তু রুচিটুকু মোটা হয় নি।

চাকরি নিলে মনে মনে প্রায় সবাই দাস হয়ে যায়। চাকরি ছাড়া আর কিছু ভাবতেই পারে না। সুরঞ্জনাও ব্যতিক্রম হয় নি।

—'মহিষাদলে কতদিন আছ?'

—'এক বছর হ'ল মোটে। আর কতদিন ফেলে রাখবে কে জানে?'

—'তোমার ত এক বছর মাত্র। আমি আজ তিন বছর ধরে এই ব্লকে পড়ে আছি। দেখছ ত কি রকম

গ্রাম। উপায় কি আর? লোকজন নেই—তদ্বির-তদারক কে করে?'

—'গ্রামই তো ভালো, আধা শহরে যেয়ে কি লাভ? শহরও পাবে না, গ্রামও সরে যাবে।'

ঝি এসে খাবার দিয়ে গেল দুজনের। প্লেটে করে ফুলকো লুচি, সন্দেশ, আর তরকারি—দুকাপ ধূমায়িত চা এনে রাখল টেবিলের উপর।

চায়ে ঠোঁট নামিয়ে দিবাকর বলল—'বেশ আছ, চাকরি-বাকরি সেরেই অখণ্ড অবসর।'

—'কেন? তোমার হাতে অবসর নেই বুঝি?'

দিবাকর নাস্তিকের মত একটা দুর্বোধ্য হাসি আনল। বলল—'তোমার মা-বাবা সবাই কোথায়?'

আঙুল তুলে উর্দ্ধলোকে নির্দেশ করল সুরঞ্জনা। যেন একটু বিমনা দেখাল ওকে।

দিবাকর অপ্রতিভ হয়ে বলল—'কিছু মনে ক'রো না সুরঞ্জনা, আমি ঠিক বুঝতে পারিনি।'

—'আমি কিছু মনে করিনি। তারপর তুমি বিয়ে-থা করেছ ত? কটি ছেলেমেয়ে?'

দাঁতে ঠোঁট টিপে একবার ভাবল দিবাকর।—'ছেলে মেয়ের সংখ্যা বেশী নয়।' সে বলল।

—'বউ কেমন হয়েছে? একদিন নিয়ে এস না'—

দিবাকর হেসে জবাব দিল—'আচ্ছা, সে দেখা যাবে। তারপর তোমার ভাইবোনরা কে কোথায়?'

—'ভাইবোনদের জন্যই ত চাকরি, ওরা সবাই ভাগলপুরে—কাকার কাছে। রাজসাহী থেকে ত ওখানেই গেছলাম। তোমরা ত কলকাতায় চলে এলে, তাই না?'

রাজসাহীর কথা আরও অনেকবার টেনে আনল দিবাকর। সুরঞ্জনা কিন্তু সে পরিচ্ছেদের পাশ দিয়েও গেল না। লজ্জা পেয়ে দিবাকর পুরাতন অধ্যায়টা কিছুতেই উল্লেখ করতে পারল না, অথচ আজ বন-কাপাসীতে আসবার আগে পুরাণো স্মৃতিই রোমন্থন করেছে। সুরঞ্জনা হয়ত বলবে কিছু। যে জীবনে ছেদ পড়েছে বহুদিন আগে, তার কথা কি সবই হারিয়ে গেছে?

খাওয়ার পর ওকে শোবার ঘরে নিয়ে গেল সুরঞ্জনা। বলল—'তুমি এখানেই বিশ্রাম কর। আমি ওদিকে গিয়ে গড়িয়ে নিচ্ছি একটু।' বাধা দিয়ে দিবাকর উত্তর দিল—'বারে, বিশ্রামের আবার প্রয়োজন কি? বিকেল হলেই চলে যাব, তার আগে দু'দণ্ড গল্পটল্প করা যাক্।'

—'এখানকার এস. ডি. ও.র সঙ্গে তোমার জানা-শোনা আছে?'

দিবাকর বলল—'আছে বৈকি। পরাশর সেন এক সময় হোষ্টেলে থাকত আমার সঙ্গে। পুরাণো বন্ধুত্ব আজও ভোলেনি। দেখা হলে এখনও অন্তরঙ্গ ব্যবহার করে।'

মনে হ'ল কিছু বলতে চায় সুরঞ্জনা। কিন্তু দ্বিধায় দোদুল্যমান।

—'তুমি কি কিছু বলবে?' দিবাকর জানতে চাইল।

—'না, এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম।'

সমস্ত দুপুর ধরে একটানা চাকরির গল্পই করে গেল সুরঞ্জনা। বি. ডি. ও. অফিসে ভারী কষ্ট। নানা ঝামেলা সব। শিক্ষা বিভাগে গেলে উন্নতি ছিল। বি. টি. পাশ করেছিল সুরঞ্জনা। অনার্সটা দিয়ে নিলে এ্যাসিষ্ট্যান্ট হেডমিস্ট্রেসের চাকরি সে অনায়াসে পেতে পারে। তবে প্রাইভেট স্কুলে যাবে না, সরকারী চাকরি ছাড়তে নারাজ।

বলল—'আমাদের ডিপার্টমেণ্ট থেকে কত মেয়ে গিয়েছে এডুকেশন ডিপার্টমেণ্টে। ওদের উন্নতিও হয়েছে তাড়াতাড়ি।'

চোখদুটো চকচকে উজ্জ্বল দেখাল ওর। যেন ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছে সুরঞ্জনা।

বিকেল গড়াতেই দিবাকর উঠল। বলল, 'এবার যেতে হবে। নইলে বাসটা পাব না।'

চা করে আনল সুরঞ্জনা। একটু খাবারও ছিল। চা খেতে খেতে দিবাকর ওর দিকে চাইল।

—'রাজসাহীর কথা তোমার মনে আছে সুরঞ্জনা?'

—'থাকবে না? কি সুখে ছিলাম বল ত। আর এদেশে এসে কি নাকাল। যেন ঠাঁই নেই, ঠাঁই নেই রব।'

কি মনে আছে, কতটুকু ভোলে নি কিছুই বুঝতে পারল না দিবাকর। সুরঞ্জনার মুখের দিকে চেয়ে রইল শুধু।

দরজায় এসে দাঁড়াল সুরঞ্জনা। দিবাকর পা ফেলে এগিয়ে চলল। বাসের আর দেরি নেই। এখন বেরুলে রাত আটটা নাগাদ পৌঁছে যাবে।

—'একটা কথা শোন দিবাকর।' পিছন থেকে সুরঞ্জনা মিষ্টি করে ডাকল।

হয়ত কিছু বলবে সুরঞ্জনা। রাজসাহীর কথা, কলেজের দুপুরগুলি, বড়কুঠির মাঠের মরা বিকেলগুলির কথা, আর-একবার তুলবে। যা সারাদিনে বলতে পারে নি হয়ত শেষবেলায় তাই একবার শোনাতে চায়। সেই আশায় আশায় ফিরল দিবাকর। মহিষাদল থেকে এতখানি পথ সেই জন্যই এসেছে সে। নইলে চাকরির কথা, সংসারের কথা, উন্নতির সোপানের ইতিহাস, এসব কিছুই অজানা ছিল না। তা ছাড়া ঘরে মাধবী রয়েছে। এ গল্প তার সঙ্গে হয়। রোজনামচার মত, নিত্যকার আলোচনা। শুধু মাধবী যা দিতে পারে নি তারই একটুকু আস্বাদ করতে ছুটে এসেছে। সেই প্রথম প্রেমের রোমাঞ্চটুকু আর-একবার যদি অনুভব করা যায়। সেই মরা অতীতটা সুরঞ্জনার মুখে আর একবার যদি কথা বলে।

—'একটা অনুরোধ করব দিবাকর, বল রাখবে?'

দিবাকর বলল, 'কি ব্যাপার? বল না তুমি। অত কুণ্ঠিত হচ্ছ কেন?'

—'পরাশর সেনকে আমার কথা বলবে একবার?'

দিবাকর নির্বাক্ হয়ে চেয়েছিল।

কি বলতে চায় সুরঞ্জনা? রাজসাহীর সেই নানা-রঙের দিনগুলির সঙ্গে পরাশর সেনের সম্পর্ক কোথায়?

সুরঞ্জনা বলল, 'বেশী কিছু নয়। একটা ভাল ট্রান্সফারের জন্য। যদি তমলুকে যেতে পারতাম। মিঃ সেন চেষ্টা করলে ঠিক হয়।'

ছোটবেলায় একবার অন্ধকারে পা ফস্কে গর্তে পড়ে গিয়েছিল দিবাকর. বেশী কিছু লাগে নি। কিন্তু হঠাৎ মনে হয়েছিল, পায়ের তলার মাটিটা যেন আর নেই। সুরঞ্জনার কথায় তেমনি একটা ভাব আর শৈত্য অনুভব করল সে। খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে বলল, 'বেশ ত! সুযোগ পেলেই বলব এস. ডি. ও.কে'—

—'সত্যি? বলবে ত?' একটা আশার আনন্দে মুখখানা উজ্জ্বল দেখাল সুরঞ্জনার।

কৃতজ্ঞতায় আর খুশিতে বাসষ্ট্যাণ্ড পর্যন্ত এল সুরঞ্জনা। বেলা আর নেই। দূরে আকাশের কোণে অস্তসূর্য আবীর ছড়াচ্ছে। বাসে উঠবার আগে দিবাকর বলল, 'রাজসাহী কলেজের একজিবিশনের কথা মনে আছে সুরঞ্জনা? সেই যে তোমার শাড়ীতে রং ছড়িয়ে দিয়েছিলাম?'

—'মনে নেই আবার? তুমি কি কম দুষ্টু ছিলে তখন'—

মনে সব আছে। শুধু মনটাই নেই, বাসে যেতে যেতে দিবাকর ভাবছিল। মাঝে মাঝে গাছগাছালির আড়ালে রূপনারায়ণ দেখা যায়। অন্য এক দেশে এসেছে দিবাকর। অন্য মাটি, অন্য নদী, অন্য মানুষজন। আজ যাকে দেখল, সেও এক অন্য সুরঞ্জনা।

—

শিল্পী প্রশান্তকুমার রায়

শ্রীমিহির সিংহ

শান্তিনিকেতন কলাভবনের শ্রীযুক্ত প্রশান্তকুমার রায় মহাশয়ের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। পরিবেশটি বেশ চিত্তাকর্ষক। ছোট্ট ঘর—একটা ছোট চৌকি, গুটি-দুয়েক কৌচ আর একটি ছোট রিভলভিং চেয়ারেই প্রায় ভর্তি হয়ে গিয়েছে। বাকি জায়গাটুকুতে আছে দু'টি ডেস্ক, বইভর্তি আলমারি আর একপাশে একটি ঝোলান তাকে প্রশান্তবাবুর স্ত্রীর তৈরী অপূর্ব কতকগুলি পুতুল। এছাড়া এখানে ওখানে ছড়ান রয়েছে বন্দুকের কার্ট্রিজ, নানারকম যন্ত্রপাতি, ছবি আঁকার সরঞ্জাম, কতকগুলি বাঁধান ছবি, একটা বন্দুক—আর দেওয়ালে আছে ছোটবড় নানামাপের ছবি—অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল এবং প্রশান্তবাবুর নিজের আঁকা। কত ব্যাপারে যে তাঁর আগ্রহ আছে তার একটা সজীব উদাহরণ এই ছোট্ট ঘরটি। মিল খোঁজা আমার একটা স্বভাব, আমার মনে হচ্ছিল ঘরটা যেন তাঁর নিজের জীবনটারই মতন অগোছাল, কিন্তু প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা।

প্রশান্তবাবু তাঁর সম্প্রতি আঁকা দু'টি ছবি দেখালেন, দুটিই ঘোলা জলের: গঙ্গার জলের উপরে জাহাজ ষ্টীমার নৌকোর ভিড়, আর কলকাতার বর্ষার জলের উপরে গ্যাসের আলোর খেলা। জলরঙে আঁকা ছবি। প্রথমেই যা চোখে পড়ে তা হ'ল তুলির উপরে আশ্চর্য দখল। বর্ণনামুলক ছবি, দৃষ্টিভঙ্গিতে আমরা যাকে রোম্যান্টিক বলি তাই। পর্যবেক্ষণের তীক্ষ্ণতা এবং রং ব্যবহারের কুশলতা দৃশ্যজগৎ পেরিয়ে নিবিড়তর অনুভূতির রাজ্যে নিয়ে যায়; চিরদিনের চেনাকে অচেনা চোখে দেখি। গ্যাসের আলোর ছবিটার মধ্যে একটা টিনের চাল আছে পান-সিগারেটের দোকানের উপরে। টিনের চালটা যেভাবে আঁকা হয়েছে সেটা আমার বড় ভাল লাগল। আলোচনা করতে যেতেই প্রশান্তবাবু হেসে বললেন, 'আমি কিন্তু কম্পোজিশনের কথা ভেবে ছবি আঁকি না। সত্যি কথা বলতে কি, আমার ছবি একটা সম্পূর্ণ চেহারা নিয়ে মনের মধ্যে আসে, আমি সেটাকে কাগজের উপরে ফুটিয়ে তুলি।' আমি বললাম, 'তা হ'লেও ত ফ্রেমিংএর কথা নিশ্চয়ই ভাবেন, এমনকি ফটোগ্রাফীর বেলাতেও ত তা ভাবতে হয়, নয় কি?' প্রশান্তবাবু ঘাড় নেড়ে বললেন, 'আমার চোখে ছবি আসে একটা অখণ্ড ধারারূপে, আমি তার একটা অংশ তুলে নিই আমার আঁকবার জন্যে। অর্থাৎ আমি যদি চাই ত আঁকা ছবিটুকুর ডাইনে-বাঁয়ে উপরে-নিচে যতদূর ইচ্ছে এঁকে যেতে পারি।'

প্রশান্তবাবুর কথাগুলি যে শুধুই তাঁর মুখের কথা নয়, তার প্রমাণ মিলছে যে বিরাট scrollটি তিনি আঁকছেন তার থেকে। এই scrollটিতে প্রশান্তবাবু তাঁর এই continous-visualization-এর প্রবণতাকে যেন লাগাম ছেড়ে দিয়েছেন। পাতার পর পাতা জুড়ে তিনি এঁকে চলেছেন—আমার ত মনে হয় না যে কোনোদিন তাঁর এই ছবিটা শেষ হবে। একটা পাহাড় শেষ হ'লে তার পাশে ত আর একটি পাহাড় দাঁড়াবে মাথা তুলে। গিরি-শ্রেণী শেষ হলেও থাকবে অধিত্যকা, উপত্যকা, সমতলভূমির শোভাযাত্রা। প্রচণ্ড জলপ্রপাত তাঁর ছবিতে যেন একেবারে সশব্দ, আবার লোকালয়ের প্রান্তে ছোট্ট পাখীটিও যেন জীবন্ত। এই ধরণের panorama আঁকতে গেলে প্রকৃতির ক্ষুদ্রতম তুচ্ছতম জিনিষটির সম্বন্ধেও বাছবিচার করলে চলবে না। প্রশান্তবাবুর ব্যক্তিগত মতও তাই, তিনি কাউকেই ফেলে দিতে চান না। শুধু ছবির বিষয়বস্তুর সম্বন্ধেই নয়, চিত্রকরদের অথবা তাঁদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর সম্বন্ধেও তিনি সমান দৃষ্টিসম্পন্ন। তাঁর মতে ছবি



কাবুলীওয়ালা

যে আঁকে, বিশেষ করে ছবি আঁকতে ভালবাসে বলে আঁকে, সে কোনো বিশেষ গোষ্ঠী বা শৈলীর অন্তর্ভুক্ত কিংবা অন্তর্ভুক্ত নয় বললেই তাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

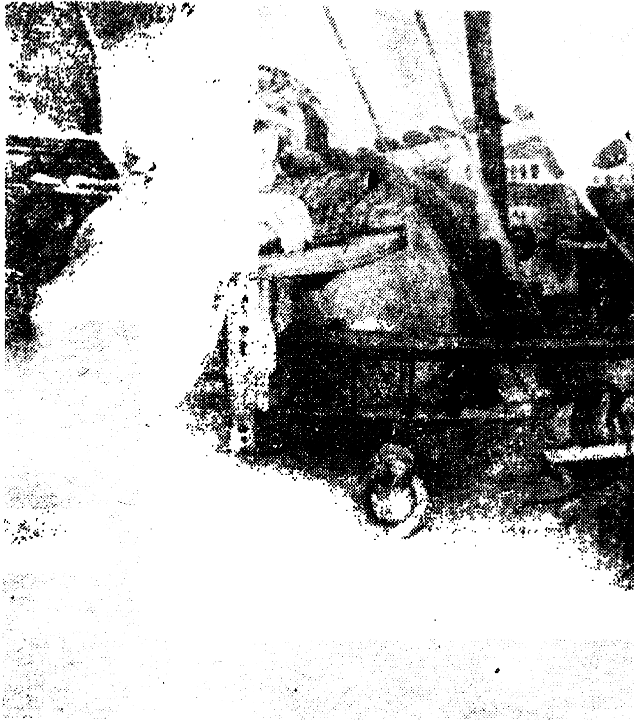
উপরের লেখাটি লিখেছিলাম ১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসে প্রশান্তবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের অব্যবহিত পরেই। কিন্তু লেখাটা শেষও হয়নি, প্রকাশিতও হয়নি। তার অন্যতম কারণ শিল্পীর কাছ থেকে সাহায্য পাইনি। তার পরে ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বর মাসে শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘের আয়োজনে তাঁর ছবির একটি প্রদর্শনী হয়ে গেছে একাডেমী অফ ফাইন আর্টস-এর গৃহে। কলকাতার রসিক সমাজে তাঁর নামটা হঠাৎ বড় পরিচিত হয়ে উঠেছে। সেই প্রদর্শনীর মধ্যে থেকে একটি দু'টি ছবি তাঁকে না জানিয়ে তাঁর আত্মীয়েরা পাঠিয়েছিলেন



বাসনওয়ালা

একাডেমীর বাৎসরিক প্রদর্শনীতে। রাজ্যপালের পুরস্কারটিও তাঁর সাধনার একটি স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি পেয়েছেন। অর্থাৎ সেদিন যখন তাঁর সম্বন্ধে লিখতে চেষ্টা করছিলাম তখন তাঁর সামগ্রিক ব্যক্তিত্বটাই বড় ছিল, আর আজকে অনেক বৃহত্তর একটি গোষ্ঠীর মধ্যে তাঁর শিল্পী-পরিচয়টাই প্রাধান্য লাভ করেছে। কিন্তু যেহেতু তিনি শিল্প-সাধনায় সার্থকতা লাভ করেছেন সেই হেতুই বোধহয় তাঁর জীবন বা ব্যক্তিত্ব আমাদের কাছে বিশেষ করে কৌতূহলোদ্দীপক। শিল্পীর জীবনকে বাদ দিয়ে তাঁর শিল্পসৃষ্টিকে বোধহয় বোঝা যায় না।

শিল্পসাধনার টীকা বা ভাষ্য করা বড় দুরূহ কাজ। কোন শিল্পীর আঁকা ছবি অনেকের ভাল লাগে কি লাগে না এটা শিল্পসৃষ্টির নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি ব'লে মনে হয় না। প্রশান্তবাবু সেদিন কয়েকবার বললেন যে, তিনি নিজের আনন্দে ছবি আঁকেন। সেইটিই বোধ হয় ঠিক। শিল্পীর নিজের যেটা অভিজ্ঞতা বা অনুভূতি, তাকে একটা নির্দিষ্ট ভাবে রূপ দিতে চেষ্টা করেন শিল্পী, যার ফলে তিনি একটা গভীরতর উপলব্ধিতে পৌছতে পারেন। ছবিটা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে তিনি নিজেই হন তার বোদ্ধা বা সমালোচক। তিনি নিজেই যাচাই করে দেখেন যে,



সিন্ধবাদ নাবিক

তিনি যা করতে চেয়েছিলেন তা করতে পেরেছেন কি না। অন্য সমালোচক বা সমঝদারের কথা তাঁর কাছে অবান্তর। সমঝদারেরা যখন পরবর্তী সময়ে ছবিটিকে দেখেন, তখন তাঁদের অনুভূতিকেও গভীরতর করে তোলার যে আকাঙ্ক্ষা তাঁদের মধ্যে থাকে সেই আকাঙ্ক্ষার একটা তৃপ্তি পান ছবিটির মধ্যে দিয়ে। মহৎ ছবি এই মহৎ অনুভূতির প্রতীক হয়ে থাকে। প্রশান্তবাবু এই বিচারে যে সফল হয়েছেন তাতে সন্দেহ কি?

শিল্পী নিজের উদ্দেশ্য হিসেবে যা ধরে রাখেন তা প্রধানতঃ তাঁর পরিবেশ ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপরে নির্ভর করে। প্রশান্তবাবু ছেলেবেলা থেকেই বহু জিনিষে হাত দিয়েছেন। এক বোধ হয় ছবি আঁকাটাই কখনও সেভাবে চর্চা করেন নি। গাড়ি বা cycle বা motor cycle তাঁর কাছে নিছক এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় যাওয়ার উপায় বলে বোধ হয় গণ্য হ'ত না। বিশেষ করে cycle-এর উপরে নানা রকমের কসরৎ করা ছিল তাঁর বহুদিনকার অভ্যাস। যন্ত্রপাতি নিয়ে নাড়াচাড়া করার শখ খুবই আছে। রেডিও তৈরি, কাঠের কাজ, ফটোগ্রাফী, সবেতেই তাঁর দখল। বন্দুকে সখ আছে, আবার তার সঙ্গে বাজনা, অভিনয় সবকিছুই বেশ ভালভাবেই চর্চা করেছেন। সৌখীন সুরকার হিসেবে তাঁর পরিচয় পাওয়া যাবে অবনীন্দ্রনাথের 'এস্পার ওস্পার' যাত্রার সুরগুলির মধ্যে। প্রিয়ম্বদা দেবীর আগ্রহে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন ছাত্র হয়ে কিন্তু ছবি সম্বন্ধে আগ্রহী হলেও ছবি আঁকার পদ্ধতি নিয়ে কোন চর্চা করেছিলেন বলে মনে হয় না। বরং তার সূচনা হ'ল আরও পরে সহপাঠী অজীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সূত্রে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে এসে অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয়ের মধ্যে দিয়ে। তবে কলাভবনে

যোগ দেবার আগে তিনি বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে পরিচিত ছিলেন তাঁর অপূর্ব কার্টুনগুলির জন্যে। জানি না তাঁর আঁকা সেই শত শত কার্টুনগুলিকে কেউ একত্রে সংগ্রহ করে একটা আলাদা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে পারবেন কি না। অন্তরঙ্গ মহলে তাঁর বোধ হয় সবচেয়ে বড় পরিচয় গল্পিয়ে হিসেবে। শিল্পী মানুষ, তুলির রং তাঁর গল্পেও লাগে। তাঁর সেই চড়া রং-এর গল্পের একটি সঙ্কলন তাঁর কোনো বন্ধু যদি করতেন তবে বৃহত্তর পাঠক সমাজ সেগুলি পেয়ে নিশ্চয়ই লাভবান্ হতেন।

এই যে বিচিত্র অভিজ্ঞতাপূর্ণ সতেজ একটি জীবন, এর ছাপ তাঁর ছবিগুলিতে স্বভাবতঃই পড়েছে। Academy ভবনে আয়োজিত তাঁর প্রদর্শনীতে যে ৮২টি ছবি এসেছিল তাতে এই বৈচিত্র্য খুব স্পষ্ট। Wash পদ্ধতিতে আঁকা জলরংই তাঁর প্রিয় রীতি। কিন্তু ছবি আঁকার পদ্ধতির এ রকম একটি নাম দিলেই কিছু বোঝা যায় না, এমন কি পদ্ধতিটাও খুব বেশি গুরুত্ব পাবার অধিকারী নয়। আঁকার রীতি বা পদ্ধতি শিল্পীর কাছে উপায় বা উপকরণ মাত্র। তাঁর স্বনির্দ্ধারিত অভীষ্টে পৌঁছনোর জন্যে এটা একটা পথমাত্র। তাঁর ছবির বেলায় এইটুকু শুধু বলা যায় যে, রং ও রেখা তাঁর সম্পূর্ণ আয়ত্তে আছে। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির উৎস খুঁজতে গেলে অবনীন্দ্রনাথ আর গগনেন্দ্রনাথের কথাই সবচেয়ে আগে মনে পড়ে। ১২৪ ফিট্ লম্বা scrollটি, যেটি আগের বছর আমার মনে হয়েছিল কোনোদিন শেষ হবার নয়, সেই End in the Endless ছবিটিতে সাদা-কালোর ব্যবহার কিংবা Pilgrim Eternal-এর সৌরমণ্ডল অতিক্রমকারী নীল রং-এর বিন্যাস স্বাভাবিক ভাবেই গগনেন্দ্রনাথের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। আবার কাবুলিওয়ালা কিংবা Stray Birds গুচ্ছের অন্তর্গত ছবিগুলি যে অবনীন্দ্র-শিষ্যের আঁকা, তা কাউকে বলে দিতে হয় না।

তবে তাঁর কৌতুকপ্রিয় অভিজ্ঞতাসন্ধানী মন সবচেয়ে উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশ পেয়েছে Calcutta Series-এ। 'বিড়িওয়ালা', 'বাসনওয়ালা', 'খালপার', 'আস্তাবল', 'অলিগলি' ইত্যাদি ছবি কয়টি শহুরে জীবনের উপরে সত্যিই এক নতুন আলোকপাত করেছে। কলকাতার অপরিচ্ছন্ন অলিগলির মধ্যে যে এত রোম্যান্টিক রং পাওয়া যায়, এত বিষণ্ণতা বা এত কৌতুকের উপকরণ পাওয়া যায় তা কে জানত? প্রশান্তবাবু label বা নাম দেওয়ার পক্ষপাতী নন তা জানি, তবে কালিঘাটের দৃষ্টিভঙ্গী আর জোড়াসাঁকোর প্রকাশভঙ্গি মিশিয়ে তিনি যা তৈরী করেছেন তাকে বিংশ শতাব্দীর পট না বলে পারছি না। আণবিক যুদ্ধের ভয়াবহতার বিরুদ্ধে impressionistic প্রতিবাদ He Bears the Cross Again and Again, কিংবা আগামী দিনের মহীরুহের ইঙ্গিতপূর্ণ সহজ সরল রচনা Birth of Santiniketan যদিও বা ভুলে যাই, থিয়েটারের পোষ্টার অলংকৃত অলিগলিকে ভুলতে পারব না।

যেহেতু প্রশান্তবাবুর ছবি আমাদের মনকে নাড়া দিয়েছে, সেইহেতু তাঁর চিত্রাঙ্কন-শৈলীকে শুধু তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার না করে আমাদের দেশের আধুনিক শিল্প-ইতিহাসের সামগ্রিক পটভূমিকাতেও বিচার করা প্রয়োজন। বস্তুতপক্ষে সকল শিল্পীর প্রয়াসকে সম্পূর্ণরূপে বুঝতে গেলে এইটা মেনে নিতে হয় যে, শিল্পী কখনও স্বয়ম্ভূ হতে পারেন না। অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের ধারার মধ্যে তিনি আবির্ভূত হন, তাঁর সঙ্গে অতীতের ঐতিহ্যের এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনার যেমন কার্য্যকারণ সম্পর্ক থাকে, তেমনি দেশের জলহাওয়া, সামাজিক অবস্থা ইত্যাদি সবকিছু মিলিয়ে তৈরী বাস্তব বর্তমানের সঙ্গেও তাঁর দেনা-পাওনার সম্পর্ক থাকে। অতীতের বিচারে প্রশান্তবাবুকে সহজ ভাবে অভিহিত করা যায় অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথের উত্তরসাধক হিসাবে। রঙের ব্যবহারেই শুধু নয়—কাঠামো রচনায় (draughtsmanship) ও বিষয়বস্তু নির্ব্বাচনেও সেই দুই আচার্যের প্রভাব তাঁর উপরে স্পষ্ট। কিন্তু সেইটাই বোধহয় প্রশান্তকুমারের সীমাবদ্ধতার কারণ।

বিশেষ করে অবনীন্দ্রনাথ স্পষ্টতঃই ভারতবর্ষের জাতীয় জাগরণের পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পসৃষ্টির কথা ভেবেছিলেন। ফলে ভারতবর্ষের পুরনো ইতিহাস ও পুরাণের পাতাতে খুঁজেছিলেন বিষয়বস্তু। তাঁর অনুপ্রেরণায় তাঁর অন্যান্য অনেক কৃতী শিষ্যের মতন প্রশান্তকুমারও মোগল বা ঐ ধরণের সংস্কৃতির ছাপ ফেলেছেন বিষয়বস্তু



রাধা-কৃষ্ণ

নির্বাচনে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় Stray Birds গুচ্ছের অন্তর্গত ছবিগুলির কথা। রঙ ও তুলির ব্যবহারে অসাধারণ নিপুণতা সত্ত্বেও এই কাল্পনিক চরিত্রগুলি আমাদের একান্ত অভিজ্ঞতার বহির্ভূত জিনিস বলে আমাদের মনকে তেমন ভাবে স্পর্শ করে না যেভাবে করে 'অলিগলি' গুচ্ছের ছবিগুলি। ছবি অত্যন্ত নিবিড় ভাবে জড়িত বিষয়বস্তুর সঙ্গে। Stray Birds-এর অন্তর্গত ছবিগুলি যে শিল্পীর নিজস্ব অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত নয় তা স্পষ্ট ভাবে বোঝা যায় দ্বিধাগ্রস্ত রেখা ও ঝাপসা রঙের মধ্যে দিয়ে। অথচ 'অলিগলি'র ছবিগুলির রেখা কত দৃঢ়, রঙ কত সজীব। তাছাড়া প্রথমোক্ত ছবিগুলির 'sentimentality'র পরিবর্তে শেষোক্ত ছবিগুলিতে পাওয়া যায় স্বতঃস্ফূর্ত কৌতুকপ্রিয়তার পরিচয়।

তবে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করে নিবিড়তর উপলব্ধির জন্যে যে প্রয়াস সব সার্থক শিল্পের মধ্যেই পাওয়া যায় এবং প্রশান্তবাবুর ছবির মধ্যেও আমরা পেয়েছি তার সবচাইতে সুন্দর ও বলিষ্ঠ প্রকাশ হয়েছে দুই ধরণের ছবির মধ্যে : কল্পনাকে লাগাম ছেড়ে দেওয়া fantasy-মূলক ছবি, যথা The Pilgrim Eternal, এবং মূলতঃ বাস্তবালম্বী অথচ ব্যঞ্জনার গভীরতায় উজ্জ্বল প্রাকৃতিক দৃশ্যালেখ্য, যথা End in the Endless নামক scrollটি। প্রশান্তবাবুর যে কার্টুনগুলি এখনও সাধারণ দর্শকের সামনে আসেনি সেগুলি বাদ দিলে এই দুই জাতীয় ছবিগুলিই বোধহয় তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। আর 'অলিগলি'র ছবিগুলিও শহুরে জীবনের উপরে সজীব সরস মন্তব্য হিসেবে অতুলনীয়। আমরা আশা করি, ইউরোপীয় শিল্পকলার প্রাণহীন অনুসরণ ও নিছক ভাব-বিলাসী ছবির জগতে এই রকম প্রকৃত নতুন স্বাদের জিনিস তাঁর কাছ থেকে আরও অনেক দিন ধরে পেতে থাকব।

গ্রন্থ-পরিচয়

কিশোরী—সম্পাদিকা শ্রীসুধা সেন। ইহা একটি সচিত্র বার্ষিকী। দাম ২'৮০, প্রাপ্তিস্থান ৫০এ, থিয়েটার রোড, কলিকাতা-১৬। অল্পবয়স্কা মেয়েরা যারা নিতান্ত শিশু নয়, তাদের জন্য আমাদের বাংলায় বিশেষ কোন পত্রিকা বা বই চোখে পড়ে না। পূজার বাজারের প্রেমের এবং বীভৎসতার গল্পই প্রধানত তাদের অবসরের খোরাক। শ্রীমতী সুধা সেন এই কথা মনে রেখে যে প্রতি বৎসর এদের জন্য 'কিশোরী' প্রকাশ করেন এটা আশা ও আনন্দের কথা। ইহাতে মহারাণী অহল্যাবাঈকে প্রথমেই স্মরণ করা আজকের দিনে বিশেষ প্রয়োজন। আমাদের দেশের এই দুর্দ্দিনে উচ্ছৃঙ্খলতাকে আদর্শ না করে ছেলেমেয়েরা দান-ধ্যান সেবা ও বীরত্বকে যদি তুলে ধরতে চায় তবেই দেশের মঙ্গল। এই মহীয়সী নারীর জীবন সে প্রেরণার উৎস।

কিশোরীর অন্যান্য লেখাগুলিও সুলিখিত এবং সুনির্ব্বাচিত। বইটি আর একটু বড় হ'লে বিষয়ের বৈচিত্র্য আরও থাকতে পারত। এই পরিসরেও সেলাই, নাচ, বাটিক, রান্না, স্বাস্থ্য স্থান পেয়েছে। স্বাস্থ্যসমস্যা সুন্দর করে বিশেষ ভাবে লেখা।

আমরা পরের বৎসরে বইটির আরও উন্নতি কামনা করি।

শ্রীশান্তা দেবী

বীর বিবেক—প্রফুল্লকৃষ্ণ ঘোষ। প্রকাশক—প্রশান্ত দে, ৫২ হালদার পাড়া রোড, কলিকাতা-২৬, মূল্য তিন টাকা।

বইটি কবিতায় স্বামিজীর জীবনী। বিবেকানন্দের জন্মকথা হতে শুরু করে মহাপ্রয়াণ পর্য্যন্ত ছোট ছোট কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে। লেখার মধ্যে ছন্দের চাতুর্য্য বা কাব্যসুষমার উৎকর্ষতা খুব একটা উঁচুদরের না হলেও বইটি পড়ে তৃপ্তিলাভ করেছি। একটানা পড়ে যেতে কোথাও ক্লান্তি আসে না। চিকাগো বক্তৃতায় বিবেকানন্দ যা বলেছেন তা কবিতায় সুনিপুণভাবে প্রকাশিত হয়েছে

······সেই ঈশ্বর আছেন সবার তরে—
তিনি ত নহেন বদ্ধ কখনো মন্দিরে, মসজিদে,
কিম্বা গির্জাঘরে।
আমার ধর্ম্ম কি কহিছে শোন—শোন পাতি দিয়া কান
কি কহেন ভগবান :—
ঘৃণা করি দূরে রেখোনা কারেও, সবারে গ্রহণ কর,
আত্মীয় বলে, ভাব সকলেরে—ভাই বলে
বুকে ধর।
আমার নিকটে কোন ভেদাভেদ নাই—

যদি কেহ মোরে ডাকে চুপে চুপে,
করে মোর পূজা যে কোনও রূপে,
আমি সবাকার কাছে যাই—
যত মতই থাক, যত পথই থাক, আসিবে আমার ঠাঁই,
নদীর মতন সাগরে মিশাবে অন্য উপায় নাই।

স্বামিজীর জীবনের ছোট্ট ছোট্ট ঘটনা—মীরাটের লাইব্রেরী থেকে Lubbock-এর বিরাট গ্রন্থটি একদিনে সমাপ্ত করে আবার ফিরিয়ে দেওয়া, আলোয়ারের মহারাজার কাছে প্রতিমাপূজার অন্তর্নিহিত ভাব প্রকাশ করা, কন্যাকুমারী গমন, ইংলণ্ডে নিবেদিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ, মিস মুলার ও সেভিয়ার দম্পতির সঙ্গে পরিচয় ইত্যাদি সবকিছুই কবিতায় সুন্দরভাবে রূপায়িত।

এই পুস্তকের প্রয়োজন আছে। আজকের পৃথিবীতে হানাহানি, রেষারেষি ও সংঘাতের অন্ত নেই। সত্যনিষ্ঠা ও আদর্শবাদ যেন কোন অন্যযুগের দুটি শব্দমাত্র। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিবেকানন্দের চেতনা ও বাণী জাতির কাছে অন্ধকারাচ্ছন্ন সমুদ্রবক্ষে দূর আলোকস্তম্ভস্বরূপ হবে।

আমরা পুস্তকটির বহুল প্রচার কামনা করি।
ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট মোটামুটি ভাল।

শ্রীঅজিত চট্টোপাধ্যায়

উমেশচন্দ্র দত্ত, মহেশচন্দ্র ঘোষ—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬। মূল্য এক টাকা।

আলোচ্য পুস্তকখানি সুবিখ্যাত সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার অন্তর্গত। উমেশচন্দ্র দত্ত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম অগ্রগণ্য নেতা এবং সিটি কলেজের অধ্যক্ষরূপে সাধারণের নিকট পরিচিত। তিনি শিক্ষাব্রতীর কার্য আরম্ভ করিয়া উক্ত কলেজের অধ্যক্ষরূপে জীবনাতিপাত করিয়াছেন। চরিত্র-মাধুর্যে ছাত্র-শিষ্যদের বিশেষ শ্রদ্ধালাভ করেন কিন্তু এ কীর্তিমান পুরুষের আর একটি কীর্তির কথা আজকাল হয়ত অনেকেরই অজানা রহিয়া গিয়াছে। তিনি দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর যাবৎ (মধ্যে কিছুকাল বাদে) বামাবোধিনী পত্রিকা সুষ্ঠুরূপে সম্পাদনা ও পরিচালনা করিয়াছেন। নাম হইতেই বুঝা যায়, এখানি স্ত্রীজাতির নিমিত্ত প্রতিষ্ঠিত। বস্তুতঃ বাংলার মহিলাসমাজ এই পত্রিকাখানির দ্বারা যে কিরূপ উপকৃত হইয়াছেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না; শুধু শিক্ষা বিস্তারেই নহে, মহিলাদের মনে সাহিত্য-প্রীতি ও সাহিত্য-সেবার প্রেরণা জাগাইতে সবিশেষ সমর্থ হয়। সাহিত্য-সাধক উমেশচন্দ্রের এই কৃতিত্বটি সর্বাগ্রে স্মরণীয়। বামাবোধিনীকে কেন্দ্র করিয়াই তাঁহার অক্লান্ত ও অকৃত্রিম সাহিত্য-সাধনা সিদ্ধির পথে অগ্রসর হয়। তিনি কখনও নামের কাঙাল ছিলেন না। তিনি পত্রিকা এই প্রকাশিত নিজস্ব রচনাবলী সংকলন করিয়া কতকগুলি বই প্রকাশিত করেন, কিন্তু তাহাতে তিনি তাঁহার নাম সংযোগ করিতে দেন নাই। গ্রন্থকার এই নীরব সাহিত্য-সাধকের অপরাপর কৃতিত্বের কথাও বইখানিতে উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রবাসীর অন্যতম প্রধান লেখক মহেশচন্দ্র ঘোষের সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা এবং সাহিত্য-কৃতীর বিবরণও এই পুস্তকে প্রদত্ত হইয়াছে। যোগেশবাবু পরিশ্রম সহকারে তাঁহার মনন-সাহিত্যমূলক বিবিধ দার্শনিক ও ধর্মবিষয়ক বাংলা প্রবন্ধাদির একটি তালিকা সংকলন করিয়া দিয়াছেন। মহেশচন্দ্র সমসাময়িক মনীষীর ও সাহিত্যিকগণের চিত্তে কিরূপ উচ্চস্থান লাভ করেন, কবি কামিনী রায়ের কবিতাটি হইতে তাহা আমরা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করি। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়া প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন। এরূপ গ্রন্থ প্রচারের আবশ্যকতা আছে।

সূর্যতপস্যা—গণেশ নন্দী, "[illegible]" ১০/১১ বাগমারী লেন কলিকাতা-১১। মূল্য এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

একাঙ্ক নাটকের দুটি প্রধান গুণ 'সাসপেন্স' এবং 'ক্লাইম্যাক্স'। গণেশ নন্দীর এই নাটকে সে দুটি গুণই বর্তমান। নাটকটি পড়িতে ভাল লাগিবে। যে নাটক পড়িতে ভাল লাগে তাহা সত্যই ভাল। আবার এমন অনেক নাটক আছে, অভিনয়ের গুণে ভাল কিন্তু পাঠোপযোগী নয়। "সূর্যতপস্যা" দুই পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হইয়াছে।

নাটকের নায়ক কবি। উজ্জ্বল জীবন গড়িবার তপস্যায় সে নিজেকে তিল তিল করিয়া দগ্ধ করিয়া গেল। এই একটি জীবনের পটভূমিকায় নাট্যকার যে অসীম ভাবের চিত্রটি তুলিয়া ধরিয়াছেন—তাহার সমাধান কোথায়? নাট্যকার সে ইঙ্গিত কোথাও দেন নাই। লেখকের নাটক লিখিবার হাত আছে, সম্ভাবনাও রহিয়াছে প্রচুর। আমরা তাঁহার অপেক্ষায় রহিলাম।

একটি উজ্জ্বল জীবন—নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, সান্যাল এণ্ড কোম্পানী, ১/১এ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২। মূল্য ছ টাকা।

'একটি উজ্জ্বল জীবন' উপন্যাস নয়, ইহা একটি জীবন-কাহিনী। লেখার গুণে ইহা উপন্যাসের মতই সরস হইয়াছে। ইহা কোন মহাপুরুষের জীবন-আলেখ্য নয়, কোন বৈজ্ঞানিক, কোন দার্শনিক বা কোন নেতা—যাঁহারা খ্যাত হইয়াই আছেন, তাঁহাদের জীবন-কথা লেখক লেখেন নাই। লেখক লিখিয়াছেন তাঁহারই এক বন্ধুর কথা। যিনি আপন প্রতিভায়, আপন কর্ম-দক্ষতায় আপন চরিত্র-বৈশিষ্ট্যে বড় হইয়াছেন যাঁকে চিনাইয়া দিতে হয় নাই, যিনি আপন মহিমায় সমুজ্জ্বল, লেখক তাঁরই কথা লিখিয়াছেন। আমরা অসাধারণ বলি কাকে? যিনি সাধারণের মধ্য হইতে বড় হইয়াছেন। বৈদ্যনাথ সরকার সেই সাধারণ ব্যক্তি। যিনি একদা মানিকতলার "তৃপ্তি-হোটেল"-এ—আর একজন সাধারণ মানুষ পি, সি, সরকারের সহিত বাস করিয়া গিয়াছেন। আজ দুজনেই সামান্য হইতে অসামান্য পর্যায়ে উঠিয়াছেন। ভগবান দুইহাত পূর্ণ করিয়া তাঁহাদের দিয়াছেন। আজ দুজনেই ভারতের কৃতী সন্তান। ইঁহাদের জীবনাদর্শ লোক-সমাজে প্রচারের প্রয়োজনীয়তা আছে। নরেশবাবু সেদিক দিয়া, এই জীবন-কাহিনী লিখিয়া প্রভূত উপকার করিয়াছেন। নরেশবাবুর লেখনী জয়যুক্ত হোক।

শ্রীগৌতম সেন

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
মুদ্রাকর ও প্রকাশক—কল্যাণ দাশগুপ্ত, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৭৭/২/১ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

'প্রবাসী' মাসিক সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকার ও অন্যান্য বিশেষ বিবরণ প্রতি বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ তারিখের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিতব্য :—

ফরম্ নং ৪

(রুল নং ৮ দ্রষ্টব্য)

১।	প্রকাশিত হওয়ার স্থান—	কলিকাতা (পশ্চিমবঙ্গ)
২।	কিভাবে প্রকাশিত হয়—	প্রতি মাসে একবার
৩।	মুদ্রাকরের নাম—	শ্রীকল্যাণ দাশগুপ্ত
	জাতি	ভারতীয়
	ঠিকানা	৭৭।২।১, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৩
৪।	প্রকাশকের নাম	ঐ
	জাতি	ঐ
	ঠিকানা	ঐ
৫।	সম্পাদকের নাম	শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
	জাতি	ভারতীয়
	ঠিকানা	৭৭।২।১, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩
৬।	(ক) পত্রিকার স্বত্বাধিকারীর নাম	প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
	ঠিকানা	৭৭।২।১, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩
	এবং	
	(খ) সর্বমোট মূলধনের শতকরা এক টাকার অধিক অংশের অধিকারীদের নাম-ঠিকানা—	১। শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৭৭।২।১, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩
		২। শ্রীমতী অরুন্ধতী চট্টোপাধ্যায়, ৭৭।২।১, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩
		৩। শ্রীমতী রমা চট্টোপাধ্যায়, ৭৭।২।১, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩
		৪। শ্রীমতী সুনন্দা দাস, ৭৭।২।১, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩
		৫। শ্রীমতী ঈশিতা দত্ত, ৭৭।২।১, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩
		৬। শ্রীমতী নন্দিতা সেন, ৭৭।২।১, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩
		৭। শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়, ৭৭।২।১, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩
		৮। শ্রীমতী কমলা চট্টোপাধ্যায়, ৭৭।২।১, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩
		৯। শ্রীমতী রত্না চট্টোপাধ্যায়, ৭৭।২।১, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩
		১০। শ্রীমতী অলকানন্দা মিত্র, ৭৭।২।১, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩
		১১। শ্রীমতী লক্ষ্মী চট্টোপাধ্যায়, ৭৭।২।১, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

আমি, প্রবাসী মাসিক সংবাদপত্রের প্রকাশক, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরি-লিখিত সব বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

তারিখ—১৫।৩।১৯৬৪ ইং

প্রকাশকের সহি—স্বাঃ শ্রীকল্যাণ দাশগুপ্ত



উইলিয়ম শেক্স্‌পিয়ার

[illegible] জন্ম—১৫৬৪ খৃ.

[illegible]

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৪শ ভাগ
১ম খণ্ড

প্রথম সংখ্যা
বৈশাখ, ১৩৭১

বিবিধ প্রসঙ্গ

নববর্ষ

বর্ষারম্ভ হইয়া গিয়াছে। বঙ্গাব্দ ১৩৭০ এখন অতীতের অন্তরালে, ১৩৭১ সাল বর্তমানকে আচ্ছাদন করিয়া ভবিষ্যতের মুখে চলিয়াছে। কিন্তু এই বর্ষারম্ভে আনন্দ কোথায়?

মনে পড়ে বর্তমান শতকের প্রথম মুখে, অতীতের এক নববর্ষের দিনে, কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছিল উদ্দীপনা-পূর্ণ নববর্ষ আগমনের গান:—

হে ভারত, আজি নবীন বর্ষে
শুন এ কবির গান!
তোমার চরণে নবীন হর্ষে
এনেছি পূজার দান!
এনেছি মোদের দেহের শকতি
এনেছি মোদের মনের ভকতি
এনেছি মোদের ধর্মের মতি
এনেছি মোদের প্রাণ!
এনেছি মোদের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ—
তোমারে করিতে দান॥

এই নববর্ষও নববর্ষে দেশপূজার আয়োজন, ইহা বাঙালীরই একান্ত নিজস্ব। যে ঐতিহ্যের উপর ইহা স্থাপিত তাহাও বাঙালীরই কীর্তি। কিন্তু আজ সেই চিন্ময়ী দেশ-মাতৃকার ধ্যান বাঙালীর হৃদয় মনে কি জাগ্রত আছে? ভারতমাতার পূজার নৈবেদ্য, সেই "দেহের শকতি" "মনের ভকতি" "ধর্মের মতি" ও শ্রেষ্ঠ অর্ঘ সেই প্রাণ আজ কে নিবেদন করিতে প্রস্তুত?

দলগত স্বার্থ চিন্তা ও হিংসাদ্বেষ-অসূয়া এবং গোষ্ঠীগত ও ব্যক্তিগত ঈর্ষা ও লালসা বাঙালীর মন-প্রাণকে আচ্ছন্ন করিয়া সমস্ত জাতীয় জীবন ও সংগঠনকে ছত্রভঙ্গ করিতে বসিয়াছে। তাই আজ এই অগ্নিপরীক্ষার দিনে আমরা ব্যাপকভাবে শক্তির ও বুদ্ধির অপচয় করিতেছি, বিক্ষিপ্ত চীৎকারে অন্যের উপর দোষারোপ করিয়া ও অসংযত বিক্ষোভে জাতিকে বিভ্রান্ত করিয়া।

মনে পড়ে এই জাতির ও সমগ্র ভারতের এইরূপ এক নৈরাশ্যময় পরিস্থিতির মধ্যে কবিগুরুর সেই ব্যাকুল প্রার্থনা:—

নিশ্চল নির্বীর্য্য বাহু কর্মকীর্তি হীনে
ব্যর্থশক্তি নিরানন্দ জীবনধনদীনে
প্রাণ দাও প্রাণ দাও, দাও দাও প্রাণ হে
জাগ্রত ভগবান হে॥

এই অভাবগ্রস্ত, রোগক্লিষ্ট ও আত্মকলহে বিভ্রান্ত জাতির উদ্ধারের পথ যে আত্মবিশ্বাসের ও পুরুষকারের উপর নির্ভর, সে কথা তিনি জানাইয়াছিলেন ঐ দেবতার প্রতি নিবেদনে। তাঁহার এই জন্মমাসে তাঁহাকে প্রণাম জানাইয়া আমরাও সেই ব্যাকুল নিবেদন জানাই যাহাতে এই জাতীয়জীবন অভিশাপ-মুক্ত হয়। এ জাতি সম্বিৎ ফিরিয়া পাইলে প্রাণ-শক্তি লাভ করিবেই। সে সুদিন আসিবেই এ বিশ্বাসে আমরা ভবিষ্যতের প্রতীক্ষা করিব। প্রার্থনা জানাই যেন

নূতন যুগ-সূর্য্যের আলোকে অচিরে দূর হয় সেই কুগ্রহ সমষ্টির প্রভাব যাহা আমাদের জাতির অতীত ও বর্ত্তমানকে তিমিরাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

কাশ্মীর ও শেখ আবদুল্লা

যে সময়ে শেখ আবদুল্লাকে মুক্তি দেওয়া হয় তখন এক-দল রাষ্ট্রনীতিবিদ—যাহাদের মধ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য হইতে সাধারণ বুদ্ধিজীবী পর্য্যন্ত সকল স্তরের লোক আছেন—বলিয়াছিলেন ও বলিতেছেন যে কাজটা ভাল হয় নাই, কেননা ইহাতে কাশ্মীর সমস্যা আরও জটিল হইল। কেহ কেহ বলেন যে, এই ভাবে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া শেখ আবদুল্লাকে ছাড়িয়া দেওয়ায় আমরা কাশ্মীর হারাইলাম। তাঁহাদের যুক্তি এই যে, কাশ্মীরের জনসাধারণ রাষ্ট্রনীতির মারপ্যাঁচ সম্বন্ধে আমাদের দেশের লোক হইতেও বহুগুণ অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ এবং কাশ্মীরে শেখ আবদুল্লার প্রভাব অন্য যে কোনও কাশ্মীরী জননেতা অপেক্ষা বহুগুণ অধিক। সুতরাং শেখ আবদুল্লার কথায় সেখানের জন-সাধারণ উঠে-বসে এবং সেই কারণেই কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ তাঁহার ইচ্ছাধীন।

যদি তাহাই হয়, অর্থাৎ কাশ্মীরের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ বলিতে যদি একমাত্র এই অব্যবস্থিত চিত্ত, অস্থির মতি ও জন-বিভ্রান্তকারী বাক্যবাগীশকেই বুঝায়, তবে বলিতে হইবে যে, ঐ অভাগা দেশের ভবিষ্যৎ ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন। এবং সেই সঙ্গে বলিতে হইবে যে কাশ্মীরের এই ভাগ্যপরীক্ষার—অর্থাৎ শেখ আবদুল্লার মুক্তিতে কাশ্মীর ও ভারতের মধ্যে যে দৃঢ় সংযোগ রহিয়াছে তাহা কর্ত্তিত হয় কি না—বিশেষ প্রয়োজন ছিল এবং তাহা আরও কয়বৎসর পূর্ব্বে করা উচিত ছিল।

মুক্তি পাইবার পর শেখ আবদুল্লার একমাত্র উদ্দেশ্য যাহা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় তাহা কাশ্মীর ও ভারতের মধ্যে বর্ত্তমান সম্বন্ধকে নষ্ট করা। কি ভাবে যে তিনি করিতে চাহেন তাহা কিন্তু সুস্পষ্টভাবে এখনও তিনি বলিতে সমর্থ নন। সেই কারণে তিনি নানা উল্টাপাল্টা কথা বলিতেছেন ও নানা অদ্ভুত যুক্তির অবতারণা করিতেছেন। যেমন কাশ্মীরের গণনির্ব্বাচনের কথায় তিনি বলেন যে ঐ নির্ব্বাচন তিনটিই অসৎ উপায়ে চালিত হইয়াছিল এবং সে কারণে উহাকে জনমতের নির্দ্দেশ বলা চলে না। প্রথম নির্ব্বাচন হয় শেখ আবদুল্লার প্রধানমন্ত্রিত্বের সময় এবং উহার পরিচালনা হয় তাঁহারই উদ্যোগে। অতএব তিনি নিজেকেই অসৎপন্থী বলিতেছেন এই মন্তব্যে।

শেখ আবদুল্লার এই অস্থির মতিগতি ও উদ্দাম বাক্য-স্রোতে মনে হয় যে তিনি নির্দ্দেশ অপেক্ষা করিতেছেন তাঁহাদেরই কাছে যাঁহারা ১২ বৎসর আগে এই জননেতাকে নাচাইয়া ও তাঁহার মনে সীমাহীন ও তৃপ্তিহীন ক্ষমতা-লালসার আগুন জ্বালাইয়া তাঁহার রাষ্ট্রনৈতিক তরণীকে বানচাল করেন। ভারতের সেই প্রচ্ছন্ন ও ক্রুর শত্রুযুগল, অর্থাৎ ব্রিটিশ রক্ষণশীল দল ও মার্কিন যুদ্ধকামী পক্ষ, কি নির্দ্দেশ কি সাহায্য দিবেন তাহারই অপেক্ষায় আবদুল্লা এই ভাবে ভারতবিরোধী অভিযান চালাইতেছেন মনে হয়। "প্রিয়তম বন্ধু" নেহরুর সহিত সাক্ষাৎকার তিনি এতদিন এড়াইয়াছেন ঐ কারণেই, বাজে অজুহাতে ও অকারণ কাশ্মীর সফরের উৎসাহে।

তিনি বলিয়াছেন যে স্বাধীন কাশ্মীর তাঁহার কাম্য নয়। ইহার কারণ তাঁহার এই জ্ঞান টনটনে আছে যে, কাশ্মীরের স্বাধীনতা ক্ষণস্থায়ী হইতে বাধ্য, যদি না তাহার পিছনে ক্ষমতাপন্ন রক্ষণ-ব্যবস্থা যুক্ত থাকে। যদি বিদেশী মুরুব্বি যুগল সেই ব্যবস্থা ইতিমধ্যে না করেন তবে পণ্ডিত নেহরুর মাথায় হাত বুলাইয়া কোনও সাময়িক ব্যবস্থা করিয়া তিনি কাশ্মীর-অধিপতি হইবেন ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। অবশ্য এই ব্যবস্থার আদ্যোপান্তই জুয়াখেলার চাল এবং ইহার মধ্যে অনেক কিছুই অনিশ্চিত রহিয়াছে—যথা যে ব্রিটিশ রক্ষণশীল দল বারো বৎসর পূর্ব্বে ক্ষমতা পাইয়া কাশ্মীরে নষ্টামি করে তাহারই ভাগ্য পরীক্ষার সময় আগত প্রায়।

অন্যদিকে অনিশ্চিতের মধ্যে আছে বর্ত্তমানে কাশ্মীর শাসনতন্ত্র যাঁহাদের অধিকারে তাঁহাদের এবং ভারতের এই ব্যাপারে প্রতিক্রিয়ার প্রশ্ন। বিগত ২০শে এপ্রিল, কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী শ্রী জি. এম. সাদিক নয়া দিল্লীতে পার্লামেণ্টের সদস্যদের সম্মুখে যে মন্তব্য করেন তাহাতে তাঁহার মন্ত্রিসভার মনোভাব পরিষ্কার ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। উহার সারমর্ম্ম সংবাদপত্রে এইভাবে দেওয়া হইয়াছে:

শ্রী জি. এম. সাদিক এখানে পার্লামেণ্টের কংগ্রেস সদস্যদের এক সভায় বলেন, তিনি স্বয়ং এবং কাশ্মীর সরকার শেখ আবদুল্লার যে কোন রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হইতে সক্ষম বলিয়া তাঁহার মনে পূর্ণ প্রত্যয় রহিয়াছে।

কাশ্মীরের তথাকথিত 'গ্র্যাণ্ড মুফতি'র মাধ্যমে পাকিস্তানের প্রচার-কার্য্যের উল্লেখ করিয়া শ্রীসাদিক বলেন, কাশ্মীরে কোন 'গ্র্যাণ্ড মুফতি' নাই। সারা ইস্লামিক দুনিয়ায় একজন মাত্র 'গ্র্যাণ্ড মুফতি' আছেন। তিনি হইলেন প্যালেস্টাইনের 'গ্র্যাণ্ড মুফতি'।

কাশ্মীর পরিস্থিতির বিশদ পর্য্যালোচনা প্রসঙ্গে মিঃ

সাদিক কারামুক্তির পর হইতে শেখ আবদুল্লার বিবৃতি-সমূহের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, শেখ আবদুল্লা প্রকৃতপক্ষে যে কি চাহেন তাহা বুঝা যাইতেছে না। বর্ত্তমান অবস্থায় এই সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে কিছুই বলা চলে না। শেখ আবদুল্লা শীঘ্রই দিল্লী আসিতেছেন। তখনই সদস্যগণ পরিস্থিতি সম্পর্কে নিজেদের ধারণা সৃষ্টি করিতে পারিবেন।

প্রকাশ, মিঃ সাদিক সদস্যদের এই আশ্বাস দিয়াছেন যে, কাশ্মীর পরিস্থিতি সম্পর্কে আতঙ্কের কোন কারণ নাই এবং শেখ আবদুল্লার বক্তৃতার ফলে আইন-শৃঙ্খলা সম্পর্কে কোন সমস্যাও দেখা দেয় নাই। তিনি বলেন যে, দিল্লীতে আসিয়া প্রধানমন্ত্রীর সহিত শেখ আবদুল্লার আলোচনার পূর্ব্বে উত্তেজনা সৃষ্টির মত কিছু বলা বা করা উচিত হইবে না।

মিঃ সাদিক সংসদ সদস্যদের বলেন যে শেখ সাহেব এমন অনেক কথাই বলিয়াছেন যাহা রাজ্য সরকার অথবা কেন্দ্রীয় সরকার পছন্দ করেন না। তিনি সাম্প্রদায়িক ঐক্য বজায় রাখার ন্যায় অনেক ভাল কথাও বলিয়াছেন।

মিঃ সাদিক বলেন, তাঁহার সরকার রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতে সমস্যা পর্য্যবেক্ষণ করার চেষ্টা করিতেছেন। আইন ও শৃঙ্খলা ব্যাহত হইলে রাজ্যের শাসন-যন্ত্র নিশ্চয়ই সক্রিয় হইবে। মিঃ সাদিক মনে করেন যে, এখন শেখ আবদুল্লাকে জনগণের সম্মুখীন হইতে হইবে এবং সেই পরীক্ষার সম্মুখীন হইলে তাঁহার নেতৃত্বের বিপর্য্যয় ঘটিবার আশঙ্কা রহিয়াছে। প্রায় এগার বৎসর পর জেল হইতে বাহির হওয়ার পর স্বাভাবিক ভাবেই তিনি বহু লোকের অভিনন্দন লাভ করিয়াছেন। কিন্তু তাহার অর্থ এই নহে যে, সকলেই তাঁহার মত সমর্থন করে।

পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করিয়া মিঃ সাদিক বলেন যে, যে গুরুত্বপূর্ণ নির্ব্বাচনে শেখ আবদুল্লা স্বয়ং প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিলেন এবং গণ-পরিষদ গঠন করিয়াছিলেন এবং যে গণপরিষদে অধিকাংশ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে, শেখ আবদুল্লা এখন তাহারই বিরোধিতা করিতেছেন। মিঃ সাদিক বলেন, জম্মু ও কাশ্মীর ভারতেরই অংশ এবং ভারতের কোন অংশকে বিচ্ছিন্ন করার অধিকার সংসদেরও নাই। এইরূপ সমস্যার উদ্ভব হইলে সমগ্র ভারতের জনগণের মতানুসারেই তাহার সমাধান করিতে হইবে।

আবার অন্য একদল লোক আছেন যাহারা বিনাবিচারে ভাবেন যে যদি কাশ্মীর যায় তবে পাকিস্তানের সহিত ভারতের বিরোধের শান্তি হইবে। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী এম. সি. চাগলা ঐ দিনই (২০শে এপ্রিল) বোম্বাইয়ে আন্তর্জ্জাতিক সুহৃদ কেন্দ্রের সম্মুখে যে মন্তব্য করেন তাহা প্রণিধানযোগ্য :

শ্রী এম. সি. চাগলা বলেন যে, পাকিস্তান ও চীনের সহিত যে কোন মীমাংসাই হউক না কেন, ভারতের সম্মান বজায় রাখিয়াই তাহা করিতে হইবে। ভারত শান্তিপূর্ণ ও সম্মানজনক সমাধানের নীতিতে বিশ্বাসী। কিন্তু উভয় দেশই বর্ত্তমানে যে মনোভাব অবলম্বন করিয়াছে, তাহাতে তাহাদের সহিত কোনরূপ আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করাও দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে।

পাকিস্তানের বিষয়ে উল্লেখ করিয়া শ্রীচাগলা বলেন যে, এমন কয়েকজন লোক আছেন, যাহারা মনে করেন যে, কাশ্মীর যদি পাকিস্তানের দিকে চলিয়া যায়, তাহা হইলে পাকিস্তানের সহিত ভারতের সকল হাঙ্গামাই চুকিয়া যাইবে। ইহা কল্পনাবিলাস ছাড়া আর কিছু নয়। কাশ্মীরের সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানের সহিত ভারতের বিরোধের অবসান কখনই হইবে না। যতদিন পাকিস্তান তাহার বর্ত্তমান নীতি অনুসরণ করিয়া চলিবে, ততদিন ভারতের সহিত তাহার বিরোধও থাকিয়া যাইবে।

তিনি বলেন, ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের ক্ষেত্রে কাশ্মীর একটি লক্ষণ মাত্র, মূল ব্যাধি অন্য। আসল কথা হইতেছে যে, পাকিস্তান যতদিন ধর্ম্মান্ধ রাষ্ট্র হিসাবে পরিচালিত হইতে থাকিবে, ধর্ম্মনিরপেক্ষ ভারতের সহিত তাহার দ্বন্দ্বও চলিতে থাকিবে।

শ্রীচাগলা বলেন যে, কাশ্মীর ভারতের ধর্ম্মনিরপেক্ষতার পরীক্ষাস্থলে পরিণত হইয়াছে এবং উহা হাতবদল করার জিনিষ নয়। তিনি বলেন, ভারত পাকিস্তানের শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে এবং অতীব দুঃখের বিষয় যে কয়েক বছর আগেও যে দুইটি দেশ এক ছিল তাহারা এখন দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইয়াছে। পাকিস্তানের সহিত ঝগড়া দ্বন্দ্ব আমাদের কাম্য নয়।

পাকিস্তানের জন্ম ও তাহার অস্তিত্ব সবই ভারতবিদ্বেষ-সম্ভূত। পরিবর্ত্তন যে সম্ভব নয় এ কথা আমরা বলি না। কিন্তু সে পরিবর্ত্তন হইতে পারে যখন জনমত স্বাধীনভাবে প্রকাশিত হওয়া ঐ রাষ্ট্রে সম্ভব হইবে।

অর্থনৈতিক একাধিপত্য বিষয়ে তদন্ত

বিগত ১৭ই এপ্রিল 'যুগান্তর' নিম্নলিখিত সংবাদটি পরিবেশন করেন। সংবাদটি অবশ্য বাংলায় কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলি কেন মাদ্রাজ বা বোম্বাইয়ের কো-অপারেটিভ সংগঠনগুলির মত কার্য্যকরী হইতে পারে না তাহারই

নিদর্শন। কো-অপারেটিভ সোসাইটি যে-মূল নীতির উপর স্থাপিত এ প্রদেশে সেই নীতির ব্যতিক্রম গোড়া থেকেই হয়। সেই নীতি ঠিকমত অবলম্বন করিতে হইলে নিঃস্বার্থ ও নিরপেক্ষ লোকের প্রয়োজন। ঐ প্রকৃতির লোক যদি কো-অপারেটিভ গঠন ও চালন সংক্রান্ত ব্যাপারে কিছু প্রকৃত অধিকার ও ভারপ্রাপ্ত হন তবে নীচের সংবাদের পিছনে যে কুটিল পথে স্বার্থসিদ্ধির নির্দ্দেশ রহিয়াছে তাহা সম্ভব হইত না। রাজ্যের উন্নয়ন দপ্তরের সহিত যে অসহযোগিতার উল্লেখ এই সংবাদে রহিয়াছে উহার প্রকৃত অর্থ বাঙালী সাধারণ জনের কল্যাণ সম্পর্কে অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি। সংবাদটি এইরূপ :

দীঘা কো-অপারেটিভ সোসাইটির কর্তৃপক্ষ রাজ্যের উন্নয়ন দপ্তরের সহিত অসহযোগিতা করিতে থাকায় দীঘায় একটি সুন্দর স্বাস্থ্যনিবাস গড়িয়া তুলিবার পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইতে পারিতেছে না। গত বছর (১৯৬৩) মে মাসে রাজ্য সরকার স্থির করিয়াছিলেন, দীঘা কো-অপারেটিভের অধীনে যে জমি আছে তাহা সরকারী দখলে আনিয়া এখানে প্রধানতঃ মধ্যবিত্তদের স্বাস্থ্য-নিবাস রচনার জন্য জমি দেওয়া হইবে। কিন্তু প্রায় এক বছর হইতে চলিয়াছে, কো-অপারেটিভ কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের অধিকৃত জমি সরকারকে দেন নাই। উন্নয়ন দপ্তরের বারংবার অনুরোধ ব্যর্থ হইয়াছে।

অন্যদিকে সোসাইটি যাহাদের জমি বিলি করিয়াছে তাহার এক তালিকা উন্নয়ন দপ্তরে সম্প্রতি পেশ করিয়াছে। তালিকাটি বিশ্লেষণ করিয়া উন্নয়ন দপ্তর যে তথ্য পাইয়াছেন তাহাকে একটি প্রথম শ্রেণীর কেলেঙ্কারী বলিয়া আখ্যা দেওয়া যায়।

সোসাইটির তালিকায় দেখা যাইতেছে, প্রায় শতকরা আশীটি জমি বরাদ্দ করা হইয়াছে ১০ই হইতে ১৪ই মের (১৯৬৩) মধ্যে। অর্থাৎ সরকার কর্ত্তৃক সোসাইটি জমি গ্রহণ করিবার সিদ্ধান্তের দিনে কিংবা কয়েকদিন পরে। দ্বিতীয় তথ্যটি আরও চমকপ্রদ। সরকারী অর্থে সস্তা দরে সংগৃহীত জমির একটা মোটা অংশ বিলি করা হইয়াছে কয়েকজন কোটিপতি লক্ষপতি অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীর মধ্যে। শুধু তাহাই নহে। কয়েকটি ক্ষেত্রে এই ব্যবসায়ী পরিবারগুলির একই ঠিকানায় বিভিন্ন নামে জমি দেওয়া হইয়াছে। কয়েকটি চটকলের নামেও জমি বিলি করা হইয়াছে।

এ সংবাদের মধ্যে চমকপ্রদ কিছুই নাই। বাঙ্গালীই যদি বাঙ্গালীর সকলের চাইতে বড় শত্রু না হইত, দেশ জাতি আত্মীয় গোষ্ঠী স্বজন সকলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতায় স্বার্থান্ধ বাঙ্গালীই যদি অগ্রণী না হইত, তবে গত ত্রিশ-চল্লিশ বৎসরের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যে, শিল্প-প্রতিষ্ঠানে ব্যাঙ্ক ও বীমা প্রতিষ্ঠানে বাঙ্গালী এরূপ ভাবে হটিত না। কলিকাতার বাঙ্গালীকে ত বাস্তহারা করিয়াছে এই অ-বাঙ্গালী রক্ত-শোষকদের দালালবর্গ। এখন সারা বাংলা দেশে সেই বিশ্বাসঘাতকতারই নিদর্শন দেখা যাইবে একই আকারে-প্রকারে। এই কো-অপারিটিভ সোসাইটির সদস্যবর্গ কাহারা এবং উহার গঠনকালে সরকারী তদারক চেষ্টা কি কিছুই ছিল না? অবশ্য "সরকার" বলিতে যে পদার্থ সমষ্টি বুঝায় তাহার ক্রিয়া-প্রক্রিয়াও অপরূপ হইয়া থাকে অনেক বিষয়ে। এই কো-অপারেটিভ গঠনের সময় সেইরূপ কোনও চক্রী-সমষ্টি হয়ত কাজ করিতেছিল এই সমাজ-বিরোধীদিগের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। যাহাই হউক এখন সরকারী উন্নয়ন দপ্তর কি করে তাহাই দ্রষ্টব্য।

পশ্চিম বাংলায় ত জাতীয় সরকার বলিতে কিছু নাই নহিলে এখানের মাটিতে যাহাদের পুরুষানুক্রমে জন্ম ও বসবাস তাহাদের স্বার্থ রক্ষায় ও তাহাদের সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ-সাধনে এরূপ অবহেলা সরকারী মহলের পক্ষে সম্ভব হইত না। অবশ্য ইহার জন্য দায়ী আমরাই। নির্ব্বাচনের সময় যদি আমরা এদেশের সন্তানগণের কল্যাণ সম্বন্ধে সজাগ এরূপ কয়েকজন কর্ম্মিংকর্ম্মা সজ্জনকে নির্ব্বাচিত করিতাম এবং তাহারা যে মূকবধির নহেন বা কোনও পার্টির আজ্ঞাবাধ্য নহেন তাহা দেখিতাম, তবে হয়ত পশ্চিম বাংলার বাঙালী এভাবে পথে বসিতে চলিত না।

কিন্তু শুধু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে অনুযোগ অভিযোগ করিয়াই বা কি হইবে? এই আয়কর-প্রবঞ্চক, ভেজাল-বিক্রেতা, মুনাফাবাজ বেইমানের দল ত এখন সারা ভারতকে নিজেদের কবলস্থ করিতেছে। যদিও এই মুনাফা-বাজী ও প্রতারণার আরম্ভ ও শক্তি-সামর্থ্যে প্রাবল্য হয় বাংলা বিহার আসাম ও উড়িষ্যায়—বিশেষ কলিকাতায়—এখন উহা ব্যাপক সর্ব্বগ্রাসীরূপে দেখা দিয়াছে সারা ভারতে। কেন্দ্রীয় সরকার এতদিন ত নানা অজুহাতে সে বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া—প্রতিকার ত দূরের কথা—উচিত মনে করেন নাই। এখন দেশের লোকজনের মানসিক চাঞ্চল্যের ফলে কয়েক ক্ষেত্রের নির্ব্বাচনে বিষম আঘাত পাওয়ায় সে দিকে নজর দেওয়ার একটা অভিনয় আরম্ভ করিয়াছেন। এই অভিনয়ে কালক্ষেপ হইবে বৎসরাধিক কাল এবং তার পর সক্রিয়ভাবে প্রতিকার করার তোড়জোড়ে আর এক বৎসর কাল অতিবাহিত হইলে, সাধারণ নির্ব্বাচনের মুখে

আমরা পৌছাইব। তখন দেশকে এই নিদারুণ অবস্থা হইতে উদ্ধারের প্রতিশ্রুতি দিয়া আরও পাঁচ বৎসরের "রামরাজত্বে"র ব্যবস্থা করা হইবে—যদি না দেশের লোক বাকিয়া বসে এবং দাবি করে যে এই মুনাফাবাজ শ্রেণীকে বিধ্বস্ত করার লিখিত প্রতিশ্রুতি যে না দিবে তাহাকে নির্ব্বাচনে দাঁড়াইতে দেওয়া হইবে না।

যাহাই হউক, নির্ব্বাচন এখনও দূরে। সম্প্রতি লোকসভায় অর্থমন্ত্রী আয়কর আদায়ের ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা হইবে এইরূপ ঘোষণা করিয়াছেন। তবে হাঙ্গর-কুমীর রাঘব-বোয়াল এই ব্যবস্থায় ঘায়েল হইবে না, সাধারণ চাকুরে বা উকীল, ডাক্তার, পুস্তক-বিক্রেতা ইত্যাদির উপর আরও কড়াকড়ি চলিবে তাহা বুঝা যাইবে কিছুদিন পরে।

অর্থমন্ত্রী ঐদিনই ১৬ই এপ্রিল লোকসভায় ঘোষণা করেন যে, ভারতে একচেটিয়া ব্যবসায় ও আর্থিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূতকরণ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার এক ছয়জন-বিশিষ্ট কমিশন নিয়োগ করিয়াছেন। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি শ্রীকে. সি. দাশগুপ্ত এই কমিশনের নেতৃত্ব করিবেন। ১৯৫২ সালের তদন্ত আইন অনুসারে এই কমিশন গঠিত হইয়াছে এবং ১৯৬৫ সালের ৩১শে অক্টোবরের মধ্যে তাঁহাদের রিপোর্ট দাখিল করিতে হইবে। বিচারপতি কে. সি. দাশ গুপ্ত ছাড়া অপর সদস্য হইবেন :—

(১) শ্রী জি, আর, রাজাগোপাল, বর্ত্তমানে আইন-মন্ত্রণালয়ে বিশেষ কর্ত্তব্যরত অফিসার ; (২) শ্রী কে, আর, পি, আয়েঙ্গার, বর্ত্তমানে শুল্ক কমিশনের সভাপতি ; (৩) শ্রী আর, সি, দত্ত, কোম্পানী আইন বোর্ডের সভাপতি ; (৪) ডঃ আই, জি, প্যাটেল, ভারত সরকারের প্রাক্তন প্রধান অর্থ নৈতিক উপদেষ্টা।

শ্রীদত্ত ও ডঃ প্যাটেল আংশিক সময়ের সদস্য থাকিবেন। কোম্পানী আইন বিভাগের বর্ত্তমান ডেপুটি সেক্রেটারী শ্রী ভি, সত্যমূর্ত্তি কমিশনের সেক্রেটারী হিসাবে কাজ করিবেন।

কমিশন নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলি সম্পর্কে তদন্ত করিবেন :—

(ক) বেসরকারী কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানবিশেষের হাতে অর্থ নৈতিক ক্ষমতা কতদূর কেন্দ্রীভূত হইয়াছে ও তাহার প্রতিক্রিয়া এবং কৃষি ভিন্ন অন্য বৈষয়িক তৎপরতায় গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলিতে একচেটিয়া অধিকার ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায়ের বিস্তৃতি সম্পর্কে তদন্ত এবং বিশেষভাবে—

(১) ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার এবং একচেটিয়া অধিকার ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায়ের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য কোন্ কোন্ ঘটনা দায়ী ;

(২) পূর্ব্বে বর্ণিত বিষয়গুলির সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক প্রতিক্রিয়া এবং তাহা সর্ব্বসাধারণের পক্ষে কতদূর ক্ষতিকর হইতে পারে, সে বিষয়ে তদন্ত।

(খ) এই তদন্তের ফলাফল কি প্রকার আইনগত ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইতে পারে তাহার সুপারিশ করা।

ইণ্ডিয়া গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় বলা হইয়াছে যে, ভারতীয় সংবিধানের ৩৯নং অনুচ্ছেদে যে রাষ্ট্রীয় নীতি নির্দ্দেশিত হইয়াছে তাহার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া গুরুত্বপূর্ণ আগামী কয়েক বৎসরে অর্থ নৈতিক উন্নয়ন অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যেই এই কমিশন গঠিত হইয়াছে।

সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিলে এই কমিশন যথাযথভাবে গঠিত হইয়াছে বলা যায়। কেননা বিচারপতি কে. সি. দাশগুপ্ত খ্যাতিমান ও বিচক্ষণ লোক এবং সদস্যবর্গ ও উচ্চপদস্থ প্রবীণ কর্ম্মচারী। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে দেখিলে বুঝা যাইবে যে, এই কমিশনের পক্ষে কার্য্যকরী হওয়া দুরূহ ব্যাপার। কারণ এই কমিশনে একজনও বেসরকারী বিশিষ্ট ব্যক্তি নাই, যাহার জনসাধারণের সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে এবং যিনি জনস্বার্থ-বিষয়ে সচেতন ও দুর্নীতির প্রভাব ও প্রতিকার সম্পর্কে জ্ঞানবুদ্ধি বিচারে সক্ষম।

বিচারপতি দাশগুপ্তের নিরপেক্ষতা ও বিচার-ক্ষমতা সম্পর্কে কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু এই কমিশনের সম্মুখে যাহা উপস্থিত করা হইবে তাহার বাহিরে কোনও বিষয় বা বস্তু তাহার বিচারের আয়ত্তাধীন হইবে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। অন্যদিকে যাহারা এই কমিশনের সদস্য বা সেক্রেটারী, তাঁহারা সকলেই বিভিন্ন কেন্দ্রীয় দপ্তরে উচ্চ অধিকারী। এবং ইহা সর্ব্বজনবিদিত যে, দেশের বর্ত্তমান প্রশাসন ও পরিচালন বিভাগের অধিকারীবর্গ জনসাধারণের সহিত সম্পূর্ণভাবে সংযোগ-বিচ্যুত এবং সেই কারণে দেশের প্রকৃত অবস্থা এবং দেশের লোকের উপর যে-সকল অনিষ্টকারী শক্তির প্রখর সংঘাত চলিতেছে সে-বিষয়ে তাঁহাদের জ্ঞান অতিশয় সীমাবদ্ধ। অন্যদিকে যাহাদের অনাচারে ও উৎপাতে দেশ জর্জ্জরিত তাহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে সরকারী প্রত্যেকটি দপ্তরের প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে এবং তাহারা এই তদন্ত বিফল করিতে কোনও চেষ্টা বাদ রাখিবে না। সুতরাং তদন্ত কতটা ব্যাপক ও সন্ধানী হইবে সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে। অবশ্য বাহিরের বিশিষ্ট জন-

সাধারণকে যদি সাক্ষ্য দিতে ডাকা হয় এবং যদি এই তদন্ত সম্পর্কে তথ্য প্রেরণ করার জন্য ব্যাপক আহ্বান জানানো হয় তবে এই অবস্থার কিছুটা প্রতিকার হইতে পারে।

এই তথাকথিত "জনকল্যাণকামী" রাষ্ট্রে বিত্তসম্পত্তি প্রতিপত্তি ও প্রভাব পাইয়াছে প্রধানতঃ তাহারাই, যাহারা এদেশের সকল অকল্যাণ ও অমঙ্গলের আকর। দেশের শাসনতন্ত্রের অধিকারীবর্গ ও তাঁহাদের আমলাতন্ত্র পাইয়াছেন বাকী যাহা কিছু—উচ্চ অধিকারীবর্গ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ-ভাবে ভেট, প্রণামী বা পুরস্কার হিসাবে। এবং ঐ অধিকারীবর্গ আর যাহাই হউক খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, যানবাহন বা অধিকারীভেদে অল্প-বিস্তর প্রমোদ ও বিলাসদ্রব্য যথা-যথভাবে পাইয়াছেন। কল্যাণের কোনও অভাব-অনটন বা অপ্রতুলতা ইঁহাদের অভিজ্ঞতায় নাই, সে কারণে সে-বিষয়ে চেতনার একান্ত অভাবই ইঁহাদের দেখা যায়। শ্রী টি. টি. কৃষ্ণমাচারী বিলক্ষণ চতুর লোক এবং এ বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান তাঁহার আছে। অন্ততঃপক্ষে এরূপ বিষয়ে বেসরকারী লোকের অভিজ্ঞতা যে এরূপ কমিশনের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয়, তাহা তিনি নিশ্চয়ই জানেন। কি ভাবিয়া ও কি বুঝিয়া তিনি এই কমিশনে এ প্রকার অসমীচীন সদস্য ব্যবস্থা করিলেন তাহা তিনিই জানেন।

আরও আশ্চর্য্য, এদেশের সকল দুঃখ-দুর্দ্দশা ও অকল্যাণের বোঝা যাহাদের বহিতে হয় সেই নিষ্পিষ্ট জনসাধারণের প্রতিনিধি এবং মুখপাত্ররূপে নয়াদিল্লীর সংসদে যাহারা বিরাজ করিতেছেন, তাঁহারাও এ বিষয়ে কোনও তীব্র প্রতিবাদ জানাইলেন না। এদেশের ভাগ্যে অকল্যাণ হইতে পরিত্রাণ সুদূরপরাহত!

সংখ্যালঘু সমস্যা

সতেরো বৎসর পূর্ব্বে ভারত বিভাগ করিয়া পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়। এই বিভাজন আমাদের এদেশের কোনও চিন্তাশীল স্বদেশপ্রেমিক চাহেন নাই। বরঞ্চ ইহাতে অনেকের মনেই একটা স্থায়ী ক্ষতচিহ্ন রাখিয়া দিয়াছে। কিন্তু যে ঘটনাপরম্পরায় ও যে অভাবনীয় পরিবেশে ইহা অবশ্যম্ভাবী হইয়া দাঁড়ায় তাহাও সুধীজনমাত্রেরই স্বীকৃত ঐতিহাসিক সত্য—যে সত্য কলমের খোঁচায় উড়াইয়া দেওয়া যায় না। সে সময় আমাদের নেতৃবর্গের সম্মুখে ছিল দুইটি মাত্র পথ। প্রথম পথে ছিল আরও দীর্ঘকালের জন্য ইংরেজের দাসত্ব ও মুস্লিম লীগের অশেষ অনাচার ও অত্যাচারযুক্ত প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া লইয়া ভারত বিভাগ রোধ করা এবং সেইসঙ্গে ছিল মিঃ জিন্নাও তাঁহার দলবলের কাছে এই পথে চলিবার অনুমতি-প্রাপ্তির সর্ত্ত। সেই পথে চলিতে গিয়া গান্ধীজী মিঃ জিন্নার কাছে কি ব্যবহার পাইয়াছিলেন তাহা যাহারা জানেন তাঁহারা বুঝেন এই দাসত্ব স্বীকার ও প্রভুত্ব স্বীকারের পথও মিঃ জিন্নার পাকিস্তান দাবিতে কিরূপ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। দ্বিতীয় পথ ছিল ভারত বিভাগ ও পাকিস্তান সৃষ্টি স্বীকার করিয়া ভারতের দাসত্ব-শৃঙ্খল মোচন করা। কোনও পথই বাঞ্ছনীয় ছিল না এবং কোন পথই সহজ বা সুবিধাজনক ছিল না এবং একমাত্র কম্যুনিষ্ট পার্টি এই দেশবিভাগকে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের পথ বলিয়া সমর্থন করে, অন্য কোন রাষ্ট্রনৈতিক দলই ইহাতে সহজে রাজী হয় নাই। কিন্তু গত্যন্তর ছিল না ইহাও সত্য।

রক্ত প্লাবনের মধ্যে পাকিস্তানের জন্ম। কলিকাতায়, নোয়াখালিতে ও বিহারশরীফে, রক্তের স্রোত বহে পাকিস্তানের জন্মের পূর্ব্বে। জন্মের পর পশ্চিম ও পূর্ব্ব পাঞ্জাবে, দিল্লীতে ও উত্তর প্রদেশে সমানে চলে সেই অমানুষিক খুন জখম ও ধ্বংসলীলা। ইতিহাসে সে সকলের ক্ষতচিহ্ন ত চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে।

তার পর সতেরো বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে এবং এই সতেরো বৎসর পাকিস্তানের সংখ্যালঘু দল, যাহাদের মধ্যে হিন্দু ছাড়াও বেশ কিছু সংখ্যায় খ্রীষ্টান ও বৌদ্ধ আছে, অশেষ অনাচার, অত্যাচার ও অপমান আশ্চর্য্য ধৈর্য্যের সহিত সহ্য করিয়া সেখানে থাকিয়া গিয়াছিল। অবশ্য এই সংখ্যালঘুদের প্রায় সকলেই আছে পূর্ব্ব পাকিস্তানে, পশ্চিম পাকিস্তানে আছে মুষ্টিমেয় খ্রীষ্টান এবং অনুন্নত ও অচ্ছুৎ হিন্দু। মাঝে মাঝে কিছু সংখ্যায় ঐ সংখ্যালঘুগণ ভিটামাটি ছাড়িয়া নিরাপত্তা-লাভের জন্য এ দেশে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে, কিন্তু এবারের মত ঐরূপ সংখ্যায় ও অবিশ্রাম ভাবে গত দশ-বারো বৎসরের মধ্যে আসে নাই। ইহার সোজা অর্থ এই যে, পাকিস্তান সরকারের তরফ হইতে যে পূর্ব্ব পরিকল্পিত নক্সা অনুযায়ী অত্যাচার অনাচার ও খুন জখম বলাৎকার এবার এই অসহায় সংখ্যালঘুদের অনিষ্ট সাধনের জন্য চালিত হইয়াছে তাহা মানুষের সহ্যশক্তির সকল সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে। এবং এবারের পাকিস্তানী অনিষ্ট-পরিকল্পনায় খ্রীষ্টান ও বৌদ্ধরাও বাদ যায় নাই। উপরন্তু পাকিস্তানী সরকারের সৈন্য ও পুলিস এবং আনসার নামের নরপশুর দল, পলায়মান স্ত্রীপুরুষ ও শিশুদের উপর অশেষ অত্যাচার করিতেছে। পূর্ব্ব পাকিস্তানের ভদ্র মুসলমানগণ

ক্ষমতাহীন, তাই তাঁহাদের প্রতিবাদ ও প্রতিকার চেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে।

এতদিন এই পাশবিক মনোবৃত্তি-চালিত কার্য্যক্রমের লক্ষ্য ছিল শুধু হিন্দু সংখ্যালঘু। এবার খ্রীষ্টান সংখ্যালঘু দলও ঐ অমানুষিক অত্যাচারের আওতায় আসায় বহির্জগতে তাহার সাড়া পৌঁছিয়াছে। তবে আমাদের কর্তৃপক্ষের কর্মশক্তি-হীনতার ফলে উহার প্রচার অতি অল্পই হইয়াছে। এদেশের কাগজে ও লোকমুখে উহার যে বিবরণ বাহির হইতেছে তাহার কোন কিছুই বিদেশে পৌঁছাইতেছে না। বিদেশে প্রচার যাহা কিছু হইয়াছে তাহার প্রায় সবকিছুই গিয়াছে বিদেশী খ্রীষ্টান মিশনারীদের তরফ হইতে। এবং সেই কারণে পাকিস্তানী সরকার এখন চেষ্টা করিতেছে যে, খ্রীষ্টান সংখ্যালঘুদের অন্ততঃ কিছু অংশকে ফিরাইয়া আনিতে, যাহাতে পাকিস্তান সরকার ও তাহার পোষকদ্বয় জগৎকে বলিতে পারে যে ভারত প্রলোভন দেখাইয়া যাহাদের লইয়া গিয়াছিল তাহারা দলে দলে ফিরিতেছে। এই উদ্দেশ্যে সরকারী অনুরোধে ঢাকার বিশপ ঐ খ্রীষ্টান বাস্তুহারাদের পূর্ব পাকিস্তানে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টায় অনুরোধ জানাইয়াছেন এবং ময়মনসিংহের পাকিস্তানী ডেপুটি কমিশনার ঐ অঞ্চলের পলায়মান আদিবাসী খ্রীষ্টানদের মধ্যে ছাপানো ইস্তাহার ছড়াইয়াছেন। ইস্তাহারে আছে অনুরোধ, ভারত সরকার যে জমি দিবার "লোভ দেখাইতেছেন" তাহাতে না ভুলিতে। সেই সঙ্গে বলা হইয়াছে যে, তাহাদের জমিজমা ও লুণ্ঠিত সম্পত্তি ফিরাইয়া দিবার ভার লইতেছে পাকিস্তান সরকার এবং ভবিষ্যতের জন্য সকল প্রকারের রক্ষণাবেক্ষণের প্রতিশ্রুতি দিতেছে। আদিবাসিগণ এই সকল অনুরোধ-উপরোধ অবজ্ঞার সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়াছে ও করিতেছে, কেননা তাহারা বুঝিতেছে এ সকল আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি ভুয়া।

এ সমস্যার সমাধান, পাকিস্তানের অসহায় সংখ্যালঘুদের এই মর্ম্মন্তুদ পরিস্থিতি হইতে উদ্ধার, কোন্ পথে হইতে পারে? যাহারা এদেশে আসিয়া পৌঁছাইতেছে তাহাদের সকল প্রকারে সাহায্য ও পুনর্ব্বাসন আমাদের করিতেই হইবে, এ কথা ত সর্ব্বজনস্বীকৃত ও ভারত সরকার প্রতিশ্রুত। কিন্তু যাহারা রহিয়া গিয়াছে বা আসিতে পারে না, তাহাদের কি উপায় হইবে? যে সকল ব্যবস্থার কথা বা যে সকল দাবি খবরের কাগজে ও জননেতা স্থানীয় লোকের মুখে প্রচারিত হইতেছে তাহার কোনটিতেও সম্পূর্ণ ও বিচারসহ কার্য্যপন্থা নাই। কেননা এ সমস্যার সমাধান হইতে পারে যদি পাকিস্তান সরকার প্রকৃত রূপে সহযোগিতা করে অথবা কোনও বহির্শক্তির প্রভাবে এই অবস্থার প্রতিকার করিতে বাধ্য হয়। সমাধান এই দুইটি পথই নির্ভর করে বহির্জগতের জনমতের চাপের উপর। উহার কোনটিই ভারত সরকারের আয়ত্তাধীন নয়, ইহা বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন লোকমাত্রেই স্বীকার করিবেন। সুতরাং এখন প্রয়োজন সুচিন্তিত কর্ম্মপন্থা যাহাতে আমাদের কার্য্যসিদ্ধিই হয়, পাকিস্তানের মিথ্যা প্রচারের সুযোগ না আসে। হিংসা বা প্রতিহিংসার পথে এই সমস্যার সমাধান নাই একথা উন্মাদ বা নির্ব্বোধ ভিন্ন সকলেই বুঝিবেন। কেননা সে পথের একমাত্র পরিণতি যুদ্ধযাত্রা—যাহা পাকিস্তান চাহিতেছে ও যাহা উহার বর্ত্তমান নায়ক চীনের একান্তই অভিপ্রেত। এবং আমরা যদি যুদ্ধযাত্রা করি তবে পাকিস্তানের আর দুই সমর্থক বিটিশ রক্ষণশীল দল ও মার্কিন সামরিক সংস্থা যে আমাদের সাহায্য করার পথে অশেষ বাধা সৃষ্টি করিবে, একথা কাহার জানা নাই? উপরন্তু যুদ্ধযাত্রা যদি আমরা করি তবে পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের উপর নারকীয় অত্যাচারের প্লাবন বহিয়া যাইবেই। তাহাদের উদ্ধার বা পরিত্রাণের সকল পথই রুদ্ধ হইবে—যেমন হইয়াছে জার্ম্মান ইহুদীদের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে।

এখন অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া লেখার বা বক্তৃতা দেওয়ার সময়, নহিলে সমস্যা জটিলতর হইবেই। "গরম" সম্পাদকীয় ও উত্তেজক বক্তৃতার ফলে পূর্ব্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের কোনও উপকার হওয়া সম্ভব নয়। বরঞ্চ ঐরূপ লেখা ও বলার ফলে যাহা ঘটিয়াছে তাহাতে উহাদের নিদারুণ ক্ষতিই সম্ভব।

ডাঃ অনাদিচরণ ভট্টাচার্য্য

লোকহিতব্রতী সুচিকিৎসক ডাঃ অনাদিচরণ ভট্টাচার্য্য বিগত ৭ই চৈত্র (২১শে জানুয়ারী) ১৩৭০ তারিখে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার মাত্র ৫৭ বৎসর বয়স হইয়াছিল। অনাদিচরণ কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। এম. বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার কিছুকাল পরে চক্ষু-চিকিৎসকরূপে কার্য্য আরম্ভ করেন। তিনি ১৯৩৮ সনে হুগলী জেলার কংগ্রেস নেতা ত্যাগ-বীর ডাঃ আশুতোষ দাসের সংস্পর্শে আসেন এবং তদবধি তাঁহার সেবাকেন্দ্র হরিপালে বিনা পারিশ্রমিকে স্বল্পবিত্ত ও নিঃসম্বল রোগীদের চক্ষু-চিকিৎসায় ব্রতী হন। ১৯৪১ সনে আশুতোষের মৃত্যু হইলে শ্রীযুক্ত রতনমণি চট্টোপাধ্যায়ের

উদ্যোগে এবং ডাঃ আশুতোষের অনুরক্ত কয়েকজন সহকর্মীর সহায়তায় 'আশুতোষ চক্ষু চিকিৎসা সমিতি' স্থাপিত হয়। এই সমিতি ডাঃ অনাদিচরণের অকুণ্ঠ সহযোগিতা লাভে ধন্য হইয়াছে। সমিতি প্রায় কুড়ি বৎসর ধরিয়া হাওড়া, হুগলী, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলায় রুগীদের ছানি কাটাইবার নিমিত্ত বহু সাময়িক চিকিৎসা-কেন্দ্র স্থাপন করেন। ডাঃ অনাদিচরণ একক চিকিৎসকরূপে দীর্ঘকাল এই সকল কেন্দ্রে রুগীদের বিনা দক্ষিণায় ছানি কাটিয়া দিয়া চক্ষুষ্মান করিয়াছেন। ইহা দ্বারা গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র অধিবাসীরা যে কতখানি উপকৃত হইয়াছেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এই ধরণের রোগীর সংখ্যা হইবে প্রায় চারি সহস্র। তাঁহাকে দূর দূর অঞ্চলে যাইতে হইত কিন্তু পাথেয় স্বরূপ কপর্দ্দকটি পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতেন না। তাঁহার কলিকাতাস্থ চিকিৎসাগারেও চক্ষুর বিবিধ রোগের চিকিৎসায় তিনি লিপ্ত ছিলেন ও বিভিন্ন শ্রেণীর বহু গরীব ও দুঃস্থ রোগীদের বিনা পয়সায় সার্থকভাবে চিকিৎসা করিয়াছেন। তাঁহার অমায়িক মধুর ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হইতেন এবং রুগীমাত্রেই বিশেষ ভরসা পাইতেন। ডাঃ অনাদিচরণ পণ্ডিতাগ্রগণ্য জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের অধঃস্তন অষ্টম পুরুষ। এইরূপ একজন সমাজ-সেবীর প্রয়াণে জনসাধারণ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা আত্মীয়-বিয়োগ ব্যথা অনুভব করিতেছি।

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীকরুণাকুমার নন্দী

ব্যক্তিগত সম্পদ, আয় ও আর্থিক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ

গত মাসে কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টে তাঁহার বাজেট বক্তৃতার উপলক্ষ্যে শ্রীকৃষ্ণমাচারী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনানুযায়ী দেশের আর্থিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে যে ব্যক্তিগত সম্পদ্ ও আয়ের ক্রমবর্দ্ধমান কেন্দ্রীকরণের লক্ষণ কিছুকাল হইতেই লক্ষ্য করা যাইতেছে এবং তাহার ফলে ব্যক্তিগত আর্থিক ক্ষমতার বর্দ্ধমান আয়তন সম্বন্ধে যথেষ্ট উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনানুযায়ী দেশের গত দশ-বারো বৎসরে যে জাতীয় আয় বৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে, তাহার একটা মোটা অংশ যে মাত্র গুটি কয়েক শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠী আত্মসাৎ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নাই। ইহার ফলে বেসরকারী আর্থিক উদ্যোগে (Private sector enterprise) ব্যক্তিগোষ্ঠীর অধীনে যে প্রভূত আর্থিক ক্ষমতা ক্রমেই অধিকতর পরিমাণে কেন্দ্রীভূত হইতেছে তাহা আশঙ্কার বিষয় সন্দেহ নাই। এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণমাচারী বলেন, "ব্যক্তিগত মালিকানায় তাহার নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে শিল্পপ্রসারের উপযুক্ত সুযোগ অবশ্যই করিয়া দিতে হইবে, কিন্তু যাহাতে ব্যক্তিগোষ্ঠীর হাতে অতিরিক্ত আর্থিক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ এবং তাহার ফলে প্রতিযোগিতাহীন উদ্যোগের সৃষ্টি না ঘটিতে পায় তাহারও কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। কি করিয়া শিল্পপ্রসারে এবং আর্থিক উন্নয়নে কোন প্রকার বিঘ্ন না ঘটাইয়া এই উদ্দেশ্য সাধন করা সম্ভব হইতে পারে তাহা গভীর বিবেচনার বিষয়। ভারত সরকার মনে করেন এই বিষয়ে কোন বিশেষ নীতি রচনা ও তাহার প্রয়োগ সুরু করিবার পূর্ব্বে একটি নিরপেক্ষ ও বাস্তবতানুসারী অনুসন্ধানের দ্বারা এ বিষয়ে সকল জ্ঞাতব্য তথ্য উদ্‌ঘাটন করিবার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে কমিশন অফ ইনকোয়ারিজ এ্যাক্ট অনুযায়ী গঠিত একটি অনুসন্ধান কমিশনের উপর এই বিষয়টির ভার অর্পণ করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।" সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি মাননীয় কে, সি, দাশগুপ্তের নেতৃত্বে এরূপ একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারী ঘোষণা করিয়াছেন।

ইতিমধ্যে অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের অধীনে জাতীয় আয় ও সম্পদ্ বণ্টন-বিষয়ক যে অনুসন্ধান চলিতেছিল তাহার ফলাফল সম্প্রতি সরকারের নিকট পেশ করা হইয়াছে। মহলানবীশ কমিটির মূল রিপোর্টটি এখনো আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। সংবাদপত্রে এই রিপোর্টের যে সারাংশ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে দেখা যায় যে, কমিটির মতে "প্রথম দুইটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রূপায়ণের ফলে জাতীয় আয় বণ্টনের ধারায়

কোন লক্ষ্যণীয় (Significant) পরিবর্তন এখন পর্যন্ত পরিলক্ষিত হইতেছে না। চাকুরিজীবীদের আয় মোটামুটি গড়পড়তা হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু কৃষিজীবীরা এই বৃদ্ধির কোন অংশ উপভোগ করেন নাই। এই প্রসঙ্গে কমিটি বলেন যে, ঠিকাদারগোষ্ঠীরা দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ আয়-বৃদ্ধির ভাগী হইয়াছেন এবং এই বৃদ্ধির পরিমাণ সাধারণ চাকুরিজীবীদের আয়বৃদ্ধির তুলনায় অনেক গুণ বেশী। এই তথ্য কমিটি আয়কর বিভাগের তথ্যাদি বিশ্লেষণের দ্বারা সংগ্রহ করিয়াছেন। শিল্প, ব্যবসা, পরিবহণ, লগ্নী ইত্যাদি ক্ষেত্রে স্বয়ংনিয়োজিত আয়-কারী গোষ্ঠী এবং চাকুরিজীবীদের আয়করের হিসাব হইতে দেখা যায় যে তাহাদের আয়বৃদ্ধি মোটামুটি দেশের চাকুরিজীবীদের গড়পড়তা আয়বৃদ্ধির অনুপাত রক্ষা করিয়াই বৃদ্ধি পাইয়াছে মাত্র।

"দেশের গ্রাম ও শহর উভয়বিধ অঞ্চলে সাধারণ লোক বর্তমানে পরিকল্পনানুযায়ী উন্নয়নের ফলে এখন ১৯৫০ সনের তুলনায় ভাল খাইতে-পরিতে পাইতেছেন এবং অপেক্ষাকৃত উন্নত মানের বাসগৃহে বাস করিতেছেন, এই সাধারণ ধারণার স্বপক্ষে মহলানবীশ কমিটি কোন যুক্তিযুক্ত প্রমাণ খুঁজিয়া পান নাই বলিয়াছেন। অথবা সাধারণ লোকের কর্মপরিবেশে কোন উন্নতি সাধিত হইয়াছে এমন কোন প্রমাণও পাওয়া যায় নাই। তবে এদেশে বিভিন্ন সামাজিক বা আর্থিক স্তরের অন্তবর্তী আয়-বৈষম্য অন্যান্য উন্নত বা অনুন্নত দেশের তুলনায় বেশী, এমন কথা বলা চলে না। অন্যান্য দেশের মতই এদেশেও শহরাঞ্চলে বিভিন্ন স্তরের আয়-বৈষম্য গ্রামাঞ্চলের তুলনায় প্রভূত পরিমাণেই বেশী। কমিটির হিসাব-মত এদেশে পারিবারিক, কোম্পানীসমূহের দ্বারা অধিকৃত (লিমিটেড ও অন্যান্য) রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার মিলিয়া মোট সম্পত্তির মূল্য ১৯৫০ সনে ছিল ১৭,০৮৮ কোটি টাকা; ১৯৬১ সনে ইহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়ায় ৩২,১৬৮ কোটি টাকায়।

"বিভিন্ন স্তরের আয়-কারীদিগের আয়ের পরিমাণ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া কমিটি বলেন, খনি এবং বৃহৎ শিল্পের কর্মীদিগের আয় বৃদ্ধির পরিমাণ দেশের গড়পড়তা মাথাপিছু আয়-বৃদ্ধির তুলনায় প্রথম দুই পরিকল্পনাকালে অনেকটা বেশী হইয়াছে; বিদ্যালয়ের শিক্ষকশ্রেণী এবং অধ্যাপকদিগের বেতনও অনুরূপ ভাবে গড়পড়তা হারের অধিক বৃদ্ধি পাইতেছে, অন্ততঃ দ্বিতীয় পরিকল্পনার সুরু পর্যন্ত তাহা হইয়াছে। তুলনায় পেশাদার আয়-কারীদের (Professional income-earners) আয় বৃদ্ধির পরিমাণ ১৯৫০ হইতে ১৯৫৯ পর্য্যন্ত অনেক কম ছিল। কমিটি বলেন যে, এই তুলনামূলক বিশ্লেষণের বাস্তবতা অনেকটা পরিমাণে বিভিন্ন পরিমাণের ট্যাক্স ফাঁকির কারণে বিঘ্নিত (vitiated) হইয়াছে—বিশেষ করিয়া বাঁধা বেতনের চাকুরিয়া এবং অনির্দিষ্ট আয়-কারীদের তুলনার ব্যাপারে।

কমিটির বিশ্লেষণ অনুযায়ী সাধারণ কৃষিজীবী কর্মীদের গড়পড়তা আয়ের বার্ষিক পরিমাণ ছিল মাত্র ৩০০৲ টাকা; তুলনায় শিল্পকর্মীরা অন্ততঃ বার্ষিক ৬০০৲ টাকা রোজগার করিয়াছেন। মাসিক ২০০৲ টাকা বা তন্নিম্ন বেতনের শিল্পকর্মীদের আয় প্রথম দুইটি পরিকল্পনা কালে শতকরা ৪৪৲ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঐ সময়ের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের বেতন শতকরা ২৭৲ টাকা, রেল কর্মচারীদের শতকরা ৩৭৲ টাকা এবং গ্রামাঞ্চলে কুশলী কর্মীদের (skilled workers) আয় শতকরা ২৩৲ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

"১৯৫০ সনে দেশের হিসাবযোগ্য মোট সম্পদের ৭১% ছিল ব্যক্তিগত বা পারিবারিক (households) অধিকারে, সমিতিবদ্ধ বে-সরকারী উদ্যোগসমূহের অধিকারে ১২% এবং সরকারী উদ্যোগের অধিকারে ১৭%। ১৯৬১ পর্য্যন্ত ইহার অনুপাত যথাক্রমে দাঁড়ায় ৬০%, ১৫% এবং ২৫%-এ।

"দেশের শহরাঞ্চলে জমির উপরে দখলের বিশ্লেষণ করিতে গিয়া কমিটি-আবিষ্কার করেন উচ্চতম অধিকার বিশিষ্ট ২০% পরিবারের অধিকারে শহরগুলির মোট জমির প্রায় ৯৩% কুক্ষিগত। ইঁহারাই শহরের প্রায় সমগ্র জমির কার্য্যকরী মালিকানা উপভোগ করিয়া থাকেন। অধিকতর বিশ্লেষণের ফলে দেখা যায় যে, ইঁহাদের মধ্যে উচ্চতম আয় বিশিষ্ট মাত্র ৫% পরিবার শহরের মোট জমির ৫২%-এর মালিক। গ্রামাঞ্চলে জমির মালিকানার সর্বোচ্চ কেন্দ্রীকরণ ঘটিয়াছে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে, শহরে অনুরূপ কেন্দ্রীকরণ বেশী ঘটিয়াছে দেশের পূর্বাঞ্চলে।

"কোম্পানীর শেয়ার, ব্যাঙ্কে গচ্ছিত অর্থ, অর্থকরী সম্পত্তি (commercial property) ইত্যাদির মালিকানার পরিমাণ নির্দেশ করিবার মত উপযুক্ত তথ্য কমিটি সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। কেবলমাত্র আয়কর বিভাগে রক্ষিত তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উচ্চতম আয়বিশিষ্ট আয়কর-দাতাদের মধ্যে ১০% ১৯৫৫-৫৬ সনে শেয়ারের ডিভিডেণ্ডের মোট ৫৫% আত্মসাৎ করিয়াছেন এবং নিম্নতম আয়বিশিষ্ট ১০% করদাতা এরূপ

আয়ের মাত্র ২% অংশ পাইয়াছেন। ১৯৫৯-৬০ সনে উচ্চতম ১০% করদাতার অংশ ৫৫% হইতে ৫২%-এ নামিয়া যায় এবং নিম্নতম আয়বিশিষ্ট ১০% করদাতাদের অংশ খুব সামান্যই বৃদ্ধি পাইয়া ২১/২%-এ উঠে। দেশের সমগ্র জনসংখ্যার মাত্র ১% আয়করের আওতায় পড়ে। অতএব ডিভিডেণ্ড হইতে রোজগারের হিসাব ধরিতে হইলে দেশের জনসংখ্যার মাত্র শতকরা একজনের এক দশমাংশ দেশের এই বিশিষ্ট ক্ষেত্রের মোট সম্পদের অর্দ্ধেকেরও বেশীর উপরে মালিকানা উপভোগ করিয়া থাকেন। ইহা হইতেই স্বতঃই প্রমাণ হয় যে, শিল্প বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহের উপরে ব্যক্তিগত মালিকানা জমির মালিকানা বা বাড়ীর মালিকানার তুলনায় অনেক বেশী কেন্দ্রীভূত। উপরোক্ত হিসাব কেবল আয়কর তথ্যের উপরে নির্ভর করিয়া ধার্য্য করা হইয়াছে। আয়কর ফাঁকির পরিমাণের উপরে এই মালিকানার কেন্দ্রীভূতি (concentration) আরও আনুপাতিক পরিমাণে ঘনতর হইবে।"

মহলানবীশ কমিটির সিদ্ধান্তের উপরোদ্ধৃত কেবল মাত্র শেষ অংশটি লইয়া শ্রীকৃষ্ণমাচারীর বাজেট বক্তৃতার যে অংশটুকুতে আয়, সম্পদ ও আর্থিক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের উল্লেখ করা হইয়াছে, প্রথমে তাহারই বিচার করা যাউক। শ্রীকৃষ্ণমাচারী তাঁহার বাজেট বক্তৃতার ১৯নং অনুচ্ছেদে বলিতেছেন :—

"......সাধারণ লোকের ধারণা যে বেসরকারী উদ্যোগে পরিচালিত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির মালিকানা কেবল মাত্র মুষ্টিমেয় সংখ্যক লোকের কুক্ষিগত। এই ধারণা মাত্র আংশিক সত্য। আমাদের মতন দরিদ্র দেশে জনসংখ্যার একটা বৃহৎ অংশ অবশ্যই দেশের শিল্প, বাণিজ্য, ব্যাঙ্ক ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হইতে পারেন না। ইহাও সত্য যে যত বড় ধনী, তাহার বিভিন্ন উদ্যোগের অংশের পরিমাণও আনুপাতিক পরিমাণে বৃহৎ হইবে। তবুও একথাও হৃদয়ঙ্গম করা দরকার যে, দেশের বৃহত্তর শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি মালিকানার দিক দিয়া অনেকটা পরিমাণেই সাধারণের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য, যাঁহারা এসকল প্রতিষ্ঠান আদিতে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বলিয়া এইগুলি তাঁহাদের নামের সহিত আজিও যুক্ত আছে, তাঁহাদের মালিকানার অংশ সাধারণতঃ আজ অপেক্ষাকৃত সামান্যই মাত্র।......তাহা ছাড়া অপেক্ষাকৃত সামান্য অবস্থার লোকদেরও আজিকালিকার দিনে শেয়ার লগ্নীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে।"

মহলানবীশ কমিটির হিসাব অনুযায়ী দেশের জনসংখ্যার ১%-এর মাত্র এক-দশমাংশ সংখ্যক লোক বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত সকল শিল্প, বাণিজ্য ও ব্যাঙ্কিং ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের ৫২% অংশের মালিক। অর্থাৎ দেশের ৪৪ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে মাত্র ৪,৫০,০০০ লোক দেশের সমগ্র বেসরকারী উদ্যোগের অর্দ্ধেকেরও বেশি মালিকানা অধিকার করিয়া আছেন। মহলানবীশ কমিটির হিসাব অনুযায়ী ১৯৬১ সনে দেশের হিসাবাধীন মোট সম্পত্তির মূল্য ছিল ৩২.১৬৪ কোটি টাকা এবং ইহার ১৫% বেসরকারী উদ্যোগের অধীন ছিল, অর্থাৎ ইহাদের অধীনস্থ সম্পত্তির মোট মূল্য ছিল ৪,৮২৫ কোটি টাকার অধিক। অর্থাৎ সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের মিলিত মোট ১০,২৯৩ কোটি টাকা মূল্যের সম্পত্তির প্রায় এক-চতুর্থাংশ এই অপেক্ষাকৃত মুষ্টিমেয় সংখ্যক লোকের হাতে ন্যস্ত আছে। এই কেন্দ্রীকরণের ফলে যে আর্থিক ক্ষমতা ইহারা কুক্ষিগত করিয়া রাখিয়াছেন এবং তাহার ফলে দেশের আর্থিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইহারা যে প্রচণ্ড প্রভাব প্রয়োগ করিতে সমর্থ হইতেছেন, তাহার ফলে আর্থিক উদ্যোগের ক্ষেত্রে যে প্রতিযোগিতাহীন এবং ব্যক্তিস্বার্থে অপ্রতিহত সংগঠনের সৃষ্টি (growth of monopolies) অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিবে ইহাতে আর সন্দেহ কি? এই সন্দেহ যে অর্থমন্ত্রীর নিজের মনেও নাই তাহা তাঁহার বক্তৃতার মধ্যেই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। মাননীয় বিচারপতি কে সি দাশগুপ্তের নেতৃত্বে তিনি এক্ষণে যে অনুসন্ধান কমিশন গঠন করিয়াছেন আশা করা যায় এ বিষয়ে তাঁহারা বিশদতর তথ্য উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হইবেন এবং তাহার ফলে বেসরকারী উদ্যোগে পরিচালিত শিল্পবাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে এই প্রকারের উত্তরোত্তর ক্ষমতা ও প্রভাব বৃদ্ধি খর্ব করিবার কার্য্যকরী উপায় উদ্ভাবিত হইবে।

একথা ক্রমেই অধিকতর স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে যে এই প্রকারের আর্থিক কেন্দ্রীভূতির ফলেই দেশের সামগ্রিক আর্থিক উন্নয়নের ধারা এখন পর্য্যন্ত সাধারণ্যে উপযুক্ত ভাবে প্রসারিত হইতে পারিতেছে না। বস্তুতঃ কোন কোন ক্ষেত্রে যদিও আর্থিক উন্নয়নের অনেকটা সুফল বিশিষ্ট স্তরের কর্মীর মধ্যে খানিকটা পরিমাণে প্রসারিত হইয়াছে বলিয়া দেখা যাইতেছে, তবু ইহা যে দেশের সমগ্র জীবনকে প্রায় একেবারেই স্পর্শ করে নাই তাহাও খুবই স্পষ্ট। দেশের শতকরা ৭৩ জন লোক এখনো প্রধানতঃ কৃষিজীবী, পরিকল্পনানুসারী দেশের এ পর্য্যন্ত আর্থিক উন্নয়ন যে

কৃষিজীবীর জীবনে কোন প্রকারের উন্নয়ন সাধন করিতে সমর্থ হয় নাই তাহা মহলানবীশ কমিটির রিপোর্টে খুবই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। শিল্পক্ষেত্রে কর্মীদিগের আয়ে যে অগ্রগতি লক্ষ্য করা যাইতেছে, কৃষিক্ষেত্রে তাহা যে প্রসারিত হয় নাই তাহা কৃষিজীবীর অপেক্ষাকৃত সামান্য আয়ের অঙ্কে—ইহা শিল্পকর্মীর অর্দ্ধাংশেরও কম বলিয়া মহলানবীশ কমিটি বলিতেছেন—প্রমাণিত হইতেছে। কৃষিজীবীর অবস্থার যে আশু প্রতিকারের কোন সম্ভাবনা নাই একথা বলাও বাহুল্য। প্রথম এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার অন্তর্বর্তী কালে কৃষি উৎপাদনে বেশ খানিকটা অগ্রগতি লক্ষ্য করা গিয়াছিল। এই সময়ের মধ্যে দেশের মোট কৃষিজ উৎপাদন ৪৬% বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া দাবি করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ কৃষি উৎপাদনে যে বর্তমানে উৎপাদক আয়োজন সৃষ্টি হইয়াছে তাহা সমধিক পরিমাণে প্রসার লাভ না করিলে হয়ত উৎপাদনের পরিমাণ আর সবিশেষ বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনাও নাই। সেচ, সার-সরবরাহ ইত্যাদির যে আয়োজন বর্তমানে চালু আছে তাহাতে কৃষি উৎপাদন এদেশে এখনও প্রধানতঃ প্রকৃতির আনুকূল্যেরই উপরে নির্ভর করিতেছে। তাই তৃতীয় পরিকল্পনার খসড়ায় যদিও মোট ৯৬% কৃষি-উৎপাদন এবং বিশেষ করিয়া ৪০% খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা সন্নিবেশিত হইয়াছিল, বস্তুতঃ তাহার কিছুই বাস্তবে সিদ্ধ হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণমাচারীর বাজেট বক্তৃতার অন্তর্ভুক্ত হিসাব অনুযায়ী ১৯৬১-৬২ সনে, অর্থাৎ তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ মাত্র ১.২% বৃদ্ধি পায় কিন্তু পর বৎসরই ইহার পরিমাণ আবার ৩.৩% কমিয়া যায়। বস্তুতঃ প্রাক্তন কৃষি ও খাদ্য মন্ত্রী শ্রী এস কে পাতিল খুব স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন যে, পরিকল্পনার খসড়ায় যাহাই ধরিয়া লওয়া হইয়া থাকুক না কেন, আগামী দশ বৎসরের মধ্যে দেশে কৃষিজ উৎপাদনে, বিশেষ করিয়া খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা সাধন একেবারেই অসম্ভব।

যাহাই হউক, দেশে আর্থিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইবার পথ রুদ্ধ করিবার কার্য্যকরী আয়োজন রচনা করিবার যে প্রতিশ্রুতি শ্রীকৃষ্ণমাচারী তাঁহার বাজেট-বক্তৃতা প্রসঙ্গে দেশবাসীকে দিয়াছেন তাহা কতদুর নির্ভরযোগ্য তাহা বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন। কৃষ্ণমাচারী বলিতেছেন যে উন্নয়নের পথ রোধ না করিয়া অর্থ-বৈষম্য দূর করিতে হইবে, আর্থিক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ বন্ধ করিতে হইবে। এই কাজে উপযুক্ত প্রয়োগবিধি রচনা করিবার পূর্বে তিনি নির্ভরযোগ্য তথ্য উদ্ঘাটন করিবার প্রয়াসে অনুসন্ধান কমিশন নিয়োগ করিয়াছেন। ভাল কথা, সন্দেহ নাই। তিনি আরও বলিতেছেন যে, ইতিমধ্যে নানাবিধ কার্য্যকরী আর্থিক (fiscal) প্রয়োগের দ্বারা এই উদ্দেশ্য যতটা পারা যায় সাধন করিতে হইবে। এই বিষয়ে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে অর্থমন্ত্রী প্রথমেই বলিয়া রাখিয়াছেন যে উন্নয়নের ধারা কোনপ্রকারে অবরুদ্ধ না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এই উন্নয়নপ্রবাহ অব্যাহত রাখিবার মানসে তিনি বর্তমান বাজেটে বেসরকারী উদ্যোগ-সমূহের কতকগুলি ক্ষেত্রে যে পরিমাণ ট্যাক্স মকুব করিবার আয়োজন করিয়াছেন তাহার পরিণতি কি হইবে সে সম্বন্ধে খানিকটা অনুমান করিতে পারা অসম্ভব হওয়া বা কষ্ট হইবার কথা নহে। কৃষ্ণমাচারী পূর্বেই তাঁহার বাজেট বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, আর্থিক ক্ষমতা ও অর্থ বৈষম্যের মূলে আছে বেসরকারী উদ্যোগের ব্যক্তিগত মালিকানার ধারা ততটা নয়, যতটা এই সকল উদ্যোগের উপরে পরিচালক-গোষ্ঠীর অপ্রতিহত নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা। ইহাকে উপযুক্ত পরিমাণে খর্ব করিতে পারা আর্থিক ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণ রোধ করিবার পথে যে প্রথম পদক্ষেপ তাহাও কৃষ্ণমাচারী স্বয়ংই বলিয়াছিলেন। তথাপি এইভাবে ইহাদের অধীনস্থ কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট উদ্যোগকে প্রভূত ট্যাক্স হইতে অব্যাহতি পাইবার যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহার ফলে যে অধিকতর কেন্দ্রীকরণ অবশ্যম্ভাবী হইবে না সে ভরসা স্বয়ং কৃষ্ণমাচারী নিজেও দিতে পারিবেন না। অবশ্য যদি এই ট্যাক্সের অব্যাহতির ফলে শিল্পবাণিজ্যে লগ্নীর পরিমাণ আনুপাতিক বৃদ্ধি পায় তবে এই আয়োজন অবশ্যই সার্থক হইয়াছে বলিয়া মানিতেই হইবে। কিন্তু বেসরকারী উদ্যোগের কর্মকর্তাদিগের অতীত ব্যবহারের ইতিহাসে এরূপ ভরসা করিবার কোন কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না।

অন্যপক্ষে এই আয়োজনের অন্য একটি সম্ভাব্য কুফল সম্বন্ধে অবহিত হইবার প্রয়োজন আছে। এই ভাবে শিল্পপতিদের হাতে যে প্রভূত পরিমাণ অতিরিক্ত অর্থ বর্তাইবে তাহার কিছুটা অংশ যে অন্ততঃ মূল্যমানের উপরে আনুপাতিক চাপ সৃষ্টি করিতে পারে সে আশঙ্কা সম্বন্ধে অবহিত হইবার প্রয়োজন আছে। শ্রীকৃষ্ণমাচারী মূল্য বৃদ্ধি রোধ প্রসঙ্গে বাজেট বক্তৃতায় নিয়ন্ত্রণ অপেক্ষা উপযুক্ত আর্থিক (fiscal) আয়োজন প্রয়োগ করিবার কার্য্যকারিতা বেশী হইবে বলিয়া বলিয়াছেন। বাজেটের বিভিন্ন প্রস্তাবে এই আর্থিক প্রয়োগের কোন কার্য্যকরী আয়োজন আমরা আবিষ্কার করিতে সমর্থ হই নাই।

সরকারী হিসাব অনুযায়ী বর্তমান পরিকল্পনা প্রয়োগের প্রথম তিন বৎসরে পাইকারী দরের পরিসংখ্যান মোট ৮% বৃদ্ধি পাইয়াছিল বলিয়া দেখান হইয়াছে। অর্থমন্ত্রীর মতে এই অপেক্ষাকৃত সামান্য মূল্যবৃদ্ধিতে উৎকণ্ঠিত হইবার কোন কারণ নাই। কিন্তু ১৯৬৩ সনের মার্চ হইতে ১৯৬৪ সনের জানুয়ারী পর্য্যন্ত এই সাধারণ মূল্য পরিসংখ্যান যে ৭.২% বৃদ্ধি পাইয়াছে দেখা যাইতেছে তাহাতে উৎকণ্ঠিত হইবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। উৎকণ্ঠার কারণ যে ঘটিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সকলের চাইতে বেশী উৎকণ্ঠার কারণ আরও দুইটি; প্রথমত এই মূল্যবৃদ্ধির ধারা এখনও অব্যাহত রহিয়াছে এবং বাজেট পেশ হইবার পর হইতে এখনও পর্য্যন্ত মূল্যস্থিরতা প্রতিষ্ঠিত হইবার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। দ্বিতীয়ত এবং এইটাই আরও অধিকতর আশঙ্কার কারণ বলিয়া মনে হয়—এই মূল্যবৃদ্ধির ধারায় পাইকারী ও খুচরা মূল্যমানের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান বৈষম্য। এই বৈষম্যটি আরও বেশী করিয়া প্রকট হইয়া উঠিয়াছে খাদ্য ও অন্যান্য অবশ্যভোগ্য পণ্যের ক্ষেত্রে। এই ধারাটিকে রোধ করিতে না পারিলে সরকারী হিসাবের বাহিরে দেশে যে বিরাট পুঁজির ক্ষেত্র সর্বদাই তৎপর রহিয়াছে এবং ইহার অস্তিত্ব ও প্রকোপ স্বয়ং অর্থমন্ত্রী নিজেও বারংবার স্বীকার করিয়াছেন—তাহাতে সাধারণের সামান্য আর্থিক সঙ্গতির উপরে অনিবার্য্য অপঘাত ঘটাইয়া অর্থ বৈষম্যকে আরও বেশী করিয়া তুলিবে।

এই বিষয়ে কার্যকরী প্রয়োগের পরিকল্পনার বাজেটে সম্পূর্ণ অভাব বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। অর্থমন্ত্রী স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে তাঁহার পূর্ববর্তী অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই তাঁহার রাজত্বকালে উন্নয়ন ও শেষের দিকে প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে বাধ্য হইয়াই পরোক্ষ শুল্ক ধার্য করিয়া রাজস্বের প্রয়োজন মিটাইয়াছেন এবং তাহার ফলে মূল্যমানের উপরে অতিরিক্ত চাপ বর্তাইয়াছে। একথা স্বীকার করিলে সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মানিয়া লওয়া প্রয়োজন যে মূল্যবৃদ্ধি নিরোধকল্পে কৃষ্ণমাচারী যে সকল আর্থিক প্রয়োগের কথা বলিয়াছেন তাহার জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন দেশের শুল্ক সংস্থার (Taxation structure) একটা আমূল সংশোধন এবং পরিবর্তন। ১৯৬৩-৬৪ সনের বাজেট পর্যন্ত কেন্দ্রীয় রাজস্বের শতকরা ৭৪·৬% পরোক্ষ শুল্কের দ্বারা আদায় করা হইয়াছে। ইহার মধ্যেও বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে এই মোট পরোক্ষ শুল্কের দ্বারা আদায়ী রাজস্বের অর্ধেকের বেশীই কতকগুলি অবশ্য ভোগ্য এবং অন্যান্য ভোগ্য পণ্যের উপরে আবগারী শুল্ক ধার্য করিয়া আদায় করা হইয়া থাকে। রাজস্ব বিজ্ঞানের প্রথম পাঠই এই যে জন-কল্যাণে ভোগ সঙ্কোচ করিবার প্রয়োজন ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে ভোগ্য পণ্যের উপরে আবগারী শুল্ক ধার্য করা বিজ্ঞানানুমোদিত রাজস্ব নীতি নহে। যথা মদ্য জাতীয় পণ্যের উপরে কঠিন পরিমাণ আবগারী শুল্ক ধার্য করা সুনীতি কেন না এভাবে এই বিশেষ পণ্যটির ভোগের পরিমাণ যতটা সঙ্কোচ করা যায় ততটাই সমাজ কল্যাণসূচক। কিন্তু খাদ্য পণ্যের উপরে কিম্বা অনুরূপ অবশ্য ভোগ্য পণ্যের উপরে এইরূপ আবগারী শুল্ক ধার্য করিলে তাহা অনিবার্য ভাবে অনুপাতের অধিক চাপ ঐ সকল পণ্যের মূল্যমানের উপরে সৃষ্টি করিয়া থাকে পরোক্ষ ভাবে এই ধরণের পরোক্ষ শুল্কের বিষময় ফলের কথা কৃষ্ণমাচারী তাঁহার বাজেট বক্তৃতায় স্বীকার করিয়াছেন বটে কিন্তু ইহার সংশোধনের কোনই আয়োজন তিনি করেন নাই। বরং যে সামান্য অতিরিক্ত রাজস্বের বরাদ্দ তিনি তাঁহার বর্তমান বাজেটে করিয়াছেন তাহারও মোটামুটি ৬৩·৬% অংশ পরোক্ষ শুল্কের দ্বারা আদায় করিবার আয়োজন করিয়াছেন। ইহার ফল যা অবশ্যম্ভাবী তা অচিরেই ঘটিতে সুরু করিয়াছে। বাজেট পেশ হইবার পর হইতে সকল প্রকার অবশ্য ভোগ্য পণ্যের মূল্য দ্রুত করিয়া আরো বৃদ্ধি পাইতে সুরু করিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রিত মূল্য হইতে গড়পড়তা ৮% হইতে ১০% বৃদ্ধি ইতিমধ্যেই বৃদ্ধি পাইয়াছে। সরকার ভরসা দিতেছেন বটে যে তাঁহারা সাংঘাতিক কিছু একটা করিবেনই কিন্তু রেশন দোকানে রেজিষ্ট্রিকৃত কার্ডওয়ালাদের বরাদ্দ চাউলের অতি সামান্য অংশমাত্র সরবরাহ করা হইতেছে ফলে বাজার দর উত্তোরোত্তর চড়িয়াই চলিয়াছে।

এ সকলই অর্থ বৈষম্য বৃদ্ধি ও আর্থিক ক্ষমতা অধিকতর কেন্দ্রীভূত করিয়া চলিয়াছে। ইহা রোধ করিবার ক্ষমতা বা হয়ত ইচ্ছাও সরকারী কর্মকর্তাদের নাই। না থাকাই স্বাভাবিক। এই আর্থিক ক্ষমতাসম্পন্ন গোষ্ঠীর অর্থানুকূল্যেই বারংবার কংগ্রেস দল শাসন ক্ষমতা পুনরাধিকার করিতে সমর্থ হইতেছে। ভবিষ্যতেও যে ইহাদের অর্থানুকূল্য না হইলে দেশের বর্তমান শাসনকর্তারা শাসনদণ্ডটি আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে সমর্থ হইবেন না সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতএব নিজেদের স্বার্থেই ইঁহারা এ বিষয়ে যে সকল আয়োজন সুফল প্রসব করিতে পারিত তাহা এড়াইয়া চলিয়াছেন।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক পটভূমিকা

শ্রীশ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম বছর থেকে যথার্থ ভাবে আরম্ভ হয় ধরা যেতে পারে। ঐ সালে বাঙালীর নিজের হাতে লেখা গদ্য রচনার সাহিত্যিক প্রকাশ ত হয়ই, পদ্য রচনাতেও কবিওয়ালাদের প্রাধান্য এই সময়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে মঙ্গলকাব্য নিশ্চিতভাবে লুপ্তির পথে, এমন কথা বলা চলে। বাংলা কাব্যে এই সময় যুগান্তরের লক্ষণগুলি রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবুর রচনায় বেশ ফুটে উঠেছিল। গদ্যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত ও মুন্সীদের কথা অবশ্য স্মরণীয়। কোন একটি মানুষকে আধুনিক সাহিত্যের একমাত্র প্রবর্তক বলা কোন মতেই সঙ্গত হবে না। বাঙালীর চিন্তা-জগতে রামমোহনের অসামান্য দান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলে তাঁকে আধুনিকতার প্রবর্তক বলা যেতে পারে কিন্তু বাংলা গদ্য সাহিত্যের জনক আখ্যা দেওয়া অসম্ভব, সমগ্রভাবে বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের স্রষ্টা বলাও ঠিক নয়। আসলে ঐ সময়ে বিপুল বিশ্বে যে এক বিরাট্ আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল তার তরঙ্গাভিঘাতে এদেশের সাহিত্যেও যে আলোড়ন সঞ্চারিত হয়েছিল, রামমোহন তার এক প্রবল প্রকাশ কিন্তু একমাত্র বা প্রথম বা প্রধান প্রকাশ নন।

১৭৭৪ সালে (মতান্তরে ১৭৭২ সালে) যখন রামমোহনের জন্ম, তখন, অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে বাঙালী জাতি তথা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এক নব যুগ শুরু হয়। সে-সময়ে সারা পৃথিবীতে এক অভিনব আন্দোলন দেখা গেছে যার সঙ্গে মধ্যযুগের অবসানে দেখা-দেওয়া নব-জাগরণ বা রেনেসাঁস আন্দোলনের তুলনা চলে কিন্তু যা বহির্বিশ্বে কিংবা বঙ্গদেশে রেনেসাঁস (রেনেসাঁ নয়) আখ্যায় ভূষিত হবার যোগ্য নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে যে নবীন চৈতন্য সমস্ত সভ্য জগতে এক অদ্ভুত উদ্দীপনার সঞ্চার করে তার বঙ্গদেশীয় প্রকাশকে ভুল ক'রে রেনেসাঁস ব'লে চালাবার যে চেষ্টা করা হয়, তা অযৌক্তিক। ঐ নব-চেতনাকে বিশ্বের সর্বত্র যে ভাবে বর্ণনা করা হয়, আমাদের দেশেও তাকে সে-ভাবে দেখা উচিত। কারণ, এ-ব্যাপারে বাংলা দেশে বিশ্বের সঙ্গে যোগ অব্যাহত রেখেই মানসিক অগ্রগতি সুসম্পন্ন হয়েছিল।

বিশ্বজনীন এই আলোড়ন দু'টি প্রবল রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের রূপ ধ'রে আত্মপ্রকাশ করে: আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ (১৭৭৬) এবং ফরাসী বিপ্লব (১৭৮৯)। দু'টি উপপ্লবই প্রকৃতপক্ষে এক নব বৈপ্লবিক চেতনার দুমুখী-দ্বিক্ষেত্রিক প্রকাশ। দু'টি বিরাট্ ব্যক্তিত্বকে অবলম্বন ক'রে জগতে এই নব-শক্তি আত্মপ্রকাশ করে: ওআশিংটন আর নাপোলেঅন। এই শক্তির বিভিন্ন প্রতিনিধি এক সময়েই বিভিন্ন দেশে আবির্ভূত হন। বাংলা দেশের চিন্তা-জগতে, মুখ্যতঃ সাংবাদিকতা, ধর্ম, সমাজ ও শিক্ষা-সংস্কারের ক্ষেত্রে, কিন্তু সাহিত্য জগতে মোটেই নয়, এই শক্তির প্রথম প্রধান বিকাশ হ'ল রামমোহনের ব্যক্তিত্বে। বাংলা কাব্যে ঐ শক্তির দুঃসাহসিক অভিব্যক্তি আরও আগে একাধিক কবির রচনায় দেখা গেছে আঠারোর শতকেই। বাংলা গদ্যেও আধুনিকতার সূত্রপাত হয়েছে কেরি সাহেব এবং তাঁর মুন্সী ও পণ্ডিতদের রচনায় রামমোহনের আগেই।

এ কথা অস্বীকার করার কোন কারণ নেই যে, চিন্তা-জগতের নেতৃত্ব তখন ছিল রামমোহনের আয়ত্তে। তাঁর সময় থেকে বাংলা দেশ সভ্য জগতের প্রগতি-প্রবাহের সঙ্গে সর্বপ্রথম সংযুক্ত হ'ল। যে বাঙালীর "ঘর হইতে আঙিনা বিদেশ" ছিল, সে প্রথম সাত সাগরের পারে পাড়ি জমিয়ে ঐ নব-শক্তির উদ্দাম প্রবাহের সঙ্গে নিজের সংস্কৃতি স্রোতটি যুক্ত ক'রে দিল। উল্লিখিত নব-চেতনা এমন এক সুষমা ও সমৃদ্ধিময় বৈচিত্র্যবহুল সাংস্কৃতিক সৃষ্টিসম্ভার রচনা করে, সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসে যার কোন

তুলনা নেই। উৎকর্ষের দিক্ থেকে রেনেসাঁস-যুগের শিল্পসৃষ্টির সঙ্গে এর তুলনা করা গেলেও বৈচিত্র্যের দিক্ দিয়ে এর দান নিশ্চয় অতুলনীয়।

ব্যাপ্তির দিক্ থেকে এই অভ্যুত্থান চতুর্দশ-ষোড়শ শতকের নব-জাগরণের চেয়ে মহত্তর। কারণ, এই অভ্যুত্থান মুষ্টিমেয় ধনী ও অভিজাতকে স্পর্শ করেই ক্ষান্ত না হয়ে সমগ্র মধ্যবিত্ত সমাজকে আলোড়িত ও অভ্যুদিত করে এবং দরিদ্র সমাজকেও স্পর্শ করে। এই অভ্যুত্থানের জন্মদাত্রী যে-শক্তি, সে দীর্ঘকাল মানব-মর্মে নিহিত থেকে প্রকাশোপযোগী অবকাশের অপেক্ষায় ছিল। অকস্মাৎ আমেরিকা ও ফ্রান্সের রাষ্ট্রীয় বিপ্লবে, ওঅশিংটন আর নাপোলেঅনের ব্যক্তিত্বে এই শক্তি প্রচণ্ড বিক্ষোভে নিজেকে প্রকাশ করল। সমস্ত ইন্দো-ইউরোপীয় জগৎ এই চেতনায় বিশেষ ভাবে দুলে উঠল অনেক দিনের ঘুম ভেঙে আপন স্বরূপ নতুন আলোয় চিনবার চেষ্টায়। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই চেতনার অভিব্যক্তির নাম দেওয়া হ'ল রোমান্টিক অভ্যুত্থান (Romantic Revival)। বাংলা দেশের বাইরে বহির্বিশ্বে এর প্রথম অভ্যুদয় মাত্র অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। বাংলাদেশে এর তরঙ্গ মাত্র এক শতাব্দীর মধ্যেই উল্লেখযোগ্যভাবে আসতে পেরেছিল।

রোমান্টিক আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিরা দেশে দেশে অচিরে পূর্ণ মহিমায় উদিত হন। ইংল্যাণ্ডে ওআর্ডস ওআর্থ, ফ্রান্সে ভিক্তর য়্যুগো, জর্মনীতে গ্যেটে, রুশে তলস্তয় এই অভ্যুদয়ের শ্রেষ্ঠ বিকাশ। বাংলা দেশে রোমান্টিক চেতনার শ্রেষ্ঠ বিকাশ রবীন্দ্রনাথ। তিনি পৃথিবীতে এই অভ্যুদয়ের যে-সব শিল্পী আত্মপ্রকাশ করেছেন, তাঁদের শ্রেষ্ঠজন বললে অত্যুক্তি হবে না।

রোমান্টিক চেতনাকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রথম আত্মপ্রকাশ করতে দেখা যায়, আমেরিকার নতুন স্বাধীনতাকামী ঔপনিবেশিকবৃন্দ আর ফরাসী মনীষিগণের দাবি, আশা ও চিন্তাধারায়। স্বাধীনতার দাবি, সব মানুষের সমান অধিকার, মৈত্রী প্রতিষ্ঠা ও সর্বজনীন সমৃদ্ধিলাভের আশা এবং কুসংস্কার ও সমষ্টিগত মূঢ়তা বিনাশের প্রয়াস নিয়ে যে-সব রচনা প্রকাশিত হ'ল, সেগুলির দ্বারা মার্কিন ও ফরাসী বিপ্লবের বাণীমূর্তি নির্মিত হয়েছিল। নাপোলেঅন ঐ বাণীর শক্তিকে প্রথম সুদৃঢ় বাস্তব রূপ দেন তাঁর রাজ্য শাসন-বিধির সাহায্যে। তাঁর সমকালীনদের শত কুৎসাপ্রচার সত্ত্বেও তিনি জগতের নমস্য। মেটারনিক-প্রমুখ প্রতিক্রিয়াশীলেরা প্রায় তেত্রিশ বছর ইউরোপে এই আন্দোলনকে ঠেকিয়ে রেখেছিলেন ; কিন্তু তাঁদের ব্যর্থতা বরণ করতে হয়। রামমোহন বাংলা জাতির ভাবজগতে ও সমাজজীবনে কিছু পরিমাণে বিপ্লবাত্মক ভাবধারার অনুশীলন করলেও সংস্কৃতির কোন ক্ষেত্রে নাপোলেঅনের মত দুঃসাহস তাঁর ছিল না, বরং ব্যক্তিগত জীবনযাপনের ত্রুটিচ্যুতির জন্যে তিনি তাঁর নিজের দেশে ও সমাজে প্রায় বিস্মৃত ও পরিত্যক্ত হন যার জন্যে রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি আক্ষেপ করেছেন। রামমোহনের পর বিদ্যাসাগরের জীবন আলোচনা করলে দেখা যায় যে, বিদ্যাসাগরের মহৎ জীবন-যাপন-পদ্ধতির মধ্যে ঐ ধরণের কোন বিচ্যুতি ছিল না যার জন্যে মানুষ হিসেবে তিনি অনেক বেশি শ্রদ্ধার্হ। সমাজ-জীবনে আর শিক্ষা-সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে বৈপ্লবিক চিন্তাধারার প্রসারকর্মে বিদ্যাসাগর শুধু রামমোহনের উত্তরসাধক নন, মহত্তর সাধক। সমসাময়িক বামনদের তুচ্ছ ক'রে তাঁর শীর্ষদেশ আজ খ্যাতির গগনস্পর্শী, মহিমার কিরীটভূষিত, যশের রবিকরোজ্জ্বল। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মত প্রতিক্রিয়াশীলেরা বাধা দিলেও রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের জয়লাভ বাংলা দেশের আবহাওয়ায় ঐ আন্দোলনের প্রভাব বিস্তৃত হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

কিন্তু বহির্বিশ্বে রোমান্টিক অভ্যুত্থান ও ফরাসী বিপ্লবের বাণী দিকে দিকে প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হলেও এ দেশে তার অগ্রগতি কিছুদিনের মধ্যে ব্যাহত হয়। ইউরোপে মেটারনিকের বাধা চূর্ণ ক'রে নবশক্তি নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। রামমোহন প্রতিক্রিয়াশীল রাজতন্ত্রের বিরোধী ছিলেন। তিনি যে লুই ফিলিপকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন, অচিরে তাঁর পতন হলেও দেশে দেশে প্রজাপুঞ্জের হাতে ক্রমশ কর্তৃত্ব ছড়িয়ে যেতে থাকে আর সাধারণ লোকের অন্তর্নিহিত সুপ্ত-প্রতিভার উন্মেষও বেড়ে যায় অনেক পরিমাণে। ইউরোপে ক্রমশ ইতালী ও জর্মনীর উদয় হবার পর বাংলা দেশেও তাদের প্রভাব ব্যাপ্ত হয়।

রামমোহন-বিদ্যাসাগরের পর বাংলা দেশের সাংস্কৃতিক জগতে উল্লেখযোগ্য প্রভাব মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব। দুজনেরই রোমান্টিক ব্যক্তিত্ব এবং প্রভাব সুদূরপ্রসারী। ইংরেজী শাসন ও শিক্ষার গুণে দেশে তখন শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত, সাধারণের চিত্তপ্রকর্ষের ব্যবস্থা ক্রমবর্ধমান। ছাপাখানার দৌলতে এদেশের পাঠক প্রথম হাতে প্রচুর সংখ্যক বই পড়ার সুযোগ পেল। ইংরেজী ভাষার কল্যাণে বহু ভাষা ও সাহিত্য, জ্ঞানবিজ্ঞান শিল্পকলার দ্বার তার কাছে উন্মুক্ত হ'ল। মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজ প্রথম লাভ করল সামাজিক নিরাপত্তা, পূর্বের তুলনায় শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্ত পেট ভ'রে খেতে পেল যা ভারতচন্দ্রের মত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সাহিত্যিকেরও কল্পনার অতীত ছিল। ইংরেজী ভাষার কাছে ত বটেই, ইংরেজ শাসনের কাছেও আমাদের যে-ঋণ, তা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা উচিত বিশেষত হিন্দু মন সহজে মনোভাব প্রকাশের তথা সাংস্কৃতিক অনুশীলনের যে সুযোগ ১৭৭৩ সাল থেকে লাভ করল তা আগেকার নবাবী আমলে অকল্পনীয় ছিল। এদেশে ইংরেজী শাসন ১৭৭৩-৯৩ সালের মধ্যে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত না হলে বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগ তথা মধু-বঙ্কিমের যুগল রোমান্টিক ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব কখনও সম্ভবপর হ'ত না। কিন্তু বাঙালী নির্বোধের মত অল্পকালের মধ্যেই সে-কথা ভুলে গিয়ে সংস্কৃতি, ধর্ম ও সমাজের দিক্ থেকে ইংরেজ শাসনের পূর্ব যুগে ফিরে যেতে চাইল। এতবড় ভ্রান্তি কোন জাতির জীবনে খুব কম ঘটে। ইংরেজের সঙ্গে অকালে রাজনৈতিক সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হওয়া বাঙালী হিন্দুর পক্ষে গুরুতর ক্ষতির কারণ হয়। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, ইংরেজ শাসনের প্রথম যুগে বাঙালী মুসলমান এই ভুল ক'রে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার দান থেকে নিজেকে বঞ্চিত রেখে বিশেষ ভাবে পশ্চাৎপদ ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরবর্তীকালে বাঙালী মুসলমান কখনও ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংগ্রামে ব্রতী হয় নি। সেই ভ্রান্তির পরিণামে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে বাংলার বাঙালী হিন্দুর প্রায় সমস্ত গৌরব এক রকম বিধ্বস্ত হয়েছে। মধু-বঙ্কিমের যুগে তাঁরা যে-শিক্ষা বাঙালীকে দিয়েছিলেন তার মর্ম অনুধাবন না ক'রে আকস্মিক পশ্চাদ্‌গতির জন্যেই রোমান্টিক আন্দোলনের ভাবধারা এদেশের চিত্তজগতে সম্পূর্ণ সক্রিয় হতে পারে নি।

ইংরেজ শাসন যে এ-দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এ-অনুভূতি ১৭৯৩ সালে বাঙালীদের মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা তথা ফরাসী বিপ্লব ও রোমান্টিক আন্দোলনসঞ্জাত চিন্তারাশি রামমোহন—বিদ্যাসাগর—মধুসূদন—বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি যুগনায়ক-চিন্তানায়ক মনীষী লেখকদের আবির্ভাব সম্ভব করে, অন্যদিকে তেমনি প্রতিক্রিয়াশীলতার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় কয়েকজন যুক্তিবিচারবির্জিত খ্যাতনামা প্রভাবশালী লেখক ও প্রচারকের চেষ্টায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এই দুই প্রবণতার মধ্যে প্রবল সংঘর্ষ আরম্ভ হয়। একই লেখকের মধ্যে পরস্পরবিরোধী এই দুই ভাবধারার প্রকাশ এক সময়ে দেখা গেছে। বাঙালী মিশ্র জাতি ব'লে এটা আরও বেশি সম্ভবপর হয়েছিল। রামমোহনের মত প্রবল যুক্তিবাদী লেখক খুব কম দেখা যায় যা পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার প্রবল এবং সকল প্রভাবের নিদর্শন। কিন্তু তিনি যে ভাবে নাস্তিক আর পশুর পর্যা-পরম্পরা কল্পনা করে গেছেন, উদারপন্থী বৈদান্তিক আর ঔপনিষদিক সর্বাস্তিকবাদী হিন্দুমতের সঙ্গে পরমত-অসহিষ্ণু ইসলামী ধর্মাদর্শের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন, এক দিকে সতীদাহ প্রথার বিরোধিতার মত প্রগত মনোভাবের পরিচয় দিয়ে অন্যদিকে ব্যক্তিগত জীবনে একাধিক বিবাহ এককালে অনুষ্ঠিত রেখেছেন তাতে ঐ পরস্পরবিরোধী ভাবধারার অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত রচনা পড়লে অনায়াসে দেখা যায় যে, ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত তিনি প্রজাপুঞ্জের কল্যাণ-সাধনের ব্যাপারে রোমান্টিক আন্দোলনের বাণীমূর্তি; কিন্তু তিনিই আবার বিধবা-বিবাহ পছন্দ করতেন না। অবশ্য সব জড়িয়ে রামমোহন—বিদ্যাসাগর—মধুসূদন—বঙ্কিমচন্দ্র—জগদীশচন্দ্র—রবীন্দ্রনাথ—বিবেকানন্দ—দ্বিজেন্দ্রলাল—বিনয়কুমার—মানবেন্দ্রনাথ—সুভাষচন্দ্র, এঁদের প্রভাব প্রগতির পথে জাতিকে নিয়ে গেছে। অন্য দিকে ভূদেব মুখোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতির দ্বারা প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারা জাতিকে

বিপথে টেনে এনেছে চিত্তমুক্তির উজ্জ্বল সূর্যালোকে তার স্নানশুদ্ধি সম্পন্ন হবার আগেই।

প্রতিক্রিয়াশীলেরা একদিন যেমন ডিরোজিও-র বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনে তাঁকে অন্যায় ভাবে অপসারণের ব্যবস্থা করে, তেমনি রামমোহন—বিদ্যাসাগর—মধুসূদন প্রভৃতির প্রত্যেকটি অভিনব প্রচেষ্টায় বাধা দেওয়া হয় এবং ১৮৫৮-১৯০৫ সালে প্রগতিশীলদের প্রভাবশালিতা মোটামুটি অক্ষুণ্ণ থাকলেও ১৯০৫ সাল থেকে প্রতিক্রিয়াশীলেরা প্রাধান্য বিস্তারে সমর্থ হয়। রোমান্টিক ভাবধারা সাহিত্যে অব্যাহত প্রকাশ-সৌভাগ্য অক্ষুণ্ণ রাখতে পারলেও, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শ্রীঅরবিন্দ-সুভাষচন্দ্র, এঁদের মত অগ্নিসাধকদের সাধনার কথা বাদ দিলে অত্যন্ত আপত্তিকর এক প্রতিক্রিয়াশীল আত্মঘাতী মনোভাব এমন ভাবে বিস্তৃত হয় যা জীবনের সব ক্ষেত্রে বাঙালীর অগ্রগতি রুদ্ধ ক'রে ফেলে।

১৮৫৭ সালের সিপাহী-বিদ্রোহে বাঙালী যোগ না দিয়ে অত্যন্ত শুভবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিল ব'লেই ১৮৫৮-১৯০৫ সালে তার চিত্ত, চেতনা ও কর্মক্ষেত্রের প্রসার সম্ভব হয়েছিল। এ-বিষয়ে আচার্য সুকুমার সেন যুক্তি-সম্মতভাবে লিখেছেন: "এখনকার দিনে অবাঙালী রাজনৈতিক মহলে এ-কথাটা খুব চালু হইতেছে যে, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙালীর 'জাতীয়'-জাগরণ, তাহার স্বাধীনতাস্পৃহা কিছু নয়, এবং সিপাহী-বিদ্রোহে যে বাঙালী যোগ দেয় নাই সেটা তাহার অক্ষয় কলঙ্ক। এ-কথার মধ্যে কোন যুক্তি নাই।······ শিক্ষিত বাঙালী সিপাহিবিদ্রোহে খুব উল্লসিত হয় নাই। তাহার কারণ এই যে, সিপাহীবিদ্রোহের একটা বীজ ছিল সমাজ-সংস্কার-বিমুখতা। ইংরেজ বিধবাবিবাহ আইন পাস করিয়াছে, সে ভারতীয়দের ইংরাজি শিখাইয়া বিদেশী-ভাবাপন্ন করিতেছে, সে ভারতীয়দের জাতিপাঁতিতেও হাত দিতে উদ্যোগ করিয়াছে—এই ধারণাই সিপাহীদের ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছিল। সিপাহীদের জয়লাভ মানেই আবার জীর্ণ মোগল-শাসনের দিনে প্রত্যাবর্তন এবং অর্ধ-শতাব্দীব্যাপী সব কিছু প্রগতির প্রত্যাখ্যান। শিক্ষিত বাঙালীর কাছে এ-চিন্তা ছিল অসহ।" (বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড)। স্বয়ং সুভাষচন্দ্র সিপাহীবিদ্রোহকে স্বাধীনতাসংগ্রাম ব'লে ভুল করেছিলেন; পরবর্তী কালে ঐতিহাসিক-শ্রেষ্ঠরা একবাক্যে আচার্য সুকুমার সেন মহাশয়ের মতবাদ সমর্থন করেছেন, সুভাষচন্দ্রের মত ভুল প্রমাণিত হয়েছে। সিপাহীবিদ্রোহ ছিল একটি চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলন। তাতে যোগ না দিয়ে বাঙালী যে সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিল, ঠিক সেই পরিমাণ দুর্বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিল বিংশ শতাব্দীর প্রথমে নিজের ঘর না সামলিয়েই ইংরেজের সঙ্গে অসহযোগিতা আরম্ভ ক'রে।

দীর্ঘকালের কুসংস্কার, অশিক্ষা আর জড়তার জন্যে বাংলা দেশের এক বিপুল জনাংশের মনের মাটিই এমন যে, সেখানে ভালর বীজেও কালোর ফসল ফলে। বিবেকানন্দের মত বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী অবিরাম কর্মশীলতা আর প্রচারের সাহায্যেও এদেশে রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রকৃত সুস্থ মনোভাব গ'ড়ে তুলতে পারেন নি। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-অরবিন্দ তিন জনের শিক্ষার প্রকৃত মর্ম গ্রহণ না ক'রে এক ধরণের কর্তাভজা মনোভাবকেই বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয় ঐ মহামানবদের উপলক্ষ ক'রে, যা নিশ্চয় তাঁদেরও কাম্য ছিল না। বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠার পর সেবাকার্যের প্রভূত ব্যবস্থা আর সমাজ ও আধ্যাত্মিকতা প্রসঙ্গে আধুনিক মতামত-সমূহ প্রচার ক'রে দেশের দারিদ্র্য ও অস্পৃশ্যতা দূর করার চেষ্টা করেন। কিন্তু ঐ সৎ কাজগুলি সত্ত্বেও দেশের কুসংস্কারাচ্ছন্ন পরিবেশের জন্যে লোকে রামকৃষ্ণের সৎ উপদেশাবলী আর বিবেকানন্দের শ্রমসাধ্য কর্মসমূহের বিবরণের চেয়ে তাঁদের সম্বন্ধে প্রচারিত অলৌকিক কাহিনী ও কিংবদন্তীসমূহের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়। ইংরেজি শিক্ষা ও আধুনিকতার প্রভাবে কদাচার আর কুসংস্কারগুলো দূর হতে দেখে যে-সব অতিপ্রাকৃত-বিশ্বাসী সাধুবাবা-ভক্ত যুক্তিবাদ-বীতশ্রদ্ধ বিজ্ঞান-বিরোধী ব্যক্তি নিতান্ত অসুবিধা বোধ করছিলেন, তাঁরা রামকৃষ্ণ সারদামণি এবং শ্রীঅরবিন্দ-শ্রীমাকে পেয়ে তাঁদের অন্ধতার অবলম্বনে পরিণত করলেন। বাঙালী হিন্দু মুসলমানের সঙ্গে বোঝাপড়া করার আগেই ইংরেজের

বিরুদ্ধে বিপ্লবে ব্রতী হয়ে যে-গুরুতর প্রমাদ ঘটিয়ে বসল, তার সঙ্গে অচিরে যুক্ত হ'ল ভূদেবচন্দ্র-কেশবচন্দ্র-গিরিশচন্দ্র ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রভৃতির যুক্তিবিচারবিরোধী রক্ষণশীল মননশীলতা। ১৯০৫ সালের তথাকথিত স্বদেশী আন্দোলনে দেশের জনসাধারণের দুঃখ দূর হ'ল না; তাদের চিত্ত-প্রকর্ষ বা বৈষয়িক স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির পরিবর্তে জনকয়েক ভারতীয় শিল্পপতির উদর স্ফীত হওয়া ছাড়া আজ পর্যন্ত তথাকথিত দেশপ্রেমাত্মক আন্দোলনগুলিতে কোন সৎ কাজ হয় নি। ভুল বুঝতে পেরে রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল স্বদেশী আন্দোলন থেকে স'রে দাঁড়ান। দ্বিজেন্দ্রলাল বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনও সমর্থন করতেন না। তাঁরা যে ঠিক বুঝেছিলেন, আজ দূরত্বের পরিপ্রেক্ষিতে সে-কথা আমরা বুঝতে পারছি। রামমোহন—বিদ্যাসাগর—মধুসূদন—বঙ্কিমচন্দ্র—জগদীশ-চন্দ্র—রবীন্দ্রনাথ—দ্বিজেন্দ্রলাল, এঁরা আধুনিক বাঙালীর নবজীবনের যুগস্রষ্টা মহাপুরুষ বলা যায়। এঁদের মধ্যে মধু—বঙ্কিম—রবীন্দ্র—দ্বিজেন্দ্র,—চারজন প্রতিভাশালী সাহিত্যিকই রোমান্টিক ভাবধারার মূর্ত বিকাশ। এই সব ব্যক্তিত্বশালী মনীষী কেউই প্রাচীন নির্বিচার বিশ্বাস-প্রবণতার পুনঃ প্রতিষ্ঠাকে সুনজরে দেখতেন না। রামমোহন আজীবন হিন্দুধর্মের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন। বিদ্যাসাগর ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিরোধিতা পেয়েছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কেশবচন্দ্রের বিরোধিতা সহ্য করতে হয়। কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথের প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ রামকৃষ্ণকে বাড়াতে থাকেন। তা সত্ত্বেও ১৯৩৬ সালের আগে রামকৃষ্ণ-জন্মশতবার্ষিকীর পূর্ব পর্যন্ত রামকৃষ্ণ-ভক্ত সম্প্রদায়ের খুব বেশি সুবিধা হয়নি। রবীন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বিশেষত রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রায় নীরব; তাঁর প্রথম বয়সে তিনি কেশবচন্দ্রের বিরোধিতা ও রামকৃষ্ণের সম্বন্ধে অবজ্ঞা প্রকাশ করেছিলেন। বিদ্যাসাগর-মধু—বঙ্কিম—কারও উক্তিতে বা রচনায় রামকৃষ্ণ-ভক্তির লেশমাত্র নেই। সমস্ত উনিশ শতকে রামকৃষ্ণ প্রায় সম্পূর্ণ অবজ্ঞাত। তাঁকে মিশনারিসুলভ উদ্দেশ্য ও কর্মতৎপরতার সঙ্গে বিংশ শতকে বাড়িয়ে তোলা হয়, যা আদৌ স্বাস্থ্যকর মনোভাবের অনুকূল হয় নি। শ্রীঅরবিন্দের দিব্যজীবন-দর্শন নিয়েও একটা অলৌকিক আবহাওয়া রচনার চেষ্টা হয় এবং তাঁর শিক্ষার ভাল যা কিছু, তা সরিয়ে রেখে অতিপ্রাকৃত বিশ্বাসের ওপর জোর দেওয়া শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম কর্তৃপক্ষের কারও কারও উদ্যোগে চলতে থাকে। শ্রীমা-কৃত ভবিষ্যদ্বাণী (ভারত ও পাকিস্তানের রাজনৈতিক একীকরণ ১৯৫৭ সালে) হয়ত অনেকের স্মরণ আছে। এই মনোভাবকে বিদ্রূপ ক'রে দিলীপকুমার লিখেছিলেন :—

"যে-ধরণের বিশ্বাসকে আঁকড়ে তোমরা অনেক সময়ে আশ্রমে থাক, সে-ধরণের বিশ্বাস বহু চেষ্টা ক'রেও আমি আয়ত্ত করেও পারিনি আজ পর্যন্ত। ক্ষীণা দেবীকে তোমার মনে আছে? তাঁর এক কাকা ছিলেন সে-সময়ে রাওলাপিণ্ডির জর্জ। ভাইঝির শরীর খারাপ দেখে তাকে যেই তিনি তাঁর ওখানে চেঞ্জে যেতে অনুরোধ করলেন, সেই ক্ষীণা দেবী—বলিষ্ঠ সুরে জবাব দিলেন—গুরুদেবের কাছে যারা এসেছে তারা মারা যেতেই পারে না। আশা করি যারা গিয়ে তাঁর মত পরিবর্তন হয়েছে।" (ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া—১৯৪৭)

ভক্তিপ্রাণ জনসাধারণের কাছ থেকে অর্থসংগ্রহের সুবিধার জন্যে এদেশের অলিগলিতে নকুড় ঠাকুর ও বিরিঞ্চি বাবাদের পুজার সুব্যবস্থা বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে আরও বেড়েছে। এমন ব্যাপার অল্পশিক্ষিত লোকদের মধ্যে সর্বত্র থাকলেও সুশিক্ষিত পণ্ডিতদের মধ্যে দেখতে পাওয়া দুর্ভাগ্যের বিষয়। রোমান্টিক অভ্যুত্থানের জন্মস্থান পশ্চিম ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাজ্যের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা আজ ব্যক্তিবিশেষকে সেন্ট পল বা সেন্ট ফ্রান্সিসের মর্যাদা দিয়ে পূজা করছেন, এ-কথা ভাবা যায় না। কিন্তু এদেশে তা ত হ'লই, উপরন্তু গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রভৃতির হাতে এক জঘন্য অপকৃষ্ট সাহিত্য গ'ড়ে উঠল যা আবর্জনা ব্যতীত আর কিছু নয়। পৌরাণিক নাটকে সত্যনিষ্ঠ বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গির প্রবর্তন ক'রে দ্বিজেন্দ্রলাল যে অগ্রগতি এনেছিলেন, ঐ দুই নাট্যকার তা নষ্ট ক'রে ফেলেন। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই ভাবে অনধিকারী রসস্রষ্টার স্থূল হস্তাবলেপ চলতে থাকে। উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের মত অসাধারণ রোমান্টিক প্রতিভার আবির্ভাবের পরও

এদেশে এমন মূঢ় সাহিত্য-সমালোচকের সাক্ষাৎকার পাওয়া যায় যে উপন্যাসে বাস্তবানুগামিতার চিটে গুড়ের সুখ্যাতি করে। সে-রকম সাহিত্য-সমালোচকের রচনা মুরুব্বির জোরে বিশ্ববিদ্যালয়-স্তরে পাঠ্য নির্দিষ্ট হয়ে ছাত্রদের বিভ্রান্তির কারণ হচ্ছে। অথচ উপন্যাসে বঙ্কিম-প্রদর্শিত পথটিই বাংলা উপন্যাসের প্রকৃত ধারা-নির্দেশ করে। সেই পথেই রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, দিলীপকুমার, মণীন্দ্রলাল, শরদিন্দু, প্রমথনাথ, বুদ্ধদেব প্রভৃতি নিপুণ রোমাণ্টিক ঔপন্যাসিকদের আবির্ভাব। রোমাণ্টিকতা-বিরোধী কোন উপাদান দিয়ে প্রকৃত সাহিত্যসৃষ্টি অসম্ভব; ধর্ম বা বাস্তব বোধের দোহাই দিয়ে রসসৃষ্টি করা যায় না, যেমন যায় না রাজনৈতিক মতবাদ বা প্রতিক্রিয়াশীল স্বাদেশিকতার গোঁড়ামি দিয়ে।

আচার্য সুকুমার সেন মহাশয়ের অভিমতে, "সাহিত্য-সৃষ্টির মূল প্রকৃতিই রোমাণ্টিক।" সুতরাং রোমাণ্টিক ভাবান্দোলনের অভিঘাতে বাঙালীর চিত্ত-সমুদ্রে যে তরঙ্গমালা রচিত হয়েছিল, অকালে রাজনৈতিক স্বার্থবুদ্ধি ও বাস্তববোধের স্থূল দৃষ্টির বালুকাবেলায় তাকে প্রহত ও শুষ্ক হ'তে দেওয়া বাঙালীর পক্ষে আত্মঘাতের সামিল হয়েছিল। বিশেষত বাঙালী হিন্দুর পক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র-প্রদর্শিত পথ পরিত্যাগ করা রাজনীতি ও সাহিত্য, দুই ক্ষেত্রেই ক্ষতিকারক হয়। হিন্দুর অতীত গৌরব স্মরণ করা এবং বর্তমান স্বার্থ সংরক্ষণ করা তার কাছে সাম্প্রদায়িকতা ও উপহাসের বিষয় ব'লে গণ্য হয় রাজনীতি-ক্ষেত্রে; রোমাণ্টিক কল্পনাবিলাস ও স্বপ্নময়তার পরিবর্তে যৌন কেলেঙ্কারি ও ধর্মাচারের বীভৎস সংমিশ্রণকে বাস্তবতার গালভরা আখ্যা দিতে তার কুণ্ঠা হয় নি ব'লেই বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এমন সব বহু-পঠিত গ্রন্থের অভ্যুদয় দেখা গেছে উপন্যাসের বাজারে, যাদের সঙ্গে পরিচয় থাকাও সুরুচিসম্পন্ন ভদ্রলোকের পক্ষে লজ্জার কথা। রাজনৈতিক উপন্যাসের নামে কি রকম আবর্জনা রচিত হতে পারে তারও নিদর্শনের অভাব নেই। রাজনৈতিক দলের তকমার জোরে সে-সব বইএর লেখকদের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক বিধানসভা বা কলাকেন্দ্রের সদস্য হতে কোন বাধা হয় না। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ আর শরৎচন্দ্রের পথের দাবি-র মত উপন্যাস সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথ আপত্তি তুলেছিলেন; বর্তমান কালের সাহিত্য-সম্রাট্ পদাভিলাষীদের উপন্যাস পড়লে তিনি নিজের সাহিত্যবোধ পুনর্বিবেচনা করতেন কি না, কে জানে।

প্রতিক্রিয়াশীলতার শক্তি ১৯০৫ সালের পর থেকে ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চয় ক'রে রবীন্দ্রনাথ ও বিভূতিভূষণের মৃত্যুর পর এখন বিশেষ প্রবল হয়েছে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত সময়ের মধ্যেই এ-দেশে ইংরেজি শিক্ষার মান ক্রমাগত নেমে গেছে, স্বদেশিয়ানার নামে উদার ও প্রগত মনোভাব ক্রমশ প্রতিহত হয়েছে। বাংলা দেশ দ্বিখণ্ডিত হবার পর রাজনীতিক্ষেত্রে যে বাঙালীর স্থান নিম্নাভিমুখ তার জন্যে দুঃখ করা নিরর্থক। কারণ, হাজার চেষ্টা করলেও ভারতীয় গঠনতন্ত্রের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ কোনদিনই খুব উচ্চ মর্যাদা অর্জন করতে পারবে না। কিন্তু তার সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ এবং আত্মমর্যাদাবোধ নষ্ট হবে কেন?

রামমোহনের সময় থেকে সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের সময় পর্যন্ত দেড় শতাব্দী কাল বাঙালীর চিত্ত-প্রকর্ষের পক্ষে গৌরবের যুগ এবং এ-সময় জীবনের সব ক্ষেত্রে রোমাণ্টিক উদ্দীপনার প্রাধান্য দেখা যায়। নেতাজীর বিস্ময়কর কার্যকলাপও রোমাণ্টিক ভাবোদ্দীপ্ত দুঃসাহসিক অভিযান ছাড়া আর কিছু নয়। এখন ঐ ভাবধারার দীপশিখা জ্বালিয়ে রাখার মত ব্যক্তিত্ব এদেশে চোখে পড়ছে না। যে উনিশ শতকীয় রোমাণ্টিক ভাবুকতার বশবর্তী হয়ে বহুজন-হিতায় মার্কিন প্রেসিডেণ্ট কেনেডি আত্মদান করলেন, ফরাসী প্রেসিডেণ্ট দে গোল সারা জগতের কূটনীতি-ক্ষেত্রে বিস্ময়ের চমক আনলেন প্রখর ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়ে, আইরিশ প্রধানমন্ত্রী ডি ভ্যালেরা ব্রিটিশ কমনওএলথের বাইরে গিয়েও ক্ষুদ্র জন্মভূমিকে মাথাপিছু সর্বাধিক খাদ্যের অধিকারী করলেন সমগ্র বিশ্বে, সে-ভাবোদ্দীপ্ত কর্মময়তা আর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ এ-দেশে প্রায় লুপ্ত। যদিও দুই বিপরীতমুখী ধারার মধ্যে এখনও সংগ্রাম চলেছে, তবু ১৯৪৭-৬৪ সালের মধ্যে ভারতে তথা পশ্চিমবঙ্গে তথা বাঙালী হিন্দু সমাজে ফরাসী বিপ্লব ও

রোমান্টিক আন্দোলন-উদ্ভূত ভাবধারা অতি ক্ষীণপ্রাণ হয়ে এসেছে যার পরিণামে একটা অধোমুখ অবক্ষয় পূর্ণমাত্রায় দেখা যাচ্ছে, অনেকটা ভারতচন্দ্রের সময়কার কৃষ্ণনগরের সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনের মত।

রোমান্টিক ও প্রতিক্রিয়াশীল, দুই শক্তির মধ্যে সংগ্রামের সুযোগে এদেশে তৃতীয় এক ভাবধারা জীবনের সব ক্ষেত্রে প্রবল প্রভাব বিস্তার করতে সুরু করেছে। বাংলা সাহিত্যেও তার প্রভাব দেখা যায়। তাকে রুখবার জন্যে প্রতিক্রিয়াশীলতা ইতিমধ্যেই তৎপর বটে, কিন্তু তাতে ক'রে বাঙালীর সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবক্ষয় বেড়ে চলেছে। নবাগত কমিউনিষ্ট প্রভাবের স্বরূপ ও সাফল্য বুঝতে হ'লে রোমান্টিক প্রভাবের পতনের কারণ উপলব্ধি করতে হবে।

চিরাচরিতের গতানুগতিকতা থেকে পরিত্রাণ লাভের ব্যাকুলতা রোমান্টিক মনোভাবের প্রবল বিশেষত্ব। সেই পরিত্রাণ লাভের জন্যে আঠার শতকের শেষার্ধের বাঙালী মরিয়া হয়ে উঠেছিল। তার আর ভাল লাগছিল না প্রথার শুষ্ক বন্ধন, সামাজিক আচারের অহেতুক নিপীড়ন, বিফল ধর্মচর্চা আর প্রথাসর্বস্ব ভগবদারাধনা। প্রথমে সে আরম্ভ করল ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ রামেশ্বর, রামানন্দ, ভারতচন্দ্রের শাণিত লেখনীর দ্বারা, অভিমান ক'রে গাল-মন্দ করল রামপ্রসাদ আর শাক্ত নানা গীতিকবির রচনায়, শেষে সোজাসুজি বিদ্রোহ ঘোষণা করল নিধুবাবুর গানের ভাষায়, কবিওয়ালাদের বেপরোয়া অশ্লীলতায়। ঈশ্বর গুপ্তের চিন্তাধারা প্রতিক্রিয়াশীল হওয়া সত্ত্বেও তাঁর তীব্র ব্যঙ্গরসিকতা এই ব্যক্তিমনের বিদ্রোহে উৎসাহ সঞ্চার করে। ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত আগে আর ঐ শাসন স্থাপিত হওয়ার গোড়ার দিকে এই ভাবে রোমান্টিক বিদ্রোহের ধ্বনি চারদিকে শোনা যাচ্ছিল। সেই ক্ষুরধার ব্যঙ্গ ও তীব্র বিরাগ, যা বর্তমানের শুষ্ক ডোর ছিন্ন ক'রে ভবিষ্যতে আত্মপ্রসার চায়, সব রকম প্রাচীন প্রথা আর অনুশাসনের বিরুদ্ধে বাঙালীর মনে এসেছিল ব'লে সেদিন সে নবাবী আমলের অবসানে ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্ঠায় সিরাজউদ্দৌল্লার পতনে পলাশীর পরাজয়ে মোটেই ভয় পায় নি। ১৯০৫ সালের পরবর্তী নাট্যকার প্রতিক্রিয়াশীল ভাবাতিরেকের বশীভূত হয়ে সিরাজের প্রতি যে-দুর্বলতা দেখান না কেন, ১৯০৫ সালের আগের কবি ও অন্য ধরণের সাহিত্যিকরা ত বটেই, ১৭৫৭ সালের বাঙালী বিশেষতঃ বাঙালী হিন্দু সিরাজের দুর্বল দুঃশাসনের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে পরম নিষ্কৃতিলাভের নিঃশ্বাস ফেলেছিল। ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন বাঙালীর লজ্জার দিন নয় যেমন ১৮৫৭ সালের সিপাহী-বিদ্রোহে সিপাহীর কাজ-না-করা বাঙালীর যোগ-না-দেওয়া ক্ষোভের ব্যাপার বলা যায় না। বাস্তবিক ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন বাঙালী হিন্দুর এবং ব্যাপক অর্থে সমগ্র বাঙালী জাতির গৌরবের দিনের প্রথম সূচনা। আর ১৮৫৭-১৯০৫ সালের অর্ধ শতাব্দী বাঙালীর গৌরবের ভাস্বর যুগ, যা ভাঙিয়ে তার এখনও চলছে। সিরাজের পরাজয়ের অর্থ, বাঙালীর নতুন শিক্ষা, সুশাসন, উন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞান, সামাজিক নিরাপত্তা লাভ। সিরাজের জয়লাভের অর্থ পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুর মত সমস্ত বাঙালী হিন্দু সমাজের দিনের পর দিন স্তিমিত-তেজা বিধর্মা বিজাতীয় শাসনে, মহারাষ্ট্রবাসিগণের অপ্রতিরোধ্য আক্রমণে, সতীদাহে, বাল্যবিবাহে, বিধবানির্যাতনে, বলপ্রয়োগে ধর্মান্তরিত করায় নির্বীর্য, নিরাশ্বাস, নিরুদ্যম হয়ে থাকা। সিপাহীদের সাফল্যের অর্থও তাই হ'ত। ইংরেজের সাহায্য না পেলে সহস্রগুণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হলেও রামমোহন সতীদাহ বন্ধ করতে পারতেন না, বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ বিধিবদ্ধ করতে পারতেন না। রাজবল্লভের ব্যর্থতার কথা আমাদের মনে রাখা উচিত। শিক্ষার মধ্যে ভট্টাচার্যের চানা চিবোন, ভ্রমণের মধ্যে তীর্থক্ষেত্রে পাণ্ডপ্রপীড়িত কয়েকটি কুৎসিত মন্দির প্রদক্ষিণ, কর্মের মধ্যে কৃষিকার্য, আত্মকলহ, কুৎসা, পর-নিন্দা! সেই ভয়াবহ অবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে আমাদের পলাশীর যুদ্ধ পরিণামে ভারত ভাগ্যবিধাতাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। ১৯০৫ সালের বাঙালী সে-কথা ভুলে গিয়ে ইংরেজের আওতায় থেকে আগে মুসলমান সমস্যার সমাধান না ক'রে ইংরেজের বিরুদ্ধে যে- আত্মঘাতী আন্দোলনে প্রবৃত্ত হয়, তার ফলে সে আজ অপেক্ষাকৃত অধম জাতির শাসনাধীন। জগতের শ্রেষ্ঠ ভাষার

বদলে এক নিকৃষ্ট পর-ভাষা তার রাষ্ট্রভাষা। ১৯০৫ সালের আন্দোলনের এর চেয়ে বড় ব্যর্থতার নিদর্শন আর কিছু হ'তে পারে না। ইংরেজির বদলে হিন্দি আমাদের রাষ্ট্রভাষা হ'লে আমাদের জাতীয় গৌরব ও শিক্ষা-সংস্কৃতি অভাবনীয় পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে, এই ধরণের চিন্তা ঊনবিংশ শতাব্দীর যে-সব বাঙালীর মাথায় এসেছিল তাঁরা মোটের ওপর শিথিল-মস্তিষ্ক বা অভিসন্ধি-পরায়ণ ছিলেন।

১৮০১-১৯৬৪ সালের প্রায় দেড় শতাব্দীর আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় দেখা যায়, এই সময়ে যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ আমরা আহরণ, উৎপন্ন ও রচনা করেছি, সে-সবই পাশ্চাত্ত্য প্রভাবে সংগৃহীত, নির্মিত, সমৃদ্ধ। আমরা বিশ্বসাহিত্যে উল্লেখযোগ্য মৌলিক কীর্তি রেখেছি; কিন্তু সে-কীর্তি রচনা যে সম্ভবপর হ'ল তার কারণ আমাদের শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীলদের চিত্তদুয়ার অর্গলমুক্ত ছিল। আর সে-মুক্তি পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার শক্তিতে সম্ভব হয়েছিল, না হ'লে কবে কি ভাবে হ'ত বলা প্রায় অসম্ভব। ইংরেজ শাসন নানা দোষে দুষ্ট, এ-কথা অস্বীকার করা মূঢ়তা। কিন্তু তার যত দোষ থাক, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা তার দ্বারা বংলা দেশে বাহিত হয়েছিল। যে-সব দেশ ইংরেজ শাসনের স্পর্শ পায় নি, তারা রোমান্টিক আন্দোলনে প্রবুদ্ধ অন্য জাতির সাহচর্যে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার সুফল পেয়েছিল। যে-সব দেশ কোন পাশ্চাত্ত্য জাতির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাবের অধীনে আসে নি, তারাও স্বেচ্ছায় পাশ্চাত্ত্য প্রভাব বরণ ক'রে দ্রুত উন্নতি লাভ করে। যেমন, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জাপান, বিশ শতকের প্রথম ভাগে তুরস্ক। যারা বৈদেশিক বিজাতীয় প্রভাব থেকে দূরে থেকেছে, তাদের অবস্থা আজও শোচনীয়। সুতরাং পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা তথা তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান যে বিপ্লব ও ভাবান্দোলন, তাদের ঋণ সমস্ত জগৎবাসীর সঙ্গে বাঙালীকেও কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করতে হবে। আর, একথাও মানতে লজ্জা থাকলেও ভয়ের কারণ নেই যে, পাল রাজাদের পতনের পর বাংলা দেশের প্রায় সাড়ে আট শ' বছরের পরাধীনতার ইতিহাসে পর্যায়ক্রমে কানাড়ি, তুর্কি, মুগল, ইংরেজ এবং হিন্দুস্থানী—এই যে পাঁচটি বৈদেশিক শাসন এসেছে, তাদের মধ্যে ইংরেজি শাসন-ব্যবস্থা সকলের চেয়ে ভাল। অবশ্য আরও অনেক ভাল শাসন বাঞ্ছনীয় এবং সম্ভবপর। কিন্তু সে ত বর্তমানের শাসন-ব্যবস্থা নয়! এখনকার ব্যবস্থায় বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের উদ্ভব আর সম্ভবপর নয়,—তাঁদের সমপর্যায়ের রসস্রষ্টা রোমান্টিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যময় পরিমণ্ডল ভিন্ন জন্মাতে ও বাড়তে পারেন না। অষ্টাদশ শতকের পরিবেশ অক্ষুণ্ণ থাকলে আমরা যেমন রাজসিংহ, সোনার তরী আর শ্রীকান্ত-র পরিবর্তে আরও কয়েকটি মঙ্গলকাব্য লাভ করতাম, তেমনি বর্তমান পরিবেশে ঝড় ও ঝরাপাতা, উত্তরায়ণ, ছুরি বৌদি, সাগর থেকে ফেরার মত নিষ্ফলরস রচনাবলী ছাড়া মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি করা কঠিন। সুতরাং রামরাম বসু-র রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র পুস্তকের উদ্ভবের সময় থেকে দিলীপকুমারের "ভাবি এক, হয় আর" গ্রন্থ পর্যন্ত সময়ের ঐতিহাসিক পটভূমিকা আলোচনা ক'রে কোন্ প্রভাবের গুণে আমাদের সমৃদ্ধি আর কোন্ প্রভাবের শনির দৃষ্টিতে আমাদের অবক্ষয়, সেটা বোঝা দরকার।

বহির্বিশ্বে রোমান্টিক প্রভাব এখনও প্রবল ভাবে সক্রিয়। আমাদের দেশে এই শক্তির কাজ আমরা কখনও পূর্ণমাত্রায় বা অবাধে হতে দিই নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, রামমোহনকে আমরা মুখে জাতির জনক ব'লে স্বীকৃতি দিলেও ধর্মসংস্কার সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব আদৌ কার্যকরী করা হয় নি। তিনি প্রতিমাপূজার একান্ত বিরোধী ছিলেন। যে-কোন যুক্তিবাদী স্বীকার করতে বাধ্য যে, বাঙালী হিন্দু সমাজ থেকে যদি প্রতিমাপূজা নিশ্চিহ্ন করা হয় তা হ'লে আমাদের জীবন ঢের বেশি পরিচ্ছন্ন, শ্লীল ও শোভন হয়ে ওঠে এবং ব্যয়বাহুল্য অনেক কমে। পৌত্তলিকতা অবলম্বনে কি ভাবে দলাদলি, অনৈক্য আর রুচিবিকারের সঙ্গে অপব্যয়বহুল উন্মত্ত তাণ্ডব বাঙালী হিন্দুর সমষ্টিগত জীবনে বিশৃঙ্খলা নিয়ে আসে, তার পরিচয় আমাদের সর্বজনীন পূজাগুলিতে প্রত্যক্ষ। আমরা রামমোহনকে এক পাশে সরিয়ে রেখে মহোৎসাহে ঐ তাণ্ডবে সায় দিয়ে যাচ্ছি, এমন কি রামকৃষ্ণ-সারদামণি-বিবেকানন্দেরও মূর্তিপূজা চলছে। রামকৃষ্ণ সরলপ্রাণ অধ্যাত্মবিৎ ধর্মপ্রবক্তা

উৎকৃষ্ট কথকরূপে গণ্য না হয়ে একাধারে রাম ও কৃষ্ণ ব'লে পূজাপ্রাপ্ত হ'লে তাঁরও সম্মান বাড়ে না, আমাদেরও বুদ্ধির ভরাডুবি ঘটে; যেহেতু, রাম যে মস্ত বড় অধ্যাত্ম-সাধক ছিলেন এমন কথা বাল্মীকির রামায়ণে তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজলে পাওয়া যাবে না, সেহেতু, গদাধর চট্টোপাধ্যায় পরমহংস মহাশয়কে "রাম" ব'লে মনে করার সার্থকতা কোথায়? আর্য রাজকুমারের রাজনৈতিক কৃতিত্বের কাব্যকাহিনীর সঙ্গে পরমহংসদেবের মত আধ্যাত্মিক ভাবসাধকের সাধনা ও সিদ্ধির যোগ কোন কষ্টকল্পনার দ্বারাও খুঁজে পাওয়া যায় না। সারদামণি নিরক্ষরা ছিলেন; এমন অবস্থায় তিনি বিদ্যা বিতরণ করতে এসেছিলেন, এমন উদ্ভট চিন্তার যৌক্তিকতা কি? তার চেয়ে বেথুন সাহেবকে মা সরস্বতীর প্রেরিত দূত ব'লে ভাবা যেতে পারে। সেই রকম, বঙ্কিমচন্দ্রের নীতি-নির্দেশ মেনে আমরা যদি মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা আগে সমাধান ক'রে পরে ইংরেজের সঙ্গে লড়তে যেতাম, তা হ'লে পাকিস্থানী জিন্না সাহেব যে সুবিধা পেয়েছেন, তার বহুলাংশ আমাদের হাতে অনেক আগে আসত। আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের পরিবর্তে চিত্তরঞ্জনের নীতি গ্রহণ করায় আমাদের অতি ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে, লোক-বিনিময় হওয়া পর্যন্ত আরও অনেক দুঃখ আমাদের পেতে হবে। এই ভাবে জীবনের নানা দিকে আমরা দিশারি মহাপুরুষ-প্রদত্ত বাণীর কর্ম-রূপায়ণ অসম্পূর্ণ রাখায় রোমান্টিক আন্দোলনকে উপলক্ষ ক'রে অন্যান্য সভ্য দেশে যে-অগ্রগতি সম্ভবপর হয়েছে, এখানে তা হয় নি। এদেশে রোমান্টিক প্রভাবের পতনের কারণ অতঃপর সন্ধান করা যাক।

যখন ইউরোপ ও আমেরিকায় ফরাসী বিপ্লব ও রোমান্টিক আন্দোলনের প্রভাব কার্যকরী হয়ে "পবিত্র রোমক সাম্রাজ্যের সম্রাট্" তাঁর খেতাবটি ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন, দুই আমেরিকায় ব্রিটেন, ফ্রান্স, স্পেন ও পর্তুগালের উপনিবেশগুলি পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করল আর ইউরোপের মধ্যেও বহু দেশ প্রতিবেশী সাম্রাজ্য-বাদের কবল থেকে মুক্তি লাভ করবার পর নবীন উদ্যমে এগিয়ে গেল উন্নতির বিভিন্ন দিকে, তখন অশ্বেতকায় জাতিগুলির মধ্যে সভ্যতা বিস্তারের একটা মিশনারি-জনোচিত মানবতাবাদী সুস্থ আগ্রহ দেখা গিয়েছিল, বিশেষ ক'রে পশ্চিম ইউরোপের শ্বেতকায়দের মধ্যে। "White man's burden" কথাটির জন্ম এই সময়ে হয়। যে প্রেরণায় বাংলা দেশে ডেভিড হেয়ার আর পশ্চিম আফ্রিকায় আলবার্ট সোআইৎসারের আবির্ভাব সম্ভব হয়, তার জন্ম এক করুণাপরায়ণ রোমান্টিক মনোভাবের মধ্যে এই সময়ে হয়। সেই সময়ে দুর্ভাগ্যবশতঃ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবিস্তারের জন্যে এশিয়া ও আফ্রিকার অনগ্রসর অঞ্চলের দখল নিয়ে পাশ্চাত্ত্য জাতিগুলির মধ্যে দেখা দিল তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাময় সংগ্রাম। উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলে এশিয়া, আফ্রিকা আর ওশিয়ানিয়ার আদিবাসীরা নতুন শিক্ষা, জ্ঞানবিজ্ঞান, যুক্তিবাদ, ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রভৃতি আগে-অকল্পিত সুখ-সুবিধা লাভ করল বটে, বিশেষ দাসব্যবসায় উচ্ছেদের পর, কিন্তু গোষ্ঠীগত স্বাধীনতা তাদের হারাতে হ'ল। পরোক্ষভাবে তারা শোষিতও হ'তে লাগল।

উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যসমষ্টির স্থানীয় অধিবাসীরা নিজেদের দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ্‌সমূহের উপযুক্ত ব্যবহার জানত না ব'লে আগে তাদের যতটা সমৃদ্ধি ছিল, সাম্রাজ্য আর উপনিবেশ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দেশের সব রকমের প্রাকৃতিক সম্পদের সম্যক্ ব্যবহার সুরু হওয়ার পরে তার চেয়ে বেশি সমৃদ্ধি তারা পেল অর্থাৎ তাদের জীবনযাত্রার মান হ'ল উন্নততর। সুখ-শান্তি মনের ব্যাপার; তা হয়ত অনেক কমে গেল জীবনযাত্রার মানের তথাকথিত উন্নতির ফলে। ভারতের কয়লার খনি, বনের বিভিন্ন গাছ-গাছড়া আর অন্য ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ প্রায়ই অব্যবহৃত হয়ে প্রচুর পরিমাণে পড়ে ছিল শিল্পবিস্তারের অপেক্ষায়। ঐ সব সম্পদ্ থেকেও ভারতবাসীর কোন কাজে লাগত না। ইংরেজ-শাসনের সঙ্গে কলকারখানার প্রসার হওয়ায় ঐ সব সম্পদের অনেকাংশ বিদেশে চালান হয়ে দেশটা শোষিত হতে লাগল বটে, কিন্তু ভারতবাসীরাও যন্ত্রের প্রসারে ঐ সব প্রাকৃতিক সম্পদের রূপান্তর শিল্পদ্রব্যগুলির ব্যবহার-সৌভাগ্য প্রথম লাভ করল।

স্বাধীনতা লাভের উদগ্র আকাঙ্ক্ষা রোমান্টিক মনের একটি স্বাভাবিক ও প্রবল প্রবণতা। সাম্রাজ্যগুলিতে

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক শিক্ষার গুণে প্রচণ্ড স্বাদেশিকতার আবির্ভাব হ'ল। তখন সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শাসক-সম্প্রদায়ের সঙ্গে অধীন জাতিগুলির নব-শিক্ষিত দেশপ্রেমিক সম্প্রদায়ের মনোমালিন্য, বিবাদ ও সংগ্রাম আরম্ভ হ'ল। ১৯০৫ সালের আন্দোলনও ইংরেজি শিক্ষায় অতি শিক্ষিত ভাবপ্রবণ রোমাণ্টিক বাঙালী মধ্যবিত্ত মনের দান। ঐ আন্দোলনের চিন্তানায়ক অরবিন্দ ইউরোপীর শিক্ষায় মেরুমজ্জা পর্যন্ত সম্পৃক্ত ছিলেন এবং মাতৃভাষায় তাঁর কোন অধিকার ছিল না বললেই হয়। তিনি পেশাদার রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন না, কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রাদেশিক সভাপতিদের মত। তখনও তিনি আধ্যাত্মিক হয়ে ওঠেন নি; তাঁর তৎকালীন রচনাবলী পড়লে বেশ বোঝা যায় যে, সাহিত্যে এবং রাজনৈতিক সংগ্রামে তিনি ছিলেন রোমাণ্টিক কবি এবং রোমাণ্টিক বিপ্লবী।

বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মধ্যে ঈর্ষা আর প্রতিযোগিতার ভাব ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। তার অনিবার্য পরিণামে ছোটখাট যুদ্ধ ছাড়াও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই দু'টি বিশ্বযুদ্ধ বা কুরুক্ষেত্রের আয়োজন হ'ল। নাপোলেঅন যে বিশ্বভৌমিক সাম্রাজ্য কল্পনা করেছিলেন, তা বাস্তবে রূপায়িত না হওয়ায় ফরাসী বিপ্লব পূর্ণ সার্থকতা লাভ করে নি। জগতের অধিকাংশ দেশ ও নরনারী এই বিপ্লবের ফলে উদ্ভূত কল্যাণী শক্তির সহায়তা, উন্নত সংস্কৃতিচেতনার শিখাস্পর্শ তাদের দারিদ্র্যদুর্দশার তমসাচ্ছন্ন জীবনে মোটেই পায় নি। ধরা যাক্ রুশের কথা। নাপোলেঅনের প্রভাব রুশ-সমাজে বিস্তৃত হতে পারে নি। সেখানে পিটার দি গ্রেট আর দ্বিতীয় ক্যাথারাইনের প্রভাবে পশ্চিম ইউরোপের সংস্কৃতি সামান্য একটু ছড়িয়ে পড়ে আর উনিশ শতকে এক চমৎকার রোমাণ্টিক সাহিত্যও গড়ে ওঠে। কিন্তু সে-সাহিত্য রুশদেশে নিতান্ত অগভীর এক সমাজস্তরের সাহিত্য। বৃহত্তর রুশসমাজে ১৯১৭ সালের বিপ্লবের সময় পর্যন্ত তার কোন প্রভাব পড়ে নি। ফলে, রুশ জনসাধারণ রোমাণ্টিক অভ্যুত্থানের আগের মত অতৃপ্ত থেকে গিয়েছিল। সেই জন্যে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের আত্মকলহের অবকাশে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা, যুক্তিবাদ, কুসংস্কারমুক্তি রোমাণ্টিকতা প্রভৃতির স্বাদের সঙ্গে অপরিচিত রুশ জনগণের ঘুমন্ত ক্ষুধার্ত আত্মা যখন হুঙ্কার দিয়ে জেগে উঠল ওপর-তলার সমাজ চূর্ণ ক'রে দিয়ে, তখন সে দেশের রোমাণ্টিক সাহিত্য-সংস্কৃতি রঙীন বুদ্বুদের মত নিমেষে বিদীর্ণ হয়ে উবে গেল। ১৯১৭-৫৩ সালে অন্ততঃ স্তালিনীয় যুগে রোমাণ্টিক রুশ-সাহিত্য বহির্বিশ্বে পরম সমাদরের সামগ্রী হলেও রুশদের নিজদেশে ছিল নিতান্ত অনাদৃত। পুশ্‌কিন, লেরমন্তফ, গোগোল, দস্তইএফস্কি, বুনিন প্রভৃতি নিজ বাসভূমে একরকম পরবাসী হয়ে পড়েন। রুশে রোমাণ্টিক অভ্যুদয়ের ক্ষীণ রশ্মি লুপ্ত হতেই সমগ্র বিশ্বে রোমাণ্টিক আন্দোলনের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা ও তার কারণ শোচনীয়ভাবে প্রকট হ'ল।

বোঝা গেল, যে-সব দেশে একটা বেশ শক্তিশালী বর্ধিষ্ণু মধ্যবিত্ত সমাজ গঠিত হয়ে আছে বহুদিন থেকে, সে-সব দেশে রোমাণ্টিক আন্দোলনের পরবর্তী সংস্কৃতি দৃঢ়মূল; সেখানে রুশ বিপ্লবের শক্তি বা কমিউনিজমের প্রবেশ লাভ কঠিন ব্যাপার। কমিউনিষ্টদের পরিভাষায় বুর্জোআ রোমাণ্টিক সংস্কৃতিধারকেরা বুঝতে পারলেন যে, হয় এই নব-শক্তির কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হবে নয় সমস্ত জগতে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী অর্থাৎ ফরাসী বিপ্লবের শক্তি কার্যকরী হতে দেওয়া আশু প্রয়োজন, যাতে শক্তিশালী মধ্যবিত্ত সমাজের সুদৃঢ় অর্থনৈতিক কাঠামোর ভিত্তিতে গড়ে-ওঠা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যময় রোমাণ্টিক সংস্কৃতি রুশ বিপ্লবের শক্তির অনুপ্রবেশ প্রতিরুদ্ধ করতে পারে। আরও দেখা গেল, যে-সব দেশে ফরাসী বিপ্লবের তরঙ্গ রোমাণ্টিক আবহ নিয়ে ভাল ভাবে কিংবা একটুও ঢুকতে পায় নি, সে-সব দেশের অনগ্রসর, অসংস্কৃত, ক্ষুধিত, বঞ্চিত জনসাধারণের মধ্যে এই রুশ বিপ্লবজাত শক্তির রাষ্ট্রিক, আর্থনীতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নানা ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারের সুবর্ণ সুযোগ বিদ্যমান। ফরাসী বিপ্লব মধ্যবিত্তের বিপ্লব এবং রোমাণ্টিক চেতনা মধ্যবিত্তের মর্মসম্পদের শ্রেষ্ঠ দান। সুতরাং রসানুভূতি-পরিমার্জিত শক্তিশালী ও সুস্থ মধ্যবিত্ত সমাজের অস্তিত্ব কমিউনিজমের প্রধান প্রতিবন্ধক। বাংলা দেশে এই মধ্যবিত্ত সমাজ ভেঙে

পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রোমাণ্টিক ভাবধারা দুর্বল হয়ে পড়ে, অধোমুখ অবস্থার নিদর্শনস্বরূপ প্রতিক্রিয়াশীল প্রাচীনপন্থা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে আর তারও অনিবার্য পরিণামে ঐ নবীন প্রভাব এদেশে প্রবল হয়ে ওঠার সুযোগ পেয়ে গেল।

সুতরাং বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজের ভাঙনই উনিশ শতকের বাঙালী সংস্কৃতির উৎবর্ষ হ্রাসের কারণ। বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজের অকাল-ভাঙনের প্রধান কারণ, ইংরেজের সঙ্গে ১৯০৫ সাল থেকে অবিবেচনা-প্রসূত সংগ্রাম এবং বাঙালী মুসলমান সমাজকে তোষণ করার নির্বোধ আত্মঘাতী প্রবৃত্তি। ইংরেজ এই দুর্বলতা দু'টিরই সুযোগ নিয়ে ১৯৪৭ সালের মধ্যেই বাঙালীকে অন্ততঃ দীর্ঘস্থায়ীরূপে কোণঠাসা করে ফেলেছে। "আমার দুর্গোৎসব" রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন স্বাধীন বঙ্গের ঐশ্বর্যময়ী মূর্তি সম্বন্ধে :

"এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। এ-মূর্তি এখন দেখিব না—আজি দেখিব না—কাল দেখিব না—কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না।"

বাঙালীর বুদ্ধির দোষে কালস্রোত এখন তার প্রতি-কূলে গেছে। ইংরেজের সঙ্গে সংগ্রামে আপোষহীন মনোভাব আর মুসলমানদের ক্রমাগত ভাই-এর মতও না দেখে একেবারে পত্নীভ্রাতাদের মত দেখে অতি-তোষণ, বাঙালী হিন্দু রাজনীতিবিদদের প্রধান ত্রুটি। আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের নীতি থেকে বিচ্যুত হওয়ার জন্যে আমাদের এই দুর্দশা। চিত্তরঞ্জনের ভ্রান্ত নীতির জন্যে শ্রীঅরবিন্দ বিচলিত ভাবে ব'লে ওঠেন : চিত্ত কি ভুল করলে! তিনি কোন সময়ে চিত্তরঞ্জনের মুসলিম-তোষণ নীতি সমর্থন করেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র মুসলিম-বিদ্বেষী না হয়েও ইংরেজদের সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন ব'লে লিখেছিলেন :

"ইংরেজ রাজা না হইলে সনাতনধর্মের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই। সনাতনধর্মের পুনরুদ্ধার করিতে গেলে আগে বহির্বিষয়ক জ্ঞানের প্রচার করা আবশ্যক। ইংরেজ বহির্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত, লোকশিক্ষায় বড় সুপটু। যতদিন না হিন্দু আবার জ্ঞানবান্, গুণবান্ আর বলবান্ হয়, ততদিন ইংরেজ রাজ্য অক্ষয় থাকিবে; ইংরেজ-রাজ্যে প্রজা সুখী হইবে। নিষ্কণ্টকে ধর্মাচরণ করিবে। অতএব, হে বুদ্ধিমান্! ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে নিরস্ত হইয়া আমার অনুসরণ কর।"

বাঙালী কিছুদূর পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসরণ করলেও অল্পদিনের মধ্যে পথভ্রান্ত হয়ে তাঁকে সাম্প্রদায়িক আখ্যায় ভূষিত করে। অথচ বঙ্কিমচন্দ্র ধর্ম সম্পর্কে যাবতীয় গোঁড়ামি থেকে রামমোহনের চেয়েও বেশি মুক্ত ছিলেন ব'লে লিখেছিলেন :

"তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা সনাতনধর্ম নহে, সে একটা লৌকিক অপকৃষ্ট ধর্ম। মাছ-পাঁটা খেয়ে কি তবে বৈষ্ণব হওয়া যায়? মূর্খ! তোকে বুঝাইলাম কি? কল্পনা করিয়াছি, আগামী বৎসর কছিমদ্দি সেখকে দিয়া দুর্গোৎসব করাইব। ছাগমাংস কিছু গুরুপাক। মুরগী বড় লঘুপাক, অতএব বৈষ্ণবের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।"

হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালী ছিল বঙ্কিমের সাধনার অবলম্বন; তাই তিনি সপ্তকোটিকণ্ঠ, ছয় কোটি সন্তানের দ্বাদশ কোটি ভুজের কথা বার বার উল্লেখ করেছেন। যে আগে বাঙালী, সে হিন্দু কি মুসলমান, তা নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র মাথা ঘামাতেন না। কিন্তু যে আগে মুসলমান পরে বাঙালী, তার সম্বন্ধে কি করা উচিত, বাঙালীশ্রেষ্ঠ বঙ্কিমের সে-বিষয়ে কোন দ্বিধাদৌর্বল্য ছিল না। ফরাসী বিপ্লবের বাণীমন্ত্রে পূর্ণভাবে সম্পৃক্ত বঙ্কিমচন্দ্র এ-ব্যাপারে ফরাসীদের মত জাতীয়তাকে একমাত্র বিবেচ্য বিষয়রূপে দেখতেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা তা দেখি নি। বঙ্কিমচন্দ্রকে গোঁড়া হিন্দু সাম্প্রদায়িক বিশেষণ হিন্দু হয়েও যারা দিতে আরম্ভ করে, তাদের প্রগতিশীল বলা যুগধর্ম দাঁড়িয়ে গেল ১৯১৭ সালের বিপ্লবের পর কমিউনিষ্ট প্রভাবের ফলে এক দিকে, গান্ধী ও চিত্তরঞ্জনের প্রভাবে অন্য দিকে। দক্ষিণপন্থী খিলাফতি কংগ্রেসী আর ব্রিটিশ কমিউনিষ্ট পার্টি-প্রভাবিত ভারতীয় কমিউনিষ্ট মহল, দুই গোষ্ঠীর বিচারেই বঙ্কিমচন্দ্র সাম্প্রদায়িক আখ্যা পেলেন।

রামমোহন থেকে সুভাষচন্দ্র ও শ্যামাপ্রসাদ পর্যন্ত বাঙালী হিন্দু মনীষী ও নেতৃবৃন্দ বহু সাধনায় যে-পথ দেখিয়েছিলেন, প্রতিক্রিয়াশীলতার বশে সে-পথ থেকে

সরে গিয়ে আত্মঘাতের পন্থা বরণ করাই বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজ তথা বাঙালী জাতির অধঃপতন ও অবক্ষয়ের কারণ।

১৯১৭ সালের নবোদিত শক্তির পূর্ণ স্বরূপ বিচার করা এখনও অসম্ভব। দূরত্বের পরিপ্রেক্ষিত এখনও যথেষ্ট ব্যবহিত নয়। নাপোলেঅন যখন রাইন নদীর রাষ্ট্রসমবায় গঠন করেন, তখন আধুনিক মহা শক্তিশালী জর্মানীর কথা কেউ ভাবে নি। ফরাসী বিপ্লবের ৮১ বছরের মধ্যে জর্মানী ও ইতালী দুটি অখণ্ড রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে রোমাণ্টিক ভাবোদ্দীপ্ত দেশপ্রেমের জোরে। ঐ বিপ্লবের শক্তি বিভিন্ন দেশে আজও কি ভাবে সক্রিয় তা ফরাসী আফ্রিকার দ্রুত স্বাধীনতা লাভ আর ফরাসী রাষ্ট্রনায়ক দে গোলের অভিনব কূটনীতি দেখে অনুধাবনীয়, কাজেই ১২৮ বছর পরের রুশ-বিপ্লবের শক্তি কি ভাবে কতদিন কতখানি কাজ করবে, তা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। এখন পর্যন্ত যা দেখা গেছে, তার সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের যেটুকু সম্পর্ক সে অনুপাতে এই বিপ্লব ও তার প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা চলতে পারে।

১৯১৭ সালে এই বিপ্লবের অন্তরালস্থিত শক্তি পূর্ণ তেজে আত্মপ্রকাশ করলেও এর কাজ চলছিল বহুদিন থেকে। ১৯১৭ ও ১৯৪৯ সালে রুশ ও চীনের দুই বিরাট্ রাষ্ট্রবিপ্লবের দ্বারা এই শক্তি অচিন্তিতপূর্ব ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জন করে। দুর্বল ও অবক্ষীণ মধ্যবিত্ত সমাজ-বিশিষ্ট রুশ ও চীনের মত অনগ্রসর দেশ দু'টি যে সব-আগে মার্ক্স-কথিত বিপ্লব গ্রহণ করবে, তা স্বাভাবিক। রুশ-জাতি পশ্চিম ইউরোপের সান্নিধ্যে ডারউইন ও মার্ক্সের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত ছিল ব'লে অধিকতর অভাবগ্রস্ত ও পশ্চাৎপদ চীনে আগে না হয়ে রুশে এই বিপ্লব হয়। এই বিপ্লবের পশ্চাতে মার্ক্স আর ডারউইনের দান ততটা, যতটা রুশো আর ভোল্‌তেরের ফরাসী বিপ্লবের পেছনে। রুশীয় বিপ্লব লেনিন, ট্রট্স্কি আর স্তালিনের ব্যক্তিত্ব অবলম্বনে প্রকাশিত হয়। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে ইংরেজির পর ফরাসী সাহিত্য ও মনীষার প্রভাব ছিল সর্বাধিক। বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলা সাহিত্যে ইংরেজির পর রুশ সাহিত্য আর কার্ল মার্ক্স ও ডারউইনের মনীষার প্রভাব খুব বেশি পড়ে। কমিউনিষ্ট মতবাদ রুশ বিপ্লবের পর মাত্র ৩২ বছরের মধ্যে জীবনের সর্বক্ষেত্রে চীন দেশ অধিকার করে নেয়। বাংলা সাহিত্যে তার ঢেউ এসে লাগে প্রথম মহাযুদ্ধের পর। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইংরেজের আনুকুল্যে এই ধারাটি পরিপুষ্টি লাভ করে। তবুও আধুনিক বাংলা সাহিত্য মুখ্যতঃ রোমাণ্টিক অভ্যুত্থানের সাহিত্য। গত দেড় শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য প্রায় সর্বাংশে বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের রোমাণ্টিক অভ্যুত্থানের সাংস্কৃতিক নিদর্শন। রুশ বিপ্লবের মত কোন বিপ্লব যদি এ দেশে সংঘটিত হয়, তা হ'লে রোমাণ্টিক বাংলা সাহিত্যের পরিণতি কি হবে, তা বোঝা কঠিন নয়।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইউরোপে ফরাসী বিপ্লবের বাণী একদিক্ থেকে মহত্তর সাফল্য লাভ করে। ইউরোপ থেকে সাম্রাজ্যবাদ প্রায় নিঃশেষে লুপ্ত হয় যার জন্যে H. A. L. Fisher লিখেছেন :

"The new political frontiers of Europe are Wilsonian, and so drawn that three per cent. only of the total population of the continent live under alien rule. Judged by the test of selfdetermination, no previous European frontiers have been so satisfactory."

"ইউরোপের নতুন রাজনৈতিক সীমারেখাগুলি উইলসনীয় আর এমন ভাবে আঁকা যে মহাদেশের জনসমষ্টির মাত্র শতকরা তিন ভাগ বৈদেশিক শাসনে বাস করে। আত্মনিয়ন্ত্রণের পরীক্ষা অনুসারে বিচার করলে এর আগের কোন ইউরোপীয় সীমারেখাসমূহ এত সন্তোষকর ছিল না।"

উইলসন মার্কিন ও ফরাসী বিপ্লবের মানস পুত্র, এ-কথা স্মরণীয়।

ইউরোপে এর পর যে-সব দেশে নামে রাজা থেকে যায় সে-সব জায়গাতেও কাজে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়। বহু ক্ষুদ্র জাতি স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা লাভ করে। এই সময়ে ফরাসী বিপ্লবের প্রভাবে গঠিত পশ্চিম ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধারক-বাহক শক্তি এবং রুশ

বিপ্লবের শক্তি পরস্পরকে শত্রু ব'লে চিনতে পারে। ফরাসী বিপ্লবের শক্তি যাঁদের মধ্যে কাজ করছিল তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, অবিলম্বে পৃথিবীর সব দেশে শক্তিশালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় গ'ড়ে তুলতে না পারলে রুশ বিপ্লব সর্বত্র বিস্তৃত হয়ে ধনতন্ত্র ধ্বংস করার অজুহাতে ধনী ও মধ্যবিত্ত সমাজ, রেনেসাঁস আর রোমান্টিক রিভাইভাল-জাত সংস্কৃতির নিঃশেষ লুপ্তিসাধন করবে। যদি ফরাসী বিপ্লব থেকে ক্রমবিবর্তনের ফলে উদ্ভূত আধুনিক পাশ্চাত্ত্য গণতন্ত্র সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া যায় তা হ'লে ধনতন্ত্রবাদ ও ধনীরা রক্ষা পাবে, দরিদ্ররাও নানা রকম সুখ-সুবিধা পাবে এবং ধনী ও দরিদ্র, এই দুই শ্রেণীর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা তথা সমাজের কর্তৃত্ব করবে মস্তিষ্কজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণী। ধনিকদের সাধ্য নেই যে, ১৯১৭ সালের বিপ্লবের নব-জাগ্রত শক্তির গতিরোধ করে। মধ্যবিত্তরা তাদের বিচিত্র সামাজিক অবস্থান আর উচ্চ সংস্কৃতিচর্চার জোরে সেটা পারে। এই মধ্যবিত্ত সোপানশ্রেণী অবলম্বনে সহজে দরিদ্র ক্রমশঃ ধনী সমাজের অঙ্গীভূত এবং ধনী ভাগ্যহত হলে ধীরভাবে পর্যায়ক্রমে দরিদ্র সমাজের আত্মস্থ হ'তে পারে প্রচণ্ড সামাজিক অভিঘাত ব্যতীতই।

তা ছাড়া, ব্যক্তিস্বাধীনতা ফরাসী বিপ্লবের প্রাণের কথা। ব্যক্তির নিজের ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা জাগ্রত-চৈতন্যের মানুষমাত্রে চায়। এই স্বভাব কেবল বুর্জোআ ব্যক্তির নয়, প্রোলেটারিএট ব্যক্তিরও। অথচ রুশ বিপ্লবের শক্তির মস্ত ত্রুটি এই যে, এই বৈপ্লবিক শক্তি কাৰ্যতঃ ব্যক্তির স্বাধীনতা স্বীকার করে না বা তার মর্ম বোঝে না। ব্যক্তিস্বাধীনতার দাবিরূপ মহাস্ত্র এই বিপ্লবের গতিরোধে কার্যকরী হতে পারে। এই ধারণা নিয়ে ব্রিটেন ও আমেরিকা প্রথম মহাযুদ্ধের পরই রুশ-বিরোধিতায় অগ্রসর হয়। যেহেতু ব্রিটেনের অধীন ভারতে, বিশেষত বাংলা দেশে তখন ইংরেজবিরোধী বিপ্লবী মনোভাব প্রবল, সেহেতু সহজেই বাঙালীর রোমান্টিক কল্পনাপ্রবণ মন ধরে নিল যে, ইংরেজের শত্রু বলেই রুশ বিপ্লবীরা ভারতীয় বিপ্লবীদের পরম বন্ধু, মানবতার পক্ষে অশেষ কল্যাণকর ত বটেই। রুশ সাম্রাজ্য ভেঙে টুকরো টুকরো করার অভিযানে যখন বিভিন্ন পাশ্চাত্ত্য শক্তি সমবেত হ'ল, তখন নজরুল লিখে বসলেন, "সাত মহারথী শিশুরে বধিতে ফুলায় বেহায়া ছাতি!" রুশ সাম্রাজ্য যে ধুমসো ধাড়ী সেটা লক্ষ্য না করে ১৯১৭ সালের বিপ্লবকে শিশু বিপ্লব বা অভিমন্যুতুল্য মহাবীর বলা হ'ল। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট থেকে আমাদের ভারতীয় বণিক্-স্বার্থে পরিচালিত রাষ্ট্রকে যেমন দীর্ঘকাল শিশুরাষ্ট্র বলা হ'ত, তেমনি আর কি। সত্যেন্দ্রনাথ মনের আবেগে লিখে ফেললেন, "সভ্য বর্বর-তার তরে বল্‌শী আসে কলসি-দাড়ি নিয়ে!" শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের সম্পাদক নলিনীকান্ত গুপ্ত "বোলশেভিকী" লিখে এর আত্মায় কি মহত্ত্ব সুগোপন আছে দেখতে বসলেন। শিবরাম চক্রবর্তী "মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি" প্রবন্ধমালায় সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে এই তর্কে প্রবৃত্ত হলেন যে, ভারতের অধ্যাত্মদর্শন এক বিরাট্ ধাপ্পা ছাড়া কিছু নয়, মস্কোই এখন মুক্তিপিপাসু বিশ্ববাসীর মক্কা হওয়া উচিত। অর্থাৎ ১৯১৭ সালের বিপ্লবের মওকায় মক্কা মস্কো মোক্ষ সব একাকার হয়ে গেল বাঙালী রোমান্টিক ভাবুকদের চোখে।

কিন্তু অপেক্ষাকৃত বেশি রাজনীতি-সচেতন বহির্বিশ্বে মধ্যবিত্ত সমাজ এক বিরাট্ শিল্পগত ও সামরিক অভ্যুত্থান নিয়ে তার প্রবল শত্রু বোলশেভিজমের বিরুদ্ধে দাঁড়াল ইতালী ও জর্মনিতে মুসোলিনী ও হিটলারের নেতৃত্বে। ইংরেজ কখনও ইজম্ দেখে ভয় পায় না, কিন্তু শক্তিশালী জাতির শিল্পবিস্তারকে যমজ্ঞান করে। সুতরাং সারা দুনিয়ার রাজনৈতিক গবেষণা বিপর্যস্ত করে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি রুশের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তথা-কথিত ধনতন্ত্রবাদী দুই শত্রুকে ঘায়েল ক'রে বসল। তাতে করে বাঙালী সাহিত্যিকের চোখে রুশ বিপ্লব ও তার শক্তির মর্যাদা বা প্রেষ্টিজ আরও অনেক বেড়ে গেল।

রুশ জাতি তার আদর্শবাদের প্রভাব জগতের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অধিবাসীর ওপর বিস্তৃত করেছে গত দুই মহাযুদ্ধে গণতান্ত্রিক জাতিগুলির আত্মকলহ ও দুর্বুদ্ধির সুযোগে। চীনের পর ভারতে তার প্রভাব চীন-ভারত বিবাদের আগে পর্যন্ত খুব বেশি বিস্তৃত হয়েছিল। ভারতে তথা বঙ্গদেশেও রোমান্টিক সংস্কৃতি রুশদেশের মত

সমাজের ওপরের স্তরমাত্র স্পর্শ করেছে। বিপুলসংখ্যক জনসাধারণ আজও রেনেসাঁসের আগের যুগের নিদারুণ মধ্যযুগীয় দুর্দশা ও অন্ধতার মধ্যে প'ড়ে আছে। যে কোন এক বিপ্লবে এই ঘুমন্ত গণশক্তি হঠাৎ খাড়া হয়ে উঠে এদেশের সুন্দর সুখপাঠ্য কিন্তু জনসাধারণের অজ্ঞাতপ্রায় রোমান্টিক সাহিত্যকে ক্ষুদ্র ভগ্নপ্রায় মধ্যবিত্ত সমাজের মত নিমেষে ধ্বংস ক'রে দিতে সমর্থ।

বর্তমানে আমাদের দেশের কর্ণধার যাঁরা, তাঁরা চীনের ভারত আক্রমণের দোহাই দিয়ে জনসাধারণের মনোযোগ অন্যত্র নিবদ্ধ করলেও এ-ভাবে বেশি দিন বিপ্লবের শক্তিকে ঠেকিয়ে রাখা অসম্ভব। প্রতীয়মান কারণে ভারত ও তার অঙ্গরাজ্যগুলির নিয়ন্ত্রিগোষ্ঠী মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতি বীভৎসভাবে বিরূপ। ইংরেজ শাসনে ভারতে মধ্যবিত্ত সমাজের যেটুকু শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল, ১৯৪৭-৬৪ সালের স্বাধীন ভারতে তা প্রায় বিধ্বস্ত হয়েছে। এতে আপাততঃ বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজের মুখ শুকিয়ে গেলেও বিকটবদন শিল্পপতি ও তাদের তাম্বুল-করঙ্কবাহক নেতৃবৃন্দের উল্লাসের হেতু নেই; কারণ, "তোমারে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে।" সে-গোকুল মস্কো বা ওআশিংটন যে-কূলেই হোক্ না কেন। ইঅমার্কিন শক্তির চোখে ভারতীয় শিল্পবিস্তার আর রুশের চোখে ভারতীয় শিল্পপতিগোষ্ঠী তুল্য আদরের।

—

পাকিস্তান

পাকিস্তান প্রস্তাব সম্বন্ধে আমরা বরাবর বলিয়া আসিতেছি যে, ইহার পশ্চাতে ও মধ্যে ব্রিটিশ কারচুপি ও সমর্থন আছে।

দুঃখের বিষয়, কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরা সম্বন্ধে যাহা করিয়াছিলেন, অথবা করেন নাই, পাকিস্তান প্রস্তাব সম্বন্ধেও তাহাই করিতেছেন, অথবা করিতেছেন না। এদিকে মুসলীম লীগ খুব উদ্যোগিতার সহিত এই পরিকল্পনাটা প্রচার করিতেছে।

যে-সকল হিন্দু, মুসলমান, শিখ, পারসী, ইহুদী, প্রভৃতি ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডত্ব একান্ত আবশ্যক মনে করেন, তাঁহাদিগকে অধিকতর উদ্যোগিতার সহিত তাহার ঐকান্তিক প্রয়োজন প্রচার করিতে হইবে।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী, কার্ত্তিক, ১৩৪৭।

ময়ূরাক্ষী

শ্রীসুনন্দা মুখোপাধ্যায়

ওঁরা সকলে পিকনিকে এসেছেন ময়ূরাক্ষীর ধারে। নদী এখন শুকিয়ে এসেছে, সরু রূপোলী রেখার মত জল। ফাল্গুনের উজ্জ্বল সকাল। একটু দূরে আমের বনে মঞ্জরী দেখা দিয়েছে। একটা মাদক গন্ধে বাতাস বিহ্বল। রাস্তার ধারে কার একখানা বাড়ীর গায়ে একটি সজনে গাছ, ফুলে ফুলে ভরে গেছে। শীতার্ত্ত ভাবটা বিদায় নিয়েছে প্রায়, হাওয়ার ছোঁয়ায় এখন "রোমে রোমে" শিহরণ লাগতে সুরু করেছে। কোকিলদের প্রণয়-বিহ্বল আহ্বান শোনা যাচ্ছে সবে। দখিন হাওয়ার পদসঞ্চারে মৃদু-মর্ম্মর ধ্বনি জাগছে পাতায় পাতায়।

প্রতাপবাবুরা সপরিবারে এসেছেন। একটা বড় গাছের তলায় দু'খানা সতরঞ্চি বিছানো হয়ে গেল। সরমা নিজেই ভারী সতরঞ্চি টেনে পাতছিলেন আর হাঁফাচ্ছিলেন; চাকরদের অপেক্ষায় থাকার ধৈর্য্য তাঁর নেই। প্রতাপবাবু ঠাট্টার সুরে বললেন, "শুধু সতরঞ্চি টেনে কি মন ভরবে? বাড়ী থেকে চেয়ার-বেঞ্চগুলো নিয়ে এলেই হ'ত।" সরমার মুখ নিমেষে কঠিন হয়ে গেল। সতরঞ্চি পাতা ফেলে তিনি রিক্শ থেকে ডেকচি নামাতে গেলেন। বড়ছেলে সুনির্ম্মলের দুই মেয়ে পর্ণা আর পম্পা মোটর থেকে গ্রামোফোনটা নামাতে ব্যস্ত। ওদিক থেকে ছোটছেলে সুদীপ্ত হাঁক দিল, "ভাল ভাল রেকর্ডগুলো সব এনেছিস্ ত?"

বড়মেয়ে রত্নার ছেলে কাজল চেঁচিয়ে বলল, "ছোটমামু, প্লীজ সেই রেকর্ডটা দাও, 'নৃত্যের তালে তালে'।"

এদিকে মেজবউ শান্তা তার কোলের মেয়ের বোতল খুঁজে হয়রান। ছোটমেয়ে রমা জনাকে নিয়ে সকলের থেকে দূরে একটা গাছের তলায় বসে গভীর আলাপে মগ্ন। সঞ্জয় একা একা ঘুরছিল। সামনেই সুনির্ম্মলকে দেখে কাছে গিয়ে জিগ্যেস করল, "আচ্ছা বড়দা, এটা কি গাছ? বনপুলক না?"

"কি জানি? আমি ঠিক জানি না।" ব'লেই একমুখ সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ল সুনির্ম্মল। পাশেই বসেছিলেন রত্নার স্বামী শঙ্কর মিত্র। বড় ব্যবসায়ী। সুনির্ম্মলও ব্যবসা করে। দুজনে একস্পোর্ট, ইমপোর্ট নিয়ে গভীর আলোচনায় মত্ত হয়ে গেলেন। ওদিকে জনার গলা শোনা যায়, উদাত্ত কণ্ঠে কবিতা আবৃত্তি করছে, "নিত্য তোমায় চিত্ত ভরিয়া স্মরণ করি!" সঞ্জয় ওদের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াল, পকেট থেকে কাগজ-পেন্সিল বার ক'রে কি যেন করতে সুরু ক'রে দিল। পেছন থেকে সুদীপ্ত এসে উঁকি মারল, বলল, "বাঃ, চমৎকার ত।" সঞ্জয় হেসে পিছন ফিরে তাকাল, জিগ্যেস করল, "কোন্‌টা চমৎকার লাগছে? জনাদির কবিতা, না…?"

"জনার কবিতা শুনতে পাইনি, তোমার আঁকা ছবিটা ভারী সুন্দর।"

সঞ্জয় ছবি আঁকা কাগজটা পকেটে পুরল। কে যেন গুনগুন করছে "বসন্ত তার গান লিখে যায়……ধূলির পরে।"…

ব্রীজের ওপর দিয়ে দু'একটা ট্রাক চলেছে, দূরের পায়ে-চলা পথটা চোখে পড়ে। কয়েকবারই এখানে বেড়াতে এসেছে সে। এখানকার মাটি ও প্রকৃতির বিচিত্র রূপলীলা—সবই বড় ভাল লাগে। মাটির রং গৈরিক। বর্ষায় সিক্ত মৃত্তিকা স্বর্ণ চন্দনের তিলক আঁকে বনস্থলীর ললাটে, শীতে শিশির-স্নিগ্ধ আলপনা, গ্রীষ্মে অগ্নিময় ভস্মকণা ওড়ে, বসন্তে স্বর্ণফাগের রেণু ছড়িয়ে পড়ে বাতাসে। এখানকার ধুলোতেও ঋতুবদলের ছোঁয়াচ লাগে। বারেবারে সাজ বদল করে প্রকৃতি। ফাল্গুনের সুরুতেই আকাশে, বাতাসে, অরণ্যে সজ্জার বিচিত্র সমারোহ সুরু হয়েছে। নদীর ধারটা প্রায় বালিতেই ঢাকা। একদিকে রিক্ত মরুভূমির মত বালির চর, অন্যদিকে শ্যামলিমার দাক্ষিণ্যে পরিপূর্ণা প্রকৃতি।

জয়ন্ত ক্যামেরা নিয়ে ঘোরাফেরা করছিল। সুদীপ্ত হেসে বলল, "কি জয়দা, স্যুট-বুট পরে বসবার সুবিধা হচ্ছে না বুঝি? চিৎ হয়ে শুয়ে পড় না।" জয়ন্ত অল্প কথার মানুষ। তার ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি দেখা দিল।

ওদিকে ততক্ষণে উনুন খোঁড়া শেষ, ডালপালা জোগাড় ক'রে কানাই আগুন ধরাতে ব্যস্ত। সামনের

বড় সতরঞ্চিখানায় বসে চেঁচিয়ে গান ধরেছে প্রতাপবাবুর সেজ ছেলে সুনীল। তার স্ত্রী অণিমা আর দিদি রত্নাও গানে যোগ দিয়েছে। রত্না এককালে খুবই ভাল গাইত। ওর গলার খানকয়েক রেকর্ডও আছে। চর্চা এখনও রেখেছে, যদিও গলার সে মাধুর্য্য আর নেই। তবে গান গাইতে এখনও বড় ভালবাসে রত্না। ছিপছিপে চেহারা তার, বেশে, বাসে, আভরণে সুরুচির আভাস স্পষ্ট। ভাইবোনেদের মধ্যে সুনির্ম্মলের পরেই তার জন্ম। সুনীলের স্ত্রী অমিমার গলাও ভারী মিষ্টি, মোটাসোটা হাসিখুশি চেহারার মেয়েটি। বউদের মধ্যে সেই সবচেয়ে শান্ত।

একটু দূরে সরমা একাই তরকারির বোঝা নিয়ে বসেছেন। সংসারের কাজে পারতপক্ষে কাউকে ডাকতে চান না তিনি। নিজেই মরতে মরতে সব সামলে নেবেন—এধরণের একটা প্রচ্ছন্ন গর্ব্ব হয়ত মনের আড়ালে আছে। মনে মনে প্রত্যাশাও করেন এর জন্য প্রশংসা মিলবে। কিংবা হয়ত কোন আশাই নেই। নিছক একটা যান্ত্রিক নিয়মে কাজ করে চলেছেন শুধু; তবু নিজের ঘর-সংসারকে অন্যদের কাছ থেকে আড়াল করে রাখা তাঁর চিরকালের স্বভাব। যখন অল্পবয়স ছিল, সংসারে স্বামী আর ছেলেমেয়েরা ছাড়া কেউ ছিল না। না করলে চলেনি। এখন সাহায্যের লোক অনেক এসেছে, কিন্তু অভ্যাসের বদল হয়নি। স্বামী এ নিয়ে সামনেই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেন, ছেলেরা অনুরোধ করে, বউরা সাহায্যের জন্য ব্যগ্র হয়, মেয়েরা ত রাগই করে। কিন্তু তবু সরমা অটল, অন্যের মনের দিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি নিজে যা ভাল বোঝেন তাই করেন, তাতে বাড়ীর সকলে কষ্ট পেল কি না পেল, সে-সব কথা ভেবে দেখার দরকারও বোধ করেন না। তাঁর সঙ্গে কেউ-ই পেরে ওঠে না। দেখেশুনে সকলেই হাল ছেড়ে দিয়েছে। যে যার নিজের কাজ নিয়ে আছে, সরমার সংসার-জগতে অনধিকার প্রবেশের চেষ্টা আর কেউ করে না।

আজ কিন্তু সরমা একা আর পেরে উঠছেন না। সব দেখেশুনে সেজবউ অণিমা উঠে গেল, বলল, "মা, আপনি উঠুন না, আমি কুটে দিচ্ছি।"

"না, আমি একাই পারব, একা করলে আমার সুবিধা হয়। তোমরা গানটান কর না।" সরমার গলার স্বর কোমলতা-বিহীন। অণিমা মুখ নীচু ক'রে স'রে এল।

মেজছেলে সুধীর এরই মধ্যে দূরের গ্রামে গেছে হেঁটে, গ্রাম সম্বন্ধে জানবার আগ্রহ ওর অপরিসীম। গ্রামবাসীদের সম্বন্ধেও অনেক কথা জানতে চায় নিজে। ইকনমিক্‌সের ছাত্র ছিল, পল্লীর অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে সম্প্রতি গবেষণাও সুরু করেছে। স্ত্রী শান্তাও গেছে সঙ্গে, বাচ্চাকে বড় ননদ রত্নার জিম্মায় দিয়ে শান্তা কিছুদিন মুখ্য সেবিকা ছিল কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ব্লকে। তারও স্বামীর কাজে সমান উৎসাহ।

বউদের মধ্যে শান্তাই সবচেয়ে সুন্দরী, ভারী খোলামেলা চটপটে স্বভাবের মেয়েটি। বধূদের যতটা মানায় তার চেয়ে হয়ত একটু বেশী উচ্ছ্বাসই প্রকাশ করে ফেলে মাঝে মাঝে, এরজন্য সরমা তার ওপর বিশেষ খুশি নন, বড্ড অকারণে হাসে শান্তা, আড্ডা দিতে খুব ভালবাসে। বিয়ের চার বছর পরে একটি মেয়ে হয়েছে ওদের। এতদিন ত একেবারে অবাধ স্বাধীনতা ছিল; তাছাড়া সংসারের খুঁটিনাটি নিয়ে মেতে থাকাটা কোনদিনই পছন্দ নয় শান্তার। শাশুড়ীর অপ্রসন্নতা সত্ত্বেও ওর আনন্দ করতে বাধে না, জীবনটা বেশ উপভোগ্য ওর কাছে। বাড়ীর আর সকলের—বিশেষ করে দেবরদের সে বড় প্রিয়।

সুদীপ্তও ততক্ষণে এসে গানের দলে যোগ দিয়েছে, দূর থেকে ধূমায়মান কফির পেয়ালা দেখেই গান থামিয়ে দিল সকলে, সুদীপ্ত বলে উঠল, "বাঃ বাঃ, চমৎকার।"

কফি তৈরী করছিল বড়বউ অমলা। সে নিজে অধ্যাপিকা, স্বামীও ব্যবসায়ে দু'পয়সা করেছেন। অমলার চালচলনটা তাই একটু ভিন্ন ধরণের। ঠোঁটে সামান্য রঙের আভা, গালে পাউডারের প্রলেপটা একটু গাঢ়। যতটা খুশি হয়, তার চেয়ে একটু বেশী আনন্দের ভান করে। দেবররা মাঝে মাঝে ক্ষ্যাপাতে ছাড়ে না, অমলা বিশেষ ভ্রূক্ষেপ করে না। নিজেও সে স্পষ্টবাদিনী, তার কথাতেও ধার কিছু কম নয়। কফির পেয়ালাগুলি সতরঞ্চির উপর নামানো মাত্র সুদীপ্ত বলে উঠল, "বড় বউদি না হ'লে কি এসব হয়? আমি······আ···"

"নিজেরা ত কোন কম্মের নও। খালি বসে বসে পাকামো।" অমলা কথাগুলো বেশ আস্তে আস্তে চেপে চেপে বলে। সুদীপ্ত আর তাকে ঘাঁটাল না। নিঃশব্দে কফির পেয়ালায় চুমুক দিল। খানিক দূরে সঞ্জয় একাই গ্রামোফোনের কাছে বসে একমনে একটা ইংরেজী গান শুনছে।

গানের সঙ্গে বড় করুণ সুরে পিয়ানো বাজছে।

সঞ্জয়ের বাড়ীর কথা মনে পড়ল। দারিদ্র্য তার সর্ব্বস্ব গ্রাস করেছে। বছর পাঁচেক আগে তার মা প্রায় বিনা চিকিৎসায় মারা গেছেন। কবে কোন্ ছোটবেলায় বাবা মারা গিয়েছেন, থাকার মধ্যে ছিলেন দূর সম্পর্কের এক কাকা। তাঁরই সাহায্যে স্কুলের গণ্ডিটুকু পার হয়েছিল। তারপর থেকে প্রতাপবাবুর বাড়ীতেই আছে। প্রতাপবাবু এখানকার মানী লোক, দু'একটি ছেলেকে সর্ব্বদা তিনি বাড়ীতে রাখেন। সঞ্জয় টিউশনী ক'রে পড়ার খরচ চালায়। খাবার খরচ প্রতাপবাবু নেন না। প্রতাপবাবুর বাড়ীতে এমনিতে ভালই আছে সে, তবু মাঝে মাঝে একান্ত আপনজনের জন্য কাঙাল হয় মন। এ পৃথিবীতে তার নিজের বলতে কেউ নেই, কিছু নেই, এটা যেন ভাবতে ইচ্ছা করে না।

গ্রামোফোনের সুর জনা আর রমার কানেও পৌঁছেছিল। রমা কলকাতার একটা স্কুলে চাকরি করে। বছর চারেক হ'ল বি-টি পাশ করেছে, বিয়ে এখনও করেনি। ভাইবোনেদের মধ্যে সেই সবচেয়ে ছোট। জনা তার একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু। রমা জনার মুখটা ধরে নিজের দিকে ফেরাল, বলল, "আর কতদিন অপেক্ষা করবি জনা? একটা হেস্তনেস্ত কর্।"

"কে আমি?" জনা হাসল। তার ফর্সা গালে টোল খেল। কানের সবুজ পাথরের দুলে একটু আলোর ঝিলিক্। পরক্ষণেই বিষণ্নতায় সব আচ্ছন্ন।

"কেন? অরুণবাবু চিঠি লেখেন না?"

"প্রথম প্রথম লিখতেন, এখন লেখেন না।"

"কেন?"

"কি জানি! থাক্ না ওসব কথা। চল্, গানটা শুনে আসি।" জনা রমার হাত ধরে মৃদু আকর্ষণ করল।

ওদিকে ততক্ষণে বাঁধাকপির ঘন্ট নেমেছে, মাংস চাপাচ্ছেন সরমা, ঘেমে নেয়ে উঠেছেন তিনি। পিক্‌নিকে ঘটা না হ'লে তাঁর মন ভরে না। ছেলেরা অবশ্য বলেছিল, "শুধু খিচুড়ি হ'লেই চলবে মা, খাবার জন্য ত যাওয়া নয়, বেড়াবার জন্য যাওয়া।" সরমা অবশ্য যথারীতি তাদের কথায় কান দেননি। নিজেই খেটে চলেছেন, কাউকে সাহায্যের জন্য ডাকছেনও না।

প্রতাপবাবু সতরঞ্চির ওপর আধশোয়া হয়ে একখানা বই পড়ছিলেন। পড়া তাঁর প্রাণ। জীবনে অনেক সংগ্রাম ক'রে আজকে সাফল্যের মুখ দেখেছেন তিনি। ম্যাট্রিক পাশ করার আগেই বাবা গেলেন মারা। কোনমতে আই. এ.-টা পাশ করলেন এর-ওর সাহায্যে, তারপর ত সব অন্ধকার। মা আর ছোট দু'টি ভাই তাঁরই মুখ চেয়ে ছিল। পড়া আর হ'ল না, চাকরি নিলেন কলকাতারই একটা স্কুলে, তারপর রাত জেগে পড়া সুরু করলেন বাড়ীতে। বি. এ. পাশ করলেন, ইকনমিক্সে অনার্স নিয়ে। আস্তে আস্তে চাকরিতে উন্নতি হ'ল, শিক্ষকতা ছাড়লেন। শেষের দিকে বেশ বড়সড় পদই পেয়েছিলেন একটা কমার্শিয়াল ফার্ম্মে, বিলেতেও গিয়েছিলেন বছর দু'য়েকের জন্য। এখন অবসর নিয়েছেন। স্কুলে চাকরি করার সময় মা হঠাৎ মারা গেলেন, সংসার দেখার লোক আনতে হ'ল। সরমা এলেন তাঁর ঘরে। সরমার রূপ ছিল না। প্রতাপবাবু নিজে সুপুরুষ। মনে মনে এর জন্য প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার ছিল তাঁর। সরমার রূপহীনতার জন্য ক্ষোভ ছিল কি না তা তিনি নিজেও জানেন না। কিন্তু অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে রূপের কামনা তাঁর ছিল। এই অভাববোধটাকে অবশ্য সব সময় লুকিয়ে রাখতেই চাইতেন সরমার কাছ থেকে। প্রথম দিকে স্ত্রীর সঙ্গে নিবিড় যোগ ছিল তাঁর—প্রতাপবাবু নিজেও এক-একবার অবাক্ হয়ে ভাবেন, যে সরমা তাঁকে কাছে না পেলে শুতে চাইত না, অভিমান করত, সেই আজকাল অতি তুচ্ছ কারণে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, নয়ত সুকঠিন আবরণের আড়ালে নিজেকে ঢেকে রাখে।

প্রতাপবাবুর মনে যাই থাক, মুখে তিনি বড় বেশী কটু কথা বলেন। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ তাঁর সবার সঙ্গে—সরমার সামান্যতম দোষ-ত্রুটি নিয়ে অনেকবার সকলের সামনে আঘাত করেছেন তাঁকে। সরমা চিরকালই শান্তস্বভাবের, মুখে তিনি কখনও কিছু বলেন নি, হয়ত আড়ালে কেঁদেছেন। নিজের অজ্ঞাতে ধীরে ধীরে সরে গেছেন। স্বামীর ওপর একটার পর একটা অভিযোগ পুঞ্জীভূত হয়েছে তিলে তিলে। এখন তিনি অতিমাত্রায় আত্মনিমগ্না, একটু অস্বাভাবিক। যিনি এককালে স্বামীর সব কথা নির্ব্বিবাদে মেনে নিতেন, তিনি আজকাল তাঁকে কোন ব্যাপারে গ্রাহ্য করেন না। এক তিল মমতায় যা অতি সহজে হ'তে পারত, নিরন্তর আঘাতে সেই কাজই দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে।

প্রতাপবাবু বই পড়তে পড়তে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন, বিলেতে গিয়ে এই ক'বছর আগে ক্যাথারিণ বার্নেট নাম্নী শ্বেতাঙ্গ ললনার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন তিনি, আজীবন যে রূপ-কামনা অন্তরের কোন অতলে

গোপন ছিল, প্রৌঢ় বয়সে সেই কামনার কি নিদারুণ আত্মপ্রকাশ !

মাংস নাড়তে গিয়ে হাত প্রায় অবশ হয়ে আসছে সরমার। চাকর কানাই এসে হাতাটা নিল তাঁর হাত থেকে, বিশেষ বাধা দিলেন না। ঝি শঙ্করীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "ষ্টোভে একটু চা কর্‌ ত।"

সুদীপ্ত পেছন থেকে এসে হাত ধরল, "চল ত মা, একটু বসবে। জনা কবিতা পড়বে আর মেজ বউদিও এসে গেছে, ও-ও ত ভাল কবিতা পড়ে।"

নিরুৎসাহ স্বরে সরমা বললেন, "তোরা গানটান কর্‌ না। পর্ণা, পম্পা, টুটুল, কাজল সব গেল কোথায় ? বেশ, গানের আসর জমা আমি এখুনি আসছি। চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে একটু চাঙ্গা হই।" বলে একটু হাসলেন। এর মধ্যে সুনীল জনাকে ডেকে এনেছে, 'সঞ্চয়িতা'র পাতা ওল্টাচ্ছে জনা। সরমাও এসে গেলেন। নাতি-নাতনীরা সবাই মিলে গান ধরল, "বসন্তে ফুল গাঁথল।"

সুদীপ্ত জনার পাশে দাঁড়িয়ে বলল, "জনা, একটু এদিকে এস। তোমার কবিতা শুনব।"

বনপুলক গাছের তলায় বসে সঞ্জয় সামনের ছোট ছোট ঘাসের ফুলগুলিকে এক মনে দেখছিল। সুদীপ্ত এসে বলল, "এই সঞ্জয়, কবিতা ত খুব ভালবাস, শোন না, জনা কি চমৎকার পড়ে।"

জনা সঞ্চয়িতার পাতা খুলে সুরু করল, "শুধু অকারণ পুলকে।" শেষ হবার আগেই জয়ন্ত এসে দাঁড়াল ; সুদীপ্তর দিকে তাকিয়ে বলল, "কি রে, এখানে তিতির মেলে না, কিংবা বুনো হাঁস ?"

পড়ায় ছেদ পড়ল। জনা বইয়ের ফাঁকে আঙুল রেখে সামনের নদীটার দিকে তাকাল, রমার কাছে একটু আগে শুনেছে, বর্ষায় নাকি এই নদীটা আশ্চর্য্য হয়, একেবারে দুর্ব্বার, প্রাণের প্রবাহে বেগবতী। অথচ এখন ক্ষীণস্রোতা, তপস্যা-ক্ষীণা পার্ব্বতী। রূপের উচ্ছলতা এখন একটুও নেই।

সুদীপ্ত জয়ন্তকে বলল, "শিকারের খবর বড়দা ভাল জানবে ; শঙ্করদাও জানতে পারেন। আমরা মাষ্টার মানুষ, ওসব কি আর পোষায় ?"

সঞ্জয়ও নদীটার দিকে তাকিয়ে ছিল ; গত বছর সে একা এসেছিল এখানে। ছবি আঁকতে। তখনও নদীটা যেমন ছিল, আজও তেমনি—একটুও বদলায় নি, অথচ—সঞ্জয়ের মনে ত কত বদল হয়েছে। হঠাৎ মনে হ'ল নদীর যে মন নেই, তাই বেশ আছে ও। মনের বালাইটা ভাল নয়।

সুদীপ্ত জনার কথা ভাবছিল, জনা রমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু—সেই সূত্রেই বাড়ীর সকলে, এমনকি সে নিজেও, তাকে তুমি সম্বোধন করে—কিন্তু তার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানে না। মাঝে মাঝে মনে হয়, ওর হঠাৎ বিষণ্ণ হয়ে-আসা চোখ দু'টির আড়ালে একটা বেদনার্ত্ত কাহিনী আছে, কিন্তু সে সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করতে বাধে।

অণিমা কতগুলি কাঁচের গ্লাস ধুচ্ছিল। সুনীল পাশে এসে দাঁড়াল। স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলল, "তুমি ভাল করে গানটান করলে না কেন ? গীটারটাও ত আননি ?"

"দূর, এত খাওয়া-দাওয়া হৈ হৈ-এর মধ্যে আর ওসব হয় না।"

"সত্যি।" সুনীল একটা নিঃশ্বাস ফেলল।

সুনীল শিউড়ির একটা অফিসে কাজ করে, দুদিনের ছুটিতে বাবা মা'র কাছে এসেছে। ভাইয়েদের মধ্যে আরও সকলে দূরেই থাকে, কেউ কলকাতা, কেউ বর্দ্ধমান।

প্রতাপবাবু ওদিক্‌ থেকে তাকালেন। "সুনীল, এদিকে একবার শোন ত।"

সুনীল তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। প্রতাপবাবু তখন উঠে বসেছেন ; বইখানা নামিয়ে রেখে বললেন, "কাজের কাজ একটা কিছু কর, সাইকেল করে নিবারণকে একবার ডেকে নিয়ে এস, এই ত কাছেই ?"

সুনীলের ঠিক এখন যাবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু কারও কোন কথাতে প্রতিবাদ জানান তার স্বভাব নয়। সংসারে তার নিজের স্থানটুকু আদায় করে নিতে জানে না সে, লোকে তাই তাকে বঞ্চিত করে, জোর দেখাবার মত অভদ্র নয় বলে অক্ষমও ভাবে। প্রতাপবাবুও সর্ব্বদা সুনীলেরই সাহায্য চান সব বিষয়ে, জানেন সে কিছু এড়াতে পারে না।

নিবারণকে ডাকতে গেল সুনীল।

প্রতাপবাবুর প্রায় সারা জীবন জুড়েই অর্থের অভাব ছিল, মিতব্যয়ী তাঁকে বাধ্য হয়ে হ'তে হয়েছিল। তারপর সেটাই অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। আজকাল সংসারে অর্থের প্রাচুর্য্য। ছেলেরা সবাই চাকরি করে—সাঁইথিয়ায় নিজেদের বাড়ী আছে। প্রতাপবাবু নিজেও বেশ কিছু জমিয়েছেন, তবু পুরাণো স্বভাবটাকে ছাড়তে পারেন নি। নিজের শখের জন্য কখনও কিছু খরচ করেন না, অন্যদের শখও মেটাতে চান না। পয়সা-কড়ি খরচের

বেলায় এখনও তিনি আগের মতই হিসেব করে চলেন। সবক্ষেত্রে অবশ্য কথাটা খাটে না। আজ যেমন নিবারণকে ডেকে পাঠালেন। নিবারণ তাঁর অফিসের পুরাণো বেয়ারা। সম্প্রতি এখানেই আছে। এখন বড় দুরবস্থা তার, প্রতাপবাবুই প্রতিমাসে কিছু কিছু সাহায্য করেন। আজও এখানে ডাকলেন, বাড়ীর ছেলেদের নিয়ে যদি আসে, ভালমন্দ খেতে পাবে। সরমা একেবারেই পছন্দ করেন না বলে বাড়ীতে ডাকতে ভরসা পান না। এখানে সরমা বিশেষ কিছু বলবেন না ভেবে ডাকতে সাহস পেলেন। মিছিমিছি অশান্তির পক্ষপাতী নন তিনি। বছর চারেক আগে কলকাতার বাড়ীতে যা কাণ্ড হয়েছে, তার জন্য তিনি নিজেই সবটা দায়ী নন। সরমার উপর অবিচার করেছেন তিনি ঠিকই, কিন্তু সরমাও তাঁকে বুঝতে চান নি, আস্তে আস্তে দূরে সরে গেছেন। সরমার মধ্যে কোন উত্তাপ নেই, একমাত্র রাগের তাপ ছাড়া। অনুরাগের এতটুকু অবশেষ খুঁজে পান না। তাঁর ঐ শীতলতায় জীবনকে বারে বারে বিস্বাদ মনে হয়েছে। ক্যাথারিণের কাছে গিয়েছিলেন একটু তপ্ত আবেগের আশায়। পরিণয়ে যে প্রেমের পাত্র চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে, সেই পাত্রের মদিরার আস্বাদ পেতে চেয়েছিলেন বিগত যৌবনে। কিন্তু বিষে তাঁর কণ্ঠ ভরে উঠেছিল। ফিরে আসার পর যখন সরমা সব জেনেছিলেন, তিনি তাঁর মুখদর্শন পর্য্যন্ত করতেন না। শুধু সন্তানদের মায়ায় তাঁকে ছাড়তে পারেননি। সংসার আঁকড়ে রয়েছেন, কিন্তু কথা পর্য্যন্ত বন্ধ ছিল তাঁর সঙ্গে। সাঁইথিয়ায় বাড়ী করেছেন বছর দুই। এখানেই তাঁর পিতৃনিবাস ছিল। আজকাল সরমার সঙ্গে সম্বন্ধটা আগের থেকে একটু সহজ হয়েছে, কিন্তু সবটাই তিক্ত আস্বাদে ভরা। সেই প্রথম যৌবনের মাধুর্য্য আজ আর একটুও অবশিষ্ট নেই সরমার মধ্যে। বয়সের তুলনায় বুড়িয়ে গেছেন অনেক, সাজসজ্জায় কোন দিনই বিশেষ আগ্রহ ছিল না, হয়ত রূপহীনতার গোপন ক্ষোভই এর কারণ। প্রতাপবাবুর আজও মনে পড়ে, রং কালো বলে কোন দিন লাল টিপ পরতেন না সরমা। একবার এক শিশি আতর এনে দিয়েছিলেন, জীবনে বোধ হয় স্ত্রীকে প্রথম উপহার। প্রয়োজনের অতিরিক্ত অন্য কিছু। সরমা কিন্তু নিজে তার থেকে একটুও খরচ করেন নি। সুনির্ম্মলের বিয়ের পর অমলাকে দিয়ে দিয়েছিলেন। সত্যিকারের সব সম্বন্ধ চুকে যাওয়া সত্ত্বেও এ ঘটনায় প্রতাপবাবু আহত হয়েছিলেন। যদিও মুখে কিছুই বলেন নি।

সামনের দিকে তাকিয়ে প্রতাপবাবু দেখলেন, নিবারণ আর তার ছেলে সন্তোষ আসছে। সুনীল ত এখনও এল না। নিবারণ এসে হেঁট হয়ে প্রণাম করল, প্রতাপবাবু স্নিগ্ধ হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি রে, কেমন আছিস্? সেজদা কোথায় গেল?"

"আজ্ঞে, উনি পদ্ম আনতে গেলেন, আমাদের পুকুরে অনেক ফুটেছে।"

"যা, গিন্নীমার সঙ্গে দেখা করে আয়।"

নিবারণকে দেখে সরমা অপ্রসন্ন মুখে তাকালেন, বিরক্তি গোপন ক'রে একটু হাসবার চেষ্টা ক'রে বললেন, "কি রে, তুই কখন?"

"আজ্ঞে, বাবু ডেকে পাঠালেন।" নিবারণ বিনয়ে বিগলিত হ'ল।

"ও।" এবার আর সরমার কণ্ঠে বিরক্তি গোপন রইল না। নিবারণ একটু তফাতে গেলে নিজের মনেই বলে উঠলেন, "ওঁর সব তাতে বাড়াবাড়ি।"

বড় বধূ অমলার কানে গেল কথাটা, সেও শান্তার দিকে তাকিয়ে বলল, "বাবার সব তাতে অদ্ভুত কিছু একটা ক'রে বসা চাই।"

শান্তা এ কথার কি জবাব দেবে ভেবে পেল না। কথাটা অস্বীকার করা যায় না। সাধারণতঃ লোকে যা করে না, প্রতাপবাবু ঠিক তাই করেন। এ জন্য অনেক সমালোচনা সহ্য করতে হয় তাঁকে। বিরক্তির বোঝা বইতে হয়। তবু সবার থেকে আলাদা হয়ে থাকবার এই অনুভূতিটুকু তাঁর ভাল লাগে। তার জন্য যত তিক্ততাই তাঁকে সহ্য করতে হোক না কেন।

শান্তার মেয়ে স্বপ্না ঘুমিয়ে পড়েছে। সতরঞ্চির উপর বিছানা পেতে দিল বড় ননদ রত্না। স্বপ্নাকে শুইয়ে দিল শান্তা। রত্না কাজলকে ডেকে বলল, "ছোটদের সবাইকে ডেকে আন্, রান্না ত তৈরী, খেয়ে নে তোরা।"

প্রতাপবাবু উনুনের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে সরমাকে উদ্দেশ করেই বললেন, "শুনছ, নিবারণ আর সন্তোষকেও এ সঙ্গে বসিয়ে দাও, ওদের বাড়ীতে কি কাজ আছে।"

সরমা তাঁর কথার কোন জবাব দিলেন না। প্রতাপবাবু অগত্যা রত্নাকে ডেকে বললেন, "নিবারণদের এর সঙ্গে বসিয়ে দিস্, ওরা আমাদের মত অকর্ম্মা ত নয়। ওদের বাড়ী ফিরতে হবে তাড়াতাড়ি।" তাঁর স্বরে উত্তাপ নেই, কিন্তু কথার মধ্যে একটু খোঁচা ছিল। হঠাৎ সরমা তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচিয়ে ওঠেন, "তুমি সব তাতে

সর্দারি কর কেন বল ত? নিবারণদের ডেকেছিলে কেন? ওদের এখন বসান হবে না। পরে চাকর-বাকরদের সঙ্গে বসবে।"

বহু যুগ আগের লাজনম্রা বধূটির সঙ্গে আজকের সরমার কোন মিল নেই। প্রতাপবাবু আবার তাঁর নিজস্ব জায়গায় গিয়ে বসলেন, চশমা খুলে কাঁচ দুটো মুছলেন ভাল করে। তার পর সামনের নদীটার দিকে তাকালেন। বর্ষায় এই নদীতে কি ঢলই নামে, ঠিক ক্যাথারিণের যৌবনও তাঁর মনে এমনি বন্যা এনেছিল। ভাসিয়ে নিয়েছিল তাঁর যুক্তি বুদ্ধি সব। বহুদিনের বুভুক্ষু মানুষের মত নিঃশেষে উপভোগ করতে চেয়েছিলেন সেই তপ্ত ফেনিল পানপাত্রের মদিরা। তার সঙ্গে তিনি সুইজারল্যাণ্ডে বেড়াতে গিয়েছিলেন। কিন্তু যে যৌবনে এত তীব্রতা, রক্তে যার উদ্দাম কলরোল, এই বিগত-যৌবন প্রৌঢ়ের প্রতি সেই মোহময়ীর আকর্ষণ চিরস্থায়ী হয় নি। হওয়া সম্ভবও নয় হয়ত। স্খলনের কলঙ্ক আর বঞ্চনার আলা নিয়ে আবার ফিরে এসেছেন নিজের সংসারে। কিন্তু যে স্থানটি হারিয়েছিলেন, তাকে আর ফিরে পান নি। ছেলেরা তাঁকে শ্রদ্ধা কতটুকু করে জানেন না। সম্মান তাঁকে সকলেই দেয়, জ্ঞান তাঁর অগাধ। আলাপ-আলোচনায় এবং কর্ম্মতৎপরতায় তাঁর জুড়ি নেই। মাঝে মাঝে এর-ওর প্রতি দাক্ষিণ্যও দেখান, এক কথায় তিনি সকলের কাছে বেশ আকর্ষণের—বয়স ষাটের কোঠা পেরিয়েছে, কিন্তু রসবোধ তাঁর অপরিসীম, তীক্ষ্ণতারও অভাব নেই। ঠিক জায়গায় স্পষ্ট কথা বলতে তাঁর বাধে না। জীবনে একবার শুধু বিচার-বুদ্ধি হারিয়েছিলেন। বিদেশের নিঃসঙ্গতা, সরমার উত্তাপহীন সান্নিধ্যের স্মৃতিই হয়ত এর কারণ। তা না হ'লে সহজে ত তিনি হৃদয়-দৌর্ব্বল্য প্রকাশ করেন না কখনও। তাঁর অতীত ত সম্পূর্ণ মালিন্যহীন।

ছোটরা সব খেতে বসে গেছে।

কাজল চেঁচাচ্ছে, "দিদা, আমি মেটে পাই নি। এদিকে মা খালি পম্পাকে বেছে বেছে মেটে দিচ্ছে।"

সরমা স্নিগ্ধ হেসে সকলকে পরিবেশন করছেন। একটু আগের ক্রুদ্ধমূর্ত্তি কোথায় মিলিয়ে গেছে এখন আবার সেই কোমলা মাতৃরূপ। সারাজীবন ধরে এই মায়ের ভূমিকাকেই আঁকড়ে ধরেছেন সরমা, সন্তানদের কেন্দ্র করেই তাঁর সব অস্তিত্ব। মা হওয়া ছাড়া আর কোন আকাঙ্ক্ষাই যেন নেই তাঁর জীবনে।

শান্তা সামনে সতরঞ্চিতে বসে সুবীরের সঙ্গে গভীর আলোচনায় মগ্ন, আজকে গ্রামে গিয়ে বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে বেশ অন্তরঙ্গ কথাবার্ত্তা হয়েছে। গোয়ালাদের মেয়ে রাণী ত গোটা কয়েক ডাঁশা পেয়ারাই দিয়ে দিয়েছে তার হাতে। এ সময়ে পেয়ারা দুর্লভ, শান্তা ত খুব খুশী। সুবীর অন্যান্য সমস্যার কথা আলোচনা করছিল। শান্তা স্বামীর মুখের দিকে চেয়েছিল একদৃষ্টে, কথা বলবার সময় অদ্ভুত উজ্জ্বল দেখায় সুবীরের চোখ দু'টি। নিজে যা বিশ্বাস করে, সেটা খুব জোরের সঙ্গে বলা তার স্বভাব।

রমা রেকর্ড শুনতে শুনতে পাশে তাকিয়ে দেখে, জনা কাছাকাছি নেই। কোন্ ফাঁকে উঠে গেছে। জনা একা একা ঘুরছিল—আশেপাশে শরঝোপের আড়ালে খসখস আওয়াজ, তীর-ধনুকধারী দু'একটি সাঁওতাল যুবককে দেখা গেল, বোধ হয় খরগোসের সন্ধানে চলেছে। ঝোপেঝাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের নিরাবরণ নিকষ কালো দেহ রোদের আভায় চকচক করছে, নিম্নাঙ্গ সামান্য বস্ত্রে আবৃত, গলায় ছোট-বড় পুঁতির মালা। দৃষ্টিতে স্নিগ্ধ কৌতূহল ছাড়া আর কিছু নেই। ওদের পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল জনা। খানিক দূরে বালির চড়ায় বসে হঠাৎ তার পুরীর কথা মনে পড়ল। সেখানেও এমন কৃষ্ণকায় নুলিয়ার দল জাল ফেলে মাছ ধরত সর্ব্বদা, তাদের চোখেও এমন এক কৌতূহলের ছায়া দেখেছিল সে। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার পর একবার পুরী গিয়েছিল জনা। মনে পড়ল সমুদ্রের তরঙ্গোচ্ছ্বাস, ঝাউ বনের মর্ম্মর। সঙ্গে সঙ্গে মনে এল কোনারক। অতীতের কোন্ অনামা শিল্পী তার স্বাক্ষর রেখে গেছে দেবতার মন্দিরে। জনা বিমোহিত হয়ে গিয়েছিল, তারুণ্যের ঘোর তখন সবেমাত্র লাগতে সুরু করেছে মনে, যৌবনের বিহ্বল উন্মাদনা সেই প্রথম অনুভব করেছিল। তাদের সঙ্গে ছিল পিসতুতো দাদা অজয়, জনারই প্রায় সমবয়সী। ওর তন্ময় মূর্ত্তির দিকে তাকিয়ে বলেছিল, "কি রে, তুইও কি পাথর হয়ে গেলি নাকি এখানে এসে?"

জনা হেসে বলেছিল, "সত্যি অজয় দা, ইচ্ছে হয় মূর্ত্তি হয়ে যেতে। ওরা যেন আমাদের চেয়েও জীবন্ত।"

"তোকে মূর্ত্তি হ'লে ভালই মানাবে।" অজয় হেসে বলেছিল।

জনা সে কথার কোনো জবাব দেয় নি। আজ এই

নির্জ্জন নদীর ধারে বালির ওপর বসে সেদিনের আশ্চর্য্য অনুভূতি আবার অনুভব করছিল। প্রথম বসন্তের তীব্র মাদকতা কেমন যেন নেশা ধরিয়ে দেয়। কিন্তু কত বসন্তই ত এল জীবনে…।

উঠে পড়ল জনা, দূরের ঘন বনের ছায়া-স্নিগ্ধতা, আর খররৌদ্রদীপ্ত বালির চড়ার দিকে তাকিয়ে ব্যানী শংকর আর অন্নপূর্ণার যুগল রূপের কথাটা মনে আসে। প্রকৃতিতেও কি আশ্চর্য্য ভাবে এদের প্রকাশ ঘটেছে। জনার জীবনেও কি তাই? শুধু কি মরুভূমির স্বাদই সে পেয়েছে? স্নিগ্ধ সরসতাও ত কম পায় নি? বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান, ধনীর সংসারে তার প্রাপ্তির অন্ত ছিল না। মায়ের মমতা, বাবার আদর যে তাকে নিঃশেষে ভরে দিয়েছে। মনে পড়ে, ছোট বেলায় কোন কিছু তাকে চাইতে হয় নি কখনও, চাইবার আগেই সে সব পেয়ে গেছে।…হঠাৎ চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে গেল, দূর থেকে রমা ডাকছে…"এই জনা—"

উঠে পড়ল জনা, তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল।

সঞ্জয় বাচ্ছাদের নিয়ে একটা মজার খেলা খেলছে। সুদীপ্তর ঘড়িটা নিয়ে লুকিয়ে রেখে এসেছে। বাচ্ছাদের সেটা খুঁজে বের করতে হবে। বেশ হুল্লোড় চলছে। ওদের দেখে মাঝ পথে জনাও দাঁড়িয়ে পড়ল।

সঞ্জয় হাসিমুখে বলল, "আপনিও খেলবেন নাকি?"

জনা মৃদু হেসে জবাব দিল, "সে বয়স কি আর আছে?" তার পর একটু কৌতুক-মাখা সুরে বলল, "তুমি খেল ওদের সঙ্গে।" সঞ্জয় এমনিতেই একটু লাজুক প্রকৃতির। কথা সে কম বলে। বিশেষ করে জনার কথার উত্তরে কি বলবে ভেবে পায় না। জনাকে বড্ড খেয়ালী মনে হয় অনেক সময়, এই হাসছে, গল্প করছে, হঠাৎ অন্যমনস্ক গম্ভীর হয়ে গেল। এই ত কাল রাত্রে সবাই মিলে তাস খেলতে বসা হয়েছিল, খেলা গল্প সমান তালে চলছে, কথায় কথায় ছবি আঁকার কথা উঠল। সুদীপ্ত হঠাৎ বলে উঠল, "পোর্ট্রেট ত তুমি খুব ভাল আঁক সঞ্জয়, বউদিদের একেকটা আঁক না?"

শান্তা বউদি তখুনি বলে উঠল, "আহাঃ, যা একেকখানা চেহারা আমাদের—পোর্ট্রেট আঁকার মতই বটে। তার চেয়ে বরং জনার ছবি আঁকলে কাজ দেবে।" বলেই সে একটু মুখ টিপে হাসল।

ওর কথার ইঙ্গিতটুকু সঞ্জয় তখন ঠিক বোঝে নি, তার মনে হয়েছিল সুদীপ্ত যেন অকারণেই কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। ভারী গম্ভীর লেগেছিল রমার মুখ। জনা তার আগেই কি যেন হেসে হেসে বলছিল সঞ্জয়কে, হাসিটা হঠাৎই নিভে গেল। একটু বাদেই "বড্ড ঘুম পেয়েছে" বলে উঠে গিয়েছিল সে।

এসব কথা ভাবতে ভাবতে নদীর দিকেই তাকিয়েছিল সঞ্জয়, ভাবছিল জনার প্রকৃতিও কি ঠিক এই নদীর মত? বর্ষার সময় এই নদী প্রাণের আবেগে উচ্ছল হয়ে ওঠে, প্রখর গ্রীষ্মে আবার ক্ষীণকায়া, প্রাণপ্রবাহহীন। জনাও ত ঠিক এমনি বিচিত্ররূপিণী। নদীর মতই কি তার মনেও কোন রেখা পড়ে না? হাসি আনন্দ সবই তার বাইরের—ভেতরে এর কোন চিহ্ন নেই?

দূর থেকে গানের সুর ভেসে এল, সুদীপ্ত ভরাট গলায় গাইছে, "তোমার খোলা হাওয়া।" সুবীরও এসে তার সঙ্গে যোগ দিল। সুনীল ততক্ষণে একরাশ পদ্ম নিয়ে ফিরেছে, সে ত সাইকেলের ওপর থেকেই গান সুরু করে দিল। সুনির্ম্মলের কোনকালেই গান বাজনায় উৎসাহ নেই।—শঙ্করবাবু ব্যবসায়ী মানুষ। কিন্তু তাঁর যে গানে একেবারেই রুচি নেই, সে কথা বলা যায় না। একদা প্রথম যৌবনে রত্নার গান শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। আজ অবশ্য তাঁদের ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত আলোচনা বেশ জমে উঠেছে; এখন ঠিক গান শোনার সময় নয়। গানের সুর কানে আসতেই রত্না পরিবেশন ফেলে ছুট দিল। অণিমা শাশুড়ীর পেছন পেছন ঘুরছিল, একটু সাহায্য করার আশায়। পেছন থেকে বড় মেয়ে মল্লিকা এসে বলল, "মা, এস না, বাবা ডাকছে।" কথাটা সরমার কানে যাওয়া মাত্রই তিনি বললেন, "যাও বউমা।"

অনিচ্ছাসত্ত্বেও অণিমাকে যেতে হ'ল।

পথ দিয়ে একদল হাটুরে চলেছে, ধুলোমাখা পা, কারও কোলে উলঙ্গ শিশু। কেউ বা এক ঝাঁকা শশা নিয়ে চলেছে। ঔৎসুক্য ভরে তারা তাকালেন, কেউ কেউ দাঁড়িয়ে পড়ল।

জনাও এসে রমার পাশে বসে পড়ল। জনা গান ভালবাসে খুব, নিজে বিশেষ গায় না। সুদীপ্ত তার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমিও গাও না জনা, সব সময় ত গুন গুন কর।"

সঞ্জয়কে ডেকে সুনীলও বলে, "এই সঞ্জয়, এস, লেগে পড়। ওদিকে পম্পা জয়ন্তর হাত ধরে টানাটানি করছে, "তুমি এস না জয়ন্ত কাকু, গাইবে।"

জয়ন্ত তার কথার কোন জবাব দিল না। নদীর কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াল। দুত্তোর ছাই, এ বাড়ীতে ত সারাদিন গানবাজনার চোটে প্রাণ অস্থির। এখানে

এসেও খালি গান আর গান। কি কুক্ষণেই কয়েকখানা পুরণো বিলাতী রেকর্ড এনে সুদীপ্তর হাতে দিয়েছিল। সকলেই বোধ হয় ভেবেছে, গানটান নিয়েই দিন কাটে তার। আসলে বাড়ীতে পড়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল রেকর্ড-গুলো।

এসব বনজঙ্গলে এলে তার কিন্তু বার বার শিকারের কথা মনে হয়। সত্যি! শিকারের এমন সুযোগ শীগগির আর আসবে নাকি? রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়ে আর কবিতা পড়ে ওদের রক্তে আর কোন তাপ নেই—খালি ফুল, গান আর চাঁদের আলো। প্রতাপবাবু তার মামা হন, তাঁকে সে মনে মনে শ্রদ্ধা করে। কিন্তু তাঁর ছেলেদের প্রতি তার বিশেষ কোন টান নেই। ওরা এ যুগের অযোগ্য। অবশ্য সুনির্মলকে ওদের দলে ফেলা চলে না, সে সত্যিই কাজের ছেলে। ব্যবসাতে বেশ পয়সা করেছে। অর্থ ও সামাজিক প্রতিপত্তির অভাব নেই তার। জয়ন্তকেও রীতিমত লোহা পিটিয়ে হাতুড়ি ঠুকে উঠে দাঁড়াতে হয়েছে। সারাক্ষণ ঐ নরম সুরে গান করলে আর সুবীরের মত প্রেম করলে এসব হ'ত না। এক সময়ে অবশ্য সেও সুরের চর্চ্চা করত। স্কুলে পড়ত তখন, বর্মায় থাকত। বাবা বেশ বড় চাকুরে ছিলেন, ওই ছিল তাঁদের একমাত্র সন্তান। এক গোয়ানীজ ভায়োলিনিষ্টের কাছে বেহালা শিখত। জীবনে তখন পদে পদে সুরের বিচ্যুতি ঘটে নি। গান-বাজনা, লেখা-পড়া নিয়েই দিনগুলি কাটত। আই. এস-সি পাশ করার পরেই বাবা গেলেন মারা। তার পর এল যুদ্ধ। বর্মা ছেড়ে আসতে হ'ল তাদের। অনেক সংগ্রামের মুখোমুখী হ'তে হ'ল, জীবন-যুদ্ধের প্রচুর লাঞ্ছনা জুটল কপালে, তিলে তিলে জানল, জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পথটা কি। পদে পদে অতল অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে বেঁচে থাকবার অনেক তথ্য জেনে নিল। সংগ্রামের ফল ফলল, বিলেতের ডিগ্রী জুটল। বড় চাকরিও পেল সে।

দূরে একটা তিতির দেখা গেল যেন। বন্দুকটা নিয়ে এল গাছের গোড়া থেকে। টিপ করবে, এমন সময় জনা আর রমা এসে দাঁড়াল প্রায় তার বন্দুকের সামনা-সামনি। গুলী ছোঁড়া আর হ'ল না, নামিয়ে রাখতে হ'ল বন্দুকটা। তিতিরগুলো উড়ে গেল। জনা হেসে হেসে কি বলছে রমাকে। ওর সাদা শাড়ীটা ঠিক হাঁসের গায়ের মত ধবধবে। গতিভঙ্গিও তার তাই। রাজহংসীর মত দাম্ভিকাও বটে। চোখের দৃষ্টিতে এতটুকু প্রশ্রয় নেই। অথচ প্রায় সব সময় হাসে মেয়েটি। একটু আগেও ত কি যেন বলল তাকে হাসতে হাসতে, সাজানো দাঁতগুলো ঝক্‌ঝক্ করে উঠল।

পেছন থেকে সুনির্ম্মলের গলা শোনা যায়, "এই জয়ন্ত, তোর লাইটারটা দে ত। আমারটা যে কোথায় ফেললাম খুঁজে পাচ্ছি না।"

জয়ন্ত তখনও উড়ে-যাওয়া তিতিরগুলোর দিকেই তাকিয়েছিল, জনা আর রমা সেইরকমই দাঁড়িয়ে সেখানে। সুনির্ম্মল জয়ন্তর দৃষ্টি অনুসরণ করে মৃদু হাসল। বলল, "কি রে, তোরও মনে ধরেছে নাকি?"

"অত সহজে কি কথা দেওয়া যায় নির্ম্মল দা। মা আরও দু' তিনজনকে দেখে এসেছেন। তাদের দেখি—কোন্‌টি রূপগুণে শ্রেষ্ঠ সেটা বিচার করি আগে।" জয়ন্ত মুচকি হেসে জবাব দিল। এসব ব্যাপারে ভাবাবেগকে একেবারে প্রশ্রয় দেয় না সে।

ওদিকে সরমার ধমকের চোটে কানাইয়ের অবস্থা সঙ্গীন। সে ত নদীর জলে পা ডুবিয়ে বসে আছে, সরমা একাই কলাপাতা ধুয়ে খাবার ব্যবস্থা করছেন। শঙ্করীকেও পাত্তা দিচ্ছেন না। সে বেচারী অপরাধিনীর মত দাঁড়িয়ে আছে। সুবীর একটু স্পষ্টবাদী, সে এগিয়ে এসে ব'ল, "এই বেলা একটার সময় আর কেন হাঙ্গামা করছ মা? এ কাজটা ওদের হাতেই ছেড়ে দাও না। চল, সবাই মিলে বসে যাই।"

সরমা নিঃশব্দে পাতা ধুয়ে যেতে লাগলেন, সুবীরের কথার কোন জবাব দিলেন না। সুবীর নিজেই সকলকে ডাকাডাকি করতে সুরু করল। অণিমা, অমলা, শান্তা সকলে কাছাকাছি ছিল। ওরা এসে পাতাগুলো সাজিয়ে ফেলল, মাংসের হাঁড়িটাও ধরাধরি করে নিয়ে এল। সরমাকে জিজ্ঞাসাবাদ না করে এসব কাজে হাত দেওয়াতে তিনি অসন্তুষ্ট হচ্ছেন—এ আশঙ্কা সকলের মনেই ছিল। আজ কিন্তু সরমা বিশেষ বাধা দিলেন না, শুধু মুখের রেখায় তাঁর কাঠিন্যের ছাপ গাঢ়তর হচ্ছিল।

খেতে বসে সবাই বেশ হাল্‌কা হাসি-ঠাট্টায় মেতে গেল। অণিমাই চুপিচুপি গিয়ে কানাইকে ডেকে আনল।

জয়ন্ত প্রথমেই সকলের একটা ফটো নিল। শঙ্কর-বাবু চেঁচিয়ে বললেন, "দেখ ভাই, আমার মিসেসকে যেন বাদ দিও না।"

প্রতাপবাবু খেতে এলেন না তখনও। অণিমা

ডাকতে গেল। তিনি বই পড়তে পড়তে চোখ না তুলেই জিজ্ঞাসা করলেন, "নিবারণ খেয়েছে?"

অণিমা মাথা নিচু করে বলল, "না, বাবা।"

"ওকে আমি নেমন্তন্ন করে এনেছি মা, ও না খেলে ত আমি খেতে পারি না।" তাঁর কথার মধ্যে কোন কাঠিন্য নেই, কিন্তু গলার স্বর দৃঢ়।

"আমি মাকে বলে দেখছি বাবা।" অণিমা আস্তে আস্তে সরে গেল, মনে মনে সে জানত, এসব ব্যাপারে তার কোন হাত নেই। সরমার অমতে কোন কিছু করা তাদের পক্ষে সাধ্যাতীত। তবু সে সুনীলকে ডেকে চুপ চুপি বলল ব্যাপারটা। সুনীল সুবীরকে ডাকল। এ সমস্যার সমাধান করতে যদি কেউ পারে ত সুবীরই পারবে।

অগ্নিগর্ভ আগ্নেয়গিরির মত সরমারও আকস্মিক বিস্ফোরণ ঘটতে পারে, এ ভয় ছিল। তবু সুবীর গিয়ে ব্যাপারটা বলল তাঁকে। আশ্চর্য্য শান্ত সুরে সরমা বললেন, "নিবারণদেরও এই সঙ্গে বসিয়ে দে।" তার পর একটু থেমে বললেন, "তোরা যা ভাল বুঝিস্ কর্ বাবা। আমাকে আর কেন এর মধ্যে টানিস্? এখন তোদেরই যুগ।" তাঁর গলার স্বরে রিক্ততা আর ব্যর্থতার একটা মিলিত হাহাকার যেন শুনতে পেল সুবীর।

নিবারণ আর সন্তোষ গাছের তলায় চুপচাপ বসে ছিল, সুবীর গিয়ে তাদের ডেকে আনল। প্রতাপবাবুও এসে খেতে বসলেন। খেতে খেতে শঙ্করীকে ডেকে নিবারণ আর সন্তোষকে বারবার এটা-ওটা দিতে বললেন। সরমা এক কোণে বসে নিঃশব্দে খাচ্ছিলেন, সুদীপ্ত খেতে খেতে তাকাল দূরের দিকে। কারা যেন এদিকে আসছে, কাছাকাছি কোন গ্রামের লোকই বোধ হয়। তার কেমন অস্বস্তি বোধ হ'ল। তারা বেশ চর্ব্ব্য-চোষ্য খাচ্ছে, ফেলাও যাচ্ছে অনেক। একদল লোক সেটা দেখতে দেখতে যাবে, এটা ভাল লাগল না।

এর পরে যে ব্যাপারটা ঘটল সেটা অবশ্য অভাবনীয়। ওদের খাওয়া তখন শেষ হয়ে গিয়েছে, উঠে এঁটো পাতা ফেলতে যাবে—ঐ দলটার থেকে দু'টি ছোট ছোট ছেলে ছুটে এল। তাদের পেছনে একটি বৃদ্ধা। সুদীপ্তর হাত থেকে পাতাটা প্রায় কেড়েই নিল তারা—মিনতি ভরে বলল, "কুকুরকে দেবেন না বাবু, আমাদের দিন।"

সুদীপ্ত বাধা দিতে যাবে, পেছন থেকে বৃদ্ধা বলে উঠল, "কোন ভয় নেই বাবা। তোমাদের কিছু ছোঁয়া যাবে না।" সুদীপ্ত এঁটো হাতেই সেখান থেকে সরে এল। ততক্ষণে অন্যদের হাত থেকেও পাতা নেওয়া সুরু হয়ে গেছে। নানাজনের মন্তব্যও তার কানে আসছে। শঙ্করবাবু নাসিকা কুঞ্চিত করে বললেন, "ভারতবর্ষে 'বেগারে'র সংখ্যা আর কমবে না সুনির্ম্মল।"

ওদিক থেকে অমলা ভুরু কুঁচকে কি যেন বলল। সরমার রুষ্ট স্বর শোনা যায়, "যা, সরে যা এখান থেকে।"

সুবীর তখনও খাওয়া সুরু করে নি, সবেমাত্র বসেছিল—পাতাসুদ্ধ তুলে দিল একটি উলঙ্গ ছেলের হাতে।

রত্নাও একটু বিরক্তি-ভরা স্বরে বলল, "এরা সব এল কোত্থেকে?"

নিবারণ এতক্ষণ নীরব দর্শক ছিল, রত্নার কথার জবাবে মৃদুস্বরে বলল, "আজ্ঞে এরা আমাদেরই গাঁয়ের লোক, ছোট জাতের। এবার ত ধান-চাল ভারী মাগ্‌গী—তাই দুটো খাবার জন্য—"

তার কথায় বাধা দিয়ে রূঢ় স্বরে বলে উঠল সুনির্ম্মল, "তাই বলে আমরা রাজ্যসুদ্ধ লোকের খাবার জোগাব নাকি?"

প্রতাপবাবু এতক্ষণ কিছু বলেন নি, এবার গম্ভীর স্বরে ডাকলেন, "নিবারণ।" দলে বোধ হয় ছোট-বড় মিলিয়ে গোটা পঁচিশেক ছেলে আর দু'টি বৃদ্ধা ছিল—"ফিরে গিয়েই তোর বাড়ীতে দু'মণ চাল পাঠিয়ে দিচ্ছি। কাল ওদের ডাকিস্।" কথাটা শেষ করেই আঁচাতে চলে গেলেন প্রতাপবাবু। অণিমা তাকিয়ে দেখল, তাঁর চোখ দু'টি একটু বিষণ্ণ। এর আগে মাঝে মাঝে মনে হয়েছে, উনি বোধহয় গ্রামের লোকদের একটু বেশী প্রশ্রয় দেন। নিজে শখ করে কখনও কিছু কেনেন না। কাউকে উপহার পর্য্যন্ত সহজে দিতে চান না। অথচ ওদের দেবার বেলায় অনেক সময় মুক্তহস্ত। গাছের পেয়ারা, আম, ফল ত নিত্য বিলোচ্ছেন, এমন কি পুকুরের মাছ পর্য্যন্ত সবটা ঘরে আসে না, বাড়ীর সকলেই মনে মনে বিরক্ত ওঁর ওপরে। আজ কিন্তু কোন অভিযোগ এল না মনের মধ্যে।

সুনির্ম্মল অবশ্য নিজের মনে গজ গজ করতে লাগল। বেহিসেবী খরচটা তার পক্ষে সহ্য করা সহজ নয়। জয়ন্ত বিরক্তিভরা চোখে তাকাল। এসব মানুষদের সম্বন্ধে তার বিশেষ কোন অনুভূতি নেই, পশুর সঙ্গে এদের তফাত কিছু খুঁজে পায় না সে। সঞ্জয় একটু দূরে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখছিল, তীব্র বেদনায় ভরে উঠল

তার মন। দারিদ্র্যের অভিশাপ তার সারা জীবন জুড়ে রয়েছে। কিন্তু তবু কুকুরের খাবার গ্রামের মানুষ কেড়ে খাচ্ছে এ দৃশ্য এই প্রথম দেখল। এ ত এতদিন অকল্পনীয় ছিল, দেশে এখন দুর্ভিক্ষ নেই, নতুন ধান উঠেছে কিছুদিন হ'ল। তবু মানুষ এমন ভাবে ভাতের জন্য ঘুরছে!

সুদীপ্তর মনটাও ভারী হয়ে উঠেছিল। সে সহজে কাতর হয় না। মনকে শক্ত করতে জানে। আজ কিন্তু তার চোখে জল এসে গিয়েছিল।—নিজের এই দুর্ব্বলতাকে গোপন করবার জন্য একটু দূরেই সরে গেল সে। সুবীর ভাবছিল একটু আগেকার কথা।—শান্তার সঙ্গে সে গভীর তত্ত্বালোচনায় মগ্ন হয়েছিল, অন্যরাও কেউ কেউ এসে যোগ দিয়েছিল।—আলোচনার বিষয় বিচিত্র। সর্ব্বোদয়, সোস্যালিজম, গোপবন্ধুনগরের কংগ্রেস সেশন। তার পরে অবশ্য সকলেই নিশ্চিন্ত মনে খেতে বসেছিল। বেলা ন'টার সময় প্রচুর পরিমাণে জলযোগের ফলে অনেকেরই তেমন ক্ষিধের আধিক্য ছিল না—ফেলা যাচ্ছিল প্রচুর। কিন্তু এ দৃশ্য দেখতে হবে, সে-কথা কেউ ভাবে নি। রমা-জনারও খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। এ অপ্রীতিকর দৃশ্য তাদেরও ভাল লাগছিল না। সঞ্জয়ের দিকে তাকিয়ে রমা বলল, "চল না সঞ্জয়, গ্রামোফোনে গান শুনি।" রেকর্ড শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক হয়ে গেল সঞ্জয়। অস্পষ্ট একটা মোহাবেশ তাকে ঘিরে ধরছে। নারী সান্নিধ্যে সে অভ্যস্ত নয়। এসব চিন্তাকে পারতপক্ষে কখনও মনে ঠাঁই দেয় না। তার ভবিষ্যতে কোন আলোর রেখা নেই। পরাশ্রিত সে। হৃদয়-বিলাস তার সাজে না। তবু জনাকে দেখবার পর থেকে কেমন একটা অলক্ষ্য আকর্ষণ অনুভব করেছে তার প্রতি। বয়সে জনা তার থেকে কিছু বড়ই হবে। কিন্তু মেয়েটিকে বড় আশ্চর্য্য লেগেছে। নিজেকে যেন একটা রহস্যের আবরণে ঘিরে রেখেছে সর্ব্বদা। অথচ কারও সঙ্গে ব্যবহারে এতটুকু ত্রুটি নেই তার। হাসছে, কথা বলছে, কবিতা পড়ছে—তবু তাকে অনেক দূরের মনে হয়। যেন চির দুর্লভ, দুর্লভতমা। শুধু সঞ্জয় কেন, পৃথিবীর কোন পুরুষই বোধ হয় ওর নাগাল পাবে না। ওর মধ্যে কোথায় যেন একটা বৈরাগিণীর মূর্ত্তি লুকিয়ে আছে, সে প্রচ্ছন্ন হলেও প্রতিপদে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করে।

দূরে সুদীপ্তকে দেখা গেল, নদীর তীর দিয়ে চলেছে। রমা হঠাৎ বলল, "চল না জনা, বেড়িয়ে আসি। সঞ্জয়, তুমি যাবে?"

"না থাক্।" সঞ্জয় গ্রামোফোনের রেকর্ড বাছছিল। মনে মনে হয়ত আশা করছিল জনাও তাকে ডাকবে। জনা কিছু বলল না। সেও বোধ হয় একটু অন্যমনস্ক ছিল। কাজল, পম্পা, সুনীলের মেয়ে—সবাই জনা আর রমার পিছু নিল।

সরমা সতরঞ্চির উপর চুপচাপ শুয়ে ছিলেন। কাছাকাছি কেউ ছিল না। সকলের অলক্ষ্যে প্রতাপবাবু এসে কাছে বসলেন, আস্তে আস্তে কপালের উপর একটা হাত রাখলেন। সরমা নিঃসাড়ে পড়ে রইলেন। কোন সাড়া দিলেন না।

সুবীর আর শান্তা গাছের ছায়ায় বসে ছিল, সুনীল অণিমাও ছিল ওদের সাথে। দূরে দেখা গেল জনাকে।

শান্তা সেদিকে তাকিয়ে বলল, "জনাকে দেখে কেমন অদ্ভুত লাগে। এত রূপ! বয়সও ত প্রায় পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে। শুনেছি বড় লোকের মেয়ে। বিয়ে করে নি কেন?"

অণিমা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, "এদিকে আবার রমাদের স্কুলে টিচারী করে। ওর কি টাকার অভাব?"

সুনীল কোন মন্তব্য করল না। সুবীর বলল, "বিয়েটা তোমরা ঘটালেই পার। কোন দিকে ত চোখ নেই। নিজেদের নিয়েই মত্ত।"

"আহাঃ, আমরা আর কিছু বুঝি না, না? কিন্তু ঠাকুরপো ত বিয়ের নামেই খাপ্পা। বলতে ভরসা হয় না বাপু।" শান্তা স্বামীর দিকে ভ্রূভঙ্গি করে। তারপর অণিমার উদ্দেশে বলল, "তাছাড়া জনা কি আমাদের মত ঘরে বিয়ে করবে? তুই-ই বল অণু।"

অণিমা জবাব দেবার আগেই সুবীরের উক্তি শোনা যায়। "কি যে বল বেরসিকের মত। 'প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে, কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে'।" হো হো করে হেসে উঠল সে।

অণিমা চুপি চুপি শান্তার কানে কানে বলল, "তোমাদের রসের কথা আর ফুরোয় না। নিজেরাও ত একদিন এ সব কাণ্ড করেছিলে।"

"সত্যি! কতকাল যে হয়ে গেল! ওসব কথা যেন ভুলেই গেছি।" বলতে বলতে একটা নিঃশ্বাস ফেলল শান্তা, গলার স্বরটা কেমন করুণ শোনাল, অতীতের জন্য চিরন্তন হতাশ্বাস!

সুদীপ্ত আর সঞ্জয় পাশাপাশি বসে গল্প করছিল। এ বাড়ীর মধ্যে সুদীপ্তই সঞ্জয়ের সঙ্গে সবচেয়ে বেশী অন্তরঙ্গ হয়। বয়সে কিছু বড় হলেও সমবয়সীর মতই মেশে সে সঞ্জয়ের সঙ্গে। সঞ্জয়ের রুচি, বুদ্ধি তাকে মুগ্ধ করেছে। সংসারে অনেক সংগ্রামের মুখোমুখী হ'তে হয়েছে তাকে, তবু দমে নি ছেলেটা, ছাই হয়ে যায় নি সব অনুভূতি। তার মধ্যে প্রাণ আছে যথেষ্ট। এইজন্য সঞ্জয়ের উপর শ্রদ্ধা হয় সুদীপ্তর। ওদের আলোচনা চলছিল বেড়ানো নিয়ে। সঞ্জয় বলল, "এমন চমৎকার জায়গা থাকতে আমরা দূর দূর দেশে কেন যে বেড়াতে যাই বুঝি না। এখানে জ্যোৎস্না রাতে কোনদিন এসেছেন?"

সুদীপ্ত মৃদু হেসে বলল, "সেই ত আসল কথা. 'দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া ঘর হ'তে শুধু দুই পা ফেলিয়া'···। আমাদের হয়েছে সেই অবস্থা।"

"সত্যিই তাই! কোজাগরী পূর্ণিমার রাতে একবার এসেছিলাম একা। অনেকক্ষণ বসেছিলাম, অদ্ভুত লাগছিল। মনে হচ্ছিল কোন জায়গার চেয়ে কম নয় এই ময়ূরাক্ষীর তীর, জ্যোৎস্নায় আচ্ছন্ন চারদিকের এই বন।" বলতে বলতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল সঞ্জয়ের দুটি চোখ, স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে গেল সে।

সুদীপ্ত হেসে বলল, "তুমি একেবারে কবি! কবিতাও লিখছ নাকি?"

সলজ্জ হেসে সঞ্জয় ঘাড় নাড়ল।

কাব্যের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে জনার কথা মনে পড়ল সুদীপ্তর। কবিতা জনাও ভালবাসে। আশ্চর্য্য যাদু আছে ওর গলার স্বরে, মনটাকে আবিষ্ট করে দেয়। অথচ জনা এমনিতে কত নিরুচ্ছ্বাস, এতটুকু আবেগের আতিশয্য নেই তার মধ্যে। কিন্তু কবিতা পড়ার সময় কি আশ্চর্য্য আবেগে উচ্ছ্বসিত হয় তার কণ্ঠ। মনে হয়, রোজকার জনা আর এই কাব্য-পাঠরতা জনা আলাদা মানুষ। বারবার ওর কবিতা শুনতে ইচ্ছা করে। রবীন্দ্রনাথের কত কবিতাই ত পড়েছে সুদীপ্ত, আজ কিন্তু বারে বারে তাঁর একটি কবিতার ছোট্ট একটি ছত্র মনে পড়ছে "বৈরাগী বসন্ত যবে আপনারে বৈভব বিলায়।" হয়ত চারিদিকে ফাল্গুনের এই সমারোহ দেখে মনে পড়ছে এ কথা। বসন্ত কি সত্যিই বৈরাগী? তার ঐশ্বর্য্যের অন্ত নেই কিন্তু সবই ত নিবেদিত, সে ত উজাড় করে দিচ্ছে তার সব সম্বল। নিজেকে বৈরাগী করছে সব বিকিয়ে দেবার আনন্দে। নিজের বলে কিছু আর অবশিষ্ট থাকছে না।

শঙ্করবাবু, সুনির্ম্মল, অমলা আর রত্না জমিয়ে তাস খেলতে বসেছেন। খেলতে খেলতে রত্নাই বলল, "জনা বেশ খেলে কিন্তু, ওকে ডাকলে হয়।"

সুনির্ম্মল বলে উঠল, "হ্যাঁ, জনা তোর জন্য বসে আছে! আচ্ছা, বল্ ত ওর মন কার দিকে পড়েছে? জয়ন্ত ত বেশ একটু মজেছে বলে মনে হচ্ছে, মুখে অবশ্য কিছু বলছে না। বাপের মত সাহেবী মেজাজ ত।"

শঙ্করবাবু গম্ভীর মুখে বললেন, "তোমরা যাই বল, অত সহজে ধরা দেবার মত মেয়ে নয় জনা। ব্যারিষ্টার মিত্রর মেয়ে। ওদের বাড়ীর সকলের কথাই শুনেছি, চৌরঙ্গী সোসাইটি করে সবাই। এর আগে দিল্লীতে সুন্দর নগরে ছিলেন।"

"জনাকে দেখে কিন্তু ঠিক সেরকম মনে হয় না। এত সিম্পল।" রত্না বলে উঠল।

"এখানে এসে কি হীরে-জহরৎ প'রে বেড়াবে নাকি? কলকাতায় গিয়ে দেখ।" শঙ্করবাবু মন্তব্য করলেন।

এতক্ষণে অমলা মুখ খুলল। একটু স্পষ্ট সুরে কথা বলা ওর স্বভাব। বলল, "আমি কিন্তু জনাকে আগে থেকেই চিনি। ও ত আমার ছাত্রী ছিল। ওকে যতদূর জানি, চমৎকার মেয়ে। কখনও 'অড' ভাবে সাজতে দেখিনি। এক-একজন মেয়ে যে-ভাবে সেজে-গুজে কলেজে আসে, মনে হয় বিয়েবাড়ী যাচ্ছে—ও চিরকালই একরকম। আচ্ছা, ওর সম্বন্ধে একটা কথা কিন্তু···"

তার কথায় বাধা দিয়ে শঙ্করবাবু বলে উঠলেন, "আপনি যখন প্রশংসা করেছেন, তখন অবশ্য একথা ঠিক না হয়ে যায় না। সহজে ত কারও সম্বন্ধে ভাল কিছু বলেন না।" বলেই হো হো করে হেসে উঠলেন তিনি।

অমলার ভুরু দুটো একটু কুঁচকে এল, কিন্তু রাগ করতে পারল না। সকলের সঙ্গে হাসতেই হ'ল তাকে।

শঙ্করবাবু একটু পরে আবার বললেন, "জনার সম্বন্ধে কিন্তু একটা কথা শুনেছিলাম। দেখে যদিও···" মাঝ পথে থেমে গিয়ে বললেন, "ওদের সোসাইটিতে অবশ্য এ সব ব্যাপার হামেশাই ঘটছে। গা-সওয়া হয়ে গেছে সকলের।" বলেই মুখ টিপে হাসলেন। ইচ্ছে করেই যেন ব্যাপারটাকে রহস্যাবৃত করে একটু রস পাচ্ছিলেন তিনি।

অমলাও সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, "আমিও ত তাই বলছিলাম, আমিও যেন কি···"

"বলই না বাপু ব্যাপারটা কি? এরা বড্ড হেঁয়ালীর সুরে কথা বলে।" রত্না কৌতূহলী হয়ে ওঠে। সকলের মনেই জনা নাম্নী সুন্দরী তরুণীটি সম্বন্ধে ঔৎসুক্য ছিল যথেষ্ট। মুখরোচক আলোচনায় যোগ দিতে সবাই তৎপর হ'ল। মাঝ পথে বাধা পড়ল। রত্নার বড় ছেলে কাজল ছুটে এল, "দেখ না মা—কণাটা কিছুতেই কথা শুনছে না। খালি বনের মধ্যে ছুটে চলে যাচ্ছে।" কণা রত্নার ছোট মেয়ে। অগত্যা জনার আলোচনা মুলতুবী রেখে কণার সন্ধানে এগিয়ে গেলেন সকলে।

প্রতাপবাবুর হাতে একটি বই। "ক্রনিনের, এ্যাড-ভেঞ্চারস্ ইন্ টু ওয়ার্লডস্।" জনা আর রমা কাছাকাছি এসে দাঁড়াল। জনা এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, "ওটা কি বই মেসোমশাই?"
নামটা শুনে বলল, "আপনার পড়া হয়ে গেলে আমি পড়ব কিন্তু।"

প্রতাপবাবু হেসে বললেন, "নিশ্চয়ই পড়বে মা। বইটা বেশ ভাল লাগছে আমার। লোকটি ভারী 'সিন্সিয়ার'। আদর্শবাদের ওপর আন্তরিক শ্রদ্ধা আছে।" বলতে বলতে প্রতাপবাবুর গলার স্বরে একটু আবেগের ছোঁয়া লাগল। খানিক বাদে চলে গেল ওরা।

জনার দিকে তাকিয়ে গৌরীর কথা মনে পড়ল তাঁর। গৌরী তাঁদের প্রথম সন্তান। জনার সঙ্গে অদ্ভুত মিল পান তিনি তার। গৌরী তাঁরই সর্ব্বাধিক প্রিয় ছিল। তার জন্মের এক বছরের মধ্যেই সুনির্ম্মল জন্মায়, তাই প্রতাপবাবুই তাকে কাছে কাছে রাখতেন সর্ব্বদা। সরমার অবকাশ ছিল না। গৌরীর সুন্দর কচি মুখখানা এখনও চোখের সামনে ভাসে। জীবনে তিনি অনেক পেয়েছেন। কিন্তু সব প্রাপ্তির মধ্যেও গৌরীকে হারানোর ব্যথা সবচেয়ে বেশী করে বাজে তাঁর বুকে, আজও সে শূন্যতা তাঁর পূর্ণ হয়নি, কোনদিনও হবে না। জনার মধ্যে তাঁর সেই হারানো মেয়েকে যেন সত্যি ফিরে পান। সতেরো বছর বয়সে টাইফয়েড হয়েছিল গৌরীর, সেই রোগ তাকে চিরকালের জন্য কেড়ে নিল। প্রতাপবাবুর চোখে সমস্ত পৃথিবী সেদিন অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। গৌরী ছিল তাঁর একাধারে সব—বন্ধু, কন্যা, মাতা। তার সঙ্গে তাঁর যত আলাপ, যত আলোচনা। মায়ের মত মমতা দিয়ে সে তাঁকে ঘিরে রাখত। আদর আব্দারেরও অন্ত ছিল না তার। তিলে তিলে তিনি তাকে হারানোর বেদনা সয়েছেন। জনাকে দেখলেই তাঁর গৌরীর কথা মনে পড়ে। সেও ঠিক তারই মত—জানবার আগ্রহ তার অপরিসীম। বই পড়ায় খুব উৎসাহ। তাঁর সঙ্গে নানা আলোচনা করে, তর্ক চালায়, হারতে রাজী হয় না। পরশু দিন রাত্রে বাইরে বসে পড়ছিলেন, বেশ ঠাণ্ডা ছিল, হঠাৎ মনে হ'ল কে যেন তাঁর গায়ের উপর একখানা শাল জড়িয়ে দিচ্ছে, চেয়ে দেখেন জনা। হারানো কন্যার মমতাময় স্পর্শ ফিরে পেয়েছিলেন সেদিন। চিরকালের জন্য জনাকে নিজের করে নিতে লোভ হয় প্রতাপবাবুর। স্বভাবতঃ তিনি চাপা প্রকৃতির। আবেগের প্রকাশ তাঁর জীবনে কদাচিৎ ঘটেছে। জনার প্রতি এই মনোভাবের কোনদিন কোন বহিঃপ্রকাশ ঘটে নি। কিন্তু অন্তরে অন্তরে তিনি চাইছিলেন, জনা তাঁর ঘরে বধূ হয়ে আসুক। হারানো সন্তানের স্বাদ আবার তার মধ্যে ফিরে পেতে চান তিনি। কিন্তু সরমাকে এ সম্বন্ধে কিছু বলতে যাওয়া বৃথা। জনাকে তিনি বিশেষ পছন্দ করেন না। রূপ সম্বন্ধে ঘৃণা আর ঈর্ষা মিশ্রিত এক বিচিত্র অনুভূতি আছে সরমার মনে, তাই বোধহয় জনাকে তিনি আমল দিতে চান না। একবার কে যেন কথাটা তুলেছিল, বোধহয় সুবীরই বলেছিল—"জনাও বেশ মেয়ে, দীপ্তর সঙ্গে খুব মানায়।"

সরমা বেশ অপ্রসন্ন স্বরেই বলেছিলেন, "জনাকে তোদের যে এত কি পছন্দ বুঝি না। আর তা ছাড়া ও ত বয়সে প্রায় দীপ্তর সমান। আমি কিন্তু দীপ্তর জন্য অল্পবয়সী বউ আনব।"

সরমার হাবভাব দেখে প্রতাপবাবু আর নিজের ইচ্ছাকে প্রকাশ করতে সাহস পাননি। এক যদি দীপ্ত নিজে থেকে উদ্যোগী হয়। দীপ্তর সঙ্গে জনার মনেরও কোথায় যেন একটা মিল আছে, মেয়েটির লেখাপড়া সম্বন্ধে ভারী আগ্রহ, দীপ্তও পড়তে বড় ভালবাসে। তাঁর নিজের জীবনে চিরকালই একটা ক্ষোভ বহন করেছেন তিনি, সরমা তাঁর পাঠানুরাগকে কখনও ভাল চোখে দেখেন নি। নিজে যে একেবারে অশিক্ষিত, তাও মোটেই নয়। সে যুগে ম্যাট্রিক পাশ করেছিলেন, অথচ স্বামীর বিদ্যানুরাগের উপর তিলমাত্র শ্রদ্ধা নেই। জনার মনে বিদ্যার প্রতি শ্রদ্ধা আছে, চেহারায় তার বুদ্ধির দীপ্তি, লাবণ্যে সে কোমল—মনে হয় অনুরাগের মাধুর্য্য তার জীবনের পাত্রটিকে সুধায় ভরে তুলবে। হয়ত সবটাই তাঁর নিজের কল্পনা। তবু সর্ব্বদাই জনার প্রতি স্নেহমমতার এক বিপুল

আকর্ষণ অনুভব করেন তিনি, জোর করেও নিজেকে দমন করতে পারেন না।

সুনির্ম্মল, অমলা, রত্না, শঙ্করবাবু সকলে মিলে একটু ঘুরতে বেরিয়েছেন। সরমার কাছে কণা আর কাজলকে বসিয়ে রেখে এসেছে রত্না। বড় দুরন্ত হয়েছে ওরা। সারাদিন ছোটাছুটি করে অসুখ-বিসুখ কিছু একটা বাধাবে। কথা হচ্ছিল আজকালকার থাকা-খাওয়ার সমস্যা নিয়ে, ওদের জীবনে সমস্যাটা অবশ্য একটু ভিন্ন ধরণের। অমলারা যে পাড়ায় থাকে, সেখানকার দোকানে পর্দ্দার কাপড় কিনতে গিয়ে বড্ড ফ্যাসাদে পড়তে হয়, মানানসই রং মেলে না। এদিকে রত্নার ত প্রায়ই মার্কেট ছুটতে হয় গোলাপ কেনার জন্য। বড় গাড়িটা নিয়ে শঙ্করবাবু বেরিয়ে যান। ছোট গাড়িটা বেশ কিছুদিন অকেজো হয়ে পড়ে আছে। এদিকে মার্কেট যাবার এত অসুবিধে। ট্রামে-বাসে চড়াও আজকাল মুশকিল, তা ছাড়া কেমন বাধো-বাধো ঠেকে। অথচ ড্রইংরুমের ফুলদানীতে ভাল গোলাপ না হ'লে মানায় না।

শঙ্করবাবুর আবার এসব দিকে রুচিজ্ঞান খুব, পর্দ্দার রঙে আর সোফার ঢাকনার রঙে না মিললে তাঁর ভারী খারাপ লাগে। ফুলদানীতে ফুল আর স্ত্রীর ত্রুটিহীন সাজসজ্জা দুটোই তাঁর চাই—অগত্যা মার্কেট যাওয়া ছাড়া গতি নেই রত্নার। কাছাকাছি বাজারে ঠিক তেমন গোলাপ ত মেলে না।

সুবীর আর শান্তাও ছিল ওদের পেছনে। ওদেরও কানে গেল কথাটা। সুবীর একটু হেসে বলল, "কি রে, গোলাপ-সমস্যা নিয়ে বড্ড ফ্যাসাদে পড়েছিস্, তাই না? বাড়ীতে টবে গোলাপ করলেই পারিস্।"

অমলা পিছন ফিরে বলল, "তোমরা কি বুঝবে বাবা? মালি পাওয়া খুব শক্ত।"

সুবীরের হাসিটা আর একটু গাঢ় হ'ল। "নিজেরাই লেগে পড়লে পার, গার্ডেনিং করলে শরীর ভাল থাকে। আমরা ত খুব বাগান করি, শান্তার আবার এসবে"—

শান্তা সুবীরের হাতে গোপনে চিমটি কেটে থামিয়ে দিল। অমলার ধারালো কথার খোঁচা সে অনেক খেয়েছে, এখন আর গালাগাল খেতে রাজী নয়। প্রসঙ্গান্তর করে বলল, "চলনা গো, ওই দূরে বালির চড়ায় একটু বেড়িয়ে আসি।"

শঙ্করবাবুর ঠোঁটে হাসি দেখা দিল। বললেন, "এরা সর্ব্বদা হনিমুন স্পিরিটে আছে বাপু।"

সুবীর চিরকালই একটু ঠোঁটকাটা, সেও হেসে জবাব দিল, "আপনারাই বা কম কিসে। সর্ব্বদাই ত দিদির সঙ্গে ঘুরে বেড়ান।" বলতে বলতে এগিয়ে গেল সে।

জয়ন্ত একা একাই ঘুরছিল। শিকার ত হ'লই না। ছবিও তোলা গেল না ভাল করে। জনার একখানা ছবি নেবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তার ত দেখা পাওয়াই ভার, অদ্ভুত মেয়ে!

ঘুরতে ঘুরতে সুদীপ্ত আর জনা একটু বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। অদূরে নদীর তীরে বালির ওপর প্রখর রোদের ঝিকিমিকি, ফাল্গুনের সুরু, সমস্ত প্রকৃতিতে একটা মাদকতার আবেশ লাগতে সুরু করেছে। জল, স্থল, আকাশ, অরণ্য স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে আছে যেন। সুদীপ্তর মনে ক'দিন ধরেই দোলা লেগেছে। জনাকে সে অনেক দিন ধরে দেখছে, প্রায় বছর খানেক হবে। এর মধ্যে জনা দু'তিন বার এসেছে ওদের বাড়ী। রমার বন্ধু হিসেবে বাড়ীর সকলের সঙ্গেই তার যথেষ্ট আলাপ হয়েছে। গত গ্রীষ্মের ছুটিতে জনা দিন দুয়েক কাটিয়ে গিয়েছিল ওদের বাড়ী। সুদীপ্তও তখন ছুটিতে বাড়ী এসেছিল, সে বর্দ্ধমান কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক। প্রথম প্রথম অবশ্য জনার সম্বন্ধে সামান্য কৌতূহল ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কিন্তু এবারে একটু অন্য অনুভূতি জাগছে। কৌতূহল ত আছেই, তা ছাড়াও একটু ভিন্নতর স্বাদের আরও কিছু জড়ানো রয়েছে তার সঙ্গে। বিশেষতঃ আজ কিছুক্ষণ ধরে রক্তের মধ্যে দোলা লাগতে সুরু করেছে—মনে হচ্ছে নিজের জীবনের অনেক কথা জনাকে বলা যায় আজ। যা কোনদিন কাউকে বলে নি।

চারিদিকের এই শুব্ধতা, সমস্ত প্রকৃতিতে একটা অনাম্নী মন্ত্রের গুঞ্জরণ, অজানা ফুলের গন্ধ—সবই এই মুহূর্ত্তে আশ্চর্য্য বলে মনে হ'ল। একটা প্রচণ্ড আবেগ যেন তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে বন্যার মত। শঙ্কা, সঙ্কোচ, সংশয়, দ্বিধা সব কিছু মেশানো একটা অদ্ভুত অনুভূতি তাকে আচ্ছন্ন করে দিল। জনাও কি যেন ভাবছিল নিজের মনে, সুদীপ্ত তার দিকে ভাল করে তাকাতেই পারছিল না এতক্ষণ। পাশ ফিরে কিছু একটা বলতে যাবে, হঠাৎ দেখে সে পাশে নেই। বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে। এ ভাবে চলে যাবার অর্থ বুঝল না। ডাকতে গিয়েও ডাকল না সুদীপ্ত। মনে হ'ল এ ভাবে চলে যাওয়াটা ইচ্ছাকৃত। সে যেন মনে মনে সুদীপ্তর ভাবান্তরটা টের পেয়েই সরে গেল তার কাছ থেকে। আস্তে আস্তে আবার সতরঞ্চি বিছানো গাছের

তলায় ফিরে এল সুদীপ্ত—Bing Crosby-র সেই পুরণো রেকর্ডটা আবার বাজছে। "Wherever you are, my love will guide you…"

এসে দেখে সরমার সঙ্গে বাঁধাছাঁদায় লেগে গেছে জনা। রমা ধারে-কাছে কোথাও নেই। এবার আর না জিগ্যেস করে পারল না সুদীপ্ত, "কি হ'ল জনা? হঠাৎ চলে এলে যে?"

হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল জনার মুখ, "মাসীমাকে একটু সাহায্য করতে এলাম ছোড়দা। দেখুন না, কিরকম একা একা খাটছেন।"

ছোড়দা সম্বোধনের নতুনত্বটা সুদীপ্তর কানে বাজল। খানিক পরেই রমাকে আসতে দেখে তার দিকে এগিয়ে গেল সুদীপ্ত। বলল, "এই রমা, এদিকে শোন্ একটু।"

"কি রে ছোড়দা?" জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকাল রমা।

"তোর বন্ধুটিকে বাপু বোঝা ভার। একেবারে তল পাওয়া যায় না!"

"কে, জনা? তুই যা ভাবছিস্ ঠিক তা নয়। তবে ওর একটা…" মুখটা বিষণ্ণ হ'ল রমার।

"ওর কি?" সুদীপ্ত উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করল।

"ওর একটা ইতিহাস আছে ছোড়দা। সবাই ওকে ভুল বোঝে। কিন্তু কোন পুরুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়াই ওর পক্ষে সম্ভব নয়।"

"কেন, কি এমন ব্যাপার?" সুদীপ্ত সাগ্রহে প্রশ্ন করল।

শান্তা ওদিক্ থেকে ডাক দিল, "রমা ভাই, এদিকে একটু শুনে যা না।"

"এক মিনিট ছোড়দা। আমি এক্ষুণি আসছি," রমা দ্রুতপদে চলে গেল। তার অসমাপ্ত কথা ক'টির সূত্র ধরে নানা ভাবনা জাগল সুদীপ্তর মনে। খানিক পরে রমা ফিরে এল। সুদীপ্তকে ডেকে নিয়ে গেল একটু তফাতে। "জনাকে কি কেউ কিছু বলেছে নাকি ছোড়দা? ও ত আজ রাত্রের ট্রেণেই কলকাতা ফিরবে বলছে।" রমা সুদীপ্তর দিকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকাল।

উদাস ভাবে সুদীপ্ত বলল, "কে আবার কি বলবে ওকে?"

"তা জানি না। কিন্তু জনা যদি কোন ব্যাপারে ব্যথা পায় তা হ'লে আমার কষ্টের সীমা থাকবে না। ওর জীবনটা যদি স্বাভাবিক হ'ত, তা হ'লে ভাবনার কিছু ছিল না। অথচ এত দুর্ভাগ্য ওর, সব পেয়েও কিছু পেল না।"

"হেঁয়ালী রেখে আসল কথাটা বল্ না।" সুদীপ্ত অধৈর্য্য হয়ে ওঠে।

রমা আস্তে আস্তে বলল, "বছর চা'রেক আগে জনার বিয়ে হয়েছিল"—

"বিয়ে? কিন্তু ওকে দেখে ত"—সুদীপ্তর কণ্ঠে অপরিসীম বিস্ময়।

"না, সিঁদুর পরা ও ছেড়ে দিয়েছে। কারণ"… বলেই একটু থামল রমা।

"কারণ কি?" সুদীপ্ত প্রশ্ন করে।

একটু ইতস্ততঃ করে রমা বলল, "তোমায় এত কথা বলছি কেউ যেন জানতে না পারে। জনা এসব কথা আমাকে ছাড়া কাউকে বলে নি। আমিও তোমাদের বলি নি, দরকার হয় নি বলবার। আজ বাধ্য হয়েই বলছি।" বলতে বলতে বিষণ্ণ হ'ল রমার মুখ। চোখ নীচু করে বলল, "রাগ ক'রো না ছোড়দা, একটা কথা বলি—আমি জানি তোমার মনটাও ওর দিকে একটু ঝুঁকেছে—বাড়ীর সকলেও ওর সম্বন্ধে আগ্রহ দেখাচ্ছেন। তোমাদের কি দোষ বল? ওরই ভাগ্যের দোষ।"

রমাই আস্তে আস্তে বলল সব। জনার স্বামী অরুণ অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ। বিয়ের পর থেকেই তিনি ওর সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে চান নি। জনার প্রতি তাঁর কোন আকর্ষণই নেই, বিয়ের রাতটুকু ছাড়া একসঙ্গে শোন নি পর্য্যন্ত। এক বাড়ীতে মাস ছয়েক একসঙ্গে ছিলেন, কিন্তু শুধু সামান্য দরকারী কথাবার্ত্তা ছাড়া দু'জনের কথাও হ'ত না। বিয়ের ছ'মাস বাদে তিনি রাশিয়া চলে যান। জনাও রমাদের স্কুলে চাকরি নেয়। জনার নামে ব্যাঙ্কে মোটা টাকা জমা দিয়েছেন তাঁর স্বামী। কিন্তু জনা তার থেকে একটি পয়সাও নেয় নি। স্ত্রীর অধিকারই যে দিল না, তার কাছ থেকে টাকা নেওয়াটাও অসম্মানের ওর কাছে। অরুণবাবু চিঠিও লেখেন না। জনার বাবা ত কেস পর্য্যন্ত করতে চেয়েছেন। কিন্তু জনা কিছুই করতে চায় না।

সব শুনে উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল সুদীপ্ত, "ওর ত ওকে ডিভোর্স করা উচিত।"

"কিন্তু জনার পক্ষে তা অসম্ভব, ও অরুণবাবুকে সত্যি সত্যি ভালবাসে।" রমা মৃদুস্বরে জবাব দেয়।

"বাজে বকিস্ না রমা। ভালবাসা আবার এক তরফা হয় নাকি? একটা লোক আমায় ফেলে দিয়ে পালাল। আর আমি তার জন্য…" সুদীপ্ত রাগত স্বরে জবাব দিল।

"রাগ করিস না ছোড়দা। আমার কিন্তু মনে হয় জনা মনে মনে আশা করে, অরুণবাবু একদিন ফিরে আসবেনই।" রমার কথা শেষ হ'তে না হ'তে প্রতাপবাবুর গলা শোনা যায়, "এবার সবাই তল্পিতল্পা গুটোও—বেলা পড়ে এল।"

ওদিক্ থেকে কে যেন বেসুরো গলায় গেয়ে উঠল, "সময় হ'ল সময় হ'ল, যে যার আপন বোঝা তোল।"

সঞ্জয় ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। গ্রামোফোনের রেকর্ডগুলি গুছিয়ে তুলেছে বাক্সে। গ্রামোফোনের ডালাটাও বন্ধ হয়ে গেছে। তবু ঘুরে ফিরে সেই একই সুর বাজছে মনের মধ্যে—"Where I'll have this memory when you're gone···"

তিতির শিকার করতে না পারার ক্ষোভে জয়ন্তর মেজাজও বিশেষ ভাল নেই। সুদীপ্ত গম্ভীর মুখে সাইকেল চড়ছে। সুনীল অণিমা হেঁটে ফিরবে ভাবছে। সরমার তখনও সব জিনিসপত্র বাঁধা শেষ হয়নি। তিনি জয়ন্তর মোটরেই ফিরবেন। শঙ্করবাবু গাড়িতে বসে আগাথা ক্রিষ্টির অসমাপ্ত উপন্যাসটা শেষ করছেন। তাঁর গাড়িতে যারা যাবে, সকলে এখনও এসে পৌঁছয়নি। শান্তার কোলে ছোট বাচ্চা, সেও তাই মোটরেই উঠে বসল। সুধীর সাইকেলে ফিরছে। রত্না একে একে বাচ্চাদের ডেকে ডেকে গাড়িতে তুলছে। তাদের কারও ফেরবার চাড় নেই। তখনও সকলে খেলায় মত্ত। বেলা পড়ে আসছে, একটু ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। বড় ব্যাগটা খুলে গরম জামাগুলো বের করল রত্না। ওদের হাতে দিয়ে বলল, "যে যার গায়ে দিয়ে নাও, এখন সীজন চেঞ্জের সময়, খুব অসুখবিসুখ করেছে। শেষকালে বাড়ীগিয়ে আমার গলাব্যথা করছে বলে কেউ চেঁচাতে পারবে না।"

চারিদিকে গোধূলির ম্লান ছায়া, এদিক্-ওদিক্ মাটির গ্লাস, কলাপাতা ছড়ান। দু'চারটে কুকুর শুঁকে শুঁকে বেড়াচ্ছে। কাজের শেষে একটি সাঁওতালের দল ঘরে ফিরছে। তাদের দুর্বোধ্য গানের কথা কানে আসে। সরমার নির্দ্দেশে সঞ্জয় জিনিসপত্র নিয়ে একটা রিক্‌শয় উঠল। জনা আর রমা উঠে বসল জয়ন্তর মোটরে। জনা একটু অন্যমনস্ক হয়ে দূরের বটগাছটার দিকে তাকিয়েছিল। অসংখ্য ঝুরি নেমেছে। কত পাখীর বাসা ওর ডালে। এই নদীর কোলে কত লোকের আসা-যাওয়া। চিরকাল ওদের শুধু দর্শকের ভূমিকা। নায়িকা হবার সব ঐশ্বর্য্যই ছিল জনার, নিজের অজ্ঞাতেই সে মুগ্ধ করে মানুষের মন। তবু ওই ময়ূরাক্ষীর মতই অনন্ত কাল ধরে শুধু দেখবে জনা, কত দৃশ্যান্তর হবে, বারে বারে যবনিকা পড়বে। জীবনের এই রঙ্গমঞ্চের একধারে চিরন্তন দর্শকেরই ভূমিকা তার। আজকে সুদীপ্তর মনে দোলা লেগেছে, হয়ত সে একটু আঘাতও পেয়েছে। সে কথা জানে জনা। কিন্তু এও জানে, এ তরঙ্গের দাগ মুছে যাবে। নতুন ক'রে নায়ক হবে সে, রচনা করবে সংসার। কিন্তু জনার মনে যে চিহ্ন আঁকা হয়ে আছে, সে যেন পাষাণ-লিপির মত ক্ষয়হীন। তা কি কোনদিন মুছবে?

প্রতাপবাবুও হেঁটেই রওনা হয়েছেন, রত্না গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে বলল, "বাবা, তুমি গাড়িতে চল না।"

"না রে, আমার আবার শ্রীনিবাসদের ওখানে একটু হয়ে যেতে হবে। ওর ছেলের অন্নপ্রাশনে যেতে পারিনি।" এগিয়ে গেলেন তিনি।

একা চলতে চলতে কত ভাবনা এল মনে। ছেলেমেয়েরা যখন ছোট ছিল, সকলে নিবিড় ভাবে এক হয়েছিলেন। সংসারে অসচ্ছলতা ছিল অনেক, কিন্তু পরস্পরের যোগের অভাব কি ছিল? আজ ত সকলেই দূরের মানুষ। যে যার নিজের সংসার নিয়ে একএকটি নিভৃত কক্ষ-কোণ রচনা করেছে। নিজেদের স্ত্রী, পুত্রকন্যা, নিজের কাজ, নিজের উচ্চাশা—এর বাইরে আর কোনদিকে দৃষ্টি নেই। প্রতাপবাবু নিজেও সকলের থেকে দূরে সরে এসেছেন। তিনিও নিজের জগতের মধ্যে মগ্ন।

জনার কথাও মনে পড়ল। কন্যার সাধ তাকে দিয়ে মেটাতে চান কিন্তু কতটুকু জানেন ওকে? শুনেছেন ওর বাড়ীর সকলে অতি আধুনিক। মেয়ের বিয়ে কি তাঁরা দিতে চাইবেন এখানে? জনার মনই বা কি বলে? তার মধ্যে কি তেমন আগ্রহ আছে? সুদীপ্তর জন্য যদি সত্যিই ব্যাকুল হ'ত প্রাণ, তা হ'লে মাঝে মাঝে এমন নিরাসক্তি দেখাতে পারত না, অনুরাগের যে চিরন্তন দীপ্তিতে মেয়েদের মুখে আলো ঝরে, কপালে রক্তিমা ঘনায়—তেমন কোন আভাস কি পেয়েছেন জনার মধ্যে? মাঝে মাঝে বড় উদাসীন মনে হয় ওকে। যেন বিষণ্ণতার প্রতিমূর্ত্তি। কি জানি, ওর জীবনে আবার কি কান্নার লিপি লেখা আছে! আসার আগে দেখছিলেন, রমা আর সুদীপ্ত অনেকক্ষণ ধরে কি যেন বলাবলি করছিল, মনে হ'ল কোন ব্যাপারে আহত হয়েছে দীপ্ত। ওঁর চোখ এড়ায়নি কিছুই। রমাকে

-ডেকে একবার জানতে হবে সব। মনে হয়, তাঁর আশা পূর্ণ হবে না। যা চেয়েছেন তা কোনদিনই পাবেন না।

চোখ তুলে তাকালেন দূরের বনের দিকে। ফুলের গন্ধে উন্মনা বাতাস। ঋতু-বদলের বিচিত্র ছায়া দোলে এই ময়ূরাক্ষীর বুকে। বসন্তের দাক্ষিণ্যে সে কখনও ধন্য, শীতের সজ্জাহীনতায় রিক্তা, গ্রীষ্মের অগ্নিতাপে তপঃশীর্ণা, বর্ষার স্নিগ্ধতায় শ্যামল। জীবনেও তাই।

সূর্য্য সবেমাত্র অস্ত গেছে। তার রক্তাভা তখনও মেলায়নি। নদীর দিকে চোখ পড়ল, অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইলেন। এই নদীর বুকে কত ছায়া পড়ে। পাখী ওড়ে, সূর্য্য ওঠে, তীরের কাশবন হাওয়ায় দোলে, সূর্য্যের অস্তরাগে লাল হয়ে যায় ময়ূরাক্ষীর জল। এই সূর্য্যোদয়ের রক্তাভা, খররৌদ্রের দীপ্তি, উড়ে-যাওয়া পাখীর দল, নদীর তীরে পথ-চলতি মানুষ,—জলের ওপর এদের সকলেরই ছায়া পড়ে। মনে হয় এদের সবার প্রতিচ্ছায়া মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে, জলের ওপরে সৃষ্টি করেছে এক বিচিত্র বর্ণের ছবি, কোথাও এতটুকু অসামঞ্জস্য নেই। কিন্তু এক রঙের সঙ্গে অন্য রঙের মিল সত্যিই কি আছে? প্রতিবিম্ব তাদের যত কাছেরই মনে হোক না, আসলে তারা পরস্পর থেকে কত দূরে। সবার আলাদা সত্তা, আলাদা স্বাতন্ত্র্য। আজকের দিনে এই হাসি, গান, কথা সবের মধ্যে বারে বারে তাদের সকলের মনের ছায়া পড়েছে। সবাই মিলে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া, হৈ হৈ, কথাবার্ত্তা কিছু কম হয়নি। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে কারও সঙ্গে কোন ব্যবধান নেই। সব মিলে গেছে এক হয়ে। কিন্তু সত্যিই কি তাই? ওদের চিন্তায়, আশায়, আনন্দে, বেদনায় পরস্পরের সঙ্গে কোনো মিল কি আছে?

সামনের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, সুবীর সাইকেল ক'রে এদিকে আসছে। চেঁচিয়ে বলল, "বাবা, তোমার দেরি দেখে ফিরে এলাম। বাড়ী চল। এদিকে আবার শ্রীনিবাস কাকা তোমার কাছে এসেছেন, কাল যে যাওনি ওঁর ওখানে।"

"এই যে, যাই।" প্রতাপবাবু দ্রুতগতিতে বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন।

বঙ্গের বন্ধুর অ-প্রাচুর্য, অ-বন্ধুর প্রাচুর্য

কারণ যাহাই হউক, বর্তমান সময়ে বাংলা দেশের—বিশেষ করিয়া বাঙালী হিন্দুর—বন্ধু বড় বেশী নাই; অ-বন্ধুই (শত্রু কাহাকেও বলিতে চাই না) প্রচুর। যদিও আমাদিগকে ভগবৎ কৃপার ও স্বাবলম্বনের উপর নির্ভর করিয়াই মনুষ্যত্ব অর্জন ও রক্ষা করিতে হইবে, তথাপি বন্ধু ও সহায় যত পাওয়া যায়, ততই মঙ্গল। এ অবস্থায় ছিঁচ কাঁদুনের মত "আমাদিগকে অপমান করিল" বলিয়া নাকে কাঁদা কিম্বা যাত্রার দলের ভীমের মত বক্তৃতা ঝাড়া কোনক্রমেই সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে। নাকে কাঁদিয়া বা ঝগড়া করিয়া অপরের সম্মান আদায় করা যায় না।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭

বিপ্লবী থেকে সাহিত্যিক

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

বাংলার পাঠক-সমাজের কাছে ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের হয়ত নতুন করে পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন হয়েছে। কারণ তাঁর বিচিত্র ও বিস্ময়কর প্রতিভার স্ফুরণ হয় সুদূর বিদেশে এবং বিদেশী ভাষার মাধ্যমে। আমেরিকা ইংলণ্ডের পাঠক-সমাজ তাঁকে জেনেছে একজন প্রতিভাবান্ সাহিত্যিকরূপে। ইউরোপ-আমেরিকার শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁকে চিনেছে, ভারতের এক অসাধারণ দেশপ্রেমিক বাগ্মী ব'লে—যাঁর জীবনের মহান্ ব্রত ছিল অমরাত্মা ভারতের বিবেকবাণী প্রচার, ভারতের দর্শন ও ধর্ম্ম, ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি, ভারতের শিক্ষাদীক্ষা ও চিন্তাধারা, ভারতের গিরি নদী নগর প্রান্তর অরণ্যানীর কথা প্রতীচ্য জগতের সামনে উপস্থাপিত করা। স্বদেশের গৌরবময় ঐতিহ্য বিদেশীদের কাছে শুধু পরিচিত করা নয়, সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করা। বিদেশে আমৃত্যু বাস ও বিদেশিনীর সঙ্গে দাম্পত্য জীবন যাপন করেও এমন মনে-প্রাণে স্বদেশী থাকার এবং স্বদেশের সেবার এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বেশি দেখা যায়নি।

স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি ভক্তিমতী মিস্ ম্যাক্‌লাউড একটি স্মরণীয় উক্তি করেছিলেন ধনগোপাল সম্পর্কে :

After Vivekananda, Dhan has successfully interpreted India in America. His words are very popular."

কুখ্যাতা মিস্ ক্যাথারিন মেয়ো "Mother India" গ্রন্থ রচনা ক'রে যখন ভারতের কুৎসা প্রচার করলেন পাশ্চাত্ত্য জগতে, ধনগোপাল তখন খাস আমেরিকাতেই বসে তার সমুচিত জবাব দিলেন "A Son of Mother India Answers" প্রকাশ করে। মিস্ মেয়োর বইয়ের বিষয় গান্ধীজী তীব্র মন্তব্য করেছিলেন (ড্রেন ইন্সপেক্টারের রিপোর্ট) এবং লালা লাজপত রায় "Unhappy India", K. L. Gamba "Uncle Sam" ইত্যাদি পুস্তক লিখেছিলেন। কিন্তু ধনগোপালের উত্তর-স্বরূপ বইখানি বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল পাশ্চাত্ত্য জগতে—মাত্র আড়াই মাসে তার সতেরটি মুদ্রণ হয় আমেরিকায়!

ধনগোপালের "Face of Silence" পুস্তকটি প্রকাশিত হওয়ার ফলে পাশ্চাত্ত্যে শ্রীরামকৃষ্ণের মহাত্ম্য প্রচারে অনেকখানি সহায়তা হয়। মনীষী রমাঁ রলাঁ ধনগোপালের এই গ্রন্থ পাঠ করে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং কথিত আছে, তাঁর শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে পুস্তক রচনা করবারও প্রেরণা পেয়েছিলেন। 'Face of Silence" প'ড়ে রমাঁ রলাঁ ধনগোপালকে লেখেন,

Mr. Mukherjee, what can I do to make you immortal in Europe?" ধনগোপাল উত্তর দেন, "Nothing for me. Please make Ramakrishna and Vivekananda wellknown in Europe."

ধনগোপালের "Visit India With Me" পাঠ করে আর্ল ব্রিউস্টার ও তাঁর পত্নী সবিশেষ প্রশংসা করেছিলেন। এই পুস্তকটি শুধু ভারতবর্ষের নানা তীর্থ ও নগরীর বহিরঙ্গ ভ্রমণ-কাহিনী নয়, ভারতের আত্মার সন্ধানী। এই বইও প্রকাশের তিন মাসের মধ্যেই চারটি সংস্করণ হয়।

তাঁর সাহিত্য-কৃতির বিষয়ে এই সব তথ্যই অবশ্য শেষ কথা নয় এবং সাহিত্যিক রূপে তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয়ও নয়। কারণ তিনি ছিলেন সত্যকার সৃজনশীল সাহিত্যিক, কবি ও নাট্যকার। সাহিত্যের প্রতিভা তাঁর বহুমুখী। কবি ও নাটকরচয়িতা, প্রাবন্ধিক ও জীবনীকার, ভ্রমণ-কাহিনী লেখক এবং পুরাণ-ব্যাখ্যাতা। তা ছাড়া, অপরূপ শিশুসাহিত্য স্রষ্টা। শিশুসাহিত্য রচয়িতা রূপে আমেরিকায় তিনি বিপুল যশের অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁর Gay Neck পুস্তকটি ১৯২৭ সালের শ্রেষ্ঠ শিশুসাহিত্য রূপে লাভ করে জন নিউবেরি

পুরস্কার। শিশুসাহিত্য রচনার বিষয়বস্তু হিসেবেও তিনি ভারতের জীবজন্তু, শিকারী, অরণ্যের মানুষ ও শিশুর এক অজ্ঞাতপূর্ব জগতের সন্ধান দেন তাঁর বিদেশী শিশুপাঠকদের। শ্রেষ্ঠ শিশুসাহিত্য বড়দেরও আকৃষ্ট ক'রে থাকে; তাই তাঁর ছোটদের জন্যে রচিত সাহিত্য পুস্তকগুলি মার্কিণ সাহিত্যের বৃহত্তর পাঠক সমাজেরও অভিনন্দন লাভ করেছিল। যথা,

Kari, the Elephant. Jungle Beasts and Men. Ghond, the Hunter. Hari, the Jungle Lad. The Chief of the Herd, ইত্যাদি।

তিনি একাধিক নাটক রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে "Judgment of Indra" নাটকটি Gollanx প্রতিষ্ঠান প্রকাশিত ৫০টি শ্রেষ্ঠ নাটকের অন্যতম রূপে অন্তর্ভুক্ত আছে। গিরীশচন্দ্রের বিল্বমঙ্গল নাটকটিরও তিনি অনুবাদ করেছিলেন "Chintamani" নামে।

"My Brother's Face" পুস্তকে তিনি ভ্রাতা যাদুগোপালের বিপ্লবী জীবনের কিঞ্চিৎ পরিচয় এবং নিজের বাল্য জীবনের কিছু কথাও বর্ণনা করেছেন। "Caste and Outcaste" গ্রন্থ থেকে তাঁর বিদেশে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যে কঠোর সংগ্রামের আভাস পাওয়া যায়।

এমন বৈচিত্র্যময় ছিল তাঁর সাহিত্যকর্ম। অথচ তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশ করেছিলেন কাব্যের আঙিনা দিয়ে। আমেরিকায় তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ—"Rajani", কবিতার বই। তাঁর দ্বিতীয় পুস্তকটি নাটক—"Layla Majnu"। পরবর্তী জীবনে কাব্যরচনা আর বিশেষ করেন নি, ভগবদ্‌গীতা ইত্যাদির অনুবাদ ভিন্ন। প্রধানতঃ গদ্য সাহিত্যের লেখকরূপেই তাঁর সাহিত্যজীবন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তাঁর সাহিত্যজীবনের সূত্রপাত হয় বিদেশে, সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ পরিবেশে এবং অতি তরুণ বয়সে। তা ছাড়া, তার আগে বাংলায় কোন গ্রন্থ তিনি রচনা করেন নি এবং বাংলা দেশে থাকতেও সাহিত্য চর্চ্চা তাঁর ঘটে ওঠেনি।

আরও আশ্চর্য্যের কথা, তাঁর জীবন আরম্ভ হয়েছিল বিপ্লবী রূপে। বাংলা দেশে প্রথম যুগের বিপ্লবী ভাবধারায় তিনি কিশোর বয়সেই উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। বিপ্লবের দীক্ষা কিন্তু তাঁর হয় বাড়ীতেই, নিজের ভাইদের কাছে। অনুশীলন দলের সঙ্গে যোগাযোগে তাঁরা তিন ভাই সক্রিয় হয়ে ওঠেন—ক্ষীরোদগোপাল, ডঃ যাদুগোপাল (পরবর্ত্তীকালে যুগান্তর দলের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় নেতা) এবং ধনগোপাল। তাঁরা স্থির করেছিলেন, বিদেশের সাহায্য লাভ না করতে পারলে ইংরেজকে বিতাড়িত করা যাবে না। সেই উদ্দেশ্যে সাব্যস্ত হয় বিদেশে গুপ্ত সমিতি গঠন ক'রে কাজ আরম্ভ করা এবং সেই কর্ম্মসূচী অনুসারে ক্ষীরোদগোপাল যান বর্ম্মায় এবং ধনগোপাল জাপান হয়ে আমেরিকায়।

১৯০৮ সালের এপ্রিল মাসে (বয়স তখন তাঁর ১৮ বছরও পূর্ণ হয়নি) ধনগোপাল একাকী সমুদ্রযাত্রা করেন। স্কুলের পাঠ শেষ করে মাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়েছেন, ফল তখনও অপ্রকাশিত। গুপ্তসমিতি গঠনের উদ্দেশ্যে জাপান যাওয়ার কথা তিনি ও তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা গোপন রেখেছিলেন এবং প্রচার করেন যে যন্ত্রবিদ্যা শিক্ষার জন্যে জাপান চলেছেন। আসল উদ্দেশ্যের কথা আর কখনও প্রকাশিত হয়নি। কারণ পরবর্ত্তী জীবনে ধনগোপাল ভিন্ন-পথের পথিক হওয়ায় এই তথ্যটি উহ্য থেকে যায় এবং তিনি নিজেও Caste and Outcast কিংবা অন্য কোন পুস্তকে কথাটি উল্লেখ করেন নি, হয়ত অপ্রয়োজনীয় মনে করে।

ধনগোপালের প্রতিভা-বৈচিত্র্যের অন্তরঙ্গ পরিচয় পাবার জন্যে তাঁর বংশকথা জানা প্রয়োজন।

পারিবারিক পরিবেশ

ধনগোপালকে নিয়ে তাঁদের বংশের কলকাতায় সাত পুরুষের বাস। এই বংশীয়দের আদি নিবাস ছিল বাঁকুড়া জেলার মৃজাপুরে। সেখানকার বংশ প্রতিষ্ঠাতার নাম রামহরি মুখোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন বিষ্ণুপুর রাজের দেওয়ান। ধনগোপালের পিতামহ রাজবল্লভের চার পুত্র—কিশোরীলাল, পিয়ারীলাল নৃত্যলাল ও গৌরহরি।

উত্তর কলিকাতার আহিরীটোলা অঞ্চলে ৭, দাঁ গলিতে তাঁদের আদি বাড়ী। পরে কাছাকাছি ৬২

বেনেটোলা লেনে আর একখানি বাড়ী তৈরি হ'লে দু'টি বাড়ীতে তাঁদের বাস হ'তে থাকে। সংসার একান্নবর্ত্তী এবং কর্ত্তারা উচ্চ আদর্শবাদী। স্বজাতিপ্রীতি এবং স্বাদেশিকতার উদার আবহ এই পরিবারে ছিল, বিশেষ কিশোরীলাল এবং গৌরহরির চরিত্রে। বৃত্তিতে প্রায় সকলেই আইনজীবী। কিন্তু তা বাহ্য। আপন আপন আদর্শের প্রেরণায় চলতেই তাঁরা অভ্যস্ত ছিলেন। সাধারণ একান্নবর্ত্তী সংসারের সমস্ত ক্ষুদ্রতা ও নীচতার বহু ঊর্দ্ধে আদর্শের আনন্দলোকে বিচরণ করতেন তাঁরা। জ্যেষ্ঠ কিশোরীলাল ১১।১২ বছর মেদিনীপুরের তমলুকে ছিলেন ওকালতির সূত্রে। কিন্তু তিনি নানা স্থানের সঙ্গীতাসরে যোগদান করতে যেতেন, কারণ তাঁর যথার্থ পরিচয় ছিল সঙ্গীত-সাধক রূপে। তৎকালীন বাংলার এক সুকণ্ঠ ও গুণী ধ্রুপদী ছিলেন তিনি এবং ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ওস্তাদ মুরাদ আলীর শিষ্য। ময়ূরভঞ্জের রাজদরবারের বিখ্যাত গায়ক যদুনাথ রায় ছিলেন কিশোরীলালের গুরুভাই। যদু রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র আশুতোষ রায় এবং ভাগলপুরের সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, বাংলার এই দুই গুণী গায়ক, কিশোরীলালের কাছে কিছু কিছু সঙ্গীতশিক্ষা করেন। সঙ্গীতচর্চ্চা ভিন্ন কিশোরীলালের আর একটি প্রিয় বিষয় ছিল—দেশ-বিদেশের ইতিহাস পাঠ, বিশেষ স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা। উদার ও মহৎ অন্তঃকরণের মানুষ ছিলেন তিনি।

কিশোরীলালের তৃতীয় ভ্রাতা নৃত্যলাল আলিপুরের অতি কৃতী উকীল ছিলেন। কিন্তু তিনি অবিবাহিত থেকে সমস্ত উপার্জ্জিত অর্থের একাংশ ব্যয় করতেন যৌথ পরিবারে, একাংশ দান করতেন রামকৃষ্ণ মিশনে এবং একাংশ দুঃস্থ মানুষের সাহায্যের জন্যে। ৬২, বেনেটোলার বাড়ীখানিও তাঁর তৈরি। সংসারে থেকেও তিনি সাধু।

কনিষ্ঠ গৌরহরি পেশায় এ্যাটর্নি হলেও, মন ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে। তিনি ছিলেন দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, স্মরণীয় ব্যায়ামাচার্য। বাংলা দেশে জিম্‌ন্যাষ্টিক ব্যায়ামচর্চ্চার প্রচলন বহুলাংশে তাঁর দ্বারাই সম্ভব হয়েছিল। কথিত আছে, তাঁর তরুণ বয়সে কলকাতায় আগত মিশরী জিম্‌ন্যাষ্টিক দলের দৃষ্টান্তে তিনি এই ব্যায়াম-চর্চ্চায় ব্রতী হন এবং তাঁর বীরত্বের সাধনায় বাস্তব প্রেরণা দেয় সেকালের গোরা সৈন্যদের দুর্ব্বৃত্তরা। মাতাল ও উচ্ছৃঙ্খল 'টমি'দের অত্যাচার এস্‌প্ল্যানেডকে কেন্দ্র করে কলকাতার দক্ষিণ উপকণ্ঠ এবং উত্তরাঞ্চল পর্য্যন্ত বাঙ্গালী মহলে ত্রাসের সঞ্চার করত। তারই প্রতিক্রিয়ায় এবং গোরাদের উত্তম-মধ্যম শিক্ষা দেবার শুভ সঙ্কল্প নিয়ে গৌরহরি একটির পর একটি ব্যায়ামাগার স্থাপন ক'রে বাংলার তরুণদের মধ্যে ব্যায়ামচর্চ্চার বিস্তার সাধন আরম্ভ করলেন। তাঁর কার্য্যধারা বিস্তৃত হয় কলকাতা ও সহরতলীর নানা স্থানে, এমন কি হাওড়া ও হুগলী জেলায় পর্যন্ত বহু আখড়ার পত্তন হয় এবং তিনি স্বয়ং সে-সব আখড়া মাঝে মাঝে পরিদর্শন করে উৎসাহ দিতেন শরীর-চর্চ্চায়। সে-কালটি হ'ল 'হিন্দুমেলার' যুগ, অর্থাৎ বাংলার নব জাগ্রত জাতীয়তা-বোধের যুগ। গৌরহরির কলকাতার এক শিষ্য মতিলাল বসু পরে Bose's Circus প্রবর্ত্তন ক'রে বিখ্যাত হন। সেই সার্কাসও গৌরহরি তত্ত্বাবধান করতেন। এসবের সঙ্গে তিনি আবার ছিলেন সঙ্গীতের সেবক। বীণা ও সুরবাহার বাদনে তিনি নিপুণ ছিলেন এবং সঙ্গীতের তত্ত্ববিষয়ে চিন্তাশীল প্রবন্ধাদিও রচনা করতেন। তাঁর বেহালা বাদন শুনে এক সাহেব মুগ্ধ হন এবং তাঁকে উপহার দেন দু'টি ব্যাঘ্র শাবক। সে দু'টিকে গৌরহরি বাড়ীতেই রেখে পালন করতেন। আর একটি সামান্য তথ্য আছে তাঁর সম্পর্কে, যা থেকে তাঁর মনের একটি অসামান্য দিক্, তাঁর স্নেহশীল ও উদার মনের পরিচয় ফুটে ওঠে—তাঁর ক্যাশবাক্সের চাবি রেখে দিতেন ভ্রাতুষ্পুত্র যাদুগোপালের কাছে।

কিশোরীলালের পাঁচ পুত্র—ননীগোপাল (অল্পায়ু), মাখনগোপাল, ক্ষীরোদগোপাল, যাদুগোপাল ও ধনগোপাল বেশির ভাগ কলকাতাতেই থাকতেন। তাঁদের ছাত্রজীবনও প্রধানত কলকাতায়। মাঝে মাঝে যেতেন তমলুকে পিতামাতার কাছে। সেখানে শিল্পী-প্রাণ, বিদ্যা ও সত্যে অনুরাগী পিতা ছেলেদের সামনে এই আদর্শ ধরতেন, তারা যেন দেশ-হিতৈষী ও সুশীল হয়। শুধু অর্থোপার্জ্জন ক'রে ধনী হওয়া তিনি তাদের

কাছে আশা করেন না। তাদের জননীও চরিত্রে ছিলেন মহীয়সী। তীব্র ন্যায়-অন্যায়বোধ, উৎপীড়িত ও দুর্গতদের প্রতি গভীর সহানুভূতি, স্বাধীনতা যুদ্ধের নানা কথায় আগ্রহ—মাতার স্বভাবে এই সব বৈশিষ্ট্য ছিল এবং সন্তানদের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় এসব ভাব সঞ্চারিত হ'ত তাদের মনে। তমলুকে পিতামাতার কাছে এমনি প্রভাব আর কলকাতায় কাকাদের, বিশেষ গৌরহরিবাবুর চরিত্র ও কার্য্যকলাপ। ছেলেদের মানসিক গঠনে এই দ্বিবিধ প্রভাব ক্রিয়া করেছিল। আর, উনিশ-বিশ শতকের সন্ধিক্ষণ থেকে দেশের হাওয়ায় সশস্ত্র সংগ্রামের কথা ভেসে বেড়াত। তাই সচ্ছল সুখী পরিবারের আদরের সন্তানদের (আদরের যে, তা ছেলেদের নামকরণেই প্রকাশ) প্রাণে সাড়া জাগাল ঝড়ের আহ্বান। ঝড়ের সঙ্কেত এল ঘর থেকেই। মাখনগোপাল হলেন কনিষ্ঠদের দীক্ষাগুরু। ভাইদের সঙ্গে তাঁর আলোচনা চলত—১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ ব্যর্থ হয়ে যায় জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগের অভাবে। তাই এবার দরকার চতুরঙ্গ বিপ্লব। ছাত্র, সৈন্য, কৃষক, শ্রমিক এই চার অঙ্গকে এবার সংগঠিত করে সশস্ত্র অভ্যুত্থান করতে হবে। মাখনগোপালের ভাষা-চর্চ্চার বিষয়েও প্রতিভা ছিল। ফরাসী, জার্ম্মান, ল্যাটিন, সংস্কৃত ইত্যাদি ভাষা নিজের চেষ্টায় আয়ত্ত করেছিলেন তিনি।

মাখনগোপাল তাঁর দুঃসাহসিক ভাবধারা ও বৈপ্লবিক আদর্শ কনিষ্ঠদের মনে গভীর ভাবে অঙ্কিত করে দেন। ক্ষীরোদ, যাদু ও ধনগোপাল তিনজনেই দীক্ষা নিলেন অগ্নিমন্ত্রের।

১৯০৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মাখনগোপালের বসন্ত রোগে মৃত্যু হয়। কিন্তু দুঃসাহসিক ভ্রাতাদের বিদেশে গুপ্তসমিতি গঠনের পরিকল্পনা বর্জ্জিত হ'ল না। কয়েকমাসের মধ্যেই নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মসূচী অনুসারে ক্ষীরোদগোপাল গেলেন বর্ম্মায়, ধনগোপাল জাপানে এবং ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় শ্যামদেশে পাড়ি দিলেন। যাদুগোপাল ডাক্তারি পড়বার জন্যে তখন বিদেশে যান নি। ডাক্তার হয়ে ভারতীয় সৈন্যদলে বিপ্লববাদ প্রচার ও বৈপ্লবিক সংগঠন গড়ে তোলা ছিল তাঁর লক্ষ্য। শ্যামদেশ থেকে ভোলানাথ সাঙ্কেতিক চিঠি যাদুগোপালকে পাঠাতেন, বর্ম্মায় ক্ষীরোদগোপালের মধ্যস্থতায়।

ক্ষীরোদগোপাল প্রথমে রেঙ্গুনে ও পরে মিচিনায় অবস্থান করতেন এবং কিছু বর্ম্মীদের সহানুভূতিসম্পন্ন করেছিলেন। শেষে দুর্দ্ধর্ষ পাঠান মাসিদি যাঁর সাহায্যে অস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টায় গ্রেপ্তার ও অন্তরীণ হন। তাঁর বর্ম্মা প্রবাস সম্পর্কে একটি অতিশয় উল্লেখযোগ্য সংবাদ এই যে, ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের সঙ্গে রেঙ্গুনে তাঁর পরিচয় ঘটে এবং শরৎচন্দ্র তাঁর কাছে বাংলার তৎকালীন বিপ্লবীদের বিষয়ে নানা বিবরণ পান। এশিয়ার বিভিন্ন দেশ জুড়ে যে বাংলার কল্পনাপ্রবণ ও অসমসাহসী তরুণের দল গুপ্তসমিতি সংগঠন করছেন—এইসব চমকপ্রদ খবরও ক্ষীরোদগোপালের কাছে ভালভাবেই জানতে পারেন শরৎচন্দ্র। পরে নিজের বিচিত্র কল্পনাশক্তি ও প্রতিভাদীপ্ত কথাশিল্পের মাধ্যমে (এবং অন্য সূত্রে সংগৃহীত বিবরণাদি যুক্ত করে) সেই সমস্ত উপাদানকে তিনি "পথের দাবী"র অপূর্ব্ব সাহিত্য-সৃষ্টিতে রূপায়িত করেন। ক্ষীরোদগোপাল যুগপৎ দু'হাতে রিভলভার চালাতে পারতেন। এই নৈপুণ্য শরৎচন্দ্রের মানসপুত্র 'সব্যসাচী'রও দেখা যায়। (শরৎচন্দ্রের সম্পর্কিত মাতুল বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়েরও একসঙ্গে দু'হাতে রিভলভার চালনার কথা অবশ্য তিনি জানতে পারেন।) "পথের দাবী"র উপকরণের জন্যে শরৎচন্দ্র ক্ষীরোদগোপালের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে বিশেষ লাভবান্ হয়েছিলেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কারণ ক্ষীরোদগোপাল বর্ম্মায় অবস্থানের সময়ে স্বয়ং সেকালের এক আদর্শ বিপ্লবী-চরিত্র ছিলেন। যা হোক, বর্ম্মার অন্তরীণ-জীবন সমাপ্তির পর ক্ষীরোদগোপাল বাংলা দেশে ফিরে এসেছিলেন এবং আবার স্বগৃহে অন্তরীণ হন। কিন্তু সেই অবস্থায় পরে যে সন্ন্যাসী হয়ে নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন, আর তাঁর কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি!

ধনগোপালের জীবন-কথা

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে ধনগোপালের জন্ম হয়। জন্মস্থান কিন্তু কলকাতা নয়, পিতার কর্ম্মস্থান তমলুক। প্রথম শিক্ষা তমলুকের বাংলা স্কুলে। (এই স্কুলটির এখন আর অস্তিত্ব নেই।) তারপর কলকাতায়

নিমতলা স্ট্রীটের ডাফ্‌ কলেজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি হয়ে সেখান থেকেই প্রবেশিকা (এণ্ট্রান্স) পরীক্ষা দেন (১৯০৮)। স্কুলে পড়বার সময়েই ক্ষীরোদগোপাল ও যাদুগোপালের সঙ্গে বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। যাদুগোপাল স্বল্পভাষী ও চাপা স্বভাবের ব'লে বাড়ীতে গুরুজনেরা তাঁর মনের খবর বা গতিবিধি কিছুই জানতেন না, বাড়ী তল্লাসীর আগের দিন পর্য্যন্ত। কিন্তু ধনগোপালের তখন স্বভাব ছিল আবেগপূর্ণ, ভাবপ্রবণ। তিনি এক-একদিন পকেটে ভরে রিভলভার বাড়ীতে এনে দেখিয়ে শুনিয়ে জানিয়ে দিতেন যে, ইংরেজ তাড়াবার আয়োজন ভাল ভাবেই হচ্ছে।

প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল বেরুবার আগে, নিজেদের মধ্যে পরামর্শক্রমে ধনগোপাল তাঁদের ৬২ নম্বর বাড়ী থেকে জাপান যাত্রা করলেন যন্ত্রবিদ্যা শিক্ষার অজুহাতে। জাপান পৌঁছে কিছুদিন দেশ-হিতৈষণার কাজ করেছিলেন পড়বার সঙ্গে। গুপ্ত সমিতি গঠনের প্রথম ধাপে যেমন কাজ করতে হয়।

জাপানে কয়েক মাস থেকে তিনি চলে গেলেন আমেরিকায়। এখানে কিন্তু অবস্থাবিপাকে তাঁর জীবনের গতি প্রথম পরিবর্ত্তিত হ'ল। আমেরিকার মতন স্থানে, নিঃসহায় নিঃসম্বল ১৮ বছরের বিদেশী তরুণের পক্ষে অতি কঠিন জীবন-সংগ্রাম আরম্ভ করতে হ'ল অর্থোপার্জ্জনের জন্যে। অবশ্য শুধুই জীবনধারণের জন্যে নয়, শিক্ষা ও বিদ্যা লাভের লক্ষ্য থেকেও তিনি বিচ্যুত হননি। সেজন্যে অমানুষিক কায়িক পরিশ্রমে তাঁকে জীবিকা অর্জ্জন করতে হ'ত—কখনও হোটেলে, কখনও গৃহস্থের বাড়ীতে, কখনও বাগানে, এমন কি শস্যক্ষেত্রে চাষীর কাজ পর্য্যন্ত তিনি করেন সেই দুর্দ্দিনে। এইভাবে পাথেয় সংগ্রহ করে তিনি বি. এ. পরীক্ষা দিলেন, ক্যালিফোর্নিয়ার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। বি. এ-তে তাঁর বিষয় ছিল—Comparative Literature (তুলনামূলক সাহিত্য)। ইতোমধ্যে তিনি আমেরিকায় নৈরাজ্যবাদীদের (anarchist) প্রভাবে পড়ে তাদের দলে যাতায়াত করতেন। সেই উপলক্ষ্যে পত্র মারফৎ তীব্র বাদানুবাদ হয় তাঁর সঙ্গে যাদুগোপালের, একমাত্র তাঁর সঙ্গেই ধনগোপালের স্বদেশে যোগাযোগ ছিল। যাদুগোপালের যুক্তিতর্কের ফলে তিনি আমেরিকান নৈরাজ্যবাদীদে প্রভাব থেকে ক্রমে সরিয়ে এনেছিলেন নিজেকে।

আমেরিকায় তাঁর ছাত্রজীবনের মধ্যে, বি. এ. পরীক্ষা দেবার আগে, ধনগোপালের একটি নতুন স্বরূপ প্রকাশ পায় বিশেষ সম্ভাবনা নিয়ে। তা হ'ল তাঁর কবি ও সাহিত্যিক সত্তা। ১৯১২-১৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লেখকরূপে যশ অর্জ্জন করতে আরম্ভ করেন, এবং বক্তা রূপেও।

তাঁর এই অভিনব যুগ্ম স্বরূপ প্রকাশিত হবার কথা শুনে যাদুগোপাল তাঁকে একটি অমূল্য নির্দ্দেশ দেন, যা বহুলাংশে ধনগোপালের প্রতিভাকে আপন বিশিষ্ট পথে চরিতার্থতার প্রেরণা দেয়। যাদুগোপাল তাঁকে লেখেন যে, তিনি যেন ভারতের দিকে আমেরিকাবাসীর চিত্ত আকৃষ্ট করার কাজে নিজেকে নিযুক্ত করেন লেখা ও বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে। যাদুগোপালের এই নির্দ্দেশ যেমন সময়োপযোগী, তেমনি ধনগোপালের মানসিক প্রবণতার সঙ্গে সুসঙ্গত হয়েছিল। সাহিত্যসেবায় নতুন করে প্রেরণা লাভ করেছিলেন ধনগোপাল এবং সাহিত্য চর্চ্চার অর্থ নতুন রূপে প্রতিভাত হয়েছিল তাঁর মানস-লোকে। তাঁর সাহিত্য ও বক্তৃতা দুইয়েরই বিষয়বস্তুতে প্রধান স্থান অধিকার করে রইল, যা তাঁর নিজেরও সত্তায় পূর্ণ প্রভাবে বিদ্যমান ছিল—বাংলা দেশ, ভারতবর্ষ, স্বদেশ!

তাঁর প্রথম প্রকাশিত (কবিতার) বইখানির নাম হ'ল—"Rajani"। তার Foreword-এও তিনি বলেন, In writing these poems,the spirit and music of my own language, Bengali, have overlapped the English meter. No desire for experiment has created them. They came . . . into the shadow light garment of the dying day . . in the image of my own beloved Bengal."

তাঁর দ্বিতীয় পুস্তক (নাটক) "Layla Majnu" একই বছরে (১৯১৬) প্রকাশিত হয়। তারপর থেকে প্রবন্ধ, ভ্রমণ-কাহিনী, আত্মজীবনী, শিশুসাহিত্য ইত্যাদিতে তাঁর বিচিত্র সাহিত্যকর্ম্ম রূপায়িত হতে থাকে দীর্ঘ ২০ বছর ধরে। এবং তিনি আমেরিকা এবং

ইংলণ্ডেরও জনসাধারণের কাছে একজন রীতিমত খ্যাতিমান্ সাহিত্যিকরূপে পরিগণিত হন। এথেল রে ডুগান নামে আমেরিকান মহিলাকে তিনি বিবাহ করেছিলেন। এই মহিলা ছিলেন চিত্রশিল্পী। তাঁদের একমাত্র পুত্রের নামও ধন মুখার্জ্জী।

ধনগোপাল পরে দু'বার স্বদেশে এসেছিলেন। ১৯২১ ও ১৯২৯ সালে। দুবারই অবস্থান করেন বেলুড় মঠে, তবে কলকাতার বাড়ীতে যাতায়াত করতেন।

সে-সময় পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু একবার ধনগোপালকে কিছুদিন সাদরে রেখেছিলেন তাঁর এলাহাবাদ ভবনে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে তিনি শান্তিনিকেতনেও গিয়েছিলেন। ১৯২১ সালে অবস্থানের সময়ে তিনি বাংলার অনেক সাহিত্যিকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করেন "ভারতী" মাসিক পত্রিকার কার্য্যালয় সুকীয়াস ষ্ট্রীটে। সেখানে তাঁকে প্রথম পরিচিত করেন সাহিত্যিক ও তাঁর বন্ধু সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সুরেশচন্দ্রের সঙ্গে ধনগোপালের প্রথম পরিচয় হয়েছিল জাপানে থাকবার সময়। ধনগোপালের কয়েকটি বই তিনি বাংলায় অনুবাদ করেন—Gay Neck থেকে 'চিত্রগ্রীব', The Chief of the Herd থেকে 'যূথপতি' ও Caste and Outcast থেকে আংশিকভাবে 'ঘরের ছেলে বাহিরে'।

ধনগোপাল বাংলা দেশে এসে বিদেশী পোশাক বর্জ্জন ক'রে মাত্র ধুতি-চাদর গায়ে থাকতেন ও সকলের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে যেতেন। শ্যামবর্ণ, মাঝারি আকার, সদালাপী, চোখ-মুখে বুদ্ধি ও চিন্তাশীলতার অভিব্যক্তি এবং সরল অনাড়ম্বর স্বভাব। চিন্তায় ও কর্ম্মে অতি সুশৃঙ্খল এবং পাণ্ডিত্য ও গভীর চিন্তা সত্ত্বেও নিজেকে একান্তভাবে বিচ্ছিন্ন রাখতেন না, সহজ ভাবে সকলের সঙ্গে মিশতেন। কথা বলতেন মৃদুস্বরে, কিন্তু কথাবার্ত্তায় ধরণ-ধারণে বিশেষ সংস্কৃতির পরিচয় ফুটে উঠত।

দুবারই ধনগোপাল ভারতে আসেন সাময়িকভাবে। কিছুকাল থেকে আবার আমেরিকায় ফিরে যান। সাহিত্যিকরূপে তাঁর খ্যাতি প্রতিপত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তিনি সেখানে সবিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

কিন্তু অতিশয় পরিতাপের বিষয় যে, বাংলার এমন এক সুসন্তানের জীবনের ছেদ পড়ল যেমন আকস্মিক তেমনি শোচনীয় ভাবে। স্নায়বিক বিকলতায়, অসুস্থ দেহে ধনগোপাল আত্মহত্যা করেন। তাঁর মৃত্যুসংবাদ এইভাবে প্রকাশিত হয়:

"New York, July 15, 1936.

Mr. Dhan Gopal Mukherji, lecturer, writer and author of the book entitled "A Son of Mother India Answers," which replies to Miss Katherine Mayo's "Mother India," found hanged in his Manhattan apartment by his American wife.

Mr. Mukherji, aged 45, had a nervous breakdown some weeks ago, said to be due to over work.

Reuter."

গ্রন্থাবলীর তালিকা

(1) Rajani—Songs of the Night. (Introduction by D.S. Jordan). San Francisco, 1916. (2) Layla Majnu—musical play in three acts (Introduction by A. W. Hope) San Francisco, 1916. (3) Caste and Outcast. London, 1923. (4) Jungle Beasts and Men. Illustrated. New York, 1924. (5) My Brother's Face. London, 1925. (6) Gay Neck—the story of a pigeon. Illustrated. New York, 1927. (7) A Son of Mother India Answers. New York, 1928. (8) Visit India with Me (with maps & illustrations). New York, 1929. (9) Devotional Passages from the Hindu Bible. New York, 1929. (10) The

Face of Silence. New York. (11) Ghond, the Hunter. Illustrated. London, 1930. (12) Disillusioned India. New York, 1930. (13) Rama, the Hero of India. Valmiki's Ramayana done into a short English version for boys & girls. Illustrated. London, 1931. (14) The Chief of the Herd. Illustrated. London. (15) Bhagavadgita—the Song of God, translation of Bhagavadgita. (16) Kari, the Elephant. Illustrated. (17) Hari, the Jungle Lad. Illustrated. (18) Judgment of India. (19) Chintamani.

"বিপ্লব দীর্ঘজীবী হউক"

আজকাল সভা-সমিতিতে ও মিছিলে যেসব আওয়াজ লিখিত ও উচ্চারিত হয়, "বিপ্লব দীর্ঘজীবী হউক" তাহাদের মধ্যে একটি। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায়, রাষ্ট্রিক, আর্থিক, সামাজিক ও ধার্মিক বিপ্লব অনেক দেশে একাধিক বার হইয়াছে। ভারতবর্ষেও হইয়া গিয়াছে এবং আবার হইবে। নানাদিকে কতকগুলি গুরুতর পরিবর্তন আবশ্যক হইয়াছে। আমরা তদ্রূপ পরিবর্তনের পক্ষপাতী। কিন্তু পরিবর্তনগুলি ক্রমে ক্রমে হইবে, না হঠাৎ বৈপ্লবিক উপায়ে হইবে, কেহ বলিতে পারে না। যাঁহারা বৈপ্লবিক উপায়ে পরিবর্তন চান, তাঁহারা "বিপ্লব হউক" বলিবার অধিকারী। কিন্তু "বিপ্লব দীর্ঘজীবী হউক" কথাগুলির মানে কি? এই যে রব বা চীৎকার, ইহার উদ্ভব "রাজা দীর্ঘজীবী হউন" (Long live the king) এই ধ্বনির সহিত পাল্লা দিবার জন্য হইয়াছে। রাজার দীর্ঘজীবন কেহ প্রার্থনা করিলে তাহার প্রার্থনার মানে এই যে, রাজা বাঁচিয়া থাকিয়া রাজধর্মপালন রূপ তাঁহার নিত্যকর্ম করিতে থাকুন। "বিপ্লব দীর্ঘজীবী হউক" প্রার্থনারও মানে এইরকমই হইবার কথা। তাহা হইলে যাঁহারা বিপ্লবের দীর্ঘজীবন কামনা করেন তাঁহারা চান যে, বিপ্লবের যে সব গুরুতর পরিবর্তন অতি শীঘ্র সংঘটন, তাহা নিত্যই চলিতে থাকুক; অর্থাৎ রাষ্ট্রে, সমাজে প্রভৃতিতে চরকীর মত ক্রমাগত পরিবর্তন হইতে থাক্! তাহা হইলে রাষ্ট্র আদিতে কোনদিন সকাল ৬টার সময় যে পরিবর্তন হইল, তাহা ৭টার সময় যদি বদলাইয়া যায়, কিংবা যদি ৩ দিন বা ২ মাস বা ২ বৎসর পরেও বদলাইয়া যায়, তবে তাহার শুভ (বা অশুভ) ফলের পরীক্ষা কখন হইবে, শুভ ফল ভোগ কে, কখন করিবে?

"বিপ্লব দীর্ঘজীবী হউক" প্রার্থনাটির এইরূপ অর্থের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা থাকায় যুগপৎ হাস্য ও আতঙ্কের উদ্রেক হয়।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী, পৌষ, ১৩৩৬।

রিফিউজী ক্যাম্পে দশ দিন

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী

গত ১৫ই জানুয়ারী ১৯৬৪ সাল, বুধবার, রাত্রি ১১টার সময় আমার অবস্থা হইয়াছিল নীরব দর্শকের মত। আমি সংখ্যালঘু সম্মিলনীর কাজে ব্যস্ত। ১১ই, ১২ই জানুয়ারী অধিবেশন। আমি ঢাকা নগরীতে ৫১নং হেমেন্দ্র দাস রোডে স্বদেশ নাগের বাড়ীতে আছি, ইতিমধ্যে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত কুমিল্লা হইতে ঢাকা আসিয়া সম্মিলনী স্থগিত রাখিতে অনুরোধ করিলেন। এদিকে সম্মিলনীর কাজ অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। নিমন্ত্রণ পত্র বিতরণ করা হইয়াছে। টাকা খরচ হইয়াছে অনেক, এজন্য কনফারেন্স বন্ধ করার আমার ইচ্ছা ছিল না, পরে অবশ্যই অবস্থার চাপে বাধ্য হইয়া সম্মিলনীর কাজ স্থগিত রাখিলাম। আমি সেই সময়োপযোগী একটি বিবৃতি বিভিন্ন কাগজে দেওয়ার জন্য ১৪ই জানুয়ারী ওয়ার স্ট্রীট দিয়া হাটখোলার দিকে পায়ে হাঁটিয়া যাইতেছিলাম, পরণে ছিল খদ্দরের ধুতি এবং কোট, সঙ্গে স্বদেশ নাগ ছিল, তখন একটি মুসলমান যুবক বলিল—আপনারা ওদিকে যাবেন না, একটি খুন হইয়াছে। আমরা বাসায় ফিরিলাম, সহর গরম। আমার বিবৃতি ১৫ই জানুয়ারী আজাদ, ইত্তেফাক ও সংবাদ কাগজে বাহির হইয়াছিল। কলিকাতার কাগজেও বিবৃতি পাঠাইয়াছিলাম। ১৫ই জানুয়ারী বাসায় আছি, দ্বিপ্রহরের পর হইতে ৫১নং হেমেন্দ্র দাস রোডে স্বদেশ নাগের বাসায় আশেপাশের হিন্দুরা আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল, শেষ পর্য্যন্ত মেয়ে-পুরুষ-শিশুসহ সংখ্যা প্রায় তিনশত হইল। কারফিউ জারি হইয়াছে। কারফিউ হইয়াছে সত্য—কিন্তু এক শ্রেণীর লোক রাস্তায় হৈ-চৈ করিয়া চলাফেরা করিতেছে। আমরা স্থির করিলাম বাসায়ই থাকিব। স্বদেশ নাগ রাত্রে সকলের খাওয়ার জন্য ডাল-ভাত রান্নার ব্যবস্থা করিতেছে। রাত্রি যতই হইতেছে, ভয়ের আশঙ্কা ততই বৃদ্ধি পাইতেছে, সকলের মন অস্থির চঞ্চল। রাত্রি প্রায় ১১টার সময় দুই-একজন মুসলমান বন্ধু স্বদেশ নাগকে উপদেশ দিলেন, আপনারা সরিয়া পড়ুন। সরিয়া পড়া ছাড়া উপায় ছিল না। আমার অবস্থা নীরব দর্শকের মত হইল, ৭৫ বৎসর বয়স, হার্ট ট্রাবল। হার্ট ট্রাবলের দস্তুর এই, উত্তেজনার সময় বা সামান্য পরিশ্রম করিলে ট্রাবল বৃদ্ধি পায়, দম বন্ধ হইবার উপক্রম হয়, চলার শক্তি থাকে না। আমার যৌবনে, আমি যখন অনুশীলন সমিতির সভ্য হইয়া অসি খেলা ও ড্যাগার খেলা শিখি তখন আমার মনে এই বিশ্বাস ছিল, হাতে একখানা অসি থাকিলে দুই শত লোকের মোকাবেলা করিতে পারিব, একটি লাঠি হাতে থাকিলে অন্তত: পঞ্চাশ জন লোককে ফিরাইতে পারিব। ১৯৪৭ সালে শ্রীহট্ট জিলার নওগাঁয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর আমি বিধ্বস্ত অঞ্চলে যাই, সেখানে কৈবর্ত্তরা একটি মুসলমান গ্রাম পোড়াইয়া দিয়াছিল, ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রায় ৮।১০ হাজার মুসলমান নৌকাযোগে নওগাঁ আক্রমণ করে। তখন ছিল বর্ষাকাল। গ্রামটি ছিল একটি দ্বীপের মত। চারিদিকে জল, গ্রামের লোক দ্বীপের চারিদিকে বাঁশের ব্যূহ রচনা করিয়া বাধা দেয়। আক্রমণকারীরা নৌকায় ছিল, নৌকাবোঝাই মানুষ। গ্রামের লোক কুইচ, বল্লম, মুলি বাঁশ চোখা প্রভৃতি লইয়া গ্রামের চারিদিকে দাঁড়াইয়া বাধা দিতে লাগিল, মেয়েদের মধ্যে কান্নাকাটি নাই, মেয়েরা মুলি বাঁশ চোখা করিয়া, ইট টুকরা করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে পুরুষদের নিকট দিয়া আসিয়াছে, তাহারা পান-তামাক, জল ঘুরিয়া ঘুরিয়া সকলকে খাওয়াইতেছে, পুরুষরা সংগ্রাম করিতেছে। আক্রমণকারীদের অসুবিধা ছিল এই, নৌকাবোঝাই মানুষ, বিপক্ষের আক্রমণে তাহাদের বহু লোক আহত হইল, তাহারা ব্যূহ ভেদ করিয়া পাড়ে উঠিতে পারে নাই।

কোন পক্ষেই বন্দুক ছিল না, অবশেষে আক্রমণকারীরা নওগাঁ পরিত্যাগ করিয়া বিভিন্ন গ্রাম লুট করে ও পোড়াইয়া দেয়। দাঙ্গার সংবাদ পাইয়া আমি হবিগঞ্জ শহরে যাই এবং রাত্রে একটি ঘরোয়া বৈঠক করি। আমি প্রস্তাব করি, আমি দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চলে যাইব, আমার সঙ্গে যাওয়ার জন্য ২১জন লোক চাই। সকলেই নীরব, এমন সময় এক ভদ্রলোক এক কোণ হইতে দাঁড়াইয়া বলিলেন, শুনিয়াছি আমার গ্রাম পোড়াইয়া দিয়াছে, ভাই আহত হইয়াছে, আমি আপনার সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত, যদি আপনি দয়া করিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া যান। পরে জানিতে পারিলাম তিনি ভাদিগিরার জমিদার, অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বিনোদ বর্ম্মণ রায়। বিনোদবাবু আমাকে গোপনে বলিলেন, আমার একটি পাশকরা বন্দুক আছে, বন্দুকটি সঙ্গে লইব কি? বন্দুকের কথা শুনিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। একটা বন্দুক এবং যথেষ্ট কার্ত্তুজ থাকিলে ২।৪ হাজার লোক কি করিবে? লুণ্ঠনকারীরা মরিতে আসে না, তাদের প্রাণের মায়া আছে। আমি ও বিনোদবাবু বিধ্বস্ত সকল গ্রামেই যাই, নওগাঁও যাই, তখন নওগাঁ গ্রামে গুর্খা বন্দুকধারী সিপাহী পাহারা ছিল, গ্রামের পুরুষদের অধিকাংশই চলিয়া গিয়াছিল। আমাদের নৌকা ঘাটে ভিড়িলে গুর্খা সিপাহী বিনোদবাবুকে দেখিয়া সেলাম দিল; আমরা নিশ্চিন্ত হইলাম। গ্রামের লোক প্রথমতঃ আমাদের নিকট কিছু বলিতে চায় নাই। ঐ সময় আনন্দবাজার স্বাধীনতা সংখ্যায় যাহাদের ফটো ছিল তাহাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। একটি কলেজের ছাত্র ঐ স্বাধীনতা সংখ্যা নওগাঁ লইয়া গিয়াছিল। আমার নাম বলায় ঐ ছাত্রটি ফটোর সহিত আমার চেহারা মিলাইয়া পরে সকল ঘটনা আমাদের নিকট প্রকাশ করিল। ঐ সময় পূর্ব্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন খাজা নাজিমুদ্দিন সাহেব। আমি পরে তাঁহার সহিত দেখা করিয়া সকল ঘটনা বলি। আমি নওগাঁর কৈবর্ত্তদের আত্মরক্ষার বীরত্ব কাহিনী, বিশেষতঃ মেয়েদের কাজের প্রশংসা করিয়া আনন্দবাজার কাগজে এক বিবৃতি দেই। আমার বিবৃতি আনন্দবাজারে বাহির হইয়াছিল।

১৫ই জানুয়ারী রাত্রি ১১টার সময় আমার শুধু এই কথাই মনে হইতেছিল, "আমার সেই দিন নাই।" আত্মরক্ষার জন্য আক্রমণকারীকে কে বাধা দিবে? সরকারী লরী উপদ্রুত অঞ্চল হইতে সংখ্যালঘুদের কোর্টে স্থানান্তরিত করিতেছিল, আমরাও সেই লরীর সাহায্যে কোর্টে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। স্বদেশ নাগ ক্রমে ক্রমে সকলকে লরীতে উঠাইয়া পার করিতে লাগিল। শেষ লরীতে আমাকে, তাহার দিদিকে, নাতনী নলিনাকে উঠাইয়া নিজে উঠিল। কোর্ট-প্রাঙ্গণে তিল ধরার স্থান নাই। দলে দলে বিভিন্ন অঞ্চল হইতে লোক আসিতেছে, কি করুণ দৃশ্য, করুণ কাহিনী! কেহ কেহ বিভীষিকাময় দৃশ্য দেখিয়া আসিয়াছে, কেহ কেহ ভুক্তভোগী, নিজ পরিবারের কে কোথায় গিয়াছে স্থির নাই, জীবিত আছে কি না তাহাও বলা যায় না; চারিদিকে শোকের ছায়া। কেহ একমাত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া চলিয়া আসিয়াছে, কেহ টাকা-পয়সা কিছুই সঙ্গে লইয়া আসিতে পারে নাই। আমরা সারা রাত্রি কোর্টে বসিয়া কাটাইলাম। কি ভীষণ শীত! যাহাদের সঙ্গে বিছানা বা কাপড় নাই, তাহাদের কি দুরবস্থা! পরদিন বেলা প্রায় দশটার সময় আমরা জগন্নাথ কলেজ রিফিউজী ক্যাম্পে স্থানান্তরিত হই।

আমি এখন রিফিউজী ক্যাম্পে আছি। আমি পাক্-ভারতের স্বাধীনতার জন্য ত্রিশ বছর জেলে ছিলাম, পাঁচ বছর পলাতক অবস্থায় ছিলাম, স্বাধীনতা লাভের পর রিফিউজী ক্যাম্পে থাকার আমিই অধিকারী, এ অভিজ্ঞতা লাভ আমার প্রয়োজন ছিল। জগন্নাথ কলেজ ক্যাম্পে প্রায় সাত হাজার রিফিউজী ছিল। স্বদেশ নাগ সঙ্গে থাকায় আমার খাওয়া-দাওয়ার বিশেষ কোন অসুবিধা হয় নাই। কিন্তু অসুবিধা ছিল পায়খানার। কলেজ কর্তৃপক্ষ কল্পনা করেন নাই এই কলেজে সাত হাজার রিফিউজী আশ্রয় গ্রহণ করিবে, কাজেই তাঁহারা সেই অনুপাতে পায়খানা তৈয়ার করান নাই। কলেজের প্রিন্সিপাল সায়েদুর রহমান সাহেবের কাজ এবং ব্যবহার খুবই প্রশংসনীয়। প্রিন্সিপাল সাহেব নিজকে নাস্তিক বলিয়া প্রকাশ করেন; তাঁহার মতে মানব সেবাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

তিনি কাজের মধ্য দিয়া তাহা দেখাইয়াছেন। সাত হাজার রিফিউজীর সেবা কম কথা নয়। মানব সৃষ্টির পর হইতে ধর্ম্মের নামে বহু লড়াই হইয়া গিয়াছে। কত নিরপরাধ নিরীহ লোক ধর্ম্মের নামে বলিপ্রাপ্ত হইয়াছে. ইতিহাস তাহার সাক্ষী। ভগবান্ আছেন কি না কেহ দেখে নাই। অপর ধর্ম্মাবলম্বীকে হত্যা করা, তাহাদের ঘর-বাড়ী পোড়াইয়া দেওয়া, লুণ্ঠন করা ভগবানের নির্দ্দেশ কি না জানা নাই, কিন্তু সবই হইতেছে ধর্ম্মের নামে। বর্ত্তমান সভ্যতা ও বিজ্ঞানের যুগে যেখানে ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে শিক্ষিত লোক সন্দিহান, সেখানে ধর্ম্মের নামে কেন এই সব পৈশাচিক কাণ্ড? ইহার মূল কোথায়? দাঙ্গা বন্ধ করা কি খুব কঠিন কাজ?

রিফিউজী ক্যাম্পে যাওয়ার দুই দিন পর আমি প্রিন্সিপাল সাহেবের সহিত পরিচিত হই। প্রিন্সিপাল সাহেব আমার জন্য আলাদা একটি কোঠার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন বলিলেন, আমি তাহাতে রাজী হইলাম না। আমি বলিলাম, সকলের সঙ্গে একত্র আছি, একত্রই থাকিব। ক্যাম্পে প্রধান অসুবিধা হইল পায়খানার। এত লোক, মেয়ে-পুরুষ-শিশু যাবে কোথায়? কাজেই ক্যাম্পের চারিদিকে যে যেখানে পারে বসিয়া যায়। যে কয়টা পায়খানা ছিল ময়লার স্তূপ, দাঁড়ানোর স্থান নাই। রাত্রে বারান্দায় মেয়ে-পুরুষ-শিশু সকলেই মলত্যাগ করে। মেথর নাই। আমরা কমার্স বিল্ডিংএর দোতলায় ওয়েটিং রুমে ছিলাম। বারান্দা এরূপ ভাবে তৈরি, বাহিরের জল কোঠার ভিতর প্রবেশ করে। এক রাত্রে বারান্দার প্রস্রাবের জল দরজা দিয়া কোঠার ভিতরে প্রবেশ করায় আমাদের বিছানা ভিজিয়া গেল। বারান্দার স্থানে স্থানে ময়লার স্তূপ। একদিন স্বদেশ নাগ তাহার একজন কর্ম্মচারীকে সঙ্গে লইয়া নিজ হাতে সমস্ত বারান্দা পরিষ্কার করিল। একদিন সন্ধ্যা'র পর স্বাস্থ্যমন্ত্রী ভবানীশঙ্কর বিশ্বাস প্রিন্সিপালের সহিত দেখা করিতে গেলেন। বৈঠকখানায় আমি উপস্থিত ছিলাম, আমি মন্ত্রী মহাশয়কে মেথরের কথা বলিলাম, তিনি ফোনে কয়েক জায়গায় নির্দ্দেশ দিলেন কিন্তু দুই দিনের মধ্যে মেথর পাওয়া গেল না। প্রিন্সিপাল সাহেবও মেথরের জন্য বহু চেষ্টা করিলেন, অবশ্য পরে মেথর পাওয়া গেল, তবে তাহারা কাজ করিত নামে মাত্র।

প্রিন্সিপাল সাহেবের সহিত পরিচিত হওয়ার পর প্রায়ই তাঁহার অফিসে গল্প শোনার জন্য যাইতাম। কয়েকজন প্রফেসারও ছিলেন। যখন চা খাওয়ার ডাক পড়িত তখন প্রিন্সিপাল সাহেব সকলকে লইয়া ডাইনিং রুমে উপস্থিত হইতেন, আমিও বাদ পড়ি নাই। প্রিন্সিপাল সাহেবের সহধর্ম্মিণী নীরব কর্ম্মী, বেশী কথা বলিতেন না, তিনি নিজ হস্তে সকলকে খাওয়াইতেন, ব্যবস্থাও থাকিত ভাল। দু'দিন পর আমার মনে হইল ভদ্রলোকের সৌজন্যের অপব্যবহার করা ভাল নয়। আমি ঐ সময় বাদ দিয়া গল্প করার জন্য তাঁহার অফিসে যাইতাম। প্রিন্সিপাল সাহেবের এই সরলতাপূর্ণ ব্যবহার চিরকাল [illegible] থাকবে।

তাঁতিবাজার, শাঁখারীবাজারের হিন্দুরা দুই [illegible] জগন্নাথ কলেজ ক্যাম্পের রিফিউজীদিগকে [illegible] খাওয়াইয়াছে, যুবকেরা ভলাণ্টিয়ারী করিয়াছে। প্রিন্সিপাল সাহেব উচ্চকণ্ঠে তাহাদের প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি ফোনে অনেককে বলিয়াছেন, তোমরা রোজা রাখ, নামাজ পড় কিন্তু মানবসেবা [illegible] তাঁতিবাজার শাঁখারীবাজারের হিন্দুরা তাহাদের [illegible] বিপদের মধ্যেও সাত হাজার লোককে [illegible] খাওয়াইতেছে, আর তোমরা কি করিতেছ? অবশ্যই যথেষ্ট চাউল, ডাইল গবর্ণমেণ্ট দিয়াছিলেন। আমার সহিত ক্যাম্পে দেখা করিবার জন্য ভূতপূর্ব [illegible] জনাব আতাউর রহমান খান, সেখ মুজিবর, মামুদ আলী, জহুর হসেন প্রভৃতি বন্ধুগণ গিয়াছিলেন, ইত্তেফাকের মানিক মিঞা সাহেবও গিয়াছিলেন। সেখ মুজিবর প্রিন্সিপাল সাহেবের নিকট পাঁচ শ' পাঁউরুটি [illegible] আসিয়াছিলেন। অদৃষ্টের কি পরিহাস, আমরা এই দেশেরই নাগরিক, স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করিতে পারি না, খাঁচায় আবদ্ধ, আর অপর সম্প্রদায়ের বন্ধুরা খাঁচার ভিতর আসিয়া আমাদিগকে দেখিয়া যাইবেন! অপর সম্প্রদায়ের লোক স্বাধীন ভাবে রাস্তায় চলাফেরা করিতেছে, ক্যাম্পের ভিতর দোকান সাজাইয়া, ফেরি করিয়া জিনিস বিক্রী করিতেছে, আমার সেই স্বাধীনতা নাই কেন? আমি কি অপরাধ করিয়াছি?

এবার যাহা ঘটিয়াছে, দাঙ্গা বলা চলে না। দাঙ্গা হয় দুই দল বা সম্প্রদায়ের মধ্যে। উভয় পক্ষেই হতাহত হয়, কিন্তু এ-যাত্রা ঘটিয়াছে এক তরফা আক্রমণ, লুণ্ঠন, দহন। এক পক্ষ আক্রমণকারী অপর পক্ষ প্রাণ ভয়ে পলায়নকারী। এখন যাহারা নিহত হইয়াছে, লুণ্ঠিত হইয়াছে, তাহাদের প্রশ্ন এই, আমরা কি অপরাধ করিয়াছি? আমরা কোন রাজনীতি করি না, অথবা পাকিস্তানের কোন কাজে হস্তক্ষেপ করি না। আমাদের প্রতিবেশীর সহিত কোন বিবাদ নাই। আমি এই দেশের নাগরিক, এই দেশের উন্নতিকল্পে, [illegible] আমি রাষ্ট্রের [illegible] প্রজা [illegible] আমি কেন নিহত হইব? আমার বাড়ী লুণ্ঠিত হইবে, ভস্মীভূত হইবে, আমার [illegible] শিশুপুত্র-কন্যা নিহত হইবে, আমার [illegible] অপমানিত হইবে? [illegible] কি কোন প্রতিকার [illegible] নাই? [illegible] আমার দেশের [illegible] সম্প্রদায় [illegible] যখন [illegible] অপর সম্প্রদায়ের [illegible] তাহারা কেন [illegible] অর্থ তাঁহাদের কোন সম্মান [illegible]।

পূর্ব পাকিস্তানের স্পীকার [illegible] সাহেব সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন, [illegible] দাস রোডের বাসায় [illegible] আমাকে সেই বাসা হইতে লইয়া [illegible] গাড়ি লইয়া আসিয়াছিলেন। আমি [illegible] পড়িয়াছিলাম, তিনি আমার সন্ধান না পাইয়া ফিরিয়া যান। আমি এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার বাসায় গিয়া দেখা করি। এই উচ্চশিক্ষিত সাম্প্রদায়িক মনোভাব-বর্জ্জিত সম্ভ্রান্ত জমিদার পরিবারের সহিত বহু-কাল যাবৎ হিন্দুদের প্রীতির সম্বন্ধ বজায় আছে। তাঁহাদের অনেক কর্ম্মচারী এবং বাড়ীর চাকর হিন্দু। তিনি আমাকে বলিলেন, কিছুদিন যাবৎ আমি অনুভব করিতেছি, হিন্দুরা চলিয়া গেলে দেশের এবং মুসলমান সমাজের অত্যন্ত ক্ষতি হইবে। এই দাঙ্গার সময় কিছু সংখ্যক মুসলমান যখন হিন্দুদিগকে রক্ষার জন্য আগাইয়া আসিয়াছে, এখন সময় আসিয়াছে, হিন্দু মুসলমান একত্র দাঁড়ানর। এ জন্য প্রয়োজন মাইগ্রেশন্ করিয়া যাওয়া বন্ধ করা। আমি বলিলাম, হিন্দুরা থাকার জন্যই প্রস্তুত ছিল কিন্তু তাহারা যে থাকিবে, তাহাদের ধন-প্রাণের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি কি?

স্বাধীনতা লাভের ১৭ বৎসর পরও যদি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়, তবে ভবিষ্যতে যে আর দাঙ্গা হইবে না তার নিশ্চয়তা কি? হিন্দুরা দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে, সেখানেও তাহারা সুখী হইবে না, বহু অসুবিধার সম্মুখীন হইবে, বহু লোকের মৃত্যু হইবে, তবুও তাহারা দেশ ত্যাগ করিবে, সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে [illegible] নিরাপত্তার অভাববোধই ইহার একমাত্র কারণ।

সাম্প্রদায়িকতা মহাব্যাধি, ইহার অর্থ ব্যাপক [illegible] একই দেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বাস। [illegible] দেশের লোক নাগরিক হিসাবে চিন্তা না করিয়া সম্প্রদায় হিসাবে চিন্তা করে, সেই দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। দেশের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব থাকিলে সেই দেশবাসী জাতি হিসাবে দাঁড়াইতে পারিবে না, ফলে জাতি দুর্ব্বল হইবে। এক কোটি বা পাঁচ কোটি সংখ্যা-লঘু জাতির একটি বিরাট অংশ। ইহা অবহেলার বিষয় নয়, চিন্তার বিষয়। যেখানে দেশপ্রেম সেখানে সাম্প্রদায়িকতার স্থান নাই, সেখানে আমার দেশ, আমার দেশবাসী আমার দেশের জিনিষ এই জ্ঞানই প্রবল হইবে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় যে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইল, তাহা জাতীয় সম্পত্তি নষ্ট নয় কি? ইহা দ্বারা দেশের সুনাম নষ্ট, জাতীয় সম্পদ নষ্ট, জাতীয় সংহতি নষ্ট হয় নি? এক শ্রেণীর লোকের দুর্ব্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া যদি অপর শ্রেণীর কতিপয় লোক অত্যাচারমূলক কাজ করে, তার যদি কোন প্রতিকার না হয়, তবে ব্যাপকভাবে অরাজকতা দেখা দিবে, তখন সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোকেরাও রেহাই পাইবে না। সংখ্যালঘুরা বিশেষ কিছু চায় না, তাহারা চায় নিরা-পত্তার প্রতিশ্রুতি, তাহারা চায় অপরাধীর শাস্তি, তাহারা চায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সহানুভূতি।

সৌভাগ্যের বিষয় এবার এই হত্যাকাণ্ডের সময়

কিছু মুসলমান নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া হিন্দুদিগকে রক্ষা করার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন, প্রাণ বিসর্জন দিয়াছেন, আহত হইয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা কম নয়। আমির হুসেন চৌধুরী এবং অন্যান্য যাঁহারা নিহত হইয়াছেন, আহত হইয়াছেন, হিন্দু সমাজ কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাদের নাম স্মরণ করিতেছে।

"আকর্ষণীয়"

যা আমার করা উচিত, তাকে বলি আমার করণীয়। যাকে আমার বরণ করা উচিত, তিনি আমার বরণীয়। যাঁকে পূজা করতে পারি তিনি পূজনীয়। যা আমার দর্শন করার যোগ্য তা দর্শনীয়। আমি যে বস্তুকে নমিত করতে পারি তা নমনীয়।

এমনি ভাবে ক্রিয়াতে অনীয় প্রত্যয় যোগ ক'রে যাদের পাচ্ছি, ক্রিয়াগুলির কর্তা তারা নয়।

যে ভূমিকে কর্ষণ করা যায় তা কর্ষণীয়। কর্ষণ যে করে, অর্থাৎ কৃষক, সে কর্ষণীয় নয়। সুতরাং আকর্ষণ যে করে, অর্থাৎ যা attractive, সে ত 'আকর্ষণীয়' হতে পারে না। আকর্ষণীয় হচ্ছে তাই যাকে আমি আকর্ষণ করতে পারি, যে আমার আকর্ষণের যোগ্য। যেমন, ট্রেণে আততায়ী দ্বারা আক্রান্ত হ'লে বিপদ্‌জ্ঞাপক সঙ্কেতের শিকলটা আমার আকর্ষণীয়।

যে কর্ষণ করে সে কৃষক বা কর্ষক। যে আকর্ষণ করে সে আকর্ষক। তাই বলি, চিত্তাকর্ষক। বলি না, চিত্তাকর্ষণীয়।

আমরা যখন ইস্কুলে পড়তাম, তখন কোনো ছাত্র ইংরেজী attractive কথাটার বাংলা অনুবাদ ক'রে 'আকর্ষণীয়' লিখলে মাস্টার তার কান মলে দিতেন। কিন্তু আজকালকার নামী সাহিত্যিকরাও অনেকে attractive অর্থে 'আকর্ষণীয়' লিখছেন। ভাষার আসরে সবাই আজকাল নিরঙ্কুশ। কর্ণমর্দ্দন যাঁরা করতে পারতেন, তাঁরা কেউ আর বেঁচে নেই।

স. চ.

হরতন

শ্রীবিমল মিত্র

॥ ২১ ॥

কেষ্টগঞ্জের গ্রাম্য-জীবনে এমন ক'রে যে একদিন ঝড় উঠবে তা কেউ কল্পনাও করতে পারে নি। আগেও ঝড় উঠেছিল কিন্তু সে বড় আস্তে আস্তে। রাতারাতি দুলাল সা, নিতাই বসাক বড়লোক হয় নি। কর্তামশাইও রাতারাতি বাড়েন নি। ওঠা-পড়ার স্বাভাবিক নিয়মেই তা ঘটেছিল। কূটচক্রের কারসাজিতে কিংবা প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই তা ঘটেছে। লোকের চোখে তা সয়ে গিয়েছিল, সবাই সেই নিষ্ঠুর সত্যিটাকে মনে-প্রাণে স্বীকার করেই নিয়েছিল।

কিন্তু এবার অন্য রকম। এবার যেন হঠাৎ ঝড় উঠে সব ওলট-পালট করে দিয়ে গেল।

বঙ্কু বরাবর নির্ব্বিবাদী মানুষ। বরাবর যাত্রাগান গেয়েছে। অধিকারী মশাইয়ের সঙ্গে গ্রামে-গ্রামে জেলায়-জেলায় ঘুরে বেড়িয়েছে। রাত জেগে, গান গেয়ে দিনভর ঘুমিয়ে কাটিয়েছে। তার পর কখন মনের কোন্ দিকে একটা অচ্ছেদ্য শেকলে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিল, তা সে নিজেও টের পায় নি।

যেদিন হঠাৎ আবিষ্কার হয়ে গেল যে অঞ্জনা যে-সে কেউ নয়, কেষ্টগঞ্জের জমিদার ভট্টাচার্যি মশাইয়ের হারাণো নাতনী, সেদিন তার মত আনন্দ বোধহয় কর্তা-মশাইয়েরও হয় নি। বঙ্কুর মনে হয়েছিল তার নিজের যা-হয়-হোক, অঞ্জনাকে ত আর তাদের দলের সঙ্গে টো-টো করে মুখে খড়ির গুঁড়ো মেখে যাত্রা করে বেড়াতে হবে না?

বঙ্কু বলত—আমাদের যা-হয় হোক, অঞ্জনার ত ভালো হ'ল—

অন্য সবাই বলত—কিন্তু অঞ্জনা চলে গেলে দল কি আর টিঁকবে? আমাদের চাকরি কি আর থাকবে রে?

বঙ্কু বলত—ঐ ত তোদের স্বভাব, শালারা তোরা কারও ভালো দেখতে পারিস্ না—

অঞ্জনার বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললে বঙ্কুর মুখ দিয়ে সত্যিই গালাগালি বেরিয়ে যেত।

অন্য লোকরা কারণটা জানত।

বলত—তোর ত লাগবেই তোর যে প্রাণের টান রে, লাগবে না?

বঙ্কু রেগে যেত। বলত—খবরদার বলছি, মুখ সামলে কথা বলবি—

অনেক সময় পাড়াগাঁয়ের আটচালার মধ্যে সবাই যখন দল বেঁধে ঘুমোত তখন এক-একদিন ওমনি ঠাট্টা-তামাসা করতে করতে মারামারি বেধে যেত। আগের দিন রাত জেগে চণ্ডীবাবু হয়ত নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে, হঠাৎ মারামারির শব্দ পেয়ে একেবারে সোজা ঘরে ঢুকে যাকে পেত তাকেই ঘাড় ধরে হিড়-হিড় করে বাইরে টেনে আনত।

বলত—যত সব হাড়-হাবাতের দল এসেছে আমার কাছে মরতে—চুপ কর্, চুপ কর্—

তারপর বঙ্কুর দিকে চেয়ে বলত—তোর এত তেজ কেন শুনি র‍্যা? তোর এত তেজ কেন শুনি? যেদিন তাড়িয়ে দেব সেদিন বুঝবি ঠেলাটা—

চণ্ডীবাবু জানত, বঙ্কুকে তাড়ালেও বঙ্কু যাবে না। মাইনে না পেলেও চণ্ডীবাবুর দল ছেড়ে বঙ্কুর কোথাও যাবার ক্ষমতা নেই। বঙ্কু বাঁধা পড়ে গেছে 'শ্রীমানী অপেরা'র দলে। তারপর যখন সেই অঞ্জনা কর্তামশাই-এর বাড়ীতে এল, বঙ্কুও সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল। জীবনে নিজের কিছু হ'ল না বলে ভাবনা করবার মত লোক আর যে-ই হোক্, বঙ্কুর কোনও দুঃখ ছিল না। অঞ্জনার অসুখটা সেরে গেলেই চলে যাবে এই রকম ব্যবস্থাই হয়েছিল। কিন্তু একদিন সমস্ত ওলট-পালট হয়ে গেল রাতারাতি।

সরকার মশাই বাড়ীতে আসতেই বঙ্কু সামনে গিয়ে হাজির।

বললে—টাকা দিন, টাকা দিন সরকার মশাই—

নিবারণ সরকার যেন হঠাৎ বোবা হয়ে গেছে। কথা বলবার ক্ষমতাটুকুও যেন নেই আর তার।

—কই, টাকা দিন, ওষুধ আনতে হবে, দেরি করছেন কেন?

নিবারণ বরাবর দুলাল সা'র বাড়ীতে যায় আর

টাকা নিয়ে আসে। আর সেই টাকা দিয়ে ওষুধ কেনা হয়, চিকিৎসা হয়। শুধু ওষুধ নয়, কর্ত্তামশাইয়ের বাড়ীর যাবতীয় সংসার খরচ সেই ধারের টাকায় চলে। কোথায় কোন্ কাগজে সই করে দিয়ে আসে, তা কারও জানবার প্রয়োজনও হয় না, কেউ জিজ্ঞেসও করে না। এমনি করেই এতদিন এ-সংসার চলে এসেছে। কর্ত্তামশাইয়ের অসুখের আগেও যা, পরেও তাই। আগেও কখনও কর্ত্তামশাই জিজ্ঞেস করেন নি নিবারণকে—কোন্ জমিটা বন্ধক দিয়ে এ-টাকা নিয়ে এলে। আর এখন ত সে-প্রশ্ন ওঠেই না। টাকা ত আসবেই। তাঁর ধারণা, এ-টাকা তাঁর প্রাপ্য। হরতন এ বাড়ীতে আসার পর থেকেই তাঁর ভাগ্য ফিরে গেছে। তাঁর অনেক ঐশ্বর্য্য হয়েছে। এ সবই থাকবে। আবার তাঁর অতীত গৌরব পুনরুদ্ধার হয়েছে। সবই হরতনের জন্যে। হরতন যখন স্বয়ং লক্ষ্মী, তখন লক্ষ্মী তাঁর ঘরে অচলা হয়ে থাকতে এসেছেন—নইলে এতদিন পরে তাঁকে ফিরে পাবেনই বা কেন?

বঙ্কু কিন্তু এত কথা জানে না। তার কাজ সে করে যায়। তার হরতনকে সেবা করা কাজ, সে তাই-ই করে যায়। কলকাতায় যায়, ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসে, ওষুধ কিনে নিয়ে আসে। আর টাকার যোগান দেয় নিবারণ।

কিন্তু আজ নিবারণকে চুপ করে থাকতে দেখে বঙ্কুও রেগে গেল।

বললে—আ রে, কথাটা কাণে যাচ্ছে না আপনার? আটটা বিয়াল্লিশের ট্রেণ ছেড়ে গেলে আমি কখন যাব আর কখনই বা আসব?

নিবারণ এতক্ষণে যেন কথা বলবার ক্ষমতা ফিরে পেলে।

বললে—টাকা নেই।

—টাকা নেই মানে? টাকা নেই মানেটা কি? তা হ'লে ওষুধ আসবে না?

নিবারণ বললে—আমি জানি না—

—আলবৎ জানেন আপনি। হরতন কি ওষুধ না খেয়ে থাকবে বলতে চান?

নিবারণ যেন একটু ভয় পেয়ে গেল। বললে—তুমি চুপ কর বঙ্কু, অত চেঁচিও না, টাকা জোগাড় করতে পারি নি, বিকেল বেলাটা পর্য্যন্ত একটু সবুর কর না, আমি চেষ্টা করে দেখি—

বঙ্কু বললে—কিন্তু আমি যে কাল থেকে বলে রেখেছি আপনাকে, হরতনের ওষুধ ফুরিয়ে গিয়েছে—

—কিন্তু বললে কি হবে? কর্ত্তামশাইয়ের ওষুধও ত ফুরিয়ে গিয়েছে, তাঁর ওষুধও ত আনতে হবে।

তারপর যেন বুড়ো মানুষটা কি করবে ঠিক করতে না-পেরে মাথার চুলগুলো টানতে লাগল।

—তা হ'লে আমি মা-মণিকে গিয়ে বলিগে, যে টাকা নেই বলে ওষুধ আনতে পারলাম না—চিকিৎসা হবে না আর, হরতন তা হ'লে মরে যাক, এইটেই আপনি চান—

নিবারণের চোখ দু'টো হঠাৎ ছলছল করে উঠল। আর দাঁড়াতে পারলে না সেখানে। পাশের দরজা দিয়ে বারান্দায় চলে গেল।

বঙ্কু নিজের মনেই নিবারণকে উদ্দেশ করে বলতে লাগল—ঠিক আছে, আমার কি! আমার কলাটা! ওষুধ না হ'লে আপনাদেরই চিকিৎসা হবে না, আপনারাই ভুগবেন, আমার বয়ে গেছে জেনে মরতে—

ব'লে বঙ্কু সোজা গিয়ে উঠোনের দিকের রোয়াকে গিয়ে উবু হয়ে বসল। এইসব সময়েই বঙ্কুর বড় খারাপ লাগত। সারা জীবন কেবল ঘুরে বেড়িয়েছে যে-মানুষটা, এতদিন পরে একটা আস্তানার আশ্রয়ে এসে সে যেন নিশ্চিন্ততার একটা আরাম পেয়ে গিয়েছিল; কিন্তু আরাম যার কপালে নেই, তার আরাম কেমন করে হবে। সবে একটু সেরে উঠছিল হরতন, ঠিক সেই সময়েই যত ঝঞ্ঝাট, যত ঝামেলা। ঠিক সেই সময়েই কর্ত্তামশাই-এর অসুখ। অসুখ হবার আর সময় পেলে না বুড়ো। আমার কি! আমি খাবও না দাবও না, এই এমনি করে চুপ করে এইখানে বসে রইলাম। হরতন যদি ওষুধ না পায় ত আমিও ভাত খাব না। সাধাসাধি করলেও খাব না। দরকার নেই খেয়ে। কতদিন কত-রাত না-খেয়ে কেটেছে, এবারও না-হয় না-খেয়েই কাটিবে। হাজার সেধে বললেও খাব না। ওষুধ আনতে বললেও আর আনব না।

হঠাৎ নজরে পড়ে গেছে বড়গিন্নীর। বড়গিন্নী কম কথার মানুষ। সারা জীবন কর্ত্তার বুকে তেল-মালিশ করেই কেটেছে। আর এখন ত তিনি শয্যাশায়ী। এখন রান্নার দিকটাও দেখতে হচ্ছে, কর্ত্তামশাই-এর সেবা করতেও হচ্ছে।

বঙ্কুকে দেখেই অবাক্ হয়ে গেলেন।

ডাকলেন—বঙ্কু—তুমি ব বা এখানে বসে আছ?

বঙ্কু উত্তর দিলে না।

বড়গিন্নী আরও একটু অবাক্ হয়ে গেলেন। এমন ত করে না কখনও বঙ্কু। ডাকলেই সাড়া দেয় বরাবর।

বললেন—হরতন একলা রয়েছে নাকি?

বঙ্কু এবার গর্জ্জে উঠল, কেন একলা থাকবে না? আমি কে? আমি কেন তাকে দেখব শুনি? আমার কোনও কথার যখন দাম নেই, তখন হরতন মরে যাক, জাহান্নমে যাক, আমি আর দেখতে যাচ্ছি নে—

—কি হ'ল তোমার হঠাৎ? রাগ করলে কেন? হরতন কিছু বলেছে?

—হরতন কেন বলতে যাবে? সে সে-রকম মেয়ে নয়! আমি তাকে আপনার চেয়েও বেশি দিন চিনি, তার নামে কেন আপনারা মিছিমিছি দোষ দিচ্ছেন?

—তা হ'লে তুমি এখানে চুপ করে বসে আছ কেন বাবা? কি হয়েছে তোমার?

বঙ্কু বললে, সে আমার খুশি, আমি বেশ করছি বসে আছি—

বড়গিন্নী বললেন, তোমার কি খিদে পেয়েছে বাবা? আমি না-হয় ভাত বেড়ে দিচ্ছি আগে—

বঙ্কু বললে, খিদে পেতে আমার বয়ে গেছে, আমার অত নোলা নেই—ফকিরের মত অত খাই-খাই বাই নেই আমার—

—ফকির? ফকির কে বাবা?

—ফকির কে সে আপনার জেনে দরকার কি? সব কথায় আপনি কান দেন কেন? আপনারা খেয়ে নিন্ গে যান, আমি আর খাবই না, আমি এ-বাড়ীতে আর জল-স্পর্শই করব না—

বড়গিন্নী ভয় পেয়ে গেলেন।

বললেন, কেন বাবা? আমরা কি অপরাধ করেছি তোমার কাছে?

—না, আপনারা কেন অপরাধ করবেন, অপরাধ আমিই করেছি। আমারই হাজার অপরাধ—আমি লেখা-পড়া জানি না, মুখ্যু মানুষ, যাত্রা করে বেড়াই, সবই আমার অপরাধ।

—এ সব কি বলছ তুমি?

বঙ্কু এবার রেগে উঠল।

বললে, আমি বলছি বার বার যে আমি এখন চুপ করে বসে থাকব, কথা বলব না, খাব না দাব না, তবু কেন আপনি আমাকে বিরক্ত করছেন? আপনি কি চান যে আপনাদের বাড়ী ছেড়ে চলে যাই?

—তা কেন বলব বাবা? আমি কি কখনও তাই বলেছি তোমাকে?

—মুখে বলেন নি আপনারা, কিন্তু মনে মনে ত বলেছেন!

—ওমা, সে কি কথা! এমন কথা যে আমি স্বপ্নেও ভাবি নি!

বঙ্কু বললে, আপনি না ভাবেন, ওই বেটা ভেবেছে—

—কে বাবা? কার কথা বলছ তুমি? আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি নে—

বঙ্কু বললে—তা কেন চিনতে পারবেন, নিজেদের লোক কি না, তাকে ত আপনারা চিনতেই পারবেন না, আর আমি যে পর, পর বলেই আমাকে এত অপগেরাস্থি —আমি ত এ-বাড়ীর কেউ নই, বসে বসে কেবল আপনাদের অন্ন-ধ্বংস করছি—

বড়গিন্নী ভাবলেন সব বুঝি অভিমানের কথা। বললেন, কার কথা বলছ তা বুঝতে পারছি না বাবা, তা সে যা-হোক, বুঝতে পারছি তোমার খিদে পেয়েছে, খিদে পেলে ত রাগ হবেই মানুষের—

বঙ্কু দাঁড়িয়ে উঠল এবার। আর থাকতে পারলে না।

বললে, খবরদার বলছি মা-মণি, আমাকে আর রাগিয়ে দেবেন না। আমি বলে মরছি নিজের জ্বালায়, তার ওপর আর জ্বালাবেন না আপনি! আমি এক কথা সাফ বলে দিচ্ছি আমার খিদে পায় নি—

—তা হ'লে? তা হ'লে তোমার হয়েছেটা কি?

বঙ্কু বললেন, তাহলে আপনি শুনবেন?

—হ্যাঁ, বল না, শুনব বলেই ত জিজ্ঞেস করছি—

—তা হ'লে যা বলব তা করবেন?

বড়গিন্নী বড় মুশ্‌কিলে পড়লেন।

বললেন, কি করতে হবে আগে তাই বল?

—না, আমি যা বলব তাই করবেন, কথা দিন—

—আচ্ছা বাবা, তাই করব, কথা দিলাম—

বঙ্কু পাশের বারান্দার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, তা হ'লে ওই বেটাকে আগে তাড়ান—

—কাকে তাড়াব? কার কথা বলছ তুমি বাবা?

—কেন? ন্যাকা আপনি? বুঝতে পারছেন না? ওই যে ঘরের ঢেঁকি কুমীর হয়ে কেবল গেরস্থর ভাত গিলছে!

—ও, নিবারণ সরকারের কথা বলছ?

—তা না ত কার কথা বলব? ও আপনাদের ঘরের শত্রু বিভীষণ। আপনারা ত এখনও চিনলেন না—আপনাদের খেয়ে-পরে আপনাদেরই সর্ব্বোনাশ করছে—

বড়গিন্নী বললেন, ছিঃ বাবা, ও-কথা বলতে নেই, ওই নিবারণ ছিল বলে তবু যা-হোক এখনও বেঁচে আছি আমরা, নইলে কবে···

বঙ্কু বললে, তবে থাকুন, সেই বিশ্বাস নিয়েই থাকুন আপনারা—আমার কথা যখন বাসি হবে তখন ফলবে!

—কিন্তু নিবারণের ওপর তোমার এত রাগ কেন বাবা? কি করেছে তোমার ও?

—কি করে নি আগে তাই জিজ্ঞেস করুন গিয়ে ওকে। আজ তিন দিন হ'ল পই-পই করে বলছি যে টাকা দিন, হরতনের ওষুধ ফুরিয়ে গেছে, ওষুধ কিনে আনব। আটটা পঁয়তাল্লিশের গাড়িতে কলকাতায় গিয়ে ডাক্তারকেও ডেকে আনব আর ওমনি ওষুধও কিনে আনব। তা টাকাটা দেবার নামই নেই? ভেবেছে টাকা নিয়ে আমি চম্পট দেব? টাকা নিয়ে আমি পালিয়ে যাব? আমি নিজের জন্যে এ-পর্য্যন্ত একটা টাকা কখনও নিয়েছি? এই যে আমার জামাটা ছিঁড়ে গেছে, এর জন্যে কখনও বলেছি আপনাদের যে, একটা নতুন জামা দরকার? কখনও সে-কথা শুনেছেন আমার মুখে? আমার কিসের ভাবনা মা-মণি! আমি নিজের জন্যে জীবনে কখনও ভাবতে যাই নি, আজ ভাবব? আমি হরতনের কাছে যেতেই পারছি না সেই ভয়ে! পাছে হরতন সেরে ওঠে তাই টাকাটা ও দিচ্ছে না আমাকে, তা জানেন? আজ যদি আমার পকেটে টাকা থাকত ত আমি ওর টাকার পরোয়া করতাম? আমি নিজেই গিয়ে ডাক্তার আনতাম, ওষুধ আনতাম, তা জানেন?

বড়গিন্নী এ-কথার কোনও জবাব দিলেন না।

বঙ্কু আবার বলতে লাগল—এতদিন পরে একটু শরীরটা সেরেছে হরতনের, আর ঠিক এই সময়েই ওর বদমায়েসী! আমি কিছু বুঝি না ভেবেছে? আমি বোকা? আমি আহাম্মক? আমি মুখ্যু বলে কি একেবারে গো-মুখ্যু ভেবেছে আমাকে?

বড়গিন্নী তখনও চুপ। তাঁর চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসছিল।

হঠাৎ একটা শব্দ কানে যেতেই বড়গিন্নী চমকে উঠলেন। নিবারণের গলা।

—গিন্নীমা!

কেবল ওইটুকুই। তার বেশি কিছু কথা বলবার ক্ষমতা যেন নিবারণ সরকারের নেই।

বঙ্কু দেখতে পেয়েছে। নিবারণকে দেখতে পেয়েই বড়গিন্নীর দিকে চেয়ে বলতে লাগল, এই ত এসেছেন বিভীষণ, এবার জিজ্ঞেস করুন যা বলেছি আমি সত্যি কি না। প্রমাণ হয়ে যাক কে সত্যিবাদী আর কে মিথ্যুক। যাক্, মুখোমুখি প্রমাণ হয়ে যাক্—

বঙ্কুর কথাতে যেন কেউই কান দিলে না। দেওয়ার প্রয়োজনও মনে করলে না। নিবারণ সরকার মাথা নীচু করে শুধু বললে—শেষ!

বড়গিন্নীও যেন পাথর হয়ে গেছেন। একটু নড়লেন না, একটু হেললেন না, একবার আচমকা আর্ত্তনাদ করেও উঠলেন না। যেমন ধীর-স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তেমনি ধীর-স্থির হয়েই সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন। মনে হ'ল মাথার ওপর সমস্ত ছাদটা ভেঙে পড়লেও যেন তিনি ওই রকম ধীর-স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারতেন। পৃথিবীর কোনও শক্তিই যেন তাঁর মাথা নুইয়ে দিতে পারত না।

শুধু বঙ্কু বোকার মত দু'জনের মুখের দিকে চেয়ে একটা মানে খোঁজবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু কোনও মানে খুঁজে না পেয়ে নিবারণের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে—শেষ মানে? কিসের শেষ? শেষ বললেই চলবে না আমাকে, কিসের শেষ বুঝিয়ে দিতে হবে!

কিন্তু কে আর সে-কথা বঙ্কুকে বোঝাবে তখন? দু'জনের সমস্ত বোধশক্তি যেন বোধগম্যের বাইরে চলে গেছে।

এতটুকু কান্নাকাটি নেই, এতটুকু আর্ত্তনাদ নেই, এ কেমন মৃত্যু! কেষ্টগঞ্জের ভট্টাচার্য্যি বংশে কান্নাও যেন পরাজয়। কর্ত্তামশাই নিজে জীবনে কখনও কাঁদেন নি, তাঁর মৃত্যুতেও কেউ কাঁদতে পাবে না। তোমরাও কেঁদ না কেউ! আমার ঘরের লক্ষ্মী ঘরে ফিরে এসেছে। আবার সব ঐশ্বর্য্য ফিরে আসবে। একদিন কেষ্টগঞ্জের লোক আবার দেখবে, এই ভট্টাচার্য্য-বাড়ীই দুলাল-সা'র বাড়ীর চেয়ে ধনে-জনে-ঐশ্বর্য্যে সমৃদ্ধির শিখরে উঠেছে। আমি না-হয় চলেই গেলাম। কিন্তু হরতন ত রইল, লক্ষ্মী ত রইল। দুলাল সা' তার সমস্ত সম্পত্তি ত্যাগ করে কাশীবাসী হবে। এতদিনে তার সুমতি হয়েছে, সেটাও সুলক্ষণ। বেঁচে থাকতে কেউ আসে নি সংসারে। একদিন সকলকেই চলে যেতে হবে। আজ আমি যাচ্ছি, কাল দুলাল সা', নিতাই বসাক সবাই যাবে। একদিন আগে আর একদিন পরে। কিন্তু দেখে নিও, সত্যের জয় হবেই। আমি সারা জীবন ধর্ম্মের পথে থেকেছি, আমার পরাজয় কেমন করে সহ্য করবেন ঈশ্বর। পাপ যা তা কখনও চাপা থাকে না। পারার মত তা ফুটে বেরোবেই। দুলাল সা' যত পাষণ্ডই হোক, শাস্তি তাকে পেতেই হবে।

নিবারণের মনে হ'ল যেন কর্ত্তামশাই আবার কথা বলছেন।

—হোক মৃত্যু, মৃত্যুতেই জীবনের শেষ হয় নিবারণ। তুমি রইলে, তুমি দেখে যেতে পারবে আমার কথা মিথ্যে হবে না, হবে না, হবে না—

সকাল থেকে নিবারণের অনেক ঝামেলা গেছে। কয়েক রাত নিবারণের ঘুমই হয়নি, সারাদিন চব্বিশ ঘণ্টা ধরে কর্ত্তামশাই-এর পাশে বসে থেকেছে আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছে। কর্ত্তামশাই-এর ঐশ্বর্য্যের দিনে যখন এসেছিল নিবারণ তখন তার বয়েস কম ছিল। অনেক আশা ছিল, আশাতিরিক্ত উৎসাহ ছিল। কিন্তু দিনে দিনে সব যখন একে একে গেল চোখের সামনে, তখনও একটা মাত্র ভরসা ছিল,—হরতন। সেই হরতনের জন্যেই হয়ত কর্ত্তামশাই বেঁচে ছিলেন এতদিন। কিন্তু নিবারণ কেমন করে মুখ ফুটে বলবে তাঁর সব আশা, সব কল্পনা নির্ম্মূল হয়ে গেছে? সব মিথ্যে, সব অসার?

কর্ত্তামশাই-এর সেই শবদেহটার সামনে দাঁড়িয়ে নিবারণ যেন বলবার চেষ্টা করলে—টাকা আমি পাই নি কর্ত্তামশাই—

—কেন? পাওনি কেন টাকা?

নিবারণ বললে—দুলাল সা দিলে না,—

—দিলে না মানে? বরাবর দিয়ে এসেছে আর আজ দিলে না কেন?

নিবারণ বললে—দুলাল সা'র কিছু নেই আর—

কর্ত্তামশাই যেন চীৎকার করে উঠলেন—কি যা-তা বলছ? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে নিবারণ? তুমি কি পাগল হয়ে গেছ?

—আজ্ঞে, না কর্ত্তামশাই, আজ আপনি আর শুনতে পাচ্ছেন না, তবু আমি বলছি, দুলাল সা'র কিছু নেই আর—

—তার মানে?

—তার নিজের পুত্রবধূ, যাকে দুলাল সা নিজে পছন্দ করে ঘরে নিয়ে এসেছে, সেই তার নতুন-বৌই ভেজাল! সে জেলের মেয়ে।

—বলছ কি তুমি?

—হ্যাঁ, আমি ঠিকই বলছি কর্ত্তামশাই। আমি আপনার চিকিৎসার জন্যে, হরতনের চিকিৎসার জন্যে টাকা চাইতে গিয়েছিলাম আজ সকালে। গিয়ে দেখলাম তাদের সর্ব্বনাশ হয়েছে, বাড়ীতে পুলিশ এসেছে, দারোগা এসেছে, সেই নতুন-বৌও এসেছে—সকলের সামনেই সব প্রকাশ হয়ে গেছে। আমি চলে আসতে চাইছিলাম, কিন্তু নতুন-বৌ জোর করে আমাকে সেখানে থাকতে বললে—আমি সব শুনে এলাম—

—কি শুনে এলে?

—শুনে এলাম সেই ঘটক—যে ঘটকালি করেছিল দুলাল সা'র ছেলের বিয়ের, সেই ঘটক নিজের মুখেই সব বলে ফেললে। সেও যে পাগল হয়ে গেছে কর্ত্তামশাই। পনের ভরি সোনার লোভে সে দুলাল সা'র এই সর্ব্বনাশ করেছিল, তাও বললে। এ সমস্ত-কিছুর মূলে সেই সদানন্দ! দুলাল সা'র সেই পাটের আড়তের কয়াল। পেঁপুলবেড়ের বাঁওড় নিয়ে যে সমস্ত কিছু হ্যাঙ্গাম বাধিয়েছিল!

বলতে বলতে নিবারণের চোখ দুটো জলে ভরে এল। বড়গিন্নী কর্ত্তামশাই-এর বিছানার পাশেই নিঃঝুম-নিঃসাড় হয়ে পড়ে আছেন। নিবারণ সেই দিকেও একবার চেয়ে দেখলে। আজ এত বড় ঝড় বয়ে গেল এ-বাড়ীতে অথচ কেষ্টগঞ্জের জনপ্রাণীটি পর্য্যন্ত তার আভাস পেলে না। কেউ জানতে পারলে না কেষ্টগঞ্জের কত বড় সর্ব্বনাশ ঘটে গেল। এবার থেকে দুলাল সা যা খুশি তাই করবে, কেউ তার প্রতিবাদ করবার পর্য্যন্ত রইল না।

হঠাৎ কর্ত্তামশাই যেন বলে উঠলেন—চুপ করলে কেন? বল, বল, তারপর বল—

—তারপর আমি আর কিছু জানি না কর্ত্তমশাই, তবু বুঝতে পারলাম সদানন্দ শুধু-শুধু মরে নি। শুধু-শুধু মরবার লোক নয় সে! তাকে খুন করা হয়েছে। পুলিশ তার প্রমাণ পেয়েছে।

—কেন? কে তাকে খুন করলে? কেন খুন করলে? তাকে খুন করে কার কি লাভ?

নিবারণ বললে—তাকে না মারলে যে সব ফাঁস হয়ে যায় কর্ত্তামশাই। সে যে সব জানত। কোথা থেকে দুলাল সা কত টাকা আয় করেছে, সব যে তার নখদর্পণে। সে যে এককালে দুলাল সা'র খাতা রাখত। দুলাল সা কত টাকা গভর্ণমেণ্টকে ফাঁকি দিয়েছে তা যে সব সে জানত—

—এখন তা হ'লে কি হবে?

নিবারণ বললে—সে ত পুলিশ জানে কর্ত্তামশাই। সদানন্দকে খুন করার জন্যে কারোর শাস্তি হবে কি না

তা পুলিশই বিচার করবে। কিন্তু নতুন-বৌ যে তার নিজের বিচার নিজের হাতে নিয়েছে।

—তার মানে ?

নিবারণ বললে—নতুন-বৌ আমার সামনেই বললে যে, যদি প্রমাণ হয় যে সত্যিই সে জেলের মেয়ে, যদি সে প্রমাণ পায় যে দোলগোবিন্দের ঠকানোর শিকার হয়েছে, তা হ'লে সে শ্বশুর, স্বামী, সংসার সব কিছু ত্যাগ করে চলে যাবে—

— কোথায় যাবে ?

নিবারণ বললে—আমি আর শুনতে পারলাম না কর্তামশাই। আমি আর শুনতে চাইলামও না। নতুন-বৌএর মুখের দিকে চেয়ে, দুলাল সা'র ছেলের মুখের দিকে চেয়ে আমার বড় দুঃখ হ'ল। ভাবলাম, কেন আমি এখন ওখানে গিয়েছিলাম। ওখানে টাকা চাইতে না গেলে ত ও-সব আমাকে শুনতে হ'ত না—। কিন্তু যতবার আমি চলে আসতে চেয়েছি ততবারই নতুন-বৌ আমাকে বাধা দিয়েছে। কেবল বলেছে—আমি চাই সবাই শুনুক, সবাই জানুক—! বাইরের মানুষের কাছে সব কিছু প্রকাশ করে দিয়ে হয়ত হাল্কা হয়ে যেতে চেয়েছিল নতুন-বৌ—

—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কি হ'ল ?

নিবারণ বললে—শেষ পর্য্যন্ত সবাই নতুন-বৌএর বাপের বাড়ীর দেশে যাওয়া ঠিক করলে, আমি সেই পর্য্যন্ত শুনেই চলে এলাম কর্তামশাই—সেখানে গিয়ে যদি প্রমাণ হয় নতুন-বৌ স্বজাতির মেয়ে নয়, তা হ'লে কি হবে তা আর বলতে পারছি না—

কর্তামশাই-এর প্রাণহীন নিষ্কম্প দেহটা তখনও বিছানার ওপর এলিয়ে পড়ে রয়েছে। বড়গিন্নীও তাঁর পাশে নিথর-নিশ্চল হয়ে বসে। বাইরে একবার গাড়ির শব্দ হ'ল। হয়ত কেষ্টগঞ্জের ডাক্তারবাবু এলেন। বঙ্কু ডাক্তারবাবুকে খবর দিতে গিয়েছিল। গাড়িটা বাড়ীর সামনে থামল। গাড়ির দরজা খুলে সেটা আবার বন্ধ হবার শব্দও হ'ল। শেষ বারের মত ডাক্তারবাবু এসে যথারীতি সার্টিফিকেট দিয়ে যাবেন। ওপরের ঘরের একপ্রান্তে হরতন শুয়ে আছে। তাকে খবর দেওয়া হয়নি। সে জানতেও পারেনি যে কর্তামশাই-এর জীবন-দীপ নিঃশেষ হয়ে গেছে। জানতে দিলে তার ক্ষতি হতে পারে। যখন জানবে তখন জানবে। তার আগে তাকে খবর দিলে তার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর !

নিবারণ ডাক্তারবাবুকে ভেতরে ডেকে নিয়ে আসবার জন্যে ঘরের বাইরে যেতেই অবাক্ হয়ে গেছে। ডাক্তারবাবু নয়, সুকান্ত রায়, কেষ্টগঞ্জের ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার।

—আপনি কি করে খবর পেলেন সুকান্তবাবু ?

—কিসের খবর ?

সুকান্ত রায় কথাটা শুনে হতবাক্ হয়ে গেল।

নিবারণ বললে—আপনি শোনেন নি কিছু ?

—কি শুনব ?

ততক্ষণে ওদিকে কেষ্টগঞ্জের ডাক্তারবাবুর গাড়িটা এসে বাড়ীর সামনে ব্রেক কষে দাঁড়াল। ভেতর থেকে নামল ডাক্তারবাবু। আর তার পেছনেই বঙ্কু।

সুকান্ত বুঝতে পারলে না কিছু। নিবারণের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে—অসুখ কার ? কর্তামশাই-এর নাতনীর ?

ক্রমশঃ

সঙ্গীতের আসরে

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

সুরের আগুন

নাম ছিল তাঁর গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী। কিন্তু সে নামে আজ আর ক'জন তাঁকে চিনবে? তাঁর হাত দু'টি একটু ছোট ছিল বলে প্রাকৃতজনের মুখে তাঁর নাম দাঁড়িয়ে যায় —নুলো গোপাল। এই ভব্যতাহীন নামেই তিনি প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন, আসল নাম গেছে লুপ্ত হয়ে। অত বড় এক গুণী গায়ক শ্রুতি-স্মৃতিতে বেঁচে আছেন তাঁর এক শারীরিক ত্রুটিতে চিহ্নিত হয়ে, আমাদের জাতি-গত রুচির কল্যাণে। আমাদের একটি জাতীয় বৈশিষ্ট্য যে অপরের ছিদ্র অনুসন্ধান করা, তা পরের দেহের ত্রুটির কথাও ঘটা করে প্রচার করে। তাই আমাদের সমাজে যেমন, তেমনি সঙ্গীতের আসরেও এক এক গুণীর নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে এক একটি অশিষ্ট শব্দ: নুলো, কাণা, কুটে ইত্যাদি।...

উনিশ শতকের বাংলায় যে ক'জন শ্রেষ্ঠ গায়ক জন্মেছেন, গোপালচন্দ্র তাঁদের মধ্যে একজন। ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পা তিন অঙ্গের গানেই তাঁর অসামান্য দক্ষতা ছিল। সেকালের ভারত-প্রসিদ্ধ হিন্দুস্থানী ওস্তাদদের সঙ্গে এক আসরে সমান মর্যাদায় তিনি অনেকবার গেয়েছেন—শুধু বাংলা দেশে নয়, পশ্চিমাঞ্চলেও। খেয়াল গানে বাঙ্গালীদের মধ্যে তাঁকে একজন আদি পুরুষ বলা যায়। তাঁর আগেকার বা তাঁর সমসাময়িক বাঙ্গালী খেয়াল-গায়কদের মধ্যে তাঁর তুল্য খ্যাতিমান্ আর কেউ ছিলেন কি না সন্দেহ।

মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের তিনি ছিলেন প্রধান সভাগায়ক এবং তাঁরই আনুকূল্যে তিনি পশ্চিমাঞ্চল থেকে রীতিমত সঙ্গীত শিক্ষা করে আসেন। তাঁর প্রধান সঙ্গীতগুরু ছিলেন, বারাণসীর শতায়ু ধ্রুপদগুণী গোপালপ্রসাদ মিশ্র। কাশীর এই ধ্রুপদী পরিবারের কাছে বাংলা দেশের ঋণ কম নয়। গোপালপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সারদাসহায়ের কাছে তালিম পেয়েছিলেন সেযুগের বিখ্যাত খেয়াল ও টপ্পা গায়িকা যাদুমণি। আর কনিষ্ঠ লক্ষ্মীপ্রসাদ মিশ্রের (বীণ্‌কার) কাছে যন্ত্রসঙ্গীত শিখেছিলেন ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ও শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। গোপালপ্রসাদের কাছে গোপালচন্দ্র অনেক বছর ধ্রুপদ শিক্ষা করেন।

তাঁর খেয়ালের ওস্তাদ ছিলেন গোয়ালিয়রের স্বনামধন্য গায়ক হদ্দু খাঁ ও হস্সু খাঁ। তখনকার কালে সারা ভারতবর্ষে এই দুই খেয়ালিয়া ভাইয়ের মতন প্রসিদ্ধ ও গুণী বেশী ছিলেন না। আর গোপালচন্দ্র ভিন্ন অন্য কোন বাঙ্গালী হদ্দু-হস্সু খাঁর তালিম ভালভাবে পেয়েছিলেন বলেও শোনা যায় না।

এমনি সব কলাবতদের শিক্ষা পেয়ে তাঁর সঙ্গীত-জীবন বিকশিত হয়। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁর সঙ্গীত-প্রতিভা দেখে যে পশ্চিমে থেকে তাঁর সঙ্গীত-শিক্ষার সুব্যবস্থা করেছিলেন তাও হয় সার্থক।

ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পা তিন রীতির গানেই গোপালচন্দ্র সিদ্ধ ছিলেন এবং আসরে তিন ধরণের গান গাইতেন ইচ্ছা মতন। তার মধ্যে খেয়ালে তিনি নিজস্ব এমন একটি শৈলী গড়ে তুলেছিলেন, যে-জন্যে তাঁর গান শ্রোতাদের খুবই আকৃষ্ট করত। গানের মধ্যে তিনি চমৎকার তেলেনার প্রয়োগ করতেন প্রয়োজন মতন, আর সেসব ছিল, extempore তা বলাই বাহুল্য। অর্থাৎ তখনকারই রচনা, বাঁধা জিনিষ নয়। এমন সুন্দর করে তিনি এইসব তেলেনার সন্নিবেশ ঘটাতেন যে গানের সৌন্দর্য বহুগুণ খুলে যেত এবং অভাবিত পথে। একটা অপ্রত্যাশিত আনন্দে শ্রোতারা অভিভূত হয়ে পড়ত আর গান ও সুরের কারুকর্মে জমাট বাঁধত। গোপালচন্দ্র ছিলেন সৃজনশীল শিল্পী।

চিরকুমার গোপালচন্দ্র দীর্ঘকালের একনিষ্ঠ সাধনায় গলাটি অসাধারণ তৈরী করেছিলেন। তাঁর সেই কণ্ঠনৈপুণ্যের কিছু কিছু পরিচয় বিধৃত আছে সঙ্গীত-সমাজের শ্রুতিস্মৃতিতে। তার কয়েকটি উল্লেখ করলে তাঁর গানের বিষয়ে খানিক ধারণা হতে পারে।

তাঁর পরবর্তী যুগের গুণী, সুরশৃঙ্গার বাদক ও ধ্রুপদী প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (গোপালচন্দ্রের চেয়ে ৩০ বছরের বয়োকনিষ্ঠ) সঙ্গীতচর্চা বেশ কিছুকাল আরম্ভ করবার পর চক্রবর্তী মশায়ের গান শুনেছিলেন। তিনি বলতেন যে, গোপলবাবুর গলার আওয়াজ 'ঝিম'

ছিল। তাঁর গলা চড়ত না বলে তারা গ্রামে কাজ করতেন না। মুদারা গ্রামের মধ্যেই তাঁর গলা বেশি খেলত আর যা কিছু কাজ সবই ওই পাঁচ-ছটা পর্দায়। কিন্তু ওই ক'টি পর্দাতেই এমন অদ্ভুত সুরের কাজ তিনি করতেন যে কি বলব!

আধুনিক ঠুংরি গানের অন্যতম প্রবর্তক, গোয়ালিয়রের বিখ্যাত গণপৎ রাওয়ের (ভাইয়া সাহেব) সুযোগ্য শিষ্য শ্যামলাল্ ক্ষেত্রী বলতেন যে, গোপালবাবু অতি বুদ্ধিমান্ ও গুণী গায়ক ছিলেন এবং তাঁর অনুকরণ করবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল।

বাংলা সাহিত্যের বীরবল, সঙ্গীতরসিক ও সঙ্গীত-তাত্ত্বিক প্রমথ চৌধুরী চক্রবর্তী মশায়ের একেবারে শেষ বয়সে তাঁর গান শুনেছিলেন। তবু তা কত উচ্চশ্রেণীর ছিল তা তিনি "আত্মকথা"য় লিখেছেন—(গোপালচন্দ্রকে) "বৃদ্ধ বয়সে আমি দেখেছি। তখন তাঁর গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোত না। তিনি আমার এবং আমার খুড়শ্বশুর মহাশয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুরোধে ফিস্ ফিস্ করে একটি গান গাইলেন। আমি অবাক্ হয়ে গেলাম। কি মিষ্টি তাঁর তান। কি দরদী তাঁর মিড়। আর বুঝলাম যে এঁর যখন গলা ছিল, তখন ইনি একটি অসাধারণ গাইয়ে ছিলেন।"

আচার্য রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, যিনি প্রথম জীবনে কলকাতায় এসে কিছুদিন গোপালচন্দ্রের কাছে গান শিখেছিলেন, বলতেন যে, অমন সুরেলা গলা খুব কম শুনেছি।

গোপালচন্দ্রের এক প্রশিষ্য (সাতকড়ি মালাকরের শিষ্য) একটি কথা বলেন, যা বোধ হয় সাতকড়িবাবুর মুখেই শোনা—চক্রবর্তী মশায় এমন চরকির মতন তান ঘোরাতেন যে মনে হ'ত যেন ঘরটাই ঘুরে গেল।

এই সব মতামত থেকে তাঁর গানের আর গলার বিষয়ে একটা আন্দাজ করে নিতে হয়। কারণ তাঁর গানের কোন রেকর্ড নেই। তাঁর প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের সময়ে এ দেশে গ্রামোফোন রেকর্ডের ব্যবসা আরম্ভ হয় নি।

যেমন সৌখীন স্বভাব তেমনি মেজাজী গাইয়ে ছিলেন তিনি। আসরে গাইতে বসতেন দু'পাশের ধূপদানিতে সুগন্ধি ধূপ জ্বালিয়ে রেখে। সেই পরিবেশ তাঁর পক্ষে মনোরম ছিল এবং তাঁর মেজাজ স্ফূর্তি লাভ করত। হাত দু'টি ক্ষুদ্রাকার হলেও তিনি সুদর্শন পুরুষ ছিলেন এবং কুঞ্চিত কেশগুচ্ছের নীচে তাঁর তন্ময় মুখভাব ও পরিপাটি বেশভূষায় আসরের মধ্যমণি হয়ে শোভা পেতেন। হাত দু'টি সঞ্চালিত করতেন তান কর্তব কিংবা মিড় গমকের বিশেষ বিশেষ ঝোঁকের দোলায়। হাতের সেই সব মুদ্রায় তাঁর গানের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হ'ত, সুরে চিত্রডোর যেন মূর্তিধারণ করত। গানকে আরও হৃদয়গ্রাহী করে তুলত তাঁর বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের ব্যঞ্জনা।...

সঙ্গীত-জগতে তাঁর স্থান কোথায় ছিল তা বোঝা যায় তাঁর শিষ্যবৃন্দের কথা মনে করলে। যথা: সাতকড়ি মালাকর, লালচাঁদ বড়াল, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী (কিছুদিন), বিষ্ণুপুরের রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণনগরের শশী কর্মকার, আলাউদ্দিন খাঁ, রামশরণ সান্যাল (গিরীশচন্দ্রের অনেক নাটকের সঙ্গীত পরিচালক) প্রভৃতি।

আলাউদ্দিন খাঁর প্রথম জীবনে গোপালচন্দ্র যে প্রধান সঙ্গীতগুরু ছিলেন একথা খাঁ সাহেব উল্লেখ না করলে বোধ হয় অজ্ঞাত থেকে যেত। আলাউদ্দিন খাঁর ('আমার কথা'র) বিবৃতি না পেলে আমরা ধারণা করতে পারতাম না, কোন্ স্তরের সঙ্গীতাচার্য ছিলেন গোপালচন্দ্র আর কি কঠিন সাধন-সাপেক্ষ ছিল তাঁর সঙ্গীত-পদ্ধতি।

আলাউদ্দিন অতি তরুণ বয়সে (তাঁর ত্রিপুরা জেলার শিবপুর গ্রামের) বাড়ী থেকে পলাতক হয়ে কলকাতায় এসে যখন গোপালচন্দ্রের কাছে গান শিখতে চান, তখন চক্রবর্তী মশায় তাঁকে বলেন যে, বারো বছর স্বর সাধনা করতে হবে।

আলাউদ্দিন তাতেই রাজী। তাঁকে অনেকদিন কষ্ট করতে দেখে তবে গুরুর শিক্ষাদান আরম্ভ হ'ল। সে শিক্ষার পদ্ধতিতে শিষ্যকে সাধনা করতে হ'ত এইভাবে: এক পায়ে তাল, অন্য পায়ে মাত্রা। এক হাতে তানপুরা, অন্য হাতে তবলা।

গোপালচন্দ্রের নির্দেশে এইভাবে আলাউদ্দিন রেওয়াজি করতেন। সাত বছর গোপালচন্দ্র তাঁকে সার্গম শেখান আর তিনশ' রকম পাল্‌টি। গুরুর কাছে শিক্ষা অবশ্য আলাউদ্দিনের শেষ হয় নি। তার আগেই ছেদ পড়ে, চক্রবর্তী মশায়ের অকালমৃত্যুতে। এবং তাঁর মৃত্যুর পর আলাউদ্দিন খাঁ গান ছেড়ে দেন।

গোপালচন্দ্রের এই সব বিখ্যাত শিষ্য ছাড়া আরও কয়েকজন ছিলেন, তাঁরা তেমন খ্যাতিমান্ হন নি। যেমন—এণ্টালির রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব, শোভাবাজারের

বিনোদকৃষ্ণ মিত্র (সরোদ-বাদক নীরেন্দ্রকৃষ্ণের পিতা এবং শোভাবাজার রাজপরিবারের দৌহিত্র), বরেন্দ্রনাথ ঠাকুর (মহারাজা রমানাথ ঠাকুরের পৌত্র), লক্ষ্মীকান্তপুরের রাজমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

কাশীর বিখ্যাত ধ্রুপদগুণী ও সঙ্গীত গ্রন্থলেখক হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়কে চক্রবর্তী মশায় কল্যাণের রাগমালা ও দরবারী কানাড়া শিক্ষা দেন, এ কথা হরিনারায়ণ উল্লেখ করেছেন।

গোপালচন্দ্রের কণ্ঠস্বরের প্রসঙ্গ একটু আলোচনা করে তাঁর একটি আসরের ঘটনার কথা বলা হবে।

সুরশৃঙ্গার-বাদক প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় দেখা গেছে যে, চক্রবর্তী মশায়ের গলা ছিল চাপা, বসা। চড়ার দিকে গলা একেবারে উঠত না।

শুধু প্রমথনাথ নয়, যাঁরা গোপালচন্দ্রের পরিণত বয়সের গান শুনেছেন, তাঁদের সকলেরই ঐ মত। তেমনি শ্রোতা-পরম্পরায় আরও একটি কথা চলিত আছে : ঐ রকম বসা গলা তাঁর প্রথমে ছিল না। হয়েছিল পরিণত বয়সে। কিন্তু বয়সের বা জরার জন্যে তা নয়।

এক ব্যক্তি আক্রোশের বশে তাঁর গলার এই সাংঘাতিক ক্ষতি করেছিল। চক্রবর্তী মশায়ের পানের সঙ্গে কিছু বিষাক্ত জিনিস মিশিয়ে তাঁকে নাকি খাওয়ানো হয়, যার ফল তাঁর সেই স্বরবিকৃতি।

সেকালে সঙ্গীতক্ষেত্রে রেষারেষির ফলে কখনও কখনও এমন ঘটতে শোনা যেত। গোপালচন্দ্রের এই ঘটনাটিও একাধিক সূত্রে শোনা যায়। তাঁর সঙ্গে যে এই শত্রুতা করেছিল, সে কিন্তু তাঁরই এক ছাত্র, তবে তাঁর যে শিষ্যদের নাম আগে জানানো হয়েছে সে তালিকায় তার নাম নেই। এমনি ভাবে বৃত্তান্তটি পাওয়া যায় : তাঁর সেই ছাত্রটি সঙ্গীত-শিক্ষার আশায় অনেক দিন তাঁর কাছে ধর্না দিয়েছিল। কিন্তু তিনি তাকে আদৌ আমল দিতেন না তার যোগ্যতার অভাবের জন্যে। শিক্ষার্থীটি ছিল ধনীর সন্তান আর গুরুর মন আকর্ষণ করবার জন্যে খরচও বেশ করত। সঙ্গীত বিষয়ে তার শক্তির অভাব বা অক্ষমতার কথা কিন্তু সে বুঝতে চাইত না। তার ধারণা হয়েছিল যে গুরু তাকে বিদ্যা দান করতে নারাজ হয়েছেন অকারণে, অন্যায় ভাবে। শেষ পর্যন্ত সঙ্গীত-বিদ্যা তাঁর কাছে কিছুই পাবার আশা নেই দেখে সে গুরুর কণ্ঠের সর্বনাশ করে দিতে চায় প্রতিশোধ নেবার জন্যে। একদিন চক্রবর্তী মশায়কে পানের সঙ্গে পারা আর সিঁদুর নাকি খাইয়ে দেয়। তারপর থেকেই তাঁর গলার আওয়াজ যায় বসে। আর তা আগেকার শক্তি ফিরে পায়নি।...'

এবারে তাঁর সেই আসরের গল্প। সে ১৮৯১।৯২ সালের কথা।

আসর সেদিন ভালই ছিল। বাংলার ক'জন শ্রেষ্ঠ গায়ক-বাদক সেখানে ছিলেন। আর ছিলেন সমজদার অনেক শ্রোতা। জমজমাট আসর।

গায়কদের মধ্যে গোপালচন্দ্র ছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন অঘোরনাথ চক্রবর্তী। অঘোরবাবুর (চক্রবর্তী মশায়ের চেয়ে ২০ বছরের বয়োকনিষ্ঠ) তখন বয়স প্রায় ৪০ বছর। বয়স আর তাঁর সঙ্গীত-প্রতিভার পূর্ণ বিকশিত অবস্থা। শিক্ষাপর্ব সমাপ্ত করে গায়করূপে তাঁর তখন খুব নাম-ডাক। ওস্তাদ আলীবক্সের কাছে তিনি রীতিমত তালিম পেয়েছেন। তারপর মহাগুণী ধ্রুপদী মুরাদ আলী আর দৌলৎ খাঁর কাছেও ধ্রুপদ শিখেছেন। তা ছাড়া, শ্রীজান বাঈয়ের কাছে করেছেন টপ্পা সংগ্রহ। আবার ভোলানাথ দাসের কাছে নিয়েছেন ভজন গীতাবলি। এমনি ভাবে তাঁর সঙ্গীত-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে। তার ওপর তাঁর গলা ছিল যেমন তৈরি, তেমনি মাধুর্যে ভরা। কণ্ঠসম্পদের জন্যই অনেক সময়ে আসর মাৎ করতেন আর নিজের গলার সেই যাদু বিষয়ে সচেতন ছিলেন। যখনকার কথা বলা হচ্ছে, তখনও কণ্ঠে তাঁর যৌবনের সতেজ সজীবতা। জরার আক্রমণ থেকে নিরাপদ্ দূরত্বে অঘোরনাথ বিরাজ করছেন প্রখর প্রতিভার মধ্যগগনে।

আর তখন ষাট উত্তীর্ণ গোপালচন্দ্র বার্ধক্যের কবলে। যৌবনের সে পরিশীলিত, শাণিত কণ্ঠস্বর, যে কারণেই হোক আর তাঁর বশে নেই। ইচ্ছামত তাকে তাঁর সুরসত্তার বাহন করে উত্তরাঙ্গে আত্মপ্রকাশ করতে পারতেন না। যত সাধন ও সাধ্য তাঁর আগে ছিল, তা আর শ্রোতাদের পরিপূর্ণ করে দেবার ক্ষমতা ছিল না তখন। কিন্তু আসরে গান করতেন তখনও, অনুরোধে-উপরোধে, কারণ সুরের ঐশ্বর্য তখনও তাঁর নিঃশেষ হয়ে যায় নি।

সে আসরে গায়কদের মধ্যে অঘোরবাবুর গান আগে হ'ল। তিনি সাধা গলায় বেশ মেজাজের সঙ্গে গাইলেন—তাঁর সুকণ্ঠে শ্রোতারা যেমন মুগ্ধ হতেন, পরিতৃপ্ত বোধ করতেন—এখানেও তাই হ'ল। সকলের ভাল লাগল তাঁর গান। অনেকে তাঁর গানের সুখ্যাতি

করতে লাগলেন। আসরে সৃষ্টি হ'ল সুরের বেশ একটি প্রসন্ন আবহ।

তারপর কার গান আরম্ভ হবে সেজন্যে শ্রোতারা অপেক্ষা করছেন। কেউ কেউ নিজেদের মধ্যে আলোচনায় মেতেছেন অঘোরবাবুর গানের কথা নিয়ে। এমন সময় অঘোরবাবু এমন একটি কথা বলে ফেললেন যে, আসরের সুসমঞ্জস পরিবেশটি একেবারে বদলে গেল।

অঘোরবাবু হঠাৎ বলে উঠলেন—আগুন জ্বেলে দিয়েছি। এর পরে আর কি গান হবে?

সঙ্গীতের সেই সূক্ষ্ম ও অনাবিল অনুভবের পরেই তাঁর এই কথাটি বড় স্থূল আর দাম্ভিক শোনাল। আর হৃদয়হীনও বটে। কারণ চক্রবর্তী মহাশয়ের তুল্য প্রবীণ গুণী যখন স্বয়ং আসরে উপস্থিত। তাই অঘোরবাবুর কথাটি অনেকেরই মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলে। হয়ত অঘোরবাবু গোপালচন্দ্র কিংবা অন্য কোন গায়ককে কটাক্ষ করে কথাটি বলেননি। হয়ত অহঙ্কারে মত্ত হয়েও মন্তব্যটি করেননি তিনি। হয়ত সার্থকতার আনন্দে সরল প্রাণেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু সেই স্থান-কালে কথাটি আদৌ ভাল শোনাল না। শ্রোতাদের মধ্যে অনেকেই চঞ্চল হয়ে উঠলেন, মনে তাঁদের ক্ষোভ জাগল। আর অনেকের আপনা থেকেই চোখ পড়ল চক্রবর্তী মশায়ের মুখের দিকে।

তাঁর হৃদয়ও সরাসরি বিদ্ধ হয়েছিল। আর অচিরেই তার প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। তিনি একটু নড়ে-চড়ে বসে যেন আত্মস্থ হয়ে নিলেন। তারপর মুখে-চোখে ভয়ের ভাব ফুটিয়ে ব্যঙ্গের সুরে বললেন অঘোরনাথের দিকে ফিরে,—ওরে বাবা, আগুন জ্বালিয়ে দিলি? বলিস্ কি রে? আমি বুড়োমানুষ, ছুটে পালাতেও পারব না। পুড়ে-ঝুড়ে মরব নাকি? আচ্ছা মুশ্‌কিলেই পড়া গেল ত?

তারপর কণ্ঠ আরও কঠিন পরিবর্তিত ক'রে নিয়ে শুভ্র কুঞ্চিত কেশভরা মাথা উঁচু করে আর দীর্ঘ বপু ফুলিয়ে অঘোরবাবুকে বলে উঠলেন—আচ্ছা, এবার আমি একটু গান আরম্ভ করি। শোন্। শুধু তুই কেন? তোর বাকৃস-টাকৃস* কি সব আছে নিয়ে আয়। শোনাই একটু।

ব'লে সেই এক-আসর শ্রোতাদের সচকিত ক'রে গান আরম্ভ করলেন মর্মাহত বৃদ্ধ। 'বাকৃস-টাকৃস' আনবার জন্যে ধৈর্য ধরে আর অপেক্ষা করতে পারলেন না। অঘোরবাবু অবশ্য কোন উত্তর দিলেন না। রইলেন মৌন। শ্রোতারা বিস্মিত কৌতূহলে চক্রবর্তী মহাশয়ের গান শুনতে লাগলেন।

সিংহ বৃদ্ধ হলেও সিংহ! শ্রোতাদের এই কথাই মনে হ'তে লাগল তাঁর গান শুনতে শুনতে। তাঁর কণ্ঠ থেকে উৎসারিত সুরের নির্ঝরিণীর পরিচয় পেতে পেতে। এত সুর এখনও আছে এই বৃদ্ধের মধ্যে? আছে এখনও এমন বিচিত্র, এমন লীলাময় স্বরলহরী? অন্তরের কোন্ গোপন মর্মতল থেকে এই সুরের চঞ্চল ধারা ঝঙ্কারিত হয়ে চলেছে?

মৃদু গুঞ্জরণে স্পন্দিত কণ্ঠে কখন্ রাগের উদ্‌বোধন করেছিলেন সঙ্গীত-প্রবীণ। বিস্ময়ের ঘোরে তখন আসর নিথর নিষ্কম্প। কখন্ রাগ বিস্তারের নব নব পথে, রাগরূপের অভাবিত উন্মোচনে শ্রোতাদের মায়ালোকে নিয়ে চলেছেন সুরসাধক—সে চেতনা কারও নেই। সুরের অপরূপ মোহিনী স্পর্শে সকলের চৈতন্য যেন আচ্ছন্ন, মগ্ন হয়ে গেছে। স্তবকে স্তবকে সুর নিঃসারিত হয়ে পরিপূর্ণ ক'রে দিয়েছে আসরের শ্রোতাদের মনের সমস্ত শূন্যতা। সুরের মূর্তিহীন আত্মা যেন শরীরী হয়েছে, স্বরের মুক্ত পক্ষে ভর ক'রে আন্দোলিত হচ্ছে আসরের হাওয়ায় হাওয়ায়! যেন তাকে স্পর্শ করা যায়!......

অবশেষে চক্রবর্তী মশায় যখন গান শেষ করলেন, তখন আর ব'লে দিতে হয়নি যে সুরের আগুন জ্বলেছে কি না। সমস্ত আসর সুরের অপূর্ব আবেশে স্তব্ধ। প্রশংসা করবার কথা ধৃষ্টতা মনে হয়েছে অনেকের।

অঘোরবাবু নির্বাক্, নতমস্তক। তাঁর গানের পরেও এমন গান সে আসরে সম্ভব হ'ল! আর তাও এই বৃদ্ধের কণ্ঠে!

অঘোরবাবুর গানের পরে তাঁর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ ক'রে চক্রবর্তী মশায় নতুন করে আসর মাৎ করলেন। কিন্তু তাঁর পরে আর কেউ গান গাইবার কথা কল্পনাও করতে পারলেন না। তাঁর সুরের আগুনে আসর জ্বলে গেছে যে!

---

* অঘোরবাবুর প্রধান ওস্তাদ আলী বক্স তীব্র ব্যঙ্গের চোটে এই অপভ্রংশে পরিণত!

বজ্রের মতন ধা

কেশব মিত্রের পাখোয়াজ ! কথাটা এককালে গান-বাজনার জগতে প্রবাদ বাক্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আজও তাঁর নাম একেবারে লুপ্ত হয়নি। বেঁচে আছে নানা আসরের কথা-কাহিনীতে। আর বেঁচে আছে তাঁর হাতে-গড়া ভবানীপুর সঙ্গীত-সম্মিলনীতে।

কেশববাবুর মতন পাখোয়াজী এদেশে কমই জন্মেছেন। উনিশ শতকের তিনি একজন শ্রেষ্ঠ পাখোয়াজ-বাজিয়ে ছিলেন—এমন সব কথা জানা যায় আমাদের সঙ্গীতচর্চার অলিখিত ইতিহাস থেকে।

তাঁকে যাঁরা দেখেছেন, তাঁর হাতের বাজনা যাঁরা শুনেছেন, তাঁদের মুখে মুখে কেশবচন্দ্রের অনেক গুণ-পণার কাহিনী একালে এসে পৌঁছেছে। তারই কয়েকটি এখানে বলা হবে। তবে তার আগে তাঁর নিজের কথা কিছু জানান দরকার।

ভবানীপুরের প্রসিদ্ধ মিত্র বংশের সন্তান কেশবচন্দ্র ছিলেন বিচারপতি স্যর রমেশচন্দ্রের তৃতীয় অগ্রজ। আর সেকালের অনেক বাঙালী গুণীর মতন তিনিও ছিলেন সৌখীন, অর্থাৎ অপেশাদার। বরং বাজনার জন্যে দস্তুরমত খরচ করতেন। পেশাদার গায়ক ওস্তাদদের মুজরো দিয়ে নিজের বাড়ীতে এনে, সঙ্গত করতেন তাঁদের গানের সঙ্গে। পশ্চিম থেকে কোন বিখ্যাত কলাবত এসেছেন অথচ কেশববাবুর সঙ্গে আসর হয়নি, এমন বড় একটা ঘটত না। মুরাদ আলীর মতন অত বড় একজন ধ্রুপদীকে তিনি নিজের বাড়ীতে ছ'মাস রেখে দেন তাঁর সঙ্গে বাজাবার জন্যে। তিনি ছিলেন কলকাতার আদি মৃদঙ্গাচার্য শ্রীরাম চক্রবর্তীর ঘরের শিষ্য। বাংলা দেশে পাখোয়াজের এত বড় ঘর সেকালে আর ছিল না।

পাখোয়াজ কোলে নিয়ে তিনি যখন গায়কের মুখোমুখী বসতেন, সে আসর একটা দেখবার মতন জমজমাট হয়ে উঠত। কেশববাবু ত নন, যেন সাক্ষাৎ গণেশ।—তাঁর অনুরাগী কোন কোন বৃদ্ধের মুখে এমন প্রশংসার উচ্ছ্বাস শোনা গেছে। বলবার বোধহয় দরকার নেই যে, গণেশ শুধু সিদ্ধিদাতা নন, পুরাণে তাঁকে আদি মৃদঙ্গাচার্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে।......

মিত্র মহাশয়ের হাত অসাধারণ তৈরি ছিল, রীতিমত রেওয়াজী হাত। সৌখীন হলেও মৃদঙ্গচর্চাই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র সাধনা। প্রতিভার সঙ্গে সাধনাকে যুক্ত করে তিনি পাখোয়াজ-সঙ্গতে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। অনর্গল অভ্যাসের ফলে তাঁর হাত তৈরী হয়েছিল যন্ত্রের মতন। কৌশলী এবং ক্লান্তিহীন। তিনি যখন 'ধেরে কেটে তেরে কেটে' বোল্ ওঠাতেন, যেন কাঠের মতন আওয়াজ হ'ত। যখন রেলা চালাতেন, আসর ভরে যেত গম্ভীর গুরু গুরু মন্দ্র ধ্বনিতে। আর ধা মারতেন কেমন ? তা একটু পরেই বলা হবে।

কেশববাবুর কঠিন হরফ ছিল—সাঙ্গীতিক পরিভাষায় বলতেন অতি বৃদ্ধ তবলাগুণী বিধুভূষণ দত্ত। লক্ষ্ণৌ ঘরাণার বিখ্যাত তবলিয়া বাবু খাঁর শিষ্য (গড়পারের) বিধুভূষণ দত্ত অনেকবার মিত্র মশায়ের বাজনা শুনেছিলেন।

কেশবচন্দ্রের বাজনার বিষয়ে আর একটি বড় চমৎকার কথা জানান প্রাচীন ধ্রুপদী অমরনাথ ভট্টাচার্য। কথাটি ভট্টাচার্য মশায় তাঁর পিতা, ধ্রুপদগায়ক (ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর শিষ্য) কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্যের মুখে শুনেছিলেন। কালীপ্রসন্ন অনেক আসরে কেশবচন্দ্রের হাতের বাজনা শোনেন আর গল্প করতেন তাঁর বাজনার বিষয়ে। কথাটি হ'ল—কেশববাবু আসরে গানের সঙ্গে সঙ্গত করতে বসে প্রথমেই একটি ধা মারতেন। গায়ককে এবং আসরের সবাইকে যেন স্বাগত জানাবার জন্যে একটি তেহাই দিয়ে বাজনা আরম্ভ করতেন কেশববাবু।

বাজনা আরম্ভ করেই এই যে তেহাই মারা, এর একটি তাৎপর্য আছে। কারণ ব্যাপারটি মোটেই সহজ নয়। যে-কোন গায়কের সঙ্গে বাজাতে বসে—তাঁর গায়ন-রীতিনীতি অনেক সময়েই অজানা থাকত—প্রথমেই একটি তেহাই ভাল করে মারা বেশ কঠিন কাজ। তালাধ্যায়ে অসামান্য অভিজ্ঞ না হ'লে এমন তেহাইয়ের মুখপাত হ'তে পারে না। তাল লয় ছন্দ ইত্যাদি নিজের একান্ত দখলে না থাকলে কেশববাবুও তা করতে পারতেন না। তাই মনে হয়, ওটা শুধু তাঁর আসরকে ও গায়ককে অভিবাদন জানানো নয়। ওই মুখপাত তেহাইয়ের ভাষায় তিনি যেন গায়ককে বুঝিয়ে দিতেন—এ সমস্ত আমার অজানা নয়। আমি জানি এখন কি হবে। আমি পাল্লা দিতে পারব তার সঙ্গে। আমি প্রস্তুত।

তাঁর অসাধারণ তৈরি হাতের জন্যে অনেকে যেমন প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতেন, তেমনি কেউ কেউ আবার ঈর্ষাও করতেন মনে মনে। শোনা যায়, এমনি একজন

ছিলেন তাঁরই এক গুরু-ভাই মুরারিমোহন গুপ্ত, যিনি নিজেও ছিলেন একজন মৃদঙ্গাচার্য।

কেশবচন্দ্র এবং মুরারিমোহন দুজনেই ঠনঠনিয়ার শ্রীরাম চক্রবর্তীর ঘরের শিষ্য। একই গুরুর শিষ্য অর্থাৎ গুরুভাইদের মধ্যে একটি বিশেষ প্রীতির সম্বন্ধ গড়ে ওঠে। একসঙ্গে গুরুর কাছে শিক্ষা নেওয়া, একই বিষয় ও ভাবে শিক্ষা পাওয়া, অন্যান্য ঘরাণা থেকে পৃথক্ একটি বিশিষ্ট পদ্ধতির চর্চা করা, ইত্যাদি কারণে গুরুভাইদের মধ্যে একটি হৃদ্যতা ও ঘনিষ্ঠতা থাকে। আবার সেই সঙ্গে কোন কোন ক্ষেত্রে একটু ঈর্ষার ভাবও দেখা যায়। সঙ্গীত-জগতে এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে এবং এটি অসম্ভবও নয়, অস্বাভাবিকও নয়। এতে আশ্চর্য হবার যেমন কিছু নেই, গুপ্তমশায়ের অনুরাগীদের দুঃখিত হবারও কথা নয়। একটি আসরের গল্পের প্রয়োজনে কথাটার উল্লেখ করতে হ'ল; মানুষের স্বভাবে অনেক রকম রিপু থাকে, এও তার মধ্যে একটি। দোষে-গুণে মানুষ। মুরারিবাবুর যেমন কেশববাবু সম্পর্কে ওইটি ছিল, তেমনি কেশববাবুরও আবার আর একটি দোষ (সেকালের সঙ্গীত-জগতের অনেকের মতন) ছিল। কিন্তু সে সব দোষের কথা থাক। এখন গুণের গল্প হোক্।

তাঁদের গুরুভাইদের মধ্যে বাজিয়ে হিসেবে কেশবচন্দ্রের নাম-ডাক ছিল সবচেয়ে বেশি। তাঁদের গুরুর ঘরে আর একজন ওস্তাদ সঙ্গতকার হলেন বসন্ত হাজরা। মুরারিবাবু এঁদের তুল্য বাদক না হলেও আর একটি গুণে তাঁর খুব প্রসিদ্ধি ছিল। গুপ্তমশায়ের গুরুভাইদের মধ্যে তাঁরই সবচেয়ে শিষ্য গঠন করবার গৌরব প্রাপ্য। গোপালচন্দ্র মল্লিক, সত্যচরণ গুপ্ত, দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রভৃতি বাংলার স্বনামধন্য পাখোয়াজীদের গুরু হলেন মুরারিমোহন।

কেশবচন্দ্রের কিন্তু একজনও অমন কৃতী শিষ্য হন নি। বলতে গেলে, কেশববাবুর কোন শিষ্যই নেই। বিহারী মিশ্র নামে এক ভদ্রলোক অনেকদিন তাঁর কাছে শিক্ষার্থী হয়ে যাতায়াত করেন। কিন্তু যোগ্যতার অভাবে তাঁর কিছুই হয় নি। বিখ্যাত সঙ্গতকার নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম জীবনে কিছুদিন মিত্র মশায়ের কাছে শেখবার কথা কেবল জানা যায়। নগেন্দ্রবাবু পরে দীননাথ হাজরার কাছে যান শেখবার জন্যে। এই সব কারণে, মৃদঙ্গ-চর্চার ক্ষেত্রে শিক্ষক হিসাবে কেশববাবুর অবদান ধর্তব্য নয়। কিন্তু মুরারিমোহনের দান সে বিষয়ে স্মরণীয় হয়ে আছে। যে তিন জনের নাম আগে করা হয়েছে, তাঁরা ছাড়া আরও কয়েকজন কৃতী শিষ্য তাঁর ছিলেন। যথা: আনন্দনারায়ণ মিত্র, ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, চারুচরণ মুখোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ দে (প্রথম জীবনে) প্রভৃতি।

তবে গুপ্ত মশায় যত বড় মৃদঙ্গাচার্য ছিলেন, তত বড় মৃদঙ্গী ছিলেন না তার একটি কারণ হয়ত এই যে, তিনি বেশি বয়সে মৃদঙ্গ শিক্ষা বা চর্চা আরম্ভ করেছিলেন। আসরে তাঁর পাখোয়াজ-সঙ্গত তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারত না, কেশবচন্দ্রের মতন। যত জ্ঞান বা যত বোলের সংগ্রহ তাঁর ছিল, ক্রিয়াসিদ্ধ বাদক হিসেবে তেমন কৃতী ছিলেন না তিনি। সেই কারণে কিংবা অন্য কোন কারণে কেশববাবুর প্রতি একটু অসূয়ার ভাব তাঁর ছিল।

একদিন মিত্র মশায়ের একটি আসরে বাজাবার কথা। বড় আসর। আরও কয়েকজন গুণীর সেখানে গান-বাজনা হবে। গায়কদের সঙ্গে সঙ্গত করবার জন্যে অন্য পাখোয়াজীও সেখানে দরকার। সেই আসরে আমন্ত্রিত হয়ে মুরারিমোহন তাঁর দুই কৃতী শিষ্যকে সেখানে পাঠানো স্থির করলেন। তিনি নিজে আসরে উপস্থিত হবেন না। তাঁর সেই দুই শিষ্য হলেন—গোপালচন্দ্র মল্লিক ও সত্যচরণ গুপ্ত। তাঁরা মুরারিবাবুর শ্রেষ্ঠ শিষ্য শুধু নন, তখনকার বাংলায় শ্রেষ্ঠ পাখোয়াজীদের মধ্যেও দুজন।

গোপালচন্দ্র এবং সত্যচরণকে তিনি বিশেষ নির্দেশ দেন, যেন তাঁরা যথাসাধ্য ভাল বাজান সেই আসরে। এত ভাল তাঁদের বাজাতে হবে যাতে কেশবচন্দ্রকে টক্কর দিতে পারেন। মুরারিবাবুর শিষ্যদের গুণপনায় যেন ডুবে যায় কেশববাবুর বাজনা। তাঁদের দুজনের বাজনা শুনে আসরে যেন সকলে ধন্য ধন্য করে।

সে আসরও যেমন-তেমন নয়। জোড়াসাঁকোর সেই বিরাট্ বাড়ীর জলসাঘর। রোমান স্থাপত্য-শৈলীতে গড়া, বিরাট্ স্তম্ভ, সুপ্রসর সোপানশ্রেণী আর তোরণে সাজানো সেই প্রাসাদের আসর। এত উচ্চশ্রেণীর জলসা এখানে অনুষ্ঠিত হয়েছে যে, দেশের সঙ্গীতচর্চার ক্ষেত্রে এই অট্টালিকার একটি ঐতিহাসিক মূল্য আছে। সারা ভারতবর্ষের কত শিল্পীর কত সঙ্গীত-স্মৃতি যে এখানকার বিশাল জলসাঘরের সঙ্গে বিজড়িত, এ প্রাসাদের কথা একবার উল্লেখ না করলে সেকালের সঙ্গীত-জীবনের অনেকখানিই অপরিচয়ের অতলে থেকে

যায়। অট্টালিকাটির নিজের ইতিহাসও কি বিচিত্র উত্থান-পতনের কাহিনী! মহাকালের নাটকীয় পটক্ষেপে কতবার উৎক্ষিপ্ত হয়ে গেছে এই প্রাসাদের স্বত্ব-স্বামিত্ব। শ্রীকৃষ্ণ মল্লিক এবং শ্যামাচরণ মল্লিক, রাজা ছুনিয়ালাল শীল এবং হরেন্দ্রকৃষ্ণ শীল, তারপর প্রদ্যুম্ন মল্লিকের হাত-ফের হয়ে অট্টালিকাটি শেষ পর্যন্ত 'লোহিয়া মাতৃ সেবাসদন' নামে হস্তান্তরিত ও রূপান্তরিত হয়েছে। বাংলার এই মহাধনী সুবর্ণবণিক গোষ্ঠীর হাত থেকে বর্তমান ভারতের ধনকুবের রাজস্থানী বণিকদের আশ্রয় লাভ করেছে। আর কি বৈচিত্র্যময় জীবন-নাট্যও অভিনীত হয়েছে এখানে। কোটিপতি হরেন্দ্রকৃষ্ণ শীল আমীর থেকে ফকির হয়ে এই প্রাসাদের রঙ্গমঞ্চ থেকে অবিচলিত চিত্তে বিদায় নিয়েছেন। প্রদ্যুম্ন মল্লিকের জীবনের চরম ট্র্যাজেডি ঘটবার সময়েও তিনি ছিলেন এই অট্টালিকার মালিক। এমনি কত কাহিনী!

সেই বিলাসভবন রূপান্তর গ্রহণ ক'রে এখন হয়েছে সেবানিকেতন। সঙ্গীতের কল-গুঞ্জরণ সেখান থেকে বহুদিন অন্তর্হিত। শ্যামাচরণ মল্লিক থেকে হরেন্দ্রকৃষ্ণ পর্যন্ত যে সঙ্গীতনির্ঝর সেই সুসজ্জিত জলসাঘরে ছন্দে-তানে নিক্বণে মুখরিত হিল্লোলিত ছিল, রোগাবাসের দেয়ালের অন্তরালে তা স্তব্ধীভূত হয়ে আছে। আর কোনদিন সে মৌন মুখর হ'তে পারবে না।···

যে সময়ের আসরের কথা এখানে বলা হচ্ছে, তখন সেই প্রাসাদের পরিপূর্ণ সাবেকী রূপ বর্তমান। সঙ্গীত-জীবনের সূত্রে বলতে গেলে, তখন তার নবীন যৌবন। সুরের জাগরণে উদ্বোধনে সজীব সেখানকার জলসাঘর।···

এমনি এক সন্ধ্যায় সেই জলসাঘর উৎসবের সাজে সজ্জিত শোভায় আসর বসিয়েছে। বেলোয়ারী ঝাড়ের আলো অসংখ্য কাচখণ্ড থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে দেওয়ালের দর্পণে দর্পণে প্রতিবিম্বিত। বহুমূল্য কার্পেটের ওপর আসন নিয়েছেন গুণীজন আর অতিথি-অভ্যাগত ব্যক্তিরা। কলকাতার এবং পশ্চিমের কয়েকজন গায়ক-বাদক এসেছেন। কেশববাবুও উপস্থিত।

এই আসরেই পাখোয়াজ বাজাবার জন্যে গোপালচন্দ্র মল্লিক ও সত্যচরণ গুপ্তকে পাঠিয়েছেন মুরারিমোহন। তাঁদের সেখানে পৌঁছতে খানিক দেরি হয়ে যায়।

তাঁরা যখন ফটক পার হয়ে এসে সিঁড়ির সারি শেষ করে নীচের অলিন্দে দাঁড়িয়েছেন, তখন দোতলার দক্ষিণের জলসাঘর থেকে সঙ্গীতধ্বনি শুনতে পেলেন। কোন ওস্তাদ হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ গাইছেন আর তাঁর সঙ্গে পাখোয়াজ বাজাচ্ছেন কেশববাবু।

তাঁর সাধা হাতের পাখোয়াজ থেকে মেঘ-গম্ভীর বোলের আওয়াজ নীচে ভেসে আসছে। সুস্পষ্ট আর সোচ্চার সেই সঙ্গতের ছন্দমুখর ধ্বনি।

সত্যচরণ সেখানেই থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। কেশব-বাবুর নিজস্ব ঢঙের বাজনা তাঁর খানিক কানে যেতেই তিনি আর এগোলেন না। উৎকর্ণ হয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলেন কেশববাবুর দাপটের বাজনা। তিনি নিজেও গুণী, তাই কেশবচন্দ্রের গুণপনা হৃদয়ঙ্গম করতে তাঁর বিলম্ব হ'ল না।

তাঁর সঙ্গী গোপাল মল্লিক অন্যমনস্ক হয়ে আসছিলেন, অতটা খেয়াল করেন নি। তা ছাড়া, গুরুর নির্দেশ তাঁর কানে রয়েছে: কেশববাবুকে আজ টেক্কা দিতে হবে। তাই আসরে যাবার জন্যে তিনি উন্মুখ। হঠাৎ সত্যচরণকে থমকে দাঁড়াতে দেখে বললেন—কি হ'ল? দাঁড়িয়ে পড়লে যে? ভেতরে চল।

সত্যচরণ তাঁর হাত ধরে মৃদু চাপ দিয়ে বললেন—চুপ। কোথায় যাবে? শুনছ না, ও কি বাজনা?

গোপালচন্দ্র সবিস্ময়ে গুরুভাইয়ের মুখের দিকে চাইলেন। সত্যচরণের এই আচরণ আর কথার ধরণ দেখে বড়ই আশ্চর্য লাগল তাঁর। বিশেষ গুরুর এই সদ্য নির্দেশের পরে। আসরে যেতে এই অযথা দেরি করতে তাঁর মোটেই ইচ্ছা হ'ল না, অথচ সত্যচরণ সেখানে যাবার কোন আগ্রহই দেখাচ্ছেন না—এতে তিনি বিব্রত বোধ করলেন। সঙ্গীকে হয়ত গুরুর কথা একবার স্মরণ করিয়ে দেবেন ভাবছিলেন।

কিন্তু সত্যচরণের তখন প্রায় মন্ত্রমুগ্ধ অবস্থা। তিনি আলঙ্কারিক ভাষায় উপমা সহযোগে কেশবচন্দ্রের বাজনার গুণকীর্তন করে উঠলেন—ওই শোন—কেশব-বাবুর হাতের বোল। যেন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। কোথা থেকে তেহাই উঠছে আর কিরকম করে এসে পড়ছে, দেখছ? ধা মারছেন যেন বজ্রপাত হচ্ছে! এক-একটা ধা পড়ছে একেবারে বাজের মতন।

বলে, তিনি তন্ময় হয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলেন বাজনা। নিজেও আসরে গেলেন না, গোপালবাবুকেও যেতে দিলেন না। শেষে সেখান থেকেই দু'জনে ফিরে এলেন গুরুর বাড়ী।

তাঁরা সে আসরে না বাজিয়েই চলে এসেছেন শুনে মুরারিমোহন বিরক্ত হলেন।

সত্যচরণ ছিলেন সত্যবাদী। তিনি অকপটে নিজের মনের ভাব জানালেন, গুরু-আজ্ঞা পালন না করবার দায়িত্ব নিজের ওপরেই নিয়ে গুরুর মার্জনা ভিক্ষা করলেন। পাছে সতীর্থের ওপরেও গুরু ক্রুদ্ধ হন, তাই বললেন—আমিই গোপালকে আসরে যেতে দিই নি, ও বাজাতে চেয়েছিল। কিন্তু আমরা কেশববাবুর ওই বাজনার পরে আর বাজাব কি? সে কি তেহাই আর বজ্রের মতন ধা!...

গুণগ্রাহী সত্যচরণ সেদিন যথার্থ গুণীর প্রশংসা না করে পারেন নি। সে গুণী যদি গুরুর প্রতিদ্বন্দ্বী হন, তাতেই বা কি? সত্যকার গুণপনা যেখানে, সেখানে কেন তা স্বীকার করব না? তার প্রাপ্য মর্যাদা দেব না কেন? এই মনোভাব থেকেই তিনি সেদিনকার আসরে কেশববাবুর সঙ্গে টক্কর দিতে যান নি। সাহস বা যোগ্যতার অভাবের জন্যে নয়। ও দু'টি বস্তু যে তাঁর বিলক্ষণ ছিল, তার একটি দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া যাক। কেশবচন্দ্রের প্রসঙ্গ আপাতত স্থগিত থাক কিছুক্ষণের জন্যে।

সত্যচরণের এই আসরটি হয়েছিল কাশীতে, কেশব-বাবুর সেদিনের বাজনার কিছুকাল পরের ঘটনা। সত্যচরণ উত্তর-জীবনে কাশীবাসী হয়েছিলেন, সেই সময়ের কথা। তখন কাশী নরেশের দরবারে উত্তর ভারতের দেশীয় নৃপতিদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। সেই উপলক্ষ্যে আগত রাজাদের সামনে এক-দিন কাশীরাজের সভায় একটি সঙ্গীতাসর বসে।

সে আসরের যিনি প্রধান গায়ক, তাঁর নাম গুরু বালাজী। মহারাষ্ট্রের ধ্রুপদী। অতি প্রবীণ—গুণে এবং বয়সেও। তাল-লয়ে অতিশয় দক্ষ। তাঁর সেই বার্ধক্য দশাতেও জরা তাঁর সঙ্গীত-শক্তিকে পরাস্ত করতে পারে নি। সেই বয়সেও তিনি রীতিমত দাপটের সঙ্গে গান করেন এবং তালাধ্যায়ে যেমন কূট তেমনি অটুট নৈপুণ্য।

গুরু বালাজী সেই বিশিষ্ট আসরে রাগমালা গাইতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু একই তালে সব রাগ নয়। প্রতিটি রাগ ভিন্ন তালে পরিবেশন করে তিনি মুন্সীয়ানা দেখাতে লাগলেন। তাঁর গান খুবই উপভোগ করছিলেন শ্রোতারা। কিন্তু বিপদ্ হ'ল সঙ্গতকারদের।

বালাজীর গানের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে বেসামাল হয়ে পড়তে লাগলেন পাখোয়াজীরা। একজন-দু'জন নন। কাশীর কয়েকজন বড় বড় পাখোয়াজী-বাজিয়ে একের পর এক গুরুজীর সঙ্গে সঙ্গত করতে গেলেন, কিন্তু কেউই বাজাতে পারলেন না হাত খুলে। কাউকেই জমিয়ে ধা মারতে শোনা গেল না। গায়কের মনের মধ্যেও হয়ত সেই কামনা ছিল, মুখে না ব'লে কাজে দেখাতে লাগলেন।

অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, এক একজন পাখোয়াজ কোলে নিয়ে বসছেন আর বাজনা শেষ করছেন অপ্রস্তুত হয়ে। সেই অতি-বৃদ্ধ ধ্রুপদী, যাঁর মুখের চর্ম লোল হয়েছে, ভ্রূজোড়া চোখের ওপর ঝুলে পড়েছে, পালোয়ান পালোয়ান পাখোয়াজীদের কচুকাটা করতে লাগলেন গণ্যমান্য শ্রোতাদের সামনে।

আসর তখন মাটি হ'তে আর বাকি কি? গতিক দেখে তখন উদ্‌যোক্তাদের একজন সত্যবাবুকে বাজাতে অনুরোধ করলেন। তিনি একবার চেষ্টা ক'রে দেখুন, যদি আসর রক্ষা হয়।

সত্যবাবুর সেখানে বাজাবার কথা ছিল না। কিন্তু তিনি তাঁদের আবেদন এড়াতে পারলেন না। পাখোয়াজ নতুন ক'রে বেঁধে নিয়ে বালাজীর সঙ্গে বাজাতে আরম্ভ করলেন। এতক্ষণ পরে সত্যিকার সঙ্গতের পরিচয় পেয়ে শ্রোতারা যেমন চমৎকৃত হলেন, তেমনি গায়কও। ভাঙ্গা আসর আবার জোড়া লাগল। সত্যবাবুর তৈরী হাতে, তাল-লয়ের নিখুঁত হিসেবে, ছন্দ-সৃষ্টির নৈপুণ্যে আর উচ্চকিত ধা মারবার কৃতিত্বে শ্রোতারা উল্লসিত হয়ে উঠলেন।

আসরের সব আমন্ত্রিত পশ্চিমা বাদকরা ব্যর্থ হবার পর সেদিন বাংলার মুখোজ্জ্বল করলেন সত্যচরণ!

এবার কেশববাবুর প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক্। আগেই বলা হয়েছে যে, তিনি বিখ্যাত ধ্রুপদী মুরাদ আলীকে কয়েকমাস নিজের বাড়ীতে রেখেছিলেন। মুরাদ আলী, শোনা যায়, প্রথমে কলকাতায় আসেন নবাব ওয়াজিদ আলীর মেটেবুরুজ দরবারে নিযুক্ত হয়ে। কিন্তু তিনি বেশীদিন নবাবের বেতনভুক ছিলেন না। কারণ অত্যন্ত মেজাজী মানুষ ছিলেন মুরাদ আলী। আত্মসম্মান এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়েছে মনে করলে কিংবা কোন কারণে মেজাজ একবার বিগড়ে গেলে তিনি কোথাও তিষ্ঠতেন না, তা সে-জায়গায় যতই সুখ-সুবিধা থাক। নবাব ওয়াজিদ আলী তাঁকে নাকি একদিন একটি অসময়ের রাগ গাইতে ফরমায়েস করায় তিনি দরবারের চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে আসেন, ইতি জনশ্রুতি। তাঁর এমনি স্বভাবের সম্বন্ধে আরও গল্প

শোনা যায়। তাই মেজাজের জন্যে তাঁকে রাখা অনেকের পক্ষেই কঠিন হ'ত।

কিন্তু ধ্রুপদ-গায়ক হিসেবে তাঁর ছিল অপরিসীম মর্যাদা। পশ্চিমের নানা অঞ্চল থেকে যত গুণী গায়ক সেকালে বাংলায় আসেন তাঁদের মধ্যে তাঁর তুল্য খুব কমই ছিলেন। গলায় ছিল তাঁর অপূর্ব জোয়ারীর ঐশ্বর্য আর তাল-লয়ের পাকা ভিত্তিতে সুরের সূক্ষ্ম অলঙ্করণ। এইসব গুণে গায়ক মুরাদ আলী ভারতের সঙ্গীতক্ষেত্রে একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলে গণনীয় ছিলেন। তাঁর প্রিয় রাগ ছিল মালকোষ আর ইমন এবং সেই দুটিতে সিদ্ধ ছিলেন তিনি। বাংলা দেশে তিনি অনেক বছর বাস করেন এবং কয়েকজন বাঙ্গালী তাঁর কৃতী শিষ্য হয়েছিলেন। যথা,—(ময়ূরভঞ্জ রাজার সভাগায়ক) যদুনাথ রায়, কিশোরীলাল মুখোপাধ্যায়, অঘোরনাথ চক্রবর্তী, অবিনাশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি। তাঁর মৃত্যু ও সমাধিও ঘটে কলকাতায়, তাঁর শিষ্য অবিনাশ ঘোষের বাড়ীতে।

কেশববাবুর (ভবানীপুর) পদ্মপুকুর রোডের বাড়ীতে মুরাদ আলী থাকবার সময় নিয়মিত তাঁদের গান-বাজনার আসর বসত। মুরাদ আলী গাইতেন, কেশবচন্দ্র পাখোয়াজ সঙ্গত করতেন। বিচারপতি রমেশ মিত্রও অনেক সময়ে উপস্থিত থাকতেন এই ঘরোয়া আসরে।

সেদিনটা ছিল শনিবার। কেশববাবুর বাড়ীতে আসর বসেছে। মুরাদ আলী গাইছেন আর তিনি পাখোয়াজ বাজাচ্ছেন। স্যর রমেশচন্দ্র এবং কয়েকজন বন্ধুবান্ধব আছেন শ্রোতাদের মধ্যে।

বাজাতে বাজাতে কেশববাবু হঠাৎ একটি কাণ্ড করলেন। নিছক নিজের খেয়ালের বশে করলেন, না রমেশচন্দ্র সেদিন আগে থেকে তাঁকে এবিষয়ে প্ররোচনা দিয়েছিলেন (এরকমও শোনা গেছে) ঠিক জানা যায় না। তবে কাণ্ডটা কেশববাবু সেদিনের আসরে ঘটালেন।

তিনি সঙ্গতের একসময়ে পর পর একুশটা ধা মারলেন মুরাদ আলীর গানের সঙ্গে। একুশটা ধা এই ভাবে দেওয়া খুবই শক্ত এবং খুব কম পাখোয়াজীই তা দিতে পারেন। কিন্তু ব্যাপারটি শুধু মুন্সীয়ানার কথা নয়, তার মধ্যে আর একটু বিশেষ তাৎপর্য আছে গায়কের সম্পর্কে। পাখোয়াজী একাদিক্রমে একুশটা ধা মারলে গায়কের পক্ষে নাকি সম্মানহানিকর হয়ে পড়ে। এতে যেন গায়ককে টেক্কা দেবার মতন শোনায়। ধ্রুপদীর ওপর ছাপিয়ে উঠে পাখোয়াজী যেন নিজেকে জাহির ক'রে তাঁকে নস্যাৎ ক'রে দেন, এমন ধারণাও একুশটা ধা মারার জন্যে হ'তে পারে। গায়কের এটা এক ধরণের পরাজয়ের সামিল।

অন্তত এক্ষেত্রে মুরাদ আলীর তাই মনে হ'ল। কারণ কেশববাবুর বাড়ীতে তিনি অতিথি শিল্পী এবং কেশববাবু বাজাচ্ছেন নিজের বাড়ীতে বসে। মুরাদ আলী অত্যন্ত আত্মাভিমানী। তিনি মুখে কিছু তখন বললেন না বটে, কিন্তু ব্যাপারটাকে অতিশয় গুরুতর ভাবে নিলেন। গান-বাজনা সেদিনকার মতন শেষ হ'ল, কিন্তু তার জের সেখানেই চুকল না। মুরাদ আলীর মনের ওপর আরম্ভ হ'ল তার প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া।

অপমানে আর অন্তর্জ্বালায় তিনি সেরাত্রে শয্যার ধারেও গেলেন না, ঘুম দূরের কথা। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে তিনি সারারাত পায়চারি করতে লাগলেন। আর চাকরটিকে মোতায়েন রাখলেন ঘন ঘন তামাক সেজে দেবার জন্যে। তামাকের ধোঁয়া ছাড়া মুখে আর কিছু ঠেকালেন না। তিক্ত বিষাক্ত অন্তর। একটি মাত্র ক্রূর চিন্তা তাঁর সমগ্র চৈতন্য আচ্ছন্ন করে আছে: কেশববাবু আমায় এমন ক'রে অপমান করলেন। আমি মুরাদ আলী খাঁ! আমায় একুশটা ধা শোনালেন নিজের বাড়ীতে, দশজনের সামনে। এর প্রতিশোধ নিতে হবে!......

এমনিভাবে শনিবার রাত কাটল। রবিবারই সকালে তিনি কেশববাবুকে বলে পাঠালেন,—আজ সন্ধ্যের পর আসরের ব্যবস্থা করুন। আমি আজও গাইব। কাল যাঁরা আসরে ছিলেন, তাঁরাও সবাই যেন আজ আসেন।

পরের দিনেই মুরাদ আলী এইভাবে আগের রাত্রের শ্রোতাদের সামনে গাইতে চেয়েছেন শুনে কেশববাবুর সন্দেহ হয়েছিল। গত দিনের আসরে একুশটা ধা মারবার পর গানের শেষে খাঁ সাহেবের মেঘাচ্ছন্ন মুখ দেখে তাঁর মনে হয়েছিল যে, কাজটা ঠিক হয়নি। মুরাদ আলী মনে বড় আঘাত পেয়েছেন। তারপর সকাল বেলা খবর পেয়েছিলেন যে, খাঁ সাহেব সারারাত ঘুমোননি। ঘরময় পায়চারি করেছেন আর ঘন ঘন তামাক খেয়েছেন। এসবের পর আবার সকালেই যখন খবর পাঠিয়েছেন আজই আসর বসাতে, তখন

কেশববাবু আন্দাজ করলেন ব্যাপারটি। কিন্তু আসর ত বন্ধ রাখা চলে না।

সন্ধ্যার পর শ্রোতারা একে একে এলেন। আরম্ভ হ'ল মুরাদ আলীর গান। কেশবচন্দ্র তাঁর মুখোমুখী পাখোয়াজ নিয়ে বসলেন।

মুরাদ আলী ঢিমা লয়ের গায়ন-পদ্ধতিতে সুদক্ষ ও সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন (এবং তাঁর শিষ্যরাও সে জন্যে ঢিমা চালে নিপুণতার পরিচয় দেন)। সেদিনও তিনি গাইতে লাগলেন অতিশয় বিলম্বিত লয়ে, অতি কূট কায়দায়। পাখোয়াজী যত বড় লয়দারই হোন, এত ঢিমা লয়ে এমন কড়া চালে গানের সঙ্গে হাত খুলে বাজাতে পারেন না, স্ফূর্তি আসে না তাঁর সঙ্গতে। এক্ষেত্রেও গায়ক মৃদঙ্গীর হাত বেঁধে ফেললেন।

কেশববাবু বুঝলেন, খাঁ সাহেব গত রাতের শোধ নিচ্ছেন। তিনি হাত খুলতে পারলেন না, সেই সব বজ্রের মত ধা মারতে অপারগ হলেন। কিন্তু খাঁ সাহেবকে আর কিছু বলা চলে না তখন। শ্রোতারা কেশববাবুর বেকায়দা অবস্থা দেখলেন।

তারপর এক সময়ে গান শেষ হ'ল। কিন্তু সেখানেও শেষ হ'ল না ব্যাপার। খাঁ সাহেব তার পরের দিন সে বাড়ী ছেড়ে চলে গেলেন। কেশববাবুর অনেক অনুরোধেও আর রইলেন না সেখানে।

কেশবচন্দ্রের আর একটি আসরের কথা এবার বলা হবে। তাঁর অদ্ভুত দ্বি-ধার কাহিনী। রাণী রাসমণির জানবাজারের অট্টালিকায় এই আসর হয়েছিল। বেশ বড় আসর। কয়েকজন গায়ক বাদক সেই সঙ্গীতানুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন। কিন্তু সে আসরে প্রধান গায়ক ছিলেন অঘোরনাথ চক্রবর্তী এবং প্রধান সঙ্গতকার—কেশবচন্দ্র।

অঘোরনাথের সব চেয়ে কৃতী শিষ্য, ধ্রুপদী গোপাল-বন্দ্যোপাধ্যায় গুরুর সঙ্গে সে আসরে উপস্থিত ছিলেন। এবং পরবর্তীকালে তিনিই সে আসরে অঘোরবাবুর সঙ্গে কেশবচন্দ্রের সঙ্গতের চমকপ্রদ বিবরণ এমনি ভাবে গল্পচ্ছলে বলতেন: চক্রবর্তী মশায়ের গানের সঙ্গে পাখোয়াজ বাজাচ্ছিলেন কেশববাবু। আসরে অনেক সমঝদার ছিলেন। গান-বাজনা খুব জমে উঠেছে। বেশ ভালই হচ্ছিল কেশববাবুর সঙ্গত। কিন্তু তিনি বাজাতে বাজাতে হঠাৎ—বোধহয় অন্যমনস্ক হয়ে—এক সমের মাথায় দুটো ধা মেরে দিলেন; যে সব সমঝদার শ্রোতা এক মনে শুনছিলেন, তাঁরা কেশববাবুর অসাবধানে দুটো ধা মারার ভুলটি বুঝতে পারলেন। একজন ত স্পষ্টই জানিয়ে দিলেন—এটা কি হ'ল? কেশববাবু কিন্তু অপ্রস্তুত হলেন না। অদ্ভুত ভাবে মানিয়ে নিয়ে বললেন, বাজনা থামিয়ে—ওঃ, আপনাদের বলা হয় নি। আজ বাড়ী থেকে বেরুবার সময় মনে আমার দ্বিধা ছিল। আমি ঠিক করেছিলাম একটার জায়গায় দুটো করে ধা মারব। ওটা আমি ইচ্ছে করেই মেরেছি। ভুল নয়।—এই বলে আবার সঙ্গত আরম্ভ করলেন। আর তারপর যতবার ধা মারবার দরকার হ'ল, প্রত্যেক বারই দুটো করে ধা মারতে লাগলেন। অথচ ভুল কিছুই মনে হ'ল না, এখন ঠিক ঠিক মাত্রা হিসেবে ধা পড়তে লাগল। আসরে সকলেই অবাক্ হয়ে গেলেন। এমন ব্যাপার সত্যিই শোনা যায় না। কেশববাবু ভুলটাকেই সামলে মানিয়ে নিয়ে ঠিকে দাঁড় করিয়ে দিলেন। দুটো করে ধা আর মোটেই ভুল শোনাল না। আরও অনেকক্ষণ তিনি এইভাবে বাজালেন। অঘোরবাবু তারপর যে-ক'টি গান গাইলেন সব এক তালে নয়, আলাদা আলাদা তালে তাঁর গান হ'ল। কেশব-বাবুই তাঁর সঙ্গে বরাবর বাজালেন আর সব রকম তালেই ওইভাবে দু'টি করে ধা মেরে গেলেন। তাঁর ভুল ধরবার ক্ষমতা আর কারুর হ'ল না সে আসরে।···

এবারে তাঁর জীবনের শেষ বাজনার কথা বলে তাঁর কথা শেষ করা হবে। তিনি যখন বাজনা ত্যাগ করলেন, তখনও তাঁর হাত বয়সের পক্ষে বেশ তৈরিই ছিল। ইচ্ছে থাকলে আরও কিছুকাল অক্লেশে বাজাতে পারতেন। কিন্তু তিনি নিজে থেকেই ছেড়ে দিলেন বাজনা।

পাখোয়াজ তাঁর শুধু সাধনার বস্তু নয়, শখেরও। আর তিনি ঠিক করেছিলেন, কোন রকম শখ আর জীবনে করবেন না। তাই বিসর্জন দেন জীবনের সব চেয়ে বড় শখ। সব চেয়ে বড় সাধ।

যে দিনের কথা এখানে বলা হচ্ছে, সেদিন তাঁর সঙ্গতে কে গান গাইছিলেন, তা জানা যায় নি। তবে সে গান আর তাঁর বাজনা বেশ ভালই হচ্ছিল। কিন্তু শ্রোতাদের মধ্যে কেউ জানতেন না, মনের মধ্যে কি গভীর উৎকণ্ঠা আর দুর্ভাবনা নিয়ে কেশববাবু বাজাচ্ছিলেন। তাঁর একমাত্র উপযুক্ত পুত্র তখন কর্মস্থলে, কলকাতা থেকে অনেক দূরে, বিহারের একটি শহরে কঠিন রোগাক্রান্ত হয়ে রয়েছেন। তাঁর কুশল সংবাদ

এখনও পান নি। বাইরে থেকে মনে হচ্ছিল নিবিষ্ট মনে বাজাচ্ছেন, কিন্তু মনে দুশ্চিন্তার কালো ছায়া।

এমন সময় তাঁর নামের একটি টেলিগ্রাম নিয়ে সেই ঘরে লোক এল। তিনি তা দেখে বাজাতে বাজাতেই ইশারা করে টেলিগ্রামটি রেখে দিতে নির্দেশ দিলেন। আর বললেন—এখন খুলো না। আমি জানি ওতে কি আছে।

তারপর যখন গান শেষ হ'ল, কেশববাবু শেষ ঘা দিয়ে পাখোয়াজ কোল থেকে নামিয়ে টেলিগ্রামটি পড়ে দেখলেন। কালো কালো অক্ষরে লেখা কাল সংবাদ: পুত্রের মৃত্যু হয়েছে।

সেই দিন থেকে আর কেউ পাখোয়াজ বাজাতে দেখে নি কেশববাবুকে।

—

ভারতবর্ষ ভাগ

জনাব জিন্না সাহেব ভারতবর্ষকে যেরূপ ভাগ করিতে চাহিয়াছেন, তাহা মুসলীম লীগের গত অধিবেশনে তাঁহার বক্তৃতায় ও গৃহীত প্রস্তাবে পুনরায় ব্যক্ত হওয়ায়, সে বিষয়ে আলোচনা বাড়িয়াছে। দেখা যাইতেছে, বহু মান্যগণ্য মুসলমান, মুসলীম লীগেরও অনেক মুসলমান, ইহার বিরোধী। তাঁহারা ইহার সমালোচনা ও বিরুদ্ধবাদে অবতীর্ণ হওয়ায় আমাদের সে কাজ করিবার প্রয়োজন কমিয়াছে।

যে কোন রকমের ভাগাভাগি যাহারা চান, তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, ভারতবর্ষ নানা ভাবে বিভক্ত থাকায় বার বার পরাধীন হইয়াছে। ইহা প্রাদেশিকতার প্রভাবে স্ব-স্বপ্রধান প্রদেশসমূহে, কিংবা সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবে হিন্দুস্থান-পাকিস্তানে বিভক্ত হইলে পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিঁড়িতে পারিবে না, কোনোপ্রকারে স্বাধীন হইলেও স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিবে না।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৪৭।

জনক

শ্রীঅজিত চট্টোপাধ্যায়

হাঁটুভাঙ্গা দ। অষ্টাবক্র মুনির আকৃতি। রামায়ণে ভগীরথের কাহিনী আছে। মুনির আশীর্বাদে যিনি সুঠাম সুন্দর রূপ পেয়েছিলেন। দিব্যকান্তি সুদর্শন হয়ে গঙ্গাকে এনেছিলেন তপস্যার জোরে।

এ গল্পও ভগীরথের। তবে অন্য ভগীরথ। শুধু চেহারাটা বাঁকা। হাঁটুভাঙ্গা দ'য়ের মত। মুনির আশীর্বাদ পাবার আগে রামায়ণের ভগীরথ যা ছিলেন।

সারেঙ্গা হাসপাতালের পাশ দিয়ে লালরঙের রাস্তাটা গিয়েছে। বিষ্ণুপুর ওন্দা হয়ে বাঁকুড়ার দিকে। লালরঙ মিছে বলা, লাল ধুলোরই পথ। আর শুধু পথ কেন, পাহাড় বন আর প্রান্তর লালে-সবুজে মেশামেশি। অঞ্চলটা বিহারের কাছাকাছি। মাটিতে লাল কল্লাচ,···মোরাম ছড়ানো যত্রতত্র। শালবন রয়েছে চারপাশে। সারেঙ্গা পেরিয়ে পথটা বনে ঢুকেছে।

মিশনারী হাসপাতাল। জায়গাটাও মিশনারীদের আড্ডা। অনেকদিন আগের সেই ইংরেজ আমল থেকে। এখানকার লোকে বলে মাইকেল সায়েবের হাসপাতাল। রেভারেণ্ড মাইকেল জন এই হাসপাতালে আছেন প্রায় তিরিশ বছর ধরে। সোনার মত উজ্জ্বল রং। লম্বা দেহটি। ষাটের কাছাকাছি বয়স। এখনও কিন্তু এতটুকু ভাঙ্গে নি শরীর। রোজ সকালে হাসপাতালের আউটডোরে তাঁর সেই শুভ্রবাস পরিহিত মূর্তিটি একটি বিশেষ সময়ে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে। মুখে প্রসন্ন হাসি। স্নিগ্ধ শান্ত রূপ—।

রোগীর দল কাছাকাছি গ্রামের। জ্বরজাড়ি, কানে পুঁজ কিংবা সর্দিকাশিতে ভুগছে—। মাইকেল সায়েবের উপর বিশ্বাস আছে, শ্রদ্ধা আছে। গলায় ষ্টেথোস্কোপ ঝুলিয়ে সাহেব যখন কাছে এসে দাঁড়ান তখনই অর্ধেকটা রোগ ভাল মনে হয়। বাকীটা ওষুধে, পথ্যে।

হাসপাতালের কাছেই ভগীরথ দাসের চপ-ফুলুরির দোকান। সকালে-বিকালে জমাটি আড্ডা। কানাই সাঁতরা আসে, পঞ্চানন বিশ্বাস আসে। আর আসে পচাই ঢোল। সারেঙ্গা হয়ে বাস সার্ভিস আছে। বাসের কণ্ডাক্টার এসে হাঁক দেয়—'এ ভাই ভগীরথ, দু আনার আলুর চপ। জলদি, জলদি'—

বাস থামলেই একটা ব্যস্ততা। যাত্রীদের কেউ কেউ নামে। জল চায়, তেলেভাজা কেনে। ঘুরেফিরে জায়গাটা দেখে। মৌচাকে মৌমাছি উড়ে বেড়ানর মত একটা গুঞ্জন শোনা যায় বহুক্ষণ।

ভিনগাঁ থেকে রোগী দেখে মাইকেল জন ফেরেন। ওদের জমাটি আড্ডার কাছে এসে পা দুটো ছড়িয়ে দেন মাটিতে। সাইকেলে চেপে লম্বা মানুষ থামতে হ'লে যেমন করে।

হেসে বলেন—'কেয়া ভগীরথ? বেচা-কেনা কেমন চলছে তুমার?'

ভগীরথ অল্প অল্প হাসে। তেলেভাজা বেচতে বেচতে তাকায় সাহেবের দিকে।

ওর হয়ে পচাই ঢোল বলে—'ভগীরথের ইবার বিয়া দিতে হবেক সাহেব। আর বউ বিনে মানাচ্ছে নাই।'

সবাই ফিক্ ফিক্ ক'রে হাসে।

মাথাটা আরো খানিকটা নীচে নামিয়ে দেয় ভগীরথ। লজ্জায় বিনম্র হয়ে ওঠে।

জন সাহেব বলে—'বিয়া? ইউ মিন শাদী?' হো হো ক'রে খানিকটা হেসে নেয় সাহেব।

প্রশ্ন করে—'শাদী ঠিক? আই মিন ডেট?'

কানাই সাঁতরা ফোড়ন কাটে—'এক কথায় কি বিয়া হয় সাহেব? আমাদের দেশে লাখ কথা ভিন্ন উসব হয় না।'

সাহেব মাথা নাড়ে। বলে—'ঠিক, ঠিক।'

সাইকেল চালিয়ে চলে যায়। হাসপাতালের দিকে।

তেলের কড়া নামিয়ে ভগীরথ চেঁচিয়ে ওঠে—'সাহেবের সামনে ইসব মস্কারা করছিলি কেনে?'

—'মস্কারা কেনে?' পচাই ঢোল বলে—'ইবার তোর একটা বিয়া লাগিয়ে দিই ভগীরথ, কি বলিস্?'

ভগীরথ জবাব দেয় না। কুঁজো হয়ে বেসন ফাটতে সুরু ক'রে দেয়। উনুনের আঁচ চ'লে গেলে আর ফুলুরি হবে না।

পঞ্চানন বিশ্বাস ঝুনো লোক। সামান্য বিষয়-আশয় আছে। মহকুমা শহরে দু'চারবার মামলা-মোকদ্দমা ক'রে এসেছে। ঠাট্টা ক'রে সে বলল—'বিয়া অমনি দিলেই হ'ল? তোদের যেমন কথা। বলে সেই রাধাও নাচবেক নাই আর আশী মণ তেলও পুড়বেক নাই। বিয়া দিবেক কে উয়ার

সাথে ? ঐ ত চেহারা—ত্রিভঙ্গ মুরারী।' নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠল বিশ্বাস।

কথাটা নিষ্ঠুর সত্য। বিয়ের চেষ্টা অনেকবার করেছে ভগীরথ, কিন্তু সব বারই ব্যর্থ। খোঁজ নিয়ে কনেপক্ষ পিছিয়ে গেছে। চালচুলো নেই পাত্রের। সম্বল তেলেভাজার দোকানটি। আর চেহারা হাঁটুভাঙ্গা দ'য়ের মত—অষ্টাবক্র মুনির সংস্করণ। এমন পাত্রে মেয়ে দেবে কে ? গরীবঘরেও স্বাস্থ্যসম্পদটা দেখে। ভগীরথ দাসের সেটুকুও নেই।

কিন্তু অদৃষ্টে বিয়ে থাকলে কে ঠেকায় ? ভগীরথের পাতাচাপা কপাল। একদিন হাওয়ার জোরে পাতাটা সরে গেল। ওর পাত্রী এল বাসে চেপে, ওর দোকানের সামনে।

ব্যাপারটা খুলে বলা ভাল। সকালে দোকানের ঝাঁপ খুলে উনুন ধরাবে ভগীরথ। হঠাৎ ওর দৃষ্টি পড়ল বাইরে রাখা বেঞ্চিটার দিকে। বেঞ্চিটায় কে যেন গুড়িসুড়ি দিয়ে শুয়ে। এই কাকডাকা সকালে কে এসে শুলো বেঞ্চিটায় ? শেষরাতের বাস থেকে হয়ত নেমেছে! ভগীরথ অবাক্ হয়ে তাকাল।

অচেনা মেয়েছেলে। যুবতী বয়স। চব্বিশ-পচিশের বেশী নয়।

ভগীরথের ডাকে উঠল মেয়েটি। ফোলা ফোলা চোখ, আলুথালু বেশ। উঠে বেশবাস ঠিক ক'রে নিয়ে দাঁড়াল।

—'হাসপাতালকে আইচ ? অসুখ হইচে ?'

—'অসুখ ? কেয়া, বিমারী ? নেহি 'নেহি'—মেয়েটি মিষ্টি ক'রে হাসল।

ওর দিকে নেকড়ের ক্ষুধার্তচোখে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল ভগীরথ। সুগঠিত স্বাস্থ্য। গায়ের রং উজ্জ্বল গৌর। ভগীরথ ভাবল, আহা! ভারী সোন্দর দেখতে। কি মিষ্টি মন-ভুলানো হাসিটা। আগের দিনের বাসি তেলেভাজা আর মুড়ি খেতে দিল ওকে। জল দিল নিজের গ্লাসে—

মুখ-হাত ধুয়ে সুস্থ দেখাল মেয়েটিকে। তাজা আর সজীব। ক্লান্তিটুকু ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার।

—'কুথাকে যাবে ?'

মাথা নাড়ল মেয়েটি। বলল—'নেহি জানতা।' নিজের কপালে করাঘাত করল।

খবর পেয়ে পচাই ঢোল এল সবাগে। তার পিছনে কানাই সাঁতরা। আর সবশেষে পঞ্চানন বিশ্বাস।

কানাই সাঁতরা জড়িয়ে ধরল ভগীরথকে। খানিকটা উত্তেজনায়, খানিকটা আনন্দে। উত্তেজিত হ'লে বাংলা আর হিন্দী মিশিয়ে কথা বলে কানাই। ফিসফিসিয়ে বলল —'ইসকো শাদী ক'রে লাও সাঙাত।'

কথাটার পচাই ঢোল তারিফ করল খুব। পঞ্চাননকে বলল—'লাগিয়ে দিই ইয়ার সঙ্গেই। কি বল বিশ্বেস ?'

মাঠের আকাশ রৌদ্রদগ্ধ, পাণ্ডুর বর্ণ। শালবনে নতুন পাতা গজিয়েছে সামান্য। এ্যাশফল্টের রাস্তার উপর পিছলে যাচ্ছে ফাল্গুনের সতেজ রোদ্দুর।

মেয়েটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করল পচাই ঢোল—'তুমার নাম কি গো ? বাড়ী কুথায় ?'

মেয়েটি সপ্রতিভ হেসেই জবাব দিল—'লছমী নাম আছে। বাড়ী বহুত দূর'—

—'ইথানে কুথাকে আইছিলে ?'

আর কোন জবাব নেই। লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে রইল যেন।

অনেক প্রশ্ন আর জিজ্ঞাসার জট ছাড়িয়ে আসল কথাটা বেরিয়ে এল। ছাপরা জেলায় বাড়ী লছমীর, দেহাতী মেয়ে। ঘর ছেড়েছিল ভালবাসার মোহে, রতনমনিয়ার সঙ্গে। কত জিনিষপাতি ফিরি করত রতনমনিয়া। কাঁকণ, চুড়ি, মাথার তেল আর পায়ের আলতা। পুরা তিন সাল ওর সাথে ঘুরেছে লছমী। বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর আর কত সব গাঁয়ে। সাত রোজ আগে ওকে ফেলে পালিয়েছে রতনমনিয়া। এখন চলেছে কপাল নিয়ে।

পচাই ঢোল সান্ত্বনা দিয়ে বলল ওকে—'সে কপাল লিয়ে তুমাকে অত চিন্তা করতে হবেক নাই। আমাদের ভগীরথকে শাদী করবে ? উয়ার তুমাকে বড় পছন্দ'—

মেয়েটি ফিক্ ক'রে হাসল।

কানাই সাঁতরা করে তালি বাজাল। ভগীরথকে বলল —'হো গিয়া সাঙাত। এখন বাজনা বাজাও।'

পঞ্চানন বিশ্বাস বলল—'কিন্তু কি মতে হবেক বিয়াটা ? তোর ঐ ঘরপালানো হিন্দুস্থানী মেয়েটার সঙ্গে কোন্ পুরুত মন্ত্র পড়বেক'—

অনেক বেলা পর্যন্ত জটলা করল ওরা। তিনজনে। খদ্দেরপাতি বেশী নেই আজ। রবিবারে হাসপাতালের আউটডোর বন্ধ। রুটের সব বাসগুলো চলে না।

পঞ্চানন বলল—'একটা উপায় আছে ভগীরথ। তোরা দু'জনেই ক্রীশ্চান হয়ে যা।'

—'ক্রীশ্চান ? তারপর দোকান ? দোকানটা চলবেক ?' যেন তাড়া-খাওয়া জন্তুর মত আর্তনাদ ক'রে উঠল ভগীরথ।

পচাই ঢোল বলল—'কেনে চলবেক নাই ? আর তোর সাতকুলে কে আছে ? উয়ার কিসের জাতবিচের ?'

লছমীর দিকে সকলে চাইল।

অন্য কিছু হ'লে হয়ত ভাবত ভগীরথ। চিন্তা করত।

কিন্তু লছমীর দিকে চেয়ে কিছুই পারল না। ওর ক্ষুধিত পিপাসিত যৌবন আসঙ্গলিপ্সায় উন্মুখ হয়ে উঠল।

হুঙ্কার দিয়ে সে বলল—'আর কোন উপায় নাই, বলছ তুমরা?'

তিনজনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

—'তবে তাই হোক্।' জজ সায়েবের ভঙ্গিতে রায় দিল ভগীরথ।

ধর্মান্তর হয়ে গেল। মাইকেল জন সাহায্য করলেন যথেষ্ট। বিয়ে হ'ল ওদের। আলফ্রেড ভগীরথ দাসের সঙ্গে এডিথ লছমী দাসীর। গাদা ফুলের মালা আর রূপোর আংটি পরে দু'জনে এসে ঘরে ঢুকল।

পচাই ঢোল ওদের উলু দিয়ে বরণ করল। চোখেমুখে সার্থকতার হাসি ভগীরথের। ভবিষ্যতের সোনা দিনের স্বপ্ন। রাতে ঘটা ক'রে ভোজ দিল ভগীরথ। নিমন্ত্রিতের দলে পচাই ঢোল, কানাই সাঁতরার দল। রান্না করল এডিথ লছমী। বিশেষ কিছু নয়। মাংস, রুটি আর শহর থেকে কিনে আনা দই-সন্দেশ। পেট ভ'রে খেল সবাই। রসিকতা করল ভগীরথ আর লছমীকে নিয়ে।

কানাই সাঁতরা বলল—'রাত্তির বেলায় ভোঁস্ ভোঁস্ ক'রে ঘুমোস্ নি, বুঝলি বেটা মোষ। লছমী বৌদির সঙ্গে গল্পটল্প করিস্।'

পঞ্চানন জবাব দিল—'নে, তোকে আর শেখাতে হবে না ওকে।'

পচাই ঢোল বলল—'ভগীরথ আমাদের বোকা নয় গো। বোকা সেজে থাকে'—

সকলে হি হি ক'রে হাসতে লাগল।

মাসখানেক পরেই একটা হোঁচট খেল ভগীরথ। আচমকা ধাক্কা। এতটুকু তৈরী ছিল না মনে। কালো কুচকুচে ওর পৌরাণিক মুখখানা হঠাৎ নির্মম হয়ে উঠল। ক'দিন কেমন দুর্বল ছিল লছমী। ভগীরথ ওকে নিয়ে গেছল মাইকেল জনের হাসপাতালে।

পরীক্ষা ক'রে জন সায়েব হাসলেন। কাছে ডাকলেন ভগীরথকে। বললেন—'তোর বউয়ের বাচ্চা হবে ভগীরথ। এটা তিন মাস চলছে—সাবধানে রাখিস্। হাসপাতালে নিয়ে আসবি মাঝে মাঝে।'

বাড়ী ফিরে স্তব্ধ হয়েছিল ভগীরথ। কথা বলে নি একটাও। মনের মধ্যে কি একটা জ্বালা। কি আক্রোশে ফুলে ফুলে উঠছিল।

কানাই সাঁতরা বলল—'কেয়া সাঙাত? বাচ্চা হবে, এ ত আনন্দের কথা। মন খারাপ কেনে তুমার?'

বিরক্ত ভগীরথ জবাব দিল—'নে, নে। অত ফ্যাচ ফ্যাচ করিস্ নে।'

পচাই ঢোল ভগীরথকে বোঝাল ভাল ক'রে। বলল—'মন খারাপ করিস্ নে। লছমী যখন তোর বউ হয়েছে, ও বাচ্চাও তোর বাচ্চা হবে।'

কি বুঝল ভগীরথই জানে। কিন্তু পরদিন থেকে সোজা হয়ে বসল। আবার হাসিখুশী, আবার গালগল্প। রাতে লছমীকে আদর করল খুব। বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করল। রসিকতা করল। দোকানের ঝাঁপ খুলে উৎসাহের সঙ্গে আলুর চপ আর ফুলুরি ভাজতে মন দিল।

একটি মেয়ে হ'ল লছমীর। ফর্সা, ফুটফুটে। মাইকেল জন নাম দিলেন মেরী। ভগীরথ বলল—'একটা দিশী নামও থাকুক উয়ার।' ঠিক হ'ল চম্পাবতী, চম্পা ব'লে ডাকবে ভগীরথ। মেরী চম্পা দাসী। সুন্দর ফুটফুটে মেয়েটা ভগীরথের ঘরে বড্ড বেমানান। ওর কুচকুচে কালো রঙের সঙ্গে ধবধবে শাদা রঙের মেয়েটা একটা অদ্ভুত বৈসাদৃশ্যের মত বড় চোখে পড়ে।

তরতরিয়ে দিন কাটল। মাস পেরুল। পুরো একটা বছর শেষ হ'ল। সারেঙ্গার ধুলো-বালি মেখে মেরী চম্পাবতী বড় হয়ে উঠল অনেকখানি। পুরোদমে দোকান চলছে ভগীরথের। আজকাল লছমী ভোরে ওঠে, উনুনে আঁচ দেয়। ভগীরথ শুধু বেচাকেনা করে। বাড়ীর পিছনে খানিকটা জায়গা পড়েছিল। এতকাল সেদিকে ফিরে চায় নি। এখন দু'চারটে ফুলগাছ লাগিয়েছে ভগীরথ। লাউ-গাছের লতাগুলি ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে। এরপর একটা মাচা ক'রে দেবে সে। শীতের মধ্যে লাউ ধরবে কত—পাঁচটা, দশটা—হয়ত অজস্র।

কিন্তু ফাল্গুন শেষ হবার আগেই প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেল ভগীরথ। নিদারুণ বিপর্যয়। সকালে এসে কানাই সাঁতরা দেখল আঁচ পড়েনি দোকানের উনুনে। চম্পাবতী ধুলোয় পড়ে কাঁদছে। আর ভগীরথ নির্বিকার হয়ে ব'সে—চোখ দুটো শুকনো, দিশাহারা।

এডিথ লছমী দাসী পালিয়েছে ঘর ছেড়ে। পঞ্চানন বিশ্বাস এসেছিল পিছু পিছু। ভগীরথকে বলল—'গাঁ শুদ্ধ সবাই জানে। আর তুই বুঝতে পারলিনে কিছু?'

ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে রইল ভগীরথ।

পঞ্চানন বলল—একটা হিন্দুস্থানী লোক নাকি আসত দোকানে। বাসে ক'রে এসে নেমেছিল দু'তিন দিন কি সব কথাবার্তা বলত। মদনা সাউ, হারাধন বোষ্টম সবাই দেখেছে।

কানাই সাঁতরা বলল—'কেয়া বোলতা বিশ্বাস? সেই ভালবাসার লোকটা নাকি? যার সঙ্গে পেরথম পালিয়েছিল।'

—'কি ক'রে জানব বল? হয়ত হবেক।' একটা রহস্যভরা দৃষ্টি ছুড়ে দিল পঞ্চানন।

দিন দুই-তিন পরেই একটু সুস্থ হয়ে উঠল ভগীরথ। লোকজনের ফিস্‌ফিসানি, কানাকানি কিছুই আমল দিল না। দোকানের ঝাঁপ খুলল। উনুনে আঁচ দিয়ে তেলেভাজা তৈরী করল। বেচাকেনা করতে লাগল আগের মত। সমস্যা হ'ল মেয়েটাকে নিয়ে। পচাই ঢোল নিয়ে যেতে চেয়েছিল ওর বাড়ীতে। কিন্তু ভগীরথ রাজী হয় নি। মেরী চম্পাবতীকে ওরা কি তেমন আদর-যত্ন করবে? কেউ ঠাট্টা ক'রে কেচ্ছা গাইবে ওর মাকে নিয়ে। ভগীরথ তা সহ্য করতে পারবে না, কিছুতেই না।

বিকেল নিবল। সন্ধ্যা নামল অগোচরে। আগের মত পচাই ঢোল, কানাই সাঁতরা আর পঞ্চানন বিশ্বাসের দল আড্ডা জমিয়ে বসল। সাঁতরা বলল—'কেয়া সাঙাত? আর বিয়াটিয়া করবে নাই?'

পঞ্চানন উত্তর দিল—'ভগীরথের অনেক শিক্ষে হয়েছে। আর ন্যাড়া কবার বেলতলাকে যাবেক?'

—'তা লয়।' পচাই ঢোল বলল—'ছোট মেয়াটার কথা ত ভাবতে হবেক।'

—'মেয়াটা কি উয়ার? একটা অনাথ আশ্রমে-টাশ্রমে দিলেই ল্যাটা চুকে যায়।' পঞ্চানন পথ বাতলাল।

কখন উঠে গেছে ভগীরথ। ওরা দেখে নি। কিন্তু মেরী চম্পাবতীর সম্বন্ধে এই কথাগুলি যে ভগীরথের ভাল লাগে নি তা ওরা বুঝল। চুপ ক'রে গেল সকলে। আকাশের তারাগুলির মত বোবা হয়ে গেল সভাটা।

চোত-বোশেখের নিঃস্ব দিনগুলি শেষ হয়ে জষ্ঠি এল। কাঠফাটা রোদ্দুর। ভগীরথের বাড়ীর পিছনের ফুলবাগানটা কবে শুকিয়ে গেছে। কতদিন জল দেওয়া হয় নি। এখন মাটি জ্বলে-পুড়ে বিবর্ণ হয়ে আছে। মাঝে মাঝে জায়গাটার দিকে তাকিয়ে নিজের কথা ভাবে ভগীরথ। সন্ধ্যায় মেয়েকে আদর করতে করতে এডিথ লছমী দাসীকে ওর মনে পড়ে যায়। বনটিয়ার মত ছটফটে মেয়েটা। ক'দিন কি আনন্দেই না কাটল। অকারণ খিলখিলিয়ে হাসত লছমী। মেরী চম্পাবতী যখন হাসে তখন কুঁজো হয়ে ওর মুখের হাসিতে লছমীর ছায়া খোঁজে ভগীরথ। নিজের কুৎসিৎ চেহারাটার কথা ভাবে। হয়ত ওকে আর সহ্য করতে পারে নি লছমী। না পারাই স্বাভাবিক। লছমীর সুগঠিত সৌন্দর্যের পাশে ভগীরথ একটা জন্তু ছাড়া আর কি?

মেরী চম্পাবতী তিন বছরে পা দিয়েছে। ফুটফুটে ফর্সা, টানা টানা চোখ আর টিকালো নাক। ঠিক মায়ের মত মেয়েটা অবিকল। সন্ধ্যাবেলায় ওর সঙ্গে খেলা করছিল ভগীরথ। গল্প বলছিল কতরকম। রাজপুত্তুর, বাঘভালুক আর রাক্ষসখোক্কসের গল্প। এক মনে শুনছিল মেরী। একাগ্র হয়ে।

হাসপাতালের চাপরাসী এসে ডাকল—'ভগীরথ আছিস, ভগীরথ।'

মেরীকে কোলে নিয়েই পথে নামল ভগীরথ। বলল—'কি ব্যাপার? এত রেতে?'

—'সায়েব ডাকছেন তোকে। এখনই চল্'—

মেরীকে কোলে নিয়েই চলল ভগীরথ। হাসপাতালের গেটটা ছাড়িয়ে বাঁ দিকে জন সায়েবের কোয়ার্টার।

বারান্দায় অপেক্ষা করছিলেন মাইকেল জন। বললেন—'আমার সঙ্গে চল্ ভগীরথ। কথা আছে।'

মেরীকে চাপরাসীর কোলে দিয়ে এগিয়ে গেল ভগীরথ, জন সায়েবের সঙ্গে। হাসপাতালের ওয়ার্ডের কাছে এসে বললেন—'তোর বৌকে দেখবি? এডিথকে?'

—'কুথায় সায়েব?'

—'হাসপাতালে পড়ে আছে। এখন ভাল। দশঘরা গাঁ থেকে চৌকিদার পৌঁছে দিয়ে গেছে। ওর মেয়েকে দেখতে চায়। তুই নিয়ে যাবি মেরীকে?'

কি ভাবল ভগীরথ। তারপর সায়েবকে বলল—'আমি একবারটি যাব উয়ার কাছে?'

ইনডোরে ঢুকল ভগীরথ। চিতাবাঘের মত হাল্কা পায়ে। টিমটিমে আলো জ্বলছে। ফিমেল ওয়ার্ডে আর কোন পেশেণ্ট নেই। ভগীরথ ভাবল শক্ত দুটো হাতে গলাটা টিপে ধরবে লছমীর। মনের জ্বালা খানিকটা মিটিয়ে নেবে।

কিন্তু কাছে এসে থমকে দাঁড়াতে হ'ল ওকে।

বিছানায় শুয়ে আছে লছমী। শীর্ণ, ক্ষয়ে-যাওয়া স্বাস্থ্য। মুখে নিষ্প্রাণ হাসি। যেন কতদিন ভাল ক'রে খায় নি। ওকে দেখে ব'লে উঠল—'মেরে চম্পাকো একবার দেখাবে। তেরে কসম, ইস দেশ সে চ'লে যাবে। আর কভি আসবে না।' ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেলল—

কোন উত্তর না দিয়ে ওর কাছে এসে দাঁড়াল ভগীরথ। বলল—'কুথাকে যাবি? কত দুর্বল এখন তুই। জন সায়েব ছেড়ে দিলে তোর ঘরকে যাবি নাই?' চুলে হাত বুলিয়ে দিল ভগীরথ। আদর করতে লাগল আগের মত।

বেরিয়ে এসে বলল—'সায়েব, উ সেরে গেলে উয়াকে ঘরকে লিয়ে যাব। চম্পাটা, মানে আপনার মেরী উয়ার মায়ের লেগে বড় কাঁদে।'

জনসায়েব বললেন—'তুই ঘরে নিবি ওকে ?'

—'লিব নাই কেনে সায়েব ? উ কুথাকে, কার কাছে যাবেক আর ?'

মাইকেল জন ম্লান হেসে বললেন—'তা নয়। তবে তোর বউয়ের আবার বাচ্চা হবে। মাস চার পরে।'

ওর দিকে তাকালেন জন সায়েব। কিন্তু ভগীরথ সব ধ্যান-ধারণার বাইরে। উজ্জ্বল দু'টি চোখ তুলে বলল—'সত্যি সায়েব ? তবে ইবার নিশ্চয় একটা ছেল্যা হবেক।'

কয়েকদিন পর। মেটে মেটে জ্যোৎস্না ফুটেছে। জমাটি আড্ডা বসেছে ভগীরথের ঘরে। কানাই সাঁতরা, পচাই ঢোল আর পঞ্চানন বিশ্বাস আসর জমিয়েছে—

—'কেয়া সাঙাত ? আবার বাচ্চা আসছে তুমার ঘরে। ইবার লেড়কা হবেক জরুর।' কানাই সাঁতরা বলল।

পঞ্চানন হাসছে মিটিমিটি। পচাই মুখ নামিয়ে ব'সে। কাউকে দুঃখ দেওয়ার ওর ইচ্ছে নেই।

ভগীরথ ঘোষণা করল—'ইবার আমার ছেল্যা হ'লে, তুমাদিগকে রুটি-মাংস খাওয়াব হে—মাইরি।'

সাইকেল চালিয়ে ফিরছিলেন জন সায়েব। হয়ত রোগী দেখে। ওদের জটলা লক্ষ্য ক'রে পা দুটো নামালেন মাটিতে। হেঁকে বললেন—'কি হে ? তুমাদের কি আড্ডা হচ্ছে' ভগীরথ ?'

পচাই ঢোল ভগীরথের ঘোষণাটি শুনিয়ে দিল সায়েবকে।

সারেঙ্গার মিশনারী গীর্জায় ঘণ্টা বাজছে। প্রার্থনা পড়ছেন কোন ধর্মপ্রাণ ক্রীশ্চান। সুর ভেসে আসছে এখান পর্যন্ত। জন সায়েবের মনে হ'ল ক্ষমাসুন্দর যীশুখ্রীষ্টের হাসিটি আজ ভগীরথের মুখে। কত সুন্দর দেখাচ্ছে কুৎসিৎ ভগীরথকে। যীশুখ্রীষ্টের অমলিন হাসিটি ভাসছে আলফ্রেড ভগীরথ দাসের পৌরাণিক মুখের স্থির চাহনিতে—

সাইকেলে আরোহী হ'লেন জনসায়েব। মনে মনে বললেন—'But the stranger that dwelleth with you shall be unto you as one born among you, and thou shalt love him as thyself, for ye were strangers in the land of Egypt. I am the Lord, your God.'

আঙ্গুল ক'টি বুকের দু'পাশে ঠেকিয়ে আবার বললেন—আমেন।

——

ত্রৈলোক্যনাথ : স্বজাতিপ্রীতি ও স্বদেশপ্রেম

শ্রীভূপেশ দাস

"ঈশ্বর বাঙালী জাতিকে যেরূপ প্রখর বুদ্ধি দ্বারা বিভূষিত করিয়াছেন, সেরূপ প্রখর বুদ্ধি অন্য কোন জাতিকে তিনি প্রদান করেন নাই। এই প্রখর বুদ্ধি যখন সত্য, সাধুতা ও কর্তব্যপরায়ণতা দ্বারা আরও প্রভাবিশিষ্ট হইবে, তখন বাঙালী জাতি পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইবে।"

উল্লিখিত উদ্ধৃতি যাঁর রচনা থেকে সংগৃহীত তাঁর বাঙালীপ্রীতি তথা স্বদেশপ্রেম সম্বন্ধে ঘটা ক'রে কিছু বলার আবশ্যকতা নেই। বাঙালী জাতিকে তিনি কিরূপ শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন তা তাঁর রচনায় সর্বত্র পরিস্ফুট।

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিটি ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের। ত্রৈলোক্যনাথ (১৮৪৭-১৯১৯) বর্তমানে বিস্মৃতপ্রায় সাহিত্যিকে পর্যবসিত। উনবিংশ শতকের শেষার্ধে বাংলা সাহিত্যে ব্যঙ্গ ও রঙ্গরস রচনার যে প্লাবন পরিলক্ষিত হয় তাতে বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ দু'একজন লেখকের রচনাদি ছাড়া সুরুচির চেয়ে অমার্জিত গ্রাম্যতা ও ব্যক্তিগত অসহিষ্ণুতাই প্রাধান্য পেয়েছে। কালবশে এই লোকদের অনেককেই বর্তমান যুগ ভুলে গেছে। কিন্তু এদের সঙ্গে ত্রৈলোক্যনাথের নামও বিস্মৃতির গর্ভে তলিয়ে গেছে—এটাই সবচেয়ে ক্ষোভের ও ক্ষতির কারণ। ত্রৈলোক্যনাথের ন্যায় কৃতী হাস্যরসিক বাংলা সাহিত্যে বিরল। যে কয়জন মুষ্টিমেয় সাহিত্যিক পরিচ্ছন্ন রুচি ও অসূয়াবর্জিত মনোবৃত্তি নিয়ে বাংলা সাহিত্যের আসরে হাস্যরস পরিবেশন করেছেন, ত্রৈলোক্যনাথের স্থান তাঁদের মধ্যে সর্বোচ্চে।

ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর সমসাময়িক যুগরুচির চেয়ে একটু বেশী মাত্রায় প্রাগ্রসর ছিলেন। তাই সমকালীন সাহিত্য-রসিক বা পাঠকেরা তাঁকে সম্যক্ বুঝতে পারেন নি। যে বিশেষ ধরণের হাস্যরসের আস্বাদনে তৎকালীন জনচিত্ত অভ্যস্ত, ত্রৈলোক্যনাথ তার অনুবর্তন করেন নি। তা ছাড়া বাঙালীরা চিরদিনই কমবেশী ভাবপ্রবণ। ভাবালুতা সত্যের রূঢ়তাকে সহ্য করতে পারে না। ত্রৈলোক্যনাথের রচনায় ব্যঙ্গের মাধ্যমে সত্যের কঠোর প্রকাশকে তাই সেদিনকার বাঙালী বরদাস্ত করতে পারে নি। অথচ বাঙালী জাতি তথা বাংলা দেশের প্রতি কি অপরিসীম দরদ নিয়েই না কল্যাণব্রতী ত্রৈলোক্যনাথ কলম ধরেছিলেন। তাঁর লেখার ছত্রে ছত্রে যে বাঙালীপ্রীতি ও স্বদেশপ্রেম ফুটে উঠেছে তার তাৎপর্য অনুধাবন করলে আজকের বাঙালী মাত্রেই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় ও কৃতজ্ঞতায় মস্তক অবনত করবেন।

ত্রৈলোক্যনাথের জীবন ও সাহিত্য-সাধনা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। প্রথম জীবনে তিনি অনেক ক্লেশ পেয়েছেন, সামাজিক বিরূপতা ও কুসংস্কারের সম্মুখীন হয়েছেন; দারিদ্র্য ও উপবাসের জ্বালাও তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। সমাজে প্রচলিত এই সমস্ত অত্যাচার অবিচার দূরীকরণের জন্যই তিনি কলম হাতে নিয়েছিলেন, শখের খাতিরে সাহিত্যকণ্ডূয়ন তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। দেশের জনসাধারণের দুঃখদুর্দশায় তাঁর মহৎ প্রাণ করুণার্দ্র হয়ে উঠত। জনগণের কিসে কল্যাণ হবে, কিসে তাদের দুঃখদৈন্য দূরীভূত হবে প্রতিনিয়ত এই ছিল তাঁর চিন্তা। সরকারী কর্মে লিপ্ত থেকেও তিনি তাঁর এই ধ্যানজ্ঞানকে বাস্তবে রূপায়িত করে গেছেন এবং অবসর গ্রহণ করার পরে সাহিত্য-সাধনার মাধ্যমে জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন।

তাঁর বাঙালীপ্রীতির কিছু নমুনা পূর্বেই প্রদত্ত হয়েছে। বাঙালীর অধঃপতিত অবস্থা তাঁকে ব্যথিত ক'রে তুলত। বাঙালীর উদ্যমহীনতা, মিথ্যাচার, কূপমণ্ডূকতা ও ধর্মীয় কুসংস্কারকে তাই তিনি ব্যঙ্গের কশাঘাতে জর্জরিত করেছেন, বাঙালীকে আত্মসচেতন হবার জন্য রূঢ় ধাক্কা দিয়েছেন। তবে তাঁর ব্যঙ্গে উপহাস আছে, জ্বালা নেই; সত্য ভাষণের পারুষ্য আছে, ব্যক্তিগত বিদ্বেষপ্রবণতা নেই। আর থাকবেই বা কি করে? 'শাসন করা তারেই সাজে সোহাগ করে যে গো।'

ত্রৈলোক্যনাথের জীবন সত্যের দ্বারা বিধৃত। 'সত্য' এই শব্দটির প্রতি তিনি বিশেষ জোর দিতেন। তিনি

বলেন, "একমাত্র সত্য, সত্য, সত্য ভিন্ন আর আমাদের অন্য গতি নাই। পুনরায় বলি—সত্যপথ হইতে কখনও বিচলিত হইবে না।" বাঙালী-চরিত্র সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যে ভূয়োদর্শন ও অভিজ্ঞতার ছাপ সুস্পষ্ট—

"বাঙালী জাতির নানা রূপ কলঙ্ক আছে। বাঙালী জাতি ভীরু, বাঙালী সত্য কথা বলে না, প্রতিজ্ঞা পালন করে না, কার্যের ভার গ্রহণ করিয়া সে কার্য সম্পন্ন করে না। সেই জন্য বাঙালী পরস্পরকে বিশ্বাস করে না, আর সেই নিমিত্ত পাঁচজনে মিলিত হইয়া কোন কাজ করিতে পারে না। অন্য জাতির জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়াও বাঙালীর জ্ঞান হয় না।…'অসত্য কথা, অসত্য আচরণ বাঙালী একেবারেই জানে না';—যখন আমাদের এই যশ জগতে ঘোষিত হইবে, তখন বাঙালীর ঘর ধনধান্যে পূর্ণ হইবে, বাঙালীর বিদ্যা, বুদ্ধি ও ধর্মপ্রভাবে জগতে নূতন প্রাণের সঞ্চার হইবে, সকল জাতি তখন বাঙালীকে পূজা করিবে, বাঙালীর গৌরবে তখন সমস্ত পৃথিবী আলোকিত হইবে।"

ব্যবসায়ের ব্যাপারে বাঙালী কিরূপ পরাঙ্মুখ এবং ব্যবসায়ের নামে কি কাণ্ডজ্ঞানহীনতার পরিচয় দেয় তা ত্রৈলোক্যনাথ আমাদের শুনিয়েছেন ডমরুধরের মুখ থেকে—

"আমি বলিলাম, মা! সুন্দরবনে আমার আবাদে মৃগনাভি হরিণের চাষ করিবার নিমিত্ত স্বদেশী কোম্পানী খুলিব মনে করিতেছি। ভেড়ার পালের ন্যায় বাংলার লোক যেন টাকা প্রদান করে, আমি এই বর প্রার্থনা করি।

দেবী বলিলেন, কৈলাস পর্বতের নিকট তুষারাবৃত হিমাচলে কস্তুরী হরিণ বাস করে। সুন্দরবনে সে হরিণ জীবিত থাকিবে কেন?

আমি বলিলাম, যে কাজ সম্ভব, যে কাজে লাভ হইতে পারে, সে কাজে বাঙালী বড় হস্তক্ষেপ করে না। উদ্ভট বিষয়েই বাঙালী টাকা প্রদান করে।"

ব্যবসায়ের নামে প্রতারণা তথা স্বার্থসিদ্ধি বাঙালীর অন্যতম জাতীয় কলঙ্ক। ত্রৈলোক্যনাথের ব্যঙ্গের শর এদিকেও নিক্ষিপ্ত হয়েছে। শিক্ষিত বাঙালী যুবকের মস্তিষ্কের অপব্যবহার সম্পর্কে নিম্নের দৃষ্টান্তটি কৌতুকাবহ—

"আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি তিনটা পাশ দিয়াছ। পাঁচ দ্রব্য মিশাইয়া নূতন বস্তু প্রস্তুত করিতে পার। ঔষধ বেচিয়া কি হইবে? কোন একটা লাভের বস্তু প্রস্তুত করিতে পার না?

কিছুক্ষণ নীরবে সে চিন্তা করিয়া আমাকে বলিল, কল্য আসিয়া আপনার এ কথার উত্তর দিব।

পরদিন সে একরাশি এঁটেল মাটি ও চার-পাঁচখানি ধবধবে চিক্কণ কাগজ আনিয়া আমাকে দেখাইল। সে বলিল, এঁটেল মাটি হইতে আমি এই কাগজ প্রস্তুত করিয়াছি। এক টাকার এঁটেল মাটি হইতে দশ টাকার কাগজ হইবে। নয় টাকা লাভ থাকিবে। প্রথম প্রথম যাহা অল্প খরচ হইবে, তাহা যদি আপনি প্রদান করেন, তাহা হইলে আমরা এক স্বদেশী কোম্পানী খুলিব। লাভ অর্ধেক আপনার, অর্ধেক আমার।"

বাংলা দেশের স্বদেশী যুগটি বর্তমানে আমাদের মনে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সে যুগেও হুজুগে ও স্বার্থপর লোকের অভাব ছিল না, যারা স্বদেশীর নামে সমাজবিরোধী কাজে লিপ্ত থেকে স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করত। ত্রৈলোক্যনাথ এইসব ভণ্ডদের মুখোস উন্মোচিত ক'রে তাদের সাধনোচিত ধামে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছেন। এইবারে দেখা যাক সেই সাধনোচিত ধামের স্বরূপটি কি—

"ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের নিকট গিয়া যম আবেদন করিলেন যে,—'বঙ্গদেশের বিটলে কপট স্বদেশ-ভক্তগণ শীঘ্রই প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইবে। তাহাদের প্রেতকে আমার আলয়ে আমি স্থান দিতে পারিব না। তাহাদের কুহকে পড়িলে আমি উৎসন্ন যাইব। ছেলেখেকো বক্তারাও শীঘ্র প্রেত হবে। তাহাদিগকেও আমি স্থান দিব না। আমার ছেলেগুলি তাহা হইলে গোল্লায় যাইবে। স্বদেশী প্রবঞ্চকদিগের প্রেতকেও আমি স্থান দিতে পারিব না। আমার আলয়ে আসিয়া তাহারা হয়ত কোম্পানী খুলিয়া বসিবে। তখন যমনীকে হাতের খাড়ু বেচিয়া শেয়ার কিনিতে হইবে। তাহার পর মহাপ্রভুরা এক কড়া কাণা কড়িও উপুড়হস্ত করিবেন না। ইহাদের জন্য কোন ব্রহ্মাণ্ডে স্থান হইবে না। আপনারা ইহার ব্যবস্থা করুন।' ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ইন্দ্রের ঘোড়া উচ্চৈঃশ্রবাকে এক ডিম্ব প্রসব করিতে বলিলেন। বিশ্ব-সংসারের ওপারে এই অণ্ড আছে। ইহাতে বিটলে স্বদেশভক্ত ছেলেখেকো বক্তা ও স্বদেশী প্রবঞ্চকগণের প্রেত বাস করে।"

বিদেশ গমনের ব্যাপারে ধর্মীয় আপত্তি সম্পর্কেও ত্রৈলোক্যনাথ কটাক্ষপাত করেছেন। লুল্লু নামক ভূতের মুখে কুসংস্কারগ্রস্ত রক্ষণশীলতার প্রতিধ্বনিই আমরা শুনি—

"তবে কি না, আমরা ভারতীয় ভূত, ভারতের বাহিরে আমরা যাইতে পারি না। সমুদ্রের অপর পারে পদক্ষেপ করিলে আমরা জাতিকুলভ্রষ্ট হইব। আমাদের ধর্ম কিঞ্চিৎ কাঁচা। যেরূপ অপক্ব মৃত্তিকাভাণ্ড জলস্পর্শে গলিয়া যায়, সেইরূপ সমুদ্র-পারের বায়ু লাগিলেই আমাদের ধর্ম ফুস্ করিয়া গলিয়া যায়, তাহার আর চিহ্নমাত্র থাকে না, ধর্মের গন্ধটি পর্যন্তও আমাদের গায়ে লাগিয়া থাকে না।"

বীরবালা নামক রূপক গল্পটি ত্রৈলোক্যনাথের জ্বলন্ত দেশপ্রেমের অনন্যসাধারণ উদাহরণ। পরাধীন ভারতবর্ষের দুরবস্থা ও তাহার সমাধানের ইঙ্গিত রয়েছে এই গল্পটিতে। তবে শুধুমাত্র গল্প লিখেই ত্রৈলোক্যনাথ দেশপ্রেমের পরিচয় দিতে চান নি। ফাঁকা রাজনৈতিক বুলি আউড়ে স্বদেশী করার মনোবৃত্তিতে তিনি মোটেই বিশ্বাসী ছিলেন না। বরং এই ভণ্ডামিকে নিন্দাই ক'রে গেছেন কঠোরভাবে। তাঁর স্বদেশপ্রেম ছিল দেশের লোকের দুর্দশামোচনে, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের হাত থেকে মুক্তি দেবার ফলদায়ক প্রচেষ্টায়। দেশপ্রেমের এই জ্বলন্ত অনুরাগ নিয়েই তিনি দেশের কুটীর-শিল্পকে সমৃদ্ধ করতে চেয়েছেন, হস্তশিল্পজাত দ্রব্যসমূহ বড় বড় হোটেল ও স্টেশনের প্রকাশ্য স্থানে বিক্রির ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন, দুর্ভিক্ষের সময় লোকে গাজর খেয়ে জীবন-ধারণ করতে পারবে বুঝে সরকারকে গাজর চাষে উৎসাহিত করেছেন। স্বদেশী বক্তাদের মত শুধু কথার ভেল্‌কি না দেখিয়ে নিজের হাতে কাজ ক'রে দেশপ্রেমের নিদর্শন রেখে গেছেন। পূর্বেই বলেছি, তিনি নিজের জীবনটাই দেশব্রতে উৎসর্গ করেছিলেন। দেশ ও দশের কল্যাণেই তাঁর সরকারী চাকুরি গ্রহণ, বিলাত যাত্রা, বিশ্বকোষ সম্পাদনা, স্কুলপাঠ্য পুস্তক রচনা এবং সর্বশেষে সাহিত্য-সাধনা।

ব্যর্থ চেষ্টা ও সিদ্ধি লাভ

যে সোপানশ্রেণী বাহিয়া উঠিয়া সিদ্ধির মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়, অনেক সময় এক একটি ব্যর্থ চেষ্টা তাহার এক একটি ধাপ।

স্বাধীনতার সংগ্রাম একবার আরম্ভ হইলে, পুনঃ পুনঃ পরাজয় সত্ত্বেও, তাহা সর্ব্বকালেই পরিশেষে জয়শ্রীমণ্ডিত হইয়া থাকে।

চেষ্টা করিবার অধিকার ও সামর্থ্য সকল মানুষেরই আছে। কবে কি হইবে আগে হইতে বলিবার এবং সুফল দাবী করিবার সামর্থ্য ও অধিকার কাহারও নাই। কিন্তু সমুদয় আন্তরিক সুচেষ্টার যথাযোগ্য ফল ফলিয়াই থাকে। যিনি চেষ্টা করেন, সেই ফল ভোগ করা তাঁহার ভাগ্যে না ঘটিতে পারে, কিন্তু কালক্রমে অপরে সুফল-ভাগী হইবে, ইহাও সন্তোষ ও আনন্দের বিষয়।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী, চৈত্র, ১৩৩৬।

চাকর

শ্রীহেনা হালদার

শেষ পর্যন্ত চাকরটাকে বিদায় করতেই হ'ল রাঙাবৌদিকে। অথচ ছাড়িয়ে দেবার কিংবা তাড়িয়ে দেবার মতন লোক ও ছিল না। গত পাঁচ বছর ধ'রে নিশ্চিন্ত আরামের নিরঙ্কুশ দিনযাপনের পর গৃহকাজের বিপুল বোঝার ওপর শাকের আঁটির মত লেগে রইল মনে বিবেকের অদৃশ্য খোঁচাটা। অথচ এর জন্যে রাঙাবৌদিকেই কি খুব একটা দোষ দেওয়া যায়?

তা হ'লে গোড়া থেকেই বলি ব্যাপারটা। মানুষের রূপ-গুণ বস্তুটাও যে সময় সময় কত দুঃসহ দূষণীয় হয়ে উঠতে পারে সেটা নিদারুণ ভাবে প্রমাণিত হ'ল ঐ চাকরের বেলায়। সত্যি, অত গুণ না থাকলে বোধ হয় চাকরিটাও বজায় থাকত ছেলেটার।

এক রবিবারের দুপুরবেলায় রাঙাবৌদি আবার বসেছিলেন তাঁর 'অনন্ত বয়নে'। রাঙাদার জন্যে গত আড়াই বছর ধরে এটা বুনতে প্রয়াস পাচ্ছেন রাঙাবৌদি। কিন্তু গ্রীক উপাখ্যানের পেনিলোপের মতন যতটুকু বোনা হচ্ছে তার অর্ধেকটাই খুলে ফেলতে হচ্ছে। হয় প্যাটার্ণটা ঠিক উঠছে না, নয় ঘর ফেলতে ভুল হয়ে যাচ্ছে, এমনই একটা না একটা কিছু ঘটছে। রাঙাদা সোয়েটারটার নামকরণ করেছেন 'অসমাপিকা'। ওদিকে গত আড়াই বছরে রাঙাদার দেহের স্ট্যাটিস্‌টিক্‌সের যে কি ভয়ঙ্কর ওলট-পালট হয়ে গেছে সেদিকে খেয়াল নেই রাঙাবৌদির। সোয়েটারটা (রাঙাবৌদি ঐ নিরাকার বস্তুটাকে অবশ্য কার্ডিগান বলে থাকেন সগৌরবে) যদি-বা কোনকালে শেষ হয়, রাঙাদার শরীরটাকে যে ওর মধ্যে গলানো যাবে না কোনক্রমেই, এ সত্য অস্বীকার করেই ফ্রম হিয়ার টু ইটার্নিটি ঐ ক্যাম্পেন চালিয়ে যাবেন রাঙাবৌদি।

সেদিনও যথারীতি ওঁর অনেস্ট এ্যাটেম্পট চলছিল। কয়েকটা ঘর পড়ে যাওয়ায় একমনে মাথা নীচু করে তুলতে ব্যস্ত ছিলেন রাঙাবৌদি। এমন সময় ওঁর মেয়ে সোনালী এসে বললে, 'মা, গুপ্ত-কাকু না একটা চাকর পাঠিয়েছেন, এখানে পাঠিয়ে দেব?' গত দু'মাস ধরে চাকরের অভাবে যারপরনাই কষ্ট পাচ্ছেন রাঙাবৌদি। বোনার ওপর নজর রেখেই বললেন, 'দে'।

খানিকক্ষণ পরে পদশব্দে বুঝতে পারলেন চাকরটা কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। বোনার ক্রাইসিসটা তখনও কাটে নি; মুখ না তুলেই বললেন, 'নাম কি তোমার?'

'আজ্ঞে, সঞ্জয়কুমার।'

'কি কুমার?' প্রায় খেঁকিয়ে উঠলেন রাঙাবৌদি।

ভারতবর্ষের সিনেমা-মানসিকতার জল যে এত নীচুতলা পর্যন্ত গড়িয়েছে বোধ হয় ভাবতে পারেন নি তিনি।

ভ্রূকুটি-কুটিল মুখটা তুলে ছেলেটার অসীম স্পর্ধা জরীপ করতে চাইলেন রাঙাবৌদি। আর চোখ দুটোকে তক্ষুণি ফিরিয়ে আনতে পারলেন না তিনি। বছর কুড়ি বয়স হবে। গৌরবর্ণ সুন্দর মুখ, সপ্রতিভ উজ্জ্বল চোখ, ঘন সুবিন্যস্ত চুল, ধোপ-দুরস্ত চেহারা। একেবারে নায়ক না হোক, পার্শ্বচরিত্রের ভূমিকাটা ঠেকিয়ে রাখা কঠিন। ওঁর নিজের ছেলেমেয়েরা কেউ বিশেষ সুন্দর নয়, তাই প্রসন্ন হতে পারলেন না রাঙাবৌদি।

—'ওসব কুমার-টুমার চলবে না, বুঝেছ? ও নাম ছাড়তে হবে। যাও নীচে গিয়ে কাজ কর। ভোলার-মা তোমাকে সব দেখিয়ে-শুনিয়ে দেবে।' গম্ভীর ভাবে বিরক্ত গলায় আদেশ দান করে বোনার অথৈ জলে ডুবে গেলেন রাঙাবৌদি।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল চাকরি ছাড়তে রাজী, কিন্তু নাম ছাড়তে রাজী নয় সঞ্জয়কুমার। রাঙাবৌদির দুই ছেলের নাম তন্ময় আর কিশলয়। অবশ্য কুমার বাদ দিয়েই! তবু ওদের সঙ্গে মিলিয়ে চাকরের নাম থাকাটায় ভীষণ আপত্তি তুললেন রাঙাবৌদি। রাঙাদা বহু মিনতি করে শেষ পর্যন্ত রাজী করালেন ওঁকে! অথচ ছেলেটা এমন চালাক-চতুর আর চটপটে, এমন অসাধারণ করিৎকর্মা, এত ভদ্র বিনীত আর নিরলস যে, ভৃত্য হিসেবে প্রায় আদর্শ-

স্থানীয়। ব্যারাকপুরের ননদ, আর একডালিয়া রোডের জা'য়েরা ত প্রায় হাত বাড়িয়েই আছেন, যো পেলেই ছোঁ মেরে নিয়ে যান। কাজেই নাকের ওপর বিশ্রী ফোঁড়ার মতন অস্বস্তিকর লাগলেও নামটা ওঁকে সয়ে যেতেই হয়। ছেলেটা শুধু করিৎকর্ম্মা-ই নয় বিশ্বকর্মা-ও। এমন জিনিষ নেই যে জানে না, এমন কোন কাজ নেই যে পারে না। সমস্ত বাংলা রান্না ত পারেই, মাদ্রাজী দোসা, পার্শি ভিণ্ডালু, মারাঠি কড়্‌হিও চমৎকার রাঁধতে পারে। সাহেবী কেতায় টেবিল সাজাতে অথবা ম্যাণ্টেলপীসের ওপর ফ্লাওয়ার ভাসে জাপানী কায়দায় ফুল লাগাতেও ওস্তাদ। ওর অশিক্ষিত পটুত্ব দেখে দেখে তাক লেগে যাচ্ছে সকলের। তা ছাড়া রাঙাদার সকালবেলার বাড়্‌তি পেয়ালা গরম চায়ের মৌজ, রাঙাবৌদির দুপুরের ঠাণ্ডা কফির দুর্বলতা, সব কেমন করে যেন টের পেয়ে গেছে। সোনালীর, মোড়ের মাথার দোকানের হিংএর কচুরির গোপন বাসনা, আর তন্ময়ের সকলের চোখকে ফাঁকি দিয়ে সিগ্রেট খাওয়ার ব্যসন অব্যাহত থাকছে সঞ্জয়কুমারের কল্যাণে। সুতরাং বলতে গেলে বাড়ীসুদ্ধ সকলেই ওর হাতের মুঠোয় চলে গিয়েছে নিজেদের অজান্তেই। আর শুধুই কি চাকরের কাজ? ভদ্রলোকের অকাজেও ওর উৎসাহের অভাব নেই। এই ত সেদিন কিশলয় ক্রিকেট খেলছিল পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে, সঞ্জয়কুমার চমৎকার ব্যাটিং করে দেখিয়ে দিল। তন্ময়ের ক্যামেরায় 'ট্রিক্‌সি' কুকুরটার অদ্ভুত একখানা পোজের ছবি তুলে দিয়েছে অবলীলায়। তা ছাড়া রান্না করতে করতে রবীন্দ্রনাথের দেবতার গ্রাস থেকে আবৃত্তি করতে, আর কাপড় কাচতে কাচতে আধুনিক গানের সুর ভাঁজতে ওকে সকলেই শুনেছে। মাঝে মাঝে নাকি মাউথ অর্গানে হিন্দি ফিল্মের সুরও সেধে থাকে।

অথচ কোথায় এ-সব শিখল জিজ্ঞেস করলে সদুত্তর পাওয়া যায় না। বলে, 'শেখবার ইচ্ছে থাকলে শিখতে পারা আর এমন কি কঠিন বাবু?'

অকাট্য যুক্তি। সুতরাং চুপ করে যেতে হয়। তন্ময় মাকে চুপি চুপি বলে, 'গতিক সুবিধের নয় মা, ফাঁক পেয়ে ও একদিন ঠিক তোমার সোয়েটারটা শেষ করে রাখবে। খুব সাবধান।' রাঙাদা হো-হো করে হেসে ওঠেন। রাঙা-বৌদি চটে উঠে বলেন, 'তার চেয়ে সাবধানে থাকিস্ তোর কলেজের পড়াটা না পাশ করে ফেলে।'

তন্ময় মাথা নেড়ে বলে, 'আশ্চর্য নয় কিছু। তোমার বিশ্বকর্মা সব পারে।'

একদিন ওর ঘরে বেশ কতকগুলো উপন্যাস ও কবিতার বই দেখা গেল। বটতলার নয়, দস্তুরমত নামকরা সাহিত্যিক-দের। আর একদফা হৈ চৈ পড়ে গেল। তন্ময় ওকে ডেকে বললে, 'কি হে সঞ্জয়কুমার, তুমি যে পি. সি. সরকারের ম্যাজিক দেখিয়ে ছাড়লে! তোমার টুপির থেকে আরও কত পায়রা বের করবে? তুমি ত যে-সে চাকর নও বাপু।'

সলজ্জ মুখের বিষণ্ণ দৃষ্টি তুলে সঞ্জয় উত্তর দিলে, 'চাকরের ঘরে জন্মেছি বলে চাকর হয়েই ত জন্মাই নি দাদাবাবু! নিজের চেষ্টায় মানুষ হতে চাওয়াটা কি অন্যায়?'

ওর কথা শুনে ত তন্ময় একেবারে হতভম্ব। এক লাফে ছাদে পৌঁছে গিয়ে রাঙাবৌদিকে বললে, 'মা, তোমার চাকর যে আজকাল দীপক চৌধুরী-মার্কা কথা বলতে সুরু করল। নিশ্চয় লুকিয়ে লুকিয়ে গল্প-টল্প লিখছে। বাবাঃ, কি চাকরই জোটালে!'

রাঙাদা চিন্তিত ভাবে বলেন, 'ভাল করে খোঁজ-টোজ না নিয়েই রাখা হ'ল, দ্যাখো আবার কমিউনিষ্ট না বেরয়।'

'তা আর বিচিত্র কি?' পশমের গোলা পাকাতে পাকাতে রাঙাবৌদি বলেন, 'নিজের ইষ্ট-অনিষ্ট জ্ঞান কম বলেই না ওদের কমিউনিষ্ট বলেছে।'

কয়েকদিন পরের ঘটনা। সোনালী মেয়ে স্কুলের উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে পড়ে। ওদের স্কুলের প্রাইজ উপলক্ষ্যে চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য করা হচ্ছে। চিত্রাঙ্গদার পার্ট করছে স্কুলের সেরা সুন্দরী ও নৃত্যকুশলা রত্না চৌধুরী, অর্জ্জুন সোনালী দাশগুপ্তা।

সেদিন রিহার্সালের সময় নৃত্য-শিক্ষিকা সুরভিদির অনুপস্থিতিতে রত্নাই সকলকে শেখাচ্ছিল। ক্লাশের সবচেয়ে ফাজিল ঝর্ণা ঘোষ হঠাৎ বলে বসল, 'তোর নাচের তাল-গুলো তোদের সব্যসাচী সঞ্জয়কুমারের কাছে শিখে নিস্ না কেন? মাউথ অর্গান বাজায়, রবীন্দ্র সঙ্গীত গায়, নাচটাও কি আর না-পারে?'

খুব একটা হাসাহাসি পড়ে গেল মেয়েদের মধ্যে।

অপমানে চোখ-মুখ লাল করে সোনালী প্রতিবাদ করে উঠল : 'কক্ষনো না! আমার বয়ে গেছে চাকরের কাছে নাচ শিখতে।'

'কিন্তু ও কি সত্যি সত্যি চাকর রে?' নিরীহ মুখে বললে ঝর্ণা। 'আমরা ত শুনেছি তোদের কি রকম ডিসট্যাণ্ট রেলেটিভ হয়। গরীব বলে তোরা ওকে চাকরের মতন খাটাস্।'

এত বড় মিথ্যে অভিযোগে রাগে দুঃখে দিশাহারা হয়ে কেঁদে ফেলে সোনালী। 'দাঁড়াও না আমি মিস খাসনবীশকে গিয়ে বলে দিচ্ছি তোমরা আমাকে অপমান করেছ,' ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললে। বেগতিক দেখে ওরা ঘাট মানে। কিন্তু রূপের গরবে গরবিণী রত্না চৌধুরী ঠোঁট টিপে হেসে টিপ্পনি কাটে, 'আত্মীয় হয়ত নয়, কিন্তু ভদ্রলোক যে তাতে কোনই সন্দেহ নেই। কে জানে বাবা বর্ণচোরা মাণিকটি তোমার প্রেমে পড়েই চাকর সেজে বাড়ীতে ঢুকেছেন কি না...'

এরপর যারা শালীনতাবোধে চুপ করে ছিল তারাও হাসির তোড়ে ভেঙে পড়ে।

মেঘলা-মুখে বাড়ী ঢোকে সোনালী। গট্‌গট্ করে সোজা রাঙাবৌদির কাছে হাজির হয়ে বলে, 'মা, ভাল চাও ত তোমার সঞ্জয়কুমারকে বিদেয় কর। ইস্কুলে সকলে বলাবলি করছে যে ও নাকি আমাদের দূর-সম্পর্কের আত্মীয়। গরীব বলে নাকি আমরা ওকে চাকরের মতন খাটাই। এমন বিশ্রী লাগে আমার। চাকর চাকরের মতন থাকতে পারে না—অতসব বাহাদুরি দেখাতে যাবার দরকার কি ওর? ডিস্‌গাষ্টিং!' অবশ্য রত্নার মন্তব্যটুকু আর মাকে বলা যায় না।

রাঙাবৌদি ততদিনে একেবারে সঞ্জয়কুমারের গুণমুগ্ধ। যদিও যথাসাধ্য গোপন রাখতে চেষ্টা করেন সেটা। বললেন, 'তা বাপু তোদের বন্ধুদেরও বলিহারি। চাকরকে নিয়ে অত মাথা ঘামাতে যাওয়াই বা কেন? আর ওকেও বলি, অতসব ঘোড়া রোগের কি দরকার বাপু তোর? চাকর আছিস্, খাবিদাবি কাজ করবি, তা নয়, দুনিয়ার ঝামেলায় মন।'

যেমন হয়। মুখে যতই সাম্যবাদের জয় ঘোষণা করা হোক চাকরের মনুষ্যত্বকে স্বীকৃতি দিতে কেউ রাজী নয়। সুযোগ্যের জন্যেই সুযোগ এমন দর্শনের খাতিরেও নয়। তবু চলছিল এক রকম করে। কিন্তু দুর্ঘটনাটা শেষ পর্যন্ত ঘটলই। সঞ্জয়কুমার ওর রূপগুণের সঞ্চয় নিয়েও টি঳কে থাকতে পারল না।

রাঙাবৌদির বোনপোর বিয়ে ভাগলপুরে। দিদি বেশ অবস্থাপন্ন। জামাইবাবু ভাগলপুরী সিল্ক বলে হরেক রকম কৃত্রিম রেশম বিক্রী করে বেশ পয়সা করেছেন। দিদির ঐ একটি মাত্র সন্তান। সুতরাং বিয়েতে ঘটা-পটা জাঁক-জৌলুষের অভাব হবে না। পাত্রী ভাগলপুরেরই কোনও উকিলের মেয়ে। স্বর্ণের ও বর্ণের জোরেই বধূরূপে মনোনীত। ভাগলপুরে যেতে সঞ্জয়কেও সঙ্গে নিতে হয়েছে। যেহেতু বিয়েবাড়ীর হাজার ঝঞ্চাট ঝামেলার মধ্যেও রাঙাদা আর বৌদির খিদমদ্‌গারি করতে ওর জুড়ি মেলা ভার। বিয়েবাড়ীতে পৌঁছেই সকলের মন কেড়ে নিয়েছে সঞ্জয়কুমার। নানান খাতে-বওয়া ওর বহুবর্ণ প্রতিভার রং-বাহার দেখিয়ে।

বিয়ের দিন সন্ধ্যায় বর-যাত্রার প্রাক্কালে কি একটা দরকারে রাঙাবৌদি তন্ময়কে খুঁজছিলেন। সামনে একটি অপরিচিত ছেলেকে দেখে বললেন, 'আমার ছেলেকে একটু ডেকে দাও না বাবা, ঐদিকে কোথাও আছে।'

ছেলেটিকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটতে দেখে হেসে ফেললেন রাঙাবৌদি : 'আরে বড় যে ডাকতে ছুটছ,—আমার ছেলেকে চেন তুমি?'

'বাঃ, নিশ্চয়! আপনার ছেলেকে কে না চেনে—ওই ত ওদিকে দেখলাম একটু আগে। দাঁড়ান, ডাকছি......।' শশব্যস্তে চলে যায়। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে আসে। একেবারে হাত ধরে টেনেই এনেছে। সগর্বে রাঙাবৌদিকে বলে, 'দেখুন, ঠিক চিনেছি কি না। এ রকম চেহারা যেন পথেঘাটে গড়াচ্ছে!'

বিস্ময়ে বাক্‌রোধ হয়েছে বোধ হয় রাঙাবৌদির। বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছেন। জীবনে যেন প্রথম দেখছেন সঞ্জয়কুমারকে। দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, ফর্সা মুখ, উজ্জ্বল চোখ। গত ক'বছরে মাথায় অনেকখানি বেড়ে গেছে, গায়েও সেরেছে। লুঙ্গি আর গেঞ্জি, কিংবা ধুতি আর

কামিজের স্তর থেকে হাওয়াই শার্ট আর ব্রাউন প্যান্টে কবে ওর উত্তরণ হ'ল, মনে করতে পারলেন না রাঙাবৌদি। চুলের সযত্ন বিন্যাসে জনপ্রিয় চিত্রাভিনেত্রীর অনুকৃতি। বাঁ-হাতের মণিবন্ধে ঘড়ি। তন্ময়ের ইঞ্জিনিয়ারিং পাশের উপলক্ষ্যে রাঙাবৌদিই দিয়েছিলেন ওটা বক্শিস হিসেবেই। অঙ্গে আর আঙ্গিকে কোনও খুঁৎ নেই।

রাঙাবৌদিকে হাঁ করে চেয়ে থাকতে দেখে ছেলেটি সকৌতুকে বললে, 'খুব অবাক্ হয়ে গেছেন আপনি, না? পরিচয় নেই অথচ কেমন সনাক্ত করে আনলাম।'

রাঙাবৌদি শুধু বিড় বিড় করে বলতে পারলেন, 'আমাদের চাকর……।'

ছেলেটি ওঁর মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বলে উঠল— 'হ্যাঁ, আপনার চাকরকেও চিনি। ঐ দেখুন না নবাবপুত্তুর ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগ্রেট ফুঁকছেন। একেবারে এক নম্বরের ফাঁকিবাজ। আবার ড্রেসের বাহার কি। এই ব্যাটা, এদিকে শোন্……'

ছেলেটির দৃষ্টি অনুসরণ করে বজ্রাহত হ'ন রাঙাবৌদি। মাথার মধ্যে কেমন করতে থাকে, চোখে অন্ধকার দেখেন। বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়ে ধূমপান করছে তন্ময়। শ্যামবর্ণ রোগাটে চেহারা বিশেষত্বহীন খর্বাকৃতি। বেশবাসেও সৌখীন পারিপাট্যের অভাব। ঝাপ্‌সা গলায় কি একটা যেন বলবার চেষ্টা করেন রাঙাবৌদি, তারপর ওখানেই ধপ্ করে বসে পড়েন।

এরপর অবশ্য রাঙাদাও আর সঞ্জয়কে চাকরিতে বহাল রাখতে সাহস করেন নি।

জনৈক যুবকের প্রতি

গত ১লা জানুয়ারী প্রাতঃকালে জনৈক যুবক আমার বাসায় আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন। যতদূর মনে পড়িতেছে তাঁহার পারিবারিক পদবী "ঘটক"; নাম বোধ হয় দেবেন্দ্রনাথ। তিনি পুনর্ব্বার আমার সহিত দেখা করিলে বাধিত হইব।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী, মাঘ, ১৩৪৭।

১৩৪৭ সালে যিনি যুবক ছিলেন, তিনি আশা করি পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য নিয়ে বেঁচে আছেন এখনও। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের উপরি-উক্ত অনুরোধ তিনি রক্ষা করেছিলেন কিনা, এবং কি কারণে রামানন্দ ঐ অনুরোধ তাঁকে করেছিলেন, কোনো বাধা না থাকলে তা যদি তিনি প্রবাসী সম্পাদককে লিখে জানান ত রামানন্দ-জন্ম-শতবার্ষিকীর উদ্যোক্তারা অত্যন্ত খুশী হবেন।

শিল্পী অসিতকুমার হালদার

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

শিল্পী অসিতকুমার হালদারের সহিত একদিন ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার সুযোগ পেয়েছিলাম। ফলে আমাদের মধ্যে যে সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল তাতে চলতি রীতি অনুসারে সমব্যবসায়ীর ঈর্ষাজাত কোন আক্রোশ ছিল না। তিনি নিজগুণে পরকে এমন ভাবেই আপন করে নিতেন যে অসিতবাবু কেমন করে অসিতদা হয়ে গেলেন তা জানার সময় পাই নি। সে আজ অর্দ্ধশতাব্দী আগের ঘটনা। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে তাঁহার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। সুদর্শন কান্তি, দীর্ঘ ঋজু-দেহ, বর্ণ গৌর। প্রথম দর্শনেই মনে হয়েছিল লোকটি স্বপ্নবিলাসী। চাল-চলনে সাধারণ থেকে পার্থক্য, একটি স্বাতন্ত্র্যের আভাস সুস্পষ্ট। বেজায় গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ না হলেও কাছে ঘেঁষতে হ'লে অপরিচিতকে সাহস নাগালে রাখতে হ'ত। স্বাতন্ত্র্যের আভিজাত্য তাঁহাকে যে ভাবে ঘিরে ছিল তাতে সহজ ভাবে এবং সাক্ষী রেখে কথা বলতে পারলে বেশ একটা আত্মশ্লাঘা বোধ করতাম। লোকদের জানান প্রয়োজন হ'ত যে আমিও একজন কেউ-কেটা নয়।

Oriental Society-র প্রদর্শনীতে তাঁহার দেখা পেতাম। Oriental Society-র প্রদর্শনীতে তাঁহার আঁকা ছোট-বড় বিভিন্ন আকারের ছবি দেখতাম, ভাল লাগত, "কেন"র প্রশ্নে কাবু হবার অবসর ছিল না। রস-ভোগের উপকরণে বিশ্লেষনের উৎপাত তেড়ে আসে নি। বুভুক্ষু ও রসনা-বিলাসীর মতই আহারের প্রাচুর্য ও সুস্বাদের প্রতি আকর্ষণ ছিল বেশী। নির্লজ্জের মত পেটুকের কথা বলে ফেলি, ছবি দেখা আমাকে নেশার ঘোরের মত পেয়ে বসেছিল, একটার পর একটা ছবি দেখতে পেলেই খুশী হতাম, সুন্দরকে কাছে পেলে আনন্দের খোরাক জুটে যেত। সত্যকে গোপন করতে চাই না, সুন্দর কাকে বলে জানতাম না, কোন্ মানদণ্ডের সাহায্যে ভাল-মন্দের বিচার হ'তে পারে, কুৎসিতকে পৃথক্ করা যায় এসব চিন্তা নিয়ে মনকে বিব্রত করার অবসর ছিল না। অবাক্ হয়ে দেখতাম অসিতদা বড় বড় ছবি আঁকতে পারেন। শুধু বড় ছবি আঁকেন না গোটা মানুষকেই ছবির ভিতর যেমন খুশি দাঁড় করান কিংবা বসান। মনে হ'ত তাজ্জব কাণ্ড চলেছে। প্রকাণ্ড ছবিতেও যে সাধারণ কথা বলা চলে এ খবর আমার জানা ছিল না। একবার প্রদর্শনীতে দেখলাম, "পুরুষকার" বা ঐ ধরণের কোন নামে এক বিরাট্‌কায় ছবি Society-র ঘরে ঝোলান হয়েছে। ছবিটি অসিতদার আঁকা। যে ছবির আকার এত বড় তাতে রাজা-উজীর জাতীয় কোন মহামানব, নিদেন পক্ষে কোন বলবান্ জাঁদরেল পুরুষের প্রতিকৃতি থাকবে। কিন্তু ছবি বড় হ'লে কি হয়, দূর থেকে কিছু দেখা যায় না। কাছে আসতে হ'ল। দেখি লোকটা মোটেই অসাধারণ কিছু নয়। দেহে দৃঢ় মাংসপেশীর বালাই পর্য্যন্ত নেই, কবাট বক্ষ, সিংহ-কটি ত দূরের কথা। লোকটা খালি গায়ে গয়না পরেছে। আরও কাছে আসতে হ'ল গয়নাগুলো খাটি কি না দেখার জন্য। ছবির ভিতর গয়না খাটির মত দেখতে হলেও তা যে নকল, সে বিষয় পরীক্ষার আগে বিচার করি নি। এর পর ধারণা জন্মাল, নাম-করা শিল্পী হ'লে অতি সাধারনকেও বড় করে দেখান চলে এবং বড়কেও ছোট করার বাধা নেই। ছবির কেন্দ্রে সব প্রকাণ্ড বিষয়কেই তুল্য সম্মান দেওয়া চলে, যদি রূপের মধ্যে সুন্দরের ছোঁয়া লাগান যায়।

মহাশিল্পী গুরু অবনীন্দ্রনাথের খ্যাতি তখন বাংলার বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছে। বিদেশী রূপদক্ষরা তাঁহার অবদানকে শ্রদ্ধার সহিত স্বীকৃতি দিতে আরম্ভ করেছেন। অতীতের সম্পদ্ হাতড়ে এই নতুন অঙ্কন-পদ্ধতির আবিষ্কার। বিদেশীদের কৃপায় দৃষ্টি লাভের পর বাংলায় ছবির আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে রুচির পরিবর্তন হ'তে লাগল। রসগ্রাহী ও রূপস্রষ্টারা পাশ্চাত্ত্য বাস্তবপন্থীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন, বিদেশী আদর্শ অনুসরণ, জঘন্য মনোবৃত্তির পরিচায়ক প্রতিপন্ন হয়ে গেল। কৃষ্টির পরিবেশে এই ধুয়ো এমন ভাবেই ঝোড়ো হাওয়ার মত বইতে লাগল যে আন্দোলনটি রস নিবেদনের পরিবর্তে যেন রাজনৈতিক কোলাহল হয়ে দাঁড়াল। যাই হোক্, অবনীন্দ্রের শিষ্যমণ্ডলী অতীতের ফর্মায়-ফেলা রীতিকে নতুনের বৈশিষ্ট্য দেবার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠলেন। দেশী হোক্, বিদেশী হোক্ বিশ্বাসের উপর নির্ভর করেই আদর্শকে গ্রহণ করতে হয়। বৈশিষ্ট্য দানে যাঁহারা ব্রতী হয়েছিলেন তাঁহারা বিশ্বাস করতেন, ঘরোয়া

মাটির ডাকে, রূপ-সৃষ্টির উচ্ছ্বাসে সাড়া না দিলে বুঝতে হবে শিল্পী বিধর্মীর অনুগামী হয়েছেন, কিংবা পথভ্রষ্ট দিশাহারা। নমস্য শিল্পী নন্দলাল বসু বিশ্বাসের সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্য বেরিয়ে পড়লেন পথের সন্ধানে, চলা সুরু হ'ল দেশী রাঙ্গা মাটির পথে। মাঠের মাটি মাড়িয়ে চলার গতি স্বভাবতই হ'ল মন্থর। চোখের সামনে যা পড়ত তা খুশীমত দেখতেন। দ্রুতগামী মোটর বা রেলে চড়ে দেশ ভ্রমণের দৃশ্য দেখার তাড়া ছিল না। খুশীমত দেখার পিছনে বোঝার তাগিদ ছিল যথেষ্ট এবং বোঝার মধ্যে রসের সন্ধান পেলে রসোপলব্ধিকে রূপ দিয়ে রসিকের সামনে ধরতেন। নন্দলালকে যাঁহারা পথ-প্রদর্শক বলে মেনেছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অসিতদাকে বাদ দেবার উপায় নেই, অসিতদার বহু কাজে নন্দলালের আশীর্বাদ মনে হয় যেন ছবিকে ছুঁয়ে গেছে।

মহতের শুভেচ্ছার বাইরে যে শক্তি অসিতদাকে প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে দিয়েছিল, সেটি তাঁহার আত্মবিশ্বাস। নিজের প্রতি শ্রদ্ধা থাকার জন্য তিনি কাজের মধ্যে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন। ছবির মধ্যে ভিড়কে শাসনে রাখা বৈশিষ্ট্যের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। এইখানে আমার বক্তব্যকে স্পষ্ট করে বলার জন্য দুই-একটি বিদেশী বুলি ব্যবহার করতে হচ্ছে। ভিড় বলতে আমি group composition-এর কথা বলতে চেয়েছিলাম এবং শাসনের অর্থে organised arrangement বলা উদ্দেশ্য ছিল। group composition বলতে যে ছবির কথা মনে পড়ল তার নাম, "রাস", মাদ্রাজের মুডেলিয়ার সাহেব ছবিটির স্বত্বাধিকারী। "রাস" ছাড়া আরও অনেক ছবির নাম করা যায় যেগুলি ইতিহাসের পাতায় স্থান পাবে অবনীন্দ্র-যুগের জয় ঘোষণার জন্য।

ব্যক্তিগত বৈশিষ্টের কথা উঠতে, ধীর চিন্তা এবং সাধনালব্ধ প্রকাশভঙ্গির উপকরণের সহিত, আধুনিক সঙ্ঘপন্থী প্রগতিশীল চিন্তাধারার তুলনা না করে পারছি না, কারণ এখনকার আধুনিকতার সহিত অবনীন্দ্র যুগের আদর্শের কোন মিল নেই। তথাপি সে যুগের শিল্পীরা আজও টিঁকে আছে কেন সন্ধান করলে দেখা যাবে, দীক্ষার প্রতি অটল বিশ্বাসই ঝোড়ো হাওয়ার টান থেকে তাদের বাঁচিয়েছে। বিশ্বাস অটল না হ'লে ছবির আঙ্গিনায় বেসামাল রেখার হুড়োমুড়ি লেগে যেত এবং অবোধ্য হিজিবিজির pattern আমাদের মত পিছিয়ে-পড়া মানুষকেও শেষ পর্যন্ত চালাক করে ছাড়ত। প্রয়োজন অপেক্ষা বেশী চালাক হলে খোকা আর্ট বা হিজিবিজির pattern বোঝার জন্য যুক্তিকে নিয়ে টানাপোড়েন পড়ে যেত, কথা কাটাকাটির ঝনঝনানিতে আমরা অর্থাৎ পিছিয়ে-পড়া মানুষের দল intellectual দাঙ্গার মধ্যে গিয়ে পড়তাম। দাঙ্গার দাপটে সুন্দর আত্মগোপন করে বসত। যাকে নিয়ে চেঁচামেচি, তাকেই হারিয়ে আমরা আত্মতুষ্টি খুঁজতাম।

আমি মনে করি, রূপ-চর্চার প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল সুন্দরকে চেনা এবং অপরকে চিনিয়ে দেওয়া। চেনার প্রধান সম্বল আন্তরিক উপলব্ধি; এখানেও ভাল-মন্দ সম্বন্ধে সাংস্কারিক প্রভাব প্রতিনিয়ত রূপ-স্রষ্টা বা রসগ্রাহীকে সচেতন করে রেখেছে বিশ্বাস অনুযায়ী বিচারকে স্বপক্ষে টানার জন্য। নিরপেক্ষতা তখনই সম্ভব হয় যখন মানুষ নির্লিপ্ত হ'তে পারে। বরং বিরুদ্ধ মতাবলম্বীকে মানতে রাজী আছি, কিন্তু নির্লিপ্তকে আমাদের প্রয়োজন নেই। দীর্ঘকাল সুষুপ্তির পর যদি জাগরণ এসে থাকে তা হ'লে সজ্ঞানে মার খাওয়া চলে, আত্মরক্ষা সম্বন্ধে চিন্তা করার অবসর পাওয়া যায়। সুন্দরের কাছ থেকে আমাদের দাবি, কেবল আনন্দ যা দলাদলির আক্রোশে ক্ষুণ্ণ হ'তে পারে না, যার গুণ আপন সত্তায় প্রতিষ্ঠিত, বাইরের তাগিদে যে সব অনাহূত বিশেষণ এসে পড়ে সেগুলি মনকে স্তোক দেবার আড়ম্বর মাত্র। সামাজিক সংস্কার, শালীনতার শাসন, ইত্যাদির প্রয়োজনে বক্তব্য বিষয়কে নানা রং-এ সাজান যায়, কিন্তু বিষয়বস্তু রূপের উপলক্ষ মাত্র—রস-সৃষ্টির শেষ কথা নয়।

উপলক্ষকে সূত্র করে যা প্রকাশ হয় তারই মধ্যে আমরা খুঁজি সুন্দরকে। সুন্দরই হ'ল রসিকের কাছে আনন্দের উৎস। অসিতদা এই আনন্দের খোরাক অনেককে দিয়েছেন। তাঁকে স্মরণ করে আমার বক্তব্য শেষ করি।

[রবীন্দ্র-ভারতী সমিতি ও অবনীন্দ্র পরিষদের সম্মিলিত উদ্যোগে আয়োজিত স্মৃতিসভায় পঠিত প্রবন্ধ।

রায়বাড়ী

(তৃতীয় পর্য্যায়)

গিরিবালা দেবী

হেমন্তের বেলা যাই-যাই করিতেছে। রায়বাড়ী নীরব নিস্তব্ধ। অবিরত উৎসব অনুষ্ঠান পালন করিয়া সকলে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া দিবানিদ্রা উপভোগ করিতেছে। শুধু ঘুম নাই ঠাকুমার চোখে। তিনি হাতীর চিরন্তন সিংহাসন ছাড়িয়া আজ আশ্রয় লইয়াছেন বিনুর শয়ন-গৃহের বারান্দার সিঁড়িতে।

বৃহৎ আঙ্গিনা, তার একদিকে রায়বাড়ীর পুরাতন বিরাট্‌ অট্টালিকা। দুই ভাগে বিভক্ত বাহির ও অন্দর। বাহিরের দিকে প্রশস্ত সারি সারি মোটা থামযুক্ত গোল বারান্দা, গোল সোপান শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট। গোল বারান্দার সামনে প্রকাণ্ড হল। তার পরেই কতকগুলি শয়ন-গৃহ। শয়ন গৃহের কোলে চওড়া বারান্দা, হাতী-মুখী সিঁড়ি।

পল্লীগ্রামের চতুঃশালা বাড়ী, কোন দিকের কোন ভিটে খালি থাকে না। তাই দক্ষিণের ভিটেয় মহেশ-বাবু বড় ছেলের জন্য নূতন কোঠা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। কোলাহল কলরব হইতে বিনুর শয়ন-গৃহখানা যেন স্বতন্ত্র সুদূর মনোরম শান্তির নীড়।

ঠাকুমা সোপানে বসিবার পূর্ব্বে সেই ঘরে একটু বিচরণ করিয়া ছল ছল চোখে গম্ভীর গলায় বলিয়াছিলেন "শ্যাম যে চলিয়া গেছে পদচিহ্ন পড়ে আছে।"

বিনু তখন ঘরেই ছিল। ঠাকুমা বাহির হওয়া মাত্র সে সারা গৃহে পদচিহ্ন খুঁজিয়া বেড়াইয়াছিল। কিন্তু পায় নাই। এখানে গোটা দিনমানে প্রসাদ পদক্ষেপ করে নাই। তাহার ব্যবহারের জামাকাপড় জুতা রাখা হইত বাহির মহলে। রাত্রি দশটার পরে প্রভাত না হওয়া অবধি এখানে ছিল তার অবস্থিতি। সে যেন এক নিশাচর পাখী, নিশাসমাগমে আবির্ভাব, নিশা অবসানে অন্তরাল।

এই গণ্ডগ্রামে রক্ষণশীল রায়বাড়ীর আবেষ্টনে দিবা-ভাগে নব বর-বধূর পক্ষে দেখা-সাক্ষাৎ ও বাক্যালাপ করা অতি অভাবনীয় কাণ্ড। শুধু অভাবনীয় নহে, মহা-পাতক।

বছর কতক পরে অবশ্য ইহার শিথিলতা দেখা যায়। নিরন্তর একত্রে বসবাস করিবার ফলে স্বামী-স্ত্রীর ভিতরে সময় সময় বাধিয়া যায় কলহ-কোন্দল-কথা কাটা-কাটি, তর্ক বিতর্কের চাপা গুঞ্জন। বাতাসে তাহার এতটুকু আভাস গুরুজনদের কানে আসিয়া আসিলে সেটাও তাঁহারা প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারেন না। পাড়ায় পাড়ায় মেয়েমহলে আন্দোলন জটলা চলে 'ব্যাপিকা' 'লজ্জাহীনা' বধূর বিরুদ্ধে। তাঁহাদের ঘরের ছেলেরা অতি সাধু-সজ্জন। পরের মেয়েরাই বেহদ্দ-বেহায়া। তাহাদের লঘুগুরু জ্ঞান নাই। তাঁহারাই আবার সখী সম্মিলনে ছড়া কাটিয়া থাকেন—"নূতন নূতন তেঁতুলের বীচি, পুরাণো হলে বাতায় গুঁজি।"

এ হেন পরিবেশে বিনু প্রসাদের পদচিহ্ন কোথায় খুঁজিয়া পাইবে? পদচিহ্ন যে পড়িয়া আছে চটি জুতার মধ্যে।

না, প্রসাদের কোন চিহ্নই এখানে নাই। থাকিবার ভিতরে রহিয়াছে বিনুর পাঠ্য পুস্তকে ও হাতের লেখার খাতায় লাল-নীল পেনসিলের লেখা। সেটা বিনুর নিতান্ত অপ্রিয় ঘটনা।

যে ব্যক্তি কৌশলে অপরের চিহ্ন লইয়া সরিয়া যায়, সে কেন নিজের এতটুকু একটুও চিহ্ন রাখিয়া যায় না, কেন?

হ্যাঁ, সুচতুর প্রসাদ বিদায়ের পূর্ব্বে ছলনার আশ্রয় লইয়াছিল।

মাইল দুই দূরে ইহাদের ষ্টীমার ঘাট, বন্দরের গায়ে সাধুগঞ্জের ঘাট। সেখানে দুইবার ষ্টীমার আসিয়া ভেড়ে—প্রথম ষ্টীমার আসে মধ্যাহ্নে, তার নাম 'উজান' ষ্টীমার—সেইটা ধরিতে আসিতে হয় শিয়ালদহ, তাহার পরে ঢাকা মেলে। গোয়ালন্দ হইতে কালিগঞ্জের ষ্টীমারে সাধুগঞ্জে অবতরণ করিলেই গ্রামে আসা যায়। যাইতে হয় 'ভাটাইলে'। জলপথ, সময়ের স্থিরতা নাই। কখনও আসে আগে, কখনও পরে। সেই কারণে সময় হাতে রাখিয়া রওনা হইতে হয়।

প্রসাদের যাত্রার সমারোহ চলিতে ছিল প্রভাত হইতে। দুই রন্ধনশালায় রান্নার আয়োজন। ছোট ঠাকুমার হাতের নিরামিষ তরকারি খাইতে প্রসাদ বড়

ভালবাসে। আবার মায়ের রান্না কইমৌরি মাছের কাঁটার সুক্তোর সে পরম ভক্ত।

ফলে স্নানান্তে মা ঢুকিয়াছেন মাছের দিকে। ছোট ঠাকুমা নিরামিষে।

বিনু নিয়মের ঘরের বারান্দায় বঁটি পাতিয়া বসিয়াছে। কচ কচ খচ খচ তরকারির পরে তরকারি কুটিয়াই চলিয়াছে থালা ভরিয়া গামলা বোঝাই করিয়া। তবু শেষ হইতেছে না। এ যেন 'রাবণের চিতা নির্ব্বাণ' নাই।

বেলা হইলে এক সময় মনোরমা হঠাৎ আসিয়া তাড়া দিলেন, "কি বৌমা, এখনও তোমার তরকারি কোটা শেষ হ'ল না? যা হয় 'নতা ফেলে রেখে তুমি চট্ করে নেয়ে এস। এ বাড়ীর নিয়ম—বাড়ীর কেউ রওনা হবার আগে বাড়ীর মেয়েদের নেয়ে-ধুয়ে নিতে হয়। ওগুলো থাক পড়ে। নেয়ে এসে কুটে দিও।"

বিনু শাশুড়ীর আদেশে তখনই উঠিয়া গিয়াছিল, ব্যস্তসমস্ত হইয়া হারাণীকে লইয়া স্নান করিতে।

স্নানান্তে ভেজা শাড়ী বদলাইয়া সে ঢুকিয়াছিল তাহার ঘরে প্রসাধন টেবিলের সামনে। রায়বাড়ীর নিয়ম স্নানান্তে চুলে চিরুণী না দিয়া, সিঁদুর না পরিয়া কোন কাজে হাত দিতে নাই। তাহার মন কিন্তু পড়িয়া ছিল আধ-কোটা তরকারির উপর। এমনি তাহার নাম "অকর্ম্মা" "অগোছালো" "কুঁড়ের বাদশা" "গতর পোষা", তাহার উপরে সে অসমাপ্ত কাজ রাখিয়া আসিয়াছে।

বিনুর চুলের রাশি যেন আগাছার জঙ্গল। জট পাকাইয়াই আছে। ঘন কোঁকড়া চুলের অরণ্যে সহজে চিরুণী ঢুকিতে চায় না। জট ছাড়াইয়া দিলে ফের জটা বাঁধিয়া যায়। লবঙ্গ বলিয়াছিল একদিন, "যাদের কোপন স্বভাব তাদের চুলে জট হয়।"

বিনু সে কথার প্রতিবাদ করিতে পারে নাই। জানিলে ত করিবে?

বিনু আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কেশের জাল সরাইয়া সিঁথিটা খুঁজিয়া বাহির করিতে উদগ্রীব হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাকে যে সিঁথিতে সিঁদুর দিয়া বাহির হইতে হইবে।

এমনি গোলমালের সময় সে সহসা শুনিতে পাইল প্রসাদের কণ্ঠস্বর। প্রসাদ জিজ্ঞাসা করিতেছিল, "মা, আমার একটা তোয়ালে পাচ্ছি না?"

রন্ধনশালার দ্বারে উপনীত হইয়া মা জবাব দিলেন, "তোয়ালে যাবে কোথায়? তোর ঘরে বিছানায় টিছানায় পড়ে রয়েছে কি না দেখ্ গে।"

নিমেষে প্রসাদ উপস্থিত বিনুর পশ্চাতে।

আচমকা বিনু মাথায় কাপড় তুলিয়া দিবারও সময় পাইল না।

প্রসাদ বাঁ-হাতে তাহার কেশের গুচ্ছ চাপিয়া দক্ষিণ হস্তের আঙ্গুলে জড়াইয়া এক থোকা চুল ছিঁড়িয়া লইয়া অনুচ্চস্বরে বলিল, "তোমার একটা চিহ্ন নিয়ে যাচ্ছি। তুমি ভাল হয়ে থেক। লেখাপড়া করতে ভুলে যেয়ো না বিনু।"

বিনুর কথা বলার অবকাশ হয় নাই। আঙ্গিনায় পদশব্দ শুনিয়া প্রসাদ সচকিত হইয়া মুঠায় কেশের গুচ্ছ চাপিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল।

কথা না হইলেও তাহাদের চোখ, অধরের হাসি নিদ্রিত ছিল না। বিনুর হৃদয় অনুশোচনায় ভরিয়া গেল। প্রসাদের অমন ঢেউ-খেলানো কুঞ্চিত কেশের এক থোকা সে কেন কাঁচি দিয়া ক্যাঁচ করিয়া কাটিয়া রাখে নাই।

সে জানিত না চুলের মহিমা। জানিবে কিরূপে? তাহার ত সংস্কৃত ইংরেজী কাব্য কবিতার সহিত পরিচয় হয় নাই। সে ইতিপূর্ব্বে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই—

"বাঁধিতে অবোধ হিয়া তোমার অলকে প্রিয়া,
কোথা হতে এল এত ফাঁস?
তোমার চরণচ্ছায় স্বপনেরা পায় পায়
হৃদয় হরিতে করে বাস।"

বিনু স্বামীর কোন স্মরণ-চিহ্ন খুঁজিয়া না পাইয়া অবশেষে তাহার বিছানায় গিয়া আশ্রয় লইল।

নূতন পালিশ-করা জোড়া খাট, গদির ওপরে নূতন তূলার তোশক পাতা। তাহার উপরে দুগ্ধফেননিভ চাদর। শিথানে মোড়া বালিশ। মোটা পাশ বালিশ, সূচী-শিল্পের নিদর্শন তাহার ওয়াড়ে। সাটিনের জড়ির কাজ-করা আচ্ছাদনী দিয়া বিছানা ঢাকা।

বিছানার ঢাকা তুলিয়া বিনু আগ্রহভরে প্রসাদের মাথার বালিশ কোলের উপরে তুলিয়া লইল। না—বালিশে একগাছা চুলও লাগিয়া নাই। অমলিন ধপ ধপ করিতেছে ওয়াড়। কোথায়ও মাথার তেলের ছোপটুকুও নাই। থাকিবে কিরূপে? প্রসাদের স্নানপর্ব্ব বিনু আড়াল হইতে লক্ষ্য করিয়াছে। মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত

চন্দনের সাবান দিয়া শরীরের কি মার্জ্জনা! অত সাবান ব্যবহারের জন্যে তাহার সর্ব্বশরীর মার্জ্জিত ঝকঝকে।

বিনু বালিশ লইয়া নাকের কাছে ধরিল, হ্যাঁ, বালিশে তাহার অঙ্গের সৌরভ লাগিয়া রহিয়াছে। চন্দনের সুমিষ্ট মৃদু সুবাস। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে যেমন ব্যক্ত করিয়াছিল—

"তাহার অঙ্গের বাস মলয় বহিয়া আনে,

চলে যাই তার কাছে কিবা কাজ কুলে মানে।"

বিনু যথাস্থানে বালিশ রাখিয়া শুইয়া পড়িল। এই গন্ধটুকুই যা কতটুকু সময় স্থায়ী হইবে? নবীন চাকর ক্ষিতিকে লইয়া গিয়াছে প্রসাদকে ষ্টীমারে তুলিয়া দিতে। রায়বাড়ীর বিছানার ভার তাহার উপরে। সে বাড়ী থাকিলে এতক্ষণ এ-বিছানা তনছন হইয়া দ্বিতলের কোণের ঘরে বাড়তি বিছানার গাদায় স্থান লাভ করিত!

রায়বাড়ীর বালিশ-বিছানা রক্ষিত হয় দ্বিতলের কোণের ঘরে সাবেকী একখানা বিরাট্ খাটে। সেখান হইতেই সেগুলিকে মাঝে মাঝে রৌদ্রে দিয়া ধূলা ঝাড়িয়া রাখা হয়। প্রয়োজন মত বিছানা ওঠা-নামা করে। ধোপা-খানায় চলিয়া যায়।

খানিক বাদে ছোট ঠাকুমার বিছানা আসিয়া এখাটে বিরাজ করিবে ভাবিতে বিনুর ভাল লাগিল না।

কোথায় সুন্দর সুঠাম এক তরুণ। আর কোথায় বৃদ্ধা বুনকাঠ ছোট ঠাকুমা। দুধের পরিবর্ত্তে ঘোল।

বিনুর দিবা-নিদ্রার অভ্যাস নাই। ঘুমের পরীরা সন্ধ্যা না হইলে তাহার চোখে বাসা বাঁধে না। কিন্তু আজ হইল তাহার ব্যতিক্রম। বিনু সহসা ঘুমাইয়া পড়িল।

তাহার সুখনিদ্রা ষ্টীমারের বংশীধ্বনিতে হঠাৎ ভাঙ্গিয়া গেল।

সাধুগঞ্জের ষ্টীমারের তীক্ষ্ণ তীব্র ভোঁঃ ভোঁঃ শব্দ দূর হইতেই শোনা যায়। ওই শব্দে গ্রামবাসীরা অনুমান করিতে পারে কোন্ ষ্টীমার কখন তটে ভিড়িয়াছে এবং ছাড়িয়া যাইতেছে।

বিনু তার পায়ের দিকের দেয়াল-ঘড়িটার প্রতি চোখ তুলিল,—তিনটে বাজিয়া সাত মিনিট। ক্ষণকাল পরেই ক্ষিতি নবীনরা ফিরিয়া আসিবে। তাহাদের আগেই ফিরিবে রায়বাড়ীর বিস্ময়কর দুইটি জীব। তাহাদের নাম আছে, কিন্তু সাধারণ লোক বলে মানিক-জোড়। তাহাদের বিষয় রায়বাড়ীতে উল্লেখ করা হয় নাই। আশিকালের বাসী কথা বসিলে বলিতে কত ভুল-ভ্রান্তি ত্রুটি-বিচ্যুতি হইয়াই থাকে।

বিনু ঘড়ির পানে চোখ মেলিয়া তেমনি বিছানায় পড়িয়াই রহিল। তাহার চিত্তে হর্ষও নাই, বিষাদও নাই, কিন্তু তাহার অগোচরে বুকের ভিতরে একটা তীক্ষ্ণধার কাঁটা যেন বিঁধিয়া খচ খচ করিতেছে। এ অনুভূতি পূর্ব্বে তাহার জানা ছিল না, তাই সে বুঝিতে পারিল না। না বুঝিলেও সে বিছানা ছাড়িয়া বাহিরে পদক্ষেপ করিল না। সকলে মজা করিয়া বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতেছে, তাহার কি দায় তরতর থরথর করিয়া সকলের অনুসন্ধান লওয়া।

সে একবার মাথা তুলিয়া ঠাকুমাকে লক্ষ্য করিল; তিনি দেয়ালে ঠেস দিয়া মুখ ঢাকিয়া তেমনি বসিয়া আছেন। নাতির বিচ্ছেদ বেদনায় ম্রিয়মাণ হইয়া তিনি ঘুমাইতেছেন কিংবা ঝিমাইতেছেন বিনু তাহা টের পাইল না।

ষ্টীমারের বংশীধ্বনিতে তাহার আচকা কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। এমন আর কোনদিন এত সহজে তাহার ঘুম ভাঙ্গে না। সে জানে না, তাহার অচেতন মনে বোধহয় এই ধ্বনি শুনিবার আগ্রহ ছিল।

বিনু মুদিত নয়নে ফের ঘুমের চেষ্টা করিতে লাগিল।

কতক্ষণ পরে উঠানে কুকুর কান্নার বিকট শব্দে বিনুর আবার তন্দ্রার ঘোর ভাঙ্গিয়া গেল। সে সচমকে বিছানা ছাড়িয়া বাহির হইল।

কুকুরের আর্ত্তনাদে সকলেই বাহির হইয়াছে। ঠাকুমা মুখের কাপড় তুলিয়া মৌনব্রত ভঙ্গ করিয়া বলিতেছেন, "লালজী, কালজী, আমার পেসাদকে ধুমা সকলের নায়ে তুলে দিয়ে এলি? আয়, কাছে আয়। তার তরে কাঁদিস নে। বাছা আমার আবার ভালোয় ভালোয় তোদের কাছে ফিরে আসবে। তোরা পশু হ'লেও মায়ার বাধনে বাঁধা পড়েছিস—

'মায়ার বাঁধন সোজা নয়, বাসলে ভাল কাঁদতে হয়'।"

মনোরমা সুমন্তর হাত ধরিয়া আঙ্গিনায় নামিয়া আসিলেন। সারা দুপুর ছেলেকে লইয়া তিনি জ্বালাতন হইয়াছেন। সুমন্ত দাদার জন্যে কাঁদিয়া-কাটিয়া অস্থির। সে যাইবে দাদার সহিত নৌকায় চাপিয়া। তরুও ষ্টেশনে যাইবার জন্য বায়না ধরিয়াছিল। মা মেয়েকে যাইতে দেন নাই।

গলির বর্ষার জল শুখাইয়া কাদা থক থক করিতেছে।

কোথায় বা পায়ের পাতা ডোবা জল। গ্রাম্য-পথের এই অবস্থা। 'গায়ের জোরে পুকুর ঠ্যালা' করিয়া বাড়ীর ছোট ডিঙিখানায় প্রসাদ রওনা হইয়া গিয়াছে। গ্রামের বাহির হইলেই বিল, বিলের পরে চীরা সাগর। চীরা সাগরের বুকে সাধুগঞ্জ। এত হাঙ্গামার পথ, মনোরমা সেইজন্য ক্ষিতি নবীনের সঙ্গে ছেলেমেয়েদের যাইতে দেন নাই। নহিলে সতর্ক প্রহারায় তাহাদের যাতায়াতের অভ্যাস আছে।

ছোটরা প্রসাদকে ডাকে দাদা বলিয়া। ক্ষিতি তাহাদের ফুলদাদা। ফুলদাদা অপেক্ষা দাদারই বেশি বাধ্য তাহারা। বিশেষতঃ সুমন্ত, সে যেন 'রামের ভাই লক্ষ্মণ।'

একে দাদা চলিয়া গিয়াছে, তাহার পরে তাহার একান্ত অনুগত নবীনও অদৃশ্য। ইহাতেই শিশু-চিত্ত বিক্ষিপ্ত হওয়াতে সে অবিরত ক্যান ক্যান থ্যান থ্যান করিতেছিল। এখন লালজী কালজীর সকরুণ রোদনে সুমন্ত যোগ না দিয়া চুপ করিয়া রহিল না।

"ছেলে কাঁদে কুকুর কাঁদে এ কি বাড়ীর অলক্ষণ!"

সুলক্ষণ-অলক্ষণের প্রতি সরস্বতীর সজাগ দৃষ্টি।

সে ছুটিয়া আসিয়া মহা রাগতস্বরে কহিল, "দিনে-দুপুরে কুকুরের কান্না তোমরা দেখছ দাঁড়িয়ে? কুকুর-বেড়ালের কান্নায় যে অকল্যাণ ডেকে আনে তা কি জান না? হারাণি, লাঠি পিটে দে ত অলক্ষ্মী দুটোকে বাইরে তাড়িয়ে।"

সুমন্ত নিজের কান্না ভুলিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "না না, লালজী-কালজী যাবে না। আয় আয়।"

লালজী কালজী অকস্মাৎ কান্না থামাইয়া তাহাদের ক্ষুদে প্রভুর পদতলে বসিয়া হাঁপাইতে লাগিল।

তাহাদের পরিশ্রম কম হয় নাই। নৌকা ছাড়া মাত্র মাঠ ঘাট খাল বিল পার হইয়া তাহারা ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছিল। পথে স্বজাতিদের সহিত ঝগড়া-বিবাদ অনিবার্য্য। এই মানিকজোড় দু'টি ভ্রমেও অন্য কুকুরের সংশ্রবে যাইতে পারে না। রায়বাড়ীর অন্নে পালিত হইয়া তাহাদের আভিজাত্য প্রবল হইয়াছে। কুকুর দম্পতি বাড়ী হইতে নড়ে না। নড়ে শুধু কর্ত্তা ও তাঁহার ছেলেরা বাহিরে পা বাড়ানো মাত্র।

জমিদারী-সংক্রান্ত ব্যাপারে কর্ত্তাকে যদি পাবনা শহরে যাইতে হয় তাহা হইলে লালজী-কালজী তাঁহার প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ী হইতে উধাও হইয়া যায়। তাঁহার গন্তব্যস্থানে পৌঁছিবার পূর্ব্বে তাহারা সেখানে পৌঁছে। আবার তাঁহার ফিরিবার আগে তাহারা বাড়ীতে আসিয়া কর্ত্তার প্রত্যাগমন সংবাদ জ্ঞাপন করে। কি বর্ষা, কি গ্রীষ্ম কিছুতেই ইহার ব্যতিক্রম হয় না। তাহারা যায় কিরূপে আসে কিরূপে কেহ তাহা জানে না।

ঠাকুমা বলেন, কে কোথায় যাইবে শ্বেত মাছি তাহা উহাদের কানে বলিয়া দেয়। উহারা কুকুর জন্ম লইলেও আসলে শাপভ্রষ্ট দেবতা। উনপঞ্চাশ পবনে উহাদিগকে উড়াইয়া লইয়া যায়, ইত্যাদি।

কিন্তু উহারা যাই হোক রায়বাড়ীর বিস্ময়কর বস্তু। সন্ধ্যার পরে কেহ রায়বাড়ীতে পদার্পণ করিতে সাহস পায় না। সমস্ত রাত্রি দুই কুকুর সগর্জ্জনে পাহারা দিয়া বেড়ায় বাড়ীর এ প্রান্ত হইতে ও প্রান্ত অবধি।

লালজী পুরুষ, ভীষণ তাহার আকৃতি। কালজী মেয়ে, স্বামীর তুলনায় কিছু খর্ব্ব।

কুকুরের চিৎকারে মেয়েরা দাসীরা সকলেই আঙ্গিনায় উপনীত হইয়াছিল। সরস্বতীর আদেশে হারাণী 'লাঠির ঘায়ে কুকুর পাগল' করিয়া লালজী-কালজীকে বাহির মহলে বিতাড়িত করিল না দেখিয়া সরস্বতীর আক্রোশের সীমা রহিল না। কুকুর ছুঁইয়া দিবার আশঙ্কায় সে তাড়াতাড়ি নিয়মের ঘরের বারান্দায় আশ্রয় লইল।

মনোরমা হারাণীকে আদেশ করিলেন "তখন ওদের ভাল করে খাওয়া হয় নি, ভাত-মাছ ঢাকা রয়েছে রান্না-ঘরের কোণে, আঁস্তাকুড়ে নিয়ে ওদের টিনের থালায় ঢেলে দিয়ে আয়।"

লালজী-কালজী কথা বোঝে, তাহারা লেজ নাড়িতে নাড়িতে চলিয়া গেল রন্ধনশালার পিছনে। মনোরমা ছেলের হাত ধরিয়া সেই দিকে অগ্রসর হইলেন।

মধুমতী পান চিবাইতে চিবাইতে বলিল, "কুকুর দুটো সেয়ানা ঘুঘু, আপন-পরের জ্ঞান টন টনে। দিদি জামাইবাবু যে চলে গেল, তখন কিন্তু তাদের সঙ্গে গেল না। কান্না ত দূরের কথা একবার কুঁই কুঁই শব্দটা পর্য্যন্ত করলে না। অথচ দাদার বেলায় দেখ না কাণ্ড। লালজী যেন গেল বুঝলাম, তুই কোন্ আক্কেলে ছিল বিল পার হয়ে বনজঙ্গলের ভেতর দিয়ে দৌড়ে গেলি। তোর পেটে একপাল বাচ্চা না কিলবিল করছে? কখন বা হয়ে পড়ে। পশু আর কাকে বলেছে?"

কামিনীর মা ঝাঁটা হাতে বিনুর ঘর ঝাড় দিতে আসিয়াছিল। সে দাঁড়াইয়া হাসিতে হাসিতে বলে,

"তোমাগো কথা শুনি আর বাঁচি না ঠাকুজ্জি, কুত্তা বিলাইংের আবার বিয়োবার জাগা বেজাগা। ছাও হইয়া পড়িত জঙ্গলে, শেয়াল ধরি খাইত। কয় বিয়ান দিইচে, তার একটাও রইল না। বেবাগগুলান গেইচে শেয়ালের প্যাটে। এবার তোমাগো বাড়ীতে মা ষষ্ঠীর দয়া হইবে, কুকুর বিলাই তিনডা গরুর ছাও হইবে। দুধ খাইও কলস কলস।"

ঠাকুমা সারা দুপুর চুপ করিয়া ছিলেন। কুকুরদের ফেরার পরে তাঁহার হৃদয়ের পুঞ্জীভূত মেঘ অনেকটা হাল্কা হইয়া আসিয়াছিল।

এখন তিনি সেই মেঘভার শব্দের বাতাসে উড়াইয়া দিতে মনস্থ করিয়া মুখ খুলিলেন—"ভাইরে ভেইয়া, গাই বিয়ালো এঁড়ে বাছুর, বৌ বিয়ালো মেইয়া।"

মধুমতী খিল খিল শব্দে হাসে, "কি বললে ঠাকুমা, বউ না ছোট, ওকে সবুরে মেয়া ফলতে দাও। এখন যে তোমার বড় নাতনীর দরকার। বল, রায়বাড়ীর বড় কন্যা বিউইলো ম্যাইয়া।"

'কেবল বড় কেনে, মেজ কি গাঙের জলে ভেসে এইচে? তার কি মেঘে মেঘে বেলা হয় নি? বড় মেয়ের সেজ মেয়ের সোনার কোলে মানিক দোলে, না হ'লে যে সাজন্ত হয় না?

মধুমতী লজ্জায় মুখ ফিরাইয়া ত্বরিত পদে সরিয়া গেল।

ঠাকুমা আকাশের পানে তাকাইয়া বেলার পরখ করিতে করিতে আপনার মনে বিড় বিড় করিতে লাগিলেন, "বেলা পড়ো পড়ো এইচে। ক্ষিতিরা এক্ষুণি ফিরে আসবে। আমার পেসাদ এতক্ষণ কলকেতা ধর ধর হ'ল। ধুমাকলের নায়ের যে দাপট, এক দণ্ডে পদ্মা যমুনা পার হইয়ে যায়। কাঁচা বয়েসের বৌ রইল ঘরে, ছেলে গেলেন লেখন-পড়ন করতে। ভেবে চিন্তে কি করব—জয়কালে ক্ষয় নাই, মরণকালে ওষুধ নাই।"

বিনু ঠাকুমার পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল। নবীন ফেরার পূর্ব্বে তাহার একটা কাজ আছে।

ঠাকুমাও উঠিয়া পড়িলেন। বারেক বিনুর দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, 'রামের লাগি সীতা কাঁদে, সীতার লাগি রাম; মধ্যিখানে সিন্ধু কাঁদে, বিধি হইল বাম।"

কামিনীর মা খাটের দিকে পিছন দিয়া ঘর ঝাঁট দিতেছিল। বিনু প্রসাদের বিছানার পাশে উপস্থিত হইয়া একবার এদিকে-সেদিকে চাহিয়া ক্ষিপ্রহস্তে প্রসাদের মাথার বালিশের ওয়াড় দু'টি খুলিয়া লুকাইয়া রাখিল তাহার গদির নীচে।

নবীন ফেরামাত্র বিছানা তনছন করিয়া ফেলিবে। সে কি খুঁজিবে না বালিশের খোল? খুঁজিয়া খুঁজিয়া অবশেষে ধরিয়া লইবে তাহার আদরের দাদুবাবু প্রয়োজনবোধে উহা লইয়া গিয়াছেন।

সামান্য দু'টি নক্সাকাটা বলিশের জন্য রায়বাড়ীতে কেহ মাথা ঘামাইবে না। অমন বালিশের খোল এ বাড়ীতে রাশি রাশি পড়িয়া রহিয়াছে। ইহাদের যতই থাকুক না কেন কিন্তু বিনুর নিকটে উহার মূল্য আছে।

যে ব্যক্তি বলা নাই, কহা নাই বিনুর একগোছা কেশ অকস্মাৎ ছিঁড়িয়া লইতে পারে, বিনু যদি তাহার সৌরভমাখা স্মরণ-চিহ্ন লুকাইয়া রাখে, তাহাতে কিসের অন্যায়?

কামিনীর মা'র ঝাঁট দেওয়া শেষ হইলে সে ডাকে, "বৌমা, চিরণ ফিত্যা নয়ে আইস, তোমাগো চুল বাঁধি দেই। একডা পরে একডা কামের ঠ্যালায় কতদিন ভরি 'চোকে সরষে ফুল' দেখিচি। মিটে গ্যাল পুজ্যা পরব; বাড়ী হইচে পাতলা। এহন আমি করি দিব তোমার চুলের জাত।"

বিনু উদাস স্বরে জবাব দিল, "থাকগে চুল বাঁধা। চুল নিয়ে বসতে ভাল লাগছে না।"

"সোয়ামী দেশান্তরে চলি গেলে কারোর কি ভাল লাগে মা? চুল বাঁধন কিন্তুক সধ্বা মানুষের করতি হয়। চুল বাঁধন, সিঁদুর দেওন সোয়ামীর মঙ্গলের লাগি।"

স্বামীর মঙ্গল কামনায় স্ত্রীর প্রসাধনের কথাটা বিনু উপেক্ষা করিতে পারিল না।

চিরুণী-কাঁটা-ফিতা লইয়া কামিনীর'মা'র সামনে বসিয়া কহিল, "তুমি মন খারাপের কথা বলছ কেন মাসী। এখানে থাকতে আমার ভাল লাগে না, তাই চুল বাঁধতে চাই নি। একজনা পড়তে গেছে, তাতে আমার কেন খারাপ লাগবে?"

কামিনীর মা মুচকি হাসিয়া মনে মনে বলে, এক কৌটা একটা হাবাগোবা মেয়ে তাহার চোখে ধুলা দিবে, এ জিনিষের আস্বাদ সে যেন পায় নাই। যখন তাহার বয়েস ছিল, সে কামিনীর মা হয় নাই, রাজেশ্বরী ছিল, সেই অতীতের অস্পষ্ট স্মৃতি তাহার হৃদয়ে সহসা জাগ্রত হইয়া ক্ষণেকের জন্য তাহাকে বিমনা করিয়া তুলিল।

কবি মিছে বলেন নাই—"জীবনে বারেক আসে প্রেমের স্বপন, হৃদয় করিয়া যায় দেব-নিকেতন।"

কামিনীর মা'র আঁটিয়া-সাঁটিয়া চুল বাঁধা বিনুর অভ্যাস ছিল না। চুলে টান লাগিতেছিল। সে বাঁ-হাতে খোঁপা ধরিয়া নাড়া দিতেই কামিনীর মা অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "চুলে টান লাগিছে বৌমা? আঁটি-সাঁটি চুল বাধনই ভাল। চুল ভাতে থাকে। তোমরা একালের ঢিলা-ঢালা ঝুঁটি বাঁধ, তাতে চুল ভাল থাকে না। আমি দিন কতক তোমারে চুল বাঁধি দিলেই তোমাগো সইয়া যাইবে। 'শরীরের নাম মহাশয় যা সহাও তাই সয়।' জানি মা, সকলি জানি। বেড়াবেণী বাঁধন জানি, বেনে খোঁপা, ফিরিঙ্গি কোনটাতেই রাজেশ্বরী অপারক নয়। এখন হাত-পা ধুইয়া ধোয়া কাপড় পরি নিয়মের ঘরে যাও। অবেলায় গা ধোয়নের কাম নাই। আমিও উঠি আমার চরকায় ত্যাল দিতি। 'বাঁধন-ছাঁদন হইয়া গেল নতুন বৌয়ের চুল। বাকি থাকিল খোঁপায় দিতে কলমি শাকের ফুল'।" বলিতে বলিতে কামিনীর মা চলিয়া গেল তাহার চরকায় তেল দিতে।

মা আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ রে ক্ষিতি, প্রসাদকে ষ্টীমারে তুলে দিয়ে এলি? সে ভাল ভাবে উঠে গেছে? ষ্টীমারে ভিড় কেমন?"

ক্ষিতি বলিল, "খুব ভিড় মা, ছুটির শেষে সকলেই যে ফিরে যাচ্ছে আমি ষ্টীমারে উঠে দাদাকে ভাল জায়গায় বসিয়ে দিয়ে এসেছি। বৌঠান কোথায় মা? তার কাছে আমার একটু দরকার আছে।"

ক্ষিতির সঙ্গে বিনুর মুখোমুখি বাক্যালাপ না হইলেও সে তাহাকে বৌঠান বলে।

মা আশ্চর্য্য হইয়া ছেলেকে প্রশ্ন করেন, "বৌমার সঙ্গে তোর দরকার, সে কি তোর সঙ্গে কথা বলছে?"

ক্ষিতি ফেটে পড়ে, "তোমরা কথা না বলালে সে বলবে কি করে মা? যত সব ইয়ে—এ ওর সঙ্গে কথা বলবে না। দেখলে ঘোমটা টানবে। ওসব আমার বিশ্রী লাগে। দাদা যাবার সময় বলে গেল, 'মা যদি বলেন তবে বৌয়ের সঙ্গে কথা বলিস্। বাবার আলমারি থেকে বই দিস্ পড়তে। যে খাতায় হাতের লেখা লেখে, মাঝে মাঝে লেখাগুলো পরীক্ষা করে দেখিস্ ঠিক লিখছে কি না।' ওই ত বৌঠান তার ঘরেই রয়েছে তুমি বলে দাও আমার সঙ্গে কথা কইতে। না বললে কথা বলবে না।"

মা এগিয়ে গিয়ে বলেন, "বৌমা, ক্ষিতি তোমাকে যেন কি বলবে, তুমি ওর সঙ্গে কথা বল। ও তোমার ভাইয়ের মত। ওকে লজ্জা করতে হবে না।"

ক্ষিতি ছাড়পত্র পাইয়া সদর্পে বুক ফুলাইয়া বিনুর নিকটস্থ হইয়া বলিল, "নিন বৌঠান, দাদা আপনাকে চিঠি দিয়েছেন। আমার কাছে আপনি আর মুখ ঢেকে চুপ করে থাকতে পারবেন না।"

সমবয়সের প্রতি সাধারণতঃ মানুষের একটা আকর্ষণ থাকা স্বাভাবিক। ক্ষিতির সহিত মেলামেশা করা ও কথা বলিবার আগ্রহ বিনুর কম ছিল না। কিন্তু এতদিন তাহার ভাগ্যবিধাতাদের নির্দেশ না পাইয়া তাহার একান্ত ইচ্ছাকে সে দমন করিয়া রাখিয়াছিল। আজ অপ্রত্যাশিত রূপে মাহেন্দ্র-লগ্ন দ্বারে আসিয়াছে।

বিনু সঙ্কুচিত হইয়া নোটবুকের ছেঁড়া পাতায় পেনসিলে লেখা খোলা চিঠিটা হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিল। কাগজে বেশি কিছু লেখা ছিল না।

"শ্রীমতী বিনু,

আমার ষ্টীমার আসিয়াছে, চলিলাম। পৌঁছিয়া চিঠি লিখিব। আসিবার সময় তোমাদের ওখানে দেখা করিয়া আসিয়াছি। শুনিলাম উঁহারা শীঘ্রই তোমাকে লইয়া যাইবেন। তোমার হাতের লেখা ক্ষিতি মাঝে মাঝে দেখিয়া দিবে। মা'র মত হইলে ক্ষিতির সহিত কথা বলিবে। লেখাপড়া করিতে ভুলিও না। ইতি—

প্রসাদ।"

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে চিঠি পাঠ করিয়া বিনু আস্তে আস্তে বলিল, "আমি ত ইচ্ছে করে আপনার সঙ্গে কথা না বলে থাকি নি। ওঁরা যে বারণ করে দিয়েছিলেন। আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন, বসুন না ওই চেয়ারে।"

ক্ষিতি তেমনি দাঁড়াইয়াই জবাব দিল, "এই ত ফিরে এলাম আমরা। আমার মাষ্টারমশাই এক্ষুণি আসবেন। বসলে চলবে না। আচ্ছা বৌঠান, আপনি আমাকে আপনি বলছেন কেন? দাদা হিসাব করে দেখে বলেছেন আপনি নাকি বয়েসে আমার তিন মাসের বড়। বয়েসে বড়, সম্পর্কেও বড়, আপনি আমাকে আর আপনি বলবেন না।"

বিনু ক্ষোভের সহিত বলিল, "না বললে যে বকুনি খেতে হবে আমাকে। ওঁরা যে তরু ক সুমন্তকেও আপনি বলতে বলেছেন 'তুমি' শুনলে রাগ করবে সবাই।"

"কে শুনতে আসবে, কে রাগ করবে! আমার দিদিদের কথা ছেড়ে দিন। যত সব ইয়ে—"

"ইয়ে হলে তুমিও আমাকে আপনি বলো না।"

"না, সেটা হয় না। যিনি পুজনীয়া বয়েসে বড় তাঁকে আমি 'তুমি' বলতে পারব না। আপনি খাতার পাতায় হাতের লেখা করে রাখবেন; আমি এক-একদিন এসে দেখে দেব। গাঁয়ে আমাদের উঁচু স্কুল নেই; যেতে হয় পড়তে বন্দরের স্কুলে। দাদা এখানে ছোটদের জন্যে একটা স্কুল করে দিয়েছেন, খেলার ক্লাব করে দিয়েছেন। আপনি বুঝি জানেন না, দাদা মস্তবড় খেলোয়াড়। সব খেলায় ওস্তাদ। দাদা এখানে থাকলে কত উন্নতি করতেন গাঁয়ের। আপনাকে কত লেখাপড়া শেখাতেন। কাল এসে আমি আপনার লেখা সংশোধন করে দেব।"

ক্ষিতি বাহির হইয়া গেলে বিনু ভাবিতে লাগিল, ছেলেটি মন্দ নয়। কিন্তু রায়গোষ্ঠীর রক্তের ধারা, কি অহঙ্কার! আমার হস্তাক্ষর উনি সংশোধন করিয়া দিবেন। ওঁর লেখা কে সংশোধন করে তার ঠিক নাই।

বিনু তখনও ক্ষিতির হস্তাক্ষর দেখে নাই। ক্ষিতির লেখা যেমন নির্ভুল তেমনি মুক্তার মতন নিটোল সুন্দর।

ক্ষিতির অল্পবয়েস হইলেও সে বিনুর হস্তাক্ষর পরীক্ষকের দাবি করিতে পারে।

ক্ষিতি চলিয়া গেলে বিনু আর-একবার প্রসাদের চিঠিটা চোখের সামনে মেলিয়া ধরিল। তাহাকে শীঘ্রই ঠাকুরদারা লইয়া যাইবেন—এই সংবাদটা তাহার হৃদয়ে সুধা বর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু ইহারা যদি যাইতে না দেয়? বিনু আর ভাবিতে পারিল না।

ক্রমশঃ

জবাহরলালের কারাদণ্ড

গোরখপুর জেলায় প্রদত্ত কয়েকটি বক্তৃতার জন্য জবাহরলাল নেহরুর চারি বৎসর কারাবাস দণ্ড হইয়াছে।...ইংরেজীতে যেমন কথা আছে যে, জীবিত সীজরের চেয়ে মৃত সীজরের প্রভাব অধিক হইয়াছিল, সেইরূপ কারাগারের বাহিরের মুক্ত জবাহরলালের চেয়ে তাহার ভিতরে আবদ্ধ জবাহরলালের দ্বারা তাঁহার মত অধিক প্রচারিত হইবে।

মাতা দেবকীর পুণ্য জঠর হইতে অষ্টম বারে যিনি বাহির হইয়াছিলেন, তাঁহার অবদান পরম্পরা জগতে সুবিদিত। দেশভক্তদের সংস্পর্শে পূত কারাগার হইতে জবাহরলাল অষ্টম বার বাহির হইবার পর কি ঘটিবে, কে বলিতে পারে?

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭।

ছায়াপথ

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

॥ আঠারো ॥

নিজেকে নিয়ে মালতী খুব বিব্রত বোধ করছে।

মহিমের যেন হাত খুলে গেছে। রাত্রে মত্ত অবস্থায় ফিরে এসে মাঝে মাঝেই মালতীকে প্রহার করে, কোন-না কোন ছুতোয়। এ যেন তার কাছে মস্ত বড় একটা কৌতুকের বস্তু। অসহায় একটি মেয়েকে নির্যাতন করা।

লজ্জায় মালতী চীৎকার পর্যন্ত করতে পারে না। নিঃশব্দে মুখ বুঁজে নির্যাতন সহ্য করে। ভদ্রঘরের মেয়ের তা ছাড়া উপায়ই বা কি?

কিন্তু সে করবে কি?

যতদিন বেঁচে থাকবে, এই অত্যাচার এমনি মুখ বুঁজে সহ্য করে যাবে? কিসের জন্যে? দু'বেলা দু'টি অন্নের জন্যে? এই প্রাসাদের একটি কক্ষে পার্থিব আরাম-বিলাসের মধ্যে বাস করবার সুবিধার জন্যে?

সে কি এমনই মহার্ঘ বস্তু যে তার জন্যে এই নিষ্ঠুর নির্যাতন সহ্য করা যায়?

মালতীর মন বলে, না।

কিন্তু নিজের পায়ে দাঁড়াবার সামর্থ্য কি তার আছে?

মালতী দিনের পর দিন নিজের মনে মনে তর্ক করে: যে আরাম-বিলাস এবং শিষ্টতার মধ্যে এখানে সে আছে, নিজের রোজগারে সে ভাবে থাকবার সামর্থ্য নিশ্চয়ই তার নেই। কিন্তু এভাবে থাকবার ত তার কথা ছিল না। সে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরের মেয়ে। সেই পরিবেশের মধ্যেই সে মানুষ। দৈবাৎ এই প্রাসাদে এসে পড়েছে।

পড়ে কি বিভ্রাটই না বেধেছে! তার সমস্ত জীবন, এবং সমস্ত জীবনের শিক্ষা-দীক্ষা, সমস্তই আজ বিপর্যস্ত, এর চেয়ে মধ্যবিত্ত জীবনে ফের ফিরে যাওয়া ঢের ভাল।

আই. এ-টা পাস করা আছে। প্রাইভেটে বি. এ-টা পাস করতে পারলে বাপের বাড়ীতে থেকে নিজের উপার্জনে দু'বেলা দুটো খেয়ে-পরে স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকা যায়।

সেই পরামর্শ করবার জন্যে সে মায়ের কাছে ছুটল। মাকে নিজের দুঃখের কথা সবিস্তারে বললে। সহস্র নির্যাতনেও কোনদিন তার চোখ থেকে জল বেরোয় নি। আজ মায়ের কাছে নিজের দুঃখের কথা বলতে নিজেও যত কাঁদলে, মাকেও তত কাঁদালে। তিনি এ সমস্ত কথা জানতেন না। ভাবতেন, ধনী গৃহে পড়ে মেয়ে তার আরাম-বিলাস এবং ঐশ্বর্যের মধ্যে সুখেই রয়েছে। এখন বুঝলেন, মালতী আরাম, বিলাস এবং ঐশ্বর্যের মধ্যে থাকলেও সুখে নেই।

মালতী জিজ্ঞাসা করলে, কি করব বল।

শক্ত প্রশ্ন।

মধ্যবিত্ত ঘরের গৃহিণীর কাছে আরাম-বিলাসটাও সামান্য নয়। ভাগ্যদোষে সুখ পাওয়া গেল না বলে সেই আরাম-বিলাস ত্যাগ করে আসাটাও তাঁর বিবেচনায় বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

সেই কথাই তিনি বললেন।

এত দুঃখের মধ্যেও মালতীর হাসি এল: বাইরে থেকে যত মূল্যবান্ তুমি মনে করছ মা, আসলে আরাম-বিলাস তত মূল্যবান্ নয় মা।

মা হেসে বললেন, দাঁত থাকতে ত দাঁতের মর্যাদা বোঝা যায় না।

যাই হোক্, প্রশ্ন হচ্ছে মালতী কি করতে চায়।

মালতী বললে, তার পক্ষে দুটো করণীয় আছে: একটা হচ্ছে কিল-চড় খাখিয়ে শ্বশুরবাড়ীর আরাম উপভোগ করা, আর নয় ত বাপ-মায়ের আশ্রয়ে জীবন কাটানো। কিন্তু এর কোনটাই সে করতে চায় না।

কিল-চড়ের কথায় মা শিউরে উঠলেন : সে আবার কি রে?

—হ্যাঁ। রাত বারোটায় মাতাল হয়ে ফিরে আমার ওপর বীরত্ব করা হয়। এ আমি আর পারছি না।

মায়ের সমস্ত শরীর কাঠের মত শক্ত হয়ে গেছে। চোখে পলক পড়ে না। মুখ স্তব্ধ।

অনেকক্ষণ পরে বললেন, তুই এখানে চলে আয়।

মালতী বললে, সে কথাও মাঝে মাঝে মনে হয়। তোমরা যতদিন আছ অসুবিধা হবে না। কিন্তু তার পরে?

—তার পরে কি?

—না মা, বৌদির নাক-নাড়াও খেতে পারব না। চোখ-কান বুঁজে ওখানেই আমাকে থাকতে হবে, যতদিন না বি-এ পাস করছি। উপার্জনক্ষম হওয়ার পরে আমি এখানেই থাকি, আর অন্য কোথাও থাকি, যাবে-আসবে না।

মা জিজ্ঞাসা করলেন, তুই কি বি-এ পরীক্ষা দিবি?

—সেই রকমই ত ভাবছি।

মা ভেবে বললেন, মন্দ হবে না। তোর শাশুড়ীর মত হবে ত?

—আপত্তির কি আছে? কলেজে ত যাচ্ছি না। বাড়ীতে বসে পড়ব। তাতে জমিদার-বাড়ির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবার কারণ নেই। তা ছাড়া কি জান, লেখাপড়ার বিষয়ে তাঁর আগ্রহ আছে।

—কি করে বুঝলি?

—ওঁদের একটা তেলের দোকান আছে। সেই দোকানে একটি ছোকরা কাজ করে। তার কলেজের মাইনে, বই কেনার টাকা সমস্তই তিনি দিয়েছেন। এবারে সে বি-এ দিচ্ছে। পাছে তার পড়ার অসুবিধা হয় সেজন্যে তাকে দু' মাসের ছুটি ত দিয়েছেনই, তাকে আমাদের কাছারি-বাড়ীতে একখানা নিরিবিলি ঘরও ছেড়ে দিয়েছেন। ছেলেটিকে দিয়ে আমি অনেক সাহায্য পাব।

—তা হ'লেও একবার তাঁর অনুমতি নেওয়া দরকার।

—পরে নেব। আগে তৈরী ত হই।

বলেই বললে, জানো মা, আমার শাশুড়ী একটি আশ্চর্য মানুষ।

—কি রকম?

—কোথাও তিনি যান না। ভোর থেকে দুপুর পর্যন্ত ঠাকুরদালানে বসে। সেইখানেই দু'টি প্রসাদ খান। বাকি সময়টা অন্দরে, তাঁর নিজের ঘরে। সেইখানে বসেই অত বড় বাড়ীর কোন্‌খানে কি হচ্ছে, সব তিনি জানেন। জমিদারি, ব্যবসা, সদর, অন্দর সমস্ত তাঁর নখদর্পণে। যেদিন আমি পরীক্ষা দেওয়ার কথা মনে মনে স্থির করেছি, সেই দিনই খবরটা তাঁর কাছে পৌঁছে গেছে!

—কি ক'রে? যাদু জানেন নাকি?

—কি জানি। কেউ বলে, যাদু জানেন। কেউ বলে, ওঁর চর সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে।

—তা, জামাই যে অত্যাচার করেন, তা নিয়ে তাঁকে কিছু বলেন না?

—না।

—কেন? তুই যে বলিস্ সবাই তাঁকে ভয় পায়?

—পায়। পাছে তিনি তিরস্কার করেন সেই ভয়ে অত বড় বাড়ীর সকলেই অস্থির। তাঁর কাছে অভিযোগ করার দরকার হয় না। তার আগেই তিনি সমস্ত ব্যাপার জানতে পারেন। আমার দুঃখের কথাও নিশ্চয় তিনি জানেন। অথচ ছেলেকে একটা কথাও বলেন না। এমন ব্যবহার করেন যেন কিছুই হয় নি।

মালতী বিষণ্ণ ভাবে হাসলে।

বললে, আমার মনে হয় ছেলেকে তিনি ভয় পান। মাতাল বলে নয়, ছেলে বলে। অথবা বৌএর ওপর শাশুড়ীর শুনেছি রিষ থাকে। আমার ওপর অত্যাচারটা মনে মনে তিনি হয়ত উপভোগ করেন। মোট কথা এ নিয়ে তিনি ছেলেকে কিছু বলেন না।

মালতী সশব্দে একটা নিঃশ্বাস ছাড়লে।

বললে, আজ আমি উঠি মা। কি ঠিক করি তোমাদের জানাব। বাবার সঙ্গে দেখা হ'ল না। তাঁকে সব কথা জানিও।

ইচ্ছা ছিল ফেরবার পথে ডিস্পেন্সারীতে ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করে আসে। তার সঙ্গেও এ বিষয়ে পরামর্শ করা দরকার ছিল। তাকে মালতী হিতৈষী বন্ধু বলে মনে করে। এখনও সে বিবাহ না করায় সেই বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়েছে।

কিন্তু শ্বশুরালয়ের কাউকে সে বিশ্বাস করে না। ড্রাইভারটাকেও না। মনে হয়, কিছুদিন থেকে সব সময় একটা ছায়া যেন তার পিছু পিছু ঘুরে বেড়াচ্ছে। গোপনে কিছুই করবার যো নেই। মুহূর্ত মধ্যে শাশুড়ী তা জেনে ফেলেন।

সুতরাং ডিস্পেন্সারীর দিকে আর গেল না। সোজা বাড়ী ফিরে এল।

একটু পরে গিন্নীমার খাস ঝি এসে খবর দিলে: গিন্নীমা ডাকছেন।

মালতী চমকে উঠল।

গিন্নীমা তাকে বড় একটা ডাকেন না। দু'জনে দেখা হয় কমই। কথা হয় আরও কম। যাদেরকে গিন্নীমার প্রয়োজন হয়, তাদেরকেই তিনি ডাকেন। এইটেই তাঁর দস্তর। এমন কি নিজের খাস ঝিকেও বিনাপ্রয়োজনে তিনি বড় একটা ডাকেন না। এবং তাঁর প্রয়োজনও কাউকে বড় একটা হয় না। সুতরাং কাউকে তিনি ডাকলে স্বভাবতই সে ব্যস্ত এবং বিব্রত হয়ে পড়ে।

মালতীও ব্যস্তভাবে তাঁর ঘরে গেল।

প্রশস্ত শয়নকক্ষ। একধারে প্রকাণ্ড বড় একখানা খাট। খাটে নরম গদির বিছানা। কিন্তু সেখানে তিনি শোন না। মেঝেয় একটা কম্বল পাতা। সেই তাঁর শয্যা।

সেইখানে বসে তিনি মহাভারত পড়ছিলেন।

মালতী নিঃশব্দে গিয়ে দাঁড়াল।

চোখের চশমাটা খুলে গিন্নীমা তার দিকে চাইলেন।

—মায়ের কাছে গিয়েছিলে?

—হ্যাঁ।

—বেয়াই-বেয়ান সব ভাল আছেন?

—হ্যাঁ।

—ছেলেমেয়েরা?

—সব ভাল।

—আমি একটা কথা ভাবছিলাম।

এইবার সেই আসল ব্যাপারটা আসছে ভাবতেই মালতীর দেহ কাঠের মত শক্ত হয়ে এল। সে দুরু দুরু বক্ষে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল।

চশমাটা সযত্নে খাপের মধ্যে রেখে গিন্নীমা বললেন, এ বাড়ীতে আমি যখন আসি তখন আমার বয়স এগারো। শ্বশুরবাড়ী যে কি তাই তখন বুঝি নি। তোমাদের মত বড় বয়সে আসি নি।

অনেক দূর থেকে ভনিতা। মালতী বুঝলে, আসল কথায় আসতে বেশ খানিকটা দেরি হবে। কিন্তু উপায় কি"

গিন্নীমা বলে যেতে লাগলেন:

সে সময়কার সব কথা মনে পড়ে না। কিন্তু আজকে আমি ভাবতেই পারি না, এই বাড়ীটা ছাড়া আর কোথাও আমার বাড়ী ছিল।

গিন্নীমা হাসলেন।

—একটা আশ্চর্য দেখ, পুরুষমানুষ যেখানে জন্মায় সেইটেই তার বাড়ী। আমাদের কিন্তু উলটো। যেখানে জন্মাই না সেইটেই আমাদের বাড়ী। নিজের বাড়ী। তুমি বড় হয়েছ। লেখাপড়া শিখেছ। জ্ঞান-বুদ্ধি হয়েছে। শ্বশুরবাড়ী কি তা চিনেছ।

মালতী মনে মনে বললে, হাড়ে হাড়ে চিনেছি। এখন পালাতে পারলে বাঁচি।

গিন্নীমা বলে চললেন, আমাদের সেই আমলের কথা তুমি ধারণা করতে পারবে না। কত বিধি-নিষেধ! এটা করতে নেই, ওখানে যেতে নেই, একথা বলতে নেই, অত জোরে হাসতে নেই। সহবৎ শিক্ষাই কত রকমের! গুরুজনের সামনে অমন করে বসতে নেই, অমন করে দাঁড়াতে নেই, মাথার ঘোমটা কোন সময়েই এর বেশি তুলতে নেই। আরও কত কি, আজ আর সব মনেও পড়ে না।

গিন্নীমা হাসলেন।

তারপরে বোধ হয় মনে পড়ল। বলতে লাগলেন: তখন আমাদের একটা প্রকাণ্ড জুড়িগাড়ি ছিল। সেটা পুরুষদের জন্যে। আমাদের জন্যে একটা পালকি-গাড়ি।

বাইরে বেরুবার বিশেষ রেওয়াজ ছিল না। আত্মীয়-স্বজনের বাড়ী ক্রিয়াকর্মে, কি গঙ্গাস্নানে আমরা তাই চড়ে যেতাম। শাশুড়ীদের মুখে শুনেছি, তার আগে তাঁরা পালকি করে গঙ্গা নাইতে যেতেন। বেহারারা পালকিসুদ্ধ চুবিয়ে তুলে নিয়ে আসত!

গিন্নীমা আর এক দফা হাসলেন।

গিন্নীমার মুখখানি সর্বদাই হাসি-হাসি। কিন্তু মালতী তাঁকে কখনও হাসতে দেখে নি। কেউই বোধ হয় দেখে নি। অথবা খুব কম ভাগ্যবানেরাই দেখে থাকবে। বোধ হয়, তখন মেয়েদের জোরে হাসা যে নিষেধ ছিল তারই চিহ্ন আজও বহন করে চলেছেন।

কিন্তু আসল কথাটা কি?

মালতী ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করে রয়েছে।

গিন্নীমা বললেন, এই যে তুমি যখন-তখন গাড়ি ডাকছ আর বাপের বাড়ী যাচ্ছ, আমাদের কালে তার যো ছিল? কে যাচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে, কখন যাচ্ছে? যখন যাচ্ছে তখন বারবেলা আছে কি না। সঙ্গে কে কে যাচ্ছে। শাশুড়ীর অনুমতি নিয়ে তাঁর ব্যবস্থাপনায় যেতে হ'ত। তার চেয়ে বৌরা না যাওয়াই পছন্দ করত।

এবারে গিন্নীমা মালতীর দিকে চেয়ে হাসলেন।

মালতী ভাবতে লাগল এইটেই কি আসল কথা? তার আজকের পিত্রালয় যাত্রার উপর নিগূঢ় শ্লেষ?

সে নিঃশব্দে কাঠের মত শক্ত হয়ে বসে রইল।

হঠাৎ গিন্নীমা তাঁর স্বাভাবিক গাম্ভীর্যে ফিরে এলেন।

বললেন, আসল কথাটা কি জান মা, মেয়েদের প্রচুর ধৈর্য দরকার। সবচেয়ে ধৈর্য বেশি বসুন্ধরার। তাঁর মেয়ে সীতা। আমরা তাঁর বংশ। আমাদের ধৈর্য না থাকলে সংসার ভেসে যায়। বুঝলে না?

গিন্নীমা গভীর জলের মাছ। তাঁর কথা শোনা মাত্রই বোঝা যায় না। মালতীও সম্পূর্ণ বুঝলে না। শুধু মনে হ'ল যেন কিছু কিছু বুঝেছে। নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে তাই সে জানালে।

নিজের শোবার ঘরে ফিরে এসে মালতী ভাবতে বসল গিন্নীমার বক্তব্যটা কি? ধৈর্য? সীতার মত ধৈর্য? তার উপর যত নির্যাতনই হোক, মুখ বুজে সহ্য করে যাওয়া? কেন? তা নইলে সংসার ভেসে যাবে।

মালতী হাসলে: কার সংসার ভেসে যাবে? তার নিজের? ক্রীতদাসীর আবার নিজের সংসার কিছু আছে নাকি? তা হ'লে ত সারদারও ধৈর্য দরকার।

—জানলি সারদা, এবার থেকে তোর ওপর আমি প্রচণ্ড অত্যাচার করব। তুই কিন্তু মুখ বুজে সব সহ্য করে যাবি। কথাটি কইবি না। বুঝলি?

সারদা এসেছিল মালতীর ছাড়া কাপড়-জামা গুছিয়ে তুলে রাখতে। মালতীর কথা শুনে অবাক্!

—অত্যাচার করবেন কেন? আমি কি করেছি?

—কিছুই না করলেও করব। কারণ আমি তোর মনিব। তোকে মাইনে দিই, খেতে-পরতে দিই।

—সে ত যেখানে খাটব সেখানেই দেবে।

—সেখানেই অত্যাচার করবে।

সারদার ভীরু ভাবগতিক দেখে মালতীর ঠোঁটে একটা চাপা হাসি খেলে গেল। তা সারদার দৃষ্টি এড়াল না। বুঝলে, এর মধ্যে একটা নিগূঢ় পরিহাস আছে।

মালতীর পরিত্যক্ত শাড়িখানি গোছাতে গোছাতে সারদা বললে, সেই ত ভয়ের কথা বৌরাণী। লঙ্কায় সবাই যদি রাক্ষস হয়, যাব কোথায়?

মালতী বললে, কেন, তুই কি জায়গা পাস্ নি?

—কই আর পেলাম?

—কেন, এখানে রয়েছিস্, খেটে-খুটে খাচ্ছিস্, মার-ধোর ত করছে না।

সারদা হেসে বললে, আপনিই ত করবেন বলে শাসাচ্ছেন।

—সে হ'ল 'যদি'র কথা। এই আজকেই তোকে মারতে পারতাম। আমাকে ফেলে এই আসছি ব'লে চলে গেলি, আর এলি নে।

লজ্জিত ভাবে সারদা বললে, কোথাও যাই নি বৌ-রাণী। একটুখানি—

—পার্কে বসে বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছিলাম!

সারদা চমকে উঠল। অস্বীকার করতে পারলে না। কিন্তু ভয় পেয়ে গেল। নিজের জন্যে ত বটেই, রামকিঙ্করের জন্যেও।

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলে, বাবুটিকে চিনতে পেরেছেন বৌরাণী ?

—কেন পারব না। আমাদের জানা ছেলে ত।

সারদা করযোড়ে বললে, ডাক্তারবাবুর কাছে যাওয়া-আসা নিয়েই ওঁর সঙ্গে আলাপ। উনি সেরকম লোক নয় বৌরাণী।

মালতীর হাসি পেয়েছিল। কোনমতে বললে, কি রকম বাবু তা তুই জানিস্। কিন্তু পার্কে আলাপ করাটা সুবিধের নয়। কারও চোখে পড়ে গেলে মুশ্‌কিল হবে।

সারদা কুণ্ঠিত ভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

মালতী বললে, ঘাসের ওপর যেরকম মুখোমুখি বসে তোরা হাসি-গল্প করছিলি,—আমি না হয় জানি যে, তুইও ভাল, রামকিঙ্করও ভাল,—কিন্তু অন্য লোকের সন্দেহ করতে কতক্ষণ ?

সারদা নিঃশব্দে নতমুখে দাঁড়িয়ে।

মালতী বলে চলল, তারপরে ভাব দেখি, কথাটা যদি কোনপ্রকারে মায়ের কানে পৌঁছয়, ছেলেটির পরকাল ঝরঝরে হয়ে যাবে না ? গরীবের ছেলে, গিন্নীমার দয়ায় লেখাপড়া শিখছে, গিন্নীমা বিরূপ হ'লে আর কি ও কোনদিন দাঁড়াতে পারবে ?

সারদা কথা বলে না।

তার পর আজ বাদ কাল ওর পরীক্ষা। পাস করবে কি করে ? তোরা কি রোজ সন্ধ্যেবেলা পার্কে হাওয়া খেতে যাস্ ?

সারদা কাঁদ-কাঁদ স্বরে বললে, না বৌরাণী, আপনাকে নামিয়ে দিয়ে ফিরছিলাম, দৈবাৎ দেখা।

মালতী হেসে উঠল : আর সঙ্গে সঙ্গে বসে গেলি গল্প করতে ? তোমাকে আর শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে হবে না। কাপড়গুলো গুছিয়ে তুলে রাখ।

ক্রমশঃ

রবীন্দ্রসকাশে চীন শুভেচ্ছা-দূত

ভারতের প্রতি শুভেচ্ছা-জ্ঞাপক চীন দৌত্যের নেতা মনীষী তাই চী-তাও সেদিন রবীন্দ্রনাথকে দেখিতে ও তাঁহাকে চীনরাষ্ট্রপতি চিয়াংকাই-শেকের চিঠি দিতে গিয়াছিলেন। চিঠিতে চিয়াংকাই-শেক কবির পীড়ার সংবাদে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া তাঁহার আরোগ্য প্রার্থনা করিয়াছেন এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতি রক্ষার উপায় সম্বন্ধে কবির উপদেশ চাহিয়াছেন। কবি ভারতবর্ষ ও চীনের প্রাচীন যোগ পুনঃস্থাপন করিয়া তাহার রক্ষার উপায়ও করিয়াছেন। তিনি এই উপদেশ দিবার যোগ্যতম ব্যক্তি।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭।

বিদেশের কথা

শ্রীযোগনাথ মুখোপাধ্যায়

সাইপ্রাসে অশান্তি

সাইপ্রাস কার্যত দ্বিধাবিভক্ত দেশে পরিণত হয়েছে। অবস্থা আয়ত্তে আনার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ অফিসাররা ঐ ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্রটির বিবদমান দুই সম্প্রদায়কে সাময়িক ভাবে আলাদা করার জন্য মানচিত্রের যেখান দিয়ে সবুজ দাগ টেনেছিলেন, সেই সবুজ দাগই এখন গ্রীক ও তুর্কী সিপ্রিয়টদের "রাষ্ট্রীয়" সীমানা। গ্রীক অঞ্চলে বসবাসকারী তুর্কীরা সব তুর্কী অঞ্চলে চলে এসেছে এবং তুর্কী অঞ্চলও একই ভাবে গ্রীকশূন্য হয়েছে। তুর্কী অঞ্চলে কোথাও এখন সাইপ্রাসের পতাকা দেখা যায় না, তার বদলে সেখানে উড়ছে তুরস্কের জাতীয় নিশান। স্বেচ্ছাসেবকদের টুপি ও ব্যাজেও রয়েছে তুর্কী পতাকার প্রতীক। তারা স্পষ্টই বলে যে, সাইপ্রাসে কোন আইনসম্মত সরকারের অস্তিত্ব নেই, আর তাদের অংশ বর্তমানে তুরস্কেরই অংশ। অপর দিকে গ্রীক-অধ্যুষিত অঞ্চলেও গ্রীসের সঙ্গে সাইপ্রাসের সংযুক্তি আন্দোলন ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।

মনের দিক্ থেকে দু'টি সম্প্রদায় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে তাদের আবার ঐক্যবদ্ধ করে একটি জাতিতে পরিণত করা যে কি কঠিন কাজ তা অন্তত ভারতের অজানা নেই। সুতরাং জেনারেল গিয়ানির দৌত্য যদি শেষ পর্যন্ত ফলপ্রসূ না হয় তবে সেটা অন্তত তাঁর স্বদেশবাসীদের কাছে খুব বড় ব্যর্থতা বলে মনে হবে না। মুস্লিম ধর্মাবলম্বীদের স্বাতন্ত্র্যবোধ এত তীব্র যে, অপর ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে একটি শক্তিশালী জাতিগঠন করে পৃথিবীর কোথাও তাদের বাস করতে দেখা যায় না। মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ায় এবং উত্তর ও পূর্ব আফ্রিকায় যে প্রায় দুই ডজন মুস্লিম রাষ্ট্র আছে তার মধ্যে একমাত্র ক্ষুদ্র লেবানন ছাড়া আর কোথাও উল্লেখযোগ্য ভিন্ন ধর্মাবলম্বী সংখ্যালঘুর অস্তিত্ব নেই। কিন্তু ঐ লেবাননেও আজ পর্যন্ত খ্রীষ্টধর্মীদের সঙ্গে আরব মুস্লিমদের প্রকৃত জাতীয় সংহতি গড়ে ওঠে নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কুড়ি কোটি অধিবাসীর মধ্যে নিগ্রোর সংখ্যা প্রায় দুই কোটি, তার মধ্যে আবার মুস্লিম ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা কিঞ্চিদধিক এক লক্ষ, যারা ইতিমধ্যেই 'ব্ল্যাক মুস্লিম" নামে স্বতন্ত্র পরিচিতি লাভ করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের মূল নিগ্রো আন্দোলনের লক্ষ্য বর্ণভেদ-লোপ ও জাতীয় সংহতি হ'লেও ব্ল্যাক মুস্লিমদের দাবি স্বতন্ত্র নিগ্রোস্থান। যুক্তরাষ্ট্রের এক-সপ্তমাংশ অঞ্চল নিয়ে একটি মুস্লিম নিগ্রো রাষ্ট্রগঠনের দাবিতে তাদের আন্দোলন সুরু হয়ে গেছে।

সাইপ্রাসের তুর্কী সিপ্রিয়টদের মধ্যে জাতীয় সংহতির পক্ষে কিছু সংখ্যক লোক অবশ্যই আছেন। কিন্তু বর্তমানে সমগ্র তুর্কী সম্প্রদায় চরমপন্থী টি-এন-টি দলের কুক্ষিগত হওয়ায় তাদের নিরুপায় হয়েই নিষ্ক্রিয় হয়ে যেতে হয়েছে। আর যতদিন না আবার গ্রীক ও তুর্কী সিপ্রিয়টরা পরস্পরের সঙ্গে নির্ভয়ে মেলামেশা করতে পারবে ততদিন তুর্কীদের মধ্যে জাতীয় সংহতির সমর্থনে প্রচারকার্য চালানো সম্ভব হবে না। সুতরাং রাষ্ট্রসঙ্ঘবাহিনীর উপস্থিতির ফলে আপাতত সাইপ্রাসে ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামার আশঙ্কা লোপ পেলেও সাইপ্রাসের অশান্তির প্রকৃত কারণ দূর হতে অনেক সময় লাগবে।

মিশরে নতুন সংবিধান

সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রে গত ২৫শে মার্চ যে নতুন সংবিধান প্রবর্তিত হয়েছে তাতে "গণতান্ত্রিক সমাজবাদ" ঐ রাষ্ট্রের আদর্শ ও লক্ষ্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে। মিশরে এই প্রথম আইনত জমির উপর জনগণের যৌথ অধিকার স্বীকার করা হ'ল। ভূমি-সংস্কার আইনের এক ও দুই ধারা অনুসারে ইতিপূর্বে বৃহৎ ভূস্বামীদের কাছ থেকে যে ছয় লক্ষ একর জমি ছিনিয়ে নেওয়া হয় তাতেই যৌথ চাষ প্রবর্তন করে জনগণের যৌথ অধিকার

কায়েম করা হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মিশরে বর্তমানে কর্ষণযোগ্য জমির পরিমাণ প্রায় যাট লক্ষ একর। আসোয়ান হাই ড্যামের কাজ শেষ হ'লে মিশরে কর্ষণযোগ্য জমির পরিমাণ যে আরও প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বাড়বে, সেখানেও যৌথ পদ্ধতিতে চাষ হবে বলে মিশর সরকার ঘোষণা করেছেন।

প্রেসিডেন্ট নাসের বলেছেন, সরকারী কর্তৃত্বাধীন বড় বড় যৌথ খামারগুলিতে শুধু খাদ্যশস্য বা তুলার চাষই হবে না, ফল ও ফুল চাষের দিকেও নজর দেওয়া হবে। কারণ ইউরোপের বাজারে ঐ দু'টি বস্তুর ব্যাপক চাহিদা আছে। তবে কোন্ জিনিস কি ভাবে চাষ করলে সবচেয়ে বেশী লাভ হবে সেটা কৃষি-বিশেষজ্ঞরা বিচার-বিবেচনা করে দেখবেন। মোটামুটি ভাবে তাঁরা হিসাব করে দেখেছেন যে, এক একর জমিতে খাদ্যশস্য ফলিয়ে সারা বছরে পাওয়া যায় ৩৪ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় সাড়ে চার শ' টাকা। সে জায়গায় তুলা চাষ করে পাওয়া যায় ৬৮ পাউণ্ড ও ফল চাষ করে ১২৫ পাউণ্ড। কিন্তু শস্য চাষ করতে এক একর জমিতে লাগে একজন, তুলা চাষ করতে দু'জন, ফল চাষ করতে পাঁচজন ও ফুল চাষ করতে দশজন।

ইতিপূর্বে বড় বড় জমিদারদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া কিছু কিছু জমি পাঁচ একর হিসাবে ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছিল। সরকারের আশঙ্কা, ব্যাপক যৌথ পদ্ধতিতে চাষের প্রস্তাবে ঐ ক্ষুদ্র চাষীরা আপত্তি জানাবে। কিন্তু সরকার তার জন্য বিচলিত নন। কারণ যৌথ চাষের যে পরিকল্পনা তাঁরা নিয়েছেন তাতে অন্তত চল্লিশ লক্ষ ভূমিহীন কৃষককে কাজ দেওয়া সম্ভব হবে বলে তাঁরা আশা রাখেন। এই ভূমিহীন কৃষকরাই সরকারের নতুন কৃষি পরিকল্পনার সবচেয়ে বড় সমর্থক।

দক্ষিণ রোডেসিয়া

১৯৫৩ সালের ১লা আগষ্ট উত্তর ও দক্ষিণ রোডেসিয়া এবং নিয়াসাল্যাণ্ড নিয়ে যে মধ্য আফ্রিকা ফেডারেশন গঠিত হয়েছিল, ঐ এলাকার কৃষ্ণাঙ্গ অধিবাসীদের প্রবল বিরোধিতায় এই বছর ১লা জানুয়ারী তার অবসান ঘটে। ইতিমধ্যে ডাঃ হেষ্টিংস বাণ্ডার নেতৃত্বে নিয়াসাল্যাণ্ড স্বাধীনতা অর্জন করেছে, কেনেথ কাউণ্ডার নেতৃত্বে উত্তর রোডেসিয়াও অনতিবিলম্বে স্বাধীনতা অর্জন করবে। কিন্তু সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে দক্ষিণ রোডেসিয়াকে নিয়ে। কিঞ্চিদধিক দেড় লক্ষ বর্গমাইল আয়তনবিশিষ্ট এই দেশটি প্রাকৃতিক সম্পদে খুবই সমৃদ্ধ এবং এর আবহাওয়া শ্বেতাঙ্গদের বসবাসের অনুকূল। এ কারণে দক্ষিণ আফ্রিকার মত এই এলাকাটিতেও শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশীরা গায়ের জোরে তাদের অধিকার ও কর্তৃত্ব চিরস্থায়ী করতে চায়। দক্ষিণ রোডেসিয়ার পঁচিশ লক্ষ লোকের মধ্যে শ্বেতাঙ্গ মাত্র ৮·৪ শতাংশ হ'লেও ঐ দেশের ৪৯ শতাংশ জমি তাদের খাস দখলে, এবং বলা বাহুল্য, ওর বাইরে আর কোন ভাল জমি সেখানে নেই। দক্ষিণ রোডেসিয়ার তামাকের চাষ, সোনা ও অন্যান্য ধাতুর খনি সবই তাদের দখলে। আর সবচেয়ে বড় কথা, ঐ উপনিবেশটির রাজনৈতিক কর্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে তাদের করায়ত্ত।

অর্থনীতি ও রাজনীতির উপর এই পূর্ণ কর্তৃত্ব বজায় রেখেই দক্ষিণ রোডেসিয়ার শ্বেতাঙ্গরা স্বাধীন হতে চায়। কিন্তু দক্ষিণ রোডেসিয়ার কৃষ্ণাঙ্গ অধিবাসীরা ব্রিটিশ সরকারের কাছে দাবি জানায় যে, তাদের পূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার স্বীকার করে নিয়ে তবেই দক্ষিণ রোডেসিয়াকে স্বাধীনতা দেওয়া চলবে। বিষয়টি রাষ্ট্রসঙ্ঘে পর্যন্ত ওঠে এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত এক প্রস্তাবে ব্রিটেনকে এই বলে অনুরোধ জানানো হয় যে, সকলের পূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার স্বীকার করে তবেই যেন দক্ষিণ রোডেসিয়াকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়। কিন্তু দক্ষিণ রোডেসিয়ার শ্বেতাঙ্গদের মনোভাব ও বর্তমান কার্যকলাপ দেখে মনে হয় না যে রাষ্ট্রসঙ্ঘের অনুরোধ বা দক্ষিণ রোডেসিয়ার কৃষ্ণাঙ্গদের দাবি তাঁরা কার্যকরী হতে দেবেন।

সম্প্রতি দক্ষিণ রোডেসিয়ার অপেক্ষাকৃত উদারপন্থী প্রধানমন্ত্রী মিঃ উইনষ্টন ফিল্ড পদত্যাগ করেছেন এবং তাঁর স্থানে অধিষ্ঠিত হয়েছেন মিঃ আয়ান স্মিথ। কৃষ্ণাঙ্গ-স্বার্থ বিরোধী এই শ্বেতাঙ্গ মানুষটি অবিলম্বে দক্ষিণ রোডেসিয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা চান, এবং কৃষ্ণাঙ্গদের সঙ্গে কোন যুক্তিতেই তিনি ক্ষমতা ভাগ করতে রাজী নন। আফ্রিকায় কৃষ্ণাঙ্গদের শাসনাধীন চৌত্রিশটি রাষ্ট্রের উদ্ভব হলেও আয়ান স্মিথের মতে কৃষ্ণাঙ্গরা দেশের শাসনদায়িত্ব গ্রহণের অনুপযুক্ত। আয়ান স্মিথ প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ায় এটাও বোঝা যাচ্ছে, শ্বেতাঙ্গ সমাজও এ ব্যাপারে কোনরকম আপোষে আসতে রাজী নয়। দুঃখের বিষয়, দক্ষিণ রোডেসিয়ার জাতীয়তাবাদী শক্তিও এই সময় দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে। 'জিম্বাবুয়ে

আফ্রিকান ন্যাশনালিষ্ট কংগ্রেসে'র নেতা রেভারেণ্ড সিথেল ঘোষণা করেছেন, শ্বেতাঙ্গরা স্বাধীনতা ঘোষণা করলে কৃষ্ণাঙ্গরাও তাদের সঙ্গে স্বাধীনতা ঘোষণা করবে। আফ্রিকানদের অন্যতম জাতীয় সংস্থা 'পিপলস কেয়ার-টেকার কাউন্সিল'-এর নেতা জোস্যুয়া এন্‌কোমো অধিকতর জনপ্রিয় ও প্রগতিশীল নেতা। তিনি এখন রাজধানী সলস্‌বারী থেকে পনের মাইল দূরে স্বগ্রাম বুলাউত্রয়োতে নজরবন্দী অবস্থায় বাস করছেন, এবং এ ব্যাপারে তাঁর মতামত এখনও জানা যায় নি। আফ্রিকার অন্যান্য স্বাধীন দেশগুলি এন্‌কোমোর উপরেই বেশী আস্থাশীল। তিনিও নিশ্চয়ই শ্বেতাঙ্গ প্রভুত্ব মুখ বুঁজে মেনে নেবেন না। সুতরাং দক্ষিণ রোডেসিয়ার শ্বেতাঙ্গরা যদি কৃষ্ণাঙ্গদের দূরে সরিয়ে রেখে ঐ রাজ্যের রাজনৈতিক অধিকার সম্পূর্ণ কুক্ষিগত করার চেষ্টা করে তবে স্বাধীনতার প্রাক্‌-মুহূর্তে সেখানে প্রচণ্ড বর্ণ-সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়বে।

বর্মায় একনায়কতা

জেনারেল নে উইন দুর্নিবার গতিতে বর্মাকে পূর্ণ একনায়কতার পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। গত ২৮শে মার্চ জেনারেল নে উইনের নিজের দল 'বর্মা সোশ্যালিষ্ট প্রোগ্রাম পার্টি' ছাড়া আর সব রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। সমস্ত রাজনৈতিক দলের যাবতীয় সম্পত্তিও সরকার বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছেন। ক্ষমতা দখলের সময়েই জেনারেল নে উইন তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী উ নুকে গ্রেপ্তার করেছিলেন, তিনি আজও কারারুদ্ধ। অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতাদেরও ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জনসাধারণের সভা শোভাযাত্রার অধিকারও বহুদিন থেকে নেই।

এই কঠোর শাসনের সঙ্গে সুরু হয়েছে ব্যাপক রাষ্ট্রীয়-করণ। বর্মার যাবতীয় ব্যবসায়, শিল্প, ব্যাঙ্ক, আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য এখন সরকারের সম্পত্তি। রেডক্রস, বয় স্কাউটস্‌, ইত্যাদি সংস্থাকেও নে উইন বেসরকারী থাকতে দেন নি। বেসরকারী শিল্প উদ্যোগকে এক কলমের খোঁচায় সরকারী সম্পত্তিতে পরিণত করলেই যে উৎপাদন বা জাতীয় আয় বাড়ে না এটা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সম্প্রতি বহুভাবে প্রমাণিত হয়েছে এবং বহু দেশেই একারণে সরকারের দখল-করা শিল্প-বাণিজ্য আবার বেসরকারী উদ্যোগীদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। জেনারেল নে উইনের তা অজানা থাকার কথা নয়। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক বর্মার খুঁটিনাটি সব কিছু সরকারের সম্পত্তিতে পরিণত করাই এখন তাঁর একমাত্র জাতীয় কর্মসূচী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নে উইন সরকারের এই জাতীয়করণের ধাক্কায় যাদের সবচেয়ে বেশী বিপন্ন হ'তে হয়েছে, বর্মা-প্রবাসী ভারতীয় সমাজ তাদের অন্যতম। এই সব ভারতীয়রা কয়েক পুরুষ আগে, বর্মা যখন ভারতের অংশ ছিল সেই সময়, ভারত ত্যাগ করে বর্মায় যান ও বিভিন্ন ব্যবসায়ে লিপ্ত হন। দীর্ঘ অনুপস্থিতির ফলে ভারতের সঙ্গে তাঁদের কোন সম্পর্ক নেই এবং আইনত তাঁরা বর্মার নাগরিক। অথচ বর্মা সরকারের অনুসৃত নীতির ফলে কপর্দকশূন্য অবস্থায় বর্মা ত্যাগ করে তাঁরা ভারতেই চলে আসতে বাধ্য হচ্ছেন। বর্মাত্যাগী ভারতীয় শরণার্থী সংস্থার প্রেসিডেণ্ট সম্প্রতি এক বিবৃতিতে জানান যে, শুধু খুচরা ও পাইকারী দোকানগুলি বর্মা সরকার গত ১৯শে মার্চ সরকারী দখলে নিয়ে নেওয়াতে ভারতীয় সমাজের প্রায় ১৫ কোটি টাকা লোকসান হয়েছে। পাকিস্তান-ত্যাগী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন করতেই ভারত দিশাহারা, তার পরেও বর্মা-ফেরৎ শরণার্থীদের দায়িত্ব ভারতকে নিতে হবে।

মস্কো-পিকিঙ বিচ্ছেদ

কমিউনিষ্ট দুনিয়ার দুই প্রধান সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীনের নেতৃবৃন্দের বিরোধ মীমাংসার যাবতীয় প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। ব্যর্থতার কারণ, সোভিয়েট নায়ক ক্রুশ্চেভের শান্তি ও সহঅবস্থান নীতি চীনা নেতৃবৃন্দের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব হয় নি। তাঁরা মনে করেন না যে, আমেরিকা ব্রিটেন প্রভৃতি দেশগুলির সঙ্গে আর এক দফা জোর লড়াই না করে বিশ্বব্যাপী কমিউনিষ্ট আন্দোলন সফল করা সম্ভব হবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে সোভিয়েট ইউনিয়নে কমিউনিজম কায়েম হয়েছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে চীন সহ ইউরোপ ও এশিয়ার বারোটি দেশে কমিউনিজম বিস্তৃত হয়েছে। সুতরাং পৃথিবীর বাকি অংশটা কমিউনিষ্টদের দখলে আনতে হ'লে আর একটা যুদ্ধ না হ'লেই নয়।

অপর পক্ষে ক্রুশ্চেভ বলেন, পারমাণবিক অস্ত্রের যুগে যুদ্ধের চিন্তা শুধু বাতুলের পক্ষেই সম্ভব। আবার যদি বিশ্বযুদ্ধ বাধে তবে সারা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে আর সেই সঙ্গে ধ্বংস হবে এত কষ্টে গড়ে তোলা কমিউনিষ্ট সমাজ, যা ইতিমধ্যেই পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশে

সুপ্রতিষ্ঠিত অধিকার কায়েম করেছে। ক্রুশ্চেভ আরও বলেন, কমিউনিষ্টরা এখন এত শক্তিশালী যে সাম্রাজ্যবাদীরা আর অস্ত্রের জোরে তাদের বিনাশ করার কথা চিন্তা করতে পারে না। সুতরাং নির্ভয়ে অতি আস্থার সঙ্গে বিশ্বের বাকি দুই-তৃতীয়াংশে এখন কমিউনিজম প্রচার করা সম্ভব।

তারপর ষ্টালিনের আমলের অর্ধভুক্ত শৃঙ্খলিত সোভিয়েট জনগণকে ক্রুশ্চেভ আজ যে স্বাধীনতা ও উন্নততর জীবনযাপনের সুযোগ দিয়েছেন এটা চীনা নেতাদের মনঃপূত নয়। তাঁরা মনে করেন, ভালভাবে বাঁচার সুযোগ পেলে সোভিয়েট জনগণের বৈপ্লবিক চেতনা লোপ পাবে। কিন্তু ক্রুশ্চেভ তার জবাবে বলেন, ভালভাবে বাঁচার আশাতেই সোভিয়েট জনগণ একদিন বিপ্লব করেছিল। সুতরাং আজ যদি তারা ভালভাবে বাঁচার সুযোগ পেয়ে থাকে, বুঝতে হবে বিপ্লব সার্থক হয়েছে।—এই রকম পরস্পরবিরোধী মনোভাব ও চিন্তাধারা নিয়ে বেশীদিন একসঙ্গে চলা সম্ভব নয়। সোভিয়েট ও চীনা নেতাদের পক্ষেও তা সম্ভব হয় নি। ক্রুশ্চেভ প্রকাশ্যে চীনা নেতাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনে ভাঙন ধরানোর অভিযোগ এনেছেন; আর চীনা নেতারা বলছেন, ক্রুশ্চেভ শোধনবাদী, বিপ্লববিরোধী।

অনিবার্যভাবে এই মস্কো-পিকিং বিরোধের ঢেউ সারা বিশ্বের কমিউনিষ্ট আন্দোলনে ছড়িয়ে পড়েছে। ভারতের কমিউনিষ্ট আন্দোলনও এখন দ্বিধাবিভক্ত। নয়াদিল্লীতে কিছুদিন আগে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির জাতীয় পরিষদের যে সভা হয় তা'তে দলের চেয়ারম্যান ক্ষোভ করে বলেন, সাম্রাজ্যবাদীরা শত চেষ্টাতেও কমিউনিষ্ট আন্দোলনে ভাঙন ধরাতে পারে নি, কিন্তু চীনা কমিউনিষ্টদের বিভেদনীতি সে-কাজে সফল হ'ল। আর বেরিয়ে-আসা কমিউনিষ্ট নেতারা তার উত্তরে বলেছেন, দলের সরকারী নেতারা এখন কংগ্রেস ও ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণীর বন্ধু, সুতরাং তাদের সঙ্গে হাত মেলানোর অর্থ কমিউনিষ্ট আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা।

প্রবাসী

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

এরা ফিরে যাবে।
যেমন এসেছে দলে দলে
তেমনি আবার একদিন
দলে দলে ফিরে যাবে,
বানডাকা জলের মতন
ফিরে যাবে পিছু টানে।

এ দেশ এদের নয়,
এরা যে প্রবাসী।
ঠাঁই দেব,ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে,
নিজের ক্ষুধার অন্ন
ভাগ ক'রে খাওয়াব এদের,
দেব আর পাব ভালবাসা,
তবু এরা ভুলবে না
প্রবাসী যে এরা।
এদের নদীর হাওয়া
এরা যেখানেই যাক, খুঁজে খুঁজে যাবে,
শোনাবে করুণ ভাটিয়ালি,
আয় আয় ব'লে ডাক দেবে।

সেই ডাকে এদের আত্মা
সাড়া দেবে বার বার,
তার পর ধ্বসে যাবে সীমার প্রাচীর
প্রাণের আবেগে একদিন,
এরা ফিরে যাবে।
যে-পথ এসেছে ভ'রে হাহাকার দিয়ে
সে-পথে হাসির হাহারব
তুলে এরা ফিরে যাবে।

কিন্তু এরা?
এরা কোথা যাবে?
নিজ দেশে বাস্তহীন নিরন্নের দল?
ঋতুতে ঋতুতে দেশে কত যে রসাল ফল ফলে
ডাস্টবিনে পায় তার পরিচয়।
ক্ষিদেয় নেতিয়ে প'ড়ে যখন ঘুমোয়
আর-এক দেশের স্বপ্ন দেখে
যে-দেশ কোথাও নেই।
এরাও প্রবাসী।
এরা কোথা যাবে?

প্রথম প্রেম

শ্রীশ্রীকৃষ্ণধন দে

তুমি যৌবনে মম প্রথম পান্থ এলে,
মোর নিভৃত গোপন কুঞ্জবিতান-সন্ধান কোথা পেলে?
আমি চিত্রাহরিণী আপন তনুর গন্ধে
ফিরি চঞ্চল-হিয়া পুলকমদির ছন্দে,
নব পুষ্পিতবনে নিশীথলগনে অভিসারদীপ জ্বেলে,
তুমি যৌবনে মম প্রথম পান্থ এলে।

কত দক্ষিণবায়ুচঞ্চল তরুবীথিতে
আমি তোমারে খুঁজেছি উচ্ছল প্রেমগীতিতে,
মম নব-উন্মেষ-শঙ্কিত তনু, যেও না যেও না ফেলে,
তুমি যৌবনে মম প্রথম পান্থ এলে।

ঘন পুঞ্জিত মেঘে ওঠে বারি ছলছলিয়া,
মোর কামনা-কোরক যেও না যেও না দলিয়া,
—ওড়ে মনোবিহঙ্গী নবদিগন্তে স্বপন-পক্ষ মেলে;
তুমি যৌবনে মম প্রথম পান্থ এলে।

কেন বল

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

কেন বল এমন অন্ধকারে দেখা
কেন বল তোমার মুখ দেখতে পাই না?
জীবনের সমস্ত মুহূর্তগুলি
তোমার দিকে চেয়ে ছিল,
শেষের দিকের সব মুহূর্ত
তোমার দিকেই চেয়ে থাকবে।

আজ সন্ধিক্ষণে
যখন চাঁদনাতলার গুণ্ঠন খুলল
তখন অন্ধকার
তোমার মুখ দেখা যায় না।

কেন বল এমন অন্ধকারে দেখা?

ফিরতে গিয়ে

শ্রীসুনীলকুমার নন্দী

সবই আছে···সেই নদী বন, নদীর মুখে ভাটিয়ালী,
মাইল মাইল শস্যসবুজ মাঠের হাওয়া,
গঞ্জ.খামার, ভগ্ন দেউল, পারাপারের শীর্ণ সাঁকো।

পথের পাশে খেলছে শিশু, কৃষ্ণচূড়া
আজো কেমন রক্তরাঙা—
আমার জন্যে হয়নি ত কেউ আত্মহারা।

আমার চোখে ভালোলাগা নীলচে আলো
নেই, ঘরে নেই, জ্বলছে ঘরে, জ্বলছে যেন
অন্য কারো ভালোলাগা।

তবে, তবে, তবে কেন মিথ্যে আসা—
সবই আছে, প্রহর শেষে আমি শুধু
কী বলি···কী···হয়ত এখন অবাঞ্ছিত···

কেবা কাকে মনে রাখে, দুয়ার থেকে ফিরে আসি।

লেভেলক্রসিং

শ্রীশঙ্কর দে

তুমি না গেলে এবার দুর বাহির শূন্যতা বহে যায়
তুমি না গেলে এবার দুর পার হয়ে যাও স্বপ্নে
লেভেলক্রসিং—
বুকের ভিতরে স্পষ্ট হস্তরেখা, দীর্ঘতর সময় ও সন্ধানী
ভবিষ্যৎ ষ্টেশনের আলো
তুমি জ্বেলে ধরো অন্ধকারে, যাত্রাপথে
প্রভাত ও মাধবী।

স্বপ্নের ভিতরে ছিলে ষ্টেশনবাহিনী তুমি ট্রেন
লোকালয়, তোমারো পথের শেষ মলিনতা
কাঁটাফুল, হৃদয় বিস্তারে
বিদ্যুৎবাহিনী তুমি ট্রেণ, না গেলে এবার দুর
তুমি না দিলে এবার দুর ফিরে যাই বাহির ষ্টেশনে।

রামানন্দ
জন্ম-শতবার্ষিকী

মনীষী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের শতবার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে ১৩৭১ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে কলিকাতায় একটি প্রদর্শনী করার কথা হইয়াছে। প্রদর্শনীতে অন্যান্য জিনিষের সঙ্গে তাঁহার প্রকাশিত "দাসী", "প্রদীপ", "প্রবাসী", "Modern Review" ও হিন্দী "বিশাল ভারত" প্রভৃতি পত্রিকার পুরাতন সংখ্যা প্রদর্শিত হইবে। প্রথম বৎসরের পত্রিকাগুলি বড় কোথাও দেখা যায় না। এইগুলি পাইলে বিশেষ উপকার হয়। অন্যান্য বৎসরের মধ্যে ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বের অর্থাৎ তাঁহার জীবিতকালে প্রকাশিত সকল সংখ্যা প্রদর্শিত হইবে আশা করিতেছি। পত্রিকাদি ছাড়া তাঁহার যে কোন বয়সের একক বা গ্রুপ ফটো (সুস্পষ্ট), পেনসিল স্কেচ, তাঁহার লিখিত মূল্যবান্ চিঠি বা রচিত প্রবন্ধাদির খবরও পাইলে উপকার হয়। তিনি ইংরেজী ও বাংলা নানা পত্রে বহু বৎসর লিখিয়াছেন। সেই সেই পত্রের সেই সেই সংখ্যা কাহারও থাকিলে জানাইবেন। বহু সভা-সমিতিতে অভিভাষণ দিয়াছেন। সেগুলিও সংগৃহীত হইলে ভাল হয়। তাঁহার রচিত বর্ণ পরিচয়, Century Primer, প্রভৃতি শিশুপাঠ্য পুস্তক ও তাঁহা র সম্পাদিত রামায়ণ, মহাভারত ও আরব্য উপন্যাস প্রথম সংস্করণের সন্ধান চাই। Chatterjee's Picture Albums, Towards Home Rule, Raja Ravi Varma, Rammohan and Modern India প্রভৃতি পুস্তকও কাহারও নিকট থাকিলে খবর দিবেন। আমরা প্রয়োজন মত কিছু কিছু লইব। যাহা দুষ্প্রাপ্য বলিয়া রাখিতে চাহিব তাহার মূল্য সংগ্রাহক কত চান জানাইবেন। বাকি যাহা প্রদর্শনীর পর ফেরত দিব তাহা ডাকে যাইবার সম্ভাবনা। জিনিষের ফর্দ্দ পাঠাইলে তাহার মধ্যে কি কি রাখিব পরে জানাইব।

"প্রবাসী"র যুগের আগের ভারতীয় মাসিক পত্রিকাদি প্রদর্শনীতে রাখিতে চাই। যথা বঙ্গদর্শন, ভারতী, সাধনা, মুকুল, সখা ও সাথী, হিন্দী সরস্বতী ইত্যাদি। Modern Review-এর পূর্ব্বেকার ভারতীয় ইংরেজী মাসিক পত্র এবং রামানন্দ সম্পাদিত— Kayastha Samachar প্রভৃতি পাইলে ভাল হয়। তাঁহার এলাহাবাদ প্রবাসকালে Advocate প্রভৃতি পত্রে তিনি লিখিতেন, সেগুলো পাওয়া সম্ভব হইলে ভাল। ৭০।৭২ বৎসর পূর্ব্বে "ধর্ম্মবন্ধু" নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হইত। কিছুদিন রামানন্দ তাহার সম্পাদক ছিলেন। তাহা পাইলে সাদরে গৃহীত হইবে।

এই সকল জিনিষ যাঁহাদের নিকট আছে তাঁহারা ইংরেজী ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় খবর দিলে সুখী হইব। আমরা উত্তর দিবার পূর্ব্বে জিনিষ পাঠাইবেন না।

ইতি

শ্রীশান্তিশ্রী নাগ

১০৮, রাজা বসন্ত রায় রোড, কলিকাতা—২৯

পঞ্চশস্য

পৃথিবীর আবর্তন

পৃথিবী নিজের অক্ষদণ্ড ঘিরে আমাদের সকলকে নিয়ে ঘণ্টায় ১০০০ মাইলের মতন বেগে ঘুরছে। তার এই আবর্তনের ফলে আমাদের দিনরাত্রির হিসাব, তা সকলেই জানেন। কেবল একটা কথা হয়ত অনেকের জানা নেই যে, এই আবর্তনের বেগ মাঝে মাঝে কমে আর বাড়ে। সম্প্রতি কিছুকাল যাবৎ চব্বিশ ঘণ্টার থেকে এক সেকেণ্ডের এক-দশমাংশ কম সময়ে পৃথিবী নিজেকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে। এর ঠিক অব্যবহিত আগে ১৯৫৫ সালে এই আবর্তনের বেগ হ্রাস পায়। ১৯৫৭ সালে সেটা আবার বাড়ে। তারপর ১৯৬২ সাল থেকে তা আবার কমতে আরম্ভ করেছে। কেন যে থেকে থেকে বাড়ে আর কেনই যে কমে, তা কেউ জানে না।

মিঠাইয়ের দাম

বাঙ্গালী জাতের নানা রকম দুর্নামের মধ্যে একটা হ'ল, তারা বড্ড বেশী মিষ্টি খেতে ভালবাসে। অন্য দুর্নামগুলিকে নিয়ে তর্ক করা চলে, কিন্তু এটিকে স্বীকার ক'রে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

ইংরেজ জাতের সঙ্গে বাঙ্গালী জাতের আর কোথাও না মিলুক, এই একটা জায়গায় মিল আছে। দুজাতির লোকই মিষ্টির পক্ষপাতী।

বিলেতের রয়্যাল নেভী বা রাজকীয় নৌবহরের পিছনে যা খরচ হয়, তার অর্দ্ধেকের বেশী পরিমাণ টাকার মিষ্টি ব্রিটিশ জাতির লোকেরা উদরস্থ করে। এই টাকার পরিমাণ বৎসরে তিন শ' কোটির চেয়েও বেশী।

ভারতবর্ষে যেমন বাঙ্গালীদের, তেমনি ইউরোপে ব্রিটিশ জাতের মিষ্টির প্রতি অনুরাগের দুর্নাম আছে। কিন্তু কেবল টাকার দামে এই মিষ্টির দাম নয়। শতকরা ৯৫টি বারো বৎসর বয়স্ক ব্রিটিশ ছেলেমেয়ে নানা-রকম দাঁতের অসুখে ভোগে, অনেকের দাঁতের ফুটো বুজিয়ে নিতে হয়, অনেকের দাঁত সেই বয়সের মধ্যে পড়েও যায়। সে-দেশের দাঁতের চিকিৎসকদের মতে বেশী মিষ্টপ্রীতিই এর কারণ। বাঙ্গালী ছেলে-মেয়েরা দাঁত নিয়ে ঠিক এতটাই ভোগে না, তার কারণ হয়ত এই যে, প্রচুর মিষ্টপ্রীতি সত্ত্বেও মা-বাপের দারিদ্র্য বশতঃ মিষ্টান্ন, প্রচুর দূরে থাক, কালে-ভদ্রে ছাড়া তাদের ভাগ্যে বিশেষ জোটে না। বাঙ্গালী মিঠাইওয়ালারা মিঠাইয়ের দাম অসম্ভব রকম বাড়িয়ে বাঙ্গালী ছেলে-মেয়েদের এইদিক্ দিয়ে খুবই উপকার করছেন বলতে হবে।

আর যেখানেই যান, জুপিটারে যাবেন না

এই গ্রহটি যদিও আয়তনে বৃহৎ—পৃথিবীর ৮০০০ মাইল ব্যাসের সঙ্গে এর ৮৬,৭০০ মাইল ব্যাসের তুলনা করলেই যা বোঝা যায়—এর প্রায় সবটাই গ্যাসের উপাদানে তৈরি। এই গ্যাস খুব ঘন আর সেই রকমই ভারী। এই গ্যাসের আবরণের নীচে কোথায় যে এই গ্রহটির কেন্দ্রীয় কঠিন সত্তাটি রয়েছে এবং সেটি যে কত বড়, বা কত ছোট, তা আজও মানুষের অগোচরে। কোন মহাকাশ-যান জুপিটারে গিয়ে যদি নামে ত এর উপরকার ১৪,০০০ থেকে ২০,০০০ মাইল গভীর বায়বীয় আস্তরণের চাপেই সেটার পৌঁছলে যাবার কথা। এই বায়ুর চাপ পৃথিবীর বায়ুর চাপের দশ লক্ষ গুণ বেশী।

এ সত্ত্বেও যানটি কোনও প্রকারে গ্রহপৃষ্ঠে গিয়ে যদি নামে, ত কয়েক হাজার মাইল গভীর চাপ চাপ বরফের হিমবাহের উপর গিয়ে নামবে। হয়ত দেখা যাবে, এই বরফ আবার ঢাকা আছে মিথেন এবং এ্যামোনিয়ার বিষাক্ত পাঁকে।

জুপিটারে নাই বা গেলেন।

এক ঘণ্টায় সংসারের কাজ

গৃহকর্মে সময়-সংক্ষেপ করা নিয়ে যেসব বিজ্ঞানীরা ভাবছেন, তাঁরা ভবিষ্যদ্বাণী করছেন যে, কিছুকালের মধ্যেই আপনার সংসারের যাবতীয় কাজ এক ঘণ্টায় করে নেওয়া আপনার পক্ষে সম্ভব হবে। যে ভ্যাকুয়াম-ক্লিনারের সাহায্যে আপনি ঘর পরিষ্কার করবেন, সেটাকে আপনার ঠেলে নিয়ে বেড়াতে হবে না, সেটা নিজে নিজে চলবে। থালা-বাসন মাজার পর্ব উঠে যাবে, কারণ, সেগুলি হবে প্লাষ্টিকের তৈরী এবং বাড়ীতে তৈরী। আর এগুলি তৈরী করার খরচ এতই কম হবে, যে একবার ব্যবহারের পর স্বচ্ছন্দে সেগুলিকে আপনি ডাষ্টবিনে ফেলে দিতে পারবেন। ঝড়-বৃষ্টি হবার উপক্রম হলেই জানলাগুলি নিজে থেকে বন্ধ হয়ে যাবে। কাপড়ের আলমারিতে ছাড়া কাপড়গুলি ঝুলিয়ে রোজ রাতে শুতে যাবেন, সকালে উঠে দেখবেন, সেগুলি রাতারাতি কাচা হয়ে আছে।

বিশেষজ্ঞরা এমন ভবিষ্যদ্বাণীও করছেন যে, এমন দিন আসছে যখন আপনি কাগজ জাতীয় জিনিষে তৈরী কাপড়-চোপড় পরে কাজে বেরিয়ে যাবেন, তারপর সন্ধ্যায় বাড়ী এসে সেগুলোও ফেলে দিয়ে আসবেন ডাষ্টবিনে। যে ইলেকট্রনিক উনুনে আপনার রান্না হবে তার গায়ে হাত ঠেকে গেলে আপনার হাত পুড়ে যাবে না, কারণ, যদিও খুব জোরালো তাপের উদ্ভব তার মধ্যে হচ্ছে, তার নিজের গা-টা হবে একেবারে ঠাণ্ডা। আপনার দরজার বন্ধ তালা খুলতে আপনার বাড়ীর লোকদের চাবির দরকার হবে না। কারণ, তাদের আঙুলের ডগার সূক্ষ্ম রেখাগুলির সঙ্গে এই তালার পরিচয় থাকবে এবং সেই টিপসইয়ের পরিচয়ে দরজা নিজে থেকে খুলবে।

গাঁজা? এ যুগে কেউ তা বলবেন না।

প্যাপিরাস্ কি পদার্থ

নীল নদের ধারে ধারে হোগলা জাতীয় এক প্রকার উদ্ভিদ্ জন্মায়। তার আঁশবহুল পাতা থেঁৎলে ছেঁচে তার একটির গায়ে আর একটিকে জুড়ে জুড়ে প্রয়োজনমত আয়তন বাড়িয়ে প্রাচীন মিশরের লোকেরা লেখার কাজে ব্যবহার করত। কাগজের সমার্থক ইংরেজী পেপার কথাটির উদ্ভব এর থেকেই।

লেখার কাজে প্যাপিরাসের ব্যবস্থার সুরু হয় ৪০০০ বৎসর আগে। তার আগে এজন্যে মাটির টালি ব্যবহৃত হত। ২০০০ বৎসর আগেকার লিপি-সম্বলিত প্যাপিরাস প্রায় অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। অবশ্য মরুভূমি-বহুল দেশের বিশিষ্ট আবহাওয়া এর মূলে।

সম্মোহন বন্দুক

একটা লোক রাহাজানি করে পালাচ্ছে। পুলিশ তার পিছু নিয়েছে কিন্তু কিছুতেই তার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছে না। এ অবস্থায় একমাত্র



সম্মোহন বন্দুক

উপায়, তাকে লক্ষ্য করে গুলী ছোঁড়া। কিন্তু গুলী খেয়ে লোকটা হয়ত মরে গেল, যদিও তার অপরাধ এত গুরুতর নয় যেজন্যে আদালতে তার প্রাণদণ্ড বিধান হ'ত। এছাড়া বিচার হবার আগে একটা মানুষের প্রাণ নেবার অধিকার কারও ত নেই ?



সম্মোহন বন্দুকের তীরন্দাজী লক্ষ্য

তাই আমেরিকার পুলিশরা এসব ক্ষেত্রে এক ধরণের নতুন বন্দুক ব্যবহার করার কথা ভাবছেন। এই বন্দুক থেকে গুলীর বদলে তীর ছোঁড়া হবে। এই তীরগুলি এত ছোট হবে যে সেগুলি কিছুতেই প্রাণঘাতী হবে না, কিন্তু তাদের ফলায় থাকবে জোরদার সিডেটিভ বা ঘুমপাড়ানো ওষুধ মাখানো। তীর যার গায়ে বিঁধবে তার সঙ্গে সঙ্গেই শুয়ে পড়ে ঘুমিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না।

এই তীরন্দাজী বন্দুক খুব কাজে লাগবে ক্ষেপে-যাওয়া খুনে আর ক্ষ্যাপা কুকুর-শেয়ালের বেলাতেও। এখন এদের গুলী করবার সময় রাস্তার ভিড়-করা লোকদের নিরাপত্তার দিকে খুব বেশী দৃষ্টি রাখা যায় না।

ঢেউ-খাওয়া ট্রেণ

পশ্চিম জার্মানীর উপকূলের নিকটবর্তী সিল্ট উত্তরসাগরের একটি দ্বীপ। একটি ড্যামের উপর পাতা রেলরাস্তা দিয়ে মূলভূমির সঙ্গে এই দ্বীপটির যোগাযোগ। মূলভূমির থেকে বহু নরনারী খেলা-ধূলার জন্যে



ঢেউ খাওয়া ট্রেণ

সিল্ট দ্বীপে যান। তাঁদের যাতায়াতের পথে ট্রেণটিকে জোয়ারের সময় বেশ খানিকটা জল কেটে চলতে হয়। বাতাস জোরে বইলে বড় বড় ঢেউ ওঠে আর সেই ঢেউ ট্রেণটির গায়ে এসে ভেঙে ভেঙে পড়ে। তার উত্তেজনা বেশ উপভোগ্যই হয় যাত্রীদের পক্ষে।

যান্ত্রিক দোকানদার

এই দোকান-যন্ত্রটিতে ৫০ রকম বিভিন্ন জিনিষ রাখা আছে। প্রত্যেকটি জিনিষের নমুনা রাখা আছে কাচে ঢাকা দেরাজে। দেরাজের



কেনা জিনিষ ডেলিভারী বেল্ট বেয়ে চলে আসছে

গায়ে জিনিষগুলির তলায় তলায় ফুটো। ধরুন, জিনিষটির দাম আড়াই ডলার। আপনি ফুটোতে তিন ডলার (মুদ্রায়, নোটে নয়) ঢুকিয়ে

যান্ত্রিক দোকানদারকে দাম দেওয়া

দিলেন। যান্ত্রিক দোকানদারের কাজ শুরু হ'ল। এর ইলেকট্রনিক কান প্রথমে বাজিয়ে দেখে নিল আপনার ডলারগুলো মেকি কি না। যদি একটা ডলার মেকি ব'লে সে বুঝল ত সেই ডলারটি বেরিয়ে এল, আপনি আর একটি ডলার ফুটোতে গুঁজে দিলেন। তারপর বেরিয়ে এল, আপনি খুচরো যেটা ফিরে পাবেন। আর সেই সঙ্গে এল রসিদ। আপনার এইভাবে কেনা সমস্ত জিনিষ এরপর একটা কাউণ্টারে ডেলিভারী-বেল্টের সাহায্যে গিয়ে জমা হবে, আপনার কেনাকাটা শেষ হ'লে সেখান থেকে সেগুলিকে আপনি সংগ্রহ করবেন।

সুইজারল্যাণ্ড তৈরী এই ইলেক্‌ট্রনিক যন্ত্রটির নামকরণ হয়েছে 'জিরোবোট'। যন্ত্রটি কেবল সেল্‌সম্যান-এর কাজই করে না, সঙ্গে সঙ্গে বিক্রি যা হচ্ছে তার হিসাবও রাখে।

সবচেয়ে দ্রুত পায়ে হাঁটার রেকর্ড

১৯৫৮ সালে লোবাস্টভ নামক একজন রুশ ৪ ঘণ্টা ১৬ মিনিট ৮'৩ সেকেণ্ডে ৫০,০০০ মিটার বা ৩১ মাইল পথ পায়ে হেঁটে অতিক্রম করে যান। এতে গড়পড়তা পায়ে হাঁটার গতিবেগ দাঁড়াচ্ছে ঘণ্টায় ৭'২ মাইল। এইটিই—এখন পর্য্যন্ত পৃথিবীর দ্রুততম পায়ে হাঁটার রেকর্ড।

ভূমিকম্পের পূর্ব্বলক্ষণ

পূর্ব্বলক্ষণ দূরে থাক, গত ২রা বৈশাখ কলিকাতায় বেশ জোরদার ভূমিকম্প হয়ে যাবার পরেও সেটার যে কোথায় উৎপত্তি তাই বিজ্ঞানীরা স্থির করতে পারছিলেন না।

আমেরিকার একজন ভূমিকম্প-বিজ্ঞানী, ডক্টর ডীন এস কার্ডার প্রস্তাব করেছেন, ভূপৃষ্ঠের প্রস্তরাবরণের যে-সমস্ত ফাটল-জাতীয় ত্রুটি অধিকাংশ ভূকম্পনের মূলে, সেইরকম কোন জায়গায় মাটির ১০০০ থেকে ২০০০ ফুট নীচে একটি মাইক্রোফোন (যার নাম জিওফোন) বসাবেন। ভূমিকম্প হবার আগে ভূতলের প্রস্তরাবরণে নানারকমের শব্দ অনুভূত হয়। সেগুলির মধ্যে কোন রকমের প্যাটার্ণ বা নিয়মানুবর্ত্তিতা আছে কি না, এবং সেই প্যাটার্ণের সঙ্গে ভূপৃষ্ঠের নড়াচড়ার কোন সম্পর্ক আছে কি না, এই জিওফোনের সহায়তায় তা হয়ত বোঝা যেতে পারে।

প্রস্তাবিত এই নিরীক্ষার জন্যে যা ব্যয় হবে, তার পরিমাণ প্রায় ১০ লক্ষ টাকা।

শোনা যায়, পশুপাখীরা ভূমিকম্পের আসন্নতা আগে থাকতে টের পায়। কি করে পায়, সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান কিছু কি করা যায় না?

স্বয়ংক্রিয় সান্‌-গ্লাস বা রোদের চশমা

নতুন একরকম চশমার কাঁচ আবিষ্কৃত হয়েছে যা সাধারণ অবস্থায় সম্পূর্ণ স্বচ্ছ, কিন্তু রোদের সংস্পর্শে এলেই রোদের তীব্রতা অনুসারে ফিকে থেকে ঘনতর বেগ্‌নী রঙের হয়ে আসে।

এখন পর্য্যন্ত এই আশ্চর্য্য কাঁচের চশমা বাজারে চালু হয় নি এই জন্যে যে, তার এই রঙের ছোপ নেওয়ার কাজটা যথেষ্ট তাড়াতাড়ি হয় না। কিন্তু আবিষ্কর্ত্তারা আশা করছেন, খুব অল্পকালের মধ্যেই তাঁরা এর এতটা উন্নতি-বিধান করতে পারবেন যে, রোদের সংস্পর্শে আসবার এবং রোদের তীব্রতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্ত্তেক সময়ের মধ্যেই এর কাঁচে প্রয়োজন মত রঙের ছোপ ধরবে।

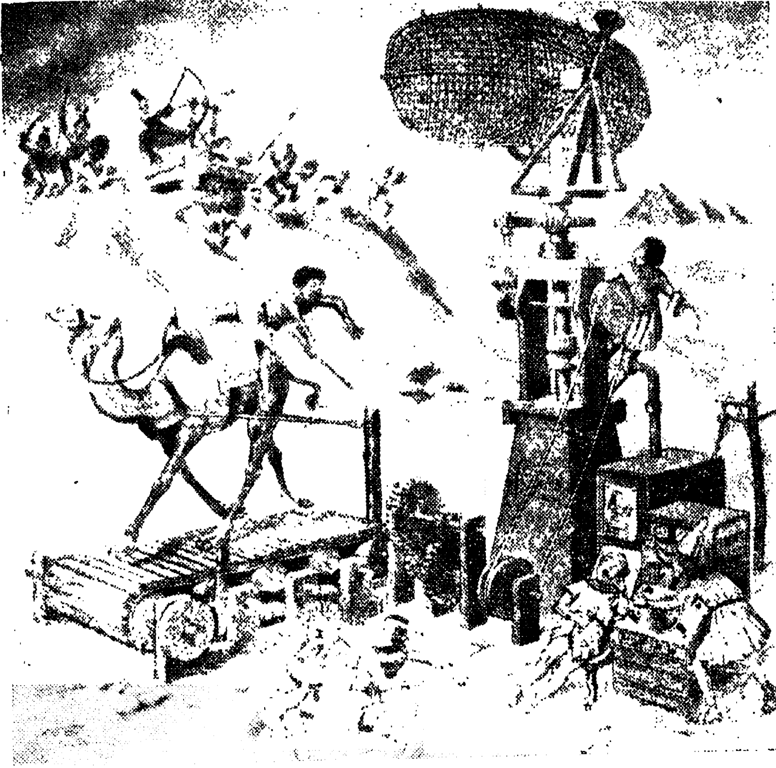
স. চ.

বিচিত্র 'রাডার' কথা

রাডার হ'ল সর্বত্রচক্ষু সমস্তদর্শী যন্ত্র। যেখানে যা কিছু রয়েছে—গোপন কিংবা অজ্ঞাত, সমস্তই রাডারের চোখে ধরা পড়ে। উলটানো ছাতার মতই তার বিশাল "অ্যান্টিনা", এখান থেকে বিশেষ যে আলো নির্গত হয়, জিনিষের গায়ে বাধা পেয়ে তা আবার রাডারের "পর্দা"তেই ফুটে ওঠে। শব্দের প্রতিধ্বনির মত আলোর এই প্রতিফলন। রাডার একাধারে দূরবীক্ষণ এবং আয়না। রাডার মেঘবাহন ইন্দ্রজিতের দুঃস্বপ্ন।

এই রাডারের চোখে অতীতকে প্রত্যক্ষ করুন।

প্রায় দু হাজার বছর আগেকার কথা। খ্রীষ্টপূর্ব ৪৫ সাল। মিশর সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী তখন ক্লিওপাট্রা। সেই ক্লিওপাট্রা ইতিহাসে বহুশ্রুতা, কিংবদন্তীময়ী, লোককান্তা, বহুবল্লভী ক্লিওপাট্রা। এই রহস্যময়ী নারী রাজ্যের সম্পদ্ উজাড় করে যতই বিলাস জীবন যাপন করুন, রাজকাজ



ঘুমে অচেতন রাডার-চালক মোমনদুন তোলমে

আর রাজনীতির ঘোরালো পথে তাঁর মন ছিল উন্মুক্ত। দেশের সীমান্ত জুড়ে বসানো ছিল "রাডার যন্ত্র," যাতে শত্রুপক্ষের গতিবিধি অনেক দূর থেকেই নজরে রাখা যায়। যে সময়ের কথা বলছি খ্রীষ্টপূর্ব ৪৫ সালের ৭ই এপ্রিল তারিখ, যে কোথা থেকে বন্য বর্বর লোকেরা রাজ্যের সীমান্ত জুড়ে লুটতরাজ শুরু করল। রক্ষীবাহিনী যে প্রস্তুত হয়ে প্রতি-আক্রমণ করবে তার সুযোগ মিলল না, তাদের "চোখ"ই যে তখন বাঁধা—রাডারের চালক মোমনদুন তোলমে রাডারের সামনেই ঘুমে অচেতন (কৌতুক দৃশ্য: চিত্র দেখুন)। অসহায়ভাবে দস্যুদের হাতে মারা গেল সবাই, শুধু মোমনদুন-ই যে কি করে পালিয়ে বাঁচল বলা দুষ্কর।

কিন্তু শমন তার পিছু পিছু ছুটল। সীমান্তের অরাজকতা দূর হয়েছে—এবার বিচার আসন।

বিচারে বসেছেন স্বয়ং সম্রাজ্ঞী ক্লিওপাট্রা। কর্তব্য-কাজে অবহেলার জন্য তিনি রাডার-চালক মোমনদুনকে তলব করেছেন। বন্দী মোমনদুন। কি জানি কি তার শাস্তি হয়—স্তব্ধ সভাগৃহে এই একমাত্র জিজ্ঞাসা। অপরাধীর দিকে তাকিয়ে সম্রাজ্ঞী প্রশ্ন করলেন—তোমায় কেন আমার পোষা কুমীরের মুখে ছুঁড়ে দেওয়া হবে না বলতে পার?

—কিন্তু, আমি যদি জেগেও থাকতাম রাডারের চোখে কিছুই ধরা পড়ত না, এ রাডার কোন কাজেই আসত না।

—কেন?

—আজ্ঞে, কারণ এখনো যে Bomac-এর 'রাডার-টিউব' তৈরি হয় নি।

আসামী বেকসুর খালাস পেল।

Bomac বিংশ শতাব্দীর একটা রাডার তৈরীর প্রতিষ্ঠান। অধিক নিষ্প্রয়োজন। বিজ্ঞাপন-বৈচিত্র্য আশা করি উপভোগ করলেন।

কলেরার বিরুদ্ধে

কলকাতা ও বৃহত্তর কলকাতার ৬৫ লক্ষ লোকের কাছে কলেরা প্রতি বছরই দারুণ মহামারী বিভীষিকা। ঋতুচক্রের শীত গ্রীষ্ম বর্ষার মত কলেরাও কলকাতার বছরের হিসাবে বাঁধা থাকে। বসন্তের ফুল ফোটার মত কলেরাও যেন এক প্রাকৃতিক ব্যাপার। মহামারী সহসাই আসে—আকস্মিকতাই তার লক্ষণ; কিন্তু কলকাতার এই মহামারী মারণক্ষমতায় সার্থকনামা হয়েও যেন মহানগরীর প্রাণস্পন্দনের সূত্রে

বাঁধা—সংক্রামক মৃত্যুর দুর্ঘটনায় সাধারণের জীবন শঙ্কাগ্রস্ত করে রাখে। পরিসংখ্যানের কথা যদি বলি—গত বছর মার্চ মাসের মাত্র এক সপ্তাহেই শহরে কলেরা রোগের আক্রমণ ৬২০ এবং ঐ সপ্তাহেই মৃত্যু--সংখ্যা ২০০। বলা বাহুল্য, এমন একটা রোগের বিরুদ্ধে আমাদের আয়োজন যুদ্ধযাত্রার মতই উদ্যোগপূর্ণ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের রাষ্ট্র ও পৌরনায়কদের দৃষ্টি অনেক জটিল পথে ঘুরে শেষ পর্যায় এখানে এসে সংহত হ'তে পারে নি। অবশ্য অতি সম্প্রতি অনেকে এ বিষয়ে সচেতন হয়েছেন, কিন্তু সমাধান সময়সাপেক্ষ।

১৯৫৯ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিশেষজ্ঞরা কলকাতায় কলেরা মহামারী সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের জন্ম এখানে এসেছিলেন। তাঁরা ১৯৬৩ সালে যে বিবরণী পেশ করেন তাতে দেখা যায় যে জন-স্বাস্থ্যসংক্রান্ত এ সমস্যাটি মূলতঃ ইঞ্জিনিয়ারিং। পানীয় জলের সরবরাহ এবং পয়ঃপ্রণালীর সংস্কার এ দু'টিই হ'ল মূল বিষয়। এর বিহিত হলে কলেরা সংক্রামণের সম্ভাবনাও সঙ্গে সঙ্গে লোপ পাবে।

কলেরার বিরুদ্ধে সম্প্রতি আর একটি ক্ষেত্র উন্মুক্ত হয়েছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতায় একটি গবেষণার কার্যক্রম গ্রহণ করে কলেরা চিকিৎসার আধুনিকতম উপায়গুলি অনুধাবন করে দেখা হচ্ছে। এই লব্ধ বিশেষ জ্ঞান ক্রমে ক্রমে দেশের সমস্ত চিকিৎসকদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হবে।

কলেরা জীবাণুবাহী সংক্রামক রোগ। স্বাস্থ্যসম্মত নিয়ম আচরণের সঙ্গে সমস্যাটি গভীরভাবে যুক্ত। জনসাধারণকে এই সমস্ত বিধিনিষেধগুলি সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে হবে। যে দেশের একটা বিরাট অংশ অশিক্ষায় ডুবে আছে—নিজের নামটি পর্যন্ত সই করতে পারে না, সেখানে স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত সাধারণ নিয়মগুলির কথা প্রচার করতে যাওয়াও গুরুতর সমস্যা। কর্পোরেশনের পোষ্টার দিয়ে তাতে বিশেষ কাজ হয় না। সাধারণ মানুষের মনের ভিতর স্বাস্থ্য-নীতির ছোট ছোট কথাগুলি পৌঁছে দিতে হবে। আজকের যুগে সিনেমা তার একটা বিশেষ বাহন। কলেরা রোগের সমস্যা এবং বিপদ্‌গুলি নিয়ে যদি দশ কি পনেরো মিনিটের ছবি গল্পের আয়তনে বেঁধে সাধারণের মত করে হাজির করা যায়, বিষয়টির গুরুত্ব অনেকটা স্পষ্ট হবে। চোখের সামনে ফুটে-ওঠা বাস্তব জিনিষের আলাদা একটা প্রভাব রয়েছে। মনের ঠিক সে জায়গায় এসে ঘা দিতে হবে। তখন যে সমস্ত বিধি-নিয়ম সহজেই পালন করা যায় অথচ উপেক্ষা করা হচ্ছে তাদের গুরুত্ব সম্বন্ধে সবাই সচেতন হয়ে ওঠে। শুধু রেডিওর বক্তৃতা উপদেশ, পুলিসের নিয়ন্ত্রণবিধি নয়, এ ভাবেই কলেরার বিরুদ্ধে মানুষের প্রস্তুতি শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

বিজ্ঞান : বাংলা বই

দুই' কি তিন শ' বছর আগেকার কোন মানুষ যদি রহস্যময় উপায়ে আজকের এই বিংশ শতাব্দীর শেষ মধ্যভাগে এসে উদয় হয় তবে তার চোখে প্রথমে যে জিনিষটি ধরা পড়বে তা হ'ল দুনিয়ার পরিবর্তন। বাস্তবিকই এই সামান্য সময়ের ব্যবধানে সে কি বিপুল পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের মূলে হ'ল বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের ধ্যান-ধারণা ও রীতি-নীতিগুলি গ্রহণ করেই মানুষ আজকে বিংশ শতাব্দীর এই মধ্যভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও বিজ্ঞানের প্রভাব আজ সুদূরপ্রসারী। এই বিজ্ঞান অধিকাংশ মানুষের কাছেই কিন্তু অজানা, আকাশের চাঁদের মতই তা আমাদের মধ্যে থেকেও আমাদের বড় অপরিচিত। বিজ্ঞান সম্বন্ধে সাধারণের যা কিছু ধারণা তা বড় বড় কতকগুলি ঘটনাকে আশ্রয় করে—খবর কাগজে যা প্রকাশ পায়, কিন্তু মূল বিষয়গুলির সঙ্গে পরিচয় না থাকায় এ সমস্ত বৃহৎ ঘটনাগুলি তাদের কাছে মোটেই তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে না। বিজ্ঞানকে আরও গভীরভাবে পেতে হ'লে সাধারণের জীবিকা, জীবন ও ধারণার জগতে পেতে হলে বিজ্ঞানের মূল বিষয়গুলি আরও ভালভাবে জেনে নিতে হবে। তার একমাত্র উপায় এই উপযুক্ত বই। যে বই বিজ্ঞানের দুরূহ দিকগুলি যথাসম্ভব গোপন রেখে মূল সত্যটিকে সাধারণের মত করে তুলে ধরবে। মাতৃভাষা এর যোগ্য মাধ্যম। এ কথা আজ সর্বস্বীকৃত। কিন্তু সে উদ্দেশে উদ্যোগ আয়োজন কই? বাংলায় বিজ্ঞানের বই প্রকাশ হয় কয়টি? বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষার মর্যাদায় স্থায়ী করতে হ'লে বিজ্ঞানের দিকে নজর দিতে হবে। হিন্দী এ বিষয়ে অনেক এগিয়ে আছে। আর ইংরেজী? বলা বাহুল্য, শিক্ষার শেষতম পর্যায়ে তা হ'ল আমাদের বিজ্ঞান-শিক্ষার একমাত্র ভাষা। কিন্তু সাধারণের জন্য বিজ্ঞানকে মাতৃভাষার ঘরে নিয়ে আসতে হবে। তা না হ'লে বিজ্ঞানের মহৎ সম্ভাবনাগুলি অনেকাংশে খর্ব হবে।

বিজ্ঞান আলোচনায় বাংলা ভাষার অবস্থা যে কি নীচু পর্যায়ে তা এই তালিকা থেকেই স্পষ্ট হবে।

॥ ১৯৬০ সালে প্রকাশিত বিজ্ঞান-বিষয়ক বই ॥

	রসায়ন পদার্থ বিদ্যা গণিত ইত্যাদি	ইঞ্জিনিয়ারিং	চাষবাস	অন্যান্য	মোট
বাংলা	৩৫	২	৩	১৩	৫৩
হিন্দী	৬১	২	৮	২৫	৯৬
ইংরেজী	১৮৮	৫৮	১১	৫০	৩০৭

॥ ১৯৬১ সালে প্রকাশিত বিজ্ঞান বিষয়ক বই ॥

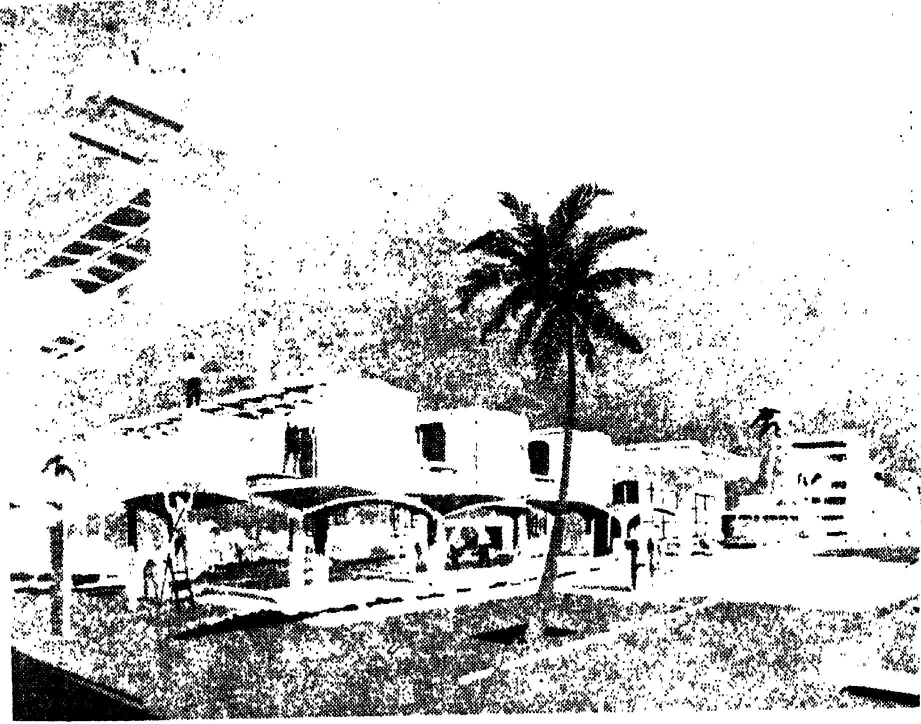
	রসায়ন পদার্থবিদ্যা গণিত চিকিৎসা ইত্যাদি	ইঞ্জিনিয়ারিং	চাষবাস	মোট
বাংলা	৪৫	৫	৩	৫৩
হিন্দী	৬৪	৪	১৪	৮২
ইংরেজী	২১৯	৪৩	১৪	২৭৬

হোমিওপ্যাথি ও স্কুলপাঠ্য বই নিয়ে এই হিসাব। ১৯৬১ সালে বাংলায় স্কুলপাঠ্য বই ১৬টি। (ন্যাশনাল বিব্লিওগ্রাফী থেকে এই তথ্য সংগৃহীত।)

প্লাষ্টিকের প্রাসাদ

অবাক হবার কিছু নেই। প্লাষ্টিকের বাড়ী শূন্যে প্রাসাদ তৈরীর মত অলীক কিছু নয়। প্লাষ্টিক দিয়ে গড়া বাড়ী শুধু যে সম্ভব তাই নয়, তা যে এখনই রয়েছে। হাঁ, রয়েছে। কবি বলেছেন—

বহুদিন ধরে বহু ক্রোশ ঘুরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়াছি পর্বতমালা,
দেখিতে গিয়াছি সিন্ধু।



হেলিকপ্টারের সাহায্যে প্লাষ্টিকের বাড়ী তৈরি হচ্ছে

দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপর
একটি শিশির বিন্দু।

একটি শিশির বিন্দু শুধু দেখা হয় নি। আমাদেরও তেমনি প্লাষ্টিকের এত চাকচিক্যের মধ্যে সেই পরিচিত প্লাষ্টিকের ঘরগুলি দেখা হয়ে ওঠে নি। দেখা হয় নি বলতে দেখেও চিনে উঠতে পারি নি। বাংলার গ্রামে গ্রামেই তা রয়েছে, আমাদের অনেকেই তাতে বাস করেছি অথবা এখনো করি। আর ভূমিকায় কাজ কি: কাদাও প্লাষ্টিক, মাটিও প্লাষ্টিক। কাদামাটির ডেরা কে না দেখেছে? প্লাষ্টিক লোহা বা অ্যাসবেস্টসের মত বিশেষ কোন জিনিষের নাম নয়, প্লাষ্টিক এক জাতের কতকগুলি জিনিষের নাম। সেলুলোজ যেমন—কাগজ এবং কাপড় দুই-ই সেলুলোজ। অ্যালয় (Alloy) গুলি যেমন—জার্মান সিলভার, গান মেটেল, পিতল, ব্রোঞ্জ সমস্তই হ'ল এক-একটি অ্যালয়। পাড়া-গাঁয়ের দীনদরিদ্র বাড়ীগুলিও এভাবে প্লাষ্টিকের বাড়ী।

তবে আমরা বলছিলাম আর এক ধরণের প্লাষ্টিকের কথা। জিনিষের দ্রব্যগুণ (Physical Properties) বিচারে তারাও প্লাষ্টিক, তবে এই প্লাষ্টিক আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কার। হাজার রকমের প্লাষ্টিক এ পর্যন্ত তৈরি হয়েছে, আরো হাজার রকমের তৈরি হবে। এদের মধ্যে আমরা যে প্লাষ্টিকের কথা এখানে বলতে চাই—এখনো তার ব্যবহার সুরু হয় নি বটে, তবে বাড়ী তৈরীর উপকরণ হিসাবে তা আদর্শ। ইট বালি সিমেণ্টের মিশ্রণ (Mortar) বাড়ী তৈরির পক্ষে অতুলনীয়, কিন্তু তা গড়ে তোলার অসুবিধাগুলিও কম নয়। শক্ত অথচ খুবই হালকা—সহজে বহন করা যায় সহজে তৈরি করা যায়, এমন কোন উপকরণ যদি সম্ভব হ'ত—এ কথা অনেকেই চিন্তা করে আসছেন। একমাত্র প্লাষ্টিকের মধ্যেই এটা সম্ভব হ'তে পারে। বিজ্ঞানী—তাঁরা আশাবাদী—ভবিষ্যতের উপর ভরসা রাখছেন। তন্তুময় এক ধরণের কাচ আছে Glass fibre) তা দিয়ে প্লাষ্টিককে আরও শক্ত (reinforced) করে নিয়ে বাড়ী নাকি তৈরি করা যাবে। শিল্পী ভবিষ্যতের এই ছবিটি এখানে এঁকেছেন। প্লাষ্টিকের তৈরি 'চালাগুলি' (shed) হেলিকপ্টারে বয়ে আনা হচ্ছে। একটা কারখানা তৈরি হ'তে আর ক ঘণ্টা চাই। প্লাষ্টিক এভাবে মানুষের জন্য আশ্চর্য ভবিষ্যৎ রচনা করছে।

একটি প্রতিষ্ঠানের সুবর্ণ জয়ন্তী

গভর্ণমেণ্ট টেষ্ট হাউস—সাধারণের কাছে যা আলিপুর টেষ্ট হাউস নামেই বেশি পরিচিত—সম্প্রতি তার সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হ'ল। গত ২১ ২২ ও ২৩শে মার্চ্চ তারিখে এ উপলক্ষে যে বিস্তৃত অনুষ্ঠান আয়োজিত

হয়, খবর কাগজে অনেকেই তা লক্ষ্য করে থাকবেন। শিল্পদ্রব্যের প্রদর্শনীটি বিচিত্রধর্মী ছিল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়-সংক্রান্ত আলোচনা সভায় বহু বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ার নিজেদের অভিমত পেশ করেছিলেন। উৎসব-মুখর আবহাওয়ায় রঙ বেরঙের তোরণ এবং কর্মীদের ব্যস্ত-সমস্ত ভাবের মধ্য দিয়ে জাতীয় শিল্প-বিন্যাসের এই উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান এভাবে গত পঞ্চাশ বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে তার বর্তমানকে দর্শনীয় এবং ভবিষ্যতের পথটি যাচাই করে নিল।

আলিপুরে গিয়ে গোপালনগরের মোড়ে ওল্ড জজ্ কোর্টের ঐ মস্ত বাড়ীটি অনেকেরই চোখে পড়ে, কিন্তু প্রাসাদপুরী কলকাতার অসংখ্য বাড়ীর মধ্যে বিশেষ এই বাড়ীটির কথা মনে বেশিক্ষণ স্থান পায় না। পথিক হয়ত জানেন, হয়ত বা জানেন না—এটিই টেষ্ট হাউস, সরকারী কোন কর্মশালা। তবে বোধহয় জানেন না, এই আলিপুর টেষ্ট হাউসটিই হ'ল ভারতের শিল্পদুনিয়ার রাজধানী। দিল্লী নয়, শিল্পাগ্রসর নাগে নয়, বাংলার রাজধানী এই কলকাতা—কলকাতার এই বিশেষ প্রতিষ্ঠান।

মানুষ ও যন্ত্র মিলে যে অভিনব জগৎ, তার ফসলগুলি কি রকম হ'ল বুঝে নেওয়া চাই। চাষবাষের বেলায় যেমন। ক্ষেতে ধান হ'ল কি পাট হ'ল কি গম হ'ল। এই ধান রূপশাল না বাসমতী, পাটের আঁশগুলি খুব সূক্ষ্ম, লম্বায় বড় না কি পোকায় কাটা, গমের দানাগুলির সাদাটে না তামাটে রঙ। এ সমস্তই দেখে নেওয়া চাই, বুঝে নেওয়া চাই। শিল্পের জিনিষগুলি প্রকারে প্রকরণে প্রায় অসংখ্য। যাচাই করার প্রশ্নটি তাই এখানে অনেক জটিল। সে সঙ্গে গুরুতর। সভ্যতা বলতে যে ধ্যান ও কর্মপদ্ধতি মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে (এবং অনেকের মতে দুর্দশারও) উপকরণ জোগাচ্ছে, যন্ত্রের ছোট-বড় চাকার "মন্থনে" তা তৈরি হয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, আমাদের খাওয়া-থাকা চিন্তা সব কিছুর সঙ্গেই তা মিলেমিশে আছে। জানলার ভিতর দিয়ে বাইরের দিকে তাকালাম, চশমার কাঁচে বাইরের বিশ্ব প্রকাশিত হচ্ছে—চশমার ঐ কাঁচটা, ঘরে বসে আছি মাথার উপরকার ঐ পাখাটা, বিজলীর আলোটা, লিখছি—কাগজটা কলমটা কালিটা, সভ্যতার নানা উপকরণ এভাবে সামান্য সাধারণ হয়ে ছড়িয়ে আছে। যা নিয়ে আমরা আছি, যা ছাড়া আমরা পারি না, অথচ সে সম্বন্ধে সচেতনও না। সমস্ত মানুষ সমস্ত, সংসার—এই সভ্যতামগ্ন পৃথিবীটাই যেন এক বিরাট কারখানা। কারখানায় যেমন লোহালক্কড় টুকরো-টাকরা ইতস্তত ছড়ানো বিছানো বিক্ষিপ্ত, কেউ তাদের দিকে তাকায় না, বরং মাড়িয়ে চলে, অথচ এ সমস্তই কারখানার প্রাণ, যন্ত্রের প্রয়োজনকে জুগিয়ে চলে; মানুষও তেমনি এত কিছু পেয়ে পাওয়ার গুরুত্ব সম্বন্ধে অবচেতন থাকে, তার চারদিকে যে বিচিত্র উপকরণ—যা তাকে তার বর্তমান রূপে বিবর্তিত করেছে—সে বিষয়ে সে কশ্চিৎ চিন্তা করে। আর চিন্তা করেই বা কূল কি? কত ধরণের জিনিষ, কত রকম তার গড়ন—জীবনযাত্রার প্রয়োজনে তার এটি কিংবা ওটির হামেশাই দরকার হচ্ছে—কখন প্রত্যক্ষভাবে কখন বা পরোক্ষভাবে, অথচ কোনটার কি গুণাগুণ, কি তার ব্যবহার ইত্যাদি বিশদ জানতে যাওয়া বোধহয় ধানচাষের আগে সমস্ত উদ্ভিদবিদ্যা রপ্ত করার চেয়েও শক্ত ব্যাপার। শুধু শক্ত নয়, অসম্ভব ব্যাপার। একের যা সম্ভব নয় প্রতিষ্ঠান তা করে, এক্ষেত্রে আলিপুর টেষ্ট হাউস। পাখা আমি কিনলাম বটে, কিন্তু তার ভালমন্দ খুঁটিনাটি আমি যতটা বুঝে নিয়েছি, আমার হয়ে এই প্রতিষ্ঠান তা আরো পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাই করে নিল। ঘরে বাতি জ্বালার জন্য যে 'সুইচ'-টি (Switch) আছে তা বোধহয় এক হাজার বার জ্বালিয়ে-নিভিয়ে দেখা হয়েছে কেমন কাজ করছে। আরে—এই বেকেলাইট (Backelite) চলবে না, লোকে 'শক' (Shock) খেতে পারে, সুতরাং প্লাগ (Plug) যদি তৈরি করতেই চাও ভাল জিনিষ নিয়ে এস। তোমার কালিতে কালিমা কম নেই, তবে তলানি যে পড়ে সামলে নাও। তুমি রঙ বানাচ্ছ, কিন্তু কিছুদিন পড়েই যে তা উঠে যায়—বাজারে এটি চলবে না। আরে, কি করছ, 'ওয়েল্ডিং' (Welding) আরো ভাল কর—ধাতুতে ধাতু জোড়া লাগুক, তোমরা করছ বয়লার (Boiler) ষ্টীম যাতে তৈরি হয়, ভাল জোড় না খেলে যে ফেটে চৌচির হবে, অতএব সাবধান। এমনি নানা ব্যাপার। হাজার চোখে লক্ষ দিকে চোখ রাখা। জিনিষের মান যাতে বজায় থাকে। খুঁত যাতে না থাকে। লোকে কত প্রয়োজনে জিনিষ ব্যবহার করে, গুণাগুণ সে জানে না। টেষ্ট হাউসের গুরুত্ব তাই বেড়ে গেছে। ব্রহ্মপুত্রের উপরে তৈরি হচ্ছে পোল, কত লোক কত গাড়ি পারাপার করবে—ব্রীজ আছে এটুকুই তারা জানে, সমস্ত দায়িত্ব তাই টেষ্ট হাউসের। পরীক্ষা করে তারা যদি নিশ্চিন্ত হন তবেই ছাড়পত্র মিলবে।

শিল্পদুনিয়ার যে রাজধানী তার হ'ল এই কাজ। পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ এবং সেই মত মন্তব্য প্রকাশ। সমস্ত দেশ জুড়ে চলছে হাজার রকম কার্য। টেষ্ট হাউস তাদের প্রতিটি বিষয়ে নজর রাখে। সবই তাদের গোচরে থাকে। দরকার মত নিয়ন্ত্রণ করে। আমাদের জামা জুতো কাগজ কলম থেকে সমস্ত কিছুর মধ্যে এই নিয়ন্ত্রণ ছড়িয়ে থাকে। প্রত্যক্ষভাবে নয়, পরোক্ষভাবে। গত পঞ্চাশ বছর ধরে তা করেছে, আগামী বছরগুলিতেও তাই করবে। আমরা সাধারণ মানুষ তা জানতে পারি না। নিয়ন্ত্রণের এর থেকে ভাল নিদর্শন আর কি হ'তে পারে? আলিপুরের ভিতর দিয়ে ট্রাম যায়, বাস চলে, অনেক বাড়ীর ভিড়ে আমরা জানতেও পারি নি এই ১১ নং ওল্ড জজ কোর্ট রোডের উপর রয়েছে যে টেষ্ট হাউস তা হ'ল ভারতের শিল্পদুনিয়ার রাজধানী। অদৃশ্য নিয়ন্ত্রণের সুতোয় সারা দেশের শিল্পজাত জিনিষের মান নির্ধারণ করছে।

এ. কে. ডি.

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতার জন্ম-মৃত্যুর হিসাব-নিকাশ :

কলিকাতা কর্পোরেশনের বাৎসরিক মৃত্যুর যে খতিয়ান সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে কলিকাতায় শিশু-মৃত্যুর পরম উদ্বেগজনক একটি চিত্র প্রকট হইয়াছে। ১৯৫৮ হইতে ১৯৬১ সালে এই তিন বৎসরে এই মৃত্যু সংখ্যা ছিল ১,০০,৬০৯—কিন্তু এই সংখ্যার মধ্যে শিশু-মৃত্যু ছিল ২৬,৭৭২টি।

কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রকাশিত সাম্প্রতিক রিপোর্টে দেখা যাইতেছে যে—কলিকাতায় একদিকে যেমন হিন্দুর জন্মহার হ্রাস পাইতেছে, অন্যদিকে তেমনি মুসলমান এবং খ্রীষ্টানদের জন্মহার ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে ১৯৬১-৬২ এবং ১৯৬২-৬৩ সালের সম্পূর্ণ বাৎসরিক রিপোর্ট এখন প্রস্তুত হয় নাই। ১৯৬৩-৬৪ সালের বাৎসরিক রিপোর্ট প্রণয়নের কাজ এখনও সুরু হয় নাই—এরূপ প্রকাশ।—নাগরিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে এই বিষম উদাসীনতা কর্পোরেশনের কর্তব্যনিষ্ঠার বহু প্রমাণের মধ্যে, আর একটি জলন্ত প্রমাণ বলিলে আশা করি কলিকাতা কর্পোরেশনের মালিক কাউন্সিলারগণ অপরাধ লইবেন না।

নিম্নে বৎসর অনুযায়ী মৃত্যুহার দেওয়া হইল :

বৎসর অনুযায়ী মৃত্যুর সংখ্যা

সাল	মোট মৃত্যুর সংখ্যা	শিশুর মৃত্যু
১৯৫৮-৫৯	৩৩,২৬৯	৯,১১৭
১৯৫৯-৬০	৩৪,৩৮৩	৯,০৮৬
১৯৬০ ৬১	৩২,৯৫৭	৮,৫৬৯

ঐ তিন বৎসরে শিশু-মৃত্যুর হার ছিল প্রতি হাজারে যথাক্রমে ১২৮.৮১, ১২৮.৬৫ এবং ১২০.৮৬।

রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, মুসলমানদের মধ্যেই শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা সর্ব্বাধিক। ইহার প্রধান কারণ, নিম্নশ্রেণীর মুসলমানেরা কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া চিকিৎসার এবং ধাত্রীদের উপদেশ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া থাকেন।

নিম্নে তিন বৎসরে প্রতি তিন হাজারে সম্প্রদায়গত মৃত্যুর হার দেওয়া হইল :

বৎসর	জাতি	মৃত্যু
১৯৫৮-৫৯ হইতে	মুসলমান	১১১৯.২৫
১৯৬০-৬১।	খ্রীষ্টান	৩৯৮.২৭
	হিন্দু	৩৩৪.৯০

রিপোর্ট অনুযায়ী ঐ তিন বৎসরে মোট ২ লক্ষ ১২ হাজার ৫৪টি শিশুর জন্ম হইয়াছিল। উহাদের জন্মের সাত দিন হইতে এক মাসের মধ্যেই মৃত্যু-সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশি।

১৯৪১-৪২ সালের পর হইতে শিশুদের মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে। ১৯৪২-৪৩ সালে শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৩৭১৫। গত ২৩ বৎসরের মধ্যে ইহাই সর্ব্বনিম্ন সংখ্যা। ১৯৫০-৫১ সালে সর্ব্বাপেক্ষা বেশি শিশুর মৃত্যু হইয়াছিল। এই বৎসর মোট শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ১২,২৫৫।

সাধারণতঃ পুরুষ অপেক্ষা নারীর মৃত্যু-সংখ্যা বেশি। তিন বৎসরে প্রতি তিন হাজারে নারী-মৃত্যুর হার ছিল ৪৬.৩৪ এবং পুরুষদের মৃত্যুর হার ছিল ৩৪.৩৪।

যক্ষ্মা

হেলথ অফিসার তাঁহার রিপোর্টে স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন যে, যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়া নাগরিকদের স্বাস্থ্যের চরম অবনতি ঘটিতেছে। ৩ বৎসরে যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়া ১৪৩৩ জনের জীবনাবসান হইয়াছে। গত ৩৬ বৎসরের মধ্যে যক্ষ্মা রোগে ১৯৫২-৫৩ সালেই সর্ব্বাধিক মৃত্যু হয়। ঐ বৎসরে মৃত্যু-সংখ্যা ছিল ৩৪২২। ১০ হইতে ৩০ বৎসরের মেয়েদের মৃত্যু-সংখ্যা পুরুষদের দ্বিগুণ। ইহার প্রধান কারণ মেয়েদের কম বয়সে বিবাহ। নিম্নে বৎসর অনুযায়ী প্রতি হাজারে ১০ হইতে ৩০ বৎসরের পুরুষ ও নারীর মৃত্যুর হার দেওয়া হইল :

বৎসর	পুরুষ	নারী
১৯৫৮-৫৯	.৮১	২.১০
১৯৫৯-৬০	.৭৭	১.৭৩
১৯৬০-৬১	.৭৪	১.৫৯

যক্ষ্মা রোগেও মুসলমানদের মৃত্যু-সংখ্যা বেশি

বিভিন্ন রোগে মৃত্যু

১৯৫৮-৫৯ সাল হইতে ১৯৬০-৬১ সাল পর্যন্ত কলেরা রোগে ২৬৭৯, বসন্ত রোগে ২৫৭, টায়ফয়েড রোগে ১৪২২ এবং শ্বাসকষ্টে ১৬,৬২২ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

জাতি অনুযায়ী জন্ম-সংখ্যা

সাল	হিন্দু	মুসলমান	খ্রীষ্টান
১৯৫৮-৫৯	৬৬,১২০	৩,৬৪৯	৭১৬
১৯৫৯-৬০	৬৫,৪৫৮	৩,৭৬৭	৯৫৩
১৯৬০-৬১	৬৪,৩৭৬	৫,০৪০	১০৫২

উপরে প্রদত্ত পরিসংখ্যান হইতে দেখা যায় যে, কলিকাতা শহরে হিন্দুর জন্মহার কমিতেছে এবং মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের জন্মহার বাড়িতেছে।

এই মৃত্যুর খতিয়ান সম্পর্কে মন্তব্য করিবার বিশেষ অবকাশ নাই। তাহা সত্ত্বেও কয়েকটি কথা এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে। বিশেষত যক্ষ্মা সম্পর্কে।

যক্ষ্মা-নিরোধ

যক্ষ্মা আজ বাংলা দেশে কি ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে তাহা হয়ত সকল জনের জানা নাই। যক্ষ্মা আজ বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীকে ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে এবং এই যক্ষ্মার গতিরোধ করিতে রাজ্য সরকার এবং যক্ষ্মা সমিতিগুলি কিছু কাজ অবশ্যই করিতেছেন। কিন্তু কয়েকটা যক্ষ্মা-ক্লিনিক এবং হাসপাতালে যক্ষ্মাক্রান্তদের জন্য কিছু বেডের সংখ্যা বৃদ্ধি করিলেই কার্য্যোদ্ধার হইবে না। মূলে আঘাত না করিলে যক্ষ্মাকে ভিটাছাড়া করা অসম্ভব। এবং যক্ষ্মাকে এই মূলে আঘাত করিতে হইলে :

বাঙ্গলা দেশের সাধারণ মানুষের জীবন-ধারণের জন্য— নিম্নতম মানের ভাল এবং প্রচুর ডাল-ভাত তরকারির যোগানের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মানুষের মত বাঁচিবার, বসবাস করিবার জন্য সামান্য আলোবাতাস-যুক্ত আবাস এবং বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। এই দিকে সর্ব্বপ্রথম দৃষ্টি না দিয়া—যক্ষ্মা সম্পর্কে বড় বড় বক্তৃতা, পোষ্টার, ম্যাজিক লণ্ঠন স্লাইড, দু-একটা রঙ্গীন পুস্তিকা, 'যক্ষ্মা-মারী টিকিট' প্রকাশ করিয়া বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কোন বিশেষ উপকার করা যাইবে বলিয়া মনে করি না।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। সংবাদপত্রে এবং অন্যান্য বহু পুস্তক-পত্র-পত্রিকার Anti—Tuberculosis Worker (যক্ষ্মা-নিরোধ কর্ম্মী) হিসাবে বহু ডাক্তার এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে কয়জন মনেপ্রাণে প্রকৃত anti-tuberculosis worker তাহা জানিতে ইচ্ছা হয়। যতদূর জানা যায়— সখ কিংবা 'নাম-কা-ওয়াস্তে' বহুজন যক্ষ্মা-দমন নামক বিষম দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিজেদের জড়িত করিয়াছেন। নিজেদের পেশাগত কাজকর্ম্ম তথা অর্থোপার্জ্জনের দিকটা সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া—অবসর সময়ে সভা-সমিতি-কমিটি করিয়া যক্ষ্মা দমন কতখানি সম্ভব?

আমাদের বক্তব্য এই যে, 'অনাহারী'-বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পরামর্শদাতা হিসাবে রাখা যাইতে পারে, কিন্তু যক্ষ্মা-দমনের সকল ব্যবস্থা, সকল কার্য্যকর পন্থা (ডাক্তার এবং অ-ডাক্তার সবই) 'আহারী' অর্থাৎ বেতনভূক সুনির্ব্বাচিত ব্যক্তিদের উপর ন্যস্ত হওয়া উচিত। এই সকল ব্যক্তি সর্ব্বসময়েয় জন্য যক্ষ্মা-দমন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন। ডাক্তার হইলে, তাঁহাদের চেম্বার কিংবা প্রাইভেট প্র্যাকটিস বর্জ্জন করিয়া—উপযুক্ত বেতনে যক্ষ্মা-দমনরূপ বিষম দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্ম কিংবা ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। একথা এই কারণে বলিতেছি—অবৈতনিক চেষ্ট্ ক্লিনিকের সহিত যুক্ত কোন কোন চিকিৎসকের সম্পর্কে আপত্তিকর নানা অভিযোগ লোকে করিয়া থাকে। চেষ্ট ক্লিনিক হইতে রুগী ভাগাইয়া নিজের চেম্বারে চালান করার অভিযোগও আছে। অবশ্য এ বিষয় প্রমাণ চাহিলে তাহা দেওয়া হয়ত সম্ভব হইবে না। যক্ষ্মা-নিরোধ সম্পর্কে নিম্নে প্রদত্ত পত্রান্তরে প্রকাশিত পত্রখানি উল্লেখযোগ্য :

যক্ষ্মা উচ্ছেদ

সরকার দেশ থেকে যক্ষ্মা বিতাড়নের শুভ সঙ্কল্প গ্রহণে মনোযোগী হয়েছেন। মিটিং হয়েছে, কাগজে কর্ম্মরত বিশারদদের ছবিও বেরিয়েছে। কিন্তু আমরা জানতে চাই 'বাই ফিট্স এ্যাণ্ড পার্টস' পন্থায় যক্ষ্মা বিতাড়ন সম্ভব কি না। দীর্ঘ দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে দেশ থেকে ম্যালেরিয়া উচ্ছেদ হয়েছে। তার জন্যে ডি ডি টি'র আবিষ্কারকদের ধন্যবাদ। ম্যালেরিয়া চলে গেছে কিন্তু আজও প্রদেশে প্রদেশে, গ্রামে গ্রামে ম্যালেরিয়ার মশা আছে কি না জানবার জন্যে শত শত লোক নিযুক্ত। ম্যালেরিয়ার মশা হয়ত নেই, অন্য মশা আছে, থাক্—সে মশার কামড়ে জ্বর হয় কি না এবং হ'লেও সেই জ্বর থাকাকালীন ম্যালেরিয়া-মহল জ্বর যাচাই করবার জন্যে এসে পড়বেন কি না সেটা দৈবাধীন ব্যাপার। যক্ষ্মার সব ষ্টেজেই জ্বর হয় না—আর হ'লেও সে কথা ম্যালেরিয়া

মহলের মারফৎ উচ্চতর মহলে পৌঁছনোর কথা নয়। দিনের পর দিন সরকার ম্যালেরিয়ার পোকা খুঁজে চলেছেন, এদিকে যক্ষ্মার পোকা নীরবে নিভৃতে নিজের কাজ করে চলেছে। সরকার মুখে বলছেন—'রোসো, এবার যক্ষ্মা তাড়াব'। স্বর্গত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বহুকাল আগেই বলেছিলেন শতকরা ৮০ জন লোক আজ অজ্ঞাতে যক্ষ্মাপ্রাপ্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে যক্ষ্মা নির্ণয় পরিকল্পনা গ্রহণের কথাও কানাঘুষা শোনা গিয়েছিল, আজ এতদিন পরেও 'যক্ষ্মা তাড়াব' মিটিং হচ্ছে, নাকেমুখে মাস্ক্ পরে ছবি তুলে 'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া'র মহড়া দিয়ে আর কতদিন লোককে ভুলিয়ে রাখা হবে? কবে আমাদের সরকার যক্ষ্মার 'মাস ইর‍্যাডিকেশনের' কার্য্যকরী পন্থা গ্রহণ করবেন জানতে চাই। ভাল খাদ্য ও অন্যান্য সুষম পরিবেশের দায়িত্ব জনগণের নিজের হাতে রেখেও অন্ততঃ ডি ডি টি'র অনুরূপ কোন ব্যবস্থা করে প্রথম পর্য্যায়ে প্রিভেনশন ও একই সঙ্গে দ্বিতীয় পর্য্যায়ী কিউবের (কিউওরের?) পরিকল্পনা রূপায়ণ সরকার কি করতে পারেন না, যার ফলে যেটুকু দেরি হয়েছে তার বেশী না হয়ে যায়?

—মনোনীতা দেবী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

উদ্ধৃত পত্রের উপর অধিক মন্তব্য প্রয়োজনহীন। যক্ষ্মা প্রতিরোধ কল্পে যক্ষ্মারোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা যে সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য, সে বিষয় দ্বিমত নাই। একথা সকলেই জানেন যে, যক্ষ্মা-বীজাণু এক হইতে দশে, দশ হইতে শতে, শত হইতে হাজারে এবং শেষ পর্য্যন্ত হাজার হইতে লক্ষ লক্ষ জনকে সংক্রমিত করিয়া থাকে এবং বাঙ্গলা দেশে বর্ত্তমানে ইহাই অহরহ ঘটিতেছে।

পশ্চিমবঙ্গের দুইটি হাসপাতাল (১) কে এস রায় টিউবারকিউলসিস হাসপাতাল এবং (২) গোবরার চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল সংলগ্ন রাণী তীর্থময়ী টিউবারকিউলসিস ব্লক—যক্ষ্মা চিকিৎসায় বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছে। যাদবপুরস্থিত কে এস রায় টি বি হাসপাতাল এশিয়ার সর্ব্ববৃহত্তম বেসরকারী যক্ষ্মা হাসপাতাল, এখানে বেডের সংখ্যা ৭৫০। এই হাসপাতালে যক্ষ্মা চিকিৎসার জন্য সর্ব্বপ্রকার আধুনিক মেডিক্যাল এবং সার্জিক্যাল ব্যবস্থার পূর্ণ আয়োজন আছে। এই হাসপাতালের যাঁহারা চিকিৎসক—তাঁহাদের মধ্যমণি ডাঃ নরেন্দ্রনাথ সেন। খ্যাতির মোহ ইঁহার নাই, আত্মপ্রচারের বালাইও নাই। ডাঃ সেন স্বর্গত বিধানচন্দ্র এবং কুমুদশঙ্করের হাতে-গড়া লোক এবং ঐ দুই স্বর্গত মহাজনের জন এবং জাতি সেবার ঐতিহ্য তিনি সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা করিতেছেন। ডাঃ সেনের কর্ত্তব্যনিষ্ঠ আদর্শে হাসপাতালের সকল কর্ত্তব্যপরায়ণ ডাক্তার এবং অন্যান্য কর্ম্মী সর্ব্বদা অনুপ্রেরণা পাইতেছেন—এবং সেইমত আর্ত্ত মানব-সেবায় নিজেদের নিযুক্ত রাখিয়াছেন।

চিত্তরঞ্জন হাসপাতালস্থিত টি বি ব্লকটি নূতন এবং ছোট হইলেও ক্রমশ প্রসারিত হইতেছে—বেডের সংখ্যাও বাড়িতেছে। দুইটি হাসপাতালই সাধারণের দানের অপেক্ষা রাখে। দানের অর্থ কোন প্রকারে অপচয় হইবে না, কাজেই এই প্রতিষ্ঠান দুইটি সকলের সাহায্য সহযোগিতা পাইবার অধিকারী।

যক্ষ্মা প্রতিরোধে করণীয় কি?

বাঙ্গলা তথা ভারতের অন্যতম বিখ্যাত যক্ষ্মা-চিকিৎসাবিদ ডাঃ নরেন্দ্রনাথ সেন এ-রাজ্যে যক্ষ্মা প্রতিরোধ করিতে হইলে আমাদের কর্ত্তব্য কি সেই বিষয়ে বলিতেছেন—

"প্রথম কাজ হ'ল—প্রচার ও লোকশিক্ষা। স্কুল, কলেজ, ক্লাব, গ্রাম্য পঞ্চায়েত, হাট-বাজার যেখানেই লোক সমাগম হয় সেখানেই এই রোগ সম্বন্ধে আলোচনা ও প্রচার করা দরকার।

"দ্বিতীয় কাজ হ'ল রোগ নির্ণয়ে সাহায্য করা এবং রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। যাঁরা প্রায়ই সর্দ্দি-কাশিতে ভোগেন তাঁদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এক্স-রে ও থুথু পরীক্ষা করাতে হবে। রোগ ধরা পড়লে রোগীকে কিছুদিনের জন্য আলাদা রাখতে হবে যাতে করে শিশুদের মধ্যে রোগ না ছড়ায়। পল্লীগ্রামে স্বতন্ত্র চালাঘর তৈয়ারী করে এবং সহর অঞ্চলে বারান্দা বা ছাদের এক কোণ ঘিরে রোগীর থাকবার ব্যবস্থা হ'তে পারে।

"যেখানে এটুকুও সম্ভব নয়, সেখানে দেখতে হবে যেন রোগীর খাটে শিশুরা না ঘুমায়। রোগীর থুথু একটা মুখ-বন্ধ কৌটায় লাইজল লোশানে ধরতে হবে।

"যথাসম্ভব শীঘ্র চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে থুথু শীঘ্রই জীবাণু-মুক্ত হয়। সাধারণতঃ অধিকাংশ রোগীই তিন মাসের মধ্যেই অনেকটা সুস্থ ও কর্ম্মক্ষম হয়ে উঠেন, যদিও চিকিৎসা চালাতে হয় অন্ততঃ দুই বৎসর। ধারে-কাছে কোথাও স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা ক্লিনিক না থাকলে ঐরূপ ক্লিনিক স্থাপনের জন্য সরকারকে চাপ দিতে হবে। আজকাল অধিকাংশ ক্লিনিক থেকে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হয়।

"তৃতীয় কাজ হচ্ছে সুস্থ রোগীদের পুনর্বাসন। যাঁরা রোগগ্রস্ত হওয়ার আগে কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন তাঁদের সেই কাজেই ফিরে যাওয়া উচিত, কারণ যে কোনও নূতন কাজের তুলনায় অভ্যস্ত কাজ অনেক সহজ। তবে যে-সব কাজে অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রমের দরকার হয় সে-সব কাজ কয়েক বৎসর না করাই ভাল।

"আসল সমস্যা বেকারদের নিয়ে। সরকার ও সমাজ-কর্ম্মীরা একত্রে সমবায়ের ভিত্তিতে শিল্প-কলোনী খুলে এদের কর্ম্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারেন।

"চতুর্থ কাজ হচ্ছে, ব্যাপকভাবে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের চেষ্টা করা। নিরক্ষরদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার, পরিবার নিয়ন্ত্রণ, বস্তি উন্নয়ন, ব্যাপকভাবে খাদ্য উৎপাদন এবং সমাজকল্যাণে শ্রমদান—এ ধরণের কাজে সবাই কিছু-না-কিছু অংশ গ্রহণ করতে পারেন। ক্ষয়রোগ হওয়ার পূর্ব্বে যাঁরা অবিবাহিত ছিলেন রোগমুক্তির ৪।৫ বৎসর তাঁদের বিবাহ না করাই ভাল। যাঁরা বিবাহিত, তাঁদেরও এই সময়ের মধ্যে সন্তান-সন্ততি না হওয়াই ভাল। যাদের অধিক সন্তান আছে তাঁদের জন্ম-নিয়ন্ত্রণ ক্লিনিকে গিয়ে জন্ম-নিরোধক অপারেশন করিয়ে নেওয়া উচিত।

"ক্ষয়রোগ প্রতিরোধে যারা ব্রতী হবেন—পরিকল্পনার সামগ্রিক রূপটি যেন সর্ব্বদাই তাঁদের সম্মুখে থাকে। শুধু চিকিৎসা ব্যবস্থায় এ রোগ দূর হবে না। দেশের শাসকবর্গ, সমাজকর্ম্মী, চিকিৎসক ও জনসাধারণ প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করলে তবেই এ রোগের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। ম্যালেরিয়া এখন আয়ত্তের মধ্যে। এটমের যুগে আগামী দশ বৎসরে ক্ষয়রোগ কি আয়ত্তে আসবে না?"

আমরা আশা করি সরকারী এবং বে-সরকারী মহলে ডাঃ সেনের প্রস্তাবিত বিষয়গুলি যথাযোগ্য বিবেচিত হইয়া কার্য্যকর করা হইবে। গত প্রায় ৩৫ বৎসর ধরিয়া ডাঃ সেন এ-দেশে বৃহত্তম যক্ষ্মা হাসপাতালে যক্ষ্মা-চিকিৎসায় নিযুক্ত আছেন। হাজার হাজার রোগীর চিকিৎসা করিয়া যক্ষ্মা বিষয়ে তিনি যে জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন, আশা করি তাহার পূর্ণ সুযোগ কর্ত্তৃপক্ষ মহল লইবেন। দুঃখের বিষয় বর্ত্তমানে দেশে প্রকৃত জ্ঞানী-গুণীর আদর-কদর প্রায় নাই। বাক্যবীর এবং কর্ম্মবীর আজ একদরে বিকাইতেছে—বাক্যবীরদের মূল্য হয় কিছু বেশী! আদর বেশী মেকির—আসলের নয়!!

বন-মহোৎসব?

আর কিছুকাল পরেই সারা দেশ জুড়িয়া বন-মহোৎসব ঘনঘটার সহিত পালিত হইবে। কলিকাতার রাজভবনে নারী-নৃত্য এবং বিবিধ সঙ্গীতাদির দ্বারা বন-মহোৎসব সূচিত হইবে। বড় বড় বিশিষ্ট মন্ত্রী এবং উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী দেশের কল্যাণের জন্য বন তথা বৃক্ষের প্রয়োজন কতখানি—সে-বিষয়ে না বুঝিয়াই বহু গুরুগম্ভীর ভাষণ দিবেন এবং উৎসবাগত নর-নারীদের বিষম করতালি দ্বারা ঐ সব ভুয়ো-ভাষণ অভিনন্দিত হইবে। আজ দশ-পনেরো বৎসর যাবৎ ইহাই আমরা অবাক্ হইয়া দেখিতেছি—কিন্তু পুলকিত হইবার শত চেষ্টাতেও পুলক অনুভব করিতে পারি নাই!

প্রতি বৎসর বন-মহোৎসবের সময় বার বার কেবলই মনে হইতে থাকে—দেশের সর্ব্বত্র কেমন করিয়া, কি নিষ্ঠুর অবিবেচনার সহিত বন-সংহার এবং বৃক্ষ-বধ উৎসব সারা বছর ধরিয়াই চলিতেছে। বিশেষ করিয়া আমাদের এই (একদা) শস্যশ্যামলা বাঙ্গলা দেশে। প্রভুরা বন-মহোৎসবের সূচনা কালে এবং তাহার পরেও দেশে কত কোটি বৃক্ষ-চারা রোপণ করা হইয়াছে এবং তাহার শতকরা কতগুলি বড় হইবার অবকাশ পাইয়াছে বা পাইল তাহার কোন সঠিক হিসাব দিবার বা সাধারণজনকে জানাইবার কোন প্রয়োজন বোধ করেন না। বন-মহোৎসবের কারণে অর্থ ব্যয় নেহাৎ কম হয় না, এবং এই অর্থ সমস্তই গরীব করদাতাদের ট্যাক হইতেই যোগান দেওয়া হয়—কাজেই আমরা মনে করি, বিগত পনেরো বছরে বন-মহোৎসব উপলক্ষ্যে মোট কত টাকা ব্যয় এবং কত লক্ষ বা কোটি বৃক্ষ রোপিত হইয়াছে এবং ঐ সব রোপিত বৃক্ষের কি পরিমাণ এখনও বাঁচিয়া আছে এ-হিসাব জনগণের পক্ষ হইতে দাবি করিবার পূর্ণ অধিকার আছে। আমরা যতদূর জানি—প্রতি বৎসর নৃত্যগীত, বক্তৃতা এবং বাণীবর্ষণের ঘনঘটার সহিত যে সব বৃক্ষ রোপণ করা হয়, তাহার শতকরা বোধ হয় ৬০।৭০টি অচিরে অবহেলায় প্রাণত্যাগ করে—বহুক্ষেত্রে সস্নেহ-রোপিত চারাগুলি একটু বড় হইবামাত্র হয় গরু-ছাগলের পেটে যায়, আর না হয় মানব-শাবকদের দ্বারা কর্ত্তিত হইয়া জ্বালানী কাঠে পরিণত হয়। প্রায় সর্ব্বক্ষেত্রেই দেখি—বৃক্ষাদির প্রতি স্নেহ-মায়া-মমতা বন-মহোৎসবের পরেই সকলের মন হইতে বাষ্প হইয়া উর্দ্ধলোকে উঠিয়া যায়। বৃক্ষজগতেও দেখিতেছি 'শিশুমৃত্যুর' হার অতীব ভয়াবহ।

বৃক্ষ-তরুলতারও যে প্রাণ আছে এবং সেই প্রাণেও

মানুষের মত বেদনাবোধ আছে, এ-বোধ আমাদের যতদিন না হইবে, বৃক্ষাদি কাটিতে, পাতা ছিঁড়িতে বা ডাল ভাঙ্গিতে আমরা যতদিন না নিজেদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কর্ত্তন বা ভাঙ্গার দারুণ বেদনা-যন্ত্রণা বোধ করিব, ততদিন পর্য্যন্ত বন-মহোৎসব শুধুমাত্র বাহ্যিক অনুষ্ঠানেই আবদ্ধ থাকিবে। বন-মহোৎসবের অন্তরালে যে নিদারুণ বৃক্ষমেধ যজ্ঞ প্রত্যহ অনুষ্ঠিত হইতেছে—সেদিকে কে দৃষ্টি দিবেন ?

বৃক্ষমেধ যজ্ঞ

কেবলমাত্র কলিকাতা এবং নিকটবর্ত্তী অঞ্চলের কথাই বলিতেছি। বেলগাছিয়া, মাণিকতলা, বেলেঘাটা, ঢাকুরিয়া এবং যাদবপুর—মাত্র এই কয়টি স্থানে যে-কেহ চোখ মেলিলে প্রত্যহ সকাল-বিকাল কি দৃশ্য বিশেষ ভাবে প্রত্যক্ষ করিবেন ? শত শত লরী এবং মহিষ গাড়ি ভর্ত্তি হাজার হাজার কর্ত্তিত বৃক্ষের কাণ্ড চালান হইতেছে, স্থানীয় করাত-কলে চেরাও হইতেছে। বলা বাহুল্য, আশেপাশের (৩০।৪০ মাইল বেড়িয়া) গ্রামাঞ্চল হইতে বিবিধপ্রকার (আম, জাম, কাঁঠাল, শাল, শিরিষ প্রভৃতি বৃক্ষও বাদ পড়ে না) বৃক্ষ অকালে মানুষের হাতে কর্ত্তিত হইয়া কলিকাতা প্রভৃতি শহরাঞ্চলে আমদানী হইতেছে। বর্ত্তমানে এ অঞ্চলের অবস্থা এমনই দাঁড়াইয়াছে যে, অচিরে বৃক্ষমেধ যজ্ঞ প্রতিরোধ না হইলে সারা কলিকাতা এবং নিকট-দূরের সকল অঞ্চল কালক্রমে বৃক্ষহীন হইয়া মরুভূমিতে পরিণত হইতে পারে এবং এ সম্ভাবনা অমূলক নহে। কাজে-অকাজে, প্রয়োজনে বিনা-প্রয়োজনে গাছ কাটা, গাছের ডাল ভাঙ্গা, পাতা ছিঁড়িয়া গাছকে প্রায় ন্যাড়া করিয়া দেওয়া আমাদের বর্ত্তমান জাতীয়-চরিত্র বলিয়া মনে হইতেছে। পূজা-পার্ব্বণ উপলক্ষ্যে দেখিতে পাই—ছেলে-ছোকরা, এমন কি বুড়া-বুড়ীর দলও পরম উৎসাহে কোন নিষেধ না মানিয়া, পরের গাছপালা কাটিয়া, ছিঁড়িয়া (কোন কোন ক্ষেত্রে একটি ফুলের জন্য একটি সম্পূর্ণ গাছকে সমূলে উৎপাটন করিতেও দেখিয়াছি) সমস্ত তছনছ করিয়া দিতে কোন দ্বিধা বা সঙ্কোচ বোধ করে না। এই প্রকার স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তিদের উৎসাহে কেহ বাধা দিতে গেলে, এমন কি ভদ্রভাবে নিষেধ করিলেও তাঁহার নিগৃহীত, অপমানিত হইবার আশঙ্কা, সুপ্রচুর। এই শ্রেণীর লোকেদের বেপরোয়া অত্যাচারে আজ কলিকাতায় কাহারও পক্ষে বাড়ীতে ফুলের গাছ এমন কি টবের ফুল-গাছও রক্ষা করা একপ্রকার অসম্ভব হইয়াছে। সাহেব-পাড়া এবং আলীপুর অঞ্চলের ধনী ব্যক্তিদের বৃহৎ হাতা-ওয়ালা প্রাসাদগুলির বাগানের কথা হিসাব হইতে বাদ দিয়া একথা বলিতেছি—কারণ সেখানে সিপাই-সান্ত্রী এবং মালীদের হাতে প্রহারের ভয় আছে বলিয়া বীর যুবক বালকবাহিনী গাছ ভাঙ্গিতে বা ফুল ছিঁড়িতে ঐ অঞ্চল পরিহার করে—ধর্ম্মোন্মাদনাও এখানে প্রতিহত হয় !

কলিকাতার পথ পার্শ্বে, এবং গড়ের মাঠে এবং লেকের ধারে বড় বড় বৃক্ষগুলি এক একটি করিয়া শুকাইয়া কাঠ হইয়া যাইতেছে। এ বিষয় কর্ত্তাব্যক্তিদের দৃষ্টি কতটুকু পড়িয়াছে জানি না। কলিকাতায় বহু গভীর নলকূপ বসাইবার জন্যই নাকি বৃক্ষগুলি তাহাদের প্রাণস্বরূপ প্রয়োজনীয় জল হইতে বঞ্চিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে—একজন ডাক্তার-বিশেষজ্ঞের মত ইহাই। এ বিষয় কর্ত্তৃপক্ষ মহল কি বিবেচনা করিবেন তাহা কর্ত্তারাই বলিতে পারেন।

এ বিষয় বেশী আলোচনার স্থান নাই। আসল কথা বন-মহোৎসব করিতেই যদি হয়—কর্ত্তাব্যক্তিগণ করুন। কিন্তু এই বন-মহোৎসবের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে বৃক্ষলতাদির প্রতি সমাজের আবালবৃদ্ধবনিতার মনে একটা মমত্ববোধ জাগ্রত হয় সেই চেষ্টা ব্যাপকভাবে করিতে হইবে, অন্যথায় বন-মহোৎসব একটা অসার্থক, লক্ষ্যভ্রষ্ট প্রাণহীন অনুষ্ঠানেই পর্য্যবসিত হইবে।

আর একটি কথা। প্রাচীন কালের কথা ছাড়িয়া দিলে নব্য ভারতে বন-মহোৎসব ব্রত প্রথম অনুষ্ঠিত করেন শান্তি-নিকেতনে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ। এই অনুষ্ঠান তথাকথিত স্বাধীনতা লাভের পর, সমগ্র দেশে প্রসার লাভ করে। ব্যক্তিগত ভাবে জানি গুরুদেবের কি অসীম স্নেহ-মমতা ছিল বৃক্ষলতাদির উপর। শান্তিনিকেতন আশ্রমের প্রতিটি বৃক্ষলতা ছিল তাঁহার পরমাত্মীয় সমান। ভোর রাত্রে যখন তিনি আশ্রমের পথে পথে গাছপালার তলা এবং মধ্য দিয়া বেড়াইতেন সেই সময় তাঁহাকে দেখিলে সত্যই মনে হইত যেন তিনি প্রতিটি বৃক্ষলতাকে সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছেন, তাহাদের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাদের নিকট হইতে মানুষের জন্য কল্যাণ-আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছেন। এ-দৃশ্য যে একবার দেখিয়াছে—চিরদিন ইহা সে মনে রাখিবে। রবীন্দ্রনাথের কাছে বৃক্ষলতা ছিল প্রাণময়, দুঃখ-আনন্দ-বেদনাবোধসম্পন্ন সৃষ্টি, আর সেইজন্যই বৃক্ষলতাকে কেহ আঘাত করিলে সে আঘাত তাঁহার দেহ এবং মনেও লাগিত। বৃক্ষলতা মানুষের অপরিসীম কল্যাণ করে বলিয়াই গুরুদেব বৃক্ষকে দেবতা বলিয়াও অভিহিত করিতেন।

আজ সরকারী আওতায় বন-মহোৎসব যাঁহারা করেন—না-বুঝিয়া এই উৎসব উপলক্ষ্যে গুরুগম্ভীর বাণী প্রদান করেন, তাঁহাদের কয়জন বৃক্ষলতা, পশুপক্ষীকে সত্যই ভালবাসেন, বলিতে পারি না।

আবার জবরদখল ?

১৯৫০ হইতে ১৯৫৬ সাল পর্য্যন্ত—এই ৬।৭ বৎসরে কয়েক লক্ষ উদ্বাস্ত পশ্চিমবঙ্গে জবরদখল জমির উপর কলোনী বা বাস্তভিটা স্থাপন করেন। পুলিস-আদালত এবং বহু হাঙ্গামার পর এই জবরদখল কলোনীগুলির অধিকাংশই সরকারী স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে—বাকীগুলিও অবিলম্বে করিবে বলিয়া মনে হয়। ১৯৫০-৫১ সালে প্রায় বারো (১২) লক্ষ উদ্বাস্ত প্রবল জনস্রোতের মত পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করে। সেই অস্বাভাবিক এবং দুর্য্যোগপূর্ণ অবস্থায় কেহই সম্পত্তির অধিকারের চিরাচরিত প্রশ্ন তোলেন নাই, তুলিতে সাহসও করেন নাই। দেশের এবং জাতির পরম বিপদের সময়, আমাদের সমষ্টিগত বৃহৎ স্বার্থ এবং প্রয়োজনের নিকট ব্যক্তি বা পারিবারিক স্বার্থকে বলি দিতে কেহ কোন আপত্তি করেন নাই। যাঁহাদের জমি এই ভাবে বেদখল হয়, সরকার হইতে তাঁহাদের উপযুক্ত ক্ষতি-পূরণের দাবিও মানিয়া লওয়া হয়। কিন্তু জমি জবরদখলের যে ঘটনা ১৯৫০ হইতে ১৯৫৬ পর্য্যন্ত ঘটিয়াছিল—

..."১৯৬৪ সালে ঐ ঘটনার পুনরাবৃত্তি কি সম্ভব, অথবা বাঞ্ছনীয় ?—এই প্রশ্ন দেখা দিয়াছে, কারণ গত ৭ এপ্রিল যাদবপুরের কাছে জলাজমিতে এবং এক সপ্তাহ পরে শ্রীরাম-পুরের কাছে কতকগুলি ডাঙা জমিতে আবার কিছু লোক জবরদখলের অভিযান সুরু করিয়াছেন। দুইটি ক্ষেত্রেই জবরদখলকারী এবং মালিকপক্ষের মধ্যে প্রত্যক্ষ লাঠালাঠি ঠেকাইবার জন্য পুলিশকে ১৪৪ ধারা লইয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছে; এবং যাঁরা জমি দখলের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁরা দুর্ভোগ, লাঞ্ছনা ও গ্রেপ্তার পর্য্যন্ত বরণ করিতে বাধ্য হইয়া-ছেন। কিন্তু যাঁরা সত্য সত্যই পূর্ব্ববঙ্গের ৯০ লক্ষ সংখ্যা-লঘুর মুক্তি চান এবং সমগ্র ভারতবর্ষে তাঁদের জন্য সহানুভূতি ও আশ্রয়স্থল গড়িয়া তুলিতে চান, তাঁরা এই বিক্ষিপ্ত ঘটনা-গুলিতে উদ্বেগ বোধ করিতে বাধ্য।

কারণ, ১৯৬৪ সালের আবহাওয়া ও ১৯৫১ সালের আবহাওয়া এক নয়। ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৪০ লক্ষ উদ্বাস্ত তাঁদের "হোম ল্যাণ্ড" বা মাতৃভূমির অধিকার লাভ করিয়াছেন। ১৯৬৪ সালে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে যে-নূতন স্রোত আরম্ভ হইয়াছে, তা কবে এবং কোন্ সংখ্যায় গিয়া শেষ হইবে কেহই বলিতে পারে না। অন্তত আমরা বার বার এই দাবি করিয়া আসিয়াছি যে, পাকিস্তানের অনিবার্য্য মৃত্যু, পীড়ন অথবা ধর্ম্মান্তরকরণ হইতে ৯০ লক্ষ নরনারীকে উদ্ধার করার দায়িত্ব আমাদের এবং ভারতবর্ষে এই মানুষগুলির জন্য স্থান করিতে হইবে। সুতরাং একমাত্র পথ হইতেছে, শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, গোটা ভারতবর্ষ এবং উহার ৪৪ কোটি নরনারীকে এই ৯০ লক্ষ মানুষের দায়িত্ব গ্রহণে রাজী করাইতে হইবে এবং তাঁদের দুঃখের সমভাগী করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, এই সর্ব্বভারতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব পশ্চিমবঙ্গের মানুষকেই নিতে হইবে।

"কিন্তু যদি জনভারাক্রান্ত এবং দারিদ্র্যপীড়িত এই রাজ্যের মানুষের উপর আবার জবরদখলের অভিযান চালান হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ববঙ্গের সংখ্যালঘুরা কি পশ্চিমবঙ্গের মানুষের অকুণ্ঠ সহানুভূতি পাইবেন? প্রকৃতপক্ষে কয়েক দিন পূর্ব্বে কলিকাতায় মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত একটি সভায় শ্রীঅতুল্য ঘোষ এই প্রশ্নই তুলিয়া ধরিয়াছেন। গত জানুয়ারী মাস হইতে এই রাজ্যের মানুষ আন্তরিক বেদনা ও সহানুভূতি লইয়া পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের দিকে তাকাইয়াছে—জনসভা, মিছিল ও হরতালে প্রতিদিন পূর্ব্ববঙ্গের ৯০ লক্ষের জন্য এখানে হাজার হাজার কণ্ঠের আবেদন ধ্বনিত হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের পক্ষ হইতে পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে যে, এখনই ১০ লক্ষ উদ্বাস্তর জন্য ভারতবর্ষে জায়গা করিতে হইবে। অর্থাৎ সমস্ত রাজনৈতিক দল এবং এই পশ্চিমবঙ্গের জনমত বৃহৎ আকারে ও বৃহৎ সহানুভূতির ভিত্তিতে সমস্যাটিকে দেখিতেছেন ও দীর্ঘস্থায়ী সমাধান চাহিতেছেন। অন্যদিকে মুষ্টিমেয় কতকগুলি লোক এই সুযোগে নিজেদের "বাড়ী করার বাসনা" মিটাইতে মাঠে নামিয়াছে। এর ফলে কিছু দালাল এবং যাঁরা নিজের স্বার্থ গুছাইবার ফিকির খুঁজিতেছেন, তাঁরা হয়ত লাঠালাঠির দ্বারা কয়েক বিঘা জমি দখল করিতে পারেন। কিন্তু তাঁরা এই ৯০ লক্ষের প্রতিনিধি নন এবং তাঁদের আত্মকেন্দ্রিক অভিযানের ফলে ৯০ লক্ষের স্বার্থ পণ্ড হইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ, সোজা কথা যে, জবরদস্তি ও সহানুভূতি একসঙ্গে বাস করিতে পারে না। আমরা যদি সহানুভূতি ও পবিত্র জাতীয় কর্ত্তব্যের কথা বলি তাহা হইলে জবরদস্তির পথ আমাদের ত্যাগ করিতে হইবে।"

কিন্তু এই জমি দখলে 'নব-অভিযাত্রী' প্রকৃত পক্ষে কাহারা? এ কথা অনেকেই হয়ত জানেন না—ইহারা বহুকাল পূর্ব্বেই পাকিস্তান ত্যাগ করিয়া আসে এবং বিগত দশ-বারো বৎসরে জমি-জায়গা এবং বাড়ীঘর করিয়া বেশ গুছাইয়া লইয়াছে। জনকয়েক এখন নব-জবরদখলকারী আছে—যাহারা বর্ত্তমানে "বাড়ীওয়ালা" এবং মাসিক ভাড়া ১০০ হইতে ২।৩ শ' টাকা বাঁধা আয়ও করিতেছে। যাদবপুর এবং কাছাকাছি অঞ্চলে যে-সকল উদ্বাস্ত গত ১০।১৫ বৎসর যাবৎ সংসার গুছাইয়া এবং

বাড়ী-ঘরের মালিক হইয়া বসবাস করিতেছে, আজ তাহারাই নব-উদ্বাস্তুর ভেক লইয়া পরের জমি বে-দখল করিবার কার্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী উৎসাহী এবং তৎপর! জবরদখল জমিগুলির মালিক শতকরা ৯৯ জনই পশ্চিমবঙ্গ-বাসী—তবে দু-চারজন পূর্ব্ববঙ্গবাসীও (উদ্বাস্তু নহেন) আছেন। নব-জবরদখলকারীদের প্রায় সবাই চাকরি এবং অন্যান্য অর্থকর পেশায় নিযুক্ত আছে।

নূতন করিয়া যদি পুরাণো উদ্বাস্তুরা আবার জমি দখলের হাঙ্গামা সৃষ্টি করে, তাহার ফল তাহাদের পক্ষে ভাল হইবে না বলা বাহুল্য!

এক শ্রেণীর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত উদ্বাস্তু আজ পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া যে-বিক্রম প্রকাশ করিতেছে—সেই বিক্রম যদি পূর্ব্ববঙ্গে কিছুটাও দেখাইতে সাহস করিত—তাহা হইলে বোধ হয় একটা জাতিকে এমন ভাবে হতমান এবং হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া দেশত্যাগ করিতে হইত না।

প্রসঙ্গক্রমে একজন বিশিষ্ট পুরাতন কংগ্রেসসেবীর কথা (যিনি বর্ত্তমানে বিশেষ পদের অধিকারী), বলা যায়, যিনি গড়িয়া অঞ্চলে পরের জমি দখল এবং তাহার উপর দুই-তিনখানি বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া একটিতে নিজে বসবাস এবং বাকীগুলি ভাড়া খাটাইতেছেন! যাহাদের জমি, তাহারা হতভাগ্য পশ্চিমবঙ্গবাসী, কাজেই এ দৃশ্য ফ্যালফ্যালায়িত নয়নে দেখা ছাড়া তাহাদের আর কি উপায় আছে?

আকাশবাণীর কথা

১৯৫২ সালে তদানীন্তন বেতার-মন্ত্রী শ্রীকেশকার ঘোষণা করেন যে, ভারতীয় বেতার প্রতিষ্ঠানকে আইন করিয়া স্বয়ং-শাসিত বেতার কর্পোরেশনে পরিণত করা হইবে। তাহার পর চৌদ্দ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে—কিন্তু এখনও ভারতীয় বেতার প্রতিষ্ঠান রাহুমুক্ত হয় নাই—কোন-না-কোন মন্ত্রীর খাস দপ্তর হইয়া রহিয়াছে। বর্ত্তমানে আকাশবাণীর প্রচার-বার্ত্তা এবং অন্যান্য বেতার ভাষণ শ্রবণে মনে হইবে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যমন্ত্রী মহোদয়গণ, উচ্চপদাধিকারী সরকারী বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি এবং সরকারের অনুগৃহীত একশ্রেণীর চাটুকার-দের—সরকারের বেপরোয়া গুণানুবাদ এবং সেই সঙ্গে আত্ম-প্রচারের প্রশস্ত ক্ষেত্র হইয়াছে এই ভারতীয় বেতার-প্রতিষ্ঠান, —একথাও বলা প্রয়োজন যে, বিশেষ কতকগুলি সবিশেষ অনুগৃহীত ব্যক্তির (অযোগ্য হইলেও) রুজিরোজগারের পীঠস্থান এই বেতার-প্রতিষ্ঠান। বিশেষ করিয়া কলিকাতার বেতার-প্রতিষ্ঠান।

'পল্লীমঙ্গল' নামক আসরের কথাই ধরা যাক্। যে মহাশয় ব্যক্তিটি এই আসরের মোড়ল নামে খ্যাত, তাঁহার বিদ্যা-বুদ্ধি এবং অন্যান্য গুণের কথা কিছু জানা নাই—কিন্তু তাঁহার সম্পর্কে কিছু না জানিয়াও—এইটুকু মাত্র বলিতে পারি তিনি বেলুড় মঠের দালাল জাতীয় কিছু একটা—এবং এই জন্যই বোধ হয় কলিকাতা বেতারে তাঁহার এই 'ব্যক্তিগত' আসরটিকে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব এবং স্বামীজীর বাণী প্রচারের কেন্দ্রে পরিণত করিয়াছেন। প্রায় প্রত্যহ আসর আরম্ভ হইবার সময় তাঁহার কণ্ঠ হইতে ন্যাকা-ন্যাকা স্বরে ও ভঙ্গিতে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী প্রচারিত হইবেই। ঐ বাণীগুলি অবশ্য শুনিবার এবং সকল মানুষের গ্রহণ করিবার মত স্বীকার করিব—কিন্তু তাহার প্রচার যোগ্য স্থান হইতে যোগ্য ব্যক্তির দ্বারা না হইলে—সমস্ত ব্যাপারটাই পরিহাসে পরিণত হইতে বাধ্য। তাহা ছাড়া মোড়ল মহাশয় কি বাঙ্গালী শ্রোতাদের বোকা শিশুর দল মনে করেন? রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভক্ত আমরাও এবং এইজন্যই বলিতেছি ঐ দুই দেবতুল্য মহাপুরুষদের বাণী প্রচারের স্থান বেতারের আড্ডাখানা কখনও হইতে পারে না। মোড়ল হয় ত মনে করেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের উপদেশাবলী, বাণী এবং লেখা তিনি একলাই পাঠ করিয়া-ছেন, বাঙ্গলা দেশের আর কেহ যেন তাহা করেন নাই। এ-ধারণা যদি তাঁহার হইয়া থাকে—তবে তাহা ভুল, মিথ্যা। পল্লীমঙ্গল আসরকে রবিবাসরীয় নীতি-বিদ্যালয় মনে করা অন্যায়। মোড়ল মহাশয় যদি শ্রোতাদের ভালো করিবার, তাহাদের চরিত্রের উন্নতি করিবার এবং সেই সঙ্গে ধর্ম্ম-প্রচারের বৃথা প্রয়াস ত্যাগ করেন, শ্রোতাদের—সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারও কল্যাণ হইবে। পল্লীমঙ্গল আসরের সব কিছুই বাজে, এমন কথা বলি না—কিন্তু এ-আসরের ভালোগুলি বাণী-বিনোদ মোড়লের বাজে ফড়ফড়ানিতে তিক্ত হইয়া যায়। একাধারে ধর্ম্ম-প্রচারক, নাট্যকার, প্রযোজক, নট এবং 'হোয়াট্-নট্' এই মোড়লের প্রতিভা একটু সীমিত করা অত্যাবশ্যক। বিশেষ করিয়া মোড়ল রচিত নাটকগুলির অভিনয় আসরে আর চালান ঠিক নহে। রেডিও-কর্ত্তারা একবার দয়া করিয়া মোড়ল-রচিত নাটক অভিনয় তাঁহাদের লম্বকর্ণ বিস্তার করিয়া যদি শ্রবণ করেন, আমাদের কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এ নাটকগুলি না-টক, না-মিষ্টি, না-তেতো—ইহার তুলনা একমাত্র বস্তা-পচা আলুর সহিত হইতে পারে।

রেডিও-কর্ত্তারা বলিবেন—শ্রোতাদের লিখিত পত্রের দাবী মত এই সব নাটক মাইকস্থ করা হয়। কিন্তু মোড়ল শ্রোতাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত (?) যে পত্রগুলি পাঠ করেন

—তাহার সুর এবং বক্তব্য প্রায় একই রকম। সেইজন্য বহু পূর্ব্বে একবার বলিয়াছিলাম যে—কয়েকটি পত্র টেপ-রেকর্ড করিয়া প্রতি সপ্তাহে একবার প্রচার করিলেই কার্য্যোদ্ধার হইবে।

দিল্লী হইতে বাঙ্গলা সংবাদ-প্রচারকদের (পুরুষ এবং মহিলা), ঢাকা হইতে পাকিস্তানী সংবাদ প্রচার কি ভাবে করা হয়, তাহা একবার শ্রবণ করিতে বলি। পাকিস্তানী সংবাদের সত্য-মিথ্যার কথা বলিতেছি না, প্রচারের ঢং এবং বাচন-ভঙ্গির কথাই বলিতেছি। ভারতের কুৎসা এবং বিবিধ প্রকার নিন্দা পাকিস্তানী (মহিলা এবং পুরুষ) সংবাদ-প্রচারকগণ যে প্রকার জোরের সঙ্গে এবং যে প্রকার বিশুদ্ধ বাঙ্গলায় করিয়া থাকেন, তাহাতে আমাদের শিক্ষা করিবার বহু কিছু আছে। প্রচারের জোরালো ভাষা এবং চমৎকার বাচনভঙ্গির কারণে শ্রোতাদের কাছে পরম মিথ্যাও সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়। কলিকাতা ষ্টেশন হইতে যে কয়জন স্থানীয় সংবাদ প্রচার করেন, তাঁহাদের দিল্লী হইতে সংবাদ প্রচার করিতে দিলে শ্রোতার কর্ণ কিছু আরাম এবং মন আনন্দ পাইবে। দিল্লী হইতে বাঙ্গলা সংবাদ-প্রচারিকাদের কণ্ঠস্বর এবং বাচনভঙ্গী আজ একেবারে অচল হইয়াছে! বিশেষ করিয়া একজন বিশেষ সংবাদ-প্রচারিকার কণ্ঠস্বর এবং বাচনভঙ্গি অশ্রাব্য বিরক্তিকর। বহুকাল পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম এই প্রচারিকাকে সংবাদ প্রচারের ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত হইতে পাগলা কুকুর তাড়া করিয়াছে বলিয়া মনে হয়—এখনও সেই কুকুরের তাড়া থামে নাই! 'ঐ আসে ঐ আসে ভৈরব' গর্জ্জনে পুরুষ সংবাদ-প্রচারকের গুরুগম্ভীর স-ব্যাখ্যা সংবাদ প্রচার শ্রোতার নিকট মহা বিভীষিকার বস্তু! কিন্তু তাহাতে কি? লম্বকর্ণ রেডিও-কর্ত্তার দল দুই কাণে দুই পাউণ্ড তুলা গুঁজিয়া আছেন—শ্রোতাদের কর্ণ-যাতনা এবং মর্ম্ম বেদনা তাঁহাদের নিকট পৌঁছায় না!

—*—

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—কল্যাণ দাশগুপ্ত, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৭৭।২।১ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৪শ ভাগ
১ম খণ্ড

দ্বিতীয় সংখ্যা
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১

বিবিধ প্রসঙ্গ

১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১

আজ হইতে কিঞ্চিদধিক ষোল বৎসর পূর্ব্বে সারা দেশ স্তব্ধ ও বিমূঢ় চিত্তে শোনে জাতির জনকের মহাপ্রয়াণ সংবাদ। সকলের মন উদ্বেগ ও আশঙ্কায় অবসন্ন, "দেশের কি হবে, জাতির ভবিষ্যতে কি আছে?" সম্বিৎ ফিরিবার পরে লোকের মনে পড়িল "জবাহরলাল ত রহিয়াছেন" এবং সেই ভরসায় লোকের মনে আশার আলো আবার জ্বলিল।

তারপর এই দীর্ঘ ষোল বৎসরের অধিক দিন, সেই প্রদীপ, সারা ভারতের আশার আলোক সমানে জ্বলিয়াছে, শত ঝড়-ঝঞ্ঝা অতিক্রম করিয়া, কত দুর্য্যোগ-আচ্ছন্ন দুর্দ্দিনের অন্ধকারে পথ প্রদর্শন করিয়া। আজ দেশের লোক বিচলিত স্তম্ভিত হইয়া শুনিল সে আলোক নিবিয়া গিয়াছে। সকলের মনে একই প্রশ্ন, "এর পর কে? কি আছে এদেশের ভাগ্যে? আর ত কেহই রহিল না, তাহাদের মধ্যে বিঘ্ন-বিপদ দুঃখ দহন তুচ্ছ করিয়া স্বাধীনতার ধ্বজা ধরিয়া রহিবে জাতির জনকের নেতৃত্বে।" রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণ যথার্থই বলিয়াছেন, "সেই যুগ শেষ হইয়া গেল নেহরুর তিরোধানে।" এখন শোকাচ্ছন্ন দেশ ও জাতি নূতন যুগ-সূর্য্যের উদয় প্রতীক্ষায় রহিয়াছে উৎকণ্ঠাপূর্ণ মনে ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে।

ভরসার কথা এই যে, যিনি আমাদের ছাড়িয়া গেলেন তিনি তাঁর কর্ম্মময় জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে সারা দেশ ও সমগ্র জাতিকে অবিশ্রাম চেতনা দিয়া গিয়াছেন জাতির আদর্শবাদ সম্পর্কে, সংহতি এবং সর্ব্বাঙ্গীণ প্রগতি সম্পর্কে। তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষা-দীক্ষায় দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া আমরা যদি লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইতে পারি তবে আমাদের কোনও ভয় নাই। কিন্তু নেতৃত্ব লইয়া বিরোধ যদি হয়, প্রধানমন্ত্রীর আসন লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষ যদি কেহ ছড়াইতে থাকে ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত চিন্তার বশে, তবেই প্রমাদ গণিতে হইবে।

জবাহরলাল নেহরু তাঁহার আসনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, তাহার কারণ তিনি কোনও বিশেষ গোষ্ঠী বা প্রদেশের প্রতিনিধিরূপে সেখানে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন না। তিনি ছিলেন সারা ভারতের সাধারণ জনগণের প্রতিভূ। যাঁহারা তাঁহার চিন্তাধারার ও কর্ম্মপন্থার কথা সত্যসত্যই অবগত আছেন তাঁহারা জানেন যে পণ্ডিত নেহরু জ্ঞাতসারে কোনও প্রদেশ বা প্রাদেশিক জনগণের উপর অন্যায় ব্যবস্থা বা অবিচার সহ্য করিতেন না।

জবাহরলাল নেহরু তাঁহার জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া গিয়াছেন। যাহা তাঁহার আদর্শ ছিল, শত বিঘ্ন-বিপদ অগ্রাহ্য করিয়া নানা প্রচণ্ড বিপদ-বিক্ষোভের আঘাত সহ্য করিয়া তাহা তিনি দৃঢ়হস্তে স্থিরচিত্তে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। সে কথা যেন আমরা চিরদিন মনে রাখি।

অতি-মুনাফা নিরোধ

সম্প্রতি চাউল, মৎস্য এবং সরিষার তৈলের অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধির দিকে সরকারী নজর পড়িয়াছে। ঐ খাদ্য-দ্রব্যের তিনটিরই চাহিদা অত্যধিক এবং উহাদের উপর সাধারণ বাঙালী গৃহস্থের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ খুবই নির্ভর করে। সেই কারণে বাজার সরবরাহ আটকাইয়া উহাদের মূল্যবৃদ্ধির চেষ্টা এতদিন বিক্রেতার দল সকলেই প্রায় করিয়া আসিতেছিল এবং সে চেষ্টা এখনও সফলই হইতেছে। খবরের কাগজে যদিচ "অতি-মুনাফা নিরোধ আইনে বহু ব্যবসায়ী দণ্ডিত" ইত্যাদি সংবাদ পরিবেশন করা হইতেছে, কার্য্যতঃ সেই নিরোধ চেষ্টা সেরূপ ফলপ্রসূ হয় নাই—কারণ দণ্ডের পরিমাণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অতিশয় কম। এবং সেই সঙ্গে ইহাও সত্য সত্যই দেখা যাইতেছে যে, পুলিস ও মুনাফা নিরোধকারীদের জালে চুনা-পুঁটিই পড়িতেছে, রাঘব বোয়াল, হাঙ্গর-কুমীর ধরিবার চেষ্টাও হইতেছে না মনে হয়। অথচ মাছের সরবরাহরোধে ব্যাপকভাবে হিম-ঘরের ব্যবহার এখনও সমানে চলিতেছে, একথা মন্ত্রীদেরও জানা আছে এবং সাধারণ জেলে বা ছোট ফড়িয়ারা ঐরূপ ব্যবস্থা করার ক্ষমতা রাখে না, ইহা সর্ব্বজনবিদিত।

এইরূপ অবস্থার প্রধান কারণ আমাদের শাসনতন্ত্রের অধিকারীবর্গের জনসংযোগের অভাব। তাঁহারা নির্ভর করেন দৈনিক কাগজগুলির উপর, এ বিষয়ে এবং দৈনিক কাগজের মালিক যাঁহারা তাঁহাদের অধিকাংশেরই এইসব বিষয়ে খবর রাখা প্রয়োজন হয় না, কেননা কাহারও নিজের পুকুরেই অজস্র মাছ আছে আবার অন্য কাহারও দৈনিক বাজারে পর্য্যাপ্ত টাকার যোগান থাকায় এই জাতীয় খবরের কোনও গুরুত্ব তাঁহারা বুঝিতে অক্ষম। উপরন্তু গরীব গৃহস্থের ও মধ্যবিত্তের রক্ত শোষণ যাহারা নির্ব্বিবাদে করিয়া চলিতেছে তাহারা জানে কি ভাবে এই দুই পর্য্যায়ের 'দরগায়' সিন্নী কি ভাবে চড়াইতে হয়। বাকী রহিল জন-আন্দোলন—'গণ আন্দোলন' নহে কেননা ঐ বস্তুটি কচিৎ-কদাচিৎ জনসাধারণের দুর্দ্দশা নিবারণে ব্যবহৃত হয়—এবং যেখানে সেটা প্রখর হয়, যেমন হইয়াছিল 'দম্‌দম্ দাওয়াই'য়ের বেলায়, তখন সরকারী ও সংবাদপত্র এই দুই মহলেই টনক নড়ে। অবশ্য এ ছাড়াও আছেন আমাদের সেই মুখপাত্রগণ, যাঁহারা আমাদেরই প্রতিনিধিরূপে সংসদে ও বিধানমণ্ডলে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহাদের অধিকাংশই এ সব 'ছোটকথা' কানে তোলা উচিত মনে করেন না, যত দিন না দলের কর্ণধারবর্গের নির্দ্দেশ প্রত্যক্ষভাবে তাঁহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে।

এত কথা লিখিলাম তাহার কারণ এখনও দেখিতেছি, এসকল বিষয়ে সরকারী মহল সেই আদি-অনন্ত কালের 'লাগে তাক্ না লাগে তুক্' চালেই চলিতেছে। চাউল লইয়া জন-আন্দোলনের ফলে সরকারী মহলে সাড়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে মূল্য নিয়ন্ত্রণও হইল—কিন্তু ফাঁক রহিয়া গেল অশেষ। নহিলে এইবার ফসল ভাল হওয়া সত্ত্বেও বাজার হইতে ধান উধাও হয় কেমন করিয়া? কর্ত্তৃপক্ষ হুমকি দেওয়ায় ও উড়িষ্যা হইতে চাউল আনায় কিছুটা অবস্থার উন্নতি দেখা দিয়াছে, কিন্তু এই কয় দিনের ফাঁকে গরীব গৃহস্থের রক্ত-শোসকদের পেট কিছু ভারী ত হইলই। যে ব্যবস্থার ফলে, যে ক্ষমতা প্রয়োগের হুম্‌কির বশে মজুতদার চাষী ও আড়তদারের গোলা হইতে ধান বাহির হইতেছে, সেই ব্যবস্থা, সেই ক্ষমতা গ্রহণ ও অর্পণ আগে হইতে করিলে কি শাসনতন্ত্র দূষিত হইয়া যাইত?

তবুও ত এখনও এই ব্যবস্থা সব দিকে করা হয় নাই। গরীব গৃহস্থ সপ্তাহের সব দিন কুচো চিংড়ি বা ছোট মাছও কিনিতে পারে না। মধ্যবিত্তের সংসারেও মাছ খাওয়া সব দিন হয় না, মাছের আস্বাদ গ্রহণই অনেক দিন দুষ্কর হইয়া পড়ে। এই দুই শ্রেণীর—অর্থাৎ পশ্চিম বাংলার নাগরিক সাধারণের শতকরা ৯৬ অংশের—নির্ভর প্রধানতঃ ডাল ও আলুর উপর, খাদ্যে প্রোটিন ও শর্করা উৎপাদক 'শ্বেতসার' বা ষ্টার্চ যোগাইবার জন্য। ঐ দুই পদার্থই জীবনধারণের ও শ্রমক্ষম থাকিবার জন্য অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য্য। কর্ত্তৃপক্ষ চাউল ও মাছের দিকে নজর দিয়াছেন সুতরাং যে অর্থপিশাচেরা সরকারী গাফিলতির ফলে এদেশের জনসাধারণের রক্ত-মাংস-হাড় চিবাইয়া চুষিয়া খাইবার সুযোগ এতদিন পাইতেছে তাহারা ঐ দিকে ভর করিয়াছে। ডাল অগ্নিমূল্য, আলুও হিমঘরে বোঝাই, সরকার ঝিমাইতেছেন, গরীব গৃহস্থ পেট ও কপাল চাপড়াইতেছে এবং মুনফাবাজ ভুঁড়ি দোলাইতেছে!

কেন, খাদ্যবস্তুর তালিকা করিয়া, তাহার মধ্যে অত্যাবশ্যকীয় ও অপরিহার্য্য যাহা বা যেগুলি তাহার ব্যাপক উল্লেখ দিয়া, সে সকলে ভেজাল বা তাহা লইয়া মুনফাবাজী খেলিলে তাহার কঠোর দণ্ড-নির্দ্দেশ, ফৌজদারী আইনভুক্ত করিলে কি বেদ অশুদ্ধ হয়? এখন যাহা চলিতেছে তাহা ছেলেখেলা মাত্র, তাহাতে ছোট মুদি বা জেলের গায়ে আঁচড় পড়িতেছে মাত্র। কঠো

কারাদণ্ড এবং সেই সঙ্গে বড় অঙ্কের জরিমানা এবং মাল বাজেয়াপ্তের নির্দ্দেশ থাকিলে যাহারা প্রধান অপরাধী তাহাদের আক্কেল আসিতে পারে। অবশ্য সেই সঙ্গে চেতনা দেওয়া প্রয়োজন আমাদের দয়াময় হাকিমদের—যাঁদের এ বিষয়ে দয়া ও দাক্ষিণ্যের অবকাশ নাই।

যাহারা এই ভাবে সমস্ত দেশকে ফতুর করিয়া নিজেদের বিশাল অর্থাগম করিয়াছে ও করিতেছে, তাহাদের সম্পর্কে এদেশের জনসাধারণেরও চেতনা হওয়া প্রয়োজন। আমাদের উচিত এখন হইতেই এ সকল বিষয়ের প্রতিকার চিন্তা করা। এবং আমাদের উচিত যাঁহাদের আমরাই জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসাবে সংসদে ও বিধানমণ্ডলে প্রত্যক্ষভাবে পাঠাইয়াছি ও পরোক্ষভাবে শাসনতন্ত্রের অধিকারীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, তাঁহারা কে কিভাবে এই নিদারুণ জনস্বার্থ অবহেলার সহিত সক্রিয় ভাবে অগ্রসর হইয়াছেন বা নিষ্ক্রিয় থাকিয়া নিজ স্বার্থপূর্ত্তির কথাই ভাবিয়াছেন, সে সকলের নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করা। নহিলে আবার সেই নির্ব্বাচনের উচ্ছ্বাসে অযোগ্য লোকের দলই প্রতিষ্ঠিত হইবে। মুনাফাবাজের প্রধান সহায় এই সকল অযোগ্য লোক। কিন্তু এখানেই সমস্যার শেষ নয়। দেশের খাদ্যশস্য বিষয়ে যে ঘাটতি আছে তার কিছু অংশ হয়ত পূরণ হইত যদি দেশের লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি এরূপ প্রচণ্ড না হইত। জন্মনিয়ন্ত্রণ যে আমাদের পক্ষে মরণ বাঁচন সমস্যা এ কথা শুধু দেশের লোককে বুঝাইলে হইবে না, কিছু অংশে বাধ্যতামূলক ভাবে চালাইতে হইবে। যে বা যাহারা বেপরোয়া ভাবে সন্তানের জন্ম দিয়া এই সমস্যা জটিলতর করিতেছে তাহাদের এদিকে দৃষ্টি দিতে বাধ্য করিতে হইলে, যাহারা জন্মনিয়ন্ত্রণ মানিয়া লইয়াছে বা লইতেছে তাহাদের সাধারণ ও প্রত্যক্ষ ভাবে এমন কিছু সুবিধা দিতে হইবে যাহা অবাধ জন্মদানকারীগণ পাইবে না। তবেই তাহারা বুঝিবে যে এ বিষয়ে সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

অন্য দিকে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমাইলেও যে উহাতেই সমস্যা পূরণ হইবে না এ কথাও মনে রাখিতে হইবে। লোকসংখ্যা অল্প-বিস্তর বাড়িবেই এবং জমির ফলন না বাড়াইলে সে কারণে ঘাটতি বাড়িবেই। খাদ্য-মূল্য নিয়ন্ত্রণের একটা দিক মুনাফাবাজি বন্ধ করা, অন্য দিকে খাদ্যশস্যের চাহিদা, দেশের ভিতরে ফলন বৃদ্ধি করিয়া, দেশের শস্যেই মিটাইবার ব্যবস্থা করা। এক দলের ধারণা চাষী শস্যের মূল্য বেশী পাইলেই শস্যের ফলন বাড়াইতে সক্ষম হইবে। এই সিদ্ধান্ত কিন্তু ঠিক নয়, অন্ততঃ সর্ব্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, সে কথার প্রমাণ রহিয়াছে আখের চাষে ও চিনির উৎপাদনে।

যুদ্ধের পূর্ব্বে—ও যুদ্ধের মধ্যেও আখের দাম ছিল বোধ হয় দুই আনা মণ, চিনি-কলের দ্বারে পৌঁছাইলে পরে। আজ সেই দামের বারো গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে, আইনের জোরে ও সংসদে আখচাষীদের মুখপাত্রদের চীৎকারে। কিন্তু আখের ফলন বাড়িয়াছে কি? মোটেই না, বরঞ্চ উত্তর প্রদেশে একর-প্রতি ষোল-সতের টনের স্থলে আজ হইতেছে ১৪।১৫ টন ও বিহারে ১৩-১৪ টনের জায়গায় হইতেছে ১১-১২ টন। উপরন্তু আখে শর্করার পরিমাণও শতকরা ১০-১১ হইতে নামিয়া ৯-১০ দাঁড়াইয়াছে!

ইহার অর্থ চাষী যদি দেখে যে, ফসল কমিলেও মূল্য-বৃদ্ধির ফলে আয় কমে নাই বরঞ্চ কিছু বাড়িয়াছেই তবে সে অধিক পরিশ্রম ও গাঁটের কড়ি দিয়া সারের জোগাড় করিবে কোন্ দুঃখে বা কিসের দায়ে? বরঞ্চ সে খাটুনি কমাইয়া, পয়সা বাঁচাইয়া মনের আনন্দে দিন কাটাইবে। দোষ যে মাটির নয় তার প্রমাণ আছে দক্ষিণ অঞ্চলে আখের ফলনে ও সৌরাষ্ট্র, মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের কয়েক স্থলে। সেখানে আখের ফলন ২৫-৩০ হইতে ৪০-৪৫ টন আখ প্রতি একরে জন্মায়। তাহার কারণ চাষী শিক্ষিত এবং তাহার মুখপাত্র ও প্রতিনিধি-গণের মগজে কিছু পদার্থ আছে, শুধু গলাবাজিতে কার্য্যোদ্ধারই তাঁদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়।

ফরক্কা ও হলদিয়া

সারা ভারতের উন্নয়ন-কার্য্য যে সকল পরিকল্পনা-অনুযায়ী চালিত হইতেছে সে সবের প্রত্যেকটির প্রতি পদক্ষেপে বৈদেশিক সাহায্যে প্রাপ্ত বা বিদেশে রপ্তানি-বাবদ অৰ্জ্জিত বিদেশী মুদ্রার প্রয়োজন হয়। এবং এই কারণেই কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তর এই রপ্তানির উপর নজর রাখেন এবং একাধিক মন্ত্রী এ বিষয়ে ভাষণ দান ও প্রচার করেন। এই বিদেশে রপ্তানির পথ হিসাবে অর্থাৎ এ দেশ থেকে বিদেশে মাল চালান দেওয়ার পথ হিসাবে যে কয়টি বন্দর আছে তার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এই কলিকাতা বন্দর, কেননা বৈদেশিক মুদ্রা অৰ্জ্জনের জন্য যে সকল বাণিজ্যবস্তু ভারত হইতে বিদেশে চালান হয় তার অর্দ্ধেক অংশ বা ততোধিক যায় এই একটি বন্দর হইতে। এই বন্দরের প্রাণশক্তি কমিলে অন্য কোনও ভিন্ন প্রদেশের বন্দর সে

কাজ চালাইতে পারিবে না, সেটা নিশ্চিত, কেননা অন্য পথে ঘুরাইয়া পাঠাইলে সে মালের উপর পরিবহনের ভাড়া ত চড়িবেই উপরন্ত সেই পরিমাণ মাল জাহাজে তুলিবার ও তার আগে তাহাকে সুরক্ষিত ভাবে রাখিবার ব্যবস্থা পূর্ব্বাঞ্চলের কোনও বন্দরে করিতে হইলে অন্ততঃ ১৫০-২০০ কোটি টাকা ও ২০ হইতে ৩০ বৎসর সময় লাগিবেই। সেই টাকার ব্যবস্থা, স্থানের ব্যবস্থা ও অন্য পাঁচ রকম আয়োজন করিতে করিতে এদেশের রপ্তানির, বাজার অন্য কোনও দেশ দখল করিবেই। এ কথা সকলেরই জানা, শুধু জানা নাই কতকগুলি বিদগ্ধ চূড়ামণির যাঁহাদের মন ও বুদ্ধি প্রাদেশিক স্বার্থের মাদকে আচ্ছন্ন।

কলিকাতা বন্দরের অনেকখানি ভার লইতে পারে হলদিয়া, কেননা সেখানের বন্দর কলিকাতা বন্দরের জল-স্রোতেরই মুখে এবং রেল ও রাজপথে উহার দূরত্ব সামান্য। সেই কারণে বৈদেশিক বিশেষজ্ঞরা অনেক হিসাব ও অনেক গবেষণার পর হলদিয়ায় জাহাজ চলার বন্দর নির্ম্মাণের পরামর্শ দিয়াছেন। তারপর সেখানে বন্দর স্থাপিত হইলে সেখানের বিস্তৃত প্রান্তর, সহজলভ্য শ্রমিকশক্তি, রেলও নদীর যুগ্ম পরিবহন পথ ও অন্য অনেক সুবিধা দেখিয়া কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়ম মন্ত্রী শ্রীহুমায়ুন কবীর সেখানে একটি তৈল শোধনাগার ও খনিজ তৈল-জনিত রাসায়নিক দ্রব্যের বিশাল প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। বলা বাহুল্য এই ব্যবস্থা বিদেশী ও স্বদেশী বিশেষজ্ঞদিগের সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুযা'য়ীই করা হয়। এবং উহা করিবার পর মন্ত্রী শ্রীকবীর এ ব্যবস্থায় সহযোগী বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিবার জন্য সোভিয়েট দেশ, রুমানিয়া, ফ্রান্স ও ইটালী সফরে গিয়াছেন।

কিন্তু আমাদের ভিন্ন-প্রদেশীয় বন্ধুদের গাত্রদাহের উপশম ত তিনি করিয়া যাইতে পারেন নাই। সুতরাং এই সকল পরিকল্পনা বানচাল করিবার চেষ্টা সেখানে সমানে চলিতেছে। হলদিয়া বন্দরের প্লান নষ্ট করিয়া উড়িষ্যার কোথায়ও কিছু হয় কি না সে বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার ও ঐ জাতীয় আকাশকুসুম রোপণ ও চয়নের জন্য কিছু সময় নষ্ট করিবারও মঞ্জুরি টাকা রোধ করিবার চেষ্টা ত চলিতেছেই এবং সেই সঙ্গে হলদিয়ায় তৈল শোধানা-গার যাহাতে স্থাপিত না হয় তাহারও অবিশ্রাম চেষ্টা চলিতেছে। অবশ্য আমাদের মুখপাত্র বলিতে বর্ত্তমানে দিল্লীতে বিশেষ কেহই নাই সুতরাং এ কাজ অনেকটা নির্ব্বিবাদেই চলিতেছে। কি ভাবে এই বাংলা ও বাঙ্গালী বিরোধী বিষের স্রোত অন্তঃসলিলার মত সেখানে চলিতেছে তার কিছু নির্দ্দেশ নিম্নে প্রদত্ত ও 'যুগান্তর' পরিবেশিত সংবাদে পাওয়া যাইবে —

'হলদিয়াতে তৈল-শোধনাগার স্থাপিত না হওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে জল্পনা-কল্পনা যাহাই হউক না কেন, চতুর্থ যোজনায় ভারতকে যদি তৈল উৎপাদনের নির্দ্ধারিত লক্ষ্য অর্থাৎ ৩ কোটি টন উৎপাদনে পৌঁছিতে হয় তাহা, হইলে হলদিয়ায় তৈল শোধনাগার স্থাপন 'অবশ্য' চিহ্নিত কার্য্যসূচীর অন্তর্গত করিতে হইবে।

এখানে যে খোঁজখবর পাওয়া গিয়াছে তাহাতে মনে হয় যে, হলদিয়ায় তৈল-শোধনাগার স্থাপনের কাজ আগামী ডিসেম্বর মাসে সুরু করা হইবে। আগামী জুলাই মাসে মাদ্রাজে তৈল-শোধনাগার স্থাপনের কাজ আরম্ভ হইলেও হলদিয়ার কাজ তাহাতে কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিবে না। কারণ দেশের পেট্রলের চাহিদা পূরণের জন্য এই দুইটি তৈল-শোধনাগারই পুরাপুরি চালু করিতে হইবে।

মাদ্রাজে তৈল-শোধনাগার স্থাপনে যে নয়টি কোম্পানী ভারত সরকারকে সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, সেই কোম্পানীগুলিকেই হলদিয়ার শোধনাগার স্থাপনে সাহায্য করার জন্য অনুরোধ করা যাইতে পারে। অপর পক্ষে সরকার অন্যান্য পন্থা খুঁজিয়া বাহির করার চেষ্টাও করিতে পারেন।

বিদেশে পক্ষকাল সফরের সময় কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর সোভিয়েট ইউনিয়ন, রুমানিয়া, প্যারিস এবং ইতালীর কয়েকটি সম্ভাব্য সহ-যোগীদের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিতে পারেন।

হলদিয়া তৈল-শোধনাগার স্থাপনের দাবি বিতর্কমূলক বিষয়ে পরিণত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কিছু প্রবণতা বা টালবাহানা দেখা গেলেও তাঁহারা বন্দরটির অনুপূরক অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজে একপ্রকার অঙ্গীকার-বদ্ধ হইয়াছেন। এখানে শুধু শোধনাগার স্থাপন নহে পেট্রলজাত রাসায়নিক দ্রব্যাদি উৎপাদনের কেন্দ্র স্থাপনেরও সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে।

শেষোক্ত উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় পেট্রলিয়ম মন্ত্রী সোভিয়েট রাশিয়া, ইতালি এবং ফ্রান্সে বৈদেশিক কারিগরি ও অন্যবিধ সাহায্য ও উপদেশ লাভের চেষ্টা করিবেন।'

এই ত গেল হলদিয়ার কথা। তারপর আসে ফরক্কায় গঙ্গার উপর বাঁধ দেওয়ার বিষয়।

এই বাঁধের কথা প্রথম দিল্লীতে যায় স্বাধীনতার প্রথম মুখে ১৯৪৯-৫০ সালে। তখনই বিশেষজ্ঞরা বুঝিয়াছিলেন ও বলিয়াছিলেন যে, গঙ্গার স্রোতমুখ এই ভাগিরথী ও হুগলীর দিকে না ফিরাইতে পারিলে কলিকাতা বন্দর ও কলিকাতা মহানগরের আয়ুষ্কাল আর বেশী দিন নাই। নদীবক্ষের বালি তুলিয়া বন্দর বাঁচানো যায় কি না সে চেষ্টায় কিছুদিন গেল। তার পর সেই পুরাণো প্রথায় নূতন করিয়া অনুসন্ধান গবেষণা ইত্যাদিতে আরও কিছুদিন গেল। শেষে, যখন নানা টালবাহানায় প্রায় দশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে তখন এ কাজে হাত দেওয়া হইল। কিন্তু সেই যাত্রায় বলা হইল যে, এই পাঁচসালা পরিকল্পনায় ইহার আরম্ভ মাত্র, সুতরাং টাকার ব্যবস্থাও সামান্য। পরের পরিকল্পনায় কিংবা তার পরের কল্পনায় ইহার শেষ হইবে—যদি না ইতিমধ্যে কলিকাতা বন্দরের পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ও আপদের শান্তি ঐ কয় বৎসরের মধ্যে হয়।

গড়িমসি করিয়া কাজ চলিতেছিল কিন্তু চীন যুদ্ধ বাধিতে কর্ত্তারা একটু সজাগ হইলেন। তার পর যুদ্ধ-প্রস্তুতিতে ঢিলা পড়িল এবং ফরাক্কার কাজেও পূর্ব্বেকার শ্লথ গতি আসিল। তবে সম্প্রতি সে বিষয়ে কিছু নজর পড়িয়াছে মনে হয়। সেই সঙ্গে ইহাও দেখা যায় যে, অনিচ্ছাজনিত অবহেলার ফলে কাজ অগ্রসর হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক কি পরিমাণে জমিয়াছে।

"বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে কতকগুলি অতি-প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহে অসুবিধা এবং সিমেন্টের দুষ্প্রাপ্যতার দরুন বিশ্বের দীর্ঘতম বাঁধ ফরাক্কা বাঁধ পরিকল্পনার অগ্রগতি ব্যাহত হইবার আশঙ্কা দেখা দিতে পারে। ইতিমধ্যে ফরাক্কা কর্ম্মচঞ্চল হইয়া উঠিলেও অত্যাবশ্যক কতকগুলি বৃহদাকারের যন্ত্রপাতি ও 'সিট পাইলের' জন্য পরিকল্পনা-কর্ত্তৃপক্ষ চিন্তান্বিত হইয়া পড়িয়াছেন। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালমশল্লার অভাবের দরুন পরিকল্পনার কাজ প্রায় এক বছর পিছাইয়া যাইবে বলিয়া আশঙ্কা করা হয়।

প্রকাশ, ঐ সব যন্ত্রপাতি ও 'সিট পাইল' ক্রয় করিতে এখনই সরকারের ৮ কোটি টাকার মত বৈদেশিক মুদ্রা প্রয়োজন। ডলার অঞ্চল হইতে ঐগুলি আনার প্রয়োজন হইবে। যন্ত্রচালিত বৃহদাকারের হাতুড়িও প্রচুর পরিমাণে লাগিবে। ঐগুলিও বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হইবে। বৈদেশিক মুদ্রার অসুবিধার জন্য পরিকল্পনা-কর্ত্তৃপক্ষকে হয়ত শেষ পর্য্যন্ত রাশিয়া অথবা অন্যান্য পূর্ব্ব ইউরোপীয় দেশের শরণাপন্ন হইতে হইবে।

জানা গিয়াছে যে, ডলার অঞ্চল হইতে এই পর্য্যন্ত ২৫০০ টন 'সিট পাইল' সরবরাহ করা হইয়াছে। অথচ প্রয়োজন, ৪০ হাজার টন।

এই সব অসুবিধা দুরীকরণের জন্য পরিকল্পনা-কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ আগ্রহশীল বলিয়া জানা যায়। সিমেণ্ট ও অন্যান্য মালমশল্লা সরবরাহ অব্যাহত রাখার জন্য তাঁহারা নাকি বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিতেছেন। পরিকল্পনার আসল কাজ সুরু হইলে দৈনিক প্রায় ৫০০ টন করিয়া সিমেণ্ট লাগিবে। অবিলম্বে তাঁহাদের ৮ হাজার টন সিমেণ্টের প্রয়োজন। প্রকাশ, ইতিমধ্যে চারি হাজার টন সিমেণ্টের বরাদ্দ মঞ্জুরী হইয়া আসিয়াছে। আর একটি সমস্যা দেখা দিয়াছে—শ্রমিক সংগ্রহ। পরিকল্পনার কার্য্যে তিন বৎসর ধরিয়া দৈনিক ২০,০০০ শ্রমিকের প্রয়োজন হইবে। কিন্তু পর্য্যাপ্ত সংখ্যক পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক পাওয়া নাকি যায় না। অবশ্য পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের এই কার্য্যে নিয়োগ করা যায় কি না, পরিকল্পনা-কর্ত্তৃপক্ষ এখনও হয়ত ভাবিয়া দেখেন নাই।"

এই সকল যন্ত্রপাতির ও বাঁধ নির্ম্মাণের মাল মশল্লার কথা ত নূতন নয়, ঐ সবের উল্লেখ, পরিমাণ নির্দ্দেশ ও মোটামুটি দাম-দর নির্দ্ধারিত না হইলে ত তৃতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনায় এই যোজনার খরচের হিসাবই হইত না, সুতরাং পরিকল্পনা-কর্ত্তৃপক্ষ কিছু পূর্ব্বে এ বিষয়ে দৃষ্টিক্ষেপ করিলে এরকম দেরি হওয়ার কারণ থাকিত না। অবশ্য এতদিন যাঁহারা কর্ত্তৃপক্ষ ছিলেন তাঁহারাই বর্ত্তমানে এ বিষয়ে 'আগ্রহশীল' হইয়াছেন না নূতন দল আসিয়া কাজ অগ্রসর করিবার জন্য কোমর বাঁধিয়াছেন তাহা আমাদের জানা নাই।

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীকরুণাকুমার নন্দী

পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য মূল্যবৃদ্ধি

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে গত বৎসর আশাতীত পরিমাণ ধানের ফসল হওয়া এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক ধান ও চাউলের উর্দ্ধতম পাইকারী ও খুচরা দর নিয়ন্ত্রিত করা সত্ত্বেও, গত কয়েক সপ্তাহে চাউলের মূল্য অসম্ভব বৃদ্ধি পাইয়াছে। বস্তুতঃ কেবল মাত্র চাউল নহে, সকল রকমের ডাইল, সরিষার তেল, এমন কি সকল প্রকারের সব্জীর দরও সঙ্গে সঙ্গে অসাধারণ গতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে। মাছ-মাংসের ত কথাই নাই। নিয়ন্ত্রিত মূল্যে মাছ এক রকম পাওয়াই যাইতেছে না; কলিকাতা ও উপকণ্ঠস্থিত সকল বাজারেই মাছের আমদানী অসম্ভব রকম কমিয়া গিয়াছে।

মাছের কথা ছাড়িয়া দিলেও—দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত বাঙালী বহুকাল হইতেই মাছের স্বাদ একরকম ভুলিয়াই গিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না—সাধারণ লোকের প্রাণধারণের প্রয়োজনে যে-সকল খাদ্যপণ্য অবশ্যভোগ্য বলিয়া জানা আছে, যথা চাউল, ডাইল এবং যৎকিঞ্চিৎ সরিষার তেল, সব কিছুরই মূল্য এমন ভাবে এবং পরিমাণে গত ৫।৬.সপ্তাহের মধ্যে বাড়িয়াছে এবং এখনও বাড়িয়া চলিয়াছে যে, সাধারণ বাঙালী কি করিয়া দেহ-ধারণের ন্যূনতম চাহিদা তাহার সামান্য আয়ের মধ্যে সঙ্কুলান করিবে তাহাই এখন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

দৈনিক সংবাদপত্রসমূহের রিপোর্ট হইতে দেখা যাইতেছে যে গত পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা ও উপকণ্ঠস্থিত শিল্পাঞ্চলে চাউলের পাইকারী মূল্য গড়পড়তা আন্দাজ ১২% এবং খুচরা দর ১৫%-এরও অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ডাইলের দর মোটামুটি বাড়িয়াছে আন্দাজ ২৫%; সরিষার তেলের মূল্য বৃদ্ধির পরিমাণ ২৮%। সব্জীর বাজারে প্রধান সাধারণ-ভোগ্য আনাজ, আলুর দর বাড়িয়াছে ৩৪%। এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, খাদ্যপণ্যাদির পাইকারী মূল্যবৃদ্ধির পরিমাণ সাধারণতঃ খুচরা দর-বৃদ্ধির তুলনায় অপেক্ষাকৃত অনেক কম। জনসাধারণের সম্বন্ধ মূলতঃ খুচরা দরেরই সঙ্গে। পাইকারী দর-বৃদ্ধির অনুপাতে খুচরা দরও বৃদ্ধি পাওয়া অবশ্য স্বাভাবিক। কিন্তু এই খুচরা দরের অনুপাত যখন অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী হইতে থাকে তখন বুঝিতে হইবে যে মূল্যমানের স্থিরতার অভাবের সুযোগ লইয়া অতিরিক্ত মুনাফাবাজী সুরু হইয়াছে।

চাউলের ফসলের পরিমাণ, গত ফসলে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পূর্ব-প্রকাশিত বিবৃতি অনুযায়ী, মোটামুটি এবার ৫৪ লক্ষ টন আমন, এবং আন্দাজ আরও ৪ লক্ষ টন আউস ধানের চাউল পাইবার মতন হইয়াছিল। মুখ্যমন্ত্রীর সেই একই প্রসঙ্গে বিবৃতি অনুযায়ী রাজ্যের মোট চাহিদার পরিমাণ ৬২ লক্ষ টন। মুখ্যমন্ত্রীর এই হিসাব যে বাস্তবতা-অনুসারী নহে, তাহার বিশদ আলোচনা আমরা পূর্বেই করিয়াছি। বস্তুতঃ বাস্তব হিসাবে ৫৮ লক্ষ টন চাউল রাজ্যের সমগ্র চাহিদা সরকারী বরাদ্দ—অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য দৈনিক ১৬ আউন্স অনুযায়ী, মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট। তাহা ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার এবং উড়িষ্যা এবং অন্ধ্র রাজ্য হইতেও পশ্চিমবঙ্গে চাউল আমদানী হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। ইহা ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গবাসী গত বৎসর মোট ১০ লক্ষ টন গমও (এই হিসাব সরকারী রেকর্ড হইতে পাওয়া গিয়াছে) ব্যবহার করিয়াছেন। বর্তমান বৎসরে গম ব্যবহারের পরিমাণে গত বৎসরের তুলনায় কিছু বিশেষ সঙ্কোচন ঘটিয়াছে এমন মনে করিবার কারণ নাই। অর্থাৎ মোটামুটি খাদ্যশস্যের সরবরাহে কোন প্রকার ঘাটতি হইবার কোন সঙ্গত কারণ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। গত বৎসর অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রথমতঃ, পূর্ব বৎসরে এ-রাজ্যে মোট চাউলের ফসলের যে সরকারী হিসাব পাওয়া যায়, তাহার পরিমাণ আমন ও আউস মিলাইয়া ছিল মাত্র ৪০ লক্ষ টন। অর্থাৎ এ-রাজ্যের মোট চাহিদার তুলনায় ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১৮ লক্ষ টন। সেই সময়ে উড়িষ্যা হইতে চাউল আমদানী করিবা এই ঘাটতি আংশিক ভাবে পূরণ করিবার পথেও উড়িষ্যা সরকার বাধা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার উপরে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে চাউল সরবরাহের

প্রতিশ্রুতিও সময় মতন পুরণ করিতে গাফিলতি ঘটিয়াছিল। এ সকল মিলিয়া চাউলের বাজারের অবস্থা ফসলের প্রায় প্রথম দিক হইতেই সঙ্কটজনক পরিস্থিতির পথে চলিতে সুরু করিয়াছিল। নূতন ফসল উঠিবার পরে অনিবার্যভাবে চাউলের দর সাধারণতঃ পড়িয়া থাকে। গত বছর এই মূল্য-সঙ্কোচের পরিমাণ মণপ্রতি ১৲ টাকার বেশী হয় নাই। তাহা ছাড়া মাসেক কালের মধ্যেই চাউলের দর বাড়িতে সুরু করে এবং যে মাস নাগাৎ ২৬৲ টাকা মণ দরের চাউল ৩১৲।৩২৲ টাকায় চড়ে। চাউলের সরবরাহে এই সবিশেষ ঘাটতির জন্য এই মূল্য-পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিয়াছিল, একথাটা আংশিক সত্য মাত্র। তৎকালীন কেন্দ্রীয় কৃষি ও খাদ্য-মন্ত্রী শ্রী এস. কে. পাতিল এই প্রসঙ্গে যে কথা বলিয়াছিলেন তাহাও সম্পূর্ণ সত্য নহে। তিনি প্রথমে বলেন যে, চাউলের এই মূল্যবৃদ্ধি স্বাভাবিক নিয়মেই কৃশ-ঋতুতে (normal upward fluctuation during the lean season) ঘটিয়া থাকে। পরবর্তী আর একটি বিবৃতিতে তিনি যাহা বলেন তাহা আরও চমকপ্রদ ; তিনি বলেন, চিরকাল চাষীরা শহরবাসীদিগের স্বার্থে বঞ্চিত হইতেই থাকিবে এটা অন্যায়। চাউলের মূল্যবৃদ্ধির দ্বারা এই সত্যটি সূচীত হইতেছে যে, অবশেষে বঞ্চিত চাষীরা তাহাদের ন্যায্য পাওনা পাইতে সুরু করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে দেশের সাধারণ কৃষিজীবীদের তরফ হইতে এই মূল্যবৃদ্ধির ধারার বিরুদ্ধে তবে কেন গভীর অসন্তোষ এবং প্রতিবাদ ধ্বনিত হইতে সুরু করিয়াছিল তাহার কোনই উল্লেখ অবশ্য তিনি করেন নাই। বস্তুতঃ উৎপাদনে ঘাটতি, অন্যান্য রাজ্য হইতে চাউলের আমদানীর দ্বারা ঘাটতি পুরণের পথে বাধা। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিশ্রুত সরবরাহের আমদানীতে বিলম্ব ইত্যাদি নানাবিধ অবস্থার সুযোগে যে খাদ্যশস্য লইয়া প্রচণ্ড মুনাফাবাজী সুরু হইয়াছিল এবং তাহাই যে গত বৎসরের চাউলের অসম্ভব মূল্যবৃদ্ধির প্রকৃত কারণ, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।

বর্তমান বৎসরে এ সকল অবস্থাগুলি উপস্থিত নাই। উৎপাদন আশাতীত পরিমাণে প্রভূত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যও যথাসময়ে পাওয়া যাইতেছে বলিয়া বলা হইয়াছে। তাহা ছাড়া উড়িষ্যা রাজ্য হইতে চাউলের আমদানীর পথে পূর্বে যে বাধা উপস্থিত ছিল, তাহাও এবার নাই। তাহার উপরে চাউল কল হইতে সুরু করিয়া খুচরা দোকানদারী পর্যন্ত সকল স্তরে বিভিন্ন প্রকারের চাউলের মূল্যও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন। এই মূল্য নির্দ্ধারণ করিবার সময় রাজ্য সরকার চাউল-ব্যবসায়ীদিগকে এই হুমকিও দিয়া রাখিয়াছিলেন যে, নির্দ্ধারিত মূল্যে চাউল কেনা-বেচায় বাধা সৃষ্টি হইলে তাঁহারা নির্দ্ধারিত মূল্যমান আরও কমাইয়া দিবেন এবং তাহাতও মুনাফাবাজী বন্ধ না হইলে খাদ্যশস্যের সমগ্র ব্যবসায়টিকে তাঁহারা সম্পূর্ণ ভাবে সরকারী আয়ত্তাধীন করিয়া লইতে বাধ্য হইবেন।

অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি ও খাদ্য মন্ত্রণালয় দেশের সমগ্র খাদ্যশস্য ব্যবসায়ীগোষ্ঠীকে অনুরূপ হুমকি দিয়াছেন। দিল্লীতে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত নিখিলভারত খাদ্য-ব্যবসায়ী সম্মেলনে তাঁহার উদ্বোধনী ভাষণে কৃষি ও খাদ্য-মন্ত্রী সর্দার স্বর্ণ সিংহ বলেন যে, জনসাধারণের অবশ্যভোগ্য খাদ্যপণ্য লইয়া মুনাফাবাজী তিনি কোন মতেই বরদাস্ত করিবেন না। খাদ্য ব্যবসায়ীগোষ্ঠী যদি জনসাধারণকে উচিৎ মূল্যে তাহাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য-শস্য সংগ্রহ করিতে বাধা দেন বা সরকারী নীতির সহিত সহযোগিতা করিতে স্বীকৃত না হন তবে অচিরেই খাদ্য-শস্যের সমগ্র ব্যবসায়টিকে সরকারী আয়ত্তাধীন (State Trading) করিয়া লইতে দ্বিধা করিবেন না।

এ সকল সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে গত কয়েক সপ্তাহে কেবল চাউল নহে, সঙ্গে সঙ্গে ডাইল, সরিষার তেল ইত্যাদি সকল অবশ্যভোগ্য খাদ্যপণ্যের যে অসম্ভব মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াছে তাহা যে নিছক মুনাফাবাজদিগের কারসাজি এ বিষয়ে সন্দেহের কোনই অবকাশ নাই। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া এই মূল্যবৃদ্ধির প্রকোপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই বিষয়ে কার্যকরী প্রয়োগের একান্ত প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অবহিত হইয়াছেন বলিয়া দেখা যাইতেছে। চাউলের দর পূর্ব হইতেই নির্দ্ধারিত ছিল, এখন যাহাতে নির্দ্ধারিত মূল্যে চাউল সত্যই কেনা-বেচা হয় তাহার চেষ্টা চলিতেছে। সরিষার তেলের মূল্য গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে কিলোগ্রাম প্রতি ২৷৷০ টাকা হইতে ৩ টাঃ ২০ নঃ পঃ হইয়াছিল, রাজ্য সরকার এখন ইহার মূল্য ৩৲ টাকা ধার্য করিয়া দিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে ডাইলের মূল্যও ঐ সময়ের মধ্যে—মসুর ডাল ৮০ নঃ পঃ হইতে ১৲ টাকা (২৫%) বৃদ্ধি পাইয়াছে, মটর ডাল ৭৩ নঃ পঃ হইতে ৯৫ নঃ পঃ (৩০%), মুগ ডাল ৯৩ নঃ পঃ হইতে ১ টাকা ২০ নঃ পঃ (২৯%) বৃদ্ধি পাইয়াছে। দরিদ্রের খাদ্যে এই একটি বস্তু ডাইল, যাহার মধ্যে কিঞ্চিৎ প্রোটিন

জাতীয় পুষ্টি পাওয়া যায়। কিন্তু এই বস্তুটির মূল্য সম্প্রতি যে পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার ফলে এইটুকুও তাহার আয়ত্তাতীত হইয়া পড়িয়াছে। মাছ, মাংস, দুধ, ডিম ইত্যাদি অন্যান্য প্রোটিনবাহী খাদ্য বহুকাল হইতেই দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত জনসাধারণের নাগালের বহু উর্দ্ধে উঠিয়া রহিয়াছে। কেবল মাত্র ডাইল হইতেই সে সামান্য কিছু পুষ্টি পাইত, তাহাও এখন তাহার আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। মাছের নিয়ন্ত্রিত দর বলবৎ রাখিবার জন্য রাজ্য সরকার বহু আয়াস ও অর্থ ব্যয় করিতেছেন, কিন্তু দরিদ্রের নিকট এই অতি, এমন কি অবশ্য-প্রয়োজনীয় খাদ্যবস্তু ডাইলের উচিত মূল্য নির্দ্ধারণ এবং তাহার কার্যকরী প্রয়োগ সম্বন্ধে রাজ্য সরকার পূর্বাপর সম্পূর্ণই উদাসীন হইয়া রহিয়াছেন।

চাউলের মূল্যবৃদ্ধি প্রসঙ্গে চাউল-কলের মালিক-গোষ্ঠী রাজ্য সরকারের নিকট দরবার করিয়াছেন যে, তাঁহারা নির্দিষ্ট মূল্যে ধান সংগ্রহ করিতে না পারায় চাউল উৎপাদন ও সরবরাহে অসম্ভব বাধা সৃষ্টি হইয়াছে। ধানের মজুতদারেরা অধিক মুনাফার লোভে তাঁহাদের মজুদ ধান বাজারে ছাড়িতেছেন না, ফলে মিলগুলি বেকার হইয়া পড়িতেছে। সঙ্গে সঙ্গে বাজারেও চাউলের সরবরাহে ঘাট্‌তি সুরু হইয়াছে। তাঁহাদের এই অভিযোগের ফলে সরকার অতিরিক্ত মজুদ ধান জব্দ করিবার হুকুম জারি করিয়াছেন এবং এই সাপক্ষে তল্লাসী ইত্যাদি চলিতেছে। কিন্তু ইহার ফলে খুব যে একটা সুবিধা হইয়াছে তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। কিছু পরিমাণ ধান অবশ্য বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে কিন্তু তাহার পরিমাণ সামান্যই এবং তাহার ফলে চাউলের কালো-বাজারী যে কিছুমাত্র কমে নাই তাহাও সন্দেহাতীত। প্রথমতঃ, অতিরিক্ত ধানের মজুদের (Surplus Stocks) হিসাব কি ভাবে করা যাইতে পারে তাহার হদিস পাওয়া মুশ্‌কিল। দ্বিতীয়তঃ, পশ্চিমবঙ্গের সামান্য সংখ্যক অপেক্ষা-কৃত স্বচ্ছল জোতদারেরা হঠাৎ এমনি ধনকুবের হইয়া পড়িয়াছেন যে, তাঁহারা ইচ্ছামতন যতটা পরিমাণ খুশী ধান বিক্রয় না করিয়া অনির্দিষ্টকালের জন্য মজুদ করিয়া রাখিতে সমর্থ হইতেছেন, ইহাও কেমন যেন আশ্চর্য ও অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। বস্তুতঃ এই অবস্থা হইতে ইহাই প্রমাণ হয় যে, ইঁহাদের পিছনে অন্তরাল হইতে কোন শক্তিশালী ও বিত্তবান গোষ্ঠী আপনাদের মুনাফা-বাজী মতলব হাসিল করিয়া লইতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে চাউল ব্যবসায়ীরাও আপনাদের মুনাফাবাজী বিরুদ্ধবাদী সকল সরকারী প্রয়োগকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া অনায়াসেই চালাইয়া যাইতেছেন। চাউলের অনেক খুচরা ব্যবসায়ীকে সরকার মূল্য-নিয়ন্ত্রণাদেশ লঙ্ঘন করিবার অজুহাতে গ্রেপ্তার করিয়াছেন, কিছু সংখ্যক মামলাও আদালতে দায়ের করা হইয়াছে এবং আরও কিছু সংখ্যক ব্যবসায়ীকে ইতিমধ্যে আদালতে ১৫৲ হইতে ৫০০৲ টাকা পর্যন্ত জরিমানাও দিতে হইয়াছে। ইহা সত্বেও চাউলের মূল্য বিন্দুমাত্র কমে নাই, বরং আরও কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং কালোবাজারে সরবরাহের পরিমাণেও কিছুমাত্র কমতি নাই। অর্থাৎ এই প্রসঙ্গে সরকারী সকল প্রয়োগই এ পর্যন্ত সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসতি হইয়াছে।

বস্তুতঃ যে ভাবে সরকারী নীতির প্রয়োগ হইতেছে, তাহাতে এই ব্যর্থতা অনিবার্য ছিল। উড়িষ্যা বা অন্ধ্র রাজ্য হইতে চাউল আমদানীর ব্যাপারটাই বিবেচনা করা যাউক। জনমত সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া এই আমদানীর ব্যবস্থাটিকে পশ্চিমবঙ্গের এবং রপ্তানীকারক রাজ্য দুইটির ব্যবসায়গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক চুক্তির উপরে নির্ভরশীল করিয়া রাখা হইয়াছে। ফলে উড়িষ্যা হইতে মোটা চাউল মিহি বলিয়া বর্ণিত হইতেছে এবং সেই উচ্চতর মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। ব্যবস্থাটি উভয় রাজ্যের সরকারী আয়ত্তে সীমায়িত করিয়া রাখিলে এই ভাবে অন্যায় মুনাফাবাজীর সুযোগ সৃষ্টি হয়ত বন্ধ করা যাইতে পারিত। এখনও পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই বিষয়ে অবহিত হইলে সুফল পাওয়া যাইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে খাদ্যপণ্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করিবার নীতিটিরও একটু আলোচনা প্রয়োজন। সরিষার তেলের খুচরা বাজার দর গত ১৫ই এপ্রিল তারিখ পর্যন্ত কলিকাতায় ছিল ২ টাকা ৫০ নঃ পঃ। পরদিন হইতে এই দর বাড়িয়া ৩ টাকা ২০ নঃ পঃ দাঁড়ায়, অর্থাৎ ২৮% বৃদ্ধি পায়। ইহার একমাত্র সঙ্গত কারণ এই হইতে পারে যে, সরিষার দরবৃদ্ধির ফলে ইহা অনিবার্য হইয়া পড়িয়াছিল। কলিকাতার দৈনিক পাইকারী বাজার দরের তালিকা হইতে দেখা যায় যে, গত ২১শে মার্চ তারিখে সরিষার গড়পড়তা দর ছিল ব্যাগ-প্রতি (২ কুইন্টল) ১১১ টাকা ৪৫ নঃ পঃ; ১৬ই এপ্রিল তারিখে এই দর বাড়িয়া দাঁড়ায় ১২১ টাকা ৯০ নঃ পঃ অর্থাৎ প্রায় ৯% বেশী। ইহার ফলে সরিষার তেলের দর ১০% বৃদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু তাহা ২৮% বাড়িলে, ইহা যে মুনাফাবাজী ছাড়া আর কিছুই নহে, তাহাও স্পষ্ট ও

সন্দেহাতীত। গত ১লা মে তারিখে সরিষার গড়পড়তা দাম ছিল ১১৯ টাকা ৬৪ নঃ পঃ, বর্তমানেও মোটামুটি সেই দরই বলবৎ রহিয়াছে, অর্থাৎ ২১শে মার্চ তারিখের মূল্যমানের তুলনায় ৭% আন্দাজ বেশী রহিয়াছে। রাজ্য সরকার এখন সরিষার তেলের খুচরা দাম ৩ টাকায় নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন, অর্থাৎ ২১শে মার্চের দরের তুলনায় ২০% বেশী। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই ক্ষেত্রে সরিষার তেলের মুনাফাবাজের দালালেরই মতন ব্যবহার করিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি করা হইবে না।

বস্তুতঃ মূল্যবৃদ্ধির বিষয়ে কেবল মাত্র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার নহেন, কেন্দ্রীয় ও অন্যান্য রাজ্য সরকারও গত ১৫।১৬ বৎসর ধরিয়া অনবরত তাঁহাদের অসামর্থ্য, বিবেচনাহীনতা ও সম্পূর্ণ ব্যর্থতারই প্রমাণ দিয়া চলিয়াছেন। ইতিমধ্যে পরিকল্পনা কমিশন ঘোষণা করিতেছেন যে, সমাজবাদী গণতন্ত্রের আদর্শ অনুযায়ী দেশের লোকের নিম্নতম জীবনমান অচিরেই উন্নত করিতেই হইবে। তাঁহারা প্রতিশ্রুতি দিতেছেন যে, আগামী পঞ্চম পরিকল্পনার শেষ পর্যন্ত দেশের দরিদ্রতম পরিবারও (পাঁচজনের) যাহাতে অন্ততঃ মাসিক ১০০ টাকা আয় করিতে পারেন তাহার আয়োজন করিতেই হইবে। ১৯৫০-৫১ সনের তুলনায় অবশ্যভোগ্য সকল পণ্যের মূল্যমান শতকরা ২৫% এরও বেশী বাড়িয়াছে, খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি আরও অধিক। বর্তমান মূল্যবৃদ্ধির ধারা যদি অব্যাহত থাকে—ইহাকে সংযত করিবার কোন কার্যকরী নীতি বা প্রয়োগের পরিচয় দেশবাসী এখনও পায় নাই—তাহা হইলে আশঙ্কা হয় যে, আগামী ১০ বৎসরে আরও ২৫%।৩০% মূল্যবৃদ্ধি ঘটিবে। তাহা হইলে ১৯৫০-৫১ সনের তুলনায় ১০০ টাকার সত্যকার মূল্য ৫০ টাকারও কম হইবে। এই রকম উন্নয়নে, উন্নয়নকারী ও তাঁহাদিগের আশ্রিত গোষ্ঠীর প্রভূত লাভ হইতে পারে, কিন্তু দেশের জনসাধারণের পক্ষে তাহা যে শ্বাসরোধকর হইয়া উঠিবে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আমরা এখনই পাইতেছি।

বিদ্যুৎশক্তি ও ডি. ভি. সি

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে বিভিন্ন 'স্বয়ংসম্পূর্ণ' সংস্থাসমূহের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন ও সরবরাহের ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে। রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন ছিলেন প্রধান উৎপাদনকারী। তাঁহাদের উৎপাদিত শক্তি কিছুটা পরিমাণে বিভিন্ন বৃহৎ শিল্প-সংস্থাদিগকে সরাসরি সরবরাহ করা হইতেছিল, আর বাকী পরিমাণ শক্তি কতকগুলি আঞ্চলিক শক্তি-সরবরাহক সংস্থার মাধ্যমে ব্যবহারকারীদিগকে দেওয়া হইতেছিল। রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের (দুর্গাপুর, রাণীগঞ্জ এলাকা) শিল্পকেন্দ্র ব্যতীত অন্যান্য স্থানে প্রধানতঃ ডি. ভি. সির দ্বারা উৎপাদিত শক্তি স্থানীয় সরবরাহক সংস্থা এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বৈদ্যুতিক সংস্থার (State Electricity Board) মাধ্যমে ব্যবহারকারীর নিকট পৌঁছান হইতেছিল। এই এলাকায়—যথা দুর্গাপুর, ব্যাণ্ডেল ইত্যাদি স্থানে রাজ্য বৈদ্যুতিক সংস্থার আয়োজনে শক্তি উৎপাদন করাও হইতেছে। এই উৎপাদন আয়োজন ক্রমশঃ আয়তন ও পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং আজ পর্যন্ত এই সাপক্ষে যে পরিমাণ আয়োজনের মঞ্জুরী হইয়াছে, তাহার ফলে অদূর ভবিষ্যতে এই সংস্থাটিই পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম বৈদ্যুতিক শক্তি-উৎপাদনকারীর স্থান অধিকার করিবে বলিয়া আশা করা যায়। ইহা ছাড়া কলিকাতা মহানগরী ও উপকণ্ঠের শিল্প-প্রধান এলাকাগুলিতে বৈদ্যুতিক শক্তির প্রধান সরবরাহক কলিকাতা বৈদ্যুতিক শক্তি-সরবরাহক সংস্থা (Calcutta Electric Supply Co.)। ইহার মোটামুটি অধিকাংশ পরিমাণ শক্তি এই সংস্থাটি স্বয়ং উৎপাদন করিয়া থাকেন; বাকীটা ইঁহারা ডি. ভি. সি. হইতে পাইয়া থাকেন।

কলিকাতা ও উপকণ্ঠের বৈদ্যুতিক শক্তির চাহিদা কেবলমাত্র যে বিরাট্ তাহা নহে; এই চাহিদা গত পনর-ষোল বৎসর ধরিয়া দ্রুতগতিতে উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। এই চাহিদা সম্পূর্ণ ভাবে মিটাইবার পক্ষে বর্তমান উৎপাদন ও সরবরাহের আয়োজন যথেষ্ট নহে। সম্প্রতি ডি. ভি. সি., সি. ই. এস-সি'কে আরও কিছু পরিমাণ অতিরিক্ত শক্তি সরবরাহ করিতে সুরু করিয়াছেন, কিন্তু ইহাও যে কলিকাতার উত্তরোত্তর প্রসারমান চাহিদা পূরণ করিতে সমর্থ হইবে না তাহা খুবই স্পষ্ট।

কলিকাতার স্থিতি ও প্রগতি যে বহুল পরিমাণে চাহিদার অনুপাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের আয়োজনের উপর নির্ভর করিতেছে তাহা সুবিদিত। আর কলিকাতার স্থিতি ও প্রগতির উপরে যে দেশের সামগ্রিক ভবিষ্যৎ কল্যাণ প্রভূত পরিমাণে নির্ভর করিতেছে তাহা বলাই বাহুল্য। বৃহত্তর কলিকাতা এলাকার যে বিরাট্ ও বহুমুখী শিল্পকেন্দ্র গত দুই শতাব্দী ধরিয়া ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে ভারতের বৃহত্তম শিল্পকেন্দ্র। শুধু তাহাই নহে এই

এলাকায় প্রতিরক্ষার জন্য অত্যন্ত জরুরী কতকগুলি ক্ষুদ্র ও নাতিবৃহৎ শিল্পায়োজন দেশের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার পক্ষে একান্তই অপরিহার্য। এ সকলই পর্যাপ্ত পরিমাণে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের উপরে নির্ভরশীল। গতপূর্ব বৎসর দেশের উত্তর সীমান্তে চীনা হামলা সুরু হইবার পর হইতে এ সকল শিল্পের গুরুত্ব খুব ভাল করিয়াই উপলব্ধি করা গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে এই উপলব্ধিটুকুও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, এ সকল শিল্পসংস্থাগুলির উৎপাদন ক্ষমতা বৈদ্যুতিক শক্তির পর্যাপ্ত পরিমাণ সরবরাহের অভাবে সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করা এখনও সম্ভব হইতেছে না। ইহা ছাড়াও কলিকাতার উপকণ্ঠে বহু সংখ্যক ছোট ও মাঝারি আকারের উৎপাদক ও ভোগ্য-শিল্প সংস্থা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, যাহার গুরুত্ব কলিকাতা, তথা পশ্চিমবঙ্গ ও সমগ্র দেশের পক্ষে কম গুরুত্বপূর্ণ নহে। বৈদ্যুতিক শক্তির পর্যাপ্ত সরবরাহের উপরে এ সকল শিল্পসংস্থার বর্তমান উৎপাদন ও ভবিষ্যৎ প্রগতি প্রভূত পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। কলিকাতা ও উপকণ্ঠের বড়, মাঝারি ও ছোট ছোট অসংখ্য উৎপাদক শিল্প এবং কিছু সংখ্যক ভোগ্য-শিল্পও একান্তভাবে বৈদ্যুতিক শক্তির সরবরাহের উপরে নির্ভরশীল। তাহা ছাড়াও স্বাধীনতার পর হইতে কলিকাতা ও উপকণ্ঠের বৃহত্তর কলিকাতা অঞ্চলে যে প্রচণ্ড পরিমাণ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার ফলেও বৈদ্যুতিক শক্তির পারিবারিক ব্যবহারের চাহিদা (Domestic Consumers) প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং দিন দিন আরও বাড়িতেছে।

এই নিত্য প্রসারমান বৈদ্যুতিক শক্তির চাহিদা পর্যাপ্ত পরিমাণে পূরণ করিবার ক্ষমতার উপরে কলিকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ বহুল পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। সেই সঙ্গে ইহাও বিবেচনা করা প্রয়োজন যে গত দুই পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনাকালে পশ্চিমবঙ্গে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন ও সরবরাহের আয়োজনে চাহিদার তুলনায় একটা বড় ফাঁক আগাগোড়াই থাকিয়া গিয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় এই ফাঁকটা খানিকটা কমাইয়া আনিবার আয়োজন করা হইয়াছে, কিন্তু সম্পূর্ণ ভরাট হইবার আশা ছিল না। তৃতীয় পরিকল্পনাকালের মধ্যে প্রস্তাবিত আয়োজন সম্পূর্ণ পরিমাণে রূপায়িত হইবার সম্ভাবনায় বর্তমানে খানিকটা অনির্দিষ্টতার আশঙ্কাও অমূলক নহে। এই অবস্থায় গুরুত্ব অনুযায়ী বৈদ্যুতিক শক্তির সরবরাহ ও ব্যবহারের সুব্যবস্থা হওয়া যে একান্ত প্রয়োজন সেই বিষয়ে নিশ্চয়ই কোন মতদ্বৈধ হইবে না। বর্তমান অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র (বস্তুতঃ সমগ্র দেশেই) এবং বিশেষ করিয়া কলিকাতা ও তাহার উপকণ্ঠের বিরাট এবং বহুমুখী শিল্পকেন্দ্রে বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে নিয়মিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। অযথা ঐশ্বর্য বিস্তারে বা অন্যান্য ভাবে বৈদ্যুতিক শক্তির অনুৎপাদিকা ব্যবহার বা অপচয় সর্বপ্রকারে বন্ধ করিবার প্রয়াস করিতে হইবে। বর্তমান ত্রিবিধ বা তাহারও অধিক সংখ্যক স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং মোটামুটি পরস্পর নিরপেক্ষ আয়োজনে এই একান্ত প্রয়োজনীয় কাজটি সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করা আদৌ সম্ভব কি না তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

এই জন্য একান্ত প্রয়োজন একটা কেন্দ্রীয় অধিকরণের দায়িত্বে ও তত্ত্বাবধানে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন, সরবরাহ ও গুরুত্ব অনুযায়ী তাহার ব্যবহারের একটা সর্বাত্মক প্রয়োগ। ইহার মধ্যে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের দায়িত্বটা স্বভাবতঃই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। উৎপাদনেও যাহাতে বিভিন্ন উৎপাদক সংস্থার মধ্যে একটা পারস্পারিক সহযোগ গড়িয়া উঠে তাহার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। গত কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতায় দেখা যাইতেছে যে, বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনে কেবলমাত্র যে সামগ্রিক চাহিদার তুলনায় প্রভূত ঘাটতি হইতেছে তাহাই নহে, এই শক্তি উৎপাদন ও সরবরাহে নিযুক্ত বিভিন্ন উৎপাদক সংস্থার মধ্যেও পারস্পরিক সহযোগিতা খুব বেশী ঘটে নাই। ইহাদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে বৃহত্তম বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদক সংস্থা, ডি. ভি. সি.। কলিকাতার সি. ই. এস্-সি, নিজেরাও অন্যতম উৎপাদক হইলেও তাঁহাদের মক্কেলদের চাহিদার জন্য ডি. ভি. সি-র নিকট হইতে শক্তি সরবরাহের উপরেও প্রভূত পরিমাণে নির্ভরশীল। কলিকাতার শক্তি সরবরাহের ব্যাপারে ডি. ভি. সির গত কয়েক বৎসরের কার্যকলাপ খুব আশাপ্রদ নহে। কারণ যাহাই হউক, ইঁহাদের চুক্তি অনুযায়ী কলিকাতার সরবরাহে প্রায়শঃই ঘাটতি হইয়াছে। সম্প্রতি সরবরাহে কিছুটা উন্নতি সাধিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু এই অবস্থা কতদিন টিঁকিবে তাহা নিতান্তই অজানা। গত কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে, ইহার সকল প্রকার দায়িত্ব পালনেই ডি. ভি. সির প্রয়োগ কোন ক্ষেত্রেই আশানুরূপ হয় নাই; বন্যা প্রতিরোধের ব্যাপারে ডি. ভি. সির সময়মত উপযুক্ত প্রয়োগের অভাবে দক্ষিণবঙ্গ গত কয়েক বৎসর দুই-দুইবার সম্পূর্ণ প্লাবিত হইয়া গিয়া প্রভূত

ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে ; সময়মত প্রতিশ্রুত সেচের জল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের চাষীগোষ্ঠী আজ পর্যন্ত কখনও পায় নাই ; আর বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন ও সরবরাহের ব্যাপারে ডি. ভি. সির এ পর্যন্ত অকৃতকার্যতা প্রায় কিংবদন্তী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারী বৈদ্যুতিক শক্তি সংস্থা (Electricity Board) বর্তমান প্রসঙ্গে আলোচিত এই রাজ্যের কেন্দ্রীয় অধিকরণের দায়িত্ব লইতে পারিতেন। তাহা না হইয়া সম্প্রতি গৃহীত সরকারী সিদ্ধান্ত যে ডি. ভি. সির অধিকর্তারা পশ্চিমবঙ্গে ডি. ভি. সির প্রযোগে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যুৎ উৎপাদক আয়োজনগুলির পরিচালনে কায়েম থাকিবেন খুব যে একটা আশাপ্রদ অবস্থার সূচনা করিতেছে এমন কিছুতেই মনে করা চলে না।

পঞ্চম পরিকল্পনায় মাথাপিছু আয়

গত ১০ই মে তারিখে প্রধানমন্ত্রী নেহরুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্ল্যানিং কমিশনের একটি অধিবেশনে আগামী পঞ্চম-পরিকল্পনাকালের শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯৭৫-৭৬ সন পর্যন্ত মাথাপিছু আয় মাসিক ২০ টাকা হারে এইরূপ একটি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হইয়াছে। এই লক্ষ্যে পৌঁছাইতে হইলে আর্থিক উন্নয়নের গতি বার্ষিক ৭% হওয়া প্রয়োজন, এইরূপ স্থির হইয়াছে এবং চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়া এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার উপযোগী করিয়া রচনা করিতে হইবে।

প্ল্যানিং কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ৪র্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আনুপাতিক পরিমাণে প্রসারিত করিবার প্রয়োজন হইবে। এবং কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতি বিশেষভাবে নজর দেওয়া প্রয়োজন হইবে।

প্ল্যানিং কমিশনের পারস্পেক্টিভ বিভাগের বিচার অনুযায়ী, তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ পর্যন্ত জাতীয় আয়ের পরিমাণ পূর্ব-পরিকল্পিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯০০০ কোটি টাকার পরিবর্তে ১৮০০০ কোটি টাকা পর্যন্ত হওয়ার সম্ভাবনা। বর্তমান সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৭৫-৭৬ সন পর্যন্ত মাথাপিছু মাসিক আয়ের পরিমাণ ২০ টাকায় তুলিতে হইলে এই জাতীয় আয়ের পরিমাণকে দ্বিগুণেরও বেশী বাড়াইয়া ৩৭,০০০ কোটি টাকায় তোলা প্রয়োজন হইবে। জাতীয় আর্থিক উন্নয়নের গতি যদি বার্ষিক ৭% হারে বৃদ্ধি পাইতে থাকে তবে ১৯৭০-৭১ সন পর্যন্ত জাতীয় আয় ২৬,০০০ কোটি টাকায় এবং ১৯৭৫-৭৬ সন পর্যন্ত ৩৭,০০০ কোটি টাকায় উন্নীত করিতে পারা যাইবে। এই দুই সালে দেশের সম্ভাব্য লোকসংখ্যার অঙ্ক হইবে যথাক্রমে ৫৫২ কোটি এবং ৬২২ কোটি।

আলোচ্য হারে উন্নয়ন বৃদ্ধি সাধন করিতে হইলে চতুর্থ পরিকল্পনাকালে বার্ষিক পুঁজি-সৃষ্টির হার পূর্ব-পরিকল্পিত ১৪%-এর পরিবর্তে ১৯৬৫-৬৬ সনে ১৫% এবং ১৯৭০-৭১ সন পর্যন্ত জাতীয় আয়ের ২১%-এ উন্নীত হওয়া প্রয়োজন হইবে। সঙ্গে সঙ্গে আগামী দুই পরিকল্পনাকালে বৈদেশিকী সাহায্যের পরিমাণও কমাইয়া আনা প্রয়োজন হইবে। বর্তমানে মোট বার্ষিক লগ্নীর প্রায় ২৫% বৈদেশিকী অর্থ সাহায্য দ্বারা সাধন করা হয়। ইহার পরিমাণ ক্রমে কমাইয়া আনিয়া ১৯৭০-৭১ সন পর্যন্ত ৭%-এ নামাইতে হইবে এবং ১৯৭৫-৭৬ সন পর্যন্ত নূতন লগ্নীর জন্য বৈদেশিকী অর্থ সাহায্যের উপরে নির্ভরশীলতা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে হইবে।

প্ল্যানিং কমিশনের উপরোক্ত সিদ্ধান্ত ও বিচারগুলি আপাততঃ প্রাথমিক মাত্র বলিয়া বলা হইয়াছে। তবে বেশ জোরের সঙ্গেই বলা হইয়াছে যে, উপরোক্ত লক্ষ্যে পৌঁছিতে হইলে সরকারী প্রযোজনা ও মালিকানায় দেশের শিল্পায়নের ক্ষেত্রটি আরও প্রভূত পরিমাণে বিস্তৃত করিয়া লইতে হইবে। তাহা সত্ত্বেও চতুর্থ পরিকল্পনাকালে প্রাইভেট সেক্টারের অধীনে লগ্নীর পরিমাণ পূর্ব-পরিকল্পনার তুলনায় আরও অনেক বাড়ান প্রয়োজন হইবে।

উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলির একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কোনও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া গেল না। দেশের আর্থিক উন্নয়নের ধারায় মূল্যবৃদ্ধির প্রকোপ কি প্রকারের পরিস্থিতির সৃষ্টি করিতেছে এবং মূল্যমানে কোন স্থিরতা সম্পাদন না করিতে পারিলে পরিকল্পিত আর্থিক উন্নয়নের লক্ষ্য বাস্তবপক্ষে কতটা পরিমাণে সঙ্কুচিত হইতে পারে তাহার কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া গেল না। প্ল্যানিং কমিশন বলিতেছেন যে, ১৯৭৫-৭৬ সন পর্যন্ত মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ ২০ টাকায় তুলিতে হইলে উল্লিখিত আয়োজনগুলি সিদ্ধ হইতে হইবে। কিন্তু এই মাথাপিছু ২০ টাকা আয় কি বর্তমান মূল্যমানের হিসাবে হইবে, কিংবা ১৯৭৫-৭৬ সনে যে মূল্যমান থাকিবে সেই হিসাবে হইবে তাহার কোন উল্লেখ নাই। ১৯৫০-৫১ সনে সাধারণ পাইকারী মূল্যমান, সরকারী ভাবে স্বীকার করা হইয়াছে, মোটামুটি ২০.২৫% বৃদ্ধি পাইয়াছে। অবশ্য-ভোগ্য পণ্যের ক্ষেত্রে এই মূল্যমান খুচরা বাজারে আরও অনেক বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে। যদি আগামী ১০ বৎসর

মূল্যমানে স্থিরতা সম্পাদিত না হইয়া বর্তমান ক্রমবর্দ্ধমান ধারা অব্যাহত থাকে, তবে আরও ২৮.২৫% মূল্যবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে ২০ টাকা আয়ের বাস্তব মূল্য আনুপাতিক পরিমাণে কমিয়া যাইবে। এ বিষয়ে কি প্ল্যানিং কমিশন বা গবর্ণমেণ্ট কাহারও কোন বাস্তব প্রয়োগের আদৌ পরিকল্পনা আছে, এমন মনে করিবার কোন কারণ আজ পর্যন্ত ঘটে নাই।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা বিষয় বিশেষ ভাবে উল্লেখ-যোগ্য। প্ল্যানিং কমিশন যে মাথাপিছু মাসিক ২০ টাকা আয়ের কথা বলিতেছেন, তাহা কি সমগ্র লোকসংখ্যার গড়পড়তা মাথাপিছু হিসাব, না কমিশনের কৃষিবিষয়ক ভারপ্রাপ্ত সদস্য শ্রীমান নারায়ণ দ্বারা কিছুকাল পূর্বে বর্ণিত দেশের দরিদ্র্যতম ৬০% লোকের মাথাপিছু ভোগ্য-আয়ের কথা? যদি সমগ্র লোকসংখ্যার গড়পড়তা আয় হিসাবে এই লক্ষ্য স্থির করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই লক্ষ্যটা এমন কিছু উন্নতির আশা যে সূচনা করিতেছে না তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠে। তবে যদি এই মাথাপিছু আয় বলিতে প্ল্যানিং কমিশন দেশের দরিদ্রতম ৬০% লোকের মাথাপিছু ভোগ্য আয় বলিয়া বুঝাইতে চান, তবে সেটা অবশ্যই একটা বিশেষ উন্নতির সূচনা করিবে,—অবশ্য এই আয়ের কোন অংশ যদি মূল্য-বৃদ্ধির প্রকোপে অংশতঃ খাইয়া না যায়।

কমিশন বর্ণিত পঞ্চম পরিকল্পনার শেষে দেশের আর্থিক অবস্থার সম্ভাব্য যে রূপের চিত্রটি পাওয়া যাইতেছে তাহাতে দেখা যাইবে যে, আলোচ্য বৎসরে দেশের সমগ্র উৎপাদনের মাথাপিছু অঙ্ক প্রায় ৬০০ টাকা পরিমাণ হইবে। বর্তমান অবস্থার তুলনায় ইহা উন্নতির পরিচায়ক বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু বিশ্বমানের তুলনায় তাহা গর্ব করিবার মতন কিছু হইবে না। তাহা হইলেও এই উন্নতি যদি সার্থক ভাবে সাধিত হয় তবে সেটা প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু লগ্নীর তুলনায় এই ফলাফল কতটা সার্থকতাসূচক তাহারও বিচার করা প্রয়োজন। কমিশনের পারস্পেপকৃটিভ বিভাগ বলিতেছেন যে, ১৯৭০-৭১ সন পর্যন্ত বার্ষিক পুঁজির সৃষ্টির পরিমাণ অন্ততঃ জাতীয় আয়ের ২১% হইতেই হইবে। অর্থাৎ কায়েমী লগ্নীর সহিত জাতীয় আয়ের আরও এক পঞ্চমাংশেরও অধিক বার্ষিক লগ্নী করিয়া যে পরিমাণ উন্নয়ন সাধনের আশা দেখা যাইতেছে, তাহাতে ভোগ্য-পণ্যের সরবরাহে অনিবার্য ভাবেই একটা পরিমাণ ঘাট্‌তি চলিতেই থাকিবে। তাহা যদি হয়, তবে মূল্যমানের উপরে চাপ হইতে অব্যাহতি পাইবার আশা সুদূর-পরাহত।

গত ১৫ বৎসর ধরিয়া উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রয়োগ হইতে একটা কথা খুব স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। সেটা এই যে, যেমন একদিকে এই উন্নয়নের ধারা কৃষি ও শিল্প এবং বৃহৎ উৎপাদক শিল্প ও নাতি-বৃহৎ এবং ক্ষুদ্রতর ভোগ্য-শিল্পসমূহের মধ্যে পারস্পরিক ভারসাম্য (balance) রক্ষা করিয়া অগ্রসর হয় নাই, তেমনি অন্য দিকে কি সরকারী প্রযোজনায়, কি সরকারী সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত বা প্রসারিত বেসরকারী মালিকানায় লগ্নীর অনুপাতে উৎপাদন সর্বদাই বিশেষ পরিমাণে কম হইয়াছে। ইহার ফলে দেশের সমগ্র আর্থিক ব্যবস্থায় উৎপাদন-ব্যয়ে যে চাপ সৃষ্টি হইয়াছে তাহার অন্ততঃ খানিকটা বর্তমানে অনবরত বর্দ্ধমান মূল্যমানের জন্য অনিবার্য ভাবে দায়ী। এই প্রসঙ্গে উন্নয়নে বৈদেশিকী অর্থ-সাহায্যও কি ভাবে এবং কতটা পরিমাণে মূল্যমানের উপরে চাপ সৃষ্টি করিয়াছে এবং করিতেছে তাহারও বিচার হওয়া প্রয়োজন। স্থানাভাবে বর্তমানে সেই প্রসঙ্গটির অবতারণা সম্ভব হইল না।

—

সঙ্গীতের আসরে

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

সেকালের সেতার ডুয়েট

কয়েক বছর ধরে সঙ্গীত সম্মেলন ইত্যাদিতে ডুয়েট বাজনা শোনা যাচ্ছে। রবিশঙ্কর ও আলী আকবর সেতার সরোদ ডুয়েট বাজিয়ে কত আসর মাৎ করেছেন। হাফিজ আলী খাঁ তাঁর ছোট ছেলের সঙ্গে জুড়িতে সরোদ বাজিয়েছেন, ছেলেটি পরিচিত হয়েছে সমাজে। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ পৌত্র আশীষকুমারকে নিয়ে দ্বৈত সরোদ শুনিয়েছেন, অতীত ও বর্তমানের সুরসেতু রচনা ক'রে! এমনি কত গুণী ডুয়েট বাজিয়েছেন।

শুধু বাজনা কেন। দ্বৈত কণ্ঠে গানও কেউ কেউ গেয়েছেন। সালামৎ ও নাজাকৎ আলীর খেয়ালে অপূর্ব সুর বিহার। ডাগর ভ্রাতাদের কণ্ঠে অভিনব ধ্রুপদ।

এসব সাম্প্রতিক কালের ঘটনা। এর আগেকার যুগে ললিতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী তাঁদের অপরূপ কণ্ঠে দ্বৈত ধ্রুপদ শুনিয়ে গেছেন। তার আগের যুগে, তালাধ্যায়ে বিখ্যাত শিব-সেবক ও পশুপতিসেবক মিশ্র জুড়িতে ধ্রুপদ গান করেছেন বহু আসরে।

এমনিভাবে দেখা যায়, জুড়িতে বাজানো বা গান গাওয়া এদেশে নতুন নয়। যাঁদের নাম করা হ'ল, তাঁদেরও অনেক আগে থেকে ডুয়েট গান-বাজনা চলে আসছে। অন্ততঃ আজ থেকে প্রায় ৮০ বছর আগে একটি ডুয়েট বাজনার কথা পাওয়া যায়। সেটি বলবার মতন। অতদিন আগেও যে এখানে রাগসঙ্গীতে ডুয়েট বাজানো হয়েছিল, তা' হয়ত অনেকেরই জানা নেই। আর তাও যেমন-তেমন বাজানো নয়, অতি উঁচু দরের বাজনা। একথা একজন যথার্থ সঙ্গীত-শিল্পীর লেখা থেকে জানা যায়।

সেই ডুয়েট সেতার বাজিয়েছিলেন রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

দ্বৈত গান বা বাজনার অনুষ্ঠান করেন সাধারণতঃ গুরু-শিষ্য কিংবা দুই গুরুভাই। কারণ একই রীতিতে সঙ্গীত-চর্চায় যাঁরা অভ্যস্ত তাঁরাই ডুয়েট গান-বাজনা ক'রে থাকেন। দু'টি ভিন্ন ঘরের শিল্পীর পক্ষে দ্বৈত সঙ্গীত সার্থক হয় না। প্রথমে যাঁদের নাম করা হয়েছে, তাঁরা হয় গুরুশিষ্য, নচেৎ একই গুরুর শিষ্য অর্থাৎ গুরুভাই।

শৌরীন্দ্রমোহন ও কালীপ্রসন্নও গুরুভাই ছিলেন। আচার্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর দুই প্রিয় শিষ্য।

ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী অনেক কারণে ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। সেসব কথা এখানে সবিস্তারে বলবার দরকার নেই। শুধু উল্লেখ ক'রে রাখা যাক যে—তিনি ভারতবর্ষে সবার আগে ঐকতান বাদন (অর্কেস্ট্রা) গঠন করেন। স্বরলিপিও এদেশে প্রথম রচনা করেন তিনি। বাংলা ভাষায় (এবং প্রথম ভারতীয় ভাষায়) প্রণালীবদ্ধ ভাবে সঙ্গীততত্ত্বের আলোচনাতেও তাঁকে পথিকৃৎ বলা যায়।

তাঁর এই দুই শিষ্যের মধ্যে কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দু'টি আসরের কাহিনী এর পরেই বলা হবে।

এখন শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের কথা। তাঁকে সঙ্গীত-রেণেসাঁসের একজন প্রধান পুরুষ বললে বেশি বলা হয় না। সঙ্গীতচর্চার সব বিভাগে তাঁর এত দান আছে যে, তাঁর নাম ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে।—যথা,—বাংলা ভাষায় বহু মূল্যবান্ সঙ্গীতগ্রন্থ রচনা ও সঙ্গীতে একাধিক বিষয়ে প্রথম পুস্তক প্রণয়ন। পদ্ধতিগত ভাবে সঙ্গীত শিক্ষাদানের জন্যে সুপরিকল্পিত সঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপন। প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রের পুনরুদ্ধার ও মুদ্রণের ব্যবস্থা। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী প্রবর্তিত স্বরলিপি প্রণালীর প্রচার এবং নিজে বহুল পরিমাণে স্বরলিপি রচনা ও প্রকাশ। বহু সঙ্গীত-গুণীর পৃষ্ঠপোষকতা এবং তাঁদের দ্বারা উৎকৃষ্ট সঙ্গীতের প্রচলনে সাহায্য। ভারতীয় সঙ্গীতকে প্রণালীবদ্ধ ও বিভিন্ন মতের সমন্বয়ের জন্যে কলকাতায় প্রথম বিরাট্ সম্মেলনের অনুষ্ঠান। ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রগুলির সংগ্রহশালা স্থাপন। দক্ষ শিল্পীদের দ্বারা বিভিন্ন রাগরূপের চিত্রাবলী অঙ্কন। প্রতিভাবান্ শিক্ষার্থী-দের উপযুক্ত গুরুর কাছে শিক্ষালাভের সুব্যবস্থা। ইংরেজীতে পুস্তকাদি রচনার দ্বারা পাশ্চাত্ত্য জগতে ভারতীয় সঙ্গীতবিদ্যার পরিচয় দান ও তার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি।

এই সবের সঙ্গে বিশিষ্ট গুণীদের কাছে তাঁর রীতিমত সঙ্গীতশিক্ষার কথাও ধর্তব্য। এমন বিশেষভাবে শিক্ষা লাভ না করলে তিনি ভারতীয় সঙ্গীতের মর্ম গ্রহণ করতে

হয়ত পারতেন না। পদ্ধতিগত শিক্ষা তাঁর সঙ্গীতবিষয়ে সব কাজের একটি প্রধান প্রেরণা ছিল, বলা যায়।

শৌরীন্দ্রমোহন একাধিক কলাবতের কাছে ভাল ক'রে সঙ্গীতশিক্ষা করেছিলেন। শুধু কণ্ঠসঙ্গীত নয়, যন্ত্র-সঙ্গীতও। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর কথা আগে বলা হয়েছে। তিনি ছিলেন শৌরীন্দ্রমোহনের প্রথম সঙ্গীতাচার্য।

তাঁর দ্বিতীয় সঙ্গীতগুরু হলেন পণ্ডিত লক্ষ্মীপ্রসাদ মিশ্র। তিনি বারাণসীর বীণকার এবং সারদা সহায় ও গোপালপ্রসাদ মিশ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মীপ্রসাদ বীণকার বলে পরিচিত হলেও তাঁদের ঘর ছিল ধ্রুপদী। মিশ্রজীর কাছে ক্ষেত্রমোহনও শিক্ষা পেয়েছিলেন এবং শৌরীন্দ্রমোহন লক্ষ্মীপ্রসাদের কাছে সঙ্গীতবিষয়ে বিশেষ লাভবান্ হন।

লক্ষ্মীপ্রসাদ ভিন্ন আর একজন বড় ওস্তাদের তালিম পান শৌরীন্দ্রমোহন। তিনি হলেন সুবিখ্যাত সেতারী সাজ্জাদ মহম্মদ। সুরবাহার যন্ত্রের প্রবর্তক গোলাম মহম্মদের পুত্র ও শিষ্য। সাজ্জাদ মহম্মদ শেষ বয়সে অনেকদিন শৌরীন্দ্রমোহনের আশ্রয়ে ছিলেন এবং শৌরীন্দ্রমোহন তাঁর কাছে সেতার ভালভাবে শিক্ষা পান। সমস্ত যন্ত্রের মধ্যে সেতার ছিল শৌরীন্দ্রমোহনের সব চেয়ে প্রিয় বাজনা এবং সেতারে তিনি কৃতবিদ্য হয়েছিলেন।

সেতার-বাদক রূপে তাঁর গুণপনার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আর তা' হ'ল কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর ডুয়েট বাজনা।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের একেবারে গোড়ার কথা। জানুয়ারী মাস। তখনকার ইউরোপের বিখ্যাত বেহালাশিল্পী কলকাতায় এসেছেন। তিনি হলেন প্রফেসর এড্ওয়ার্ড রেমেনী, জাতিতে হাঙ্গেরিয়ান। বেহালা বাজনায় তাঁর এমন সুনাম যে তিনি King of Violin নামে সুপরিচিত।

তিনি পর্যটনে বেরিয়ে কলকাতায় উপস্থিত হয়েছেন। তাঁর ভারতীয় সঙ্গীত শোনবার, তার সাক্ষাৎ পরিচয় পাবার বিশেষ ইচ্ছা। তাই শৌরীন্দ্রমোহনের প্রাসাদে (৬৫, পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট) তাঁর নিমন্ত্রণ হ'ল।

শৌরীন্দ্রমোহনের নাম প্রফেসর রেমেনী তার আগেই শোনেন। কারণ শৌরীন্দ্রমোহন ইউরোপের অনেক দেশ থেকে সঙ্গীতচর্চার জন্যে সম্মান লাভ করেন, ভারতবর্ষে বাস করেই। যে সময়ের কথা হচ্ছে, তখনই তিনি অনেক বিদেশ থেকে সঙ্গীতজ্ঞের স্বীকৃতি পেয়েছেন। তাঁর আগে কোন ভারতীয় এমন আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেন নি সঙ্গীতের জন্যে। শুধু বিদেশে কেন, দেশেও তিনি সঙ্গীতচর্চার জন্যে যত সম্মান পান, তা' সেযুগে দুর্লভ ছিল। তাঁর 'রাজা' উপাধিও (১৮৮০খ্রীঃ) পেয়েছিলেন সঙ্গীত-গুণের জন্যে, অর্থসম্পদের কারণে নয়।

যা হোক, শৌরীন্দ্রমোহনের আমন্ত্রণ পেয়ে এড্ওয়ার্ড রেমেনী পাথুরেঘাটায় এলেন। বিদেশী সঙ্গীতশিল্পীকে শৌরীন্দ্রমোহন অভ্যর্থনা করলেন তাঁর সঙ্গীতসভায়।

তারপর আরম্ভ হ'ল সঙ্গীতের আসর। শৌরীন্দ্রমোহন ও কালীপ্রসন্ন দ্বৈত সেতার বাজালেন।

বাজনা শেষ হ'তে সাহেব উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। কিন্তু তাই সব নয়। তাঁদের দুজনের সেতার তাঁর কেমন লেগেছিল, সে বিষয়ে তিনি লিখলেন (১৯ই জানুয়ারী, ১৮৮৬) Englishman কাগজে।

সেই লেখা থেকে বোঝা যায় যে, প্রফেসর রেমেনী সঙ্গীতের কত বড় সমঝদার ছিলেন। তাঁর শিল্পী-সত্তা বিজাতীয় আর ভিন্ন রীতির দূরত্ব পার হয়ে ভারতীয় সঙ্গীতের মর্ম কেমন গ্রহণ করেছিল! কি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গেই তিনি শুনেছিলেন তাঁদের সেতার ডুয়েট। তাঁর লেখাটির এখানে অনুবাদ ক'রে দেওয়া হ'ল:

"আমার সৌভাগ্য যে রাজা শৌরীন্দ্রমোহনের কাছ থেকে ক'দিন আগে সনির্বন্ধ নিমন্ত্রণ পাই। তিনি আমন্ত্রণ জানালেন, তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে সত্যিকার প্রাচীন হিন্দু সঙ্গীত শোনবার জন্যে। আমার কাছে এটি বড়ই স্বাগত মনে হ'ল। কারণ তার আগেই আমি এই সঙ্গীতজ্ঞ রাজার বিষয়ে অনেক কিছু শুনেছিলাম।...রাজার বাড়ীতে যাবার পর বাবু কালীপ্রসন্ন ব্যানার্জীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়।...রাজা বাজাতে লাগলেন এক রকমের মিশ্র হিন্দু সেতার। বাবু কালীপ্রসন্ন ব্যানার্জীর হাতে ছিল একটি খাঁটি হিন্দু সেতার। হিন্দু সঙ্গীত ও বিদ্যার দেবী সরস্বতীর হাতে যেমন দেখা যায়, তাঁর সেতারটিও তেমনি বড় আকারের। আর আমার এও মনে হ'ল যে, এই দুই গুণীর সুরসৃষ্টির সময় সেই পৌরাণিক দেবী তাঁদের মাথার ওপর তাঁর অভয় পক্ষ বিস্তার ক'রে আছেন। (তাঁদের বাজনা শুনে) আমি একেবারে মুগ্ধ হয়ে যাই আর অকপটে আমার সেই আনন্দ প্রকাশ করি। এই প্রকৃত সঙ্গীত আমি অটুট মনোযোগ দিয়ে শুনেছিলুম। কোন বিদেশী প্রভাব এই সঙ্গীতকে স্পর্শ করে নি। শুনতে শুনতে তাঁদের সঙ্গীতের সমস্তই আমার কাছে চমৎকার পরিষ্কার হয়ে যায়, আমি বেশ বুঝতে পারি

তার মর্ম। যা সব চেয়ে মহান্, তা সব চেয়ে সরল—আর্টে একথা বড় সত্য। গোটে ঠিকই বলেছেন।

"বাবু কালীপ্রসন্ন ব্যানার্জী অতি উঁচু দরের গুণীর মতন রাজার সঙ্গে (বাজনায়) সহযোগিতা করলেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম তিনি তাঁর দ্বৈত বাদনে নানারকম অতি জটিল সুর উপস্থিত ক্ষেত্রে রচনা করছেন। আর সেসব কাজ অতি সুন্দর। আমি একেবারে আশ্চর্য হয়ে তাঁদের চমৎকার অনুষ্ঠানের সময় আবিষ্কার করলাম যে, আমাদের ইউরোপীয় সঙ্গীতের মতন হিন্দু সঙ্গীতও সম্পূর্ণ একই ভিত্তির ওপর গ'ড়ে উঠেছে। ইউরোপীয় সঙ্গীতও অবশ্য এসেছে প্রাচ্য থেকেই।...

"উপসংহারে আমি শুধু অকৃত্রিম ধন্যবাদ জানাতে চাই রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও বাবু কালীপ্রসন্ন ব্যানার্জীকে। তাঁরা আমাকে সঙ্গীতের এই রহস্য উন্মোচন ক'রে কি আনন্দই দিয়েছেন। আর আমার ধারণা, ছিদ্রান্বেষী ইউরোপের অনেক সঙ্গীত পণ্ডিতই এই সঙ্গীত থেকে এখন আনন্দ লাভ করবেন।"

প্রিন্স্ অব্ ওয়েল্সের আশ্চর্য অভিজ্ঞতা

কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়। এই নামটি আমাদের এখনকার সঙ্গীতজগতে প্রায় অপরিচিত। আজকের সঙ্গীতসমাজে কেউ এ নাম উচ্চারণ করে না। কিন্তু আমাদের সঙ্গীতের ইতিহাসে নামটি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবার যোগ্য।

কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় যে কত বড় গুণী ছিলেন, তার কিছু নিদর্শন এখানে দেওয়া হবে।

রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রসঙ্গে তাঁর সেতারে ডুয়েট বাজনার কথা বলা হয়েছে। সেতার ও সুরবাহার যন্ত্রে কালীপ্রসন্ন অসামান্য পারদর্শী ছিলেন। এ বিষয়ে তিনি ছিলেন শৌরীন্দ্রমোহনের গুরুভাই। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর শিষ্য দুজনেই। অবশ্য শৌরীন্দ্রমোহনের দরবারে আগত অন্যান্য যন্ত্রী ও গায়কদের কাছেও যে কালীপ্রসন্ন লাভবান্ হয়েছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। কারণ, শৌরীন্দ্রমোহনের সঙ্গীতসভায় তিনি ছিলেন রাজার নিত্যকার সঙ্গী। তবে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীই ছিলেন কালীপ্রসন্নের সত্যিকার সঙ্গীতগুরু।...

সেই দ্বৈত সেতারের আসরে এড্ওয়ার্ড রেমেনী কালীপ্রসন্নের বাজনারও উচ্ছ্বসিত সুখ্যাতি করেছিলেন। আর বলেছিলেন একটি অপ্রিয় সত্য কথা—'বাবু, আপনার দেশের লোক আপনাকে চেনে না; এই সবচেয়ে বড় দুঃখের কথা।'...

অথচ সেযুগে কালীপ্রসন্নের খ্যাতি ভারতের চতুঃসীমা পার হয়ে বহুদূরে আমেরিকা ও ইউরোপে পর্যন্ত পৌঁছেছিল। বলা যায়, একমাত্র শৌরীন্দ্রমোহন ভিন্ন ভারতের অন্য কোন সঙ্গীতগুণী সেকালে এমন আন্তর্জাতিক প্রসিদ্ধি পান নি, কালীপ্রসন্নের মতন।

সঙ্গীত-প্রতিভার জন্যে তিনি (আমেরিকার) ফিলাডেলফিয়া থেকে প্রথম বৈদেশিক সম্মান ও স্বীকৃতি পান। ফিলাডেলফিয়া বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে মানপত্র দেন ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে। তারপর ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ইটালী থেকে ও ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিস থেকে তিনি স্বর্ণপদক ও প্রশংসাপত্র পেয়েছিলেন। উনিশ শতকে শৌরীন্দ্রমোহন ছাড়া ভারতবর্ষের অন্য কোন সঙ্গীতজ্ঞ বিদেশ থেকে এমন সম্মান লাভ করেন নি।

যেমন বিদেশ থেকে, তেমনি কলকাতায় আগত বিদেশী সঙ্গীতজ্ঞ, বিদেশী শিক্ষাবিদ্, বিদেশী রাজপুরুষ, শাসনকর্তা প্রভৃতির কাছেও কালীপ্রসন্ন বিস্তর সমাদর পান। সে তুলনায় উপযুক্ত সম্মান স্বদেশবাসীরা বোধহয় তাঁকে দেয়নি। (অবশ্য বেঙ্গল একাডেমী অব মিউজিক থেকে ১৮৮৫ খ্রীঃ তাঁকে 'সঙ্গীত উপাধ্যায়' উপাধি ও একটি স্বর্ণকেয়ূর উপহার দেওয়া হয়। কিন্তু তা বিদেশ থেকে সমস্ত সম্মান পাবার পর এবং তাঁর শ্রেষ্ঠ গুণগ্রাহী শৌরীন্দ্রমোহনের উদ্যোগের ফলে।) তাই বোধ হয় অধ্যাপক রেমিনী তাঁর বিষয়ে ওই রকম মন্তব্য করেছিলেন।

ভারতের তিনজন বড়লাট লর্ড লীটন, লর্ড রীপন ও লর্ড নর্থব্রুক, ভারতের শিক্ষা কমিশনের সভাপতি স্যার উইলিয়ম হাণ্টার প্রভৃতি ছিলেন কালীপ্রসন্নের গুণগ্রাহী। লর্ড লীটন ও লর্ড রীপন কয়েকবার তাঁকে নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে যান বেলভেডিয়ার প্রাসাদে, তাঁর বাজনা শোনবার জন্যে। লর্ড রীপন নিজের একটি ছবি তাঁকে স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে উপহার দিয়েছিলেন।

রাণী ভিক্টোরিয়ার পুত্র সপ্তম এডওয়ার্ড কালীপ্রসন্নের কি ক'রে গুণগ্রাহী হন সেকথা খানিক পরে বলা হবে।

সেকালের বিখ্যাত লা মার্টিনীয়ার কলেজের অধ্যক্ষ জে. এ. অলডিস কালীপ্রসন্নের শুধু গুণমুগ্ধই ছিলেন না, তাঁর শিষ্য হয়ে ছ'মাস নিয়মিত তাঁর কাছে সেতার শিখেছিলেন মিষ্টার অলডিস। সাহেব নিজে সেকথা লিখে গেছেন।

কালীপ্রসন্ন সেতার, সুরবাহার ও ন্যাসতরঙ্গ—এই তিন যন্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। তাঁর সেতার বাজনার বিষয়ে 'ভায়োলিনের রাজা' অধ্যাপক রেমিনীর সুখ্যাতি শৌরীন্দ্র-

মোহনের কথায় আগেই জানানো হয়েছে। তাঁর নবাব ওয়াজেদ আলী শা'র দরবারে সুরবাহার বাজাবার কথা শেষে বলা হবে।

এবারে তাঁর ন্যাসতরঙ্গ বাজনার কথা।

সেই আসরের বর্ণনা করবার আগে ন্যাসতরঙ্গ যন্ত্রটির পরিচয় দেওয়া দরকার। কারণ, কালীপ্রসন্নের নামের মতন ন্যাসতরঙ্গ যন্ত্রও অনেকের অনেকের কাছে অচেনা। এ যন্ত্রের বাদকও এদেশে দুর্লভ। আগে কালীপ্রসন্ন ভিন্ন দু'এক জন মাত্র ছিলেন, এখন কারও নামই শোনা যায় না। সেকালে নীলমাধব চক্রবর্তীর ন্যাসতরঙ্গ বাজাবার কথা জানা যায়। তিনি ছিলেন যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গীতসভার একজন সেতার ও সুরবাহার বাদক। ন্যাসতরঙ্গ বাদনে তাঁর কালীপ্রসন্নের তুল্য খ্যাতি অবশ্যই ছিল না। তাঁদের পরবর্তী যুগে, বিখ্যাত আফ্‌তাবুদ্দিন খাঁ (আলাউদ্দিনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) ন্যাসতরঙ্গ বাজিয়েছিলেন। তবে এ পর্যন্ত যতদুর জানা যায়, কালীপ্রসন্ন ছিলেন এই যন্ত্রের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী।

ন্যাসতরঙ্গ বাদক এত অল্প হওয়ার কারণ—এ যন্ত্র বাজানো শুধু কঠিন নয়, অতি কষ্টসাধ্য। দু'টি বাঁশীর মতন যন্ত্র নিয়ে ন্যাসতরঙ্গ বাজাতে হয়। বাঁশীর মতন দেখতে হলেও, বাঁশীর ছিদ্র এর মধ্যে নেই। যন্ত্র দু'টি ধাতুর তৈরি, লম্বায় প্রায় এক ফুট এবং দু'টি মুখ ছাড়া আগাপোড়া নিশ্ছিদ্র। দেখতে বাঁশী বা শানাইয়ের মতন হলেও এ যন্ত্র ফুঁ দিয়ে বাজাবার নয়। যন্ত্রের যে মুখটি বেশী সরু সেটি গলার দু'পাশে, কণ্ঠতন্ত্রীর ধারে, চেপে রেখে বাদক বাজান। ফুঁ দিয়ে বাঁশী বা শানাইয়ের মতন বাজে না। সেই সরু মুখের নলের মধ্যে একটি ঝিল্লিময় সূক্ষ্ম অংশ থাকে। বাদক তাঁর গলার তন্ত্রীতে শ্বাস-প্রশ্বাসের আশ্চর্য কৌশলে চাপ দেওয়ার ফলে ওই ঝিল্লিময় অংশে বায়ুতরঙ্গ আন্দোলিত হয় ও সুর-বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। বাঁশীটির মধ্যেকার ঝিল্লিময় অংশটিই যন্ত্র হিসেবে আসল। কারণ, বাঁশীর মতন স্বরগ্রামের ছিদ্রগুলি না থাকায়, এখানে স্বরপরিবর্তন এই ঝিল্লি-যন্ত্রটির মধ্যেই হয়ে থাকে। অর্থাৎ সুরের যা' কিছু কাজ, সবই ওইখানে!

ফুৎকারের কোন প্রয়োজনই এই বাজনায় নেই। বাদক পাইপ দু'টিকে গলার দু'পাশে রেখে, কণ্ঠের তন্ত্রীতে নিঃশ্বাসের চাপ দেন। তার ফলে পাইপের মধ্যেকার ঝিল্লি দিয়ে সুর-লহরী সৃষ্টি হয়। চাপের তারতম্যের ফলে স্বরপরিবর্তন বা সুরের ওঠানামা হ'তে থাকে। এই হ'ল, ন্যাসতরঙ্গ বাদন।

শ্বাস-প্রশ্বাসের অতি কঠিন ও কষ্টকর প্রক্রিয়া ভিন্ন ন্যাসতরঙ্গ বাজান সম্ভব নয়। 'ন্যাস' কথাটির মধ্যেই প্রাণায়ামের সঙ্গে যোগ আছে, বোঝা যায়।

কালীপ্রসন্নও অত্যন্ত আয়াসে ন্যাসতরঙ্গ বাজাতেন। শ্রোতারা শুনে অপূর্ব আনন্দ লাভ করত। কিন্তু তিনি সেই কঠিন প্রাণায়ামের ফলে প্রতিবারই অসুস্থ হয়ে পড়তেন কিছুদিনের জন্যে। এত কষ্টকর বলেই আসরে তিনি সারা জীবনে কুড়ি-বাইশ বারের বেশী এ যন্ত্র বাজান নি। তবুও তিনি ন্যাসতরঙ্গ বাজাবার জন্যেই দুরারোগ্য শ্বাস রোগে আক্রান্ত হন ও অতি কষ্টভোগের পর তাঁর মৃত্যু ঘটে। সেসবের বিস্তারিত বিবরণ এখানে দেবার দরকার নেই।......

ন্যাসতরঙ্গ বাদন যে নিছক একটি ভেল্‌কি ছিল, সুরের সূক্ষ্ম কাজ তাতে দেখান যেত না, তা নয়। ন্যাসতরঙ্গের সাঙ্গীতিক মূল্যও যথেষ্ট ছিল, অন্ততঃ কালীপ্রসন্নের ক্ষেত্রে। তাঁর বাজনায় সুরের অসামান্য কারুকর্ম শুনে একটি বিবৃতি প্রচার করেছিলেন অধ্যক্ষ অল্‌ডিস, কিন্তু তা এখানে উদ্ধৃত করা বাহুল্য।

কালীপ্রসন্ন ন্যাসতরঙ্গে তাঁর ইচ্ছা মতন রাগ বাজাতে পারতেন ও সুরের কাজ করতেন। সেজন্যেই তিনি এ যন্ত্রে অদ্বিতীয় ছিলেন!

ন্যাসতরঙ্গে তিনি একদিন National Anthem (জাতীয় সঙ্গীত) বাজিয়েছিলেন, জানা যায়! (বলার বোধহয় দরকার নেই যে, সে-যুগের বাঙ্গালীর 'জাতীয় সঙ্গীত' ছিল—God save the King!)···

কালীপ্রসন্নের ন্যাসতরঙ্গ বাদনের আর একদিনের কথা যে এখানে বলা হবে, সে এক বিরাট্ অনুষ্ঠান।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের একেবারে শেষ দিকে (২৮, ডিসেম্বর) সেই আসর বসেছিল।

রাণী ভিক্টোরিয়ার পুত্র প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্ (পরে সপ্তম এডওয়ার্ড) সে বছর ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তাঁর সংবর্ধনার জন্যে রাজধানী কলকাতায় মহা আড়ম্বরে একটি সভা হয় ওই তারিখে পাকপাড়ার সিংহ পরিবারের বিখ্যাত বেলগাছিয়া ভিলায়।

সেদিনের আসরে কালীপ্রসন্ন ন্যাসতরঙ্গ বাজান। সেখানে অন্যান্য অনুষ্ঠানও হয়েছিল। কিন্তু তার প্রধান আকর্ষণ হ'ল তাঁর ন্যাসতরঙ্গ। তাই তার আগের দিন 'দি ইংলিশম্যান' ঘোষণা করে—'বাবু কালীপ্রসন্ন ব্যানার্জী

ন্যাসতরঙ্গ যন্ত্র বাজাবেন। যুবরাজ বাগানে দু'ঘণ্টা মাত্র থাকবেন। অনুষ্ঠানটি হবে আগাগোড়া প্রাচ্য রীতিতে।'

'ইংলিশম্যান' কাগজে সেদিনকার অন্য কোন শিল্পীর নাম উল্লেখ না ক'রে শুধু কালীপ্রসন্নের কথা যে জানান হয়, তা লক্ষ্য করবার মতন।

বেলগাছিয়া বাগান-বাড়ীর এই সংবর্ধনা সভা এক বৃহৎ ব্যাপার। উদ্যোক্তাদের মধ্যে আছেন মহারাজা যতীন্দ্র-মোহন ঠাকুর, রাজা দিগম্বর মিত্র প্রভৃতি। আর উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন—জয়পুর, যোধপুর, বিকানীর, গোয়ালিয়র, মহীশুর, ত্রিবাঙ্কুর, বারাণসী, রেওয়া, কাশ্মীর, পাতিয়ালা ইত্যাদি তাবৎ দেশীয় রাজ্যের নৃপতি। আর আসরের প্রথম সারিতে—প্রিন্স অব ওয়েল্স, ভাইসরয় লর্ড নর্থব্রুক, লর্ড বিশপ প্রভৃতি।......

যথাসময়ে কালীপ্রসন্ন তাঁর ন্যাসতরঙ্গ বাদন আরম্ভ করলেন। গলার দু'দিকে 'বাঁশী' দু'টিকে চেপে ধরে বাজাতে লাগলেন তিনি।

এ এক অদ্ভুত 'বাঁশী' বাজাবার দৃশ্য। যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে সমস্ত শ্রোতারা এই আশ্চর্য ব্যাপার দেখতে লাগলেন!

বাদকের মুখ বন্ধ রয়েছে। অথচ অপরূপ সুরে 'বাঁশী' বেজে চলেছে স্বরলহরী তরঙ্গিত করে।

প্রিন্স অব ওয়েল্স্ থেকে আরম্ভ ক'রে অনেকেই প্রথমে ধারণা করতে পারলেন না, সুর উৎসারিত হচ্ছে কি কৌশলে এবং কোথা থেকে!

প্রথমে শ্রোতারা ভাবলেন—আওয়াজ বেরুচ্ছে বাদকের মুখ থেকে। কিংবা হয়ত এটা কোন বাজনাই নয়—আসলে ventriloquism।

কিন্তু চোখের সামনেই দেখা যাচ্ছে—বাদকের মুখ বন্ধ!

কণ্ঠতন্ত্রীতে কি গভীর শ্বাসক্রিয়ার ফলে কালীপ্রসন্ন যে সেই পাইপ থেকে বাঁশীর পরিচ্ছন্ন সুর সৃষ্টি ক'রে আসর ভরিয়ে তুলেছেন—প্রিন্স এবং ভাইসরয় প্রমুখ অনেক শ্রোতা তা' ধরতে পারলেন না।

এ এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। এরকম অদ্ভুত বাজনা তাঁরা আগে কখনও শোনেন নি!

সভায় অভূতপূর্ব বিস্ময় ও আনন্দের সঞ্চার হ'ল। শ্রোতারা সকলেই যেন মন্ত্রমুগ্ধ!

প্রিন্স এক অপূর্ব উদ্দীপনা অনুভব করলেন কালীপ্রসন্নের ন্যাসতরঙ্গ শুনে।

বাজনা শেষ হ'তে, তাঁকে এবং ভাইসরয় নর্থব্রুক্কে সেই ধাতুর পাইপ দু'টি দেখান হ'ল।

তখন তাঁরা পরীক্ষা ক'রে বুঝতে পারলেন—সেই ঝিল্লির মধ্যে হাওয়ার চাপ প'ড়ে যা কিছু সুরের কাজ হয়েছে!

সেদিনকার আসরে কালীপ্রসন্নের ন্যাসতরঙ্গের স্মৃতি সব চেয়ে উজ্জ্বল হয়ে আঁকা রইল শ্রোতাদের মনের পটে!

হীরের মালা ও ফুলের মালা

লক্ষ্ণৌর শেষ নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ্। রাজ্যহারা এবং নির্বাসিত হয়ে তিনি তখন মেটেবুরুজে বাস করছেন। কলকাতার দক্ষিণ উপকণ্ঠে খিদিরপুর, সেখান থেকে আরও দক্ষিণে মেটেবুরুজ।

সেখানে গঙ্গার ধারে অনেকখানি জায়গা জুড়ে নবাবের বসতি আরম্ভ হয়। লক্ষ্ণৌর নবাব হলেন মেটেবুরুজের নবাব। কোথায় প্রায় স্বাধীন লক্ষ্ণৌ রাজ্যে নবাবী আর কোথায় এই মেটেবুরুজে ব্রিটিশের বৃত্তিজীবী হয়ে নির্বাসন। তবু নবাবী আছে! আসল গেলেও, নকল হ'লেও।

তাই মেটেবুরুজেও লক্ষ্ণৌর অনুকরণে গড়ে ওঠে নবাবের কয়েকটা বাড়ী আর বাগিচা। কিন্তু লক্ষ্ণৌর রোশনি এসবে নেই। আর দরবার—সঙ্গীতের দরবার। কিন্তু এখানেও সে জুলুষ নেই। তবে ওয়াজিদ্ আলীর নবাবীর যা বাকি আছে তা সবই এই দরবারে।

এমন সঙ্গীতের দরবার তখন হিন্দুস্থানে আর কোথাও নেই। কোন রাজসভায় নয়, অন্য কোন নবাবের দরবারেও নয়। দিল্লীর তো তখন বাদশাও নেই, দরবারও গেছে। বাদশা মহম্মদ শাহের দরবারে যেটুকু চেক্নাই ছিল, বাহাদুর শার সঙ্গে তাও শেষ।

নবাব ওয়াজিদ আলীর দরবার তাঁর এক স্মরণীয় কীর্তি। এই দরবারের জন্যেই তখন মেটেবুরুজের নাম হিন্দুস্থানের সব ওস্তাদদের মুখে মুখে ফেরে। মেটেবুরুজ দরবারের কথা জানে না সঙ্গীত-জগতে এমন কে আছে? একসঙ্গে এক জায়গায় এত কলাবত আর তখন কোথায়? এত গাওয়াইয়া, সাজিন্দে, বাঈজী, নর্তক ও নর্তকীর দল, তবলিয়া আর শানাইওয়ালা।

মেটেবুরুজ দরবারে প্রায় দেড়শ জন গাইয়ে-বাজিয়ে। তা ছাড়া, বাঈজী আর নাটক করবার জন্যে মেয়ে-পুরুষ মিলিয়ে আরও প্রায় দু'শ জন। এঁরা সকলেই বাঁধা বেতনে নিযুক্ত। বছরে পনের লাখ (মাসে সওয়া লাখ) টাকা পেনশনে তাই নবাবের দরবার টিকে আছে। এই টাকায় মাঝে মাঝে টানাটানি পড়ে, সব দিক্ বজায় রাখা কষ্টকর হয় নবাবের পক্ষে। বছরে পনের লাখ টাকায় তাঁর বিরাট্

হারেম ও নিজের অন্য সব খরচ চালিয়ে ওই দরবারকে বাঁচিয়ে রাখা কঠিন হ'ত—যদি না উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করতেন হীরে-জহরৎ সোনা-দানার বহুমূল্য সঞ্চয়।···

নবাবের মেটেবুরুজের দরবার বসে গঙ্গার ধারে একটি দোতলা বাড়ীতে। শোনা যায়, এই সঙ্গীতের দরবার নবাবের জীবিতকালে কোনদিন কোনক্ষণ সুরশূন্য হ'ত না। গায়ক-বাদকদের সঙ্গীতৈকপ্রাণ নবাব এমন বন্দোবস্ত করেছিলেন যে দিবারাত্র গান বা বাজনা চলতে থাকবে এই-সঙ্গীতের দরবারে। নবাব সেখানে উপস্থিত হন বা না হন, চব্বিশ ঘণ্টাই সুর উপস্থিত থাকবে। কণ্ঠে কিংবা কোন যন্ত্রে সঙ্গীত চলবে অবিরাম। প্রহরে প্রহরে বাজবে শানাই। অন্য কোন যন্ত্রী যখন থাকবে না, গায়ক যখন উপস্থিত হবে না, তখন শানাই বাজবে। বাদকদের মধ্যে তাই নবাব শানাইওয়ালা রেখেছেন সবচেয়ে বেশী। মেটেবুরুজ দরবারে তাই চব্বিশ জন শানাইওয়ালা মোতায়েন।······

ওয়াজিদ আলীর দরবারকে সেজন্যে সঙ্গীতের দরবার না বললেই ভুল হয়। অন্য কোন দরবারের সঙ্গেই তার তুলনা চলে না। এই দরবারে বসে নবাব শুধু নিজের নিযুক্ত কলাবতদের সঙ্গীত উপভোগ করতেন, তা নয়। কলকাতায় আগত অন্য গুণীদেরও সেখানে আমন্ত্রণ ক'রে আনতেন। কখনও ফরমায়েস ক'রে শুনতেন নিজের প্রিয় কোন রাগ। সৌখীন কলাকুশলীদেরও সসম্মানে সেখানে নিমন্ত্রণ করতেন।

বাংলার অনেক গুণীও মেটেবুরুজ দরবারে গান বাজনা করেছেন।

এখন কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা। তিনি মেটেবুরুজ দরবারে একদিন নিমন্ত্রিত হয়ে আসেন বাজাবার জন্যে।

এবারে কিন্তু ন্যাসতরঙ্গ নয়। সুরবাহার।

কালীপ্রসন্নবাবু সেতার ও ন্যাসতরঙ্গের মতন সুরবাহারেও বড় গুণী। দরবারে তাঁকে ন্যাসতরঙ্গের বদলে সুরবাহার বাজাতে নবাব অনুরোধ করেন কি না জানা যায় নি। অনুরোধ করতেও পারেন। কারণ, সেতার সুরবাহার নবাবের প্রিয় বাজনা। তিনি নিজেও ছিলেন সেতারী।

ছেলেবেলা থেকে নবাবের সেতার বড় ভাল লাগে। সেতার বাজানো তাঁর তখন থেকেই আরম্ভ। তারপর বিখ্যাত ওস্তাদ কুতুব আলী খাঁর কাছে সেতারে দস্তুরমতন তালিম নেন। কুতুব এত বড় সেতার বাজিয়ে ছিলেন যে, তাঁর নামই হয়ে যায় 'সেতার-বাজ' কুতুব আলী।

কুতুবের ওস্তাদ ছিলেন বিখ্যাত ওমরাহ খাঁ, যাঁর উজীর খাঁ (রামপুর)। ওমরাহের আর এক সা হলেন গোলাম মহম্মদ, যিনি সুরবাহার যন্ত্র প্রথম বাজান

সেতার সুরবাহারের কদর বুঝতেন নবাব ওয়া আলী। তাই তিনি কালীপ্রসন্নকে সুরবাহার বাজ অনুরোধ করতেও পারেন।

যাই হোক্, সেদিন মেটেবুরুজের গঙ্গার ধারে দরবারে কালীপ্রসন্ন এলেন, সুরবাহার বাজাতে।

সাজানো আসর বসেছে। নবাবের দরবারী গা বাদকরা অনেকেই উপস্থিত। সামনে আছেন নবাব।

কালীপ্রসন্ন সুরবাহারে আলাপচারী আরম্ভ করলেন

নিপুণ চিত্রকর যেমন তুলি দিয়ে রঙে-রেখায় শ পটের ওপর রূপময় ছবি ফুটিয়ে তোলে, তেমনি ব কালীপ্রসন্ন রাগরূপ রচনা করতে লাগলেন সুরবাহা তারে তারে ঝঙ্কার দিয়ে, আঙুলের মায়া পরশে ি সুরের ইন্দ্রলোক সৃজন করলেন।

ধীর মন্থর গতিতে রাগের পদক্ষেপ ঘটা তিনি। অদৃশ্য লোক থেকে তারের মৃদু ঝঙ্কারে সুর তিনি আসরে আহ্বান ক'রে নিয়ে এলেন! অলক্ষ্য চর তার প্রথম আবির্ভাব। ক্রমে বাদকের দক্ষ আঙুে ছোঁয়ায় তার রূপ-মাধুরী ভাস্বর হয়ে উঠল। মীড়, গম আশ, মূর্চ্ছনার বিচিত্র অলঙ্কারে ভূষিত হয়ে রাগ মূর্তি প্র করলে শ্রোতাদের মনের পটে।···

কালীপ্রসন্নের সুরবাহার সুমিষ্ট সুরে যেন কথা বল লাগল।

নবাব তন্ময় হয়ে শুনছেন। সময় কোথা দিয়ে চ যাচ্ছে, কারও খেয়াল নেই। সুরবাহারের সুরের যাদু সমস্ত আসর তখন আচ্ছন্ন।

নবাবের বুঝতে বাকি নেই, কত বড় গুণীর আগম আজ দরবারে ঘটেছে। এমন সুরের কাজ তিনিও ক দেখেছেন। একাগ্র চিত্তে তিনি শুনতে লাগলেন এ বাঙ্গালী গুণীর সুরবাহারে সুরবিহার।

তারপর একসময়ে কালীপ্রসন্ন তাঁর বাজনা থামালেন।

কতক্ষণ বাজিয়েছিলেন তিনি? দেখা গেল, নবাবে ভোজনের সময় উত্তীর্ণ হয়ে আরও দু'ঘণ্টা পার হয়ে গেছে কেউ তাঁকে ডাকতে সাহস করে নি—এমন নিবিষ্ট হ বাজনা শুনেছেন তিনি। তাঁর নিজেরও একেবারে খেয়া নেই।

এখন বাজনা থামতে নবাব বার বার কালীপ্রসন্নকে

সাবাস দিলেন। আর আপনার কণ্ঠ থেকে সুগন্ধি পুষ্পমালা নিয়ে পরিয়ে দিলেন সেই মহান্ সুরশিল্পীর গলায়।

তারপর অশ্রুভরা আবেগের সঙ্গে বললেন—যে আনন্দ, যে তৃপ্তি আজ আপনার বাজনা শুনে আমি পেয়েছি, তার উপযুক্ত সম্মান দেখাতে আমি অক্ষম। কারণ আমি স্বাধীন নই। তা না হ'লে, ফুলের মালার বদলে আজ হীরের মালা দিয়ে আমি গুণীর মান রক্ষা করতাম।···

তার উত্তরে কালীপ্রসন্ন কি বলেছিলেন, তা জানা যায় নি। কিন্তু নবাবের এই অন্তরের উচ্ছ্বাস সেদিন হয়ত ওই ফুলের মালাকেই হীরের মালার মর্যাদা দিয়েছিল!

গান শুনতে ট্রেণ বন্ধ

গায়ক অঘোরনাথ চক্রবর্তীর পরিচয় আর নতুন ক'রে দেবার দরকার নেই। গোপালচন্দ্র চক্রবর্তীর সেই গানের আসরে তাঁর কথা জানান হয়েছে—কার কার কাছে তিনি গান শিখেছিলেন, তাঁর গলা কেমন তৈরী ছিল, কণ্ঠমাধুর্যের জন্যে তিনি আসর কিরকম মাৎ করতেন, ইত্যাদি।

এখানে তাঁর একদিনের গানের কথা বলা হচ্ছে। এটি কিন্তু কোন আসরের গল্প নয়।

অঘোরবাবু তখন সঙ্গীতের আসরে খুব বিখ্যাত হ'লেও, এদিনের গান কোন আসরে হয় নি। গানের এমন পরিবেশের কথাও বড় একটা শোনা যায় না। কারণ, এবারের ঘটনাস্থল হ'ল—মফস্বলের একটি ছোট রেল ষ্টেশন। চব্বিশ পরগণার সোনারপুর ষ্টেশন।

সোনারপুরের পাশে রাজপুর গ্রামে অঘোরবাবুর জন্মস্থান ও বাড়ী। আর তখন তিনি সেখানেই বাস করতেন। কম বয়স থেকেই তাঁকে যাতায়াত করতে হ'ত কলকাতায় কাজের জন্যে। চাল কেনা-বেচায় মধ্যস্থতা করতেন। বেলেঘাটায় নন্দীদের গোলায় সে-সময় প্রায় প্রতিদিন তাঁকে আসতে হ'ত।

সোনারপুর অঞ্চলের ওপর দিয়ে রেল লাইন পাতা হয়ে তখন নিয়মিত ট্রেণ চলাচল আরম্ভ হয়ে গেছে। অঘোরবাবু সেই লাইনের ডেলি প্যাসেঞ্জার। প্রতিদিন সকালের প্রথম ট্রেণে চলে আসতেন বেলেঘাটায়। তারপর সমস্ত দিন কলকাতায় থেকে রাত্রের গাড়িতে দেশে ফিরতেন। জীবিকার সঙ্গে কলকাতার সঙ্গীতজগতের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখতেন তিনি।

এমনি একদিনের কথা। সকালবেলা গ্রাম থেকে এসে ষ্টেশনে উপস্থিত হয়েছেন, কলকাতায় আসবার জন্যে।

ট্রেণ আসতে তখন একটু দেরি আছে। অঘোরবাবু ষ্টেশনের একটি বেঞ্চে বসেছেন। সঙ্গের সঙ্গী ছোট হুঁকোটিতে এক ছিলিম তামাক সেজে খাওয়াও সাঙ্গ হ'ল। মনটি বেশ প্রফুল্ল।

সকালের স্নিগ্ধ হাওয়া ঝিরঝির ক'রে বয়ে, চলে চলেছে। পরিচ্ছন্ন নীল আকাশের নীচে মনোরম সবুজ প্রান্তর।

অঘোরবাবুর খুশী মেজাজে গুন গুন ক'রে ভৈরবী সুরের সাড়া জাগল।

সেই শান্ত সকালে একা ব'সে তিনি প্রাণের আরামে তাঁর একটি ভৈরবীর প্রিয় বাংলা গান ধরলেন। কাউকে শোনাবার জন্যে নয়, নিজের ভাবে বিভোর হয়ে তিনি গাইতে লাগলেন—

বিফল জীবন, বিফল জনম, জীবনের জীবনে না হেরে···

অঘোরবাবু দরাজ গলায় গাইছেন—

সুখে ডালে ব'সে ডাকিছ পাখী রে,
ডাকিছ কি সেই পরম পিতারে···

এমন সময় ট্রেণ সশব্দে ষ্টেশনে এসে দাঁড়াল। অঘোরবাবুর কানে সে সংবাদ তখনই পৌঁছল না। তিনি তখন তন্ময় হয়ে গেয়ে চলেছেন—

কি বলে ডাকিছ, ব'লে দে আমারে, ডেকে যদি দেখা পাই রে···

একে অঘোরবাবুর লালিত্যময় কণ্ঠ, তার ওপর মনের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে গাওয়া গান তখন ষ্টেশনে সুরের মধুর আবহ সৃষ্টি করেছে।

সদ্য-থামা ট্রেণের যাত্রীদের কানে সেই সুর পৌঁছতেই তারা প্রথমে কামরার জানলায় মুখ বাড়িয়ে শুনতে লাগল। কিন্তু সেখান থেকে শুনে যেন পুরো তৃপ্তি না পেয়ে তারা প্ল্যাটফর্মে গায়কের কাছে এসে দাঁড়াল। কিংবা গানের সুর যেন তাদের আকর্ষণ ক'রে নিয়ে এল তার উৎসের পাশে। শুধু যাত্রীরা নয়। গার্ড থেকে আরম্ভ ক'রে ড্রাইভার পর্যন্ত এগিয়ে এসে উপভোগ করতে লাগল সেই গানের মাধুর্য।

প্ল্যাটফর্মে এত লোকজন এসে পড়ার জন্যেই বোধহয় গায়কের চমক ভাঙল। তিনি ট্রেণ এসেছে দেখে গান বন্ধ করলেন গাড়িতে ওঠবার জন্যে।

কিন্তু তিনি বুঝতে পারেন নি যে, এর মধ্যে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মটি মুগ্ধ শ্রোতার ভিড়ে সঙ্গীতের আসরে পরিণত হয়েছে।

তাই তিনি গান থামাতেই অনুরাগী শ্রোতারা বলে

উঠল, গান বন্ধ করবেন না। আমরা সবাই শুনছি। আর একটু হোক।

বিস্মিত অঘোরবাবু বললেন, কিন্তু ট্রেন যে লেট হয়ে যাবে।

সবাই কলরব করে উঠল, হোক গে লেট। আমরা সব একদিন লেট করেই যাব, তাতে আর হয়েছে কি? এমন গান ত আর অন্যদিন শুনতে পাব না।

গার্ড, ড্রাইভার সকলেরই মনের সেই ইচ্ছে, আর একটু শুনতে হবে। গান যেন বন্ধ না হয়। কিন্তু কাজের দায়িত্বের জন্যে হয়ত কিছু দ্বিধা ভাব ছিল।

তাই স্টেশন মাস্টার, যিনি নিজেও এতক্ষণ একজন মুগ্ধ শ্রোতারূপে দাঁড়িয়ে ছিলেন, এগিয়ে এসে বরাভয় দিলেন—সে সব আমি ঠিক করে নেব। তার জন্যে কাউকে কিছু ভাবতে হবে না। এখন অঘোরবাবুর গান চলুক। গান চলুক।

অগত্যা অঘোরবাবু গানখানি সম্পূর্ণ গাইলেন—

গুঞ্জরি ভ্রমর করি গুন্ গুন্, গাইছ কি সেই গুণাকর গুণ ;
শিখাও আমারে, আমি যে নির্গুণ, কি গুণে ভুলালে তাঁরে।
কেন ফুল্ল কুল হাসিছ সকলে, পেয়েছ কি সেই পরম দয়ালে ;
পায়ে ধরি, বল কেমনে পাইলে, প্রাণারাম প্রাণেশ্বরে।
সুনীল গগন নীল আবরণে, আবরি রেখেছ বুঝি প্রাণধনে ;
খোল আবরণ, বারেক নয়নে হেরে প্রাণ জুড়াই রে।
বিশাল সুমেরু ওহে বিন্ধ্যাচল, গ্রীবা উচ্চ করি
কি হেরিছ বল ;
করেছ কি হেরি জনম সফল, বিশ্বম্ভর বিশ্বেশ্বরে॥

গান শেষ হবার পর ট্রেন ছাড়ল সাত-আট মিনিট লেট করে। অঘোরবাবুর সঙ্গে সুরও যেন স্টেশন থেকে যাত্রা করলে।···

এই "বিফল জীবন বিফল জনম" গানখানির সঙ্গে অঘোরবাবুর আর এক দিনের আসরের স্মৃতি জড়িয়ে আছে। সেটিও উল্লেখ করবার মতন।

না, রেকর্ড করার কথা নয়। যদিও এই গান রেকর্ড হয়েছিল তাঁর আরও তিনটি গানের সঙ্গে, একটি বিশেষ অবস্থায়। তাঁর এই চারখানি গানের রেকর্ড গ্রামোফোন কোম্পানীতে হয় নি, কারণ তিনি রেকর্ডে কণ্ঠদান করতে সম্মত ছিলেন না। তাই তাঁর গান রেকর্ড হয়েছিল মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ীতে এবং এক রকম বিনা প্রস্তুতিতে তিনি গান চারখানি সেখানে গেয়েছিলেন। কোন যন্ত্রের সঙ্গত তাঁর গানের সঙ্গে ছিল না আর সেই রেকর্ড দু'টিতে মুদ্রিত আছে—In the household of Maharaja J. M. Tagore. "বিফল জীবন" গানটি ভৈরবীতে তাঁর Gramophone Concert Record স্বরূপে আছে "আনন্দবন গিরিজা"র অন্য দিকে (G. C. 2—12912)।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা কর্তব্য যে, তাঁর এই গান চারখানি (অন্য দু'টি হ'ল—"নজরা দিলবাহার", শ্রীজানের কাছে পাওয়া টপ্পা ও "গোবিন্দ মুখারবিন্দ") যথোচিত ভাবে এবং বিনা যন্ত্রে ও সঙ্গতে, শুধু গলায় গাওয়া। অনুকূল পরিবেশে গৃহীত না হওয়ায় এই রেকর্ড দু'টি থেকে অঘোরবাবুর গানের বিচার করতে গেলে, ঠিক ন্যায় কাজ হবে না।

সেকথা থাক। "বিফল জীবন বিফল জনম" গানখানি তিনি বড় ভাল গাইতেন। তাঁর এই প্রিয় গানের রচয়িতা ছিলেন বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়, যিনি ব্রহ্মসঙ্গীতরূপে এটি রচনা করেন। অঘোরবাবু গানটিকে টপ্পা অঙ্গে গঠন করে আসরে গাইবার উপযোগী করে নিয়েছিলেন, মনে হয়। কারণ এই গান তিনি রীতিমত ওস্তাদদের আসরে পরিবেশন করেন, এমন অন্তত একটি ঘটনার কথা জানা যায়।

সেদিনের সেই আসর বসেছিল কাশীতে। কাশীর সঙ্গে অঘোরবাবুর সম্পর্ক অনেক দিনের। জীবনের শেষ দশ বছরের মধ্যে অনেকটা সময় তাঁর কাশীতে কাটে। তাঁর মৃত্যুও হয় কাশীতে।

কাশীবাস করবার সময়েই তিনি পরবর্তী কালের গুণী ধ্রুপদী গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গীত শিক্ষা দেন। অঘোরবাবুর আর এক শিষ্য অমরনাথ ভট্টাচার্যও মাঝে মাঝে কাশীতে গেলে তাঁর কাছে শিক্ষা লাভ করতেন। অমরবাবু অবশ্য প্রথম জীবনে কলকাতায় অঘোরবাবুর শিক্ষা পেয়েছিলেন। অঘোরবাবুর কৃতী শিষ্য (শিবপুরের) নিকুঞ্জবিহারী দত্ত নিজের বাড়ীতে গুরুর শিক্ষা পান। পুলিনবিহারী মিত্র প্রভৃতি অঘোরবাবুর অন্যান্য শিষ্যেরা শিখেছিলেন কলকাতাতেই। ধরতে গেলে, গোপালবাবু ছাড়া তাঁর আর কোন শিষ্যই কাশীতে অঘোরবাবুকে পান নি। কারণ গোপালবাবু ছিলেন কাশীর সন্তান। প্রথম জীবনে তিনি কলকাতায় একবার এসে অঘোরবাবুর কাছে শিক্ষার জন্যে আবেদন করেছিলেন। তখন অঘোরবাবু রাজি হন নি। বলেছিলেন, যদি কখনও কাশীবাস করতে যাই, তখন এস, শেখাব।

পরিণত বয়সে যখন তিনি কাশীতে বাস আরম্ভ করেন, তখন গোপালবাবু এসেছিলেন শিক্ষার্থী হয়ে এবং অঘোরবাবুও কথা রেখেছিলেন।···

"বিফল জীবন বিফল জনম" গানটি অঘোরবাবু কাশীর

সে আসরে যখন গেয়েছিলেন, তাও তাঁর জীবনের শেষ দিকের কথা। কারণ সে আসরে, পরের যুগের ধ্রুপদগুণী ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (মহীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের শিষ্য) উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি গোপালবাবুর চেয়ে ৭।৮ বছরের ছোট।

এই আসরটি বিশ শতকের প্রথম ৫।৭ বছরের কোন সময়ে বসেছিল মনে হয়।

অঘোরবাবু তখন বছরের বেশীর ভাগ সময় কাশীতেই থাকতেন।

এমন সময় একটি আসর বসে সেখানে এবং অঘোরবাবু নিমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত হন।

অন্য যাঁরা সেখানে গান-বাজনা করতে এসেছিলেন, তাঁদের নাম জানা যায় নি। কিন্তু তাঁরা যে সবাই পশ্চিমা বা হিন্দুস্থানী ছিলেন, অর্থাৎ অঘোরবাবু ভিন্ন বাঙ্গালী কেউ ছিলেন না, তা জানা গেছে। ভূতনাথবাবু সেই আসরে উপস্থিত ছিলেন শ্রোতা হয়ে, গায়করূপে নয়।

গান আরম্ভ হ'তে তখনও কিছু দেরি আছে। আসরে বসে গল্প-স্বল্প করছেন গাইয়ে-বাজিয়ের দল। সবাই ত পশ্চিমের লোক। নিজেদের মধ্যে গল্প করতে করতে তাঁরা বাঙ্গালীদের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ আরম্ভ করে দিয়েছেন। কেউ বলছেন, বাঙ্গালীদের শরীরে কি তাকৎ আছে যে, ওরা গান গাইবে ?

কেউ বলছেন, বাংলা মুলুকে কি এমন চিজ্‌ পাওয়া যায় যে আমাদের মতন দাপটের সঙ্গে গাইতে পারবে !

কেউ বলছেন—আরে, চিংড়ি মাছ খেয়ে আবার গান গাইবে কি ?

তাঁদের ধারণা—কালোয়াতি গান গাইতে গেলে পশ্চিমের পালোয়ান হওয়া চাই। এ গান গাওয়া বাঙ্গালীর কর্ম্ম নয়।

পশ্চিমের অনেক সঙ্গীতজ্ঞেরই এই রকম ধারণা ছিল এবং এখনও একেবারে নেই বলা যায় না। তার কারণ শুধু এই নয় যে, বাঙ্গালীদের তাঁরা হিন্দুস্থানীদের মতন যথেষ্ট পরিমাণে ষণ্ডা মনে করেন না (সত্যিই পশ্চিমের অনেকের ধারণা—মল্লবীর না হ'লে সঙ্গীতজ্ঞ হওয়া সম্ভব নয়)। সেই সঙ্গে অনেক পশ্চিমাদের এই এক অহমিকা আছে যে, বাঙ্গালীরা কখনও রাগসঙ্গীতে হিন্দুস্থানীদের মতন পারদর্শী হ'তে পারে না। এই সঙ্গীতে পশ্চিমাদেরই একচেটিয়া অধিকার। বাঙ্গালীদের নিজস্ব সঙ্গীত এটা নয়—তাদের নিজেদের গান-বাজনা হ'ল অতি হাল্‌কা জিনিষ। রাগ-সঙ্গীতের তুল্য ভার বা ধার কিছুই তার নেই। বাংলা দেশের গান মানেই এই সব লোকের কাছে, অতি হাল্‌কা গান, থিয়েটারের গান ইত্যাদি বোঝায়।

সেই আসরেও বাঙ্গালীদের চিংড়ি-খেকো ইত্যাদি বলে এইরকম মনোভাবই প্রকাশ করা হচ্ছিল।

সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যে সেখানে একা অঘোরবাবু চুপ করে বসে তাঁদের কথাবার্তার ধরণ-ধারণ দেখছিলেন। কোন প্রতিবাদ করেন নি। মনে মনে বোধ হয় তিনি সংকল্প করছিলেন যে, মুখে তর্ক না করে কাজে দেখিয়ে দেব। বাঙ্গালী কিরকম গাইতে পারে, তা গান গেয়েই দেখিয়ে দিতে হবে।...

যথাসময়ে গান আরম্ভ হ'ল। প্রথমে হিন্দুস্থানী গায়ক দু'একজন গাইলেন। তার পর এল অঘোরবাবুর পালা। তিনি সকলকে অবাক্ করে দিয়ে ধরলেন—"বিফল জীবন বিফল জনম জীবনের জীবনে না হেরে...।"

এই ধরণের আসরে তিনি বাংলা গান বড় একটা গাইতেন না। গাইতেন হিন্দী ধ্রুপদ, ধ্রুপদাঙ্গ কিংবা টপ্পা অঙ্গের ভজন, কিংবা টপ্পা। এখানে বাঙ্গালীদের নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ হ'তে শুনে তিনি পুরোপুরি বাংলা গানই ধরলেন, হিন্দুস্থানী শ্রোতাদের বাংলা ভাষার মর্ম গ্রহণ করতে অসুবিধা হবে জেনেও।

যেন সমস্ত বাঙ্গালীদের মুখপাত্র হয়ে তিনি গানখানি আরম্ভ করলেন। অতি যত্নের সঙ্গে, দরদ দিয়ে, নিজের সব শক্তি প্রয়োগ করে লালিত্যময় টপ্পার দানায় ভরিয়ে গাইতে লাগলেন তিনি। বাংলা গান ধরবার বোধ হয় উদ্দেশ্য ছিল : তোমরা শোন বাঙ্গালী গাইতে পারে কি না। তোমরা আরও শোন—বাংলা ভাষায় কেমন টপ্পা হ'তে পারে।

গায়ক হিসাবে অঘোরবাবুর যেসব গুণের কথা শোনা যায়, সেদিনকার গানে তার অনেকখানি ফুটে উঠল।

গান যখন তিনি শেষ করলেন, তখন স্পষ্টই বোঝা গেল, আসর মাৎ হয়েছে। হিন্দুস্থানী শ্রোতাদের একবাক্যে স্বীকার করতে হ'ল—গান ভাল হয়েছে। সত্যিই বড় ভাল হয়েছে। যদিও ভাষা বোঝা যায় নি, অর্থ বোঝা যায় নি—কিন্তু সুরের কাজ চমৎকার, গাইবার রীতি অতি উঁচু দরের।

সেদিনের একজন শ্রোতা ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পরে এই আসরের গল্পটি বলতেন।

সুনের গুণ সবাই গায় না

আমাদের সঙ্গীতক্ষেত্রে all-rounder বা সর্বমুখী গুণী কমই দেখা গেছে। কারণ, ভারতীয় সঙ্গীত শুনতে যতই মধুর হোক, শিখতে বড় কঠিন। এ বিদ্যা যেমন গভীর, তেমনি জটিল। যেমন বিপুল, তেমনি বিচিত্র।

গানেরই কত ভিন্ন ভিন্ন রীতি। ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী। বাজনার রকমারি যন্ত্র—বীণা, সেতার, সরোদ, এস্রাজ, বেহালা, বাঁশী। সঙ্গতের জন্যে পাখোয়াজ, তবলা। এই সব বাজনা আর গানের এক-একটি শাখা ধরে কত সঙ্গীত-সাধক আজীবন সাধনা করে গেছেন—এত অফুরন্ত তার ভাণ্ডার।

বহুমুখী গুণী তাই ভারতীয় সঙ্গীতে দুর্লভ। এমনি একজন শক্তিধর সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন লক্ষ্মীনারায়ণ বাবাজী।

জীবনের অনেকখানি তিনি সন্ন্যাসীর মতন কাটিয়ে-ছিলেন। বেশভূষাও ছিল সন্ন্যাসীর মতন। তাই বাবাজী কথাটি বরাবরের জন্যে তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়।

প্রথম জীবনে তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। বাংলা দেশ ছেড়ে চলে যান পশ্চিমের নানা অঞ্চলে। জানা-অজানা বহু ওস্তাদের কাছে অদম্য আগ্রহ নিয়ে সঙ্গীতশিক্ষা করতে যান। অনেক বাধা-বিঘ্ন দুঃখ-কষ্ট সয়ে সঙ্গীত-সাগরের বহু রত্ন উদ্ধার করেন তিনি। এক সঙ্গীত-গুরুর সঙ্গলাভ করবার জন্যে ত তীর্থে তীর্থে বহুকাল ঘুরেছেন। সঙ্গীত-শিক্ষায় তাঁর কোনদিন যেন বিরাম ছিল না।

এমনি করে বছরের পর বছর চলে যায় তাঁর নানা কলাবতের কাছে শিক্ষা করতে। তারপর তিনি ফিরে আসেন কলকাতায়। কলকাতায় বাস করবার সময়েও তিনি কয়েকজন ওস্তাদের কাছে তালিম নেন। তখন তাঁর পরিণত বয়স, তবু অফুরন্ত উৎসাহে নতুন করে বিদ্যা অর্জন করেছেন।

যেখানে যাঁর কাছে ভাল কিছু আছে জেনেছেন, তাঁর কাছেই গেছেন শিক্ষার্থী হয়ে। শিক্ষার বিষয়ে তাঁর কোন অহঙ্কার বা অভিমান ছিল না। গুণী পেলে বয়সে তাঁর চেয়ে ছোট হলেও শিখতে দ্বিধা করতেন না। তাই নিজে যখন তিনি কলকাতার সঙ্গীত-সমাজে ধ্রুপদীরূপে সুপ্রতিষ্ঠ, বয়সে ছোট রমজান খাঁর কাছে টপ্পা গান নিতে কোন রকম সঙ্কোচ বোধ করেন নি।

নানা তীর্থের বারি নিয়ে তাঁর সঙ্গীতের ঘট ভরেছিলেন লক্ষ্মীনারায়ণ। তাই তাঁর পরিচয় দিতে গেলে বলতে হয়, একাধারে তিমি ছিলেন খেয়াল-গায়ক ও ধ্রুপদী। ঠুংরী ও টপ্পা গানেও পারদর্শী। তা ছাড়া, বীণকার, সেতার-বাদক ও এস্রাজী। আবার তবলাবাদক ও পাখোয়াজী। এমন বহুমুখী সঙ্গীত-প্রতিভা শুধু বাংলা দেশে নয়, ভারতবর্ষেও দুর্লভ ছিল।

তাঁর সঙ্গীত-কৃতির এই বর্ণনা অবিশ্বাস্য মনে হয়। কিন্তু তা মোটেই অতিকথন নয়। সঙ্গীতের ওই সব শাখায় তাঁর সত্যকার দখল ছিল, তিনি master of none ছিলেন না। কারণ তাঁর শিক্ষার মধ্যে কোন ফাঁকি ছিল না।

তাঁর সব ক'টি গুণের মধ্যে ধ্রুপদীর পরিচয়ই অবশ্য বড় ছিল। বাংলার সঙ্গীতসমাজে তিনি সুপরিচিত ছিলেন ধ্রুপদ-গায়ক বলে। কারণ, আসরে তিনি সাধারণত ধ্রুপদ গাইতেন।

ধ্রুপদের শিক্ষা তিনি লাভ করেন একাধিক কলাবতের কাছে।

গোয়ালিয়রের ধ্রুপদী হায়দর খাঁ এ বিষয়ে তাঁর এক ওস্তাদ ছিলেন। বেতিয়া ঘরানার প্রবর্তক, তানসেনের পুত্রবংশীয় যে হায়দর খাঁ ছিলেন—ইনি সেই ব্যক্তি কি না জানা যায় না। এই দুই হায়দর খাঁ অভিন্ন হ'তেও পারেন।

হায়দর খাঁ ভিন্ন রামকুমার মিশ্রের কাছেও ধ্রুপদের তালিম নেন লক্ষ্মীনারায়ণ। রামকুমার মিশ্র ছিলেন কলকাতায় সুপরিচিত বীণকার-ধ্রুপদী-খেয়াল-গায়ক লক্ষ্মী-প্রসাদ মিশ্রের পিতা এবং কয়েকজন প্রথম শ্রেণীর বাঙ্গালী সঙ্গীতজ্ঞের গুরু। রামকুমার মিশ্রের অধীনে লক্ষ্মীনারায়ণ ধ্রুপদ ও খেয়াল দুই শিখেছিলেন।

বিখ্যাত শ্রীজান বাঈয়ের কাছে তিনি অনেক ঠুংরী গান নেন। শ্রীজান বাঈ অবশ্য শুধু ঠুংরী-গায়িকা ছিলেন না। তাঁর মতন কলাবতী সঙ্গীতজ্ঞা খুব কমই জন্মেছেন এদেশে। তিনি ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী চার রীতির গানেই অসামান্যা পারদর্শিনী ছিলেন। তাঁর গানের গলা ছিল মর্দানা ঢঙ-এর। তিনি বাংলা দেশে বহু বছর অবস্থান করেন। তিনি কোন্ শ্রেণীর গায়িকা ছিলেন, তা হৃদয়ঙ্গম করা যায় তাঁর বাঙ্গালী শিষ্যদের কথা মনে করলে। বাংলার কয়েকজন দিক্‌পাল সঙ্গীতজ্ঞ—অঘোরনাথ চক্রবর্তী, প্রমথ-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শশীভূষণ দে (অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে-র প্রথম জীবনের এক সঙ্গীতগুরু), (রাণাঘাটের) নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (নগেন্দ্রনাথ দত্ত এবং পদ্মবাবু নামে সুপরিচিত নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গীত-শিক্ষক) প্রভৃতি শ্রীজানের কাছে কোন না কোন সময়ে শিক্ষার্থী হয়েছিলেন। তাঁদের সঙ্গে লক্ষ্মীনারায়ণের নামটিও করতে হয় এ প্রসঙ্গে।

বীণা, সেতার ও এস্রাজ যন্ত্রের শিক্ষা লক্ষ্মীনারায়ণের কাশীতে হয়েছিল। এই সব বাজনায় গুরু তাঁর কে বা কারা ছিলেন, তা সঠিক জানা যায় না।

তেমনি তবলাও তিনি প্রথমে শিখেছিলেন কাশীতে। তাঁর কাশীর তবলা শিক্ষকের নামও পাওয়া যায় নি। কিন্তু তারপর তিনি কলকাতায় তখনকার প্রসিদ্ধ তবলিয়া বাবু খাঁর কাছেও তালিম পান। বাবু খাঁ প্রথমে নবাব ওয়াজেদ আলীর মেটেবুরুজ দরবারে তবলাবাদক ছিলেন। তারপর নবাবের মৃত্যু হ'লে তিনি পূর্ব-উত্তর কলকাতায় রাজাবাজারের বাসিন্দা হন এবং কয়েকজন কৃতী বাঙ্গালী শিষ্য গঠন করেন, যাঁদের অন্যতম ছিলেন মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (বিখ্যাত হীরুবাবুর পিতা)। লক্ষ্মীনারায়ণ বাবাজীও তাঁর এক গুণী শিষ্য।

তাঁর পাখোয়াজের গুরু ছিলেন, পশ্চিম অঞ্চলের এক সন্ন্যাসী পাখোয়াজী-[illegible]। তাঁর নাম হ'ল—ঠাড়ীদাস। তিনি অনেক সময় প্রায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব কাজ করতেন, তাই এই নাম হয়। ঠাড়ীদাস নানা তীর্থে পর্যটন করতেন এবং লক্ষ্মীনারায়ণও তাঁর সঙ্গে পশ্চিমের তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ ও শিক্ষা করতেন। শোনা যায়, ঠাড়ীদাসের কাছে তিনি শুধু পাখোয়াজ নয়, গানও কিছু কিছু শিখেছিলেন।…

সুপ্রসিদ্ধ টপ্পাশিল্পী রমজান খাঁর কাছে তাঁর টপ্পা গান নেবার কথা আগেই বলা হয়েছে।

এই পর্যন্ত লক্ষ্মীনারায়ণের গুরুকরণের বৃত্তান্ত।

পশ্চিমাঞ্চল থেকে বাংলায় ফেরবার পর তিনি কলকাতাতেই জীবনের শেষ পর্যন্ত কাটান এবং গত শতকের শেষ দু' দশকে এখানকার সঙ্গীতক্ষেত্রে ছিলেন বিখ্যাত ব্যক্তি। পাথুরেঘাটার ঠাকুরবাড়ী ইত্যাদি সমস্ত বড় বড় আসরে তিনি সাধারণত ধ্রুপদ গাইতেন, কিন্তু কখনও কখনও পাখোয়াজও বাজিয়েছেন। স্বনামধন্য ধ্রুপদী মুরাদ আলীর—যাঁর তুল্য ধ্রুপদগুণী পশ্চিম থেকে বাংলায় খুব অল্পই এসেছিলেন—সঙ্গেও এক আসরে পাখোয়াজে সঙ্গত করেন তিনি।

লক্ষ্মীনারায়ণের গানের সঙ্গে বাংলার সবশ্রেষ্ঠ পাখোয়াজীরা বাজিয়েছেন—কেশব মিত্র, বসন্ত হাজরা, মুরারি গুপ্ত, নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। কেশববাবু তাঁকে অনেকবার নিজের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে সঙ্গত করেন তাঁর গানের সঙ্গে।

বিখ্যাত টপ্পা ও খেয়াল গায়ক সাতকড়ি মালাকর এবং অন্য এক অন্ধ গায়ক শরৎচন্দ্র মিত্র এক সময়ে লক্ষ্মীনারায়ণের শিষ্যত্ব স্বীকার করেছিলেন। তা ছাড়া, রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ (গড়পার), নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (ভবানীপুর), যোগেন্দ্রনাথ রায় (ব্যারাকপুর), লালমোহন বসু, ব্রজজীবন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিও ছিলেন তাঁর শিষ্য।

আচার্য রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী তাঁকে গুরুর মতন শ্রদ্ধা করতেন। বহরমপুরে মহারাজা মণীন্দ্র নন্দীর যে সঙ্গীত-বিদ্যালয়ের তিনি অধ্যক্ষ হন, সেখানকার এক অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি করে লক্ষ্মীনারায়ণকে নিয়ে যান গোসাইজী।

লক্ষ্মীনারায়ণ নিজে পাখোয়াজ ও তবলায় অভিজ্ঞ থাকায় তাল ও লয়ের উপর তাঁর অসাধারণ দখল ছিল। এ বিষয়ে তিনি কত বড় কলাবৎ ছিলেন, তার একটি দৃষ্টান্ত পাখোয়াজী নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের একটি আসরের প্রসঙ্গে দেখা গেছে।

গানের সঙ্গে স্বরের কাজও তাঁর কম ছিল না। আর গলাও তেমনি তৈরী। একদিকে তার যেমন মিষ্টত্ব ছিল, তেমনি অনায়াসে গলায় তিন সপ্তকের range শ্রোতাদের সবিস্ময় আনন্দ জাগাত।

রাগের উপর তাঁর এমন দখল ছিল যে, একই গান ইচ্ছা মতন তিনি আলাদা আলাদা রাগে গাইতে পারতেন।

একদিন তিনি দরবারী কানাড়া গাইছিলেন ঘরে বসে। এমন সময় তাঁর এক শিষ্য এলেন এবং দরবারীটি শেষ হবার পর, ভৈরব শুনতে চাইলেন।

তখন লক্ষ্মীনারায়ণ আর ভৈরবের জন্যে অন্য গান ধরলেন না। যে গানে দরবারী কানাড়া গাইছিলেন, সেই বাণীতেই ভৈরবের রূপ দিয়ে আরম্ভ করলেন এবং সম্পূর্ণ গাইলেন।…

তাঁর জীবনের অবলম্বন ছিল সঙ্গীত। সঙ্গীত ভিন্ন জীবন তাঁর কাছে অর্থহীন, যদিও এখনকার অর্থে তিনি পেশাদার ছিলেন না। কোন অর্থকরী কাজে সময় ও শক্তির অপচয় যাতে না করতে হয়, সঙ্গীতের সাধনার যাতে কোন বিঘ্ন না আসে, সেজন্যে তাঁর কয়েকজন গুণগ্রাহী ব্যক্তি বৃত্তির ব্যবস্থা করে দেন এবং তিনিও ছিলেন অল্পে সন্তুষ্ট।

[illegible] সিংহ তাঁকে যে মাসিক [illegible], যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর [illegible], আর শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর [illegible] টাকা দিতেন, তাইতেই সেই সস্তার বাজারে তাঁর চলে যেত 'বাজার খরচ'। আর সে যুগের অনেক বাঙ্গালী গুণীদের মতন তিনিও তাই অপেশাদার থাকতে পেরেছিলেন। অর্থাৎ সঙ্গীতকে দৈনন্দিন পেশায় পরিণত করেন নি। ভাল ভাল আসরে নিমন্ত্রিত হয়ে যেতেন এবং গান গাইতেন বা বাজাতেন বিনা পারিশ্রমিকে। প্রতিদিন

টাকার বিনিময়ে গান-বাজনা করবার তাঁর প্রয়োজন হ'ত না, প্রবৃত্তিও ছিল না। তখনকার অনেক গুণীর মতিগতিই এই রকমের ছিল, তাই তাঁদের এখনকার হিসেবে ঠিক পেশাদার বলা যায় না। পৃষ্ঠপোষকদের অর্থসাহায্য নিয়েও তাঁরা ছিলেন সৌখীন।

যাক সে কথা। তাঁর সঙ্গীতের আসর সব ভাল ভাল বাড়ীতেই বসত। পাথুরেঘাটা ঠাকুরবাড়ী থেকে আরম্ভ করে অনেক বড় বড় আসরেই আমন্ত্রণ হ'ত তাঁর। কিন্তু সবচেয়ে বেশী তিনি গাইতেন গড়পারের নিবারণচন্দ্র দত্তের বাড়ীতে। এখানে নিয়মিত তাঁর গানের আসর হ'ত। নিবারণবাবুও তাঁর এক পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সেখানেই এই ঘটনাটি ঘটে।

লক্ষ্মীনারায়ণ বাবাজী ছিলেন নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব। নিরীহ এবং শান্ত প্রকৃতির। পারতপক্ষে কারও সঙ্গে তাঁর বাদ-বিসম্বাদ হ'ত না। কিন্তু তাঁর স্বভাবের আর একটি দিক্ ছিল। তিনি বড় serious ছিলেন সঙ্গীত বিষয়ে। সে ব্যাপারে এমন তেজস্বী ছিলেন যে, কারও খাতির বা পরোয়া তিনি করতেন না। সেদিন সন্ধ্যার পর তাঁর আসর বসেছে নিবারণবাবুর বৈঠকখানায়। ঈষৎ খর্বাকৃতি, শ্যামবর্ণ লক্ষ্মীনারায়ণ বেশ খুশী মেজাজে ধ্রুপদ ধরেছেন। নিবারণবাবু তাঁর বন্ধু-বান্ধব নিয়ে শুনতে বসেছেন সামনে।

এখন, নিবারণবাবুর ছিল নুনের কারবার। বাবাজীর গান আরম্ভ হবার পর হঠাৎ তাঁর ব্যবসার কি দরকারী কথা মনে পড়ে গেল। তিনি পাশের একজনের সঙ্গে নুন-সংক্রান্ত কথাবার্তা বলতে লাগলেন।

দরবারী আসর ত নয়, বৈঠকখানার বৈঠক। গানে মগ্ন হলেও লক্ষ্মীনারায়ণের কানে গোটাকতক নুনের কথা ঢুকল এবং মনের সুর কেটে গিয়ে বিস্বাদ হয়ে গেল মেজাজটি। বিরক্ত হয়ে তিনি গান বন্ধ করলেন।

—এ কি! গান বন্ধ হয়ে গেল কেন? কারণ বুঝতে না পেরে অন্যমনস্ক গৃহস্বামী প্রশ্ন করলেন।

লক্ষ্মীনারায়ণ তীব্র শ্লেষের সঙ্গে বললেন, 'আজ নুনের গল্প হোক। কাল গুণ গাইব।'

বলতে বলতে তিনি উঠে দাঁড়ালেন, আসর থেকে চলে যাবার জন্যে।

তখন অনেক অনুরোধ ইত্যাদি করা হ'ল তাঁকে গান গাওয়াবার জন্যে। আসর যাতে মাটি না হয় সেজন্যে গৃহকর্তা থেকে আরম্ভ করে অনেকেই তাঁকে ক্ষান্ত হতে বললেন। কিন্তু ভাঙ্গা আসর আর সেদিন জোড়া লাগল না।

গানে বিঘ্ন ঘটায় লক্ষ্মীনারায়ণের ক্রোধ আর শান্ত হ'ল না। কোন অনুরোধ-উপরোধ আর স্পর্শ করতে পারলে না তাঁর সুর-ক্ষুণ্ণ মন। সব নস্যাৎ করে দিয়ে তিনি আসর ত্যাগ করলেন। যাবার আগে গায়কের এক মর্মান্তিক অভিমান ব্যক্ত করে গেলেন—'বত্রিশ নাড়ি ছিঁড়ে গান গাইতে হয়। তখন কেউ সামনে বসে যদি গল্প করে, তা হ'লে সেখানে আর গানের দরকার কি?'

মহাত্মা রামমোহন

যাঁহারা মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে অখ্যাতিকর কোনো অনুমান প্রকাশের জন্য প্রবাসীর সম্পাদকের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদের সহিত এই সম্পাদক পত্রিকা-সম্পাদন-রীতি সম্বন্ধে একমত নহে। সত্যনির্ণয়ই সকলের লক্ষ্য হওয়া উচিত; এবং সত্যনির্ণয় করিতে হইলে অনেক অপ্রীতিকর এবং হয়ত ভবিষ্যতে অসত্য বলিয়া যাহা প্রমাণ হইবে এরূপ অনেক কথারও আলোচনা করিতে হয়।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী, পৌষ, ১৩৩৬।

রায়বাড়ী

(তৃতীয় পর্য্যায়)

গিরিবালা দেবী

নবীন গৃহে গৃহে আলো দিয়া বেড়াইতেছিল। সেই আলো দেখিয়া বিনু সজাগ হইল। কামিনীর মা কত আগে তাহাকে হাত-পা ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া নিয়মের ঘরে যাইতে বলিয়াছে। বিনু তাহা ভুলিয়া গিয়াছিল। সেখানে যে সৃষ্টির কাজ পড়িয়া রহিয়াছে। উনুনের উপরে এক মণ দুধ অপেক্ষা করিতেছে ছানা মাখন সরের নাড়ু ক্ষীরের নাড়ুর অপেক্ষায়।

বিনু কাপড় ছাড়িয়া পশ্চিমের বারান্দায় হাত-পা ধুইতে গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কি আশ্চর্য্য, মণ্ডপের গা ঘেঁষিয়া বোধনের ঝাঁকড়া বেলগাছের সংলগ্ন নূতন বাঁশের মাথায় যে আকাশ প্রদীপটি মিটিমিটি করিয়া জ্বলিতেছে বিনু তাহা এতদিন লক্ষ্য করে নাই। রায়বাড়ী অরায়বাড়ীর এদিকে-সেদিকেও কয়েকটা আকাশ প্রদীপ আকাশ-পথে ক্ষীণ-রশ্মি বিতরণ করিতেছে। তাহার পিত্রালয়েও আকাশ প্রদীপ নিয়মিত প্রজ্বলিত হইয়াছে। সেই আকাশ প্রদীপের দিকে তাকাইয়া তাহার মনে পড়িল অকালে হারাইয়া যাওয়া স্নেহের ছোট ভাইটিকে। কিন্তু আকাশ প্রদীপের দিকে চাহিয়া থাকা বৃথা, কখনও তাহার ছায়াটুকু পর্য্যন্ত আকাশপথে প্রতিভাত হয় নাই। হইবে কিরূপে? সে যে দিদির কাছে থাকিবে বলিয়া এ-বাড়ীতে সুমন্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সে বিনুর বাহুবন্ধনে ধরা দিলেও বিনু তাহাকে ভুলিতে পারে না।

আকাশ প্রদীপের প্রতি চাহিতে চাহিতে বিনুর হৃদয় মথিত করিয়া চোখ জলে ভরিয়া গেল। এ অশ্রু সমাগমের সহিত প্রসাদের বিদায়ের কোন সংযোগ ছিল কি না বিনু তাহা বুঝিতে পারিল না। তাহার মনের কুঁড়ি ফুটি ফুটি করিয়াও পূর্ণ বিকশিত হইতেছে না।

বিনু নিয়মের সিঁড়িতে পা দিতে দিতে শুনিতে পাইল সরস্বতী মাকে বলিতেছে, "এ বাড়ীতে এ কি কাণ্ড করলে মা—ক্ষিতি অত বড় ছেলে তার সঙ্গে নতুন বৌকে কথা বলতে দিলে? যে বেহায়া বৌ, কবে হাতা-হাতি লাগিয়ে দেবে?"

মা বললেন, "কথা বললেই কি হাতাহাতি করবে? বৌমার ভাই নেই, ভাইবোনের মতন দু'জনা মিলেমিশে থাকুক।"

বিনুর আড়ি পাতিয়া পরের কথা শোনার অভ্যাস ছিল না। সে থামিল না, ঘরে ঢুকিয়া গেল।

মনোরমা দুধ জ্বালের উনুন ধরাইয়া সারি সারি বাটি-ঘটি ভাল জলে ফের ধুইয়া লইতেছেন।

সেই ফাঁকে বিনু যাইয়া উনুনের সামনে খুপরি পিঁড়িতে বসিয়া দুধ জ্বাল দিতে বসিল।

মনোরমা প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "তুমি দুধ জ্বাল দেবে বৌমা? আমি চিনি দিয়ে দিচ্ছি।"

'সাবধানের বিনাশ নাই।' মনোরমা ঠেকিয়া শিখিয়াছেন, দুধে চিনির ভার বধূকে দিয়া চলিবে না।

চিনি-মিশ্রিত দুধ ফুটিতেছে টগবগ করিয়া, ক্রমে ঘন হইয়া আসিতেছে। বাটিতে বাটিতে ভাগে ভাগে দুধ তুলিয়া মনোরমা বলিলেন, "কড়ার সব দুধ এবার ক্ষীর হবে। এবার উনুনে বেশি কাঠ দিও না। তা হ'লে নীচে ধরে যাবে। তুমি ভাল করে দুধ নাড়তে থাক, আমি সুমন্তকে দুধ খাইয়ে দিয়ে আসি। প্রসাদের জন্যে ছেলেটার মন খারাপ রয়েছে। তাই ছুতোনাতায় ঘ্যান ঘ্যান করছে।"

মনোরমা দুধের বাটি লইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

সরস্বতী জপের আসনে বসিল।

বিনু মুখের ঘোমটা কম করিয়া দুধ নাড়িতে লাগিল।

সরস্বতী জপে মগ্ন, গৃহে কেহ নাই। বিনু বাম হাতে হাতা ধরিয়া উনুনের মুখ হইতে নির্ব্বাপিত কাঠকয়লা লইয়া পরিষ্কার নিকানো উনুনের গায়ে আঁকাবাঁকা অক্ষরে লিখিল—

"এসে কেন চলে যায়—এ বাড়ীর বড় ছেলে,
বালিশে রেখে যায়, চন্দন সুবাস ঢেলে।
শিখেছে একটা কথা, 'বই পড় লেখ খাতা।'
আমি যদি পড়ি বই, ও এসে নাড়ুক হাতা।"

"এ কি বৌমা, পরিষ্কার লেপা-পোচা উনুনের পাড় কয়লা দিয়ে হিজিবিজি কেটে নোংরা করছ কেন?"

বিনু চমকিয়া উঠিল। সে ভাবে বিভোর হইয়া

রচনায় মন দিয়াছে। তাই শাশুড়ীর পদশব্দ টের পায় নাই। হাতা-ধরা বাম হস্ত তার দুধের কড়ায় আবদ্ধ। ডান হাতে সে তাড়াতাড়ি লেখাগুলি মুছিয়া শাড়ীর আঁচলে হাত মুছিতে লাগিল। মনোরমা বিরক্ত হইলেন, "এ কি করলে? ধোয়া ভাল শাড়ীকে যে কালিমাখা করলে? তুমি উঠে এস, ক্ষীর হয়ে এসেছে, আমি দেখে নামাচ্ছি। সুমন্ত ফের বায়না ধরেছে। 'বইদির কাছে ঘুমোব।' নবুনে তেতো হয়ে গেছে। তুমি সাবান দিয়ে ভাল করে হাত ধুয়ে কাপড় ছেড়ে আমার বিছানায় যাও। কালি মাখা কাপড়ে বিছানায় শুলে বিছানা ময়লা হয়ে যাবে।"

সরস্বতী 'নমো বিষ্ণুঃ তদা বিষ্ণুঃ' বলিয়া জপ সাঙ্গ করিয়া ঘাড় ফিরাইয়া বলিল, "দেখ না উনুনের পাড়টায় কি কাণ্ড করেছে? কচি খুকী, খেলার সাধ; কাজের সময় 'ঘোড়া দেখে খোঁড়া' হয়ে যান।"

বিনু সে মধুর বচন আর শ্রবণ করিল না। ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। তপ্ত মরুভূমির মধ্যে যে সুশীতল জলাশয়ের সন্ধান পাইয়াছে, তাহার বিলম্ব সহিবে কেন?

পরের দিন হঠাৎ রায়বাড়ীর সেজ জামাতা তারকনাথ মধুমতীকে লইয়া যাইতে উপস্থিত হইল। তারক পাবনা কোর্টের নব্য উকীল।

মধুমতী বাহিরে চাপা শান্ত হইয়া থাকিলেও ভিতরে ভিতরে হয়ত উত্তাল তরঙ্গের সৃষ্টি করিয়াছিল। নহিলে তারকনাথের 'টনক নড়িবে' কেন?

ঠাকুমা তাঁহার যথাস্থানে হাতীর মাথায় সমাসীনা। তারক প্রণত হইতেই তাহাকে সাদরে হাত ধরিয়া পাশে বসাইয়া প্রশ্নের পরে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন—"হ্যাঁ তারক, পুজোয় এলে না কেনে? মাধ্যি আমার 'মনের জ্বালায় ঝালাপালা, দেয় না দেখা চিকণ কালা, কিসের আমার ফুলের মালা'।"

তারক হেমন্তের মত সপ্রতিভ নয়। লাজুক প্রকৃতির। সে নতমস্তকে বলিল, "আজ্ঞে, পূজোয় মামা ধরেছিলেন, সেই জন্যে আসা হয় নি। একেবারে পুজো-পার্ব্বণ মিটে গেলেই নিতে এলাম। জগদ্ধাত্রী পুজোয় আমাদের কাছারি দুই দিন বন্ধ। এর ভেতরে আমাদের ফিরে যেতে হবে।"

ঠাকুমা ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন, "আসতে না আসতেই তোমার যাই যাই বুলি, এ কেমন ধারা তারক? তোমার 'রাঁধতে সইল, বাড়তে সইল না।' তুমি এলে নরা কাত্তিকে বৌ নিতে।"

"ছুটি যে নেই ঠাকুমা?"

ঠাকুমা তারককে ধমক দিলেন, "জগদ্ধাত্রীর পর রাস, রাসের পরে কার্ত্তিক পুজো। সবগুলো এক মাসে জড়ো করলে কত দিন হয়, আমি যেন জানি না। কত কাল পরে জামাই এল ঘরে ঝলক দিতে।"

তারক চট করিয়া সরিয়া পড়িল।

আবার রায়বাড়ীতে সুরু হইয়া গেল কোলাহল, জামাই ভোজনের আয়োজন। লোক ছুটিল বেড়ার বন্দরে পাকা রুই মাছ আনিতে। গৃহপালিত একটা খাসির শিরচ্ছেদন হইল। দোতলার বন্ধ ঘর খুলিয়া ঝাড়া-মোছা হইতে লাগিল। বিছানা-বালিস রৌদ্রে দেওয়া হইল। উচ্চ খাড়া সিঁড়িতে পদধ্বনি প্রতিধ্বনি তুলিল ধুপ ধুপ।

তারকনাথ রহিল মাঝে একদিন মাত্র। তাহার মধ্যে যতটা সম্ভব ভোজের সমারোহের ত্রুটি রহিল না।

ফের সেই সাত সকালে রন্ধন, ষ্টীমার ধরিবার ত্বরা।

রায়বাড়ী ধীরে ধীরে শূন্য হইয়া যাইতেছে। উৎসব-মণ্ডিত জনরব-মুখর দিনগুলি বিনুর মন্দ কাটে নাই। বাড়ীর প্রত্যেকটি মানুষ খাটিয়া হাড় চূর্ণ করিয়াছে, সেক্ষেত্রে বিনুর পরিশ্রমের কে হিসাব রাখে? বিনু কি কাজের? 'হাতী ঘোড়া গেল তল, ভেড়া বলে কত জল'।

মধ্যাহ্নে বিনু তাহার নিভৃত গৃহে মেঝেয় মাদুর পাতিয়া বই খাতা লইয়া বসিয়াছিল বটে কিন্তু সেদিকে সে মনঃসংযোগ করিতে পারিতেছিল না। বার বার মনে হইতেছিল মধুমতীর মুখখানি। মেয়েটি দিব্য হাসিখুশী, শান্ত স্বভাবের। জগদ্ধাত্রী পূজার ছুটিতে মধুমতীর স্বামী আসিয়া তাহাকে লইয়া গেল। কই, এ গ্রামে ত জগদ্ধাত্রী পূজার ঢাক-ঢোল কাঁসি-বাঁশী বাজিতেছে না? হয়ত এখানে হয় না। তাহাদের গ্রামেও জগদ্ধাত্রী পূজা নাই। কিন্তু বিনুর সহিত জগদ্ধাত্রী পূজার পরিচয় আছে।

হরিহরপুরে তাহার দাদামহাশয়ের বাড়ীতে বিনু কত পূজা দেখিয়াছে। কার্ত্তিক মাস ব্যাপী দুর্গোৎসব, যাহার নাম 'কাত্যায়নী' পূজা, বিনু দেখিয়াছে। কাত্যায়নী পূজা গোকুলের গোপকন্যারা প্রচলিত করিয়াছিল শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলাভ করিবার মানসে। তিন দিন দুর্গাপূজা করিতেই লোক অস্থির, তায় আবার এক মাস

ভরিয়া পূজা বলি ভোগ আরতি। ভাবিতে বিভীষিকা লাগে।

সকল পূজা হইতে জগদ্ধাত্রী পূজাই বিনুর মনের মত। এক দিনেই তিনবার পূজা, তিনবার বলি, তিনবার ভোগ। দিনমানেই সমস্ত মিটিয়া যায়। কালীপূজার মতন অমাবস্থার ঘোর নিশীথে ডাকিনী-যোগিনী ভূত-প্রেতের উপাসনা বিনু ভালবাসে না।

দাদামহাশয়ের একমাত্র সন্তান মেয়েকে কোন্ জন্মে পার করিয়া দিয়া স্বামী-স্ত্রী শুধু পূজা-পার্ব্বণ লইয়া প্রসাদ বিতরণ করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। ঐ যেন উঁহাদের এক মহাযজ্ঞ—কত লোক অন্ন পাইতেছে, বস্ত্র পাইতেছে। পরিশ্রমের মূল্য দিয়া ভাঙ্গা ঘর তুলিতেছে।

দাদামহাশয়ের মত রায়বাড়ীর পূজা নাস্তিক হইলেই বিনু গিয়াছিল। ঠাকুমা যে বলেন, 'একা রামে রক্ষা নাই সুগ্রীব মিতা।' মিছে বলেন না।

নানারূপ ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে বিনু উদাস হৃদয়ে তাহার লেখার খাতাখানা খুলিল। লিখিতে তাহার ভাল লাগে না। পড়ার বই পড়িতেও তাহার ভাল লাগে না। গল্প উপন্যাস কবিতার বই পাইলে তাহার চিত্ত ভরিয়া যায় এক অজানা আনন্দে। সে পুস্তকের ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলেও যে রস তুলনা-বিহীন।

"বৌঠান, চুপ করে বসে কাঁদছেন নাকি বাপের বাড়ীর জন্যে? রায়বাড়ীর বৌরা কিন্তু নাকে কান্না কাঁদে না।"

বিনু সচমকে ক্ষিতির দিকে চোখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আজ এত সকালেই তোমার স্কুল হয়ে গেল? তুমি বসো, ওই চেয়ারে।"

ক্ষিতি চেয়ারে না বসিয়া খাটে পা ঝুলাইয়া বসিয়া বলিল, "আজ যে শনিবার, হাফ স্কুল। সকাল কোথায়, বেলা গেছে।"

বিনু ভাবিল হেমন্তের এমন স্নিগ্ধ কোমল বেলাকে ঠাকুমা সাধে কি মরা কার্ত্তিক নাম দিয়াছেন। মরা কার্ত্তিকের বেলা দেখিতে দেখিতে সরিয়া যায়।

বিনুর নীরবতা ভঙ্গ করিয়া ক্ষিতি সহাস্যে বলে, "বৌঠান, আপনার জন্যে আমি একটা জিনিষ এনেছি, তার জন্যে আপনি আমাকে কি পুরস্কার দেবেন?"

বিনুর কাছে কেউ নাকি পুরস্কার চায়? সে আবার একটা মানুষ? ক্ষিতি কি আনিয়াছে তাহার জন্যে? কি আনিতে পারে? কই, তাহার হাতে ত কিছুই নাই?

বিনু হাসিয়া আগ্রহভরে বলে, "কি এনেছ দেখি? আমার কি জিনিষ নেবে?"

"মেয়েলী জিনিষে আমার দরকার নেই বৌঠান। বন্দরের দোকানে দেখে এলাম ভারি একটা মজার খেলার জিনিষ, তার নাম 'ব্যাগাটেল'।"

বিনু বোকা হইলেও ক্ষিতিকে আর বলিতে হইল না।

বিনু উঠিয়া তাহার কাপড়ের আলমারি খুলিল। চন্দনের ছোট বাক্সে তাহার খরচের জন্যে মা যে কয়েকটা টাকা দিয়াছিলেন, তাহার মধ্য হইতে পাঁচটা রূপার টাকা বাহির করিয়া ক্ষিতির হস্তে অর্পণ করিয়া কহিল, "এই নাও, এতে যদি না হয় আবার নিয়ো। এখন দাও আমাকে কি দেবে?"

ক্ষিতি শার্টের পকেটে টাকা রাখিয়া অন্য পকেট হইতে খামে আবদ্ধ প্রসাদের চিঠি বাহির করিল।

বিনু সবিস্ময়ে কহিল, "এরই জন্যে এত? চিঠি যে আজ আসবে তা আমি জানতাম।"

"নাও ত আসতে পারত? দাদার চিঠি পেয়ে আপনি কি খুশী হলেন না বৌঠান?" বলিতে বলিতে ক্ষিতি উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে এখনই বন্ধুমহলে খেলার মাঠে যাইতে হইবে।

বিনু চিঠি হাতে লইয়া কুণ্ঠার সঙ্গে কহিল, "খুশী হয়েছি। তুমি এক্ষুণি যাচ্ছ কেন ঠাকুরপো? আমার খাতার লেখা—"

"সে আর একদিন দেখব। আপনি খাতা ভরে ভরে লিখে রাখুন। খাতার পাতা ফুরিয়ে গেলে, আমাকে বলবেন; আমি ফের খাতা এনে দেব। আমি এখন ক্লাবে যাচ্ছি। লেখা দেখার সময় নেই।"

পকেটে টাকা বাজাইতে বাজাইতে প্রসন্নচিত্তে ক্ষিতি বাহির হইয়া গেল।

সরস্বতী খাও বাড়াইয়া তাহাকে পিছু ডাকিতে লাগিল, "ও ক্ষিতি, স্কুল থেকে এসে কিছু না খেয়েই যে ছুটে গেলি বৌয়ের কাছে। আয়, জল খেয়ে যা।"

ক্ষিতি চলিতে চলিতে ঘাড় ফিরাইয়া উত্তর করিল, "ভরা পেটে ফুটবল খেলা যায় না সেজদি। খেলে এসে খাব। বৌঠানের কাছে একটু দরকার ছিল বলে গিয়েছিলাম।"

"কি দরকার?" জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বে ক্ষিতি অন্তর্দ্ধান।

সরস্বতী মহা বিরক্ত হইল, ইহারই মধ্যে তাহার ভাইটিকে বৌ বশীভূত করিয়া লইয়াছে। তাহাদের গোপন কথা ক্ষিতি দিদির কাছেও ফাঁস করিয়া দিতে পারিল না। ও আবার নতুন বৌ। "রাইএর রঙ্গ দেখে অঙ্গ জ্বলে।"

ওদিকে সরস্বতীর অঙ্গ জ্বলিলেও এদিকে বিনুর অঙ্গ শীতল হইল প্রসাদের চিঠি পাইয়া।

চিঠিতে প্রসাদ লিখিয়াছে, সে নিরাপদে পৌঁছিয়াছে, ভাল আছে। বিনুর বাপের বাড়ী যাইবার দিন ঠিক হইল কি? তাহারা সকলে কেমন আছে? চিঠি পাইয়াই যেন সে রাত্রে বসিয়া উত্তর লিখিয়া রাখে। পরের দিন সকাল বেলা নবীনের হাতে চিঠি দিলেই সে ডাকবাক্সে দিবে। নবীনকে এ বিষয়ে বলা আছে।

বিনুর চিঠি পড়িলেই প্রসাদ বুঝিতে পারিবে তাহার লেখার উন্নতি হইতেছে কি না। ক্ষিতি লেখার খাতা দেখিতেছে ত, ইত্যাদি।

স্বামীর চিঠি নয়, ঠাকুরদা যেন নাত্‌নীকে চিঠি লিখিয়াছে। না আছে 'দু'টি সোহাগের বাণী,' না আছে একটি প্রীতিসম্ভাষণ। এ আবার চিঠি, খালি 'লেখ পড়', আর কথা নাই। যেমন দাদা তার তেমনি ভাই। একটা ছুতো ধরে পাঁচ পাঁচ টাকা আদায় করে নিয়ে উধাও। খাতাখানার প্রতি তাহার একবার নজর দিবার সময় হইল না। কেনই বা হইবে? একজনার কাঁচা লেখা পাকা করিবার ক্ষিতির কিসের দায়?

যাহার দায় সে নিজে আসিয়া মাষ্টারী করুক না কেন? লেখাপড়া শিক্ষার কারণে নিজের যাইতে হয় বিদেশে, থাকিতে হয় ছাত্র-নিবাসে। শিক্ষার যেমন আয়োজন, তেমনি সমারোহ। আর বিনুর বেলায় লেখাপড়া হইল 'ছেলের হাতের মোয়া'। 'একবার শ্যাম রাখ, একবার কুল রাখ।' না—বিনু আর লেখাপড়া করিতে পারিবে না। পত্রোত্তরে সে তাহাই লিখিয়া দিবে। যাহার অত সখ সে আসিয়া বসিয়া বসিয়া শিক্ষা দিক।

প্রসাদের চিঠিখানা লুকাইয়া বিনু পুবের বারান্দায় বসিল। এ দিকটা নির্জ্জন স্তব্ধ, এখন ঢেঁকিশালার কাজ নাই। সহসা মনে পড়িতে লাগিল হরিহরপুর, সই কুসুম, তাহার স্বামীর প্রেমপূর্ণ লিপির আকুলতা, উচ্ছ্বাস। তাহার প্রতি ছত্র বিনুর হৃদয়ে গাঁথা হইয়া রহিয়াছে। সেই চিঠি আর এই চিঠি! 'কোথায় বাঁশীর ধ্বনি, কোথায় ঝিল্লীর গুনগুনি।'

মূঢ় বিনুর জানা ছিল না—'অল্প জলে পুঁটি মাছের খেলা, গভীর নীরে রুই কাতলার লীলা।" সে ফল্গুনদী দেখে নাই। বাইরে তাহার প্রকাশ নাই, উচ্ছ্বাস নাই—সে অন্তঃসলিলা।

বিনুকে একাকিনী দেখিয়া কোথা হইতে ঠাকুমা আগাইয়া আসিয়া পাশে বসিলেন। বসা মানে পায়রার মত বক বক, "শোন লো মণিমালা, আজকে পেসাদের পত্তর এইচে? আহা, আমার ব্রেজের গোপাল ব্রেজ আঁধার করে গিয়েছে মথুরায়। একাল, তবু ভাল, পত্তরের চলাচল আছে। আমাদের কালে এর চলন ছিল না। তখনকার বুড়া বুড়ীরা কইত, 'মেয়েমানুষ লেখন-পড়ন করলে বিধবা হয়।' বিদ্যার দেবী সরস্বতীর স্বামী নেই। তার সেবা করলে মেয়েমানুষের স্বামী থাকে না। দেখ্ মণি বৌ, পেসাদ তোরে কি লেখে লো? পত্তরখানা পড়্ না একবার, শুনি?"

বিনু বলিল, "কি আবার লিখবে, ভাল আছে।"

"দেখ্ লো, তোর মনটা যেন ভার ভার লাগছে? একে একে চলে যাচ্ছে সকলে। হেমন্ত-ভাস্তি গেল, পেসাদ রওনা দিল। মাধুও গেল। লক্ষও গেইচে মামার বাড়ী, মেয়েটার বাপ মা নেই, 'যে বলে আয় রে, তারি কাছে যাইরে।' মেয়েটা এদিকে মন্দ না। দোষ চলন-বলনে, আর দিনরাত হাসায়। অত হাসা কি ভাল। কথাতেই আছে, 'যত হাসি তত কান্না কয়ে গেছে রাম শর্ম্মা।' সকলেই চলে যাচ্ছে, এবার তুইও যাবি। মায়ের বাছা, মা'র কাছে যাবিই ত? আজ তোদের সেখানকার চাকর এসেছিল, তোর শ্বশুরের কাছে পত্তর নিয়ে।"

বিনু সচকিত হইয়া কহিল, "তা ত শুনি নি ঠাকুমা? কবে আমি যাব শুনেছেন নাকি?"

ঠাকুমা সে কথার উত্তর দিবার পাত্রী নন। নিজের কথার সূত্র ধরিয়া আপনার মনে বকিতে লাগিলেন, "রায়-বাড়ীর বৌদের বাপের বাড়ী যাওয়া কর্ত্তারা ভালবাসে না। নিজেদের মেয়ে পুষতে বড় ভালবাসে। কোন্ মান্ধাতার কালে এয়েছিলাম এ বাড়ীতে, এখন তা মনেও নাই। যখনি কর্ত্তারে কয়েছি, 'আমারে একবার পাঠায়ে দাও, সকলকে দেখে আসি।' কর্ত্তা মুখের পরে সাফ কয়ে দিছেন, 'তুমি যাবে সবাইকে দেখতে বড় বৌ, আমাকে দেখবে কে? কার কাছে তুমি আমাকে থুয়ে যাবে?' শোন কথা, যে পাঁচখানা গাঁয়ের মাথা—

যার পরতাপে 'বাঘে বলদে এক ঘাটে জল খায়', তারে দেখবে কে?"

ঠাকুমা নীরব হইলেন। অতীতের কথা স্মরণে আসাতে তাঁহার শুষ্ক মলিন মুখে একটা কোমল আভা খেলা করিতে লাগিল।

এমন সময় ছুটিতে ছুটিতে তরু আসিয়া উপস্থিত। আঁচলের নীচ হইতে একটা পাথরের বাটি বাহির করিয়া তরু চুপে চুপে বলিল, "বৌদি, খাবে? কচি তেঁতুল শিলে ছেঁচে নুন-লঙ্কা দিয়ে মেখে এনেছি। মেনীটা কি বোকা, সকলের সামনে তেঁতুল ছেঁচতে গিয়েছিল, ধরা পড়ে গেছে। ওর মা ওকে আটকে রেখেছে। কচি তেঁতুল খেতে খুব ভাল লাগে, খেয়েই দেখ।"

ঠাকুমাকে কাহারও সমীহ করিবার দরকার হয় না। বিশেষ তরুর সাদর আমন্ত্রণ, বিনু হাত বাড়াইল।

ঠাকুমা সেদিকে তাকাইয়া বলিলেন, "পড়েছ যবনের হাতে খানা খেতে হবে সাথে।"

তরু তেঁতুল চুষিতে চুষিতে মুখে চুক্ চুক্ শব্দ করিয়া বলে, "ঠাকুমা, তুমি আমায় যবন বললে? খাবে একটু? এখনও বাটি এঁটো হয় নি, তোমাদের নিরামিষ শিলেই থেঁত করে এনেছি।"

ঠাকুমা মাথা দোলান—"না লো, এখন টক খেতে পারি না, অম্বল তাম্বল হয়। তোরা খা, বৌ চলে গেলে কার সাথে তখন খাবি? ও-সকল দেব্য একলা খেয়ে সুখ নেই।"

"একলা খেয়ে যদি সুখ নেই, তা হ'লে পাকা কামরাঙ্গা কুড়িয়ে তুমি একলা খেয়ে কি সুখ পাও? বৌদির যাবার দেরি আছে, বাবা বলেছেন নবান্নের পরে পাঠাবেন। নবান্নের আগের দিন রবিবারে আমার 'নাটাই পূজো' হয়ে যাবে। বৌদি দেখে যাবে। শেষেরটায় ফিরে আসবে।"

ঠাকুমা সাগ্রহে প্রশ্ন করেন "তা হ'লে ক'দিন থাকবে মণি বাপের বাড়ীতে?"

"তা অনেক দিন থাকবে, দশ-বারো দিনের কম নয়। মা বলছিলেন অঘ্রাণ মাস পড়তে পড়তেই বৌদিকে ছেড়ে দিতে। বাবা বললেন, 'নবান্নের পরে।' বাবার ইচ্ছে নয় বৌদি বেশি দিন সেখানে থাকে। নিজের মেয়েদের রাখতে বেশ লাগে।"

ঠাকুমা 'ঝোপ বুঝে কোপ দিয়ে' এ বাড়ীর নাড়ী-নক্ষত্রের সংবাদ সংগ্রহ করেন। তিনি তরুর কথার উত্তর স্বরূপ বলেন, "নবান্নের দিন অঘ্রাণ মাসের কোন্ তারিখে পড়ছে লো? আমাদের আবার মুলো ষষ্ঠী আছে। পাষাণ চতুর্দশীর বস্ত আছে। কালকেই কার্ত্তিক মাসের শেষ দিন।"

বিনু জানিত কার্ত্তিক সংক্রান্তিতে কার্ত্তিক পূজার বিধি। কি ভাগ্য রায়বাড়ীতে কার্ত্তিক পূজার সমারোহ আরম্ভ হয় নাই। আগেই ত ঠাকুমা গাহিতেছেন—'মুলো ষষ্ঠী' 'নবান্ন', 'পাষাণ চতুর্দশী', 'নাটাই পূজা'। গাহিলে কি হইবে, কার্ত্তিক যে যায়। অগ্রহায়ণ মাসে বিনুর ছুটি হইবে। কয়দিনের ছুটি তাই ভাবিতে তাহার হৃদয়ে পুলক-মিশ্রিত বিষাদ ঘনাইয়া আসিতেছিল।

তরু কহিল, "তুমি তেঁতুল খাচ্ছ না কেন বৌদি? মাখা ভাল হয় নি?"

"এই ত খাচ্ছি, বেশ সুন্দর হয়েছে। এ গাঁয়ে বুঝি কার্ত্তিক পূজো নেই?" বলিতে বলিতে আনমনা বিনু পাথরের বাটি হইতে এক খাবলা তেঁতুল মাখা তুলিয়া লইল।

তরু সগর্ব্বে বলে, "আমাদের গাঁয়ে এমন পূজো নাই যে হয় না। তোমাদের গাঁয়ে কত বাড়ী কার্ত্তিক পূজো হয়?"

"সাহা বাড়ী, কুণ্ডু বাড়ী, গয়লা—"

তরু বিনুকে কথাটা শেষ করিতে দিল না। আসলে এখানে কার্ত্তিক পূজার তেমন প্রচলন ছিল না। কিন্তু জমিদার-তনয়া ভিন্ন গ্রামের মেয়েদের কাছে সে পরাভব মানিবে কেন? তরু তেঁতুলের হাত চাটিতে চাটিতে তাচ্ছিল্যভরে কহিল, "আমাদের গাঁয়ের লোক কিসের দুঃখে কার্ত্তিক পূজো করবে? আমি ছোট ঠাকুমার কাছে শুনেছি, যাদের ছেলেমেয়ে নেই তারাই কার্ত্তিক পূজো করে, গণেশ পূজো করে। আমাদের গাঁয়ে সবারি গাদা গাদা ছেলে-মেয়ের ঘর ভরা। আমাদের কুকুর-বেড়ালদেরও মাসে সাতবার করে বাচ্চা হয়।"

তেঁতুল ফুরাইয়া গিয়াছে। বাটির গায়ে, আঙ্গুলে তাহার চিহ্নও নাই। বিনু চুপ করিয়া আছে। তরু উঠি-উঠি করিতেছে। এমন সময় গরর গরর শব্দ করিতে করিতে লেজ ফুলাইয়া ফুলমণি বেড়ালের আবির্ভাব। তরুকে কোনখানে স্থির হইয়া বসিতে দেখামাত্র ফুলমণি ছুটিয়া আসে তাহার কোলে বসিতে। বালিকার সুকোমল ক্রোড় তাহার অতিশয় আরামপ্রদ স্থান।

এক্ষেত্রে ফুলমণি সেই আশায় আসিয়াছিল। কিন্তু ফুলমণির ভাগ্য আজ বিরূপ। তরু বিড়ালকে ঠেলিয়া দিয়া উঠিয়া চলিতে চলিতে বলিল, "বুড়ীর সখ দেখে

বাঁচি নে, বসামাত্র আমার কোলে এসে বসবে। পেটের ভেতরে যে বাচ্চাগুলো নড়ে-চড়ে সে খেয়াল নেই। আমার গা শির শির করে।"

তরু সবেগে প্রস্থান করিল, তাহার পিছনে ফুলমণি।

পরের দিন প্রভাতে বিনুর ঘুম ভাঙ্গিতে দেরি হইয়া গিয়াছিল। দেরির অপরাধ নাই। রাত্রে অনেকগুলি চিঠির কাগজ নষ্ট করিয়া অবশেষে বিনু স্বামীর নিকটে একখানা চিঠি লিখিয়া শেষ করিতে পারিয়াছিল। কর্ত্তার আবার হুকুম, বৈকালে চিঠি পাইলে রাতে তাহার উত্তর লিখিয়া রাখিবে। এবার আবার বিদ্যার দিগ্‌গজ বিনুর হস্তাক্ষর পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, লেখা উন্নতির পথে যাইতেছে কি না। রাতের আহারাদি মিটিবার পরে বিনুর আর জ্বালা-যন্ত্রণা থাকে না। ছোট ঠাকুমা বিনুর পাহারাদার। দিবালোকে তিনি এ-গৃহের ত্রিসীমানা মাড়ান না। তাঁহার সারা-দিনের আশ্রয়স্থল ছোট ভোগের ঘর, যাহার এক অংশে নিত্য ভোগ রান্না হয়। অপর অংশে ছোট একখানা সরু তক্তাপোষে থাকে ছোট ঠাকুমার বেতের ঝাঁপি, কাপড়, গায়ের চাদর, পূজার সরঞ্জাম, জপের মালা ইত্যাদি।

বিনুর নৈশ ভোজনের পরে ছোটঠাকুমা প্রসাদের খাটে আসিয়া শয়ন করেন। তাঁহার একমাত্র নির্দ্দেশ, বধূ যেন গৃহে শব্দ না করে; কাগজের বেষ্টনী দিয়ে উজ্জ্বল আলো ঢাকিয়া রাখে। ইহার বেশি তাঁহার চাহিদা নাই। কাজেই বিনুর চিঠি লেখার ব্যাঘাত হয় না। কিন্তু ব্যাঘাত করে বিনুর অবাধ্য ঘুম। ঘুম যেন বাঘের মত আড়ালে আড়ি পাতিয়া বসিয়া থাকে; বিনুকে পাইলে আর রক্ষা নাই। ঝাঁপাইয়া পড়ে ঘাড়ে নয়, চোখের পাতায়।

ভোরে ছোট ঠাকুমা বিনুকে ধাক্কা দিয়া ঘুম ভাঙ্গাইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন নিজের কাজে। বিনু ফের সুখনিদ্রায় নিমগ্ন হইয়াছিল। পত্র পর্ব্বে রাত আড়াইটে পর্য্যন্ত তাহাকে কম পরিশ্রম করিতে হয় নাই। সকলেই কি সব পারে? বিনুর হইয়াছে 'ভালুকের হাতে খন্তা'।

পুকুরের দিক্ হইতে একটা অস্পষ্ট গোলমাল শুনিয়া বিনুর ঘুম সভয়ে অন্তর্হিত হইল। দিনের বেলা কাহারও ঘরে ডাকাত পড়িয়াছে, না আগুন লাগিয়াছে?"

বিনু মুখ ধুইয়া আঙ্গিনায় পা দিতেই তরু কহিল, "ও বৌদি, শুনেছ, মথুর দত্তের বাড়ীতে কি কাণ্ড?

বিনু মথুর দত্তকেও চেনে না; কাণ্ডও জানে না। যে সদ্য নিদ্রাভাঙ্গা বিহ্বল নেত্র তরুর মুখে নিবদ্ধ করিয়া প্রশ্ন করে, "মথুর দত্ত কে? কোথায় থাকে?"

"মথুর দত্ত আমাদেরই প্রজা। ওরা বেনে কি না, বন্দরে বেনেতি মশলার দোকান আছে। থাকে পুকুরের ওই দিকে, গলির ওপারে। দত্তর দুটো বৌ; ছেলে হয় না। আজ ভোরবেলা পাড়ার দুষ্টু ছেলেরা দুষ্টুমি করে ওদের ঘরের সামনে জোড়া কার্ত্তিক ঠাকুর রেখে গেছে। দোর খুলেই কার্ত্তিক দেখে হাউ-মাউ করে মরছে সবাই। আমি কামিনীর মা হারাণীর সাথে গিয়েছিলাম ওই-খানে। কি সুন্দর কার্ত্তিক ঠাকুর; টুলটুল করছে মুখ।"

ঠাকুমা আগাইয়া আসিলেন, "কি কইলি তন্বি, মথুরের বাড়ীতে কার্ত্তিক এয়েছে? ভাল কথা—শুভ সংবাদ। এতকাল এ কথাটা গাঁয়ের লোকের খেয়াল ছিল না। ছোট-বড় দুই-দুইটি বৌ, কারোর কোলে সোনার কার্ত্তিক আসে নি। নাতির তরে দত্ত গিন্নীর কত আক্ষেপ। পয়সা আছে, খাবার লোক নেই। 'কেউ বলে ভাত কি দিয়ে খাব—কেউ বলে ভাত কোথায় পাব'।"

কামিনীর মা, হারাণী,পসারী-খেঁসারী সকলে দত্ত-বাড়ী প্রদক্ষিণ করিয়া একে একে ফিরিয়া আসিতেছিল।

ঠাকুমার কথায় সায় দিয়া কামিনীর মা বলে, "যা কইলে মাঠান, যেখানে খাওনের দুঃখ নাই সেখানে ছাওয়াল ম্যায়ার পাল যায় না। যত আমদানি হা-ভাতের কাছে।"

ঠাকুমা জিজ্ঞাসা করেন, "ঠাকুর পেয়ে দত্ত গিন্নী তুষ্ট হয়েছে ত রাজেশ্বরী? কি করছে ওরা? বৌদের কোলে দিয়েছে?"

"হা রে আমাগো মরণ দশা—দত্তমশাই হাড় কেপ্পন, পুজ্জ্যার খরচ লাগিবে বলি চটে-মটে আগুন। দত্ত গিন্নী বুড়া মানুষ, নাচন-কোঁদনের সাধ্যি নাই। তবু বুড়ী 'আশার দুয়ারে বান্ধা খাটে'। দুই বৌরে ডাকি বসায়ে কোলে ঠাকুর দিতে যায়, বড় হাসি হাসি কোলে নয়া বসে। ছোট মুখ বাঁকায়ে কয়, 'আমার ঠাকুর-দ্যাবতায় দরকার নাই। মাটির ঠাকুর, অত বড় ভার দেব্য কোলে নিলে আমার কাঁকাল টন টন করিবে।' বুড়ী বৌরে হাতে ধরে ব্যাগাতা করি তার কোলের কাছে এতটুকু বসায়ে দিইছেল। তক্ষুণি তড়াক্ করে ঢলানি উঠি পড়ল। সাধে কি ওয়ার নাম থুইছে গেরামের লোক মথুরা-বাসিনী। যখন দত্তমশাই বুড়া বয়েসে যোয়ান বয়েসী বৌ বিয়ে কর্‌য়া আনিছেল 'বাড়ীতে কাকের বাসা

বাঁধিল।' মিছে কয় নাই। শুনি, পাড়ার চাষাভুষার ডবকা ছাওয়ালরা বাড়ীর চারদিকে ঘুরে বেড়ায়। গায়েন গায়, ঢিল দেয় টিনের ঘরের চালে।"

হারাণী বলে, "সে গায়েন কি য্যামন-ত্যামন গায়েন, কথা-গুলান মন্দ না—'আজি যে গোলাপ ফুল, সৌরভে করে আকুল, কালি যে ঝরিয়া যাবে কে তাহারে চায় রে।"

মনোরমা চায়ের ঘর হইতে এইদিকে আসিতেছিলেন, কামিনীর মা সেইদিকে তাকাইয়া ক্ষুদ্র জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিল—"যা তোরা, যে-যার কাজে যা। দত্ত-বাড়ীতে কাত্তিক আইচে তাইতে আমাগো কি? 'যার ঝি তার জামাই, পড়শী বাড়ীর কাটনা কামাই।' বৌমা, তরকারি নয়া বসগে।"

যে যাহার কাজে চলিয়া গেলে ঠাকুমা হেলিতে-দুলিতে রওনা হইলেন ভোগশালার দিকে।

ছোট ঠাকুমা স্নানান্তে তুলসীতলায় জল দিতেছিলেন। ঠাকুমা সেইখানে থমকিয়া দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়া মুখ খুলিলেন "কত দুঃখ দিলে হরি, সংসারে আনিয়া
বসায়ে হাটের মাঝে, রহিলে সরিয়া।"

ভূতের মুখে রাম নাম শুনিয়া ছোট ঠাকুমা কহিলেন, "তুলসীতলায় একটু বসবে দিদি? কুশাসন পেতে দিই। সাত সকালে নেয়ে-ধুয়ে আঁস্তাকুড়ে ঘুর ঘুর করছ। যাবার ত সময় হ'ল, এখন পারের কড়ি সম্বল কর।"

"তোরাই সম্বল করতে থাক্‌। আমার কিসের দায় পড়েছে। যে এখানে আমাকে পাঠিয়েছে, নেবার দায় তারই। আমি তার ভরসায় ঘুরে বেড়াই।" বলিতে বলিতে ঠাকুমা চলিয়া গেলেন বিন্থর ঘরের পিছনের বাগানে।

তরকারির বোঝা নামাইয়া বিন্থ স্নান করিতে গেল হারাণীর সঙ্গে। বাসন মাজার ঘাটে পসারী বাসন মাজতেছিল। গলির মুখে পুকুরের চোখের পাশে রায়বাড়ীর আর একটা ছোট-খাট বাঁধানো ঘাট আছে। গলির ওপারের মেয়েরা ওই ঘাটে স্নান করে, জল লইয়া যায়। সেই ঘাটের সোপানে বসিয়া তিতপোল্লার খোসায় সাবান মাখিয়া গা ঘষিতেছিল মথুর দত্তের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ললিতা, যাহাকে পাড়ার সকলে মথুরা-বাসিনী বলে। সেটা তাহার অসাক্ষাতে, সাক্ষাতে সে ললিতা।

ললিতা দেখিতে ভাল, বয়েস কুড়ি-বাইশের বেশি নয়। লাবণ্যে ঢল ঢল মুখখানি। সর্ব্বদা ছিমছাম ভাব।

হারাণী আগাইয়া ডাকে, "ও ললিতা বৌ, নাইতে আইছ? তোমাগো কাত্তিক পূজার কি হইচে? ঢাক ঢোল কাঁসির বাদ্যি শুনছি না ত?"

পায়ের নখে সাবান মাখিতে মাখিতে ললিতা মুখ তুলিয়া উত্তর দেয়, "যাগরে পূজ্যা তারাই জানে বাজন-বাদ্যির বিত্তান্ত। আমরা আদার ব্যাপারী, আমাগো জাহাজের খবরে কাজ নাই'।"

"কি কইছিস্ লো ললিতা বৌ? তোর নেগেই না দত্তমশাইয়ের কাত্তিক পূজা—ছাঁদ পড়া চুল পাকা বড়কীর মা হওনের বয়ক্রম পার হইয়া গিইচে। এখন তোর কাছেই কাত্তিক ঠাকুর ব্যাটা হইয়া আসিবে।"

"ব্যাটায় আমার কাজ নাই হারাণীদি, পরের সোয়ামীকে সোয়ামী বলিই মানি না; তার আবার ব্যাটা? যে স্যাবা করে কাছে পেয়ে বুড়াডার, তার কাছেই ব্যাটা আসুক।"

"তুই থাকিস্ না ক্যানে সোয়ামীর ঠাঁই? স্যাবাই বা করিস্ না ক্যানে? বড়কী এখন বুড়া হইয়া গিইছে, তারই স্যাবা নাগে। তারও য্যামন সোয়ামী তোরও তেমান।"

"আমাগো আবার সোয়ামী, আথার ছাই। 'ভাত দেওনের করতা নয়, কিল দেওনের গোঁসাই।' বয়েস কালে যারে নয়া নীলা করিছে, এখন বুড়াকালে সেই করুক গা স্যাবা-দ্যাবা। ভাঙা মাজায় বাতের ত্যাল ডলিতে আমার বালাই পড়িচে। ত্যালের গন্ধে আমাগো বাম আসে বাল, আমি পাও দেই না বুড়ার ঘরে।"

হারাণী গালে হাত দেয়, "ওমা, কি কইলি ললিতা বৌ? যার সাথে বিয়া বইছিলি তারে হেনেস্তা করে কেউ? বুড়ারে তোর যদি এত ঘেন্না তা হ'লি বিয়া বইছিলি ক্যানে?"

ললিতা বৌয়ের সাবান সর্ব্বাঙ্গে মাখা হইয়া গিয়াছিল। সে জলে নামিয়া ডুবের ওপরে ডুব দিতে দিতে কহিল, "ছোট কালে মা-বাপ মরা আমি, ভাইগরে গলায় পড়িছিলাম। ভাত-কাপড় দেওনের ভয়ে ভাইরা বুড়া শয়তানের কাছ থেইক্যা লুক্যায়ে-চুরায়ে পাঁচশো টাকা ঘুষ খায়ে আমারে বেচে ছিইছেল বুড়ার কাছে। তারে বিয়া কয় কেডা হারাণীদি? যার সাথে বিয়া হইছেল সেই বিয়ার বৌ কাত্তিক পূজা নয়ে নাচুক গা।"

ললিতা বৌ স্নান সারিয়া ভরা কলসী কাঁখে লইয়া নামিয়া গেল গলি পথে। পথে বোধহয় কেহ তাহার প্রতীক্ষায় ছিল, তাই নারী কণ্ঠের সুমিষ্ট খিল খিল হাস্য ধ্বনি ভাসিয়া আসিল বাতাসে।

হারাণী "মরণ মরণ" কহিয়া বড় ঘাটে ফিরিয়া আসিল।

বিনু গলা-জলে দাঁড়াইয়া নিবিষ্ট মনে ইহাদের বাক্যালাপ শুনিতেছিল। তাহার মনে পড়িতেছিল হরিহরপুরের জমিদার ভবনের দু'টি নারীতে "একাকিনী শোকাকুলা অশোক কাননে কাঁদেন রাঘববাঞ্ছা"র মতন সেই দুই বিষাদ প্রতিমা। তাঁরা ভদ্র, শিক্ষাসম্পন্না, সেই জন্যে সকলের অগোচরে গোপনে অশ্রুপাত করিয়া হৃদয়ের অবর্ণনীয় বেদনার ভার লাঘব করিতে চেষ্টা করেন। ললিতা বৌএর কি আছে? সে গর্ব্বে প্রকৃতির প্রতি-শোধ লইতেছে।

ক্রমশঃ

ধর্ম্ম

কোন কোন ধর্ম্মবিধি সম্বন্ধে তাহার সমর্থকেরা বলিয়া থাকেন, মানব-প্রকৃতির দুর্ব্বলতা বিবেচনা করিয়া ঐরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে; কেননা, যে আদর্শের অনুসরণ করা অতি কঠিন, বা কতকটা কঠিন, সেরূপ আদর্শ মানুষের সম্মুখে ধরিলে অল্প লোকেই তাহার অনুসরণ করিতে পারিবে। যাঁহারা এরূপ কথা বলেন, তাঁহারা বিস্মৃত হন যে, ধর্ম্মের মহত্বই এইখানে যে তাহা মানুষকে দুষ্কর কাজ করিতে বলে, মহৎ আদর্শের অনুসরণে দুঃখ ও বিপদ্‌কে অগ্রাহ্য করিতে বলে। যাহা সহজ, ধর্ম্ম যদি আমাদিগকে কেবল তাহাই করিতে বলিত, তাহা হইলে মানুষের উন্নতি হইত না।

'কেজো' ধর্ম্মবিধির সমর্থকেরা আরও এই একটি কথা ভুলিয়া যান যে, অনেক মানুষ যেমন আরামের বিলাসের সহজসাধ্যতার আহ্বানে সাড়া দেয়, তদ্রূপ অনেকে দুষ্করতার ও বিপদের ডাকেও সাড়া দেয়। বস্তুতঃ, যাহাদের মনুষ্যত্ব আছে, পৌরুষ আছে, শক্তি আছে, তাহারা দুঃসাধ্য যাহা, বিপদ্‌সঙ্কুল যাহা, তাহার ডাকেই বেশী সাড়া দেয়। নতুবা মানুষ কৈশোর ও যৌবনেও কাঠের ঘোড়া চড়িতেই ভাল বাসিত, তেজীয়ান জীবন্ত ঘোড়া চড়িতে চাহিত না। এই জন্য দুঃসাহসের কাজ করিতে যাওয়া সকল দেশেই যৌবনের ধর্ম্ম। বৈধ এরূপ কাজ করিবার সুযোগ কোন দেশে না থাকিলে, যৌবনের ধর্ম্ম অনেককে বিপথে লইয়া যায়।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৩৭।

ইতিহাস কথা কয়

শ্রীঅজিত চট্টোপাধ্যায়

['ইতিহাস কথা কয়' আগ্রা ও দিল্লীর মোগল স্থাপত্যের কাহিনী। এর সঙ্গে স্থান দু'টির ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি কিছু কিছু যুক্ত হ'ল। লিখতে গিয়ে এদেশের এবং বিদেশের বহু লোকের বিভিন্ন পুস্তকের সাহায্য আমায় নিতে হয়েছে। সমস্ত পুস্তকগুলির নাম পরে সন্নিবেশিত হবে। লেখকদের নিকট ঋণ স্বীকার করে তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। লেখক]

ট্রেণ ছাড়তেই ভিন্ন প্রদেশবাসী ভদ্রলোক বললেন, 'কেয়া সাব, পশ্চিম যাতা হ্যায়?'—পশ্চিম বলতে এক সময় আমরা বুঝতাম বিহার প্রদেশের কয়েকটি স্বাস্থ্যকর স্থান মাত্র। ছোটবেলায় নভেল-উপন্যাসে পড়েছি যে স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য পূজোর ছুটিতে সেকালে পশ্চিমে যেতেন অনেকে। গন্তব্য স্থান গিরিডি, মধুপুর হতে রাজগীর, চুণার পর্যন্ত ছিল।

প্রশ্ন করেই বন্ধুটি হাসছিলেন। ভাবটা, খুব একটা কৌতুকভরা প্রশ্ন ত্যাগ করেছেন তিনি। মনে মনে আমিও হাসছিলাম। সেটা সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে। পশ্চিম দেশের সংজ্ঞা আজ অনেকখানি বদলেছে। ওয়েষ্ট বলতে আজ আমরা ইউরোপকেই বুঝি। পশ্চিম শব্দের অর্থ কন্টিনেন্টের কোন একটি স্থানকে নির্দেশ করে, কিংবা সাগরপারের ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জকে। বললাম, দিল্লী পর্যন্ত যাব। পথে আগ্রাতে নামব একটু।

ভদ্রলোক কথা শুনে যেন হাসলেন মনে হ'ল।

উত্তর দিলেন—'তব তো বহুত দুর যাতা হ্যায়'—

কথাটা রসিকতা মাত্র। দিল্লী আজ আর দুর নয়। নয়শত মাইলের পথ চব্বিশ ঘণ্টাতেই পৌঁছে দেয় কোন বিশেষ ট্রেণ। শুনেছি খেচরযানে তা আরও সংক্ষিপ্ত। সকালে দিল্লীতে প্লেন ধরলে কলকাতায় নাকি অফিস করাও যায়। আমাদের ট্রেণটির নাম সুন্দর—তুফান এক্সপ্রেস। দিল্লী পৌঁছতে প্রায় বত্রিশ ঘণ্টা সময় নেবে। তুফান শব্দের অর্থ ঝটিকা। ট্রেণের গতি প্রায় ঝড়ের মত বৈকি!

ছোটবেলায় তুফান মেলের কথা শুনতাম। তখন পাড়াগাঁয়ের ছেলে। ট্রেণ দেখতাম পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে—কিংবা উঁচু ঢিপির ওপর উঠে। লোক্যাল কিংবা শাট্‌ল ট্রেণ। তবু মনে হ'ত কি শক্তিমান্ ইঞ্জিনটা। কি প্রচণ্ড গতিতে ছুটে চলে। তুফান মেলের কথা শুনতাম তখন। কি একটা সিনেমায় যেন গান ছিল—

'যায় তুফান মেল—
… … … …
অজগরের সেই'ত মাসী
চমক দিয়ে বাজায় বাঁশী
… … … …
বংশী বটের ছায়
যায় তুফান মেল।'

মেল আজ এক্সপ্রেস হয়েছে। গতিবেগ সম্ভবত কম, তবু তুফানে উঠে কেমন একটা আনন্দ হ'ল। ছোটবেলায় মনে কোন দিন হয়ত ইচ্ছে হয়েছিল তুফান মেলে চড়ে দেশ-ভ্রমণের। এতদিনের সেই অবদমিত ইচ্ছেটা আজ পূর্ণ হয়েছে। সেই আনন্দেই হয়ত চিত্ত গিয়েছে ভরে।

দিল্লী যাচ্ছি আপিসের কাজে। বলা বাহুল্য খরচপত্র সব তাদের। খবরটা বাড়ীতে বলতেই গৃহিণী হাসি হাসি মুখে কাছে এসে দাঁড়ালেন।

বললাম, 'গোছগাছ করে দিও। একটা ছোট বিছানা আর চামড়ার সুটকেসটা'—

গৃহিণীর হাতে বালা ছিল। কিন্তু তা কই বেজে উঠল না। আঁখি দু'টি জলভারে ছলছল করে এল না। প্রফুল্ল হাসি মুখে এনে বললেন—

—'বা রে, তুমি একা যাবে নাকি?'—

—'একা, মানে?' আমি চোখে ব্যথা এনে তার দিকে তাকাই।

—'আমিও যাব তোমার সঙ্গে। তোমার খরচ ত ওরাই দেবে। আর আমার খরচটা তুমি দিতে পারবে না?'

আমি অক্ষম, আমি অপারগ। এ কথা আর যাকেই বলা যাক্, মডার্ণ স্ত্রীকে বলা যায় না। বাধ্য হয়ে বোকার মত ড্যাবডেবে চোখে তার দিকে চেয়ে রই।

নিজের যাওয়া এক রকম নিজেই ঠিক করলেন গৃহিণী। বাক্স-প্যাটরা বাঁধা-ছাঁদা হ'ল। টুকিটাকি এটা-সেটা কিছুই বাদ পড়ল না। নিজেকে স্ত্রীর হাতে সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসলাম।

এ যুগে স্বামিত্বের আর বড়াই করা চলে না। তবু পত্নীত্বের একটা পরিচর আছে। আমার মতে স্বামী মানেই পোষমানানো পুরুষ। যে পুরুষ বুনো অর্থাৎ পোষ মানল না তাকে নিয়ে স্ত্রীর বড় জ্বালা। সে বেচারী মেয়ের সমাজে মুখ দেখানই মুশকিল। সৌভাগ্যের কথা, বুনোদের দেখা আর বড় একটা পাওয়া যায় না। পত্নীদের অপ্রতিহত ক্ষমতাই আজ একচেটে।

পূর্ব রেলের বিজ্ঞাপন দেখেছিলাম—ভ্রমণ মানেই মুক্তি। অতএব আর দেরি করবেন না। রেলবিভাগ সম্ভবত একটা কথা লিখতে ভুল করেছে। ভ্রমণে মুক্তি নেই। মুক্তি আছে একক ভ্রমণে। স্ত্রীর অধীনেই যদি রয়ে গেলাম তবে মুক্তি কোথায়? বিবাহ যদি বন্ধন হয় তবে যুগলে ভ্রমণ নিশ্চয়ই মুক্তির নির্দেশ দেয় না।

বিকেলের দিকে শিমুলতলা পার হয়ে গেলাম। চার পাশে ছোট-বড় পাহাড়, হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে। রোদ পড়ে এসেছে, পাহাড়ের মাথায় ম্লান আলো। ঝাঁঝাঁ স্টেশন আসবার আগে পাহাড় আর বন আরও উঁচু উঁচু মনে হ'ল। ঝাঁঝাঁর পরই যেন আবার সমভূমি,। কিউল স্টেশনের পরই কি একটা নদী। খুব ছোট নয়। সহযাত্রীরা বলল, নদীর নামও কিউল।···

পরদিন ভোরে যখন ঘুম ভাঙল তখন গাড়ি ছুটে চলেছে কানপুরের দিকে। বিহার নয় আর, উত্তর প্রদেশ স্বরু হয়েছে। সমতল মাঠ, নানা গাছপালা···ছোট-বড় গ্রাম··· লোকজন···চোখের সামনে একবার ভাসছে আবার অদৃশ্য হচ্ছে। উত্তর প্রদেশের সঙ্গে বাংলা দেশের তফাৎটা কোথায়? চেয়ে চেয়ে সেইটাই নিরীক্ষণ করছি। ফাল্গুনের মাঝামাঝি,···রোদ এখানে এখনও মিষ্টি। শীত যায় নি। সকালের বাতাসে তার ঠাণ্ডা ছোঁয়া এখনও পাচ্ছি একটু।

—'উত্তর প্রদেশের সঙ্গে বাংলা দেশের তফাৎটা কোথায়?'—গৃহিণীকে জিজ্ঞেস করলাম।

—'পাচ্ছ না কিছু?'

—'কই তেমন? সেই মাঠ-ঘাট, বন-বাদাড়'—

—'একটু আছে বৈকি।' উনি হেসে বললেন, 'চেয়ে চেয়ে একটা তাল-নারিকেল গাছ পেলে? শুধু আমগাছ··· আর মাটিটা যেন একটু রুক্ষ। গাছপালাগুলোতে সেই সবুজ শ্যামলিমা ঠিক নেই।'

লক্ষ্য করে দেখলাম। কথাটা ঠিক। বাংলা দেশের সবুজরূপ উত্তর প্রদেশ পাবে কোথায়? মাটি সমতল হ'তে পারে, কিন্তু ঝোপঝাপে সেই মনোহর সবুজ রঙ বেশ একটু কম।

ইতিমধ্যে কামরাতে যাত্রী বদল হয়েছে। আমাদের পাশে এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক এসে বসেছেন। বেশ সুন্দর চেহারা···ছিমছাম বেশবাস। অল্পক্ষণেই আলাপ হ'ল। নাম মদনলাল শর্মা। এলাহাবাদে কোন কলেজে অধ্যাপনা করেন। এদিকে চলেছেন এক আত্মীয়ের বাড়ী। আমাদের গন্তব্য স্থান বললাম। আগ্রাতে নামব সে কথাও জানালাম।

—'আগ্রাতে ক'দিন থাকছেন?' শর্মাজী হেসে প্রশ্ন করলেন।

—'ক'দিন থাকব? দেখি ক'দিন থাকতে পারি।'—

শর্মাজী হাসলেন। 'এক মাসের কমে আগ্রাকে ঠিক দেখা যায় না।'

—'এক মাস? বলেন কি শর্মাজী?'

—'দেখার কি কম জিনিষ আছে আগ্রায়? শুধু তাজমহলকে দেখেই আপনার আশ মিটবে না। ওর গায়ের সমস্ত কাজগুলি খুঁটিয়ে দেখতে কম-সে-কম সাতদিন ত লাগবেই'—

—'এক হপ্তা?' আমি আরও অবাক্ হয়ে বলি।

—'তাজমহল তৈরি করতে কতদিন লেগেছিল জানেন? বাইশ বছর, আর তাই দেখতে এক হপ্তাও লাগবে না?'

শর্মাজীর কাছে শুনছিলাম আগ্রার গল্প। অনেক অনেক দিনের পুরাতন শহর আগ্রা। সাহজাহান ওর নাম দিতে চেয়েছিলেন আকবরাবাদ। কিন্তু পুরাণো নামকে সরান গেল না। হারিয়ে গেল আকবরাবাদ। আগ্রাই বেঁচে রইল। আগ্রা নামও হওয়ার নানা ইতিহাস রয়েছে।

উত্তর প্রদেশে আগরওয়ালা বেনিয়াদের সংখ্যা কম নয়। হয়ত আগ্রাতে তারা এসেছিল বসবাস করতে। ব্যবসা সুরু করেছিল আগ্রার মাটিতে। সেই থেকে নাম হয়েছে আগ্রা।

অন্য মতও রয়েছে। ইতিহাস নানা মুনির নানা কথায় ভরা কাহিনী। 'আগর' শব্দের হিন্দীতে একটা অর্থ রয়েছে। লবণ তৈরীর পাত্র। এক সময় আগ্রার মাটি ছিল লবণাক্ত। হয়ত সেই বিস্মৃত অতীতে লবণ উৎপাদনে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল আগ্রা, 'আগর' শব্দই আগ্রা নামের উৎপত্তির কারণ।

শর্মাজী মৃদু মৃদু হাসছিলেন।

বললাম, 'কি ব্যাপার? আপনি যে আবার থেমে গেলেন।'

—'দেখছিলাম আপনার ভাবখানা। অধ্যাপক মানুষ, চান্স পেলেই বক্তৃতা দেবার লোভ সামলাতে পারি নি। কিন্তু আপনি কিভাবে নিচ্ছেন, তা দেখতে হবে ত।'

বললাম, 'শর্মাজী, এটা কিন্তু আপনার অধ্যাপকোচিত কাজ হচ্ছে না। অধ্যাপক হবেন আপনভোলা, তিনি যখন বলবেন তখন সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত। অপরের দিকে চোখ দেবার কথা কেন মনে হবে তার?'

অধ্যাপক শর্মা যুক্তি ভালবাসেন। কিসের অধ্যাপক জানি না, তবে তর্কে তাঁকে পরাস্ত করা শক্ত। উনি বললেন, 'আজকের যুগটাই আলাদা। অধ্যাপনাও আজ একটি বৃত্তিমাত্র। অধ্যাপকের আপনভোলা হ'লে চলবে কেন?'

আগ্রা শহর সম্পূর্ণ নষ্ট হয়েছিল সুলতান মাহমুদের আক্রমণে, ১০২২ খ্রীষ্টাব্দে। মাহমুদ সেবারও আক্রমণ করলেন। তার রণোন্মত্ত সৈন্যবাহিনীর কাছে সব শক্তি বিনষ্ট হ'ল, আগ্রা ধ্বংস হ'ল প্রায়। লুণ্ঠতরাজে মানুষজন সব শেষ। প্রায় ছোট্ট একটা গ্রামে পরিণত হ'ল আগ্রা। অর্থ, বৈভব, ঐশ্বর্য সবটুকু নিংড়ে নিয়ে গেলেন সুলতান মাহমুদ।

তারপর থেকে বহুদিন প্রায় অবহেলিত হয়ে পড়েছিল আগ্রা, উল্লেখযোগ্য তেমন কোন আক্রমণ আর হয় নি। কিন্তু সেও বেশী দিন নয়। সুলতান সিকন্দর লোদীর আমলে আবার জনবহুল হয়ে উঠল আগ্রা। ১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দে একদল লোক পাঠালেন সিকন্দর। দিল্লী থেকে নৌকা



তাজমহল

করে এসে পৌছল জরিপ করবার দল। অনেক খুঁজে-পেতে একটি স্থান তারা বের করল। সিকন্দর লোদীকে খবর পাঠাতেই তিনি রওয়ানা হলেন আগ্রার পথে। দু'টি উঁচু উঁচু স্থান পছন্দ হ'ল সিকন্দরের। প্রাসাদ রচনা করা যেতে পারে। এক নায়েককে প্রশ্ন করলেন সিকন্দর,—'দু'টি স্থানের কোনটি পছন্দসই?' লোকটি উত্তর দিল,—'যেটি আগে রয়েছে।' সেই 'আগে রহে' থেকেই নাকি স্থানটির আগ্রা নাম দিয়েছিলেন সিকন্দর। যমুনার পূর্ব কূলে রাজ-প্রাসাদ গড়ে উঠল এবং আগ্রা আবার জনবহুল নগরীতে পরিণত হ'ল।

কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর সিকিভাগ পার হবার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবর্ষের সীমান্তে এক নতুন কৃষ্ণমেঘের সঞ্চার হ'ল। উত্তর ভারতের শাসককুল ভাবলেন যে ভাসমান কালো মেঘ আবার ভাসতে ভাসতেই অন্য দিগন্তে চলে যাবে। কিন্তু তাদের রাজনৈতিক দূরদর্শিতা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত পরিণত হ'তে দেরী হ'ল না।

হিমালয়ের ওপারে মধ্য এশিয়ার ছোট্ট একটি রাজ্যে এক যুবক স্বপ্ন দেখেছিলেন। ভারতবর্ষের সম্পদ ও ঐশ্বর্যের কথা ভ্রমরের গুনগুনানির মত তাঁর কানে অহরহ অনুরণিত হচ্ছিল। চেঙ্গিজ ও তৈমুরের বংশধর বাবর ফারখানার ছোট্ট রাজ্য হ'তে হিন্দুস্থানের সীমান্তে এলেন। এক মস্ত বড় রাজ্যের তিনি অধীশ্বর হবেন। সমরখন্দের ছোট্ট রাজ্যটি পেয়ে তাঁর মন ভরে নি। উচ্চাশা তাঁকে টেনে

নিয়ে এল ঐশ্বর্যশালী হিন্দুস্থানের কাছে। কাবুল অধিকার করে সিন্ধুনদ অতিক্রম করলেন বাবর। তাঁর সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনীর সহায় ছিল কামান, বারুদ আর গোলাগুলি। পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে বিশাল আফগান সৈন্যবাহিনীকে পরাস্ত করে দিল্লীর দিকে ছুটে চললেন তিনি।

দিল্লীর পথে ছুটে গিয়েছিলেন বাবর। কিন্তু আগ্রার কথা তাঁর মনে ছিল। দিল্লী ও আগ্রার সম্পদ্ ও ঐশ্বর্যের কথা ভায়োলেটের দেশ ফারখানাতে বসে তিনি কতবার শুনেছেন। পরবর্তীকালে আত্মচরিতে লিখেছেন বাবর—'তামাম হিন্দুস্থানের শ্রেষ্ঠত্ব এইখানে যে এটা একটা মস্ত বড় দেশ এবং এর সোনা-রূপার ভাণ্ডার প্রাচুর্যে ভরা।'

দিল্লী অধিকার করতে চললেন বাবর। কিন্তু হুমায়ুনকে পাঠিয়ে দিলেন আগ্রার পথে। একদল সৈন্যবাহিনী নিয়ে আগ্রা দখল করতে চললেন হুমায়ুন। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দ। মে মাসের প্রচণ্ড গরম। সমরখন্দের নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু ছেড়ে পথ চলতে বেশ পর্য্যুদস্ত হয়েছে সৈন্যবাহিনী। তবু হয়ত তখন উত্তর ভারতের জলবায়ু এত শুষ্ক ছিল না। অন্তত আগ্রার জলহাওয়া অনেকাংশে স্বাস্থ্যকর ও ভাল ছিল। সেই কারণেই দীর্ঘদিন ধরে আগ্রাতেই থেকেছেন—আকবর, জাহাঙ্গীর। আগ্রা ছেড়ে চলে গিয়েও আবার ফিরে এসেছেন আগ্রা রাজধানীতে।

শর্মাজীর গল্প বলার ভঙ্গিটি ভারী সুন্দর। ওর বাচনভঙ্গি ইতিমধ্যেই আকৃষ্ট করেছে আরও অনেককে। আমাদের সামনেই এক বাঙালী দম্পতি বসে। সম্ভবত এলাহাবাদ থেকে উঠেছেন। অল্প বয়স মেয়েটির! চোখ টানা টানা, নাক টিকালো, কপালে ছোট্ট একটি কালো টিপ। পাশের ভদ্রলোকটি বেশ মোটাসোটা, রংটা পরিষ্কার নয়। অনুমান করলাম স্বামী-স্ত্রী। মেয়েটি শর্মাজীকে বলল, 'আপনার গল্প আমরাও কিন্তু মন দিয়ে শুনছি।'

শর্মাজী বললেন, 'আগ্রা গিয়েছেন ত?'

মেয়েটি বলল, 'বলতে লজ্জা হয়। দেখুন না আজ দেড় বছর হ'ল বিয়ে হয়েছে। এলাহাবাদে শ্বশুরবাড়ী। দিল্লীতে গিয়েছি মাস ছয় হ'ল। উনি সেক্রেটারিয়েটে কাজ করেন। কিন্তু আগ্রা দেখা হ'ল না'—

শর্মাজী ভদ্রলোককে বললেন, 'কি ব্যাপার মশায়? তাজ দেখতে দু'জনে যান নি? জ্যোৎস্না রাতে দু'জনে চলে যান একবার, দেখে দু' চোখ ভরে উঠবে। তাজমহ[ল] শুধু পাথর নয়—পাথরের কবিতা।'

ভদ্রলোক লজ্জা পেয়েছেন মনে হ'ল।

শর্মাজীকে উত্তর দিলেন—'সত্যি, এত কাছে থেকে দু'জনে তাজ দেখতে যাই নি একথা ভাবা যায় না।'

মেয়েটি ঠাট্টা করে বলল, 'যান নি মানে, আমাকে নি[য়ে] যান নি আর কি। নিজে একবার দেখেছেন বিয়ে[র] আগে।'

আমার স্ত্রী ঠোঁট টিপে হাসছেন, মনে মনে আমি[ও] হাসছি। বড় বেকায়দায় পড়েছেন ভদ্রলোক শর্মাজী[র] কাছে। একে শর্মাজীই দুর্দান্ত প্রতিপক্ষ, তায় স্ত্রী বিপক্ষে অর্থাৎ প্রতিপক্ষের স্বপক্ষে, রণে ভঙ্গ দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই—

শর্মাজী রাজী করিয়ে ছাড়লেন ভদ্রলোককে। সামনেই গুড ফ্রাইডের ছুটি। এবার গুড ফ্রাইডে শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে। দ্বাদশীর জ্যোৎস্না বড় পরিষ্কার। অপূর্ব মোহময় দেখাবে তাজমহল। ভদ্রলোক যেন নিশ্চয় যান আগ্রায়।

মেয়েটিকে হেসে বললেন শর্মাজী—'কেয়া বহেন, সব ঠিক হ্যায় ত। এক মাহিনা ঠহর যাও। আউর কেয়া?'

আবার গল্প সুরু করলেন শর্মাজী। আগ্রার গল্প। হুমায়ুন যখন এসে পৌছেছেন আগ্রা শহরে। ১০ই মে, ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দ। আগ্রা পৌছলেন হুমায়ুন, তাঁর সৈন্য-বাহিনীকে কেউ বাধা দিল না তেমন। বীরদর্পে মোগল-বাহিনী আগ্রা অধিকার করল।

আগ্রায় এসে এক অত্যাশ্চর্য বস্তু লাভ করলেন হুমায়ুন। ইতিহাসের পাতায় বস্তুটির নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। বস্তুটি কোহিনুর হীরক—ইংরেজীতে বলে, Mountain of light। মালবের সুলতান আলাউদ্দীনের কাছে ছিল হীরকটি। তাঁর কাছ থেকে কেমন করে না-জানি পেয়েছিলেন গোয়ালিয়রের রাজা বক্রামজিৎ। রাজ্য হারিয়ে বক্রামজিৎ এসেছিলেন আগ্রায়। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বাস করছিলেন আগ্রা শহরে। পাণিপথের যুদ্ধে যেতে হয়েছিল বক্রামজিৎকে। কিন্তু সেই যাওয়াই শেষ যাওয়া। স্ত্রী-পুত্রকে দেখবার জন্য আর ফিরে আসেন নি বক্রামজিৎ। পাণিপথের প্রান্তরেই তাঁর শেষ নিঃশ্বাস পড়ল। হয়ত মরবার আগেও একবার মনে পড়েছিল বক্রামজিৎ-এর



আগ্রা ফোর্ট থেকে তাজমহল দেখা যায়

হারিয়ে-আসা রাজ্য গোয়ালিয়রের কথা··· স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের মুখচ্ছবি আর স্ত্রীর কাছে গচ্ছিত রেখে আসা সম্পদটি··· কোহিনূর হীরকের বর্ণচ্ছটা।

কোহিনূর লাভ করলেন হুমায়ুন। শোনা যায় বক্রামজিৎ-এর পুত্র-পরিজনের উপর কোন অত্যাচার করেন নি তিনি। তাই খুশী হয়ে তাঁরা উপঢৌকন দিলেন হুমায়ুনকে···কোহিনূর হীরকখানি। এ কাহিনী সত্য-মিথ্যা দুই সম্ভাবনাতেই পূর্ণ। কিন্তু সত্য এই যে, কোহিনূর অধিগত হ'ল মোগলের। শুধু কোহিনূর নয়···কোহিনূরের সাথে সাথে বিশাল উত্তর ভারত ধীরে ধীরে মোগলের বশ্যতা স্বীকার করল। কোহিনূর সেই সম্ভাবনার পথের প্রথম পদক্ষেপ মাত্র।

কোহিনূরের কথা লিখে গেছেন বাবর। এর মূল্য নিরূপণ করতে গিয়ে একদল জহুরী বিচারকের শরণ নিয়েছিলেন তিনি। তখনকার সময় কোহিনূরের মূল্য নিরূপিত হয়েছিল এক আশ্চর্য সংজ্ঞায়। সমস্ত পৃথিবীর দৈনিক খরচের অর্ধেকও যা, কোহিনূরের মূল্যও তাই।

চার বৎসর রাজত্ব করেছিলেন বাবর।

যুদ্ধবিগ্রহের শেষ ছিল না এই কয় বৎসরেও। তবু আগ্রা শহরে সুন্দর এক রাজধানী গড়ে তুলেছিলেন তিনি। তখনকার দিনে কনষ্টানটিনোপল স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ ছিল। অটোমান তুর্কদের প্রতিভার কথা বাবরের অবিদিত ছিল না। বিখ্যাত অটোমান স্থপতি সিনানের কাছে লোক পাঠালেন তিনি। আগ্রাতে রাজধানী গড়তে নতুন স্থপতি এলেন বাবরের কাছে। ইউসুফ—সিনানের প্রিয় শিষ্য।···

গল্প শুনতে শুনতে কখন তুণ্ডলা পার হয়ে গেছি। গাড়ি আগ্রার কাছাকাছি এসে গেছে। কেউ কেউ ট্রেন থেকে তাজমহল দেখবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছে······।

শর্মাজী বললেন, 'আগ্রা ত এসে গেলাম প্রায়। খানিকটা গল্পও শুনলেন। এবার নিজের চোখেই চেয়ে দেখবেন।'

সেই মেয়েটি কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে বলল, 'শর্মাজী, আপনি কতদূর যাবেন?'

—'মথুরা, বহেন। যিসকো ব্রিটিশ নে মুট্রা (Muttra) বানায়া থা।'

সকলে হেসে উঠলাম।

গাড়ি যমুনার পুলে। শব্দ উঠছে ঝম-ঝমা-ঝম, ঝম-ঝমা-ঝম। ফাল্গুনেই শুকিয়ে গেছে যমুনা। রাশি রাশি বালুকা শুধু। জল নেই, একটা শীর্ণ ধারা এককোণে অল্প-স্বল্প দেখা যায়।

যমুনার ওপারে চোখের সামনে ভেসে উঠেছে তাজমহল। মর্মর মূর্তি, রৌদ্রালোকে ঝিকমিক্ করছে কোন কোন অংশ। কি সুন্দর। কি নয়নাভিরাম দৃশ্য।······

আগ্রা সিটি স্টেশনে নামলাম।

শর্মাজীর সঙ্গে আর কোনদিন দেখা হবে না। হয়ত কোনদিনই না। মিষ্টি হাসলেন শর্মাজী, এই কয় ঘণ্টায় কি একাত্ম হয়ে গেছি সকলে।

হাত নেড়ে বিদায় জানালাম। চোখের সামনে দিয়ে তুফান এক্সপ্রেস বেরিয়ে গেল।

২

একটি পরিচ্ছন্ন হোটেলে উঠলাম আমরা। যমুনার কাছেই। হোটেলের বারান্দায় এলে তাজমহলের কোন কোন অংশ চোখে পড়ে।

আগ্রা শহরটা বড় নোংরা আর অপরিচ্ছন্ন মনে হয়েছে। আগ্রা সিটি স্টেশন থেকে আসার পথে দু'পাশে চোখ মেলে দেখলাম। আমাদের টাঙ্গাওলা লোক ভাল। এক নজরেই বুঝতে পেরেছে যে আগ্রাতে আমরা সম্পূর্ণ নতুন। নিজেই বলেছে, যে-ক'দিন থাকব সকাল-বিকেল দু'বেলাই আমাদের নিয়ে বেড়াবে। ভাড়া? তার জন্য যেন না চিন্তা করি। আগ্রার অন্য টাঙ্গাওলাদের তুলনায় তার ভাড়া খুব কম।...

স্টেশনে নামতেই তিন-চারজন লোক প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল আমাদের উপর। এরা হোটেলের কর্মচারী। খরিদ্দার সংগ্রহের আশায় সব ট্রেণই দেখে। ওদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া মুশকিল। কারও হোটেল বাঙ্গালীর, কারও হোটেলের ম্যানেজার বাঙ্গালী, হোটেলের গুণপনা সব কিছু এক সঙ্গে বর্ষিত হ'তে লাগল আমাদের উপর। সামনাসামনি দাঁড়িয়ে কি সুন্দর নিন্দা করতে পারে এরা। আমি এক-জনের উপর অনুরক্তির ভাব প্রকাশ করতেই অন্য সকলে সেই হোটেলের যত অসুবিধার কথা আমার কর্ণগোচর করতে লাগল। সামনাসামনি এমন পরিপাটি নিন্দা আমি বড় একটা শুনি নি।

অবশেষে একজনের কাছে আত্মসমর্পণ করলাম। সেই সব ব্যবস্থা করল। কুলি ডাকিয়ে মাল তোলা, টাঙ্গায় আমাদের বসানো, কুলির সঙ্গে দরদস্তুর করা,—সব কাজ তার।

টাঙ্গার সামনে উঠে আমাকে বলল, 'এবার চলুন স্যর। আমাদের হোটেল বাঙ্গালীর হোটেল; এমন আরাম অন্য কোথাও পেতেন না।'

বললাম, 'আপনার বাড়ী কোথায়?'

—'ভবানীপুরে স্যর। আপনারা নিশ্চয় কলকাতা থেকে আসছেন।'

মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম, কিন্তু আগে জানতাম না যে ভবানীপুরে আমার এক ভাই রয়েছে। টাঙ্গার উঠে আমার স্ত্রী একটু অসুবিধা বোধ করছিলেন। হোটেলের কর্মচারীটি তাকে বলল, 'আপনি পিছন দিকে হেলান দিয়ে বসুন বৌদি, তা হ'লেই আর অসুবিধা হবে না'—

পরে গৃহিণী ত হেসে কুটি কুটি। আমাকে বললেন, 'দেখেছ, লোকটা কেমন বৌদি বলে ডাকল।'

অপরিসর পথ, দু'পাশে খোলা নর্দমা। মাছি উড়ছে। দোকানে বেশ ভিড়। পথের দু'পাশের বাড়ীগুলো বেশ পুরাতন। ইটের গড়ন পর্যন্ত প্রাচীনত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এক পাশে আগ্রা ফোর্ট স্টেশন পড়ে রইল। পথ উঁচু-নীচু। আমরা এসে হোটেলে পৌঁছলাম।

ফোর্টের কাছাকাছি আসতেই আমাদের সেই টাঙ্গাওলা বলল, 'বাবুজী, গাইড নেবেন ত?'

বন্ধুরা বলে দিয়েছিল। সঙ্গে যেন গাইড নিই। কার্পণ্য করলে নিজেকেই ঠকতে হবে।

টাঙ্গাওলা বলল, 'দু'রকম গাইড আছে বাবুজী। ইংরেজী আর দিশী, আপনি দিশী গাইড নেবেন।'

ইংরেজী গাইড মানে ইংরেজীতে ব্যাখ্যা করে বোঝাবে। সাধারণতঃ বিদেশী ট্যুরিষ্টরা নেয় ওদের। দিশী গাইড হিন্দী কিংবা অন্য কোন ভারতীয় ভাষায় ব্যাখ্যা করবে।

টাঙ্গাওলার বলা ছিল। এক বাঙ্গালী গাইড আমাদের দেখতে পেয়ে এগিয়ে এলেন। ভাব দেখে বুঝলাম, অন্য গাইডরা সন্তুষ্ট নয় আমাদের উপর। এভাবে গাইড বেছে নেওয়াতে তাদের খুব আপত্তি।

গাইডের বাড়ী বর্ধমান জেলায়। প্রায় পনর বছর ধরে আগ্রায় আছেন। কথাবার্তা বেশ ভদ্র আর মার্জিত।

আগ্রা ফোর্ট স্টেশনের দক্ষিণে আগ্রা কেল্লা, তাজমহল থেকে মাইলখানেক দূরত্বে। এর আগেও আগ্রাতে আর একটা কেল্লা ছিল। বাদলগড় কেল্লার ইতিহাস অস্পষ্ট, সম্ভবত আফগান সেলিম সুরের সৃষ্টি। পুরাণো কেল্লার আজ কোন চিহ্ন নেই। হয়ত যুদ্ধবিগ্রহে নষ্ট হয়েছিল কিছু এবং বাকীটুকু ভেঙ্গে দিয়ে তার উপরই নতুন কেল্লা গড়লেন আকবর। ১৫৬৫ খ্রীঃ হ'তে ১৫৭৩ খ্রীঃ পর্যন্ত প্রায় পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয় করে আগ্রা ফোর্ট নির্মিত হ'ল, কিন্তু সবটুকু নয়। আকবরের সময় থেকে যা সুরু হয়েছিল, আওরঙ্গজেবের রাজত্বকাল পর্যন্ত তাতে যোজন এবং



আগ্রা ফোর্টের একাংশ

সংস্কারের কাজ চলেছে। তবে উল্লেখযোগ্য শাহজাহানের রাজত্বকাল। আগ্রা ফোর্টের বহু বিশিষ্ট সৃষ্টিই শাহজাহানের অবদান।

আগ্রার কেল্লা একটি ত্রিভুজের আকৃতি। পরিধিতে মাইল দেড়, শুধু যমুনার দিকেই এর বিস্তৃতি আধ মাইলের মত।

গাইড বলছিল ফতেপুর সিক্রীর কথা, যেখানে সতের বৎসর ছিলেন আকবর। বনজঙ্গল আর হিংস্রপ্রাণী অধ্যুষিত ফতেপুর সিক্রীতে এত আশ্চর্য সুন্দর রাজধানী গড়ে তুলেছিলেন বাদশা, কিন্তু সেই অপূর্বসুন্দর নগরী ছেড়ে আকবরকে আবার ফিরে আসতে হয়েছিল। কেউ বলেন জলকষ্ট, অন্যদের মতে সেই ফকিরের অনুরোধে আকবর ফিরে এসেছিলেন আগ্রায়, ফতেপুর সিক্রীর যে ফকির সেলিম চিস্তির আশীর্বাদে জাহাঙ্গীরকে পেয়েছিলেন আকবর। আত্মচরিতে লিখেছেন জাহাঙ্গীর,—আটাশ বৎসর বয়স পর্যন্ত আকবরের কোন সন্তান জন্ম নিয়েও বেঁচে থাকে নি। তাই দরবেশ আর ফকিরের শরণাপন্ন হ'তে হ'ল বাদশাহকে। ফতেপুর সিক্রীতে ফকির সেলিম চিস্তির দরগায় জাহাঙ্গীরের জন্ম। ফকিরের নামেই ছেলের নাম দিলেন আকবর—সুলতান সেলিম।

ফতেপুর সিক্রীকে রাজধানী করে তুললেন বাদশাহ। সৈন্যবাহিনীর পদভরে কম্পিত হ'ল মেদিনী। রাজসভায় পাত্রমিত্র অমাত্যদের মধ্যে বাদশাহ পরিচালনা করতে লাগলেন রাজকার্য। হাটে-বাজারে, উদ্যানে-বাগিচায়, উৎসবে-ব্যসনে নরনারীর আনন্দ-কোলাহলে ভরে উঠল ফতেপুর সিক্রীর শান্ত আকাশ-বাতাস।

কিন্তু ফকির সেলিম চিস্তির হয়ত অসুবিধা ঘটছিল। কলকোলাহলের মধ্যে শান্তমনে আর উপাসনায় তিনি মন দিতে পারতেন না। তাই আকবরকে বললেন ফকির—'যদি বাদশাহ না যান তবে ফকিরকে ছেড়ে যেতে হবে ফতেপুর সিক্রী।'

কিন্তু বাদশাহ আকবর এতটুকু বিচলিত হন নি। প্রশান্ত মুখে উত্তর দিলেন—'যদি তাই ইচ্ছা, তবে প্রভু কেন? এ বান্দাই ছেড়ে চলে যাবে।'—

জনশূন্য হয়ে পড়ল ফতেপুর সিক্রী। বাদশাহের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত নগরীই উঠে এল আগ্রায়,—যমুনার তীরে।

গাইড বলছিল কেল্লার কথা। এখন অনেকটা অধিকার করে রয়েছে সৈন্যবাহিনী। সমস্ত ফোর্টটা পরিক্রমা আর সম্ভব নয়।

অমর সিং গেট দিয়ে ঢুকলাম আমরা। অমর সিং রাজপুতের নামে গেট। সোজা এসে পড়লাম জাহাঙ্গীর মহলের সামনে। জাহাঙ্গীরের নামের সঙ্গে যুক্ত হলেও সম্ভবত এটি আকবরের সময়ের সৃষ্টি। অন্তত তাঁর রাজত্বকালে সুরু হয়ে জাহাঙ্গীরের সময় পর্যন্ত এই মহলের কাজ চলেছিল। জাহাঙ্গীর মহলের ভিতরের কারুকার্য অপূর্ব। দেওয়ালের গায়ে হিন্দু ও মুসলমান কারুশৈলী পাশাপাশি

বিদ্যমান। এই প্রাসাদের এক অংশে বাস করতেন বাদশাহের এক হিন্দু স্ত্রী। ইতিহাসে তিনি যোধবাঈ নামে খ্যাত। একটা কুলুঙ্গীর দিকে গাইড আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। এখানে হনুমানজীর এক মূর্তি রেখেছিলেন যোধবাঈ। সম্ভবত আওরঙ্গজেবের সময় সেটি বিনষ্ট হয়।

খাসমহল আজ কারও খাস নয়। একদা মোগলসুন্দরীদের কলহাস্যে ভরে উঠত খাসমহলের প্রকোষ্ঠগুলি। তাদের সুর্মা-আঁকা চোখের না-বলা ভাষায় আর স্ফুরিত অধরে-অভিমান পড়ত ঝরে। খাসমহল সম্ভবত শাহজাহানের সৃষ্টি। অপূর্বসুন্দর মার্বেল পাথরে খাসমহলের বহু অংশই নির্মিত। সূর্যালোকে ঝিক্‌মিক্ করে পাথরগুলি। এক বিদেশী লেখক খাসমহল দেখে লিখে গেছেন—'প্রখর রৌদ্রালোকে খাসমহল দেখা উচিত নয়। খাসমহল দেখতে হয় সূর্যাস্তের আগে। আকাশের রক্তিমাভায় যখন মার্বেলের রঙ গোলাপী বলে ভ্রম হয়, তখন কল্পনায় মনে হ'তে পারে বহুমূল্য ব্রোকেড ও শাড়ী-পরিহিতা মোগল ললনার দল হারেমের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঝরণার জলমর্মর কান পেতে শুনছেন।'

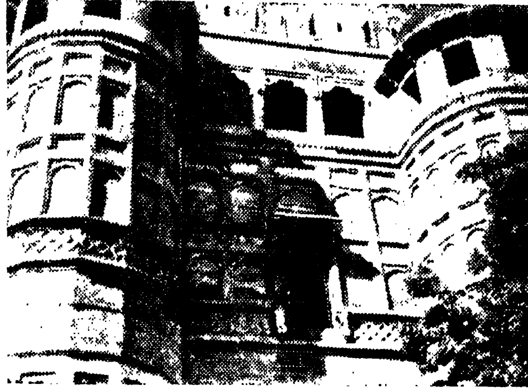
খাসমহলের দেওয়ালে অনেকগুলি কুলুঙ্গি আজ খালি পড়ে আছে। এক সময় তৈমুর হতে সুরু করে বহু মোগল সম্রাটের প্রতিকৃতি শোভা পেত সেখানে। পরবর্তীকালে ভরতপুরের রাজা সুরাজমল জাঠ আক্রমণ করেন কেল্লা। বহু মূল্যবান্ সামগ্রীর সাথে এই প্রতিকৃতিগুলিও সে সময় খোয়া যায়। খাসমহলের প্রায় সত্তর ফুট নীচু দিয়ে একদিন বয়ে যেত যমুনা, কেল্লার দেওয়ালকে ধৌত ক'রে। দক্ষিণ দিকে একটি সিঁড়ি নেমে গেছে ভূগর্ভস্থ প্রকোষ্ঠে। আত্মচরিতে বাবর লিখেছেন যে, হিন্দুস্থানের তিনটি জিনিষ তাঁর অসহ্য মনে হয়েছে। এর উত্তপ্ত রোদ, দুরন্ত হাওয়া এবং ধুলোবালির ঝাপটা তাঁকে বড় ক্লেশ দিত। আগ্রার গ্রীষ্ম-তাপ হতে রক্ষা পাওয়ার জন্যই হয়ত এই প্রকোষ্ঠের সৃষ্টি। কিন্তু অন্ধকারাচ্ছন্ন ভূগর্ভে কখনও কখনও অপরাধীদের পাঠান হ'ত শাস্তি পেতে। পথভ্রষ্ট নারী কিংবা দুষ্ট দাসীদের সাময়িক নির্বাসন হ'ত ভূগর্ভের অন্ধকার শীতল নির্জন কক্ষে।

খাসমহলের সামনে আঙ্গুরী বাগ। আজ আঙ্গুরলতা নেই, শুধু নামটাই আছে। আঙ্গুরী বাগ পুরাণোকালের মোগল উদ্যানের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। উত্তর দিকে শিশ্ মহল। গাইডের সাথে আমরা হেঁটে চললাম সেদিকে। শিশ্ মহল অর্থাৎ আয়নার প্রাসাদ। সমস্ত দেওয়ালে আয়না বসান। ছোট ছোট ক্ষুদ্রাকৃতি আয়না। গাইড এক পিওনকে ডেকে আনল আমাদের কাছে। সামান্য কিছু দক্ষিণা দিতেই এক ম্যাগনেসিয়াম তারে আলো জ্বালিয়ে দিল সে। হাজার আলোয় উদ্ভাসিত হ'ল শিশ মহল।

আগ্রার কেল্লায় অবশ্য দ্রষ্টব্য আরেকটি জিনিষ রয়েছে। আঙ্গুরী বাগের বিপরীত দিকে একটি কক্ষে বস্তুটি রাখা আছে। সাধারণ গাইড আজও বহু দর্শককে বস্তুটির ভুল পরিচয় দেয়। ওরা বলবে বস্তুটি বিখ্যাত সোমনাথ মন্দিরের দরজা। ১০২৫ খ্রীষ্টাব্দে সোমনাথ লুণ্ঠন করে মাহমুদ নাকি ওটি গজনী নিয়ে যান। বস্তুটি পুনরুদ্ধার হয় ১৮৪২ সালের আফগান অভিযানে। সমস্ত ভুলটাই তদানীন্তন গভর্ণর এলেনবরো সাহেবের। মহা উৎসাহে তিনি ঘোষণা করেন যে, গজনী থেকে সেই বিখ্যাত চন্দন কাষ্ঠের দরজা আবার পুনরুদ্ধার হয়েছে এবং আটশত বৎসর আগেকার অপমান কিছু অংশে উশুল করা গেছে। আসলে দরজাটি চন্দন কাষ্ঠের নয়—দেবদারু কাঠে নির্মিত। দরজার কারুকার্যশৈলী ইঙ্গিত দেয় যে বস্তুটি, সম্ভবত গজনী কিংবা তারই আশে-পাশে তৈরী।

সুলতান মাহমুদ সোমনাথ লুণ্ঠন করে ঐ বিশাল দরজা গজনী নিয়ে গিয়েছিলেন কি না তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। লুণ্ঠনকারী মাহমুদের কাছে অর্থ ও বৈভবের মূল্য ছিল। ঐ বিশাল দরজা বিক্রী করে সেকালে চট করে উপযুক্ত মূল্য পাওয়া সম্ভব ছিল না।

সম্মান বুর্জে শাহজাহানের শেষ নিঃশ্বাস পড়েছিল। এই আটকোণা বুরুজটি সম্রাটেরই সৃষ্টি। মার্বেলের তৈরী ও কারুকার্যময় এই অট্টালিকা থেকে যমুনা তীরে তাজমহল পরিষ্কার চোখে আসে। মৃত্যুর সময় প্রিয়কন্যা জাহানারা পাশে ব'সে। দিবসের শেষ আলোক যখন তাজমহলের উপর থেকে সরে গেল, বন্দী সম্রাট্ সাত বৎসরের অবরুদ্ধ জীবন কাটিয়ে প্রিয়পত্নী মমতাজের কাছে চললেন। ডিসেম্বর, ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দ। শীতের রাতে তাজমহল আর দেখা যায় না। এই সাত বৎসর বন্দী-জীবনে আর অসুস্থতায় শুধু তাজমহলই দেখেছেন সম্রাট্। কিন্তু সেদিন দিনশেষে



আগ্রা ফোর্ট—অমরসিং গেটের একাংশ

অন্ধকার শুধু মাটিতেই নেমে এল না, নেমে এল শাহজাহানের দুই চোখে।

দেওয়ান-ই-খাস কথাটি ইতিহাসে সুপরিচিত। সেকালে মোগল বাদশাদের দু'টি সভাকক্ষ ছিল। দেওয়ান-ই-খাস শুধু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য, সবসাধারণের এতে কোন অধিকার ছিল না। দেওয়ান-ই-খাস মার্বেলে গঠিত। দেওয়াল গাত্রের কারুকার্য, প্রোথিত পুষ্প সম্ভার পারসিক আর্টের ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু এক বিশিষ্ট লেখকের মতে, এই পারসিক আর্টও ভারতীয় রসে সিক্ত। শিল্পীর হাতে ভারতীয় পুষ্পরাজিই মার্বেলের বুকে সুন্দররূপে রূপায়িত হয়েছে।

একথা সত্য, এই সব আর্টের সমঝদার সাধারণ দর্শক নয়। কিন্তু আর্ট ছাড়াও অনেক গল্প কিংবা ঘটনা ছড়িয়ে আছে আগ্রা কেল্লার চারপাশে। ঘুরতে ঘুরতে হয়ত চোখে পড়বে তেমন কিছু। তখন গাইডই গল্প শোনাবে। দীর্ঘ চার শত বৎসরের স্মৃতি-বিজড়িত আগ্রা ফোর্টের ঘটনা আপনার কাছে রোমাঞ্চকর মনে হবে।

দেওয়ান-ই-খাসের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে দু'টি পাথরের আসন সাজানো আছে। একটি শ্বেত মার্বেলের, মচ্ছিভবনের দিকে—অন্যটি কালো স্লেট পাথরের, নদীর দিকে পাতা আছে। কালো পাথরটি জাহাঙ্গীরের সিংহাসন ছিল বলে জানা গেছে। এর চারপাশে পার্শী ভাষায় লেখা একটি প্রশস্তি গ্রথিত হয়েছে। আকবরের মৃত্যুর বৎসর দুই পূর্বে সম্ভবত এটি নির্মিত হয়েছিল যুবরাজ সেলিমের জন্য। কারও কারও মতে বিদ্রোহী জাহাঙ্গীর এলাহাবাদে নিজের সভাকক্ষে এটি ব্যবহার করতেন। পরে এটিকে আগ্রা নিয়ে আসা হয়।

পাথরটি আজ ফেটে গেছে। এক স্থানে ছোট ছোট গর্ত এবং সরু একটি ফাটল লম্বা ভাবে বিদ্যমান।

গৃহিণী বললেন, 'কেমন ফেটে গেছে পাথরটা'—

গাইড হাসতে হাসতে উত্তর দিল—'রাগে আর দুঃখে'।

আমি বিস্মিত হয়ে চাইলাম। রাগে আর দুঃখে পাথর কেমন করে কাটে?

গাইড গল্প সুরু করল।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ। জাঠরাজ সুরাজমলের পুত্র জওহর সিং আগ্রা কেল্লা আক্রমণ করে সাময়িকভাবে তা অধিকার করেন। চলে লুণ্ঠতরাজের বন্যা। কিংবদন্তী বলে, জওহর সিং পা দিয়ে উঠেছিলেন কৃষ্ণপ্রস্তরের সিংহাসনে। তাই ফেটে উঠেছিল পাথর। রক্ত বেরিয়েছিল এর বুক চিরে। লাল দাগ পাথরের উপর সত্যি আছে। অবশ্যই তা রক্তের দাগ নয়—লোহার কোন অক্সাইড কিংবা অন্য কোন খনিজ পদার্থ পাথরে মিশ্রিত আছে। ফাট ধরার কারণটিও জানা গেছে। পরবর্তীকালে সিন্ধিয়ার সেনাপতি মঁসিয়ে পেরণ এবং ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে জেনারেল লেক আগ্রা দুর্গ আক্রমণ করেন। নদী-তীর হ'তে সাজানো কামানের গোলা এসে পড়ল আগ্রার দুর্গে। সম্ভবত সেই গোলারই এক টুকরো

এসে পড়েছিল কৃষ্ণপ্রস্তরে। দেওয়ান-ই-খাসের উত্তরভাগে দেওয়ালের গায়ে গোলার আঘাতে গর্ত হয়েছে। কাজেই কৃষ্ণপ্রস্তরের সিংহাসন ফেটে যাওয়ার এটিই বিশ্বাসযোগ্য কারণ। কৃষ্ণপ্রস্তরে যে সম্রাট-প্রশস্তি লেখা আছে তার খানিকটা উদ্ধৃত করা হ'ল—

—তা ফলক্ তখতে গা খুরসীদ অস্ত্,
উলফতে মানিন যের শাহ সেলিম
বাদশাহী তে গে উসাদ চু দো প্যয় কর
সইদো ইয়া জমিন।

প্রস্তরে উৎকীর্ণ লিপি আমার বোধগম্য নয়। গাইডই আমাকে পড়ে শোনাল। মানে জিজ্ঞেস করায় খানিকটা ব্যাখ্যাও সে করল। সবটা ঠিক আমার মনে নেই। তাই লিপির অর্থ উদ্ধার করা সম্ভব হ'ল না।

দেওয়ান-ই-খাস ছাড়িয়ে আমরা এলাম স্নানাগারে। মোগল বাদশাহের হামামে। হামাম থেকে দু'টি পথ গিয়ে পড়েছে যমুনায়। তখন যমুনা কেল্লার দেওয়াল ছুঁয়ে প্রবাহিত ছিল। দু'টি পথের একটি ছিল হারেমের নারীদের জন্য, অন্যটি ব্যবহার করতেন জাহাঙ্গীরের হিন্দুপত্নী যোধবাঈ।

মার্কুইস অফ হেষ্টিংস গভর্ণর জেনারেল থাকাকালীন একটি সুরম্য স্নানাগার খুলে নিয়েছিলেন হামাম থেকে। সেটি পাঠানো হয়েছিল ইংলণ্ডে—রিজেণ্ট যুবরাজের কাছে। পরবর্তীকালে ইনি চতুর্থ জর্জ নামে বিখ্যাত হন।

হাঁটতে হাঁটতে আর একদিকে গেলাম। গাইড বলল, 'আম দরবারের কথা আপনাদের অজানা নয়। বাংলা দেশের মানুষ আপনারা, আধুনিককালেও আম দরবার দেখেছেন।'

গাইডের ইঙ্গিত বুঝতে পারলাম। গিন্নী মুখ টিপে হাসছেন।···

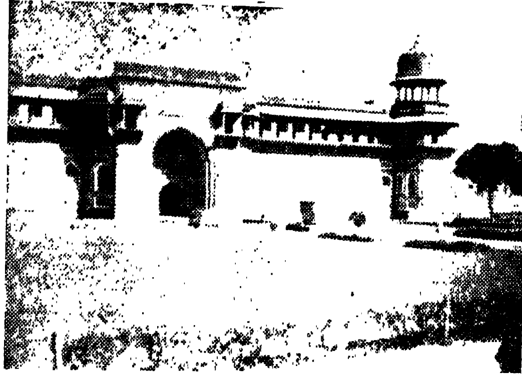
ততক্ষণে দেওয়ান-ই-আমের সামনে। সর্বসাধারণের কথা শোনবার জন্য দেওয়ান-ই-আম দরবার। সর্বোচ্চে বাদশার আসন। তার নীচে উজীর, আমীর-ওমরাহের দল। জনসাধারণের দুঃখ কষ্ট, আবেদন-নিবেদন দেওয়ান-ই-আমে বসে শুনতেন বাদশা। এই বিশাল অট্টালিকা কার সৃষ্টি তা নিয়ে নানা মত প্রচলিত। তবে বিদেশী লেখকদের বিবরণী অনুযায়ী এটি আকবরের আমলের সৃষ্টি। সম্ভবত শাহজাহান তাঁর রাজত্বকালে দেওয়ান-ই-আমের চাকচিক্য ও কারুকার্য বর্ধনে সক্রিয় চেষ্টা করেন।

দেওয়ান-ই-আমের সামনে এক বিরাট জলাধার আজও বিদ্যমান। এটি জাহাঙ্গীরের হৌজ নামে ইতিহাসে পরিচিত। বস্তুত এটি একটি স্নানের 'টাব' ছাড়া অন্য কিছু নয়। হৌজের গায়ে পারস্য ভাষায় কোন লেখা উৎকীর্ণ ছিল। হৌজটি পাঁচ ফুটের মত উঁচু এবং এর ব্যাস (মুখের কাছে) প্রায় আট ফুট। এই স্নানের 'টাব'টি জাহাঙ্গীরের জন্য নির্মিত এবং সম্ভবত নূরজাহানের সঙ্গে তাঁর পরিণয়ের সময় পাওয়া একটি উপহার মাত্র।

কোন এক সময় দেওয়ান-ই-আম অস্ত্রাগারে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের লেঃ গভর্ণর স্যর জন স্ট্র্যাচি সাহেবের হস্তক্ষেপের ফলে এটি আবার একটি অতীত ইতিহাসের মূক সাক্ষী হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। এই প্রশস্ত হলে একদা এসেছিলেন প্রিন্স অফ ওয়েলস। দেওয়াল-গাত্রে মার্বেল পাথরের বুকে উৎকীর্ণ রয়েছে গভর্ণর জেনারেল লর্ড লিটনের আদেশে লেখা স্ট্র্যাচি সাহেবের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য।

মচ্ছিভবনের উপর থেকে আজ আর প্রাঙ্গণের জলাধারে মৎস্যের জলক্রীড়া দেখা যাবে না। সুরাজমল জাঠ আক্রমণ করে আগ্রা কেল্লার অনেক কিছু নিয়ে যান। মার্বেল পাথরের জলাশয় এবং জল প্রবেশের পথ ইত্যাদি অনেক কিছুই অপহৃত হয়েছে লুণ্ঠনে। শোনা যায় জাঠরাজ 'ডিগ' নামক স্থানে তাঁর রাজপ্রাসাদে এগুলি আবার ব্যবহার করেন। অবশ্য ইংরেজ আমলের লর্ড বেন্টিংকও বিক্রী করেছিলেন কিছু কিছু। প্রাসাদের বহু সুন্দর মোজেইক ও মার্বেল পাথর নীলামে তুলে দিয়েছিলেন তিনি। উপযুক্ত ক্রেতা পেলে সম্ভবত তাজমহলও অটুট থাকত না।

আগ্রা কেল্লায় বেড়াতে বেড়াতে গাইড একবার নিশ্চয়ই 'মিনাবাজারের' কথা আপনাকে বলবে। মিনাবাজার কেবলমাত্র বাদশাহ, শাহজাদা ও হারেমের মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু মিনাবাজার শুধু বাজারই ছিল না। মাঝে মাঝে তামাশার হাট বসত সেখানে। বাদশাহ বা অন্য সকলের কখনও ইচ্ছে হত সাধারণ সাজতে। সেদিন বেগম সাহেবাদের নিয়ে বাদশা বেরুতেন নিজে বাজার করতে। বিক্রেতা সেজে আসতেন আমীর ওমরাহদের সুন্দরী ললনারা। জিনিষ কিনতেন বাদশা, দর করতেন বেগমেরা। রীতিমত দরদস্তুর, এক পাইও বেশী দেবেন



জাহাঙ্গীর-ঈ মহল আগ্রা ফোর্ট

না তাঁরা। বিক্রেতাও কম যান না। সুর্মা আঁকা চোখের কম্পিত পল্লবে নিজের সামগ্রীর উৎকর্ষতা শতগুণ করে বোঝাতেন তাঁরা। শুধু দাম দেওয়ারই সময় হ'ত যত ভুল। দু' পাই দর করে হয়ত দুই স্বর্ণমোহর দিয়ে বসতেন বাদশা। ক্রেতা বিক্রেতার হাস্যরোলে ভরে উঠত মিনাবাজারের চারিপাশ।

শর্মাজী ঠিক বলেছিলেন, এক মাসের কমে আগ্রাকে দেখা যায় না। সংক্ষেপে দেখতে হ'ল সুন্দর মোতি মসজিদ। মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত শ্বেত মার্বেল পাথরের নাগিনা মসজিদটি শুধু শুভ্র নয়, সুন্দরও।

ফেরার পথে ভাবছিলাম মিনাবাজারের কথা। একদিন মিনাবাজারের বাতাসে শুধু বেচাকেনার তামাশাই ছিল না। পূর্বরাগের রেণু গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ভেসে বেড়াত সেখানের কোণে কোণে। শোনা যায় শাহজাদা সেলিম নূরজাহানকে প্রথম দেখেছিলেন মিনাবাজারে এবং সম্ভবত বিক্রেতার আসনে। চোখের আলোয় সেদিন কি দেখেছিলেন সেলিম তা তিনিই জানতেন। কিন্তু চোখের সামনে নূরজাহান দেখেছিলেন এক উন্নতশির শুভ্র পুরুষকে, যার ভালবাসার আবেদনে সাড়া দিয়ে মেহেরউন্নিসা হয়েছিলেন হারেমের নূরজাহান। গাইড বলছিল, শাহজাদা খুরম এই মিনাবাজারেই আকৃষ্ট হন অর্জুমন্দ বানু বেগমের প্রতি। সে দিনের হাল্কা রোমান্স, পরবর্তীকালের গভীর প্রেমের প্রতীক তাজমহলে রূপান্তরিত হয়েছিল।

আগ্রার কেল্লায় একদিন আশ্রয় গ্রহণ করেছিল শত শত ইংরেজ। মেয়ে-পুরুষ শিশু প্রাণ বাঁচিয়েছিল দুরন্ত সিপাহী বিদ্রোহের অগ্নিঝটিকা থেকে। স্যর উইলিয়ম মুইর তদানীন্তন রেভিনিউ বোর্ডের জুনিয়র সদস্য ছিলেন। তাঁর 'Agra in the mutiny and the family life of W. & E. H. Muir in the Fort'. গ্রন্থে বলেছেন—'Thank God for the fort of Agra, what would it not have been for our dear ones on that dreadful night without it but a place of awful peril.'

আগ্রা ফোর্টের মধ্যে দেওয়ান-ই-আমের বিপরীত প্রাঙ্গণে রঙীন পাথর এবং শুভ্র মার্বেলে মোড়া একটি স্মৃতি-সমাধি সকলের চোখে পড়ে। এখানে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন লেঃ গভর্ণর জে. আর. কলভিন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় আগ্রা ফোর্টে তিনি মারা যান।

আগ্রা ফোর্টের নীচ দিয়ে আজ তৈরী হয়েছে প্রশস্ত রাজপথ। যমুনা বহু দূরে সরে গেছে। ফোর্ট থেকে বেরিয়ে এসে টাঙ্গা নিয়ে এই পথ ধরে চলেছি। সূর্য অস্তোন্মুখ, চেয়েছিলাম কেল্লার দিকে। আজকার শান্ত-সন্ধ্যার মত আগ্রা ফোর্টও নিস্তব্ধ নির্জন। আর কোন দিন কল-কোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠবে না তিন-চার শত বৎসর আগেকার সেই দিনগুলি। শুধু দীর্ঘদিনের দুঃখ ও বেদনা বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে এই মূক ঐতিহাসিক সাক্ষী, বর্তমান যুগ ও ভবিষ্যতের কানে কানে শোনাবে অতীতের কাহিনী······সেই বাদশা-বেগমদের গল্প।

চণ্ডীবাঙ্গী

শুভঙ্কর

মনে মনে তার নামকরণ করেছিলাম চণ্ডীবাঙ্গী। কারণ প্রথম পরিচয়েই তার যে রূপ পেয়েছিলাম তাতে আর কোন নামের কথা আমার মনেই জাগে নি।

স্থানটা আজ যতদূর মনে পড়ে—রামপুর চটি। চটি কেদারের পথে বেশ বড়গোছের একটি যাত্রীবাস—ত্রিযুগীর ঠিক আগেই।

দু'দিন জ্বর নিয়ে হেঁটে সেদিন সন্ধ্যায় এসে পৌছলাম রামপুর। চটিতে ঢুকতেই জ্বর ছাড়ল। এক কাপ চা খেতে বেশ ঝরঝরেও লাগছিল শরীরটা। একটু বিশ্রাম নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। চটিতে চটিতে আলো। অনেকের নৈশ ভোজন ইতিমধ্যেই সমাপ্ত। কোথাও কোথাও বা তখনও তার প্রস্তুতি চলেছে। আকাশ ভ'রে তারা উঠেছে। আশেপাশে পাহাড়। পাহাড়িয়াদের ঘরে দু'একটি প্রদীপ জ্বলছে। স্থির হয়ে।

হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা নীচে নেমে গিয়েছিলাম। উঠে আসছি। হঠাৎ একটা চটির কাছে আসতেই বিবদমান দু'টি কণ্ঠের পরিচিত সম্ভাষণ শুনে কৌতূহল হ'ল। দাঁড়ালাম। দু'জনেই বাঙ্গালী। বোধ হয় স্বামী-স্ত্রী। বুঝলাম—দাম্পত্য কলহই স্থান-কাল ভুলে এ ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম। কিন্তু তখনও যে দুরন্ত গতিতে ঝড় বইছিল, বুঝলাম, অবস্থা শান্ত হ'তে সময় লাগবে।

পরদিন দেখা হ'ল দু'জনের সঙ্গে পথে। প্রথম দর্শনেই অবশ্য চিনতে পারি নি। কিন্তু সময়ও বেশী লাগল না। আমার সঙ্গে সঙ্গে উঠছিল তারাও। চড়াই পথ। হাঁটার চেয়ে বিশ্রাম বেশী। সে বিশ্রামের অবসরেই আলাপ।

—আপনারা বাঙ্গালী বুঝি ?

—আজ্ঞে। ব'লে আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে প্রশ্ন করে লোকটি—আপনিও ত বাঙ্গালী, না ?

—হুঁ। ঘাড় নাড়লাম এবং ভাল ক'রে তাকালাম তাদের দিকে। লোকটির বয়স পঞ্চাশের উপর। আর মহিলার বয়সও চল্লিশ-বিয়াল্লিশের মত। সংক্ষিপ্ত বেশভূষার ধূলিধূসরতায় একটি নিষ্করুণ দারিদ্র্যের পরিচয় দু'জনেরই।

—কোত্থেকে আসছেন ? কলকাতা ?

—না, বর্দ্ধমান। আমার দিকে তাকিয়ে একটি অমায়িক হাসিতে গোটা মুখখানাকে উদ্ভাসিত ক'রে লোকটি বলতে লাগল—তবে গে কর্ত্তা, বাড়ী আম্মার ঠিক বর্দ্ধমান নয়। কোশ দু-তিন দূরে। থাকি বর্দ্ধমানেই। ঠাকুর পিত্তিমে গড়ি।

কথায় কথায় মোটামুটি একটি পরিচয় পেলাম তাদের। এবং এটাও লক্ষ্য করলাম, কথা যখন বলে দু'জনেই বলে। আর তার প্রমাণ ত কাল সন্ধ্যেবেলাতেই পেয়েছি।

সারাটা সকাল সেদিন তাদের সঙ্গেই চড়াই বেয়ে বেয়ে উঠলাম। সুখ-দুঃখের অনেক কথাই বলল দু'জন। এবং কথার ফাঁকে এটুকুও জানলাম, কাল ঘটনাচক্রে নেপথ্য থেকে যে কুরুক্ষেত্র পর্ব্ব শ্রবণ করেছিলাম এ তাদের প্রায়-প্রাত্যহিক দাম্পত্য প্রণয়ের খণ্ডাংশ মাত্র।

ত্রিযুগীতে পৌছে প্রথম দিকেই একটি চটিতে তারা উঠল। বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ খেয়াল হ'তে জিজ্ঞেস করলাম—নামটা কিন্তু জিজ্ঞেস করা হয় নি আপনার। লোকটি তেমনি অমায়িক হেসে বলল—আমার নাম চরণ পাল !

পালের সঙ্গে দেখা হ'ল আবার পরদিন রামওয়ারায়। আমরা কেদারের পথে উঠছি—দুপুরের পরটায়, তারা এসে পৌছাল। আমাকে দেখে সহাস্যে প্রশ্ন করল পাল—ভাল আছেন কর্ত্তা ?

তার পর দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছি। তাদের কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। যোশীমঠে এসে হঠাৎ তাদের কথা মনে পড়ল। সূত্র সেই প্রায়-যুধ্যমান দাম্পত্য প্রণয়। প্রথমটা একটু সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু মুহূর্ত্ত মাত্র। পালের স্ত্রীর কণ্ঠ সব সন্দেহ দূর ক'রে দিল।

কি জানি কি হ'ল। শোভন-অশোভনের বিচার না ক'রেই তাদের চটিতে গিয়ে উঠলাম—ও পালমশাই। পাল-মশাই।

তন্ময় হয়ে দু'জনেই তখন ঝগড়ায় মত্ত। কাজেই সাড়া দিতে একটু সময় লাগল।

—কি ব্যাপার। কি আরম্ভ করেছেন দু'জনে ?

আমাকে দেখে ছুটে এল পাল—দেখুন দিকি নি। যত

বলি চুপ কর, চুপ কর, মাগীর কাণ্ডটা দেখুন ত! এ যে দেবতার থান সে খেয়াল আছে?

—খেয়াল থাকবে কি ক'রে? চোখ দুটোর মাথা ত আর খেয়ে বসি নি। দ্রুতপদে ছুটে এল পাল-গিন্নী—রীতিমত রণোন্মত্ত মূর্তি। বলি দেবতার থান যে—এটা নিজেরই কি হুঁশ আছে? এইটুকুন জ্ঞানগম্যি ত বুঝি থাকে লোকের। না—কি? না—সবই ত তোমার বিন্দাবন।

এবারে জ্বলে উঠল পাল—চুপ কর, চুপ কর হারামজাদী। কথা বলবি ত মুখ সামলে বলবি।

ভেংচি কেটে বিকৃত স্বরে পাল-স্ত্রী বলল—মুখ সামলাব কেন? কেন? যখন চোখদুটো ঘুর ঘুর ক'রে ঘুরে বেড়ায় তখন সামলাতে পার না? না, তখন ভারী রস। ভারী সোয়াদ। না—নয়নমণির গন্ধ আছে।

ক্ষিপ্ত হয়ে পাল এবার স্ত্রীর দিকে ছুটে যাচ্ছিল; হাত ধ'রে নিরস্ত ক'রে, টানতে টানতে বাইরে নিয়ে এলাম।

মেজাজটা একটু শান্ত হ'তে জিজ্ঞেস করলাম—ব্যাপারটা কি খুলে বলুন ত! নয়নমণি কে? আপনার স্ত্রীর সতীন-টতীন নাকি?

প্রথমটায় একটু ইতস্ততঃ করল পাল। পরে সলজ্জ হেসে বলল—না কর্তা, ও কিছু নয়। ছোটবেলায় একসঙ্গে থাকতাম, খেলাধূলো করতাম।

—তাই মনে রং ধরিয়েছিল বুঝি?

—না। না। আজ্ঞে, ওসব কিছু নয়। কবে চুকে-বুকে গেছে সে সব। সে মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে কবে। বেঁচে থাকলে এ্যাদ্দিনে নাতি-নাতনী নিয়ে ঘরকন্না করত। যত বলি ওসব নিয়ে আর কেন—কিন্তু কে শোনে?

—স্বভাবই এটা মেয়েদের। কি করবেন!

—না কর্তা, না। মেয়ে ওকে বলবেন না। পুরুষের এককাঠি উপরে। আমার কথা কয়টি যেন ফুঁ দিয়ে জ্বালিয়ে দিল পালকে।—ছোটবেলায় কবে কোন্ মেয়ের সঙ্গে খেলা করেছি, সে কি গায়ে লেগে আছে? না—কেবল এই এ সন্দ, ঐ এক ভয়। ওই বুঝি কোন্ মেয়ের দিকে চোখ তুললাম, ওই বুঝি কোন্ মেয়ে দেখতে নয়নমণির মত। সেই এক জ্বালা—নিশিদিন ওতেই জ্বলে-পুড়ে ম'ল। যত নূতন মেয়ে দেখছে, কেবল এক ভয়, দেখতে বুঝি নয়নের মত। এ পথে এসে এ ভয়টা যেন একটু বেড়েছে।

পালের কথা শুনে কৌতুক বোধ করছিলাম।

—কি ঝামেলা বলুন দেখি। নিত্যি নিত্যি সয় কত? সইবারও ত বুঝি একটা ক্ষেমতা আছে, না কি? আর শুধু এই নাকি? আরও শুনবেন? একটু যেন ইতস্ততঃ করল পাল, পরে আরম্ভ করল আবার—এইত এবারেই ত। পালের গাঁয়ের দত্তবাড়ী থেকে সরস্বতীর অর্ডার দিয়ে গেল। ঐ তল্লাটে বড় বাড়ী। বার মাসে তের পার্ব্বণ ত আছেই। ঠাকুর যদি মনোমত হয় বুঝতেই ত পারছেন। গোটা বছরের একটা হিল্লে হয়ে যায়। কাজেই ঠাকুরও খেটেখুটে ত বুঝি তৈরী করতে হয়, না কি বলুন না? এ ত শুধু আমি ব'লে নয়, সবাই করবে। আপনি হ'লেও করতেন। গড়লাম ঠাকুর, কিন্তু ও মা! পুজোর আগের দিন সকাল-বেলা বাজারে গেছি রং আনতে, এসে দেখি ঠাকুর ভেঙ্গে রেখেছে। নাকি ঠাকুর দেখতে নয়নমণির মত। আর কি? এইখানেই শেষ। বুঝতেই ত পারেন তার পর। কিন্তু আজ সন্ধ্যেবেলা যে আসবে ঠাকুর নিতে, তাদের কি ব'লে বোঝাই; আর তারাই বা করে কি?

পরদিন পথে আবার দেখলাম পালের স্ত্রীকে। সম্পূর্ণ অন্য মূর্তি, বেশ হাসিখুশী প্রসন্ন। ঝড়ের পরে গাঢ় নীল আকাশ। সহজ ভাবে কথায়বার্ত্তায় পথ চলছিল। আমায় জিজ্ঞেস করল—বিয়ে করেছ গো কর্তা?

ঘাড় নাড়লাম।

—তবে এখন এলে কেন এ পথে? দু'দিন বাদে বিয়ে ক'রে বৌ নিয়ে ত বুঝি আসতে হয়।

হেসে বললাম—আসব আবার, দু'বার পুণ্যি হবে।

হাসল ক্ষান্তমণিও।

কথায় কথায় বলল—সয়ে সয়েই গেলাম এ জীবনটা। বাপ মা বুঝতে পেরেছিল, তাই বুঝি নাম দিয়েছিল ক্ষান্ত।

—নামটা কিন্তু তোমার ভুল হয়েছিল। বললাম।

—কেন?

—নামটা হওয়া উচিত ছিল তোমার চণ্ডী ঠাকরুণ।

প্রথমটা ও বুঝতে পারে নি। বুঝতে পেরে হাসল।

কিন্তু কথায়-বার্ত্তায় এমনিতে মনে হয়, আর দশটা বাঙ্গালী বৌয়ের মতই। বলল—বদরীতে নাকি নারায়ণের সম্বচ্ছরের বাস। এখানে প্রার্থনা জানালে ত মিথ্যে হবে না? হবে?

সেদিন সন্ধ্যেবেলা আবার দুর্য্যোগ। শুধু বারিপাত নয়, বজ্রপাতও। আমরা সবে তখন চটিতে এসে উঠেছি। অনুমান করলাম পথে পাল বুঝি আবার কোন্ মেয়ের দিকে তাকিয়েছে।

উঠে গেলাম।

ততক্ষণে উদ্যোগ পর্ব্ব থেকে হাতাহাতি সুরু হয়ে গেছে। জোর ক'রে টেনে বাইরে নিয়ে এলাম পালকে। ক্ষ্যাপা

কুকুরের মত সে তখনও ফুঁসছে। আজ তোর লীলা ঘুচিয়ে দিতাম। হারামজাদী বজ্জাত মাগী।

পাল-গিন্নীও সহজে হটবার পাত্রী নয়। দর্পভরে বাইরে ছুটে এল, আয় না। আয়। আজ মুড়ো ঝাঁটা দিয়ে তোর চোখ দুটো গালব। জন্মের মত তোর চোখের দেখা সাদ ক'রে দেব। একবার ভেতরে আয় না?

নখের আঁচড়ে পালের কাঁধ পিঠ ছড়ে গিয়েছে, রক্ত পড়ছে। নিয়ে গেলাম ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার ত শুনে হেসেই অস্থির।

আর একবার দেখেছিলাম মাত্র পাল-দম্পতীকে বদরীনারায়ণের মন্দিরে। যুক্তকরে দাঁড়িয়ে আছে দু'জনেই। আমাদের চারদিকে অগণিত যাত্রী। নির্ব্বাক্, নিমীলিত-নেত্র।

একধারে সম্মিলিত কণ্ঠে স্তোত্র পাঠ হচ্ছে। দীপাধারের ঘৃতালোক আর ধূপের ধোঁয়ায় সব যেন কেমন অলৌকিক দেখাচ্ছে।

মন্দিরের সামনেই ব্রহ্মকুণ্ড। অলকানন্দার পাড়ে। মন্দির থেকে বেরিয়ে সেদিকেই যাচ্ছিলাম। দেখি পাল-দম্পতীও নামছে। জিজ্ঞেস করলাম—কি গো চণ্ডী ঠাকৃরুণ, কি চাইলে ঠাকুরের কাছে?

কিছু বলল না ক্ষান্তমণি। শুধু একবার আমার দিকে তাকিয়েই নেমে যাচ্ছিল।

পেছন থেকে ডাকলাম আবার—কি গো জবাব দিলে না যে আমার কথার?

—কি জবাব দেব? পেছন দিকে তাকাল একবার ক্ষান্ত।

—এতদূর এসে কি চাইলে ঠাকুরের কাছে? বললে না ত?

এবার মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল ক্ষান্ত—আর জালিও না ত বাপু। যাও, গিয়ে বিয়ে ক'রে বৌ নিয়ে এস আবার। বৌকে তখন জিজ্ঞেস কর, বৌ ব'লে দেবে।

হেসে বললাম—জানি। সিঁথির সিঁদুর ত?

আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই মুখ ঘুরিয়ে ক্ষান্ত দ্রুতপদে নীচে নেমে গেল, যেন ধরা পড়ে গেছে।

শ্রেষ্ঠ মানুষ

জীবজগতে বোধহয় কেঁচোকে এবং তদ্বিধ অন্য কোন কোন প্রাণীকে খুব আঘাত করিলে, বা পিষিয়া মারিয়া ফেলিলেও, তাহারা আঘাতের পরিবর্ত্তে আঘাত করে না। ইহা সাত্ত্বিকতা নহে। ইহা এক প্রকার জড়তা, কিম্বা অতি নিকৃষ্ট রকমের জান্তব স্বভাব। ছোটবড় অন্য অনেক প্রাণী আছে, যাহারা আঘাত করিলে আঘাত করে। যেমন পিপীলিকা, মৌমাছি, বোলতা, কাক, টিয়াপাখী, কুকুর, ষাঁড়, ঘোড়া, বাঘ, সাপ ইত্যাদি। এই যে প্রতিক্রিয়া, ইহা জান্তব স্বভাব। এই জান্তব প্রকৃতি কেঁচোর জান্তব প্রকৃতির চেয়ে কিছু উচ্চ শ্রেণীর। এই উভয় প্রকার জান্তব প্রকৃতির পরিচয় মানব জাতির মধ্যে দেখা যায়। ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্বভাবের মানুষ আছে। সেরূপ মানুষকে বশে রাখিবার জন্য আঘাত করিলে, সে বলে, "আমি তোমার অধীন হইব না, কিন্তু আঘাতের পরিবর্ত্তে তোমাকে আঘাত করিব না, তোমার প্রাণবধ করিতে চাহিব না। আমি তোমার জান্তবতা নষ্ট করিব, তুমি যে অপরকে তোমার অধীন রাখিতে চাও, তাহাকে তোমার সুখভোগের ও স্বার্থসিদ্ধির উপায় করিতে চাও, তোমার এই নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রাণবধ করিব।" এই রকমের মানুষই শ্রেষ্ঠ মানুষ।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, 'প্রবাসী, পৌষ, ১৩৩৭।

বিজ্ঞান-জনহিত-ধর্ম

শ্রীদিলীপকুমার রায়

"Any profound Weltanschauung (world-view) is mysticism, in that it brings men into a spiritual relation with the Infinite."*

MY LIFE & THOUGHT....Albert Schweitzer....Epilogue)

শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়

আপনার চমৎকার পত্রটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবার কিছুই নাই, কারণ আপনি যা বলেছেন আমিও সেই কথাই বলেছি আমার আগের পত্রে। তবু আপনার চিঠিটি পড়ে দু'চারটি কথা যা মনে এল লিখছি, বিশেষ ক'রে— মহামনীষী শ্বাইৎজারের বিজ্ঞান, দর্শন ও সংস্কৃতি-প্রবুদ্ধ মনে ধর্ম কি ভাবে আলো জ্বালিয়েছে।

প্রথমেই জানিয়ে রাখি যে, আপনার পত্রের চতুর্থ অনুচ্ছেদটি আমার অত্যন্ত ভালো লেগেছে, আরো আপনার এই অঙ্গীকারটি; "বিজ্ঞানের পুতুল পূজার (worship of mere matter) আমি সমর্থক কখনো নই।" আপনার একথাও কাটবার জো নেই যে, "বিজ্ঞানের গোঁড়ামি ও ধর্মের গোঁড়ামি দুইই মানুষকে অমানুষে পরিণত করতে পারে।" যেহেতু একথা আমি নিজেও লিখেছি আমার নানা প্রবন্ধে তথা উপন্যাসে, গল্পে, সেহেতু এর পরে আপনাকে সতীর্থ তথা দরদী না ব'লে উপায় আছে ?

না, এ চটুল পরিহাস নয়। আপনাকে সত্যিই বলা চলে উদার বৈজ্ঞানিক, যেমন আলবার্ট শ্বাইৎজারকে বলা চলে উদার ধার্মিক। "উদার" বিশেষণটির ভাষ্য—গুণগ্রাহী কিন্তু গোঁড়া নয়। কেবল দুঃখ এই যে, যেমন সব ধার্মিকই শ্বাইৎজারের মতন উদার তেজস্বী নন, তেমনি সব বৈজ্ঞানিকই কিছু আইনষ্টাইন বা এডিংটনের মতন ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নন। কে না জানে আইনষ্টাইন বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে দিক্‌পাল? কিন্তু খুব কম লোকেই জানেন—বিশেষ ক'রে আমাদের দেশে—তিনি আজীবন ধর্মের শ্রদ্ধাশীলতার পূর্ণ সমর্থক ছিলেন। তাঁর নানা লেখারই religious reverence সম্বন্ধে চমৎকার চমৎকার উক্তি ঝিকমিক ঝিকমিক করছে। একটি দৃষ্টান্ত দিলামই বা: The World as I See It-এ তিনি অকুতোভয়েই লিখেছেন:

"I maintain that the cosmic religious feeling is the strongest and noblest incitement to scientific research."*

শ্রেষ্ঠ ধর্মবিৎ ও মনীষীরা যুগে যুগে মানুষের অন্তর্নিহিত যে-উর্ধ্বমুখী অভীপ্সার গুণগান করেছেন আইনষ্টাইনও সেই ব্যক্তিরূপের মহিমাকে অভিনন্দন করেছেন সর্বান্তঃকরণে তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ "What I Believe"-এর ও অন্য নানান্ অঙ্গীকারে; বলেছেন খুব জোর দিয়েই যে, জীবনের তথা "do of harmony"-র শ্রেষ্ঠ সূত্র গ'ড়ে তুলতে পারে কেবল স্রষ্টা মানুষ—creative personality। নানা সংঘ বা "ইস্‌ম্"-এর চাপে এই মহৎ প্রেরণা নিষ্পিষ্ট হয়ে যায় ব'লেই তিনি ফ্যাশিস্ত, নাজি বা বলশেভিক নীতিকে অকুণ্ঠে নিন্দা করেছেন। তাঁর Credo, What I Believe-এ লিখেছেন তিনি:

"For this reason I have always been passionately opposed to such regimes as exist in Russia, Germany and Italy today...I am convinced that degeneracy follows every autocratic system of violence, for violence inevitably attracts moral inferiors. Time has proved that illustrious tyrants are succeeded by scoundrels. 1941†

* জগৎ সম্বন্ধে যে কোন গভীর দৃষ্টিভঙ্গির মূল ধর্মের প্রেরণা। কারণ এ-দৃষ্টি মানুষকে অসীমের সঙ্গে আত্মিক যোগসূত্রে বাঁধে।

* "আমি মনে করি—বিশ্বলীলাবাদী ধর্মানুভূতি বৈজ্ঞানিক গবেষণার একটি বলবত্তম ও মহত্তম প্রেরণা।" তিনি আরো এক জায়গায় লিখেছেন যে এ বিশ্বলীলা প্রত্যক্ষ করলে মনে হয়ই হয়, সুষমার ঈশ্বর (god of harmony) আছেনই আছেন। এ বিরাট্ সুষমার দৃশ্যে যার হৃদয়ে শ্রদ্ধা সমীহের ভাব না আসে তার হৃদয় অসাড়, জীবন্মৃত ......ইত্যাদি

† "এই জন্যে আমি চিরদিন তীব্র প্রতিবাদ করে এসেছি রুশ জার্মান ও ইতালীতে যে-ধরণের ডিকটেটর নীতির প্রতিষ্ঠা হয়েছে—তার বিরুদ্ধে। বাহুবলপ্রতিষ্ঠিত রাজতন্ত্রের পরিণাম মনুষ্যত্বের অধোগতি, কারণ বাহুবল দলপাকায় হীন মানুষকে নিয়ে। ইতিহাসে দেখতে পাই —প্রখ্যাত অত্যাচারীদের পরে অভ্যুদিত হয়েছেন দুরাত্মারাই।"

তাঁর ও শ্বাইৎজারের একাধিক জীবনী পড়তে পড়তে আমার বহু বৎসর-লালিত একটি ধারণা সমর্থন পেল যেন নতুন ক'রে। সে ধারণাটি এই যে,সংসারে মোটামুটি দু' থাকের মানুষ আছে। এক—যাঁরা জগৎকে দেখেন শ্রদ্ধার অঞ্জন মেখে ; দুই—যাঁরা বুদ্ধির সর্বক্ষমতা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হয়ে শ্রদ্ধেয়কে—অর্থাৎ গভীর বিশ্বাসলভ্য সত্যকে—অশ্রদ্ধেয় প্রতিপন্ন করতে উঠে-প'ড়ে লাগেন। বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ের পরে এই দুই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে বিরোধ আরও প্রবল ও মুখর হয়ে উঠেছে। খ্যাতনামা ভাবুক উইল ডুরাণ্ড তাঁর Story of Civilisation নামক বিরাট্ বিশ্বকোষে অকারণ লেখেন নি (৭ম খণ্ড, ভূমিকা): "বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে মহাবিতণ্ডা এযুগের চিন্তাধারার একটি প্রধান স্রোত—

The great debate between science and religion is the main current of modern thought." THE AGE OF REASON BEGINS ....To the Reader.

এ-বিতণ্ডার নিষ্পত্তি সুদূর না আসন্ন—বলতে পারি না, তবে একটা কথা বলা যায় জোর ক'রেই যে, বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফল বিশ্বব্যাপী হ'লেও তাতে ক'রে মানুষের নৈতিক উন্নতির পথ একটুও সুগম হয় নি। মানুষ প্রাক্‌বৈদিক যুগে ভারতবর্ষে বা প্রাক্‌হেলেনিক যুগে পাশ্চাত্য দেশে যেমন অসুখী, অশান্ত ও হিংসুক ছিল আজও ঠিক তেমনিই আছে—কেবল সভ্যভব্য পোশাক প'রে অশুদ্ধি চিত্তবিক্ষেপকেও জাতে তুলেছে মাত্র—"সংস্কৃতি" বা রকমারি "ইস্‌ম্‌" উপাধি দিয়ে। এর ফলও ফলেছে হাতে হাতে : আণবিক আগ্নেয়াস্ত্রের প্রতিপত্তি, জেট-প্লেনের জ্যোতিষ্কগতির জয়ধ্বনি, লক্ষ লক্ষ লোককে ভুলিয়ে রাখাএই স্তোকবাক্যে যে, বিজ্ঞানের একক প্রচেষ্টায়ই "স্বর্গ নামিয়া আসিবে মর্ত্যে, স্বর্গে উঠিবে ধরণী।"

কবির ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হবে না যদি আমরা সাশ্রু-নেত্রে বিজ্ঞানকেই ভগবান্ দাঁড় করাতে না যাই, যদি আমরা মহামনীষী গেটের অঙ্গীকারে সই ক'রে বলি যে, আমরা সর্বনাশা সংশয়কে প্রশ্রয় দেব না :

"Ich habe geglaubt, nun glaub' ich erst recht,
Ich bleibe beim glaubigen Orden :
So duester es oft und dunkel es war....
Auf einmal ist's lichter geworden !

শ্রদ্ধারে আমি করিয়া এসেছি অঙ্গীকার,
আজ আরো চাই হৃদয়ে জপিতে সে-বিশ্বাস।
এসেছে ধরণী হয়ে বার বার অন্ধকার,
তবু প্রতিবারই করেছে আলো সে-কালোরে গ্রাস।"

কিন্তু মহাকবি গেটের বা মহাত্মা শ্বাইৎজারের মতন লোকোত্তর মনীষীরা শ্রদ্ধাবিশ্বাসের আঁধার-জয়ী শক্তি সম্বন্ধে অঙ্গীকার করলে হবে কি, এ যুগের সংশয়ীদের সংসদে শ্রেষ্ঠ নবীর পদবী পেয়েছেন কবিরা নয় ত, পেয়েছেন বিজ্ঞানোচ্ছ্বাসী তথা রাষ্ট্রপতিরা। তাঁরা প্রায় একবাক্যে রায় দিলেন যে, সত্যের পথনির্দেশ দিতে পারে কেবল বিজ্ঞানী বুদ্ধি ও বস্তুতান্ত্রিক জীবনদর্শন। বুদ্ধি অতীত যুগেও মান পেয়েছে, কিন্তু শ্রেষ্ঠ ধ্যানী জ্ঞানী ঋষি মুনির কাছে নয়—তাঁরা পরম দিশারি ব'লে বরণ করেছিলেন বোধির প্রজ্ঞাকে (intuition ও revelation)। কাজেই এ মুকুটমণি পেয়ে বস্তুবিচারী বুদ্ধির মাথা গরম হয়ে উঠল, সে হাঁকল স-দাপটে : "আমি যা বুঝি তাই সত্য, যা বুঝতে পারি না তা হয় কবিকল্পনা ধুম-জল্পনা, না হয় মিথ্যার শোভাযাত্রা কুসংস্কারের উর্দী প'রে।"

সাধারণ মানুষ কোন কিছুই তলিয়ে ভাবে না, যা চকচক করে তাকেই সোনার মান দেয়। বৈজ্ঞানিকের ও তাঁদের তাঁবেদার যন্ত্রনির্মাতাদের (technologist) অঘটনঘটনা কীর্তিকলাপ দেখে ও হাতে হাতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের নগদবিদায় পেয়ে তাই ত মানুষ হকচকিয়ে গিয়ে বলল : "এরই ত নাম ভাগবতী বিভূতি—যে তার জাদু-বলে আমাদের কাঁটাবনকে নন্দনকানন ক'রে তুলল ব'লে ! অতএব বল ভাই সবাই মিলে সঘনে—নমো নব বিজ্ঞানদেব, আমাদের কর্তা ও বিধাতা !" কিন্তু মুশ্‌কিলের দেখা মিলল, যখন দেখা গেল, বিজ্ঞানবৈভবী দৃপ্ত বুদ্ধিকে সরাসর কর্তা ও বিধাতা দাঁড় করালে ঐ সঙ্গে হর্তা না হয়ে তার আশ মেটে না। তবে এ সঙিন সমস্যার অভ্যুদয় হয়েছে হাল আমলে—হিরোশিমা নাগাসাকির অতিকায় হত্যাকাণ্ড দেখে যা তৈমুর চেঙ্গিস নাদিরশা মাহমুদ প্রমুখ মহাহন্তাদেরও দুয়ো দেয় কৃপার হাসি হেসে : "আর কে আমার মত চক্ষের নিমেষে বিশ্বহন্তা হ'তে পারে ?"

কিন্তু বিজ্ঞানের সর্বেসর্বা হওয়ার ফলে শুধু যে বাহ্য-জগতে বিশ্বধ্বংসী কাপালিকতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছে তাই নয়—ঐ সঙ্গে নাস্তিকতা মান পেয়েছে মানুষের চরম-বোধির পদবী পেয়ে। কারণ, বিজ্ঞানের সন্ধানী বুদ্ধি

ভগবানের ধারও ধারে না। সে বলে সগর্জে'ই: "সত্য আবিষ্কারের তীর্থযাত্রায় ভগবান্ অবান্তর, শুধু বস্তুবিচারী বুদ্ধিই চরম নিয়ন্তা। অপি চ, বিজ্ঞান এরই মধ্যে যে সব অদ্ভুত অঘটন ঘটিয়েছে তার জোরে একথা বলা চলে বড় গলা ক'রেই, যে, ভগবান্‌কে বাতিল ক'রে বিজ্ঞানকে তাঁর বেদীতে বসালে আর ভয় থাকবে না। 'হালের কাছে মাঝি আছে করবে তরী পার'—কবির এ ভবিষ্যবাণী অপ্রতিবাদ্য, কেবল সে-মাঝির নাম বিজ্ঞান, আর কর্ণধারের নাম বিজ্ঞানবাহিনী বস্তুতান্ত্রিকতা।"

একথা ঢাক পিটিয়ে আরও প্রচার করলেন মহাশক্তিধর রাষ্ট্রপতিরা—লেনিন, স্টালিন, হিটলার। "Religion is the opium of the soul" বর্গীয় বুলির বেদবাক্য রটিয়ে। এর ভাষ্যও পরেই রয়েছে: "আকাশের ভগবান্ অকর্মা বা নাস্তি। জগৎ চালাচ্ছে—সাফ দেখতে পাচ্ছি—বুদ্ধিমন্ত কমিসারিয়েট ও যান্ত্রিক হাকিমের দল।" এ ধরণের কথা ক্রমাগত শুনতে শুনতে মানুষের আবেশ জেগে উঠল, বিশেষ ক'রে বিজ্ঞানের শক্তি চাক্ষুষ ক'রে। সে বলল সসম্ভ্রমে, ঠিকই ত! আকাশের ভগবান্ কী-ই বা করেছেন? বড় জোর দু'চার কোটি অকেজো নীহারিকা নিয়ে ডাণ্ডাগুলি খেলছেন। করবার মতন কাজ করছে শুধু মানুষের বিজ্ঞানী বুদ্ধি। কাজেই সেই ত ভগবান্।

এ নয়া মন্ত্রবাণীর ফেরে প'ড়ে মানুষ চলছিল খাসা fool's paradise গ'ড়ে—কেবল, হায় রে, বাগড়া দিল বিজ্ঞানী যজ্ঞের রাক্ষসী—বিশ্বহন্ত্রী আণবিক কৃত্যা। বিজ্ঞানী বুদ্ধি নাস্তিক্যের ঝাণ্ডা উড়িয়ে টেনে নিয়ে এল মানুষকে ধ্বংসের অতলান্তিকের সামনে। যে-শক্তি সে আবিষ্কার করল সে "কম্‌লী"র মতন হয়ে দাঁড়াল—অর্থাৎ ছাড়লেও ছাড়ান দেয় না। মহাকবি গেটে তাঁর দূরদর্শী কল্পনায় পেয়েছিলেন এর পূর্বাভাস, তাই নবীর মতনই লিখেছিলেন বৈজ্ঞানিকের শিক্ষানবীশের আশু সংকটের কথা:

Herr! die Not ist gross!
Die ich rief die Geister,
Werde ich nun nicht los!

দেখ দেখ প্রভু, একি দুর্নিবার বিপদ্ ভীষণ!
যে বিশ্ববিনাশী ঘোর রাক্ষসীরে করেছে আহ্বান,
ছাড়িলেও ছাড়ে না সে—রক্ষা পাব কেমনে এখন?

গেটের এ সবিলাপ প্রশ্নের উত্তর দিতে বিজ্ঞানী বুদ্ধি অক্ষম। দিতে পারে কেবল ধর্মবুদ্ধি, যে বলে নাস্তিক্যের অন্ত্যেষ্টি নিধনে—শুধু ভগবদ্-আশ্রয়েই হানাহানির মর্ত্য-লোক গলাগলির অমরাবতী হতে পারে। বৈদিক ঋষি তাই আমাদের সাবধান করেছিলেন:

"ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি
ন চেদিহাবেদীন্ মহতী বিনষ্টিঃ।" (কেন উপনিষদ্।)
বিভুর মিলনে শুধু জীব হয় ধন্য ইহলোকে,
না লভিলে তাঁরে আসে সর্বনাশ দুঃখে ভয়ে শোকে।

কিন্তু এ লাভের প্রথম সোপান তথা অটল ভিত্তি হ'ল আস্তিক সত্যে শ্রদ্ধাবিশ্বাস। বৈজ্ঞানিক তথ্যজ্ঞান সুখ-সুবিধার, তথা রকমারি স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের ব্যবস্থা করতে পারে, কেবল পারে না শান্তির বিধান দিতে। অমৃতানন্দের চিরঞ্জয় বাণীর সন্ধান পেতে। কিন্তু তবু মোহ যখন পেয়ে বসে তখন মরীচিকাকেই জল ব'লে ভ্রম হয়, কে না জানে? তাই এত ঠেকেও মানুষ শুধু যে শিখতে চাইছে না তাই নয়, যেন আরও সদর্পে চাইছে চিরন্তন আর্যবাণীকে পাল্‌টে ঘোষণা করতে:

বিজ্ঞান-বিধানে যার নাই ভক্তি এই মর্ত্যলোকে
সে নাস্তি ঈশ্বরে কল্পি' কেঁদে মরে দুঃখে ভয়ে শোকে।

আপনার একথা কে না মানবে যে, ঈশ্বরকে নানা অজ্ঞানীই যুগে যুগে নিজের মনগড়া রূপে কল্পনা ক'রে অমানুষ হয়ে ধর্মের নামে অধর্মের দুর্ভোগ এনেছে। কিন্তু কোনো পথে মেকির দেখা মেলে ব'লেই এ সিদ্ধান্ত মঞ্জুর নয় যে, খাঁটি নাস্তি। তাই অজ্ঞানী অমানুষেরা ধর্মের অমানুষিক ব্যভিচার করেছে ব'লেই সাব্যস্ত হয় না যে, দেবব্রতী সত্যধর্ম নামঞ্জুর। এ কথার সবচেয়ে বড় প্রমাণ—যুগে যুগে সব দেশেই বহু মহাপুরুষ তপস্যা ক'রে পেয়েছেন সেই দেবতার দেখা, যিনি আনন্দী শিব সত্য ও সুন্দর এবং একথার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ দিয়েছেন নিজেদের নির্লোভ নিরভিমানিতায়, সর্বজীবের মঙ্গলসাধনে, অধ্যাত্মজ্ঞানে, স্বার্থত্যাগে, পথনির্দেশে, ক্ষমায়, প্রেমে। তাঁরা সবাই একই উপলব্ধিকে প্রকাশ করেছেন নানা ভাষায়, নানা সুরে, নানা ছন্দে যে, মানুষের মধ্যেই ভগবান্ আছেন আত্মগোপন ক'রে, তাঁকে আবিষ্কার করলেই আপৎ শান্তি:

এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
রচিলেন যে দেবাদিদেব এই মহাবিশ্ব—তার
প্রতিজীব হৃদে নিত্যাসীন সেই মহাত্মা অপার।

আপনি আপনার নানা পত্রেই লিখেছেন, এ বিশ্ব-লীলায় সেই নিত্যাসীন মহাত্মার লীলা বোঝা ভার।

ক্লিষ্ট প্রশ্ন তুলেছেন—কেন আবহমানকাল সর্বজীবেরই দুঃখশোকযন্ত্রণার অন্তহীন পুনরাবর্তন হয়ে এসেছে? আপনার আক্ষেপের যে হেতু আছে, জীবের জৈবিক যন্ত্রণা যে দুঃখময়, বিশেষ ক'রে মানুষের মিথ্যাচার হীনতা ও নিষ্ঠুরতার দুষ্প্রবৃত্তি যে জঘন্য, একথা কে না মানবে বলুন? যুগে যুগে দেশে দেশে হৃদয়বান্ মানুষ যাঁরা, তাঁরা সবাই দুঃখ পেয়েছেন মানুষের দুঃখ আর্তি দেখে। আর, এ-দুঃখ প্রায় নিরাশায় পৌঁছেছে যখন মানুষ নিজে খাল কেটে কুমীর এনেছে। প্রাকৃতিক দুঃখের উপর চাপিয়েছে স্বকৃত দুঃখ—man-made misery—যুদ্ধবিগ্রহে, কাড়াকাড়িতে, দুর্বলকে আরও মাড়িয়ে গিয়ে। ইতিহাসের পাতায় পাতায় মানুষ অশ্রুর অক্ষরে লিখে গেছে যে, সে ইতিহাস থেকে কিছু শেখে নি কোনদিনই। বারবারই দেখেছে—পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় যন্ত্রণায় দুর্ভোগে অবসাদে, তবু বারবারই বাছাই ক'রে নিয়েছে পুণ্য ছেড়ে পাপকে, ধর্ম ছেড়ে অধর্মকে। গত যুদ্ধের সময় আমি প্রায়ই ভাবতাম—এই problem of choice এর সমাধান কি? কেন মানুষ বারবারই খোলাচোখে দুষ্প্রবৃত্তির অতল গহ্বরে ঝাঁপ দেয়—অধর্মের পাওনা হয় বার বার চাক্ষুষ করার পরেও যে, সুপ্রবৃত্তির শুভদীপ নিভিয়ে দিলে তার অবসান—অন্ধকারে আত্মঘাতে?

একটা উত্তর কেবল পাওয়া যায়—যদিও পুরাপুরি জানাও কঠিন। সে উত্তরটি হ'ল মামুলি—এ পর্যন্ত জগতের বিকাশ হয়ে এসেছে দ্বৈতের (duality) মধ্যে দিয়েই—আলোয় কালোয়, সুখে দুঃখে, বিয়োগে মিলনে, হাসি অশ্রুতে, ওঠা পড়ায়। দুঃখের এ-ব্যাখ্যায় কিছুটা সান্ত্বনা মেলে, কেননা যদি দুঃখ শোক জরা মৃত্যু পাপ তাপ আদৌ না থাকত তা হলে হয়ত সুখ অশোক যৌবন জীবন পুণ্য শান্তিকে তাদের স্বরূপে চেনাই যেত না। কিন্তু খতিয়ে এ হ'ল জীবনের ছন্দ যাকে স্বীকার করেও আশাশীল (optimist) হওয়া সম্ভব। কিন্তু যখন মানুষের খুন চেপে যায়—যখন সে নির্লজ্জ হয়ে পশুর চেয়েও পাশবিক হয় লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা ক'রে একেশ্বর (dictator) হতে, তখন তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুঃখবাদী (pessimist) না হয়ে মেনে নেওয়া একটু কঠিন হয়ে ওঠে যে, এত শত দুরাচরণের দরকার ছিল মহত্ত্বের মহিমা আরও বেশি ক'রে বুঝবার জন্যে। কেবল তবু শেষমেশ একটি কথা মানতেই হয় যে, নৈসর্গিক ও মানবিক দুঃখকষ্টের অবধি না থাকা সত্ত্বেও মানুষ খতিয়ে অন্ধকার থেকে আলোর দিকেই চলেছে—এত শত ভূমিকম্প মহামারি কুরুক্ষেত্র ও অত্যাচার সত্ত্বেও নরখাদক গুহাবাস অধ্যা[…] থেকে উঠে গড়েছে সমৃদ্ধ সভ্যতার রাজধানী, যেখা[…] মহৎ শিল্পী, বিজ্ঞানের তপস্বী, জ্ঞানের দার্শনিক—সর্বোপরি, সর্বত্যাগী সাধুসন্ত, বিশ্বপ্রেমিক মহাতপা[…] সমুদ্র-উদার ভাবুক ও স্বপ্নচারী দার্শনিকের দে[…] মিলেছে। মানুষ বারবার পড়েছে কিন্তু আবার উঠেছে[…] এও ত অস্বীকার করা চলে না। শেষে কি বিজ্ঞান[…] মারণাস্ত্রেই তার বহুবিচিত্র সভ্যতার ভরাডুবি হবে—যার পরে বংশে বাতি দিতেও কেউ থাকবে না?

তবু এ-আশাশীলতার ভিত্তি নিতান্ত দুর্বল না হ'লে[…] ভয় হয়ই যখন দেখি, বিজ্ঞানের নানা বর পাওয়া সত্ত্বে[…] মানুষের নানান্ নৈতিক অবনতি হয়েছে বিজ্ঞানপু[…] বস্তুতান্ত্রিকতার প্ররোচনায় ও বিজ্ঞানসমর্থিত নাস্তি[…] ভোগবাদের কুহকে। নইলে হয়ত আজ আদর্শবা[…] পরার্থনিষ্ঠা, ত্যাগব্রত ও ভগবদ্‌ভক্তি সেকেলে ব'লে এ[…] অপদস্থ হ'ত না—কে জানে? অবশ্য কয়েকজন স্বভা[…] সুমতি ও ধর্মভীরু মহাত্মা চিরদিনই দেশে দেশে দে[…] দিয়েছেন, যাঁরা পই পই ক'রেই সমসাময়িকদের মা[…] করেছেন কাম ক্রোধ লোভ মোহের মায়াকে আস্কা[…] দিতে। কিন্তু করলে হবে কি? জগতে অসংযমীরা[…] যে সংখ্যাগরিষ্ঠ—মেজরিটি। কাজেই এ দলে-ভা[…] ভোগবাদীর হাতে এল শক্তির রাশ—তাঁরা মানুষকে[…] বললেন—"যেখানেই হাতে হাতে নগদ বিদা[…] মেলে সেখানেই রাজধানী বসাও, ভোগের পথে যার[…] বাধা দেয় তাদের উচ্ছেদ কর।" কথাটা একটু হাল্ক[…] সুরে বললাম বটে, কিন্তু তা ব'লে যুক্তির দিক্ দিয়ে খু[…] অপলকা নয়। কাড়াকাড়ি করতে যারা পটু তারা[…] রাজতক্তে উঠে বসে সব আগে। তারপর তারা যা ব'লে[…] কান-পাতলা মানুষ শুনতে শুনতে বিশ্বাস করে। ভে[…] দেখে না যে, প্রেয় প্রথমদিকে স্বাদু হ'লেও অন্তি[…] বিষময়, অন্যদিকে শ্রেয় প্রথমদিকে বিস্বাদ হ'লেও শে[…] রক্ষা করে—সাধনায় নীরস তপস্যাই আনে জীবনে[…] স্থায়ী সরসতা। কিন্তু এ-বাণী তাদের কানের মধ্যে[…] দিয়ে মরমে পশে না, যারা তলিয়ে ভাবতে চায় না[…] শ্বাইৎজার এই নিদানই দিয়েছেন তাঁর জীবনদর্শনে[…] লিখেছেন তাঁর আত্মজীবনীতে (এপিলোগে): "দু'টি[…] অনুভব আমার জীবনকে ম্লান করেছে: এক—এ জগৎ[…] একটা হেঁয়ালি; দুই—আমি জন্মেছি মানুষের এক[…] গভীর আধ্যাত্মিক অধোগতির যুগে", যার নাম দিয়েছেন

তিনি spiritual decadence। শুধু তাই নয়, তিনি আরও একটি কারণ নির্দেশ করেছেন এ-অধোগতির: আমাদের সংশয়কে ক্রমাগত প্রশ্রয় দেওয়া—অর্থাৎ শুভ-বুদ্ধির ফল ফলতে দেরি হয় ব'লে সংশয়রূপী দুর্বুদ্ধিকে দিশারি ব'লে বরণ করা। গীতায়ও এই কথাই বলেছেন ঠাকুর: "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি"—অবিশ্বাসীর মরণ ধ্রুব। শ্বাইৎজার এ-সূত্রটিকে আধুনিক জীবনের ভাষ্য দিয়ে ফলিয়ে বলেছেন (এপিলোগে): "সংশয়বাদের বীজে ফসল ফলেছে: মানুষ খুইয়ে বসেছে তার অধ্যাত্ম আত্ম-প্রত্যয়। বাইরে থেকে দেখলে তাকে হাজার আত্ম-নিশ্চিত মনে হ'লেও অন্তরে সে অত্যন্ত আত্মসন্দিহান; বাস্তব জগতে সে সক্রিয় শক্তিমান্ হ'লেও আসলে সে বামনই র'য়ে গেছে, বাড়তে পারে নি।"

কিন্তু এ-মহামতি প্রতিভাধর কর্মী তথা দার্শনিক জগতের দুঃখব্যথায় বিষণ্ণ হলেও হাল ছেড়ে দেন নি। যেখানেই অসত্য অত্যাচার হীনতা ক্ষুদ্রতা দেখেছেন প্রতিবাদ করেছেন। আত্মজীবনীতে বড় গলা ক'রেই বলেছেন যে, সত্য যে আছে এ-বিশ্বাস তিনি হারান নি কোনদিনই। তাই মানুষের দুঃখতাপে তিনি ক্লিষ্ট বোধ করলেও সংশয়ের ধারপাশ দিয়েও যান নি, মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন আজও (নব্বই বৎসর বয়সে) যে, খ্রীষ্টের বাণী চিরন্তন সত্য যে, বাহ্য ঐশ্বর্যে মানুষের মুক্তি নেই, ধর্মের প্রেমদীক্ষায়ই কেবল মিলতে পারে আনন্দ'সন্ধি, বৈষম্যের সমাধান। খ্রীষ্টের এ-মন্ত্র তিনি বরণ করেছেন মনে-প্রাণে: "যে শুধু নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে চাইবে সে হবেই হবে সর্বহারা, আর যে ভগবানের জন্যে মরণও পণ করতে রাজী সেই হবে সর্বজয়ী, চিরজীবী।" (১৮ অধ্যায়।)

আমি এ-মহাপুরুষের কথা এত ক'রে উদ্ধৃত করলাম শুধু এই জন্যেই নয় যে, তিনি এ-যুগের দার্শনিকশ্রেষ্ঠ ভাবুকদের অন্যতম মুকুটমণি; এ জন্যেও বটে যে, তিনি বারবারই সকৃতজ্ঞে অঙ্গীকার করেছেন যে, জীবনে তিনি অসহনীয় দুঃখ-কষ্ট সহ্য ক'রেও তাঁর পরার্থব্রত উদ্‌যাপন করতে পেরেছেন শুধু খ্রীষ্টের ধর্মদীক্ষায়। ধর্ম মানুষকে পরার্থনিষ্ঠার কি গভীর প্রেরণা দেয়, এযুগে অনেক বিজ্ঞানোৎসাহী বস্তুতান্ত্রিক ভুলে যান ব'লেই আরো শ্বাইৎজারের ধর্মসিদ্ধির কথা তাঁদের প্রণিধানযোগ্য। ভাবুন কি গভীর সে-প্রেরণা, যার তাগিদে চব্বিশ বৎসর বয়সে দর্শনে পি-এইচ-ডি উপাধি পাওয়ার পরে সাত বৎসরে ডাক্তার হয়ে অর্ধ শতাব্দীকাল বিদেশে কোথাকার কে নিগ্রোদের সেবায় তিনি জীবন উৎসর্গ করতে পারলেন—এখনও সেই বিদেশেই তাঁর স্থায়ী বসতি। আর মনে রাখবেন, এ দৃঢ় সংকল্প বজায় রাখতে তাঁকে আত্মীয় বন্ধু-স্বজনের মুখর আপত্তি উপেক্ষা করতে হয়েছে। অভাবনীয় নয়? শুধু খ্রীষ্ট-উদ্বুদ্ধ ধর্মবাণীর প্রেরণায় দারুণ গ্রীষ্মপ্রধান মধ্য আফ্রিকায় গিয়ে হাসপাতাল ডাক্তারখানা গ'ড়ে তোলা, তিন-চার শ' কুষ্ঠ রোগীর জন্য একটি চিকিৎসাগ্রামের পত্তন করা—আর এমন বিভুঁয়ে যেখানে শুধু গ্রীষ্ম দারুণ নয়—সভ্যতার আরামের কোন সুখ-সুবিধাই নেই, না মুনিসিপালিটি, না সভ্য সংস্কৃতি, না বিজলী পাখা কি বাতি। ডাক্তার হয়ে তাঁকে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়েছে আজীবন—দিনে তের-চোদ্দ ঘণ্টা ক'রে! কিন্তু এমনই কৃতসংকল্প তাঁর প্রতিভা ও অধ্যবসায় যে, এরই মধ্যে তিনি সঙ্গীত-চর্চা ক'রে এসেছেন—য়ুরোপে বহু কন্সার্টে নিজে পিয়ানো ও অর্গান বাজিয়ে টাকা তুলেছেন স্বহস্ত-নির্মিত দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্যে। লিখেছেন নানা গ্রন্থ—সঙ্গীত, খ্রীষ্টধর্ম, দর্শন ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে। ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধেও একটি বই লিখেছেন, তাঁর গভীর শ্রদ্ধার অঙ্গীকারে। তাঁর এ সাংস্কৃতিক অবদানের সম্পর্কে ব্রিটানিকা বিশ্বকোষে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পড়লে মন ভরে ওঠে, শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে আসে।* এঁর গুণ-

* ব্রিটানিকা বিশ্বকোষে এঁকে বলেছে:

"Philosopher, theologian, musician, mission doctor, winner of Nobel Peace Prize of 1952....He has an astonishing capacity for arduous physical and mental....of relentless energy....above all an artist striving with humility to become as nearly perfect as possible in his Christian discipleship and in all the manifestations of his manysided genius".

তাঁর বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থ Kulturphilosophie যখন দু'খণ্ডে প্রকাশিত হয় তখন তাঁর ধীশক্তি ও বিশ্লেষণে সবাই চমকে ওঠে। প্রথম খণ্ডের নাম Verfall und Wiederaufbau der Kultur (Eng. Translation—The Decay and Restoration of Civilisation), 1923, is a brief introduction, while the second, Kultur and Ethic (Eng. trans., Civilisation and Ethics) is a brilliant review of the history of ethical thought

কীর্তনে আইনষ্টাইনের একটি উক্তি বিশ্ববিদিত, "Here goes a great man!" এহেন মহামনীষী শিক্ষায় আধুনিক হয়েও দীক্ষায় ধর্মাশ্রিত। ভাবতে পারেন? নানা চিন্তাগভীর গবেষণার পরেও তিনি দেখতে পেয়েছেন—যে কথা বার বারই লিখেছেন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে—যে, খ্রীষ্টপ্রেম উদ্বুদ্ধ না হ'লে পাশ্চাত্য সভ্যতা ডুববেই ডুববে। অকুতোভয়েই অঙ্গীকার করেছেন যে, খ্রীষ্টের বেদবাক্যই তাঁর জীবনের গুরুবাক্য, মন্ত্রবাণী।

বিশ্বাস করবেন—তাঁর জীবনী এত ক'রে ফলিয়ে লিখেছি বিজ্ঞানী বুদ্ধিকে খর্ব করতে নয়। বিজ্ঞান আমাদের অঢেল দিয়েছে একথা কে না সকৃতজ্ঞে মানবে বলুন? আপনি লিখেছেন যে, বিজ্ঞান মানুষের অনেক দুঃখদৈন্যের লাঘব করেছে। আমি আরও বেশী বলি: বিজ্ঞান আমাদের অনেক কুসংস্কার ও ভয় থেকে মুক্তি দিয়েছে, নানা অসহায়তার হাত থেকে বাঁচিয়েছে, অন্তর্নিহিত পুরুষকারকে উদ্দীপ্ত ক'রে আমাদের স্বাবলম্বী হ'তে শিখিয়েছে। কিন্তু সব মেনেও বলতেই হবে সত্যের খাতিরে যে, বিজ্ঞানের মোহে না পড়লে আমরা এই জাজ্বল্যমান সত্যটি দেখতে পেতাম যে, সে মানুষের নাস্তিক্য-বুদ্ধিকে খানিকটা আস্কারাই দিয়েছে, যার ফলে মানুষ—অন্ততঃ বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ের প্রথম পর্বে—ভেবে বসেছিল যে, সে খোদার উপর খোদকারি ক'রে ধর্মকে পুলিপোলাও চালান দিয়ে ছত্রপতি হবে এই দর্পের ঝাণ্ডা উড়িয়ে যে, বিজ্ঞানী বুদ্ধি যার নাগাল পায় না, সে সত্যের পদবী পেতেই পারে না। সঙ্গে সঙ্গে এ-আস্ফালনও করেছেন নানা বিজ্ঞানমুগ্ধ কল্পনা-বিলাসী যে, যে-চিরন্তন সত্যসন্ধান আমাদের অন্তরাত্মার সর্বোত্তম ক্ষুধা, বিজ্ঞানের প্রসাদে সে-ক্ষুধানিবৃত্তি হ'ল ব'লে। কিন্তু তা হয় নি, হ'তে পারে না ব'লেই। আর পারে না শুধু এই জন্যেই যে, সবচেয়ে বড় সত্য—সত্যের সত্য, আলোর আলো, প্রাণের প্রাণ, সুধার সুধা ধরা-ছোঁওয়া দেয় না বস্তুবিচারী বহির্মুখী তথ্যনির্ণয়ে, যান্ত্রিক প্রগতিতে, পরিসংখ্যানে। তাঁকে জানতে হ'লে সব আগে ছাড়তে হবে বুদ্ধির জাঁক, কীর্তির অভিমান ও সংশয়ী যুক্তির তাঁবেদারি। হ'তে হবে শ্রদ্ধাপন্থী, অন্তর্মুখী; পাট নিতে হবে প্রেমোজ্জ্বল শরণাগতির; যে-মনের যুক্তি বলে, "আগে জানব তবে মানব," তার পরামর্শ ছেড়ে ধর্ণা দিতে হবে সেই মনের অতীত সহজবোধের দ্বারে, যে বলে: "আগে শ্রদ্ধাভরে না মানলে জানতে পারবে না সেই গুহ্য তত্ত্ব—পরাৎপরের কৃপা—যার বরে জন্ম সার্থক হয়, মানুষ বলতে পারে প্রহ্লাদের সুরে: কৃতকৃত্যোঽস্মি ভগবন্ বরেণানেন যৎ ত্বয়ি—ভবিত্রী ত্বৎপ্রসাদেন ভক্তিরব্যভিচারিণী—আমি ধন্য হ'লাম প্রভু আপনার এই ভরসায় যে আমার মিলবে অব্যভিচারিণী ভক্তি।" এই পরাভক্তিই পরাপ্রজ্ঞার জননী—বলতেন মহর্ষি রমণ। কেবল সে-ই ডাক দিতে পারে সেই সচ্চিদানন্দকে যিনি—শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়—বস্তুবিশ্বে মূর্ত হ'ল রূপশ্রীতে, প্রাণলোকে শক্তিসামর্থ্যে, মনোলোকে জ্ঞানে ও হৃদয়ে প্রেমরসে। সব পাওয়া শেষ হ'লেও এই পরম-প্রাপ্তি বিনা যে মানুষ কৃতকৃত্য আপ্তকাম হ'তে পারে না, ধর্মাত্মা শ্বাইৎজারের জীবনী এই পরম সত্যটিরই যেন একটি আনন্দ-আশ্বাসময় মহৎ-ভাষ্য। তাই যখন নানা বস্তুতান্ত্রিক বিজ্ঞানোৎসাহী ধার্মিককে ধমকান: "ওসব সেকেলিয়ানা ছাড়, বিজ্ঞান ধ'রে ফেলেছে ধর্মের ধাপ্পাবাজি, ধর্মের দিন গত"—তখন উত্তরে শ্বাইৎজার প্রমুখ ধর্মবিদ্‌রা বলবেন: "একথা যদি সত্য হয় তা হ'লে শান্তির আশা দুরাশা, আনন্দের স্বপ্ন আকাশকুসুম, জীবনের অগুনতি হানাহানিকে বিশ্ব-সৌভ্রাত্রের সুষমার রূপ দেওয়ার চেষ্টা বিড়ম্বনা। ধর্ম মানুষের সমস্ত সত্তাকে অধিকার ক'রে তাকে মহত্তম ত্যাগব্রতী করতে পারে ব'লেই ধর্মের দুরভিসারে যুগে যুগে দেশে দেশে লোকোত্তর মহাত্মারা পরার্থব্রতী হয়ে এলেন তাঁদের যথাসর্বস্ব উৎসর্গ ক'রে। তাই ত আবহমানকাল ধর্মের ডাকে যত মানুষ স্বার্থ ছেড়ে সর্বপ্রেমিক হতে পেরেছে আর কোন মানবিক বৃত্তির তাগিদে পারে নি সেভাবে আত্মোৎসর্গ করতে।" বিজ্ঞানোৎসাহীদের একথা যদি সত্য হয় যে, ধর্ম একটা সেকেলে কুসংস্কার, যার ভিত্তি প্রাণিক ভীরুতা ও কৃপার কাঙালপনা, তা হ'লে মানুষের পক্ষে চিত্তশুদ্ধি লাভ ক'রে শুধু যে দেবত্ব লাভ অসম্ভব হয়ে উঠবে তাই নয়, তার মনুষ্যত্বও হয়ে দাঁড়াবে পাতালমুখী স্বার্থসাধনা, যার আভাস—writing on the wall—জ্বল জ্বল ক'রে উঠেছে গত দুই বিজ্ঞান-গাণ্ডীবী বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ টঙ্কারে। শ্বাইৎজার তাঁর জীবনীতে লিখেছেন, নিগ্রোরা যখন তাঁকে বলেছিল: "তোমরা খ্রীষ্টান ও বুদ্ধিমান্ হয়ে কেন ক্ষেপে উঠে ভাই ভাইকে হত্যা করছ পিশাচের মত?" তখন তিনি লজ্জা পেয়েছিলেন বৈ কি।

---

leading to his own original and positive contribution of reverence for life as the true and effective basis for a civilised life."

তবে ভগবান্ যখন আছেন এবং এ কালচক্র জগৎচক্র চালাচ্ছেন তখন বিজ্ঞানী বুদ্ধি তাঁর দিশা না পেয়ে তাঁকে বাতিল করলেই কিছু পরম-অস্তি নাস্তি হয়ে যাবে না—ধর্মের ডাকে মানুষ কখনই সাড়া দিতে নারাজ হবে না—ভুলবে না যে, মানুষ মহত্ত্বের তুঙ্গতম শিখরে উঠেছে ধর্মেরই আরোহণী বেয়ে। এ শুধু মাদৃশ ধর্মপন্থীর কথা নয়। এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক টয়েনবি (Arnold Toynbee) লিখেছেন তাঁর খ্যাতনামা Civilisation on Trial গ্রন্থে :

"The works of artists and men of letters outlive the deeds of business men, soldiers and statesmen. The poets and philosophers out-range the historians ; while prophets and saints overtop and outlast them all."

অর্থাৎ শিল্পী ও সাহিত্যিকের কৃতি বণিক্ সৈনিক ও রাজনীতিকের চেয়ে দীর্ঘজীবী। কবি ও দার্শনিক, ঐতিহাসিকের চেয়ে বড়। আর সাধুসন্ত-নবীদের কীর্তি তুঙ্গতম ও কালজয়ী।

ইতি। ভবদীয় গুণগ্রাহী শ্রীদিলীপকুমার রায়।

পুনশ্চ : শ্বাইৎজারের ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে বইটি পড়ছি পরমানন্দে। তাঁর ধীশক্তি ও ঔদার্যে বিস্মিত হ'তে হয়—মনে সম্ভ্রম আসে তাঁর চিন্তাশক্তির গভীরতায় ও নিঃস্পৃহতায়। বইটির নাম Indian Thought and its Development। প্রথমেই চোখে পড়ল ভূমিকায় তাঁর ভারতদর্শনে শ্রদ্ধার একটি উজ্জ্বল অঙ্গীকার। তিনি লিখছেন (৬ পৃঃ): "প্রথম থেকেই আমার মনে এ প্রত্যয় এসেছিল যে, সব চিন্তারই শেষ বিষয়বস্তু একটি : কেমন ক'রে মানুষ অনন্ত সত্তার সঙ্গে আত্মিক মিলন লাভ করবে। আমি ভারতীয় দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হই—ভারত এই সমস্যা সমাধানের সাধনা করেছে এবং এ সাধনার মূল ধর্মের অতীন্দ্রিয়বোধে।" তিনি আরও লিখছেন (৯ পৃঃ): "প্রাচ্য বা পাশ্চাত্ত্য দর্শন বাদ-প্রতিবাদে যেন না চায় প্রমাণ করতে যে, আমি অভ্রান্ত তুমি ভ্রান্ত। অতীত ইতিহাসে নানা অনৈক্য চোখে পড়লেও আজকের দিনে আমরা যেন চাই—অনৈক্যকে ডিঙিয়ে ঐক্যের ভিত্তিতে পৌঁছতে—যে ঐক্যের সম্পদ্ অন্তিমে বিশ্বজনীন না হয়েই পারে না।" এ বইটিও প্রতি বিজ্ঞানোৎসাহীর পড়া উচিত, বিশেষ ক'রে নাস্তিক তার্কিকদের।

হিন্দুর ধর্ম্মান্তর গ্রহণ

মুসলমান বাঙালীদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে যে হিন্দুসমাজ ত্যাগ করিয়া অন্য সমাজে যাইতে হইয়াছিল, ইহা হিন্দুসমাজের পক্ষেই অগৌরবের বিষয়। সামাজিক অবজ্ঞা ও উৎপীড়ন হইতে মুক্তি পাইবার জন্য অনেক হিন্দু অতীত যুগে মুসলমান হইয়া থাকিবেন। ইহা তাৎকালিক হিন্দুসমাজের পক্ষে প্রশংসার বিষয় নহে। কেহ কেহ ধনমান উচ্চপদের প্রলোভনেও ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া থাকিবে। ইহাও নিন্দনীয়। অনেকে প্রাণভয়ে বা অন্য কোন বিপদের ভয়েও মুসলমান হইয়া থাকিবে। ইহার দ্বারা হিন্দুসমাজের নিজের লোকদিগকে সাহসী করিবার এবং রক্ষা করিবার ক্ষমতার অভাব সূচিত হয়। ধর্ম্মের আকর্ষণেও কেহ কেহ মুসলমান হইয়া থাকিবেন। হিন্দুশাস্ত্রে অতি উচ্চ অঙ্গের ধর্ম্মোপদেশের অভাব নাই। হিন্দুসমাজের নেতারা এই সকল উপদেশকেই শ্রেষ্ঠ স্থান বরাবর দিয়া আসিলে এবং তৎসমুদয়ের জ্ঞান সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়া আসিলে কোন হিন্দুকেই ধর্ম্মের জন্য হিন্দুসমাজ ত্যাগ করিয়া অন্য সমাজের আশ্রয় লইতে হইত না।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী, চৈত্র, ১৩৩৭।

উপায় কি ?

শ্রীপঙ্কজভূষণ সেন

তখন বেলা আটটা হবে।

দীনদয়ালবাবু দৈনন্দিন আনাজ-সব্জির বাজার সেরে বাড়ীর দিকে চলেছেন হনহন ক'রে—দশটায় অফিস। মনটা বেশ প্রফুল্ল—এক টাকার নোটের সবটা খরচ করতে হয় নি—২৫০ গ্রাম আলু, ১০০ গ্রাম পেঁয়াজ, কুমড়োর ফালি ছয় নয়ার, পান তিন নয়ার এবং গিন্নীকে খুশী করবার জন্য নিয়েছেন ষোল নয়ার কুচো চিংড়ি মাছ। মাছ! এটাতেই মোটা পয়সা বেরিয়ে গেল—শুধু বেরিয়ে যাওয়া নয়, একেবারে জলে পড়ল! কি করবেন দীনদয়ালবাবু—উপায় ত নেই! সেই যেদিন লক্ষ্মীদেবীকে বিয়ে করেন শুধু সেই দিনটায় যা কিছু ঘরে ঢুকেছিল দীনদয়ালবাবুর—তারপর থেকে ওঁকে হিল্লে ক'রে সবই জলেপড়ার ব্যাপার—জলে পড়া নয়ত কি? মাসটা যদি একমাসেই তিনবার ক'রে কাবার হয় তা হ'লে খুব ভাল হয় গিন্নীর, তিনবার ক'রে ফর্দ আর তিনবার ক'রে আসে তেল ঘি মশলা, হাত আর হাতাটা সশব্দে নাড়তে পান মনের সাধে! লক্ষ্মী! লক্ষ্মীই বটে! শ্বশুর-শাশুড়ীর কি কাণ্ডজ্ঞান—নাম রাখতে গিয়েছেন লক্ষ্মী! তার চেয়ে যদি উড়ন-চণ্ডী নাম রাখতেন তা হ'লে ওঁদের দিব্যদৃষ্টির প্রশংসাই করতেন দীনদয়ালবাবু। তা বাবা, এই আক্রা-গণ্ডার বাজারে তোমাদের ঘরের লক্ষ্মীটিকে নিয়ে যাও না বছর দুয়েকের মত, কিছুদিন দীনদয়ালবাবু লক্ষ্মী-ছাড়া হয়েই না হয় থাকুন!

বাড়ীর কাছাকাছি এসে পড়লেন দীনদয়ালবাবু—লক্ষ্মীদেবী আজ বাজার দেখে খুশীই হবেন বলে মনে হচ্ছে। পেঁয়াজ ত এনেইছেন, সেই সঙ্গে কুচো চিংড়ি। ক'দিন থেকেই কুচো চিংড়ির কথা লক্ষ্মী ব'লে আসছেন—দীনদয়ালবাবু প্রতিদিনই মুখের চেহারাটা এমন ঈশ্বরচন্দ্রীয় করেছিলেন যে লক্ষ্মীদেবীর মত সন্দিগ্ধ স্ত্রীও বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছেন যে, বাজারে আর কুচো চিংড়ি মোটেই পাওয়া যায় না! অন্যায় হয়েছে? মোটেই নয়! নাই দিয়ে লক্ষ্মীদেবীর নোলার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ঘটিয়ে নিজের ফেরার হবার পথ দীনদয়ালবাবু মোটেই পরিষ্কার করতে চান না। আজ সেই আদর্শচ্যুতি যখন দীনদয়ালবাবুর ঘটেছে তখন গৃহিণীর অতিদুর্লভ সুপ্রসন্ন আনন যে তিনি দেখতে পাবেন তাতে আর সন্দেহ কি?

রান্নাঘরের সামনে বারান্দায় লক্ষ্মীদেবী তরকারির প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে।

দীনদয়ালবাবু প্রথমেই কাগজের ঠোঙায় আনা কুচো চিংড়িগুলো ঢেলে দিলেন, তারপর উজাড় করলেন চটের থলিটা—অতি সন্তর্পণে ঝাড়লেন বার কয়েক—

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেই লক্ষ্মীদেবী নিঃশব্দে ফিরে গেলেন নিজের শোবার ঘরে—হাঁ না কোন উচ্চবাচ্য নেই মুখে—তরকারিগুলো হতভম্ব দীনদয়ালবাবুর সামনে যেমন ঢালা তেমনি অবস্থায় প'ড়ে থাকল।

ঝড়ের আগে থমথমে নিস্তব্ধতা? ঝাঁপ দেবার আগে পিছু হটা? দীনদয়ালবাবুর কানে, উচ্ছিষ্ট করা হাসিটা এক নিমিষে মিলিয়ে গিয়েছিল—ওদিক্ থেকে গিন্নীর চড়া কণ্ঠস্বর ভেসে এল—"র'বে—? রামু—?"

পুত্র-কন্যারা কেউ নেই! না থাক্, ওরা উপলক্ষ্য মাত্র! যাকে উদ্দেশ ক'রে বলা সে ত ঠায় দাঁড়িয়ে—

"র'বে? তোর বাপ মিন্সেকে বল্ যে শুধু হাতে জল নিয়ে খেতে বসলে হয় না—আজ নিজে সব্বাইকে পরিবেশন ক'রে তবে যেন যায় অফিস না কোন্ চুলোয়! দিন গেলে যে বারটা পাতে পিণ্ডি আর তরকারি বাঁটতে হয় তা কি জানে না? কাঁচা খোকন! নিজের আর কি, পঞ্চাশ ব্যঞ্জন দিয়ে গিলে চলবেন অফিসে—বাকী সবাই থাক না আঙ্গুল চুষে—!"

থামলেন লক্ষ্মীদেবী কিন্তু ইচ্ছে ক'রে থামেন নি—একটা হাঁচি এসেছিল, তারপরেই পুরো দমে আরম্ভ করলেন—"একদিন হয়, দু'দিন হয়, চালিয়ে নিলাম টেনেটুনে—প্রতিদিন ঐ কঞ্জুসিপনা! এমন হাড়কিপ্টের বংশ দেখি নি বাপের জন্মে—"

বংশ! বংশ তুললেই ক্ষেপে ওঠেন দীনদয়ালবাবু, মাথার আর ঠিক থাকে না। অথচ এই বংশে লক্ষ্মী-ঠাকরুণকে অধিষ্ঠিতা করতে ওর বাপের জুতোর হাফসোল পাল্টাতে হয়েছিল অন্ততঃ তিনবার! "ছিল এই দীনদয়াল শর্মা তাই উদ্ধার পেয়ে গিয়েছেন লক্ষ্মীদেবী, নইলে—"

"নইলে—কি, শুনি—?" লক্ষ্মীদেবী তাঁর শোবার ঘর থেকে যেন উড়ে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন দীনদয়ালের সামনে—"নইলে কি হ'ত শুনি—?"

নইলে, কোন এক হাভাতের গৃহিণী যে লক্ষ্মীদেবী হতেন সে বিষয়ে দীনদয়ালবাবু নিঃসন্দেহ এবং সেই সূত্রে উনি যে কতরকম লাঞ্ছনা ভোগ করতেন তার একটা দীর্ঘ ইস্তাহারও প্রকাশ করতে পারেন, কিন্তু ওসব কিছুই করলেন না, শুধু গম্ভীর ভাবে ধমক দিলেন—"চুপ—!"

"কি—? চুপ করব? দেবার থোবার কেউ নয় ধমক দেবার গোঁসাই! কি সুখে রেখেছ যে চুপ করব? বলি—কি দিয়েছ? কি খাইয়েছ? কি পরিয়েছ? গয়না বলতে এই পিটপিটে হার আর ব্রোঞ্জের চুড়ি! বাঁদী পেয়েছ আমাকে? আর শাড়ি—? দেখ, দেখ, শাড়ির ছিরি দেখ—" লক্ষ্মীদেবী শাড়ির আঁচলটা একবার উড়িয়ে দিলেন দীনদয়ালবাবুর সামনে, তারপর টান মেরে খোঁপাটা খুলে ফেলে চুলের বিনুনীটা স্বামীর নাকের কাছে ধ'রে জিজ্ঞাসা করলেন—"এর চেয়ে সস্তা পচা তেল বাজারে জোটে নি? আর তরকারির ঐ ছিরি—তিনটে আলু আর চারটে পেঁয়াজ! নিকুচি করি তোমার তরকারির—!" লক্ষ্মীদেবী পানের বাণ্ডিলটা ছুঁড়ে দিলেন দীনদয়ালের মাথার দিকে, বাদবাকী তরকারিগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিলেন উঠোনময়—রাগে ক্ষোভে তিড়বিড় ক'রে নিজের ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলেন সশব্দে।

সর্বনাশ! পানটাই ছুঁড়ে দিলেন গিন্নী! কি হ'ত যদি দীনদয়ালবাবু পানের বদলে কিনে আনতেন কতবেল? সর্বনাশ—সর্বনাশ! এর উপযুক্ত ওষুধ বহুকাল আগে যা প্রচলিত ছিল তাই যদি দেওয়া হয়!—চুলের মুঠি ধ'রে—! দাঁত ক'টা কড়মড় ক'রে উঠল দীনদয়ালবাবুর—কপালের শিরাগুলো ফুলে উঠল অদম্য রাগে—হনহন ক'রে এগিয়ে গেলেন খিল-দেওয়া দরজার কাছে এবং সজোরে একটা লাথি কষিয়ে দিলেন দরজায়—"খোল বলছি দরজা—"

এক মুহূর্তও দেরি নয়—দড়াম ক'রে দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন লক্ষ্মীদেবী—"এই ত খুললাম, কই, মার দেখি! মস্ত পালোয়ান—বউ মেরে দেখাতে এসেছেন বীরত্ব! গলায় দড়ি—ছি—ছি—ছি—" লক্ষ্মীদেবী কাঁচের আর সোনার চুড়ি বোঝাই হাতটা দীনদয়ালবাবুর নাকের এত মারাত্মক সন্নিকটে আর এত সবেগে নাড়তে লাগলেন যে দীনদয়ালবাবুকে নিজের নাকের নিরাপত্তার জন্যও দু'পা পিছু হটতে হ'ল।

দীনদয়ালবাবুকে দোষ দেওয়া চলে না—অন্য প্রাণীরাও এই রীতিই ত অবলম্বন ক'রে থাকে—কুকুরের তাড়া খাওয়া বেড়াল যখন ঘুরে দাঁড়িয়ে লেজ খাড়া ক'রে ফোঁস করে তখন কুকুর যত তাগড়াই হোক-না রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য। সে যা'ই হোক—দীনদয়ালবাবুর মনে হ'ল এসব গিন্নীদের ধ'রে ধ'রে সব সুন্দরবনে ছেড়ে দিয়ে আসা উচিত! কিন্তু ধরে কে? এত থাকতে শেষে কিনা দীনদয়ালবাবুর কপালেই এসে জুটল? কে না জানে গিরগিটি রঙ বদলায়, কিন্তু গিন্নীরাও যে রঙ বদলায়, দীনদয়ালবাবুর মত দেখতে পায় ক'জন? যখন বিয়ে হয়েছিল সেই গিন্নী আর আজকের এই গিন্নী? হরেকেষ্ট! হরেকেষ্ট! বিয়ের ঢুলিদের প্রথম লাইনেই বাদ্যের বুলি হচ্ছে—"বড় রঙ! বড় রঙ! বড় রঙ!" তারপর দ্বিতীয় লাইনে ওদের বুলি—"বুঝবি শেষে! বুঝবি শেষে—বুঝবি শেষে!" আজ সত্যি দীনদয়ালবাবু হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছেন যে, বিয়ের প্রথমে যত রঙই থাক না কেন, পরিণামে ঠিকই "বুঝবি শেষে—বুঝবি শেষে!"

যাকগে! লক্ষ্মীদেবীকে আজকের মত ক্ষমা করলেন দীনদয়ালবাবু—দৈবাৎ তুবড়িতে যখন আগুন দেওয়া হয়েছে তখন ওটা আর কেউ নিজের দিকে মুখ ঘুরিয়ে ধরে না। কতক্ষণ আর বকবে? যাকগে—যাকগে, তুবড়ির খোল যত বড়ই হোক, বারুদের একটা ত সীমা আছে—বারুদ ফুরোলেই সব ঠাণ্ডা।

"ওমা! এ কি? এসব কে ছিটোল—?" ওদের ন'বছরের মেয়েটা পাড়া বেড়িয়ে বাড়ী ফিরল, কিন্তু পুরোপুরি বিস্ময় প্রকাশ করার সুযোগও পেল না, সেই

মুহূর্তে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতে হ'ল—মা রুখে আসছেন হন হন করে, "মুখপুড়ি! কে ছিটোল? তোর যমে—ছি—" আর বৃথা বাক্যব্যয় না করে মেয়ে রানুর দিকে ছুঁড়ে দিলেন এ্যালুমিনিয়ামের শূন্য ঘটিটা, তারপর পরম আক্রোশে রানুকে ধাওয়া করলেন খিড়কি দরজা পর্যন্ত।

দীনদয়ালের মেজাজটা সত্যি একটু নরম হয়ে এসেছিল কিন্তু গৃহিণীর কাণ্ড দেখে আর মেজাজ ঠিক রাখতে পারলেন না—"ব্যাপার কি? ক্ষেপা কুকুরের মত তাড়িয়ে বেড়াচ্ছ সব্বাইকে, প্রত্যেক জিনিষের একটা সীমা থাকা উচিত!"

"ক্ষেপা কুকুর—!" হাতের চাটু দিয়ে মুখটা ঢেকে হু হু করে কেঁদে ফেললেন লক্ষ্মীদেবী। লক্ষ্মীদেবীর জীবনটা জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে থাক ক'রে আজ বলা হ'ল ক্ষেপা কুকুর? চিরদিন শুধু ছেলে আর হাঁড়িই ধ'রে যাবে—জীবনের সাধ-আহ্লাদ আর কিছু নেই? এসব বাবুদের শুধু বিয়ে করারই সখ! সম্ভ্রম আর শালীনতার আবরণ দিয়ে জীবনের দাবি ঢেকে রাখার দায়িত্ব একা লক্ষ্মীদেবীর নয়! পাড়াপড়শীরা শুনবে? আসল কথা বলবে, তাতে পাড়াপড়শীরা শোনে ত বয়েই গেল।

কার মুখ দেখে যে উঠেছিলেন দীনদয়ালবাবু! এদিকে অফিসের বেলাও হয়ে এল—ডাল আর ভাতটা বোধহয় প্রতিদিনের মত নামিয়ে রেখেছেন লক্ষ্মীদেবী, তরকারির প্রতীক্ষায় বসেছিলেন, মাঝখান থেকে গণ্ডগোল হয়ে গেল দীনদয়ালবাবুর ক'টা পয়সা বাঁচাতে গিয়ে। আলুটা সত্যি বড্ড কম কেনা হয়েছে আর আধ কেজি নিলেই হ'ত!

কি আর করেন—দীনদয়ালবাবু একটি একটি ক'রে আলু, কুচো চিংড়িগুলো কুড়িয়ে রাখছেন থলির মধ্যে! গিন্নির নিজের ট্যাঁকের পয়সা হ'ত ত বুঝতেন যে কেনা জিনিষ ছিটিয়ে দেওয়া—

"যাঃ! কে ছিটোল বাবা?" পুত্র রবি উঠোনে পা দিয়েই রানুর মতই একই প্রশ্ন করল।

"কে আবার!" তারপর গৃহিণীর ঘরের দরজার দিকে চেয়ে ফিস ফিস ক'রে বললেন—"পয়সা দিয়ে কেনা জিনিষ যে ছিটোতে পারে, সেই-ই—"

"মা বুঝি?"

রবির খুব বুদ্ধি! দীনদয়ালবাবু খুব সন্তর্পণেই বললেন—"ঠিক ধরেছিস্ বাবা!"

"ঠিক ধরেছিস্! বটে রে র'বে! আজ তোর পাতে ছাই বেড়ে দোব! হতচ্ছাড়া—যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর! দুধভাত দিয়ে এত কাল সাপ পুষেছি! দূর—দূর—দূর—!"

ওদের কান আর জিভ কত প্রখর দীনদয়ালবাবুর অজানা নয়—দীনদয়ালবাবুর শিক্ষা আর হ'ল না! বেশী-কিছু নয়—ভগবান্ যদি কোন উপায়ে ও দুটো ভোঁতা ক'রে দেন, তা হ'লে দীনদয়ালবাবুর সংসারের মত কত সংসারে যে শান্তি বিরাজ করে!

দীনদয়ালবাবু আপন মনেই গজগজ করতে করতে চলে গেলেন রান্নাঘরের দিকে। ঠিক—ডাল আর ভাত নেমেছে—উনোনের আঁচটা বয়ে যাচ্ছে থামকা। এতক্ষণ ঝোল আর অম্বলটা হয়ে যেত। যাকগে—উপায় ত নেই। এখন দীনদয়ালবাবুকেই বাকী রান্নার একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হবে—গিন্নী আর এদিক্ পানে আসছেন না।

"আলু পেঁয়াজ আর কুচো চিংড়ি সব এক সঙ্গে ভেজে ফেলি—কি বল্ রবি? তুই ততক্ষণে মাছ ক'টা ধুয়ে ফেল্ দেখি—ঐ দেখ্, উনোনের পাশেই জলের বালতি—"

টর্ টর্ ক'রে রান্নাঘরের দরজায় হাজির হলেন লক্ষ্মীদেবী—"র'বে—"

কি হ'ল আবার? রবি ঘটি হাতে দাঁড়িয়ে গেল—

"বলি ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে এসে ছুঁয়ে দিলি নাকি রান্নার জলটা?"

"না—তো!" সভয়ে রবি উত্তর দিল।

"না—তো! ঘটি হাতে কি করছিলি শুনি?"

রবি নিরুত্তর।

"আর কেউ ছুঁয়েছে—?" জেরা করলেন লক্ষ্মীদেবী।

রবি বুঝতে পেরেছে যে "আর কেউ" মানেই বাবা। এবং এবারও রবি প্রমাণ করল যে সে বুদ্ধিমান্—"বাবাও ছোঁয় নি! নয় বাবা—?"

"ছুঁয়ে থাকলেও স্বীকার করবে নাকি? কোন দিন করেছে? আজ ত সামান্য জলের বালতি! বলি তোমার বাপ কি পাঁচ বছরের খোকন? বাজারের ছত্রিশ জাত ছুঁয়ে ঢুকতে এসেছেন রান্নাঘরে? বাবাঃ, জীবনটা

আমার—" লক্ষ্মীদেবী জলের বালতিটা রান্না ঘরেই উপুড় করে ঢেলে দিলেন—"যে সংসারে আচার-বিচার নেই সে সংসারে প্রতুল আছে নাকি ? কথখনও নয়—"

*　　*　　*

দিন কয়েক কেটে গেল—

ওদের সংসারের রথটা যথারীতি আবার চলতে সুরু করেছে—শুধু চাকাগুলোর ক্যাঁচক্যাঁচানির শব্দটা ক'দিন বেশী মাত্রায় পাওয়া গেল শুনতে—দীনদয়ালবাবু ওদিকে আর কানই দেন না। বকে নিক প্রাণ ভরে আর খেদ মিটিয়ে; দীনদয়ালবাবু পিঠে দিয়েছেন কুলো আর কানে দিয়েছেন তুলো—সেজে বসেছেন কালা আর বোবা! এই দিব্যজ্ঞানটা দীনদয়ালবাবুকে কেউ শিখিয়ে দেয় নি—ওটা জীবধর্ম! তাড়া খেলেই প্রাণী বিশেষে সেঁধিয়ে যায় নিরাপদ্ নিভৃতিতে—দীনদয়ালবাবুও তাই! নিতান্ত জরুরী বাক্যালাপ চলল ছেলেমেয়ের মাধ্যমে, নয়ত ভাববাচ্যে।

সাত দিনের দিন বিকালে লক্ষ্মীদেবী একহাতে চায়ের কাপ অন্য হাতে সরষের তেলের টিনটা ঠক করে নামিয়ে দিলেন দীনদয়ালবাবুর সামনে—তারপর নিঃশব্দে ফিরে গেলেন নিজের কাজে। মানেটা অত্যন্ত পরিষ্কার, কথা বলার দরকার নেই—তেল ফুরিয়েছে—!

পড়ে থাকল চা—

দীনদয়ালবাবু নিবিষ্ট চিত্তে গুনে চলেছেন আঙুল—মঙ্গল বুধ, বৃহস্পতি…আজ শনিবার! পাঁচদিনেই এক কেজি তেল সাবাড়! অথচ যাবার কথা আট দিন। নাঃ—এ একেবারে অশ্বমেধ যজ্ঞ—ভুতোনন্দী কাণ্ড। দীনদয়ালবাবুর ঠাকুরদাদারও সাধ্যি নেই চালায় এমন—

"রানু? দেখ্ ত মা তোর বাবা কি গুনছে? শমসা আর পাঁপর নিত্যি ভেজে ভেজে খাওয়ার কথা বাবুর বোধহয় মনে পড়ছে না আজ—"

লক্ষ্মীদেবী ত চেনেন দীনদয়ালবাবুকে, চুরি ক'রে স্বামীর আঙুল গোনাটা বোধহয় লক্ষ্য করেছিলেন জানালার ওদিক্ থেকে!

এরই নাম কি ব্যক্তিস্বাধীনতা? সরকার সংবিধান গঠন করেছেন—ব্যক্তি-স্বাধীনতার নাকি বড় বড় কথা আছে সেখানে! আরে বাপু, তেলটা ক'দিন গেল না গেল, বিনা বাধায় বাড়ীতে বসে যদি সে হিসাব করার মৌলিক অধিকার দীনদায়লবাবুর না থাকে ত কিসের সংবিধান আর কিসেরই বা ব্যক্তিস্বাধীনতা? স্থানীয় লোকসভার সভ্য রমাকান্তবাবুর কাছে দীনদয়ালবাবু করজোড়ে অনুরোধ করবেন যাতে একটা সংশোধনী প্রস্তাব এনে সংবিধানের যথাযোগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা করেন। আর তা যদি না করেন তা হ'লে আগামী নির্বাচনে ভোট-ফোট পাবেন না মশাই—

সরষের তেলের খালি টিনটা সামনে সাক্ষী রেখে কোন ভদ্রসন্তানের চা খেতে ভাল লাগে? দীনদয়ালবাবুরও লাগল না। গোটাতিনেক টাকার শ্রাদ্ধ এক্ষুণি করতে যেতে হবে! চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখতে না রাখতেই রানু এগিয়ে ধরল সুপারি কুচোর বাটি আর অন্য হাতে চিনি আনার বিশেষ থলি আর রেশন কার্ড। মানে? চিনিও ফুরিয়েছে? এ নিশ্চয় রানুর গর্ভধারিণীর কীর্তি!

"যাব নাকি সঙ্গে চিনিটা নিয়ে আসতে?" রানু প্রশ্ন করল।

"যাব নাকি সঙ্গে!" খেঁকিয়ে উঠলেন দীনদয়ালবাবু, তারপর অসহায় ভাবে গা-টা এলিয়ে দিলেন চেয়ারে, পর মুহূর্তে খাড়া হয়ে বেশ মিষ্টি করে ডাকলেন, "রানু!"

রানু কিন্তু বাপের অসহায় ভাব দেখেই সরে পড়েছিল, আসতে হ'ল কাছে, "কি বলছ বাবা?"

"বলছি, এক কাজ কর। তোমার বাদবাকী ভাই-বোনরাই বা বাকী থাকে কেন রবি, শশী, নিশি, কুমু? এদের কারও হাতে চালের ধামা, কারও হাতে ডালের কৌটো, কারও গুড়ের টিন দিয়ে মাকে বলো সারি দিয়ে দিক আমার পিছনে, তারপর সবাই মিলে মার্চ করে চলে যাই মুদির দোকানে! হরেকেষ্ট! হরেকষ্ট!" দীনদয়াল-বাবুর মনে হ'ল বিয়ের টুলিরা সত্যি সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষ। পরিণামে ঠিকই হ'ল, বুঝবি শেষে, বুঝবি শেষে!

কিন্তু উপায় নেই।

তেলের টিন আর চিনির থলেটা নিয়ে দীনদয়ালবাবু উঠোনে পা দিতে না দিতেই গিন্নীর নেপথ্য কণ্ঠধ্বনি শোনা গেল, "রানু, বলে দে ত এক কৌট জর্দা যেন আনে।"

চিৎ ক'রে দেওয়া আরশোলার মত অসহায় ভাবে হাত-পা ছুঁড়ে বহুকষ্টে আবার সাব্যস্ত হয়ে পায়ে ভর দিয়ে যেন

গুটিগুটি যাচ্ছিলেন দীনদয়ালবাবু, লক্ষ্মীদেবী আবার চিং করে ফেললেন দীনদয়ালবাবুকে। একটুকুও মমত্ববোধ নেই স্বামী জীবটার প্রতি, "এক কৌটো জর্দা যেন আনে!"

স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে পড়লেন দীনদয়াল। আচ্ছা, এর ওষুধ কি? কত দুরারোগ্য ব্যাধির কত অমোঘ ওষুধ আবিষ্কৃত হচ্ছে কিন্তু কেউ নজর দিল না এই বামাক্ষেপীদের দিকে, অথচ শুধু ওদের জন্যেই কত স্বামী যে সন্ন্যাস রোগে মরছে তার লেখা-জোখা নেই, একথা খবরের কাগজে পণ্ডিতরা বলেছেন। এবং একদিন হবেও তাই! দীনদয়ালবাবু দিব্য চক্ষে দেখতে পেলেন সে শেষ পর্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে নেহাৎ যদি সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে না যান ত সন্ন্যাস রোগেই ওঁর—

"রানু, তোর বাবাকে এক গেলাস ঠাণ্ডা জল দিয়ে আয় ত, আর ঐ সঙ্গে হিমকল্যাণ তেল ওর টাকে—" লক্ষ্মীদেবীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

"না, ওসব নয়। তার চেয়ে নিয়ে আয় মাছবানান বঁটিটা।"

পরিহাসের বিষয় এবং সময় একটা আছে। কি দরকার লক্ষ্মীদেবীর এই রকমভাবে দীনদয়ালবাবুকে ক্ষেপিয়ে দেবার? ক্ষেপিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কি? গিন্নীর দৃষ্টিতে স্বামী একটা ঘানি ছাড়া যেন আর কিছুই নয়—মাথার ঘাম পায়ে ফেলা রোজগারের টাকাগুলো ঘানিতে সরষে পেষার মতই পিষে আর পাক দিয়ে নিঙড়ে বের করে নিচ্ছে ফোঁটা ফোঁটা করে। চিনি নেই, জর্দা নেই, অমুক নেই, তমুক নেই!

লক্ষ্মীদেবী সত্যি সত্যি এক গেলাস জল নিয়ে গিয়ে দীনদয়ালবাবুর দিকে এগিয়ে ধরলেন। লক্ষ্মীদেবীর মুখটা যদিও গম্ভীর দেখাচ্ছে কিন্তু ওঁর ভিতরটা যেন ভীষণভাবে হেসে চলেছে দীনদয়ালবাবুর হাঁড়ি-মুখ দেখে।

জলের গেলাস লক্ষ্মীদেবীর হাতেই থেকে গেল, গিন্নীর মুখের দিকে একবার মাত্র কটমট করে তাকিয়েই হনহন করে বেরিয়ে গেলেন বাড়ী হ'তে। এরই নাম গৃহিণী? কে বাবা বৈষ্ণব পদকর্তাকে এমন গালভরা প্রশংসা লিখতে বলেছিল, "ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে···"

ক'দিন ধরে দাম্পত্য ঝড়-বৃষ্টির ফল একটু ভালই হয়েছে। সংসার-যাত্রার পথে উভয়েই এখন সন্তর্পণে আর পা টিপে-টিপে হাঁটছেন। দীনদয়ালবাবু মাছ সব্জি একটু বেশী করেই কিনছেন আর ভাণ্ডারের তেলের টিন কিছু দেরি করেই খালি হচ্ছে, কিন্তু তা হ'লে কি হয়, রবিবার এলেই দীনদয়ালবাবুর একটা না একটা ফাঁড়া উপস্থিত হবেই হবে।

লক্ষ্মীদেবী দীনদয়ালবাবুর হাতে প্রাতঃকালীন দ্বিতীয় চায়ের কাপটা সদরে গিয়ে সবেমাত্র দিয়েছেন—"মা ঠাকরুণ, ছায়া শাড়ি ব্লাউজ ফ্রক কিছু রাখবেন নাকি? ডেকরণের নোতুন নোতুন"—ফেরিওয়ালা পর্বত-সমান কাপড়ের বোঁচকাটা গিন্নীমায়ের আর অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই ধুম করে নামিয়ে দিল বাইরের বারান্দায়।

দুর্গা দুর্গা! বারান্দায় নয়, বোঝাটা যেন দীনদয়ালবাবুর বুকের ওপরেই নামান হ'ল! ডেকরণের নোতুন নোতুন শাড়ি ব্লাউজ! মা ঠাকরুণ রাখবেন নাকি কিছু? রাখবেন নাকি মানে? মা ঠাকরুণ ইতিমধ্যেই বোঝাটার অতি সন্নিকটেই আকৃষ্ট হয়েছেন, "কই, দেখি কেমন?"

এক ঢোক চা গিলে দীনদয়ালবাবু মুখটা বিকৃত করলেন। মনে হ'ল গৃহিণীদেবী হয়ত আজ চায়ের পাতার পরিবর্তে নিম পাতাই বা দিয়েছেন। ওদিকে ফেরিওয়ালাটা কি চট্‌পটে! ছোট্ট চট বিছিয়ে খান পাঁচ-সাত ডেকরণের শাড়ি বিছিয়ে দিয়েছে। একটার পর একটা শাড়িগুলোর নিজস্ব জৌলুস ত আছেই তার ওপর পড়েছে সূর্যের রঙীন আলো।

"এটার দাম?" লক্ষ্মীদেবী জিজ্ঞাসা করলেন।

"পঁয়ত্রিশ।"

"ঐটার?"

"বেয়াল্লিশ।"

"ঐ ডান দিকেরটা?"

"সাতচল্লিশ আর এই ফিকে বেগুনি রঙেরটা পঞ্চান্ন টাকা। আমারটা আগের চালানের বলেই এত কমে দিতে পারছি মা ঠাকরুণ। এখন এর দাম—"

দীনদয়ালবাবু নেপথ্যে থেকেই কান খাড়া করে দামের উর্দ্ধগতি লক্ষ্য করে যাচ্ছেন আর সেই সঙ্গে ওঁর ব্লাড প্রেশারও বেড়ে চলেছে ঠিক ঐ অনুপাতেই! দীনদয়ালবাবু চুপি চুপি সরে পড়বেন নাকি? দেরাজের চাবিটা সশব্দে বন্ধ করলেন, তার চেয়ে বেশী শব্দ করে নিজের চেয়ারটা

ঠেলে দিলেন পিছনের দিকে। গিন্নী শুধু একবার এইদিক্ পানে চাইলেই হাতজোড় ক'রে চোখের ভাষায় মিনতি জানাবেন, রক্ষে কর !

নাঃ, কিচ্ছু হ'ল না—গিন্নীর কানে যেন কিছুই যাচ্ছে না ! যে ক'টি ছেলেমেয়ে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল তাদের মধ্যে একজনকে বললেন—"বেলা, যা ত মা, স্বপনের মা-কে একবার ডেকে আন্ ত—বিশেষ দরকার।"

থপ করে বসে পড়লেন দীনদয়ালবাবু। স্বপনের মা মল্লিকাদেবী ! তা হ'লেই হয়েছে। একদিকে উনি প্রফেসারের গিন্নি, অন্যদিকে জমিদারের মেয়ে, স্বামী-স্ত্রীর খরচের হাত দরাজ ! হবে নাই বা কেন ? সংসার বলতে ঐ একটি মাত্র ছেলে—স্বপন। মল্লিকাদেবী পাড়ার গিন্নীদের শাড়ি-ব্লাউজ পছন্দের একমাত্র নির্ভরযোগ্য গাইড !

বঙ্কিমচন্দ্র সত্যি ঋষিব্যক্তি ছিলেন। যত নষ্টের গোড়া ত ঐ পাশের বাড়ীর সুসজ্জিতা সালঙ্করা গিন্নীরা। শেষ পর্যন্ত বাড়ীটা বদলাতেই বা হয়, দুগ্‌গা দুগ্‌গা !

"এ কি, সকাল বেলাতেই ঘুমোচ্ছেন নাকি ? ডেকরণের এই শাড়িখানাই রাখা হ'ল আর এই ব্লাউজটা," মল্লিকাদেবী দীনদয়ালবাবুর আচ্ছন্ন ভাবটা ভেঙ্গে দিলেন।

মল্লিকাদেবীর হাতে শাড়িখানা আর লক্ষ্মীদেবীর হাতে ব্লাউজ—দুজনেই টেবিলের ওদিকে এসে দাঁড়ালেন।

"দামটা চল্লিশেই রফা করা গেল, আমাদেরই জিত, কি বলুন ?" মল্লিকাদেবী সহাস্যেই জিজ্ঞাসা করলেন।

নিশ্চয়—নিশ্চয় ! আপনাদেরই ত জিত ! শুধু আজ কেন, পুরাকালের বল্কলধারিণী থেকে সুরু ক'রে আজকের এই ডেকরণের কালেও ! এর ব্যত্যয় কখনও হয়নি, হবেও না—!

দীনদয়ালবাবু দেরাজের চাবিটা ঘোরালেন, এক এক ক'রে গুণে দিতে হ'ল চল্লিশটা টাকা। বুকের পাঁজরের হাড়ও অতগুলো নেই—তবু কিন্তু দিতে হ'ল।

বারান্দার ভিড় কমে গেল, দীনদয়ালবাবু তাক থেকে পঞ্জিকা খানা পেড়ে নিয়ে বসলেন—কাছাকাছি একটা ভাল দিন পেলেই বেরিয়ে পড়বেন ! আর নয়, যথেষ্ট হয়েছে ! লক্ষ্মীদেবী ডেকরণ পরুন, দীনদয়ালবাবুর সংসারের সাধ খুব মিটেছে। কি প্রয়োজন আর ধুতি-জামার, একখানা গামছা আর চিমটে ; ব্যস্, বম বম করে বেরিয়ে পড়বেন রাস্তায়, তারপর—

"আসতে পারি ?" লক্ষ্মীদেবী অন্দরের পর্দা ঠেলে হাজির হলেন, একটা প্লেটে গোটা কয়েক রসগোল্লা আর এক গেলাস জল। দীনদয়ালবাবুর সামনে টেবিলে নামিয়ে রাখলেন প্লেট আর জলের গেলাস।

দীনদয়ালবাবু ইতিমধ্যে মনে মনে হিসাব কষতে লেগে গিয়েছেন—শাড়িতে গেল চল্লিশ আর এক টাকার রসগোল্লা, মোট—

"ভয় নেই, রসগোল্লা আমি নিজের টাকায় খাওয়াচ্ছি।"

যদিও রসগোল্লার ওপর দীনদয়ালবাবুর বিশেষ দুর্বলতা আছে, তবুও গোটা ছয়েক খাওয়ার পর দীনদয়ালবাবু হাত গুটোলেন, "না না, আর নয়"।

"আমার দিব্যি থাকে ! আমার মাথা" লক্ষ্মীদেবী কালবিলম্ব না ক'রে বাদবাকী চারটে রসগোল্লা নিজের হাতে জোর ক'রে স্বামীর মুখে দিয়ে দিলেন, কোন আপত্তিই শুনলেন না।

জলের গেলাসটা নামিয়ে রাখতেই লক্ষ্মীদেবী গলবস্ত্র হয়ে হাতজোড় করে জিজ্ঞাসা করলেন, "প্রভু, টাকার শোক আর রাগ কিছু কমল ?"

"উপায় কি ! হেউ, বাবাঃ," পূর্ণ পরিতৃপ্তির বিরাট্ একটা ঢেকুর তুললেন দীনদয়ালবাবু।

পবিত্র স্মারক

জুলফিকার

শ্রীনগরের হজরতবাল মসজিদ থেকে পয়গম্বরের কেশ চুরির ব্যাপার নিয়ে পূর্ব্ব ও পশ্চিম বাংলায় বিশেষ পূর্ব্ববঙ্গে) যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড, লুটতরাজ ও অগ্নিকাণ্ড হয়ে গেল, তা লোকে সহজে বিস্মৃত হবে না।

ধর্ম্মগুরুদের পূত স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে বিবাদ বিসম্বাদ দলাদলি এর আগেও হয়েছে, কিন্তু এইরূপ তীব্র আকারে নয়।

বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ সকলেরই কিছু না কিছু পবিত্র স্মারক, তাঁদের ভক্তরা অতি সযত্নে রক্ষা করে আসছেন, আজ বহুযুগ ধরে।

প্রভু যীশুখ্রীষ্ট তাঁর শেষ ভোজন (Last Supper) করেছিলেন যে থালায় এবং যাতে তাঁর শিষ্য যোসেফ এ্যারিমাথিয়া তাঁর ক্রুশবিদ্ধ দেহ থেকে ক্ষরিত পবিত্র রক্ত নিয়ে এসেছিলেন—সেই হোলি গ্রেলের (Holy Grail) সন্ধানে মধ্যযুগীয় নাইটেরা নানারূপ দুঃসাহসিক অভিযানে ব্রতী হয়েছিলেন। এ নিয়ে ইউরোপীয় সাহিত্যে বহু গাথা ও কাব্য রচিত হয়েছে।

বুদ্ধের দন্ত : ক্যাণ্ডির দালানা মালি গাওয়ান

সিংহলে ক্যাণ্ডির প্রসিদ্ধ দন্তমন্দির দালাদা মালি-গাওয়ানে গৌতম বুদ্ধের দন্ত সংরক্ষিত আছে। কিন্তু চীনারাও দাবি করছে যে তাদের দেশেও বুদ্ধের দন্ত আছে। ১৯৬১ সালে চীন সরকার সিংহলের জনগণের নিকট প্রদর্শনার্থ ভগবান্ তথাগতের দন্ত প্রেরণের প্রস্তাব করেছিলেন কিন্তু এতে সিংহলবাসীদের মধ্যে দারুণ বিক্ষোভ সৃষ্টি হ'ল। তাদের ধারণা হ'ল, চীনারা সিংহলের প্রাচীন দন্তমন্দিরের খ্যাতি ও মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করতে প্রয়াসী। সিংহলীদের মতে ক্যাণ্ডির মালি-গাওয়ানে রক্ষিত এই দাঁতটি ভগবান্ বুদ্ধের একমাত্র স্মারক দন্ত। চীনে রক্ষিত বুদ্ধের দন্তের কথা কোন বৌদ্ধ গ্রন্থে উল্লেখ নাই। কাজেই চীনাদের দাবি অমূলক এবং একটা জাল দাঁত দেখিয়ে তারা বৌদ্ধ জগতে তাদের মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যগ্র।

বৌদ্ধ উপাখ্যানে আছে, গৌতম বুদ্ধের মহানির্ব্বাণ লাভ করার পর (খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৪৮০ সালে) যখন তাঁর নশ্বর দেহ চিতায় স্থাপিত হ'ল, তখন চিতায় অগ্নিসংযোগ করা সত্ত্বেও তা প্রজ্বলিত হ'ল না। বুদ্ধের শ্রেষ্ঠ ভক্তদের মহাকাশ্যপ তাঁর শেষকৃত্যের সময় উপস্থিত ছিলেন না। …যা হোক, সমবেত শিষ্যেরা মৃতের শ্রীচরণ স্পর্শ করে আকুল প্রার্থনা জানাতে চিতা জ্বলে উঠল এবং ভগবান্ বুদ্ধের মরদেহ ভস্মীভূত হ'ল—শুধু রইল তাঁর করোটি, কণ্ঠার দুখানি হাড় এবং চারটি দাঁত।

ক্ষেম নামে একজন শিষ্যের ভাগ্যে মিলল একটি দাঁত। এটা পরে কলিঙ্গরাজ ব্রহ্মদত্তের হস্তগত হয়। ব্রহ্মদত্ত এর উপর একটা সুদৃশ্য স্তূপ রচনা করেন। উত্তরকালে ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি ঘটলে, বৌদ্ধ ভিক্ষুরা দাঁতটি নিয়ে সিংহলে চলে যান। সিংহলে তখন বৌদ্ধ ধর্ম্মের অপ্রতিহত প্রভাব। এর পর দাক্ষিণাত্যের কোন কোন হিন্দু রাজা সিংহলে অভিযান চালালেও, ভগবান্ বুদ্ধকে শ্রীবিষ্ণুর অবতার জ্ঞানে ক্যাণ্ডির দন্ত মন্দিরের কোন ক্ষতি করেন নি। ষোড়শ শতাব্দীতে পর্ত্তুগীজেরা সিংহলীদের খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করবার ইচ্ছায়, বুদ্ধের দন্তটিকে বিনষ্ট করতে সচেষ্ট হয়ে উঠেছিল। তারা ভেবেছিল, বুদ্ধের এই স্মৃতিচিহ্নটুকু বিলুপ্ত করতে পারলে সিংহলবাসীদের ধর্ম্মান্তরণ সহজ সাধ্য হবে। পর্ত্তুগীজেরা একবার ক্যাণ্ডির এই মন্দিরটি আক্রমণও করেছিল, কিন্তু বৌদ্ধ ভিক্ষুরা জীবনপণ করে ভগবান্ বুদ্ধের এই পবিত্র স্মারকটি রক্ষা করতে কৃতসংকল্প হয়েছিলেন, এবং শেষপর্য্যন্ত এটাকে নিয়ে সিংহল ছেড়ে ভারতে পালিয়ে আসতে সমর্থ হন।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশরা সিংহল জয় করে। সিংহলে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে বুদ্ধদেবের এই স্মারক দন্ত পুনরায় সিংহলে ফিরিয়ে আনা হয়।

দালানা মালি গাওয়ানে একটা সোনার কাঁটায় গাঁথা এই দাঁতটি সযত্নে ও সংগোপনে রক্ষিত আছে। কখনও এটাকে মন্দিরের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয় না। বার্ষিক পেরাহেরা উৎসবের সময় শুধু শূন্য আধারটি নিয়ে মিছিল বার হয়।

বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্র

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে বুদ্ধঘোষ কৃত 'সুমঙ্গল বিলাসিনী' নামক গ্রন্থে বুদ্ধদেবের ভিক্ষপাত্রের (পিণ্ড পাত্র) বিষয় বলা হয়েছে। রাজার মৃত্যুর পর তাঁর রাজদণ্ড যেমন পরবর্ত্তী রাজার হাতে তুলে দেওয়া হয়, তেমনি এই পাত্রটি বৌদ্ধ সঙ্ঘের অধ্যক্ষের কাছ থেকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত পরবর্ত্তী সঙ্ঘরাজের দখলে আসত। বুদ্ধের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হবার পর মহারাজ অজাত-শত্রু বুদ্ধের শ্রেষ্ঠ শিষ্য মহাকাশ্যপের উপদেশ অনুযায়ী এই পিণ্ডপাত্র ভগবান্ তথাগতের অন্যান্য স্মারকের সহিত সমাহিত করেন এবং তাদের উপর একটা স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন। মহাকাশ্যপ ভবিষ্যৎবাণী করেন যে, একশ' বছর বাদে এমন একজন রাজা ভারতবর্ষে জন্ম নেবেন, যাঁর দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্মের লুপ্ত গৌরব পৃথিবীতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবে। এই পাত্রটির তিনিই হবেন যোগ্যতম তত্ত্বাবধায়ক।...সম্রাট্ অশোক রাজা হয়ে এই পাত্রটির জন্য অনুসন্ধান চালান এবং স্তূপ খনন করে এই পাত্র সমেত প্রভু বুদ্ধের আরও অনেকগুলি স্মারক উদ্ধার করেন। এই সব স্মারক দ্রব্যগুলি ভারতের বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহারে ভাগ করে দেওয়া হয়। কিন্তু সম্রাট্ বুদ্ধের ব্যবহৃত পাত্রটি আপনার কাছেই রেখে দিলেন।

এরপর যখন ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্য লোপ পেল, তখন বুদ্ধের দন্তের মত এই পিণ্ডপাত্রটিও সিংহলে নীত হল এবং এর উপরে বুদ্ধভক্তেরা একটা চৈত্য প্রতিষ্ঠা করলেন।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক ফা হিয়েন, পুরুষপুরে (পেশাওয়ারে) কুশান সম্রাট্ কনিষ্ক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত এক বিহারে রক্ষিত একটি পাত্রের সন্ধান পান—সেই পাত্রটিই নাকি ভগবান্ বুদ্ধের ব্যবহৃত পিণ্ডপাত্র। ফা হিয়েন তাঁর বিবরণীতে লিখেছেন 'এই মঠে সাত শত ভিক্ষুর বাস। প্রতিদিন দ্বিপ্রহরে, এই পাত্রটি বাহিরে জনসাধারণের সামনে রাখা হয় এবং তাদের প্রদত্ত খাদ্য-দ্রব্যাদি ভিক্ষুরা নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে তাঁদের মধ্যাহ্ন ভোজন সমাধা করেন। এর পর সান্ধ্য প্রার্থনা-গীতের সময় পাত্রটিকে আবার মঠের মধ্যে তার জায়গায় ফিরিয়ে আনা হয়। পাত্রটিতে বড় জোর দুই গ্রাস খাবার ধরে। দরিদ্র ব্যক্তিরা শ্রদ্ধা-সহকারে এক অঞ্জলি ফুল বা তণ্ডুল দিলেই ওটা ভরে ওঠে, অথচ ধনবানের প্রদত্ত রাশি রাশি পুষ্পার্ঘ্যে বা খাদ্যদ্রব্যেও ওটা ভরবে না। পাত্রটি বহুবর্ণে রঞ্জিত তবে কৃষ্ণবর্ণেরই আধিক্য দেখা যায়। এতে চারটে জোড় আছে, ⅖ ইঞ্চি পুরু কাঁচের মত স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল পদার্থে নির্ম্মিত।'

ফা হিয়েন সিংহলেও গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি বুদ্ধের পিণ্ডপাত্রের কোন সন্ধান পান নি। তিনি সেখান-কার বৌদ্ধ প্রধানের মুখে শুনেছিলেন যে, যদিও পাত্রটি বর্ত্তমানে সিংহলে নেই, তবুও ভবিষ্যতে বুদ্ধের ব্যবহারের জন্য এটা পুনরায় সিংহলে ফিরে আসবে। পাত্রটির ইচ্ছা-মত একস্থানে থেকে অন্যস্থানে চলাচল করবার ক্ষমতা ছিল। যে দেশে বৌদ্ধ অনুশাসন উপেক্ষিত বা লঙ্ঘিত হ'ত, পাত্রটি অবিলম্বে সে দেশ পরিত্যাগ করে যে দেশের লোকেরা বৌদ্ধশীলে আস্থাবান্ সেই দেশে চলে যেত।

ফা হিয়েনের দু'শ বছর পর হিউয়েন সাঙ যখন এ দেশে এলেন, তিনি শুনলেন, পেশাওয়ার ছেড়ে পাত্রটি নাকি চলে গেছে পারস্যে। তার পর পাত্রটি একরূপ নিখোঁজ হয়ে যায়। সমসাময়িক কোন গ্রন্থের পাতায় তার কোন হদিস মেলে না। নৈষ্ঠিক বৌদ্ধদের বিশ্বাস, পাত্রটি পৃথিবী ছেড়ে স্বর্গে চলে গেছে এবং নতুন বুদ্ধের শুভ আবির্ভাবের জন্য অপেক্ষা করছে। নতুন বুদ্ধ ধরায় অবতীর্ণ হলে, পাত্রটিও আবার নেমে আসবে পৃথিবীতে। এই বুদ্ধ জন্ম নেবেন গৌতম বুদ্ধের মহানির্ব্বাণের পাঁচ হাজার বছর পর অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ৪৩৭৯ সালে—আজ থেকে আরো চব্বিশ হাজার পনের বছর পর।

চীনারা বলে, এই পিণ্ডপাত্র বুদ্ধের শিষ্য মহাকাশ্যপ প্রথম বৌদ্ধ সঙ্ঘাধিপতি আনন্দের হাতে তুলে দেন। এই ভাবে হস্তান্তর হতে হতে ষড়্বিংশ সঙ্ঘাধিপতির হাতে যখন ওটা এল, তিনি তখন ওটা নিয়ে চীনে গেলেন, সেখানকার বৌদ্ধ প্রচার কেন্দ্রের ভার নিয়ে। চীনের বৌদ্ধধর্ম্মকেন্দ্রের ষষ্ঠ সঙ্ঘরাজের আমলে ওটা একদিন অদৃশ্য হয়ে যায়। বোধ হয় ওকে ধ'রে রাখবার মত আত্মিক শুচিতা তিনি তখন হারিয়ে ফেলেছেন।

খ্রীষ্টানদের পুণ্য স্মারক ঃ

ক্রুশ কাষ্ঠের অংশ ও ক্রুশে ব্যবহৃত লৌহকীলক

যিশুখ্রীষ্টকে যখন ইহুদীদের অভিযোগে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়, সেই সময়কার তাঁর বহু স্মারকের অস্তিত্ব এখনও আছে বলে জানা যায়। এগুলোর মধ্যে সব চাইতে পবিত্রতম হচ্ছে, যে ক্রুশে যিশুকে বিদ্ধ করা হয়ে-ছিল তারই অংশ ও ব্যবহৃত লোহার পেরেকগুলো। প্রভু খ্রীষ্টের তিরোধানের পর ক্রুশটাকে কোন জায়গায়

পুঁতে রাখা হয়েছিল—সে খবরটা জানত কেবল প্যালেস্টাইনের একটি মাত্র ইহুদী পরিবার। কোন হিব্রু গ্রন্থ থেকে এ সম্বন্ধে কোন তথ্য জানা যায় না।

৩১২ খ্রীষ্টাব্দে বাইজানটিয়াম রাজ্যের অধীশ্বর কনষ্টানতিন এক অলৌকিক শক্তির প্রভাবে শত্রুদের বিধ্বস্ত করবার পর খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তাঁর মা ধর্ম্মপ্রাণা হেলেনা গির্জ্জা প্রতিষ্ঠা ও খ্রীষ্টের স্মারক সংরক্ষণের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করলেন।

৩২৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজমাতা যখন প্যালেষ্টাইন সফর করছিলেন তখন একজন বৃদ্ধ ইহুদী তাঁকে প্রভু যিশুর ক্রুশের সমাধিস্থলে নিয়ে যান। তাঁর প্রদর্শিত স্থানটির মাটি খুঁড়ে রাজমাতা তিনটি ক্রুশের সন্ধান পেলেন। একটা ক্রুশের শীর্ষদেশে 'ইনি ইহুদীদের রাজা যিশু'—এই শ্লেষাত্মক বাক্যটি হিব্রু ভাষায় খোদিত ছিল। এ ছাড়া হেলেনা কয়েকটি লোহার কাঁটাও পান,—যা দিয়ে পরিত্রাতা যিশুর দেহ ক্রুশ দণ্ডের সঙ্গে আটকানো হয়েছিল। হিব্রু লিখন সম্বলিত ক্রুশটিতেই যে যিশুকে হত্যা করা হয় সে বিষয়ে সন্দেহের নিরসন হল, যখন এর উপর শুয়ে একজন মরণাপন্না রোগিণী আশ্চর্য্যরূপে রোগমুক্ত হয়েছিল। খোদিত লেখা সমেত ক্রুশটি সম্রাট্ কনষ্টানতিন রোমে পাঠিয়ে দেন। বর্ত্তমানে সেটা জেরুসালেমের সেণ্ট ক্রোশ গির্জ্জায় (Church of St. Croce) রক্ষিত আছে।

যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করবার জন্য কয়টা কাঁটা ব্যবহার করা হয়েছিল, সে বিষয়ে মতবিরোধ থাকলেও খ্রীষ্টান জনসাধারণের চলতি ধারণা যে, মাত্র চারটে কাঁটায় তাঁকে ক্রুশের সঙ্গে গাঁথা হয়েছিল। জাহাজে ক'রে যখন পবিত্র স্মারকগুলি (ক্রুশের অংশ ও পেরেকগুলো) নিয়ে আসা হচ্ছিল তখন ভূমধ্যসাগরে প্রচণ্ড ঝড় ওঠে। এই বাত্যাক্ষুব্ধ সমুদ্রকে শান্ত করার জন্য রাজমাতা সেণ্ট হেলেনা একটা কাঁটা সাগর জলে ছুঁড়ে ফেলে দেন। বাকি কাঁটাগুলোর একটাকে পিটিয়ে পাত করে তা দিয়ে মনৎসে (Monze) রক্ষিত লম্বার্ডির মুকুটের বেড় (Circlet of the crown of Lombardy) তৈরি করা হয়েছিল। খ্রীষ্টের মৃত্যুর পর মিলান কারপেণ্ট্রা ও অন্যান্য স্থানে এ পর্য্যন্ত প্রায় ত্রিশটা পেরেক প্রভু যিশুর ক্রুশে ব্যবহৃত স্মারক হিসাবে পূজিত হয়ে আসছে।

ক্রুশবিদ্ধ কালীন যিশুর পরিচ্ছদ

ক্রুশে বিদ্ধ করবার পূর্ব্বে রোমান সৈন্যরা যিশুকে যে সেলাই-বিহীন বেগুনী রঙের পরিচ্ছদে (Robe Christ) ভূষিত করেছিল, তার অস্তিত্ব সম্বন্ধেও মতবিরোধ রয়েছে। অনেকে বলেন, ফ্রান্সের আর্জেন্তেল গির্জ্জায় যে ভায়োলেট রঙা অঙ্গরাখাটি আছে সেইটেই এই পোশাক। আবার কারো মতে জার্ম্মানীর ট্রায়ার্স গির্জ্জায় রক্ষিত পোশাকটি ক্রুশবিদ্ধ হবার আগে যিশুকে পরানো হয়েছিল, আর্জেন্তেলের পোশাকটি জাল। দুটো বিভিন্ন দলের মধ্যে এ ব্যাপার নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা অদ্যাবধি চলে আসছে। গত দশ শতাব্দী ধরে ট্রায়াসের গির্জ্জায় রাখা আলখাল্লাটি মোট আঠার বার জনসাধারণের সম্মুখে প্রদর্শিত হয়েছে। এটাকে শেষবার দেখানো হয়েছে ১৯৫৯ সালে দশ লক্ষ তীর্থযাত্রীর সম্মুখে। গির্জ্জার লোহার সিন্দুকে তালাবদ্ধ অবস্থায় এটাকে রাখা হয়।

হজরত মহম্মদের স্মৃতি :
ইমাম হোসেনের তলোয়ার

হজরত মহম্মদ তাঁর শিষ্যদের তাঁর দেহের কোন অংশ বা তাঁর নিজস্ব কোন জিনিষের প্রতি অহেতুক ভক্তি বা পৌত্তলিক মনোভাব নিয়ে দেখতে নিষেধ করে গেলেও হজরতবাল মসজিদে রক্ষিত তাঁর কেশ চুরির ব্যাপারে যেরূপ ব্যাপক বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি হয়েছিল তাতে স্বতঃই প্রমাণ হয়েছে যে তাঁর প্রতি অন্ধ ভক্তির আতিশয্যে তাঁর ভক্তেরা গুরুর উপদেশ অমান্য করতে দ্বিধা বোধ করেনি।

নবীর স্মারক হিসাবে বহু জিনিস ভারতবর্ষে আনা হয়েছিল মোগল বাদশাহদের আমলে, এদের মধ্যে ছিল আকবরের সময়ে আনিত লোমে বোনা তাঁর একটা অঙ্গরাখা, পরে ওটা এদেশের বাইরে চলে যায়।

মাষ্টার তারা সিংহের সাম্প্রতিক বিবৃতিতে জানা যায় যে, নবীর দৌহিত্র হজরত ইমাম হোসেন কারবালার মরুপ্রান্তরের যুদ্ধে যে তরবারি ব্যবহার করেছিলেন সেটা আনন্দপুরের সাহেব গুরুদোয়ারায় রক্ষিত আছে। কিন্তু শিখনেতার এই ঘোষণার বিরুদ্ধে রামপুরের জনৈক মুসলমান ভদ্রলোক প্রতিবাদ জানিয়েছেন। ইনি দাবি করেন যে, ইমাম হোসেনের এই তলোয়ার তাঁর বাড়ীতে আছে। তাঁদের পরিবারে তলোয়ারের সঙ্গে প্রদত্ত মোগল সম্রাট্ মহম্মদ শাহের ফরমানও আছে। তাতে লেখা আছে, এই তলোয়ার যেন ভবিষ্যতে কেউ ব্যবহার না করে।

আনন্দপুর সাহেব গুরুদোয়ারার তলোয়ারখানা যে ইমাম হোসেনের, সে সম্বন্ধে কোন নজির মাষ্টারজী দেখাতে পারেন না, কাজেই ওটা নকল হাতিয়ার।

আর্থিক

শ্রীচিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

জাতীয় আয় বণ্টন ও জীবনযাত্রার মান

মহলানবীশ কমিটি রিপোর্টের যতটুকু সারাংশ কাগজে প্রকাশিত হয়েছে তাই দেখেই ইতিমধ্যে দেশজুড়ে আলোচনা সুরু হয়েছে; সম্পূর্ণ রিপোর্টটি দেখবার জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন। সরকারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্যে ধনী ধনীতর হচ্ছেন, এই সম্ভাবনাই সকলের কাছে পীড়াদায়ক। রাজস্ব পদ্ধতি, মুদ্রানীতি এবং উৎপাদনের কাজে বৃহত্তর প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকতর সুযোগ-সুবিধা লাভ, এইরকম বিবিধ পথে আমাদের পরিকল্পনা-ভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে উঠছে—এই ধরণের ইঙ্গিত রিপোর্টটির সারাংশে উল্লেখ থাকাতে দেশবাসী স্বভাবতঃই মনে করবেন এই অগ্রগতির পরিণতি কি ?

উত্তরে বলা যেতে পারে যে, কোন দেশেই অগ্রগতির প্রথম ধাপে আসল লক্ষ্য থাকে দেশের প্রকৃত মূলধন বৃদ্ধি করার দিকে; এমন কোন নজির হয়ত দেখানো যায় না যেখানে 'প্রাইভেট সেক্টর' মারফৎ ধনোৎপাদন ব্যবস্থা বজায় রেখেও উন্নতির প্রথম অধ্যায়েই ধন বণ্টন সমান হারে রক্ষিত হয়েছে। আরও বলা যেতে পারে যে, অন্যান্য দেশের ধনবৈষম্যের সঙ্গে তুলনা করলে আমাদের দেশে গ্রাম ও শহরবাসীর মধ্যে অথবা শহরবাসীদেরই বিভিন্ন আয়ের লোকেদের মধ্যে ধনবৈষম্য খুব উগ্ররকম নয়। তৃতীয় যুক্তি হ'তে পারে, আয়ের পার্থক্য অনিবার্যভাবে কিছু যদি বেড়েও থাকে সেই সঙ্গে একথাও মানতে হবে যে, সর্বনিম্ন আয়ের লোকদের মধ্যে জীবন ধারণে প্রয়োজনীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থাদি ব্যাপকতর হয়েছে; হাসপাতাল, স্কুল, ভাল রাস্তা, গ্রাম ও শহরের মধ্যে সহজ যাতায়াত ব্যবস্থা ইত্যাদির প্রসার হওয়াতে সঙ্গে সঙ্গেই সকলের আয়বৃদ্ধির পথ সুগম না হ'লেও বহুসংখ্যক লোকের জীবনযাত্রার দৃষ্টিভঙ্গি বদলাচ্ছে। সর্বশেষে এই যুক্তি দেখান হ'তে পারে যে, উৎপাদনের বহুক্ষেত্রেই 'পাবলিক সেক্টর'-এর প্রসার হচ্ছে; এ যদি না হ'ত তা হ'লে ধনবৈষম্য আরও বেশি হ'ত; সব দিক্ বিচার করে 'পাবলিক সেক্টর'-এর পরিধি কিছু ধীরগতিতেই বাড়াতে হচ্ছে; অর্থ এবং উপযুক্ত লোকের অভাব অল্পদিনে ঘোচান সম্ভব নয়।

উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান এই দুইটি, বহুলাংশে পরস্পরবিরোধী, সমস্যার সমাধান করতে গেলে সমাজ-ব্যবস্থার যে কোঠাতে হাত দিতে হয়, সেখানে আমাদের মনোভাব কিছু দ্বিধাগ্রস্ত, এ বিষয়ে আজ কেউ দ্বিমত পোষণ করেন না। উপরন্তু, অপর যে জিনিষটি জনসাধারণ সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করেন, সেটি হচ্ছে ধনশালী ও নির্ধনের ক্ষেত্রে আইনের নিরপেক্ষতার অভাব এবং সরকারের কর্ণধারদের তরফে ব্যয়বহুল বিলাসিতাকে প্রশ্রয় দান। দেশের অর্থ বৈষম্য যাই থাকুক না কেন, আইন ধনীর ক্ষেত্রে একভাবে প্রযোজ্য, গরীবের ক্ষেত্রে আরেক ভাবে প্রযোজ্য, এই ব্যবস্থাটিই জনসাধারণের মনকে আজ প্রচণ্ড ভাবে আঘাত দিচ্ছে। আরেকটি হচ্ছে সরকারী পরিচালন ব্যবস্থায় ব্যয়বাহুল্য। এর দৃষ্টান্ত এত অজস্র এবং এত উগ্রভাবে এই গরীব দেশের অনুপযোগী যে, এই নিয়ে আজ আর লোকে আলোচনা করতেও বিরক্ত বোধ করে। অপর যে বিষয়টি সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ নির্লিপ্ত অথবা যেগুলিকে প্রত্যক্ষভাবে প্রশ্রয় দিয়েছেন সেটি হচ্ছে, যে-সব উৎপাদন ব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত হওয়া নিষ্প্রয়োজন এবং ব্যাপকতর কর্মসংস্থানের পরিপন্থী, সেসব ক্ষেত্রে 'প্রগতি'র নামে যান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার প্রচলনে সহায়তা।

সমবায় নীতিতে পরিচালিত উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার প্রচলনে সক্রিয় সাহায্য যদিও করা হচ্ছে কিন্তু

'সীমাবদ্ধ দায়িত্ব' (Limited Liability) পদ্ধতিতে যেখানে দেশের প্রায় সব ব্যবসায়ী- প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে এবং যার ফলে সব কোম্পানীরই মালিকানা (Ownership) বহুল পরিমাণে বিকেন্দ্রিত, সেখানে সমস্যাটি Limited Liability Company থেকে Co-operative Societyতে রূপান্তরের মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ হয়। মালিকানা যদি আজ 'শেয়ারহোল্ডারে'র হাত থেকে সমবায় সমিতির সদস্যের হাতে আসে তা হ'লে ধনবৈষম্য দূর করার দিক্ দিয়ে কতটুকু তফাৎ হচ্ছে? যদি আমরা যুক্তির খাতিরে ধরে নিই যে, সমবায় সমিতিগুলি দেশের যাবতীয় উৎপাদন-ব্যবস্থার ভার নিল, অথচ উৎপাদন পদ্ধতি যেভাবে ক্রমে যান্ত্রিকতার দিকে ঝুঁকছে সেরকমই থেকে গেল, তা হ'লে কি এই পরিবর্তনের দ্বারাই অনিবার্যভাবে ধনবৈষম্য ঘুচবে বা কর্মসংস্থান বাড়বে? 'লিমিটেড কোম্পানী'র ক্ষেত্রে 'মালিকানা' এবং 'পরিচালনা' সম্পূর্ণভাবে দুই শ্রেণীর লোকের হাতে বিভক্ত, একদিকে অগণিত শেয়ারহোল্ডার, আরেকদিকে মুষ্টিমেয় 'শিল্পপতি'। যদি আজ 'যৌথ কারবার' (Joint Stock Company) অচল হয় এবং সব ব্যবসায় ও শিল্প প্রতিষ্ঠান সমবায় পদ্ধতিতেই গঠিত হয়, তা হ'লে, একদিকে এই শিল্পপতিদের মুনাফার লোভ, আরেকদিকে অধিক উৎপাদন ও ব্যাপকতর কর্মসংস্থানের প্রশ্নটি কিভাবে মিটছে?

শিল্পপতিদের অতিরিক্ত মুনাফার লোভের পথ বন্ধ করতে গেলে আরও গোড়া ধরে টান দিতে হয় আর কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করতে গেলেও শিল্পনীতির পুনর্বিচার প্রয়োজন।

সমবায় নীতির প্রসারের একান্ত প্রয়োজনীয়তা আছে; এই নিয়ে কোন প্রশ্নই ওঠে না। অপর দিকে অধিকতর কর্মসংস্থানের নামে যন্ত্র বিসর্জন দিয়ে হাতের দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টাও বাতুলতা মাত্র। আজ যে প্রশ্ন বিশেষভাবে আমাদের সামনে আসছে সেটি হচ্ছে, বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে থেকে একদিকে ধনবৈষম্যের বৃদ্ধি রোধ, অপর দিকে উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে কর্মসংস্থানের সমবায় কিভাবে ঘটান যায়।

গত দশ-বারো বছরের রাজস্ব আদায়ের হিসাব থেকে দেখা যায়, প্রত্যক্ষ করের তুলনায় পরোক্ষ কর বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে, তার পুঞ্জীভূত ফল কর্তৃপক্ষ এতদিনে কিছুটা উপলব্ধি করছেন। আয়কর আরও বাড়ালে incetrive নষ্ট হবে, এ যুক্তি যদি বা মানা যায় তারপরে যে প্রশ্ন থেকে যায় সেটি হচ্ছে, নির্ধারিত আয়কর আদায়ের শৈথিল্য আর আজও দেশের মধ্যে যে কেন কোটি কোটি টাকার block money ঘুরছে এ প্রশ্নেরই বা কি সদুত্তর থাকতে পারে? অপর দিকে দেখছি, সময় ও ব্যয় সংক্ষেপের যুক্তিতে এমন সব কুটিরশিল্পকে যন্ত্রের দ্বারা চালনা ও ফলে কয়েকজনের হাতে কেন্দ্রীভূত করা হচ্ছে যেখানে কোন অতিরিক্ত ধন উৎপাদন হচ্ছে না। ঢেঁকির বদলে হাস্কিং মেসিন প্রচলন হওয়াতে উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে পারে না, দেশের এই সম্পদ্ বেশি বা কম উৎপাদিত হবে সে প্রশ্নের মীমাংসা করছে ধানের উৎপাদক চাষীরা, ধান থেকে চালে রূপান্তরকারী চালকল-মালিকরা নয়। বহু লোকে যে কাজ করছিল সে কাজ মুষ্টিমেয় হাস্কিং মিল-মালিকরা সম্পন্ন করছে। আপাত ভাবে মনে হচ্ছে দেশে শিল্প বাড়ল, চোখের আড়ালে ছিল অগণিত গ্রামবাসীর বেকারত্ব। আবার অপর দিকে দেখছি, কয়েক হাজার শিক্ষিত শ্রমিকের আপাতঃ বেকারত্বর আশঙ্কায় বিদেশী মুদ্রা অর্জনকারী পাটশিল্পে উন্নত যন্ত্র ব্যবহারে দ্বিধা, ফলে বহির্বাণিজ্যে প্রতিযোগিতায় দক্ষতার অভাব। পাট-কলে কর্মদক্ষ মিলকর্মীরা আজকের প্রসারের যুগে বেকার বসে থাকত না, ইংলণ্ড যখন উল বোনার কাজ থেকে সুতীর কাপড় তৈরীতে ঝুঁকল বা জাপান যখন সিল্ক ছেড়ে রেয়ন তৈরী আরম্ভ করল তখন ঠিক এই পরিবর্তন-বাবদ কারখানার কাজে দক্ষ লোকেদের কাজের অভাব ঘটে নি। উভয় ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে আমাদের দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ এবং দ্বিধাগ্রস্ত।

সরকার 'প্রাইভেট সেক্টর'-কে নির্মূল করতে যে চান না সে কথা পরিকল্পনারই অঙ্গ। বিভিন্ন দিকে সরকারী হস্তক্ষেপের ফলে 'প্রাইভেট সেক্টর'-এর কাজের পথ সুগম হোক, এই লক্ষ্য নিয়েই অনেক ক্ষেত্রে শিল্প রাষ্ট্রীয়করণ করা হয়েছে। অতএব সরকার প্রত্যক্ষভাবে শিল্পপতিদের অধিকতর লাভ করার সাহায্য করছেন, এই প্রশ্ন উত্থাপন করে সরকারকে নিন্দা করা চলে না। আজ যেটি হচ্ছে, তা

হ'ল মুষ্টিমেয় ধনী শিল্পপতিদের চাপে পরিকল্পনার রূপায়ণে অসম্পূর্ণতা। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে মোটর শিল্পের কথা; দেশে যদি আরও গাড়ির চাহিদা থাকে এবং আমরাও যদি motor age আনবার কথা ভেবে থাকি তা হ'লে বর্তমানে যে মূল্যে যেরকম দ্রুততার সঙ্গে মুষ্টিমেয় কয়েকটি কোম্পানী, অন্যান্য অনেক গাড়ির তুলনায় কম দক্ষ গাড়ি সরবরাহ করছেন, সে ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন কেন ভাবা হচ্ছে না এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে আসে। এই রকম দৃষ্টান্ত বহুক্ষেত্রেই দেখা যাবে এবং লক্ষ্য করা যাবে যে পরিকল্পনায় গৃহীত নীতি ও এযাবৎ অনুসৃত ব্যবস্থায় প্রচুর পার্থক্য। গুড় ছেড়ে চিনি বেশি করে খাওয়া ভাল কি না অথবা subsidy দিয়ে চিনি রপ্তানী করা ভাল কি না সে প্রশ্ন না বিচার করেও, যখন শুনি আখমাড়াই কলগুলি গ্রামের লোকে যাতে না পায় সে ব্যবস্থা করা হচ্ছে (উদ্দেশ্য, আখ উৎপাদনকারীরা আখের কলে আখ বিক্রী করবে গ্রামে গুড় করবে না!) তখন মনে হয় শিল্প বিকেন্দ্রীকরণ বা গ্রামীন শিল্পের পুনরুদ্ধারের কথা পরিকল্পনাতেই আছে, তার রূপায়ণে নেই। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে গ্রামে আখমাড়াই ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে সমবায় পদ্ধতিতে পরিচালিত, যদিও তার পেছনে সরকারী হাত আদৌ নেই।

ধনবৈষম্য বৃদ্ধির যে সম্ভাবনা আজ আমরা লক্ষ্য করছি তার মূলটা কোথায়? আজ সেই গতিরোধ করার জন্য জনসাধারণের বা সরকারের কি করণীয়? সরকার পথ-নির্দেশ করবেন আশা করা যাক।

ঢাকার দাঙ্গা

রাজধর্ম্মপালন ঢাকায় হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানদের জন্য বেশী প্রয়োজন ছিল। যাহাদের সম্পত্তি ও প্রাণ গিয়াছে, যাহারা আহত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে হিন্দুদের সংখ্যাই খুব বেশী। হিন্দুর লুণ্ঠিত ও দগ্ধ সম্পত্তির মূল্যও মুসলমানের লুণ্ঠিত ও দগ্ধ সম্পত্তি অপেক্ষা অনেক হাজার গুণ বেশী। কিন্তু হিন্দু অপেক্ষা অনেক অধিকসংখ্যক মুসলমানের এই হইয়াছে যে, তাহারা কাপুরুষতা, নিষ্ঠুরতা ও দস্যুতার সুযোগ পাইয়া মনুষ্যত্ব হারাইয়াছে এবং ধর্ম্মচ্যুত ও বর্ব্বরীভূত হইয়াছে। অতএব যাহাদের প্ররোচনা, প্রশ্রয় বা অবহেলায় ঢাকায় দানবীয় কাণ্ড ঘটিয়াছে তাহারা হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানেরই শত্রুতা ও ক্ষতি বেশী করিয়াছে। হিন্দুদের অন্ততঃ এই উপকারটুকু হইয়াছে যে, তাহারা চিন্তা করিলে নিজেদের অবস্থা বুঝিতে পারিবে ও প্রকৃত প্রতিকারের উপায় করিতে পারিবে, এবং তাহাদের অনেকের প্রকৃতিগত বীরত্ব ও মানবপ্রীতির পরিচয় দিবার সুযোগ ঘটিয়াছে। অবশ্য দৈহিক ও আর্থিক ক্ষতি ছাড়া যে-সব হিন্দুর সাহস কমিয়াছে ও ভীরুতা বাড়িয়াছে, তাহাদের গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে বটে।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩৩৭।

বিদেশের কথা

শ্রীযোগনাথ মুখোপাধ্যায়

স্বাধীন আফ্রিকার সঙ্কট

দেশ যতদিন পরাধীন থাকে ততদিন সব দুঃখদুর্দশা ও অনগ্রসরতার জন্য পরাধীনতাই দায়ী বলে মনে হয়। রাষ্ট্রনেতারা বলেন ও সাধারণ মানুষ তা নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করে যে, স্বাধীনতার আলোয় সব সঙ্কটের অন্ধকার মুহূর্তে মিলিয়ে যাবে। কিন্তু স্বাধীনতা যখন সত্যই আসে ও বছরের পর বছর অতিক্রান্ত হয়ে যায়, অথচ জাতির দুঃখের বোঝা কণামাত্র লাঘব হয় না তখন আশাহত মানুষের মনে প্রশ্ন জাগতে আরম্ভ করে—এই কি স্বাধীনতা? এরই জন্য এতদিন ধরে এত দুঃখবরণ? রাষ্ট্রনেতারা তখন বলেন, রাজনৈতিক স্বাধীনতাই স্বাধীনতার শেষ কথা নয়। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া তা অসম্পূর্ণ ও অর্থহীন, আর এই অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য অনেক বেশি কঠোর সংগ্রাম করতে হবে দেশবাসীকে। কিন্তু রাষ্ট্রনায়কদের এই ডাকে খুব কম ক্ষেত্রেই আগের মত সাড়া পাওয়া যায়।

তার প্রথম কারণ, নিঃসন্দেহে আশাভঙ্গের নৈরাশ্য আর দ্বিতীয় কারণ, আদর্শবাদের অবলুপ্তি, যার জন্য নেতাদের দায়িত্ব কিছু কম নয়। দেশ যতদিন পরাধীন থাকে ততদিন নেতা ও কর্মীদের ব্যবধান থাকে খুব সামান্য। বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে তাঁরা সংগ্রাম করেন, দুঃখভোগ করেন একসঙ্গে। দেশাত্মবোধের আবেগে সেদিন বিদ্যা, সম্পদ ও বংশমর্যাদার সব ব্যবধান লুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু পরাধীনতার অবসানে ঐ নেতারাই যখন শাসন-দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন প্রায় ক্ষেত্রেই দেশের সাধারণ মানুষ ও তাঁদের মধ্যে অলঙ্ঘ্য ব্যবধান গড়ে ওঠে। সে ব্যবধান ক্ষমতার, ভোগ-বিলাসের, পদমর্যাদার। সাধারণ মানুষের কাছে এটা বিদেশী শাসকদের হৃদয়হীন উপেক্ষার চেয়েও অসহনীয় মনে হয়। তাই দেশবাসীর কাছে নেতারা আবার যখন ত্যাগ ও দুঃখবরণের আহ্বান জানান, খুব কমজনের মনেই তা সাড়া জাগাতে পারে। তাছাড়া দেশগঠনের জন্য যে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য ও অগণিত দক্ষ কর্মী প্রয়োজন, বিশ্বের অধিকাংশ সদ্যস্বাধীন দেশগুলিতে, বিশেষ করে আফ্রিকায় তা নেই বললেই হয়। এ কারণে স্বাধীনতালাভের পর আফ্রিকার প্রত্যেকটি দেশকেই বৈষয়িক উন্নয়নের প্রয়োজনে আবার তাদের প্রাক্তন শাসকদের উপর নির্ভরশীল হ'তে হয়েছে। প্রাক্তন শাসকরাও এই নির্ভরশীলতার পূর্ণ সুযোগ নিতে কোথাও দ্বিধাবোধ করে নি। ফলে তাদের প্রত্যক্ষ শাসন এখন পরোক্ষ শাসনে রূপান্তরিত হয়েছে, আর অর্থনৈতিক শোষণ আগের চেয়েও বেড়েছে। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে তাদের দখলে যে সবচেয়ে ভাল জমি বা বাগিচাগুলি ছিল, তথাকথিত স্বাধীনতা খুব কম ক্ষেত্রেই তার ব্যতিক্রম ঘটাতে পেরেছে; পরন্তু বিশেষজ্ঞ, উপদেষ্টা অথবা মূলধন-নিয়োগকারী হিসাবে আরও অনেক নতুন শ্বেতাঙ্গ উপনেবেশী এসে ভিড় করছে সেখানে। তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিগত দুই দশকে স্বাধীনতা আফ্রিকার গণজীবনে যে আশার বাণী বহন করে এনেছিল তা আজ প্রায় ক্ষেত্রেই অর্থহীন শূন্য কথায় পরিণত হয়েছে। স্বাধীন আফ্রিকা এই কারণেই পরাধীন যুগের চেয়েও বেশি বিক্ষুব্ধ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আফ্রিকায় এ পর্যন্ত বত্রিশটি দেশ স্বাধীনতালাভ করেছে। আরও কয়েকটি দেশ অবিলম্বে পূর্ণ রাষ্ট্রের মর্যাদালাভ করবে। স্বাধীনতা তাদের কারও জীবনেই অবিমিশ্র আশীর্বাদ বহন করে আনে নি। এবং কোন কোন রাষ্ট্রের জীবনে তা দুর্বিষহ অভিশাপ হয়ে দেখা দিয়েছে। শাসকবিরোধী ষড়যন্ত্র, সামরিক অভ্যুত্থান, উপজাতীয় সংঘর্ষ ও অনর্থক রক্তপাত আজ আফ্রিকার রাষ্ট্রজীবনে প্রতিদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আফ্রিকার অধিকাংশ দেশের দারিদ্র্য আজ সীমাহীন, পরাধীন যুগের অর্থনৈতিক অবস্থা বজায় রাখাও কঠিন হয়ে পড়ছে কোন কোন দেশের পক্ষে।

আফ্রিকার আজকের এই দুরবস্থার জন্য প্রাক্তন শাসকদের কুকীর্তিই নিঃসন্দেহ সবচেয়ে বেশি দায়ী। সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশীরা যখন নিজেদের মধ্যে আফ্রিকা ভাগ করে নেয় তখন যে কোন উপায়ে সবচেয়ে বেশি দখলই ছিল তাদের একমাত্র চিন্তা। ফলে বহুক্ষেত্রে একটি বৃহৎ জাতি কয়েকখণ্ডে বিভক্ত হয়ে যায়। যেমন

বাকঙ্গো জাতি বিভক্ত হয় ফরাসী কঙ্গো, বেলজিয়ান কঙ্গো ও পর্তুগীজ শাসনাধীন এঙ্গোলার মধ্যে, বা সোমালি জাতি বিভক্ত হয় সোমালিয়া, ইথিয়োপিয়া ও কেনিয়ার মধ্যে। এই বিভাগ হয়ত আজ আফ্রিকার জনজীবনে অন্যতম বড় অশান্তির কারণ হয়ে দেখা দিত না যদি উপনিবেশীরা তাঁদের শাসনকালে ঐ সব কৃত্রিম পদ্ধতিতে সৃষ্ট রাজ্যগুলিতে শিক্ষা বিস্তার করে, রাজনৈতিক চেতনা জাগিয়ে তুলে ও বৈষয়িক সমৃদ্ধি ঘটিয়ে এক-একটি আধুনিক জাতি সৃষ্টিতে একটু যত্নশীল হতেন। কিন্তু সে পথ দিয়েই তাঁরা যান নি, আফ্রিকার কোন দেশে তাঁরা এমন পরিবেশ সৃষ্টি করেন নি যাতে আফ্রিকার কোন মানুষ উপজাতীয় গণ্ডির উর্ধ্বে নিজেকে বৃহৎ জাতির সদস্যরূপে ভাবতে পারে। ফলে স্বাধীনতা অর্জনের পরেই আফ্রিকার দেশগুলি উপজাতীয় দ্বন্দ্বে ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়। অধিকাংশ খণ্ডিত উপজাতি রাষ্ট্রের কৃত্রিম সীমা লঙ্ঘন করে ঐক্যবদ্ধ হ'তে চায় বা বৃহত্তর উপজাতিগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র উপজাতিগুলিকে বিতাড়িত বা ব্যাপকভাবে হত্যা করে একক অধিকার কায়েমে উদ্যত হয়। একারণে সীমান্ত বিরোধ আফ্রিকার রাষ্ট্রজীবনে এখন প্রাতিদিনের ঘটনা। এই বিরোধ সশস্ত্র সংঘর্ষে পরিণত হয়েছে সোমালিয়া, ইথিয়োপিয়া ও কেনিয়া সীমান্তে এবং উত্তরে আলজিরিয়া ও মরক্কো সীমান্তে। পশ্চিম আফ্রিকার যে কোন দেশেও কোনদিন সীমান্ত বিরোধ ভয়ংকরভাবে সুরু হয়ে যেতে পারে।

উপজাতীয় দ্বন্দ্বে এ পর্যন্ত সর্বাধিক প্রাণহানি ঘটেছে পূর্ব আফ্রিকার ক্ষুদ্র রাজ্য বুয়ান্ডায়। বেলজিয়ানদের রক্ষণমুক্ত এই দেশটিতে সংখ্যাগুরু বাহুতু উপজাতীয়দের আক্রমণে উয়াতুৎসি উপজাতিটি প্রায় নিশ্চিহ্ন হওয়ার উপক্রম হয়েছে। দৈত্যাকৃতি উয়াতুৎসি উপজাতি বিশ্বের সর্বোচ্চ মানবগোষ্ঠী, তাদের গড় উচ্চতা ৬ ফুট ৬ ইঞ্চি। কয়েক শতাব্দী ধরে তারা বাহুতুদের উপর প্রভুত্ব করছিল এবং বেলজিয়ানদের রক্ষণকালেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। যদিও উয়াতুৎসি উপজাতীয়রা বর্তমানে সংখ্যায় আড়াই লক্ষ ও বাহুতুরা পনের লক্ষ। রুয়াণ্ডা রক্ষণমুক্ত হওয়ার পর থেকেই উয়াতুৎসিদের উপর নির্যাতন সুরু হয়। সংখ্যাধিক্যের জোরে বাহুতুরা ক্ষমতাসীন হয় ও উয়াতুৎসিদের বিরুদ্ধে তাদের বহু শতাব্দী সঞ্চিত আক্রোশ ফেটে পড়ে। প্রাণভয়ে উয়াতুৎসিরা দলে দলে রুয়াণ্ডা ত্যাগ করে। প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে আশ্রয় নিতে থাকে। প্রায় তেত্রিশ হাজার যায় বুরুণ্ডিতে, আটচল্লিশ হাজার উগাণ্ডায়, ষাট হাজার কঙ্গোর কিভু প্রদেশে ও দশ হাজার টাঙ্গানিকায়। এই ভাবে প্রায় দেড় লক্ষ উয়াতুৎসি রুয়াণ্ডা ছেড়ে চলে যাওয়ায় ও বাকি একলক্ষ বাহুতুদের শাসন মেনে নেওয়ায় রুয়াণ্ডায় কোনরকমে শান্তি বজায় থাকে। কিন্তু গত বছরের শেষে দেশত্যাগী উয়াতুৎসিরা হঠাৎ রুয়াণ্ডার উপর সশস্ত্র আক্রমণ সুরু করে ও প্রায় রুয়াণ্ডার রাজধানী কিগালার কাছাকাছি উপস্থিত হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাহুতুদের প্রতিরোধই জয়ী হয় ও উয়াতুৎসিরা পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়। তারপরেই বাহুতুরা স্বদেশে ব্যাপকভাবে উয়াতুৎসি হত্যা সুরু করে। বাহুতুদের হাতে প্রতিদিন সহস্রাধিক উয়াতুৎসি নিহত হতে থাকে, সারা রুয়াণ্ডা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে দীর্ঘদেহী উয়াতুৎসিদের ক্ষতবিক্ষত দেহ। আফ্রিকার অন্যান্য রাষ্ট্রের চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত এই গণহত্যা বন্ধ হয়েছে, কিন্তু বাহুতু-উয়াতুৎসি মৈত্রী আজ অসম্ভবের চেয়েও অসম্ভব ঘটনা।

অশিক্ষা আফ্রিকার জীবনে অন্যতম অভিশাপ। আফ্রিকার কথ্য ভাষা সংখ্যাতীত হ'লেও তার নিজস্ব কোন লিখিত ভাষা বা সাহিত্য ছিল না। ঔপনিবেশিক শাসনকালেও তার ভাষা সমৃদ্ধ করার কোন উল্লেখযোগ্য চেষ্টা হয় নি। বিদেশী শাসকরা শুধু নিজেদের কাজ চালানোর প্রয়োজনে কিছু কিছু লোককে শিক্ষিত করে নিয়েছিল তাদের নিজস্ব ভাষায়; সে বিদ্যা কেরাণি বিদ্যার অতিরিক্ত কিছু নয়। এ কারণে যখন তারা চলে যায় তখন অধিকাংশ দেশের পক্ষে শাসনকার্য চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় লোক সংগ্রহ করাও কঠিন হয়ে পড়ে। যেমন, বেলজিয়ানরা যখন কঙ্গো ত্যাগ করে তখন আফ্রিকার অত বড় সমৃদ্ধ দেশটিতে একজনও আফ্রিকান চিকিৎসক ছিলেন না। আইনজীবী ছিলেন একজন আর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট ৩১ জন ও জুনিয়র হাইস্কুলের শিক্ষক ৮৪ জন। স্বাধীনতার পর এই রকম একটা দেশে যদি মারামারি কাটাকাটি সুরু না হয় ত হবে কোথায়! ঐ সামান্য ক'জন তরুণ গ্রাজুয়েটই কিছু দিনের জন্য কঙ্গোর শাসন-দায়িত্ব দখলে রেখেছিল।

পরাধীনতার যুগে আফ্রিকার যে সামান্য কয়েকজন ভাগ্যান্বেষী শাসন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করেন, আফ্রিকার স্বাধীন দেশগুলিতে তাঁরাই হয়ে ওঠেন সর্বাধিক গণ্যমান্য ব্যক্তি। সব ক'টি দেশে অবিলম্বে এমন একটা ধারণা গড়ে তুলতে সমর্থ হন তাঁরা, যে, তাঁরা আছেন বলেই দেশ কোন রকমে টিকে আছে, নইলে শত্রুদের আক্রমণে এই বহু কষ্টার্জিত স্বাধীনতাটুকুও রক্ষা করা সম্ভব হ'ত না। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে সৃষ্ট হয়েও

আফ্রিকার প্রত্যেকটি দেশ যে কঠোর একনায়কতন্ত্রে পরিণত হচ্ছে এই মনোভাবই তার প্রধান কারণ। যাঁরা একবার ক্ষমতা দখল করেছেন তাঁদের কাছে এখন দেশের কল্যাণের চেয়ে আমৃত্যু ক্ষমতাসীন থাকার প্রশ্নটাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। এ কারণে জনগণের যাবতীয় মৌল অধিকার হরণ করে দেশকে একটি কারাগারে পরিণত করতেও তাঁদের কোন দ্বিধা বোধ হয় নি। শুধু কয়েকটি প্রাক্তন ব্রিটিশ উপনিবেশ—সিয়েরা লিয়ঁ, নাইজেরিয়া, টাঙ্গানিকা, কেনিয়া ও উগাণ্ডায় এখনও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বজায় আছে, লাইবেরিয়া ও সোমালিয়াকেও এর পর্যায়ভুক্ত করা যেতে পারে। কিন্তু ঐ সব দেশে যেসব দল বা ব্যক্তি ক্ষমতাসীন আছেন অদূর ভবিষ্যতে তাঁদের ক্ষমতা হারানোর কোন সম্ভাবনা নেই। যেমন লাইবেরিয়ার প্রেসিডেন্ট টাবম্যান প্রথম প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হন ১৯৪৪ সালে, তারপর থেকে ১৯৬৪ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত তিনি পর পর পাঁচবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর এইবারের কার্যকাল শেষ হবে ১৯৬৯ সালে, যখন টাবম্যানের বয়স হবে ৭৩। তার পরেও যদি তিনি জীবিত থাকেন ও আরও একবার প্রেসিডেন্ট হওয়ার বাসনা প্রকাশ করেন, তাতে বাদ সাধার কোন শক্তি লাইবেরিয়ায় নেই। ঠিক এমনি ভাবেই নাইজেরিয়ায় ক্ষমতাসীন থাকবেন স্যার আবুবকর, কেনিয়ায় কেনিয়াট্টা, টাঙ্গানিকায় জুলিয়স নিয়েরের। উল্লেখিত ব্যক্তিদের দীর্ঘকাল ক্ষমতাসীন থাকার অন্যতম কারণ তাঁদের জনপ্রিয়তা। জোমো কেনিয়াট্টা দল-মত-নির্বিশেষে কেনিয়ার সকল লোকের প্রাণের মানুষ। টাঙ্গানিকায় ১৯৬০ সালে যে সাধারণ নির্বাচন হয় তাতে জুলিয়স নিয়েরেরের দল টাঙ্গানিকা আফ্রিকান ন্যাশনাল ইউনিয়ন (সংক্ষেপে 'তানু') ৭১টি আসনের মধ্যে ৭০টি আসনে জয়ী হয়। নিয়াসাল্যাণ্ডের হেষ্টিংস বাণ্ডা বা উত্তর রোডেসিয়ার কেনেথ কাউণ্ডাও যথেষ্ট জনপ্রিয় নেতা।

কিন্তু সব জনপ্রিয়তা হারিয়ে ও সারা দেশের অভিশাপ কুড়িয়ে আমৃত্যু ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছেন ঘানার প্রেসিডেন্ট এনক্রুমা। একদিন ঘানার বাইরেও তাঁর জনপ্রিয়তা বিস্তৃত ছিল, কিন্তু ক্ষমতার অন্ধ মোহে আজ তিনি সব হারিয়েছেন। যতদিন বাঁচবেন তিনি ততদিনই হয়ত স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকবেন, কিন্তু ডাঃ এনক্রুমার জীবনের মেয়াদ খুব দীর্ঘ বলে মনে হয় না। কারণ এ পর্যন্ত অন্তত পাঁচবার অতি কাছ থেকে তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

ইথিয়োপিয়ার সম্রাট হাইলে সেলাসি স্বৈরাচারী, কিন্তু প্রজাপালক ও জনপ্রিয়। মরক্কোর রাজা হাসান বা লিবিয়ার রাজা ইদ্রিসও কম জনপ্রিয় নন। সারা পৃথিবী জুড়ে রাজতন্ত্রের দুর্দিন সুরু হলেও আফ্রিকার এই তিন রাজা শুধু রাজত্বই করেন না, শাসনও করেন। একমাত্র সামরিক অভ্যুত্থান ছাড়া আর কোন কারণে আফ্রিকার ঐ তিনটি দেশ থেকে নিকট ভবিষ্যতে রাজতন্ত্রের অবসান হবে না। আফ্রিকার আরও একটি ক্ষুদ্র দেশ বুরুণ্ডি রাজতন্ত্রী।

প্রাক্তন বেলজিয়ান উপনিবেশ কঙ্গোয় এখনও গণতান্ত্রিক শাসন চালু আছে, কিন্তু তার মত দুর্দশাগ্রস্ত দেশ আজকের আফ্রিকায় একটিও নেই। গত তিন বছরে কঙ্গোয় সাতবার ক্ষমতার হাতবদল হয়েছে এবং প্রত্যেকটি নয়া শাসন ঐ দেশটিকে আরও বেশি দুর্দশার মুখে ঠেলে দিয়েছে। আজ কঙ্গো শতধাবিভক্ত এবং রাজধানী লিওপোল্ডভিলের বাইরে কেন্দ্রীয় শাসনের প্রভাব নেই বললেই হয়। প্রেসিডেন্ট কাসাভুবুর প্রায় কোন সাড়া-শব্দই পাওয়া যায় না এবং প্রধানমন্ত্রী আদোলা সদিচ্ছাসম্পন্ন ব্যক্তি হলেও তাঁর কর্মক্ষমতা ও জনপ্রিয়তা সীমিত। তাঁর নিজস্ব কোন রাজনৈতিক দল নেই এবং নিজ প্রদেশ ইকুয়েটর থেকে সংসদীয় নির্বাচনে তিনি জয়ী হতে পারেন নি। তিনি কঙ্গো পার্লামেন্টের মনোনীত সদস্য। কঙ্গোর অর্থনৈতিক বিপর্যয় এখন এমন চরম সীমায় পৌঁছেছে যে, যুক্তরাষ্ট্র ও বেলজিয়ামের আর্থিক সহায়তা ছাড়া তার বাঁচার কোন উপায় নেই। ১৯৬০ সালে কঙ্গো যখন স্বাধীন হয় তখন তার বাজেটে ঘাটতি ছিল ২০০ কোটি ফ্রাঁক; ১৯৬২ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ২৪০০ কোটি ফ্রাঁক ও ১৯৬৩ সালে ৩০০০ কোটি ফ্রাঁক। '৬৩ সালে কঙ্গো পার্লামেন্টে যে বাজেট প্রস্তাবিত হয় তাতে রাজস্ব বাবদ আয় ধরা হয়েছিল ১২০০ কোটি ফ্রাঁক ও ব্যয় ১৫০০ কোটি ফ্রাঁক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রাজস্ব আদায় হয় ৮০০ কোটি ফ্রাঁক, এ কারণে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৫০০ কোটি ফ্রাঁক। ক্রমবর্ধমান এই ঘাটতির পরিমাণ থেকেই বোঝা যায় যে, কঙ্গোর অবস্থা এখন কতটা দুর্দশাগ্রস্ত। কঙ্গোর বৈষয়িক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার এই অধোগতির সবচেয়ে বেশি সুযোগ নিচ্ছে প্রাক্তন শাসক বেলজিয়ানরা। কঙ্গো স্বাধীন হওয়ার সময় প্রায় এক লক্ষ বেলজিয়ান বাস করত সেখানে এবং স্বাধীনতার পর সাংঘাতিক অনিশ্চয়তা দেখা দেওয়ায় তারা হাজারে

হাজারে কঙ্গো ত্যাগ করে স্বদেশে ফিরে যায়। কিন্তু আবার তারা ফিরে এসেছে এবং কঙ্গোর সব খনিজ সম্পদ্ এখন তাদের দখলে।

সাহারা অঞ্চলে বা সাহারার দক্ষিণে ফরাসী সাম্রাজ্য থেকে উদ্ভূত বারোটি স্বাধীন দেশে কোথাও আজ গণতন্ত্রের অস্তিত্ব নেই। সর্বত্রই একদলীয় রাজনৈতিক অথবা সামরিক শাসন কায়েম হয়েছে। কিন্তু তাতে কোন দেশেরই প্রশাসনিক ব্যয় হ্রাস হয় নি বা সাধারণ মানুষের দুর্গতিরও কোন প্রতিকার হয় নি। যে অঞ্চল শাসন করতে ফরাসী আমলে পঁচিশজন শাসকই যথেষ্ট ছিল এখন সেখানে মন্ত্রীর সংখ্যা দুই শতেরও বেশি! পশ্চিম আফ্রিকার দাহোমে নামক দেশটির রাজস্বের প্রায় ষাট শতাংশ শুধু সরকারী কর্মচারীদের বেতন দিতেই ব্যয় হয়ে যায়। তার ওপর আছে শাসনকর্তাদের অবিশ্বাস্য বিলাস ব্যয়। দাহোমের পদচ্যুত প্রেসিডেণ্ট হুবাট মাগা ৩০ লক্ষ ডলার অর্থাৎ প্রায় দেড় কোটি টাকা ব্যয় করে নিজের জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন আর ফরাসী কঙ্গোর প্রেসিডেণ্ট এবি ফুলবার্ট ইউলু, প্রেসিডেণ্ট হওয়ার আগে যিনি ছিলেন ক্যাথলিক যাজক, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে দেখিয়েছিলেন, ভেকধারী যাজকের মনেও পার্থিব সুখভোগের বাসনা কত প্রবল এবং সুযোগ পেলে তা কত ভয়ংকর রূপ নিয়ে প্রকাশ পায়। যে দেশের জাতীয় অর্থনীতির ভরসা শুধু বনের কাঠ, সেই দেশের প্রেসিডেণ্টের দিনাতিপাত হ'ত বিলাসবহুল হোটেলে শ্যাম্পেনের ফেনিলোচ্ছল পাত্র-মুখে। গত বছর আগষ্ট মাসে ফরাসী কঙ্গোর শ্রমিকরা সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে প্রেসিডেণ্ট ইউলুকে গদিচ্যুত করেন।

পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলির মধ্যে শিক্ষার দিক্ থেকে দাহোমে সবচেয়ে অগ্রসর। ঔপনিবেশিকতার যুগে দাহোমের শিক্ষিত যুবকরা প্রতিবেশী দেশগুলিতে গিয়ে শিক্ষকতা করত বা সরকারের কাজ নিত। এ কারণে দাহোমে এতদিন গর্ব করে বলত, মস্তিষ্কই তার সেরা পণ্য। কিন্তু অন্যান্য দেশগুলির ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যার ফলে দাহোমের শিক্ষিত যুবকদের এই বিশেষ সুযোগের দিন শেষ হয়ে আসছে। নাইজার রিপাবলিকের প্রেসিডেণ্ট হামানি দিয়োভি গত বছর ডিসেম্বর মাসে তাঁর দেশ থেকে ১৬ হাজার দাহোমিয়ানকে কর্মচ্যুত ও বিতাড়িত করেন। তার ফলে নাইজার রিপাবলিকের প্রায় অর্ধেক শিক্ষকপদ ও অর্থদপ্তরের তিন চতুর্থাংশ পদ খালি হয়। পশ্চিম আফ্রিকার অন্যতম ক্ষুদ্ররাজ্য ক্যামেরুনেরও এখন শিক্ষিত বেকারসমস্যা বিশেষ প্রবল। সেখানকার শিক্ষিত কর্মপ্রার্থীরা কোন কাজের প্রত্যাশায় তিন মাস বিনা বেতনে কাজ করেন।

স্বাধীনোত্তর আফ্রিকার আর এক সমস্যা বৈষয়িক উন্নয়নের অসম অগ্রগতি। শহর বা শিল্পাঞ্চলে যত কাজ পাওয়া যায় গ্রামে তা পাওয়া যায় না। এ কারণে সব দেশেই ক্ষুধা ও দারিদ্র্য থেকে রক্ষা পেতে গ্রামবাসীরা শহরে এসে ভিড় করছে। আইভরি কোষ্টের রাজধানী আবিদজানে ১৯৩৯ সালে লোক ছিল মাত্র পনের হাজার, এখন ঐ শহরটির লোকসংখ্যা আড়াই লক্ষ। আফ্রিকার প্রত্যেকটি দেশের রাজধানী ও শিল্পাঞ্চল এইভাবে জনাকীর্ণ হয়ে উঠছে ও তার ফলে গড়ে উঠছে নোংরা বস্তি ও নগরজীবনের বিবিধ সমস্যা।

ফরাসীরা তাদের উপনিবেশগুলিকে স্বাধীনতা দেওয়ার সময় খণ্ড খণ্ড করে অনেকগুলি রাষ্ট্র সৃষ্টি করে। যেমন ফরাসী বিষুব-আফ্রিকাকে তিন টুকরো করে গাবোঁ, কঙ্গো ও সেণ্ট্রাল আফ্রিকা রিপাবলিক নামে তিনটি রাষ্ট্র সৃষ্টি করা হয়। এই রাষ্ট্রগুলির কোনটিরই জনসংখ্যা পঁচিশ লক্ষের বেশি নয়, এবং গাবোঁর জনসংখ্যা মাত্র পাঁচ লক্ষ। সাহারা অঞ্চলের মরুরাজ্য মরিটানিয়ার জনসংখ্যাও পাঁচ লক্ষের কম। এই খণ্ডিকরণের পেছনে ফরাসীদের দু'টি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এবং দু'টি উদ্দেশ্যই তাদের সফল হয়েছে। ফরাসীরা জানত যে, ঐ ক্ষুদ্র, জনবিরল, নিঃসম্পদ্ রাষ্ট্রগুলির পক্ষে কোনদিনই নিজের পায়ে দাঁড়ানো সম্ভব হবে না, এবং এ কারণে সকল অবস্থাতে তাদের ফ্রান্সের উপর নির্ভর করে থাকতে হবে। তবু যেটুকু অনিশ্চয়তা এ ব্যাপারে ছিল সেটুকুও ফ্রান্স দূর করে স্বাধীনতা দেওয়ার সময় তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে বিশেষ ধরণের কয়েকটি চুক্তি সম্পাদন করে।

ফরাসীদের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রসঙ্ঘে শক্তিবৃদ্ধি। সাম্রাজ্য হারিয়েও ক্ষুদ্র ফ্রান্স যে এখনও বিশ্বরাজনীতিতে বৃহৎ শক্তির মর্যাদা পায় তার প্রধান কারণ ঐ প্রাক্তন উপনিবেশগুলির সমর্থন। ফ্রান্স যেদিকে ভোট দেয় আফ্রিকার সাম্রাজ্য উদ্ভূত বারোটি রাষ্ট্রও সব সময় সেদিকে থাকে। ফ্রান্স-কর্তৃক কমিউনিষ্ট চীনকে স্বীকৃতিদান এই কারণেই যুক্তরাষ্ট্রকে বিব্রত করে।

ফরাসী সাম্রাজ্য-উদ্ভূত আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পাঁচটিতে গত বছর নানারকম রাষ্ট্রীয় অশান্তি দেখা দেয়।

জানুয়ারী মাসে তোগোল্যাণ্ডে সামরিক অভ্যুত্থান হয় ও তাতে প্রেসিডেণ্ট সিলভানাস ওলিম্পিও ঘাতকের হাতে প্রাণ হারান। ফেব্রুয়ারী মাসে আইভরি কোষ্টের প্রেসিডেণ্ট ফেলিক্স বইগ্নিকে হত্যার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। মার্চে চাদ সরকার একটি ব্যর্থ ষড়যন্ত্রের কথা ঘোষণা করেন ও বিরোধী দলের পাঁচজন নেতাকে ঐ ব্যাপারে গ্রেপ্তার করা হয়। আগষ্টে ফরাসী কঙ্গোর প্রেসিডেণ্ট ইউলুপন ত্যাগে বাধ্য হন যার কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। আর অক্টোবরে পদচ্যুত হন দাহোমের প্রেসিডেণ্ট মাগা। এই বছরে প্রথম অভ্যুত্থান হয় গাবোঁয়, এবং সর্বশেষ প্রেসিডেণ্ট হত্যার চেষ্টা হয় আই-ভরি কোষ্টে, এপ্রিল মাসে। ষড়যন্ত্রের নায়ক ছিলেন সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন প্রেসিডেণ্ট মিঃ আর্নেষ্ট বোকা, নিজের বোকামির খেসারত দিতে যিনি ধরা পড়ার আগেই আত্মহত্যা করেন।

কিন্তু গাবোঁর অভ্যুত্থান দমনে ফ্রান্স যেভাবে হস্ত-ক্ষেপ করেছে তাতে এ প্রশ্ন খুব স্বাভাবিক কারণেই উঠতে পারে যে, ফ্রান্সের সাম্রাজ্য-উদ্ভূত দেশগুলি সত্যই স্বাধীন কি না। গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী রাত্রে গাবোঁর রাজধানী লিবারভিলে হঠাৎ সামরিক অভ্যুত্থান হয় এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিনা রক্তপাতে সৈন্যবাহিনী ক্ষমতা দখল করে। প্রেসিডেণ্ট লিয় এম-বা বিদ্রোহীদের হাতে বন্দী হয়ে পদত্যাগ করেন। সৈন্যবাহিনী গাবোঁর প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও বিরোধী দলনেতা জাঁ-হিলেয়ার আউপমেকে প্রেসিডেণ্ট পদ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানায় এবং তিনি সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করে অবিলম্বে মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন। কিন্তু তারপরেই সম্পূর্ণ অযাচিতভাবে ফ্রান্স গাবোঁর আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে এবং বিভিন্ন স্থান থেকে বিমানযোগে সৈন্য এনে গাবোঁর বিদ্রোহী সৈন্যদের পরাস্ত করে ও সদ্য-গঠিত বিপ্লবী সরকারকে উৎখাত ক'রে ফরাসী অনুগত পদচ্যুত প্রেসিডেণ্ট এম-বাকে পুনরায় স্বপদে অধিষ্ঠিত করে। বিদ্রোহীদের ক্ষমতা দখলের সময় একজনেরও প্রাণহানি হয় নি, অথচ প্রেসিডেণ্ট এম-বার অবাঞ্ছিত শাসন পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করতে ফরাসী সৈন্যবাহিনী ১৮ জনকে হত্যা করে ও আহত করে প্রায় অর্ধশত ব্যক্তিকে। গাবোঁর সামরিক বাহিনী মাত্র ৪৩০ জন সৈন্য নিয়ে, সুসজ্জিত ফরাসী সৈন্য বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করা তাদের সাধ্যাতীত।

এ ব্যাপারে ফ্রান্সের বক্তব্য, গাবোঁর অভ্যুত্থানের পিছনে গণসমর্থন ছিল না। আর ১৯৬০ সালের চুক্তি অনুসারে গাবোঁর অনুরোধমত সামরিক সাহায্য দিতে ফ্রান্স বাধ্য। প্রথম যুক্তি অর্থহীন, কারণ কোন দেশের অভ্যুত্থানের পিছনে গণসমর্থন আছে কি না সেটা ফ্রান্সের বিচার্য নয়। আর দ্বিতীয় যুক্তিটি বাজে অজুহাত মাত্র। গাবোঁ বলতে গাবোঁর ক্ষমতাশীল সরকারকেই বোঝায়, পদচ্যুত সরকারকে নয়। এম-বার অবাঞ্ছিত শাসনকে ফ্রান্স গায়ের জোরে গাবোঁয় কায়েম করেছে শুধু নিজের প্রয়োজনে। গাবোঁয় যে ইউরেনিয়ামের খনি আছে তা ফ্রান্স কিছুতেই হাতছাড়া হতে দেবে না। ফরাসী কঙ্গোয় অভ্যুত্থানকালেও ফরাসী সৈন্যরা এমনি অযাচিত-ভাবে হস্তক্ষেপ করে। সুতরাং এ প্রশ্ন অবশ্যই উঠতে পারে যে, সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে যাদের রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্যপদ দেওয়া হয়েছে আফ্রিকার সেই দেশগুলি সত্যই স্বাধীন কি না।

তুমি আমি মরিলাম কত অক্ষৌহিণী

শ্রীজ্যোতির্ময়ী দেবী

তুমি আমি একদিন ছিলাম ছিলাম
সুজলাং সুফলাং শস্য ভারে শ্যামলাম্
ওই গ্রাম জনপদে নদনদীকূলে।
আমি জ্বালিতাম দীপ তুলসীর মূলে ;
চেরাগ লইয়া তুমি গেয়ে যেতে গান
শুনাতে—"মুস্কিল যাহা তাঁহাই আসান।"
সহসা শুনিনু কার উগ্র কণ্ঠস্বর,
'ছাড়ো ছাড়ো এই দেশ এই বাড়ী ঘর।'
নিমেষে মানুষ দেহে জাগিল বর্বর।
সত্য ত্রেতা শেষ—জাগে নূতন দ্বাপর ?
অট্ট হাসি' দ্রৌপদীর টানিছে বসন
নতশির রাজসভা মাঝে দুঃশাসন।
নব কুরু পাণ্ডবের নূতন কাহিনী।
তুমি আমি মরিলাম কত অক্ষৌহিণী ?

*　　*　　*　　*

কোথা ধর্ম কোথা জয় ! গান্ধারী পাষাণ।
শ্মশানে স্ত্রীপর্ব ? না, না, ঘরেই শ্মশান !
এবারে স্ত্রীপর্ব কোন্ ? তার বিভীষিকা
কোনো ইতিহাসে কভু নাই নাই লিখা !
ক্রৌঞ্চ মিথুনের কবি তাঁহার লেখনী,
মহাভারতের ব্যাস—কত কবি মুনি
নারিলা লিখিতে। শুধু আকাশে বাতাসে
নারীর ধিক্কার লজ্জা মূক ভাষে ভাসে।
নব কুরুক্ষেত্রে মাটি মোদের শোণিতে
সিক্ত হ'ল। ওঠে রাজ্য তার নম্র ভিতে।
—ইট মাটি কাঠ নয়, তোমার আমার
কঙ্কালে কঙ্কালে হ'ল বনেদ আধার।
তারা চুপি চুপি ফেলি' বাতাসে নিঃশ্বাস
বলে, কি মিলিল এবে চিরস্থায়ী বাস ?

*　　*　　*　　*

ওরা মোরা এক সাথে ছিলাম ছিলাম।
সে কোথায় ? কোন্খানে ? মুছে কি দিলাম !

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্

ভাবানুবাদ

৪ অধ্যায় ১৮ শ্লোক

শ্রীপুষ্প দেবী

এই ধরণীতে কখন দিবস কখনো আসে রাতি
আলোক আঁধার এই দুইজন তাহার যে চিরসাথী।
বিশ্বের সব সীমানার পার
যেখানে আলোক চিরদিনকার
নাহি দিবা সেথা নাহিক রাত্রি চির উজ্জ্বল ভাতি,
সকল নিয়ম যেখানেতে শেষ, নাহি দিবা নাহি রাতি।

তেমনি আমার অহঙ্কারের জড়ত্বে অবগাহি
ঢেকেছে যাঁহার জ্ঞান জ্যোতিভার ক্ষণেক প্রবেশ নাহি।
স্বার্থ আড়াল করিয়া দাঁড়ায়
ভুল বুঝি মন নিজ সুখ চায়,
সকলেরে ভাল না বেসে কেবল আপনার সুখ চাহি।
মোহের আঁধার শুধু চারিধার জ্ঞানের প্রবেশ নাহি।

কবে বলো মোর অহঙ্কারের কিছু আর রহিবে না,
তোমার পরশে যত কিছু আলো নিমেষে হইবে সোনা।
সকলের হিত করিব কামনা
শুধু নিজ সুখ বারেক চাব না
তখনি পাইব তব দরশন জড়ত্ব যাবে কাটি,
বিশ্ব প্রেমের উজল আলোকে সমতল হবে মাটি।

সেই দিন হতে ওগো শ্রেয়তম যাব আমি তব পানে
যত কিছু বাধা কিছু না মানিয়া শুধু তব সন্ধানে।
সত্য ও শিব সকলি হইবে
কল্যাণ ধারা শুধু বরষিবে,
রহিবে না ক্ষয়, হব নির্ভয় নাহি হব পথহারা,
চলিব ছুটিয়া সকলি প্লাবিয়া ভাঙ্গি আমিত্ব কারা।

যত ক্ষীণ ধারা যেমন চলেছে মহা জলধির পানে
না থাক শকতি তবু ছুটে চলে আপন প্রাণের টানে।
যা কিছু আমার সঁপিতে সঁপিতে
শুধু তব নাম জপিতে জপিতে
বিশ্বের হিত ব্রত সম্বল নিঃস্ব হইয়া যাব,
জানি সেই দিন অন্তরতম তব দরশন পাব।

বিশ্বের জনে ভালবাসি যদি আপনার জন জানি,
তুমি যা দিয়েছ তাহাতেই খুশী আপন প্রাপ্য মানি।
মানুষের যত দুর্ব্বলতারে
পারি যদি প্রভু ক্ষমা করিবারে
উদার বক্ষে হেরিব চক্ষে তব মুখচাঁদখানি,
প্রসন্ন মুখে রাখিবে মাথায় তোমার অভয়পাণি।

সেই গাছটা

শ্রীহেনা হালদার

নিঃসঙ্গ ছায়া শিরীষ গাছটা দেখেছিলাম কোথায় ?
কে জানে কোন্ তেপান্তরের নিবিড় নিতল নির্জ্জনতায়।
সবুজ সবুজ পাতা মেলে
বেগ্নী ছায়ার ছাতা মেলে
দাঁড়িয়েছিল :
রৌদ্র হরণ শুভেচ্ছাকে দু'হাত ভরে বাড়িয়েছিল।
পরাক্রান্ত সূর্যকেও নিভিয়ে দিতে চেয়েছিল !
জানি না ঐ দুঃসাহস কেমন করে পেয়েছিল।
পাণ্ডু-পাদপ বদান্যতা কবে দেখেছিলাম কোথায়……
আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন দেখার হয়ত নিছক দুর্বলতায়।

এ জন্মে কি আরেক জন্মে দেখেছিলাম ?
সত্যি দেখেছিলাম ? নাকি কল্পনাতে এঁকেছিলাম ?
এই গ্রহে কি অন্য গ্রহে ? এখন আমার
নেই ক' মনে। সারি সারি শস্যশ্যামল ক্ষেত ও খামার
সবই আছে। কেবল কোথাও শিরীষ গাছের
চিহ্ন নেই…
ও গাছটা কি পল্লবিত হয়েছিল মনে মনেই ?
দীঘল-দীঘল ডালে পালায় নিবিড় সবুজ :
ভালবাসার হৃদয় অবুঝ…
হেমন্তে আর বসন্তে তার ব্যগ্র ডালা সাজিয়েছিল,
বৈশাখে শ্রাবণে কত কড়ি-কোমল বাজিয়েছিল।
ক্লান্ত পথিক ভুলেও মায়া বাড়ালো না—
পায়ে পায়ে শীতল ছায়া মাড়ালো না—
গাছটা কি সেই অভিমানে হারিয়ে গেল হঠাৎ কোথায় ?
অবিশ্বাসের তপ্ত-বালির কঠিন কঠোর নিষ্ঠুরতায় !

শস্য

শ্রীকৃতান্তনাথ বাগচী

পুরাতন প্রান্তরের শূন্যতার গ্লানি
ধুয়ে মুছে চলে গেছে রৌদ্র, ঝড়, জলে,
নবীন ধানের চারা তীক্ষ্ণ শ্যাম হানি
নিঃশেষ করেছে নীল মরুপ্রেত দলে।

দুরান্তের বার্তা আনে বকের বলাকা
তরঙ্গের রূপকথা, নক্ষত্রের সুর ;
আকাশের স্বর্ণরেণু সমুজ্জ্বল পাখা,
বাতাস নিঃশ্বাস যেন পরম বন্ধুর।

ফসলের স্বপ্নে ভোর দিগন্তের আঁখি,
অবাক্ বিকেল আর আশ্চর্য সকাল,
ধরণী নিয়েছে মুখে কি মাধুরী মাখি',
প্রাণের প্রশস্তি রচে মৌন মহাকাল।

মৃত্যুঞ্জয়ী কবিতার অলক্ষ্য কুলায়
জীবন বুনিয়া চলে নিষ্ঠুর ধুলায়।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি সম্পর্কে আলোচনা করতে হ'লে প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে ছবি বলতে, চলতি মতে, আমরা কি বুঝি। সংক্ষিপ্ত উত্তর, ছবি সুন্দরের রূপ, শিল্পী ও রসগ্রাহীকে আনন্দ দানই তার অস্তিত্বের উদ্দেশ্য ও ধর্ম। বলাই বৃথা, রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি উদ্দেশ্য-ভ্রষ্ট নয়, তবে জনসাধারণের কাছে এখনও গুণের উপযুক্ত আদর হয় নি—চলতি রুচির সঙ্গে মিল না থাকায়। ধর্ম বলতে রূপের বাহ্যিক ও অন্তর্নিহিত গুণের কথা বলতে চেয়েছি। বাহ্যিক রূপকে সমালোচক প্রদত্ত বিশেষণের পক্ষপাতিত্বে একেবারে বাতিল করা যায় না। কারণ, যে কোন গুণই আবিষ্কার করা হোক, চাক্ষুস রূপকে অবলম্বন করেই তার অস্তিত্ব। এ ক্ষেত্রে শিল্পীর কল্পিত রূপ ও ভাব-ব্যক্তি অগ্রাহ্য করার উপায় নেই। এ বিষয় আরও কিছু বলার আছে, পরে আলোচনা করা যাবে।

ছবির সঙ্গে সুন্দর, রসগ্রাহী, উদ্দেশ্য এবং ধর্ম জড়িয়ে যাওয়ায় প্রশ্ন জটিল হয়ে উঠেছে। এক কথায় মীমাংসা হবার উপায় নেই; কারণ রসিক যে মতেরই অনুগামী হ'ন, সচরাচর মতের সমর্থন আসে সংস্কারবদ্ধ রুচি থেকে। যেখানে সংস্কার বা সাময়িক রুচি অর্থাৎ চলতি ফ্যাশানের শাসন মেনে চলতে হয়—সেখানে ভালমন্দের বিচার সম্বন্ধে রসগ্রাহীকে উদার হ'তে হ'লে ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও বশ্যতা সংশ্লিষ্ট সংস্কারের উপর জুলুম এসে পড়ে। বিশ্বাসের উপর অত্যাচার বা স্বার্থজড়িত বশ্যতাকে অস্বীকার সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব ছবির রূপ ও গুণের বিশ্লেষণ ও বিচার যে কোন মতবাদীর উক্তিতে নথিবদ্ধ হোক না কেন সেইটেই চরম কথা নয়।

ছবির রূপ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথেরও একটা মত ছিল। সাহিত্য কাব্য বা সঙ্গীত রচনায় শৃঙ্খলার নীতি মানলে কি হয়—ছবিকে তিনি ভিন্ন স্তরে বসিয়েছিলেন—সম্ভবত নূতন নীতির প্রতিষ্ঠার জন্য। তাঁহার বিশ্বাস অনুসারে যে ধরণের ছবি আঁকলেন তা গতানুগতিকতা থেকে সরে দাঁড়াল; সাংস্কারিক প্রত্যাশার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারল না। কিন্তু রসিককে আনন্দদানে তাঁহার কোন কৃপণতা ছিল না। সময়টা তখন গুরু অবনীন্দ্রনাথের যুগ। ছবি দেখা এবং বোঝায় সাড়া পড়ে গিয়েছে। বাঁকা আঙ্গুল, ভাঙ্গা পা, সংক্ষেপে বিকৃতিপূর্ণ গঠন এবং ভুল ড্রয়িং দেখলেই বিশেষ প্রকারের রসিকরা শিল্পীকে পাকড়াও করে সম্মানের বোঝা চাপাতে আরম্ভ করেছেন। এমনকি নির্দিষ্ট মূল্যের অধিক দিয়ে ধারে কেনার প্রস্তাবও শুনেছি। সমঝদারের আন্তরিকতা এবং দেশী আর্টের প্রতি নেকনজর এর চেয়ে বেশি কি দিয়ে প্রমাণিত হ'তে পারে!

ছবি সম্বন্ধে রসচেতনার স্রোত তখন বেগবান্ গতিতে ছুটেছে, রুচির প্রবাহ বহুমুখী হয়ে গিয়েছে। নতুন আন্দোলন উঠেছে ধাঁধার মারপ্যাঁচ নিয়ে। সংক্ষেপে বিদেশ থেকে আমদানি, টাটকা Interpretation-এর ফলে চলতি মত টলায়মান। তখনকার দিনে সাধারণতঃ লোকে জানত, যারা শখের জন্য ছবি আঁকে তারা, হয় অর্থশালী বেকার মানুষ, অথবা বিকৃতমস্তিষ্ক। অকাজে সময় কাটানোর জন্যই ছবির পিছনে ধাওয়া। ফাটা বা শূন্য দেওয়াল ভরাট করার প্রয়োজন হ'লে ছবি কাজে আসে বটে কিন্তু কৃষ্টির পৃষ্ঠপোষকতার জন্য ছবি কেনার পিছনেও কোন ধোঁকা আছে। আসলে কৃষ্টির দোহাই পেড়ে অসম্ভব দামে বিলাতী ছবি কেনা মানেই দম্ভের প্রচার। ধনী হিসাবে মালিকের আত্মজাহির। দেশী ছবি ত লাখের অঙ্ক নিয়ে কারবার করে না! কে কত অধিক মূল্য দিয়ে বিদেশী সৌখীন সামগ্রী কিনতে পারে, এইটুকু দেখানই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। ভিনিশিয়ান কাট গ্লাস-এর ঝাড়, সোনার বা রূপার থালা, পারস্য বা আরব দেশের গালিচা; সবই কেনা হ'ত দম্ভ প্রচারের জন্য। এইরূপ ক্ষেত্রে বেশির ভাগ ক্রেতারই

রুচি প্রশ্ন-সাপেক্ষ; কারণ অর্থের বিনিময়ে রাতারাতি সুরুচির মালিক হওয়া সম্ভব নয়। আন্তরিক অনুপ্রেরণা এবং সুন্দরের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ব্যতীত ব্যক্তিগত মতও যা হয় তা নির্দিষ্ট আদর্শকেই আরাধ্য ক'রে তোলে। এইরূপ ক্ষেত্রে বেশির ভাগ সময় আদর্শের বাইরে বিচার বিড়ম্বনা। ভিন্ন প্রকারে রুচি গঠনের শিক্ষায় থাকে সাময়িক চলতি ফ্যাশানের তাগিদ; যার ফলে সমষ্টিগত মত মেনে নিতে হয়। নিরাপদ্ আশ্রয়ের আড়ালে থেকে সুরুচিসম্পন্ন বা তথাকথিত মার্জিত হওয়ার এমন সুবিধা আর দু'টি নেই। এই জাতীয় সহজপন্থী রসিক বাদ দিলে যাঁরা রসগ্রাহীর স্পৃহাকে আন্তরিকতার সহিত বাড়িয়ে তোলেন—তাঁদের বিচারকে রূপ-সৃষ্টির এক প্রকারের প্রেরণা বলেই ধরতে হয়। কারণ, উৎসাহের অভাবে রূপ-স্রষ্টার মন বিকল হয়ে যায়। রসিকই এরূপ ক্ষেত্রে তার সমবেদনার দ্বারা শিল্পীকে দ্বন্দ্বের মধ্যে এগিয়ে দিতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবিতে রূপ-পরিকল্পনা ও প্রকাশ-ভঙ্গির যে বৈশিষ্ট্য আছে তা তুলনাসাপেক্ষ নয়, কারণ, কোন বিশেষ শিক্ষাপদ্ধতি বা আদর্শ অনুসরণ করে তিনি রূপ ধরার কৌশল আয়ত্ত করেন নি। ফলে ছবিকে সাজিয়ে তোলার প্রথায় অর্থাৎ Composition-এ যতটা সংস্কার-গ্রাহ্য শৃঙ্খলা, সহজেই যা চোখে পড়ে, তা দৈবাৎ ঘটনার ফল বলেই আমার ধারণা। শৃঙ্খলার দীক্ষায় যাঁরা শিক্ষা লাভ করেছেন, তাঁদের মধ্যে অনেক দক্ষ শিল্পীকেও এই রূপ-গঠনে লাভবান্ হ'তে দেখেছি! তবে ভাগ্যদবতা সব সময় সকলের জন্য প্রসন্ন হয়ে থাকবেন, এমনটি আশা করা অন্যায়। তাই শিক্ষাধীন বিশ্বাসের উপর নির্ভর করতে হ'লে, ছবি ভরাটের সময় প্রধান দ্রষ্টব্য রূপকে উপযুক্ত স্থান না দিলে, সঙ্গীতে সুর বা তাল কেটে যাবার মতই ছবির প্রকাশভঙ্গ খাপ-ছাড়া হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ সামঞ্জস্যের এই জটিল সমস্যা কি ভাবে সামলিয়েছিলেন তা ধারণা করাও কষ্টসাধ্য ব্যাপার। অবাক্ হয়ে ভাবি, দেশী বা বিদেশী কলাবিদের দক্ষতা, যা নির্ভরশীল হ'তে হাজার হাজার বৎসর লেগেছে, সেই অভিজ্ঞতা অগ্রাহ্য করে নিজের মতে যথেচ্ছ চলার সাহস এবং শক্তি পেলেন কেমন করে। আমার বিশ্বাস, শিক্ষানবীশির কঠোর ও নিরস নিয়মই রসরাজকে আতঙ্কিত করে তুলেছিল। সব সময় ভীতির তাড়নায় পীড়িত হওয়া অপেক্ষা রূপ সন্ধানের পথে বেপরোয়া হয়ে নিজেকে ব্যক্ত করার জন্য তিনি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। সহজ আদিম মানুষ অদমনীয় উচ্ছ্বাসকে প্রকাশ করার তাগিদ এলে যেমন কোন বাধাই মানতে চায় না,—বলার কথা ব'লে ফেলে শান্তি খোঁজে, ঠিক সেই ভাবে রূপ-স্রষ্টা কল্পনার রূপ চাক্ষুষ করার জন্য অস্থির হয়ে ওঠেন। আপন সৃষ্টির মধ্যে তিনি পেতে চান সুন্দরের সান্নিধ্য যা রূপকারের কাছে আনন্দের সম্বল। অন্যথায় শিল্পীর বাঁচার উদ্দেশ্যই অনর্থক হয়ে যায়। ঘটনাটি কতকটা আসন্নপ্রসবা জননীর মত। সন্তান গর্ভে স্থান পেলে সে ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত শান্তি নেই। গর্ভস্থিত নতুন প্রাণীকে দেখার আশায় জননী যাবতীয় বেদনা সহ্য করে। সন্তান পৃথিবীর আলোকে মায়ের বুক যখন জড়িয়ে ধরে তখন শিশুর রূপ বা গুণের বিচারে বাইরের লোক যাই বলুক, মাতার কাছে সদ্যজাত শিশুর সব কিছুই সুন্দর হয়ে ওঠে। সে যে আনন্দের প্রতীক। ছবির কল্পনা মাথায় এলে রবীন্দ্রনাথ সরল ও দুর্দান্ত শিশুর মতই রং ও রেখার খেলায় মত্ত হয়ে ওঠেন। আগুন নিয়ে খেলা, তথাপি হাত পোড়ার ভয় নেই। ছবির উপর সম্ভব-অসম্ভব সঙ্গত-অসঙ্গত দাবিরও অন্ত নেই। দুর্দান্ত যা চায় তা পাওনা হিসাবেই চায়। দাবির কথায় দয়ার প্রশ্ন ওঠে না। সুতরাং স্বীকার করতে হয় তিনি স্বয়ংসিদ্ধ। তাই বলে তাঁহার আঁকা ছবিকে সুন্দরের পংক্তি থেকে বাতিল করা চলে না। আমার ধারণা রবীন্দ্রনাথের ছবি আঁকার প্রেরণাও অদ্ভুত সূত্র থেকে। অনুমান করি লেখা সংশোধনের সময় রচনার কাটাকাটিতে অনাহুত রেখার উৎপাতে হিজি-বিজির ভিড় কটুদৃশ্য হয়ে উঠত। ওদের পাশ কাটাবারও উপায় নেই। গত্যন্তরে হিজিবিজিকেই সুশ্রী করতে হয়। এই সুযোগে রেখার হুড়োমুড়ির ভিতরে ছবির অস্পষ্ট রূপ তাঁহার অজ্ঞাতেই আত্মপ্রকাশ সুরু করে দিল। হিজিবিজির ব্যূহ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য ছবিও ব্যাকুল হয়ে উঠল। আপন সত্তায় স্বতন্ত্র ভাবে প্রতিষ্ঠার জন্য অভিযোগ সুরু করে দিল। অভি-

যোগ বলব না, এখানেও দাবি এল—শিল্পীকে বশ মানাতে। কবি ধরলেন তুলি, ছবি এল রং ও রেখার অর্ঘ্য নিয়ে। কবির ভাব শিল্পীর ভাষায় প্রকাশ হ'তে লাগল। ছবির বিষয়বস্তুতেও চলতি ধারার কাহিনী নেই। ছবির চৌহদ্দির—ভিতরে ঢুকলেই দেখা যাবে প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিচিত্র জানোয়ার, বা পাখী। হাজার হাজার বৎসর অদৃশ্য থেকে হঠাৎ অতীতকে সবাক্ করে তুলেছে। ওরা কবির ভাব নিয়ে শিল্পীর ভাষায় কথা কয়। কি কথা; যে বোঝে সেই জানে। অতীতের মন গড়া আবেষ্টনী থেকে বেরিয়ে পড়লে দেখি স্বপ্ন-রাজ্যে এসে পড়েছি। রহস্যময়ী নারী সামনে দাঁড়িয়ে, অবর্ণনীয় তার রূপ ও সাজ। পরিচ্ছদে স্বচ্ছ হালকা রং-এর শাড়ী। বহুরূপীর মতই অঙ্গবস্ত্রে রং-এর অদল-বদল চলেছে। কৌতূহল উত্তেজিত হয়ে উঠলেই হাল্‌কা রং গাঢ় হয়ে যাচ্ছে। রূপ দেখায় প্রয়োজন অপেক্ষা বেশি জানার চেষ্টা করলেই আশঙ্কা আসে, পাছে দৃশ্য-রূপ স্বপ্নের মোহ কাটিয়ে বাস্তবে এসে পড়ে। সেখানে হিসাব করে জহুরী সুন্দরকে যাচাই করে। দাম স্থির হয় চলতি মানদণ্ডের মাপে। রস গ্রহণ যে নিরবচ্ছিন্ন, ব্যক্তিগত উপলব্ধির বস্তু। সুন্দরের রূপ কোন নির্দিষ্ট আকারের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে না। সুন্দরের ব্যাখ্যা বা Interpretation ও যে দেশ-কাল-পাত্র ও সাময়িক রুচি চাহিদায় পরিবর্তনশীল। রূপ দর্শনে একের বিচার যে অপরের যুক্তির দ্বারাই খণ্ডন হতে পারে—এসব কথা ভাববার অবকাশ পাই কেমন করে।

Interpretation ও একটি হেঁয়ালীপূর্ণ তত্ত্ব; সুবিধা, স্বার্থ ও বিশ্বাস অনুসারে ব্যাখ্যার বিশ্লেষণ হয়ে থাকে। দৃষ্টান্তের অভাব নেই যেমন, ভক্তের বিশ্বাস অনুসারে শালগ্রাম শিলা দেবতার রূপে সর্বগুণাধার, কেবলমাত্র নুড়ি নয়। অপর দিকে ভূতত্ত্ববিদ্ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দ্বারা ভক্তের বিশ্বাস চুরমার করে দিয়ে বলেন, ওটা নীরেট পাথর। অনাদি কালের বস্তু নয়, ওর বয়স আছে; লাখের ওপর লাখ বৎসর যোগ দেওয়া চলে।

মাটির বুক চিরে নুড়ির জন্ম-ইতিহাস পাওয়া গিয়েছে। এখন কোন্ বিশ্বাসের বিচারকে সত্য বলে মানা যাবে? Oscar Wilde-এর লেখা Artist Critic প্রবন্ধে শিল্পীর কল্পনা ও সৃষ্টিকে সমালোচকের প্রয়োজনে কেবলমাত্র উপলক্ষ্য করে ফেললেন, ছবির বাহ্যিক রূপ ও গুণের অন্তর্নিহিত সত্য রইল আপন আকারে বন্দী হয়ে। বন্দীকে নিষ্কৃতি দিয়ে বাইরে আনার জন্য সমালোচক পরালেন ছদ্মবেশ। প্রচারের কৌশলে সমালোচকের ব্যাখ্যাই সাধারণের কাছে সত্য বলে প্রমাণিত হ'ল। অভিযোগ নেই, কারণ, ভক্ত যদি তার বিশ্বাস অনুসারে একটি পাথরের নুড়ীকে দেবতার পদে অধিষ্ঠিত করতে পারে—যাবতীয় গুণে ভূষিত করে নুড়িকেই সর্বগুণাধার ভাববার অধিকার পায়, তা হ'লে সমালোচকের বিচারে শিল্পীর গড়া রূপকে ইচ্ছামত গুণের অধিকারী করারও অধিকার আছে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবির বিচারে যে রস-চেতনার প্রয়োজন, তা বিশেষ দলভুক্ত পক্ষপাতিত্বের বাইরে।

আমার শেষ বক্তব্য এই যে, রুচি এবং তার ক্রমবর্দ্ধনকে মানতে হ'লে রূপের সহিত ঘনিষ্ঠতাকেও মানতে হয়। যার প্রভাব ধীরে সুন্দরের সঠিক খবর রসিকের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়; আমার বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবির সঙ্গে আন্তরিক ঘনিষ্ঠতা বাড়লে সত্যের রূপ আপনা হতেই উদ্ঘাটিত হবে।

মুণ্ডকোপনিষদ্

শ্রীচিত্রিতা দেবী

শঙ্করাচার্য যে এগারটি উপনিষদের ভাষ্য করে গেছেন,—'মুণ্ডক' তাদের অন্যতম। অথর্ববেদে সর্বসমেত আটাশটি উপনিষদ্ আছে। তার মধ্যে শঙ্করাচার্য মাত্র দু'টি উপনিষদের ভাষ্য রচনা করেছেন,—'প্রশ্ন' ও 'মুণ্ডক'। অনেকে বলেন, তার কারণ, শঙ্করাচার্য বেদান্ত বা ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যেই উপনিষদের ব্যাখ্যা করেছেন। যে যে উপনিষদের দ্বারা বেদান্তসূত্রের অদ্বৈততত্ত্ব প্রকাশিত হয়,—সেই সেই উপনিষদের ব্যাখ্যা করেছেন।

আবার কেউ বা বলেন, শঙ্করাচার্যের সময়ে, এই এগারটি উপনিষদ্‌কেই প্রামাণ্য বলে ধরা হ'ত। আর সেইজন্যেই তিনি এই ক'টি উপনিষদের ভাষ্য করেছেন।

'মুণ্ডক' অথর্ববেদের মন্ত্রকাণ্ডীয় উপনিষৎ, আর 'প্রশ্ন' সেই অথর্ববেদেরই ব্রাহ্মণ-ভাগে গ্রথিত।

'মুণ্ডন' মানে মূল কর্তন, একেবারে মাথা মুড়িয়ে ন্যাড়া করে দেওয়া। সনাতনপন্থীরা বলেন, এই উপনিষদে এমন সব জ্ঞানের কথা আছে, যার দ্বারা অবিদ্যার মূলশুদ্ধ উপড়ে ফেলা যায়। চিত্ত একেবারে নির্মল পরিষ্কার হয়ে যায়।

কেউ কেউ বলেন, 'মুণ্ডক' অর্থাৎ ন্যাড়ামাথা কোন সন্ন্যাসী অথবা বৌদ্ধ শ্রমণের লেখা বলে এই উপনিষদের নাম 'মুণ্ডক'।

এই গ্রন্থে সন্ন্যাসের বহু প্রশংসা আছে। সেই যুক্তিতে একে সন্ন্যাসীর লেখা বলা চলতে পারে; কিন্তু বৌদ্ধভাবের বিশেষ কোন কথা এতে আছে বলে ত মনে হয় না। বরং যজ্ঞের প্রশংসা আছে। বেদবিহিত, মন্ত্রচালিত যজ্ঞই যে সামাজিক মানুষের প্রধান কর্তব্য, সে কথাও বহুবার বলা হয়েছে। কাজেই একে ঠিক বৌদ্ধভাববাদী বলা চলে না। তবে এটা ঠিক যে, এই উপনিষদেই বোধ হয় প্রথম এত বেশী বার, এত বেশী জোর দিয়ে ন্যায়, ধর্ম ও সত্যের কথা বলা হয়েছে।

কায়মনোবাক্যে সত্য হয়ে ওঠা ছাড়া জ্ঞানলাভের আর দ্বিতীয় উপায় নেই।

এই গ্রন্থের মধ্যে মানুষের নৈতিক ও চারিত্রিক দিক্‌টা খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

অবশ্য 'কঠ' প্রভৃতি অন্যান্য উপনিষদেও মানবসত্তার উপরেই জোর দেওয়া হয়েছে বেশী। বহু পাণ্ডিত্য ও কঠোর তপস্যার চেয়েও আত্মদ্রষ্টা জ্ঞানী পুরুষের সঙ্গ অনেক বেশী দামী। শত পাণ্ডিত্যেও যা বুঝতে পারবে না—দ্রষ্টা মানবের সান্নিধ্যে এলেই তা অনেক পরিষ্কার হয়ে যাবে।

"ন নরেনাবরেণ প্রোক্ত এষ
সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ···"

প্রাকৃত যে জন,
শত উপদেশে তাঁহারে বুঝাতে নারে,
চিন্তার জাল বহু বিকল্পে,
তাঁহারে ধরিতে চায়।
অভেদদর্শী, মুক্ত পুরুষ,
যদি বলে তাঁর বাণী,
সব সংশয় তবে হয় অবসান।
বুদ্ধির ছল বিভিন্নরূপে প্রমাণ করিতে ছোটে,
তবুও তাঁহারে কখনো ধরিতে নারে।
তর্কের দ্বারা তাঁরে নাহি পাওয়া যায়।

তার্কিক নয়, যে আছে, কেবল,
শুদ্ধ জ্ঞানের ভাণ্ডারী
তারি উপদেশে,—শুধু তাঁরে
জানা যায়॥

সব উপনিষদেই একথা নানাভাবে ব্যক্ত হয়েছে যে, মানবজীবনের উদ্দেশ্যই হ'ল আত্মদর্শন।—"আত্মানং বিদ্ধি!"—নিজেকে জান—"আমার পরাণবীণায় লুকিয়ে আছে অমৃত গান।" সেই গানকে আবিষ্কার কর। নিজেকে নিজের অহঙ্কার থেকে মুক্ত করে বাইরে এনে দেখ।

কিন্তু কেমন করে সে দেখা দেখতে পাব?—নিজের সঙ্গে নিজের আলাপ-পরিচয় জমবে কি করে?

এর উত্তর অবশ্য নানা উপনিষদে নানা ভাবে বলা হয়েছে। উপনিষদের সেই সব উক্তিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন মতবাদ গড়ে উঠেছে।

'মুণ্ডক' উপনিষদে ঋষি অঙ্গিরা বললেন, আত্মদর্শনের উপায় হ'ল—সত্য, জ্ঞান ও ব্রহ্মচর্য্য।

মানবজীবনের লক্ষ্য হ'ল জ্ঞানলাভ। এইখানেই ত মানুষের সঙ্গে পশুর তফাৎ। মানুষ শুধু খেয়ে-দেয়ে পশুর মত বাঁচতে চায় না,—সে জানতে চায়। সে জ্ঞানের পথিক।

অনেক সময়ে অবশ্য মনে হয়, মানুষ যেন অবোধ অজ্ঞানের মধ্যেই দিব্যি খুশিতে আছে। সেটা শুধু জড়তার প্রভাব। সে প্রভাব কেটে গেলেই দেখা যাবে যে, সন্ধানী মানুষ তার অন্তরের দীপশিখাটি খুঁজে পেয়েছে, যে দীপ নিয়ে সে জ্ঞানের পথে চলতে পারবে।

মানুষের এত হাজার বছরের ইতিহাস শুধু তার এই পথ চলার ইতিহাস—সন্ধানের ইতিবৃত্ত।

এমনি এক সন্ধানী জ্ঞান-পথিকের ছোট একটু গল্প দিয়ে এই উপনিষদের সুরু। সুখের মধ্যে বাস করেও মানুষ যে শুধু সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটিয়েই সুখী হয় না, তবু যে সে জ্ঞানের সন্ধানে ঘুরে মরে, এই গল্পে তারই আভাস।

গৃহপতি শৌনক নিশ্চয়ই মহাধনী। কারণ তিনি মহাশাল। অর্থাৎ বিশাল গৃহের অধিপতি। তিনি গেলেন শিষ্য হয়ে, ব্রহ্মজ্ঞানী মহাঋষি অঙ্গিরার কাছে;—জ্ঞানের কথা শুনতে। বললেন, "প্রভো,—এমন কি কিছু আছে, যা জানলে, সমস্তই জানা হয়ে যায়?"

এই হ'ল এ গ্রন্থের সূত্রপাত। অবশ্য তার আগের ছত্রে, অর্থাৎ প্রথমেই ব্রহ্ম-বিদ্যার ইতিহাস বলা হয়েছে। এই বিদ্যা, এই মহাজ্ঞান কি করে প্রকাশিত হ'ল জগতে তারই কাহিনী। ব্রহ্মা নিজে জ্যেষ্ঠ পুত্র অথর্বাকে এই বিদ্যা দিয়েছিলেন। এই অথর্বা কি অথর্ববেদ-প্রণেতা?—মুণ্ডকোপনিষৎ যে অথর্ববেদের সঙ্গে যুক্ত—তার সঙ্গে কি এই বাণীর কোন তাৎপর্যগত মিল আছে?

এই ব্রহ্মা কিন্তু পুরাণোক্ত ব্রহ্মা নন। ইনি হিরণ্যগর্ভ অথবা প্রথম প্রাণরূপ বা প্রাণতত্ত্ব।

বেদান্ত সাহিত্যে ব্রহ্মা বলতে হিরণ্যগর্ভই বুঝিয়েছে, যিনি ব্রহ্ম-সন্তান,—প্রথমজ বা প্রথমজাত। অর্থাৎ ব্রহ্ম হ'তে প্রথমেই এই সৃষ্টির মূল তত্ত্ব বা আদি প্রাণরূপের সৃষ্টি হ'ল।

তা হ'লে এই বাক্যের এই রকম অর্থ করাও অসঙ্গত হবে না যে, অথর্বা প্রাণের মধ্যে থেকেই প্রথমে এ জ্ঞান লাভ করেছিলেন।

অথর্বা আবার সে জ্ঞান দিলেন অঙ্গি ঋষিকে। তিনি আবার দিলেন সত্যবহকে। আর সত্যবহ দিলেন অঙ্গিরাকে। অঙ্গিরার ব্রহ্মবিদ্যার খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। সেই খ্যাতি শুনেছিলেন, মহাগৃহী শৌনক। শুনেই শিষ্য সেজে একেবারে হাতে সমিধ্ নিয়ে মহর্ষির কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন, "গুরু, আমাকে এমন জ্ঞান দাও, যা দিয়ে সব জানতে পারব।"

কিন্তু গুরু বললেন, জ্ঞানীরা বলেন, দুটো বিদ্যেই জানতে হবে। শুধু একটা জানলে হবে না। অর্থাৎ ফাঁকি দিয়ে কার্যোদ্ধার হবে না। যা জানলে সব জানা যায়, সেটা জানার আগে সব কিছু জানার সাধনাটা শেষ করতে হবে।

কারণ বিদ্যার দুই রূপ—অপরা ও পরা। অপরা বিদ্যা শেষ করে তবে পরা বিদ্যায় আসতে পারবে। সোজাসুজি এক লাফে পরাজ্ঞান হবে না। যদিও আপাতদৃষ্টিতে দুই বিদ্যায় প্রভেদ প্রচুর। কিন্তু পরাজ্ঞান পেলেই বুঝবে, সব জ্ঞানের অন্তরে সেই একই জ্ঞানের দীপ্তি। এ কথা যখনই উপলব্ধি করবে তখনই সব জানা সত্য হয়ে উঠবে। তাই ব্রহ্মবিদ্‌রা বলেন, অপরা ও পরা—"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে।"

অপরাবিদ্যার মধ্যে আছে যা কিছু জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান; তারই মধ্যে মন্ত্র ও যজ্ঞ। শিক্ষা, কল্প ও ব্যাকরণ; যা কিছু কর্ম, যা কিছু শিল্প, সবই অপরাবিদ্যার অন্তর্গত। কাজেই অপরাবিদ্যাকে জানতে হবে। জগতের মানুষকে জাগতিক কর্ম করতেই হবে; মাটির ঋণ শোধ দিতে হবে। অপরাবিদ্যাসহায়ে তাকে কর্ম করতে হবে। পরে সে যখন কর্মের ফলগুলি পরীক্ষা করে দেখবে, তখন বুঝতে পারবে এ সবই অনিত্য। শুধু শোনা কথায় হবে না, ব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছু প্রত্যেককেই ব্যক্তিগত ভাবে, এ সত্য উপলব্ধি করতে হবে।

কর্মশেষে যখন কর্মফলের অসারত্ব বুঝতে পারবে, তখনই তার চিত্ত পরাবিদ্যার সাধনার উপযুক্ত হবে।

প্রথমে অপরাবিদ্যা ও কর্মের প্রশংসা করে ঋষি বললেন,

কর্মত্যাগী সন্ন্যাসীই জ্ঞানলাভের উপযুক্ত। ফলের লোভ যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণ শুদ্ধ জ্ঞান হৃদয়ে উদ্ভাসিত হবে না। আগে কর্ম, পরে কর্মত্যাগ ও জ্ঞানলাভ।

ঈশোপনিষদে আমরা জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয়ের কথা শুনেছিলাম। ঈশোপনিষদের ঋষি বলেছিলেন, কর্ম ও জ্ঞানের ফল আলাদা। কর্মের ফল ভোগ ও জ্ঞানের ফল ত্যাগ। দুটোই এক সঙ্গে করতে হবে। "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা।"

কর্মত্যাগ করলে জ্ঞান সার্থক হবে না। আর অজ্ঞানে আচ্ছন্ন কর্ম ত শতবারই ব্যর্থ হবে। তাই দুটোই করতে হবে। কর্মের ফলে সুখ ভোগ করবে; ভাবীকালের মধ্যে আপন কর্ম-সংযুক্তির দ্বারা মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হয়ে যাবে। আর জ্ঞানের ফলে অন্তরে বৈরাগ্য লাভ করবে। নিরাসক্ত ভাবে কর্মকে পরিচালিত করতে পারবে। কামনা বা লোভ ত্যাগ করে, চিত্তের মধ্যে ব্রহ্মসঙ্গের অমৃত আনন্দ লাভ করবে।

কিন্তু শঙ্করাচার্য বলছেন, 'মুণ্ডক' উপনিষদের কথা হচ্ছে—আগে কর্ম ও পরে জ্ঞানের ফলে কর্মত্যাগ ও সন্ন্যাস। তা হ'লে কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকে যায়। তাই যদি হবে তবে, কর্মের পরে কর্মবিরতি বা বৈরাগ্যের ভাব আসছে কি করে? তা হ'লে নিশ্চয়ই কর্মের মধ্যেই জ্ঞান-সাধনাও নিহিত ছিল। না হলে, অজ্ঞানে আচ্ছন্ন কর্ম কি করে জ্ঞানের সন্ধান পেল।

অপরাবিদ্যার অন্তরে আছে পরাবিদ্যার আহ্বান। সেই আহ্বানেই কর্মসাধনার মধ্যে দিয়ে জ্ঞান পরিস্রুত হচ্ছে।

অঙ্গিরা বললেন, অপরাবিদ্যার শেষে পরাবিদ্যায় আসবে। পরাবিদ্যার সাধনায় অক্ষর ব্রহ্মকে লাভ করতে পারবে।

যদি ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, তা হ'লে এই দুই বিভিন্ন সাধনার সার্থকতা কি? এর উত্তরে কথা হচ্ছে এই যে, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, অদ্বিতীয় সত্তা, তিনি ছাড়া মানবের জ্ঞাতব্য আর কিছু নেই বটে; কিন্তু ব্রহ্ম যেখানে কোটি বিচিত্ররূপে নিজেকে রূপায়িত করে, সহস্র বিভিন্ন নামে নিজেকে অঙ্কিত করেছেন, সেখানে সেই বিভিন্ন বিশিষ্ট জ্ঞানের মধ্যে দিয়ে ব্রহ্মেরই জ্ঞান হচ্ছে, তবে তা তাঁর পরিচ্ছিন্ন বিশিষ্ট জ্ঞান।

পরাবিদ্যার সাধনায় অখণ্ড অদ্বৈত ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধির মধ্যে লাভ করা যায়।

তারপরে সুরু হয়েছে ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনা। যখনই উপনিষদের ঋষিরা অরূপ অদৃশ্য অনির্বচনীয় ব্রহ্মের বর্ণনা করতে চেয়েছেন, তখনই দেখা গেছে, তাঁদের ভাষায় কবিত্ব ও আনন্দ নির্ঝরের মত ঝরে পড়েছে। শতমুখে শতবার নির্গুণ ব্রহ্মের গুণ বর্ণনা করেও তাঁরা ক্ষান্ত হতে পারেন নি। অজস্র বিচিত্র উপমা তাঁদের কণ্ঠ হতে বয়ে গেছে "নির্বারিত স্রোতে।"

প্রথম মুণ্ডকের প্রথম খণ্ডের শেষে দিলেন ঊর্ণনাভের উপমা। দ্বিতীয় মুণ্ডকের প্রথম খণ্ডে এল অগ্নিস্ফুলিঙ্গের বর্ণনা। স্ফুলিঙ্গও যেমন আগুনই বটে, তেমনই এই বিচিত্র জগৎপ্রপঞ্চ ব্রহ্ম।

তৃতীয় মুণ্ডকের প্রথম খণ্ডে রয়েছে সেই বিখ্যাত দুই পাখীর উপমাটি। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও এই দুই পাখীর কথা আছে। কোন্‌টি প্রাচীনতর, সেটা সঠিক জানবার বোধ হয় কোন উপায় নেই। কঠোপনিষদের দু'একটি শ্লোকের দেখা এখানে পাওয়া গেল।

এই উপনিষদের অন্তর্গত একটি মহৎ বাণীকে ভারত সরকার তার নীতিগত আদর্শরূপে গ্রহণ করেছে; এবং আশা করছে, এ আদর্শ একদিন তার সমগ্র চরিত্রে প্রতি-ফলিত হবে। তাই আজকের দিনের সরকারী কাগজপত্রে এই বাণীটি বহুবার মুদ্রিত হচ্ছে।—"সত্যমেব জয়তে নানৃতম্।" সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার নয়।

"ব্রাহ্মধর্ম" গ্রন্থটির মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ মুণ্ডক উপনিষদের এই সব সত্যপন্থী বাণীগুলি গ্রথিত করেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে, বাংলা দেশের নবধর্ম আন্দোলনের মধ্যে মুণ্ডক উপনিষদের দান সামান্য নয়। এই উপনিষদের অন্তর্গত কয়েকটি শ্লোক থেকে রাজা রাম-মোহন সে যুগের চোখের সামনে আচার-বিচারের ব্যর্থতা ও নীতিধর্মের সার্থকতা দেখাতে চেয়েছিলেন; বলেছিলেন, সত্য, ধর্ম ও ন্যায়ের পথেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়, অনুষ্ঠানের দ্বারা নয়।

ঋষি বললেন, এই জ্ঞান-সাধনায় করার চেয়ে হওয়া বেশী। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা মানে ব্রহ্মসমান হয়ে যাওয়া। তাই এই সাধনায় প্রতিপদে সত্যকে উপলব্ধি করতে করতে

সত্যের জয় ঘোষণা করতে করতে যেতে হবে। জানতে হবে "সত্যমেব জয়তে—নানৃতম্।"

সত্যের সাধনায় অন্তরে ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করা যায়, অখণ্ড অদ্বৈতেররসে প্লাবিত হওয়া যায়—সুধার সমুদ্রে ডুবে যাওয়া যায়।

ঋষি বললেন, তিনি 'আবিঃ',—প্রকাশই তাঁর রূপ। আকাশে আকাশে তাঁরই নিত্য জ্যোতির লীলা—আবার তিনিই গুহাচর—হৃদয়গুহার অধিবাসী। জ্ঞানের মধ্যে তাঁরই উদ্ভাসনা—প্রাণের মধ্যে তাঁরই আনন্দ। গিরি, নদী, সমুদ্র, ধ্যান, ধারণা, তপস্যা, ভোগ, সুখ, সৌন্দর্য, সকল রস-মাধুর্য সমস্তই সেই ব্রহ্মের বিচিত্র তনুপ্রকাশ। চন্দ্র সূর্যের আলো দিয়ে তাঁকে প্রকাশ করা যায় না। তাঁরই জ্যোতিতে সূর্য চন্দ্র জ্যোতিষ্মান্। তাঁরই আলোয় এই সমস্ত আলোকিত—বিশ্বপ্রকাশিত।

সেই আনন্দরূপমমৃতম্‌কে, সেই সকল জ্যোতির জ্যোতিকে হৃদয়ে উপলব্ধি করতে পারলে সব সংশয় দূর হয়ে যায়, অবিদ্যার গ্রন্থিগুলি ছিঁড়ে যায়। মহামুক্তির অনন্ত আনন্দ সত্তায় বিকশিত হয়ে ওঠে—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে
সর্বসংশয়াঃ
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি,
তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।"

কিন্তু কি করে সেই পরমাত্মাকে আত্মস্বরূপে উপলব্ধি করতে পারা যাবে? ঋষি বললেন, তার জন্যে চাই সম্যক্ জ্ঞান, অর্থাৎ জ্ঞানের পূর্ণতা। একপেশে শিক্ষা নয়—যে জ্ঞানের দ্বারা বুদ্ধির পূর্ণতা সাধন হয়, সেই জ্ঞান। আর চাই ব্রহ্মচর্য, অর্থাৎ চিত্তসংযম। বল্গা টেনে রাখতে হবে, ইন্দ্রিয়ের ঘোড়াগুলিকে লাগাম কষে ছোটাতে হবে। লাগাম ছেড়ে, তাদের উপরেই রথের ভার দিয়ে দিলে চলবে না।

তুমি তোমার দৃঢ় ব্রহ্মচর্যের বল্গার দ্বারা ইন্দ্রিয়ের ঘোড়াগুলিকে, তোমার দেহমনের রথকে ঠিক পথে পরিচালিত করে নিয়ে যেতে পারবে, যে পথে সে ব্রহ্মসদনে পৌঁছে যাবে, যে ব্রহ্মবাস লুকিয়ে আছে তোমারি হৃদয়ের নিভৃত অন্তঃপুরে। ঐ তোমার দেবযান পথ—সত্যে বিছানো যে পথ শুধু সত্যের দ্বারাই লাভ করা যায়—"সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।"

——

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

সেকালের নেতা বাঙ্গলা—আজ কি ?

বিশিষ্ট শিল্পপতি শ্রীরামস্বামী মুদালিয়ার এক ভাষণ-প্রসঙ্গে দুঃখ করিয়া বলেন যে, এককালে প্রায় সকল শিল্পের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিলেও বাংলা এখন পিছু হটিয়া যাইতেছে। এ সম্পর্কে তিনি বাংলার রসায়ন শিল্পের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস এবং উহাতে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অবদানের উল্লেখ করেন। বাংলার অগ্রগামী মৃৎশিল্পপতিদের হুঁশিয়ার করিয়া তিনি বলেন, ত্রিশ বৎসরের পুরাতন এই শিল্পটিকে যেন পিছু হটিতে না হয়।

যে-নিষ্ঠুর সত্যটি শ্রীমুদালিয়ারের কাছে সহজেই প্রকট হইয়াছে—দুঃখের কথা, বর্ত্তমান বাঙ্গলার নেতৃত্বের কাছে এখনও সেই বিষম-সত্যটি বোধহয় অপ্রকাশ রহিয়াছে—কিংবা সত্য-দ্রষ্টার চোখ বাঙ্গালী কোন নেতারই নাই! কংগ্রেসী নেতাদের কথা বলিয়া লাভ নাই—কারণ তাঁহাদের প্রখর (এবং নিস্বার্থ?) দৃষ্টি আজ সর্ব্বতোভাবে 'কেন্দ্রীক' বা 'কেন্দ্রী'-ভূত হইয়াছে! কেন্দ্রেই তাঁহাদের টিকি বাঁধা এবং সেই কারণে তাঁহারা লাট্টুর মত কেন্দ্রের চারিদিকেই অহরহ পাক খাইতেছেন!

কিন্তু দেশগত-প্রাণ বামপন্থী নেতারাই বা কি করিতেছেন? কলকারখানা এবং অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠানে হাজার হাজার লোকের রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা হইতেছে—কিন্তু কয়লা, বিদ্যুৎ এবং অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার সুবিধা থাকা সত্বেও আজ বহুসংখ্যক শিল্পপতি এ-রাজ্যের শ্রমিক ও আইন-শৃঙ্খলার সমস্যাতে বিব্রত হইয়া, তাঁহাদের শিল্প-সংস্থাগুলি গুটাইয়া কেন বাঙ্গলার বাহিরে লইয়া যাইতেছেন? ইহার প্রকৃত কারণ সম্পর্কে কেহ অবহিত হইয়াছেন কি? কথায় কথায়, (এবং শতকরা ৯০টি ক্ষেত্রেই অন্যায়-অযথা) ধর্ম্মঘটের কল্যাণে আজ কাহারও পক্ষে পশ্চিমবঙ্গে কলকারখানা এবং ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান নির্ব্বিরোধে সুষ্ঠুভাবে চালান এক প্রকার অসম্ভব হইয়াছে। (দৃষ্টান্তস্বরূপ বিখ্যাত জয় ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার কথা বলা যাইতে পারে। রেমিংটন র‍্যাণ্ড ত বহুকাল পূর্ব্বেই তাঁহাদের কলিকাতাস্থিত একটি সুবৃহৎ কারখানা বোম্বাই-এ চালান করিতে বাধ্য হইয়াছেন!) বলা বাহুল্য প্রায় সর্ব্বত্রই বামপন্থী বেপরোয়া নেতারাই সকল ধর্ম্মঘটের পুরোহিত! ইঁহারা নিজ বা দলীয় স্বার্থের কারণে শ্রমিক খেপাইতে জানেন, কিন্তু ঐ শ্রমিকদের প্রকৃত স্বার্থ এবং কল্যাণের কথা চিন্তায় স্থান দিতে পারেন না। সে-ক্ষমতাও তাঁহাদের নাই। অবস্থার প্রতিকার না হইলে অচিরে পশ্চিমবঙ্গের শতকরা ৯০টি কলকারখানার দরজা বন্ধ হইবে এবং ইহাদের মধ্যে শতকরা ৭০টি হয়ত বাঙ্গলার বাহিরে গিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিবে। প্রসঙ্গক্রমে বলিতে পারি যে একটি বিখ্যাত বাঙ্গালী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান মার্কিন কোম্পানীর সহযোগিতায় কলিকাতায় একটি টাইপ রাইটার কারখানা স্থাপনের সকল প্রাথমিক ব্যবস্থা (জমি ক্রয় সমেত) করেন, কিন্তু বাঙ্গলার শ্রমিক সমস্যা এবং আইন-শৃঙ্খলার দাপটে তাঁহারা প্রস্তাবিত কারখানাটি এখন মাদ্রাজে স্থাপন করিতেছেন! রাজ্য সরকারের বর্ত্তমান দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাঁহাদের শ্রমদপ্তরে সকল সমস্যার 'পিঠ-চাপড়ান' নীতির আমূল পরিবর্ত্তন অচিরে না ঘটিলে—এ-রাজ্যের ব্যবসা-বাণিজ্য দ্রুত এবং নিশ্চিত নির্ব্বাণের পথেই যাইতে বাধ্য।

রাজ্য সরকার এবং এল-আই-সি

সংবাদপত্রে প্রকাশ :

"একদিকে উচ্চপদ হইতে বাঙ্গালী অফিসার বিতাড়ন এবং অন্যদিকে বাঙ্গলায় অর্থ বিনিয়োগে কার্পণ্য—পশ্চিমবঙ্গকে জব্দ করার জন্য লাইফ

ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশনের পরিচালকরা বেশ কিছুদিন যাবৎ এই দ্বিমুখী অভিযান চালাইয়া যাইতেছেন।

"এ সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নীরব দর্শকের ভূমিকা লওয়ায় লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশনের বাঙ্গলা ও বাঙ্গালী বিদ্বেষী পরিচালকদের খুব সুবিধা হইয়া গিয়াছে। কিছু বলিবার কেহই নাই। অথচ অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গেই লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশনের আয় সবচেয়ে বেশী।

"কলিকাতায় এল আই সির আঞ্চলিক ম্যানেজার ছিলেন বাঙ্গালী। তাঁহাকে অন্যত্র বদলি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বাঙ্গলার ছয়জন ডিভিশনাল ম্যানেজারের ছয়জনই এখন অবাঙ্গালী। সর্ব্বশেষ বাঙ্গালী ডিভিশনাল ম্যানেজারও কিছুদিন পূর্ব্বে কাজ ছাড়িয়া অন্যত্র চাকুরি লইতে বাধ্য হইয়াছেন। এল আই সির উচ্চপদস্থ বাঙ্গালী অফিসারের অধিকাংশেরই গত পাঁচ বছরের মধ্যে কোন পদোন্নতি হয় নাই। এখন এল আই সির পরিচালকমণ্ডলীতেও কোন বাঙ্গালী নাই।

"অথচ মাদ্রাজী, মহারাষ্ট্রীয় এবং পাঞ্জাবী অফিসারদের পদোন্নতি হইয়াই চলিয়াছে। পাঞ্জাবের সকল ফিল্ড অফিসার প্রমোশন পাইতে পাইতে গত পাঁচ বছরের মধ্যে অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী পর্য্যন্ত উঠিয়া গিয়াছেন। মাদ্রাজী অফিসার অনেকেই ঐ সময়ের মধ্যে তিনটি পর্য্যন্ত সিঁড়ি ডিঙ্গাইয়া দেন।

"ওদিকে গত পাঁচ বছরে এবং এখনও এল আই সির সবচেয়ে ভাল ব্যবসা পশ্চিমবঙ্গে। কলিকাতার আঞ্চলিক অফিস হইতে গত পাঁচ বছরের মধ্যে বোম্বাইর কেন্দ্রীয় ভাণ্ডারে অন্তত ১০০ কোটি টাকা জমা পড়িয়াছে। জীবনবীমা ব্যবসা জাতীয়করণের পূর্ব্বেও এক্ষেত্রে বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানগুলি যথেষ্ট সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছিল। বাঙ্গালী অফিসাররাই এইসব প্রতিষ্ঠান চালাইতেন। কিন্তু জাতীয়করণের পর সেইসব বাঙ্গালী অফিসারেরই এল আই সিতে উপযুক্ত ঠাঁই জোটে নাই।

"এল আই সির প্রতিদিন উদ্বৃত্ত থাকে ৪০ লক্ষ টাকা। শেয়ার, উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা এবং সরকারী ঋণপত্রে এইসব টাকা খাটানো হয়। এই টাকার প্রায় ৪০% আসে কলিকাতার আঞ্চলিক অফিস হইতে। কিন্তু এই অঞ্চল (পঃ বঙ্গ, আসাম ও উড়িষ্যা) ইহার কতটা পায়? শতকরা ২৫ ভাগ কি না সন্দেহ।

"রাজস্থান এবং পাঞ্জাবে সহর উন্নয়নের জন্য বহু মিউনিসিপ্যালিটি এল আই সির নিকট হইতে মোটা টাকা ঋণ নিতেছে। এ ব্যাপারে ঐ দু'টি রাজ্যের সরকারই সবচেয়ে উৎসাহী। মিউনিসিপ্যালিটিগুলি সরকারের নির্দ্দেশ মত জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ, পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা তৈরী করে। সেই পরিকল্পনা কার্য্যকরী হয় এল আই সির টাকায়। রাজ্য সরকার দুইটি শুধু যে ঋণ পরিশোধের গ্যারাণ্টির দাঁড়ান তাহাই নহে, (এল আই সির নিকট হইতে) আদায়েরও সকল ব্যবস্থা করিয়া দেন।

"পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী সর্দ্দার প্রতাপ সিং কাইরণ ত নিজেই সবচেয়ে উৎসাহী। পাঞ্জাবের বর্ত্তমান ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প যাহাতে এল আই সির ঋণ পায় সেদিকেও তাঁহার কড়া নজর। মহারাষ্ট্র, গুজরাট এবং মাদ্রাজ সরকারও সমভাবে উৎসাহী।

"অফিসার নিয়োগের ব্যাপারেও ঐ সব সরকারের কড়া নজর। পাঞ্জাব এবং উড়িষ্যায় এল আই সি অফিসের অন্য রাজ্যের অফিসার নিয়োগ করিলে সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি তোলা হয়।

"আর পশ্চিমবঙ্গে? অফিসার বিতাড়ন, পদোন্নতি বন্ধ করা বা ঋণ আদায়—সকল ব্যাপারেই এখানের সরকার নীরব দর্শক মাত্র।"

কথায় বলে 'নেপোয় মারে দই', নেপো যদি বাধা না পায়, দধিভক্ষণে তাহার অবাধ অধিকার থাকিবেই। এই নেপোকে রাজ্য সরকার বাধা হয়ত দিতে পারিতেন—কিন্তু 'কেন্দ্র'-ভীত এবং ভক্তি গদগদ এ রাজ্য সরকার ঠুঁটো জগন্নাথ!

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারকে আমরা যাহাই বলি না কেন প্রাদেশিক 'দোষদুষ্ট'—এ অপবাদ কখনও দিতে পারিব না। রাজ্য-সরকার প্রধানের উদার দৃষ্টিতে সমগ্র দেশের (ভারতের) স্বার্থ প্রাদেশিক স্বার্থ অপেক্ষা অধিক মূল্যবান।

জয় ভারত!

এই মূল্যবৃদ্ধির শেষ কোথায় ?

বামপন্থীরা যখন ট্রাম-বাসের নব-প্রবর্ত্তিত এক নয়া পয়সা ভাড়া বৃদ্ধির রোধ করিতে জীবনমরণ পণ করিয়াছেন ঠিক সেই সময়ে—সরকার এবং বাক্যবীর মহাপ্রাণ মুখ্যমন্ত্রীর সকল আশ্বাসবাণী মিথ্যা প্রমাণ করিয়া গত দুই মাসে কলিকাতা এবং এ-রাজ্যের অন্যান্য স্থানে ডাইল, সরিষার তৈল, তরি-তরকারি প্রভৃতির মূল্য শতকরা ১২ হইতে ১৬ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত বৎসরের তুলনায়—আজ বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধির হার শতকরা ২৫।৩০-এরও বেশী !

চাউলের দর ইহার মধ্যে না ধরাই ভাল। কারণ, কলিকাতায় এখন খোলার চেয়ে কালো বাজারে চাউল কেনা-বেচা বেশী। সরকার 'ফাইন''নামে যে মাঝারী চাউলের মণকরা দর ৩০ টাকা বাঁধিয়া দিয়াছেন আসলে তাহা বিক্রী হইতেছে ৩২ হইতে ৩৪ টাকার মধ্যে।

১৯৫৯ সালের বাজারের সঙ্গে তুলনা করিলে মারাত্মক এক ছবি ফুটিয়া ওঠে। ঐ সময়ের তুলনায় নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম বাড়িয়াছে প্রায় দ্বিগুণ। কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের হিসাব ঃ

	১৯৫৯ এপ্রিলের প্রথম টাকা	১৯৬৪ এপ্রিলের প্রথম টাকা
মাঝারী চাউল মণ	১৯·২০	৩১·৮২
মসুর ডাল (কেজি)	০·৬২	০·৯০
সরিষার তেল (কেজি)	২·০০	৩·২০

এপ্রিলের প্রথম দিকের তুলনায় মে'র গোড়ায় দর অনেক বেশী। উত্তর কলিকাতার একটি বাজারে কয়েকদিন পূর্ব্বে ডাল তেলের দর চাওয়া হয় ঃ অড়হর ১ টাকা ১২ নয়া পয়সা, মসুর ১ টাকা, মুগ ১ টাকা ১২ নয়া পয়সা, সরিষার তেল ৩ টাকা ৩০ নয়া পয়সা, আলু (বড়) ৭৫ নয়া পয়সা, ছোট ৬০ হইতে ৭০ নয়া পয়সা, পটল (মাঝারী) ১ টাকা এবং ঝিঙে (চলন সই) ৪০ নয়া পয়সা। সবই কেঃ জি-র হিসাব।

মাসখানেক আগে ঐ বাজারেই আলু (বড়) বিক্রী হইয়াছে ৫৫ নয়া পয়সায়, মসুর ৮৫ নয়া পয়সা, মুগ ৭৮ নয়া পয়সা, সরিষার তেল ২ টাকা ৪০ নয়া পয়সা।

আহিরিটোলার পাইকারী বাজারে খোঁজ লইয়া জানা গেল, গত পনের দিনের মধ্যে ডালের কুইন্টাল প্রতি দর বাড়িয়াছে ৭ হইতে ৯ টাকা। সরিষার তেল কয়েকদিন পূর্ব্বে প্রতি কুইন্টাল ২৮৮ হইতে ২৯০ টাকার মধ্যে বিক্রী হইতে দেখা গেল। কয়েকদিন আগেও দাম ছিল ২৫০ টাকার মত।

মনে হয় দ্রব্যমূল্যের এই বিষম বৃদ্ধির জন্যই সদাশয় এবং প্রজাপালক সরকার দেশের এই নিদারুণ অর্থ-কষ্টের দিনে—'এম, পি, এবং এ-রাজ্যের' এম, এল, এদের বেতন একশত টাকা এবং প্রাত্যহিক ভাতা ১০ হইতে ১৫৲ বৃদ্ধি করা একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া ধার্য্য করিলেন ! গরীব কেরাণী-দের প্রতিও অর্থ-কারুণ্য কম দেখানো হয় নাই—মাথা-প্রতি ৬।৭ টাকা মাসিক ভাতা বৃদ্ধি করা হইয়াছে ! ! মনে হয় এই বর্দ্ধিত ৫।৭ টাকাতেই কর্ম্মচারীদের পারিবারিক এবং নিজেদের সকল দায় সহজেই ঠেকানো যাইবে !

কিন্তু সংসারের দায় মিটাইতে আজ যে ন্যূনতম অর্থ আবশ্যক—গরীব বেসরকারী, বিশেষ করিয়া হাসপাতাল কর্ম্মী-কর্ম্মচারীদের কি ব্যবস্থা কর্ত্তারা করিতেছেন ? আবেদন-নিবেদন কম হইতেছে না, কিন্তু সবই যেন পাষাণ-দেবতার পায়ে মাথা ঠোকা ! কর্ত্তৃপক্ষ বলেন, টাকা কোথা হইতে আসিবে—কে দিবে ? কিন্তু এ প্রশ্নের জবাব কর্ম্মী-কর্ম্মচারীদের দিবার কথা নহে। যাঁহারা এক একটি বেসরকারী হাসপাতাল এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে কর্ত্তা হইয়া বসিয়া আছেন—অধীনস্থ কর্ম্মী এবং কর্ম্মচারীদের জীবন-মরণের প্রধান দায়িত্ব তাঁহাদেরই আজ লইতে হইবে 'টাকা নাই' বলিয়া এক কথায় মামলা নিষ্পত্তি করা যাইবে না।

দরিদ্র কর্ম্মী এবং কর্ম্মচারীদের অবস্থা আজ কি হইয়াছে—কর্ত্তৃপক্ষ তাহা উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না। কারণ বর্ত্তমান অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি কর্ত্তাস্থানীয় ব্যক্তিদের খুব বেশি (ক্ষেত্র বিশেষে একেবারেই না) বিব্রত বা বিড়ম্বিত করিতে পারে নাই। এবং এই জন্যই হয়ত আজ কর্ম্মী-কর্ম্মচারীদের বাড়তির-আর্থিক দাবিটাকে তাঁহারা চিরাচরিত এবং অভ্যাসগত মামুলী 'দাবি'—পর্য্যায়ে ফেলিয়া

তাহাকে কোনপ্রকার গুরুত্ব দিতেছেন না (এবং ইহাও বলা যাইতে পারে, এই গুরুত্ব আরোপ না করাটাও কর্ত্তৃপক্ষের চিরাচরিত এবং স্বভাবগত অভ্যাস !) !

কিন্তু সে যাহাই হউক, আজ রাজ্য সরকার তথা বেসরকারী হাসপাতাল এবং অন্যবিধ সংস্থার চালক-পরিচালকদের অধীনস্থ চাকুরিয়াদের দাবির প্রতি অবশ্যই অবহিত হইতে হইবে—অন্যথায় বিষম বিপর্য্যয়ের জন্য তাঁহারা প্রস্তুত হইতে পারেন।

একমাত্র উপায়

যে-সব ব্যবসায়ী চাউল, ডাইল, তেল, মাছ, মাংস, তরিতরকারি লইয়া মানুষ-মারা কারবার চালাইতেছে—তাহাদের এ দুঃসাহস সরকারী ক্লৈব-নীতির ফলেই সম্ভব হইয়াছে। অবস্থা এখন আয়ত্তের বাহিরে—এবং জনসাধারণের পক্ষেও অসহনীয় হইয়াছে। আমরা আশঙ্কা করিতেছি—এইবার জনগণ বাধ্য হইয়াই কালোবাজারীদের সায়েস্তা করার পবিত্র দায়িত্ব নিজেদের হাতে লইতে অগ্রসর হইবেন।

অন্নহীন, বস্ত্রহীন, শিক্ষাহীন, চিকিৎসাবঞ্চিত এবং সর্ব্বভাবে নিপীড়িত সাধারণজন শাসকগুষ্টির স-উল্লাস, দম্ভ-ভরা 'ডিমোক্র্যাসীর' অত্যাচারে আজ নির্ব্বাণের পথ-যাত্রী হইতে চলিয়াছে, এ-অবস্থার অবিলম্ব-প্রতিকার চাই। যে ডিমোক্র্যাসীতে মানুষের বাঁচিবার ক্ষীণতম অধিকার নাই, যে-ডিমোক্র্যাসীতে দুর্ব্বার-লোভী এবং কালোবাজারীদের মানুষকে অন্নবস্ত্র বঞ্চিত করিয়া হত্যা করিবার অধিকার দাবী কার্য্যত শাসকব্যক্তি নতমস্তকে হাসিমুখে স্বীকার করিয়া লয়েন, সে-ডিমোক্র্যাসীর অবলুপ্তির আশু প্রয়োজন এবং ইহা না ঘটিলে এমন দিন অবশ্যই আসিতে বাধ্য, যেদিন এই পাপ ডিমোক্র্যাসীর সঙ্গে সঙ্গে এই ডিমোক্র্যাসীর ধ্বজাধারীদেরও—জনসাধারণের হাতে নিগৃহীত—নিপাতীত হইতে হইবে। মানুষের খাদ্য লইয়া ব্যবসায়ীদের এমন বেপরোয়া খেলা অন্য দেশে যে হয় নাই, তাহা বলিব না, কিন্তু অন্যান্য নানা দেশে :—যেমন সোভিয়েট, মরক্কো, মিশর প্রভৃতি—যখনই কারবারীদের মানুষের খাদ্য লইয়া কালোবাজারী চলিয়াছে, তখনই রাষ্ট্রশক্তি সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিয়া তাহা কঠোর হস্তে দমন করিতে দ্বিধা করে নাই। মাত্র কিছুদিন পূর্ব্বে হোয়াইট-অয়েল মিশ্রিত ভেজাল তেল বিক্রয়ের অপরাধে মরক্কোতে ২১ জন তৈল-ব্যবসায়ীকে চৌ-মাথায় গুলী করিয়া হত্যা করা হয়। সোভিয়েট দেশে ত প্রায়ই ব্যবসায়ী এবং সরকারী কর্ম্মচারীদের দুর্নীতির অপরাধে সরাসরি গুলী করা হইতেছে। আর আমাদের এই বিষম ডিমোক্র্যাসীতে? অপরাধী অতিলোভী ব্যবসায়ীদের সাদর নিমন্ত্রণে সরকারী দপ্তরে "ভদ্রলোকের চুক্তি" করিবার জন্য বারবার আহ্বান করা হইতেছে—এবং এই 'ভদ্রলোকের চুক্তি' (বহু-ঘোষিত নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তির মত) সম্পাদিত হইবার ক্ষণকাল পরেই ভঙ্গ বা লঙ্ঘন করিতে 'ভদ্রলোক' কালোবাজারীরা দ্বিধা বা ভয় করিতেছে না; রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রক ডিমোক্র্যাটরা ফ্যাল্ ফ্যাল্ নেত্রে তাহাই দেখিতেছেন এবং 'কালোবাজারীদের দমন করিবার মত আইন নাই' বলিয়া ক্রন্দন (লোক দেখান) করিতেছেন !

দেশের বর্ত্তমান অবস্থায়—মাত্র ১০।১৫ জন কালোবাজারী এবং অতিলোভী ব্যবসায়ীকে যদি চৌরঙ্গীর মোড়ে গুলী করিয়া হত্যা করা হয়—দুই ঘণ্টার মধ্যেই খাদ্য লইয়া সকল দুর্নীতি দূর হইয়া যাইবে। শাসকদের এ-সৎসাহস হইবে কি?

পরম দুঃখেও হাসি পায় যখন দেখি যাহারা দেশের লোককে খাইতে, পরিতে দিতে অপারগ, ব্যর্থ হইয়াছে, সেই তাহারাই আমাদের ভবিষ্যৎ-বংশীয়দের সুখ-সমৃদ্ধির জন্য বড় বড় পরিকল্পনার সঙ্গে আরও বড় বড় বাক্য বলিতে লজ্জা-সঙ্কোচ বোধ করে না !

"The vanity and presumtion of governing beyond the grave is the most ridiculous and insolent of all tyrannies. Man has no property in man ; neither has any generation a property in the generations to follow".

আমাদের বর্ত্তমান রাষ্ট্র-নায়কগণ এই বাক্যের বিপরীতেই বিশ্বাসী বলিয়া মনে হইতেছে। ইঁহারা বর্ত্তমানের চিতার আগুনের উপর ভবিষ্যতের সৌধ নির্ম্মাণ করিতে বিষম ব্যর্থ প্রয়াস করিতেছেন !

কি ফল লভিলে—হায় !

আমরা দেখিয়া সত্যই পরম পরিতৃপ্ত হইয়াছি যে,

বামপন্থীদের কলিকাতায় ট্রাম-বাস বর্জ্জনের (ভাড়াবৃদ্ধির প্রতিবাদে) বিষম আহ্বান বেকার, বেফয়দা হইয়াছে! যাহারা ট্রাম-বাসে চড়ে সেই যাত্রীদের এক নয়া পয়সা ভাড়া বৃদ্ধিতে কোন আপত্তি কোথাও দেখা যায় নাই—অথচ যাত্রী-সাধারণের দুঃখে এই সপ্ত বামপন্থী নেতাদের প্রাণ কাঁদিয়া—হৃদয় বিগলিত হইল!

অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য-সামগ্রীর মূল্য যে-সময় হু হু করিয়া চড়াই-এর মুখে সেই সময় এক নয়া পয়সা লইয়া দেনেওয়ালা যাত্রীরা বিশেষ বিব্রত হয় নাই বলা বাহুল্য! কিন্তু তাহাতে কি আসে-যায়—সর্ব্বসাধারণের গাড়িয়াম—অর্থাৎ আমাদের মালিক এই ৭-বামপন্থী নেতারা আমাদের কল্যাণ চিন্তা না করিয়া কেমন করিয়া বাঁচিবেন! বিচিত্র ইঁহাদের চিন্তাধারা এবং বিচিত্রতর কর্ম্মপদ্ধতি! ট্রামে-বাসে নিযুক্ত কর্ম্মী, কর্ম্মচারীদের এই 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল' শ্রেণীর নেতারা বেতন এবং ভাতাবৃদ্ধির (অন্যায় হইলেও) দাবির জন্য লেলাইয়া দিবেন—এবং এই কর্ম্মীর দল কোম্পানী মালিকদের ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব স্বীকার করিয়া লইবেন—কিন্তু অন্যদিকে এই নেতারাই যাত্রী সাধারণকে কোম্পানীর বর্দ্ধিত ব্যয়ের দায় মিটাইবার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় নামমাত্র এক নয়া পয়সা বর্দ্ধিত ভাড়া না-দিতে 'রাজকীয়' হুকুম জারি করিবেন (এবং আমাদের বিষম জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলিও এই আদেশ-নির্দ্দেশ সাড়ম্বরে প্রকাশ করিবেন)!! আমদের মনে হয়, সংবাদপত্রগুলির ভয়-মিশ্রিত আদেশ পালনের কারণেই বামপন্থীদের ক্ষতিকর কার্য্যকলাপ আজ সাধারণ মানুষের প্রায় অসহ্য হইতে চলিয়াছে। বুঝিতে পারি না, কেন এবং কি গোপন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলি বাম-(এবং অন্যান্য বিকার) পন্থীদের সর্ব্ববিধ ফতোয়া (অর্থাৎ জনসাধারণের প্রতি আদেশনামা) নির্ব্বিচারে প্রকাশ করিয়া থাকেন—এবং তাহার ফলে জনসাধারণ অযথা বিচলিত বিভ্রান্ত হয়েন!

কিন্তু বামপন্থী নেতাদের কাহাকেও ত চাউল, ডাইল, তৈল, মৎস, তরিতরকারী এবং অন্যান্য এই প্রকার একান্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রীর আকাশ-প্রমাণ মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধে সক্রিয় হইতে এখনও দেখিলাম না! এ কাজ কি ক্যাম্প-ফলোয়ার অর্ব্বাচীন বালক এবং যুবকদের জন্যই ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে? (সত্যকথা স্বীকারে লজ্জা নাই—এই 'অর্ব্বাচীন' বালক এবং যুবার দলই তবু যা হোক কিছু কাজের কাজ—বাজারে হানা দিয়া করিয়া থাকে!)

জন-দরদী এবং দেশকল্যাণকামী বামপন্থীদের এই কাতর নিবেদন জানাইব—তাঁহারা অবিলম্বে (দয়া করিয়া) দ্রব্য মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ-কল্পে, সক্রিয়ভাবে আত্মনিয়োগ করুন, এবং ইহার দ্বারাই তাঁহারা তাঁহাদের (জন-অস্বীকৃত) নেতৃত্বের স্বীকৃতি অর্জ্জন করিতে পারিবেন। বাজে হুজুগে বৃথা চিৎকারে কোন লাভ নাই!

বেতার সংবাদ প্রচার

বিগত ৬ই মে, সকাল সাড়ে সাতটার আকাশবাণীর বাঙলা সংবাদ প্রচার মারফত জানিতে পারিলাম যে, নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর বিতর্কের সূচনা করেন—

কাশ্মীরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীভুট্টো

ইহা শ্রবণ করিয়া হয়ত অনেকেই চমকাইয়া উঠিবেন, কিন্তু বেতার-কর্ত্তৃপক্ষ (উচ্চ বেতনভোগী) লম্বকর্ণের দল খবর পড়া শেষ হইবার পরেও আজ পর্য্যন্ত একথা প্রচার করিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই যে,

"কোন ভুট্টো কাশ্মীরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী নহেন।" বলা বাহুল্য কাককণ্ঠী এক মহিলা সংবাদঘোষক, এই সংবাদ-অমৃত প্রচার করেন।

বেতার সংবাদ প্রচার দেশের পক্ষে অতীব দায়িত্বপূর্ণ বিষয় বলিয়া সর্ব্বদেশেই স্বীকৃত, একমাত্র উজ্জ্বল ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে এই প্রাচীন গৌরবমণ্ডিত (বর্ত্তমানে খণ্ডিত) ভারত!

তৈল-সমস্যা সমাধান

মুখ্যমন্ত্রীকে আমাদের সর্ব্বভাবে নিপীড়িত এবং মর্দ্দিত অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা না জানাইয়া পারিলাম না। কারণঃ

(সরিষার) তৈল-লোভী বাঙালীদের তৈলাভাব দুর করিয়া তৈলের সহজ-প্রাপ্তির ব্যবস্থা তিনি করিয়া দিলেন। গত ৮ই মে হইতে বাজারে কিলো প্রতি ৩ টাকা দরে তৈল সহজলভ্য হইয়াছে! মুখ্যমন্ত্রী মুল্য স্থিতিশীল করনার্থে যে বিচিত্র উপায়-পদ্ধতির আশ্রয় বার বার লইতেছেন তাহাতে অবাক হইবার কোন হেতু নাই। কারণ ব্যবসায়ী

বিক্রেতাদের নির্দ্দেশ মতই মূল্য স্থির করিতে তিনি ন্যায়ত বাধ্য, বাস্তবে এ-মূল্য যতই উর্দ্ধমুখী এবং অস্থির হউক না কেন। এ বিষয় ক্রেতা-সাধারণের ক্রয়-ক্ষমতা এবং আর্থিক সামর্থের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া প্রজাপালক মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব বা কর্ত্তব্য কিছুই নাই, থাকিতেও পারে না।

ভাতে হাত পড়িয়াছে, মাছেও টান ক্রনিক, ডাইল, সাধারণ তরিতরকারিও সাধারণজনের ক্রয়-ক্ষমতার অতীতে গিয়াছে, এবার শেষ 'মূল্য-মার' পড়িল দরিদ্রজনের একান্ত প্রয়োজনীয় তৈলের উপর। ভালই হইল বলিতে হইবে—বাঙ্গালীর মাছ, ভাজাভুজি এবং তৈল পক্ক অন্যান্য প্রকার (শরীরের পক্ষে) অহিতকর খাদ্য-প্রীতি এবং অভ্যাস এবার হয়ত দূর হইবে! বাঙ্গালী জাতির ভবিষ্যৎ মহা-কল্যাণের কথা ভাবিয়াই আমাদের পরমপ্রিয়, প্রজাপোষক, প্রাজ্ঞ, প্রশাসনিক-পোক্ত মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল চিত্তে এই প্রজাপালন কর্ত্তব্য সমাপন করিলেন।

কিন্তু একটা বিষয় খটকা লাগিতেছে। তৈল দ্বারা কেবল মৎস্যই ভাজা হয় না, "তৈল সে ত লাগে আরও নানা কাজে" এবং এই নানা কাজের মধ্যে তৈলদান কার্য্যটি একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। আমরা ভাবিতেছি—আমাদের মত গরীবদের পক্ষে—'তৈলদান' নামক অবশ্যকর্ত্তব্যটি 'পালন' করিতে তৈল পাইব কোথা হইতে এবং তৈল-দান বন্ধ হইলে বর্ত্তমান সরকারী মন্ত্রী মহোদয়গণের—চিত্তের প্রফুল্লতা বজায় থাকিবে কি? বাধ্য হইয়াই হয়ত যতটুকু তৈল কিনিতে পারি—তাহা প্রভুদের শ্রীপদে মর্দ্দনেই ব্যয়িত হইবে।

পশ্চিমবঙ্গে পাক-চক্র কত গভীর

কিছুকাল পূর্ব্বে কেন্দ্রীয় নন্দদুলাল হিসাব দিয়াছেন যে, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম এবং ত্রিপুরাতে পাকিস্তানী অনুপ্রবেশ-কারীদের সংখ্যা প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ হইবে। ইহারা বেআইনী প্রবেশকারী—কিন্তু ইহার উপর আছে 'বৈধ-অনুপ্রবেশকারীর' প্রচণ্ড এক ভয়াবহ সংখ্যা!

গত দুই মাসে প্রায় ২,০০০ পাক নাগরিক নাকি সার্টিফিকেট দেখাইয়া পশ্চিমবঙ্গের নানা জেলায় বসবাসের দাবি আদায় করিয়া লইয়াছে। জানিতে চাই, কিসের সার্টিফিকেট, এবং এই মঞ্জুরী দিল কে? হাজার হাজার পূর্ব্ববঙ্গ আগত উদ্বাস্তু হিন্দু যখন এ-রাজ্যে পথে-ঘাটে নিরাশ্রয় হইয়া অকালে মৃত্যুর পথে চলিয়াছে, সেই সময় পাকিস্তানী অনুপ্রবেশকারীদের প্রতি এই দয়ার স্রোত প্রাবাহিত হইতেছে কোন্ মহারাজের আদেশে? এ কি এক আত্মঘাতী নির্ব্বিকার নির্ব্বোধ নীতি! পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তের হাটদুয়ার দিয়া এমনিতেই লক্ষ লক্ষ পাকিস্তানী এখানে আসর জমাইয়া বসিয়াছে। আমাদের বন্দরে পাকিস্তানী, পুলিসে পাকিস্তানী, পুঁথিপত্র বাঁধাই, হোটেলের খানাপিনা, ফলে, সবুরের মেওয়ায় পাকিস্তানীদের মৌবসিপাট্টা, তাহাতেও কি ভরা পূর্ণ হয় নাই? এই কলিকাতা শহরেই হগমার্কেট, বেনিয়াপুকুর, পার্ক সার্কাস, তালতলা, গার্ডেনরীচ, খিদিরপুর—অজস্র ছোট-বড় মাঝারি ক্ষুদে পাকিস্তান। এইগুলির অস্তিত্ব সম্পর্কেই বার বার সাবধানবাণী উচ্চারণ করা যাইতেছে। উদারতা অথবা আর যাহা কিছু গালভরা বুলির দোহাই আমরা পাড়ি, পাকিস্তান যে জন্মলগ্ন হইতে ভারতের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন রাষ্ট্র, তাহাতে কোনও সন্দেহের অবকাশ কি আছে? শয়তান রাষ্ট্র পাকিস্তানের পিছনে দাঁড়াইয়া মদত দিতেছে, তাহার হঠাৎ-বন্ধু চীন। মৌচাকগুলি ক্রমশ জমজমাট, "দ্বিতীয় পাকিস্তান" দাবির জমি তলে তলে লোকচক্ষুর আড়ালে তৈয়ার হইতেছে! এমন ভয়ানক অবস্থার মধ্যেও কোন্ ভরসায় দেশের কাণ্ডারীরা শুধু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া দেখেন, আর হাই তোলেন! দেশের বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতের ভাবনা বিলকুল বিসর্জ্জন না দিলে এমন তুরীয় দশা সম্ভব হয় না।

'নাবিকের' দল যদি জাহাজ ভরাডুবি করিতে বদ্ধপরিকর হয় তবে সে জাহাজকে ভাসাইয়া রাখিবে কে? আমাদের রাষ্ট্রতরীর বর্ত্তমান ঝুনো-নাবিকদের ক্রিয়া-কলাপে আমাদের মনে এই সামান্য প্রশ্নটি জাগরিত হইয়াছে। কলিকাতায় নবাগত পাক-ডেপুটি হাই কমিশনার সদা ভ্রাম্যমান, তিনি ইচ্ছামত পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করিয়া কলিকাতায় সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং পুরাণো প্রেম আর পরিচয় এখানের সংখ্যালঘু মাতব্বরদের সঙ্গে ঝালাইয়া লইতেছে, পাক-ডেপুটি হাই কমিশনারের (এবং তাঁহার অনুচরদেরও ক্রিয়াকলাপের সহিত দেশের স্বার্থ ও নিরাপত্তা

যে কতখানি জড়িত—তাহা আমাদের রাষ্ট্রতরণীর লম্বকর্ণ নাবিকের দল বুঝিয়াও বুঝেন না, দেখিয়াও দেখেন না! ক্লীব সৌজন্যের অপার অনন্ত মহিমা সাধারণজন বুঝিবে না!

"বিশেষ করিয়া এই সৌজন্যও একমুখী রাস্তা। রাজশাহীর ভারতীয় দুতাবাসটি কবে উঠিয়া গিয়াছে পাকিস্তানের একতরফা ডিক্রিতে, অথচ শিলংএ পাকিস্তানী গুপ্ত মধুচক্রটি গুঞ্জনে যথাপূর্ব্ব ভরপুর। রেসিপ্রসিটি বলিয়া কোনও তত্ত্ব আমাদের কূটনৈতিক অভিধানে লেখে না। সুতরাং আসামে অন্তর্ঘাতমূলক কাজের জন্য অর্থ যোগায় চীন, আর সেই আসামের চৈনিক সীমান্তে পাক-অনুপ্রবেশকারীদের বসবাস আর ভিড়।"

কেন্দ্রীয় নন্দ মহানন্দে নাদুদের জন্য গুরু আনন্দ বিধান করিতেছেন!

ভারতে আবার "পাকিস্তান" সৃষ্টি

পরিবার পরিকল্পনার ফলে (?) এদেশে হিন্দু জন্ম-নিয়ন্ত্রণ করিতে পরম উৎসাহী—এবং সেই অবসরে চক্রবৃদ্ধিহারে মুসলমান জন্মবৃদ্ধি এবং অন্যান্য উপায়ে সংখ্যাবৃদ্ধি করিতে ব্যস্ত হইয়াছে। এ-বিষয়ে সেন্সাস রিপোর্ট কি বলে দেখুন:

হিন্দু সংখ্যাবৃদ্ধি

প্রদেশ	বৎসর	হিন্দু	দশ বৎসরে বৃদ্ধি
অন্ধ্র	১৯৬১	৩,১৮,১৪,০২৯	১৫·৯৬%
	১৯৫১	২,৭৪,৩৪,৯২৩	
আসাম	১৯৬১	৭৮,৮৪,৯২১	৩৩·৯৬
	১৯৫১	৫৮,৮৬,০৬৩	
বিহার	১৯৬১	৩,৯৩,৪৭,০৫০	১৮·৯৬
	১৯৫১	৩,৩০,৭৫,৬৬৪	
গুজরাট	১৯৬১	১,৮৩,৫৬,০৬১	২৮·১১
	১৯৫১	১,৪৩,২৮,৪৪৬	
কেরালা	১৯৬১	১,০২,৮২,৫৬৮	২৩·২৩
	১৯৫১	৮৩,৪৪,৩৫১	
মধ্যপ্রদেশ	১৯৬১	৩,০৪,২৫,৭৯৮	২৩·১৪
	১৯৫১	২,৪৭,০৭,৯৭৪	
মাদ্রাজ	১৯৬১	৩,০২,৯৭,১১৫	১১·১৩
	১৯৫১	২,৭২,১২,৬৪১	
মহারাষ্ট্র	১৯৬১	৩,২৫,৩০,৯০১	১৩·৫৮
	১৯৫১	২,৮৬,৪২,৩০৪	
মহীশূর	১৯৬১	২,০৫,৮২,৮০৩	২১·৯০
	১৯৫১	১,৬৮,৮৫,৬৪৩	
উড়িষ্যা	১৯৬১	১,৭১,২৩,১৯৪	১৯·৫৯
	১৯৫১	১,৪৩,১৮,৪১১	
পাঞ্জাব	১৯৬১	১,২৯,৩০,০৪৫	৩০·৮৬
	১৯৫১	৯৮,৮০,৭৭৯	
রাজস্থান	১৯৬১	১,৮১,৩২,৬৯০	২৫·৪৪
	১৯৫১	১,৪৪,৫৪,৯২৬	
উত্তর প্রদেশ	১৯৬১	৬,২৪,৩৭,৩১৩	১৬·১৩
	১৯৫১	৫,৩৭,৬২,৯২৫	
পশ্চিমবঙ্গ	১৯৬১	২,৭৫,২৩,৩৫৮	৩২·৬৩
	১৯৫১	২,০৭,৫১,৪১২	

মুসলিম সংখ্যাবৃদ্ধি

অন্ধ্র	১৯৬১	২৭,১৫,০২১	১২·৬৫
	১৯৫১	২৪,১০,১৬৮	
আসাম	১৯৬১	২৭,৬৫,৫০৯	৩৮·৫৬
	১৯৫১	১৯,৯৫,৯৩৬	
বিহার	১৯৬১	৫৭,৮৫,৬৩১	৩২·২৯
	১৯৫১	৪৩,৭৩,৩৬০	
গুজরাট	১৯৬১	১৭,৭৫,১০৩	২০·২৫
	১৯৫১	১৪,৫১,২১৪	
কেরালা	১৯৬১	৩০,২৭,৬৩৯	২৭·৫০
	১৯৫১	২৩,৭৪,৫৯৮	
মধ্যপ্রদেশ	১৯৬১	১৩,১৭,৬১৭	২৫·৪৫
	১৯৫১	১০,৫০,২৯৮	
মাদ্রাজ	১৯৬১	১৫,৬০,৪১৪	৮·১৪
	১৯৫১	১৪,৪২,৯৩৫	
মহারাষ্ট্র	১৯৬১	৩০,৩৪,৩৩২	২৪·৫৪
	১৯৫১	২৪,৩৬,৩৫৭	
মহীশূর	১৯৬১	২৩,২৮,৩৭৬	১৯·৪০
	১৯৫১	১৯,৫০,০৭৭	

উড়িষ্যা	১৯৬১	২,১৫,৩১৯	২২ ১১
	১৯৫১	১,৭৬,৩৩৮	
পাঞ্জাব	১৯৬১	৩,৯৩,৩১৪	৩৮·০১
	১৯৫১	২,৪৮,৯৯৩	
রাজস্থান	১৯৬১	১৩,১৪,৬১৩	৩২·৬২
	১৯৫১	৯,৯১,২৪৬	
উত্তর প্রদেশ	১৯৬১	১,০৭,৮৮,০৮৯	১৯·৪৮
	১৯৫১	৯০,২৮,৯৯২	
পশ্চিমবঙ্গ	১৯৬১	৬৯,৮৫,২৮৭	৩৬·৪৮
	১৯৫১	৫১,১৮,২৬৯	

সর্ব্বভারতীয় হিসাব হইতেছে এইরূপ :

	১৯৬১	১৯৫১	বৃদ্ধি
মোট জনসংখ্যা	৪৩,৯২,৩৪,৭৭১	৩৬,১০,৮৮,০৯০	২১·৫১
হিন্দু	৩৬,৬৫,০২,৮৭৮	৩০,৩৫,৭৫,৪৭৪	২০·২৯
মুসলমান	৪,৬৯,৩৯,৩৫৭	৩,৫৪,১৪,২৮৪	২৫·৬১

মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই হার অতিশয় উদ্বেগজনক। আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, রাজস্থান এবং পশ্চিমবঙ্গে ইহারা দশ বছরে এক-তৃতীয়াংশ হারে বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহা অস্বাভাবিক। কি পরিমাণ পাকিস্থানী আসিয়া ঢুকিতেছে এবং ভারতের "নাগরিক" ও "জাতীয়তাবাদী" হুমায়ুনেরা কি ভাবে উহাদিগকে পক্ষপুটে আশ্রয় দিয়া ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে বসাইয়া দিতেছে, ইহা তার অকাট্য প্রমাণ। কেন্দ্রীয় বিচারে ইহা বোধহয় কিস্সু না! কাজেই মুসলমান সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ আবিষ্কার এবং তাহার প্রতিবিধানের প্রয়োজন কি?

উলেমাদের সামান্য দাবি

কিছুদিন পূর্ব্বে রাজ্য বিধান পরিষদে জনৈক সদস্য জমিয়ৎ উলেমা-হিন্দের সামান্য দাবির যে ফিরিস্তি দিয়াছেন, তাহা শুনিয়া আপনারা হকচকাইয়া যাইবেন।

'জাতীয়তাবাদী' সংগঠনরূপে খ্যাত জমিয়ৎ-উল-উলেমার কঠোর সমালোচনা করিয়া তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর নিকট প্রেরিত তারবার্ত্তায় ইঁহারা দাবি করিয়াছেন :

পুলিসের এক-তৃতীয়াংশের বেশী পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু দিয়া ভর্ত্তি করা চলিবে না, অপর এক-তৃতীয়াংশ মুসলমানদের দিয়া ভরিতে হইবে, মুসলমানদের বন্দুকের লাইসেন্স দেওয়া সহজ করিতে হইবে, বাস্তুচ্যুত মুসলমানদের জন্য বহুতলা বাড়ী তৈরী করিতে হইবে—৫০ বৎসরে উহার মালিকানা মুসলমানদের দিতে হইবে, এই এলাকা "মুসলিম অঞ্চল" হিসাবে দেখিতে হইবে, এই বাড়ী নির্ম্মিত না হওয়া অবধি সি-আই টি'র বাড়ীতে বিনা ভাড়ায় মুসলমানদের রাখিতে হইবে। উপদ্রুত এলাকার থানার দারোগা ও ইন্সপেক্টারদের শাস্তি দিতে হইবে—তাহার পূর্ব্বেই পদাবনতির কথা ঘোষণা করিতে হইবে। এই "ক্ষুদ্র পাকিস্তান" সৃষ্টির প্রস্তাব অপেক্ষাও যে বিপজ্জনক প্রস্তাব দেওয়া হইয়াছে তাহা হইল :

কলিকাতাকে কেন্দ্রের অধীনে আনিতে হইবে!

মুখ্যমন্ত্রী শ্রী প্রফুল্ল সেন এ সম্পর্কে যদিও কোন জবাব দেন নাই তাহা হইলেও এ রাজ্যের মমতাময়ী ত্রাণ-মন্ত্রীর কথায় জানা গিয়াছে যে, সংখ্যালঘুদের জন্য কলিকাতায় কতকগুলি বহুতল-প্রাসাদ নির্ম্মিত হইতেছে। আমাদের মতে—জমিয়ৎ-উল-উলেমার তালিকায় একটি অতি ক্ষুদ্র দাবি বাদ পড়িয়াছে। দাবির ফর্দ্দে থাকা উচিত ছিল :

—আগামী ৫০ বৎসর পশ্চিমবঙ্গে যত হিন্দু বিবাহ হইবে, তাহাতে শতকরা অন্তত ৫০টি 'জামাতা' বাবাজী অবশ্যই মুসলমান হইতে হইবে।

কলিকাতাকে 'কেন্দ্রের' অধীন করার দাবি আরো স্পষ্ট হওয়া উচিত ছিল, কারণ কেন্দ্র বলিতে কোন্ 'কেন্দ্র' মনে করা হইতেছে তাহা বুঝা গেল না। এ-বিষয় স্পষ্ট করিয়া বলা উচিত যে উলেমার দল কলিকাতাকে ঢাকা কেন্দ্রের অধীন করিতে দাবী জানাইতেছেন। রাওয়াল-পিণ্ডি হইলেও চলিবে, কারণ জাতীয়তাবাদী (ভারতীয়) উলেমাদের প্রাণকেন্দ্র হয় ঢাকা আর না হয় রাওয়ালপিণ্ডি।

আমরা ভাবিয়া পাই না ভারতে বসবাস করিয়া এই সব কাঠ উলেমারা কেমন করিয়া কোন্ সাহসে এত ধৃষ্টতা দেখাইতে সাহস করিতেছে। কিন্তু এই পাক্‌প্রেমী ভারতীয় উলেমাদের দোষ দিয়া লাভ কি? এই শ্রেণীর মুসলমানদের মাত্রাতিরিক্ত আদর, খোসামোদ এবং তোয়াজ করিয়া কেন্দ্রীয় নন্দদুলাল এবং প্রাদেশিক হাজি মুখ্যমন্ত্রী মাথায় তুলিয়াছেন। পাকিস্তানী লাথি খাওয়া ত কর্ত্তারা অভ্যাস

করিয়াছেন—এইবার তথাকথিত 'ভারতীয়' মুসলমানদের লাথি খাওয়া আমাদের সকলকেই অভ্যাস করিতে হইবে!

এইবার দয়া করিয়া জবাব দিবেন কি?

বিগত দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত সংখ্যালঘুদের, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী জনাব প্রফুল্ল সেন মুক্তহস্তে পরলোকগত গৌরী সেনের অর্থ যেমন ইচ্ছা দরাজ হস্তে বিলি-বণ্টন করিতেছেন—যাহা দেখিয়া আমাদের মত দরিদ্র ব্যক্তিদের বার বার মনে হইতেছে—"হায় রে! আমরা যদি আজ এই হাজি-রাজ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক হইতাম!" সে-কথা যাক্, এখন কয়েকটি সামান্য প্রশ্নের জবাব (পাইব না জানিয়াও) জনাব সেনের নিকট হইতে সকাতরে প্রার্থনা করিতেছি:

১ম প্রশ্ন: সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কত শত বা হাজার ব্যক্তি তাহাদের ছেঁড়া কাঁথা পোড়াইয়া কাশ্মীরী শাল দাবি করিয়া তাহা পাইয়াছে—

২য় প্রশ্ন: কত হাজার মুসলমান ভ্রাতা—বস্তীর ফুটো দরমা এবং ভাঙ্গা বাঁশের তৈরী কুটির পুড়াইয়া তাহার বদলে পাকা বাড়ীর প্রতিশ্রুতি পাইয়াছে—

৩য় প্রশ্ন: দাঙ্গার (?) পূর্ব্বে গৃহহীন কত হাজার সংখ্যালঘু "সর্ব্বস্ব লুট হইয়াছে" বলিয়া বিষম চিৎকার করিয়া ৫০০৲ হইতে ৮।৯ শত টাকা নগদ পাইয়াছে এবং এই নগদ প্রাপ্তির দুই দিনের মধ্যেই তাহারা কোথায় গা-ঢাকা দিয়াছে—এ-পারে না ও-পারে—

৪র্থ প্রশ্ন: কত হাজার ভিক্ষুকশ্রেণীর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্য 'আশ্রয়চ্যুত হইয়াছি'—এই অজুহাতে সি-আই-টি'র পাকা বাড়ীতে বিনা ভাড়ায় আস্তানা পাইয়াছে কিংবা অদূর ভবিষ্যতে পাইবে—

৫ম প্রশ্ন: দাঙ্গার (?) সময় এবং তাহার পরে প্রায় ১০।১৫ দিন কত হাজার 'ঠাণ্ডা পোলাও' এবং বেইগন্-কা-কোপ্তা' ভক্ষণকারী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভাগ্যবানকে স্বর্গত গৌরী সেনের অর্থে বিবিয়ানী এবং গোস্তরুটি খাওয়ান হয়—

৬ষ্ঠ প্রশ্ন: কত সহস্র তথাকথিত নিগৃহীত (দাঙ্গায়?) মুসলমানকে 'দুই নয়া পয়সাও মূল্য নয়' ভাঙ্গা টিনের মগ, ফুটো কেৎলি আর পুরাতন মরচে-ধরা টিনের থালা-বাটির বদলে ২৫।৩০ টাকা মূল্যের নূতন বাসনপত্র দেওয়া হইয়াছে—

৭ম (এবং বর্ত্তমানের মত) শেষ প্রশ্ন:

যে-সব সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের নির্ব্বিচারে নগদ অর্থ, পাকা বাড়ী, দামী পোশাক-পরিচ্ছদ (বিশেষ করিয়া দামী লুঙ্গি ও পায়জামা), বাসনপত্র দান, সরকার বাহাদুর (কেন্দ্রীয় নন্দদুলালের আদেশমত) কল্পতরু হইয়া দান-খয়রাতী করিয়াছেন, তাহার মোট অর্থমূল্য কত, এবং দান-প্রাপ্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের মধ্যে প্রকাশ্য বা ছদ্মবেশী পাকিস্তানী মুসলমানের সংখ্যা শতকরা কত? এই সংখ্যা দানপ্রাপ্তদের শতকরা অন্তত ৬০-এর কম হইবে কি—

বর্ত্তমানে দেশের অবস্থা শান্ত এবং স্বাভাবিক, কাজেই বিগত (তথাকথিত) দাঙ্গায় ক্ষয়-ক্ষতি এবং সম্প্রদায়ওয়ারী লাভ-লোকসানের একটা মোটামুটি হিসাব লইতে দোষ কি? এই প্রসঙ্গে ইহা বলা কর্ত্তব্য যে, আমরা ভারতীয় তথা বাঙ্গালী ভদ্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন উক্তি করিতেছি না। আমাদের বক্তব্য সেইসব মুসলমানদের বিরুদ্ধে যাহারা মনে-প্রাণে খাঁটি পাকিস্তানী—কিন্তু অবস্থার সুযোগ লইয়া গাছেরও খাইতেছে, তলারও কুড়াইতেছে!

——

হলদে চাঁদ

আভা পাকড়াশী

আজ হপ্তা মিলেগি।

সব চটকলের কুলিরা সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে। আজ তারা হপ্তা পাবে। প্রত্যেকের হাতে টিকিট। এক মাথা চুল-দাড়ির বোঝা নিয়ে রামুও এসে এদের মধ্যে দাঁড়িয়েছে। তার হাতে একটা ছেঁড়া কাগজ। সে সেই কাগজটা অন্যদের দেখিয়ে বলছে, ই দেখো মেরা ভি টিকিট হ্যায়, মুঝহে ভি হপ্তা মিলহি।

আনন্দে চক্ চক্ করছে তার বড় বড় চোখ দুটো।

অন্য কুলিরা তাকে নিয়ে মজা করছে, বলছে—

হাঁ হাঁ, কিঁউ ন মিলি? আরে মালিক, তেরে পরদাদা লাগত্ যো। অন্যেরা এই রসিকতায় হো হো করে হেসে ওঠে। রামু ক্ষেপে গিয়ে চোখ লাল করে তাদের গালি দেয়। সামনের শাড়ীর দোকান দেখিয়ে বলে, ঐ দেখ্ বুদ্ধুগুলো, দেখ ঐ লাল শাড়ীখানা আমি এক্ষুণি লছমীর জন্য কিনব।

হপ্তা মিলতে হি তু যইসে মতোয়ালা নাই বনব।

আবার হেসে ওঠে কুলিগুলো, কিন্তু ওদের মধ্যেই কয়েকজন পুরোণো দিনের লোক তাদের থামায়। বলে, রহ্ দো ভাইয়া, ছোড়দো, দিওয়ানা আদমী হ্যায়।

তাদের মনে পড়ে পুরাণো জমানার কথা।

এই রামু তখন পাগল ছিল না। সুন্দর-সুঠাম শরীর ছিল ওর। চটকলের কুলি বস্তির জান ছিল ও। গানে-বাজনায় কথা-বার্তায় মাতিয়ে রাখত সারা বস্তি। নিজে যেমন হাসত, তেমনি অন্যের দুঃখও সইতে পারত না। যতটা পারত অন্যদের জন্য করত। সুন্দর সুখী পরিবার। দু'টি ছিমছাম ছেলেমেয়ে আর কান্তিময়ী সহনশীলতার প্রতিমূর্তি স্ত্রী লছমী।

হর পূণমের দিন সত্যনারায়ণের শিরনি চড়াত রামু। বাতাসা দিয়ে পুজো হ'ত। মুসলমান, শিখ, ইসাই সব কুলিরা গিয়ে জমায়েৎ হ'ত সেই পিপ্পল বেড়ের নীচে। সবাই বাতাসা চড়াত। কারুর মনে কোন দ্বিধা হ'ত না কারণ, তারা এখন সবাই এক জাত, সে জাত হ'ল কুলি। পুজো শেষে লছমী বাতাসার থালি হাতে ঘুঙ্ঘটের নীচে মিষ্টি হাসি নিয়ে সবাইকে বাতাসা বাটত।

আর রামু বসে যেত মাঞ্জিরা নিয়ে। অন্যদিন আল্হা গাইত। আল্হা উদলের বীরত্বের কাহিনী শুনতে শুনতে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠত বস্তিবাসীরা। নিজেদের গরিবী, হয়রানি সব ভুলে যেত। সাহস আসত তাদের মনে। অন্য জগতে চলে যেত তারা। আবার যেদিন বিরহা গাইত, সেদিন কেঁদে ভাসাত সারা বস্তির লোক। রাধার কৃষ্ণ-বিরহের জ্বালায় আর যশোদার পুত্র বিহনে দিন বিতানর দুঃখে তারা আত্মহারা হয়ে যেত। নিজেদের দুঃখ তখন তাদের কাছে নেহাতই অকিঞ্চিৎকর মনে হ'ত।

কিন্তু এই সত্যনারায়ণের পুজোর দিন রামু সত্যনারায়ণের কথা শোনাত গানের মধ্যে দিয়ে। তার ভরাট গলায় সে বলে চলত, স্বামী-বিরহিণী কন্যা কলাবতীর দুঃখের কথা। আবার এই সত্যনারায়ণের পুজোর গুণেই স্বামী ফিরে এল। আনন্দে আত্মহারা হয়ে যেই সে ছুটে গেল স্বামীকে দেখতে অমনি স্বামীর নাও কিনারায় এসে দরিয়ায় ডুবে গেল। হাহাকার করে কেঁদে উঠল কলাবতী-কন্যা। শূন্য থেকে আদেশ হ'ল, আমার পরসাদের অপমান করেছ তাই শাস্তি দিলাম। ফিরে গেল কন্যা, পরম আদরে ভক্তিভরে পরসাদ মাথায় নিল। এবার স্বামী ফিরে পেল। এমনি গুণ এই সত্যনারায়ণ পুজোর। এই পুজো করলে নিজের মনস্কামনা পুরো হয়। অন্ধের চক্ষু হয়। খঞ্জের পা হয়। গরীবের ধন হয়। হারাণো জিনিষ ফিরে পায়। জয় সত্যনারায়ণের জয় বলে পুজো শেষ হ'ত। বাচ্চাগুলো দু' হাত তুলে নাচত। আর তারা? তাদের মন এক অজানা আস্বাদে ভরে উঠত। মনে হ'ত আবার তাদের সুখ হবে, সহজেই হবে।

কিন্তু এই চটকলের কুলিদের কাজের কোন স্থিরতা নেই, সব সময়েই তাদের মাথায় ছাঁটাইয়ের খাঁড়া ঝুলছে—তারা যেন যুদ্ধের সৈনিক। কে কখন মরবে তার ঠিক নেই। সুতরাং যতক্ষণ বেঁচে আছে, তারা চায় বাঁচার আনন্দ। এখন এই হপ্তা পেলেই ওরা গিয়ে ভাটিখানায় ভিড়বে। কিন্তু তখন হপ্তা পেলেই তারা ছুটত মিঠাইয়ের দোকানে। কিছু মিঠাই কিনে রামুর সেই রামজীর সিংহাসনে চড়িয়ে দিত। আর রামুও সঙ্গে সঙ্গে মাজিরা নিয়ে বসত। মাজিরার ডুমডুমাডুম বোল উঠলেই ছেলে বুড়ো মরদ আউরৎ সবাই এসে জমা হ'ত। সেদিন আবার গানের সঙ্গে হ'ত নাচ। অনেক রাত পর্যন্ত তাদের সেই নাচ-গানের আসর চলত। ওতেই তারা যথেষ্ট উত্তেজনার খোরাক পেত।

ওদের হপ্তা বাঁটার কাজ আমার। আমার হাত থেকে ওরা হপ্তা পায় তাই আমার নাম দিয়েছে 'দেওতা'। এক এক করে এগিয়ে আসে, আর আমি টিকিট দেখে হপ্তা দিয়ে চলি। কে একদিন আসে নি, কে দু'দিন আসে নি সব লেখা আছে সেই টিকিটে। সেই অনুসারে মাইনে কাটতে হয়। ওরা চিৎকার করে—দেওতা দোয়া হো, রহম্ করো দেওতা!

কিন্তু আমি ত দেবার মালিক নই, শুধু ভাগ করবার অধিকার আছে। বৃথাই দেবতা বানিয়েছে এরা আমায়। বলি, এই হপ্তা পুরো কাম কর তা হ'লে এটাও মিলবে। ওরাও জানে পাবে না, আমিও জানি দেব না, তবু সান্ত্বনা দেই। কেউ রাগ করে বলে, আমার লড়কাঠো বোখার সে মরি যাওয়াত হায়, ঔর তু পয়সা কাটত্ দেওতা?

অন্যজনকে হপ্তা দিই, সে বলে,—

ফির ভি কম পয়সা মিলা? অবকি হারামি নোকরি ছোড় দেইবে।

জানি কাল ভোরেই আবার কাজে আসবে। প্রাণ-পণে ছাঁটাই বাঁচাবার চেষ্টা করবে। তার জন্য ওর ওপর-ওলাকে ঐ সপয়া থেকেই ঘুষের পর ঘুষ খাওয়াবে। আর সেও তা নির্বিবাদে নেবে। কারণ তারও শত দিকে অভাব।

কিন্তু এই রামু, ওকে যখনই হপ্তা দিয়েছি, কোন প্রতিবাদ করে নি। পয়সাটি হাত পেতে নিয়ে কপালে ঠেকাত, আর বলত, রামজী আপকো ভালা করে।

চারদিকের এই অসন্তোষ ইতরামির মধ্যে ওর প্রশান্ত ভাবটি বড় ভাল লাগত।

ধীরে ধীরে ঐ রামুর সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা ঘটে-ছিল। ওর সত্যনারায়ণের বাতাসার ভাগ আমিও পেতাম। কত সময় আমাকে একা বেড়াতে দেখে জোর করে টেনে নিয়ে গেছে বস্তিতে। সেই ভাটিখানার তাড়ির গন্ধ, কাঁচা নর্দমার গ্যাস, নীচু নীচু খড়ের ঘর, কোথাও কেউ খিস্তি করছে, কেউ মাতলামি করছে। ভাটিখানার গলির ধারে রোগা হাড় বের-করা কতকগুলো মেয়ে, কাজল আর খড়ি মেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিড়ি খাচ্ছে। দেখে দেখে আমার গা গুলিয়ে উঠত, কিন্তু ঐ সব মাড়িয়ে, একরাশ নোংরা নেংটা ছেলেমেয়ে, তাদের পোষা জানোয়ার, ঘেয়ো কুকুর, বকরি, গরু সব দেখে একেবারে শেষের বস্তির দালানে যখন দাঁড়াতাম তখন মনে হ'ত, এই মাটির দাওয়া আর ঐ দুটো কোঠা যেন দল ছাড়া। গোবর-মাটি লেপা, পরিষ্কার উঠোন। উঠোনে দড়ির চারপাই। চারপাইতে দু'টি শিশু ঘুমোচ্ছে, বেশ স্বাস্থ্য, আর পরিষ্কার, দেখলে কোলে নিতে ইচ্ছে করে। এক পাশে একটা গরু হাম্বা হাম্বা করছে।

অঙ্গনে পা দিয়েই রামু চেঁচাত, লছমী, এ লছমী···য়া, ইয়ে দেখ হমারি ঝোপড়ি মে দেওতা আওল বা। নিজের এই অসম নামকরণের লজ্জায় মাথাটা আমার নীচু হয়ে যেত। উঠোনের পরেই একটা বট গাছ, তার তলাটা বেশ পরিষ্কার। একটি চৌকিতে রামভকত হনুমানজী আর রামজী সীতামাঈয়ার তসবীর। গান জুড়ত রামু, নিমেষে লোকে ভরে যেত জায়গাটা, আর সত্যিই সেই নোংরামি, কাঁচা নর্দমার গ্যাস, কিছুই তখন বিশেষ অনুভব হ'ত না। একটি মাটির দিয়া হাতে নিয়ে লছমী আসত। তার একহারা শরীরটি ভক্তিভরে নুয়ে পড়ত আসনের সামনে।

সেবার চটকলে লোকসান যাচ্ছিল। কে বা কাকে ঘুষ দিয়ে যত পাট গছিয়ে দিয়েছে তার বেশীর ভাগ গাঁট ভিজে। নতুন গাঁট না এলে বা এই গাঁট না শুকোলে আর কল চালিয়ে লোকসান দেবে কে? সুতরাং

সাংঘাতিক ভাবে ছাঁটাই সুরু হ'ল। তাতে রামুও বাদ পড়ল না।

অনেকের সঙ্গে ছাঁটাই হওয়ায় প্রথমটা ওর তত লাগে নি। তারপর লছমী, সে স্বভাবেও লছমী। কোন রকমে চালিয়ে নিতে লাগল। অন্যরা ধীরে ধীরে কাজ গুছিয়ে নিল। কেউ গাঁয় ফিরে গেল। কিন্তু রামু অন্য চটকলে কাজ নিলেও দু'চার দিনের বেশী টিঁকতে পারল না। এখানে ওর কাজ খুব সূক্ষ্ম। তার জন্য ওর সুনামও ছিল। ও নিজের সেই মেসিনটাকেও রামজীর মত পূজো করত। তাকে ভালবাসত, গান শোনাত। তেল দিয়ে ঝেড়ে-পুছে চকচকে করে রাখত। ওর আশেপাশে যারা কাজ করত তারা ওর ঐ রকম মেসিনের যত্ন দেখে হাসত। আমি একদিন গিয়ে পড়ায় আমাকে সাক্ষী মেনে রামু বলেছিল, কাহেকা নেহি করব্ দেওতা? উয়ো হামে রোটি নাই খিলাওত্? কহ বাবু? ইস লিয়ে হাম উসে তেল পিলাওত্। উহার খিদ্‌মত করত্। ওর যুক্তিতে ও ঠিক আছে। মেসিনের দৌলতে ও রুটি পায়, তাই ও মেসিনে তেল দেয়।

কিন্তু মেসিনে তেল দেওয়া জানা থাকলে কি হবে, মানুষকে তেল দেবার প্রক্রিয়াটা বোধহয় রামুর ঠিকমত জানা ছিল না। তাই ওর চাকরি টিঁকছিল না। কয়েকবার আমাকে এসে বলল, ও মেসিনটি দেখতে চাইল। বললাম, তোমার মেসিন এখন অকেজোই পড়ে আছে। এখন ওর কাম নেই তাই আরাম করছে। ও হঠাৎ ভেঙ্গে পড়ে বলেছিল, উয়ো আরাম করত্ পর হাম কা করি দেওতা? আরাম যো হামারে হারাম হ্যায়! আমার লছমী? বাচ্চা দুটো? তাদের দিকে যে আর তাকান যায় না বাবুজী?

বুঝি ত সব, কিন্তু আমার নিজের চাকরি যায় যায়।

সেই গোলমালের পর বেশ কিছুদিন রামুকে দেখি নি—আবার এই কয়েকদিন হ'ল দেখছি। দোল পূর্ণিমার আর বড় বাকি নেই। গত বছরে বোধ হয় এই হোলির আগেই আমার কাছে এসেছিল। বলেছিল, দেওতা, অব কি হোলিমে হামার ঝোপড়ি মে :ল যাওব তুঝে, লছমী গুঝিয়া বনাও ত হ্যায়, উকারা হাত কি গুঝিয়া বহুত বড়হিয়া বনত্ দেওতা। খিলাওব তুঝে।

আর বলেছিল, লালার দোকান থেকে, একটা শাড়ী কিনবে। লছমী লাল শাড়ী চেয়েছে। এই হপ্তা পেলেই কিনবে। সে হপ্তা ও আর পায় নি। সেই হপ্তাতেই ও ছাঁটাইয়ের পরওয়ানা পেল।

তারপর ধীরে ধীরে ওর গরু গেল। লছমীর পায়ের লচ্ছা, গলার হাঁসুলী গেল, এমন কি সোহাগীর চিহ্ন সেই পায়ের আংটি ক'টা, তাও গেল ছেলে ববুয়ার অসুখে। সেই ববুয়া, গোলগাল হাসিমুখো ছেলেটা। কোমরে পয়সার ঘুনসি, চোখে মোটা কাজল, আঙুল চুষত বাপের কাঁধে বসে।

বাপ তখন কুলদের টিফিন বেচছে। কখন বেসনের বা আটার লাড্ডু, কখনও মোমফলির পট্টি বা লাইয়া পট্টি। তার গান করে সওদা বেচার ঢঙে ভালই বিক্রি হ'ত। অন্য খুঞ্চাবালাদের তা সহ্য হ'ল না। সেই ভুট্টাবালা, যে একরাশ ভুট্টা ছাড়িয়ে মালসায় কাঠ-কয়লার আগুন জ্বালিয়ে পাখার বাতাস করে করে, ভুট্টা সেঁকে লেবু-নুন মাখিয়ে বেচত, তার ভুট্টা পড়ে থাকে। পুরি-তরকারিবালার সেই খোসাশুদ্ধ পচা আলুর ঝাল-তরকারি আর পোকা-ধরা আটার তেলে-ভাজা লুচিও পড়ে থাকে, আগে যা নিমেষে উড়ে যেত। পেঁড়া, বর্ফিবালার থালাও খালি হয় না। আসলে কুলি-কামিনরা সবাই রামুকে ভালবাসে, তারা তাকে সাহায্য করতে চায়। কিন্তু এই খুঞ্চাবালাদের রোজগার মাটি হ'লে সইবে কেন এরা? বেদম করে মারল একদিন তারা রামুকে। তার সওদা কেড়ে নিল।

এবার দোরে দোরে ভিক্ষা চেয়ে বেড়ায় রামু। বিরহা গায় বলে রামজী আমার ওপর নারাজ হয়েছে। সে আর আমায় দয়া করবে না। কিন্তু লছমীর কাছে লুকোয়, ভিক্ষে করেছে বলে না। সে বড় অভিমানী। ভিক্ষের পয়সা নেবে না। না খেয়ে মরবে সেও ভাল। ধীরে ধীরে শরীর ভেঙ্গে পড়ল রামুর। বর্ষায় ভিক্ষায়ও বেরুতে পারে না। বাড়ীর অবস্থাও শোচনীয়। আর চেয়ে দেখতে পারে না। লছমীর সে রূপ নেই, শুকিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। ছেলেমেয়ে দুটোর আর কাঁদবারও ক্ষমতা নেই। ফুটো চাল বেয়ে অঝোরে জল পড়ছে ঘরে। সকলের অভাব, কে কার খবর নেয়? ঘর খালি,

লছমী আর সে দু'জনে মিলেই সব বেচেছে। তবে একে অন্যকে লুকিয়ে। কিন্তু ঘর তার দৈন্য প্রকট করে দিয়েছে, লুকিয়ে রাখে নি।

মরীয়া হয়ে সেদিন বেরিয়ে পড়ল রামু ভিক্ষেয়। সারাদিন ভিজে ভিজে ভিক্ষে করে যখন ফিরছে তখন দেখল, মেঘ সরে গিয়ে চাঁদ উঠেছে। পূণমের চাঁদ। গুণে দেখল, যা পয়সা হয়েছে তাতে তাদের চারজনের কারুরই পেট ভরবে না। তখন সেই পয়সা দিয়ে খানিকটা ধুতুরার বিষ কিনল আর কিনল মিঠাই। ভাবল আজ এতদিন পর ঘরে মিঠাই নিয়ে যাচ্ছে, বাচ্চা দুটো আর লছমী খুব আনন্দ করে এই বিষ-মিশান মিঠাই খাবে।

মহল্লায় ঢুকেই একটা চীৎকার দিল,—এ ভাইয়ো, হামে নোকরি মিল গওয়া, চলো আজ গানা গায় চলকে।

সকলেই খুশী, যে যেমন পারে কিছু কিছু বাতাসা নিয়ে ছুটল সেই পিপ্পল গাছের নীচে। অত সোরগোল শুনে দুর্বল শরীরটা টেনে টেনে লছমী এসে দাঁড়াল দরজায়। তার হাতে সেই মিঠাইয়ের দোনা তুলে দিয়ে ঘরে ঢুকে বাচ্চা দুটোকে খুব আদর করল রামু, তারপর লছমীর চোখের দিকে তাকিয়ে, জোর দিয়ে বলল,

হামে নোকরি মিল গওয়া। ইয়ে মিঠাই লায়ে হ্যাঁয় তেরে সবকে লিয়ে।

আর ঘরে থাকতে পারে নি, এদের মৃত্যুর সেই মরণ-যন্ত্রণা চোখের ওপর দেখতে পারে নি। যদি কারুর গলার আওয়াজ বা গোঙানি শোনা যায় সেই ভয়ে পিপ্পলের নীচে বসে জোরে জোরে মাজিরা বাজিয়ে পাগলের মত আল্‌হা গেয়েছে। বিরহা গায় নি। আনন্দের মধ্যেই মৃত্যু আসুক এই চেয়েছে, ভেবেছে কিছু পরে সব শেষ হ'লে বাকি মিঠাই সে খেয়ে ওদের সাথী হবে। কিন্তু পারে নি।

তারপর পুলিস এসেছে। লাশ সরিয়েছে। রামুকে পায় নি। যখন ফিরে এল তখন ও বেঁচে মরে রয়েছে। তখন ও পাগল, দিওয়ানা। কিন্তু রামু হোলি ভোলে নি, পূণম ভোলে নি, লছমীর জন্য লাল শাড়ী কিনতে হবে তা ভোলে নি। তাই টিকিট নিয়ে হপ্তা নেবার জন্য এসে দাঁড়িয়েছে, বলছে, আজ মুঝহে ভি হপ্তা মিলেগি, ইয়ে দেখত হো মেরা টিকট? হাতে একটা ছেঁড়া কাগজ।

রামু কিন্তু আর আল্‌হা গায় না, বিরহাও গায় না, কেউ রামজীর নাম নিলে তার গায় থুথু দেয়, মারতে আসে তাকে। শুধু এই পূণমের চাঁদ উঠলে সে একটা উর্দু গজলের লাইন গায়। কেমন করে শিখল কে জানে? দেহাতি লোক, গ্রাম্য ভাষাই বলেছে চিরকাল কিন্তু আশ্চর্য্য, উর্দু'র উচ্চারণ করে ঠিক ঠিক।

"ইক মহল কি আড়সে নিকলা উয়ো পিলা মাহ্‌তাব্
জৈসে মুল্লা কা আমামা, জৈসে বনিয়ে কি কিতাব,
জৈসে মুফলিস কি জওয়ানী, জৈসে বেওয়া কা শবাব।"

এর মানে—একটা মস্ত বাড়ীর আড়াল থেকে ঐ হলদে রং-এর চাঁদ বেরিয়েছে, চাঁদের ঐ হলদে রং যেন মোল্লার হলুদ আলখাল্লা, যেন বেনের হিসেবের হলদে খেরো। যেন ভিখিরী মেয়ের যৌবন, যেন বিধবার সাজ। আর কিছু নয়।

—

হরতন

শ্রীবিমল মিত্র

২২

সুকান্ত রায় আসলে এসেছিল নিতাই বসাককে খুঁজতে। অনেক টাকা নিয়েছে নিতাই বসাক। এ পর্য্যন্ত কত টাকা যে দিয়েছে সুকান্ত নিতাই বসাককে তার হিসেব-নিকেশ নেই। রাজা করে দেবার ক্ষমতা আছে নিতাই বসাকের, এটা নিতাই বসাকই বার-বার প্রচার করেছে।

যখনই সুকান্ত বলেছে—কি দাদা, কি হ'ল? রাইটার্স বিল্ডিং-এ গিয়েছিলেন আর?

নিতাই বসাক এমনিতে ব্যস্ত মানুষ। কিন্তু ভদ্রতাতে নিখুঁত। বলেছে—সে কি কথা বলছেন মিষ্টার রায়? রাইটার্স বিল্ডিংএ যাব না? তা হ'লে খাব কি? আমাদের পেট চলছে কিসে?

—না, না, আপনাদের সব বড় বড় পারমিটের ব্যাপার, আপনাদের ত যেতেই হবে! তা বলছি না, বলছি আমার ব্যাপারটার কিছু খবর নিয়েছেন?

—বাঃ, এটা কি বললেন? আপনার ব্যাপারের জন্যে ভাবছেন মাথা-ব্যথা নেই? কালীপদবাবুকে বলে এলাম। বললাম—সুকান্তবাবু আমার ক্যাণ্ডিডেট, তার জন্যে আপনাকে কিছু করতেই হবে স্যার, নইলে আমরা বাঁচব কি করে?

—আপনি বললেন ওই কথা?

—তা বলব না? কালীপদবাবু এখন মিনিষ্টার হয়েছেন বলে কি একেবারে পীর হয়ে গেছেন? আগে একসঙ্গে আমরা কত তাস খেলেছি দু'জনে, মুড়ি-তেলে-ভাজা খেয়েছি, সে সব কি আর ভুলে যেতে পারে কেউ?

—আপনারা কি একসঙ্গে আড্ডাও দিয়েছেন নাকি?

নিতাই বসাক হো-হো করে হাসত। বলত—আরে শুধু কি একা কালীপদবাবু? ওই এক আপনাদের ডাক্তার বিধান রায় ছাড়া আর যতগুলো মিনিষ্টার আছে সকলের সঙ্গেই ত আড্ডা দিয়েছি এককালে। আমি ছিলাম মশাই এক নম্বরের আড্ডাধারী। জীবনে আমার যা-কিছু উন্নতি দেখছেন সবই ওই আড্ডার দৌলতে! তবে হ্যাঁ, লোক বেছে বেছে আড্ডা দিয়েছি। আমার ফোর-সাইট ছিল, এমন-এমন লোকের সঙ্গে আড্ডা দিয়েছি যারা একদিন বড় হবে জানতাম—

সুকান্ত বলত—সত্যিই আপনার দেখছি দূর-দৃষ্টি আছে—

নিতাই বসাক বলত—তবে মুশ্‌কিলটা কি জানেন, আজকাল মিনিষ্টারদের সেক্রেটারিগুলো হয়েছে ত্যাঁদোড়! কথা শুনতে চায় না। আর তাদেরও দোষ নেই—ঘুষ-দেনেওয়ালা লোক যে আজকাল রাইটার্স বিল্ডিং-এর আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে! তারা এমন লোভ দেখিয়ে দিয়েছে যে টাকা না দিলে আর কলম ধরতে চায় না—

সুকান্ত বললে—তা যদি বলেন ত টাকা না-হয় দেব —কত টাকা দিতে হবে? এক হাজার?

নিতাই বসাক বলত—খবরদার, খবরদার! টাকার নামটি করবেন না। আগে কাজ না হ'লে ওদের টাকা দিতে নেই। সব বেটা রাঘব-বোয়াল! টোপটা গিলে নিয়েই একেবারে মাটির নীচেয় গিয়ে ডুব মারবে, আর টিকি দেখতে পাওয়া যাবে না—

সুকান্ত জিজ্ঞেস করত—তা হ'লে কি করব?

প্রথম প্রথম নিতাই বসাক বলত—সে যা করতে হবে, আমি যথা-সময়ে বলব, আপনি কিছু ভাববেন না মিষ্টার রায়—

কিন্তু আস্তে আস্তে যত পুরণো হ'তে লাগল, যত ঘনিষ্ঠতা বাড়তে লাগল, ততই যেন নিতাই বসাক বদলে যেতে লাগল। বলতে লাগল—দিন, দু'শ টাকা দিন, কাজটা পেকে এসেছে—

সুকান্তর অবস্থা এমন কিছু নয় যে দু'শ বললে তখনি

দু'শ টাকা বার করে দেবে। কিন্তু চাকরির উন্নতির জন্যে লোকে সব কিছু করে। বৌ-এর গয়না বাঁধা দিতে হ'লেও কেউ পেছ্‌পাও হয় না। সুকান্ত নিজের উন্নতির জন্যে যে-ক'টা টাকা জমিয়েছিল, আস্তে আস্তে সবই নিতাই বসাকের হাতে তুলে দিয়েছিল। শেষ-কালে যখন বোঝা গেল তার হাতে আর টাকা নেই, তখন থেকেই নিতাই বসাকের আসাও কমে এল। তখন সুকান্তকেই নিতাই বসাককে খুঁজে খুঁজে বেড়াতে হয়। বার-বার গাড়ি নিয়ে এসে দুলাল সা'র বাড়ী এসে শোনে—নিতাই বসাক কলকাতায় গেছে, কিংবা দিল্লী গেছে, কিংবা বোম্বাই—

শেষকালে একেবার দেখাই পাওয়া যায় না তার।

তখন সুকান্তর মনে সন্দেহ হ'তে লাগল। লোকটা কি তাকে ঠকালে নাকি? তাই সেদিন দুলাল সা'র বাড়ীতে এসে যখন শুনলে কলকাতায় গেছে নিতাই বসাক, তখন কি খেয়াল হয়েছিল কর্তামশাই কেমন আছে দেখে যাবে। দুলাল সা'ও নেই, নিতাই বসাকও নেই। সব গেছে বেয়াই-এর দেশে।

কিন্তু এখানে এসে যা শুনলে তাতে হতবাক্ হয়ে গেল।

নিবারণের তখন পাগলের মতন অবস্থা।

সুকান্ত জিজ্ঞেস করলে—শেষকালে কি হয়েছিল?

ততক্ষণে বোধহয় খবরটা কেমন করে ছড়িয়ে পড়েছে কেষ্টগঞ্জে। পিল্ পিল্ ক'রে লোক আসতে আরম্ভ করেছে। কারোর মুখেই আর কোনও কথা নেই। সেই সবই হ'ল শেষ পর্যান্ত। কেষ্টগঞ্জের ভট্টাচার্যি-বাড়ী আবার মাথা তুলে দাঁড়াল। সত্যিই আবার হরতন ফিরে এল। নাত্‌নী আসার সঙ্গে সঙ্গেই কর্ত্তমশাই আবার বংশের আদি-গৌরব ফিরিয়ে আনলেন। আর কিছুদিন বেঁচে থাকলেই হয়ত পৈঁপুলবেড়ের বাঁওড়ের ওপর দুলাল সা'র নতুন সুগার-মিলটাও নিয়ে নিতেন। কর্ত্তামশাই নিজেও সকলকে তাই বলতেন শুনিয়ে শুনিয়ে। সবাই-ই আশা করেছিল সেইটেই সত্যি হবে। কবে একদিন দুলাল সা'র গুরুদেব এসে কি ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন, তার সবটাই যদি মিলল ত বাকিটা মিলল না কেন? কেন তিনি বাকিটা দেখে যেতে পারলেন না?

ভেতর-বাড়ীতে বড়গিন্নী বুঝি হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠেছিলেন। এমনিতে বড়গিন্নীর গলা কখনও কেউ শোনে নি বা শুনতে পায় নি। কিন্তু আজকের দিনেও কি তিনি না কেঁদে থাকতে পারেন?

নিবারণ সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে গিয়ে বললে—কর্ত্তামা, চুপ করুন, হরতন শুনতে পাবে—

হরতনের নামটা শুনেই বড়গিন্নী সামলে নিলেন বুঝি নিজেকে। আর কাঁদতে পারলেন না। একমাত্র নিবারণ ছাড়া হরতনের কথা বুঝি সবাই ভুলেই গিয়েছিল। এতদিন এত যত্ন, এত চিকিৎসা, এত সেবা, এত অর্থব্যয় যাকে কেন্দ্র করে হচ্ছিল, তার কথা বুঝি আর কারোর মনেই ছিল না। সে যে এই মৃত্যুর কথা জানে না, তাকে যে এই মৃত্যুর সংবাদ জানান উচিত নয়, তা যেন কারোর খেয়ালই ছিল না। সত্যিই ত, এ-খবর জানলে তার অসুখ ত আবার বেড়ে যেতে পারে। সে-দিক্‌টা দেখছে বঙ্কু। বঙ্কু এতক্ষণ সব দেখে বোবা হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু খেয়াল ছিল তার সব দিকে। সে সিঁড়িটা আগ্‌লে দাঁড়িয়ে ছিল। কেউ যেন না ওপরে যেতে পারে, কেউ যেন না ওপরে গিয়ে খবরটা হরতনকে দিতে পারে, হরতনও যেন কর্ত্তামশাই-এর খবরটা পেয়ে নিচেয় নেমে না আসে।

তবু সন্দেহ ঘোচে নি বঙ্কুর।

বঙ্কু আস্তে আস্তে ওপরে গেল। বাইরের বারান্দা থেকে উঁকি মেরে দেখলে হরতন ঘুমোচ্ছে। মাথার ওপরে পাখাটা বন্ বন্ করে ঘুরছে। সামনের টেবিলের ওপর ডাব, বেদানা, আঙ্গুর, আপেল। সমস্ত কিছু তৈরি।

হঠাৎ হরতন চোখ মেলতেই দেখে ফেললে বঙ্কুকে।

—কি, লুকিয়ে লুকিয়ে কি দেখছিলে?

থতমত খেয়ে গেল বঙ্কু। আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকল। বললে—না, দেখতে এসেছিলাম তুমি কি করছ? ওষুধ খাবার টাইম হয়েছে কি না!

হরতন ঠোঁট বেঁকালো। বললে—ওষুধ আমি আর খাব না—

—কেন? কত কষ্ট করে কলকাতা থেকে ওষুধ আনি আমি তা জান?

—তা ত জানি! এত কষ্ট করে ওষুধ এনে তুমি কি ভাব তোমার লাভ হবে কিছু?

—আমি কি আমার লাভের জন্যে কষ্ট করি ভেবেছ? তুমি ভাল হয়ে যাবে বলেই ত এত কষ্ট করা!

—তা আমি ভাল হ'লে তোমার লাভটা কি? আমি ভাল হয়ে গেলেই ত তোমাকে এ-বাড়ী থেকে চলে যেতে হবে। তখন তোমাকে আর এ-বাড়ীতে কেউ খেতে দেবে না বিনা পয়সায়।

বঙ্কু একটু হাসতে চেষ্টা করলে। নিচেয় যে-কাণ্ড হচ্ছে তা যেন টের না পায়।

বললে—আমি বিনা-পয়সায় এখানে থাচ্ছি, এটা তোমার বুঝি সহ্য হচ্ছে না?

হরতন বললে—তা বলছি না, বলছি আমি ভাল হয়ে গেলে তোমাকে আবার খেটে খেতে হবে চণ্ডীবাবুর অপেরায়—

তারপরে হঠাৎ নিজের কানটা খাড়া করে রইল হরতন।

বললে—নিচেয় কিসের গোলমাল হচ্ছে গো? অনেক লোক এসেছে বুঝি?

—হ্যাঁ, ও কিছু না!

—কারা এসেছে বল না? দাদুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে বুঝি?

হরতন যেন ছেলেমানুষের মত হয়ে গেল।

বললে—অনেকদিন দাদুকে দেখি নি, দাদু আমার কাছে আর আসে না কেন বল ত? আমি ভাল হয়ে গেছি ব'লে?

বঙ্কু বললে—না না, অনেক কাজ-কর্ম্ম পড়েছে যে! আরও একটা জমি কিনছেন তোমার জন্যে। সেখানে আর একটা বাড়ী তুলবেন কি না! রোজই ত তোমার কথা জিজ্ঞেস করেন কর্ত্তামশাই, এই ত এক্ষুণি জিজ্ঞেস করছিলেন হরতন কেমন আছে—

—তুমি কি বললে?

—আমি আর কি বলব? আমি বললাম খুব ভাল আছে। আর সত্যিই ত তুমি খুব ভাল আছ। আর তুমি ভাল হ'লেই ত আমি ছুটি পাব।

হরতন এবার হাসল। বললে—তা হ'লে আমি আরও কিছু দিন শুয়ে পড়ে থাকি, কি বল?

—কেন?

—তা হ'লে তুমি যা চাও তাই-ই হবে!

—আমি কি চাই তুমি জানলে কি করে?

—এতদিন একসঙ্গে যাত্রাগান করে এসেছি, তুমি কি চাও তা আর জানি না মনে কর?

—তুমি খুলে বল না, আমি কি চাই?

—যাও, পারিনে বাপু তোমার সঙ্গে! এ কি নল-দময়ন্তীর পালা যে পার্ট দেখলাম আর মুখস্থ বলে গেলাম!

বঙ্কু বললে—দাদু কিন্তু বলেছে একদিন তোমার প্লে দেখবে। তুমি ভাল হয়ে উঠলে একদিন এই বাড়ীর সামনের বাগানে 'রাণী রূপকুমারীর' প্লে দেখবে তোমার—

হরতন বললে—এখন সব পার্ট ভুলে গেছি, সে-সব আর কিছু মনে নেই—

বঙ্কু বললে—আমি কিন্তু ভুলি নি। আমি তোমার পার্টটা এখনও গড়-গড় করে বলে যেতে পারি। আমার সব কথা মনে আছে!

হরতন হঠাৎ বললে—আচ্ছা, আমি সেরে উঠলে তুমি কি করবে বঙ্কু? আবার গিয়ে চণ্ডীবাবুর অপেরায় ঢুকবে?

বঙ্কু বললে—সে-সব কথা এখনও ভাবি নি!

—কিন্তু এখন থেকে না ভাবলে চলবে কি করে তোমার? চিরকাল ত আমার কাছে বসে থাকলে তোমার চলবে না।

বঙ্কু বললে—তা ত চলবেই না। তোমার বিয়ে-থা হবে, সংসার হবে, গিন্নী-বান্নি হয়ে ঘর-সংসার করবে। তখন হয়ত এক-একবার দেখে যাব তোমাকে এসে, তুমি

হয়ত ঘোমটা দিয়ে এসে দাঁড়াবে আমার সামনে, তারপর ভেতরে চলে যাবে—

হরতন হাসল, বললে—বা রে, তুমি ত বেশ আমার ভবিষ্যৎ একেবারে ছক্ কেটে রেখে দিয়েছ দেখছি—তোমার ত বেশ দূর-দৃষ্টি আছে—

বঙ্কু বললে—সত্যি বলছি অঞ্জনা, তার বেশি দাবি করবার কি অধিকার আছে আমাদের?

হরতন বললে—না বাপু, তুমি আর যাত্রা ক'রো না এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে—

বঙ্কু বললে—আমার 'রূপকুমারীর' পার্ট দেখে কত লোকে কত হেসেছে, কত লোকে কত দুয়ো দিয়েছে, তাতে আমি কিছু মনে করি নি। কিন্তু তুমি আমাকে দুয়ো দিলে আমার গায়ে লাগে।

হরতন বললে—তা অন্যায়টা আমি কি বলেছি! কেন তুমি ও-সব কথা আমাকে শোনাচ্ছ?

—কি কথা?

—ওই যে আমি বিয়ে করে সংসার করে ঘোমটা দিয়ে তোমার সামনে আসব, হ্যান্-ত্যান্ কত কি কথা বললে!

—তা আমি কি মিথ্যে কথা বলেছি? তুমি বিয়ে করবে না কোনওদিন! সংসার করবে না কোনওদিন? তা হ'লে এই এত বড় বাড়ী, এত সম্পত্তি, এত ঐশ্বর্য, এ সব খাবে কে? এ-সব দেখবে কে?

হরতন বললে—ও, তাই বল, আমি যে এত বড়-লোক হয়েছি এ তোমার সহ্য হয় নি?

বঙ্কু বললে—সহ্য হয়েছে বলেই ত তোমার মুখের সামনে এত কথা বলবার সাহস হয়েছে আমার—তুমি যে এতদিন পরে আবার সেরে উঠেছ এতে আমার মত আর ক'জনের আনন্দ হয়েছে শুনি?

হরতন বললে—কিন্তু সত্যি বলছি বঙ্কু, মনে হচ্ছে এত আরাম না পেলে হয়ত বুঝতে পারতাম না কাকে বলে কষ্ট সহ্য করা। তাই ত তোমার কথা ভেবে ভয় পাচ্ছি! এখান থেকে ফিরে গেলে আর কি চণ্ডীবাবু তোমাকে চাকরি দেবে? আর চাকরি দিলেও তুমি কি আর সে-চাকরি করতে পারবে?

বঙ্কু বললে—আমার কথা ছেড়ে দাও তুমি, আমি কি আর একটা মানুষ!

হঠাৎ নিচে থেকে আর একটা গোলমাল কানে এল।

হরতন জিজ্ঞেস করলে—ও কিসের শব্দ; অত গোলমাল হচ্ছে কেন নিচেয়? ওরা কারা?

বঙ্কু বললে—ও কিছু না অঞ্জনা, কই, আমি ত কিছু শুনতে পাচ্ছি না, দাদু বোধহয় সরকার-মশাইকে বকছেন।

আবার নিচে থেকে গোলমাল উঠল। হরতন বিছানা ছেড়ে উঠতে যাচ্ছিল। বঙ্কু বললে—তুমি উঠছ কেন? আমি দেখে আসছি, তুমি শুয়ে থাক—

কিন্তু নিচের গোলমালটা যেন আরও বেড়ে উঠল। কার যেন চাপা কান্না, কয়েকজন লোকের কথাবার্তা, যেন অনেক লোক এসে কি সব বলছে। বিরাট বাড়ী, সব কথা স্পষ্ট ওপরে এসে পৌঁছাচ্ছে না।

—তুমি যেন চেপে যাচ্ছ আমার কাছে! বল কি হয়েছে? বল?

বঙ্কু বললে—না না, কিছু হয় নি। তুমি শুয়ে থাক চুপ করে—আমি দেখছি, আমি যাচ্ছি নিচেয়, আমি দেখে আসছি—

হরতন কথা না শুনেই উঠে দাঁড়াল বিছানা ছেড়ে। বললে, তুমি লুকোচ্ছ বঙ্কু আমার কাছে, আমি বুঝতে পেরেছি—

বলতে বলতে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

বঙ্কু হরতনের হাতটা ধরে ফেললে। বললে—তুমি যেও না অঞ্জনা, নিচেয় যেও না, কথা শোন, তোমার শরীর খারাপ, তোমার অসুখ—

হরতন এক ঝট্‌কায় বঙ্কুর হাতটা ছাড়িয়ে নিয়েই সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

বঙ্কুও চিৎকার করে ধরতে গেল—অঞ্জনা, তোমার অসুখ, ডাক্তার বারণ করেছে তোমায় নড়া-চড়া করতে, শোন শোন—

কিন্তু ততক্ষণে নিচে থেকে গোলমাল আরও জোরে কানে আসতে সুরু করেছে। হরতন দুম্ দুম্ করে সিঁড়ি দিয়ে নিচের দিকে নামতে লাগল।

বঙ্কুও পেছন পেছন নামছিল—অঞ্জনা, অঞ্জনা—

কিন্তু হরতন নিচেয় এসেই অবাক্ হয়ে গেছে। নিচেয় তখন অনেক লোক। ঘর-বারান্দা-বৈঠকখানা

সব ভস্তি হয়ে গেছে। বঙ্কুও সকলকে দেখে হতবাক্ হয়ে গেছে। বড়গিন্নী মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছেন। কর্তামশাই তখনও বিছানায় অসাড় হয়ে পড়ে আছেন। ঠোঁটের ওপর একটা কালো মাছি বসে বসে পাখা নাড়ছে। আর নিবারণ সরকার পাথরের মত ঠায় দাঁড়িয়ে। তার যেন নড়বার শক্তিটুকুও নিঃশেষ হয়ে গেছে।

আর যারা এতক্ষণ কথা বলছিল তারাও হরতনকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখে চুপ করে গেল।

হরতন সকলকে যেন চিনতে পারলে। ওই ত নতুন-বৌ, দুলাল সা, নিতাই বসাক। আর তার পেছনেই, দুলাল সা'র পেছনে, তার ছেলে বিজয়।

সুকান্ত রায় এদের পেছনে দাঁড়িয়ে সকলকে দে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল।

আর সকলের শেষে কয়েকজন পুলিশ, দারোগ আর একজন অচেনা মুখ।

—দাদু, দাদু!

হরতনের গলার ডাকটা যেন আর্তনাদের ম শোনাল। সকলের মনে হ'ল যেন কর্তামশাই ওই ডা শুনে এখনি জেগে উঠে বসবেন। কিন্তু তিনি তং অসাড়, অচৈতন্য।

নতুন-বৌ হঠাৎ সামনে এসে হরতনকে ধরলে।

ক্রমশঃ

—*—

অসাধারণ মানুষদের মধ্যে যে সকল গুণ ও শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, সাধারণ মানুষদের মধ্যেও তাহা আছে, কিন্তু ততটা বিকশিত অবস্থায় না থাকিতে পারে। মহাপুরুষদের জীবনের প্রভাবে তৎসমুদয় বিকশিত হইতে পারে।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৭।

পাঞ্চজন্য

ছুই বিজ্ঞানী—ছুই জ্যোতিষ্ক

স্থান—ওয়াশিংটনের হোয়াইট হাউস।

কাল—২রা ডিসেম্বর, ১৯৬৩ সাল। এনরিকো ফার্মি পুরস্কার-প্রাপ্তির অনুষ্ঠান।

ছুই বিজ্ঞানী গভীরভাবে করমর্দন করলেন। সে সঙ্গে বহু বছরের চাপা গুঞ্জন, জনশ্রুতি, খবর কাগজের চমৎকার বহু কাহিনী সমস্তই বন্ধ হ'ল। অনুষ্ঠানের সভাঘরে—দীর্ঘ দশ বছর পরে ছুই বিজ্ঞানী মিলিত হলেন। ছু'টি নিভৃত বেদনা পরস্পরের পরিচয় পেল। ছুই বিজ্ঞানী—আমেরিকার বিজ্ঞান জগতের তাঁরা ছুই জ্যোতিষ্ক। রবার্ট ওপেনহাইমার এবং এডওয়ার্ড টেলার।

জ্যোতিষ্কই তাঁরা বটে। পৃথিবীর বুকে তাঁরাই বিস্ফোরণশীল জ্যোতিষ্কের তেজ বহন করে এনেছিলেন।

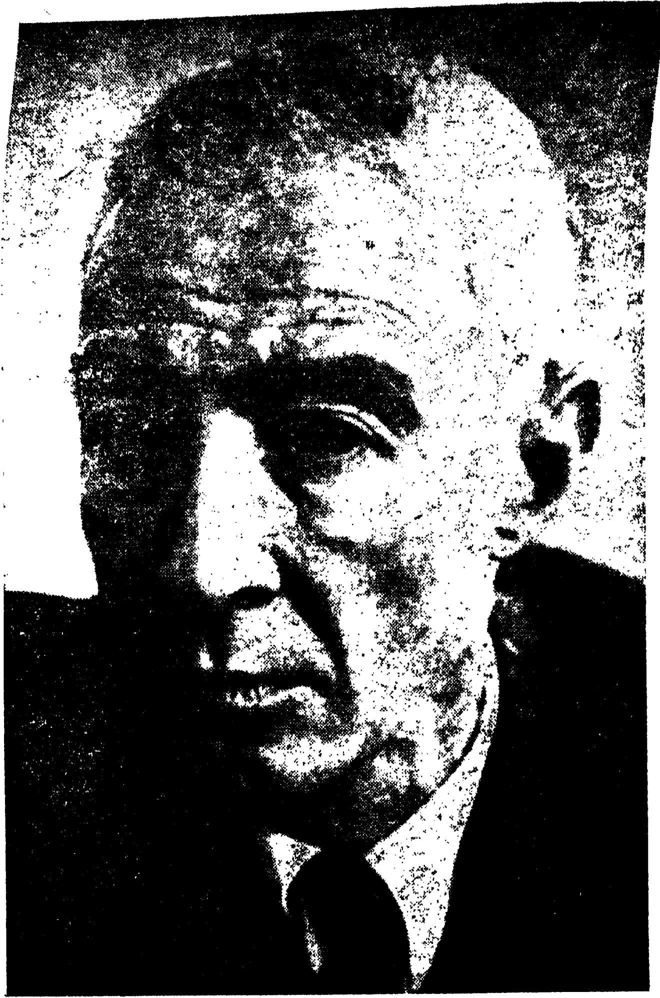
ওপেনহাইমার যুদ্ধকালীন পরমাণু-যজ্ঞের প্রধান হোতা—পরমাণু বোমার মূল নির্মাতা। মেক্সিকোর নির্জন মরুভূমিতে পরমাণুর প্রথম বিস্ফোরণের মধ্যে তিনি "শত সহস্র সূর্যের" তেজ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। বহু ভাষাবিদ্ বিজ্ঞানী তখন বিহ্বল স্বরে শ্রীমৎভগবদ্গীতার মূল সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করে বলেছিলেন—

দিবি সূর্য্য সহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ।

আকাশে যদি এক সঙ্গে হাজার সূর্যের উদয় হয় তবেই একমাত্র এই দারুণ দীপ্তির কিছু তুলনা চলে। লস এলামোসের সেই গোপন বৈজ্ঞানিক কারখানায় এতদিনের সাধনায় জন্ম নিল যে "শিশুটি" (প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান সুদূর ইউরোপে বসে পরমাণু বোমার খবর এই সাংকেতিক কথাতেই পেয়েছিলেন) তার এই ভীষণ রুদ্র রূপ দেখে সংবেদনশীল বিজ্ঞানী পৃথিবীর ভবিষ্যৎ চিন্তায় অস্থির হলেন। বোমার এই মারাত্মক শক্তিকে কিভাবে সংযত করা যায়, নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ওপেনহাইমার তখন আমেরিকার বিজ্ঞান জগতের নায়ক, পরমাণু-সংক্রান্ত উপদেশক-মণ্ডলীর তিনিই হলেন সভাপতি—সরকারী মহলে তাঁর অখণ্ড প্রভাব। এই প্রভাবের বলে তিনি দেশের অস্ত্র গবেষণার দিকগুলির রাশ টেনে ধরলেন। এটম বোমার পর হাইড্রোজেন বোমার কথা উঠল। ছুনিয়ায় তখন আমেরিকাই এটম বোমার একমাত্র অধীশ্বর রাশিয়া তখনও দ্বিতীয় নায়ক হিসাবে দেখা দেয় নি। প্রতিরক্ষার তুলনায় মানবিক মূল্যগুলিই তখন প্রধান হয়ে উঠেছিল। ওপেনহাইমারের প্রেরণায় বিজ্ঞানীগোষ্ঠী তাই নূতন বোমার বিরুদ্ধে মত দিলেন। হাইড্রোজেন বোমার কাজ স্তিমিত হ'ল। ঠিক এ সময়েই এডোয়ার্ড টেলার পরমাণুর বিস্ফোরণ-বিক্ষুব্ধ রঙ্গমঞ্চে হাইড্রোজেন বোমা তৈরীর প্রতিজ্ঞা নিয়ে অবতীর্ণ হলেন। ইতিহাসের ঘটনাগুলি তাঁর জন্য নূতন সুযোগ তৈরি করে দিল।

আমেরিকার এটম বোমা তৈরীর কয়েক বছরের মধ্যে রাশিয়াও এটম বোমায় সফল হয়। প্রত্যাশিতই ছিল, তবে এত তাড়াতাড়ি—রাষ্ট্রনায়কেরা ধারণা করতে পারেন নি। সাজো সাজো রব পড়ে গেল—বোমা বিস্ফোরণের নৈতিক দিকগুলি চাপা পড়ল। টেলার—যিনি আগে ওপেনহাইমারের সহকারী ছিলেন, লস এলামোসে ওপেন-হাইমারের গণ্ডী ছেড়ে তিনি বার্কেলীতে নূতন ল্যাবরেটরীর কর্তৃত্ব পেলেন। এখানে এই ল্যাবরেটরীতে বসে টেলার সূর্যের শাস্ত বিস্ফোরণের কৌশল আয়ত্ত করে হাইড্রোজেন পরমাণুর বোমার বিস্ফোরণ সম্ভব করে তুললেন। এডোয়ার্ড টেলার সফল হলেন, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা এই যে, প্রথম হাইড্রোজেন বোমার কয়েক মাসের মধ্যেই রাশিয়াও এই নূতন বোমাটি হাতের মুঠোর মধ্যে পেল। আমেরিকা আর একবার সচকিত হ'ল। বোমা-বিরোধী রীতিনীতির জন্য ওপেনহাইমার সমালোচনার সম্মুখীন হলেন। সরকারী মহলে তাঁর প্রতিপত্তিতে চিড় খেল। শুধু তাই নয়, তিনি নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষের সন্দেহের কারণ হয়ে উঠলেন।

সন্দেহ অবশ্য তাঁকে নিয়ে একাধিক বারই দেখা দিয়েছিল। সে তার জটিল প্রকৃতি এবং বিচিত্র সংসর্গের জন্য। ওপেনহাইমার এক সময়ে কম্যুনিষ্ট এবং কম্যুনিষ্ট ভাবাপন্ন লোকদের সঙ্গে সংযোগ রেখে-ছিলেন—১৯৩০-এর দশকে আমেরিকায় সে এক সময় গিয়েছিল। অনেক গুণীজ্ঞানী চিন্তাবিদ্ সেই অকম্যুনিষ্ট দেশেও কম্যুনিষ্ট ভাবাপন্ন হয়ে উঠে-ছিলেন। অবশ্য ওপেনহাইমারের কথা বলতে গেলে—তিনি কম্যুনিষ্ট পার্টির সক্রিয় কি প্রচ্ছন্ন সদস্য কোন কালেই ছিলেন না। কম্যুনিষ্ট চিন্তাধারায় তিনি বিশ্বাসীও নন। এটম বোমার প্রকল্পে যোগদানের সময় তার পুরাণো সেই সমস্ত আপত্তিকর সংসর্গের কথা উঠেছিল। বিজ্ঞানী কম্‌টনের চেষ্টায় সেবারের বাধা তিনি উৎরে গেলেন। এখানে উল্লেখ-যোগ্য, তখনকার নাৎসী-কবলিত হাঙ্গেরী থেকে আসা টেলর সম্বন্ধেও প্রথম প্রথম প্রতিরক্ষার কারণে নানা আপত্তি উঠেছিল, ওপেনহাইমারই তার যোগ্য ব্যবস্থা করেছিলেন। ঘটনার কি বিচিত্রগতি—হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণের পট-ভূমিকায় এই ওপেনহাইমার সম্বন্ধে সরকারী ধারণা ও বিশ্বাস যখন গোলাটে হয়ে উঠেছে, ওপেনহাইমার নূতন করে তদন্তের মুখোমুখি হয়েছেন, তখন এডওয়ার্ড টেলারই তাঁর ভূতপূর্ব প্রধানের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়ে এলেন। সাক্ষী দিয়ে এলেন এটাই অবশ্য বড় কথা নয়, ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা এখানে ওঠে না—টেলার এবং ওপেনহাইমার পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। এই শ্রদ্ধা এখনও তাঁরা পোষণ করে থাকেন, কিন্তু জীবনের নৈর্ব্যক্তিক চিন্তায় যা তাঁর কাছে সত্য, যে-সমস্ত মূল নীতি কর্মপদ্ধতিতে তিনি বিশ্বাস করে থাকেন, সে সবের কথা ভেবেই টেলার



রবার্ট ওপেনহাইমার

দেশের নিরাপত্তার প্রশ্ন বিবেচনা করে ওপেনহাইমারের বিরুদ্ধে মত জানিয়ে এলেন। রবার্ট ওপেনহাইমার নিজের হাতে এটম বোমার আগুন জ্বালিয়েও শেষ পর্যন্ত নিজেকে বাঁচাতে পারলেন না। সরকারী প্রভাব-প্রতিপত্তির গৌরব তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে গেল। দেশের নিরাপত্তার দিক্ থেকে তিনি "বিপদ্‌জনক" বলে ঘোষিত হ'লেন। পরমাণুর বৃহৎ জগৎ থেকে নিজেকে গুটিয়ে এনে তিনি প্রিন্সটনের শান্ত পরিবেশে তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার চর্চায় নিজেকে নিয়োজিত করলেন। খবর কাগজের ভাষায় তিনি "দেশের শত্রু" "কম্যুনিষ্ট" বলে ধিক্কার পেলেন। কোন প্রমাণ না থাকলেও একমাত্র সন্দেহের কারণে বিজ্ঞানী ও দেশের সমাজে "একঘরে" হয়ে রইলেন। সংবেদ[illegible] বিজ্ঞানীর মর্মবেদনা দেশের বিজ্ঞানীরা অনুভব করতেন। [illegible] সরকারী নিষেধে পরমাণু-প্রকল্পে নিয়োজিত বিজ্ঞানীরা তাঁর [illegible] যোগাযোগ রাখতে পারতেন না। তাঁদের একটা বৃহৎ অংশ তাঁর অগৌরব অবস্থার জন্য টেলারকেই দায়ী মনে করতেন। পৃথি[illegible] বিজ্ঞানীদের চোখে ওপেনহাইমার ছিলেন একজন "শহীদ" বিশে[illegible] রাজনীতির কারণে যিনি লাঞ্ছিত অপমানিত হলেন; আর টেলারই তার কারণ। কিন্তু এই বিচার আপাতমাত্র, আসলে আমেরিকার সময়কার রাজনৈতিক আবহাওয়াই ছিল মূল কারণ। :সি[illegible]



এডোয়ার্ড টেলার

ম্যাকার্থির তখন অখণ্ড প্রভাব, আর তাঁর কম্যুনিষ্ট বিদ্বেষের খ্যাতি বিশ্বজোড়া। কেবলমাত্র সন্দেহের বশেই তখন অনেকের জীবনে অনেক বিপর্যয় ঘটে গেছে, খ্যাতি প্রতিপত্তি সম্মান প্রতিষ্ঠিত লোকের প্রতিষ্ঠা একমাত্র সন্দেহের বশেই ধুলায় মিলিয়ে গেছে। ওপেনহাইমারের বিরুদ্ধে যে-সমস্ত কথা জড়ো হয়েছিল ছাপান পৃষ্ঠায় তার আয়তন হবে অন্তত এক হাজার পৃষ্ঠা—শেক্‌স্‌পীয়ারের সমস্ত কবি-কর্মের থেকে তা কম হবে না। আয়তন থেকেই ওপেনহাইমারের বিরুদ্ধ-শক্তির কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যাবে।

বহুদিন ধূমায়িত থাকার পর অনুকূল রাজনৈতিক অবস্থায় তা সহসা একদিন অগ্নিময় হয়ে উঠল। ওপেনহাইমার বিস্মিত হলেন, প্রথম এটম বোমা বিস্ফোরণের পর তিনি যেমন বিস্মিত হয়েছিলেন। কিন্তু বিরুদ্ধ শক্তিগুলির বিরুদ্ধে তিনি তেমন শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারেন নি। তাঁর মানসিকতা—বৈজ্ঞানিক মানসিকতা—ল্যাবরেটরী ও গবেষণার বাইরে এত রীতিনীতি জটিল আইন-কানুন খুঁটিনাটি জিজ্ঞাসাবাদের মধ্যে থৈ খুঁজে পায় নি। তদন্তকারী সভায় ওপেনহাইমার সঠিকভাবে নিজে নিজের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন নি। শুধু তাই নয়, অনেক সময় তিনি নিজের প্রতিপক্ষ হিসাবেও কাজ করেছিলেন। এরই পটভূমিকায়……

এডোয়ার্ড টেলার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করলেন: "ডাঃ ওপেনহাইমারকে আমি আমেরিকার একজন বিশ্বস্ত নাগরিক বলেই

মনে করে থাকি।—কিন্তু কোন দায়িত্বপূর্ণ সরকারী পদে তিনি অধিষ্ঠিত না থাকলে দেশকে আমি অধিক নিরাপদ্ বোধ করব।"

এটম বোমা, হাইড্রোজেন বোমা প্রসঙ্গে বিজ্ঞানীদের মত এবং বিশ্বাস দু'টি পরস্পর-বিরোধী শিবিরে ভাগ হয়েছিল। ওপেনহাইমারের পরাভবের মধ্যে পরমাণুর বিস্ফোরণ শক্তিরই জয়জয়কার হ'ল। কিন্তু বিজ্ঞানবিদ্‌দের মধ্যে যাঁরা মানুষের মানবতায় বিশ্বাসী, যাঁরা নৈতিক মূল্যবোধকে অনেক মূল্যের ওপর ঠাঁই দিয়েছিলেন সমস্ত পৃথিবীতে তাঁরা সংখ্যায় কম ছিলেন না। তাঁদের চোখে ওপেনহাইমার শুধু যে একজন "রাজনৈতিক শহীদ" মাত্র ছিলেন তা নয়, ফেডারিক জোলিও কুরির মত তিনি শক্তির মূর্ত প্রতীক হিসাবে রূপ গ্রহণ করলেন। আর তাঁর প্রতিরোধী হিসাবে রইলেন এডোয়ার্ড টেলার—হাইড্রোজেন বোমার যিনি জনক। উঁচু উঁচু দার্শনিক চিন্তাগুলি বিসর্জন দিয়ে টেলারের মতাবলম্বী বিজ্ঞানীরা বাস্তব পৃথিবীতে বারবার বিস্ফোরণের ঝড় তুললেন। তাই বলে পরমাণু প্রসঙ্গে বিতর্কের কখনও শেষ হয় নি, সমস্যাটি আজকের প্রতিটি মানুষের মনকে স্পর্শ করে গভীর থেকে গভীরতর জিজ্ঞাসার সৃষ্টি করেছে। এডোয়ার্ড টেলার নিজেকে যুদ্ধনীতির প্রবক্তা হিসাবে গণ্য করেন না। এ সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য—"যুদ্ধবাজ হিসাবে আমার একটি খ্যাতি আছে। আসলে আমি তা নই। আমি একজন শান্তিবাদী। সেই সঙ্গে বাস্তববাদী।" নিজের সম্বন্ধে তাঁর এই ধারণা কতদূর সত্য, সে হ'ল অন্য কথা—ইতিহাস তার বিচার করবে। আপাতত আমরা দেখি, ওপেনহাইমার এবং টেলারের আদর্শগত দ্বন্দ্ব ব্যক্তিগত পর্যায়ে নেমে এসেছে। বিজ্ঞানী দু'জন অবশ্য সরাসরি যুক্ত হন নি, কিন্তু তাঁদের এই দুটো বড় নামের আড়ালে অনেক আক্রোশ উত্তেজনা ও ক্রোধ জমা হয়েছে। দুই বিরোধী মতের সমর্থকরা আমেরিকার বিজ্ঞান-জগতে এক অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি করেছে। বিজ্ঞানীর সঙ্গে বিজ্ঞানীর সম্পর্ক ব্যাহত হয়েছে। এডোয়ার্ড টেলার এ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। ১৯৬২ সালের ২রা ডিসেম্বর—ফেৰ্মি পুরস্কার দানের উৎসব। পুরস্কার-প্রাপক রবার্ট ওপেনহাইমারের সঙ্গে টেলার গভীরভাবে করমর্দন করলেন। সে সঙ্গে বহু বছরের চাপা গুঞ্জন, জনশ্রুতি, খবর কাগজের চমৎকার কাহিনী, সমস্তই বন্ধ হয়ে গেল।

নয়া পয়সা তথা মেট্রিক প্রথা

নয়া পয়সার নূতনত্ব গেছে, নয়া কথাটার তাৎপর্য্য নেই আর। শুধু 'পয়সা' বলুন, 'পাই—'বলুন বা একশ ভাগের এক ভাগ হিসাবে 'শতক' বলুন—'নয়া পয়সা' আর নয়। অবশ্য এভাবে একটি হিন্দী শব্দের অবাধ প্রচার বন্ধ হ'ল। তবে ভাষাপ্রেমিকেরা চান বা না চান, সময়ের গুণে (কিংবা দোষে) সমস্তই পুরাণো হয়, সুতরাং কালে নয়া পয়সা যে তার নূতনত্ব হারাবে এতে আর বিচিত্র কি। তবে কি না, নূতন দিল্লী এতদিনের হয়েও আজও পর্য্যন্ত তা 'নূতন' কিন্তু তা পুরাণো দিল্লী নামে একটা ইন্দ্রপ্রস্থীয় দিল্লী আছে বলেই। নয়া পয়সার জুড়ি পুরাণো পয়সা নেই আর। জিনিষের মূল্যবৃদ্ধির এই "তুরীয়" অবস্থায় ভিখারীরা নাকি একটা নয়া পয়সা নিতে ইতস্তত করে, এক নয়া পয়সার ডাকটিকিট ছাড়া ভূ-ভারতে আর কিছুই পাওয়া যাবে না। তবু এই ছোট্ট মুদ্রাটি এক এবং অদ্বিতীয়—টাকাপয়সার জগতে "একশ্চন্দ্রম্‌।" অন্য কোন পয়সা—পুরাণো পয়সার জটিল প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই আর।

আমাদের কথা কিন্তু অন্য প্রসঙ্গে। মেট্রিক পদ্ধতি—যা আমরা জিনিষের মাপ-জোখ আর টাকাকড়ির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছি—তা হ'ল এক কথায় দশের নামতা। দশগুণ বেশি বা কম—এই হ'ল আসল হিসাব! গ্রাম-কিলোগ্রাম, লিটার-মিলিলিটার, মিটার-সেন্টিমিটার কিলোমিটার সমস্তই এই দশের হিসাবে বাঁধা। নয়া পয়সা আর টাকার অঙ্কটাও এই সহজ দশের নামতা। ৬৪ পয়সার টাকা আর নেই, সে সঙ্গে শুভঙ্করের কসারও আর প্রয়োজন দেখি না। শুভঙ্করের মণকষা সেরকষা যতই সহজ হোক, পাটিগণিতের দশের নামতার থেকে তা সহজ নয়। গ্রাম থেকে টাকা-পয়সা, মানে টাকা নয়া পয়সা, মিটার থেকে টাকা নয়া পয়সা, লিটার থেকে টাকা নয়া পয়সা, এ সমস্ত হিসাব এখন আর মোটেই কষ্টকর হয় না। শূন্যের হেরফেরে সমস্তই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। মেট্রিক পদ্ধতির এই হ'ল সার্বজনীন সুবিধা—যেজন্য পৃথিবীর এতগুলি দেশ জাতীয়তার গর্ব বিসর্জন দিয়ে মেট্রিক পদ্ধতিকে স্বীকার করে নিল। হাজার গুনি, লক্ষই গুনি—দশটি মাত্র অঙ্ক নিয়ে আমাদের গণনাপদ্ধতি—মেট্রিক পদ্ধতিতে এই দশকেই প্রতিভার স্বীকার করে নিয়েছে, এ জন্যে তা এত সরল, মৌখিক অঙ্কের মত জটিলতা বর্জিত। কিন্তু আশ্চর্য এই যে আমাদের নয়া পয়সার হিসাবে মেট্রিক পদ্ধতি স্থান পেলেও তা নিয়ে লেনদেন ১৬ আনার টাকা থেকে অনেকক্ষেত্রে সুবিধাজনক হয় নি। একটা উদাহরণ দিলেই পরিষ্কার হবে। ধরুন, জিনিষের দাম-বাবদ আপনি দোকানীকে ৪৩ নয়া পয়সা দেবেন। একটা সিকি—২৫ নয়া পয়সা, একটি দশ নয়া পয়সা, একটি পাঁচ, একটি দুই এবং একটি এক—মোট পাঁচটি মুদ্রায় আপনি প্রাপ্য বুঝিয়ে দেবেন (২৫ + ১০ + ৫ + ২ + ১ = ৪৩), অথবা চারটি দশ নয়া পয়সায় চল্লিশ নয়া পয়সা, এবং সঙ্গে আরও তিন পয়সার হিসাবে।

গণনা কোনটাই সহজ হ'ল না। ২৫ নয়া পয়সার মুদ্রা দিলাম, ১৯ নয়া পয়সা দাম—৬ নয়া পয়সা ফিরত দিতে হবে। তার মানে অন্তত দুটো মুদ্রা, একটি পাঁচ অপরটি এক (২৫—৫—১ = ১৯)। টাকার চার আনি বা সিকিকে বাঁচাতে গিয়েই আমাদের এত গণ্ডগোল। মেট্রিক পদ্ধতিতে চারের নামতা নেই। দশ—দশের অর্ধেক পাঁচ থাকতে পারে, দুই থাকতে পারে (৫ × ২ = ১০), আর এক—একক—ত থাকবেই। চারের স্থান এখানে নেই—সিকির স্থান এখানে নেই—দশমিক মুদ্রায় ২৫ নয়া পয়সা বলে কোন মুদ্রা থাকতে পারে না। তার জায়গায় হবে ২০ নয়া পয়সার মুদ্রা। মেট্রিক পদ্ধতিকে গ্রহণ করেও আমরা টাকা-পয়সার ব্যাপারে সিকিকে ভুলতে পারি নি, হিসাবের জটিলতা তাই দেখা দিচ্ছে।

নয়া পয়সাকে পয়সাই বলি কিংবা অন্য যে-কোন নামেই বলে থাকি, মেট্রিক পদ্ধতিকে পুরোপুরি গ্রহণ করতে হবে। দশমিক বিন্যাসে মুদ্রা হবে মোট সাতটি—এক, দুই, পাঁচ, দশ, কুড়ি, পঞ্চাশ এবং একশ (টাকা)। দশের এই নামতাটি তুলে ধরতে হবে। দাব খেলায় ঘোড়ার আড়াই চালের মত দশের আড়াইগুণ পঁচিশের মুদ্রা হিসাবের ছক বিপর্যস্ত হচ্ছে। নয়া পয়সার নাম বদলের সঙ্গে সঙ্গে পুরাণো সিকির গড়নও বদলে নিতে হবে।

সিগারেটের ধোঁয়া : কিঞ্চিৎ রসায়ন

সিগারেটের বিরুদ্ধে সম্প্রতি আবার ঝড় উঠেছে। আমরা ইতিপূর্বে এ সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করেছিলাম। আসল কথাটি এই যে, ধূমপানের সঙ্গে ফুসফুসের ক্যান্সারের আদৌ কোন সম্পর্ক রয়েছে কি না। ১৯৬২ সালে ইংলণ্ডের চিকিৎসক সমিতির (Royal College of Physicians) বিস্তারিত রিপোর্ট প্রকাশের পর জনসাধারণ এ সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন হয়ে উঠেছেন। আরও সম্প্রতি—১৯৬৩ সালে আমেরিকায় সিগারেটের বিরুদ্ধে বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য আরও জোরালো ভাষায় রূপ পেয়েছে। প্রসঙ্গটি এখনও পর্যায়ে এক বিতর্কিত বিষয়, এ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত পরস্পর বিরোধমূলক। ধূমপানের বিপদ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের অভিমতগুলি মূলত পরিসংখ্যাননির্ভর, পরিসংখ্যানগত নানা তথ্য জড়ো করে এই সিদ্ধান্তটি টেনে আনা হয়েছে—সরাসরি কোন পরীক্ষাগত ভিত্তি এর পিছনে নেই। পৃথিবীর লক্ষ কোটি মানুষের স্বাস্থ্যের সঙ্গে জড়িত এই জটিল প্রশ্নটির পূর্ণাঙ্গ বিচার-বিশ্লেষণের জন্য সম্প্রতি বিভিন্ন দেশের ল্যাবরেটরীগুলিতে নানা রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা উদ্যোগ আয়োজন চলছে।

তবে একটি কথা এখনই নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার দিক থেকে চিন্তা করলে ধূমপান সম্বন্ধে মোটেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। এর ধূম্রজালের মধ্যে মিশে রয়েছে এমন কয়টি জিনিষ শরীরের পক্ষে যা নিঃসন্দেহে ক্ষতিকর। সিগারেটের ধোঁয়া খুবই জটিল একটা মিশ্রণ (Mixture)। তার বায়ুস্বভাব গ্যাসের মধ্যে তেল জাতীয় কয়েকটি জিনিষ অত্যন্ত সূক্ষ্ম আকারে বিরাজ করে। ধূমপানের সময় ভিতরে টেনে নেওয়া ধোঁয়ার শতকরা প্রায় ৫০ ভাগই (৫০ শতমিক) ফুসফুসে রয়ে যায়। ফলে ঐ তেলাক্ত জিনিষগুলি তখন সরাসরি শ্বাসনলের (Bronchial Tube) দেওয়ালে বসে পড়ে। বলাবাহুল্য, রাসায়নিক বিচারে শরীরের পক্ষে এগুলি ক্ষতিকর উপাদান।

নিকোটিন সিগারেটের ধোঁয়ার আর একটি পরিচিত উপাদান। একটি পুরোমাত্রার সিগারেট পুড়লে এক থেকে তিন মিলিগ্রাম নিকোটিন বেরিয়ে আসে। এই নিকোটিন প্রধানত হৃদ্‌পিণ্ড পাকস্থলী মূত্রাশয় এবং রক্তবহা শিরা-উপশিরাগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করে। তামাকের ধোঁয়া পুরোটা টেনে নিলে শতকরা ৯০ ভাগ নিকোটিনই শরীরের সঙ্গে মিশে যায়, নচেৎ শতকরা মাত্র ১০ ভাগ।

ধূমপান যে আপাত শ্রান্তিহর তার মূলে রয়েছে কতকগুলি উত্তেজক জিনিষ। এছাড়া অ্যামোনিয়া, বিভিন্ন উদ্‌বায়ী (Volatile) অ্যাসিড, নানা ধরণের। ফেনল (Phenols) এবং কিটোন (Ketones) ইত্যাদি সিগারেটের ধোঁয়ার মধ্যে প্রচুর রয়েছে। এদের প্রভাব মূলত শ্বাসযন্ত্রের উপর।

কিন্তু—আগে যা বলেছি—ধূমপান প্রসঙ্গে এ সমস্তই হ'ল গৌণ বিবেচনা। ধূমপানের বিরুদ্ধে প্রধান বক্তব্য ক্যান্সার, ফুসফুসকে তা আক্রমণ করে। জ্বলন্ত সিগারেটের ক্ষণস্থায়ী উঁচু তাপাঙ্কে (Temperature) যে সমস্ত গ্যাস বেরিয়ে আসে তার সঙ্গে আধপোড়া তামাকের ধোঁয়া মিলে যে উগ্র আবহাওয়ার সৃষ্টি হয় তা বিশেষ কয়েক ধরণের ক্যান্সার ("Industrial Cancers") এবং ক্ষতিকর টিউমার (Malignant Tumours)-এর পক্ষে বিশেষ অনুকূল। ল্যাবরেটরীর পরীক্ষায় এ সম্বন্ধে ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা হয়েছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উইনডার (Wynder) ও তাঁর সহকর্মীরা কতকগুলি ইঁদুর আর খরগোসের উপর এক যন্ত্রণাময় পরীক্ষা করে দেখেন, তাদের ত্বকে এক ধরণের দুষ্ট ক্ষত (Malignant Skin Tumour) বিস্তৃত হচ্ছে। প্রাণীগুলির গায়ে তাঁরা সিগারেটের জমানো ধোঁয়া প্রয়োগ করেছিলেন। জার্মানীর ড্রাকারির (Druckery) পরীক্ষা ছিল আরও সুদূরপ্রসারী। তিনি ল্যাবরেটরীর "দধীচি"দের গায়ে সরাসরি সিগারেটের জমানো ধোঁয়ার ইনজেকশন প্রয়োগ করেন। ফল হ'ল দুরারোগ্য টিউমার। টিউমার অবশ্য এক জাতের ক্যান্সার, কিন্তু তাতে ফুসফুস-সংক্রান্ত বিষয়টি প্রতিপন্ন হয় না। ধূমপানের ফলে সত্যসত্যই ক্যান্সার হ'তে পারে কি না, এর উত্তর সন্দেহাতীত ভাবে পরীক্ষা-মূলক উপায়ে পাওয়ার এখন যথেষ্ট অসুবিধা রয়েছে। সিগারেটের ধোঁয়ার "বিষ"—অর্থাৎ ক্যান্সার সৃষ্টির উপকরণগুলি খোঁজার দিকে তাই আজকাল বেশি করে নজর দেওয়া হচ্ছে।

ইংলণ্ডের একটি গবেষণার যন্ত্র একসঙ্গে ২৪টি করে সিগারেটের "ধূমপান" করে। এই ধোঁয়া নীচু তাপাঙ্কে জমে তামাটে রঙের একটা তরল জিনিষে পরিণত হয়। সিগারেটের ধোঁয়ায় অন্তত তিনশটি জিনিষের খোঁজ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ক্যান্সার-সৃষ্টিকারী (carcinogen) Coal Tar বা আলকাতরার বিভিন্ন উপাদান এবং Polycylic Aromatic Hydrocarbon শ্রেণীর Benz Pyrene ইত্যাদি কতকগুলি যৌগিক পদার্থ। পরিমাণ অবশ্য খুবই কম, এতই কম যে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে তাদের দাঁড় করানো যায় কি না তা নিয়ে বিতর্ক চলে। তবে এমনও হতে পারে যে, সিগারেটের সাদা ধোঁয়ায় এমন কিছু উপাদান রয়েছে যা এখনও পর্যন্ত নজরে আসে নি। অনেকের মতে আবার তামাকের ধোঁয়ার কিছু কিছু উপাদান প্রত্যক্ষভাবে ক্যান্সারের কারণ না হলেও ক্যান্সার তৈরির অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করে থাকে। এ সমস্ত জিনিষের (Co-Carcinogen) সহযোগে ক্যান্সার-সৃষ্টিকারী উপাদানগুলি অল্পমাত্রাতেও সক্রিয় হয়। তবে সমস্তই অনুমানের ব্যাপার, প্রত্যক্ষ প্রমাণ খুবই অস্পষ্ট।

অনেকে এমন কথাও বলে থাকেন যে, ধূমপানের সঙ্গে ক্যান্সারের সরাসরি কোন যোগ নেই। তাঁদের মতে শহরের ধূলিজর্জরিত বিষাক্ত আবহাওয়াই এই যন্ত্রণাদায়ক রোগটির প্রধান কারণ। দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রামাঞ্চলে ক্যান্সার রোগের স্বল্পতার কথা তাঁরা উল্লেখ করে থাকেন। গ্রামের নির্মল বাতাসের মুক্ত পরিবেশে ফুসফুস সহজে আক্রান্ত হ'তে পারে না। তবে শহরের দূষিত বাতাসের সঙ্গে সিগারেটের ধোঁয়া মিশে অবস্থা ক্যান্সারের পক্ষে বিশেষ অনুকূল হয়ে ওঠে, এটাই স্বাভাবিক। শহরের শিল্পাঞ্চলের বাতাসে Benzpyrene-সহ যে সমস্ত Aromatic Hydrocarbon রয়েছে সিগারেটের ধোঁয়া গ্রহণের সময় তা সহজেই ফুসফুসের ভিতরে পথ খুঁজে পায়,—ক্যান্সার-সৃষ্টিকারী এ সমস্ত জিনিষগুলি তামাকের ধোঁয়াতে আবার গলেও যায়। ফুসফুসে ক্যান্সারের ক্রিয়া এভাবে ত্বরান্বিত হয়। শ্বাসনলীর গায়ে এক ধরণের ঝাড়ু-জাতীয় জিনিষ বসানো থাকে, এদের কাজ হ'ল ফুসফুসের প্রবেশপথটি যথাসম্ভব জীবাণু এবং ধূলিমুক্ত করা। কোটিন (Kotin)-এর মতে সিগারেটের ধোঁয়ার প্রভাবে ফুসফুসের এই "ঝাড়ুটি" অনেকাংশে অকেজো হয়ে পড়ে। ফলে ধূলিবালি ও বিষাক্ত রাসায়নিক জিনিষগুলি তখন ফুসফুসের গায়ে সরাসরি বসতে পারে। ফুসফুস এভাবে ক্যান্সার

আক্রমণের পক্ষে আরও উন্মুক্ত হয়। কোটিমের অভিমতটি অবশ্য আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা-প্রমাণসাপেক্ষ। সেই সঙ্গে ধূমপান এবং শিল্পাঞ্চলের জলহাওয়ার প্রকৃতি আরও গভীরভাবে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। সিগারেটের ধোঁয়ার রসায়ন এ প্রসঙ্গেই আজ এত গুরুত্ব নিয়ে উঠেছে।

গ্যালিলিওর "অপরাধ"

গ্যালিলিও গ্যালিলাই—আধুনিক বিজ্ঞানের জনক। পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী বলে যিনি কীর্তিত, তাঁর আবার কি "অপরাধ?" কি অপরাধে তিনি জীবনের শেষ বারোটি বছর জেলখানার অন্ধকারে দিন কাটিয়েছিলেন? বিজ্ঞানী যখন, অপরাধ নিশ্চয়ই বিজ্ঞান—অর্থাৎ জানা। এই জানা কখনো কখনো বড় "পাপ"। জ্ঞানবৃক্ষের ফল—যা খেলে জ্ঞানবুদ্ধির উন্মেষ হয়, আদিম মানবযুগল তা খেয়ে ফেলেছিলেন। এই হ'ল আদি পাপ। এই পাপের ফলে মানুষ ঈশ্বরের স্বর্গভূমি থেকে বিচ্যুত হয়ে পৃথিবীতে জটিল অর্থনীতিতে বদ্ধ জীবন যাপন করছে। এই জানা হ'ল পাপ। গ্যালিলিও গ্যালিলাই এই পাপই করে বসেছিলেন। তিনি জেনেছিলেন, সূর্যটাই স্থির, পৃথিবী ইত্যাদি তার চারপাশে ঘুরছে। তাঁর এই কথা ছিল প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে, বাইবেলের মতের বিরুদ্ধে। গ্যালিলিও এই কথাগুলি বইয়ের আকারে ছেপে প্রকাশ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, যা তিনি সত্য বলে জেনেছেন তার প্রতিষ্ঠার জন্য বাইবেলের বিরুদ্ধে নানা যুক্তিতর্ক পরীক্ষাগত প্রমাণ হাজির করেছিলেন। বৈজ্ঞানিক তিনি, বিজ্ঞানের পথেই অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু সময়টা তখন ঘোরতর অবৈজ্ঞানিক। চার শ' বছর আগে ইউরোপে তখন এরিষ্টটলের যুগ। ইউরোপের শিক্ষিত সমাজ এই মনীষী পুরুষের ধারণা ও মতবাদগুলিই মানুষের সমস্ত জিজ্ঞাসার শেষ উত্তর বলে মেনে নিয়েছিলেন। যা নেই ভারতে তা নেই ভারতে। এরিষ্টটল যা বলেন নি তার বাইরে আর কিছু নেই—কিছু থাকতে পারে না। Magister Dixit, গুরুই সমস্ত বলে গেছেন, সুতরাং নূতন কোন প্রশ্ন নেই। নূতন কোন উত্তর নেই, পুরাণো প্রসঙ্গেরও পুনর্বিচারের প্রয়োজন নেই। সে যুগের শিক্ষিত লোকদের কাছে গ্যালিলিওর মতবাদ তাই তাৎপর্যহীন "বিকৃত মস্তিষ্কের খেয়াল" মাত্র ছিল। সৌরজগতের ক্রিয়াকাণ্ড সম্বন্ধে তাঁর অভিমত কোপার্নিকাসের অভিমতের মতই সাধারণভাবে উপেক্ষিত ছিল। কিন্তু এই বিশেষত্বহীন বৈজ্ঞানিক মতবাদই বাইবেলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে অবস্থাটি অনেক জটিল করে তুলল। ইউরোপের দেশগুলিতে তখন গির্জাতান্ত্রিক শাসন খুবই প্রবল। ধর্মের নামে ধর্মান্ধতার সেই যুগে, গির্জা মিশন ও পাদ্রীদের প্রবল প্রতিপত্তির সেই যুগে বাইবেলের বিরুদ্ধে কথা বলা মোটেই সাধারণ কথা ছিল না। রাজার শাসনের ক্ষমতার উপরে তখন ছিল ধর্মশাসন (Inquisition)। গ্যালিলিও তাঁর বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসের কথা প্রকাশ করতে গিয়ে ঐ ধর্মশাসনের আওতায় গিয়ে পড়লেন। রোমের বিচার সভায় তাঁর "অপরাধ" সহজেই প্রমাণিত হ'ল। পৃথিবী যে স্থির, এই ঘোষণা জানিয়ে গ্যালিলিও প্রথম বারের মত ছাড়া পেলেন। নিজে যা সত্য বলে জানেন সে বিশ্বাসে অটুট থাকলে তিনি বোধহয় শহীদ হতেন, কিন্তু গ্যালিলিও আজকের এই গ্যালিলিও হতেন না। কোরাণের সেই বাণী তিনি বোধহয় বিশ্বাস করতেন—'শহীদের খুন আর জ্ঞানীলোকের কলমের কালি, খোদাতাল্লার চোখে দু-ই সমান।' এই কালির আঁচড় বাঁচাতে গিয়েই গ্যালিলিও মিথ্যা ঘোষণার অপমান স্বীকার করেছিলেন। তাঁর সাধনা অব্যাহত চলল। বিজ্ঞান তাঁর কাছে জীবন-সত্যই ছিল। তাই ঐ ঘটনার বিশ বছর বাদে তিনি আবার সেই বিশ্বাসের কথা প্রকাশ করলেন। আবার বিচার বসল। গ্যালিলিও আবার অপরাধী সাব্যস্ত হলেন। এবার অপরাধীর শাস্তি কারাবাস। বৃদ্ধ জ্ঞানী অধ্যাপক অন্ধকার কারাজগতের দিকে পা বাড়ালেন। গির্জার শাসনে আর একবার প্রমাণিত হ'ল, পৃথিবীই স্থির এবং সূর্য্য তার চারদিকে ঘুরছে। তবু ঐ মহাবিজ্ঞানী শেষবারের মত নাকি উচ্চারণ করেছিলেন, Eppur si muove—তবু পৃথিবীটাই ঘুরছে।

এই ছিল গ্যালিলিওর "অপরাধ!" (সম্প্রতি তাঁর জন্মের চার শ' বছর পূর্ণ হ'ল।)

এ. কে. ডি.

মাথার মাপের চেয়েও বেশী বড় মাথা-ব্যথা

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র প্রভূত বিত্তশালী দেশ। জনসংখ্যার অনুপাতে মোটর গাড়ির মালিক সে দেশে যত, এত আর কোন দেশে নয়। কিন্তু যে কারণেই হোক, গাড়ি চুরির পরিমাণ সে-অনুপাতে আরও অনেক বেশী সে-দেশে। ১৯৬৩ সালে মার্কিণ পুলিশের কাছে প্রতিদিন কমবেশী ১০০০টি ক'রে গাড়ি চুরির খবর এসেছে। বিগত কয়েক বৎসর ধ'রে শতকরা দশটি ক'রে বেশী গাড়ি চুরি গিয়েছে সে-দেশে। আমেরিকায় বিত্তসংক্রান্ত অপরাধের মধ্যে এইটিই আয়তনে সবচেয়ে বড়। ১৯৬৩ সালে চুরি-যাওয়া গাড়িগুলির দাম ২০০ কোটি টাকা।

দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন আঙ্গুল

আপনি আঙ্গুল দিয়ে দেখতে পান কি না, কখনও কি পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন? হয়ত দেখতে পান, আপনি সেটা জানেন না।

রোজা কুলেশোভা নাম্নী একটি রুশীয় মেয়ে আঙ্গুল দিয়ে ...র কা... অনেকটাই করতে পারে ব'লে খবর পাওয়া গেছে। চোখ বেঁধে দি... নানা রঙের বল তার সামনে এনে রাখলে সে আঙ্গুল দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁ... ব'লে দিতে পারে, কোন্ বলটা লাল, কোন্‌টা নীল, কোনটা বেগু... বা হলদে বা আর কিছু। বড় টাইপের ছাপা বই আঙ্গুল বুলিয়ে ... পড়তে পারে। মস্কোতে সম্প্রতি এই মেয়েটিকে নিয়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।

একটা উজ্জ্বল জিনিষের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকবার প... চোখ ফিরিয়ে নিলে যেমন সে-জিনিষটার একটা নীলাভ ছায়ার ম... চোখের সামনে ভাসতে থাকে, এই মেয়েটির দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন আঙ্গুলগুলি বেলাতেও তাই হয়।

এদিকে, মেয়েটির যেখানে বাড়ী সেখানকার একটি আর্ট স্কুলে কর্তৃপক্ষ ওখানকার আর কারুর আঙ্গুল দিয়ে দেখার ক্ষমতা আছে কি না দেখতে চেষ্টা করছেন। আর্ট স্কুলের ৩০টি ছাত্রছাত্রীর চোখ বেঁ... দিয়ে পরীক্ষা ক'রে তাঁরা নাকি জানতে পেরেছেন যে, প্রতি ছয় জন ছা... ছাত্রীর মধ্যে একজন আঙ্গুল বুলিয়ে ছবিতে আলো-ছায়ার তফাৎ বুঝ... পারে, এবং কতগুলি রঙও নির্ভুলভাবে সনাক্ত করতে পারে। হয়... আপনিও পারেন, দেখুন না পরীক্ষা ক'রে?



জোড়া-পিরীচ হল্

প্ল্যাষ্টিকের কাগজ

বর্ষারাত্রির শেষে আপনার বাড়ীর দুতলায় রাস্তার দিক্‌কার বারান্দায় যখন জল থইথই করে, আর কাগজওয়ালা আপনার খবরের কাগজটিকে মুড়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে তার ওপর ছুঁড়ে দিয়ে যায়, তখন কাগজটির কি দশা হয় তা আপনার অজানা নেই। সেদিন যদি রোদ না উঠল ত সে কাগজটা আর হয়ত খুলে পড়তেই পারা গেল না। এরকম



প্লাষ্টিকে ছাপা খবরের কাগজ

অবস্থার সৃষ্টি হয় না, যদি খবরের কাগজগুলি প্ল্যাষ্টিকের কাগজে ছাপা হয়। এ কাগজ ছিঁড়বে না, জল এর কোন ক্ষতি না ক'রে এর উপর দিয়ে গড়িয়ে যাবে, ছাপাও হবে অনেক বেশী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। অফিসে বেরুবার তাড়ার মুখে স্নানের ঘরে শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে এ কাগজ আপনি পড়ে নিতে পারবেন। হল্যাণ্ডে এই প্ল্যাষ্টিকের কাগজ তৈরি হয়েছে।

স্তম্ভহীন বিরাটাকার হল্

একটা খুরো-ওয়ালা বিরাট্ পিরীচকে সোজা ক'রে বসিয়ে তার উপর ঠিক সেই মাপের আর-একটা পিরীচকে উল্টে চাপা দিলে তার যেরকম চেহারা হয়, আমেরিকার ইলিনয় ইউনিভার্সিটির নূতন তৈরি একটি এ্যাসেমব্লি হল দেখতে অবিকল সেই রকম। এই হলে ১৬০০০ লোকের বসবার আসন আছে, আরও ২০০০ লোককে এদিকে ওদিকে ধরিয়ে দেওয়া যায়। খেলাধুলো, অভিনয়, বা সভাসমিতির অধিবেশন যাই সেখানে হোক, ১৮০০০ লোকের দৃষ্টিপথে কোন স্তম্ভের বাধা নেই ব'লে তারা ত পুরোপুরি দেখতে পায়।

কত জাহাজ ডুবেছে ?

নৌবীমা ব্যবসার অধিকর্তা, লণ্ডনের লয়েড্‌স্-এর খাতাপত্রে দেখা যায় যে, ১৯০২ থেকে আজ পর্যন্ত বৎসরে গড়পরতা ৩৯৮টি জাহাজ সমুদ্রের কুক্ষিগত হয়েছে। ফরাসী দেশের প্রাচীন একটি ডিরেক্টরী থেকে জানা যায়, উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বহু বৎসর ধ'রে বৎসরে গড়পড়তা ৩০০০-এর চেয়েও বেশী জাহাজডুবি হয়েছে। এখনকার তুলনায় সে-যুগে জাহাজডুবি যে অনেক বেশী হ'ত সে ত বলাই বাহুল্য।

মানুষ যে অন্ততঃ বিগত ২০০০ বৎসর সমুদ্রপথে যাতায়াত করছে ইতিহাসে তার সাক্ষ্য আছে। গড়পড়তা বৎসরে ৫০০টি জাহাজডুবি হয়েছে ধ'রে নিয়ে পণ্ডিতরা বলছেন, অন্ততঃ ১০ লক্ষ জাহাজ যে এই সময়ের মধ্যে সমুদ্রগর্ভে সমাধিস্থ হয়েছে তাতে কোন ভুল নেই। এর অর্থ, পৃথিবীর সমুদ্রাচ্ছাদনের প্রতি ১৪ বর্গমাইলে একটি ক'রে নিমজ্জিত জাহাজ।

কিন্তু এই পণ্ডিতদের মধ্যে এমনও অনেকে আছেন, যাঁদের মতে মানুষ ২০০০ বৎসরেরও অনেক বেশী আগে থেকে ছোট-বড় নানারকমের তরণী নিয়ে সমুদ্রে পাড়ি জমিয়েছে। তাছাড়া ঐতিহাসিক সময়ের পরিধির মধ্যেও যত জাহাজ ডুবেছে তার সঠিক হিসাব সব দেশে সকলে রাখেনি। সুতরাং তাঁরা অনুমান করেন, সমুদ্রের কুক্ষিজাত জাহাজের সংখ্যা হবে প্রতি বর্গমাইলে একটি।

ধন্য মানুষ। ধন্য তার বিপদ্ বরণের প্রেরণা এবং ঐকান্তিকতা।

সুইডেনের নিরপেক্ষতা নীতি

সুইডেন বহুকাল সব রকম যুদ্ধবিগ্রহ থেকে দূরে থেকেছে, যুদ্ধমান কোন জাতির সঙ্গে মিতালি ক'রেও যুদ্ধে লিপ্ত হয়নি, তবু সুইডেনের বহু লোককে রণক্ষেত্রে প্রাণ দিতে হয়। এদেশের কাউণ্ট বার্ণাডোট ছিলেন একজন অক্লান্তকর্মী সুবিখ্যাত বিশ্বশান্তিকামী। রাষ্ট্রসঙ্ঘের পক্ষ থেকে প্যালেস্টাইন বিরোধে মধ্যস্থতা করতে গিয়ে ইনি আততায়ীর গুলীতে নিহত হ'ন।



কাউণ্ট বার্ণাডোট

সম্প্রতিকালে কঙ্গোতে রাষ্ট্রসঙ্ঘ দ্বারা প্রেরিত যে-সমস্ত সৈন্যদল শান্তিরক্ষার কাজে ব্যাপৃত ছিল, তাদের মধ্যে সুইডরা সংখ্যায় ছিল খুব বেশী, এবং খুব বেশী সংখ্যায়ই এরা মারাও গিয়েছে সেখানে।

বিশ্বশান্তিরক্ষার কাজে এত বেশী সংখ্যায় সুইডদের নিয়োগের মূলে অবশ্য রয়েছে এদের স্বভাবের অপক্ষপাত। মৃত্যুর কাছেও এরা সমানই অপক্ষপাতিত্ব পাচ্ছে।

গ্রীনল্যাণ্ডের কি সবটাই গ্রীন বা সবুজ ?

সবুজের লেশমাত্রও নেই কোথাও গ্রীনল্যাণ্ডে, এর উপরে দু'মাইল গভীর বরফের আস্তরণ, অর্থাৎ যাকে বলে, কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন।

এই কানা ছেলেটির নাম পদ্মলোচন যিনি রেখেছিলেন তিনি একজন নরওয়েজিয় পরিব্রাজক, 'এরিক দি রেড' নামে তাঁর পরিচিতি। ৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দে এই দ্বীপটিকে দেখে এসে ওতে লোকবসতি স্থাপন করা যায় কি না দেখবার জন্যে খুব একটা ঔৎসুক্য হয়েছিল তাঁর, আর লোককে ধোঁকা দেবার জন্যেই তিনি এর নামকরণ করেছিলেন গ্রীনল্যাণ্ড। কিন্তু ধোঁকা দিতে তিনি পারেন নি। ঐ নামকরণের পর প্রায় ১০০০ বৎসর গত হয়েছে, গ্রীনল্যাণ্ডে উল্লেখযোগ্য রকমের লোকবসতি কিছুই হয়নি। কিন্তু আইসল্যাণ্ড অর্থাৎ বরফের দেশ নামে যার পরিচয়, কাউকে ধোঁকা দেবার কোন চেষ্টাই ছিল না যার নামকরণের মধ্যে, তার লোকসংখ্যা ১,৮০,০০০।

ডাকটিকিটে দেশের জীবিকা

ইটালীর মূলভূমির অন্তর্বর্তী ২৩ বর্গমাইল আয়তনের সান মেরিনো একটি ছোট রিপাব্লিক। এই রিপাব্লিকটির লোকেদের উপজীবিকা হচ্ছে, ডাকটিকিট ছেপে বের করা। ঐটুকুন দেশে ক'টাই বা মানুষ, আর চিঠিপত্রই বা তারা কত লিখে উঠতে পারে, কিন্তু দেশে ডাকটিকিট ছাপা হয় হাজারে হাজারে। দেশে এয়ারপোর্ট বা বিমান-বন্দর নেই কিন্তু এয়ার মেল বা হাওয়াই ডাকের টিকিট ছেপে বের হয়েছে আজ অবধি ১৫০ রকমের। দেশে রেলগাড়ি চলে না, কিন্তু রেলরাস্তা-সংক্রান্ত ডাকটিকিট ছাপা হয়। যেসব মহাপুরুষদের ছবি ও নাম নিয়ে টিকিট ছাপা হয়, তাঁরা কেউ হয়ত সান মেরিনোর নামও কোনদিন শোনেন নি। কিন্তু হ'লে কি হয়, সব রকমের সব টিকিটই বিক্রি হয়ে যায় যে! আর ভাল দামে বিক্রি হয়। নানা দেশের নানা রকম ডাকটিকিট সংগ্রহ ক'রে এ্যালবামে এঁটে রাখা যাঁদের শখ, ইংরেজীতে যাঁদের বলা হয় Philatelist, তাঁরা এইসব টিকিট সাগ্রহে ক্রয় করেন। সান মেরিনোর টিকিটছাপানেওয়ালারা যখন শুনল, যে, সংগ্রাহকদের কাছে সাধারণ টিকিটের চেয়ে একটু অসাধারণ রকমের টিকিট, যাতে একটু ছাপার ভুল বা অন্যরকমের খুঁৎ কিছু আছে, তার দাম অনেক বেশী, তখন তারা নানারকমের খুঁৎওয়ালা টিকিট ছাপতে আরম্ভ ক'রে দিল। পয়সা খরচ নেই, অথচ পয়সা বেশী আসে, যেমন ছবিটা উল্টো ক'রে ছাপা, কিংবা যে রঙের টিকিটের যে দাম হওয়া উচিত তার বদলে অন্য দাম ছাপা, কিংবা আঠা লাগান হয় নি, এমনি নানারকমের ইচ্ছিত ভ্রান্তিমূলক টিকিটও প্রচুর ছাপা হয় সান মেরিনোতে।

পনীর এবং উত্তেজনা দমনের ওষুধ

এদেশে পনীর বা চীজ খুব কমসংখ্যক লোকই খেয়ে থাকেন, কেউ কেউ আছেন যাঁরা পয়সার অভাবে ইচ্ছে থাকলেও খেতে পান না। তবু একটা কথা সকলের জেনে রাখা ভাল।

কোন কোন ধরণের চীজ বা পনীর, ঘুমের ওষুধ বা উত্তেজনা দমনের ওষুধ (Tranquillizers) খাবার পর খেলে বিষবৎ হয়ে উঠতে পারে; দুর্দান্ত শিরঃপীড়া, ঘাড়ের পেশী শক্ত হয়ে যাওয়া, প্রচণ্ড বিবমিষা, এমন কি মৃত্যুও হয়ে যেতে পারে এই দু'টি জিনিষ একসঙ্গে মেশার ফলে;

সব চীজ বা সব Tranquillizer-এর বেলাতেই যে এটা হয় তা নয়। কিন্তু কোন্ ধরণের চীজের সঙ্গে কোন্ ধরণের Tranquillizer যাবে তা যখন আপনার জানা নেই তখন চীজ খাবার দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা মনে জাগ্রত হ'লে ওষুধটা খাবেন না, আর ওষুধ না খেলে যদি একেবারেই না চলে ত চীজ খাবার লোভটা সংবরণ করবেন।



বানর-বাহিনী

শ্রীরামচন্দ্র সীতা উদ্ধারের কাজে বানর-বাহিনীর সাহায্য নিয়েছিলেন। বর্তমান যুগে মানুষের স্বাস্থ্যোদ্ধারের কাজে আমেরিকাতে বানরবাহিনীর সাহায্য নেওয়া হচ্ছে।

নূতন নূতন নানারকমের ওষুধ, নানা ধরণের চিকিৎসার ফলাফল নিরূপণের পরীক্ষা এদের নিয়ে করা হয়। এমন কি মহাকাশ যাত্রায় মানুষের কোন্‌দিকে কিরকমের অসুবিধা, বিপদাপদ্ হ'তে পারে না পারে তারও পরীক্ষা এদের সাহায্য নিয়েই করা হয়ে থাকে।

বানর-বাহিনী বলছি এই কারণে, যে, একমাত্র ১৯৬২ সালেই, চিকিৎসা বিজ্ঞানের সহায়তার জন্যে ২০০,০০০ বানরের চালান গিয়েছে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে, আমাদের এই ভারতবর্ষ থেকে।

শ্রীরামচন্দ্র তাঁর নিতান্ত অনুগত বানর-বাহিনীর পরিচর্য্যার ব্যবস্থাদি কি করেছিলেন, সীতা-উদ্ধারের চিন্তায় মগ্ন থাকার দরুণ আদৌ কিছু করেছিলেন কি না, রামায়ণে তা লেখা নেই। কিন্তু এদেশের বানররা আমেরিকায় গিয়ে খাওয়া-শোওয়া, খেলাধুলো, অসুস্থ হ'লে প্রথম শ্রেণীর হাসপাতালে ওষুধপথ্য ইত্যাদির যে সমস্ত সুব্যবস্থার সুবিধা পায়, আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত পরিবারের আদুরে ছেলেমেয়েরাও ততটা পায় না।

গ্রহযাত্রা

চন্দ্রলোকে যাত্রা, গ্রহযাত্রার পথে মানুষ যত এগিয়ে চলেছে তত তার মনে এই ধারণাটাই দৃঢ়মূল হচ্ছে যে, এ যাত্রার ফলে জ্ঞানবৃদ্ধির দিক্ ছাড়া অন্য কোনদিকে সে লাভবান্ হবে না। অর্থব্যয়ের দিক্ দিয়ে বিচার ক'রে দেখলে ক্ষতি হবে প্রচুর।



চন্দ্রাচারীর পোশাক

পৃথিবীতে যে-সমস্ত খনিজ দ্রব্যের অপ্রাচুর্য্য রয়েছে, গ্রহ-উপগ্রহগুলিতে সেগুলি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে যদি দেখা যায়, ত সেই আবিষ্কার মানুষের কোন কাজে লাগবে না এই কারণে যে, সেগুলিকে পৃথিবীতে বয়ে নিয়ে আসার খরচ পোষাবে না।

পৃথিবীর ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার কোন উদ্‌বৃত্তাংশ অন্য গ্রহ-উপগ্রহে গিয়ে যে উপনিবেশ স্থাপন ক'রে বাস করবে, তারও বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। শুক্রগ্রহ মনুষ্যবাসের অনুপযুক্ত, বুধগ্রহের উত্তাপ প্রাণঘাতী, বৃহস্পতি হয়ত একটা বিরাট গ্যাসের পিণ্ড, প্লুটো এত দূরে এবং এত ঠাণ্ডা যে সমস্ত রকম প্রতিকারের উপকরণ সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়েও মানুষ সেখানে কতক্ষণ প্রাণ ধারণ করতে পারবে বলা শক্ত। চন্দ্র এবং মঙ্গল গ্রহে প্রাণ ধারণ ক'রে থাকা সম্ভব হ'তে পারে, নানারকম বহু ব্যয়সাপেক্ষ তোড়জোড়ের ফলে। যেমন, প্রথমেই এমন আশ্রয়-শিবির তৈরী করতে হবে যার সঙ্গে বাইরেটার কোন সম্পর্ক থাকবে না। কালনাগিনীর দংশন থেকে লখিন্দরকে রক্ষা করবার জন্যে যেরকম লৌহশিবির নির্ম্মাণ করা হয়েছিল সেইরকমের নিশ্ছিদ্র শিবির। তারপর পৃথিবী থেকে বয়ে নিয়ে গিয়ে সেই শিবিরে জমা ক'রে ক'রে রাখতে হবে প্রয়োজন মত জল, বাতাস এবং খাদ্য। শিবির ছেড়ে দু'পা বেরুতে হলে, প্রাণধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় বাতাস ইত্যাদির জোগান-সম্বলিত যে-ধরণের পোশাক পরতে হবে তার ছবি পাশে দেখুন।

এরোপ্লেনের গতিবেগ

যেরকম দ্রুতগতিতে এরোপ্লেনের গতিবেগ বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে অনুমান করা যাচ্ছে যে, ১৯৭০ সালের সুরু থেকেই যাত্রীবাহী হাওয়াই জাহাজগুলি ঘণ্টায় ১৮৫০ মাইল বেগে দেশ-দেশান্তর ক'রে বেড়াবে। শব্দতরঙ্গের গতিবেগ ঘণ্টায় ৬৬০ মাইলের মতন। এরোপ্লেনের গতি এর চেয়ে দ্রুততর হলেই তাকে ঘিরে একটি চাপ-বাঁধা বাতাসের পরিবেশ গ'ড়ে ওঠে। এর থেকে এমন কতগুলি ঢেউয়ের উদ্ভব হয়, যার ধাক্কা পৃথিবীর গায়ে এসে লাগলে ধাক্কার প্রচণ্ডতা অনুসারে বন্দুক দাগার শব্দ থেকে বজ্রপাতের মতও শব্দ হয়। ১৮৫০ মাইল বেগে প্লেন ত চলবে, কিন্তু তারা যদি বজ্রনিনাদে চলতে থাকে ত যেখান দিয়ে উড়ে যাবে সেখানকার-লোকদের প্রাণান্ত হবে।

ক্রমাগত এই ধরণের শব্দ কানে এলে মানুষের কি অবস্থা হয়, কোনদিকে মারাত্মক রকমের ক্ষতি কিছু তার হয় কি না, আমেরিকার ওক্লাহোমা সিটির ৫ লক্ষ লোককে ২৬ সপ্তাহ ধ'রে এই শব্দ শুনিয়ে এবিষয়ে পরীক্ষা চলছে।

স. চ.

বিশ্বামিত্র

শ্রীচাণক্য সেন

৬

মারাঠা সম্প্রদায়কে হাতে রাখার রাজনৈতিক চারুকলায় কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যাঁর কাছে সবচেয়ে সাহায্য পেয়েছেন তাঁর নাম মাধব দেশপাণ্ডে। চিৎপাবন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, রাজনীতি-কূটনীতি এঁদের ধমনীতে হাজার হাজার বছর প্রবাহিত। মাধব দেশপাণ্ডের শীর্ণ দেহে প্রথম অপরাহ্নের বিগলিত দীপ্তি; হঠাৎ দেখলে শুচিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ ব'লে শ্রদ্ধা হয়। পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের দেহ বিধাতা যেন হাতুড়ি পিটিয়ে মজবুত করেছেন, কোথাও এতটুকু বাড়তি মেদ নেই। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল কদম-ছাঁট, অপ্রশস্ত ললাটে সারি সারি গভীর কুঞ্চন। চওড়া চোয়াল বেখাপ্পা কায়দায় হঠাৎ ভেঙ্গে অনেকটা ত্রিকোণ চিবুকে নেমে এসেছে, তাতে মাধব দেশপাণ্ডের মুখখানা কেমন ছন্দহীন, অযত্নে গড়া। চ্যাপটা নাক, পাতলা ওষ্ঠাধর, বিড়াল-চোখ।

মাধব দেশপাণ্ডেও একদা আইন পাস ক'রে জিলা আদালতে ব্যবসা সুরু করেছিলেন। বাপের কিছু পয়সা ছিল, নিজের কিছু বাড়তি উৎসাহ ছিল, তাই জিলা শহরেই একদিন এক সাপ্তাহিক মারাঠী পত্রিকার পত্তন করলেন। যেহেতু উদয়াচলের সেই জিলায় মারাঠা সম্প্রদায় ছিল সংখ্যা-গরিষ্ঠ, এবং মাধব দেশপাণ্ডের পত্রিকা "মাতৃভূমি" মারাঠাদের মুখপত্রের ভূমিকা দাবী করেছিল, সেহেতু কিছুদিনের মধ্যে তা জনপ্রিয় হয়ে উঠল। মাধব দেশপাণ্ডে বোম্বাই-এ মারাঠা নেতাদের কাছে পরিচিত হবার সুযোগ পেলেন। তারপর একদিন দেখা গেল, তিনি জিলা শহর ত্যাগ ক'রে "মাতৃভূমি"-সহ রাজধানী বিলাসপুরে উঠে এসেছেন। তখন থেকে তাঁর আসল কর্মক্ষেত্র হ'ল "মাতৃভূমি"। সাপ্তাহিককে তিনি দৈনিকে পরিণত করলেন। তিন দশকের অসহযোগ আন্দোলনে মাধব দেশপাণ্ডে সাবধানী পথ অনুসরণ ক'রে 'মডারেট' নামে পরিচিত হ'ন। তাতে পত্রিকার ব্যবসা পুষ্ট হ'ল, এবং মাধব দেশপাণ্ডেকে কারাবাস করতে হ'ল না। কিন্তু ১৯৩৭ সালে যখন কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করল, তখন মাধব দেশপাণ্ডেও "মাতৃভূমি"র ভূমিকা বদলে দিলেন। "মাতৃভূমি" পুরোপুরি কংগ্রেস-পন্থী হয়ে দাঁড়াল। মাধব দেশপাণ্ডে হাত মেলালেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশলের সঙ্গে। ১৯৪২-এর আন্দোলনে তাঁর সংক্ষিপ্ত কারাবাস হ'ল। ইংরেজ-রাজের 'ভারত-রক্ষা আইনের' প্রতিবাদে "মাতৃভূমি" তিন মাস সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ছাড়াই আত্মপ্রকাশ করল। দেশ-সেবার চিরাচরিত দীক্ষা পেয়ে মাধব দেশপাণ্ডে রাজনৈতিক নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠা পেলেন। "মাতৃভূমি"র লাভ খাটিয়ে মাধব দেশপাণ্ডে একখানা ইংরেজী দৈনিকও সুরু করলেন। নাম দিলেন, 'দি পিপ্‌ল্'।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যখন পাকা মন্ত্রিত্ব গঠনে উদ্যোগী হলেন, মাধব দেশপাণ্ডে তখন এক রাজনৈতিক সমস্যা হয়ে দাঁড়ালেন।

মারাঠা সমাজে মাধব দেশপাণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রজাপতি শেউড়ে। ১৯৩৭ সাল থেকে বলতে গেলে মাধব কৃষ্ণদ্বৈপায়নের রাজনৈতিক সহকর্মী। প্রজাপতি শেউড়ে মারাঠা সমাজে মাধবকে হিন্দীভাষীদের বন্ধু ব'লে নিন্দা করেন। প্রজাপতি বয়সে অপেক্ষাকৃত নবীন; ছাত্র ও শ্রমিক মহলে তাঁর রাজনৈতিক প্রভাব। কংগ্রেসের মধ্যে থেকেও তিনি উদয়াচলের মারাঠা-প্রধান জিলাগুলি একত্র ক'রে ভিন্ন প্রদেশ গঠনের নীতিতে বিশ্বাসী। এ ধরণের স্বতন্ত্র মারাঠাভাষী প্রদেশ গঠনে মাধব দেশপাণ্ডের অমত নেই, কিন্তু তিনি জানেন যে, এ রাজনৈতিক স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হবার সম্ভাবনা কম। তাই হিন্দীভাষীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে রাজনীতি করার পথ তাঁর কাছে শ্রেয়তর। প্রজাপতি শেউড়েও জানেন স্বতন্ত্র মারাঠা প্রদেশ উদয়াচলের অঙ্গচ্ছেদ ক'রে তৈরী হওয়া সম্ভব নয়, যদি কখনও হয়, তা হ'লে বোম্বাই-এর মারাঠা অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত হয়েই তার জন্ম সম্ভব। মাধব দেশপাণ্ডে জানেন যে, ঐ রকম সংযুক্ত মারাঠা প্রদেশে তাঁর প্রতিপত্তি খুব বেশী থাকবে না; বোম্বাই-এর মারাঠা নেতারাই নেতৃত্ব করবেন। তাই মারাঠা প্রদেশ আন্দোলনের প্রতি নিরুৎসাহ সমর্থন জানিয়েও তিনি আপাতত হিন্দীওয়ালাদের সঙ্গে একত্রে রাজনীতি করার পক্ষপাতী। প্রজাপতি শেউড়ে উদয়াচল মন্ত্রীসভায় অন্যতম উপমন্ত্রী; সুতরাং সংযুক্ত মারাঠা প্রদেশ গঠনে তাঁর উৎসাহ অনেক বেশী। ক্ষমতা-ক্ষেত্র প্রসারিত না হ'লে তাঁর রাজনৈতিক উচ্চাশা ফলবতী হবে না, এটুকু বোঝবার মত বুদ্ধি তিনি রাখেন।

কোশল মন্ত্রীসভা গঠনের উদ্যোগ-পর্বে মাধব দেশপাণ্ডের সঙ্গে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক আঁতাত

ছিল না। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন উদয়াচল কংগ্রেসের সাংগঠনিক নেতা ছিলেন ; "মাতৃভূমি" তাঁকে বাধ্য হয়েই মোটামুটি সমর্থন করত। বাইরে দু'জনের মধ্যে কিছুটা সম্প্রীতি ও বন্ধুত্ব দেখা যেত। কিন্তু মাধব দেশপাণ্ডে কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নকে কখনও ঠিক বুঝতে পারতেন না। এক সময় মনে হ'ত লোকটির কিছুটা রাজনৈতিক সততা আছে, অন্তত খানিকটা দেশপ্রেম আছে ; অন্য সময় মনে হ'ত কৃষ্ণদ্বৈপায়নের সম্বল একমাত্র অসাধারণ আত্মবিশ্বাস, অসামান্য ধূর্ততা, সিদ্ধান্তে ও কর্মে ক্ষিপ্রতা এবং দার্শনিক সুবিধাবাদ। আবার এক-এক সময়, যখন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন রাজনীতি এড়িয়ে কাব্য ও জীবনরহস্য নিয়ে আলাপ করতেন, মাধব দেশপাণ্ডের মনে হ'ত এ যেন একেবারে অন্য মানুষ। রাজনৈতিক চালে নিজেকে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের কাছে কেমন যেন এ্যামেচার খেলোয়াড় মনে হ'ত : তাঁর দীপ্ত, নাসিকা-শাসিত মুখে তাকিয়ে মাধব দেশপাণ্ডের রক্তপ্রবাহ হঠাৎ মন্থর হয়ে আসত। তিনি জানতেন, কৃষ্ণদ্বৈপায়নের সঙ্গে হাত না মিলিয়ে উদয়াচলে রাজত্ব করা যাবে না। অথচ তাঁর আলিঙ্গন যে আত্ম বিলোপ, এ কথাও বুঝতে পারতেন।

এ কারণে, দুর্গাভাই দেশাইকে মুখ্যমন্ত্রী করবার সংক্ষিপ্ত প্রচেষ্টায় মাধব দেশপাণ্ডের সায় ছিল। তিনি আশা করেছিলেন দুর্গাভাই উঁচু দামে তাঁর সহযোগিতা কিনতে রাজী হবেন। দুর্গাভাই সরল ভাল মানুষ, গান্ধীজীর চেলা ; তাঁর আদর্শ সুপরিচিত। রাজনৈতিক খেলায় তাঁর কাছে হারবার সম্ভাবনা কম, হারলেও তাতে নিজেকে ছোট মনে হবার জ্বালা থাকবে না। দুর্গাভাইকে মুখ্যমন্ত্রিত্ব নেবার অনুরোধ বহন ক'রে যাঁরা একদিন রাত্রিবেলায় তাঁর বাড়ীতে হাজির হয়েছিলেন, মাধব দেশপাণ্ডে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিতে বিশেষ দ্বিধা করেন নি। সংশয় ও ভয় যে একেবারে ছিল না তা নয়—দুর্গাভাই অগ্রসর না হ'লে মাধব দেশপাণ্ডেকে এ জন্যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন লাঞ্ছনা করবেন, তিনি ধ'রে নিয়ে-ছিলেন। কিন্তু রাজনীতিতে যে সতীত্বের দাসখৎ নেই, এ সাধারণ সত্য এ কর্মে যাঁরা অবতীর্ণ, তাঁরা সবাই জানেন।

মন্ত্রিত্ব গঠনের সেই প্রথম অধ্যায়েই বার বার কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন মাধব দেশপাণ্ডেকে চমকিত ক'রে দিয়েছিলেন। যেভাবে তিনি দুর্গাভাই দেশাইকে জয় ক'রে নিলেন তাতে তাঁর পরম শত্রুরাও চমৎকৃত না হয়ে পারেন নি। দুর্গাভাই মুখ্যমন্ত্রী ত হ'তে চাইলেনই না, কৃষ্ণদ্বৈপায়নের প্রধান সহকর্মী হয়ে নিশ্ছিদ্র সহযোগিতায় তাঁর পাশে দাঁড়ালেন। এমন যে হবে, মাধব দেশপাণ্ডে একেবারে ভাবেন নি। দুই মহারথীর এই আকস্মিক একতায় উপদলীয় নেতারা অনেকেই বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। তার মধ্যে মাধব দেশপাণ্ডের অবস্থা ছিল সঙ্গীন। কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের কাছে তিনি ষড়যন্ত্রকারী, বিশ্বাস-অযোগ্য ; দুর্গাভাই দেশাই-এর কাছে স্খলিত-চরিত্র। তা ছাড়া, তাঁর রাজনৈতিক ইতিহাসও দুর্বল ছিল : দীর্ঘকাল তিনি ছিলেন মডারেট, কারাবাসের গৌরবে বঞ্চিত। তাঁর একমাত্র রাজনৈতিক দাবি, তিনি মারাঠা নেতা : এ দাবি সাম্প্রদায়িক হ'লেও দুর্বল ছিল না। মাধব দেশপাণ্ডে বুঝতে পেরেছিলেন, স্বাধীন ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক আন্দোলনের জোর ক্রমে বেড়ে চলবে, কমবে না। আধুনিক দাবিকে মুখর ক'রে, নিম্নতর রাজনৈতিক চেতনার মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলে, তাঁর মত নেতারা দীর্ঘদিন নেতৃত্ব করতে পারবেন। সুতরাং, কংগ্রেস শাসনের গঠন-পর্বে মাধব দেশপাণ্ডে মনে-প্রাণে মারাঠী নেতা হয়ে উঠলেন। "মাতৃভূমি" ও "পিপ্‌ল্"-এর স্তম্ভে স্তম্ভে মারাঠা-গৌরবের দীপ্তি ছড়িয়ে পড়ল। ছত্রপতি শিবাজী, নানা পাতিল, মহামতি গোখলে, বীরবর বালগঙ্গাধর তিলক, মনীষী রাণাডে, বীর সাভারকর : সকলের জীবন-কেতন একসঙ্গে উড়িয়ে দিল তাঁর দু'খানা সংবাদ-পত্র। শুধু তাই নয়। "মহারাষ্ট্র সংস্কৃতি সংঘ" নামক হঠাৎ-প্রতিষ্ঠিত সংগঠনের উদ্যোগে বিলাসপুরে মারাঠা কীর্তির অম্লান জ্যোতি প্রকাশ ক'রে ফেললেন মাধব দেশপাণ্ডে। হাজার দশেক টাকা খরচ হয়ে গেল ; কিন্তু তখন অর্থ-ব্যয়ে কার্পণ্য করার সময় নয়।

এতখানি উদ্যোগের পুরো মূল্য আশা করেছিলেন মাধব দেশপাণ্ডে। এই সময় কৃষ্ণদ্বৈপায়নের কাছে তিনি আর একবার হারলেন।

শোনা গেল, মন্ত্রীসভা গঠনের খসড়া তালিকায় তাঁর নাম একেবারে বাদ পড়েছে। না কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল, না দুর্গাভাই দেশাই লিষ্টে তাঁর নাম রেখেছেন।

শুধু তাই নয়। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের তালিকায় অন্য এক-জন মারাঠা নেতার নাম। শঙ্করপ্রসাদ পাতিল। মারাঠা সমাজে বহু-সম্মানিত এই নাম। শঙ্করপ্রসাদ পাতিল রাজনীতি করেন নি। গঠনমূলক কাজে সারাজীবন ব্যস্ত থেকেছেন। উদয়াচলে মারাঠা সমাজে শিক্ষা-বিস্তারে তাঁর দান অসামান্য। স্কুল, কলেজ, টেকনিকাল ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছেন ; বহু প্রতিভাশালী যুবককে

উচ্চশিক্ষায় সাহায্য করেছেন। বুকে কঠিন বেদনার সঙ্গে মাধব দেশপাণ্ডে বুঝতে পারলেন, শঙ্করপ্রসাদ পাতিল মন্ত্রী হ'লে কেবল বোবা হয়ে থাকলেই তাঁর চলবে না, কৃষ্ণদ্বৈপায়নের এই অসামান্য ধূর্ততার ভূয়সী প্রশংসা করতে হবে।

মহারাষ্ট্র সংস্কৃতি প্রদর্শনের জন্যে দশ হাজার টাকা ব্যয়ে মাধব দেশপাণ্ডে তিনদিন ব্যাপী যে জৌলুসের আয়োজন করেছিলেন, তার সভাপতির পদে বৃত হয়েছিলেন শঙ্করপ্রসাদ পাতিল।

হতবুদ্ধি মাধব দেশপাণ্ডে আরও জানতে পারলেন যে, কৃষ্ণদ্বৈপায়নের তালিকায় স্থান পেয়েছেন প্রজাপতি শেউড়ে। তরুণ ও নবীন মারাঠা সমাজের নেতা।

মন্ত্রী-তালিকা পাকা হবার আগে সম্ভাব্য সদস্যদের নাম কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নিজেই সাবধানে সংবাদপত্রের রিপোর্টারদের কাছে ফাঁস করে দিলেন।

মাধব দেশপাণ্ডে কয়েকদিন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে রইলেন। শঙ্করপ্রসাদ পাতিলকে মন্ত্রীসভায় আহ্বানের প্রচেষ্টা "মাতৃভূমি"র সম্পাদকীয় নিবন্ধে প্রশংসা করতে হ'ল। প্রজাপতি শেউড়ের সৌভাগ্য নিয়ে সম্পাদকীয় মন্তব্য করা স্থগিত রইল। মাধব দেশপাণ্ডে নিজের স্বাক্ষরে এক প্রবন্ধে সতর্কতার সঙ্গে মন্ত্রীসভা গঠনে উদয়াচলের "দুই গৌরবান্বিত নেতাকে" সদুপদেশ দিলেন। "মারাঠা সমাজ সংখ্যায় লঘু হ'লেও গুরুত্বে লঘু নয়। শতকরা ত্রিশ ভাগকে ঠিক সংখ্যালঘু বলা চলে না। উদয়াচলের জীবনধারার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে এ সমাজ জড়িত। প্রদেশের সংগঠনে ও প্রগতিতে এর দান স্বীকৃত। মন্ত্রী নির্বাচনে মারাঠা সমাজকে পূর্ণ স্বীকৃতি দেওয়া ঔদার্য ও বিচক্ষণতার কাজ হবে। না দিলে নানা রকমের সঙ্কট দেখা দেওয়া অসম্ভব নয়। মন্ত্রীসভায় মারাঠা সমাজের প্রতিনিধি নির্বাচনে উভয় নেতাকে অনেক কিছু ভেবে দেখতে হবে। এ নিয়ে রাজনৈতিক চাল খেলা শেষ পর্যন্ত ক্ষতিকর হ'তে পারে।"

এই প্রত্যক্ষ ইঙ্গিতেও কোন ফল হ'ল না।

তখন মাধব দেশপাণ্ডে দুর্গাভাই দেশাইর কাছে দূত পাঠালেন। "মাতৃভূমি"র সম্পাদক, তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর, অর্জুন ঘোরপাড়ে। তাতে ফল আরও খারাপ হ'ল।

অর্জুন ঘোরপাড়ে দীর্ঘকাল "মাতৃভূমি"র সম্পাদনা করতে করতে বৃদ্ধ হয়েছেন। বার্ধক্যে তাঁর পূর্বস্মৃতি এত প্রখর ছিল না। এ দৌত্যের পরামর্শ মাধব দেশপাণ্ডেকে তিনিই দিয়েছিলেন।

দুর্গাভাই দেশাই পূর্বস্মৃতি ভোলেন নি। মডারেট পত্রিকা "মাতৃভূমি" একদা তাঁর রাজনৈতিক আন্দোলনকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করত, তিনি ভোলেন নি। সে-নিন্দার শিল্পী ছিলেন অর্জুন ঘোরপাড়ে। তাও তিনি ভোলেন নি।

দৌত্য, অতএব, কার্যকরী হ'ল না। দুর্গাভাই বললেন, "আপনারা কোশলজীর কাছে যান। তিনি দলের নেতা। তিনিই মুখ্যমন্ত্রী। আমি ত জেলে জেলেই জীবন কাটিয়েছি। আপনারা আমার কাজকর্ম বিশেষ সুনজরে দেখেন নি। কোশলজী আপনাদের অনেক ভাল জানেন, চেনেন।"

অর্জুন ঘোরপাড়ের এতক্ষণে স্মরণ হ'ল। বুঝলেন, চালে ভুল হয়েছে। বললেন, "সে ত বহুদিনের কথা। তখন অন্য কাল ছিল। সে-সব কথার আজ কি কোনও মানে আছে?"

দুর্গাভাই বললেন, "আপনাদের কাছে নেই। আমার কাছে আছে।"

অর্জুন ঘোরপাড়ে বললেন, "আপনি মহাপ্রাণ মানুষ—"

দুর্গাভাই রেগে উঠলেন, "আমি মহাপ্রাণ মানুষ নই। আমি দুর্গাভাই দেশাই। গান্ধীর চেলা। দেশের একজন সামান্য সেবক। আমার কাছে স্তাবকতার দাম নেই।"

অর্জুন ঘোরপাড়ের মুখে কথা সরল না।

দুর্গাভাই ব'লে চললেন, "আমার কাছে স্বাধীনতার কোনও মানে নেই, স্বাধীনতা সংগ্রামকে বাদ দিয়ে। কেন আমরা স্বাধীনতার জন্যে লড়েছি, কি আদর্শ নিয়ে, কোন্ লক্ষ্যে পৌঁছুতে, কোন্ পথে চলতে, এ সব ভুলে গেলে স্বরাজের কোনও মানে নেই। তখন স্বরাজ হ'ল হঠাৎ-পাওয়া ক্ষমতার সুরা: তাকে পান ক'রে মত্ত হবার জন্যে চতুর্দিকে নোংরা কোলাহল। আপনাদের কাছে স্বাধীনতা সংগ্রামের মানে নেই, স্বাধীনতার মানে আছে। তাই সংগ্রামের দিনে আপনারা মডারেট, সংগ্রাম শেষে ক্ষমতাপ্রার্থী। এই হ'ল আজকার রাজনীতি। এর মধ্যে আমি নেই। কোশলজী এসব বোঝেন, আপনারা তাঁর কাছে যান।"

অগত্যা মাধব দেশপাণ্ডেকে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের দরবারেই দাঁড়াতে হ'ল। সহজে তিনি পারলেন না। লজ্জা বা অসম্মানের চেয়ে ভয় বেশি। রাজনৈতিক চালের ভয়।

কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ভয়ংকর ব্যক্তিত্বকে ভয়। তাঁকে না বুঝতে পারার অস্বস্তিকর ভয়।

কোশল দ:বারে যাবার রাস্তা খুঁজছেন মাধব দেশপাণ্ডে, এমন সময় কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নিজেই তাঁকে আহ্বান করলেন।

বিলাসপুর শহরের পূর্বপ্রান্তে প্রাচীন শিবমন্দির। অধুনা মাধব দেশপাণ্ডে প্রতি রবিবারে শিবমন্দিরে পূজা দিচ্ছেন। এক রবিবারে পূজাশেষে মন্দিরের সংলগ্ন বট গাছের ছায়ায় দেখতে পেলেন একটি তরুণ ব'সে রয়েছে। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের কনিষ্ঠ পুত্র, চন্দ্রপ্রসাদ।

সে এসে মাধব দেশপাণ্ডের সামনে দাঁড়াল। নীচু মাথায় প্রণাম করল।

"ভালো আছেন ত, দেশপাণ্ডেজি?"

"মহাদেব যেমন রেখেছেন। তোমাদের খবর কি? পিতাজি সর্বাঙ্গীণ কুশলে আছেন ত?"

"কাকাজি, কোশল সাহেবের কুশল জানবার অবকাশ আমাদের জোটে না। সে সৌভাগ্য ত আপনাদের। আপনাদের কে কে মন্ত্রীসভায় থাকবেন বা থাকবেন না তাই নিয়ে পিতাজির আহার-নিদ্রা বন্ধ।"

মাধব দেশপাণ্ডের দেহ জ্বলে উঠল অথচ মনে অদম্য কৌতূহল বোধ করলেন। এক বখাটে ফাজিল ছোকরার সঙ্গে এমন গুরুতর ও ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে কথা বলতে তাঁর রুচি নেই, অথচ এর কাছ থেকে কিছু খবর বার ক'রে নেবার আগ্রহ তিনি চাপতে পারলেন না।

"হাঁ, তা ত হবেই," মাধব দেশপাণ্ডে বললেন, "একটা সমস্ত প্রদেশের শাসনব্যবস্থা কি কম বড় দায়িত্ব? রোজ নিশ্চয় অনেক লোক যাতায়াত করছে, কি বল?"

"অনেক, অনেক, কাকাজি। ধরুন, আজই সকালে। দুর্গাভাই দেশাইজি, প্রজাপতি শেউড়েজি, সুদর্শন দুবেজি, হরিশংকর ত্রিপাঠিজি, নিরঞ্জন পরিহারজি, আর—" দাঁতে ঠোঁট কামড়ে, জিভে এক বিচিত্র শব্দ করে—"বাজপাইজি।"

মাধব দেশপাণ্ডের কৌতূহল বাড়ল।

"সুদর্শনজি এসেছিলেন বুঝি?"

"উনি ত রোজ আসছেন!"

"রোজ আসছেন?"

"কোনও কোনও দিন দিনে দুবারও আসেন।"

খবরটা মাধব দেশপাণ্ডের পক্ষে শুভ নয়। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল ও সুদর্শন দুবে একত্র হ'লে হিন্দীওয়ালাদের জোট ভয়ানক শক্ত হয়। মারাঠারা দুর্বল হয়ে পড়ে।

"প্রজাপতিও বুঝি আজ এসেছিল?"

"জি হাঁ। উনিও বেশ ঘন ঘন আসছেন।"

"শঙ্করপ্রসাদভাই আসেন না?"

"একদিন আসতে দেখেছিলাম।" চন্দ্রপ্রসাদ এবার গলা নামিয়ে বলল, "পিতাজির সঙ্গে খুব উত্তেজিত কথাবার্তা হচ্ছিল।" এবার আরও গলা নামিয়ে: "সকালে চা খেতে ব'সে পিতাজি কি ভয়ানক গম্ভীর হয়ে রইলেন। কারুর সঙ্গে একটা কথাও বললেন না।"

"তাই বুঝি? তাই বুঝি? কেন? কেন?"

"তা কি ক'রে বলব কাকাজি? আমার মনে হ'ল—"

"কি মনে হ'ল তোমার?"

"আমার মনে হ'ল শংকরপ্রসাদজির ওপর পিতাজি খুব রেগে রয়েছেন।"

"রেগে রয়েছেন?"

"তাই ত মনে হ'ল?"

"কিন্তু, আমি যে শুনছি—যাক্ গে! শংকরপ্রসাদজি আর আসেন নি?"

"এসে থাকতে পারেন, আমি দেখি নি।"

"তুমি দেখ নি!"

"আজ্ঞে না। তবে—"

"তবে কি?"

"তাঁর নাকি মন্ত্রী হবার খুব ইচ্ছে।"

"তাই বুঝি? কি করে বুঝলে?"

"মনে হ'ল।"

"হুঁম্। মন্ত্রী হবার ইচ্ছে ত সবারই!"

"সবার নিশ্চয় নয়। দেখুন না, আপনার ত মন্ত্রী হবার ইচ্ছে নেই!"

"আমার? আমার কথা তুমি জানলে কি ক'রে?"

"মালুম করছি। আপনি ত পিতাজির কাছে আসেন না!"

"মন্ত্রিত্বে আমার লোভ নেই। আমি আজীবন দেশের সেবক। সাধ্যমত দেশের সেবা করেছি। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ক'রে যাব। মন্ত্রিত্বে আমার বিন্দুমাত্র লোভ নেই।"

"তা ত সবাই জানে। পিতাজিও তাই বলছিলেন।"

"অ্যাঁ! কোশলজিও তাই বলছিলেন? কি বলছিলেন?"

"কাল সকাল বেলা চায়ের সময় আমিই জিজ্ঞেস

ক'রে বসলাম। বললাম, পিতাজি, মহারাষ্ট্র সমাজের সবচেয়ে নামকরা নেতা ত মাধব দেশপাণ্ডেজি। তাঁকে নিশ্চয় আপনি মন্ত্রীসভায় নিচ্ছেন! পিতাজি বললেন, মাধবজিকে তোমরা জানো না। মন্ত্রিত্বে তাঁর লোভ নেই। তিনি দেশকর্মী, দেশের সেবাতেই তাঁর আনন্দ, পরিতৃপ্তি। পিতাজি আরও বললেন, মাধবজির মত লোক দেশে সবচেয়ে দরকার।"

"তাই বুঝি? তাই বুঝি? তোমার পিতাজি পুণ্যবান্ মহাপ্রাণ নেতা। তাঁর কাছে আমরা নগণ্য।"

"এই দেখুন না কাকাজি। মন্ত্রীসভা তৈরী হবে, তাই নিয়ে কি দারুণ কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে! পিতাজিকে আমরা কখনও এত ব্যস্ত, উত্তেজিত, ক্লান্ত, বিমর্ষ দেখি নি। একদিন তিনি বলেছিলেন, মন্ত্রীসভায় যদি দুশো চল্লিশ জনের স্থান হ'তে পারত, তা হ'লে কোনও সমস্যা থাকত না। তা হ'লে প্রত্যেক কংগ্রেস এম. এল. এ.-কে মন্ত্রী, উপমন্ত্রী বা কিছু একটা বানিয়ে রাখা যেত।"

মাধব দেশপাণ্ডে উদাস হাসলেন।

"পিতাজির জন্যে কষ্ট হয়, কাকাজি। অনেকেই তাঁকে ভুল বোঝে। আসলে তিনি রাজনৈতিক নেতা নন, কবি। কাব্যেই তাঁর প্রকৃত পরিণতি। আমাদের ত ভয় হয় এ সব গোলমালে তাঁর স্বাস্থ্য না ভেঙ্গে পড়ে।"

"কেন? তাঁর ভবিষ্যৎ কি সুস্থ নেই?"

"ভবিষ্যতের কথা হচ্ছে না কাকাজি। তাঁর মনের কথা বলছি। একদিন এসে দেখে যান না তাঁকে? আপনি ত আর মন্ত্রিত্ব নিয়ে লড়বার জন্যে আসবেন না? আপনার সঙ্গে তিনি দু'চারটে অন্য কথা বলে নিশ্চয় আরাম পাবেন।"

"ঠিকই বলেছ তুমি। আমিও ভাবছিলাম একদিন যাব। তবে কোশলজি ব্যস্ত মানুষ, তাই এ সময়ে তাঁর সময় নষ্ট করতে চাই নি।"

"আপনাকে দেখলে পিতাজি নিশ্চয় সুখী হবেন। সেদিন বলছিলেন, মাধবজির সঙ্গে অনেক দিন দেখা নেই।"

"বলছিলেন বুঝি?"

"বলছিলেন, 'তোমরা একটু খোঁজ করো তিনি সুস্থ আছেন কি না? আমার ত এখন মরবারও পর্যন্ত সময় নেই। মন্ত্রীসভার কাজ চুকে গেলে আমি একদিন দেখা করতে যাব'।"

মন্দির থেকে বাড়ী ফিরে মাধব দেশপাণ্ডে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশলকে টেলিফোন করলেন। সেদিন রাত্রে দু'জনের সাক্ষাৎকার হ'ল।

এ সাক্ষাৎকারের ফলে মাধব দেশপাণ্ডে কোশল মন্ত্রী-সভায় পূর্ত ও গৃহনির্মাণ বিভাগের মন্ত্রী হলেন। তাঁর এবং কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মধ্যে বোঝাপড়া হ'ল, তিনি বিনা-সর্তে মুখ্যমন্ত্রীর দলীয় রাজনীতির পেছনে দাঁড়াবেন। মারাঠা সম্প্রদায়ের সমর্থন নিয়ে। মাধব দেশপাণ্ডেকে খুশী করবার জন্যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রজাপতি শেউড়েকে উপমন্ত্রিত্বে খর্ব করে রাখলেন।

শংকরলাল পাতিল নির্বাচিত হলেন বিধান সভার স্পীকার।

দুর্গাভাই একবার আপত্তি করেছিলেন।

'মাধব দেশপাণ্ডে ডাহা সুবিধাবাদী। জীবনে একবারও জেল খাটে নি। সব সময় নিজেকে, নিজের স্বার্থকে বাঁচিয়ে চলেছে। আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ক'রে আমার কাছে এসে হাজির হয়েছিল। বলেছিল, মারাঠা সমাজ কোশলজিকে চায় না। আর আপনি ওকেই মন্ত্রিত্ব দিচ্ছেন। আপনার রাজনীতি আমি বুঝতে পারি নে, কৃষ্ণদ্বৈপায়নজি।''

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হেসে উত্তর দিয়েছিলেন: ''দুর্গাভাইজি, রাজনীতির সবচেয়ে বড় প্রেরণা স্বার্থ ও সুবিধা। আদর্শ তার পরে। লক্ষ্য নিয়ে ঝগড়া যত, তার চেয়ে অনেক বেশি পথ নিয়ে। কৌশল নিয়ে, কূটনীতি নিয়ে। দুর্গাভাইজি, আমি বার বার মহাভারত পাঠ করেছি, এখনও ক'রে থাকি। কেবল জীবনরহস্য বুঝবার জন্যে নয়, রাজনীতি-রহস্য জানবার জন্যেও। অত বড় রাজনৈতিক মহাকাব্য পৃথিবীতে আর লেখা হয় নি। উদ্যোগপর্বের কথা স্মরণ করুন। কৌরব পাণ্ডব উভয় শিবিরে যুদ্ধের উদ্যোগ। আর রাজনীতি, কূটনীতির কি নিপুণ খেলা। মদ্ররাজ শল্য, নকুল-সহদেবের মাতুল, বিরাট সৈন্যদল নিয়ে যাচ্ছিলেন পাণ্ডবদের সঙ্গে যোগ দিতে। মাঝপথে দুর্য্যোধন তাঁর গতিরোধ করলেন। বাহুবলে নয়, বিচিত্র সংবর্ধনায়। দেখুন দুর্যোধনের রাজনৈতিক চাল। দুর্যোধনের আদেশে শিল্পীগণ স্থানে স্থানে বিচিত্র সভা-মণ্ডপ, কূপ, দীঘি, পান্থশালা নির্মাণ করল। খেলাধূলা, আমোদ-আহ্লাদ, খাদ্য-পানীয়ের অকৃপণ আয়োজন। শল্য উপস্থিত হ'লে দুর্যোধনের মন্ত্রিগণ তাঁকে দেবতার ন্যায় পূজা করলেন। সে সম্বর্ধনা-সভার সৌন্দর্য দেখে শল্য ত বিমুগ্ধ। বললেন, কোন্ শিল্পী এমন সুন্দর কাজ

করেছে? তাকে আমার কাছে নিয়ে এস। পুরস্কার দেব। এসে হাজির হলেন দুর্যোধন নিজেই। শল্য অত্যন্ত প্রীত হ'য়ে বললেন, তুমি কি চাও বল, তোমার অভীষ্ট আমি পূর্ণ করব। দুর্যোধন বললেন, আপনি আমার প্রধান সেনাপতি হন। শল্য রাজী হলেন। দেখুন, দুর্গাভাইজি, রাজনীতির এক খেলায় দুর্যোধন জিতলেন। যুধিষ্ঠিরের ভাবা উচিত ছিল যে, শল্যকে পথে দুর্যোধন আটকাতে পারে। তা না ভেবে তিনি রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার পরিচয় দিলেন। কিন্তু তাই ব'লে যুধিষ্ঠিরও কম বুদ্ধিমান্ ছিলেন না। তিনি জানতেন, রাজনীতিতে পুরো জয় বা পুরো পরাজয় কদাপি নেই। সবচেয়ে বড় জয়ের মধ্যেও পরাজয়ের কালো ছায়া থাকে; সবচেয়ে বড় পরাজয়কেও অন্তত কিছুটা জয়ে পরিণত করা যায়। যুধিষ্ঠির-শিবিরে উপস্থিত হয়ে শল্য যখন জানালেন, তিনি দুর্যোধনের সেনাপতি হ'তে রাজী হয়েছেন, পাণ্ডবরাজ দুঃখ পেলেও মুখে তা প্রকাশ করলেন না। বললেন, দুর্যোধনের প্রতি তুষ্ট হয়ে আপনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা ভালই। এখন আমার একটি উপকার করুন। অকর্তব্য হ'লেও এ আপনাকে করতে হবে, কেননা আমাদের মঙ্গলের জন্যে এ কাজ বড় প্রয়োজন। যুদ্ধে আপনি বাসুদেবের সমান। কর্ণ ও অর্জুনে যুদ্ধ হবে। অর্জুনের সারথি হবেন কৃষ্ণ। আপনাকে হ'তে হবে কর্ণের সারথি। কর্ণের সারথি হয়ে দুটো কাজ আপনাকে করতে হবে: অর্জুনকে রক্ষা, আর কর্ণের তেজ নষ্ট। যুধিষ্ঠির বললেন, মামা, অকর্তব্য হলেও এ কাজ আপনাকে করতে হবে। উত্তরে শল্য বললেন, এ কাজ আমি নিশ্চয় করব। যুদ্ধের সময় কর্ণকে আমি এমন সব প্রতিকূল ও অহিতকর বাক্য বলব যাতে তার তেজ নষ্ট হবে এবং অর্জুন তাকে অনায়াসে বধ করতে পারবে। শুধু এই কেন, তোমাদের ভালর জন্যে আরও অনেক কিছু আমি করব।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলে চললেন, "দুর্গাভাইজি, যুধিষ্ঠিরের রাজনীতি একবার ভেবে দেখুন। বিরাট্ সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে শল্যের মত অত বড় যোদ্ধাকে দুর্যোধন ভাগিয়ে নিয়ে গেল, এমন পরাজয়ে তিনি একটুও ম্লান হলেন না। খবর পাবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাথায় খেলে গেল এই বিরাট্ বিপর্যয় থেকে কতটুকু জয় আদায় ক'রে নেওয়া যায়। আর তক্ষুণি এক অতি নিপুণ যুদ্ধকৌশল তিনি ভেবে ফেললেন। যুধিষ্ঠির জানতেন, পাণ্ডবদের যদি কাউকে ভয় করার থাকে সে হচ্ছে কর্ণ। একমাত্র কর্ণই প্রাণ দিয়ে দুর্যোধনের পক্ষে লড়বে—তার সমস্ত শক্তি দিয়ে, ইচ্ছা দিয়ে, অপমান, হিংসা, ক্রোধ ও মহাবিক্রম দিয়ে। যুধিষ্ঠিরের সবচেয়ে ভয় ছিল অর্জুনকে নিয়ে। কর্ণের হাতে অর্জুন নিহত না হন। তাই শল্য শত্রুপক্ষের সেনাপতি হওয়ায় যুধিষ্ঠির যেন সুখী হলেন। কৃষ্ণের সমান যোদ্ধা শল্য। কর্ণ ও অর্জুনের যুদ্ধে, কৃষ্ণ হবেন অর্জুনের সারথি। সুতরাং সেনাপতি শল্য কর্ণের সারথি হ'লে দুর্যোধন বা কর্ণ সন্দেহ করবে না। সারথি হয়ে রথ চালনার কলা-কৌশলে শল্য অর্জুনকে বিপদ্ থেকে বাঁচাতে পারবেন। কর্ণ বিরাট্ যোদ্ধা বটে, কিন্তু অত্যন্ত দাম্ভিক, আত্ম-সচেতন ও অহঙ্কারী। শল্য যদি তাঁর অহমিকাকে আঘাত ক'রে কথা বলেন, কর্ণ উত্তেজিত হবে, যুদ্ধে তার ভুল হবে, তার তেজ কমে যাবে। এতখানি কূট-রাজনীতি মুহূর্তে যুধিষ্ঠিরের মাথায় খেলে গেল। আর, দুর্গাভাইজি, আপনারা যুধিষ্ঠিরকে খুব ভালমানুষ ব'লে উপেক্ষা করেন, নয়ত ধর্মপুত্র ব'লে পূজা করেন।"

দুর্গাভাই-এর বিস্মিত, প্রভাবিত মুখে দৃষ্টিপাত ক'রে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব'লে চললেন: "মাধব দেশপাণ্ডে সুবিধাবাদী, সবাই জানে। কংগ্রেসের আন্দোলনে তিনি যোগ দেন নি, জেলে যান নি, আপনাকে আমাকে তাঁর পত্রিকা 'মাতৃভূমি' বার বার নিন্দা করেছে। সব সত্য। কিন্তু সেদিন ত ইতিহাস! ১৯৪২-এর পরে দেশের অবস্থা বুঝে মাধব দেশপাণ্ডে কংগ্রেসী হয়েছেন। আজ মারাঠা সমাজে তাঁর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত। 'মাতৃভূমি' প্রভাবশীল সংবাদপত্র। 'পিপল্'কেও উপেক্ষা করা যায় না। একমাত্র মাধব দেশপাণ্ডেই উদয়াচলের সংবাদপত্র-ম্যাগনেট, মারাঠা সমাজ থেকে মন্ত্রী নির্বাচন সহজ নয়। শঙ্করপ্রসাদ পাতিলকে মন্ত্রিত্ব দেওয়া যায়, কিন্তু শিক্ষা দপ্তর ছাড়া অন্য কিছু তিনি চান না—অথচ এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে আপনার-আমার মতের একটুও মিল নেই। আমরা যে সামাজিক শিক্ষা এবং গ্রামে গ্রামে 'গুরুকুল' প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করেছি, তিনি তাকে অর্থ, সময় ও প্রচেষ্টার বিরাট্ অপচয় মনে করেন। এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয়েছে, আপনিও তাঁর সঙ্গে আলাপ করেছেন। তা ছাড়া শঙ্করপ্রসাদ শিক্ষাবিদ্, রাজনৈতিক নেতা নন। মারাঠা সমাজের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা তাঁকে মন্ত্রিত্ব দিলে মিটবে না। বিধান সভায় মারাঠা সদস্যরা—আমাদের দলের কথাই বলছি—শঙ্করপ্রসাদের নেতৃত্ব মানবে না।

ওদের নেতা মাধব দেশপাণ্ডে, প্রজাপতি শেউড়ে। তাই মাধব দেশপাণ্ডেকে মন্ত্রিত্ব দিতেই হবে।"

"দিতেই যদি হবে ত প্রথম থেকে দিলেন না কেন?"

"তার অনেক কারণ আছে, দুর্গাভাইজি। মাধব দেশপাণ্ডের বুদ্ধি যত স্থূল, উচ্চাশা তত বিরাট্। তাঁকে প্রথম থেকে বুঝতে দিন তিনি মারাঠাদের নেতা, দেখবেন তিনি নানা সর্ত নিয়ে হাজির। বলবেন, দশ জনের মন্ত্রীসভায় অন্তত চার জন মারাঠা মন্ত্রী চাই; ছয় জন উপমন্ত্রীর মধ্যে কম ক'রে দু'জন। এককালে লীগ যা করত, এখন আমরা নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে তা করছি। শুধু তাই নয়। মাধব দেশপাণ্ডে বলবেন, আমি যাঁদের নাম করব তাঁরাই মন্ত্রী হবেন। অর্থাৎ মারাঠাদের এক ও অদ্বিতীয় নেতা হিসেবে মাধব দেশপাণ্ডের প্রতিষ্ঠা আপনি নিজের হাতে ক'রে দিলেন। তার পর একদিন দেখতে পাবেন, আপনাকে সরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হবার দুরন্ত উচ্চাশায় মাধব দেশপাণ্ডে গভীর ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছেন।"

"তাই বুঝি আপনি তাঁকে ভেঙ্গে টুকরো ক'রে আবার জোড়া লাগালেন?"

"তা বলতে পারেন, দুর্গাভাইজি। মাধব দেশপাণ্ডের সবচেয়ে ভুল হয়েছিল আপনার দরজায় আমার বিরুদ্ধে গিয়ে হাজির হওয়া। তার পর আমার কাছে আসবার সৎসাহস তাঁর আর হয় নি। মন্ত্রী হবার জন্যে তিনি যে দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করছিলেন আমি জানতাম। এজন্যে কোন দাম দিতেই তাঁর আটকাবে না, তাও জানতাম। দরকার ছিল মাধব দেশপাণ্ডের অহমিকা চূর্ণ করবার। তাঁকে বুঝিয়ে দেবার যে, মারাঠা সমাজে কংগ্রেসী নেতা তাঁর মত আরও অনেক আছেন, মন্ত্রী হবার দাবি তাঁদেরও আছে।"

"তাঁকে আপনার খাস কামরায় আনলেন কি ক'রে?"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হেসে বললেন, "একটু কৌশল করেছিলাম, দুর্গাভাইজি। তা আর আপনাকে নাই বললাম। আপনি আদর্শবান্, পুণ্যপ্রাণ মানুষ। শুনলে দুঃখ পাবেন, আমার ওপর আপনার যেটুকু শ্রদ্ধা আছে তাও কমে যাবে।"

নীরব দুর্গাভাই-এর চোখে ক্লান্ত উদাস দৃষ্টি রেখে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আরও বলেছিলেন, "মহাভারতের কয়েকটি শ্লোক মনে পড়েছে, দুর্গাভাইজি। শান্তিপর্বে যুধিষ্ঠিরকে ভীষ্ম সদুপদেশ দিচ্ছেন। বলছেন, 'যে চ মূঢ়তমা লোকে যে চ বুদ্ধেঃ পরং গতাঃ। তে নরাঃ সুখমেধন্তে ক্লিশ্যত্যন্তরিতো জনঃ॥' যারা মূঢ়তম, যাদের বুদ্ধি নেই, অর্থাৎ যারা বোকা, এবং পরমবুদ্ধি লাভ করেছে, জগতে তারাই সুখভোগ করে। যারা মধ্যবর্তী, তারাই দুঃখ পায়। দুর্গাভাইজি, রাজনীতিতেও তাই। মাধব দেশপাণ্ডের মত মূঢ় এবং আপনার মত পরমবুদ্ধি, আপনাদের দুঃখ অনেক কম। দুঃখের বিরাট্ বোঝা আমার মত মধ্যবর্তী মানুষদের জন্যে। তাই আমি অনেক সময় ভীষ্মের অন্য উপদেশটি মনে মনে আবৃত্তি করি: 'সুখং বা যদি বা দুঃখং প্রিয়ং বা যদি বাপ্রিয়ম্। প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাসীতে হৃদয়েনাপরাজিতঃ॥' সুখ বা দুঃখ, প্রিয় বা অপ্রিয়, যাই উপস্থিত হোক্, অপরাজিত, অর্থাৎ অনভিভূত হয়ে হৃদয়ে মেনে নেবে। এ উপদেশের আধুনিক ব্যাখ্যা হ'ল: সুখে, দুঃখে, জয়ে-পরাজয়ে একেবারে হৃদয় ভাসিয়ে দিতে নেই। তার মানে, ইংরেজীতে বলতে হয় দুর্গাভাইজি—যতটা সম্ভব ডিটাচ্‌ড্ থাকতে হবে। নির্লিপ্ত। আলগা। সিনিক না হ'লে রাজনীতি করা যায় না, দুর্গাভাইজি।" ক্রমশঃ

সর্বস্বান্ত, লাঞ্ছিত, আহত বা নিহত হওয়াটা পরাজয় নহে; নিজেকে অসহায় মনে করিয়া ভয়ে মনুষ্যত্ব বিসর্জন দেওয়াই পরাজয়।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩৩৭।

রামমোহন রায়

রামমোহন রায় কাহা অপেক্ষা বড় বা কাহা অপেক্ষা ছোট ছিলেন, কত বড় বা কত ছোট ছিলেন, তাহার আলোচনা বা নির্দ্দেশ করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু তিনি যে মহাপুরুষ ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

তিনি নিজের প্রদেশকে ভুলেন নাই, অথচ সমগ্র ভারতবর্ষের হিতৈষী ও হিতসাধক ছিলেন। তিনি নিজের জন্মগত হিন্দুধর্ম্ম সম্প্রদায়কে এবং তাহার শাস্ত্রকে শ্রদ্ধা ও প্রীতি করিতেন, এবং বাল্যকালেই তাহার মূল ও প্রধান সত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণচেতা ছিলেন না, (কোন রাজনৈতিক কারণ, প্রয়োজন, বা উপলক্ষ্য ব্যতিরেকে) মুসলমান ও খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায় এবং তাহাদের শাস্ত্র সকলকেও তিনি শ্রদ্ধা ও প্রীতি করিতেন, এবং মূল আরবী, গ্রীক ও হীব্রু ভাষায় তৎসমুদয় অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয়ানদিগের সহিত তর্কে তিনি প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মের আন্তরিক সমর্থন করিতেন। তিনি কেবল পণ্ডিতের মত পড়েন নাই, মহামনস্বী ছিলেন বলিয়া মনন ও ধ্যান দ্বারা সকল ধর্ম্মের সার সত্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রদ্ধাভক্তি তাঁহার বিচারশক্তিকে বলহীন করে নাই; তিনি সকল সম্প্রদায়গত ভ্রমের উল্লেখ ও নিরসন "তুফাতুল মুত্তাহিদীন" নামক আরবী-ফারসী পুস্তিকায় এবং নানা বাংলা হিন্দী ও ইংরেজী গ্রন্থে করিয়াছেন।

ভারতবর্ষ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও অধিকারে অন্য যে-কোন দেশের সমকক্ষ হয়, ইহা তাঁহার হৃদ্গত ইচ্ছা ছিল। ভারতবর্ষ যে কালে স্বরাজ্য লাভ করিবে, ইহা তিনি বুঝিয়াছিলেন, যদিও স্বরাজ্য কথাটি ব্যবহার করেন নাই। ভারতীয়দের রাষ্ট্রীয় উন্নতির জন্য তিনি তৎকালোচিত বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রীয় উন্নতি-চেষ্টার তিনিই আধুনিক প্রবর্ত্তক। যুদ্ধ দ্বারা ভারতবর্ষের স্বরাজ্যলাভের সম্ভাবনা না থাকায় এবং যুদ্ধ তাঁহার মনঃপূত ছিল না বলিয়া, তিনি নিরস্ত্র চেষ্টার প্রবর্ত্তন করেন। তিনি ভারতীয়দের, সমুদয় এশিয়াবাসীর, আত্মমর্য্যাদার লাঘব কখনও সহ্য করিতেন না। ভারতীয়েরা বিদ্যালাভ প্রভৃতি বিষয়ে সুযোগ পাইলে ইউরোপীয়দের সমকক্ষ হইতে পারে, তাঁহার এই মত তাঁহার গ্রন্থাবলীতে দেখা যায়; তাঁহার সমসাময়িক ভারতীয় লোকেরা যে উচ্চ সরকারী কাজের উপযুক্ত, তাহা তিনি বলিয়া গিয়াছেন। মোটের উপর ভারতীয় জ্ঞানসমষ্টি যে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানসমষ্টি অপেক্ষা কম বা অল্পমূল্য নহে, এই মতও তিনি ব্যক্ত করিয়াছিলেন। সমগ্র এশিয়াবাসীদের সম্মান রক্ষার জন্য তিনি সর্ব্বদা অবহিত ছিলেন। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। একবার একজন ইংরেজ খ্রীষ্টীয়ান তাঁহার সহিত তর্কবিতর্ক করিতে করিতে Asiatic effiminacy কথাটা ব্যবহার করায়, তিনি জবাব দেন, যে, এশিয়াবাসীরা জন্মতঃ বংশতঃ ইউরোপীয়দের চেয়ে নিকৃষ্ট নহেন, এবং এশিয়াবাসীদের পৌরুষের দৃষ্টান্ত দিয়া বলেন, যীশুখ্রীষ্ট, সাধু পৌল (St. Paul) প্রভৃতি এশিয়ার লোক ছিলেন। শুধু ইঁহাদের নাম করিবার কারণ এই যে, তিনি খ্রীষ্টীয়ানের সঙ্গে তর্ক করিতেছিলেন।

তাঁহার এই প্রকার সদাজাগ্রত স্বাজাত্য, স্বাদেশিকতা ও স্বমহাদেশিকতা (continental patriotism) সত্ত্বেও তাঁহার অতি উদার বিশ্বজনীন মানবপ্রেম ছিল। বিদেশী কোন জাতি স্বাধীনতা লাভ করিলে তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইতেন—একবার এইরূপ কারণে টাউনহলে ভোজ দিয়াছিলেন; স্বাধীনতা লাভ চেষ্টায় বিদেশী কোন জাতি বিফলপ্রযত্ন হইলে তিনি ম্রিয়মাণ হইতেন; আইরিশদের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় সমবেদনা ছিল, ও তাহাদের প্রতি ইংরেজদের অত্যাচারের তিনি তীব্র প্রতিবাদ করিতেন; ফ্রান্সকে স্বাধীনতার পীঠস্থান জ্ঞানে তিনি ভালবাসিতেন ও ভক্তি করিতেন, বিলাতযাত্রার পথে উত্তমাশা অন্তরীপের নিকটে এক ফরাসী জাহাজের ফরাসী জাতীয় পতাকাকে সেলাম করিতে গিয়া পা পিছলাইয়া পড়ায় তাঁহার পা ভাঙ্গিয়া যায়; ইংরেজের অত্যাচার নিবারণ ও প্রভুত্বনাশের জন্য তিনি চেষ্টিত থাকিলেও উদার মানবপ্রেম বশতঃ ইংলণ্ডের সংস্কার-আইন পাস না হইলে তিনি

ইংলণ্ডের সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—জাতি-দেশ-নির্ব্বিশেষে তাঁহার স্বাধীনতাপ্রিয়তা এমনি প্রবল ছিল।

রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাই মানবের কল্যাণ সম্বন্ধে তাঁহার সম্পূর্ণ বা চরম আদর্শ ছিল না। সামাজিক বিষয়েও মানুষের হিত ও স্বাধীনতা তিনি চাহিতেন; ধর্ম্ম বিষয়ে, আত্মিক বিষয়ে, মানুষের স্বাধীনতা ও কল্যাণ তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। এই উভয় লক্ষ্য সাধনে তিনি সর্ব্বস্বপণ ও প্রাণপণ করিয়াছিলেন—প্রতিপক্ষীয়েরা তাঁহাকে বধ করিতে সংকল্প করাতেও তিনি নিবৃত্ত হন নাই। দেশে শিক্ষা বিস্তার দ্বারা লোকদের জ্ঞান বৃদ্ধি করিতে তিনি যত্নবান্ ছিলেন, এবং তজ্জন্য একদিকে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্ত্তন ও অন্যদিকে বালক-বালিকাদিগের পাঠ্য পুস্তক রচনা করেন। আধুনিক বিজ্ঞানাদির জ্ঞানলাভ আবশ্যক, এবং সে সময়ে (এবং এখনও) ইংরেজী (বা অন্য কোন উন্নত পাশ্চাত্য ভাষা) না শিখিলে উহা অধিগম্য ছিল না ইহা জানিয়া তিনি যেমন স্বেচ্ছায় একদিকে ইংরেজী শিখিয়াছিলেন ও ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন (অন্য পাশ্চাত্য ভাষা শিক্ষা করা অপেক্ষা ইংরেজী শিক্ষাই সহজতর ছিল), তেমনি অন্য দিকে ভারতীয় অতুলনীয় পরাবিদ্যা যাহাতে লুপ্ত ও বিস্মৃত না হয়, পরন্তু উহার চর্চ্চা হয় তজ্জন্য বৈদিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন।

দেশের অর্থাৎ প্রধানতঃ সাধারণ লোকদের আর্থিক উন্নতির জন্যও তিনি সচেষ্ট ছিলেন। এইরূপে তিনি আধুনিক ভারতবর্ষের যুগপ্রবর্ত্তক ছিলেন।

তাঁহার মহত্ত্ব কেবল ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয়ই নহে; উহা সমুদয় পৃথিবীসংসৃষ্ট। কেননা, তিনি সমুদয় মানুষের রাষ্ট্রীয় ও আত্মিক স্বাধীনতার সমর্থক ছিলেন; বিশ্বমানবের কল্যাণের, ঐহিক, পারত্রিক সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণের আদর্শ তাঁহার প্রাণে আধুনিক কালে সর্ব্বপ্রথমে উদিত হয়, (পুরাকালেও আর কাহারও প্রাণে ঐরূপ সর্ব্বাঙ্গীণ আদর্শ উদ্ভাসিত হইয়াছিল কি না, জানি না) এবং সেই আদর্শকে তিনি বাস্তবে পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; তিনি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে, সকলের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা দ্বারা, মিলনের সত্যপথ আবিষ্কার করিয়াছিলেন; দেশে দেশে ও জাতিতে জাতিতে, মহাদেশে মহাদেশে, প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে, মিলনের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন; তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মনোরাজ্যের মধ্যে সেতু রচনা করিয়াছিলেন, যাহাতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে পরস্পর আদান-প্রদান, অধমর্ণ-উত্তমর্ণ বা ভিক্ষুক-দাতার মধ্যে আদান-প্রদানের মত না হইয়া, সমান-সমানের মধ্যে হইতে পারে; তিনি অতীতের আত্যন্তিক পারত্রিকতা (otherworldliness) ও বর্ত্তমানের ঐকান্তিক ঐহিকতার secularism-এর) মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান ও সেতুরচনা করিয়াছিলেন; এবং তিনি স্বদেশবাসীর ও স্বজাতির (হয়ত বা সকল মানবের) আত্মা (soul) এবং ধর্ম্মবুদ্ধিকে (conscience) সর্ব্বপ্রকার কৃত্রিম ও সংস্কারগত বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

তিনি কেবল পুরুষের হীনদশার বেদনা বোধ করিতেন না, নারীর দুর্গতিতেও তাঁহার হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছিল। নারীর দায়াধিকার ও নারীর সামাজিক স্বাধীনতার জন্য তিনি যাহা করিয়াছেন, ভারতবর্ষে আর কেহ তাহা অপেক্ষা অধিক কিছু করেন নাই। নারীর চরিত্র ও নারীর স্বভাবকে মিথ্যা কলঙ্ক হইতে মুক্ত করিবার জন্য তিনি যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, ভারতীয় বা অন্য দেশীয় কোন লেখকের লেখায় সেরূপ কিছু আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

হিমাচলের পাদদেশে দাঁড়াইয়া হিমাচলকে চেনা যায় না; কিছুদূর হইতে, উচ্চস্থানে দাঁড়াইয়া, হিমালয়কে দেখিলে উহার বিরাট্ মূর্ত্তি উপলব্ধি হয়। বড় একখানা ছবি দেখিতে হইলেও উহা হইতে কিছু দূরে সরিয়া দাঁড়াইতে হয়। বুদ্ধদেবের জন্মের আড়াই হাজার বৎসর পরে ভারতবর্ষ ও পাশ্চাত্ত্য জগৎ তাঁহাকে পুনরাবিষ্কার করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে সম্মান করিতে পারিয়াছে। রামমোহনকে কোনও মহাপুরুষের সহিত তুলনা না করিয়া বলিতে পারা যায় যে, তাঁহাকে চিনিতে যদি লোকের এক শত বৎসর অপেক্ষা বেশী সময় লাগে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তাঁহাকে বুঝিতে সময় লাগিবে।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮।

গ্রন্থ-পরিচয়

ছায়া মিছিল—শ্রীঅনীতা বসু। প্রকাশক: নলেজ হোম কলিকাতা-৬; মূল্য আড়াই টাকা মাত্র।

বাংলা সাহিত্যের অভূতপূর্ব বিস্তার ঘটেছে বিগত দশকে। স্বল্পখ্যাত বহু লেখক-লেখিকার রচনায় যে রসের আস্বাদন করেছি, তার স্বাদ সহজে ভোলবার নয়। কবিতা, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, কোথাও এর ব্যতিক্রম নেই।

এ কথা স্বীকার করা যেতে পারে যে, মহাকাব্যের যুগ অতিক্রান্ত। খণ্ডকাব্য, গীতিকবিতা এ যুগের কাছে মহত্তর আবেদন নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। তাই আজ ছোটগল্পেরও কদর বেড়েছে। মানুষ আজ শুক্তির মধ্যেকার মুক্তোটিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সেই সন্ধানী-মনের কাছে সাঁচ্চা যা, আসল যা তা সহজেই ধরা পড়ছে, তার কদর হচ্ছে। শিল্প-সাহিত্যের দরবারে আজ সমঝদার মানুষের অভাব নেই। তাই সাহিত্যিকের পথে স্বীকৃতি লাভ অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছে। খ্যাত-অখ্যাতের সীমারেখাটা ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হচ্ছে। আজকে একটা সুলক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। সেটা হ'ল সৃষ্টি-মূল্যে স্রষ্টাকে যাচাই করা। একে যুগলক্ষণ বলতে পারি।

তাই ত শ্রীমতী বসুর পক্ষে তাঁর এই ছোট গল্পগুচ্ছের জন্য সাধারণ্যে স্বীকৃতি পাওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছে। গল্পগুলি সুন্দর ও সরস; বাচনভঙ্গি সুনিপুণ; গল্পের ভাষা গভীর ব্যঞ্জনামণ্ডিত। সহজ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ, ক্লান্তি ও বেদনার অনবদ্য রেখাচিত্র এঁকেছেন গ্রন্থকর্ত্রী। আমরা এঁকে সাদর অভিনন্দন জানাচ্ছি। তাঁর সৃষ্টিনৈপুণ্যের পূর্ণতর প্রকাশ বাংলা সাহিত্যের পাঠক-পাঠিকারা অচিরেই পাবেন ব'লেই আমাদের বিশ্বাস।

প্রকাশক নলেজ হোম এই সুন্দর প্রকাশনার জন্য সকলের ধন্যবাদার্হ।

শ্রীসুধীরকুমার নন্দী

অনুরাগে রাঙা—জগদীশপ্রসাদ দাশ, সাহিত্যকেন্দ্র, এ-১৩১ কলেজ ষ্ট্রিট মার্কেট, কলিকাতা—১২। দাম ২·৫০ ন. প।

বিষয়বস্তুর দিক হইতে সেই নর-নারীর প্রেম ও মিলন হইলেও, গল্পটির পরিবেশ নূতনত্বের দাবি রাখে। বৈষ্ণব-পরিবারের দু'টি ছেলে-মেয়ে কৃষ্ণচরণে দেহমন সমর্পণ করায় তাহাদের পরস্পরের আকর্ষণও দেহাতীত প্রেমে রূপপরিগ্রহ করিতে চলিয়াছে। "মধুর এক সুখানুভূতিতে ভরে যাচ্ছে কমললতার সমস্ত দেহ। দৃষ্টিতে ঝরছে প্রেমময়ী রাধার অমৃত মাধুরী। সার্থক আজ কমললতার জীবন। সার্থক তার নবগোপালকে ভালবাসা!" লেখকের এই দু'টি কথায় চরিত্র দু'টি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

নবগোপালের ছিল সুকণ্ঠ। তাহার কণ্ঠে মধুর পদাবলী কীর্তন শুনিয়া কলিকাতায় এক ধনী পরিবার তাহার অতি দুঃখের দিনে তাহাকে নানা দিক দিয়া সাহায্য করেন। তাঁহারই চেষ্টায় নবগোপাল যশ-খ্যাতির সঙ্গে ঐশ্বর্যের অধিকারী হইল বটে, কিন্তু তাহার মন ভরিল কই? তাহার নিত্যপূজার ব্যাঘাত হইতে লাগিল। বিশেষ করিয়া, ধনীকন্যার প্রলোভনও তাহাকে দিব্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিতেছিল। নবগোপাল ইচ্ছা করিলে সেই ধনীকন্যাকে বিবাহ করিয়া অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হইতে পারিত; এইখানেই নবগোপালের অগ্নিপরীক্ষা সুরু হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল একদিন এই ধনী-পরিবারকে বিস্মিত করিয়া নবগোপাল গৃহে প্রত্যাবর্তন করিল। প্রকৃত বৈষ্ণবই পারে এই ত্যাগ করিতে। নিঃস্ব হইতে পারিয়া যেন সে আজ-বাঁচিয়া গেল।

লেখকের ইহাই বোধহয় প্রথম উপন্যাস। কিন্তু তাঁহার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ লক্ষ্য করিতেছি। প্রসাদগুণে সত্যই ইহা মধুর হইয়াছে।

গৌতম সেন

বাংলার নবজাগরণের কথা—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, বসুধারা প্রকাশনী, ৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য চার টাকা, পৃষ্ঠাসংখ্যা ২০৩।

ঊনবিংশ শতাব্দী বাঙ্গালীর পক্ষে বিশেষ গৌরবের কাল। ইংরেজের অধীনে থাকিলেও এই সময় বাঙ্গালী জাতির মধ্যে এক ভাবদ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। একদিকে পাশ্চাত্ত্যের প্রগতিশীল ভাবধারা ও অন্যদিকে সংস্কারের মোহ ও শাস্ত্রবিধির দৃঢ় বন্ধন। ইহার মধ্যে বাঙ্গালী জাতির মুক্তির আকাঙ্ক্ষা অধীর ও অশান্ত হইয়া উঠে। যুক্তিনিষ্ঠ চিন্তাভাবনা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৌরুষ-পাকতনা তাহাকে সংগ্রামের উল্লাস, উজ্জ্বল প্রাণাবেগ ও আত্মচেতনার স্ফূর্তিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। সেদিন বিদেশী শিক্ষা ও সভ্যতার মদির বাঙ্গালার মানস-শরীরে যে রসায়ণের কায করিয়াছিল তাহারই বিদ্যুৎ-স্পর্শে জাতীয়-জীবনে এক প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়। এই প্রতিক্রিয়ার ফলে ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারের কাযে বাঙ্গালী ব্রতী হইয়াছিল। ইহাই বাংলার নবযুগের নবধর্ম আন্দোলন বা 'রেণেসাঁস'। জাতীয়ত্বের বিকাশ ও তদনুবিদ্ধ প্রাণধর্মের প্রকাশ এই আন্দোলনের ফলে ঘটিয়াছিল। বিখ্যাত গবেষক শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল বাঙ্গালীর এই নবজাগৃতির ইতিহাস আলোচ্যমান গ্রন্থে পর্যালোচনা করিয়াছেন। প্রথমে তিনি 'রেণেসাঁস' কথাটির ইতিহাস-ভিত্তিক সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন। তারপর ইউরোপীয় 'রেণেসাঁসের' ওই সর্বব্যাপী পরিপূর্ণ রূপের নিরিখে গত শতকে বাংলা দেশে যে নবজাগৃতির আবির্ভাব ঘটে তাহার তিনি বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। লেখক মোটামুটি তিনটি সনের দিকে আমাদের দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করিয়াছেন যথা ১৭৭৩, ১৭৭৪ ও ১৭৮৪; ইহার কারণ ১৭৭৩ সনে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট রেগুলেটিং এ্যাক্ট প্রণয়ন করিয়া কোম্পানীর যথেচ্ছ শাসনকে নিয়মিত করিতে উদ্যোগী হন; ১৭৭৪ সনে যুগন্ধর পুরুষ রামমোহন রায়ের আবির্ভাব ঘটে এবং ১৭৮৪ সনে বাংলা দেশে এসিয়াটিক সোসাইটি স্থাপনের ফলে ভারতবর্ষে প্রাচ্য-সাহিত্য, দর্শন, শিল্প, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি অনুশীলনের পথ সুগম হয়।

বাংলায় 'রেণেসাঁসে'র ন্যায় যুগান্তকারী ঘটনাটি একদিনেই ঘটে নাই। নবজাগৃতির এই রূপটি সুস্পষ্ট হইতে সমগ্র শতাব্দী লাগিয়াছিল। ইহার পশ্চাতে ছিল নানা আন্দোলন, উৎসব-অনুষ্ঠান, সভা-সমিতি, অনুশীলন, পত্র-পত্রিকা ও প্রযত্ন। বাংলার নবজাগৃতির ইতিহাসে ধর্মসংস্কার ও সমাজ-সংস্কারের অবিসম্বাদিত নেতারূপে কেবল এদেশের মনীষিগণই নহেন—ইংরেজ মনীষিগণও যে দান রাখিয়া গিয়াছেন প্রবীণ গবেষক তাঁহাদের কথা স্মরণ করিয়া সত্যদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন।

পলিমৃত্তিকার পদাঙ্ক বেশিক্ষণ থাকে না। বাংলা পলিমৃত্তিকার দেশ বলিয়াই বোধহয় পূর্বসূরীর পূর্ব ঋণের কথা অল্পক্ষণেই বাঙ্গালী ভুলিয়া যায়। রামমোহন রায়, যিনি কেবল বাংলা ভাষাকেই গ্রানিড স্তরের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, এদেশের শিক্ষা, সমাজ, রাজনীতি, প্রাচীন শাস্ত্রালোচনার প্রতি দেশের উৎসাহ—প্রভৃতি ব্যাপারের পথিকৃৎ ছিলেন, নবযুগের বিষয় আলোচনা-প্রসঙ্গে লেখক তাঁহার কথা বিস্তৃত ভাবে বলিয়াছেন। যোগেশবাবু বাংলার নবজাগৃতির আলোচনা-প্রসঙ্গে আমাদের কয়েকটি ঐতিহাসিক ভ্রমেরও

নিরসন করিয়াছেন। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ ডিরোজিও যুগের তেমন স্থায়ী দান নাই বলিয়া মনে করেন। আবার কেহ কেহ ডিরোজিও যুগের উপরে অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করিতে গিয়া অন্যের উপর সুবিচার করিতে ভুলিয়া যান। লেখক এইরূপ ভ্রম সম্পর্কে আমাদের সতর্ক করিয়াছেন। ডিরোজিও-প্রদত্ত শিক্ষায় যুবছাত্রদল উৎসাহিত হইয়া যুক্তিনিষ্ঠ ভাবনা-কার্যে প্রতিফলিত করিতে অগ্রসর হন। ডিরোজিওর শিক্ষা বস্তুতঃ নাস্তিক্যবাদ-প্রসূত নহে। তাঁহার শিক্ষার মূলমন্ত্র ছিল যুক্তি।

দ্বিতীয় ঐতিহাসিক ভ্রম রাধাকান্ত দেব সম্বন্ধে। অতিরিক্ত রক্ষণশীল ছিলেন বলিয়া পরবর্তী কালে কেহ কেহ তাচ্ছিল্য ভরে তাঁহার নাম উল্লেখ করেন। লেখক বলিয়াছেন যে, বিগত ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসরে বাংলার সংস্কৃতি-সম্বন্ধে নূতন গবেষণার ফলে যে-সব তথ্য পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে রাজা রাধাকান্ত দেব গত শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইংরেজি শিক্ষা, জনশিক্ষা এবং স্ত্রীশিক্ষার প্রচেষ্টাগুলিতে এক বিরাট অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। লেখক আরও একটি বিষয়ের উপর সত্যের আলোক নিপতিত করিয়াছেন। বাংলার রেণেসাঁসের জন্য বাংলার বিপ্লববাদও কম কার্য করে নাই। বিপ্লববাদ বলিতে আমরা সন্ত্রাসবাদ মনে করি; কিন্তু ইহা যে এক মহান আদর্শরূপে আমাদের দেশে দেখা দিয়াছিল তাহা আমরা তলাইয়া বুঝি না। এই বিপ্লববাদের উদ্দেশ্য ছিল আত্মশক্তির উদ্বোধন ও স্বদেশের মুক্তিসাধন।

যোগেশবাবু আরও দুইটি বিশেষ বিষয়ের উপর আলোকপাত করিয়া আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তন্মধ্যে একটি বঙ্গের নবজাগৃতিতে নারী-সমাজের কৃতিত্ব কতখানি এবং দ্বিতীয়টি হইল ঐ নবজাগৃতির প্রভাব মুসলমান-সমাজে কতখানি কার্যকরী হইয়াছিল। এদেশের নারী-সমাজ বরাবরই লোক-শিক্ষা ও লোক-সংস্কৃতির মধ্য দিয়া অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া আসিতেছিল সত্য কথা, কিন্তু তাঁহাদের ব্যক্তি-মানসকে যুগোপযোগী করিবার জন্য সর্বাঙ্গীণ বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। এই উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় নারী-সমাজ বহু মনীষী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও পত্র-পত্রিকার সহায়তা পাইয়াছিলেন। গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, রাজা রাধাকান্ত দেব, রামমোহন, বেথুন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ব্রাহ্মনেতাগণের নাম এই প্রসঙ্গে প্রথমেই স্মরণে আসে। গৌরমোহন 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক পুস্তক' রচনা করেন। এই পুস্তক রচনার মূলে ছিলেন রাজা রাধাকান্ত দেব। তাঁহার সম্বন্ধে পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ইহার পর রামমোহন নারী-পুরুষের মৌলিক অধিকার স্বীকার করেন। স্ত্রীশিক্ষার জন্য নারী বিদ্যালয় স্থাপন করেন বেথুন। বিদ্যাসাগর মহাশয়-প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়গুলিও জন-সমাদর লাভ করে। উত্তরপাড়া হিতকারী সভা ১৮৬৪ সন অবধি রাঢ়-অঞ্চলে নূতন বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া ও পুরাতন বালিকা বিদ্যালয়গুলিকে নানাভাবে উৎসাহ দিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় স্ত্রীশিক্ষার সহায়তা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মনেতাগণও 'অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার' অভিনব আয়োজনে রত হন। ব্রাহ্মযুবকগণ 'বামাবোধিনী' সভা প্রতিষ্ঠার দ্বারা ও 'বামাবোধিনী' পত্রিকার প্রচার দ্বারা বিবিধ উপায়ে স্ত্রীজাতির মধ্যে জ্ঞান-বিস্তারে ব্রতী হন। এই সমস্ত আয়োজনের সমকালে কোন কোন বঙ্গ-মহিলা কবিতা-চর্চাও করিতেন। নবজাগৃতির ইতিহাসে ইহাও বিশেষভাবে স্মরণীয়। মুসলমানগণ ভিন্ন ধর্মাশ্রয়ী হইলেও বাংলা দেশের জলবায়ু, মাটির গুণ ও হিন্দুর সহিত সহাবস্থানের ফলে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে একটি সহজাত সংস্কৃতি ও সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বঙ্গের নবজাগৃতির প্রভাব তাঁহাদের সমাজে কার্যকরী হয় নাই কেন ইহার উত্তরে একটি ঐতিহাসিক সত্যকথা যোগেশবাবু উচ্চারণ করিয়াছেন—'ভিত্তি শিথিল হইলে ইমারত টেঁকসই হয় না। যেখানে ভিত্তিই নাই সেখানে 'রেণেসাঁস' আসিবে কি করিয়া? জাতির চিরন্তন সম্পদ সংরক্ষণ এবং নূতন সম্পদ আহরণ ইহাই 'রেণেসাঁসের' ধর্ম। মুসলমান সমাজের কি প্রাচীন কি আধুনিক নেতৃবৃন্দ এই সত্যকে অস্বীকার করিয়া চলিয়াছিলেন। আর অস্বীকারকে দৃঢ়ীকরণ করে ব্রিটিশ শাসননীতি।'

আজকাল সংস্কৃত ভাষাকে 'মৃতভাষা' বা dead language বলা হইলেও বাংলার নবজাগৃতির ইতিহাসে সংস্কৃত ভাষানুশীলনের দানও অবিস্মরণীয়। লেখকের সিদ্ধান্ত এই যে, পাশ্চাত্য-প্রভাবে যে 'রেণেসাঁস' জাগিয়াছিল তাহা ছিল বহির্মুখী; সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপক অনুশীলনের ফলে তাহা হইতে থাকে অন্তর্মুখী। বাংলার নবজাগরণের ইতিহাস আলোচনাকারীদের এই উক্তি নিশ্চয়ই ভাবিয়া দেখিবার মত। বস্তুতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল সংস্কৃত সাহিত্য হইতে মূল্যবান রত্নরাজি উদ্ধার বা আবিষ্কার। এতদ্ব্যতীত সংস্কৃত শিক্ষার ফলে উপনিষদ প্রভৃতি হইতে ধর্মবিষয়ে উচ্চতম চিন্তার সূত্র ধরিয়া অগ্রসর হইয়া আমরা ক্রমে আত্মস্থ হইতে থাকি। ইহাতে ভারতাত্মার পূর্ণ পরিচয়ও আমাদের নিকট ফুটিতে থাকে। অতএব লেখকের সিদ্ধান্ত যথার্থ।

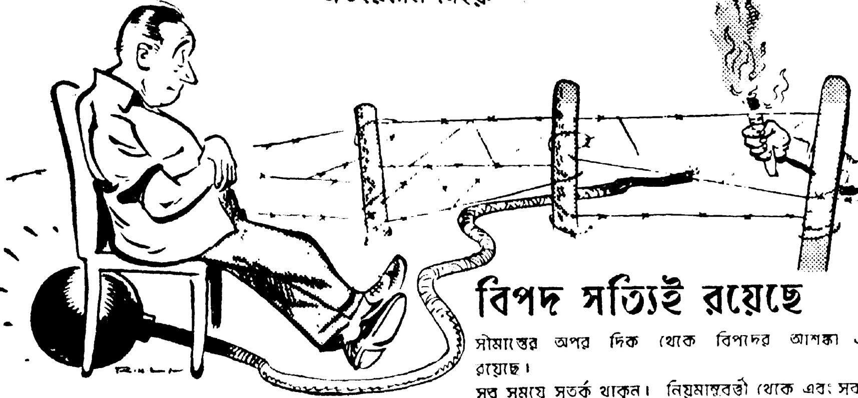
যোগেশবাবুর গ্রন্থখানি কেবল যে তথ্য হিসাবেই নূতন আলোকপাত করিবে তাহা নহে, জাতীয়তার আদর্শেও ইহা আমাদের উদ্বোধিত করিবে। বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার দুর্গম ক্ষেত্র হইতে তিনি যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন সেগুলি অন্যের 'হাত-ফেরতা' বা Second hand নহে। ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ ও সাহিত্য লইয়া যাঁহারা গবেষণা করিতেছেন এবং ভবিষ্যতে করিবেন—তাঁহাদের নিকট আলোচ্যমান গ্রন্থখানি অপরিহার্য বলিয়া মনে করি। গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি। মুদ্রণ ও বাঁধাই বিশেষ রোচনীয়।

শ্রীঅমিয়কৃষ্ণ রায়চৌধুরী (অধ্যাপক)

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—কল্যাণ দাশগুপ্ত, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৭৭।২।১ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

সূচীপত্র—আষাঢ়, ১৩৭১

সূচীপত্র—আষাঢ়, ১৩৭১





সূচীপত্র—আষাঢ়, ১৩৭১

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৪শ ভাগ
১ম খণ্ড

তৃতীয় সংখ্যা
আষাঢ়, ১৩৭১

বিবিধ প্রসঙ্গ

কালোবাজার, অনাচার ও দুর্নীতির উৎস

খবরের কাগজে দেখা যায় যে, "কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলে" ন্যায্যমূল্যের দোকানগুলিতে চাউল ও গম বিক্রয় সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য এবং "কালোবাজারী রোধের" উদ্দেশ্যে "পুলিস ও খাদ্য দপ্তর এতদিনে এক ব্যাপক ও যুক্ত পরিকল্পনা" গ্রহণ করিয়াছে। পুলিসের দিক হইতে "এনফোর্সমেণ্ট ব্রাঞ্চ"কে আরও শক্তিশালী করার জন্য গোয়েন্দা দপ্তরের একজন বিশেষ কর্ম্মঠ অফিসারকে ঐ বিভাগে দেওয়া হইয়াছে খাদ্যের চোরাকারবার সম্পর্কে গোপন তথ্য সংগ্রহের জন্য। সেই সঙ্গে ভুয়া কার্ডের বিরুদ্ধেও অভিযান চলিবে।

ব্যবস্থা ভাল—অবশ্য এখানেও "ফলেন পরিচীয়তে" বলা উচিত। কেননা এ সকল ব্যবস্থাই উপর উপর করা হইয়াছে। এই যে, কালোবাজার, মুনাফাবাজী অন্যায় ও অকারণ মূল্যবৃদ্ধি, ট্যাক্স ফাঁকি, সরকারী কর্ম্মচারীদের ঘুস দেওয়া ইত্যাদি এই সকল দুর্নীতি ও অনাচার চালাইতেছে একদল প্রচুর বিত্তশালী লোক, যারা অসৎ উপায়ে অর্জ্জিত টাকার জোরে দেশের শাসনতন্ত্রের অধিকারীদের বশ করিয়া রাখিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে লক্ষ্ণৌতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ কংগ্রেস কর্ম্মীদের এক সভায় কিছু কঠোর সত্যসমন্বিত এক ভাষণে এই কথাই স্পষ্ট ভাষায় বলেন। তিনি বলেন, পুঁজিপতিরাই আজ কংগ্রেসে প্রভুত্ব করিতেছেন এবং ইহাই বর্ত্তমান কংগ্রেসের প্রকৃত অবস্থা।

কংগ্রেস নেতা শ্রীগোবিন্দ সহায়ের বাসভবনে এই বৈঠক বসিয়াছিল এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নন্দ প্রায় ত্রিশ মিনিট অতি খোলাখুলিভাবে বক্তৃতা করেন। তিনি প্রকাশ্যে বলেন, এক পুঁজিপতি তাঁহাকে জানাইয়াছেন যে, সংসদের পঁয়ত্রিশ জন সভ্য তাঁহার কথায় ওঠেন-বসেন। এবং তিনি জানিতে পারিয়াছেন যে, কয়েকটি রাজ্যের সাম্প্রতিক সাংগঠনিক নির্ব্বাচনে পুঁজিপতিদের নিকট হইতে লওয়া অর্থ ব্যয় করা হইয়াছিল।

শ্রীনন্দ স্পষ্ট ভাষায় বলেন যে, কংগ্রেস সম্পর্কে সাধারণ লোকের বিতৃষ্ণা বর্ত্তমানে খুবই বেশী। সেই সঙ্গে তিনি কংগ্রেসীদের দোষ দেখাইয়া বলেন যে, কংগ্রেসের আদর্শ ও লক্ষ্যসাধনের জন্য কাজ না করিয়া সরকারী মহলে ও দলের মধ্যে ক্ষমতালাভের জন্য পরস্পরের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে ইঁহারা ব্যস্ত এবং সেজন্য তিনি তাঁদের তিরস্কার করেন।

যে ধরনের পুঁজিবাদ এদেশে দুর্নীতি দুষ্কৃতি ও অনাচারের প্লাবন আনিয়াছে তাহার মূলে একদিকে জুয়াখেলা—অর্থাৎ ফাটকাবাজী ইত্যাদি—ও অন্যদিকে চুরি

ও ফাঁকি। ব্যবসা-বাণিজ্যে বা শিল্পে আজ যে সততা বলিয়া বস্তু প্রায় উধাও হইয়া গিয়াছে তাহার কারণ সেখানে প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের জুয়াড়ি ও ফেরেব্‌বাজদিগের উত্তরাধিকারী ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মুনাফাবাজী, কালোবাজারী ও ট্যাক্স ফাঁকিতে সফলকাম একদল পুঁজিপতি প্রায় একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে। ইহাদের কার্য্যপন্থার বীজমন্ত্রে ফাঁকি, মেকি ও ভেজাল গ্রথিত আছে এবং ইহাদের চরিত্রে বা দেহমনপ্রাণে মনুষ্যত্ব বা মানবত্বের কোনও আদর্শবাদ বা ধর্ম্মজ্ঞানের লেশমাত্র নাই—আছে শুধু অতৃপ্ত ও অতল অর্থলালসা। কংগ্রেস পড়িয়াছে ইহাদের খপ্পরে সেইদিন, দেশের শাসনতন্ত্রে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যেদিন কংগ্রেসের প্রধানগণ ইহাদের কাছে হাত পাতিয়াছিলেন। ফলে এই দল এখন কংগ্রেসে প্রভুত্ব করিতেছে।

এই প্রভুত্বের ফলে কংগ্রেস দূষিত, শাসনতন্ত্র কলুষিত এবং দেশে অনাচার ও দুর্নীতির প্লাবন বহিতেছে। দেশের সাধারণ জনের মনেও নীতিজ্ঞান সম্পর্কে বিকার ও কংগ্রেস সম্পর্কে ধিক্কার আসিয়াছে এই কারণেই। সাধারণ জন তাহার সহজ বিচারে চর্ম্মচক্ষু কর্ণের সাহায্যে দেখিতেছে যে, চতুর্দ্দিকেই ধর্ম্মের ও সততার পরাজয়। প্রতিপদেই তাহাকে প্রশ্রয় দিতে হইতেছে ফাঁকি, জুয়াচুরি ভেজাল ও মুনাফাবাজীকে। সর্ব্বত্রই দুর্নীতির জয়, সুতরাং রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে যে তাহার প্রবল বিতৃষ্ণা দেখা দিয়াছে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? এদিকে ভুয়া গান্ধীবাদ, ওদিকে মেকি মার্ক্সবাদ, সে যায় কোথায়?

শ্রীগুলজারীলাল নন্দ যেদিন লক্ষ্ণৌতে সোজা সরল ভাষায় কংগ্রেস কর্ম্মীদের বুঝাইতেছিলেন যে কোন ছিদ্রপথে কংগ্রেসে পাপের বেনোজল প্রবেশ করিয়াছে, সেইদিনই নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী পার্টির এক সাব-কমিটি দ্রব্যমূল্য সম্বন্ধে নানাপ্রকার ব্যবস্থার সুপারিশ করিয়াছেন। তাহার মধ্যে ছিল প্রথম পর্য্যায়ে সীমাবদ্ধ অঞ্চলে, নির্দিষ্ট ধরনের খাদ্যশস্য লইয়া পাইকারী ও খুচরা ক্রয়-বিক্রয় রাষ্ট্রায়ত্ত করার, মজুত ও মুনাফাশিকারীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা, যেখানে সঙ্গত মনে হইবে সেখানে মজুত খাদ্যশস্য আটক ও মজুতদারদের কঠোর শাস্তি এবং "লাভজনক" মূল্য দিয়া চাষীদের নিকট হইতে খাদ্যশস্য ক্রয় করিয়া মজুত ভাণ্ডার গঠন এবং প্রয়োজন অনুসারে ন্যায্যমূল্যের দোকান মাধ্যমে উহা বণ্টন, ইত্যাদি।

সুপারিশগুলি ভাল কিন্তু উহা কোন্ পথে ও কিভাবে চলে তাহাই দ্রষ্টব্য। তবে সংসদের কংগ্রেসী দলে চৈতন্যের উদয় হইয়াছে এটাও ভাল কথা। যদিও পাপের উৎস কোথায় সে বিষয়ে শ্রীনন্দের মত খোলাখুলি বিচার বা মন্তব্য করিবার সৎসাহস তাঁহাদের মনে এখনও আসে নাই। অন্যদিকে সংসদের সবল ও সক্রিয় সমর্থন ভিন্ন শ্রীনন্দের দুর্নীতি বহিষ্কারের অভিযান সফল হইতে পারে না।

পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রতাপসিং কায়রণ দাশ কমিশনের রায়ে "আপন ও আপনজনের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অপব্যবহার" দোষে অপরাধী সাব্যস্ত হইয়াছেন। এই কমিশনের মতে সর্দ্দার প্রতাপসিং কায়রণের আচরণ মুখ্যমন্ত্রীর ন্যায় উচ্চ ও দায়িত্বপূর্ণ পদাধিকারীর পক্ষে আদৌ যথাযথ বা শোভন হয় নাই। সর্দ্দার প্রতাপসিং কায়রণের কার্য্যভার হইতে "অব্যাহতি" দান দাশ কমিশনের রায় প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হইয়াছে।

পরে কি হয় তাহা দ্রষ্টব্য, কিন্তু এতদূর যে কংগ্রেস অগ্রসর হইতে পারিয়াছে তাহাও শুভ লক্ষণ। ইতিপূর্ব্বে বহু ক্ষেত্রে ক্ষমতার অপব্যবহার হইয়া গিয়াছে এবং হয় সেসব "ধামাচাপা" দেওয়া হইয়াছে নয়ত লোকদেখানো ভাবে দোষীকে সরাইয়া পর্দার আড়ালে পাপ লুকাইয়া রাখার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

কালোবাজার দমনের ব্যাপক ব্যবস্থা কবে কোথায় কিভাবে করা হইবে সে সবই এখন জল্পনা-কল্পনার সামিল। সম্প্রতি এ প্রদেশে কলিকাতায় ও শিল্পাঞ্চলে খাদ্যশস্যে কালোবাজার ও অসৎ উপায়ে অভাব-অনাটন সৃষ্টির ফলে বিষম খাদ্য-সঙ্কটের অবস্থা দেখা দিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই পরিস্থিতির নিরসনের জন্য এই অঞ্চলের ৬৫ লক্ষ লোকের রেশন সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন। "এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলগুলিতে রেশন বিক্রয়, ভিড় নিয়ন্ত্রণ ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য কলিকাতা ও সংশ্লিষ্ট জেলাগুলিতে ব্যাপক পুলিসী ব্যবস্থা করা হইয়াছে" —এরূপ সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে। আনন্দবাজার পত্রিকা জানাইয়াছেন যে:

"রাজ্য খাদ্য দপ্তর ৬৫ লক্ষ লোককে রেশন দেওয়ার যে গুরুদায়িত্ব কাঁধে লইয়াছেন তাহা যাহাতে সুষ্ঠুভাবে পালিত হয়, সেজন্য তাঁহারা যথাসম্ভব ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। সোমবার খাদ্য দপ্তরের কর্ম্মচারীরা মহানগর এবং বৃহত্তর কলিকাতা অঞ্চলে রেশনের দোকানে উপস্থিত থাকিয়া যাহাতে রেশন বণ্টন-পর্ব্ব নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখিবেন। বিভিন্ন রেশনের দোকানে কার্ড অনুসারে চাল-গম সরবরাহের ব্যাপক ব্যবস্থা লওয়া হইয়াছে। তবে খাদ্য দপ্তর রেশন-গ্রহীতাদের একসঙ্গে তাড়াহুড়া করিয়া রেশন না লওয়ার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন, রেশন সপ্তাহের যে কোন দিন লওয়া যাইবে।"

খাদ্য দপ্তর এই কাজে কতটা সাফল্য দেখাইতে পারিবেন সে কথা এখন নির্ভর করে জনসাধারণ, পুলিস ও রেশন দোকানদারের সহযোগিতার উপর। রাজ্য সরকারের এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু এই সাময়িক প্রতিকার ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে দেশের জনসাধারণের কুটিলতম শত্রু যাহারা সেই মুনাফাবাজ, কালোবাজারী, পুঁজিপতিদের দমন ও উচ্ছেদ ভিন্ন কোনও স্থায়ী সুফল পাওয়া সম্ভব নয়, একথা যেন তাঁহারা ভুলিয়া না যান।

অন্যদিকে নয়াদিল্লীতে খাদ্যমন্ত্রী খাদ্যশস্য ব্যবসায়ীগণের সহিত যে বোঝাপড়া করার চেষ্টা করিয়াছেন সে সম্পর্কে একটি সংবাদ উল্লেখযোগ্য। সেই সংবাদটি এইরূপ :

"নয়াদিল্লী, ২১শে জুন—খাদ্যশস্য ব্যবসায়ী সমিতি-সঙ্ঘ খাদ্যশস্য ব্যবসায়ের জাতীয়করণের কথাবার্ত্তা সম্পর্কে খোলাখুলি আপত্তি জানাইয়াছেন। তাঁহারা কেন্দ্রীয় সরকারকে এ বিষয়ে তাঁহাদের সুচিন্তিত মত জানাইয়া বলিয়াছেন যে, এই ব্যবসায় জাতীয়করণের ফলে দাম কমিবে না, নির্দ্দিষ্ট স্থানে স্থির থাকিবে না এবং খাদ্যশস্য সুষ্ঠুভাবে বন্টন করাও যাইবে না।"

অস্যার্থ : যতদিন এই মহাশয় ব্যক্তিদের ক্ষমতা থাকিবে—অর্থাৎ অসৎ উপায়ে অর্জ্জিত টাকায় কার্য্যোদ্ধার চলিবে, ততদিন খাদ্যশস্যের দাম ও বন্টন এবং তার আগে সংগ্রহের সকল ব্যবস্থায় ইঁহারা বাধাসৃষ্টি করিবেন। কেন্দ্রীয় সরকারের এখন অস্ত্র গ্রহণের সময় আসিয়াছে।

বলাবাহুল্য এই অস্ত্র গ্রহণ—অর্থাৎ দেশের উন্নতি-প্রগতির সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল বাধাবিঘ্ন সৃষ্টির মূল কারণ যাহারা, তাহাদের উচ্ছেদের জন্য অস্ত্র গ্রহণ অতি দুরূহ ব্যাপার দাঁড়াইয়াছে এই দীর্ঘ সতের বৎসরের "গয়ংগচ্ছ" পন্থা অনুসরণের ফলে। এখন পাপ প্রবেশ করিয়াছে মন্ত্রীসভা ও শাসনতন্ত্র এবং সংসদ ও বিধানমণ্ডলের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। সুতরাং অস্ত্র গ্রহণের পূর্ব্বে অস্ত্র নির্ম্মাণ ও অস্ত্রচালন ব্যবস্থার সময় হইতে প্রচণ্ড বাধার সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সে কারণে দমিলে চলিবে না, কেননা এই ব্যাপক দুর্নীতি দমন বিনা এই রাষ্ট্রের পতন সুনিশ্চিত।

প্রশ্ন এই যে, প্রতিকারের পথ কি আছে। পথ আছে নিশ্চয়, যদি দেশের সকল হিতকামী সৎলোককে কঠোর পরীক্ষায় রাজী ও সমর্থ করা যায়। এবং তাহা সম্ভব হইবে যদি কয়েকজন শক্তিশালী ও দৃঢ়চিত্ত লোক এই কাজে আত্মনিবেদন করিতে প্রস্তুত থাকেন। কেননা, প্রশ্নের সমাধান যথার্থ নেতৃত্বের দ্বারাই সম্ভব। এবং সেই নেতৃত্ব শুধু তাঁহাদের দ্বারা সম্ভব যাহাদের দেহমনপ্রাণ অর্থ বা ক্ষমতা লালসায় আচ্ছন্ন নয়। "সদাচার সমিতি" ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব বা নেতৃত্বে যদি ভণ্ড বা কপট লোককে নিয়োগ করা হয় তবে সে ঐ প্রতিষ্ঠানকে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই শুধু ব্যবহার করিবে, এই স্বয়ংসিদ্ধ সত্যকে উপেক্ষা করা যে মারাত্মক ভুল একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

আমরা বিশ্বাস করি যে, দেশের অধিকাংশ লোক এখনও সততার পথেই চলিতে চাহে। তাহারা বিভ্রান্ত হইতেছে কুটিলমনা স্বার্থসর্ব্বস্ব ভুয়া নেতার পরামর্শে এবং তাহাদের সৎপথ হইতে পদস্খলন হইতেছে নৈরাশ্যে, অভাবে ও দুর্নীতিপরায়ণ প্রবল লোকের অত্যাচারে। সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিকার করাও সাধারণ লোকের ক্ষমতার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে অসৎ বা অপদার্থ সরকারী কর্ম্মচারীদের দুর্নীতিপরায়ণতার প্রকোপে ও নিদারুণ কর্ত্তব্যে অবহেলার কারণে। এই লোকেদের পিছনে আছে রাষ্ট্রনৈতিক দলের পাণ্ডারা, যাহাদের কাজে কর্ম্মে ও সাধারণ প্রবৃত্তিতে নীতি-জ্ঞানের লেশমাত্র নাই। দেশের অবস্থা উন্নতির পথে লইতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে প্রয়োজন এই দেশদ্রোহী কপট দেশসেবকদের বহিষ্কার। সুতরাং কার্য্যারম্ভের প্রথম পর্য্যায়েই কংগ্রেসকে পাপমুক্ত করা প্রয়োজন। অথচ যখন

সে কথার অবতারণা করেছিলেন ভূতপূর্ব্ব কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীচিন্তামন দেশমুখ তখন এক কংগ্রেসী বিদগ্ধচূড়ামণি বলেছিলেন যে, শ্রীদেশমুখের প্রস্তাব ভারতের সংবিধানের বিরুদ্ধে যাইবে। বলিহারি স্থায়জ্ঞান ও নিষ্ঠা!

যদি সংবিধানে বাধা থাকে তবে তাহার আমূল সংস্কার প্রয়োজন। দেশ ডুবিবে ও দেশের লোক অভাবে অনাটনে জর্জ্জর হইয়াও এই দুরাচার রক্তশোষকদের দণ্ডিত করিতে পারিবে না—এই যদি সংবিধানে থাকে তবে সে সংবিধান ঢালিয়া সাজিতে হইবেই।

শ্রীগুলজারীলাল নন্দ অতি কঠোর ব্রত লইয়াছেন। আমরা সেজন্য তাঁহাকে অভিনন্দন জানাই। সেইসঙ্গে বলি যে, এই ব্রত উদ্‌যাপনে অনেক কিছুই বলি দিতে হইবে, অনেক দিনের সাথী বহু লোককেই অপদস্থ—এমনকি দণ্ডিত করিতে হইবে। এ ছাড়া পথ নাই।

পশ্চিম বাংলায় সরকারী মহল এখন খাদ্যসমস্যা সমাধানে কিছু তৎপরতা দেখাইতেছেন। তবে এ-রাজ্যের খাদ্যসমস্যা বড়ই জটিল, কেননা খাদ্যের প্রায় প্রতিটি পদেই এই রাজ্য পরমুখাপেক্ষী এবং বাঙ্গালীর খাওয়া-দাওয়ায় অন্য প্রদেশীয় লোক অপেক্ষা অনেক কিছুই বেশী উপকরণ প্রয়োজন। অবশ্য খাদ্য-মাত্রেরই মূল্য নিয়ন্ত্রিত হয় এই প্রদেশে চাউলের দামের অনুপাতে। সে কারণে কর্তৃপক্ষের এদিকে কড়া নজর দেওয়া খুবই সমীচীন হইয়াছে মনে হয়।

এই সরকারী অভিযানে নানা অপ্রত্যাশিত ফলাফল দেখা দিয়াছে, অন্ততঃ সংবাদপত্রের মন্তব্যে তাই মনে হয়। ভুয়া রেশন কার্ডের বিরুদ্ধে অভিযান তিন সপ্তাহকাল চলিবামাত্রই প্রায় পৌনে তিন লক্ষ ভুয়া কার্ড বাতিল হইয়াছে। শোনা যায় বস্তী অঞ্চলে ও অবাঙালী অঞ্চলেই এই ভুয়া কার্ডের ছড়াছড়ি ধরা পড়িয়াছে। একটি সংবাদপত্র আবার খবর দিয়াছেন যে, ভুয়া রেশন কার্ডের সঙ্গে ভুয়া দোকানও নাকি আছে। অন্ততঃ খাদ্য দপ্তরের তালিকা ও পুলিসের খোঁজে প্রাপ্ত দোকানের তালিকায় বিশেষ গরমিল নাকি দেখা গিয়াছে। যদি ইহা সত্য হয় তবে এবিষয়ে বিশেষভাবে তদারক করা প্রয়োজন।

খাদ্যশস্যের সঙ্গে সঙ্গে সমানভাবে অন্য অতি-প্রয়োজনীয় খাদ্যবস্তুর দিকেও কড়া নজর সমানে রাখা প্রয়োজন। তেল, ডাল ও মাছ লইয়াও কালোবাজার চলিতেছিল এবং এখনও সেখানে নানাপ্রকারে মুনাফাবাজী ও ফাঁকিঝুঁকি চালাইবার প্রবল চেষ্টা চলিতেছে। আশা করা যায় যে, এই দিকেও সরকারী নজর সমানে কড়া থাকিবে। সংবাদপত্রে শোনা যায় বাজারে প্রচুর ইলিশ মৎস্য আসিয়াছে—দাম কিন্তু সমানেই চড়া এবং খরিদ্দারের সামনে মাছের চালান চাহিদার সমতুল্য কোনদিনই থাকিতেছে না। সরিষার তৈল লইয়া নানা প্রকার খেলা চলিতেছে এবং ভেজাল তেলের বিক্রয় ক্রমেই বাড়িয়া চলিতেছে—অবশ্য কালোবাজারে, খোলাবাজারে তৈল নাই বলিলেও চলে। এখানে খুচরা বিক্রেতা দোষ দেয় তেল কলওয়ালাদের। তাহারা যাহাতে নিজেরাই খুচরার দরে তৈল বিক্রয় করিয়া বেশী লাভ করিতে পারে সেই চেষ্টায় তাহারা সরবরাহ "নিয়ন্ত্রণ" করিতেছে। তেলকলওয়ালারা বলিতেছে যে এই অভাবের জন্য দায়ী একদিকে সরকারের "অন্যায্য আইন" এবং অপরদিকে পাইকারী সরিষা ব্যবসায়ীদের ষড়যন্ত্র। বলাবাহুল্য এই সরিষার তৈলের ব্যাপারে এই তিন স্তরেই সমান চেষ্টা চলিতেছে অসৎ ও অন্যান্য উপায়ে মুনাফাবাজীর ও কালোবাজার সৃষ্টির।

এই কালোবাজার ও মুনাফাবাজী সমানে ও সহজে চলিতেছে আমাদের দেশে এই জাতীয় সমাজদ্রোহী কাজের নিরোধে সেরূপ কঠোর ব্যবস্থা নাই বলিয়াই। খুচরা বিক্রেতা বা পাইকারের দোষ ষোল আনা প্রমাণিত হইলেও, সদাশয় সরকারের ব্যবস্থায় তাহার ২০০৲ বা বড়জোর ৫০০৲ জরিমানা হয়। যে ব্যক্তির ঐরূপ অসৎ উপায়ে দৈনিক "বাড়তি লাভ" ৫০।৬০ হইতে ২০০।৩০০ টাকা, তাহার নিকট ইহা ত তুচ্ছ ব্যাপার। গত মহাযুদ্ধের সময় এক পাঞ্জাবী ম্যাজিষ্ট্রেট এ-জাতীয় বে-আইনী কাজের বিচারে বিশেষ ক্ষমতাযুক্ত হইয়া নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি ২০০।৫০০ টাকার বদলে ৫০।৬০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড ও অন্যথায় দীর্ঘদিনের জেল ব্যবস্থা করায় এই জাতীয় প্রবঞ্চক ও তস্করদিগের কিছু হুঁশ হয়। তবে সেটা মুসলিমলীগের শাসনের আমল, অর্থাৎ অঢেল ঘুষ দেওয়া লওয়ার যুগ ছিল। সুতরাং উচ্চপদস্থ পীরের দরগায় যথাযথ সিন্নী দেওয়ায় ম্যাজিষ্ট্রেট বদলী হইলেন এবং বর্ত্তমান বাটপার-

গণের পূর্ব্বপুরুষগণ হাঁক ছাড়েন। মুখ্যমন্ত্রী দিল্লীর সলা-পরামর্শের মধ্যে এবিষয়ে কিছু চেষ্টা করিবেন কি?

আমাদের সংবিধান

আমাদের সংবিধান জগতের অত্যাশ্চর্য্য কীর্ত্তির অন্যতম!

যাহারা ইহা রচনা করেন তাঁহারা আইনজ্ঞ সজ্জন ছিলেন সন্দেহ নাই। তবে ন্যায়ধর্ম্ম বলিতে সাধারণ জন—যাহাদের রক্ষণ ও পোষণের জন্য এই বস্তুর সৃষ্টি—যাহা বুঝে, সে বিষয়ে তাঁহাদের কোনও বিশেষ ভাবনা-চিন্তা ছিল বলিয়া মনে হয় না। মূল খসড়া তৈয়ারীর পর দীর্ঘদিন ইহার বিচার ও আলোচনা চলে সংবিধান সভায়, যেখানে সাধারণ জনের প্রতিনিধি, মুখপাত্র ও অভিভাবকরূপে উপস্থিত ছিলেন প্রধানতঃ তাঁহারাই, যাহারা ব্রিটিশ আমলের নির্ব্বাচনে ও মনোনয়নে সেখানে আসন পাইয়াছিলেন। এবং তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন সকল প্রকার মনুষ্যই—শুধু ছিলেন না কেহ যিনি বা যাহারা এই অপরূপ "দুমুখো শাখের করাত" কিভাবে দেশের দরিদ্র সাধারণ জনের স্বার্থনাশ করিতে পারিবে, সেকথা বুঝিতে বা ভাবিতে কিছুমাত্র চেষ্টা করিয়াছিলেন।

দুষ্ট লোকে বলে আইনজ্ঞ লোকে এই সংবিধান রচনা করিয়াছিল যাহাতে ব্যবহারাজীব ও আইনব্যবসায়ীর অর্থাগমের পথ চতুর্দ্দিকে খুলিয়া যায়। কার্য্যতঃ দেখা যায় যে, অন্যায়ের প্রতিকারলাভ সাধারণ জনের সাধ্যের অতীত। অন্যদিকে দেখা যায় দুষ্কৃতকারী যদি টাকার ব্যবস্থা রাখে তবে তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করার উপায় প্রায় নাই, যদি সে আইনের ফাঁকের উপর লক্ষ্য রাখিয়া কু'কাজ চালায়। সরকারী কর্ম্মচারী অসহায় লোকের উপর অত্যাচার চালাইয়া নিজ কর্ত্তব্যে নিদারুণ অবহেলা করিয়াও তাঁহাতে ঘুষ লইয়া নির্ব্বিবাদে বিরাজ করে। হাতে-নাতে ধরা পড়িলেও অসংখ্য সংবিধান অনুযায়ী পলায়নের বা পরিত্রাণের সুড়ঙ্গ-পথ আছে, প্রয়োজন শুধু কৌশলী কৌঁসুলি। সুতরাং ঘুষের পথে সকল দুষ্কৃতির নিস্তার। এ যেন "পরিত্রাণায় দুষ্কৃতাম বিনাশায় চ সাধুনাম" সংবিধানের আবির্ভাব!

সমাজদ্রোহী বা সাধারণ দুষ্কৃতকারীদের সম্পর্কে এই সংবিধান রচনাকারীদের মাথাব্যথা ছিল না সেকথা আমরা বুঝিতে পারি, কেননা এই সমাজদ্রোহীর দল তাঁহাদের কোনও অপকার ত করিতই না বরঞ্চ খোসামোদ—এমন কি পদলেহন পর্য্যন্ত করিত, যেমন তাঁহারা এখনও করে মন্ত্রীদের ও শাসনতন্ত্রের উচ্চ অধিকারীদের। কিন্তু দেশদ্রোহী লোকে যে দেশরক্ষার ব্যবস্থা বানচাল করিয়া দেশ ও জাতিকে বিপন্ন করিতে পারে, একথাও কি তাঁহাদের চিন্তার বাহিরে ছিল?

চীন আমাদের প্রবল শত্রু এবং সে বিশ্বাসঘাতক ও কুটিল চক্রান্তকারীরূপেই এখন পরিচিত। অথচ তাহার টাকায়, ভারতে ধ্বংসাত্মক কাজ চালাইবার জন্য এদেশে টাকা আসিতেছে নানা পথে। যেখানে ধরা পড়ে সেখানে সে পথ বন্ধ হয় এবং চীন অন্য পথ খোঁজে। সম্প্রতি এক সংবাদপত্র লিখিয়াছেন যে "চীন পূর্ব্ব পাকিস্তানের মধ্য দিয়া পশ্চিমবঙ্গের চীন-প্রেমী কম্যুনিষ্টদের প্রচুর টাকা পাঠাইতেছে। রাজ্য সরকারের গোয়েন্দা দপ্তর এই অর্থ আমদানীর কিছু প্রমাণও পাইয়াছেন।" জানি না এই সংবাদ কতটা খাটি, কিন্তু যদি উহা আংশিকভাবেও সত্য হয় তবে ঐ টাকা যাহারা লইতেছে সেই দেশদ্রোহীদের দমনও কি সংবিধান বিরুদ্ধ? বিদেশে মৃত্যুদণ্ডও হয় এই অপরাধে!

বামমার্গী কম্যুনিষ্ট!

কিছুদিন যাবৎ সংবাদপত্রে এক জাতীয় কম্যুনিষ্টদের "বামপন্থী" বা "বামমার্গী" বলা হইতেছে। এ দেশের অপরিণতবুদ্ধি যুবজনের কাছে, এবং বেশ কিছু সংখ্যক বিচারবুদ্ধিবিহীন পরিণতবয়স্ক লোকের কাছে এই "বামমার্গ" বা "বামপন্থা" মার্কা "লেবেল" উচ্চ আদর্শবাদের প্রতীক বলিয়া গৃহীত হয়। সুতরাং স্বদেশের উন্নতি প্রগতি, স্বাধীনতা-স্বাতন্ত্র্য বা জাতীয় সংহতি বিনাশ করাই যাহাদের একমাত্র লক্ষ্য ও উপরন্তু যাহারা বিদেশী শত্রুর অর্থের বিনিময়ে যে-কোনও ঘৃণ্য কাজ করিতে প্রস্তুত তাহাদের "বামপন্থী" বা "বামমার্গী" আখ্যা দেওয়া যে কতদূর বিভ্রান্তি-কারক তাহা বলাবাহুল্য। এই জাতীয় দেশদ্রোহিতাকে "বামমার্গ" বা "বামপন্থা" বলিয়া যাহারা "মেকী" চালাইতে

সাহায্য করিতেছেন তাঁহাদের বিবেচনা করা উচিত যে, কে ঐ শ্রেণীর লোককে ঐরূপ আখ্যা দিয়াছে এবং ঐরূপ আখ্যা দেওয়ার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি।

এই নকল বামপন্থীদের প্রধান ভরসা এই যে দেশের মধ্যে অতি অল্প কয়জন আছেন যাঁহারা "বামমার্গ" বা "বাম-পন্থা" কি বস্তু ও তাহার পিছনে কি আদর্শবাদ আছে তাহা বিচার করিতে সমর্থ। সুতরাং বিদেশী শত্রুর অর্থের বিনিময়ে স্বদেশের সর্ব্বনাশ করার প্রচেষ্টাকে বামমার্গের মুখোস পরাইয়া তাহাকে কৃত্রিম আদর্শবাদে মহিমান্বিত করিলে গুপ্তঘাতী কাজ চালাইবার সুযোগ পাওয়া যায়। আসলে কিন্তু ইহারা "চাঁদিকে চন্দ টুকরে পর দেশকো বেচনেওয়ালে!"

সম্প্রতি কম্যুনিষ্ট পার্টিতে যে ফাট ধরিয়াছে তাহার দরুণ এই মেকী বামপন্থীদের স্বরূপ কিছু প্রকাশিত হইতেছে। নিম্নস্থ সংবাদ তাহার উদাহরণ :—

"বোম্বাই, ২৩শে জুন—কম্যুনিষ্ট পার্টির চেয়ারম্যান শ্রীএস এ, ডাঙ্গে আজ বামমার্গী কম্যুনিষ্টদের "চীনা দালাল" বলিয়া ধিক্কার দিয়াছেন। তিনি ঘোষণা করেন, জাতীয় পরিষদের যে ৩২ জন সদস্যকে সাসপেণ্ড করা হইয়াছে, নীতি বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া আনা হইবে না।

শ্রীডাঙ্গে স্বীকার করেন যে, ঐ সদস্যরা চলিয়া গেলে পার্টি দুর্ব্বল হইবে। কিন্তু কয়েকজন সদস্যের জন্য—পার্টিতে তাঁহাদের স্থান যত উচ্চই হউক—নীতি বিসর্জ্জন দেওয়া যাইতে পারে না।"

ইহার উপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

পাকিস্তান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত

পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী চতুর লোক। পাকিস্তান দীর্ঘদিনের চেষ্টায় যখন ভারত-ধ্বংসের কাজে তাহার পশ্চিমী জোটের বন্ধুদলকে—বিশেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনকে নামাইতে পারিল না তখন ভারতের (তৎকালীন) প্রচ্ছন্ন শত্রু লালচীনের সহিত মিতালী পাতাইয়া ভারতের বিরুদ্ধে চক্রান্ত আরম্ভ করিল। পশ্চিমী জোটে থাকিয়া, দু'হাত পাতিয়া মার্কিন অর্থ ও মার্কিন অস্ত্র লইয়া, ঐ পশ্চিমী জোট যাহার বিরুদ্ধে তাহারই সঙ্গে মিতালী পাতাইতে অবশ্য পাকিস্তানের কোনও দ্বিধা হইল না, কেননা তাহার ধারণা ছিল যে, মার্কিন রাষ্ট্রকে "বোকা বুঝাইয়া" নিজ কার্য্যসিদ্ধি করার মত বুদ্ধি পাকিস্তানের আছে। এই মিতালী ও চক্রান্তের কাজে প্রধান উদ্যোগী ও প্রধান কুচক্রী হইলেন পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ভুট্টো। তিনি চীনের সঙ্গে ভাগবাটোয়ারায় বোধ হয় চীনকে বলিয়াও ছিলেন যে, পশ্চিমী শক্তিজোট যাহাতে ভারতকে তাহার বিপদের সময় কোনও সাহায্য না করে সে ব্যবস্থা পাকিস্তান করিবে। বলা বাহুল্য সে চেষ্টাও হইয়াছিল এবং তাহা বিফল হওয়ায় পাকিস্তানের হিংসাদ্বেষ ও আক্রোশের সীমা নাই। সম্প্রতি পাক্-জাতীয়-পরিষদে এক মুলতবী প্রস্তাবের বিতর্কে শ্রীভুট্টোর বিষোদ্গার তাহারই লক্ষণ। রাওয়ালপিণ্ডির সংবাদে আছে :

"শ্রীভুট্টো বলেন, আমেরিকা এই সিদ্ধান্ত করায় পাকিস্তানের পক্ষে 'পরিস্থিতি পুনরায় বিবেচনা করিবার এবং সম্পূর্ণ পৃথক পরিস্থিতিতে সে (পাকিস্তান) যে রাজনৈতিক ও সামরিক দায়িত্বে আবদ্ধ হইয়াছিল' তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। শ্রীভুট্টো অবশ্য এই সঙ্গে এ কথাও বলেন, "ইহার অর্থ এই নহে যে, নীতিগত একটা আমূল বা মৌলিক পরিবর্ত্তন ঘটিতে যাইতেছে। আমাদের বন্ধুবর্গ ও আমাদের জনগণের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য রহিয়াছে।'

শীঘ্রই হোক বা বিলম্বেই হোক, ভারতকে আমেরিকার সামরিক সাহায্য দানের ব্যাপার পাকিস্তান মানিয়া লইবে—এই ভুল ধারণা সম্পর্কে শ্রীভুট্টো আমেরিকাকে সতর্ক করিয়া দেন। তিনি আমেরিকাকে আরও বলেন, আমেরিকা তাহার মিত্ররাষ্ট্রগুলির স্বার্থহানি করিয়া তাহার বিশ্বজোড়া স্বার্থসিদ্ধি করিতে পারে না। তিনি বলেন : 'যদি তাহার বিশ্বজোড়া স্বার্থ ও তাহার মিত্ররাষ্ট্রগুলির স্বার্থের সমন্বয়সাধন না করা যায়, তবে জোটের আর প্রয়োজন নাই বলিয়া তাহার বিবেচনা করা উচিত।'

মার্কিন সরকার এই হুমকিতে সন্ত্রস্ত বা বিভ্রান্ত হয় কি না সেটা অবশ্য ভবিষ্যতে দেখা যাইবে। কিন্তু একদিকে এই প্রকাশ্যে ভারতের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার অন্যদিকে আয়ুব খাঁর "বন্ধুভাব" প্রদর্শন আশ্চর্য্য ব্যাপার!

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীকরুণাকুমার নন্দী

চরমতম কংগ্রেসী প্রতারণা

পূর্ব্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যা সম্বন্ধে আমাদের কেন্দ্রীয় ভারত সরকারের নেতৃবর্গের সত্যকার কোন স্পষ্ট ধারণা আজ পর্য্যন্ত জন্মায়াছে কি না তাহা সন্দেহজনক বলিয়া মনে হয়। দেশবিভাগ তথা পাকিস্তানের জন্মকাল হইতে সুরু করিয়া গত প্রায় সতের বৎসর ধরিয়া পূর্ব্ব পাকিস্তানবাসী হিন্দুদিগকে অনবরত কি কারণে তাহাদিগের বংশপরম্পরা ধরিয়া অধিকৃত বাসভূমি, ভূসম্পত্তি সকলই ত্যাগ করিয়া পলাইয়া আসিতে হইতেছে তাহা আমাদের বর্ত্তমান শাসকগোষ্ঠীর আজও সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তাঁহারা এখনও নানাবিধ চমকপ্রদ আদেশ-উপদেশাবলীর দ্বারা দেশের লোকের মনে বিভ্রান্তি ঘটাইবার এবং নিজেদের ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছেন।

অথচ সত্য ঘটনাটি কি? দেশ বিভাগের পর হইতেই পূর্ব্ববঙ্গ হইতে ভিটামাটির মায়া ত্যাগ করিয়া হিন্দুর পলাইয়া আসা একদিনের জন্যেও বন্ধ হয় নাই; কেবল ইহার প্রবাহের আয়তনে ক্ষণে ক্ষণে তারতম্য ঘটিয়াছে মাত্র। কখনও ইহা প্রবল বন্যার আকার ধারণ করিয়াছে, কখনও বা ইহার স্রোত খুব ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে; কিন্তু গত প্রায় সতের বৎসর ধরিয়া এই প্রবাহের ধারা কখনও সম্পূর্ণ শুখাইয়া যায় নাই। ভারতে পলাইয়া আসিয়া ইহারা এমন কোন সুবিধা পায় নাই যাহার ফলে এমন মনে করা সমীচীন হইবে যে অপেক্ষাকৃত অধিকতর সুযোগ-সুবিধার লোভেই বিনা কারণে ইহারা নিজ নিজ গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিতেছে। অতএব কালে যে পূর্ব্ব পাকিস্তান হইতে সকল হিন্দুকেই ভারতে পলাইয়া আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে, অন্যথায় জীবন সংশয় করিয়া, নানাবিধ অত্যাচার ও অবমাননা সহ্য করিয়া শাসক সম্প্রদায়ের দয়ার উপরে নির্ভর করিয়া সেখানে বাস করিতে হইবে, এই অনিবার্য্য পরিণতির কথা অস্বীকার করিবার কোনই উপায় নাই। এই অতি স্পষ্ট সত্যটিকে আমাদের শাসকগোষ্ঠী কোনমতেই স্বীকার করিয়া লইতে রাজী হইতেছেন না। তাহা না হইলে আজ সতের বৎসর ধরিয়া পলাইয়া-আসা লক্ষ লক্ষ হিন্দু উদ্বাস্তুদিগের পুনর্ব্বাসনের সত্যকার কোন কার্য্যকরী আয়োজন আজও সৃষ্টি হয় নাই, ইহার মত একাধারে শোচনীয় ব্যর্থতা ও অমানুষিক হৃদয়হীনতার দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে?

ঐতিহাসিক বিশ্বাসঘাতকতা

অথচ পূর্ব্ববঙ্গবাসী হিন্দুরা এমন কি অপরাধ করিয়াছিল যে, তাহাদের প্রতি এই অমানুষিক ব্যবহার চলিতে থাকিবে? তাহার আজ চাল-চুলা বলিতে সবই গিয়াছে, আপন বলিতে কেহ বা কিছু নাই; এমন কি সব গেলেও যাহা মানুষকে বাঁচাইয়া রাখে, ভবিষ্যত বলিয়াও আজ তাহার আর কিছু অবশিষ্ট নাই। তাহাদের প্রধান অপরাধ যে দেশ বিভাগের সময় তাহাদের শ্রদ্ধেয় নেতাদের বাণীতে বিভ্রান্ত হইয়া তাহারা এই বিরাট্ ঐতিহাসিক বিশ্বাসঘাতকতায় সায় দিয়াছিল। ভারত বিভাগের ঐতিহাসিক পটভূমিকার সত্যকার তথ্যানুসারী বিশ্লেষণ আজও রচিত হয় নাই—এই প্রচণ্ড মূর্খতা ও প্রতারণার এখনও আমরা এত কাছাকাছি অবস্থান করিতেছি যে, নিরপেক্ষ বিচার বা বিশ্লেষণের উপযুক্ত আবহাওয়া এখনও সৃষ্টি হয় নাই এবং তাহার ফলে

ইতিহাস রচনায় বিভ্রান্তি ও বিকৃতি ঘটা স্বাভাবিক, এমন কি অনিবার্য্য হইয়া পড়িবার আশঙ্কা আছে। বর্ত্তমান শাসকগোষ্ঠীর ইঙ্গিত ও পৃষ্ঠপোষকতায় এই সময়কার ইতিহাস বলিয়া যে কিছু কিছু রচনা ইতিমধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে এই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত বিকৃতির পরিচয় খুব স্পষ্ট করিয়াই পাওয়া যায়। কিন্তু যখন প্রকৃত তথ্যাসুসারী ইতিহাস রচনার সময় ও সুযোগ উপস্থিত হইবে তখন এ কথা কিছুতেই অস্বীকার করা যাইবে না যে, তখনকার প্রবীণ কংগ্রেস নেতৃগোষ্ঠী মুখে যতই জোর গলায় প্রচার করিয়া থাকুন না কেন যে, তাঁহারা কিছুতেই সাম্প্রদায়িক বিভেদের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হইতে দিবেন না বা পাকিস্তান স্বষ্টিতে রাজী হইবেন না, ভিতরে ভিতরে তাঁহারা কিন্তু মহম্মদ আলী জিন্নার দাবি মানিয়া লইতে প্রস্তুত হইয়াই ছিলেন। সাম্প্রদায়িক সমতা (balance) সাধনের অজুহাতে বঙ্গদেশ ও পঞ্চনদপ্রদেশ দ্বিখণ্ডিত করিবার যে জিগীর ইঁহারা তাঁহাদের আশ্রিত সংবাদপত্রগোষ্ঠী মারফৎ তোলাইয়াছিলেন তাহা হইতেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। সাম্প্রদায়িক অত্যাচারে বিভ্রান্ত ও প্রাণভয়ে ভীত পূর্ব্ববঙ্গবাসী হিন্দু ও পশ্চিম পঞ্চনদবাসী হিন্দু ও শিখ সম্প্রদায় যে স্বতঃই এই জিগীর উৎসাহের সঙ্গে সমর্থন করিবেন তাহা সহজেই বুঝা যায়। দেশ বিভাগের দাবি তথা পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্ভব মানিয়া লইবার পথে ইহাই ছিল প্রথম পদক্ষেপ। কংগ্রেস নেতৃগোষ্ঠী জানিতেন যে পাকিস্তানের দাবি না মানিয়া লইলে ইংরাজের নিকট হইতে স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের শাসন-ক্ষমতা হয়ত তাঁহাদের জীবদ্দশায় আয়ত্তাধীন হইবার পথে শেষ পর্য্যন্ত অলঙ্ঘ্য বাধা সৃষ্টি হইতে পারে, ইহা তাঁহারা উপলব্ধি করিতেছিলেন। জিন্না সাহেবও জানিতেন যে পাঞ্জাব ও বাংলা প্রদেশদ্বয় বিভাগে রাজী না হইলে, তাঁহার বিকৃতমস্তিষ্কপ্রসূত পাকিস্তান হাত ফস্কাইয়া যাইবার আশঙ্কা আছে। আশ্চর্য্যের কথা, উভয় পক্ষের কেহই ভাবিয়া দেখে নাই যে, সে সময়ে ইংলণ্ডের ক্ষমতাসীন দলের ভারত শাসনের ধারায় এমন একটা সঙ্কটজনক পরিস্থিতি উপস্থিত হইয়াছিল যে শাসন-যন্ত্রটি হস্তান্তর করিবার কাজটা যথাসম্ভব সত্বর সম্পূর্ণ করিয়া না ফেলিতে পারিলে, এই যন্ত্রটির উপরে তাহা-দিগের অনিবার্য্য প্রভাব একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়িবে। ক্যাবিনেট মিশন কর্ত্তৃক ভারত-শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরের যে তারিখ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, অর্থাৎ ১৯৪৮ সনের জুন মাস, তাহা প্রায় এক বৎসর কাল আগাইয়া দিয়া কেন তৎপরিবর্ত্তে ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্ট তারিখে ভারতকে ইংরাজের শাসন হইতে মুক্ত করিয়া দেওয়া হইল, তাহা এই পটভূমিকার উপরে স্থাপন করিয়া বিচার করিলে সহজেই বুঝা যাইবে। অথচ ক্ষমতালাভের লোভ ও লালসা ইঁহাদের বুদ্ধি ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টি উভয়ই এমন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল যে, রাজনৈতিক চালের এই নিতান্ত প্রাথমিক পাঠটুকুর তাৎপর্য্যও ইঁহাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে নাই।

বস্তুতঃ বাঙালী হিন্দু বা পাঞ্জাবী হিন্দু ও শিখ সম্প্রদায় তথা ভারতবর্ষের সমগ্র জনগণ কখনই ভারত বিভাগ ও পাকিস্তান সৃষ্টির স্বপক্ষে কোন সক্রিয় সমর্থন জ্ঞাপন করে নাই; সে সুযোগই তাহাদিগকে দেওয়া হয় নাই। বাঙালী ও পাঞ্জাবী একই রাষ্ট্রের অধীনে থাকিয়া তাহাদিগের নিজ নিজ প্রদেশ ভাগের প্রস্তাবে সমর্থন জানাইয়াছিল মাত্র। তাহারা যে নিতান্তই বিভ্রান্তির বশে এই প্রস্তাবে সায় দিয়াছিল তাহা অত্যন্ত স্পষ্ট; তাহারা বুঝিতে পারে নাই, তাহাদিগকে স্পষ্ট করিয়া কেহ কখনও বুঝাইয়া দেয় নাই, যে দেশের নেতৃগোষ্ঠী দেশভাগেও যে ইহাদের সক্রিয় সমর্থন ছিল, গৌণভাবে তাহাই প্রতিষ্ঠা করিয়া লইলেন।

পশ্চিম পাঞ্জাব ও পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু

পশ্চিম পাঞ্জাববাসী হিন্দু ও শিখ কিন্তু কোনক্রমেই নূতন পাকিস্তান রাষ্ট্রের নাগরিক বনিয়া থাকিতে

কিছুতেই রাজী হইলেন না। নূতন স্বাধীন ভারত সরকার ইঁহাদিগকে আশ্রয় দিতে এবং পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা করিতেও বাধ্য হইলেন। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গবাসী হিন্দুদের বেলায় ইঁহারা যাহা করিলেন তাহা চরমতম প্রতারণা ও হৃদয়হীনতার পরিচায়ক বলিলেও অত্যুক্তি করা হইবে না। দেশভাগের প্রাক্কালে ইঁহারা পূর্ব্ববঙ্গবাসী কতিপয় তদানীন্তন বিশিষ্ট এবং ইঁহাদের নিতান্ত অনুগত কংগ্রেস নেতাদের দিয়া আর একটি বিভ্রান্তিকর প্রচার সুরু করিয়া দিলেন। ইঁহাদের মধ্যে অন্যতম ও প্রধান ছিলেন একদা প্রসিদ্ধ গান্ধীবাদী ও তথাকথিত সত্যানিষ্ঠ ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। ইনি এবং ইঁহার সহকারীগণ পূর্ব্ববঙ্গে ফিরিয়া গিয়া প্রচার করিতে সুরু করিয়া দিলেন যে, ইঁহারা কখনই পূর্ব্বপুরুষের ভিটামাটি ত্যাগ করিয়া যাইবেন না, নূতন পাকিস্তান রাষ্ট্রের নাগরিক হইয়া জনমত সৃষ্টি করিবেন, যাহাতে এই নূতন রাষ্ট্রে ক্রমে ধর্ম্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। সরল স্বভাব এবং সাধারণতঃ নিরক্ষর পূর্ব্ববঙ্গবাসী হিন্দু এই সকল শ্রদ্ধাভাজন নেতাদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হইয়া পাকিস্তানেই থাকিয়া যাইবেন বলিয়া স্থির করেন। ফলে দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম পাঞ্জাবের মত পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুরা বন্যার স্রোতের মতন ভিটামাটি ত্যাগ করিয়া ভারতে আসিয়া আশ্রয় লয় নাই। পশ্চিম পাঞ্জাবে হিন্দু ও শিখ সম্প্রদায়ের মতন যদি তখন এই অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হইয়া পূর্ব্ববঙ্গবাসী হিন্দুও সম্পূর্ণ সংখ্যায় পাক্ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ভারতে প্রবেশ করিতেন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ পাঞ্জাবীদের মতই ইঁহাদিগের উপযুক্ত পুনর্ব্বাসন-ব্যবস্থা না করিয়া ভারত সরকারের আর উপায় থাকিত না। কিন্তু কংগ্রেসী নেতাদের কুটনৈতিক চালের ফলে এই প্রবাহ আপাততঃ রোধ করা গেল। কিন্তু কংগ্রেসী নেতৃগোষ্ঠীর অভিসন্ধি যে কেবলমাত্র পূর্ব্ববঙ্গবাসী হিন্দুর দায়িত্ব এড়াইবার মানসেই সুপরিকল্পিত পথে অগ্রসর হইতেছিল, তাহার স্পষ্টতম প্রমাণ এই যে, স্বাধীনতা দিবসে দেখা গেল যে পরম সত্যানিষ্ঠ গান্ধীবাদী প্রফুল্লবাবু তাহার মাত্র কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বের সংবাদপত্র মারফৎ প্রচারিত প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া নূতন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের প্রথম "প্রধানমন্ত্রীর" দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন বলিয়া শপথ গ্রহণ করিতেছেন। অবশ্য এই বিবেকহীন প্রতারণার মূল্য তাঁহাকে দিতে হইয়াছে, এত সাধের "প্রধানমন্ত্রিত্ব" বেশীদিন টেঁকে নাই—কংগ্রেস নেতৃত্বও গিয়াছে। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে যে দাম তিনি দিয়াছেন, তাহা পূর্ব্ববঙ্গবাসী হিন্দু যে মূল্য গৃহহীনতায়, জীবননাশে, ধর্ম্মনাশে এবং সম্পূর্ণ অন্ধকার ভবিষ্যতে আজও দিতেছে, তাহার তুলনায় নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।

ভারত সরকারের প্রতারণা

পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু আজ নিজ-গৃহ হইতে অসহ নির্য্যাতন ও অবমাননার বোঝা লইয়া বিতাড়িত। কিছু সংখ্যক হিন্দু এখনও যে নিতান্তই প্রাণের দায়ে পূর্ব্ব পাকিস্তানে পড়িয়া আছে তাহারাও যে শেষ পর্য্যন্ত গৃহত্যাগ, অন্যথায় ধর্ম্মত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে তাহাও অনিবার্য্য। যে স্বাধীন ভারত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আশায় সে তাহার নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিপন্ন করিল সেখানেও যদি তাহার কণামাত্র সম্মানজনক আশ্রয় মিলিত তাহা হইলেও কিছুটা সান্ত্বনা তাহার থাকিত। কিন্তু তাহাও হয় নাই, কখনও যে হইবে এমন আশাও দেখা যায় না। অবশ্য গত ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাসে খুলনা ও ঢাকায় হিন্দুদের উপরে যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার পরে সরকারী ভাবে প্রচার করা হইয়াছে যে পূর্ব্ব পাকিস্তান হইতে যে-সকল হিন্দু ভারতে চলিয়া আসিতে চাহেন, তাঁহাদের চলিয়া আসিবার পথ সুগম করিয়া দেওয়ার এবং তাহাদের পুনর্বাসনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ভারত সরকার গ্রহণ করিবেন। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি কতটা রক্ষিত হইয়াছে বা হইতেছে তাহা বিচার করা প্রয়োজন।

গত বৎসরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে প্রায় ৮০ লক্ষাধিক

পূর্ব্ববঙ্গবাসী হিন্দু ভারতে আসিয়াছেন তাঁহাদের পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা এখনও পর্য্যন্ত অপেক্ষাকৃত মুষ্টিমেয় সংখ্যায় মাত্র হইয়াছে। ইঁহাদের একটা বিরাট্ অংশ একরকম ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া কায়ক্লেশে জীবনাতিপাত করিতেছেন মাত্র। ইঁহাদিগকে, সুস্থ, স্বাবলম্বী ও মানুষের মত করিয়া বাঁচাইয়া তুলিবার কোন সর্ব্বাত্মক আয়োজন আজও কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। অপরপক্ষে ইঁহাদের নাম করিয়া প্রচুর সরকারী অর্থ অপব্যয় হইয়া চলিয়াছে, তাহাতে কতকগুলি সম্পূর্ণ বিবেকহীন রাজনৈতিক চালবাজের (adventurers) এবং অন্যান্য কিছু লোকের হয়ত সুবিধা ও অর্থাগম হইতেছে, কিন্তু ইঁহাদের কোনই সুবিধা হয় নাই, হইবার আশাও নাই। কেবল ইঁহাদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া রাজনৈতিক সুবিধাবাদীরা (opportunists) নিজ নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া লইতেছেন।

বর্ত্তমান বৎসরেও যে তাহাই ঘটিতেছে তাহারও প্রমাণের অভাব নাই। পশ্চিমবঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গ উদ্বাস্তুদের নাম করিয়া এখন অনেক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করা সম্ভব। কিন্তু ইহাদের প্রতি দরদ দেখাইতে গিয়া পুনর্ব্বাসনের উপযুক্ত ব্যবস্থা না করিয়া ইহাদিগকে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় দিলে এই উদ্দেশ্য হাসিল হইবার বদলে যে এই রাজ্যে কংগ্রেসের ভবিষ্যতসুদ্ধ বিপন্ন হইয়া পড়িবে, তাহাও জলের মতন স্পষ্ট। অতএব অতুল্যবাবু এক ঢিলে দুই পাখী মারিবার আয়োজন করিলেন। সম্প্রতি কংগ্রেসের উচ্চতম নেতৃত্বের উপরে ইঁহার প্রভাব অপরিসীম হইয়া উঠিয়াছে। তাহার বলে এবং পশ্চিমবঙ্গে স্থানাভাবের অজুহাতে এই পরম দরদী উদ্বাস্তু-বন্ধুটি নূতন উদ্বাস্তু পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদিগকে কেন্দ্রীয় সরকরের দায়িত্বে ইঁহাদের তথাকথিত পুনর্ব্বাসনের অজুহাতে পশ্চিমবঙ্গের বাহিরে চালান করাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু মুশ্‌কিল হইল ইহারা এখনও নিতান্ত গরু-ভেড়ার পর্য্যায়ে পড়েন না। চালান করিয়া দিয়াই সমস্যার সমাধান হইল না, ইঁহারা আবার জোর করিয়া দলে দলে পশ্চিমবঙ্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সুরু করিলেন।

সম্প্রতি এইরূপ একটি ঘটনার সংবাদ হইতে আসল অবস্থাটা বোঝা যাইবে। এইরূপ একদল উদ্বাস্তুকে উড়িষ্যায় পাঠান হয়। তাঁহারা তাঁহাদিগের তথাকথিত পুনর্ব্বাসন শিবির পরিত্যাগ করিয়া নিকটবর্ত্তী রেল ষ্টেশনে আসিয়া জমায়েৎ হন এবং কলিকাতায় ফিরাইয়া পাঠাইবার ব্যবস্থা দাবি করেন। পুলিশ ইঁহাদের উপরে গুলীবর্ষণ করিবার ফলে ৫ জন হত এবং আরও অনেকে আহত হন। ব্যাপারটা এমন অভিনব কিছু একটা নহে। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে কেন ইঁহারা পুনর্ব্বাসন শিবির পরিত্যাগ করিতেছেন?

সম্প্রতি পার্লামেণ্টের একদল সদস্য এ সকল উদ্বাস্তু শিবির পরিদর্শন করিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতেই এই প্রশ্নের জবাব মিলিবে। ইঁহারা উড়িষ্যায় অবস্থিত এ সকল শিবির দেখিয়া আসিয়া বলিতেছেন যে তাহাদিগকে "সম্পূর্ণ পড়ো জমির উপরে আনিয়া ফেলা হইতেছে (dumped), যেখানে একটু ছায়া মিলিবার মত একটি গাছও নাই, জল নাই, কোন গৃহ, এমন কি একটি চালা পর্য্যন্ত নাই, জীবনধারণের ন্যূনতম আয়োজনেরও কোন ব্যবস্থা নাই।" ইহার জবাবে নূতন পুনর্ব্বাসন মন্ত্রী মহাবীর ত্যাগী বলিতেছেন "এই উদ্বাস্তুরা শৃঙ্খলা মানিয়া চলিতে চায় না। সকলকে চাষোপযোগী জমি দেওয়া সম্ভব নহে, অতএব তাহাদের কায়িক পরিশ্রমেও রাজী হইতে হইবে।" তিনি বলিতেছেন যে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার যথাসাধ্য ইহাদের পুনর্ব্বাসনের আয়োজন করিতেছেন। হয় পুনর্ব্বাসন মন্ত্রী না হয় ত পার্লামেণ্টের পরিদর্শনকারী সদস্যের দল—একপক্ষ সত্যের অপলাপ করিতেছেন। আমরা এই ক্ষেত্রে মন্ত্রীমহাশয়কেই সত্য অপলাপী বলিয়া মনে করিতেছি।

বুঝা যাইতেছে যে কেন্দ্রীয় সরকারের পুনর্ব্বাসন

প্রতিশ্রুতি রাজনৈতিক চালবাজি মাত্র। উদ্বাস্তুদিগকে ভারত সীমান্তে পৌছিবার সঙ্গে সঙ্গেই—পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের প্রভাব বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য—উহাদিগকে দলে দলে এই নিদারুণ গ্রীষ্মে খোলা প্রান্তরে ফেলিয়া দিয়া আসা হইতেছে—প্রাকৃতিক বিধানেই যাহাতে চিরকালের জন্য উহাদের পুনর্ব্বাসনের জন্য আর কাহাকেও মাথা ঘামাইতে না হয়। হিটলারের বেলসেনের কাহিনীকেও এই অভিনব পুনর্ব্বাসন ব্যবস্থা বর্ব্বরতার দৃষ্টান্তে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

পর্ব্বতের মূষিক প্রসব

খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি নিরোধ-কল্পে সম্প্রতি নয়া দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এবং বহুল-প্রচারিত যে মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলন হইয়া গিয়াছে তাহা প্রবাদ-বর্ণিত পর্ব্বতের মুষিক প্রসবের ন্যায় হইয়াছে। সম্মেলন সুরু হইবার প্রাক্কালে শোনা গিয়াছিল যে, কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রসঙ্গে খাদ্য-পণ্যের বণ্টন-নিয়ন্ত্রণের (rationing) দ্বারা মূল্যবৃদ্ধি নিরোধ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় প্রয়োগের সকল কার্য্যকরী আয়োজন স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন। কেবল মাত্র ইহার প্রয়োগ মূলতঃ রাজ্য সরকারদের দায়িত্ব বলিয়া বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের স্বীকৃতি পাইলেই ইহার ব্যবস্থা করা যাইবে। বস্তুতঃ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর একটি বহুল-প্রচারিত বিবৃতিতে এই অঙ্গীকারই করা হইয়াছিল। অন্যপক্ষে শোনা গিয়াছিল যে, কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীসুব্রহ্মণ্যম্ খাদ্যশস্যের কারবার ও চাউল কলগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়া লইবার সকল প্রাথমিক আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন, রাজ্য মুখ্যমন্ত্রীদের অনুমোদন পাইলেই তাহা চালু করিয়া দেওয়া হইবে এবং এই ভাবে মুনাফাবাজদিগকে ঘায়েল করিয়া ফেলা হইবে। দুই প্রস্তাবই সম্পূর্ণ বানচাল হইয়া গিয়াছে দেখা যাইতেছে। ব্যবস্থা এ পর্য্যন্ত যাহা ছিল তাহাই চলিতে থাকিবে; কেবল কেন্দ্রীয় সরকার ঘাটতি রাজ্যগুলিকে ঘাটতি পূরণ করিবার মত যথেষ্ট চাউল ও গম সরবরাহ করিবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব স্বীকার করিয়াছেন। ইহাতে অবস্থার কোন উন্নতি হইবে এমন আশা করা বাতুলতা। অন্য পক্ষে নিয়ন্ত্রণ ও রাষ্ট্রীকরণ করিতে গভীর আপত্তির পিছনে সরকারী মনোভাবের আর একটি পরিচয়ও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—মুনাফাবাজ-দিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবার কোন প্রস্তাব ইঁহারা অনুমোদন করিবেন না, তাহাতে দেশের লোক যদি অনশন বা অর্দ্ধাহারে থাকিতে বাধ্য হয়, তাহাতে তাঁহারা বিচলিত নহেন।

অন্য পক্ষে মূল্যবৃদ্ধির মূল কারণ নির্ণয়ের কোন প্রয়াসের লক্ষণ দেখা যায় না। উন্নয়নের অজুহাতে প্রচণ্ড গতিতে বিস্তারমান পুঁজি লগ্নী, কিন্তু উৎপাদনে আনুপাতিক অসার্থকতা মূল্যবৃদ্ধির একটা মূল কারণ বলিয়া আমরা মনে করি। সার্থক উৎপাদন সম্ভাবনার দ্বারা লগ্নী সীমিত করিবার কোনই প্রয়াস নাই, বরং উৎপাদন যাহাই হউক, লগ্নী বাড়িয়াই চলিয়াছে। অন্য পক্ষে মূল্যবৃদ্ধির কারণে অতিরিক্ত ভাতা ইত্যাদির দ্বারা মুদ্রাস্ফীতি আরও বাড়াইয়া দেওয়া হইতেছে। মুদ্রাস্ফীতিকারক সরকারী শুল্কনীতি সংশোধনের কোন লক্ষণ নাই। সবার উপরে কালোবাজারী পুঁজি যাহাতে মূল্যস্ফীতি ঘটাইতে সাহায্য না করিতে পারে সে বিষয়েও কোন কার্য্যকরী প্রয়োগের কোন আভাস আজি পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। এ সকল উপেক্ষা করিয়া কেবল ধর্ম্মোপদেশের দ্বারা যদি মূল্যস্ফীত বন্ধ করা যাইত, তাহা হইলে অনেক পূর্ব্বেই মূল্য-স্থিরতা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত।

ভারত পথিকৃৎ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীকরুণাকুমার নন্দী

সাময়িক উত্তেজনা মানুষের দৃষ্টিকে ক্ষণে ক্ষণে আচ্ছন্ন করিয়া দেয়। আজিকার ঘটনাবলী, বর্তমানের কোন শক্তিমান চরিত্রের প্রভাব, অতীত ইতিহাসের ধারাবাহিকতা হইতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। আমরা মনে করি, কেবলমাত্র খণ্ডিত বর্তমানটুকুকে লইয়াই সংসারের সব কিছু। সংসারে যাহা কিছু ঘটে তাহা যে একটি নিরন্তর চলমান ধারাবাহিকতার বিন্দু পরিমাণ স্থানমাত্রে অবস্থিত, আজিকার যে শক্তিমান ব্যক্তিত্বের উদ্ভব হইল তাহাও যে স্থান-কালের মধ্যে সীমিত একটি আকস্মিক ঘটনা বা আবির্ভাব মাত্র নহে, এ সকলই ঐতিহাসিক পারম্পর্যের ধারায় বিধৃত একটি প্রকাশ মাত্র, তাহা আমরা প্রায়ই বিস্মৃত হই।

ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসের ধারা ৭৯ বৎসর পূর্বে ভারতীয় কংগ্রেস সংগঠনের সৃষ্টির সহিত সুরু হয় নাই, পরবর্তী কালে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা-যজ্ঞের পৌরোহিত্য যেদিন হইতে মহাত্মা গান্ধী গ্রহণ করেন, সেদিন হইতেও নহে। তাহারও শতবর্ষাধিক পূর্বে যখন মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে ভারতেতিহাসে নবযুগের প্রবর্তনের সুরু হইল সেদিন হইতেই বস্তুতপক্ষে আমাদের দীর্ঘদিনের স্বাধীনতা-যজ্ঞে প্রথম আহুতি পড়িল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে আমাদের দেশের সমাজ তখনও পুরোহিত-শাসিত মধ্যযুগ অতিক্রম করিয়া এক পাদও অগ্রসর হয় নাই। রামমোহন ও তাঁহার পরবর্তী উত্তরসাধকগণ সংস্কারের কারাগারের দ্বার প্রথম অর্গলমুক্ত করিলেন—নূতন যুগে প্রবেশের পথ প্রস্তুত করিলেন। এই নবযুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, মানুষের চেতনাকে নানাবিধ সংস্কারের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিয়া তাহাকে আত্মপ্রত্যয়, আত্মসম্মান ও উদার মানবিক চেতনার মধ্যে তাহাকে প্রতিষ্ঠা করা। এই পথেই দেশ ও সমাজ ধীরে ধীরে, বহু ত্যাগ, বহু বঞ্চনা স্বীকার করিয়া রাষ্ট্রস্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইয়াছে। দুই শতাব্দীর অবিচ্ছিন্ন সাধনার ফলে আজ ব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা তাঁহাদের দেহমনের সকল শক্তি, হৃদয়ের রক্ত উজাড় করিয়া দিয়া এই নিরবচ্ছিন্ন সাধনার ধারাকে সঞ্জীবিত, পুষ্ট করিয়া গিয়াছেন, আজ স্বাধীনতার ফল আয়ত্তের মধ্যে আসিয়া যাওয়ায় যদি আমরা তাঁহাদিগকে এবং তাঁহাদের অবিস্মরণীয় আত্মোৎসর্গের কথা বিস্মৃত হইয়া যাই তবে তাহা কেবলমাত্র অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক হইবে শুধু তাহাই নহে, ইহার দ্বারা আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে অস্বীকার করা হইবে। ইতিহাস-বিস্মৃত জাতি কখনও কোন মহৎ লক্ষ্যে পৌঁছাইতে পারে না। দিশারীহীন জাহাজের মত অসীম কালসমুদ্রে হারাইয়া যায়। তাই আমাদের নিজেদেরই স্বার্থে, দেশের ও জাতির মহৎ ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিতে হইলে, আমাদের ইতিহাসের উপাদান আমরা যাঁহাদিগের নিকট হইতে পাইয়াছি, তাঁহাদিগকে এবং তাঁহাদের কর্মধারাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ ও অনুশীলন করা প্রয়োজন।

রামমোহনের যে-সকল উত্তরসাধকগণ আমাদের ইতিহাসের পথে তাঁহাদিগের পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক স্বর্গত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন অন্যতম বিশিষ্ট সাধক। শিক্ষাব্রতীর দায়িত্ব লইয়া তিনি জীবনের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই তিনি উপলব্ধি করেন যে, মামুলী শিক্ষায়তনের নিতান্ত সীমাবদ্ধ পরিধির মধ্যে তাঁহার প্রয়াসকে সীমিত করিয়া রাখিলে দেশের বৃহত্তর ক্ষেত্রে শিক্ষার আলোক প্রবেশ করিতে বহু বিলম্ব হইয়া যাইবে। তিনি তাই আপনার কর্মক্ষেত্রটিকে এই বৃহত্তর ক্ষেত্রে বিস্তৃত করিয়া দিলেন। "প্রবাসী" এবং কয়েক বৎসর পর হইতে "মডার্ণ রিভিয়ু" এই মহত্তর প্রয়াসেরই স্বাক্ষর। কিঞ্চিদধিক অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অসাধারণ প্রকাশভঙ্গির ফলে "প্রবাসী" ও "মডার্ণ রিভিয়ু" দেশের লোকের মনে যে শিক্ষা ও চেতনা জাগ্রত করিয়াছে তাহার বিচার করিবার সময় আসিয়াছে। আগামী জ্যৈষ্ঠ মাসে তাঁহার জন্মশতবর্ষপূর্তির অবসরে এই নিতান্ত প্রয়োজনীয় কর্তব্যটি সমাধা করিবার প্রয়াস করা হইবে আশা করা যায়।

এই মহৎ প্রয়াসে তাঁহাকে কত ত্যাগ, রাজরোষ ইত্যাদি অশেষ যন্ত্রণাভোগ করিতে হইয়াছে তাহার হিসাব করিয়া লাভ নাই। এ সকল সমাজ-সাধকদিগের মামুলী পাওনা। কিন্তু এ সব কিছুই তাঁহার কর্মধারাকে কখনও যে ক্ষণকালের জন্যও লক্ষ্যভ্রষ্ট করে নাই, সে কথা আজ গভীর শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবার সময় হইয়াছে। আমাদের জাতীয় জীবনের অগ্রগতির পথ যাঁহারা নিজের সমগ্র শক্তি ও প্রতিভা দিয়া প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন, আজ সে পথে চলিবার অধিকার ও সুযোগ লাভ করিয়া আমরা যদি এসকল মহৎ পথিকৃৎদের কথা বিস্মৃত হই তবে আমরা দেশের, সমাজের এবং ভবিষ্যৎ ইতিহাসের নিকট অপরাধী হইয়া থাকিব।

সঙ্গীতের আসরে

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্র ও যদু ভট্টের সংঘর্ষ

বঙ্কিমচন্দ্র এবং যদু ভট্ট। বাংলার দুই দিক্‌পাল এবং ক্ষণজন্মা পুরুষ। আপন আপন আসরে তাঁদের নাম অমর হয়ে আছে।

বঙ্কিমচন্দ্রকে অমরত্ব দিয়েছে তাঁর কীর্তি। তাঁর রচিত অপূর্ব সাহিত্য। যার আস্বাদ গৌড়জন এখনো লাভ করতে পারেন এবং অনেকে করেও থাকেন।

কিন্তু সে যুগের গায়ক যদু ভট্টের বেলা তা' হবার নয়। মহাকাল লুপ্ত ক'রে দিয়েছে তাঁর কীর্তি—তাঁর অপরূপ সঙ্গীত। নশ্বর দেহপটের সঙ্গে বিলীন হয়ে গেছে তাঁর সুর-সৃষ্টি, যা অবিনশ্বর হ'তে পারত যন্ত্রবিজ্ঞানের যুগ হ'লে। শুধু তাঁর নামটি বেঁচে আছে সঙ্গীত-জগতের শ্রুতিস্মৃতিতে।

তাঁদের প্রতিভার ক্ষেত্র এক নয়, একথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তাঁদের দুজনের মধ্যে একটি যোগসূত্র ছিল। সেই সূত্রটি হ'ল—সঙ্গীত। এই দুই প্রতিভাধরের জীবনে সঙ্গীত একটি চমৎকার যোগাযোগ ঘটায়।

তাই বঙ্কিমচন্দ্র ও যদু ভট্ট দু'টি নামই অমর বটে। কিন্তু দু'রকমে।...

তাঁরা শুধু পরস্পরের পরিচিত ছিলেন না। তার চেয়ে আরও বেশি ঘনিষ্ঠতা ছিল তাঁদের মধ্যে। অন্তত কিছু কালের জন্যে। কারণ—কথাটি অনেকের কাছেই এক আশ্চর্য সংবাদ মনে হ'তে পারে—বঙ্কিমচন্দ্র সঙ্গীত বিষয়ে যদু ভট্টের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। বঙ্কিমের বয়স সে সময় বছর ত্রিশ হবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গীত প্রসঙ্গ নিয়ে বিশেষ আলোচনা কেউ করেন নি। যদিও তা করবার মত। সেজন্যে অনেকেরই জানা নেই যে, তাঁর রীতিমত সঙ্গীত জ্ঞান ছিল এবং তিনি যদু ভট্টের তুল্য গুণীর অধীনে সঙ্গীত-চর্চা ও শিক্ষা করেন। যে ঘটনাটির কথা বর্ণনা করা হবে, সেই উপলক্ষ্যেই দুজনের মধ্যে পরিচয়ের আরম্ভ।

সেই গল্পটি বলবার আগে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গীত বিষয়ে কিছু বলা দরকার। যদু ভট্টের পরিচয় পরে অনেক আসরের গল্পে পাওয়া যাবে। এখন বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গীত প্রসঙ্গের ভূমিকা হিসেবে কিছু আলোচনা করা যাক।

বঙ্কিম যে যদু ভট্টের কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন, সে বিষয়ে প্রামাণিক নজিরটি প্রথমে দিয়ে রাখা ভাল। তা হ'লে হয়ত পাঠক-পাঠিকাদের পক্ষে সূত্র অনুসরণ করবার একটি বিশ্বাসযোগ্য ভিত্তি পাওয়া যাবে।

তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "বঙ্কিম জীবনী"তে (৩৬৯ পৃঃ) বলেছেন—

"ত্রিশ বৎসরের পর মৃণালিনী লিখিবার সময় বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাস ও বিজ্ঞান পাঠ আরম্ভ করেন।

"এই সময় সঙ্গীত শিক্ষার ঝোঁক চাপিয়াছিল। সুযোগও বেশ হইয়াছিল। কাটালপাড়ায় একজন বঙ্গবিশ্রুত গায়ক বাস করিতেন, তাঁহার নাম যদু ভট্ট তান্‌রাজ। বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতন দিতেন। এই যদু ভট্টর নিকট বঙ্কিমচন্দ্র সঙ্গীতাদি শিক্ষা করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সুকণ্ঠ ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার তান-লয় বোধ অনন্যসাধারণ ছিল। হারমনিয়ম যন্ত্রে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

"একদিন তিনি রঙ্গমঞ্চে মৃণালিনী অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। গিরিজা গাহিতেছিল—

বিকচ নলিনে, যমুনা পুলিনে,
বহুত পিয়াসা—রে।
চন্দ্রমা-শালিনী, যা মধু যামিনী,
না মিটিল আশা—রে।

"সুর বঙ্কিমচন্দ্রের মনোমত হইল না। তিনি সাতিশয় বিরক্তিসহকারে রঙ্গালয় পরিত্যাগ করিলেন। এবং পরদিন তিনি তাঁহার দৌহিত্র দিব্যেন্দুসুন্দরকে এই গানটির সুর লয়

শিক্ষা দিয়াছিলেন। সেই সময় শ্রীমতী সরলা দেবীও এই গানটির একটি সুর দিয়াছিলেন, এবং দিব্যেন্দুসুন্দরকে হারমনিয়ম সাহায্যে শিখাইয়াছিলেন।"

যদু ভট্টের কাছে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গীত শিক্ষার বিষয়ে এই বিবৃতিটি একটি নির্ভরযোগ্য প্রমাণ। তবে যদু ভট্ট যে কাঁটালপাড়ায় বাস করতেন বলা হয়েছে, তা হয়ত ঠিক নয়। যদু ভট্ট মাঝে মাঝে চুঁচুড়ায় যেতেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রও অনেকদিন সেখানে ছিলেন। খুব সম্ভব, যদু ভট্টকে বঙ্কিমচন্দ্র চুঁচুড়াতেই পান। সেখানকার গঙ্গার পরপারেই কাঁটালপাড়া। সেজন্যেই হয়ত লেখক যদু ভট্টের কাঁটালপাড়ায় বাসের কথা ব'লে থাকবেন। যদুর কাঁটালপাড়ায় অবস্থানের কথা অন্য কোন সূত্রে জানা যায় না।

যেখানেই হোক, বঙ্কিমচন্দ্র যদু ভট্টের কাছে সঙ্গীত শিক্ষার্থী ছিলেন ঠিক। নচেৎ তাঁর জীবনীকার এমন স্পষ্ট ক'রে উল্লেখ করতেন না। বঙ্কিমচন্দ্র যে কণ্ঠসাধনা করে গায়ক হবার জন্যে যদুর কাছে তালিম নিয়েছিলেন, তা নয়। রাগ-বিদ্যা অর্থাৎ বিভিন্ন সুরের বিষয়ে বিশেষ ভাবে জানাই সম্ভবত তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। যদু ভট্টের কাছে তাঁর সঙ্গীত শিক্ষার এই তাৎপর্যই মনে হয়। বঙ্কিমের শিল্পী ও সংস্কৃতিবান্ সত্তা এবং তাঁর জ্ঞানপিপাসু মন তাঁকে রাগ-বিদ্যার পরিচয়লাভে উদ্বুদ্ধ করেছিল। বিশেষ যদু ভট্টের মত গুণীর সাহচর্য তিনি যখন পেয়েছিলেন।

সঙ্গীত বিষয়ে বঙ্কিমের যে অভিজ্ঞতা ছিল, তার একটি সামান্য নিদর্শন উদ্ধৃত অংশের মধ্যে আছে। তিনি গিরিজায়ার গানটির সুর পছন্দ না হওয়ায় পরদিন দৌহিত্রকে তা' অন্য সুরে শিখিয়েছিলেন।

আসলে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গীত জ্ঞান বহুমুখী ছিল। তার প্রচুর দৃষ্টান্ত তাঁর রচনাবলীতে ইতস্তত চিহ্নিত আছে। সঙ্গীত প্রসঙ্গে তাঁর সেইসব অভিজ্ঞ বর্ণনা আর-একবার পাঠক-পাঠিকাদের দৃষ্টির সামনে তুলে ধরতে ইচ্ছা হয়। কারণ তাঁর গ্রন্থাবলী পড়বার সময় সেসব কথায় হয়ত অনেকে তেমন মনোযোগ দেন নি। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গীত জীবনের ভূমিকা হিসেবেও সেসব মনে রাখবার মত। তাঁর সেই পরিচয় নেবার পর তাঁর ও যদু ভট্টের সেই গল্পটি বলা হবে।

সঙ্গীত বঙ্কিমের কতখানি প্রিয় ছিল, সুর-রসের তিনি কি মার্জিতরুচি রসিক ছিলেন, সঙ্গীতের তত্ত্ব ও ক্রিয়াংশের নানা দিকে তাঁর কি গভীর জ্ঞান ছিল, তার ভূরি ভূরি নিদর্শন তাঁর বিভিন্ন রচনার মধ্যে রয়েছে।

কমলাকান্তের দপ্তরে সেই "একা"—"কে গায় ওই?" ("বহুকাল বিস্মৃত সুখ স্বপ্নের ন্যায় ঐ মধুর গীতি কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। এত মধুর লাগিল কেন?···") তাঁর সঙ্গীতপ্রেমের একটি চমৎকার নিদর্শন।

তারপর ঐ দপ্তরের আর একটি আবেগগাঢ় রচনা—"একটি গীত" ("সুর করিয়া···আমি গীতটি আদ্যোপান্ত গায়িলাম।

এসো এসো, বঁধু এসো, আধ আঁচরে বসো,
নয়ন ভরিয়ে তোমায় দেখি।
অনেক দিবসে, মনের মানসে,
তোমা ধনে মিলাইল বিধি।
মণি নও মাণিক নও যে হার ক'রে গলে পরি,
ফুল নও যে কেশের করি বেশ।
নারী না করিত বিধি, তোমা হেন গুণনিধি,
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ।···

"মিল ত চমৎকার, 'দেখি' আর 'বিধি' মিলিল। কিন্তু বাংলা ভাষায়, এইরূপ মোহমন্ত্র আর একটি শুনিব, মনে বড় সাধ রহিয়াছে। যখন এই গান প্রথম কর্ণ ভরিয়া শুনিয়াছিলাম, মনে হইয়াছিল, নীলাকাশতলে ক্ষুদ্র পক্ষী হইয়া এই গীত গাই—মনে হইয়াছিল, সেই বিচিত্র সৃষ্টিকুশলী কবির সৃষ্টি দৈববংশী লইয়া, মেঘের উপর যে বায়ুস্তর—শব্দশূন্য, দৃশ্যশূন্য, পৃথিবী যেখান হইতে দেখা যায় না, সেইখানে বসিয়া, সেই মুরলীতে, একা এই গীত গাই—এই গীত কখনও ভুলিতে পারিলাম না; কখনও ভুলিতে পারিব না।

এসো এসো বঁধু এসো···।"

সঙ্গীতপ্রিয় বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পী-মনের একটি উজ্জ্বল উদাহরণ এখানে পাওয়া গেল।

"মৃণালিনী" উপন্যাসের জন্যে তিনি ক'টি উৎকৃষ্ট গান রচনা করেন। গিরিজায়ার মুখে সে-সব গান শুনে হেমচন্দ্র, মৃণালিনীর মনে কি ধরণের প্রতিক্রিয়া ঘটে তারও হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা তাঁর লেখায় আছে। এসব থেকেও বোঝা যায় যে,

সঙ্গীতকে তিনি কতখানি অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন এবং সঙ্গীতরস তাঁর হৃদয়ে কি গভীরভাবে বিদ্যমান ছিল।

তাঁর "বিবিধ প্রবন্ধ"র "সঙ্গীত" লেখাটি থেকে ধারণা হয় যে, বিভিন্ন রাগের ধ্যানরূপ থেকে আরম্ভ ক'রে সঙ্গীতের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পর্যন্ত সব বিষয়েই তাঁর যথাসম্ভব জ্ঞান ছিল। তাঁর সময়ে সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা বিভাগে যতদূর পর্যন্ত চর্চা হয়েছিল, বঙ্কিম ছিলেন তার সব বিষয়ের সঙ্গেই সুপরিচিত। তাঁর সঙ্গীত প্রসঙ্গেও সেকথা সমান সত্য। "সঙ্গীত" প্রবন্ধটি তার একটি সার্থক পরিচয় বহন করছে।

কিন্তু এহ বাহ্য। ভারতবর্ষের প্রথম জাতীয় সঙ্গীত-রচয়িতা যে সঙ্গীতবেত্তা হবেন, এ ত স্বাভাবিক। তিনি ছিলেন শিক্ষিত এবং সমঝদার সঙ্গীতপ্রেমী। তাই শুধু হৃদয় দিয়ে তিনি সঙ্গীত উপভোগ করতেন না, সঙ্গীত বিষয়ে তাঁর ছিল পরিশীলিত ও পরিমার্জিত মন। সেজন্যে সাধারণভাবে সঙ্গীতপ্রীতি ত' তাঁর ছিলই, রাগসঙ্গীতেও ছিল রীতিমত বোদ্ধার অধিকার। শুধু বিভিন্ন রাগে নয়, বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের বিষয়েও তিনি অবহিত ছিলেন। তাঁর নানা উপন্যাসের নানা স্থানে তাঁর রাগসঙ্গীতে অভিজ্ঞতার দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়। সেসব কথা এবারে চয়ন করে দেওয়া হবে। আমাদের বক্তব্য কাহিনীটির সঙ্গেও বঙ্কিমচন্দ্রের রাগসঙ্গীতপ্রীতি জড়িত! তাই রাগসঙ্গীতের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতার নিদর্শন হিসেবে তাঁর উপন্যাসগুলি থেকে এখানে একে একে উদ্ধৃত করা হ'ল।

একথা অনেকেরই জানা আছে, বঙ্কিমচন্দ্র "বন্দেমাতরম্" গান রচনা ক'রে "আনন্দমঠ" গ্রন্থে তার জন্যে প্রথম সুর নির্দিষ্ট করেন—মল্লার। শুধু তাই নয়। তার তাল উল্লেখ ক'রে "কাওয়ালী তাল যথা" ব'লে তার মাত্রা বিভাগও দেখিয়ে দেন "আনন্দমঠ" পুস্তকে। এই গ্রন্থে আর একটি গানের ("দড়বড়ি ঘোড়া চড়ি কোথা তুমি যাও রে···") তিনি সুর ও তাল নির্দেশ করেন—"রাগিণী বাগীশ্বরী—তাল আড়া।"

মল্লার রাগে "বন্দেমাতরম্" গান 'শিক্ষিত' শ্রোতার মনে কেমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তার আভাস বঙ্কিমচন্দ্র এইভাবে দিয়েছেন—"ভবানন্দ আবার বন্দেমাতরম্ গাহিতে লাগিল। মহেন্দ্রের গলা ভাল ছিল, সঙ্গীতে একটু বিদ্যা ও অনুরাগ ছিল—সুতরাং সঙ্গে গাহিল—দেখিল যে গাহিতে গাহিতে চক্ষে জল আইসে।" (আনন্দমঠ)

সারঙ্গ নামক যন্ত্রের সহযোগিতায় গান করবার রীতি বঙ্কিমের সবিশেষ জানা ছিল: "আবার কোথায় সারঙ্গের মধুর নিক্বণে বাজিল···এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে?" ···"জীবানন্দ বসিয়া সারঙ্গ বাজাইতেছিলেন।···" (আনন্দমঠ)

"শান্তিদেবী আবার সারঙ্গ লইয়া মৃদু মৃদু রবে গীত করিতে লাগিলেন—প্রলয় পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং···।" (আনন্দমঠ)

"মৃণালিনী"তে গিরিজায়ার মুখে "মথুরাবাসিনী মধুরহাসিনী শ্যামবিলাসিনী রে" গানখানি দিয়ে তিনি লেখেন—"টিমে তেতালা জয়জয়ন্তীতে গেয়।"

বীণাবাদনের ধ্বনি-মাধুর্য বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনায় এইভাবে পাওয়া যায়—"সেই···রূপবতী মূর্তিমতী সরস্বতীর ন্যায় বীণা বাজাইতেছিল। ঝম্ ঝম্, ছন্ ছন্, ঝনন্ ঝনন্, ছনন্ ছনন্, দম্ দম্, দ্রিম্ বলিয়া বীণে কত কি বাজিতেছিল। বীণা কখন কাঁদে, কখন রাগিয়া উঠে, কখন নাচে, কখন আদর করে, কখন গর্জিয়া উঠে—বাজিয়ে টিপি টিপি হাসে। ঝিঁঝিট, খাম্বাজ, পিলু—কত মিঠে রাগিণী বাজিল—কেদার, হাম্বীর, বেহাগ—কত গম্ভীর রাগিণী বাজিল—কানাড়া, সাহানা, বাগীশ্বরী—কত জাঁকাল রাগিণী বাজিল—নাদ, কুসুমের মালার মত নদী-কল্লোল স্রোতে ভাসিয়া গেল। তারপর দুই-একটা পরদা উঠাইয়া-নামাইয়া লইয়া, সহসা নূতন উৎসাহে উন্মুখী হইয়া সে বিদ্যাবতী ঝন্ ঝন্ করিয়া বীণের তারে বড় বড় ঘা দিল।···বীণে নট রাগিণী বাজিতে লাগিল।···" (দেবী চৌধুরাণী)

এখানে একটি কথা বলা দরকার, এই পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার একটি সামান্য ত্রুটি আছে মনে হয়। বীণাবাদনের শেষ দিকে বীণের দু'একটি পরদা উঠিয়ে-নামিয়ে বাজাবার কথা যে বলা আছে, তা সঠিক নয়। বীণার কোন পরদা ওঠানো-নামানোর প্রয়োজন নেই। এ যন্ত্রের ২০টি পরদা বাঁধা থাকে, তাদের সরানো হয় না। সে জন্যে বীণাকে বলা হয়—অচল ঠাট। সেতারের মুদারা গ্রামের রেখব ও ধৈবত

এবং তারা গ্রামের রেখব কোমল করবার জন্যে সরানো হয়ে থাকে, বিশেষ বিশেষ রাগের প্রয়োজনে। বঙ্কিমচন্দ্র, খুব সম্ভব, সেতারের এই রীতিকে বীণের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেছেন। তবে এটা তাঁর কোন বড় ত্রুটি নয়। তিনি বলেই যন্ত্রের এই পরদা ওঠানো-নামানোর এই খুঁটিনাটি লক্ষ্য করেছিলেন। কিন্তু অসাবধানে ভুল করে সেতারের ব্যাপারটি বীণের বলে লিখেছেন।...

"দেবী চৌধুরাণী"র আর এক জায়গায় তিনি দেবীর সঙ্গিনী নিশির বাঁশী বাজাবার কথা উল্লেখ করেছেন—"নিশি বাঁশীতে ফুঁ দিয়া মল্লারে তান মারিল।"

সঙ্গীতের সময়ে মেজাজের যে গুরুত্ব আছে, সে বোধও বঙ্কিমচন্দ্রের বিলক্ষণ ছিল! দলনী বেগমের গান-বাজনার কয়েকটি বর্ণনায় তার পরিচয় পাওয়া যায়:

"তখন সুন্দরী এক ক্ষুদ্র বীণা লইয়া তাহাতে ঝঙ্কার দিল এবং ধীরে ধীরে...গীত আরম্ভ করিল।"

..."বীণার তার অবাধ্য হইল—কিছুতেই সুর বাধে না। বীণা ফেলিয়া দলনী বেহালা লইল, বেহালাও বেসুরা বলিতে লাগিল, বোধ হইল। নবাব বলিলেন, 'হইয়াছে, তুমি উহার সঙ্গে গাও।' তাহাতে দলনীর মনে হইল যেন নবাব মনে করিয়াছেন, দলনীর সুরবোধ নাই।..." (চন্দ্রশেখর)

যন্ত্রের বেসুর থাকা, সুর বাঁধা ইত্যাদি ব্যবহারিক বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ ধারণা ছিল। তার আরও পরিচয় আছে: "দেবেন্দ্র সেই বেহালা আনিয়া তাহাতে ছড়ি দিলেন। বেহালা ঘাঁকর ঘোঁকর করিতে লাগিল।" (অর্থাৎ বেসুরো ছিল)..."দেবেন্দ্র বেহালা হাতে লইয়া এক প্রকার চলনসই করিয়া লইলেন (অর্থাৎ তার বেঁধে সুর মিলিয়ে নিলেন) এবং তাহার সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া...গাইলেন।"... "দেবেন্দ্র তানপুরা লইলেন...এবং গীতারম্ভ করিলেন।" (বিষবৃক্ষ)

"কৃষ্ণকান্তের উইল" উপন্যাসে "গোবিন্দলাল ও রোহিণীর নিভৃত বাসকুঞ্জে যখন নিশাকরের আবির্ভাব ঘটে, সে-সময়ের কথায় বঙ্কিম অনেক সঙ্গীতযন্ত্রের ক্রিয়া বর্ণনা করেছেন। যথা—

"গোবিন্দলাল তবলা লইলেন...কিন্তু আজি দানেশ খাঁর সঙ্গে তাঁর সঙ্গত হইল না, সকল তালই কাটিয়া যাইতে লাগিল।...তখন গোবিন্দলাল একটা সেতার লইয়া বাজাইবার চেষ্টা করিলেন. কিন্তু গৎ সব ভুলিয়া যাইতে লাগিলেন।"

সেখানে রোহিণী ও তার ওস্তাদের সঙ্গীতের জন্যে প্রস্তুতির কথাও বলেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। তার মধ্যে তবলার সঙ্গে মিলিয়ে তানপুরায় সুর বাঁধবার বর্ণনা সকৌতুক মুন্সিয়ানার সঙ্গে করেছেন—"একজন...একটা তম্বুরার কাণ মুচড়াইতেছে—কাছে বসিয়া এক যুবতী ঠিং ঠিং করিয়া একটি তবলায় ঘা দিতেছে। তম্বুরার কাণ মুচড়াইতে মুচড়াইতে দাড়িধারী তাহার তারে অঙ্গুলি দিতেছিল। যখন তারের মেও মেও আর তবলার ঘ্যান্ ঘ্যান্ ওস্তাদজীর বিবেচনায় এক হইয়া মিলিল...।" (কৃষ্ণকান্তের উইল)

তানপুরায় নিবিষ্ট হয়ে সুর বাঁধার এই প্রসঙ্গটি লক্ষ্যণীয়। অনেকক্ষণ ধরে তানপুরার তার বাঁধবার জন্যেই একদিন বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে যদু ভট্টের সংঘর্ষ হয়েছিল। সেই আসরের কাহিনীটিই এখন বিবৃত করা হবে।

সে কাহিনী সত্য হ'লেও নাটকীয়। আর সে নাটিকার প্রধান চরিত্র দু'টি: বঙ্কিমচন্দ্র এবং যদু ভট্ট। সেদিন তাঁরা এক অদ্ভুত ঘটনাচক্রে পরস্পর পরিচিত হন।

যতদূর জানা যায়, তা ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের কিংবা তার কিছু আগেকার কথা। ঠিক কোন্ সাল বলা যায় না। তবে বঙ্কিমের "দুর্গেশনন্দিনী" ও "কপালকুণ্ডলা" তখন প্রকাশিত হয়েছে। তিনি তখন খ্যাতিমান্ হ'তে আরম্ভ করেছেন। কিন্তু সুপ্রসিদ্ধ হন নি।

যদু ভট্টের বিষয়েও প্রায় সেই কথাই বলা যায়। তাঁর খ্যাতি তখনও সীমাবদ্ধ ছিল কয়েকটি সঙ্গীত-গোষ্ঠীর মধ্যে। বৃহত্তর সমাজের দিগন্তে তা বিস্তৃত হয় নি। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের দু'বছরের বয়োকনিষ্ঠ ছিলেন।

তাঁদের দু'জনের মধ্যে তখন পরিচয় ছিল না। তাঁরা চিনতেনও না পরস্পরকে। কিন্তু একে অন্যের নাম বা গুণের কথা কিছু শুনে থাকবেন।

এমনি এক সময়ের কথা। ঘটনাস্থল—চুঁচুড়া।

সন্ধ্যার পর একটি গানের আসর বসেছে। যদু ভট্টকে সেখানে আনা হয়েছে গাইবার জন্যে। সাজানো আসরে তিনি বসেছেন সকলকার সামনে। নিমন্ত্রিত শ্রোতারাও

সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁদের প্রথম সারিতে আছেন বঙ্কিমচন্দ্র।

এইবার গান আরম্ভ হবে। সভার একজন উদ্‌যোক্তা যদু ভট্টকে অনুরোধ জানালেন গান করতে।

ভট্টজী সুর বাঁধবার জন্যে কোলের ওপর তানপুরা তুলে নিলেন। তারপর তার বাঁধতে আরম্ভ করলেন নিবিষ্ট মনে।

এক-একজন গায়ক তানপুরা বাঁধতে অনেক সময় নেন। তাঁর মনের মতন নিখুঁত ক'রে সুর না বেঁধে তিনি কিছুতেই গান আরম্ভ করেন না। তানপুরা বাঁধা পছন্দসই না হ'লে গানের মেজাজ আসে না তাঁর। কোন শ্রোতার ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে কি না সেদিকে তাঁর খেয়াল থাকে না।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রথম জীবনে যখন গায়ক ছিলেন, তখনকার এই রকম কথা জানা যায়। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে গান শোনাবার সময় কতদিন এমন হয়েছে। নরেন্দ্রনাথ গান আরম্ভ করবার আগে অনেকক্ষণ ধরে তানপুরা বেঁধেছেন। আর অধৈর্য হয়ে উঠেছেন তাঁর শ্রোতারা। এমন কি শ্রীরামকৃষ্ণ পর্যন্ত। এ পর্যন্তও হয়েছে যে শ্রীরামকৃষ্ণ ধৈর্য হারিয়ে ব'লে উঠেছেন—'ইচ্ছে হচ্ছে তানপুরাটা ভেঙ্গে ফেলি।'—কিন্তু নরেন্দ্রনাথ অবিচল। মনের মতন ক'রে সুর না বেঁধে তিনি গান আরম্ভ করেন নি।

যদু ভট্টের স্বভাব ছিল অনেকটা সেই রকম। অন্তত সেদিনের আসরে তেমনি ব্যাপার ঘটে।

অনেকক্ষণ ধ'রে যদু নিখুঁত ভাবে তানপুরা বাঁধতে লাগলেন। শ্রোতাদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র এই বিলম্বের জন্যে অস্বস্তি বোধ করলেন। এবং বিরক্ত হয়ে উঠলেন শেষে। যদুর কান তখনও তানপুরার চারটি তারকে অনুমোদন করে নি। তিনি একাগ্রচিত্তে মাথা নীচু ক'রে সুর বাঁধছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র আর ধৈর্যধারণ করতে পারলেন না। তিনি যদুর হাতের তাম্বুরাটির দিকে চেয়ে শ্লেষাত্মক কণ্ঠে বললেন—'লাউ-কুমড়ো বাঁধা কখন্ শেষ হবে?'

এই বেসুরো মন্তব্য শুনে যদুর মেজাজটিও বিগড়ে গেল। তিনিও চড়া গলায় বঙ্কিমকে কটাক্ষ ক'রে জানালেন—'এমন গোয়াল ঘরে আমি গাইব না।'

(অর্থাৎ এখানে গো-জাতীয় জীবেরা আছে, যারা সুরের ধার ধারে না। এখানে যদুর গান কি ক'রে হবে?)

এই ব'লে তিনি যন্ত্রটি কোল থেকে নামালেন। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়। রাগ তখন তাঁর মাথায় চড়েছে। তিনি তাই তাম্বুরাটিকে তুলে একটি আছাড় দিলেন। লাউয়ের সুরলীলা সাঙ্গ ক'রে উঠে পড়লেন আসর থেকে। গান তিনি গাইবেন না।

যদুর এই ব্যবহারে বঙ্কিমচন্দ্রও ঘোর অপমানিত বোধ করলেন। তাঁরও কোপন স্বভাবের খ্যাতি কম নয়। তাই চট্টোপাধ্যায় মশায় চটে উঠে দাঁড়ালেন আসর ত্যাগ ক'রে যাবার জন্যে।

ততক্ষণে আসরে হুলুস্থুল পড়ে গেছে। এ কি বিভ্রাট! সুরের আসরে এ কি কাণ্ড। চার দিকে হৈ চৈ আরম্ভ হয়ে গেল। অনেক শ্রোতা কলরব ক'রে উঠলেন। কোথায় গান আরম্ভ হবে, না তার বদলে ঘটে গেল বিশ্রী বিবাদ? আর তাও এত বড় গায়ক আর এমন বিশিষ্ট শ্রোতার মধ্যে!

অনেকেই হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন। চলে যাবার জন্যেও তোড়জোড় করলেন কেউ কেউ। এমন ভাল আসর ভেঙ্গে যাবার উপক্রম হ'ল।

কিন্তু উদ্‌যোক্তারা তৎপর হয়ে উঠলেন। তাঁরা চেষ্টা করতে লাগলেন, আসর যাতে মাটি না হয়। শ্রোতাদের স্থির হয়ে বসতে বললেন। তারপর কয়েকজন মিলে, একদিকে নিয়ে গেলেন যদু ভট্টকে। আর একদিকে নিয়ে গেলেন বঙ্কিমচন্দ্রকে। তাঁদের ক্রোধ শান্তির আশায়।

অনুনয় এবং অনুরোধ ক'রে তাঁরা তাঁদের শান্ত করবার চেষ্টা করলেন।

যদু ভট্টকে একপাশে এনে জনান্তিকে বলা হ'ল—উনি কে তা' বোধহয় আপনি জানেন না? ওঁর নাম বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, আর এই বয়সেই মস্তবড় লেখক হয়েছেন। দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা এসব বই ওঁরই লেখা। উনি গান-বাজনা বড় ভালবাসেন। আপনি ওঁর কথায় রাগ করবেন না। আপনি গান গাইলে ওঁর নিশ্চয় ভাল লাগবে, দয়া করে আসরে আসুন। আপনার গান শোনবার জন্যে অনেকে অনেক দূর থেকে এসেছেন। তাঁদের আপনি নিরাশ করবেন না।

তাঁদের কথায় যদু অবশেষে শীতল হলেন। তারপর আসরে এসে বসলেন।

ওদিকে বঙ্কিমচন্দ্রকে কয়েকজন এক পাশে নিয়ে গিয়ে বললেন—উনি কে তা জানেন ত? ওঁর নাম যদু ভট্ট। এমন ধ্রুপদ গান খুব কম লোকই এখন গাইতে পারেন। আপনি অনুগ্রহ ক'রে বসবেন চলুন। যা হবার হয়েছে। ওসব কথা আর ধরবেন না। ওঁর গান শুনলে আপনি নিশ্চয় তৃপ্তি পাবেন। আসুন।

বঙ্কিমচন্দ্রও এই সনির্বন্ধ অনুরোধ আর এড়াতে পারলেন না। উপস্থিত হলেন আসরে।

ভাঙা আসর আবার জোড়া লাগল।

অন্য একটি তানপুরা আগেই যদুকে দেওয়া হয়েছিল। তিনি যথারীতি তার সুর বাঁধলেন। বঙ্কিমচন্দ্র এবার বসে রইলেন ধৈর্য ধ'রে।

তারপর যদু ভট্ট গান আরম্ভ করলেন। উদাত্তকণ্ঠে ধরলেন দরবারী কানাড়া।

অন্য অনেক আসরে যেমন করেন, এখানেও গাইতে লাগলেন নিজের লেখা ধ্রুপদ গান। কি হিন্দী, কি বাংলা, তাঁর রচিত সব গানেরই যেমন চমৎকার বন্দেশ, এ গানটির মধ্যেও তার অভাব নেই। ঝাঁপতালে তিনি স্বরচিত ধ্রুপদখানি গাইতে লাগলেন। তাঁর দরাজ গলায়, নিপুণ মীড়ের কাজ দিয়ে, গমকের তরঙ্গ বিচ্ছুরিত ক'রে। মেঘমন্দ্রধ্বনিতে মৃদঙ্গের সঙ্গত হ'তে লাগল।

আসরে অপূর্ব ভাবের সঞ্চার হ'ল। যদু ভট্ট দরবারী কানাড়ায় সিদ্ধ ছিলেন। শ্রোতারা তার পরিচয় পেলেন। যদুর সুরের সুরধুনীতে দোলায়িত হ'তে লাগলেন সকলে।

বিস্মিত পুলকে তন্ময় হয়ে শুনছেন বঙ্কিমচন্দ্র।

যদু সমস্ত শ্রোতার মন সুরের মন্ত্রে আকর্ষণ ক'রে নিয়ে গাইতে লাগলেন—

রাধারমণ মদনমোহন মাধব মুকুন্দ মুরারি।
মধুসূদন মনোহর ময়ূরপুচ্ছধারী॥
কৃষ্ণ কেশব কান্ত কালীয়দমন,
কলুষহারী কংসারি।
কাল কমলাকান্ত দনুজহারি হরি॥
ব্রজমে গিরিধারীলাল,
ব্রজরাজ গোপাল বাঁকে বিহারী।
নীল নীরদ শ্যাম, নব লোকেশ্বর, জয়তি যদুনাথ
শ্রীনাথ গোপীনাথ গোলোকনাথ শ্রীহরি॥…

শ্রোতৃমণ্ডলীকে সুরের ধারায় অবগাহন করিয়ে যদু ভট্টের দরবারী কানাড়ার সেই গান এক সময়ে শেষ হ'ল।

আসরের অন্য শ্রোতাদের কথা বলা বাহুল্য। আর বঙ্কিমচন্দ্র? তিনি স্পষ্টই অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর দু'চোখ তখন অশ্রুসজল। মুখমণ্ডলের ভাব অতি কোমল।

গান আরম্ভ হবার আগেকার সেই রুদ্রমূর্তি তখন কোথায় অন্তর্ধান করেছে। কোন্ মায়াবলে যেন রূপান্তরিত হয়েছেন সেই অধৈর্য, ক্রুদ্ধ মানুষটি। ইনি যেন আর এক বঙ্কিমচন্দ্র!…

তিনি স্বল্পভাষী এবং বাইরে থেকে গম্ভীর স্বভাবের ছিলেন। তাই বেশি কথা বললেন না। কিন্তু সেই অল্প ক'টি কথাতেও ফুটে উঠল তাঁর অন্তরের অকুণ্ঠ প্রশংসা, অপূর্ব আনন্দ পাওয়ার স্বীকৃতি আর গুণীর প্রতি বিনয়।

যদু ভট্টও শ্রোতাকে তৃপ্ত করতে পেরেছেন জেনে পরিতৃপ্ত হলেন।

দুজনের সেই প্রথম সাক্ষাৎ ও পরিচয়। আর বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনীতে দেখা গেছে যে, তিনি ভট্টজীর কাছে সঙ্গীতাদি শিক্ষা করেছিলেন। সুতরাং অনুমান করলে ভুল হবে না যে, তাঁর সেদিনের অভিজ্ঞতার জন্যেই তা সম্ভব হয়। পরে যখন বঙ্কিম রাগবিদ্যা শেখবার জন্যে উপযুক্ত ওস্তাদের প্রয়োজন অনুভব করেন, তখন যদু ভট্টের নামই তাঁর প্রথম মনে পড়ে। কিংবা এমনও হ'তে পারে, সে রাতের পরেই তিনি মনে মনে সংকল্প করেন—এমন গায়কের কাছেই সঙ্গীতবিদ্যা ভাল ভাবে শিক্ষা করা উচিত।

আগেই বলা হয়েছে যে, বঙ্কিমচন্দ্র বয়সে যদু ভট্টের চেয়ে দু' বছরের বড় ছিলেন। তবু তিনি যদুর শিষ্য হ'তে দ্বিধা করেন নি। কারণ গুণীর যোগ্য সমাদর করবার মতন তাঁর হৃদয় ছিল উদার ও গুণগ্রাহী।…

দু'টি সূত্রে চুঁচুড়ার সেই আসরের স্মৃতি একালে এসে পৌঁছেছে। পণ্ডিতপ্রবর, স্বর্গত ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামীজীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা) একদিন গল্প করবার সময়

ঘটনাটির বিষয় লেখককে বলেন। বিশ্বস্তসূত্রে শুনেছিলেন তিনি বঙ্কিম-যদুর ওই যুদ্ধ ও শান্তির কাহিনী। একথা অনেকের জানা নেই যে, ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে কিছুদিন সঙ্গীতশিক্ষা করেছিলেন এক গায়কের কাছে। এবং সঙ্গীত-বিষয়ে তাঁর প্রাথমিক জ্ঞান ছিল, যদিও পরে আর তার চর্চা করবার সুযোগ পান নি।···

ওই আসরের কথা বলতেন বিখ্যাত মৃদঙ্গবাদক নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ও। দু'টি বিবরণ হুবহু এক। ঘটনাটির সত্যতার এও এক প্রমাণ।

সুরসিক এবং সুরতাল-রসিক নগেন্দ্রনাথের নানা কথা পরে আসবে। এখানে তাঁর বিষয়ে সেজন্যে আর কিছু বলা হবে না, শুধু যদু ভট্টের প্রসঙ্গ ছাড়া। যদু ভট্টের গানের কথা মুখুজ্যে মশায় অতি আবেগের সঙ্গে বলতেন। আর ওই আসরের কথা তিনি শুনেছিলেন স্বয়ং যদু ভট্টের মুখে।

কি ভাবে নগেন্দ্রনাথ যদুর সাক্ষাৎ পান, কেমন ভাবে তাঁর গান শোনেন আর ওই আসরের কথা তাঁর নিজের মুখে জানতে পারেন—সেসব কথাও শোনবার মতন।

তাই নগেন্দ্রনাথ যেমন করে বলতেন, তেমনি করে (অর্থাৎ তাঁর নিজের ভাষাতেই) তাঁর কথা এখানে দেওয়া হ'ল।

যদু ভট্টের গান একদিন আমি খুব ভাল করে শুনে নিয়েছিলুম। একেবারে তাঁর সামনাসামনি বসে। একটি ছোট্ট ঘরে। আমরা দু'জন ছাড়া সে ঘরে আর কেউ ছিল না। কি করে হঠাৎ সে সুযোগটা এসে গেল, বলি।

তখন আমার বয়েস খুব কম। ঠিক করে আর এখন তা বলতে পারব না। হয়ত এদিক্ ওদিক্ হ'তে পারে। তবে সব কথাই আমার বেশ মনে আছে। যতদূর মনে পড়ে, তখন আমার বয়েস ১৪।১৫ বছর হবে। সেই সময় আমি একদিন শুনলুম যদু ভট্টের কথা।

শুনলুম তিনি মস্ত বড় গাইয়ে। আর এসে রয়েছেন ঝামাপুকুরে। আমাদের বাড়ী পটলডাঙ্গায়। তাই আমাদের বাড়ীর কাছেই। একদিন সন্ধান নিয়ে তাঁর কাছে হাজির হলুম। তিনি ছিলেন রাজা দিগম্বর মিত্রের বাড়ীর বাইরেকার একটি ঘরে। একতলার সেই ছোট ঘরটিতেই তিনি তখন থাকতেন। তার কিছুদিন পরেই তিনি সেখান থেকে চলে যান।

সে যা হোক, আমি তাঁর কাছে গিয়ে বললুম, 'আপনার গান শুনতে এসেছি।'

বয়েস তখন অত কম ছিল বলেই যদু ভট্টের কাছে গিয়ে অমন করে গান শুনতে চেয়েছিলুম। এখন ভাবলে আশ্চর্য লাগে।

আমি তখন নেহাৎ ছেলেমানুষ। কিন্তু তবু যদু ভট্ট আমার কথায় বিরক্ত হলেন না, বা আমায় হাঁকিয়েও দিলেন না। তখন দুপুরবেলা। তিনি একলাটি ঘরে ছিলেন।

আমার কথা শুনে হাসিমুখে বললেন—'গান শুনবে? কিন্তু এখন ত হবে না। তা হ'লে আজ মাঝ-রাত্তিরে এসো।'

তাঁর কথায় তখন চলে এলুম। আমাদের বাড়ী থেকে ত তেমন দূরে নয়। তাই বেশ রাত করে আবার হাজির হলুম তাঁর সেই ঘরটিতে। তখনও তিনি একাই ঘরে ছিলেন। আমাকে দেখে বসতে বললেন।

একটু পরে তিনি গান আরম্ভ করলেন—দরবারী কানাড়া। রাধারমণ মদনমোহন মাধব মুকুন্দ মুরারি···

আমার তখন সব বোঝবার মতন বয়েস নয়। কিন্তু এটুকু বেশ মনে আছে—আহা, সে কি গলা আর কি সুর! অমন দরবারী আর ত শুনলুম না।

চোখ দু'টি বুজে তন্ময় হয়ে তিনি গাইতে লাগলেন। আমাকে তিনি গান শোনাবেন কি? আমি ত একটি উপলক্ষ্য। গান গাইতে লাগলেন তিনি নিজের প্রাণের আবেগে। সে কি ভাবের গান। চোখ দিয়ে তাঁর টপ্ টপ্ করে জল গড়িয়ে পড়ছে। আর তিনি একমনে গেয়ে চলেছেন সেই দরবারী কানাড়া।

কতক্ষণ তিনি গাইলেন, কত সময় কেটে গেল—তার কিছুই আমার খেয়াল নেই।

যখন তিনি গান শেষ করলেন, জানলা দিয়ে চেয়ে দেখি, কোথায় রাতের অন্ধকার? আকাশে ভোরের আলো ফুটে উঠেছে। ঘরের মধ্যেও এসে পড়েছে প্রথম সকালবেলার সেই আলো। এক গানেই রাত কাবার।

আমি তাঁর মুখের দিকে এতক্ষণ ভাল করে দেখি নি—গানের সুরে এমন মন্ত্রমুগ্ধ আর অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলুম। এখন তাঁর দিকে চোখ পড়তে দেখি, চোখের জলে মুখ বুক ভেসে যাচ্ছে। সে একটা দৃশ্য! নিজের সুরসৃষ্টিতে নিজেই আত্মহারা হয়ে নিজের অন্তরকে যেন উজাড় করে দিয়েছেন। আমার বয়স তখন যত কমই হোক, তাঁর চোখের দৃষ্টি দেখে মনে হ'ল তিনি যেন অন্য মানুষ। যে যদু ভট্ট দুপুরবেলা আমায় হাসিমুখে গান শোনাবার কথা বলেছিলেন, তিনি যেন আর একজন। এখন সেদিনের কথা মনে হ'লে বুঝতে পারি, তিনি আপনার সুরসৃষ্টিতে আপনি আত্মহারা হয়ে তখন সুরের জগতে চলে গিয়েছিলেন। তাই তাঁর চোখের দৃষ্টি অমন হয়েছিল।...

যাই হোক, আমার মুখ দিয়ে কোন কথা তখন বেরুল না। গান শুনে তারিফ করে কিছু বলবার বয়েসও তা নয়।

গান শেষ করে তিনি খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। যেন এই জগতের মাটিতে ফিরে আসতে কিছু সময় লাগছিল!

তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন—জানো, এই গানটার একটা ইতিহাস আছে। এই দরবারী কানাড়া গাইবার আগে একবার বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে হাতাহাতি হবার জোগাড়। তানপুরা বাঁধা নিয়ে আসরে একটা কাণ্ড ঘটে যায়। সে এক মজার ব্যাপার।

এই বলে যদু ভট্ট সেদিন আমায় বঙ্কিমবাবুর ওই আসরের কথা আগাগোড়া বললেন।

"শের হ্যায়......"

যদু ভট্ট যে কত বড় গুণী গায়ক ছিলেন, সেকথা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ লিখে গেছেন। বিশেষ রবীন্দ্রনাথ। যদু ভট্টের প্রতি তিনি যে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন, তেমন বোধ হয় অন্য কোন কলাবত বা রাগসঙ্গীত গায়ককে জানান নি। সে-সব কথা উদ্ধৃত করে লেখা আর ভারি করবার দরকার নেই। তবে তার মোদ্দা কথাটা শুধু উল্লেখ করা যায়। এবং তা হ'ল—যদু গানের মধ্যে রসসঞ্চার করতে পারতেন। তাই তাঁর গান অত হৃদয়গ্রাহী হ'ত।

যদু অসাধারণ শ্রুতিধর ছিলেন। আর তেমনি ছিল তাঁর সুরসৃষ্টির ক্ষমতা। রবীন্দ্রনাথ সে গল্পও করতেন। সেই যে ত্রিপুরার রাজসভায় এক পশ্চিমী গায়ক একদিন গাইলেন নটনারায়ণ রাগের একটি ছোট গান। যদু ভট্ট তখন সেখানে বসে শুনছিলেন। গাইবার পর সেই ওস্তাদ যদুকে বললেন যে, সেই গানের জুড়ি কোন গান শোনাতে পারলে বেশ হয়। যদুর কাছে তিনি তেমনি একটি গান শোনবার আশা করেন।

যদু বললেন—বেশ, আমি কাল এই রাগের গান এই দরবারে শোনাব।

নটনারায়ণ রাগ যদুর তার আগে জানা ছিল না। কিন্তু তাতে কি? রাগের কাঠামোটি তিনি মনের পটে এঁকে নিয়ে গেলেন সেই আসর থেকে। তার পর ঘরে গিয়ে সে রাতেই ওই সুরে আর চৌতালে তিনি নিজে একটি গান তৈরি করলেন। আর পরের দিন রাজা বীরেন্দ্র মাণিক্যের সামনে, সেই ওস্তাদের সামনে দরবারে গেয়ে শোনালেন সেই গান। যদুর মুখে নটনারায়ণের এমন বিস্তার শুনে সভায় সকলে চমৎকৃত হলেন। আর সেই ওস্তাদও।

এমন প্রতিভা ছিল যদু ভট্টের। তাঁর এই গল্পটি রবীন্দ্রনাথ বলতেন। যদুর সেই নটনারায়ণ গানটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এত ভাল লাগে যে, তার অনুকরণে তিনি পরে একটি বাংলা গান রচনা করেন।

পরম্পরায় যতদূর জানা যায়, যদু ভট্টের তুল্য গায়ক বেশি জন্মান নি। শুধু বাংলা দেশে নয়, ভারতবর্ষেও। তার কিছু পরিচয় এ পর্যন্ত পাওয়া গেল। আরও কিছু দেওয়া হবে পরে; তাঁর আরও দু'তিনটি আসরের গল্পে।

সে সব গল্প করবার আগে তাঁর বিষয়ে আর কয়েকটি কথা ব'লে নিলে হয়। তাঁর সঙ্গীত-শিক্ষার আর প্রথম জীবনের কথা। তাঁর অসাধারণ গায়ক হবার আর খ্যাতিলাভের কথা।

তাঁর মতন গুণী যেমন কম ছিলেন, তাঁর মতন বিখ্যাতও তেমনি কম ছিলেন। অন্তত বাঙালী গায়কদের মধ্যে। বাঙালী ধ্রুপদ-গাইয়েদের মধ্যে।

এদিকে ত্রিপুরার রাজসভা। ওদিকে পশ্চিমের নানা

দরবার পর্যন্ত তাঁর নাম-ডাক ছড়িয়েছিল। পশ্চিমাঞ্চলের অনেক দরবারে তিনি সম্মান পেয়েছিলেন। কিন্তু, শোনা যায়, যদু বেশি দিন কোথাও থাকতে পারতেন না চঞ্চল স্বভাবের জন্যে। একমাত্র ত্রিপুরার দরবারে তিনি প্রায় ছ'বছর টিঁকে ছিলেন। কিন্তু তা তাঁর জীবনের একেবারে গোধূলি বেলায়। সেই শেষ পর্বে তাঁর চাঞ্চল্য অনেকখানি স্তিমিত হয়ে আসে।

মাত্র ৪৩ বছরের জীবন। তারও প্রায় অর্দ্ধেক কালের সঙ্গীত-জীবন। তার মধ্যেও থাকত না নিয়ম-শৃঙ্খলা, সঞ্চয় আর হিসেবের বুদ্ধি, ভবিষ্যতের জন্যে কোন চিন্তা। শুধু সুরের ডানায় ভর দিয়ে মুক্ত পাখীর মতন বিহার। আর আসক্তি একটি জিনিষে। বাকি সমস্ত বিষয়ে উদাসীন।

বিষ্ণুপুরের সন্তান। প্রথম কিছু সঙ্গীত শিক্ষাও সেখানে। বিষ্ণুপুরের আদিগুরু রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের কাছে। কিন্তু কতটুকুই বা সে শিক্ষা! রামশঙ্করের যখন মৃত্যু হ'ল, যদুর বয়েস তখন ১৩ কি ১৪ বছর। আর গুরুর বয়েস ৯২!

তাঁর মৃত্যুর বছর খানেকের মধ্যেই যদু চ'লে এলেন কলকাতায়। লেখাপড়ার সেখানেই ইতি। তখন মনে তাঁর আকুল আগ্রহ—ভাল ক'রে গান শিখতে হবে। সঙ্গীতের অদম্য আকর্ষণ সেই বালককে একলা কলকাতায় টেনে নিয়ে এল। কলকাতায় অনেক বড় বড় গাইয়ের বাস। সেখানে ভাল ক'রে গান শেখবার সুযোগ পাওয়া যাবে।

এই আশায় যদু বাড়ী থেকে একরকম পলাতক হয়ে এলেন কলকাতায়। সহায়-সম্বলহীন একটি মফস্বলের ছেলে। তাই দুঃখকষ্ট কম পেতে হয় নি। দুর্ভোগ হয়েছে নানা রকম। শেষ পর্যন্ত গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের আশ্রয় পান।

গঙ্গানারায়ণ ইংরেজ আমলের কলকাতার আদিযুগের মহা গুণী ধ্রুপদী। পশ্চিমাঞ্চল থেকে খাণ্ডারবাণী ধ্রুপদ শিখে এসেছেন। বাংলা দেশে তখন তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই ধ্রুপদে। যদুর অসাধারণ গলার পরিচয় একদিন হঠাৎ গঙ্গানারায়ণ পেলেন।

শোনা যায়, যদু নাকি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে প্রথমে পাচকের কাজ নিয়েছিলেন কিছুদিন। একে বয়েস কম, তা ছাড়া অন্য কোন কাজও জানতেন না। কলকাতার আসরে গানকে পেশা ক'রে জীবিকা অর্জন করবার মতন গায়কও তখন হন নি। তাই হয়ত রান্নার কাজ ক'রে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন সে সময়। কিংবা হয় ত সেই অজুহাতে গঙ্গানারায়ণের বাড়ীতে প্রবেশ করেন তাঁর আসল উদ্দেশ্যের জন্যে। গঙ্গানারায়ণ এত বড় গায়ক। তাঁর গান বাড়ীতে থেকে নিত্য শোনা যাবে। সুতরাং শিখে নেবার সুবিধে। এই আশাতেও গঙ্গানারায়ণের বাড়ী কাজ নিতে যদু পারেন। খুব সম্ভব সেই লক্ষ্যই ছিল তাঁর।

যা' হোক একদিন গঙ্গানারায়ণ যদুকে আনমনা গান গাইতে শোনেন, আর শুনেই বুঝতে পারেন—সে কি বস্তু।

তাকে জিজ্ঞেস করেন—গান শিখবে আমার কাছে?

সে আর বলতে। চাটুজ্যে মশায় যদি শেখান দয়া করে। যদুর তার চেয়ে বড় সাধ আর কিছু নেই। যদু তৎক্ষণাৎ রাজি।

গঙ্গানারায়ণ বললেন—বেশ! এবার থেকে আমার কাছে গান শিখবে। আর শোনো। রান্নাঘরে আর তুমি যেও না, ওসব তোমার আর করবার দরকার নেই।

শুধু গান শেখা নয়। যদু গঙ্গানারায়ণের বাড়ী আশ্রয়ও পেলেন। সেকালে এমন হ'ত। আরও কারও কারও জীবনে ঘটেছে এরকম।

যদু রয়ে গেলেন গুরুর বাড়ী। প্রাণ ভরে গান শিখতে লাগলেন সেখানে থেকে। জোড়াসাঁকো, বলরাম দে ষ্ট্রীটের সেই বাড়ীটিতে।

কয়েক বছর ধ'রে তিনি গঙ্গানারায়ণের কাছে ধ্রুপদ গান শিখলেন। খাণ্ডারবাণী রীতির ধ্রুপদ, যাকে তানসেন বলেছেন—গানের রাজ্যে সেনাপতি (ফৌজদার)।

গঙ্গানারায়ণের কাছে শেখবার পর, যদু পশ্চিমে চলে যান। পশ্চিমাঞ্চলের অনেক রাজ্যে ঘোরেন। অনেক দরবারে গান করেন, গান শোনেন। আর শোনা যায়, কোন কোন ওস্তাদের কাছে শেখেনও এক এক সময়। কখনও জানিয়ে, কখনও না জানিয়ে।

এমনি ক'রে তিনি হন বিখ্যাত গায়ক যদু ভট্ট।

সঙ্গীতের আসরে তিনি সাধারণত খাণ্ডারবাণীতে

গাইতেন, শ্রুতিস্মৃতিতে তাই বলে। তাঁর গানে গমকের কাজ খুব বেশি থাকত। আর গলা চড়ত খুব। তারা গ্রামে অনায়াসে তাঁর কণ্ঠ যথেচ্ছ সুর বিহার করত আর সেই সঙ্গে তাঁর স-দাপট গমক।

সব সময়েই তিনি যে গমক-প্রধান পশ্চিমী ধ্রুপদ গান গাইতেন, তা নয়। বাংলা ধ্রুপদও গাইতেন, সেরকম আসর হ'লে। তাঁকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কিছুদিন আদি ব্রাহ্ম সমাজের গায়ক নিযুক্ত করেছিলেন। তখন সমাজে (এবং জোড়াসাঁকো মহর্ষি ভবনেও) তিনি তখন অনেক ব্রহ্ম সঙ্গীত গেয়েছেন। ব্রাহ্ম সমাজে গাওয়া তাঁর সেই সব বাংলা ধ্রুপদও তখন বিখ্যাত হয়েছিল। যেমন—"বিপদ ভয় বারণ, যে করে ওরে মন, তাঁহারে কেন ডাক না" (ছায়ানট, ঝাঁপতাল)। "দেখিয়ে হৃদয় মন্দিরে, ভজ না শিবসুন্দরে" (দেশ, সুরফাঁক্তা) ইত্যাদি।

অত বড় গাইয়ে ছিলেন যদু, কিন্তু নিজের গানের বিষয়ে কোন অহঙ্কার বা অভিমান ছিল না। গানের আসর হবে খবর পেলে কত সময় নিজেই চলে আসতেন সেখানে। তাঁকে সেখানে গাইবার জন্যে আগে হয়ত আমন্ত্রণও জানান হয় নি। কিন্তু সভায় এসে বসবার পর তাঁকে গাইতে অনুরোধ করা হয়েছে। আর গেয়েছেনও তিনি। তখন অত নামডাক,—কিন্তু সে বিষয়ে কোন অভিমান নেই।

বাহ্য অনেক ব্যাপারেই আনমনা। বেশভূষার পারিপাট্যও তেমনি। পরণে যেমন-তেমন একটি কাপড়। গায়ে উড়ুনি জড়ানো। আর পায়ে এক জোড়া চটি। এই বেশে কত বড় বড় আসরেই আসর হয়েছেন। কৃশ, দীর্ঘকায়, শ্যামবর্ণ শরীর যদু ভট্টের। কত আসরের শ্রোতারা প্রথমে গ্রাহ্যই করত না। তারপর স্তম্ভিত হয়ে যেত তাঁর গান শুনে।

পাখোয়াজী কেশব মিত্রের সঙ্গত যদু বড় ভালবাসতেন। কত আসরে যদু গান গেয়েছেন তাঁর বাজনার সঙ্গে। তাঁদের দুজনের মধ্যে বেশ একটি অন্তরঙ্গতার ভাব ছিল। কেশববাবুর বাজনা হবে শুনে অনেক সময়ে যদু নিজের থেকে উপস্থিত হতেন আসরে। তাঁর সঙ্গতে গান গেয়ে তিনি বড় তৃপ্তি পেতেন।

যদু ভট্টের গানের সঙ্গে কেশব মিত্রের পাখোয়াজ! এমন জুটি কমই ছিল তখনকার আসরে।

যদুর সাহসও ছিল খুব। ভয়ডর কাকে বলে, একেবারে জানতেন না। মহা মহা গুণীর পাশে বসে তেজের সঙ্গে গেয়ে গেছেন। পরোয়া করেন নি কাউকে। বড় বড় ওস্তাদের দাপটের সঙ্গে গানের পরে, জমাট আসরে তিনি গান ধরেছেন। তারপর নিজের দিকে ঘুরিয়ে এনেছেন আসরকে। অন্য অনেক গাইয়ে সেখানে হয়ত গান ধরতে সাহস করতেন না, যদু সেখানে গেয়েছেন। আসর মাৎ করেছেন। এমন হয়েছে অনেকবার।

সুবিখ্যাত ধ্রুপদী মুরাদ আলী খাঁ। তার মতন মেজাজী আর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন গাইয়ে সারা ভারতে তখন কমই ছিলেন। সেই মুরাদ আলী এক আসরে গাইছেন। যদু এসে হাজির হলেন সেখানে। মুরাদের গলায় আর সবই ছিল, শুধু তেমন চড়ত না। একেবারে যে চড়ত না, তা নয়। যাঁদের চড়া গলা, তাঁদের হিসেবে গলা সে রকম চড়ার কাজ করতে পারত না মুরাদ আলীর।

সেই আসরটিতেও মুরাদ ডি-তে গাইলেন। গান খুবই ভাল হ'ল। আসর জমজমাট।

তাঁর পরেই যদুর গাইবার পালা। গান আরম্ভ করবার আগে তিনি হাতে সেই তানপুরা তুলে নিলেন। মুরাদের সামনে বসেই তাঁর নিজের হাতে ডি-তে বাঁধা তানপুরার সুর চড়িয়ে নিলেন এফ্-এ। তারপর দরাজ গলায় গাইতে লাগলেন। আর সেই অসম্ভবকেও সম্ভব করে তুললেন। অর্থাৎ, মুরাদ আলীর সেই অপূর্ব জোয়ারীদার গলার পরেই আবার নতুন করে জমালেন আসরকে।

এমন সাহস আর এমন সুর যদু ভট্টের ছিল।

আর একটি আসরের গল্প শোনা যায় তাঁর। এই আসর হয়েছিল রূপচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে, ভবানীপুরে।

মেটেবুরুজের নবাব ওয়াজিদ আলী শা'র এক উচ্চ কর্মচারী রূপচাঁদ মুখোপাধ্যায়। লক্ষ্ণৌর শেষ নবাব 'ওয়াজিদ আলী শা' নির্বাসিত হয়ে এসে মেটেবুরুজে ছিলেন। তাঁর সঙ্গীতপ্রিয়তা আর তাঁর মেটেবুরুজ

দরবারের কথা পরে অনেকবার আসবে। এখানে আর সেসব বলবার দরকার নেই।

রূপচাঁদের কথা বরং একটু বলে নিলে হয়। তিনিও ছিলেন বড় সঙ্গীতপ্রিয়। প্রায় প্রতি সপ্তাহেই তাঁর বাড়ীতে গান-বাজনা হ'ত। আর সেই জলসায় অনেক বড় বড় গাইয়ে-বাজিয়ে আসতেন। বাঈজীদেরও আগমন ঘটত মাঝে মাঝে। মেটেবুরুজের নবাবের প্রিয় এক উচ্চ কর্মচারী ছিলেন বলে তাঁর খাতিরে সেখানকার গাইয়ে-বাজিয়ে থেকে আরম্ভ করে বাঈজীরাও তাঁর বাড়ীর আসরে গান-বাজনা করতেন। তাঁর বাড়ীর জলসা হ'ত উঁচুদরের।

রূপচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের নামে ভবানীপুরে একটি রাস্তা আছে, রসা (এখনকার শ্যামাপ্রসাদ) রোডের পশ্চিমে। সেই রূপচাঁদ মুখার্জী লেন যেখানে কালীঘাট রোডের সঙ্গে মিলেছে, সেইখানে দেওয়ানজীর বাড়ী। এখনও সে বাড়ীর অস্তিত্ব আছে বটে। কিন্তু তার পূর্বরূপ আর নাই। আকার-প্রকারে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে! একটি পরিবর্তন হ'ল—রাস্তার দিকে অনেক ওস্তাদের অনেক গান-বাজনার স্মৃতি-জড়ানো সেই দোতলার প্রকাণ্ড ঘরখানি এখন নিশ্চিহ্ন।

কিন্তু যখন সে বাড়ীর মালিক ছিলেন রূপচাঁদ মুখোপাধ্যায়, যখন সেই জলসাঘর সপ্তায় সপ্তায় গুণীজনের সুরধারায় মুখরিত হয়ে উঠত—তখনকার একদিনের এই কাহিনী।

রাস্তার ধারের দোতলায় রূপচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের জলসা-ঘর। সেখানে সেদিন বড় আসর বসেছে। কয়েকজন ওস্তাদ এসেছেন। কয়েকটি বাঈজীও উপস্থিত। প্রায় সকলেই মেটেবুরুজ দরবারের। আন্সাদ দৌলা, মুস্তাকিন্ দৌলা প্রভৃতি।

মেটেবুরুজের বাইরেকার যাঁরা, তাঁদের মধ্যে ছিলেন পাখোয়াজী কেশববাবু। কোথা থেকে খবর পেয়ে যদু ভট্ট এসে পড়েছেন। তাঁকে গাইবার জন্যে সেদিন নিমন্ত্রণ করে পাঠানো হয় নি। তিনি এসেছেন কেশব মিত্রের বাজনা হবে শুনে। এরকম ভাবে যদু অনেক সময় আসরে চলে আসতেন। তারপর আসর বা বাড়ীর কর্তা তাঁর পরিচয় পেয়ে খাতির-যত্ন করতেন। অনুরোধ করতেন আসরে গাইবার জন্যে।

সেদিন এই আসরে দুজন বাইরেকার গায়ককে গাইবার জন্যে আনা হয়েছিল। তাঁরা পেশাদার এবং ভাল গাইয়ে। কিন্তু কলকাতার সঙ্গীত-সমাজে অপরিচিত। তাই উদ্দেশ্য ছিল এই আসরে তাঁদের গুণপনার পরিচয় দিইয়ে কলকাতার সঙ্গীতক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ ক'রে দেওয়া। স্থানীয় গুণী-দের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ঘটানো।

এখনকার মতন সেকালেও অবস্থা অনেকটা একরকম ছিল। এখনও যেমন, তখনও তেমনি কলকাতাই ছিল সঙ্গীত ও সঙ্গীতজ্ঞদের শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক, সারা ভারতবর্ষের মধ্যে। সে প্রায় ৯০ বছর আগেকার কথা। কলকাতা তখন ভারতবর্ষের রাজধানী। শুধু রাষ্ট্রনীতিক নয়, সাংস্কৃতিক জীবনেরও রাজধানী কলকাতা। সঙ্গীতকে যিনি জীবনের অবলম্বন করতে চান, বৃত্তিরূপে তার চর্চা করতে চান, তাঁকে কলকাতায় আসতে হবে। অন্তত কখনও কখনও। এলে তাঁরই সমাদর বাড়বে, তাঁর গুণপনা প্রতিষ্ঠা লাভের সুযোগ পাবে। আজও কলকাতা সঙ্গীত বিষয়ে তেমনি অতিথি-বৎসল, যদিও বাহ্যত রাজধানীর গৌরব তার অনেককাল নেই।

যাক সে কথা।...দেওয়ানজীর আসরে পশ্চিমের সেই দুই গায়কের গান হ'ল। আসরে তাঁদের গানের সকলে সুখ্যাতি করলেন। তাঁদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হ'ল উপস্থিত গুণীদের সঙ্গে। তাঁদের গান শুনে সকলের মনে বেশ ভাল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। আসরে তাঁরা বেশ প্রভাব বিস্তার করেছেন, বলা যায়।

এমন সময় গাইতে অনুরোধ করা হ'ল যদু ভট্টকে। তিনি যখন এসেছেন আসরে, তখন তাঁকে গাইতে না বলার কথা কেউ ভাবতে পারেন না। আর অনুরোধ করলে তিনি গাইবেনই। গাইবেন আপনার অন্তরের তাগিদে। গানের আসরে গান না গেয়ে তিনি পারেন না। কারণ গান তাঁর দ্বিতীয় সত্তা। গাইবার জন্যে নিমন্ত্রিত হয়ে আসেন নি। অতএব 'আজ গলা খারাপ আছে' এমন মিথ্যে অজুহাত দিয়ে এড়িয়ে যাবার পাত্র নন তিনি। গানের ব্যাপারে কোন ন্যাকামি কিংবা বাজে অহমিকাবোধ তাঁর ছিল না।

তিনি সম্মত হয়ে তানপুরাটি তুলে নিলেন। সুর নতুন করে বাঁধবেন। এই তানপুরাতেই গান গেয়েছেন আগেকার সেই দুই গায়ক। তাঁদের বয়েস খুব বেশি নয় আর গলাও বেশ তেজী।

কিন্তু যদু তাঁদের বাঁধা তানপুরা হাতে নিয়েই তিনি পর্দা চড়িয়ে বাঁধলেন। সুর ক'রে নিলেন মধ্যমকে—উদারার মা-কে করলেন খাদের সা। তারপর তাঁর স্বভাব-সিদ্ধ দরাজ কণ্ঠে গান আরম্ভ ক'রে দিলেন। তাঁর গানের প্রথম চোটেই সেই দুই গায়ক যে কোথায় তলিয়ে গেলেন তা জানতেও পারলেন না তিনি।

কিন্তু সে বেচারাদের তা' বুঝতে বাকি রইল না। আর যাঁরা তাঁদের সে আসরে গাইবার ব্যবস্থা করেছিলেন, তাঁরাও বুঝলেন বিলক্ষণ। সে দুজনের গানে আসরে যে ছাপ পড়েছিল, যদুর ওই মধ্যমকে সুর করে আর সেই অপূর্ব গলায় গান আরম্ভ করবার সঙ্গে সঙ্গেই তা' একেবারে মুছে গেল। কিন্তু কি আর করেন তাঁরা। বসে বসে শুনতে লাগলেন।

যদু ততক্ষণে সমস্ত আসরটিকে বেঁধে ফেলেছেন সুরের জালে। পাখোয়াজ সঙ্গত করছেন কেশব মিত্র।

খানিক পরে আবার একটি ছোট্ট ঘটনা ঘট্‌ল। যদুর গানই তখন চলছে।

তিনি যেখানে বসে গাইছিলেন, তার অনতিদূরে বসেছিল বাঈজীরা। তারাও যদুর গান শুনছিল বটে, কিন্তু বোধ হয় কিছু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। কিংবা হয়ত ঠিক খেয়াল করে নি যদুর গানের পদ্ধতি।

তিনি তখন খানিকক্ষণ ধরে খাদের কাজ করছিলেন। বাঈজীরা তা' মন দিয়ে না শোনার জন্যেই সম্ভবত বুঝতে পারে নি যে গায়ক স্বেচ্ছায় উদারায় নেমেছেন। তারা ভাবলে, তিনি বোধ হয় ঠিক সুরে ফিরতে পারছেন না। বেসুর হয়ে পড়ছেন।

তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল—সুরমে গানা বহুৎ কড়া হ্যায়। (সুরে গাওয়া বড়ই কঠিন!)

কথাটা হঠাৎ যদুর কানে গেল। শোনবামাত্র তিনি এক মুহূর্ত গান থামিয়ে তাদের দিকে গর্জন করে উঠলেন—চোপ্ রও।

বলেই একেবারে গলা চড়িয়ে তারা গ্রামে এমন গমক ছাড়লেন যে আসরে যেন বিদ্যুতের চমক খেলে গেল।

সচকিত বাঈজীরা স্বতস্ফূর্তভাবে বলে উঠল—শের হ্যায়!

অর্থাৎ যদু যেন বাঘের মতন।

এটি তুলনা নয়, উপমা।......

যদু গান শেষ করলেন, শ্রোতাদের প্রশংসায় ধন্য হয়ে। কিন্তু সে আসরের জের সেখানেই মিটল না।

সেই আসরের সূত্র ধরে যদু ভট্টের সুখ্যাতি পৌঁছল মেটেবুরুজ দরবারে। সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীতপ্রেমী নবাব ওয়াজিদ আলী যদু ভট্টের গুণপনার কথা শুনলেন: অসাধারণ সেই বাঙ্গালী গায়কের গলা। তাঁর গান শোনবার জিনিষ, ইত্যাদি।

সেই বাঈজীরা এবং মুস্তাকিন্ দৌলা, আন্‌সাদ দৌলা সকলেই ফিরে গিয়ে যদু ভট্টের গানের গল্প করতে লাগলেন মেটেবুরুজে। তাঁদের মুখে নবাব যদু ভট্টের গানের কথা শুনলেন। মুস্তাক ও আন্‌সাদ নবাবকে জানালেন যে, এমন ওস্তাদের গান খুব কমই শুনেছেন তাঁরা।

বাঈজীরা সেই মন্তব্যই করলে—শের হ্যায়।

নবাব তার আগে যদু ভট্টের কথা কিছু জানতেন না। এই সব শুনে যদু ভট্টকে একদিন মাইফেলের নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন। কেশববাবুকেও আমন্ত্রণ করা হ'ল তাঁর সঙ্গে পাখোয়াজ সঙ্গত করবার জন্যে।

মাইফেলের দিন স্থির হ'ল একটি শনিবার। যদুর গানের জন্যেই সেদিন বিশেষ জলসার আয়োজন হয়েছে দরবারে।

যদু ভট্ট উপস্থিত হয়েছেন। কেশববাবুও এসেছেন। অন্যান্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা, গায়ক-বাদক আর শ্রোতারাও এসে গেছেন সকলে।

নবাব তাঁর দরবারের নিজস্ব আসনে বসলেন। এই-বার যদুর গান আরম্ভ হবে। যথারীতি কায়দামাফিক তাঁকে অনুরোধ জানানো হ'ল।

তিনি তানপুরার সুর মিলিয়ে নিলেন মনের মতন করে। কেশববাবুও তার সঙ্গে পাখোয়াজ বাঁধলেন।

এবার যদু ভট্ট গান আরম্ভ করবেন। নবাব এবং আসরের অনেকেই তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে।

কিন্তু যদুর গান আরম্ভ হচ্ছে না। তিনি উসখুস করছেন। এদিক্-ওদিক্ চাইছেন আর মুখ খোলবার যেন লক্ষণ নেই।

কি ব্যাপার? গান আরম্ভ করছেন না কেন?

শ্রোতাদের সঙ্গে নবাবও কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। একজন অনুচরকে দিয়ে জানতে চাইলেন—কি হয়েছে গায়কের? এবার গান ধরবেন ত?

নবাবের হয়ে যদুর কাছে এসে সেকথা জিজ্ঞেস করলেন একজন। সেই সঙ্গে গান আরম্ভ করবার জন্যে আর একবার অনুরোধ জানালেন।

যদু তখন সেই ব্যক্তির প্রশ্নের সদুত্তর দিলেন কানে কানে।

সুর ভিন্ন জীবনে যদু ভট্টের দ্বিতীয় আসক্তি আর একটি-মাত্র বস্তুতে। শুনতে তা অনেকটা সুরেরই মতন।

গান আরম্ভ করবার আগে এখন একটু হ'লে ভাল হয়। এখানে সুবিধে হবে কি?

এই ইচ্ছা সবিনয়ে এবং ইসারায় যদু সেই ব্যক্তিকে জনান্তিকে জানালেন, নবাবের সম্মতির জন্যে।

নবাব তা জানতে পেরে বললেন যদুকে দরবারেরই লাগাও একটি ঘরে নিয়ে যেতে।

যদু উঠে গেলেন নির্দিষ্ট কামরায়। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এলেন। আসরের কেউ কেউ বুঝতে পারলেন, কেউ বা বুঝলেন না এই যাতায়াতের কারণটি। কেশববাবু বিলক্ষণ বুঝলেন।

যদু এবার বেশ প্রফুল্ল হয়ে গান ধরলেন। গান আরম্ভ করবার আগে শুধু একবার কেশববাবুর কানের কাছে মুখ এনে ফিস্‌ফিস্ ক'রে বললেন—ওঃ, কি জিনিষ! আমার চোদ্দ পুরুষে কখনও এমন···

কথা শেষ ক'রেই তিনি গান সুরু ক'রে দিলেন। মেজাজ তখন অতি চমৎকার।

তখন আসরের যদু ভট্ট! অন্য কোন ভাব নেই। অন্য কোন ভাবনা নেই। সুরের মধ্যে তন্ময় হয়ে গেলেন নিজে। আর শ্রোতাদের তন্ময় করতে আরম্ভ করলেন।

সমস্ত তুচ্ছতাকে নীচে ফেলে রেখে তিনি যেন কোথায় উঠে গেলেন, অসীম আকাশে সুরচারী হয়ে। সঙ্গে মৃদঙ্গের মেঘধ্বনি। সারা দরবার সুরে সুরে ভ'রে উঠল।

নবাব সুরের আবেশে আপন আসন ছেড়ে যদুর সামনে এসে শুনতে লাগলেন।

আসরের সবাই মোহিত হয়ে গেলেন যদুর গান শুনে। নবাবও পরম পরিতৃপ্ত হলেন।

গান শেষ হ'তে সকলে সাবাস বলতে লাগলেন যদুকে।

নবাব এতদূর মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। উচ্ছ্বসিত হয়ে উর্দুতে যদুকে যা বললেন, তার অর্থ—আপনার গান শুনে আমি আজ বড় খুশী হয়েছি। আপনাকে আমি পুরস্কার দিতে চাই। কি নেবেন, কি চান আপনি, বলুন।

যদু ততক্ষণে সুরের নভোমণ্ডল থেকে নেমে এসেছেন কাদামাটির পৃথিবীতে।

তাই নবাবের 'কেয়া মাংতা, বলিয়ে'-র জবাবে সাফ বললেন—ওই চীজ!

তখন নবাবের হুকুমে আবার যদুকে নিয়ে যাওয়া হ'ল, দরবারের পাশের সেই ঘরটিতে।

যদু ভট্টের অনেক গল্পের মতন এটিও বলেন কেশববাবু। সেই আসরের কথায় তিনি বলতেন—যদু ভট্টের গান শুনে নবাবের তখন এমন খোসমেজাজ যে সেদিন সে লাখ টাকা চাইলেও নবাব পেছপা হতেন না। কিন্তু যদু চেয়ে বসল—ওই চীজ্!

—

রায়বাড়ী

শ্রীগিরিবালা দেবী

তরুর হইয়াছিল আজ সুপ্রভাত। গত সন্ধ্যায় বধূর নিকটে তাহাদের গ্রামে কার্ত্তিক পূজার উল্লেখে সে একটু খর্ব্ব হইয়াছিল। প্রভাতের সোনার আলোয় তাহার গ্রাম্য মর্য্যাদা বৃদ্ধি হইয়াছে। দ্বিপ্রহর অতীত হইতে না হইতে সে সারা বাড়ীতে প্রচার করিতে লাগিল, ফুলমণির চারিটা শাবক প্রসবের বার্ত্তা। রায়বাড়ীর শস্যপূর্ণ মাচার জালার আড়ালে ফুলমণির সূতিকাগার।

সর্ব্বঘটে বিরাজমান ঠাকুমা সানন্দে মাথা দুলান, "ভাল দিনেই বাচ্চা হইচে। অদিনে অক্ষণে কুকুর-বেড়ালের বাচ্চা হওয়া ভাল নয়। তাতে গৃহস্থের বাড়-বাড়ন্ত হয় না।"

কামিনীর মা চাপিয়া ধরে তরুকে, "হেই ছোট্টু-ঠাকুজ্জি, তোমাগো নাতি নাতিন হইচে, মেঠাই-মণ্ডা খাইতে দেও সকলেরে।"

তরু চটিয়া যায়, "মেঠাই খেতে চাও খাওয়াব কামিনীর মা। কিন্তু তুমি আর কখনও ওই অসভ্য কথা বলতে পারবে না।"

কামিনীর মা হাসে খিল্ খিল্ শব্দে। তরু তাহার হাতে মানুষ। খাইতে চাহিলে দরাজ হাতে খাইতে দেয় তাহাকে। পিতার নিকট হইতে টাকা চাহিয়া আনে, লোক পাঠাইয়া বাজার হইতে মিষ্টান্ন আনিয়া দাস-দাসী মহলে বিতরণ করে। তরু পিতার অত্যন্ত আদরিণী।

আদরিণীর আজ আর পিতার কাছে প্রার্থনা লইয়া উপস্থিত হইতে হইল না।

অপরাহ্নে মথুরা দত্ত দই, ক্ষীর, গামলাভরা ক্ষীর-চমচম ও সন্দেশ লইয়া জমিদারকে যুক্তকরে সবিনয়ে নিমন্ত্রণ করিয়া গেল পূজার আঙ্গিনায় পদধূলি দিতে।

তরু আনন্দে ডগমগ। সত্যই ফুলমণির ছানাদের পয় আছে। কত মিষ্টি আসিয়াছে ভারে ভারে, কে ক[ত] খাইবে?

ইতিমধ্যে তরু বাহির-মহল হইতে সংবাদ সংগ্র[হ] করিয়া বিনুকে জানাইয়া দিয়াছে, আগামীকাল অগ্রহায়ণ মাস আরম্ভ হইবে। কাল রবিবার। এ রবিবারের পরের রবিবারে রায়বাড়ীর নবান্ন। নবান্নের পরের দিন বিনু যাইবে পিত্রালয়ে। সেখান হইতে কাহাকেও আসিতে হইবে না। রায়বাড়ীর গরুর গাড়িতে বধূকে পৌঁছান হইবে। নিজেদের দুইখানা গাড়ি, দুই জোড়া বিশালকায় বলদ থাকিতে রায়বাড়ীর বধূ ভাড়াটে গাড়িতে পদক্ষেপ করিতে পারে না।

পল্লীগ্রামবাসীদের প্রধান যানবাহন বর্ষায় নৌকা, গ্রীষ্মে গরুর গাড়ি অথবা পাল্‌কি। কিন্তু এ সময়টা পাল্‌কি-বেহারা কুর্ম্মী কাহারের দল বৎসরান্তে দেশে চলিয়া যায় ধান কাটিতে। বিবাহের মরশুমে ফের ফিরিয়া বন্দরে বন্দরে আস্তানা গাড়ে।

তরু আরও খবর দিয়াছে, দিন পনেরর বেশী বিনু সেখানে থাকিতে পারিবে না। পৌষ, চৈত্র ও ভাদ্র মাসকে রায়বাড়ীর নববধূকে এক বছর মানিয়া চলিতে হইবে। যাতায়াত চলিবে না। অগ্রহায়ণের শেষে বিনুকে আবার ফিরিতে হইবে। এ ব্যবস্থায় বিনু খুশী হইতে পারিল না। যে মাসে যাওয়া সেই মাসেই যদি আসিতেই হয় তাহা হইলে মাস-পয়লা পাঠাইয়া দিলে কি ক্ষতি হইত?

ইহাদের কাটা নূতন ধানের আঁটিতে মণ্ডপের আঙ্গিনা ভরিয়া গিয়াছে। তাহাদের সেখানে কি ভরিয়া যায় নাই? ইঁহারাই নবান্ন করিতে জানেন, তাঁহারা কি নবান্ন করেন না? নবান্নের ছুতা ধরিয়া বৌকে আটকাইয়া রাখে কে?

দিনের আলো নিবিয়া গেলে বিনু তাহার কর্ম্মশালায়

অভ্যাসবশতঃ একবার ঢুকিয়াছিল। মনোরমা তাহাকে অব্যাহতি দিলেন। এ বেলা সমস্ত দুধের ছানা কাটিয়া রাখা হইবে। যে দই-ক্ষীর আসিয়াছে তাহার সদ্ব্যবহার করা চাই।

মনোরমার হাতে জিলেপি ও পানতুয়া উতরাইয়া যায় অপূর্ব্ব স্বাদের; মাঝে মাঝে স্বহস্তে ছানা কাটিয়া বিধবাদের জন্য ভোগের ঘরে বসিয়া তাঁহাকে পানতুয়া জিলেপি ভাজিতে হয়। যেখানে রন্ধন হইবে তাহার সন্নিকটে বিধবাদের হবিষ্যি করিবার নিয়ম। অন্যত্র হইতে প্রস্তুত খাদ্য তাহাদের অচল।

নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ও বিধবারা ভাজা জিনিষ 'ভাতের পাত' ভিন্ন খাইতে পারে না। মনোরমা খুঁত খুঁত করেন তাঁহার বিপুল পরিশ্রমের পানতুয়ায় রস ঢোকার অবকাশ পায় না বলিয়া। তবু ঘরে ছানা করিয়া নানাবিধ খাদ্য তাঁহাকে প্রস্তুত করিতে হয় সরস্বতীর জন্য। বেচারা জীবনে কিছুরই আস্বাদ পাইল না।

সন্ধ্যা-সমাগমে দত্তবাড়ীতে কাত্তিক পূজার ঢাক-ঢোল, কাঁসি বাজিতে লাগিল। মশালের আলোয় গলিপথ আলোকিত হইল। কাত্তিক পূজার ঢাকের বোল বিনু জানে। তাহার বোল হইল—"জিজিং জিজিং জিংলা কাত্তিক ঠাকুর হ্যাংলা, একবার আসে মায়ের সাথে, আবার আসে একলা।"

কোন্ পূজায় ঢাকের কি বোল বিনু তাহা শুনিলেই বুঝিতে পারে। পারিবেই না কেন—জন্মের সঙ্গে সঙ্গে পূজা-পার্ব্বণের মধ্য দিয়া তাহার জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে।

আলো-আঁধারে পূবের বারান্দায় বিনু চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, বাজনার শব্দ তাহাকে যেন কেমন উন্মনা করিয়া তুলিল।

তাহাদের বাড়ীর সংলগ্ন সাহাদের গৃহে কাত্তিক পূজায় কত ধুম, আনন্দ, এবার তাহার কাত্তিক পূজা দেখা হইল না। জগদ্ধাত্রী পূজায় যোগ দেওয়া হইল না। সর্ব্বাপেক্ষা পরিতাপ বিনু নাকালিয়ায় রাসের মেলায় যাইতে পারিল না।

নাকালিয়া বন্দরেই বিনুদের আদি নিবাস ছিল। হীরাসাগরের আক্রমণে খানিকটা দূরে তাহারা সরিয়া আসিলেও বন্দরের সহিত যোগ বিচ্ছিন্ন হয় নাই।

বন্দর ব্যবসায়ীদের স্থান। বিত্তশালী ব্যবসায়ীরা সকলে মিলিয়া মহা সমারোহে রাসযাত্রা নির্ব্বাহ করে। রাসের মঞ্চ হয় মনোরম। বৃক্ষের শাখায় পল্লবে ফুলে প্রস্তুত হয় বিরাট্ রাস-মঞ্চ। মাঝখানে বেদীতে বন্দরের জাগ্রত দেবতা জগন্নাথদেবের দারুমূর্ত্তি বিরাজ করেন। তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া অগণিত গোপিনী, অগণিত শ্রীকৃষ্ণের মনোহর মূর্ত্তির সমাবেশ।

বিরাট্ মেলা বসিয়া যায় দিগন্ত-প্রসারিত প্রান্তরে। দেশ-দেশান্তর হইতে মহাজনী নৌকায় পণ্যদ্রব্য আসে ভারে ভারে।

যাত্রা, কবি গানের ও পুতুল নাচের আসর বসিয়া যায়। বাউলের দল একতারা বাজাইয়া নাচিয়া নাচিয়া গান ধরে—

"আমার যেমন বেণী তেমনি র'বে, চুল ভেজাব না।
জলে নামিব, জল ছিটাইব,
আথালি-পাথালি সাঁতার কাটিব,
চুল ভেজাব না।"

বিনুর অত্যাচারে আবদারে অতিষ্ঠ হইয়া ঠাকুরদা তাঁহাকে নৌকা ভাসাইয়া লইয়া যাইতেন রাসের মেলায়। কি ভিড়, লোকে লোকারণ্য। স্তূপ স্তূপ কত জিনিস।

খেলার তৈজসপত্র কিনিয়া দিয়া, পুতুল নাচ দেখাইয়া ঠাকুরদা সন্ধ্যা হইতে না হইতে তাহাকে লইয়া নৌকায় ফিরিতেন।

অনন্ত নীলাকাশ হইতে রাসপূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র গলিত রজত-ধারা ঢালিয়া দিতেন ভুবনে। হীরাসাগরের কল-কল্লোলে মিশিয়া যাইত বাউলের উদাস স্বর—"যেমন বেণী তেমনি র'বে, চুল ভেজাব না।"

নবীন টেবিলের উপরে আলো রাখিয়া গিয়াছে। বিনু টেবিলের সামনে দাঁড়াইয়া খাতা দেখিতেছিল। খাতার সাদা পাতা যেমন ছিল তেমনি পড়িয়া আছে; তাহাতে কালির আঁচড় পড়ে নাই। লিখিতে তাহার ভাল লাগে

না। পড়ার বই পড়িতও না। গত রাত্রে চিঠি লিখিতে বসিয়া অনেক কাগজে লেখা হইয়াছে, অনেক কাগজ ছেঁড়া হইয়াছে। আজ কাজকর্ম্ম বিশেষ নাই, একটু ঘুমাইয়া লইলে মন্দ হইবে না। কত কাল সন্ধ্যাবেলা বিনু ঘুমাইতে পারে নাই। কামিনীর মা পিছনে লাগিয়া থাকে। ঠেলিয়া পাঠায় কর্ম্মশালায়।

আজ কামিনীর মা বাড়ীতে নাই। দল বাঁধিয়া গিয়াছে কার্ত্তিক পূজা দেখিতে। তাহাদের শুধু "রথ দেখা ও কলা বেচার" উদ্দেশ্য নয়। কৌতূহল প্রবল, মথুরাবাসিনী মধুরহাসিনী ললিতা বৌয়ের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া দেখার।

কামিনীর মা না থাকুক, তরু ছিল বাড়ীতে। তরু পিছন হইতে ডাকিল, "ও বৌদি, একা কি করছ? সবাই গেছে ঠাকুর দেখতে। নবীনের কোলে চেপে সুমন্ত গেল ফুলদার সংগে।

বিনু মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "নেমন্তন্ন খেতে বুঝি? তুমি গেলে না তরু?"

তরু বলে, "শূদ্দরের বাড়ীতে কি ব্রাহ্মণ পাতা পেতে নেমন্তন্ন খায় বৌদি? ওদের ত ঠাকুর-দেবতাকে অন্ন-ভোগ দিতে নেই। ফুলদাকে বাবা পাঠিয়েছেন নেমন্তন্ন রক্ষে করতে ঠাকুরের প্রণামী দিয়ে। ফুলদার ইচ্ছে হ'লে একটা মিষ্টি মুখে দেবে, নয়ত এক খিলি পান কি একটা এলাচ তুলে নেবে। আমাদের নিয়ম, রাজা প্রজা যে হোক্ না, নেমন্তন্ন রাখতে বাড়ীর ছেলেদের এক-জনাকে যেতেই হয়। রায়বাড়ীর মেয়েরা তাদের প্রজার বাড়ী নেমন্তন্নে যায় না। বাবা একশ' টাকা দিয়েছেন ঠাকুরের প্রণামী, ফুলদার হাতে।"

বিনু জমিদার-ভবনের রীতি-নীতি জানে না। সে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে, "টাকা দিয়ে ওরা করবে কি?"

"পুজোয় খরচ করবে। ওদের দেওয়া খাবার আমরা খাব"—বলিয়া তরু আঁচলের ভিতর হইতে কলার পাতায় মোড়া একটা সন্দেশ ও চমচম বিনুর হাতে অর্পণ করিয়া কহিল, "বৌদি, একটু চেখে দেখ, সুন্দর তৈরি করেছে। মা ছানা-মাখন নিয়ে ঢক ঢক করছেন। তাঁর কাজ সারা হ'লে সবাইকে ভাগ করে দেবেন। ভাগ হবার আগেই আমি চেখে দেখে তোমার জন্যে নিয়ে এলাম, খাও।"

বিনু কুণ্ঠিত হইল, এ তেঁতুল কামরাঙ্গা নয়, সন্দেশ চমচম। তরু লুকাইয়া খাইতে পারে, খাইয়াও থাকে; কিন্তু বিনু কেন চুরির ভাগ লইবে?

বিনু সবেগে ঘাড় নাড়ে—"না, আমি খাব না, তুমি খেয়ে ফেল। মা যখন দেবেন তখন খাব।"

"টক খেতে যখন ডাকি তখন ত না কর না বৌদি? আজ মিষ্টি দিতে এলাম অমনি না বললে? যাই, আমি যেখানকার জিনিস সেইখানে রেখে দিই গে। মা এক্ষুণি ভাগ-জোক করতে বসবেন। ঠাকুর দেখে সবাই ফিরে আসবে। আর কখনও তোমাকে আমি কিছু দিতে আসব না।"

অভিমানে তরু ঠোঁট ফুলাইল।

তরুকে অসন্তুষ্ট করিতে বিনুর সাহস হইল না। মেয়েটি পাকা মুখরা হইলেও তাহাকে ভালবাসে।

সন্দেশ ভাঙ্গিয়া মুখে দিতে দিতে বিনু বলিল, "তুমি আমার কাছে আজ থেকে শোবে তরু, মস্ত বিছানা।"

তরু উত্তর দেয়, "তুমি বাপের বাড়ী থেকে ঘুরে এলে তখন শোব বৌদি, তোমার ঘর বিছানা সবই ত ভাল। ভাল না ছোট ঠাকুমার ঘুমের মধ্যে ফুঃ ফুঃ শব্দ। আমার ভাল লাগে না।"

বিনুরই কি ভাল লাগে? ছোট ঠাকুমার দাঁত নাই। ঘুমাইলে ফোকলা মুখ হইতে একটা ফুঃ ফুঃ বিকট শব্দ বাহির হয়। শুনিয়া বিনু ভাবে, ইহা অপেক্ষা নাসিকা-গর্জ্জন অনেক ভাল। আসল কথা প্রসাদের ঝক্‌ঝকে মেহগনি খাটে পোড়া-কাঠ ছোট ঠাকুমাকে বিনু সহিতে পারে না। ওই নরম শুভ্র শয্যায় শোভা পায় বলিষ্ঠ গঠনের প্রিয়-দর্শন এক তরুণকে। যাহার টানা টানা চোখ, মাথাভরা ঘন কালো কুঞ্চিত কেশের স্তবক, সর্ব্বাঙ্গ চন্দন সৌরভে সুবাসিত। নহিলে বিনু একবার বিছানা লইলে কোথায় থাকেন ছোট ঠাকুমা, কোথায় তাঁহার ফুঃ ফুঃ।

সন্দেশ চমচম খাওয়া হইলে বিনু জল খাইয়া মুখ-হাত মুছিল।

তরু বলে, "তোমার কাছে শোব না, শুনে তুমি কি রাগ করলে বৌদি?"

"না, রাগ করব কেন? ক'দিন পরেই ত শোবে বললে। ভারী ত পনেরটা দিন, একদণ্ডেই ফুরিয়ে যাবে।"

"পনের দিন কি অল্প হ'ল তোমার? আমি মাষ্টার-মশাইয়ের কাছে শুনেছি, ওকে এক পক্ষ বলে। এক পক্ষ থাকবে—তাতেও তোমার মন ওঠে না। না যাওয়ার চেয়ে 'নাই মামার থেকে কাণা মামা কি ভাল নয়'? বৌদিরা, দাদা নেই, দিদিরা নেই, তুমিও থাকবে না, তাতে কি আমাদের ভাল লাগবে? সেই জন্যেই আমি বাবাকে বলেছিলাম 'বেশী দিন বৌদিকে বাপের বাড়ী রেখ না'।"

তরুর গলার সুরটা সহসা কেমন যেন ভাঙ্গা ভাঙ্গা নরম শোনাইতেছিল।

সেই স্বরে বিনুর হৃদয় ঈষৎ স্নেহে সিক্ত হইল। সে বলে, "তোমাদের ছেড়ে থাকতে আমারও বোধ হয় তেমন ই-য়ে"—

কার্ত্তিক দর্শন করিয়া সকলেই ফিরিয়া আসিয়াছে। মা মিষ্টি বিলাইতে সকলকে ডাকিতেছেন। দাস-দাসী-দের নাম ধরিয়া।

বিনুর মন্তব্য শেষ হইল না। তাহারা উভয়ে গোপনে গাছের খাইয়াছে, এখন তলার খাইতে হাত ধরাধরি করিয়া বাহির হইল।

সরস্বতী জপের মালা লইয়া বসিয়াছিল।

হারাণীকে নিকটে পাইয়া মালা কপালে ঠেকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁরে হারাণি, কেমন পুজো দেখে এলি? বেনে-বাড়ীতে ঠাকুরের ভোগ দিচ্ছে কি দিয়ে? পুরুত পেয়েছে ত?"

হারাণী হাসিমুখে বিবরণ দিতে লাগিল, "হঁ, ঠাকুজ্জি পুরুত আইচে বাপে ব্যাটায়। বাপে পূজ্যায় বসিছে, ব্যাটায় লুচি-পুরী হালুয়া করিছে ভোগের নাগি। দত্তর দুই বুন আসিছে ছাওয়াল ম্যায়া নিয়া। কাছে-পিঠের কুটুম-কাটমে বাড়ী ভরি গিইচে। মেঠাই-মণ্ডা ফল-পাকুড়ে দই-ক্ষীরে পূজ্যার ঘর থই থই করিছে। করিবে না, টাকাওয়ালা দত্ত, দত্ত-গিন্নীরও কাঁড়ি কাঁড়ি টাকায় ছাতা পড়ি যাইচে। কিন্তুক টাকায় কারুর সুখ নাই। নলিতা বৌডা জ্বালায়ে মারিচে সকলকে।"

সরস্বতীর আঙুলের মধ্যে জপের মালা মধ্যদেশে পৌঁছিয়াছিল, সুতরাং সে এখন কথা বলিতে পারে না।

সরস্বতী হারাণীকে সমর্থন করিয়া ঘাড় নাড়িল। হারাণী মহা উৎসাহে ফের সুরু করিল, "এই যে পূজ্যা হইছে, বৌয়ের সেদিকে নজর নাই। সাজিয়া-গুজিয়া চপ চপ কইর‍্যা পান খাইছে, আর হাসি-মস্করা করিছে সগলের সাথে। বড়বৌ, বুড়া শাউড়ী খাটি খাটি খুন। দত্তগিন্নী আমাগো ডাকি কইল, 'হারাণি মা, দেখিছিস্ ছোটবৌর ব্যাভারখানা? নাতির আশায় আমি বড়বৌরে দাগা দিয়া ব্যাটারে ভজায়ে ভজায়ে আঁটকুড়ির বিটিরে 'খাল কাটি কুমীর' আনিছিলাম। ও না করে ঘরের কাজ, না থাকে সোয়ামীর কাছে। খাই-দাই পক্ষী হইয়া সাজি সাজি ঘুরে বেড়ায় নাগরের খোঁজে। বড়বৌর কাছে দোষ করিছিলাম—সে এহন আমাগো ছাড়ি কথা কয় না। তোরা আশীর্ব্বাদ কর্, বড়বৌর কোলে কার্ত্তিক ঠাকুর ছাওয়াল হইয়া আসুক।'

"আমি কইলাম, 'চুবাও মা চুবাও; নোকজনের মধ্যি শুভকর্ম্মে ছেনালের কথা দিয়া কাজ নাই। দেওনওয়ালার মর্জ্জি হইলে তোমার বড়কীর কোলেই সোনার চাঁদ আসিবে। মরাগুকান ডালেই ফুল ফুটিবে'।"

সরস্বতীর জপের সংখ্যা পূর্ণ হইয়াছিল। সমাপ্তির কেষ্ট কেষ্ট কেষ্ট, হরে রাম হরে আবৃত্তি আরম্ভ করিল, "হরে কেষ্ট হরে কেষ্ট, কেষ্ট কেষ্ট হরে হরে, হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে।"

ঠাকুমা হাতার মাথায় বসিয়া নিঃশব্দে সাধুপ্রসঙ্গ শ্রবণ করিতেছিলেন। রাত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার শয়নের সময় হইয়াছে। তিনি উঠিয়া যাইবার সময় নাক-সমান ঘোমটার ভিতর হইতে একটি তীর নিক্ষেপ করিয়া গেলেন—

"বুড়া যদি করবি বিয়া বুড়ী ধরে কর,
ছুঁড়ি কেনে ছোঁড়া থুয়ে করবে বুড়ার ঘর।"

রাত্রির তরল আবছা অন্ধকার মিলাইয়া যাইতে না

যাইতেই ধানভাহুনীরা আসিয়া হাজির হইয়াছে। নবান্নের নূতন ধানের চাল করা হইবে। সম্পূর্ণ ধান এখনও মাড়াই হয় নাই। মণ্ডপের আঙ্গিনায়, কাছারি বাড়ীর আঙ্গিনায় আঁটি আঁটি কাটা ধান পাহাড়ের মতন স্তূপ করিয়া 'পালা দিয়া' রাখা হইয়াছে। এখনও গরুর গাড়ি বোঝাই হইয়া আঁটি-বাঁধা কাটা ধান মাঠ হইতে আসিবার বিরাম নাই।

কর্ত্তা কেবল জমিদারী লইয়া প্রজা ঠেঙ্গাইতেই ভালবাসিতেন না, তাঁহার ক্ষেত-খামারের সখও ছিল অপরিসীম। তাই রায়বাড়ীর শস্যপূর্ণ ক্ষেতের সংখ্যা সংখ্যাতীত।

কয়েকটা দিন ঠাকুমা যেন কেমন নিস্তেজ বিমনা হইয়া ঝিমাইতেছিলেন। ছোট হোক বড় হোক, উৎসবের সূচনায় আজ তিনি সজীব হইয়া উঠিয়াছেন। আসন লইয়াছেন বিহুর শয়ন গৃহের পূবের বারান্দার সোপানে।

সামনেই ঢেঁকিশালা—দুই ধানভাহুনী ঢেঁকিতে পাড় দিতেছে ধুম ধুম। পাড়নের সম্মুখে খুপরি পিঁড়িতে বসিয়া কামিনীর মা ধান 'আলাইয়া' দিতেছে।

ঠাকুমা কহিলেন, "কয়কুড়ি ধান আনাইছিলি মরাই থেকে রাজেশ্বরী? টুকটাক পুজো-পার্ব্বণ হলেও মাসভরা লেগেই থাকবে। তন্বির চারটে নাটাই বত্ত, চার দিন হুনে আহুনে পিঠা করে দিতে হবে পুজোর। নবান্নের পরেই মুলোষষ্ঠী। যত জনার ষষ্ঠী বত্ত তত জনের নামে নামে নতুন চালের পিঠালি দিয়া কলার পাতায় গরু-বাছুর বানিয়ে দিতে হয়। ফল-মিষ্টির সাথে জোড়ায় জোড়ায় মুলো লাগে। পুজো হ'লে ষষ্ঠীর কথা শুনে ফুল-জল নিয়ে পাতার গরু-বাছুর দিতে হয় বিস্না ঝোপের ঝাড়ে।

"আমার মহেশের নবান্নে কি সোজা চাল লাগবে নাকি রাজেশ্বরী? কতকাল হ'তে তুই দেখছিস, করছিস।

"নবান্নের একধামা চাল আধ-ভাঙ্গা করে রাখিস আলাদা। আধ-ভাঙ্গা চাল না হ'লে মাখা নবান্ন মজে না। শুধু কি আধ-ভাঙ্গা চাল! ওর ভেতরে মাজা তিল, কোরা নারকেল, ছড়ি ছড়ি কাঁঠালি কলা, নতুন গুড়, ঘি, মধু, কর্পূর, তবে না নবান্ন মাখা। কতগুলো ভোজ্য দিতে হবে। তারপরে ধামাখানেক চালের গুঁড়ো করতে হবে পিঠাপুলির জন্যে। ধান বেশী করে না ভানলে চলবে কেনে?"

কামিনীর মা সাবধানে পাড়নের ধান উল্টাইয়া দিয়া মুখ তুলিয়া কহিল, "কয় কুড়ি ধান মরাই থাকি নামাইয়া দিছে ছোট সরকার আমি তা জানি না। তোমাগো ঘরে কি ধান-পানের দুঃখ আছে মাঠান, না খাওন-দাওনের। এই আগনেই না তোমাগো 'পাটাই' পূজ্যা আছে, পিঠাপুলির বাজার আছে। চাল কমতি হইলে ফের ভানি নিয়ো।"

দুই ধানভাহুনী ঢেঁকিতে পাড় দিতে দিতে বলিল, "হ, মাঠান, ধান থাকিলেই চাইল হইব। যখনি খবর দিইবা তহনি আইস্যা কুটি দিইব ধান।"

ঠাকুমা সে কথার জবাব না দিয়া ছড়া কাটিলেন—

'আইল আগুন মাস অন্তরের অভিলাষ
রোদে বসি পিঠাপুলি খাই।
পইথানে আগুন থুয়া, কাঁথার তলায় শুইয়া
আনমনে জাড়ি গান গাই।'

ধানভাহুনীরা হাসিয়া অস্থির—"তোমরা বড়নোক মাঠান, জাড়ের কালে নিত্যি পিঠাপুলি খাইবা না ত খাইবে কে? এ বাড়ীত 'বাড়া বানিতে' আইলে কত ভাল ভাল কথা শুনিতে পারি। আমাগো মাঠান হইল কথার রাজা।"

প্রভাতের রৌদ্র লুটাইয়া পড়িয়াছিল বারান্দায়। ঠাকুমা সেখানে আর অবস্থান করিতে পারিলেন না।

কথার রাজা বা রাণী কথিকা চলিলেন 'নাটাই' ব্রত-পরায়ণা তরুর উদ্দেশে।

তরু খুবই ব্যস্ত। রায়বাড়ীর ছোট সরকার হেম ঘোষ কলাগাছের ডাঁটা দিয়া নাটাই ঠাকরুণ গড়িবার ওস্তাদ। তরু পূর্ব্বের বলা সত্ত্বেও ইহারই মধ্যে দুইবার তাহাকে তাগিদ দিয়া আসিয়াছে।

ছোট সরকার তরুকে আশ্বাস দিয়াছে—"সাঁঝের আগে ত তুমি পূজা করিবে না দিদি, তখন ঠাকুর পাইলেই হ'ল।"

সেদিকে নিশ্চিন্ত হইয়া তরু অন্যদিকের তদ্বির

করিতেছে। আঙ্গিনার মধ্যস্থলে ক্ষুদ্র একটা পুকুর কাটিয়া পুকুরের মাটি দিয়া গাঁথা বেদীতে প্রতিমা স্থাপন করিয়া পূজার বিধি। নাটাই দেবীকে কেহ বলে মঙ্গলচণ্ডী, কেহ বলে বনদেবী। যে যাহা বলুক, তরু তাহা লইয়া কখনও মাথা ঘামায় না। দিদিরা কুমারী কালে এই ব্রত পালন করিয়া একের পরে এক বিবাহান্তে শ্বশুরালয় চলিয়া গিয়াছে। এখন পালা পড়িয়াছে তরুর। তরুর কুমারিত্ব ঘুচিয়া গেলে আর কে লইবে পূজার ভার?

তরু এবার কার্য্যরতা ভূমিমালী বৌএর পিছনে ধাওয়া করিল, "ও বৌ, তুমি আমার পুকুর কেটে কখন বেদী গেঁথে দেবে? গোটা উঠোনটা তোমাকে লেপে দিতে হবে।"

"হ, ঠাকুঝি, জানা আছে আমাগো। এখন ল্যাপা-পোঁছা করি থুইলে কি থাকিবে ভাল? কুত্তা-বিলাই চলাচল করি তলাতল করিবে। আমরা মাগীমদ্দ যে রইচি···'মলমেনের ঠাঁই'। দুপুরে খাওন-নাওনে যাইবার সময় তোমাগো সগল সাইর‍্যা টলটলে করি দিইয়্যা যাইব।"

"বেদীর ওপরে পুকুরের চারদিকে যে আলপনা দিতে হবে বৌ, মাটি ভেজা থাকলে আলপনা হবে না।"

মালীবৌ হাসিয়া বলে, "ম্যায়ার কতা শুনি বাঁচি না। এ টানের দিনে মাটি নাকি ভেজা থাকে? আমি যাই—ধানের জাত কয়্যা দিইয়া আগেভাগে তোমাগো কাজ সারি দেই।"

মালীবৌ চলিয়া যায় ধান মাড়াইবার কাজে।

কৃষাণরা দুই ভাগে ধান মাড়াই করিতেছে। দুই জোড়া বলদ ঘুরিতেছে তাহাদের 'ডাইনে-বাঁয়ে' ইঙ্গিতে চক্রাকারে। আঁটি আঁটি শুষ্ক ধান আঙ্গিনায় বিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বলদের পদপিষ্ট হইয়া ধান খড় হইতে বিচ্যুত হইয়া ঝরিয়া পড়িতেছে মৃত্তিকায়। ভূমিমালীরা লম্বা লাঠি দিয়া খড় সরাইয়া কুলার বাতাসে আবর্জ্জনা উড়াইয়া দিতেছে। ভূমিমালী স্ত্রীলোকেরা আরপাউ দিয়া টানিয়া ধান জাত করিয়া রৌদ্রে দিতেছে। দুই-তিন দিন রৌদ্রে থাকিয়া ধান স্থান পাইতেছে সযত্নে মরাইতে। উহাদের পারিশ্রমিক ধান। যে যেমন কাজ করিবে ধানের বরাদ্দ তাহার তেমনি।

ঠাকুমা আসিয়া দাঁড়াইলেন রায়বাড়ীর অন্দর বাহিরের দরজায়। সামনে দুই আঙ্গিনায় ধান মাড়াই হইতেছে। ধানের আঁটির অর্দ্ধাংশ এখনও পালায়।

ঠাকুমা ক্ষণেক ধান মাড়াই দেখিয়া ধরিলেন জানকী সরকারকে—"ও জানকি, তাড়াতাড়ি মলাই করে ধান-গুলো মরাই জাত কর। এবার কাঙ্গালী ভাল হয় নাই। দেয়া নাম্‌লে কিন্তু তোমার পাকা ধান হেজে যাবে। সকালে আকাশ ঘোলা ঘোলা দেখেছিলাম।"

জানকী সরকার বিনীত ভাবে উত্তর করিল, "ও শীত নামবে ব'লে ঘোলা ভাব। বৃষ্টি এখন হবে না। ভয় নাই মাঠান্‌, ক'দিনের মধ্যেই ধান জাত হয়ে মরাইতে উঠবে।"

ঠাকুমা নিশ্চিন্ত হইয়া অগ্রসর হইলেন গোশালার দিকে। প্রকাণ্ড গোশালায় অনেকগুলি গরু থাকে। গোশালার একদিকে বাছুরের পৃথক্ জায়গা।

দিনের বেলা গাভীরা বাহিরের আম-কাঁঠালের বাগানে জাব খায়, বাছুরেরা চরিয়া বেড়ায়। আসন্নপ্রসবা গাভী দু'টিকে ঠাকুমা বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিলেন। না, আর দেরি নাই, 'ওলান' বড় হইয়াছে, বাঁট হইয়াছে চাটিম কলা।

বাগানের পরে রায়বাড়ীর স্নানের পুকুর। দূরে-নিকটে রায়দের আরও পুকুর রহিয়াছে। নদীশূন্য গ্রামবাসীরা সেই সব পুকুর ব্যবহার করে। এ পুকুরে পাড়ার বৌ-ঝিরা স্নান করে। পুরুষ সমাগম নাই। ঘাট জনশূন্য। জল পরিদর্শন করিয়া ঠাকুমা চলিলেন ছোট ভোগের ঘরের সামনে। মনোরমা পানতুয়া ভাজিতেছে। ছোট ঠাকুমা ও বিন্দু মোটা মোটা লম্বা করিয়া পানতুয়া গড়িয়া দিতেছে। আজ ভোগের রান্না হইবে সংক্ষিপ্ত। এ বেলা তরকারি কুটিতে বসিয়াছে সরস্বতী।

ঠাকুমা বিন্দুর গৃহের পেছনের বাগান প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিলেন আঙ্গিনায়—তরু তখন চীৎকার করিতেছে—

"গোলাঘরে তিলের জালার আড়ালে ফুলমণিও

নাই, চারটে বাচ্চাও নাই। হারাণী, তুমি খুঁজে দেখ কোথায় গেল তারা। কামিনীর মা, আজ কি তোমাদের ঘুম লেগে গেছে, কোথায় গেল ফুলমণি? পাড়ার হুলো বেড়াল এসে বাচ্চাগুলোকে খেতে খেতে ফুলমণিকেও খেয়ে ফেলেছে।"

কামিনীর মা ছুটিয়া আসে, তরুকে সান্ত্বনা দেয়—"অত বড় বুড়া বিলাইডারে হুলো বিলাই কি খাইতে পারে? ফুলমণিই ঘাড়ে কামড় দিইয়া মুখে করি লইয়া থুইচে খ্যান কোন ঠাঁই। আমি খুঁজি বার করচি।"

কামিনীর মা, হারাণী, অনেক অনুসন্ধানের পরে তরুর হারাধনের সন্ধান পাইল চায়ের ঘরের বেঞ্চির নীচে। 'হারাধনে'র দশটি ছেলের মতন ফুলমণির দুইটি ছেলে অন্তর্দ্ধান। তরু কাঁদিয়া অস্থির।

কথা বলিবার সুযোগ পাইয়া ঠাকুমা পরম পুলকিত হইলেন। হাতীর আসন হইতে তখন রৌদ্র সরিয়া গিয়াছে। ঠাকুমা স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মুখ খুলিলেন, "ভরা দুপুরে কাঁদে না তন্বি, আজ তোর নাটাই পূজোর শুভদিন। চোখের জল ফেলতে হয় না। লালজী-কালজীর ভয়ে হুলো বেড়াল এ বাড়ীর ত্রিসীমায় উঁকি দিতে সাহস পায় না। কুকুর-বেড়ালের মায়েরা ছা খায় একটা করে। একটা খেতে ও দুটো পেটে দিয়েছে। বেড়ালের ছানা বেশি থাকা ভাল না। ওরা মনে মনে বলে, 'গৃহস্থ কানা হোক, আমরা পাতায় বসে দুধে মাছে খাব।' কুকুররা বলে, 'গৃহস্থের বংশ বৃদ্ধি হোক, আমরা আগেপিছে খাওয়া করি'।"

কামিনীর মা সায় দেয়, "যা কইলে মাঠান, বেশী বিলাই ভাল না। বচ্ছরে তিন-চারবার যাগরে ছা হয় তার নেগে আবার দুঃখু! তোমাগো ফুলমণি 'সেয়ান বিলাই ধরি কিলাই'। দুধের বরণ ছাও দুইডা থুইয়া কালা কুটকুটে দুইডারে উদরে দিইচে।"

সকলের সান্ত্বনায় তরু শান্ত হইল।

বেলাশেষে আলপনায় বিচিত্র বেদীর উপরে নাটাই প্রতিমা স্থাপিত হইলেন। ছোট সরকার দক্ষ কারিগর। কলাগাছের মোটা ডাঁটা দিয়া অপূর্ব্ব দেবী মূর্ত্তি গঠন করিয়াছে। দেবী চতুর্ভুজা, করবী ফুলের পাতায় তাঁর জিব হইয়াছে। সেই জিব সিঁদুরে রঞ্জিত হইয়া লকলক করিতেছে। চোখ-নাক আঁকা হইয়াছে কালির আঁচরে। মাথায় ফুলের মুকুট, সর্ব্বাঙ্গে ফুলের গহনা।

বিনু আলপনা দিয়াছে। বেদীর উপরে শঙ্খ পদ্ম। জলাশয় বেষ্টন করিয়া কলাগাছ কলমিলতা তরুলতা কুঞ্জলতা ইত্যাদি।

ঠাকুমা বিনুর অঙ্কন নিরীক্ষণ করিয়া প্রশংসায় পঞ্চমুখ—"আহা কি সোন্দর আলপনা দিচে মণিমালা, তাকালে চোখ জুড়িয়ে যায়। কেউ ডেকে নিয়ে কাজ দেখিয়ে-শুনিয়ে না দিলে নতুন মানুষ করবে ক্যাম্‌নে? কথায় আছে—

'নাই কইতে যে করে কর্ম্ম তারে কই উত্তম,
কহিলে যে করে কর্ম সে হইল মধ্যম।
কহিলেও যে না করে কর্ম্ম সে হইল অধম।' মণিবৌ উত্তম না হলেও মধ্যম।"

মায়ের চওড়া লালপাড় গরদের শাড়ী পরিধান করিয়া পূজারিণী তরু আসনে বসিল। পাশে কুশাসনে হোতা সরস্বতী। পূজা-অর্চ্চনায় তাহার যেমন অনুরাগ তেমন মন্ত্রেতন্ত্রে দখল।

ধূপ দীপ জ্বলিল, পূজার উপকরণ বিনু দেবীর সামনে সাজাইয়া দিল। দুই পাশে রাখা হইল নুনে ও আনুনে পিঠে।

মেনির সহিত সম্প্রতি তরুর 'আড়ি' হইয়াছে। মেনি অনুপস্থিত, সেও পূজা করিতেছে। সেই কারণে বিনুর সহিত তরুর সখ্য গড়িয়া উঠিতেছে।

পূজার মন্ত্র সুরু হইল "নমো বনদুর্গা" বলিয়া। বিনু ভাবে জিব-বারকরা দেবী কালী না হইয়া বনদুর্গা হইল কিরূপে?

বিবিধ উপাদান, ধূপ দীপ পুষ্পমাল্য ভোগ সমস্তই বনদুর্গার উদ্দেশে নিবেদন করিয়া দেওয়া হইল। অনেক দিন পরে ঠাকুমা প্রাণ ভরিয়া উলুধ্বনি দিয়া বাঁচিলেন।

পূজান্তে ব্রতকথা আরম্ভ হইল। গরীব বামুনের দুই মেয়ের বিয়ে হয় না। তাদের পেটে ভাত নেই, পরণে কাপড় নেই, বিয়ে হবে কি দিয়ে? মনের দুঃখে

মেয়েরা একদিন বনের ধারে সরোবরে ডুবে মরতে গেল।

বনের ধারে ছিল কাঠুরেদের বাড়ী। সেখানে তাদের মেয়েরা নাটাই মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করছিল। কুমারী বামুনের মেয়ে দেখে তারা আদর করে ডেকে নিলে পুজোয় যোগ দিতে। পুজা করে ব্রতকথা শুনে প্রসাদ খেয়ে তারা ঘরে ফিরল। পরের দিন পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে রাজপুত্র ও মন্ত্রীপুত্র এসে তাদের বিয়ে করে নিয়ে গেল রাজপুরীতে।

কথা সাঙ্গ হইলে সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল দেবীকে। ঠাকুমা আবার উলু দিয়া রায়বাড়ী মুখর করিয়া তুলিলেন।

কোন্‌টা নুন দেওয়া, কোন্‌টা আলুনে সেটা ব্রতচারিণীকে না জানাইয়া দেবীর ডাইনে বামে সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। আসনে বসিয়াই পূজারিণীকে সর্ব্বাগ্রে পিঠা প্রসাদ মুখে দিতে হয়।

তরু পিঠা মুখে দিয়া কহিল "আলুনে"। না, এ বছরেও তরুর বিবাহের ফুল ফুটিবে না। নুনে পিঠা খাইলে কুমারীর বিবাহের ফুল ফোটে।

তরু ও বিনু ছোট ছোট কলার পাতায় প্রসাদ ভাগবণ্টন করিয়া বাড়ীর দাসদাসী হইতে সকলকে বিতরণ করিতে লাগিল।

পানতুয়ার ভারে ঠাকুমাদের পেটে হইয়াছিল স্থানাভাব, তবুও মুখরা নাতনীর ভয়ে তাঁহাদিগকে যৎসামান্য গ্রহণ করিতে হইল। মনোরমা পূর্ব্বেই সরস্বতীর জন্যে শুদ্ধাচারে ঘরে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। যেখানে-সেখানে বসিয়া যা-তা মুখে দেওয়া তাহার পোষায় না। বৈধব্য তাহাকে দেবতার ঊর্দ্ধে উচ্চাসন দিয়াছে।

সরস্বতী পূজার জিনিষপত্র গোছাইতে গোছাইতে বলিল, "তোমাদের সে তিন কাঁদি কাঁঠালি কলা এক সাথে পেকে গেল মা? নবান্নে এক কাঁদির বেশি লাগবে না। সেদিন নতুন চালের পিঠের ভেতরে কলার বড়ার হাঙ্গাম করবে কে? কলা দিয়ে পরশু ভোরে উষা মঙ্গলচণ্ডী পুজোটা সারলে হয়? অনেকদিন হয় না, মাসটা ভাল।"

রায়বাড়ীর কাহারও কোন কথা ঠাকুমার কান এড়াইতে পারে না। কেহ তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করা দরকার বোধ না করিলেও তিনি সর্ব্বদা বলিতে উন্মুখ হইয়া থাকেন।

সরস্বতীর কথা শেষ হওয়ামাত্র ঠাকুমা বলিয়া ওঠেন, "তাই করিস্, সবি, কাল সকল দেবাজাত গোচ করে রাখিস্। এক বাটি তেল, সারা সিঁদুর পান-সুপারি কলা-বাতাসা এই হ'লেই উষা মঙ্গলচণ্ডী হয়ে যায়। রাত পোয়ালে লক্ষীর কড়ির ঝাঁপি থেকে মঙ্গলচণ্ডীর শিলটা বের করে ধুয়ে-মুছে রেখে দিতে হবে। পুজো হয়ে গেলে তিন দিন সিঁদুর চন্দনমাখা শিলকে রেখে দিতে হয় বড় ঘরের লোহার সিন্দুকের ওপরে। তার পরে আবার তিনি লক্ষীর কড়ির ভেতরে থাকবেন। দেখ্ সবি, মনে করে ত্রিদল বেলপাতা দুর্ব্বোর অর্ঘ্য সাজাতে নতুন চাল দিস্ দুটো, আর নতুন চালের নৈবিদ্যি। তেমাথায় পুজো করতে হয়। তা তোদের বাড়ীর মধ্যে এঘর-ওঘর যাবার কত তেমাথা পথ রয়েছে। যেখানে পুজো হবে সেখানটা রাতে ভাল করে গোবর দিয়ে লেপিয়ে রাখিস্। উষাকালে পুজো, সূয্যি ঠাকুর ওঠবার আগে।"

ঠাকুমার বাক্যস্রোত থামিলে ছোট ঠাকুমা কহিলেন, "অত কলা পেকেছে, তার ক'টাই বা যাবে মঙ্গলচণ্ডী পুজোয়, এয়োদের ডেকে তাদের কপালে তেল-সিঁদুর দিয়ে আঁচলে পান সুপারি কলা বাতাসা দিলেও কলা থাকবে ঢের। পাড়ায় আর এয়ো ক'টা!"

ঠাকুমা বলিলেন, "তোমার কথায় বাঁচি না ছোটবৌ। 'দেওনওলার কাছে আবার খাওনওয়ালা—'। ঝি-চাকরদের তিন-চারটে ক'রে দিয়ে দিস্, তারা প্রাণভরে খাবে। আমার মহেশের বাগানের কলা। আর এক কাঁদিতে পাক ধরেছে, সেটা পাড়ার সকল বাড়ী বাড়ী পাঠালেই হবে।"

ঠাকুমা পাকা কলার ব্যবস্থা করিয়া সরিয়া গেলেন। বিনু প্রসাদ খাইতে বসিয়া ভাবে, "বাবা, কি বাড়ী!

এক পূজোর আসনে বসিয়াই আর এক পূজোর ব্যবস্থা। লোকে যে বলে, 'কাজ নাই কাঁথা সেলাই'। ইহাদেরও সেই দশা।"

আবার শেষরাত হইতে সেই ধুম ধুম ঢেঁকির পাড়। নবান্নের চাল কম পড়িবার আশঙ্কায় বেশি বেশি ধান ভানাইয়া রাখিতে হইতেছে। এই চালের কতক গুঁড়া কুটিতে হইবে পিঠার জন্য। গুঁড়া হইবে দুই ভাগে—একটা নিয়মের, একটা অনিয়মের। অনিয়মের জন্য চিন্তা নাই—সেটা হয় কামিনীর মা'র তত্ত্বাবধানে। নিয়ম লইয়াই মুশকিল, মণিরাম কাণরাম উৎকলবাসী দুই ভাই, দরকার হইলে ঢেঁকির ওপরে উঠিয়া ঢেঁকুস ঢেঁকুস করিতে আপত্তি করে না। তাহাদের পেটে খাইয়া পিঠে সহিতেছে। সহৃদয় মনিবের কৃপায় তাহারা দেশে একটার পরে একটা ধানের জমি করিয়াছে, পাকা ঘর করিয়াছে।

ঠাকুমার চিন্তা, চালের গুঁড়া কে পাড়নের ভিতরে হাত দিয়া উল্টাইয়া দিবে, চালনায় ছাঁকিয়া লইবে?

মনে পড়িতেছে ভানুমতীকে। "ছাই ফেলার সময় ভাঙ্গা কুলার আদর।"

ঠাকুমা নাতনীদের ভালবাসেন না। মেয়েদের ধরণ "খাই দাই পাখীটি বনের দিকে আঁখিটি।" কেবল ঝোল টানা নিজেদের দিকে। খাইয়া-দাইয়া লইয়া-থুইয়া 'পগার পার'। কিন্তু কাজের সময় ভানুমতীকেই সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে। একজনাই একশ'। তাহার চোপা নাড়ায় রায়বাড়ী থরথর কম্পিত হইলেও 'যে গরু দুধ দেয় তাহার চাঁট' সহিতেই হয়।

ঠাকুমা বিমনা হইয়া নিয়মের চালের গুঁড়া লইয়া চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় বাহির মহল হইতে তরু খবর আনিল, গত রাতে কালজীর চারটা ছানা হইয়াছে খড়ের গাদায়। তখনই ঠাকুমাকে উঠিতে হইল শাবক-গুলির তত্ত্বাবধানে।

পথে হারাণী জিজ্ঞাসা করিল, "মাঠান, কুত্তার ছাও দেখিতে যাইছেন নাকি?"

সকালবেলা হইতে ঠাকুমা কথা বলিবার তেমন সুযোগ পান নাই। এখন মুখর হইলেন, "যাই, দেখে আসি বাচ্চাগুলোর কি গতি হইবে। 'যে কাজে যায় না শিবা সে কাজের সুসার কিবা'। গরু-বাছুর দিলে লাভ হয়, তা না কুকুর-বেড়ালের ছানায় বাড়ী-ঘর ভরে ফেলছে। কেষ্টর জীব, একবার গিয়ে দেখতে হয়। দেখ হারাণি, কাল দিনটা ভালই ছিল না? নাটাই বর্ত্ত হ'ল। ভোরে তরু নাটাই ঠাকুর পুকুরে ভাসিয়ে দিয়েই না খবর এনেছে।"

হারাণী সায় দিল, "হ, মাঠান, দিন ভালই ছেল, কিন্তুক্ এ কি মানুষের ছাওয়াল-ম্যায়া, দিনক্ষণ দেখন নাগবে? কুত্তা-বিলাই মিতালি করি বিয়েন দিসে, ওয়ারো চারডা, এয়ারো চারডা।"

"দেখ্ হারাণি, চোখ দিস্‌নে, চোখে বিষ থাকে। ফুলমণির দুটো ত চোখেই গেছে। ওর চারটে এখন থাকলে হয়। সকলেই কেষ্টর জীব—'যত জীব তত শিব'।" বলিয়া ঠাকুমা রওনা হইলেন গোশালার দিকে। গোশালার পশ্চাতে গরুর প্রধান খাদ্য মস্ত দুইটি খড়ের পালা। দুই পালার সঙ্কীর্ণ ফাঁকে কালজীর বাচ্চা হইয়াছে।

দিব্যসুন্দর হৃষ্টপুষ্ট শাবক কয়েকটিকে বুকের নিকটে লইয়া কালজী শুইয়া আছে।

ঠাকুমাকে দেখিয়া কালজী লেজ নাড়িতে লাগিল, অনুচ্চ স্বরে বার কতক ভেউ ভেউ করিয়া স্বাগত সম্ভাষণ জানাইল।

কুকুর-পর্ব্ব পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ঠাকুমা অন্তঃপুরে ঢুকিলেন। ধানভানুনীরা নবান্নের চাল প্রস্তুত করিয়া চলিয়া গিয়াছে। চাল উঠিয়াছে ভাঁড়ারে।

আজ তরু বিনুর সহিত স্নান করিয়া পূবের বারান্দায় কাপড় ছাড়িতেছিল—ঠাকুমা সেইখানে থমকিয়া দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাত পোয়াতে না পোয়াতে যে তোদের উমা মঙ্গলচণ্ডী, তার ত যোগাড় দেখচি না লো তন্বি? আজ গুছিয়ে-গাছিয়ে না রাখলে শেষ রাতে উঠে লাগবে হুলুস্থুল ব্যাপার। আগের কাজ ভাল, পিছের কাজ ভাল না।"

তরু বিরক্ত হইল, "সারাদিন তোমার 'আবোল-

তাবোল' ঠাকুমা, কাল সকালে তোমার মঙ্গলচণ্ডী, এখনই তার যোগাড় করতে হবে। এবাড়ীতে নিত্যি যেন লেগে থাকে ঘটা-পটা।"

"ভাল কাজে নজর দিতে হয় না তন্থি। মহেশ আমার বেঁচে বর্ত্তে থাকুক, পুজো আচ্চা লেগে থাকুক, গরীব-দুঃখীরা পেট পুরে পাতা পেতে পেসাদ পেয়ে বাচুক। 'নিজের বেলায় আঁটি সাঁটি, পরের বেলায় দাঁত কপাটি'। তুই নাটাই পুজো করলি কেন? তুই সায়েব বিয়ে করে বিবি হয়ে হিন্দুর গাঁওয়ালি পার্ব্বণ উঠিয়ে দিস। এতেই এই, এখনও ত মাঘ মাস আসে নি।"

বিনু সভয়ে প্রশ্ন করে, "মাঘ মাসে এখানে কি হয় ঠাকুমা?"

"মাঘে মাধবীলতা মথুরায় গমন
দশদিক্ অন্ধকার শূন্য বৃন্দাবন।"

ঠাকুমা বিনুর প্রশ্নের উত্তর না দিয়া ছড়া কাটিতে কাটিতে চলিয়া গেলেন অন্যদিকে।

মেনি তাহার মা'র সঙ্গে ঘাটে যাইতেছিল স্নান করিতে, তাহাদের পুকুর নাই। এই পুকুরেই ঘাটের কাজ সারে। তরু ভেজা কাপড় ছাড়িয়া বারান্দার নীচে দাঁড়াইয়া ছিল। তরুর সহিত চোখাচোখি হইবা-মাত্র চোখ ফিরাইয়া লইল। মেনি হাসিভরা মুখে তরুর সন্নিকটে আগাইয়া ডাকিল, "তরু, টু, আড়ি নয় ভাব, ভাব নয় ভাব।"

আর তরুকে আটকায় কে? চোখে হাসি, ঠোঁটে হাসি, গলায় কল কল।

তরু মেনির বাহু ধারণ করিয়া চলিল ঘাটে। সেদিকে তাকাইয়া বিনু খুশী হইতে পারিল না। আড়ির কল্যাণে বিনু কয়েকটা দিন তরুর সহচরী না হইয়াও সাহচর্য্য পাইয়াছে। সব কাজে তরু সহযোগিতা করিয়াছে। ফুরাইয়া গেল সে সুখ। বনের পাখী বনে বিচরণ করিয়া বেড়াইবে।

ঠাকুমাকে সকলে সাবধান করিয়া দিয়াছিল, তিনি যেন 'গারসী' পুজার মতন রাত একটার সময় সকলের দরজায় করাঘাত না করেন। তা ঠাকুমা এবার কথা রাখিয়াছেন। আকাশের আলো ও শুকতারার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তিনি রাত্রি পাঁচ ঘটিকার সময় সকলকে জাগাইয়া দিলেন। দাসদাসী হইতে ছেলেমেয়ে কেউ বাদ গেল না।

তেমাথায় উষা মঙ্গলচণ্ডী পূজা করিবার বিধি। রায়বাড়ীর অন্দরে তেমাথার অভাব নাই। এঘর হইতে ওঘর, ওঘর হইতে সেঘর।

ভোগশালা, কয়শালা ও কাষ্ঠশালার মধ্যের স্থানটা কামিনীর মা গোবর দিয়া লেপিয়া রাখিয়াছিল। যার এক পাশে একটা ঝাঁকরা সপেটা ফলের গাছ ফলভারে অবনত। অন্য পাশে কাগজি লেবুর গাছ। বারমাস লেবু ফলে।

ব্রতী সরস্বতী, অব্রতীরাও বসিয়া গেল ভিড় করিয়া। কালো মসৃণ একখানা লম্বাকৃতি শিলা হইলেন উষা মঙ্গলচণ্ডী। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে উষাকালে ইহার আরাধনা হয় বলিয়া নাম হইয়াছে 'উষা মঙ্গলচণ্ডী'। সোমবারের বিদায়ক্ষণে মঙ্গলের সূচনায় ইনি শুভাগমন করেন মর্ত্ত্যে।

ত্রিদল বিল্বপত্রে দেবী সমাসীন হইলেন। স্নানান্তে অর্ঘ্যপাদ্য ফল ফুল গ্রহণ করিলেন। ধূপ দীপ কিছুরই ত্রুটি হইল না। ঠাকুমা বসন্তের কোকিলের অনুরূপ পঞ্চম স্বরে উলু দিয়া পাড়া সজাগ করিয়া তুলিলেন।

পূজাশেষে ব্রতকথা আরম্ভ হইল। এবার কাঠুরিয়া নহে, সদাগরের কাহিনী।—

সওদাগর শ্বেতদ্বীপে বাণিজ্যে যাইতেছে। সাত-ডিঙ্গা মধুকর সুসজ্জিত। অনুকূল পবনে সাত সমুদ্র তের নদী পাড়ি দিয়া সওদাগর উপস্থিত হইল শ্বেতদ্বীপে।

শ্বেতদ্বীপের রাজ্যে যাহা নাই, তাহাই বিনিময় হয় সেই দেশে। জিরার বদলে হীরা, মুক্তার বদলে মুক্তা (পাট পাতা), শঙ্খের বদলে বঙ্গ, হরিদ্রার বদলে সোনা ইত্যাদি বিনিময় করিয়া সওদাগর সাতডিঙ্গা মধুকর মণি-মাণিক্যে, হীরা মুক্তা সোনায় বোঝাই করিয়া প্রভাতে রওনা হইল দেশে। তেমাথা পথে ঘটিল বিভ্রাট। গোয়ালার মেয়েরা উষা মঙ্গলচণ্ডী পূজা করিতেছিল। সওদাগরকে যাইতে দেখিয়া ডাকিয়া

কহিল, 'বিদেশী, মঙ্গলচণ্ডীকে প্রণাম করিয়া প্রসাদ লইয়া যাও।'

পাষাণ শিলার দিকে তাকাইয়া সওদাগর বিদ্রূপের হাসি হাসিল প্রণাম করিল না, প্রসাদ লইল না।

মা মঙ্গলচণ্ডী কুপিত হইলেন; তখনই ছুটিয়া আসিল শ্বেতদ্বীপের পেয়াদা পাইক। রাজ-ভাণ্ডারে চুরি হইয়াছে। সে চোর সওদাগর। তাহাকে কারাগারে বন্দী করা হইল। সাতডিঙ্গা মধুকর আটক করিয়া রাখা হইল।

দিনের পরে দিন যায়, বছরের পরে বছর। দেখিতে দেখিতে বারো বছর কাটিয়া গেল। এদিকে সওদাগরের বৌ কাঁদিয়া কাঁদিয়া অন্ধ হইবার উপক্রম।

পাড়ায় ছিলেন এক দয়াবতী ব্রাহ্মণী। তিনি দয়াপরবশ হইয়া বৌকে দিয়া ঊষা মঙ্গলচণ্ডী ব্রত উদ্‌যাপন করাইলেন।

মা প্রসন্ন হইয়া রাজাকে স্বপ্নে আদেশ করিলেন, 'আমি ঊষা মঙ্গলচণ্ডী, আমার পরম ভক্ত সওদাগর। তাহাকে সসম্মানে মুক্ত করিয়া ধনে-রত্নে সাতডিঙ্গা মধুকর ভরিয়া দেশে পাঠাইয়া দে। না দিলে তোর সর্ব্বনাশ সাধন করিব।'

রাজা সভয়ে আদেশ পালন করিলেন। সওদাগর জয়ডঙ্কা বাজাইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিল।

স্ত্রীর নিকটে ঊষা মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতের মহিমা শুনিয়া সোনার মঙ্গলচণ্ডী প্রস্তুত করাইয়া নিত্য পূজার ব্যবস্থা করিল।

"ঊষা মঙ্গলচণ্ডী ব্রত করিলে কি হয়? দরিদ্রের ধন হয়। পুত্রহীন পুত্র পায়। বন্দী মুক্ত হয়। বিপদ আপদ্ দূর হইয়া যায়।"

প্রত্যেকে এক একটা ফুল হস্তে ভক্তিভরে ব্রতকথা শুনিতেছিল। কথা শেষ হইলে দেবীর মস্তকে পুষ্প অর্পণ করিয়া প্রণাম করিল। ঠাকুমা উলু দিতে লাগিলেন।

ক্ষিতিকে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছিল, পূজা সাঙ্গ হইলে ফুল বেলপাতা সমেত দেবীকে মাথায় লইয়া দৌড়িয়া গিয়া রাখিয়া দিতে হইবে বড় ঘরের লোহার সিন্দুকের উপরে।

ক্ষিতি চিলের মতন ছোঁ দিয়া লইয়া প্রস্থান করিল।

সুমন্ত কাঁদিয়া অস্থির, "ফুলদা ঠাকুর নিলে, আমাকে দিলে না।"

মা ছেলেকে শান্ত করিলেন, "ঠাকুর নিয়ে ছুটে পালিয়ে যেতে হয়। তুমি পারতে না, ফেলে দিয়ে ভেঙ্গে ফেলতে। তুমি আর একটু বড় হ'লে ঠাকুর নেবে। ফুলদা নেবে না।"

সুমন্ত শান্ত হইল। আকাশের পূর্ব্ব প্রান্ত তখন ঊষা-অরুণের সম্মিলনে লালে লাল।

বেলা হইলে পাড়ার সধবা মেয়েদের ডাকা হইল। তাঁহারা একের পর এক আসিয়া মাথাভরা তেল, কপাল ভরা সিঁদুর ও আঁচল ভরিয়া পান সুপারি বাতাসা কলা লইয়া চলিয়া গেলেন। তখন কাহারও গাল-গল্প করিবার অবকাশ হইল না। সকালে রাজ্যের কাজ পড়িয়া ছিল।

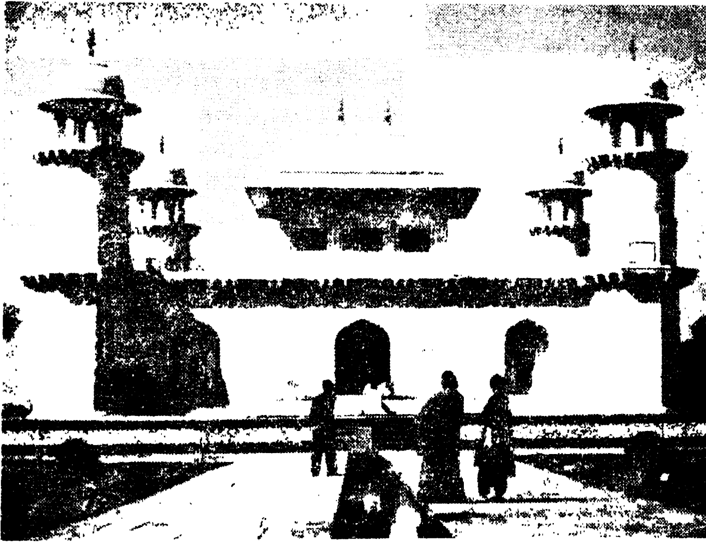
ক্রমশঃ

ইতিহাস কথা কয়

শ্রীঅজিত চট্টোপাধ্যায়

দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে তাজ দেখতে বেরোলাম। প্রাচ্যের এক আশ্চর্য—আগ্রার তাজমহল। দূরদূরান্ত থেকে তাজ দেখতে কত লোকই না এসেছে আগ্রায়। আজও আসে। যে হোটেলে উঠেছি সেখানে এই দু'দিনেই কতজন বিদেশী ট্যুরিষ্টই না দেখলাম।

ফাল্গুনের মাঝামাঝি। বাংলা দেশে এখন বেশ গরম। কোকিল ডাকছে সেখানকার আমবনে, বাঁশবনে বসন্তবৌরী পাখী সুর তুলছে···টুকলি···টুকলি।



ইৎমাদুদ্দৌলা

হোটেলে এক বাঙালী দম্পতির সঙ্গে আলাপ হয়েছে আমাদের। ভাব জমাতে গৃহিণী ওস্তাদ। মেয়েটির সঙ্গে এর মধ্যেই বেশ ভাবসাব করে নিয়েছেন। ঠাট্টা-পরিহাসও করছেন ফাঁকে ফাঁকে। হৃষীকেশ থেকে এসেছে ওরা। ছেলেটি সেখানে ইঞ্জিনিয়ার। মাত্র মাসখানেক বিয়ে হয়েছে ওদের। মধুচন্দ্রিমায় বেরিয়েছে। নিজেদের আনন্দেই মশ্‌গুল।···

গৃহিণী হেসে বললেন—'দেখলে ত, কি সুন্দর হনিমুন করতে বেরিয়েছে। আর বিয়ের পর তুমি আমাকে হেঁসেলঘরে ঢুকিয়েছ।' আমি বলি,—'তা হোক, এতদিন পরে ত তুমিও হনিমুনে বেরিয়েছ।'

—'হনিমুনে?' আমার স্ত্রী চোখ বড় বড় ক'রে বললেন। 'এই বুড়ো বয়সে হনিমুন?'—'হনিমুন নয় গো, এ আমার ঘানিমুন।'

—'কেন নয়? বিলম্বিত মধুচন্দ্রিমা।'

কথাটা বলেই একটা ধাক্কা লাগল মনে। 'বিলম্বিত মধুচন্দ্রিমা' নামে একটি গল্প লিখেছিলাম। গল্পটা ইংরেজিতে লেখা। কলকাতার একটি বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ঘটনাটা এই,···'বিয়ের পর নীলিমাকে নিয়ে কোথাও যেতে পারে নি অনুপম। বিয়ের আগে ইস্কুল-মাষ্টারী করত নীলিমা—মফঃস্বলে। ইস্কুল-মাষ্টারী ছেড়ে কলকাতায় এল অনুপমের সংসার চালাতে। জল্পনা-কল্পনা করত দু'জনে। দূরে কোথাও না হোক, কাছে-পিঠে একবার ঘুরে আসবে। সেই শীতকালে এসেছে নীলিমা। তারপর শীত পেরিয়ে গ্রীষ্ম এল। বর্ষা শরৎ শেষ করে বছরও যায় যায়। কতবার পুরী যাবার ফর্দ করেছে দু'জনে। কিন্তু হিসেবে আর মেলাতে পারে নি।

শুধু স্বপ্নই দেখেছে দিনে-রাতে,…নীল সমুদ্র, পুরীর মন্দির,…কোনারকের আশ্চর্য সূর্যমন্দির…। মার্চের শেষদিকে বেরিয়ে পড়ল ওরা। আমোদপুরে, চড়কের মেলা দেখতে। মার্টিনের রেলষ্টেশনে নেমে গরুর গাড়িতে যাচ্ছিল। ঢলুনিতে ঘুম এসেছিল নীলিমার। স্বপ্ন দেখছিল পুরীর,…কোনারকের সূর্যমন্দিরটি। অনুপম ধাক্কা দিতেই ধড়মড় করে জেগে উঠল। আমোদপুর এসে গেছে,…গাছপালার আড়ালে মন্দিরের চূড়ো দেখা যায়। কোনারকের সূর্যমন্দির নয়—আমোদপুর গাঁয়ের শিব-মন্দিরটাই এখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।'……

হৃষীকেশের সেই দম্পতিকে দেখে কেন জানি না খুব হিংসে হচ্ছিল। খাওয়া-দাওয়া সেরে ওরা বেরুল সেকেন্দ্রার পথে। তাজমহল পরে দেখবে।

আগ্রায় এখনও বেশ শীত। গরম স্যুট পরেও শীত শীত মনে হচ্ছে। কাল রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে একরকম কেঁপেছি। সঙ্গে লেপ আনি নি,…কনকনে ঠাণ্ডার কাছে একটা কম্বল যেন একটা সুতীর চাদরের সামিল।………আমাদের সেই টাঙ্গাওলা বুড়ো একটা নিমগাছের নীচে টাঙ্গা রেখে ঝিমুচ্ছে।……

তাজমহল রচিত হয়েছিল অর্জুমন্দ বানু বেগমের স্মৃতির উদ্দেশ্যে। ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে জাহাঙ্গীর নাম দিয়েছিলেন মমতাজমহল। অবশ্য পূর্বরাগের পালা বিয়ের আগেই সারা। ১৬১২ খ্রীঃ। অর্জুমন্দ তখন প্রস্ফুটিত গোলাপের মত সুন্দর। কুড়িটি বসন্ত পার হয় নি তার জীবনে। বিংশতি বসন্তই নিয়ে এল মিলনের লগ্ন। শাহজাহানের ঘরণী হলেন অর্জুমন্দ বানু। গৃহিণী হলেন মমতাজ। কিন্তু ঘরে তাঁর সতীনের অভাব ছিল না। শাহজাহানের আরও দুই সংসার ইতিমধ্যে হয়েছে। তবু পুরুষ চিরদিনই রূপ আর গুণে মুগ্ধ। ভালবাসার জন্ম ভাল লাগা থেকে। সেই ভাল লাগার আকর নারীর সৌন্দর্য ও সৌজন্য বোধ।

সম্পর্কে নূরজাহানের ভাইঝি। মমতাজও কোন অংশে কম যান না। শাহজাহান তাঁর গভীর প্রেমের বাঁধনে ধরা দিলেন। রাজকার্যে পরামর্শ দিলেন মমতাজ। যুদ্ধবিগ্রহে, দণ্ডমকুবে সম্রাট্ তাঁর অভিমত আহ্বান করলেন। এক কথায় বেগম মমতাজ হলেন সত্যকার সহধর্মিণী।

প্রায় উনচল্লিশ বৎসর বেঁচে ছিলেন মমতাজ। মারা গেলেন প্রসবের পর। চতুর্দশতম সন্তানটি কন্যা। বুরহানপুরে জন্ম হ'ল গর্ভজরআরা বেগমের। কিন্তু মেয়ে হবার পরই নিস্তেজ হয়ে পড়লেন অর্জুমন্দ। মাঝে মাঝে মূর্চ্ছা। মমতাজ বুঝলেন, তাঁর সময় শেষ হয়ে এসেছে। তাই কন্যা জাহানারাকে পাঠালেন বাদশাহের কাছে; বসন্ত-বিদায়ের বার্তা দিয়ে। সম্রাট্ এসেছিলেন ছুটে। কিন্তু অর্জুমন্দ তখন পরলোকযাত্রী। যাবার আগে চোখের জলে ভেসেছিলেন মমতাজ। শাহজাহানকে বলেছিলেন ছেলেমেয়েদের যত্ন নিতে। সকলের প্রতি কর্তব্য পালন করতে।

মমতাজমহল মারা গেলেন। শূন্য হৃদয়ে ভগ্নমনে সম্রাট্ ফিরে এলেন আকবরাবাদ। রাজকার্যে আর মন বসে না। হারেমে ফিরে এলে মমতাজের কথাই মনে হয়। মেয়ের মুখের দিকে চাইলে মায়ের মুখচ্ছবি মনে আসে। অর্জুমন্দবিহীন দিন শাহজাহানের আর কাটে না। কাছে পেয়ে যাঁকে যতখানি ভালবেসেছিলেন, তার দ্বিগুণ ভালবাসলেন তাঁকে হারিয়ে।

মৃত্যুর ছ' মাস পরে মমতাজের দেহাবশেষপূর্ণ আধারটি বুরহানপুর থেকে আগ্রা নিয়ে আসা হ'ল। সমস্ত পথে দরিদ্র জনসাধারণকে অর্থ ও খাদ্য বিলিয়ে দিতে আদেশ দিয়েছিলেন সম্রাট্। আগ্রাতে মমতাজের দেহাবশেষ যেখানে থাকবে তার উপর এক সুন্দর স্মৃতিসৌধ গড়তে সংকল্প করলেন সম্রাট্। শহরের দক্ষিণে যমুনার তীরে রাজা মানসিংহের দৌহিত্র রাজা জয়সিংহের এক সুন্দর বাগান ছিল। ক্ষতিপূরণ দিয়ে রাজার কাছ থেকে নেওয়া হ'ল বাগানটি। এই উদ্যানেই রচিত হ'ল মমতাজের সমাধি।

তাতারদের একটা পুরাতন রীতি আছে। সমাধিক্ষেত্র একটি উদ্যানের মধ্যে রচিত হবে। বাগানের ফুলগাছ আর অজস্র প্রস্ফুটিত পুষ্প হবে জীবনের প্রতীক। অপরদিকে সযত্ন রচিত প্রবর্ধমান সাইপ্রেস গাছের সারি হবে মৃত্যু ও শোকের সূচক।

তাজমহল গড়বার জন্য একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করলেন সম্রাট্। সে যুগটাই ছিল স্থাপত্যের। তাজ কোন ব্যক্তিবিশেষের সৃষ্টি নয়। তাজমহল একটি যুগের, একটি শিল্পরসিক জনমানসের সার্থক অভিব্যক্তি।

গাইড নিয়েছিলাম তাজমহলেও। ইউ.পি'র লোক। আগ্রার কাছেই বাড়ী। বুকে আঁটা গাইড ব্যাজ। গৌরবর্ণ। পরণে প্যাণ্ট কোট। হিন্দী আর ইংরেজী মিশিয়ে আমাকে বোঝাচ্ছিলেন।

তাজের প্ল্যান যে সঠিক কার, এ নিয়ে নানা মত ছড়িয়ে আছে। কারও মতে ইটালীয়ান ডিজাইনার জেরোনিমো ভেরোনিও সম্রাটের কাছে প্ল্যান পেশ করেন। কিন্তু

যে মতটি গৃহীত হয়েছে তাতে ভেরোনিওর উল্লেখ নেই। তাজমহলের প্ল্যান পেশ করেছিলেন উস্তাদ ইসা। সম্রাট্ তাঁর প্ল্যানটি গ্রহণ করেন। উস্তাদ ইসা তুরস্কের লোক। কারও মতে তিনি পারস্যের অন্তর্গত শিরাজ থেকে এসেছিলেন।

এক হাজার টাকা মাসিক বেতন ছিল ইসার। অন্য যারা এসেছিলেন তাজমহলকে রূপ দিতে, তাঁরাও সব দূরদূরান্তের। পারস্য থেকে এসেছিলেন আমানত খাঁ, বাগদাদ থেকে মহম্মদ হানিফ আর বল্খ্ থেকে এসেছিলেন মনোহর সিং। কান্দাহার থেকে মন্নুলাল, লাহোর থেকে এলেন কৈয়ুম খাঁ। এক-একজন শিল্পী, এক-এক বিষয়ে পারদর্শী। কেউ লিপি উৎকীর্ণ করতে, কেউ পাথরের প্রাচীর গেঁথে তুলতে, কেউ বা স্মৃতিসৌধের চূড়া গড়তে ওস্তাদ!···

কাঁচা মালও বিভিন্ন স্থান থেকে আহরিত হ'ল। মধ্য এশিয়া থেকে রাজপুতানা পর্যন্ত বিস্তৃত স্থান থেকে সংগ্রহ করা হ'ল এগুলি। জয়পুরের মার্বেল, ফতেপুর সিক্রীর লাল বেলেপাথর, পঞ্জাবের জেসপার, চারখোর কৃষ্ণমার্বেল, বাগদাদের কর্নেলিয়ান, এবং সিংহলের লাপিস্ লাজুলী, হীরা এল বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত পান্না থেকে এবং আরব দেশ ও লোহিতসাগর থেকে আনা হ'ল কোরাল। রঙ-বেরঙের নানা পাথর এল তিব্বত, ইয়েমেন, চীন, বুন্দেলখণ্ড এবং জয়সলমীর থেকে। নাম-না-জানা নানা দ্যুতিময় পাথর, ···তাজমহলের প্রস্তরময় শবাধারে প্রোথিত হয়ে সুন্দর পুষ্পরাজি তারা ফুটিয়ে তুলেছে। কারও মতে তাজমহলের মার্বেলগাত্রে রঙ-বেরঙের পাথরের অলংকরণ ফরাসী-শিল্পী অষ্টিন দ্য বুর্দর শিল্পনৈপুণ্য। কিন্তু সম্ভবত এ অভিমত ঠিক নয়। মার্বেলগাত্রের সমস্ত কাজ মূলতঃ পারস্য দেশের শিল্পকলার ধারা। ফরাসী-শিল্পীর এতে কোন হাত ছিল না।

তাজমহল সমাপ্ত হ'তে সতের বৎসর অতিবাহিত হয়েছিল। কিন্তু তাভার্নিয়েরের মতে তাজমহল সম্পূর্ণ শেষ হ'তে বাইশ বৎসর লেগেছিল। বিশ হাজার শ্রমিক কাজ করেছিল। এর থেকে অনুমান করা যায় এই সুন্দর স্মৃতিসৌধটি নির্মাণ করতে কি বিপুল অর্থ রাজকোষ হ'তে ব্যয়িত হয়। মোগল শাসনের এই দিক্‌টাই বড় অন্ধকার! অর্থ ছিল, আনন্দ ছিল, প্রেম ছিল। কিন্তু সবই চাঁদের এক দিক্। অন্য দিক্‌টা বড় অন্ধকার, বড় দুঃখভরা। সম্রাটের সিংহাসনের পিছনে যে বিপুল জনসাধারণ অপেক্ষা করত, তাদের দুঃখ-দুর্দশার শেষ ছিল না। সম্রাটের বৈভব ও জনগণের দারিদ্র্য—দুই সমানভাবে পরিলক্ষিত হ'ত।

তাজমহল দেখতে যাওয়ার প্রথম পর্যায়ে একটি বৃহৎ গেট দিয়ে আমরা ঢুকলাম। সহেলী বুরুজ আমাদের দেখা হ'ল না। গেট দিয়ে ঢুকে একটি প্রশস্ত স্থানে আমরা দাঁড়ালাম। চারপাশে লাল বেলেপাথরের প্রাচীর এবং ছোট ছোট ঘর। আসলে এই স্থানটি সরাইখানা, পথশ্রান্ত যাত্রীরা সমস্ত দিনের ক্লান্তি এখানে বসে অপনোদন করত। রাজব্যয়ে দরিদ্র ও নিপীড়িত জনগণের সেবা করা হ'ত। কিন্তু এখান থেকেই একনজরে তাজকে দেখা যাবে না। অবগুণ্ঠিতা গৃহবধূর মত তাজ একটু একটু করে নিজেকে উন্মোচিত করেছে। হঠাৎ দেখা দিয়ে নিজের সৌন্দর্যকে সাধারণ করে তোলেনি। আরও খানিকটা হেঁটে ধাপে ধাপে সিঁড়ির উপর উঠে লাল বেলেপাথরের এক প্রকাণ্ড গেটওয়ের সামনে এলাম। এর গায়ে নানা লিপি উৎকীর্ণ; সম্ভবত সেগুলি কোরাণ ও অন্যান্য ধর্মপুস্তক থেকে গৃহীত।

গেটওয়ে পেরিয়ে সুন্দর একটি উদ্যানে আমরা অবতরণ করলাম। লাল বেলেপাথরের দেওয়াল দিয়ে এটি ঘেরা। একটি দেওয়াল যমুনার তীর বেয়ে। উদ্যানে নেমেই প্রথম দুচোখ ভরে তাজকে দেখলাম। আমাদের গাইড বলল, 'তাজকে প্রথম দূর থেকে দেখে নিন।' তখন রোদ বেশ। সূর্য হেলতে সুরু করেছে। কিন্তু আমরা স্থির হয়ে রয়েছি। চোখের আলোয় আঁখি ভরে দেখছি এক মর্মর স্মৃতিসৌধ, যুগযুগান্তের অমর প্রেমের বাণী নিয়ে যে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে তার অনাবিল সৌন্দর্য সম্ভার উন্মুক্ত করে।

উদ্যানে আজ যথেষ্ট পুষ্পসম্ভার নেই। সেই সমাহিত, শান্ত ও বিষণ্ণ সাইপ্রেস গাছের সারি খুব একটা চোখে পড়ল না। দীর্ঘ তিন শত বৎসরে অনেককিছু বদলেছে। বদলায় নি শুধু তাজমহল। দূর থেকে দেখে মনে হ'ল যেন এইমাত্র সম্পূর্ণ হয়েছে স্মৃতিসৌধ—আমরাই এর প্রথম দর্শক।

বিরাট্ গেটওয়ে এবং তাজমহলের মধ্যে একটি মার্বেলের প্ল্যাটফর্ম রয়েছে। তার মধ্য হ'তে একটি ঝরণার উৎস। গেটওয়ে হ'তে একটি পথ সোজা তাজমহল পর্যন্ত পৌঁছেছে। সুন্দর চৌকো পাথরে বাঁধান পথটি। মাঝখানে ক্যানালের মত। তার জলে তাজমহলের ছায়া টলমল করছে। হাঁটতে হাঁটতে একেবারে তাজের কাছে। ততক্ষণে স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে মন, ঠাণ্ডা ফুরফুরে হাওয়া চোখেমুখে এসে লাগছে।

এবার শ্বেতপাথরের মস্ত বড় এক প্ল্যাটফর্ম বা বেদী। কাছাকাছি তাজমহলকে দেখলাম। প্রায় আঠার ফুট উঁচু এই বেদী। সিঁড়ি বেয়ে আস্তে আস্তে আমরা উঠলাম। পিছন দিকে চাইতেই, সেই ঝরণা, ক্যানালের মত জলাশয় এবং বিরাট্ গেটওয়ে আবার চোখে পড়ল। প্ল্যাটফর্মটির চার কোণে চারটি মিনার। শ্বেত মার্বেলের মিনার চারটি সত্যিই অপূর্ব। এক বিদেশী লেখক এই মিনার চারটির সুন্দর উপমা দিয়েছেন। এরা যেন চারটি ধাত্রী, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রাজকুমারীর পরিচর্যা করছে।

এই বিশালকায় বেদীর ঠিক মধ্যখানে চৌকো মস-উলিয়মটি। চারপাশে ছোট ছোট বুরুজ বা গম্বুজ দিয়ে ঘেরা। এগুলি শ্বেত মার্বেলের দ্বারা গঠিত। মধ্যিখানের একটি আটকোণা ঘরে মমতাজ ও শাজাহানের সমাধি। শাজাহানের ইচ্ছা ছিল না যে তাঁর সমাধি তাজমহলেই রচিত হোক। যমুনার ওপরে তাজমহলের ঠিক বিপরীত দিকে আর একটি মর্মর স্মৃতিসৌধ গ'ড়ে তুলতে মনস্থির করেছিলেন তিনি। ইচ্ছা আরও কিছু ছিল মনে। বাসনা ছিল, এই দুটি মর্মর স্মৃতিসৌধ একটি শুভ্র মার্বেলের সেতু দ্বারা সংযুক্ত হবে। এই যোগাযোগ দু'টি সৌধের নয়, দু'টি হিয়ার। মরণের ওপারে গিয়েও যারা যুক্ত, মর্ত্যের বাঁধন ক্ষয় হ'লেও বেহেস্তের এককোণে যারা অমর হয়ে আছে, সংযুক্ত হয়ে আছে একে অন্যের বাঁধনে।

কিন্তু শাজাহানের মনোবাসনা পূর্ণ হয় নি। যমুনার অন্যপারে কাজ সুরু করেছিলেন সম্রাট্। সেই সুরু করা পর্যন্তই হয়েছিল। নতুন তাজমহল গড়া আর হ'ল না, বিবাদ সুরু হ'ল পুত্রদের মধ্যে। আওরঙ্গজেবের চক্রান্তে বন্দীজীবন কাটাতে হ'ল শাজাহানকে দীর্ঘ সাতটি বৎসর। অনেক, অনেক সৌধমালা সৃষ্টি করেছিলেন শাহজাহান। মোগলস্থাপত্য তাঁর হাতে অমর ও কালজয়ী আখ্যা পেয়েছে। শুধু পারেন নি নিজের সমাধিমন্দির গ'ড়ে যেতে। সে ইচ্ছা খোদা তাঁর পূর্ণ করেন নি।

তাঁর মৃত্যুর পর, আওরঙ্গজেব মুন্সী মোল্লাদের ডেকেছিলেন। অর্থব্যয় করে আবার একটি স্মৃতিসৌধ করার এতটুকু ইচ্ছা ছিল না তাঁর। তাই সভায় তিনি বললেন, —আমার পিতা, মাকে খুব ভালবাসতেন। আমার মনে হয় তাঁদের দুজনের সমাধি একই স্থানে, একই ঘরে হওয়া উচিত। সভাসদরা আপত্তি করেন নি। তাই তাজমহলেই সমাধিস্থ করতে আনা হ'ল শাজাহানকে।

মমতাজের সমাধির চারপাশে সোনা আর নানা মূল্যবান্ পাথরে খচিত একটি সুন্দর বেড়ার মত রচনা করেছিলেন শাজাহান। কিন্তু পরে অসঙ্গত হতে পারে এই আশঙ্কায় এটিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রস্তরময় শবাধার দু'টির চারপাশে এখন পাথরের সুন্দর কারুকার্যময় নাতিউচ্চ বেষ্টন শোভা পাচ্ছে। মার্বেলের নির্মিত এই বেড়াটি স্থাপত্যের এক উচ্চ নিদর্শন। এক সময় তাজমহলে দু'টি রৌপ্যনির্মিত দরজা শোভা পেত। সম্ভবত ১৭৬৪ খ্রীঃ জাঠ আক্রমণে সেগুলি লুণ্ঠিত হয়।

এই আটকোণা ঘরটির কোণে কোণে ছোট ছোট কক্ষ আছে। এখানে এক সময় মুন্সী মৌলবীরা ধর্মপুস্তক পাঠ করতেন। কখনও সুমিষ্ট ধর্মসঙ্গীতে ভরে যেত ঘরখানি। মার্বেলের বুকে প্রার্থনার বাণী উৎকীর্ণ হয়েছে। সে কাজ এত সূক্ষ্ম যে, ছোট একটি ছুঁচ এর উপর বুলোলেও মনে হবে না যে, শ্বেতপাথরের বুকে কৃষ্ণপ্রস্তর প্রোথিত করে লিপি উৎকীর্ণ হয়েছে মার্বেলগাত্রে। মসৃণতার এতটুকু অভাব নেই, কোথাও উঁচু নীচু মনে হবে না।

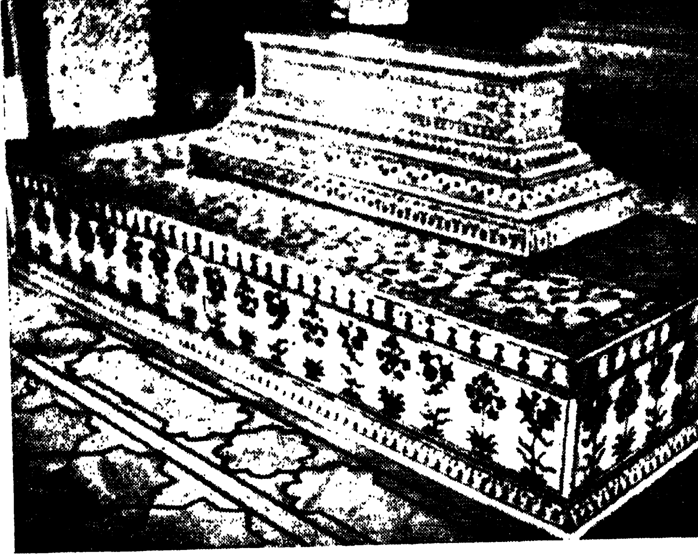
এই বিশাল কক্ষটিতে আলোর খেলা বড় মনোরম। ফার্গুসন লিখেছেন:

The light in the central apartment is admitted only through double screens of white marble trellis-work of the most exquisite design, one on the outer and one on the inner face of the walls.

এই স্ক্রীন বা পর্দা দু'টি এক আশ্চর্য সৃষ্টি। শ্বেতমার্বেল এবং জেসপার পাথরের অপরূপ সমষ্টিতে পুষ্পের এক সুন্দর প্যাটার্ন এতে ফুটে উঠেছে।

মমতাজমহল বেগমের শবাধারটি ঘরের ঠিক মধ্যে। তার পাশে সম্রাট্ শাহজাহানের প্রস্তর শবাধার। সমাধি দু'টিই শ্বেতপাথরের। এর গাত্রে রঙ-বেরঙের নানা পাথরের আশ্চর্য অলংকরণ। ছোট ছোট নানা পাথরের কাজে মনোহর সব পুষ্পসম্ভার ফুটে উঠেছে সমাধিগাত্রে। কর্ণেলিয়ান, এগেট্, লাপিস্ লাজুলী এবং রক্তপাথর······ আরও কত নানা বর্ণের বিচিত্র পাথরের অলংকরণ। একটি ছোট্ট ফুল তৈরী করতে হয়ত পঞ্চাশ-সাটটি বিভিন্ন বর্ণের পাথর ব্যবহার করতে হয়েছে। সমাধির গায়ে লিপিও উৎকীর্ণ। সে কাজ এত সুন্দর যে, শিল্পী হয়ত বিচারেরও ঊর্দ্ধে।

আসল দেহাবশেষ রয়েছে ঠিক নীচের আর একটি কক্ষে। সিঁড়ি বেয়ে আমরা সেখানে পৌঁছলাম। এখানেও সম্রাট্ ও বেগমের সমাধি। প্রস্তরনির্মিত শবাধারটির



মমতাজের কবর

নীচে ওদের মরদেহের শেষাবশিষ্টটুকু রাখা আছে। দু'টি ঘরেই সম্রাটের সমাধি বেগমের চেয়ে সামান্য উচেঁ।

তাজমহলের গোল ছাদ বা গম্বুজে প্রতিধ্বনির খেলা বড় সুন্দর। ছোট্ট একটি শব্দ উচ্চারিত হ'লে একটি সুন্দর সুর ভেসে বেড়ায় বহুক্ষণ পর্যন্ত। ধীরে ধীরে সুরটি হারিয়ে যায়। মনে হয় যেন বেগম মমতাজমহলের জন্যই কেঁদে ফিরছে কোন সুর। অনেকক্ষণ কেঁদে কেঁদে অবশেষে তা মিলিয়ে যাচ্ছে বাহির বিশ্বে, নিখিল নীলাকাশে।

তাজমহলের দুইপাশে, প্রায় একশত গজ দূরত্বে, দু'টি মসজিদ্‌ দাঁড়িয়ে আছে। এগুলি লাল বেলেপাথর এবং শ্বেতমার্বেলে তৈরী। দূর থেকে তাজের দু'পাশে এ দু'টিকে দেখতেও সুন্দর লাগে।

প্রাচ্যের এই আশ্চর্য স্মৃতিমন্দির দেখতে যুগে যুগে বহু লোক এসেছেন আগ্রায়। নানা দেশের, নানা ভাষাভাষী লোক। তাঁদের ধর্ম ভিন্ন, তাঁদের দৃষ্টি অন্য, তাঁদের চিন্তাধারা অন্য দেশের জলবায়ু এবং শিক্ষাদীক্ষায় গঠিত। কিন্তু তাজমহল দেখে অভিভূত হন নি, এমন লোক বোধ হয় কেউ ছিলেন না। এর কারণ সম্ভবত তাজমহলের ইতিবৃত্ত। এর সৃষ্টির পিছনের অপূর্ব ভালবাসার অমর ইতিহাস। মার্বেলের তাজ, শুধু পাথর নয়। পাথরে সৃষ্টি এক প্রেমের কবিতা। দেহাতীত সেই বিশুদ্ধ প্রেম যুগে যুগে নরনারীকে কাঁদিয়েছে। সে কাঁদনে উদ্বেলিত হয়েছে পুরুষ ও রমণীর অন্তর। তাজমহল সেই অনাবিল প্রেমের এক স্মরণীয় প্রতীক। এই পরিপ্রেক্ষিতে তাজমহলের সৃষ্টি কোন ধর্মের নয়, কোন জাতির নয়। জাতি-ধর্মের ঊর্দ্ধে যে অমর প্রেমের পৃথিবী আধেক ছোঁয়ায়, আধেক দেখায় এক-আধবার সামনে আসে, তাজমহল সেইখানের জিনিষ। এই হিংসায় উন্মত্ত ধরিত্রীতে তার অবয়ব পড়ে আছে মাত্র, তাকে বুঝতে বা জানতে হ'লে সেই অন্য জগৎটাকে আগে জানতে হবে। তাজমহল শাজাহানের সৃষ্টি নয়। অর্জুমন্দের প্রেমে পাগল এক ভালবাসায় বিভোর পুরুষের বরণীয় অবদান। তাজ দেখে এক লেখক বলেছেন:

'Angels must have brought it from heaven, and a glass case should be thrown over it to preserve it from every breath of air.'

কিন্তু সার্থক উক্তি সেই রাশিয়ান শিল্পীর। তাজ দেখে তিনি বলেছিলেন—'এক আশ্চর্য সুন্দরী রমণী, একে যা

ইচ্ছা তুমি বলতে পার। কিন্তু যখনই তুমি এর সংস্পর্শে আসবে, তখনই তুমি এর অচ্ছেদ্য আকর্ষণে বাঁধা পড়বে।'

সত্যিই তাজমহল যেন এক রমণী। হয়ত বা মমতাজ নিজেই। কত সুন্দর দেখতে ছিলেন অর্জুমন্দ, দর্শক তার কল্পনায় খোঁজ করে যান। তাজমহল দেখে খানিকটা হয়ত বোঝা যায়। এত সুন্দর যার স্মৃতিমন্দির, সে রমণী এর চেয়েও সুন্দর। প্রস্ফুটিত এক লাল গোলাপের মত, বর্ণে গন্ধে অতুলনীয়া।

তাজমহল দেখতে এসেছিলেন শ্লীম্যান। সঙ্গে তাঁর মেমসায়েব।

'Rambles and Recollections of an Indian Official' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন :—

'I asked my wife, when she had gone over it, what she thought of the building.'

'I cannot,' said she 'tell you what I think, for I know not how to criticise such a building but I can te you what I feel; I would die tomorrow to have such another over me.'

তাজ দেখতে আর একবার এসেছিলাম। প্রায় রাত নটা তখন। টাঙ্গাওলা বলেছিল—'সাব, মুনলাইট দেখবেন না?'

তখন আমল দিই নি। ওর কথার মানেটাও ঠিক বুঝতে পারি নি। কিন্তু রাত্রিবেলায় যখন তাজমহল দেখলাম তখন অনাবিল এক আনন্দে আমাদের মন ভরে উঠল। শুভ্র মূর্তি। মর্মর স্মৃতিসৌধ। সেই নানা বর্ণের পাথরগুলি কোথায় লুকিয়েছে। জ্যোৎস্নায় স্নান করে এক অপূর্ব আলোয় সেজেছে তাজমহল। সেই নানা বর্ণের পাথরগুলি সম্ভবত জ্বলছে। জ্যোস্নার কিরণ পড়ে একখণ্ড উজ্জ্বল হীরার মত মনে হচ্ছে আমাদের সামনের শুভ্র তাজমহল—এক আশ্চর্য সুন্দর দৃশ্য। সত্যিই নয়নাভিরাম।......

হয়ত আর কোনদিন তাজ দেখতে আসা হবে না। আগ্রাতে আর ক'দিন আছি। এই রূঢ় সত্য সমস্ত মনটাকে বেদনায় ভরে দিল। আমার স্ত্রী বলেছিলেন,—'যদি এখানে কিছুদিন থাকতাম তা হ'লে রোজ একবার তাজমহল দেখতে আসতাম।'—কিন্তু থাকার দিনও গোনাগুনতি। হয়ত কাল কিংবা তার পরদিন রওনা হ'তে হবে দিল্লীর পথে।

হোটেলে ফিরতে প্রায় দশটা হ'ল। জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে পৃথিবী, কিন্তু তেমনি শীত। কানের কাছে কনকনে হাওয়া যেন ছুঁচ বিঁধিয়ে দিচ্ছে।

ঘরে এসে কাপড়-জামা ছাড়ছি। গৃহিণী বারান্দায় ঘুরে এলেন খানিকটা। তারপরই আমাকে এসে খবর দিলেন—।

নতুন এবং অনাস্বাদিত সংবাদ পেলে মেয়েরা সবচেয়ে বেশী উত্তেজিত হয়। ওদের কৌতূহলগ্রাহী ইন্দ্রিয়গুলি রসনায় সিক্ত হয়ে ওঠে। তাঁর দ্রুত শ্বাস, চোখের চাহনি দেখে বললাম—'কি ব্যাপার?'

উনি বললেন—'জান, ওদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে।—

'ধরে নিয়ে যাচ্ছে কাদের?'

—'ঐ যে গো। যারা ঋষিকেশ থেকে এসেছে—স্বামী-স্ত্রী।"

অগত্যা চটিটা পায়ে গলিয়ে বেরোলাম। হোটেলের অফিসঘরে একজন পুলিশ অফিসার। বাইরে জন দুই সেপাই মোতায়েন। ব্যাপারটা অন্য কিছু নয়। প্রেমের দোলনায় দুজনে ঝুলেছে। জাতের দারুণ বাধা। বিয়েতে মা-বাবা রাজী হন নি। তাই মেয়েটি পালিয়ে এসেছে সঙ্গীর সাথে। অবশ্য বিয়েটা রেজেষ্ট্রি করে সেরেছিল সঙ্গোপনে। আইনমতে ওরা এখন স্বামী-স্ত্রী।

জাঁদরেল পুলিশ অফিসারকে বললাম—'তবে আর ঝামেলা কিসের মশায়? বিয়ে ত হয়েছে দুজনের।'

কিন্তু আইন বোধহয় তা শুনবে না। অন্তত আইনের প্রহরী সেই পুলিশমশায় শুনতে রাজী নন। বিয়ে যে হয়েছে সেটাই ত প্রমাণ করতে হবে। মেয়ের বাবা কমপ্লেন করেছেন, সেটা বিচার না করে ত বাতিল করা যায় না। বিয়ে করে লুকিয়ে লুকিয়ে চলে আসাটাই কি তা হ'লে অন্যায়?

মেয়েটির দু' চোখে জল। বড় বড় ফোঁটা গাল বেয়ে নামছে।......

আমার মন তখন তাজমহলের স্মৃতিতে ভরা। চোখে তাজের স্বপ্ন, প্রেমের ছবি।......

ভদ্রলোককে বললাম—'আপনি একজন আইনজীবীর সাহায্য নিন।'

কিন্তু ব্যাপার-ট্যাপার দেখে ভদ্রলোকও ঘাবড়ে গেছেন মনে হ'ল। তাঁকে উৎসাহ দিয়ে বললাম—'এত মনমরা কেন মশায়? কোর্টে দাঁড় করালেও, বিয়ে-হওয়া স্বামী-স্ত্রীকে কি কেউ বিচ্ছিন্ন করতে পারে?'......

ওরা চ'লে গেল। যাবার সময় মেয়েটি আমার কাছে এসে বলল—'আপনারা বুঝি তাজ দেখে ফিরলেন? আমরা

ঠিক করেছিলাম যে কাল সারাদিন ধরে তাজ দেখব।' একটা হাল্কা দীর্ঘশ্বাস পড়ল বেচারীর।······

হয়ত তাজমহল দেখতে ওদের আবার আসতে হবে। এ যাত্রায় তাজ দেখা আর হবে না। মেয়েটির চোখে জল দেখেছি। মনটা কেমন বিষণ্ণ হয়ে ছিল। কিন্তু তাজ-মহল কি ওরাও গড়ে তোলে নি? যে ভালবাসায় দু'টি হিয়া বাঁধা পড়েছে তা যদি সত্য হয়, তবে সেই প্রেমই ত এক তাজমহল। কারণ তাজমহল ত পাথরের নয়, তা প্রেম, ভালবাসা ও অনুরাগের সমষ্টিমাত্র।

তাজমহলে গাইড বলেছিল—'বাবুজী, আগ্রায় ক'দিন থাকছেন?'—

—'ক'দিন আবার? দু'-একদিন—'

—'ইৎমাদুদ্দৌলা দেখেছেন?'

বললাম—'না, তবে ইচ্ছে আছে দেখবার—'

সে বলল—'দেখবেন। তাড়াতাড়িতে ওটা যেন বাদ না পড়ে যায়।'

ওর দিকে অবাক্ হয়ে তাকাই।

ইৎমাদুদ্দৌলা আসলে বেবী তাজ—গাইড বলেছিল। যখন দেখলাম তখন আমারও মনে হয়েছে তাই।

পন্টুন ব্রীজ পেরিয়ে বাঁ-দিকে ইৎমাদুদ্দৌলা। যমুনার তীর ঘেঁসে। এখান থেকে আগ্রা শহরটা ভারী সুন্দর দেখায়। দুপুরে রোদ লেগে তাজমহল ঝিকমিক করে। এখান থেকে তাজও বড় সুন্দর মনে হয়।

ইৎমাদুদ্দৌলার চারপাশটা কিন্তু ভারী নোংরা। অপরিসর সংকীর্ণ পথ, ধুলোয় ভরা। মোটর, লরী, টাঙ্গা আর ঠেলাগাড়িতে ঠাসাঠাসি। দোকানপাট তেমন সাজানো নয়। পুরাণো ধাঁচের সব কিছু।

মোগল-স্থাপত্যের ইতিহাসে ইৎমাদুদ্দৌলা স্মৃতিসৌধ একটা সন্ধিক্ষণের মত। আকবরের রাজত্বে যে স্থাপত্য প্রথম জন্ম নিল, জাহাঙ্গীরের সময় তা কৈশোরকোরক। শাজাহানের রাজত্বকাল স্থাপত্যের যৌবনকলা। ইৎমাদুদ্দৌলা জাহাঙ্গীরের সময়ে সৃষ্টি। কিন্তু ইৎমাদুদ্দৌলা শিল্প-সৃষ্টির একটি সার্থক ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেয়। তাজমহলের অনেক কারুকার্যই ইৎমাদুদ্দৌলা সমাধিমন্দিরের পরিপূর্ণ বিকাশ মাত্র। এ বিষয়ে Havell লিখেছেন:

'The towers at the four corners might be the first suggestion of the detached minarets of the Taj. The Hindu feeling which is so characteristic of most of Akbar's buildings is here only conspicuous in the roof of the central chamber over the tomb; in pure saracenic architecture, a tomb is always covered by a dome.'

শ্বশুরের স্মৃতিরক্ষার্থে সমাধিমন্দির সৃষ্টি করেছেন, এ রকম দৃষ্টান্ত ইতিহাসে প্রায় বিরল। হয়ত এ ব্যাপারে জাহাঙ্গীর একক ও অনন্য। কিন্তু জাহাঙ্গীরের কোন উপায় ছিল না। শোনা যায়, বিয়ের আগে কিংবা পরে মেহেরউন্নিসাকে তিনি কথা দিয়েছিলেন। স্ত্রীর মাতা-পিতার স্মৃতিতে একটি সুন্দর স্মৃতিসৌধ গড়ে তুলবেন তিনি। অনেক কথাই আদায় করে নিয়েছিলেন মেহের-উন্নিসা। রূপমুগ্ধ এক প্রেমিকের কাছে অনেক দাবি পেশ করেছিলেন। শাসনকার্যে হাত থাকবে মেহেরউন্নিসার। মুদ্রায় তাঁর নাম অঙ্কিত হবে। স্ত্রীর কথা সব রেখেছিলেন জাহাঙ্গীর। নূরজাহানকে অদেয় তাঁর কিছু ছিল না। মেহেরউন্নিসা থেকে নূরমহল, অর্থাৎ হারেমের আলো। কিন্তু তাতেও জাহাঙ্গীরের অন্তর তৃপ্ত হ'ল কই? নূরমহল হলেন নূরজাহান—জগতের আলো। সন্ধ্যাবেলায় স্ত্রীকে নিয়ে শকটে করে হাওয়া খেতে বেরোতেন সেলিম। পিছনে বসবার আসনে নূরজাহান। চালকের আসনে সম্রাট্ স্বয়ং। স্বর্ণমুদ্রায় নূরজাহানের নাম দেখে জাহাঙ্গীর বলেছিলেন—'সোনার আজ নতুন মূল্য হ'ল, কারণ, তার ওপর নূরজাহানের নাম লিখিত হয়েছে।'

ইৎমাদুদ্দৌলা সম্রাটের প্রদত্ত উপাধি। আসল নাম মীর্জা ঘিয়াস বেগ। ইতিবৃত্ত বলে তিনি পার্শিয়ান। তেহেরান থেকে বেরিয়েছিলেন ভাগ্য অন্বেষণে। কেউ বলে, তিনি তাতারদের বাসভূমি থেকে এসেছিলেন ভারত-বর্ষের দিকে। ভাগ্য অবশ্য চেয়ে হাসল মীর্জার প্রতি। ভারতবর্ষে এসে মোগল সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন তিনি। প্রথম হলেন খাজাঞ্চিখানার বড় খাজাঞ্চি। তারপরই প্রমোশন হ'ল উজীরের পদে। মেয়ে নূরজাহান তখন সম্রাজ্ঞী। মীর্জা ঘিয়াস বেগের আর চিন্তার কোন কারণ ছিল না।

অথচ ভাগ্য অন্বেষণে যখন প্রথম বেরিয়েছিলেন তখন কি কষ্টই না পেতে হয়েছিল ঘিয়াস বেগকে। মরুভূমিতে সহায়-সম্বলহীন অবস্থা। খাদ্য নেই, জল নেই······আশ্রয় নেই। এমনি সময় এক মেয়ে হ'ল মীর্জার। টানা টানা চোখ, মিষ্টি হাসি। মুখের দিকে

চাইলে আর চোখ ফেরাতে ইচ্ছে হয় না। কিন্তু ক্ষুধার্ত ও শ্রান্ত মীর্জা-দম্পতি মেয়েকে এক নির্জন লতাঝোপের পাশে ফেলে যাওয়াই মনস্থ করলেন। এই মরুভূমির কষ্টে নিজেদের প্রাণ বাঁচে কি না তার ঠিক নেই···মেয়েকে বাঁচাবেন কি করে? কিন্তু খানিকটা পথ যেতেই কেঁদে উঠলেন মীর্জার স্ত্রী। মেয়েকে ছেড়ে এক পা হাঁটতে রাজী নন তিনি। আবার ফিরলেন ঘিয়াস বেগ। ঝোপের কাছ থেকে তুলে নিয়ে এলেন ছোট্ট মেহেরউন্নিসাকে।

মেহেরউন্নিসাকে ফেলে এলে মীর্জার কি হ'ত বলা শক্ত। খাজাঞ্চি হতেন হয়ত, কিন্তু মন্ত্রী হওয়া আকাশ-কুসুম কল্পনার সামিল হয়ে থাকত। আর এই সুন্দর স্মৃতি-সৌধ? তা কখনই সৃষ্টি হ'ত না যমুনার কূল ঘেঁসে।······ শুধু খাজাঞ্চি বা মন্ত্রীর জন্য এমন সুন্দর একটি স্মৃতিসৌধ কি গড়তেন জাহাঙ্গীর? নৈব নৈব চ।

স্মৃতিচারণে শ্বশুরমশায়ের কথা লিখে গেছেন জাহাঙ্গীর। মীর্জা ঘিয়াস বেগের পড়াশুনার দিকে ঝোঁক ছিল এবং কবিতায় তিনি অনুরাগী ছিলেন। তাঁর ব্যবহার ছিল মার্জিত এবং ভদ্র। কাজেকর্মে অত্যন্ত পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন ছিলেন মীর্জা। কিন্তু তাঁর একটি দোষের কথা উল্লেখ করে যেতে ভোলেন নি জাহাঙ্গীর। তিনি উৎকোচ নিতে ভালবাসতেন এবং সহজভাবে ও সাহসের সঙ্গে তা দাবি করতেন।

যমুনার তীরে এই স্মৃতিসৌধের নির্মাণকার্য সুরু হয়েছিল ১৬২২ সালে। সেই বৎসরই মারা যান মীর্জা ঘিয়াস বেগ। অন্য আর সব স্মৃতিসমাধির মত এটিও একটি উদ্যানের মধ্যখানে অবস্থিত। একটি বাঁধানো প্ল্যাটফর্মের ওপর শ্বেত মার্বেলে নির্মিত এই সুন্দর সৌধটি ভারী পরিচ্ছন্ন ও নয়নমুগ্ধকর। মেঝেতে মার্বেলের ওপর মোজেইকের কাজ। দেওয়ালের গায়ে রঙ-বেরঙের পাথরের অলংকরণ। মীর্জা ঘিয়াস বেগ ছিলেন পারস্যের লোক, কন্যা নুরজাহানের রক্তে পারস্যের মাটির প্রতি একটা সুপ্ত আকর্ষণ থাকা অসম্ভব ছিল না। হয়ত সেই কারণেই এই স্মৃতিসৌধে পারস্যের আর্ট কিছুটা বেশী পরিলক্ষিত হয়। দেওয়ালের গায়ে যে সুন্দর চিত্রগুলি রঙ-বেরঙের পাথরের সাহায্যে উৎকীর্ণ হয়েছে তা ফুল, সাইপ্রেস গাছ, ফুলদানি, সুরার পাত্র এবং গোলাপজল রাখার আধার। এ সমস্তই অবিকল পারস্যের স্থাপত্য ও চিত্রকলা হ'তে গৃহীত। এই স্মৃতিসৌধের ঘরের ছাদে এবং ওপরের কক্ষের দেওয়ালে ফুল ও নানাবিধ চিত্রের এক আশ্চর্য অলংকরণ দেখা যাবে।

মধ্যখানের কক্ষটিতে মীর্জা ঘিয়াস বেগ এবং তাঁর স্ত্রী ইসমাত-উন-নিসার প্রস্তরনির্মিত শবাধার। এগুলি আসল সমাধি। উপরের কক্ষে অনুরূপ দু'টি নকল সমাধি রয়েছে। মধ্যভাগের কক্ষটিকে ঘিরে আরও কয়েকটি ছোট ছোট ঘর আছে। ঘিয়াস বেগের সমাধি উজ্জ্বল হলুদে আভার এক ধরণের মার্বেলে গঠিত। মধ্যভাগের কক্ষটিকে বেষ্টন করে যে কয়েকটি ছোট ছোট কক্ষ রয়েছে সেগুলিতে পরিবারের অন্যান্য আত্মীয়জনের প্রস্তরনির্মিত শবাধার রয়েছে। স্মৃতিসৌধটির চারকোণে চারটি টাওয়ার বা স্তম্ভ। এগুলির শীর্ষদেশ 'marble kiosques' এর মত রচিত।

১৬২১-২২ সালে মীর্জা ঘিয়াস বেগ চলেছিলেন কাশ্মীর। যাওয়ার পথে কাংড়ায় অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। সম্ভবত সেই অসুখের সংবাদ পেয়ে নুরজাহান লোক পাঠিয়ে তাঁকে নিয়ে আসেন। কিন্তু ঘিয়াস বেগ বুঝেছিলেন, তাঁর অন্তিম আসন্ন এবং নুরজাহানের সাধ্য নেই তাঁকে সারিয়ে তোলেন। অসুস্থ মন্ত্রীকে দেখতে জাহাঙ্গীর এসেছিলেন ছুটে। আর শুধু উজীর নয়, মীর্জা তাঁর সম্মানিত শ্বশুর মহাশয়। ঘিয়াস বেগের কানে তখন ওপারের ডাক এসেছে। নুরজাহান বাবার কাছে বলেছিলেন—'সম্রাট্‌কে তুমি কি চিনতে পারছ বাবা?'—

মৃত্যুপথযাত্রী মীর্জা সে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। উত্তর কথায়, কিন্তু গদ্যে নয়। এক ছন্দোবদ্ধ কবিতায়। মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে এক পারসী কবির কবিতার ক'টি ছত্র আবৃত্তি করেছিলেন তিনি। তার ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন একজন—

"Even if a born blind man
Should happen to be present,
He will at once recognise the chief
By the splendour of his brow."

সত্যই মেধাবী ছিলেন ঘিয়াস বেগ। তাঁর মৃত্যুর পর এক সময় নুরজাহান ভেবেছিলেন যে শুধু রূপো দিয়ে বাপের স্মৃতিতে এক সৌধ গড়ে যাবেন। কিন্তু বুদ্ধিমানরা তাঁকে সবধান করে দেয়। রূপো মূল্যবান—অপহৃত হওয়ার আশঙ্কা ষোল আনা। তাই রূপোর চেয়ে রূপোর মত শুভ্র শ্বেতমার্বেলই বাঞ্ছনীয়।

রূপোর স্মৃতিসৌধ হ'লে এই তিনশত বৎসর পরে তা টিঁকে থাকত কি না সন্দেহ। অন্তত ব্রিটিশ শাসনকালে তা নিশ্চয়ই রাজকোষে গৃহীত হ'ত। কিন্তু শ্বেতমার্বেলের ইৎমাতুদ্দৌলা স্মৃতিসৌধ এই তিনশত বৎসর পরে আজও নতুন ···নবীন দর্শকের কাছে নতুন বিস্ময়ের উদ্রেককারী।

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—মানুষ ও শিল্পী

শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

আঁদ্রে জিদ্ সম্পর্কে আর্নল্ড বেনেট একবার বলেছিলেন : 'He writes in the very midst of morals. They are not only his background but very frequently his foreground.'

উক্তিটি আঁদ্রে জিদ্ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সার্থক কি না এ বিষয়ে অনেকের সন্দেহ আছে। কথাটা আবেগজনিত অতিশয়োক্তি বলে মনে করবার লোকের অভাব নেই। কিন্তু এই মন্তব্য সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে করলে সকলেই তা শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে নেবেন।

বাস্তবিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সারাজীবন আশ্চর্য একটা সুস্থ আবহাওয়ার মধ্যে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। 'বাঁচিয়ে রেখেছিলেন' কথাটা বলছি তাঁর কৃতিত্বের স্মারক হিসাবে। বেঁচে থাকবার দুঃখ, দিনগত পাপক্ষয়ের ঝামেলা তাঁর কম ছিল না, কিন্তু উদার প্রসন্নতায় অপ্রাপ্তির সব বেদনা ঢেকে হাসিমুখে তিনি সত্যসুন্দরের আরতি করে গেছেন। তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে নভেম্বর তিনি দেহ রেখেছেন। সিপাহী বিদ্রোহের আপাতব্যর্থতার হতাশা এবং এই মহান্ জাতীয় জাগরণের প্রেরণা, পরাধীন মাতৃভূমির সর্বস্ব পণ করা মুক্তি-সংগ্রামের ঘটনাবহুল ইতিবৃত্ত, দু' দুটো বিধ্বংসী মহাযুদ্ধ, আবর্তসঙ্কুল ইতিহাসের চাপে বাঙ্গালীর সমাজ-জীবনের নানা ওলট-পালট, পুত্রহীন পরিণত বয়সে জীবন-সঙ্গিনী বিয়োগের মত ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে বহু ছোট-বড় ক্ষয়ক্ষতির সমস্যা, কলকাতা, জব্বলপুর, কাশী, পূর্ণিয়া—দেশের অভ্যন্তর ভাগে ব্যাপক পরিক্রমা এবং ঘরকুণো বাঙ্গালীর একজন হয়েও বক্সার বিদ্রোহের বিশৃঙ্খলার মধ্যে সুদূর চীনদেশে পাড়ি,—বৈচিত্র্যের তরঙ্গাঘাত তাঁর দীর্ঘজীবনে অনেক হয়েছে। কিন্তু আনন্দের কথা এই যে, এই সব নাড়াচাড়ায় কলাসৃষ্টির ক্ষেত্রে বর্ণসমারোহেরই সুযোগ মিলেছে, মনে তাঁর কোন ক্ষতের সৃষ্টি হয় নি। দাক্ষিণেশ্বরে কেদারনাথের বাড়ী, ঘর থেকে দু' পা এগুলেই ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের সান্নিধ্য লাভের দুর্লভ সুযোগ। প্রথম জীবনের কোমল হৃদয়-পাতে এই সান্নিধ্যের প্রভাব পড়েছিল বলেই বোধ হয় বাস্তবের দুঃখদৈন্য কখনও তাতে কলঙ্কের দাগ ধরাতে পারে নি। হাস্যরসাত্মক রচনায় কেদারনাথের শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজনস্বীকৃত। শ্রদ্ধেয় সাহিত্য-সমালোচক ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এদিক্ থেকে তাঁর সঙ্গে ইংরেজী সাহিত্যের ঊনবিংশ শতাব্দীর দিক্‌পাল চার্লস ডিকেন্স এবং বিংশ শতাব্দীর পি. জি. ওডহাউসের তুলনা করেছেন। কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাস্যরসে হাসি আছে, ব্যঙ্গও আছে, কিন্তু বিদ্বেষ নেই। তাঁর লেখনী সত্যাশ্রয়ী, অন্যায়, অসত্য, মিথ্যাচার, দুর্নীতির মুখোশ খুলে দেবার জন্য ব্যঙ্গের আশ্রয় নিতে হয়েছে তাঁকে, তবু এসব রচনার পিছনে সহানুভূতিশীল, মানবতাবাদী ন্যায়নিষ্ঠ গঠনমূলক লেখকমানস থেকে গিয়েছে বলে সে লেখা কঠোরতায় রূঢ় হতে পারে নি। রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে নির্মল শুভ্র হাস্যরসের প্রবর্তক রূপে বঙ্কিমচন্দ্রকে অভিনন্দন জানিয়েছেন, এই উজ্জ্বল রসের সার্থক অনুশীলনের জন্য কেদারনাথও সাহিত্যরসিকমাত্রেরই শ্রদ্ধাভাজন। এই জন্যই সাহিত্যরথী প্রমথ চৌধুরী 'আমরা কি ও কে' গ্রন্থের সমালোচনা-প্রসঙ্গে গ্রন্থকার কেদারনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায়কে অভিনন্দিত করে বলেছেন : "'আমরা কি ও কে' অতি চমৎকার লেখা। ও-লেখার প্রতি ছত্রে রস আছে। আর আপনি বৈঁচি স্টেশন মাষ্টারের যে ছবি এঁকেছেন—বাংলা সাহিত্যে তার জুড়ি নেই। ভদ্র-লোকের অবস্থা শুনে ও তাঁর কথা শুনে আমার দু'চোখ জলে ভরে এসেছিল—অবশ্য হাসতে হাসতে। আমার বিশ্বাস বাংলায় আর একজন লোক নেই যিনি ও ছবি আঁকতে পারেন।"

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস বা গল্প অনেকের কাছে আভিধানিক অর্থে উচ্চশ্রেণীর বলে গণ্য হবে না। এগুলিতে নর-নারীর দৈহিক প্রেমের টানা-পোড়েন নেই এবং চরিত্রগুলির মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা খুবই কম। বিশেষ করে শরৎচন্দ্রের যুগে কেদারনাথের রচনা শ্রেণী-বিশেষের কাছে নিরামিষ মনে হ'তে পারে। আর্টের সূক্ষ্মকলা এগুলিতে প্রায়ই অনুপস্থিত। কিন্তু অন্য হিসাবে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যের মূল্য অনেক। নিজ জীবনের অভিজ্ঞতাপ্রসূত চিত্রধর্মী

মনোজ্ঞ রচনা এবং সেই রচনার অনেকগুলিতে নিজের গ্রামকে পটভূমি ও নিজেকে প্রধান চরিত্ররূপে উপস্থাপন এগুলিতে বিচিত্র রূপ ও রসের সঞ্চার করেছে। এদিক্ থেকে কেদারনাথের লেখার সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম দিক্‌পাল বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখার আশ্চর্য মিল দেখা যায়। তা ছাড়া জগৎ ও জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, সুনীতির প্রতি অটুট আস্থা, কল্যাণ-ধর্মের অবিরাম অনুশীলন এবং পরিবেশ ও ঘটনাসংস্থানের বিরূপতা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত আশ্বাসের দক্ষিণা বাতাস কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যের সম্পদ্। আগেই বলা হয়েছে তাঁর লেখার মধ্যে হাল্‌কা হাসির ছড়াছড়ি, কারও ক্ষতি না করে বা কারও প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ না করে মহৎ ও সুন্দর জীবনাদর্শের প্রতিষ্ঠা করার সাধনা তিনি করেছেন। তাঁর বিখ্যাত সৃষ্টি 'কালাচাঁদ খুড়ো' অমর কমলাকান্তের সরল সংস্করণ এবং কালাচাঁদ খুড়ো তিনি নিজেই। যা কিছু সামাজিক বা জাতিগত অন্যায়, মিথ্যাচার ও দুর্নীতি, কালাচাঁদ খুড়ো ব্যঙ্গের আশ্রয়ে তারই জীবন্ত প্রতিবাদ।

কেদারনাথের ধর্মবিশ্বাস তাঁর বৈশিষ্ট্যের স্মারক। এই ধর্মবিশ্বাসের ব্যাপারে তিনি প্রাচীনপন্থী সন্দেহ নেই, কিন্তু অন্ধ-সংস্কারাচ্ছন্ন নয়। ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে তিনি সব সময় চেষ্টা করতেন প্রাচীন প্রথাদির নিহিত মূল্য উপলব্ধি করতে, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সাহায্যে তাদের যৌক্তিকতা অনুধাবন করতে। এই সঙ্গে আবার আধুনিকতার মহত্ত্বটুকু তিনি হাসিমুখে সশ্রদ্ধভাবে মেনে নিতেন। দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা পরিষ্কার হবে। দেওঘরে বৈদ্যনাথ মন্দিরে ভারতের বিভিন্ন নদীর জল ক্ষুদ্রাকার শিশিতে চড়া দামে বিক্রী হয়, ভক্তরা বাবার মাথায় ঢালবার জন্য তা কেনে। 'কোষ্ঠীর ফলাফল' উপন্যাসে এই দৃশ্যের বর্ণনা হাস্যরসাত্মক, কিন্তু বর্ণনাটির শেষ দিকে কেদারনাথের মানসলোকের পরিচয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। প্রাচীন প্রথার মূল্যায়নে কেদারনাথ আবেগের সঙ্গে বলেছেন: "এই জলদেবতা এমন সব দুর্লভ জিনিষ রাখেন, য হাদের ড্রামের মূল্য কিং কোম্পানীর এক ড্রামের মূল্য অপেক্ষা অনেক বেশি। কিন্তু তাহা অন্যায় নহে, অন্যায্যও নহে; কারণ এই সব জল জাহাজেও আসে না, ল্যাবরেটরীতেও বনে না। গরীবেরা অধিকাংশ পথই পদব্রজে অতিক্রম করিয়া সেতুবন্ধ, দ্বারকা, মানস সরোবর প্রভৃতি সুদূর দুর্গম তীর্থ হইতে অসীম শ্রমে বিপদ্‌সঙ্কুল পথে তাহা বহন করিয়া আনে। এই শ্রদ্ধার সামগ্রীর যথার্থ মূল্য আমরা দিতে পারি কি? পারি কেবল উপহাসের এক ফুৎকারে তাহাদের সৎকার করিতে।" শারদীয়া অষ্টমীতে দেবীকে কাপড় দেওয়ার রীতি সাধারণ্যে প্রচলিত। পূজায় সার্বজনীন নববস্ত্র সংগ্রহের চাপে এ কাপড়ের গুণাগুণের জন্য কারও বড় একটা মাথাব্যথা নেই, নিয়মরক্ষা হ'লেই হয়। ভক্ত কেদারনাথ কিন্তু এতে সুখী নন। স্বাভাবিক ব্যঙ্গের আশ্রয় নিয়ে 'ভোলানাথের উইল' গল্পে তিনি লিখলেন: "বেপরোয়া বাঙ্গালীরা বাড়ীর তাগাদামত আপিস যেতে আসতে দুবেলা পূজার মালের খবর নিচ্ছিলেন। মহালয়ার (শ্রাদ্ধের) দিনে 'শো কেসে' শাণিত 'মদনবাণ' শাড়ী ঝুলতে দেখে তাঁরাও গলা বাড়িয়ে ঝুলে পড়লেন, ছোঁ মেরে নিয়ে যেতে শুরু করলেন।...সপ্তমীর মধ্যে বাঙালীদের খরিদ একপ্রকার শেষ—কেবল মহাষ্টমীতে দেবীকে দেবার মত সস্তা কস্তাপেড়ের জন্যে তেমন তাগাদা ছিল না। একজোড়া নিয়ে ঝিয়েরও একখানা হবে, দুর্গারও একখানা হবে।"

আবার, আগেই বলেছি, সনাতন ভাবধারা ও ধর্ম-বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হওয়া সত্ত্বেও আধুনিক জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কেদারনাথ সচেতন ছিলেন না। বস্তুবাদী ঐতিহাসিক পরিবর্তন তিনি সহজভাবেই গ্রহণ করেছিলেন। এইজন্য সম্ভাবনাময় নূতনকে বরণ করতে তাঁর দ্বিধা ছিল না। অবসর গ্রহণের পর তিনি কাশীবাসী হয়েছিলেন পুণ্যার্থী হয়েই, কিন্তু সেখানে শুধু ধর্মচর্চা বা পূজানুষ্ঠানই তাঁর অবলম্বন হ'ল না। তিনি কাশীধামেও সমবয়সী বৃদ্ধদের চেয়ে, দেশের যারা ভবিষ্যৎ সেই তরুণদের সঙ্গে বেশি মিশ্‌তেন এবং তাদের বোঝবার বা বোঝাবার চেষ্টা করতেন। 'আই হ্যাজ' উপন্যাসে এর কৈফিয়ৎস্বরূপ তিনি বলেছেন—"তরুণদের মন স্ফটিকের মত স্বচ্ছ, তারা ভুল করতে পারে, কিন্তু জ্ঞানতঃ অনিষ্ট করবে না। পারলে সাহায্য করাই তাদের ধর্ম, না পারলেও চেষ্টা পায়। তাই না ভালবাসি।" আবার 'চাটুয্যে সংবাদ' গল্পে বলেছেন—"অবসর গ্রহণান্তে কাশী এসে রইলুম। একটা কিছু নিয়ে থাকা চাই। অনন্যস্ত পূজা, জপ, গঙ্গাস্নান নিয়ে অনির্দিষ্ট দিনের অপেক্ষা করাও বড় বোরিং।

"জয়নারায়ণ স্কুলের সামনে রেউড়িতলায় বাসা—দ্বিতলেই থাকি। প্রীতিভাজন তরুণেরা আসেন—কেহ লেখক, কেহ সাহিত্যপ্রেমিক। বেশ একটি আনন্দ-বৈঠক নিত্যই বসে—সাময়িক সাহিত্যকথা চলে। তারা

যেন নবযুগের বার্তাবাহক—চোখে-মুখে আনন্দ উত্তেজনা ও প্রাণশক্তির চাঞ্চল্য। কিছু সৃষ্টির জন্য উৎসুক। ভাবতুম এই ত যৌবন, একেই বলে যৌবন। এরাই ত জগৎকে নূতন রূপ দিতে আসে।"

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৎ ও সাত্ত্বিক জীবন-যাপনের অনুরাগ কিরকম গভীর ছিল 'কাশীসঙ্গীতাঞ্জলি', 'বাণীসুধা'র পবিত্র গান ও কবিতাগুলির মধ্যে তার স্পষ্ট পরিচয় মেলে। বলতে গেলে তাঁর প্রায় সব রচনাতেই এই মহৎ মনোধর্মটি ছড়িয়ে আছে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এই ধর্মের বাস্তব মর্যাদা দিয়েছেন। পুঁথিগত বিদ্যার পুঁজি তাঁর বেশি ছিল না, কিন্তু চাকরিটি তিনি পেয়েছিলেন ভাল। সেই চাকরির বন্ধন কিন্তু তাঁকে বাঁধতে পারে নি, বিষণ্ণ করেই রাখত। একমাত্র সন্তান কন্যার বিবাহের পর সংসারেদ রায় একটু কমার সঙ্গে সঙ্গেই কেদারনাথ তাঁর অফিসার মেজর স্মিথ, ডি. এস্. ও-কে জানালেন চাকরি করতে তাঁর আর মন নেই। খোলাখুলি বললেন: "'ছেলে নেই, কন্যাদায়-মুক্ত হয়েছি; জীবন কিন্তু নিষ্ফল। জীবিকার্জন করেছি মাত্র, নিজের কাজ কিছুই করা হয় নি। আমি ব্রাহ্মণ-সন্তান, পরমার্থ চিন্তা আমার অবশ্য করণীয় কাজ, সেটা রয়ে গিয়েছে।' সব সত্য কথা বললুম ও আমাকে কর্ম হতে অবসর নিতে সাহায্য করতে অনুরোধ করলুম। তিনিশুনে অবাক্। পরে আমার প্রস্তাবের আন্তরিকতা ও দৃঢ়তা বুঝতে পেরে বললেন, 'পাঁচটা বছর থাকলে এখন যা পাচ্ছ তার তিনগুণ পাবে, নির্বোধের মত এরূপ ত্যাগস্বীকার কেন?' বললুম, 'সারাজীবন comfort seeking-এ (আরাম খুঁজে) কেটেছে, একাজে ত্যাগই প্রথম সোপান, আমি যদি অল্পে চালাতে না পারি, ত্যাগের আনন্দ আমাকে সাহায্য না করে, তবে বুঝব আমার এ সংকল্পের মধ্যে সত্য নাই'। (দাদামশায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প— সজনীকান্ত দাসের ভূমিকা।)

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানবতাবোধ অপরিমেয়। এই মানবতাবোধের আত্যন্তিকতায় তাঁর অনেক লেখা সম্ভাবনা সত্ত্বেও আর্টের পর্যায়ে উঠতে পারে নি। বিশেষ করে সমাজে যারা ছোট হয়ে থাকে তাদের জন্য সুগভীর মমতায় তিনি সর্বদাই উচ্ছল। বৃদ্ধ বয়সে প্রীতিধন্য সকলে তাঁকে দাদামশাই বলে ডাকতেন, সে উপাধি সার্থক। তাঁর জীবনচর্যা এবং সাহিত্যকৃতি এই দাদামশায়-সুলভ স্নিগ্ধ ভালবাসায় সমুজ্জ্বল। সমাজে অন্যায় সুযোগ নিয়ে যারা অতিরিক্ত সুবিধা ভোগ করে, সামাজিক দায়িত্ব পালনের ভার নিয়ে আনুষঙ্গিক অধিকার ভোগ করেও যারা সে দায় বহন করে না, তাদের তিনি কঠিন আঘাত করতেন। কিন্তু যাদের যোগ্যতা উপযুক্ত কর্মক্ষেত্রে পরীক্ষিতই হ'ল না, সুযোগের অভাবে চিরকাল যারা ছোট হয়ে রইল, অকৃত্রিম প্রীতিস্পর্শে তিনি তাদের উজ্জ্বল করে এঁকেছেন। এই জন্যই কোষ্ঠীর ফলাফলে সাধারণ কাবুলীওয়ালা মুসলমান আজিজ অনায়াসে ব্রাহ্মণ সমাজপতি সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্যকে অতিক্রম করে গেছে। এই গ্রন্থের শেষ দিকে প্রচণ্ড শীতের রাতে ট্রেণের যে দরিদ্র পাহাড়ী যুবক নিজের শেষ সম্বল কম্বল-খানা ঢেকে দিয়ে শীতার্ত সহযাত্রীর প্রাণ বাঁচিয়ে হাসি-মুখে নেমে গেল তার কথা ভোলা যায় না। তাঁর 'থাকো' গল্পে পল্লীগ্রামের পরিচারিকা শ্রেণীর গয়লা বৌ থাকো, চরিত্র তার নীতিশাস্ত্রের বিধানে হয়ত দাঁড়ায় না, কিন্তু হৃদয়ের ঐশ্বর্যে সে শুধু গ্রামের ইতর-ভদ্র সকলকে জয় করেনি, সহৃদয় পাঠকের অন্তরও জয় করেছে। 'কালী ঘরামী' গল্পে সামান্য চাকর কালী পরের গ্রামের মানুষের কষ্ট লাঘবের জন্য নিজের বহুশ্রমে অর্জিত ৫২২ টাকা স্বেচ্ছায় সাঁকো তৈরীতে নিজের নামটি গোপন রেখে দান করল, দক্ষিণেশ্বর গ্রামের সে সাঁকোর সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেছেন কেদারনাথ। 'আনন্দময়ী দর্শন' গল্পে ব্যাণ্ডেলের ষ্টেশন মাষ্টার অতিকায় ও ভীষণদর্শন কাফ্রী খ্রীষ্টান মিঃ শেফার্ড, মুসলমান যুবক সুলতান, ট্রেণের ইউরোপীয় টিকিট-পরীক্ষক মিঃ হার্ডি, সাধারণ বাঙ্গালী যুবক সতীশ, সকলেই হৃদয়-মাধুর্যের অনুপম প্রকাশে পাঠকের মন লুটে নিয়েছে। মিঃ হার্ডির প্রথম দর্শন প্রীতিকর নয়, রূঢ়ভাষী কর্তব্যবিলাসী শ্বেতাঙ্গপুঙ্গব, কিন্তু এই কঠিন বহিরঙ্গরূপের অন্তরালে তাঁর স্নিগ্ধ-কোমল মনটিকে খুঁজে বার করেছেন লেখক। উৎসব প্রাক্কালে ওড়নাখানি উপহার দিয়ে আদরের বোন সেলিনার মুখে হাসি ফোটার মধুর কল্পনা করতে করতে বৈঁচি ষ্টেশন থেকে নিজের গ্রামের পথে রাত্রির অন্ধকারে পা বাড়াল সুলতান, আর তাকে বিপদমুক্ত করে গৃহমুখে বিদায় দিয়ে ফেরার ট্রেণের জন্য বৈঁচি ষ্টেশনে অপেক্ষা করতে লাগলেন মিঃ হার্ডি। কেদারনাথ লিখছেন—"মিঃ হার্ডি এবার জ্যোৎস্নাখচিত চন্দ্রাতপতলে একখানা চে[illegible]র টানিয়া আনিয়া উদাসভাবে বসিলেন। তাঁহার একমাত্র বোন সোফিয়ার কথা মনে পড়িল। দেড় বৎসর হইল সোফিয়া তাঁহাকে পর পর তিনখানি পত্র লেখে ও প্রত্যেকখানিতেই ভারতের রমণীদের পোশাক-পরিচ্ছদ

ও অলঙ্কারাদির আর নূরজাহান ও তাজমহলের ফটো পাঠাইয়া দিবার জন্য আগ্রহপূর্ণ অনুরোধ জানায়। তিনি 'মিছে কাজ' বলিয়া তাহা গ্রাহ্যই করেন নাই। আজ সেই বিস্মৃত কথা বার বার তাঁহাকে আঘাত করিয়া পীড়া দিতে লাগিল। সোফিয়ার অভিমান-ভারাবনত চক্ষুর মধ্যে ভগ্নীত্বের অবমাননার নালিশ তিনি আজ সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলেন।"

কেদারনাথ প্রথম জীবনে বাংলার যে সমাজ রূপ দেখেছিলেন তাতে ভাঙনের ইঙ্গিত ছিল সুস্পষ্ট। নীতি-বোধ, শৃঙ্খলা এবং মানবিকতার অবক্ষয় যত্রতত্র পরিলক্ষিত হ'ত। বঙ্কিমচন্দ্র কথিত 'বাবু'র দল তখন পারিবারিক জীবনে স-দাপটে বিরাজমান, ফলে কুলমহিলাদের দুর্দশার অনেকক্ষেত্রেই অন্ত ছিল না। এর বিপরীতে পতিতারা বরং সুখে থাকত। সমাজজীবনে সর্বব্যাপী পুরুষ-প্রাধান্যের ফলে স্বভাবতই মেয়েদের মনে একটা অন্তর্নিহিত হীনতাবোধ ব্যাপকভাবে সঞ্চারিত হয়েছিল, যার জন্য অবস্থাকে যা করে হোক মানিয়ে নেবার একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছিল তাদের মধ্যে। কেদারনাথ মাতৃজাতির এ দুর্গতিতে ব্যথিত হয়েছিলেন। অসহায়া কুললক্ষ্মীদের হৃদয়-ঐশ্বর্য প্রকাশ ক'রে তাদের প্রকৃত মূল্যায়নের জন্য এবং তাদের প্রাপ্য মর্যাদা ফিরিয়ে দেবার জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করেছেন। তাঁর স্বাভাবিক ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে লেখা "দেবী-মাহাত্ম্য" এ হিসাবে এক অবিস্মরণীয় গল্প। প্রফুল্ল স্বচ্ছল গৃহস্বামী, কালাচাঁদ খুড়ো তার দরিদ্র প্রতিবেশী। বলা বাহুল্য, কালাচাঁদ খুড়ো বা খুড়োর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছেন স্বয়ং কেদারনাথ। গল্পে বন্ধু-পরিবৃত প্রফুল্ল ও খুড়োর কথোপকথনের একাংশ তুলে দিলাম:

"প্রফুল্ল—একদিন রাত্রে বেড়িয়ে এসে ডাকলুম, দু' মিনিট হয়ে গেল উত্তর নেই, দোর খোলাও নেই। রাত তখনও সাড়ে বারোটা হয় নি হে! রাগে ব্রহ্মাণ্ড জ্বলে গেল। সজোরে একটা লাথি মারতে খিলটা কোথায় ছিটকে গেল।

খুড়ো—এক লাথিতে, অ্যাঁ,—মায়ের দুধ খেয়েছিলে বটে! তারপর?

প্রফুল্ল—দেখি, লাণ্ঠান নিয়ে ছুটে আসছেন! খুকিটে চিল চেঁচাচ্ছে, বরদাস্ত করতে পারলুম না। লাণ্ঠানটা ছিনিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলুম।

খুড়ো—আমিও ঠিক তাই ভেবেছিলুম, ও সময় ও ছাড়া আর কিছু আসতেই পারে না, fitও করে না। আমি নিজে না পারলেও তোমাকে বুঝতে পারি না। দাব্ থাকা চাই বই কি! আর নয়ত স্ত্রী পুরুষে প্রভেদ থাকে কোথায়?

প্রফুল্ল—শুনুন, তার পর সাড়ে তিন মাস হয়ে গেল, আজও দোরের খিলটে হ'ল না! সেটাও কি আমার কাজ?

খুড়ো—তুমি যে অবাক্ করলে বাবাজি! তুমিই ভাঙবে আবার সারাতে হবে তোমাকেই! তাহলে ত যার অসুখ তাকেই ডাক্তার ডাকতে ওষুধ আনতে যেতে হয়।"

এই 'দেবী-মাহাত্ম্য' গল্পের মতই আর একটি সার্থক গল্প 'নামঞ্জুর'। অবশ্য 'নামঞ্জুর'-এ কেদারনাথ ব্যঙ্গের সাহায্য নেন নি। এতে স্বার্থপর দুর্নীতিপরায়ণা স্ত্রীলোকের রূপ তিনি দেখিয়েছেন 'মাষ্টার বৌ' চরিত্রে, সতীলক্ষ্মী স্ত্রী ক্ষ্যান্ত থাকা সত্ত্বেও মাধব মোহে পড়ে যাকে নিয়ে ঘর বেঁধেছিল। ক্ষ্যান্তর কাছে 'মাষ্টার বৌ' একেবারে ম্লান হয়ে গেছে। গল্পটিতে জটিল সমস্যার একটা সুলভ সমাধান হয়েছে সন্দেহ নেই, প্রাচীনপন্থী মনের একটা চাপও এতে আছে—এসব হিসাবে আর্টের দিক্ থেকে গল্পটির দাম একটু কমে গেছে। কিন্তু তা হ'লেও নিগৃহীতা, অবহেলিতা বাংলার পুরস্ত্রীদের জন্য কেদারনাথের বেদনাবোধ এতে চমৎকার ফুটেছে।

বাংলার শ্যামল প্রকৃতিকে কেদারনাথ যেমন ভালবাসতেন, তেমনি ভালবাসতেন তার মানুষগুলোকে। এই বাঙ্গালীর দোষ, হীনতা বা অধঃপতন তাঁকে মর্মাহত করত। তাদের সব দিক থেকে মানুষ করে তোলবার জন্য সাহিত্যিক কেদারনাথ সাধ্যমত চেষ্টা করেছেন এবং এর জন্যই তিনি ব্যঙ্গের আশ্রয় নিয়েছেন। বাঙ্গালী হৃদয়বান্ হোক, সৎ হোক, কর্মী হোক, নিজের ঐতিহ্য আর অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে সম্ভাবনা অনুযায়ী নিজেকে গড়ে তুলুক, এই ছিল কেদারনাথের স্বপ্ন। 'আমরা কি ও কে' গ্রন্থের গল্পগুলি প্রধানতঃ এই দৃষ্টিকোণ থেকেই লেখা। গ্রন্থের নাম-গল্পে বাঙ্গালী চরিত্রের দুর্বলতার বিপরীতে তিনি একটি অত্যুজ্জ্বল অথচ অতি সাধারণ মাতাল ইংরেজ নাবিকের ছবি এঁকেছেন। এই নাবিকটি প্রচণ্ড ঝড়জলের মধ্যে হাওড়া ব্রিজের উপর থেকে অসুস্থ বাঙ্গালী তরুণ কিশোরীর প্রাণরক্ষা করল নিজের পানে না তাকিয়ে, অথচ কলকাতা থেকে গৃহাভিমুখী ডেলি প্যাসেঞ্জার বাঙ্গালী কেরাণীর দল কিশোরীকে পড়ে থাকতে দেখেও

ঝড়জল থেকে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টাতেই দ্রুতপায়ে অন্তর্ধান হ'ল। এখানেও কেদারনাথ কালাচাঁদ খুড়োর বেনামীতে উপস্থিত হয়েছেন এবং ক্ষুরধার ব্যঙ্গের আঘাতে স্বদেশবাসীর চৈতন্য ফেরাতে চেষ্টা করেছেন। গল্পের শেষে অসুস্থ কিশোরীকে তার স্বস্থান শ্রীরামপুরের গাড়িতে তুলে দিয়ে শ্বেতাঙ্গ নাবিক ফিরল, কালাচাঁদ খুড়ো তার ফিরে যাওয়ার চিত্র বর্ণনা করছেন:

"দূর থেকে দেখা গেল, যাকে ঝড়বৃষ্টির মধ্যে বেপরোয়া হাওয়ার মত হঠাৎ মোড় ফিরে এসে পড়ায় পেয়েছিলুম, সে তেমনি নির্বিকার স্বাধীন হাওয়ার মত সেই ঝড়বৃষ্টির মধ্যেই চলেছে। তার কোথাও বাধা সঙ্কোচ, ভেদাভেদ নেই। আশ্রয় তাকে বাঁধতে পারে নি। বিলিতী binding-এর (মলাটের) জীবন্ত বেদান্ত!'

এই ভাবেই বাঙ্গালীর দুর্বলতার উপর কেদারনাথ ব্যঙ্গের কুঠারাঘাত করেছেন 'দাদার দুরভিসন্ধি' গল্পে। বড়ভাই জগৎ প্রবাসে চাকুরি করে, ছোটভাই শশী বাড়ীতে থেকে ক্রমেই সঙ্গদোষে অল্পবয়সেই সাবালকত্ব লাভ করছে। লেখাপড়ায় সে ইস্তফা দিতে চায়, শিক্ষক বিধুমাষ্টার ব্যাজস্তুতিতে এই দুষ্টকে সমর্থন করলেন: "যাদের নষ্ট করবার মত টাকা আছে তারা চিরদিন পড়ুক না, তা না ত আমাদের চাকরি থাকবে কেন? তোমার সঙ্গে ত সে কথা নয়, তুমি আমাদের নমস্য ঘোষাল মশায়ের ছেলে। যা শিখেছ, তা গেরস্থ ছেলের জন্য যথেষ্ট। ওর ওপরে গেলেই—কবিতা লেখা আর কাগজে জ্যাঠামি করা বাড়ে বৈ ত না। তোমাকে সে কুপরামর্শ দিয়ে আমি পাপ বাড়াতে পারব না। লেখাপড়া যদি জ্ঞানবুদ্ধি বৃদ্ধির জন্যে হয়, আর ঘোষাল মশায়ের বুদ্ধির যদি এক কাঁচ্চাও পেয়ে থাক ত কোন মাড়োয়ারী বাচ্চাও তোমাকে ঠকাতে পারবে না—এ আমি গঙ্গাজল ছুঁয়ে বলতে পারি। আর যদি রোজগারের কথা তোল, পশুপতিবাবুর কাছে শুনেছি, জগৎ বেশ দু'টাকা কামাচ্ছে। তোমার চারদিকে চটকলের কুলি আর কন্যাদায়গ্রস্ত কেরাণী, সেই টাকা আনিয়ে মোটা সুদে ছাড়লে একটা হৌসের মুচ্ছুদ্দির মোটা রোজগার ঘরে বসেই করতে পারবে। হিসেব যখন হাসিল করেছ তোমার আবার ভাবনা কি, টাকা লাফিয়ে বাড়বে। বুদ্ধির 'টেস্‌ট্‌' টাকা রোজগার।"

ভয়াবহ ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর দেশে শান্তিশৃঙ্খলা আনবার সংকল্প নি'য়েই লর্ড কর্ণওয়ালিস জমিদারী প্রথার প্রবর্তন করেছিলেন। সমাজের উচ্চস্তর থেকেই প্রধানতঃ জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু কালক্রমে লর্ড কর্ণওয়ালিসের এই মহান্ কাজটি নৈরাশ্যজনক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হ'ল, বাংলার জমিদার সম্প্রদায়ের আত্মকেন্দ্রিকতা, আলস্য, দম্ভ, বিলাসিতা ও অমিতাচারের হীনতা বাঙ্গালীর সমাজজীবনের উপর প্রতিক্রিয়াশীল প্রভাব সৃষ্টি করল। সম্ভাবনাপূর্ণ ব্যবস্থার এই শোচনীয় পরিণতি কেদারনাথ অপেক্ষাকৃত প্রাচীনপন্থী হয়েও সমর্থন করতে পারলেন না। 'দুর্গেশনন্দিনীর দুর্গতি' শীর্ষক হাস্যরসাত্মক গল্পটিতে এই জমিদারের ব্যঙ্গচিত্রই তিনি ফুটিয়েছেন। গল্পটির প্রথম কয়েকটি পংক্তি পড়লেই কেদারনাথের বক্তব্য এবং আকাঙ্ক্ষা অনবহিত পাঠকের কাছেও ধরা পড়বে:

"চৌধুরী মশাই ছিলেন গ্রামের একজন সম্ভ্রান্ত সম্মানিত স্থূলকায় মাতব্বর, ছ আনি জমিদার। বাড়ী, বাগান, পুষ্করিণী, শিবমন্দির, সটকার মাথায় অনির্বাণ বাড়বানল, সবই তাঁর ছিল। আর ছিল—তাস, পাশা, অহিফেন আর সান্ধ্য মজলিস—এই চতুর্বেদ চর্চা। অহিফেনটা তিনি আহার করতেন, সাত সের দুধে দু'ভরি আফিং সুপক্ক হলে তার সরখানি তিনি ভোগে লাগাতেন, দুগ্ধটা পার্ষদদের মধ্যে অধিকারী মত বণ্টন হ'ত।

ভৃত্য নন্দার প্রধান কাজ ছিল, গোসেবা, দুগ্ধ প্রস্তুত আর কলকে বদ্‌লে দেওয়া। আর যে কাজটি ছিল সেটি সে দুধ জ্বাল দিতে দিতেই সেরে রাখত। কথাবার্তার জবাব সে চোখ বুজেই দিত।

চৌধুরী মশাই কখনও কখনও আন্দাজে বলতেন, "নন্দা, ঘুমুচ্ছিস বুঝি! খবরদার বেটা, দোর গোড়ায় বসে ঝিমুলে গেরস্তোর অকল্যাণ হয় জান না পাজি, দূর করে দেব।"

নন্দা চোখ বুজেই বলত—"আপনি দেখলেন কখন হুজুর।"

কথাটা ঠিক, শুনে চৌধুরী মশাই খুশীই হতেন। বড়লোকের, বিশেষ জমিদার লোকের, চোখ চেয়ে থাকাটা একেবারেই ভাল নয়, লোকসেনে লক্ষণ। প্রজা বেটারা চোখ দিয়েই ভেতরে ঢুকে বাঁধি ব্যবস্থা বিগড়ে দেয়—মতলব হাসিল করে নেয়—দুঃখ-কষ্ট মাখানো মুখ দেখিয়ে অকস্মাৎ দয়া টেনে বার করে বসে। এটা ছিল তাঁর পিতৃবাক্য। চোখ চাওয়ার তরে পড়ে রয়েছে ভস্মলোচনেরা—নায়েব, গোমস্তা, পাইক, পেয়াদা।"

বাংলা দেশের মানুষের মত বাংলা সাহিত্যকে কেদার-

নাথ প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন এবং বাংলা সাহিত্যের অনুশীলন যাতে বাড়ে তার জন্য সর্বপ্রকারে চেষ্টা করতেন —অবসর গ্রহণের পর কাশীতে গিয়ে ধর্মেকর্মে আত্মনিয়োগের চেয়ে সাহিত্যানুশীলনে তিনি নিজেকে অধিকতর ব্যাপৃত রাখতেন। তাঁর উপন্যাস "আই হ্যাজ"এ আছে, কাশীতে কালীকুমারকে তিনি বলছেন, "তুমি ভাই বঙ্কিমবাবু, রবিবাবু আর শরৎবাবুর যা লেখা বেরিয়েছে, তাই ভাল করে দেখ—বারবার—আর কিছু দেখ আর না দেখ। রসে, সৌন্দর্যে, শিল্পে, আমাদের অমন সম্পদ্ রামায়ণ মহাভারত ছাড়া আর কোথাও আছে কি না আছে আমার জানা নেই।" মাইকেল মধুসূদন সম্পর্কেও তাঁর শ্রদ্ধা কি রকম প্রগাঢ় ছিল 'কোষ্ঠীর আলাপে'র মূল চরিত্রের দেওঘরে নাতজামাইয়ের সঙ্গে কথোপকথনের উদ্ধৃতি থেকে তা বোঝা যাবে— "আবার আমাদের মধু কবি মাইকেল ক'দিন ধরে এক নাপিতের মামলা—কয়েকটা কবির গান শুনে ভরে দিয়েছিলেন, তাইতেই হাজার টাকা খোলের ফাঁকটা উপ্‌চে উঠেছিল।

"শ্রীমান্—আর তাই তাঁর শেষ অবস্থাটাও খুব শোচনীয়, মলেনও দাতব্য চিকিৎসালয়ে।

"বলিলাম—মলেন!—না মরাকে বাঁচালেন? কোন খবরই রাখ না বন্ধু। ত্রেতাযুগের মরা মেঘনাদকে সব যুগে অমর করে গেলেন, আর নিজেও অমর হয়ে রইলেন —তোমার মেটিরিয়েল 'মেশিনগানের' এত শক্তি নেই যে আর তাঁদের মারেন।"

কাশীতে একবার শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কেদারনাথের সাক্ষাতের সম্ভাবনা হয়। 'কবুলতি' গল্প গ্রন্থের 'স্মরণে' গল্পে আছে, সেই প্রসঙ্গে তিনি বললেন—"শরৎবাবুকে দেখবার ইচ্ছাটা সত্যই প্রবল। যিনি বইছাড়াদের কেঁচে বই ধরিয়েছেন তাঁকে দেখতে হবে বই কি। খ্রীষ্টানই হয়েছি—তা বলে সরস্বতী পূজো করব না কেন?"

এর পর যখন শরৎচন্দ্রের সাহিত্যকৃতির এক নব মূল্যায়ন—"চরিত্রহীনে গৃহদেবতা নারায়ণকে অন্ন দেওয়ার ঘটনাটা নিয়ে কলেজ থেকে ফেরবার পথে— গঙ্গাতীরে বসে যে অনুতপ্ত অপরাধীটি শাস্তিলাভার্থে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল, সে দিবাকর নয়, বোধ করি শরৎচন্দ্র। অন্ততঃ দিবাকরের প্রাণে যিনি অনুতাপ এনেছিলেন তিনি—আপনি। আবার অতবড় বিচার-গর্বিতা বিদূষী কিরণময়ীর হাতে যিনি কালীঘাটের ফুল বিল্বপত্র দিয়ে তার অভিনয়ের পরিসমাপ্তি করেছেন, তিনিও আপনি বই আর কেউ নন।" তার পর শরৎচন্দ্র বিদায় নিলে তাঁর প্রসঙ্গ আলোচনার জের টেনে কেদারনাথ বললেন —"যে লোকটির লেখা পড়তাম আর অবাক্ হয়ে ভাবতাম—বাঃ, কোথাও ফিকে মারছে না। ভাষার শক্তি আর সৌন্দর্যে—ঘরের পরিচিত আটপৌরে জিনিসটিকে কি উপভোগ্য করেই উপস্থিত করেন। কোথাও রঙের সাজগোজ নেই—উচ্ছ্বাসের উৎপাত নেই—সবই সহজ। আজ সেই মানুষটির চেহারায় আর পরিচ্ছদে সেই পরিচয়ই পেলাম।"

বাংলা সাহিত্যকে যাঁরা সেবা করে সমৃদ্ধ করেছেন সেই সব সাহিত্যরথীকে কেদারনাথ প্রাণপ্রিয় মনে করতেন। তিনি নিজে সাহিত্যিক, কিন্তু যশোলাভের প্রশ্নে প্রতিযোগীসুলভ মনোভাব তাঁর ছিল না। মাতৃভাষার অন্য যশস্বী সেবকদের অকুণ্ঠ প্রশস্তি জানাতে তাঁর মনে কোন হীনমন্যতা জাগত না। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—"সাহিত্যের আনন্দের ভোজে, নিজে যা পারি নি দিতে নিত্য আমি আছি তার খোঁজে।" কবিগুরুর এ বদান্য উক্তি কেদারনাথের মধ্যে একান্ত সার্থকতা পেয়েছে —নিজের লেখা বিভিন্ন গ্রন্থ তিনি বঙ্গসাহিত্যরথীদের করকমলে উৎসর্গ করে নিজেকে ধন্য মনে করেছেন। নিম্নোদ্ধৃত উৎসর্গপত্রগুলির ভাষায় প্রকৃত কেদারনাথকে সহজেই স্পর্শ করা যায়:—

১। আমরা কি ও কে—গল্পগ্রন্থ—আমার জীবন সন্ধ্যায় ভাগ্যলব্ধ সুহৃদ্বর বিশ্ববরেণ্য কবি শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে পরম শ্রদ্ধায় নিবেদিত।

২। আই হ্যাজ—উপন্যাস—প্রথম জীবনে যাঁহার রচনা আমাকে রসসাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট করে ও প্রেরণা দেয়—সেই শ্রদ্ধাভাজন ৺ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে।

৩। কবুলতি—গল্পগ্রন্থ—পরম শ্রদ্ধেয় রসরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের করকমলে।

৪। কোষ্ঠীর ফলাফল—উপন্যাস—শ্রদ্ধেয় সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের করকমলে।

৫। ভাদুড়ী মশাই—উপন্যাস—যাঁর অসীম প্রভাব, কথিত চলতি ভাষাকে পুস্তকে পাংক্তেয় করে প্রকাশ চেষ্টাকে সহজ শক্তি দিয়েছে, সেই অশেষ শ্রদ্ধাভাজন প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের করে—চলতি ভাষায় লেখা আমার এই সামান্য অর্ঘ্য অর্পণ করলাম।

৬। সন্ধ্যা-শঙ্খ—গল্পগ্রন্থ—শুভাশীষসহ প্রিয় বনফুলকে।

কেদার বন্দ্যোপাধ্যায় সূক্ষ্ম শিল্পী ছিলেন না, কিন্তু মহৎ শিল্পীর সম্ভাবনা তাঁর মধ্যে ছিল। স্বদেশ ও সমাজের কল্যাণব্রতী হওয়ার জন্য তাঁকে সাধারণের বোধগম্য হ'তে অতিরিক্ত স্পষ্ট হ'তে হয়েছে এবং সেই সূত্রে ব্যঙ্গাশ্রয়ী হওয়ার জন্য তাঁর এই মহৎ শিল্পীত্বের সম্ভাবনাও নিঃসন্দেহে বহুলাংশে খণ্ডিত হয়েছে। তাঁর রচনায় রূপসজ্জায় একটু শৃঙ্খলার অভাব দেখা গেলেও রচনা অতি সুখপাঠ্য। তাঁর সঙ্গে বিখ্যাত ইংরেজ কথা-শিল্পী চার্লস ডিকেন্সের তুলনা করা চলে। ডিকেন্সের অভিজ্ঞতা, ডিকেন্সের সংবেদনশীলতা, ডিকেন্সের মানবতাবাদ, ডিকেন্সের সাধারণের মর্মস্পর্শী পরিহাসক্ষমতা এবং ডিকেন্সের আর্ট-নিরপেক্ষ সহজ সরল ভাবপ্রকাশ-প্রবণতা কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। কেদারনাথের প্রতিভা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথই শেষ কথা বলেছেন —"তোমার এই রচনার কুঞ্জে মরা ডাল শুকনো পাতা নেই বললেই হয়। তোমার চিত্রপট থেকে ছবিগুলো বেরিয়ে এসে কথা কইতে থাকে।"—(রবীন্দ্রনাথের পত্র, আপল্যাণ্ডস্, শিলং, ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪।)

বঙ্গের শক্তিহীনতা

বঙ্গের শক্তিহীনতার একটি কারণ, বাংলা দেশের লোকসমষ্টির মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী অধিক অংশ অনগ্রসর। জীবনের সকল বিভাগে বঙ্গের যাহা কৃতিত্ব, তাহা বলিতে গেলে কেবলমাত্র অর্দ্ধেকের কম হিন্দু বাঙালীদের কৃতিত্ব। অন্য প্রধান অংশ যে মুসলমান বাঙালীরা, তাহাদেরও কৃতিত্ব যদি ইহার সহিত যুক্ত হইত, তাহা হইলে বঙ্গের শক্তি ভাল করিয়া অনুভূত হইত। অতএব, মুসলমান বাঙালীদের কুসংস্কার অজ্ঞতা প্রভৃতি দূর করিবার চেষ্টা মুসলমান অমুসলমান সকল বাঙালীর করা উচিত। মুসলমান বাঙালীরা পঙ্গু থাকিলে বাংলা দেশ যথেষ্ট শক্তিশালী হইতে পারিবে না।

বঙ্গের শক্তিহীনতার আর একটি কারণ বাংলা দেশে পর্দার আতিশয্য—বিশেষতঃ মুসলমানদের মধ্যে। উৎপীড়ন ও কুৎসা অগ্রাহ্য করিয়া ব্রাহ্মসমাজ নারী প্রগতির ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছিলেন। রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের সাহায্যে সেই চেষ্টা ক্রমশঃ সফল হইতেছে। বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টায় মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মসমাজের পুরুষ অপেক্ষা মহিলাদের আত্মোৎসর্গ বেশী বই কম নয়। বৃহত্তর প্রাচীন হিন্দু সমাজের আরও অধিকসংখ্যক মহিলা ইহাতে যোগ দিয়াছেন। কোন কোন জেলায় পল্লীগ্রামের নিরক্ষর মহিলারাও যেরূপ দেশভক্তি ও সাহসের পরিচয় দিতেছেন, তাহা বিস্ময়কর।...

বঙ্গের শক্তিহীনতার আর একটি কারণ, হিন্দু বাঙালীদের অধিকাংশ সেই সব জাতের লোক যাহাদিগকে অস্পৃশ্য, অনাচরণীয়, ইতর প্রভৃতি মনে করার ও বলার অপরাধ আমরা নিত্য করিয়া থাকি। হিন্দুদের এই অধিক অংশ অনগ্রসর। মুসলমানদের মধ্যে অতি অজ্ঞ দরিদ্র এবং অতি অধম ব্যক্তিও মুসলমান বলিয়া গৌরব করিতে পারে। "নিম্ন শ্রেণীর" হিন্দুদের হিন্দু বলিয়া গৌরব করিবার কি কারণ আছে? হিন্দু সমাজের কতকগুলি লোক তাহার অধিকাংশ লোকের মাথার উপর দাঁড়াইয়া থাকিবে অথচ হিন্দুরা শক্তিমান্ থাকিবে, ইহা দুরাশা মাত্র। প্রত্যেক মানুষ মানুষের মত ব্যবহার ও সৌজন্য পাইতে অধিকারী। ইহা তোমার আমার দয়া নহে; ইহা সকলের অধিকার। হিন্দুসমাজ অস্পৃশ্যতা আদি দোষ সমূলে বিনাশ করিয়া সকলকে মানুষের অধিকার না দিলে আরও দুর্ব্বল হইবে।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী, মাঘ, ১৩৩৭।

রহস্যময় সুন্দরবন

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ

পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে বঙ্গোপসাগারের তরঙ্গ-বিধৌত যে অরণ্য, তা কবি কালিদাসের কথায় তমালতালী-বনরাজিনীলা নয়, তমাল এবং তালকুঞ্জ না থাকলেও তা নিবিড় শ্যামসমারোহে নয়নলোভন। দূর থেকে দেখে মনে হয়, পুঞ্জ পুঞ্জ শ্যামকুন্তল সাগরজল পর্যন্ত বিস্তৃত করে দিয়ে অরণ্যকন্যা যেন স্নানবিলাসে মত্ত। স্থলভাগের বৃক্ষরাজির যে উচ্চতা তা সাগরাভিমুখে ক্রমে হ্রাস পেয়েছে বলে সাগরের দিক্ থেকে একটানা অরণ্যের বিস্তার চোখে পড়ে। এই সুন্দরবনের নামের সঙ্গে সৌন্দর্য ও ভয়ের মিশ্রণ সাধারণ মানুষেয় মনে এর প্রতি কৌতূহলী আকর্ষণ জাগিয়ে রেখেছে।

খণ্ডিত সুন্দরবন

দেশবিভাগের পূর্বে বাংলা দেশে সুন্দরবনের আয়তন ছিল ৪ হাজার বর্গমাইল। এত বড় সমুদ্রবন পৃথিবীর আর কোন দেশে মিলবে না। দেশ খণ্ডিত হ'ল, রাজনৈতিক খাঁড়ার কোপ থেকে সুন্দরবনও রেহাই পেল না। খণ্ডিত বনের ২৩৭০ বর্গমাইল গেল পূর্ব পাকিস্তানের ভাগে, বাকি ১৬৩০ বর্গমাইল রইল পশ্চিমবঙ্গের অংশে। এই সংরক্ষিত বন-অঞ্চল এখন ২৪ পরগণা জেলার সঙ্গে যুক্ত।

আয়তনে এবং অরণ্য সম্পদে পূর্ব পাকিস্তানের ভাগের অংশই উৎকৃষ্ট। তার কারণ, পলিমাটিবাহী নদীগুলি বেশির ভাগই পড়েছে পূর্ব-অংশে। এক সময়ে পশ্চিমে হুগলীর মোহনা থেকে পূর্বে মেঘনার মোহনা পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল জুড়ে নিবিড় সমুদ্রবন বিরাজিত ছিল। উত্তর দিক্ থেকে মানুষের আবাদের অগ্রগতি হয়েছে দক্ষিণ দিকে। বন কেটে বসতি স্থাপিত হয়েছে। এমন কি এককালে সমৃদ্ধ মন্দির-সেবিত জনপদও গড়ে উঠেছিল এই অরণ্যের আশ্রয়ে। জলবায়ু এবং মাটির দাক্ষিণ্যে আমাদের দেশে শ্যামশোভাময় অরণ্যের অভাব নেই: উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশে বিস্তৃত গভীর অরণ্য-অঞ্চল, মধ্যভারতে এবং দক্ষিণ ভারতেও অরণ্যভূমি বনসম্পদ্ এবং বন্যজীবের আশ্রয়স্থল হয়ে রয়েছে। কিন্তু সুন্দরবনের সঙ্গে দেশের অভ্যন্তরভাগের অরণ্যের পার্থক্য বিরাট্। এর উৎপত্তি এবং বিস্তারও বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

সুন্দরবন, না সমুদ্রবন?

সাধারণ চলিত কথায় জানা যায় সুন্দরবন কথাটি এসেছে সুঁদরি কাঠের গাছ থেকে, যে গাছ এখানকার অরণ্যে মাটি এবং জলের গুণে জন্মে থাকে। ভারতবর্ষের উপকূলবর্তী কয়েকটি স্থানে, যেখানে বড় নদী দেশের ভিতর থেকে কোমল পলি বহন করে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে, সেখানেই এই ধরণের বনের উৎপত্তি হয়েছে। অন্ধ্র রাজ্যে গোদাবরী ও কৃষ্ণার মোহনায়, মাদ্রাজে কাবেরীর মোহনায়, উড়িষ্যায় মহানদীর মোহনায় এবং আন্দামানে সমগ্র উপকূল জুড়ে এ ধরণের স্বাভাবিক বন দেখতে পাওয়া যায়। যে-গাছ সুঁদরি গাছ নামে পরিচিত, তার বৈজ্ঞানিক নাম হেরিটিয়েরা মাইনর (Heritiera Minor)। তবে সুঁদরি নাম হ'ল কেন, এ সম্বন্ধে মনে কৌতূহল জাগা স্বাভাবিক। অন্ধ্র রাজ্যে সুঁদরি গাছের নাম সেখানকার ভাষায় 'সমুন্থিরি'। এ থেকে মনে হয়, সমুদ্রের লোনা জলে নদীর পলিমাটিময় ভূমিকে আশ্রয় করে যে-গাছ সমুদ্রের দিকে বনবিস্তার করতে সহায়তা করেছে, তার বনের নাম দেওয়া হয়েছিল সমুদ্রবন এবং গাছকে হয়ত বলা হ'ত 'সমুদ্রী' গাছ; কালক্রমে এই নাম 'সমুদ্রী' থেকে 'সমুন্দরি' এবং 'সুঁদরিতে' পরিণত হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়।

সুন্দরবন প্রকৃত পক্ষে সমুদ্রবন। সমুদ্রবনের একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল ক্রান্তীয় অঞ্চলে এবং এর সামান্য বাইরে—বিষুবরেখার উত্তর ও দক্ষিণে ৩০ ডিগ্রি অক্ষাংশের মধ্যে—সমুদ্র উপকূলে এর বিস্তার। যে সকল স্থানে ঝটিকাসদৃশ বাতাস ও সাগর-জোয়ারের প্রবল উচ্ছ্বাস তটভূমিকে

আঘাত হানে না, সেইরূপ স্থানই সমুদ্রবনের পক্ষে অনুকূল। উন্মুক্ত সাগরতট ও বালুকাবিছানো বা পাষাণময় সমুদ্র-সৈকত সমুদ্রবনের বিস্তারক্ষেত্র নয়। এর সঞ্জীবতার জন্য চাই কোমল পলিমাটি, মেঘের ধারাবর্ষণ আর লবণাক্ত সাগর-জলের নিত্য প্লাবন।

সাগর-বিজয়ের কেতন

পৃথিবীর সেই আদিযুগে, যেদিন প্রলয়পয়োধিজলে আবৃত বসুন্ধরায় প্রথম ডাঙা জেগে উঠেছিল, সেইদিন থেকেই দখলী স্বত্ব নিয়ে জল ও স্থলের মধ্যে চ'লে আসছে অবিরাম দ্বন্দ্ব। কোথাও ভূমি তলিয়ে যায় সাগরজলের নীচে, কোথাও জমি জেগে ওঠে জলের মধ্য থেকে। বৃষ্টির জলে ও নদীর প্রবাহে যে কোমল মাটির কণিকা বাহিত হয়ে সমুদ্রের সাথে নদীর মিলনস্থলে এসে জমা হয় তার স্তর ক্রমে ভূমির সীমানাকে এগিয়ে নিয়ে যায় সাগরের দিকে। এমনিভাবে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের জলধারা বাংলা দেশের নিম্ন অংশ সাগরের বুক থেকে অধিকার করে নিয়েছে; শ্যামল অরণ্যের নিশান তুলে ভূমি সমুদ্রের সঙ্গে তার সীমানা চিহ্নিত করে রেখেছে। গঙ্গাহৃদি বঙ্গদেশ। গঙ্গার হৃদয়ের পলি-অস্থি দিয়ে এদেশ গঠিত এবং সাগর অভিমুখে ক্রমপ্রসারমান। ২৪ পরগণা জেলার ভূমি খুঁড়ে প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, নদীবাহিত পলিমাটির স্তর এখানে ২০ থেকে ৫০ ফুট গভীর। ভাগীরথী ও অন্যান্য নদীগুলি দিনরাত রাশি রাশি মৃত্তিকা-কণা বহন করে এনে সাগরের মুখে নামিয়ে দিচ্ছে, সমুদ্রের লোনাজল-মিশ্রিত অস্থায়ী মাটির ওপর বিশেষ ধরণের উদ্ভিদ গজিয়ে উঠে তাকে শক্ত স্থায়ী রূপ দেবার কাজে সহায়তা করছে, ক্রমে বৃষ্টির জল ও উদ্ভিদের কল্যাণে মৃত্তিকার লবণভাগ কমে এসেছে, তখন সেখানে মিঠামাটির উদ্ভিদ্ ও ফসল তাদের দখল বিস্তার করেছে। এইভাবে সাগর বিজয়ের ব্যাপারে সমুদ্রবন হয়েছে স্থলভূমির অগ্রগামী সেনাদল। সমুদ্রের সাথে লড়াই করা শাল সেগুন প্রভৃতি বনস্পতি সেনাপতির কাজ নয়, কারণ এরা মিঠামাটির উদ্ভিদ্; পায়ের নীচে এদের শক্ত জমীন চাই। সাগরের জোয়ারে গা ভিজিয়ে, লবণমাটির রস নিয়ে অ-শক্ত মাটিতে যে বংশবিস্তার করতে পারে সে হ'ল লবণভুক্ সমুদ্রী বৃক্ষ।

অরণ্যসেনা

সমরবিজ্ঞানী জানেন, সমরাঙ্গনের ভৌগোলিক অবস্থা অনুযায়ী সৈন্যদের প্রস্তুত করতে হয়; যেরূপ জল-বায়ু ও ভূমির সাক্ষাৎ মিলবে সেই অবস্থার সঙ্গে নিজেদের দৈহিক পটুতা ও যুদ্ধশক্তির সামঞ্জস্য বিধান করতে না পারলে রণে পরাজয় অনিবার্য। তাই মরুভূমির জন্য, পর্বত অঞ্চলের জন্য, জলাভূমি অঞ্চলের জন্য ভিন্ন ভিন্ন রূপে ট্রেনিং এর ব্যবস্থা। প্রকৃতির রাজ্যেও এই নিয়ম। মরুভূমিতে যে উদ্ভিদ্ মাটি আঁকড়ে নিজের আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করছে, সে অগ্নিময় সূর্যকিরণ থেকে সুধা আহরণ করে, মাটিতে জলের প্রত্যাশা না রেখে বালুকা রাশির ভিতর তার শিকড় চালিয়ে দেয়, মেঘহীন রাত্রির তারকা-খচিত আকাশ থেকে যেটুকু স্নেহশীতল স্পর্শ পায় তাতেই উৎফুল্ল। পাষাণময় অঞ্চলের বলিষ্ঠ বৃক্ষ পাথরের বক্ষ ভেদ করে করুণাধারার সন্ধান করে। এদের উভয়ের স্বভাবে রয়েছে পার্থক্য। তেমনি লবণ-মিশ্রিত তরল পলি-মাটিতে যে বৃক্ষ উদ্ভিদ্‌রাজ্যের সীমানা বিস্তার করে, তার স্বভাব সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। মাটি থেকে লবণ শুষে নিয়ে পাতা দিয়ে তার কতক বের করে দেয়; কয়েক জাতের গাছের পাতায় তাই বিন্দু বিন্দু লবণের দানা দেখতে পাওয়া যায়। সমুদ্রী বৃক্ষরূপ অরণ্যসেনা যুগ যুগ ধরে তিলে তিলে অগ্রসর হয়ে সাগরের কাছ থেকে বাংলা দেশের প্রায় সমগ্র সমতট অঞ্চল অধিকার করে নিয়েছে। ঠিক এরূপ সাগরবিজয়ের অভিযান চলেছে ইউরোপের হল্যাণ্ডে। সেখানে উদ্ভিদ্-সেনা নয়, মানুষই লড়াই চালিয়েছে সমুদ্রের বিরুদ্ধে এবং কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে সাগরকে ক্রমে হটিয়ে দিয়ে ভূমি দখল করে নিচ্ছে। ওদেশে তাই একটি প্রবাদ আছেঃ ঈশ্বর পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, ডাচরা তাদের নিজেদের দেশ সৃষ্টি করেছে।

সমুদ্রবনের বৈশিষ্ট্য

জীববিজ্ঞানী বলেন, জীবনসংগ্রামে টিঁকে থাকার জন্য প্রাণীকুলকে পরিবেশ অনুসারে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাজের উপযোগী করে নিতে হয়েছে; তাই আজ দেখতে পাই যে জীবের যে-অঙ্গ যেরূপ হ'লে সবচেয়ে সুবিধা হ'ত, সেইরূপই

হয়েছে। বেঁচে থাকার জন্য ও বংশবিস্তারের জন্য যেরূপ দেহ ও স্বভাব আবশ্যক, প্রকৃতি তাই দিয়ে প্রাণীকে সজ্জিত করেছে। জীবনসংগ্রামের উপকরণ ও স্বভাব শুধু জীব-জগতে নয়, উদ্ভিদ্‌জগতেও বিস্ময়কর-ভাবে সক্রিয় রয়েছে। সমুদ্রবনের গাছপালার স্বভাব থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট বোঝা যাবে।

সমুদ্রবনের ওপর দিয়ে সাগরের জোয়ার-ভাটা খেলে। দিনে-রাতে দুইবার জোয়ার এবং দুইবার ভাটা; জোয়ারের জল ১২ থেকে ১৬ ফুট উঁচু হয়ে সিন্ধুর বিজয়রথের মত সগর্জনে বনভূমি প্লাবিত করে, কিছু সময় প্লাবনের অবস্থান, তারপর জল ফিরে যায় সাগরের দিকে। সমুদ্র-তরঙ্গের এইরূপ নিয়মিত আগমন-প্রত্যাবর্তনের মধ্যেই এখানকার বৃক্ষকে সবলে মাটি আঁকড়ে টিঁকে থাকতে হয়, বংশবিস্তারের ব্যবস্থা করতে হয়। সমুদ্রবনের অধিকাংশ গাছ কতক শিকড় মাটির ওপরে বর্শাফলকের মত বের করে দেয়, এর ভেতর দিয়ে নিঃশ্বাস নেবার জন্য; এগুলি নাসিকা-মূল। কতক গাছ ফল থেকে চারাগাছ তৈরি করে বংশ-বিস্তারের যে কৌশল গ্রহণ করে, অন্যত্র তা দেখা যায় না। দীর্ঘ বোঁটার সঙ্গে থাকে গুচ্ছ গুচ্ছ ফল; পাকা ফল বোঁটা থেকে খসে পড়ার আগেই তা থেকে শিকড় গজিয়ে নীচের দিকে ঝুলে আসে কিন্তু নীচে পড়লেই ত জোয়ারের জলের সঙ্গে কোথায় ভেসে যেতে হবে; তাই গাছ ফলকে সহজে ছেড়ে দেয় না, বোঁটাকেই বরং লম্বা করে মাটির দিকে নামিয়ে দেয়। জোয়ার-ভাটার দাপট কাটিয়ে ফল যখন মাটির ভিতর শিকড় প্রবেশ করিয়ে দিয়ে ভূমি আঁকড়ে ধরে, তখনই গাছ তাকে বোঁটা থেকে খসিয়ে দেয়। এ যেন সন্তানকে স্বাবলম্বী করে পৃথক্ সংসারে প্রতিষ্ঠা করা!

সমুদ্রবনের গাছপালার ফলের পরিমাণ হয় প্রচুর, কারণ দুরন্ত সাগরের সঙ্গে লড়াই করে অনেকেই প্রাণ হারাবে; আর ফলগুলি হয় এমন যাতে অনায়াসে সাগর-জলে ভেসে দূরদূরান্তে গিয়েও বৃক্ষরূপে মাটিতে প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারে। ঢেউ-এর দোলায় মহাসাগর পাড়ি দিয়ে এক দেশের ফল অন্যদেশে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করেছে, এমন নজির আছে অনেক।

সুন্দরবনের উদ্ভিদ্

যে সুঁদরি গাছের নাম অনুসারে সুন্দরবনের নামকরণ, তার সবচেয়ে অনুকূল বিস্তারক্ষেত্র হ'ল নদীবাহিত পলি-মাটি এবং সাগরের লোনাজলের জোয়ার-প্লাবিত স্থান। এক সময়ে গঙ্গার শাখানদীগুলি এ অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রচুর পলিমাটি বহন করে প্রবাহিত হ'ত। নদীর গতি পরিবর্তিত হওয়ায় সুন্দরবনের পশ্চিম অংশে সুঁদরি কাঠের বনের উৎকর্ষও কমে গেছে। এখন কেবল ইছামতীই ভাগীরথীর সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করছে, অন্য নদীগুলি, যেমন কালিন্দি, হরিণভাঙ্গা, রায়মঙ্গল প্রভৃতি, প্রবহমান বড় নদীর সংযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সাগরের খাড়িতে পরিণত হয়েছে। স্থানীয় স্থলভাগের বৃষ্টিধৌত জল ছাড়া এতে পলি আসার আর কোন সুবিধে নেই। সুন্দরবনের পূর্বভাগ বা পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত তার ভিতর দিয়ে অনেক কয়টি জীবন্ত নদী প্রবাহিত থাকায় সেখানে সুঁদরি কাঠের বন সতেজ এবং সমৃদ্ধ। সুঁদরিকাঠ গাছ ৭০ ফুট পর্যন্ত দীর্ঘ হয়ে থাকে; দৈর্ঘ্য অনুপাতে মোটা বেশি নয়, বুক পরিমাণ উচ্চতায় ব্যাস ১৬ ইঞ্চির মত। এই সরল দীর্ঘ এবং শক্ত কাঠ টেলিগ্রাফের খুঁটি প্রভৃতি কাজে ব্যবহারের বিশেষ উপযোগী।

লবণাক্ত ভূমির অন্যান্য গাছ হ'ল কাঁকরা, গেওয়া, ধুঁদল, বাইন, কেওড়া, পাসুর, গরান প্রভৃতি। সুন্দরবনের আর একটি প্রয়োজনীয় উদ্ভিদ্ হ'ল গোলপাতা-গাছ। একটি নারিকেল গাছ কেবল শীর্ষ অংশটুকু ছাড়া অন্য সবখানি মাটিতে প্রোথিত থাকলে যেমন দেখায়, গোলপাতা-গাছ দেখতে তেমনি। এর মসৃণ লম্বা পাতা কুঁড়েঘর ছাউনির কাজে ব্যবহৃত হয়। দেশের অভ্যন্তর-ভাগের অরণ্যে যেমন ঝোপঝাড় ও বৃক্ষাশ্রয়ী লতার প্রাচুর্য দেখা যায়, সুন্দরবনে তার অভাবই বরং চোখে পড়বে।

অরণ্য সম্পদ্

সুন্দরবনের সর্বপ্রধান উপযোগিতা হ'ল দেশের ভূমি-ভাগ গঠনে তার অবদান। দ্বিতীয়তঃ, এরূপ অরণ্যজাত বৃক্ষাদি কতকগুলি বিশেষ গুণান্বিত। এর অধিকাংশ গাছের ছালের রসে ট্যানিন থাকায় চামড়া রাঙানোর জন্য

বিশেষ ধরণের রঞ্জক পদার্থ পাওয়া যায়। সুঁদরি কাঠের দীর্ঘ খুঁটি, গরাণ কাঠের ছোট আকারের খুঁটি কাজের পক্ষে যেমন উপযোগী তেমনি মজবুত। সুঁদরি কাঠ দিয়ে হাল্কা সুন্দর ও টেঁকসই ছাতার ডাঁট তৈরি হয়। আসবাবপত্র তৈরির জন্য পাসুর, এবং কাঠের কলম ও পেন্সিল তৈরির জন্য নরম ধুঁদল কাঠের বেশ চাহিদা। তক্তার জন্য বাইন গাছ এবং প্যাকিং বাক্স ও দেশলাই-এর কাঠির জন্য গেওয়া কাঠের ব্যবহার হয়। সুন্দরবন থেকে জ্বালানিকাঠ সংগ্রহ হয় যথেষ্ট পরিমাণে।

সুন্দরবনের একটি বনজ সম্পদ হ'ল মধু ও মোম। বছরে প্রায় ৬ হাজার মণ মধু এবং প্রচুর পরিমাণে মোম এখান থেকে সংগৃহীত হয়। খলসী ও সিংড়াফুলের মধু স্বাদেও গন্ধে সর্বোৎকৃষ্ট; গরাণ গাছের ফুল থেকেই বেশির ভাগ মধু পাওয়া যায় এবং এর উৎকর্ষও মন্দ নয়, গেওয়াফুলের মধু নিকৃষ্ট ধরণের।

সুন্দরবনের পশুপক্ষী

সুন্দরবন নামের সঙ্গে বাঘ আর কুমীরের চিত্র যেন অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত রয়েছে। কথায় বলে, সুন্দরবনে জলে কুমীর ডাঙায় বাঘ। যে-সে বাঘ নয়, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। জন্ম থেকেই সে নরমাংস ভোজন-বিলাসী। সৃষ্টির সবচেয়ে সেরা জীব মানুষ। স্থাবর জঙ্গম পদার্থ, জলচর স্থলচর খেচর উভচর কেউই তার ভোজন-তালিকা থেকে বাদ পড়ে নি। ভোজনপটু মানুষের এমন যে নশ্বর দেহ সেই মহামাংস ভক্ষণে যে উৎসাহী সে কম বাহাদুর নয়! সুন্দরবনের বাঘ যেমন সুন্দর তেমনি শক্তি-মান, যেমন সাহসী তেমনি ধূর্ত। কাঠ, গোলপাতা মৌচাক কাটতে এবং মাছ ধরতে যারা সুন্দরবনে যায়, সামান্য অসতর্ক হ'লে তাদের বাঘের হাতে মৃত্যু নিশ্চিত। বনে বাঘের স্বাভাবিক খাদ্য হ'ল হরিণ, শূকর প্রভৃতি। সুন্দর-বনে চিতল হরিণ আছে প্রচুর সংখ্যায়। বাদামি রঙের দেহ, তাতে শ্বেত চন্দনের ফোঁটার মত শুভ্র বিন্দু; পুরুষদের মাথায় সুশ্রী ডালছড়ানো শিং, চঞ্চল কালো চোখ। দলে দলে চ'রে বেড়ায়। এদের মিত্রজীব হ'ল বানরের দল। কেওড়া গাছের পাতা ও ফুল হরিণের প্রিয় খাদ্য। বানরেরা এর পাতা ফুল ছিঁড়ে নীচে ফেলে, বাঘ দেখতে পেলে চীৎকার শব্দে হরিণদের সতর্ক করে দেয়। বানরের সঙ্গে তাই বাঘের বৈরিতা। গাছের নিরাপদ উচ্চতা থেকে বানর বাঘকে ভেংচি কাটে, বাঘ ক্রুদ্ধ ঘোলাটে চোখে তার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করে।

সুন্দরবনের খাঁড়ি, নদীনালায় কুমীরের সংখ্যা প্রচুর। এরা বড় হিংস্র। কেবল উত্তর কানাডা ছাড়া এরূপ ভীষণ প্রকৃতির কুমীর পৃথিবীর আর কোথাও নেই। কায়দায় পেলে বাঘকেও এরা সমীহ করে ছেড়ে দেয় না।

অভয়ারণ্য

বন্যজীব ও পাখী যে কেবল অরণ্যের শোভা তাই নয়, প্রকৃতিতে ভারসাম্য রক্ষার ব্যাপারে এদের প্রত্যেকের প্রয়োজন আছে। মানুষের নিজের কল্যাণেই তাই বন্য-জীব রক্ষার ও এদের বংশ-বৃদ্ধিতে সহায়তা করার আবশ্যকতা রয়েছে। সুন্দরবনের তিনটি অভয়ারণ্য আছে, সেখানে আইন করে প্রাণিহত্যা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই অভয়ারণ্যের আয়তন এ জীবজন্তুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দেওয়া যাক্।

নাম	আয়তন	কি কি জীব দেখতে পাওয়া যায়	কখন দেখতে যাবার উপযুক্ত কাল
১। লোথিয়ান দ্বীপ—	১৪·৬৭ বর্গমাইল	বাঘ, বন্যশূকর, চিতলহরিণ, বিবিধ জলচর পাখী	ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি
২। হ্যালিডে দ্বীপ—	২·৩ বর্গমাইল	বাঘ, চিতলহরিণ	ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি

৩। সজনাখালি— ১৩৯·৯২ বর্গমাইল বক, ধেনোপাখী, ছোট পানকৌড়ি, কৃষ্ণকণ্ঠ সারস, সর্পপাখী, সবুজ বক, পেলিকান প্রভৃতি বিভিন্ন ঋতুতে বিদেশাগত নানা জলচর পাখীর সমাবেশ দেখা যায়। জুলাই থেকে ডিসেম্বর

পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্রবন সাপ-বাঘ-কুমীরের বাসস্থান বলে ভয়ংকর, সুদৃশ্য মৃগ ও বিচিত্র বর্ণাঢ্য পাখীর বিচরণক্ষেত্র বলে নয়নসুখকর, মূল্যবান্ অরণ্যজাত দ্রব্যের আকর বলে জাতীয় সম্পদ্ ভাণ্ডার, দেশের স্থলভাগ গঠনে সহায়ক বলে ভূমির কাঙাল মানুষের বন্ধু। মানব-সভ্যতার আদিযুগে অরণ্যের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ছিল নিবিড়; বর্তমানযুগে মানুষ অরণ্য থেকে দূরে সরে এলেও অরণ্যের উপযোগিতা কিছুমাত্র কমে নি, বরং শিল্পায়নের সাফল্যের জন্য এর প্রয়োজন বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের সমুদ্রবন প্রচুর সম্ভাবনায় পূর্ণ।

(রঙ্গিলা রসুলের রচয়িতা) রাজ্যপালের হত্যা

কথায় বলে, মূর্খস্য লাঠৌষধিঃ। সচরাচর ইহার মানে এইরূপ করা হয়, যে, যে ব্যক্তি বুদ্ধিহীন ও অবুঝ তাহাকে বুঝাইবার একমাত্র উপায় লাঠি-প্রয়োগ। ইহার আরও একটা মানে এই হইতে পারে যে, মূর্খেরা লাঠিকেই একমাত্র যুক্তি মনে করে, এবং কথায় কথায় লাঠি চালাইয়া থাকে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই লাঠিকে বা জড়পদার্থ নির্ম্মিত অন্য কোন অস্ত্রকে ভ্রম এবং চিত্তবিকারাদির ঔষধ মনে করা যাইতে পারে না।

নিজের ধর্ম্মসম্প্রদায়ের কোন লোক নিহত হইলে উত্তেজনা সহজেই হয়। কিন্তু উত্তেজনাবশে প্রতিহিংসা করা প্রাজ্ঞের কর্ম্ম নহে। এইজন্য সকল হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতা ও অন্য লোকদিগকে ধীর ও শান্ত অথচ দৃঢ়চিত্ত থাকিতে অনুরোধ করিতেছি।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৩৬।

শ্রীঅরবিন্দের সমাজ-দর্শন

শ্রীচিত্তরঞ্জন গোস্বামী

শ্রীঅরবিন্দ-দর্শনের বিরাট্ কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ তাঁর সমাজ-দর্শন। জগৎ ও জীবনের পরম তত্ত্বকে যে আলোকে তিনি দেখেছেন তা থেকেই প্রসূত হয়েছে সমাজ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি ও বিচার।

যে দর্শনের পেছনে জীবনের পরম সত্যের বিচার নেই, তার ভিত্তি যেমন দুর্বল, তেমনি যে দর্শনে সংসার বিলকুল মিথ্যা না হ'লেও তার সত্যতা নিতান্ত আপেক্ষিক, সে দর্শনের উপর সমাজতত্ত্বের ভিত্তি কখনও দৃঢ় হ'তে পারে না—বালির উপর ইমারত গড়ার চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, শঙ্করের মায়াবাদ তাঁর দেহে কাঁটার মত বিঁধছিল, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের জীবন ও সাধনা তাতে অনেকখানি প্রলেপ হিসাবে এসেছে, কিন্তু কণ্টক উৎপাটিত হয়েছে শ্রীঅরবিন্দের জড় ও আত্মা, ব্রহ্ম ও জগতের সমন্বয়বাদী দর্শনে। (An Indian Pilgrim পৃ: ৭৩)

শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিতে বিশ্বলীলা সত্যমূলক, বিশ্বাতীত ব্রহ্মেরই দেশ ও কালে আত্মপ্রসারণ—self extension এবং এই সৃষ্টি বা লীলা অনন্ত কাল ধ'রেই চলেছে। বিশ্ব যেহেতু ব্রহ্মেরই অঙ্গদ্যুতি তা মিথ্যা আদৌ নয়। যে শক্তিতে সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্ম নিজেকে প্রকাশ করেছেন, যদিও এই প্রকাশের দ্বারা তিনি কোনভাবে খর্ব বা সীমাবদ্ধ হন নি, সেই চিন্ময় শক্তিই সমস্ত বিশ্বব্যাপারে কাজ করছে। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে যেমন, জড় চেতনার প্রথম স্ফুরণ থেকে মানুষ অবধি দীর্ঘ অভিব্যক্তি ধারায় যেমন, মনুষ্য-সমাজের ইতিহাসেও তেমনি শ্রীঅরবিন্দ এই শক্তির অমোঘ অদৃশ্য হস্ত দেখছেন, অবশ্য সে শক্তি দৃশ্যত: ব্যক্তি ও সমষ্টির চিন্তা-চেষ্টাকে অবলম্বন করেই কাজ করে। কাজেই মানুষের বাইরের চেষ্টা সামাজিক কাঠামো সংস্থা ইত্যাদির পরীক্ষা-নিরীক্ষা শ্রীঅরবিন্দের সমাজ-দর্শনে একান্ত হ'তে পারে নি, তিনি এই সমস্তের মধ্যে দিয়ে মানব-সমষ্টির চেতনা কি রূপ নিচ্ছে, কিভাবে অভিব্যক্ত হয়ে চলেছে তাই যেন দেখাতে চেয়েছেন বেশি করে। তাঁর দৃষ্টিতে সকলেই ঈশ্বরের যন্ত্র, সজ্ঞান বা অজ্ঞান। যে সমস্ত বীর চিন্তানায়ক ও কবির নেতৃত্বে সমাজ এগিয়ে চলেছে তাঁদের মহত্ত্ব সেই শক্তিরই মহত্ত্ব, যুগে যুগে ভগবানের অবতরণও ঘটেছে এই সংসারে বিশেষ বিশেষ সঙ্কট কাটিয়ে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যেই।

সমাজের এই অগ্রগতি বা অভিব্যক্তি যে উচ্চ উচ্চ ধাপে ঋজু রেখায় এগিয়ে চলেছে তা মোটেই নয়। একটি মানুষের জীবন কত জটিল; মুখ্যত: মনোময় হ'লেও প্রাণের প্রবর্তনাই তার মধ্যে বলবৎ, দেহেরও দাবি অনেক, ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, পরিবেশ উত্তরাধিকার পূর্বজন্ম কর্মফল ইত্যাদি ছাড়াও রয়েছে প্রাণময় মনোময় প্রভৃতি সূক্ষ্ম জগতের প্রভাব, সর্বোপরি বিশ্বাতীত সেই দিব্যশক্তির প্রত্যক্ষ অভিপ্রায়; কাজেই পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষের এই যে সমাজ তার বিকাশ স্বাভাবিক ভাবেই হয়েছে অত্যন্ত জটিল, বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বহু অপচয়, বহু ধ্বংস সৃষ্টি ও আগু-পাছুর মধ্যে দিয়ে চলেছে এটি একটি লক্ষ্যের দিকে। লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যহীন এ গতি নিশ্চয়ই নয়। সে লক্ষ্যের কথায় পরে আসা যাবে।

যদিও কোন পরিচ্ছিন্ন সূত্রের সাহায্যে সমাজের অভিব্যক্তির ধারাকে ধরা যায় না, তবু সাধারণভাবে শ্রীঅরবিন্দ মনুষ্যসমাজের বিকাশের ধারায় তিনটি স্থূল পর্যায়-বিভাগের কথা বলেছেন। যুক্তিবিচারের পূর্বের পর্যায় (infrarational stage), যুক্তিবাদের যুগ (rational stage) ও যুক্তির অতীত পর্যায় (supra-rational stage)। প্রাথমিক (বা infrational) স্তরে সহজ প্রেরণায় প্রাণের তাগিদে বিধির অলঙ্ঘ্য নির্দেশে মানুষ সমাজবদ্ধ হয়েছে, সামাজিক সংহতি ও

জীবন গড়ে উঠেছে এক-একটি বংশে বা গোষ্ঠীতে, পরিবারই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বিস্তৃত হয়ে একটি গোষ্ঠী বা জাতিতে পরিণতি লাভ করেছে। এই স্তরে সমাজ-জীবনে ধর্ম, প্রতীক. অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস এবং সামাজিক কাঠামোর মধ্যে নমনীয়তা বিশেষ ভাবে দৃষ্ট হয়। পরে ধীরে ধীরে ধর্ম, সামাজিক রীতিনীতি একটি নির্দিষ্ট আকার নিতে থাকে এবং ফলে নমনীয়তার স্থানে ক্রমে এসে যায় কঠোর নিয়মতন্ত্র। যেমন আমাদের দেশের বর্ণভেদ যা বৈদিক যুগে ছিল একটা ভাবগত সত্য—ব্রহ্মের জ্ঞানের প্রতিরূপ ব্রাহ্মণ, শক্তির প্রতীক ক্ষত্রিয়, ভোগ সংবৃদ্ধি ও বিনিময়ের বৈশ্য, কর্ম সেবা ও আনুগত্যের প্রতীক শূদ্র—তাই ক্রমে হয়ে দাঁড়াল সমাজ-দেহের বিভিন্ন অঙ্গ বা শ্রেণী, তা থেকে মধ্যযুগের কট্টর জাতভেদ প্রথা। এই কঠিন নিয়মতন্ত্রের মধ্যে জীবনের সহজ স্বাভাবিকতা বাধা পায়, ব্যক্তির স্বাধীন স্ফূর্তির পথ একদম বন্ধ হয়ে যায়।

সমষ্টির চাপে নিষ্পেষিত ক্ষুব্ধ ব্যক্তিত্ব যখন স্বাভাবিক ভাবেই স্বাতন্ত্র্যের জন্যে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে তখনই সমাজে আসে বুদ্ধি-বিচারের যুগ। ধর্মকে মানুষ যাচাই করে নিতে চায় আপন অন্তরের আলোকে, সমাজের প্রতিটি নিয়ম, প্রতিটি ব্যবস্থা, তা সে রাজতন্ত্রই হোক্ আর বিবাহবিধিই হোক্—সে বিচার করে বিশ্লেষণ করে দেখতে চায়। ফলে সমস্ত পুরাতন ব্যবস্থার বনিয়াদ যায় ধ্বসে, নবলব্ধ চেতনায় মানুষ সব কিছু ভেঙ্গে-চুরে নতুন ক'রে গ'ড়ে তোলে, যাতে সমাজ-জীবনে ব্যক্তির আত্ম-বিকাশের দুর্লঙ্ঘ্য কোন বাধাই আর না থাকে। এই বুদ্ধির যুগেই আমরা আধুনিক সভ্য মানুষ রয়েছি। এই বুদ্ধিরই শক্তিতে প্রকৃতির রহস্য সব উদ্ঘাটিত হয়ে চলেছে। জীবনকে সমৃদ্ধ করে তোলবার বিশ্বজোড়া যজ্ঞ চলেছে। গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র এই যুক্তিবাদেরই স্বাভাবিক পরিণতি, প্রতিটি মানুষেরই অংশ থাকবে, যে সমষ্টিগত জীবন তাকে বাদ দিয়ে নয়, তার নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে। প্রতি মানুষের দেহে একই প্রাণের প্রবাহ, সকলেরই বাঁচার ও সুখের আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। প্রত্যেকেরই চাই পৃথিবীর সম্পদে কিছু-না-কিছু অধিকার।

কিন্তু এই বুদ্ধির আলোকে ব্যক্তির শুধু স্বাতন্ত্র্য নয়, সমষ্টির উপর তার নির্ভরতাও প্রকট হয়েছে। স্বাধীনতা ও সমান অধিকার লাভের জন্যে শুধু সংগ্রাম নয়, সহযোগিতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণও দরকার। ব্যক্তি-স্বাধীনতার নির্বাধ স্ফূর্তি নিয়ে যায় ধনতন্ত্রের শোষণ ও শাসনে, গণতন্ত্র শেষ পর্যন্ত ধনিক ও অভিজাত তন্ত্রের নামান্তর হয়ে দাঁড়ায়। অপর দিকে সবাইকে সমান অধিকার দেবার চেষ্টায় ব্যক্তির স্বাধীনতার মূলে আঘাত হানতে হয়, তাতে করে সকলেরই অন্নবস্ত্র জোটার সম্ভাবনা ঘটে বটে কিন্তু ব্যক্তির স্বাধীন কর্ম ও সৃষ্টি-প্রেরণা শুকিয়ে যাবার জোগাড় হয় এবং এই ব্যবস্থায়ও শ্রেণীবৈষম্য দূর হয় না; রাষ্ট্রের কর্ণধার ও প্রধান কর্মকর্তাদের নিয়ে নতুন এক ধনিক না হোক্ অভিজাত শ্রেণী গড়ে ওঠে—সমাজের উপর অধিকার তাদেরই। কাজেই ব্যষ্টি ও সমষ্টির সামঞ্জস্য এই বুদ্ধিবাদের যুগে একটা বিরাট্ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বুদ্ধি নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে নেই, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের নানা রকমের মিশেল দিয়ে বিচিত্র সব ফরমুলা তৈরী করে যাচ্ছে, আমাদের socialistic pattern of society তার একটি নমুনা; কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না, বুদ্ধির গড়া যান্ত্রিক ছকে জীবনকে বাঁধা যায় না, আঁটঘাট যতই বাঁধা হোক্ না, কি করে যে কোথা দিয়ে ফাটল ধরে কাঠামো বিকৃত হয়ে যায়, তা ধরাই কঠিন হয়ে ওঠে।

শ্রীঅরবিন্দ বলছেন, সামঞ্জস্যের পথ বিশ্লেষণধর্মী বুদ্ধির কাছে পাওয়া যাবে না, সে পথের সন্ধান দেবে বোধি, যার দৃষ্টি সমগ্র অখণ্ড। বোধির দৃষ্টিতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও বুদ্ধিবাদ সমাজের অগ্রগতির একটি বিশিষ্ট সোপান মাত্র। আমরা ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য চাইছি অথচ ব্যক্তিত্বকেই ভাল করে জানতে পাই নি। আমার যে 'আমি' অন্য দশ-জন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখে, সে আমার আসল সত্তা নয়। যে আমি অন্য দশজনের সঙ্গে মূলগত ঐক্য জাগ্রত জীবন্তভাবে, অস্পষ্ট আবেগ বা বুদ্ধির বিচারে নয়, উপলব্ধি করে সেই আমিই আমার আসল সত্তা। তার সঙ্গে সমষ্টির বিরোধ নেই, আছে অখণ্ড ঐক্য ও নির্বাধ পারস্পরিকতা। বিচ্ছিন্ন আমির স্বাতন্ত্র্যে আমরা হয়ে

পড়ি শোষক ও শাসক, আসল আমির স্বাতন্ত্র্যে আসতে পারে প্রেম, সামঞ্জস্য, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, যুগপৎ ব্যষ্টি ও সমষ্টির আনন্দময় স্ফূর্তি :

"Perhaps liberty and equality, liberty and authority, liberty and organised efficiency can never be quite satisfactorily reconciled so long as man, individual and aggregate, lives by egoism, so long as he cannot undergo a great spiritual and psychological change and rise beyond mere communal association to.... the ideal of fraternity, or less sentimentally and more truly expressed, an inner oneness. That no mechanism....has ever created or can create, it must take birth in the soul and rise from hidden and divine depths within."—Ideal of Human Unity—Sri Aurobindo—পৃষ্ঠা ১৩০।

ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের প্রতিবাদে যাঁরা ব্যক্তিকে সমষ্টির পায়ে বলি দিতে চান শ্রীঅরবিন্দ স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের দলে নন। ব্যষ্টি আত্মা জাতীয় আত্মা (Nation soul) বিশ্বআত্মা পরব্রহ্মেরই প্রকাশের বিভিন্ন ছন্দ। একে অপরের মধ্যে হারিয়ে গেলে বিশ্বলীলা পঙ্গু হয়ে যাবে, একই সঙ্গে ঐক্যবোধ ও বিচিত্র স্ফূর্তি, এই হ'ল সৃষ্টির মর্মের কথা। ব্যষ্টি আত্মা হ'ল কীলক, তাকে কেন্দ্র করেই সমষ্টির বিকাশ ও অগ্রগতি—কবি ঋষি দার্শনিক রাষ্ট্রনেতা এই সমস্ত ব্যক্তিশ্রেষ্ঠদের কেন্দ্র করেই কাল-পুরুষ তথা আত্মাশক্তি কাল ও সমাজের গতি নিয়ন্ত্রিত করে চলেছেন। শুধু মানুষের মধ্যে নয় পরমাণুতেও একটি কেন্দ্রবিন্দু আছে, প্রতিটি জীবকোষে রয়েছে একটি কেন্দ্র, আবার বিরাটের মধ্যে সৌরনক্ষত্র জগতে আছে কেন্দ্র; বস্তুত: আত্মাকে কেন্দ্র করেই বিশ্বস্রষ্টা নিজেকে প্রস্থত করেছেন বিচিত্র এই সৃষ্টিতে। ব্যক্তিকে খর্ব করে নয়, তার সম্ভাবনার বিকাশের মধ্যেই রয়েছে চরিতার্থতার পথ :

"The individual always remains the focal point in the political and spiritual philosophy of Sri Aurobindo."

লিখেছেন বিশ্বনাথ প্রসাদ বর্মা (Political Philosophy of Sri Aurobindo—পৃষ্ঠা ৩৬২।)

আসলে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ওপর যে আমরা এত বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি সেটাই ঠিক নয়। শ্রীঅরবিন্দ রাষ্ট্র বা State-কেই গোটা সমাজ (community) বলে মানতে নারাজ। সমাজের শৃঙ্খলা বিধানের জন্যে তৈরী একটা যন্ত্র মাত্র হ'ল রাষ্ট্র।

"The state is a convenience and a clumsy convenience, for our common development; it ought never to be made and end in itself." —Ideal of Human Unity.

সাম্প্রতিককালে জীবনের সমস্ত ব্যাপারেই একটি শৃঙ্খলা ও পরিকল্পনার প্রয়োজনে রাষ্ট্র অনেক বেশি গুরুত্ব অর্জন করে ফেলেছে। রাষ্ট্র-ব্যবস্থার উপরই মনুষ্য-সমাজের ভবিষ্যৎ যথার্থত: নির্ভর করে না: "it works like a machine without tact, taste, delicacy or intuition"—পৃষ্ঠা ২৭), ভবিষ্যতের ভরসা তাঁরাই যাঁরা আত্মআবিষ্কারের সাধনা করে যাচ্ছেন, নিজের সঙ্গে বিশ্বের ঐক্য উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন। তাঁদেরই প্রভাবে ক্রমে রাষ্ট্রের যান্ত্রিক ব্যবস্থায়ও আসবে আত্মিক আলো, তাতেই সূচিত হবে ব্যক্তি-সমষ্টিতে ও রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বিরোধের অবসান।

কিন্তু যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন চেষ্টা চলবে দুভাবেই,—তত্ত্বদর্শী কবি ঋষিরা একত্বের আদর্শ প্রচার করবেন, আর রাষ্ট্রগুলো মুখ্যত: বাইরের চাপেই—অর্থ-নৈতিক বাণিজ্যিক প্রয়োজন, আত্মরক্ষা ইত্যাদি—পরস্পরের কাছাকাছি আসার চেষ্টা করবে। কিভাবে বিশ্ব-রাষ্ট্র গঠিত হ'তে পারে, তার কাঠামো কি রকম হ'লে কি সুবিধা বা অসুবিধা হবে সে সম্পর্কে প্রচুর আলোকপাত করেছেন শ্রীঅরবিন্দ তাঁর Ideal of Human Unity গ্রন্থে। কিন্তু সব চাইতে বেশি জোর দিয়েছেন তিনি

Religion of Humanity বা মানবধর্মের উপর। সমস্ত মানুষকে আত্মিক ঐক্যোপলব্ধিতে যেতে হবে, তা নইলে স্থায়ী কিছু হওয়ার আশা নেই। ভ্রাতৃত্বের উপরই স্বাধীনতা ও সাম্য প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে। এই ভ্রাতৃত্ব একটা নীতি বা প্রাণের আবেগ মাত্র হ'লে চলবে না, সকলেই এক ঈশ্বরের সন্তান এই প্রতীতির দৃঢ়তাও যথেষ্ট নয়, এটি হওয়া চাই জাগ্রত প্রত্যক্ষ একটি আত্মিক উপলব্ধি। এই উপলব্ধির আলোকে যখন আমাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবন সম্পূর্ণভাবে গঠিত হবে তখনই সমাজ উন্নীত হবে বুদ্ধির ঊর্ধ্বের স্তরে supra-rational stage-এ। এরও অবশ্য থাকবে নানা পর্যায়—পরিণতির নানা ধাপ। কাজেই সামাজিক অভিব্যক্তির জন্যেও চাই মূলতঃ ব্যক্তির চেতনা ও জীবনের রূপান্তর। শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণযোগ এই রূপান্তরেরই সাধনা—ব্যষ্টির ও সমষ্টির। তাই তাঁর যোগ বিশ্বেরই কল্যাণের, জাগতিক সমস্যা সমাধানের, সংসারে স্বর্গরাজ্য আনয়নের সাধনা। স্বর্গরাজ্য, কেননা এ সমাজে সামাজিক বিধান হবে ব্যক্তিরই অন্তরের ধর্ম (outer law is the inner compulsion), মানুষ কাজ করবে কাজেরই আনন্দে, স্ব স্ব অন্তরের প্রেরণা অনুসারে—সঞ্চয় বা শোষণ করবার জন্যে নয়। যে সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শ বহুদিন ধরে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে আসছে তা বাস্তব রূপ নেবে এই suprarational সমাজে।

এখানে কথা উঠতে পারে যে শ্রীঅরবিন্দ যে দিব্য সমাজের কথা বলেছেন তা একটা ইউটোপিয়া বা কল্পিত স্বর্গ মাত্র। বাস্তব সমাজের দিকে তাকিয়ে হতাশাস বহু সমাজতাত্ত্বিক—প্ল্যাতো থেকে সুরু করে এইচ জি ওয়েলস পর্যন্ত—এ জাতীয় কল্পনা রেখে গেছেন। এর মূল্য কতখানি? আর-সকলের কল্পনা থেকে শ্রীঅরবিন্দের পার্থক্য এইখানে যে, তিনি যে স্বর্গরাজ্যের কথা বলেছেন তা তিনি দেখিয়েছেন অভিব্যক্তির অনিবার্য পরিণতি হিসাবে বাস্তব রূপ নিতে বাধ্য—'a thing decreed and inevitable'। তাঁর বিচারে যে দিব্য সৌষম্য ও আনন্দ লুক্কায়িত ছিল নিশ্চেতনার অন্তরালে, যার ক্রম-আত্ম-উন্মোচনে এই সভ্যতা ও সমাজের বিকাশ তা মাঝপথে মনবুদ্ধির আধো আলো আধো অন্ধকারে এসে থেমে যেতে পারে না, পরিপূর্ণ আত্মপ্রকাশের দিকেই তার নিশ্চিত গতি। দ্বিতীয়তঃ, তিনি শুধু দূর লক্ষ্যের কথাই বলেন নি, তাতে পৌঁছানর বাহ্য ও আন্তর পন্থাও নির্দেশ করেছেন, প্রকৃতি যে সেই পন্থা নিচ্ছে ইতিহাসের বিশ্লেষণ করে তাও দেখিয়েছেন। বিশ্ব ঐক্যের চেষ্টা পূর্ব পূর্ব যুগে হলেও এযুগেই তা অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। তার জন্যে নিম্নরূপ প্রয়াস আমাদেরকে নিতে হবে; বিভিন্ন রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক বিবাদের মীমাংসা করবে শান্তিপূর্ণভাবে—সভ্যতাকে ধ্বংস থেকে রক্ষার এটাই একমাত্র পন্থা বলে আজ সকলেই অনুভব করছে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রগুলি পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার নীতি মেনে নেবে—সে নীতিও আজ গৃহীত হয়েছে বলা চলে; তার সঙ্গে অবশ্য চাই সর্বমানবীয় ধর্মের প্রতিষ্ঠা, আত্মিক ঐক্যের উপলব্ধি। তার জন্যে তিনি যে যোগাদর্শ তুলে ধরেছেন তা সব দেশের সব মানুষের পক্ষেই সর্বাবস্থায় অনুশীলিত হ'তে পারে। কাজেই শ্রীঅরবিন্দ যে দিব্য সমাজের ছবি তুলে ধরেছেন তাকে ইউটোপিয়া বলে অগ্রাহ্য করা চলে না।

আর একটি জরুরী বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে আর পাঁচজন সমাজতাত্ত্বিকের পার্থক্য রয়েছে। উচ্চশ্রেণীর চিন্তাবিদ্‌দের চিন্তাও যে তাঁদের সমাজ অবস্থা ও স্বার্থের দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। কার্ল মার্ক্স এই যুক্তিতে তাঁর পূর্ববর্তীদের মতবাদ বর্জনীয় মনে করেছেন। এ বিষয়ে জনৈক গবেষকের উক্তি শুনুন,—

"It follows that most minds are situationally oriented and interest-bound and therefore, most social philosophies are ideologies (i.e. ideals contaminated by group-interest and conscious deception). But the rare souls who have attained to non-attached state of mind, are capable of transcending the limitations of socio-cultural environment, and

producing normative social philosophies uncontaminated by situational influences".—(K.P. Mukherjee—Implications of the Ideology-concept,—(পৃষ্ঠা ৩১।)

শ্রীঅরবিন্দ যে এই 'rare soul'দের শিরোমণি তা বলাই বাহুল্য। সর্বপ্রকার সংস্কারের অভিভব থেকে মুক্তি তাঁর যোগের অন্যতম মূলসূত্র। সংবুদ্ধ ব্যক্তির চিন্তা ও কর্ম সম্পর্কে তিনি বলছেন :

"The gnostic being will not accept the mind's ideals and standards, he will not be moved to live for himself, for his ego, or for humanity or for others or for the community, or for the state, for he will be aware of something greater than these half-truths of the Divine Reality, and it is for that he will live, for its will in himself and in all, in a spirit of large universality, in the light of the will of the Transcendence."

Transcendence বা তুরীয় ব্রহ্মের ইচ্ছাই মূর্ত হয়েছে শ্রীঅরবিন্দের জীবনে ও তাঁর লেখায়, তাঁর সমাজ-দর্শন সেই ইচ্ছার, সেই পূর্ণ সত্যেরই প্রকাশ।

নেতাজী বসু তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন :

"All that was needed in my eyes to make Aurobindo an ideal guru for mankind was his return to active life."—পৃষ্ঠা ৭৪।

আমরা জানি, শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরীতে নিষ্ক্রিয় ছিলেন না, সমস্ত বিশ্বের মুক্তির জন্যেই নিরলস চেষ্টা করে গেছেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর মধ্যে এই জগৎকল্যাণ শক্তির সংহত রূপ দেখেই মুগ্ধ হয়েছিলেন, শ্রদ্ধার সহিত বলেছিলেন,

"You have the Word (the Word is that which helps to bring forth towards manifestation the unmanifest immense in man) and we are waiting to accept it from you. India will speak through your voice to the world 'Hearken to me.' "—The Modern Review, July, 1928.

শ্রীমা বলেন, বিদেহী হয়েও শ্রীঅরবিন্দ পার্থিব পরিমণ্ডলে থেকে মনুষ্যের রূপান্তরের কাজই এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।

হিন্দী ও উর্দ্দু

আগ্রা-অযোধ্যা প্রভৃতি উত্তরভারতের কোন কোন অঞ্চলের ভাষা নাগরী অক্ষরে লিখিলে তাহাকে বলে হিন্দী, আরবী অক্ষরে লিখিলে বলে উর্দ্দু। তা ছাড়া আরও এই তফাৎ আছে যে পণ্ডিতেরা হিন্দীতে সংস্কৃত কথা বেশী ঢুকাইতে চান, মৌলবীরা উর্দ্দুকে বেশী আরবী ফারসী কথা ঢুকাইতে চান। নতুবা মোটের উপর হিন্দী উর্দ্দু একই ভাষা। ব্যবহারে উহাদের বিশেষত্ব এই আছে যে, উর্দ্দু কোন কোন হিন্দু ও শিখও লেখায় ব্যবহার করেন, কিন্তু বর্ত্তমানে হিন্দীর ব্যবহার লেখায় খুব কম মুসলমানই করিয়া থাকেন ; উর্দ্দুর ব্যবহার অমুসলমানদের মধ্যে কমিয়া আসিতেছে, হিন্দীর ব্যবহার মুসলমানদের মধ্যে বাড়িতেছে না।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬।

রবীন্দ্রসাহিত্যে ভূমার আহ্বান

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

কবির জন্ম ইতিহাসের একটি পরম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এমার্সনের ভাষায়:

All that we call sacred 'history' attests that the birth of a Poet is the principal event in chronology.

মানুষ আজও সেই মানুষের আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে আছে যে তাকে অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে যাবে, তাকে সত্যের রাস্তায় দাঁড় করিয়ে দেবে, তার চৈতন্যকে সত্যের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করবে।

রবীন্দ্র সাহিত্যে যে সত্যটি বারংবার ধ্বনিত হয়েছে, কখনও প্রাঞ্জল গদ্যে, কখনও কাব্যের সুললিত ছন্দে, সেটি "মানুষের ধর্ম্ম" বক্তৃতাগুলিতে যা তিনি বলেছেন: "আপনাকে বৃহতে উপলব্ধি করাই সত্য, অহংসীমায় অবরুদ্ধ জানাই অসত্য।" তাঁর কাব্যে অনন্তের সুর ঝঙ্কৃত হয়েছে, হৃদয়গ্রাহী ছন্দে বেজেছে ভূমার আহ্বান। আর মানুষের আত্মায় ত অনন্তেরই জন্যে সুতীব্র পিপাসা। যে-কাব্য আমাদিগকে একটি দীপ্ত মুক্ত মহাজীবনের দিকে আহ্বান করে না, তার ক্ষমতা নেই আমাদের আত্মার ক্ষুধাকে পরিতৃপ্ত করে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা আমাদের কাজের দাবিকেই শুধু তৃপ্ত করে না, আমাদের প্রাণের দাবিকেও।

"কুসুম পরাগ ঝরিবে ঝলকে ঝলকে
অধরে অধরে মিলন অলকে অলকে
কোথা পুলকের তুলনা,
নীপ শাখে সখি ফুলডোরে বাঁধ ঝুলনা।"

অথবা

"নদীকূলে কল্লোল তুলে গিয়েছিলে ডেকে ডেকে,
বনপথে আসি করিতে উদাসী কেতকীর রেণু মেখে।
বর্ষা শেষের গগন কোণায় কোণায়,
সন্ধ্যা মেঘের পুঞ্জ সোনায় সোনায়
নির্জন ক্ষণে কখনো অন্যমনায়
ছুঁয়ে গেছ থেকে থেকে।
কখনো হাসিতে কখনো বাঁশিতে গিয়েছিলে ডেকে ডেকে।"

অথবা

"এ নহে মুখর বনমর্ম্মর গুঞ্জিত,
এ যে অজাগর-গরজে সাগর ফুলিছে!
এ নহে কুঞ্জ-কুন্দ-কুসুম-রঞ্জিত,
ফেন-হিল্লোল কলকল্লোলে দুলিছে।"

অথবা

"তালে তালে দু'টি কঙ্কণ কনকনিয়া
ভবন শিখীরে নচোতো গণিয়া গণিয়া
স্মিতবিকশিত বয়ানে
কদম্বরেণু বিছাইয়া ফুল শয়ানে।"

রবীন্দ্রকাব্যের সর্ব্বত্র ধ্বনির এই মাধুর্য্য, ছন্দের এই লালিত্য, শব্দ-যোজনার এই অপূর্ব্ব পারিপাট্য!

কিন্তু শুধু ভাষার যাদুকে আশ্রয় ক'রে প্রতিভা কখনও কালজয়ী হ'তে পারে না। যাঁরা চিরকালের কবি, তাঁদের কাব্যে আর একটি বস্তু লক্ষ্য করবার বিষয়। মহাকবিদের কাব্য পড়লে আমাদের মনে হয়, আমরা অনন্তের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়িয়েছি; আমাদের চৈতন্য সমস্ত ক্ষুদ্রতার শৃঙ্খলকে চূর্ণ ক'রে দিগ্‌দিগন্তে প্রসারিত হয়ে যায়, একটি বৃহৎ জীবনের কল্লোলধ্বনিতে আমাদের সমস্ত সত্তা পূর্ণ হয়ে ওঠে, আমাদের চিত্ত ভোগাসক্তির বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে একটি অনির্ব্বচনীয় আনন্দের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। কবিতা প'ড়ে প্রাণ যদি দুলে না ওঠে, বৃহতের দিকে, মহতের দিকে আমাদের চিত্ত যদি ধাবিত না হয়, নিজেকে দিকে দিকে ছড়িয়ে দেবার উল্লাসে হৃদয় যদি স্ফীত হয়ে না ওঠে, তবে বুঝতে হবে, সেই কবিতা বর্ত্তমানের সীমানা পেরিয়ে কখনও মহাকালের মধ্যে বেঁচে থাকবে না, সে কবি এমার্সনের ভাষায় Eternal নয়, সাময়িক বা Contemporary।

উপনিষদ্ বলছে: আমাদের স্বভাবে শ্রেয়ও আছে, প্রেয়ও আছে। আমাদের প্রবৃত্তির দিক্‌টাকে তিনি অস্বীকার করেন নি, জীবনের সহজ আনন্দগুলিকে তুচ্ছ ব'লে, মায়া ব'লে উড়িয়ে দেন নি। "পলাতকা"য় নববধূর চেলি পরিয়ে বাল-বিধবা মঞ্জুলিকাকে কবি সানন্দে পাঠিয়ে দিয়েছেন পুলিন ডাক্তারের সঙ্গে ফরাক্কাবাদে। তিনি একথা বলেছেন: "বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়।"

কিন্তু শ্রেয়ের ইচ্ছার সঙ্গে প্রেয়ের ইচ্ছার দ্বন্দ্ব বেধেছে যেখানে, সেখানে শ্রেয়কেই তিনি বেছে নিয়েছেন। "বিদায় অভিশাপ" কবিতায় কচের জীবনে শ্রেয়ের সঙ্গে প্রেয়ের সংঘর্ষে শ্রেয়ের আদর্শই কি জয়ী হয় নি? কচকে দেবযানী যেমন ভালবেসেছিল, কচও দেবযানীকে তেমনি গভীর করেই ভালবেসেছিল। কিন্তু তরুণীর প্রতি হৃদয়ের দুরন্ত অনুরাগ কচকে সত্যভ্রষ্ট করতে পারে নি। নিজের সুখের জন্যে কচ ধর্ম্মপথ থেকে বিচ্যুত হ'তে পারল না। বিদায়ের ক্ষণে কচ দেবযানীকে বলেছে :

ভালবাসি কি না আজ
সে তর্কে কি ফল? আমার যা আছে কাজ
সে আমি সাধিব। স্বর্গ আর স্বর্গ ব'লে
যদি মনে নাহি লাগে, দূর বনতলে
যদি ঘুরে মরে চিত্ত বিদ্ধ মৃগ সম,
চিরতৃষ্ণা লেগে থাকে দগ্ধ প্রাণে মম
সর্বকার্য-মাঝে—তবু চলে যেতে হবে
সুখশূন্য সেই স্বর্গধামে। দেব সবে
এই সঞ্জীবনীবিদ্যা করিয়া প্রদান
নূতন দেবত্ব দিয়া তবে মোর প্রাণ
সার্থক হইবে। তার পূর্ব্বে নাহি মানি
আপনার সুখ। ক্ষম মোরে দেবযানী,
ক্ষম অপরাধ।"

"গান্ধারীর আবেদন" কবিতায় পিতা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রস্নেহে অন্ধ, দুর্নীতিপরায়ণ পুত্রকে তাই শাস্তি দিতে নারাজ। মাতা গান্ধারী কিন্তু আসক্তির বন্ধন থেকে মুক্ত। পুত্রস্নেহ তাঁকে সত্য পথ থেকে, ধর্ম্মপথ থেকে, কর্ত্তব্যপথ থেকে বিচলিত করতে পারে নি। স্বামীকে তিনি বলছেন :

"পাপী পুত্রে ক্ষমা কর যদি
নির্বিচারে, মহারাজ, তবে নিরবধি
যত দণ্ড দিলে তুমি যত দোষীজনে
ধর্ম্মাধিপ নামে, কর্ত্তব্যের প্রবর্ত্তনে
ফিরিয়া লাগিবে আসি দণ্ডদাতা ভূপে,—
ন্যায়ের বিচার তব নির্ম্মমতারূপে
পাপ হয়ে তোমারে দাগিবে। ত্যাগ করো
পাপী দুর্য্যোধনে।"

সমস্ত রবীন্দ্রসাহিত্যেই এই আদর্শবাদের সুর। শুধু প্রাণধারণের জন্যে যে-বাঁচা সে ত জন্তুর বাঁচা। তার মধ্যে মনুষ্যত্বের কোন বালাই নেই। তা আমাদের চিত্তকে দুর্ব্বহ ক্লান্তির হাত থেকে কখনই রক্ষা করতে পারে না। সেই বাঁচার মধ্যে মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ গৌরব আছে, যার মধ্যে বৃহতের প্রতি আছে আকর্ষণ। রবীন্দ্রকাব্যের মধ্যে বৃহতের প্রতি এই ইঙ্গিত! "বর্ষশেষ" কবিতায় আত্মকেন্দ্রিক জীবনের সমস্ত সঙ্কীর্ণতাকে অতিক্রম করে বৃহৎ জীবনের মধ্যে নিজেকে সম্প্রসারিত করবার উদার আহ্বান অনুপম ভাষায় মন্ত্রিত হয়ে উঠেছে!

হে কুমার, হাস্যমুখে তোমার ধনুকে দাও টান
ঝনন রনন—
বক্ষের পঞ্জর ভেদি অন্তরেতে হউক কম্পিত
সুতীব্র স্বনন।
হে কিশোর, তুলে লও তোমার উদার জয়ভেরি,
করহ আহ্বান—
আমরা দাঁড়াব উঠি, আমরা ছুটিয়া বাহিরিব
অর্পিব পরাণ।
চাবো না পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন ক্রন্দন,
হেরিব না দিক্—
গণিব না দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচার,
উদ্দাম পথিক।
মুহূর্তে করিব পান মৃত্যুর ফেনিল উন্মত্ততা
উপকণ্ঠ ভরি
খিন্ন-শীর্ণ জীবনের শতলক্ষ ধিক্কার লাঞ্ছনা
উৎসর্জন করি।

শুধু দিন যাপনের, শুধু প্রাণ ধারণের মধ্যে একটা দুঃসহ গ্লানি আছে। পশ্চিমের মনীষী বার্ট্রাণ্ড রাসেল (Bertrand Russel) জীবনের সহজ আনন্দগুলিকে মূল্য দিয়েছেন যথেষ্ট। তিনি নিবৃত্তি মার্গের পথিক নন। কিন্তু জীবনকে ভোগলালসার মধ্যে একান্তভাবে সীমিত করলে ক্লান্তিতে, নৈরাশ্যে আমরা হাঁপিয়ে উঠি, এই সত্যকে তিনি অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দিয়েছেন :

Life devoted only to life is animal without any human value, incapable of preserving men permanently from weariness and the feeling that all is vanity.

বার্ণার্ড শ'ও তাঁর Man and Superman নাটকে নরকের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন :

'Hell is the home of unreal and of the seekers for happiness'.

নরকে শুধু ইন্দ্রিয়সুখ। সেখানে শুধু হাসি, শুধু বাঁশি, শুধু অবকাশ, শুধু ভোগ। ভারতবর্ষীয় ঋষিরা তাই শ্রেয়ের আদর্শকে এত মূল্য দিয়ে গিয়েছেন। রবীন্দ্র

সাহিত্যে ভারতীয় সংস্কৃতির জয়ধ্বনি! মানুষের স্বভাবে জীবনের সহজ আনন্দগুলির দিকে যে ঝোঁক রয়েছে তাদের দাবি নিশ্চয়ই স্বীকৃতি পেয়েছে তাঁর কাব্যে। কিন্তু একথা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে যে, পরম গৌরব তিনি দান করেছেন মানুষের অন্তরবাসী ভূমার দাবিকে। মানুষ সম্পর্কে বারংবার তিনি বলেছেন: "জ্ঞানে কর্ম্মে ভাবে যতই সকলের সঙ্গে সে যুক্ত হয় ততই সে সত্য হয়।" বলেছেন, মানুষ হয়ে জন্মলাভ ক'রে আরাম চাইবে কে, বিশ্রাম পাব কোথায়, মুক্তি পেতে হবে, মুক্তি দিতে হবে এই যে তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য—

"মহাবিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা,
মৃত্যুরে করি না শঙ্কা। দুর্দ্দিনের অশ্রুজলধারা
মস্তকে পড়িবে ঝরি, তারই মাঝে যাব অভিসারে
তারি কাছে, জীবন সর্ব্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি।"

এমার্সন তাঁর Intellect প্রবন্ধে একটা মোক্ষম সত্য পরিবেশন করেছেন। এই সত্যটি হ'ল, মানুষের স্বভাবে প্রেয় আর শ্রেয় দুইই রয়েছে।

God offers to every mind its choice between truth and repose. Take which you please,—you can never have both. Between these, as a pendulum, man oscillates ever.

"প্রত্যেক মানবচিত্তের সম্মুখে ভগবান্ দু'টি বস্তু রেখেছেন: একটি সত্য, অপরটি আরাম। এ দু'টির একটিকেই তোমায় বেছে নিতে হবে। দু'টিকেই একই সঙ্গে কখনই তুমি পেতে পার না সত্য আর আরাম—এ দুয়ের মাঝে মানুষ অনবরত দুলছে ঘড়ির দোলকের মত।"

আরামের প্রতি যাদের অনুরাগ তাদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তার কোন বালাই নেই। বাপ-ঠাকুরদার কাছ থেকে জীবনের যে-আদর্শগুলি তারা পায়, সেইগুলিকেই নির্বিচারে তারা মেনে নেয়। এতে আরাম আছে। বিপদের কোন ঝুঁকি নেই। খ্যাতি আছে, লোক-নিন্দার ভয় নেই। বাংলার যৌবনের সামনে রবীন্দ্রনাথ এই আরামের আদর্শ রাখেন নি। সত্যের দুর্গম ক্ষুরধার পথে চলবার নিমন্ত্রণ তাঁর কাব্যে।

ক্ষতি এনে দিবে পদে অমূল্য অদৃশ্য উপহার
চেয়েছিলি অমৃতের অধিকার,—
সে ত নহে সুখ, ওরে সে নহে বিশ্রাম,
নহে শান্তি, নহে সে আরাম।

ফাল্গুনী নাটকে নব যৌবনের দল গান ধরেছে:

ভাল মানুষ নই রে মোরা
ভাল মানুষ নই।
গুণের মধ্যে ঐ আমাদের,
গুণের মধ্যে ঐ।
দেশে দেশে নিন্দে রটে,
পদে পদে বিপদ্ ঘটে,
পুঁথির কথা কইনে মোরা,
উল্টো কথাই কই।

পৃথিবীতে কঠিনতম কাজ কি? এমার্সন বলছেন, To think। কোনরকমের গোঁড়ামির বশবর্ত্তী না হয়ে স্বাধীন মন নিয়ে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারাটাই পৃথিবীর সবচেয়ে দুরূহ কাজ। কবিরা কর্ম্মবীর নন। অন্যেরা কঠিন কর্ম্মকে সহায় ক'রে যুগের উপরে কীর্ত্তির ছাপ রেখে যাবে। তেনজিং আর হিলারীর ভূমিকায় তারা উত্তুঙ্গ পর্ব্বতশৃঙ্গে আরোহণ করবে, কলম্বাস হয়ে নূতন মহাদেশে পৌছানোর পথ খুলে দেবে, গান্ধী হয়ে শৃঙ্খলিত স্বদেশকে চালাবে স্বাধীনতার বিঘ্নবহুল শৈল-পথে। কবি দেবে বাণী, যে বাণীর মধ্যে সত্যের জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ। সেই বাণী আমাদের অভ্যস্ত জীবনযাত্রায় একটা বৈপ্লবিক আলোড়ন নিয়ে আসে, আমাদের চোখে নূতনতর পৃথিবীর একটা স্বপ্ন দেয়, আমাদের পুরাতন দৃষ্টিভঙ্গিমায় একটা আমূল পরিবর্ত্তন আনে, যাকে আমরা উন্নত পর্ব্বতের গৌরব দিতাম তাকে বল্মীকের স্তূপ ব'লে প্রতিপন্ন করে, আর যাকে বল্মীকের স্তূপ বলে অনাদর করতাম, তাকে অভ্রভেদী হিমাদ্রির গৌরব দেয়। এমন কাজ যারা করে তারা প্রবীণ আর পাকাদের চোখে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর মানুষ। কেন? কারণ তারা কাউকে অভ্যস্ত জীবনের পুরাতন কোটরের মধ্যে শান্তিতে থাকতে দিতে চায় না। তাদের হাতে নূতন আদর্শের সমর-ভরা অমর জয়ধ্বজা। আর কেজো লোকেরা যাই বলুক:

'This World is, after all, absolutely governed by ideas.' 'Men live according to their Philosophy of life.'

রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে যে বাণী বহন করে এনেছেন তার মধ্যে রয়েছে চিরন্তন সত্যে প্রতিষ্ঠিত একটা জীবন-দর্শন। এ জীবন-দর্শন বলেছে, "সমগ্রের মধ্যেই শিব, শিব ঐক্য বন্ধনে!" এই জীবনবেদ ঘোষণা করেছে, "আত্মার লক্ষণ হচ্ছে শুভবুদ্ধি, যে-শুভবুদ্ধিতে সকলকে এক করে।"

সমস্ত রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রাণময় আবেদন আমাদের শুভবুদ্ধির কাছে, আমাদের ঐক্যবোধের কাছে। আত্ম-পরিচয় গ্রন্থে তিনি বলেছেন ঃ

"আমি এসেছি এই ধরণীর মহাতীর্থে—
এখানে সর্ব্বদেশ, সর্ব্বজাতি ও সর্ব্বকালের
ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে আছেন নর দেবতা—
তাঁরই বেদীমূলে নিভৃতে ব'সে আমার
অহঙ্কার, আমার ভেদবুদ্ধি ক্ষালন করবার
দুঃসাধ্য চেষ্টায় আজও প্রবৃত্ত আছি।"

আমরা যে কবির জন্মদিনটিকে চিহ্নিত করে সর্ব্বত্র উৎসবের আয়োজন করি তার কারণ, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে দেশ "আপন ভাবাবান্ প্রকাশ" অনুভব করেছে। ভারত-বর্ষের অন্তরাত্মা ভেদবুদ্ধিকে কোথাও প্রশ্রয় দেয় নি। এই অন্তরাত্মার মর্ম্মবাণী হচ্ছে আত্মকেন্দ্রিকতার দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরের সীমানার বাহিরে চৈতন্যকে দিগ্‌দিগন্তে প্রসারিত ক'রে দেওয়া। আপনাকে সকলের ভিতরে এই ছড়িয়ে দেওয়ার মধ্যে একটি অনির্ব্বচনীয় আনন্দের অনুভূতি আছে। সমস্ত আত্মার আনন্দময় এই বিস্তারের অনুভূতি থেকেই সম্ভব কঠিনতম আত্মত্যাগ, সঙ্কট-আবর্ত্তমাঝে ঝাঁপিয়ে পড়বার দুঃসাহস, বন্দরের নিস্তরঙ্গ জলরাশির নিরাপত্তা থেকে অকূলে পাড়ি দেবার দুরন্ত পাগলামি। কাব্যের কাজ, সঙ্গীতের কাজ হচ্ছে একটি অবর্ণনীয় আনন্দের শিহরণে আমাদের সত্তাকে বৃহতের মধ্যে বিস্তীর্ণ ক'রে দেওয়া। কাব্যের ধর্ম্ম হচ্ছে আমাদের বুদ্ধিকে ততটা নাড়া দেওয়া নয় যতটা আমাদের প্রাণকে দুলিয়ে দেওয়া, আর প্রাণ না দুল্‌লে আমরা কোন দুঃসাহসের কাজ করতে পারি নে। কবির ফাল্গুনীতে আছে ঃ পৃথিবীতে যা কিছু সকলের বড় তার প্রমাণ নেই। পৃথিবীর যত কবি, যত কবিত্ব সমস্ত যদি ধুয়ে-মুছে ফেলতে পার তা হ'লেই প্রমাণ হবে এতদিন কেজো লোকেরা তাদের কাজের জোরটা কোথা থেকে পাচ্ছিল, তাদের ফসলক্ষেতের মূলে রস জুগিয়ে এসেছে কারা!"

বৃহতের মধ্যে চৈতন্যের এই প্রাণময় সম্প্রসারণই ত জীবন। রবীন্দ্র সাহিত্যে জীবনেরই কল-কল্লোল। কোথাও কোন প্রাচীরের বাধা নেই! নেই গৃহজীবনের একঘেয়ে অস্তিত্বের মধ্যে তন্দ্রাতুর চিত্তের শান্তির নির্জ্জীবতা! রবীন্দ্রনাথের কাব্য শান্তির জয়গান নয়। জীবনকেই তিনি কামনা করেছেন, যে-জীবনের প্রচণ্ড আকর্ষণকে আমরা অনুভব করি বাধার পর বাধাকে জয় করে, বিঘ্নবহুল শৈলপথে নিরন্তর চলার মধ্যে। তাঁর কবিতায় সেই অদম্য প্রাণের জয়ধ্বনি, যে-প্রাণ শান্তির মোহে আপনাকে বেঁধে রাখে না সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতার ক্ষুদ্রতার মধ্যে। "দুরন্ত আশা" কবিতায় বৃহৎ জীবনের মধ্যে মুক্তির আস্বাদন পাবার একটা সুতীব্র ব্যাকুলতার প্রকাশ।

নিমেষ তরে ইচ্ছা করে
বিকট উল্লাসে
সকল টুটে যাইতে ছুটে
জীবন-উচ্ছ্বাসে।
শূন্য ব্যোম অপরিমাণ
মদ্যসম করিতে পান,
মুক্ত করি রুদ্ধ প্রাণ
ঊর্দ্ধ নীলাকাশে।
থাকিতে নারি ক্ষুদ্র কোণে
আম্রবন ছায়ে,
সুপ্ত হয়ে লুপ্ত হয়ে
গুপ্ত গৃহবাসে।

বলা বাহুল্য, যেখানে সমস্ত আত্মার আনন্দিত বিস্তারের এই পুলক শিহরণ নেই সেখানে আমরা আমাদের সত্তাকে আত্মকেন্দ্রিকতার একটা কঠিন আবরণের মধ্যে সঙ্কুচিত ক'রে রাখি, সেখানেই আমাদের যথার্থ মৃত্যু ঘটে। যেখানে চারিপাশের মানুষগুলিকে আমরা ভালবাসার শক্তি হারিয়ে ফেলি সেখানে বেঁচে থেকেও আমাদের স্থান মৃতেরই দলে। যেহেতু রবীন্দ্রনাথ জীবন-পূজারী, সেই হেতু তাঁর সাহিত্যে ভেদবুদ্ধির পারে আমাদের চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করে সমস্ত মানবপরিবারের সঙ্গে একটি সুগভীর ঐক্যবোধের মধ্যে। মানুষের কান্নায় প্রাণ তাঁর দুলে উঠেছে আর সেই সংবেদনশীল কবি-চিত্তের অনুভূতির উর্ম্মিমালায় রবীন্দ্র সাহিত্য সর্ব্বত্র তরঙ্গায়িত। ইংরেজীতে যাকে বলে reverence for life অর্থাৎ জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা—সেই শ্রদ্ধার অভিব্যক্তিতে রবীন্দ্র সাহিত্য মহিমাময় হয়ে আছে। পশ্চিমের একজন মনীষী এই যুগকে বলেছেন Age of Crisis, দুটো পরস্পর-বিরোধী শক্তির নিদারুণ সংঘর্ষ যুগের চিত্তকে ফেনিল করে তুলেছে। একটি শক্তির খেলা চলেছে মানুষকে নানাদিক্ দিয়ে দাসত্ব-নিগড়ে বাঁধবার দিকে, অপরটির অভিযান মানুষকে বন্ধনমুক্ত করবার লক্ষ্যের অভিমুখে। রবীন্দ্রনাথের লেখনী-মুখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের বিকিরণ। বৈপ্লবিক চিন্তাধারার আগুনে তিনি পোড়াতে চেয়েছেন দাসত্বের শৃঙ্খল। রক্ত-করবীতে Industrialism-এর অনাচারের বিরুদ্ধে কবি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। যে-সভ্যতার মরীচিকায় মুগ্ধ

হয়ে গ্রামের মানুষ পঞ্চবটচ্ছায়া শীতল কুটীর ছেড়ে চট কলের কুলি হয়, মনুষ্যত্বের গৌরব থেকে বঞ্চিত হয়ে পর্য্যবসতি হয় ব্যক্তিত্বহীন সংখ্যায়, পরিপূর্ণ জীবনের মহিমা হারিয়ে ফেলে খনির টুকরো মানুষ হয়ে যায়—সেই সভ্যতাকে কবি ক্ষমা করতে পারেন নি। ক্ষমা করতে পারেন নি "মুক্তধারায়" যন্ত্রাসুরের আকাশস্পর্শী স্পদ্ধাকে। মুক্তধারা নাটকে রাজা রণজিৎ যেখানে রাজকীয় অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে প্রজাদের ক্ষুধার অন্নে হাত দিতে চেয়েছেন, সেখানে ধনঞ্জয় বৈরাগী রাজদ্রোহের ঝড়কে ডেকে এনেছেন আর বিদ্রোহ রবীন্দ্রনাথের আশীর্ব্বাদ লাভ করেছে। এ দেশে নারীজীবন পুরুষের কাছ থেকে যে-অবহেলা, যে-অনাদর পেয়ে আসছে এবং পাতিব্রত্যধর্ম্মের নামে যে দাসত্বকে মেয়েরা আজও সহ্য করছে—"স্ত্রীর পত্র" গল্পে, "যোগাযোগ" উপন্যাসে সেই দাসত্বের, সে অবহেলার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ কি অভিযান ঘোষণা করেন নি? পূর্ণ, শুদ্ধ, মুক্ত মানবের জয়ধ্বনি তাঁর কণ্ঠে। আমাদের সংবিধানের dignity of the individual একটি স্তম্ভস্বরূপ। প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে এমন একটি স্বকীয়তা আছে যা অনুপম আর এই অনুপমের স্বীকৃতিতেই গণতন্ত্রের মহিমা। রবীন্দ্র সাহিত্যে এই গণতন্ত্রের জয়ধ্বনি। জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে সৌভ্রাত্রের স্বর্ণসূত্রে বেঁধে গণতন্ত্রের ভিত্তিতে নূতনতর জগৎ তৈরীর কথা আজ শোনা যাচ্ছে। সেই জগদ্ব্যাপী সৌভ্রাত্র সম্ভব কি ব্যক্তিস্বাধীনতার আকুণ্ঠ স্বীকৃতিতে নয়?

"চরখা-যজ্ঞ"

'বৈধ' কংগ্রেসের কলিকাতায় "জাতীয় সপ্তাহ" অনুষ্ঠানের একটি অঙ্গ ছিল সূত্র-যজ্ঞ বা চরখা-যজ্ঞ। শ্রদ্ধানন্দ পার্কে ইহার আয়োজন হইয়াছিল। অনেক পুরুষ ও মহিলা চরখা লইয়া সেখানে সুতা কাটিতে আরম্ভ করেন। তাঁহাদের বিরোধী দলের কতগুলি লোক আসিয়া নানারূপ ধ্বনি করেন ও অন্যবিধ বাধা উপস্থিত করেন। মহিলা ও পুরুষদের উপর ধূলা ও কাঁকর প্রভৃতি নিক্ষেপ তাহার অন্তর্গত। যাঁহারা সুতা কাটিতেছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আহতও হইয়াছিলেন।···

চরখায় সুতা না-কাটিলে কেন স্বরাজ লব্ধ হইতে পারে না, অহিংস হইতে হইলে এবং অহিংস উপায়ে স্বরাজ অর্জন করিতে হইলে চরখায় সুতা কাটা কেন একান্ত আবশ্যক, আমরা তাহা বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু তাহা অনাবশ্যকও মনে করি না। অধিকন্তু, অশ্বমেধ যজ্ঞে অশ্ব বলি দিতে হয় বলিয়া, চরখা-যজ্ঞেও চরখা বলি দিতে হইবে মনে করিবার কোন কারণ দেখিতেছি না। চরখার সুতা হাতের তাঁতে বোনা খাদির পক্ষপাতীরা সুতা ও কাপড়ের মিলের যন্ত্রপাতি ত ভাঙিয়া দেন না। তাঁহারা অহিংস থাকেন। সেইরূপ চরখা ও খাদির বিরোধীরাও চরখা ও খাদি সম্বন্ধে অহিংস থাকিতে পারেন। তাহাতে তাঁহাদের 'দেশ-সেবা' বাতিল হয় না। সুতাকাটুনী মহিলাদেরও উপর ধূলা কাঁকর নিক্ষেপ ও তাঁহাদেরও লাঞ্ছনা হইয়া থাকিলে তাহা অত্যন্ত ঘৃণ্য অভদ্রতা ও কাপুরুষতা।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৪৭।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানের ইংরেজী অনুবাদের তালিকা

শ্রীসুধাময়ী মুখোপাধ্যায়

মুখবন্ধ

য়ুরোপীয় অধিকাংশ সাহিত্যিক, কবি, নাট্যকারের রচনার অনুবাদ ইংরেজী ভাষায় সহজপ্রাপ্য। আবার ইংরেজী ভাষার শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ য়ুরোপীয় প্রধান ভাষাগুলিতেও অনূদিত হয়ে পাঠকদের নিকট সহজলভ্য হয়েছে। মোট কথা, নিজ নিজ মাতৃভাষার মাধ্যমে লোকে প্লেটো থেকে পাস্তেরনাক ও সফোক্লিস থেকে সাত্রে-র সমগ্র রচনার পূর্ণস্বাদ পায়। য়ুরোপীয় সকল ভাষার শ্রেষ্ঠ লেখকদের রচনাবলী বহুখণ্ডে প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগারেই শোভমান দেখা যায়। গ্যেটে পড়বার জন্য য়ুরোপের সাধারণ পাঠককে জার্মান ভাষা অধ্যয়ন করতে হয় না; টলস্টয় পড়তে হ'লে রুশী ভাষা আয়ত্ত করতে হয় না। নিজ নিজ ভাষায় সব গ্রন্থই পড়তে তারা পায়। রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী অবাঙালী পাঠকদের সামগ্রিক ভাবে পড়বার উপায় নেই—কারণ তাঁর রচনাবলীর সেভাবে অনুবাদ করার ব্যবস্থা হয় নি। কবিকৃত ইংরেজী অনুবাদ অসম্পূর্ণ; কারণ তিনি নিজেই বেছে বেছে অনুবাদ করেছিলেন এবং সে অনুবাদকে translation না বলে transvaluation বললেই ভাল হয়। যৌবনের কবিতাকে বৃদ্ধ বয়সে মন্থন করে ভাষান্তরিত করলে তার মৌলিক স্বাদটুকু পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। রবীন্দ্রনাথের জীবনকালে এবং তাঁর মৃত্যুর পরে বহু লেখক কবির রচনার ভাষান্তর করেছেন। সে-সব অনুবাদের মধ্যে অনুবাদকের নিষ্ঠা প্রকাশ পেয়েছে; তবে কবির রচনার বিবর্তনের ধারার মধ্যে সেগুলি দেখাবার পরিবেশ রচিত হয় নি।

রবীন্দ্র-রচনাবলী অনুসরণ করে বা কালানুক্রমে তাঁর সাহিত্যের বিবর্তনের দিকে দৃষ্টি রেখে, সুশৃঙ্খলভাবে ভাষান্তরণের ব্যবস্থা হয়েছে রুশী ও চেক ভাষায়। রুশীভাষায় দশ খণ্ডে রচনাবলী মুদ্রিত হয়েছিল। কবির জন্মশত-বার্ষিকী উপলক্ষ্যে তা দ্বাদশ খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে। সোবিয়েত সাহিত্যিকরা রবীন্দ্রকাব্য আরম্ভ করেছেন সন্ধ্যা সংগীত থেকে; এবং পর পর প্রভাত সংগীত, ছবি ও গান, কড়ি ও কোমল, মানসী প্রভৃতি কাব্য থেকে বাছা-বাছা কবিতাগুলি অনুবাদ করে গেছেন। তাঁদের অনুবাদ-বিধি সমবায়িক—অর্থাৎ কয়েকজন মিলে কাজটা করেন—দায়িত্ব একজনের নয়। শুধু শাব্দিক অনুবাদ করেই তাঁরা নিশ্চিন্ত হন না; ছন্দ ও ভাব যেখানে স্পষ্ট হয়, কবিতা-অনুবাদ সেখানেই সার্থকতা লাভ করে।

রবীন্দ্রনাথের কবিতার রুশী অনুবাদে ছন্দ যাতে ঠিক থাকে, তার চেষ্টার ত্রুটি হয় না বলে শুনেছিলাম। মনে আছে, মস্কোতে একটি সেমিনারে রবীন্দ্রনাথের কবিতার অনুবাদ নিয়ে আলোচনাকালে তাঁদের একজন বললেন যে, তাঁরা মূল ছন্দ রাখবার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। এই বলে তিনি রুশীভাষায় অনূদিত একটি কবিতা পাঠ ক'রে বললেন, "অনুমান করুন কবিতাটি কি।" ছন্দ শুনে অথবা আবৃত্তি করে পড়ার ঢং দেখে মনে হ'ল কবিতাটি 'সোনার তরীর' অনুবাদ। তাঁরা বললেন ঠিক তাই—'গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা'ই অনুবাদ।

মিসেস্ বিকোভা গত বৎসর পৌষ মেলার সময়ে আমাদের বাড়ীতে সাতদিন অতিথিরূপে বাস করেন। তখন তিনি ছন্দ নিয়ে আলোচনা করছেন। বোরিস কারপুশকিন, বিকোভা ও আরও কয়েকজন মিলে রুশীভাষায় যে বিরাট্ বাংলা ব্যাকরণ লিখছেন, ছন্দ সম্বন্ধে এই কাজটা তারই অন্তর্গত। প্রবোধচন্দ্র সেনের সম্পাদিত রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ' সদ্য প্রকাশিত হয়েছে। মিসেস্ বিকোভা সে বই কিনে পড়েন ও আলোচনা করেন। বুঝলাম, এঁরা যে কাজ করেন তা শৌখীনভাবে নিষ্পন্ন করেন।

শ্রীসুধাময়ী দেবী রবীন্দ্রনাথের কবিতার ইংরেজী অনুবাদের যে তালিকা প্রস্তুত করেছেন, তার খসড়া আমাকে দেখাতে একটা কথা হঠাৎ স্পষ্ট হয়ে উঠল। রবীন্দ্রনাথকে বিদেশী ভাষায় ভাষান্তরিত করা যা হয়েছে, তা আদৌ পর্য্যাপ্ত নয়—তা অসম্পূর্ণ। এই তালিকার প্রতি যাঁরা একটু মনোনিবেশ করবেন, তাঁদের কাছে এই তত্ত্বটি স্পষ্ট হবে যে, রবীন্দ্রনাথকে বিদেশী ভাষায় রূপদানের বিরাট্ অবকাশ রয়েছে। পাঠকরা লক্ষ্য করবেন, তাঁর কাব্যের বড় বড় ফাঁক রয়ে গেছে অনুবাদের তালিকায়। আমি সাহিত্যিক নই, যারা ইংরেজী ভাষাবিদ্, তাঁরা বলতে পারবেন বাংলা কবিতাকে ইংরেজী ছন্দে ফেলা যায় কি না। ইংরেজী গানের সুর যদি বাংলা গানে আনা যায়, তবে ছন্দের পরীক্ষা করতে দোষ কি?

সুধাময়ী দেবীর এই কাজটি দেখে যদি সাহিত্যিকরা রবীন্দ্রনাথের রচনার ধারাবাহিক ইংরেজী অনুবাদ করবার জন্য সমবায়ীভাবে অগ্রসর হন, তবে একটা খুব বড় কাজের প্রবর্তক রূপে তাঁরা বিশিষ্ট সম্মানের অধিকারী হবেন।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

ভূমিকা

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনেক কবিতা ও গান নিজে ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন। Gitanjali, Gardener, Fugitive, Fruit Gathering, Crescent Moon প্রভৃতি বইতে সেগুলি প্রকাশিত হয়েছে।

বিশ্বভারতী থেকে ১৯৪২ সালে কবির অনূদিত কবিতা কয়েকটি বেছে 'Poems' নামে বইটিতে সঙ্কলিত করা হয়। ১৯৪৩-এ প্রকাশিত হয় Poems-এর দ্বিতীয় সংস্করণ।

১৯৩৬ সালে ম্যাকমিলান কোম্পানী প্রকাশ করেন, Collected Poems and Plays of Rabindranath Tagore। এতে প্রধানত কবির ইংরেজীতে অনূদিত বই-গুলি থেকে অনেক গান ও কবিতা ও কয়েকটি নাটক গ্রথিত করা হয়েছে।

কবির নিজের করা অনুবাদ ছাড়া আরও অনেকে তাঁর কবিতার অনুবাদ করে বই আকারে প্রকাশ করেছেন। ১৯০৯ সালে রবি দত্ত অনুবাদ করেন রবীন্দ্রনাথের আগের দিকের অনেক কবিতা Echoes from East and West বইতে। সে বই দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয় নি। বইটির অন্তর্গত কয়েকটি কবিতার একটি তালিকা পেয়েছি আমরা শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছ থেকে, যথাস্থানে সেই তালিকাটি আমরা দেব। এই তালিকা ছাড়া আমরা তাঁর কাছ থেকে আরও সাহায্য পেয়েছি। Fugitive, Fruit Gathering প্রভৃতি থেকে কয়েকটি অনূদিত কবিতার মূল বাংলা কবিতার হদিস্ দিয়েছেন তিনি আমাদের অনুরোধে।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের Sheaves, ভবানী ভট্টাচার্য্যের Golden Boat, অরবিন্দ বসুর Flight of Swans, Herald of Spring ও Wings of Death বইগুলিতে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কাব্য গ্রন্থের অনেক কবিতা ও গানের অনুবাদ আছে।

মডার্ণ রিভিউ, বিশ্বভারতী ত্রৈমাসিক প্রভৃতি অনেক পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে কবি নিজে ও অনেকে তাঁর কবিতা ও গানের অনুবাদ করেছেন।

শ্রীপুলিনবিহারী সেন এই সব পত্রিকায় প্রকাশিত অনুবাদের দু'টি Bibliographical List প্রকাশ করেন —একটি বিশ্বভারতী পত্রিকায় ১৯৬১ সালে ধারাবাহিক ভাবে, অন্যটি Viswa Bharati Quarterly, Tagore Centenary Number-এ ১৯৬২ সালের মে-তে। এই কাজে তিনি সহায়তা পেয়েছেন শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও শুভেন্দু মুখোপাধ্যায়ের।

এই List থেকে আমরা যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি। মূল অনুবাদ দেখা সম্ভব হয় নি অনেক ক্ষেত্রে। সেজন্য কোন কোন কবিতার ইংরেজী অনুবাদের প্রথম লাইন বা নাম (Title) উল্লেখ করি নাই ; List-এর নির্দেশ দিয়েছি।

আমাদের এই তালিকা প্রস্তুতের কাজে শ্রীপুলিনবিহারী সেনের কাছ থেকে নানারূপে উৎসাহ ও সাহায্য পাওয়ায় আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ।

আমাদের সঙ্কল্প—কবির কবিতা ও গানের অনুবাদের তালিকা প্রস্তুত করা। এক্ষেত্রে যে-সব অনুবাদকের নাম আমরা পাই, তাঁদের মধ্যে পূর্ব্বোল্লিখিত চারজন ছাড়া আর কয়েকজনের নাম উল্লেখ করছি—লোকেন্দ্রনাথ পালিত, অজিত চক্রবর্ত্তী, আনন্দ কুমারস্বামী, সোমনাথ মৈত্র, হুমায়ুন কবীর, ক্ষিতীশ রায়, অমিয় চক্রবর্ত্তী, ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী, লীলা মজুমদার, লীলা রায়, শিশিরকুমার ঘোষ প্রভৃতি।

কবির নিজের করা অনুবাদ অনেক ক্ষেত্রেই মূল বাংলা কবিতা থেকে পরিবর্ত্তিত হয়ে নূতন রূপ ধারণ করেছে তা পাঠকমাত্রেই লক্ষ্য করবেন। Poems প্রভৃতি বইতে সে-জন্য পিছনে কবিতাগুলির সম্বন্ধে টীকা দেওয়া হয়েছে। আমরা কবির কাব্য-গ্রন্থগুলি একটি করে নিয়ে তার মধ্যে কবিতাগুলির অনুবাদের তালিকা দিয়ে যাব। প্রয়োজন-মত প্রত্যেক গ্রন্থের শেষে পাদটীকায় কোন কবিতা সম্বন্ধে যা বক্তব্য উল্লেখ করব। অনুবাদের তালিকার মধ্যে পাঠক প্রভাত সঙ্গীত থেকে কোন কবিতার অনুবাদের উল্লেখ না দেখে হয়ত বিস্মিত হবেন। বস্তুত আমরা এর কোন কবিতার অনুবাদের সন্ধান পাই নাই। শিশুর কয়েকটি কবিতা, যেমন—'আমি আজ কানাই মাষ্টার'-এর অনুবাদ আমাদের চোখে পড়ে নাই। সহৃদয় পাঠকদের কাছে আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে, এই তালিকার বাইরে কোন কবিতার অনুবাদের সন্ধান যদি তাঁরা পান তবে তা অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদের জানালে অত্যন্ত বাধিত হব।

প্রথমত, আমরা কবির বাংলা কাব্য-গ্রন্থগুলির কালানুক্রমিক একটি সূচী দিচ্ছি। সেই সূচী অনুসারে গ্রন্থগুলির একটি একটি ধরে সেটি বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত রবীন্দ্র-

রচনাবলীর কোন্ খণ্ডে আছে তার উল্লেখ করব। তারপর নিম্নলিখিত ভাবে তার কবিতাগুলির অনুবাদের বিবরণ দেব :

(১) বাংলা কবিতার নাম (২) কবিতার প্রথম লাইন (৩) ইংরেজী বই বা পত্রিকার নাম, অনূদিত কবিতার নম্বর (৪) অনুবাদের প্রথম লাইন বা নাম (৫) অনুবাদকের নাম (যে ক্ষেত্রে অনুবাদ কবির নিজের নয়)।

Collected poems and plays of Rabindranath-এ যে সব কবিতা আছে তা এর কোন্ পৃষ্ঠায়, তা উল্লেখ করেছি ( ) বন্ধনী চিহ্ন দিয়ে। যে সব কবিতা এ বইতে নাই তার শেষে বন্ধনী চিহ্নের মধ্যে পৃষ্ঠা সংখ্যা নাই। কোন কোন কবিতার একাধিক অনুবাদ আছে। সেখানে পরে পরে বিভিন্ন বই বা পত্রিকার নাম ও সংখ্যার উল্লেখ করা হয়েছে।

যে-সব কবিতা গানে রূপান্তরিত হয়েছে বা প্রথম থেকেই যেগুলি গানই, সেগুলির বাপাশে তারকা চিহ্ন দেওয়া হ'ল।

এই তালিকাটির শেষে বাংলা কবিতাগুলির বর্ণানুক্রমিক একটি নির্দেশিকা প্রস্তুত করে দেবার সঙ্কল্প রইল।

সুধাময়ী মুখোপাধ্যায়

বাংলা কবিতা ও গানের বইগুলির কালানুক্রমিক সূচী

সন্ধ্যা সংগীত	১৮৮২	খ্রীঃঅঃ	নৈবেদ্য	১৯০১	খ্রীঃঅঃ
প্রভাত সংগীত	১৮৮৩	,,	স্মরণ	১৯০৩	,,
ছবি ও গান	১৮৮৪	,,	শিশু	১৯০৩	,,
ভানু সিংহের পদাবলী	১৮৮৪	,,	উৎসর্গ	১৯০৩ ১৯১৪	,,
			খেয়া	১৯০৬	,,
কড়ি ও কোমল	১৮৮৬	,,	গীতাঞ্জলি	১৯১০	,,
মায়ার খেলা	১৮৮৮	,,	গীতিমাল্য	১৯১৪	,,
মানসী	১৮৯০	,,	গীতালি	১৯১৪	,,
সোনার তরী	১৮৯৪	,,	বলাকা	১৯১৬	,,
বিদায় অভিশাপ	১৮৯৪	,,	ফাল্গুনী	১৯১৬	,,
চিত্রা	১৮৯৬	,,	পলাতকা	১৯১৮	,,
চৈতালি	১৮৯৬	,,	শিশু ভোলানাথ	১৯২২	,,
কথা ও কাহিনী	১৯০০	,,	লিপিকা (গদ্য কথিকা)	১৯২২	,,
কাহিনী	১৯০০	,,			
কল্পনা	১৯০০	,,	পূরবী	১৯২৫	,,
ক্ষণিকা	১৯০০	,,	লেখন, স্ফুলিঙ্গ	১৯২৭	,,
মহুয়া	১৯২৯	,,	ছড়ার ছবি	১৯৩৭	,,
পরিশেষ	১৯৩২	,,	সেঁজুতি	১৯৩৮	,,
পুনশ্চ	১৯৩২	,,	প্রান্তিক	১৯৩৮	,,
বিচিত্রিতা	১৯৩৩	,,	প্রহাসিনী	১৯৩৮	,,
শ্রাবণগাথা	১৯৩৪	,,	আকাশ প্রদীপ	১৯৩৯	,,
শেষসপ্তক	১৯৩৫	,,	নবজাতক	১৯৪০	,,
বীথিকা	১৯৩৫	,,	সানাই	১৯৪০	,,
পত্রপুট	১৯৩৬	,,	রোগ-শয্যায়	১৯৪০	,,
শ্যামলী	১৯৩৬	,,	আরোগ্য	১৯৪১	,,
চিত্রলিপি	১৯৩৬	,,	জন্মদিনে	১৯৪১	,,
			শেষ লেখা	১৯৪১	,,

অন্যান্য কবিতা ও গান যে যে বিভিন্ন বইতে অনূদিত, তাদের প্রথম প্রকাশকাল

(1) Echoes from East and West 1909.

(2) Gitanjali (Song Offerings) London—India Society 1912.

(3) Gardener—London, Mac., Oct. 1913.

(4) Crescent Moon London. Mac. 1913.

(5) Fruit Gathering—London, Mac.—1916.

(6) Lover's Gift and Crossing—New York—Macmillan 1918.

(7) Fugitive—London, Mac. 1921.

(8) Collected poems and plays of Rabindranath Tagore—London, Mac., 1936.

(9) Poems—Visva Bharati, Cal. 1st. Ed. 1942, 2nd. Ed.—1943.

(10) The Golden Boat By Bhabani Bhattacharya —London. Allen & Unwin—1932.

(11) Sheaves By Nagendranath Gupta—New York. Mac.—1932.

(12) A Flight of Swans—By Aurobindo Bose—London. John Murray—1955.

(13) The Herald of Spring—By Aurobindo Bose—London. John Murray—1957.

(14) Wings of Death—By Aurobindo Bose—London. John Murray—1960.

(15) Anthology of 100 Songs. Sangeet Natak Akademi Vol. I 1962.

অন্যান্য গান ও কবিতা বিভিন্ন পত্রিকায় অনূদিত

Tagore Centenary Exhibition—Pub. by Lalitakala Akademi—1961.

Mother India . . . . May. 1961.

Modern Review, Visva Bharati Quarterly and other periodicals.

(১৮৮২) সন্ধ্যা সংগীত—রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১ম খণ্ড

তারকার আত্মহত্যা—জ্যোতির্ম্ময় তীর হতে—Golden Boat—A star kills itself—A star jumped down.
Modern Review, Aug. 1911—The Death of a Star By Loken Palit

গান আরম্ভ—চারিদিকে খেলিতেছে মেঘ—Echoes from East and West—To The Muse—Sheaves—To The Muse—Hither where the clouds play around

শিশির—শিশির কাঁদিয়া শুধু বলে—Sheaves—The Dew drop—Weeping wails the dew drop

(১৮৮৪) ছবি ও গান—র র ১ম খণ্ড

রাহুর প্রেম—শুনেছি আমারে ভালোই লাগে না—Fugitive I, No. 3—You desired my love, and yet you did not love me
—Golden Boat—The Love of Rahu—You do not like me

(১৮৮৪) ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী—র র ২য় খণ্ড

* মরণ রে তুঁহু মম শ্যামসমান—Sheaves—Death—O Death, like my Syam art thou!
* সজনি সজনি রাধিকা লো—Sheaves—The coming of Krishna—Behold Radhika, my friend
* শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা—Anthology of 100 Songs, Vol. I, No. 15—Dense clouds are massed

(১৮৮৬) কড়ি ও কোমল—র র ২য় খণ্ড

প্রাণ—মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে—'Education'—Lucknow, May 1942—'Life'—Tr. by Tewari

কাঙালিনী—আনন্দময়ীর আগমনে—Hind. Std. Annual 1944—'The Beggarmaid'—By Indira Debi Chowdhurani

মঙ্গলগীত (২)—চারিদিকে তর্ক উঠে—Crescent Moon—The Child Angel—They clamour (p. 85)

মঙ্গলগীত (৩)—আমার এ গান মাগো—Crescent Moon—My song—The song of mine (84)

* বাঁশী—ওগো শোন কে বাজায়—Fruit Gathering—Listen my heart in his flute (211)

গীতোচ্ছ্বাস—নীরব বাঁশরিখানি বেজেছে আবার—Lover's Gift No. 3—The spring flowers....Poems No. 2 (2nd Ed.)—The news of my love

বিবসনা—ফেলো গো বসন ফেলো—Sheaves—'Undraped'—Cast aside your garment
—Golden Boat, 1932—Nudity—Cast aside your garment

চরণ—দুখানি চরণ পড়ে ধরণীর গায়—Fugitive I 6—Two little bare feet flit over the ground
—Sheaves—A woman's feet—Two foot falls upon the breast of the earth

বাহু—কাহারে জড়াতে চাহে দুটি বাহুলতা—Fugitive II 6—I was to go away, still she did not (417)

* হৃদয় আকাশ—(আমি) ধরা দিয়েছি গো—Gardener 31—My heart,—the bird of wilderness (111)

অঞ্চলের বাতাস—পাশ দিয়ে গেল চলি—Gardener 22—When she passed by me with quick steps (106)

কল্পনামধুপ—প্রতিদিন প্রাতে শুধু গুন্‌গুন্ গান—Fugitive II 7—My songs are like bees (418)

পুনর্মিলন—নিশিদিন কাঁদি সখী মিলনের তরে—Gardener 50—Love, my heart longs day and night (123)

বন্দী—দাও খুলে দাও সখী ওই বাহুপাশ—Gardener 48—Free me from the bond of your sweetness (122)

মরীচিকা—এস ছেড়ে এস সখী কুসুম শয়ন—Poems No. 1 (2nd Ed.)—Come friend, flinch not

মায়ের আশা১—কুলের দিনে সে যে চলে গেল—Crescent Moon—The Recall

(১২৮৮)* মায়ার খেলা—গীতিনাট্য—র র ১ম খণ্ড

জীবনে আজ কি প্রথম এল বসন্ত—V. B. Quarterly Vol. XIV Part III, Nov. 1948—Jan. '49—Is it the first spring
—Hind. Std., Annual 1946—Spring in Life (printed in facsimile)

আমার পরাণ যাহা চায়—Sangeet Natak Akademi 100 songs. Vol. I, No. 27—You are what my heart desires

যেওনা যেওনা ফিরে—V. B. Q. Vol. XIV Part III—Do not, Oh do not turn

এসেছি গো এসেছি—V. B. Q. Vol. XIV Part III—I have come

সখা, আপন মন নিয়ে কাঁদিয়া মরি—V. B. Q. Vol. XIV Part III—This is my own heart

আমি কি যেন (জেনেশুনে বিষ) করেছি পান—V. B. Q. Vol. XIV Part III—I know not what wine

ভালবেসে যদি সুখ নাহি—From Poems No. 4—V. B. Q. Vol. XIV Part III—If there is nothing but pain

ভালবেসে দুখ সেও সুখ—Gardener 25—Trust love, even if it brings sorrow (109)
—V. B. Q. Vol. XIV Part III—Sweet is the pain

ওগো দেখি আঁখি তুলে চাও—Gardener 25—Come to us youth, tell us truly (108)

সখী সাধ করে যাহা দেবে—Gardener 26—What comes from your willing hands (108)

সকল হৃদয় দিয়ে—V. B. Q. Vol. XIV Part III—Can she to whom I have offered

তবে সুখে থাকো—V. B. Q. Vol. XIV Part III—I leave you to your

ভুল করেছি, ভুল ভেঙেছে—From Poems 5—V. B. Q. XIV Part III—Delusions did I cherish

অলি বার বার ফিরে যায়—V. B. Q. Vol. XIV Part III—The bee returns again and again

এ কী স্বপ্ন এ কী মায়া—V. B. Q. Vol. XIV Part III—Is it an illusion

আমার নিখিল ভুবন (নৃত্যনাট্যে)—V. B. Q. Vol. XIV Part III—My world is lost

ডেকো না আমারে („)—V. B. Q. Vol. XIV Part III—Do not call me back

যে ছিল আমার স্বপনচারিণী („)—V. B. Q. Vol. XIV Part III—She is an apparition elusive

ছিন্ন শিকল পায়ে নিয়ে („)—V. B. Q. Vol. XIV Part III—......................
also In V. B. Q. May-July 1943—Snapped Chain
—With the piece of the snapped chain

বিদায় করেছ যারে নয়নজলে—Sheaves—The Mistake—Whom You have sent away in tears

---

১ দ্রষ্টব্য—কাব্যগ্রন্থ ১ম ভাগে বিশ্বভারতী পুনর্মুদ্রণ—ভাদ্র ১৩৩৪—কড়ি ও কোমল পৃঃ ৬২। 'শিশু' কাব্যে 'আকুল আহ্বান' কবিতাটির সঙ্গে একত্রে 'মায়ের আশা' কবিতাটির অনুবাদ করেছেন Crescent Moon-এ The Recall নাম দিয়ে। দ্রষ্টব্য 'শিশু' কাব্যের পাদটীকা।

(১৮৯০) মানসী—র র ৩য় খণ্ড

ভুল—কে আমারে যেন এনেছে ডাকিয়া— Fugitive I 16—I forgot myself for a moment (411)

নিষ্ফল কামনা—বৃথা এ ক্রন্দন —V. B. Q. V. Part III, 1939, poems No. 3—All fruitless is thy cry
Lover's Gift 25—I clasp your hands

বিচ্ছেদের শান্তি—সেই ভালো তবে তুমি যাও —Fugitive I 14—I am glad, you will not wait (411)

আকাঙ্ক্ষা—আর্দ্রতীব্র পূর্ববায়ু বহিতেছে বেগে— Fugitive II 23—The river is grey and the air (424)

প্রকৃতির প্রতি—শত শত প্রেমপাশে টানিয়া হৃদয় —Sheaves—To Nature—Thou tanglest my heart

কুহুধ্বনি—প্রখর মধ্যাহ্ন তাপে প্রান্তর— Lover's Gift 55—The noon day air is quivering

হৃদয়ের ধন—কাছে যাই ধরি হাত— Gardener 49—I hold her hands (122)

জীবনমধ্যাহ্ন—জীবন আছিল লঘু —Sheaves—The Noon of Life—Light was my life

ব্যক্তপ্রেম—কেন তবে কেড়ে নিলে— Gardener 56—I was one among many (126)

অনন্তপ্রেম—তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি— Poems No. 6—I have ever loved thee

ভালো করে বলে যাও— Gardener 29—Speak to me, my love (110)

অহল্যার প্রতি—কী স্বপ্নে কাটালে তুমি— Poems No. 7—Struck with the curse

শেষ উপহার—আমি রাত্রি তুমি ফুল— Fugitive I 7—I am like night to you (407)

(১৮৯৪) সোনার তরী—র র ৩য় খণ্ড

সোনার তরী—গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা —Fugitive I 17—The rain fell fast (412)

শৈশব সন্ধ্যা—ধীরে ধীরে বিস্তারিছে —Crescent Moon—The Home—I paced alone (51)

বসুন্ধরা—আমারে ফিরায়ে লহ অয়ি বসুন্ধরে —Fugitive III 7—How often great Earth have I felt (431)

তোমরা ও আমরা—তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাও —Fugitive I 8—You, like a rivulet (410)

পরশ পাথর—খ্যাপা খুঁজে ফিরে পরশ পাথর —Gardener 26—A wandering man was seeking

যেতে নাহি দিব—দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি —Fugitive III 11—At the sleeping village, the noon was still (433)
—March of India, Vol. I No. 2—Tr. by Humayun Kabir

অবসন্ন দিবালোকে কোথা হতে ধীরে —Fugitive II 8—I believe, you had visited me in a vision

মানসসুন্দরী১—(ক) জানি আমি জানি সখী —Fugitive II 9—I think, I shall stop startled (418)

(খ) বীণা ফেলে দিয়ে এসো —Fugitive II 10—Lay down your lute, my love (419)

(গ) রজনী গভীর হল দীপ নিবে আসে —Fugitive II 8—The night deepens

(ঘ) তুমি এই পৃথিবীর প্রতিবেশিনীর মেয়ে —Fugitive III 6—My world, when I was a child

---

১ মানসসুন্দরীর মধ্যকার চারটি স্তবকের অনুবাদ পৃথকভাবে করা হয়েছে। যে স্তবকগুলির অনুবাদ হয়েছে তাদের প্রথম লাইন দিয়ে আমরা নির্দেশ দিলাম।

দেউল—রচিয়াছিনু দেউল একখানি —Gardener 72—With days of hard travail, I raised (138)
সমুদ্রের প্রতি—হে আদি জননী সিন্ধু —Modern Review, Feb. 1912—Tr. by S. N. Mukherji
দুই পাখী—খাঁচার পাখী ছিল সোনার খাঁচাটিতে —Gardener 6—The tame bird was in a cage (93)
অনাদৃত—তখন তরুণ রবি প্রভাতকালে —Gardener 3—In the morning I cast my net
দুর্বোধ—তুমি মোরে পার না বুঝিতে —Gardener 28—Your questioning eyes are sad
ঝুলন—আমি পরাণের সাথে খেলিব আজিকে —Gardener 82—We are to play the game of death
* হৃদয় যমুনা—যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ —Gardener 12—If you would be busy and fill (99)
প্রত্যাখ্যান—অমন দীন নয়নে তুমি চেয়ো না —Fugitive I 8—Do not stand before my window
লজ্জা—আমার হৃদয় প্রাণ সকলি —Fugitive II 14—All that I had, I gave to you (420)
বন্ধন—বন্ধন ? বন্ধন বটে সকলি —Poems 9—Bonds ? Indeed they are
অক্ষমা } যেখানে এসেছি আমি
দরিদ্রা } দরিদ্রা বলিয়া তোরে } —Gardener 73—Infinite wealth is not yours (139)
নিরুদ্দেশ যাত্রা—আর কতদূরে নিয়ে যাবে —Sheaves—The Aimless Voyage—How far will you take me

ক্রমশঃ

গান্ধীজির নাম প্রচার

আমি ন্যূনকল্পে বার বৎসর ধরিয়া গান্ধীমহাশয়ের ও তাঁহার সহযোগী ও অনুচরবর্গের জীবন ও চরিত্রের মধ্যে নানাবিধ প্রশংসনীয় ও অনুকরণীয় বিষয় বহু চিত্রসহ প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউ কাগজ দুখানিতে প্রকাশ করিয়া আসিতেছি; ফলে এই দুখানি কাগজে তাঁহাদের সম্বন্ধে যত লেখা ও ছবি প্রকাশিত হইয়াছে বঙ্গের কোন কাগজে ত তাহা হয়ই নাই, ভারতবর্ষের কোন কাগজে হইয়াছে কিনা সন্দেহ।......"ন্যূনকল্পে বার বৎসর" এইজন্য বলিতেছি যে, ১৯০৯ সালে আমি বোম্বাই ছোট আদালতের প্রধান বিচারপতি Chief Judge আমার বন্ধু কৃষ্ণলাল মোহনলাল ঝাভেরী মহাশয়ের দ্বারা গান্ধীমহাশয়ের দক্ষিণ আফ্রিকার কারাবাসের অভিজ্ঞতার কাহিনী সম্বন্ধে চারিটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখাইয়া ক্রমে ক্রমে ছাপিয়াছিলাম বলিয়া মনে পড়িতেছে। সম্ভবতঃ তাহারও অনেক বৎসর পূর্ব্বে মডার্ণ রিভিউ ও প্রবাসীতে গান্ধী মাহাত্ম্য কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছিল।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী, আলোচনা, আষাঢ়, ১৩২৮।

বাজনা

শ্রীঅজিত চট্টোপাধ্যায়

পল শিবরামণকে হয়ত আপনারাও দেখেছেন। লোয়ার সার্কুলার রোডের ধারে যে সমাধিক্ষেত্রটি রয়েছে তারই একটা ঢুকবার গেটে শিবরামণকে সন্ধ্যার দিকে দেখা যেতে পারে। ওর সেই উদাস উদাস বড় বড় চোখের চাহনি আজও তেমনি আছে। তবে পরণের বেশবাসগুলো আর আগের মত নয়। তখন যেন বেশ ছিমছাম আর টিপ্‌টপ্‌ থাকত শিবরামণ। এই পাঁচ বছরে অকাল-বার্ধক্যে জীর্ণ হয়ে গেছে মানুষটা। বাজপড়া ন্যাড়া তালগাছের মত। মাথার অমন ঘনকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশদাম কোথায় অদৃশ্য হয়েছে। পরিবর্তে অনেকদিনের তেল-না-মাখানো অল্প অল্প চুল ঈষৎ হাওয়ায় ইতস্তত আন্দোলিত হচ্ছে।

এক নজরে আর চেনা যায় না শিবরামণকে। কথাটা পুরোপুরি সত্যি। হয়ত আমিও চিনতে পারতাম না ওকে। দ্রুত রাস্তা হাঁটলে পাঁচ বছর আগের দেখা একটা লোককে চট করে চিনে ফেলা শক্ত। কিন্তু আমার হাতে কাজ ছিল না। আগের দিন সকালে কলকাতা এসেছি মাত্র। অফিসের যা কাজ ছিল দুটো দিনে প্রায় শেষ, আর যা সামান্য আছে, তা একদিনেই সেরে ফেলতে পারব।

শান্তমনে হাঁটছিলাম তাই। শিয়ালদা গিয়ে ট্রেণ ধরব। হাঁটতেও খারাপ লাগে নি। বৈশাখের শেষ। সারাদিনের খরতাপে তেতে উঠেছে মাটি। বেলা পড়ে এলেও মাটি এখনও ঠাণ্ডা হয় নি। সুন্দর ফুরফুরে হাওয়া বইছে। প্রাণভ'রে সেই বাতাস টানছি।

বাদুড়ঝোলা হয়ে মানুষ চলেছে ট্রামে-বাসে। পথে-ঘাটে লোকজন ব্যস্ত। চোখে-মুখে অস্থিরতার ছাপ। পুবে-পশ্চিমে, উত্তরে-দক্ষিণে দ্রুত পথ হাঁটছে। ডান-দিকে বেরিয়েল গ্রাউণ্ডটা পড়তেই আমি একটু থামলাম। মনটা কেমন উদাস হয়ে উঠল। বাঁচামরা, জীবনের অনিত্যতা, হাসিকান্না সব কিছু এক সঙ্গে ভিড় করে মনে এল। সমাধিক্ষেত্রটার দিকে দৃষ্টি মেলে দিলাম। কতক্ষণ পরে হঠাৎ মনে হ'ল গ্রাউণ্ডে ঢুকবার গেটের কাছে যেন পল শিবরামণ না?

এগিয়ে গিয়ে আরও দৃঢ় হ'ল ধারণা। কাছে যেতেই আর কোন সন্দেহ নেই। পল শিবরামণই। গেটের কাছে রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ওর বড় বড় চোখ দু'টি স্থির নিস্পন্দ, ভাবলেশহীন। যেন কি ব্যথা আর বেদনায় ভারাতুর দুই আঁখি।

কাঁধে হাত দিয়ে ডাকলাম, 'শিবরামণ না?'

ঘাড় ফিরিয়ে সে হাসল। হাসিতে আরও চিনলাম মানুষটাকে। পল শিবরামণের অনেক কিছু বদলে গেছে, বদলায় নি শুধু হাসিটা। সেই আগের মত মিষ্টি মিষ্টি হাসি। যার জন্যে প্রথম দিনই ওকে ভালো লেগেছিল।

গায়ের রংটা তামাটে হয়ে গেছে। মুখটা শীর্ণ বলে একটু লম্বা-ধাঁচের দেখায়। বেশবাস মলিন। একগুচ্ছ ফুল হাতে শিবরামণ চেয়ে আছে।

পল শিবরামণ ক্যাথলিক ক্রীশ্চান। কেরালার লোক। ওর দেশে নীল সমুদ্রের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে মাটিতে। জ্যোৎস্নায় নারিকেল বনের পাতায় হাওয়ার মর্মর জাগে। লম্বা লম্বা খালের দুপাশে বাংলা দেশের মতই সবুজ শ্যামল ছোট ছোট গাঁ।

এক জাতের লোক আছে যারা সব সময়ই ঘরোয়া। অফিসে আর খেলার মাঠে, রেলের কামরায় কিংবা বাসের সীটে তারা অল্প আলাপেই অন্তরঙ্গ। পরিচয়ের ক্ষীণসূত্রকে এক মুহূর্তেই শক্ত রজ্জুতে পরিণত করতে ওদের দেরি হয় না। শিবরামণ সেই জাতের।

সরকারী অফিসে এসে দেখা করতে এলে স্লিপ পাঠাতে হয়। স্লিপ অনুযায়ী ডাকা হয় আগন্তুকদের।

কিন্তু শিবরামণ নিয়মবহির্ভূত। প্রথম দিনই সুইংডোর ঠেলে সোজাসুজি ঘরের মধ্যে সে আবির্ভূত হ'ল।

পিছু পিছু পিওনটি এসেছিল। কিন্তু তাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই করমর্দনের জন্য হাত বাড়াল শিবরামণ।

অবাক্ হলাম। এ অফিসে নানা কাজে লোক আসে। সুইংডোরের পিছন থেকে উঁকিঝুঁকি দেয়। পিওনের সঙ্গে সঙ্গে ফিসফিস করে, কথা বলে। কিন্তু না বলে-কয়ে ভিতরে আসতে কাউকে দেখেছি বলে মনে হয় না।

বিভিন্ন ফার্ম থেকে লোক আসে। নানা ধরণের অফিসিয়্যাল সব ব্যাপার। কেউ সন্তুষ্ট হয়ে ফেরে, খুশী মনে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। কারও আশাভঙ্গ হয়। মনস্কামনা পূর্ণ করা যায় নি। বিরক্ত হয়ে অফিসারের মুণ্ডপাত কামনা করে। প্রথম প্রথম নীরবে, তার পরে অফিসের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে ভাষায় সরব হয়ে ওঠে।

শিবরামণ হেসে বলল, 'গুড আফটারনুন স্যর।'

ওকে বসতে বলি। ইঙ্গিতে পিওনকে বাইরে যেতে নির্দেশ দিই।

—'কি ব্যাপার? কি চাই আপনার?'

একটা দরখাস্ত বের করল শিবরামণ। আমার টেবিলে রেখে বলল, 'কুড়ি দিন হ'ল দিয়েছি। আজও জবাব পাই নি।'

গম্ভীর হয়ে বললাম, 'দুঃখিত। এই কপিটা রেখে যান। তাড়াতাড়ি উত্তর দেব।'

শিবরামণ হাসল। সবজান্তার হাসি। চিঠিটা যে কেন দপ্তর থেকে টেবিলে আসে নি, বোধ হয় তার সবটাই ওর জানা।

তেমনি গম্ভীর হয়ে একটা সরকারী ব্যাখ্যা ওকে শোনালাম।

—'মাঝে মাঝে গোলমাল হয়। এখানের চিঠি সেখানে গুঁজে থাকে, আর পাওয়া যায় না চট্ করে।'

শিবরামণ হেসে বলল, 'তার জন্য কিছু মনে করছি না স্যর। কিন্তু আপনি কোন্ দিকে থাকেন?'

—'মানে?'

—'আপনার ঠিকানাটা জানতে চাইছিলাম।'

এত অল্প আলাপে ঠিকানা জানতে চায় দেখে আশ্চর্য হ'লাম।

বললাম, 'আমার ঠিকানা জেনে কি লাভ?'

শিবরামণ আগের মতই হাসল। জানতে চাইল আমি যন্ত্রসঙ্গীত ভালবাসি কি না।

সঙ্গীত, তা কণ্ঠনিঃসৃত বা যন্ত্রপ্রসূতই হোক তাকে ভালবাসি না এমন কথা বলা যায় না।

যেন সে কথা শিবরামণ বুঝল। পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে খস খস করে আমার নাম লিখে এগিয়ে দিল।

বলল, 'কতদূরে থাকেন জানি না। কিন্তু সময় পেলে নিশ্চয়ই যাবেন। আপনাকে পেলে আমরা ভারী খুশী হব।'

কার্ডখানা রেখে দিলাম। নমস্কার করে শিবরামণ বেরিয়ে গেল। দরজার কাছে গিয়ে মুখ ফিরিয়ে ওর সেই মিষ্টি হাসিটা আবার উপহার দিল।

হাতের কাজ সেরে কার্ডখানা ভাল করে দেখলাম। সাধারণ ব্যাপার। প্রবাসী কেরালাবাসীদের একটা জলসাগোছের অনুষ্ঠান। যাঁরা অংশ গ্রহণ করবে তাদের মধ্যে পল শিবরামণও রয়েছে।

বোধ হয় দিন সাত পরের কথা। ফাল্গুনের প্রথম। মৃদু মৃদু দখিনা বাতাস বইতে সুরু করেছে কলকাতায়। সাদার্ণ এভিনিউয়ের মাঝখানের সংরক্ষিত স্থানে সযত্নলালিত বৃক্ষশাখায় নতুন কিশলয়ের আগমন সুরু হয়েছে।

সম্ভবত শনিবার সেটা। কার্ডখানা পকেটেই ছিল। হাঁটতে হাঁটতে কোন এক সময় সেখানে পৌঁছে গেছি। দরজার কাছে শিবরামণ, আরও দু-তিনটি ভদ্রলোক। ওদের পিছনে কয়েকটি মেয়ে। কলকল করে নিজেদের মধ্যে কথা বলাবলি করছে। মাথায় খোঁপা নেই কারও। সাপের মত কৃষ্ণবেণী পিঠের উপর লুটোচ্ছে।

আমায় দেখে শিবরামণ ওর সেই সুন্দর মিষ্টি হাসি দিয়ে আপ্যায়িত করল। এগিয়ে এসে বলল, 'আপনি যে আসবেন, ভাবতেই পারি নি। আমরা দারুণ খুশী হয়েছি।'

ওর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল শিবরামণ। তার পর পিছনের একটি মেয়েকে উদ্দেশ করে বলল, 'ষ্টিফানা কোথায়? ষ্টিফানা—'

মেয়েদের মধ্যে দু' একজন মুচকি হাসল। একজন দৌড়ে গেল ভিতরে। বোধ হয় ষ্টিফানাকে ডাকতে।

শিবরামণকে বললাম, 'আপনি এখন ব্যস্ত। আমি বরং ভিতরে গিয়ে বসি।

—'দাঁড়ান না। ষ্টিফানার হাতে আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছি। ওই ভিতরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেবে।'

ষ্টিফানা এল। বছর বাইশের একটি মেয়ে। মাথার চুল বব করা, পরণে স্কার্ট ব্লাউজ। কি মিষ্টি আর স্মার্ট চেহারা। ষ্টিফানার চোখে বেশী পাওয়ারের চশমা, তবু দৃষ্টিতে যেন যাদু মেশানো আছে।

শিবরামণ বলল, 'ষ্টিফানা, ইনি আমার নতুন বন্ধু। একে ভিতরে নিয়ে যাও। সামনের দিকের আসনে বসিয়ে দিও।'

ইংরেজীতে ভদ্রতাসূচক দু' একটি কথা বলল ষ্টিফানা। আমায় দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছে। আমার সাহচর্য্যে তারা সবাই খুশী।

ষ্টিফানা আমায় ভিতরে নিয়ে গেল। প্রথম সারির একটা আসনে বসতে অনুরোধ করল। বলল, 'অনুষ্ঠান কেমন লাগল, তাকে জানালে সে খুশী হবে।'

সব ছিল অনুষ্ঠানে। নাচ, গান, আবৃত্তি আর যন্ত্রসঙ্গীত। সবশেষে শিবরামণ এল ডায়াসে। হাতে একটি বেহালা। শিবরামণ কি বাজাতেও পারে? যে হাতে টাকা-পয়সার হিসেব তোলে লেজারের রুল-টানা খাতায়, সেই হাতে বেহালার ছড় টানবে। কিন্তু বড় সুন্দর বাজাল শিবরামণ। বেহালার সুর কেঁদে কেঁদে ফিরল ঘরটায়। একদিকে তাকিয়ে আমি অবাক্ হ'লাম। হলঘরের এককোণে ষ্টিফানা দাঁড়িয়ে। অতগুলি লোকের মাঝখানে সে যেন বড় নিঃসঙ্গ একা, মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে আছে শিবরামণের দিকে। বাঁশীর সুরে আবিষ্ট সাপিনীর মত মাঝে মাঝে অল্প অল্প দুলছে।

শো ভাঙ্গতে প্রায় সাড়ে নটা হ'ল। সকলের সঙ্গে আস্তে আস্তে গেটের দিকে এগোচ্ছি। বাইরে এসে দেখি শিবরামণ আর ষ্টিফানা আমার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

আমায় দেখে ষ্টিফানা বলল, 'পল, এই যে তোমার নতুন বন্ধু।'

আমি হেসে বললাম, 'এখন বোধ হয় শুধু বন্ধু। নতুন কথাটা বাদ দেওয়া যেতে পারে।'

খিল খিল করে হাসল ষ্টিফানা। ওর অল্প অল্প রং-মাখা ঠোঁটের পিছনে দন্তরুচি কৌমুদী ঝিক্‌মিক্ ক'রে উঠল।

বললাম, 'তোমাদের অনুষ্ঠান খুব ভাল লাগল শিবরামণ। আর তুমি যে এত সুন্দর বেহালা বাজাও তা আমি ভাবতেও পারি নি।'

আমার কথার উত্তর না দিয়ে ষ্টিফানার দিকে চাইল শিবরামণ। ওর সেই মিষ্টি মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে পড়ল।

ওদের সঙ্গে করমর্দন করে গুডনাইট জানালাম। শিবরামণ বলল সময় পেলেই সে একদিন আমার সঙ্গে দেখা করবে।

দিন সাত পরই শিবরামণের সঙ্গে দেখা। অল ইণ্ডিয়া রেডিওর পিছন দিয়ে হেঁটে চলেছে গঙ্গার দিকে।

—'শিবরামণ না?'

সেই মিষ্টি হাসি ফুটে উঠল ঠোঁটে।

আমাকে দেখে বলল, 'কাজ আছে নাকি? না হ'লে চলুন গঙ্গার দিকে গিয়ে বসি।'

শিবরামণকে ভাল লাগে। ওর কথা বলার ভঙ্গিটা ভারী সুন্দর। এমন অনায়াস গতিতে বলে চলে যে মুগ্ধ না হয়ে পারি না।

আউটরাম ঘাটের জেটিতে গিয়ে দু'জনে বসি।

বললাম, 'ষ্টিফানা কোথায়?'

—'হসপিটালে গেছে। ওর ডিউটি আছে দশটা পর্যন্ত।'

—'হসপিটালে কেন?'

—'বা রে, ষ্টিফানা যে ডাক্তার। এখন হাউস সার্জন আছে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে।'

—'ডাক্তার! ভারী খুশী হলাম শুনে। কিন্তু, শিবরামণ, মেয়েটি তোমার শুধু বন্ধু, না, আরও কিছু?'

শিবরামণ চুপ করে রইল। একটু লজ্জা-লজ্জা। হাসি ওর গৌরমুখে ছড়িয়ে পড়েছে।

বললাম, 'তা হ'লে ঠিক ধরেছি, কি বল ?'

—'কি ?'

—'মেয়েটি তোমার ফিঁয়াসি।'

এবার বেশ সহজ হয়ে বলল শিবরামণ, 'বোধ হয় তার চেয়েও কিছু বেশী। আমরা দুজনে দুজনকে বড় বেশী ভালবাসি।'

—'তা হ'লে বিয়ে করছ না কেন ?'

—'আমরা এনগেজড্।' হাতের একটা আংটি দেখাল শিবরামণ। ষ্টিফানার নামের আদ্যাক্ষর তাতে লেখা। বলল, 'শীঘ্রি বিয়ে করছি আমরা।'

শিবরামণ আর ষ্টিফানার প্রেমের গল্প শুনছি। ভালবাসার আদি ও অকৃত্রিম কাহিনী...।

গঙ্গার ওপার থেকে হাওয়া বইছে। ফুরফুরে তাজা বাতাস। জলে ছোট ছোট ঢেউ। নদীর উপর ভাসমান নানা দেশের জাহাজ নোঙর করে রয়েছে। যে দেশের জাহাজ সে দেশের পতাকা সগৌরবে উড়ছে জাহাজের ওপর। একটা জাহাজের বুকে কাস্তে-হাতুড়ি আঁকা। সম্ভবত রাশিয়ান কিংবা কোন কমিউনিষ্ট দেশের জাহাজ সেটা।

কলকাতায় এসেছিল শিবরামণ কুড়ি বছর বয়সে। আই. এস-সি. পাস ছেলে। ইচ্ছে, কোন ফার্মে এপ্রেণ্টিস থেকে কারিগরি কিছু শেখে। রিপন ষ্ট্রীটের একটা বাড়ীর একতলায় থাকত। ছোট্ট একটুকরো ঘর, ওরই মধ্যে শোয়া থাকা পড়াশুনা এমন কি রান্নাবান্না পর্যন্ত। নিজে রান্নাবান্না না করে উপায় ছিল না, সাউথ ইণ্ডিয়ার খাওয়া-দাওয়ায় অভ্যস্ত শিবরামণ। এদেশী রান্না খেয়ে খুব তৃপ্তি পেত না। তা ছাড়া খরচ চালানো, বাড়ী থেকে মাত্র সত্তরটি টাকা আসত। ওরই মধ্যে সবকিছু কুলিয়ে গুছিয়ে থাকা।

প্রায় রোজ বিকেলে টেকনিক্যাল স্কুল যাওয়ার পথে ষ্টিফানাকে দেখত শিবরামণ। বব করা চুল, সিল্কের ফিতেয় বাঁধা। হাতে বই নিয়ে কলেজ থেকে ফিরছে। শিবরামণ কার কাছে যেন শুনেছিল, মেয়েটি লরেটোয় পড়ে। এবার আই. এস-সি দেবে। কিন্তু প্রথম প্রথম দেখাই সার। দু' বছর পর্য্যন্ত একটা কথাও হয় নি। কলকাতা শহরে এক বাড়ীতে হাজার মানুষের জটলা। তবু কেউ কারও অন্তরঙ্গ নয়। দু'বেলা দেখে, চেনে। বড় জোর একটু হাসি কিংবা সামান্য দু' একটা কথা বলে। ব্যচিলর শিবরামণ কোন্ ভরসায় ষ্টিফানার সঙ্গে আলাপ জমাবে ?

আলাপ হ'ল প্রায় তিনটি বছর পর। ততদিনে টেকনিক্যাল স্কুল ছেড়ে কমার্স পড়ছে শিবরামণ। ওর এক বন্ধু বলেছিল বি. কম. নিতে। পাশ করলে চাকরি-বাকরি সহজ, অন্তত কেরাণীগিরি বাঁধা।

রোজ রাতে বেহালা বাজাত শিবরামণ। ছড় টানলে রাতের অন্ধকারে সুর কেঁদে ফিরত। তেতলায় শোবার ঘরে খাটে শুয়ে কতদিন শুনেছে ষ্টিফানা। কে এমন সুন্দর করে বাজায় ? কার মনে এত ব্যথা সুর হয়ে ছড়ায় ?...কতবার ইচ্ছে হয়েছে ষ্টিফানার, সুর শুনে সিঁড়ি বেয়ে নামে, আলাপ করে শিল্পীর সঙ্গে।...

শীতের প্রথমেই বড় ঠাণ্ডা পড়ল সেবার। কলকাতায় এরকমটা ব্যতিক্রম। পথেঘাটে লোকজন কম। ডিসেম্বরের সুরুতেই হাড়কাঁপানো শীত। কেমন করে ঠাণ্ডা লাগিয়েছিল শিবরামণ। প্রথম প্রথম অল্প অল্প কাশি আর বুকে ব্যথা। কিন্তু সেই নিয়ে বেরুতে সুরু করল। ফল হ'ল সাংঘাতিক। একদিন রাতের বেলায় ফিরল জ্বর নিয়ে। গা-হাত পুড়ে যাচ্ছে। গলা শুকিয়ে কাঠ হবার জোগাড়।

সকালবেলাতে জ্বরের ঘোরে কাতরাচ্ছিল শিবরামণ। ঘরের দরজা হাট করে খোলা। জ্বর গায়ে ফিরে কপাট লাগাতেও ভুলে গেছে। একটু বেলা হ'তেই মেডিক্যাল কলেজে যাচ্ছিল ষ্টিফানা। কাতরানি আর যন্ত্রণা শুনে থামল একবার। কার কি হ'ল ? কৌতূহলবশত পায়ে পায়ে এগিয়ে এসেছিল মাত্র। বিছানায় পড়ে অসহায়ভাবে ছটফট্ করছে শিবরামণ। ঘরের জিনিষ-পত্র এলোমেলো ছড়ান। বেহালা আর ছড়টা টেবিলের এক কোণে ঠেসানো রয়েছে। বেহালাবাদককে চিনতে পারল ষ্টিফানা। আহা বেচারী !

প্রাথমিক পরীক্ষা সেই করল। কপালে হাত দিয়ে জ্বর পরীক্ষা, গলা জিভ দেখা, আরও সামান্য দু' একটা কাজ। কলেজের পথে আর পা বাড়াল না, বেরুলো একবার। সেও ডাক্তারকে আনতে। পরীক্ষা করে ডাক্তার বললেন ইনজেকশন দেওয়ার কথা। সে কাজ ষ্টিফানাই পারবে। গোটা ছয়েক ইনজেকশন, এবেলা ওবেলা দিতে হবে।

দ্বিতীয় দিন বিকেলেই জ্বর নামল। শিবরামণ বালিশে ঠেস দিয়ে উঠে বসল। তৃতীয় দিনে পুরোপুরি আরাম অনুভব করল। ষ্টিফানা আসতেই শীর্ণ-পাণ্ডুর মুখে হাসি এনে বলল, 'আপনি আমার জন্য অনেক করেছেন। সে ঋণ শোধ হবে না। কিন্তু টাকাকড়ি কি খরচ করেছেন, তা বলুন।'

ষ্টিফানা ধমক দিয়ে বলেছিল, 'এখনও রোগ সারে নি আপনার। এত কথা বলা ভাল নয়।' তারপর হেসে বলেছিল, 'ইচ্ছে করলে ত ঋণ শোধ করতে পারেন।'

—'ঋণ শোধ ?'

—'হ্যাঁ, রোজ রাতে বেহালা বাজিয়ে শোনাবেন। নিজের ঘরে বসে আমি ঠিক শুনব। খুব মিষ্টি হাত আপনার।'

ওষুধের দাম পর্যন্ত নেয় নি ষ্টিফানা। বলতে গেলেই হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। নিরুপায় হয়ে এক তোড়া গোলাপ কিনে এনেছিল শিবরামণ। ষ্টিফানাকে একলা পেয়ে দিয়েছিল। এতটুকু আপত্তি করে নি ষ্টিফানা, দু'হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করল উপহার। বুক ভ'রে ঘ্রাণ নিল রক্তগোলাপের। কি মিষ্টি হেসেছিল সেদিন। শিবরামণের মনে হয়েছিল ষ্টিফানার লাল ঠোঁটের হাসি ওই রক্তগোলাপের চেয়েও সুন্দর, পবিত্র। এই আউটরাম ঘাটের জেটিতে বসে কতদিন বেহালা বাজিয়েছে শিবরামণ। অনেক রাত অবধি দু'জনে থেকেছে। জলে ঢেউ জেগেছে। ছলছল শব্দ। চাঁদের রূপোলী আলো ভাসমান জাহাজগুলোর গায়ে পড়ে এক অপূর্ব সৌন্দর্য বিস্তার করেছে।

ষ্টিফানা বলত, 'বাইরের বলতে তুমিই আমার প্রথম রুগী, তা জান ত পল।'

—'প্রথম মানে ? বল প্রথম এবং চিরকালের'—

আনন্দে সোহাগে শিবরামণের বুকে মুখ লুকিয়েছে ষ্টিফানা। দু'টি হৃদয় আবেগে আর ভালবাসায় থর থর করে কেঁপে উঠেছে।

মাঝে মাঝে দেখা হ'ত শিবরামণের সঙ্গে। কখনও অফিসে, কখনও চৌরঙ্গীর ধারেপাশে। কোনদিন দেখতাম ওরা যুগলে বেরিয়েছে, ষ্টিফানা আর শিবরামণ।

আমাকে দেখে দু'জনেই সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছে। অনুরোধ করেছে ওদের সঙ্গী হ'তে। কিন্তু স্থান-বিশেষে তৃতীয় জন বড় অবাঞ্ছিত। তাই ষ্টিফানাকে বলেছি, 'হাতে এখন ভীষণ কাজ। তোমরাই বেড়িয়ে এস।'

দু'জনেই ফুটফুটে ফর্সা। শিবরামণের স্বাস্থ্য ভাল, ষ্টিফানার ফিগার প্রশংসার দাবি রাখে। ওরা হেঁটে গেলে পথচারীর দল মুখ তুলে তাকিয়েছে। ওদের যুগল সৌন্দর্য অনেকের চোখের নীরব প্রশংসা কুড়িয়েছে।

শরতের প্রথমেই একদিন এল শিবরামণ। আকাশটা পরিষ্কার নীল। তুলোর মত পেঁজা পেঁজা শাদা মেঘ অনেক নীচ দিয়ে ভেসে যাচ্ছে।

ঘরে ঢুকেই ঘোষণা করল সে, 'আমাদের বিয়ে। তোমাকে নেমন্তন্ন করতে এলাম।'

খুশী হয়ে কার্ডটা নিলাম। সোনালী বর্ডার দেওয়া একটি সুন্দর কার্ড। বিশেষ একটি দিনের সন্ধ্যায় পার্টি দিচ্ছে শিবরামণ। চৌরঙ্গী অঞ্চলের বেশ ভাল একটি হোটেলে।

—'এতদিনে অনুষ্ঠানটা সেরে নিচ্ছ তা হ'লে।'

—'অনুষ্ঠান ?'

—'অনুষ্ঠান বৈকি। ভালবাসা আর মন দেওয়া-নেওয়া দুই ত আগে হয়েছে।'

কথা শুনে শিবরামণ উচ্চকণ্ঠে হাসল।

পার্টির পর ওর বাড়ীতে নিয়ে গেল শিবরামণ। এখন আর সেই রিপণ ষ্ট্রীটে নয়। কিড্ ষ্ট্রীটে দোতলায় দু'কামরার ফ্ল্যাট নিয়েছে। সুন্দর করে সাজানো ফ্ল্যাট। ফুলশয্যা ওদের নেই, কিন্তু শোবার ঘরখানা ফুলে ফুলে ছাইয়ে দিয়েছে। আমাকে খুশী করার জন্য বেহালা

বাজাল শিবরামণ। ষ্টিফানা নিজের হাতে কফি করে দিল। এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে আগে। জলে-ভেজা বাতাসে শিবরামণের বেহালার সুর অনেক দূর পর্যন্ত ভেসে গেল।

দিন পনের পরই এক নতুন খবর নিয়ে এল শিবরামণ। চোখমুখ উত্তেজিত, লাল। মাথার চুল এলোমেলো।

বলল, 'ভারী গুড্ নিউজ'—

—'কি নিউজ ?'

—'দুটো।' আঙুল তুলে দেখাল।

—'বলে ফেল। দেরি করছ কেন ?'—

—'আমরা কেরালা যাচ্ছি। হনিমুনেও বলতে পার কিংবা দেশে যাচ্ছি তাই ধরে নিও।'

বললাম, 'গ্রাণ্ড। ষ্টিফানা খুব এনজয় করবে।'

—'আর ? আর হয়ত দুজনেই আমেরিকা চলে যাচ্ছি আগামী মাসে।'

—'আমেরিকা ?' বিস্মিত না হয়ে পারি না।

—'হ্যাঁ, ষ্টিফানা চাকরি পেয়েছে। সানফ্রান্সিস্কো হাসপাতালে।'

—'চাকরি পেয়েছে ?'

—'হ্যাঁ, কত মাইনে জান ?'

অজ্ঞতা জানিয়ে মাথা নাড়ি।

ডলারের একটা অংশ বলল সে। ব্যাখ্যা করে যা শোনাল সেটা টাকায় হাজার চারেকের মত।

—'তুমিও যাবে ?'—

—'নিশ্চয়। আমি পড়াশুনো করব। পাঁচ বছরের কণ্ট্র্যাক্ট। ততদিনে আমিও একটা ডিগ্রী জোগাড় করে নেব। তারপর দুজনেই ফিরে আসব ইণ্ডিয়ায়।'

—'কিসে যাচ্ছ ?'

—'কেন, প্লেনে ?'

—'টিকিট ত অনেক টাকার শিবরামণ।'

—'এয়ার ওয়েজ কোম্পানী ক্রেডিট দিচ্ছে। আমেরিকা গিয়ে টিকিটের টাকা কিস্তিতে শোধ করব।'

বললাম, 'গুড আইডিয়া। তা হ'লে তোমার সঙ্গে আবার দেখা ?'

—'হয়ত এখন আর হচ্ছে না। ভাবছি মাদ্রাজ থেকেই ফ্লাই করব।'

বেশীক্ষণ বসল না শিবরামণ। বড় ব্যস্ত মনে হ'ল, খানিকটা উত্তেজিতও। যাবার সময় বলল, 'একদিন এস না আমাদের ফ্ল্যাটে। ষ্টিফানা খুব খুশী হবে। সামনের শনিবার, কেমন ?'

ওদের ওখানে আর যাওয়া হয় নি। হঠাৎ বদলীর অর্ডার পেলাম। বাংলা দেশের বাইরে যেতে হবে। পাটনায়। বাঁধাছাঁদা, তোড়জোড়, ঝামেলা ত আর কম নয়। পাটনায় বসে শিবরামণ আর ষ্টিফানার কথা ভেবেছি, মাঝে মাঝে হিংসে করেছি। কেরালা থেকে এসে কেমন পাখীর মত উড়ে আমেরিকায় পাড়ি দিল।

পাঁচ বছর পরে শিবরামণকে দেখছি। ভগ্নস্বাস্থ্য, আধবুড়ো মানুষটা। কেমন কুঁজো হয়ে গেছে।

বললাম, 'আমেরিকা থেকে কবে ফিরেছ ? ষ্টিফানা কোথায় ?'

কোন উত্তর না দিয়ে শুধু হাসল শিবরামণ। ম্লান নিষ্প্রভ হাসি। অনেকক্ষণ পরে বলল, 'একটু দাঁড়াও, অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে। ফুলগুলো দিয়ে আসি।'

সমাধিক্ষেত্রের এক কোণের একটা বেদীর উপর ফুলগুলি ছড়িয়ে দিল।

গম্ভীর হয়ে বললাম, 'কি ব্যাপার শিবরামণ ?'

—'এখানেই মাকে শুইয়ে দিয়েছি। সুযোগ পেলেই ফুল দিয়ে যাই। তুমি জান না, কেরালায় আমাদের বাড়ীতে মা একটা সুন্দর বাগান করেছিলেন। উনি খুব ফুল ভালবাসতেন।'

—'কিন্তু তোমার মা এখানে কেন ?'

—'ষ্টিফানা চলে যাবার পর মাকে এনেছিলাম কলকাতায়। কিন্তু বেশীদিন রাখতে পারলাম না।' একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল তার।

সন্ধ্যা হয়েছে ইতিমধ্যে। তরল অন্ধকার মহানগরীর বুকে ছড়িয়ে পড়েছে। কাছাকাছি একটা পার্কের এক কোণে আমরা বসলাম। পাঁচ বছরের ইতিহাস একটানা বলে গেল শিবরামণ। বড় অদ্ভুত সব ঘটনা,

জীবন বিচিত্র। অন্তত শিবরামণের ক্ষেত্রে তা নিদারুণ সত্যি।

তীরে গিয়ে তরী ডুবল শিবরামণের। তোড়জোড় করেও আমেরিকা যাওয়া হয় নি। বাদ সাধল ফরেন এক্সচেঞ্জ! ষ্টিফানার খরচে শিবরামণের চলবে ঠিক। কিন্তু শিবরামণ না গেলে খানিকটা ডলার হয়ত আসবে এদেশে। কি থেকে কি হ'ল শিবরামণ জানে না, কিন্তু শেষমুহূর্তে ওর যাত্রার অনুমতি বাতিল হয়ে ফিরে এল।

ষ্টিফানা কাঁধে হাত রেখে বলল, 'থাক পল। নাই বা গেলাম আমেরিকা। তোমাকে রেখে কোথাও যেতে চাই না আমি। তোমার বেহালা না শুনলে রাতে আমার ঘুম আসবে না।'

পল শিবরামণ তাতে রাজী হয় নি। আমেরিকা যাওয়া এখনও এদেশে সৌভাগ্যের সামিল। চান্স পেয়েও যাবে না ষ্টিফানা, তাই কখনও হ'তে পারে?

ঠেলেঠুলে ওকে পাঠাল শিবরামণ। প্রায় জোর করেই তুলে দিল প্লেনে। এয়ার পোর্টে দাঁড়িয়ে ষ্টিফানাকে বলল, 'হাসিমুখে যেতে হয়, বুঝলে? মাত্র পাঁচটা বছর, দেখ না কত তাড়াতাড়ি কেটে যাবে।'

ষ্টিফানাকে নিয়ে প্লেন উড়ল। লাল নীল আলো আকাশের বুকে কতক্ষণ দেখা গেল। তারপরই দৃষ্টির বাইরে। শিবরামণ ক্লান্ত-মন্থর গতিতে বাইরে এল।

প্রথম বছরে অনেকগুলো চিঠি লিখেছে ষ্টিফানা। কি মাসে দু-তিনখানা, চিঠি পেয়ে মনের খানিকটা ফাঁক ভরত। শিবরামণ পিওনের আশাপথ চেয়ে চিঠির প্রতীক্ষা করত।

ষ্টিফানা লিখল :

পল,

তোমাকে না নিয়ে এসে বড় নিঃসঙ্গ আর একলা বোধ করছি। এখনও কারও সঙ্গে ভাল করে আলাপ হয় নি। এদেশটা বড় গতিশীল। এদের জীবনে কখনও একটা জিনিষকে এরা আঁকড়ে থাকতে চায় না। গাড়ি, ব্যবহারের জিনিষপত্র, সবকিছু কিনছে আবার ফেলে দিচ্ছে। নতুন ডিজাইনের জিনিষ এনে ঘর ভর্তি করছে।

আমার সঙ্গে আর একজন ডাক্তার এই হাসপাতালেই জয়েন করেছেন। এদেশেরই ছেলে, নাম মিঃ রিচার্ডসন। তোমারই বয়সী। অল্প অল্প আলাপ হয়েছে।···

কিছুদিনের মধ্যেই নতুন চিঠি পেল শিবরামণ—

পল,

তোমার চিঠি পেয়েছি। উত্তর দিতে একটু দেরি হয়ে গেল। উইক-এণ্ডে বেরিয়েছিলাম। তুমি থাকলে আরও ভাল লাগত।

সানফ্রান্সিস্কো থেকে বেশ কিছুদূরে একটা সুন্দর জায়গা আছে। উইক-এণ্ড কাটাতে অনেকেই এসে জোটে। রিচার্ডসনের গাড়িতে করে গিয়েছিলাম। ভদ্রলোক ভারী আমুদে আর হাসিখুশী। আমি ম্যারেড শুনে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করেছে।···

আরও অনেক চিঠি। শিবরামণ সব তুলে রেখেছে। মাঝে মাঝে পড়ে।

একবার ষ্টিফানা লিখল—

পল,

চিঠি দিতে তোমায় দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমার কোন দোষ নেই। যত দোষ ওই দুষ্টু রিচার্ডসনের। ছুটি পেলেই আমাকে এখানে ওখানে বেড়াতে যেতে বলছে। ওর সঙ্গে গেলে বেশ খানিকটা মোটরিং হয়। মানুষটা বড় খোলামেলা। তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে পারলে খুশী হতাম।

রিচার্ডসনের একটা গুণের কথা তোমায় বলি নি। সুন্দর গীটার বাজাতে পারে রিচার্ডসন। একদিন সী-বীচে বসে ওর বাজনা শুনলাম। তোমার বেহালার করুণ সুর নয়। কেমন ঝলমলে আনন্দের তান। তুমি কেন গীটার বাজাতে শেখ না। রিচার্ডসনকে বলেছি যে চেষ্টা করলে ওর চেয়ে অনেক ভাল তুমি বাজাতে পার।

আজকাল সন্ধ্যায় একটা ক্লাবে যাচ্ছি। রিচার্ডসন সভ্যা করে দিয়েছে। জীবন যে এত ফাষ্ট হ'তে পারে এ দেশে না এলে বিশ্বাসই হ'ত না।···

গত এক বৎসরে কোন চিঠি পায় নি শিবরামণ। অনেক লিখেছে, খোঁজ করেছে। কোন জবাব আসে নি। হিসেবমত আগামী মাসে ষ্টিফানার ফেরার কথা। কণ্ট্রাক্ট শেষ হবে :...

এখন এপ্রিলের শেষ। আকাশ রৌদ্রদগ্ধ পাণ্ডুর।

শিবরামণ ভাবছে, হয়ত মে মাসের প্রথমেই আমেরিকা থেকে ফিরে আসছে ষ্টিফানা, দমদম এয়ারপোর্টে আবার ওরা দু'জনে মিলিত হবে। দেখা হ'লে কি বলবে তাও ভেবে রেখেছে শিবরামণ। প্রথমেই রিচার্ডসনের কুশল জানতে চাইবে। হ্যাঁ, ষ্টিফানা একটু লজ্জা পাবে ঠিক। কিন্তু শিবরামণ ত তাই চায়, ওর সামনে লজ্জায় লাল হয়ে উঠুক না ষ্টিফানা। তখন শক্ত দু'হাতে ওকে কাছে টেনে নেবে শিবরামণ। ষ্টিফানা আর বাধা দিতে পারবে না :...

কোন কথা বলি না, চুপ করে শুনি। এতদিনেও কিছু বোঝে নি শিবরামণ। হয়ত আর ফিরবেই না ষ্টিফানা। ষ্টিফানা মানে ষ্টিফানা রিচার্ডসন।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে শিবরামণ বলল, 'আটটা বাজে, আমায় যেতে হবে।'

—'কোথায় ?'

—'এক গোস্বামীজের কাছে যাই, হপ্তায় তিনদিন।'

—'কেন ?' বিস্মিত হয়ে বলি।

আমাকে আরও বিস্মিত করে শিবরামণ বলল, 'গীটার বাজানো শিখতে।'

সত্যেন্দ্রকাব্য আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ

শ্রীসুযশনিলয় ঘোষ

দীর্ঘ জীবনে রবীন্দ্রনাথ নানা সূত্রে মাঝে মাঝে সাহিত্য-সমালোচনায় নেমেছেন এবং প্রায় সর্বত্রই তিনি যেসব মত ব্যক্ত করেছেন ক্ষেত্রবিশেষে, তা অতি সংক্ষিপ্ত হ'লেও তার মূল্য কম নয়। এর মূলে রয়েছে দুটো জিনিষ—তাঁর তীক্ষ্ণ বিচারশক্তি এবং অনুভূতির গভীরতা। এই শেষোক্ত গুণটির জন্য তাঁর মন আলোচ্য বিষয়ের কোন অংশকে খণ্ডিত করে দেখত না; তার লক্ষ্য থাকত সমগ্র রূপের প্রতি। এর ফলেই তাঁর ব্যক্ত মতামতের মধ্যে দেখা দেয় নি একদেশদর্শিতা। আর সেই সঙ্গে বিচার-বুদ্ধি সম্মিলিত হওয়াতে আবেগের স্রোতে কখনও ভেসে যায় নি তাঁর সিদ্ধান্ত। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সমালোচনার সঙ্গে যাঁরা ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত এই কথাগুলি তাঁদের অবিদিত নয়।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যুতে ব্যথিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ যে শোক-কবিতাটি[১] লেখেন তা তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির মধ্যে অন্যতম। এতে মৃত কবির স্বরূপ বর্ণনার মধ্য দিয়ে তাঁর কাব্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে ধারণার প্রকাশ হয়েছে, সমালোচনা হিসাবেও তার মূল্য কম নয়। রচনাটি অনুজ কবির প্রতি তাঁর স্নেহের পরিচায়ক হ'লেও স্নেহান্ধতার নয়। কারণ, স্নেহের ভাব উচ্ছ্বসিত হয়ে তাঁর বিচারবুদ্ধিকে যে আচ্ছন্ন করে দেয় নি তা কবিতাটির প্রথমাংশ বিচার করলেই বোঝা যায়। এর মধ্যে তিনি নিরপেক্ষ ভাবে সত্যেন্দ্রকাব্যের নানা লক্ষণের উল্লেখ করে তার প্রকৃত রূপটি তুলে ধরেছেন সকলের সামনে। সত্যেন্দ্রনাথকে তিনি মহাকবি আখ্যা দান করেন নি—তাঁর কাব্যকে মানবজীবনের গভীরতার সমুদ্রমন্থনজাত অমৃতও বলেন নি। তার বদলে সত্যেন্দ্র-নাথের প্রকৃতিপ্রীতি, দেশপ্রীতি ও ব্যঙ্গপ্রবণতার কথা বলেছেন; তাঁর ছন্দানুরাগের উল্লেখ করেছেন, তাঁর চিত্রাঙ্কন প্রবৃত্তির কথাও বাদ যায় নি। এক কথায় কবিতাটির মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যবৈশিষ্ট্যগুলিকে কাব্যময় ভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। অর্থাৎ সমালোচকের প্রধান কাজ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে ধারণা ছিল তারই প্রকাশ ঘটেছে এই বিচারের রীতিতে। এ বিষয়ে তাঁর একটি উক্তি উদ্ধৃতির যোগ্য—"পণ্যের মূল্য নির্ধারণ কালে ঝগড়া করে তর্ক করে কিংবা আর পাঁচ জনের নজির তুলে তার সমর্থন করা জলের উপর ভিত্ গাড়া। জল ত স্থির নয়, মানুষের রুচি স্থির নয়, কাল স্থির নয়। এস্থলে ধ্রুব আদর্শের ভান না করে সাহিত্যের পরিমাপ যদি সাহিত্য দিয়েই করা যায়, তা হ'লে শান্তি রক্ষা হয়।" [সাহিত্য-বিচার—সাহিত্যের স্বরূপ]

সত্যেন্দ্রকাব্যের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করতে গিয়ে তিনি প্রথমে জানিয়েছেন যে সত্যেন্দ্রনাথ মর্ত্যের কবি; আর সেই মর্ত্যপ্রীতির দু'টি দিক্ বর্তমান—মর্ত্যপ্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রতি আসক্তি এবং বাস্তব পৃথিবীর ভালমন্দ নানা বিষয়ের প্রতি আগ্রহ। সত্যেন্দ্রনাথের মর্ত্যপ্রীতির উল্লেখ এই ভাবে করা হয়েছে কবিতার মধ্যে—

জানি তুমি প্রাণ খুলি
এ সুন্দরী ধরণীরে ভালবেসেছিলে। তাই তারে
সাজায়েছ দিনে দিনে নিত্য নব সঙ্গীতের হারে।

এর পরে কবি তাঁর রচনা সম্বন্ধে যা যা বলেছেন তা বিশ্লেষণ করলে পূর্বোক্ত দু'টি বিভাগ পাওয়া যায়।

প্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রতি সত্যেন্দ্রনাথের মুগ্ধদৃষ্টির কথা কবিতাটির মধ্যে বার বার উল্লিখিত হয়েছে। আনন্দময়ী প্রকৃতির স্পর্শে উল্লসিত সত্যেন্দ্রনাথের কবি-প্রাণ যে রঙীন ও নৃত্যচপল ভাষায় তার আবেগকে প্রকাশ করত, তাও এ প্রসঙ্গে ঘোষিত হয়েছে। কবির ভাষায়,

বঙ্গের অঙ্গনতলে
বর্ষা বসন্তের নৃত্যে বর্ষে বর্ষে উল্লাস উথলে;
সেথা তুমি এঁকে গেলে বর্ণে বর্ণে বিচিত্র রেখায়
আলিম্পন; কোকিলের কুহুরবে, শিখীর কেকায়
দিয়েছ সঙ্গীত তব, কাননের পল্লবে কুসুমে
রেখে গেছ আনন্দের হিল্লোল তোমার।

কবিতার সুরুতে মৃত কবির দ্বারে বর্ষা ও শরৎ প্রকৃতির যে ব্যর্থ অভিসারের বর্ণনা পাওয়া যায়, তার মধ্য দিয়ে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে প্রকৃতিপ্রেমিক এক কবির তিরোভাবের করুণ সুর।

রবীন্দ্রনাথ যে বার বার সত্যেন্দ্রনাথের প্রকৃতিমুগ্ধতার উল্লেখ করেছেন, তার কারণ আছে। কবিদের

প্রধান বিষয় হ'ল তিনটি—ভগবান্, প্রেম ও প্রকৃতি। সত্যেন্দ্রকাব্য পাঠকমাত্রেই জানেন যে, তাঁর কাব্যে ঈশ্বর-প্রীতি বা ভগবৎ-চেতনা প্রায় অনুচ্চারিত। পরীক্ষা, আকিঞ্চন, ভিক্ষা, সফল অশ্রু, বৈকালী, চিন্তামণি, ভূমিষ্ঠ প্রণাম, প্রণাম প্রভৃতি কয়েকটি ছাড়া উল্লেখযোগ্য ঈশ্বর-চেতনাসমৃদ্ধ কবিতা সমগ্র সত্যেন্দ্রকাব্যে নেই। সত্যেন্দ্রনাথের স্বাধীন রচনার সংখ্যাগুরুত্বের কথা মনে রাখলে এদিকে তাঁর মনোযোগের অভাবই ধরা পড়বে। কবিদের দ্বিতীয় প্রিয় বিষয় প্রেমও তাঁর রচনায় গাঢ় হয়ে উঠতে পারে নি। ইতস্ততঃ প্রেমের কবিতার সাক্ষাৎ পাওয়া গেলেও তা অনেক ক্ষেত্রেই গতানুগতিকতার স্তরে রয়ে গেছে। কবির এই বিষয়ক নিজস্ব অনুভূতি ও উপলব্ধি নতুন ছন্দে ও ভাষায় রূপ পায় নি। সাধারণ ভাবে অসার্থক কবি বলেই এই ব্যর্থতা দেখা দিয়েছে, বলা চলে। কিন্তু যখন প্রকৃতির কবিতায় দেখি তার সৌন্দর্যের প্রতি তাঁর মুগ্ধদৃষ্টি কল্পনার চপলতা, ছন্দের দোলা, ধ্বনির ঝঙ্কার ও রঙের প্রবাহের মধ্য দিয়ে ঝরে পড়ছে, তখন বাধ্য হয়েই স্বীকার করতে হয় যে, প্রেম তাঁর কবিসত্তার জাগরণ ঘটাতে পারে নি। সত্যেন্দ্রনাথের কবিক্ষমতার প্রধান লক্ষণ আঙ্গিক-চেতনার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে প্রধানতঃ প্রকৃতির কবিতায়। এই বিষয়ক অসংখ্য কবিতার মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখ-যোগ্য হচ্ছে গ্রীষ্মের সুর, বর্ষা, চিত্রশরৎ, ঝর্ণা, ঘুমতী নদী, যুক্তবেণী প্রভৃতি। এ ছাড়া বিভিন্ন ঋতুর ফুলের বন্দনাগীতিগুলিও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। সত্যেন্দ্রনাথ যে প্রকৃতির সৌন্দর্যকে কাব্যে যথাযথ ভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য বাণীর সাধনা করেছিলেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাই সত্যেন্দ্রকাব্যের প্রসঙ্গে এই দিকের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে কবিগুরু সূক্ষ্ম দৃষ্টিরই পরিচয় দিয়ে গেছেন।

আগেই বলা হয়েছে যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুজ কবির মর্ত্যপ্রীতির আর একটি দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন—তা হ'ল বাস্তব পৃথিবীর ভাল-মন্দ নানা বিষয়ের প্রতি সত্যেন্দ্রনাথের আগ্রহ। তার এক দিকে আছে সত্যনিষ্ঠা—

অন্যায় অসত্য যত, যত কিছু অত্যাচার পাপ
কুটিল, কুৎসিত, ক্রূর তার 'পরে তব অভিশাপ
বর্ষিয়াছ ক্ষিপ্রবেগে অর্জুনের অগ্নিবাণসম—
তুমি সত্যবীর, তুমি সুকঠোর, নির্মল, নির্মম…

পৃথিবীকে যে ভালবাসে সে-ই তার ভালর প্রতি যেমন আসক্ত হয়, মন্দর প্রতি তেমনই কঠোর হয়ে ওঠে; তাকে ত্রুটিমুক্ত সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলার দিকে তার আগ্রহ দেখা দেয়। পৃথিবীর প্রতি আকর্ষণ যে অনুভব করে না, সে-ই তার সব কিছু সম্বন্ধে উদাসীন থাকতে পারে।

সত্যেন্দ্রনাথ যে এই শেষোক্ত শ্রেণীভুক্ত ছিলেন না, তার প্রমাণ তাঁর তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গবিদ্রূপাত্মক কবিতাবলী। শ্রীশ্রীটিকিমঙ্গল, শ্রীশ্রীবস্তুতন্ত্রসার, কুক্কুটপাদমিশ্রের প্রশস্তি, দ্বিতীয় পক্ষ, তৃতীয় পক্ষ, টিকিমেধ যজ্ঞ, বেতালের প্রশ্ন, কোনো নেতার প্রতি, দোরোখা একাদশী প্রভৃতি কবিতা তাঁর এই বিদ্রূপপ্রবণতার পরিচয় বহন করছে। অন্যায় ও ভণ্ডামির প্রতি তাঁর ঘৃণা বিষাক্ত তীরের মতই মারাত্মক হয়ে উঠেছে এই কবিতাগুলিতে। দেশাচারের গোঁড়া ভক্ত, কু-সমালোচক, ভণ্ড পণ্ডিত, হৃদয়হীন বিধানদাতা ব্রাহ্মণ, প্রভুপ্রসাদলুব্ধ দেশনেতা, বিবাহপিপাসু বৃদ্ধ কেউই তাদের ত্রুটিদুর্বলতা নিয়ে আত্মগোপন করতে পারে নি তাঁর দৃষ্টি থেকে।

শুধু সমালোচনা করে নয়, দেশের সৎপ্রচেষ্টাগুলিকে সমর্থন জানিয়ে, নবীনের জয়গান গেয়ে দেশের ভবিষ্যৎ কর্ণধারদের মনে উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগানোর আয়োজন ক'রে তাদের যাত্রাপথ যে সত্যেন্দ্রনাথ মসৃণতর ক'রে গেছেন তারও উল্লেখ আছে কবিতাটির মধ্যে,

বঙ্গভূমে

যে তরুণ যাত্রীদল রুদ্ধদ্বার রাত্রি অবসানে
নিঃশঙ্কে বাহির হবে নব জীবনের অভিযানে
নব নব সঙ্কটের পথে পথে, তাহাদের লাগি
অন্ধকার নিশীথিনী তুমি, কবি, কাটাইলে জাগি
জয়মাল্য বিরচিয়া—রেখে গেলে গানের পাথেয়
বহ্নিতেজে পূর্ণ করি;

মর্ত্যচারী কবির মর্ত্যমমতার এই দিকটি দেশপ্রীতির আকার ধারণ করে দেখা দিয়েছিল। দেশকে সুস্থ ও স্বাধীন করার জন্য তিনি জাতির মনে প্রেরণা সৃষ্টি করেন দেশবন্দনামূলক কবিতা রচনা করে, নবজাগ্রত হরিজন আন্দোলনকে সমর্থন করে এবং দেশের যুবশক্তিকে স্বাগত জানিয়ে। এই ভাবে দেশের ও জাতির জাগরণের বোধন-অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে সত্যেন্দ্রনাথ দেশ তথা মর্ত্য-পৃথিবীর প্রতি তাঁর আন্তরিক প্রীতির পরিচয় রেখে গেছেন। জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন তখন নতুন করে জন্ম নেয়, তাকে

১ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—পূরবী

তিনি লালন করে গেছেন 'শূদ্র', 'মেথর,' 'সেবাসাম,' 'জাতির পাঁতি' প্রভৃতি কবিতায়। অসহযোগ আন্দোলনের নেতা গান্ধিজীকে তিনি বরণ করেন 'গান্ধিজী' কবিতায়। তাঁর চরকা-প্রচারনীতির সমর্থনে লেখেন 'চরকার গান', 'চরকার আরতি' প্রভৃতি কবিতা। আর যারা এই সব আন্দোলনকে সার্থকতার স্বর্গে পৌঁছে দেবে তাদের জন্য জয়মাল্য রচনা করেন 'ছেলের দল', 'বন্দরে', 'সবুজ পাতার গান', 'সবুজপরী', 'জাগৃহি' প্রভৃতি রচনা করে।

এর থেকেই বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির সার্থকতা—'জানি তুমি প্রাণ খুলি এ সুন্দরী ধরণীরে ভালবেসেছিলে'। সত্যেন্দ্রনাথ ঈশ্বরপ্রেমে আকুল হয়ে তাঁর বাসস্থান মর্ত্যভূমিকে অবহেলা করেন নি; কিংবা কল্পনার লঘু পাখায় ভর দিয়ে আকাশকুসুম চয়ন ক'রে দৈন্যদুঃখপীড়িত, অন্যায়-অত্যাচারে জর্জরিত এই মাতৃভূমিকে ভুলে যান নি। তিনি একদিকে প্রকৃতির নদী, সমুদ্র, পর্বত, ঋতুবৈচিত্র্য, পুষ্পসম্ভার প্রভৃতি সব কিছুকে যেমন আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তাঁর কাব্যলক্ষ্মীর মন্দিরে, তেমনই আন্তরিকতার সঙ্গে ডাক দিয়েছেন তাঁর দুঃখিনী দেশমাতাকে আর অধঃপতিত দেশবাসীকে। কাব্যের মানদণ্ড প্রয়োগে তাঁর রচনার মূল্য যাই হোক না কেন, এই মর্ত্যপ্রীতির দিকটি মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তুগত বিশেষত্বই হ'ল এইখানে।

কিন্তু শুধু বিষয়বস্তুগত বিশেষত্ব নির্দেশ করলেই কোন কবির পরিচয় দান সম্পূর্ণ হয় না। কারণ, তাঁর প্রকাশরীতির মধ্য দিয়েই তাঁর কবিসত্তার সার্থক প্রকাশ ঘটে। সেই রীতির তারতম্য অনুসারে আমরা চিনে নিতে পারি বিশেষ বিশেষ কবিকে। এখানেও দেখি, প্রথম স্তবক থেকেই রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্র-কাব্যের বিষয়বস্তুর কথা যেখানে যেখানে বলেছেন সেই সেই জায়গায় তাঁর আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্যেরও সুস্পষ্ট উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দো-বৈচিত্র্য, ধ্বনিহিল্লোল, চিত্রাঙ্কনপ্রবণতা, বর্ণাঢ্যতা প্রভৃতি কাব্যকলার কোন দিকই বলতে তিনি ভোলেন নি। এই প্রসঙ্গে কবিতাটির নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলি স্মরণীয়,

> বর্ষার নবীন মেঘ এল ধরণীর পূর্বদ্বারে,
> বাজাইল বজ্রভেরী। হে কবি, দিবে না সাড়া তারে
> তোমার নবীন ছন্দে? আজিকার কাজরীগাথায়
> ঝুলনের দোলা লাগে ডালে ডালে পাতায় পাতায়;
> বর্ষে বর্ষে এ দোলায় দিত তাল তোমার যে বাণী
> বিদ্যুৎনাচন গানে,...

এ অংশে সত্যেন্দ্রনাথের অভিনব ছন্দ-রচনায় আগ্রহ এবং শব্দ ও ধ্বনিগত কৌশলের সাহায্যে সৃষ্ট ধ্বনিরোল যা তাঁর কাব্যের প্রাণস্বরূপ তারই উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া পূর্বোদ্ধৃত 'বঙ্গের অঙ্গনতলে" ইত্যাদি পংক্তিও এ প্রসঙ্গে আবার মনে পড়ে। বিশেষ করে এই অংশটি,

> সেথা তুমি এঁকে গেলে বর্ণে বর্ণে বিচিত্র রেখায়
> আলিম্পন;

এখানে প্রকৃতির সৌন্দর্যকে শব্দকুশলী কবির বর্ণাঢ্য ও বাঙ্ময় করে তোলার স্বাভাবিক ক্ষমতার কথাই বলেছেন কবিগুরু।

সত্যেন্দ্রকাব্যের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত, তাঁদের কাছে এ কথার সত্যতা প্রমাণ করতে বসা নিতান্তই বাহুল্য ব্যাপার। কারণ, আবেগবিরল তাঁর কবিতাগুলির অধিকাংশই তাদের ছন্দোবৈচিত্র্য ও নানা প্রসাধন-কলার সাহায্যে একদা পাঠকহৃদয় জয় করেছিল। নৃত্যপরা নটীর মত স্বরাঘাতপ্রধান ছন্দবাহিত তাঁর কবিতাগুলি ধ্বনিহিল্লোলের নূপুর বাজিয়ে পাঠকের কর্ণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন করেছিল। এ ছাড়া তাঁর কাব্যে সংস্কৃত, ফার্সী, ইংরেজী, ফরাসী, গ্রীক প্রভৃতি নানা ভাষার ছন্দের অনুসরণ দেখা যায়। সংস্কৃত ছন্দের মধ্যে যক্ষের নিবেদন (মন্দাক্রান্তা), রিক্তা (মালিনী), তখন ও এখন (রুচিরা), বিদ্যুৎ-বিলাস (শার্দূল-বিক্রীড়িত) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য; অন্যান্য ভাষার ছন্দের মধ্যে সিংহল (Young Lochinvar)[২], গ্রীষ্মের সুর (ফরাসী কবি Victor Hugo রচিত একটি কবিতার ছন্দ)[২], তাজের প্রথম প্রশস্তি (ফার্সী), রাজর্ষি রামমোহন (গ্রীক Bumos ছন্দ) প্রভৃতি কবিতা স্মরণীয়। আর পাল্কীর গান, চিত্র শরৎ, পিয়ানোর গান, ঘুমন্তী নদী, ঝর্ণা, জ্যৈষ্ঠী মধু, দূরের পাল্লা, চরকার গান, ছন্দহিল্লোল, যুক্তবেণী প্রভৃতি কবিতা একাধারে শব্দঝঙ্কার ও চিত্রণপ্রবণতার সাক্ষ্য বহন করছে।

এতক্ষণ আলোচনা করে দেখা গেল যে, কবিতাটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথের রচনার বিষয়বস্তু ও

২ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'কুহু ও কেকা'র 'টীকা-টিপ্পনী' অংশ দ্রষ্টব্য।

ভঙ্গি সম্বন্ধে সংক্ষেপে যা বলেছেন তা তথ্য ও যুক্তির দৃঢ়-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু কবিতাটির মধ্যে শুধুই সত্যেন্দ্রকাব্যের বৈশিষ্ট্যনিরূপণ তথা ঐ কবির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা হয় নি। বাংলা কাব্যে তাঁর দান কি, সে সম্বন্ধেও সচেতন হ'তে দেখি রবীন্দ্রনাথকে,

তুমি বঙ্গভারতীর তন্ত্রী 'পরে
একটি অপূর্ব তন্ত্র এসেছিলে পরাবার তরে।
সে তন্ত্র হয়েছে বাঁধা ; আজ হ'তে বাণীর উৎসবে
তোমার আপন সুর কখনো ধ্বনিবে মন্দ্ররবে
কখনো মঞ্জুল গুঞ্জরণে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি স্বভাবতঃই আমাদের বিস্মিত করে। কারণ, সত্যেন্দ্রনাথ যে কবি হিসেবে উচ্চস্তরের নন সে কথা কাব্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করবেন। তা হ'লে কি ভেবে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বাংলা কাব্যে নব সুরের স্রষ্টা বলে উল্লেখ করলেন! সহজেই এই পংক্তি ক'টিকে সাময়িক শোকোচ্ছ্বাস বলে গণ্য করা যেত। কিন্তু সত্যেন্দ্রকাব্যের বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ে তাঁর যে নিরপেক্ষতা ও সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয় একটু আগেই পাওয়া গেল তার পরে এত সহজে অস্বীকার করা যায় না তাঁর মতটিকে। এর যাথার্থ্য বিচার করবার সময়ে দেখতে হবে সত্যেন্দ্রনাথের আগে বাংলা কাব্যের কি রূপ ছিল। তার পরে সত্যেন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্যগুলি স্মরণ করলেই বোঝা যাবে এই উক্তির সত্যতা। তার আগে দেখা যাক এখানে 'তোমার আপন সুর' বলতে রবীন্দ্রনাথ কি বোঝাতে চেয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে পূর্বোক্ত একটি সত্যের স্মরণ নিতে হবে আবার। তা হ'ল এই যে, কবির আত্মপ্রকাশ ঘটে তাঁর বাণীভঙ্গির মধ্যে। আবহমান কাল থেকে একই বিষয় নিয়ে কাব্য লেখা হ'লেও প্রধানতঃ এই কারণেই প্রত্যেক কবির রচনায় পার্থক্য দেখা দিয়েছে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ এখানে সত্যেন্দ্রনাথের বিশিষ্টতা বোঝাতে গিয়ে তাঁর কলানৈপুণ্যের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন বলে মনে হয়। বিশেষ করে তাঁর স্বকীয়তার প্রসঙ্গে 'সুর' এই শব্দের প্রয়োগ আমাদের অনুমানকেই সমর্থন করছে। এই প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর অন্যত্র প্রকাশিত দু'একটি মন্তব্য মনে পড়ে। সে সব ক্ষেত্রেও তাঁর বিশিষ্টতার কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন—"মনে পড়ে একবার শ্রীমান সত্যেন্দ্রকে বলেছিলুম 'ছন্দের রাজা তুমি, অ-ছন্দের শক্তিতে কাব্যের স্রোতকে তার বাঁধ ভেঙে প্রবাহিত করো দেখি।' সত্যেনের মত বিচিত্র ছন্দের স্রষ্টা বাংলায় খুব কমই আছে। হয়ত অভ্যাস তাঁর পথে বাধা দিয়েছিল, তাই তিনি আমার প্রস্তাব গ্রহণ করেন নি।"৩

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের সঙ্গে ছন্দ বিষয়ে আলাপ প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কবি যা বলেন তার ভঙ্গিটা আলাদা হ'লেও ভাবের দিক্ দিয়ে তা পূর্বোক্ত মতেরই সগোত্র—"আমি এক সময়ে সত্যেনকে বলেছিলাম বাংলায় rhythmic prose রচনা করতে, কিন্তু সে ত তা করলে না। সে কবিতার ছন্দের ঝঙ্কারে এমন আকৃষ্ট হ'ল যে, শেষের দিকে এক রকম ছন্দে-পাওয়া হয়েই গিয়েছিল।"৪ তা ছাড়া আলোচ্য কবিতাংশের 'কখনও ধ্বনিবে মন্দ্ররবে, কখনও মঞ্জুল গুঞ্জরণে' অংশটিও লক্ষ্যণীয়। এর দ্বারাও আমাদের বক্তব্যই সমর্থিত হচ্ছে ; কারণ, এখানে সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যরীতির চটুলতা ও গাম্ভীর্যের উল্লেখ করা হয়েছে ; 'ঝর্ণা', 'চরকার গান', 'পিয়ানোর গানে'র মত লঘু রীতির কবিতার সঙ্গে 'গ্রীষ্মের সুর', 'ছন্দহিল্লোল', 'মহাসরস্বতী'র মত গম্ভীর রীতির কবিতাও তাঁর আছে।

এবার বিচার করে দেখা যাক সত্যেন্দ্রনাথের 'আপন সুর'টির অভিনবত্ব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতের সত্যতা। বাংলা কাব্যের আধুনিক যুগের সুরু থেকে সত্যেন্দ্রনাথের পূর্ব পর্যন্ত চারজন কবির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যাঁরা নেতৃত্ব করে গেছেন নিজের নিজের সময়ে। এই চারজন হচ্ছেন ঈশ্বর গুপ্ত, মধুসূদন, বিহারীলাল এবং রবীন্দ্রনাথ। এঁদের সমসাময়িক অন্যান্য কবিরা সাধ্যমত এঁদের পথেই চলবার চেষ্টা করেছেন। সুতরাং এই চারজনের আলোচনা করলেই কাব্যের ধারাটা বোঝা যাবে। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা অনুভূতি-বিরল ; তার মধ্যে সাংবাদিকতার ভাবই মুখ্য হয়ে উঠেছে। যমক, অনুপ্রাসাদির বহুল ব্যবহারে রচনা কিছুটা কৌতুকপ্রদ হ'লেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্রুতিমধুর হয় নি। কাব্যে ভাব ও ভঙ্গি উভয় দিক্ দিয়েই নূতনত্ব আনলেন মধুসূদন। তাঁর ছন্দ নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষার ক্ষেত্র সীমিত ছিল ; দেশী-বিদেশী সব ছন্দের তিনি অনুসরণ করতে যান নি। আসলে সেদিনের বাংলা কাব্যের আঙ্গিকগত দুর্ভিক্ষের দিনে নিজের কবিসত্তার প্রকাশের উপযোগী

৩ গদ্যকাব্য—সাহিত্যের স্বরূপ। ১ম সংস্করণ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪ ছন্দ সংলাপ। (ক) পদ্যকবিতার ছন্দ—ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ। ১ম সংস্করণ। শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র সেন

ছন্দ শুধু তিনি সংগ্রহ করে নেন। বিহারীলাল ছিলেন আত্মমগ্ন গীতিকবি; অত্যধিক ভাবোচ্ছ্বাসের ফলে তাঁর বাণীভঙ্গি শোচনীয় ভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের আত্মময়তার সুরেরই সাধনা করলেন—রোমান্টিক গীতিকবিতাকে ভাবে-ভঙ্গিতে তিনি ঐশ্বর্যের শিখরে তুলে দিলেন। কিন্তু তাঁর কাব্যের ভঙ্গিগত বৈচিত্র্য তাঁর কবিসত্তার ক্রমবিকাশের পথ ধরে দেখা দিয়েছে; তাঁর কবিতায় ভাবের সঙ্গে ভঙ্গির অভেদ সম্পর্ক লক্ষিত হয়। শুধুই শব্দ ও ছন্দ নিয়ে পরীক্ষার কৌতূহল মেটাতে তাঁর কবিজীবনে বার বার ভঙ্গিগত পরিবর্তন ঘটে নি। তাই তার মধ্যে ঐশ্বর্য থাকলেও আড়ম্বর নেই। তাঁর কাব্য ভাবের পসারী, বিষয়ের কারবারী নয়।

এইবার বোঝা যাবে, কেন রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথের অভিনবত্ব স্বীকার করে গেছেন। ইতঃপূর্বে কেউই অনুভূতিকে গৌণ ক'রে ছন্দের বৈচিত্র্য ও শব্দের শক্তি পরীক্ষা এবং ধ্বনির সৌন্দর্য-সৃষ্টির খেয়াল নিয়ে মেতে ওঠেন নি। এইখানেই সত্যেন্দ্রনাথের মৌলিকতা। আর দেশী-বিদেশী নানা শব্দের যথাযথ প্রয়োগে, শব্দচিত্র অঙ্কনে, ধ্বনির সাহায্যে সৌন্দর্য-সৃষ্টিতে এবং অভিনব ছন্দ প্রবর্তনায় তিনি যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সার্থক হয়েছিলেন তাও স্বীকার করতে হবে। প্রধানতঃ এই কারণেই তাঁর কবিতাবলী সে-সময়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। শুধু পাঠকদের প্রশংসা নয়, তাঁর সমকালীন ও অব্যবহিত পরবর্তী কোন কোন কবির রচনায় তাঁর মত নানা শ্রেণীর শব্দ প্রয়োগের প্রবণতা, ধ্বনিহিল্লোল সৃষ্টির প্রয়াস, ছন্দের অনুসরণ প্রভৃতিও এই জনপ্রিয়তার সাক্ষ্য বহন করছে। এই শেষোক্ত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, বঙ্গভারতীর তন্ত্রীতে সত্যেন্দ্রনাথের নিজস্ব তন্ত্রটি বাঁধা হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথের সুরটি যে তাঁর অনুরাগী সাহিত্য-সেবকরা ধ্বনিত করে তুলেছিলেন, এ কথা ঐতিহাসিক দিক্‌ দিয়ে সত্য। তাই আপাতদৃষ্টিতে এই উক্তিটিকে আকস্মিক ও অযৌক্তিক বলে মনে হ'লেও এর সত্যতা স্বীকার করতে হয়।

এবার আর একটি বিতর্কমূলক উক্তির বিচার ক'রে আলোচনার শেষ করব। সেটি হচ্ছে সত্যেন্দ্রনাথের নিজস্ব তন্ত্রটিকে রবীন্দ্রনাথের 'অপূর্ব' এই অভিধা প্রদান সম্পর্কিত। হঠাৎ মনে হয় রবীন্দ্রনাথ বুঝি এর দ্বারা সত্যেন্দ্রকাব্যকে চমৎকার বলতে চেয়েছেন। কিন্তু কবিতার ঐ অংশটি গভীর ভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে, সত্যেন্দ্রনাথের মৌলিকতাই এখানে আলোচ্য বিষয়। উপরের আলোচনা থেকেও এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে। সুতরাং এই 'অপূর্ব' বলতে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয় যা পূর্বে হয় নি অর্থাৎ যা নূতন বা অভিনব তা-ই বোঝাতে চেয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ, ভঙ্গিসর্বস্বতাই যে শ্রেষ্ঠ কবিতার ধর্ম নয়, এ বোধ তাঁর ছিল। এ বিষয়ে অন্য প্রসঙ্গে প্রকাশিত তাঁর একটি মন্তব্য উদ্ধৃতির যোগ্য—"...ছন্দের নেশা, ধ্বনিপ্রসাধনের নেশা অনেক কবির মধ্যে মৌতাতি উগ্রতা পেয়ে বসে, গদ্‌গদ আবিলতা নামে ভাষায়—স্ত্রৈণ স্বামীর মত তাদের কাব্য কাপুরুষতার দৌর্বল্যে অশ্রদ্ধেয় হয়ে ওঠে।"৫—সুতরাং ভঙ্গিসর্বস্ব কবির রচনার মৌলিকতা স্বীকার করলেও রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তাকে চমৎকার বলা সম্ভব নয়।

কিন্তু তবু সংশয় দূর হয় না। এই কবিতারই এক জায়গায় কবিগুরুর একটি উক্তি সম্পূর্ণ বিপরীত ধারণা জাগায় আমাদের মনে। বক্তব্যটি তাঁর নিজের ভাষাতেই শোনা যাক:

অনাগত যুগের সাথেও
ছন্দে ছন্দে নানা সূত্রে বেঁধে গেলে বন্ধুত্বের ডোর
গ্রন্থি দিলে চিন্ময় বন্ধনে, হে তরুণ বন্ধু মোর,
সত্যের পূজারি।
আজো যারা জন্মে নাই তব দেশে
দেখে নাই যাহারা তোমারে, তুমি তাদের উদ্দেশে
দেখার অতীত রূপে আপনারে করে গেলে দান
দূরকালে। তাহাদের কাছে তুমি নিত্যগাওয়া গান
মূর্তিহীন।

এই অংশের বক্তব্যকে সংক্ষিপ্ত করলে দাঁড়ায় যে, সত্যেন্দ্রনাথ কালোত্তীর্ণ কবি। আর এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে, যে-কবি নিজের কালকে অতিক্রম করতে পারেন, কবি হিসেবে তিনি বরণীয়। তাই এই অংশ থেকে স্বভাবতঃই মনে হয় যে, সত্যেন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্বের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কিন্তু এই আলোচনায় নামবার আগে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, বিষয়-গৌরবের জন্য কোন কবি কালোত্তীর্ণ হ'তে পারেন না। আর যদি কোন সাময়িক বিষয় তাঁর কাব্যের উপজীব্য হয়, তা' হলে সমাজে তার আয়ুকাল পর্যন্তই কবির জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ থাকবে। সেই বিষয়টি যদি কোন কারণে কবির সময়কে অতিক্রম

৫ সাহিত্যের স্বরূপ—সাহিত্যের স্বরূপ। ১ম সংস্করণ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

করে, তা' হলেও সেই কারণে কালোত্তীর্ণ কাব্য শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারে না। কারণ, বিষয়-সর্বস্বতা কাব্যের ধর্ম নয়।

কবিতাটির যে অংশ এখানে উদ্ধৃত হ'ল, তার পূর্বসূত্র মনে রাখলে দেখা যায়, কবি এখানে বলতে চেয়েছেন যে, দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে যারা সফল করে তুলবে অনাগত যুগের সেই তরুণ সম্প্রদায় সত্যেন্দ্রনাথের দেশ-বন্দনামূলক, সাম্যবাদী ও নবীনবরণের কবিতা থেকে উৎসাহ-উদ্দীপনা লাভ করবে; এই ভাবে সত্যের পূজারী সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে নব যুগের মানুষের যোগ সাধিত হবে।

সুতরাং এখানে দেখা যাচ্ছে যে, সত্যেন্দ্রনাথের কালোত্তীর্ণতার কারণ হিসেবে শুধু তাঁর কাব্যের একটি বিষয়গত বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে; আর সেই বিষয়টিও সাময়িকতার সীমায় আবদ্ধ। তাই আপাতঃ-দৃষ্টিতে এই কালোত্তীর্ণতাকে শ্রেষ্ঠত্বজ্ঞাপক বলে মনে হ'লেও গভীর ভাবে বিচার করলে দেখা যায় তা ভ্রান্ত। এ প্রসঙ্গে আর একটা জিনিষ দেখবার আছে। যেখানে কবিগুরু বঙ্গভারতীর বীণায় সত্যেন্দ্রনাথের নিজস্ব তার বাঁধার কথা বলেছেন, সেখানে শুধু তাঁর আঙ্গিকচেতনার উল্লেখ পাওয়া যায়—এই বিষয়-গৌরবের কথা সেখানে অনুচ্চারিত। সুতরাং এই বিষয়-নির্ভর কালোত্তীর্ণতার উল্লেখ করে কবি যে সত্যেন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্বের দিকে ইঙ্গিত করেন নি, তা বেশ বোঝা যায়।

সব শেষে আর একটা কথা আমার বলা উচিত মনে করি। সত্যেন্দ্রনাথকে স্মরণ করে রচিত এই কবিতাটির মধ্যে তাঁর কাব্যের সমালোচনা থাকলেও সর্বোপরি এটি একটি সার্থক কবিতা। সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যু রবীন্দ্রনাথের কবিহৃদয়ে আঘাত করে যে সুর সৃষ্টি করেছিল, তাই সঞ্চিত হয়েছে কবিতাটির মধ্যে—পাঠকদের কাছে এই হচ্ছে পরম লাভ; সমালোচনার অংশটি উপরি পাওনা।

শিক্ষকদের বেতন

সন্তুষ্ট শিক্ষক-সমষ্টির উপর জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে, ইহা সর্ব্বসাধারণকে মনে রাখিতে হইবে। শিক্ষক-মহাশয়দিগকেও মনে রাখিতে হইবে যে, যদিও কোন দেশেই ভারতবর্ষের মত কম বেতনভোগী শিক্ষক নাই, তথাপি ইহাও সত্য যে, বর্ত্তমান সময়ে কোন দেশেই শিক্ষকেরা তাঁহাদের সমান বুদ্ধিমান্ ও শিক্ষিত অন্য অনেক শ্রেণীর লোকদের সমান পারিশ্রমিক পান না। ইহার কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা এখানে করিব না। মোটের উপর ইহাই বাঞ্ছনীয় যে, একদিকে সর্ব্বসাধারণে শিক্ষকদের আর্থিক উন্নতির জন্য সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকিবেন, এবং অন্যদিকে শিক্ষকগণ নিজেদের কাজ ব্রতস্বরূপ গ্রহণ করিবেন। আমরা অল্প চেষ্টা করিলেই অন্য কোন কোন ব্যয় সংক্ষেপ করিয়াও, ছেলেমেয়েদের স্কুলের বেতন বেশী করিয়া দিতে পারি। তাহা হইলে শিক্ষকদের বেতন বাড়ান যায়।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬।

কাল রাতে

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

কাল রাতে ঝড় হয়ে গেছে।
মনের অরণ্যভরা গাছগুলো পত্রশূন্য হয়ে
সারি-সারি কঙ্কালের মত
দাঁড়িয়ে রয়েছে।
কাল রাতে নিষ্ঠুর কঠিন এক
ঝড় বয়ে গেছে।

তবু সেই ঝড়ের পরেই
হাঁসুলির মত
বাঁকা এক চাঁদ
আকাশের এক কোণে দেখা গিয়েছিল।
তার দিকে চেয়ে
ঝড়ের স্মৃতিটা মুছে গেল।
বিবর্ণ মনের অরণ্য
ভেসে গেল
আশ্চর্য আলোয়।

হাঁসুলির মত সেই চাঁদ
সে কি চোখ, সে কি ঠোঁট
সুদূর তোমার?

ষ্টেশন

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

স্টেশনের নামটা পড়ি নি।
শিটি দিয়ে সিগ্‌ন্যাল পোস্ট পার হয়ে
ট্রেণটা মাঠের পথ ধরল যখন,
তখন পড়ল সেটা মনে।
এইখানে যারা ওঠে নামে,
কোথা থেকে আসে তারা, কোথা তারা যায়,
হয়ত নামটা জেনে নিলে
কিছুটা জানতে পারা যেত।

এমন ত কতই স্টেশন
এসে চ'লে গেছে এই জীবনের পথে ও বিপথে,
জানি না যাদের নাম।
আজ ঐ স্টেশনের পাশে
বুড়ো নিম গাছের ছায়াটা
যেখানে শুয়েছে লম্ব' হয়ে
দিনান্তের ক্লান্তি নিয়ে,
সেইখানে ক্লান্ত চোখ আর
বাক্স-বিছানা নিয়ে ব'সে
যে-মেয়েটি চেয়ে ছিল আমার দুচোখে,
কিছু কি বলার ছিল তার?

হয়ত বা চেয়ে ছিল চোখদুটো খুলে রাখতেই
অবসাদ-তন্দ্রা এড়াতে।
আবার এও ত হতে পারে,
কিছু তার বলবার ছিল,
যে কথা শোনাতে পারে এমন মানুষ কেউ নেই
তার ত্রিজগতে?
পিছনটা ফেলে রেখে আসা,
সামনে কি আছে তা জানে না,
যাত্রিণী সে, জানা নেই যাত্রা কোন্ পথে।

নিজেকে বোঝাই,
কেউ কি তা জানে?
এই যে চলেছি আমি, আমিই কি জানি
আমার এ যাত্রা কোন্ পথে?
তবু মনে হয়,
স্টেশনের নামগুলি জেনে রাখা ভাল।
নয়ত এমন যদি হয়,
জানব কোথায় যেতে চাই,
সেখানে যে কারা ওঠে নামে,
সেখানে যে শোনবার মত
কথা কিছু আছে;—
জানব না স্টেশনের নাম,
পারব না কাটতে টিকিট।

হয়ত বা সে স্টেশন এসে চ'লে গেছে।

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

জবাহরলাল

অধিকাংশ শোকসভা এবং শোক-প্রকাশের বাণীতে অত্যুক্তির বাহুল্য লক্ষিত হয়। কিন্তু এই ধারার অদ্বিতীয় ব্যতিক্রম জবাহরলাল। তাঁহার প্রথম এবং প্রধান পরিচয়—তিনি ভারতের তথা সমগ্র জগতের জবাহরলাল; দ্বিতীয় পরিচয়—প্রধানমন্ত্রী জবাহরলাল। তাঁহার পরলোক গমনে বিশ্বব্যাপী যে শোকের প্রবাহ দেখা গিয়াছে—এমন ধারা ইতিপূর্ব্বে কেবল ভারতেই নহে, বিশ্বের অন্য কোন রাষ্ট্রপ্রধানের মৃত্যুতে পরিলক্ষিত হয় নাই। জবাহরলাল আমাদের এবং বিশ্ববাসীর নিকট কি ছিলেন—তাহা তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ প্রচারিত হইবার পর মুহূর্ত্ত হইতেই প্রকট হয়। বর্ত্তমান যুগে এমন কোন মানুষ বা রাষ্ট্রনেতার কথা মনে পড়ে না, যিনি মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া অনতিকালের মধ্যে সমগ্র বিশ্বের সম্মুখে এমন অমর মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইতে সক্ষম হইয়াছেন।

জবাহরলাল সম্পর্কে নূতন কথা আজ আর বলিবার প্রয়োজন বোধ করি না। বহুকাল পূর্ব্বে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ জবাহরলাল সম্পর্কে যে কথাগুলি বলেন সেইটুকু মাত্র উল্লেখ করিলেই জবাহরলালের পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হইবে:

> "জওহরলাল আজ সমস্ত ভারতের তরুণ হৃদয়ের রাজাসনে প্রতিষ্ঠিত হবার অধিকারী; অপরিসীম তাঁর ধৈর্য্য, বীরত্ব তাঁর বিরাট্—কিন্তু সকলের চেয়ে বড় তাঁর সুদৃঢ় সত্যনিষ্ঠা। পলিটিক্সের সাধনায় আত্মপ্রবঞ্চনা ও পরপ্রবঞ্চনার পঙ্কিল আবর্ত্তের মধ্যে নিজেকে কখনও হারিয়ে ফেলেন নি। সত্য যেখানে বিপদ্‌জনক সেখানে সত্যকে তিনি ভয় করেন নি, মিথ্যা যেখানে সুবিধাজনক সেখানে তিনি সহায় করেন নি মিথ্যাকে। মিথ্যার উপচার আশু প্রয়োজনবোধে দেশ-পূজার যে অর্ঘ্যে অসঙ্কোচে স্বীকৃত হয়ে থাকে, সেখানে তিনি সত্যের নির্ম্মলতম আদর্শকে রক্ষা করেছেন। তাঁর অসামান্য বুদ্ধি কূটকৌশলের পথে ফললাভের চেষ্টাকে চিরদিন ঘৃণাভরে অবজ্ঞা করেছে। দেশের মুক্তিসাধনায় তাঁর এই চরিত্রের দান সকলের চেয়ে বড় দান।"

জবাহরলালকে স্মরণ, তাঁহাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিবার জন্য আজ দেশের সর্ব্বত্র সর্ব্বশ্রেণীর মানুষ নানা স্থানে সমবেত হইতেছেন—ইহা অতি স্বাভাবিক এবং দেশ-বাসীর কর্ত্তব্য। যাঁহার চরিত্রের দীপ্তি, অসাধারণ মনোবল, অমানুষিক পরিশ্রম এবং দেশের ও মানুষের কল্যাণের জন্য নিবেদিত প্রাণমন সহজেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, আজ তাঁহাকে শোকের মায়া কিংবা দুঃখের ছায়া দিয়া আবার গড়িয়া তুলিবার কোন প্রয়োজন নাই।

জবাহরলাল কি ছিলেন, তাঁহার তিরোধানে আমরা এবং বিশ্বমানব কি হারাইল, কি অমূল্য সম্পদ্ হইতে পৃথিবী বঞ্চিত হইল, তাহা বুঝাইতে বা বুঝিতে কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই।

যে-ব্যক্তি ভারত তথা সমগ্র বিশ্বের শান্তি এবং মানুষের কল্যাণের কারণে নিজেকে সর্ব্বভাবে নিয়োজিত করেন ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক সুখ-সম্পদের কথা বিস্মৃত হইয়া, সেই পরম মানুষ, মহাপ্রাণ জবাহরলালকে প্রণাম জানাইয়া তাঁহার অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।

যে কয়জন মানুষ মরিয়াও অমর হইয়া আছেন, জবাহরলালের স্থানও তাঁহাদের মধ্যেই হইল।

শোক-প্রবাহ?

জবাহরলালের তিরোধানের পর বারদিন ধরিয়া যেভাবে এবং ধারায় সমগ্র দেশে তাঁহার জন্য শোক-প্রকাশ করা হইয়াছে, সেই সম্পর্কে দু'চারটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। মানুষ যখন প্রচণ্ড শোকের আঘাত পায়—তখন সাধারণতঃ সেই আঘাত তাহাকে

স্তম্ভিত এবং মুহ্যমান করিয়া দেয়। চিৎকার করিয়া ক্রন্দন করিবার শক্তিও তাহার লোপ পায়। কিন্তু জবাহরলালের বেলায় কি দেখিলাম? কলিকাতা বেতারে ত সকাল হইতে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত জবাহরলালের জন্য একটি জঘন্য, বিড়াল-কান্নার প্যান্‌প্যানানী সুরের রেকর্ড প্রায় বার দিন ধরিয়া বাজিল। বেতার-কেন্দ্র হইতে রাম শ্যাম হরি মধু যদু—খ্যাত-অখ্যাত, গুণী-অগুণী শত শত ব্যক্তি তাঁহাদের শোকের কথা তারস্বরে প্রচার করিলেন। সংবাদপত্রে ছবি ছাপাইবার সমারোহ পড়িয়া গেল। ফিল্ম-শিল্পী, ব্যবসায়ী-অব্যবসায়ী এবং পরিচিত-অপরিচিত যে কেহ নেহরুজীর সঙ্গে ফটো উঠাইবার হঠাৎ সুযোগ পাইয়াছিলেন, সকলেই সেই ছবি সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। সংবাদপত্রগুলিও কোন বাছবিচার না করিয়া ঐসব বাজে ফটোগ্রাফ, কেন জানি না, সাড়ম্বরে ছাপিলেন। ব্লকের মূল্য কে বা কাহারা দিল বলিতে পারি না।

পথে-ঘাটে, মাঠে-ময়দানে, ধর্ম্মসভায়, নাটমন্দিরে, আনাচে-কানাচে সর্ব্বত্র শোকসভার অগুণ্‌তি আয়োজন হইল। এবং এই সকল সভায় প্রস্তাবিত শোকবাণীগুলি সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় অতি সমাদরে স্থান পাইল! শোকের বাহ্য প্রকাশ দেখিয়া অনেকে ভাবিতেছেন যে—জবাহরলালের মৃত্যুকে উপলক্ষ্য করিয়া বিশেষ এক শ্রেণীর লোক আত্মপ্রচারের মওকা পাইয়া গেল।

শোকের প্লাবনে ইহাই দেখা গেল যে স্বর্গত জবাহরলাল যাহা পছন্দ করিতেন না, যে-সকল বিষয়ে তাঁহার তীব্র ঘৃণা এবং বিরুদ্ধমত ছিল, সেই সব বিষয়গুলিকে প্রাধান্য দিয়া প্রায় সকলেই জবাহরলালের শ্রদ্ধা-তর্পণ করিয়া তাঁহাকে অপমানিত এবং অশ্রদ্ধা করিতে দ্বিধা করিলেন না।

এইভাবে একজন বিশ্ব-শ্রদ্ধেয় এবং রাষ্ট্রনেতার মৃত্যুর পর শোকের প্লাবন চিন্তাহীন, শ্রদ্ধাহীন একপ্রকার মাতলামো ছাড়া আর কি বলা যায়?

জবাহরলালের প্রতি সকলের শ্রদ্ধা যদি সত্য হইত, তাঁহার মৃত্যু সকলকে দুঃখ-শোকে অভিভূত করিত, তাহা হইলে তাঁহারই দেশবাসী তাঁহার অমর আত্মাকে এমন করিয়া, তিনি যাহা চাহিতেন না, যাহা নিষেধ করিয়া গিয়াছেন—তাহাই সাড়ম্বরে প্রতিপালন করিয়া এমন ভাবে অপমানিত করিতে পারিতেন না। জবাহরলালের জন্য শোক-প্রকাশের অছিলায় এমন করিয়া আত্ম-প্রচারের প্রয়াস—দেশবাসী কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছে জানি না।

জবাহরলালের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা অতি গভীর এবং তাঁহার তিরোধান আমাদিগকে সত্যই অভিভূত করিয়াছে। আজ আমাদের দেশের এক শ্রেণীর লোকের শোক-প্রকাশের বিচিত্র ধারার (যাহা আন্তরিক নহে) উদ্দাম বাহ্য প্রকাশের জন্য জবাহরলালের আত্মার নিকট করজোড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি—ইহার বেশী আমরা আর কি করিতে পারি।

বর্ত্তমানে প্রয়োজন ছাড়া গান্ধী-ভক্তের দল তাঁহার নাম মুখে আনেন না। অথচ গান্ধীর মৃত্যুর পর এই ভক্তেরা গান্ধীর আদর্শ-উপদেশ আমৃত্যু আঁকড়াইয়া থাকিবার প্রতিজ্ঞা করেন। জবাহরলালের ভাগ্যেও কি তাহাই ঘটিবে?

মহাত্মা গান্ধীকে ত আজ দেশ প্রায় ভুলিয়াছে।

মূল্যবৃদ্ধি—শেষ কোথায়?

নিত্য-প্রয়োজনীয় সামগ্রীর—যথা, চাউল, ডাইল, তৈল, মৎস্য-মাংস, দুগ্ধ, চিনি, তরি-তরকারী এবং অন্যান্য সকল দ্রব্যের মূল্য প্রতি ঘণ্টায় ঊর্দ্ধমুখে চলিয়াছে—ইহার সঙ্গে আছে বাড়ীভাড়া, গাড়িভাড়া, ছেলেমেয়েদের স্কুল-কলেজের বেতন এবং শিক্ষার অন্যান্য বহুবিধ খরচা, ডাক্তার এবং ঔষধাদির খরচ, ঝি-চাকরের বেতনাদি, ধোপা-নাপিতের দক্ষিণা—এবং এই সমস্ত খরচ যোগ করিলে আজ সাধারণ গৃহস্থের অবস্থা কি দাঁড়াইয়াছে তাহা বুঝিতে কিংবা অনুভব করিতে কাহারও পক্ষে কোন কষ্টই হইবে না! সাধারণ গৃহস্থ, যাঁহাদের মাসিক আয় ১৫০ টাকা হইতে ৪।৫ শত টাকা এবং যাঁহাদের বাড়ীতে ৩।৪টি ছেলেমেয়ে এবং ২।১টি শিশু আছে—অর্থাৎ সীমিত আয়ে যাঁহাদের পরিবারের পাঁচ-ছয় জনের অন্নবস্ত্রের এবং শিক্ষার সংস্থান করিতে হয়, সেই সব গৃহস্থ পরিবারের চরম অবস্থার কথা আজ আর কেহ অস্বীকার, অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না!

বর্ত্তমান বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত সমাজের এক একটি পরিবার কেবল মাত্র স্বামী-স্ত্রীতেই আবদ্ধ নহে। এমন হাজার হাজার পরিবার আছে, যাহাদের বৃদ্ধ পিতামাতা, অপ্রাপ্তবয়স্ক ভ্রাতা-ভগিনী, বিধবা বোন, এমন কি প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষিত অথচ বেকার ভ্রাতাদেরও প্রতিপালন করিতে হয়। এই সকল পরিবারের অবস্থা আজ কি তাহা ভাবিতেও ভয় হয়। বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত সমাজের

চাকুরিজীবী সম্প্রদায়ের একজন মাত্র রোজগারীর উপর গড়ে অন্তত পাঁচ জন নির্ভর করিয়া থাকে—ইহাতে তর্কের বা সন্দেহের অবকাশমাত্রও নাই।

নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজ এবং কলকারখানায় নিযুক্ত শ্রমিক সমাজের অবস্থাও মূল্যবৃদ্ধির কারণে আজ বিপর্য্যস্ত হইতে চলিয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে ইহাই স্বীকার করিতে হয় যে, আজ সারা বাংলা দেশে অনাহার, অচিকিৎসা, অশিক্ষা, একান্ত বাধ্য হইয়া অবশ্য-প্রয়োজনীয় সঙ্কোচন এবং যাহার কারণে দেশের সকল স্তরের সকল মানুষের মনে সঞ্চিত হইতেছে অসন্তোষ এবং হতাশা এবং ইহারই ফলে ভদ্র বাঙ্গালী পরিবার এবং সমাজের শিক্ষিত অথচ বেকার যুবক—এমন কি বালকেরাও জীবনে আশা এবং আদর্শহীন হইয়া অধঃপতনের অতলে তলাইয়া যাইতেছে। চোখ মেলিয়া দেখিলে ইহাই প্রতীয়মান হইবে যে আজ দেশব্যাপী দুর্নীতি এবং অন্তঃপ্রবাহী পাপের স্রোত সমস্ত বাঙ্গালী সমাজকে একেবারে ভিত্তি হইতে ফাটাইয়া ধ্বসাইয়া দিতেছে। দেশের এবং জাতির এই চরম অবস্থায়—এই নিরাশার পটভূমিতে শিল্প-সাহিত্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি, মানব-কল্যাণ, বিশ্বমৈত্রী প্রভৃতির কি মূল্য? সব কিছুই কি অসার মিথ্যা হইয়া যাইতেছে না? এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, ক্ষুধার খাদ্য এবং দাঁড়ানোর মাটি মানুষের প্রয়োজন সর্ব্বপ্রথম, তাহার পর অন্য কিছু।

'বাবাজী-কালচার' এবং মহাপুরুষের বাণী তোতা-পাখীর মত আওড়াইয়া দেশ এবং জাতিকে বাঁচাইবার বল এবং সম্বল দেওয়া যাইবে না। নিষ্ঠুর বাস্তবকে অগ্রাহ্য করিয়া—ফাঁকা আদর্শবুলিতে মানুষের পেট ভরিবে না, মনের জ্বালাও শান্ত হইবে না। জনকয়েক, যাহাদের সম্বল আছে এবং যাহারা বিবিধ উপায়ে এবং প্রকারে সর্ব্বপ্রকার অভাবের সমাধান করিতেছে, ধর্ম্মের কথা, 'ঠাকুর' এবং 'ব্রহ্মচারী' মহারাজদের অসার ফাঁকা বাণীতে তাহারা হয়ত চিত্তশান্তি লাভ করিতে পারে, কিন্তু পরের পয়সায় যাঁহারা 'মহারাজত্ব' এবং পরমান্ন ভোজনে নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করিতেছেন—তাঁহাদের উপদেশামৃত দেশের বর্ত্তমান ভয়াবহ দুর্দ্দশা কতটুকু দূর করিতে পারিবে?

সর্ব্বনাশের আর বাকি কি?

বাংলা দেশের মানুষের মধ্যে যখন চাউল, তৈল, মৎস্য, তরি-তরকারির জন্য হাহাকার উঠিয়াছে—সেই সময় সরকার বাহাদুর বড় বড় মাথা একত্র করিয়া বিষম সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজিতে ব্যস্ত। অর্থাৎ বরাবর যে-প্রকার কাগজী-পরিকল্পনা হইয়া থাকে এবারেও তাহাই হইতেছে। এই বিষম সঙ্কটকালে শুনা যাইতেছে যে, তেলকল মালিকগণ তাঁহাদের মিল বন্ধ রাখিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইঁহাদের সঙ্গে কলিকাতার গোলদারী ব্যবসায়ী সমিতিও (অর্থাৎ চাউল, ডাইল, তৈল প্রভৃতির দোকান) তাঁহাদের দোকানগুলিও অচিরে বন্ধ করিতে বাধ্য হইবেন। খুচরা ব্যবসায়ীদের অভিযোগ এই যে: (১) অতিমিহি সুগন্ধযুক্ত চাউলের বর্ত্তমান বাজার দর কিলো-প্রতি ২.১৫ টাকা। এই চাউল সরকার-নির্দ্দিষ্ট ৮০ নঃ পঃ দরে পাওয়া যায় না, (২) অন্যান্য অতিমিহি চাউলও সরকার-নির্দ্দিষ্ট দরে মিলে না,......(৩) পূর্ব্ব ঘোষণা অনুসারে 'খ' শ্রেণীর খুচরা ব্যবসায়ীদের ৪ কুইণ্টল চাউলের কম কিনিতে দেওয়া হইতেছে না, (৪) প্রতিবার বিক্রয়ের জন্য ক্যাশমেমো দেওয়া সম্ভব নয়।

অন্যদিকে তেলকল মালিক সমিতি বলেন যে, ৪৮ টাকা মণ দরে সরিষা কিনিয়া তেলের পড়তা পড়িতেছে কুইণ্টল প্রতি ৩২০ টাকা। কিন্তু সরকারী বিক্রয় দর হইতেছে ৩০০ টাকা। কাজেই প্রতি কুইণ্টলে ২০ টাকা করিয়া লোকসান খাইতে হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট সমিতি আবেদন করিয়াছিলেন যে, সরিষার সর্ব্বোচ্চ মূল্যও বাঁধিয়া দেওয়া হউক, নচেৎ তেলকলগুলি বন্ধ হইয়া যাইবে। রাজ্য সরকার তাঁহাদিগকে সাফ জানাইয়া দিয়াছেন, উহা তাঁহাদের আয়ত্তের বাহিরে। ইহাতে যদি এই রাজ্যের তেলকল বন্ধ হইয়া যায় যাইবে।

সমিতির একজন মুখপাত্র আরো বলেন, "বহুদিন আগে থেকেই আমরা এই রাজ্যে সরিষার চাষ বৃদ্ধির জন্য সরকারকে তৎপর হ'তে অনুরোধ জানিয়ে আসছি। তার জবাবে একবার এক কৃষিমন্ত্রী আমাদের হাতে পেঁয়াজ চাষের একটি পুস্তিকা গুঁজে দিয়ে বলেছিলেন, সরিষার চাষ করে কি হবে, আপনারা বরং পেঁয়াজের চাষ বাড়াবার চেষ্টা করুন তাতে দেশের উপকার হবে।"

উপকারের ফল জনগণ হাড়ে হাড়ে ভোগ করিতেছে! মন্ত্রীকে তৈল দানের লোক কম নাই! অযোগ্য এবং অক্ষমদের হাতে দেশ-শাসনের ভার থাকিলে যাহা স্বাভাবিক আজ তাহাই ঘটিতেছে—ভবিষ্যতে আরও ঘটিবে!

মুদী এবং তেলওয়ালাদের বক্তব্য সত্য কি মিথ্যা তাহার বিচার আমাদের করিবার কথা নহে—এ-বিচার তথ্যাভিজ্ঞ সরকারী কর্ণধারকগণ করিতে পারেন। কিন্তু একথা অসত্য নহে যে, বহু তৈল-ব্যবসায়ী এবং মুদীর দোকানে প্রচুর মাল মজুত থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা ক্রেতা-সাধারণকে অতি-লোভের আশায় নাজেহাল করিতে ভয় বা সঙ্কোচবোধ করিতেছেন না। প্রথমে 'মাল নাই' বলিয়া, পরে দাবিমত বর্দ্ধিত মূল্য পাইলেই সেই 'নাই-মাল' যাদু-মন্ত্রবলে 'আছে-মাল' বলিয়া দেখা যাইতেছে। মাত্র কয়েক দিন পুর্ব্বে তৈল কিনিতে গিয়া ইহা প্রত্যক্ষ করিলাম। '৩৲ টাকা কেজির' তৈল নাই—কিন্তু মুদীর দাবিমত মূল্য ৪৲ টাকা কেজি স্বীকার করিতেই মাল কোথা হইতে হাজির হইল বলিতে পারি না।

প্রায় সর্ব্বত্রই ইহা ঘটিতেছে এবং শান্তিরক্ষকদের জ্ঞাতসারেই। অবস্থা দেখিয়া মনে হইতেছে, নিজেদের হাতে বাজার এবং বাজারীদের সায়েস্তা করা ছাড়া সাধারণ জনসাধারণের আর কোন পথ নাই। চোর-ডাকাত-বাটপাড়দের মানুষমারী অভিযান ঠেকাইতে সরকার যখন অক্ষম এবং ক্লীব হইয়া বসিয়া আছেন—তখন বনের হিংস্র পশু অপেক্ষা হাজারগুণ হিংস্র মানুষ-রূপী এই জানোয়ারদের ভদ্র এবং অহিংসা ও নীতিবাণী প্রচার করিয়া দমন করা যাইবে না। প্রয়োজনমত যে-কোন পন্থা অবলম্বন করিয়া মানুষকে নিজেদের বাঁচিবার সমবেত প্রয়াস অবিলম্বে করিতে হইবে।

ভাল কথা—সপ্তবাম-নেতারা এখন কি করিতেছেন? বাস-ট্রামের এক নয়া পয়সা ভাড়া বৃদ্ধিতে যাঁহারা মড়া কান্নার সঙ্গে করতাল বাজাইয়া হরতাল করেন, তাঁহারা আজ কি, কিছুদিন পুর্ব্বের অতি-পরিশ্রম জনিত ক্লান্তির জন্য, বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতেছেন!

মূল্যবৃদ্ধির ভয়াবহতা

আনন্দবাজার সত্যই বলিতেছেন:

"...নিত্য-প্রয়োজনীয় পণ্যের সঙ্গে তাল রাখিয়া বাসভাড়া, ট্রামভাড়া, মায় ট্যাক্সিভাড়াও বাড়িয়াছে, বাড়ীভাড়া ত ক্রমশই সাধারণ মানুষের নাগালের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। এ অবস্থায় লোকে যায়ই বা কোথায়, থাকেই বা কোথায়? আর দরের আবর্ত্ত ত চক্রাকারে ঘুরিতেছে। একটা জিনিষের দাম বাড়িলে তাহার দোহাই দিয়া আরও পাঁচটারও বাড়িতেছে এবং সেই পাঁচটার নজির দেখাইয়া আরও দশটার। ফলে প্রত্যহই জীবন-যাত্রার ব্যয় বাড়িয়া যাইতেছে এবং যাহাদের সাধ্য সীমিত, তাহারা এই চড়া দামের দরিয়ায় থই পাইতেছে না। ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিরূপে মাগ্গী ভাতা এবং বেতনবৃদ্ধির দাবি সোচ্চার হইয়া উঠিতেছে এবং অন্যে পরে কা কথা, খাস কেন্দ্রীয় সরকারকেও সে দাবি মানিয়া লইতে হইয়াছে।

"সে মানা কিন্তু শেষ কথা নয়—তাহাকে শেষের সুরু বলিলেও বলা যাইতে পারে। বেতন অথবা মজুরি বৃদ্ধি কিংবা মাগ্গী ভাতার পুনর্বিন্যাসের ফলে কিন্তু দরের উর্দ্ধগতিতে পূর্ণচ্ছেদ পড়ে নাই—দাম যেমন বাড়িতেছিল তেমনই বাড়িয়া চলিয়াছে, লোকের দুর্দ্দশা যেমন ছিল তেমনই আছে, বরং আরও নিদারুণ হইতেছে। মূল্যবৃদ্ধির অসীম পাথারে অতিরিক্ত মাগ্গী ভাতা অথবা বেতনের কয়েকটা টাকা ত সমুদ্রে শিশির-বিন্দুর মত। তাহাতে না মিটিতেছে উদরের দাবি, না বজায় রাখা যাইতেছে ভদ্রতার ঠাট। অথচ বেতন কিংবা মাগ্গী ভাতা বৃদ্ধির চাপ যাহারা পণ্যমূল্যবৃদ্ধির শল্যে শূলবিদ্ধ তাহাদের উপরই গিয়া পড়িতেছে। বেতন কি মাগ্গী ভাতা বাড়ানোর অর্থ উৎপাদন-খরচ বাড়িয়া যাওয়া অর্থাৎ আর-এক দফা মূল্যবৃদ্ধি। অতএব ডান হাতে যাহা দেওয়া হইতেছে তাহা বাম হাতেও নয়—সেই ডান হাতেই আবার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ফিরাইয়া লওয়া হইতেছে। মাঝে পড়িয়া চড়া দামের জাঁতাকলে লোকে পিষ্ট হইয়া প্রায় খাবি খাইতেছে।"

মূল্যবৃদ্ধির সর্ব্বনাশা প্রকোপ এবং দাপট দেখিয়া এতদিনে সরকারী মহল হঠাৎ চমকিত হইয়া সমস্যা-সমাধানের উপায় খুঁজিতে সুরু করিয়াছেন। স্বয়ং অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারী স্পষ্টই স্বীকার করিতেছেন যে, পণ্যমূল্যের উর্দ্ধগতি সরকারের পক্ষে গভীর উদ্বেগের কারণ হইয়াছে এবং অচিরে এই ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন না করিতে পারিলে গুরুতর সঙ্কট দেখা দিবে।" কিন্তু এখন আর 'সঙ্কট দেখা দিবে' বলার কোন অর্থ নাই। সঙ্কট এবার বাস্তবে দেখা দিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণমাচারী এবং অন্যান্য সরকারী মহাশয় ব্যক্তিগণ

এতদিন নিদ্রিত ছিলেন কি না জানি না—কিন্তু দ্রব্য মূল্য আজ হঠাৎ বা একদিনে বাড়ে নাই। দ্রব্যমূল্য, কখনও দ্রুতলয়ে, কখনও বা ঢিমে তেতালায়—বহু কাল ধরিয়াই ঊর্দ্ধমুখে চলিয়াছে।

সরকার যে ভয়াবহ পণ্যমূল্য বৃদ্ধি দেখিয়া আজ সচকিত, আতঙ্কিত হইয়াছেন, সময়ে অবস্থার প্রতি অবহিত থাকিলে আজ হঠাৎ 'পালে বাঘ পড়িয়াছে' বলিয়া সরকারকে আর্ত্তনাদ করিতে হইত না। রোগ আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে তাহার প্রতিরোধ ব্যবস্থা আছে, কিন্তু রোগ যখন মহামারীরূপে দেখা দেয়, তখন প্রতিরোধ ব্যবস্থার কথা চিন্তা না করিয়া উপযুক্ত চিকিৎসা-ব্যবস্থা কি করিয়া করা যায়, তাহাই ভাবিতে হয়। মূল্যবৃদ্ধিরূপ মহামারী হইতে মানুষকে বাঁচাইতে হইলে যথাযথ প্রতিকারের পন্থা অবিলম্বে বাহির করিতে হইবেই!

সমস্যা-নিরাকরণে শ্রীকৃষ্ণমাচারী গম্ভীর কণ্ঠে বীরদর্পে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য, ষ্টেট্ ট্রেডিং এবং খুচরা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে কঠোর নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার কথা বলিয়াছেন। কিন্তু ইহাতেই কি আমরা মূল্য-বৈতরণী পার হইতে সক্ষম হইব?

"রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য এ দেশে নূতন নয়। তাহার পরিধিও ক্রমশই বাড়িতেছে। কিন্তু তাহাতে কোন্ জিনিষের দর কমিয়াছে, কোন্ ভোগ্যবস্তুই বা অনায়াস-লভ্য হইয়াছে? চিনির খুচরা বিক্রয়ের দায়িত্ব যখন সরকার লইয়াছিলেন তখন লোকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছে এই ভাবিয়া, এতদিনে বুঝি চিনি-সমস্যার একটা সুরাহা হইল। কিন্তু হা হতোঽস্মি, চিনির দরও ক্রমশই বাড়িতেছে এবং মাথা-পিছু বরাদ্দও কমিতেছে—উৎকর্ষের কথা লোকে ত কবে ভুলিয়া গিয়াছে। সরকার দুধ বেচিতেছিলেন যে দরে তাহা এতদিন মোটের উপর খুব বেশী ছিল না। কিন্তু সে দুধের দামও ধীরে ধীরে বাড়িতেছে এবং মুনাফাশিকারী গোয়ালা যে দরে দুধ বেচে তাহার সঙ্গে পার্থক্যটাও ঘুচিয়া যাইতেছে। সরকারী পরিবহণব্যবস্থায় বাসের ভাড়া কমিতেছে না, বাড়িতেছে। রেশনের কাঁকরমণি চালের দাম কম বটে, কিন্তু সেও ত ঈদের চাঁদের মত সহসা দৃষ্টিগোচর হয় না। সরকারী নিয়ন্ত্রণে কাপড়ের দাম বাড়িয়াছে, কমে নাই। দেখা যাইতেছে সরকার যে ব্যবসায়ই হাতে লইয়াছেন তাহাতে গৃহস্থের যন্ত্রণা নানাভাবে বাড়িয়াছে এবং দর কোনও পণ্যেরই কমে নাই।"

লোকে যখন দেখিবে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য এবং ষ্টেট্ ট্রেডিং ক্ষেত্র আরো বিস্তৃত হইবে—বিগত অভিজ্ঞতা হইতে সাধারণ আরও আতঙ্কিত হইবে, ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়।

এই প্রসঙ্গে অধিক আর কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই—কেবল একটি মাত্র কথা সরকার এবং দেশের অর্থ-লোভী দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যাপারীদের মনে করাইয়া দিব যে—সাধারণ মানুষ এবার বেপরোয়া হইয়া উঠিয়াছে। অভাবনিপীড়িত, অনাহারী-অর্দ্ধাহারী এবং জীবনে আশাহীন সাধারণ মানুষ হঠাৎ কখন কি করিয়া বসিবে বলা যায় না। কাজেই সকলে অবহিত হউন!

বাস্তবে কি দেখিতেছি?

রাজ্য সরকার এবং তাঁহাদের কর্ত্তব্যনিষ্ঠ 'জনরক্ষক এবং পাপী দমনকারী' পাহারাদারদের সদা সজাগ এবং সতর্ক:

"...চোখের উপর দিয়া বস্তা বস্তা চাল, টিন টিন তেল, ঝুড়ি ঝুড়ি মাছ কালোবাজারের অতল গহ্বরে তলাইয়া যাইতেছে নিশ্চিহ্ন হইয়া—কিন্তু তাঁহারা কি করিবেন? তাঁহাদের এক হাতে সাংবিধানিক সংহিতা, অন্য হাতে গণতান্ত্রিক গীতা—যাহার মূলতত্ত্ব অক্ষুন্ন ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং বিধানের প্রাধান্য অর্থাৎ বিলাতী ভাষ্যে যাহাকে বলে 'রুল অব ল'। নীতির এই দুই অনুশাসনের বাঁধনে তাঁহাদের বুদ্ধি ও বিবেক দুই-ই বন্দী হইয়া পড়িয়াছে; দুস্তর সে নৈতিক বাধা অতিক্রম করিয়া কেমন করিয়া তাঁহারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান চালাইবেন, সেটা তাঁহারা ঠাহর করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না।

দেশ জুড়িয়া যে দুর্নীতির খেলা চলিতেছে, এ-কথা তাঁহারা বিলক্ষণ জানেন। এও জানেন, নীতি-দুর্নীতির যুগ্ম প্রবাহের সঙ্গমক্ষেত্র হইতেছে সরকারী দপ্তরখানা, আমলাতান্ত্রিক অযোগ্যতা ও অক্ষমতার রন্ধ্রপথে শনি প্রবেশ করিয়াছে রাষ্ট্রীয় দেহে। তাই দেখি, সরকারী হুমকির কামাই নাই, বিধিনিষেধের অন্ত নাই, উপদেশ-বর্ষণে ছেদ নাই। অথচ কালোবাজারের কালসাপের বিষদাঁত কিছুতেই ভাঙিতেছে না, সে খুশীমত ছোবল মারিয়াই

চলিয়াছে। এতদিন পর্য্যন্ত তাহার বিষ চড়াদরের রূপ লইয়াই সমাজ-জীবনকে জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিতেছিল। ইদানীং তাহার তেজ আরও বাড়িয়াছে। এখন আর সমস্যা শুধু দামের ধাক্কা সামলানো নয়, তাহার সঙ্গে যোগ হইয়াছে মুনাফা-শিকারী ব্যাপারীর অত্যাশ্চর্য্য ভোজবাজি। রাতারাতি চাল, তেল বেমালুম উবিয়া যাইতেছে, যেন তাহারা কর্পূরপিণ্ড ছাড়া আর কিছু নয়। ওস্তাদ যাদুকরের লোমহর্ষণ ক্রীড়াকৌশলের চেয়েও ইহা আরও রোমাঞ্চকর। আর ঐন্দ্রজালিক যেমন ফুল, ফল, খেলনা, রুমাল হইতে সুরু করিয়া পাখি, পশু এমন কি জীবন্ত মানুষকেও চোখের সামনে উড়াইয়া দিয়া আবার যাদুমন্ত্রে ফিরাইয়া আনে, তেমনই কালোবাজারের যাদুকরেরাও ইচ্ছা করিলেই শূন্য-লোক হইতে আনিয়া দুর্লভ চাল, তেল কি মাছ দিয়া অনুগত দলের ভাণ্ডার ভরিয়া দিতে পারে। তবে তাহার জন্যও মন্ত্র পড়িতে হয়, আর সে মন্ত্র কারেন্সী নোট। সে নোট যাহার ব্যাঙ্কে অথবা সিন্দুকে আছে, চড়া দামের উত্তাপ তাহার কেশাগ্র স্পর্শও করিতে পারে নাই—হাহাকার করিয়া মরিতেছে তাহারাই, যাহাদের উপর মা-লক্ষ্মী বিমুখ হইয়াছেন।"

অনেকে বলিবেন যে, এমন অবস্থায় কালোবাজারী এবং মুনাফা-শিকারীদের সরকার কেন দমন করিতেছেন না, এই সকল মানবপ্রাণঘাতীর দল কি অপরাধী নহে? কিন্তু ইঁহারা মনে রাখিবেন যে, আমাদের এই Socialistic pattern ডিমোক্র্যাসীতে :

> "ডিক্টেটরী চলে না, অগণতান্ত্রিক টোটালিটারিয়ান দেশ এ নয়—গণতন্ত্রের পতাকা এখানে সগৌরবে উড়িতেছে। নিছক সন্দেহের বশে এ দেশে কাহাকেও শাস্তি দেওয়া যায় না। কাজেই কাহারও বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠিলেই সরকার তাহাকে দণ্ড দিতে পারেন না, যতদিন না আইনমাফিক দোষী সাব্যস্ত হইতেছে। সে বড় সহজ ব্যাপার নয়, তাহার ঝামেলাও অল্প নয়। অতএব ইতিমধ্যে লোকের নিদারুণ কষ্টের জন্য শোকপ্রকাশ করা ছাড়া সরকারের গত্যন্তর নাই। আইনেরও যে অসংখ্য ত্রুটি, তা কি আর সরকার জানেন না? কিন্তু তাহার সংশোধনও সোজা ব্যাপার নয়, সে কাজ রাতারাতি করাও যায় না। এ সব কথাই সরকার বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন এবং কিছু-না-কিছু একটা করিবেনই। তাই বলিয়া কালোবাজার দমন করিবার জন্য সরকার আইনের প্রাধান্য ক্ষুন্ন করিবেন, এ কেমনতর কথা? প্রাণধারণের প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে, কিছু লোকের অন্তত বাঁচিয়া থাকা দরকার, নহিলে সরকার শাসন করিবেন কাহাদের? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও ভুলিলে চলে না, নীতির মর্য্যাদা বজায় রাখিবার জন্য প্রাণবিসর্জ্জন করিতেও আপত্তি হওয়া উচিত নয়—সে মৃত্যু ত মহৎ মৃত্যু, তাহার তুল্য গৌরব কি আর আছে?—"

অবশ্য এই মহৎ এবং আদর্শ প্রাণদানের গৌরব একমাত্র অসহায় জনগণেরই প্রাপ্য। উপর-তলাবাসী শাসক সম্প্রদায় এবং বিত্তবান্ ও পরম নীতিজ্ঞানসম্পন্ন মহাশয়দের সব কষ্ট স্বীকার করিয়াও বাঁচিয়া থাকিতে হইবে—এবং এই বাঁচিয়া থাকা দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্যই! আর যাহারা কষ্ট করিয়া প্রাণধারণ করে, তাহারাই প্রাণের মূল্য বুঝে। সহজ সুখে পরমানন্দে যাহারা দিন কাটাইতেছে, তাহারা প্রাণ এবং প্রাণধারণ কি বিষম বস্তু বর্ত্তমানে হইয়াছে—তাহার কি বুঝিবে? কাজেই তাহাদের পক্ষে প্রাণদানে কোন গৌরব বা মহত্ত্ব নাই! অতএব তাহারা বাঁচিয়া থাক্—মরিতে হইলে সে-মরার গৌরবের মনোপলি আমরা কিছুতেই ছাড়িব না!!

হিন্দু-মুসলমান

কতকগুলি ঘটনার কথা জানিয়া আজ একটা কথা স্পষ্ট করিয়া বলার প্রয়োজন বোধ করিতেছি। কথাটা সামান্য, কিন্তু উভয় বাঙ্গলার বর্ত্তমান সঙ্কটজনক অবস্থায় ইহা সকল বাঙ্গালীর জানা একান্ত আবশ্যক।

মুসলমান হইলেই মানুষ খারাপ হয় না—এবং হিন্দু হইলেই মানুষ ভাল হয় না। বিগত তথাকথিত হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার পর—এমন বহু ঘটনার আজ প্রকাশ পাইয়াছে, যাহাতে দেখা যাইতেছে—কত মুসলমান পূর্ব্ববঙ্গে গোলযোগের সময় নিজেদের সকল বিপদ্ অগ্রাহ্য করিয়া সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিতে গিয়া ধনসম্পত্তি—এমন কি জীবন পর্য্যন্ত দান করিয়াছেন। অবশ্য ইঁহাদের মধ্যে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত মুসলমানের সংখ্যাই বেশী। অপরদিকে কলিকাতা

এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য বহু স্থানে বহু বহু হিন্দু সংখ্যা-লঘুদের বাঁচাইতে নিজেদের সকল বিপদ তুচ্ছ করেন এবং স্বধর্মীদের হাতে বহু প্রকারে নির্য্যাতিত হন। সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া বুঝা যাইতেছে যে, মুসলমান সমাজে যেমন বহু দেবতুল্য মানুষ আছে, হিন্দুদের মধ্যেও তেমনি নরাধমের কোন অভাব নাই।

হিন্দু নরাধম হইলেও তাহাকে একান্ত আপনজন বলিয়া মনে করিতে হইবে, কিন্তু দেবতুল্য ব্যক্তি, মুসলমান বলিয়াই তাহাকে পরিহার করিয়া শত্রু বলিয়া ধরিতে হইবে—এ মনোভাব এখন বর্জন না করিলে, বাঙ্গালীর পক্ষে অগ্যকার জীবনযুদ্ধে টিঁকিয়া থাকা অসম্ভব হইবে।

পশ্চিমবঙ্গে দ্রব্যমূল্যের অসম্ভব বৃদ্ধিতে আজ সাধারণ মানুষের কি অবস্থা হইয়াছে তাহা সকলেই জানেন। এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য দায়ী এবং সাক্ষাৎভাবে চক্রান্তকারী যাহারা—তাহাদের মধ্যে শতকরা ৯৮ জনই হিন্দু—এ কথা স্বীকার করা ছাড়া পথ নাই। হিন্দু হইয়াও যাহারা হিন্দু-সাধারণকে আজ মরণের পথে ঠেলিয়া দিতে, হিন্দু-মুসলমান সাধারণ মানুষের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া নিজেদের বিত্ত বৃদ্ধি করিতে কোন লজ্জা বা দ্বিধা বোধ করে না, (হিন্দু বলিয়াই কি)—সেই তাহাদের কি ক্ষমার চক্ষে দেখিতে হইবে? মানবতার ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার কোন স্থান থাকিতে পারে না, যদি থাকে তবে তাহা দেশের পক্ষে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পক্ষে বিষম এবং সমান ক্ষতিকর। আজ আমাদের নূতন ভাবে চিন্তা করিতে হইবে—ভাবিতে হইবে আমরা প্রথমে বাঙ্গালী—এবং তাহার কে হিন্দু, কে মুসলমান। দেশের স্বার্থে, জাতির কল্যাণে সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে আজ একই আদর্শে, একই মানবতার মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইতে হইবে। ধর্ম্ম একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং ইহার সহিত কোন রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত ব্যবহারিক সম্পর্ক জড়িত থাকিতে পারে না, থাকা উচিত নয়। নিজের গৃহে, পরিবারের মধ্যে, মন্দিরে-মসজিদে—রুচিমত যে যাহার ধর্ম্ম পালন করুক, কিন্তু ধর্ম্মকে আজ মাঠে-ময়দানে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এবং সামাজিক সম্মেলনে টানিয়া আনা যেমন করিয়াই হউক বন্ধ করিতে হইবে। এ কার্য্য ও দায়িত্ব আজ দেশের যুব-সমাজকেই লইতে হইবে। হিন্দু সমাজকে যেমন অগ্যকার মানব-'ঠাকুর', 'ব্রহ্মচারী'-'মহারাজদের' প্রভাবমুক্ত করা দরকার, তেমনি মুসলমান সমাজকেও কাঠ-মোল্লাদের দাপট হইতে মুক্ত করিতে হইবে। সর্ব্বাগ্রে আমরা মানুষ, তাহার পর বাঙ্গালী—আজ এই পাঠ নূতন করিয়া গ্রহণ করিয়া সাধারণ জীবনক্ষেত্র হইতে তথাকথিত ধর্ম্মের গোঁড়ামিকে নির্ব্বাসিত করিতেই হইবে।

বর্ত্তমান জীবনহীন, আদর্শহীন বাঙ্গালী চরিত্রে, জীবনে এবং সমাজে এখন যদি নূতন প্রাণের নূতন আদর্শ ও চিন্তাধারার প্রবাহ সৃষ্টি না করিতে পারি, তাহা হইলে কবির ভাষায় উচ্চ কণ্ঠে বলিব—"হে মহামারী, তুমি আমাদের বান্ধব—হে দুর্ভিক্ষ, তুমি আমাদের সহায়!"—"ভিক্ষাবৃত্তির তারস্বরে, অক্ষম বিলাপের সানুনাসিকতায় রাজপথের মাঝখানে…" আমাদের প্রতি বিশ্বজগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মধ্যে নিজেদের ক্লীবত্ব প্রচার করা ছাড়া অন্য গৌরব নাই। বাঁচিতে হইলে—হিন্দু-মুসলমান সকল বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী হইয়াই বাঁচিতে হইবে।

বিদ্যাদেবীর প্রতি ভক্তি

সপ্তম বা অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য লেখা কোন পাঠ্য-পুস্তকে মুদ্রণ-প্রমাদ বা প্রুফ দেখায় ত্রুটির অজুহাতে কয়টি ভুল উপেক্ষা করা যাইতে পারে? একটি,—দুইটি—বড় জোর না হয় পাঁচটি। কিন্তু ইংরাজী দ্বিতীয় পত্রের এমন একটি বই পাওয়া গিয়াছে যাহা ব্যাকরণগত এবং অন্যান্য ধরনের কম-বেশী দুই শতাধিক ভুলে পূর্ণ। বইটির নাম A Guide to English Second Paper। লেখক ডানকুনির কোন একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক। বইটি ৭ম এবং ৮ম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য লেখা।

বইটির Preface হইতেই ভুলের সুরু। Preface-এর প্রথম বাক্যে লেখা—The book like this hardly needs any preface. Its objectives are obvious, aims rivid. তারপর আসুন Contents-এ। Contents-এর Nine হইতে Twenty Chapter-এর মধ্যে ভুল আছে মোট ছয়টি। ভুলের নমুনা,—Use বানানটি Uess, Adverbial বানান Adverbal, Infinitive বানান Indifinitive ইত্যাদি। একটি Simple sentence-কে Complex sentence-এ প্রকাশ করিতে গিয়া লেখা হইয়াছে—The girl has who come from Calcutta is very beautiful.

এবারে কিছু ইংরাজী অনুবাদের নমুনা দেওয়া যাক্।

গ্রীষ্মকালে আম পাকে—Mangoes ripen in summer. (page—72) পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী, প্রফুল্লচন্দ্র সেন, একজন শিক্ষক ছিলেন—Prafulla Chandra Sen, the Prime Minister of West Bengal, was a teacher. (page—83) ভাল কথা, তোমার বাবা কেমন আছেন?—By the bye, how are your father. (page—99) এই বুধবারের পরের বুধবারে আমি বাড়ী যাইব—I shall go home Wednesday week. (page—99)।

'কিং লিয়রে'র প্রতি তাঁহার কন্যা এবং ভৃত্যদের দুর্ব্যবহার ও রাজার গৃহত্যাগ প্রসঙ্গটির ইংরাজী ভাষ্যের 'প্রেসি' করিতে গিয়া লেখা হইয়াছে,—The old king Lear gradually neglected and ill treated by his daughters and their servants.

বইটিতে এই ধরনের যে কত ভুল আছে তা বলিয়া শেষ করা যায় না। তবে আরও কয়েকটি বানানের নমুনা তুলিয়া ধরা উচিত বলিয়া মনে হয়।

যেমন,—Newton স্থলে Netwon, liberty স্থলে libarty, understood স্থলে undertood, died স্থলে deid, loose স্থলে lose, anxiety স্থলে anxity প্রভৃতি।

আরও আশ্চর্য্যের কথা বইটির নামের Guide বানানটিই ভুল। Guide-এর স্থলে লেখা আছে Giuide. (page—139)

ইহা ব্যতীত যতি চিহ্নের ব্যবহারে লেখক বিশেষ উদার। কোথাও অকারণ যতি চিহ্নের মাত্রাধিক্য। আবার কোথাও চিহ্নের বালাই-ই নেই।

দুর্ভাগ্যের কথা এত ভুল বুকে লইয়াও বইটি দেশের বহু দেশের বহু বিদ্যালয়ে পাঠ্য-পুস্তকরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। (সৌজন্য—আনন্দবাজার)

ইহাই ত স্বাভাবিক। যে-দেশে এবং সমাজে অচল-মুদ্রা, ভেজাল খাদ্য, মূর্খ-পণ্ডিত, রাসভ-শিক্ষক এবং প্রচণ্ড অনভিজ্ঞদের চলন আজ সর্ব্বাধিক, সে-দেশে আলোচ্য পাঠ্য-পুস্তকটির স্বীকৃতি-সমাদর আমরা অতি স্বাভাবিক এবং উত্তম বলিয়া মনে করি। দুঃখের বিষয় আমাদের পিনাল-কোডে বিদ্যা-ধর্ষণ অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় নাই, কাজেই বিদ্যা-ধর্ষণকারীর বিচার এবং দণ্ড ব্যবস্থারও কোন ধারা নাই!

বিশ্বামিত্র

চাণক্য সেন

সাত

কোশল মন্ত্রীসভার প্রথম বছরগুলিতে রাজকার্য্য, শাসনকার্য উদয়াচলের পথে বেশ ভালই চলেছিল। মন্ত্রীসভায় বড় রকমের অন্তর্বিরোধ ছিল না; ছোটখাট যে-সব বিরোধ ঘটত, নীতি নিয়ে নয়, ব্যক্তি বা গোষ্ঠীস্বার্থ নিয়ে, তা যে-কোনও মন্ত্রীসভায় হয়ে থাকে; সামগ্রিক প্রশাসনে তার ছায়া পড়ত না। মাধব দেশপাণ্ডে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশলের সঙ্গে সহযোগিতাই ক'রে যাচ্ছিলেন। যদিও সেচ ও বিদ্যুৎ বিভাগের দায়িত্ব পেয়ে তিনি খুব খুশী হন নি, চেয়েছিলেন স্বরাষ্ট্র অথবা অর্থ-মন্ত্রিত্ব, তথাপি ক্রমে ক্রমে এই দুই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের বর্ধমান পরিধিতে মাধব দেশ-পাণ্ডে উদয়াচলের উন্নতি ও কল্যাণ সাধনের যথেষ্ট সুযোগ পেয়ে শান্ত হয়েছিলেন। তিনটি নতুন বিদ্যুৎ কারখানা স্থাপন ক'রে উদয়াচলকে অন্ধকার হ'তে আলোয় নিয়ে যাবার সুমহান্ কর্তব্যের ভিত্তিস্থাপন করতে পেয়ে আত্ম-তৃপ্তিতে মাধব দেশপাণ্ডে নধরকান্তি হয়ে উঠেছিলেন। দেহে সামান্য মেদের আভাস দেখা দিয়েছিল, মুখের হাসি বেশ একটু গোলাকার হয়ে এসেছিল, চলা-বসায় নতুন নতুন একটা ভারিক্কিভাব রপ্ত হয়েছিল। বিদ্যুৎ, অর্থাৎ পাওয়ার, নিয়ে মাথা ঘামাতে ঘামাতে মাধব দেশপাণ্ডে ধীরে ধীরে পাওয়ারের নিগূঢ় রহস্যে মজে গিয়েছিলেন; তাঁর অন্ধকার মানসে গোপন উচ্চাকাঙ্ক্ষাও নতুন আলোকে আত্মপ্রকাশ করেছিল। কিন্তু তা কয়েক বছর পর।

কৃষ্ণদ্বৈপায়নেরও অসন্তুষ্টির কারণ ছিল না। 'মাতৃভূমি' ও 'পিপ্‌ল্‌' দুখানা কাগজেই তিনি পূর্ণ সমর্থন পেতেন। অর্থাৎ উদয়াচলের 'প্রেস' তাঁর সঙ্গেই ছিল। মাধব দেশ-পাণ্ডেকে দিয়ে দরকার মত দু'চারটে অন্য কাজও তিনি করিয়ে নিতে পারতেন। সেচ ও বিদ্যুৎ বিভাগের উদ্যোগে উদয়াচলে কাজ একেবারে মন্দ হয় নি; তিনটি বিদ্যুৎ কারখানা ছাড়াও। দু'টি নদীতে মাঝারি সাইজের বাঁধ দেওয়া হয়েছে, এবং উদয়াচলের সবচেয়ে বড় নদী সোনা-মুখীকে কেন্দ্র ক'রে বেশ বড় এক বহুমুখী প্রজেক্টের উদ্যোগপর্ব অনেকখানি এগিয়ে গেছে। মাধব দেশপাণ্ডে মারাঠা সমাজকে মোটামুটি শান্ত রেখেছেন; সমাজে তাঁর রাজনৈতিক নেতৃত্ব সুপুষ্ট।

'নবভারত সংগঠন' নামে একটি প্রতিষ্ঠানকে সোনামুখী প্রজেক্টের বেশ কিছু কাজ পাইয়ে দেবার জন্যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মাধব দেশপাণ্ডেকে অনুরোধ করেছিলেন। সে অনুরোধের অসম্মান হয় নি। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন জানেন যে 'নবভারত সংগঠনে'র শতকরা বাট ভাগ শেয়ার যে তাঁর তিন পুত্রের নামে বেনামীতে কেনা আছে, সে খবর আজ পর্যন্ত মাধব দেশপাণ্ডের জানা নেই। একমাত্র তিনি এবং জগন্মোহন তিওয়ারী ছাড়া আর কেউ তা জানে না; তাঁর ছেলেরাও না।

দুর্গাভাই মাঝে মাঝে তাঁর কাছে নালিশ জানিয়েছেন।

"মাধব দেশপাণ্ডে কিন্তু বড় বাড়াবাড়ি করছে কোশলজী।"

"কেন? কি ব্যাপার বলুন ত!"

"আপনি কি কিচ্ছু জানেন না?"

"শুনি আমি অনেক কিছুই, জানিও কিছু কিছু। কিন্তু আপনার ও আমার সংবাদ এক কি না তা কি ক'রে বুঝব?"

"মন্ত্রী হবার পর মাধব দেশপাণ্ডে কতজন নিকটাত্মীয়কে চাকরি দিয়েছেন তা জানেন আপনি?"

"সতের জন।"

"হনুমান নেশন বিল্ডিং কোম্পানীটা আসলে কার আপনি জানেন?"

"হরিশ দেশপাণ্ডের।"

"অর্থাৎ মাধব দেশপাণ্ডের বড় ছেলের। আর এই কোম্পানীই পাওয়ার হাউস বা ইরিগেশনের সবচেয়ে বেশি কন্‌ট্রাক্ট পাচ্ছে!"

"তা পাচ্ছে।"

"এ কি অন্যায়, অনাচার নয়? মন্ত্রীর পক্ষে এ সব কি শোভন?"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ঈষৎ হেসে জবাব দিয়েছিলেন, "দুর্গাভাইজি, মন্ত্রী ত দেবতা নয়, ঋষিও নয়। মন্ত্রী আর সবারই মত মানুষ।"

"কিন্তু সে অনেক মানুষের বিশ্বাস, আস্থা ও শ্রদ্ধার পাত্র। যে বিরাট্ ক্ষমতার সে অধিকারী, সে ক্ষমতা তার নিজের অর্জিত নয়, উত্তরাধিকারও নয়। বহু মানুষ বিশ্বাস ক'রে এ ক্ষমতা তার হাতে তুলে দিয়েছে। এ ক্ষমতার সামান্যতম ব্যবহার বহুর কল্যাণ, মঙ্গল ও উন্নয়নের জন্যে। এতে মন্ত্রীর বিন্দুমাত্র স্বাধিকার নেই।"

"নীতি হিসাবে আপনার প্রত্যেকটি কথা মানি, দুর্গাভাইজি।" কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সাবধানে বললেন। "কিন্তু নীতির নিষ্ঠুর নির্দয় বিচারে ক'জন মানুষ বেকসুর খালাস পায়, বলুন? আপনার মত আদর্শবাদী সজ্জন যদি সবাই হ'ত তা হ'লে পৃথিবী হ'ত স্বর্গের চেয়েও মহৎ, কারণ মানুষের এমন অনেক গুণ আছে যা দেবতাদের নেই।"

"তা হ'লে আপনি মাধব দেশপাণ্ডের কাজে অন্যায় দেখতে পান না?"

"পাই। নিশ্চয় পাই। মাধবভাইকে দু'একবার আমি সতর্কও করেছি। কিন্তু কি জানেন, আপনি তাঁকে যত বড় দোষী মনে করছেন, ততটা দোষ তার নয়।"

"আপনার কথা বুঝতে পারলাম না।"

"দোষ মাধব দেশপাণ্ডের নয়। দোষ ভারতবর্ষের, হিন্দু সমাজের, ধর্মের, দোষ এ দেশের জল-মাটি-হাওয়ার, দোষ ইতিহাসের।"

"ছি, ছি, কোশলজি, আপনি ত ইংরেজের মত কথা বলছেন। মেকলে সাহেব যা বলেছিলেন আপনি ঠিক তাই বলছেন।"

"না, দুর্গাভাইজি। তা আমি বলছি না। আমি একেবারে অন্য কথা বলছি। যদি অনুমতি করেন ত বুঝিয়ে বলি।"

দুর্গাভাই নীরবে অনুমতি দিলেন।

"নীতির দুটো দিক্ আছে, দুর্গাভাইজি। নীতি সামগ্রিক; দেশ, কাল, পাত্র, সমাজ, সভ্যতা সবকিছুর ঊর্ধ্বে। এ হ'ল আদর্শবাদী নীতি। ইতিহাসে কখন-সখন এমন মানুষ জন্ম নেন যাঁদের কাছে নীতি ও আদর্শ সব কিছুর ওপর। তাঁরা নমস্য। কিন্তু তাঁদের নিয়ে দুনিয়া-সংসার নয়। যে নীতি ব্যবহারিক তা নির্দিষ্ট হয় সমাজ, ধর্ম, আর্থিক ব্যবস্থা ও ঐতিহাসিক বিবর্তন দিয়ে। ধরুন, আজকাল আমরা ব'লে থাকি যে ইংরেজের নীতিবোধ খুব প্রখর। অথচ আমরাই জানি, সাম্রাজ্য তৈরি করতে গিয়ে এমন কোনও দুর্নীতি নেই ইংরেজ যা প্রয়োগ করে নি। আমরা বলি, সাহেব ব্যবসায়ীরা মালে ভেজাল দেয় না, ভারতীয় ব্যবসায়ীরা দেয়। অথচ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দুষ্ট ব্যবসায়ীদের শাস্তিবিধানের যে বিশদ ও কঠিন ব্যবস্থা আছে, আমাদের কংগ্রেসী রাজত্বে তার অংশমাত্র নেই। তাতে জানা গেল, ভারতীয় ব্যবসাদার চিরদিন অসৎ ছিল না, এবং এককালে অসৎ ব্যবসায়ীকে কঠোর শাস্তি পেতে হ'ত। আফিং-এর ব্যবসা ক'রে চীনের সর্বনাশ যে ইংরেজ বণিক্‌শ্রেণী করেছিল, রাজশক্তির পূর্ণ সমর্থন নিয়ে, তাকে নিশ্চয় আপনি সৎ ব্যবসায়ী বলবেন না?"

"তাতে কি প্রমাণিত হ'ল?"

"শুধু এটুকু যে, নীতি-দুর্নীতির চিরন্তন মাপকাঠি ব্যবহারিক পৃথিবীতে নেই। আজ ইংরেজের নীতিবোধ আমাদের চেয়ে বেশি, তার কারণ বেঁচে থাকবার মৌলিক সমস্যাগুলির সে সমাধান ক'রে ফেলেছে। ধরুন, চাকরির কথা। ইয়োরোপে আজকাল আর বেকার কেউ নেই। কর্মপ্রার্থীদের চেয়ে চাকরির সংখ্যা বেশি। তাই লোকে বড় একটা চাকরির জন্যে অন্য লোকের—আত্মীয়-বন্ধুর শরণাপন্ন হয় না। সুতরাং আত্মীয়পোষণ নামে যে দুর্নীতি আমাদের দেশে চালু, ইয়োরোপে তা অনেক কম, এবং অন্য ধরনের।"

"তা ঠিক।"

"আমাদের দেশে মানুষ অনেক, চাকরি কম। বেকারের শেষ নেই।"

"সে জন্যেই ত একমাত্র যোগ্যতার ভিত্তিতে কর্ম হওয়া অত্যন্ত দরকার।"

"যতটা সম্ভব। তার চেয়ে বেশি নয়। যে অযোগ্য, তারও চাকরি চাই, দুর্গাভাইজি। তারও পেটে ক্ষিধে, জীবনের মার সেও কম খাচ্ছে না।"

"তবু একটা নীতি আমাদের ধরে থাকতেই হবে।"

"নিশ্চয়। কিন্তু তার সামান্য ব্যতিক্রমে, অল্প স্খলনে বিচলিত হ'লে চলবে না। ভেবে দেখুন, ভারতবর্ষে বহু শতাব্দী ধরে কোনও সামাজিক নীতি ও ন্যায় বোধ নেই। ইংরেজীতে যাকে ব'লে স্যোসাল মরালিটি। ব্যক্তিগত ন্যায় ও নীতি আমাদের দীর্ঘদিনের, কিন্তু সামাজিক ক্ষেত্রে বহু দুর্নীতিকে আমরা হাজার বছর প্রশ্রয় দিয়ে এসেছি।"

"যেমন?"

"উদাহরণের যে শেষ নেই, দুর্গাভাইজি। বিধবার অবস্থা থেকে একান্নবর্তী পরিবারের অসংখ্য অলস, কর্মহীন মানুষের পোষণ পর্যন্ত সবকিছুই সামাজিক দুর্নীতি ও ন্যায়-হীনতার মধ্যে আনা যায়। আত্মীয় পোষণ ত আমাদের

ধর্মের নির্দেশ! যে-কেউ একটু জীবনে দাঁড়িয়েছে, অমনি তার আত্মীয়বর্গ অনেক কিছু দাবি, আশা, প্রার্থনা নিয়ে তার দ্বারস্থ। আপনি তাদের ভাগিয়ে দিন, অমনি সবাই আপনাকে এমন বদ্‌নাম দেবে যে আপনি সহ্য করতে পারবেন না। তা ছাড়া ভাগাবেনই বা কেন আপনি? বহু শতাব্দীর শিক্ষা ও সংস্কার আপনাকে তাদের সঙ্গে বেঁধে রেখেছে; আপনি নিজেই চাইবেন তাদের জন্যে কিছু করতে, তাদের বাদ দিয়ে ত আপনার অস্তিত্ব পূর্ণ নয়! হাজার বছর ধরে আমাদের দেশে ঘুস বা উপরি-পাওনা নিত্যনৈমিত্তিক নীতি হয়ে চলে আসছে। যার মাইনে ছিল দশ টাকা, জমিদারী ব্যবস্থার কল্যাণে তার উপরি রোজগার ছিল মাইনের অনেক বেশি। ইংরেজ এদেশে এসে দেখল, এ ব্যবস্থা প্রাচীন; সে তার পরিবর্তন করবার চেষ্টা মাত্র করল না। ফলে, এককালে গুরুজনরা ছোটদের আশীর্বাদ ক'রে বলতেন, বাবা, দারোগা হও। ইংরেজ তার শাসনকার্যে ভারতীয়দের নিয়োগ করল সামান্য বেতনে, ধরে নিল 'উপরি' আর ঘুস ত এরা নেবেই। খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মেশান ভারতবর্ষে কতশত বছর ধরে চালু তার কি কেউ হিসেব করেছে? আমাদের ছোটবেলা শুনতে পেতাম, স্বর্ণকার নিজের মা এবং স্ত্রীর জন্যে গহনা গড়তে গেলেও সোনা চুরি করে। অর্থাৎ, সোনা যে সে চুরি করবে, সমাজ তা মেনেই নিয়েছিল। তারপর যত ইংরেজের রাজত্ব ন'ড়ে উঠল তত সামাজিক দুর্নীতি গেল বেড়ে। এক একটা লড়াই পথ ক'রে দিল আরও অনেক দুর্নীতির। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ঘুষ, ভেজাল, স্ত্রী-ব্যবসা ত বড়-রকমের ইণ্ডাষ্ট্রি হ'য়ে দাঁড়াল। সুতরাং সামাজিক দুর্নীতি আমাদের সভ্যতা ও সংস্কারের সঙ্গে বহু শতাব্দী ধ'রে অনেক ভাবে জড়িয়ে আছে। হঠাৎ একদিনে তাকে দূর করা সম্ভব নয়। করতে যাওয়াও বিপজ্জনক।"

"না, কোশলজি। একথা মানতে আমি রাজী নই। কংগ্রেস যখন মন্ত্রিত্ব নিল, দেশ যখন স্বাধীন হ'ল তখন দুর্নীতিপরায়ণ ব্যবসায়ী ও রাজকর্মচারীদের হৃদকম্প সুরু হয়েছিল। আমার মনে আছে, পণ্ডিতজির সেই কথা: 'ঘুষখোর আর অসৎ ব্যবসায়ীদের নিকটতম ল্যাম্প-পোষ্টে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেওয়া হবে।' সে সতর্কবাণীর ফল কি হয়েছিল একবার স্মরণ ক'রে দেখুন। আমি শুনেছি, কংগ্রেসী রাজত্বের প্রথম দিনগুলোতে সাধারণ পুলিস পর্যন্ত তার উপরি নিতে হাত পাতত না। আমরাই সেই সম্ভাবনাপূর্ণ অবস্থার সুযোগ নিতে পারি নি। মন্ত্রিত্ব নিয়ে যদি আমরা সত্যিকারের গান্ধীবাদী জীবনযাপন করতাম তা হ'লে আজকের অবস্থা সৃষ্টি হ'ত না। আমরা কেউ বিত্তবান্ লোক নই: না আপনি, না আমি, না মাধব দেশপাণ্ডে, না হরিশঙ্কর ত্রিপাঠী। অথচ মন্ত্রিত্ব নিয়ে আমরা যে জীবনযাত্রা বেছে নিলাম তার সঙ্গে আমাদের নিজস্ব জীবনের কোনও সাদৃশ্য নেই। আমরা কেন সহজ সরল সাধারণ মানুষের জীবন গ্রহণ করলাম না? এই এত বড় বড় বাড়ী, অভিনব আসবাবপত্র, অসংখ্য নোকর-বেয়ারা-মালী-চাপরাশি, চারিদিকে বিরাট্ আড়ম্বরের চোখ-ঝলসান জৌলুস, এতেই আমাদের চরিত্রের পতন সুরু হ'ল। কেন আমরা ইংরেজ গভর্ণরদের প্রাসাদগুলোকে হাসপাতাল, কলেজ বা মিউজিয়মে রূপান্তরিত করলাম না? কেন আমাদের স্বাধীন ভারতবর্ষের রাজ্যপালরা সে প্রাসাদগুলির পুরো আড়ম্বর বজায় রেখে তাতে বসবাস আরম্ভ করলেন? কেন আমরা পায়ে হেঁটে বা সাইকেল রিক্শয় চেপে শহরে ঘুরে বেড়াই না? কেন ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করি না? শুনেছি পশ্চিমবঙ্গের একজন নাম-করা দেশকর্মী মন্ত্রী হবার পর খালি পায়ে রাজভবনে ঢুকতে গিয়ে দারোয়ানের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন। অথচ আজীবন গান্ধীর চেলা হয়ে যদি আমরা খালি পায়ে দেশের সেবা করতে পেরে থাকি, আজ মন্ত্রী হয়ে কেন আমাদের সে মূল্যবোধ রাতারাতি বদলে গেল? এই বিলাসপুর শহরেই রাজ্যপালের গাড়ি যখন চলে তখন পুলিশ আর সব গাড়িকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখে। তার কি সত্যি কোনও প্রয়োজন আছে? রাজ্যপাল ত সবাকার সেবক। কেন তিনি সাম্রাজ্যবাদীর আড়ম্বর উপভোগ করবেন? এসব প্রশ্ন নিশ্চয় প্রত্যেক কংগ্রেসকর্মীর মনে হয়েছে, অথচ কেউ প্রকাশ্যে তা উত্থাপন করতে পর্যন্ত সাহস পায় না। এতদিনকার এত বড় একটা সংগ্রামের সুমহান্ আদর্শ এত সহজে কেন, কি ক'রে পচতে সুরু করল আমি তা ভেবে পাই নে।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মনেও যে এসব প্রশ্নের যন্ত্রণা হয় নি তা নয়। কিন্তু দুর্গাভাই দেশাই-এর মত তিনি বাস্তব না মেনে নিতে পারার ব্যথায় কষ্ট পান না। জীবনে, তিনি জানেন, অনেক কিছু ঘটে, যা না ঘটলে মানুষের ইতিহাস এমন দুর্ঘটনাবহুল হ'ত না। তা ছাড়া, নীতি ও ন্যায়ের আদর্শকে সামনে রেখে বাস্তবপথে যতটা চলা যায় তার বেশি তা নিয়ে মাথা-ঘামানো কৃষ্ণদ্বৈপায়নের স্বভাব নয়।

রাজনীতির কারবার বাস্তব নিয়েঃ আদর্শ তার লক্ষ্য, কিন্তু আদর্শ ও বাস্তবে তফাৎটুকু সে সর্বদা মেনে চলে। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আরও জানেন, মানুষ তার সকল দুর্বলতা নিয়েই মানুষ, তার সব স্খলন, পতন, ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়েই সে সম্পূর্ণ। শাসন হ'ল ক্ষমতার দৈনন্দিন ব্যবহার। শাসন করতে গেলে শাসক ও শাসিতের মধ্যে দূরত্ব প্রয়োজনীয়। গণতন্ত্র সকলের রাজত্ব হ'লেও এখানে সবাই রাজা নয়। সে রাজত্ব সম্ভব যখন সবাকার চেতনা, নাগরিক নীতিবোধ অনেক উঁচুতে সুস্থির। সে অবস্থায় শাসনের বিশেষ প্রয়োজনই নেই। ভারতবর্ষের মত দেশে গণতন্ত্র চলতে পারে না তাকে রাজতন্ত্রের পোশাক না পরালে। অশিক্ষিত অচেতন জনসাধারণ; শাসকদের অনেক উঁচুতে না ব'সে তাদের ওপর রাজত্ব করা সম্ভব নয়। তার কারণ ভারতীয় গণতন্ত্রের গোড়ার গলদ। গলদ নয়, দারিদ্র্য, অভাব। গণতন্ত্র প্রত্যেক নাগরিকের সমান অধিকার স্বীকার করে নেয়। ভারতীয় গণতন্ত্রে আকবর বাদশা আর হরিপদ কেরাণীর কোনও ভেদ নেই। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে ভেদ আছে, ভেদের শেষ নেই। শুধু আকবর বাদশা আর হরিপদ কেরাণীর নয়; হরিপদ কেরাণী আর কেষ্ট চাঁড়ালের মধ্যেও তফাৎ অনেক। গণতন্ত্র সবাইকে সবকিছু দেবার অঙ্গীকার করে। শিক্ষা, রুজি, গৃহ, স্বাস্থ্য সব-কিছু দেবার অঙ্গীকারে সে আবদ্ধ। ধর্ম, জাতি, ভাষা নির্বিশেষে। অথচ ভারতীয় গণতন্ত্রের দেবার ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল ভাবেন, ভোট নেবার সময় অঙ্গীকারের সীমা টানি নে আমরা। অথচ জানি, যা দেব বলছি তা দেবার ক্ষমতা আমাদের নেই। জেনে-শুনে আমরা ধোঁকা দিচ্ছি। আমাদের গণতন্ত্রের মধ্যে এ ধোঁকা নিহিত রয়েছে। সাধারণ মানুষ নিজেদের অধিকার জানে না, তাই এ গণতন্ত্র চলছে। জানলে, চলত না। আসত বিপ্লব, ঘটত অনাচার। জনসাধারণকে ভুলিয়ে রাখি আমরা। নানা কথায়, নানা অঙ্গীকারে। ভবিষ্যতের রঙিন স্বপ্ন দিয়ে। আদর্শের তপ্ত আলোকে মন রাঙিয়ে। আর নয়ত তাদের চিত্তকে আমরা বিভ্রান্ত ক'রে দি। রাজনীতির এ বাস্তব কুৎসিত চেহারা দেখে আমাদের ভয় পেলে চলবে না। এ খেলায় এসব বহু-পরীক্ষিত অস্ত্র। শাসকদের থেকে শাসিতকে দূরে রাখার কৌশলও অন্যতম অস্ত্র মাত্র।

চার বছর কোশল-মন্ত্রীসভা বেশ ভালই চলেছিল।

ভাঙন লাগল পঞ্চম বছরে।

ভাঙন লাগল মহেন্দ্র বাজপাঈকে নিয়ে।

সুদর্শন ত্রুবে ছিলেন প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি। তিনি হঠাৎ দাবি ক'রে বসলেন হরিশংকর ত্রিপাঠীকে মন্ত্রীসভায় রাখা চলবে না।

এ দাবির পেছনে ছিল বহুদিনের সংঘাত, বিদ্বেষ, শত্রুতা।

তা চরমে উঠল একজন রমণীকে নিয়ে।

তার নাম সরোজিনী সহায়।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সুদর্শন ত্রুবের দাবি মানতে পারলেন না। মহেন্দ্র বাজবাঈর প্রতি তাঁর বিশেষ কোনও দুর্বলতা ছিল না। পারলে তিনি মন্ত্রীসভা থেকে তাঁকে খুশী হয়েই সরিয়ে দিতেন। কিন্তু কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বুঝলেন, মন্ত্রিত্বে একবার ভাঙন সুরু হ'লে তাকে আর ধরে রাখা যাবে না। তখন অনেক দল-উপদলপতির অনেক দাবি একসঙ্গে মাথা নাড়া দিয়ে উঠবে।

তা ছাড়া, সরোজিনী সহায়কে নিয়ে যে অপরাধ মহেন্দ্র বাজপাঈ-এর, সে অপরাধ সুদর্শন ত্রুবেরও। সে অপরাধে অন্য মন্ত্রীদের মধ্যেও অনেকে অপরাধী।

নারী-ঘটিত কেলেঙ্কারী প্রকাশ্যে টেনে এনে সমস্ত মন্ত্রীসভা ও তাঁর নিজস্ব নেতৃত্বের অবমাননায় কৃষ্ণদ্বৈপায়ন রাজী হলেন না।

দুর্গাভাই দেশাইও তাঁর মতে সায় দিলেন।

কিন্তু দেখা গেল, সুদর্শন ত্রুবের দল ভারী হয়ে উঠেছে। মাধব দেশপাণ্ডে এবং আরও তিনজন মন্ত্রী তাঁর সঙ্গে ভিড়েছেন।

দুর্গাভাই দেশাইর মনেও সব ব্যাপারটা নিয়ে তিক্ততা জমে রয়েছে।

প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির এক্জিকিউটিভ সভায় সুদর্শন ত্রুবের প্রচেষ্টায় একদিন এক প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশলকে অনুরোধ করা হ'ল তিনি যেন প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতির সঙ্গে সলা-পরামর্শ ক'রে তাঁর মন্ত্রীসভা পুনর্গঠন করেন। তা না হ'লে মন্ত্রীসভায় জনসাধারণের আস্থা দীর্ঘদিন বজায় থাকবে না।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ঝড়ের সঙ্কেত পেলেন।

তখন প্রাদেশিক কংগ্রেসের নির্বাচন আসন্ন।

তিনি হরিশংকর ত্রিপাঠীকে কংগ্রেসের সভাপতি করতে চাইলেন।

হরিশংকর সহজে রাজী হলেন না। কিন্তু শেষ অবধি হ'লেন।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কেন্দ্রীয় নেতাদের বোঝালেন যে, প্রাদেশিক কংগ্রেসের নেতৃত্ব ও মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে পূর্ণ সদ্ভাব না থাকলে রাজত্ব করা অসম্ভব।

সুদর্শন ত্রুবের সঙ্গে তাঁর অসদ্ভাব বহুদিনের।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সমস্ত শক্তি নিয়োগ করলেন প্রাদেশিক কংগ্রেসের নেতৃত্ব রক্ষা করতে। বহু অর্থ ব্যয় হ'ল। অনেক নতুন লোককে তাঁর অনুগতেরা কংগ্রেসের প্রাথমিক সভ্য করল।

কিন্তু নির্বাচনে তাঁর হার হ'ল।

এক চুলের জন্যে জিতে গেলেন সুদর্শন ত্রুবে।

সেই যে ভাঙন সুরু হ'ল তা আর রোধ করা গেল না।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন চেয়েছিলেন সুদর্শন ত্রুবেকে প্রাদেশিক কংগ্রেসের নেতৃত্ব থেকে সরাতে।

এবার সুদর্শন ত্রুবের খেলা সুরু হ'ল: কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে মুখ্যমন্ত্রীর গদি থেকে সরাবার।

সুদর্শন ত্রুবের খেলা প্রথমে চলল সতর্কে, মন্থর-চক্রান্তে।

তিনি প্রথমে হাত করলেন হরিশংকর ত্রিপাঠীকে। ত্রিপাঠী প্রাদেশিক কংগ্রেসের নির্বাচনে হেরে গিয়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ওপর বীতরাগ হয়েছিলেন। সুদর্শন ত্রুবে তাঁকে বোঝালেন, কৃষ্ণদ্বৈপায়নের আসল উদ্দেশ্য ছিল মন্ত্রীসভা থেকে তাঁকে সরিয়ে দেবার। ত্রিপাঠীকে আশ্বাস দিলেন, নতুন মন্ত্রীসভা তৈরী হ'লে তিনি স্বরাষ্ট্রবিভাগের দায়িত্ব পাবেন।

মাধব দেশপাণ্ডের সঙ্গে সুদর্শন ত্রুবের কোনওদিন বিশেষ সদ্ভাব ছিল না। ত্রুবেজিকে তিনি কদাচ বিশ্বাস ক'রে উঠতে পারতেন না। তাই সুদর্শন মাধব দেশপাণ্ডেকে একসঙ্গে লোভ এবং ভয় দেখালেন। লোভ দেখালেন অর্থমন্ত্রিত্বের। ভয় দেখালেন বনবাসের। সেচ ও বিদ্যুৎ বিভাগের দুর্নীতি-দুরাচারের কথা কারুর জানতে বাকী নেই। নতুন মুখ্যমন্ত্রী যদি মাধব দেশপাণ্ডেকে মন্ত্রীসভায় আদৌ স্থান না দেন, লোকে তাঁর নিন্দা করবে না, বরং প্রশংসা করবে।

মন্ত্রীসভার বেশির ভাগ সদস্যকেই নানা কৌশলে সুদর্শন ত্রুবে হাত করলেন।

তখন সমস্যা হ'ল দুর্গাভাই দেশাইকে নিয়ে।

দুর্গাভাই কোশল-মন্ত্রীসভার নেতা না হলেও, দ্বিতীয় প্রধান স্তম্ভ। আসলে, তিনিই তার প্রধান অলঙ্কার। তাঁর মত আদর্শবাদী সজ্জন মন্ত্রীসভায় আছেন ব'লে সারা দেশে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের অনেকখানি সুনাম। দুর্গাভাইকে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের বিরুদ্ধে না আনতে পারলে মন্ত্রীসভার জীবননাশ সম্ভব নয়।

সুদর্শন ত্রুবে জানতেন, দুর্গাভাই তাঁকে পছন্দ করেন না। তাঁর চরিত্রে, নীতি-ন্যায়-বলে দুর্গাভাই-এর আস্থা নেই। দুর্গাভাই কৃষ্ণদ্বৈপায়নকেও পুরো পছন্দ করেন না। তাঁর দুর্বলতা, স্খলন-ত্রুটি সব তিনি জানেন। কিন্তু সব জেনেও কৃষ্ণদ্বৈপায়নের অসামান্য ব্যক্তিত্বের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা কম নয়। তা ছাড়া, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দুর্গাভাইকে কদাচ প্রতারণা করেন নি। নিজের দুর্বলতা তাঁর কাছে গোপন করবার ব্যর্থ চেষ্টাও করেন নি। পাঁচ বছরের সহকর্মে দু'জনের মধ্যে বেশ একটা পারস্পরিক বোঝাবুঝি তৈরি হয়ে গেছে। দুর্গাভাইকে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আগাগোড়া যথেষ্ট সম্মান দেখিয়ে এসেছেন।

কোশল-মন্ত্রীসভার দুর্বলতা ও ব্যর্থতা দুর্গাভাই যেমন জানতেন, তেমনি আরও জানতেন যে অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে তুলনায় তার স্থান খুব নীচে নয়। তা ছাড়া, মন্ত্রীরা যদি দুর্বল-চরিত্র হন, লোভ সংবরণ করতে না পারেন, ক্ষমতায় বিনীত না হয়ে দাম্ভিক ও অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন, তা হ'লে একমাত্র মুখ্যমন্ত্রীকে দোষ দিলে চলবে কেন?

কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে সরিয়ে দিলেই উদয়াচলের প্রশাসন উন্নততর হবে, সুদর্শন ত্রুবের এ দাবি দুর্গাভাই-এর কাছে দুর্বল ও অবাস্তব মনে হ'ল।

তিনি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে রাজী হ'লেন না।

এমনি ক'রে কোশল মন্ত্রীসভা ষষ্ঠবর্ষে পদার্পণ করল।

সংকট-সংকুল বছর। সাধারণ নির্বাচন এ বছরের শেষে!

সুদর্শন ত্রুবে বুঝলেন, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মুখ্যমন্ত্রী থেকে নির্বাচন পরিচালনা করলে, নতুন মন্ত্রীসভার নেতৃত্বও তাঁরই থাকবে। তখন তিনি নিজের ইচ্ছামত সদস্য নির্বাচন করবার অনেক সুযোগ পাবেন। নতুন মন্ত্রীসভাও তিনি গঠন করবেন অনেকখানি নিজের ইচ্ছামত।

তার পর আর তাঁকে মুখ্যমন্ত্রিত্ব থেকে সরানো যাবে না।

সুতরাং, মন্ত্রীসভার পতন ঘটানো এক্ষুণি দরকার। বিলম্বে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের জয়। সুদর্শন ত্রুবের পরাজয়।

সমস্যা তখনও দুর্গাভাই দেশাইকে নিয়ে।

এই সংকট-মুহূর্তে ভাগ্য কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ওপর হঠাৎ রুষ্ট হয়ে উঠল।

তিনটি ঘটনা এমন আকস্মিক ঘটে গেল যে, অমন ধুরন্ধর রাজনৈতিক কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল কিছুই করতে পারলেন না।

উদয়াচল সাধারণতঃ খাদ্যশস্যে বাড়তি প্রদেশ। শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য অনগ্রসর, কিন্তু লোকসংখ্যার তুলনায় কৃষি-উৎপাদন প্রয়োজনের অতিরিক্ত। অতএব, মানুষগুলির জীবনযাত্রা দরিদ্র হ'লেও ক্ষুধায় কাতর নয়। উদয়াচলে প্রচুর চাল, বজরা, মক্কা, তিল ও চিনেবাদাম উৎপন্ন হয়। ভারতের অন্য প্রদেশ উদয়াচল থেকে চাল ও বজরা কেনে। রাজস্বের অন্যতম প্রধান উপায় হ'ল উদ্‌বৃত্ত চাল।

বছর ধ'রে বৃষ্টির অভাব। শস্য ভাল হয় নি! বিশেষ ক'রে চাল। বাজারে চাল আসছে না যথেষ্ট পরিমাণে। দাম বাড়ছে। কংগ্রেসী রাজত্বে সর্বপ্রথম মানুষের পেটে অতৃপ্ত ক্ষুধা।

মন্ত্রীসভায় এ নিয়ে গুরুতর অশান্তি।

খাদ্যের অভাব, চাল ও বজরার উঠ্‌তি দাম, জনসাধারণের দৃষ্টি টেনে এনেছে সেচ ব্যবস্থার প্রতি। হঠাৎ দেখা গেল, কাগজে কলমে যতগুলো ছোট ও মাঝারি সেচ ব্যবস্থা তৈরী হয়েছে ব'লে লিপিবদ্ধ তার অনেকগুলির অস্তিত্বই নেই।

আট হাজার টিউবওয়েল বসান হয়েছে ব'লে বিধান সভায় বিবৃতি দেওয়া হয়েছিল। 'ভারত টাইম্‌স্' হঠাৎ একদিন সংবাদ পরিবেশন ক'রে বসল যে, চার হাজারের বেশি টিউবওয়েল কদাপি বসান হয় নি; তার মধ্যে দু-হাজার আট শ' ত্রিশটি মাত্র চালু রয়েছে।

বিধানসভায় বিরোধী দল জরুরী প্রশ্ন তুললেন।

মাধব দেশপাণ্ডে জোর গলায় বললেন, 'ভারত টাইম্‌স্'-এর সংবাদ মিথ্যে। আট হাজার টিউবওয়েল ঠিকই বসান হয়েছে, যদিও তাদের মধ্যে সবগুলি কাজ করছে না।

বিরোধী দলগুলি দাবি করল, কোন্ কোন্ গ্রামে টিউবওয়েল বসান হয়েছে তার তালিকা পেশ করা হোক।

মাধব দেশপাণ্ডে চট্ ক'রে রাজী হলেন না। বললেন, 'খাদ্যশস্যের বর্তমান পারস্থিতির জন্যে সরকার উদ্বিগ্ন। সেচবিভাগ পুরোদমে কাজ করছে, সেচ-ব্যবস্থাকে কৃষির প্রয়োজন মেটাবার উপযুক্ত করতে। এ সময়ে আট হাজার গ্রামের তালিকা তৈরী করা সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ।

বিরোধী দলগুলি উত্তেজিত হয়ে উঠল। বিধান সভা বিশৃঙ্খল হ'ল।

স্পীকার মন্ত্রী মাধব দেশপাণ্ডের কথায় খুশী হ'লেন না। বললেন, "টিউবওয়েলের ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ। সরকারের পক্ষ থেকে যে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে, বিরোধী দলগুলি তার যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করছেন।"

জনৈক বিরোধী নেতা ব'লে উঠলেন, "আমরা জানি, সরকারী বিবৃতি মিথ্যা।"

স্পীকার তাঁকে তিরস্কার করলেন। কিন্তু বললেন, "সরকার অনায়াসে বিরোধী পক্ষের সন্দেহ ও অভিযোগ দূর করতে পারেন। যে-সব গ্রামে বা সহরে টিউবওয়েল বসান হয়েছে তার লিষ্ট তৈরী করতে খুব বেশি সময় বা অর্থব্যয় হবার কথা নয়। সুতরাং মন্ত্রী মহাশয়কে আমি অনুরোধ করছি, এ লিষ্ট যেন এক মাসের মধ্যে বিধান সভায় দাখিল করা হয়।"

মন্ত্রীসভায় ঝড় উঠল। দুর্গাভাই জানতে চাইলেন, টিউবওয়েলগুলি সত্যিই বসান হয়েছে কি না।

মাধব দেশপাণ্ডে নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করলেন। এ প্রশ্ন করার মানেই তাঁর প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করা।

দুর্গাভাই বললেন, 'উদয়াচলের 'টিউবওয়েল স্ক্যানডেল' সারা ভারতবর্ষে জানাজানি হয়ে গেছে। সংবাদপত্রে এ নিয়ে কঠোর সমালোচনা হচ্ছে। মন্ত্রীসভার সুনাম যেতে বসেছে। এ অবস্থায় ঢাক-ঢাক নীতি তিনি বরদাস্ত করতে রাজী নন।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "লিষ্ট তৈরী হচ্ছে। সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যেই প্রকৃত অবস্থা জানা যাবে।"

দু'সপ্তাহ পরে বিধান সভায় আট হাজার টিউবওয়েলের তালিকা দাখিল করা হ'ল।

তার তিনদিন পরে 'ভারত টাইম্‌স্' ঘোষণা করলেন যে, উল্লিখিত গ্রামগুলোর অন্তত এক-তৃতীয়াংশের কোনও অস্তিত্বই নেই। তাদের অস্তিত্ব কেবল মাধব দেশপাণ্ডের কল্পনায়।

কয়েকটি গ্রামে, 'ভারত টাইম্‌স্' জানালেন, টিউবওয়েলের নামগন্ধ নেই। গ্রাম আছে, কিন্তু টিউবওয়েল নেই, কোনও দিন ছিল না।

মাধব দেশপাণ্ডে সব দোষ চাপিয়ে দিলেন বিভাগীয়

কর্মচারীদের ওপর। তিন জন ইরিগেশন ইঞ্জিনীয়রকে সাসপেণ্ড করা হ'ল।

দুর্গাভাই কৃষ্ণদ্বৈপায়নের কাছে এর চেয়ে অনেক কড়া ব্যবস্থার দাবি করলেন। মুখে নয়, একেবারে লিখিত ভাবে।

"মন্ত্রীরা সীজরের পত্নী নন। তাঁরা কলঙ্কের উর্ধ্বে নন। মন্ত্রীদের দুরাচারে দেশের সর্বনাশ। এত বড় একটা কেলেঙ্কারীতে সেচমন্ত্রীর কোনও নিজস্ব দায়িত্ব নেই, আমি মানতে পারি না। তাঁর এক্ষুণি পদত্যাগ করা উচিত। না করলে মুখ্যমন্ত্রীর কর্তব্য তাঁকে বরখাস্ত করা। কর্তব্য, টিউবওয়েল ব্যাপারে নিরপেক্ষ অনুসন্ধানের জন্যে হাই-কোর্টের বিচারপতির অধীনে একটি কোর্ট বসান। এর কমে মন্ত্রীসভার কলঙ্ক যাবে না। জনসাধারণও শান্ত হবে না।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দুর্গাভাই-এর দাবি মানতে পারলেন না।

বললেন, "মাধব দেশপাণ্ডে অন্যায় করেছেন, মানছি। কিন্তু তিনি জেনেশুনে এত বড় একটা কেলেঙ্কারী ঘটতে দিয়েছেন একথা আমার বিশ্বাস হয় না। মাধব দেশ-পাণ্ডেকে আমি জানি। অনেক বড় অন্যায়ের দুঃসাহস তাঁর নেই।"

দুর্গাভাই বললেন, "এটা মনস্তত্ত্বের কথা নয় কোশলজি। সত্য ও তথ্যের কথা।"

"ধরুন, আজ মাধব দেশপাণ্ডেকে আমরা পদত্যাগে বাধ্য করলাম, তাতে কার লাভ?"

"উদয়াচলের।"

"তা নয়। লাভ একমাত্র একজনের। সে হ'ল সুদর্শন দুবে। সে চাইছে এ মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে যাক। এই কেলেঙ্কারী একবার যদি মেনে নি তা হ'লে মন্ত্রীসভা আর টিঁকে থাকবে না।"

দুর্গাভাই বললেন, "যে-কোনও প্রকারে মন্ত্রীসভা টিঁকিয়ে রাখতেই হবে, এই কি আপনার বক্তব্য?"

"একটু ভেবে দেখুন দুর্গাভাইজি। বছর না ঘুরতে নতুন নির্বাচন। এখন মন্ত্রীসভার পতন ঘটলে এক বিশেষ জটিল অবস্থার সৃষ্টি হবে। নির্বাচনের পর নতুন মন্ত্রীসভায় মাধব দেশপাণ্ডেকে না রাখলেই ত আপনার দাবি মেটান হ'ল।"

"না, হ'ল না। আমি চাই বর্তমান দুর্নীতির অবিলম্ব প্রতিকার। বছর দেড় বছর পর কি হবে কেউ বলতে পারে না। মাধব দেশপাণ্ডে হয়ত এমন কলকাঠি নাড়বেন যে মন্ত্রীসভায় তাঁকে আপনার নিতেই হবে।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "দুর্গাভাইজি, ভেবে দেখুন মাধব দেশপাণ্ডের পদত্যাগ দাবির পরিণাম কি হবে। জন-সাধারণের কাছে মেনে নেওয়া হবে যে, টিউবওয়েল ব্যাপার নিয়ে মন্ত্রীসভা বিষম দুরাচারের প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে। মেনে নিলে কংগ্রেসী রাজত্বের অবসান হবে না; উদয়া-চলে কংগ্রেসকে নির্বাচনে হারাতে পারে এমন শক্তি এখনও জন্মায় নি, আরও বহুদিন জন্মাবে না। কিন্তু সুদর্শন দুবের কাছে আমাদের পরাজয় হবে। মাধব দেশপাণ্ডেকে সুদর্শন দুবে বাধ্য করবে পদত্যাগ না করতে। তখন সমস্ত মন্ত্রীসভার পদত্যাগ অনিবার্য হয়ে উঠবে। আর মন্ত্রীসভার পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে সুদর্শন তার নিজের নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করতে চাইবে। যদি না-ও চায় তা হ'লেও আগামী নির্বাচনে কংগ্রেস-প্রার্থী মনোনয়নে তার কর্তৃত্ব হবে অনেক বেশি, এবং নির্বাচনের পর সে নিজের নেতৃত্বে বা ইচ্ছামত মন্ত্রীসভা গঠন করতে পারবে।"

দুর্গাভাই বললেন, "মন্ত্রিত্ব যে-কোনও প্রকারে করতেই হবে এমন কোনও দাসখৎ আমি অন্তত কাউকে লিখে দি নি।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন জবাব দিলেন, "তা আমি জানি। বিশ্বাস করুন, মুখ্যমন্ত্রিত্ব করতেই হবে, যে কোনও দামে, যে কোনও প্রকারে, এমন মনোভাব আমারও নেই। আমি মুখ্যমন্ত্রিত্ব ছাড়তে রাজী আছি—কিন্তু সুদর্শন দুবের কাছে নয়। আজ যদি আমি স'রে দাঁড়াই বা ওঁরা আমাকে সরিয়ে দিতে পারেন, তা হ'লে উদয়াচলের মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন আপনি কি জানেন না? হয় সুদর্শন দুবে নিজে, নয়ত মাধব দেশপাণ্ডে বা হরিশঙ্কর ত্রিপাঠী! আমার নেতৃত্বে অনেক দোষ দুর্বলতা থাকতে পারে, নিশ্চয় আছে; কিন্তু উদয়াচলের ভাগ্য আমি বিনা সংগ্রামে সুদর্শন দুবের হাতে তুলে দেব না। উদয়াচলকে আমি এতটুকু নিশ্চয় ভালবাসি।"

দুই কারণে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের এই কথাগুলি দুর্গাভাই-এর ভাল লাগে নি। প্রথমত, অন্যায় অনাচার দুরাচার ঘটেছে জেনেও তিনি তার প্রতিকার করতে বিমুখ; মুখে যাই বলুন না কেন, মুখ্যমন্ত্রিত্ব কোশলজি ত্যাগ করতে রাজী নন। তাঁর কাছে এখন সুদর্শন দুবের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ক্ষমতা-সংগ্রামের দাম সবচেয়ে বেশি। আদর্শ, ন্যায়-নীতি, জনস্বার্থ সব কিছুকেই এ সংগ্রামে জিতবার জন্যে তিনি ছাড়তে প্রস্তুত।

দ্বিতীয় যে কারণে কৃষ্ণদ্বৈপয়ানের কথা দুর্গাভাইকে খুশী

করল না তা একান্ত ব্যক্তিগত। খানিকটা সূক্ষ্ম : দুর্গাভাই নিজেই তা মানতে রাজী নন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, তিনি যদি মুখ্যমন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন, গদিতে বসবেন হয় সুদর্শন দুবে, নয় মাধব দেশপাণ্ডে, নয় হরিশঙ্কর ত্রিপাঠী। কথাটায় দুর্গাভাই অপমানিত বোধ করলেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কি তবে ভুলে গেছেন, তিনি, দুর্গাভাই দেশাই, ইচ্ছে প্রকাশ করলেই মুখ্যমন্ত্রিত্ব পেতে পারেন? তিনি কথা বলেন সতর্কতার সঙ্গে—মুখ দিয়ে সহজে অসাবধান কথা তাঁর নির্গত হয় না। সুতরাং ইচ্ছে করেই তিনি পরোক্ষে দুর্গাভাইকে বুঝিয়ে দিলেন যে, তাঁকে তিনি আর প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেন না।

দুর্গাভাই আদর্শবান্, সৎ, নীতিতে দৃঢ়। কিন্তু তিনি আত্মসচেতন, দাম্ভিক, স্তুতিপ্রিয়। প্রসংসা শুনতে ভালবাসেন, শুনলে খুশী হন, না শুনলে অপমানিত বোধ করেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাঁর অসামান্য উজ্জ্বল চরিত্রের এই মলিনতাটুকু জানেন। তাই সর্বদা তাঁকে তিনি সযত্নে প্রশংসা করেন। আজ উত্তেজনার মুহূর্তে তিনি যথেষ্ট সতর্ক ছিলেন না। দুর্গাভাই যে আহত হ'লেন, তিনি বুঝতেও পারলেন না।

দ্বিতীয় ঘটনা ঘটল কৃষ্ণদ্বৈপায়নের অগোচরে।

উদয়াচলে কলকারখানা বলতে যা আছে তার প্রধান স্থান দখল করেছে তিনটি কাপড়ের কল। মালিক তিনটি গুজরাতী পরিবার; বিবাহ-সূত্রে পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ। তিনটি কারখানার বেশির ভাগ শেয়ারই তিন পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তিনটি কারখানার মধ্যে যেটি সব চেয়ে বড় তার নাম সুখনলাল কটন মিল্‌স্। এরা উৎপাদন করে কেবল ধুতি ও শাড়ী।

চাল, গম ও বাজরার দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কাপড়ের দামও আস্তে আস্তে বেড়ে গেল। খুচরা দোকানীরা নালিশ করল, পাইকারী ব্যবসায়ীরা মাল ছাড়ছে না। পাইকারী ব্যবসাদাররা বলল, সুখনলাল কটন মিল্‌স্ নিজেই মাল গুদামে রাখছে, বিক্রী করছে না।

শিল্পমন্ত্রী হরিশঙ্কর ত্রিপাঠী সুখনলাল বিঠলদাস প্যাটেলকে ডেকে পাঠালেন। সুখনলাল বললেন, কাপড়ের উৎপাদন ভয়ানক কমে গেছে। বৃষ্টির অভাবে কার্পাস ভাল হয় নি, তুলার বড় অভাব। বিদেশী তুলা ত আমদানী খুব কম—বিদেশী মুদ্রা কোথায়? বাধ্য হয়ে উৎপাদন কমিয়ে দিতে হয়েছে। মাল তাঁরা গুদামে আটকে রাখছেন এ অভিযোগ একেবারে মিথ্যে। ত্রিপাঠীজি ইচ্ছে করলে পুলিশ দিয়ে অনুসন্ধান করাতে পারেন।

হরিশংকর ত্রিপাঠী মুখ্যমন্ত্রীর কাছে নোট পাঠালেন। প্রস্তাব করলেন, পুলিশ দিয়ে ব্যাপারটার অনুসন্ধান করা হোক।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নোট পেয়েই পুলিশ কমিশনারকে অনুসন্ধানের আদেশ দিলেন।

তিনদিন পরে রিপোর্ট পেলেন সুখনলাল কটন মিল্‌স্-এর মালিকদের নিজস্ব গুদামে ধুতি-শাড়ী মজুত করা হচ্ছে, এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

ক্যাবিনেট মিটিংএ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হরিশঙ্কর ত্রিপাঠীর নোট, তাঁর নিজের মন্তব্য ও পুলিশ কমিশনারের রিপোর্ট দাখিল করলেন।

এ ব্যাপারের তিনদিন পর দুর্গাভাই 'জনৈক নাগরিক'-এর কাছ থেকে একখানা পত্র পেলেন। তাতে লেখা আছে: "উদয়াচলের অন্ধকার আকাশে আপনিই একমাত্র তারকা। যে রাজনৈতিক তমসা এ প্রদেশকে আচ্ছন্ন ক'রে আছে তার মধ্যে আপনিই একমাত্র আলোর ভরসা। তাই আপনাকে ছাড়া এ পত্র কাকে লিখব? সুখনলাল কটন মিল্‌স্-এ উৎপাদন কমে নি, বরং বেড়েছে। প্রতিদিন লরী বোঝাই ধুতি-শাড়ী কলকাতায় রপ্তানী হচ্ছে রাতের অন্ধকারে। মুখ্যমন্ত্রী এ খবর খুব ভাল করেই জানেন। কিন্তু তিনি সুখনলালের বিরুদ্ধে কিছু করতে রাজী নন। কারণ তাঁর পুত্র শ্যামাপ্রসাদ সুখনলাল কটন মিল্‌স্-এর সোল এজেন্সী চেয়েছে কুষাণপুর জেলায়। আমার কথা প্রত্যয় না হ'লে আপনি অনুসন্ধান ক'রে দেখুন।"

দুর্গাভাই গোপনে অনুসন্ধান করলেন। মাল চালানের কোনও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পেলেন না। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ কোশল যে কুষাণপুর জেলায় সুখনলাল কটন মিল্‌স্-এর সোল এজেন্সী চেয়েছে তা তিনি জানতে পারলেন।

খবরটা তাঁকে দিলেন হরিশংকর ত্রিপাঠী।

তৃতীয় ঘটনা ঘটল কৃষ্ণদ্বৈপায়নের অন্দর-মহলে।

একদিন দুপুরে দুর্গাভাই-এর গৃহে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-পত্নী পদ্মাদেবীর বৃদ্ধা দাসীর আগমন হ'ল। দুর্গাভাই আহারান্তে বিশ্রাম করছিলেন। দাসী এসে ঘোমটায় মুখ ঢেকে দরজায় দাঁড়াল। নিবেদন করল, সময় যদি থাকে, দুর্গাভাই যেন বিকেল চারটের সময় একবার পদ্মাদেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

পূর্বে বলেছি, পদ্মাদেবীর সঙ্গে দুর্গাভাই-এর একটি শ্রদ্ধা

ও প্রীতির সম্পর্ক ছিল। পদ্মাদেবীকে দুর্গাভাই যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর গান্ধীবাদী সংগঠন উদ্যোগে তাঁর কাছ থেকে সাহায্য কম পান নি।

দুর্গাভাই জানতেন পদ্মাদেবী ইদানীং সংসারধর্ম প্রায় পরিত্যাগ করেছেন। দিনরাত্রির বেশির ভাগ সময় পূজা-অর্চনা নিয়ে থাকেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের সঙ্গে সম্পর্ক তাঁর নেই বললেই হয়। চারটার সময় দুর্গাভাই মুখ্যমন্ত্রী ভবনে হাজির হলেন। ঠিক মুখ্যমন্ত্রী ভবনে নয়, পদ্মাদেবীর অন্দর-মহলে।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সেদিন গেছেন এক জেলা শহরে কৃষি-মেলা উদ্বোধন করতে।

দাসী এসে দুর্গাভাইকে পদ্মাদেবীর পূজার ঘরে নিয়ে গেল।

শীর্ণ দেহ গৌরবর্ণ পদ্মাদেবীকে দেখে দুর্গাভাই সশ্রদ্ধ নমস্কার জানালেন।

বললেন, "তলব করেছেন, ভাবীজি?"

ম্লান হেসে পদ্মাদেবী বললেন, "তলবই করতে হ'ল ভাইয়া, তলব না করলে ত আর আপনার দর্শন মেলে না?"

সবিনয়ে দুর্গাভাই বললেন, "রাজকার্যে দিনরাত কেটে যায়। সময় আর পাই নে।"

পদ্মাদেবী বললেন, "তা কি আর জানি নে ভাইয়া? আপনারা রাজত্ব চালান, না রাজত্ব আপনাদের চালায় সেটা ঠিক বুঝতে পারি নে।"

"তা যা বলেছেন, ভাবীজি। আমরা রাজত্ব চালাই নে। রাজত্বই আমাদের চালায়।"

"এ এক বিচিত্র ব্যাপার, ভাইয়া। আপনাদের পলিটিক্স! বন্ধু নেই, স্নেহ নেই, ন্যায়, ধর্ম, নীতি কিছু নেই। আনুগত্য নেই, বিশ্বাস নির্ভরশীলতা নেই। এ ত এক হিংস্র জঙ্গল-জীবন!"

দুর্গাভাই-এর মুখে কথা সরল না।

পদ্মাদেবী বললেন, "মনে আছে, এককালে আপনারা যখন দেশের কাজ করতেন? তখন আদর্শ ছিল, ব্যথা, অনুভূতি, আনুগত্য ছিল। বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়বার দুঃসাহস ছিল। অনেকখানি সততাও আপনাদের অনেকের ছিল।"

"তা ছিল।"

"আজ সে সব গেল কোথায় ভাইয়া?"

দুর্গাভাই জবাব খুঁজে পেলেন না।

পাল্টা প্রশ্ন করলেন: "তার কি কিছুই নেই ভাবীজি?"

"কিছু নেই কি ক'রে বলব? আপনি ত এখনও আছেন। শুনলাম উমানাথকে আপনি উদয়াচলে কোনও চাকুরির জন্যে দরখাস্ত পর্যন্ত করতে দেন নি?"

দুর্গাভাই প্রীত হয়ে বললেন, "দিই নি, ভাবীজি। উদয়াচলে সকলেই আমাকে জানে। উমানাথের জীবনে দাঁড়াবার যোগ্যতা আছে। এ প্রদেশে চাকুরি-প্রার্থী না হ'লেও তার চলবে। জানেন বোধহয়, এলাহাবাদ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সে কাজ পেয়েছে।"

"আপনার মনে হ'ল, উদয়াচলে চাকরি চাইলে উমানাথ আপনার অপমান করবে?"

"তা ঠিক নয়। মনে হ'ল, যেখানেই সে চাকরি চাক না কেন, কর্তৃপক্ষ জানবেন সে আমার ছেলে। হয়ত কিছুটা সুবিধা সে পেয়ে যাবে, যা তার পাওয়া উচিত নয়।"

পদ্মাদেবী কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে বললেন, "আপনি জানেন, ভাইয়া, অম্বিকাপ্রসাদ আইন কলেজে স্থায়ী কাজ পেয়েছে?"

"জানি।"

"অম্বিকাপ্রসাদ ল' পরীক্ষায় তৃতীয় শ্রেণীতে পাস করে-ছিল। এম. এ.-তেও তাই। তবু ল' কলেজে লেকচারার হয়েছে। শুনেছি ছাত্ররা প্রথম প্রথম তার কাছে পড়তে চাইত না। এখন সে হাইকোর্টেও কেস পায়।"

"একথা কেন বলছেন ভাবীজি?"

"বলছি এজন্যে যে, অম্বিকাকে দেখলে আমার কষ্ট হয়। তার পিতা নিজের যোগ্যতায় বড় হয়েছেন। কিন্তু সে নিজের যোগ্যতায় কিছু করবার সুযোগ পেল না। শুধু সে কেন, আমার পাঁচ ছেলের মধ্যে দুর্গাপ্রসাদ ছাড়া কেউ না।"

দুর্গাভাই কিছু বললেন না।

পদ্মাদেবী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "ভাইয়া, ছেলেদের নিয়ে দুঃখ করবার জন্যে আপনাকে আমি এখানে টেনে আনি নি। আমার কিছু গুরুতর কথা আছে।"

"বলুন।"

"আপনাদের মন্ত্রীসভায় ত জোর ভাঙন ধরেছে।"

"কিছু গোলমাল ত হচ্ছেই।"

"কিছু না। অনেক। উনি আমাকে কিছু বলেন না। কিন্তু আমি জানি।"

দুর্গাভাই বললেন, "আপনার দুশ্চিন্তা করবার মত কারণ উপস্থিত হয় নি। কোশলজির নেতৃত্ব নিরাপদ।"

পদ্মাদেবী আবার ম্লান হাসলেন।

"এবার আপনার বড় ভুল হ'ল ভাইয়া। কোশলজির হার নিশ্চিত হ'লে আমি চিন্তিত হতাম না। নিশ্চিত নয় ব'লেই আমার দুশ্চিন্তা।"

বিস্ময়ে দুর্গাভাই হতবাক্ হলেন।

পদ্মাদেবী বললেন, "আপনি অবাক্ হচ্ছেন, না? কিন্তু অবাক্ হবার কিছু নেই ভাইয়া। আজ পাঁচ বছর হয়ে গেল কোশলজি মুখ্যমন্ত্রী। আমি তাঁকে যতটা জানি ততটা আর কেউ জানে না। তাঁর চরিত্রে বলের সঙ্গে অনেক রকম দুর্বলতা রয়েছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী হবার পর দুর্বলতাগুলির খুব একটা প্রশ্রয় তিনি দেন নি। ছেলেদের কিছু সুবিধে ক'রে দিয়েছেন; আমার প্রতিবাদ কানে তোলেন নি। কিন্তু অন্যান্য মন্ত্রীরা—আপনি বাদে—যতটা আত্মীয় পোষণ করেছেন, তার তুলনায় কোশলজি খুব কমই করেছেন। অন্যান্য দুর্বলতাও তিনি শাসনে রেখেছেন—পুরোপুরি নয়, তবে অনেকখানি।"

"তা আমি জানি, ভাবীজি।"

"কিন্তু এই গোলমাল সুরু হবার পর কোশলজি বদ্‌লে যাচ্ছেন। সুদর্শন দুবে কি চরিত্রের লোক আপনি খুব ভালই জানেন। তার সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে কোশলজি দ্বিতীয় সুদর্শন দুবে হয়ে উঠছেন। রাজত্বের নেশা তাঁকে পেয়ে বসেছে। ক্ষমতা তিনি ছাড়তে রাজী নন। শঠতার পরিবর্তে শঠতা করছেন, মিথ্যার জবাব দিচ্ছেন মিথ্যা দিয়ে। এ এক কুৎসিত লড়াই চলছে, ভাইয়া। গত কয়েক মাসে কোশলজি যে-সব কাজ করেছেন, পাঁচ বছর কেউ তাঁকে দিয়ে তা করাতে পারে নি।"

দুর্গাভাই বিস্ময়ে পদ্মাদেবীর মুখ তাকিয়ে রইলেন।

"আমি কেমন যেন ভয় পেয়ে গেছি, ভাইয়া। রাজনীতির এ কি ভয়ঙ্কর চেহারা? এ ত এক ধরণের গৃহযুদ্ধ, আত্ম-সংহার! কোশলজির সাধ্য যতটুকু, যা কিছু আছে, সব দিয়ে তিনি এ ক্ষমতার লড়াই লড়ছেন। অথচ আমি জানি, জিতলে তাঁর সর্বনাশ হবে। যে-সব আসুরিক, তামসিক অস্ত্র প্রয়োগ ক'রে তিনি জিতবেন, জয়ের পরে সেগুলো আর সংবরণ করতে পারবেন না। তারা তাঁকে পেয়ে বসবে। যাদের সাহায্য নিয়ে তিনি এ গৃহযুদ্ধ লড়ছেন, তাদের দাবি মেটাতে গিয়ে নীতির দিক্ থেকে তাঁকে দেউলিয়া হ'তে হবে। এ বড় সাংঘাতিক অবস্থা, ভাইয়া।"

"ভাবীজি, আপনি এত সব বুঝলেন কি ক'রে? এমনি ক'রে ত আমিও ভাবতে পারি নি!"

"ভাইয়া, আপনারা পুরুষ মানুষ, যতটা তাকান ততটা দেখতে পান না। আপনাদের স্বদেশী ত কমদিনের নয়। আপনারা স্বদেশী করেছেন, আমরা তাকিয়ে আপনাদের দেখেছি। দেখেছি, গৌরবের সঙ্গে অগৌরবও, বলের সঙ্গে দুর্বলতা, ত্যাগের সঙ্গে লোভ, বিনয়ের মধ্যে অহঙ্কার। আপনাদের গৌরবে আমরাও রঙিন হয়েছি—কিন্তু লুকিয়ে আমরা যে বাঁকা হেসেছি তা আপনারা দেখতে পান নি। আমরা রাজনীতির বড় বড় কথা বুঝি নি, কিন্তু আপনাদের মত মানুষদের বেশ ভালই চিনেছি, দেখেছি, বুঝেছি।"

"আপনার কথা শুনে আমারও যে ভয় করছে, ভাবীজি। আমার সব দুর্বলতাও আপনি জেনে ফেলেছেন।"

"ভাইয়া, আপনি সজ্জন, সবাই আপনাকে শ্রদ্ধা করে। উদয়াচলের গৌরব আপনি।"

"ভাবীজি, আমাকে আর লজ্জা দেবেন না।"

"কিন্তু, ভাইয়া, পবিত্রতা যেমন বাঞ্ছনীয়, শুচিবাই তেমনি অবাঞ্ছনীয়।"

"তার মানে?"

"রাস্তায় দেখবেন, ভিখারী সযত্নে তার দেহের ক্ষতকে বাঁচিয়ে রাখে, ওই তার উপায়ের সম্বল। কিছু মনে করবেন না, ভাইয়া, আপনি ঠিক তার বিপরীত।"

দুর্গাভাই-এর মুখ লাল হয়ে উঠল।

"আপনি আপনার সততা এমন সযত্নে বাঁচিয়ে রেখেছেন যে, ওটা আপনার কাছে সবচেয়ে বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে—উদয়াচলের থেকে, ভারতবর্ষের থেকে।"

"তা কি অন্যায়, ভাবীজি?"

"ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন তুলছি নে ভাইয়া। এই সততা আপনাকে দুর্বল করেছে।"

"দুর্বল?"

"দুর্বল নয়? আপনি নিজের সুনামকে বাঁচাতে গিয়ে সবচেয়ে বড় দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছেন।"

"সবচেয়ে বড় দায়িত্ব? কিসের দায়িত্ব?"

"উদয়াচলের নেতৃত্বের দায়িত্ব। মুখ্যমন্ত্রিত্বের দায়িত্ব।"

জীবনে বোধ করি প্রথমবার দুর্গাভাই-এর বুক কেঁপে উঠল।

পদ্মাদেবীর কণ্ঠস্বর কঠিন।

"এ দায়িত্ব আজ নয়, পাঁচ বছর আগে আপনার গ্রহণ করা উচিত ছিল। রাজনীতির কদর্য চেহারা দেখে সেই

যে আপনি ভয় পেয়েছিলেন, সে ভয় আপনার আর কাটল না।"

মৃদুস্বরে দুর্গাভাই বললেন, "তা সত্যি।"

"যদি ভয়ই পাবেন তবে এর মধ্যে এলেন কেন? রাজনীতি ও রাজত্ব করা ছাড়া আপনার কি আর কোনও কাজ ছিল না?"

"কোশলজিকে সাহায্য করা সেদিন সবচেয়ে বড় কর্তব্য মনে হয়েছিল।"

"মনে আছে, ভাইয়া, মন্ত্রীসভা তৈরি হবার আগে আপনার সঙ্গে একদিন কথা হয়েছিল? মনে আছে, আপনাকে সেদিনও আমি বলেছিলাম, নেতৃত্ব করবার দুঃসাহস আপনার নেই? আপনি উত্তর দিয়েছিলেন, সে দুঃসাহসের প্রয়োজন আজ নেই। যদি কখনও হয়, নিরাশ হবেন না।"

"মনে পড়ছে।"

"আজ আপনাকে এ জন্যেই তলব করেছি, ভাইয়া। যদি সাহস আপনার থাকে তা হ'লে এবার তার প্রমাণ দিন।"

"কি বলছেন আপনি, ভাবীজি?"

"আরও সহজ ক'রে বলি। কোশলজি পাঁচ বছরের বেশি উদয়াচলের নেতৃত্ব করেছেন। তাঁর পক্ষে যতখানি ঐকান্তিক সেবা সম্ভব উদয়াচলকে তিনি তা দিয়েছেন। দেবার মত আর তাঁর কিছু নেই। এবার যে সংঘাত চলছে, তিনি যদি জেতেন, উদয়াচলের সেবা তাঁর দ্বারা আর সম্ভব হবে না। তাই তাঁর প্রয়োজন পরাজয়। পরাজয়ে তাঁর নিজের মঙ্গল, উদয়াচলের মঙ্গল।"

দুর্গাভাই-এর নীরব বিস্মিত চোখে চোখ রেখে পদ্মাদেবী আরও বললেন: "স্বামীর পরাজয় চাইছি ব'লে আপনি অবাক্ হচ্ছেন। তাঁকে ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি বলেই চাইছি।"

"ভাবীজি, আপনাকে দেখে জীবনে এই প্রথম অবাক্ হচ্ছি না।"

"কোশলজির পরাজয় সম্ভব একমাত্র আপনার সাহায্যে।"

"আমার সাহায্যে?"

"তাই। একদিন আপনি কর্তব্যের আহ্বানে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। আজ কর্তব্যের আহ্বানে আপনার উচিত তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়ান।"

দুর্গাভাই কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন।

তারপর বললেন: "ভাবীজি, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশলকে পরাজিত করা আজ কঠিন কাজ নয়। কঠিন কাজ হ'ল তার পরে। কোশলজির পরে মুখ্যমন্ত্রী হবেন কে?"

পদ্মাদেবীর চোখে আগুন, মুখে কঠিন হাসি:

"যদি সাহস থাকে ভাইয়া, তবে আপনি। যদি সাহস না থাকে, তবে– "

এই নাটকীয় ঘটনার পাঁচ দিন পরে দুর্গাভাই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশলকে ছোট্ট একটি নোট পাঠালেন। একান্ত ব্যক্তিগত ও গোপনীয়।

"আগামী সপ্তাহে বিধান সভায় কংগ্রেসী দলের বৈঠক বসবে। আপনি জানেন, এ বৈঠকের একমাত্র আলোচ্য বিষয় বর্তমান মন্ত্রীসভার পরিবর্তন। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আপনাকে জানাচ্ছি, প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দাঁড়ান আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এ সিদ্ধান্তে আসা আমার পক্ষে সহজ হয় নি। কিন্তু কর্তব্যের আহ্বান আমি অবহেলা করতে পারলাম না। আপনি আমার শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন।"

দলের বৈঠকে সুদর্শন দুবে বিশেষ আমন্ত্রণে উপস্থিত ছিলেন। হাই কমাণ্ডের একজন প্রতিনিধি ছিলেন সভাপতি। মহেন্দ্র বাজপাঈ প্রস্তাব উত্থাপন করলেন।

বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী দলের অধিকাংশ সদস্যের আস্থা হারিয়েছেন। এই সভা প্রস্তাব করছে দলের নতুন নেতা নির্বাচিত হোক।

গোপন ব্যালটে ভোট গৃহীত হ'ল।

কৃষ্ণদ্বৈপায়নের পঁচিশ ভোটে পরাজয় হ'ল।

সুদর্শন দুবে খুশী হলেন না। মাত্র পঁচিশ ভোটে জয়লাভ কোনও রকমেই নিশ্চিত বিজয় নয়।

দুর্গাভাই কৃষ্ণদ্বৈপায়নের সাফল্যে বিস্মিত হ'লেন।

মাত্র পঁচিশ ভোটে হেরে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নেতৃত্বের আশ্চর্য ক্ষমতা জাহির করেছেন।

নতুন নেতা নির্বাচন নিয়ে গোলমাল হ'ল।

সুদর্শন দুবে চাইলেন, তক্ষুণি নতুন নেতা নির্বাচিত হোক্।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আপত্তি করলেন।

"মাত্র পঁচিশ ভোটে আমার হার হয়েছে। প্রতিপক্ষ সব রকম চেষ্টা করেও এর বেশি কেরামতি দেখাতে পারেন নি। আজই নতুন নেতা নির্বাচিত হ'লে পরবর্তী মন্ত্রীসভা দুর্বল ও স্বাস্থ্যহীন হ'তে বাধ্য। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, এক সপ্তাহ সময় পেলে সদস্যগণ অনেকেই দ্বিতীয়বার চিন্তা

ক'রে দেখবেন। নেতা যিনিই নির্বাচিত হোন না কেন, তাঁর সুস্পষ্ট সমর্থন থাকা একান্ত প্রয়োজন।"

সুদর্শন দুবে উত্তর দিলেন: "বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি দলের অধিকাংশ আস্থা হারিয়েছেন। অতএব, দলের নেতা হবার অধিকার আর তাঁর নেই। নতুন নেতা নির্বাচিত হবার সঙ্গে সঙ্গে, মুখ্যমন্ত্রী যে-সব উপায়ে অনেক সদস্যের সমর্থন জোগাড় করেছেন তার প্রকৃত তাৎপর্য সদস্যরা বুঝবেন, এবং আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, তাঁদের অনেকেই নতুন দলনেতার সঙ্গে হাত মেলাবেন।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দাবি করলেন: "দলের নেতৃত্ব কারুর একচেটিয়া নয়। গণতন্ত্রে এ অধিকার প্রত্যেক সদস্যের সমান। নতুন নেতৃনির্বাচনে আমার প্রার্থী হবার অধিকার আছে কি না সভাপতির পরিষ্কার নির্দেশ চাই।"

সভাপতি নির্দেশ দিলেন, "আছে।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "এবার আমার প্রস্তাব, নতুন নির্বানেতাচন এক সপ্তাহের জন্যে স্থগিত থাক। আগামী সপ্তাহের আজকের দিনে সন্ধ্যা সাতটার সময় এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোক।"

সুদর্শন দুবে দৃঢ়তার সঙ্গে আপত্তি জানালেন।

তাঁকে সমর্থন করলেন মহেন্দ্র বাজপাই, মাধব দেশপাণ্ডে, হরিশংকর ত্রিপাঠী।

সভাপতি এবার দুর্গাভাই-এর মত চাইলেন।

দুর্গাভাই কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলেন না। যখন বললেন, তাঁর কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠল।

"আমি মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাব সমর্থন করি।"

সুদর্শন দুবে চেঁচিয়ে উঠলেন: "হায় রাম!"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল পাথরের মত নিস্তব্ধ।

দুর্গাভাই-এর কথা উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি চোখ বুজলেন। যেন ধ্যানস্থ।

এবার হাত তুলে ভোট।

চুয়াল্লিশ ভোটে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের প্রস্তাব গৃহীত হ'ল।

হেরেও তিনি জিতলেন। কিংবা, পদ্মাবতী যা আশঙ্কা করেছিলেন, জিতেও তিনি হারলেন।

ক্রমশঃ

গণতন্ত্র ও গোরুর গাড়ীর যুগ

ব্রিটিশ ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী য়্যাটলি সাহেবের মতে ভারতবর্ষের বিস্তর লোক এখনও গোরুর গাড়ীর যুগে থাকায় এদেশে গণতন্ত্র প্রবর্তন করা কঠিন হয়েছে—গণতন্ত্র নাকি মোটরগাড়ীর সঙ্গেই মানায় ভাল। কিন্তু প্রাচীন ভারতে যদিও মোটরগাড়ী ছিল না, তথাপি অনেক অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন রকমের সাধারণতন্ত্র ছিল। সামাজিক বিষয়ে ভারতবর্ষের সর্বত্রই বরাবর গণতান্ত্রিক পঞ্চায়তি প্রথা চ'লে আসছে। ব্রিটিশ শাসনের প্রভাবে কোন কোন প্রদেশে—যেমন বঙ্গে—এই প্রথা প্রায় লুপ্ত হয়ে গেলেও আগ্রা-অযোধ্যা প্রভৃতি প্রদেশে খটিক, পাসি, চামার প্রভৃতিদের মধ্যেও এই গণতান্ত্রিক প্রথা এখনও খুব কার্যকর আছে। সুতরাং গোরুর গাড়ীর দেশে ও যুগেও গণতন্ত্র খুব চালান যায়।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী, কার্ত্তিক, ১৩৪৯।

বিদেশের কথা

শ্রীযোগনাথ মুখোপাধ্যায়

টোকিও শীর্ষ সম্মেলন

মালয়েশিয়া গঠিত হওয়ার পর থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনীতিতে যে সমস্যা সৃষ্টি হয়, বহু শলাপরামর্শ ও আন্তর্জাতিক উদ্যোগ সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত তার কোন মীমাংসা হয় নি। জুন মাসের মাঝামাঝি টোকিওয় মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপিন্‌স্‌-এর রাষ্ট্রপ্রধানরা মিলিত হয়ে আর একবার মালয়েশিয়া পরিস্থিতি আলোচনার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু ঐ শীর্ষ সম্মেলনের পূর্ব-সর্ত হিসাবে মালয়েশিয়ার পক্ষ থেকে যে দাবি জানান হয়েছে তাতে মনে হয়, এবারের শীর্ষ সম্মেলনও গোড়া থেকেই সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে। মালয়েশিয়ার মন্ত্রিসভা গত ৪ঠা জুন এক বিশেষ বৈঠকে স্থির করেন যে, ইন্দোনেশিয়ার মনোভাব ও তৎপরতা "সন্তোষজনক" না হওয়া পর্যন্ত মালয়েশিয়া প্রস্তাবিত শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেবে না।

মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী টুঙ্কু আবদুল রহমান সাংবাদিকদের বলেন যে, উত্তর বোর্ণিওয় মালয়েশিয়া সীমান্ত থেকে ইন্দোনেশিয়া তার গেরিলা বাহিনী সম্পূর্ণ অপসারিত করে নেবে এই সর্তে মালয়েশিয়া টোকিও শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে সম্মত হয়েছিল। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে, টোকিও আলোচনার সন্তোষজনক অগ্রগতি হ'লে তবেই ইন্দোনেশিয়া তার গেরিলা বাহিনী প্রত্যাহার করবে। তাছাড়া ইন্দোনেশিয়ার সৈন্য বাহিনী প্রত্যাহারের কাজ তদারকির জন্য থাইল্যাণ্ডকে যে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়ার কথা ছিল, টুঙ্কুর মতে, সে সম্বন্ধেও ইন্দোনেশিয়ার মনোভাব স্পষ্ট বা আশানুরূপ নয়। ইন্দোনেশিয়া নাকি জানিয়েছে যে, শুধু সৈন্য বাহিনী প্রত্যাহার সুরুর কাজ থাইল্যাণ্ডকে পর্যবেক্ষণ করতে দেওয়া হবে। টুঙ্কু আবদুল রহমান তাই জানিয়েছেন যে, টোকিওয় শীর্ষ সম্মেলন সুরু হওয়ার পূর্বেই যদি থাইল্যাণ্ডের তত্ত্বাবধানে উত্তর বোর্ণিওয় মালয়েশিয়া সীমান্ত থেকে ইন্দোনেশিয়ার গেরিলা বাহিনী সম্পূর্ণ প্রত্যাহৃত না হয় তবে মালয়েশিয়া টোকিও শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেবে না।

কিন্তু মালয়েশিয়ার এই সিদ্ধান্ত ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও শীর্ষ সম্মেলনের প্রারম্ভিক প্রস্তুতি বন্ধ হয় নি। ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেণ্ট ডঃ সুকর্ণ ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ সুবান্দ্রিও টোকিওর উদ্দেশ্যে ইন্দোনেশিয়া ত্যাগ করে ফিলিপিন্‌সে এসেছেন এবং সেখানে ফিলিপিন প্রেসিডেণ্ট মাকাপাগালের সঙ্গে মালয়েশিয়া সঙ্কট নিয়ে তাঁদের দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী টুঙ্কু আবদুল রহমান যদি টোকিওয় না যান তা হ'লে কি হবে—এই প্রশ্নের উত্তরে ডঃ সুবান্দ্রিও বলেছেন, এব্যাপারে তাঁদের কিছু করণীয় নেই, তাঁরা টুঙ্কুকে সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে বাধ্য করতে পারেন না।

শীর্ষ সম্মেলন সফল হতে হ'লে যে মানসিক প্রস্তুতি প্রয়োজন তা যে এক্ষেত্রে অনুপস্থিত তা টুঙ্কু ও ইন্দোনেশিয়ার নেতৃবৃন্দের উক্তি থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। সুতরাং এই অবস্থার পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত টোকিও শীর্ষ সম্মেলন সফল হওয়ার সম্ভাবনা বিশেষ আছে বলে মনে হয় না।

লাওসে গৃহযুদ্ধ

লাওসে গৃহযুদ্ধ আবার প্রবল আকার ধারণ করেছে। কম্যুনিষ্ট চীন ও উত্তর ভিয়েৎনামের সমর্থনপুষ্ট কম্যুনিষ্ট-পন্থী পাথেট লাও বাহিনীর আক্রমণে নিরপেক্ষ বাহিনী প্লেন অফ জারস ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে, এবং ৫ই জুনের সংবাদে প্রকাশ, প্লেন অফ জারসের উত্তরে ফু খুট পর্বত অঞ্চলে নিরপেক্ষ বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল কঙলে যে নতুন ঘাঁটি স্থাপন করেন তাও পাথেট লাও বাহিনীর অতর্কিত আক্রমণে বিপন্ন হয়ে পড়েছে। বলা বাহুল্য, পাথেট লাওর এই অগ্রগতি যদি অব্যাহত থাকে তবে আর কয়েকদিনের মধ্যেই লাওসে নিরপেক্ষ বাহিনীর অধিকারে আর কোন অঞ্চল থাকবে না।

পাথেট লাও বাহিনীর নেতা প্রিন্স সুফানোভঙ লাওসের নিরপেক্ষ প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স সুভানা ফুমাকে শান্তির সর্তস্বরূপ জানিয়েছেন, লাওসের সংযুক্ত সরকার থেকে ১৯শে এপ্রিলের দক্ষিণপন্থী অভ্যুত্থানের নেতাদের অপসারিত করতে হবে ও তাদের রাষ্ট্রবিরোধী আচরণের বিচার করতে হবে। আর সেই সঙ্গে বামপন্থীদের সংযুক্ত সরকারে দিতে হবে পূর্ব মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা। লাওস সঙ্কটের মীমাংসার জন্য বৃহৎ শক্তিবর্গের নানা উদ্যোগ আয়োজন সুরু হয়েছে, কিন্তু পাথেট লাওর দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত লাওসে শান্তি আসবে বলে মনে হয় না। শত্রুভাবাপন্ন তিনটি বিরোধী শক্তির সংযুক্ত সরকারের পক্ষে সন্তোষজনকভাবে দেশের শাসনকার্য চালানো খুবই কঠিন। তার ওপর যদি বিবদমান প্রতিটি পক্ষ অপর পক্ষগুলিকে সব সময় যে কোন উপায়ে উৎখাতের চেষ্টা করে তবে সেক্ষেত্রে শান্তির আশা দুরাশায় পরিণত হবেই। লাওসের বর্তমান অশান্তির আশু কারণ, দক্ষিণপন্থীদের বিগত ১৯শে এপ্রিলের অভ্যুত্থান। অভ্যুত্থানের নায়ক জেঃ কুপ্রাসিৎ অভয় শাসনক্ষমতা দখল করে পাথেট লাওদের রাতারাতি উৎখাত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন, ফলে আজ তাঁদেরই পায়ের তলা থেকে শেষ মাটিটুকু সরে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। আজ মধ্য ও দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে পার্থক্য অতি সামান্য এবং তারা মিলিতভাবে বামপন্থীদের প্রচণ্ড আক্রমণের সম্মুখীন। লাওসের আজ প্রকৃত সমস্যা হ'ল পরস্পরের প্রতি সন্দেহ ও একের ষড়যন্ত্রে অন্যের উৎখাত হওয়ার আশঙ্কা। এই অবিশ্বাস ও অন্যের আক্রমণে নিশ্চিহ্ন হওয়ার আশঙ্কা থেকে বিবদমান তিন পক্ষ মুক্তিলাভ না করা পর্যন্ত ইন্দোচীন উপদ্বীপের ভূমিবদ্ধ ক্ষুদ্র দেশটির অশান্তি কিছুতেই দূর হবে না। আর এই অবস্থা যতদিন থাকবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, চীন, সোভিয়েট ইউনিয়ন, ব্রিটেন প্রভৃতি বৃহৎ শক্তিবর্গের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া তথা সমগ্র বিশ্বের শান্তি ততই বিপন্ন হবে।

আরব ঐক্যের প্রয়াস

সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট নাসের ও ইরাকের প্রেসিডেন্ট আরেফ গত ২৬শে মে কায়রোয় এক ঐক্যচুক্তি সম্পাদন করেন। চুক্তির ফলে এখনই মিশর ও ইরাক সংযুক্ত হয়ে একটি নতুন রাষ্ট্র গঠন করবে না, কিন্তু উভয় প্রেসিডেন্টই চুক্তি স্বাক্ষর-অন্তে বলেছেন, তাঁদের দুই দেশের ঐক্য বৃহৎ আরব ঐক্যের পথে একটি বিরাট্ পদক্ষেপ। চুক্তি এমনভাবে সম্পাদিত হয়েছে যে অন্যান্য আরব রাষ্ট্রেরও ঐ চুক্তির এক্তিয়ারভুক্ত হ'তে কোন অসুবিধা হবে না।

চুক্তির ব্যবস্থামত আপাতত কায়রোয় দুই দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সভাপতি পরিষদ (প্রেসিডেন্সিয়াল কাউন্সিল) ও একটি যুক্ত সামরিক কমাণ্ড গঠিত হবে। এবং চুক্তিবদ্ধ দেশ দু'টির কোনটি বহিঃশত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হ'লে অপর দেশ সে আক্রমণকে তার নিজের ওপর আক্রমণ বলে মনে করবে। যুগ্ম সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্থা ছাড়াও নানাবিধ সাংস্কৃতিক সংস্থা গঠনের প্রস্তাব চুক্তিতে আছে। বলা হয়েছে যে, আরব জাতিগুলির "চিন্তায় ঐক্যসাধন" চুক্তির অন্যতম লক্ষ্য। কিভাবে আরব ঐক্য আরও ব্যাপক ও দৃঢ়ভিত্তিক করা যায়, যুক্ত সভাপতি পরিষদ তা চিন্তা করে দেখবেন।

সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভ সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র সফর-কালে প্রেসিডেন্ট নাসের ছাড়াও আলজিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বেন বেলা, ইরাকের প্রেসিডেন্ট আরেফ ও ইয়েমেনের প্রেসিডেন্ট সালালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তার পরেও প্রকাশ্য জনসভায় ঘোষণা করেন যে, জাতীয়তাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত আরব ঐক্য মার্কস-লেলিনবাদের আন্তর্জাতিক চিন্তাধারার পরিপন্থী। এ কারণে সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষে আরব জাতীয়তাবাদের প্রতি সমর্থন জানানো সম্ভব নয়। অথচ ক্রুশ্চেভের মিশর ত্যাগের চব্বিশ ঘণ্টা পরেই মিশর-ইরাক ঐক্যচুক্তি ঘোষিত হয়। এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, সোভিয়েট ইউনিয়নের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নাসেরের নেতৃত্বে আরবের ঐক্যপ্রয়াস নতুন করে সুরু হয়েছে। নানাকারণে পশ্চিমী শক্তিবর্গের সঙ্গে নাসের ও তাঁর সমর্থক আরব দেশগুলির সম্পর্ক ভাল নয়। তবুও যে মিশরের উন্নয়ন-প্রয়াস ব্যাহত হয় নি তার প্রধান কারণ সোভিয়েট সহায়তা। সোভিয়েট ইউনিয়নের সহায়তা ছাড়া মিশরের পক্ষে কিছুতেই আসোয়ান বাঁধ নির্মাণ সম্ভব হ'ত না। ভবিষ্যতের বহু প্রকল্পের জন্যও প্রেসিডেন্ট নাসের অকৃপণ সোভিয়েট সহায়তার প্রত্যাশী। সবার উপরে আছে ইস্রায়েল সমস্যা। ইস্রায়েলের পিছনে আছে ব্রিটেন, আমেরিকা প্রভৃতির পূর্ণ সমর্থন, সুতরাং জর্ডন নদী ভিন্নগতি করার জন্য ইস্রায়েলী প্রয়াস ব্যর্থ

করতে হ'লে আরব দেশগুলিকে অবশ্যই সোভিয়েট ইউনিয়নের সাহায্য নিতে হবে। সুতরাং সোভিয়েট ইউনিয়ন না চাইলে আরব দেশগুলির জাতীয়তাবাদী ঐক্য কতটা দৃঢ় বা ব্যাপক হবে সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। তা ছাড়া আরব রাষ্ট্রগুলির ঐক্যপ্রয়াস এই প্রথম নয়। ইতিপূর্বে মিশর ও সিরিয়ার সংযুক্তি শেষ পর্যন্ত বিচ্ছেদ ও বৈরিতায় পর্যবসিত হয়েছে। আর একবার মিশর, ইরাক ও সিরিয়ার মিলন ও সংযুক্তির উদ্যম অনেক দূর এগিয়ে ও অন্যান্য আরব জাতির মনে অনেক আশা জাগিয়ে পূর্বের মতই ব্যর্থ হয়েছে। আরব লীগ একটা নেতিবাচক ইস্রায়েল-বিরোধী ঐক্য ছাড়া আর কিছুই নয়। এ সব কারণে সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র (মিশর) ও ইরাকের সতর্কিত ও সীমিত ঐক্য আরব দুনিয়ায় বা বহির্বিশ্বে কোন আশা বা উৎসাহের সঞ্চার করতে পারে নি।

ব্রিটিশ গায়েনায় অশান্তি

ব্রিটিশ গায়েনা সুদূর দক্ষিণ আমেরিকার একটি ক্ষুদ্র ব্রিটিশ উপনিবেশ হলেও ভারতের সঙ্গে তার আত্মিক যোগ আছে। দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর সীমান্তে অবস্থিত ৮৩ হাজার বর্গমাইল আয়তনের ঐ দেশটির ৬ লক্ষ ৩ হাজার অধিবাসীর মধ্যে তিন লক্ষেরও বেশী ভারতীয় এবং তার বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ডাঃ ছেদী জগন ভারতীয় বংশোদ্ভূত। ঐ সব ভারতীয়ের পিতৃপুরুষরা প্রায় শতাব্দীকাল আগে আখের ক্ষেতের শ্রমিকরূপে ভারত থেকে ব্রিটিশ গায়েনায় যান এবং সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দায় পরিণত হন। ব্রিটিশ গায়েনার অন্যান্য অধিবাসীদের মধ্যে প্রায় ত্রিশ হাজার আদিম রেড ইণ্ডিয়ান, কয়েক হাজার শ্বেতাঙ্গ ও প্রায় তিন লক্ষ নিগ্রো। নিগ্রোরাও ইক্ষু শ্রমিকরূপে সেদেশে যায়।

ব্রিটিশ গায়েনার পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়ে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আলোচনা সুরু হয়েছে। কিন্তু সম্প্রদায়ভিত্তিক রাজনীতি সেদেশের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি এমন অশান্ত ও জটিল করে তুলেছে যে, স্বাধীনতাকামী গায়েনা সরকারের অনুরোধেই ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীকে সেখানে ছুটে যেতে হয়েছে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে। অবশ্য তাতেও গায়েনা শান্ত হয় নি। এই বছর জানুয়ারী মাসে গায়েনার ইক্ষু শ্রমিকদের একাংশ বিভিন্ন অর্থনৈতিক দাবিতে ধর্মঘট সুরু করার পর থেকে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রমিক ইউনিয়নের মধ্যে যে বিরোধ ও সংঘর্ষ সুরু হয় তার ফলে এ পর্যন্ত প্রায় ত্রিশ জন নিহত ও তিন শতাধিক ব্যক্তি আহত হয়েছে। এখন ভারতীয় ও নিগ্রো শ্রমিক ও জনসাধারণের বিরোধ গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে, এবং ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর কর্মকর্তারা বলছেন যে, সরকারী নীতির পরিবর্তন ছাড়া এ বিরোধের মীমাংসা হওয়া সম্ভব নয়। ব্রিটিশ গায়েনার গ্রামে গ্রামে গিয়ে শান্তি রক্ষা করা ব্রিটিশ বাহিনীর পক্ষে অসম্ভব।

ডাঃ জগনের 'পিপলস প্রগ্রেসিভ পার্টি' প্রধানত ভারতীয় সম্প্রদায়ের দল। গায়েনার আইন সভার ৩৫টি আসনের মধ্যে ২০টি তাদের দখলে, যদিও নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী ভোটদাতাদের মধ্যে শতকরা ৪৩ জনের সমর্থন পেয়েছেন তাঁরা। অপরপক্ষে বিরোধী দল 'পিপলস ন্যাশনাল কংগ্রেসে'র প্রধান সমর্থক নিগ্রো সম্প্রদায়। আইন সভার ১১টি আসন তাঁদের দখলে। বাকি ৪টি আসনের অধিকারী 'ইউনাইটেড ফোর্স' দল। এই বিশ্লেষণ থেকেই এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, 'পিপলস ন্যাশনাল কংগ্রেস' ও 'ইউনাইটেড ফোর্স' দল ঐক্যবদ্ধ হ'লে অধিকতর গণ-সমর্থনের জোরে তাঁরা ভারতীয়দের পরাস্ত করে গায়েনার ক্ষমতা দখল করতে পারবেন, এবং তার ফলে পৃথিবীর অন্য অনেক দেশের মত গায়েনাতেও ভারতীয়দের পক্ষে শান্তিতে বসবাস অসম্ভব হয়ে পড়বে। সুতরাং নিগ্রো-ভারতীয় ঐক্য অর্থাৎ 'পিপলস প্রগ্রেসিভ পার্টি' ও 'পিপলস ন্যাশনাল কংগ্রেসে'র সংযুক্ত সরকার ছাড়া গায়েনার বর্তমান সঙ্কটের রাজনৈতিক সমাধান কিছুতেই সম্ভব নয়। ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকেও এই ঐক্যের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, ক্ষমতাসীন ভারতীয় দলের অনাগ্রহে এই সংযুক্তির প্রস্তাব কার্যকরী করা সম্ভব হচ্ছে না। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অন্ধ বিদ্বেষ কি ভাবে একটি দেশ ও বিভিন্ন সম্প্রদায়কে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেয় গায়েনার বর্তমান অশান্তি তা আর একবার প্রমাণ করল।

চীন-সোভিয়েট বুঝাপড়া

সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টির মুখপাত্র 'প্রাভদা'র সংবাদে প্রকাশ, সোভিয়েট ইউনিয়ন কম্যুনিষ্ট চীনের সঙ্গে বুঝাপড়ার উদ্দেশ্যে অবিলম্বে বিশ্ব কম্যুনিষ্ট সম্মেলনের আহ্বান জানাবে। ঐ সংবাদেই বলা হয়েছে যে, পোলাণ্ড, ইতালী, প্রভৃতি কয়েকটি দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টি

এখনই আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট সম্মেলনের পক্ষপাতী না হ'লেও সোভিয়েট ইউনিয়ন এ ব্যাপারে আর বিলম্ব করতে চায় না। কারণ বিশ্বের ৯০টি কম্যুনিষ্ট পার্টির অধিকাংশ আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের স্বার্থে অবিলম্বে বিশ্ব সম্মেলন আহ্বানের পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

কিন্তু অধিকাংশ সমর্থকদের যে তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে তা সোভিয়েট পক্ষের খুব বেশী সাফল্যের সাক্ষ্য বহন করে না। প্রথমতঃ কম্যুনিষ্ট দেশগুলির মধ্যে চীন, আলবানিয়া, উত্তর কোরিয়া ও উত্তর ভিয়েৎনাম বহুদিন পূর্বে সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব অস্বীকার করেছে। সম্প্রতি প্রকাশিত সোভিয়েট সমর্থক তালিকায় দেখা যাচ্ছে যে, রুমানিয়া ও কিউবার নাম তাতে নেই, যদিও কিউবার জন্য এখন সোভিয়েট সরকারের প্রতিদিন প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যয় হচ্ছে। তালিকার মধ্যে জাপান, ইন্দোনেশিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টিরও উল্লেখ নেই। অপর-পক্ষে সমর্থক তালিকায় যে বেলজিয়াম, ভারত, সিংহল ও অষ্ট্রেলিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টির উল্লেখ করা হয়েছে সেটাও সম্পূর্ণ ঠিক কথা নয়। কারণ ঐ ক'টি দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টি চীন-সোভিয়েট দ্বন্দ্বে দ্বিধা-বিভক্ত এবং চীন-সমর্থক বিরোধীদের শক্তি সোভিয়েট-সমর্থক সরকার পক্ষের তুলনায় নগণ্য নয়। ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির অভ্যন্তরে চীনা শক্তির প্রাবল্য লক্ষ্য করলেই তা বুঝতে পারা যায়। সমগ্র এশিয়ার মধ্যে একমাত্র বহির্মঙ্গোলিয়া ছাড়া আর কোন কম্যুনিষ্ট দেশ বা কম্যুনিষ্ট দল সম্পূর্ণরূপে সোভিয়েট ইউনিয়নের সমর্থক নয়। বিশ্বের অকম্যুনিষ্ট দেশগুলির মধ্যে ইন্দোনেশিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টি বৃহত্তম, তার পূর্ণ সমর্থন লাভ করেছে কম্যুনিষ্ট চীন। রুমানিয়া ও কিউবার চীন পক্ষ সমর্থন, এমন কি নিরপেক্ষতাও সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষে একটা বড় নৈতিক পরাজয়। পোলাণ্ডের মনোভাবও সুস্পষ্ট নয়। পূর্ব জার্মানী হয়ত তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই শেষ পর্যন্ত সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষে থাকবে। 'প্রাভদা'র প্রবন্ধে বলা হয়েছে, বিশ্বের ৯০টি কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে ৫৩টি সোভিয়েট পক্ষ সমর্থন করেছে। এই হিসাবেই দেখা যাচ্ছে যে ৩৭টি দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টি চীনের পক্ষে। তারপর সত্যই যদি আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলন দ্বিধা-বিভক্ত হয় তবে দেখা যাবে যে, সোভিয়েট তালিকায় যে ৫৩টি দেশের নাম আছে তার মধ্যে অন্ততঃ অষ্ট্রেলিয়া, বেল-জিয়াম, সিংহল, ভারত, নিউজিল্যাণ্ড, ইতালী, ফ্রান্স ও ব্রিটেনের কম্যুনিষ্ট পার্টি দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাবে।

—•—

চন্দাবাঈ

শ্রীহেনা হালদার

দক্ষিণমুখী ঘরে কাশ্মীরী গালচের ওপর হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসেছিল দময়ন্তী চন্দোরকর। ওর থেকে খানিকটা দূরে বিষণ্ণ গম্ভীর মুখে বসেছিলেন ওর মা জয়ন্তী চন্দোরকর। আর ওদের দু'জনের মধ্যিখানে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে দীর্ঘ শ্মশ্রুগুম্ফে হাত বোলাচ্ছিলেন বৃদ্ধ মুসলমান ওস্তাদ মনসুর আলি খান।

'বেটি রোও মৎ, মেরা পাস্ আও,' সস্নেহে বললেন ওস্তাদ। 'দুনিয়ার সর্ব্বত্রই হারজিত আছে বেটি, ওর জন্যে আফশোস করতে নেই,' বললেন মনসুর আলি। 'আল্লার কুদরতে তোমার আওয়াজ এত মিঠা আর দিমাগ এত তেজ যে তুমি একদিন তামাম হিন্দুস্থানে নাম করতে পারবে আমার এ্যাকিন আছে—মিথ্যে মন খারাপ ক'রো না, ওঠ।'

দময়ন্তী মুখ তুলল না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। লক্ষ্ণৌয়ের ভাতখণ্ডে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বিশারদ' পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে আজ। দময়ন্তী চন্দোরকর মাত্র চার নম্বরের জন্য প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হ'তে পারে নি, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। তার এই পরাজয় অন্য কারুর কাছে নয়, ওর নিজের মা জয়ন্তী চন্দোরকরের কাছেই। শান্ত না-হওয়া মনকে সান্ত্বনা দিতে পারছে না দময়ন্তী কিছুতেই। ও অনেক কষ্ট ক'রে দিনরাত রেওয়াজ করেছে, অথচ সমস্ত গৃহকর্ম্মে অব্যাহত থেকেও শেষ পর্য্যন্ত জয়ন্তী-ই কি না প্রথম হ'ল! ওরা দু'জনে এক সঙ্গে ওস্তাদজীর কাছে গান শেখে। দময়ন্তীর ধারণা, ওস্তাদজী ওর মা'র প্রতি পক্ষপাত করে বেশী যত্ন নিয়ে শিখিয়েছেন।

মনসুর আলি ধীরে ধীরে ওর কাছে সরে এলেন। ওর মাথায় হাত রেখে বললেন, 'বেটি, মায়ের কাছে হার মানায় কোনও শরম্ নেই। ওঁর আশীর্ব্বাদ যেমন তোমার সবচেয়ে আনন্দ, ওঁর সাফল্যেও তেমনি তোমার গৌরব নয় কি?'

জলে-ভেজা নার্গিস ফুলের মত আরক্ত চোখ দু'টি ওস্তাদের মুখের ওপর তুলে ধরল দময়ন্তী, বললে, 'আপনি আমাকে ঠিকমত তালিম দেন নি ওস্তাদজী, আপনি চেয়েছিলেন মা'রই জিত হোক। আমি গান ছেড়ে দেব।'

'তোবা তোবা, এ তুমি কি বলছ বেটি!' যেন চমকে উঠলেন বৃদ্ধ মনসুর আলি। 'সঙ্গীতের সাধিকার পক্ষে এমন প্রতিযোগী মনোভাব খুব হানিকর। এমন কথা আর কক্ষণো ব'লো না। এমনি রেষারেষির ফলে এই লক্ষ্ণৌ সহরেই এক গানওয়ালী মেয়ে এক সর্ব্বনাশ ঘটিয়ে দিয়েছিল। যার ফলে সঙ্গীতের দুনিয়া এক মহৎ শিল্পীকে হারিয়েছিল চিরকালের মত। শোন, সেই গল্প বলি।'

দময়ন্তীকে কাছে টেনে নিয়ে বৃদ্ধ মনসুর আলি খান গল্প বলতে আরম্ভ করলেন।

'লক্ষ্ণৌয়ের বাঈজী মহলে তখন চন্দাবাঈ উদীয়মান চাঁদের মত আলো ছড়াচ্ছে। ওর দাদ্‌রা আর ঠুংরি, গজল আর কাওয়ালির অসম্ভব খ্যাতি। স্ফুরিত-যৌবনা অপরূপ রূপবতী এই চন্দাবাঈ সমস্ত গানের মেহ্‌ফিল জমিয়ে রেখেছে। শুধু গান নয়, তার সঙ্গে নাচ-ও। পায়ের কারুকার্য্যের সঙ্গে চোখের আয়নায় নানান রঙের আলো খেলাতে পারে চন্দাবাঈ। নিগাঁহে ইসরৎ, নিগাঁহে উলফৎ, নিগাঁহে ফুরকৎ, নিগাঁহে নফরৎ-এর বিলাস-বিভ্রমে। নতুন প্রেমের কুঁড়িকে অনায়াসে প্রগাঢ় বাসনার লীলাপদ্মে ফোটানোর কৌশল আয়ত্ত করেছে সে।

সমস্ত রাজোয়াড়ার সঙ্গীত সভা থেকে ডাক আসছে ওর।—গোয়ালিয়র, অমৃতসর, এলাহাবাদ, বরোদা সব মেহ্‌ফিলে সোনার মোহরের মত নাম বাজছে শ্রোতাদের মুখে মুখে। তামাম হিন্দুস্থান থেকে লুঠে আনছে খ্যাতির মণিরত্ন ওর কণ্ঠের সাতনরীতে। নামের সঙ্গে দাম-ও মিলছে, অলঙ্কারের সঙ্গে বাড়ছে অহঙ্কার।

এমনি সময় গোয়ালিয়রের রাজসভায় গান গাইতে গিয়ে প্রথম ওর অহংমিকায় পড়ল প্রচণ্ড ঘা। ও ম্লান হয়ে গেল বেনারসের প্রসিদ্ধ বাঈজী সিতারাবাঈয়ের কাছে। উত্তর-যৌবনা সিতারাবাঈ কণ্ঠ-মাধুর্য্যে অপরাজেয়।

সবচেয়ে অল্পবয়সী ব'লে সবার আগেই চন্দাবাঈয়ের ডাক পড়েছিল আসরে। ম্যাজেণ্টা রঙের জরির বুটিদার ঘাঘরায় ঢেউ তুলে, ময়ূরকণ্ঠীরঙ চেলির ওপর সূক্ষ্ম ফিরোজা ওড়নাকে টেনে দিয়ে বিদ্যুৎশিখার মত আসরের মধ্যে গিয়ে তসলিম করেছিল চন্দাবাঈ। রূপকে কতকটা আবৃত, কতকটা অনাবৃত করার রহস্যে অনভিজ্ঞা

ছিল না চন্দাবাঈ। হীরে-মোতি চুণী-পান্নার ঝাপ্‌টা আর বিঁন্দিয়া, ঝুম্‌কো আর বেসর, কঙ্কণ আর বাজুবন্দে ঝলমলিয়ে উঠেছিল ওর যৌবনের রূপ-ঝিল লক্ষ তারার প্রতিবিম্বে।

আলাপ নিয়ে ধ্রুপদী ঠাটে সাপ খেলায় নি চন্দাবাঈ। শ্রোতাদের মজ্জিমাফিক, সংক্ষিপ্ত আলাপে সুরের অঙ্গ ছুঁয়েই মধ্য এবং দ্রুত লয়ে গান ধরেছিল। খেয়াল ধ্রুপদের চেয়ে ওর গলায় ঠুংরিই খোলে বেশী। ও তা জানে।

দানাদার সুরেলা গলায় খাম্বাজে ঠুংরি ধরেছিল ও:

'লট উলঝি সুলঝা যা
বালমওয়া, হাথ্‌মে মেহ্‌দী লগি।'

গাইতে গাইতে লতায়িত যৌবনা, লীলায়িত দেহকে মদের পেয়ালার মত তুলে ধরেছিল শ্রোতাদের দৃষ্টি-সীমায়। পাতলা ওড়নার আধ-ঘোমটায় মুখকে লজ্জার মোহন ভঙ্গিতে ঢাকতে ঢাকতে এক বেণী-বিসর্পিণী নারী যেন দয়িতকে মিনতি করে বলেছিল, 'ওগো বঁধু, আমার বেণী খুলে গেছে তুমি এসে বেঁধে দিয়ে যাও, আমার হাতে যে মেহ্‌দী লাগা।' স্বরের মাধুর্য্য আর রূপের মোহ বিস্তার করে সমস্ত সভায় যেন আলোড়ন তুলেছিল উচ্ছলদেহিনী চন্দাবাঈ।

'মাথ্‌কে বিন্দিয়া বিখর গই মোরি
অপ্‌নে হাত লগা যা
বালমওয়া, হাতমে মেহ্‌দী লগি।'

গানের সমাপ্তিতে সভার মধ্যে 'শোভানাল্লা', 'বহুত খুব'-এর ঝড় বয়ে গিয়েছিল। প্রতিধ্বনি উঠেছিল ফরাস থেকে খিলানে দোলানো ঝাড়লণ্ঠনের সারে।

তার পর উঠেছিল বেনারসের বিখ্যাত বাঈজী সিতারাবাঈ। সিতারা তখন প্রৌঢ়ত্বের সীমান্তে। পরণে ওর ছিল শাদা দুধে গরদ, জরি পাড় দেওয়া। সর্ব্বাঙ্গ রেশমের চাদর দিয়ে ঢাকা। চন্দাবাঈ-এর গান শুনতে শুনতে যেন মোহাবিষ্ট হয়ে গিয়েছিল ও এতক্ষণ। বিচরণ করছিল স্বপ্নরাজ্যে। অতীত যৌবনের স্তিমিত দ্যুতি ঘনিয়ে এসেছিল সিতারাবাঈ-এর পল্লববিরল দুই চোখের ক্লান্তিতে। পুরাতন হস্তীদন্তের মত হলদে রঙের মুখের চামড়ায় ফুটে উঠেছিল স্মৃতির রেখাচিত্র।

ঠুংরির জমজমাট পরিবেশে গাইতে বসে কিন্তু ঠুংরি ধরে নি সিতারাবাঈ। দীর্ঘ আলাপের তান বিস্তারের পর, গমকী গলায় খেয়াল ধরেছিল গম্ভীর মালকোষ রাগে:

'মুখ মোড় মোড় মটকাত যাত
এক চতুর নারী অঠলাত যাত,
শির পর গাগর, গাগরী পে গড়ুয়া
পত্‌লি কমর লচকাত যাত
এক চতুর নারী...'

আর সঙ্গে সঙ্গে বিগত-যৌবনা এক জরাঙ্কিতা নারীর অপরূপ কণ্ঠস্বরের যাদুস্পর্শে, অশরীরী রাগরূপ মুহূর্ত্তে এক তন্বী চঞ্চলা প্রগ্‌লভা ছলনাময়ী নারীতে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল রং-ঢং, লীলালাবণ্য দীপ্তি আর দাহ নিয়ে।

দেহভঙ্গিমা বা মদির কটাক্ষের সহায়তা না নিয়েও শুধুমাত্র কণ্ঠস্বরের তুলি দিয়ে আশ্চর্য্য প্রাণস্পর্শী জীবন্ত ছবি এঁকেছিল সিতারাবাঈ শ্রোতাদের অন্তরে। মেয়ে-মানুষের গলায় অমন গমক আর রমকের কাজ, তানের আর মীড়ের খেলা এর আগে শোনে নি চন্দাবাঈ। হলকৃতান, পলট্‌তান, বোলতান, ছুটতানের নিপুণ দীপ্তি ঠিক্‌রে ঠিক্‌রে প'ড়ে বিস্ময়ে হতবাক্‌ করে দিয়েছে চন্দাবাঈকে। নিজেকে বড় তুচ্ছ, ভয়ানক খেলো মনে হয়েছিল তুলনায়। রাগে-দুঃখে জল এসে গিয়েছিল গরবিনী চন্দাবাঈ-এর চোখে।

বিমুগ্ধ শ্রোতারা এক কথায় স্বীকার করে নিয়েছিলেন সিতারাবাঈ-এর শ্রেষ্ঠত্ব। জয়মালা কণ্ঠে পরেও সিতারাবাঈ-এর মুখ গর্ব্বে-গৌরবে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে নি। ঈর্ষ্যাকাতরা আহত সর্পিণীর মত চন্দাবাঈকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে অপমানিত হয়ে ফিরে এসেছিল সে। ঝট্‌কা মেরে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে সদর্পে আসর ছেড়ে চলে গিয়েছিল চন্দাবাঈ।

আর তার পর থেকে দীর্ঘ পাঁচ বছর কোন মেহ্‌ফিলে গানের নিমন্ত্রণ নেয় নি চন্দাবাঈ। বায়না নেয় নি কোন সভায় নাচের।

প্রাণ ঢেলে সঙ্গীতের সাধনা সুরু করেছিল সে। এবার আর ঠুংরির লঘুচপল গায়েন-শৈলী নয়, নয় লাস্যময় রীতি-নীতি, রং-ঢং। ধ্রুপদের গম্ভীর ঠাট আর খেয়ালের দুরূহ পদ্ধতি আয়ত্ত করতে চায় সে। খানদানী-সম্ভূত গুণী ওস্তাদের কাছে দীর্ঘ দিন তালিম নিয়ে নিজেকে তৈরি করতে বদ্ধপরিকর হ'ল। সিতারা-বাঈকে পরাজিত করার দৃঢ় সঙ্কল্পই ইন্ধনের কাজ করল। হ'ল সফলতার বীজমন্ত্র।

স্মৃতি ও শ্রুতির সঙ্গে যোগ দিলে ব্যগ্র একাগ্রতা। শুধু স্বরজ্ঞানই নয়, সঙ্গীত-বিজ্ঞানের শিখর স্পর্শ করতে চাইলে দিনরাত্রির অক্লান্ত অধ্যবসায়ে। সিতারাবাঈ-এর দীর্ঘ আয়ু আর দীর্ঘ অভিজ্ঞতার বিপক্ষে হাতে এল অনেকগুলি তীক্ষ্মমুখ অস্ত্র। এবার যুদ্ধে নামতে পারে সে। পারে বৃদ্ধা বাঈজীকে পরাস্ত করতে অবহেলায়।

অন্যান্য বছরের মত এবারও ডাক এল মৈহারের রাজসভায় সঙ্গীত পরিবেশনের। গোপনে সংবাদ নিয়ে জানল, সিতারাবাঈ ঐ মেহ্ফিলে গান গাইতে আসছে। উদ্দাম উৎসাহে আর উন্মাদনায় যেন জলদে বেজে উঠল চন্দাবাঈ। লড়াইএর ঘোড়ার মত নেচে উঠল মন। প্রতিশোধস্পৃহায় টান টান হয়ে উঠল সমস্ত তন্ত্রী।

মৈহারের মেহ্ফিল তামাম হিন্দুস্থানের গুণী শিল্পী আর শ্রোতার মিলন-ক্ষেত্র। ওখানে গাইতে পাওয়া ভাগ্যের কথা। এ সুযোগ সে ছাড়বে না। এই উপলক্ষ্যে বহুমূল্য পোশাক-পরিচ্ছদ তৈরী করাল সে। নতুন নতুন জেওরৎ গড়াল। এবার আর প্রথম রাত্রে গান গাইবে না চন্দাবাঈ; ওস্তাদের মার শেষরাত্রে। অন্ততঃ মধ্যরাত্রের আগে গান জমে না, মেজাজ তৈরী হয় না শ্রোতাদের।

তিন দিন ধরে মেহ্ফিল চলবে। প্রথম দিন আর শেষ দিন বিশিষ্ট গুণীদের অনুষ্ঠান, মাঝের দিন মাঝারি গায়ক-গায়িকা, উঠ্তি শিল্পীদের জন্যে। চন্দাবাঈ প্রথম ও শেষ দিনের জন্যে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। যদিও সিতারাবাঈএর আগে তাকে স্থান দেওয়া হয়েছে অনুষ্ঠান-সূচীতে। তবুও এবার ছাড়বে না চন্দাবাঈ, দেখে নেবে কার কেমন কেরামতি।

যথাসময়েই মৈহারের মেহ্ফিলে পৌঁছালো চন্দাবাঈ। প্রথম দিনের আসরে টাল-মাটাল ক'রে বারোটা বাজিয়ে দিয়ে গান গাইতে বসল চন্দাবাঈ। ধরল দরবারি কানাড়ায় খেয়াল: 'ঘুংঘট্‌কে পট খোল তেরা পিয়া মিলেঙ্গে'...

গভীর গম্ভীর রাগের সূত্র ধরে মহলের পর মহল অতিক্রম করে চলেছে চন্দাবাঈ। কিন্তু সহজ সাবলীল নয়, একান্ত সন্তর্পণে। যেন তারের ওপর হাঁটবার সার্কাসী কৌশল দেখাচ্ছে। তাই জবড়জং গয়না আর কাপড় পরা পুতুল হয়ে রইল ওর গান, প্রাণস্পর্শে প্রতিমা হয়ে উঠল না। ঘেমে নেয়ে উঠল চন্দাবাঈ। বিস্তর কালোয়াতি দেখিয়ে গান শেষ করল। কিছুটা সাধুবাদ অবশ্য মিলল কিন্তু তার অনেকখানিই গানের চেয়ে গায়িকার রূপযৌবনের প্রতি, এ সত্যটা উহ্য রইল না চন্দাবাঈ-এর চোখে। আসর ছেড়ে উঠতে যাচ্ছে, সিতারাবাঈ পেছন থেকে ওকে বুকে টেনে নিলে। ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বললে, 'বড় সুন্দর গেয়েছ তুমি, কিন্তু ঠুংরি গাইলে না কেন? তোমার গলায় বড় চমৎকার খোলে। তোমার গোয়ালিয়রের গান এখনও আমার কানে বাজে।'

সিতারাবাঈ-এর আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে অবজ্ঞায় ঠোঁট বাঁকালো চন্দাবাঈ। বললে, 'ওসব হাল্কা গায়কীর গান আমি আর গাই না।' রূপযৌবনের উদ্ধত ঢেউ তুলে নিজের জায়গায় গিয়ে বসল সে, মখমলের তাকিয়ায় ঠেস্ দিয়ে রাণীর মত।

আরও কয়েকজনের গানের পর ভোর রাত্রে উঠল সিতারাবাঈ। পূর্ব্বদিকে উষার রক্তিমাভাস। সন্ধি-প্রকাশ রাগ-রাগিণীর লগ্ন আসন্ন। ভৈঁরো, মিয়াঁকী তোড়ি, ললিত কিংবা আশাবরীতে খেয়াল ধরলে না সিতারা। দ্রুত লহরায় তানের ঝড় বইয়ে দিয়ে ভৈরবীতে ঠুংরি জুড়ে দিলে:

'হটো কাহে কো ঝুঁটে বনাও বতিয়া
ওহা যাও যাঁহা রহে সারি রতিয়া...'

কপট প্রেমিকের শঠতায় সারারাত্রি বিনিদ্র প্রতীক্ষায় ব্যর্থ খণ্ডিতা নায়িকার তীব্র ভৎর্সনার ঝংকার ঠিকুরে ঠিকুরে পড়ল রেখকে আর গমকে দানাদার গলার ঝট্‌কায়। তবলার সঙ্গত কথার পিঠে কথার মত ঠেকা দিয়ে যাচ্ছে আশ্চর্য্য নৈপুণ্যে। সমস্ত মেহ্ফিল যেন মস্ত্ হয়ে গেল একেবারে। ধারালো মিষ্টি গলার পলট্ তানে শ্রোতাদের উচ্চকিত করে গান চলল:

'অব বন্-কহ্ রহে কা উয়ো মৌকা ন থা—
অব বো ঘাত ন থা—
অরে হাঁ, হাতমে মেহ্দী ন থা—
ঔর আপকো বরসাত ন থা
আর কজা আয়ে কি সিবা কোই বাত ন থা
দিনকো ন আ সকতে থে আপ তো
ক্যা রাত ন থা?
এহী কহিয়ে কী মঞ্জুর মুলাকাত ন থা
অরে হাঁ, ওহি যাও যহাঁ রহে সারি রতিয়া
হটো কাহে কো ঝুঁটে বনাও বতিয়া...।'

গান শেষ হবার পরেও যেন ঘোর কাটতে চায় না শ্রোতাদের। সম্মোহিত বিস্ময়ে যেন পাথর হয়ে গেছে ওরা।

সিতারাবাঈ কখন আসর ছেড়ে চলে গেছে, জানতে পারে নি চন্দাবাঈ। আর একবার যেন চরম পরাজয়ে অপমান করে গেছে ওকে। ঠুংরির সস্তা বোড়ের চাল দিয়ে ওর সবচেয়ে দামী রাজাটাকেই মাৎ করে গেছে। রাগে চোখ দিয়ে যেন আগুন ছুটতে থাকে চন্দাবাঈ-এর।

মাঝের দিনটা ওদের দু'জনের কারুর গান-ই ছিল না। রাজভবনের অতিথিশালার ঘরগুলোতে গণ্যমান্য বরেণ্য অতিথি-অভ্যাগত আর শিল্পীরা বিশ্রাম করছিলেন। চন্দাবাঈ নিজের কামরায় তবলচী রহমতুল্লার সঙ্গে রেওয়াজ করছিল। এমন সময় ঘরে এসে ঢুকলেন ছোট-খাটো এক দেশীয় রাজ্যের রাজা পুরন্দর সিং। মেহ্ফিলে ইনি চন্দাবাঈ-এর জন্যেই এসেছেন।

তসলিম করে উঠে দাঁড়াল চন্দাবাঈ। বললে, 'তসরিফ রখিয়ে মেহেরবান। কহিয়ে ম্যয় আপকে ক্যা সেবা কর সকতি হুঁ?'

ওর দেহের রঙীন ঢেউগুলো লুব্ধ দৃষ্টি দিয়ে ছুঁতে ছুঁতে রাজাসাহেব আসন গ্রহণ করলেন। বললেন, 'তোমার গান শুনে বড্ড খুশী হয়েছি চন্দাবাঈ, তোমাকে আমার সঙ্গে আমার এষ্টেটে যেতে হবে। আমি সব বন্দোবস্ত করে রেখেছি।'

'তাই নাকি?' খিলখিলিয়ে হেসে উঠল চন্দাবাঈ। ঝিলমিলিয়ে উঠল ওর উদগ্র যৌবন অঙ্গাবরণে আর অঙ্গাভরণের দ্যুতিতে।

'তুমি যত রূপিয়া চাও পাবে।' পুরন্দর সিং জানালেন।

'না, রূপিয়ার জন্যে ভাবি নি,' মদির কটাক্ষে বিদ্ধ করতে করতে চন্দাবাঈ হাসলে: 'রূপিয়া ঢের কামিয়েছি মেহেরবান, আমি অন্য জিনিসের কথা ভাবছিলাম।' দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে চুপ করে গেল ও।

'বল, বল, অন্য কি চাইবার কথা ভাবছিলে?' ব্যস্ত হলেন রাজাসাহেব। 'আমি দেব তোমাকে চন্দাবাঈ, যা চাইবে তা-ই দেব।' কামার্ত্ত চোখে চন্দাবাঈ-এর দেহকে লেহন করতে করতে বললেন পুরন্দর সিং।

'আপনি কি দিতে পারবেন?' সংশয়াচ্ছন্ন কণ্ঠে কেমন বিমনা হ'ল চন্দাবাঈ।

'আমার ক্ষমতাকে উপহাস করছ তুমি!' পুরন্দর সিং-এর কণ্ঠে ঝড়ের পূর্ব্বাভাস।

'গুস্তাকী মাফ করবেন সরকার,' চোখে-মুখে বিনয়ের ভাব প্রকাশ করলে চন্দাবাঈ, 'কালকের মেহ্ফিলে চন্দাবাঈ শ্রেষ্ঠত্বের মর্য্যাদা চায় মেহেরবান, তামাম আসমানের তারার জ্যোতি নিভিয়ে পূনমের চাঁদের মতন জ্বলতে চায় সে···পারবেন মহারাজ, পারবেন তার ব্যবস্থা করতে আপনি?' উদ্বেগ-আকুল কণ্ঠে আবেদন জানাল সে।

'আরে, এতে আর আমার মদদের কি দরকার বিবিজান?' হাসলেন রাজাসাহেব।

'সঙ্গীতের দুনিয়ার সম্রাজ্ঞী হয়েই ত তুমি জন্মেছ। তোমার আবার কাকে ভয়?'

'সিতারাবাঈ ছাড়া অন্য কারও পরোয়া চন্দাবাঈ করে না মেহেরবান,' হাসল চন্দাবাঈ। পুরুষের রক্তধারাকে ক্ষিপ্ত ক'রে তোলা সর্ব্বনাশা হাসি।

'বেশ, তাই হবে,' বললেন পুরন্দর সিং। 'তুমি নির্ভয়ে রেওয়াজ কর, আমি যাই।' বেরিয়ে গেলেন তিনি।

ঘটনাটা সেই রাত্রেই ঘটল। সন্ধ্যাবেলা রাজবাড়ীর মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিল সিতারাবাঈ, ফিরতে বেশ একটু রাত হয়ে গেল। নাট-মন্দিরে বসে অনেকক্ষণ ধ'রে ভজন শুনেছে সে। কি এক অব্যক্ত আনন্দ বেদনায় চোখেও জলে বুক ভাসিয়ে।

অন্ধকার রাত্রি। টাঙায় করে ফিরছিল সিতারাবাঈ। অতর্কিতে একদল গুণ্ডা টাঙার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ব্যাপারটা ভাল করে অনুধাবন করার আগেই ছোরার আঘাত এসে বিঁধল বুকে। চীৎকার করে উঠল সিতারাবাঈ। রক্তে ভেসে গেল দেহ।

এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় বিমূঢ় হয়ে গেল সকলে। গানের জলসা বন্ধ হয়ে গেল। রাত দুটোর সময় মারা গেল সিতারাবাঈ। মৃত্যুকালে উকিলের কাছে উইল করে নিজের সমস্ত টাকাকড়ি, গহনাপত্র আর বেনারসের দু'খানা বাড়ী দিয়ে গেল চন্দাবাঈকে। সিতারাবাঈ-এর ধারণা, বিশ বছর আগে তার যে তিন বছরের শিশু-কন্যাটি লক্ষ্ণৌ-এর বাড়ী থেকে চুরি হয়ে যায়, চন্দাবাঈ নাকি সেই হারাণো মেয়ে। সিতারাবাঈ নাকি সম্প্রতি তার প্রমাণ পেয়েছে।

চন্দাবাঈ-এর অনুশোচনা হয়েছিল কি না খুদা জানেন। কিন্তু তারপর থেকে গান গাওয়া সে একেবারে ছেড়ে দিলে।

চুপ করলেন মনসুর আলি।

দময়ন্তী কখন যেন উঠে গিয়ে মা'র গলা জড়িয়ে ধরেছে।

আলোচনা

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক পটভূমিকা

শ্রীসুধীন্দ্রলাল রায়

১৩৭১ বৈশাখের প্রবাসীতে শ্রীশ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধটি আগ্রহের সঙ্গে পড়িলাম। ইহা নিঃসন্দেহ যে তিনি সবল ও স্বাধীন চিন্তাধারার পরিচয় দিয়াছেন। যে বিরাট্ পটভূমিকে তিনি আলোচনার বিষয় করিয়াছেন তাহার সম্যক্ মসাচিত্র প্রবাসীর দ্বাদশ পৃষ্ঠায় সম্ভব নয়। একটা উপক্রমণিকা মাত্র দেওয়া সম্ভব। কিন্তু তাহা তিনি দিতে পারেন নাই। ইতিহাসের ভিত্তি হইল সময় বা কাল। ঘটনার পারম্পর্য্য অনুসারেই ইতিহাসের মূল্যায়ন সম্ভব। কাল-নিরপেক্ষ বিচার ঐতিহাসিক বিচার হইতে পারে না। পারস্য ভাষায় ইতিহাসকে বলে "তওয়ারিখ", যাহা হইতে বাংলা তারিখ শব্দটি সংগৃহীত। শ্যামলবাবু ঘটনার তারিখী মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারেন নাই। সেইজন্য তাঁর ঘটনা-বিশ্লেষণ হোঁচট খাইতে খাইতে অগ্রসর হইয়াছে। তথ্যগুলির সত্যরূপ তাঁহার নাগালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। তথ্যগুলির চতুর্দ্দিকে তিনি কনকেভ ও কনভেক্স আয়না সাজাইয়া হ্রস্বকে প্রলম্বিত দেখাইয়াছেন, দীর্ঘকে হ্রস্ব করিয়াছেন।

যেমন, রাজা রামমোহন রায়কে শ্যামলবাবু বলিলেন—"রামমোহনকে বাংলা সাহিত্যের জনক আখ্যা দেওয়া অসম্ভব।" কেননা, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাণ্ডিত ও মুন্সীরা স্মরণীয়। রামমোহনের "সাহিত্য" এবং মুন্সী পণ্ডিতদের বাংলা গদ্যের পার্থক্য করিতে না পারায় শ্যামলবাবুর ঐতিহাসিক পটভূমি হইতে রামমোহন নির্ম্মমভাবে পদচ্যুত হইলেন। "ঐ সময়ে বিপুল বিশ্বে যে এক বিরাট্ আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল…… রামমোহন তার এক প্রবল প্রকাশ।" ("বিপুল" "প্রবল" এবং এরূপ বিশেষণগুলির বহুল ব্যবহার শ্যামলবাবুর বয়োধর্ম্মের পরিচয় দিতেছে)। ইনি পরে যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে মনে হয় যে, ফরাসী বিপ্লবই এই বিরাট্ আন্দোলন। কিন্তু রামমোহনকে উহার "প্রবল প্রকাশ" বলিলে যুক্তি, তথ্য ও লজিকের মস্তক চর্ব্বণ করিতে হয়। রামমোহন জন্মিলেন ১৭৭৪ (বা ১৭৭২) এবং ফরাসী বিপ্লব ঘটিল ১৭৮৯। তখন রামমোহনের বয়স হয় ১৫ নয় ১৭। সেই বয়সে রামমোহন ইংরাজী জানিতেন না। সুতরাং ফরাসী বিপ্লব সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হইবার কোনও সম্ভাবনা তাঁর ছিল না। এ ছাড়া যে একেশ্বরবাদ এদেশের চিন্তাধারায় তাঁর বিশিষ্ট দান, তাহা ঐ ১৭ বৎসর বয়সেই তাঁর মনে দানা বাঁধিয়া গিয়াছে যুগপৎ আরবী, ফার্সী ও সুফী সাহিত্যের গভীর অনুশীলনের ফলে। শ্যামলবাবুর ইমোশনালিজ্‌ম তাঁকে তারিখ ও তথ্যের ঊর্দ্ধে এক তুরীয় পর্য্যায়ে পৌঁছাইয়া দিয়াছে। রামমোহনের traditionalism শ্যামলবাবুকে বিস্মিত করিয়াছে যদিও তাহার কারণ খুবই যুক্তিগ্রাহ্য।

শ্যামলবাবুর আর একটা ঐতিহাসিক আবিষ্কার—"দু'টি বিরাট্ ব্যক্তিত্বকে অবলম্বন করে জগতে এই নবশক্তি আত্মপ্রকাশ করে— ওয়াশিংটন ও নাপোলিয়ন।" বাগবাজারের খাঁটি বাসিন্দাই এমনভাবে ইতিহাসকে নস্যাৎ করিতে পারে। ওয়াশিংটনকে "অবলম্বন" করিয়া মার্কিন স্বাধীনতা যুদ্ধ আত্মপ্রকাশ করে নাই। স্বাধীনতা যুদ্ধকে "অবলম্বন" করিয়া ওয়াশিংটনের প্রকাশ। সেইরূপ ফরাসী বিপ্লবের অবলম্বনেই বোনাপার্ট নেপোলিয়ন হইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া ফরাসী বিপ্লব "আত্মপ্রকাশ" করে নাই। বিপ্লবকে বিনাশ করিয়াই তিনি বৈপ্লবিক চিন্তাধারাকে ফরাসীজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত ও ইউরোপের চেতনায় নিহিত করিয়াছিলেন। "আমেরিকার ঔপনিবেশিকবৃন্দ" নতুন "স্বাধীনতাকামী" ছিলেন না। ইউরোপের স্বাধীনতাকামীরাই আমেরিকায় উপনিবেশ করে। এবং ইংলণ্ডের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ নিছক আর্থিক ও রাজনৈতিক কারণে। "রোমাণ্টিক চেতনাকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে" শ্যামলবাবু যেভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে দেখিয়াছেন তাহা অনৈতিহাসিক অযুক্তিবাদের আচাভূয়াবোম্বাচাক্। তিনি লাফিং গ্যালারিতে বসিয়া বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের স্বরূপ দেখিতে চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়াই রামমোহনের ব্যক্তিগত জীবনযাপনের ত্রুটি-বিচ্যুতির উল্লেখ করিয়া ঐ যুগপুরুষের মহত্ত্বের মর্য্যাদাবোধে অক্ষম হইয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশের খ্রীষ্টানী মরালিটির কৃত্রিম অনুকরণকারী সমাজের কষ্টিপাথরে একশত বৎসর পূর্ব্বের রামমোহনের বাংলাসমাজের পরিমাপ করিতে গিয়া শ্যামলবাবু প্রমাদগ্রস্ত হইয়াছেন। ১৭৭৪ হইতে ১৮৩০ পর্য্যন্ত বাংলাসমাজের আদর্শ অনুযায়ী রামমোহনের কোনও ব্যক্তিগত ত্রুটিবিচ্যুতি ছিল, ইহা কোনও ঐতিহাসিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি বলিতে পারে না। এবং রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের মধ্যে কে মহত্তর, এ প্রশ্ন তুলিতে পারে না। "প্রতিক্রিয়াশীল" ও "রক্ষণশীলের" পার্থক্য বুঝিতে পরাঙ্মুখ হইয়া শ্যামলবাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যা দিয়া বসিয়াছেন।

"বাংলা দেশের সাংস্কৃতিক জগতে" "বিদ্যাসাগরের পর মধুসূদন-বঙ্কিমের আবির্ভাব"—শ্যামলবাবুর এই মন্তব্য তথ্য-সিদ্ধ নহে। মধুসূদন ও বঙ্কিম বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক। মধুসূদন ও বঙ্কিমের মানসিক ও সাংস্কৃতিক প্রস্ফুটনে বিদ্যাসাগর একেবারেই নির্দ্দোষ।

রামমোহনের জীবনে "পরস্পর-বিরোধী ভাবধারায় অস্তিত্বের পরিচয়" শ্যামলবাবু পাইয়াছেন, কেননা রামমোহনের মানসিক উন্মেষ ও বিকাশের মূলসূত্র তিনি ধরিতে পারেন নাই। ইসলামিক ধর্ম্মাদর্শই রামমোহনকে প্রখর যুক্তিবাদী করিয়া তুলে। বিশুদ্ধ ইসলাম পরমত-অসহিষ্ণু ছিল না। ছিল না বলিয়াই গ্রীক, ভারতীয় ও চীন সাহিত্যের অনুবাদের দ্বারা ইসলাম সংস্কৃতি ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন হয় এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ডোভা হইতেই ইউরোপীয় বিদ্যার্থীরা জ্ঞানবিজ্ঞানের মহলে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়। অনেক গ্রীক পুস্তক বিলুপ্ত হইয়া ও আরবী অনুবাদ হইতে পুনরায় অনূদিত হইয়াই ইউরোপের রিনেসাঁসকে পরিপুষ্ট করে। এইরূপ ঐতিহাসিক বোধের অভাবই শ্যামলবাবুর প্রবন্ধটিকে পরস্পর-বিরোধী ও অসঙ্গতিপূর্ণ বক্তব্যের আকরে পরিণত করিয়াছে। ঐ অভাবের জন্যই তিনি মন্তব্য করিতে পারিয়াছেন— "কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ রামকৃষ্ণকে বাড়াতে থাকেন।" ঐতিহাসিক বিচারে এ মন্তব্য টেঁকে না। রামকৃষ্ণকে কেশব "বাড়াতে" চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া জানি না। কেশব জ্ঞান ও বাগ্মিতার দ্বৈত রথে চড়িয়া ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডে তাঁর মাহাত্ম্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেন ও তার পরই তিনি দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করেন। সে সময় তাঁর যশ চতুর্দ্দিকে সমুচ্চারিত। দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন আত্মসন্ধানী নীরব সাধক, কেশবের মত প্রচার-ধর্ম্মী ছিলেন না। সুতরাং ঐ সময়ে দেবেন্দ্রের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হওয়ার কোনও কারণই কেশবের ছিল না। শ্যামলবাবু ভাবালুতার আবেগে কেশবের মত বিরাট্ মনীষাকে বিদ্বেষের ক্ষুদ্রতায় মণ্ডিত করিয়া ঐতিহাসিকতার আদ্যশ্রাদ্ধ করিয়াছেন—সে

কথা তিনি নিজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। কেশব-রামকৃষ্ণ সংবাদ বাংলার ধর্ম্ম-আন্দোলনের ইতিহাসের আলোচনার বিষয় হইতে পারে; উহা সাহিত্যিক ইতিহাসের পটভূমির বাহিরের বিষয়।

যেমন "সিপাহী বিদ্রোহ"। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের কোনও সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা নিরর্থক। শ্যামলবাবুর আচার্য্য ইহার অবান্তর আলোচনা করিয়াছেন। সুকুমারবাবুর যে ভাষ্যটুকু শ্যামলবাবু উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা পড়িয়া মনে হয় যে, সমগ্র বাঙালী জাতি সমবেত হইয়া বিচারতর্ক করিয়া স্থির করিল যে, তাহারা "সিপাহী বিদ্রোহে" যোগ দিবে না, কেননা "সিপাহীদের জয়লাভ মানেই আবার জীর্ণ মোগলশাসনের দিনে প্রত্যাবর্ত্তন এবং অর্দ্ধ শতাব্দীব্যাপী সব কিছু প্রগতির প্রত্যাখ্যান।" সুকুমারবাবুর একথা মনেও আসিল না যে, একজন বাঙালী সিপাহীও ইংরাজ ফৌজে ছিল না। সুকুমারবাবুর দৃষ্টিহীনতার জন্য তিনি দেখেন নাই যে, ইতিহাস কালপ্রবাহে পিছাইয়া যায় না—থামিয়া থাকিতে পারে। মানবজীবন ইতিহাস অনবরত পরিবর্ত্তনশীল। একথাও দেখিতে পান নাই যে, ইংরেজ হারিলে মোগল শাসনে প্রত্যাবর্ত্তন নয়, বর্গীর খপ্পরগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী ছিল। তৃতীয়তঃ আচার্য্য সুকুমারের দৃষ্টিবহির্ভূত রহিয়া গিয়াছে যে, প্রথম দিকে বল, ম্যালিসন, ধর্ণহিল প্রভৃতি সমসাময়িক ইংরেজ লেখকরা "সিপাহী" বিদ্রোহ বলেন নাই। তাঁদের পুস্তকগুলি "ইণ্ডিয়ান" বিদ্রোহের সম্বন্ধে। কংগ্রেস গঠিত হওয়ার পর ইংরেজ শাসকরা মনস্তাত্ত্বিক কারণে ভারতীয় ছাত্রদের স্কুল-কলেজ মারফত শিখাইল উহা "ইণ্ডিয়ান" বিদ্রোহ নহে—"সিপাহী" বিদ্রোহ। যুক্তিবিবর্জ্জিত বিদ্যা বা জ্ঞান যে কত হানি করে তাহা এই সুকুমার-সংবাদে বুঝিতে পারিতেছি। "সিপাহী" বিদ্রোহ ও বাংলা সাহিত্যকে এক সূতায় গাঁথার কাকতালীয় বুদ্ধি যদি আচার্য্যদেরই থাকে, তবে শ্যামল শিষ্যরা বিচার-ক্ষমতা কেমন করিয়া লাভ করিবে?

থাকিতে পারে না বলিয়াই সাহিত্য-বিচারে সুভাষচন্দ্র, চিত্তরঞ্জন, অরবিন্দকে টানিয়া আনিয়া তাদের নাস্তানাবুদ করা হইয়াছে। কুইক্সোটের মত যত্রতত্র তিনি দানব ও রাক্ষস খাড়া করিয়া এলোপাতাড়ি হাতিয়ার ছুঁড়িয়াছেন। বার পৃষ্ঠার মধ্যে এত পরস্পর-বিরোধী মন্তব্য ঠাসিয়াছেন যে বিস্মিত হইতে হয়।

"প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইউরোপে ফরাসী বিপ্লব মহত্তর সাফল্য লাভ করে", এরূপ আজগুবি মন্তব্য ইউরোপের কোন স্কুলের ছাত্রও করিবে না। এবং ইহার সমর্থনে ফিশারের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার অর্থ না বুঝিয়া। প্রথম মহাযুদ্ধের ফলে ইউরোপের ক্ষেত্র হইতে যে তুর্কী-বিদেশীর অধিকার অপসৃত হয় ফিশার তাহাই বলিতেছেন।

বিশ্ব ইতিহাসের ধারা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম হইয়াই শ্যামলবাবু অসংলগ্ন ও অযৌক্তিক মন্তব্যে তাঁর প্রবন্ধ কণ্টকিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে এক ভয়াবহ সিদ্ধান্ত এই—"১৯০৫ সালের বাঙালী ......ইংরেজের বিরুদ্ধে যে আত্মঘাতী আন্দোলনে প্রবৃত্ত হয়, তার ফলে সে আজ অপেক্ষাকৃত অধম জাতির শাসনাধীন। জগতের শ্রেষ্ঠ ভাষার বদলে এক নিকৃষ্ট পর-ভাষা তার রাষ্ট্রভাষা।" অদূরদর্শী, সত্যবিরোধী মনোভাবের ফলে একদল বাঙ্গালীর মধ্যে উৎকট বাঙ্গালিয়ানা দেখা দিয়াছে, বাংলাকে তারা ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতেছে, ফলে বাঙ্গালীর সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনিতেছে। দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে জাতক মালায় এক গল্প এই মনোভাবের পরিণাম বর্ণনা করিয়াছে। উদরের প্রতি হিংসায় হাত, পা, মুখ ননকোঅপারেশন করিয়া দেহের অপমৃত্যু ঘটাইয়াছিল। স্বাধীন ভারতে বাঙ্গালী অবাঙ্গালী-ভারতীয় "অধম জাতির শাসনাধীন"—এই পাগলের প্রলাপ সৌভাগ্যক্রমে সব বাঙ্গালীর নয়, মধু-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের ত নহেই—শরদিন্দু-প্রমথনাথ-বুদ্ধদেবেরও নয়। দাদাজী দিলীপও অবাঙ্গালীর গুরুগিরি করিতেছেন। উদরকে পূর্ণ না করিলে যে হাত-পা অচল হয়, ভারতকে বাদ দিলে যে বাঙ্গালীর অস্তিত্ব থাকে না—এ কথা যাহারা বুঝে না, তাহারা সত্যই করুণার পাত্র। ঐ বাঙ্গালীরা বেমালুম ভুলিয়া গিয়াছেন যে, চাটুজ্যে বাঁড়ুজ্যে ঘোষ বসু মিত্র যাঁরা বাঙ্গালিয়ানার চিৎকারে দিগন্ত প্রকম্পিত করিতেছেন, তাঁরা খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতেও ঐ "অধম" জাতিভুক্ত "নিকৃষ্ট পর-ভাষা"-ভাষী হিন্দীওয়ালা ছিলেন। মাদ্রাজী বল্লাল সেন ১১৫৮ হইতে ১১৭৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাংলা শাসন করিয়া, বাংলা দেশের বিদ্রোহী বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদিগকে জব্দ করিবার জন্য নিকৃষ্ট পরভাষাভাষী কনৌজিদের আনিয়া আজকের হিন্দী-বিদ্বেষী ধুরন্ধরদের পূর্ব্বপুরুষদের বাংলায় প্রতিষ্ঠিত করেন। কুতুবুদ্দীন ১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লী দখল করেন ও ১১৯৮ সালে বক্তিয়ার খিলজি পশ্চিমবঙ্গ জয় করেন। সুতরাং ভারতে মুসলমান বিদেশীরা যতদিন হইতে বসবাস করিতেছে, বাংলা দেশে চাটুজ্যে বাঁড়ুজ্যে ঘোষ বসুদের অবাঙ্গালী পূর্ব্বপুরুষরা তার চাইতে বেশী দিন আগে বাস করিতে আসে নাই। আদিম বাঙ্গালী বেশীর ভাগ ছিল বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, তাহারা এই নবাগত "অধম জাতির" বংশধর "হিন্দু" উচ্চবর্ণের অত্যাচারে সাম্যবাদী ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। পশ্চিমবঙ্গে মাহিষ্য, বাগদি প্রভৃতিরা অবহেলিত, নিষ্পিষ্ট ও অবাঙ্গালী-রূপে গণ্য হইতে লাগিল চাটুজ্যে বাঁড়ুজ্যেদের পূর্ব্বপুরুষদের কৃপায়। এই ঐতিহাসিক পটভূমি যাঁহারা উপেক্ষা করিবেন তাঁহাদের কাছে ঐতিহাসিক বিচার আশা করা যায় না।

তার পর "নিকৃষ্ট পর-ভাষা"র কথা। ঐ নিকৃষ্ট ভাষাই যাদের মাতৃভাষা, সেই অধম জাতীয় ঔপনিবেশিকরা বল্লাল সেনের কৃপা ও অর্থে পুষ্ট হইয়া যখন বাংলার বুকে কুলীন হইয়া বসিলেন, তখন ঐ ভাষা খাঁটি বাংলা ভাষাকে কতখানি প্রভাবিত ও নবরূপে ভূষিত করিল—ঐতিহাসিক সত্যকে যারা দেখিয়াও দেখিবে না তারা বুঝিবে কেমন করিয়া? যখন বাঙ্গালীর চিন্তা করিবার ক্ষমতা ছিল তখন বাঙ্গালী মনীষা হিন্দীর নিকট বাংলা ভাষার ঋণ অস্বীকার করিতে চেষ্টা করে নাই। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে সাহিত্য-বিষয়ক বক্তৃতাগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত করিয়াছেন, সেগুলি শ্যামলবাবু চর্চ্চা করিলে হিন্দীর নিকট বাঙ্গলা ভাষার ঐতিহাসিক ঋণের কথা জ্ঞাত হইতেন। রসিকলাল রায় নামক এক গবেষকের হিন্দীভাষা সম্বন্ধে রচনাগুলির সঙ্গে পরিচয় করিবার অধ্যবসায় যদি শ্যামলবাবুর থাকিত, তবে তিনি জানিতে পারিতেন যে, বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য কতখানি হিন্দী কবি সুরদাসের নিকট ঋণী। রবীন্দ্রনাথের ভানুসিংহের পদাবলী রচনার গূঢ় অর্থ বুঝিলে তিনি বাংলার উপর হিন্দীর প্রভাব অনুধাবন করিতে পারিতেন। ভাগলপুরে অনুষ্ঠিত বাংলা সাহিত্য সম্মেলনের সপ্তম বা অষ্টম অধিবেশনে, সারদাচরণ মিত্রের প্রস্তাবে বাঙ্গালী বিদগ্ধ-সমাজ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, স্বাধীন ভারতে হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হইবে। রবীন্দ্রনাথ এই সভায় উপস্থিত শুধু ছিলেন না—ঐ প্রস্তাব সমর্থন করেন। হাতের কাছে পাঁজি নাই তাই ঠিক বলিতে পারি না—উহা বোধ হয় ১৯০৮ সালে। ঐ পর্য্যন্তই বাঙ্গালী ভারতের চিন্তাজগতে অগ্রণী ছিল। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা সস্তা হওয়ার পরই চিন্তাশক্তি সে হারাইয়াছে।

এপষ্টাইন ও রবীন্দ্রনাথ

শ্রীমৃণাল ঘোষ

[illegible] ভাস্কর এপষ্টাইনের জগৎজোড়া খ্যাতি। তাঁর সমসাময়িক কালের ইউরোপের বহু মনীষী সিটিং দিয়েছেন তাঁর লণ্ডনের ষ্টুডিওতে। রবীন্দ্রনাথের একটি আবক্ষ মূর্তি সৃষ্টি করবার কোন সুযোগ পান নি বলে শিল্পীর মনে বড খেদ ছিল। তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু তদানীন্তন লণ্ডন স্কুল অফ আর্টের প্রিন্সিপ্যাল, রবীন্দ্রানুরাগী উইলিয়াম রদেনষ্টাইনের কাছে তিনি সে কথা বার বার বলেছিলেন। এই রদেনষ্টাইনই আইরিশ নোবেল লরিয়েট উইলিয়াম বাটলার ইটশ-এর ভূমিকাযুক্ত ইংরেজী গীতাঞ্জলিতে মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের একটি সুন্দর রেখাচিত্র এঁকেছিলেন।

সেবার রবীন্দ্রনাথ লণ্ডনে পৌছবার পরই এপষ্টাইন তাঁর ষ্টুডিওতে কবিসম্রাটকে সিটিং দেবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন। প্রার্থনা মঞ্জুর করে রবীন্দ্রনাথ ষ্টুডিওতে তাঁর শুভাগমনের দিনটি শিল্পীকে জানিয়ে দিলেন।

অবশেষে বহু আকাঙ্ক্ষিত দিনটি এল। রবীন্দ্রনাথ এপষ্টাইনের ষ্টুডিওতে নামবামাত্রই তাঁকে শিল্পীর পূর্ব-নির্দেশ অনুযায়ী সসম্মানে একেবারে তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়া হ'ল!

হিলিয়োট্রোপ রঙের ক্রেটনের পর্দা সরিয়ে, মৃদু নীলাভ আলোয় আলোকিত ষ্টুডিওর মধ্যে যখন রবীন্দ্র-

নাথকে নিয়ে আসা হ'ল, এপষ্টাইন হঠাৎ মুহূর্তের জন্য যেন স্তম্ভিত হতচকিত হয়ে ঈষৎ নতমস্তকে কবিকে সাদর অভ্যর্থনা করবার জন্য দ্রুত অগ্রসর হলেন। প্রথম একটি অস্ফুট "Ah" শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীর মুখের বহুমূল্য পাইপটি মেঝেয় পড়ে চুরমার হয়ে গেল।

অতি মৃদুভাষী শিল্পীর ঐকান্তিক অনুরোধে রবীন্দ্রনাথকে সেদিন কিছু দীর্ঘ সময় ষ্টুডিওতে অবস্থান করতে হয়েছিল। ঘন গেরুয়া রঙের আলখাল্লার ন্যায় পোশাক পরিহিত দীর্ঘদেহী রবীন্দ্রনাথ পার্শিয়ান কার্পেটের উপর footstool-এ পা রেখে, অষ্ট্রিচের পালকে ঢাকা নরম ভেলভেট কুশন চেয়ারে যখন বসেছিলেন, তখন সেই আলোকোজ্জ্বল কক্ষে যেন ধ্যাননিমগ্ন ঋষিপ্রতিম এই মহামনীষীর দিকে শিল্পাচার্য্য এপষ্টাইন বারংবার অপলকনেত্রে চাইতে চাইতে মগ্ন হলেন তাঁর শিল্পসাধনায়।

কবিগুরুর প্রস্থানের পর, সেই দিন সন্ধ্যার পর এপষ্টাইন এলেন বন্ধু রদেনষ্টাইনের গৃহে। যেন ঝড়ের মত দ্রুতগতিতে তিনি প্রবেশ করলেন বন্ধুর ড্রয়িং রুমে। অত্যন্ত ধীরস্বভাব এই মৃদুভাষী শিল্পসাধককে এত বিচলিত, এত চঞ্চল দেখে রদেনষ্টাইন অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার হয়েছে কি? এত বিচলিত এত উত্তেজিত কেন?" এপষ্টাইন উত্তর দিলেন "উত্তেজিত হব না? তুমি জান আজ কি হয়েছে? সেই আশ্চর্য মানুষ আজ আমার ষ্টুডিওতে এসে প্রথম sitting দিয়েছেন। The Great Tagore যখন আমার ষ্টুডিওকক্ষে ঢুকলেন, সেই অপূর্ব-সুন্দর দীর্ঘদেহী সৌম্যকান্তি মানুষটিকে দেখে আমি স্তম্ভিত হতবাক্ হয়ে পড়েছিলাম। আমার চোখের সামনে কাকে দেখলাম —স্বর্গের কোন্ দেবদূত—angel না স্বয়ং Messiah আমার ষ্টুডিওতে প্রবেশ করলেন। একটি অস্ফুট Ah শব্দ আমার মুখ থেকে উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সেই অষ্ট্রিয়ান প্রিন্সের দেওয়া আমার বহুমূল্য পাইপটি মেঝেয় পড়ে খান খান হয়ে গেল।"

কফি-ভরা কাপে চুমুক দিতে দিতে, গলা ভিজিয়ে নিয়ে এপষ্টাইন আবার বলতে লাগলেন, "তাঁকে মহা-সমাদরে বসিয়ে যখন কাজ আরম্ভ করলাম, একবার সামান্য একটু ঘুরিয়ে বসবার জন্য তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়েছিলাম, তাঁর সেই saffron robe-এর sleeve আমি স্পর্শ করতে গিয়েছিলাম, কিন্তু পারি নি। মনে হ'ল Apollo Belvedere কি শুভ্র কেশ এবং flowing beard ধারণ করে আমার ষ্টুডিওতে বসে রয়েছেন? এ কোন্ Living God আমার সমস্ত ঘরকে এমন করে illumined করে দিলেন। আমি ইয়োরোপের অনেক Prince, Premier of Dominions এবং celebrated personalities-এর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেছি, অনেক racial types, বিশেষ করে caucasian stock-এর সঙ্গে আমি অতি নিবিড় ভাবে পরিচিত, কিন্তু বন্ধু বিশ্বাস কর, আমি টেগোরের মত এত রূপবান্, এমন austerely charming, এমন sublimely beautiful man আমার জীবনে কখনও দেখি নি।"

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন, বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ রূপদক্ষ, জ্যোতির্ময় রবীন্দ্রনাথকে এমনি ভাবেই দেখেছিলেন, উপলব্ধি করেছিলেন।

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীকল্যাণ দাশগুপ্ত, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৭৭।২।১ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩